



সামিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৬৬

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা]

কথামৃত

শ্রীশ্রীরাধিক পূরমহাসদেব । 'আমার চৌকপুত্রের কেহ শিবকেও কখন দেখনি, বিষ্ণুকেও কখন দেখনি ; অতএব কে বড় কে ছোট, তা কেমন ক'রে বোলাবো ? তবে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বাড়িয়েছে ; অতএব যার যে ইষ্ট, তার কাছে সেই দেবতাই অত সৰ্বল দেবতা অপেক্ষা বড় ।'

"পদ্মলোচন অত বড় পণ্ডিত হ'য়েও এখানে (আমাতে) এতটা বিশ্বাস ভক্তি কোরত ! বলেছিল—'আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে, সভা ক'রে সকলকে বোলাবো, তুমি ঈশ্বরারত্নার ; আমার কথা কে কাটতে পারে দেখাবো ।' মথুর (এক সময়ে অত কার্যে) যত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভার বোগাড় করছিল । পদ্মলোচন নিম্নোক্ত অনুরোধপ্রার্থী নির্ভাচারী ব্রাহ্মণ ; সভার আসবে না ভেবে আসবার ভয় অহরোধ করত বলেছিল । মথুরের কথার তাকে ভিজাসা করেছিল—'হ্যাঁসা, তুমি দক্ষিণেশ্বর আসে না ?' তাইতে বলেছিল—'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাঁকীতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি ।' কৈবর্তের বাঁকীতে সভার যাব, এ আর কি বড় কথা !'

'কেউ ভাতারি করে, কেউ খিয়েটারে ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বললেন । ওরা মনে করে 'অবতার' ব'লে আমাদের খুব বাড়ালে—বড় করলে । কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি ? ওদের এখানে আসবার ও অবতার বলবার জের আসে পদ্মলোচনের মত লোকে—যারা সারা জীবন ঐ বিবরের চর্চার কাল কাটিয়েছে—কেউ ছুটা মর্পনে পণ্ডিত, কেউ তিনটা মর্পনে পণ্ডিত—কত সব এখানে এসে অবতার ব'লে গেছে । অবতার কলার কুহুজান হ'য়ে গেছে । ওরা অবতার ব'লে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল ?'

"ওউ সব যার ঘুরে তবে চিকে উঠে ; দেখব থেকে হাজা অরুণি সন্সারে যত বকম অবস্থা আছে সে সবলর দেখে, ওসে, ভোগ ক'রে, তুচ্ছ ব'লে ঠিক ঠিক ধারণা হ'লে তবে পরমহংস অবস্থা হয়, বর্ষা জানী হয় !" এত সেল সাধকের নিজের চরমজ্ঞানে উপনীত হইবার কথা । আবার লোকশিক্ষা বা জনসাধারণের বর্ষা শিক্ষক হইতে হইলে কিরণ হওয়া আবশ্যক ভংসবতে বলিতেন—'দাম্পত্য্য একটা নরম দিয়ে করা যায় ; কিন্তু পরকে মামে হ'লে (শক করে মামে) ভাল ঈজার হবতার হয় ।'

পদ্মা গাঙের খেয়া

শতীন্দ্রনাথ অধিকারী

কথার বলে 'এক নদী বিশ কোশ', বিশেষ করে পদ্মা গাঙের খেয়াঘাটে।

এপারে কালোয়ার চর থেকে ওপারে বাজিতপুরের ঘাট লবধি পৌঁছতে লাগবে ঝাড়া এক ঘণ্টা, বহি নদী শান্ত থাকে। এপারে ধলাইলহ ওপারে পাবনা সহর। বাজিতপুর পাবনা সহরের বন্দর। জানে ভাটি বাড়াইতলা, হীমারগুলা। ঢেউএর প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে ঘরাঘাটটা পদ্মার বুকের মধ্যে মধ্যে পাশ কাড়িয়ে পাবনা পৌরালয় তیارাত করে। কাঁচি চর চিক্ চিক্ করে। সময় সময় খেয়ানাত ম চরগুলিকে সাবধানে অতিক্রম করে পারাপার করে। বর্ষাকালে খন এই চরগুলো ভুবে যায়, তখন পদ্মা সমুদ্র বিশেষ।

ভোর হয়েচে। প্রথম খেয়া হাড়বার সময় হয়েচে কালোয়ার ঘাট থেকে। শীতের শেষ। প্রভাতে মিঠে মিঠে রোদ, সঙ্গে শিরশিরে দ্যায় হাওয়া। পারের বাজীরা বেশ আনামেই প্রথম খেয়ার পোশাক্য গল্প-গুজব করছে, তামাক খায় খেয়া মাঝির কুঁড়ে ঘরের আমনে, কেউ কাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে। মাছ, তরিতরকারী, দুধ, মটর লসাই, পায়াজ, গুড়ের হাঁড়ি, শাকসবজী, গরু, ছাগল, ঘোষ, বুয়ী, পারের আশার খেয়া মাঝির ঘরের সামনে ছোটখাটো একটা বাজার সিয়েছে, কিন্তু প্রথম খেয়া হাড়তে দেয়ী হবে।

বাজীদের প্রেরের পর প্রেরে জানা গেল, জমির ভাই অল্পশহিত সেই প্রথম নাও হাড়তে দেয়ী হবে। বেলা বাড়ছে। খোদাবর নকারী হাঁক হাড়তো এনায়েৎ চাচা, লাও হাড়ো, বেলা হল, ইলিশ ছি বেঈশ্বর রাখা বাবে না।

এনায়েৎ বুড়ো মাছ। এই খেয়াঘাটের মাঝি ও মালিক। অনেক টাকার সে ঠাকুর বাবুর কাছারী থেকে এই ঘাট বন্দোবস্ত নিয়েছে। নিজে খাটতে পারে না। এনায়েতের দুই ছেলে জমির দার জহির পারঘাটের খবরদারী করে, পারাপারের ব্যবসায়ী বন্দোবস্ত করে দুই জন মাইনে করা মুসলমান মাঝির সাহায্যে। বুড়ো এনায়েৎ ঠাট খুব ভালই চালাচ্ছে, সবাই তার উপরে খুশী। বড় ছেলে জমিরই খরার কর্তা। পারঘাটের কায়দা কাছুন, বরণ ধারণ, নদীর অবস্থা, খরার অঙ্গ-সজ্জা তার নখরপূর্ণ। জমির নতুন বিয়ে করেছে আজ পামখানেক হল। রবিবারে সেই বে নতুন খন্তরবাড়ি গিয়েছে, আজ তার দিন হল কেরে নাই। তাইতেই খেয়া পারাপারের কিছু অব্যবস্থা বে। একারণে বাপ এনায়েৎ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিরক্ত। খেয়া-ঘাটের এতদিনকার পুন্যম নষ্ট হবে, সে কথা সে ভাবতেও পারে না।

খেয়াবাজীদের সোরগোল শ্রুত হল। দীর্ঘ নীকদারের পাবনা লোকী কোটে মোকর্দমা আছে। শিকদার মশাই বললেন এনায়েৎ, পোড়োতদের দিয়েই লাও হাড়ো। বেলা বাড়ছে। ওদিকে হলোয়া চ্যাচাচ্ছে পাবনা বাজার ঘরতে হবে এনায়েৎ তাই। সহরের জার। সে তো শিগেসের হাট লর।

এনায়েতের বকাবকির ঠালায় হোট ছেলে জহির গজর গজর রতে করতে বড় নাওখান্দর লগি খুলে ফেল ডাকলো—জার রে

তামিজ ভাই, পাঁড় ধর। তোমরা সব উঠে পড়ো ভাই সব। লাও হাড়লাম।

পারের বাজী অধিকাংশই আগে ভাগেই মালপত্র নিয়ে বড় নৌকার উঠে বসেছে, নৌকার গলুই পর্যন্ত বোকাই। বারা ভীয়ে কাঁড়িয়েছিল তারাও তাড়াতাড়ি এক হাঁটু জল জেতে নৌকার উঠে পড়ল। নৌকা হাড়ল।

নৌকা হাড়ামাত্র এপারের ঘরিশারের পাড়ির উপর থেকে হাতাখাখার দু-তিন জন লোক চ্যাচাতে লাগলো—আমাদের লিয়ে বাও মাঝিভাই, জমির, জমির ভাই পাঁড়াও।

আর 'মাঝিভাই পাঁড়াও' ততক্ষণ হালের দুই তিন বাইতে নৌকাখানা আধরশি এসিয়েছে, তীরের জলপ্রোতে কল কল ধনি তুলে বাজীদের কলগুজনের মধ্যে বাজা শ্রুত করেছে। কেউ কেউ মন্তব্য করছে—আরে বাবা, সাধারণ ছোটোছোটো খেয়াঘাটে গড়াগড়ি। পরের লাওএ আইসো গো—পরের লাও হাড়ছে।

প্রভাতে পর পর দুখানা নৌকা হাড়বার নিয়ম। তাই পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে আবার অনেক বাজী জড় হল। তিনটে গাইবাছুর এলো ওপারে সানিপুর বাথানে বাবে। নৌকা আর একখানা না হাড়লেই নয়। বুড়ো এনায়েৎ তামাক খেতে খেতে পড়েৎ জমারংকে বলল, দেখতো জমারং, হারামজাদা জমিরের আক্কেলখানা দেখ। বেটার তিন তিনটে দিন শব্দরবাড়ী মধুর হাঁড়ি খেয়েও আশ মিটলো না। এতবড় পদ্মাগাঙের খেয়া। যেটা শাড়ি দেখে তুলেছে। আহম্মকটাকে গেলে হয়, আমি ওকে পায়জার পেটা করব। আমার কিসে ভাগোৎ আছে রে বাবা! বাক্ চল, আমিই হাল ধরিছি। মাজার গামছা বেঁধে চট জরে চলে আর জমারং।

বুড়ো এনায়েৎ সাঁ করে গিয়ে আর একখানা খেয়ানৌকার হাল ধরে কেলল। ধবধবে সাদা পৌকখাড়ি, বুক সাদা গৌক সন্তর বছরের বুড়ো, গামছাটা মাখায় বেঁধে স্বর্ণ দুখানা হাতে হাল ধরে কেলল। বাড়িকো চিমুড়ে শুকনা দেহখানা বেন হঠাৎ বীরকণ্ঠে বিগত দৌরনের স্মৃতিকে কৈশে উঠালো। সবাই অবাক। আজ চার-পাঁচ বছর এনায়েৎ খেয়া নাওএর হাল ছোঁয় না। বৃদ্ধ বাজীরা বলল একী এনায়েৎ চাচা, তুমিই যে হাল ধরলে?

আর বোলো না বাহু, সে হারামজাদা গেছে খন্তরবাড়ি হাসিমপুরে। তার কথা আর বোলো না। আমার নসিব। ছেলেটা একেবারে বেরাঙেলে নালা চাষ। আজ তিন দিন হল পেছে। এতবড় একটা খেয়াঘাটের ভার তারি উপরে। হারামজাদা নিমকহারাম। কথার বলে চাষা বুদ্ধিশা—ঘরে আগুন বাইরে বাসা। আমার সেই মশা এই বুড়ো কালে। সে ভাই সব উঠে পড়। ওরে গরুহুডো ছটকট করছে, নাও তুলছে—ওদের বুকের কাছে থড় মেনা রে ভাই। জমারং, পাঁড় ধর। দেখো ভাই সব, লাও কাৎ না হয় বেন। ওরে ছাগল করটাতে বীধ। আয়ে বেশ বাতাস উঠেছে রে। পাল পায়ে-পাল পায়ে। পালের ছালা বীধ। তমিজ

ভাই, ছালায় দড়িটা ধরো না—এখানে বাঁধো। পাল খাটাই।
কেমন চমৎকার হাওয়া পেয়েছে! এইতো রেলপাড়ির মত
নৌড়োবে লাগে।

বাকী তমিজ সেখ এনারেত্তের বিশেষ পরিচিত ও অঙ্গুগত।
সে পালটা ঠিক করে ফেলল। একে পূবাল হাওয়া, তার পর
শান্ত নদীর তরতরে স্রোত। সমস্ত পালখানাকে অঙ্গুগতকারে
ফুলিয়ে বৌঁধো শব্দ পাড়ের অঙ্গে জলে কলকল শব্দ তুলে নৌকাখানা
পদ্মার বুকে ছুটে চলল। অনেক দিন পরে পাকা বহুদর্শী মাঝির হাত
পড়েছে খেদা নৌকোর।

ডানহাতে একাধি হালখানা ধরে বুদ্ধ এনারেং পাঁড়ালো
ঢোখে মুখে তার যে বিরক্তি ও অসহায় ভাব ছিল, তা কোথায়
উড়ে গেল। মনে হল যেন চম্পিন বহুরের বুকে এনারেং মাঝি আজ
বহুকালা পরে পদ্মা গাং পাড়ি দেবার মত খেদানৌকার হাল ধরেছে।
বোঝার নৌকা চলছে—দাঁ সা করে পদ্মার বুকে নিবিড় কলরোল তুলে।
এনারেং বেশ প্রকৃত চিত্তে গল্প জুড়ে মিল। মেজাজ ভাল থাকলে
এনারেং গল্প বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। 'আজও নির্ভাবনার
কিসের যেন কুস্তিতে সে গল্প জুড়ে মিল—তার বোঁবনের ইতিহাস।

বুঝলে তমিজ ভাই! তুমিও তো ঠাকুর বাবুর শিলেদা কাছারীতে
বরকন্দাজী করেছ। তোমরা আর কী দেখেছ ঠাকুর বাবুর দাপোটে।
সে সব দিন কি আছে রে ভাই? সে সব দিন কি আর কিরবে?
শোনো, সে সব কাণ্ডকারখানা। স্বদেশীর ডেউ লেগেছে সারা ভাণে।
ইংরাজরাও বাবুরের ধরে ধরে জেল মিচ্ছে। তবু ভাণময় হৈ-চৈ।
ঐ যে কী বলে বাবুরা—বন্দে মাতরং নাকি—ঐ বুলি সবার মুখে মুখে,
কত গান, কত কবিতা। বাবুদশাই আসেন জমিদারীতে—হৈ-চৈ
কাণ্ড, গায়ে গায়ে সাজা পড়ে গেল। কী চেহারা বাবুদশায়ের।
আঃ! জুড়ে-জালতায় গায়ে বরণ, সোনার বরণ লাড়ি, মাথায়
বাবরি চুল, পদ্মফুলের মত দুটো ঢোখ। বাঁশীর মত গলার স্রব।
বাবুদশাই গান গাইতেন—কত গান। সে সব তুলে গেছি। না না;
হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে আছে—ঐ যে 'তার মরা গাড়ে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাঙ্গা তরী।' ভেটী নায়ে বসে বাবু গাইতেন,—পেরজারা
হৈ-চৈ করে গী ছেড়ে তাঁকে ঘিরে ধরতো। কত উদ্‌য়লোক বাবু
আসতো—নানান্ ভাণ খেকে। স্বদেশী বাবুরা গান গাইতো আর
বাবু দশাইয়ের হাতে লাল নৃত্যো বেঁধে দিত,—সবার হাতে ঐ
রাজা নৃত্যো, ঐ 'জাঁধি বন্ধন' না কি যে বলে, ভাই বাঁধা। সব
বাড়িতে বাঁধাবাজা বন্ধ। বিলতী কাপড়, পাখা, লুপ রাজার ফেল
দিতো, পুড়িয়ে দিতো। সবাই পদ্মা গাঙে চান করতো সাতার
খেলত। আর বাবু দশাই কথা বলতেন—কী মিঠে গলার স্রব—
বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—আঃ—সে দিনের কথা কী বলব।

তমিজ বলল—আমরা শুনেছি। ঢোখে দেখিনি। আছে,
তুমি তো আগে ডাকাতি করতে? তুমি ডাকাতি ছেড়ে ঠাকুর বাবুর
বরকন্দাজীতে বহাল হলে কেমন করে, সেই গল্প কয় চাটাজী।

এনারেং একটু কেশে হেসে আবার আরম্ভ করল তার ডাকাতি-
জীবনের ইতিহাস। শোন—তবে শোন। আমি ডাকাতি করতাম
কনিষুদ্ধী সর্দারের দলে। সে বারে পুরেংপুরে কড়ি বসাকের বাড়ীতে
যে ডাকাতি হ'ল—তাতে আমিও ছিলাম একজন আসামী। আরে
আমি কনিষুদ্ধির দলের লোক হলে কি হয়—জানি নে, শুনিবে,—

আমাকেও লাল পাগড়ী পুশিয়ে ধরে নিয়ে আলো। কত তনয় হল
দায়োগা এসো, কনিষ্টবল এসো বলে দলে। কনিষুদ্ধী ধরা পড়লো।
মামলা হল কুঠের আমলাতে। আমি ঐ ডাকাতিতে সত্যিই ছিলাম
না—আর পেরমাণ হয়ে গেল। আমি খালস পেলাম। সাতমেজের
বারদেখি বাড়ীর ডাকাতিতে এক বছর জেল খেটেছিলাম। খেটগেজের
কেলে আমি টানিছি, খেদা ভাড়াছি—ওঃ বড় কষ্ট! তাই খালস
পেয়েই একেবারে শিলিমা বোট বাবু মশায়কে ধরলাম সেলাম ঠুকে।
তখন এরিগরের সেরা ওজাদ লেটেল মেয়ের সর্দার বাবু মশায়ের সর্দার
বরকন্দাজ হয়েছি। আর কালোয়ার মধু মাল, একাধি, হেঁউজের
হায়থর সর্দার রহিম বন্ধ, কোটপাড়ার এসমাইল, জোলাবালি, শিলিয়ার
তারণ সিং, কেতু ঢালী—এরা সব অনেকে ডাকাতি ছেড়ে বরকন্দাজীতে
ভরতি হয়েছি। বাবুদশাই সব গায়ের জেলেনের নিয়ে জামেজী বল
গড়লেন। তাদের সবাইকে লাঠিখেলা আর কুড়ী দেখাতে হবে।
কুড়ীবাড়ীতে লাঠিখেলা হল। আমি বাবু দশাইকে সেলাম করে
করেক হাত লাঠি খেললাম। বাবুদশাই ভারি ধুশী হলেন।
আমি বরকন্দাজী চাকরীতে বহাল হলাম। সে সব কি দিন
গেছে যে বাবা!

তার পরে শোনো, মধ্য বড় তাঁতের ইছুল হল। ঠকাঠক
ঠকাঠক তাঁত বসল শিলিহ কাছারীর মাঠে টিনের দাপডার।
দিন-রাত জ্ঞানর জ্ঞানর চরকা চলে। কুঠে কুড়ীবাড়ীতেও
তাঁত বসল। কত সভাসমিতি হল—কত গান। কাপড়,
পামড়া, চাদর ভৈরী হল। জমিদারীর ওজাদ জোলা
কারিকররা গায়ের লোকদের আর ছাত্তোরদের তাঁতের কাছ
দেখাতে লাগল। আবার খোলকর্তাল নিয়ে সাঁবের বেলা
লগরসকীর্জন বেয়াতো গায়ে গায়ে। কী সব গান—আবার
মনে আছে, কুচিনি—সোনার, বালা, তোমায় ভালবাসি।
আবার আগে চল ভাই—ওঃ সে কত রকমের গান। আর একবার
কী হল জানো? বাবু দশাই বোট চড়ে পাবনা সহরে গেলেন।
সেখানে মধ্য বড় সভা। শিলিহ কুড়ীর হাট থেকে বহুবাহুব নিয়ে
বাবুদশাই বোট ছাড়লেন। উঃ কীসে বিষ্টি! মূলধবারে বিষ্টি।
ম্যানেজার বাবু মাথার হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। পদ্মাগায়ে
বাবু মশার কী বিশপ হবে। তাঁর হকুমে আমরা চরমহালের
পেরজারা সব ডিকী-লাও নিয়ে বড়না হলাম। পকাশখানা লাগে
তিন চারশো পাড়ি। উঃ ঐ বহাকম বুলি মাথার করে বাজিতপুরে
দল বেঁধে বেয়ে দেখি, বাবু দশাই হাসছেন—পৌছে গেছেন ঐ হুস্ত
পদ্মা পাড়ি দিয়ে। আছার কুদরত। ভারি কুস্তি। বোদ্ধুব
উঠলো বলমল করে। উঃ পাবনা সহর তোলাপাড়। বাবু দশাই
গান করলেন, বাড়ী তিন বটা বস্তিমে মিলেন। লোকে লোকারণ্য।
আমরা মুখা মাছব, কী বা বুঝি। কতো রাজা মহারাজা আবার
ওমরাও এসেছিলেন। পাড়ি-খোড়া লোকলগ্নরে পাবনা সহর
জলজার। ফিটিন পাড়িতে বাবু দশাইকে চড়িয়ে পাবনার উকিল
বাবুরা বন্দে মাতরং শব্দে সহর কীপারে দিলো।

খেদা নৌকো তীরবেগে চলছে। এনারেং তখন গল্পে মজে
গিয়েছে। ডরা নৌকোর সবাই হাঁ করে শুনেছে। এনারেং
বলতে লাগলো—

তারপরে শোনো এক মহার কণ্ড! আমি বরকন্দাজী করি

সুখন ঠাকুর বাবুর ধোঁবপুরচরে। ভৈরব পাড়ার সীমানা নিয়ে নাটোবের ছোট ভরক রাজার সঙ্গে ঠাকুর জমিদারের বিবাদ। মায়লা মোকদ্দমা, বেওয়ারী কোজদারী, অনেক হল। শেষে নাটোবের ছোট ভরকের নারেব করল এক মজার কারসাজী। বলা নেই কণ্ডা নেই, ঠাকুর বাবুর সীমানা প্রায় তিন মাস চর জবর দখল করে এই মাদারকলার হামে প্রায় দুই তিন কুড়ি নাড়ার কুড়েকর বানিয়ে তাদের পেরজা বসিয়ে দিল। তাদের গরু মোব ছাগল চরতে থাকে। পেরার একশো দেড়শো বাসিন্দা। নারেব মশাই বললেন—এনারেং, আর তো ওদের সঙ্গে কোজদারী করতে পারি না। ওরাই কোজদারীকারা ককক, আমরা হব আসামী। কী উপায় করা যায় বল। আমি বললাম—হুজুর চূপ করে বুক ধরা দিবে বসে থাকুন। যেন কিছুই হয় নি। হেঁটে করতে বাধ্য করুন। আমি কোজদারীর আসামী হয়ে কাছ সাড়া কবে দি। নারেব মশাই নিশ্চিন্দ। কোন হেঁটে নাই, আমরা যেন কিছুই জানি না। একদিন ঠিক হুপুর। থা থা করছে চরের আঙনের মত বোধ। আমি চূপ করে ওদের পাড়ার কাছে ঘাট হাতে করে এই কাশবনে পারখানা করতে গিয়েছিলাম এক মজার কাণ্ড করে। আর বায় কোথায়? পেলার কাণ্ড। এই হুপুরে একেবারে লজ্জাকাণ্ড। সব নাড়ার কুঁড়ে ধুধু করে জলে উঠল। মেয়েরা গিছিল চানে, মিমসেরা সব মাঠে, গরু-বান্দুর সব চরছে বাউবোনায়ে। কেউ পরাণে মরল না—হেঁটে কাণ্ড, গরু বান্দুর গা গা করে ছুটতে লাগলো, মেয়েছেলারা হাউ-মাউ কেঁদে চর কাটিয়ে দিল। কী ভরকের আঙন। শেষে হায় হায় সব ছেড়ে আমরাই আঙন নিবিয়ে দিলাম। সব পাগিয়ে প্রাণ বাঁচালো। তার পরের দিন আমরা সেখানে পেরার ক্লিশ-ক্লিশ জন লাভল লাগিয়ে চ'সে কলাই ছিটিয়ে দিলাম। নশ-বারোজন আমাদের পক্ষের পেরজা মোতাইন করে দিলাম একদিনের মধ্যে। নাটোর রাজার নারেব ভাবাচাকা খেয়ে চূপ করে গেল। কিল ধারে কিল চুরি করল—কোজদারীতে মোটেই গেল না। এই মাদারকলার হামে আমাদের দখল হয়ে গেল। তারপরে চলল বেওয়ারী মায়লা। পাবনা কোট, হাইকোর্ট। যেমন ঠাকুর জমিদার তেমনি নাটোবের রাজা। কেউ কম নয়। বাবুমশাই চার মহাল তদন্ত করলেন, কাগজপত্র চিঠি বাতেন লকসা কত দেখলেন। জেদের মায়লা চলল বছরের পর বছর। তারপর আমাদের গাঁয়ে লাগল কলোরা। অনেক লোক মরল, গা সাঁক হয়ে গেল। আমার বিবি সেই কলোরাতেই মারা যায়। হুজো চাংড়া ছাওরাল নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়লাম। সবাই বলল—নিকে করো। আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াইতাম। কোন ছোটলোকের মাইয়া আনবো, ছাওরাল হুজার বতন হবে না—সসায়ে অশান্তি হবে। নিকে পুথতে মন মরল না। জহিরদি বোলা বলল—নিকে করো। হলিম মোজার বিধবে ম্যারাতারে নিকে কর, বড় ভাল মারে, তোমার ছাওরালদের অস্ত্র হবে না। পারলাম না। দিনরাত বোঁএর মরা হুখ চোঁহের উপর ভাসতো, তার কথাগুলো কানের মধ্যে বাজতো। তার জন্তে পরাণ্ডা সান্নাদিন আহলি-বিহলি করত। তার ডাগর ডাগর চোখ হুজো—আহা, মিঠি কথাগুলো—

জীর দ্বিতি জেসে, উঠলো বোঁএনের দ্বিতিকথার। তাই লজা

পেরে এনারেং সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিল। এমিকে পালের জোরে নৌকা পদ্মপাড়ি দিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাজিতপুরের ঘাটে এসেছে।

মাস ছয়কে কেটে গেল। বড় ছেলে জমির এসে ঘাটের ভায় নিয়ে বখারীতি খেয়ার কাজ চালাচ্ছে।

খেয়াঘাটের উপরেই বাটমাসির দোচালা ঘর। ঘরের সামনে বাঁশের বাধারির তৈরী 'চরাট' ওজাপোষের মত সবার বসবার জন্তে, আতিথ্য দেবার জন্ত। সারাদিন হকা কলকে তামাক চলে। একটা চারপারার উপর বসে এনারেং সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ঘরখানার পিছনে একখানা ছোট চালার রান্নাঘর। এনারেং রান্নাবান্না করে কখনো কখনো। আবার অনেক সময়ই হুড়ি চিড়ে ছাতু খেয়ে দিন কাটায়। আলত ও অবহেলায় খাওয়া দাওবার অসুবিধার এনারেংয়ের বর্জিকা বেশী প্রকট হয়েছিল।

ছেলে-অন্ত প্রাণ এনারেং জমিরের খন্তরবাড়ির উপরে অস্বাভাবিক চান কোন কারণে, তা অনেক দিন আগেই বুকেছে। তাই তার নিজের বাড়িখানা বা একেবারে লক্ষীছাড়া হয়ে গিয়েছিল, মেয়ামত করে নিয়েছে প্রায় দুশো টাকা খরচ করে। শুধু তাই নয়, গরু ছাগল পুবেছে হুঙ্গী পুবেছে। টোঁর বোঁকে এনে সসায়ে পরম মেহে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। লাউ কুমড়োর মাচা, মরিচ বেগুনের ক্ষেত তৈরী করে বোঁর বোঁ-এর সাথআছাদ মেটোবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিয়েছে। ছোট ছেলের বিয়েও প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছে। দুই ছেলেকে সসায়ে দ্বিত্ব করতে পারলেই এনারেং নিজের কর্তব্য শেষ করতে পারে। নিমতলামাঠে হোসেন সর্দারের জোতটা নিলাম খরিদ করে সতেরো বিঘে বানজমিও ছেলোদের জন্ত করে দিয়েছে। খেয়া-ঘাটের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার সাংসারিক উন্নতিও অব্যাহত আছে। ছেলে-অন্ত প্রাণ এনারেং অক্ষরে অক্ষরে তার পিতৃকর্তব্য পালন করে চলেছে। এ যেন তার পিতৃ-দায়িত্ব, কঠোর কর্তব্য সম্পাদন যাত্র। এত করবে এনারেং খেয়াঘটিতে থাকতো, রাত কাটাতো, খাওরা-দাওরা করত। বলত, ছেলোদের ঘর-দুজোর গুছিয়ে দিলাম। আর কি, আমি তো এখন খালাস। ওরা মাদ্রব হোক, অথৈ থাক, খেয়াঘাট চালুক, আর কি করব আমার কাজ খতম। এখন আচ্ছা কবে তাঁর পাহার তলার ডেকে নেবেন তারই আশার আছি বাবু। আমার কাজ আমি করেছি।

খেয়াঘাটে ভাঙা দোচালা ঘরে চূপচাপ বসে থাকে এনারেং। খেয়াঘাটের ঘরই যেন তার বাড়ি-ঘর সব। নিজের তৈরী সোমার সসায়ে বেখানে, সে বাড়িতে সে জলই যায়, সেও যেন নিতান্ত কর্তব্যবোধে। বোঁর বোঁদের ব্যবহার কথাবার্তা চালাচালনে সে আনন্দ পায় না। তার পরের মেহে, এসেছে সোয়ামী-সসায়ে নিয়ে অথৈ ঘর-সসায়ে করত। খন্তর লাঙলী বা আর কেউ যে সসায়ের তাগিদার থাকবে, তাদের অথৈর ভাগ বসায়ে সে রকম শিকা তারা পায় নাই। এনারেং স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পেল। হঠাৎ ছেলে তার নরনের মণি, তাদের অথৈই তার অথৈ। বোঁমারা খন্তরকে খেতে বলত, হুটো ভাত বেড়ে দিত, তামাক সঙ্গে খন্তর অল্পবোধ করল কলকের একটু আঙন দিত, দাওরা বসবার জন্ত চাটাই দিতো, এইমাত্র। এর বেশী যে স্নেহমত্যা আদর-বুড় বুড় পুত্রপুত্র প্রাণ খন্তর আশা করে, তারা তা বুঝতে না। বাড়িতে এলে এনারেংয়ের পরলোকবার্তাসী জীর দ্বিতি

এইজন্মেই তাকে বেশী কষ্ট বিড়। তার সোনার সংসার তো নয় তার সবই পর হয়ে গেছে।

কিছুদিন সহ্য করার পর অনায়েৎ এ সব আর গায়ে মাখতো না। খেয়ার হুঁড়ে ঘরে বেশ আরামে সে থাকে। অল্পবিধার মধ্যে সে রাজা করে খাওয়াটা একটা হাংগাম মনে করে। দু-তিনখানা গায়ের স্নানের ঘাট এই খেয়াঘাটেরই পেছনে। একটা বাউ বোনাভের প্রাচীরের ধার দিয়ে সেই একপেয়ে হাওয়াটা জলে নেমেছে। প্রাণের পুরুষ রমণী ছেলেমেয়েরা সেই ঘাটে আনাগোণা করে। তারা বৃত্তে পান্থে যে অন্য মাঝি বাড়িতেও যায় না, রাজা করেও যায় না।

ধর-সংসারওলা বুড়া মানুষটা এভাবে বাঁচে কি করে? চিড়ে-মুড়ি ছাতু খেয়ে একটা সমর্থ বুড়া মানুষ বাঁচতে পারে? ছেলে জন্মের কাছ্ জনেকেই অল্পবোগ করে, কড়া কথা পোনার—তার গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই? সত্যি কি সে বুদ্ধিমান চাষা? এমন স্নেহপ্রবণ বাণের উপর সমস্ত মায়ামমতা কি তারা অশ্রু বোঁ পেয়ে একেবারে ভুলে গেছে? জন্মের আর জন্ম এই নিয়ে তাদের জীবনের সাধে কগড়া বাধার, ছোটলোক চাষার ঘরের মধ্যে বলে গালাগাল পাড়ে। বাণের কাছে এসে অল্পবোগ জানায় হুই বেলা বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবার জন্যে। বাণ সবই শোনে, ছেলেদের মনের ভাব বেশ বোঝে, কিন্তু যে পাখানের আশ্বাসে বুকের বুক ভেঙেছে, সে আশ্বাসকে এড়িয়ে চলতে চায়। হা হা করে হেসে ছেলেদের অল্পবোগ উড়িয়ে দিয়ে সে বলে এই পদ্মাগাভের অক্ষুৎস্ত জল আর হাওয়ায় প্রায় বিশ বছর মানুষ হয়েছি। এই আমার ভালো। এই খেয়াপারের বাড়ীদের আনাগোণা মেশামিশি সারা দিনমান আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, কাজে ডুবিয়ে রাখে। আমার সেই সুখের পথে তোরা বানী হ'লেন বাণজান! আমি বেশ আছি, সুখে আছি।

বুড়া অনায়েতের মনের মধ্যকার পতীর ক্ষতের প্রকৃত সন্ধান পায় জনেকেই। বিশেষ করে একটা অনাথা ত্রীলোক। সেও জীবনে কারো স্নেহ পায় নাই, স্বামিপ্রেমের বাদও সে পায় নাই, কারণ সে বাল-বিধবা। কারও ঘরগাঁও সে হতে পারে নাই, কারণ সে রকম চেষ্টা করার মত দরদ তার ভাইদের নাই। তার ভাইবোরাও এই অসীম বিধবা বানীর মনের ঝোঁক তো রাখেই না বরং উঠতে বসতে তাকে খোঁটা দেয় গরীব ভাইদের ঘাড় বসে সে ভাত গেলে, আর পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। বাপ হলিম মোল্লা শেষ বয়সে ভিক্ষা করে খেতো—আর কষ্ট সহ্য করতে না পেয়ে একদিন কোথায় বেন নিরুদ্দেশ হল। নছিরণ হ'মালও স্বামীর ঘর করে নাই। ঘোর বর্ষার পল্লার মাছ ধরতে গিয়ে তার স্বামী রুড়ের মধ্যে মারা যায়। বাপ মা ভাইয়ের স্নেহ স্বামীর আদর সোহাগ বিধাতা তার কপালে লেখেন নাই। সারা পাড়ার হতভাগিনী টো-টো করে ঘোরে—বেথানে পায় সেখানেই হুঁহুটে খেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু ক'দিন কে ক'বে খেতে দেয়। তাকে পাড়ার চাহিদামত গভর খাটের পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়। উলাসীন অনায়েৎকে হুঁবেলা দেখে খেয়াঘাটে।

বুড়া অনায়েৎ খেয়াঘরে বসে বসে চুপ করে দেখে নছিরণ কারো বাড়ির জল টানলে কাঁখে কলসী নিয়ে, কারো ধারে কাপড় কেটে

দিয়ে সারা দুপুরের ঘোঁড়া মাথার করে। একদিন নছিরণ অনায়েৎকে ঘাটে একা পেয়ে বলল—মাঝি গো, তুমি এরকম উপোস করে ক'দিন বাঁচবে? আমি তোমার দুবেলার বেঁচে খাওয়াবো। এই রাজার ঢালার রাখবো—বুকে? একটা বুককাটা কাগজ তার গলুর ঘরে।

অনায়েৎ সবই বুঝেছে, কারণ ঘটকে হতভাগিনীর এই দুর্দশা সে দিনের পর দিন দেখে আসছে—হুটে ভাতের জন্য তার কী হানডা। বুধ হুটে কিছু কলতেও পারছে না—সইতেও পারছে না। সে বলল—বেশ, হুই ছেলে! আমার বেঁচে খাওয়াস। আমি সব বন্দোবস্ত করে রাখবো।

সেই থেকে অনায়েৎ ছেলেটা রাজাভাত খাচ্ছে, নছিরণের সেবাধর পাচ্ছে। হাটের দিনে একখানা সাড়ি আর গামছা কিনে বলল—নছিরণ, এই নে, সাড়িখানা পরিস। নছিরণ হাসিমুখে সাড়িখানা হাতে নিলো—ক্রোধ দিয়ে কয়েক কৌটা জল পড়ল। তা কিন্তু অনায়েতের চুই এড়ায় নাই। গভীর সমবেদনার তার মনের মধ্যকার দুঃস্থ ভালবাসা ফেটে উঠল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বর্ষার আগমনী সূত্র হয়েছে হুসুলদারী উম্মাসিনী নবাবোবনা পদ্মার অঙ্গে। পদ্মার বুক অস্বাভী চরঙো পদ্মার বিশাল বুক আলুর নিরেছে। কালবৈশাখীর উদ্যম নৃত্যে বোঝল চকলা পদ্মার নৃত্য সূত্র করেছে।

দিলেদহ সার কাছারী থেকে বরকন্দাজ মোহন সিং পরোয়ারা এনে দেখালো খেয়ামাঝি অনায়েৎকে। আগামী স্নানবাডা মেলার যে বিশৃঙ্খল বাদীসম্মান হবে গোপীনাথের স্নানবাডার উৎসব দেখতে, তাদের পারাপারের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করার জন্যে ম্যানেজারবাবু হুকুম সে শোনালো। এবছরে খেয়া পারাপারের নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। গত বৎসর ঐ প্রকাণ্ড মেলার পরদিন সাদিসপুর খেয়াঘাটের ওপারে চরের মধ্যে একটা নারীধর্ষণ হয়েছিল, অনেক কষ্টে সেই অপরাধী শুভাকে পুলিশ পকড়াত করে। হামলা-মোকদ্দমা হয়ে সেই শুভার জীবন বাস লাভ হয়। মেলার কয়েক দিন পদ্মার চরের নিকটেই গভীর রাজে নির্জনতার সুবাসে শুভারা এই রকম অত্যাচার করার ঠাকুরবাবুর হুমায় রটেছে, মেলার ক্ষতি হয়েছে, জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। তাই ম্যানেজারবাবুর কড়া হুকুম, স্নানবাডার মেলার তিন দিন তিন রাত্রি পারাপারের অতিরিক্ত বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে, আর দুর্ঘা অন্ত বাবার পর পরই এপার ওপার হুপারের খেয়া নৌকা বাদীবহন করতে পারবে না। পুলিশ আর প্রাসের খেজাসেরকেয়া এই সব তথ্যই তাগাদা করবে।

স্নানবাডার মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসরই খেয়া পারাপারের অতিরিক্ত বন্দোবস্ত করতে হয়। এতে যেমন খরচ হয় আরও খুব বেশী হয়ে থাকে। এবারেও সেই সমস্ত মালুদী ব্যবস্থা করার জন্যে জন্মের জন্ম হুই ভাই উঠে পড়ে লাগলো। এগিকে ঢোলসহক দিয়ে কাছারী থেকে প্রচার করে দেওয়া হয়েছে—মেলার তিন দিন তিন রাত স্নানবাডার পর সমস্ত খেয়াঘাট বন্ধ। কোন বাদী বেন পারাপারের চেষ্টা না করে এক খেয়ার বাটমাঝি বেন সতর্ক হয়।

অনায়েতের খেয়াঘাটে মেলার প্রথম দিন থেকেই বাদী-বাদীনি

অসম্ভব ভিত্তি। পুঙ্খ-বাড়ীর দ্বিগুণ ঘেরেবাড়ী। ঘেরেঘেরে বিরাট হলুদনির মধ্যে খেয়ার নাও ছাড়ো। আবার নতুন বাড়ী-পরিপূর্ণ নৌকা বাটে ভিক্সলেও অল্পরূপ কলধানি। কয়েকজন বাড়ী খেয়াবাটে বসেই হাল্লা-খাওয়া করে দেয়। অপরাধ ঢেঁড়াইর নানা দেশের বাড়ী-বাড়িনীর বৈচিত্র্যে খেয়াবাটের একধারে সেই খাটা বদলে গেছে।

বুধবার মেলায় শেষ দিন। তিন দিন তিন রাত্রি অবিরত পরিভ্রমে খেয়ার মাঝিরা সবাই ক্লান্ত। স্বয়ং এনারেংকও কয়েক বার হাল ধরে বাড়ী-পারাপার করতে হয়েছে। সারা দিন রাত খেয়াবাট লোকসমাগমে সরগরম। বৈকল্য-বৈকল্যীদের কীর্জন আর বাউল-ককিরদের গানে বুড়ো এনারেংকেব মনটা খুঁতে ভরপুর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার রূপালী চরণান। পদ্মায় বিশাল বুকখানা স্বকমক করছে। পূর্বা অস্ত যেতে যেতেই খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে, লোকের আনাগোনা নাই। নীরব নির্জন পদ্মাবক, খেয়াবাট পদ্মায় চর, তারুভূমির গ্রামগুলো। খেয়াবাটে কেউ নাই—একা এনারেং চরের উপর বসে তামাক খাচ্ছে। অনেক দিন থেকেই সে অভিমাত্রায় বেশী গভীর। নছিরপ রাবার ঢালায় রাগা করছে। এনারেং আজ বেশ খুশি। নছিরপকে বেশ খোসেঝাজে ডাকল—নছির, মেলায় গিয়েছিলি? মেলা দেখি ন? নছিরপ কোন জবাব দিল না। খুব চাপা ঘেরে নছিরপ। সে জানে এনারেং তার জন্মে মেলা থেকে রঙ্গগোলা পানতুরা এনেছে, একখানা তাঁতের সাড়ি এনেছে। সে জানে, এনারেং তাকে খুব ভালবাসে। এনারেংয়ের মনটা এই কারণেই খুঁশী আচ্ছন্ন। নছিরপ আজ আর নিরাশ্রয় নয়।

এমন সময় হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক একা এসে হাজির খেয়াবাটে। তার সঙ্গে না আছে কোন ঘেরে বা পুঙ্খ-সলী। রাত কম হয় নাই। এমন সময়ে একাকিনী স্ত্রীলোকটি খেয়াবাটে হাজির হল কেন? এনারেং ভাবতে লাগলো, মেয়েটির সাহস তো বড় কম নয়। খেয়াবাটে এই চরে সে কেন মরতে এলো?

মেয়েটি এনারেংয়ের কাছে এসেই এনারেংয়ের পা জড়িয়ে ধরল। কান্নার ভাঙা গলায় বলল—মাঝি, তুমি আমার বাপ। আমার বাঁচাও তুমি। আমার জাত বার ধর বার। আমি তোমার ঘেরে। এনারেং আশ্চর্য করল, কোন গুণ্ডা বদমায়েস এর পেছু নিয়েছে। সে বলল—ব্যাপার কি গো? কি হয়েছে বল তো?

সে বলল—এই চরের একটা লোক আমার ভুলিয়ে এনেছে। আমার গাঁয়ের সাখীরা গোপিনীখের মন্দিরের ভিতরে ছিল, আমি বাইরে মেলায় মধ্যে কাচের চুড়ি কিনছিলাম। সে লোকটা এসে বলল, তোমার বাড়ি তো সাতবেড়? তোমার সলীরা তোমার খুঁজে না পেয়ে বাড়ী রওনা হয়ে গিয়েছে। আমার বলে গেছে তোমার খেয়া পার করে কাজীপাড়ার নিয়ে বেতে। কাজীপাড়ার তারা তোমার অপেক্ষা করবে। আমি বিবাস করতে পারলাম না। কললাম আমি হেথায় থাকবো, তারা ঠাকুর দেখে আমার নিয়ে বাবে, কথা আছে। লোকটা ভাঙল না। তার সঙ্গে আরো তিনজন মুসলমান ছিল। শেষে তারা উর কেশোনা, নানারকম ধারণা কথা বলল, সে সব কথা বলতে

লজ্জা করে। তখন মনে করলাম, ওদের কথামত খেয়াবাট অবধি বাই। সেখানে গেলে হরতো বাঁচতে পারবো।

এনারেং আশ্চর্য হয়ে উঠল, বলল, তুমি এলো বাছা, আমার এই ঘরের মধ্যে গিরে বসে থাকো। তোমার কোন উর নেই। বা করবার আমি করছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার জন বগুয়ার্ক বুক এসেই বলল, মাঝি, আমরা পায়ে বাবো। আমাদের বাড়ির একটা ঘেরে এখানে এসেছে। তার মায়ের বড় অল্প। তাকে নিয়ে এই রাত্তিরেই বাড়ি বেতে হবে। সে মেয়েটা তোমার ঘরে আছে বোধ হয়, তাকে আসতে বলো। নাও ছাড়ো, না হয় বল, আমরাই ছোট নাওখানা নিয়ে পার হই।

এনারেং বলল এখন কেউ পারাপার হবে না। এখন বাও, কাল ভোরে এসো, পার করে দেব। সন্ধ্যা থেকে পারাপার বন্ধ, তা জানো না?

তার ক'জনেই অনেক কড়া কড়া কথা শুনাগো, তর্ক করল। শেষটার ওরা ছোট নৌকাখানা খুলে নিয়ে পার হবে জানিয়ে বলল, মেয়েটি কোথায়? তাকে ছেড়ে লাও। নইলে তোমার মাঝিসিঁরি দিখিয়ে দেবো। ঢালাকী করো না।

এনারেং বুঝলো এরা দলে ভারী। খেয়াবাটে সে সন্দিহান এক। তার পক্ষে দ্বিতীয় পুঙ্খ নেই। তাইতে এরা সাহস পেয়ে গেছে। সে অহরোধ করল—এখন খেয়া ছাড়া বেআইনী। তারা নৌকার হাত দিলে তাদের বিশদ হবে। কিন্তু তারা কিছুতেই শুনবে না। একজন বলল—মার শালাকে। আর দুজন খেয়ার কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হল।

এনারেংয়ের মাথা গম্ব হয়ে উঠলো; বলল—শোনো, আমি এনারেং লেঠেল, এনারেং ডাকাত, আমার গারে হাত দিলে তোমাদের জাল হবে না। আমার ঘরের মধ্যে কেউ গেলে মারা পড়বে। সাবধান। তোমাদের চিনি। বুড়ো মাছের কথটা শোনো।

লোক কয়টির হাতে লাঠি ছিল। তারা গালাগাল দিয়ে উঠলো। এনারেং এক লাফ দিয়ে কুঁড়ে থেকে তার বড় আড়ালটা খানা নিয়ে এগিয়ে এলো, আর বরাশারা আর আমার সামনে। নছিরপকে বলল নছির, মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়। শীগগির পালা।

বাথলো মারামারি। এনারেংয়ের লাঠির ঘরে একজন বরাশারী হল, তখন আর তিন জন তাকে একলঙ্গে আক্রমণ করল। নছিরপ হঠাৎ মাছের বীট নিয়ে ধেরে এলো পাছকোমর বেঁধে। তার তখন চাটুড়া-মূর্তি। সে বাক পাছে তাকেই বীটের কোপ দিচ্ছে আর প্রাণপলে চাঁৎকার করছে তোমরা এগোও, এগোও, ডাকাত পড়ছে ডাকাত পড়ছে।

সেই চাঁৎকারে বহু লোক ছুটে এল। তিন জন জোয়ান মর্দর সঙ্গে একা লাঠি চালিয়ে বহু এনারেং ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কিন্তু গুণ্ডা ক'জনও বেশ অল্প হয়েছে। বহু লোক এক সঙ্গে সঙ্গে মেলায় পুলিশ ছুটে এল। গুণ্ডাদের একেবারে করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। চারিদিকে হৈ-ঠে পড়ে গেল। এই রাত্রেও কাছাকাছি ক'খানা গাঁয়ের লোক সেখানে জমা হল। জমির আর অছির এসে

পড়ছে। বৃদ্ধ এনায়েতকে বরাবরি করে চতুর্থাংশ উপর উইয়ে দেওয়া হয়েছে। এনায়েতের জ্ঞান নাই, বুকের ডান পাশে ভয়ানক জখম, বয়সবশতঃ রক্ত পড়ছে। এ তো লাঠির খান্না। নহিষণ বলল—শুণাদের হাতে ধারালো অস্ত্রও ছিল। মনে হল তারা আত্মরক্ষার জন্য হোঁরা ব্যবহার করেছে। এনায়েতের ঐ অবস্থা দেখে সবাই ভয়ানক উদ্ভিষ্ট হয়ে উঠলো। নহিষণ জল ঢেলে এনায়েতের জ্ঞান সঞ্চার করতে না পেরে তার বুকের উপর কৈদে আঁড়ে পড়ল—ওহে আল্লা, এ কি করলে? মারিকে বাঁচাও আল্লা! তার বুককাটা অবিরাম কান্নার সবাই বেকী বিভ্রত হয়ে পড়লো, সরকারী ডাক্তার ডাকা হল।

ডাক্তার সব দেখে-শুনে বললেন, শুণ্ডারা হোঁরা বেয়েছে বুকের বাঁ দিকে, রক্ত বন্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য। সবাই হতাশায় ভেঙে পড়ল। কুঠে থেকে বড় ডাক্তার আনবার সময় পাওয়া বাবে কি না সম্ভব। জ্বর ও জ্বিয়ারে হুখ গুটিয়ে গেল, বাপজান বাপজান চীৎকারে ডাকের হুঁতারের কান্না, উপস্থিত জনতার চোখেও জল। সবার কান্না ছাপিয়ে উঠল নহিষণের কান্নার বোল—মারি গো মারি—আমার ছেড়ে বেগে না মারি—হা আল্লা, আমার মারিকে বাঁচাও। আমার রক্ত নাও।

সরকারী ডাক্তার রক্ত বন্ধ করবার জন্য কোন ক্রটি করছেন না। নহিষণ পাগলিনীর মত একবার জল ঢালছে—এদিকে ওদিকে ছুটে ডাক্তারের ওপর এগিয়ে দিচ্ছে আর ডাকছে বুককাটা কান্নার ভেঙ্গে পড়ে—মারি গো মারি—একবার ডাকো মারি। ঐ বে তোমার জ্বর জ্বিয়ারে ঝাঁড়িয়ে কীদছে। একবার চোখ মেলে চাও। মারি এই বে ডাকছি একবার কথা কও মারি, ওঠো কথা কও।

হঠাৎ এনায়েতের বেন জ্ঞান হল। চারিদিকে চেয়ে যন্ত্রণার কাতর শব্দ করে ডাকলো—নহিষণ, আর, আমার কাছে আর। উঃ আমার পরাণ বে বেঁধিয়ে ধার নহিষণ, নহিষণ আর আর আমার কাছে আর তোকে পাক্তের জলে ভাসিয়ে দিবে সেলাম রে—

নহিষণ তখন উম্মাদিনী। এনায়েতের বুকে দুটিয়ে পড়ে কীদছে মারি গো, আমার মিয়ে বাও, মারিও বাবো তোমার সজ মারি গো—উম্মাদিনী নহিষণের বুককাটা ক্রন্দন, সমবেত জনতার অজ্ঞাধারা—সব শেষ করে দিবে এনায়েৎ হুঁতিনবার মাথাটা কীকানি দিবে শেষ নিঃশ্বাস কেমনলো। খোঁরাখাট ক্রন্দনরোলে দুখরিত, অভাগিনী উম্মাদিনী নহিষণ মারির মধ্যে গড়াচ্ছে আর বুককাটা চীৎকার করছে মারি গো—মারি গো। পল্লার কলরোল ছাপিয়ে উঠছে তার বোহনধ্বনি।

স্থানাটোরিয়ম

শক্তি সুখোপাধ্যায়

এখানে বেশ আছি। সবুজ পাহাড়ের গায়
হুনিপুণ শিল্পীর হাতে-আঁকা ছবির মতন
প্রকৃতির বুক থেকে জেপে-ওঠা নতুন জীবনে
আলোর সন্ধান। স্থানাটোরিয়ম।

এখানে বেশ আছি। স্যাঁতসোতে বস্ত্রের গলি-দুঁজি ধরে
আর নয় থুক থুক কাশি।
হুখ দিয়ে রক্ত নেমে বুক ভেঙে অবিরত
আর নয় ভিলে ভিলে বিদগ্ধ জীবন।

এখানে বেশ আছি। তপতী তুমি আজও
নির্ভরে নিশ্চিন্ত হয়ে বাতায়ন খুলে
বসে আছে! এলোচুলে। আমার বারতাখানি
তোমার সৃষ্টির দ্বারে স্বপ্ন নিয়ে নামে।

এখানে বেশ আছি। প্রাণন্ত বনের কোণে
আমার বেড়ের ওপর কোন এক হতাশ প্রেমিক
যোমাক কাহিনী নিয়ে অতিশয় জীবন মারখানে
বিশীর্ণ দেহ তার তল্লাস চোখ মেলে জাসে।

এখানে বেশ আছি। সকলেই বলে,
বাজবোপ সেয়ে বাবে হুহ হাভো আসের মতন
জীবনকে কিরে পাবো
আগামী কালের কোন দিনে।

এখানে বেশ আছি। এ শুধু আখাস বাগী
মন আমার আলাহত, ভর হয় প্রতি পদক্ষেপে
প্রেমের ও জীবনের
হুহু এসে এই বুধি শিরে গাঁড়াল।

পৃথিবীর আলো বধি করে করে
চোখ দিয়ে অন্ধকার নামে
আমার হতাশ প্রেম হুহুয় হুখোহুখি এসে
প্রিয়তার অন্ধজলে হবে তার জীবন-সমাধি।

ইন্টারমিডিয়েটে অশ্লীল পাঠ্যপুস্তক

ডক্টর শ্রীমধাকর চট্টোপাধ্যায়

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওড়ি়া ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার একটি কবিতা পাঠ্য করেছেন। তার বিষয়বস্তু আর বাই হোক, স্কুলব্যবস্থায় বালক-বালিকার নিকট পরিবেশনযোগ্য নয়। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।—স]

কিছুদিন আগে ভার পড়েছিল ইন্টারমিডিয়েট ওড়িয়ার একটি ছাত্রকে কিছুটা সাহায্য করার। বাংলা-হিন্দীর মতই ওড়িয়াতেও টেকটবুক বা পাঠ্যপুস্তকের চাপ বেশী, নম্বর কম। চল্লিশ নম্বর বাইরে, বাট নম্বর বাইরে। কলেজ-এ অধ্যাপনা করতে করতে বিরক্ত হয়েছি এ কথা ভেবে যে, দুবছর ধরে ছাত্রদের যে ইন্টার বাংলার টেকট পড়ান হয় তাতে মাত্র চল্লিশ নম্বরের বিশদ আলোচনা করা হয়। আর বাকী বাট নম্বর যে-কলেজে ভাল টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা আছে সেখানে কোন বকমে বুজী-হোয়ার মত শেষ করা। অর্থাৎ অধ্যাপকরা 'টচ এণ্ড গো' না অহুমরণ করে 'টচ এণ্ড গো' সজ্ঞিত অহুমরণ করেন। পরীক্ষা সেই ধরনের হয়। ওড়িয়া পড়তে গিয়েও সেই ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। হুটি পড়তুম। হুটি কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতা। রাখানার্থ গ্রন্থাবলী পূর্বেই নাড়াচাড়া করেছি। ওড়িয়া সাহিত্যের উপর বাংলায় প্রভাব নিয়ে 'বহুমতী'তে 'বঙ্গসাহিত্য ও বহির্বিদ' নামে আলোচনাও করেছি ১৯৪৬ সালে। প্রথম ভেবেছিলাম এ বিষয়ে বীদিস নেব। পরে হিন্দী-সাহিত্যের উপর বাংলার প্রভাব নিয়ে বীদিস নিই। পুরোনো বই হাতে আসতে অমীর আগ্রহের সাথে পুনর্নির্দেশের আনন্দ অনুভব করলাম। 'রাখানার্থ গ্রন্থাবলী'র সব কবিতা পূর্বে পড়া হয়নি। তের বছর আগে গ্রন্থাবলীর ভূমিকা এবং 'মহাভারত' কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তের বছর বাদে 'গ্রন্থাবলী'র অপর একটি কবিতা পড়তে বসার আগে পড়তে বসলাম। ইন্টারমিডিয়েট ওড়িয়ার পাঠ্য কবিতা 'পার্কী'। ওড়িয়া সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ রাখানার্থ বার। ভূস্ব-নবীনের সমসাময়িক...ভূস্ব-নবীনের ঐতিহ্য। বাংলা সাহিত্যে ভূস্ব-নবীনের যে স্থান, ওড়িয়া সাহিত্যে রাখানার্থের স্থান তার চেয়ে কম নয়। 'কবির ৩রাখানার্থ আধুনিক উৎকর্ষের সাহিত্যিক সম্প্রদায় এবং গুণগ্রাহী বিশ্বমণ্ডলী-কর্তৃক সাহিত্যসম্রাটের স্বর্ধ্ব সিংহাসনকে অভিব্যক্তি হোই অছত্তি। বস্ত্তঃ ৩রাখানার্থ আধুনিক উৎকর্ষ সাহিত্য মন্দিরের সর্বপ্রধান নির্বাচ।' 'কবির রাখানার্থ' সত্যই একজন শক্তিশালী কবি। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অহুগামী হিসেবে হেমচন্দ্র নবীনের প্রেক্ষিতা পেয়েছিলেন, ওড়িয়া সাহিত্যে মধুসূদনের অহুগামী অমিত্রাক্ষরের কবি হিসেবে রাখানার্থের স্থান তার চাইতে উঁচুতে বসেই আমার মনে হয়। আজ হেমচন্দ্র সন্দেহ একথা বলা বোধ হয় অসম্ভব হবে না। মধুসূদনের কবি-প্রতিভা হেমচন্দ্রের ছিল না, তাই বর্ধ অহুত্বিত হিসেবে হেমচন্দ্রের কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য আছে, চিরন্তন মূল্য নেই। রাখানার্থ কবি। তাঁর সন্দেহ একথা বলা

বার না। ভারতের যে কটি সাহিত্য পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাতে বিশদ শতাব্দীর ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে রাখানার্থের যে বিশিষ্ট স্থান আছে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এই রাখানার্থের 'পার্কী' কবিতা ইন্টারমিডিয়েট-এ পাঠ্য। পরম আগ্রহের সঙ্গে কবিতাটি পড়তে শুরু করে নিলাম।

কবিতা পড়তে পড়তে মাথাটা যেন কেমন এক রকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝি ত? কেমন যেন গোলমালে ঠেকছে কবিতাটা। নিঃসন্দেহে কবিতাটি ভাল, কিন্তু বিষয়বস্তু ইন্টার-মিডিয়েটের, বার্য পনেরো বোলায় পা দিয়েছে তাদের পক্ষে, একবারেই অপাঠ্য বলে মনে হচ্ছে। ঐতিহাসিক ট্রাজেডির ভীষণতা এবং অন্তর্লভ হাহাকাঁর বরষ পাঠকের বোধগম্য...এবং গ্রীক সাহিত্যপিপাসুর পাঠ্য। বালক-বালিকাদের অপাঠ্য বিষয়বস্তু—মাতা পুত্রের বিষম পরিণতি। তবু সেখানে নিয়তির বিড়ম্বনার বিচ্ছিন্ন মনুষ্যপ্রেমের অভিলিপ্ত অর্ন্তনাদ। এখানে ব্যাপার আরও গভীর...এখানে পিতা-পুত্রের মধ্যে ব্যাপার, তাও উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের অজ্ঞতা নেই। এ ধরনের কাহিনী সাহিত্যে অপ্রচলিত নয় পিতার জন্ম উন্নত কস্তার কাহিনী ওডিসের 'ম্যেটামরফসিস'-এ রয়েছে (Cinyras and Myrrha)। কস্তার জন্ম উন্নত পিতা শিবঠাকুর বাংলা পদ্মপুরাণে দেখা দিয়েছেন। স্বপ্ন-বেদে এবিধ কাহিনী আছে। Cenciর ঘটনাও অজানা নয়। তবে 'এনসাইক্লোপিডিয়া গ্ৰীট্যানিকা' বলে যে পিতা Francesco Cenci কে কস্তা Beatrice Cenci সঙ্গ এ ধরনের অন্তার কিছু করেছিলেন তা প্রমাণিত নয় ("but there is no evidence that he tried to commit incest with her, as has been alleged")। এবিধ ঘটনা সাহিত্যে আলোচিত হ'লেও ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আলোচিতব্য একবারেই নয়। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া-ইন্টারমিডিয়েট-এ বার্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তাঁরা হয় কবিতাটি ('পার্কী') না পড়ে নির্বাচিত করেছেন, বা না ভেবে নির্বাচিত করেছেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভালও বাসি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তবুও একথা বলব যে না-পড়ে প্রশ্ন কস্তার ঘটনা বিবল নয়। আমার পাঠ্যজীবনেই ঘটেছে। ১৯৪৫-এ এম-এ-তে আমার প্রাথমিক তর্ষা 'ওড়িয়া' ছিল। একটি ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থে 'নববর্ষা ভাবনা' কবিতা পাঠ্য ছিল। কবিতাটি নতুন বর্ষাকাল সম্বন্ধীয়। বিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বইটি পড়েন নি। দ্রুতবেগে 'নববর্ষাকাল বর্ষা' এর 'নির্মলিকা' কাব্যগ্রন্থ উল্টোতে গিয়ে 'নববর্ষা ভাবনা' পড়েছিলেন; এবং ইংরাজীতে প্রশ্ন করেছিলেন যে "advent of new year" সন্দেহ কবি কি লিখেছেন বর্ষা? প্রশ্ন করেছিলেন কে জানি না, তবে ভুলেছি খুব সন্তব পণ্ডিত শোনাবরীশ মিত্র। পরীক্ষা দেবার পর আমার দল বেঁধে কনফারেন্সের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম এবং তদন্তের পর এ প্রশ্নটির জন্ত সবাইকে কত নম্বর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল ভুলেছি। বলা বাহুল্য, এ 'ডিস প্রশ্ন' নম্বর না পেলেও হয়ত ওড়িয়াতে আমি প্রথম হ'তাম।

এখানেও অহুত্বপ ব্যাপার ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং বিষয় নির্বাচন বার্যই করে থাকুন আমার এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীমুখ নির্মলকুমার সিংহ, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক রামতত্ত্ব লাহিড়ী

অবশ্যক আমাদের প্রবেশের শুধু উত্তর প্রদেশের রাজসভা এবং
কুলনার্থক ভাবাভায়ে ধর্য প্রদেশের উত্তর প্রদেশের সেন
মহাপ্রসাদের দ্বারা আকর্ষণ করছি। আর বাইরে বীরা আছেন
তাদের মধ্যে আমাদের শুধু এক হিন্দী বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থের
নির্দেশক উত্তর প্রদেশের রাজসভার চট্টোপাধ্যায়, পূজনীয় অবশ্যক
প্রিয়রঞ্জন সেন এবং প্রবেশের সাহিত্যিক প্রিয়নাথের দ্বারা মহাপ্রসাদের
আমার প্রবেশের বৈজ্ঞানিকতা বিষয়ে এবং ইটালি রাজসভার পক্ষে
পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত না করার জন্য আমি যে অন্তিমত জানাচ্ছি
তা কতখানি গ্রন্থগোষ্ঠী তা বিচার করতে বলি।

অসীমতা বিষয়গতও হতে পারে, বর্ণনাগতও হতে পারে।
দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ শুধু বহুবচনে, জেমস জয়েসের ইউলিসিস
এছাড়া। প্রথম শ্রেণীর অসীমতা 'পার্বতী'তে বিশেষ করে বর্ণনাময়
চিত্রা করি যে নির্দোষকমণ্ডলী পনের বোলার কচি কাঁচা ছেলে-
মেয়েদের জন্য বিষয়বস্তুটি অনুমোদন করেছেন।

কবির বাথানাথ দ্বারা 'পার্বতী'র ছুটি সর্গ কবিতার লিখে
যেতে পেরেছেন, বাকী অংশের প্রায় গড়ে লেখা রয়েছে তা তিনি
কবিতার রূপান্তর করার পূর্বে দেখাও করেছেন। 'পার্বতী'র
ঘটনা এইরূপ—

সমস্ত উৎকলে নিবিজর সেরে বীরসিংহ গজেন্দ্র রত্নপুর দুর্গ
অবরোধ করার জন্য তৎপর। শতবর্ষবাপী কত বৃদ্ধ হয়ে গেছে, কত
মহাপ্রাণী হত হয়েছে কিন্তু রত্নপুরপতির মস্তক অবনত হয়নি
এখনও। তাই রাজা গজেন্দ্র সমস্ত বিজিত রাজ্য ও রাজসৈন্যসহ
আপন সৈন্তবাহিনীর অধিনাতি হয়ে সেখানে দুর্গ অবরোধ করে
রয়েছেন দীর্ঘ দিন। সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজা নিজ কন্যাকে
নিরে গেছেন। কন্যা কৌশল্যা 'একমাত্র পুণ্ড্র অস্ত্রের সেই শিবির-
কটকবনে' কাঁটার মধ্যে স্তম্ভর কুলের মত হুটে রয়েছেন। এ কন্যা
"রূপে গুণে বাল্য অতুল্য জগতে"। কিন্তু এই কন্যা—

"গুপ্ত প্রেমে পড়ি সসজ্জা কৌশল্যা
হেলা সে সেনা-নিবেশে,
জলে তৈলবিন্দু পরা এ কলঙ্ক
ব্যাপি গলা দেশে দেশে।"

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে রাজকন্যার কলঙ্ক। কুমারী রাজকন্যা
'সসজ্জা'। রাজা রয়েছেন সৈন্ত ও কন্যাকে নিয়ে অবরোধ ক্ষেত্রে,
সেখানে এ ঘটনা কি করে ঘটল! রাণী রয়েছেন দেশে, তাঁর অন্তর
এই সর্বদা 'গুপ্তপাক' প্রায় নিরন্তর জ্বলছিল। মনে তাঁর শাস্তি
নেই। কেবল কৌশল্যার দুর্ভাগ্যের চিন্তা। হঠাৎ রাণীর কর্ণকূহরে
এক অশ্রুধারী বাণী প্রবীষ্ট হল—"কৌশল্যার কথা কহিব সে 'আগি'।
চমকে উঠলেন রাণী। কেউ কোথাও নেই।

এদিকে প্রাসাদ-নিধির বসে রয়েছে পর্যবেক্ষণ-নিরত কক্কী।
দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে কত দূরে রত্নপুর অবধি। প্রতি
পাহাড়ের মাথার আঙন আলোবার ব্যবস্থা রয়েছে। রত্নপুর বিজয়ের
সংবাদ অস্বপ্নে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে দ্রুতবেগে ছুটে
আসবে গজেন্দ্রের দেশে তাইই ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি রাজ্যে অন্ধকারের
মাকে ডুবে বাওয়া বৈদ্যশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থাকে কক্কী। আঙন
জ্বল কি? বিজয় সংবাদ কি আঙনের অন্ধরে শৈলনিধির কলসে

উঠল? প্রতিবার আসার পর দাঁসি বার। হঠাৎ একদিন জ্বলে
উঠল পাহাড়ের আঙন...এ পাহাড় হতে সে পাহাড়ে অগ্নিগন্ধে।
আনন্দ সংবাদ। কক্কী রাণীর কাছে ছুটল সেই আনন্দ সংবাদ
দিয়ে। কিন্তু কেবল আনন্দ সংবাদ। অন্ধকারের মধ্যে কেবল
বিজয়ের অগ্নি গন্ধেই লক্ষ্য করেনি কক্কী, আরও কিছু লক্ষ্য
করেছে। অশ্রুধারী রাজকন্যা হুড়ি সে স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে...সেই
অন্ধকারে। অবিকল সেই আকৃতি, সেই বেশভূষা কিন্তু "সে প্রভু
তাঁর নাই" সে বসনে কেবল বিবাহ বোঝা। সংবাদ শুনে রাণী ভবিত।
চতুর্দিকে আনন্দ সঙ্গীত শ্রবিত হয়ে উঠল, 'জয় গজেন্দ্র', কেবল
রাণীর মনে সুখ নেই, শাস্তি নেই। প্রত্যন্তে অশ্রুধারী হুত এক
গজেন্দ্রের বিজয় সংবাদ নিয়ে—

"বৃদ্ধ রত্নপুর পতি হেলে যথা—
রাজ্য হতে নিধন,
রত্নপুর জেমা অরুণা এসে
সেবিবে দেবী চরণ।
পূর্ণিমা দিনে বীর গজেন্দ্র
বিজ্ঞে করিবে ভবনে,
বিজিত বাঘত সামন্ত কুশাল
আসিবে মৃগ-গহনে।"

রাজা গজেন্দ্র রত্নপুর রাজকন্যা (রাজসেনা) অরুণা সৈন্ত ও
ও সঙ্গী রাজ্যের নিয়ে পূর্ণিমা তিথিতে ফিরবেন। আয়োজন চল
অভ্যর্থনার। সমস্ত পুরী আনন্দপূর্ণ কেবল রাণীর মনে সুখ নেই।
কন্যা কৌশল্যার কি হল? রাজ্যে নিযুক্ত নিধীবে বর্ণন সমস্ত পুরী
নিজামর তখন বহুবীর হতে ক্রন্দনধ্বনি ভেসে এল। রাণী সেই
ধ্বনি লক্ষ্য করে সাহসে ভয় করে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন
কন্যার আকৃতি। বিলাপ করছে সে হুড়ি। ভবিত হয়ে গেলেন
রাণী, পার্বতী। কিছুক্ষণ কথা বেলল না সুখ দিয়ে তার পর ধীরে
ধীরে প্রায় করলেন, কে তুমি? আমার কন্যার আকৃতি নিয়েই বা
তুমি এই ভাবে বৃদ্ধ কেন? হুড়ি পরিচয় দিল—

"হুঃখিনী কৌশল্যা জননী লো, তোর
অছি কি আউ জীবনে?
যেহ বসে মাতা এ হুঃখিনী বুঝা
গোহু ছুছি কি কারণে?
যেহরে পালিতা তনয়া ভোহর
নাহি এ মর্ত্য সঙ্গরে
আর্ন্তে অন্নু অছি অন্তঃসিনী এবং
ভব যবনিকা পারে।"

হুঃখিনী কৌশল্যা এই দশার কারণ সিবন্ধন করবে মায়ের কাছে,
তাই সে এসেছে। কতদিন বসে সে মাকে ডেকেছে যা ত তার
ডাকে মাতা নয়নি। আজ মা এসেছে, মাকে জানাবে সে সব কথা।
ভালতে লাগল কৌশল্যা আপন কথা :—

লোক যে বলে রাজকুলে জন্ম হওয়া ভাগ্যের কথা সে কথার
দিক। দিক আমার জন্মে, দিক রাজকুলে, দিক সে লোকসম্মানে।
"রাজ্যে আসলে মহাহর্ষতরে বাইখিলি বৃদ্ধকুলে, পিতৃসেবা, দ্বাভ
সেবারে মোহর দিন বাউখিলা জলে।" একদিন শিতা সমস্ত বীর

রাজাকে (বারা তাঁর সঙ্গী ও সাহায্যকারী ছিলেন) লক্ষ্যবিন্দু করে বললেন, পল্লবের এই প্রতিজ্ঞা আপনারা তখন। বাসিকা কৌশল্যা আপনাদের সমুখে, রূপে সে অভুলনীর। তখন সে বীরের বোঁদা। সেইজন্য কার্যকালে বাক্যবীর ও কার্যবীরের মধ্যে পার্থক্য করে বরষরা হবার জন্য এই বুদ্ধত্বের বজ্র এসেছে। এই রক্তপূর্ণ ছুঁশিরে যে বিকরী রাজা পতাকা তুলতে পারবে তাকেই বরষরা গ্রহণ করবে পতিরূপে। তারপর একদিন—

সম্মিলিত পুছিলে দিনে নূপ যোতে
“কহিহুটি জেমাননি
লাগণ্য প্রতিমা গ্রহণ করিবা
অন্তরুণে তা কি মনি ?
হুঁ কহিলি, ‘তহি কেউ দোষ ?’ রাজা
তনি হেলে জটন,
কহিলে, যেমন্ত আকৃতি বাহার
বিচার তার তেমন।
কহিবার হুঁহে বচনে ঝট্টা
নিশাযোগে বাহা মাতঃ !
অভাগীর কর দোষকু হেলা সে
দারুণ নিশা প্রভাত।

সেই রাত্রে দারুণ ঘটনার নিদারুণ সূত্র ইচ্ছা জেগে উঠল। নিরন্তর করার জন্য বলতে লাগলেন দিনের পর দিন রাজা। অবশেষে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নির্জন কারার প্রেরণ করলেন শিবিরের পাশে। লোক সম্মুখে রাজা বললেন যে, জট্টা বলে কণ্ঠকে তিনি কারার প্রেরণ করেছেন। সেই নির্জন কারাবাসে কেউ দেখা করতে আসতে না, কেবল রাজার আশার অধিকার ছিল—

“কেহি ন আসিলে দেখিবাকু যোতে
এক সে রাজা বিহনে,
রাজা সঙ্গে দেখা— ঠাক সে নিজুন
ক্রেঃ বিলা শতগুণে।”

কারণ, রাজা কেবল দেখা করতেই আসতেন না। “মর্ত্য বুদ্ধিপাক” এই রকম কয়েক মাস কাটল। অবশেষে “পাপ পরিপাক হেলা পাপগর্ভ লক্ষণ মোর প্রকাশ।” সংসারটুকু বাইরে প্রকাশ করলেন রাজা, বিচারক তিনি। কঠোর শাসনবিচারক, জট্টা কণ্ঠকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। সবাই রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আর কতায় নিদার ব্যস্ত। বাক্যকালে কারাগৃহে শিত আবির্ভূত হল। রাজা দেখলেন সেই শিতকে এক

“তার অবয়ব দেখিলে নৃপতি
সে পুত্রে প্রতিফলিত”

‘মহাপাপে মহাপাপ সাঙ্গাপন সাকর’ দেখা দিল। নবজাতক ও কৌশল্যা সোপানে ধট্টা পুরুতে প্রেরিত হল। সেখানে এক কূপে পাতিত হল কৌশল্যা ও নবজাতক বাহার নির্দেশে। সেই কূপে কিছু দিন শুষ্কভাবে নবজাতককে বাঁচাবার চেষ্টা করল কৌশল্যা। তার পর মায়া গেল সেই শিত। নিদারুণ জঠর বাতনার হাড়ের

সূত্র ঘটল। নবজাতকের প্রাণহীন দেহ কুণ্ডলিত সহায়ক হ’ল মাতায়—

সে কৌশল্যা এবং জঠর বালায়ে
ভট্টাঝিলা শিত শব।

শিতা কণ্ঠকে মারবার জন্য কেলসেন কূপে, আর মাতা পুত্র শরীরের সাহায্যে কুণ্ডলিত প্রায়শ পেল।

“শিতা হোই সূতা প্রাণ এহিরূপে
নাশিবার অনশনে,
মাতা হোই মন বলাইবা সূত
তনয়-তমু-ভোজনে ?
দেখিবার খাউ তেধি কি, এহো কি
তনিখিলু কর্ণে কে বে ?
কে কহিব এহি অমায়ুর্বা কথা
কেমন্তে সহিলে দেবে ?

কূপে সেই কূপে জীবনবরণ শেষ হল কৌশল্যার। এত সব কথা বলল কৌশল্যা মাকে। তার পর শেষ কথা বলে কৌশল্যা বিদায় নিল :—

“বাউছি মা’ যোতে যুগে যুগে মিলু
তো পরি জননী ভবে,
যো পরি ছাঁখিনী সূতা জাত পুনি
ন হেউ তোয় গরভে।”

‘ভীষণ অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা’ শুনে রাণী হতভম্ব হয়ে বসিলেন।

“মোর সূতা-ভাগ্যে এহি শিতা, হাহা !
মোহরি ভাগ্যে এ পতি !”

প্রথম সর্গের সমাপ্তির পর দ্বিতীয় সর্গে রাজ আগমন। সঙ্গে এলেন রক্তপূর্ণ-রাজকণ্ঠা অরুণা। মনুষ্যদন দত্তের দ্বারা অরুণাশ্রিত রাধানাথ রায় ‘মহাভারত’ মহাকাব্যে কি ধরনের অমিত্রাক্ষর ওড়িয়া সাহিত্যে প্রবেশন করেন তা আমি অগ্রহ (বঙ্গসাহিত্য ও বহির্বিজ্ঞ) আলোচনা করেছি। [এ প্রসঙ্গে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান জট্টা] এখানেও নীতা ও সরমাকে মনে পড়বে অরুণা ও পার্শ্বতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে। একজন শোকলিষ্টা শিউহারা অল্প জন শত্রুপুত্রকে কল্যাণকারিণী। মনুষ্যদনের ‘বিষা বিধাবার রমা অরুণাশ্রিত’ মনে পড়বে রাধানাথের কবিতা পড়তে পড়তে—

স্মিয়মাণা আহা, অরুণাশ্রিত তলে
কিহো কিহায়া রমা।

অথবা মনে পড়বে মনুষ্যদনের :—

বহিবার কালে, সখি, প্রাণ-পীড়নে
কাঁদে প্রবাহ, ঢালে, ভীর অতিক্রম,
বারিরাশি ছই পাশে ; তেমতি যে মন :
ছাঁখিত, ছুঁখের কথা কহে সে অশ্রুণে।

বধন রাগানাত্মক কবিতা পড়া হবে—

দেবি গো, প্রাণুটে তত্নী বেসনে
ন পাবে বারি সন্ধানি,
অসন্ধানি হুই পূব প্রবাহক
বেনি কুলে কি এ ঢালি
হুই সেহি পতি, শুনে যবে তার
বলি পড়ে জ্বল বাধা,
সম হুই জলে জলর ভিটাই
কহে নিজ-হৃদয় কথা।

এ অংশটি আরও অনেক কুলে বহুসংখ্যক মেঘনাদবধ কাব্যের
হুবহু অঙ্কন। সে-প্রসঙ্গ এখন আলোচনা করব না। এই
অংশে অরপূর্ণা আপন হৃদয় কাহিনী এবং রত্নপুত্র পরাজয়ের কল্প
কাহিনী বলে সর্গ শেষ করলেন। বাকী অংশ গুরুত্ব লেখা ঘটনা
কবি সেটি কবিতায় রূপ দিয়ে যেতে পারেননি। অরপূর্ণা
রাজপুত্র-প্রেমিকা, এদিকে রাজা নিজে তাকে গ্রহণ করতে চায়।
রাণী বধন শুনলেন যে পুত্রবধু সমা অরপূর্ণাকে রাজা গ্রহণ করতে
চান, আপন কস্তার ব্যাপারের পরেও তখন রাণী ভাবলেন, “এ মোহ
পুত্রটাকে মন সমর্পণ করি বিবাহ মোহর বধু, মৃতরাং কস্তা হানীরা
হোই-মহন্তি। এহাং উপরে পুণি অত্যাচার। হে বিধাতা!
কেউ পাণয়ে এ ডলি স্বামী পাইলি? এ পরি নররাক্ষস হু পৃথিবী
দীর পতি বোলি সহি শারস্তি, মাত্র হু পারিবি নাহি।”

রাণীর খণ্ডের আঘাতে মারা গেলেন রাজা। রাণী পুত্রকে
বললেন, “এ রাক্ষস নিজর যোশিত বৃকস্জহনর প্রতিজ্ঞা করিবিলা।
শুনি বিম্মিত হু অ নাহি, এহি রাক্ষস কোণল্যাঙ্ক জঠা করি সেহি
অনাথা বালিকাকু সন্তান নিহত করাইলা। কুমার, তুম্বর সেহি
প্রাণতপিনী ও মোহর সেহি প্রাণর হুহিতা কোণল্যা আক জীবনরে

নাহি। এ পায়র নিজর যোশিত বৃক বোলি মোহ কস্তার সত্যক
নই কলা।” রাজার বৃদ্ধা ঘটর পর, অরপূর্ণার বৃদ্ধা ও রাণীর
নিরুদ্দেশ পার্শ্বর্তীর পুত্রেণে সরাণ। এই পুত্রেণ কাব্যর কস্তার
কিন্তু কবিতা নয়। এই হুই সর্গের পার্শ্বর্তী কাব্য ইষ্টারমিডিয়েট
হাজহাজিরের পাঠ্য। এখন আপনারা বিচার কখন পাঠ্য
কবিতাটি ইষ্টার হাজহাজিরের পক্ষে অপাঠ্য কি না?

এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ‘মাসিক বঙ্গবন্ধু’ ১৩৬৬
সালে ডায়েরিয়ার ‘সম্মানসূচক’ প্রবন্ধটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
এইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীতে কি-এ অনাস এ পাঠ্য ছিল।
‘সম্মান-সূচক’ এইটি যৌলিক নয়, এবং এতে অল্পবয়ে বাল্যলীলার
প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে কিনা বাংলা কথার সাহায্যে তা
বিবেচনা করার জন্য ‘আমার আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলায়
হান’ এইটি দেখতে বলি। অথবা এ ব্যাপারে ডক্টর শ্রীমতীতীকুমার
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি বলেন, তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানার
চেষ্টা করতে পারেন।

পরিশেষে, গুড়িয়া সাহিত্যাহরণীরা যেন আমাকে ভুল না
বোঝেন তার জন্য বলছি যে পার্শ্বর্তী কবিতার কাব্যমূল্য সম্বন্ধে
আমি অচেতন ঘোটেই নই। বইটি ইষ্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে
নির্ধারিত করাতেই আমার আশঙ্কি। প্রভা রাধি আমি গুড়িয়া
সাহিত্যের প্রতি এবং কবির রাগানাত্মক আমি বিনম্র হোট
করার চেষ্টা করিনি। রাগানাত্মক অনেক আপেকার পূর্বপক্ষ
বালালী কায়হ ছিলেন এটা বাংলার পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা।
আর বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ সমালোচনার
প্ররই প্রর না, আমার সমালোচনার লক্ষ্য ইষ্টারমিডিয়েট সিলেবাসে
কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি না হওয়া বিষয়ে। এ হাজা আমার আর
কোন উদ্দেশ্য নেই।

খেরালী

মাধবী ভট্টাচার্য

মন রাত্রির কল্ললমাথা উজ্জল চোখ হুটি
থমুক যেদিন পাড়াবে আমার শব্দার পাশে এসে,
নীল আশমানে রঙ্গীন চাঁদ হানিয়ে কুটিল ক্রকুট
বপ-কুহেলি বিছাবো আমার নিবিড় শব্দা-প্রাণেশে।

ভোরের হাওয়ার সত্তা আমার খেরালী শব্দ বোনে
নীল নীল হুটি চোখে
গভীরের মাঝে কান পাতি কোন্ অমরার বাণী শোনে।

মন রাত্রির অকলতলে স্রব্ধেতে হুখ ঢাকি’
আত্মা হুকারি হুকারি বলে ভালবাসা কোথা রাখি?

রাত্রির কালো চোখে ইঙ্গিত ভেসে ওঠে

খেরালের জ্বরী জ্বলে চলে যাবে খেরালী তত্নী রাহি’
খেরালী সে কোন কল-কলসায় খেরালের পান পাখি’।



বকিমচন্দ্রের ধর্ম-জিজ্ঞাসা

ডক্টর হুশীলকুমার গুপ্ত

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা-বিজ্ঞান

ও ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা এবং ব্রাহ্মধর্মোন্মেষনের প্রতিজ্ঞা-রূপে কিছু সমাজের দ্বারা এবং চাকলা দ্বারা দেয় এবং সমাজের কেন্দ্রস্থল ধর্মের সনাতন আচার্যকে বলা করতে সচেষ্ট হন। বা কিছু প্রাচীন তার মহিমা-কীর্তন করে তাঁরা সমাজের ভিতরকে বোধ করত চেষ্টা করেন। ক্রমে যুগের প্রয়োজনে হিন্দুধর্মের সংস্কার জরুরি হয়। এই সংস্কার-আন্দোলনের অন্তর্গত প্রধান রাজক-বুদ্ধিমত্তা রূপোপাধায় (১৮৮১-১৮৯৪)।

জীবনের মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তা কোন বিশেষ ধরনের প্রতি প্রবৃত্তি দেখান নি। সাধারণ ভাবে তিনি নিজেই 'কোমপণ্ডী' বা 'পজিটিভিষ্ট' বলে পরিচিত হইতেন। তবে তিনি যে হিন্দুধর্ম সত্যক আদর্শে আরত করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নয়। ত্রৈমাসিক 'দি ক্যালকট্টা রিভিউ' পত্রের ১০৬ সংখ্যার ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'Buddhism and the Sankhya Philosophy' বুদ্ধিমত্তার বেনারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রক্ষেত্রে রূপোপাধায়ের 'The Mukherjee's Magazine' এর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের যে দ্বাদশ বুদ্ধিমত্তা 'The study of Hindu Philosophy' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে পোতাঁবাড়ার-রাজবাড়ীতে এক প্রাচীর ব্যাপারে পাত্রী ভেঙে ও বেজারের কুকমোহন বন্দোপাধায় হিন্দুধর্মকে অগ্রহণ করলে বুদ্ধিমত্তা 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে তাকে প্রতিরোধ করার সময়ে হিন্দুধর্মের মূলভঙ্গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করে ওঠেন। এই সময় তিনি পজিটিভিষ্ট বোমেনচন্দ্র ঘোষকে Letters on Hinduism নামে কতকগুলি পত্র লেখেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, উনবিংশ শতাব্দীর বিতরণার্থে এ দেশে 'পজিটিভিজমের' প্রবল ঢেউ উঠেছিল। তালতলার নীলমণি কুমারের এক আন্দোলনের ব্যপ্তিতে একটি 'পজিটিভিষ্ট' ক্লাব ছিল। এই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন বোমেনচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার, কুমারনাথ রূপোপাধায়, নীলমণি কুমার প্রভৃতি। এঁরা সকলেই পুরোপুরি কৌতের শিষ্য না হ'লেও 'হিউমানিটি' (humanity) এর সেবার জীবন উৎসর্গ করাকে মহত্তর কাজ বলে মনে করতেন। বোমেনচন্দ্র কৌতের মতবাদকে এসেশের লোকের উপযোগী করার জন্যে এর অংশবিশেষের পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। 'হিউমানিটি' এর বৃত্তি বীজবৃষ্টির জননী ম্যাডোনার প্রতিভূতির অঙ্কন করাই কৌতের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বোমেনচন্দ্র ম্যাডোনার বৃত্তির পরিবর্তে কঙ্কাপেড়ে খাড়াপরা ও কপালে সিঁহর দেওয়া একটি নারী শিল্পকে ভজ্ঞপান করাতেন—এই রকম বৃত্তি ভেদী করে তার নাম দিয়েছিলেন 'নারায়ণী'। এই ব্যাপারে কুকমল এক জন বড় 'পজিটিভিষ্ট' ছিলেন। স্মৃতিকথার তিনি বলেছেন, 'আমি positivist: আমি নাস্তিক।' বোমেনচন্দ্রের কৌতের হিন্দুধর্মী সংকল্প কটন, কুকমল প্রভৃতি 'পজিটিভিষ্ট'র সমর্থন দাত করে নি। বোমেনচন্দ্র কৌতকে খবির বলতে রাখে হ'লে

উঠেছিলেন এবং 'কবাবুয়সজাব' প্রকৃতি পূর্বের ভাব পর্যন্ত 'পজিটিভিজম' এর মধ্যে ঢালাতে চেষ্টা করেছিলেন। বোমেনচন্দ্রের দৃষ্টান্তে এই আন্দোলনের উৎকলনা কমে আসে। বোমেনচন্দ্রের সম্পর্কেই বুদ্ধিমত্তা যে কৌতের 'হিউমানিটি'র ভাবে বিশেষ ভাবে উন্নত হয়েছিলেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বুদ্ধিমত্তা নবযুগের প্রেরণা, উৎকর্ষ ও প্রয়োজনকে অঙ্কন করতে পেরেছিলেন। তিনি এ কথা স্পষ্ট ভাবেই বুঝছিলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈজ্ঞানিক বৃত্তিভঙ্গি এবং প্রথম যুক্তিমানের কাছে পুরাতন সত্যের ও শাস্ত্রবিধি কোনরূপেই আনুগত্য করতে পারবে না। কিন্তু তিনি এ কথাও অঙ্কন করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের আদর্শ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণেই এ দেশের আদর্শ হ'তে পারে না। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে তিনি কোন দিনই সূচীত হইতেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল—পাশ্চাত্য শিক্ষার সামগ্রিক হ্রাস করে হিন্দুধর্মকে নবযুগের প্রয়োজনানুযায়ী এক মানবধর্ম রূপদান করা। তাঁর মতে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবী প্রাথমিক সোপান। 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে বুদ্ধিমত্তা মনুষ্যকে মানবধর্ম বলে ধর্মের একটি সর্গাঙ্গী আদর্শ প্রতিপন্ন করেছেন।

কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই বুদ্ধিমত্তার ধর্মতত্ত্বের ধারণা স্পষ্ট হবে। বুদ্ধিমত্তার অমূলীনত্বের মূল কথাগুলি (২) এই—

- ১। 'শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি, প্রবণ করুন।
- ২। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অমূলীন, প্রযুগ ও চরিতার্থতার মনুষ্য।
- ৩। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।
- ৪। সেই অমূলীনদের সীমা, পদম্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।
- ৫। তাহাই স্বাধীন।
- ৬। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অমূলীন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরসুখী হয়। ঈশ্বরসুখিতাই উপযুক্ত অমূলীন। সেই অবস্থাই ভক্তি।
- ৭। ঈশ্বর সর্বভূতে আছে। এই ভক্ত সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্য নাই, ধর্ম নাই।
- ৮। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি; হয় এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।
- ৯। বুদ্ধিমত্তার মতে অমূলীন ধর্ম পুরাতন ধর্মের সংস্কার মাত্র। এ সম্বন্ধে বুদ্ধিমত্তা লিখেছেন—
- ১০। 'শিষ্য। অমূলীন আবার ধর্ম। এ সকল নূতন কথা।
- ১১। ভক্ত। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।' (৩)
- ১২। কালভেদে ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করতেন।
- ১৩। "ওক।.....তবে বিশেষ বিশেষকাল ধর্মই সম্বোধিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্মের নব সংস্কারে এই মূল কথা।" (৪)
- ১৪। বুদ্ধিমত্তা সত্যাসের পক্ষপাতী একবারেই ছিলেন না।

“ওক ।.....সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না—অজ্ঞতা: সম্পূর্ণ বলি না। অহুঁসন প্রকৃতি মার্গ—সন্ন্যাস নিম্নতম মার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম। জন্মান বর: কর্মেরই প্রেরিতা কর্তন করিরাছেন। অহুঁসন কর্তব্যক।”

বহিঃসত্ত্বা মনে করতেন, তত্ত্বজ্ঞান যে ধর্ম তা অতি নিম্নতম ধর্ম। সে যে তত্ত্বজ্ঞান নেই তা নয়, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রেরিত। বহিঃসত্ত্বার অহুঁসন ধর্ম গীতাত্ত ধর্মের এক নতুন বাণী মাত্র। তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বর্ণেই প্রদর্শন ছিলেন। তবে তিনি বলেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান তাত্ত্বিক সত্যিকার বৈষ্ণব হতে পারে না। বহিঃসত্ত্বার ধর্মবস্তুর মূলে কোথাও বৈষ্ণবিক বৃত্তিবাণ বা প্রকৃতিবাদের অধীকার করা হয় নি। তিনি ত্রিমূর্ত্তির সেই মর্ত্ত্যভাগকে অমর বলেছেন বা মর্ত্ত্যবোর হিতসাধন করে এরা মানব প্রকৃতিতে ধর্ম মূল।

“ওক —চিন্মূর্ত্তির সেই মর্ত্ত্যভাগ অমর। তিরকাল চলিবে, মর্ত্ত্যবোর হিতসাধন করিবে, কেন না, মানব-প্রকৃতিতে তাহার তিষ্ঠি।” ৬

ধর্মতত্ত্বের মূলে এই প্রকৃতিবাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্যীয়। এই প্রকৃতিবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রধান অলঙ্ঘন জীবন ও জগৎ। এইখানে বহিঃসত্ত্বার তত্ত্বমত্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি মরণীয়।

“ওক।—নিখিল বিশ্বের সর্বাত্মকই মর্ত্ত্যবোর সকল বৃত্তিগুলিরই অহুঁসল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়।” ৭

এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবেই বহিঃসত্ত্বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধনা ও ভারতীয় অধ্যাত্মপাশার সক্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহিঃসত্ত্বার কাছে জগৎ সত্য এবং দেহই প্রধান ও আদি সাধনের বস্তু। দেহ ও মনের প্রধান ও মূল বৃত্তিগুলির পূর্ণ উন্মোচনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। মানুষের ধর্মপ্রবণতা মানুষের প্রকৃতি থেকেই জন্মলাভ করে। মানুষের প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতির যে অবস্থা তার আদর্শই ঈশ্বর নামে অভিহিত।

“শিবা। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মর্ত্ত্য ত দেখি না।

ওক। মর্ত্ত্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাত্মক সৃষ্টির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য বৈষ্ণবত্বের নিগুণ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক ধর্ম্য প্রাপ্ত হয় না, কেন না যিনি নিগুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।—বাহ্যকে “Impersonal God” বলি, তাঁহার উপাসনা নিফল, বাহ্যকে “Personal God” বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।” ৮

বহিঃসত্ত্বার ঈশ্বরত্বের ধারণার মূলে ছিল ‘হিউম্যানিজম’ (Humanism)। এই ‘হিউম্যানিজম’ মানুষেরই পূজা, মানুষের মতোই দেবতার অল্পমকান ও আরাধনা। এই ‘হিউম্যানিজম’ের পথেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জীবন ও ধর্মজিজ্ঞাসার একটা সেতুবন্ধন হয়েছিল। বহিঃসত্ত্বা ব্যক্তির অধ্যাত্ম সাধনাকে কোন প্রকারের ধর্মার্থবর্ষ বৃত্তির আরাধনা বলে মনে করতেন না। সমাজসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে বহিঃসত্ত্বা সর্বভূতের মঙ্গল ও ব্যক্তির আপন কল্যাণ সাধনের দ্বন্দ্ব মিটাতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর দ্বন্দ্ব এই সমাজসেবার পথেই মানব-দেবতার সেবা করা সম্ভব। এই

ক্ষেত্রে বহিঃসত্ত্বা পাশ্চাত্যের হিতবাহকে অহুঁসনতত্ত্বের অধীকৃত করেছেন।

“ওক ।.....আমি যেখানে উঠাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার অহুঁসনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র।.....

মূলকথা, অহুঁসন ধর্ম Greatest good of the greatest number পণ্ডিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৯

বহিঃসত্ত্বা আদর্শিত সাধনকে পরহিত সাধনের নীচে স্থান দিয়েছেন।

ওক। পরের অনিষ্টমাত্রই অবর্ষ। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনায় হিতসাধন করিবার তাহারও অধিকার নাই। ১০

চিত্তের যে অবস্থার আদর্শীভূত ও পরদীপ্তিতে বিরোধের অবসার হয় বহিঃসত্ত্বার দ্বন্দ্ব তাই চিত্তজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। বহিঃসত্ত্বা এই মানবদীপ্তিকেই সকল নৈতিক গুণিতার উৎস স্থান দিয়ে একে মানবধর্মের অন্তর্গত করেছেন। বহিঃসত্ত্বা স্বজাতি ও বৈদেশীতিকে অধীকার না করে স্বজাতি ও বৈদেশীতীর দ্বন্দ্ব দিয়ে বিবর্তিত সাধনের প্রয়াসী ছিলেন।

“ওক। বহুত:—জাগতিক দীপ্তির সঙ্গে আদর্শীভূত বা স্বজন-দীপ্তি বা দেশদীপ্তির কোন বিরোধ নাই। পরসমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া বাহ্যকেও আপনায় সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক দীপ্তি ও দেশদীপ্তির সামঞ্জস্য। ১১

বলা বাত্বেল, এই দেশদীপ্তি ইউরোপীয় patriotism নয়; কেন না ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য পরসমাজের সূতন করে নিজসমাজের পুষ্টি সাধন।

বহিঃপ্রচারিত patriotism কে অরবিন্দ ঘোষ religion of patriotism বলেছেন।

“This is second great service of Bankim to his country that he pointed out to it the way of salvation and gave it the religion of patriotism, of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru.” ১২

বহিঃসত্ত্বা সনাতন ধর্মার্থকেই যুগের প্রয়োজনে শোষণ করে নিয়েছিলেন। বলতে গেলে সনাতন ধর্মার্থ একটা নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন,

“তিনি তত্ত্ববাকী (mystic) সাধক বা বোণী ছিলেন না—তিনি ছিলেন ঐটি Humanist; Humanismকেই বতখানি শোষণ করিয়া লওয়া যায় তিনি তাহাই করিরাছেন, এই কথা মনে না রাখিলে তাঁহার সেই সাধনা ও বিবিধ প্রতিভার মূল্য নির্ণয়ে কুল হওয়াই সম্ভব। ১৩

বহিঃসত্ত্বা তৎপ্রচারিত অহুঁসন ধর্মের উদাহরণ-ধরণ ‘কৃষ্ণচরিত্র’ রচনা করেন। পৌরাণিক ঈশ্বর কৃষ্ণের ঈশ্বর্য প্রতিপন্ন করা তাঁর উদ্দেশ ছিল না। কৃষ্ণের মানবচরিত্র সমালোচনা করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। যুগের ধর্মসাধকের প্রেরণাতেই বহিঃসত্ত্বা কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনার উদ্বুদ্ধ, কেন না কৃষ্ণ একেই সর্বব্যাপক।

‘প্রচারে’ বার্ষিকভাবে তাকে বের হ’য়ে ‘কুচরিত্র’ ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ১২ই আগষ্ট পৃষ্ঠকাভাবে প্রকাশিত হয়। অল্পদীর্ঘকাল পরে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্নচক্র ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) নামক ত্রিভাষিনি উপভাস রচনা করেন।

পুণ্ড্রী-বলহি, বৈকুণ্ঠের প্রতি বিভিন্নচক্রের আন্তরিক প্রভা ছিল। তাঁদের ব্যক্তিতে রাধাবল্লভের নিত্য পূজা হত। তিনি কীর্তন শুনে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এসবক বলা বার যে, বিভিন্নচক্রের রচনার কীর্তনীয়ার চরিত্র হুড়ি ও কীর্তনের উল্লেখ তাঁর বৈকুণ্ঠের প্রীতির পরিচয় প্রকাশ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, “একবার ভনিরাহি, কীর্তনওয়ালকে পোলা দিতে দিতে তিনি ‘মঙ্গলমের’ তহলি খালি করিয়া মিলাছিলেন। পানের উপর তাঁহার বেশ খোঁক ছিল।” তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু ভ্রমের নিকট গমন পিছিয়েছেন।

বিভিন্নচক্রের কুচরিত্রের ওপর বৈকুণ্ঠের প্রভাব আছে। বৈকুণ্ঠের প্রভাবই বিভিন্নচক্র কুচরিত্রের বানবস্তা ঢেলে দিয়েছেন। অল্প সেই সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রধর্মের প্রভাবে বিভিন্নচক্র তাঁর কুচরিত্রকে দার্ঢ্য, ঐর্ষ্য ও তেজবিতার মণ্ডিত করেছেন। শুধু তাই নয়। পাণ্ডিত্যের বুদ্ধিবাদের সাহায্যে তিনি কুচরিত্রকে বহু পৌরাণিকতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে এনেছেন। কিন্তু এসব সঙ্গেও বলতে হয় যে, বিভিন্নচক্রের কুচরিত্র আদর্শজ্ঞানে লোভ উপাসনা করবে এ কখনই সম্ভবপর নয়। বিভিন্নচক্রের মধ্যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক অহুভূতির অভাব ছিল। শুধু rationalism-এর দৃষ্টিই প্রধানতঃ তাঁকে কুচরিত্র প্রণয়নে চালিত করেছে। ঐক্যচক্রের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে কালীনাথ দত্ত লিখেছেন, “সাধারণ মানুষের একজন উপাসকের আদর্শ চান—একজন ভক্তের প্রতিচ্ছবি দেখিতে চান। ঐক্য চরিত্রে ‘ইহার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে না ছিল বৈরাগ্য ও ভগবৎনির্ভর, না ছিল ভগবৎভক্তি, না ছিল ভগবৎ-প্রেম, না ছিল ভগবৎ-বিবাসের গভীরতা ও প্রশস্ততা।”

বিভিন্নচক্র নিজের এই অভাব বোধ করেছিলেন “কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ‘ধরতলে’ বলিয়াহি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধান বৃত্তি। কুচ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির হুড়ি দেখিলাম কৈ?”

বিভিন্নচক্র এই বর্ধজিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন নি।

বিভিন্নচক্রের কুচরিত্র ব্রূত হলে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে হু—একটি কথা জানা আবশ্যক। বিভিন্নচক্রের প্রধান শিকা তাঁর পিতার কাছে। পূর্ণচক্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ হানচক্রের জীবন দান করে তাঁকে দীক্ষিত করেন। ১৭ এদিকে তিনি পরম বৈকুণ্ঠ ছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সন্তুত গ্রন্থাদি পাঠ করেই বিভিন্নচক্রের মনুষ্য প্রথম বর্ষের উদ্দেশ্য হয়। র সব সন্তুত গ্রন্থাদি বিভিন্নচক্র পাঠ করেন তাদের মধ্যে জ্যোতিষতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রও ছিল। বিভিন্নচক্রের রচনাদি থেকেও প্রমাণ করা যায় যে, তিনি তত্ত্ব, মন্ত্রশক্তি, দৈববল ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শাস্ত্রভাব প্রধানতঃ এই বিশ্বাস থেকে পাওয়া। এর পর পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবাদ, ‘Humanity’-এর আদর্শ প্রভৃতি তিনি

পাণ্ডিত্য শিক্ষার কল্যাণে লাভ করেছিলেন। এই তিনটি বার্ষিক বিভিন্নচক্রের কুচরিত্র আভিষিক্ত।

‘ভববোধিনী’তে যিহেননাথ ঠাকুর কুচরিত্রের সমালোচনা করলে ‘প্রচারে’ বিভিন্নচক্র তার জবাব দেন। এই প্রসঙ্গে যিহেননাথ তাঁর বুদ্ধিকথার বলেছিলেন,

“কেন বিভিন্ন হুঁচো কুচরিত্র অবতারণা করিলেন, এবং এক কুচকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বিভিন্নচক্র শেবাশি বড়ই সীতাজক্ত হইল না কেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়া পাক positivist ছিলেন। Positive Philosophy বাহাই হউক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা Positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অবশি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন grandman—মহাপুরুষ। বিভিন্ন বাবু ভাবিলেন, এই ভ আহার হাতের কাছে একজন grandman বহিয়াছেন; যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই বকম চৌকস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে positivist religion দাঁড় করাইতে হইলে ঐক্যকে grandman করিলেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে। তবে বুঝাবনের ঐক্যকে আর মহাভারতের ঐক্যকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বিভিন্নের কুচরিত্র।”

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ বিভিন্নচক্রের ধর্মতত্ত্বকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন। ১২১১ সালের (১৮৮৪) অগ্রহায়ণ মাসের ‘প্রচারে’ বিভিন্নচক্র ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যহিন্দুপ্রদায়’ নামে এক প্রবন্ধে এই আক্রমণের বলিষ্ঠ জবাব দেন।

বিভিন্নচক্র ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখা বলেছেন।

“ব্রাহ্মধর্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, বাহাতে মনে করা বাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্মে পরিণত হইবে।”

বিভিন্নচক্রের জীবনের শেষের দিকে পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি উত্তর ও পূর্ব বাংলা থেকে কলিকাতায় এসে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবরণ করে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার প্রোতা ছিলেন বিভিন্নচক্র, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ। হুঁতিনটি বক্তৃতার উপস্থিতি হবার পর বিভিন্নচক্র আর বাননি। এই প্রসঙ্গে বিভিন্নচক্র চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন,—

“.....ওগুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নাচিয়া ‘ধরাকে সরা জ্ঞান’ করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন ছারি কল হইতে পারে না। মালা, তিলক, কোঁটা ও শিখা রাখায় যে বর্ধ টায়ে, আর ঐগুলির আভাবে যে বর্ধ লোপ পায়, সে ধর্মের জন্ম বেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাপুত্র ব্রাহ্ম-পণ্ডিত, তিনি এখনও বৃত্তিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার কলে বেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ বর্ধ চায়।” (২০)

বিভিন্নচক্র তাঁর ‘দৈবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম’ নামক প্রবন্ধের এক স্থলে ফুটনোট বলেছেন,—

“পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, মহাপুত্র যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে

নিম্নে, তাহা আমাদের হস্তে কখনই টিকিবে না এবং তাহার বই পলাইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাহার কোন কথাই প্রত্যাখ্যান করিলাম না।" (২১)

উপরে আলোচনা থেকে বহুবিভাগের ধর্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপ স্পষ্ট হবে বলে বিশ্বাস। বহুবিভাগের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা ধর্ম।

সেই কারণে তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে পরিচিত না হ'লে তাঁর চরিত্রের পূর্ণরূপ গ্রহণ ও মূল্যনির্ণয়ণ সম্ভব নয়। বহুবিভাগের ধর্মজিজ্ঞাসার মধ্যে উনবিংশ শতকের শেষের উৎকর্ষ ও প্রয়োজন বরা পড়েছে। এই হিসেবে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা একটি বিশিষ্ট মূল্যে মহৎ ও দীপ্তিময়।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। বিশদবিহারী গুপ্ত। পুরাতন এসজ (প্রথম পর্ব)। কলিকাতা ১৯১৩ : পৃ: ২৩০।
- ২। বহুবিভাগের গ্রন্থাবলী (সাহিত্য গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ) : বহুমতী সাহিত্য দপ্তর বাঙ্গালার : পৃ: ৮২
- ৩। ঐ : পৃ: ৭
- ৪। ঐ : পৃ: ১৪
- ৫। ঐ : পৃ: ১৮
- ৬। ঐ : পৃ: ১৪
- ৭। ঐ : পৃ: ১৭
- ৮। ঐ : পৃ: ১১
- ৯। ঐ : পৃ: ৬৭
- ১০। ঐ : পৃ: ৬৬
- ১১। ঐ : পৃ: ১৪৪

- ১২। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত বহুবিভাগের (পরিশিষ্ট-২)। কলিকাতা ১৯২১ : পৃ: ১৫।
- ১৩। মোহিতলাল মজুমদার : বাঙ্গালার নবমূল : কলিকাতা ১৯৪৫ : পৃ: ১৪।
- ১৪। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত বহুবিভাগের : পৃ: ১৫৭।
- ১৫। ঐ : পৃ: ২৫০।
- ১৬। বহুবিভাগের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ : পৃ: ১৭০।
- ১৭। বহুবিভাগের : পৃ: ১৮-১০২।
- ১৮। বিশদবিহারী গুপ্ত : পুরাতন এসজ দ্বিতীয় পর্ব : কলিকাতা ১৯২৩ : পৃ: ১৯৫-৫।
- ১৯। বহুবিভাগের সাহিত্য গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ : পৃ: ৩৩৯।
- ২০। বহুবিভাগের : পৃ: ৩০৩-৪।
- ২১। বহুবিভাগের চট্টোপাধ্যায় : বিবিধ (সাহিত্য পরিষদ দ্বা)। কলিকাতা ১৯৪১ : পৃ: ১৮৭।

ছুটি

অমিত বসু

কাগজ কাগজ রাশি রাশি নাম আবার শব্দ
বাতায়াত বোজ কথোপকথনে কাটাই দিন,
জমা ও খরচ মিলিয়ে করিয়ে মাথার ঘাম
বিল-ভাউচার সাজিয়ে-গুছিয়ে মিটিয়ে দাম।
প্রতি মিনিটের প্রতি আনা-পাই সূদে ও মূল
চুকিয়ে তবেই ছুটির বাতাস লাগাই চলে,
সে ছুটি মরবে দেওয়ালের চাপে ডাইনে-বামে
সে ফুল স্বরবে আঙাবলের ফুলের ঘামে ?
অথচ কিছু নেচে উঠাল হু' বাহ ফুলে
সেই নির্জন বাগিচা-ফুলে উঠবে ফুলে,
চেটে ছেকে ছেকে কিছুক ফুড়িয়ে হুজবে তারা
কিরবে রাস্তা খুঁজিতে উথলে ক্ষুধার সারা।
হুগুরের ছায়া বিকেলের মাঠে শিকার সেরে
হাড়িলা ডাক বুনে। তিষ্ঠির সরাল মেঝে,
আবার সুরের অনুরে সুরা-ওমর-সাকী
হুয়ে সাড়া দেবে পাহাড়ের কোলে পানের পাখী।
বকুলের ফুল স্বরে টুপ টুপ কোলের কাছে
মিকটে উক নিবিড় গুমের ইসারা আছে,
রাত গাঁত হ'লে গাছেরা যুগোলে আকাশ জাগে
ফুলের পেহালা তবে ওঠে জাগে ভোরের আলো।

যন্ত্রদানব না যন্ত্রদেবতা ?

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

[এরা নানা জাতির লোক কলকারখানার রহস্য আরও করবার জন্যে এক অবাধ উৎসাহ ও স্বর্বাঙ্গ পেয়েছে। তারি একপ্রকার কারণ যতকৈ ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসিধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যতকৈ দোষ দিই, মাতলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। —রবীন্দ্রনাথ (বাশিয়ার চিঠি)]

রক্ষণশীল বা সনাতনপন্থী বলতে বা বোঝায়, লোক সাধারণত সেটা পছন্দ করে না। সমাজে রক্ষণশীলতার কছর নেই। অথচ আধুনিক চিন্তাজগতে সনাতনপন্থার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় নানা দিকে। এমন কি আধুনিকপন্থী বা অগ্রগতিপন্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ আচমকা একটা বা খেয়ে বা অন্য কোন কারণে বাতাবাতি ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে সনাতনপন্থার গুণ গাইতে শুরু করেন। রক্ষণশীলতা কেউ পছন্দ করে না অথচ তার অস্তিত্বও থেকে যাওয়া এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে। আধুনিক রক্ষণশীলতার ইতিহাস হচ্ছে অগ্রগতিশীল গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবাদার সমস্ত রকম অগ্রগতি ও স্বাক্ষরের বিরোধিতার ইতিহাস।

এতদ্ব্যতীত বার্ক ক্রান্সি বিপ্লব সম্পর্কে বা বলতেন আজকের সনাতনপন্থীরা রূপ বিপ্লব সম্পর্কেও সেই ধরনের কথাবার্তা বলেন। সমাজতন্ত্রের দেশে বিজ্ঞান ও স্বত্বকৌশলের অভাববীর্য কীভাবে দেখে আঁৎকে উঠছেন তাঁরা, বলছেন সেই স্বত্বগততা মানুষের পক্ষে সম্ভব বিপদ। কারণ মানুষ সেখানে স্বত্ব-মানবের দাঁস হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির ক্রমাঙ্কগততার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিকে যেতে তাঁরা নারাজ। অতীতের সামনে বর্তমানকে তাঁরা এমন ভাবে আলাদা করে খাড়া করতে চান যেন পট-বস্মা আধুনিক যুগ গৌরবময় স্বতীতকে প্রায় কবে ফেলার চেষ্টা করছে। এই ধারণাটি যথ্য প্রেক্ষার কিছু বুদ্ধিবীর্য মধ্যেই বেশি দেখা যায়। তাঁরা সাননে সেকালের মধ্যে যুগ ওঁজে স্বস্তি পেতে চান। সমাজের অগ্রগতি তাঁদের মধ্যে এই ধরনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স এবং আধুনিক সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বাটাই করেন। তাঁরা আইনের বদলে কতটা শক্তি প্রয়োগ করা হোল বা চিরাচরিত প্রথার বদলে কত বর্ষর ভাবে নতুন ধারা চালু করা হোল তাই দিয়ে। এঁদের চোখে মার্কিন ও সোভিয়েত ব্যবস্থা ছুই কুৎসিত কিন্তু সোভিয়েত আরো অনেক বেশি কুৎসিত। এখানেই শেষ নয়। তাঁদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত এই মতে ফিরে যান যে মানুষের প্রকৃতি কিছুতেই বদলায় না। এমন কি সাম্যবাদী সমাজেও নয়। তাঁরা বলেন, মানুষ জন্মগত অপরাধী ও বিরোধী এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বতই চাব করা হবে ততই বি চালা হবে 'নিহিলিজমের' আগমন। বর্ষরতা মানুষের স্বতাবজ্ঞাত এবং কোন রকম নতুন সামাজিক পরিবেশেই তা বদলায় না। এই সম্পর্কে মাক্স এঙ্গেলস লেনিনের বক্তব্য বাদ দিয়েও এইটুকু বলা যায় যে, আদিম সাম্যবাদের যুগে মানুষ কিছুতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হানত না। ব্যক্তিগত

সম্পত্তির বিকল্পে তার স্বতাব বিস্তারিত করত। ব্যক্তিগত উৎপাদনে যুগে সেই প্রকৃতি আন্তে আন্তে তার বদলে গেল। তখন ত খ্যান ধারনার রাজ্য দখল করে নিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তেম সমাজতন্ত্রের সমবায়িক পরিবেশেও মানুষের কৃতি প্রকৃতি নতুন নিতে বাধ্য এবং নিচ্ছে।

মানুষের প্রকৃতি বদলায় কি না সেটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচ্য মানুষের সমাজে যন্ত্র বিশেষ ক অটোম্যাটিক বা স্বয়ংচালিত যন্ত্রের ভূমিকা। স্বতীকরণ ও স্বয়ংচাল মানুষকে যন্ত্রের দাঁস করে এবং মানুষকে ব্যক্তিগত করে ফেলে না। মানুষই যন্ত্রকে নিজের হুকুম তামিল করতে বাধ্য করে, এই হা মৌলিক প্রশ্ন।

সমাজের তথ্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সবচেয়ে ব বিষয় কী? একথা এমন কি বনতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসবেত্তারা স্বীকার করেন যে, সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে প্রথান উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির ইতিহাস, উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতি ইতিহাস, উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতির ইতিহাস এবং উৎপাদনে ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস।

মানুষ উৎপাদনের উপায় উপকরণগুলির উন্নতি করার চেষ্টা ক নিজের স্বপ্ন-স্ববিধা আরাম-বিরামের জন্যে। যাতে অল্পসম আয়ো বেশি ভোগ করবার জিনিষ তৈরী করা যায়, যাতে ক মেহনত করে বেশি উৎপাদন করা যায়, এই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এক কথায় প্রতিদিন মানুষের যে সামসারিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বে চলেছে তা স্বতন্ত্র সম্ভব মেটাবার চেষ্টা করার জন্যেই মানুষ ক কৌশলের উন্নতি করতে চায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপকভাে বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রকৃতিক শক্তিগু একের পর এক আরও এনে সেগুলির সাহায্যে নতু স্বত্বকৌশলে উৎপাদন ও স্বপ্ন-স্বচ্ছন্দ্য বাড়াবার এবং মানুষে ষাটুনি কমাবার চেষ্টা চলছে। সমস্ত মানুষ অংশ নিচ্ছে সে কাজে সেই অভাববিহীন সমাজ ও তার সাংস্কৃতিক ইমারত রচনার সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন লেনিন যেন তিনি বলেছিলেন। এমন দিন আসবে যেন একজন রাষ্ট্রনীও রাষ্ট্র পরিচাল করতে পারবে। ইংরেজ কবি উইলিয়াম বার্নসের স্বপ্নও ছি তাই।

লেনিনের সেই স্বপ্ন সকল হতে চলেছে, সকল হতে চলে প্রথমত নতুন ভারসঙ্গত সমাজ ব্যবস্থার কল্যাণে এবং দ্বিতীয় স্বত্বকৌশলের অধুর্ স্বাক্ষরের দৌলতে। সে দেশে যন্ত্রের উন্নতি ব্যবহার কাটকে বেকার করে না বরং তাঁদের মেহনত হাঙ্গা ক সক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নতি করে। স্বত্ব ও সম্ভব পাঁচ-শালা বনোব

জাদয়া তারাই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। ৩৪ পরিকল্পনার বসড়া নির্দেশনামার বলা হয়েছিল :

“বয়স্কোশলের আরও উন্নতির জন্য, উৎপাদনের হান উন্নত করার জন্য এবং কাজকর্ম আরও সহজ সরল করার জন্য বয়স্কোশনের বিপুল উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে এবং ব্যাপক ভাবে স্বয়ং চালনা ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।”

এখানে কাজকর্ম আরও সহজ সরল করার উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করার মত।

এবার নতুন ৭-সালার পরিকল্পনার কথা ধরা যাক। পরিকল্পনার বলা হয়েছে :

সামূহিক বয়স্করণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ অর্থনীতির উন্নতির প্রধান ও নিয়ামক উপায় এবং তাহার ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি নতুন ভাবে বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনের পড়তা বৃদ্ধি কমিবে এবং উৎপন্ন প্রবাহের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও মেহনতী জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট কারণ হিসাবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি, পরিকল্পিত বয়স্করণ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রচলনের ভিত্তিতে বর্ধিত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

মেহনতী জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হবে (দৈনিক ৫ ঘণ্টা) এবং সম্ভাচ্ছে হুঁসিন পুরো ছুটি দেওয়া হবে। অর্থাৎ মানুষ অনেক বেশি অবসর পাবে জ্ঞান সঞ্চয় ও সাংস্কৃতিকতা করার জন্যে। তখন তারা সকলেই পলিটেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করার সময় পাবে। যে ভিত্তি জালিন তাঁর ‘সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী’ বইখানিতে এই বকম বারপাই দিয়ে গিয়েছেন সোভিয়েত দেশের আগামী সমাজ ও সাংস্কৃতি সম্পর্কে। তিনি বলছেন যে সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়মের প্রথম অংশটি হচ্ছে সমগ্র সমাজের প্রতিনিয়ত বর্ধমান সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার বস্তুর সম্ভব পরিভূক্তি সাধন। কি ভাবে সেটা হবে সেখানা বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন :—

“শ্রমজীবী জনতার অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না করে সমাজের মানুষের সাংস্কৃতিক মানের বেশ ভাল রকম উন্নতি করা বাবে এ ধারণা ভুল। তার জন্য সর্বপ্রথমে দৈনিক কাজের সময় অন্তত ৬ ঘণ্টা এবং পরে ৫ ঘণ্টার কমিয়ে আনতে হবে। তারপর আবশ্যিক পলিটেকনিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন করার দরকার হবে, যাতে সমাজের লোকেরা নিজের পছন্দসই পেশা বেছে নিতে পারে, সারা জীবন একই পেশার বাঁধা না থেকে।”

সাম্যবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের এই হচ্ছে নীলনজা। জালিন যে পূর্বাধর্য মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে মানুষকে সারা দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। বাকি সমস্ত সময়টাই সে সাংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার শিচ্ছেন ধর করতে পারবে। স্বয়ংক্রিয় ও অজান্তে বয়স্কোশনই তাকে এনে দেবে সেই সুযোগ।

রাশিয়ার চিঠির প্রথম পাতাতেই বইখানি লিখছেন :

“চিরকালই মানুষের সভ্যতার একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সখ্যা বেশি, তারাই বাহন। তাদের মানুষই হবার সময় সেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিন্নতা তারা প্রতিপালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে,

কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে। তারা সভ্যতার পিলভর, মাথার প্রাণী নিয়ে খাড়া ঠাঁড়িয়ে থাকে, উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। অথচ উপরে না থাকলে নিখাত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তুমি মানুষের মানুষ নও ? একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ কল অবকাশের মধ্যে কলছে।

কম খাওয়া, কম পরা, কম শেখা, এই কন্মের পালা সাজ করে পৃথিবীর বন্দোবস্ত করা এবং সেই সঙ্গে অবকাশের প্রয়োগ বাড়ানো পারলে তবেই পোটা দেশের সমস্ত মানুষ, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবে, বিশ্বসাংস্কৃতিকে করতে পারবে সমৃদ্ধতর। বিজ্ঞান ও বয়স্কোশনের উন্নতি এবং উৎপাদনের স্বার্থে সেগুলির ব্যবহারই তার একমাত্র উপায়। পুরাতন পৃথিবীর জরাজীর্ণ অজার সমাজকে উর্টে দেবার “লার্মিডিডের লিভার” হচ্ছে এই সব অভিনব কলকৌশল। কিন্তু মানুষের এইসব নতুন কীটিকে অভিনব নতুন জাতিতে একদল বুদ্ধিজীবী এর তুলছেন যে এসবে মানুষের সুখ কি বাড়বে ? ‘সাইবানোটিসক’ শব্দটি তাদের কাছে ছুঃখের সারিল।

‘সাইবানোটিসক’ শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ কাইবারোটিক থেকে, যার মানে মাঝি অর্থাৎ চালক। বৃষ্টি বৈজ্ঞানিক এসকিলে সটোমেশন বা স্বয়ং চালনার সম্ভা দিচ্ছেন এই ভাবে :—

এমন ধরনের টুঁপরের স্বয়ংক্রিয় বয়স্কোশন বা পদ্ধতির প্রবর্তন করা বা মানুষের কার্যিক পরিচর্যা এবং খুঁটানি নিয়ন্ত্রণ কার্য অনেকাংশে বাদ দিয়ে দেবে।

তুমি বয়স্কোশনে মেহনত কমে গেলেও তদারক বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থেকে বার, পদে পদে বস্তুর কাজের প্রত্যেকটি ধাপের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। স্বয়ংক্রিয় ব্যবহার বস্ত্র নিজের কাজের তদারক নিজেই করে। মানুষের তুমি দায়িত্ব থাকে বস্ত্র ঠিক মত চলছে কি না সেইটুকু দেখা।

একটি উদাহরণ দিই। সোভিয়েত দেশে কে ‘মেমাখা’ নামে একটি মোটর জাহাজ আছে। সেটি এখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন তাতে হাল ধরবার কোন লোক থাকে না সেই কাজের দায়িত্ব রয়েছে একটি কলের উপর ; যার নাম ‘জাইরো-হেমসমানান’। জাহাজটি পথভ্রষ্ট হলেই ‘জাইরো কম্পাসটি’ (বিসদর্পন বস্ত্র) এক বৈজ্ঞানিক কৌশলে জাইরো-হেমসমানান বা বস্ত্রমারিকে সেই ধরন পৌছে দেয় এবং বস্ত্রমারি স্বয়ংক্রিয় বয়স্কোশনে জাহাজটি ঠিক পথে কিরিয়ে আনে।

যার একটি দৃষ্টান্ত। উক্রাইনের একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি ইলেকট্রনিক বস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যা দরীরে যে কোন জায়গার রক্তচাপ ধরে দিতে পারে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও হারি রেকর্ড করে, হৃৎপিণ্ডের কাজে গলতি থাকলে তা জানিয়ে দেয়। এমন কি সেই অসুস্থতার চিকিৎসা পদ্ধতি সক্রান্ত তথ্য দাখিল করে। তাই বস্ত্রটির নাম ‘স্বয়ংক্রিয় ডাক্তার’।

উদাহরণ ছাড়া থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েত দেশে মানুষ স্বয়ংক্রিয় কলকৌশল বা সাইবানোটিসক কাজে লাগাচ্ছে ব্যস্তিত ‘হুজিৎ’

হিসাবে। মানুষ একটা কাজ ঠিক করে দিচ্ছে এবং ব্যক্তিগত "মস্তিষ্ক" মানুষের ইচ্ছা ও নির্দেশমত সেই কাজটি নিতুলভাবে করে দিচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের মেরুদণ্ডটা বন্ধ করে দিচ্ছে। তাই কার্ল মার্স বলেছেন, সাইবার্গেটিক্স যন্ত্রপাতি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির শক্তির একটি প্রকৃতিরূপ। সেগুলি মানুষের ইঞ্জিনগুলির কিরী প্রকৃতির অঙ্কুরণ করে এবং অনেক সময় সেগুলি আমাদের ইঞ্জিনের চেয়েই অনেক তাত্কাৎকি সাড়া দেয়। আসলে সেগুলি বস্তুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করবার ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এই ধরনের একটি ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র আমাদের ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে। এই যন্ত্রটির "স্বয়ংশক্তি" আছে এবং সে এক হাজার সংখ্যা মনে রাখতে পারে, সেগুলি দিয়ে মানুষের নির্দেশমত হিসাব করে দিতে পারে যে কোন বিষয়ে। তার স্বয়ংশক্তিতে ভুল হবার ঝুঁকি নেই। মানুষের স্বয়ংশক্তি ও মস্তিষ্কের ভুল ভ্রান্তি হয় কিন্তু স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্রের হয় না।

সোভিয়েত দেশে মানুষের পরিশ্রম স্বাধীনতা এবং উৎসাহের বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কারখানা-শিল্পে স্বয়ংচালিত কলকৌশল ব্যবহার হচ্ছে। লোহশিল্পে লোহার চালের নির্দিষ্ট মাপের গর্ত করা এবং অজান্তে নানা কাজ বন্ধ আপনা আপনিই করে সুপারজাইন্টার টেলিকোনে হকুম দিলেই। টেলিকোনের হকুম অনুসারে যন্ত্রের গণনা ও স্বয়ংশক্তি বিভাগ কোন কাজটা কি মাপে এবং কতটা করতে হবে সেটা হিসাব করে নেয়। তার পর যেখানে টিপলেই হকুম মাসিক কাজ চলতে থাকবে। স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র দিয়ে আজকাল শিল্প ও অর্থনীতির মান্যক কথা হচ্ছে, যেটা বিমানের ইঞ্জিনের নক্সা তৈরি সজ্জা হিসাবপত্র করা হচ্ছে, জলবায়ুর পূর্বাভাস দেওয়া যাচ্ছে, যুক্তির চেয়েও দ্রুতবেগে যুক্তির গতিপথ গণনা করা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সব কাজের পড়তা, খরচা হাজার হাজার গুণ কমে যাচ্ছে। অটোম্যাটিক বোলিং মিলে প্রমিকলের আর ভারি লোহার ভাল নাড়াচাড়া করতে হয় না। সে খালি বসে যেখানে টেপে। এমন কি সেখানে বসে বসে সে গল্পের বই বা কোন বই পড়তে পারে। যন্ত্রের কাঁধে নিজের কাজের ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সে খালাস। কাজের মধ্যেই সে অবকাশ পায়। যন্ত্র কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা, তার কোথাও কিছু বিকল হয়েছে বা বিগড়েছে কি না সেদিকে নজর রাখা এইটুকুই তার কাজ।

সাইবার্গেটিক্স বিজ্ঞানের প্রথম স্তর নিবদ্ধ করেন মার্কিন বৈজ্ঞানিক নর্বাট গ্রেইনার। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে কণ্ঠশপটিলের সম্পর্কে কণ্ঠ বৈজ্ঞানিক ইভান পাভলভের লিকাই সাইবার্গেটিকসের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। লেনিনগ্রাদে "সভ্যজানান" নামে যে "ইলেকট্রো ভাঙ্কুয়া" কারখানা আছে সেখানে ১৯৩৫ সনে কুকুরের একটি বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি করা হয় এবং সেই মডেলটিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা কণ্ঠশপটিলের স্রবণ স্রবণ করা গিয়েছিল। তাই থেকে প্রমাণিত হয়, স্বয়ংচালিত নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ স্নায়বিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। মানুষের দেহে আছে কোটি কোটি (১৫০০ কোটি) স্নায়ুকোষ। সেই স্নায়ুকোষের জায়গায় গণনা যন্ত্র রয়েছে ইলেকট্রনিক টিউব (সবচেয়ে বড় যন্ত্র ২২/২৩ হাজার পর্বত টিউব থাকতে পারে)। মানুষের দেহে যেমন স্নায়ু তেমনি গণনাযন্ত্রে বৈজ্ঞানিক তার। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক

লেভ ভলেনস্কাইর বলেছেন—এই ব্যাপারে মানুষের স্বয়ংশক্তিই বিশেষ করে জরুরী। ইলেকট্রনিক মেশিনের স্বয়ংশক্তির মানুষের স্বয়ংশক্তির সঙ্গে সেই ধরনের সম্পর্ক যে সম্পর্ক রয়েছে চোখের সঙ্গে আলোক কোষের বা মাইক্রোকোনের সঙ্গে কানের। এই ধরনের কোন কোন সাদৃশ্য আমরা স্থূল করতে পারি কিন্তু তাই বলে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে সব জৈব-পদার্থিক বা জৈব-রাসায়নিক কিরী প্রক্রিয়া ঘটে সেগুলি ইলেকট্রনিক মডেলের মধ্যে স্থূল করার কোন দরকার নেই। মানুষের মস্তিষ্কের গাণিতিক বা সংখ্যা প্রক্রিয়া এবং মডেলের গাণিতিক প্রক্রিয়া মিলিয়ে দিতে পারাটাই আসল কথা।

এই ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র যে কোন বই-এর লেখা মুখস্থ করে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সাহায্যে অল্প সময়ের পাঠকের চোখের সামনে টেলিফিসনের পর্দায় সেই লেখা প্রতিকলিত করতে পারে। বি-ই-এস-এম মডেলের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ১০ মিনিটের মধ্যে আঁহাওয়ার যে পূর্বাভাস দিতে পারে সেই কাজ করতে একটি গোটা আঁহাওয়ার অক্সিসের ২ বছর লাগে বাবে।

সোভিয়েতে বেলগাভীর ইঞ্জিনের জন্ত একরকম স্বয়ংচালিত চালক তৈরি হয়েছে যা সব দিক হিসাব করে প্রয়োজন মত গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং গাড়ীর নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে।

আগেই বলেছি, রক্তচাপ ও স্তন্যপিণ্ডের স্পন্দন হিসাব করবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথা। স্তন্যপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার করা হবে কিনা এবং উচিত হলে কখন করা হবে, এসবই সেই যন্ত্র বলে দিতে পারে। স্তন্যরোগ শল্য চিকিৎসককে কোন কী নিতে হয় না।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। মস্তিষ্কের কোন অংশ আহত হলে অল্প অল্প সে কাজে আনাড়ি চলতে সে কাজের দায়িত্ব নেয় সাময়িক ভাবে। তার বলে দেহযন্ত্রের কাজকর্ম আবার চলতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্ষেত্রেও অংশ-বিশেষ বিগড়ে গেলে অল্প অল্প বাতে তার কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আরো নির্ভরযোগ্য হবে। তা করতে পারলে "যন্ত্রের মস্তিষ্ক" পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার রকম কাজের জন্য হাজার রকমের যন্ত্র না করে, খালি বিভিন্ন অংশ অদল-বদল করে বাতে একই মডেলের দ্বারা নানা রকম কাজ করা যায়, সেদিকে চিন্তা করতে হবে এবং গোটা কারখানায় সমস্ত কাজের সামগ্রিক স্বয়ং চালনা প্রবর্তন করতে হবে। এই হচ্ছে সান্যাবারী সমাজে উত্তরণের জন্য সমাজবাদী সমাজের দায়ী।

কিন্তু যন্ত্র কি সত্যিই মস্তিষ্কের জায়গা দখল করবে? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডমণ্ড বার্কলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলিকে "বিরাট মস্তিষ্ক বা চিন্তাশীল যন্ত্র" আখ্যা দিয়েছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ইয়ং-এর মতে মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড গণনাযন্ত্র যার মধ্যে রয়েছে ১৫০০ কোটি স্নায়ুকোষ। এঁরা দুজনেই মানুষের মস্তিষ্ক আর যন্ত্রের মস্তিষ্কের ধর্মগত পার্থক্য উপেক্ষা করে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যটি দেখেছেন।

প্রথমতঃ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের স্রষ্টা মানুষ, তার মালিকও মানুষ।

স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র তার প্রচার হইতে তামিল করে। কিন্তু মানুষের মানসিক বহু হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের পরিণতি। সবচেয়ে নিখুঁত বস্ত্রের সঙ্গেও মানুষের মস্তিষ্কের তুলনা করতে হইত বাতুলতা। কারণ বস্ত্রের মানুষের মাথার মত চিন্তা করার, উপলব্ধি করার, জীবনকে বিশ্লেষণ করার, অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ ও সমীক্ষা করার এবং আনামীকালকে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা নেই। মানুষের প্রজ্ঞা আছে, বুদ্ধি আছে, আছে কর্তন্য করার ক্ষমতা। কিন্তু বস্ত্র বস্ত্রই, সে একটি স্বয়ংক্রিয় কৌশল মাত্র। অল্পগত ভূত্যের মত সে কাজ দিলে, তা ঠিক মত করে দেয় চোখ বুজে। মানুষের হুকুম না পেলে তার অবস্থা কাঁড়ার একটা অচল জড়স্তম্ভের মত। সে আঁক করতে পারে কিন্তু সাহিত্য রচনা করতে পারে না, বস্ত্র-কৌশলের তথ্য তর্জমা করতে পারে কিন্তু উপভাস অল্পবাদ করতে পারে না। তার সৃষ্টির কোঠার কিছু শব্দ আর কবিতার ছন্দের নিয়ম, সংখ্যার নিপিবদ্ধ করে দিলে সেই নিয়মে সে কবিতার লাইন সাজিয়ে দিতে পারে কিন্তু মূল কবিতা রচনা করতে পারে না। ছকে দেওয়া গণিতের সমস্তার সমাধান সে করতে পারে কিন্তু নতুন সমস্যা বার করতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র অল্প যে কোন বস্ত্রের মতই মানুষের শ্রমের একটি হাতিয়ার মাত্র। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে মানুষের মস্তিষ্কের একটি প্রবর্তন মাত্র, যেমন প্রবর্তন হচ্ছে হাতুড়ি, মানুষের হাতের। বনতান্ত্রিক দুনিয়ার কোটি কোটি বেকার আছে, দুশাশ্ব শিকারের বোঝাবোঁ আছে বলে সেখানে বস্ত্র এবং আরো বেশি করে স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র শ্রমিকের শত্রু; কারণ বস্ত্র বসানো মানেই কিছু লোক কাপড় হয়ে পড়া। বস্ত্র একাই তো তাদের অনেকের কাজ করে দেবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের দুনিয়ার বেকার সমস্যা ও গলা-কাটা প্রতিরুদ্ধতা নেই বলে বস্ত্র সেখানে মানুষের বন্ধু ও সহযোগী। আসল কথা বস্ত্র নিজে ভাল বা খারাপ, একথা বলার কোন অর্থ নেই। কে বস্ত্র ব্যবহার করছে এক কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে, তার ওপরই বস্ত্রের গুণাগুণ নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত দিই। বুটেনের কাউণ্ট্রী ওয়ার্কার্স' জার্নাল লিখেছে :

“বুটিন শ্রমিকরা জানতে চায় যে কারখানা স্বয়ংচালিত হলে ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৮ জনের যদি চাকরী যায় তাহলে সেই কারখানার তৈরি জিনিষ কিনবে কারা?”

ফরাসী পত্রিকা “ভিয়ে উজিয়ে” মন্তব্য করেছে :—
“আমরা স্বয়ংক্রিয় ও অজ্ঞান নতুন বস্ত্রপাঠির শিকার হতে রাজি নয়। উৎপাদন বুদ্ধির পরিণামটা যে কী তা আমাদের জানা আছে : মেহনতের তুলনায় মজুরী কম আর বেকার হওয়া।”

এক্ষেত্রে নতুন বস্ত্রকৌশল যে মানুষের আত্মমর্যাদা নিয়ে মানুষের মত বাঁচার পথে বাধা দিয়ে মানবাত্মার অপমান করছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু কেন হচ্ছে এরকম? হচ্ছে এই জন্য যে, বনতান্ত্রিক সমাজের হস্তীকর্তা বিধাতাদের অপমান ও গায়ত্রী-বস্ত্র হচ্ছে মুনাকা। মূলধনের মালিক ও শ্রমিকের যে সম্পর্ক সেখানে তো উৎপাদনের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রমিক হাঁটাই করে এবং মজুরী কমিয়ে সেখানে মুনাকার টাকা নতুন বস্ত্রকৌশলের পিছনে ঢালা হয়। ফলে উৎপাদন বাড়ি কিন্তু সেই সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও

বেড়ে চলার উৎসর্গ জিনিষ বিক্রী করার বাজার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। কারণ বেকার হত বাড়ি কেনবার লোক ততই কমে। ফলে বাজারে মাল পড়ে থাকে। বাজার নরসেহ, নরগন লোকেরা ঘুরে বেড়ায় কাজের সন্ধান, তাকিয়ে থাকে লুপ্ত দৃষ্টিতে দোকানের শেল্বে-কেনে সাজানো ভরেক বস্ত্রের জামা কাপড় জুতার দিকে। জিনিষ রয়েছে, চাহিদা রয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশী, কিন্তু মাল বিক্রী হয় না। সেই মাল শেষ পর্যন্ত হস্ত পড়িয়ে, হয় ফুটপাথে নয় “Reduction sale” এ বেচেতে হয় কিন্তু তবু বার কাপড় জামা নেই সে কাপড় জামা কিনতে পারে না। বার ফুটাই নেই তাকে—বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে কলকাতা সহরের পীঠের বাজার পা পুড়িয়ে হাঁটতে হয়, মুনাকারীরা প্রচণ্ড শীতে গা হাত পা অসুস্থ হয়ে সেলেও সে গরম জামা কিনতে পারে না। দোকানে দোকানে জামা সাজানো থাকা সত্ত্বেও। কারখানার মালিকের পক্ষেও নতুন বস্ত্রকৌশলের পিছনে মজুর-মারা টাকা ঢেলে বতটা লাভ হওয়া উচিত ছিল তা হয় না। তবু সেই বিবাক্ত রাজ্য হাজার গতি নেই, কারণ টাকা ছাড়া তিনি কিছু কিনতে শেখেননি। বেকারের দল বত কাঁপবে মজুরী নিয়ে দরবারি করার ক্ষমতাও মালিকের তত বাড়বে। কিন্তু পণ্য বেচবার বাজার না বাড়তে পারলে মজুরী কমিয়ে বা হাঁটাই করে তাঁর বাঁধা পূর্ণ হ’তে পারে না।

দেশের লোকের তো কেনার ক্ষমতাই নেই। স্বতরাং তখন তাঁর মতলবটা সমব্যবসায়ীকে পথে বসাবার দিকে যায়। তিনি যে মাল তৈরি করেন সেই মালের অল্প ব্যবসায়ীদের চেয়ে সস্তার মাল বাজারে ছাড়তে পারলে তাঁর বাজার বাড়ি। নতুন বস্ত্রকৌশল লাগাতে পারলে উৎপাদনের পড়তা থরচা কমে। তাই যিনি বস্ত্রকৌশলের পিছনে বত টাকা ঢালতে পারেন তিনি তত বেশি করে চুনামাছ জাতীয় ব্যবসায়ীদের লালাবাতি জ্বালতে বাধ্য করে নিজে রাধব-বোরাল হয়ে পড়েন। কিন্তু লোভের কোন শেষ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করেও দেশের সাধারণ লোকের অভাব অনটন বাড়তে থাকার দরপ, সব মাল তিনি বেশি বেচেতে পারেন না। তখন বিশেষী বাজারের দিকে তাকান তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে। শেষ পর্যন্ত দেশের মধ্যে তাঁর তৈরি মালের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেই মাল বিদেশে রপ্তানী করেন, মুনাকার অংশ তিনি অল্পই রাখার চেষ্টা করেন। বিদেশে গিয়ে তাঁর মাল অল্প দেশের রপ্তানী করা মালের সঙ্গে বাজারে যদি টেকা দিতে পারে তবেই তাঁর লাভ। সেই পালা ছুটে জেতবার জন্য পড়তা থরচা আরো কমাতে গিয়ে তিনি মজুরী আরো কমাতে চেষ্টা করেন আরো লোক হাঁটাই করার শাসনি দিয়ে। না হলে নিজের মুনাকার আঁক ঠিক রেখে বা বাড়িয়ে অল্প দেশের রপ্তানীকারকদের চেয়ে সস্তার তিনি বিশেষী বাজারে মাল ছাড়বেন কি করে? স্বতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনর্গল উৎপাদন বাড়িয়ে বেতে পারে না। সেই সমাজের পাণ্ডুরা যখন মজুরদের বেঁট করে পেটের গর্ভ ছোট করতে হুকুম দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো স্লোগান ছাড়ল, সেটা হচ্ছে মজুরদের খোঁকা দেবার চেষ্টা মাত্র। সেজন্যে বস্ত্রকৌশলের পূর্ণ ব্যবহার করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে সমাজ সমস্ত মানুষের চাহিদা মেটানকেই সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে করে বস্ত্রকৌশলের পূর্ণ সুযোগ নিতে পারে সেই বনি সে বনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের আশির্বাদ

কামের করতে পারে। ইতিহাসে এই ধরনের বহু নজির আছে। ভাঙ্গুপের শিশুরীর শৈবতন্ত্রকে লৌহযুগের আবির্ভাবের পর গ্রীসের অপেক্ষাকৃত ভাঙ্গুপের সমাজের জন্ম জায়গা হেঁড়ে দিতে হয়েছিল। ভাঙ্গুপের মধ্যযুগের শেষের দিকে ভারি যন্ত্রপাতির উদ্ভাবের ফলে কুটির-শিল্পভিত্তিক সামন্ততন্ত্রকে নতুন আঙ্গুত্বক ধনতন্ত্রের হাতে কমতা তুলে দিতে হয়। সেদিনকার সেই প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের কাছে আজ "প্রাচুর্য" বা অজ্ঞাতপাশন একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজ্ঞাতপাশনের জমিতেই তার ফসল ফলে, দুভিক হলেই তার লাভ। প্রাচুর্যের "বিশদ" দেখা দিলেই সে কৃত্রিম কৌশলে অজ্ঞাতপাশনের হস্তি করে। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রকৌশল প্রমিতের পক্ষে যন্ত্রপাশন। সেই সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতে পরাজয় বরণ করতে হবে, এই হচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ বিধান। সেই নতুন সমাজে সমস্ত লোকের ক্রয়ক্ষমতা থাকার ফলে দেশের বাজারে কোন সময়েই চাহিদার অভাব থাকবে না, এবং মজুরী দিনকে দিন বাড়বে বলে চাহিদাও বেড়ে চলবে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রকৌশলের কল্যাণে খাটনি কমতে থাকবে। মজুরের বল বেরানি কারখানার বছর চক্ৰক্ষেপ আগে প্রথম স্বয়ং চালনা দৈর্ঘ্যক হয়। তারপর সেখানে একটি 'যান্ত্রিক হাত' তৈরি হয়। তারপর আসে বুদ্ধ। যুদ্ধের পর নতুন উদ্ভবে স্বয়ং চালনার দিকে মন দেওয়া হয়। আজ সেখানে গেলে দেখতে পাবেন, সুপরিদর পরিচ্ছন্ন লপঙলিতে কুঁতল লোহার বা তেলের দুর্গক নেই, অগ্নিগলি দিয়ে কোন ট্রিলর চলাকোরা নেই, কোথাও লোহার বড়তি পড়তি ছাঁটাই গাঙ্গা হয়ে পড়ে নেই। লোক নেই, জন নেই, কোন আওয়াজ নেই। মনে হবে যেন এক বৈরাগ্য ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু কারখানার কাজ বন্ধ হয়নি, মজুর ছাঁটাইও করা হয়নি। ১৯৫৫ সালের তুলনার উপপাশন বেড়েছে ৬০ ভাগ। চোখের অলক্ষ্যে যন্ত্র মানুষের হৃদয় তামিল করে যাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়তার দক্ষণ বাসের সেখানে আর দরকার নেই তাদের অজ্ঞাত কাজ দেওয়া হয়েছে মাইনে বাড়িয়ে। আর বারা নতুন করে তালিম নিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উপর খবরদারী করছে, তাদের মাইনে বেড়েছে দেড়গুণ, দ্বিগুণ। কাল তারা ছিল কামিক-প্রমিত। আজ তারা শরীরের পরিচ্ছন্নের বলসে মাথার পরিচ্ছন্ন করেই খালাস অর্থাৎ যন্ত্রকৌশল ও স্বয়ংচালনা দৈর্ঘ্যিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নের ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়ে আনছে। এটা মানুষের মর্দালা ও গোঁরব বাড়ানো না কমাচ্ছে? যন্ত্রের দৌলতে সোভিয়েতের মানুষের অবসর সময় বাড়বার ফলে সেই অবসরের জমিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব নতুন ফসল ফসলে, তা মানুষের মর্দালা বাড়াবে না কমাতে? সে ক্ষেত্রে যন্ত্র দানব না দেবতা?

উনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রীকরণের গতিবেগের তুলনায় আজকে ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বয়ংচালনার গতিবেগ বেশি হবে। কারণ আজ বিজ্ঞানকে সফলভাবে উপপাশনের কাজে লাগান হচ্ছে। কিন্তু স্বয়ংচালনা ব্যবস্থা বত বেশি চালু হবে ধনতন্ত্রের নড়বড়ে অবস্থা ভতই বাড়তে থাকবে। বিভিন্ন ধনিকের দুর্ভাগ্যের হারের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকার ফলে বাজারে তাদের পরম্পরের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব ভাব থাকবে না। কাজে কাজেই গলাগাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠবে আরো সঙ্গী। সেই সঙ্গে শিল্পের অজুগুত যন্ত্রকৌশল

এবং অপেক্ষাকৃত পুণ্ডাংপন ক্রিয়াব্যবস্থার মধ্যে কীকটা আরো বেড়ে যাবে। এই ভাবে শুধু কোম্পানীতে কোম্পানীতে কেন, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মধ্যে বৈষম্য দেখা দেবে। তদনিক ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির মধ্যে অসমানতা বাড়তে থাকবে, দুর্ভব বাড়তে থাকবে অজুগুত শিল্পপ্রধান দেশ ও অজুগুত দেশগুলির অর্থনীতির মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এই সব অজুগুত দেশের অর্থনীতির মধ্যে 'সাহায্যের' নাম করে যিলিত হবার চেষ্টা করে শোষণের মতলবে। কিন্তু আজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের দেশগুলি যন্ত্রকৌশলের অজুগুতপূর্ণ উন্নতি ও ব্যবহারের কল্যাণে আমাদের মত গরীব অজুগুত দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নেবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রকৌশল, বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় উপপাশন কৌশল বনিক শ্রেণীর উপপাশিকা শক্তি ও প্রমিত শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতার অন্তর্বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলবে। কারণ মজুরী হিসাবে কম টাকা খরচ করে মালিকরা বেশি মাল তৈরি করতে পারবে। ফলে উপপাশিকা শক্তির, জনগণের ক্রয়ক্ষমতিকে ছাপিয়ে যাবার যে স্বভাবজাত বৌক ধনতন্ত্রের মধ্যে আছে সেটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দক্ষণ আরো জোরদার হতে থাকবে—বার পরিণাম হবে অর্থনৈতিক সঙ্কট। আসলে স্বয়ংচালনা ব্যবস্থা সাম্রাজ্যতন্ত্রের জিনিষ। মানুষের বুদ্ধি ও বেহনভের চরম পরিপ্রকাশ হিসেবে স্বয়ংচালিত উপপাশন ব্যবস্থার সফল পরিণতি ঘটতে পারে, সেই সমাজে যেখানে উপপাশনের উপায় উপকরণ দুইয়ের কয়েকজনের উপবৃত্ত মূল্য কাঁপিয়ে তোলাবার হাতিয়ার না হয়ে সমগ্র সমাজের মালিকদার থেকে উপপাশ সামগ্রী সমাজের সমস্ত মানুষের হাতে তুলে দেবে।

স্বয়ংচালিত যন্ত্রকৌশল ও পারমাণবিক শক্তি ধনতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে এক প্রচণ্ড ভাঙ্গনের শক্তি। উপপাশিকা শক্তি ও উপপাশিকা সম্পর্কের অন্তঃসংঘাতকে তারা বিফোরণের মুখে নিয়ে যাবে। বিংশ শতাব্দীর সর্বহারা বিপ্লবের যুগে বৈপ্লবিক যন্ত্রপাশকে স্বয়ংচালনা ও পারমাণবিক শক্তি হবে সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত। বিপ্লবের গর্ভে যে নতুন সমাজের অজুগুত হবে সেখানে মানুষকে তার কল্পিত-কৃতির জন্ম হুতীবনা করতে হবে না। ভাল ভাবে খেয়ে পরে অজ্ঞত অবসর নিয়ে সে জ্ঞানচর্চা করতে পারবে। সেই সমাজের শেষ স্তরে মাইনে মজুরী বলে কিছু থাকবে না। কারণ যন্ত্রকৌশল ও বিজ্ঞানের দৌলতে তখন এক ভোগ্য সামগ্রী তৈরি হবে যে মজুরী বা মাইনের বীধন নিয়ে ক্রয়ক্ষমতা বেঁধে দিয়ে পণ্যের বাজারে "রেশন" চালু রাখার দরকার হবে না। সকলে সাধ্যমত সমাজের সেবা করবে, সমাজ সকলকে বালি সমন্বয়ের পারিশ্রমিক না দিয়ে প্রত্যেককে পরিপূর্ণ জীবন বাপনের মত জিনিষপত্র দেবে। সেখানে সকলেই কখনোপূণ্য অর্জন করে শ্রেণীবিভেদের অন্তরায় দূর হবার পরবর্তী অগ্রগতির অজুগুত অর্থাৎ বল ও বুদ্ধির ব্যবধান দেবে ঘুচিয়ে, সকলেই হবে একাধারে প্রমিত ও বুদ্ধিবী। অতএব যে অজ্ঞাতের পুনরুজ্জীবনকারী সু-সমাচার প্রচার করা আজ অনিশ্চয়তাবাদ ও অজ্ঞাত পূজার বৌদ্ধিতে বসে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বোদ্ধাদের দল ও বাল্লদ জোগাবার চেষ্টা করছেন, বায়রের জাযার বলা যাঁর যে, যে হাতের গাঁটা একদিন তাঁরা খেয়েছেন আজ সেই হাতই তাঁরা চাটছেন এবং বুকের মধ্যে নিজে প্রমিত তুপার বলে মরছেন। যন্ত্র মানুষকে কি মুখ দেবে। তাঁদের এই প্রেরণে জাযা হচ্ছে—হ্যাঁ দেবে, নিশ্চয়ই দেবে।

বীররাগনা জুড়িখের কীর্তি ইতিহাসে চিরস্বর্গীয় হ'য়ে আছে।

জগতে জুড়িখই প্রথম নারী, যিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন বীর রূপ এবং বুদ্ধিকে বোল আনা কাজে লাগিয়ে।

সে প্রায় হ' হাজার বছর আগেকার কথা—খুইখের তখন অসহী হয়নি, ইহুদি জাতি হুনিয়ার অন্ততম শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের বেশ ছিল জেকজালেম। আজ এই ইহুদি জাতি বুর্জানদের অমানুষিক অত্যাচারে হুনিয়া থেকে লুণ্ঠপ্রার্থী—আজ তারা গৃহহীন, দেশহীন, জাতিহীন, বাহাবর; কিন্তু আমি স্বধনকার কথা বলছি, তখন তাদের বেশ ছিল, জাতি ছিল।

এই ইহুদি জাতিরই একটি শাখা আসিরীর রাজ্যের অন্তর অত্যাচার সহ্যে না পেয়ে জেকজালেমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন জেকজালেম ছিল সবুজ পাইন আর দেবদারু গাছে ঢাকা ছোট পাহাড়ী দেশ—ইহুদিরা এই দেশটিকে খুব পছন্দ করেছিল আর ভেবেছিল, এই প্রস্রুত ভারগার এখন থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ—আসিরীর রাজ্যের অন্তর অত্যাচার থেকে অন্ততঃ তারা মুক্ত।

সেখানে কয়েক বছর তারা খুব সুখেই দিন কাটালো। অবশেষে এক দিন তাদের তুল ভাঙলো। আমরাত আমাদের গল্প আরম্ভ করবে সেই দিন থেকেই।

তখন সব সুখোদর হ'য়েছে, একজন পশিক একটা মজ বড় শাদা ঘোড়ার চপে ইহুদিদের নগরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। অচেনা লোক দেখে বৌতুহলী নর-নারীর দল ভিড় ক'রে দাঁড়ালো তার চার পাশে। সৈনিকের হাতে একখানা খোলা চিঠি—সে এসে দাঁড়ালো ইহুদিদের সর্দারের বাড়ীর দরজায়।

কিন্তু সর্দারকে আর ডাকতে হলো না, তিনি নিজেই বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, একজন আসিরীর সৈনিক তার বাড়ীর দরজায় ব'সে—দেখে তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। ক্রমে তার বিস্ময় শংকার পরিণত হ'লো। চিঠিখানা প'ড়েই তা হাতের মুঠোয় চেপে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, বাবার সময়ে সর্দার সৈনিককে উত্তরের জন্ত কিছু সময় অপেক্ষা ক'রতে ব'লে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে চিঠির কথা সমস্ত নগরে ছড়িয়ে প'ড়লো। যুবক-যুবক-বালক সবাই গুনলো। তারপর একে একে তারা এসে সমবেত হ'লো সর্দারের বাড়ীতে—এক অজানা শংকার থেকে থেকে কেবলই তাদের সকলের মন হুলে উঠছিলো।

শেষকালে সর্বসম্মত চিঠিখানা পড়া হ'লো। আসিরীর সম্রাট জানিয়েছেন তিনি দিখিরয়ে বের হবেন, তার জন্ত ইহুদি প্রজাদের অন্তত হাজার সৈন্ত দিয়ে তাঁকে সাহায্য ক'রতে হবে। অন্তর্ধায় ইহুদিদের রাজ্য আক্রমণ ক'রে তিনি তা ধ্বংস ক'রে ফেলবেন।

চিঠি প'ড়ে সবাই ধানিককণ নির্ধাক নিশ্পাক হ'য়ে ব'সে রইলো, কিন্তু সে বৃহত্ত মাত্র। তারপরেই সবাই স্বড়ের বেগে পা-পাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা অপসিরীয় অপমান আর বেদন-বোধ তাদের মনকে আছন্ন ক'রে রেখেছিল। তরুণরা অপমান বিকৃত হ'য়ে উঠলো,—এ অপমান কিছুতেই তারা সহ ক'রবে না। আসিরীর রাজা এক সময়ে তাদের মনিব থাকলেও আজ আর তিনি মনিব নন। স্মৃতরাং তার এ অন্তর আদেশ ইহুদিরা মানতে রাজী নয়।

বীররমণী জুড়িখ

শ্রীঅমল সেন

ইহুদিদের সর্দার আসিরীর নৃত্যের চোখের সামনে রাজ্যের সেই আদর্শ-লিপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে বাতাসে উড়িয়ে দিলো। আসিরীর রাজদূত শুধু হাতে নিজের দেশে ফিরে গেলো।

আসিরীর নৃত্য করে গেলো। কিন্তু আসিরীর যা যে অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না একথা ইহুদিরা ভালো ক'রেই জানতো। তারা তাই ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

সমগ্র ইহুদি জাতি পবিত্র ঐক্যমন্ত্র দীক্ষিত হ'য়ে এক বৃহৎ সংঘবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হ'লো। তারা কয়েক মাসের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে উপযুক্ত বাস্তব সংগ্রহ ক'রে সমস্ত নগরবাসীদের নিয়ে এক উচ্চ পাহাড়ী দুর্গে এসে আশ্রয় নিল। দুর্গম অত্যন্ত সে বন-দুর্গ। বাইরে থেকে এই দুর্গের অবস্থান সহজে লোকের চোখে পড়ে না।

কিছুদিন পরে আসিরীর সম্রাটের বিরাট সৈন্তবাহিনী এসে ইহুদিদের নগরের মধ্যে প্রবেশ ক'রলো, কিন্তু তারা দেখে আশ্চর্য হ'লো, ইহুদিদের ঘরবাড়ী সব শূন্য প'ড়ে আছে—কোথাও কোনো লোকজন নেই। সেনাপতি অবাক হ'য়ে ভাবতে 'লাগলেন, লোকজন সব গেলো কোথায়? কোথায় বেতে পারে? তাঁর সৈন্তরা সব বেরিয়ে প'ড়লো ইহুদিদের সম্মুখে। অবশেষে বহু কষ্টে ইহুদিরা যে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল সেই দুর্গের সন্ধান মিললো। কিন্তু দুর্গঘাটের উপস্থিত হ'য়ে দেখলো, দুর্গতোষণ বহু। বিশাল বেগে তারা গিয়ে কাপিয়ে প'ড়লো সেই দুর্গের উপর, তাদের প্রচণ্ড আঘাতে দুর্গ-হ্রদ্যর বন-বন ক'রে ধৈর্য উঠলো—কিন্তু ভাঙলো না। আঘাতের পর আঘাতেও তা রইলো জটিল, অব্যাহত। আসিরীর সৈন্তদল প্রাণ হ'য়ে গভীর হতাশার ব'লে প'ড়লো। সেনাপতি বললেন, পাহাড়ের চারদিক ঘুরে খুঁজে দেখো এই দুর্গের আর কোনো দিকে কোন দুহরার আছে কি না।

সৈন্তরা তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো এবং নগর প্রদক্ষিণ ক'রে এসে জানালো, না জুড়ুর, এর চার দিকে খাড়া উচ্চ পাহাড়—চোকার কোনো উপায় নেই।

ইহুদিদের দুর্গঘাটে বিরাট আসিরীর সৈন্তবাহিনীর ছাড়নি প'ড়লো। তারা দিনের পর দিন দুর্গে প্রবেশের উপায় অনুসন্ধান ক'রতে লাগলো, কিন্তু কোনো উপায়ই মিললো না। এদিকে তাদের খাদ্য বসিও বর্ষণে পরিমাণে ছিল কিন্তু জল কুড়িয়ে আসতে লাগলো। বিশেষ চিন্তার কথা। জল কুড়িয়ে গেলে বিপদের আর অল্প থাকবে না। সেনাপতি মশাই গুহানক চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন। তিনি কয়েক জন সৈন্তকে ডেকে ব'ললেন, দেখো, এটা পাহাড়ী দেশ, কাজেই এখানে জল না থেকেই পারে না। খুঁজে বের করো কোথায় স্বর্ণা আছে।

সৈনিকরা স্বর্ণার অনুসন্ধান বের হলো।

ইহুদিরা শত্রুর ভয়ে দিনের বেলা কখনো স্বর্ণা থেকে জল নিতে আসতো না, পাছে শত্রুরা টের পেয়ে স্বর্ণা আটক করে। তা হ'লে তারা জলের অভাবে শুকিয়ে ম'রবে। তারা রাত্রির স্বদকারে চুপি চুপি শত্রুদের অলক্ষ্যে এসে স্বর্ণা থেকে কলসী ভ'রে

জল নিয়ে যেতো। কাজেই আসিরীর সৈন্যরা সহজে এর সন্ধান পেলো না।

কিন্তু একদিন আসিরীর সৈনিকদের কাছে এ রহস্য ঘরা পড়ে গেলো।

করণীর সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে সেনাপতি ভোঁ এক লাফে খসে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, বাও, একুশি হুঁশো জীরন্নাং নিয়ে গিয়ে করণা আটকাও। দিনে বা রাত্রে কোনো বাটা ইহদি বেন তা থেকে এক বড়া জলও না নিতে পারে।

এমনি ভাবে ইহদিদের জলের উৎস অবরুদ্ধ হলো।

ইহদিরা বিশেষ চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলো। আসিরীর সৈন্যরা যদি এক মাসের পরও দিনের পর দিন অবরোধ চালাতে থাকে তা হলে উপায়? ইহদিদের মুখে একটা চিন্তার কালোছায়া ঘনিয়ে এলো।

আর আসিরীর শিবিরে উঠতে লাগলো ঘন ঘন উল্লাসধ্বনি।

দেড় মাস পরে—

আসিরীর সৈন্যদের অবরোধ তুলে ফেলবার কোনো লক্ষণই লক্ষ্য পেলো না। ইহদিদের দুর্গ তখনও অবরুদ্ধ। এদিকে সন্ধ্যা হল, সুরিয়ে গেলো। প্রথম দু-চারদিন ইহদিরা মুখ বুজ জলের অভাব সহ করতে চেষ্টা করলো—কিন্তু জলের কষ্ট কি সওয়া যায়? তারা দু-চারজন মরিয়া হয়ে ছুটে গেলো শত্রুর কবল থেকে করণা উদ্ধার করতে—কল হলো সুত্থা। শত্রুর বিব্রাধা তীব্র এসে তাদের কষ্ট বিদ্ধ করলো।

শেষ কালে জলের অভাব তীব্র হয়ে উঠলো, সমস্ত নগরময় হাছাকার উঠলো—জল, জল! জলের তৃষ্ণার অধীর হয়ে সবাই পাগলের মতো ছুটে গেলো সর্দারের কাছে। কিন্তু সর্দার কি করবেন? তারা তৃষ্ণার পাগল হয়ে গর্জে উঠলো, এ স্বাধীনতা আমরা চাই না। যে স্বাধীনতা আমাদের কুখার অন্ন, তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত দিতে পারে না তেমন স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কি হবে? আমরা বাঁচতে চাই। তুমি আমাদের অসুস্থতি দাও সর্দার, আমরা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

কিন্তু সর্দার অবিচলিত। বীর গভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, না, তা হয় না।

তারা আবার চীৎকার করে উঠলো, হয় না? কেন হয় না শুনি? সর্দার সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, ভোঁই সব, তোমরা যে একটা দুর্বলচিত্ত তা আমি জানতুম না। সময় বহন ভালো থাকে তখন বীর্য অনেকই দেখাতে পারে। ঝাঁটি বীর্যের পরীক্ষা হয় হুসমেয়ে। জাতিব স্বাধীনতা নিয়ে যেখানে প্রাণ সেখানে এর চাইতেও বাস্তব, এর চাইতেও জনস্বার্থক হুং দেখে বুক ফেটে গেলেও তা সহ্যে হবে। আজ শত্রুর কাছে নতজানু হ'য়ে জল তিকা ক'রে তৃষ্ণার দাবদাহ থেকে প্রাণ হয় ভোঁ বাঁচতে সমর্থ হবে, কিন্তু তার পর? তার পর দীর্ঘ দিন দীর্ঘ যুগ জাতির ভবিষ্যৎ যে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে থাকবে, তার কথা ভেবে দেখেছা কি? জেবে দেখেছা কি—পর্যাবীকতা এর চাইতেও শোচনীয় সুত্থা, এর চাইতেও ভিত্তিকর বেননা? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ

তখন অহরহ যে অভিশাপ দেবে, তারা যে অন্ধ বিসর্জন ক'রবে তার দাহ করবেও যে আমাদের তির্যোতে দেবে না।

তবে কি করবো সর্দার? এ তৃষ্ণার ছালা যে আর সহ্যে পারি না।—তাদের উত্তর কণ্ঠ বীরে বীরে শব্দ হ'য়ে এলো।

সর্দার বললেন, আজ তোমরা সবাই যে হার ঘরে ফিরে যাও তাই! গিয়ে দেবতার চরণে প্রার্থনা করো, বলো, আমাদের বাঁচাও, তৃষ্ণার দাহ থেকে আমাদের রক্ষা করো। পরাবীনতার বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত রাখো। তার পরও যদি কিছু না হয় তখন দেখা বাবে পরামর্শ ক'রে।

কী ক'রবেন তখন সর্দার? সর্দার চেয়ে দেখলেন একটি মেয়ে, তার চোখে-মুখে অপূর্ণ নীতি ফুটে বেরছে—দেবতার কাছে প্রার্থনা ক'রেও যদি আপনারা দীপ্তি ফল না মেলে তা হ'লেই কি আপনারা আপনারদের দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশী শত্রুর পায়ে উৎসর্গ ক'রবেন? চকিতে সবাই ঘেরটির দিকে ফিরে তাকালো।

এই-ই জুড়িধ।

তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো তার কণ্ঠ,—নিরাভরণা, রুকবশ, জ্যোতির্মণ্ডিতা অপূর্ণ যুবতী বিধবা। সকলেই নিশ্চিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—জুড়িধ।

জুড়িধ তার কণ্ঠক আরো তীক্ষ্ণ, আরো ঝাঁঝালো ক'রে জবাব দিলো, হাঁ, আমি জুড়িধ। আমি জানতে চাই, এই কি বিশ্বাস-পরায়ণ ইহদিদের মতো কথা? এই কি মাহুঘের কাজ? দেবতা কি আমাদের গোলাম? সে কি কান্নার তোয়াক্কা রাখে যে আমরা তার ওপরে হুকুম চালাবো? কতদিনে তিনি দয়া ক'রবেন তা তাঁর ইচ্ছা—পাঁচ দিনেও ক'রতে পারেন, পাঁচ হাজার দিনেও ক'রতে পারেন, ততদিন কি আমরা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকবো? আর যদি প্রার্থনা বিফল হয় তখনই কি আমরা মাটিতে লুটিয়ে প'ড়বো অসহায়ের মতো? আমরা কি মাহুঘ নই? নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যদি আমরা নিজেরা যুদ্ধ ক'রতে না পারি তবে মাহুঘ হ'য়ে জয়গ্রহণ ক'রেছিলাম কেন? আপনারা আত্মসমর্পণের কথা ভুলে বান। সবাইকে একথা বেশ পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিন—আমরা শিপাশার তিলে তিলে শুকিয়ে মরবো শুবু শত্রুর কাছে মাথা নোয়াবো না।

সর্দারের মনে হ'লো, ভগবানের আদেশবাণী বেন জুড়িঘের মধ্য দিয়ে আজ আত্মপ্রকাশ ক'রছে। তিনি বললেন, তবে তাই হোক মা। পূণ্যবতী তুমি, তোমার কথা কখনো মিথ্যা হবার নয়। সর্দারের আদেশে সবাই যে হার বাড়ী ফিরে গেলো। জুড়িঘও বাড়ী ফিরে এলো।

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জুড়িধ স্বপ্ন দেখলো। দেখলো, সেই শৈলশিখরে ঝাঁড়িয়ে সে একা—আকাশ দিয়ে নিরাশার কালো ডেউ ছুটে আগছে—নোচে তৃষ্ণার নর-নারীর বুকফাটা চীৎকার। এমন সময়ে কে বেন তাকে উদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলো, জুড়িধ! এ জাতিকে নিরাশার হাত হ'তে, শিপাশার হাত হ'তে বাঁচাবার ভার তোমার।

জুড়িধ বললো, হীনা নারী আমি, আমার সে শক্তি কোথার প্রভু?

উত্তর হ'লো, তুমি হীনা নও। চেয়ে দেখো, শক্তি তোমার নিজের মধ্যে—তোমার রূপে, তোমার মেধায়, তোমার নির্ভীকতায়।

কে এই জুড়িখ? সকল কালের সকল দেশের স্বাধীনতার পূজারীসের ইনি নমস্তা।

মিরাবী—ইহনির আরয়ের কত্তা জুড়িখ। অপূর্ব সুন্দরী, দেখে মনে হ'তো বেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হুণাখের খোলাই ক'রে এক জীবন্ত নারী-প্রতিমা সৃষ্টি ক'রেছেন, চাইলে চোখ ফেরানো যেতো না। একদিন মানাসেসের সঙ্গে তার রিয়ে হ'রে গেলো।

কিন্তু কয়েক দিন বাসেই জুড়িখ বিধবা হ'লো। মানাসেস অনেক ধনসৌলভ বেখে মারা গিয়েছিল, কিন্তু জুড়িখ ধনসৌলভের জন্ত লালসারিত ছিল না। স্বামীর শোকে সে সন্ন্যাসিনীর মতো হ'লো—নিরাকরণ, উপবাসকীর্ণা, ক্লমকেশ, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জিত। এখন ভাবে জুড়িখের দিনের পর দিন কাটছিলো।

কিন্তু সেদিন ভোরের আলোর তার স্বপ্ন ভেঙে গেলো, সে চোখ মেলে চাইলো। সবাই অবাক হ'রে দেখলো, জুড়িখ বেন আর সে জুড়িখ নেই। কী অপূর্ব এক আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তির আলোকে বেন তার একদিনকার জমাইবাঁধা অন্ধকার দূর হ'রে মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

সারাটা দিন জুড়িখ আনন্দ ক'রে কাটালো, সন্ধ্যাবেলার সন্ধ্যাকে ডেকে এনে নিরবিচ্ছিন্ন হুঁজনে অনেকক্ষণ কি বেন পরামর্শ ক'রলো। তারপর জুড়িখ তার পরিচারিকাকে ডেকে ব'ললো, আমার সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দাও তো?

বুঝা পরিচারিকা জুড়িখের একথা প্রথমটা বিশ্বাস ক'রতে পারছিল না, ভাবলো, জুড়িখ ঠাটা ক'রছে।

জুড়িখ তার মুখ দেখে তার মনের ভার বুঝতে পারলো, ব'ললো, হী ক'রে চেয়ে দেখছো কি? তোরাও খেকে আমার ভালো ভালো গরনাপত্তর জামা-কাপড় সব বের ক'রে নিয়ে এসো। আমি আজ অভিসারে বাবো।

পরিচারিকা আর কোনো কথা না ব'লে তার আদেশ মতো জিনিসপত্র এনে জুড়িখকে সাজাতে ব'ললো। বসন-ভূষণে রত্নালংকারে তিলোত্তমা সজে জুড়িখ বের হ'লো অভিসারে। সংগে সেই বুঝা পরিচারিকা। পরিচারিকার হাতে চার-পাঁচদিনের উপযুক্ত খাবার আর সেখানে গিরে প'রবার মতো কাপড়-চোপড়। পরিচারিকা জানে না কোথায় তারা যাচ্ছে।

নিভক অন্ধকারের বৃক পথ রচনা ক'রে চ'লেছে দুটি নারী। জুড়িখ আগে আগে, শিঙনে সেই কৌতূহলী পরিচারিকা। হুঁজনে পাহাড়ী পথ বেরে তব-তর ক'রে নীচে নামতে লাগলেন। নগরের সীমান্তে পৌঁছানোমাত্র দ্বারী দ্বার খুলে দিলো, জুড়িখ বাইরে শত্রু-শিবিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। সবাই এসে ভিড় ক'রে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো, চার দিকে লুহুহুহু। কিন্তু জুড়িখ সেদিকে দৃকৃশাত না ক'রে পরম নিশ্চিন্তভাবে ব'ললো,—তোমাদের সেনাপতি মশাই কোথায়?

একজন প্রায় ক'রলো, তার কাছে তোমার কি দরকার?

জুড়িখ উত্তর দিলো, আমি একজন হিঁক নারী, আর এই আমার পরিচারিকা। বিনা শত্রুকরে ইহদিদের দেশ জয় করার ফন্দী আমি জানি।

সবাই কোলাহল ক'রে উঠলো এক সংগে—কি? কি ফন্দী?

জুড়িখ তাহিল্যের সুরে ব'ললো, তোমাদের সেনাপতি হাফা-মার কাউকেই তা ব'লগো না।

অসত্য! জুড়িখকে আর তার পরিচারিকাকে সেনাপতির কাছে হাজির করা হ'লো।

জুড়িখের অতুলনীয় রূপ দেখে সেনাপতি মুগ্ধ হ'লেন। এমন সুন্দরী মেয়ে তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে সেনাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কি চাই তোমার?

আমি জাপানারের বিনা সৈত্করে শত্রুজয় করার উপায় ব'লে দিতে পারি,—জুড়িখ ব'ললো।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তাতে তোমার কি লাভ?

এক অদ্বুত কুটিল হাস্তে সেনাপতিকে মুগ্ধ ক'রে জুড়িখ ব'ললো, সেনাপতি মশাই, কেউ যদি আশনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহলোকের সর্বোত্তম রত্ন লুণ্ঠন ক'রে নিতে আসে তো কি দণ্ড আপনি তার বিধান করেন?

মুগ্ধ! হুঁজ!

আমিও তাই ক'রবো সেনাপতি! নগরের কেউ আমাকে সাহায্য ক'রতে পারবে না। তাই তো বেরিয়ে এসেছি প্রতিহিংসার আগুন বৃক নিরে।

তাহ'লে তুমি আমাদের শিবিরেই থাকছো তো?

হ্যাঁ, আপাতত তুমি আছি। দরকার মতো নগরে হুঁক সন্বাদাদি নিয়ে আসবো।

জুড়িখের বাস করার জন্য একটি পৃথক তাঁবু ছেড়ে দেওয়া হ'লো। তার পর এলো রাশি রাশি খাবার, কিন্তু সে খাবার জুড়িখ স্পর্শও ক'রলো না। তার নিজের সংগের খাবারই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এমনি ক'রে জুড়িখ শত্রু-শিবিরে আত্মনা ক'রলো।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেলো—জুড়িখ বসে বসে শত্রু-ধ্বংসের অবসর খুঁজছিলেন। অবশেষে এক দিন সে অবসর এলো। সেনাপতি রাত্রে জুড়িখকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন,—জুড়িখ সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা তো করলেনই না বরং সাংগে তা গ্রহণ করলেন। এই-ই তার শত্রু ধ্বংস করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি বুঝলেন, এই-ই শ্রেষ্ঠ রূপ স্বাধীনতার মন্ডিরে পূজা দেবার। অনেকক্ষণ বসে তিনি দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানালেন,—দেবকে শত্রুর হাত হতে মুক্ত করবার জন্য আমার এ রূপ নিয়ে খেলা, আমার এ প্রেমেয় অভিনয়—এর জন্য নারীর রূপকে তুমি অভিসম্পাত ক'রো না ঠাকুর। তুমি আজ আমার রূপকে শত্রুগণে বর্জিত করে।

সেনাপতির স্মৃতিতে সেদিন জোয়ার ডাকলো। স্বয়ং জুড়িখ—মনোমোহিনী রূপসী, অপূর্ণশাভনা জুড়িখ আজ মহাদাত্রী। কাজেই পানের মাত্রা অস্বাভাবিক হ'কম বেড়ে গেলো। পেয়ালার পর পেয়ালো নিঃশেষ হচ্ছে। শেষে এমন হ'লো যে, আর মাথা তোলার শক্তি নেই। সেনাপতি শয্যার লুটিয়ে পড়লেন। জুড়িখ একা,—তখন ঘরে আর কেউ নেই। গভীর রাত্রি।

জুড়িখ সচকিত হ'রে দাঁড়ালো। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু,—তাকে ধ্বংস করার এই তো উপযুক্ত সময়।

কিপ্রহস্তুে বসনের তল হ'তে একখানা তীক্ষ্ণ সুবধার ছুরিকা

বেশক'রে ঘুচ মুহূর্তে ধরে একবার ঈশ্বরের নাম নিলো জুড়িধ, তার পর সেই ছুরি সজায়ে সেনাপতির গলায় বসিয়ে দিলো,—শির ফছচ্যুত হ'লো। সেনাপতি একবার হ'লি করাকণ্ড অবসর পেলো না। জুড়িধের হাত রক্তে রঙীন হ'য়ে উঠলো।

পরিচারিকা এতক্ষণ বাইরে বসেছিল। জুড়িধের লাহরানে ভিতরে এসে ভক্তিত হ'য়ে পাকিয়ে পড়লো। জুড়িধ বিনা আক্যে ছির অক্লান্ত হস্তে সেনাপতির ছিন্নহুণ্ডটা ধ'রে পরিচারিকার কুক্ষিতে তুলে দিলো।

পরিচারিকা ভয়ে ধরধর করে কাঁপতে লাগলো।

জুড়িধ বললো, চলো, এখনই আমাদের নগরে ফিরতে হবে।

হুজনে তাঁবুর বাইরে এসে পাঁড়ালো, কেউ তাদের বাধা দিলো না। কারণ তেমন ছত্ৰম ছিল না। অন্ধকার ভেঙ করে হুজনে এসে নগরের তোরণের কাছে পাঁড়ালো,—তোরণদ্বার খুলে গেলো। সেনাপতির হুণ্ডটা নগর-সীমান্তে বুলিয়ে রেখে জুড়িধ খুব জোরে

বগভেরীতে যা দিলো। পূর্বরক্ষাবল্ল মতো হাজার হাজার ইছমি যুবক অস্ত্র হাতে নিয়ে ছুটে এলো। আবার নগর-তো: খুলে গেলো।

আসিরীয় সৈন্তরা এ-সবের কিছুই টের পারনি। টের পেতে বখন তখন চারিদিকে ইছমি-সৈন্ত। সবাই চোঁচিয়ে উঠতে সেনাপতি কোথায়? সেনাপতি কোথায়? সেনাপতির তাঁবু দলে দলে সৈন্ত ছুটে গেলো, গিয়ে দেখে, সেনাপতির গড়টা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সৈন্তরা ভয়ে চতুর্ভুজ হ'য়ে পড়লো। সেনাপতি মৃত্যুতে ভীত হ'য়ে বে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো।

পরদিন বখন পূর্বের আকাশ লাল হ'য়ে উঠলো, দেখা গেলো প্রান্তর আসিরীয় সৈন্তদের শবে পরিপূর্ণ। একটি জীবিত আসিরীয় সৈন্তও সেখানে নেই।

বীরাংগনা জুড়িধের কীর্তি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো জুড়িধই বোধ হয় অগতের ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রথম পূজারিণী।

ব্যর্থ সাধনা

ক্রীবেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনেতে ছিল যে নীরব বাসনা
তোমারই অর্প করিব রচনা
আমারই নীরব সাধনা দিয়া,
তুমি তো জানিতে মনের বাসনা
চিরদিন আমি করেছি কাশনা
তোমারে লভিব শ্রেষ্ঠ সাধনা দিয়া।

মনে ছিল আশা, সাধা ছিল না সে সাধ সাধিতে,
তবু নিশি-দিন করেছি কাশনা
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধনা
কঠোর সাধনা দিয়া।

কত যত্নী স্তন্যয়েছে গান, তোমার বস্ত্র জানি
মোর গীতহীনা বীণা পড়ে থাকে
তোমারই বেদীর পরে,
ওগো, একটু করুণা লাগি
বার্ষ হবে কি মোর শ্রেষ্ঠ সাধনাখানি?

তুমি তো জান, এক তান
আমি সেখেছি শতেক বার,
তবুও তোমার কটাক হয়েছে যে উপহার,
তুমি জান ওগো, করি নাই হেলা
তোমারে শোনাতে মোর এই দীন বীণা
করেছে প্রয়াস শতেক বার।

তোমার শ্রবণে হইবে মধুর
ভাবিয়া মনেতে বুধাই আমি যে সেখেছি সুর,
বুধাই হবে কি এ সুর সাধনা নীরব বাসনা মোর?
মনেতে ছিল যে অনেক আশা
আমার সুরেতে ফুটিবে সে ভাষা;
আজি এনেছি বহিয়া ছিন্নতন্ত্রী নীরব স্নান
কেবাও যুব, কবো পো একটু করুণা দান।
কেল পো অস্ত্র একটি বিন্দু করুণাখানি,
সব হতে ভবে সার্থক হবে মোর বার্ষ সাধনাখানি।

অন্যতম শ্রীমদ্রামায়ণ অষ্টমোহর্য্যায়

সারাবাহিক জীবনী-রচনা

নিমাই-ই নতুন কৃষ্ণ। একাধারে রাধাকৃষ্ণ।
কৃষ্ণই 'রমানাং রসতমঃ'। সর্বভূতমনোহর।
'যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন, সর্বপ্রাণী করে
আকর্ষণ।' ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকুঞ্জিত। কৃষ্ণের
তিনটি বাঁশি। বৈগবী, হৈমী আর মণিময়ী। যখন
গুরু চরায় তখন সহচর রাখালদের আনন্দ দেবার জন্তে
বৈগবী বাজায়। যখন গোপীদের আকর্ষণ করবে তখন
বাজায় হৈমী। আর মণিময়ী? যখন সম্মোহিত
করবে ত্রিজগৎকে। যখন মস্ত মনুর নৃত্য করবে
আনন্দে। কৃষ্ণসারগেহিনী হরিণী মুগ্ধ হয়ে ছুটোছুটি
করবে, কখনো বা পাট প্রণয়দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকবে
স্থির হয়ে। যখন স্তনক্ষরিত স্কেনগ্রাস খেতে ভুলে
যাবে গোবৎসেরা। প্রণতভারবিটগী ফলে-পুষ্পে
মধুধারা বর্ষণ করবে। আবর্ততলে ভাবোচ্ছাস জাগবে
নদীতে। কৃষ্ণের তিন বাঁশি তাই আনন্দিনী,
আকর্ষিণী আর সম্মোহিনী। যার আকর্ষণে বন্ধো-
বিলাসিনী লক্ষ্মী পর্যন্ত আকৃষ্ট। 'যাঁর মাধুরীতে করে
লক্ষ্মী-আকর্ষণ।' যার 'পীরিতিময় প্রতি অঙ্গ', যে
'কেবল রসনিরমাণ'। সৌভাগ্যের 'পরঃ পদঃ', ভূষণেরও
ভূষণস্বরূপ।

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্যসিক্ত। ক্ষীরোদকশায়ী। 'আমি
ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি ক্ষীরোদবিহারী।' কৃষ্ণের রূপ
অসমোক্ষ, অসম আর অনুষ, অর্থাৎ এর সমানও
কিছু নেই, অধিকও কিছু নেই। একরূপ অনন্তসিদ্ধ,
কোনো কৃত্রিম আভরণের ধার ধারে না।
সকলসৌন্দর্যসারসন্নিবেশ। এ রূপ অপরিকলিতপূর্ব।
এমনটি আর দেখিনি কখনো, শুনিনি কখনো। যত
দেখি ততই অদেখা থেকে যায়। নিজের মাধুরীতে
কৃষ্ণের নিজেরও অভূত। যেহেতু নিজের রূপ

নিজে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ আত্মদান করতে পারছে না।
'দর্পণাত্মে দেখি যদি আপন মাধুরী। আত্মাদিতে
লোভ হয় আত্মাদিতে নারি।'

এই আত্মদানের একমাত্র সামর্থ্য রাধিকার।
মাদনাখ্য মহাভাবের যে অধিকারী। কে রাধিকা?
যে আরাধনা করে সেই রাধিকা। যে গোবিন্দের
আনন্দিনী। যে সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তালিরোমণি।
ভাবের পরমাকাষ্ঠা। যার প্রথম স্নান কারুণ্যামৃত-
ধারায়, দ্বিতীয় স্নান তারুণ্যামৃতধারায়, তৃতীয় স্নান
লাবণ্যামৃতধারায়। স্নানশেষে পরেছে কী। 'নিজলজ্জা
শ্যাম পট্টশাড়ি পরিধান।' দ্বিতীয় বসন নেই? আছে।
'কৃষ্ণ-অম্বরাগ-রক্ত দ্বিতীয় বসন।' বুক ঢেকেছে কী
দিয়ে? প্রণয়-মান কঙ্কালিকায়। অজ্ঞানুলেপন
করছে না? করছে বৈ কি। তবে তার উপাদান কী?
নিষ্কাস্তি কুঙ্কম, সখীপ্রণয় চন্দন, আর অধরের
হালিটুকু কপূর। কৃষ্ণের উজ্জল রসই যুগমদ, তার
কলেবরের চিত্রলেখ। প্রেমকুণ্ডলিতাই ছুই চোখের
কাজল, অম্বরাগই অধরের অরুণিমা। চাক ললাটে
সৌভাগ্যের তিলক, প্রেমবৈচিত্র্যই বুকের মধ্যমণি।
সর্ব অঙ্গে উদ্দীপ্ত সাদৃশ্যিক ভাব—নির্বৈদ, বিবাদ, দৈন্ত,
গ্রানি, গর্ব, আবেগ, জাভা, ভীড়া, চিন্তা। কৃষ্ণনাম-
গুণযশই কর্ণভূষণ। কৃষ্ণনামগুণযশই রসনার দীপ।

রাধিকাই একমাত্র দর্পণ, নির্মল সংপ্রেমদর্পণ,
যাতে কৃষ্ণমাধুর্য ঠিক-ঠিক প্রতিকলিত হতে পারে।
আগার সেই প্রতিকলিত জ্যোতি কৃষ্ণে পড়ে
কৃষ্ণমাধুর্যকে আরো মোহনীয় করে তোলে।
'মদ্যধূর্য রাধাপ্রেম—দোহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে
বাড়ে দোহে কেহো নাহি হারি।' যত পান তত
পিপাসা। যত স্পর্শ তত প্রীতি। যত প্রেম তত

মাধুর্য। যত মাধুর্য তত প্রেম। শুধু ইঙ্গিত
থাকলেই কি দর্শন চলে? আর শুধু দর্শনেই কি
আশ্বাদন? চম্ভ তো চিরমধুর, কিন্তু সেই মাধুর্য সেই
পরিপূর্ণ আশ্বাদন করতে পারে যার চোখে প্রেম
আছে। যতটুকু প্রেম ততটুকুই ভোগ। কৃষ্ণ তো
মধুরের সম্রাট, আর, কে এমন ব্রজবাসী আছে যে
না ভালোবাসে কৃষ্ণকে? কিন্তু ব্রজবাসীদের
ভালোবাসা আংশিক, 'পূর্ণতমের চেয়ে সব সময়েই
কম। পূর্ণতম প্রেম একমাত্র রাধিকায়। রাধিকায়ই
একমাত্র প্রোঢ় নির্মল পরিপক্ব প্রেম, রাধিকায়ই
ভাবের একমাত্র অবধি। সুতরাং রাধিকায়ই কৃষ্ণ-মাধুর্য
আশ্বাদনের পরিপূর্ণ অধিকার। রাধিকাই স্বাদ-
শক্তিগরীয়সী।

দর্পণে নিজের মাধুরী দেখে কৃষ্ণের আবার ইচ্ছে
হয় নিজেকে আশ্বাদন করি। মানুষের এই ইচ্ছেই
স্বাভাবিক যে আমার মাধুর্য অস্ত্রে আশ্বাদন করুক।
কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা লোকাতীত। তার ইচ্ছা, আমার
মাধুর্য আর সকলে আশ্বাদন তো করবেই, আমিও
করি। এই-ই স্বভাব, এই-ই স্বরূপপত ধর্ম
কৃষ্ণমাধুরীর। আর সে পরিপূর্ণ আশ্বাদন কি করে
সম্ভব যদি না রাধাভাবে উদ্ভাসিত হই। তাই কৃষ্ণের
রাধিকাস্বরূপ হবার উৎকণ্ঠা। কিন্তু রাধিকা হতে
পারে না বলেই কৃষ্ণের খেদ। 'কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে
উপজায় লোভ। সম্যক আশ্বাদিতে নারে, মনে রহে
কোভ।' কিন্তু কৃষ্ণে কই সেই রাধাভাব?

কৃষ্ণের ক্ষোভের নিবারণ হল খ্রীচৈতন্যে। হল
স্বাদবাহুগার পরিপুতি। রাধিকার ভাব আর কান্তি
অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হলেন নবদ্বীপে।

‘পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি।

রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥

নবদ্বীপে শচী গর্ভ-সুন্দর হুঙ্গসিদ্ধ।

তাহাতে প্রকট হৈল কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু ॥’

১০

দেখ পড়ায় কেমন মন আমাদের নিমাইয়ের।
বাড়ির বার হয় না ছেলে। সারাক্ষণ বই মুখে করে
বসে থাকে। বাবা-মায়ের চোখের আড়াল হয় না।
ক্লেপ থাকে ছায়ার মত।

বিশ্বরূপ একথানা পুঁথি রেখে গেছে তার জন্তে।

বড় হয়ে পড়তে বলছে। কবে বড় হবে না জানি।
কবে সব বুঝবে দাদার মত।

যাবার আগে বিশ্বরূপ ডাকল মাকে। বললে,
‘মা, এই পুঁথিখানা তোমার কাছে রাখো।’

‘কেন বল তো?’

‘বড় হলে পড়তে দিও নিমাইকে।’

‘সে কি,’ অবাক হলেন শচী দেবী, ‘তুই নিজেই তো
দিতে পারবি। আমাকে টানছিল কেন? তোর
পুঁথি তোর কাছেই থাক।’

বিশ্বরূপ হাসল। বললে, ‘আমি যদি দিতে পারি,
ভালো কথা। কিন্তু ঘটনার শ্রোত কখন কোন দিকে
যায়, আগে-পরে কে কবে মরে-বাঁচে, কে বলতে
পারে? আমি বলছি, রেখে দাও তোমার
কাছে।’

তখনো কিছু বোঝেন নি শচী দেবী। রাখলেন
ছেলের কথা। রাখলেন পুঁথি।

খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, নিমাইকে পাঠালেন
অদ্বৈতভায়া, দাদাকে ডেকে আনতে।

কিন্তু কোথায় বিশ্বরূপ! এখানে-ওখানে
কোনোখানে সে নেই, নেই বুঝি বা সংসারসীমানায়।
কান্নার রোল উঠল বাড়িতে। দাদা নেই, নিমাই
লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। আর নিমাই যখন কাঁদছে
তখন আর সব ভুলে আগে নিমাইকে শাস্ত করো।
নিমাই-ই তো সর্বস্বণের পরিশোধ।

এই একজন বিমুখ সংসারে কৃষ্ণ-নাম করছিল,
নবদ্বীপে কলাবলি করছে সবাই, সেও ছেড়ে গেল
আমাদের। বিশ্বরূপই যদি বনে যায় তা হলে
আমরাও তার সঙ্গী হব। কী সুখ হল কৃষ্ণ-নামে,
‘পায়গুরি’ দল যখন উপহাস করবে তখন সইবে না
বাক্যজালা। আমরাও তাহলে কৃষ্ণ-তৃষ্ণা ছেড়ে
দেব। সংসারকেই সার মানব। বাড়াব না গ্রহসন।

কিন্তু অদ্বৈত টলে না। জগন্নাথের আঙিনায় সে
হরিনামের ধ্বনি তোলে। বলে, হরিতেই সমস্ত হরণের
পরিপূরণ। সর্বশৃঙ্খলের পূর্ণায়ন।

অদ্বৈতের উৎসাহে আর সকলেও প্রাণ পায়।
আশায় বুক বাঁধে। কণ্ঠের সুর মেলায়। হরিশ্বনিন
লহর তোলে।

শিশুদের সঙ্গে নিমাই খেলছিল বাইরে, হঠাৎ
খেলা বন্ধ করে বলে উঠল: ‘আমাকে ডাকছে
বাড়িতে।’

‘তোকে আবার কখন ডাকল?’ সজীরা আপত্তি করল।

‘হ্যাঁ, ঐ যে, পাচ্ছিস না শুনতে?’ ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল নিমাই।

নিমাইকে ছুটে আসতে দেখে সবাই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলে: ‘কি রে, কি হয়েছে? কি চাই? আসছিস কেন হস্তদস্ত হয়ে?’

‘বা রে, আমাকে ডাকলে যে তোমরা।’ নিমাই তাকাতে লাগল চারদিকে।

‘না তো, তোমাকে ডাকি নি তো কেউ। সবাই মিলে হরিকীর্তন করছিলাম।’

‘ও, ডাকো নি বুঝি!’ নিমাই আবার ছুটে চলে গেল খেলাস্থলে।

যাকে ডাকছে সে কে, নিমাই-ই বুঝি বুঝতে দিতে চায় না।

‘নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।’ অনেকে একত্র হয়ে ফুটকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করাই কি শুধু সঙ্কীর্তন? না। একলা বসে সম্যক কীর্তনও সঙ্কীর্তন। সম্যক কীর্তন কী? স্পষ্ট স্বরে নামের যথার্থ উচ্চারণই সম্যক কীর্তন। তাই সজনেই হোক, নির্জনেই হোক, দলবদ্ধ হয়েই হোক বা একাকীই হোক, যখনই নাম করবে শব্দ করে করবে। শব্দেই পাট হবে অভিনিবেশ। দূরে যাবে চিন্তা-বিক্ষেপের সম্ভাবনা। সংযত হবে বাগিস্থিয়। আর কে না জানে রসনাই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। রসনা বশীভূত হলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রশমন। তাই উচ্চস্বাভে নাম করে। অহুচে বা নীরবে নাম করলে কি ফল হবে না? আর সব ফল হবে শুধু প্রেম জাগবে না। নীরবে কি প্রেমসম্ভাষণ হয়? নৈঃশব্দ্য কি জাগাতে পারে প্রতিধ্বনি? তা ছাড়া উচ্চস্বর কীর্তনেই তো হতে পারে পরসেবা। বাঘের সঙ্গে নাচতে পারে হরিণ, সাপের সঙ্গে ময়ূর। পরস্পরকে চুষন করতে পারে। হরিদাসের ঘরের ছয়ারে বসে বেণু হতে পারে বৈষ্ণবী।

প্রতিদিন এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করে হরিদাস। লক্ষহীরা তাকে ভ্রষ্ট করতে এসেছে, ব্যস্ত করেছে তার যৌবনের অভিলাষ। হরিদাস বলছে, অপেক্ষা করো, আমার নাম-সঙ্কীর্তন আগে শেষ হোক। তুমি ততক্ষণ বসে শোনো এই নামধ্বনি। নাম শেষ হলে তুমি যা চাও তাই হবে।

‘হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।

সংখ্যানাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার ॥

তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সঙ্কীর্তন।

নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন ॥’

নাম শোনবার পর তোমার যে মন হয়, অর্থাৎ তখন তোমার মনে যে বাসনা আসে তা চরিতার্থ করব। নাম শুনতে-শুনতে প্রস্তুত অবস্থিত হই, সংখ্যাপূরণের পর লক্ষহীরার মনে জাগল ক্রীড়কসেবার বাসনা। ‘তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি। ঘারে বসি নাম শুনে—বোলে হরি-হরি।’

নামই পূর্ণতা-দাতা। নববিধা ভক্তির জনয়িতাও নাম। সর্ববেদ, সর্বতীর্থ, সর্বসংকর্ষ থেকেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। নামই পরম উপায়।

পড়ায় খুব মন দিয়েছে নিমাই। যা পড়ে তাই মনে রাখে, শোনামাত্রই সমস্ত প্রচ্ছন্ন অর্থ প্রকটিত করে। এমন সুবুদ্ধি শিশু আর দেখিনি কোথাও, পণ্ডিত-ছাত্র সবাই বলে একবাক্যে, বলে বিতায় এ বৃহস্পতিকে অতিক্রম করবে।

দেখে-শুনে শচী খুব খুশি। কিন্তু জগন্নাথ বিবাদগম্ভীর। বলে, ‘বিশ্বরূপেরও এমনি মতি ছিল অধ্যয়নে। সমস্ত শাস্ত্রপাঠ শেষ করে শেষ পর্যন্ত এই শিখল, সংসারে ভিলমাত্র সত্য নেই, আর তাই জেনে বিষয়মুখ তুচ্ছ করলে। তোমার এই ছেলেও বিদ্যার অমনি ব্যাখ্যা করবে, সংসার ছেড়ে চলে যাবে অরণ্যে। সুতরাং ওর আর পড়ে কাজ নেই।’

‘মুখ হয়ে থাকবে?’ শচী দেবী আরেক রকম ভয় দেখলেন।

‘তবু ঘরে তো থাকবে। থাকবে তো চোখের উপর।’ বললেন জগন্নাথ।

‘কিন্তু মুখ হয়ে থাকলে ওকে খাওয়াবে কে?’ শচীর আরেক রকম নালিশ।

‘যে সকলের পোষণ-পালন করছে সেই কৃষ্ণ খাওয়াবে। এই আমাকেই তো দেখছ। এত বিদ্যার্জন করেও কেন এত দারিদ্র্য? আর দেখ, যে ভালোমত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না তার ছয়ারে সহস্র পণ্ডিতের ভিড়। বিদ্যায় কিছু হবে না, যদি হয় তো হবে গোবিন্দের আনন্দে।’

আচলে চোখ ঝাঁপলেন শচী দেবী। ‘মুখ হয়ে থাকলে কেউ তো কষ্ট দেবে না নিমাইকে?’

‘কপালে কৃষ্ণ যেমন লিখেছে, মুখই হোক আর

পণ্ডিতই হোক, ঠিক তেমনটি জুটে যাবে আপন-আপনি। কৃষ্ণ-কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়। দৈন্ত্যহীন জীবন আর কষ্টহীন মৃত্যু—তাও কৃষ্ণকৃপার। ধনে-পুত্রই বা কী হবে যদি কৃষ্ণ-আজ্ঞা কৃষ্ণ-ইচ্ছা না থাকে? সুতরাং চিন্তা করে লাভ নেই, কৃষ্ণই একা চিন্তাকর্তা। ডাকো নিমাইকে।

হ' বছরের শিশু, নিমাই কাছে এসে দাঁড়াল।

নির্মম শোনাল জগন্নাথকে। বললেন, 'আজ থেকে তোমার পড়া বন্ধ। পাঠশালা বন্ধ। বুঝলে? যেতে পারবে না আর গুরুর কাছে, পুঁথিপত্রের সব কেসে দিয়ে এস গলায়।'

কাতর গোঁথে তাকিয়ে রইল নিমাই।

জগন্নাথ দমলেন না এতটুকু। কঠোর স্বরে বললেন, 'না কিছুতে না। বিতাই একজনের কাল হয়েছে। আর নয়। আমার মূর্থ পুত্রই ভালো।'

যথা আজ্ঞা। বিতাইরসে ভঙ্গ দিয়ে খেলা নিয়ে মাতল নিমাই। দাদার শোকে একটু সংবৃত হয়েছিল, আবার উদ্ধত হয়ে উঠল। শুধু দিনমানে নয়, রাত্রেও চলল তার চাপল্য। সন্ধ্যা হয়ে গেল, বাড়ি ফিরবি নে নিমাই? আমার কি আর পড়া আছে যে বাড়ি ফিরব? আমার কি আর বই নিয়ে বসা আছে? তার চেয়ে গায়ে কবল মুড়ি দিয়ে বাঁড় সাজি, এ-বাড়ি ও-বাড়ি জিনিসপত্র ভেঙে দিয়ে আনি, পড়ন্তীর কলাবনে ঢুকে তাণ্ডব লাগাই। এ কী মুখের মত ব্যবহার! মূর্থ করে রেখেছ, ব্যবহার কি তবে অশ্রু রকম হবে?

ঐস্বাক্ষুড়ে ঢুকেছে নিমাই। এঁটো হাঁড়ি পর-পর সাজিয়ে সিংহাসন করে বসেছে। গৌর-অঙ্গে মেখেছে হাঁড়ির কালি। সজীরা ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে শচীকে। দেখবে এস নিমাইয়ের কীতি।

হায়-হায় করে ছুটে এসেছেন শচী। এ তুই করেছিল কা? এ তুই কোথায় এসে বসেছিল?

'আমি তার কী জানি।' নিমাই বলছে গভীরমুখে, 'আমি তো মূর্থ। আমার কি ভ্রাতৃত্বের জ্ঞান আছে? আমি কি জানি স্থানের ভালো-মন্দ? আমার কাছে সব জায়গাই সমান।'

'ছি ছি,' ধিকার দিয়ে উঠলেন শচী দেবী, 'তা বলে তুই এঁটো-বুঁটো মানবি নে? আত্মকর্না কেলবার অপবিত্র স্থানে গিয়ে বসবি?'

নিমাই বললে, 'আমি যেখানে বসি সে স্থান কি অপবিত্র?'

'প্রভু বলে, মাতা। তুমি বড় শিশুমতি।

অপবিত্র স্থানে কতু নহে মোর স্থিতি।

যথা মোর স্থিতি সেই সর্বপুণ্য স্থান।

গঙ্গা আদি সর্বতীর্থ তহি' অধিষ্ঠান।'

'শীগগির উঠে আয় বলছি।' তাড়না করলেন শচী, 'স্নান করে আয় গলায়।'

নিমাই গ্রোহণ করল না।

'তোমার বাবা দেখতে পেলেন কী বলবেন বল তো?' শচীর কণ্ঠে এবার অতুলন বরল: 'লক্ষ্মী মাগিক আমার, উঠে আয়।'

'তা হলে বলো আমাকে পড়তে দেবে? যেতে দেবে পাঠশালায়?' ছুটু হাসিতে নিমাইয়ের হুঁচোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বহু লোক জড়ো হয়েছে ইতিমধ্যে। দেখছে মা-ছেলের কাণ্ড। বাপের কাছে খবর পাঠিয়েছে।

'সত্যিই তো কেন পড়তে দেবে না? এ কোন শত্রু পরামর্শ দিল যে ছেলেকে মূর্থ করে রাখতে হবে?' সকলে গজনা দিল শচীকে। জগন্নাথ এসে পড়লে জগন্নাথকে বললে, 'কত বড় ভাগ্য তোমাদের, ছেলে নিজের থেকেই পড়তে চায়। এমনটি আর-মেলে কোথায়? সেই ছেলের মনে ব্যথা দিয়ে লাভ কি? যা করবেন কৃষ্ণ করবেন। যদি কাউকে তিনি নিয়ে যেতে চান মূর্থ বলে নিরস্ত হবেন না।'

সকলে পীড়াপীড়ি করতে লাগল জগন্নাথকে। পড়তে দাও ছেলেকে। ছেড়ে দাও কৃষ্ণের হাতে।

কৃষ্ণই মূল কারণ। আর প্রকৃতি? প্রকৃতি গৌণ কারণ। ঘটের মূল কারণ কুস্তকার। গৌণ কারণ চক্র-দণ্ড। অগ্নিপার্শ্বে দৌহ তপ্ত হয়ে যদি দহ করে তবে সেই দাহের মূল শক্তি অগ্নি, গৌণ শক্তি দৌহ। তাই কৃষ্ণই আদিপুরুষ, প্রকৃতি তার মায়া, নিমিত্ত-কারণ। কি রকম কারণ? 'প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলন্তন।' কোনো কোনো ছাগীর গলায় স্তনের মত মাংসপিণ্ড ঝোলে। দেখতে স্তনের মত হলেও তাতে দুধ জমে না। অজাগলন্তন যেমন তাই সত্যিকার স্তন নয় তেমন প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নয়। বাস্তব কারণ কৃষ্ণ। সবই কৃষ্ণশক্তি প্রস্ফুরিত। সব তাই অর্পণ করে কৃষ্ণকে।

জগন্নাথ বললেন, 'উঠে' আয়। এবার থেকে দেব তোকে পড়তে।'

বজ্রিত হাঁড়ির রাজসভা থেকে হাসিমুখে উঠে এল নিমাই। গঙ্গাদাসের পাঠশালায় আবার পড়তে গেল।

ব্যাকরণের অধ্যাপক, গঙ্গাদাস হিমসিম খাচ্ছে নিমাইকে নিয়ে। গুরু যাই ব্যাখ্যা করে তাই খণ্ডন করে নিমাই, আর যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে গঙ্গাদাস তখন আবার সেই মূল ব্যাখ্যা স্থাপন করে।

বিজ্ঞা-ব্যাখ্যা শুধু পাঠশালাতেই নয়, ঘরে-বাইরে, স্নান করতে এসে চালায় গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে। প্রতি ঘাটে সাঁতার কেটে এসে উপস্থিত হয় আর ব্যাকরণের বিশেষ কোনো সূত্র বা টীকা ধরে কলহ করে। কোনো ছন্দেই গৌরচন্দ্রের সঙ্গে কেউ এঁটে ওঠে না। খণ্ডন করেছ কি, স্থাপন করি; স্থাপন করেছ কি ছেদন করি। আমি শুধু ছেদনে-কর্তনে নই, আমি আবার আরোপে-প্রতিষ্ঠায়।

গঙ্গার বড় ক্ষোভ ছিল, কৃষ্ণ শুধু যমুনাতেই নীলা-বিহার করেছে। ঈর্ষা ছিল যমুনার প্রতি। গঙ্গার সেই ক্ষোভ মিটিয়ে দিল গৌরহরি। নৃতনতর নীলা করল। শুধু কৃষ্ণনীলা নয়, যুগলিত রাধাকৃষ্ণের নীলা। এক দেহে দুই প্রেম। এক ডুবে দুই স্নান।

এবার তবে পৈতে দাঁও ছেলের। দিনক্ষণ ঠিক করো।

উৎসবের আয়োজন করলেন জগন্নাথ। মৃদঙ্গ-দানাই বাজতে লাগল, বিপ্রগণ গুরু করল বেদপাঠ। গৌরঙ্গ আজ শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র ধরবে, হাতে দণ্ড, কাঁধে বুলি, ভিক্ষেয় বেরুবে ঘরে-ঘরে। এস তোমরা দেখবে এস। বামনরূপ ধরবে আজ গৌরচন্দ্র।

বামনের মধ্যে বলি বিস্তরূপ দেখল। দেখল হরির পদদ্বয়ে ধরণী, পদতলে রসাতল। নাভিতে আকাশ, জঙ্ঘাযুগলে পর্বতনিকর, কুক্ষিদেখে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র, কণ্ঠে সামবেদ, বাহু চতুষ্টয়ে দেবমণ্ডলী, কর্ণযুগলে দিক্, শিরে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় বায়ু, দুই চক্ষে সূর্য, বদনে অগ্নি, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ে অধর্ম, পাদদ্বায়ে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাস্তে মায়া, শিরায় নদী, নখে শিলা আর রোমে গুণধি। বামন বলল, হে অম্বরবর, তুমি আমাকে ত্রিপাদশরিরিভ

ভূমি দিয়েছ, আমি দুই পদবিস্তারে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করেছি, এখন তৃতীয় পদের জন্তে ভূমি নির্দেশ করো। গুরু শুক্লচাঁদ্র দ্বারা ভিন্নকৃত হয়েও স্তব্ধত বলি সত্য পরিচয় করে নি, বললে, আমার মাথায় আপনি তৃতীয় পা রাখুন। 'পদং তৃতীয়ং কুরু নীক্ষি মে নিজম্।'

নিমাইয়ের মস্তকমুণ্ডন হল; পরল রক্তবস্ত্র। জগন্নাথ ছেলের কানে পায়ত্ৰীমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এ কি অঘটন! মন্ত্র শুনে নিমাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, পড়ে গেল মুছিত হয়ে। সমস্ত দেহ পুলকে শিহরিত হচ্ছে, বিতরণ করছে উদীপ্ত ভেজ আর দুই চোখে নেমেছে অকূল জাবন। সঃলের পরিচর্যায় যখন বাহুজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের, তখন তার সে কী গম্ভীর মূর্তি! এ যেন তখন নতুন আরেক মানুষ, যেন এ জগতের কেউ নয়। ন' বছরের ছেলে তখন নিমাই, কিন্তু তার দেহে যে নতুন মানুষের আবেশ এসেছে, তাকে চিনতে কারুর ভুল হয়নি। 'চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপ অবতারণ। সিংহদ্বীপ সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার।' গৌরদেহে শ্রীহরির আবির্ভাব হয়েছে। সূত্রং এর নাম হোক গৌরহরি। গৌররায়।

হে কৃষ্ণ, জানি না তুমি কোথায়, জগন্নাথ প্রার্থনা করতে লাগলেন, আমার পুত্রের প্রতি রেখো তোমার শুভদৃষ্টি। কন্দর্পজয়ী এর রূপ, দেখো ডাকিনী-দানবেরা যেন বশ করতে না পারে তাকে। আর যে ছেলে সর্বদা তোমাকে দেখে, তোমাকে ডেকে খুশি, তার যেন না কোনো অমঙ্গল হয়।

প্রার্থনা শুনে মনে মনে হাসল বৃষ্টি নিমাই।

হঠাৎ জ্ঞানীগুরুর মত গম্ভীর স্বরে মাকে ডাকল তার কাছটিতে। ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালেন এসে শচী। এ যেন তাঁর বালক পুত্র নয়, যেন কোন পরাক্রান্ত পুরুষ। শাসনশাসিত স্বরে বললে, 'মা, তুমি একাদশীর দিন ভাত খাও কেন? খাবে না ভাত।'

'খাব না।' অপরাধীর মত বললেন শচী, অমুজ্জা পালনের ভজিতে।

'আর,' আরো বললে নিমাই, 'শোনো, এ দেহ আমি ত্যাগ করলাম এ মুহূর্তে, চললাম গৃহ ছেড়ে। যে দেহ রইল সে তোমার পুত্র, তাকে স্নেহে-যত্নে পালন করো। সময় হলে আমি আবার আসব, আবার দেখবে আমাকে সকলে।'

নিমাই আবার মুহুঁত হয়ে পড়ল। জলসেক
আবার তার চেতনা ফিরে এলে সকলে দেখল, সে
চণ্ডভেজ দেবাবেশ আর তাতে নেই, এ নিমাই আবার
সেই সন্তান-নিমাই। সেই নিতলশীতল নবনীকোমল
লাবণ্যপুঞ্জ।

‘কী বলছিলি বল তো?’ জগন্নাথ মনে করিচ্ছিলেন
দিত্তে চাইলেন।

‘কী বলছিলাম?’

‘বলছিলি, এ দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যে রইল
সে তোমার পুত্র, তাকে তোমরা দেখো।’

‘কই! কখন!’ বিস্ময় মানল নিমাই:
‘আমি আবার কী বললাম।’

হে গোবিন্দ, নিমাই আমার ঘরে থাক, নিমাই
আমার গৃহস্থ হোক। তার যত্নের আমরা ক্রটি
করব না। প্রাণপণ পরিচর্যা করব। পাখার উত্তাপের
আড়ালে রাখব তাকে সন্তুর্পণে।

‘এ কি, এ প্রার্থনা করছ কেন?’ শচী দেবী
শুনতে গেয়েছেন স্বামীর কাতরতা।

‘জানো, হুঃস্বপন দেখেছি।’

‘কী হুঃস্বপন?’ শচী দেবীর মুখ কালো হয়ে
উঠল।

‘দেখলাম নিমাই শিখার মুগুন করেছে, ধরেছে
সন্ন্যাসীবেশ। সব সময়ে কৃষ্ণ বলে হাসছে কাঁদছে
চলেছে নাচছে। দলে দলে লোক চলেছে পিছে-পিছে,
অদ্বৈত আচার্য পর্যন্ত, সুরে সুর মিলিয়ে চলেছে।
সে সুর আকাশ ছুঁয়েছে, ছুঁয়েছে দিক্দিগন্ত।
সকলের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে নিমাই, অদ্বৈতের
মাথায় পর্যন্ত, বলছে গিয়ে বিষ্ণুর সিংহাসনে। এ কী
দেখলাম।’

শচী দেবী আশস্ত করতে চাইলেন। বললেন,
‘এ স্বপ্নমাত্র। এ কখনো ফলবার নয়। পুঁথি ছাড়া
নিমাইয়ের আর কোনো মতি নেই, রুচি নেই। ঘরের
বাইরে জানে না সে পথ-প্রান্তর। বিজ্ঞানসভাবই
তার একমাত্র বস্তু, একমাত্র ধর্ম। তুমি চিন্তা
কোরো না। নিমাই আমার ঘরের ভিত্তি, আমার
অয়ের স্বাদ, আমার চক্ষের তারা। আমার দেহের
মেরুদণ্ড। আমাকে ছেড়ে যাবে না এক পা।’

[ক্রমশঃ।]

মেমোরিয়ালের মাঠের সেই মেয়েটি

বিমলচন্দ্র সরকার

মেমোরিয়ালের মাঠে দেখি তাকে

শব্দ সে সাজ করেছে একটি।

খুশিরে সাদা হাওয়ার উড়িয়ে দিচ্ছে,

বুড়ো বুড়ো ধূলি উড়িয়ে দেবার মতন।

উচ্ছ্বাসে বুধরা একটি চিত্রাপিতা নদী,

অস্তর-বাহিরে লেপেছে বৌবনের ঢেউ।

আলতো গালে সূর্যের রক্তিম-আভা পড়েছে।

উজ্জ্বল কুন্তলরাশি মুখে চপলা হাসি,

দেহের স্তবকে স্তবকে উদ্ভাসিত বৌবন-প্রবাহ।

শূন্য-হাসি তার ছুঁটি কাজলা আঁধি-ছারে;

স্বর্গের মেনকা বৌবনমধে গবিতা মেয়ে

প্রেমাসনে ভোগবতী শিঞ্জীর কল্লিত বাননী।

ঠোটে তার অলঙ্কার তিলক মাখা

কোন রক্তখাকী, বুথি এক প্রেতিনী।

প্রেমোন্মাদে হল ও কলার মারাবিনী,

সাজ সাথে রত্নসুখ-ভোগবিলাসিনী।

কাষিনী অলঙ্কার মেয়ে, কলির মেনকা,

এ বুকের ভাবীজননী উগ্র আধুনিকা।

বীচে কাটছে মঞ্চ নয়। দিনের আলোর অকসেস কাজ করে। আর রাতের আঁধারে জলের ধারে সমুদ্রের ঢেউ

গোঁগো। ওরা আসে আবার চলেও যায়। যাবে করে নিয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ভাল কি, রাতের আঁধারে তা ঢিক্ ঢিক্ করে জলতে থাকে। ওরা কোন্ জানোয়ার জানতে ইচ্ছা যায়। ভয়ও হয়। যদি ওর ঘনিল অতল জলবি থেকে উঠে আসে অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক কোনো জানোয়ার।

রাতের খানা-দানা সাধা। শুয়ে আছি সেই পুরাতন গর্ত আশ্রয় করে, নেটের ঐক্ মশারি মেলে। বগ্ন দেখেছি ভূতের। ভূতে ভাড়া করেছে। আর আমার পাখা গম্বিরেছে, তাই দিয়ে উড়ে উড়ে পালাচ্ছি। হঠাৎ প্রবল বাঁকুনি খেয়ে বগ্ন টুটে গেল। ঘুমও ছুটে গেল। গেল ক্যান? জাহাজভূবি? নাঃ। ও সব কিছুই নয়। আমার পুরোন ও-সির জিপ-ডাইভার। লারেক কাশের আলি। ও কি এখানে তৃত হয়েছ? এত রাতে নির্জন বাচে এলো কি করে? ওর ইউনিট তো এখান থেকে বহু দূরে।

—কি খবর মিঞা সাব?

—হুজুর, বড়া সাব, গাড়ী ভেজা। তুবুন্ত, চলিয়ে। ও সেলাম দিয়ে জানায়। বাফ্। অশরীরী নয়। সশরীরে এসেছে। কিন্তু এত রাতে? আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

তা ও জানে না। শুধু বললে ও-সির অর্ডার। তবু বিশ্বাস নেই। জাপানীদের হাতে বহু অপবৃত্তা ঘটছে। টর্চ জেলে দেখে নিই ওর ছায়া পড়ে কি না।

রাত সাড়ে বারটা। ক্রমে আরও গভীর হচ্ছে। যেতেই হবে। কেন না, খোদ ও-সির অর্ডার। জীপ পাঠিয়েছেন। ও এসেছে সেই জীপে করে। কিন্তু কেন? কোথায়?

ওই সব প্রশ্ন জ্ঞান। অবাস্তব। সবই সিক্রেট। আমরা এক সিক্রেট সোসাইটির সদস্য। কবে, কোথায়, কেন, কি হবে না-হবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও নিষেধ করতে হবে, তা এখনই। রাত বারটা, না তিনটে, সে কোনও কথাই নয়।

হুতরাং যেতে হোল। রাস্তা নয়। সমুদ্রসৈকত। জীপ ছুটেছে দুনিবার গতিতে। ভাটার টানে বাসি জমে সিমেন্টের কংক্রিট হয়ে রয়েছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে তা ক্রমাগত আরও শক্ত হচ্ছে। তারও উপর দিয়ে গাড়ী ছুটেছে উন্নয়নের মতো। স্পীডো মিটারের কাঁটা বেড়েই চলেছে—ক্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর। নাঃ। আর শুদিকে চাওয়া যায় না। যে কোনো বৃহত্তে এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। নারেকের তাক্তে জ্রুপ নেই। সীমান্তের পাঠান। ভয়-ভয় নেই কোনো। চারপাশে লোকজনও নেই যে, পরদিন তারা দেখতে পাবে—এ্যাক্সিডেন্ট হলে বাঁচার আশা। রাতের আঁধারে। বালির ওপর দীপ চাঁদের আভা। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, চূপাশে মনে হচ্ছে যেন একখানা একটানা খুব লম্বা-চওড়া কিত। মনন রাতের বিছানা বিছানো।

ক্রমে গাড়ীর গতি স্বত। সামনে ঢকসা কিশোরী এক একে-বোঁকে চলে গছে বহুদূর। নিশিপাতে উজ্জল জোয়ারের জলে জরে গিয়েছিল আপনায় ক্ষুদ্র স্বপ্ন। এখন তাই আবার ভেঙ্গে চলেছে আপন মনের খুসীতে। তেমনি উজ্জল, আর অকুপশ। সে জানে, অস্বাভাবিক জীবন বোঁক আর জোয়ারের জল। বেগন আসে,

না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বেতাল

তেমনি চলে যায়। ধরে রাখা যায় না। তাই দিয়ে চলেছে নিঃশেষে। এখনও প্রচুর জল। সে জলে জীপ ঠাই পাবে না। আরও কমবে। তাবৎ অপেক্ষা করতে হোল নিঃশেষে।

রাত্রি গভীর। একাদশীর বাঁকা দশী পশ্চিম দিশে বিলীয়মান। আকাশ স্নান। স্নান জোয়ারের ঢাকা ধরী। দিশন্ত প্রশান্তি গুহরী বৃকরী প্রান্তর। চারিদিক ঢাকা। নির্জন সমুদ্রতীর, নিস্তর সমুদ্রজল। নিস্তর প্রকৃতিবাণী নিশীথের আবাহনে উৎকর্ণ। কী যেন এক ভাব সমাবেশে সবাই গভীর, সবাই যত্নময়। মাথার উপর আবছা নীলাকাশ অন্ধকারে যত্নময়ী ধরী জলে গোল হয়ে যেনামেশি। পশ্চিম দিশন্ত সমুদ্রজলে দীপ চাঁদের আভা। মাঝে কচিং একটা ঢেউ। তাও নিঃশেষ। আর তার ভিতরে জলে হাজার হীরামানিক। ভাঁটার টানে জলে চান ধরেছে প্রচুর। মনে বিঁধে পিছনে কেসে-আলা সমস্ত জিনিষ। সেই ঠোঁকে। দামী ক্যামেরা, পার্কার স্টেট। দিনের আলোর লোন্ দিয়েছি বন্ধুত্ব। আর কখনও তাদের দেখা মিলবে না। যদি হয়, এ্যাক্সিডেন্ট। হতে পারে পরলোকে। যদি তা থাকে। প্রায় ষটী ছই বসে, সেই নির্জন আবছা অন্ধকারে। খালের জল কমতে জীপও আবার চলা শুরু করেছে। কোমর জলের ভিতর দিয়ে গাড়ী পার হয়ে গেল। ওটা আগেই ওয়াটারপ্রুফ করা ছিলো।

আবারও বীটারের কাঁটা উঠছে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর। বেগবোরা জাইভার। সামনে জলল-স্রু হচ্ছে। কোথায়ও আলোর লেশ নেই। বিশ্বাসে ত্রিযমাণ শেষ চাঁদ ডুবছে সমুদ্রজলে। সেই অন্ধকারেই গাড়ী ছুটেছে ভূতের মতো বনের ভিতর দিয়ে। গাড়ীতে আসো ছালা নিষেধ। ক্রমে সে জলল আরও ঘনীভূত। কাজেই স্পীডও কমতে করতে একেবারে কমে গেছে। পাহাড়ের কাঁকে কাঁকে ওরা কে পাঁড়িয়ে? বড় বড় তালগাছ মাথা উঁচু করে কি দেখছে। আমাদের গতিবিধি? ওরই কাঁকে কাঁকে তাঁবু। তারাও প্রেতের মত নিঃশেষে পাঁড়িয়ে। ওরাও হয় তো কিছু দেখছে। কী যেন একটা কিছু ঘটতে চলেছে। অথবা হয় তো কারও ইলারায় অপেক্ষমান। আমাদের গাড়ী পৌছেছে সেই অন্ধকারেই। কিন্তু এ কি? এত রাতে সবাই চূপচাপ বাইরে পাঁড়িয়ে কেন? নড়ন-চড়নও নেই কারো। লোকজন, অকিশার সবাই সেই অন্ধকারে পাঁড়িয়ে। সারিবদ্ধ নিঃশেষ। সবই কি প্রেতের রাজত্ব? কিসের অপেক্ষা?

সবাই প্রান্তর। হাতে রাইফেল, কাঁধে ব্যাগ, পোঁতে টোটা। বেয়নেট কুলছে। কোমরে আঁকাই হাতি বাঁটি ঠীলের দা। ওটা তরবারালের মত কুলছে। বর্বার জললমুছে ওটা দেওয়া হয়েছে একখানা করে। বাড়ের কাছে বাঁধা বেজি। ছোট নেটের ঐক্ মশারি ও আর খুব হাফা একখানা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাগ। এই সমস্ত। আরও আছে। ছোট এক টিন এয়ারজেলী রেশান। কিছু ব্যাওন্ড। আহত হলে তার ব্যবহা। বোতলে জল। একটা ছাপল।

সত্যিকারের হাঙ্গল নয়। কাপড়ে তৈরী, জল বাষ্প কায়দা। মালাবাল আর সবই ভীতুতে পড়ে। খোর-ও-সি এডজুস্ট সবারই ওই সাজ-পোষাক। কিন্তু কোথায়? সামনে, না পিছনে?

আমরা কিরে এসেছি। বর্ষার জল থেকে পালিয়ে দক্ষিণ-ভারতের এক বন্দরে। রিট্রিট। বর্ষার জল পড়ে মার খাচ্ছে ওদের হাতে। আর ওদের হাইপারের হাতে। প্রথম জাপানীরা বন্দন রেজুন আর সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে, বুটশ প্রাণভরে পালিয়েছিল। ভারতীয় আর্মি জাপানীদের হাতে বেচে নিয়ে বিনিময়ে নিজদের প্রাণ বাঁচিয়ে। ইংরেজের সে তুল ভেঙ্গেছে পরে। সেই বেচে আসা আর্মি রূপ নিয়েছে জালনাল আর্মির। বন্দন করেছে ডিভিশনকে ডিভিশন। পুরাতনী শিক্ষা। এবার তাই সবসময়ে রিট্রিট? ক্রম সে বন্দর ছেড়ে আমরা দক্ষিণাভ্যন্তর রাস্তার উঠছি। আবর্তিত হয়ে চলেছি মোটরের চাকার সাথে।

কোক নাগর ছাউনী। লোক লোকালয় বহুত দূর। তা বিশ গ্রিণ মাইল। তালবনে ছোট ছোট তালপাতার ফুঁড়ে। দোতলা বনোবস্ত। অর্ধাং মাছ-সমান উঁচু খরে মটকায় তুলে চারখানা খাটিয়া বাঁধা। দড়ির চারপাই। শবের বলতে পারেন। ভারী নীচে মাটিতে আর চারখানা। আটজনের শয়নকক্ষ। বেড়া নেই। তার চার দিক খোলা। চার পাশে বসতি নেই মাছের। জন্তুখানোয়ারও কি নেই? পাশেই ছোট ডোবার জল। বাঁধা বাঁধা হাতখুঁচ খোঁচা চলছে। আর খাবার জল এক হাত বালি খুঁচে মিলে।

বর্মার নামকরা জল উথিয়া। সেখান থেকে আমাদের কোম্পানী দিয়ে এসেছে সমুদ্রানে। এসে আশ্রয় নিয়েছে দক্ষিণ-ভারতে এই তালবনে। বর্মা থেকে মাস্তাজ। সঙ্গারবে পুন্ডাপসংগ। থবরে সর্গ ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে, আমরা এখনও জিতেই চলেছি এবং সে হিসাবে টেকিও বালিন দুটোই আমাদের ছাড়িয়ে বাবার কথা। অনেক আগে। তার বদলে আমরা গিয়েছি উন্টো দিকে। ভারতের নিরাপদ দক্ষিণ প্রান্তে। এই তালবনে। আসল থবর, বর্ষার জল জাপানী আর আই-এন-এর হাতে আমাদের করক ডিভিশন পুরো সাবাড় হয়েছে। মহামাধ জি এইচ কিউ সিমলাতে বসে। থবর পৌঁছতে ম্যালেরিয়ার। আসল তথ্য জেনেছেন ছব মাসে। আরও সাবাড় হওয়ার পর। হুতংগ যুদ্ধের কার্যকামনও ক্রমাগত বদলাতে হচ্ছে। দিন দিন তা পালটাচ্ছে। জাপানীরা পৃথিবীর সেবা মিলিটারী। সেটা প্রমাণ দিয়ে গেল এই যুদ্ধে। বুটশ, আমেরিকা, জার্মান রাশিয়া? জাপানীদের কাছে ওরা তুলনাহীন। যেন অনেক হাঙ্গা পাওয়ার পর একজন আমেরিকান জেনারেল লেখা স্বীকারও করেছেন সেদিন। "Although poverty-stricken and lacking in mental development, the Japanese are the most formidable adversary," ভারতীয় কাগজে যদিও ওকে বর্ষার আখ্যা দিয়েই চলেছে এখনো।

এখানে-রাস হুই থাকার পর আমাদের ছাউনী আবার পথ ধরেছে। সকালে উঠেই হাঙ্গল-পুরী। সাথে চা-পান। তারপর গাড়ী ছাড়লো। ট্রেন নয়, মোটর কনভয়। সমস্ত দিন তা লাইন দিয়ে চলেছে। বেদের সঙ্গার। লটবহর, ব্যক্তিগত জালপত্র, থানাকানা, মার কঠ পর্বত গাড়িতে চাপান দিয়ে

সে গাড়ী চলেছে। চলেছে তো চলেছেই। রাত দশটার আগে তার বিবাহ নেই। বতকশ না অজ ছাউনী পৌঁছায়। যোজ গড়ে শ' মাইল। ছপুয়ে এক কেকের কাছে গাড়ীগুলো থাকে। কেকের জল নিয়ে চা তৈরী হয়। চা খাওয়ার পর গাড়ী আবার পথে উঠলো। বড় বড় করে চলেছে। কেকের জল নেই। ট্রেন থামাও। ওর বরলায়ের পরম জলে চা তৈরী হলো। আপনারা খেতে দেখতে পারেন। রাতের বেলায় অজ ছাউনী। দুলায় আপাদমস্তক ঢাকা। এক কিতুত কিমাকার দৃশ্য। ভুত সাজার কত বাকী? তখন কোনোরকমে হাত মুখ ধোওয়া বা স্নান করা। আর গোয়াসে খেতে যাওয়া। কারণ পেটের ভিতর বৈধানবের লীলা। খাবারও খালে তৈরী থাকে। মাংসও থাকে। রাতটা তাই খেয়ে কাটলো। কিন্তু সকালে সূর্য ওঠার আগে আবারও সেই পথ। যে পথের শেষ অবধি শেষ পাইনি। সূর্যসেব কখন উঠে কখন অস্ত যান, সে থবর আমরা রাখি না। যদিও তিনি আমাদের সামনে মাথার উপর দিয়েই চলেছেন। আমরা কখন উঠবো, কখন অস্ত বাব বিছানায়, সেই ভাবনাই আমাদের প্রবল। কখনও উঠেছি পাহাড়ের চূড়া, কখনও গভীর ঝাড়, কখনও অন্ধকার হুড়কপথে, কখনো বা চলেছি নদীর উপর দিয়ে।

নৌকা দিয়ে দিয়ে ব্রীজ তৈরী হয়েছে। তারই ওপর দিয়ে আমাদের মোটরগুলো পার হুয়ে চলেছে। উঁচু নীচু, পাহাড় পর্বত, গিরি নদী, খালবিল, বনবাগাড় পেরিয়ে অবশেষে যেখানে পৌঁছেছি, তার নাম বোম্বাই সহর। আর ও দিকে এগোন বন্ধ। কারণ সমুদ্র। ও না থাকলে আরও যেতাম। আসবার পথে সস্ত্র পথের তীক্ষ্ণ বাঁক। পাহাড়ের চূড়ার। এমনও হয়েছে, সেখানে ঝাঁড়িয়ে গেছে দুখানা মোটর একেবারে মুখোমুখি। এগোলে বিপদ। পেছোলেও বিপদ। একেবারে খাদের তলার।

আমরা সহর ছেড়ে এবং ডক ছেড়ে এবার জাহাজে। এবার বসবার পালা। সমস্ত মোটর গাড়ীগুলোও জাহাজে উঠা গেছে। অকুরন্ত অবসর, খাও, লাও, হুমাও। প্রাণভরে স্নান করে সমুদ্রে, সমুদ্রের হাওয়া খাও। তিন দিন জাহাজে। সমুদ্রে নীতারও কেটেছি। কিন্তু সবই পুরোন হয়ে গেছে। দশ বিশবার সমুদ্র-যাত্রাও হয়েছে। প্রতে আর মন ভরে না। মনটা লোকালয়ে বেতে চায়। লোকের সাথে মিশতে চায়। একটু প্রাণখোলা জালপত্রা, কয়েক বছর জললে কাটানোর পর। কিন্তু সেটাই মানা। কারণ কারো অজানা নয়। ক্রুটে জালনাল আর্মি। সে থবর বাইরে না ছড়ায়। বাইরে বেতে পাশের প্রয়োজন? পাশ যদি বা মেলে, সবুজ পোষাকে বেতে হবে। রাস্তা ঘাট সব জায়গায় বড় বড় গোল লেবেল মারা। তাতে একটা ক্রশ আর লেখা—Out of Bounds. তারপর মোড়ে মোড়ে এম পি অর্থাৎ মিলিটারী পুলিশ। অর্থাৎ বাবার বাবা। লড়াইয়ের সময়। পুলিশের উপর মিলিটারী। তার উপর মিলিটারী পুলিশ। চুরি করে সাদা পোষাকে গেলে ওরা কি করে ধরে ফেলে। অজুত ওদের ক্ষমতা। জরুলপুত্রের ঘটনা। কয়েক বন্ধু মিলে চুরি করে সহরে বেরিয়েছেন। সাদা পোষাকে সহর বেড়ানো হচ্ছে। প্রজ্ঞা যশগুল। আচমকা এক হস্তকার ধনি এলো—Halt! থব জোর। হঠাৎ ঠাণ্ডার জল যেমন জমে বরক হয়, ওদের পাগুলো ঠিক তেমনি জমে বরক হয়ে গেল এক লম্বাঘা। ধরা পড়লো সবাই।

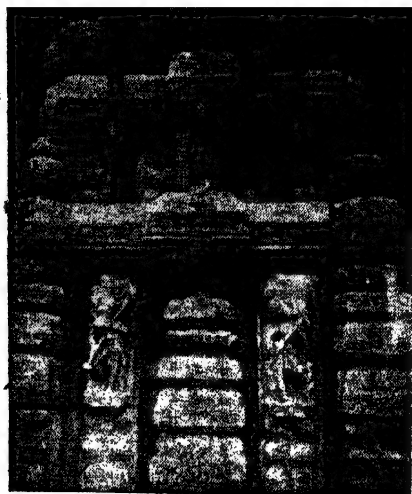


দাপুড়িয়া

-বায়োজনাথ প্রামাণিক



[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না ।]



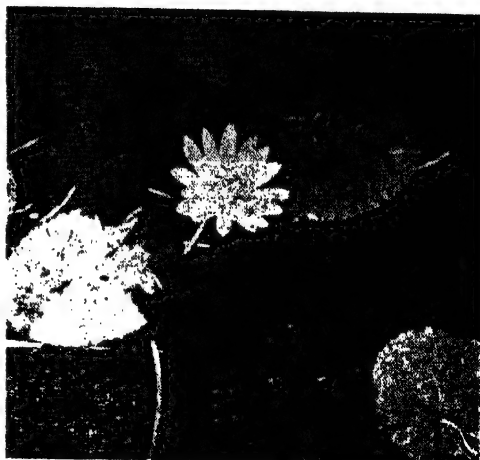
গৌরীকৃষ্ণ (ভুবনেশ্বর)

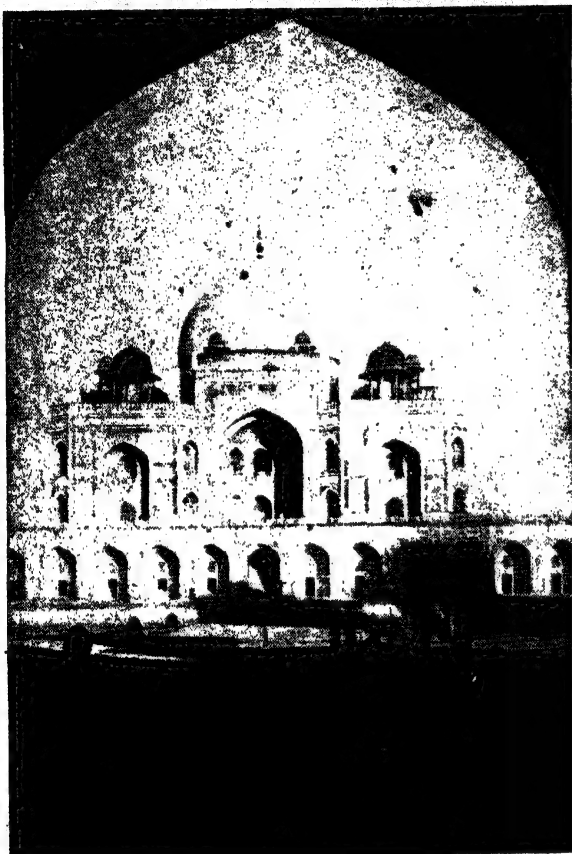
—অমলচন্দ্র দে



লিপি

—মহিলাল বসুগোপাধ্যায়



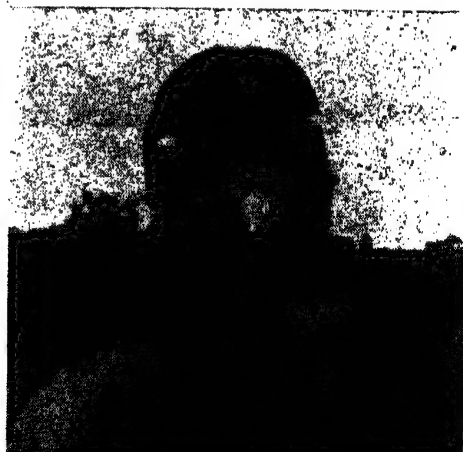


ছমায়নের সমাধি (দিল্লী)

—প্রভাত সেন

কবরী-বন্ধন

—জয়লক্ষ্মী দে





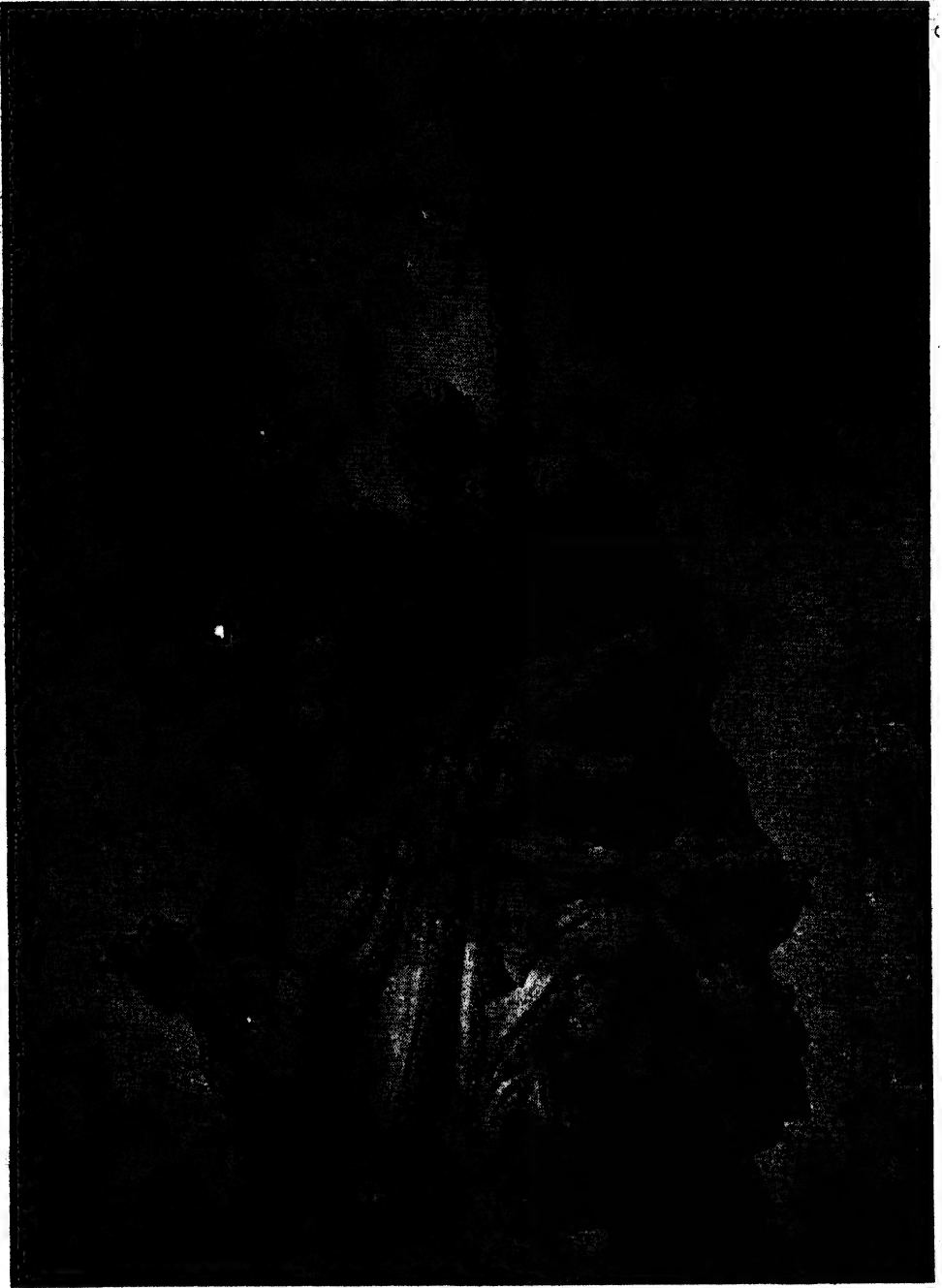
ভাই-বোন
—বাসন্তী মৈত্র



পদ্মী
—ক্যাপটেন ব্যানার্জী

তাজমহল
—ঐশ্বর্য





ସମସ୍ତଙ୍କୁ

—ସାବଧାନ ରହ

আমাদের সম্মুখে 'জম্বান' হিসেবে হজ্বানের জাতি—
জাতিতে বানর। 'জম্বু' বলতে আমাদের এই বানরকুলের

হুয়াই মনে হওয়া উচিত। ইংরাজী ভাষার 'জাম্বো' অর্থ হাঙী।
আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে 'জাম্বো' কথাটি সর্বাধিক প্রচলিত। যে
কোনও আফ্রিকানে আফ্রিকানে দেখা হলেই একে অনরকে হাসিরূপে
অভিবাদন করে আর বলে 'জাম্বো'। মাউ মাউ অশ্রুবিভ কেনিয়া
রাষ্ট্রে কিছুকালের মধ্যে দেখেছি তাগা, দেখা হলেই বলে 'জাম্বো'।
উগান্ডার রাজধানী কাম্পালাতে রোটারী ক্লাবে দেখেছি,
আফ্রিকান সভার নিজেরের মধ্যে প্রত্যাভিবাদন করে বলে 'জাম্বো'।
এক-আফ্রিকার নীলনদের মোহনার জিজার জঙ্গলে শিকারীদের
পরাম্পরে অভিবাদন করতে দেখেছি 'জাম্বো' বলে। আমাদের কেউ
শিখরে দেখনি, আমি নিজে নিজেই ভাষার পাড়ীর সোকারকে
একদিন সকালে দেখা হতেই বললাম 'জাম্বো'। আমার সোকার
শিলাপ্তো হেসে পদগম হয়ে বললো 'জাম্বো, জাম্বো'। পরক্ষণেই
জিজ্ঞাসা করলো, 'সাহেব স্পিক সহসী?'—সাহেব, আপনি
সহসী ভাষা জানেন। পরে জানতে পারলুম আফ্রিকাতে
অনেক জাত অনেক ভাগ-বিভাগ থাকলেও ওদের সবাইর
একটা (Common Language) আছে যার নাম (Swahili)
'সোকাহিলী' বা সহসী। পরে তথা সংগ্রহ করে জানতে
পারলুম যে আন্তর্জাতিক কথ্য ভাষার মধ্যে এই সহসী
ভাষার স্থান সপ্তম এবং বিশালত আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে
এই সহসী ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ। কেনিয়া, উগান্ডা,
টানজানিয়া, জাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, তৎকা সর্বত্রই সহসী ভাষার
প্রচলন আছে। এ ভাষা শিক্ষাও কঠিন নয়, বাকরণের দুর্গম কল্পনা
কেন না করেই সহসী দেখা যায়। সহসী ভাষার জাম্বো হ'ল প্রথম
অভিবাদন, অন্তর্গত দ্বিতীয় ভাষার 'নমস্তে সুকিয়া' ইংরাজী "How
do you do, Good Morning" "নমস্তার, কেমন আছেন,"
'জয় হিন্দ' অনেকটা এই জাতীয়। আজান হিসেব সভরা যেমন
নিজেরের মধ্যে 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন করতো 'জাম্বো'
কথাটির মতোও ঐরূপ জাতীয়তার তাৎপর্যপূর্ণ আনন্দমিশ্রিত
অকৃত্রিম শুভ কামনা'র উপস্থিতি আছে। কাজেই যে কোনও
আফ্রিকাবাসীকে 'জাম্বো-জাম্বো' বললে তারা খুশী হয়। জাম্বো
অর্থ 'নমস্তার, অসুখমারস্ত: শুভার ভবতু'।

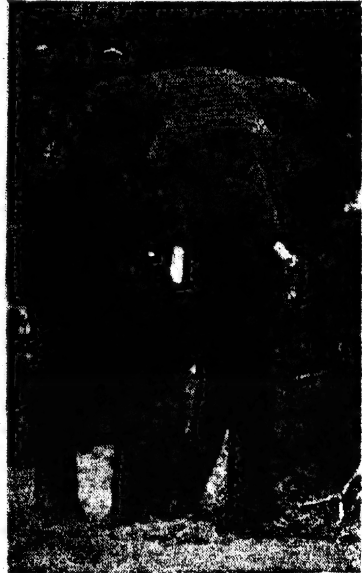
আফ্রিকার এসে আমরা একদিন দল বেঁধে দুপুর বেলায় মোটরে
চড়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করি। একেদে নিয়ম হল, পাড়ী থেকে
নায়া নিবেধ, পাড়ীর দরজা-জানালা কাচ বন্ধ করে জঙ্গলের মধ্যে
আড়ি পেতে থাকতে হয়। কিছুকাল মধ্যেই সব বকম বড় বড়
জন্তু-জানোয়ারের দেখা পাওয়া যায়। সঙ্গে একেশীয় লোক
'গাইড' নিতে হয়—জঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্রের সব হিসাব তার জানা
আছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকবার কিছুকালের মধ্যেই ৫৬০টা সিংহ
দেখতে পেলাম। আমাদের মোটরের মাত্র তিন চার ফুট দূর দিয়ে
সিংহের দল চলে গেল। জেব্রা, জিরাক, বাইসন দেখলাম নত মত,
আর জংলী হরিণ দেখলাম হাজার হাজার। জঙ্গলের মাঝে মাঝে
ঘাসের বন আছে—মাঠ আছে, সেখানে পাড়ী নিয়ে গেলে হাজারে
হাজারে জেব্রা, জিরাক, উটপাখী, হরিণ, বাইসন, সব কিছু দেখা যায়।
মোটর পাড়ীতে বসে হাতী দেখা নিরাপদ নহে। আমরা উগান্ডা
খানেকালো দুখন হাতী দেখতে যেম হলো—দুই হল সাধারণ

জাম্বো

যাঙ্গুসট্রাট পি, সি, সরকার

এখানকার এক (Tree Top Hotel) গাছের ডগার হোটলে
থাকতে হবে। দিনের বেলা বণ্ডা হয়ে এই গাছের ডালে (সিন্ধুয়ার
ট্র্যাকের মত বাড়ীতে) রাত ভোগে বসে থাকতে হবে—নীচে আসবে
সব বকম জন্তু-জানোয়ারের দল—বিশেষ করে হাতীর দল। আমরা
যখন সেখান জন্তু সেলাম তখন সব ব্যবস্থা সুলভ ছিল। কারণ এক
চার-পাঁচদিন আগেই ইংলণ্ডের রাজমাতা এখানে এসেছিলেন
এক তিনিও এই গাছের ডালে চোটেলে বসে জানোয়ার
দেখেছিলেন। দিনে দিনে বেতে হয় আবার দিন হলে কিরে
আসতে হয়। কিন্তু বনের মধ্য দিয়ে বাবার সময় যে কোনও
বুহুস্তে যে কোনও বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া যেতে পারে।
সিংহ, বাঘ, পণ্ডার, হরিণ, হামেদা, জেব্রা, জিরাক এবং কেউই
পাড়ী আক্রমণ করে মাছুষ মারে না। পাড়ী বন্ধ করে চুপ
করে বসে থাকলে এদের জন্ত কোনও ভয় নেই; তবে 'জাম্বো'
বা হাতীর কথা বস্তু। সেজ্ঞ এখানকার গভর্নমেন্ট কতকগুলি
কর্তব্য লিখে নোটস দিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমত: জঙ্গলে ঢুকলেই মাঝে মাঝে দেখা যায়
Elephants have the right of way অর্থাৎ এই পথে
আগে হাতীকে যেতে দিতে হবে। হাতীর সাধারণত:
তাদের জানা রাস্তা দিয়ে বেশী বাতায়ত করে। কাজেই
ঐ সব রাস্তা দিয়ে প্রায়ই জংলী হাতী বাতায়ত করতে
দেখা যায়। ঐ সব বাঁধা-ধরা জায়গা ছাড়াও অন্তত সর্বত্র
প্রায়ই হাতীর দেখা পাওয়া যেতে পারে। তাই মোটর-চালকদিককে



'জাম্বো'

নিম্নলিখিত উপদেশ ছাপিয়ে জানানো হয়েছে—(ক) রাস্তার পাশে ঝোপ থাকলে তাড়াতাড়ি মোটর চালাবে না, রাস্তা বাঁকা হলে খুব উচু-নীচ হলেও তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাবে না। (খ) রাস্তার হাতী দেখলে এগিয়ে যেও না, সাবধান হয়ে দূরে সরে পড়বে, হাতীকে আগে পথ ছেড়ে দেবে। গাড়ী নিয়ে আস্তে হাতীর দিকে এগিয়ে যেও না, মনে করো না যে গাড়ী দেখে হাতী চলে বাবে বরং তুমিই অবাচ হলে দেখবে যে, এক সেকেন্ডের মধ্যে তোমার পেছনেও একটা হাতী ঝাড়িয়ে আছে, বা রাস্তার ধারে বসন্তলি ঝোপ দেখেছিলে সবই হাতীতে পরিণত হয়ে আছে। (গ) হাতী রাস্তার ধারে রয়েছে দেখে অধীর হয়ে গাড়ীর গিয়ার চেপে তীব্রবেগে পার হতে চেষ্টা করো না, হাতী এতে চমকে উঠে তোমার পেছনে ভীষণ ভাবে তাড়া করবে। (ঘ) হাতী দেখে গাড়ীর হর্ণ বাজিও না, বরং ইঞ্জিনের শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বুঝতে দিও যে তুমি যাচ্ছ। (ঙ) তোমাকে শেষ কেরী ষ্ট্রিমার ধরতে হবে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তা হলে অনেক আগে রওনা হও, কারণ মাঝপথে বুনাহাতী তোমাকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে। (চ) হাতী যদি রাস্তার দিকে হুহু করে না থাকে, যদি রাস্তার দিকে আসতে না দেখে, যদি অনেক দূরে দেখে তবে ভয় নেই, নিশ্চিন্তে চলে যেও, হাতী তোমার দিকে নজরই দিবে না। আফ্রিকার জঙ্গলে পথ চলতে হলে এদেশের গাড়ীচালকদের এই ছয়টা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হয়। উপাচার Road Safety Propaganda Committee মাঝে মাঝেই এদেশের বড় বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সব কথা জানিয়ে দেন।

গভর্নমেন্টের বস্ত্র প্রাণী সংরক্ষণ সমিতির প্রধান অফিসার (মি: আর, এম, বিয়ার) একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। সম্প্রতি একজন আমেরিকার কিম্ব প্রভাসার তাঁর সহকারী সহ আফ্রিকার জঙ্গলে আসেন। এক দল হাতী এখানকার "নিয়ামাগাসানী" নদী পার হচ্ছিল তখন তিনি দুই-তিন শত গজ দূর থেকে ঐ হাতীগুলি দেখে গাড়ী থেকে নেমে কিম্ব তুলতে আরম্ভ করেন, তৎক্ষণাৎ অল্প একটা হাতী বিদ্রোহবশে তার পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে।

তিনি ক্যামেরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ক্যামেরাটিকে জেলে-চুরে দিয়ে হাতী ঐ কাঁটার ঝোপের মধ্যে থেকে মিষ্টার ল্যাণ্ডারকে টেনে বের করে তিনবার শুঁড় দিয়ে ধরে উপর দিকে ছুঁড়ে মারে—বখন তিনি হাতীর দুই পারের কঁকের মধ্যে পৌছেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ মরার ভাগ করেন। এটা কার্যকরী হয়, কারণ হাতী তাকে ছেড়ে দিয়ে যায়—বদিও সন্দেহের সঙ্গে অনেকবারই পেছন ফিরে দেখেছিল। মিষ্টার ল্যাণ্ডার প্রাণে মারা যান নি, তবে তাঁর ডান পা-টি গিয়াছে, বা পা-টিও মচকে গিয়েছে—সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষতের দাগ নিয়ে আজও বেঁচে আছেন।

আফ্রিকার জঙ্গলে একটা হাতী সর্বাধিক সংবাদপত্রে পাবলিসিটি পায়। তার সফল এদেশে এবং বিলাতে অসংখ্য সংবাদ ও ফটো ছাপা হয়েছে। আফ্রিকার জঙ্গ সংরক্ষণ সমিতির অন্ততম ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিষ্টার জন মিলস এই হাতীর অনেক বিবরণ লিখেছেন। আফ্রিকার যে হাতীটা এত প্রসিদ্ধি পেয়েছিল—জর্জীয়া তার নাম দিয়েছিল "লুব্যাংগাওন" (Lubangawon) যার ইংরাজী অর্থ করে ইংরেজগণ এর নাম দেন The Lord Mayor...বখন এই জঙ্গলের প্রধান কার্যালয় ১৯৪৪ সালে পারা (Paraa) নামক জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তখন প্রত্যেক দিন দুপুরে এই লর্ড মেয়র এসে কার্টের মিস্ত্রিদের কার্যালয়ে এসে ঝাড়িয়ে থাকতো। একদিনও বাধ বায় নি—প্রত্যেক দিন দুপুর বেলায় লর্ড মেয়র এসে কাজের কাছে তাজির। মিস্ত্রিরা ঐ লর্ড মেয়রের অন্ততঃ ত্রিশ গজ দূরে থাকলে তবে কাজে মন দিত। লর্ড মেয়র কলা খেতে খুব ভালবাসতো। যদি সে বুঝতে পারে কোনও ক্যাম্প বা মোটর গাড়ীতে কলা রয়েছে—তবে সে নিষিদ্ধে সেখানে গিয়ে শুঁড় দিয়ে কলা বের করে আনতো। মোটর গাড়ীর দরজার জানালায় কাচের কাঁক দিয়ে সে কোঁশলে শুঁড় চুকিয়ে দিতে ওস্তাদ হয়েছিল। রাত্রিবেলার ক্যাম্পের পাশে আগুন জালিয়ে নিশ্চিন্ত মনে লোকেরা শুয়ে থাকে। আগুন দেখলে হাতী, গণ্ডার, কিং সব প্রাণীই ভয় পায়, কখনও ক্যাম্পের কাছে যাবে না। লর্ড মেয়রের কথা বস্ত্র, সে রাত্রিবেলার চুপি চুপি এসে জানালা দিয়ে শুঁড় চুকিয়ে কলা-মুলা বা পায় নিয়ে যায়।



আফ্রিকার হাতী আপন মনে জল খাচ্ছে



আফ্রিকার জঙ্গলে শুধু হাতীর নহে, জলহাতীরও দলে দলে চলে

আর নিম্নিত লোকদের সাথে মজা করার জন্য তাদের গায়ের লেপ, কবল সব টেনে নিয়ে যায়। লর্ড মেরর কাউকে মাঝে নি, ভবে ভয় দেখিয়েছে সবাইকে। কত শত লোক তার কটো তুলেছে—তার কটো দিয়ে কত বক কটো শোষ্টকর্ড তৈরী হয়েছে। এসেশীর ও বিলাতী কত শত খবায়র কাগজে তার ছবি প্রথম পাতার ছাপা হয়েছে—এতেন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে সে লোকজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইহারী করতে ভালবাসতো—কলা চুরি করে খেতো। একবার একজন শিকারী এসে এখানে একটা হোটেলের আশ্রয় নেয়। হোটেলের জায়গা বেশী ছিল না—তাই কয়েক জন গাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করে সেখানে শুয়ে পড়েন। কিন্তু খাওয়ার জিনিষ (কলামূল্য) গাড়ীর নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। লর্ড মেরর যথারীতি তার রাড্রিবেলার টেল দিতে এসে, ঐ কলার খোঁজ পান কিন্তু শুঁড় দিয়ে ঐগুলি আনতে না পেরে শেষে গাড়ীটাকে উন্টনের দূরে সরিয়ে দিয়ে কলা খেয়ে নেয়। গাড়ীর আরোহীরা অকত দেখে থাকলেও তারা যে ভয় পেয়েছিল তা জীবনেও ভুলতে পারবে না। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত কিয় কোম্পানী আফ্রিকার জঙ্গলে ছবি তুলতে আসেন। তারা হ্রদের একধারে ষ্ট্রিমারঘাট তৈরী করে পাশেই তাদের Naked Earth নামক ফিল্মের 'সেট' তৈরী করেন। ঐ সেটে একটা খুব উঁচু কাঠের বেড়া দেওয়া হয়েছিল।

শক্ত কাঠের বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্য—যাতে হঠাৎ কোনও জঙ্গলী জানোয়ার সেখানে ঢুকতে না পারে। একদিন সকালে কিয় কোম্পানীর সমস্ত লোকজনকে সচকিত করে সেখানে হাজির হুল লর্ড মেরর আর ঐ বেড়াটাকে ফুংকারে উড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে এসে হ্রদের জল খেয়ে গেল। কিয় কোম্পানীর লোকেরা এই ব্যাপারটিকে প্রাপ্তি কিয় তুলে নিয়েছেন—জানা গেল যে

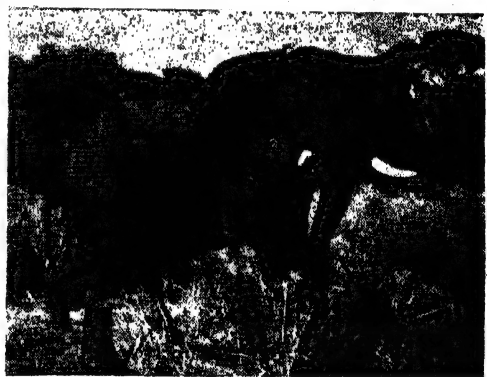
ঐ ফিল্মে ঐই দৃষ্টান্ত দেখানো হবে। পরে কিয় কোম্পানী লর্ড মেররের জন্য ঐ বেড়ার এক দিকে বাঁধা ছেড়ে দেওয়াতে আর কোনও দিন নতুন বিপদ হয় নাই।

একবার এখানকার বড় জন্ত সারকশ সমিতির অফিসারের বাড়ীর কাছে একটা জলের কল লর্ড মেররের দৃষ্টতে পড়ে। লর্ড মেরর জলের কল নাড়াচাড়া করে সেটাকে হঠাৎ খুলে ফেলে এবং প্রাণভরে ঐ নলের জল খেয়ে নেয়। পরে দেখা গেল যে প্রত্যেক দিন তিনি একটা করে জলের কল খুলে দিয়ে তার ঠোঁট জল খাচ্ছেন। লর্ড মেরর আর পচা ভোঁরা বা পক্ষি হ্রদের জল খেতে চান না, প্রত্যেক দিন কলের জল নিজে নিজে খুলে নিয়ে প্রাণ ভরে খেয়ে নেয়—কিন্তু কোন দিনই তিনি আর কলটা বন্ধ করে রাখেন না। কলে প্রতিবেশীদের হয় জলকষ্ট। তারা স্থির করলেন রাড্রিবেলার জলের সান্নাই বন্ধ করে দেবেন। লর্ড মেরর রাড্রিতে কল খুলে দেখেন জল নেই, এত বড় অশ্রম! সে কলটা ভেঙ্গে—যুটড়িয়ে জন্ত একটা কল খোলা হল সেটাতেও জল নেই। এই ভাবে পর পর কল ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ বেগবোরা হয়ে হাতী বাতে না খেতে পারে (Elephant Proof) জলের কল বসিয়েছে। লর্ড মেরর মাছ খুন করে নাই—তবে কলা আর ছুটার খোঁজে সে অনেক তাঁর ছিঁড়েছে, অনেক গাড়ী উন্টে দিয়েছে, লোকজনের বাড়ী ঘর অনেক ছোটখাট ইমারতী ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে। কাজেই গভর্ণমেন্ট একদিন তাকে গুলী করে মারতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পর তার সমস্ত বিবরণ কাগজে ছাপা হয়—মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র বিশ বৎসর, তার দেহের ওজন ছিল ৩০০ টন। আফ্রিকার ও বিলাতের পত্রিকায় পত্রিকায় তার কটো ও মৃত্যু-সংবাদ ছাপান হয়েছে। লর্ড মেরর মরেও আজ হস্তিকুলে অমর।



গাছের ডগার (Tree Top) হোটেল থেকে

হাতীর দল দেখা যাচ্ছে



হাতী তাকিয়ে রয়েছে—এ রাত্তা মোটেই নিরাপদ নয়

"Ships that pass in the night, and speak each other in passing,
Only a signal shown and a distant voice in the darkness;
So on the ocean of life we pass and speak one another
Only a look and a voice, then darkness again and a silence."

—H. W. Longfellow,

সামগ্রী অশোচকামিনী

ঐশ্বর্যীর ব্রহ্ম

[১২৩০ সালের বৈশাখ মাসে (ইং মে ১৮৫৬) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মাইহাটি পরগণাভুক্ত ঐশ্বর্য গ্রামে স্বর্গীয়া দেবী অশোচকামিনী রায়ের জন্ম। ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে তাঁহার বিবাহ হয় স্বর্গীর প্রাণকানী রায়ের পুত্র ঐশ্বর্য প্রকাশচন্দ্রে রাইয়ের সহিত। বয়স-৮ বৎসর বয়স বধাক্রমে ১৮ এং ১০ বৎসর। অশোচকামিনী-র পরলোকগত হওয়ার তারিখ ১৫ই জুন ১৮৯৬। জন্ম—১৮৫৬, মৃত্যু—১৮৯৬, বিবাহ—১৮৬৬ এই বর্ষকালের প্রত্যবেই চরিত্র আবিধানচন্দ্রে রায় আশ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সামগ্রী অশোচকামিনী আমার প্রাক্তিবেশী উক্ত রায় মহাশয়ের পুত্রনয়ী মাতা ছিলেন। এই জীবন-আলোচ্যটি ঐশ্বর্যপ্রকাশচন্দ্র সমুদায়ের কর্তৃক গঠিত ব্রিটিশ নামক পুস্তকের (জী-জাতীয়-উন্নতি বিষয়ক উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত) সংশোধিত ও বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত। তদানীন্তন বঙ্গ মহিলা সম্বন্ধে ১৩০৫ সনে প্রকাশিত এই অশটুর্ক বিষয়টির অতল তলে ভূবিয়া বাওয়ার পূর্বে জর্জ পুত্র সংখ্যা ১৫৮—১৬৪ হতে উদ্ধার করা গেল। কারণ যনে হয়, স্বর্গীয়া অশোচকামিনীর চরিত্র আলোকের দিনেও আমাদের সমাজের মা ও বোনদের অঙ্গকরযোগ্য—।]

বর্তমান সময়ে সামগ্রী অশোচকামিনীর চরিত্র মহিলাকুলের পক্ষে বিশেষরূপে হিতকর। তিনি আমায়গিরের নিকট পরিচিতা ছিলেন। এবং আমায়গিরের পরমাত্মীয় ছিলেন। উক্ত-পূর্ব বায়লার টাকী নামক পল্লীতে কারত্বকুলে অনুমান ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অশোচকামিনীর জন্ম হয়। ১৮১৫ শকে বাঁকিপুর নগরে তাঁহার বৃত্তা হয়। বাল্যকালে তাঁহার কোনরূপে বিভ্রাটিকা হয় নাই। এবং দশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তির হস্তে তাঁহার ভার অর্পিত হয় তিনি অতি সুপাত্র ও সদাশয়। টাকী নিবাসী ঐশ্বর্য প্রকাশচন্দ্র রায় অশোচকামিনীকে বিবাহ করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা কার্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন, আর বয়স হইতেই অশোচকামিনীর ধর্মে যতি জন্মে, ২১ বৎসর বয়সক্রমে তাঁহার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা হয়। তখন হইতেই তাঁহার প্রবল ধর্মতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। তিনি ধর্ম্মিষ্ঠা স্বামীর সঙ্গে একত্র হইতে বঞ্চিত হইয়েন, এবং পরহুণে সহানুভূতি ও সহায়তা করিবার জন্য আশ্রয়গ্রহে নিযুক্ত হইয়েন। এই সময়ে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া একটা প্রকাণ্ড বড় হয়, এবং তাহাতে লোকে ধারণার নাই ভীত হইয়াছিল। তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য অশোচকামিনী অর্থাভাবে আপনায় বর্ণভাবিত অকাতরে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরহিত-পরায়ণ স্বভাবের ইহাই প্রথম পরিচয়, অশোচকামিনী নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রায়শ্বেই স্বামীর কক্ষস্থানে বিহার প্রদেশে বাস করেন।

মতিহারী ও বাঁকিপুর, বিশেষত বাঁকিপুর তাঁহার কক্ষভূমি হয়, যখন যেখানেই বাস করিতেন দয়া ও পরোপকার প্রযুক্তির পরিচয় দান করিতেন, অতি সামান্য বিষয়েও পরহুণে মনযোগিনী হইতেন। বহিঃকোহ তাহাকে কোন প্রকার কল, মূল, কি মিষ্টান্ন উপহার দিত, তিনি তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাগ করিয়া অনেকের গৃহে পাঠাইয়া এবং তাহার একাংশ মাত্র নিজ

পরিবারের জন্য রাখিতেন। বিহার অঞ্চলে নারিকেল বড় দুপ্রাপ্য বস্তু। একবার অশোচকামিনী দুই চাণ্ডি নারিকেল উপহার পাইয়া তদ্বারা এক প্রকার শিষ্টক প্রস্তুত করিলেন, এবং নিকটস্থ বিভাগলের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহাৰ করাইলেন এবং ছাত্রেরা প্রবাসে অতি সামান্য আহাৰ করিয়া থাকে, এই নিমন্ত্রণে সুবাহু মিষ্টান্ন ভোজনে অতিশয় আনন্দিত হইল।

এই সামান্য বিষয়ের উল্লেখ এইজন্য করা যে, অশোচকামিনী অতি শ্রদ্ধা পরোপকার ভ্রতে অতি অধিক অগ্রগতি ও উৎসাহী হইলেন যে অন্তর সেবা তাঁহার জীবনের প্রাধান্য কাব্য হইয়া উঠিল। যেরূপ লোক হউক না কেন, উচ্চপদস্থ হউক আর অতি নীচ জাতীয় হউক বিপন্ন হইলেই সামগ্রী অশোচকামিনী তাহাদের সেবায় আশ্রয়দান করিতেন। একদিন সমাচার আসিল যে বাঁকিপুরের কোন উচ্চ কর্মচারীর পত্নী প্রসবদ্বারা পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাহাকে এবং তাঁহার কন্যা শিশুক সেবা করিবার কোনো লোক নাই। অশোচকামিনী তখন আহাৰ করেন নাই। কিন্তু শুনিবামাত্র তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন এবং যদিও এই পরিবার তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি এরূপ বস্তুর সহিত প্রসূতি ও শিশুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন যে, লোকে দর্শনায় আশ্চর্য হইল। অনাহারে সমস্ত দিন ইহাদের সেবা করিলেন কিন্তু শিশুক ঠাণ্ডা হইতে পারিলেন না। তিনি আর একদিন শুনিলেন একটি আত নীচ জাতীয় ব্রীলোক প্রসবভঞ্জে অতিশয় ক্লম হইয়া পড়িয়াছে, ক্রোধগতি সেখানে গিয়া দেখেন, প্রসূতি একজন কয়লা-বিক্রেতার পত্নী, একটি অতি ক্ষুদ্র অপরিষ্কার কুটির মধ্যে বাস করে। আবার সে কুটিরের অর্ধাংশ অস্বাস্থ্যবাসিতে পরিপূর্ণ, ঘরে ভয়ানক দুর্গন্ধ, শব্দা নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই পথ্য নাই। উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি নিজ পরিচিত চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইলেন। নিঃশব্দ হইতে শব্দা ও বস্ত্র আনাইলেন এবং স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া ধূলি মলিন ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইলেন। দুই গৃহস্থেরা অনেক নিবেদন করিল, তিনি শুনিলেন না, বলিলেন, এই দুই হস্ত কিসের জন্য? শ্রদ্ধ কুটির-বাসিনীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন এবং বতদিন সে সবল না হইল তাহার শুশ্রূষা করিলেন।

কোন আগন্তুক অতিথি অশোচকামিনী দেবীর গৃহে নিরাশ্রয় হইয়া আসিলে কিরিত না। একবার একদল সাক্ষী অভিনেতা-দিগের মধ্যে একজন পীড়িত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। এ প্রকার লোকের সঙ্গে তাঁহার কখনও কোন সঙ্গ হইল না, তথাপি পীড়িত দেবী তাহাকে তখনই গৃহে স্থান দিলেন এবং বস্ত্র সহকারে আরোগ্য করিয়া বিদায় করিলেন। এই প্রকার অনেক লোক তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইত, এবং সময়ে সময়ে যৌর অন্তরঙ্গতা ও স্বাধীনতা প্রকাশ করিত কিন্তু এক দিনের জন্য তিনি পরসেবার বিরত হইয়েন নাই। তাঁহার নিজ পরিবারে বিশ্রুতিট বাসিকা প্রতিপালিত হইত। তাহারা নানা স্থান ও নানা পরিবার হইতে সংগৃহীত। তাহাদের শিক্ষা, বাস, সদাচার সমুদায়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনায় পাঁচটি সন্তানদের সঙ্গে তাহাদিগকে রক্ষণ ও পালন করিতেন। এবং আশ্চর্য্য এই যে,

নিজের পুত্রকর্তার সঙ্গে পালিত সন্তানদের কোন প্রকার প্রভেদ রাখিতেন না। যদি কেহ বলিত তোমার অবিবাহিতা কন্যার হাতে কাচের চুড়ী খুলিয়া এক ভোড়া সোনার চুড়ী পরাইয়া দেও। তিনি বলিতেন তা হলে অপর দশটি কড়া কি ভাবিবে? পাছে তারা মনে দুঃখ পায়, পাছে তারা মনে করে আমাদের মা নাই, তাই আমাদেরকে শুধু হাতে খাচাতে হয়। স্ত্রী এবং আমি একত্র ইতর-বিশেষ করিতে পারি না।

অঘোরকামিনী নিজের পরিধানের জন্ত অতি সামান্ত এবং স্ত্রীবিবৃদ্ধ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া অনেক লোক নিশা ও বিক্রম-বাক্য করিত। কিন্তু তিনি তৎ প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। প্রকাশ বাবু উচ্চদরের ডেপুটি কালেক্টর; তাঁহার উচ্চ বচন, কিন্তু তাঁহার প্রীতিমা পত্নী নীলে ছোঁবান খান পথেন, মাসের শব্দ পথিঃ বেতনের টাকা কুলায় না। সাধারণের হিতকর কার্যে সুদূর ব্যয় হইয়া যায়। বাঁকিপুরে একটি বালিকা বিজালয় আছে, তাহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান কার্যে অঘোরকামিনী সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। এবং তাহার ব্যয় সঙ্কলনের জন্ত তাঁহার মাসিক আয়ের অনেক টাকা তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইত। আমরা সকলে ইহা জানিতাম, কিন্তু তিনি নিজে কখন ইহার উল্লেখ করেন না, এই বিজ্ঞানের সম্পদ একটি অপরূপ কাহিনী আছে। ইহা স্থাপনের কিছুকাল পূর্বে অঘোরকামিনী ভাবলেন যে বিজালয় চালাইতে গেলে নিজের উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক। আমার উচ্চ শিক্ষা নাই, শিক্ষা করিতে হইবে। তখন তাঁহার বয়স্ক্রম ৩৫ বৎসর। এই বয়সে পঞ্চ সন্তানের মাতা হইয়া, সম্পন্ন ব্যক্তির ভাড়া হইয়াও তিনি কিয়ৎ কালের জন্ত বাঁকিপুর ত্যাগ করিলেন ও লক্ষ্মী নগরে মিসনারীদিগের জ্যোতিষাশ্রমে মহা উৎসাহে ছাত্রীরূপে ভর্তি হইলেন। সেখানে নয় মাস কাল পরিশ্রম করিয়া নিজ পরিবারে ফিরাই আসিলেন এবং বালিকা বিজালয়ের কার্যে নূতন উত্তমে পুনরাবৃত্ত করিলেন।

অঘোরকামিনীর এই সমস্ত হিতৈষণার উল্লেখ করিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি তাঁহার নিজ পরিবারের প্রতি এক দিনও উদ্বেগ কিংবা অশ্রুত করিয়াছিলেন। স্বামী ও সন্তানদের জন্ত কি পর্যন্ত পরিশ্রম করিতেন ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, সমস্ত পরিবার সজল নয়নে তাহার বাখ্যা করিয়া ফুগাইতে পারে না। প্রকাশ বাবুকে সরকারী কক্ষেপালকে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইত। অঘোরকামিনী চিরদিন তাঁহার অনুগামিনী হইতেন। পথ ভ্রমণের সন্ধ্যাও অশ্রুবিধা অকাতরে বহন করিতেন। একবার প্রকাশ বাবু অতি উৎকট সীঁচাতে প্রাণসংশয় হয়, সাধী অঘোরকামিনী দুই মাস পর্যন্ত দিন-রাত্রি তাঁহার চিকিৎসা-পথের জন্ত এক প্রবিশ্রান্ত সেবা করিয়াছিলেন যে, যে তাহা দেখিয়াছে, সে কখন ভুলিবে না। অথচ অঘোরকামিনী স্বামীর সঙ্গে সর্বপ্রকার দৈনিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচার্যবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর বাহ্যিক সেবা তিনি জীবনের প্রধান কার্য মনে করিতেন না। স্বামীর ধর্মশাসিনী হওয়াই প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন।

স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ বাধ্যতা তাঁহার প্রধান ব্রত। প্রকাশচন্দ্র

ব্রাহ্মদমাজের একজন ব্যক্তি, তাঁহার নিষ্ঠা, ভক্তি, সচরিত্রতা সকলেই জানেন। তাঁহার অনেক ধর্মবন্ধু আছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষার জ্ঞার ধর্মবন্ধু তিনি অপর কাগ্যেও কখন পান নাই। নিষ্ঠা ধর্মপ্রসঙ্গ, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মপ্রচারে অঘোরকামিনীর অপ্রিস্রান্ত উৎসাহ। বাঁকিপুরে কোন সাধু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কুঃসংবাদিনী সুসজ্জিত পূজা-মন্দিরে মহাসংসারাহ পড়িয়া বসিত। সেবার ও আদরের সান্নাধ্য থাকিত না। অঘোরকামিনী প্রতি বৎসর অনেকগুলি আত্মীয়বন্ধু সঙ্গে করিয়া বাগুগৃহ নামক বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন করিতে হইতেন। ধর্মসাধনে কবিতা এই পর্যটনের একমাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন সেখানে অবল উৎসাহে ধর্মসাধন করিতেন, গম্যপথে প্রোক্তদিগের নিকট প্রবক্তা উপদেশ ও নগর-সংকীর্ণন করিতেন। এইরূপে তিনি ধর্মস্থ স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চরত পালন করিয়াছেন। ঈশ্বরানুগমনায় অঘোরকামিনীর অসামান্ত ভক্তি দেখিয়া অসংখ্য কেশবন্দ্র অতীতর সম্ভাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার ধর্মসাধন হইতেই তাঁহার পরসেবার প্রেরণা, ভগবদ্ভক্তি এবং লোকসেবা সমান পরিমাণে তাঁহার চরিত্রকে গঠিত করিয়াছিল।

অঘোরকামিনীর চুট্টাতে বাঁকিপুরস্থ মহিলামণ্ডলীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। আজ বেলগাড়া ভ্রমণকারী স্ত্রীলোকদিগের জন্ত বিশ্রামগৃহে জ্যোতিষের প্রতি অত্যাচারী দুর্ভাগ্যবিশেষের শাসনের জন্ত গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা, আজ সাংসদসকল ধর্মোচ্ছ্রাণ এক নানা প্রকার সংকার্যে তাঁহাদের সর্বদা পূর্ণ উৎসাহ ছিল। কিন্তু বহু দিন হইতে অঘোরকামিনীর শরীর অসুস্থ হইতেছিল। নানা পরিশ্রমে ও নানা কষ্টের প্রবেশের জন্ত তিনি বার বার রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। শেষে শরীর ভাঙিয়া পড়িল, ভগ্নক অবস্থার হইল, তাঁহার আত্মীয়বন্ধন সকলেই বুঝিলেন যে, এবার আরোগ্যের কোন ভরসা নাই। সকলেই তাঁহার দেহায় নিযুক্ত হইলেন। চিরজীবন তিনি লোকের সেবা করিয়াছিলেন, লোক এ সময়ের কি তাঁহার গুণ ভুলিতে পারে? তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ অপ্রিস্রান্ত সেবার জন্ত পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেবী অঘোরকামিনী ১৮৯৪ খ্রীঃাব্দে ১৫ই জুন দিবসে ভগবানের পবিত্র স্তোত্র গুণিতে গুণিতে ও কবিতা করিতে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

আজ আর সে বাঁকিপুর নাই। বালিকা বিজালয় আছে। ব্রাহ্মসমাজ আছে, স্ত্রীমণ্ডলী লোকমণ্ডলী সকলেই বহিঃস্থ, কিন্তু দেবী অঘোরকামিনীর অভাবে সকলই অসহীন, তেজোহীন, প্রাণহীন। অঘোরকামিনী সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না, স্মৃতি কি সভ্যতার জন্ত বিখ্যাত করেন নাই, সকল বিষয়েও স্বাচ্ছন্দ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার পরসেবার আত্মসমর্পণ, সংকার্যে উৎসাহ, সঙ্গারবৈরাগ্য, চৈতন্য, পাতিত্রতা, ধর্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ভগবদ্ভক্তির কথা যে শুনিবে তাহারই বিশুদ্ধ আত্মা হইবে। জীবন্ত প্রকাশচন্দ্র ব্যয় তাঁহাকে সঙ্গদ্বিতীকরণে পাঠিয়া যত্ন হইয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহাদের উত্তরকে শুদ্ধা করিয়া শ্রবী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি।

[মাসিক বঙ্গমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য]

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ছািবিশ

পল্লব বাহনগা বাগদাতকে নিয়ে পার্ক থেকে বনন বেরল তখন রাত দশটা। উত্তার দেন লিফেনের মন্ত ফুটপাতে দলে দলে যুগল মূর্তি চলছে আনন্দে। কিন্তু পল্লবের মনে হ'ল কাকুর আনন্দই ওর আনন্দের কাছাকাছিও আসতে পারে না। 'ওর কাছে এমন আশ্চর্য ভাবে কখনো প্রত্যক্ষ হয়নি আনন্দের বিশ্ববিমরী মূর্তি। বিশ্বের সম্পদ ওর কাছে আজ তুচ্ছ, নগণ্য, অবাস্তব। নন্দন কানন থেকে পারিজাত ওর হাতে আশার সঙ্গে সঙ্গে বে আর সব মর্ত্য ফুলই হ'য়ে গেছে স্নান, নিশ্চল, গম্ভীর। বাহুতে ওর বহুবাহিতার বাহুর কোমল কবোচ্চ চাপ ও নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেছে ওর সমস্ত চেতনা দিয়ে। এমন অপরূপা, এমন লোকললামত্বতা, এমন আনন্দময়ী আজ ওকে বরণ করেছে—অজীকার করেছে জীবনপথে থাকবে ওর পার্শ্ববর্তিনী, দৈনন্দিন জীবনে হবে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশ, স্বপ্ন-বেদনার সাথী—সকালে উঠেই প্রথম দেখবে ওর তজ্জালস অনিন্দ্য মুখখানি, রাতে নিজার অন্তলে তলিয়ে ধাবার আগে পর্যন্ত ওর কোমল স্পর্শ ওর সঙ্গে থাকবে লতার মতন জড়িয়ে, থেকে থেকে হুম ভেঙে উঠেও দেখবে ওকে অতৃপ্ত নয়নে—এই রকম আরো কত কী জল্পনা-কল্পনার নেশার ও পথ দেখতে পায় না যেন! বাগদান...বাগদান...বাগদান...অথচ—ওর অবাক লাগে ভারতে—হুদিন আগেও ও তো জানত না বিধাতার কোন আশীর্বাদ ওর পথ চেয়ে আছে? মনে পড়ল—পরও দিন রাত্তিরে ওর চিন্তা-বিস্ময়ের কথা। আর আজ? মনে পড়ল ওর একটি প্রিয় গান : "স্বর্গ নামিয়া আশ্রয় মর্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরনী..."

হঠাৎ কর্কশ সাইরেণ ও আইরিনের চিংকারে ওর বিহ্বল স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ফুটপাথ থেকে কে একজন ওর বাহুয়ল ধরে টান দেয়। বাহনগা আইরিনকে নিয়ে ও লাকিয়ে ফুটপাথে উঠে কোনোমতে টাল সামলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে যায়। এক চুলের জন্তু বেঁচে-বাওয়া থাকে বলে!

কানে আসে পরিচিত বিজ্ঞপের হাসি ও খাস বালায় ধমক : এমনি করেই কি প্রেম করে হে—মোড়ের মাথায়? আর একটু হলেই বে প্রেমলীলা সাক হয়ে গিয়েছিল।

এ কী! যুহু?

যুহুকের দৃষ্টি পড়ে আইরিনের 'পরে : এ কী! ক্রয়লাইন দেখে ক' ? মাক করবেন—আপনাকে পিছন থেকে দেখেছিলাম বলে চিনতে পারি নি। পারলে আপনাকেই টেপে ধরতাম প্রথমে—ট্যাক্সিটা—এ কী?

ও কিছু না—কম্বরের কাছে বঁধে লেগে ওভারকোটটা একটু হিঁড়ে গেছে।

ওভারকোটের জন্তে ভাবছি না—আপনার কম্বরে—

না না লাগে নি—চাটটা বেচারি ওভারকোটের উপর দিয়েই গেছে।

পল্লবের এককণ্ঠে সাড় ফিরে আসে, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে : সত্যি বলছ—লাগে নি চোট? দেখি—

আইরিন সুরুতে বলে : না, দেখবে আবার কী—কিছু হয় নি। কেবল ওভারকোটটার জন্তে একটু দুঃখ হচ্ছে।

যুহুকে হেসে বলল : সে জন্তে জামেক দেখেন তিনি—বিনি দায় না বুকে ভার নিতে ছোটেন।

পল্লব মরমে ম'রে গেল : সত্যি আইরিন—তোমাকে আজ আমি...মানে...খুব অজ্ঞার হয়েছ...আমি দেখতে পাই নি...

যুহুকে হেসে আইরিনের দিকে চেয়ে চোখ মিট-মিট ক'রে বলে : কিন্তু এ দায় আপনাবি ক্রয়লাইন! মানে, অন্ধকে চকু দানের।

আইরিন হেসে বলল : অবিচার করবেন না—অন্ধ নয়—সাত্তাজাত। তাই চোখ ফুটে একটু সময় লাগবে।

পল্লব অপ্রতিভ হয়ে বলল : চলো যুহুকে, একটা কাকোতে ব'সে—

না ভাই, ধন্যবাদ! আজ আমার সঙ্গে একজন আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে two is company তার একটি বেশি হ'লেই রসভঙ্গ বলে টুপি খুলে ক'ব কেতার আইরিনের কণ্ঠচূষন ক'রে ক'বভাষায় হেসে কি বলল। আইরিন খুশি হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। পল্লব শুধালো : কী বলল?

তোমার ভার নিতে—শুধু পথে চালাতেই নয়, পথ দেখাতেও বটে।

সাত্তাশ

রাত সাড়ে বারটার বনন পল্লব বাসার কিরল তখন ওর মনের সব দিবা-অন্ধ কেটে গেছে, রক্ত উঠেছে মাঁতাল হ'য়ে। চিন্তার দল এলোমেলো, কিন্তু ছুটেছে একই চিন্তার অভিসারে। কিরে কিরে মনে হয় আইরিনের প্রেম : আমি তোমার ভার হব না তো?

ভার? দু'দিন আগেও ও এনিরে কতই ভেবেছে—বিবাহের হাজিরো দায়িত্ব, সঙ্গারের ভার, লোকমত, কুহুমের নিষেধ...আরো কত কী? কিন্তু আজ মনে হয় ওর নিজের উত্তর : বেনীর কাছে কি প্রতিমাকে মনে হয় ভার, না মুক্তি? কোথেকে মনে এল এ-উপমা? এরই নাম কি প্রেরণা? যদি হয় তবে এই-ই কি জীবন-বিধাতার স্নেহ বিধান নয়? দেশের কাজ? কেন? দেশের কাজ কি বিবাহ করলে হয় না? তিলক, অরবিন্দ গান্ধী, দেশবন্ধু—দেশের কাজ এদের চেয়ে বেশি করেছে কে? বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে হঠাৎ। কিন্তু মন ক'বে উঠে বলে : সবাইকেই কি বিধাতা এক ছাঁচে ঢালাই করেন? বিবেকানন্দ অবশ্য মহাপুরুষ—নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাই বলে কি বলতে হবে তাঁর পক্ষে বা ছিল স্বধর্ম তা আর সবার কাছেও হবে স্বধর্ম? রাম, কৃষ্ণ, বাজ্রবল্লভ, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী...ও খুব জোর দিয়েই বলে মনে মনে : বিবাহ যদি মহত্তম জীবনের অন্তরায়ই হবে তবে এদের প্রত্যেকেই বিবাহ করেছিলেন কেন? মহাভারতেই কি বিধান নেই—সংসারে ঘোটারুটি চারটি স্বভাবের জীব জন্মায়? বার ইহকাল আছে কিন্তু পরকাল নেই, বধা ভোগী; বার পরকাল আছে কিন্তু ইহকাল নেই, বধা বোগী, বার ইহকালও নেই, পরকালও নেই বধা দুর্বল লম্পট আর বার ইহকালও আছে পরকালও আছে বধা ধর্মভীরু গৃহস্থ। নারী নয়কের ধার—এবিধান কি সত্যিই কেউ ভাগবত বিধান বলে মনে

করতে পারে? পল্লব ছায়ায় সঙ্গে যুদ্ধ করে: কোপীনবস্ত্র: খলু ভাগ্যবন্ত: ? হু—ও একটা কথাই নয়।

যে চুকে আসো আলিতেই দেখে, ওর লেখার টেবিলের উপরে একটি চিঠি। অতি পরিচিত হস্তাক্ষর। ঠিক আজই!...ও খুলল খামটি সতর্কণে, কুচুম লিখেছে:

“তাই পল্লব,

বিলতে থেকে ফেরার পর প্রায় আড়াই বৎসর কেটে গেছে। তোমাকে চিঠি লেখাও হয় নি প্রায় বছর খানেক। লিখব কী—জেল থেকে ওরা মাসে একটি করে চিঠি লিখতে দিত, লিখতে হ’ত বাড়িতেই—বিশেষ করে বাবাকে আশ্বস্ত করতে। তাই কিছু মনে কোরো না। তোমাকে চিঠি লিখি না বটে, কিন্তু বোধ হয় এমন দিন বার না যেদিন তোমার কথা একবারও মনে পড়ে না। বিশেষ করেই মনে পড়ত জেলে—জরানা-কল্লনা করতাম কত রকম—কী ভাবে তোমার প্রবাস জীবন কাটছে, না জানি!

মাত্র পরন্তু জেল থেকে হাড়া পেয়েছি এগার মাসের পর। বেরিয়েই প্রথম তোমাকে লিখছি।

দেশে পৌঁছেই তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। তাতে খবর দিয়েছিলাম—আমি দেশবন্ধুর নেতৃত্ব বরণ করেই দেশের কাজে বাঁপ দিয়েছি। এর জন্তে একটি বারও আমার পরিতাপ আসে নি। আমার মনে হয়—তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও গান্ধীজীর চেয়ে বড়, যদিও গান্ধীজীকে আমিও এ যুগের মহৎ মানুষদের অগ্রতম বলে মনে করি। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সার্থকতা সন্দেহে বাই বলা যাক না কেন, এ কথা না মেনেই উপায় নেই যে, তিনি তাঁর চরিত্রবল তথা আন্তরিকতার গুণে দেশে একটা নবজাগরণ এনেছেন; সে জন্তে তিনি আমাদের নমস্কার বৈ কি! কিন্তু তবু বলব তাঁর মধ্যে সে হারমনি ও গভীরতা আমি খুঁজে পাই নি বার গুণে দেশবন্ধু বড় হয়ে উঠেছেন। গান্ধীজী ত্যাগে খুবই বড়—এ কথা মানি, কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে আমি একমত যে, তিনি সামাজিক জীবনে হিন্দু হ’লেও নৈতিক দীক্ষার বিদেশী, যেহেতু তাঁর গুরু গীতার কৃষ্ণ নন, তাঁর গুরু তিনটি বিদেশী—খৃষ্ট, চন্দ্র ও ধোঁরা।

দেশবন্ধুর বেদায় একথা খাটে না, যেহেতু তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংরাজ হলেও, ধর্মনৈতিক দীক্ষাগুরু ভারতই বাটে। তিনি অন্তর্দীক্ষক, বহিঃশাস্তক। তাঁর মহত্ব আমি অভিজ্ঞত, তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্ত।

আমি গান্ধীজীর অহিংসামাত্র বিশ্বাস না করলেও দেশবন্ধুর উপদেশে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে বোগ দিই—আরো এই ভেবে যে, এ-যুদ্ধে রাজনীতির টেকনিক শুধা প্রিন্সিপল সন্দেহে অনেক কিছু জানতে পারব। জলে না নেমে শুধু যে সাঁতার দেখাই বার না তাই নয়—জলের বাধা কী জাতের সে সন্দেহে প্রত্যেক অভিজ্ঞতা অর্জন করা বার না। এর ফলে একটা যন্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে এই—যে কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলেন যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে ইংরাজ আমাদের প্রচণ্ড প্রতিকূল হলেও আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু তারা নয়। আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু হল গৃহশত্রু ওরফে মডারেট বুরজুয়ায়। এ শুধু দেশবন্ধুর অভিজ্ঞতা নয়—১১১৭-র

লেনিনেরো ঠিক এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল—সব চেয়ে বেশি তাঁকে লড়িতে হয়েছিল স্বদেশবাসীদের সঙ্গে। কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে লেনিনের তফাৎ এই যে তিনি বলেন না তারস্বরে—এদের লিকুইডেট করতে, হবে রাষ্ট্রাধিকার, বলেন—এদেরো কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু মতকগে রাজনীতি—এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলবার আছে, কিন্তু সে হবে তুমি কিরে এলে।

বলেছি, আমি স্বদেশী আন্দোলনে বোগ দিতে না দিতে ওরা আমার পায়ে নুপুর না হোক, হাতে বালা পরায় ও পাঠায় হরিণবাড়ি। সেখানে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে এক কারাককে কাটাই হ’মান—এ খবর তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। তারপর ফের আমাকে ওরা ঘরে ঠিক এগার মাস আগে। পরন্তু ছেড়ে দিয়েছে, জেলে আমার শরীর খারাপ হবার দরুণ। তবে মনে হয় ওরা ঠিক পেতে বসে আছে—আমার শরীর ভালো হতে না হতে ফের পাকড়বার জন্তে। এবার ধরলে বোধ হয় সহজে ছাড়বে না। গুজব—এবার ধরলে আমাকে পুলিশপালাও চালান দেবে বর্মার—মাগুলায় জেলে। আমি প্রস্তুত আছি। দেশের জন্তে দুঃখবরণ করেছি চোখ খুসেই—তাই সেজন্তে খেদ নেই। তবে মন খারাপ হয় ভারতে যে, জ্বর ভবিষ্যতে আমাদের স্বাধীন হবার কোনো আশাই নেই—মনে বদি না হঠাৎ ফের বিশ্বযুদ্ধ বাধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবলু বাধবেই, কিন্তু কবে বাধবে ভাবি। মনে মনে জপি: নারদ নারদ! বাধাও বাধাও বাধাও শুভ-নিশ্চয়ের লড়াই—তিলোত্তমা হোক কলোশিয়ানিসম দেবী।

জেল থেকে বেরিয়েছি নানান অসুখে ভুগে। প্রায় দশ সের ওজন কমে গেছি ডাক্তারের বলছে—দু’টি মাস পুরো বিশ্রাম নিতে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সামনে অসুস্থ কাজ, দেশবন্ধুও ক্লান্ত তথা অসুস্থ—কাজেই তাঁর অনেক কাজের ভারও আমাকেই নিতে হয়েছে। তজ্জালু দেশকে জাগানো কি সহজ ব্যাপার? আমেরিকার বাগী: ‘সমর হ’ল টাকা’, দেশবন্ধু ঠাটা করে বলেন ভারতবর্ষের বাগী: সমর হ’ল দুশুভি। রসিক লোক—সাহসেও বেদন হাসিতেও তেমনি। একটা মানুষের মতন মানুষ দেখলাম বটে।

আমার কথাই বলে চলেছি। এগার মাস লৈনিক মোনের প্রতিক্রিয়া আর কি। মতকগে, এবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করি। ইা বলতে ভুলেছি—তোমার ছ’তিনটি চিঠি পেয়েছিলাম, তখন আমি জেলে।

তোমার কব বান্ধবীদের কথা লিখেছি, বেশ লাগল। ওদের সঙ্গে মিশতে আমি বারণ করি না। দেশবন্ধুর সম্পর্কে এসে আমার এ-স্বত্ব কত একটু বললেছে। এখন আমার মনে হয়—ওদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে বার মিশতে পারে—পরিচয় ভাবে অবজ্ঞা—তারা ওদের কাছে অনেক কিছু শিখতে, লাভ করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দও বার বারই বলেছেন ওদের দেশের মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই নেবার আছে। কেবল একটু ‘কিছু’ আছে।

বিবেকানন্দ বা পারভেন তা সবাই পারে না, এটুকু ভুললে চলবে না। মোয়নলালেরই দৃষ্টান্ত নাও না। সে বড় গলা করেই বলত যে সে জানে: where to draw the line—মনে পড়ে?

কিন্তু কর্তব্য কী ঘণ্টা পেল, বলো দেখি? অবশ্য রিতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনো অভিযোগই নেই। এ-ও আমি মানব যে, সে ঘেরে ভালোই—বৈবিকী কি বঙ্গিনী নয়। কিন্তু কাল তার পাণ্ডুর বং ও রান মুখ দেখে মনে হ'ল সে মনোকেটে আছে। মোহনলাল যদিও বলল যে এদেশের গরম সইছে না বলেই তাকে এত স্থান দেখাচ্ছে কিন্তু আমার মনে হ'ল এহ বাহু—রিতার সব দ্বা ভাও তবেছলাম ঠিক তাই ঘটেছে: ও আমাদের দেশের শুধু ভুল-হাওয়াই নয়, আবহাওয়ার সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারত না। মোহনলাল কথায় কথায় বলল—ওকে একবার চোখে সুইজল'ও নিয়ে না গেলেই নয়—ওকে ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। আমি শুনে একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: শুনেছি যস্থা যোগের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয় সুইজল'ও, কিন্তু ওর তো তেমন কোনো শক্ত অস্ত্রধ করে নি?

মোহনলাল যেন একটু ক্লান্ত করেই বলল: 'রিতা বলে—এদেশে কেউ ডাক্তারির কিছুই জানে না।' শুনে প্রথমে একটু দ্রুত হয়েছিলাম—কবুল করছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম রিতার খুব লোভ নেই। এ দেশের দুখে-দৈন্ত-দারিদ্র্যই সব আগে বিদেশীর চোখে পড়ে। ছাড়াও বতই কেন না আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে জাঁক তরি, স্বাধীন দেশের লোক কিছুতেই এমন দেশকে প্রদ্বা করতে পারে না—যাও কোটি কোটি সন্তানকে পরানত করে রেখেছে রাজার পঞ্চাশেক ফিলিজি। আঙঠি সকলে এই নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনিও বললেন: ঠিক এই জন্মেই আমাদের সব ছেড়ে আগে চাঁপ স্বাধীন হওয়া, নৈলে আমাদের সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক সম্পদের বাণী ওদের কানে-র মধ্যে যেতে পারে কিন্তু মরমে পশবে না বাবা! বলেই মুহূর্তে বললেন: তুমি জানো—আমার আশপতি বিদেশিনী শিখি কতায় নয়, আমার আশপতি মেম বিয়ে করায়, কি না এমন মেরেকে বাণী করায় যে শব্দাসঙ্গিনী হবার কায়ালা-কানুন জানলেও সহদেবিনী হবার মস্ত-বস্ত্র দেখেনি। না, এ যুগে জীক শুধু সহযোগী হ'লেই চলবে না—হ'তে হবে সহদেবিনী। এ কথাটা তুমি চালু কোরো কুকুম—পরে কাজে আসবে। কথার ক্ষমতা কত বেশি তুমি এখনো জানো না, কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে জেনেছি বাবা। এই রকম কত চমৎকার কথাই যে তিনি বলেন—তুমি থাকলে নিশ্চয়ই টুক রাখতে কিছু বা বলছিলাম।

আমি মোহনলালকে বললাম একটু ক্ষুর হ'য়েই, এ দেশের ডাক্তারদের পরে বখন রিতার প্রদ্বা নেই তখন ওকে সুইজল'ও নিয়ে যাওয়াই ভালো। কবে যাচ্ছে? মোহনলাল বলল: তোমার জেলে বাওয়ায় দক্ষই যেতে পারিনি, কারণ মাস খানেক আগে দেশবন্ধু বলছিলেন—তোমাকে এ যাত্রা ছেড়ে দেবে। এখন তুমি বখন ঘরের ছেলে ঘর কিওর, তখন কালই পালপোন্টের জগে দরখাস্ত করব, বোধ হয় মাস খানেকের মধ্যেই কালাপানিতে পাড়ি দেব, ভারপার যা করেন নিয়তি। ওর কথার মধ্যে একটু কী বলব ভিনাপ্রদেয়-মটে! সুর বেজে উঠল। অথচ মনে আছে ও বিলেতে বখন রিতার মোহ পড়ে (সহদেবিনী হাড়া) আর কান্নার প্রতি সত্যিকার 'প্রেম' হ'তে পারে বলে আমার কোনো দিনই মনে হয়নি। তখন বলেছিলাম বিজ্ঞানশালের পানকে নজির ক'রে:

'প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়।

আদানে প্রেম হয় না কো হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।' কথা অবশ্য কিছু এ প্রেম জাগে কখন? না, বখন দুটো মন একই আদর্শে অস্থায়ীভাবে হ'য়ে ওঠে, তার আগে নয়। এই জন্মেই বিদেশিনীকে বিবাহ করার আমার এত আশপতি। অবশ্য যদি তেমন বিদেশিনীও দেখা মেলে যে নিজের 'স্বাভাব্য গৌরবকে নষ্টাং ক'রে দিয়ে সহযোগী তথা সহদেবিনী হ'তে পারে, তা হ'লে তাকে জীবন-সঙ্গিনী করা যেতে পারে। কিন্তু এমন মেয়ে পাওয়া দুর্ঘট, নৈলে মোহনলালের মতন সত্যিকার মহৎ যুবকও কি আজ এমন বিপাকে পড়ত? তাহ'লেই দেখ—শোষাকি মেকি প্রেমের রূপের সঙ্গে ঘরোয়া বাটি প্রেমের রূপের তফাৎ কতখানি!

এত কথা লিখতাম না, যদি না মোহনলালের অবস্থা দেখে মন ধারাপ হ'ত। কিন্তু ও এখন করবেই বা কী—বলো? দেশের কাজ ও করতে চায় সত্যিই, কিন্তু দ্রুতকৈও তো ফেলতে পারে না? সত্যি, কাল কেবলই ভেবেছি ওর কথা। হয়ত ওর সঙ্গে তোমার মাস দুয়ের মধ্যেই দেখা হবে। কারণ ও বলছিল, যেম হুয়েই বাগিনে যাবে, সংশোধন সুইজল'ও। তোমার রিতাকে দেখে কি মনে হয়, আমাকে লিখো। আমার মনে হয়, ও এদেশে এসে সুখী হয়নি। তবে এ বিষয়ে আমার ভুল হ'তেও পারে।

শেষে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: দেশে কিছই হবে? প্রায় আড়াই বছর হ'তে চলল, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর। গান তো অনেক শিখলে? আর কেন? এবার যা শিখলে দেশের কাজে লাগাও, দেশকে জাগাতে হবে গান গেয়ে—মনে রেখো। 'আমরা বুঢ়া মা তোব বৈকুণ্ঠের আমরা নই তো মেঘ।' কবে যে কের এই অপরূপ গানটো শুনব তোমার মুখে, আর শিয়ার শিবার জাগবে উদ্দাপনা! দেশবন্ধুও তোমার চান। তা ছাড়া দেশবন্ধু কালই বলেছিলেন—তুমি বেশে গিয়ে ফিরে নানা চারিটি কক্সট ক'রে আমাদের টাকা তুলে দেবে—মানে, শুধু প্রেরণা নয়, পাথরও হবে। তোমাকে ভগবান দিয়েছে অনেক কিছু—দেশের কাজে লাগালে তবেই না সে সব দান সার্থক হয়ে উঠবে। চিঠি লিখো।

ইতি তোমার নিত্যসুভাষী মহাবন্ধু কুকুম।

পুনশ্চ:—কাল রাত মোহনলালের কথ ভাবতে ভাগতে একটা কথা চেপলি মনে হচ্ছিল কির কিরে। মনে হচ্ছিল, আরো এই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক হয়েছিল বল। তুমি বলেছিলে: মোহনলাল বখন রিতাকে ভালোবেসে ফেলেছে, তখন তাকে বিবাহ না করে কি করতে পারত? আমি সে-সময়ে উত্তর খুঁজে পাইনি। কিন্তু কাল মনে হচ্ছিল যে, মোহনলাল একটা কাজ করতে পারত: রিতার প্রতি ওর ভালোবাসা প্রেম না মোহ, সেটা বাচাই করতে পারত কিছু দিনের জগে দু'ব গিয়ে। আমার মনে হয়, প্রেমকে বাচাই করার এ ছাড়া আর পথ নেই। কারণ, এক দিকে নব-নারীর পরম্পরের প্রতি টান যেমন সারিধার ইন্ধনে আগুনের মতই জলে ওঠে, তেমনি অন্য দিকে সারিধার ধোঁয়াক না পেলে নিবে বারই যায়। কারণ প্রেম প্রেম করে বতই কবিশ করি না কেন, কবিশ খানিকটা মায়াই বটে—মানে, নরকে হুই করতে পারে তার বাহুদণ্ডের

‘গোঁড়ার। এর একমাত্র কাটাম হচ্ছে, তাকে পরখ করা—অর্থাৎ
হর সান্নিধ্যবশে যে উচ্ছ্বাস জগে ওঠে, তাকে আদর্শের দিকবশে
বো দেখা।

আটাত্ত

পল্লবের মাথার যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ঋণিকক্ষণ ও
হ্রস্বের মতন চূপ ক’রে রইল। ওর মাথার মধ্যে ঘোরা-ফেরা
হতে থাকে : সহদেশিনী সহদেশিনী।

হঠাৎ ও দ্বন্দ্ব ওঠে : যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বীতা পারেনি
মোহনলালের সহদেশিনী হ’তে—তা হ’লে কি এ সিদ্ধান্ত করা যায়
আইরিনীও পারবে না ?

ওর মন বিস্তারী হ’লে ওঠে : এ কখনো হতে পারে যে যুগ-যুগ
র কবিতা মিথ্যেই প্রেমের জয়গান করে এসেছেন ? শুধু
জ্ঞানের অগাধ মোহে পড়ে, কবিত্বের আবেশেই বলে এসেছেন
ধর্ম অক্ষর, অম্মান, অমর ?

কিন্তু মোহনলালও তো রিতার সঙ্গে বধন প্রেমে পড়েছিল
খন ভেবেছিল এ-প্রেম ধোপে টিকবেই টিকবে ? সত্যিই
এ ও নিরাশ হয়েছে—সে প্রেমের রঙ ছলিনেই হারিয়েছে তার
ও চত নিবিড়তা ? আহা, আজ যদি মোহনলাল কাছে থাকত।

কুহুমের চিঠিটা ও কের পড়ল আতঙ্ক। পড়তে ওর মনে আবার
গগে উঠল দ্বন্দ্ব, সন্দেহ। একবার মনে হয়—আইরিন রিতা
য়, আবার অমনি মনে হয়—কে জানে—হয়ত সেও রিতারই মতন
পারবে না ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে ?

কিন্তু না, এ একটা কথাই নয়। কে না জানে প্রেম মানুষকে
মলে দেয়—অবশ্য যদি সে ঠাঁটি প্রেম হয়। শুধু পরকে আপন করা
য় অগ্নিপনকেও সে পর করে না কি প্রতিপদে ? নব বধু বধন
মীর ঘরে আসে তখন সে কঁদেই সারা হয় পিতৃগৃহের কথা
গ্বতে। কিন্তু তার পরে কি অচিন বরই হয় না আপন, চেনা
র যায় না দূরে সরে ?

মনে পড়ল ওর প্রিয় কবির অপরূপ নববধু কবিতা :

ক্রমশ দিন কাটিয়া গেল সন্ধ্যা ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনা ভীতি নিকট পরিচরে
বুঝিলাম যে—আমার পতি আমার সখা তিনি,
ভবন ‘পরে এমন আর কাহাকে নাহি চিনি।
পেরেছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এক স্নেহ,
বুঝিছি আজ—এমন আর আপন নহে কেহ।
এ দেখ মন দিয়েছি আমি তীহারি পায়ে সঁপি
জীবনে যেন মরণে যেন তীহারি নাম জপি ॥১)

এই অবিস্মরণীয় চরণ কাঁটি তিনি লিখেছিলেন কি তাঁর স্ত্রীকে
স্বপ্নেই নয়—যার মৃত্যুর পরে আর তিনি বিবাহ করেননি,
লিখেছিলেন—বিবাহ কেবল একবারই হয় ? এই যে একনিষ্ঠ
মতলান্তিক যেমনার ব্যবধানও স্তান করতে পারেনি—এ কি শুধু
বিবাহের উচ্ছ্বাস ? হতেই পারে না। কুহুম মহৎ, ত্যাগী,
সম্মত, কিন্তু সে কি কখনো কাউকে ভালোবাসেছে যে তাবে
নব বধুর কবি ভালোবাসেছিলেন তাঁর বধুকে ? দেশসেবার

স্বপ্নে ও অনেক কিছু জানতে পারে, কিন্তু বিবাহের ও কী জানে
তনি ?

কিন্তু অমনি কের উঁকি মারে উল্টো দিক : তাঁর প্রেম যে
মোহ ছিল না সেটা কবি প্রমাণ করেছেন কিসের সাক্ষ্য ?—
উচ্ছ্বাসের না জীবনের ? হাজার হাজার ক্ষেত্রে জীবনের সাক্ষ্য
টিক এই প্রেমকেই না মঞ্জুর করে না কি ? তবে ? কেমন করে
ও জোর করে বলতে পারে—আইরিনের প্রতি ওর প্রেম সত্যের
কোঠায় পড়ে—(যার প্রমাণ ছাড়াই) না, মিথ্যার কোঠায় পড়ে
(যার ধর্ম উবে বাওয়া)—যেমন হয়েছে হয়ত মোহনলালের ক্ষেত্রে ?

কিন্তু এ তো কুহুমের সন্দেহ মাত্র ? কে বলল যে মোহনলাল
ও রিতার প্রেম উবে গেছে, কি মশা হয়ে এসেছে ?

অমনি কের সন্দেহ ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। কেসলার বাই
হোক তাকেও আইরিন তো ভালোবাসেছিল আর বধন
ভালোবাসেছিল তখন তো তার মনে হয়েছিল—এ দ্বাদী প্রেম ?
তবে ? তবে কেমন করে পল্লব বলতে পারে যে, ওর প্রতি
আইরিনের প্রেমের জ্বাটই আলাদা ?

নাঃ, কুহুম মিথ্যা বলেনি : ওদের প্রেম সার্থক হ’তে পারে না
যদি আইরিন পল্লবের সহদেশিনী হ’তে না পারে। কিন্তু পারবে
কি না আগে থেকে জানার উপায় কী ? ওকে ছেড়ে কিছুদিন
দূরে থাক। একধা ভাবতেও ওর মন ব্যথার টন-টন ক’রে ওঠে।
কিন্তু বতই ভাবে ততই মনে হয় ফ্রাউ ক্রামারের কথা : সে,
ব্যবধানের নিকটে প্রেমকে পরখ করলে তাতে ক’রে প্রেমের
লাভ বৈ ক্ষতি নেই। আজকের মানুষ এ-যুগের আবহাওয়ার
গ’ড়ে উঠেছে, আর সে-আবহাওয়া, জগদ্বাধা হাকে বলে Zeifgeist—
চায় সব কিছু ক’বে দেখতে। আগেকার যুগের মানুষ ছিল
সবল—যা দেখত তাকেই গ্রহণ করত তখনি তখনি। এ-যুগের
মানুষের স্বভাব ঋণিকটা বললে গেছে বৈ কি ! কোনো কিছুই
সে আর দাম দরতে পারে না তার বাজার নয় নিরে। ভাড়াটা
বাচাই করতে এত ভরই বা কেন ? মোহনলালের কথা একটু
আলাদা : পাকে চক্রে রিতার এমন অবস্থা কাঁড়িয়েছিল যার
ফলে তখনি তখনি বিবাহ না ক’রেই ওর উপায় ছিল না।
কিন্তু আইরিনের তো ঠিক সে অবস্থা নয়। ও ঠিক করল—
আইরিনকে বলবে সব কথা খোলাখুলি। না, মোহনলালের
কথা বলবে না—কারণ তার ও রিতার প্রেমের এখনকার অবস্থা
যে ঠিক কী তা তো ও জানে না—তবে কুহুমের ‘সহদেশিনী’
কথাটার মর্ম ওকে বুঝিয়ে দিতেই হবে—দেখি ও কী ভাবে নেই—
আর বলবে ওকে যে, কিছু দিনের জন্তে বেছিকৃত বিরহকে বরণ
ক’রে দেখা বাক ওদের প্রেমকে বাচাই ক’রে। এতে ব্যথা বাজবে
উভয়েরই—কিন্তু ব্যথাতে ভয় কী—যদি প্রেম সঁচা হয় ?

তবু ব্যথার বুক টন-টন ক’রে ওঠে। বরুক। কুহুম দেশের
জন্তে প্রাণ দিতেও পেছপাও নয় আর তার বদু হ’য়ে ও কি না
কিছু দিনের জন্তে বিরহব্যথাকে বরণ করতে ডরাবে ? কুহুমের
ত্যাগ, মহত্ব, আনন্দমন্ডের সম্মানজনক বরণ ক’রে সর্বহার্য হবার
আদর্শ ওর মনে কের ঝলে ওঠে আলো হ’য়ে। প্রেম বড়—সত্য,
কিন্তু শুধু হ’লে তাই না সে বরণ্য। ও কাল সকালেই
আইরিনের কাছে কথাটা তুলবে। সে নিচুর বুকে—মানে যদি

জকে সে সত্যিই ভালোবাসে থাকে। ওই যাই আমাদের টানে
সে নিশ্চয়ই হতে চাইবে ওর 'সহস্রেশিনী'।

সে জ করে ছুটো বাজল। কান্না হ'য়ে ও গুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে উঠে কফি নিয়ে বসেছে, এমন সময় পরিচারিকা
হুকল একটি চিঠি নিয়ে।

এ কী! মোহনলালের হস্তাক্ষর। সাগ্রহে পড়ে :
"ভাই পল্লব,

কুছুর হয়ত তোমাকে লিখে থাকবে রিত্যর শরীর ভালো
বাহছে না। তাই স্থির করেছি কয়েক দিনেই মগোই বওনা হব।
কারণ বোধ হয় দিন সাতকের মধ্যেই একটা জাহাজে ছুটো বার্ষ
পাওয়া বাবে। প্রথমে ডেবেছিলাম যে বওনা হব মাসখানেক বাসে
কিন্তু কাল সায়াবাত রিত্যর মাথা ঘুরেছে। ও-ও আর দেখি করতে
চাইছে না, তাছাড়া যদি ওর শরীর সারতে ওকে যুরোপে বেতেই
হয় তবে শুভ্র শীত—বটেই তো।

তুমি এখন এ চিঠি পাবে তখন হয়ত আমরা যোমে। কারণ
আমরা ঠিক করেছি শোটসেড পৰ্শত জাহাজে গিয়ে কারযোতে
হু'চার দিন বিজ্ঞান করে উড়ে বাব সোজা রোম। সেখানে
আমাদের ঠিকানা : লুনা হোটেল। তুমি যোমে একবার
ঘুরে বাও না? বেশ হয় তা'হলে যদি ঘরো যোমে গিয়েই দেখি—
তুমি সশরীরে। লুনা হোটেলই থেকে—মানব যদি যোমে আসে।
যদি না আসতে পারে তবে আমাকে লিখে যোমে, আমরা বাসিনে
ইমেয়ে বাব সুইজলণ্ড—যদি সম্ভব হয় তোমাকে পাকড়াও করে।
অনেক কথাই বলবার আছে, কিন্তু চিঠি লিখবার যুগ—তে হি নো
দিয়া গতা:। এখন কেবল একটি জিনিষ পারি লুর্ধবং : তোমাকে
কাকে গেলে অনঙ্গল মনের কথা বলতে রিত্যও তোমাকে বলতে চায়
অনেক কিছু। আশা করি দেখা হবে যোমে কিবা বাসিনে। ইতি
স্নেহবন্ত মোহনলাল।"

উনত্রিশ

হঠাৎ পল্লবের মন বিবাদের ছেয়ে যায় : সবাই মিলে চক্রান্ত
করেছে ওকে আইরিশের কাছ-ছাড়া করতে! কালকের রাতের
রঙিন শিহরণ আজ কোথায় তার কারাগার জুড়েছে আজ হাজারো
বিসস তর ভাবনা, বিধা সশর। কবির শব্দ মনে পড়ে :
"Rarely, rarely comest thou, o spirit of
delight।

কিন্তু আজই আইরিশকে বলবে কোন মুখে সেবে বিরহ বরণ
করার কথা? যদি সে হাসে, কি মান করে? পারবে কি তখন
কুন্তলধানের উগ্র সস্কর বজার রাধতে? কুছুরের আদর্শ তো ওর
নিজের আদর্শ নয়? তাছাড়া বাবেই বা কোথায়? গান শেখা
সৌখিন বিলাস হ'তে পারে তবু তো একটা কাজ। অজ্ঞ গিয়ে
করবে কী? ডেবেশা ভাঙবে? নূ—বত সব উত্তর জল্পনা!

তার পরেই মনে হয় মোহনলাল ও রিত্যর কথা। ওরা হয়ত
একদিনে যোমে এসে গেছে। বোসো, ওর চিঠি এসেছে ঠিক তেইশ
দিনে। ঠা, ও যদি চিঠি লেখার সাত দিনের মধ্যে জাহাজ নিয়ে
কাকে তবে কারযোতে পৌঁছেছে দিন সাত লাট আগে। তা'হলে

এখন ওর যোমে পৌঁছে যাবার কথা। ও উঠে একটা টেলিগ্রাফ
কর নিয়ে বসে। লেখ: Mohon Ghosh, Allevgo Lun
Roma—Telegrafate gubito Perfavove..(২)

এমনি সময়ে...ক্রি...ক্রি...ক্রি...

Kommen Sie, herein! (৩) বলে ও টেচিয়ে!

হাঙ্গিমুখে যুতফের অভ্যাস, বলে হাঙ্গিমুখে : Ruten Si
nicht den Teufel herein!(৪)

পল্লব হেসে বলে : ডাক! বায়—যদি সে হয় ব্যাখ্য ব্যাখ্য
বোসো।

না ভাই বসবার সময় নেই। তোমাকে আমিই এসেছি ডাকতে।
ডাকতে? কোথায়?

যুতফ অভিমুখিত অভিবাসন করে ঘরে ইতালিয়ান : Alla
bellissima Italia—la culla della poesia.। (৫)

সে কি?

কাজ থেকে ছুটাস ছুটি নিয়েছি—আর পারি না শীত সহিতে।
আজই যোম বওনা হচ্ছি—তুমিও চলো না।

রোম?

অমন রাজধানী কি আর আছে ভাই—il pavadiso e
sogna! (৬)

কিন্তু—

কিন্তু না—চলো তোমার তো আর চাকরি নেই যে ছুটি নি
হবে। তোমাকে বত দেখি ততই জলে-পড়ে মরি—ঈর্ষায়!
ঠাটা নয়—চলো। সেদিনই তো বলছিলে ইতালি দেখবার তোম
খুব শখ। এখন ইতালিয়ানে হাতে বাড়ি হয়েছে—অসুবি
হবে না!

হিন্দু আজই?

যুতফ ওর শিটে চাপড় দিয়ে বলে : আহা, নবলকা
জুড়িয়েযাবেন না, যাবেন না। বং বিরহের আগুনে আ
জাঅল্যমানা হ'য়ে উঠবেন। মিলনকে চিনতে হলে চাই বিরহে
চক্ষুদান।

কী যে তুমি!—না, এ বিরহ মিলনের কথা নয়—আমি নিজে
ডাবছিলাম একটু বেড়াতে বাব—

বাস, তবে আর কি? জর্মনদের ডাবার বলি abgemacht
কেমন, কথা দিচ্ছো তো?

পল্লব একটু ইতস্তস্ত : ক'রে বলে : বিকেলে বলব।

কী মুশিল! টেনে ঘুমতে হবে তো। না, আর কথা নয়—
আমি একুশি একটি শোবার কুপে রিজার্ভ করতে বাচ্ছি—চাষ
লাও তো।

বাক থেকে জানতে হবে—কত টাকা?

কত আর তিন চার পাউণ্ড—সে বাক আমিই টিকিট ক
রাখব। কেবল দেখো ভাই, গরীবের টাকাটা যায় না যায়

২। Please wire at once ৩। ভিক্টরে এসো ৪

শরতানকে ডাকতে নেই ঘরের ভিতর। ৫। শুল্লীতমা ইতালি
—কবিতার সৌন্দর্য।

৬। ঘরের স্বর্ণরাজ্য।

দলীয় এখন, বড় ভাড়াভাড়ি। হ্যাঁ শোনো, তুমি শুধু তোমার
গাসপোর্টে ইতালিয়ান কনসালের কাছ থেকে একটি ছাপ নিও—
উগ। আমিও সেখানে থাকব—ঠিক দুপুর বেলা, কেমন?

শোনো শোনো। ইতালিয়ান কনসলেট কোথায়?

বিস্মার্ক ল'ব্রাসে—হ্যাঁ, ট্রেন রাত পৌনে দশটার ছাড়বে।
শংস্‌লায় বানরকে ঠিক সাড়ে আটটার মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ে
কিন্তু ভুলে গিয়ে আমাকে কঁাসিয়ে না ভাই, লক্ষ্মীটি।

বলেই মুহুর্ত বড়ের মতন বেরিয়ে গেল টুপি নেড়ে :
Addis, amico caro ! (৭)

পল্লবের মন খারাপ হয়ে গেল : এ কী কাণ্ড ! নিরতি বেন
ঠেঁপড়ে লেগেছেন ওকে রাতারাতি আইরিনের কাছছাড়া করতে !
৩য় মনের মধ্যে ছুটো স্বর ওঠে বেজে : একটা স্বর বলে :
রাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। অজ্ঞ স্বরটা বলে : কী সেটিমেটাল !
৩য় যে করে সেই হারায় সব ভাগে।

ভেবে চিন্তে ও টেলিফোন ধরে... আইরিনের নম্বর দেয়।

পরিচিত স্বর : কে ?

আমি—পল। আইরিন ?

হাসির শব্দ : এখনো পরিচয় দিয়ে চেনাতে হবে ? আমি যে
টেলিফোনে তোমার নিখাস শুনেছি বলে দিতে পারি, মনামি শের।

পল্লব হেসে বলে : তোমার সঙ্গে কার কথা, শোনো, তোমার
সঙ্গে আমার কথা আছে। একশি।

ফ্রাউ জামারের ভাবায়—ich applaudiere auf das
her(৮) Zlichte একশি চলে এসো।

কোথায় ?

কোথায় আবার ? সোজা আমার এখানে। Nur Keine
Angst ! (৯) সকালে এখানে একেবারে নির্জন—কোনো ভর
নেই—সবাই কাজে বেরিয়ে যায়।

ভর আবার কিসের ?

টেলিফোনে আইরিনের হাসি বেজে ওঠে : নাতাশা তর
দেখায়নি—কুমারী লয়ন কক্ষে কুমারের আবির্ভাব এবেশে নিবেশ ?
বলেই হেসে : কিন্তু এখন সেও কিছুই বলতে পারবে না—কেমন
হয়েছে ?

পল্লবও হাসে : খুব সাজা হয়েছে তার। আচ্ছা আমি আসছি
তাহলে। [ক্রমশঃ।

৭। শুভ বাই, প্রিয় বন্ধু !

৮। আমি সর্বান্তঃকরণে সাবাস বলছি। ৯। মা ভেঁঃ।

খর রৌদ্রে ঝলসিত

সত্যধন ঘোষাল

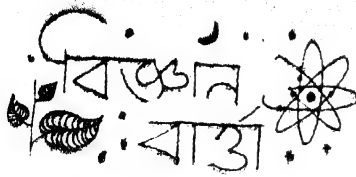
ভীর্ণতার সীমানায় ঝলসে গেল।
চিকণচিকণ কথা বলার স্বর,
এবং পাখীর টোঁটের মতন লাল হয়ে
জলতে থাকলে তুমি
কিবা সে তুমি নও—
এক অর্ধময় দেহ।

ভীত্র হয়ে ছড়িয়ে থাকে জনতা
নির্ভারক নিরাশ্রয়ও কাঁপছে
দূর আকাশ আশ্চর্য হয়ে দেখছে
কেবল প্রাচীনা পৃথিবী নির্বিকার
আমাদের অর্বাচীন প্রেমময়তার।

ভীর্ণতার সীমানায় ভীত্র হয়ে ছিটিয়ে পড়ছে সব।

জানি না কতক্ষণ তুমি জলবে—
মুঠো-মুঠো মেঘ নিয়ে যিকিঞ্চিক আকাশ,
উগ্ৰকূপাশের মত দীপ্তির সীমানায়
বুহতে ঘুরতে ব্যগ্র কামনার প্রৌঢ় হয়ে গিয়ে
আমিও

নিবন্ধ জনতায় মিশে যাব
কোন এক সময়।



পঞ্চম মিশ্র

জুন মি বেইলারের ছোট একটি আলোচনা চোখে পড়লো।

আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে বর্তমান কালের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রাণালী পরিবর্তনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে যেন হয় অভিজ্ঞিই কিছু না কিছু দ্ব্যবধান তথ্যবলী তার সঙ্গে লম্বুত হচ্ছে। সুতরাং পুরোনো শিক্ষাদানের প্রাণালী আর বিশেষ কার্যকরী নয়। নতুনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করতে হবে, পুরোনোকে তুললে চলবে না। কারণ পুরোনো ফলাফল, মতবাদ এবং তথ্যবলীর উপর ভিত্তি করেই নতুনের জন্ম হয়েছে। নতুন আবিষ্কার এবং তথ্যবলীর সঙ্গে তার পূর্বজন পরিপ্রেক্ষিতের সংঘর্ষ ঘটবে কোন কিছু ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা এক অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ শিক্ষাদানের সময় সীমাবদ্ধ, ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের সময়ও সীমাবদ্ধ, সুতরাং তার মধ্যেই ছাত্রদের জ্ঞানবিস্তারিত বর্তমান বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। তাই মনে হয়, বর্তমানকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করা কঠিন কাজ। শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক বেইলার তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের কর্তব্য কি হওয়া উচিত, তার উপর তাঁর নিজের দ্ব্যবধান মতামত প্রকাশ করেছেন। বেইলার নিজে একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ। আমেরিকার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং বর্তমানে তিনি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। এদেশে বেইলারকে অনেকেরই Mr. Inorganic Chemist বলে সম্মান জানান; তাই অধ্যাপক বেইলারের এই মতামতের বিশেষ মূল্যমান আছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার উন্নতি, অগ্রগমন, এবং প্রাণান্ত বিষয়ের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। নিজের দেশের শিক্ষাধারার মধ্যেও আধুনিক কালের সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনের সুযোগ এবং সুবিধা বর্তমান, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও যদি বেইলারের মতো একজন শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী যদি তারও পরিমার্জনের জ্ঞান চিন্তা করতে শুরু করেন, তাহলে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার এই চিন্তার প্রয়োজনও গুরুত্ব বে কতো বেশী, তা আমাদের দেশের যে কোন শিক্ষাবিদই উপলব্ধি করতে পারবেন। এদেশের সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষক তুলনামূলক ভাবে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষাদানের সুযোগ সুবিধার অধিকারী, শিক্ষাদানের পদ্ধতিও অনেক আধুনিক; তা সত্ত্বেও যদি তাদের বর্তমান কার্যপ্রণালী পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন যে কতো বেশী, তা যে কোন চিন্তাশীল পাঠকই উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিক্ষাবিদ বেইলার চমৎকার একটি উদ্ভূতি তাঁর আলোচনার

শেষ অংশে দৃঢ় করেছেন। উদ্ভূতি হলো—the mind is pyre to be kindled not a vessel to be filled। আজকের দিনে যে কোন বিষয়ের বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের এক কুহাংশও বাহুব তার মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। মাত্র জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারে, তার মূল ভিত্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এতে মনের হয় সম্প্রসারণ, জ্ঞানের মূল ভিত্তির সঙ্গে সুপরিচিত হবার সঙ্গে তার জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচিত অঙ্গসমূহে কার্যকারণকে ব্যবহার করার তার ক্ষমতা জন্মায়। মনকে তা খালিয়ে তুলতে হবে, যাতে সে নিজের আলোর এগিয়ে চলার পথ খুঁজে পায়; নিজের উত্তাপেই চলার পথের দাখ্যককে খালিয়ে দিতে পারে—নিজের শিক্ষাকে বিদ্যুতের মতো বিধকে আলো বিস্তার করতে পারে। খালিয়ে তুলতে পারে আরও অজ্ঞান নতুন দীপদীপ্তিকে। শিক্ষাদানের দায়িত্ব শিক্ষকেরা যদি ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের ইচ্ছাকে জাগরিত না করতে পারেন, তাদের জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষমতার যদি বৃদ্ধি না ঘটতে পারেন, তাহলে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ছাত্রদের মন হয়ে পড়বে জ্ঞানভাণ্ডার। শিক্ষকেরা তা ভরে দেবেন কিন্তু পাড়ের মধ্যে অবস্থিত বজ্রটির বিকাশ আর ঘটবে না। সর্ব দেশেই সৎ প্রকার শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাই শিক্ষকদের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রদের মনে জ্ঞানার্জনের ইচ্ছাকে প্রাণান্ত করা। শিক্ষকদের এ দায়িত্ব অবশ্য নতুন নয়, এটা চিরকালের। তাঁরা ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন; জ্ঞান-ভাণ্ডারে সীমানা সম্প্রসারণের জন্য সঠিক পথে চলার নির্দেশ ছাত্রেরা শিক্ষকদের কাছ থেকেই পায়।

আমাদের দেশের অবস্থাটা কি? যে শিক্ষাধারার মধ্যে দিচ্ছে আমাদের দেশের ছাত্রেরা বিশ্বের জ্ঞান-জগতের বৃহত্তর পরিবেশের দিচ্ছে এগিয়ে যান, তার স্বরূপের সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় আছে। এতে ছাত্রদের মন প্রাণীপের মতো বলে উঠে না, সীমাবদ্ধ জ্ঞানপাত্রের মতো প্রশ্ন এবং তার উত্তর খুঁজ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিশ্ব-উন্নতিকামী জাতিরা বহন প্রতিদিনের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের শিক্ষাধারার কিছু না কিছু উন্নতি এবং পরিমার্জনের কথা চিন্তা করছেন, এখন আমাদের দেশের শিক্ষাধারা চলেছে কোন পথে? শিক্ষাদানের চেয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং মুখস্থ করে উত্তর লেখার প্রাধান্য এখনও ঠিক সেই আদিম কালের মতো একই ভাবে বিরাজ করছে। ছাত্রদের মন একটা বিরাট পাত্র, মাষ্টারমশাইর সেই পাত্র কয়েকটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র দেখে ছাত্রেরা যেগুলি তাদের জ্ঞানার মধ্যে পেলো, সেগুলি দাগ দিয়ে নিয়ে তাড়াহাড়ি খাতার মধ্যে বার করে দিয়ে এলো। সকলেরই মুখে এক কথা কটা 'কমন' পড়লো। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের কটা প্রশ্নের উত্তর এ এক এক জনের মনের ঘড়ার মধ্যে বিরাজ করছিলো। ঘড়া কীক করে তা তারা সব চোলে দিয়ে এসেছে পরীক্ষার খাতায়। শেষ হয়ে গেছে তাদের কাজ—ঘড়া এখন কীক। পরীক্ষার কল বার হলো, ঘড়া থাকা কীক করতে পেরেছেন উত্তরের খাতায়, তাঁরা ডিগ্রী পেলেন। তাঁদের মান বাড়লো—ডিগ্রী হাতে করে এসে নামলেন কর্মক্ষেত্রে। ঘড়া যে সেই পরীক্ষার সময় কীক করে তিনি উত্তরের খাতায় চোলে দিয়ে এসেছিলেন—তা তার পর কীকই রইলো।

ডিগ্রীটি হাতে করেই কেউ গেল জীবন—শুধু ঘড়া তোলা রইলো

দায়বরের কুলীতে। এদিকে তিনি বড় ভয়েছিলেন নানা বস্তু সংগ্রহ করে কিন্তু হৃৎপাক্রমে তাঁর বড়ার জিনিষ প্রেরণের আসেনি—তার কি হলো? পরীক্ষার ফলে তিনি মাথার হাত দিয়ে বললেন,—তাঁর বড়ার রয়েছে ভাল আর পরীক্ষার এসেছে তেল। অতএব এবার পরীক্ষার তিনি কেল হলেন—দোষ দিলেন ভাগ্যের। লেখাপড়ার পালা শেষ হয়ে গেল। কিছু দিন পরে তাঁর ভর্তি বড়ার বা কিছু ছিল, তা সব পড়ে একেবারে শুকিয়ে গেল। পিতৃদেবের বহু কষ্টার্জিত অর্থের এই হলো সঙ্গতি। এই ঘটনার আর একটি তৃতীয় পর্যায়ও আছে,—যদি বৈদ্যর ভাগ ছেলেরই বড়ার তেল থাকে আর প্রেরণ আসে ভাল—তাহলে কি হবে? তাহলে ঘটবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা,—ছাত্ররা মিছিল করে চিৎকার করবে প্রেরণের কেন শক্ত হয়েছে? অর্থাৎ বড়ার বা ছিল, তা কেন প্রেরণের দেওয়া হয়নি? আরে, কি করে দেবেন?—তিনি প্রেরণ করেন, তিনি বড়ার কি আছে, তা জানেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন আইন নেই, বড়ার কি আছে তা দেখে প্রেরণের রচনা করতে হবে।

পাঠকেরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, বইলার সাহেবকে নিয়ে শুরু করে কথার কথার এতো দূরে চলে এলাম কেন? এলাম অনেক দূরে। স্বপ্ন আমেরিকার বসে দেশের খুব কম খবরই পাই—বা পাই তা অনেক সময় নিজেরের বিব্রত করে তোলে। এদেশে এশিয়ার খবর বলে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক বার হয় এবং যে-সব এশিয়াবাসী নানা কাজে, লেখাপড়ার বা গবেষণার যোগ দিয়ে এদেশে আছেন, বিশেষ করে তাঁরাই এটা নেন। এই পত্রিকার সাপ্তাহিক সংখ্যার দেখলাম, কোলকাতায় না কি ছাত্রহাঙ্গামা হয়েছে। ব্যাপারটা সেই চিরন্তন—কোন একটি প্রশ্নের নাকি কঠিন হয়েছিলো। এদেশে ঠিক এই কারণে ছাত্রদের দ্বারা ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বোধ হয় করনা করা যায় না। দোষটা কার—ছাত্রদের, শিক্ষকদের, যিনি প্রশ্নের রচনা করেছিলেন তাঁর না শিক্ষানবানের প্রশাসী এবং পরীক্ষা গ্রহণের দায়ার? ছাত্রদের দ্বারা এরকম প্রত্যাক সংগ্রাম তো আজ প্রথম নয়—এর অবলুপ্তির জন্ম শিক্ষানবায়কেরা কোন নতুন উপায়ের সন্ধান করেছেন?

যাই হোক, আবার নিজের কথার ফিরে আসা যাক। বইলার সাহেব বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের জন্ম প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষকেই তাঁদের শিক্ষানবানের প্রশাসীর উন্নতি বিধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিদিনের উন্নতির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তার সমন্বয়সাধনীয় পরিমার্জন ঘটান সহজ নয়। বিজ্ঞান-শিক্ষকদের সামনে এই মহাসমস্যা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের আকার ধারণ করেছে। আজকের বিজ্ঞান-জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে আগামীকাল যে পরিবর্তন

শিক্ষকেরা আনবেন,—আগামীকালের বিজ্ঞান-জগতের অগ্রগমন এবং আরও কিছু নতুন আবিষ্কারের সম্বোধন তার মধ্যে আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে। প্রত্যেক উন্নতিকামী দেশের চিন্তানায়করাই দেশের বিজ্ঞান শিক্ষানবানের দ্বারা পরিমার্জনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। কারণ, এর উপরেই তাঁদের নিজের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

ছুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষকদের শিক্ষানবানের পদ্ধতিকে উন্নত করতে হবে। প্রথমটি হলো শিক্ষানবানের পরিধির মধ্যে নতুন নতুন তথ্যাবলীর সম্বোধন এবং দ্বিতীয় হলো যেসব প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এই সব নতুন আবিষ্কার সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করেছে তার সঙ্গেও ছাত্রদের মনের সম্বোধন ঘটিয়ে দেওয়া। বইলার বলেছেন যে, এই দুটির কোন একটিকেই কম গুরুত্ব দিলে শিক্ষকেরা তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন না। কারণ নতুন তথ্যাবলীকে বাদ দিয়ে শিক্ষানবান করলে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পূর্ণরূপে ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং বর্তমানকালের বিজ্ঞান-জগতের চিন্তাধারা কি ভাবে গড়ে উঠলো ও তার সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার পূর্বসূরীরা কি উপায়ে আধুনিক বিজ্ঞান জগতকে সূশোভিত করেছেন তার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে ছাত্ররা বিজ্ঞানের মনোভাবের সন্ধান পাবেন না। বিজ্ঞানের এই মনোভাবের সঙ্গে সুপরিচিত না হলে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পদাশ্রণ করা এক মুকুটিন কাজ।

এখন শিক্ষকেরা যদি এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁদের শিক্ষাদারা পরিচালিত করেন, তাহলে সমস্যাটা আসে কোথা থেকে? সমস্যাটা বিরাজ করছে শিক্ষানবানের মূলক্ষেত্রে। শিক্ষানবানের বিষয়বস্তু যোজাই যাচ্ছে বেড়ে কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণের সময় তো বাড়েনি? সব তথ্য তো ছাত্রদের সামনে এই বয়স সময়ে উপস্থিত করা যায় না—উপস্থিত করলে তা পাঠ ভরাই হবে, প্রকৃত শিক্ষানবান করে মনকে উদ্দীপিত করা যাবে না। ছাত্রদের পক্ষে একই সময়ে এতো বেশী জিনিষ শিক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়। সেখানেই তো শিক্ষকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব শুরু হলো। তাঁকেই স্থির করে নিতে হবে, কি ভাবে পড়ালে বিজ্ঞানের মূল মনোভাবের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করানো যাবে। ছাত্ররা পাবেন রসের আনন্দ—তাঁদের জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা প্ররোচিত হবে। বিজ্ঞানের কোন তথ্যকে বেশী গুরুত্ব দেবেন, কোন তথ্যকে ঠিক কি ভাবে উপস্থিত করবেন, তার সমস্ত দায়িত্ব বিজ্ঞান-শিক্ষকের। বইলার বলেছেন, আগের যুগের চেয়ে আধুনিক কালের ছাত্রদের অনেক বেশী বিষয়-বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবেন, তাই শিক্ষকেরা যদি তাকে সক্ষিপ্ত এবং স্তম্ভবদ্ধ না করতে পারেন, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা এক অসম্ভবের পর্যায়ে উপনীত হবে।

"He who first shortened the labour of copyists by device of Movable Types was disbanding hired armies, and cashiering most kings and Senates, and creating a whole new democratic walls; he had invented the art of Printing."

—Thomas Carlyle.

চন্দ্রা তার নাম

মহাশেতা ভট্টাচার্য

৫

দুঃখের পরা মাথার নিচে কাটছিলো দিন। নিজের দিকে তাকাবার সময় ছিলো না চন্দ্রার। সেই বিয়ে ডেকে দেবার পর থেকে প্রতাপ আর তার মতো আরো ক'জন মাতব্বর পরিহার করলো তাদের। কিন্তু প্রায়ত্ত্ব মাছুষকে কিছু তারা মাথা কিনে রাখে নি। বিষ্ণু, ব্রহ্মন, ভগবতীপ্রসাদ এই সব গরীবগুরবো মাছুষ লুণ্ঠকু'রারীকে ত্যাগ করলো না। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা রইলো। পাল-পার্বণে তাদের ঘরের সামান্য আয়োজন ভাগ ক'রে নিতে ডাকও পড়লো তাদের। কিন্তু তাদের এমন ক্ষমতা নেই যে এদের কাপড়-কাটা জোগার। লাল বৈজ্ঞান্যের বাড়ীতেও মস্ত সংসার, অনেক কাজ। সাধা চুপ-রু করা শোতলা মেটে ঘর। তার নিচের কামরার বেড়ির তেলের বাতি খেলে গরীতে বসে থাকে বৈজ্ঞান্য। সুদ কবে। চাবী কিষাণের বিপদের সময়ে থলি ভরা টাকা বাজিয়ে সাহায্য করতে চায় সেখ থেকে। বলে—কিসের লিখাপড়া ভাই? ভাইকে টাকা দিচ্ছি, তাতে কিসের ভাবনা? শুণু ভাই, স্তন কারবারের আদর রাখবার জন্তে এই ডুবা কাপড়ে একটি টিপছাপ দিয়ে যাও। হাঁ, তোমার আমার দু'জনের ইমান ঠিক রইলো।

টিপছাপ দিতে দুঃখী কিষাণের আঁতুল যেন আর উঠতে চায় না। কেন না, তারা ভাল ক'রেই জানে তাদের অগন্তন তিন চার পুত্রবধও কপাল এই তৌজী ধাতাতে বাঁধা পড়লো। সত্যি সত্যিই ভাই হয়। হয় বান, নয় অনাবুটী, এই সব চোট ঠেকিয়ে যদি বা কখনো মাটিতে সোনালী সূর্য গয়ের রং ঢেলে দিলো কিষণ, সে কালে সে হাত ঠেকাতে পারে কোথায়? সব টাকা গিয়ে ওঠে এই লালার খর। গবেশের সিঁদুরছাপ দেওয়া লোহার সিলুকে। কপাল চাপড়ে কিষণ আবার ধার করে।

বৈজ্ঞান্যের হাসি হলো মকরের কামড়। এমন করে দাঁত বাসার যে, ঠা'র হয় না অস্তিম হুহুত পৰ্জ্ব। তার পর স্তনে-আসলে মিলে ধারের বহরটা বনন বুকে চেপে বসে, তখন মনের হুখে মাটিতে লাগি মেয়ে কিষণ ধার কোঁজে নাম লেখাতে। কোম্পানীর কোঁজে রক্ত হওয়ার স্বপ্ন, সে যেন সোনার হরিণ। কোঁজে নাম লিখিয়ে একটা কিষণেরও নসীব কিরছে? মনে তো পড়ে না। তবু তারা যায়। কেন যায়, জিজ্ঞাসা করলে ওপর দি'ও হাত দেখায়। ভগবান জানেন, গৈবীনাথ জানেন, কেন কোঁজে ধার কিষণ।

এই লালার বাড়ীতেই এক দিন ডাক পড়লো চন্দ্রার মা'র।

লালার ঘরেই উঠেছে তার স্বামীর জমি আর কেতী। তার বোয়েই গিয়ে পাঁড়তে মাথা কাটা গেল তার। কিন্তু দুঃখীর জাত-বাদে ডর করলে চলে না।

চন্দ্রাকে নিয়ে তবু কি গাঁয়ের মাছুষের কোঁতুলের শেষ আছে? বয়েস পনেরো পেরিয়ে গেল। ভরা বোলো বছরে কো'ন মেয়ে অবিবাহিত থাকে? সমুদুখে লালার বুড়ী-মা বললো—আমার কথা শোন। তীর্থে যাব আমি। আমার সঙ্গে দে মেয়েকে। পুঙ্কে চান করিয়ে সাবিত্রী-তিলক দিয়ে আনি তো'র মেয়েকে। বিয়ে তো হবে না। দেবতার দোর ধরে থাক।

বৌবনে পড়ে মেয়ে তয়েছে মা'র গলায় কাঁটা। মা বলে—ভাই করো নানী, আমার ভাবনা-চিন্তা দূর হয়ে থাক।

লালার মা বলে—ঘরে বসে তীর্থে হয়? না মজা পেরে, না মদিনা গয়ে, বিচ মে বিচ হাঙ্গি খে। এমন ধর ক'জন করে? আর ক'জন পারে? তীর্থে যাব, নিয়ে যাব মেয়েকে। রান্ডার আমাকে একটু মদ্য তদবির করবে। তার পর লাগিয়ে দেবো আমার কোথাও। মনে করবি চন্দ্রার মা, যে পরমেশ্বর তো'র মেয়েকে নিয়েছেন।

এমনি সব ভাল ভাল কথা বলে লালার বুড়ী-মা। তার পর বলে—আমার বেজাইটা-তে একটু ছুঁচ চালিয়ে দিবি বহ? তো এনে দিই?

—বেশ।

যেরামতি আর কুটোফাটা সারবার কাজ এনে দেয় চন্দ্রাকে তার মা। এখন আর গাঁয়ে বেরোর না চন্দ্রা। ঘরে বসে মা-কে সব কাজ করে দেয়। মা-রও হয়েছে নানা আলা। মেয়েকে যেন আর দেখতে পারে না। কেন জন্মালো এই মেয়ে? এই এক মেয়ে থেকে তার যতো দুঃখ; তখনতে তখনতে চন্দ্রা-ও এক একদিন রেগে যায়। বলে—বিব এনে দাও মা খাই। তুমি স্তখে থাকো! জন্মালে মেয়ে কেলেতে পাতোনি মা?

—ভূই আমাকে এই কথা বললি? বলে মা-মে তে একসঙ্গে একটু কাঁদে বসে। কাঁদলে মনটা বড় হালকা হয় সুরজের। চন্দ্রার বাবার নাম করে কেঁদে সে বলে—হে গৈবীনাথ, কেন আমাকে এমন করে দুঃখ দিলে? কেমন সাজানো সংসার পেয়েছিলাম। দশবছর যতো শতর, কোঁশল্যার যতো শাস—রানের মতো স্বামী।

এবার কেনবার সময়

লেখকশ্রী বিলোম ইতল

পিলখার-গ্রন্থ ক্যাপ

যুক্ত দেখে কিনবেন

এম, এল, বঙ্গু যোগ কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

তারপরই সব অভিব্যক্তি সৈন্যবাহকে ছেড়ে বামীর ওপর এসে পড়ে।

—জামি হেঁট গেলে তুমি বুক বাধা পেতে, ইলারা থেকে জল হয়ে আমতে দাঁতনি তুমি। লুকিয়ে জল এনে দিতে তুমি, দুপুরবেলা বারসেনা দিতে হাতের রূপার চুড়ি খুলে দিলাম বধন, কত মুখে করেছিলে? এখন কি এত নিদ্রা হয়েছে। বে দেখতে পাও না, কত কষ্টে দিন কাটে আমার? তোমার মেয়ে আজ বানের মুখে ভেসে যায়, আমার বুক জোর কি তাকে বাঁচিয়ে রাখি?

এমনি সব কথা বলে কেঁদে-কেঁটে শ্রবজ বায় কাজে। কিন্তু বোল বহুরের বুক যে পাখাণ-ভাঁড়, তা তো চোখের জলেও হান্কা হয় না? আর কারা যেন আসে না চম্পার চোখে। তাকে কি ভঙ্গবান এত জালা দিয়ে গড়েছিলো? ভেবে ভেবে কুল পায় না চম্পা। এসে থেকে সে কি শুধু হুঃখই দিলো লোককে? কিন্তু চম্পা তো সে কথা বলতো না?

জীর্ণ ঘরের ভাড়া গেরস্থালীর কাজ চম্পার সারা হয়ে যায়। বর্গা পড়ে নদী কেমন ভরে উঠেছে। ঘাট ভেঙে ঘাট উঠেছে শুদিকে। এ ঘাটে কেউ আসে না আজ-কাল। চম্পাদের উঠানে ছায়া ফেলে এক বাক বক উড়ে যায়। তবে কি বৃষ্টি আসবে? আকাশ ত মেঘে বেঁধে এসেছে। কাজল-কালো মেঘেরাবদিকে চেয়ে চম্পার মন যেন কেমন উলাস হয়ে যায়। কোথায়, কতদূরে গিয়েছে চম্পা। কম বহুর বে হয়ে গেল। শ্রবী ঘরের এক ছেলে, এমন করে নির্বাগনে থাকবার কি দরকার ছিল? এতাপ চাচা আর দুর্গা চাচীও ঘুরে এসেছে সেখান থেকে। নানার সঙ্গে নাকি কাজ করছে চম্পা। ফারসী শিখেছে, হিন্দী শিখেছে কোন বাঙ্গালীবাবুর কাছে থেকে। বাঙ্গালীবাবু কাকে বলে? জানে না চম্পা। তবে কৌশল্যার কাছে শুনেছে বাঙ্গালীবাবুরা মাছ খায়, মাংস খায়। সাহেবদের সঙ্গে এক সমান হয়ে কথা বলে। তাতেই বা কি হলো? এক ছেলে, তাকে বিয়ে দেবে না তার বাপ-মা? নিক না কেন, শ্রবী হোক না কেন, চম্পা কি বাদ সাধতে বাবে? কখনই না।

ভাবতে ভাবতে চম্পা বাড়ীর পেছনে গিয়ে ঝাঁড়ায়। ঐ তো এক ফালি নীল মেঘের মতো নদীখানি দেখা যাচ্ছে। চম্পা জানে, এই ঝোড়ো বাতাসে নদীর জল কেমন কুঁচকে যায়। কেমন বেধা পড়ে। আবার বৃষ্টি পড়ে বধন—টুপটাপ করে শব্দ হয় বড় বড় কৌটাতে—তখন নদীটা কেমন অশান্ত হয়ে ওঠে। কত দিন সেবেছে চম্পা। চন্দন তাকে দেখিয়েছে। বৃষ্টির বাপটায় নীল হয়ে গিয়েছে মুখ। তখন বটগাছের নিচে ঝাঁড়িয়ে হুঁসন বৃষ্টি ধরা অবধি অপেক্ষা করেছে। আবার বলমতো বোদের দিনে, নদীর জলে হাত-পা ধুয়ে, খাবার খেয়ে নিয়ে কাঁধে শীলমোহর করা থলি ফেলে সরকারের ডাকবরদার বধন ঠাঁট, ঘোড়া নিয়ে খুট খুট করে পাঁকা সড়ক ধরেছে—তার পেছন পেছন চলে গিয়েছে সে আর চন্দন। কোমরের পেটি আর কাঁধের তকুমার লাল রং বধন অনেক দূরে মিলিয়ে গিয়েছে, তখন গমক্ষেতের মধ্যের সর রাস্তা ধরে গায়ে ফিরতে ফিরতে তারা হুঁসনই গলা মিলিয়ে গান করছে—

—লোভে চন্দন চম্পক মালা

কানদে কুণ্ডল নৈন বিশালা

বাক্সি বাজে বড়োবাপা

চলো রাধাধাবকে বরাত, রে।

যেটার ওপর চিবুকখানি রেখে চম্পা উলাস চোখে তাকিয়ে থাকে। কোথায় চলে গেল চন্দন। আজ যদি কিয়ৎ আসে, চম্পা কি তার জীবনে আবার নিজের অভিশপ্ত ছায়া ফেলতে বাবে? এই তো সেদিন, কি কারণে মন খুদী হয়েছিলো। হুইফুল পরেছিলো চম্পা বেগীতে। সন্ধ্যার মুখে জল নিয়ে চলে আসছে চুপি চুপি, দেখে চন্দনের মা কেমন বিক্রম করে বললো—দেখ দেখ, আমার ছেলেটাকে দেখ-যর ছাড়া করলো, এখনো ফুল পঁরে মন ভোলাবার শখ যায় নি?

হেঁচট খেয়ে পা কেটে গেল, সেদিকে না তাকিয়ে প্রায় ছুটে চলে আসে চম্পা, তবু দুর্গার শাপিত কণ্ঠা তাকে অস্বস্তি করতে ছাড়ে নি—ও মেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে ওঠবে আর নাচ-নৌ হবে, তোমরা দেখে নিও।

চম্পা ভাবে না, দুর্গার ছেলের কাছে আর সে বাবে না। কোন দিনও না। বলা যায় না, হয় তো একদিন বরাত, নিয়ে বেহুবে চন্দনের বাবা। না কি বৌ নিয়েই ফিরবে? চন্দনের নানা না কি এমন মেয়ে বাছাই করবে, বার জোড়া নেই—চন্দ্রবদনী, মৃগনয়নী কাঁচা সোনার মতান্ত্রিত।

আর চম্পার তো বিয়েই হবে না। ভাবলে পরে মনটা ধারাপ হয়ে যায় আবার। তার কোন দিন কিছু হবে না। যত আনন্দ উৎসব সব ঐ অজ্ঞ অজ্ঞ মাহুরের হবে। নিজের দুখে নিজের উলাস হয়ে চেয়ে থাকে চম্পা। বর্ষার জল পেয়ে কদম গাছে ফুল ফুটেছে। নদীর ওপারে বনে ময়ূর ডাকে শোনা যায়। চম্পাদের ঘরের পেছনে কেমন মখমলের মতো ঘাস হয়েছে। হুইগাছটা নাড়া দিলে ফুল আর বৃষ্টির জল দুই-ই করে পড়ে। একবার গাছটা নাড়ায় চম্পা। বৃষ্টির কৌটা কৌটা জল বৃষ্টি নিচের ঘন সবুজ পাটাগুলিতে তখনো লেগেছিলো! এবার তারা ঝরে পড়ে। চম্পার চুল আটকে পড়ে বেধতে হয় ঠিক যেন ছুজো লেগে রয়েছে।

হঠাৎ কানে আসে অনেকগুলো গাড়ীর বড় বড় শব্দ। তাদের গায়েই ঢুকলো বৃষ্টি। কৌতূহলী চম্পা আগল খুলে এগিয়ে যায়। আরোহীদের চোখে পড়ে না। কিন্তু সারি সারি তিনটে বয়াল গাড়ী এলো। বড় বড় চাকা। বাঁশের ছাউনীর মুখে হাঁটা লাল কাশডের খোপা-খোপা ফুল। বাত্রিবাহী গাড়ী। এ গায়েই কাক ত এমন সময় ফেরবার কথা নয়? তবে কি বাইরে থেকেই কেউ এলো? চম্পা ভাবে—কৌশল্যার কাছে জেনে নিলেই চলবে। চকিতে আশ্চর্যচেনন হয়ে ভেতরে চলে আসে চম্পা। কৌতূহলী চোখে মাঝের গাড়ীটা থেকে কে বেন ঘুরে তাকালো। বুক দুক দুক করে তার। এমন নিলাম হয়ে এতখানি এগিয়ে আসা উচিত হয়নি তার। গায়ে আঁচল ছিল তো? মোটা হলদে ওড়নাটা টেনে নেয়।

কানপুর ও আকবরপুর থেকে রাস্তা এসে তেরাপুরের আগেই মিলেছে। তারপর তেরাপুর হয়ে সেকার নদী পেরিয়ে সে পথ বন্ধনা পেরিয়ে কান্দী হয়ে চলে গেল। এই পথ কোম্পানী সড়ক। এই পথের সঙ্গে বাগাবাগ করবার জড়ে আশ-পাশ থেকে কত পথ

জালের মতো এসে মিলেছে। আকবরপুর, বাটমপুর, কোরা, কঠোরা, হামীরপুর হিন্দুকী, কুন্তেরপুর। এই সব জায়গা থেকে এসেছে সব ছোট ছোট পথ। সব পথই যে কোম্পানী সাহেবের বানানো ভা নথ। যেমন তেরাপুরের পথ বানিয়ে দিয়েছিলেন রত্নলবাসের গাজী সাহেবের শিষ্য মহম্মদ রত্নল। বুক পৃষ্ঠ সালা দাড়ি, হাতে তসরীমালা, কোরাণ কঠু ছিলো গাজী সাহেবের। সিদ্ধপুত্র, দিনান্তে এক জাঁজলা দুধ খেতেন শুধু। আর সে দুধও নাকি একটি ধবধবে সালা গাই এসে দিচ্ছে যেতো। গাজী সাহেবের অব্যবহৃত আরোগ্য হতো সর্পাট বস্ত্র। কি হিন্দু, কি মুসলমান সবাই বিপদকালে নিয়ে যেত গাজী সাহেবকে। মহম্মদ রত্নলের ছেলেকে কাটলো বিবধ। গাজী সাহেব নিজে তখন মুত্য়ুখবার। তবু, মহাহুতের সেই কাল রাতে ঠিক চোক মাইল রাজা পেরিয়ে এলেন গাজী সাহেব। মহম্মদ রত্নলের জনাকীর্ণ ঘরে ঢুকে একবার পাঁড়লেন মুত্য়ুখবারাজীর মায়ার কাছে। হাতের লাঠিটা দিয়ে মুহু ঠেলা দিয়ে বললেন।

—কোন কাঁধ কলসি নি তুই বেটা। ময়দান পাড়ে রয়েছে, তাতে একটা গমের চারাও ফেলায় বরলি না—সে গাছের একটা দানাতো কোন চিড়ির খেতে এলো না—কি হিসেব দিবি তুই আত্মার কাছে গিয়ে? উঠো, নিদ্, না বহো, ছুনিয়া যে আপনে কাম ব্যাও।

তার পর চলে গেলেন। সকালের আগেই মহম্মদের ছেলে দুধ হয়ে উঠলো। সন্তোজ মহম্মদ গাজী সাহেবের কাছে গেলেন দরগার ভেট নিয়ে। গিয়ে দেখেন, কাঁচা এক কবরে বাতি ঝেলে লোক করছেন ব'লে উত্তবুদ্ধ। গাজী সাহেব মারা গিয়েছেন গত সন্ধ্যায়।

মহা কুন্তজতার মহম্মদ তেরাপুর থেকে রত্নলবাদ এক পাকী সড়ক বানিয়ে দিলেন। গাজী সাহেবের নাম নিয়ে চললে এ পথে বাজীর কোন বিপদ হয় না বলেই এ অঞ্চলের লোক বিশ্বাস করে।

এমনি ধারা আরো কত পথ। কোন ঠাকুরসাহেব হয়তো নিজের কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তে পথ করেছেন। কেউ বা মৃত পিতৃপুত্রের নামে উৎসর্গ করেছেন কোন কাঁচা সড়ক। কিন্তু কোম্পানী সরকারের পাকী সড়কের সঙ্গে কাকুরই তুলনা হয় না। চমৎকার পথ। চওড়া স্তম্ভর পথ। এই পথ দিয়ে কোম্পানীর ডাক চলে, কুচ চলে, রেসালা ও পদাতি ফৌজের সিপাহী সওয়ার-রা ছুটি কাটলে গ্রাম থেকে হেড কোয়ার্টারে হাজিরা দিতে যায়। কখনো সাহেবরা শিকারে চলে এ পথ ধরে। সাহেবরা এ জায়গা থেকে ও জায়গা গেলেন তো একটা ছুনিয়া শিকড় উপড়ে চললো সাথে সঙ্গে। কত তাঁবু, কত বেহারী, আবাদার, খানসামা, সহিস, মশালটি, বাবুটি, কুলী। ভেড়া, বকরা, খুঙ্গী খুঙ্গা, এমন কি দুধ দেবার গাইটিও চললো সাথে সাথে। সাহেবরা এলো তো আশপাশের মাছর রাজা ছেড়ে নেমে যাবে পাশের ক্ষেত, নালা বা খাঁদে। যে নামবে না, তাকে বোড়া দিয়ে ভয় দেখিয়ে নামিয়ে দেবে ওরা। কোম্পানী সরকার। সাহেবরা সকলেই রাজা। রাজার সঙ্গে একই পথে একই সময়ে চলা কি আদব মাকিক?

পথ। তবু কালো চামড়ার মাছরগুলোকে দূরে রেখে বাঁচবার কি প্রয়াস। বত নতুন আমদানী সাহেব, ততো এই রকম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা। কোখার বদলল দিয়ে চলছে সাহেব।

তাঁবু খাটাবে, আদাবার সাজিয়ে খাটপালং চোরার আলমারীতে বন্দোবস্ত করে দেবে হিন্দুস্থানের মাছর। দশ দিক খুঁজে পেতে খুঙ্গী খানীর মাস, তোকা চালের বিরহানী আর মদের ঠাণ্ডা বোতল, সে-ও আনবে তারা। গরমে পুড়ে তারা পাখা চালাবে, শীতে তারা-ই আঙন খালাবে। সব সময় হজুরে হাজির থাকবে। তাদের এই সবটুকু সেবা নিশেষে নেবে সাহেব। বুট উর্চু করে, পা নাচিয়ে, নিগার অথবা শূহার ব'লে। কিন্তু তাই ব'লে তাদের মাছর ব'লে স্বীকার করবে? অসম্ভব। এমন দুটমূল এ ধারণা, যে সভ্যতা থেকে অনেকদূরে, নগণ্য কোন নির্জন জায়গাতেও, কোম্পানীর সাহেবরা, সাহেবরা সাহেব ছাড়িয়ে মাছর হয়ে উঠতে পারেন না। যে সব সাহেবরা লাঞ্চে একজন, এই সব অশিক্ষিত কাম্বুনের লক্ষণের গভীর পেরিয়েছেন, তাঁদের এদেশের মাছর শ্রদ্ধা করে, ও-পাশের মাছর তাক্সিলা করে। সাহেবরা সাহেব, তাতেই তাঁদের সাত খুন মাপ। ভাষা বোঝেন না, বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই এ মহাদেশ সম্পর্কে, নিজেদের শিক্ষাসীক্ষা প্রায়ই দণ্ড দিয়ে মাশা বায়—তবু তাঁরা শাসন চালাচ্ছেন। সাল আঠারো শ' পঞ্চায়। কালো চামড়ার কোটি কোটি মাছর আর তাদের জগদ্বর্মি হতভাগ্য সব মহাদেশ, তাদের ওপর শালা চামড়া অব্যাহত শাসন চালাবে, এই হলো এই যুগের বাইবেলের নির্দেশ।

এত কথা তেরাপুরের মাছর জানে না। তবে মাগুল তাদেরও দিতে হয় বৈ কি। তাই তেরাপুরের বুড়ো মাছররা বলে।

—জমানা বদলাবারও একটা তরিকা ছিলো। আমরা বুঝতে পারতাম, কখন কি হচ্ছে! এখন আর কিছু ধরতে ছুঁতে পারি না। এমন তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে সব।

জোয়ানরা হাসে। তাঁদের রক্ত গরম। বলে বুড়ো লোকদের শুচু ভয়। সব ঠিক আছে। জোয়ানরাই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

—না, না।

মাথা নাড়ে বুড়োরা সবিশ্বাসে। বলে—বদলাচ্ছে। কিন্তু ভাল হচ্ছে কিছু? কিছু না। এত অসুখ বিসুখ, কসলে এত অজ্ঞান, আকাশের এত খামখেয়ালী, এ তো ভাল নয়।

বুড়োরা মাটির সঙ্গে গভীর টানে বাঁধা। গাছের মতো। তাই আবহাওয়ার বদলটা তারা জ্ঞান নিয়ে নিয়ে বোঝে। বোঝে কিছু বোঝাতে পারে না ছেলে-নাতিদের! মাথা নাড়ে শুধু বিভ্রান্তিতে।

তবু এই পথ তাদের জীবন-বৈচিত্র্যও জোগায়। পথ দেখে অনেক সময় যায় তাদের।

কে এলো নব আগন্তুক, জানবার জন্তে ব্যস্ত ছিলো চম্পা। তাছাড়া হঠাৎ বেন মনটা টলমল করে নড়ে গিয়েছে প্রশান্তি। পুরনো স্মৃতির সন্ধারেই কি এমনটা হলো? মনের অন্তর থেকে উঠে এলো অনেক সব ছবি, বা নাকি মুছে বাবার কথা। প্রথম বৌবনেই যে মনে এখন হয় তা জানে না চম্পা। সহসা অসম্ভব করছে বিধি-নিষেধ, জেনে-ও ছুপু বেলো একবার নদীর ধারে বাবার জন্তে আকুল হয়ে উঠলো চম্পা। সেই নদী, সেই বটগাছ, সেই প্রশান্ত, বিপুল, উদার ব্যাপ্তি। তার অনেক নিঃসঙ্গ বেদনা দিনের সঙ্গী।

কাল ছিলো হৃদিত বর্ষ। দেখ ভয়ে আকাশ নেমে এসেছিলো

চম্পানের বাড়ীর ওপর। বুড়ির প্রতিজ্ঞা ছিলো। রাতে বিনিম্বে
তোষে জানলা দিয়ে সেই নিকব আঁধার দেখতে দেখতে চম্পা মনে
মনে কামনা করেছে বুড়ি আনুক। ঝুম্ ঝুম্ করে নেমে ভাসিয়ে
দিয়ে বাক সব কিছু। তাই'লে ঘুমোতে ভালো লাগবে তার। সে
ঘুম ফুলের কোন সুখের স্বপ্ন দেখাও সম্ভব। কিন্তু বুড়ি আসেনি।
সেই বুড়ি এলো আজ, এখন। এই অসময়ে। নদীর জল
সিঁহের মতো ঢেউয়ের বেশব ফুলিয়ে উঠে এলো। বুড়িতে সত্যিই
ঠাইয় হয় না কিছু।

এ সময়ে বটগাছটার গোড়ার কাছে জল উঠে আসবার কথা।
তবু তার কথাই মনে হলো চম্পার। শৈশব থেকে এই বটগাছটাকে
সে মনে মনে বন্ধু বলে জেনেছে।

পা ফেলতে ভুল হয়েছিলো, আর একটু হলেই নরম মাটির ধসের
সঙ্গে বুঝি নিজেও চম্পা জলেই পড়ে যেতো আজ। যদি না তাকে
ধরে ফেলতো চন্দন। অকৃত একটা মুহূর্ত। পরে চম্পা চোঁটা করেও
এই মুহূর্তটার বিষয় আর চমক স্বরণে আনতে পারেনি। এ রকম
আশ্চর্য দৈবী যোগাযোগ কঠিন হয়।

—পড়ে যাবে চম্পা!

হুঁটনা বাঁচলো। কিন্তু চম্পা চলে এলো কাছে এক টানে
প্রায় বুকের ওপরই এসে পড়লো বলা চলে। কিন্তু সে-ও
মুহূর্তের বিভ্রম। তারপরই প্রায় ঝড় ঝড়ায় চম্পাকে সামনে
ঠেলে দিলো চন্দন। বললো—খুব বেঁচে গেলে।

বিষয়ের ঘোর তথ্যনা কাটেনি। চম্পা বললো—তুমি?

—নয়তো কি?

কৌতুকের হাসিতে মিত মুখ চন্দনের। বলে—কাল অমন
করে দেখলাম। ঠাঁড়িয়ে ছিলে গীলা ওড়নীতে বাহার দিয়ে। সঙ্গে
‘নাধা বাবা’ ছিলো, নইলে!

—সে তুমি?

স্বীকার করে চন্দন মাথা নেড়ে বলে—আমি এসেছি সে
কথা শোননি? আমি ত ভাবলাম তুমি শুনেই এসেছ
দেখতে।

সচেতন হলো চম্পা। ঈষৎ গর্বের ও আহত অহমিকার সুরে
বললো।

—গাঁয়ে আমি বাই না। গেলে নিশ্চয় সুনতাম। শরীফ
হয়ে ফিরে এসেছে ছেলে, আমাদের মতো গরীবকে নিশ্চয় শোনাতো
তোমার মা!

চন্দন জবাব দেয় না। তাই খোঁচটা তাকে বিঁধলো কি না,
বুঝে পার না চম্পা। আঁখাত করে নিজেই মনটা খাঁচাও
গিয়েছে যেন। তাই সেই মনটা জয় করে আবার চম্পা বলে—না
জানি কত খরচাও জকাং আজ তোমাদের বাড়ীতে। আমি তো
তাতেও বাদ পড়েছি চন্দন!

—চম্পা, বাজে কথা বলা না।

মনে যে অনেক দুঃখ চম্পার। আরো অনেক কথা বলতে
ইচ্ছে করে—কিন্তু চন্দনের গলায় গভীর সুর, সেই হেলোমাদ্য
কিশোর কণ্ঠ কোথায় গেল? কথা বলতে চেয়ে কথা হারিয়ে ফেলে
চম্পা। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রথম দর্শনের চমক আর
বোঁকটা কেটেছে। তারপর আবার নিম্ন কোন কৌতুক করতে,

সাধ বার। মনে হয় চন্দনের আত্মবিধাটো ভেঙে দেয় খোঁচা দিয়ে।
সে কথা বললো বলেই ধস্ত হয়ে গেল চম্পা? তা তো নয়।
চম্পা বলে—চেহারা তো রহীসদের মতো! অনেক বেশ ঘুরে
এসেছ? আমার জন্তে কিছু এনেছ?

—নিশ্চয়?

—কি এনেছ?

বুড়ির হোঁচাচ কি চম্পার গলায়ও লাগলো। নইলে গলা
এমন ভিত্তে কেন? যেন জুইগাছটার পাতায় ফুলে জল। নাড়া
মিলেই ঝরে পড়বে। পাছে ঝরে পড়ে, তাই নিচু গলায় চম্পা
আবার বলে—কি?

—দেখতে পাচ্ছ না? সামনে ঠাঁড়িয়ে আছি, সেই কখন
থেকে দাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে পা আমার ধরে গেল।

এবার চম্পার অভিমান ফুলে ফুলে ওঠে। চিরদিনের অনাদরের
মেয়ে। এতটুকু ভালোবাসার হোঁচাচ লেগেছে তো কথা নেই।
চম্পা বলে—এত দিন আসনি কেন?

—কাজে ছিলাম।

—কি কাজ?

—অনেক কাজ। কিন্তু সে সব কথা কেন চম্পা? এই ত
এসেছি। ভোরবেলাই চলে আসতাম। কিন্তু জান তো সব!

এবার দুজনে পাশাপাশি বৈঠক আসে। বুড়ির সাদা আবরণটা
দুজনকে ঘিরে রয়েছে। আড়াল করে রয়েছে বহির্জগৎ থেকে।
চন্দনের কথা শুনে ম্লান হাসে চম্পা। সে জানে না চন্দনের আসা
কত অসম্ভব। বলে—তুমি আর কি জানলে বল? এখানে
প্রতিদিন, সে যে কত কথা—

বলতে বলতে চম্পার হৃদে হাত চাপা দেয় চন্দন। বলে
—বাস, আমি তো এসেছি। আর কেন ভাবনা?

মুগ্ধ চম্পা তাকিয়ে থাকে। চন্দন বলে—আমি অনেক
ঘুরেছি, অনেক দেখেছি চম্পা। এরা জানে না তাই ছোট
ছোট কথা নিয়ে পড়ে আছে। তুমি কিন্তু সে সব কথার চুপে
পেরো না।

বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ে চম্পা। তার পর চন্দন বলে
—কি স্মরণ হয়েছ চম্পা? চেনা যাচ্ছে না জানো? কে
বলবে এ সেই চম্পা!

—কেন বিজ্ঞি ছিলাম?

—এমন হবে কে ভেবেছিলো? চলো নিয়ে বাই শহরে।
শহরে যেহেতু কেমন স্মরণ স্বাধী ওড়নী নাগরা পরে। কেমন
বেগী বাঁধে।

—খুব স্মরণ, না?

—তোমার চেয়ে নয়।

চন্দনের কথায় চম্পার হুনিরাটা অমনি ভ'রে ওঠে যেন।
খুশীখালির রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। চম্পা বলে—সত্যি?

—সত্যি।

আর বোঁবনের ধর্মই এই, চন্দনের সঙ্গশঃ দৃষ্টিতে চম্পা যে-ই
জানলো যে সে স্মরণ, অমনি যেন সে আরো অনেক স্মরণ হলো।
এই সৌন্দর্য আগেই এসেছিলো। কবে যে কিশোর ও বৌবন দুই-ই
মিলিত হলো। দুই-ই সাহস্যাগ জলিতে পূর্ণ ক' 'লা গার

দেহ, তা জানতো না চম্পা। চরনের সে চপলতা কবে যে মননের
নীলাঞ্জন ছায়াতে মিলিয়ে রহস্যময় করলো কটাক্ষ, তাই বা কে
জানতো। সমস্ত শরীর ভরে উঠলো। বেন মজবুত হলো লতা।
অবশ্যে বাঁধা চূন, তারই বা শোভা কত। গরীব মেয়ের লাল
আলিয়া গীলা ওড়না—তাতেই চম্পা কত মুগ্ধ। মুগ্ধ চন্দন চেয়েই
থাকে কিছুক্ষণ। লজ্জা শেষে মুখ ঘুরিয়ে নেয় চম্পা। চন্দন
বলে—অমন কুশল হ'লে কেন চম্পা? কত দিন দেখিনি বল তো?
এতক্ষণে চম্পা সহজ হয়েছিল। সত্যকৃত্যে হেসে হেসে বলে—
ছিলে কোথায়? মনে ছিলো এ গাঁয়ের কথা?

—ছিলো না? জানো না ত, সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলোম
প্রয়াগজী। পথে সাহায্যকে ভাবুর হাতে পড়লো আমাদের
গাড়ী। সাহেব ছিলো পেছনে। সড়কী বিঘলো আমার কাঁধে।
মরেই যেতাম হয় তো, যদি না সাহেব এগিয়ে এসে গুলী চালাতো
কটাপট। কিন্তু মনে হলো—যদি তোমাকে আবার না দেখতে
পাই?

—কোথায় লেগেছিল চোট?

—অবধ আমার হরে গিয়েছে।

—তবু দেখি?

ঈশৎ-গম্ভীর হয়ে চম্পা নিরীকণ করে দেখে। এত দিনের
অদেখা। তবু এমন সহজ ভাবে কীথ হাত দিয়ে দেখতে, এমন
করে কাছে আসতে এক চম্পাই পারে। চন্দনের মনে হয় চম্পার
মতো এমন দোস্ত তার কেউ নেই। এই সহজ বন্ধুত্বের জন্য বেন
কৃতজ্ঞ লাগে তার। ঠিক এই কথা হয়তো বলতে চায়নি,
তবু এই সব কথাই কেন বেন এসে পড়ে। চন্দনের মনটার
চারিশাশে বেন পাহারা ছিলো। এসব কথা ভাবতে বা কইতে
মানা ছিলো। এখন চম্পার নৈকট্যে সহজেই অপসারিত
হলো সেই বাধা।

চন্দন বলে,—তুমি কি বুঝে চম্পা? আমার মনে কত কথা,
আমি সব বলতে পারি না। শিকার করতে জঙ্গলে চলেছে সাহেব।
ডোলপুরের রাজার জঙ্গলে। রাজার হাতীতে সাহেব, পিছনের
হাতীতে আমি, সাহেবের বন্ধু নিয়ে। হঠাৎ সামনে পড়লো
গুলবাধ। কাঁপিয়ে পড়লো গাছ থেকে। সাহেবের বন্ধুকে নিশানা
ছুটে গেল, ধাবার চোট খেয়ে জানোয়ার লাফিয়ে এলো। আমার
খেরাল ছিলো এ রকম কিছু একটা হতে পারে। দাদা শিখিয়েছিলো
শিকারের বুলি। জানি চোট খেলে শেখের চাইতে গুলবাধ কিছু কম
নয়। কিন্তু হাতী যে ভয় শেষে অমন বিগড়ে বাবে আর সব ভুলে
গিয়ে অমন ছুটেবে পাগল হয়ে, সে কথা দাদা বলেনি। এক নিমিষে
কি হয়ে গেল, আমি গোলাম পড়ে। লজ্জা বাধ আমার বৃকের
ওপর। সাহেব জাতটা আমি বুঝি না চম্পা। এ সাহেব ছোঁকরা।
অতি বদমেজাজী। এখন দেখি যে না, ভীতুও বটে। ভয়ে কেপে
গিয়ে আমাকেই হয়তো সে গুলী করতো, যদি না মাছত তার হাতী
সামলে নিয়ে ঝাঁড়িয়ে উঠে সাহেবকে না হ'সিয়ায় করতো। গুলবাধার
সঙ্গে লড়াইয়ে আমি বধন বেকারবার আটকে গিয়েছি, জানোয়ার
আমাকে কবজা করেছে তখন ছুটে এলো জোনো আলি। আমার
দোস্ত। আমাকে বাঁচাতে তার ডবোয়াল জানোয়ারকে বিধলো
ঠিকই, কিন্তু আমার মাথাটাও বাঁচলো না। কি ভয়বস্ত বন্ধুণা

চম্পা, সব বেন জাঁধার হয়ে গেল, কিন্তু তোমার কথা আমার সেই
সময়ও মনে হলো।

এতক্ষণে আকাশে বৃষ্টি থেমেছে। পাতা থেকে জল ঝরছে
টুপটাপ রূপালী ছন্দে। আকাশ সবটুকু জল চলে দিয়ে
এতক্ষণে রান মেঘের ওপর রামধনুর রাস্তা হারিটুকু ছড়িয়ে
দিয়ে চেয়ে আছে মাটির দিকে। আকাশের পূর্ণতা শূন্য হলো।
আর চম্পার মনটা বেন এতদিন ধরে পিপাসী নদীর বৈশাখী
বৃকের মতো শূন্য হয়েছিলো। এতক্ষণে সেই হৃদয় ভরে
উঠেছে। হলহল করছে কানার কানার। অনেক কোভ অনেক
মুগ্ধ চম্পারও ছিলো। তার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি। চন্দনের
মা তাকে কত অপমান করেছে। অনেক দুখে চম্পার মনটা শুধু
চন্দনকেই মরণ করেছে। তারা দুজনে গৈবীনাথের মন্দিরের
পাশে কদম গাছের একটী শিত চারা আবিষ্কার করেছিলো। সেই
গাছে ফুল এসেছে গত বছর। দেখে চম্পার মন কেমন করছে।
তাদের বাড়ীর পেছনে জামগাছে এবার কালো মেঘের মতো ফল
ধরেছিলো। চুরি করে সেই জাম দু'ভনে বসে খেতো এই গাছের
তলায় বসে। সেই কথা মনে করে চম্পা এবার এক জাঁটলা জাম
একটাও খায়নি। সব ছড়িয়ে দিয়েছিলো। গাছের তলায়।
কাঠবেড়ালীরা দল বেঁধে খেয়ে গেল। সেই হরিণশিশু? চম্পার
চোখের সামনে সে বড় হলো। এবার শীতকালে সেই হরিণকে সে
মহুগ চালে এক হরিণীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। আবার
হরিণীর ডাক ডেকে সেই হরিণকে তুলিয়ে এনে তার সন্ধানে
মারলো ঐ আহীরদের ছেলে গোপাল। গোপাল হয়েছে
চিড়িয়াখানা। তিতরি, বটের, হরিণমালা, হরিণ, জ্যাক্স ধরতে
পারে না। মেরে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে সাহেবদের ঊঁচুতে।
চার পা খড় দিয়ে বাঁধা, হরিণ দোলা টানিয়ে সেই হরিণকে নিয়ে,
গেল গোপালরা কর ভাই। বলে পড়া মাথা, আর নিমীলিত চোখ।
সেই হরিণকে দেখে চম্পা, দুখে কোখে কত কেঁদেছে একা একা।
চন্দন থাকলে গোপালকে নিশ্চয় শাস্তি দিতো।

এ হলো কারণের কথা। উপলক্ষ্য ধরে মন কেমন করা। কিন্তু
তা ছাড়াও কত সময় যে এমনি মনটা কাঁদতো, হ হ করতো, উদাস
লাগতো। ক্ষেত ফুড়িয়ে গম তুলে টুকরি ভেঙছিলো চম্পা একদিন।
এমনি রাস্তা বিকেল। অজ্ঞানের বাতাসে শীত করে। কালো
কবুলের মোটা ওড়না টেনে নিয়ে সে ফুলো দিবে ঝাড়ছিলো গম—
হঠাৎ কানে এলো বিয়ের গান। পালাকি নয়, ছোট নালকি করে
বৌ চলছে ভিন্ণ গাঁয়ে। বর পাশে পাশে লাঠি হাতে জুতো পায়ে
যাচ্ছে। মেয়েরা গান গেয়ে এগিয়ে দিতে চলেছে গাঁয়ের
সীমা পর্যন্ত। ভিন্ণ পাড়ার মেয়ে। মেয়েরা একটানা কলপ
বিলম্বিত পুরে গাইছে—

‘সীতা মৈরী কী মাতা রোয়ে, রোয়ে জনাবাঝ

চলে চলহন কো চলহনীরা—

সীতা মৈরী বোকে কহে কর লাও গে দৌটকে

চলে চলহন কো চলহনীরা।

গানের সেই করুণ পুর শুনে সেদিন চম্পার মনটা সহসা চন্দনে র
কথা মনে করেই ধারাবাহ হয়েছিলো। চম্পার চোখের জল গাঁয়ের
মাঘুর কোন দিনও দেখেনি। সেদিনও সকলকে লুকিয়ে চম্পা

স্থব নিচু করে কেঁদেছিলো। হুই চার ফোটা অভিমাত্রী অঙ্গ তুষে গিয়েছিলো মাটিতে। মনে হয়েছিলো কত দিন হলো কোথায় চলে গিয়েছে চন্দন। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কত শহর, কত মাছুষ, কত দূর-দূরান্তের পথ। আবার এ-ও মনে হয়েছিলো, তার মতো মেয়ে, যে অব্যাহিত, যাকে কেউ চায় না, তার এই সব কথা মনে হওয়া বোধ হয় একান্ত বিলাস। এমনি ধারা সব কথা ভেবে হাতের গম তার মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো অজান্তে। আঁখার এসেছিলো আস্তে করে মেমে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর হিম হয়ে গিয়েছিলো।

আজ চম্পা চন্দনকে সে সব কথা বলি না। সেই সব দুঃখের চেয়ে আজকের সুখ অনেক বড়। আর চম্পা অল্প পাঁচজনের-মতো নয়। সে সব ছোট ছোট সুখ দুঃখ খুঁটিয়ে বাঁচে না। প্রত্যাগত এই বড় স্তন্যের প্রেমের প্রতিজ্ঞাতি। এত বড় সম্পদ, যা তার হেঁড়া ওড়নীর আঁচলে বেঁধে সে অনেক দুঃখ অপমানকে তুচ্ছ করে জয়ী হয়ে উঠতে পারে, স্নানর ও সন্তোজ হয়ে উঠতে পারে, এক কথা চম্পা বোঝে।

চন্দনের এত দিনে ধুব শান্তি বোধ হয়। তুচ্ছ ছিলো, আকৃতি ছিলো, ব্যাকুলতা ছিলো। সেই সব তুচ্ছ তার শান্ত হলো চম্পার কাছে এসে। চম্পার পরিপূর্ণ সুখে ভরা মুখখানার দিকে চেয়ে চন্দন বুঝতে পারে এত বেশ দূরে, এত মাছুষ দেখে, এত জীবন দেখে তবু তার মন ভরেনি কেন। অব্যাহ মন সেই বৃহত্তর জীবনের থেকে মুখ বুঝিয়ে ছিলো। প্রত্যাখ্যান করে চলেছিলো সব সুখ। তার তুচ্ছার পানীয় এইখানে মেখে রেখেছেন। এই নিঃসঙ্গ, স্নানর এক গরীব মেয়ের মধ্যে এক সরোবর টলটলে গভীর ভালোবাসাতে ভুবে না গেলে তার শান্তি নেই। বুকে তার যেন অবাকও লাগে। চন্দন বলে—কি, এখনও বলবে ভুলে ছিলো?

মাথা নাড়ে চম্পা। আর কখনো সে তা বলে? মনে মনে বলে আমি কি বেইমান?

সহসা কোনো কথা মনে ক'রে একটু হাসে চন্দন। গুন-গুন করে বলে—

—লোভে চন্দন চম্পাক মালা

কান মে' কুণ্ডল নৈন বিশালা

চম্পা হাসে। চোখ ঝল ঝল করে সেই নৈশব নৃত্যিতে। বলে—

—বাল্লন বাজে বড়াছুরাগা

চলে রামরাঘবকে বরাত, যে।

হুঁজনেই হেসে ফেলে। তাদের প্রিয় ও পরিচিত আকা যেন জলহীন জলহলে মেঘমাথা মমতাময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। রামশঙ্কু বা-মাথা সন্ধ্যামণি যেন পরম স্নেহে লুটিয়ে দেয় তাদের হুঁজনে একজনের লাল আলিয়া আর পী ওড়নী ঢাকা পুষ্টিত পলাশ ফুলের গাছের মতো মদির বৌক যেন প্রথম নিজেই আবিষ্কার করে সে জন বিমিত হলো বিমিত হয়ে চূর্ণ করে রইলো। আর একজনেরও দৈবং সহ' মুখে, মুগ্ধ অথচ গভীর দৃষ্টি। গান দিয়ে যদি এই ছবিখানি মঞ্জুর করা যেতো তো সে গানের কথা হতো—বড় ভাগসে সব পাগয়ে। কিন্তু গানের কথা ও সুর এখানে অল্পশ্রুত। তা এই ছবিখানিকে আরো স্নানর কেমন করে করা যায় কি ভেবে, চম্পা ও চন্দনের পরিচিত আকাশখানা, নিজের যা এক বাক হীরামণ উড়িয়ে দেয়। অগ্রে দেখা রাজকন্ডার বি পাখীর মতো স্নানর সেই হীরামণগুলি কিচ মিচ, ক'রে উড়ে যায় হীরে-চুলী-পাখীর মতো কিচ্‌মিকিয়ে সেই পাখীর সার মিলিয়ে ষ সাক্ষ্য গগনের রেহমর কোলে। আর সম্পূর্ণ হয় ছবিখানি। [ক্রমশ

জীবন-ছড়া

চণ্ডী সেনগুপ্ত

জীবনটা এক মাধুর্যময় ছড়া

পাড়ি কমা সেমিকোলন ভরা

লালটুকটুক ছবি দেখার সুখে

হঠাৎ যখন তুমি আসো বুকে।

জীবন-ছড়ার মাঝে মাঝে বতি

তখন আমার মনের ঘরে তোমার আরতি

তখন আকাশ আর্তনুয়ে ভিকা ক'রে আসো

আমার দেহে ছড়ার এসে সকাল জয়কালো।

জীবন-ছড়ার ছন্দে নুপুর বাজে

ফেলে-আসা সে এক মায়ার দাঁকে

সন্ধ্যাবেলায় উদাস পূর্ববীতে

কে ধরা দেয় তুলেই সুরভিত্তে?

জীবন-ছড়ার দুই দিকে দুই ধর

সত্যি শুধু মনোখানার চর।

—অকণ্ঠে ভাবছিলো, সেই যেদিন ‘বডুডেনডেন ওহু’

দিয়ে এলো ইন্দ্রাণীর হাতে, সেদিন শেষ-বুহুর্থে যে দুটি-বিনিময় হয়েছিলো ওর সঙ্গে সে দুটি কত সুন্দর, কত অমূল্যগণ্য, যে দুটির দাক্ষিণ্য ও উদ্দীপ্ত হ’য়ে ছেলেমানুষের মত মৌড়ে কিয়েছিলো, কিন্তু তারপর আবার কী ঘটলো ইন্দ্রাণীর—এমন নির্দর বিরূপতার কী কারণ ঘটলো, ইন্দ্রাণীর ‘লোটার’ পাওয়ার সংবাদ বহন ক’রে যেদিন চিঠি এলো, সেদিন সকালের মেরেকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন রমেন, দুপুরে অফিসে বসেই খবরটা পেয়েছিলেন উনি, চাপরাশী বখন রমেনের লাঞ্চ নিতে দুপুরে এসেছিলো, সেই সময় তার হাতে কলকাতার চিঠিখানা দিয়ে দিয়েছিলেন সর্বাঙ্গী। সে সংবাদে রমেনের অফিসের বাঙালী অবাঙালী প্রত্যেকেই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেশবশঙ্কর বাবু ছেলেমানুষের মত হৈ-টো ক’রে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, এবং অফিসের সবাইকে ডেকে ডেকে এ শুভসংবাদ জানিয়েছেন। এবং ব্যক্তিগত গিয়েও চা খাওয়ার টেবিলে গল্প করেছেন খুব। এ গল্পে চোখ-মুখ উজ্জল ক’রে যোগ দিয়েছে অকণ্ঠে আর নীলা। শেলিও মনে মনে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা না ক’রে পারেনি কিন্তু যেহেতু ও গেলো বছর শুধু ইংরিজীর লড়াই বি-এ পাশটা করতে পারেনি এবং ঐ একেকটা ছেলেমানুষ ইন্দ্রাণী ইংরিজীতে ফার্স্ট হ’য়ে একেবারে লোটার পেয়ে বসে আছে, তাই কেমন এক ধরণের পরাজয়ের-গ্রানি বোধ করছিলো ও, খুব নাখিয়ে নীরবে চা খেয়ে বসেছিলো, আর তরুণালা চা ঢালতে ঢালতে বড় মেয়ের লক্ষ্যাকর্ষণ মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে গভীর গলায় শুধু বললেন, বাঃ বেশ ভাল খবর।

সাক্ষাৎ ভ্রমণে বেরিয়ে মিসেস তালুকদারের সঙ্গে মালিগ কর্তে কর্তে মিসেস তরুণালা বিধাসের চোখে পড়লো, মিনার্ভা বুক সপ থেকে বই-এর ভায়ে একেবারে কুঁজো হ’য়ে বাপের সঙ্গে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে এলো।

ভাবলেন, আজ ওর সঙ্গে কথা বলে দু-এক মিনিট অপব্যয় করা চলতে পারে, ডাকলেন, শোনো! ইন্দ্রাণী খুব তুললো, রমেনও।

মিসেস তরুণালাকে দেখতে পেয়ে রমেন অসুটে বললেন, ইলুমা, আমার হাতে বই নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও, দেখো উনি কেন ডাকছেন।

মা বাবা, আমার হাতেই থাক—বই-এর বোকা হাতে নিয়েই ইন্দ্রাণী তরুণালা বিধাসের সামনে এলো।

তোমার নামটা বেন কী? ইন্দ্রাণী খুব অবাক হ’য়ে তাকালো কিন্তু খুব সংবত গলায় উত্তর দিলো, ইন্দ্রাণী।

পালো ধাঁড়ানো মিসেস তালুকদার প্রশ্ন করলেন, মেয়েটিকে? মেয়েটিকে বেন দেখেছি মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, দেখছেন বৈকি, সিমলের রাস্তা আর ক’টা—ঠিকের অফিসের এ্যাকাউন্টস অফিসার রমেন বাবুর মেয়ে। ডকে বাহবা দিতে হয়, বেশ ভাল কস করেছে এবার ম্যাট্রিকে, ইংরিজীতে নাকি ফার্স্ট হয়েছে—

আজ্ঞা! মিসেস তালুকদারের কণ্ঠে সুস্পষ্ট বিস্ময়। মিসেস তরুণালা আবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে কিছুটা বেন কথা দ্বিটোলেন চোখ দিয়ে, তা বেশ, বেশ, এসো একদিন আমাদের

ই

স্রা

নী

র

★

শ্রে

★

ন

(উপভাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

বাড়ি, মিষ্টি খাইয়ে দেব, বাবা বুঝি এসব বই পুরস্কার দিলেন তোমাকে? তা বেশ, বেশ, হঠাৎ ত্রেক করলেন তরুণালা, অনেক দূর দেখিয়েছেন উনি।

যেতে যেতে অল্পকণ্ঠে মিসেস তালুকদার বললেন, মেয়েটি খুব ইংরিজী পড়ে বোকা হচ্ছে, একদিনে একরাজ্যের বই কিনে বেলেছে।

একটু পরিহাসের সুরে উত্তর দিলেন তরুণালা, সব বই কী আর পড়বে মিসেস তালুকদার, বেশী ভাগই শোভাবুদ্ভি করবে আলমারীর। মিসেস তালুকদারের জবাবটা আর শোনো গেলো না।

ইন্দ্রাণী কিয়ে এলো বাবার কাছে, গোষ্ঠির অগ্নান আলো কেমন যেন হঠাৎ জান মনে হচ্ছে ওর কাছে। আসার সময় সাধারণ গল্পে গল্পে এসেছিলো, বাওরার সময় একেবারে চুপ। ওর কানে বাবে বাবে অল্পবিস্তৃত হচ্ছে দুটি কথা ইংরিজীতে নাকি ফার্স্ট হয়েছে, আর, সব বই কী আর পড়বে মিসেস তালুকদার? সেদিন রাতে বিনিদ্রচোখে অনেককণ কাটিয়েছে ইনা। আর নিজের দুর্বলতার জন্য নিজের ওপর যত ক্রোধের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে, তত অল্প আক্রোশের জাল বুনে চলেছে অকণ্ঠের বিরুদ্ধে। তরুণালা হাতের নাগালের বাইরে, কিন্তু অকণ্ঠে তো আছে।

সকালে রাতজাগা বাতাজোখ দেখে সর্বাঙ্গী উঠির হয়েছিলেন, কি রে তোব মুখের চেহারা অমন কেন? কাল নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলেছিস? দেখি কাছে আর তো, কপালটা দেখি—

না মা, কিছু হয়নি—ভাড়াতাড়ি মা’র চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলো ইন্দ্রাণী, ওর মনে হচ্ছিলো, ওর বুকের রক্ত আক্রোশের আন্দোলন এখনও শান্ত হয়নি সম্পূর্ণ, কাছে গেলে বা বদী টের পেরে যান।

ক্যাথলিক ক্লাবের চৌদ নম্বর স্ট্রাইট স্কোয়া ক্যাটের এসো ইন্সপেক্টর, সকালে সর্বগী বাড়ি দিয়ে এসে অরুণেশ্বরের আসার কথা বলতেই—ইন্সপেক্টর মনে মনে ঠিক করে কেসলো বিকেলে ও বাড়িতে থাকবে না, মার সঙ্গে হাতে হাতে খাবার দাবার সবই বানালো কিন্তু বিকেল পাঁচটা বাজার আগেই ও চলে গেলো চৌদ নম্বর স্ট্রাইটে। সেখানে ওর সমবয়সী এক পাঞ্জাবী মেয়ে আছে, তিনা কাপুর, মাঝে মাঝে ইনা বার সেখানে। মেয়েটি অজ্ঞাত পাঞ্জাবী মেয়েদের মত খুব একটা উৎকট আলট্রা মডার্ন নয়, সেজন্ত ওর সঙ্গ ইন্সপেক্টর সহনীয়। তাছাড়া ওর উৎসাহ এবং আন্তরিকতায় পাঞ্জাবীদের মানুষী আদব কায়দার অ-অ-ক-থ জেনে নিচ্ছে ইনা, পনেরো নম্বর স্ট্রাইট সুরীন্দর স্বরূপ নামে আর একটি পাঞ্জাবী মেয়ে আছে, সে ইন্সপেক্টর থেকে সামান্য কিছু বড় হবে, প্রায়ই সর্বগীর কাছে উল্লেখ প্যাটার্ন তুলতে আসে, সেই সূত্রে আলাপ। বোঝাই ইন্সপেক্টর একাধিক বার ওদের বাড়িতে আসতে বলে, একদিন সন্ধ্যার পর গিয়েছিলো ইনা সুরীন্দর স্বরূপের বাড়িতে, গল্পে গল্পে রাত হয়ে গিয়েছিলো সেদিন, বখন ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালো ও, তখন সুরীন্দর রাতের খাওয়া খেয়ে যাওয়ার জন্য ওকে হাত ধরে টানাটানি, আরে বহিনজী! খানা তো খান। রাত ও অস্বীকার করে তত হাত ধরে টানাটানি করে সুরীন্দর আর বলে, খানা তো খান। বহিনজী!

শেষকালে ওর বাবা মা পর্বত বখন বললেন, তখন ইনাকে সম্মতি দিতেই হলো। কালো খুলের মত খানিকটা সরষে শাক দিয়ে তিনটে তন্দুলের রুটি কোনমতে গিলে তারপর ও বাড়ি ফিরেছিলো, রুটি আদপেই পছন্দ নয় ইনার, ভাতই ভালবাসে ও, তবু অত পেড়াপিড়ি করলে না খেয়ে আর করা যায় কী! কিন্তু, তার পরদিন দুপুরে তিনা কাপুর এসে হাজির, বহিনজী! কাল তুমি এ কোর কীয়া, একদম সত্যনাশ কর দিয়া—

ইন্সপেক্টর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি? তারপর সমস্ত তিনলো ও তিনা কাপুরের কাছে—হাত ধরে টানাটানি করুক আর পা ধরে সাধাসাহি করুক কখনও খেতে হয় না ওরকম। কাল রাতে ওরা তিন জন আধগেট রয়ে গেছে, কারণ ওদের রাতের বরাদ্দ মাফিক দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিলো, ওরা তারপর আর কিছু পাকাবে না।

আজ সকালে সুরীন্দর নাকি তিনার কাছে এসে বাজালীদের এটিকেট সম্বন্ধে কিছু সমস্যা প্রকাশ করেছে। আগে নেমস্তন্ন না করলে হাজার দাঙ্গা কুটলেও খেতে হয় না। সমস্ত তিনে ইন্সপেক্টর সন্তুষ্ট, বললো, আগে নেমস্তন্ন না করলে খাওয়া উচিত নয়, এ নিয়মটা এক পক্ষে ভালই—খুব খারাপ নয়, ওটা মানলাম, কিন্তু তাহলে বাড়িও শুধু সবাই মিলে—খানা তো খানা—বলে অমন হাত ধরে টানাটানির অর্থটা কী?

তিনা ঝিল-ঝিল করে হেসে উত্তর দিয়েছিলো, পাঞ্জাব সে এদী রেওয়াজ ছার বহিনজী!

ইনা বাড়ি ফিরতেই সর্বগী ঘরকের দ্বারে বললেন, অরুণেশ্বর এসেছিলো, ডেকে পাঠালাম, তবু এগিলেন কেন?

আমি এসে আর কী করতাম—আরহা! গলায় বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো ইনা। রমেনও মেদের আচরণের প্রতিবাদ করে অরুণেশ্বর করতে বাধ্য হলেন কিন্তু মেদের কাঠখোটা উত্তরের পর ঠিক জবাবটা মুখে এসো না।

চূপ করেই রইলেন। সিঁড়ির বাঁক ঘোয়ার মুখে ইন্সপেক্টর কানে এসে, সর্বগী আনন্দের দ্বারে বললেন, দেখো, মিসেস বিশ্বাসের আভিজাত্যের উৎকট দৃশ্য দেখে আমি মনে মনে বাবার হেসেছি, অর্ধেক পরমার্থ মনে ক'রে কী হাতকর গরীব না উনি ক'রে বেড়ান, ওঁর আচরণে আমার বড় হয়নি, করুণা হয়েছে। আজ দেখলাম ওঁর সত্যিকার গর্বের স্তিমিত আছে বৈ কি, সে হলো ওঁর ছেলে অরুণেশ্বর, এমন সুন্দর সুকুমার মনের আর সুকুমার চেহারার ছেলে বীর, তাঁর আর কী লাগে পৃথিবীতে? আজ সকালে পথে বখন আমাকে ডেকে বললো, মাসীমা, আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেন না? এখন আমার মনে হয়েছিলো এত মিষ্টি গলার মাসীমা ডাক আমি যেন আর কখনও শুনিনি, তারপর বাড়ি আসতে আসতে একথাও ভেবেছিলেন—বার মুখে মাসীমা ডাক অমন, তার মুখের মা ডাক না জানি আরো কত মিষ্টি, এখন আলাপ ক'রে দেখলাম, স্বভাব তার চেয়েও মধুর।

ইন্সপেক্টর খেয়াল হতে দেখলো, ও সেই সিঁড়ির বাঁকেই ছিঁর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পায়ে পরের ধাপে পা বাড়ালো কিন্তু অরুণেশ্বরের নাম আবার বাবার গলায় তিনেই ফ্রেমে জাঁটা ছবির মত দাঁড়িয়ে গেলো।

রমেন বললেন, ও মা, তুমি অরুণেশ্বরের কথা জানো না বুঝি? ও হয়েছে ঠিক ওর বাবার মত—স্বভাবে, বিচার, ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস তো পাবেই, খুব সজব ফার্স্ট ওই হবে। ওর প্রকোষারদের কাছ থেকে সেই রকম আভাসই পেয়েছেন মিঃ বিশ্বাস। আর মাস তিনেকের মধ্যেই বিলেত রওনা দিচ্ছে অরুণেশ্বর, অক্সফোর্ডে পড়বে।

: বিলেতে চলে যাচ্ছে অরুণেশ্বর। সাত সপ্তাহ তেরো নব্বই ওপায়ে। সেই ভাল। বোজন বোজন ব্যবধানই ভাল, অরুণেশ্বরের সর্বদেশে কঠোর আর কানে আসবে না তাহলে, ও তো কঠোর স্বর নয়, ও শুধু বাহু—সে স্বর ওকেই সম্বোধিত করেন শুধু এক ডাকে ওর মাকেও মজিয়েছে। কিন্তু, চলেই তো যাচ্ছে অরুণেশ্বর, কত সাগর-উপসাগর পেরিয়ে সেই সূর্যের চলে যাচ্ছে, তার আগে একদিন একটি বার শুধু এক মিনিটের জন্য...

নিচের সিঁড়িতে মার পায়ের পরিচিত শব্দ পেতেই উর্দুধাসে সিঁড়ি বেয়ে ছুট দিলো ইন্সপেক্টর। একেবারে নিজের শোবার ঘরে এসে ঝপ ক'রে শুয়ে পড়লো। উত্তেজনা কিছুটা কমলে ইন্সপেক্টর ভাবলো, নীলাই বা আজ এসো না কেন? কী হলো নীলার? ভবে কি অরুণেশ্বর—বেসামান্য মন নিয়ে আরো একটা রাত অনিয়মিত কাটালো ইন্সপেক্টর।

পরদিন বিকেলে নীলা এসেই একটু কৈফিয়তের সুরে বললো, কাল ভাই সিনেমার গিয়েছিলেম, তাই আসা হয়নি, তা বলে পড়ায় কীকী দিইনি আমি, দু দিনের বাংলা টাঙ্ক একদিনে করে এনেছি। ইন্সপেক্টর নীলার পাশের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝাটা রেখে পাতা ওন্টাতে ওন্টাতে ফট ক'রে প্রথমেই প্রেম ক'রে বললো। তোমার দাদা বিলেত যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, তুমি জানতে না বুঝি? পাশপোটি হয়ে গেছে কবে! যেদিন পাশপোটি এসেছে, সেদিন থেকে আমার দন যে কী খারাপ—জানলার বাইরে চোখ রাখলো নীলা।

নীলার বাংলা খাতার একেবারে প্রথম পাতায়, প্রত্যেক খাতার প্রথম পাতাটা বাদ দিয়ে নীলার লেখা অভ্যেস, অরুণেশ্বরের হস্তাক্ষর

—প্রায় আধ পাতা কবিতা লেখা। ও লেখা ভুল হবার যে নেই ইচ্ছাশীল, যেন শিলাগিণির মত মুদ্রিত হ'য়ে আছে ওর অক্ষরে। নীলার অজিত সম্পূর্ণ বিবৃত হরে পড়া শুরু করে দিয়েছে ইচ্ছাশীল, পড়া শেষ হলো। এমন ক'রে কেন লিখেছে অল্পশেষ,—কিনের নেশায় যেন বাসি খেঁড়ি—অথচ জল নেই—আর জল নেই বদি, তবে তৃষ্ণার অসুস্থি কেন? এত দুঃখে অল্পশেষের, এত দুঃখে। —শেষের লাইনের বীরাচারিত প্রাণনার উপমাটা আবার ভালো মনে মনে—দুটি রক্ত চোখ তুমি ভোরবেলার জানলার মত আঁতে খুলে ধরো। আমি রাত্রি-দিন পথে—

ইচ্ছাশীল মুখে এক কৌটা রক্ত নেই। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত আওয়াজ নিজে যেন স্পষ্ট সুনতে পাচ্ছে। জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নীলা বললো, ইনা, দেখো তো ভাই, আজকের রচনাটার ট্রাট্ট ঠিক হয়েছে কি না—কথা শেষ হওয়ার আগেই অল্পশেষের লেখা কবিতাটা দেখে ফেললে নীলা, ও মা! দাদা আবার আমার খাতার কী লিখলো? দেখি—দেখি—নীলা খাতাখানা হাতে নিয়ে পড়া শুরু ক'রে দিলো। গড় গড় ক'রে কবিতাটা প'ড়ে নিয়ে বললে, কি জানি, মানেটোনে তো কিছু বুঝলেম না—দাদা মন খারাপ হলেই কবিতা লেখে, কিন্তু আমার খাতায় তো কোনোদিন—কথা খামিরে একটু যেন গভীর চিন্তা করতে লাগলো নীলা। নিজের ফ্যাকাশে মুখটা মুখ ঘুরিয়ে নীলার চোখের থেকে আড়াল ক'রে খুব আবছা গলায় ইচ্ছাশীল বললো, তাই বুঝি—? নীলা মনে মনে চিন্তা করতে করতেই কিছুটা আত্মগত ভাবে বললো।

কি জানি, দাদার যে হঠাৎ হঠাৎ এত মন খারাপ হয় কেন বুঝিও না আমি, কাল সকালে কত লাকালাকি করতে দেখলাম, আমাদের সিনেমা দেখার জ্ঞান টাকা দিলো, হাসতে হাসতে গর করতে করতে আমাদের এগিয়ে গিলে। সিনেমা-হল পর্যন্ত—তারপর কীই যে হলো, রাত আটটার বাড়ি ফিরে দেখি, ঘর অন্ধকার ক'রে শুয়ে আছে দাদা। উঠলোও না, খেলোও না, মা বন্ধন ডাকাডাকি লাগালেন, বললো, কোনো বন্ধুর বাড়ি থেকে বেদম খেয়ে এসেছে; কিন্তু সকালেও দাদাকে ঘুড়ে দেখিনি, তার মধ্যে কখন যে আবার আমার খাতার পাতার কবিতা লিখলে—মুহূর্ত দুই খেয়ে নীলা প্রাণ করলো, ইনা, তুমি দাদার কবিতার মানে বুঝছো?

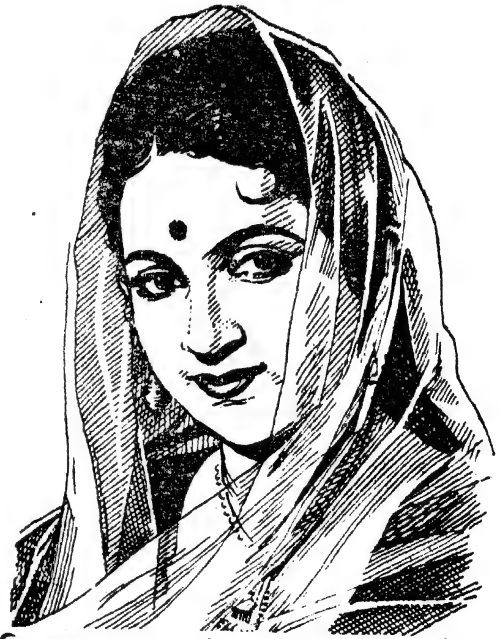
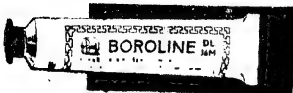
ইচ্ছাশীল বেসামাল মনটাকে প্রাণপণে গোছাবার চেষ্টা করে খুব অসুটে বললো, না তো ভাই—

সে কী, তুমিও বুঝলে না? আমি ভেবেছিলাম—ইনার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে কথা শেষ করলো নীলা,—বোধ হয় বি-এ রাশে না পড়লে এসব কবিতার মানে বোঝা যাবে না?

তাই হবে বোধ হয়—যেন কতদূর থেকে কথা ক'টি বললে ইচ্ছাশীল। ইনার কঠিন বিম্বিত হরে বন্ধুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো নীলা, ইনা ভাই, তোমার কী শরীর ভাল নেই? ইচ্ছাশীল চমকে উঠলো, ইচ্ছাশীল চমকে দেখে নীলা অবাক হলো আরো। চেষ্টা ক'রে ইনা সচেতন হলো, সকাল থেকে মাথাটা ঘরে আছে তাই, তাই শরীরে তেমন জ্বত নেই—নীলার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে যান একটা হাসলো ইচ্ছাশীল।

অমিত লাবণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাবণ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী হান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বকে মধুমলের মত কোমল ও মৃদু কোরে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ক'রে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক: জি. দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

তাহলে আজ আর পড়ে দরকার নেই, চল, বাগানে গিয়ে গর
হ—

গা তাই চল। খাতাটা আজ বরং থাক আমার কাছে,
বাস আমি দেখে রাখবো—

ঠিক আছে। দুই বন্ধু উঠলো।

গর মানে, আজ শুধু দাদার গরই করে চললো নীলা। যে
কোনো কারণেই হোক, দাদার মন কাল থেকে ভাল নেই,
তাই ওরও ভাল নেই। আজ সকালে দাদার মন খারাপ নিয়ে
অনেক ভেবেছে ও, অত যে ভাল লেখাপড়ায়, তার মন খারাপ
হয় কি? ও তো ভেবে পায় না, কেস করার কোনো চিন্তা নেই
কিছু, তাছাড়া ইচ্ছে মতন পকেটম্যানি পায়—কোনো দিন মাকে
খোশামোদ করতে হয় না ওর মত—তবে এত মন খারাপ আর মুখভরা
অন্ধকার যে দাদা কোথা থেকে ছুটির নিয়ে আসে। দাদার গর
করতে করতে নীলা বলে কেলসো, জানো ভাই ইনা, দাদার বোধ হয়
বিয়ে হবে শীগগির—

বিয়ে? ইনার কণ্ঠ চিরে কথাটা যেন বেরিয়ে এলো।

কেন, তুমি অত আশ্চর্য হ'লে কেন?

না, মানে—এত অল্প বয়সে তো আজকাল কেউ বিয়ে
করেন না—ইনা শব্দ ক'রে হাসতে চেষ্টা করলো।

তা অবশ্য ঠিকই বলেছো ভাই, কিন্তু মা দাদার বিয়ে না নিয়ে
কিছুতেই দাদাকে বিলেত পাঠাবেন না, যোজাই কথা কাটাকাটি
চলেছে এই নিয়ে বাবার সঙ্গে—

ও! ইঙ্গারীর সন্ধিগুণ উত্তর।

নীলা ঠোঁট টিপে হেসে বললো। আমার এক খুড়ভূতো
মামা বছর কয়েক আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন,
বাওয়ার আগে সিরিমা নাকি মা কালীর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে
নিয়েছিলেন যে যেম বিয়ে যেন কিছুতেই না করেন। পাশ করেও
বহন মামা এলেন না, তখন ধবর নিয়ে জানা গেলো, মামা
ওখানেই একটা কার্মে চাকরী নিয়ে যেম বিয়ে করে বসে আছেন,
তাই মার এত ভয়।

ইঙ্গারী নিরস্তর। নীলা আবার বললো। বাবার একদম মত
নেই, বলেন, বিয়ে করে গেলে পড়াগুলো ভাল হবে না, তাছাড়া
অল্পকোর্ডে রেসিডেন্সিয়াল ছাত্রদের অত কিছু ভয় নেই,—নিজের
পারে না দাঁড়ানোর আগে, আজকাল কিছুতেই বিয়ে দেওয়া উচিত
নয়। তা বাবার কথায় মা কানও পাতছেন না। অল্পকোর্ডের
ছাত্রদের ছ'মিনটে যেম বিয়ের নজির সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।

নীলা খামসে ইঙ্গারী যেন ভীষণগায় প্রের করলো। আর
তোবার দাদা কী বলেন?

দাদা? বিল বিল করে হেসে উঠলো নীলা—দাদা মার গলা
জড়িয়ে ধরে বলছিলেন সেদিন—মা, কবিরাজী বিজ্ঞানের অর্ডার
দিয়ে দিয়েছি, এলো বলে, চূর্ণ চাপ করে বসে বেশ করে কয়েক দিন
মাথায় মাথো দিকিনি, না হলে বসি আবার শ্রম্যমনারায়ণের
দরকার হয়ে পড়ে।

ইঙ্গারী হাসলো, নীলা হাসিমুখে বলে ওললো—দাদাটা ভাই
এমন চুই, এখান থেকে ওখান থেকে রাজ্যের কনের ফটো
এসেছে, মার সামনেই ফটো দেখে দেখে এমন মজার সব বিমার্ক

করবে—দুটকী, দুটকী, ভেটকী, লজ্জাবতী, কলাবতী,
হুজী, একজনর নাকটা একটু খাড়া বলে, তাকে নীলা
গুণায়ী, একজনকে খাণ্ডায়ী, আবার একজনর মুখের ধাঁটা
একটু বড় বলে তাকে বললো হিপ্পো, মা তো দাদার কথা শুনে
হেসেই বাচেন না, আমরাও। একটি খুব সুন্দরী মেয়ের কটা
এসেছে, খুব বাচ্চা-বাচ্চা দেখতে, মা সেটা দাদার হাতে তুলে দিয়ে
বললেন, একে তো তুই আর অপছন্দ করতে পারবিনে, চমৎকার
সুন্দর দেখতে।

দাদা ফটোটা নিয়ে বেশ একটু সময় দিয়ে দেখলো, মাতাবলেন,
একে নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছো দাদার, দাদা করলো কী, ফটোটাকে চিঠি
বিলির মত অল্পকটোগুলির মধ্যে টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে মার দিকে তাকিয়ে
বললো, মা, নৌরুর কাজুবাদাম আর টকির পেরায়ের আর লোক
বাড়িও না বাপু, মুখের আবসেরে ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওর এখনও
বিব্রত বাটি দিয়ে দুধ খাওয়ার বয়স পেরোয়নি, আবার সবাই মিলে
হাসাহাসি, তারপর, যে ফটোখানা হাতে তুললো দাদা তার স্বাস্থ্য
একটু বেশীরকম ভাল, সে ফটোটা হাতে নিয়ে মার গা ঘেঁসে বসে
পড়লো দাদা, বললো,—মা, একে আমার ভারি পছন্দ হয়েছো, এর
সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দাও, ঠাকুরমাকে দেখিনি বলে মনে মনে
ভারি একটা দুঃখ ছিলো আমার, এ্যাদিনে সে দুঃখটা ঘূবে,
তোমাকেও বোঁমা বলে ডাকতে শিখিয়ে দেব'খন—শুনে মা ধর
ফাটরে হাসতে লাগলেন আর আমরা তো গড়াগড়ি।

ইঙ্গারীও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। ইঙ্গারীর মুখের দিকে
তাকিয়ে তাকিয়ে নীলা মনে মনে কী ভাবলে কে জানে। বলে বললো,
সেদিন আমাকে কেপাংর জন্ত দাদা তোমার সঙ্গে অমন করে
কথা বলছিলেন ভাই, না-হ'লে দাদা লোক খুব ভাল।

সত্যি? চোখ বড় করে আবার হেসে উঠলো ইঙ্গারী।

এক ঘুমের পর শোওয়া বল করতে গিয়ে সর্বাঙ্গীর চোখে
পড়লো, মেয়ের ঘরে আলো জ্বলছে, ইনা শুলি? কাল সকালে বই
শেষ হবে—মার কথায় সখিত কিরলো ইঙ্গারীর: বই! কোথায়
বই! ওতো নীলার বাংলা খাতাটার প্রথম পাতা খুলে বসে আছে।

সর্বাঙ্গীর কণ্ঠের রমেনের হাতা ঘুম গেলো ভেঙে, ঘুম ঘুম গলায়
বললেন, ইহু দেখছি বই পড়ার নেশার তার মা-বাবা সবাইকে
ছাড়িয়ে গেলো—ভারপর গলাটা একটু উচুতে তুলে বললেন, ইহু
আর রাত জেগো না মা—শরীর বড় খারাপ হবে। ইনা শুয়ে পড়বে
বলে আলো নিবোতে উঠে দাঁড়ালো, ও যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাবে
বসেছিলো একদুগ, দাঁড়ানো অবস্থায় খাতার প্রথম পাতায় চোখ
পড়লো আবার: সর্বনাশ, এ কী ও করে বসেছে! অক্ষপেদের
লেখার নিচে, খুটি গুটি কী যেন লিখে বসেছে ও। লেখাটা পড়ে
চোখ একেবারে স্থির হয়ে গেলো ইঙ্গারীর, হাতের নির্জন অন্তর, মুখ
রাঙা হলো, কান গরম হলো, চোখের পাতা কীপলো, লজ্জার একটা
মত্ত ডেউ গলা পর্যন্ত লাগিয়ে উঠলো; তাত বাড়িয়ে পাতাটা ছিঁড়তে
গিয়ে আবার খেমে গেলো ইঙ্গারী—বদি নীলা কিছু ভাবে? পা
টিপে টিপে এসে ওর ঘর থেকে ওর মা-বাবার ঘরে বাওয়ার মাঝখানের
খোলা দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিলো। খাতাটা সামনে টেনে নিয়ে
খুব সতর্পণে বললো ইনা। নিজের লেখার আঁ পয় চোখ

ফেলতেই ওর হৃৎপিণ্ডটা যেন ধক্ ধক্ করে উঠলো। আর ঘেরী না করে লেখার অক্ষরগুলি ঝাঁচ-ঝাঁচ করে কাটতে লাগলো। সমস্ত কাটিকুটি হ্রস্বপূর্ণ ভাবে শেষ করে খাতা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো ইন্দ্রাবী। শোওয়ার পর, ওর লেখা দু-একটা শব্দ মনে করে আবার লাল হলো ইন্দ্রাবী। তারপর নিজের মনেই হাসলো : চেষ্টা করলে ও তাহলে হয়তো একদিন কবিতা লিখতে পারবে। আন্তে আন্তে লঘু মেঘের মত হালকা তন্দ্রা নামলো ইন্দ্রাবীর চোখে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হায়েছ ইন্দ্রাবী—অরুণেশ্বর মত গল্প শুনেছে আজ নীলার কাছে, তার মধ্যে কোনটা মনে করে হাসছে কে জানে। কিবা ওর মন বিহার করছে হয়তো কোনো সোনালী স্বপ্নলোকে।

পরদিন বিকালে যখন খাতা ফেরৎ দিলো, নিজেই নিজের কাটিকুটি নীলাকে দেখিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে দিলো ইন্দ্রাবী, ভাই, তোমার জন্য একটা বাংলা প্রশ্ন তুলে ওখানে লিখে ফেলছিলেম, তারপর কেটে দিয়েছি, প্রশ্নটা আবার লিখে দিয়েছি খাতার শেষ পাতায়।

নীলা হেসে বললো, তাতে আর কী হয়েছিলো, দাদা ও পাতার লিখলে কী হবে, খাতা তো আমারই। তারপর আমার রচনাটা কেমন হয়েছে ?

এক লাইন না পড়েই ইনা বলে দিলো, খুব ভাল, তারপর এদিক সেদিক তাকালো কয়েক বার, মন ওর স্থির হয়নি এখনও, যে কোনো মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যেতে পারে, এমনই যেন মনের অবস্থা।

খুব ভাল কমপ্রিমেন্ট শুনে নীলার চোখ-মুখ বন্ধক করে উঠলো, ওর রচনা পড়ে এত বড় সাটিক্কেট ইন্দ্রাবী এর আগে আর দেয়নি।

নীলা বাড়ি ফিলো যখন, সিমলার সঙ্গে তখন শুক হয়েছে সবে। গেট থেকেই ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসা স্তিমিত আলোর দেখতে পেলে ওর দাদা ওর ঘরের সামনের বস-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। অরুণেশ্বর দাঁড়ানোর কারণটা মনে হতেই হেসে ফেললো নীলা, বেথুনাল ওর খাতার কয়েক লাইন কবিতা লিখে ফেলে অরুণেশ্বরের অবস্থির আর সীমা নেই কাল থেকে, কাল খাতাট ইন্দ্রাবীর কাছে রেখে এসেছিলো বলে অনুযোগ করেছে খুব—বুদ্ধি করে আমার লেখা পাতাটা ছিঁড়ে জানতে পারলিনে ? বুদ্ধি আর ভোর করে হবে নীলা ?

গটগট করে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর খাতাটা খুলে বাঁ হাত দিয়ে চপে রেখে ফস করে প্রথম পাতাটা ছিঁড়ে ফেললো নীলা, অরুণেশ্বর বারান্দা ছেড়ে ততক্ষণ ঘরে এসে পড়েছে, দাদার দিকে পাতাখানা বাড়িয়ে দিয়ে নীলা হাসিমুখে বললো, এই নাও দাদা তোমার ছবোখা কবিতা, বাপ রে! একটা লাইনও কী জানে বুকেছি আমি।

অরুণেশ্বর হাত বাড়িয়ে পাতাখানা নিয়েই কাটিকুটির ওপর চোখ রাখলো। নীলা দেখলো সেটা, বললো, ইন্দ্রাবী তুলে বালার একটা প্রশ্ন ওখানে লিখে ফেলেছিলো—তারপর কেটে দিয়েছে।

অরুণেশ্বর কোনো উত্তর না দিয়ে বালবের একেবারে নিচে এসে পাতাটা চোখের সামনে তুলে ধরলো একবার।

: না, এমন হিজিবিজি করে কেটেছে ইন্দ্রাবী, কোনো একটা অক্ষরও স্পষ্ট হলো না। দাদার প্রয়াস দেখে হাসলো নীলা, ও প্রশ্ন জেনে তোর আর কী হবে দাদা ? ও প্রশ্নটা আমার খাতার মধ্যে আবার ইনা লিখে দিয়েছে। অরুণেশ্বর কিন্তু একবারও খাতার মধ্যে লেখা প্রশ্নটা দেখতে চাইলে না। বোনের কথার উত্তরে হেসে বললো শুধু পাগল নাকি ! বাংলা প্রশ্ন দেখে আবার কী হবে ? আমি আমার লেখাটাই আবার পড়ছিলাম একটু।

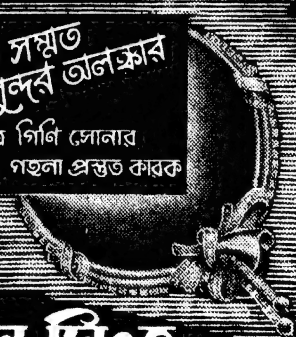
রাতের খাওয়ার টেবিলে ছেলেকে অনুপ্রস্থিত দেখে তত্বাবলা উদ্বিগ্ন হলেন খুব। নিচ থেকেই অল্প কঠ—খোকন, খোকন করে ডাকাতাকি লাগিয়ে দিলেন। ঘড়ির সময় দেখে এ বাড়ীর সকলে খাওয়ার টেবিলে এসে উপস্থিত হয়। চার বেলাই তাই। কেউ দু-এক মিনিট আগে পরে। মার গলা শুনে বড়িতে একবার চোখ ফেলেই ভাড়াভাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে কপাটের খিল খুলে কিপ্র পায়ে নীচে নেমে এলো অরুণেশ্বর—ওর জন্য প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সবাই বসে আছেন ভেবে ও মনে মনে লজ্জা বোধ করলো খুব।

দাদা, দরজা আটকে কী করছিলি রে ? ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি ? নীলার প্রশ্ন।

হঁ—বলে হ হ হাত তুলে চোখ দুটো একবার বচলে নিয়ে ঝপ করে নীলার পাশের চেয়ারে অরুণেশ্বর বসে পড়লো। অরুণেশ্বরের মুখের ভাব অতি প্রকৃত। নিয়ম মাসিক বোনদের সঙ্গে খুনজুটি করে খেতে লাগলো ও। দরজা বন্ধ করে অরুণেশ্বর মস্ত একটা হুঙ্কারে ব্যাপ্ত ছিলো অতক্ষণ। বেমলোর কোন বাড়ি থেকে একটা পাওয়ারফুল লেন যোগাড় করে, টেবিল লাইটের বাসবটা বদলে

কাল: ১৪ ৫০০২

সর্বকৃটি সম্মত
সুন্দর তালিকা
এক মাত্র গিনি সোনাল
নিখুঁত গহনা প্রস্তুত করক



কৌশল
কে. এল. সিংহ এণ্ড সন্স
 ১৬৭ বি. বহু বাজার ষ্টাট, কলিকাতা-২২

KIS

ছন্দ' পাওয়ারের বাবু লাগিয়ে, ইন্দ্রাণীর কাঁটাকুটি হিজিবিজি থেকে একটি একটি করে অক্ষর উদ্ধার করছিলো। দেড় ঘণ্টার চেষ্টার দেড় লাইন উদ্ধার হয়েছে—তাত্ত্বি ও উত্তম, কাঁটাকুটির কয়েক থেকে আর যদি বাকী শব্দগুলো নাও খালাস হয়, তাতে কোনো দুঃখ নেই ওষ। কিন্তু, সব লাইন পড়তে পারার পর, ওর মনে হয়েছিলো, শেষের শব্দ ক'টি বাদ পেলে ওর জীবনে বেন মস্ত কাক থেকে যেতো। ছেলের সহজ প্রকৃতিতে দেখে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন তরুণী। ছেলের মুখ কালো দেখলে, ওর সামনে গোটা পৃথিবীটাই কালো হয়ে যায়। মায়'র পক্ষপাতভেদে মেরেখা অনেক ক্লেপার মাকে। যুগ্মীর তনু বীর বোষ্ট্রের আর একটা টুকরো ছেলের খালাস তুলে দিতে দিতে তরুণী বললেন, পরন্তু তোরা কী হয়েছিলো খোকন? বাইরে থেকে যেয়ে এসে পেট বাধা করছিলো বোধ হয়, না?

মায়'র কথার উত্তরে ঘাড় নাড়লো অরুণেশ, তার পর দু'আঙুল দিয়ে আলগোছে যুগ্মীর ঠাট্টা নীলার পাতে তুলে দিয়ে উজ্জল গলায় বললো,—নে নীলা, তুই খা বাপু ঠাট্টা, যে ভাবে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিস আমার পাতের দিকে, আমার আর হজম হবার উপায় নেই। নীলা প্রতিবাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলো, আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবে না দাদা, আমি তোমার পাতের দিকে কখন তাকানো?

পাছে নীলা আবার ওর খালাস পট করে তুলে দেয় সেজ্ঞা বাঁহাতে দিয়ে খালা আড়াল করে অরুণেশ বললো। না রে নীলা, মনের আনন্দে তুই চিবো ঠাট্টা, আমার পেটে আর একটা কৌটা জায়গা নেই—শেলি অরুণেশের উল্টো দিকে বসেছিলো। কারি বোলটা শেলির দিকে ঠেলে দিয়ে অরুণেশ স্নিগ্ধমুখে বললো, শেলি তুই বাকীটুকু শেষ করে ফেল, ভাল করে খেয়ে গেয়ে এই এক মাসের মধ্যে শেরঘাটকে একটু সবলা করে নে দিকিন, না হলে পৃথলা হস্তিনীর পাশে নেহাৎ একেবারে হেসে সাপ বনে বাবি বে। পৃথলা হস্তিনী মানে, গিরিনের মাতা মিসেস তালুকদার, তাঁর মেঘবহল চর্বির খাঁজগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সম্বন্ধে হেসে উঠলেন সকলে। শেলি বাঁহাতে জলের গ্রাস তুলে মা-বাবার চোখ আড়াল করে ভাইকে জেঁদালা। অভয়শঙ্কর বাবু ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকন, কাল তোমার স্টুডেন্টের ট্রায়াল দিয়ে এসো, আর তোমার উপকাল স্টুটের কোর্টটা বোধ হয় একটু জাঁটো হয়েছে, ওটাও সঙ্গে করে নিয়ে বেও জলটার করার জন্ত। আমি জানিতপ্রসাদকে বলে রেখেছি।

না বাবা, উপকালের কোর্ট একদম ঠিক আছে, সেদিন কোর্টের নিচে ছুটো সোয়েটার পরেছিলো বলে অমন দেখাছিলো—উত্তর দিলো অরুণেশ, তরুণী আর জন্ত সকলে অলোক্য করছিলেন। পেট ভরে গেছে বলে অরুণেশ ফুট সেলাউ খায়নি। তরুণী কটসেলাউ খাওয়া শুরু করেছিলেন, অরুণেশ বাঁহাতে নিজের কাচের বাটিটা তুলে মায়'র বাটির মধ্যে উলুড় করে দিলো। চামচটা মুখ থেকে নামিয়ে তরুণী, খোকন, কী হচ্ছে—কী হচ্ছে—বলে উঠলেন, তখন অরুণেশের সবটুকু ঢালা হয়ে গেছে। তরুণী নিশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

দেখলে ছেলের কাণ্ডখানি। কিন্তু তরুণী আর অত্যধিক মিষ্টার-প্রীতির খবর সকলেই জানেন, সেজ্ঞা তরুণী আর কপট অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো সকলেই, মুখ ধুয়ে অরুণেশ ঘরে এসেই কপাটে খিল দিলো। টেবিল-ল্যাম্প খালিয়ে হেঁড়া পাতা আর লেজ নিয়ে আবার বসলো টেবিলে। আরো ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায়, সব কটা অক্ষর ধরা দিলো ওকে। গুপ্তধন আবিষ্কার করলেও এর চেয়ে বেশী বোধ হয় আনন্দ হয় না। উদ্বারলিপিটা হাতে তুলে নিলো অরুণেশ, গুন-গুন করে গয়ে চললো ওর মন, একবার, দু'বার, এমন করে অনেক বার—

কিরে কিরে এসে কাকৈ বাও ডাক দিয়ে

সে কী আমি, সে কী আমি—

যে আমি এখন প্রাণের পসরা নিয়ে

তোমার তীর্থগামী।

অনেক পরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো অরুণেশ। বাইরে তরুণী আরো জোৎস্না। কাচের জানলা দিয়ে চাঁদের বিজুলিত রেখাগুলি অরুণেশের স্বপ্নময় কপালে পড়ে লুটলুট খেলতে লাগলো।

সেদিন প্রহরলব্ধের আলোয় প্রখ্যাত কামনা দেবীর মন্দিরে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হ'য়ে গেলো অরুণেশের। অরুণেশের ফটো তোলায় হাত নেহাৎ মন্দ নয়। শেলি-গিরীন প্রসপেক্ট হিলসের এদিকে ওদিকে যুগলে নানান ভক্তিমায় ফটো তুলবে বলে অরুণেশকে ওদের সঙ্গে ধরে নিয়ে এসেছে। এসেই প্রসপেক্ট হিলসের মাথার মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকছে ওরা, কামনা দেবীকে প্রণাম জানাতে। অরুণেশ সূর্যের দিকে লেজ দিয়ে একটা ফটো তোলায় ইচ্ছেয় এদিক সেদিক দেখতে দেখতে মন্দিরের পশ্চিম কোণে এসেই—বিজ্ঞাতীয় পোষাকের সজ্জতা ইন্দ্রাণীকে প্রথমে চিনতেই পারে নি, আজ তিনা কাপুনের একান্ত আরাহে ওর একপ্রস্থ সালোয়ার-কামিজ আর চুল্লী পরে ওর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলো। তিনার শাড়ি পরার সম্মুখ, দুদিন ইনার শাড়ি পরে বেরিয়েছে, অতএব—ওকেও পরতে হবে। মন্দিরের পশ্চিম চাতালে একটা দোলনা টাঙ্গানো আছে, একটা বেঞ্চেজাল সেপের পিঁড়ির দুপাশে দুটো দুটো চারটে ফটো করে শক্ত কাছির মত মোটা রজ্জ দিয়ে বাঁধা। এতদ্বন্দ্ব তিনা দোল খেয়েছে—দোল দিয়েছে ইনা, এখন ইন্দ্রাণী দোল খাচ্ছিলো। ইনা ভয় পাচ্ছিলো বলে খুব বেশী জোরে সঙ্গে তিনা কাপুনের এক একটা ঠেলা দিচ্ছিলো আর খিল খিল ক'রে হেসে বলছিলেন—

বহিনজী, হাত-মাত্ ছোড়না! পানি পিয়ার পেয়েছে তিনার, দোলনার প্রচণ্ড একটা ঠেলা দিয়ে প্রায় মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত তুলে ও ছুট লাগালো মন্দির সলগ কুপের কাছে, ওখানে কুয়ার পাড়ে একজন লোক সর্বদাই বসে থাকে বাজী-বাঞ্জিনীদের হাতে জল ঢেলে দেওয়ার জন্ত। এ কুপের জলের খ্যাতিও সূর্য প্রসারিত, এ জল ভক্তি ভরে খেলে নাকি সমস্ত রোগ নিরাময় হয়। দোলনার দুইদু বেগে ইন্দ্রাণী অসুস্থ একটা চাঁৎকার ক'রে নিচের দিকে তাকাতাই অদূরে পোর্টবল ক্যামেরা কীয়ে অরুণেশকে এদিক পানে আসতে দেখে ফেললো। বিজ্ঞাতীয় পোষাকের সজ্জার অদ্ভুত আশ্চর্য একটা ধ্বনি নির্গত হলো ওর কণ্ঠ থেকে আর সঙ্গ সঙ্গে বিভ্রান্তিতে একটা হাত ছেড়ে দিলো ও। শক্ত রজ্জ

বাঁট করে আর ইন্দ্রাণী সবগে শূন্য থেকে নেমে আসতে লাগলো। ততক্ষণে অরুণেশ দেখে ফেলেছে ইন্দ্রাণীকে। বল লোকের মত লাক দিয়ে এসে অরুণেশ ইন্দ্রাণীকে একেবারে লুকে নিলো। আর তারপর, বখন বীরে বীরে চাভালে ইন্দ্রাণীকে দাঁড় করিয়ে দিলো অরুণেশ তার বহু আগেই দাঁড় করতে পারতো ও। নিবিড় আলিঙ্গনে ইন্দ্রাণীকে কয়েক মুহূর্ত বেঁধে রেখেছিলো অরুণেশ, ইনার ভীকবুকের আগুয়াজ অমৃতব করছিলো নিজের বুক দিয়ে। আলিঙ্গনমুক্ত ক'রে দাঁড় করালো বখন ইন্দ্রাণীকে তখন মনে হলো রক্ত গোখুরির বেন সবথানি রং চুরি করে নিয়েছে ইনার কপাল, কপাল। ইন্দ্রাণী মুখ নত ক'রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে অর্ধে কাঞ্চনজঙ্ঘার মত বেন স্তব্ধ মৌনভার দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্লীক্। শব্দ শুনেই মুখ তুললো ইন্দ্রাণী, দেখলো ওর এই ভঙ্গিমা অরুণেশের ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেলো, শুধু ফটোই নয়, ওর এই বিজাতীয় পোষাকের ফটো। অরুণেশের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল গলায় বললো, ছিঃ, ছিঃ, এটা কী করলেন আপনি? তারপর সম্মুখে চোখে বাড়ি ফিরিয়ে তিনা কাপুরুষে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু দেখতে পেলো না ওকে। তিনা জল খেয়েই ফিরেছিলো, দেবী করেনি। দেলনার কাছে বরাবর আসতেই আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থার অরুণেশ আর ইন্দ্রাণীকে দেখে ফেললো।

: আবে বাবা! ইনা বহিনজী এত্না পেয়ার করছে। পেয়ারের আদমিকে ভি আজ এখানে আসতে বলেছে ইনা বহিনজী, তা তো বাস্তবায়ন ওর কাছে। বট করে সামনের বিস্তারিত পাথরের ধাঁজে আড়াল করলে নিজেকে। ইন্দ্রাণী তিনা কাপুরুষে না দেখে এক দিক দিয়ে একটু অস্থির হলো বটে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হলো। আবার শব্দ হলো ক্লীক্। ওর বাড়ি ফেরানো ভঙ্গিমা ধরা পড়লো এবার।

না-না-না—মুখ ব্রীরে প্রতিবাদ করতেই ইন্দ্রাণীর চোখে পড়লো ওর দিকে লেগের মুখ বেঁধে ক্যামেরা এ্যাডজাস্ট করছে অরুণেশ। দু হাত দিয়ে তাড়াহাড়ি মুখ ঢেকে ইন্দ্রাণী বলে উঠলো, না-না-না—সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনলো ক্লীক্। বিমূর্ত ইন্দ্রাণী চোখ থেকে হাত নামিয়ে মুহূর্ত দুই অরুণেশের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরলো, ভিক্রে ভিক্রে গলায় বললো, এ কী হচ্ছে। অরুণেশ হাত নামিয়ে ক্যামেরাটা চামড়ার খাণ্ডে রেখে দিলো। চোটে ছুটী মীর হাসি চেপে রেখে মুক্ত দৃষ্টিতে ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে রইলো। অরুণেশের চোখের চাউনি অল্পসরণ ক'রে আবার টকটকে বাড়া হয়ে গেলো ইন্দ্রাণীর মুখ, মেয়েদের শরীর নিয়ে যে কী লাঞ্ছন লক্ষ্য। গোপাটা অর্ধাং চুম্বীটাকে দু হাত দিয়ে নিচের দিকে বিস্তার করতে করতে অক্ষুট আবহা গলায় বললো, আমি এবার বাই—সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে চলতে শুরু করলো ইন্দ্রাণী।

দাঁড়াও! যেও না—এমন সর্ববলেনে কঠোর কেন অরুণেশের, ছুটে পালাতে গিয়েও পারলো না ইন্দ্রাণী, ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ইনার চূর্ণকৃত্তল হাওয়ার কাঁপছে—মনও কাঁপছে একটু একটু। অরুণেশ মুখে সেই ছুটী মীর হাসি নিয়েই এলো ইন্দ্রাণীর একেবারে সামনে। ব্রীডামরী আয়ত্তিম ইন্দ্রাণীকে দেখে আরো একটু ছুটী মী করবার ইচ্ছে লাগলো অরুণেশের, কিস কিস করে বললো,

ইন্দ্রাণী, কোন ডাকটা লোভনীয় তোমার? ইন্দ্রাণী, ইনা না ইচ্ছা?

: সর্বনাশ! কেন ও পাভাটা ছেঁড়নি তখন! কী হবে। অত কাটাকাটি লেখাও পড়ে ফেলেছে অরুণেশ। হে ভগবান, আমি-আমার মুখখানা এখন কোথায় লুকাই? ইন্দ্রাণীর প্রার কাদ কাদ অবস্থা। অরুণেশের তবু মায়া হলো না। মনে মনে হেসে আরো অক্ষুট গলায় বললো, অত লজ্জা কেন পাচ্ছে ইন্দ্রাণী, ভয় নেই, শেষের লাইনটা পড়া হয়নি আমার—আত্মসমর্পণের পর মাহুঘ বখন অল্পগ্রহ ভিক্রে ক'রে, অরুণেশের চোখে ঠিক সেই রকম চোখ রাখলো ইন্দ্রাণী।

আর কত নির্ঘর হওয়া যায়, নির্ঘর খেলা আর যায় কত? অরুণেশ হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো ইন্দ্রাণীকে। মল্লিয়ার দক্ষিণ কোণ থেকে শেলির গলা শোনা গেলো, খোকন! কোথায় শেলি তুই? লাইট চলে গেলে কটো আর তোলা হবে কখন? তাড়াহাড়ি হাত সরিয়ে ভাবতে লাগলো খোকন।

: কী কাণ্ড! মনেও তো নেই—কিঞ্চিওলি তো সবই ধরচ করে বসে আছি। সামনের ঢালু পাথরটা দোল খেয়ে নেমে গেছে বেখানে, ইন্দ্রাণী উর্দ্ধ্বাঙ্গে ছুটে গিয়ে সেখানে আত্মসমর্পণ করলো। অরুণেশ কিঞ্চি ফুরানোর কথা তুলে গিয়ে ইন্দ্রাণীর বিজাতীয়গতির দিকে তাকিয়ে হাসলো।

শেলি ও গিরীন মল্লিয়ার পশ্চিম কোণে এসে পড়ছে, অরুণেশকে ঢালু পাথরটার দিকে অমন স্থির হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে শেলি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, কী হলো রে তোর? অত ভাকাডাকি ক'রে কিয়ছি, শুনতে পাসনি?

অরুণেশ মুখ ফিরিয়ে শব্দর হাসলো।

লাইট লক্ষ্য করছিলাম, আজ দেবী হয়ে গেছে, এ আলোয় আর কটো উঠবে না।

শেলি ফুর গলায় বললো, সে কী! অত ব্যবস্থা ক'রে তোকে নিয়ে এলাম—একটু টাইমিং দিয়ে কটো তোল না খোকন। বোনের মুখ দেখে খোকনের কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু তখন আর উপায় কী! ওদের পোজ নিতে বলে একটা কটো তোলার ভাণ করলো অরুণেশ, তারপর আত্মবিক্রতার দ্বয়ে বললো, আজ আর হবে না যে শেলি, তোকে কথা দিচ্ছি সামনের পনিবার আবার নিশ্চয়ই আমি আসব। আজ চল বাড়ি ফেরা হাক—অরুণেশ বড় বড় পায়ে চলতে শুরু করলো। শেছন থেকে গিরীন ডাক দিলো, দাঁড়াও না হে, অত তাড়াহড়ো লাগিয়েছো কেন? একসকলই কিরকো আমরা। শেলিও হাঁফলো, এই খোকন দাঁড়িয়ে বা।

অরুণেশ তখন অনেকটা দূরে চলে গেছে, মুখ ব্রীরে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলো, তোর আর আমি নিচে আছি। আনন্দের এমন উত্তরক উত্তেজনার কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়? লাক্ষিরে লাক্ষিরে নামতে লাগলো অরুণেশ। শেলি কিন্তু জাই-এর বিবেচনার খুশিই হলো। গিরীনের হাতে হাত ধরা দিয়ে বৈশা-বৈশি ক'রে খুব বীরে বীরে উৎসাহ নামতে লাগলো হৃদয়ে। পথ ছেড়ে অরুণেশ সন্নিপত উপনথ দিয়ে লাক্ষিরে লাক্ষিরে নেমে এলো নিচে। এ উপনথগুলি লুই হয়েছো পাহাড়ী রমণীদের ঘাস কাটার কল্যাণে।

সোজা রাস্তাটা সপিল বাক খেয়েছে যেখানে, সেখানে টিনের ঢালা বেঁগেঁগা কুড় কুড় মাটির কয়েকখানা ঘর, প্রথম কুটারের আড়িনার বাচ্চা বাচ্চা ছটো টিনে শিশু ডাঙলি খেলাছে। ডাঙলি মেয়ে আপেলগা। গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ বার করছে, এক মাতাম্‌ চা-রোটি, দু মাতাম্‌ দুখ রোটি, তিন মাতাম্‌ গোস ঘেঁটি— কুতকুতে চোখ, ফোলা ফোলা গাল আর আধো আধো ভাষার— মাতাম্‌য়ের তরু বকলাটা খুব স্বর ক'রে টেনে পুত্রের মটা পুট করে উচ্চারণ করছে। বাঃ! তারি স্নানর তো! অকপেশ পাঁড়িরে পাঁড়িরে খেলা দেখতে লাগলো।

অভাবনীর অনেক কিছুই ঘটে যায় এই পৃথিবীতে। জিতেন্দ্রনাথের উচুগলার আনন্দ উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, মৌচুদিদি ঈগণির শুনে যা—মীনাঙ্কী দৌড়ে এলো, কী দাঃ?

শেষ, তোর মাস্টারমশাই লাখোপতি হয়েছে—দাঃ ওর সঙ্গে ভামসা কছেন না কিছু বলছেন, মীনাঙ্কী প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলো না। কেমন একরকম বোকা-বোকা চোখে ফ্যাল-ফ্যাল করে দাঃর দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

কি যে বিবেশ হলো না কথটা—জিতেন্দ্রনাথ তাঁর সামনের খোলা খবরের কাগজটা টেবিলের উটে দিকে পাঁড়ানো মীনাঙ্কীর দিকে হাত দিয়ে ঠেসে দিলেন। সুপ্রিয়র আবাক ফটোটাই আগে চোখে পড়লো মীনাঙ্কীর। সামনের দিকে বস বৃক্‌ যেন কিছু নিরীক্ষণ করছে, অবিকল সেই নিজস্ব ভঙ্গিমায় ফটোখানি উঠেছে, টোটে চাপা হাসি।

কি দিদি, বিবেশ এবার হলো তো? দাঃর কণ্ঠস্বর মীনা তাঁতাড়াড়ি ফটোর থেকে চোখ সরিয়ে ফটোর ওপরের কেডিগুলির ওপরে চোখ রাখলো। বড় বড় করে লেখা বাঙালীর সৌভাগ্যলাভ। এবারের ডার্বির ফাষ্ট প্রাইজ উইনার শ্রীসুপ্রিয় সোম তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। ছোটো ছোটো অকরে আরো লেখা ছিলো কিছু। আর না পড়েই মীনা টেবিল থেকে খবরের কাগজের ওপরের পাতাটা প্রার হেঁ। দিয়ে নিয়েই ছুট দিলো ঘর থেকে। মীনাঙ্কীর উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর—
—দিদাই, দিদাই—ডাক্‌ কানে এলো জিতেন্দ্রনাথের। একটু পরেই শিশিরকণা সঙ্গ নিয়ে মীনাঙ্কী কাগজ হাতে ক'রে আবার ঘরে ঢুকলো। খুশি উপচে পড়া গলায় বললো, মাস্টারমশাইকে একদিন নেমস্কার ক'রে খাওয়াতে হয়, না দাঃ?

জিতেন্দ্রনাথ হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, সে কী মিঃ, আমরা খাওয়াবো কী? ওই তো এখন সবাইকে খাইয়ে বেড়াবে। সুপ্রিয় এখন লাখোপতি, নাও শুধু এক লক্ষের নয় তিন লক্ষের— বুঝিছ দিদি।

শিশিরকণা হাসিমুখে বললেন, হোক লক্ষপতি, আগে ওকে খাওয়াবো। মিঃর পাশের খবর দিয়ে গেলো বেদিন, তখন আমরা বাড়ি ছিলাম না, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে গিয়েছিলাম, দর্শন ক'রে বাড়ি ফিরলুম বখন—তখন চলে গেল সুপ্রিয়। ওকে বলে দিয়েছি আমি, আর একদিন এলো, তোমার খাওয়া তোলা রইলো।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের ঘটনা মনে পড়ে পাঁচটে হয়ে গেলো মীনাঙ্কীর মুখ। ওর হন বললো: আর যদি কোন দিনই সুপ্রিয় না আসে, সত্যি সত্যি যদি চোকাঠ না ডিকোর ওদের—। আর যদি—

জিতেন্দ্রনাথ কাগজ পড়তে পড়তে বললেন, চমৎকার সহজ প্রশ্ন হচ্ছেটি! ওর প্রশ্ন শুনে ললিট দেখেই বুঝিলাম, একপাল পাখরে চাপা হ'তেই পারে না। ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে তারি ভাল লেগেছিলো সেদিন, এমন একটা সহজাত দক্ষতা আছে ওর স্বভাবের, পাঁচ মিনিটের আলাপেই ওকে যেন না ভালবেসে পায়া যায় না।

মীনাঙ্কীর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেলো। চোখের জল লুকোবার জন্য ঘর ছেড়ে চলে গেলো তাড়াতাড়ি। নিজের পড়ার নিজের ঘরে এসে নীরবে অক্ষরবিস্তার করতে লাগলো। আরো অনেক দিন ওর কান্না পেরেছে—কৈদেছে, কিন্তু সে ছিলো চোখের কান্না। খুব বখন অস্থির হয়েছিল মন, ও ওর লুকোনো জায়গা থেকে তখন বার্ষিকের মলয়ের টিউবটা বার ক'রে স্থির চোখে চেয়ে থেকেছে সেটার দিকে, পেরেছে সাধনা। কিন্তু আজকের কান্না যেন হায়ানোর শব্দের কান্না: লাখোপতি সুপ্রিয় আর আসবেন না ওর কাছে, তার নাগাল ও আর কোনো দিন পাবে না। সুপ্রিয়র সঙ্গে স্নেহ-শোড়া ভাত ভাগাভাগি করে খাওয়ার ভাগ্য হলেও হ'তে পারতো কিন্তু রাজভোগের অস্বাদীয় হওয়ার ভাগ্য ওর কোনদিন হবে না। অদূরে সুবর্ণবালায় পায়ের লব্দ কানে যেতেই, চোখের জল নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে, তাড়াতাড়ি একটা বই খুলে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলো। সুবর্ণবালা সুপ্রিয়র লাখোপতি হওয়ার সবাব শিশিরকণার কাছে শুনেলেন এবং মীনাঙ্কী শুঁকে জানানোর দরকার মনে করেনি বলে মনে মনে দর্শনাত্মক ভ্রূত হলেন মেয়ের ওপর। সপক্ষে ঘরে ঢুকলেন সুবর্ণবালা। মেয়ের বই ঢাকা মুখের দিকে ধরদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে একটু যেন চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোর মাস্টার তিন লাখ টাকা পেয়েছে, সে খবরটা আমাকে দিলে কী ক্ষেতিটা হতো শুনি?

মীনাঙ্কী নিশ্চপ।

আমলো বা, মুখে কী কুলুপ লাগিয়েছিস নাকি? বাপট দিয়ে উঠলেন সুবর্ণবালা। মীনাঙ্কী নিশ্চপ্তর। সুবর্ণবালা মেয়ের ওরকম স্থির ভঙ্গি দেখে ভেতরে ভেতরে টগবগিয়ে উঠলেন। মেয়ের আড়াল করা মুখের দিকে আবার অস্বিদৃষ্টি হানলেন একটা। মনে মনে বললেন—বার জন্ম চুরি করি সেই বলে চোর,—আপনা ভাল তো পাগলও বাথো,—এ মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি,—আবার ফেটে পড়বার উপক্রম করই অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে ব্রেক করলেন সুবর্ণবালা তারপর আশ্চর্য নয়ম গলায় মেয়েকে শুধোলেন, তোর মাস্টারের ঠিকানা জানিস?

বা'র নিলজ্জ প্রশ্নে নির্বাক আর থাকতে পারলো না মীনাঙ্কী, রক্ত গভীর গলায় উত্তর দিলো, জানি না।

সুবর্ণবালা মেয়ের ভাবভঙ্গিতে একেবারে যেন ক্ষেপে গেলেন, তিন্ত গলায় বললেন, তা জানবে কেন? জানো কেবল ত্রাকামী করতে।

শব্দ ক'রে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুবর্ণবালা।

[ক্রমশঃ]

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

আপনার জন্যে চিহ্নগরকার স্নাত অপর লাবণ্য

মালা সিনহা সত্যিই অপরূপ সৌন্দর্যের
অধিকারী । কি করে তিনি লাবণ্য এত
মোলাসম হইতে পারেন ?
“বিশুদ্ধ, স্নান লাগ্ন টয়লেট সাবানের
সাহায্যে”, মালা সিনহা আপনাকে
বাস্তব । হীরাবরাদেব পিতৃ এই মোলাসম
ও শেখ মোলাসম সাবানের সাহায্যে
আপনারও হইবে যত মনঃ মনে রাখিবেন,
জানব সময় লাগ্ন সত্যিই অপরূপ হইবে ।

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ

লাগ্ন টয়লেট সাবান

চিহ্নগরকারদের সৌন্দর্য্য সুবাস



বিশুদ্ধান লিডার লিমিটেড, কল্লভী এজেন্ট ।

LT& 599-K12 80



পাখের কথা বলতে একঘেয়ে লাগে। কিন্তু পাখের ওপর দিয়ে বারি চলে তাদের কাছে পথ সব সময়ই নতুন রূপ নিয়ে আসে। এক পা বাড়ালেই চার পাশের চেহারা বদলে যায়। মোড় ফিরলেই দেখা দেয় নতুন জগৎ। অপ্রত্যাশিত কত বিপদ এসে পাখের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দেয়।

এমনি এক বিপদ এলো। এক খাড়া পাহাড়ের চূড়ার উঠে পথ শেষ হলো। শেষ মানে, সেখান থেকে অন্ততঃ তিরিশ ফুট নিচে নামতে হবে।

তিয়েলিং বললেন, কোমরে দড়ি বেঁধে নামতে হবে। তাছাড়া কোনো উপায় নেই। সঙ্গী শেরপারা সবাই জানে ঐ পদ্ধতি। তারা অভ্যস্ত। শুধু জানে না শান্তনু, কিশোর আর লালী।

পাহাড়ের চোচারা দেখলে ভয় হয়। বেন পঞ্চককে ভয় দেখাবার জন্তেই সে একটা হিংস্র সিংহের মত মাথা তুলে খাড়া হয়ে আছে।

শেরপারা কোমরে দড়ি বেঁধে তৈরী হলো। ওপর থেকে এক একজনকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। নীচে নেমে সে দড়ি খুলে ফেললো। এই ভাবে নামলো শান্তনু, নামলেন তিয়েলিং। লালী কিছুতেই রাজী নয়। কোমরে দড়ি পরায় তার আপত্তি। কিন্তু উপায় কি? শেষ পর্বত পরতে হলো ভাকে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]
শ্রীশৈল চক্রবর্তী

শুভে বলে নামতে নামতে মাঝে মাঝে শুধু পর্বতগায়ে পা ঠেকে। সেই অবস্থার চীৎকার করে উঠলো লালী। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্তে। মাটিতে পা পড়তেই সে বাতাবিক হয়ে উঠলো। এবং উল্লাসে সকলকে ছাপিয়ে উঠলো। বাধা জয় করার পরে এমনই হয়, যে আনন্দ ভীতুরা কোন দিনই পায় না।

কিছু দূর হাবার পর তিয়েলিং বললেন, সামনে ঐ যে কালো পাহাড়ের একটা পাঁচিল দেখছো, ঐটা পেরুলেই আমরা একটা ছোট উপত্যকায় গিয়ে পড়বো, তার পরেই—তিয়েলিং চুপ করলেন।

তার পর কি? ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে শান্তনু।

তার পর, তোমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান মিলবে, বললেন তিয়েলিং।

মনে মনে লাফিয়ে উঠলো শান্তনু। সে বললে, তার মানে, আপনি বলছেন সোনালি স্বর্ণা দেখতে পাবো?

হ্যাঁ, তাই।

হররে, হররে, তিনজনই সমন্বয়ে চৈলিয়ে উঠলো।

সারা দিন পথভ্রমের পর সন্ধ্যার আগেই ওরা তাঁবু ষাটোতে লেগে গেল। তুষার-বড় ঠেকেতে পারে তেমন ভাবেই তাঁবুর দড়ি-দড়া শক্ত করে বাঁধা হলো।

রাতে আহারের পর সবাই বিশ্রাম করছে, লালী আর কিশোর বলে উঠলো, লামাজী, এবার সেই গল্পটা শুরু করুন। তিয়েলিং প্রস্তুতই ছিলেন। শুধু ওদের আগ্রহ আছে কি না দেখছিলেন।

তিয়েলিং বলতে আরম্ভ করেন। গতকাল আমরা চুপোকে রাজার কাছে বিচারের জন্ত প্রত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই না?

চুপোর দিক থেকে বলবার কিছু ছিল না। কেন না, ঘটনাটা সত্যি। জমিশারের লোক এবং গ্রামের দু'একজন চাষী স্বচক্ষে দেখেছে যে একটি সাদা বোড়ার চড়ে মিমি বাচ্ছে। তার করণ মুখ ভয়ে বিবর্ণ, তবুও সেই রহস্যময় বোড়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে বাচ্ছে। এই সব সাক্ষ্যের পরে প্রমাণিত হলো যে বোড়াটি চুপোর সৈন্য।

পর্যন্তন ছেলেটাকে এখনি কয়েদখানায় গুরে রাখা হোক, রাজা বাজবাহী আওরাজে কেটে পড়লেন। তিনি আরও বললেন, তিনজন অস্বাভাবিক মিমিকে খুঁজে আনবার জন্তে এখনি বেরিয়ে পড়ুক।

চুপো বন্দী হয়ে রইলো এমন এক জেলখানার বার দেয়ালগুলো সব চেয়ে মোটা, লোহার দরজাটা সব চেয়ে মজবুত আর পাঁচিলগুলো সবচেয়ে উঁচু। তাছাড়া কয়েদের রকী বারি তারা নাকি যমদূতের মত, চেহারাও এবং স্বভাবে। সকলে আশঙ্ক করলো এতটুকু ছেলের জন্তে এত কষ্ট। চুপোর বাপ-মা কীভাবে কীদন্তে ভাবলো। আচ্ছা, বাচ্চা চুপো ওখানে আর বাঁচবে কতক্ষণ! তারা রাজাকে অনুরোধ করে বললে, দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন, বেন সময় মত ওকে খাবারটা দেওয়া হয়। কিন্তু খাবার দেওয়ার তার বার হাতে যে আবার ভীষণ নিষ্ঠুর, আর জল যে দেয় সে কানে গুলতে পায় না। যেটুকু খোঁদে তা-ও তুলে বোঝে।

স্বতন্ত্র্য বুঝেই পাছ, চুপো কী কণ্ঠেই আছে ঐ জেলের দুপে ঘরে। ভয়েই হয়তো কাঠ হয়ে গেছে সে। উঁহ, ছোট হলে কি হবে, চুপোর বুকখানা ছিল ইম্পাতের মত, ভয়ে কোমড়াবার মত নয়।

তিন দিন পরে যখন জেলখানার লোক গিয়ে রাজাকে বললে যে চুপো বেশ সুস্থই আছে, তখন রাজা খুব অবাক

হয়ে পেলেন। মনে মনে দুঃখও পেলেন একটু, লোকের কষ্ট দেখলে তিনি মজা পেতেন।

দেশের লোক সবাই এটা জানতো। রাজার সেই দিন খুবই মন খারাপ যেতো যেদিন তিনি একজনকেও শাস্তি দিতে পারতেন না। সেই জন্মে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে সবচেয়ে হিংস্র মেজাজের লোক পুথতেন তিনি। তারা রাজার রকম শাস্তির ব্যবস্থা করতো গরীব আর নিরীহ প্রজার উপর রাধা বলতেন গরীব সাজা ওদের যেমন সখ, বেত মারাও আমাদের তেমনি সখ। এইটাই ভায় বিচার।

বাই হোক, রাজা কার কাছে গুনলো, চুপোর কাছে এক বাহু-তুলি আছে, সে তুলি দিয়ে বা কিছু আঁকবে তাই জীবন্ত হবে।

এই খবর এতো দেহিতে জানাবার অপরাধে মন্ত্রীকে সাত বার ওঠ-বোস করতে হলো। বাই হোক, খবরটা বখন পেলেনই তখন তো তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাহু-তুলি যদি সত্যিই হয় তাহলে তা দিয়ে তো রাশি রাশি ধনবত্ত পাওয়া যেতে পারে। রাজার মনের জিভে জ্বল এয়ে গেল।

অবিলম্বে তিনি চুপোকে বললেন, আমাদের ধনবত্তের ছবি এঁকে লাও দেখি, আর সেগুলো সত্যি করে দাও।

চুপো বুক ফুলিয়ে বললে, মহারাজ, আমার দ্বারা ওকাজ হবে না।

বনু বনু নু নু...করে উঠলো রাজার আশে-পাশের তিরিশটা ভলোয়ার।

তবুও রাজা ধৈর্য হারালেন না। তিনি বললেন, আজ্ঞা, সোনার একটা সিংহাসন আঁকো তো?

ওটাও হবে না আমার দ্বারা মহারাজ, তেমনি নির্ভীক ভাবে বললে চুপো।

আবার তিরিশটা অসি স্বনংকার করে উঠলো। রাজা বললেন, সোনার ইট আঁকো, সোনার তালগাছ আঁকো, সোনার ফটক, সোনার হাতী—সোনার বা খুশি তোমার আঁকো। আমার কথামত কাজ করলে তোমার আমি ছেড়ে দেবো। আর তা না হলে...

চুপো ভবুও অটল। একটুও কাঁপলো না সে। অত্যাচারী ঐ রাজার ওপর তার মন বিধিয়েছিল।

কিন্তু রাজা এবার ধৈর্য হারালেন। রাগে ফুলতে থাকেন তিনি। কোমরবন্ধনী ছিঁড়ে গেল, মুকুট কাঁপতে লাগলো মাথার। ঠাঁতে ঠাঁতে শিবে তিনি গর্জন করে ওঠেন, শরতানকে জ্বলো দাও, হত্যা করো, ওর তুলি কেড়ে নাও। কই, কে আছে?

পারিষদ জরাদ অনেকই ছিল সেখানে। তারা নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়লো চুপোর ওপরে। কেড়ে নিল তার হাত থেকে তুলিটা, তারপর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল। আরো অজ্ঞকার এক কয়েদে পুরে ঢাবি দিল।

তুলিটা হাতে নিয়ে রাজা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তুলিটা তো মশ নর, হুঁতরি হবে সোনা আছে এর গায়ে। কই দেখি হে কাগজ আর রং আনো তো?

দিকে দিকে ছুটলো একশো জন লোক। বড় বড় পাকানো কাগজের তাল্ডা এয়ে পড়লো। নানান রং গুলতে বসে গেল অতনকে। সেই রং রাখা হলো একশোটা বাঁটিতে।

রাজা বললেন, সোনালি রং চাই সবচেয়ে বেশি। আমি বখন আঁকবো, সোনা দিয়ে ছাড়া আর কোনো রং আমি পছন্দ করি না।

একটা বড় গামলা ভর্তি করে রাখা হলো সোনালি রঙে। রাজা তুলি ধরলেন, গোটানো কাগজ টান করে ধরে রইলো সাত জন গোমস্তা। তিনজন জোয়ান পাখা ঢালাতে লাগলো রাজার মাথার ওপর।

রাজার কপাল ঘেমে উঠলো। গরবে না চিন্তায় কে বলবে?

কি আঁকবেন রাজা? এ বিজ্ঞা তো তাঁর জানা নেই। মনে মনে আগশোষ করেন আঁরা, এতদিন যদি শিখতুম একটু এই ছবি আঁকাটা! এখন আর উপায় নেই। রাজসভার সবাই অপেক্ষা করছে। কিছু একটা আঁকতেই হবে। মনে জোর আনেন। আপনার ওপর বিশ্বাস চাই, তিনি না রাজা। কি এমন শক্ত কাজ এটা? সবচেয়ে সহজ হবে যেটা একটা সোনার লাঠি আঁকা, তাই আঁকবো।

তাই আঁকলেন তিনি। কিন্তু সোজা রেখা টানা তো সহজ নয়, তুলি চললো আঁকারীকা হয়ে ঢেউখেলানো কাগজের ওপর।

তারপর সেই ছবি জীবন্ত হলো বটে, কিন্তু সোনার লাঠি হলো না, হলো একটা সফ্র মোটা কুৎসিত সাপ। সেই কুৎসিত সাপের গায়ে ছবিতে যেমন রং পড়েছিল ঠিক তেমনি হলো। সোনালি ছোপও কিছু ছিল। কিন্তু তার কৌস-কৌসানিতে সবাই সন্ত্রস্ত। কে জানে কাকে কখন ছোবল দেয়। তখন সবাই মিলে তাকে লাঠি শাবল ব্রহ্ম দিয়ে পিটতে লাগলো।



রাজা আগশোষ করেন, কেন একটু ছবি আঁকা শিখিনি, হার বাহু...

তারপর রাজা আঁকলেন একটা আম। আমটা আঁকবার দোষে আঁকা-বঁকা তো হলোই, তার কোনো বাহার রইলো না। বা-ই হোক, কাগজ থেকে সত্যিকার রূপ নিয়ে সেটা বখন কাঁড়ালো, তখন রাজার মনে পড়লো সোনালি রং দেওয়া হয়নি। তা যেন হলো কিন্তু সবচেয়ে বা ক্রটি হয়েছে, তা হচ্ছে আমের গোড়টা মল্লবৃত্ত করে আঁকা হয় নি। তারই ফলে টলটল করতে করতে আমটা কাঁড়াতে পারলো না। শব্দে তার পতন হলো এবং সেই সঙ্গে সব চেয়ে হিংস্র জেলখানার সেই বন্দীটাও মরলো চাপা পড়ে।

মন্ত্রী বললে, রাজা মশাই, 'কাছেব জিনিসের বিপদ অনেক, তার চেয়ে এমন কিছু আঁকুন যা দূরে থাকে।

তার মানে? রাজার বুঝতে দেবি হয়। মন্ত্রী বললে, এট যেমন অনেক দূরে পাঠাও, গাছ—

টিক বলছে। রাজা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পাঠাও তো হবেই, শুটা আঁকতে খুব পারবো। উঁচু-নিচু টেট খেলিয়ে দিলেই হলো, 'আর খোঁচা-খোঁচা পাঠাড়ের চূড়া তা তো জলের মত সহজ। তারপর সেই পাঠাড়দের হিমালয়ের দিকে ছেড়ে দিলেই হলো। তবে, তার মধ্যে একটা সোনার পাঠাড় আঁকবো, সব চেয়ে বড় হবে সেটা।

এলো মস্ত বড় কাগজ, এলো বাট-বাট রং। রাজা বিপুল উত্তম ধরলেন বাহু-ভুলি। তারপর আঁকা-বঁকা বেধা টেনে চললেন হরদম। মন্ত্রী বললে, দু'চারটে গাছ-গাছড়া দিলে মন্দ হয় না। তাও আঁকলেন রাজা কালির পোঁচ দিয়ে।

একজন পারিষদ বলে উঠলো, কতকগুলো মাছ দিলে কেমন হয়?

মাছ? রাজার তখন যৌক চেপে গেছে। তিনি তেমনি কালির পোঁচড়া দিয়ে এঁকে ফেললেন অনেকগুলো মাছ। যেগুলো আনাড়ি হাতের আঁকা, তাই না হলো মাছই না হলো জন্তু। জীবন্ত হবার পথ তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলো পাঠাড়ের গায়ে গায়ে। অনেকে বলে, সেইগুলোই নাকি পরে ইয়েতি হয়েছে, বারা জন্তু নয়, মাছই নয়।

বাই হোক, সোনার পাঠাওটা আঁকলেন সামনে। সেটাকে এতো উঁচু করলেন আর এতো নোংরা করলেন যে, জীবন্ত হতে সেটা সোনার ত হলোই না। শুধু পাখর আর পাখর। তাই কোনো গড়ন নেই, বাহার নেই। তা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নড়বড়ে পাখর অনেকগুলো এলোযেলো সাজালো যা হয় তাই হলো। একটু পরেই চড়চড় করে পড়লো বিরাট 'আওরাজ' করে। আর একটু হলেই রাজা চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরতেন। তা হলো না, কিন্তু রাজবাড়ীর আখানা গেল শুড়িয়ে ধুলো হয়ে।

তিয়েলিং একটু ধামতে লালী জিগ্যাস 'করে বললে, চুপোব কি হলো?

রাজপুরীতে আর্জানদ উঠতে তখন রাজার চৈতন্ত হলো। তিনি বললেন, ঢের হয়েছে, এ সব আমার দ্বারা হবে না বুঝতে পাচ্ছি। এখন খুনি নিয়ে এসো সেই ক্ষুদ্রে শরতানটাকে।

চুপোর হাতে তার সর্বদশে তুলিটা এঁকে দিয়ে রাজা বললেন, ভাল চাস তো, এখন খুনি একটা সোনার ডাগন এঁকে দে। নইলে তোরা থাকের মুণ্ড নামিয়ে দেওয়া হবে।

চুপো বড় করে আঁকলো একটা ডাগন। সোনা-রং দিবে দেহটা ভরিয়ে দিলে। তারপর সেটা জীবন্ত করতেও তার দোঁ লাগলো না।

বিরাট ডাগন, চকচক করছে তার সোনার মত গা। তা নিখোসে আঙুন করতে লাগলো। বললে গেল রাজপুরী। মন বড় হা দিয়ে এক গ্রাসে সে খেয়ে ফেললো রাজাকে। যে বেধাৎ ছিল উর্ধ্বাঙ্গে ছুট দিল। অনেকে গেল ডাগনের পেটে, আর কোঁ কেউ পালিয়ে বাঁচলো।

তারপর? তারপর চুপো তুলিটা জামার ভাঁজের মধ্যে নিয়ে বেরলো। তার মনে পড়লো মিমির কথা—তাকে খুঁজে বাব করতেই হবে।

রাত আর বেশি নেই। আজ এই পর্যন্ত থাক। এই কথা বলে তিয়েলিং সে রাত্রের মত চুপ করলেন। প্রবন্ধ কসী হচ্ছে তখন। [ক্রমশঃ]

ঋষি বিশ্বামিত্রের শিক্ষা

ত্রিশূলতা কর

খুব বেশী কমতা থাকলেও অহঙ্কার করা উচিত নয়। বল ও দর্শনের অবশ্য পতন হবে, এই নিয়ে মহাত্ম্যতে একটি মজার গল্প আছে।

তোমরা বিশ্বামিত্র ঋষির নাম শুনেছ? অহঙ্কার ও দর্শনের ফলে তাঁর কেমন পতন হয়েছিল, তাই নিয়ে এই গল্প।

বিশ্বামিত্র চিরকালই ঋষি ছিলেন না। প্রথমে তিনি ছিলেন কান্তকূজ দেশের রাজা। ধন, ঐশ্বর্য, সৈন্যবল কিছুই তাঁর অভাব ছিল না। রূপ-গুণের তাঁর তুলনা ছিল না। কিন্তু অনেক গুণ থাকার সত্ত্বেও তাঁর একটি বিশেষ দোষ ছিল।

কমতার অহঙ্কার মস্ত হয়ে তিনি সব লোককে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। বিনয়, বৈধী এসব গুণ তাঁর চরিত্রে একেবারে ছিল না। তাঁর আদেশ মেনে সব লোক চলবে এই ছিল তাঁর ধারণা। কেউ যদি তাঁর আদেশ অমান্য করত তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন।

রাজা বিশ্বামিত্র খুব শিকার করতে ভালবাসতেন। একদিন তিনি সৈন্য-সামন্ত দলবল নিয়ে ঘোর বনে শিকার করতে গেলেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বন ভোলপাড় করে অসংখ্য বাঘ, ভালুক হাতি, হরিণ মাংসে মাংসতে রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্য-সামন্ত রাস্তা হয়ে পড়লেন। তখন তাঁরা রাজধানীতে ফিরে বাবার জোগাড় করতে লাগলেন।

এমন সময় বিশ্বামিত্রের সেনাপতি সভয়ে বললেন—মহারাজ, আমরা রাজধানীতে ফিরে বাবার পথ হারিয়ে ফেলছি। ঘোর বনে এসে পড়েছি, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন কি করব পরামর্শ দিন।

রাজা বিশ্বামিত্র বললেন—আমরা সবাই খুব রাস্তা হয়ে পড়েছি। ক্ষিদের, তেষ্টার অস্থির হয়ে উঠেছি। খুঁজে দেখ, যদি কোন ঋষির আশ্রম পাও ত সেখানে চল। ঋষিরা সব সময় অতিথি সংস্কার করেন। তারপর রাজধানীতে ফেরবার পথ খুঁজো।

রাজার কথা শুনে সেনাপতি দলবল নিয়ে বনের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ খুঁজতেই বিশিষ্ট ঋষির আশ্রম পেয়ে গেলেন।

তখন রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেকালে ঋষির আশ্রমে অতিথিদের সম্মান দেবতার সম্মানের তুল্য ছিল।

বশিষ্ঠ ঋষি এই সব মাননীয় অতিথিদের দেখে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাবণ জানালেন। তাঁর শিষ্যেরা সবায়ের পা খোঁবার জল, বসবার আসন এনে দিলেন।

রাজা বিশ্বামিত্র পথ হারিয়ে ফেলেছেন শুনে, বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—মহারাজ, রাত গভীর হয়েছে। এখন এই বনের মধ্য থেকে পথ খুঁজ বার করা কঠিন। আজ রাতের মত আমাদের আশ্রমে থেকে যান। কাল সকালে আমার শিষ্যেরা রাজধানীর পথ চিনিয়ে দেবে।

বিশ্বামিত্র ভাবলেন—এই ঋষির আশ্রমে যে খাবার খাব আর যে বিছানায় শোব তাতে আমাদের খুবই বঠ হবে। রাজকীয় ঐশ্বর্য্য আমরা অভ্যস্ত, সে সব আর এই গরীব ঋষি কোথায় পাবে!

কিন্তু কি আর করা যায়? উপায় যখন নেই তখন রাজী হতেই হবে। এই ভেবে বিশ্বামিত্র বললেন—তাই হবে বশিষ্ঠ ঋষি। আপনার আশ্রিত্য স্বীকার করলাম। আজ রাত এখানেই কাটাব। বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখের ভাব দেখে মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনারদের সেবার কোন কট্টা হবে না।

এখন বশিষ্ঠ ঋষি পাতার কুঁড়ে ঘরে থেকে কয়েকটি শিষ্য নিয়ে পূজা-অর্চনা করে আর ছাত্রদের পড়িয়ে অতি সাধারণ ভাবে দিন কাটাতেন বটে কিন্তু তাঁর আশ্রমে একটি মহা মূল্যবান জিনিষ ছিল। এই জিনিষটি হল একটি স্বর্ণের গজ, তুষারের মত সাদা তার গায়ের বগ, কুচকুচে কালো হুটি ডাগর চোখ, কোমল তার দেহের গড়ন। বশিষ্ঠ ঋষি এই কামধেনুকে দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। একে তিনি নিজের মেয়ের মত রহে করতেন। আরও কয়েক নাম দিয়েছিলেন নন্দিনী। নন্দিনীর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, বশিষ্ঠ ঋষি তার কাছে যখন বা চাইতেন তখন তাই পেতেন। স্বর্ণে, মর্মে, পাতালে এমন কোন জিনিষ ছিল না, যা নন্দিনী দিতে পারত না। বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে এসে নন্দিনীকে ডাকলেন। নন্দিনী ছুটতে ছুটতে কাছে এল। বশিষ্ঠ তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—নন্দিনী, মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁর দলবল নিয়ে আমার অতিথি হয়েছেন। তুমি তাঁদের সেবার আয়োজন এখনি করে দাও।

নন্দিনী ঠিক মাহুঘের ভাষায় কথা বলতে পারত। নন্দিনী বলল—বাবা, কিছু ভাববেন না। আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে সে তিন বার হাথারব করে চীৎকার করে উঠল। অমনি এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। প্রথম হাথারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার খাবার উপযুক্ত হাজার হাজার সোনার পাণ্ডে ভরা রাজভোগ, মিষ্টান্ন, ফল বার হয়ে এল।

দ্বিতীয় হাথারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার শোবার উপযুক্ত হাজার হাজার দামী মখমলের বিছানা বার হয়ে এল। তৃতীয় হাথারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে হাজার হাজার দাস-দাসী রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর দলবলের সেবা করবার জন্ত বেরিয়ে এল।

তখন বশিষ্ঠ ঋষি রাজা বিশ্বামিত্রকে ও তাঁর সৈন্ত-সামন্তদের সেই সব রাজভোগ খাবার জন্ত ও তারপর মখমলের বিছানায় শুয়ে ক্রান্তি দূর করবার জন্ত অমরোথ করলেন।

এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে গেলেন।

শ্রীশ্র-ক্রান্ত তাঁরা পরম আনন্দে সেই রাজভোগ খেলেন। সেই ফুলের মত নরম বিছানায় শুয়ে অগাধ ঘুমিয়ে শ্রান্তি-ক্রান্তি দূর করলেন।

পরদিন ভোর হল। রাজা বিশ্বামিত্র ঘুম ভেঙ্গে উঠেই সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে সাজ-শোবাঁক পরে আশ্রম ছেড়ে রাজধানীর দিকে চললেন। বশিষ্ঠের শিষ্যেরা পথ দেখিয়ে দেবার জন্ত সঙ্গে চললেন।

যাবার সময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষিকে বললেন—হে ঋষি, কাল আপনি যে ভাবে অতিথি সংকার করেছেন, যে অমৃতের মত খাবার খাইয়েছেন, যে সুন্দর নরম বিছানায় শুইয়েছেন, তার জন্ত কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। এখন যাবার সময় আমার একটি অমরোথ আপনাকে রাখতেই হবে। আপনার ওই কামধেনু নন্দিনীকে আমাকে দান করুন। কাল রাত্রে ওর অদ্ভুত সব ক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ওর বললে আপনি বস্ত্র ঢাকা চান দেব, আমার অর্ধেক রাজত্ব পর্যন্ত দিতে রাজী আছি।

বিশ্বামিত্রের অমরোথ শুনে বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—মহারাজ, অতিথি দেবতার মত সম্মানের পাত্র। অতিথি বা চান তাঁকে তাই দেওয়া উচিত, কিন্তু তবুও আপনার এই অমরোথ রাখতে পারলাম না। তার কারণ আপনাকে বলছি শুধু। কামধেনু নন্দিনীকে আমি দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। প্রায়ই আমার আশ্রমে রাজা-মহারাজ এসে অতিথি হন। তাঁদের সেবা করবার জন্ত যে রাজভোগ আর যে সব বিলাসসম্রা দরকার হয়, সে সব আমি নন্দিনীকে কাছ থেকে পাই। তাছাড়া আমাকে প্রায়ই বড় বড় বজ্র করতে হয়, তাতে দেবতা, ঋষি, রাজা, মহারাজা ও সাধারণ লোক সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। সে সব জিনিষ নন্দিনী আমাকে দেয়। নন্দিনীকে দান করলে আমার অতিথি সংকার করা ও বজ্র করা দুই-ই বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং কেন আপনার অমরোথ আমি রাখতে পারলাম না, সে কথা আপনি বুঝবেন এবং আমার ক্ষমা করবেন। আর বার্ষিক ঋষিরা কখনও টাকার লোভে তোলে না, একথা আপনি জানেন। সুতরাং আপনার অর্ধেক রাজত্বের লোভে আমি নন্দিনীকে দেব না, তা বুঝতেই পারছেন।

এই বলে বশিষ্ঠ ঋষি চূপ করলেন। বশিষ্ঠ ঋষির কথা শুনে রাজা বিশ্বামিত্র রাগে জ্বলে উঠলেন। দেশ-বিশেষের রাজারা পর্যন্ত তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস পায় না। আর সামান্য একজন গরীব ঋষি কি না তাঁকে অগ্রাহ্য করছে!

বিশ্বামিত্র কঠোর হুগে বললেন—ওই কামধেনু নন্দিনীকে দিতেই হবে। আমি শেষ বার অমরোথ করছি। যদি ভাল বোঝেন ত দিলে দিন। নরত আমার সৈন্তেরা জোর করে এখনি ওকে ধরে নিয়ে যাবে। আপনি কি আর আমার সঙ্গে ক্ষমতা পাবেন?

বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—আমি গরীব ঋষি, আমার কি আর

ক্ষমতা। তবে যেহেতু নন্দিনীকে আমি দেব না। ইচ্ছা হয় ত জোর করে কেড়ে নিতে পারেন।

এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র আরও রেগে উঠলেন। এত বড় শত্রু গরীব খবির যে, সে তাঁর সৈন্তবল অস্ত্রবলকে ভয় পায় না।

চীৎকার করে বললেন—সেনাপতি, সৈন্তদের বল নন্দিনীকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যাক। গর বাছুরকেও মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাক।

রাজার আদেশ শুনে সেনাপতি সেনাদের হুকুম দিলেন। সেনারা ছুটে এসে নন্দিনীকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে টানতে লাগল। লাঠির আঘাতে নন্দিনীর ত্বণারের মত সাদা শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু তবুও সে এক পাও নড়ল না।

কাতর হয়ে কান্দতে কান্দতে নন্দিনী বশিষ্ঠকে বলল— বিশ্বামিত্রের সৈন্তরা এ ভাবে আমার মারছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনি এদের কিছুই বলছেন না। তবে কি আপনি আমাকে রেহা করেন না? আমি কি আপনার মেয়ে নই?

এক দিন ধরে মাঝব কবেও আপনার কি আমার উপর কোন মেহ নাই? আমি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে যাই, এই কি আপনি চান?

বশিষ্ঠ খবি নন্দিনীর অভিমান ভরা কথা শুনে বললেন—মা নন্দিনি, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত মেহ করি, সে কথা তুমি ভাল ভাবেই জান। আমি তোমাকে আশ্রম থেকে যেতে দিতে চাই না। কিন্তু রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্ত দিয়ে জোর করে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমি গরীব খবি, অস্ত্রবল, সৈন্তবল নেই। কেমন করে তোমায় রাখব, তাদের বাধা দেব? তা ছাড়া খবিরের ধর্মই হল ধৈর্য আর ক্ষমা। তেজ দেশালে তাদের অবশ্য হয়।

বশিষ্ঠ খবির কথা শুনে নন্দিনী বলল—বাবা, আপনি তাহলে আমাকে যেতে দিতে চান না। বুঝলাম আপনি আমাকে রেহা করেন। এখন চেয়ে দেখুন কার সাধ্য আপনার নন্দিনীকে কেড়ে নেয়।

বশিষ্ঠ খবি বললেন—নন্দিনি, ঐ দেখ তোমার বাছুরকে বিশ্বামিত্রের সৈন্তরা দড়ি বেঁধে টানছে লাঠি দিয়ে মাঝছে। সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে কান্দছে। গার ত ওদের অত্যাচার ধামাও। ওরা তোমার উপরেও যে রকম অত্যাচার করছে, যে ভাবে তোমাকে মারছে এ-ও দেখতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে বুঝছ?

বশিষ্ঠের কথা শেষ হতে না হতে এক অজুত ব্যাপার আরম্ভ হল, নন্দিনীর শরীর বাড়তে বাড়তে বিবর্তি পাহাড়ের মত হল, আর সেই শরীর থেকে প্রচণ্ড আগুনের হুকা বেরোতে লাগল। তার দুই চোখ প্রকাণ্ড বড় হয়ে দুটো আগুনের গোলাব মত হল। সেই চোখ থেকেও বলকে লগকে আগুনের বেরোতে লাগল।

তারপর নন্দিনী ভীষণ লগে ডেকে উঠল। বাঘের ডাক সে ডাকের কাছে তার মনে যায়। সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্গে লগ লগ তেজস্বী সেনা নন্দিনীর বুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারা বাইরে এনেই বিশ্বামিত্রের সেনাদের বিরে ফেলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করল।

এই অজুত ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্রের সেনারা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তবুও একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজস্বের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

কিন্তু কি সাংঘাতিক বিক্রম নন্দিনীর সেনাদের! খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিশ্বামিত্রের সব সেনাদের হারিয়ে দিল। এমন ভীষণ ভাবে বিশ্বামিত্রের সেনারা মার খেল যে তারা নন্দিনীকে আর তাঁর বাছুরকে ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে উর্ধ্বাশ্রয়ে ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। রাজা বিশ্বামিত্রও ছুটে পালাতে লাগলেন। পিছনে পিছনে নন্দিনীর সেনারা তাড়া করে চলল। খানিকটা ছোটবার পর বিশ্বামিত্র ও তাঁর সেনারা সবচেয়ে চেয়ে দেখল যে, নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে বিরে ফেলেছে আর পালাবার উপায় নেই। এখনি বুঝি প্রাণে মেরে ফেল। বিপদে পড়ে রাজা বিশ্বামিত্র বুঝলেন রাজা হয়ে অহঙ্কার করার ফল, বল ও দর্প দেখানোর ফল কি রকম বিষময় হতে পারে। যে বশিষ্ঠ খবি আশ্রয় দিয়ে অস্ত্রি সংকার করলেন, ক্ষমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁর শত্রুতা করার ফল কেমন সাংঘাতিক হল।

কিন্তু এখন আর ভেবে কি বল। নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে বন্দী করেছে। প্রাণে মারবার জন্য তীর-শস্ত্রক উঁচু করে ধরেছে। আর এক মুহূর্তেই তারা সবাই মারা যাবেন।

প্রাণের ভয়ে রাজা বিশ্বামিত্র আর তাঁর সেনারা ধর ধর করে কাঁপতে লাগলেন আর কান্দতে লাগলেন।

রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রাণ ভয়ে কান্দতে দেখে দরাসু খবি বশিষ্ঠ বললেন—মা নন্দিনি, তোমার সেনাদের বারণ করে দাও, তারা বেন এঁদের প্রাণে না মারে। আমি খবি, ক্ষমাই আমার ধর্ম।

নন্দিনী সেনাদের বলল—সৈন্তরা এই রাজাকে আর তাঁর সেনাদের প্রাণ মেরো না। কিন্তু প্রাণে না মেরেও এমন ভাবে মার বাতে এদের শিক্ষা হয় যে খবির আশ্রমে এসে অহঙ্কার ও দর্প দেখান চলে না।

নন্দিনীর কথা শুনে সৈন্তরা ভীষণ ভাবে বিশ্বামিত্র ও তাঁর শিষ্যদের মারতে লাগল। এখন বিশ্বামিত্র ও সৈন্তরা কান্দতে কান্দতে বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা চাইলেন; প্রাণ-ভিক্ষা চাইলেন।

দরাসু খবি বললেন—নন্দিনী তোমার সৈন্তদের চলে যেতে বল। নন্দিনী তখন আগের মত আবার ভীষণ লগে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সব সৈন্ত তার মুখের মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেল। নন্দিনীর প্রকাণ্ড আগুনের-জ্বালা শরীরও শান্ত হয়ে গেল। সে আগের মত স্তব্ধ স্বর্গের গন্ধরূপ ধরল।

বশিষ্ঠ খবি বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ, আপনি সৈন্তদের নিয়ে রাজ্যে বিরে যান। আমার থেকে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। আপনি শরণগত, তা ছাড়া অস্ত্রি। শুধু অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বল ও দর্প দেখাতে চেয়েছিলেন বলেই এই কষ্ট সহিতে হল।

আমি আপনাকে একটিমাত্র উপদেশ দিচ্ছি। বশুই বড় রাজা হোন, অহঙ্কার, বল ও দর্পের বল হবেন না। অহঙ্কারীরা যে পণ্ডন হয়, তা ত দেখতেই পেলেন।

বশিষ্ঠের কথা শুনে লজ্জার অজুতচানার বিশ্বামিত্রের মন ভরে উঠল। বশিষ্ঠ খবিকে প্রণাম করে তিনি বললেন—খবি, আজ থেকে আমি রাজা ভ্যাগ করলাম। বনে গিয়ে হাজার বছর তপস্বী

করে খবি হব। আপনাদের কাছে এসে বুকলাম, খবির কন্যতার কাছে রাজার সৈন্তবল, বনবল, তেজ, গর্ব, কত মিথ্যা।

তার পর বিখ্যাত সেনাপতিকে বললেন—সেনাপতি, সৈন্তদের নিয়ে দেশে চলে যাও। প্রজাদের বল, রাজা বিখ্যাত রাজা ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এই বলে বিখ্যাত রাজবংশ ছেড়ে সন্ন্যাসী পোষাক পরলেন। এমনি ভাবে এক দিন বশিষ্ঠ খবির আশ্রমে রাজা বিখ্যাতের অহঙ্কার ও গর্বের পতন হয়, আর তিনি রাজা ছেড়ে খবি হন।

ফাউ

শ্রীনিবাস চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : বোকা হবি কেন, বাজারে গিয়ে জিনিষটা কিনে ফাউটা শুদ্ধ চেয়ে নিয়ে আসবি।

পৃথিবীতে এই ফাউ পাওয়া যায় অনেক কিছুই। ফাউ কথা বলারও স্বভাব আছে অনেকের। কাজেই ফাউ নিয়ে এক কলম লিখলে নিশ্চয়ই আপনাদের কাঁপরে ফেলবেন না আমাদের। তবে ফাউ নিয়ে লেখাটা ফেলনা নয়।

শোনা যায়, এক পরশা সেব হিসেবে চার সেব বেগুন কিনে এক ডল্লাক এক সেব বেগুন ফাউ পেয়েছিলেন। তাই শুধু ফাউ নিয়েই ফিরতে চেয়েছিলেন। তার সে ইচ্ছে সফল হয়েছিল কি না সেটা আমার জানা নেই। তবে এ থেকে মালুম করুন, ফাউয়ের জন্ত মাছবের ফালতু দরদ কত! বাড়তির জন্ত বাড়াবাড়ি কেমনতর।

কবিশুদ্ধ সাহিত্যে অমর কাবুলিওরালাদের চড়া সুদে টাকা খাটানোতে ছুড়ি কম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তাদের আসল চাইতে কুদীন বা সুদের তাগান কত অস্বাভাবিক। পাওনা ছেড়ে ফাউয়ের জন্ত তাদের কাঁপার দালালির তুলনা মেলা ভার।

হরেক রকম ফাউয়ের কথা আমরা অনেকই জানি। নতুন জামাইদের কাছে ফাউ হল শ্রালিকার বাক। ঠাকুরা, দিদিমাদের কাছে আমাদের ফাউরূপ নাতি-নাতনী। বাঁক। আমাদের কাছে যৌতুক। আগে যেমন রাজপুত্রেরা রাজকন্তাদের পাণিগ্রহণ করে ফাউ পেতেন অর্ধেক রাজত্ব। বর্তমান কালে হোমরা-চৌমরার সরকারী ফাউ পান পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী, পুলি, মিলিটারী অশোকচক্র এবং সাহিত্যরথীরা আকাদেমী অওয়ার্ড বা নিমেনপকে একবার রবীন্দ্র-পুরস্কার।

কিছুকাল আগেও হুবেরের যোগ্যতার পরিমাপ ছিল শুধু চাকুরীর মাইনের নয়, তার উপরির বহরও বটে। প্রাচীনেরা তাই বাবাজীদের কুঠীহীন কঠে জিগ্যাস করতেন : বাবাজীর চাকুরীতে উপরি আছে ত? বেল, আদালত এবং পুলিশ বিভাগের চাকুরীদের তাই দাম ছিল বহু, মান বহুতর। আজ অবন্ত তেমন ভাবে কারও উপরির খবর নেওয়া শিষ্টাচার হয় না। তবে এ কথা ঠিক, পরোক্ষভাবে ফাউ কিছু শোলে আমাদের অনেকেরই গোঁসা কাটে এবং অপর পক্ষের হুঁ কাম কতে।

ফাউ বা বাড়তি পাওয়ার জন্ত আমাদের উৎসাহের নেই অন্ত, আকাঙ্ক্ষার নেই অবধি। তাই প্রতি বছরের সূর্যতে সূর্যত কালোপের জন্ত কাড়াকাড়ি কম নয়। চাকুরীর সমাপ্তিতে ফাউ

পেজেন দীর্ঘায়ু বৃদ্ধদের কাছে নয় কম উপভোগ্য। যেমন বেলওয়ার চাকুরীদের কাছে ফ্রি বেলপাশ বা বেসরকারী কল-কারখানার বাৎসরিক বোনাস কর্মীদের কাছে নয় কম আকর্ষণীয়। তাই আমাদের মনে ফাউয়ের প্রতি মমত্ব অসীম, মায়া অনন্ত। ফাউ পেতে তাই আমরা কীক খুঁজি। অতিরিক্তের জন্ত হই অতি আয়াসী।

অনুবা বিজ্ঞাপন হিসেবে কখনও কখনও ফাউ জিনিস পান ক্রেতার। সাবান বা গন্ধতেল হ'—এক বোতল কিনলে কখনও মেলে নয়নাভিরাম সাবানদানী বা মনোলোভা চিকনী। 'এরোগেনে চাপলে বাত্রীরা পান ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং রঙ্গীন এয়ার ব্যাগ। বাটার জুস্তোর দোকানে পূজার সময় শিত্তা পায় বেলুন বা চকলেট। শাজিতে এবং দৈনিক পত্রে উপহারস্বরূপ পাওয়া যায় এমন বিজ্ঞাপন বিয়ল নয়। দৈনিক খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাই থাকে হরেক সাপ্লিমেন্ট। মাসিক পত্রিকার বাৎসরিক এবং বার্ষিক গ্রাহকেরা কখনও তাই পান ফ্রি ডাকমালত। এতে ব্যবসার চলন বাড়ি, বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর আকর্ষণ হয় দুনিবার।

ফাউ পেতে এবং দিতে মজা অনেক। তবে ফাউ কথাও আনন্দ কম নয়। আসর ভ্রমণের জন্ত কথার মালা গাঁথতে হলে অনেক অনেক ফাউ কথা চাই। তবে ফাউ কথা এবং বাজের কথার ফারাক অনেক। ফাউ কথা সম্বন্ধ-বিশেষে বিবক্তি আনে কিছু বাজের কথা বক্তার প্রতি শ্রদ্ধা কমায়। ফাউ কথা তাই কখনও ভাল লাগতে পারে কিছু বাজের কথা কখনও নয়। সুরসিক লোকের ফাউ কথাও তাই পারে ফুল ফোটাতে। পারে বা হস্তর ভরাতে।

অনেক আগে রাজা, মহারাজা, বাদশা, শাহজাদা ফাউ কথা শুনবার জন্ত করতেন গুণী বাক্তির নিবেগ। তাদের আদর করে তাঁরা বলতেন বরত বা সভাসদ এবং চলতি কথার তাঁরা ছিলেন ডাঁড়। মজার মজার ফাউ কথা বলে তাঁরা তাঁদের মনোরঞ্জন করতেন। দিতেন গোড়জন আনন্দস্ব। চুঠান্তরূপ, যোগলসরাট আকবরের সভার বীরবল এবং কুফলগরের মহারাজ কুফলগরের সভার গোশাল জাঁড়ের নাম আসে মনে। সে যুগে ডাঁড়ি বা ফাউ কথার মাধ্যমে তাঁরা নির্ভেজাল হুল আনন্দের জন্ত হাস্তাস পরিবেশন করতেন, তার প্রমাণ আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

বর্তমান যুগ অনেক এগিয়ে বাছে। এখন আমরা নিজি মেপে মেপে কথা বলতে ভালবাসি। বর্তমান সভ্যতার শিক্ষা হচ্ছে স'বম এবং বিবিক্ততা। তাই আমাদের বর্তমানে কথার ফুলস্বরিতে যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির গভীরতার মূল্য অনেক। ফাউ কথার স্থান একদম নেই বললেই চলে। আবার ফাউ বলার ক্যাসাদও পদে পদে নয় কম। অন্তঃখ আর বা কিছু ফাউ আশ্রক কতি নেই কিছু ফাউ কথা বলে ফক্তিকারি করা আমাদের উচিত নয়।

নাইটিংগেল

চীনেশের রাজার রাজবাড়ী পৃথিবীর নামকরা জায়গা ছিল।

রাজার বাগানে ছিল হরেক রকমের ফুল। ফুলপাওয়ার চারিদিকে রূপোর বঁটা বাঁধা থাকত পঞ্চাতরিকে সাবধান করার জন্ত। বাগানের সীমা যে কোথায় শেষ হয়েছে, তা কেউ ধারণা করতে পারত না। বাগানের শেষ প্রান্তে ছিল অনেক বড় বড় গাছ, তাদের শাখা-প্রশাখা সমুদ্রের উপর পড়েছিল। গাছগুলির পাশেই ছিল

গভীর নীল সমুদ্র। সেই গাছগুলির শোঁথাতে একটি নাইটিংগেল পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। তার সুমিষ্ট স্বরের ধ্বনি শুনে সকলেই মুগ্ধ হত।

রাজ্যীয় বিভিন্ন দেশ হতে রাজ্যের মহানগর দেখতে আসত। মহানগর রাজবাড়ী, বাগান দেখে আনন্দ পেত। বিশেষ করে তাদের মধ্যে কেউ যদি নাইটিংগেল পাখির গান শুনে পেত, তবে তার আনন্দের সীমা থাকত না। বেশে ফিরে গিয়ে রাজ্যের রাজ্যের কথা সকলকে বলত। কেউ আবার রাজবাড়ী সযত্নে বই লিখত।

পৃথিবীর লোক বইগুলি পড়ে রাজবাড়ীর কথা জানতে পারত। একদিন একটি বই চীনদেশের রাজ্যের হাতে পৌঁছাল। রাজা বার বার পড়েন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে মাথা নাড়েন। কিন্তু বইয়ের শেষভাগে এমন কিছু পড়লেন, যা তাকে অবাক করে দিল। কথাগুলি ছিল এই, নাইটিংগেল পাখি সবচেয়ে ভাল।

প্রধান মন্ত্রীর ডাক পড়ল। মন্ত্রীর প্রকৃতি ছিল অকৃত। তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাস করলেই, সে উত্তর দিত, ফুঃ! তাকে দেখে রাজা বলতে আরম্ভ করলেন, নাইটিংগেল নামে এক ছোট পাখি আমার রাজ্যে আছে। তার গান আমার রাজ্যের সম্পদ। এর আগে কেউ তার সযত্নে আমাকে জানায়নি কেন? আমি চাই তাকে রাজসভায় নিয়ে এস এবং আজ সন্ধ্যায় পাখি আমার সামনে গান করবে। সমস্ত পৃথিবী যে বিশ্ব জ্ঞানে, আমি সে বিষয়ে অন্তঃ।

মন্ত্রী উত্তর দিল, আমি তাকে খুঁজে বার করব।

কোথায় তাকে পাওয়া গিয়েছিল? প্রধান মন্ত্রী বড় বড় ঘরের মধ্যে দিয়ে, রাস্তার মধ্যে দিয়ে দৌড়তে লাগল। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল, তারা পাখি সযত্নে কোন স্বর দিতে পারলো না। বাধ্য হয়ে রাজ্যের কাছে ফিরে গেল এবং রাজাকে বলল, লোক নিশ্চয় বাজে কথা বই লিখেছে। আপনি এই বাজে কথা বিশ্বাস করবেন না।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, যে বই আমি পড়েছি, সেই বই জাপানের রাজা পাঠিয়েছেন। সেইজন্য এই কথা বধনও মিথ্যা হতে পারেনা। আমি পাখির গান শুনে চাই। আজ সন্ধ্যায় পাখি নিয়ে রাজসভায় হাজির হবে। আমার ইচ্ছা যদি পূর্ণ না হয়, তবে রাজসভার সভ্যদের শাস্তি দেওয়া হবে।

জের প্রধান মন্ত্রী উপরতলা, নীচতলা, রাস্তার মধ্যে দিয়ে

দৌড়াতে লাগল। রাজসভায় সভ্যরা মন্ত্রীর সঙ্গী হল। অবশেষে রাজ্যের একটি ছোটমেয়ের সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটি বলল, ও! নাইটিংগেল! তাকে ভাল ভাবে জানি। কি অশ্রু গান গাইতে পারে। প্রত্যেক দিন খাবার টেবিলে বা গুঁড়োগাড় অবলিষ্ট থাকে, আমার মার জন্ত নিয়ে বসে। আমার মা সমুদ্রের ঘাটে থাকে। ফিরে আসবার সময় সমুদ্রের ঘাটে গাছগুলির নীচে বিশ্রাম করি। সেই সময় পাখির মিষ্টি গান শুনি। তার গান এত অশ্রু যে আমার চোখে জল আসে।

মন্ত্রী মেয়েটিকে মিনতি করে বলল, রাজ্যের ছোট মেয়ে আমি তোমাকে রাজ্যের বড় কাজ দেবো। পাখির কাছে আমাদের নিয়ে চল। পথে যেতে যেতে গরুর ডাক, ব্যাঙের ডাক শুনে পেলো। কিছু পরে সেই ছোট নাইটিংগেল পাখির গান বাতাসে ভেসে এল।

ছোট মেয়েটি বলল, ঐ দেখুন। গাছের উপরে তাকান। ঐ ছোট পাখিকে দেখুন। মন দিয়ে গান শুনুন।

রাজ্যের ছোটমেয়েটি পাখিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাদের মহামাজ রাজা তোমার গান শুনে চেয়েছেন।

পাখি উত্তর দিল, আনন্দের সঙ্গে রাজাকে গান শোনাব।

রাজসভায় পাখিকে নিয়ে যাওয়া হল। রাজসভার মধ্যে জায়গায় একটি ঠাঁড় বসান ছিল, সেখানে পাখিকে বসতে দেওয়া হল রাজসভার সভ্যরা এবং সেই ছোট মেয়েটি উপস্থিত ছিল। প্রত্যেকে অশ্রু কাপড় পরে এসেছিল। প্রত্যেকে সেই ছোট পাখিকে লক্ষ্য করেছিল। কিছু পরে রাজা পাখিকে গান আরম্ভ করার জন্য মাথা নাড়লেন। এত মিষ্টি করে গান গাইল যে রাজ্যের গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকের রসিকবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কারণ তার স্বরের ধ্বনি প্রত্যেককে মুগ্ধ করেছিল। রাজা পুরস্কার দিতে চাইলেন কিন্তু পাখি নিতে রাজী হোল না। পাখি বলেছিল, রাজ্যের চোখে জল দেখেছি। রাজ্যের চোখের জলের বিশেষ দাম আছে কারণ রাজার মনের ভাবের রূপ দিয়েছি। সেইজন্য এই পুরস্কার আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

অনুবাদক—বকুল ঘোষ।

শুভ-দিনে মাসিক বনুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিস্ফোরক দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুরিৎ বোধ্য বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অশচ যামুয়ের সঙ্গে যামুয়ের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বাধিকোতে, নয়তো কারণ কোন কৃতদায়িত্বতা আপনি 'মাসিক বনুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার দৃষ্টি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বনুমতী।' এই উপহারের জন্য মৃদু আবেগের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রস্তুত ঠিকানায় প্রীতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা যেনে ধনী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ মাসিক বনুমতী। কলিকাতা।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।



যে পরিবারে ছেলেযুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী । কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু । আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না । এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু । লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাক করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য হ্রাসিত রাখে । প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য হ্রাসিত রাখুন । এটি আপনাকে তাজা করিয়ে দেবে তোলে !

এনাকী আজ কড়া ধমক খেয়েছে
বাণের কাছে। মায়ের উপর

রাগে 'সমস্ত শরীর তার জ্বলে থাকে।
কিন্তু বাবা বতকণ আছেন বাড়ীতে, দুখটি
বুজ থাকতে হবে' নয়ত একটু টা 'কু' করলে
বাবার যে মুক্তি দেখতে হবে, সে চিন্তা
ক'রতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হোল তার।
বাবার রাগের সময় মুখ বুজ চড়চাপড়,
ধমক-ধামক হুমম করাই বুদ্ধিমানের কাজ,
এ তারা সব ভাইবোনেই বুঝেছে। মুখ দিয়ে
কথা বার হয়েছে কি বীরেন বাবুর চড়চাপড়
বড় হ'য়ে পড়েছে পিঠে, কিংবা চোখের
দিকে তাকিয়ে কেঁদেই ফেলেছে তারা। এমন
দিনটি অবশ্য এনাকীর স্কলনার অনেক দিন
আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সেই ইংরাজী
আর অন্ধ পরীক্ষার পর থেকে। মনে মনে
অস্থির হ'য়ে উঠেছে সে। 'বাবা অকসি

যেরিয়ে বাক না, তারপর মাকে একচোট নৈবে সে। সব কথা
বাবার কাছে পুট-পুট ক'রে নাগিল করা বের করছে এনাকী।

বাবার গলার সাড়া পেয়ে মাথা নীচু ক'রে বইয়ের পাতার
চোখ নামাল। এনা, মীনা, বিতীরবার আর ডাকার প্রয়োজন
হয় না। ছেলে-মেয়েরা যে বৈশ্যানে থাকে বাবার একডাকে সাড়া
দিয়ে ছুটে আসে কাছে। এনাকীও ক্রমের কোণা মুখে পুরে
এক কোণে এসে পঁড়াল। বড় হয়েছে কিন্তু সবৎ শেখেনি এখনও।
সব সময় জামার বল মুখে পুরে কামড়াবে। বকাবকিতেও শোধরাত
পায়া গেল না। রান্নাবরের দরজার পাড়িয়ে মা আর একটা
বিচ্ছোরণের আল্লা করাছিলেন। কিন্তু না, সামলে নিয়েছে।
হঠাৎ বাণের চোখে চোখ পড়তেই মনে প'ড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি
জামার বুলটা ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে বুলটা টান করতে লেগে গেল।
ভারীমুখে বীরেন বাবু মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন—তার বুদ্ধিষ্টা
দে। অকসি কেবত বই কিনে আনব। আর এনা—

বেচারী এনার ততকণে প্রাণ উড়ে গেছে। আথ বটাও হয়নি
একটোই বকুনি খেয়েছে। বাবার ডাক মুখটা নীচু ক'রে আজুলে
ক্রমের বুল জড়তে লাগল।—তাকা আমার দিকে—বাণের আদেশে
তাকাতে গিয়ে ভ্যা ক'রে কেঁদেই ফেলল সে।

হাতের উলটা পিঠ দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে চোখ দুটো
লাল ক'রে ফেলল।—পরীক্ষার ফেল করবি আবার কিছু বলতে গেলেও
উটে কালা। কেন, আগে মনে থাকে না? মেয়ের বল-টনটনে ছুটে
শীল চোখের দিকে তাকিয়ে তখন আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন
বীরেন বাবু। আর সাথে সাথেই বারাম্বরের বারান্দা থেকে মা
এনাকীকে আদর-মাখান মুখে ডাকলেন এনা, শোন। আর
আমার কাছে আর। মায়ের ডাক কানে যেতেই এনাকীর চোখের
জল শুকিয়ে গেছে। রাগে চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটেছে তার।

হুহুঁ পূর্বেই সেই কান্নাভেজা কোমল, ছুখী-ছুখী চেহারাটা
কিছুতেই আর চোঁক ক'রেও মনে আনতে পাচ্ছে না দোতলার সুহাস।
বেশি বুক নীচের দিকই তাকিয়ে ছিল। জ্যালাটা ভাল নয় তবু
নিজেকে শোধরাত পায়ে না। নীচের তলার বখনই কোন কারণে



বাসন্তী বন্দোপাধ্যায়

চোচোমি' গণ্ডগোল কানে যায়, মেয়েদের মত অমনিই বেশি ক'কে
পাড়িয়ে পড়ে সুহাস। এজন্তে বাড়ীর লোকের কাছে ধমক যায়, নীচের
তলারও কারো চোখ পড়ে গেলে কথা শোনতে ছাড়ে না। আর কেউ
নয়, মীনা কিংবা মীনার মায়ের নজরে পড়লে তারা নিজেরা কিছু
বলতে আসে না। আশন মনে বিভিবি ক'রে বলে, কি বলে সে এত
উঁচু থেকে সুহাস তনতে পায় না, তবে খুবই যে বিরক্ত হয়েছে সে তাদের
অগ্রসর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে অবশ্য
সরেই যায়।

কিন্তু একটু পরেই হরত কানে আসে, কি হয়েছে মা কিংবা কি রে
দিদি, কে অসভ্যের মত তাকিয়ে আছে? তার পরেই নীচে থেকে
চীৎকার ভেসে আসে এনার—মাসিমা ও মাসিমা। সুহাসের মা
আগে আগে বুঝতে না পেরে সাড়া দিতেন। বলতেন, কি রে
ডাকছিল কেন?

বগড়ার সুবে এনা বলত—ডাকছিল কেন কি! ছেলেকে
শাসন করতে পারেন না? পেরের বাড়ীর দিকে অসভ্যের মত তাকিয়ে
থাকে?

আজ-কাল আর সুহাসের মা সাড়া দেন না। বরং এনার গলা
পেলেই ওদের গুনিয়ে গুনিয়ে সুহাসকে ধমকের সুবে ডাকতে থাকেন।

তিনি যে এ বিষয়ে সুহাসকে শাসন করছেন সেটাই বাবাবাবার
জ্ঞ। বগড়াটা তাই আর গড়ায় না। কিন্তু সুহাস কিছুতেই নিজেকে
শাসনে রাখতে পারে না। তেমন কিছু কানে গেলে সেই উটে
যেখ ঠিক বেশি বুক পাড়িয়ে পড়ে। তবে আগের সেই অগাধ
কোঁড়হলও আর নেই। আজ-কাল তেমন আর মজা ও পায় না।
হুদিন পর এও হয়ত থাকবে না। আজ কিন্তু সকাল বেলাই
বীরেন বাবুর রাগারাগি কানে গেছে। কাঁকে যেন খুব ধমকানি
দিয়েছেন। কাঁকে বকছেন কে জানে? ও সব একবেয়ে হয়ে গেছে।
ভদ্রলোক নিজের ছেলেমেয়েদের ধমক-ধামক দিয়ে কি যে আনন্দ
পান, বইটা তুলে পড়ার মন বলাতে চোঁক করল। ছোট বোন গুলা
কি কাজে ঘরে ঢুক হঠাৎ ধমকে পাড়িয়ে বলল—জান দাদা, এনাকী
না ফেল করেছে? ওর বাবা ওকে কি বকছে। মেয়েছেও।

তখন তখনই আশ্চর্য্য, সুহাস বই ছেড়ে উঠে পাড়িয়েছে।
 বেশির ভাগ দিয়ে নীচের শুল উঠানটার দিকে শুল চোখেই তাকিয়ে
 রইল সে। এখন আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, চোখেও
 দেখা যাচ্ছে না কাউকে। সবাই বোধ হয় ঘরে। এনাফীও।
 এ মেয়েটি সখকে তার অহেতুক একটা কোঁতুল কেন যে মনের মধ্যে
 বাসা বেঁধেছে, কিছুতেই বুকে উঠতে পারে না সে। আজ মাস
 আটেক হোল তারা এসেছে, এই ক' মাসে উঠতে বসতে চলতে
 ফিরতে সব সময়ই চোখে পড়ছে মেয়েটিকে। একটা কিশোরী মেয়ে।
 কাপড় পরলেই যেন মানায়, তবু স্বক ছাড়বে না। ঝগড়া করছে
 যখন, মনে হয় হুনিরাস্তে ঝগড়া ছাড়া কিছু জানে না। বাড়ীতে
 কাক চিল বসতে পায় না। আবার যখন বাগের ধমক খেয়ে কাদে,
 উপর থেকে এমন অসহায় মনে হয়, কষ্টই হয় সুহাসের সে সময়।
 ছোট ভাইকে যখন শিটছে হিংস্রতায় যেন জানোয়ারকে ও ছাড়িয়ে
 যায়, মাকে ভেটি কাটছে, দিদির চুল টেনে পালাচ্ছে, সব সময়ই
 একটা চরম কিছু করা চাই-ই। প্রথম প্রথম মেয়েটার কাণ্ড কারখানা
 একটা ছেলেমানুষী ঠগ্মী মনে করে সুহাসের বেশ ভাল লাগত।
 ক্রমশঃ কিছু মনে হচ্ছে আসলে মেয়েটা ভয়ানক হিংস্রটে, ঝগড়াটে,
 বদমাশী, জেদী। সুহাসের মনে একটু সন্দেহ ছিল বোধ করি
 লেখাপড়ার চৌধুরী। বোঝা গেল তাও নর। সর্কাদিক দিয়েই একটা
 ব্যতিক্রম। তবু এ মেয়েটি সখকে সুহাসের অসীম কোঁতুল।

চৌক-পনের বছরের একটা উঠতি বয়সের মেয়ের এ সমস্ত কাণ্ড-
 কারখানা দেখতে সুহাসের ভাল লাগে। আর তাই সে বেশির ক'কে
 তাকিয়ে থাকে নীচে।

মলিনা দেবী কাছে এসে এনাফীর হাত ধরে টানতে লাগলেন।
 সান্দ্রনার স্বরে বললেন—পরীক্ষার ফল বাতাল হোলে ওকজনরা
 ও-রকম একটু বকেই। তাই বলে তুই ছুটির মত কাটছিস? এত
 বড় দিদি হ'য়ে? এ দেখ ছুটি কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে
 তোর দিকে।

মার হাত থেকে কটাকা মেয়ে হাত টেনে নিল এনাফী।
 নাকি সুরে বলল—বাও বাও। তুমিই ত বত নষ্টের মূল। সব
 কথা বাবার কাছে নাশিন করা চাই। তোমাকে আমি শরণ
 করে দিয়েছিলাম না? বলতে বলতেই আবার হুঁচোখ জলে ভরে
 এলো। মলিনা দেবী শিঁটে হাত বুলিয়ে বললেন—বোকা মেয়ে।
 পরীক্ষার ফল বাপ-মায়ের কাছে লুকোতে আছে না কি?
 এবার মনোযোগ দিয়ে পড়, সামনে বার সবার চেয়ে বেশি নম্বর
 পেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠবি।

মায়ের এ সব ছেলো কথা শোনার মত বৈধব্য কিংবা মন
 কোনটাই ছিল না এনাফীর। কান্নাবোঝা গলায়ই তেড়ে উঠল সে—
 তখন একদবার বললুম একজন মাস্টার বেধে দাও। ইংরেজী ভদ্র

ও-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

নিভাও ও পেটের পীড়া

দি ওবিয়োট্যাল রিসার্চ অ্যান্ড কমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কিছু বৃষ্টি না। তখন শুনে না। ওদিকে ফেল করলে শাসনটি ঠিক আছে। উঠে চলে আসছিল কিন্তু ওপর দিকে চোখ পড়তেই চোখের জল বাষ্প হয়ে উবে গেছে।

মলিনা দেবী বললেন—দেখি এবার বলে-কয়ে একজন মাঠার বাথতে পারি কি না। কিন্তু এনাকীর গলার ঘর শুনে 'ঘরে না হুঁচে' আবার বারান্দায়ই বেরিয়ে এলেন।

এনাকী চিংকার করে বলছে—লজ্জা করে না পথের বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকতে! অসভ্য, বদমাশ ছেলে। বলতে বলতে ওপাশের দিড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠতে লাগল।

মলিনা দেবী বাস্তব-জ্ঞান হয়ে এনাকীকে বাধা দিতে দিড়িঘুরী দৌড়ে গেলেন, কিন্তু মেয়েটার নাগাল পেলেন না। ছি, ছি, কি সব বলে আসবে কে জানে! লজ্জায় রাগে সরে যেতে ইচ্ছে হোল তাঁর। উঠানে দাঁড়িয়ে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন মেয়েকে। একটুকুও পরই এনাকী গর-গর করতে করতে দিড়ি দিয়ে নেমে এলো।

সম্ভব হবে কাছে এগিয়ে গিয়ে উৎকর্ষিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি বলে এলি তুই উপরে? ছি ছি তোয় জ্ঞান কি কারো সাথে সম্ভাব রাখার উপায় নেই? ফেল করেও তোয় লজ্জা হয়নি আবার রাগ দেখাতে বাস সবায় উপরে? মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজা ঘরে ঢুক পড়ল এনাকী। আর মলিনা দেবী নীচে থেকেই সহাসের মাকে ডাকতে লাগলেন—দিদি, ও দিদি—

মায়ের গলা পেয়েই স্বড়ের বেগে বেরিয়ে এলো এনাকী, তারপর টানতে টানতে মাকে ঘরের দিকে নিয়ে চলল। বগড়ার স্তরে বলল—আবার দিদির কেমন? বলবে বৃষ্টি এনাকী বা বলে এলো তার জ্ঞান কিছু মনে করবেন না? বা বলে এসছি ঠিকই বলেছি, তুমি আবার কোন লজ্জায় ওদের সাথে কথা বলতে বাও?

মলিনা দেবীর আর সহ্য হোল না। ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন মেয়ের গালে। চাপা হয়ে বললেন—হতজ্ঞাডী ঘেয়ে! নিজের স্বভাব মন্দ বলে দুনিয়াতক লোককে তুই মন্দ দেখিস? ছাড় তুই, আমার হাত ছাড়। চড় খেয়ে ভক্তপোশটার উপর চূপচাপ বসে রইল এনাকী। একটা অসভ্য ছেলেকে সামনাসামনি অসভ্য বলতে অপরাধ কোথায় বুঝে উঠতে পারল না। গালে হাত বুলোতে বুলোতে ছোট ভাই তপু দিকে তাকিয়েই কি কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। তারপরই দৌড়ে মার কাছে। মলিনা দেবীর মোজাজ তখনও বাতস্ত হয়নি। আবার এনাকে দেখে কেবে উঠলেন—রাগাথরে আবার কি? কাজের সময় এখন বিরক্ত করতে আসিস না। বেরো। এনাকী ভেঁচি কেটে উঠল মাকে—বেরো বললেই বেরবো নাকি। তপু কাঁট হয়েছে, টাকা ফেল, আমায় মিষ্টি খাব।

এনাকীর কথার ধরনই এ বকর। কত বার বৃষ্টিয়েছেন মেয়েদের, এমনি কক ভাবা কানে অত্যন্ত খারাপ শোনায়। বেন সর্বদাই একটা মুখ দেখি ভাব মেয়ের। বহ বার বলে বলে নিজেই হতাশ হয়ে ছেড়েছেন। মেয়ে নিজে থেকে না শোধরালে তার সাধ্য কি ও মেয়েকে শাস্তাস্তা করেন! আজ মীনা, তপু, দিপু আনন্দোজ্ঞল চেহারা দিকে তাকিয়ে এনার চেহারাটাই বার বার চোখের উপর ভেসে উঠছিল। বাপের বকুনি খেয়ে যখন

কাঁদছিল ভারী মায়া হচ্ছিল মলিনা দেবীর। কিন্তু বীরেন বাবু সামনে থেকে মেয়েকে টেনে আনার সাহস তাঁর ছিল না। ভাই কর্তা বেরিয়ে যেতে এনাকীকে কাছে টেনে আনার করে ওর দুঃখ ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ-ও জানতেন কোন বাপায়েই বেশিক্ষণ মুখভার করে থাকা স্বভাবই নয় মেয়ের। তবু এনাকীর চোখের জল দেখে সে মুহুর্তে বেনমায় প্রাণটা মুচড়ে উঠেছিল তার। সহজে কাঁদবার মেয়ে ত ও নয়? কিন্তু সাধ্য কি ওর সম্বন্ধে দু'মিনিট ওর নিশ্চিন্ত থাকার। একেবারে হাড়জালান মেয়ে। কি যে বলে এসেছে ওপরে কে জানে?

এনাকীকে পেছনে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কক্ষার দিয়ে উঠলেন—ফেল করে ফের মিষ্টি খাওয়ার কথা বলতে লজ্জা করে না তোয়? ও তুই বলেই পারিস, অজ্ঞা মেয়ে হোল এতকণ লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেত।

এনা ফের ভুক্ত কুঁচকে মুখভঙ্গি করে বলল—বা রে বা, ফেল করেছি বলে কি মুখ গোমড়া করে সারা দিন বলে থাকব নাকি, না কাঁদতে বসব? ও তোমার মন খারাপ হয়েছে, তুমি মুখভার করে বসে থাকগে। এখন টাকাটা ত ফেল।

—টাকা আমার কাছে এখন নেই। বা, বেরো।

—ইস, নেই! বললেই হোল? ঈগুগির বের কর।

মলিনা দেবী এবার কড়াটা উল্লন থেকে নামিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ লাল করে বললেন—দেখ এনা, ভাল হচ্ছে না। একটু আগে যে মার খেলি, তবু লজ্জা নেই?

—না, আমার লজ্জা নেই। তুমি টাকা দাও। লোকের বাড়ীতে দেখেছি, ছেলে-মেয়েরা পাশ করলে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া আনন্দের ধুম পড়ে যায়। আর আমাদের বাড়ী সবই উল্টো। একজন প্রথম হয়েছে, একজন তৃতীয় হয়েছে, তবু সব গোমড়াযুখ।

এ অজুত কথার কি উত্তর দেবেন মলিনা দেবী? এ উল্টো মেয়েকে কি করে সোজাপাথে বাঁকাবেন? সবটাই যে এনাকীর জ্ঞান, সে বোধ কি ওর আছে? মীনা, তপু, দিপুও যে উজ্জ্বলের মাঝে হঠাৎ এনাকীর দিকে তাকিয়ে তক্ত-বিহ্বল হয়ে উঠেছে, সে খেয়াল অবশ্য এ মেয়ের থাকার কথা নয়। অতটুকু ছেলে দিপু, সে পর্যন্ত এনাকীর কান্না দেখে ঘরের কোণায় মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে। মলিনা দেবীর কাছে এসে বলেছে—মা, বাবাকে বকতে তুমি বাবণ কর মা। ছোড়নি' যে কাঁদছে। এখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দুয়ারে তপু দিপুকে দেখতে পেলেন। এনাকীর সমস্ত ভাব ফিরে আসতে ওরাও যেন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। মুচকি মুচকি হাসছে, হু ভাইয়ে। ওদের হাসিমুখ দেখে সেকেণ্ড খানক কি ভাবল এনাকী, তার পর ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল—দেবে না ভ? আছা ঠিক আছে। আমার হু'টাকা জমেছে, আমি খাওয়াব। মলিনা দেবী হাত মুয়ে এ ঘরে এলেন। কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বললেন—দুধি, দুধি, বাপ রে বাপ! এ মেয়ের পানায় পড়লে—কথা শেষ হোল না। ততক্ষণে এনাকী ছুটে বেরিয়ে গেছে বাইরে। দৌড়ে সামনের বারান্দায় এগিয়ে গেছেন। চোঁচিয়ে ডাকলেন—এনা ভাল হচ্ছে না, ভাল হচ্ছে না। আবার তুই দোকানে দৌড়োছিস! কিবে আর, ঈগুগির কিবে আর। তপুকে টাকা দে, তপু কিনে

আনবে। মায়ের কথার একবার শেহন কিরেছিল, তার পরই গলির মোড়ে উঠাও।

এনার ঝক গলির মোড়ে উঠাও হোতেই সামনের ধল-বারান্দা থেকে নিজের ঘরটার ফিরে এলো সুহাস। এনার দোতলার ওঠা দেখেই সামনের বুল-বারান্দার আলয় নিয়েছিল সে। কি যেন সব গড়গড় করে বলে গেল মাকে, এতদূর থেকে শোনা বাচ্ছিল না, তবু মস্তব্যগুলো যে মোটেই ঞ্জতিমধুর ছিল না যে, এত দূরে থেকেও গলার স্বরে বেশ স্পষ্ট বৃষতে পারছিল। বলতে কি, একটু একটু ভয়ই হচ্ছিল সুহাসের। যদি সোজাঅলি তাকেই বাচ্ছতাই করে অপমান করে যেত সে, ভরে একরকম পালিয়েই এসে বলে আছে এখানে, তাহলে নিজের স্বপক্ষে কোন বৃষ্টিই সে দেখাতে পারত কি? এনা ফিরে যেতে মনে মনে কত বে স্বষ্টি করে গেয়েছিল, মনে করে নিজের দুর্বলতায় ফেসেই ফেলল সুহাস। বাপ যে, ও মায়ের পালার পড়লে রক্ষা ছিল না আজ। হেসে বইটা খুলে পাতা ওপটাতে ওপটাতে স্বগতোক্তি করল—কি আশ্চর্য মেরে বাবা!

মা যে ঘরের সামনে বলে কুটনো কুটছিলে সে যেহাল ছিল না। গৌরী দেবী যুব বাড়িয়ে বললেন—কার কথা বলছিল যে সুহাস? ঐ নীচের তলার এনাফীর? তারপর ছেলের সাড়াশক না পেয়ে নিজেই আবার বললেন—সত্যি অকৃত মেয়ে! হেসে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটু আগে আমাকে কি বলে গেল জানিস? সুহাস যব ছেড়ে বারান্দার মার কাছ বেসে এসে বসল। হেসেই বলল—কি?

—বলে গেল, আপনায় ছেলের চোখ আমি গেলে দেব মাসীমা। পরের বাড়ীর দিকে ডাখ-ডাখ করে তাকিয়ে থাকা জন্মের মত খুঁচিয়ে দেব। আর তাকাবি কখনও? উচ্ছসিত হোয়ে মায়েকে ছেলেতে হেসে উঠল। সুহাস হঠাৎ হাসি খামিয়ে গভীর গলার বলল—দেখ মা, আমি অবাঁক হই মেচেটার রূপান্তর, ডাবান্তর দেখে। এই চোখভরা আশুভ, বাপ রে! ওপর থেকে যে চোখের দিকে তাকালে আমার পর্যাক্ত আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার মুহূর্ত পরেই দেখ বাপের ধমকে এমন করে কাঁদছে, বউই হয় সে সময়। বাপছে বখন ছোট ছোট ভাই ছোটকে কি মারধরই না করে, আবার পর মুহূর্তেই দেখ আদরে আদরে বেচারাদের একেবারে শ্রোণান্ত! ছোটো শক্তিই সমান কাজ করছে।

গৌরী দেবী বললেন—অথচ দেখ, ডডলোকের আর পাঁচটি সন্তানই কিন্তু বড় শাঙ্ক-শিষ্ট। সব মায়ের মত হয়েছ। বাপের মেজাজ পেয়েছে একমাত্র ঐ মেজোটি। এই নিয়েই সেদিন এনার মা কত তথ্য করছিলেন। সুহাস আন্ত বিজ্ঞা হুঁ কাক করতে করতে বলল—কি বলছিলেন? গৌরী দেবী বড় মেয়ে শুকুকে ডেকে বললেন—দেখ, ত শুকু, উত্তর করল। দিবে এসেছিলাম ধরল মা কি? তারপর আলু ছাড়তে ছাড়তে ছেলের প্রোন্মের উত্তর দিলেন। একটু তাঁছিলামাথা স্তরে বললেন—বলছিলেন, মেচেটার স্বভাবে দিমকে দিন এমন বিজ্ঞা হোয়ে উঠছে যে, মনে আর শক্তি নেই তাঁর। এই সব তথ্য করছিলেন আর কি। নুহন কোরে আর কি বলবো? চোখের উপরই ত দেপতে পাই সব। অন্তবক্ত, বিজ্ঞা মেয়ে, মা বলে বলে হরবাণ, তবু ঝক ছেড়ে কাপড় পরবে না

উৎসবের জোনাক

কে. হোডের

মালোবদ প্রজাপ্রদী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪

দিনের মধ্যে পাঁচটার খাতা-পেপার, বিস্কুট-লজেন্স নিতে যোকারে পৌঁছে। আগে ভাবতাম বাপ-মায়ের দরকার। বাপ অবশ্য রাশভারী লোক। ভয়ও, ক'রে ছেলেমেয়েরা যমের মত। তা সে কতকণ? ভুললোক ত দেখি সেই সাতো নয়টার বেরিয়ে বান আর ক্রিতে ক্রিতে সেই সন্ধ্যা সাতটা। অতকণ ত অধাধা বানিনতা। অত বড় মেয়ে ভাল দেখায় না বাপু! মায়ের বিরক্তিশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস একটা গাছাড়া উত্তর দিল। বলল—ধাকে একেকটা মেয়ে এক-ধরনের।

উঠে গাছাড়াই এনার গলার সাদা পেয়ে এক পা বাড়তে গিয়ে বাধা পেয়ে এর বসে পড়তে হোল। গৌরী দেবী সার্টের তুল টেনে বসিয়ে দিয়েছেন ছেলেকে। হেসে বললেন—চোখ দুটো তোর সত্যিই বাবে। লজ্জা নেই? সহাস অমুনর ক'রে বলল—একটু দেখি মা, বেশ মজা লাগে। গৌরী দেবী পঙ্কজ হ'য়ে বললেন—হিঃ। বড় হ'য়েছিস এখনও কোন কাণ্ডজান হোল না? এ কি মেয়েলী স্বভাব হচ্ছে দিনকে দিন? বা পড়তে বা।

অগত্যা পড়ার ঘরেই চুকতে হোল সহাসকে। পর পর ছোটো বছর একই ক্লাসে র'য়ে গেল এনাকী। মাষ্টার থাকে সন্তোষ। আর এই কাকে মীনাকীর খুলের গণ্ডি পার হ'য়ে কলেজে বাতায়ত স্কুল হয়েছে। তপু ছ' ক্লাস উঠতে উঠে এনাকীকে ধরে ফেলেছে। দিপুও এগিয়ে গেছে ছ' ধাপ। শুধু এনাকীই যেই তিমিরে সেই তিমিরেই। গোল্ডার সহাসেরও এবার ফাইনাল ইয়ার।

আগের সেই অশোভন কৌতুহল আর নেই। একদম গেছে বলা যায় না, তবে অনেকটাই গেছে। এখন যেটুকু আছে তাকে আর অস্বাভাবিক বলা চলে না। শুটু অনেকেরই থাকে। গত বছরেরও প্রমোশনের দিন বীরেন বাবুর ধমক-শামক কানে গেছে সহাসের। কিন্তু এ বছর যেন বড় বেশি চুপচাপ। এবারও যে এনাকীর কপালে প্রমোশন জ্যোতিন, সে স্ববর আগেই পেয়েছে সে। সকাল থেকেই একটা ধমকের আশঙ্কায় সহাস নিজেরই ঘরে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছিল। কিন্তু না, কিছুই কানে গেল না। ভারী অস্বাভাবিক বোধ করতে লাগল সহাস। নিজের ঘরে টেবিলের উপর ছ' হাতের ভর রেখে মুখ ঢেপে এসবই চিন্তা করছিল। আচমকা একটা বড় প্রমোশন পেয়ে এনাকী যে হঠাৎ বড় বেশী বড় হ'য়ে গেছে এ যেন সহ হচ্ছিল না সহাসের। সত্যি তাই। ক্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে সেটা কিছু নয়, কিন্তু সেই উজ্জল চাপল্যা সর্কানাই প্রাণচকল একটা ঘূর্ণী আচমকা যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে সহাসের। মাত্র ছটি বছরে কেউ যে এমনি বেমানুষ পাণ্টে বেতে পারে, যেন চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এ পরিবর্তন যে হঠাৎ একটা গুলোট-পালোট এনে গেছে, তা নয়। ধীরে ধীরে সব কিছু সইয়ে সইয়ে, কাউকে তেমন আশ্চর্য্য না করে দিয়েই আন্তে আন্তে পাণ্টে গেছে এনাকী। এখন আর ছ'চোখ ছ'কান পেতে রেখেও অস্বাভাবিক কিছু চোখে ঠেকে না, কানে আসে না। বড় বেশী শান্ত-লম্বী ঘরে হ'য়ে গেছে যেন। কিন্তু সব চেয়ে বা আশ্চর্য্যকর, তা হচ্ছে সহাসের নিজেরই মন। এনাকী সেই বগড়া, সেই হিংস্রপনা, সেই গৌরাঙ্গ্যপনা, বা যেনে বিরক্তিতে রাগে কত সময় তার ক্রা কুচকে উঠেছে, সেই যেন ভাল ছিল।

একটা বতঃকুর্ন্ত জোয়ারকে কে যেন বাঁধ দিয়ে গতি বন্ধ ক'রে রেখেছে, এনাকীকে দেখলে আশ-কালুতার এমনি একটা উদাহরণ মনে পড়ে যায়। আর তাই মায়ের মুখে এনাকীর প্রশংসা শুনে মনেই ধারণা হ'য়ে যায়, মাকেও তখন সহ হয় না, মনে পড়ে যায় মায়ের আগের উক্তিগুলি। কিন্তু এটাই ত নিয়ম। শান্ত, লম্বী মেয়েদের প্রশংসাই ত প্রাণ্য। তার মনের উক্তিগুলোই বয় ব্যতিক্রম।

এই আড়াই বছরে একই বাড়ীর বাসিন্দা হ'য়েও এনাকীর পরিবারের কারো সাথেই বলতে গেলে তেমন আলাপ পরিচয় হয়নি সহাসের। সহাস এমনিতেই একটু অমিতক, তাড়াড়া তার সমবয়সী কেউ নেইও তও পরিবারে। সুতরাং আশ-কালু কাকে অকাজে ছুটে ছুটে আসে মীনাকী। শুক্রাও এমন দিনে পনের বার নামছে নীচে। এক সাথে খুল-ফাইনাল পাশ করে একই কলেজে ভর্তি হয়েছে দু'জনে, এত দিনে তাই বহুভাষ্য জমে উঠেছে খুব। সহাস ঠিক বন্ধুত্বের পর্যায়ে না উঠলেও বোনের বন্ধু হিসেবে অনেকটা সহজ হ'য়ে উঠেছে মীনাকীর কাছে।

বিকলে আজ আর বেরোয়নি। বন্ধুদের ট্রামে তুলে দিয়ে তাদের সবচেয়ে কথাবার্তা বলছিল মায়ের সাথে। মীনাকী এলো এসময়ে মাসীমা মাসীমা, হৈ-হৈ করতে করতে, এসে ধমকে ঝাড়িয়ে পড়ল। সহাস এ সময় বাড়িতে, ভাবতে পাতেনি নিজের উচ্ছাসের জন্য বড়ই লজ্জিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু বড়ই সপ্রতিভ মেয়ে মীনাকী। হেসে বলল—বা রে মাসীমা, মিষ্টি কোথায়? উত্তরটা দিল সহাস। মুহূর্তে হেসে বলল—বা রে, মিষ্টি ত আপনি আনবেন, এমন খালি হাত কেন?

—বা রে, আমি কেন মিষ্টি খাওয়াব? সহাসও গভীর গলায় বলল—বা রে, কেন খাওয়াবেন না? গৌরী দেবী মজা দেখছিলেন। এই স্ত্রী সপ্রতিভ মেয়েটিকে বড়ই রেগে করেন তিনি। মনের কোণার একটা আশাও গুণে রেখেছেন। মনে মনেই থাকেনি তা, মেয়েকে বলেছেন ও। আর শুক্রার মুখ থেকে সে কথা মীনাকীর পরিবারে কানে বেতে কতকণেরই বা ওয়াস্তা। আড়ালে মীনাকীকে বোধি বলে ঠাট্টাও শুরু করেছে। কেবল খুব গোপনভাবে সহাসের কান এড়িয়ে এমনিতেই বিষের নামে নানান জুড়ুতাত, তার ওপর মীনাকীর সাথে তার বিষের প্রস্তাব শুনে কি জানি, লজ্জায় বোধ করি যেটুকু কথাবার্তা বলত তাও বন্ধ করবে। গৌরী দেবী তা চান না। বরং সহাস আর মীনাকীকে আলাপ করতে দেখলে একটা শান্তি পান। এমন বয়েকে সহাস কিছুতেই অপছন্দ করতে পারবে না। বুঝে-সুঝে নিক না। দু'জনের কথা শুনে মজাই পাচ্ছিলেন। হেসে বললেন—এ বলছে কেন খাওয়াব ও বলছে কেন খাওয়াবেন না, বেশ মজা। আর সত্যি কথাই ত মীনাকী শুধু শুধু মিষ্টি খাওয়াতে বাবে কেন? তোর বোনের বিয়ে, এত বড় একটা শুভ সন্বাদ, মীনাকী নিশ্চয়ই দাবী করতে পারে মিষ্টি খাওয়াব, মীনা, আমি তোমার দলে। জোরে হেসে উঠলেন।

মায়ের সাথে সহাসও হাসল। বলল—বেশ কথা, বোনের বিয়ে, শুভ সন্বাদ সন্দেহ নেই, মিষ্টিখুশ কদানন্দ মতই সন্বাদ।

কিছু মীনাঙ্কী দেবীর দিক থেকে ও ত মন্ত সুসংবাদ আছে।
মিষ্টান্ন কথার মতই স্তম্ভ সংবাদ।

তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছে না মীনাঙ্কী। তুচ্ছ কুঁচকে
মুখ হেসে বলল—বুঝতে পাচ্ছি না। কি সংবাদ বলুন ত?

মনে করতে পাচ্ছেন না?

ঠোঁট কামড়ে চিন্তার ভাণ করল—না ধরতে পাচ্ছি না।

গৌরী দেবী হেসে বললেন—অত বাখার মধ্যে না রেখে পরিষ্কার
করে বলই না বাপু।

—আজ্ঞা পরিষ্কার করেই বলি। বার দু'হুটে ভাই প্রথম হয়ে
উঁচু রাসে ওঠে, তার কাছে মিষ্টি খাওয়ার আদ্যার আমরা নিশ্চয়ই
করতে পারি। কি বলেন পারি না?

মীনাঙ্কী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল—তা নিশ্চয়ই পারেন।
সে ব্যবস্থাও হবে। কিছু আগের ব্যাপার আগে। আমি যখন
জানিয়েছি আমারটা মিটে থাক, তারপর চলুন আপনি নীচে, এ
উপলক্ষে তবু আপনার শায়ের ধূলা পড়বে।

গৌরী দেবী ছোট একটু নিশ্বাস ফেলে বললেন—এবার খবর
তখন মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে! বেচারী এত খেটেও—
কথাটাকে আর শেষ করলেন না।

সুহাস মীনাঙ্কীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—ক' সাবজেক্টে
ফেল করতে আপনার বোন?

—তু' সাবজেক্টে।

—কি কি?

—অন্ধ, ইংরেজী।

আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন বিষম ও ভারী হয়ে উঠল। গৌরী দেবী
আবার বললেন—সুখ বলছিল, এনাঙ্কী নাকি আর পড়বে না।
সত্যি না কি?

মীনাঙ্কী বলল—সত্যি মাসীমা, আমরা সবাই বুঝিয়ে বুঝিয়ে
হয়রাণ হয়ে গেলাম, এমন কি বাবা বললেন, খুলে না যেতে
চল, বাড়ীতেই অন্ধ আর ইংরেজীর দুটো মাস্টার রেখে দি, প্রাইভেট
পড়। তাতেও আপত্তি। আর একবার 'না' করলে ও মেরেকে 'হ্যা'
করায় কার সাধ্য। বাবাকে যে অত ভয় করে তবু সোজা জবাব,
না, আমি আর পড়ব না।

কথার মাঝখানে হঠাৎ সুহাস বলে উঠল—সে কি, পড়াশুনা
ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে করবে কি?

এনাঙ্কীর প্রসঙ্গ উঠে পড়াতে ভারী অব্যোহাতি বোধ করছিল
মীনাঙ্কী। বোন ফেল করেছে, লজ্জাটা যেন তারই, প্রসঙ্গ
পাণ্ডার জ্ঞান সুহাসের কথার উত্তরে হেসে বলল—করবে মাথা আর
মুখ। তার পর গৌরী দেবীর দিকে তাকিয়ে বলল—তারিখ কবে
ঠিক হোল মাসীমা?

গৌরী দেবী বললেন—সবে মেরে পছন্দ ক'রে গেল, সেনা-
পাণ্ডার কথা কিছুই ঠিক হয়নি, তারিখের এখনই কি?

মীনাঙ্কী আবার কল-কল ক'রে উঠল। তুচ্ছ উঁচিয়ে বলল—কি
চাপা মেরে বাবা। বলে শরীর খারাপ, কলেজ বাব না। আমিও
তাই বিশেষ করে কলেজ গেছি। এসে গুনলাম, তরাকে আজ
দেখতে এসেছিল। কই মাসীমা, আপনিও ত কিছু বলেননি।
গলায় মুখ অমুখোপের সুর মেলায়।

—এ আর বগবানির কি আছে যে, কথাবার্তা অনেক দিন
থেকেই ত চলছে, সে ত জানিসই, আজ ওরা এসে মেরে দেখে গেল।
সুহাসেরই বন্ধ।

এসব কথা কিছু ভাল লাগছিল না সুহাসের। মনটা হঠাৎ
খারাপ হয়ে গেছে মীনাঙ্কীর কথায়। এনাঙ্কী পড়া ছেড়ে দেবে?
করবে কি করে বসে? করার মধ্যে ত মার ঘরকন্নার সাহায্য করা।
এমনিতেই হাবে-ভাবে মীনাঙ্কীকেই তার ছোট বোন বলে ভুল হয়,
এব ওপর সংসারের চাকার মাথা গললে ও-মেরের বুড়ী হোতে আর
কত দিন? ছেলেমাছর, ছেলেমাছরের মত না থাকলে...

মীনাঙ্কী বলছে—হ্যাঁ, সুহাস! বন্ধুর নাম কি, দেখতে কেমন?
বলুন না সব খুলে। মুখপুড়ী বলে আমি কিছু জানি না।

এ কথার কোন উত্তর না দিরে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল
সুহাস। পা বাড়িয়ে মীনাঙ্কীর ঘমকানো মুখের দিকে তাকিয়ে
হেসে বলল—নাম মধুর চ্যাটার্জী। দেখতে নামের মতই সুন্দর।
আর সব মায়ের কাছেই শুধুন।

মীনাঙ্কীর অন্তমনস্ক চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গৌরী দেবী
মেরেকে ডাকলেন—সুখ, চা হোল না তোমার এখনও? তার পর
বললেন—সুহাসের ঐ পাগলামি, কথা নেই, বার্তা নেই, হয়ত কোন
কথা মনে পড়ে গেছে, সাথে সাথে মুখ গভীর, গলা ভারী। তুমি
কিছু মনে কোর না মীনাঙ্কী।

সত্যি ক'রে মীনাঙ্কী একটু মনঃকুর হ'য়েই পড়েছিল।
গৌরী দেবীর কথার শুদ্ধ গলায় বলল—না, না, মনে করার কি
আছে? আমি বাড়ি শুকুর কাছে, ওখানেই চা খাব। সুহাসের
সামনের বাংলা মিহেই ওপাশে রান্নাঘর। চায়ের পেয়ালার
চুঁ-ঠাৎ শব্দ কানে আসছে। মুখ ফিরিয়ে একবার শুতার দিকে
তাকিয়ে আড়াচোখ সুহাসের ঘরের দিকে তাকাল। তক্তাশোশটার
উপর চিং হয়ে শুয়ে চোখের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে
কি ভাবছে? কি ভাবছে? মনের প্রশস্ত মুখেই বেরিয়ে গেল, মুহূর্ত
পূর্বের সেই মনখারাপটুকু আর নেই।

—কি ভাবছেন?

মুড়কড় করে উঠে বসল সুহাস। বাগ-বাকুল গলায় বলল
—শুধুন, শুধুন, এই মুহূর্তে আপনাকেই ডাকব ভাবছিলাম।
আর সুহাসের সেই গলায় স্বরে চোখের ভারী নম্রমুহুরৎ
দাঁড়িয়ে পড়ল মীনাঙ্কী। সেকেন্ডাশনিক যেন চেতনাহীন হয়ে
পড়েছিল, তারপরেই নিজেকে বস্তা সত্ত্ব সহজ করে তুলতে
চেষ্টা করল। বুকের উভাল-পাখাল টেঁকে দমন করে মুখ বাড়িয়ে
একটু হাসির ছোঁয়া তুলে বলল—হঠাৎ কি ব্যাপার বলুন ত? একটা
নিজ্জন-ঘরে সুহাস তাকেই ডাকবে ভাবছিল। ডেকেছেও। সেও
ইতিমধ্যে ঢুক পড়েছে। তবে কি অব্যক্ত কথা আজ ব্যক্ত করবে
সুহাস? বুকের বুকেপুকানি কিছুতেই ধামতে চায় না। 'হু' এসব
ক্ষেত্রে জোর করেই স্বাভাবিক হতে হয়। কাঁপা গলায় ভাই মীনাঙ্কী
একটা হাতা ভাইবই ব্যবহার করল—আমাকে আবার হঠাৎ ডাকবার
প্রয়োজন হোল কেন?

আর এ মুহূর্তে সত্যিই সুহাসের কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।
নইলে নীচের তলার একটা অপরিচিত যুগ্ম সহজ তার এই বোঝা
বল সজ্ঞেও ও কি করে বলতে পারল—দেখুন, আপনার ছোট

ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিলল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। লকালে
জারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভুতোদা
পাট পাট করে বাগানে খত বেলফুলের চারা উপড়ে
ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

“ভিনমাল ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু
ফুলের নাম নেই। লরকার নেই আমার এমন গাছে।
বিলল হস্ত দত্ত হলে পোড়ে এল—

“আহা হা করছেন কি ভুতোদা।”

ভুতোদা : “করব না
তো কি ?”

বিনয় : দোষ তো আপন
নারই। এ লক মাটিতে কি
গুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে ?

ভুতোদা : তার মানে !

বিনয় : তার মানে মাটিতে
লার মেলাব দেখবেন গাছ

চড়চড় করে বাড়বে। এখনকার মাটিতে রসকল
কম কিদা।

ভুতোদা (অবিস্বাসের সঙ্গে) : ই্যা : যতদূর
কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিনয় : সে কি ভুতোদা ? গাছ যে মাহুঘেরই মত,
সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মাহুঘের
যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও
তেমনি !



ভুতোদা : বাঃ বাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মাছের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে ?

ভুতোদা : তাই বলেই কি আমার মনে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মনেতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিখাল ভাসতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রাসায়নিক বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিনয় : 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিনয় : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিত্তর ভেজ ভেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্যগুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিষয়দেবী প্রমাণ করেছেন যেসব ভেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি

ডালডাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি ভুতু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না! বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা : আচ্ছা, আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাখানা হয় সেটাও যে বিত্তর আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে ?

বিনয় : আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনাকে কিনতে পাবেন একমাত্র দীলকরা টিনে যাতে ডেজাল না ছোঁয়াচের ফোম আশঙ্কা থাকে না।

বিনয় : তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডার' পেছনে রয়েছে তারতর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডার' সবকিছু যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রাসায়নিক যোগে করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিনয় : এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভুতোদা : কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রান্নাখানাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলকুলের চারপুলের জন্যে একটু সার আনিব তো।



বিনয়ান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

বোনকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মানে, এই একটু বুঝিয়ে দেখতাম, আর যদি রাজী হয় আমি নিজে বড় নিয়ে পড়িয়ে ওকে যেমন কোরে হোক প্রয়োজন পাইয়ে দিতামই দিতাম। একটা উচ্ছ্বাসে বোঁকে নিজেকে এমনি ভাবে উত্তুক কোরে দিয়ে ভারী লজ্জায় পড়ে গেল সে। হি, হি, তার এই বাগ্ন মনোভাবকে যে কেউ একটা মানে হিসেবেই নেবে। আমতা-আমতা গলায় ভারী বিব্রত স্বরে বলল—মানে, ছেলেরা মুখ, এ বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে করবেই বা কি, তাই একটু বুঝিয়ে দেখতাম, এ কথাটুকু যে আরো যেমানান হোল, উপলব্ধি করে একেবারে ভীষণ অপ্রস্তুত পড়ে গেল। সত্যিই ত বাপ, মা, দিদি যেখানে হার যেনে গেল, সেখানে সে একজন অপরিচিত হয়ে কি বোঝাবে?

খেয়ে খেয়ে মীনাকী উজ্জ্বল তবল—আপনি এনাকে পড়াবেন? একটা চোখবোলা বন্ধুত্বকে যেন আন্তে আন্তে ছুঁতে পারছে মীনাকী। কিন্তু কী আশ্বর্ষ, এ-ও কি সম্ভব? শুধু মাত্র দুটি ছুঁইয়ে দুটো পরস্পর-বিবোধী মনের এমনি যোগাযোগ। এনাকীর মনটাকে একটু একটু যেন বৃত্তে পায়ছিল সে। একটা সহজ সরল মেয়েলী মনকে বৃত্তে খুব কষ্টকর নয় অল্প একটু মেরের কাছে। কিন্তু সূচাল? এ তার ধারণার অতীত ছিল, আর তাই সে নিজেকে সূচালের সঙ্গে জড়িয়ে কত মধুর কল্পনা কত রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। ইকন যোগাচ্ছিল শুভ।

একজোড়া দৃষ্টির সামনে এনাকী যে নিজেকে কত পরিবর্তিত করে ফেলেছে, সব লক্ষ্য করেছে সে। মনে মনে চেপেছে। মেয়েদের এই হঠাৎ বড় হওয়ার উপলব্ধিটা যেন লজ্জাবতী সত্যার মত। একটুতেই বৃদ্ধ, কুঁকড়ে আসে। অমন দুর্দান্ত মেয়েটা সহাসের দৃষ্টির সামনে যেন এতটুকু হয়ে যায়। কুঁকড়ে-পড়া সূচালের চোখে কত সময় ভ্রবস্থার, কত সময় কৌতুক, কত সময় অল্পবোধ, অল্পবোধ, কোন সময় বা শ্রেয় মজা উপভোগ করা সব লক্ষ্য এসেছে তার এনাকীর দৃষ্টি অন্বেষণ করেই। কিন্তু কৈ, কোন দিন সে চোখে অল্পবোধ দেখেছে বলে ত স্মরণ হচ্ছে না? কিংবা হয়ত তারই চোখের ভুল, বাক সে অল্পবোধ, অল্পবোধ বলে ভেবেছে, অল্পবোধে তাই ভরে উঠেছিল। শুধু বার তবু সেই বুঝেছে, অল্পে কি এর বুঝে, তারই মত অল্প মানে করে ভুল বুঝে।

অনেকক্ষণ পরে কথাটাকে শেষ করল মীনাকী—দেখুন বুঝিয়ে, আমরা ত হার যেনে গেলাম। রাজী যদি করতে পারেন, সত্যিই একটা অসামান্য সাধন করবেন। আড়চোখে সহাসের লজ্জিত বিব্রত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিজের মনকে ছুঁতে চাইল মীনাকী, কিন্তু কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারছে না। দুঃখ না, আনন্দ না আশাও কিছুই নয়, শুধু যেন বিজ্ঞোড়া একটা প্রকাণ্ড বিষয়ে হতবাক হয়ে গেছে।

ও-ঘরে এনাকী কাপড় কুঁচিয়ে রাখছিল আলনায়। মলিনা দেবী বারান্দায় বসে ছোট মেয়ে মূগ্ধিক জামা পরিয়ে দিচ্ছিলেন, মীনাকে দেখে বললেন—কলেজ থেকে এসেই অমনি ওপরে ছুটেছিল। নে, মুখ-লাত হয়ে নে, এনা চা করে দিক।

মীনা সে কথাই কোন উত্তর না দিয়ে মায়ের গা বেঁধে এসে বসল। আত্মরে গলায় বলল—তুমি আনকাল এনাকে বেশি

ভালবাসছ মা! কেন? লক্ষ্মী মেয়ে বলে? প্রথম সন্তান মীনাকীর উপর মা বাবা উত্তরই টানটা বেশি। বড় হরও তাই আদরে আঁকারে ছোট ভাইবোনদের সে ছাড়িয়ে যায়।

মেয়ের কথায় হেসে ফেললেন মলিনা দেবী। মীনায় দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যি, ছোটবেলায় তুমি ছিলি শান্ত-শিষ্ট, এনা একটা ডাকাত। বড় হোয়ে দুহুনেই উন্টো হয়ে গেছিল। বৃত্ত বড় হচ্ছিল তোর চকলতা আরো বাড়ছে আর এনা তোর ছোটবেলার স্বভাবটা পাচ্ছে। মায়ের কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ল মীনাকী।—আচ্ছা মা, আমি'ত ছোটবেলার বোকা ছিলাম, কিছু বুঝতুম না, তাই চূপচাপ থাকতুম, বড় বত হোতে থাকলাম একটু একটু বুদ্ধি পাকতে আরম্ভ করল, চকলতাও বাড়ল। কিন্তু তোমার এই বৃত্তে পরিণত ডাকাত যেহেঁটা হঠাৎ এমন শান্ত-শিষ্ট হয়ে উঠল কেন বলত?

ছোট মেয়ের মুখে পাউডারের পাক বুলোতে বুলোতে মলিনা দেবী বললেন—তোর বত পাগলামি কথা। বড় হওয়ার সাথে সাথে ও নিজে থেকেই হয়, ছোট মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে উঠলেন এবার। মীনাকী বন্ধার দিয়ে উঠল—হাই জান তুমি। তাহলে ত আমার আরো শান্ত-শিষ্ট আরো লক্ষ্মী হওয়া উচিত ছিল, হরুই? তারপর উঠে গিয়ে এনার হাত থেকে কাপড় কেড়ে নিয়ে টানতে টানতে তাকে বারান্দায় নিয়ে এলো। মা'র দিকে ফিরে বলল—এনাকে জিজ্ঞেস কর না। হঠাৎ ও তার শান্ত-শিষ্ট মেয়ে হয়ে উঠল কেন?

এনা ধর্মমত গলায় বলল—বা, যে, এ সব কি হচ্ছে? ছাড় কাপড় ছাড়, কাজ করতে দেবে না?

রাখ তোর কাজ। হঠাৎ অত শান্ত-শিষ্ট লেজবিশিষ্ট হয়ে উঠলি কেন তাই বল আগে?

ডুক কুঁচকে এনাকী বলল—এ আবার একটা প্রশ্ন না কি? এর কোন উত্তর আছে? থাকলে মা যা বলেছেন ঐ উত্তর। সবাই ত এক ছাঁচে ঢালা নয়। সাধারণ মেয়েরা বড় হওয়ার সাথে সাথে নিজে থেকেই সযত হয়।

তেড়ে উঠল মীনাকী—তার মানে আমি অসংযত? মাঝখানে মলিনা দেবী বাধা দিলেন—কি পাগলামি আরম্ভ করেছিল বলত? শুধু-শুধু বগড়া করছিল মীনা, হয়েছে কি তোর?

রহস্যভরা গলায় মীনাকী বলে উঠল—হঁ হঁ, বাবা আমার চোখকে কীকি মিথি তুই?

মলিনা দেবী এবার উঠে দাঁড়ালেন, পা বাড়িয়ে বললেন—সর, বাই, কলেজ থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চা-খাবার না খেয়ে বাজে বকতে আরম্ভ করেছিল। সর দেখি, চায়ের জল চাপির আসি। মায়ের হাত ধরে কের বসিয়ে দিল মীনাকী। স্পষ্ট স্বরে বলল—তোমার দস্তি মেয়েকে লক্ষ্মী করেছে ঐ ওপরতলার সহাস।

মলিনা দেবী এবার হেসে ফেললেন—কি যে মাথাহুতু বকস ছাই, কোন কথাই যদি কোন মানে থাকে। তাছাড়া ওদের সাথে কি বিচ্ছিন্নী ব্যবহার করেছে এনা, চিন্তা করলে এগুনো লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল মীনাকী—সত্যি

দাখ্য! এনা কেই জিজ্ঞেস কর। তারপর এনার দিকে তাকিয়ে
চাখ পাঁকিয়ে বলল—এই এনা, মিথ্যা বলবি না।

এতক্ষণ হাতের কাজ বন্ধ করে দিদির কথাই শুনছিল এনাকী।
এবার মায়ের কাছে যেসে এসে বলল। সহজ সোজা পথই জানে
স। সত্যিই ত এ বিষয়ে তার নিজের ত কোন সন্দেহ নেই?
হবে আর বলতে বাধা কি? কিন্তু আশ্চর্য! দিদিও লক্ষ্য
হবে এসেছে বরাবর। হেসে বলল—সত্যি মা, ভারী আশ্চর্য!
সরলোক সর্করা একজোড়া দুই দ্বিমে বেন আমার শাসন করছেন।
দানী বখনই বগড়াইটি করে কিংবা অকারণে চোমেচি করে,
সু নিপুণের মায়বর করেছি হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়ে, সাথে
পথে ভারী লজ্জা পেয়ে গেছি মা! ছেলোট বেন চোখ দিয়ে
তরকারি করছে। অনেক সময় ঘোড়াও দেখেছি চোখে। অদ্ভুত
না, চোখ দিয়ে কেউ খোঁড়া ছোটতে পারে?

মলিনা দেবী এনাকীর আলগা চুলগুলোকে একটা উঁচু করে
ধাপা বেঁধে দিলেন। হেসে বললেন—একটা কথা মনে পড়ে
গেল।

তারপর মীনাকীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোর ছেলেবেলার
কথা।

এনাকী মীনাকী চোখ নাচিয়ে বলল—কি মা কি? মার
থোঁতাদের ছোটবেলার কথা শুনতে কি যে আনন্দ!

মলিনা দেবী বললেন—মীনা, তুই তখন বছর পাঁচেকের।
একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়েছিলি। উনি
চাখ গরম করে তাকাতাই আমার কাছে কান্ডতে কান্ডতে নাগিশ
দানালি মা, বাবা আমাকে ঘেরছে। উনি শুদিক থেকে আদর
দিয়ে বললেন কি দিয়ে ঘেরছি মা মণি তোমাকে?

মীনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—তুই বললি, চোখ দিয়ে
ঘেরছে ত তুমি আমাকে।

উজ্জ্বলিত হোয়ে হেসে উঠল সবাই। হাসি খামিয়ে মীনাকী
এক সময় ছাড়া গলায় বলল—হ্যাঁ ভাল কথা, তুলেই গিয়েছিলাম।
না, তোকে একবার ওপরতলার স্নহাসনা ডেকেছিল, শুনে
দাগিল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বায়ান্নার স্নহাস ডেক-চেয়ারটায় গা
দলিয়ে পড়ে ছিল। কাল সন্টার মুখে একটা খবর শুনে বিষয়ে
থকেবাবে হতবাক হয়ে গেছে সে। নিজের মন আর দুটি ছুটোকেই
মন ছুঁতে পারছে না। মন যা চায় দুটিতে ঠিক তার উল্টোটোই ফুটে
ঠেতে পারে? সে কি করে সম্ভব? সন্টার বলেছে এনাকী নাকি
তার চোখে তিরকারি ফুটে উঠতে দেখেছে, যুগা করতে দেখেছে,
হাই সে তার পূর্ব-বর্তার আন্তে আন্তে বদলাতে চেষ্টা করেছে।
লেছে নাকি একজোড়া দুই যদি অহরহ এমন অহুসরণ করতে
পাকে কি রকম অস্বাভাবি লাগে বলুন ত শুকুদি! বুঝি আপনাব
দাখ্য আমার ভালর জন্য অমনি করছেন, তবে সেটা অনেক দেরিতে
লেখি আগে ত কত গালাগালি করেছে আপনাব দাখ্যকে।
মনে মনে হাসল স্নহাস। কি সব অবচেতন মন-টন আছে, তাইকেই
বাধ করি খারাপটা খারাপই ভেগেছে। মনে বখন হয়েছে এইতেই
ওকে মানাব, অবচেতন মন হরত তখন বলছে না, ওকে ভাল
পকেই টানতে হবে। আর তাইতেই চোখের ভাবার সেই ছায়াই

পড়েছে। কি সব মনস্তত্ত্ব ব্যাপার! ও সব হেড়ে দেওয়ারই
ভাল। তবে এটা ঠিক, ওর ভাল ভাবতে নিজের ভাল লাগে।
আর তাইতেই ত এনাকীর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার সংবাদে অতটা
খিচলিত হয়ে পড়েছিল।

কাদো এলো অতি সহৃদয়—শুকুদি, আপনাব দাখ্য নাকি
আমাব ডেকেছেন? কেন?

শুকুর অবাক গলা শুনল—সে কি? দাখ্য শুধু তুমি তোকে
ডাকতে যাবে কেন?

একটা হাসির বলক কানে এলো স্নহাসের—আমিও ত তাই
বলি, হঠাৎ কিসের তলব?

বিড়-বিড় শুনল স্নহাস—দাখ্য ত মোটে তোকে চেনেই
না, কি জানি, আর এই বায়ান্নারই আছে।

চোখ বুজে মনে মনে ভারী আনন্দ উপলব্ধি করছিল। সন্টার
বলল—দাখ্য, তুমি নাকি এনাক ডেকে পাঠিয়েছ?

হ্যাঁ এসেছে নাকি?

এনাকী এক পা এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারটার হাতলে হাত
রাখল—হ্যাঁ। আমি এসেছি। কোথাও আড়টতা কিংবা
স্বাভাবিক যুবতী-স্বলভ লজ্জা দেখল না স্নহাস এনাকীর কথার কিংবা
চেয়ারার। এ মেয়েই কি ইলানী চোখে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাতো
পারত না? নিজের ডেকচেয়ারটা পেছনে ঠেলে সামনের চেয়ারটা

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি প্যাকেজ
২৪ টি
স্লট ব্রাদারের

- কলে প্রস্তুত
- স্ট্রমে সেকা
- মেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনাব স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সফলত্ব রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী

কলিকতা - ২২

দেখিয়ে বলল—বোস। তারপর ওরার অবাক চাঁউনির দিকে তাকিয়ে তরল গলার বলল—বাড়ীতে এক জন মাতৃগণ্য অভিযি এলো, এক কাপ চা খাওয়াবি না ?

এনাকী হাত তুলে বাধা দিল—না, না, শুকুনি। চা আমি বেশি খাই না। তার পর সোশা স্নাহাসের মুখের দিকে চোখ রেখে—কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না, কেন আমার ডেকেছিলেন। বলছি। লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছ কেন ?

স্নাহা তখনও কাঁড়িয়ে ছিল। আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবছিল, হু'জন অপরিচিত মানুষ ঠিক এমনি ভাবে, এমনি ভঙ্গিতে, এমনি বিবরে কি করে কথা বলতে পারে। বে জানে, নয় ত বে কেউ ওদের চোখ-মুখ দেখে কিছুতেই বিশেষ করবে না ওরা আজই প্রথম মুখোমুখি হোল। বলতে গেলে প্রথম পরিচয়। আচমকা চায়ের কথাটা মনে হোল। ঠিক। তা ছাড়া দাদাটা এনাকীর মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, কেমন জানি অযোয়ান্তি লাগতে লাগল। বুঝে পা বাড়িয়ে বলল—তখন থেকে কাঁড়িয়ে কথা বলছি, বোস না।

বসার ইচ্ছে থাকলে কারো অজুহাদের অপেক্ষা না করে নিজেই বলত সে। আর না বসবে বলি, তবে কারো কথাতেই নয়। সেটুকু বুঝে হাসল স্নাহা। কিন্তু হেসে বলল—লেখাপড়া ছাড় কেন ?

অল্প লজ করে এনাকীও হেসে উঠল—ভারী আশ্চর্য্য ত। আমার লেখাপড়া নিয়ে আপনি দেখছি ভারী চিন্তিত। তা ছাড়া দেখলেন ত, একই দাঁশে পড়ে আছি তিন বছর। ভাল লাগে ?

স্নাহা এবার অভিভাবকের সুর টেনে আলল গলায়—তাতে কি হয়েছে। সবর মেধা ত এক নয়। পড়া। পড়া ছেড়ে না। টোনের কোণার হাসিটা তখনও মিলোয়নি, এনাকী চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল—বাবা, মা, দিদিদের মত আপনিও নিশ্চয়ই আমার ভাল চাইছেন, কিন্তু তাদের যেমন নিরাস করছি, আপনাকেও তেমনই হতাস করতে হচ্ছে। চেষ্টা ত করলাম, ও হবার নয়। ও পাট তুলেই দিলাম।

স্নাহা ছেড়ে উঠে পড়ল স্নাহা—আমার কথা শোন এনা। এত বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়ে এটুকু বোঝ না, আজকালকার দিনে লেখাপড়াটা কত দরকারী ? লক্ষ্যটি। পড়া ছেড়ে না। আমি তোমার পড়াব। আর শুধু পড়ান নয়, গ্যারান্টি দিয়ে পাশ করাবই করাব। রাখবে আমার মাঠার ? রাখবে ?

এমন লক্ষ্যটি ? হঠাৎ কেমন বুক বড়কড় করে স্নাহাসের চোখে-মুখে ভাবার কোনখানেই আর সংকট ভাব দেখাছিল না সে। ছুটো মিনতি-মাধান চোখ নিয়ে বেন ভিক্টরের মত হাত পেতে কাঁড়িয়েছে। ও ছুটো চোখের দিকে আবার চোখ তুলে তাকানর সাধি নেই আর এনাকীর। বৃকের উত্তাল-পাখাল চেষ্টাকে কষ্টে দমন করল সে, অকুট স্বরে শুধু বলতে পারল—আমি এবার বাই।

হুহুর্ন্তে চোখের দুটি পাশে গেল স্নাহাসের। তখনই গলার বলল—না বাবে না। আমার কথার উত্তর দিয়ে বাও।

তার পর হঠাৎ এনাকীর দিকে তাকিয়ে সমতায় ভরে উঠল মন। যেচোরী মুখ তুলে তাকাতো পৃথক পাচ্ছে না, ধর-ধর কাঁপা হাতটা পিঠের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আঁচলটা টেনে আমল সামনে। এক হুহুর্ন্ত চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, তার পর আবছা স্বরে বলল—আমি ভেবে দেখি। একটু আগও সহজ, বহুদত্ত ছিল। বৌকের মাথার আবেগের তাড়নায় অমন করে নিজেকে প্রকাশ করে যেলা মোটেই উচিত হয়নি। এখন একটা বাণবিন্দু হৃদয়ের মতই ছটকট করছে এনাকী। তার চোখের আড়াল হোতে পারলে বেন বাঁচে।

মায়া হোল স্নাহাসের। হেসে বলল—আচ্ছা বেশ, ভেবেই বোল। কিন্তু শেষ হুহুর্ন্তে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না।

আজ্ঞে ডাকল—এনা। এনাকী থমকে কাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার কি বলবে স্নাহা ? এর পরে ও কি আর বলবে ? আর বেশি শুনেতে তার বে গা কাঁপছে, চোখ ঠেলে কান্না আসছে। না, না, আর সে শুনেতে চায় না। মত ত সে জানিয়েছে। আবার কি ? সে কি তার চোখের তাহার আজ্ঞা তার মনকে বোঝেনি ?

কোন কথা নয়, স্নাহাস এগিয়ে এসে এবার এনাকীর ছুটো দুটি চোপে ধরল। আবেগ-কাঁপা গলায় বলল—নিজের মনকে ছুঁয়েছ এনা ? এত কাল আমার চোখ দিয়ে তুমি নিজেকে চিনেছ, এবার তোমার চোখ দিয়ে আমার চিনে নাও।

হঠাৎ শায়ের লক্ষে হুজনেই চমকে উঠেছে। স্নাহা চমকে হাড ছেড়ে দিচ্ছে। পর্দার ওশানে স্নাহা চায়ের কাপ নিয়ে এসে কাঁড়িয়েছে। এনাকী একটা বড়ের মতই পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। স্নাহা বলছে—আরে চা-টা খেয়ে বাও।

কিন্তু এনাকী ততক্ষণে উঠাও। অরম্য এ প্রাণবতাকে কি দিয়ে ধরবে এনাকী ? বড়ের দাপট এখুঁটা রুদ্ধ ঘরের সব কিছু বেন উলোট-পালোট করে দিয়ে গিয়েছে স্নাহা। তাহা নয়, ভঙ্গি নয়, শুধু মাত্র দুটি দিয়ে একজন তাকে তার মনের মত তৈরী করে তারপর ভিক্টরের নীনতা নিয়ে এসে কাঁড়িয়েছে। সে কি জানে না এনাকী তারই উপযুক্ত হোতে চেষ্টা করেছে এত কাল ? আশ্চর্য্য। এনাকী নিজে কি জানত ? আজ এ হুহুর্ন্তের আগে ? না জানত না। না কি মনে মনে জানত নিজেকে, চিনত। কে জানে। এখন সে চিনেছে, এখন যে জেনেছে সে ত মিথ্যে নয়। একটা বকী প্রজাপতির মতই বেন উড়তে উড়তে এসে পাঁড়াল রান্নাঘরের দুরোরে। হু'হাত হু'দরজার কাঠে বেধে কেমন লজ্জা-লজ্জা স্বরে বলল—না মা। লেখাপড়া বাঁধ দেওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। চেষ্টা করতে দোষ কি ? কাল থেকে তুলেই বাই। পড়াশোনাত লজ্জা কি মা।

"লোকে বলে, এই ত ছুনিয়া। কিন্তু এই কি যুক্তি। পৃথিবী কি শুধু অতীতের জন্ত। মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে। নূতন কিছু কি সে করনা করিবে না। উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে। বাহা বিগত তাহা যত, কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রবৃত্ত করিতে থাকিবে।"—দরশনজ্ঞ।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় -সানলাইটের অতিরিক্ত ফেনাই এর কারণ



ছোট বিজয়ছট্টমি আরম্ভ করেছে—বাঁবার সাঁট পরে খুব মজা পাচ্ছে ও। কিন্তু সাঁটটি কি পরিষ্কার দেখুন, যেন অকম্বল করছে—মায়ের সানলাইট দিয়ে কাচা অন্যান্য সব জামাকাপড়ের মতই। একবার এই জামাকাপড়, বিছানার, চাদর, তোয়ালের গাদাটির দিকে দেখুন। এগুলি কাচা হয়েছে একটুখানি সানলাইটেই। সানলাইটের মোলায়েম অতিরিক্ত ফেনা এত পরিষ্কার করে—আর বিনা আছাড়ুই এটিটি ময়লার কথা বার করে দেয়।

সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

S. 260-X52 BQ

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।



[Osamu Dasai's "THE SETTING SUN"-এর অঙ্কন]

প্রথম অধ্যায়

সাপ

অষ্ট কাক্তরোজ্ঞ কান এল। এই তো মা খাবার ঘরে বসে স্থপ খাচ্ছিলেন, এরই মধ্যে কি হ'ল আবার? স্থপে কিছু পড়েছে ভেবে জিজ্ঞেস করলাম—চল?

না, বলে মা নির্বিকার ভাবে আর এক চামচ স্থপ মুখে দিলেন। সেটুকু শেষ হ'লে বাড়ি কাৎ করে রান্নাঘরের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে ঢেরী গাছটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন এবং ঐ অবস্থার আরও এক চামচ স্থপ টোঁটের ফাঁকে চালান করে দিলেন। 'মহিলা-পত্রিকা'র বহুবর্ষিত স্থপ খাওয়ার পদ্ধতি হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে প্রথার মা স্থপ খান, তাকে পাখীর ডানা ঝাপটানোর সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে না।

আমার ছোট ভাই 'নাওজি' একদিন রঙের মাখার বলেছিল— নামের সঙ্গে যেতাঁব জোড়া থাকলেই কিছু আর অভিজাত হওয়া যায় না। ঐকান্তিক একখানি মাত্র সজ্জা নিয়েও বহু লোক যথেষ্ট মজ্জিত হয়, আবার আমাদের মত ঐনেকে যেতাঁবমাত্র সখল করে চণ্ডালেরও অধম বনে গেছি। যেমন ধর ইরানীমাকে (ভর ইকুলের এক সহপাঠী কণ্ডিউ) দেখে বাস্তার যে কোন দালালের

চেয়েও বেশী অজ্ঞান লাগে কি না? ততভাগা তার কোন আত্মীয়ের বিয়েতে মাকিগী ডিনার জ্যাকেট পরে এসেছিল। পোষাকটোর যদি বা কোন অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু খাবার টেবিলে সে যেভাবে ভারী ভারী শব্দের বাঁধা কৈরী করে বসে চালালো, তাতে আমার রীতিমত গা ফুলিয়ে উঠছিল। এই জাতীয় সজ্জা বাহাদুরির সঙ্গে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। ইউনিভারসিটি ঘিরে যেমন 'উচ্চ শ্রেণীর নিবাসের' ছড়াছড়ি, অভিজাত বলতে তেমনি 'উচ্চবরের ভিখারীর' দলকে বোঝায়। যথার্থ নীল রক্ত বাসের গারে আছে, তারা ইরানীমার মত হামবড়াই করে না। আমাদের পরিবারে একমাত্র মা হলেন খাঁটি সোনা। তাঁর মধ্যে একটা কিছু আছে, যা আমাদের নাগালের বাইরে।

স্থপ খাওয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন? আমরা শিখেছি প্রেটের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে, চামচটাকে কাৎ করে স্থপে ঢুবিয়ে মুখে তুলতে। মা কিন্তু মাথা খাড়া রেখে, সোজা হয়ে বসে বা হাতের আঙ্গুলগুলি টেবিলে ভর দিয়ে প্রেটের দিকে না তাকিয়েই স্থপ খান। এত দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন ভাবে মা চামচে স্থপ তোলেন যে, পাখীর টোঁটের সঙ্গে দিবি তার তুলনা চলে। চামচটাকে মুখের আড়াআড়ি ধরে আলগোছে টোঁটের ভেতর তরল পদার্থটিকে চালিয়ে কেন। তারপর চারিদিকে আনমনা দুই বুলিয়ে পাখীর ডানা ঝাপটানোর মত চামচটাকে ফট-ফট করে ঝেড়ে নেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, এক কৌটা স্থপও বাইরে পড়ে না; চুচুক দেওয়ার শব্দ তো হয়ই না, এমন কি প্রেটের ওপর চামচ নামিয়ে রাখার শব্দও হয় না। হয়ত তথাকথিত ভরসমাজের নির্দিষ্ট চাল-এর সঙ্গে মায়ের স্থপ খাওয়ার ধরণটুকু মেলে না, কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য কম নয়। এটুকুই যেন সবচেয়ে খাঁটি মনে হয়। বাস্তবিক প্রেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাওয়ার চেয়ে মায়ের মত সোজা বসে খেলে স্থপটাতে যেন অনেক বেশী স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু নাওজির ভাষায় উচ্চবরের ভিখারী হওয়ার দরুণ মায়ের মত আনন্ডে স্থপ খাওয়া আমার হয়ে ওঠে না। ভর সমাজের চলতি বেওয়াজ মত গোমড়া মুখ প্রেটের ওপর ঝুঁকিয়েই খাট।

সাধারণতঃ টেবিল-ভরসা বলতে বা বোঝায়, শুধু স্থপ কেন, ব্যবহার্য আহাৰ্য্যের প্রতি মায়ের ডকীটাই তার থেকে আলাদা। মাংস পাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁকি-কাটার সাহায্যে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেন, তারপর কাটাটিকে ডান হাতে নিয়ে খুঁশি মনে একটির পর একটি টুকরোর সন্ধ্যাবহার করেন। আবার আমরা যখন শব্দ না করে মুরগীর হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে হিম্মিমু খাচ্ছি, ততক্ষণে মা দিবি নির্বিকার ভাবে হাড়টি হাতে তুলে নিয়ে মাংসতে কামড় বসান। এ ধরনের অভ্যাস চারণ কেবল যে ভাল লাগে তা নয়, কেমন যেন শ্রীতির উল্লেখ করে। নির্ভেজাল পদার্থ অন্তরকর হতে বাধ্য।

আমি অনেক সময়ে ভেবেছি যে, আঙ্গুল দিয়ে খেলে খাবারের স্বাদ বেশী ভাল লাগবে, কিন্তু খাই না, কারণ আমার মত উচ্চবরের ভিখারী মায়ের নকল করতে গেলে আসল ভিখারীর মত দেখাবে।

আমার ভাই নাওজি বলে, মায়ের সঙ্গে আমাদের কোন তুলনাই হয় না। মাঝে মাঝে নকল করতে গিয়ে নাকাল হয়েছি, একথাও ঠিক। একবার শরৎকালে আমাদের নিশিকান্তা টোঁটের বাড়ীতে অপূর্ণ জ্যোৎস্না রাতে মা আর আমি বাগানের মধ্যে

পুত্রপাণ্ডের অটিচারার বসে চাকের খোঁজা দেখছিলেন। হঠাৎ মা কাহাফাছি একটা প্রফুটিত পুশপাণ্ডের কাছে গিয়ে সাদা সাদা ফুলের মধ্যে থেকে হাসতে হাসতে আমায় ডাক দিলেন—

কাছুকা, বলতো তোমার মা এখন কি করছেন?

ফুল তুলছেন।

মা এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন, হাঁ, হাঁ।

আমি অল্পভব ফরলাম তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা করার মত এমন একটা বাঁটি বস্তু আছে, বার অল্পকণ করা অসম্ভব।

সকালে স্থপ খাওয়ার গল্প করতে বসে কোথার সরে এসেছি, সে কথা থাক, কিন্তু সম্প্রতি একটা বইয়ের পড়লাম, ফরাসী রাজতন্ত্রের যুগে সম্রাট মহিলারা রাজকোঠানে অথবা বাতায়ানের পৃথক বাক নিজেদের হাফা করতে আদৌ বিধাবোধ করতেন না।

এ ধরনের সহজতা ভারি ভাল লাগে আমার এবং আমি অবাক হয়ে ভাবি, মা বুঝি সেই মহিলাদের শেষ নিদর্শন।

বাই হোক, আজ সকালে স্থপ খেতে খেতে মায়ের অফুট চিংকরে চমকে গিয়ে বধন প্রায় ফরলাম, 'চুল' কি না, মা অবাক দিলেন না।

স্থপ বেশী হয়েছে?

রেশম পাওয়া মার্কিনী টিনের চালানী মটরগুটি দিয়ে আজকের স্থপটা আমি পাতলা করেই রেখেছিলাম। বাঁধুনি হিসেবে নিজের গুপের আঁখি আমার নেই, বহির্ প্রত্যেক মেয়ের অব্যবহিত শিক-তালিগার মধ্যে রাখাও পড়ে। সেই কারণেই মা বলছেন খাণ্ডাণ হয়নি, তবু স্থপের অস্ত্র আমার হৃদয়নার অস্ত্র নেই।

গভীর ভাবে মা বললেন—স্থপটা চমৎকার হয়েছে। সেইটু শেষ করে সাহুত্রিক শাকভাজনো ভাতের মণ্ড খেলেন।

সকালে খেতে আমার কোন দিনই ভাল লাগে না, বেলা ৪টার আগে ক্ষেপে পায় না। আজ সকালে স্থপটা কোন মতে গলা দিয়ে নামল বটে, কিন্তু আর কিছু খেতে চাওয়া বকমারি। কয়েকটা মণ্ড প্রেটে নিয়ে চপটিক দিয়ে খুঁচির খুঁচির আলু-ভাতে বানিয়ে কেললাম। চপটিকে সামান্য একটু তুলে, মায়ের চামচ ধার মত ছুঁধের আড়াবাড়ি ভাবে ধরে, তাই দিয়ে পাখী খাওয়ানোর মত মুখের মধ্যে ঠেলে দিলাম। খাবার নিয়ে আমি এই কাণ্ড করছি, ইতিমধ্যে মা নিঃশব্দে উঠে সকালের সূর্যের আলোর ভঙ্গু দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে আমার খাওয়া দেখলেন।

কাছুকা—ওভাবে খেও না। সকালের খাওয়াটা সবচেয়ে তৃপ্তি করে খাওয়া উচিত।

মা তোমার তৃপ্তি হয়?

আমার কথা ছেড়ে লাও, এখন আমি সেয়ে উঠছি।

কিন্তু আমার তো কোন অল্পখই করেনি?

না, না। ম্লান হেসে মা বাড় নাড়লেন।

পাঁচ বছর আগে ফুলফুলের রোগে আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলাম। সে রোগ অল্প সম্পূর্ণ বেজ্ঞার বাধিয়েছিল। স্নায়বিক দুর্বলতা এবং মনোগোঁড়ই মায়ের বর্তমান অল্পহতার কারণ। তাঁর একমাত্র হৃদিতা ছিল আমার নিয়ে।

আঃ, আমার মুখ কসকে বেরিয়ে গেল।

কি হল? এবার মায়ের প্রায় করার পালা।

পরম্পরের চোখে চোখ পড়তে দু'জনেই পূর্ণ সহায়ত্বভূতি অল্পভব করলাম। আমি হেসে উঠতে মায়ের মুখেও হাসি ফুটল।

হৃদিতা আমার মনকে নাড়া দিলেই এ ধরনের শব্দ আমার অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বছর তিনেক আগে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ সাক্ষাৎ ঘটনাগুলি হঠাৎই ছবির মত মনের মধ্যে ভেসে ওঠে এবং আমি টের পাবার আগেই মুচ আর্দনাদ আমার মুখ কসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের মুখে ঐ কল্প শব্দটুকুর কারণ কি? আমার মত অতীতের কোন হৃদিতা নিশ্চয়ই তাঁকেও টিক এই মুহুর্তে নাড়া দেয়নি। না, কিন্তু কারণ একটা আছেই।

মা—একুশি তুমি কি ভাবছিলে?

তুলে গেছি।

আমার বিষয়?

না।

নাওজির বিষয়?

হ্যাঁ, তারপর কৃত্তিকে আত্মসম্বরণ করে এক পাশে মাথা হেলিয়ে বললেন—বোধ হয়।

আমার ভাই নাওজি ইউনিভারসিটিতে পড়তে পড়তেই যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে ওরা তাকে চালান করে দেয়। আমরা তার কোন খবর পেতাম না এবং যুদ্ধ বিরতির পরও আজ অবধি সে নিখোঁজ। মা ধরে রেখেছেন ছেলের

ও-আমি-সি-এস-এস

অশোক কার্ডিয়াল



জীরোগে—ও, আর, সি, এল-এর অশোক কার্ডিয়াল বোতল ও চিকিৎসক-বৃন্দের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত; কারণ ইহার প্রতিটি উপাদানের প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড

কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

সঙ্গে তাঁর এ জীবনে দেখা হবে না। অন্ততঃ মুখে তাই বলেন কিন্তু আমি একবারও হাস ছাড়িনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।

ডেবেছিলাম, তার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি, কিন্তু তোমার ঐ সুবাহু নৃপতি তার কথা মনে করিয়ে মিল। এ ভাবনা আর বেন সহিতে পারি না। এখন মনে হয়, ওর দিকে আমার আরও অনেক বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল।

হাইস্কুলে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাওজির দাফন সাহিত্য-শ্রীতির উল্লেখ হয়। সেই অবধি সে দারিদ্র্যজনন-হীন জীবন বাশন করতে শুরু করে। মায়ের হৃৎস্বর সীমা রইল না। তার এ-ধরণের দারিদ্র্যজনন-হীনতা সন্তোষ'মা স্পষ্ট-খেতে খেতে তার কথাই ভাবছিলেন। রাগে আমি শাব্যরটুকু জোর করে হৃৎস্বর মধ্যে পুরে দিলাম, আমার চোখ ছুটো আশা করে উঠল।

সে বহালতবির্যতেই আছে। বাসা আছে নাওজি। ওর মত হস্তভাগাদের মরণ নেই। বারা সং, বারা সুল্লর, বারা বিনরী তারাই আগে ভাগে খতম হয়ে বার। মাখার লাঠির বাড়ি মারলেও তোমার নাওজি মরবে না।

মা হাসলেন—তার মানে তুমিই বোধ হয় আগে বাবে।

আমার ঠাটা করলেন না।

আমি কেন মরব? আমি মন্দ, আমি কুৎসিত। আঙ্গীটা বহর হেসে-খেসে কাটিয়ে দেব।

সত্যি? তাহলে তোমার মা নরকই বহর বাঁচবেন বল?

বাঁকে গিয়ে আমি বললাম—নিশ্চয়ই। হস্তভাগারা বহুকাল বাঁচে, সুল্লরেরা জন্ম বরসে মরে। আমার মা সুল্লরী, কিন্তু আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। কি যে বলব ভেবে পেলাম না। চটে গিয়ে বললাম—কেবল আমার কান্দে ফেলবার চেষ্টা না? নীচের চৌটাটা ধর-ধর করে কেঁপে উঠল, চোখের জল সামলানো দায়।

সাপের গল্পটা করা উচিত কি না বুঝতে পারছি না। দিন চার পাঁচ আগে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা বাগানের বেড়ার খোঁটার লুকনো বাহো-তেতটা সাপের ডিম খুঁজে পায়। তাদের বিশ্বাস যে, ডিমগুলো বিবাক্ত সাপের। ভেবে দেখলাম, বাহোটা সাপ যদি সারাক্ষণ বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়, তবে আগে কে কে সাবধান না হয়ে বাগানে ঢোকা দায় হবে। বাচ্চাদের বললাম—ডিমগুলো পুড়িয়ে ফেলা বাক, কি বল? বাচ্চারা হৈ-হৈ করে আনন্দে নাচতে নাচতে আমার সঙ্গে চলল।

বোপের কাছে এক রাশ ঝড়কুটো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে একটার পর একটা ডিম ছুড়ে দিলাম। বহুকণ গেল, তবু সেগুলো পুড়ল না। বাচ্চারা বেশী করে ডাল-পাতা দিয়ে আগুনটা উত্তেজিত দিল। তবু ডিমগুলো যেমনকার তেমনই রয়ে গেল। রাস্তার ওধানের বাড়ীর মেয়েটি বেড়ার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কি?

সাপের ডিম পুড়োচ্ছি। ভয় করে, পাছে বিবাক্ত সাপে বাড়ী ছেয়ে যায়।

ডিমগুলো কত বড়?

ধরখাবে সাপা হাঁসের ডিমের সাইজের।

তাহলে ওগুলো চোঁড়া সাপের ডিম। বিবাক্ত নয়। কাঁচা ডিম পোড়ে না, জানো তো?

কি বেন মজার বাদ পেয়েছে, এই ভাবে হাসতে হাসতে চলে খেল মেয়েটি।

আধ ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলল—কিন্তু ডিমের অবস্থা যে-কেনে সেই। আমি বাচ্চাদের আগুনের তাক থেকে টেনে এনে ডিমগুলো গ্রাস গাছের গোড়ার পোতবার বন্দোবস্ত করলাম। কতকগুলো ছড়ি যোগাড় করে সমাধির ব্যবস্থা হল। হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে বাচ্চাদের বললাম—এস একটু প্রার্থনা করে নিই—কেমন?

বাচ্চারা আমার কথামত হাত জোড় করে পেছন দিয়ে বসে পড়ল। সব সেরে আমি বাচ্চাদের সঙ্গে ভাগ্য করে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠি এলাম। সিঁড়ির মাথার মটরলতার মাদানের ছায়ার দাঁড়িয়ে মা বললেন—এ কি নিষ্ঠুরতা?

আমি ডেবেছিলাম, ওগুলো বিবাক্ত সাপের ডিম হবে বুঝি, কিন্তু তা নয়, একেবারেই চোঁড়া সাপের ডিম। বাই হোক, ওদের ভাল করে সমাধি দিয়েছি। হৃৎস্বর করার আর কোন কারণ নেই। মনে মনে ভাবলাম, কি কুৎসেই না মা আমার ধরে ফেললেন।

কুলকার নয়, তবে দশ বছর আগে, আমাদের নিশিকাতা স্ত্রীটির বাড়িতে বাবার মৃত্যুর পর থেকে সাপ সব্বদে মায়ের মনে কি এক আতঙ্ক আছে। ঠিক বাবা মারা বাবার আগে একটা ছোট কালো স্ত্রুতো বিজ্ঞানীর পাশে পড়ে থাকতে দেখে মা অজ্ঞানমনস্ক ভাবে সেটাকে ভুলে ফেলে দিতে গিয়ে দেখেন স্ত্রুতো নয়, সাপ। ঘরের পাশে বারান্দা মত পথ দিয়ে সাপটা পিছুলে বেরিয়ে গেল। শুধু মা আর আমার ওরালা মামা দেখেছিলেন। তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে রইলেন, পাছে শব্দ মুহূর্তে বাবার শাস্তির ব্যাঘাত হয়। সেইজন্য আমি আর নাওজি সে সময়ে সে ঘরে উপস্থিত থাকা সম্বন্ধে কিছুই টের পাইনি।

কিন্তু বৈদ্যন সন্ধ্যার বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—সেদিন আমি বাগানে পুকুরপাড়ে সব কাটা গাছে সাপ জড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তখন আমার উনত্রিশ বছর বয়স, দশ বছর আগে ছিল উনিশ, নেহাৎ কচি খুঁকি তো নয়। দশটা বছর পার হয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু সেদিন বা বা ঘটেছিল, আজও সে সব কথা আমার মনের মধ্যে পরিষ্কার আঁকা আছে, ভুল হবার বো নেই। পুকুর-পাড়ে ঘুরে ঘুরে পুন্ডার ফুল তুলছিলাম। আকালিয়া (azalea) ঝাড়ের কাছে আসতে মগ, ডালের আগার জড়ানো একটা সাপ চোখে পড়ল। গাটা শিউরে উঠল। সেখান থেকে এগিয়ে কোরিয়া গোলাপের একটা ডাল কাঁটে গিয়ে দেখি, সেখানেও সাপ। পালাপাশি সারপের গোলাপ, পেপল, জুন, উইস্টেরিয়া; চেঁরিগাহ সর্ষক, প্রত্যেকটি বোপে, গাছের ডালে একটা করে সাপ। খুব বে ভয় পেলাম, তা নয়। ভাবলাম আমার মত এই সাপের গুটি বাবার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পরে বাগানের এই সাপদের কথা ফিসফিস করে মাকে বললাম। তিনি শুধু এক পাশে মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন—বেন কি এক গভীর চিন্তার ময়। হৃৎস্বর অবশ্য কোন মন্তব্য করলেন না।

একবার ঠিক যে, এই ছুটি ঘটনার পর থেকেই,

গ্রামের বিতরণ কর্তৃপক্ষ হইল। এর থেকে এদের সংখ্যক মায়ের মনে উৎসাহ, আতঙ্ক ও আশঙ্কা বাসা বাঁধে।

আমার শাপের ভিম গোড়াতে দেখে নিশ্চয় তাঁর মনে অমঙ্গল-আশঙ্কা জাগে। একথা খোলা হতেই নিজের নির্বিকারতার গুরুত্ব বুঝলাম।

হয়ত বা অন্তর্দ্বারা আমি মায়ের কোন অমঙ্গলই ডেকে এনেছি—এই হুশিয়ার হাত বেশ কিছুকাল এড়াতে পারিনি। এবং এত সব ঘটনার পর স্নানের স্বস্তি হওয়ার মস্তব্য করে আবেগ-ভাবোন্মত্ত কণা দিয়ে চাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস চোখের জলে শেষ করলাম। পরে প্রান্তরশায়ের বাসনপত্র সরাতে গিয়ে একটা অসুস্থ জালা অল্পভব করলাম, যেন একটা কাল সাপ মায়ের আয়ুর প্রাতি নিশানা রেখে আমার বৃকের ভেতর বাসা বেঁধেছে। সেদিনই বাগানে একটা সাপ দেখলাম। সকালটা ভারি স্বন্দর, স্নিগ্ধ দেখে রান্নাঘরের পাট সেয়ে, একটা বেতের চেয়ার মাঠে টেনে নিয়ে বসে বসে উল বুনতে সাধ হল। চেয়ার হাতে বাগানে পা দিতেই কানার ঝাড়ের পাশে একটা সাপ নড়তে পড়ল। প্রথম কথা মনে হল কিরে বাই, গাভী-বারান্দার চেয়ার টেনে সেখানেই বোনা দিয়ে বসলাম। বিকেলে বাগানের শুধারে গুলোমের লাইব্রেরী থেকে মারী লংব্লিনের এক ভলুয়াম ডবির বই আনতে গিয়ে দেখি, একটা সাপ মন্থর গতিতে মাঠে পেরিয়ে চলেছে। সেই সকালের স্বন্দর, সাবলীল সাপটাই পরম শান্তিতে চলেছে। বুনো গোলাপের ছায়ায় এসে, মাথা ঝাড় করে আগুনের শিখার মত ভয়ঙ্কর জ্বল বের করে মাড়তে লাগল। কি যেন খুঁজছে মনে হল, কিন্তু একটু পরেই মাথা নীচু করে পরম স্নানভরে মাটিতে পড়ে গেল। মনে মনে বললাম—নিশ্চয় সাপিনী! তখন পর্যন্ত তার সৌন্দর্যটাই আমার চোখে পড়ছিল; গুলোম থেকে ছবির বইখানা বের করে চেয়ার পাশে সাপের ভায়গাটার চোখ বুলিয়ে নিলাম, কিন্তু সে ভয়ঙ্কর অল্পই হয়ে গেছে।

সন্ধ্যাবেলা মায়ের সঙ্গে চা খেতে বসেছি, বাগানের দিকে চোখ পড়তে দেখি, পাথরের সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে আবার সেই সাপ স্তম্ভপূর্ণে আতঙ্ককাল করছে!

মাও লক্ষ্য করছিলেন—এ কি সেই সাপ? বলতে বলতে দৌড়ে আমার পাশে এসে, আমার হাত ধরে ভয়ে ঠক ঠক করে কীপতে লাগলেন। চট করে তাঁর হুশিয়ার কাণে আমার কাছ ধরা পড়ে গেল।

আমি বললাম—অর্থাৎ সেই ডিম্বের মা?

অতিকষ্টে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

নিঃশব্দে দম বন্ধ করে আমরা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাপটা অলস ভাবে পাথরের ওপর ওঠিয়ে গুল এবং তার পরেই নড়তে শুরু করল। এলোমেলো গতিতে, দুর্বলভাবে সিঁড়ি পেরিয়ে কানার বেণের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ফিস-ফিস করে বললাম—সকাল থেকে এটা বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘাশ ক্লে মা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। হতাল ভাবে বললেন—ঠিক তাই হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি যেটার ডিমগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কি করব তেবে না শেষে বোকার মত হেসে উঠলাম। অন্তর্গামী

স্বর্ঘ্যের আভা মায়ের চোখ হঠাৎ গাঢ় নীলের ছায়া কেলেছে। ঈষৎ ক্রোধের ভাব ফুটে উঠলো—এমন অশরুপ হয়েছে যে, ছুটে গিয়ে কোলে বাঁশিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। এইমাত্র যে সাপটাকে আমরা দেখলাম, মনে হ'ল মায়ের এখনকার চেতনার সঙ্গে তার কোথাও মিল আছে। কেন যে অল্পভব করলাম কুৎসিত সাপটা আমার বৃকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, শেষ পর্যন্ত সে একদিন বিবাহময়ী মা সাপটিকে আত্মসাৎ করবে।

মায়ের নরম, সুগঠিত কীথের ওপর হাত রাখলাম। সেসময়ে আমার শরীরের ভেতর যে দারুণ আলোড়ন বয়ে গেল, তা বোঝাবার ভাষা আমার জানা নেই।

যে বছর জাপান বিনাস্তে আত্মসমর্পণ করে, সে বছর ডিসেম্বর মাসে আমরা নিশিকাতা ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ইজু (Izu)-তে চিনা-প্যাটার্নের এই বাংলার উঠি এলাম। বাবার সত্যার পর থেকে মায়ের ছোট ভাই 'ওয়ার্ল'মামা, বর্তমানে ইনিই মায়ের একমাত্র রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়—আমাদের সম্পত্তির তদারক করছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষে মামা মাকে জানালেন, ছানিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে, আগের মত বাবুয়ানা আর চলবে না। আমাদের বাড়ী বিক্রি করে চাকর-বাকরকে জবাব দিয়ে দিতে হবে; স্ত্রীরাই দেশে-গ্রামে ছোট একখানা বাড়ী কিনে হুঁজনে নিবিবিলিতে থাকাই ভাল। টাকা-পয়সা লব্ধক মা শিল্পর চেয়েও অজ্ঞ ছিলেন, কাজেই ওয়ার্লমামার এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি যেমন ভাল বোঝেন, সেই ব্যবস্থাই করতে বলে দিলেন। নভেম্বর মাসে মামার কাছ থেকে এক জরুরী ডাকের চিঠি এল, ভাইকাউন্ট কাওয়াটা (Viscount Kawata)র বাড়ী বিক্রির খবর নিয়ে। বাড়ীর ভিত্তি বোঝে উঁচু, চার পাশের ভূত ভাল, আধ একর আশ্রয় ঘাসের জমি আছে। এ ছাড়া জায়গাটা গ্রাম ফুলের অল্প বিখ্যাত। শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকে।

ওয়ার্লমামা চিঠির শেষ দিকে লিখেছিলেন—আমার বিবাহ, জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হবে। তবু ভুললোকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। কাল একবার আমার আশিনে আসতে পার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মা, তুমি বাবে?

অতি হুঁশে মুহূর্তেই সে মা জবাব দিলেন—যাব বৈ কি! ডেকেছে যে!

দুপুরের পরেই মা রওনা হলেন। আমাদের পুরনো ছাইভার তাঁর সঙ্গে গেল এবং সন্ধ্যা আটটা আশ্রয় মাকে কিরিয়ে আনল।

আমার ঘরে চুক থেকে ভরা দিয়ে এমন ভাবে বসে পড়লেন যে, মনে হল এখনি বুঝি অজান হয়ে পড়বেন।

সব ঠিক হয়ে গেল। এইটুকুই শুধু বললেন।

কি ঠিক হয়ে গেল?

সহ।

কিন্তু চমকে উঠলাম—বাড়ীটা একবার চোখের দেখাও দেখলে না?

ডেকের ওপর কইলী তুলে, হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরে, দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে মা উত্তর দিলেন—তোমার ওয়ার্লমামা বলছেন জায়গাটা ভালই। মনে হচ্ছে চোখ খোলবার কুসল

পাব না, তার আগেই সেখানে গিয়ে উঠতে হবে। এককণে মাথা তুলে বৃহৎ হাসলেন, মায়ের মুখখানা অত্যন্ত কাতর ও স্নানর দেখাচ্ছিল।

ওরালামামার প্রতি মায়ের অন্ধ বিশ্বাস দেখে বিস্মৃতভাবে আমি উত্তর দিলাম—তা তো বাটেই।

তাহলে তুমিও চোখ বুজেই থেকো।

এবার আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম, কিন্তু হাসি খামস্তেই রাজ্যের অন্ধকার মনের ওপর চেপে এল।

এর পর থেকে প্রতিদিন কুলিরা এসে বাড়ী বদলের জিনিষপত্র বাঁধাধা করে। মাঝা একদিন নিজে এসে বিক্রির মালপত্র-গুলোর ব্যবস্থা করে গেলেন। আমাদের কি ‘ওকামী’ আর আমি জামাকাপড় গোছান, আবর্জনা বাগানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা, এ ধরনের কাজে ব্যস্ত রইলাম।

মা কিন্তু মোটেই সাহায্য করতে রাজী হলেন না। নিজের ঘরে এটা-ওটা করে কাটালেন।

একদিন আমি সাহস সঞ্চর করে, একটু রাগের মাথার জিজ্ঞেস করে বললাম, ব্যাপার কি? তোমার কি ‘ইচ্ছু’তে যেতে ইচ্ছে নেই না কি? একান্ত উদাস ভাবে জবাব দিলেন—না। রাজ্যের ত্যাগজ্যোড় করতে দিন দশেক কেটে গেল। এক সন্ধ্যার আমি আর ওকামী কিছু বাজে কাগজ, খড় ইত্যাদি বাগানে নিয়ে পোড়ান্ধি, এমন সময় মা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার এসে দাঁড়ালেন এবং নিঃশব্দে অসঙ্গত আঙনের দিকে চেয়ে রইলেন। একটা ঠাণ্ডা পশ্চিমা হাওয়া উঠেছিল—ঘোঁরাটা মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি যুথ তুলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম, মায়ের এমন রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারা বহু কাল চোখে পড়েনি। আমি চেষ্টা করে উঠলাম—মা, তোমার তো মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না?

হাসিমুখেই জবাব দিলেন—ও কিছু নয়। তার পর আবার নিঃশব্দে ঘরে ফিরে গেলেন। সে রাতে আমাদের বিছানা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল বলে ওকামী একটা সোফার ওল। আমি আর মা প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে আনা বিছানা মায়ের ঘরে পেতে ওলাম। মায়ের দুর্বল কণ্ঠস্বর ভর পেলাম। মা বললেন—কেবল তোমার জন্তেই বাওয়া। তুমি আছ বলেই আমি ইচ্ছুতে যেতে রাজী হয়েছি।

অভাবনীর এই মস্তব্যে ঘাবড়ে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলাম—আর ঘর যদি আমি না থাকতাম?

হঠাৎ মা কঁদে ফেললেন—আমার পক্ষে সবচেয়ে সোজা রাস্তা ছিল মৃত্যু। তোমার বাবা এখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, এখানে মরতে পারলে কোন দুঃখ ছিল না। ভাড়া-ভাড়া কথা কান্নার জড়িয়ে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে উচ্চারণ করলেন।

এ পর্যন্ত মায়ের এমন অসহায় রূপ কোন দিন আমার চোখে পড়ে নি, এমন ভাবে কান্নার ভেঙ্গেও পড়েনি। বাবার মৃত্যুর সময় না, আমার বিয়ের সময় না, সন্তান পেতে নিয়ে বেবার তাঁর কাছে আমি তখনও না, হাসপাতালে বধন মা ছেলে হ’ল, তখনও না; পরে বধন অরুহ হয়ে দীর্ঘকাল শয্যা নিই তখনও না। এমন কি নাগজি বধন অত্যন্ত অজ্ঞার কাছ করে তখনও থাকে এক কাতর

দেখিনি। বাবার মৃত্যুর পর এই ৪৮ বছর ধরে মা ঠিক বাবার জীবিতকালের মতই শাশু-স্বহৃদ্য ভাবে কাটিয়েছেন, নাগজি আর আমি সেই সুযোগে খুশি মত বেড়ে উঠেছি, কখনও কিছুতে মাথা ঘামাই নি। এখন মায়ের টাকা ফুরিয়েছে, একটুকু অসহায় প্রকাশ না করে সমস্ত টাকা আমাদের দুই ভাই-বোনের জন্য খরচ করেছেন। আজ সংসার গুটিয়ে সহায়সম্পদহীন অবস্থার অজানা এক ছোট বাড়ীতে নতুন করে সংসার পাততে বাধ্য হয়েছেন। মা যদি কুপন হ’তেন, আমাদের বঞ্চিত করে, আর পাঁচ জনের মত গোপন অর্ধাগমের উপায় চিন্তা করতেন, তাহলে আজ সন্ধ্যার উন্টে গেলেও মরণকে এমন আকুল ভাবে ডাক দিতেন না। কীবনে আজ প্রথম আবিষ্কার করলাম অর্ধাভাব কি মাঝামাঝি, শোচনীয় অসহায় অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। বৃকের ভেতর তোলপাড় হয়ে গেল। কিন্তু এত উদ্বেগেও চোখে জল এল না। আমার মনের এই অবর্ণনীয় অবস্থাকেই বোধ হয় মানব-জীবনের মর্যাদাবোধ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেইখানে ছাত্তের দিকে চেয়ে অনড় অচল ভাবে শরীরটাকে পাখরের মত শক্ত করে শুয়ে রইলাম।

বা ভেবেছিলাম ঠিক ভাই, পরদিন মায়ের শরীর বেশ খারাপ হল। এটা-ওটা নিয়ে দেবী করতে লাগলেন বেন, এবাড়ীতে প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে অমূল্য—কিন্তু ওয়ালামামা এসে জানালেন, ইচ্ছুতে চলে যেতে হবে। প্রায় সব জিনিষই আগে রওনা হয়ে গেছে। স্পষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে মা কোঠখানা গায়ে দিলেন, তারপর কোন কথা না বলে ওকামী এবং আমাদের বাকী চাকরবাকর—বারা আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল—তাদের দিকে ফিরে মাথা হেলিয়ে বিদায় সন্ধ্যাপ জানিয়ে নিশ্চিন্তা ঝুঁটির বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন।

ট্রেনটা অপেক্ষাকৃত খালিই ছিল, আমরা বসার জায়গা পেলাম। মামার বেন আনন্দ উল্লে উঠে—গুন-গুন করে ‘নো’ পালার গান ভাঁজছেন। এদিকে মায়ের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ দুটি নীচু করে উদাসীন ভাবে বসে আছেন। নাগাওকায় (Nagaoka) মিনিট পনেরো বাবার পর নেমে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। ছোট একটা গ্রামের দিকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চড়াই উঠে গেছে—তার শেষ প্রান্তে চীন ঠাইলে তৈরী স্মন্দর একটা বালো চোখে পড়ল। উঠে একটা দম নেবার আগেই আমি চেষ্টা করে উঠলাম—বা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী স্মন্দর জায়গা। ভেতরে ঢোকবার আগে একটু থেমে মা বললেন—সত্যি তাই। মুহূর্তের অল্প তাঁর দৃষ্টিতে প্রসন্নতা নেমে এল। আশ্চর্যসদে গদগদ হয়ে মাঝা বললেন—প্রথম কথা হল বাতাসটা ভাল, বাকি বলে বিপদ বারু।

মা হেসে ফেললেন—তাই তো, চমৎকার প্রাণজুড়নো হাওয়া! আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

ভেতরে গিয়ে টোকিও থেকে আমাদের যে জিনিষ পত্র এসেছিল—সেগুলো শেলাম। বাড়ীর সামনেটা প্যাকিং কার্টের বাজের পাহাড় জমেছে। মাঝা আনন্দে একেবারে দিশাহারা হয়ে আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন—একবার বাইরে চলে দেখ—কি অপূরণ দৃষ্ট!

তখন বিকেল প্রায় তিনটে, শীতের পূর্ণা বাগানে ময়দানটার

গারে দ্বিধ পয়শ বুলিরে দিচ্ছিল। ময়দান থেকে এক বাপ সিঁড়ি গ্রাম গাছে ঘেরা ছোট একটি পুকুরের দিকে নেমে গেছে; তারপর আছে কমলা লেবুর বাগান। একটা মেঠো বাস্তার পাশে গানক্ষেত, আভরক্ষেত, সবশেষে—দূরে সমুদ্র চোখে পড়ে। বসার ঘরে বসে সমুদ্রকে ঠিক আমার বুক বরাবর উঁচু মনে হ'ল।

নিশ্চয় গলায় মা বললেন—ভানী দ্বিধ দৃষ্ট! অত্যধিক খুশি গলায় আমি সাই দিলাম—নিশ্চয়ই বাতাসের গুণ। টোকাও'র সূর্য্যের আলোর সঙ্গে এখানকার আলোর কত তফাৎ দেখেছ? বেন দেশী কাপড়ে ছেকে সূর্য্য তার বস্ত্র আমারে কাছে চালান করে দিচ্ছে।

নীচের তলার দু'খানা বড় বড় ঘর—একখানা চীনা-প্যাটার্নের চৈঠকখানা, আর একখানা বসার ঘর, এছাড়া রান্নাঘর, বসার ঘর, স্নানের ঘর, খাবার ঘর সবই আছে। কোতলার বিদেশী কারবার একটি ঘরে প্রকাশ্যে এক বিছানা।

গোটা বাড়ীটা এই, তবু আমার মনে হল আমাদের দুজনের পক্ষে বাড়ীখানা কিছু নিশ্চয় নয়। এমন কি, নাওজি কিরে এলেও বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

সে গ্রামে একটিমাত্র হোটেল, মামা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে সেখানেই গেলেন। শীগ গিরই তিন জনের মত কিছু খাত এলে পড়ায় তিনি বসার ঘরেই বেশ শুষ্কিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলেন। মামার সঙ্গে ছইকি ছিল, তার সাহায্যে আহার অনায়াসে পাকস্থলীর পথ খুঁজে নিল। উল্লেখ ওঠা খুশির তোড়ে তিনি এবাড়ীর প্রাক্তন মালিক ভাই কাউন্ট কাওয়ারটার সঙ্গে চীন অভিবাসনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করলেন। মা নামেই খেতে বসলেন এবং আঁধার ঘনিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিস-ফিস করে বললেন—আমি একটু শুতে চাই।

আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে থেকে বিছানাটা টেনে বের করে মায়ের সঙ্গে ধরাধরি করে পেতে ফেললাম। তাঁকে দেখে কেমন যেন বুকটা ছাঁৎ করে উঠতে ধারমোমিটার বের করে তাপ নিয়ে দেখি ১০.২ ডিগ্রি।

মামা পর্দা খুলে দিলেন। বাই হোক, তিনিই গ্রামের মধ্যে ডাক্তার খুঁজতে বেরোলেন। মাকে ডাকাডাকি করতে তিনি অয়ের ঘরে মাথা নাড়লেন মাত্র।

মায়ের ছোট হাতখানি নিজের মুঠিতে চেপে ধরে কঁদে ফেললাম। মা আমার এত দুঃখী, এত মর্মান্তিক দুঃখী; না গো আমার দুঃখনেই দুঃখী হাছব। আমার কাগা আর থামতে চায় না। কাঁপতে কাঁপতে মনে হল মায়ের সঙ্গে আমিও এই মুহূর্তে মরণকে বরণ করে নিই। আর কিসের আশায় বাঁচা, নিশিকাতা স্ট্রিটের বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে আমাদের বিচবার অর্থ ঘটে গেছে।

প্রায় বঁকা দুই পরে মামা এক গ্রাম্য ডাক্তার নিয়ে এলেন। ভদ্রলোককে বখেই বুদ্ধ বলেই মনে হ'ল। সেকলে পোষাকী জাপানী কাপড় গারে ছিল।

নিমোনিসায় ঝাঁপাতে পারে। বাই হোক, হ'লেও ভরের কিছু নেই। অনিশ্চিত যন্তব্য করে মাকে একটা ইন্জেকশন দিয়ে গেলেন।

পরদিনও অর নামল না। মামা আমার হাতে দুই হাজার

ইয়েন্ (জাপানী ডলার) দিয়ে বলে দিলেন হাসপাতালে পাঠাতে হ'লে টেলিগ্রাফ করে তাঁকে খবর দিতে। সেদিনই তিনি টোকিওতে ফিরে গেলেন। প্রয়োজনীয় বৎসামান্য বাসন-পত্র বের করে সামান্য ভাতের কাছ তৈরী করলাম। মাত্র তিন চামচ মুখে দিয়ে মাথা হেলিয়ে মা আর দিতে বাধ্য করলেন। দুপুরের আগে আবার ডাক্তার এলেন। এবার পোষাকের বটা কিছু কম, তবু হাতের দস্তানাভোড়া ভোলেন নি।

আমি প্রস্তাব করলাম হয়ত, বা মা'কে হাসপাতালে নিয়ে বাওয়া উচিত। ডাক্তার বললেন—না, তার দরকার হবে না। আজ একটা কড়া ইন্জেকশন দেব, তাতেই অরটা নেমে যাবে। আগের দিনের মত তাঁর আঁককের কথাতত্ত্ব বিশেষ ভরসা পেলাম না। কড়া ইন্জেকশন দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

বিকেলের দিকে মায়ের দু'খানা টুকটকে লাল হ'য়ে উঠল—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘাম হ'ল। সম্ভবত: এ সেই আন্তর্য্য ইন্জেকশনের গুণ। রাত্রে মা'য়ের জামা ছাড়িয়ে দিচ্ছি, মা বলে উঠলেন—কে জানে—হয়ত উনি মৃত্যু বড় ডাক্তার।

অরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থার নেমে এল। আনন্দের আতিশয্যে দৌড়ে গ্রামের হোটেল থেকে বাবোটা ডিম ফিরে আনলাম। কয়েকটা নরম সেক করে মাকে খেতে দিলাম। মা তিনটে ডিম আর একবাটি ভাতের কাছ খেয়ে ফেললেন।

নতুন ও পুরাতন
আমাশয়?

নতুন অথবা পুরাতন
আমাশয়ের একটি নির্ভর-
যোগ্য ঔষধ।



ও, আর
সি, এল,
লিঃ
কুমারেশ
হাউস
হাওড়া

ডায়াজেন

পরদিন সেই ডাক্তার আবার তাঁর জমকালো পোষাক পরে এসে উপস্থিত হ'লেন।

তাঁর ইনজেকশনের ওপের কথা শুনে গভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। ক্রান্তবান। ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম। তারপর সবচেয়ে মাকে পরীক্ষা করে আমার দিকে ফিরে বললেন—এখন তোমার মা সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর বা ইচ্ছে করে খেতে দাও।

এমন মজা করে কথা বলেন ভক্তলোক যে হাসি চেপে রাখা দায়। দোর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে দেখি, মা দিবা বিজ্ঞানার ওপর উঠে বসেছেন। নিজের মনেই বললেন—সত্যি ভক্তলোক বিচক্ষণ ডাক্তার বটে! আমার আর একটুও অসুস্থ নেই। সুখের ওপর তারী একটা খুশির ভাব চেয়ে আছে।

মা গো, দরজাটা খুলে দিই? বাইরে বরফ পড়ছে। ফুলের পাঁপড়ির মত বড় বড় বরফ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। জানালা খুলে দিয়ে মায়ের পাশে বসে সেদিকে চেয়ে রইলাম। আবার বেন আপন মনেই বললেন—আর আমার কোন অসুস্থ নেই। তোমার পাশে গিয়ে এই ভাবে বসে বসি, তখন মনে হয় এত দিন বা ঘটে গেছে, সে সব স্বপ্ন। সত্যি বলছি—বাড়ী বদলের কথা ভাবতেও আমার ধারণা লেগেছিল, অসহ্য মনে হয়েছিল। আমাদের নিশিকাতা স্ট্রিটের বাসার আর একটা দিন, এমন কি আশুখানা দিন বেশী থাকতে গেলে আমি বর্ণে যেতাম। ঐশে উঠে অবধি আশুখানা অবস্থা, এখানে প্রথম করেই উঠে। তারপর সব শূন্য ঠেকল। সাধারণ কোন রোগ আমার নয়। ঈশ্বর বেন আগের আমাকে যেহে ফেলে, সম্পূর্ণ নতুন করে প্রাণ দিলেন।

সেদিন থেকে আজ অবধি আমার দু'জন পাহাড়ের গায়ে এই নিরালা কুটারে দিন কাটাচ্ছি। আমরা হাল্কা করি, বারান্দায় বসে উল বুন, চীন ঘরে বসে বই পড়ি; এক কথায় বলতে গেলে বিশ্বন্যাসের বাইরে একান্ত বৈচিত্রহীন জীবন বাপন করি। ফেরারিতে সারা গ্রামখানা গ্রাম ফুলে ছেয়ে গেল। মার্চ মাস পর্যন্ত বাতাসহীন শান্ত দিন একটির পর একট করে পার হয়ে গেল। মাসের শেষ অবধি ফুলেরা গাছের ডাল

আলো করে রইল। বতবাহই কাচের সব দরজা খুলে দিই, ততবাহই সারা বাড়ী ফুলের গন্ধে মেতে ওঠে।

মার্চের শেষে প্রীতি সন্ধ্যায় একটা বাতাস কোথা থেকে ছুটে আসে। আমি আর মা গোখলি বেলায় চা খেতে বসলে পাঁপড়ির দল জানালার ভেতর দিয়ে উড়ে এসে আমাদের পেয়ালায় পড়ে। এখন এপ্রিল মাস, বারান্দায় বুনতে বসে আমাদের চাষবাসের কথা হয়। মা আমার সাহায্য করতে চান। হঠাৎ মায়ের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, আমরা মরে আবার ভিন্ন মানুষ হয়ে বেঁচে উঠেছি। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে বীজের মত পুনরুৎপাদ সম্ভব নয়। মা বলেছিলেন অতীতকে তিনি ভুলে গেছেন, অথচ আজই সকাল হুপু খেতে বসে 'নাওজি'র কথা মনে করে কঁপে উঠেছিলেন। আমার মনে থেকেই কি আর অতীতের ক্ষতের দাগ মিলিয়ে গেছে? তা নয়।

উঃ আমি সোজামুজি মনের কথা উজাড় করে সমস্ত লিখতে চাই। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, পাহাড়ী এই বাড়ীতে যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজিত, তা মিথ্যা, ভ্রম। মা ও আমার বিজ্ঞানের এই স্বপ্ন অবকাশ যদি ভগবানের ইচ্ছা বলেই ধরে নিই, তবু আসন্ন বিপদের কালো ছায়া যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, সে চিন্তার হাতও যে এড়াতে পারি না। মা খুশির ভাণ করে, কিন্তু দিন দিন তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন। আর আমার বৃকের ভেতর যে কাল সাণ বাসা বেঁধেছে, মায়ের আয়ু নিয়ে সে দিনে দিনে বেড়ে উঠছে, আমার সমস্ত প্রতিকূল চেষ্টা ব্যর্থ করেই সে পরিপূর্ণ হচ্ছে। এমন যদি হ'ত যে, বিশেষ কোন স্বত্বের সঙ্গে এর আবির্ভাব হয়ে শূন্য মিলিয়ে যেত। সাপের অন্তঃকলো ডিম পোড়ানোর কথা আদৌ যে মনে এসেছে, তা' থেকে আমার মানসিক অবস্থা অনুমান করে নেওয়া শক্ত নয়। আমার প্রতিটি কাজ মায়ের চুম্বক বাড়ানোর এবং তাঁর শক্তি কয় করার পক্ষে ব্যর্থ।

ভালবাসা—একবার কলম দিয়ে বসে লক্ষটা বেরিয়ে গেছে, তারপর আর এখানে চলে না। [ক্রমশঃ]

অনুবাদ—কল্পনা রায়

যে পাখী ফেরে না আর

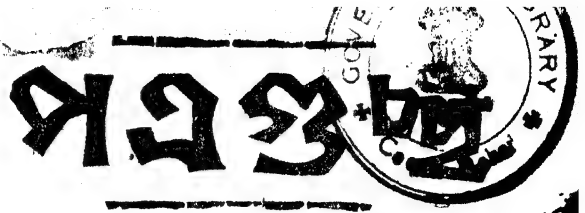
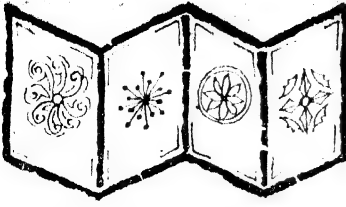
শ্রীউমাপদ রায়-চৌধুরী

বহু দূর সমুদ্র-নিভূতে নারিকেল-বীধি ঘেরা দীপের আকাশে হলুদ ডানার রাঙা বোদের সুরভি এক স্বাক্ষর নীড়-ভোলা পাখী, নিরুদ্দেশ প্রান্তিক সঙ্গীত জীবনের কণ্ঠ দিন; দিগন্ত বাতাসে নরম পালকে মাথা জোঁতা-পর্যাণ—চলে যায় আর ফেরে না কি!

ছায়াময় দীপ সেখা' একটি পৃথিবী দু'তনার একান্ত নিরালা, নিঃশব্দ তরঙ্গ-ছলেছল—সন্ধ্যার মালতী-সুখী পাগড়ি-শিখিল অনেক প্রান্তর ধুপু পার হ'রে যেমেছে সেখানে হুটি ডানা নীল—কোনো সুখী বলাকা-মিথুন অশান্ত বোবন প্রাণে ছিল যত ঢালা।

এক দিন ফিরে-আসা নতুন বন্ধুরে রোহিণী কী পাখাণ মাটি, উতল বাগানী বৃক ধূসর স্বপন পালভেঁড়া ভস্মর মাস্তুল শুনেছে কি স্বপ্ন কোনো নক্ষত্রের গান প্রাণধর্ম শুধু সত্য বাঁটি! চিত্তের চৈতালী দিনে তবু তো খোঁপায় ঝরঝরো শিরীরের ফুল।

দুর্লভ মানস-তীর্থ চির-কল্লোলক কোথা কোন অধিত্যকা-পার, জারুলের বন-শেবে বিনোয়ের চাঁদ তার পর বক্তিম প্রভাব শিশিরের সুরে হেঁধা ভিজ়ে ঘাস-মাটি, পেয়েছে কি প্রেম নিফলুহ আলো আর কালোর মল্যটে একটু নিটোল ব্যথা তোমার-আমার?



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

গান্ধীজির উত্তর—৩

বিড়লা হাউস,

নতুন দিল্লী,

২৭. ৪. ১৯৩৯,

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৩১শে মার্চের এবং তাহার পূর্বের পত্র দুইটি পাইয়াছি। তুমি স্পষ্ট কথা বলিয়াছ এবং নিজ অভিমত শইভাবে ব্যক্ত করার জন্যই আমি তোমার পত্রগুলিকে পছন্দ করি।

যে অভিমতগুলি তুমি প্রকাশ করিয়াছ তাহা আমার এবং মহাত্মাদের মতের এতই পরিপন্থী যে, একটা মীমাংসার সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মন্তব্যকে সম্প্রতিভাষে দেশের লোকের নিকট উপস্থাপিত করা উচিত। আর যদি সত্যতার সহিত উহা করা হয়, তাহা হইলে মত-সম্মেলনের পরিণতি স্পষ্টই কেন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধ রহিয়াছে তাহা অজ্ঞান নহে; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাবই অজ্ঞান। সময়ের দ্বারাই ইহার প্রতিকার হইবে, কালই স্রেষ্ঠতম নিয়ামকগারী। যদি আমাদের মধ্যে সত্যকার অহিংসা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহযুদ্ধ কখনই, তিস্ততার স্রষ্টাও হইতে পারে না।

সকল দিক বিচার করিয়া আমি এই অভিমত পোষণ করি যে, তোমার মতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে লইয়া এখন একটি কার্যনির্বাহক সমিতি তোমার গঠন করা উচিত। তোমার কার্যক্রম নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়া তাহা আগামী এ, আই, সি, সির সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত। উক্ত কমিটি যদি তোমার কার্যক্রম গ্রহণ করে তাহা হইলে তোমার পক্ষে কাজ চালাইয়া বাওয়া সহজ হইবে, সংখ্যালঘুদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে। অপর পক্ষে, যদি কমিটি তোমার কার্যক্রম স্বীকার না করে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে পদত্যাগ করিয়া কমিটিকে তাহার সভাপতি নির্বাচন করিতে দেওয়া উচিত। তখন তুমি অবশ্যে, তোমার নিজের পছন্ডিতে, দেশবাসীকে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া বলিতে পারিবে। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের কথা না ধরিয়াই আমি এই পরামর্শ তোমাকে দিতেছি।

এখন তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিই। যখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব পেশ করা হয়, তখন আমি শব্দাশারী ছিলাম। মধ্যাহ্ন সে সময়ে রাজ্যকোটে ছিলেন। তিনি একদিন সকালে আমার

নিকট এই সংবাদ আনিলেন যে, পুরাতন নেতাদের প্রতি আত্মজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব পেশ করা হইবে। আমার সম্মুখে তখন প্রস্তাবের খসড়াটি ছিল না। আমি বলিয়াছিলাম যে, যখন দেখিতেছি তাহাতে ভালই হইবে, কারণ, সেবাশ্রমে আমাকে বলা হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রপতি-পদে তোমার নির্বাচন তোমার প্রতি ততটা আত্মজ্ঞাপক নহে, যতটা পুরাতন নেতাদের প্রতি আত্মজ্ঞাপক বিশেষ করিয়া সর্দারের প্রতি। ইহার পর মৌলানা সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য যখন আমি এলাহাবাদ বাই, তখনই আমি প্রস্তাবটির আসল খসড়াটি দেখি।

আমার মর্যাদার প্রশ্ন এখানে উঠে না। উহার কোনও নিজস্ব মূল্য নাই। আমার মনোভাব সম্পর্কে যদি সন্দেহ পোষণ করা হয়, আমার নীতি বা কার্যক্রম যদি দেশবাসী অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে মর্যাদার নাম অবজ্ঞাই হইবে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের কার্যের সমষ্টিগত ফলের গুণ বা দোষ অনুসারেই ভারতের উত্থান বা পতন হইবে। ব্যক্তি বতই বড় হউন না কেন, তাহার নিজস্ব কোনও মূল্য নাই—তাঁহার মূল্য এই কোটি কোটি নর-নারীর প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠির বিচারে। সুতরাং এ প্রশ্ন জালোচনার বিষয়-বহির্ভূত করা যাউক।

তোমার মতে, এখনকার মত দেশ আর কখনও অহিংস হয় নাই। আমি তোমার এই অভিমত পূর্ণাঙ্গীকার করি। যে বাধু আমি নিঃশাস লইতেছি, তাহার মধ্যেও আমি হিংসার গন্ধ পাইতেছি। কিন্তু সেই হিংসা এখন একটি ক্ষুদ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পারস্পরিক অবিবাস নিয়ন্ত্রণের হিংসাবাদ। হিন্দু এবং মুসলমানগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ সেই হিংসারই প্রকাশ। আমি আরও উদাহরণ দিতে পারি।

কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতির পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে বলিয়া অস্বীকার হইতেছে। আমার মনে হয়, দুর্নীতি বাড়িতেছে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গী তদন্তের অগ্রদূত আমি গত কয়েক মাস ধরিয়া করিয়া আসিতেছি।

এই পরিস্থিতিতে অহিংস গণ-আন্দোলনের জন্ম উপযুক্ত পরিবেশ আমি লক্ষ্য করিতেছি না। চরমপন্থের পশ্চাতে যদি উপযুক্ত কার্যকরী শক্তি না থাকে, তাহা হইলে উহা একেবারে মূল্যহীন।

কিন্তু পূর্বে তোমাকে যেমন বলিয়াছি এখনও সেজন্য বলিতেছি আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং তজ্জন্মই সম্ভবতঃ অতি সাবধানী এবং ভীক হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু তোমার আছে যৌবন এবং যৌবন-জাত বেপরোয়া আশাবাদ। আমি আশা করি, তোমার পন্থাই ঠিক, আমার পন্থা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হউক। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, বর্তমানে কংগ্রেসের অবস্থা যেমন তাহাতে তাহার পক্ষে উদ্ভেদ সিদ্ধ

হওয়া অসম্ভব। উহার পক্ষে বধ্যভাষ্য আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তোমার ভবিষ্যৎখণী যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমার আসন এখন পশ্চাতে, সত্যাগ্রহী নেতারাণে আমার দিন চলিয়া গিয়াছে।

সুদূর রাজকোট ব্যাপারটির উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আমি আনন্দিত। আমাদের দুইজনীর বিভিন্নতা উহার দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্পর্কে যে পদা আমি গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্ম আমি আদৌ অনুতপ্ত নহি। আমি অনুভব করিতেছি যে, উহার বিশেষ জাতীয় মূল্য আছে। রাজকোটের জন্ত আমি অজ্ঞাত দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন বন্ধ করি নাই। কিন্তু রাজকোট আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে- উহা আমাকে পথ দেখাইয়াছে। স্বাস্থ্যের জন্ত আমি দিল্লীতে আসি নাই। অনিচ্ছায় আমি দিল্লীতে আছি এবং প্রধান বিচারকের দ্বারের জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। বড়লাট আমার নিকট তাঁহার শেষ তারবার্তায় যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সফল করিবার জন্ত যত্নপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ না করা হয়, ততক্ষণ দিল্লীতে থাকা আমি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। হয়ত আমি কোনওরূপ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন না-ও হইতে পারি। আমি যদি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক তাহার কর্তব্য সমাধা করিবার জন্ত আমন্ত্রণ জানাইয়া থাকি, তাহা হইলে সে কর্তব্য বধ্যভাষ্য আইন পালন করা হইল কি না তাহা দেখিবার জন্ত দিল্লীতে অবস্থান করিতে আমি বাধ্য। যে দলিলের অর্থ সম্পর্কে ঠাকুর সাহেব সন্দেহের অবকাশ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষ্য করিবার জন্ত প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করার মধ্যে আমি কোনও অস্বাভাব্য দেখি না। প্রসঙ্গতঃ জানাইতেছি যে, প্রধান বিচারকরূপে নহে, বড়লাটের বিশ্বাসভাজন দক্ষ আইনজ্ঞরূপে তার যদি দলিলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। বড়লাটের মনোনীত ব্যক্তিকে বিচারকরূপে স্বীকার করিয়া আমার মনে হয়, আমি শালীনতাঃ এবং জ্ঞানবস্তুর পরিচয় দিয়াছি এবং উছাপেক্ষা বাহা আরও প্রয়োজনীয়, এ-বিষয়ে আমি বড়লাটের দায়িত্ব বাড়াইয়া দিয়াছি।

আমাদের মধ্যে যে ভীষণ মতানৈক্য আছে, সে-সম্পর্কে আলোচিতা করিয়ায় বটে কিন্তু এ বিষয়ে আমি চূড়ান্তরূপে যে, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তদ্বারা আদৌ ক্ষুণ্ণ হইবে না। এই পার্থক্যের মধ্যে বহিঃস্বার্থিকতা থাকে, আমার বিশ্বাস তাহা আছে, তাহা হইলে, পার্থক্যজনিত ধাত্তা উহা কাটাওয়া উচিত পাবিবে।

—বাপু।

নেতাজীর পত্রে—৪

জিয়ালগোড়া পোঃ,
জেলা মানডুম, বিহার,
৬ই এপ্রিল, ১১৩১।

প্রিয় মহাস্বামী,

আমার মেজ দাদা শরৎক এক পত্রে আপনাকে উভয় পক্ষের নেতাদের মধ্যে এক প্রাণখোলা আলোচনার পরামর্শ দিয়াছিলেন, বাস্তবতে ভবিষ্যতে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার পথ পরিষ্কার হয়। ইহা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের পরামর্শ এবং অজ্ঞাত বাহাই খটিয়া থাকুক না কেন, আমি এ-বিষয়ে বধ্যভাষ্য করিতে রাজী আছি। এ-বিষয়ে আমার দ্বারা কিছু করা উচিত মনে

করেন কিনা এবং উচিত মনে করিলে, কি করা উচিত—সে সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাইবেন কি? আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এই ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টায় আপনার প্রভাব এবং ব্যক্তিগত যথেষ্ট কার্যকরী হইবে। আমরা ঐক্যসাধনের সকল আশা ত্যাগ করিবার পূর্বে আপনাকে কি সমগ্র শক্তি নিয়োগে শেষ চেষ্টা করিবেন না? এখনও দেশবাসী আপনাকে কি দৃষ্টান্তে দেখে তাহা মরণ করিতে অনুপ্রাণিত করিতেছি। আপনি কোনও দলের পক্ষপাতিত্ব করেন না। সুতরাং যুগমান দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্ত জনসাধারণ এখনও আপনার যুগের দিকে চাহিয়া আছে।

গুয়াকিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, আপনার উপদেশটি নৈরাশ্যের মন্ত্রণা। ঐক্যের সকল আশা উহা নিখুঁত করিবে। বিভেদ হইতে উহা কংগ্রেসকে রক্ষা করিবে না, উপরন্তু ঐরূপ শব্দটির জন্ত পথ সহজ করিয়াই দিবে। বর্তমান অবস্থায় একরকম গুয়াকিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেওয়ায় অর্থ দলগুলিকে এখনই বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেওয়া। উহা কি এক মারাত্মক দায়িত্ববোধ নহে? আপনি কি এই বিষয়ে চূড়ান্তরূপে হইয়াছেন যে, একযোগে কাজ অসম্ভব? আমাদের পক্ষের অভিমত এই যে, তাহা আমরা মনে করি না। “কমা করা এবং ভুলিয়া যাওয়ার জন্ত” আমরা বধ্যভাষ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। একই আদর্শের জন্ত একযোগে কাজ করিতে আমরা ইচ্ছুক। আমাদের সকলের মধ্যে এক সম্মানজনক আপোষ নীমাংসার জন্ত আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি। আমি ইতিপূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি এবং লিখিয়াও জানাইয়াছি যে, কংগ্রেসের সংগঠন এখন বৈধ আছে এবং অধুনা ভবিষ্যতে উহার বিশেষ রূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায়, সর্বজনীন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইবে। এই কমিটিতে বধ্যভাষ্য সকল দলের প্রতিনিধির স্থান থাকিবে।

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি এইরূপ সর্বজনীন গুয়াকিং কমিটি গঠনের পক্ষপাতী নহেন। আপনার এই বিরোধিতা কি নীতির দিক দিয়া (যেমন, আপনার মতে একযোগে কাজ অসম্ভব) অথবা উহা কি আপনার এই অভিমতের জন্ত যে, গুয়াকিং কমিটিতে গান্ধীবাদীদের (আমি এই ব্যক্তিগতটির ব্যবহার এইজন্য করিয়ায় যে, উছাপেক্ষা উত্তম শব্দ পাই নাই এবং এজন্য আপনি আমাকে কমা করিবেন) প্রতিনিধিত্ব অধিক থাকা প্রয়োজন? শেষের কারণটি সত্য হইলে, অনুগ্রহপূর্বক আমার তাহা জানাইয়া দিন। তাহা হইলে সমগ্র বিষয়টির পুনর্বিবেচনার এক স্রবোগ আমি পাইতে পারি। আর পূর্বের কারণটি সত্য হইলে, এই পত্রে আমি বাহা জানাইতেছি তাহার আলোকে আপনার উপদেশটি অনুগ্রহ পূর্বক পুনর্বিবেচনা করুন। হরিপুরা কংগ্রেসে যখন আমি গুয়াকিং কমিটিতে যোগ দিবার জন্ত সমাজতন্ত্রবাদীদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম তখন আপনি স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ কার্যের পশ্চাতে আপনার সমর্থন ছিল। তাহার পর কি পরিস্থিতির এতটুকু পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ফলে আপনি এখন একরকম গুয়াকিং কমিটি গঠনের পীড়াপীড়ি করিতেছেন?

আপনি আপনার পত্রগুলিতে আমাদের দুইটি দল সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহার পরস্পরের একান্ত বিরোধী। আপনি আপনার মন্তব্যটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলেন নাই। আপনি যে বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কার্যক্রমের ভিত্তিতে না ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপিত, তাহা পরিষ্কার বুঝা বাইতেছে না। আমার মতে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটা, নিতান্ত সাময়িক। যগড়া এবং মারামারি করিতে আমরা যেমন পারি, আমাদের মতানৈক্য তুলিয়া বাইতে এবং হস্তমর্শন করিতেও আমরা তেমনই পারি। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক কংগ্রেসের ইতিহাসে, স্বরাজ্যবাদী কাহিনীটির কথাই ধরুন না। বতদূর আমি জানি, কিছুকাল বিরোধের পর, আপনার সহিত সেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলালজীর সম্পর্ক বতদূর সম্ভব মধুর হইয়াছিল। গ্রেটব্রিটেনে বিপদের সময়, বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি সব সময়েই একাবদ্ধ হইয়া একই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়া কাজ করিতে পারে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে, যেমন ফরাসী দেশে, প্রত্যেকটি মন্ত্রিসভাই সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা। বৃটিশ এবং ফরাসীদের তুলনায় কি আমার কম দেশপ্রেমিক? যদি আমার তাহা না হইয়া থাকি, তাহা হইলে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করিয়া স্মৃষ্টভাবে কাজ করিতে পারিব না কেন?

আপনি যদি মনে করেন যে, ব্যক্তিগত বিষয় নহে, কার্যক্রমের ভিত্তিকেই আপনার বিরোধিতা, তাহা হইলে এই বিষয়ে আমি আপনার মতামত জানিতে চাহি। আমাদের কার্যক্রমের সহিত আপনার কার্যক্রমের পার্থক্য কোথায় এবং তাহা কি এতই গভীর যে, একযোগে কাজ সম্ভব নহে? আমি জানি যে, আমাদের মধ্যে মতবৈধতা রহিয়াছে। কিন্তু আমি ওয়াকিং কমিটির সদস্যগণকে ঊহাদের পদত্যাগ-পত্রের জবাবে বলিয়াছিলাম যে, আমার মতে, আমাদের মধ্যে বর্তমান মতপার্থক্য রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিষয়ে মতৈক্য রহিয়াছে। ত্রিপুরার ঘটনা সত্ত্বেও আমি এই মত এখনও পোষণ করি।

স্বরাজ্যের বিষয়ে আমার চরমপত্র সম্পর্কিত অভিমত সম্পর্কে আপনার পত্রগুলিতে বলিয়াছেন যে, অহিংস গণসত্যাগ্রহের উপযোগী আবহাওয়া এখন নাই। কিন্তু আপনি কি রাজকোটে অহিংস গণসত্যাগ্রহ শুরু করেন নাই? অন্ত্য দেশীয় রাজ্যেও কি আপনি তাহাই করিতেছেন না? এই দেশীয়রাজ্যগুলির অধিবাসীরা ত্যাগহীন আন্দোলন পরিচালনে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ। বৃটিশ ভারতের আমার অধিকতর শিক্ষার এবং অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারি—অন্ততঃপক্ষে উহাদের তুলনায়। ব্যক্তিগতবিনোদন এবং লায়নশীল সরকার গঠনের দাবীতে যদি দেশীয়-রাজ্যগুলিকে সত্যাগ্রহ করিতে দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে বৃটিশ ভারতের আমাদিগকে তাহা দেওয়া সম্ভব নয় কেন?

গান্ধীবাদীদের সমর্থনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে জাতীয় দাবীর প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল, তাহার কথা ধরুন। যদিও উক্ত প্রস্তাবটিতে হুন্সর দলকে সম্পূর্ণ বাক্যাংশ আছে এবং কয়েকটি বড় বড় আদর্শের ঠাঁই দিয়া আছে, তথাপি উহার সহিত চরমপত্র লান এবং আগামী সপ্তাহের জন্ত দেশকে প্রস্তুত করা সম্পর্কে আমার অভিমতের বহু সাদৃশ্য আছে। আপনি কি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন? যদি

তাহা করেন, তাহা হইলে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আমার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

এবার আমি পণ্ডিত পত্নের প্রস্তাব সম্পর্কে বলিব। ইহার প্রধান অংশটিতে (শেষাংশটির কথা বাকিহে) দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ ওয়াকিং কমিটি আপনার বিশ্বাসভাজন—পুরা বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ আপনার ইচ্ছানুসারে উদ্ভাষিত গঠন করিতে হইবে। আপনি যদি একদলীয় ওয়াকিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন এবং ঐরূপ কমিটি গঠন করা হয়, তাহা হইলে লোকে বলিতে পারে যে, উহা “আপনার ইচ্ছানুসারে” গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে যে, উহা আপনার বিশ্বাসভাজন হইবে? এ, আই, সি, সির সভায় পাঁড়াইয়া উঠিয়া একথা বলিবার স্বাধীনতা থাকিবে কি যে, আপনি একদলীয় ওয়াকিং কমিটি গঠনের উপদেশ দিয়াছেন এবং নূতন কমিটি আপনার বিশ্বাসভাজন? অপর পক্ষে আপনি যদি ঐরূপ ওয়াকিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন বাহা আপনার বিশ্বাসভাজন নহে, তাহা হইলে আপনি কি পণ্ড প্রস্তাবকে কার্যকরী হইতে দিবেন—আপনার নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা হইলে আপনি কি জাতিসংঘত কার্য করিবেন? সমস্তাটির এই দিকটি আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। পণ্ড প্রস্তাবটি যদি আপনি স্বীকার করেন তাহা হইলে শুধু যে নূতন ওয়াকিং কমিটি সম্পর্কে আপনার ইচ্ছা জানাইতে হইবে তাহা নহে, ঐ একই সময়ে, আপনার বিশ্বাসভাজন হয় এমন এক কমিটি গঠন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হইবে।

পণ্ড প্রস্তাবের শুণ সম্পর্কে এখনও আপনি কিছু বলেন নাই। আপনি কি উহা সমর্থন করেন? অথবা আপনি এমন একটি সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাবের পক্ষপাতী, যাহা কয়েকটি আমাদের পরামর্শানুযায়ী হইবে, বাহাতে আপনার নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হইবে, আপনার নেতৃত্বে পুরা বিশ্বাস জ্ঞান হইবে এবং বাহাতে বিরাধ্যত্ব কাব্যগুলি সম্বোধিত থাকিবে না? আরও, কয়েকটি পণ্ড প্রস্তাব পাশ হইবার পর, ওয়াকিং কমিটি গঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাটি কিরূপ পাঁড়াইয়াছে? আমি পুনরায় এই প্রশ্ন করিতেছি, কারণ, বর্তমান কংগ্রেস শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে আপনাই রচনা এবং সেজন্য এ—সম্পর্কে আপনার অভিমত আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে। এ-সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন আছে এবং তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। পণ্ড প্রস্তাবটিকে কি আপনি আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন? যদি তাহাই মনে করেন, তাহা হইলে, আমি তৎক্ষণাতঃ পদত্যাগ করিব এবং তাহাও বিনাসর্তে। আমার সাংবাদিক-বিশ্বব্রিতে এই প্রশ্নটি সম্পর্কে কয়েকটি পত্রিকা সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাদের সমালোচনার ভিত্তি হইতেছে এই যে, আমার পক্ষপদত্যাগ করা উচিত। এ সম্পর্কে আপনার অভিমতের এবং আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাবশেষই সম্ভবতঃ ঐরূপ মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কয়েকটি সাংবাদিকপ্রভেদে যেমন মন্তব্য করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ আপনিও সেইরূপ মনে করেন যে, পুরাতন নেতাদের কর্তৃত্বের আসনে পুনরায় বসান উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব—কার্যকরী রাজনীতিতে কিরিতা আশ্রয়, কংগ্রেসের প্রায় আনার সভ্য হউন এবং ওয়াকিং কমিটি গঠন গ্রহণ করুন। ঐরূপ উজ্জ্বল জ্ঞান আমাকে ক্ষমা করিবেন। কাহারও

প্রতি আঘাতের অভিশ্রয় না লইয়াই আমি হতা বলিতেছি। আপনার অল্পচরণের, এমন কি আপনার বিশিষ্ট, শ্রিয় অল্পচরণের সহিত আপনার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। এমন লোক বহু আছেন বাঁহারা আপনার জ্ঞান সব কিছু করিতে পারেন কিন্তু উঁহাদের জ্ঞান নহে। আপনি কি একথা বিশ্বাস করিবেন যে, গত 'রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কয়েকটি প্রদেশে কয়েক জন গান্ধীবাদী আমার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, পুরাতন নেতাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া? আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যদি এ বিষয়ে না পড়ে তাহা হইলে, পুরাতন নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের সমর্থন পাইতে থাকিব। ত্রিপুরাতে পুরাতন নেতারা চাভুধার সহিত সরিয়া পড়িয়াছিলেন এবং অধিকতর চাভুধার সহিত আমাকে আপনার বিরোধিতার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। (কিন্তু আপনার সহিত আমার কোনও বিবাদ ছিল না)। পরে তাঁহাদের বিবট জয় এবং আমার পরাজয় হইয়াছিল। আসল ব্যাপার এই যে, উহা তাঁহাদের জয় বা আমার পরাজয়ের সূচক নহে। উহা আপনারই জয়ের সূচক (আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও)। কিন্তু উহা বার্থ জয় নহে, কিছুটা আত্মসম্মান বিক্রয় দ্বারা উহা লাভ হইয়াছে।

কিন্তু আমি অবাস্তব প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছি। আপনি যাহাতে প্রত্যক্ষরূপে, খোলাখুলি ভাবে কংগ্রেসের পরিত্যক্তা করিতে পারেন, সেজ্ঞ আমি আপনার নিকট আবেদন করিতে চাহিয়াছিলাম। উহা দ্বারা সকল সমস্তা সহজ হইয়া বাইবে। পুরাতন নেতৃবৃন্দ বিরুদ্ধে বিরোধিতার অনেকখানি—উহারা বিজ্ঞে বিরোধিতা নিশ্চই আছে—আপনা হইতেই তখন অবসান হইবে।

আপনি যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আমার একটি বিকল্প পরামর্শ আছে। আমাদের দাবীমত স্বাধীনতার জ্ঞান জাতীয় সংগ্রাম, বৃটিশ সরকারকে একটি চরমপত্র দিয়া স্তব্ধ করুন, এই আমার অনুরোধ। তাহা স্তব্ধ করিলে, আপনি যদি চাহেন, তাহা হইলে, আমরা সানন্দে দায়িত্বের পদগুলি হইতে সরিয়া দাঁড়াইব; আপনি বাঁহাদের বিশ্বাস করেন বা পছন্দ করেন, তাঁহাদের হস্তে ঐ দায়িত্বের পদগুলি বহুদূর ছাড়িয়া দিব। কিন্তু একটি মাত্র সর্ত্তে—স্বাধীনতা-সংগ্রাম পুনরায় স্তব্ধ করিতেই হইবে। আমার দ্বারা, জনসাধারণও উপলব্ধি করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে আমাদের নিকট যে অযোগ্য উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ অযোগ্য একটা জাতির জীবনে ক্রটি আসে। সেইজন্য সংগ্রাম পুনরায় স্তব্ধ সহায়তার জ্ঞান আমরা যে কোনওরূপ আত্মত্যাগ করিতে রাজী আছি।

যদি শেষ পর্যন্ত আপনি বলেন যে, সর্বদলীয় ওয়াকিং কমিটি অচল, আমাদের সম্মুখে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হইতেছে একদলীয় ওয়াকিং কমিটি এবং আপনি যদি চাহেন যে আমার পছন্দমত ব্যক্তি লইয়া উক্ত কমিটি গঠন করা আবশ্যিক, তাহা হইলে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত আপনি আমার প্রতি আত্মজ্ঞাপন করুন। ইতিমধ্যে সেবা ও আত্মত্যাগের দ্বারা যদি আমরা আমাদের নীতির জ্ঞাত্যতা প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা হইলে কংগ্রেসের নিকট আমরা বিচ্ছিন্ন হইব এবং স্বত্বাবত: ও দ্বারত: দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে আমরা বিতাড়িত হইব। বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার আত্মজ্ঞাপক ভোটার জর্থ এ. আই. সি. সির আত্মজ্ঞাপক

ভোট। আপনি যদি আমাদিগকে আপনার আত্মজ্ঞাপক ভোট দেন অথচ আমাদিগকে একদলীয় ওয়াকিং কমিটি গঠন করিতে বলেন, তাহা হইলে আপনি পক্ষ প্রস্তাবকেই কার্যে পরিণত করিবেন।

পুনরায় আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া জানান, নীতির দিক দিয়া আপনি সর্বদলীয় ক্যাবিনেট (ওয়াকিং কমিটি) গঠনের বিরোধী, না আপনি উক্ত ক্যাবিনেটে পুরাতন নেতাদের সংখ্যাধিক্য চাহেন বলিয়া বিরোধিতা করিতেছেন। ২৫শে মার্চের প্রথম চিঠিতে আমি এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম।

এই পত্র শেষ করিবার পূর্বে আমি দুই একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে জানাইতেছি। আপনি পত্রে জানাইয়াছেন যে, বাহাই যটুক না কেন, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি হইবে না। আমি সর্বদাঃকরণে এই আশা পোষণ করিতেছি। প্রসঙ্গত: একথা কি আমি বলিতে পারি যে, জীবনে একটি বিষয়ে আমার গর্ববোধ আছে—আমি ভুল্লোকের সন্তান এবং নিজে ভুল্লোক। দেশবদ্ধ দাঁশ আমাদের প্রায়ই বলিছেন—“রাজনীতি অপেক্ষা জীবন বড়।” সেই শিক্ষা আমি তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়াছি। শৈশব হইতে যে ভক্ততার আদর্শ আমার মনের মধ্যে গাঁথা বহিয়াছে এবং আমার মনে হয়, বাহা আমার রক্তে আছে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হইলে, আমি আর একদিনও রাজনীতিকেরূপে থাকিব না। মানুষ হিসাবে আপনি আমাকে কি চোখে দেখেন, তাহা জানিবার উপায় আমার জীবনের সামান্য অংশই দেখিয়াছেন। আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার বিরুদ্ধে কত গল্পই না আপনাকে শোনাইয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক মাস আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুখে একটি প্রকৌশলী অথচ ভীষণ প্রচারকার্য চালান হইতেছে। বহুপূর্বেই আমি এ বিষয় আপনার গোচরীভূত করিতাম কিন্তু প্রচারের বিষয়বস্তু এবং কাহার প্রচার করিতেছে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রচারের বিষয় সম্পর্কে পরে আমি জানিতে পারিয়াছি, যদিও আমি এখনও জানিতে পারি নাই কাহার এই কার্য করিতেছেন।

পুনরায় আমি অবাস্তব প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। একটি পত্রে আপনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি বাহাই করি না কেন, “ভগবান আমাকে পথ দেখাইয়া চলিবেন।” বিশ্বাস করুন মহাত্মাজী, সকল দিবসব্যাপী আমি একটি প্রার্থনাই করিতেছি—আমার দেশের এবং দেশের মুক্তির পথ-সম্পর্কে আমি যেন আলোক পাই। প্রয়োজন এবং অযোগ্য উপস্থিত হইলে আমি যাহাতে নিজেই দৃঢ়তার সহিত সম্মুখীন হইতে পারি, সেজ্ঞ শক্তি ও অধ্যব্রেরণার প্রার্থনা আমি করিয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, একটা জাতি বাঁচিতে পারে যদি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসত্তা দেশের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মরিবার স্তব্ধ প্রস্তুত থাকে। এই নৈতিক (বা আধ্যাত্মিক) “হারা কিরি” সহজ নহে। দেশের প্রয়োজন উপস্থিত বখনই হইবে তখনই যেন তাহার সম্মুখীন হইতে পারি, সে শক্তি ভগবান যেন আমাকে দেন।

আশা করি আপনার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে থাকিবে। আমি বীরে বীরে পুত্র হইয়া উঠিতেছি। সজ্ঞ প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের—পুত্র।

এখন
ভারতবর্ষে
পাওয়া যাচ্ছে

সেই কাপড় কাচার পাউডার যা
ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজার
দখল করেছিল!



মূল্য :
১ টাকা ১২ নয়া পয়সা
(স্থানীয় কর ছাড়া)

নীল
সারফ

**অপূর্ব সাদা করে
জামাকাপড় কাচে**

সারফ—অত্যাস্থ্য নীল পাউডারটি আপনার জামা-কাপড়কে এক অপূর্ব শুভ্রতা দেয়, কোন কাপড় কাচার উপাদান যে জামাকাপড়কে এত সাদা করতে পারে তা ছিল আপনার ধারণার অতীত! এক প্যাকেট ব্যবহার করুন, আপনার মনে হবে যে...

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকৈ সাদা, এত হৃদয় উজ্জ্বল করে! সার্ট, চাদর, সাড়ী তোয়ালে—সবকিছু কাচার জন্যে এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোঁটা গরম জলে, ফোঁটা পকে এতকূল জলে, সঙ্গে-সঙ্গে আপনি পাবেন ফোঁটার এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়! বেশি পরিশ্রম নেই এতে! ভেজানো, চোপা, এবং ঘোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল!

আপনি কখনও পাননি আপনার পরসর মূল্য এত চমৎকারভাবে কিরে। একবার সারফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মনে নেবেন! সারফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই সবথেকে দেখুন...

সারফ জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে সচা যায়!

হিন্দুস্তান লিমিটেড, কর্ণক এজেন্ট।

BU, 24-X52 BQ



সাত্যকি

১১

দল বেধে ছেলেরা চল পিকনিক করতে। সমস্ত দিন একসঙ্গে মনের খুশীতে কাটাতে পারবে ভেবে ওরা চকল হয়ে উঠেছে। আজ কোন শাসন নেই, নেই পড়া না পাঠার ভর। ওদেরই মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাবছে, যদি সারা বছরই এ রকম আনন্দ করে কাটানো যেত।

একটা বাগান-বাড়িতে এসে পৌঁছলুম।

বড়লোকের সখের বাড়ি। দেখেই বোঝা যায়। এক দিকের কোণ উঁচু করে ইট দিয়ে গোল করে ঘেরা জায়গায় জায়গায়। আর তার মাঝখানে মোঁহুরী ফুলের বাহার। কাঁটাচিটাপায় গাছগুলিও স্থলর করে লাগানো। গেট থেকে সোজা বাড়ি পর্যন্ত হুড়ি-ছাওয়া পথ। পথের দু'ধারে লম্বা লম্বা পামগাছের সারি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুকুর। তার ওপর সেতু। দুটো ডিকি নৌকাও বাঁধা আছে ঘাটে, দেখা গেল।

এমন স্থলর জায়গায় এসে ছেলেরা মহানন্দে ছটোপুটি আরম্ভ করে দিল। দলে ছিলেন দুজন প্রবীণ শিক্ষক। তাঁরা প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টাছিলেন। পরে ছেলেরা উৎসাহ দেখে তাঁরা নিরস্ত হন। শুধু সাবধান করে দিলেন, যেন কেউ ফুল না ছেঁড়ে কিংবা কোন গাছপালার ক্ষতি না করে।

বড় দেখে একটা পাঁছের নীচে রান্না চাপান হয়েছে। ছোট ছোট দলে ছেলেরা বিভক্ত হয়ে এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ নৌকা বাইতে চাইল। মালীরা সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষক মহাশয় তাদের অনুমতি দিলেন।

বেলা যে দেখতে দেখতে কেমন করে কেটে গেল, বোঝা গেল না। আমি একটু অসুস্থমনস্ক ছিলাম। মনে বিগত দিনের ছবি জুসে উঠছিল। আমিও এসেই মতো এক দিন ছোট ছিলাম। এমন দৌরাণ্ডা করতুম। বড়রা কখনো হাসিমুখে সহ্য করতো, কখনো বা করতো না। বধন করতো না তখন হয় বকুনি, নয়তো ঠার খেতুম। তবু ভাল লাগত। তখন ভাবতুম বড়দের কত মজা। আমাদের মতো পড়া দেবার স্বপ্না সহ্য করতে হয় না। কেমন খন ইচ্ছে, তখন বাড়ি আসে। আর আমার বাড়ি কিরতে একটু দূরী হলেই ডবলডর সব কাণ্ড হতো বাড়িতে। আহা, যদি আবার কান দিন এই ভাবনা বিহীন দিনগুলির দেখা পাই!

কী অলস পরিকল্পনা! নিজের মনেই হাসি পাচ্ছিল। কানাই

ওদিকে একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাদিন। সেই ছেলেকে নিয়ে কাটাল। কখনো ওকে গুলতি তৈরী করে দিচ্ছে, কখনো বা ওর সঙ্গে মার্বেল খেলছে। কানাইও যেন একটু ছোট ছেলে হয়ে পড়েছে।

ফেরবার পথে কানাই বলল, শতরকে দেখতে যেন না?

—কোন শতর? আমি বিম্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

—বা রে। যে বাচ্চা-ছেলেটার সঙ্গে আমি সারাদিন কাটালুম সেই তো শতর। কানাই অসুযোগ করল।

—ও।

কানাইকে সাধনা দিয়ে বলি, হ্যাঁ, ছেলেটা বেশ দেখতে। জোয়ার যদি ওরকম একটা থাকতো।

কানাই সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, থ্যাং, কী যে বলো।

বুরলাম কানাই ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলেছে। আর এই একই কারণে ওর বিয়ের প্রস্তাব করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে যাবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম।

বাড়ি ফিরে এসে আর বাইরে যেতে ভাল লাগল না। বারান্দায় একটা মাহুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পামা এসে একবার জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে না কি?

মাথা নেড়ে বললুম, না।

—তবে শুয়ে পড়লে যে?

—এমনি।

পামা নিশ্চিন্ত মনে তার কাজ করতে চলে গেল। কি যেন ভাবছে পামা। সেই কাল রাত থেকে ওকে একটু গভীর-গভীর দেখছি। পরিহাসের সুরে আর কথা-কাটাকাটি নেই, নেই কাছ এসে সোহাগ জামানো। আজ ও শুধু শরীর খারাপ কিনা জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল। অজ্ঞ দিন হলে কাছ এসে বসতো, কপালে-বুকে হাত রেখে দেহের তাপ পরিমাপ করতে চেষ্টা করতো। কিছুই করলো না দেখে ওকে একবার ডাকতে ইচ্ছা হলো। তার পরই ভাবলুম, যেচ্ছার স্বপ্ন ও আসিনি তখন ওকে ডাকা মানে ওর অভিমানকে প্ররোচ দেওয়া। মেয়েদের তোয়াজ করার পক্ষে আমি নই। ভাতো ওরা শেষে বসে। আমি আরামের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলুম।

বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মহিম ডাকছে, নয়ন
কিয়েরো নাকি গো?

মহিমকে এনে মাহবুবের এক রিকে বসতে দিলুম। পা হুড়ে
বাগিয়ে বসে মহিম জিজ্ঞাসা করলো, তার পর কখন ফেরা হলো?

—এইতো এলুম।

—আবার বিবস্ত্র করলুম না তো?

—না না। কি যে বলেন! চা খাবেন?

—চা? তা মন্দ নয়। কিন্তু তার জন্তে তোমার ব্যস্ত হতে
হবে না। বোঁমা, ও বোঁমা!

পামা মাথার ঘোমটা একটুখানি টেনে বেরিয়ে এলো আঁচলে
ভিজ় হাত মুছতে মুছতে।

মহিম বললো, ছুঁ কাপ চা কর তো বোঁমা ভাল করে। খুব
জ্বাল বেন হয়, বুঝলে?

মাথা তুলিয়ে সার দিয়ে পামা বেরিয়ে গেল।

—তার পর খবর কি বলুন? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—খবর আর কি ভায়া! শিব বাবুর মেয়েকে দেখতে যাওয়া
তাহলে ঠিক, কী বলো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন।

—তা বলি, কানাই হোকবা গেল কোথায়? তাকে দেখছি
না যে?

—কানাই একটু বাইরে বেড়াতে গেছে।

চায়ে একটা নরম চুইক দিয়ে মহিম বলল, আ। মহিম চলে
বাবার পর ছাড়িয়ে পলভেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে হিসেবের
খাতা খুলে বসলুম। কত দিন যে হিসাব লেখা হয়নি।
নোট-বই থেকে সব পাকা খাতার তুলতে লাগলুম। কানাইকে
হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে। ওর বখান আলালা সংসার হচ্ছে
তখন ওর বচপত্র আলালা করে দেওয়াই ভালো। একমনে কাজ
করতে শুরু করলুম।

আমার একান্ত্রতা ভাঙিয়ে দিয়ে কানাই বলল, কি অত
হিসাব করছো?

—এই অনেকদিন খাতা লেখা হচ্ছে না, তাই।

—বাথো তুলে ওসব। বত বাজে ব্যক্তি বামলা বাপু।

—সে কি, কানাই? তুমি হিসেব বুঝে নেবে না?

—হিসেব বুঝে নেব? মানে?

আমাকে নিরস্তর দেখে কানাই আবার বলল, ও বুঝি।
আমাকে আলালা করে দিতে চাও। কিন্তু কেন?

—তোমার ভালোর জন্তে।

—আমার ভালো-মন্দ বোঝার ব্যয়স কী আমার হয়নি?

—হয়েছে। কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, কানাই।

তুমি জান যে আমার আর পামার সঙ্গে বিয়ে করার পর তুমি
বাস করতে আর পারো না?

—কেন পারি না?

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত কলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কানীষ বামণদী পণ্ডিত মহাসভার দ্বারী সভাপতি।
ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে দক্ষতর। হস্ত ও কপালের রেখা, কোঁজী
বিচার ও প্রকৃত এবং অন্তর ও দুই গ্রহাধির প্রতিকারকর শক্তি-ভাষ্যনাথি, তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রস
করচাৰি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ভাঙার কবিরাজ পরিতাপ্ত কর্তৃক
যোগাধির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা,
আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনীষীকৃত ভাষার অলৌকিক
দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাঁহার মুখ তাঁহাদের মধ্যে কল্পেজন্ম—

বিজ় হাইনেস মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস মাননীয়া বঠমাতা মহারানী ত্রিপুরা গেষ্ট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
মাননীয় স্তার মনমণাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সত্তোবের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্তার মনমণাথ সার চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের
প্রধান বিচারপতি মাননীয়া বি. কে. রায়, বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের মহী রাজবাহাদুর শ্রীধরসদেব রায়কর, কেউনকড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব
মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজাপাল স্তার ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. রূপল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রসদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদান কবচ—ধারণে স্বচ্ছাসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তত্ত্বোক্ত)। সাধারণ—৭১১/১০, শক্তিশালী
বৃহৎ—২১১১/১০, মহাশক্তিশালী ও সমুদ্র কলসায়ক—১২১১১/১০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও সমুদ্র কলসায়ক লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর
অবশ্য ধারণ কবচ)। সন্ন্যাসী কবচ—সন্ন্যাসিত বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সফল ১১১/১০, বৃহৎ—৩৮১১/১০। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ—
ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১১/১০, বৃহৎ—৩৮১১/১০, মহাশক্তিশালী ৩৮১১১/১০। বঙ্গলায়কী কবচ—
ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিহ মানিকের সন্ততি ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ১১১/১০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৮১১/১০,
মহাশক্তিশালী—১৮১১/১০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাঙালা সমস্যা সমাধানী জরী হয়)।

(হাপিতাম ১১১/১০) অল ইণ্ডিয়া এস্টোলাজিক্যাল এণ্ড এস্টোনমিক্যাল সোসাইটি (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মভাষা স্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ওয়েলেসলী স্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৬৫।

সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০৫, থ্রে স্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৫৫। সময় প্রাপ্তে ৯টা হইতে ১১টা।

—আমরা বিবাহিত নই বলে।

—তবে এতদিন কী করে কাটিয়ে এলুম?

—তুমি একলা ছিলে আর কিছুদিনের মধ্যেই তুমি বিয়ে করতে বাচ্ছ। তোমার স্বত্ববাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে তোমার থাকারটা পছন্দ করবে না।

—তা হলে বিয়ে বন্ধ থাক।

কানাই রাগ করে উঠে চলে বাচ্ছিল। পামা এসে তাকে আবার বসাল। তার দুটি হাত ধরে বলল, রাগ করো না, ঠাকুরপো! উনি ঠিক কথাই বলেছেন। তোমাকে আর তোমার বৌকে আমি কাছে রাখতে পারলে খুবই খুশী হতুম। কিন্তু আমি যে অসামাজিক ভাব। নরকের কীট। আমার চাষা পৃথক মাড়োনা পাণ। তুমি দেখো, ঠাকুরপো, বিয়ের পর ঠিক তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।

কানাই গুম হয়ে বসে রইল। সমাজ ব্যবস্থার পামার স্থান কত নীচে বোধ হয় সেই কথাই ও ভাবছিল। মাছুষ কতই না আমার সংস্কার মেনে চলে। আবার সংস্কার ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে না। দুঃখের আগুন মন পুড়িয়ে নিলে নাকি মন শুদ্ধ হয়। পামা কত লাজনা, কত দুঃখ, কত অপমানই না সম্ব্ব করেছে; যেমনটা আগুন পুড়ে গর মনও তো শুদ্ধ হয়েছে, পবিত্র হয়েছে। কৈ কেউ ওকে সে-মর্খালা দেবে? আসলে গর যে একটা মন আছে, সে-স্ববই কেউ বাধে না। শুধু রাখে পামার দৈহিক সৌন্দর্যের উৎসাহ-পতনের ইতিবৃত্ত।

আজ আমাদের পরিবারে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে কে? কাকো দোষ দোষ? আমি তো পামাকে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু ও বাচ্ছী হয় নি। বোধ হয় পামা বিবাহিতা, বোধ হয়েছিল বাগবান্ডা। সংস্কারের লক্ষ্যের গলিতে পামাও ধোঁট খাচ্ছে। আমাকে বিয়ে করতে গর বিয়ে বাধে। অথচ বাধাটা যে কী এবং কোথায় তা জানার সৌভাগ্য এখনো আমার হলো না। এক এক সময় মেয়েরা এমন যুক্তিহীনভাবে জেরী হয়ে ওঠে যে রাগ হয়।

রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি কানাইকে বললুম, চল, চল। খেয়ে নি। রাত অনেক হলো।

কানাই জেদ ধরলো পামাকেও বলতে হবে আমাদের সঙ্গে। বিরক্ত হলো পামা। বরাবর আমাদের খাবার 'হয়ে বাবার পর ও খেয়েছে। কানাই নাছোড়বান্দা। তার পীড়াপীড়িতে পামাকেও বলতে হলো আমাদের সঙ্গে।

১২

বিশ্রান্তের শেষ দানটা পৃথক চালান করে দেবার পর মাঠের কাজ আর আপাতত রইল না। বাইরের দিকে নজর কেঁদাতে হবে। মহাজনদের মাল কলকাতা থেকে আনতে হবে। বাঁধা ঘর বেগুলি আছে, তাছাড়াও অজ্ঞাত কারবার ঘরতে হবে অর্ডার সংগ্রহের জ্ঞান। খরচ বাড়বার আগেই আর বাড়িয়ে ফেলার পক্ষপাতী আমি। খরচ কমাতে আমি চাই না।

সিঁজিলসাদাই ডিপোতে এক দিন সকলাবেলা লরী নিয়ে গেলুম। গিয়ে দেখি রিহাট লাইন পড়েছে। একটা গাড়ী একটু এগুচ্ছে

আর সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচটা গাড়ী সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এবং জোটে হড়হড় করে এগিয়ে আসছে। পুলিশ অসহায় নর্যকর মতো চেয়ে চেয়ে দেখছে আর লাঠি হাতে গৌকে তা' দিচ্ছে। কম করে একশ' লরীর লাইন।

ওজন হবার বস্ত্র পৃথক পৌছতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর এজেন্ট, চালান পাল, মাল তোলা আর চেকিং থেকে বেরতে বেলা বারোটা বেজে গেল। এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা এখানে ভিড় করি। কেবল ব্রেট লাভজনক বলে। দিনে তিনটে ট্রিপ করতে পারলে, লাভ মোটামুটি ভালই হয়। কিন্তু সব দিন ছুটোর বেশী তিনটে ট্রিপ হয়ে উঠে না।

সেদিন সন্ধ্যাসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। অনেক কথা পর সন্ধ্যাস বলল, তোমাদের সঙ্গে বাই চল। আয়ের নতুন রাস্তা করে দি।

সন্ধ্যাসের আয়ের রাস্তা করে দেবার প্রস্তাব কানাই ভালমনে নিতে পারেনি। ভয়ে ভয়ে সে বলল, নয়ন, ওকে বিদেয় করো। আমাদের বা হাচ্ছে, তা নিশ্চয়ই চলে যাবে। ও শর্যতানটাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

—ভয় পাবার কী আছে? অভয় নিয়ে আমি বলি।

—তুমি জানো না। ও সব করতে পারে।

—দেখা যাক না ওর দাঁড়। আমরা বা ভালো বুঝব, তাই করবো। ওর কথামতো যে চলতে হবেই, তার তো কোন মানে নেই?

বা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই হলো। সন্ধ্যাস শেষ পৃথক মাল চুরি করার পরামর্শ দিলো। বস্ত্রা ছুটো করে, কিছু কিছু মাল সরিয়ে ব্রাক করার কথা বলামাত্র কানাই গর্জে উঠল, বা বলেছেন বলেছেন। আর ভবিষ্যতে কখনো আমার সামনে এরকম কথা বলবেন না। মাল কমতি আমরা করতে শিখিনি আর শিখতেও চাই না।

সন্ধ্যাস চুপ করে রইল। তার পর সব উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে বলল, বড়লোক হতে হলে এ ছাড়া সহজ রাস্তা আর নেই, কানাই! লরী করে অনেকই তো বড়লোক হয়েছে। আর তোমরা, বড়লোক হওয়া তো প্রের কথা, দুদিন লরী বন্ধ থাকলেই উপোস করবে। অবশ্য আমার কথামতো চলো আর নাই চলো, আখেরে বুঝতে পারবে যে আমি কোন খারাপ মন্তব্য নিয়ে একথা তোমাদের বলিনি। আমি তোমাদের ভাল চাই বলেই এ প্রস্তাব করছি।

—নোংরা কিছু করে, বড়লোক হতে আমরা চাই না।

—দেখ, নোংরা কোন জিনিসকে বলছ, তা জানি না। আসলে টাকা করার রাস্তা—মানে তোমাদের ব্যবসারে আর পাঁচজন বা করছে—কখনোই খারাপ হতে পারে না। থাক্ গে। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে ও সব আলোচনা না করাই ভালো।

আলোচনা বন্ধ করে সন্ধ্যাস অজ্ঞ চাল চালল, আজ সন্ধ্যার দিকে চল 'মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবে' বাওয়া যাক।

কানাই জুয়া খেলতে ভালবাসে। গর মন জয় করতে হলে জুয়ার কথা বলা ছাড়া আর কোন রাস্তা যে নেই সন্ধ্যাস তা জানে—এবং জানে বলেই 'মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবের' নাম করতে সাহস দেন।

ক্লাবে বধন পৌছলুম তখন দেখি আসির পূর্বা দিকে এসে উঠছে। কেউ আমাদের দিকে কিয়ৎ ভাবানো প্রয়োজন মনে করল না। ঘরের ভিতর কেবল নখর গোঁধার আওয়াজ।

কাগজের চাকতি নিয়ে আমরাও খেলার যোগ দিলাম। কয়েক রাউণ্ড পরেই আমার সব হার হয়ে গেল। আমি সব কিছুই তাড়াহুড়ি করি বলে কোন কিছুই জিততে পারি না। জুয়াতে জিততে হলে হৈধা দুটি আর বুদ্ধ থাকে দরকার। আমার তা কানাকড়িও নেই। কানাই দেখি অনেক চাকতি জামিয়ে ফেলেছে। লাল, নীল, সবুজ অনেক চাকতি।

হেবে গিয়ে আমি বাটরের বায়ান্দার গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে বসে বসে হাজার লোক চলাচল দেখতে লাগলুম। বায়ান্দার বে দুজন পাঠাগ দিচ্ছিল, তারা দেখি হঠাৎ চকল হয়ে উঠল। কি ব্যাপার, আমি বুঝতে পারলুম না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘরের ভিতর এসে দেখি, খেলা পুরোদমে চলছে। মালিকের সঙ্গে কী কিস-কিস করে পাহারাদাররা কথা বলছে। স্ত্রীসকল খুঁজে পেলুম না। কিছু একটা গণ্ডগোল কোথাও চলেছে মনে করে আমি কানাইকে এক পাশে ডেকে এনে কাগজের চাকতিগুলি ডালিয়ে নিতে বললুম।

হঠাৎ ঘরের ভিতরকার বাতি সবুজ হয়ে গেল। মালিক সকলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, খেলা বন্ধ করে দিম সব। আস্ত্রন একটু গান-বাজনা করা যাক।

কিন্তু গান-বাজনার অবসর আর পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা হলো পুলিশের আবির্ভাব। দেখতে দেখতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হলুম সবাই।

পুলিশের গাড়ী করে ধানায় এলুম। নাম-ধাম লেখা হলো। কিন্তু জামিন না পেলে ছাড়া পাওয়া যাবে না। অতএব কাল কোর্ট না খোলা পর্যন্ত পুলিশের আতিথ্য স্বীকার করতেই হবে।

হাজত-বাস জীবনে প্রথম বলে কেমন বেন খারাপ খারাপ লাগছিল। কত নীচু শ্রেণীর লোকের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে। চোর, জোক্তোর, পকেটমার। হয়তো খুনও আছে এর মধ্যে। গা ধিম-ধিম করে উঠল ঘুণায়। কারো দিকে কোষ তুলে তাকাতোও পারছিলাম না। একটা অবুধ লজ্জা পেয়ে বসেছি।

দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম বসে বসে। কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে। অতএব কাল কোর্ট না খোলা অবধি ভেবেও কিছু হবে না। হঠাৎ সুরাসের কথা মনে পড়ল। সুরাস কী করছে এখন। না বলে করে ও গেলেই বা কোথায়?

কানাই আমার পাশে চুপ চাপ বসে আছে। কোন কথা বলছে না। বোধ হয় ভাবছে ওর জেতেই আমার এল। বার জেতেই হোক, হাজতে বধন চুকে পড়েছি, তখন কার দেখ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কী হবে! তার চেয়ে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করা অনেক বেশী বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দরজা খুলে গেল হাজতেয়। আমি আর কানাই থানা অফিসে এলুম। সুরাসের চৌধার অবশেষে আমাদের জামিন হয়ে গেল।

একগাল হেসে সুরাস বলল, গাল দিচ্ছিলে নিশ্চয়ই এতকণ?

—না, না। গাল লোব কেন? অবাক হয়েছিলাম তোমার না দেখে। আমি বিগল বকনে বললুম।

—আরে তাই, আমি কি ছাই জানি যে পুলিশ আসছে? বাইরে

বেগিয়েছিলাম সিগারেট কিনতে। লোকানী বলল, কর্তী, বাঘের গন্ধ পাওয়া বাজছে। আর নিরিবেই সব গ্রেপ্তার হয়ে গেল সবাই। আমি তাই আর ক্লাবে না গিয়ে, সোজা উকিল বাবুর বাড়ি গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে ওঁকে ঘরে নিয়ে এলুম। নাও, সিগারেট খাও।

এই এক রাত্রিতে অনেক অভিজ্ঞতা হলো। তাহলে স্ত্রীসকল একেবারে অমায়ূব নয়। পামাকে জামা-কাপড়ের লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে বলে, যেটুকু রাগ ওর ওপোর ছিল, তা আর হইল না। বরঞ্চ ভাবলুম, আমার বেনিকে নজর নেই, ও সৈনিক আমার নজর কিরিয়ে দিয়ে ভালই করেছে। হয়তো পামার বাছানোর দিকে আমি এখন আরো একটু বেশী নজর দিতে পারব। কৃতজ্ঞতা যোগ হলো।

কানাই কথা কইল না আর।

কিন্তু কথা বলুক আর নাই বলুক, কামদেবপুরের শিব বাবুর মেরেকে লম্বতে বেতে এক কথাতাই সে রাজী হয়ে গেল। এত তাড়াহুড়ি ওর স্মৃতি হবে আমি ভাবতে পারিনি।

মেয়ে দেখার তামাসা আমরা করতে বাইনি। বংশাবলীর পরিচয়ও ঠরা—মানে পাত্রীশব্দ—জিজ্ঞাসা করে আমাদের বিব্রত করলেন না। মেয়ে এমন অসাধারণ কিছু নয়। মোটারুটি ভালই। অতএব পাকা কথা আমরা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে দিলাম।

মহিম হৌতুকের কথা তুলতেই আমি বাধা দিয়ে বললুম, আমাদের দাবী-দাওয়া কিছু নেই।

শিব বাবু খুশী হলেন। তবু তিনি বললেন, ধৈর্য, সবাইতো চার নিজের মেরেকে বধাশায়া দিতে। আমিও বরটুকু পারি লোব। তাতে আমি বাদ সাধবো না। তবে আমার জামাইকে আমি একটা উপহার দেব সেটা কিন্তু নিতেই হবে। বুঝতেই পারছেন আমার এই একটা মাত্র মেয়ে। সে উপহারটা যে কি, তা আমরা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করলুম না।

পামা সব শুনে খুশী হয়ে বলল, ঠাকুরগো, এবার আমার পাওনাটা মিটিয়ে দাও।

কানাই খুবই অবাক হয়ে বলল, বৌদি, তোমার পাওনা?

—বা রে মশাই, এত দিন যে সেবা করলুম, তার বৃত্তি কোন দাম নেই?

স্ত্রীরোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয় রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্রাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৩

সন্ধ্যা ৩—৮টা। ফোন নং ৪৬-১৩৫৮

খুব একটো হেসে কানাই বলল, ও বাব্বা! তা আবার নেই।
কী চাই বলো?

—না থাক। এখন কিছু বলব না। বিয়ের পরে বলব, কেমন?

—বেশ তাই হবে।

১৩

মাত্র আর কয়েক দিন থাকি বিয়ের। এর মধ্যে কত কাজ পড়ে রয়েছে। বাড়ি ঝুঁজতে হবে, জিনিসপত্র জোগাড় করতে হবে, আরো বত কী।

হাতে হাতে সবাই মিলে অল্প সাহায্য করছে। শ্রীমন্ত সেদিন ঘরের সজ্জা নিয়ে গেল। দুটো মাত্র ঘর। ভাড়া আঠারো টাকা। তাও আবার ওলাইনিখিতে। এখন থেকে বেশ দূর। তা হোক। যদি ভাল হয় তবে আপাতত ও দুটোই নিয়ে নিতে হবে।

ঘর দেখতে গেলুম সকালবেলা। আলো থাকতেই ঘর দেখা ভাল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। কানাইকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলুম। ঘর দেখে আমার পছন্দ হল। ভাড়া অবশ্য একটু বেশী। কিন্তু উপায় কী। আগাম জমা দিয়ে এলুম।

প্রদাস গায়ে-হালুদের তত্ত্ব নিয়ে এসেছে। পামা তাই গোছগাছ করতে ব্যস্ত। উৎসবের সাড়া পেয়ে সমস্ত বাড়ি যেন কাজে মেতে উঠেছে। কেউ বসে থাকতে চায় না। সবাই একটু-না-একটু কাজ করে আনন্দ পায। আমাদের বাড়িতে কোন ছোট ছেলে-মেয়ে নেই। অথচ পাড়ার দু-চারটে ঠিক এসে ছুটেছে।

কারা-কারা বরষাত্রী বাবে সব ঠিক করা হয়ে গেছে। এখন থাকি রইল বাতির ব্যবস্থা করা। বৌ-ভাত কানাই-এর নতুন বাড়িতে করাই আমার ইচ্ছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঠান রয়েছে সেখানে, জলেরও অভাব নেই।

কিন্তু পামা এ-প্রস্তাবে মন-খুলে সার নেয় নি। এখানে যে বৌ-ভাত হওয়া ঠিক নয়, তা সে জানে। অথচ অল্প কোন বাড়িতে বৌ-ভাত হোক, তা-ও সে চায় না।

সন্ধ্যার দিকে পামাকে একলা পাওয়া গেল। তাকে বধন সব বুঝিয়ে বললুম, তখন সে শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

ধানিকদণ্ড পরে আমার আরো কাছে সরে এসে বলল, আমি যদি ক'দিন অল্প বাড়িতে গিয়ে থাকি, তবে কী এখানে বৌ-ভাত হতে পারে না?

—তা কেন তুমি বাবে, পামা! নিজের বাড়ি থাকতে ওরকম করে কষ্ট করার কী দরকার?

—তুমি বুঝ না কেন গো? নতুন-বৌ এলে কে তাকে বরণ করবে? কে তার দেখা-শুনা করবে, বলো তো? ও বাড়িতে তো কোন আসবাবপত্র নেই, মেয়েদের বা-বা দরকার তাও নেই। আর তা ছাড়া, থাকলেই বা কী? একটা মেয়ে ছেলে কাছে না থাকলে নতুন-বৌ ভারী অসুবিধে পড়বে।

—বুঝলুম। আচ্ছা, শ্রীমন্তর মেয়েকে বলব ক'দিন ও বাড়িতে কাটিয়ে বাবে। তা হলে হবে তো?

আসলে পামার খুব ইচ্ছে নতুন-বৌকে কাছে রাখার। বুঝতে পারছি। কিন্তু এ কি এক অব্যবহেলমাত্রাধিতে যে পেয়ে বসেছে পামাকে। যদি কেউ কোন কটু কথা তাকে বলে? কিংবা যদি

কদর্ব ইচ্ছিত করে পামার চরিত্র নিয়ে? সে আখ্যাত পামা বুঝবে। সহ্য করতে পারবে না। যাতে কোম দিন তাকে কারুর কাছ থেকে কোন কথা শুনতে না হয়, তাই জ্বলন্ত তাকে আমি এতদিন সন্তপণে আগলে রেখেছি। পামার আবার আজ রাখা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর নয়।

—এই, শোনো। আমি অল্প কথা পাড়ি, তুমি কী দেবে কানাই-এর বোঁকে বলো তো?

—কী আবার দোষ। আমার কী আছে? অতিমান করল পামা।

—আমি তো জলজ্যান্ত বেঁচে আছি।

—তাই তো আমিও বেঁচে আছি।

—তা হলে ছতুম কর, কী আনতে হবে।

—কিছু আনতে হবে না। যা দেবার, তা আমার কাছেই আছে।

—ও।

—রাগ হলো বুঝি?

না না। রাগ করবো কেন? তুমি যে লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর ভাগ্যের কী কোন কিছুয় অভাব থাকে?

—থাকে নাই তো।

—কিন্তু লক্ষ্মীর ভাগ্যের যে একটা জিনিসের শোচনীয় অভাব দেখতে পাচ্ছি?

—সেটা কি?

—বুঝি।

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ঘাট মানছি। তুমি যা বলবে তাই হবে।

আমার আমারে আমাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল পামা। শাড়ীর আঁচলে দিয়ে আমার কপাল মুছে দিয়ে বলল, কী রকম শূন্যর আমার দিন কাটাচ্ছিলুম, আর কী হয়ে গেল, না?

পরিবর্তনের স্রোতের এক পাশে ঠাঁড়িয়ে অল্পশোচনা করা চলে, কিন্তু প্রবাহমান স্রোতের গতিবেগ তাতে বিন্দুমাত্র রুদ্ধ হয় না। কার মানসিক তত্তে কতখানি ভাবনার পলিমাটি পড়ল, কার অহুত্বিতে কতখানি ভাঙ্গন ঘরল, তা নিয়ে মাথা-বাথা নেই সময়ের। আজ বা আছে কালও তাই থাকবে—এটা সবাই চায় না। দুঃখী চায় না, আজকের দুঃখ কালও থাক। অসুস্থ মাথা চায় কালই সুস্থ হতে।

আমাদের জীবনের আসন্ন পরিবর্তন প্রসন্নচিত্তে পামা গ্রহণ করতে অপারগ। তাই বলে যে পরিবর্তন হবে না, সেটা তো কোন কাজের কথা নয়?

লোকজনের ভীড় আর বিয়েবাড়ির স্বাভাবিক বিলুপ্তিলার মধ্যে কানাইয়ের ঘিরে হয়ে গেল।

বৌতুক মিলেন বটে শিব বাবু। আমাদের সকলের কল্পনার বাইরে। জামাইকে তিনি উপহার একটা দেবেন বলেছিলেন—এক সেটা যে পাঁচটনি বেডকোর্ড হবে, তা আমরা ভাবিনি। বড় বড় করল বরষাত্রীরা। দিল আছে বটে—বলল অভাগতেরা।

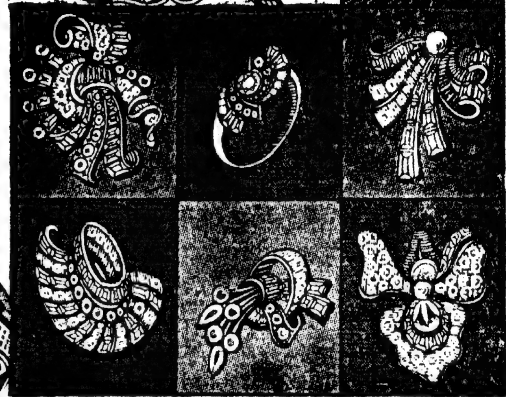
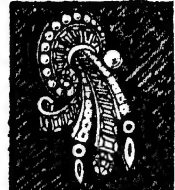
আশাশ্রিতিক্ত উপঢৌকন কী তারো মনে ঈর্ষার বীজ ছড়িয়ে দেয়নি? নিমিত্তিতরা কি সবাই প্রসন্নমনে ফিরে গেল? দেখছিলাম আর ভাবছিলাম।

তখন সানাই-এ বাজছিল মালকোষ।

[কমপঃ।



সৌন্দর্য্য মার্ঘ্য



গিনি সাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি. সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭ সি/১ মহতাজাড ট্রাষ্ট কলিকতা-২ গ্রাম-পুন্ড্রিয়াবৈষ্ণব
ব্রাহ্ম-বালি গল্ড-২০০/৫/মি গ্রামবিহারি এভিনিউ কলিকতা-২ ফোন-৪৬-৪৬৬৬
স্বাক্ষর প্রদাতন টিফনবা ১২৪, ১২৪/১, মহতাজাড ট্রাষ্ট, কলিকতা-২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাহ্ম-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৪৪৮৭



ভাবানী মুখোপাধ্যায়

চবিশ

আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা, জার্মানী ও ইংল্যান্ডের মন কথাকবি ক্রমশঃ এই প্রবলতর হয়ে উঠছে, বার্লিট শ' এনিকে মাথা ঘামাবার অবসর পাননি। কাউন্ট হেনরী কেসলার একটা আবেদন জানিয়ে বললেন—আমরা হলান্ড সেক্সপীয়র, গ্যায়টে, নিউটন, লাইবনিৎস প্রভৃতির সাংস্কৃতিক বংশধর, ইংলণ্ড ও জার্মানীতে কত সাংস্কৃতি কমিল, অতএব লড়াই কেন বাধবে? এই যুদ্ধ থেকে উভয় দেশের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ঘটে বিজ্ঞপ্তি এবং ইচ্ছাহাবের মাধ্যমে। ইংলণ্ডের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি রচনার ভার পড়ল বার্লিট শ'র ওপর। বার্লিট শ' কিন্তু বুঝলেন সেক্সপীয়র ইত্যাদির প্রতি উভয় দেশের একটা প্রভা আছে বলেই লড়াই বন্ধ করা বাবে না, তাছাড়া জার্মানরা ভাবে সেক্সপীয়র একজন জার্মান, ইংরেজরা কিছুই ভাবে না। বার্লিট শ তাই তাঁর ইচ্ছাহাবে লিখলেন জার্মান নৌবহর দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কিছু নেই, ইংলণ্ড এই বাবস্থাকে মানব সভ্যতা সংরক্ষণের এক প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা মনে করে। এর ফলে সেক্সপীয়র নিউটন প্রভৃতির সাংস্কৃতিক নাস্তি-প্রণাতিরা সেই ইচ্ছাহাবে স্বাক্ষর দান সম্মত হলেন। এ লাইনটি উঠিয়ে দিতে হবে—এই তাঁদের দাবী। বার্লিট শ' অবশ্যটা বুঝলেন, তিনি ১৯১৩-র মার্চ এবং ১৯১৪-র জানুয়ারী মাসে বাখক্রমে The Daily Chronicle এবং The Daily News এ এই বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখলেন।

বার্লিট শ' যুদ্ধবিরাগী ছিলেন মনে-প্রাণে, তিনি জানতেন, পৃথিবীতে যতদিন হিংসা-কুটিল মাছুষ থাকবে ততদিন এই ধরণের যুদ্ধ-বিরোধ বন্ধ করাও সম্ভব নয়।

বার্লিট শ' যুদ্ধ-নিবায়ক নানা রকম প্রস্তাবও দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করলেন। বলা বাহুল্য, 'এ' উপপাক্তি ছিল, এমন কি, কেউ কেউ উপহাস করে বললেন—বৈদেশিক দপ্তরে বার্লিট শ' থাকলে পনের মিনেই যুদ্ধ বাধতো, বার্লিট শ' জবাবে বলছিলেন, আমি বৈদেশিক দপ্তরে নেই বলেই ত'—আঠার মাসেই যুদ্ধ লাগলো।

বার্লিট শ'র কাছে যে-কোনো রকমের যুদ্ধ মানে একটা নিম্নোক্ত অভিজ্ঞাপ। বার্লিট শ'কে একজন একদা প্রশংসা করেছিলেন—আপনি Commonsense about the War লিখতে গেলেন কেন?

বার্লিট শ' জবাবে বললেন, কারণ আমি চিরদিনই যুদ্ধকে ঘৃণা করে আসছি। (I have always loathed war)

কিন্তু বার্লিট শ' বা তাঁর মত আরো কেউ পছন্দ করন আর নাই করন, পৃথিবীর অনেক লোক যুদ্ধে আনন্দ পায়, যুদ্ধই তাঁদের ধ্যান-জান। যুদ্ধে অসংখ্য নর-নারীর অকারণ মৃত্যু হয় এবং যুদ্ধের ফলে বিকৃত অর্থনৈতিক চাপে সমাজের আর্থিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে, এ সহ্যই জানে। তবু যুদ্ধের আনন্দে বাস্তবায়ক থেকে দূর করে—প্রত্যেকজামানি সহ্যই চালাই হয়ে ওঠে, ভয় আছে, তবু ভয়ও আছে। যুদ্ধ প্রতিযোগিতার সার্বক উপায় আজো আবিষ্কার করা যায়নি।

১৯১৪ খ্রীঃাব্দে ১৪ই মার্চের তারিখের The New Statesman and Nation দায়ক পত্রিকার অতিথিক জোড়পাত্রে বার্লিট শ' লিখিত Commonsense about the War প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ফ্রি কোর্ট সার্লি বার্লিট শ'র বক্তব্য বিষয়ের প্রতি একটুই প্রভা পোষণ করতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে তাঁর পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধি পাবে; তাই তিনি অকৃতোভয়ে বার্লিট শ'র রচনার একটি কথাও পরিবর্তন না করে প্রকাশ করলেন।

বার্লিট শ'র সমালোচক এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এইচ. জি. ওয়েলস এই প্রবন্ধ পাঠে কিন্তু হয়ে উঠলেন, তিনি শিশু হয়ে লিখলেন Shaw is like an idiot child screaming in a Hospital.

জন গলসওয়ার্থি বললেন, এই প্রবন্ধ বিকৃত কবিতার পরিচায়ক, কারণ এ বেন কাটা বাঘে ছুণের ছিটে।

কিন্তু লেবর পার্টির নেতা কীয়ার হার্ডি বার্লিট শ'কে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠি সমগ্র বিশ্ববাস্যকে একটা হুঁরে বেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। তিনি লিখলেন—Its inspiration is worth more to England than this war has yet cost her in money I mean. When it gets circulated in popular form and is read as it will be hundreds of thousands of our best people of all classes it will produce an elevation of tone in the national life which will be felt for generations to come. (এই প্রবন্ধের অল্পপ্রেরণার মূল্য যুদ্ধ বাধন ইংলণ্ড যে অর্থ ব্যয় করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এই প্রবন্ধ বহন সুলভ আকারে প্রচারিত হবে তখন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব শ্রেণীর অসংখ্য সংস্কারের মনে এক উন্নত সুর সৃষ্টি করবে এবং পুরুষামুক্রমে তা উপলব্ধি করা বাবে।) এই সব কিছুই উত্তরে বার্লিট শ' শুধু একটি কথা—বললেন—“We must tell the truth unashamed like men of courage and character—”

সমালোচকদের হাতে বার্লিট শ'র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসিক বর্ম Common sense about the War রচনা এবং প্রকাশ করা। The New Statesman and Nation পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা

১৫.... কথিতে পৌছান। এই প্রবন্ধ বিদ্যুৎ হওয়ার অনেক পরে সাংবাদিকরা তার উল্লেখ করে বার্নার্ড শ'কে অনেক কটুক্তি করেছেন। বার্নার্ড শ' কিন্তু এই কারণে একটুকু ক্ষুব্ধ হননি, তিনি জানতেন, এই বিষয়ে তাঁর বিচারবুদ্ধি চূড়ান্ত। বার্নার্ড শ' বলতেন—“You may demand moral courage from me to any extent, but when you start shooting and knocking one another about, I claim the coward's privilege and take refuge under the bed. My life is far too valuable to be machine gunned”, (আমার কাছে তোমরা নৈতিক সাহস দাবী করতে পারো, কিন্তু তোমরা যখন পরস্পরের মাথা জানাচাঁনি হুজ করে তখন আমি ভীতের ছায়ায় গ্রহণ করে বিহীনতার নীচে আশ্রয় নেওয়া প্রেতঃ হয়ে যাই। যেদিনগালের আক্রমণে আমার চাইতেও আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশী।)

Common sense about the War পড়া থাকলে হয়ত এত হৈ-চৈ হত না। অধিকাংশ বিদগ্ধ মানুষ এই নিবন্ধ পড়েননি, তাঁরা এর গুর মুখে শুনেছেন যে ভীষণ ইংরাজ-বিবোধী এবং যুদ্ধ-বিবোধী ঘটনা। ফলে সবাই মিলে আক্রমণ শুরু করল। শ' লিখেছিলেন, বেলজিয়াম ঘটনাবলী একটা অভূতাব্য মাত্র যুদ্ধের যুদ্ধে নামার, এবং সেই অভূতাব্য জাতি দুর্বল এবং ভ্রেলো। শ' বলেছিলেন, প্রতিটি সেনানিলের সৈনিকরা যদি বৃদ্ধমান হত, তাহলে যে যার দলের কর্তাকে হত্যা করে বাড়ি ফিরে আসতো, যুদ্ধরত দেশের মানুষরা যদি এর মর্ম বুঝতো, তাহলে তারা কিছুতেই যুদ্ধের খরচ দিত না। জার্মানীতেও যুদ্ধবাজ Junkers (দেশোরালা মুকনি) আছেন, যেমন আছেন ইংলণ্ডে। ইংরেজরা ভণ্ড—আত্ম-গরিমা প্রচার ও শত্রুপক্ষকে গালাগাল দেওয়া যুদ্ধজয়ের পথ নয়। তার এডওয়ার্ড গ্রে (বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব) ইংলণ্ডের মনোভঙ্গী যদি পূর্ণাঙ্গ পরিষ্কার ভাবে জানাতেন, তাহলে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা চলত।

বার্নার্ড শ' রচিত Common sense about the War গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এক দেশপ্রেমিকের বক্তব্য, খুঁটাচালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু এমন কুৎসিত কুৎসা ও কলঙ্ক বার্নার্ড শ'র বিরুদ্ধে প্রচারিত হতে লাগল, যার আর খুঁতনা পাওয়া যায় না। এ যেন এক দিকে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম আর অপর দিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুর্কী এবং বার্নার্ড শ'। সংবাদপত্রে আন্দোলন উঠল, বার্নার্ড শ'র নাটক বহুত করে। পুণ্ডিতন বন্ধুও তাকে পরিত্যাগ করলেন। রয়্যাল ড্রাভল ডিভিশন থেকে এক সন্ধ্যার হার্বার্ট এ্যাসকুইথ বলেছিলেন—The man ought to be shot।

বার্নার্ড শ'র কাছে প্রতিদিন অজস্র পত্র আসতে লাগল, গালাগাল আর তিরস্কারে পূর্ণ সেই চিঠিগুলিতে বাড়ি ভরে গেল। একদিন এক সাধারণ-রজনীর অন্তর্যে অভিনেতৃবর্গ বার্নার্ড শ'র সঙ্গে একত্রে ফটোগ্রাফ তুলতে রাজী হলেন না, এমন কি, আমেরিকার পর্য্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া পৌছালো।

বেলজিয়ানরা কিন্তু বার্নার্ড শ'র গুর চটেনি, তারা তাকে আমন্ত্রণ করে আনিলো জার্মানীর বিরুদ্ধে বক্তব্য শুন্নিয় লেখার জন্য। বার্নার্ড শ'

তার ফলে লিখলেন—An Open Letter to President Wilson—১৯১৪ এই নভেম্বর তারিখের The Nation পত্রিকার সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। এই প্রবন্ধ পাঠে উত্তো উইলসনের ঘনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটলো তা জানা যায় না। এই নব বাণীতে বার্নার্ড শ'র অভিমতাদি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আকিবালজ, হেমজাংসন, তাঁর মত অতি তীব্র। তিনি বলেছেন একদিন ঐতিহাসিকরা স্বীকার করবেন যে বার্নার্ড শ'র ঘটনা কি ভাবে উইলসনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষতঃ দ্বি-দীপ অব মেশল, ক্রীতর অব দ্বি-সিস, ভাঙ্গাট হুজি, চকুদশ চকু হুজি এবং জার্মানদের সঙ্গে সন্ধ্যারি আলোচনা বার্নার্ড শ'র মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।

জার্মানরা বার্নার্ড শ' চিহ্নিত Common sense নিজেদের প্রচার কার্ণে ব্যবহার করলেন। বহুি কোমো সমাপ্তিচক বার্নার্ড শ'র এই কীতি অন্ত্য সাহসিক এবং Ton Payne-র সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন, ফ্রান্স হারিস বা সেক্টরন আভিন প্রভৃতি জীবনীকারদের মতে বার্নার্ড শ'র পরবর্তী কার্যাবলীতে মনে হয় তিনি কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রান্স হারিসনের রচিত জীবনী বার্নার্ড শ'র জীবনকালে প্রকাশিত, এই বিষয়ে স্বঃ বার্নার্ড শ'ও কোনো মন্তব্য করেননি। ব্রুটনের লোকজন তাঁকে শত্রু মনে করলেও সরকার তাঁকে নিরাপদ নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এমন কি তাঁকে যুদ্ধ কালে সমরক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন।

উপভাস লেখক এ, ই, ডব্লু ম্যাসন যুদ্ধের সময় গুপ্তচর বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, তুমধ্যসাগর অঞ্চলে, তিনি বার্নার্ড শ'কে অন্তর্যে জানালেন যে, জার্মান রূপপ্রচারের জবাবে মুরদের মধ্যে প্রচারের জন্য কিছু লিখুন। এর ফলে বার্নার্ড শ' লিখলেন An Epistle to the Moons, বার্নার্ড শ'র এই নিবন্ধ নাকি মুরদের শাস্ত করেছিল।

এই কারণেই কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে Common sense about war নিয়ে এত হৈ চৈ কিসের?

১৯২৪-এ বার্নার্ড শ' প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—আমি কোনো দিনই সরকারের বিরোধিতা করিনি। বৃটিশ গভর্নমেন্ট জানতেন আমি তাদেরই দলে। আমি দেখছি যে আমেরিকানরা বা যে সব ইংরেজরা সেই সময় আমেরিকায় ছিলেন, যথা হেনরী আর্থার জেমস, তাঁদের ধারণা যে আমার মনোভঙ্গী পরাজিতের ভঙ্গী, কবাসীরা বাক বলে Defeatist। ইংরাজরা কিন্তু আসল খবর রাখতেন, তা নইলে আমাকে গুলী করে মারা হত। ১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দে বার্নার্ড শ' অপেক্ষা অনেক লম্বা পাণে অল্প দেশে অনেক স্বাধীনচেতা মানুষের গুরুত্ব হয়েছে।

ফার্ক হারিস একটি চমৎকার উক্তি করেছেন—মলিয়েরের মত এই ব্যক্তির দ্বারের কক্ষার কীরণারা প্রবাহিত, কিন্তু তুর্গেনিভের নিহিষ্ঠি নায়কের মত সংকটকালে কি জীবনে কিংবা নাটকে যেখানে বৈপ্লবিক মনোভঙ্গীর চরম অভিব্যক্তির প্রয়োজন সেখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে তিনি দুর্বল।

অবশ্য মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের পুত্রের স্মৃতিতে বার্নার্ড শ' কিঞ্চিৎ আবেগ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠির কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি।

‘ম’ হেসকেব পীরসনকে পরে লিখেছিলেন—“তুমি
Common sense about the war ঠাণ্ডা মাথার
পাণ্ডা তুমি অবাক হয়ে বাবে এই যে, কেন কিছু লোক এই নিবন্ধ
পড়ে কেনে উঠেছিল, বিশেষ করে বারা এক ছত্রও পড়েনি
তাদের রাগটাই বেশী, এরা কিন্তু ভেদেছিল Junker বরাটি
পালাপালা হিসাবে গ্রহণ না। কয়েক আমি সাবধান করে দিতেছি।
হুম্বোপের আসল Junker হলেন স্যার এডওয়ার্ড গ্রে। আসল
কথা হল, যে তেজু আমি জ্ঞাত আইরিশ, আমার মনোভাঙ্গী বৃটিশ-
বিরোধী, তাই বৃটিশের তরফ থেকে আমার বক্তব্য পেশ করাটা
অনেকের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল।

যুদ্ধের পর লর্ড মরলীর চিঠিপত্র প্রকাশ হওয়ার পর সম্ভ্রান্তীত
জায়ে প্রমাণিত হয়েছে ডাইকাউন্ট গ্রে এবং লণ্ডনের আরো অনেকেই
কাইজারের কাছাকাছি যেসব মাহুষ ছিলেন তাদেরই সমস্ত
অপরাধী। ফ্রান্স হারিস বলেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই বার্লিন শ’ হরত
কিছু গোপনতথ্য ভেদেছিলেন, এডওয়ার্ড গ্রে প্রভৃতির সম্পর্ক।
জানা অসম্ভব ছিল না কারণ বড় মহলের ব্যক্তিদের কাছে কোনো
খবরই গোপন থাকে না। কিন্তু ফ্রান্স হারিসের মনে হয়নি যে
পৃথিবীকে ধ্বংস করা বা হুগতি থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে নিবিড়
নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একটা আশাযন-যা,
করেছিলেন নিজের বিবেকের সঙ্গে, যেমন করেছেন তাঁর সাহিত্যের
সঙ্গে, এই বিষয়ে হয়তো তাঁর সমগোত্রীদের সংখ্যা অধিক, কিন্তু
তাই বলে তাঁকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি ফেঁদারটনকে
প্রমাণ কবি, কারণ তাঁর মতবাদ নিদ্বিধি এবং স্পষ্ট, যুদ্ধের আগে,
মধ্যে এবং পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। আমার মতে
বার্লিন শ’ বার বার ঝড় বলেছেন, যদিও তিনি বহুদূরী নন।

বার্লিন শ’ প্রতি ইংল্যান্ডবাসীর অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও ঘৃণা বেড়ে
উঠল জার্মান সাবমেরিনের হান্ধার Lucitania নামক বাত্মিহা-
জাহাজ ডোবার পর। বার্লিন শ’ বলেছেন—আশ্চর্য, যে সব মাহুষ
এতদিন কোনো রকমে ঠাণ্ডা মাথার ছিল, তাবাও কেনে উঠল,
কিহ আশ্চর্যম্ অতঃপরম্। সেলুনের নিরীহ বাত্মিদের হত্যা করা!
ততঃকিম্! এই আন্দোলন শুরু হল। কিন্তু বা ঘটলো তা
ওহুমান্ন এই কথায় ঠিকমত ব্যক্ত করা যায় না। যদিও এই
হুটিনার তিন জন বখাৎ বলি আমার সুপরিচিত বহুদের
জন্ততম তবু সমস্ত ব্যাপারটি আমার কাছে বাত্মাবাডি মনে হল।
“আমার বরং আশ্চর্য্য হল এই ভেবে যে, যে-সামরিক মাহুষ
তবু জানলো যুদ্ধের বাদ কেমন, এতদিন তারা যুদ্ধটা বৃটিশ
ক্রীড়া-কৌশলের অন্তর্গত চমৎকার খেলা মনে করত।

Lucitania ভূবি সক্রান্ত বার্লিন শ’ উক্ত The New
Statesman পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ব্লিকফোর্ড সার্পকেও সন্ত্রস্ত করে
হুলল, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বার্লিন শ’ অর্থ সাহায্য
করেছিলেন। কিন্তু মিঃ সার্প Lucitania জলময় হওয়ার সম্পর্কে
বার্লিন শ’র বক্তব্য প্রকাশ করতে স্বীকৃত হালেন না। এই কারণে
বার্লিন শ’ মনে এতটুকু ক্ষোভ বা খালা রাখেননি, পরে ব্লিকফোর্ড
সার্পের হুদশার সময় বার্লিন শ’ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে
দাহ্যতা করেছিলেন। কিন্তু New Statesman পত্রিকায় ১৯৩১

এর আগে আর কোনো দিন লেখেন নি। ১৯৩১এ আবার একটা
মহাযুদ্ধের সূচনা, বার্লিন শ’ আবার বৃহৎ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত
লিখতে শুরু করলেন The Nation পত্রিকায়।

বার্লিন শ’ তাঁর সাহিত্যিক বহু আলফ্রেড হুটরাকে বলেছিলেন
—“জার্মানরা এখন Rheims Cathedral এ গেলো ছুঁড়েছিল
তখন আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হতেছিল যে গোরক্ষকের মাথা
গুঁড়ো করে দিই। লক (L. T. Locke) আমার সামনেই
বসেছিল, সে আমার প্রস্তাব সমর্থন করে এবং আমার ভাব-বৃত্তির
প্রকাশ করে—”

Lucitania জলময় হওয়ার পর Dramatist Clubএর
এক লাঞ্ছ লক, হেনরী প্রভৃতি সন্ত্রস্ত বার্লিন শ’র মন্তব্য নিয়ে
আলোচনা করতে লাগলেন। তার পর এক রকম বিনা মেয়ে
বজাঘাতের মত বিনা নোটিশে বার্লিন শ’কে সন্ত্রস্তপন থেকে বিতাড়িত
করা হল। বার্লিন শ’ তাঁদের জানালেন যে, এই শব্দটিটা আইনগত
নয়, কারণ তাঁর সন্ত্রস্তপন খারিজ হয়নি, তবে হাজারো না বাড়িয়ে
তিনি স্বয়ং পরিত্যাগ করেন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ।

প্রাণ্ডিল বার্লিন শ’র পদত্যাগ করলেন। ইপ্রাহেল জার্মানউইলও
পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হালেন, বার্লিন শ’ বাধা দিলেন।
জার্মানউইল ডামাটিস রাব নারীসদস্য গ্রহণের স্বপক্ষে আন্দোলন
চালাছিলেন তখন। কারো কেউ কেউ হয়ত রাবের প্রতি বিরক্ত
ছিলেন, এই সুযোগে তাঁরাও পদত্যাগ করলেন।

ডব্লু. জে. লক নতুন ভাবের অতি শান্ত ভ্রমলোক ছিলেন, সেই
মাহুষও বার্লিন শ’র বক্তৃতা করার জন্য কেনে উঠলেন। বার্লিন
শ’ বলেছেন—“জন্ম এবং মৃত্যুকে লক ছিলেন পাকা ওয়েই ইণ্ডিয়ান।
এই সময়ে আমি একদিন লেখক-সমিতির কমিটি মিটিংএ উপস্থিত
ছিলাম, সহসা কোথাও কিছু নেই লক চাংকার করে উঠল—বার্লিন
শ’র সঙ্গে এক ঘরে বসতে আমি রাজী নই। তার পর দরকাটি
সম্পর্কে বক্তৃতা চলে গেল। জ্যাক হোয়ার আমার মুখে চূর্ণকালি
লেপে দেওয়ার প্রস্তাব ছেপে প্রকাশ করল। তবে এই জাতীয়
বুদ্ধকালীন চিত্তবিরার ঈগগিরাই অবসান ঘটল, জ্যাক হোয়ার আর
লক দুজনেই এসে হাত বাড়িয়ে সেহুয়াও করল। আমিও হস্ত
প্রসারিত করলাম। আমার কাছে যুদ্ধের আর ছর সক্রমিক
মহামারীর মত। এই সময় যে সব রোগী বিকারের ঘোরে প্রলাপ
বকে, তা রোগশয্যার শায়িত রোগীর প্রলাপের মতই উপেক্ষণীয়।

পরে অবশ্য ডামাটিস রাব বার্লিন শ’কে আবার ডিনারে সম্মানিত
অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু মনে এতটুকু বিরোধ পোষণ
না করলেও, বার্লিন শ’ অজুহাত বর্শন করে সেই নিমন্ত্রণ এড়িয়ে
গেলেন। বার্লিন শ’ এই উপলক্ষে একটা চমৎকার কথা বলেছেন—
“Any one who is a pioneer in art is hated by the
old gang and should not join their clubs, as it
enables them to expel him, and to that extent
places him in their power.”

বার্লিন শ’ বলেছেন, কোথায় সব হুছে গেল, আমার বিরুদ্ধে এই
সব চক্রান্ত আর অভিরোধ, অহুযোগ একদিন মিলিয়ে গেল, সেই
রাবও হয়ত উঠে গেছে, হেনরী জোনস শেষ পর্যন্ত রেগে ছিল, সে
আর কিছুতেই মিট-মট করেনি, এ তার একতরফা লড়াই, আমি

বার বার হাত, বাড়িয়ে এসিয়েছি ও হাত সরিয়ে গিয়েছে, আর একজন এইচ, জিওয়েলস্, তবে তার যাগার আলাদা। মরার সময় ওয়েলস্ একখানি ছোট কাগজে অতি কষ্ট করে লিখেছিল, আমার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ভাবে কোনো আক্রোশ নেই, সে কাগজটুকু কোথায় আছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে Testimonial Matinee'র এক কমিটি হয় জে, এইচ, বার্নসকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে। জেন্স যেই দেখলেন সেই কমিটিতে বার্ণার্ড শ'ও আছেন, তিনি পদত্যাগ করলেন, বার্ণার্ড শ' তাঁর মতে a freakish homunculus germinated outside lawful procreation (আইনগত জন্মবিধির বাইরে কৃত্রিম পদ্ধতিতে যার জন্ম, যেমন গ্রীক উপকথা'র পারাকেলস্‌স)।

এর জবাবে বার্ণার্ড শ' বললেন—সন্দেহাতীত ভাবে আমি আমার প্রখ্যাত পিতার পুত্র; এবং আমার জননীর সম্পত্তি ও পিতৃ-ধর্মের আইনগত অধিকারী।

জেন্সের এই আক্রমণাত্মক রচনার প্রকাশককে জেন্স আখ্যাস দেন, রচনাটি প্রকাশ করিলে বার্ণার্ড শ' তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করবেন না। বার্ণার্ড শ' এই কথা শুনে বললেন—এ কথা জেনে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি যে, লেখকের আখ্যাস না পেলে প্রকাশ করা এই মানহানিকর রচনা প্রকাশে সাহসী হতেন না, জেন্স বলেছিল, আমার বন্ধু নির্ভরযোগ্য, এটা সে ঠিকই বলেছে।

পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ রাখার জন্য যুদ্ধশেষে বার্ণার্ড শ' রাজনীতিক ও কূটনীতিবিদদের কাছে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভার্সাই শীস কনকারেন্সে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। বার্ণার্ড শ' রক্ত করে বলেছেন, এ বেন লগনের মাছির বিকিন উপসাগরের ঘানময় তিমিমাছের কান্নের কাছে গুজুন করা।

U. S. A. সমরাস্ত্র সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে যে সভা ডাকা হয়, বার্ণার্ড শ' তাতে বোগদান করতে রাজী হননি। বলেছিলেন—সমরাস্ত্র সীমিত করলে যুদ্ধ নিরোধ করা যায়, এই ধারণা ভুল, পথের ধারের কুড়ার-লড়াই-এর প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ।

বার্ণার্ড শ' কোনো দিন হাউস-অব-কমন্সের সভার উপস্থিত হননি, দর্শক হিসাবে কিন্তু ১৯২৮-এ জেনেভার শীস অব নেশনসের সভায় হাজির হয়েছিলেন। সমগ্র অধিবেশন তাঁর কাছে Dull এবং Stupid বলে মনে হয়েছে। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—In the atmosphere of Geneva patriotism perishes; a patriot there is simply a spy who can not be shot, কিন্তু যুদ্ধের পর রাশিয়ার সংবাদে ক্রাঙ্ক ছারিসকে লিখেছিলেন, রাশিয়া থেকে স্তসংবাদ এসেছে, ঈশ্বর বহুপক্ষে প্রকাশিত হয়ে পরিপূর্ণ হয়েছেন। আমাদের জন্য হাতের ঘুঁঠার অনেক বিষয় দেখেছেন।

[ক্রমশঃ।

না, তুমি যেয়ো না চলে

গোপাল ভৌমিক

না, তুমি যেয়ো না চলে
এই অম্লরোধ
বার বার যদিও জানাই
তোমার বধির কানে
সে কথা বাবে না জানি,
যেহেতু তখন বাজে
বিদায়ের করুণ সানাই
তখন ফেরার কথা শুধু বাতুলতা।
সব কিছু জানে মন
তবু সে জানায় কাতরতা।

না, তুমি যেয়ো না চলে,
হোক সে ক্ষণিক দাবী,
সুখ তার অনেক গভীর
জানি বলে
বার বার এক দাবী করি ;
জানি তাকে পারে দলে
তোমার আগের কোটি মাহুদের মত,
হয়তো বা দেবতার মত তুমি বাবে চলে।
হতাশার কোভ নিয়ে আমার পৃথিবী
নিজেকে ডুবিয়ে দেবে কল-কোলাহলে।

না, তুমি যেয়ো না চলে,
কে একথা বলে আর কে-ই বা না বলে !
তবু সব চলে যায়,
থাকবার ব্যর্থ থাকে পড়ে ;
পৃথিবী বলে না শেষ কথা
সাইক্লোন কিংবা বালিস্টেডে।
বখন মস্তুর ঝড় কেঁদে কেঁদে বলে,
না, তুমি যেয়ো না চলে,
তখন হ' চোখ ফিরে অস্ত্র কোনখানে
সেখাে ফুল সমারোহ, ঘরা সেই গানে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হিমাদীশ গোস্বামী

If there are five empty seats and I say the bus is full, the bus is full.

—Conductor of a London bus

এবারে লিওকিন্ড গার্ডেন।

বেলাদি' বাড়ী বদল করলেন, ঐ রাস্তারই পাশের বাড়ীতে গেলেন আমরা চলে এসাম পশ্চিম থেকে উত্তর লগুন। এবারে বাড়ীটি হ'ল বড় একটি ক্যাটের আশে।

পাড়ার নাম হাম্পস্টেড।

পাহাড়ী অঞ্চল—প্রচুর গাছপালা চারদিকে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ফলের আলো পাওয়া যায়, সবচেয়ে বেশি স্নো পড়ে, কুয়াসা সবচেয়ে কম হয়।

এ পাড়া নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। একশো বছর আগে এ দিকটার লোক-বসতি প্রায় ছিল না। লোক বসতি ছিল না তার কারণ এখনো কলের জলের ব্যবস্থা হয়নি। এক বালতি জলের দাম তখন এ পাড়াতে ছিল এক শিলিং। ডাকাতেরা কোশে



দামদা সব কিছুই বিরোধী

বাঁকে দুকিরে থাকিত—পৃথিবীর আক্রমণ করত। এর উদ্দেশ্য থেকে চোর-ডাকাতদের খুঁজে বার করা বজায় কঠিন কাজ ছিল।

এই পাড়ায় চোর-ডাকাত ছিল আর ছিলেন এক কনষ্টেবল। এই কনষ্টেবলটি কখনো একটি চোরও ধরেননি। না খেয়ে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি জীবনে একটি চোর না ধরলেও ইনি অল্প অনেক কিছুই ধরতেন, বন্দী করতেন। ইনি গাছপালা, দৃশ্য, গন্ধ-বোঁড়া এ সমস্ত তাঁর তুলি এবং স্থানভাসের সাহায্যে ধরে রেখেছেন। তার প্রমাণ এখনও আছে গ্রাশনাল আর্ট গ্যালারি এবং টেট আর্ট গ্যালারিতে।

এঁর নাম জন কনষ্টেবল। বেঁচে থাকার সময়ে তাঁর ভাগ্যে সম্মান এবং টাকা জোটেনি। এখন তাঁর ছবি দাম হাজার হাজার পাউণ্ড। শিরীরা মরে না গেলে যে তাঁদের সম্মান হয় না ইনি তাঁর হলন্ত উদাহরণ। এখনও অনেক শিরী হাম্পস্টেডে থাকেন তাঁদেরও অনেকের গারবা মরে গেলে তাঁরাও বিখ্যাত হবেন। তাঁদের ছবি দেখে অনেক সমালোচক বলেছেন তাঁদের মরাই উচিত। হাম্পস্টেডে শিরীরা বেড়েই চলেছেন। প্রতি পাঁচজন হাম্পস্টেডের লোকের মধ্যে একজন হলেন শিরী।

এই অবস্থা সমস্ত দেশে হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ত। সুখের কথা, ইংল্যান্ডের সর্বত্র শিরীদের এমন প্রাচুর্য্য নেই। হাম্পস্টেডের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শিরীদের আবিপত্য। এই শিরীরা হেঁড়া পোশাক পরেন (একজন শিরীবন্ধু বলেছেন এঁরা নতুন পোশাক থাকলে ছিঁড়ে নেন।) দাবা খেলেন, কফি খান, জাঁপল সার্ভার এবং ডিলান টমাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। এডরিম্যাল সিনেমা হলে ত্রিশ বছরের পুরোনো ভাল ছবি দেখে প্রবন্ধ লেখেন (তা ছাপা হয় না), বন্ধুদের পড়ে শোনান, বন্ধুরা প্রতিটি কথা ভুল প্রমাণ করেন—প্রতিটি মতই অগ্রাহ্য বলে মন্তব্য করেন। এই রকম বাধা পেলে তাঁরা আরো উৎসাহিত হন, আরো সমালোচনা লেখেন। কিন্তু একবার প্রশংসা করলে এঁদের সবাই সমালোচককে অনাধার্য্য লোক বলে গালমন্দ করেন। এঁদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই জায় বিচার হয় না। এঁদের কেউ যদি বিখ্যাত না হন তাহলে সেটা হল সমাজের অভ্যায় বিচারের ফল, আর যদি কেউ বিখ্যাত হন তাহলেও সেটা যে অভ্যায় বিচারের ফলেই হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় এঁদের নেই।

এঁরা সমস্ত প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী। শুচো মার্কসের মত whatever it is, we are against it মন্ত্রে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা নেগেটিভবাদী। এক কথায়, এঁরা ইনটেলেকচুয়াল। সমস্ত হাম্পস্টেড ইনটেলেকচুয়াল ভক্তি। কিন্তু আমাদের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হেইসের মধ্যে আর্থ জাউন্সও ইনটেলেকচুয়াল হবার ক্ষমতা ছিল না। ইনি টাকা বুঝতেন, এবং টাকা তাঁর ছিল। টাকা ছাড়া আর অল্প কোন রকম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকা পছন্দ করতেন না।

মিসেস হেইসের বয়স ছিল প্রায় বাট। জ্ঞাতে ছিলেন ইছরী। এঁর ছেলে ইছরী নাম হেইস পছন্দ করত না বলে দায় বদলে করেছিল হলকোর্ড। হলকোর্ড ছিল ডাক্তার। হলকোর্ড এ বাড়ীতে থাকতো না—কিন্তু তার প্রচুর বই ছিল। বাড়ীর দুটি বড় তাক ভক্তি বইগুলিতে ছিল স্টিফ পথিচর।

নিকালো এবং মনঃস্থান, বেনোয়া এবং সূত্র প্রভৃতি শিল্পীদের সম্পর্কে বড় বড় বই। তা ছাড়া বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে নানা ধরনের বই।

এই স্ট্যাটি ছিল যেসময়ে। একতলা এবং দোতলায় অস্ত্রেরা থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। লগুনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই বাতী। আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। আমাদের দেশে প্রতিবেশীরা সমস্ত বন্ধু ব্যক্তিগত প্রেমের উত্তর দিতে বাধ্য—যেমন, আপনাদের বেতন কত, জীবন বয়স কত, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার না ডেকে আলোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করান কেন, আপনি কাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলেন, রবিবার সকালে যে ভুললোক ডাকতে এসেছিলেন আপনাকে তাঁর নাম কি, ঠিকানা কি, তিনি কত মাইনে পান—ইত্যাদি এ সমস্তেরই জবাব দিতে হয়। লগুনে এ সমস্তের জবাব দিতে হয় না। কেউ বিপদে পড়লে কিছু লগুনের প্রতিবেশীরা সম্ভব হয়ে ওঠে।

লগুনে একটা ব্যাপার খুব লক্ষ্যের হয়ে উঠেছে। একবার যে বাড়ীতে ভারতীয়রা যায় সে বাড়ীতে আস্তে আস্তে ভারতীয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমে এমন হয় যে, শেষ পর্যন্ত সে বাড়ীটার সমস্ত ভারতীয় লোকজনকে ভরে যায়। এটা কেমন করে হয় বলছি। একটা বাড়ীতে দশখানা ঘর, প্রায়ই লোকেরা উঠে যায়—উঠা যাবার আগে বাড়ীর লোকেরা জানতে পারে ঘর খালি হবে। ভারতীয়রা যদি জানতে পারে যে একটি ঘর খালি হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার ভারতীয় বন্ধুকে বলবে একটি ঘর খালি আছে—সে ল্যাণ্ডলেডিকেও বলবে যে, তার বন্ধু খুবই ভদ্র, সে আসতে চায় এই বাড়ীতে। ল্যাণ্ডলেডির কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়—কারণ সে যখন একজন ভারতীয়কে ঘর ভাড়া দিয়েছে, অল্প একজনকে ভাড়া দিতে আশঙ্কি কি? এই ভাবে আস্তে আস্তে এক একটা বাড়ী ভারতীয়রা অধিকার করতে আরম্ভ করে। যে বাড়ীতে প্রচুর ভারতীয় সে বাড়ীতে ইউরোপীয়ান বা আমেরিকান কেউই থাকতে চায় না। কারণ প্রতি ঘর থেকে পোঁজ-লংকা রগুনের গন্ধ সমস্ত বাড়ীটিকে ভরে তোলে। বিশেষ ধরনের ফুলগন্ধ নাক না হ'লে সে গন্ধ সহ্য করা কঠিন। এইরকম বাড়ীতে ভারতীয়রা থাকে। প্রত্যেকের আলাদা ঘর হ'লেও তারা নিজেদের মধ্যে নানা রকম মায়া কাঁকা ভাই দালা খুড়ো সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়। খুব বন্ধু হয়ে যায় পরস্পরের মধ্যে।

খুব যেমন বন্ধু হয়, তেমনই শত্রুতাও হয়। প্রথমে গলায় গলায়, পরে আদায়-কাঁচকলায়। একত্র থাকতে থাকতে নানা রকম আর্থিক আদান-প্রদান চলে। প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছ থেকে ধার করার চেষ্টা করে। এই সব বাড়ীতে ঝাঁরা থাকেন, তাঁরা ভারতীয়দেরই কেবল পরিচয় পান। অনেকে লগুনে বছরের পর বছর থাকেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একটি ভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধু হয় না। তাঁদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় ইংরেজদের কেমন লাগল? তাঁরা উত্তর দেন : ইংরেজ তো কোলকাতার অফিসের সদস্য, সেই তো ইংরেজ। লগুনে ইংরেজ টিংরেজ দেখিনি—তবে হ্যাঁ, বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবীতে লগুন ভরা।

লগুন ভরা—কথাটা ঠিক নয়। তবে রোগুয়েতে বা কাউন্টি

কাউন্টিতে আজকাল প্রচুর ভারতীয় কেরানিগিরি করেন। প্রচুর লোক লগুন ট্রান্সপোর্টের কাজ করেন। তুলসি প্যাভিটন ট্রেনের একজন বাঙালী ইনকরমেশন কাউন্টারে বসেন—বাঙালীরা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, দাঁহ, বলতে পারেন অলফোর্ডের টিকিট কোথেকে কিনব?

বাঙালী দাঁহ 'হু'পাটি দাঁত দিয়ে নিজের জিহ্বাকে কামড়ে ধরেন, তারপর বলেন, ঐ তো ঐ দিকে পথ দেখা আছে—আর আমাকে 'বাউলার' কথা কওয়ান কেন মশাই? ইংরেজদের খাচ্ছি ওদের ভাবার কথা না কইলে চাকরি যাবে।

কিন্তু চাকরি 'গেলেই বা কি, জাশনাল-ইনশিওর্যান্স আছে না? চাকরি 'গেলেই যেমন আমাদের দেশের অনেকে বাস্তব বসে পড়েন, সারাদিন ভিক্ষা করেন, ইংল্যান্ডে চাকরি গেলেই কিছু বাস্তব-বাস্তব বসবার জো নেই। প্রথমত গবর্নেন্ট থেকে তাকে কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়—তাতে ভিক্ষা করতে হয় না। এটা তার প্রাণ্য—এটা হল ইনশিওর্যান্স। কিন্তু এতেও যদি না চলে, তাহ'লে আছে জাশনাল অ্যামিসট্যান্স, এরাও প্রচুর সাহায্য করে থাকে লোকদের।

ভারতীয়দের বাড়ী দখল সম্পর্কে আমার জানা একটি ঘটনার কথা বলছি। সে বাড়ীতে জন-কুড়ি ভারতীয় থাকত—অল্প কোন জাতের লোক ছিল না। কি কারণে একটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে ল্যাণ্ডলেডির গোলবোণ হওয়ার ল্যাণ্ডলেডি ছাত্রটিকে চলে যেতে বলেন বাড়ী থেকে। ব্যাপারটা অল্প ভারতীয়রা শুনে—শুনে ল্যাণ্ডলেডিকে অস্ত্রবোধ করলো যে নোটটি প্রত্যাহার করা হ'ক। ল্যাণ্ডলেডি কর্পরাত না করতে কুড়ি জন ভারতীয় এক সঙ্গে নোটস দিল ল্যাণ্ডলেডিকে।

বাড়ী বদলের দিন সে এক আশ্চর্য ঘটনা। প্রায় একশো জন ভারতীয় জমা হয়েছে বাড়ীর সামনে। প্রত্যেক ভারতীয় তাদের চার-পাঁচজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাড়ী বদলানোতে সাহায্য করার জন্য। প্রচুর ট্যান্টি জমায়েত হয়েছে বাড়ীর সামনে। হৈ চৈ করে জিনিবরণ নামানো হয়েছে। চারিদিকে প্রতিবেশীরা মজা দেখছে। দু' একজন পুলিশও ছুটে গিয়েছে কী হয় দেখবার জন্য। ঘটনাক্ষণেই মধ্যে সমস্ত বাড়ীটাতে নেমে এসেছিল কবরের গাভীর্ষ। একটি ভাড়াটে নেই, কেবল ল্যাণ্ডলেডি।



পুলক জামা ইত্তিরি করা শিখছে

কোনও কোনও ল্যাণ্ডলেডি ভাল বে হন না হ'ল নয়। তাঁরা ভাল, কিন্তু ভারতীয়দের অভ্যাসের কথা তাঁরা জানেন না বলে রাগ করেন। ইংরেজদের গতিবিধি প্রায় মাশা। তাঁদের গতিবিধির যেটুকু বৈচিত্র্য আছে তাতেই তাঁরা খুশি। ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁরা পাশা দিতে পারেন না। বিশেষতঃ ল্যাণ্ডলেডিয়া একটু বেশি মাত্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কান্ডর হয়ে পড়েন। ইংরেজদের ধারণা যে মাছবের বেশি বড় থাকার প্রয়োজন নেই—এক-আধজন যদি থাকে ভাল, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ভারতীয়দের বড় প্রচুর—আর বন্ধুদের কাজই হ'ল বাড়ীতে আসা, এসে হৈ চৈ করে গল্প-করা এবং এগারোটা বায়োটার লোক ঘুমিয়ে পড়লে বিনা কারণেই কোনের ঘটা বাড়িরে আগানো। কোন কোন ল্যাণ্ডলেডি সামান্য আওরজও সহ করতে পারেন না। রেডিও যদি জোরে বাজানো হ'ল তাহ'লে তাঁরা সেটাকে অপরাধ মনে করেন। অথচ খুব জোরে রেডিও না বাজালে আমরা রেডিও রাখবার অর্থই খুঁজে পাই না। একটা আইন এদেশেও আছে যে রেডিও এত জোরে খুলে রাখা চলবে না, বাতে প্রতিবেশীদের এতে অসুবিধে মোটেই না হয়। আমাদের দেশে যেমন প্রতি সহরে চার পাঁচটা রেডিও থাকলেই চলে যায়, ইংল্যান্ডে তা চলে না। সেখানে এমন কি পাশের ঘরের রেডিও শোনা যায় না এমন আস্তে বাজানো হয়।

আমাদের নতুন বাড়ীটি ভালই হ'ল। তবে ফার্মিটার প্রায় কিছুমাত্র ছিল না। সমস্তই ভাঙা এবং কোনক্রমে ব্যবহার করা বলে। একটা টেবিলের পা এমন নড়বড়ে ছিল যে সে টেবিলের উপর কিছু রাখা চলত না। আস্ত সে টেবিলে খাওয়া কিছুতেই চলত না। হঠাৎ ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। সে কথা বলতে মিসেস হেইস বলতেন টেবিল ওমনিই হয়। আস্ত টেবিল লগুনের কোন ল্যাণ্ডলেডিই দেয় না।

ল্যাণ্ডলেডিকে বললে কোন অভিযোগের প্রতিকার হয় না যে তার প্রমাণ বহু বার পেয়েছি। নিজেদেরই শারিরে নিতে হয় পরমা খরচ করে। আমাদের এখানে ইলেকট্রিক হীটার ব্যবহার করতে হল—কারণ গ্যাস হীটার নেই এ বাড়ীতে। একটা ঘরে কয়লা দিয়ে ঘর গরম করতে হয়। কয়লা প্রথমত পাওয়া কঠিন। একটা কয়লাওয়ারার কাছে নাম লেখাতে হল। তারা কয়লা দিয়ে গেল গাধা ধানেক। সে কয়লা সমস্তই ভিলে। আমি আর রব্বী (পিসতুতো ভাই বয়স ১ বছর) দুজনে মিলে মাঝে মাঝে লোহার শিক দিয়ে কয়লা ভাঙতাম বাগানে। বৃষ্টি পড়লে সেখানে ছাতা নিয়ে যেতে হত। সেখানে বসে আস্ত কয়লাকে টুকরো টুকরো করতে হত। এর ফলে অর্ধেক কয়লা গুড়ো হ'য়ে ছিটকে বাগানের বোপের মধ্যে অদ্ভুত হত। বাকী যা থাকত এক বালাতি বোকাই করে এনে আলবার ব্যবস্থা করতে হ'ত। এজন্য শুকনো কাঠ বাড়ীতে মদ্রন রাখতে হত। এই শুকনো কাঠের টুকরো প্যাকেটে করে দোকান থেকে কিনে আনতাম। একটা ছোট প্যাকেট কিনতে পাঁচ হ'লেনি খরচ পড়ত। এই কাঠ কিন্তু সহজে জলত না। এই কাঠ আলানোর জন্য আগার প্রয়োজন হ'ত খবরের কাগজ।

কিন্তু সব সময়ে খবরের কাগজে কাজ হ'ত না। কেবাসিন

ব্যবহারও করে দেখেছি। তা ছাড়া আর একরকম আলানি বাজার পাওয়া যেত, খয়েরের মত দেখতে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি পোয় আর বেশ তাপও হয়। প্যাকেটে হ'ল ঐরকম খয়ের থাকে নাম হ'লেনি। প্যাকেটে লেখা থাকে যে প্রতিবার আন্তঃ ঘরতে একটি কিংবা দুটি খরচ করলেই হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই হয় না।

কম পক্ষে চারটে করে খয়ের পোড়াতে হয়।

কয়লা ঘরতে সময় লাগে অন্তত এক ঘণ্টা। কয়লা বখা ঘরে আসে তখন বড় ভাল লাগে। কিন্তু তখন কয়লার আন্তঃ উপভোগের সময় নেই।

হাত বুতে হবে। সারা হাতে কয়লার দাগ, মুখে কয়লা দাগ। চান করলেই ভাল হয়। রোজই প্রায় চান করতে হ'ত।

এরকম আন্তঃনের কোন অর্থ বৃষ্টি না। কারণ কয়লা আলিবে বেশ আরাম করছি হয় ত—এমন সময় টেলিফোন এল পুন্স চক্রবর্তীর। ওর কাছে যেতে হবে বেলসাইজ স্তায়ারে। সেখান কী এক পার্টি হ'চ্ছে কনটিনেন্টাল রাবে। আস্ত কণ্ঠে তৈরি কং আন্তঃনকে ফেলে যেতে হয়, নিবিঘ্নে দেওয়া সম্ভব হয় না।

এরকম বাড়ীতে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'চ্ছে বিছানার শুয়ে শুয়ে পড়া। লেপ গায় দিয়ে।

যে ইলেকট্রিক হীটার ছিল এ বাড়ীতে তার উত্তাপ এত কং যে হীটারের ইকি তিনেক ঘুরে হাত না রাখলে একটুও গরম লাগত না।

পুলক চক্রবর্তী যেখানে থাকত সে বাড়ীতে থাকত সাধারণত ইউরোপের ছেলে-মেয়েরা। পুলক যে ঘরে প্রথমে গিয়েছিল ও ঘরে আরো দুজন লোক থাকতো।

তারা জার্মান বা ইটালিয়ান নর।

তারা ইউরোপের লোক নয়। তাদের আবাস চীন দেশ তাদের সঙ্গে পুলকের হ'ল বন্ধুত্ব।

এ চীনে ছেলে দুটি রোজই তাদের গেলি শার্ট ইত্যাদি সাবান দিয়ে কাচতো, শুকতো এবং ইস্তিবি করতো।

লগুনে খোবার খরচ প্রচুর। একটা শার্ট বুতে দেড় শিলি পর্যন্ত লাগে। আমাদের এক টাকার সমান। আস্তএব নিজে ঘুরে নেওয়া সবচেয়ে ভাল। এর জন্য ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যায়। কোন কোন দোকানে প্রচুর ওয়াশিং মেশিন রাখা হয়—সেখান গিয়ে আধ ঘণ্টার পাঁচ ছ সের ওজনের জামা-কাপড় আজাই শিলি খরচ করে ঘুরে আনা যায়। তারপর শুকিয়ে ইস্তিবি করে নিলেই হয়। অনেকেরই এটা করে থাকে।

চীনেয়াও তা করতো।

একদিন পুলক চীনে ছেলে দুটিকে বললো, ভাই, তোমরা আশ্চর্য কাণ্ড করছ—এমন সুন্দর ঘোরা আর ইস্তিবি এত লে ঘুরলাম কিন্তু কোথাও দেখিনি। আর বোঝ হয় এখানে কোথাও দেখব না।

চীনে ছেলে দুটি বিনয়ের অবতার। তারা বলে, এ তো খুঁ সোজা—সবাই করতে পারে, এমন কি তুমিও করতে পার। পুলক আরও বিনয়ের সঙ্গে বলে, না আমি কিছুতেই পারব না—জামা

জায়া জামা কাপড় খোওয়া হবে না। চীনেরা ভয়সা দেয় হবে হবে। এফদিন তারা পুলকের পুরনো জামা ইত্যাদি ধুয়ে নিয়ে এসে ওয়াশিং মেশিনে। পুলক দেখলো।

চীনেরা বললো, এবারে ইন্ডিরি করা শিখে নাও। কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়ে বেশ কয়েক করে আবার করি। পুলক ভাও দেখলো।

তারপর দিন থেকে বোম্ব চীনেরা পুলকের সমস্ত জামাকাপড় ধুয়ে দেয়। ইন্ডিরি করতে দেখায়।

কিন্তু পুলক কিছুতেই শিখতে পারে না।

সে কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ে অথবা দাড়ি কামায় আর মাঝে মাঝে ইন্ডিরি দেখে। পুলক ইন্ডিরি করা কিছুতেই শিখতে পারেনি। প্রায় তিন মাস চীনারা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেয়। তার পর তারা বাড়ী ছেড়ে দেয়।

লণ্ডনের থোপারা কাপড় কাচতে বড় দেরি করে।

এদের দোকান আছে, কিন্তু সংখ্যার খুব বেশি নয়। সাত দিনের মধ্যে সূতির কাপড়-জামা পাওয়া যায় না। কখনো চোদ্দ দিনও লেগে যায়। এই থোপা দোকানদারেরা খুব গভীর হুখ করে থাকে। কোথাও তাদের হাসতে দেখিনি। ইংল্যান্ডে সমস্ত দোকানেই দোকান-কর্মচারীদের হাসাবার নিয়ম—এমন কি মাসের দোকানদার পর্যন্ত হেসে জিজ্ঞেস করবে, এ দেশ ভাল লাগছে? আমাদের দেশের আবহাওয়া নিশ্চয় তোমাদের ভাল লাগে না?

কিন্তু থোপাদের হাসতে দেখিনি। এরা হাসে না, কিন্তু এদের রসিকতাবোধ আছে। এরা অস্ত্রের শাট, অস্ত্রের ক্রমাল—বিশেষ করে অস্ত্রের তোয়ালে প্যাকেটে ভরে দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার বন্ধার আইন-কানুনে ইংল্যান্ডের বাতাস ভারি, কিন্তু জামা-কাপড়ের বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শাট পরে—পরতে বাধ্য হয়।

শাট নতুন কিনেছ, থোপা দিয়েছে? এই কথাটি আমাদের মধ্যে খুব পরিচিত ছিল। কেউ নতুন শাট কিনলে তাকে জব্দ করার জন্য খুব মহাযত্নের সঙ্গে বসে হ'ত, ভাই, তোমার থোপা বড়ই অসৎ তো!

কেন?

ঐ যে শাটটি পরে আছে, ওটা তো তোমার নয়—তোমার ওরফেয় কুচিই হবে না—ব্রাউন রঙের ট্রাইপ দেওয়া শাট তোমাকে মোটেই মানায় না।

মানায় না—বটে?

একদম মানায় না।

তুমি জেনে রাখো, এই শাট আমি নিজের পরশায় এবং নিজের গছল অলুবারী কিনেছি।

মাগ করে ভাই। আমি জানতাম না।

একবার খুব মজা হয়েছিল। সাধনের প্যাকেটের সঙ্গে অস্ত্র কাম এক ভয়ালোকের প্যাকেট হুচ্চ বদলে গিয়েছিল।

তিন দিন সে রেগে ছিল। বৃজ খেলেনি, বন্ধুদের খাওয়ারনি—মন কি বাগ্না করেনি পর্যন্ত। তার পর সে একটা কাঁচ দিয়ে সমস্ত জামা কেটে ফেলে ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়। কারণ, ঘটকের গলার মাশ বাস ইকি, আর থোবার দেওয়া শাটগুলির প্রত্যেকটি চোদ্দ ইকি।

থোবার দোকানে বলেও কোন ফল হয়নি। তারা বলেছিল, নখরে মিলে থাকে অতএব এ নিশ্চয়ই সাধনের জামা। সাধন বলেছিল, না এ জামা আমার নয়, যে কোন গাধাই সেটা বুঝতে পারবে।

কিন্তু দোকানদার বুঝতে পারেনি।
কুচি হয়নি।

সে জামা কিনল এবারে—নাম তার টেরেজাইন। এ জামা থোবাকে দিতে হয় না। বাড়ীতে যেদিনে পাঁচ মিনিটে কাচা যায়, দু ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে দেয়।

এই জামার ব্যবহার ইংল্যান্ডে প্রচুর বেড়ে আছে। আস্তে আস্তে তুলোর প্রাধান্ত কমছে। এর পর বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকনা সবই এ দিয়ে তৈরি হবে হয়ত।

লোকের বত এই নতুন জিনিসের জামা ব্যবহার করছে তত থোবার কম টাকা পাচ্ছে—জার ততই থোবার খরচ বেড়ে আছে। এর পর হয়ত একটা জামা থোবার খরচ দিয়ে একটা জামাই কেনা সম্ভব হবে। লোকেরা বাড়ীতে বত কাপড় বুচ্ছে ততই সাবানের বিক্রি বাড়ছে।

বিশেষ করে শুঁড়ো সাবানের।

আর প্রচুর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে সাবানের শুঁড়োর। সব সাবানের শুঁড়োতেই সমান কাজ হয়—সমান পরিষ্কার হয়। একটু কম বেশি হ'লেও তা ধর্ষব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু সাবান কম্পানীরা বিজ্ঞাপন দেয়, আমাদের সাবান দিয়ে ধুলে সাদার চেয়েও সাদা হয়। অস্ত্র একটা কম্পানী বিজ্ঞাপন দেয় কেবল সাদাতে আর চলবে না, এর সঙ্গে প্রয়োজন উজ্জলতার। অস্ত্র একটা কম্পানী বিজ্ঞাপন দেয়, ঠাঙ্গলা আখো স্থায়ী করে আমাদের সাবানের কেনার।

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় একটা জিনিস—ইয়েজরা বেশি সাবান ব্যবহার করছে—অতএব তারা পরিষ্কার জাত। কথাটা সত্যি। আর একটা জিনিস মনে



পুলিশ ও বব

হয় যে ইংরেজরা সাবানের জন্ম বত খরচ করছে তার চাইতে বেশি খরচ করছে বিজ্ঞাপনের জন্য।

অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ করছে কোম্পানির কোটি কোটি টাকা। এই টাকা দিচ্ছে ক্রেতারা। অর্থাৎ ক্রেতারা একটি জিনিসের জন্য দাম বেশি দিচ্ছে। অর্থাৎ কোন জিনিস বিক্রি করতে হ'লে বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে সাবান বিক্রির ব্যাপারে তারা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

বাসে, টিউব বিজ্ঞাপন, রেডিওতে টেলিভিশনে সর্বত্র বিজ্ঞাপন। অধিকাংশই সাবানের।

সাবানের জুড়ির দাম মাঝে কমিয়ে দেওয়া হয়। যার দাম দু শিলিং প্যাকেট, তার দাম একটি কোম্পানি হঠাৎ এক শিলিং দু পেনি করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোম্পানি তাদের সাবানের দামও কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দেখা গেছে তাতেও তাদের লাভই থাকে।

লিওকিন্ড গার্ডিনসে 'বেলাদি' হ'লেন আমাদের প্রতিবেশী। একদিন দেখি 'বেলাদি' দু-একটা জিনিস কেমিষ্টের দোকান থেকে কিনেছেন। তার মধ্যে একটা টিউব—সান ট্যান লোশনের।

ইউরোপে এই জাতীয় লোশনের বিক্রি খুব বেশি। যারা যৌত্বে কখন বাগানে বা সমুদ্রের ধারে তাঁদের গা বাত পুড়ে না যায় তার জন্য আগে থেকে এই তৈলাক্ত পদার্থটি মেখে নিতে হয়। কিন্তু ভারতীয়দের এ জিনিস বিশেষ প্রয়োজন হয় না—কারণ ভারতীয়রা ইংরেজদের মতো অত নর্যের আলোয় চান করার পক্ষপাতী নয়। তাই গুটা দেখে অবাক হলাম। বললাম, 'বেলাদি' যৌত্বে কখন নাকি আপনি?

—কি না! কে বললো?

—আপনার কাছে সানট্যান লোশন দেখছি কি না তাই! ঠাণ্ডে গায়ে মেখে সাবান-মমেরা সমুদ্রের ধারে মড়ার মত পড়ে থাকে। 'বেলাদি' বললেন, এফুনি কেমিষ্টের দোকানে দিয়ে এসো না ফেরত এটি।

'বেলাদি' টুথপেস্ট মনে করে কিনেছিলেন গুটি। এরকম ভুল প্রায়ই হয়। দোকানে সাবানো জিনিস থাকে, নিজে ভুলে নিতে হয়, দাম দিতে হয়, সাধারণত—টুথপেস্ট মনে করে সানট্যান লোশন আনা মোটেই অসম্ভব নয়।

কিন্তু কেমিষ্টের দোকানে গিয়ে ডিম চাওয়াটা একটা বাড়াবাড়ি বৈ কি। তাও ঘটেছিল আমাদের বন্ধু ইসমতুল্লাহ আনসারির ভাগ্যে। ৭ দিনতে বেরিয়েছিল ডিম—এসেছে দু সপ্তাহ হল লাগুনো থেকে।

ফিক্সী রোড টিউব ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই বাঁদিকে দু একটা দোকানের পর হল কেমিষ্টের দোকান—আর তার পাশেই মাস ডিম ইত্যাদির দোকান। দোকানের শোকেসে রয়েছে ডিম—সাবানো।

ও ভুল করে চুকে পড়েছে কেমিষ্টের দোকানে। কেমিষ্টের দোকানে খাতা পেন্সিল ক্যামেরা রবারের বল, ডায়েরী, স্ট্রটেকস, কিম্বা এ সমস্ত পাওয়া যায়—কিন্তু কোন কারণে ইংল্যান্ডে এরা ডিম বিক্রি করে না। এরা হলুদ, দাগচিনি, লঙ্কাওড়ো পর্দা বিক্রি করে। কিন্তু ডিম নয়। কেমিষ্টদের কেবল মনেই হয় না এরা ডিমের নাম শুনেছে কখন।

আনসারি একটি মহিলা শপ অ্যাসিষ্ট্যান্টকে বলছে, গোটা হয়েক ডিম দাও তো?

ডিম? তুমি ডিম চাও?

আনসারি জবাব দিয়েছে: চাই বই কি—আলবত! ই।

আমি ডিম কিনতে এসেছি—ডিম কিনব, তুমি ডিম বেচবে।

না, আমি ডিম বেচব না। পাশের দোকানে বাও, ওদের কাছ থেকে ডিম পাবে।

আমি ডিম কিনব এবং এখান থেকেই কিনব। না কিনে নড়ব না।

ভ্রমহিলা বললেন, পরসে দাও আমি দিচ্ছি। পরসে নিয়ে পাশের দোকানে গিয়ে চারটে ডিম কিনে এনে আনসারির হাতে দিয়ে ভ্রমহিলা বললেন, এর পর থেকে যখন ডিম কিনতে আসবে তখন ঐ দোকানে যেও।

আনসারি ভুল বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠেছিল লজ্জার।

খুব সাবানো লোক আমাদের হুলুগা। (দেবব্রত চক্রবর্তী) হুলুগাও একটি কেমিষ্টের দোকানে গিয়েছেন—তিনি কিনবেন এক টিউব দাড়ি কামাবার সাবান। দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, উইথ ব্রাশ অর উইদাউট ব্রাশ? (অর্থাৎ যে সাবানের টিউব নেবে, সে সাবান হাত দিয়ে গালে সোজা হুজি যবতে পারবে—ব্রাশের প্রয়োজন নেই একেবারে—অথবা যে সাবানে ব্রাশের প্রয়োজন হয়, তেমন টিউবও আমরা রাখি।)

হুলুগা ভারলেন, উইথ ব্রাশ—অর্থাৎ এরা টিউবের সঙ্গে ব্রাশও বিক্রি করবার তালে আছে। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, ওর কোর্স, উইদাউট ব্রাশ।

বাড়ীতে এসে জল দিয়ে ব্রাশ দিয়ে হুলুগা বত চোঁচা করেন। কিছুতেই ফেনা হয় না। অবশেষে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। প্যাকেটের উপর লেখা আছে: ব্রাশ ব্যবহার করতে হয় না। উইদাউট ব্রাশ!

কোলকাতায় যে জিনিস প্রত্যেক বাড়ীতে আছে তা লগুনো প্রায় কোন বাড়ীতেই নেই—জিনিসটা কি? আরসোলো! ছায়পোকা? এগুলো দেখতে পাওয়া যায় না বটে তেমন, কিং একেবারে অদৃশ্য নয়। জর্র অরওয়েল লিখেছেন তাঁর বইতে ও টেমস নদীর উত্তরে কোন কারণে ছায়পোকা নেই—কিন্তু দক্ষিণ দিকে আছে। এর কারণ কি জানা যায় না। টেমস ত এটুকু একটা নদী। সেজন্য ছায়পোকাদের কী অসুবিধে হয় বুঝি না। কোলকাতায় যে জিনিস প্রত্যেক বাড়ীতে আছে সে হ'ল সমস্ত ছাদ। লগুনো ছাদ সমস্ত নয়। তার উপরে বসে যায় না, আড্ডা মারা যায় না।

লগুনো কোলকাতার মত ছাদ করা হয় না, তার কার্য হ'ল রো।

সেো হাতে পড়ে পড়ে ছাদের উপর জমে না যায় সেজন্য ছাদ এমন করে তৈরি যে সেো কিছু জমে গেলেই পড়ে যায় আপন। আপন। আমাদের দেশের করগেটের টিনের চালের মত।

ছায়পোকায় কথায় মনে পড়ে গেল একটি বাঙালীর কথা। লিও ফীল্ড গার্ডিনসে আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতো সে। তখন কাজ ছিল নানা বিষয়ে কেল করা। শুনেছি সে ভাল রাগাও করত।

একদিন সে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে বললো, বড় বিশদে পড়েছি, পাউণ্ড দুইকে চাল হবে? আমি রান্না ঘর থেকে এক পাউণ্ড চাল এনে দিলাম। হু পাউণ্ড কেবার মত চাল ছিল না।

রাত তখন দশটা।

আমি ঘটাধানেক পরে এসে বললো, খানিকটা মাখন পেলে ভাল হত।

মাখন তাকে দিলাম খানিকটা।

আরো একটু পর এসে বললো, গোটা চাবেক আলু যদি...

তাও দেওয়া গেল।

সে অনেক কথা প্রার্থনা করল। বিনয়ের অবতারের মত অনেকটা কথাবার্তা বললো। আরো বললো পরদিন সকালেই সমস্ত সে ফেরত দিয়ে যাবে।

কথা বাধেনি সে। তার পর থেকে ওর কথা মনে হলেই ছারপোকাকার কথা মনে পড়ে। টিপে মারতে ইচ্ছে করে। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, আলোচনা করেছি। আমার এক বন্ধু বলেন এর ভিত্তি দুঃখের কিছু নেই। একজন বাঙালী ধার নিয়ে শোধ দেননি এটাই স্বাভাবিক—অর্থাৎ বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক। আর যদি সে লগুনে ধার তাহলে সে তার বাঙালী বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। অতএব এগুলো সহ্য করতেই হবে। মশি পালিতেরও এতই অভিজ্ঞতা—তিনি প্রচুর ধার দিয়েছিলেন বহু বাঙালীকে, কিন্তু তারা খুব কমই শোধ দিয়েছে। আমরা পরে দেখেছি বাঙালীদের মধ্যে এমন এক একজন কোপকে উড়ে এসে জুড়ে বসেন, মামা দাদা দিদি সম্পর্কে পাতান এবং নানা স্ববিধে করে নেন। ওঁরা ইংরিজি খাত বুধে তুলতে পারেন না বলে প্রায় রোজই ভারতীয়দের ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়ান যদি কিছু খাত জোটে এই আশায়, ওঁরা ধার করেন—দেশে দ্রুত না খেয়ে আছে ছেলেরা পকেট কাটা ধরতে বাধ্য হচ্ছে এ সমস্ত কথা বলেন। এ বিষয়ে এক ওস্তাদের কথা বলছি। এর বহু ছদ্মনাম—কখনো ইনি প্রভু বসাক, কখনো উবা রায়। অনেক বাঙালী সবচেয়ে বাঙালীদেব সম্পর্ক এড়িয়ে চলেন—কিন্তু এই প্রভু বসাক বা উবা রায় জাতীয় লোক যে এজ্ঞা অনেকখানি দায়ী সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই প্রভু বসাক বা উবা রায়ের এক হু পাউণ্ডে চলত না, ইনি দশ পাউণ্ডের কম ধার করতেন না, এবং তারপর সে সুখ আর দেখা যেত না। রান্নায় হঠাৎ দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতেন, এই জোড়োরাটি কোথায় আছে জানি না। শুনেছিলাম কার কাছ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড ধার করে জাহাজে করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। এখন তিনি কি ভাবে লোকদের কাছ থেকে ধার করছেন জানতে ইচ্ছে হয়।

কিছু কিছু বাঙালী এখনো ভাল আছেন এটাই ভরসার কথা।

কুক মেনন একবার ছাত্রদের সভায় বলেছিলেন, তোমরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূতের মত। তোমরা যা করবে তার ফলেই নির্ভর করবে আমাদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক। আমরা বাবা মাইনে করা রাষ্ট্রদূত তাদের চেয়ে ছাত্রদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

দায়িত্বহীনতা আমাদের প্রচুর। এ গুলোর নানারকম উদাহরণ দেওয়া যায়।

ইংরেজদের একটা শুধের কথা জানি, সেটা হল তাদের ব্যবসায়িক সততা। তারা কথার দাম দেয়, খারাপ জিনিষ দিলে তা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু ভারতীয় দোকান ঠিক তার উলটো দেখতে পাই। কোন জিনিষ খারাপ দোকানদারেরা ইচ্ছে করেই দেয়, অতএব তা ফেরৎ দেয় না। আমাদের প্রায় প্রতিটি খাতে ভেজাল আমরা খাচ্ছি। ক্ষতি আমাদের যে দেহের হচ্ছে তা নয়, জাত হিসেবে আমরা ভেঙে গিয়েছি বলেই এর বিকল্প আমাদের সামাজিক প্রতিরোধ নেই। তাই একে বলা চলে নিজেই পায়ে কুড়ল মারা।

যে ইংরেজ দোকানদার হাসিমুখে খারাপ কোন জিনিষ ফিরিয়ে দেয়, তখন হয়তো কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু এটা তার পক্ষে একটা ইনস্ট্রুমেন্টও বটে। ফ্রোতা সেই দোকানে নিশ্চিন্ত মনে জিনিস কিনতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজ সং বলেই যে এটা করে তা নয়। ইংরেজ জানে, এর ফলে তার লাভই বেশি হবে। কেবল সে নয়, তার ছেলেও খাতে সে ব্যবসা বজায় রাখতে পারে সেজ্ঞা সে ছেলেরও সততাই শিক্ষা দেয়। ব্যবসার জটিল সততার প্রয়োজন।

আমার দু-একজন বন্ধু লগুনে হঠাৎ একটা বিরাট একটা ব্যবসার সুযোগ ছুটিয়ে ফেলে। কার্পেট তৈরি করার জন্য বাজে উল কেনা হয়—বাজে উল ফেলা যায় না, সেগুলোও বিক্রি হয়। হিসেব করে দেখা গেলো দশ বায়ো হাজার টাকা খরচ করলে ত্রিশ হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু দশ বায়ো হাজার টাকা ছিল না, অতএব হাজার পাঁচেক টাকা অগ্রিম চাওয়া হল।

যে কম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করার কথা তারা বললো, আগে জিনিস ডেলিভারি দাও পরে দাম দেব। বিল অফ লেজি দেখিয়েও টাকা পাওয়া যাবে না বলে তারা জানানেন, কারণ ইতিপূর্বে আর একটা ভারতীয় কম্পানি উলের সঙ্গে পাটের ভেজাল দিয়ে তাদের আশী হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে—অতএব তারা রিস্ক নিতে রাজি নন।

আমরা লিপুথিস্ট গার্ডেনসে বেশ কিছুদিন ছিলাম—অখণ্ড মিসেস হেইসকে চান করতে দেখিনি। এ ব্যাপারে খুব অস্বাচ্ছন্দ্য হতাম, বলাই বাতলা। কিন্তু তিনি নিজেই একদিন বললেন যে তিনি পাবলিক বাধে নিয়মিত চান করেন। বাড়ীতে পুস্তক চানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাইরে গিয়ে চান করেন (যেন জিজ্ঞাস্য করাকে তিনি বললেন তাঁর বয়স বেশি হওয়াতে তিনি পেনশন পাচ্ছেন গবর্নমেন্টের কাছ থেকে।) যারা বৃদ্ধ বয়সের পেনশন পান তাঁরা



হুধের বোতল ও টিট পাখি

সাধারণ স্নানাগারে কোনো খরচ না দিয়ে চান করতে পারেন এবং সোম থেকে বুধসপ্তাহের এই চার দিন বিনা খরচে যে কোন সিনেমা হলে চুকতে পারেন। মিসেস হেইস প্রচুর সিনেমা দেখতেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সিনেমা দেখা নয়, বাড়ীতে আগুন জ্বলবে খরচ না করবার জন্ত।

সাধারণ স্নানাগার লগুনে প্রচুর আছে। আমাদের একটি পোল্যাণ্ডের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পিকাডিলি পাড়ায়— নাম তার বব। বব সমস্ত রাত পিকাডিলিতে ঘুরে বেড়াত— তার সামান্য কিছু পরসা ছিল ভাতে হোটলে থাকা যেত না। অতএব সে দুপুর বেলা ছ' সাত পেনি খরচ করে চানের টবে গরম জলে ঘুমিয়ে নিত ঘণ্টা কয়েক। স্বাস্থ্য তার খুব ভাল ছিল—এবং পিকাডিলিতে সমস্ত রাত ঘুরেও তার কোন রকম অসুবিধে হত বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া পিকাডিলির খুব কাছেই কভেন্ট গার্ডেন—সেখানে সাক সজীর পাইকারী বাজার—রাত্রি বারোটার পর গ্রাম থেকে আসে লরিতে করে শাক সবজী ফল ফুল ইত্যাদি। সেখানে তার সস্তার অভাব হয় না। মাঝে মাঝে এর ওর বোঝা বয়ে দিয়ে তার ছ' চার শিলিং আয়ও হয়েছিল— কিন্তু সে বেআইনী ভাবে। তার বোঝা বওয়ার অধিকার নেই। বোঝা বইতে হ'লে ইউনিয়নের কাছে আবেদন করতে হবে। তারা বিদেশীকে কাজ করতে অস্বীকার দেবে না। আর বব নিয়মিত কাজ করতে চাইতও না। অনিয়মই ছিল তার কাম্য। ছ' একবার ইংরেজ 'টেডি বয়'দের সঙ্গে তার লুণ্ঠাবৃত্তিও হ'য়েছে।

ববের সবচেয়ে ভাল লাগে ইংরেজ পুলিশ। রাত ছুটোর সময় পুলিশের সঙ্গে ববের দেখা ট্রাফিকলগার সড়ায়। এখানে কি করছে—বাড়ী বাও! পুলিশ বলে চলে গেছে। আর কিছু বলেনি। পরদিন সেই পুলিশের সঙ্গে একই জায়গায় একই অবস্থায় দেখা। কী হে, তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী নেই।

—হ' বাড়ী নেই, বটে? আমার সঙ্গে এস।

বিনা আপত্তিতে বব পুলিশের সঙ্গে যায়। থানাকে শোবার বন্দোবস্ত নাকি খুব ভাল।

ছ' চারদিন জেলও খেটেছে।

ছেলেটি কি ভাবে পোল্যাণ্ড থেকে লগুনে এসেছিল জানি না। তার কোন পরিচর সে জানতো না। তার মাথা হরত খুব সুস্থ ছিল না। কিন্তু এই রকম ছেলেরা লগুনের দুর্বৃত্তদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। লগুনের নানারকম দুর্বৃত্ত আছে। বিশেষ করে সোহো অফলে দুর্বৃত্তদের বাঁটি আছে। এই সব দলে পৃথিবীর সবাইকে পাওয়া যায়। এরা বন্দুক রিভলভার পছন্দ করে না। বিশেষ করে দাড়ি কামানোর ক্ষুদ্র এদের খুব প্রিয়। এতে কাজও হয় আর পুলিশ এই জাতকে বে-আইনী বা অস্বাভাবিক মনে করতে পারে না। তবে লগুনের এই আগারওয়ার্ল্ড অধিকাংশ লোকদের অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে না। ভারতীয় ছাত্ররা সাধারণত সন্ধ্যার পর এ পাড়ায় আসে না, যদিও কাছেই লগুন ইউনিভার্সিটি। আমাদের এক বন্ধু দেবব্রত চন্দ্র সোহোর ভেতর দিয়ে না গিয়ে প্রায়ই আর্থ মাইল বেশি হাঁটতো। সে বলতো, গোলমাল থেকে ঘুরে থাকাই ভালো। আমরা বহুবার সোহোর মধ্যে গোলমাল দেখবার আশায় গিয়েছি, কিন্তু কোনদিনই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। বোধ হয় একেবারেই পড়েনি বললে ভুল হবে।

একদিন সোহো সড়ারের মধ্যে পার্কে সন্ধ্যার কিছুপরে দেখেছিলাম দেবব্রতকে।

দেবব্রত বলেছিল, সব বাজে কথা না রে? কই কেউ তো ক্ষুদ্র নিয়ে তাড়া করল না?

[আগামীবারে সমাপ্য]

EGYPT MIGHT IS TUMBLING DOWN

(M. E. Coleridge)

(১)

মানব-মনের মাঝে হয়েছে বিপর্য
মিশরের শক্তি বশ, বশ পরিচর,
তেমনি পতন হ'ল গ্রীসের উয়,—
রোম আর জেনিসের গর্ব হ'ল ক্ষয়।

(২)

তবু তথা আজো আছে শ্রীরা কবিগণ,
আছে জেগে জীবন মাঝে কতো না স্বপন।
অসার অস্পষ্ট, যেন বার্ষ অলীক,
আর আছে জেগে বশ মানবের মন।

অনুবাদিকা—কুমারী সঞ্জনা মুখোপাধ্যায়

এমো নববর্ষ

মধুচ্ছন্দা দাশগুপ্তা

তুমি শুধু ধারে মোর এসেছো

(তবু) ফুটেছে অজানা ফুল, রয়েছে কত বকুল

সুগতি ছড়িয়ে গেছে বাধিকায়

কোঁকিলা মুখবা হয়ে, ডেকে গেছে মৃত, মৃত

বহুমতী পুলাকিতা গীতিকায়

হে নূতন পুরাতনে টানো অবগুষ্ঠন

নব রূপে এমো মোর গৃহে আজ

যেমন এসেছে কলি মল্লিকা ডালে ডালে,

যেমন পরেছে ধরা নব সাজ

(তবু) তুমি শুধু দূর হতে হেসেছো।

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি ঘুথের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

আনন্দ-রন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অম্বাদক—ঐপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৭। দেখতে দেখতে সেই সময়টি এল, যখন স্তম্ভপান বন্ধ হয়ে যায় শিশুদের, এবং হামা টেনে আর তারা চলে না। বালকুক এখন বীরে বীরে চলেন, পায়ের পাতায় ভর দিয়েও হাঁটতে পারেন, ননী চুপিও করেন।

বিনি পরমানন্দ-কন্দ তিনি যে-ক্ষেত্রে প্রকট করছেন তাঁর বালা-লীলার কৌতুক, সে-ক্ষেত্রে কি আনন্দের জন্ম না হয়ে যায়?

২৮। একদা—

নিজের অবধানি নির্জন দেখে, চুরি করতে চুকছেন ছেলে। চুরি করলেন—আগের দিনের ননী-আলানো ঘি। চুরি করতে গিয়ে, মনিমুখে যেই না দেখা নিজের প্রতিবিম্ব, অমনি থামা। ভয়ে ভয়ে ছায়াটিকে তখন ছেলে বললেন ভাই, ভাই, বলসনি ভাই মাকে আমার, ভোর জন্তও ভাই ভাগ বেখেছি আমি, ষা ভাই। কল কল করে বকে বাচ্ছেন চোর, আর আঁড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলেন মা।

২৯। তারপরে যেই ছেলের কাছে বস করে এগিয়ে গেলেন মা অমনি ছেলে সপ্রতিভ। নিজের প্রতিবিম্বটিকে দেখিয়ে দিয়ে মাকে বলে উঠলেন—

মা মা, বেখ কে এসেছে। ননী চুরি করতে এই মাত্র ঘরে এসে চুকল। লোভ হয়েছে চোরের। বাগ করছি, কিছুতেই শুনছে না। রাগ করছি, ও আমার উপর চোখ বাড়াচ্ছে। আমার তো আর লোভ নেই ননীর উপর।

৩০। আর একদিন—

কার্যান্তরে গেছেন জননী। ইভাবসরে ননী চুরি করছেন ছেলে। হঠাৎ দৈবগতিকে মা এসে উপস্থিত। ছেলেকে দেখতে না পেয়ে যেই তিনি ডাক দিয়ে উঠেছেন—

ও কুক, বাপ আমার কোথায় গেলি তুই, কি করছিস রে? অমনি ভয়ে শুকিয়ে গেল ছেলের মুখ, বন্ধ হয়ে গেল ননী চুরি। জিরিয়ে জিরিয়ে মাকে বললেন—

মা, মা, আমার কাকনের মানিকখানা আঙনের মত জলছিল কি মা—একদম পুড়ে বাচ্ছিল আমার হাত। ননীর ভাঁড়টার ভিতর তাই হাত ডুবিয়ে জুড়িয়ে নিচ্ছিলুম বলুন।

৩১। কর্ণরমা বাক্য শুনে মায়ের ঠোঁটে অভিনয় করে উঠল বিম্বয়। বলেন—

আয় আয় এমিকে আয়। তারপরে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—

দেখি তো বাছার আমার কী হয়েছে। দেখি তো একবার হাতখানা। পুড়সো কেমন করে?

পুজার ফুলের মত হাতখানিকে বাড়িয়ে দিলেন ছেলে। আর মা সেই হাতের উপর মিঠি দিতে দিতে বললেন—

আহা, হা, সত্যিই তো, বাছার আমার হাতখানি আঙন হয়ে গেছে গো! দি এবার, বুঝ কবে ফেলে দি মানিকখানা। ভারী দুঃখু এই পয়সাগ মণিটা। তারপরেই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মায়ের সে কী খেলা!

৩২। আর একদিন—

ফুলের কলির মত কচিকচি হাত ঘুরিয়ে ছেলের সে কী চোখ মাকার ঘটা! তারপরে দুচোখ ছাপিয়ে টপটপ করে চোখের জল ফেলার সে কী কাহণা। হঁ হঁ হঁ করে সে কী ঠোট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাহার লহর! মুখের একটি বাক্যও বোকে কার সাধ্য।

কী হয়েছে ছেলের?

না, মা তাঁকে বকেছেন। ননী-চুরি-চুরি খেলা খেলছিলেন ছেলে, আর মা কি না তাঁকে বকেছেন!

আচ্ছা আর কীভাবে হবে না গো, আয় আয় তোমার মুখ মুছিয়ে দি। তোরাই তো এই এই সব—বলতে বলতে ননী-চোরাকে গলায় তুলিয়ে মায়ের সে কী চোখ ছলছলে আদর!

৩৩। আর একদিন—

পূর্ব-প্রোক্ত-বিধোক্ত মণিময় অঙ্গন। ব্রজপুরপুরকীর্তনের সঙ্গে বসে সভা জমকিয়ে শুভালাভ করছিলেন মা যশোদা, পাশেই খেলা করছিলেন ছেলে। এমন সময় আকাশের চন্দ্রটির উপর নজর পড়ল কুকস্বরের। আর বার কোথায়?

পিছন দিক থেকে গুটি গুটি এগিয়ে এলেন ছেলে। মাথার ঘোমটা সরিয়ে তুলতুলে হাত দুখানি দিয়ে মায়ের মাথার বেণী ধরে—এক টান। চুল খুলে দিয়ে মায়ের পিঠে এই মারেন কিল তো সেইই মারেন কিল। সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে ছেলের কী কাহা, আর কী আধো-আধো বুলি—

দে মা, আমার দে মা—সেহে ভিজে যায় মায়ের শ্রীণ। অরুণ হয় ছনয়ন। পাঁলের সখীঘের দিকে তিনি মিনতির চোখে চান।

৩৪। বিনয়ের প্রণয়ে গলে গেলেন সখীরা। তাড়াতাড়ি কুকস্বরকে ছাড়িয়ে নিলেন তাঁরা। নিজেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে ছেলে সামলিয়ে বললেন—

বাছা, তুমি কি চাও? কীর চাই?

না।

খুব ভালো দই?

না, না।

চাচ্চি তবে?

না, না।

তাহলে হানা?

না, না।

জবে তোমার কী হচ্ছে ?

ননীর বি দাও, ... ঘন।

ও মা, এই কথা! বেশ আমরা দেব। এবার আর টোট ফুলিও না। মায়ের উপর এত রাগ কলবে না...কেমন ?

ঘরের বি আমার ভালো লাগে না।

...এই না বলে, অজুলির পাশপড়িতিকি উর্দুখুশিন্ করে কুফল দেখিয়ে দিলেন জ্যোৎস্নার ভরা আকাশের চন্দ্রটিকে।

৩৫। সখীরা মুখচাঁওয়া-চাঁওদি করতে লাগলেন। এক সখী বলে উঠলেন—

“ওরে বাপ আমার! ওটা কেন ননীর বি হতে বাবে ? ওটা একটা বালিহীস ; আকাশপাখের পদ্ম-সায়র পার হয়ে বাচ্ছে।”
“কি...এ বালিহীসটা চাই, এনে দাও, আমি খেলব। ও পারে না পা দিয়ে বায়।”

৩৬। এই বলতে বলতে উৎকর্ষায় চটকট হয়ে কুফল মটিতে নাচাতে লাগলেন তাঁর জোড়া-পা। মায়ের সখীদের ‘গলা জড়িয়ে জড়িয়ে কেবল চোখে লাগলেন—

“দাও, দাও...”

ছেলের কান্না আর ধামে না। আগের চেয়ে অনেক বেশী কান্না। বালোর আবেশভরা কান্না। আর এক সখী তখন বললেন—

“এই এঁরা তোমায় ঠকিয়েছেন। ওঁরা রাজহীস নয়। ওটা আকাশের মাঝখানে অমৃতের রশ্মিভরা টার।”

তাহলে ঐটিই আমার দাও। আমার খুব ইচ্ছে করছে। আমার সঙ্গে ও খেলা করবে। নিয়ে এস এজুলি, দাও দাও।

৩৭। বলতে বলতে আরও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল কুফলের কান্না। ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন মা বশোদা। বললেন—

ওটি ননীর বি-ই বটে। বাজহীস নয়, অমৃত-রশ্মিও নয়। কিন্তু ওটিতো দুলাল তোমাকে দেওয়া চলবে না। ঐ দেখ, বৈবরণে ওর গায়ে গরল লেগে গেছে। তাই ওটি খেতে খুব ভালো হলেও, এখানে কেউ ওটি খায় না।

৩৮। বিশ্বয় ফুটে উঠল কুফলের উত্তরে—মা মা গরল লাগল কেন ভেতে ?

কেন মা ?

মায়ের ঘনে হল, হাক আগের আবেশ কেটে গেছে ছেলের ; তাঁর কথার শ্রদ্ধা হরছে কুফের গল্প শোনবার আগ্রহে। এক রস থেকে আর এক রসে তাহলে ঢলে পড়েছেন তাঁর ছেলে। তাই, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে জননী তখন মিষ্টি হাসে মিষ্টি ভাবে বললেন—

৩৯। বলি জবে শোন,—একটি সাগর আছে। তার নাম সীরা।

কু। মা, কী রকমের দেখতে সেটা ?

মা। হুধ দেখেছিস তো ? সেই হুধে ভর্তি সেই সাগর।

কু। আচ্ছা মা, কত গরু দোয়া হল যে ঐ সাগর জমাল ?

মা। ওরে সোনা, গরুর হুধ নয়।

কু। আমাকে ঠকাচ্ছিস মা, গাই না হলে বুঝি হুধ হয় ?

মা। বিনি গরুর মধ্যে হুধের স্মৃতি করেছেন, তিনি বিনি-গরুও হুধ তৈরী করতে পারেন।

কু। তিনি কে ?

মা। তিনি ভগবান, জগৎ-কারণ।

কু। সে আবার কে ?

মা। ওরে ছেলে, তিনি ভগবান। তাঁর নাম ‘ক...প’ তিনি চলতে পারেন না। ‘ভগবান’ের গ নেই, তাহলে ‘ভবান্’ ;...ওরে তুই যে আমার সেই।

কু। হুম বাবা, এবার মা তুই সত্যি কথা বলেছিস। ও মা, গল্প বল।

মা। পুরাকালে সুর আর অনুরদের মধ্যে ঝগড়া হয়। অনুরদের মোহিত করতে হবে, তাই এক দিন ভগবান মদন করলেন হুধ-সাগর। এক প্রকাণ্ড পাঠাড, মন্দর পাঠাড তাঁর নাম, তিনি হলেন মদন-দত্ত। রজ্জু হলেন সর্পরাজ বাসুকি। এক দিক থেকে অনুরেরা, অন্য দিক থেকে সুরেরা টানতে লাগলেন সাগর দড়ি।

কু। মা, যেমন করে গোপীরা দই ময় ?

মা। হ্যা গোপাল, ঠিক সেই রকম। আর মইতে মইতে সেই হুধ সাগর থেকে উঠল গরল, ...কালকূট তাঁর নাম।

কু। মা, হুধে কি করে গরল হবে ? সে ভো সাপেদেরি হয়।

মা। বাছা, সেই গরল কালকূটিকে যখন মস্তকুর পান করে ফেলছেন, তখন তার বা ছিটোকাটা শব্দ, সেই কৌটাকালোই খেয়ে ফেলেছিল সাপেরা। তাতেই সাপেরের বিষ হল। তাই বলছিলাম, হুধেও যে গরল থাকে সেটা ভগবানমইই শক্তি।

কু। হু, মা ঠিক ঠিক।

মা। আকাশে ঐ যে ননীর ঘরের কৌটাকটাকে দেখছিস উনিও উঠেছিলেন সেই সাগর থেকে। তাই ওর গায়ে লেগে গেল গরলের বাকিটুকু। ঐ দেখ, ঐ যে কালোদাগ...সকলেই ওর নাম রেখেছে ‘কলঙ্ক’। ...তখন ঘরের বি-ই খাও বাছা, ওটি নয়।

গল্প শুনে শুনে কুফের চোখে ঘুম নেমে এল। সীলানিত্যায় পুত্রের তত্ত্বপানি অংশ হয়ে পড়েছে দেখে জননী বশোদাদেবী তাঁকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন বহুমূল্য বিছানায়। কপূরের মুলির মত ধবল সেই শয়নতল। শুইয়ে দিয়ে আঙো আঙো মা বশোদা ঘুম পাড়িয়ে দিলেন কুফকে।

৪০। পরের দিন সকালে সূর্যের ওঠেননি তখন আকাশে, দধি-নবনীত-ইত্যাদি হাতে নিয়ে ছেলের ঘুম ভাঙাতে এলেন জননী। কুফের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—“জাগো রে, দুলাল আমার জাগো। মরে বাই, মরে বাই, কাল বাছার আমার খাওয়া হয়নি, এবার ওঠো।”

ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে গন্ধসলিল দিয়ে মুখকমলখানি ধুইয়ে দিলেন মা। তার পরে ছেলেকে কোলে বসিয়ে দেখিয়ে দিলেন সোনার পায়ে সাজানো নবনীতাদি খাতসাহগ্রী। বললেন—“বোটা মুখে রোচে, খাও।”

বললেন বটে জননী কিন্তু পুত্রের অভাস বাবে কোথায় ? স্তম্ভপান ত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি কাঁপিয়ে পড়ে পান করতে আরম্ভ করে দিলেন মায়ের স্তন।

৪১। কিছুক্ষণ হুধ খাইয়ে মা বললেন—“তুই তো ননী খেয়ে ভালবাসিস। ননীটুকু এখন খেয়ে ফেল।”

কু। না মা, ও-সব আমি খাব না। কাল রাত্তিরে জাি

তোকে মিথ্যে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার কিদে ছিল না।
 মা! তুই যদি ঘুমিয়ে পড়িস, তাহলে কে আমার ঘরে ঢুকে
 চুরি করবে ননী?

ক। মা মা, কবে আবার আমি তোমার ননী চুরি
 করলুম? মা, তুই মিথ্যে কথা বলছিস। মিষ্টি মিষ্টি টোটে
 মিষ্টি মিষ্টি কথা। মায়ের মন গলাতে, মন বাঁজাতে মন
 ভোলাতে আর কতকণ?—এই রকমের বালালীলা চলে লীলা-
 বালকের—অনন্ত খেলা, আর সে খেলা কত পরিপাটি।

৪২। একদিন,—বালকক দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন গৌশালার
 চাতালে। হঠাৎ এমন সময় লাফ দিয়ে দৌড়ল এক বাছুর। দেখাও
 বেই অমনি দৌড়ে গিয়ে বাছুরটাকে জাপটে ধরে এক ঝটকায়
 মাটিতে কেলে দিলেন ছেলে। তার পরে নিজের দু-হাটুর মধ্যে
 বাছুরটাকে না চেপে ধরে, দু হাত দিয়ে তার গলা না জড়িয়ে নিজের
 মুখের পদ্মফুল দিয়ে সে কী সুন্দর করে বাছুরের মুখ বোলালো
 ঘটা, সে কী হাসি দেওয়ার ঘটা বাছুরকে!

দেখেন, আর মায়ের প্রশ্ন আনটান করে ভয়ে আর
 কৌতুকে।

নিজস্ব গরুর গোয়ালে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বেই মলে
 দিয়েছেন একটা কচি বাছুরের লাগেজ, অমনি বাছুর দৌড়। নিজেও
 বেই তড়াব করে লাফিয়ে উঠেছেন, অমনি ছেলের খসে পড়ে যায়
 কচিটের ঝটি। আর পরাও বেই, অমনি বেন একটি ব্রহ্মস্ট্রী চুরি
 হয়ে গেল দেখুন্ডীর মন। নয় কক্ষের মধ্যে তাঁরা চকিতে অল্পভব
 করলেন অনাবৃত এক দুর্ভদ্রকে।

তার পরে আঁড়িয়ার পাঁক তুলে তুলে নিজের গায়ে মাখার
 সে কী উৎসব। দুগমদে বেন সলিস্ত হয়ে গেল নীল গা।
 দেখুন্ডীর আর পাভা পড়ে না চোখের। তাঁরা নয়ন জুড়ে
 কেতে থাকেন দুইনয়নের অতিবাসকে, সুন্দরকে। সুন্দরে কি
 অসুন্দর কখনও থাকে?

কোনো কোনো দিন বাইরে বেড়াতে বোরাবেন ডেসে।
 ছেলেকে সাজাতে বসেন মা। নিখুঁৎ করে ছেলের মাথার বেঁধে দেন
 ছোট একটা উকী। বেছে এনে কোমরে পরিবে দেন পীতবাস।
 গোরোচনা দিয়ে কপালে আঁকেন শুভালপাতার ভিলক। কাজল
 পরাচ্ছেন চোখে, ছেলের আর তর সর না। 'পাঁড়া বলছি, ঐ ডাখো,
 কুলোকের দুই আবার না পড়ে'—বলতে বলতে গায়ের মায়ের
 মত নন্দরাগি নিজের বুকের কাছে টেনে নেন তাঁর ব্রৈলোক্যমোহন
 ছেলেকে আর সুবাসুত দিয়ে পুজো করেন ছেলের মস্তক। পূজের
 কণ্ঠে ছুলিয়ে দেন অতি চমৎকার একটি বাঘনখ, সোনা দিয়ে বাঁধানো,
 শ্রোণীতে পরিবে দেন মহাঈশ্বরী এক লহর কিড়িনীমালা। এইবার
 তাহলে ধড়াচুড়া পরে পূবের বাইরে খেলতে বেরোতে পারেন
 বালকক—আত্মবিশ্বাসের পদ্ম-আঁধির আঁড়িয়ার আঁড়িয়ার।

৪৩। তার পর একদিন—ব্রজপুরের শ্রেষ্ঠ রমণীরা একত্রে
 উপস্থিত হয়ে গেলেন মহামহিমামরী ব্রজরাসীর সমীপে। তাঁরা
 সকলেই জানতেন, যে-ছেলের উপরে অধিষ্ঠান করেন জয়, বিনি
 সর্বদাই সদয়, সে-ছেলের খুঁট খেলায় পৃথিবীর যাবুধ যে মজবে,
 সে-খেলার' যে সর্বত্র বিজয় হবে এতে আর আশঙ্কা কি? এই
 জ্ঞান থাকার দরুণ তাঁদের মনে দুঃখের উদয় না হলেও

কতই না বেন তাঁরা ব্যথা পেয়েছেন, এই ভাব দেখিয়ে তাঁরা
 এলেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে মায়ের কাছে।

৪৪। এলেন তাঁরা সকলে। ওঠে কৌতুক, অবধে ভালবাসা,
 সারা মুখে হাসি। বললেন—

—'বাগী মা এ ছেলে আপনাদের ভবিষ্যতে ভারী দুঃখ হয়ে
 উঠবেন। এখন তো সব ছুটি পাভা গজিয়েছে, তাতেই এই;
 ভুবন কাঁপিয়ে তুলেছেন। বাড়লে পরে আরও লীলা বাড়বে।
 তখনই পাড়াকে পাড়া লোপ করবার চেষ্টায় আছেন, না জানি
 এর পরে আরও কি করে বসবেন?'

—'গো-দোহনের আগেই উনি বাছুরের দড়ি খুলে দেন।
 বাছুরগুলো দুহ খেয়ে নেয় সব। যদি যেহ তখন ওর সামনে গিয়ে
 বাগ দেখান, তাহলে শুকুণি উনি এমন একটি মিষ্টি হাসি হাসেন,
 যে লোপ পেয়ে যায় বোবা।'

—গহন অন্ধকারে বাগীমা, আমরা অতি ধৈর্যে লুকিয়ে রেখেছি
 ননী বি ইত্যাদি সমস্ত। কিন্তু আপনাদের ঐ ছোটটি কি করেন
 জানেন? ঘরে ঢুকে নিজের রূপের আলোর ঘরের আঁধার দূর
 করে দিয়ে ঘরের কোণায় কি আছে সমস্তই বের করে দেন।'(৩৮)

—'কী ছড়াছড়ি মা, কী আলসেমি আপনাদের ছেলের!
 থাকেন তো নিজে এই এতটুকু, আর গাছের বান্দরগুলোকে ভেঙে
 এনে খাওয়াবেন এই এতখানা। তৃপ্তিসম্পন্ন বান্দরগুলোও যদি
 আবার না খান তাহলে বেগে ভাঁড় ভেঙে সব মাটিতে ছড়িয়ে
 দেন আপনাদের কুমার।'

—'তাহার বোথানে হাত পৌঁছয় না, সেখানে নিজের উপর
 পিড়ে চাপিয়ে সিঁড়ি বানান। তার পর তার উপর কাঁড়িয়ে হাত
 বাড়িয়ে সিকে খেকে চুরি করেন হই, ননী, মাখন, ছান। যদি
 কেহ মানা করলেন তো রক্ষে নেই, এক পলকে মাটিতে ছুঁড়ে
 ফেলেন সমস্ত।'

... 'আর মা রক্ত করে যদি একবার তাঁর হাত ধরছে কেউ
 অমনি হাত মটকিয়ে শিটান। তারপর দূরে পাঁড়িয়ে দুঃখ
 গর্জন। আবার বলেন কি না—পাঁড়াও দেখাচ্ছি, ঘর পুড়িয়ে
 তোমার ছেলেরে আমি তাড়িয়ে দেছি।'

... 'কেউ যদি বা বলে কেলেছেন, ... 'ইনি চোর মহাশয়'
 তাহলে সে কী রাগ, মা, আপনাদের এই দুঃখটির। বেগেই থুন।
 একেবারে দুই হয়ে ওঠেন। বলেন... 'তুমিই চোর। এ বাড়ী
 তো আমার বাড়ী, এ বাড়ীর সমস্তই তো আমার।

—'কেউ যদি না নিজের বাঁজকে মোলারের কবে মাটির প্রলেপ
 দিয়েছেন, বা ছবিটির মত করে কলি ফিরিয়েছেন তা হলে দেখন
 গিয়ে, ঐ আপনাদের ছোটটি সেখানে গিয়ে ঘূলা ছড়াছেন বালি
 ছড়াচ্ছেন, নোংরা পাভা ছড়াচ্ছেন।—বাগীমা, ঘরের শুভি আর
 রইল ডা। আপনাদের সামনে আমাদের এই কেউ ঠাকুরটি স্থল
 বালকটি হয়ে থাকেন। আর আমাদের বাড়ীতে বেই উপস্থিত হন
 অমনি উনি হয়ে ওঠেন সাক্ষাৎ চোর, বাঁজিমির অন্ধ থাকে না, একমুখ
 খরখরে কথা, মহাশয়ী, মহা-লুভ।

৪৫। ব্রজরমণীগণ একত্রে এই বেন নিভান্ড নিষ্ঠুরতা ও
 মিথ্যা বোঝ দেখিয়ে ঐ হেন বাক্যবাণ বর্ষণ করছেন, ততক্ষণ
 বালককের নয়নে হলহল করে উঠেছে মিথ্যা-অন্ধ। বিনি নিভা

নবোৎসবে মাতিয়ে রাখেন জগৎকে, তিনিও তখন এই কুট আলাপের বৈরথ্য দেখাবার অভিলাষে মুখখানি তাঁর তুললেন। যদিও নীতির দিক দিয়ে তিনি অপরাধী, তবুও যেন কোনও অপরাধই তিনি করেননি, এমনি একটি ভাব দেখিয়ে, সখিকুঁ ধামা-চাপা দেবার উদ্দেশ্যে মধুর মধুর স্বরে বললেন—“মা, মা, এঁদের মধ্যে একজনও আমার ভালবাসেন না। এঁদের স্নেহ নেই। একটুও না। এঁদের কথার এতটুকুও সত্যি নেই। এঁরা একদম মিথ্যাক। এঁদের সমস্তই মিথ্যে। এঁরা মানুষ নন। এঁদের ছেলেরা অনেক নতুন নতুন খেলা জানে, তাই তাদের সঙ্গে আমার এত ভাব। তারা এক নিমিষে মায় আপন হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে দেখা করতে আমি রাত পোহালেই তাদের বাড়ী বাই। এঁরা আমার যেতে দেখেছেন কিনা, তাই জোর করে এখানে মিথ্যে কথা বলতে এসেছেন। বিশ্বাস করিসনে মা এঁদের কথায়। এই আমি বলে রাখছি মা, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আর যাব না আমি কোনো দিন তাদের বাড়ীতে। বলতে বলতে ছেলের মুখ কীদ কীদ হয়ে উঠল ভয়ে। না জানি আবার কি করে বসবেন? কিন্তু ব্রজেশ্বরী লীলা-বালকটিকে কোলের কাছে টেনে নিলেন, আর নিজের মুখ-চোখের ভাব গোপন করে হাসতে হাসতে ব্রজ-বনিতাদের বললেন—

৪৬। “আহা, আপনাবাই তো দেখছি মিথ্যাবাদী, আর আমার গোপালই তো দেখছি সত্যবাদী। এ বেচারী তো কেনও অপরাধই করেন নি।”

আব একে কিন্তু আপনাবা বকবেন না বেন।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সকলে, চলল, প্রীতিকথা। ঐরোহিণীদেবীও এসে পড়লেন। তারপরে তিনি যখন বাবুদেবের কপালে পরিয়ে দিলেন ভিলক, তখন সম্মানিত সেবা পেয়ে সানন্দে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ব্রজবনিতারা।

৪৭। তাঁরাও গেলেন, আর জন-নীতিপণ্ডিতা শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানীও শিক্ষা দিতে বসলেন তনয়কে। কোলে বসিয়ে বললেন—“ওরে ছেলে, তুই বড় লুতী। হুটপানা করতে হয় নিজের ঘরে করিস। ওসব নিজের ঘরেই শোভা পায়। দেখারও ভালো। পরের ঘরে গিয়ে অত সব হুট-হুট খেলা—ওরে নীলমণি, সে কি তোকে মানায়? তুই আমার কত স্নহর ছেলে, বাইরে গিয়ে এমন খেলা আর খেলিসনে বেন। খেলতে হয় নিজের আঙিনার খেলি।”

৪৮। এমন সময়ে ব্রজরাজ এসে পড়লেন সেখানে। এসেই

দেখেন তাঁর আত্মজটির, তাঁর আত্মীয়স্বজনদের হৃদয়টির কেমন যেন আছন্ন হয়ে পড়েছে প্রতাপ। কই, শরীর তো কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। তাই বাণীতে অতি মায়ুর্যের রস মিশিয়ে কৃষ্ণকে ডাক দিয়ে বললেন—আর, এদিকে আর, আমার কোলে আর।

মাতৃজ্ঞ থেকে জনকের বৃকে বাঁপিয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। বাপের কণ্ঠ জড়িয়ে মুখ টিপে টিপে বললেন—মা আমার কেন . . মিথ্যা মিথ্যা . . বন্ধে?

৪৯। এই না শুনে ঘোরাবীণ জিজ্ঞাসা করলেন—হয়েছেটা কি? তখন সেই আশ্চর্য্য ছেলে—বুদ্ধিত যিনি গুণনিধি মায়ের দিকে চোখ বাকিয়ে চাইলেন। বললেন—

মা, তুই মা বল না কী হয়েছে ষটপট। ব্রজরাজী তখন কথকথায় মত করে, কলিয়ে বলে গেলেন ঘোষ-বউদের মধুধারার মত সমস্ত কথা।

৫০। মনের ভাব গোপন করে ব্রজরাজ তখন অমুখোপের স্বরে মহিষীকে বললেন—তোমারই অপরাধ হয়েছে সব চেয়ে বেশী। আমার ছেলে, তাকে হতেই হবে নিষাপ, বুদ্ধিমান, বিনয়ী। সব সময়েই দেখছি, গোপবতুরা কৃষ্ণের নিন্দা করেন। মিথ্যে নিন্দা। নিশ্চয় বাটের রজ করেন। এঁদের স্বভাব ঐ। পরের মশি দেখলে মাংসার্থে গুঁরা ভরে গুঠেন। তাঁদের কথায় তুমি বিশ্বাস কর? আশ্চর্য্য! বলছি ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কোলেই থাক, আর কারো কোলে বাসনি। বলাও শেষ হয়নি, আর পিতৃ-অন্ত থেকে মাতৃ-অন্তে বাঁপিয়ে পড়েছেন কৃষ্ণ। মায়ের কোলে চড়বার জন্তে ছেলের সে কী জীবপীক তারপর মায়ের কোলে গুছিয়ে বসার সে কী কাহদা! রাজমংশতী তো হেসেই সারা।

৫১। রত্নজয়ময়ের জননীর সঙ্গে কিছুকাল সর্ষ হাতালাপ করে ব্রজরাজ উঠতে যাবেন, এমন সময় একটা কথা হঠাৎ তাঁর মনে জাগল। তিনি ঝাঁড়িয়ে গেলেন। মহিষীর কাছে প্রস্থান করলেন—“দেখ রাণী, কৃষ্ণ একলাই বেচার। প্রবল বলরামও সঙ্গে থাকে না। দুজনেরই একা-একা ঘোরাফেরা করাটা ভাল নয়। তাই ভাবছিলাম আমাদের এখন নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে কতকগুলি পরিচালক। খেলার সহচর হওয়া চাই, সেনাচতুরও হওয়া বাই। সব সময়েই তারা সঙ্গে সঙ্গে ভিরবে দুজনের। কি বল?”

বিচার শেষ হয়ে গেলে ব্রজরাজ সেই দিনই কৃষ্ণ-বলরামের সেবার নিযুক্ত করে দিলেন কয়েকটি বী-সচিব এবং গুটিকয়েক বালক-দল। [ক্রমশঃ।

এ মাসের প্রেক্ষদপটে প্রাকৃতিক শোভা সমন্বিত অলকানন্দার একখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ'ল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করেছেন শ্রীবিভাস মিত্র।

বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডালাগা হাউসটা ছিল গোয়েন্দা অফিস এবং প্রেসিডেন্সি জেলের মাঝের হলটি ট্রেনের মতন। প্রথমে গ্রেপ্তার করা হত তখনকার,—বোধ হয়,—Section 52 Cr. P. C. অনুসারে। তাতে ১৫ দিন রাখার পর প্রেসিডেন্সি জেলে ডিফেন্ড অ্যাট্ট বা রেকলেশন থিতে আটক রাখা হত সাধারণত এক মাস—কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রি বা 44 cell-এ। তার পর ডিফেন্ড অ্যাট্ট ওয়ালাদের সাধারণত বাইরে গ্রামে অন্তরীণ করা হত। রেকলেশন থিওয়ালাদের তার পরও জেলেই আটক রাখা হত,—এবং তখনকার দিনে আসামী ও পুলিশ, সকলেই মনে করতো, তাদের সারা জীবন আটক রাখা হবে।

৫২ ধারার প্রথম ১৫ দিন কীড স্ট্রীট ও ডালাগা হাউসে কাটতো—কীড স্ট্রীট প্রথম সন্তাষণ-আপায়ন,—আর ডালাগার বিশ্রাম। যারা পুরো স্বীকারোক্তি করতো,—যারা আধা স্বীকারোক্তি করতো,—এবং যারা স্বীকারোক্তি না করেই অগ্নিশীমায় উত্তীর্ণ হ'ত,—সব রকম লোকই ডালাগার আসতো।

স্বীকারোক্তি করার ঢাক করে কিছু বল এবং কিছু চেপে যাওয়া, এই হল আধা স্বীকারোক্তি। এই চালাকি করতে গিয়ে বেসামাল হয়েও অনেকে পুরো স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হ'ত। গোয়েন্দা অফিসাররা প্রায় প্রত্যাহই ডালাগা হাউসে আসতো কারো না কারো সঙ্গে দেখা করার জন্তে। তখনহিলুম, হু'-চারটে সেলের দরজা দিনের বেলা খোলা রাখা হ'ত, বন্দী বধন খুসী বাইরে বেহতে পারতো।

ঠাকুরের স্বীকারোক্তির পর অনেক লোক ধরা পড়েছে, তার মধ্যে অনেকে স্বীকারোক্তি করার আরো অনেক লোক ধরা পড়েছে,—আবার তাদের অনেকে স্বীকারোক্তি করেছে, এই রকম একটা ছড়াছড়ি তখন চলছিল এবং গোয়েন্দা-অফিসে হুড়হুড় করে মাল আমদানী হচ্ছে, আসাম্যাত্রই হুড়হুড় করে ঠেকানো চলছে, বাসি মাল ডালাগার পাচার করে টাটকা মালের জায়গা করা চলছে, একটা হৈ-ঠৈ হৈ-ঠৈ ব্যাপার চলছে।

শিষ্টির কথা লিখেছি, পড়ে এক বন্ধু বললেন, বিপ্লবীদের নাকি জাত মেয়ে দিয়েছি। তাঁকে আশস্ত করে বললুম, জাতমারার এখনো অনেক বাকি, এখনও জাত আধমারিও করতে পারিনি। আমি গরীব ছবিরা বলেই যে আমায়ই ওপর শিষ্টি চলছে, তা নয়, সে সময় যারা ধরা পড়েছে, তাদের সকলেই এঁ হাল।

ফেরারীদের ওপর আক্রোশ সব চেয়ে বেশী। ভবিষ্যত ভজ, টচার—বাজে কথা।

বিপ্লবজনক ফেরারী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বিভলভার সহ রাস্তার ধরা পড়েছিলেন, ডজন দেড়ক পুলিশের সঙ্গে মরিয়া হয়ে ধমকাধমকা করে জখম হয়েছিলেন, অজ্ঞান হয়েছিলেন,—পাছে স্বীকারোক্তি করতে হয় বলে' সালবাজার লক-আপে গলার কাসি লাগিয়েছিলেন আত্মহত্যা করার জন্তে—কাসি কেটে নামিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পরবর্তী কালে তাঁর স্মৃতিকথা (বিপ্লবের পদচিহ্ন) লিখেছেন :

"হিন্দুস্থানী একটি পিছনে এসে কাঁড়িয়ে আমার চুল ধরে টানতে শুরু করলো—জানি তো মারবে,—চুষ করে বইলাম।

"সাহস পেয়ে চারিদিক থেকে গাল পাড়তে শুরু করলো। মার হরত সহ হত—গাল সহ হয় না।"

তারপর তিনি চাঁৎকার করে ধমক দিলেন,—তাঁর কেস কোর্ট বাবে বলে তাঁকে আর মারতে বারণ করা হল, মার বন্ধ হল।

অন্ততঃ তিনি লিখেছেন,—"নিজেকে বাঁচাবার জন্য অপারের সর্বনাশ করা—বিপ্লবীর ধর্মত্যাগ,—বিপ্লবীর জাতিপাত।—অথচ কান্ন নামে না রটেছে? জীবন চ্যাটার্জির নামে পবিত্র—বে' জীবনকে আমি নিজের চেয়েও বেশী বিখ্যাস করি। অমূল্য জীবনের অমৃত সর্বকার—পরে তখনেছি, এঁদের নামে বা কিছু রটেছে, সবই মিথ্যা। আত্মসম্মান অনাহত রেখেই এঁরা উঠেছেন।

(অন্ততঃ)—"তখনেছিলাম ডালাগা হাউসের কথা। এক বন্ধুকে শীতের রাতে জেলে চুবিয়ে রেখেছিল স্বীকারোক্তি করার জন্তে।—অমর ঘোষ (অতুলদার ভাই—না, ব) অন্নমা মজুমদার (অমৃতবাজার পত্রিকার অ্যাসিষ্টেন্ট এডিটর—না, ব) অন্নপুণ গুহ, জীবন চ্যাটার্জি—আরো কত বন্ধুকে কীড স্ট্রীট পুলিশ অফিসে অমানুষিক মার মেরেছে,—দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সর্বক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছে,—তার উপর হাত পা বেঁধে রাতের পর রাত ক্লম দিয়ে পিটিয়েছে। জীবন ১০৪ ডিগ্রী অর নিয়ে ধরা পড়েছেন, সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে তিন চার জনে মদ খেতে এসে শেষ রাত অবধি বারের এদিক থেকে ওদিকে ঠেলে ঠেলে ফেলে টেনিস খেলেছে। আরো যা করেছে, তরলোকের মুখের ভাবায় তা বেরায় না।"

এই যে চারজনের নাম এক সঙ্গে লেখা, এইখানে, অনেক

নিখুঁত
কেশতৈলের
সন্ধান
পেয়েছেন কি ?

আপনি যদি এমন কোন কেশতৈলের সন্ধান থেকে
থাকেন—যা সম্পূর্ণ বিস্কৃত হবে, যাতে কোন কৃত্রিম
বস্তু থাকবে না আর মাথার বা স্বাভাবিক তৈলের
যোগান দেবে, তাহলে নিশ্চিতই আপনি খুঁজে নেবেন



কেরো-কার্পিন

৷ সক্রিয় তৈরী কেশতৈল
চুলে নতুন জীবন দেয় ৷

দে'জ মে ডি কে ল ষ্টো স' প্রা ই ভে ট লি:

কলিকাতা • যোহা ই • দিল্লী • মাদ্রাস

দালায় মুখে শুনেছি, ভূপেন বাবু তাঁর এক বন্ধুর স্বীকারোক্তি ঢাকা দিয়েছেন। অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্তে এরকম সহায়ত্বভূতি অসম্ভব নয়।

স্বীকারোক্তির সম্পর্কে ভূপেন বাবু লিখেছেন, “একদিন দুপুরের পরে ডাক পড়লো জেলের ফটকে। দেখি দশ-বারোজন বন্ধুকে জেলের বিভিন্ন স্থান থেকে ও অভ্যন্তর থেকে নিয়ে এসেছে সনাক্ত করার জন্তে। তার মধ্যে আছেন অধ্যাপক শরৎ ঘোষ (বাহাদুর বন্ধু—চালায় বিনি ছোট লাঠি খেলা লেখকত্ব আসতেন—না. ব.), অধ্যাপক বিপিন দে, সাংবাদিক সুরেন সিংহ এবং আরো জয়েকজন। চৌধুরীর অবস্থা প্রায় কারো সুরিবার নয়। ‘‘আমরা যখন সবাই একত্র জড়ো হয়েছি, এক জনকে ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সব স্বীকার করেছ কেন?’—‘কি করব? দেখুন, অমুক বাবু সব বলে দিয়েছেন।’’

“এই অমুক বাবুও সেখানে হাজির ছিলেন। ‘‘বন্ধুরা সবাই নীরব—আমিই একা কথা বলছি। কাজেই হিলের নজর পড়েছে আমার দিকে। ‘‘তখন এক হাতে আমার ধরলো, এক হাতে বন্ধুটিকে ধরলো, নিয়ে গোঁড়ের কাছে হাজির করলো।’’

অবস্থাটা নেহাৎ ভবিষ্যন্ত নয়। সব কথা বলে দিয়ে অনেক লোকের প্রেস্তারের কারণ হওয়ার পরও রাজবন্দী হয়েছেন অনেকেই। এমনি এক জন রাজবন্দী ছিলেন অমূল্যবীরের বোগেশ চ্যাটার্জি, বিনি ‘৪৮ সালে দিল্লীতে অশোক সেনের পতাকাভঙ্গে ৩০০ ভূতপূর্ব বিদ্রোহী প্রদর্শনী করেছিলেন, কাকোরা বড়বস্ত্র মালদার সার্টিফিকেট ও অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাহায্যে।

বসন্ত চ্যাটার্জির খুনের সঙ্গে বীরা জড়িত ছিল, তিনি তাঁদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ধরা পড়ে সব স্বীকার করে’ রেগুলেশন খিতে কেনে ‘আটক রাজবন্দী হয়েছিলেন। জেলে তাঁর দলের অন্য রাজবন্দীরা তাঁকে একঘরে’ করেছিলেন, তিনি মনমরা ভাবে একা একা বেড়াতেন। ভূপেন বাবুই তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর সঙ্গে মিশে তাঁকে rehabilitate করেছিলেন।

বাই হোক, ডালগু হাউসে আমাদেরকে যে খোশে পুরলো, তার কাছেরই এক খোশে ছিল করালী। পায়খানার নাম করে সকলে বেরোতে আনত করেছিল দেখে আমিও বেরোলুম এবং করালীর পাশে পাশে চললুম—শেঁষে পাহারাও চললো। বেশ একটু দূরে একটা টিনের চালায় একসঙ্গে অনেকগুলো পায়খানা—হুঁসারি ছোট ছোট খোশ। হুঁজনে পাশাপাশি দুই খোশে ঢুকলুম। এমনি আরো অনেক জোড়া পাশাপাশি খোশে ঢুকলো—চালা গলায় গুজরগ গুরু হল।

হুঁ মিনিট না যেতেই পাহারা হাঁক দিলে, জলদি করো। তাজাতাড়ি দুই চারটে কথা বলে এবং জেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সে সোড়তেই যার এড়িয়েছে—বলুক-শিশুদের কথা চেনে গিয়ে আর কতগুলো কথা বলেছে—তার মধ্যে পাড়ার কথা গুব কম। সে তখন সবমোটা বি-এ পাশ করেছে—কলেজ, হার্ভিঞ্জ ও হিন্দু হোষ্টেল, সতীশ চক্রবর্তী, এবং হাকুরের বাড়ীর কেরারীদের কথাই প্রধান। একজনের কথা বললো, সে থাকিছু জানতো সবই বলে দিয়েছে। করালীকে কীড ট্রীটে থাকতে হয়নি।

সন্ধ্যার সময় সেলের গরাদের কীক দিয়ে রাজের থানা দিয়ে

গেল,—কি, তা মনে নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে গেছে, ঘুম আসছে না; এমনি ছটকট করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লুম। আবার কীটা ঘুম ভেঙ্গে তোবে উঠে পায়খানা বাওয়ার পালা। এমনি করে দেখা হল প্রায় সকলের সঙ্গে,—কিছু কথা বলার সুযোগ হল না। ওরা একটু একটু তফাতের সেলে ছিল, ওদের পায়খানা বাওয়ার অঙ্গ সঙ্গী ছিল।

হুঁ—একদিন পরে একদিন দুপুরে বারান্দার চৌচামেটি শুনে গরাদের কীক দিয়ে নাক বাড়িয়ে আড়চোখে দেখি,—হাকুর সেলের বাইরে বারান্দায় এসে এক পাহারাদারের গড়গড়ার মুখ লাগিয়ে কাজলামি করে টান দিয়েছে, আর সে চৌচামে, তার গড়গড়া নষ্ট হয়ে গেছে বলে। হাকুর দাঁত বার করে তাকে বোকাবার চেষ্টা করছে।

রোজ দশটার সময় সাঙ্গোপাঙ্গ বেষ্টিত এক সাহেব আসেন, এবং প্রত্যেক সেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে বান,—“You are remanded till tomorrow.” তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট—“till tomorrow” সাহেব। অর্থাৎ রোজ আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তবে পূর্বত মহম্মদের কাছে যায় না, মহম্মদই পূর্বতের কাছে আসেন।

আমার সেলের এক পাশে থাকতেন হরিশ দাশগুপ্ত, আমাদেরই আর এক সেটারের লোক। তখন তিনি থাকতেন নবকৃষ্ণ ট্রীটে, পরে তিনি হাতীবাগানে হীরেন দত্তদের দফন বাড়ীতে শোটিং গুডলের দোকান করেছিলেন—এখন দোকান বেশ বড় হয়েছে।

তাঁর এক সহকর্মী ললিত বসাকও ছিলেন, এবং আর একজন ছিলেন এক বলাই রায় (কর্মকার) বিনি নাকি যা কিছু জানতেন, সবই বলেছিলেন। তাঁদের জুরেলারীর দোকান ছিল, এখন দোকানও বড়, এবং বেশ বড় লোক তিনি।

কয়েক দিন পরে একদিন পঞ্চাননের সঙ্গে পায়খানায় মেলবার এক সুযোগ ঘটে গেল। তিনিও বললেন আমাদের ‘একজনের’ কথা—বা জানতো, সবই বলে দিয়েছে। গয়না গলানোর কথাটা সে জানতো না, তাই পুলিশ জানতে পারেনি। পঞ্চাননকে যখন কীড ট্রীটে নিয়ে যায়,—তখনই দেখে আশ্চর্য হন যে, আমাদের ঐ ‘একজন’ ‘freely’ ঘরের মধ্যে বোঝাকেরা করছে, অকিসার তাকে সিগারেট দিচ্ছে, সে সিগারেট খাচ্ছে।

সে পঞ্চাননকে বললে, সবই পুলিশ জানতে পেরেছে, সুতরাং শুধু শুধু মার না খেয়ে, যা জান সব বলে দাও। সেই পঞ্চাননের জখম হাতটার দাগ দেখিয়ে দিলে, এবং সেই হাতটাকে পুলিশ ফল দিয়ে পিটিলে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চানন কিছু চেপে, কিছু বলে যেহাঁ গেলো।

শুধু তাই নয়,—পঞ্চানন বললেন, আমার সামনে অকিসাররা সতীশ চক্রবর্তীর সন্ধান কোথায় বেজে হবে তার পরামর্শ করলে, এবং আমাদের ঐ ‘একজনকে’ সৌক-নাড়ীর পরচুলো পরিবে মোটের নিয়ে বাওয়ার ব্যবস্থা করলে। তারপর তাকে নির বাওয়ার পর পঞ্চাননের অকিসার বললে, এই সব ছেলে নিয়ে বিদ্র: করবে? হুঁ:।

বাই হোক, পঞ্চাননকেও কীড ট্রীটে রাখেনি। হরিশ দাশগুপ্তকে যখন কীড ট্রীটে ঠেলাচ্ছে, তিনি চপ করে মার

জেনে দেখে এক কঁাকে পাহারার কন্ট্রোল তাঁকে বলে দিলে,—
‘রাতা নেই কাহে? চিল্লায়কে বোও, কমতি মারেগা।’ তারপর
তিনি চোঁতে গুচ্চ করলেন, এবং তাঁর মনে হল, সত্যিই কিছু ফুল
পলেন। পক্ষান বধন ফুল কতদের আহিরিটোলার বাড়ীতে
হলেন, তখন হরিণ বাবু এবং ললিত বাবু অনেকদিন তাঁর হাত
dress’ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর সঙ্গে আমার একটু
বান্ধবতা বোধ জন্মেছিল। সে সম্ভাব্য আশুও আছে।

গোয়েন্দা অফিসারদের কাজটার প্রকৃতি একই, কিন্তু একজন
ন-পরিচিত বয়স্ক ভরলোককে প্রথম সাক্ষাতেই মার এবং নোংরাভাবার
পাল দেওয়ার মতন ‘এলেম’ সকলের থাকে না। তার জন্তে
গাছাবাছা মাফীমারা ছোটলোক অফিসার থাকে। উদ্ভট অকথ্য
মজাচাষের ব্যবস্থাও তাদের স্বাধীন মস্তিষ্কের আবিষ্কার। এদের
যে আবার ‘পাল্লির শিবোমশি’ বলে কারো কারো খ্যাতি আছে।
তাদের হাতে বার পড়ে, সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ হয় তাদের। এরা
কিন্তু চাকরীর সবচেয়ে ওপরের শাপে উঠতে পারে না। তার
জন্তে অস্ত্রপ্রকার ‘এলেম’ দরকার।

যাই হোক,—১০ দিন ডালাগা হাউসে till tomorrow
থেকে, এক দিন বিকেলে এক কালো গাড়ী-বোকাই হয়ে
হুকুম প্রেসিডেন্সি জেলে কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রী বা ৪৪ cell এ।
সে হচ্ছে নির্জন কারাবাস।

জেলের ফটকে চুকে একটা খাতার নাম-নাম লেখা হল,
তারপরে আর একটা ফটক খুলে জেলের মধ্যে নিয়ে খানিক
দূরে ৪৪ ডিগ্রীর ফটকে হুকুম। সেখানে একজন ইউরোপীয়ান
ওয়ার্ডারের টেবিলে আবার নাম-নাম লিখিয়ে নিয়ে চললো।
গুড়া একটা রান্ডার বা দিকে বরাবর দেওয়াল, আর ডানদিকে
পর পর ৪৪টা সেলের সারি। মাঝে আর একটা গেট ও
দেওয়াল দিয়ে সেলের সারিটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, এবং সে
গেটেও এক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পাহারা আছে।

আমরা বস এগোচ্ছি, আমাদের আগে আগে একজন করোদী
মেট ডানদিকের সেলের কপাটগুলো বন্ধ করতে করতে চলেছে, এবং
আমরা পার হয়ে গেলে আবার কপাটগুলো খুলে দিচ্ছে আর একজন।
অর্থাৎ বন্দীরা যাতে কারো খুশ দেখতে না পার তার নিখুঁত ব্যবস্থা।
যে কপাটগুলো বন্ধ করা এবং খোলা হচ্ছে, সেগুলোই সেলের কপাট
নয়। সেলের গরাদে দেওয়া দরজার তালো বন্দী আছেন বন্দীরা—
তার বাইরে আর একটা সেলের মতন ছাত্রহীন জায়গা আছে, তার
নাম অ্যান্টিসেল,—সোহার কপাটগুলো সেই অ্যান্টিসেলের।

বন্দীরা দিনরাত সেলের মধ্যে তালোবন্ধ থাকেন—সকালে খুশ
খোঁড়া বা স্নান করার জন্তে একবার পনেরো মিনিট, আর বিকালে
‘Exercise’ এর (বেড়ানোর) জন্তে আর একবার পনেরো মিনিট
বন্দীকে সেই অ্যান্টিসেলে বার করা হয়। কিন্তু এক সেল বাদ দিয়ে
এক সেল, এই ভাবে দুবার তাঁদের বেহাতে দেওয়া হয়, যাতে
পাশাপাশি সেলের বন্দীরা কথোবর্তার সুযোগ না পায়। আবার
সোহার কপাটগুলোর মাঝে একটা ঢাকনা দেওয়া কুটো আছে, যাতে
গায়ে থেকে ওয়ার্ডাররা ঢাকনা সরিয়ে কুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখতে
পারে বন্দী কি করছে।

সেলগুলো এতটা চওড়া, যাতে দুখানা খাট পাশাপাশি রাখা

যায়; আর তার পিছনে আর একখানা খাট আড়াআড়ি রাখা যায়,
এতটা লম্বা। তিনখানা খাটের মত জায়গার একখানা খাট চটের
তোষক কখন বালিসমস দরজার মাক পর্যন্ত দখল করে আছে,—পাল
আর একটা খাটের মতন জায়গা আছে নড়াচড়ার মতন,—এক
সেখানে আছে একটা জলের কুঁজো একটা এনামেলের থালা ও মগ,—
এক পিছন দিকে আর একখানা খাটের মতন জায়গার আছে
চুটো আলকাতরা মাখানো চুপিড়ি,—মলমূত্র ও শৌচক্রিয়ার জন্তে।
গরাদের বাইরে আছে এক বালতি জল। পিছনের দেওয়ালের
উপর দিকে, একটা ফুলগুলি জানালা।

ব্যবস্থা দেখে অঙ্গ জল হয়ে গেল। তখনও জানি না,
কতদিন এখানে এভাবে রাখবে। আমার আসার আগে
যারা এসেছেন, তাদের অনেককে এভাবে এখানে অনেক দিন
রেখেছে, এক তাঁরা কেউ পাগল হয়ে গেছেন, কেউ আত্মহত্যা
করেছেন, সকলেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। তার ফলে কিছু
কিছু সুব্যবস্থা হয়েছে, আমি এসেছি সেই সুব্যবস্থার আমলে।

ডালাগা থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিল। কাজেই শুধু
পড়লুম। মনে হতে লাগলো, ইহলোক সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে
বাঁওবার পর যে সব ভরলোক পরলোকে (অবগত মরকে)
যান, তাঁদের সেখানে ঠিক এমনি ব্যবস্থা। অতঃপর একমাত্র
সঙ্গী অপরীচী চিন্তা—অস্পষ্ট, এলোপাতাড়ি, দম-আটকানো।
ক্রমে অবসর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাতটা কখন কেটে গেল, জানতে পারলুম না—ভোরের আগেই
পালের cell এর দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেথর
এল করোদী মেটের সঙ্গে—চাকরী খালি দেখে বখোচিত পরামর্শ
দিয়ে গেল। পরামর্শ গ্রহণ করে রাখলুম। বেলা ১টার ও বিকালে
আর দুবার এল।

সভালে অ্যান্টি সেলে বার করে গিলে। খুশ বুয়ে একটু
পায়চারী করে নিলুম। চার কয়ম হাঁটলেই দেওয়ালে মাক হুঁকে
যায়, কাজেই সে প্রায় ঘূর্ণপাক খাওয়াই হল। ১৫ মিনিটেই
আবার তালাবন্দী।

তারপর এল চা। ভোরের ডালায় মতন একটা টিনের ঠেঁটে
আত্মখান পাউকটীতে মাখন লাগানো সাজানো, আর প্রকাণ্ড এক
বালতি চা। এক শিস মাখন কটী এবং প্রায় এক মগ চা গরাদে
গলিয়ে দিয়ে গেল। খেয়ে পেট ভরে গেল। বুঝলুম Defence
of India Act এ পড়েছি, এবং ভরলোক হয়েছি।

তারপর এক আওরাজ্জ এল “সরকার সেলাম”। এক করোদী
মেট এনে বুকিয়ে দিয়ে গেল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসছেন, তিনি এলে
হাতের চোঁটা চুটো বৃকর তুপাশে বেধে তাঁর সামনে পাঁড়তে
হবে। মনে হল, ডাকাতদের “hauds up” order, পাছে কেউ
গুলিটুলি করে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রূপ দেখে এবং দেখিয়ে চলে
গেলেন।

ঘরটার নম্বর মনে নেই, ২৩২৪ হতে পারে। ঘরের টালি
খোদাই করে লেখা আছে Prithi Sing Transportation
for life Lahore Conspiracy case—1915. কখন যেন
একটু ভাল লাগলো। যেন একটু সাহস জাগে।

আপনারা হুচকি হাসি হাসবেন না। ঘটনাক্রমে একটু

জিজ্ঞাস্যে ঘুরলে আজকের ৪৪ ডিগ্রীর প্রত্যেকেরই ঐ অবস্থা হতে পারতো। পানের লোকানের পাশে দড়ির আঙন কোলে—যে না সে বিড়ি-সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চলে যায়—দোকানদার কিছু বলে না, কারও সে জানে, যে ধূমপায়ীরা তার লোকানের কাছ দিয়ে মাঝে মাঝেও হাঁটে, তারা সবাইই তার potential খুঁজে—কোনো দিন কিছু না কিছু কিনতে পারবেই। বোমা তৈরির পৰামর্শমাত্র করেও তো আশ্বাসদান-কবরের সাটিকিট পাওয়া যায়, এবং শুধু তারই জোরে নেতা হওয়া যায়। বাক—

দুপুরের খানা এল—যে ঠাঁয়ের ডালার পাউরুটি এসেছিল, সেই ঠাঁইভরা ভাত, আর বালতি বালতি ডাল, ঘাঁটা, মাছের কোল আর ডিমসিদ্ধ। ঘেন লাটসাহেবের মেঘের বিয়ে!

গরাদের কীক দিয়ে গলিয়ে গলিয়ে আমার এনামেলের থালা আর মগ ভরে বা দিয়ে গেল, মনে হল ছুঁবেলার খোরাক। কিন্তু সব খেয়ে কেলুম। অনেক দিনের ক্ষিদে!

বাইরের বালতির স্রল দিয়ে গরাদের কীকে হাত গলিয়ে থালা মগ ধুয়ে রেখে শুয়ে পড়লুম। বস্তুতাত্ত্বিক পোড়া-পেট প্রচুর বস্ত্র সংগ্রহ করে ঠাণ্ডা হল, এবং ঘুম আসতেও লজ্জা হল না।

বেশ শানিক হুমিয়ে উঠে গেটের অবস্থা দেখে চিন্তা হল—হজম তো করা চাই! খুব কতকগুলো ডন-বৈঠক দিয়ে হাঁপিয়ে আবার শুলুম। তার পর বিকেলে ১৫ মিনিট অ্যান্টিসেল ঘুরপাক খাওয়া হল। তার পর সন্ধ্যার আগে আমার রায়ে খাওয়ার পালা।

বড় বড় লাল লাল মোটা মোটা পোড়া দাগওয়ালা রুটি—দুখানা নিলুম। ডালটা ভাল—আমগ নিলুম, আর তার সঙ্গে এক হাতা মাংস। চোখাটা দেখে ভক্তি হচ্ছিল না, কিন্তু খেতে ভাগ্যই লাগলো।

চরিত্র ঘটীর এই প্রোগ্রাম দিনের পর দিন চলতে লাগলো। এসোমেলো চিন্তার হাত থেকে তেহাই পাঁচটার জন্তে বখন-তখন ডন-বৈঠক করি। দিনের পর দিন ঐ একই মুখগুলো কলের পুতুলের মতন আসে যায়, আর একটাও মুখ দেখার উপায় নেই—আমিও যেন কলের পুতুল বনে গেছি।

ইতিমধ্যে এক দিন এক মেটর হাতে একগাধা বই সমেত ওয়ার্ডার এসে বললে—ইচ্ছা হলে এর থেকে একখানা বই নিতে পার—পড়বার জন্তে—হুগার একখানা করে বই জেল-লাইব্রেরী থেকে দেওয়া হয়।

বই দেখলুম মহান টাইপের—অমির নিমাই চরিত্র, অমিত্যভ, ডাক্তার চুণীলাল বসুর খাত—এই তৃতীয় বইটাই নিলুম। ছোট বই, এক নিঃশ্বাসে পড়া হয়ে গেল। সাত দিন ধরে সেইটেরই চরিত্র-চরিত্র কললুম—প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেল। গাও সন্ধ্যা জন্ত চমৎকার বাংলা বই কিন্তু আর হয় না। খাত সবকিছু পরিপাক প্রশালী সন্ধ্যা আমার অত্যাধি ঐ বিজ্ঞানেই চলে যাচ্ছে। ৪৫ ডিগ্রীর নীট লাভ?

এক দিন ওয়ার্ডার এক কয়েদী সঙ্গে করে এসেছে, কয়েদীর হাতে এক মোটা চুল-ছাঁটা স্লিপ। ইচ্ছে করলে চুল ছাঁটতে পারি কিন্তু মাথা ও দাড়ি ঐ স্লিপ দিয়ে হুড়িয়ে দেবে আগাগোড়া আর কিছু নয়। আমি বললুম, দরকার নেই। চলে গেল। চুল-দাড়ি বড় হতে লাগলো। ঠেসে বাই, আর

বখন-তখন ডন-বৈঠক করি—ওজনও বাড়তে লাগলো। কত দিন এভাবে থাকতে হবে জানা নেই বলে,—বখন এই প্রহটা মনে হয়, তখনই মনটা অস্থির হয়ে ওঠে—আর আবার কমে ডন-বৈঠক করে হাঁপিয়ে চিন্তাটাকে ভাঙাই।

দেওয়ালের গায়ে একটা মলা রক্ত খেয়ে গোল হয়ে বসে আছে—তাকে ধরতে চেষ্টা করি,—সে উড়ে যায়, কিন্তু একটু দূর গিয়ে আবার বসে—একটু গুরুভোজন হয়েছে—আমারি মতন। ডন-বৈঠক দিতে পারে না। একবার ধরে ফেলি। সব্বের মতন এক ডোলা জমাত রক্ত আমার আঙুলে আটকে যায়,—আর মশাটা উড়ে পালিয়ে যায়। বাগাছুর!

অমির নিমাই চরিত্র আর অমিত্যভ পড়া হয়েছে—দু বার পড়তে ইচ্ছে করে না, তবু ৭ দিন ধরে চোখ বুলাই। চট্টের গদিতে গৌজা একটা বড় আলপিনি আবিষ্কার কললুম—দেওয়ালে আঁড় কেটে নামটা লিখলুম। আলপিনটা বধাস্থানে বেধে নিলুম। সময় কাটে না ডন-বৈঠকই চলে।

হঠাৎ একদিন গেটে ডাক পড়লো—বার-তারিখ ডাল গিয়েছিলুম—Interment order শেলুম—দেখলুম ৪৪ ডিগ্রীতে ১ মাস হয়ে গেছে।

"Whereas in the opinion of the Government you... have acted, is acting or is about to act in a manner prejudicial to public safty, the Government is pleased to direct that you shall proceed directly to Krishnagar, Dist. Nadia, and report yourself to the S. P., etc. etc.—হুকুম জমাত করলে জেল হবে।

এই বাঁধা গতের মধ্যে পুলিশ সাহেবের নির্দেশমত স্থানে থাকা এবং নানা বিধি-নিষেধের সর্বের কিরিস্তি। order-এর সঙ্গে রাঙা-খবচ দিয়ে শ্রেণি ছেড়ে ছিলে। পুলিশ সাহেবের কাছে হাজির হওয়ার সময় নির্দেশ করা হয়েছে ঐশের টাইম 'দেখে,—এবং ছাড়া হচ্ছে সে টাইমের ঘটী ছুই আগে। লভবত শিখনে চর থাকবে, পথে কারো সঙ্গে দেখা করি কি 'না, তা দেখবার জন্তে। স্তবরাং আলিপুর থেকে হেটেই শিয়ালদার বাবো স্থির করে রওনা দিলুম।

সারা পথ লক্ষ্য রাখলুম। ধনতলা হীটে ভালতলার মোড় পার হয়েও মনে হল না শিখনে কেউ আসছে। স্তবরাং Henghton-এর কামেরার কারখানার চুকে পড়ে টালার অতুল দাসের সঙ্গে দেখা করে বরটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। শরীর একটা ভাল হয়েছিল যে, অতুল বাবু দেখে রীতিমতন বিমিত হয়েছিলেন।

কুমসরগে বখন পৌঁছলুম, তখন অনেক রাত। ঠেলন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে যেতে যেতে এক বাঙ্গালী হাওলাদারকে দেখে পুলিশ সাহেবের খোঁজ নিলুম। আমার প্রয়োজনের কথা শুনে তিনি বললেন, এক রাত্রে বাওয়ার প্রয়োজন নেই,—আজ কোতোয়ালী থানার ওয়ে থেকে কাল সকালে সাহেবের কাছে পৌঁছেই হবে।

কোতোয়ালী থানার বড় দারোগা একটা ইঞ্জিনের দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওকেই রাতটা কাটিয়ে দিন। তাই হল—পথে কিছু খাবার খেয়ে নিয়েছিলুম, রাতটা কেটে গেল।

সকালে পুলিশ সাহেবের কাছে গেলুম,—তিনি I B officer-এর হাতে আমাকে সঁপে দিলেন—বিকালে আমাকে নিয়ে তিনি রওনা হবেন শান্তিপুরে।

বিকালে প্রচণ্ড বড় ঊরুলা,—সব চেয়ে বড় আধিনে বড়, যাতে পদ্মায় অসংখ্য নৌকা ডুবেছিল,—একখানা লককে উড়িয়ে নিয়ে একটা চরের মাঝখানে কাৎ করে কেলেছিল। বেশে কলাগাছ প্রায় নিখুঁল হয়েছিল,—অসংখ্য বড় বড় গাছ পড়ে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে পথঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেই বড়ের রাতে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন পকানন—তিনি হাচ্ছেন রাণাঘাটে। ঘটনাটকে দুজনে খানায় একরাত সারারাত গল্প করে কাটানো হল। পরের দিনটা গেল গাছ কেটে রাস্তা সাক্ষরতে। পকানন বড় লাইনে রাণাঘাটে চলে গেলেন। আমাকে ছোট লাইনে যেতে হবে, স্মৃতিরা আর এক দিন থাকতে হল। আই বির লোক হোটেল থেকে ভাত খাইয়ে আনলো।

দ্বিদি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিলেন গোড়া থেকেই এবং শেষ পর্যন্ত কর্তারা দেখা করার অমুমতিও দিয়ারছিলেন, কিন্তু সে একটা বসিকতা—দেখা করার তারিখ ছিল আমাকে জেল থেকে বার করে দেওয়ার পরের দিন। অর্থাৎ দ্বিদি বখন একরাত সেটাল জেল, আর একরাত প্রেসিডেন্সি জেলের কটকে ঘুরে পাক্সা পাচ্ছেন না, তখনই চলছে ঐ বড়, মাংস ও গর গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ছে। ভাগ্যক্রমেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা করে জল-বড় ভিক্সে নাস্তানাবু হইয়ে আমার দেখা না পেয়ে বাড়ী ফিরেছেন।

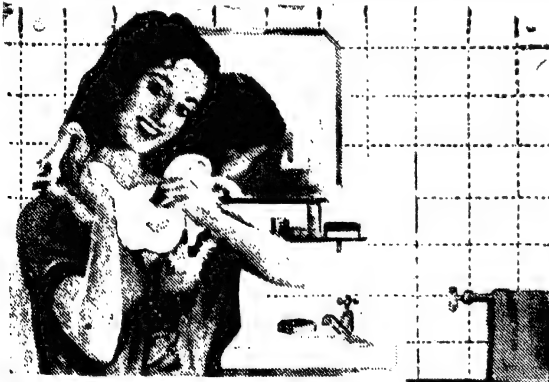
প্রথমে গোয়েন্দারা দ্বিদির পিছনে লেগেছিল, আপনি সব জানেন, সবাই বলেছে, অল্প বলছে, "হাব বলেছে", (দ্বিদির ভাষা) তখন বৃন্দলুম, আঁটকুড়ীর ব্যাটারা ঘোঁকা দিচ্ছে।

হাট-হোক, তারপর থেকে দ্বিদি তাদের পেছনে লাগলেন, ওকে আবার হাতে ছেড়ে দাও, আমি কারো সাথে মিশতে দেব না, ও আমার কথার অব্যাহা হবে না, ইত্যাদি। সে কথার আমল না দিয়ে ওরা দ্বিদির কাছে জেনে নিয়েছিল, শান্তিপুরে ছোট ভগ্নীপতির বাড়ীর কথা এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধোবন্ধ করেছিল আমাকে সেখানে রাখার।

ভগ্নীপতি বোগানন্দ গোস্বামী (উড়ে গোসাই পাড়ার আন্তি গোসাই) সপরিবারে কলকাতায় চলে আসার বন্ধোবন্ধ করছিলেন, আমি বাওয়ার পর তাঁরা চলে এলেন, তুমি তাঁর বৃদ্ধা মা থেকে গেলেন।

মস্ত চৌহদ্দির মধ্যে মস্ত প্রাচীন ভাস্ক্যচোরা বাড়ী, প্রচুর কল-ফুলের গাছ, ভাস্ক্য পাঁচিল, ইটের গালা, এবং বড় বড় পাঁড়ল ও গোধরো সাপের আড্ডা।

শান্তিপুরে শুভু গুঁরাই রাঢ়ী শ্রেণীর গোস্বামী, আর সব গোস্বামী বারেন্দ্র শ্রেণীর। ওদের পূর্বপুরুষ ঐতিহ্যবাহিনের সঙ্গে পুরীতে গিয়েছিলেন, গুঁরা এখনো পুরীতে গেলেন জগন্নাথের পাণ্ডুরা এলে কুমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে, পায়ে ধুলো নেয়, প্রসাদ এবং ভোগ দিয়ে যায়। ভগ্নীপতির সঙ্গে পরে আমি পুরী গিয়ে স্বচক্ষে দেখছি।



জীবাণুনাশক নিমতল থেকে ভৈরী, স্থগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে ত্বকের সর্বকম মালিশ দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্ত বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিকার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

পরিবারের
সকলের পক্ষেই
ভালো



মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২১

SMC-15 BEN

তাই তাঁদের নাম উড়ে গৌসাই। এমনি নাম দেওয়া শান্তিপুরের একটা বেণোজ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদের বলে, বোধ হয়, “চাকফেরা” গৌসাই। আর এক গৌসাইদের নাম “আতাবুনে।” এমনি আরো নাম আছে। এক রায়েদের নাম আছে “পাঁটা রায়”!

বাগী প্রোক্সের গ্রামস্থলের গোস্বামী আমার ভগ্নীপতির জ্যাকি-ভাই, পাশেই বাড়ী। আমি যখন গেছি তখন তিনি হবিবিয়া খান, ইট মাথার দিগে কবলে শরন করেন, বাড়ীর বাইরের প্রকাণ্ড বৈঠকখানার দর-দালালে থাকেন।

ইন্ডিয়ান আর্টের একটা ছবি ছিল দেখেছেন? “গন্ধে উদাস হাওয়ার মত ওড়ে তোমার উত্তরী, কর্ণে তোমার কুকচূড়ার মঞ্জরী?” তখন গ্রামস্থলের গোস্বামীরা চেহারা ছিল তেমনি কিনি কিনি কাইন।

সকালে সহরের এক প্রান্তে থানার রোজ একবার হাজিরা দেওয়ার আদেশ পালন করতুম, আর গ্রামস্থলের গোস্বামীরা দুই ছোট ভাই সৌর আর নিকটাই এবং আমার ভগ্নীপতির খুড়তুতো ভাই কটকের সঙ্গে গোপনে exercise করতুম। আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিল সৌর আর কটক, নিতাই আরো ছোট।

ওদেরই একমালি মদনমোহনের মন্দিরের পুরোহিত রাধানাথের সঙ্গে নাটমন্দিরে নশ-পতিশের আড্ডারও বোগ দিতুম। দিনটা কেটে যেতো। রাত্রে হত অশান্তি—বাড়ীর বাইরে বাওয়ার আদেশও ছিল না, সে কথাও ওঠে না—ঘরের বার হতেও ভয় করতো।

মল্লার গিরিনদার আত্মীয় খগেন ও রাজেন বানার্জি, দুই ভাই, অন্তরীণ হয়েছিলেন ফুলিয়ার কাছে তাদের পরিত্যক্ত শৈথ্রিক বাড়ীতে। তাঁরা থানার হাজিরা দিতেন সপ্তাহে একবার কি দুইবার—মাঝে মাঝে দেখা হত, নিষেধ সত্ত্বেও আলাপও হয়েছিল। খগেন হুজির পর সেক্রেটারী টিকেনসনকে ঘরে রেসে, বোধ হয় দুজনে, Labour Inspector এবং চাকরী পেয়েছিলেন। এখন তিনি একজন বড় অফিসার, হরত বিটায়ার করেছেন।

শান্তিপুর মতিগঞ্জের কানাইদাস ছোটভাই বলাইলা—সজীব বানার্জি বোধ হয়—ছেলেবেলার বাড়ী থেকে পালিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ শিখে ১৫ সালে দেশে ফিরছিলেন বিনা পাসপোর্টে, এবং ঘরা পড়ে Ingress into India Act এর বন্দী হয়ে কিছুদিন জেলে থেকে বাড়ীতে অন্তরীণ হয়ে এসেছিলেন। চমৎকার সৌরবর্ণ জোয়ান, প্যাণ্টের ওপর বুট চড়িয়ে বাড়ী থেকে

যেখানে এক কোঁড়ে থানার হাজিরা দিয়ে আবার এক কোঁড়ে যিয়ে আসতেন—দশবার জন্মে পথে লোক পাড়িয়ে যেতো। এখন তিনি সনাতন ছাঁ-পোরা বাঙালী।

হিন্দু হোটেলের রাম ভট্টাচার্য শান্তিপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত লালমোহন বিভাণিধির পুত্র। তাঁর দানার সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলুম—পরে রামবাবু হোম-ইন্টার্ন হয়ে আসার পর দেখা হল। গোপনে একদিন তাঁর বাড়ী নিঃস্রপ খেলুম।

আলিপুর বোমার মামলার নিরপাদ রায়ের বাড়ী বাগ-আঁড়া ঘায়ে। তিনি আশ্চর্য্যমানে কয়েক বছর দণ্ডভোগ করে ফিরে এসে শ্রেণি বা মোজার কল নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গোপনে একদিন তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল।

দিদি ইতিমধ্যে একদিন ভাগ্নীজামাইকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমানে কাছ থেকে ছুঁম নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা বলা ও শোনা হল। দিদি দেখা করে বাঙার পর লেখালেখি শুরু করলুম বাড়ী বদলের জন্মে—না না! অল্পবিধার দোহাই দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীতলাপাড়ার কাছে পাঁটা রায়ের বাড়ীর পাশে শিব বানার্জিদের বাড়ীর একাংশ ভাড়া করা হল। সেখানে চলে গেলুম। সেখানেও বাড়ীর অল্প অংশে শিববাবুর মা দাংগা ইলপেট্টেরকে বলে করে থেকে গেলেন। শিববাবু তখন বিশেষ চাকরী করেন।

ক্রমে খগেন রাজেনও লেখালেখি করে শান্তিপুরে এলেন—তাঁদের জন্মে ভাড়া করা হল রথতলার এক বড় দোতলা, যেখানে আগে বোধ হয় কনসার্টের ক্লাব ছিল। সে বাড়ীর পিছন দিকে একটু জায়গা ছিল। ক্রমে সেখানে ডেল দিগদিগা খেলা শুরু হল গোপনে। কুবীর ডাক্তার ও হাবু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কুবীর ডাক্তারের ছোটভাই রাহু, পোষ্টমাস্টারের ছেলে (ছাত্র বে-আইনী) এরা ছিল ডেল দিগদিগার দলে।

ভগ্নীপতির বাড়ীর পাশে রজনী মল্লিকের নাতি প্রভাস মল্লিক (ডাক নাম পিলু) তখন কাঠ ক্লাশের ছাত্র। তাকে হারমোনিয়ামে আঙুল টিপে টিপে “শক্তিমন্ত্রে লীক্ষিত মোহা” গানটা শিখিয়ে শেষ পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলেছিলুম। তারপরের বিকৃত হল ভার বহু সাবলা বানার্জি—গ্রামবাজারের (শান্তিপুরের) দিকে বাড়ী। সে তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

[ক্রমশঃ।

বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টি-শ্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙালী একটা বিশিষ্ট রূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার বাঙালী সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙালী সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

ঐশ্বর্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাঞ্জলি লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

খৃষ্টানুসরণ

‘খৃষ্টানুসরণ জাতৃসংঘ’ নামে স্যারুয়েল ঠোঁক্স এক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি লাহোরের বিশপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন ও অন্ত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের উপদেশ নিয়েছিলেন।

প্রথম প্রত্ন বিশ্বকোষে বীণাখণ্ড এই মর্ভূমিতে বেতাবে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, ঠিক সেই জীবনকে নিত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার অর্থ গ্রহণ করেছিলেন এই সংঘের জাতৃসংঘ। খৃষ্টানুসরণ জীবন বাপনের আনন্দে সর্বত্র ভ্যাগের সংকল্প ছিল জাতৃসংঘের প্রধান সংকল্প। নিজের বলতে কিছুই করো থাকবে না। বীণ সব চেয়ে ভালোবাসতেন দরিদ্রদের,—দরিদ্রের সেবাই ছিল এই সংঘের প্রধান আকর্ষণ ও কর্তব্য। সাধু ফ্রান্সিসের প্রথম ভক্তগণের মতো এই সংঘের সভ্যরাও দরিদ্রের জাতা হয়ে নিজেরের দত্ত মনে করেছিলেন।

এই নূতন জাতৃসংঘের আরম্ভে স্যারুয়েল ঠোঁক্স আর ব্রাদার ওয়েটার্স এই দুজন পূর্ণদস্তা হলেন। ওয়েটার্স ছিলেন কেবল মিশনের একজন তরুণ সভ্য,—ঠোঁক্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বহুদিন থেকে দারিদ্রের ব্রত-বন্ধনে বেছাড় নিয়েছিলেন। সাধু স্কটের সিং ও উইলিয়াম ব্র্যাক এই সংঘের সদস্য না হলেও একই বিস্তার ও সেবার আদর্শে এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

এই জাতৃসংঘে বোগ দেবার ক্ষেত্রে আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু উপস্থাপি মালেরিয়ার ভুগে ভুগে আমার দেহের তখন এমনই দুর্বল। যে, মনের হতাশাকে মনে চেপে রাখা হাড়া গভীর হয়ে নেই। বীণাখণ্ডের নামে বিশ্বাস ও আশ্বিনবেরনের এই কর্তব্য পথে বাঁরা পা বাড়ালেন, এই তরুণ বীরদের প্রতি আমার অন্তরের সমস্ত ভক্তকামনা ধাবিত হলো। বিশপ লিঙ্কনের দার্শনিক উৎসাহ ও আশীর্বাদও তাঁরা লাভ করলেন। এই জাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠার তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন,—পাঞ্জাবের প্রতীষ্ঠার মধ্যে এমন একটি সংঘের উদ্ভাবন তাঁর আমলের খেঁচি ঘটনা বলে তিনি মনে করেছিলেন। লাহোর সিঙ্গার এক বিশেষ উপাসনা-অনুষ্ঠান তিনি জাতৃসংঘকে অতীত আশীর্বাদ করলেন, খৃষ্টানুসরণের বন্ধু পথচারীর গুণের হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

উত্তর-পাঞ্জাবের পাহাড়ীদের সারা অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন ঠোঁক্স, তাদেরই সেবার তিনি উৎসর্গ করলেন নিজেকে। কিন্তু কয়েক বৎসর বেতে না বেতেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁকে লোকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না, তাঁর সেবারতের ভুল অর্থ করেছে তারা। তাই ভাবছে নিজের ব্যক্তিগত পারমাণবিক উন্নতিই তাঁর লক্ষ্য। এই ভুল-বোঝাবুঝি ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, সেবারতী ঠোঁক্স নিত্য অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন, দিনে দিনে নিরর্থক হয়ে উঠে তাঁর-প্রয়াস।

তাঁর সমস্ত সাধারণের বা ধারণা তা গোপন করতে না তাঁর পাহাড়ী বন্ধুরা। তারা বলত,—তুমি তো মিস্ত্রীজন সসারবন্দীর সাধু—তোমার পক্ষে পুণ্যসকল আর শক্ত কী? তোমার হুজির পথে বাগা কোথায়? কিন্তু আমরা গরীব সসারী লোক, এসোভেন আর পাণ নিয়েই আমাদের ঘর। সসার প্রতিপালনের জন্তে কটির জোগাড় করতেই আমাদের দিন বার, ঘরের কথা ভাববার সময় কোথা আমাদের? তোমার মোক তো হাড়ের হুঁচক, কিন্তু জম-জমাতের ঘরে এই পাণ পৃথিবীর পক্ষে আমাদের ঘুরতে হবে।

দিনে দিনে ঠোঁক্স উপলব্ধি করতে লাগলেন যে তারতের গৃহসংসারহীন পথচারী সাধারণ সাধুদের এরা যে চোখে দেখে, সেই চোখে তাঁকেও এরা দেখছে। এই সব সাধুরা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ায়,—নিত্যন্ত কর্তব্যবিমূঢ় আলেস্তে। যদি বা কেউ ধ্যান তপস্তা করে, তা শুধু নিজেরই আত্মার উন্নতির উদ্দেশ্যে। কিন্তু দ্বাৰ্শন্য আদর্শোদয় তাঁর লক্ষ্য নয়, বৃহৎ সসারের সেবার মানসেই তিনি সসার-নিগড়ে বাঁধা পড়েননি। অসামাজিক তিনি, কিন্তু সমাজ কল্যাণেই তাঁর খৃষ্টানুসরণ আশ্রয়,—এ কথা তিনি বুঝবেন কেমন করে? ব্যক্তিগত হুজির সাধনের জন্ত তাঁর কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই,—কিন্তু তাঁর নিঃসংশয় সন্ন্যাসী-জীবন দেখে বিপরীত ধারণাই করছে লোকে।

ঠোঁক্সের জীবনে এ এক নিদারুণ সমস্যা। দিন রাত্রি এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, বীণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এই সমস্যার সমাধান। এই প্রার্থন একটিমাত্র উত্তরই তাঁর মনে প্রতিভাত হোলো। উত্তর-তারতের পার্বত্য অধিবাসীদের সেবার জীবনোৎসর্গের সংকল্প তাঁর,—তিনি স্থির বুঝলেন এই অধিবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে এদেরই হতো তাঁকে সামাজিক জীবনের দাবি গ্রহণ করতে হবে। এই পাহাড়ীদের মধ্যে তিনি

বাস করবেন এদের সমাজেই তিনি বিবাহ করবেন,—তবেই না স্মৃতি ঘুঞ্জে এদের একান্ত হবেন তিনি।

টোক্স যদি এই পথ গ্রহণ করেন তাহলে খৃষ্টীয়সময় জাতিসংঘ ভেঙে যাবে—এই কথা তেবে আমার মন খুব খারাপ হোলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে সায় দিতে হোলো আমাকে। বিশপ কিম্ব কিম্বতেই টোক্সের মৃত্তি যেনে নিতে পারলেন না এবং তাঁর আগন্তি জানালেন। টোক্সের সিদ্ধান্তের প্রতি সহায়ত্ব সিম্পস হরে প্রথম থেকেই তাঁকে সমর্থন করলেন সুশীল স্ত্রী।

শেষ পর্যন্ত টোক্স দৈলশালিকা এক রাজপুতানী মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা ভারতীয় খৃষ্টান ছিলেন। বহু বছর পূর্বে চা-বাগানের কাজে একজন চীনা খৃষ্টান কোটাগড়ে আসেন ও এই রাজপুত পরিবারে বিবাহ করেন। টোক্সের স্ত্রী এই চীনা খৃষ্টানের পৌত্রী। টোক্সের সন্তান-সন্ততির ধর্মনীতে তিনটি বিভিন্ন জাতির বক্তব্যের সমন্বয়।

টোক্সের এই বিবাহের শিখনে আরো একটি প্রেরণা ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত খৃষ্টান। নিজের খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে ইউরোপীয়ানরা ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবিষেধমূলক যে বুদ্ধিব্যবহার করত, তা দেখে দেখে পীড়িত হয়েছিল টোক্সের চিত্ত। স্বাভাবিকভাবেই অফ্রিকা ও বর্ণবিষেধের কালিমা ইউরোপীয়ান ভারত প্রবাসীদের এমনই এক অকৃত মানসিক স্তরে পৌছে দিয়েছিল যে এমন কি যুক্তর পরও ভারতীয় ও ভারতীয় খৃষ্টানের মরসেহের সমাধি পাশাপাশি রাখা নিষেধ ছিল বহুক্ষেত্রে। শাদা-কালোর এই বিভেদ সবচেয়ে প্রকট ছিল পাঙ্গাবে, এই বিভেদ মৃত্যুশঙ্কর কীস পরিবেশেই খৃষ্টান সমাজের কণ্ঠে। বলিষ্ঠতম উপায়ে টোক্স এই বর্ণবৈষম্যকে ছিন্ন করেছিলেন, মানবাধার এই অবমাননার বিরুদ্ধে উদারত্ব বিদ্রোহ তিনি ঘোষণা করেছিলেন ভারতীয় নারীকে জীবনসঙ্গিনী করে, ভারতীয় সঙ্গারকে আপন সঙ্গার বলে গ্রহণ করে। তিনি মনে ভেবেছিলেন, এ যদি তিনি না করেন তাহলে প্রকৃত বীতর্য প্রতি তাঁর কর্তব্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। বীতর্যের কমান্বন্দর দৃষ্টির সমুখে কে বা ইহুদী, কে বা গ্রীক, কে বা আর্মি, কে বা বর্গর, কেই বা স্বাধীন আর কেই বা দাস। তাঁর লক্ষ্যদৃষ্টি সকলেই সমান, সকলেরই অন্তরে তাঁর অধিষ্ঠান।

ভারতীয় নারীকে সহস্রমিগীরূপে গ্রহণ করার শিখনে টোক্সের অতি মহান উদ্ভাটন্য ছিল। খৃষ্টান বিবাহের অন্তর্নিহিত গুহ্ম নিহের আমি গভীরভাবে চিন্তা করিনি, কিন্তু এ কথা স্থির উপলব্ধি করেছিলাম যে তাঁর এই বিবাহ নিত্যন্ত সহজ বিবাহ নয়, সমাজ-কল্যাণের এক মহান প্রেরণার এ তাঁর জীবনব্যাপী আত্মপরীক্ষার ব্রত। তাই এই ব্রত পালনের পথে তাঁকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাতে আমি বিধা করিনি। ইতিমধ্যে আমি স্থির বুকেছিলাম যে, এ যুগের মানব-সংস্কৃতির কুসংস্কৃতম শত্রু বর্ণবিভেদ, বীতর্য পবিত্র ক্রুসটিফের সঙ্গে পাশের কালোছারা এই বর্ণবিষেধ।

টোক্সের বিবাহের ফলে খৃষ্টীয়সময় সত্য ভেঙে গেল। এই সত্যকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি। টোক্সের সঙ্গার প্রবেশ সবথের প্রতি মর্যাদিত আঘাত। এই আঘাত আপন বৃকে অক্ষত করলেন আমাদের বিশপ। অত্যাধ অনেকও গভীর দুঃখ গেলেন এই ঘটনার। কিন্তু আজ বহন দুঃখটি দিয়ে দেখি শুখন

মনে হয় মাছুষের আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বৃষ্টি অতি বিচিত্রভাবে আপন উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন। জাতুসংঘের নিয়ম-গৃহস্থলার দৃঢ় বন্ধন ঈশ্বর যেন হঠাৎ খসিয়ে দিলেন। এই আশ্চর্য বৃষ্টির ফলেই সুন্দর সিং-এর মতো সাধু পুণ্ড্রের প্রতি আত্মনিবেদিত জীবনকে সারা বিশ্বের সেবার বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কী পাশ্চাত্য কী প্রতীচ্য, বিশ্বের সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন সাধু সুন্দর সিং। খৃষ্টপ্রেরমের অকুঠ বিতরণের বিনিময়ে দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ মাছুষের প্রেম তিনি অর্জন করেছিলেন। সংঘের বন্ধনে যদি তিনি বাঁধা পড়তেন, তা হলে এ হোতো না। কোনো সত্য বা সম্প্রদায়ের গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার মাছুষ ছিলেন না সুন্দর সিং। তিনি ছিলেন একলা পথিক, এক বীতর্য পথ-প্রদর্শনকেই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই পথে তিনি ছিলেন অকৃতোভয় নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী।

সংঘের অপর সমস্ত ব্রাহ্মণ ওয়েষ্টার্নের মুক্তিও মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। বিশিষ্ট করণে তিনি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, সংঘের মধ্যে থাকলে তা সম্ভব হোতো না। যে কাজ তিনি ছাড়া আর কেউ পারত না, সেই কাজের ভার ঈশ্বর তাঁর উপর তুলে করেছিলেন, ঈশ্বরেই মহা উদ্দেশ্য সাধন হয়েছিল তাঁর জীবনে। ব্রাহ্মণ ওয়েষ্টার্ন এখন দক্ষিণ-ভারতে টিনিভেলির বিশপ, বিরাট এক ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের তিনি সেবক। এই সমাজের অবিকাশ লোকই অতি দরিদ্র। বাদের মঙ্গলাকাংখার নিত্য নিয়োজিত তাঁর জীবন, তাদের অকুঠ প্রত্যাশীত্ব তিনি লাভ করেছেন।

কয়েকটি ক্ষুদ্র কথার তাৎপর্যে টোক্স সাধু সুন্দর সিং ও অত্যাধ বহুগুণের জীবন-কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আমার সেদিনের অন্তর-জীবনের কাহিনীই আমি উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করছি। ভারতে আমার মর্ম-অভিধানেব এরই ছিলেন নেতা, দৈহিক কারণে অবিলম্বে এঁদের তীর্থযাত্রায় আমি যোগদান করতে না পারলেও এঁদের জীবন ও এঁদের পন্থার আমি অমুপ্রাণিত হয়েছি। এঁদেরই কল্যাণে জীবন্ত বীতর্য ধ্যানরূপ আমি ভারতভূমিতে উপলব্ধি করেছি, এঁদেরই আদর্শে আমি আনন্দিত আবেগে শেষ পর্যন্ত সেবা ও কল্যাণের সত্য পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।

সঙ্গার জীবনের চেয়ে সঙ্গারত্যাগী প্রজ্ঞাবীর জীবনকে ভারতীয়েরা বড়ো ভাল মনে করে। এই মনে করাটা স্বাভাবিক নয়। ভারতবাসীর এই ধারণার পরিচয় টোক্স অনেক আগেই পেয়েছিলেন, আমি অতো নীচ দৃষ্টতে পারিনি। বিবাহিত জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন মহত্তর,—এই ধারণা আমি মিথ্যা এবং হীন বলে মনে করি। স্বামিস্ত্রীর স্তম্ভ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনকে ছেয়ে করলে খৃষ্টের বাণীকেই অবজ্ঞা করা হয়। মানবপুঞ্জের আদির সৃষ্টির মুখে নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক, এই সম্পর্ক পবিত্র। বিবাহ বন্ধন এক অতি পবিত্র ধর্মবন্ধন, সঙ্গারজীবন এতো পবিত্র যে বীত বলেছেন যে পৃথিবীর শিবুরা বর্ণোত্তমানের কুসুম-কোষক।

আমি নিজে বিবাহ করিনি। আমার অবিবাহিত জীবনযাত্রা নিজেও লোকের মনে ভুল ধারণার দৃষ্টি হতে পারে। বিবাহ করব কি করব না, কোন্ পথে প্রকৃত নির্দেশ আমি ভালো ভাবে পালন

করতে পারব? তখন আমার মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে আমাকেও আন্তরিকতা সহিত করতে হবে। তাঁর পর অবশ্য বহু বৎসর কেটেছে। ত্রায়ুগল হোকসে যে ডল ধারণার সমুদীন হয়েছিলেন ভারতভূমিতে আমার স্মরণীয় নিত্য-পরিচয় ইন্ডারের আশীর্বাদে এমনি ভ্রাতা ধারণার সমুদীন আমাকে কোথাও কখনো হতে হয়নি।

এ সব ঘটনা কুড়ি বছর আগেকার কথা। পুষ্ঠান-জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই কুড়ি বৎসর আমার কেটেছে। সিমলার পার্বত্য-অঞ্চলে ত্রায়ুগল হোকসে, স্মরণীয় সি ও স্মরণীয় রক্তের সঙ্গে অতিবাহিত দিনগুলি কুড়ি বৎসরের ব্যবধানের প্রান্ত থেকে স্পষ্টতর রূপে আমার চোখে ফুটে উঠেছে। স্পষ্টতর ভাবে আমি উপলব্ধি করছি বীণার পারমাধিক রাজ্যের এক অপূর্ণ বিধান, যে বিধানের কথা তিনি অতি সহজ স্বল্প উপমায় ভক্তের প্রাণে গেঁথে দিয়েছেন। প্রভু বলেছেন,—যবন শুদ্ধ শীর্ষ মাটিতে বয়ে পড়ে, তাই শত জন্মায়। সে মুকুল বয়ে না, সে মুকুল একাকী। যে মুকুল বয়ে, সেই জ্ঞান ফলের সমারোহ।

হোকসে এবং তাঁর ভ্রাতৃবৎ পুষ্ঠানসমূহের যে প্রাথমিক পরীক্ষার বীজ বপন করেছিলেন, তারই ফলে জামলা ভারতভূমিতে সজার হয়েছিল মহার্ঘ ফসল। হোকসের বিবাহের পর পুষ্ঠানসমূহ ভ্রাতৃসংঘের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু সে মৃত্যুতে ছিল পুনর্জীবনের আশীর্বাদ। এই ভ্রাতৃসংঘের আশীর্বাদ-বীজ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন রূপের নানা প্রোবাস-তরু। দক্ষিণ ভারতের ষিকপতুরে ও যুক্তপ্রদেশের আলমোড়ার অবস্থিত পুষ্ঠান-প্রশ্রমগুলি এই নবজীবনের নিদর্শন। এই মানব সমাজে যারা আশ্রিত, যারা দুর্গতম তাদের সেবার জীবনোৎসর্গের আত্মনা নিত্যকাল প্রভু খুঁটির কাণ্ড ক্ষণিত তার চলেছে, সেই আত্মনাকে সাড়া দেবার মতো উত্তরসংখ্যাত বিলম্ব নয়। তার প্রমাণ পূর্ণার পুষ্ঠান-সেবা-সংঘ ও অল্পরূপ নানা প্রতিষ্ঠান, নিখিল ভারতের কোণে কোণে যারা ছড়িয়ে আছে।

মানবপুস্তকের এই আত্মনা কতো ভাবে আমাদের কানে বাজে, কতো রূপে তিনি আবির্ভূত হন ভক্তের চিন্তামণ্ডিরে। সেই আত্মনাকে প্রতিষ্ঠার উৎকর্ষ ভক্তের ইচ্ছা, সেই অবিরতবের আত্মনাকে বিনিময় ভক্তের হৃদয়। কটিকা-বিন্দু রক্তনীর নিবিড় অন্ধকারে চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো তাঁর প্রকাশ। তপ্ত বিশ্বের রক্ত পরিভ্রমণের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি, হয়তো বা শাস্ত্র প্রভাবের অক্ষনিময় হয়তো বা স্নান গোষ্ঠীর ধূসরতায় তাঁর স্পর্শ। আশীর্বাদিত নিত্য-প্রতীক্ষিত অস্তুর নিয়ে দৃঢ় মেথলায় বসন সন্তুষ্ট করে প্রিয়-আত্মনাকে বর্ন পেতে থাকে অতিসারিকা। পংম প্রভুর কর্ম-আত্মনাকে তেমনি সর্বদান মুক্ত নিত্য প্রকৃত প্রতীক্ষা আমাদের, আমরা এই পুষ্ঠানপথের পথিক দল।

অ্যালবার্ট ক্রুইটজার

সংসদ-সমস্তার তাঁর তখনো আমার মাথা থেকে নামে নি। এক দিকে আমি 'সাদনা' করছি কী ভাবে আমার জীবন-যাত্রাকে

পুষ্ঠান-পন-চিহ্নের মধ্যে বিলীন করতে পারি, অতঃপর তাঁর ইচ্ছার আত্মরিক নির্দেশকে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে হেঁট মুখে মাজ করতে পারছি না। ঠিক এমনি সাক্ষ্যে ইন্ডারের এক পংম আশীর্বাদ আমি লাভ করলাম। মহান পুষ্ঠান অ্যালবার্ট ক্রুইটজারের আত্মরিক সম্পর্ক আমি লাভ করলাম। এই সম্পর্ক আমার ভাগ্যে এক অতি মহার্ঘ সম্পদ।

দিল্লী পুষ্ঠান সমাজের আওতায় আমি তখন পদে পদে নানা জটিল সমস্যা, নানা দুর্ভেদ্য প্রশ্ন, নানা নিরুপায়-বিবলতা। বহু ঘরে কটিকার আঘাতে যেমন করে বহু ঘরের অর্গল ভাঙে, তুচ্ছ বায় ধূলি-জঞ্জালের মালিন্য,—ঠিক তেমনি করে সমুদ্র পার থেকে অ্যালবার্ট ক্রুইটজারের বিজয়ী স্পারশ আঘাত আবেষ্টনীর কারাগার থেকে মুক্তি দিল আমার মনকে। প্রথমে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে অ্যালবার্ট ক্রুইটজারের সঙ্গে আমি পরিচিত হই, এবং পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে নিবিড় বন্ধুত্বের দ্বন্দ্বিতা আনন্দ আমি লাভ করি।

'ঐতিহাসিক বীণার সন্ধান' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনি হয় যে একটি সঙ্গ্রহ পাঠ করে জীবনের সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। আমারও ক্ষেত্রে এইরূপই হয়েছিল। এই পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদটি পড়ে আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল ক্রুইটজার যেন তাঁর রচনার মাধ্যমে আমার নিভৃত আত্মাকে স্পর্শ করেছেন।

গসপেলের ঐতিহাসিক অ্যালবার্ট আমি অত্যন্ত নিকট আগ্রহের



রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খাওন্দু'
মার্ক গেম্বী
ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৯৯৫

সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন,—আমার মানসিক অজ্ঞানতার জট্টাই বিশেষ করে খৃষ্টীয়ানীর এই দিকটি নিয়ে আমাকে বেশি করে পড়াশুনা করতে হয়েছিল। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ সমূহও আমি সঙ্গে সঙ্গে জুলনারুলক ভাবে পাঠ করছিলাম। কৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি হিন্দু অবতারের সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পকাহিনীর অস্ত্র নেই। আমার কেবলই মনে হতো আমার ধর্মগ্রন্থেও বীতখৃষ্টের জীবনীর মধ্যেও কল্পকাহিনী মিশে নেই কি ?

তা যদি হয়, তাহলে খৃষ্টীয়ানীর কতোটা সত্য আর কতোটা কল্পনা, কতোটা পুরাণ আর কতোটা ইতিহাস ? বীতখৃষ্ট কি নিছক পৌরাণিক চরিত্র না ঐতিহাসিক জননায়ক ? অল্পসন্ধিৎসু খৃষ্টভক্তের কাছে এ সমস্তার সমাধান কোথায় ?

এ শুধু বুদ্ধাবাদী সমস্তা নয়, এ আত্মার সংশয়। যজ্ঞে আমার ম্যালেরিয়ার বিব, ক্রয় হুর্দল দেখ, ভ্রমিত শক্তি ! মানসিক হুর্দলতার পক্ষে প্রশস্ত অবস্থা। সেই সময়ে বারে বারে সন্ধ্যার প্রেতচ্ছায়া মনকে আক্রমণ করে, আচ্ছন্ন করে সুস্থ স্বচ্ছ অস্তিত্বটিকে। কেমুত্রিজে বধন ছিলাম তখনো এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। কিন্তু কেমুত্রিজে থাকতে অধ্যয়নের যে ব্যাপক সুযোগ ছিল এখানে তা নেই। এখানে গবেষণার উপকরণ নেই,—বা বই হাতের কাছে আসে তাই পড়ি, তার বেশি কিছু পড়ার সুযোগ মেলে না। সমস্তার সমাধান খুঁজে পাই না।

খৃষ্টীয়ানীর ঐতিহাসিকতা বা পৌরাণিকতা নিয়ে এই যে প্রশ্ন,—এমান আরো নানা প্রশ্ন নানা অন্তর্বিণা আসে। আমার অজ্ঞত কাজর মাঝে মাঝে তারা জড় করে, বিভ্রান্তি আনে সলা সর্বনা। উত্তরহীন এই সব প্রশ্ন মনের মধ্যে গোপন কন্তের মতো জমা হয়, বহির্বিজ্ঞের সঙ্গে আমার আত্মার যোগসূত্রকে শিথিল করে দেয়। জ্ঞানের বেখানে অভাব, বিশ্বাসেরও সেখানে দৈমন্ড আর নৈতিক সমস্তা সেখানে প্রবলতর।

সাধু জনের হৃদয়মাচারে একটি অল্পচ্ছন্ন আছে, যেখানে তাঁর ভক্তবৃন্দকে খুঁট বসছেন, অল্পকাল তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, আবার অল্পকাল তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না।

আমার খৃষ্ট-নিবেদিত সমগ্র জীবনে প্রভুর এই বাণী এক আন্দর্ভ সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো সময়ে তাঁর স্পর্শ আমার অন্তরের এতো নিকটে আমি অল্পভব করেছি যে তাঁর উপস্থিতির কোনো বাহ্যিক সাংঘ্যের প্রয়োজন হয়নি,—উপহাস করতে পেয়েছি সমস্ত সংশয়কে। তাঁর প্রথম ভক্তজনের মতোই আমি তখন বলতে পেরেছি, প্রভু, স্পষ্ট আপনার বাক্য, প্রেহেলিকা-হীন প্রবাদবিহীন। তাতেই আমি বিশ্বাস করেছি যে ঈশ্বর-প্রেরিত আপন।

আবার কোনো কোনো সময়ে অজ্ঞকার বেন নেমে এসেছে, বুদ্ধ দৃষ্টির সামনে কুটে উঠেছে মেঘাবরণের বাধা, সন্ধ্যার তরঙ্গ বিকোচে মারধানে আমার বিপন্ন আত্মা বিশ্বাস ও আশার বৃগল নোঙ্গরের জড় রিষ্ট প্রার্থনা করেছে।

দিল্লীতে অবস্থান কালে সুশীল কল্প আমার পরম সহায় ছিলেন, তাঁর স্নেহ প্রীতি আমার মহা অবলম্বন ছিল, কিন্তু এইরূপ বিপন্ন বিশ্বাসের দ্বুর্ভে সরাসরি ভাবে তিনিও আমাকে কোনোরূপ সাহায্য

করতে পারতেন না। তাঁরও নিজের মনে নানা প্রকার সংশয় ছিল। খৃষ্টের প্রতি প্রীতিপূর্ণ প্রেম সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধিবাদী মন আমারই মতো নোলায়িত হোতো নানা প্রশ্নে। অশুর পক্ষে বধনই সাধু অশুরের সিং-এর সংস্পর্শে আমি আসতাম তখনই তাঁর শিশুসুলভ আত্মা ও বলিষ্ঠ সাহস আমার মনকে নির্মল আনন্দরসে পরিপ্লত করত। অশুর সিং ছিলেন গ্যালাহাডের মতো পুণ্যশ্রমের খুঁটান নাইট, ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপ সর্বদা জাগরুক থাকত তাঁর অঙ্গান দৃষ্টিতে।

নানা সংশয়ে আমার মন বধন বিচলিত তখন ঈশ্বরের এক অমূল্য উপহারের মতো আলবার্ট হুইটজারের এই গ্রন্থটি আমার হাতে এল। খৃষ্ট-জীবনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি সংক্রান্ত নিউ টেটামেন্টের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে গভীর গবেষণা করেছেন, এ পর্যন্ত প্রকাশিত খৃষ্ট-জীবনীর সমস্ত খ্যাত অখ্যাত গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন, বীতখৃষ্টের প্রতি খৃষ্টের বিরুদ্ধতা ও প্রতি খৃষ্টের বিশ্বাসকে তিনি বিচার করে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানব সমাজের প্রতি বীতখৃষ্ট দাবী অকুণ্ট আত্মগত্যের দাবী।

আমার অব্যবহৃত চিত্তের প্রতি এই ঘোষণার মূল্য সেদিন ছিল অপরিসীম। তাঁর এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ আমাকে সবচেয়ে অভিজ্ঞত করেছিল। খৃষ্ট বিবরণ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা যুক্তি ও নানা বাখ্যার অবস্থানে তিনি সমস্ত পাণ্ডিত্য পরিহার করে একনিষ্ঠ সাধুর অন্তরের ভাব্যর এই পরিচ্ছন্ন রচনা করেছিলেন।

আলবার্ট হুইটজার বলেছেন, খৃষ্ট জীবনের সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে নিতান্ত ইন্ড্রিগ্রাছ বাস্তব ইতিহাসের কাঠামোর উপর গাঁড় করালে সে জীবনের মহত্বকে উপলব্ধি করা যাবে না। সেই ঐতিহাসিক চারত্র-চত্র হবে বিবর্ণ নিষ্প্রাণ। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীরা যে বাস্তবতার খাঁচা তৈরী করেছেন তাঁর মধ্যে খৃষ্টচরিত্রকে বন্দী করা অসম্ভব। কেন না, খৃষ্ট কোনো নির্দিষ্ট যুগের কোনো নির্দিষ্ট যুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ নন। সর্বকালের সর্বধারণার কেন্দ্রে তিনি বিরাজমান। তিনি নীতিশিক্ষক নন, তিনি মানব বিবেকের সাম্প্রতিক অল্পশাসক নন। তিনি মানবজাতির সর্বযুগের একচ্ছত্র সম্রাট, মানবাত্মার সর্বসমর্পিত আত্মগত্য তাঁর দাবী। যেখানে তাঁর চৈতন্য স্পর্শ, সেখানেই তাঁর অনির্বচনীয় লীলা। এই লীলা তাঁর জাগমনীর সাক্ষ্য। খৃষ্ট যে যুগে ধবাধমে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে এক অলৌকিক যুগ ! সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা খৃষ্টের আবির্ভাব।

খৃষ্টজার প্রশ্ন করেছেন, খৃষ্টকে আমাদের জীবনের পঞ্চপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করতে সত্যি কি আমরা চাই ? তাঁর নয়নজ্যোতিকে জ্বলন্তা করে আমরা সর্বভাগ্যি হয়ে শুধু তাঁরই অল্পগামী হতে কি চাই তাঁর প্রথম শিষ্যদের মতো ? তর্কবাদী বলে, খৃষ্টের আত্ম পুনরাবির্ভাবের আশায় তাঁর প্রথম প্রথম মনোনিষ্ঠ প্রেরিতগণ হুল করেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত বাস্তবের গভীরে যে সত্য বিরাজমান ইতিহাসের নিকটে উজ্জ্বল বেধার তা কি প্রমাণিত হয়নি ? তাঁর আবির্ভাবের পর অতিবাহিত হয়েছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী পার ; ইতিহাসের প্রতি যুগে কোন্ যুক্তি চূড়ক আকর্ষণে তাঁর প্রতি

ধারিত হয়েছে নরনারীর আত্মা, আনন্দিত আত্মসমর্পণের আত্মা।
আবেগে? সর্বভূতে সর্বকালের মানবহৃদয়ে অবিনশ্বর তাঁর স্পর্শ,
এই কালজরী রহস্যের মূল কোথায়? একটিমাত্র সমস্ত স্বীকৃতিতে
এই রহস্যের উদ্ঘাটন। স্বীকার করি তিনি নিত্য আবির্ভূত,
চির-উদ্ভাসিত, পবন সত্য তিনি।

মানব-ইতিহাসের এই মহান পুণ্য যৌগুষ্ঠ, বাস্তবতার পথে
পথে তাঁর সন্ধানের সমাপ্তিতে আলবার্ট হুইটজার তাঁর আশ্চর্য
গ্রন্থে বলেছেন :

প্রতি যুগেই আমাদের সামনে যৌগুষ্ঠ আবির্ভূত চন, নামভারী
পরিচয়ভারী রূপে, যেমন একদা হুগো প্রান্তে তিনি
পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন। সেদিন ওরা তাঁকে প্রথমে চিনতে
পারেনি। আমরাও কি চিনতে পারি? সেদিনের মতো আজও
তিনি আমাদের আত্মহান করেন, বলেন, অমূল্য কণা আমাদের।
এ যুগের মাত্রার বার্তা, সে কর্তব্যের আহ্বান তিনি ধনিত
করেন আমাদের হৃদয়ে। এই নির্দেশ রাজ্য আজ্ঞা,—এ আজ্ঞার
প্রতিপালন মানবাত্মার ঐতিহাসিক অঙ্গীকার। তাঁর আজ্ঞা বারী
পালন করে, তারা পণ্ডিতই হোক আর মুখী হোক, তাঁর
নির্দেশিত পথে শত বস্ত্র শত বছর বকনার মধ্যেও তারা তাঁর
নিত্য-উদ্ভাসিত মূর্তির দর্শন লাভে ব্যস্ত হয়। তাঁর অবর্ণনীয়
লীলারূপকে তারা চিনতে পারে।

হুইটজার সেই চিরন্তন প্রভু যৌগুষ্ঠের সামনে আমরা আবার
এনে উপস্থিত করলেন, আমাদের জীবনের সংস্ক-কালিমা যুক্ত প্রতিটি
ভাষা যুগের যে প্রভুকে আমি চিনেছি, যে প্রভুকে আমি
ভালোবেসেছি। আমার মনে হোলো আমার নিভৃত অন্তরের
গোপন কথাটি বেন পাঠ করেছেন হুইটজার, সেই কথাটিই উজ্জল
অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে ফুলে ধরেছেন আমার দুঃস্বপ্নের সামনে।

হুইটজারের এই গ্রন্থ অপর একটি দিক থেকেও আমার মনকে
অতুল্য নাড়া দিয়েছিল। বীজের ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্র অকন-
মানসে তিনি হুইজ-সংস্কারের প্রথম শতাব্দীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।
সে যুগের যুগান্তকালের অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ ও লীলাবিভূতির
প্রতি বিশ্বাসকে তিনি অল্প কথায় এড়িয়ে যেতে চান নি। বীজের
আত্ম পুনরাবির্ভাবের কথা ধর্মগ্রন্থের যেখানে যেখানে লেখা আছে,
সেই সব লেখাগুলি তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন। যুগের
প্রথম লিঙ্গাঙ্গ অলৌকিককে যে ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন,
হুইটজার পরম সত্ত্ব সেই অলৌকিক পটভূমিকা রচনা করেছেন তাঁর
গ্রন্থে।

হুইটজারের এই রচনা পড়তে পড়তে আমিও আমার প্রথম
জীবনে কিবে গেলাম, ফিরে গেলাম আমার পিতা-মাতার কাছে,
তাঁদের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসের আবেগের মধ্যে। আমার পিতার ধর্ম-
বিশ্বাসের কথা আমাকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হোলো, তার
সঙ্গে আমার ধর্ম-বিশ্বাসের যোগসূত্র আমি রচনা করলাম।

আমার পিতামাতার বিশ্বাসের সঙ্গে আক্ষরিক ভাবে একান্ত
হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতি পক্ষে আমার পিতৃদেব
আমাকে লিখতেন বীজের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎবাণী অচিরে সত্য হতে
চলেছে, যদুহা-স্মৃতি পরিগ্রহ করে বীজের পুনরাবির্ভাবের আর বিলম্ব

নেই। সেই আবির্ভাবের পথ চেয়ে তিনি বসে আছেন। শিশুর
মতো সাহস নিয়ে আমার পিতা বিশ্বাস করতেন যে, ঐশ্বর যদি
ইচ্ছা করেন তাহলে এক লম্বার প্রকৃতির সব নিয়মকে তিনি বদলে
দিতে পারেন।

আমার পিতার ছিল শিশুজ্ঞানোচিত আস্থা। সেতপ আত্মার
অধিকারী না হয়েও আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, এই বাস্তব
সংসারের কেন্দ্রে এক অলৌকিক আনন্দ ভগ্নং বর্তমান। কেন না, সেই
আনন্দের আত্মা আমি পেয়েছি। এই যদুহা-ভাগ্যের মাধ্যমে
এক আত্মিক জীবনের প্রত্যাশা আমি করতাম, যে জীবনের এপার
ওপার ছুড়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, ঐশ্বরের পন্থা স্বজন করণের যে জীবন
নব নব জীবনে অম্লরাগ। আত্মার এই অবিনশ্বর অসীমতা নিয়ে
কোনো সংশয় ছিল না আমার মনে।

আমার পিতৃদেবের বাহ্যিক চোরাহাতও প্রভু বীজের চোচ্চিহ্ন
ছিল। যুগোপয চরিত্র প্রকাশ পেত তাঁর মুখমণ্ডলে। যুক্তিহীনতা
পরম প্রভু যুগের চরণে তিনি তাঁর সমস্ত বিশ্বাসকে সবল শিশুর মতো
অধিকার হয়ে সমর্পণ করেছিলেন। এই চিরবিষম আত্মদানে
রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁর চরিত্র, অপর-মূল্যের হয়েছিল তাঁর
অন্তঃকরণ। যুগের পুনরাবির্ভাবকে আত্মিক অর্থে নিয়ে তিনি
যে ভুলই করত না কেন, সমস্ত ক্ষমকে তিনি জয় করেছিলেন বিশ্বাস
নিয়ে আশা নিয়ে প্রেম গিয়ে। তাঁর যুগ-নির্ভেদিত জীবন যে
উজ্জলিত আনন্দ, অপরিমিত আশা ও উজ্জলিত ভক্তিতে পরিপূর্ণ
ছিল, সেই আনন্দ, আশা ও ভক্তিকে আমার জীবনের বৃহত্তর
ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করতে বেন পারি, এই কামনাটি ছিল আমার।

আমার পূর্বজীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে আমি পুনর্বার
একে একে মূরণ করতে লাগলাম। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার
সংযোগে ধর্মমূলে বিশ্বাসের যে ভিত্তি রচিত হয়েছিল, সেই ভিত্তির
সুদৃঢ়তা আমি আবার বীরে বীরে পরীক্ষা করে দেখলাম।
কেন না, বিশ্বাসের এই ভিত্তির উপরেই আমাকে নতুন করে
প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমার ধর্মের ধর্মমন্দির,—ভিত্তিস্থলের
প্রস্তরকাঠিকে কোনো সংশয়ের দুর্বলতা থাকলে চলবে না।

আরো একটি বিষয়ে আমি আলবার্ট হুইটজারের কাছ থেকে
শ্রেষ্ঠ সাহায্য লাভ করেছিলাম। তার নিজের জীবনের উদাহরণে

ডাঃ বঙ্গুর
অশোক কার্ডিয়েল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে
প্রথম প্রাপ্তিকারক:
ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

আমি উৎসাহ হয়েছিলাম। সমস্ত জীবন দিয়ে প্রতি মুহূর্তের বয়স দিয়ে খুইটজার নিঃশব্দ নিঃসংকোচে প্রত্যেক বীতকে অঙ্গসংগ করেছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, সঙ্গীতবেত্তা হিসাবে তাঁর ছিল দেশখোঁড়া খ্যাতি। কিন্তু শিক্ষকতা বা সঙ্গীতশ্রষ্টার লোকসংস্পর্ক বৃত্তি পরিত্যাগ করে তিনি ডাক্তারী পড়লেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সভা মাহুদের অত্যাচার যে দেশের লম্বাটে গাট থেকে গাটতর কালিমা লেপন করেছে—চিকিৎসকরূপে সেবার বৃত্তি নিয়ে সেই গভীর মধ্য আফ্রিকার তিনি বাক্সা করলেন। আফ্রিকার বিশ্ববৈশ্বিক অঞ্চলে ওগুই নদীর ধারে তিনি উপস্থিত হলেন ও ম্যালেরিয়া-বিস্মৃত একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

প্রতীচা সভ্যতার আভ্যন্তরীণ স্রব্ধ প্রান্তে আফ্রিকার আদিবাসিগণের এই নগণ্য জনপদে খুইটজার যোগী ও যুয়ুদের সেবার তাঁর খুই-নিবেদিত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। খুইয়ের পথে জীবনকে পরিচালিত করেছেন তিনি সমস্ত পার্শ্ব পাশ্চাত্যকে পরিত্যাগ করে।

আফ্রিকার উচ্চ-মণ্ডলের গভীর অরণ্যের উত্তর নির্জনতায় খুই উপস্থিতিকে অস্ত্রের একান্ত নিকটে অস্ত্রভব করেছেন খুইটজার। ঈশ্বরের অলৌকিক নির্দেশ আজও তাঁর প্রতিদিনের কর্মধারাকে পরিচালিত করছে, আনন্দ-অভিভূক্ত করছে তাঁর প্রতি মুহূর্তের সেবাতত্বকে। বীতের নামে অবজ্ঞাত দীন-সরিত্তের সেবায় তিনি তাঁর সৎ জীবনকে দান করেছেন—এই দানের আনন্দ তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত কুসুসাধনকে এক অনির্বচনীয় গৌরবে স্তব্ধ করেছে।

খুইটজার মনে করেন—খুই শুধু কোনো এক অতীত মনুষ্যচরিত্র নন, তাঁর পরিচয় শুধু প্রাচীন নথিপত্রের অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি যুগের মানবাত্মার মন্দিরে তিনি বিরাজমান। তবু তাঁকে সন্ধান করতে হয় যুগে যুগে। এ সন্ধান সহজের পথে নয়—যতো যুগ অতীত হচ্ছে, ততোই পথ হচ্ছে বন্ধুরতর, সন্ধানের বেদনা হচ্ছে তীব্রতর। প্রতি যুগে মানবসমাজের বীর অভিযাত্রীর দল তাঁর সন্ধান করে, তাঁর স্পর্শ পায়, পরম ভক্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁকে অর্জন করে। কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারাও এই অভিযাত্রীরা আবদ্ধ নয়, তাঁর সন্ধান, তাঁর পরিচয়, দেশে দেশে। দেশাচারের লোকাচারের সমস্ত অঙ্গ তিনি ভেঙেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পরমোপলব্ধির যে সন্ধানী তাকেও হতে হয় সর্ববন্দন হীন। তিনি আসেন—সমস্ত বিচার তর্ক ও বস্তুকে অতিক্রম করে তিনি আসেন, মনুষ্যচেতনার আপাত পরাজয়ের অন্ধকারের প্রান্তে আসন বিজয়-প্রভাতের জ্যোতির্ময় বিভা ফুটে ওঠে তাঁর চরণস্পর্শে। তিনি মানব-সংস্কৃতির বিগলিত অতিক্রমের পথ, তিনিই পথের প্রদর্শক। তাঁর মৃত্যুতে নবজীবনের সঙ্কেত। তাঁর জীবনদান পুনরুজ্জীবনের আকুর।

পরবর্তীকালে ইউরোপে গিয়ে কিছুদিন অ্যালবার্ট খুইটজারের সঙ্গে একত্র বসবাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার মনে হয়, সাধু-হৃদয় সি ও জাপানের কাগাওয়া হাড়া খুইটজারের মতো এতো ঘনিষ্ঠ খুইটজারের অধিকারী আর কেউ এ যুগে হননি। তাঁর প্রেমোন্মাদিত আত্মজাগরণের কাহিনীই সঙ্গে আজ সহজ

পৃথিবী পরিচিত; তাঁর অমল্লকবীরী খুইটজারের কথা আজ কারো অজানা নয়। যে বীতকে তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পূজা করে চলেছেন, তাঁর প্রত্যক্ষরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে খুইটজারের চরিত্রে, যে চরিত্রে শিশুর সাদালা-সৌরভ নিত্য বিকশিত।

খুইটজারের প্রথম পাঠ করতে করতে আমি একটি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলাম। বালাকালে শিশুগৃহে যে ধর্মশিক্ষা আমি পেয়েছিলাম, তাঁর পিছনে ঈশ্বরের অবশ্যই কোনো অভিশ্রাব ছিল। সেই শিক্ষার স্মৃতি আর খুইটজারের এই গ্রন্থ একত্রে আমার মনকে উদ্বেলিত করে তুলল। যতো সামান্য যতো অকিঞ্চিংকরই হোক না আমার জীবন—প্রত্যেক বীতের সন্ধানে আমিও কি পথে বাহ হতে পারি না? প্রাচীন বৃত্তীয় সম্প্রদায়ের অস্ত্রের যে অলৌকিক বিশ্বাস ছিল, আমার কণ্ঠেও প্রাণনার সেই বিশ্বাসকে কি পুনর্জগ্নিত করতে পারি না? যুগে যুগে মাহুদের যেখানে বেদনা, মানবাত্মার যেখানে নিপীড়ন, সেইখানেই খুইয়ের আবির্ভাব। মানবভাগ্যের সেই বেদনা বন্ধনের মধ্যেই আমি আমার প্রভুকে সন্ধান করব। শুধু যুগের মন্ত্রে নয়, তাঁর শ্রিয় কার্যের বস্ত্র হয়েছে আমি তাঁর উপাসনা করব। তাঁর নামে জীবনকে উৎসর্গ করব সর্ব মানবের সেবায়। সেই হৃদয়ের ধারে তাঁর প্রথম শিবারা প্রভুকে যেমন দেখেছিল, প্রভুর কথা যেমন শুনেছিল, আমিও কি আমার প্রভুকে উপলব্ধি করতে পারব না যেমনি করে—সর্বস্বত্বা হতে সেবাসমুদ্রের তীরে ঝাঁড়িয়ে? আমিও কি শুনতে পাব না তাঁর অমোঘ-অদ্বিত বাণী—বৎস, অঙ্গসংগ করে আমাকে!

হৃদয়-সিহরিত এই যুগ, বোগজর্জর এই পৃথিবী। সলয় আর বেদনা, অবিপুল আর বোন। খুইটজারের প্রথম শতাব্দীতে প্রথম ভক্তগণের অস্ত্র পূজা আত্মার যে অপর গুণাবলীতে মণ্ডিত ছিল, সেই ভক্তি, সেই বিশ্বাস, সেই সারল্যকে আবার এ যুগে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবেই একমাত্র মঙ্গল। এ আমি স্থির হয়েছিলাম, আমাদের আবার সেই প্রথম শতাব্দীর খুইন হওয়া প্রয়োজন।

শিশু উদ্বেজনা ও স্বপ্ন অজিততার ফলে খুইয়ের আদম ভক্তমণ্ডলী পুনরাগমনের সমস্তাটির নিত্যন্ত সহজ সমাধান করেছে। আমার সারল বিশ্বাসী পিতার মতো তাঁরাও প্রভুর কথার নিত্যন্ত আক্ষরিক অর্থ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে খুইয়ের পুনরাবির্ভাব মিথ্যা নয়। পাণ-কলুহিত মৃত্যু-বিপদে ধরনীতে খুইয়ের অলৌকিক অতীন্দ্রিয় স্পর্শে নবপ্রাণের ও নবপুণ্যের সঞ্চার—এই বিশ্বাস খুইবিশ্বাসীর হৃদয়-কেন্দ্রের চিরঞ্জীব বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই সাধুগণের হৃদয়মাচার। এই ধরনী শতকলুষ সত্ত্বেও ঈশ্বরের রাজ্য—এই রক্তের নোষণ করেছেন ঈশ্বরপুত্র মহামানব বীত। বীতখুইয়ের সমসাময়িক ভক্তগণ প্রভুর অতীন্দ্রিয় লীলার প্রকাশ দেখেছিলেন স্বত্বে—প্রত্যেক ভাবে অস্ত্রভব করেছিলেন যে, তাঁরা এই অলৌকিক স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। সেই স্বর্গরাজ্যের প্রত্যেক পুণ্যের অধিকারী তাঁরা ব্যাধিভর্যকে স্বহ করেছিলেন, অন্ধকে করেছিলেন চক্ষুমান্ন। প্রেম ছিল, প্রেমের উত্তরও ছিল, কেন না প্রভু খুই ছিলেন সর্বল কাছাকাছি। ঈশ্বর-রাজ্যের দ্বার ছিল সামান্যামনি।

খুই সন্নিহিত ভক্তগণের অধুনা-বিরল বিচিত্র উদ্বীপনার পরিচয় সাধুজন লিখিত হৃদয়মাচারের শেষের দিকের বর্ণনার অন্তর প্রকাশ পেয়েছে। এমন স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত আকিত হয়েছে যে, সমস্ত দৃষ্ট

যেন ফুটে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। সমুদ্র-তীরে প্রিয় শিষ্যগণকে বীতর শেষ দর্শনদানের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

এই কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল যে, বীতর প্রিয় শিষ্য মারা যাবেন না, বত দিন না প্রভু আসেন তত দিন প্রতীক্ষা করবেন। সেই জন্মে বীতর তরুণ পথবাগ্মিন্যের কাছে প্রকৃত কাহিনী শ্রুতি ভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়েছিল। জন সেই ঘটনা সত্যকে লিখেছেন,—কিন্তু বীতর বলেননি যে, প্রিয় শিষ্য মরবেন না। তিনি শুধু অজ্ঞাত ভক্তদের বলেছিলেন,—আমি যদি ইচ্ছা করি যে এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমাদের কি?

আমরা আমাদের মনশ্চক্রে কল্পনা করতে পারি, খুঁটের শেষ প্রত্যক্ষ শিষ্য তাঁর নবম জীবনাবসানের দিনটি পর্যন্ত বৃদ্ধ কঠোর তরুণ শিষ্যদের কাছে খুঁটের অলৌকিক জীবনী শোনান্ধেন। পরম প্রভুর এই জীবনী তিনি শুনিয়াছেন শত সহস্র বার বত দিন না মৃত্যু এসে কষ্টকর করেছে। প্রভু আসবেন, প্রভু আবার মরণেরে অবতীর্ণ হবেন, এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করা শক্ত নয়, এই বিশ্বাসের বলেই বাহ্যিক জগতের নিগড় শিথিল হয়,—যেখানে প্রভু বীতর নিত্যকাল অজুতভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই অনন্ত রাজ্যের আব্রাহামে আবুল সাদা দের বিশ্বাসী-আত্মা।

বীতর খুঁট অবিলম্বে আবার মরণেরে পৃথিবীতে পুনরাবির্ভূত হবেন, প্রভুর প্রথম ভক্তগণের মধ্যে অটুট ছিল এই বিশ্বাস। খুঁটের সমাজে প্রথম যুগে এই বিশ্বাস যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা বোধ হয় ঈশ্বরেরই মঙ্গলময় অভিপ্রেত। সে যুগের খুঁটবিশাসী নরনারীরা ছিল অতি সরল, অতি দীনহীন, কোনো বিরাট ঐতিহ্য ছিল না তাদের পিছনে। অবিশ্বাসী পুরুষ শক্তির হাতে যে প্রচণ্ড অত্যাচার তারা সহ করেছিল, সেই সহ করবার শক্তি তারা পেয়েছিল কোথা থেকে? প্রভু আবার আসবেন, আসার ঘেরি নেই—এই ধ্রুব আত্মাই সেই দীন খুঁটানের বৃকে নিয়েছিল বল। যে কল্পনা নিতান্ত সম্ভব, যে আশা নিতান্ত বাস্তব; সে সত্যকে নিতান্ত প্রত্যক্ষ তাই তখন প্রয়োজন ছিল, তাই সব অত্যাচারের অগ্নি পরীক্ষাতেও দ্রব হয়নি তাঁদের অবিচলিত খুঁটপ্রেম। সেই বিশ্বাসকে নিতান্ত স্থূল বিশ্বাস বলে অতীতের সেই অকুতোভয় খুঁটপথবাগ্মিন্যের হেয় করবার অধিকার আমাদের নেই।

বৃদ্ধ জন উপদেশ দিয়েছেন, পৃথিবীকে প্রেম কোরো না, আকৃষ্ট হোয়ো না পাখির বন্তনিচরের প্রেতি। যদি কোনো ব্যক্তি এই নবম পৃথিবীকে ভালোবাসে, পরম পিতার প্রেম থেকে সে বঞ্চিত হয়। কেন না পৃথিবীর বা কিছু সফর—দেহের বাসনা, ইন্দ্রিয়ের লালাসা ও মরজীবনের গর্ভ,—এ সব পৃথিবীরই, ঈশ্বরের নয়। এই পাখির ফুরাং ফুরাং, জুড়ায় জীবনের বাসনা কামনা,—কিন্তু

ঈশ্বরের কাঁধে যে করে সে চিরদিন জীবিত থাকে সে শিশুগণ, মনে যোগে,—শেখের প্রহর উপস্থিত।

শেখ প্রহরের বন্দী বাজছে। এ বেন জীবন-মৃত্যুর এক চরম সন্ধিক্ষণ,—আর দেরি নেই,—যা কি বাব না, নেব কি নেব না তোমার আশীর্বাদ, চসব কি চসব না তোমার আশ্রি পথে। নিঃশব্দ নিঃশব্দ করতে হবে মনকে এই মুহূর্তে। সংবত করতে হবে যেখলা, খালতে হবে অভিসারের বন্ধুর পথের স্তম্ভ-প্রদীপ, খুঁটের প্রহর মূলে এই অবিলম্বে আত্মপ্রস্তুতির-সুগতি বাজছে। নানা-মুরের ঐক্যতান এই প্রহর, কিন্তু তার মধ্যে মূল সুরটি স্তম্ভ-প্রদীপের প্রবাহন বাক্যের স্বতো। এই বাক্যের গুম ভাঙায়, গুচিরে দেয় অলস স্বপ্নের মারাজাল। খুঁটের পুনরাবির্ভাব স্বপ্ন নয় কল্পনা নয়—পরম সত্য। জীবনের যে কোনো মুহূর্তে সে সত্যের পরম প্রকাশ, ক্রুসের যুগ্মার্থে যে সত্যকে হত্যা করা বারনি। এই ক্রুসের দ্বারা অমুদ্বর্তক তাদের প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। কে জানে কখন প্রভু আবির্ভূত হবেন, বলবেন, অমুদ্বর্তক করে আমাদের। এই আহ্বান হয়তো বা মধ্য রাত্রির তিমিরাত্মকারকে ভেদ করে কানে বাজবে, হয়তো বা সেই হৃদযন্ত্রের প্রভূত্বের মতো নবোদিত পূর্বের আনন্দ-বীণার ধ্বনিত হবে সে আহ্বান। একান্ত অপ্রতীক্ষিত মুহূর্তে স্পন্দিত হবে তাঁর চির প্রতীক্ষিত পদধ্বনি।

এই প্রতীক্ষার পরম অবসানে নবজীবনের সূচনা। পৃথিবীর আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ, নবজীবনের বাসনা কামনা মানবাত্মাকে গুরু করে রাখে। কিন্তু সেই আহ্বান বার প্রাণে বাজে, সে গুরু গিরি উল্লংঘনের শক্তি লাভ করে এক মুহূর্তে, অগম্যত্ব হয় তার সর্বত্র ভার। তার অন্ধকার স্তম্ভ-কক্ষের মহাজীবনের নব উদীপনের আলোকবর্তিকা মুহূর্তে ধলে। তার আর কিছু থাকে না, কিন্তু সে সঞ্চিত রাখে না পৃথিবীর জঞ্জাল, তার সব কিছু থাকে নব প্রভু খুঁট।

দুর্বলতা ও সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার স্নেহিত অন্তরে আলবাট খুঁটটারের প্রহর সেই আলোক-বর্তিকার্তি স্থাপন করল। তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণ আমাকে ঠেলে দিল দীন দরিদ্রদের মধ্যে, দ্বারা সর্বহার্য ও ভাবাহার্য তাদের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধ করল আমার আত্মার কথা। আমি আমার বইপত্র ফেলে আবার পথে বার হতে শুরু করলাম, ঘুরতে লাগলাম গ্রামে গ্রামে। সরল গ্রামবাসীদের সাহচর্যে মানবজীবনকে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। ক্রমে আমার মন ধীরে ধীরে একনিষ্ঠ বিশ্বাসের গৌরবে নিঃসুর হয়ে উঠল। আমার স্তম্ভের মাথখানে ভক্তি ও বিশ্বাসের বার্তিকার্তিতে পরম মঙ্গলময় পিতা আপন হাতে অমলিন ও আশা-প্রোজ্জ্বল শিখাটি জ্বলে দিলেন। যে আহ্বানের জন্মে উৎকর্ষ হয়ে ছিলাম, সেই আহ্বান আমার প্রাণে এসে মন্ত্রিত হোলো। [কথন:]

অমুদ্বাদ :—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের বৈশিষ্ট্য বক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব-জাতীয়তার সাধকেরা তাঁহাদের সাধনাও এই সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা বীহার্য বোধেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাণেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ বাঙালী প্রত্যেক বাঙালকে জুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্ত, তাহার পশ্চাতে ছুটিকে চাহে।—বিনিন্দিত পাল।



ভাটি পড়ার পরেই জোয়ার আসে। তেমনি ক'লকাতা মাঠের হকি লীগের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাইটন কাপের খেলা বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই শুরু হয়েছে। বর্ষিও এখনও এর শেষ হয়নি। এবারকার বাইটন কাপের প্রতিযোগিতায় সর্বসমেত ৪১টি দল যোগদান করেছে। এর মধ্যে বহিরাগত ১৭টি দল আছে। বাইটন কাপের ইতিবৃত্ত ও পর্যালোচনা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করব। এবার ক'লকাতার মাঠের হকি খেলার একটা সামগ্রিক আলোচনা করছি।

হকি

এ বছরের প্রথম ডিভিসন হকি খেলাগুলি দেখে মনে হয়েছে, কলকাতার হকি খেলার মান ক্রমশ: নিম্নরূপী। খেলোয়াড়দের অসুস্থীলন, অধ্যবসায় যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি দেশের তরুণ খেলোয়াড়দের তৈরী করার ভার একান্তভাবে ক্লাব কর্তৃপক্ষদের। এ বিষয়ে যদি এখন থেকে ক'লকাতার ক্লাবগুলি তৎপর না হয় তা হলে ভারত অলিম্পিকের যে হকিতে একচ্ছত্র সম্রাট—সেই সিংহাসন থেকে নেমে পড়াতে হবে। পথ করে দিতে হবে হয় পার্শ্ববর্তী—পাকিস্তান বা অন্তর্জাতিকে।

এবার চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন কর'ল ক'লকাতার অন্ততম শ্রেষ্ঠ দল মহামেডান স্পোর্টিং। চ্যাম্পিয়ানশিপের জুজু মহামেডান দলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে, অপর নিকট প্রতিদ্বন্দী ইষ্ট-বেঙ্গল দলের কাছে। নিত্যন্ত দুর্ভাগ্য বশত: ইষ্ট-বেঙ্গল দল মহামেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলার যথেষ্ট ভাল খেলোও জয়লাভ করতে পারেনি। পেনাল্টি বুলির অপব্যবহার, তাড়াহুড়া বহু সুযোগের অপব্যবহার এ খেলার জয়লাভ করতে দেয়নি।

প্রথম ডিভিসনের ১১টি ক্লাবের মধ্যে সত্যই মহামেডান দল ভালই খেলোছে। অপরাধের গৌরব নিয়ে এবারকার লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ সত্যই প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহামেডান দল গতবারে রাগার্স আপ লাভ করেছিল। এটাই মহামেডান দলের প্রথম লীগবিজয় নয়। ইতিপূর্বে ১৯৪৫ সালে মহামেডান দল লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। এবারকার সমস্ত প্রতিযোগিতার খেলার মাত্র তিনটি খেলার মহামেডান দল অসুস্থীলন ভাবে শেষ করেছে। মহামেডান দলের পরই সামগ্রিক ভাবে ভাল খেলোছে ইষ্টবেঙ্গল দল।

এবার সর্বশ্রেষ্ঠ হতাশ করেছে কলকাতার অন্ততম খ্যাতিনামা দল মোহনবাগান। গতবার পর্যন্ত উপর্যুপরি চার বার মোহনবাগান দল লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে এসেছিল। তাই অনেকেই আশা করছিলেন, এবারও লীগবিজয়ী হয়ে হকি লীগের খেলার একটা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে। কিন্তু মোহনবাগান দল

ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর খেলার মধ্যে শিথিলতা প্রকাশ পায়। এর পরই ইষ্টার্ন রেলদল ও মহামেডান দলের কাছে পরাজয় বরণ করার লীগ পাঞ্জার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে।

কলকাতা মাঠে যে সমস্ত খেলোয়াড়রা হকিকে তার স্ব-আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাদের প্রত্যেকেই খেলার মধ্যে ফুটে উঠেছে জনপুণ্য। তাঁদের স্বাভাবিক ক্রীড়াকৌশল তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। ভোলা চক্রবর্তী, হরিশ শর্মা, গুই, রুডিয়াল, গুস্তা, শিয়ারা সিং, কারো খেলাই চোখে লাগে না। দিন দিন তাদের খেলা নিশ্চয় হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য সর্বাত্মক প্রয়োজন অসুস্থীলন ও অধ্যবসায় খেলোয়াড়দের মধ্যে।

প্রথম ডিভিসন থেকে এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যাচ্ছে ক'লকাতার অন্ততম খ্যাতিনামা দল ভবানীপুর ও ভালতলা। গত কয়েক বছর আগেও ভবানীপুর কলকাতার হকি মরশুমে যে আলোড়ন ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো তা দর্শকরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হননি। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ভবানীপুর দলের। ফুটবল থেকে নেমে বাণেশ্বরের পরই হকি থেকে নেমে বাণেশ্বরের মনে হচ্ছে ভবানীপুর দলের একে একে নিবিছে দেউটি। ভবানীপুর দল এবারকার প্রতিযোগিতার প্রথম ১২টি খেলার যখন মাত্র ১টি পয়েন্ট সংগ্রহ করল তখনই তারা অসুস্থীলন করলো এবারকার প্রতিযোগিতার কল্যাণ সঙ্কে। এবং অত্যন্ত হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে সরে পড়াতে। অপর দল ভালতলা ১৮টি খেলার মধ্যে মাত্র ৭টি পয়েন্ট লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত ভালতলা এবং উরাড়ী দলের মধ্যে নেমে বাণেশ্বরের পান্নায় বেশ উজ্জলনার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ৮টি পয়েন্ট পেয়ে এবারকার মত উরাড়ী দল প্রথম ডিভিসন লীগ থেকে নেমে বাণেশ্বরের হাত থেকে রেহাই লাভ করে।

আগামী বারে প্রথম ডিভিসন খেলার গৌরব অর্জন করলো আদিবাসী ও ঝাড়খণ্ড ক্লাব। দ্বিতীয় ডিভিসনে এবার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের গৌরব অর্জন করলো আদিবাসী দল। আদিবাসী দলের ক্রমোন্নতি সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। আদিবাসী দল ১৬টি খেলার মধ্যে ২৯ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করলো। অপরপক্ষে ঝাড়খণ্ড ক্লাব ১ পয়েন্ট পিছিয়ে যেতে অর্থাৎ ২৮ পয়েন্ট লাভ করে রাগার্স আপ লাভ করলো। আগামী বারে এই দুইটি দলকে প্রথম ডিভিসন হকি লীগের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে।

আন্তঃ-কলেজ হকি

আন্তঃ-কলেজ হকি লীগের খেলার ২৩টি কলেজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এবারকার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে

সেট জেভিয়ার্স' কলেজ। এবার নিয়ে মোট পাঁচ বার সেট জেভিয়ার্স' কলেজ আন্তঃ-কলেজ হকী লীগের খেলায় বিজয়ী গৌরব অর্জন করলো।

তিনটি গুপের মধ্যে একটিতে সেট জেভিয়ার্স', একটিতে রুশিয়ার্চ ও অপরটিতে বি. ই. কলেজ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। এবার এই তিনটি গুপ চ্যাম্পিয়ানকে নক-আউট প্রথার খেলিতে চ্যাম্পিয়ানসিপের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুশিয়ার্চ কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করার বি. ই. কলেজ ও সেট জেভিয়ার্সের খেলায় সেট জেভিয়ার্স' দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে।

অথ ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ

ষ্টেডিয়াম নিয়ে মাসিক বহুমতীর পাতার ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করেছি। কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম কিংবা একক ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন সর্বোপরি আলোচনার কথা ষ্টেডিয়াম হওয়ার আশার কথা।

ক'লকাতার নবনির্মাণিত মেঘর বি. কে. বানার্জি ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে সবিশেষ আগ্রহী হয়েছেন। বর্তমানে যে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে দাবী কমিটি গঠিত হয়েছে তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী বি. কে. বানার্জি। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উজোগী হয়েছেন। কলকাতার ষ্টেডিয়াম চোক, এই দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে বাংলা দেশের তরুণ ছাত্ররা। এই ষ্টেডিয়াম-বজের হোতা ছাত্র-সম্প্রদায়। তারা যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তরুণদের দাবী কোনমতেই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না বলে মনে হচ্ছে।

বার বার ষ্টেডিয়ামের কথা উঠেছে। পত্র-পত্রিকার বিশেষ ভাষ্য আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই কোন অদৃষ্ট হাতের ইচ্ছিতে সমগ্র উত্তেজনার বনিকা পতন ঘটেছে। সম্ভাব্যের মহারাজা, আজ থেকে দীর্ঘ দিন আগে কলকাতায় ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনের উপদেশ অমৃতব করেছিলেন। রাজা, মহারাজী, ক্রীড়াঙ্গণের দিকপালেরা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রত্যেকেই সবিশেষ চেষ্টা করেছেন কলকাতায় ষ্টেডিয়াম তৈরী হোক। ক্রীড়ামোদীরা যৌন-বৃত্তির হাত থেকে মুক্তিলাভ করুক। খেলা দেখার সত্যকার নির্মূল আনন্দ অমৃতব করুক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ষ্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জীকৃষ্ণ মেনন ষ্টেডিয়াম নির্মাণের সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী।

কলকাতার মতন এত বড় শহরে একটা ষ্টেডিয়াম নেই, একথা অন্ত কোন রাজ্যের তরুণেরা হয়তো কল্পনা করতেই পারে না। ফুটবলের পীঠভূমি, হকির তীর্থক্ষেত্র—সেখানে ষ্টেডিয়াম নেই, এর চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

কলকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্মাণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতা-মূলভ ব্যবহার সত্যিই আশ্চর্যজনক! তবু আশার কথা, রাজ্য সরকার শ্রী ঘোষকে পাঠিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে। তবু আর্থিক সাহায্য নয়, উন্নত ধরনের ষ্টেডিয়াম গঠনের জ্ঞান কারিগরী সাহায্যের জ্ঞান। শোনা যাচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার দশক বাতে খেলা দেখতে পারেন, তার উপযোগী করে একটি কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম গঠন হবে।

অধরা

(Browning's "Love in a life" অবলম্বনে)

তপতী চট্টোপাধ্যায়

মন যে আমার ছুটে বেড়ায় চাই গো তোমায় চাই
প্রতিধ্বনি উঠলে ওঠে কই গো তুমি কই
আঁড়াল থেকে ডাক দিয়ে ঘাও তাই তো আমার চাওরা
ডাক দিয়ে তাও লুকিয়ে বেড়াও যায় না তোমায় পাওরা।
জীবন-কমল-কোরক 'পরে
তোমার চরণ-চিহ্ন পড়ে
সে যে আমার হাতছানি দেয়
তাইতো পরাণ ছোটে,
তোমার পদধ্বনি পড়ে
আমার এ মন লোটে।

আসবে বধন তুমি আমার স্তব্ধ-কমল 'পরে
এমন হবে আলোর আলো তোমার স্পর্শ ভরে,
তোমার পারের অলঙ্কারাগ কমল হয়ে ফুটে
থরে থরে উঠবে ভরে আমার বক্ষপুটে।
তোমার অলক-স্তরঙ্গভার
হিয়ার মম পুস্পিত হার
পূর্ণ করে জীবন মম
মেলবে জীবির তারা,
নীরব তোমার মৌন হাসি
সকল ক্লান্তিহারা'।

কিন্তু আমার হিয়ার আলো কই গো আমার প্রেম
শ্রান্ত পথে ক্লান্ত চরণ বোঝে যে বিশ্রাম,
মনকে বলে প্রবোধ দিয়ে
শান্ত করে আমার প্রিয়ে
বলে আমার পূজবে বলে তাইতো তোমার বাঁচা
অধরারই বোজার সারা নূতন করে বোজা।

অক্ষন ও প্রাক্ষন



বিবাহিতা স্ত্রী পার্শ্বতী সখী

শ্রীঅমিয়রানী দাস

ইহা বিশ শতাব্দীর নয় বা উনবিংশ শতাব্দীর নয়।

ইহা যুগের প্রথমাবস্থা হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সসার-সৃষ্টির ও প্রাণিসৃষ্টির যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি। শুধু মানব সমাজে নয়, পশু-পাখী-কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও এই ব্যবধান আছে। সঠিক জমতালিকা দেখিলে তাহাতেও হয়ত দেখা যাইবে যে, এই দুইটি পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমভাগে আছে। হয়ত ইহা স্বয়ং জগবানেরই ইচ্ছা।

এই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে কে বড়, তাহা আজ পর্যন্তও গবেষণায় সঠিক ভাবে বলা যায় নাই। কেহ বলেন পুরুষ, কেহ বলেন স্ত্রী; কিন্তু অনেকের হিসাবে পুরুষ বড় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেবাদিদেব মহাদেব হইতে সসারের সৃষ্টির নিকট প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায় যে, পুরুষ জাতির দৈহিক বল বেশী এবং ঐ বিক্রমেও পুরুষজাতি বড় বলিয়া বলা বাইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীজাতির যে বল তাহা দৈহিক নয়, সেইজন্যই সাধারণ চক্ষে স্ত্রীজাতির শক্তির পরিচয় সচসা ধরা পড়ে না। স্ত্রীজাতির শক্তির পরিচয় দেয় পুরুষের ভিতর দিয়া। সেইটুকু শক্তির পরিচয় নয় বরং পুরুষজাতি হইতে অধিক বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

তর্ক হিসাবে বা সত্যিকার হিসাবে যদি গুণাগুণের বিচার করা যায়, তবে মনে হয় কোন জাতিই কম নয়। দুই জনেরই সমশক্তি। তর্ক হিসাবে বলা বাইতে পারে যে, যদি পুরুষ বড়ই হয়, তবে ঐ স্ত্রীর নিকট তাহার কিসের প্রয়োজন? যদি স্ত্রীর সেই শক্তিই না

থাকিবে তবে পুরুষ তাহার নিকট আসিতে পারে না। হইতে পারে পুরুষ জাতি দৈহিক বলে শক্তিমান; কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিতে স্ত্রীজাতির জয়, গঠন ও জীবন।

কবিগণ স্ত্রীজাতিকে শক্তিজাতি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তাহার কারণ নিকটই কিছু আছে, তাহার দরুণ স্ত্রীজাতিকে ঐ শক্তিজাতির নামে পরিচয় দেওয়া বাইতে পারে। কারণ উল্লেখ না করিয়া কবিদের আখ্যা লইয়াই ইহা জোর করিয়া বলা বাইতে পারে যে, স্ত্রীজাতি, শক্তি-জাতি। তাহার যে শক্তি আছে, তাহা পুরুষ-জাতির নাই।

বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হয় না। সেই বীজ যে জীব-পুরুষের নিকটই থাকিবে, এই যুক্তি বাতিল করিয়া দিচ্চেন বর্তমানে বিজ্ঞানিগণ। জীব-পুরুষের বীজ ছাড়াতো যে প্রাণীর সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ স্ত্রী ছাড়া সমস্তান প্রেম হয় কি না তাহা আজ পর্যন্তও বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা পড়ে নাই বা ভবিষ্যতে পড়িবে কি না তাহাও সন্দেহের কথা। এই বিষয়ে যেখানে প্রাণিসৃষ্টির প্রথম স্তরশক্তিতে স্ত্রী-জাতির শক্তি পুরুষ-জাতি হইতে অধিক বলিয়া মনে হয়, সেইখানে জয় হইতে মুহূর্ত্ত পর্যন্ত জীবন মাধ্যমে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে শক্তিতে কম, তাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

একটি জীবনের মধ্যে কয়টি শক্তি আসিতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, সেইখানে চারটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—মস্তিষ্কের, দেহের, মনের ও অন্তরের (ঐশ্বরিক) *। এই চারটি শক্তির মধ্যে দৈহিক শক্তিতে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে কম হইতে পারে। কিন্তু অস্ত্রাক্ত তিনটিতে হয় বেশী, নয়ত পুরুষ জাতির সমভাবে আছে, কম নয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও এমন অনেক নজীর আছে যে, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে জীবন-শক্তিতে কম নয়, তাহার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে, পুরাণে ইত্যাদিতে রহিয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষজাতি হিসাবে বলা হইল। এখন বস্তু-ব্য হইবে ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া, জাতি ছাড়িয়া যদি ব্যক্তিগত হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ বলা যায়, তাহা হইলে সাধারণত বিবাহিত ব্যক্তিদের বিষয়ই বলা যায়। স্ত্রী বলিতে বুঝায় বিবাহিতা এবং পুরুষ বলিতে বুঝায় যুবকের পরবর্তী জীবন। ঐ স্ত্রী প্রথমাবস্থায় স্বামী বা বালিকা, দ্বিতীয়াবস্থায় স্ত্রী, তৃতীয়াবস্থায় গৃহিণী ও চতুর্থাবস্থায় হন সর্ব সাধারণের বৃদ্ধ-মা। আর পুরুষ বালক অবস্থা হইতে যুবক পরিণত হয়, তার পর তৃতীয়াবস্থায় হয় সসার-কর্মী, চতুর্থাবস্থায় সর্বজনের উপদেশকারী বৃদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। সেই জন্যই স্ত্রী বা পুরুষ বলিলে বিবাহিত বলিয়া সাধারণত ধরিয়া লইতে হয়। স্ত্রী হিসাবে তাহার প্রথম জীবন বা প্রথমাবস্থার কথা উঠে না এবং পুরুষের কথাতোও প্রথম দুই অবস্থার কথা উঠে না।

বিবাহিত জীবনের স্ত্রী ও পুরুষের কথাই হইবে এখানে আলোচ্য বিষয়। কারণ, সেই সময় হইতে দুই জনেরই আসল জীবনের কাজ আরম্ভ হয়। জীবনের ধারার কার্যসূচনা, জীবনের গঠন ও

* যদি এ বিষয়ে কেহ ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন, তবে এই পত্রিকার মারফতে জানাইলে বাঞ্ছিত হইবে।

পরিচালন সম্পর্কে প্রয়োজনমতে সংসারী হইয়া, কণ্ঠ ও বর্ষের কর্তব্য-
শব্দ ব্যক্তিরা লইতে হয় সেই সময় হইতে।

বিবাহ বস্তুটি কি, তাহার আলোচনার অনেক আছে, তবে
এখানকার আলোচনা তাহা নহে। দুইটি বিবাহিত জীবনের
স্বপ্নাবৃত্তির সম্পর্কের বিষয় লইয়া হইবে আলোচনার বিষয়। যখন
‘বিবাহ’ বলিয়া কথা হইয়াছে, তখন বৃত্তিতে হইবে ইহা সংসারের
সম্মুখ-সমাজ ব্যতীত অন্তের নয়।

বিবাহের পর বালিকা হয় স্ত্রী, তার পর হয় মা, সন্তানের জননী।
ঐ সন্তান বত দিন না বয়স্ক হয়, তত দিন থাকে মায়ের কাছে,
স্নেহিত পালিত হয় মায়ের আদর-বাঞ্ছা, শিক্ষা পায় মায়ের গুণের।
বয়স্ক হইলে থাকে না ততটা মায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সখ্যক। বয়স্ক
সমানগণ পাইয়া থাকে তখন মায়ের শুভ আশীর্বাদ। সন্তানগণের
বিবাহ হইলে মা পাইয়া থাকেন কিছু মানসিক বিশ্রাম, যদি তাহারা
থাকে ভাল পরিবেশে। নচেৎ মা পাইয়া থাকেন আরও বেশী মনের
কষ্ট। সন্তানের সঙ্গ মায়ের ঘনিষ্ঠতা থাকে সন্তান বয়স্ক বা বিবাহ
হইবার পূর্বে। তত দিন থাকে সন্তানের উপর মায়ের অক্লান্ত
পারিশ্রম। সন্তান যখন বড় হয়, বৃদ্ধি হয়, স্থূল ও সামাজিক
শিক্ষা পায়, তখন আর মায়ের উপর ততটা টান থাকে না,
হাস্তে আস্তে সরিয়া পড়ে মায়ের কাছ হইতে। মায়ের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতায় শিথিল হয় তখন হইতে। বিবাহের পর মেয়ে সন্তান
বায় তাহার স্বামীর কাছে, আর পুত্র সন্তান বায় উপাধ্যায়ের
উপায়ে স্থানান্তরে। মা থাকেন তখন গৃহিণী হইয়া নিজের
স্বামীর পুর্বে। প্রায় শতকরা ১১ ভাগই দেখা যায় যে, পুত্র
সন্তান কার্যোপলক্ষে তাহার স্ত্রী-সন্তানাদি লইয়া থাকে অজ্ঞ স্থানে,
মা থাকেন তখন কোন এক দূর দেশে। কেন এমন বিকী বা
নিয়ম, সেই-ই হইয়াছে সংসারের স্ত্রী-পুত্রবের ধর্ম।

যদিও পুরাণে আছে যে, ‘জননী ভদ্রভূমিশ্চ বর্গানপি গরীয়সী’
গুরুজনদের মধ্যে জননী সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক হিসাবে।
স্ত্রী পুত্রবের কণ্ঠজীবন ও কর্মজীবনের ধারা পরীক্ষা করিলে ইহা
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাস্তব জীবনে পুত্রবের নিকট তাহার মায়ের
কর্তব্য থাকে সাক্ষিত, ঘনিষ্ঠতা থাকে জীবনের একাংশ, সম্পর্ক
থাকে ভক্তি ও আধ্যাত্মিক হিসাবে।

মেয়ে সন্তান কাটায় তাহার মায়ের কাছে। তাহার জীবনের
প্রায় এক-পঞ্চম ভাগ সময়, আর পুত্র সন্তান থাকে তাহার
এক-চতুর্থাংশ সময়। বাকী জীবন কাটায় নতুন জীবনের সঙ্গে—
স্ত্রী ও পুত্র হিসাবে বা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে। সন্তান বতদিন থাকে
মায়ের কাছে, ততদিন থাকে তাহার আদর, শিশুবাংসলা ভাব,
মনের কোমলতা।

মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলাস’
দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই,
মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের রুচিছান, সততা ও
বাস্তববোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলাস

দুটি সোনার গহনা নিখাতা ও রত্ন-সজ্জা
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



তার পর বধন হয় বহু, পাইয়া থাকে নূতন জীবন ধারণের প্রণালী, তখন থাকে না তাহার সেই শিশুস্বভাব চরিত্র। জীবন নির্বাহের ব্যতিক্রমী সময়ে হইয়া উঠে উগ্র, সময়ে হইয়া থাকে কোমল, জীবন পরিবর্তন ও পরিচালনার সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই জীবনের মধ্যে কে বেশী করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে চায় বা চেষ্টা করে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়; সেই দ্বারা চলিয়া থাকে এক দুই বংশের নয়, মৃত্যু পর্যন্ত।

বিবাহের পর নূতন জীবনের সাজ মিলিত হইয়া, জীবনের মান বজায় রাখিয়া, উভয় জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া, নিজের সন্তানের উপর কর্তব্য পালন করিয়া, জীবনের প্রায় তিন অংশ সময় চলিয়া নেওয়া যে কাহার পক্ষে হইতে পারে, কোন শক্তিতে সে সেই ভাবে জীবন বাপন করিতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। এই বিষয়ে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ইহা পুরুষের পক্ষে কঠিন, ইহা স্ত্রীজাতি ভিন্ন অঙ্গ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সেই সময়ে, সেই বয়সে, মা থাকেন না সঙ্গে। তখন স্ত্রী হইয়া থাকে মায়ের পুরুষ সন্তান—স্বামীর জীবনের সঙ্গী। তারাকৈই দেখিতে হয় স্বামীর জীবনের সুখ, লইতে হয় স্বামীর কষ্টের অংশ, করিতে হয় স্বামীর ঔৎসাহ্য সন্তানের শুশ্রূষা। নৌকার হালের মত রাখিতে হয় তাহার লক্ষ্য। মায়ের হাত হইতে লইয়া যায় স্ত্রী তাঁহার পুত্রের সমস্ত ভার। এই স্ত্রী-জীবন যে কত কষ্টের, তাহা সেই স্ত্রী-জাতিই কেবল বুঝে। না তাঁহার পুত্র সন্তানকে গড়িয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়া থাকেন। সেই জগৎই বিবাহিত পুত্র সন্তানের নামের সঙ্গে থাকে না মায়ের নাম, থাকে তাঁহার স্ত্রীর নাম। ইহা আভিকার নয়, পুরাণেও পাওয়া যায় ইহার সাক্ষ্য। শিবের নাম উচ্চারণ করিতে মুখে আসে পার্শ্বতীর নাম, যুধিষ্ঠির-ভীমার্কনের নামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে রহিয়াছে তাঁহাদের স্ত্রী দ্রৌপদীর নাম, রামায়ণের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ জীবনী ব্যাখ্যা রহিয়াছে সীতাদেবীর। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীমা সারদা দেবী, মহাত্মা গান্ধীর জীবনীর শ্রেষ্ঠ অংশে রহিয়াছে কস্তুরী বান্ধি গান্ধীর জীবন। শুণু এসদেশ নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই একই দ্বারা, জীবনের কণ্ঠ হিসাবে, ধর্ম হিসাবে, পুরুষের নামের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত থাকে তাঁহার স্ত্রীর জীবন। ইতিহাসের পাঠা পড়িলে পাওয়া যায় ইহার অনেক দৃষ্টান্ত। মায়ের নামের চাহিতে স্ত্রীর নামই পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে বেশীর ভাগে। পুরুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর বিষয়ে একাগ্রতা দেখাইয়াছেন দুইজন, মিল্লীর মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ আর ইংলণ্ডের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড। স্ত্রী-জীবনের ইতিহাসে থাকিবে এই দুই মহানদের আদর্শ চিরস্মরণীয়।

মেয়ে ও স্ত্রী-জীবনের সার কি? সঙ্গের উপর সন্ততা কোথায়? তাহার নিজের আভিভূত হিসাবে কি আছে? মায়ের বাড়িতে মায়ের আলস, স্বামীর ঘরে স্বামীর কণ্ঠ ও ধর্ম কাধের সহায়তা। তাহার নিজের বলিয়া থাকে কেবল নাম, স্বামীর নামের সঙ্গে স্ত্রীর নাম, কর্তব্য হয় স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের মিলন রাখা। স্বামীর ঘরের সুখ-সুবিধার আশা ও

ক্ষমতাছাড়া ব্যর্থতা করা ও সাহায্য করা, স্বামীর সন্তানকে লালন-পালন করা, স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সেবা শুশ্রূষা করা। স্ত্রীর নিজের জীবনের আভিভূত থাকে এই সব কাজের মধ্যে, নিজের সুখ আনন্দ সব ছাড়িয়া দেয় স্বামীর জীবনের মধ্যে, স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় স্বামীর জীবনের মাধ্যমে।

পুরুষ সন্তানের কাজে কাছে তাঁহার মায়ের বা তাঁহার স্ত্রী-জীবনের মূল্য কতটুকু, ধর্ম ও কণ্ঠজীবনে পুরুষ বা স্ত্রীর মূল্য কতটুকু, এই দুই জীবনের পৃথক ভাবে যুক্ত ভাবে আর কেহ ঘনিষ্ঠতার ভাবে কেহ আছে কি না, তাহা লিপিত বিষয়গুলি হইতেই স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, কাহার শক্তি কতটুকু—পুরুষের না স্ত্রীর?

একটি নির্জলা ভ্রমণ কাহিনী

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

কাঁকড়ীপের উদ্দেশ্যে ডায়মণ্ডহারবারের পথে। দু'দিকে উগ্রক

প্রান্তর, সবুজ আর সবুজ—দূরের ধূমায়মান বনরাঙিতে বিলীন হয়েছে নীল আকাশের কোল। ধানকাটা সারা হয়ে গেছে—খড়ের গোড়াগুলো খালি কান্ডের চমকতায় নিঃস্বর্ণ ভাবে জড়িত হয়ে অপসৃত-সর্বশূন্য হওয়ার লজ্জার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে আছে মাঠে। মাঝে মাঝে দু'টো-একটা কড়াইশুটি আর খেসারী ক্ষেত—খেলাঘরের যেন নয়নবিশুদ্ধকর সবুজ আর চমৎকার নীল অথবা শাদা রংএর ছোট অথচ অসুর্কি কুল বকে নিয়ে।

দূরের নারকেল গাছগুলো যেন বেড়া দিয়ে বেধেছে এই সব দেদার মাঠকে, চুকতে দেবে না কাউকে। তাই মাথা তুলে আছে আকাশে অষ্টপ্রহর নাড়ছে, মাথা অনবরত, না, না, না, প্রবেশ নিষেধ, নিষেধ নিষেধ।

পাকা রাস্তার বাঁ হাতে সড় রেলের লাইন পথের সঙ্গে পালা দিয়ে চলেছেই চলেছে। মাঝে মাঝে ইন্ডিয়ান—সবই যেন খেলাঘরের। আর ডানহাতে রাস্তার সঙ্গে পালা রেখে চলেছে সড় খাল একটানা ত্রিগতিরিয়ে টলটলে জল নিয়ে। দু'-একখানা শালতি বাঁধ রয়েছে এখানে-সেখানে।

মাঝে মাঝে গ্রাম অর্থাৎ কয়েকটা চালাবাড়ীর সমষ্টি—চাষীরা সেই জলের ধারে জাঁট করে বাঁধা খড় আছড়ে বান বার করছে। সোনার-এর খড়ে গাণা আলো করে রেখেছে এক এক জায়গাকে। নিকোনা নিটোল উঠোনে ছেলে কোল করে দাঁড়িয়ে আছে চাষী-বোঁ।

একটিমাত্র বাঁশ কেলা পুলের ওপর দিয়ে করছে কেউ কেউ আনাগোনা বড় রাস্তায়। ভাবী সূক্ষর লাগে দেখতে—একটার পর একটা ছবি যেন, খালি ছবি। বাদে ভালবাসি তাইরে এনে দেখাতে ইচ্ছে করে, একা দেখে তৃপ্তি হয় না মনটা কেমন কেমন করে। মাঝে মাঝে হাটী রাস্তার ধারে, তরিতরকারী আর ভাব—ডাবের রাজত্ব যেন!

কথা ছিল ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে হন্ট করা হবে একেবারে কিন্তু বিধি বায়। একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে বাস বিগড়ে বসল। বাক্। তবু সামনে গ্রাম রয়েছে একটা ডানহাতি। নেমে পড়া গেল। অজ দিকে হাট আর মাঠ, কেবল মাঠ।

ঐ জেট গ্রামে ঢুকে ছায়াঘেরা ঐ শান্তির নীড়ে বাবার লোভ সামলাতে পারা গেল না। কিন্তু হায়! বাঁশের পুল পেরোন হবে কেমন করে? বাঁশের পুলের কাছে সকলকে জড়ো হ'তে দেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে একদল বৌ, গিন্নী, ছেলেমেয়ে। একটা কালো বং-এর গলায় বৃত্ত বরাঁধা কুঁচুরও বেরিয়ে এসে এই অনন্যকার প্রবেশোত্তর অদৃষ্টপূর্ব আশুনিকাদের দেখে তারস্বরে চীংকার করতে লাগল।

একজন হাসিখুদী বয়সী এগিয়ে এসে বলল, এসো না মা, এসো। কি করে বাব?

কেন? এই পুল পেরিয়ে?

ওরে বাবা, মরে বাব—সবাই চৈতন্যে উঠল একসঙ্গে।

কেন, ভরতী কি? এই তো আসবে সড়সড় ক'রে, বলে এক নিমেষে সেই সড়সড়িয়ে এপারে এসে হাজির হ'ল। তখন হুঁ-চার জনের সাহস হল—হিলতোলা শিশুর সকলের পায়ে—তাই হাতে নিয়ে বাঁশে পা ঘষতে ঘষতে হুঁ-চার জন কায়ক্রেপে উৎসাহে তোলনরকমে। ওপারে বৌদিরা তো হেসে অস্থির—ছেলেমেয়েগুলো তো দুয়ো-দুয়ো সূঁচক হাততালি দিতে আরম্ভ করল। বীরস জাগলো তখন সকলের মনেই, সবাই তৎপর হ'ল তখন কণ্ঠবিস্তারে।

সুখমা মজা করল সব চেয়ে বেশী—আত্মক পথ গিয়ে আর এগোতেও পারে না, পেছোতেও না—রীতিমত কান্না শুরু—বপাং ক'রে ওর হাতের কাচবসানো লম্বোই শিশুর পড়ে গেল জলে।—হায়, হায়, হায় করে ও-ও বুকি পড়ে এইবার! সকলের বুক চিপ্, চিপ্, করতে লেগেছে।

ওপারের একটা বছর দশেকের মেয়ে এসে উদ্ধার করল ওকে—হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে।

বাবা, বাঁশের পুল পেরোন এত! এ যে মহা প্রস্থানের পথ যে বাবা!

ওপারের ওরা বহু সমাদর করল। এসো মা, বসো মা—এই যে চিড়ে কোটা হ'চ্ছে, খাওনে—ছেলেদের ডেকে ডাব চিরে দিই মা, বোসো—ইত্যাদি অনর্গল ব'লে। কি পরিহার পরিচ্ছন্ন নিকোন উঠোন, ঘরশোর, ঢেঁকিশাল।

দড়ির দোলনার স্তইয়ে রাখা থোকা আর নিকোন উল্লনের পাড়ে কুতুলী পাকিয়ে শুয়ে থাক। বেড়ালটা পর্যন্ত যেন আনন্দের উৎস এক একটা। উঠোনে বিছান ধান ভকুচ্ছে—দাওয়ার উঁচু ঠোঁকিতে বসে তিনমাথা এক হয়ে বাওয়া এক বৃদ্ধ—নলিতে, কে গো। বলে সাড়া নিল।

একটা বিরাটকার শুঁড়ুল গাছ বৃঁকে পড়ে পাহারাওয়ার মত দৃষ্টতে যেন বাড়ীটার অভিসন্ধি দেখবার জন্ত উদ্ভূত হয়ে আছে—তাই বাড়ীর এক পাশটা কি ছায়াশীতল।

বসব বসব করা হচ্ছে এমন সময় ডাইভার ডাক দিল আমাদের, এখনই যেতে হবে—কাছেই সেই সন্দের আতিথেরতার সুরোগ গ্রামে পূর্ণচ্ছেদ ফেলে উঠতে হ'ল—ও মা, সে কি কথা মা, চললে একুণি?

প্রা, আসব আবার—আবার আসব বলে বেরোন হল।

সুখমার ভিক্স ড্রাবডেবে ফুলাবান জুতো একটি ছেঁকে উদ্ধার

করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। এবার ওরা একটু দূরে একটা 'অন্যায়সে' পার হবার পুলে নিরে গেল আমাদের—তাতে ভিনটে বাঁশ আছে—এখান দিয়ে মাল বায় কি না তাই এটা এত চওড়া, বলল গিন্নী।

বাবা! এত চওড়া! পুল পার হতেও আমাদের শৌঁষ মাসে গায়ে ঘাম বেরোল।

আবার যাত্রা। বেলা তখন অনেক। আবার সেই মোহের অজ্ঞান মাথিয়ে দেওয়া নিগন্তবিসারী মাঠ আর মাঠ দু'দিকে—আর মারের মাঝে গ্রাম—দৃষ্টিশ্রবকর প্রসঙ্গময়।

কথা হল যে এবার যে হাটটা পাওয়া যাবে সেখানে খেমে একটু চা-টা খাবার চেষ্টা দেখা যাবে। কাজেই—সামনে ডান হাতি খালের ধারে একটা চালা—একটা সাইনবোর্ড কাত মেরে রয়েছে, তার উপর কি যেন লেখাও রয়েছে তাতে।

এতগুলি জীব নিয়ে বাসকে খামতে দেখে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ল এদিকে—ও মা! হুঁ মিনিটের মধ্যে যে সেই চালাখানার চালে উঠল একটা লোক। নীচে দাঁড়াল আর একজন—সাইনবোর্ডখানা ঠিক করে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—আদর্শ হিন্দু হোটেল—অনেক খাদ্যের সমাগম সম্ভাবনার মুখ শুঁজড়ে পড়ে থাকা সাইনবোর্ডের এই কপাল ফেরা।

বাঁশাদি' তখন গল্প শুরু করলেন—এটা কি রকম হোটেল জানেন?

কি রকম? কি রকম? সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

তখন বাঁশাদি' আরম্ভ করলেন—এতো একখানা চালাওলা ঘর দেখছেন, একটা চালা বিছানা শুতে পাতা আচ্ছ নিধাং—তাতে একটা কোল-বালিশের মত লম্বা মাথার বালিশ। যে হোটলে যাবে, মানেজার জিজ্ঞাসা করবে—কাত, না চিং?

সে আবার কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি।

কাত মানে কাত হ'য়ে শোবে, না চিং মানে চিং হ'য়ে শোবে।

এ কথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ?

স্থানাভাব। কাং হ'য়ে শুলে এক আনা ভাড়া, চিং হ'য়ে শুলে দুই আনা।

জানবে কি ক'রে, কে কখন চিং হচ্ছে?

সারা রাত মানেজার কাম পাহারাঘার বসে থাকবে আর চোটেবে—২নং চিং=০/০, ১নং চিং=০/০, এই রকম আর কি—

হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে নামা হ'ল বাস থেকে। খালটা আগাগোড়া গেছে, এখানে ওপারে বাবার জন্ত বাঁধানো পাকা সাঁকো একটা। সাঁকোর কপরেই নানান নিধি, ডাব তো আছেই—ভেতরে চায়ের দোকান দুটো-চারটে, কিন্তু যারা করছে চা আর বাতে ক'রে করছে, তা দেখেই চা-তেই গলাতেই মেরে ফেলতে হ'ল।

এখানেও চিড়ে কোটা হচ্ছে কিন্তু কলে—হাঁ-হাঁ করে আঙুন জলছে আর পাহাড় পাহাড় চিড়ে কোটা হ'য়ে যাচ্ছে নিমেষে—আমাদের এদিকে কখনও দেখা যায় না এসব, ধানের রাজত্বে ভিন্ন ব্যবস্থা।

একটু পরে আবার বাসে ওঠা। কিন্তু গাড়ী যে ষ্টাট নেয় না আর—কি মুস্থিল।

ভিড় জমে গেল এবার। হাটের ভিড়, চারিদিকে বাসের—

নানা মন্তব্যের পর সাবাস্ত হ'ল যখন এটা বাস নয় গল্পের গাড়ী, তখন অপমান আর সইতে না পেরেই বোধ করি অচল বাস সচল হয়ে উঠল।

ডায়মণ্ডহারবারে যখন পৌছান গেল, তখন পাঁচটা।—নামলায়।
সামনে গঙ্গার সে কি রূপ! সেই প্রলয়ঙ্করী গঙ্গার দিকে তাকালে ভয় করে—আবার বিশ্বে মন ভুঙ্ক হয়ে যায়—কত জল, কত জল! আর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে যেন তীরভূমি গোঁগ্রাসে গিলে খেয়ে চলেছে গঙ্গা, সর্বনাশী রাক্ষসী! মনে হয়, সব গিলে থাকবে, সব!

বস্তু যাত্র, কত অর্থব্যয়ে বাঁধবার সংকল্প করবার চেষ্টা করা হয়েছিল পাগলীকে—কিন্তু সে অটোহাসি হেসে টুকরো টুকরো করে অবহেলায় ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে সে বাঁধন—তাইই তাইই করে নাচেছে আবার!

ওই দূর নিগন্তে অন্ত যাচ্ছে সূর্য, লাল টুকটুকে, বর্ণনা করা যায় না এমন রং নিয়ে—ওপার থেকে এগার পঞ্চাশ সিঁদুর ঢালা একটা হিলিবিগি কাটা পথ—যেন স্বর্গে যাবার ঢেউখেলান সিঁড়ি।

এমনি অন্ধুত, এমনি ভাষার অসীত, এমনি আকাঙ্ক্ষার বজ্র—কিন্তু দূর থেকে উপভোগ্য, কাছে বাবার নামে ভয়!

কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে এদিকে—কাকবীপ চলুন, কাকবীপ চলুন, সকলে বীড়াপিড়ি করলেও খামখেয়ালী বাসের ওপর নির্ভর করে তা চলে না কিছুতেই, অতএব ফেরা।

সীতের সন্ধ্যা, দেখতে না দেখতে অন্ধকার কখন এসে যেন ঘিরে ফেলল মাঠ, পথ, চারিধার—সবুজ দূরের গ্রামে গ্রামে একটা আধটা টিমটিমে আলো আর কাছে দূরে জোনাকীর মিটমিটানি ছাড়া অন্ধকার, সব অন্ধকার!

একটা বিরাট গাছতলায় এসে বঁ্যা—চ করে খেমে পড়ল বাস।
—তবু গাছতলায়!

তারপর আর চলে না—ডাইভার, মিস্ত্রী গলদঘন, তবু চলে না—কিছুতেই না—এদিকে রাত ঘন হয়ে আসছে—এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা কেটে চলল, বাস চলে না।

লোকালয় অনেক দূরে—এখান থেকে হেঁটে আসার খোঁজাও পাগলামী। পারলিক বাস যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তাইতে চড়ে বাক্সইপুরে যেতে পারা যাবে এখান থেকে ২১২২ মাইল—তারপর বাস বদলে বেঙ্গালা, সেখান থেকে এসপ্রানোড, তারপর গন্তব্যস্থল। নানা ভক্তকট—আমাদের বাসে জিনিষপত্রও রয়েছে—তার ওপর এই তেপান্তরের মাঠে ডাইভার আর মিস্ত্রী বেচারীকে ফেলে বাওয়া সেও যেন কেমন। তাই বতকর্ণ খাস ততক্ষণ আশ করে বাস থাকতে থাকতে রাত সাড়ে নটা।

লাঠি পারলিক বাসও চলে গেল বোধ হয়। বাড়ীতে কি ভাবনা সব ভাববে—আর রাতে যে আর কেবা থাকে না, তাও স্থিরনিশ্চয়—তখন নাক কাঁদা আরম্ভ হল প্রাণ সবাইকার।

রাতে না কিরলে কার বাড়ীর লোক যে কি করবে—ভাবনার কার বাড়ীর লোক হাটফেল পঞ্চাশ করবে, তারও ফিরিস্তি শুনে শুনে কান বালা-পালা আর বলতে বলতে মুখ ব্যাধ করতে লাগল।

দূর দ্বিষ্টিয়ে আলোকগুলো সব নিবতে লাগল একে একে।

অচিরেই হয়ত সবই নিববে শুধু কবাল মুখ বাদান ক'রে দু দিন থেকে এগিয়ে আসবে অন্ধকার আর শুধু অন্ধকার।

আশে-পাশে হুঁচকার জন করে লোক জমেছে। কৌতুহলী হয়ে দেখছে, উঁকি-ঝুঁকি মারছে। গুন গুন করছে। একটা টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে মাঠ পেরিয়ে দুটা লোক এসে, ঘমদুত।

বাদের গায়ে গয়না ছিল তাঁরা সব খুলে ক্রমাগত বেঁধে বুকের মধ্যে রাখল। গয়না শরীরে সখ কেন হয়েছিল এই হিত্তার নিতে দিতে।

কি করা যায়? কোথায় বাওয়া যায়?

রাগুদি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকদেরই অনেক ইতস্ততঃ করে (সম্বোধনটা কি করবেন অনেক ভেবে ভেবে ঠিক করে ইলিশ মাছের নৌকার মাঝিদের যা ব'লে সম্বোধন করা হয়, রাগুদি বেছে নিলেন সেই সম্বোধনই) কত্যা ও কত্যা, এখানে বাবুদের বাড়ী আছে? (ভেবেছিলেন রাগুদি যখন কোন উপায়ই হবে না তখন অন্ততঃ কোন ভক্তলোকের বাড়ী গিয়ে রাতটুকুর মত আশ্রয় নেন)।

না।

কত দূরে আছে?

এখান থেকে দু কোশ, আড়াই কোশ।

দমে গেলেন রাগুদি, জিজ্ঞাসা করলেন আবার:

কাছাকাছি গ্রামের নাম কি?

মোন্সার টেস।

রাগুদি, চুপ। অস্ত্র সকলের অভিযোগ প্রবল হয়ে উঠেছে এবার।

কেন পারলিক বাস হবে হোল না আগে।

হায় রে! ধারাপই যদি হ'ল বাস সেই আদর্শ হিন্দু হোটেলের কাছেই কেন হ'ল না বীণাদি'র সেই কান্ত, ১০ আর চিহ্ন ৬০ দিয়েও না হয় কোল বাসিশে মাথা গোঁজা যেত। অথবা সেই অতিনিখৎসল গিন্নার বাড়ীর সামনেই বা কেন হল না—এই ধরনের পড়ার থেকে যে বাঁশের পুল পেরোন ঢের ভাল ছিল।

হায় হায় করতে করতে বাঁশল' সাড়ে দশটা। বাইরের অন্ধকার আর কৌতুহলী সেই কতাদের কেন্দ্রে ক'রে কত উদ্ভট ভয়ংকর কল্পনা যে পাগল ক'রে দিতে লাগল মনকে।

আর আশা নেই—কিন্তু নেই—বড় করে নিঃশ্বাস পড়ল বুক থেকে রাগুদির।

কিন্তু হয়ত সকলের মনের আকুল প্রার্থনায়ই একথানা বাস আসতে দেখা গেল—গ্যারেজে ফিরছে।

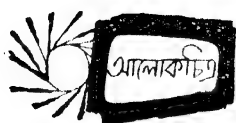
বঁধে, বঁধে, বঁধে—সকলে ছিটকে পড়ে বাস থেকে কাঁড়ান হ'ল রাস্তায়—যদি না থাকে। যদি না থাকে।

ডাইভার হকটিকেরই থামাল নিশ্চয়—ডাকাত পড়ল নাকি! আমাদের জিনিষপত্রের কথা মিস্ত্রী আর ডাইভারকে ঝড়ের বেগে বুঝিয়ে দিয়ে দয়ামায়া আর না ক'রে ডাবল ফেয়ার সিগল জারি ক'রে বাক্সইপুর।

সেখানেও সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে—তবে ঐ ভাগ্যিস গ্যারেজে ফেয়ার নিয়মটা আছে—তাই বাজা বেহালা—আবার সেখান থেকে এসপ্রানোড—কিন্তু তারপর? বাড়ী ফেরবার লাঠি ট্রেনও তো হাওড়া ছেড়ে ব্যাঙল পৌছে বাসি হয়ে গেছে! একলা দোকলা হ'লে না হয় ক্লাস্ট্রিয়-স্বকনের বাড়ী ভঁজা যায়, এত রাত্তিরে অশোভন



দিলওয়ারা মূর্তি
—অসিত রায়



ফতেসাগর লেক (রাজস্থান)
—বিলীপকুমার ব্রুখোশাঘ্য





সাক্ষসজ্জা

— মীতেশ অধিকারী





খসর-বাগ (এলাহাবাদ)

—কমলেশ দে



ভিক্টোরিয়া

— অমিতকুমার সরকার

খাতের লোভে

—বহু বাস্কাপাদায়



হ'লেও। কিন্তু এই সাক্ষাৎসাক্ষ্য নিয়ে। যতই বলা হোক খাব না, শোব না—সুখ তোমাদের বাইরের ঘরটাতেই বসে বসে রাতটুকু পুইয়ে নেব—তারা কি তা শুনেবে?—কোলকাতা সহরে পয়সা ফেসলে যত রাস্তারই হোক খাবার হয়ত মিলবে কিন্তু শোওয়া? এই প্রচণ্ড শীতের রাস্তার? একটা মাত্র লোক এলেই বা শুতে দেবার বাড়তি বিছানা থাকে ক'টা বাড়ীতে? কিন্তু এসপ্লানেডে এক দল মহিলা দাঁড়িয়ে থাকে তো যায় না। প্রথমে ঠিক হ'ল হাওড়া ষ্টেশনের ওয়েস্টে কুম্ভেই কাটিয়ে বেওয়া হবে রাত—কিন্তু বড় দৃষ্টিকটু লাগে সেটা—

রাগুদি' বললেন। চলুন বউবাজারে আমাদের 'ব্যাঙ্ক'—সেখানে বসে-বসেই না হয় কাটিয়ে দেব রাতটা। তবু একটা আশ্রয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের দায়োয়ান তো চেনে না আমাদের। খুলবে কেন গেট অত রাস্তার? কথটা যুক্তিযুক্ত বটে।

তবু চেষ্টা—আর সাড়ে বাইরা তো বেজে গেছে, আর রাত কতটুকু বা—না যদি গেট খোল দায়োয়ান তখন দেখা যাবে, বসে আবার পাড়ি সেই বউবাজারে।

বা ভাবা গেছে তাই—নেপালী দায়োয়ান হতভম্ব—তালাবন্ধ গেটের ওপার থেকে সে কোন কথার কান দেবে না।

রাগুদি তখন মানোজারকে ফোন করে অনুমতি নিতে বললেন দায়োয়ানকে। সে রাজী হয়ে ভেতরে গেল।

ভাগ্যক্রমে বাঁশরী বলে একজন কর্ণারী কার্ধ্যগতিক দেখিন বাড়ী বেতে না শেষে তেতলার শুয়েছিলেন। দায়োয়ান বুদ্ধি করে নিয়ে এল তাঁকে। সব শুনে গেট খোলালেন তিনি।

ব্যাঙ্কের পথের ওপরের বড় হল ঘরটা হ'ল ফানিচারের শো-রুম।

রাতের মত ওখানেই থাকতে হবে। করোয়ই আর গাঁড়াবার মত ক্ষমতা ছিল না—দায়োয়ানের খাটিয়ায়, টুলে, সিঁড়িতে যে যেখানে পেয়েছে বসে পড়েছে ইতিমধ্যে।

শো-রুমের ভেতরে আবার একজন দরজা বন্ধ করে পাঠারা দিচ্ছে—কুন্তকর্ণ। দরজা থাকিয়ে থাকিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে যাবার ষোণাড় বাঁশরীর আর দায়োয়ানের।

অনন্তকাল পরে জাগলেন অবশেষে মুচুকন্না।

তখন আর কথারবার্তা নয়—সেই সবভঙ্গিচরিত্র চক্চকে নয়ন-বিমুগ্ধকর বহু মূল্যবান সোকার আর গদা পাঠা খাটে ওঠা বিনা ব্যাখ্যায়।

বাঁশরীর আতিথেয়তার তুলনা হয় না অত রাত্রেও। চা-খাবারের ব্যবস্থা করলেন সঙ্গে সঙ্গে চেনা দোকানের দোকানদারকে জাগিয়ে।

তারপর বাকী রাত! শো-রুমের নিশ্চল আসবাবগুলোর ওপর সচল সচল মডেল হয়ে। কাচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিশাচর দু-চার জন—পুলিশ ও—হয়ত বিশ্ময়ে দেখছিল দাঁড়িয়ে। হুটোখের পাঠা একও করিনি আমরা। এই অভিনব অভিজ্ঞতা, অভাবনীয় ভাবে রাত্রি বাপন—বাড়ীর সকলের দুশ্চিন্তার কথা ভেবে তা সম্ভব ছিল না।

রাগুদি' একবারে সামনেরই সোফাটাতে শুয়েছিলেন—রাস্তার ওপারে এক অতিপরিচিতা ফিলস্টারের বিরাটকার ছবি 'আলোর নিচেই। ভাবছিলেন যার ছবি সে কি স্বপ্নেও ভাবছে তার ছবির দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে রাত কাটাচ্ছে কেউ! রাগুদি' তাকিয়েছিলেন বটে কিন্তু ভাবছিলেন অনেক কথা। ভাবছিলেন উচ্চশিক্ষিতা, অতি আধুনিক, বোজগেয়ে হলেও মেয়েরা মেয়েই, বেশরোজ হওয়ার উপায় নেই, হওয়া যায় না—নানা ছুজুর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় সর্বদা, বাড়ীতে বকুনি খাওয়ার ভয়েই তো কাঠ হয়ে রাত্রে ক'জন।

সংগঠ চূপচাপ। মাঝে মাঝে একজন হয়ত বগছে—কি ঘুমোতে পারে বাবা সব, এর মধ্যেও ঘুচ্ছে? তখন সংগঠকার একসঙ্গে সারা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, এ অবস্থার ঘুচ্ছে? এ অপবাদ সহ করতে সকলেই নারাজ। অমনি আবার এর ওর নাম ধরে ডাকাডাকি হাসি, শানিকটা গল্প একটু; আর রাগুদি'কে ক্ষেপানো ও কড়া ও কড়া, বাবুদের বাড়ী আছে এখানে? এ গ্রামের নাম কি কড়া? মোল্লার ঠেস। মোল্লার ঠেস—হাসি আর হাসি এখন।

ভোর চারটেই আবার বাঁশরী। পত্রপাঠ হারিসন বোডে গিয়ে ট্রাম ধরে হাওড়া ষ্টেশন।

তারপর সারা ট্রেন কার কি মনে হচ্ছিল তার ইতিহাস আর কার বাড়ী গিয়ে কি হবে, তারই ভাবনা আর ভয়।

কবিরাজু জিজ্ঞাসা করলেন রাগুদি'কে—কাকবীশে কি দেখলেন? কাক? না বীশ?

দুই-ই উত্তর দিলেন রাগুদি'।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ মাংস খুললোনার আশঙ্কা আর অর্থে সমুদ্রে একটু বীশ।

ডুল কাকলী চট্টোপাধ্যায়

হয়তো ডুল করেছি আমি,
হয়তো একই ডুল তুমিও করেছ।
সেই ডুল যদি সত্যি ডুল হয়
তা'হলে, রবি শশী তারা ডুল।
ডুল 'বউ কথা কও' পাখির গান,
সাগরের প্রতি তটিনীর অল্লরাগও
ডুল, আর তুমি আমি, এ জীবন-বোঁদন সবই ডুল।

কিন্তু ডুল নয় হৃদয়ের স্তম্ভিত আবেগ
চোখের কোণে ভীক স্বপ্নের এলোমেলো মেঘ।
ডুল নয়, বিদ্রোহের ঢগল প্রেরণা,
হরিশীর কালো চোখে মুছাইন জন্মের উৎসব
বিনিময় বসন্ত রজনীতে।
ওগো ডুল নয়,—
এই জীবন-বোঁদন ডুল নয়।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

এগারো

ফুলতলায় গাভের উপর হোটেল। টাপুরেঘাটা অজ্ঞপ্ত সেখান থেকে। জগা বলাই ও তার বড়ই এইখানে উঠছে। রেটটা কিছু বেশি জুই হোটেল, জনপ্রতি এক দিকি এক এক বেলায়। তবে শেট চুক্তি। এবং তামাক ও মাখবার তেল ক্রী। কোন খন্দের রাজে থাকতে চাইলে একটা মাহুরও দেবে, সে বাবদ কিছু লাগবে না।

রেটের কথা শুনে তার বড়ই আঙ-পিছু করছিল। বলাই তাত ধরে টানে : এশে দিকি। মা বনবিবির আশীর্বাদ থাকে তো তিন জনের তিন দিকি নিয়েও ওদের জিনে যেতে দেবো না। তিনটে পাত্তা করতে বলে ঠাকুর মশায়। দেখা থাক।

বাহুন ঠাকুর মালিকের কাছে এই তথির বাণীর বলে থাকবে কিছু। এর পরে দেখা গেল, খাওয়ার সময়টা খুব তিনি সামনের উপর দাঁড়িয়ে। বলাইর আরও বোধ চড়ে যায়। ভাত দিয়ে ঠাকুর ডাল আনতে গেছে, ঠাঁতিমধ্যে হুণ সহযোগে সমস্তগুলো ভাত সাপাট দিয়ে সে বসে আছে। বাটিতে ডাল ঢেলে দিয়ে আবার ভাত আনতে গেছে, বাটির ডাল চৌক করে এক চুম্বকে ঘেঁরে দিল। এক খন্দের নিয়েই নাস্তানাপুৰ বাহুন ঠাকুর। মালিক রাগে গরগর করছে। বলে : বড়ি-মুহুরি দশ পয়সা সের হয়ে গেছে। আর ডাল পাবে না বাণু।

হর বলে, কোন হোটলে তো এ নিয়ম নয়। ভাত আর ডাল নিয়ে কেউ কথাকথি করে না। খন্দের সব ভেগে যাবে এমনখারা করলে।

হোটেলওয়াল জাউঙ্গি করে বলে, তাদের ালে মাল থাকে কতটুকু? বড় জোর মালসাধানেক ডাল রাঁধে; আর বড় গামলায় ক্যান-ডাল গুলে বেগে দেয়। গামলায় ক্যান হাতল করেক ডাল ঢেলে আচ্ছা করে খেঁটে দেয়। বাস, হয়ে গেল। তারাকি ভক্ত দেবে না, অমন ডালে খরচাটা কি?

বলাই তাড়াতাড়ি বলে, থাকগে, ডাল কে চায়। ভাত হবে তো? আর হুণ? হুণ না হলেও চলবে, শুধু ভাতই সই।

হুণ-ভাতই চলল। হোটেলওয়াল চমৎকৃত হয়ে দেখছে। জগার আনন্দ ধরে না। হাঁ, বাহাজুর বলি বলাইকে। হুজিছাড়া

রেট সম্বন্ধে লোকটার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। হাসি চেপে জগা জিজ্ঞাসা করে, অমন এক নজরে কি দেখেন মশাই?

লোকটা বলে, চোখে তো ওর বাইরেটা দেখছি। টিপে দেখতে ইচ্ছে করছে, চামড়ার নিচে বোধ হয় এক কুচি কাড়মাস নেই—শুধুই খোল। তুলো ভরার আগে পাশবালিশের খোলের মতন।

দেই পয়সা দিনের পর থেকে হোটেলওয়াল লোকটা আর অমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ঘোরাক্কেবার মধ্যে এক একবার উঁকি দিয়ে যায়। চোখ মেলে ব্যবসার ডাঁহা সর্বনাশ দেখতে ভয় করে বোধ হয়।

খাওয়ার পরে পয়সা মিটিয়ে নেয়, এবং পানের খিল দেয় খন্দেরদের। সেই সময় জিজ্ঞাসা করে, ক'দিন আছ আর তোমরা? জগা ভালমানুষের মতো বলে, কাজ মিটেলে তবে তো। খাওয়ার কথা! পনের বিশ দিন লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। ভয় নেই, যে ক'দিন আছি, তোমার হোটেল ছেড়ে অন্য কোনখানে নড়ছি নে।

আমি তো হুণ-ভাত খাওয়াছি, অন্য সব হোটলে দেদার ডাল দেয়, তবু বাবে না? ঐ বসময় চক্কোতির ওখানে বাও। বড় বড় মাহুর দাগা—

জগা বলে, উঁহ, তুমি যে মাহুর ভাল। তোমার ঘরের দাওয়াটা আরও ভাল। ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। শুয়ে শ্রু আছে।

সেই রাতে শুতে গিয়ে মাহুর খুঁজে পায় না। গেল কোথা? হোটেলওয়াল বলে, দেখ কোন দিকে পড়ে আছে। বাতাসে হয় তো বা গাভের কোলে নিয়ে কেলেছে। কি করব, বাড়তি মাহুর মাহুরে ক'টা রাখতে পারে বলে?

হর বড়ই তখন বলে, ঘুসোর উপর শুইয়ো না দাদা। বের করো মাহুর। আজকেই শেব। সকালবেলা আমরা চলে বাছি।

ঠিক? তুমি মুকামি মাহুর—কথা দিচ্ছ কিছ। ছোড়াগুলো কখন কি বলে, ওরা বললে বিশ্বাস করতাম না।

হ্যা, বলছি আমি। নিশ্চিহ্ন হয়ে মাহুর বের করো দাদা। ঢোলক আজ বিকেলেই পাবার কথা। হয়ে উঠল না। ছাউনির কাজ রাতের মধ্যে শেব করে রাখবে, ভোরবেলা দিয়ে দেবে।

হোটেলওয়াল বলে, পুরানো লোক তুমি, অনেক দিনের

ভালবাসাবাসি। এরকম খন্দের হোটেল কোন আক্সেল এনে তুললে বলা তো?

খাইয়ে দেখছি নাকি? তসে উঠে হর ঘড়ই বলল, আচ্ছা, এবারে কাউকে বধন সঙ্গে আনব, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে পরখ করব আগভোগে।

বজ্র হাওয়া হোটেলের শিখন দিককার দাঁড়ায়। মাহুরের উপর পড়ে আছে তাই, নয়তো মাহুর সত্যি সত্যি উড়িয়ে নিয়ে যেত। ক'টা রাত পাশাপাশি ঝাটিয়ে গেল তিন জনে। জগা-বলাই দমাদ হয়ে ঘুমায়ে। ঘড়ইয়ের মগজের ভিতর নানান মতলব—এক এক সময় অতীত হয়ে ওঠে, চুপচাপ থাকতে পারে না, বৃক্ষ জগা-বলাইর গা ঝাঁকিয়ে তাদের কাছে অতীত আর ভবিষ্যতের কথা শোনার। বন কেটে বসতির শুরু—এই তো ক-বছরের কথা। কী হয়ে গেল তারপর দেখতে দেখতে! আরও হবে, শহর হলকাতা জমে উঠবে দেখা বাসা অঞ্চলের মধ্যে।

সকালবেলা উঠে জগদ্বাধ ছুটল ঢোলের দোকানে। পরগা কিয়ে দিয়ে জিনিষটা শুধু নিয়ে আসা। বলে, তোমরা ঘাটে লে বাও। যদি একটু দেরি হয়ে যায় টাপুরে-মারিকে বলে করে গ্রহণি বলাই। নৌকো ছেড়ে না দেয়।

ঘাটে গিয়ে বসছে বলাই। আছে বসে তো আছেই। এই দাঁত্বি বলে হর ঘড়ই পথের পাশে এক দোকান ঢুক পড়ল। গাট-মাহুরের দোকান। জগাও দেখা নেই। নতুন হাউনির পর ঢালক কি রকমটা ঝাঁড়াল, পরখ করতে গিয়ে হয়তো সে দোকানেই ভাল তুলতে বসে গেছে। কিছু বিচির নয়। কেউ যদি হুটার বার বাহরা দেয়, বাস, হয়ে গেল আক্সেলের মতন টাপুরে ধরা। দোকানের উপরেই গান-বাজনার আসর। জগাকে বিশ্বাস নেই, জগা সব পারে।

ঘাটের উপরে এক দোকান। ভাল দোকান—বিড়ি খিল-পান বাতাসা হুড়ির-মায়া সমস্ত মেলে! দোকান চালাঘরে—কিছু নিটে মাটির উপরে নয়। খানিকটা উঁচুতে বাঁশ ও গরানের ছিটের মাগা; মাচার উপরে মালপত্র ও দোকানদার; উপরে বস্তুর ঢাল। কোটালের সময় গাভের জল বেড়ে মাচার নিচে ছলছল করে। দোকানের সামনে খুঁটি পুঁতে চেরা-বাঁধের বেঞ্চি মতো করে বেখেছে, জন পাঁচ-ছয় বসে আছে বেঞ্চিতে—বিড়ি খাচ্ছে, পান খাচ্ছে। টাপুরে-নৌকার চড়্কার একা সব এবং বলাইও বসেছে এই জায়গায়। নৌকো ছাড়া-ভাড়া। উঠে পড়েছে দেবির লাগ। এদেরও ডাকছে। বলাই একদলজের চেয়ে পথের দিকে। সোজা পথ—বাঁকচুর নেই। উষেগের বশে এগিয়েও দেখে এসেছে বারকয়েক।

টাপুরে-নৌকার ভাড়ার দরদাম করতে হয় না। একেবারে ব্যারখোলা অবধি বাবে তো চার আনা। তবে ঠিক অর্ধেক পথ কুমিরমারি কিছু নয়। পরগা। তেলিগাতি এক আনা, গরলগাতি তিন আনা। গরুয়ে কীড়িয়ে এক জনে ঠাক পাড়ছে: ব্যারখোলা কুমিরমারি গরলগাতি ছাড়ো নৌকো, ছাড়ে-এ-এ-এ—

এক ছেড়েও ছিল টাপুরে। কাছি খুলে হাল-কাঁড় বেয়ে চলে গেল মাক-গাউ অবধি। বেকির উপরের চড়্কারেবরা নড়ে না—ওগতানি করছে, নড়ুন করে বিড়ি ধরাচ্ছে আবার। হাঁ, আসছে

এইবার—বলাই ঠাহর করে দেখে, 'মাহুরটা জগদ্বাধ না হয়ে যায় না। আসছে বাতাসের বেগে, দৌড়ানো বলা চলে। কাছাকাছি এলে দেখা যায়, ঢোলক বুলছে পিঠের দিকে—ঢোলকের আটার মধ্যে চান্দ-গলিয়ে পৈত্তের মতন কাঁধের উপর আর বগলের তুল্য দিয়ে নিয়ে গেছে।

ছেড়ে গেল নাকি যে?

বলাই বলে, নতুন বউ হয়ে পালকি থেকে নামলে দেখছি। বা বললে, আর বোলো না। লোকে হেসে খুন হবে।

বেকুব হয়ে গিয়ে জগাও হাসতে লাগল। তা বটে, পরানো কাঁধটা টাপুরেওয়ালাদের। ছাড়ছি বলে মুখে মুখে চোলে চড়্কারে গা করে না। ঘাট থেকে সত্যি সত্যি ছেড়ে খানিকটা আগু-শিছু করতে হয়। তখনও এমন কিছু চাড় নেই, সে তো এই বুঝতে পারছ নৌকার লোকগুলোর ধরণ দেখে।

গাভের দিকে তাকিয়ে জগা অবাক হল: এক-পো ভাঁটি নেমে গেল, এখনো চড়্কার ডাকে। ব্যারখোলা আজ পৌঁছতে হবে না, গরলগাতি কি কুমিরমারি অবধি বড় জোর। আর দেখি কিসের মাঝি? ছাড় এবারে।

ছড়ইয়ের ভিতরের লোকগুলো কলহব করে ওঠে। হমের মতো কথা পেয়েছে। ঠিক কথা, সত্যি কথা, ছাড়ো এখনি। কেউ বাকি থাকে তো সে লোক কালকে বাবে। দু-এক জনের জন্তে এত মাহুর কষ্ট পাবে, সেটা হতে পারে না।

মাঝি চেনে জগাকে! এ অঞ্চলের গাভে, খালে বাঁদের গভায়াত, জগাকে চিনবে না এমন কে আছে? চড়্কারে চোঁমেটি করছে, ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল—জন্ত কেউ নয়। জগা এসে আবার ফোঁড়ন দিচ্ছে স্থার ভিতরে। রাগ করে বলে, দেরি তো হোমাদের জন্তে জগা। তুমি এসে গেলে, তোমাদের হর-ব্যাশারি এখনো পাতা নেই। বাবে ফেলে তাকে? তাই চলে। ফজি তুলে ফেল ওরে ছোঁড়া। কাঁড়ে চলে যা।

জগা বলাইকে বলে, ঘড়ইটা কোথা পড়ে রইল? আমি ভাবছি, ব্যস্তবাগীল মাহুর—নৌকার মধ্যে আগভোগে গিয়ে বসে আছে।

বলাই বলে, আসছিলাম হুজনে। মাহুরের দোকান দেখে ঘড়ই ঢুক পড়ল। বলে, এগুতে লাগ, একটা শীতলপাটি নিয়ে বাচ্ছি।

পায়ে পায়ে তারা নদীর খোলে গিয়ে দাঁড়াল। জগা বলে, ছেড়ে দাও মাঝি, আর কাল নেই। শীতলপাটি কিনতে গেছে—দোকানদার সৎসা করে আনতেও তো একতরু লাগে না।

এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। নৌকো ছাড়বার মুখে এ ধরনের কথাবার্তা হামেশাই হয়ে থাকে। শেষ মুখটার বজ্র পুঁতে নৌকার কাছি তার সঙ্গে জড়িয়ে রাখে। রাগের বশে বজ্রি একবার বা তুলেই ফেলল, পরক্ষণেই আবার পুঁতে দেয়। এক চড়্কারের ভাড়া চার-চার আনার পরগা ছেড়ে বাওয়া সহজ কথা নয়।

এমন সময় দেখা গেল, হর ঘড়ই বিভিন্ন দোকানের ধাবে এসে গেছে। হাত উঁচু করেছে সেখান থেকে।

মাঝি ঠাক দিচ্ছে: চলে এসো, চলে এসো—

জগা শুড়ে ওঠে: কোথা ছিলে একতরু তুমি?

হর হাঁপাচ্ছে। কাঁধের শীতলপাটি দেখিয়ে বলে, সৎসা

করলাম। আগে মনে ছিল না, নৌকাদের সামনে এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

জগা বলে, ওরে আমার লাটসাহেব! বড় পরশা হয়েছে। নাক্তির অন্নপ্রাশন দিয়ে উঠলে সেদিন, তার উপরে আবার এখন নীতলপাটী!

ওদের মধ্যে চলিত বিশেষণের দুটো-একটা প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল। বলাই দ্বিগত জগার মুখে হাত চাপা ধরে: চূপ, চাষামি করবে না এখন। মুখ দিয়ে ভাল কথাবার্তা বলে।

নৌকোর গলুয়ের একজন ভিতরের দিকে ইঙ্গিত করে চাপা গলায় বলে, ভাল লোকেরা আছেন, চূপ চূপ—

কাল ভেঙে বাকী ক-জনে এবার উঠে পড়ল। বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। নৌকো বেশি জলের দিকে গেলো কালা ছাড়িয়ে তবে পা তুলে নেবে। জন ফুড়িক চড়নার আগন্তাগে চড়ে বসে আছে। একটা ছইয়ের নিচে অন্তগুলো মানুষ—সোরগোলে গাড়ে তো তুফান উঠবার কথা। কিন্তু কী তাজব, ধানেন বসে আছে সকলে যেন। অথবা মানুষগুলোকে কেউ বুঝি খুন করে নৌকোর উপর ফেল দিয়েছে। অ্যান্ত মানুষ—বিশেষ করে জোয়ানযুগা বেগুলো আছে, এমনবারী চূপচাপ থাকে কখন করে? তামাক খাচ্ছে, তা-ও অতি সাবধানে। হাঁকো টানার বড়ফড় আগুয়াজি বেন অতিশয় লজ্জার ব্যাপার।

ভাল করে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাশারটা মালাম হল জগার। কাড়ালে দুটো মেয়েমানুষ। দুটো মাত্র মূল্যের ভয়ে বাঘের দোসর এতগুলো মরদ ঠাণ্ডা। দুই বা বলি বেন—একজনে খোমটা টেনে জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বিনোদিনী—বিনি বউ—গগন দাসের পরিবার বিনি বউ কিছু নয়—মূল্য হল অপরটি, ঢাক। কী সন্দেহ গোলগাল পরিপুষ্ট হয়েছে! কাপড়-চোপড়ও নিবি বাহর। জোয়ান পুরুষদের সামনে কমবরসি মেয়ের লজ্জা করা তো উচিত, তা সে-ই তো দেখি নাটার মতন বড় বড় চোপ ঘুরিয়ে এক নৌকো মানুষ জরু রেখেছে। টাপুবে-নৌকোর মেয়েমানুষ চড়নারও যায়। কেনাবেচা করতে যায় ফুলভলাত, আবার তল্লাটের বউ-কিরা বাপের বাড়ি খণ্ডরবাড়ি বাতায়ত করে। দরগা ও ঠাকুরনতলায় পূজা কতে চলেছে, এমনও আছে। এরা সে দলের নয়—চেহারা এলাকপোশাক ও চালচলনে বোঝা যাচ্ছে আবার এলাকাই নয় এরা। উত্তরের ভ্রম অঞ্চল থেকে আসছে। আদম পুরুষরাই—যার নেই মূলধন সেই আসে বাদাবন। শুল হাতে এসে আস্তে আস্তে জমিয়ে নেয়। কাড়ালি চৌধুরি যেমন একদিন বনকরের বাবুদের চক্কোতি রাঁধুনি হয়ে এসেছিল। আশায় আশায় এসেছে যেমন ঐ গগন, এবং গোপাল ভরখাজও বটে। পুরুষেরা আসে, কিন্তু বাইরের ভ্রম অঞ্চলের মেয়েলোক এই প্রথম বোধ হয়। তাই দেখে তাদের সামনে বানার জোয়ানপুরুষেরা ভ্রম হবার লজ্জা উঠে পড়ে লেগেছে।

বিরক্তি দিয়ে জগা ছইয়ের বাইরে বসে পড়ল। আকাশ মেঘে ভরা, কণে কণে বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির জল বরষার কবে ভিজিয়ে দিয়ে গাঙের জলের উপর দিয়ে বনের মাথার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একবার এই হয়ে গেল, বাকটা না ঘুরেইই ফের সেই কাণ্ড। তা হোক, বৃষ্টিতে বারবার চান করবে তবু ছইয়ের ভিতরের ঐ ভেড়ার পালার মধ্যে নয়।

চলেছে, টাপুবে-নৌকো চলেছে। ছপ-ছপ দাঁড় পড়ে একটানা, মচমচ আগুয়াজি ওঠে দাঁড়ের বাঁশ দড়িতে। অন্তল নিশব্দতার মধ্যে ঐ বা এক ধরনের আগুয়াজি। জগা আর পাবে না, কেপে গিয়ে বলে ওঠে, বাক্যি সব হয়ে গেল—তোমাদের হল কি আজকে মাঝি? ভুত দেখেছ না বেলে-সিঁদুর খাইয়ে দিয়েছ কেউ? (বেলে-সিঁদুর সঠিক জানিনে, খেলে নাকি মানুষের বাকশক্তি উপে যায় একেবারে)

মাঝি বলে, বকবক করে হবে কি? গরানগাছির খাল নিয়ে ভাবনা, শেখ-ভাটায় একেবারে জল থাকছে না। কোমর ভর কাঁদা।

দাঁড়দের ক্ষুধি মিছে: সাবাস ভাই। জোর জোর এমন মেয়ে দিয়ে শুঠ। কুমিরমারিতে জোয়ার করে দাও। নংতো সারা বাজের ভোগান্তি।

আবার চূপচাপ। জগা তখন হর বড়টুক নিয়ে পড়েছে: তোমার লজ্জা দেখি। মাছের পরসার বড় গরম—উ, নীতলপাট বিনে ঘুম হয় না?

হর গলা বাড়িয়ে জবাব দেয়, পাটি আমার নয়। বড়দার।

জগা বলে, বটে! আমাদের কিছু বলে না, চুপি চুপি তোমার কাছে ফরমাস করল।

ছড়েছড়ির মানুষ তোমরা। ঠাণ্ডা মাথায় দেখেচেনে বাছগোছ করে কেনা পোষার তোমাদের? হেরা, এই একখানা পাটি পছন্দ করতে বিশখনা অন্তত লেড়ে ফেললাম। শলা সফ-মোটা হালকা-ভারী আছে, বৃহনি ঘন-পাতলা আছে, অনেক কিছু দেখে নিতে হয়। হুঁ-হু, সোশা নয়।

বলাই বলে, ওসব কিছু নয়। বড়দার লজ্জা করেছে আমাদের বলতে। খড়ি বাড়ি খালে নেমে ডুব দেয়, গরম কি রকম বুঝতে পারো না? জল লোনা হোক বাই হোক পানকোড়ির মতো ডুবতেই হবে।

জগা বলে, আর সেই মানুষ, এদিকে দেখলি তো, বাড়ির চিঠি না খুলে উঠানে দেয়। খুলে পড়লে মন পাচ্ছে নরম হয়ে গিয়ে কিছু পাঠাতে ইচ্ছে করে। বড়দা বলে মাংস করি—কিছু এক এক সময় চামার বলতে ইচ্ছে করে।

হর বড়টুক ডাড়াডাড়া চাপা দেয়: থাক থাক। ভজলোকের মেয়েছেলোরা যাচ্ছে, অকথা-কুখথা মুখের আগায় জানবেন না।

ভাল রে ভাল! মুখ খুলেই ব্রত হয়ে ওঠে অন্ত সকলে। কোন বেখালা কথা কখন বেরিয়ে পড়ে।

দীর্ঘকণের এত রাত্তা তবে কি বোঝা হয়ে কাটাতে হবে? জগা তা পেরে উঠবে না, ভজলোকের মেয়েছেলোরা বা-ই বলুক। তখন দাঁড়দের বলে, হাতে মুখে চালাও তাই সব! দাঁড় যারা, গীত ধরা ঐ সঙ্গে একখানা—

চাপা গলায় হর ধমক দিয়ে ওঠে: খামো। ওঁরা সব যাচ্ছেন গীত আবার কি লজ্জা এর মধ্যে?

বা: রে, ওঁরা যাচ্ছেন বলে বুঝে তালিচাবি এঁটে থাকতে হবে! আমার ধারা পোষাবে না। তোমাদের সরম লাগে তো আমিই ধরছি গান—

দাঁড়দের উদ্দেশ করে আবার বলে, গান গাইবে না তো



প্রিয়াঙ্গ

...সুন্দরী

নারীদের

ঐতিহ্য

“প্রিয়াঙ্গ” নামটা সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল প্রিয়াঙ্গে
তাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা প্রিয়াঙ্গ সাবানের সাহায্যে
তাদের লাগেজের যত্ন নেন — প্রিয়াঙ্গ আসল
মিনারিণ যুক্ত সৌন্দর্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিত্ত্ব এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম প্রিয়াঙ্গ ট্যালকম
পাউডারে অপূর্ব স্বগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিত্ত্বতা।



আপনার সৌন্দর্য
চর্চায় নিয়মিত
প্রিয়াঙ্গ ব্যবহার করুন

PSTP. 3-X&2 BQ

এ অ্যাণ্ড এক প্রিয়াঙ্গ লি: লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লি: কর্তৃক তৈরিতে প্রস্তুত।

দোয়ারিকি করে আমার সঙ্গে। তাঁরা গাভের উপর একলা গলায় জুত হবে না।

বাড়ি কাত করে গালে বাঁ-হাত চেপে ধরে আঁ-আঁ-আঁ করে জগা তান ধবল।

বলাই কিছুই দিয়ে গুঁতো দেয় : আঃ, কি হচ্ছে ?

ফিক করে হেসে ফেলে জগা বলে, গুনতে পাচ্ছিস না ? গান—গান নয়, কানের ফুটোর বুগুর মারা। কি ভাবছে বলে দিকিনি মেয়েছেলে। বাড়ির মতন না চেঁচিয়ে গানই ধরো তবে সত্যি সত্যি।

জগা বলে, গানের ভুই কি জানিস রে ? গান হলোই বুঝি নাকি-কান্না ! নানান সুরের গান আছে। আজকে এই চেঁচানো গানে আমার মন নিচ্ছে।

আরও করে দিল মার-মার কট্ট-কাট রবে, কানে তাল ধরিয়ে দেবার মতলব। কিন্তু কিছু দখল আছে বিজাটায়—সুরটা এক সময় মোলারেম হয়ে উঠেছে, তাল-মাত্রাও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে গানের ভিতরে। ঐতিহাসার ভাব তখন আর উগ্র নয়। আবেশে এমন কি চোখও বুঁজে গিয়েছে, হাতের চেঁচোয় খাবা দিচ্ছে নৌকোর উপরে। ছইয়ের বেড়ার গায়ে ঢোলক, বলাই পা ঘষে ঘষে গিয়ে পেড়ে আনবার তালে আছে সেটা।

খসখসানি আওরাক পেয়ে জগা চোখ মেলল। চাক ছইয়ের বাইরে চলে এসেছে। এসেছে সামনের উপর। বৃহত্তে শাসন করতে এলো নাকি ? অস্ত্রের কথাই হল না তো ঐ পরিপুষ্ট হাতে জোয় করে তার হুখ চেপে ধরে গান ধামিয়ে দেবে ?

গান আপনা-আপনি থেমে গেছে ততক্ষণে। জাজব কাণ্ড। জগন্নাথ বিধাসের সঙ্গে লাগতে এসেছে—বত বলবানই হোক—বেটাছেলে নয়, মেয়ে একটা। পরক্ষণে আচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেল গুহু করবে আবার শ্রবল কঠে—আগেভাগে মেয়েটাই বলে ওঠে, খাসা হিচ্ছিল—খামসেন কেন ?

আরো আশ্চর্য, আপনি-আপনি করে কথা ! জগা বেশ মাজবান মাহু, খাতির দেখিয়ে তেমনি ভাবে বকছে। এ তল্লাটে এ সব চলে না। হলে কি হবে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভদ্র অঙ্কস থেকে। উৎকট লাগে জগার। নীরস কঠে সে বলে, গানের এই খানটায় আমি খেমে বাই।

সে কি গো ? মাঝখানে খেমে পড়লে ভাল লাগবে কেন ? আমার এই নিয়ম।

নগেনবন্দী নিয়ে চলেছে একের। অথবা চাকই অপর দুটিকে টেনে হিঁড়ে বাল্যবনে নিয়ে যাচ্ছে। নগেন ডাকে, চলে এলো চাক, ওদিকে কি ? ওদের সঙ্গে কি বচসা লাগিয়েছে।

চাক কানেও নিল না। অভিযানে কঠ একটু বুঝি খমখমে হয়ে যায় ! আমি না এলে ঠিক আপনি সারা করতেন। বেশ, বাড়ি আমি ভিতরে।

আমার গান সারা হয়ে গেছে।

চাক তর্ক করে, ককণো হয়নি ! বা-তা বোঝালেই হবে ?

বিনোদিনী এবারে বাগ করে ওঠে। কি হচ্ছে চাক ? চলে আসবি কিনা, তাই বল।

চাক বলে, একটা সোঁয়ার স্বভাবের মাহু খাকে বউদি, লোকে বা বলে ঠিক তার উন্টোটি করবে।

নৌকোহুদ মাহু খ হয়ে তার হুখের দিকে তাকিয়ে। কোথাকার মেয়ে এসে উঠেছে, একটুও সজোচ নেই। জগা হেন পুরুষকেও হুখের উপর ট্যাক-ট্যাক করে শুনিয়ে দেয়। বলে, বেশ, তবে আমি বলছি গান আর গাইবেন না আপনি। এখানে শেষ।

গাবোই না তো !

এটা কি হল ? একমত হয়ে গেলম যে তবে ! আমি এক কথা বলব, আর বাড়ি হেঁট করে তাই আপনি যেনে নেবেন ?

জগন্নাথ বলে, আমার উন্টোপাটা রীত। লোকের কথা কখনো শুনি, কখনো শুনি নে। এবারটা শুনব।

বিনি বউ আবার ডাকে, ওরে চাক, চলে আর—

বাচ্ছি বউদি ! গানটা পুরো শুনে তবে যাবো।

কিন্তু গান আর হল না কিছুতে। চাকও নাছোড়বান্দা, গান না শুনে নড়বে না। বাড়ি সামলে আসন-পিড়ি হয়ে বসে ফেল সামনে। বসেই রইল। থাকো বসে, বয়ে গেল। সারা হেলাস্ত বসে থাকো না, কি হয়েছে।

চাক রাগল অবশেষে : বউ বাচ্ছোতাই মাহু খ আপনি। না গাইলেন তো বয়ে গেল। মেঠো গান বই তো নয়। এর চেয়ে ভালো ভালো গান কত আমরা শুনেছি !

উঠে ফরফরিয়ে চলল। ছইয়ের নিচে গেল না আর, উঠল গিয়ে ছইয়ের ছাতে। উঠবার ধরনই বা কি, খুঁটিতে পা ঠেকিয়ে তড়াক করে উপরে উঠে পড়ল। কী গেছো মেয়ে রে বাবা ! সার্বাস দেখিয়ে বেড়ার নাকি ? ছইয়ের উপরে উঠেই কিছু একেবারে চূপ—মুঠ পেড়ে কে যেন পাষণ করে দিয়েছে। যুদ্ধ চোখে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। মাঠের দূরপ্রান্তে অবধি সবুজ রঙে ঢাকা, এতটুকু ফাঁক নেই কোনখানে। উল্লাসিত কঠে সহসা চাক কথা বলে ওঠে, জঙ্গল ঐ নাকি মাঝি ? বাদানব ?

জগন্নাথ উপবাচক হয়ে সামাল করে, নৌকো টলছে—জলে পড়ে গেলে চিন্তির। জঙ্গলের স্মৃতি বেরিয়ে যাবে তখন।

নিরুদ্বেগ কঠে চাক বলে, কিছু হবে না। ভাল সাঁতার জানি আমি।

সাঁতারের ফুরসৎ দেবে না। কুমিরে ধরবে কিবা কামঠে কাটবে। কেটে নেবে বধন, বেশ হুড়হুড়ি লাগবে। তারপর দেখা যাবে, পুরো একটা পাই পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝি বলল, ছইয়ের উপর অমন করে পাড়ার না বুনডি। বসে বসে দেখ।

অনেক পথ গুণ টেনে গরলগাছির খালের কাষায় নৌকো ঠেলে ঠেলে অনেক কঠে কুমিরমারি পৌছানো গেল। বড় গাভের মধ্যে উজান বাওয়া চলবে না। বাতাসও হুখড়। নৌকো চাপান দেওয়া ছাড়া গতি নেই। আরও ধান ছই বাঁক গিয়ে দোখালার ভিতর কোন গভিকে যদি ঢুক পড়া বেশ, খালে খালে বা-হোক করে এগুলো চলত। হল না হরর দোবে। তার ভই মিতলপাটি শঙ্ক করত গিয়ে।

জগা বলে, বয়সখোলায় কাক নেই, কুমিরমারি মেয়ে আমার হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব। তোমাকেও হব, হাঁটতে হবে আমাকে সঙ্গে।

ব্যাপার-বাণিজ্যে দু-চার পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করে হর উঠে ধানিকটা বাবু হয়ে পড়েছে। বলে, জানো না তাই। পথ খনো হয়েছে নাকি? বনজঙ্গল জল-জাঙাল—

তোমার জন্তে এত লোকের ভোগান্তি। ছাড়ছিনে তোমায়। টিতে না পার, পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে তুলব।

হর চুপ করে বসে। কথায় কথা বাড়ি। ভদ্র অঞ্চলের মানুষ নৌকোর বাঁচে, তাদের সামনে আরও না জানি কী বলে বসে। ঠাকুরকেই ছোট ছোট টিনের চালা। কুমিরমারির হাট। হাটের মধ্যে বাটের ধারে নৌকা কাছি করল। থাকতে হবে বেশ গানিকরণ। জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ভাঁটার টান বতকণ না ধরছে। এক প্রহর রাত হবে তা বটেই।

নেমে পড়ছে সব চড়শায়। মরা গোলেন জল বড় নেমে গিয়েছে। নিকা না উঠানের মতো নীচ-ব তক তক করছে। ছোট ছোট মাছ কাদার উপর ছাপ কেটে সব সর লুকে ছুটোছুটি করছে এদিক-সেদিক। পা চাপালে কাদার মধ্যে বসে যাচ্ছে। নোন কাদা আঠার মতন লেপেটে যাবে, কাদার ভায়ে পা উঁচু করে তোলা দায়। ছোটার বলে তবু তো অনেক দূর অবধি নৌকো উঠে এসেছে।

নামতে হবে গো এবারে। নেমে ধেয়ে-ধেয়ে চরে-ফিরে বেড়াগে এখন। টানের মুখ বুঝে সেই সময় এসে।

চাক নামতে গিয়ে থমকে গাঁড়াল। বাবা নেমেছে, তাকিয়ে তাদের দুর্গতি দেখছে। মুখেই এত কড়কড়ানি—কাদায় পা দিতে হবে, জাঁতে উঠছে সেই শঙ্কা। সাপের মুখে পা দিতেও তা মানুষে এমন করে না। তা নামতে না চাও তো থাকো নৌকোর খোঁপে আটক হয়ে, অস্ত্র সকলে নেমে যাক, থাকো পড়ে একা একা। কার দায় পড়ছে, কে পিঠা দিচ্ছে দুর্গা ঠাকুরের সিংহের মতন—সেই পিঠের উপর পা রেখে কাদা পার হয়ে উনি ডাঙার উঠবেন। আর যে পারে পাঠক, জগা বিশ্বাস নয় কখনো। তার দিকে তাকায় কেন ব্যর্থতার, ভেবেছে কি? বাঁধন-জাঁটা নিটোল দেহটার শোভা দেখছে। দেখে তাই, আর কিছু প্রত্যাশা কারো না। মাথার কাপড় দেওয়া অপর মেয়েলোকটি দিবা তো নেমে এলো। আর নবাবনন্দিনী, দেখ, নাকি-নাকি বুলি ছাড়ছে: সবাই চলো বাছ! যে বউদি, একা-একা আমি পড়ে রইলাম—। যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে রেখেছে ছইয়ের বাঁশের সঙ্গে। কাদায় নামবে না তো ভড়াক করে লাকিয়ে পড়ে এই জগন্নাথের মতো। কাদা তো বড় জোর হাত আঁঠেক জায়গায়—আট হাত লাকাত পারো না, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবে আর শাসন কিসের অত?

এক দল পশ্চিমা কুলি রাস্তার মাটি ফেলছে। বেলা পড়ে এলো, কাছ করছে তবু এখনো। আর কত কাল লাগবে যে বাপু! মাটি ফেলাটা হয়ে গেলেই পায়ে-ইটাংর অন্তত সোঁা পথ পাওয়া যায়, গাঙে-বালৈ ঘূর্ণপাক খেয়ে মরতে হবে না। খালের উপর পুল হবে। পুলের জন্ত ইটকাঠি লোহালজ্জি এসে পড়ছে। খাল-ধারে পাহাড়-প্রমাণ তক্তা গালা দিয়ে রেখেছে। আরে আরে, কি করছে দেখে ছোঁড়া কটা—চার-পাঁচটা তক্তা কাঁধে বয়ে এনে কাদার উপর ফেলল। তক্তার উপর পদারবিধ রেখে ঠাকুরের ডাঙার ওঠা হবে। আবশ্যক তো বেড়েই চলবে এমন ধারা তোয়াক্কা হলো।

এক বন্দোবস্ত সঙ্গেও মেয়েটা যেন গলে গলে পড়েছে। চাক নয়, নাম হওয়া উচিত ছিল ওর নবনীবালা। নৌকোর কাড়ালে গাঁড়িয়ে বলছে, হাত ধরো না গো কেউ তোয়রা। নামি কেমন করে তক্তার উপরে?

তা-ও চার-পাঁচ মরদ এগিয়ে এসেছে হাত ধরে নামাবার তরে। বকম দেখে জগা গাঁড়িয়ে গাঁড়িয়ে চাসে। হঠাৎ সে-ও ছুঁল—তার সঙ্গে পারবে কে? ছুটে দবলের আগে চলে গেল। কাড়ালের এপাশে ওপাশে হাতগুলো উঁচু হয়েছে চাককে নামিয়ে আনার জন্ত। সকলের উঁচুতে উঁচু আছে জগার ইম্পাতের মতো কঠিন কালো হাতখানা।

জগার বিক্রম, লক্ষ দিয়ে কাদা পার হওয়ার সময় সকলে জেনে বুঝে নিয়েছে। চাকও বুঝেছে। আগে বাড়িয়ে এসে গাঁড়াল সেই মানুষ। হাতে হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে জগা মেয়েটার হাত অমনি মুঠোর পরে হেঁচকা টানে এনে ফেলল তক্তার উপরে নয়—তক্তার পাশে কাদার ভিতর। আর কেউ হলে সে টানে কাদার উপর গড়িয়ে পড়ত, লজ্জা মেয়ে তাই সামলে নিল কোন গন্তিকে।

ছুটো কাঁতাকা—বজ্রাতের বেহদ! বাগে গরগর করতে করতে ঠাক দু-হাতে একতাল কাদা তুলেছে জগাকে ছুঁতে মারবে বলে। কোথায় জগা? চক্ষের পলকে অত দূরে ঐ নতুন রাস্তার আড়াল হয়ে গেল। কিবা ঘোঁরা হয়ে আকাশেই উড়ে গেছে হয়তো।

ছুটে ছুটে চাকও রাস্তার উপর গেল। নতুন মাটি ফেলে অনেক উঁচু করেছে—চতুর্দিক সেখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। গেল কোন দিকে? যে চুলোয় গিয়ে থাকে, থাকুক না আপাতত পালিয়ে। নৌকা ছাড়বার সময় হলে আসতে হবে বাছাধনের। শোখবোধ সেই সময়।

হর বড়ই বাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ? পায়ে পায়ে কত পথ ঘেরে দিল তারা এতক্ষণ! একা নয়, জগা আর বলাই। আমাকেও টেনেছিল। আমি কারো গোলায় নই বাপু, স্বাধীন ব্যবসা আমার। ঘেরি হল কিবা তাড়াতাড়ি পৌঁছলাম, আমার কি যায় আসে? আমি কেন কষ্ট করতে বাই?

মানুষ অবাঁক হয়ে যায়: বলা কি গো? রাস্তার একটুখানি নিশানা হয়েছে কি না হয়েছে—জলে নেমে খালই পার হতে হবে তিন-চারটে—

হর বলে, এক পহর ঠায় বসে থেকে তারপর নৌকোর শক্তক অঞ্চল ঘুরে বাওয়া—এর চেয়ে জল কাঁপানো কাদা মাখা অনেক ভাল ওদের কাছে। বতকণে নৌকা বদারখোলা যাবে, ওরা ধেরেদেয়ে পুরো এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠবে তার ভিতরে।

ঘোপহরন্তু কামিজ-পর্য নগেনশঙ্কর সঙ্গে হর এবার পরিচয় করছে: বাবু মশায়ের বাওয়া হচ্ছে কোথা? ভেবেছিলাম কুমিরমারিতে শেষ। নতুন চৌকি বসে গেল, কুতঘাটা হল, বাবু লোকের আনাগোনা বেড়ে গেছে—মাল-স্বামী এসে পড়ে এবারে গেরহালি পাঠাবেন। আরও নাবালো বাছন এঁদের সব নিয়ে? কোথায়?



ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

[কোনও এক প্রাচীন বা আধুনিক প্রতিষ্ঠান বা সমাজ কিংবা কোনও ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশ্লেষণ এইখানে করা হয় নি। এই উপস্থাপনের প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক মনে করে নিলে আমি পাঠকদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।]

আমাদের কাছ হতে ছিনিয়ে নেওয়া গামছা ও কাপড়ের খুঁট দিয়ে একের বাহুর সঙ্গে অপরের বাহু বেঁধে তাদের গুরু-ভেড়াব মত তাড়াতে তাড়াতে চিংপুর রাস্তার মোড়ে এসে শান্তিদল সহ প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফিরে ঘটনাস্থলটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তখনও পর্যাপ্ত বজ্রবাড়িগুলির মধ্য থেকে মধ্যে মধ্যে ইট-পাটকেল ও সোজাওয়াটারের বোতল দাঁ-দাঁ করে ছুটে এসে কচুয়ী গলির ডান দিককার দিতল কোটাবাড়ির দেওয়ালের উপর পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল।

সামনের ট্রামরাস্তার উপর দিয়ে দুই-একখানা ট্রাম তখনও যে না চলছিল তা-ও নয়। কিন্তু তার ভিতরকার বাতীরা জ্বল সললেই ছিল এই অঞ্চলেরই লোক। নিরীক্ষার চিতে তারা গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাহিরের তামাসাটা দেখে নিল মাত্র। আশে-পাশের দোকানদার এবং পাথচারীদের দেখলেও মনে হয় তারাও রাস্তার সাধারণ পথিক এবং ট্রামের বাতীদের মতই নিরীক্ষার। এইরূপ ঘটনা প্রাত্যহিকই এখানে ঘটে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাদের নিকট এইরূপ ছোটখাটো ঘটনা গা'-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা'ছাড়া এখানে শাস্ত্রী পুলিশ ও জুরাড়ীদের মধ্যে ঝগড়াও হচ্ছে। তাদের এই হারজিতের মধ্যে জন-সাধারণের আগ-দ্যার কি। এই স্থলে তারা নিরীক্ষার লবণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব 'পাড়ার গুণ্ডা' পাড়ার কাকুরই ক্ষতি করে না। তবে তারা থামকা পয়ের ব্যাপারে জড়িয়েই বা পড়বে কেন? ভনা গিয়েছে যে, প্রাচীন ভারতে রাজার রাজার যুদ্ধের সময়েও কুবক্ষর্য মনের আনন্দে ভূমি করণ করে যেত। এরাও তো সেই প্রাচীন ভারতীয়দেরই বংশধর। তারা যদি তাদের বংশের বাবা এই ভাবে বজায় রাখে তাহলে সেই জন্ত দোষ দেওয়া বাবা না।

এদের এইরূপ মনোবৃত্তি প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। তাই তারা সদলবলে বড়ো রাস্তার উপর এসে

নিজেদের কতকটা নিরাপদ মনে করলেন। এমন সময় তাঁরা তাঁরা লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি সামনের কোটা-বাড়ি হাথ ঘরিত গতিতে বেরিয়ে আসছে। ক্রমশঃ দিগে মুখটা চেপে রাখতে তাকে একজন ভক্তলোক বলেই মনে হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রণব বাবু ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলেন। ভক্তলোক তাড়াহুড়া মুখের উপর হতে ক্রমশঃ গিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, আরে এ আমি! আমি প্রণব বাবু! চিনতে পারছেন না আমাকে?

প্রণব বাবু আশ্চর্যাবিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, ভক্তলোক তাঁর খুবই পরিচিত এক বনো ব্যক্তি। স্থানীয় মনোরম্য থিয়েটারের তিনি একজন মালিক। এছাড়া স্থানীয় একটি কলেজে তিনি প্রফেসরীও করে থাকেন। জনসমাজে ভক্তলোকের নানা কারণে সুনাম আছে। তাঁকে এই ভাবে একটা বেজাবাটি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চিরঞ্জীব বাবুও কম আশ্চর্য হননি! কারণ ঐ বাড়ীটার ঘরে ঘরে যে মধ্যপ্রাচীর বেজা নারীগণ বাস করে, তা উভয়েরই জানা ছিল।

'আপনারা খুব আশ্চর্য হচ্ছেন, না'? প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে ভক্তলোক বলে উঠলেন, আজ্ঞে—এই বাড়ীটা আমার নিজের হলো এখানে আমি ভাড়া আদায় করতে আসি নি। এমন-কি থিয়েটারের জন্ত কোনও একট্রেনের সন্ধানও এখানে আমি আসি না। উষাক চেনেন তো? আমাদের থিয়েটারের উষা। গত দশ বছর হলো দুজনে স্বামি-স্ত্রীর মত এইখানে থাকি। তাই প্রতিটি সন্ধ্যায় এইখানে বসে দুই তিন আমাকে কাটিয়ে যেতে হয়। এখানে বৈশীকণ আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া নিবাপদ নয়। আপনাদের বৈশীকণ আর এখানে অপেক্ষা করবেন না। আপনাদের মহলে মেলামেশা আমার বড় দিনের। তাই বলছি এখান থেকে চলে যান এখনি। শাস্ত্রীদের মধ্যে মিহামিছি বৈশী কাণ্ডহুলেটি হলে কর্তৃপক্ষ আপনাদের ট্যাটলেশ বলে অভিহিত করে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন। তা'ছাড়া ভেতরে আরও ব্যাপার আছে। সব কথা আপনাদের এখানে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আজ্ঞা, তাহলে চলি আমি—

ভক্তলোক ঘরিত গতিতে পাশ কাটিয়ে রাস্তার ওপারে অদূর হয়ে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সবগে আর একখানা ট্রাম-গাড়ী এসে পৌঁছল। এদিকে ভক্তলোকের উপদেশের মধ্যে যে বখে যুক্তি ছিল তা অভিজ্ঞ অক্ষির প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই আর ঘটনাস্থলে দেহী না করে ট্রামটিকে ধামিয়ে আদামী ও শাস্ত্রীদের নিয়ে তারা ঐ গাড়ীর সেকো রূপ কামরার উঠে পড়ে থানার দিকে এগিয়ে চললেন।

২

জোড়াসাঁকো থানার ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ অফিসার মহীন্দ্র বাবু অফিসার-ইন্চার্জের নির্দিষ্ট কামরার বসে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু জন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এই দিন সরকারী ও বেসরকারী এই উভয়বিধ কাজে তাঁকে বহুক্ষণ থানার বাহিরে কালাশহর করতে হয়েছিল। মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে তিনি থানায় ফিরে থানার জন্ত অফিসারদের নিকট হতে ঘটনাটি সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। ব্যস্তভাবে তিনি থানার জারোয়া খাতার

পাতা উঠাতে উঠাতে দেখলেন, তাতে লেখা আছে যে, এটা পচিশ মিনিটে আশ্বারাম নামে জনৈক ব্যক্তির মিকট হাতে চিরঞ্জীব বাবু উপর কচুরী গলির শুভাসের ভামলার বিধর অবহিত হয়ে প্রণব বাবু করেক জন সিপাহীসাহী সহ ঘটনাস্থলে রওমা হয়ে গিয়েছেন। এর পর একটু ভেবে নিয়ে তাঁর মুখের চকটে আরও ছোট-একবার 'টান' দিয়ে বাড়ির দিকে ভাকিয়ে তিনি দেখলেন যে, ইতিমধ্যেই ঐ ঘড়িতে সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছে। এই সময় থানার হেড জমাদার মোহন সিং বলেন এসে থানার বড়বাবু কাছ বেঁসে দাঁড়িয়েছে। সহসা মোহন সিংকে আফিস-থরে এসে উপস্থিত হতে দেখে বড়বাবু মহীশ্র হার ক্রুদ্ধ হয়ে টেবিলে উঠলেন, 'কেনা মোহন সিং! উললোককে কচুরী গলিমে আটকিয়ে' লোককে পাকড়ান কোম বোলা! এক হোজ হার মেহি থানমে হাজির নেহি হলে তো কুহ না কুহ খামেলা আ বাস্তি। যেতনা সব কাম দেখানোয়লা হোজরা অফিসারকো পাকড় পাকড় বড়া সাব মেহি শিব পর ডাল দিয়া ছায়। তুম উললোককে সম্বাদকে মানা কর দেমে মেহি লেখা।'

মোহন সিং ভামলার হলেও একজন পুরাতন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বজতালি বাবু সে এই থানার জমাদাররূপে বাহাল আছে। এই এলাকার হালচাল সবকিছু সে বিশেষরূপে অবহিত। তাই এই থানার অফিসার মাত্রই প্রতিটি দুরূহ ব্যাপারে একবার তার সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়। এ-ছাড়া মবীন অফিসারদের কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় এবং তাদের কোথায় বাওয়া উচিত বা কোথায় তাদের বাওয়া অস্বস্তিত, সেই সবকিছু পরোক্ষভাবে তাদের বুকিয়ে দেবার ভার বড়বাবু এই হেড জমাদারের উপরই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কচুরী গলির কোনও ব্যক্তির কোনও

কাব্যের জন্ত তাদের উপর এই থানার থেকে কেউ অকার্যে হস্তক্ষেপ করে, তা বড়বাবু ছাড়া হেড জমাদার মোহন সিংও পছন্দ করেনি। তাই সে অভিযোগের স্বরে বড়বাবুর প্রদ্বের প্রত্যাশ্রয়ে বলে উঠলো, 'ক্যা করে সাব, ইনলোক বাস্ত তো খোড়াই তনতে। লোকেন উ'হা বড়িরা কুহ গোলমাল হো গায়া গোয়া। নেহি তো উনলোক এতনা বড়িমে জরুর লোট আ বাস্ত। হামলোককেতি তুরন উ'হা বানে চাই।'

জমাদার মোহন সিং-এর ছায় বড়বাবুও প্রণব বাবু ও চিরঞ্জীব বাবু নিয়মপতা সবকিছু চিহ্নিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর বিরক্ত হলেও তাদের উপর রাগ করার তাঁর কোনও হেতু ছিল না। এ ছাড়া অধীনস্থ অফিসারদের উপর তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্যসহ বেশ কিছুটা রেহাও ছিল। তাই প্রকৃতকি হয়ে তিনি গম্ভীর করে উঠে মোহন সিংকে থানার বাহী সিপাহীদের তৈরী করতে আদেশ দিয়ে আশন ঘরে বলে উঠলেন, 'না; দেখকি বাটিলের বড় আখরা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এতো বড়ো আপদ! যে আমার বিনামূল্যে তাহা আমার অফিসারদের মারবর করতে সাহস করে। গাঁড়াও দেখাচ্ছি আমি মজা বেটাদের।'

থানার ইমচাফ অফিসার মহীশ্র বাবু টেবিলের উঠার থেকে গুলীভরা পিউলটা বার করে উঠে গাঁড়ানো মাত্র সেখানে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু আসামী ও শাস্ত্রীসহ উপস্থিত হয়ে বলে উঠলেন, 'খামায় কিরতে একটু ভেতী হয়ে গেল ত্রার। আমরা সকলে সোজা থানাতেই কিরে আসছিলাম কিন্তু চিরঞ্জীব বাবু এবং তৎসহ করেকজন সিপাহী এবং দুই তিন জন আসামীও আহিত হয়েছিল। সেইজন্য হাসপাতালে আগে গিয়ে এদের আঘাতজনিত ক্ষতগুলিতে



একটি মধুরতম সুবাস নির্বাচন বিলি
ক্যান্টেমিকার সুরতি নির্বাণ 'কান্তা' গন্ধ
করেন তিনি রম্যরুচিরই পরিচয় দেন।
'কান্তা' এমন একটি বিশিষ্ট গন্ধার ধার যুগ্ম
স্বাস সবায়ই অন্তর স্পর্শ করে।

কান্তা
ময়-ছোয়া সুরভিসার

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লি.
কলিকতা-১৯

পাঠি ঘরিয়ে তবে খানার ফিরতে পারলুম। চিরঞ্জীব বাবুর সাগ্রাহের লজ্জা খানি হতে বেরবার আগে ঘটনাটি সখ্বে আমি খানার জাবোলা খাতাতে পুখুপুখুরূপে লিখে রেখে গিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই ঘটনাটার বিবরণ একতরুণে এই খাতা থেকে পড়ে ভেদে নিয়েছেন। ব্যাপারটা হয়েছিল, ত্রায়—

ব্যাপারটা প্রুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে কি হয়েছিল একতরুণে তা জানতে আমার কিছুই বাকি নেই, প্রণব বাবু। আমি যেখানেই বসে থাকি না কেন, এলাকার প্রতিটি খবর আমি ঠিক সময়েই পেয়ে বাই; খবরটা পেয়েই আমি সব কাছ ফেলে খানায় ফিরে এসেছি, হাতের গুলীভরা পিষ্টগাট পুনরায় টেবিলের ডব্বারে পুরে রাখতে রাখতে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, 'কিন্তু চিরঞ্জীব বাবুও আমাকে না বলে অন্ত কম লোক নিয়ে কচুরী গলির মত জায়গায় জুয়া খরতে বাওয়া উচিত হয়নি।'

জুয়াড়ী আসামীদের সর্দার মিহুরাম বীরভাবে খানার বড়বাবুর কথাগুলি একতরুণ ধরে শুনিছিল। এইবার সে সাহস পেয়ে বলে উঠলো, 'জুয় লোক খবর ভেজনে হামলোক ধানয়ে চলা আতি। সেকেন দেখিরে না, তজুর। ইন নয়া বাবু লোক কেতনা জুমু জুটুট হামি লোককো পর কর 'চুকা, আজ।' জুয়াড়ী সর্দারকে এই ভাবে তাঁর নিকট নিলজের মতন আপ্যায়িত জানাতে দেখে বড় বাবু মহীন্দ্র বাবু দৈবদ্বারা হয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে-টেচিরে উঠলেন, চূপ রতো কমবণতকো বাজ্জ। এতনা সাহস হয় তোমরা যে ঘেরি অকসার লোককে বদনয়ে তুম হাত ডাল ছায়। এতনা রুপেরা বানায় যে তুম লোক বসাবর ধানেন্ডর আসমীজাকে হুলকে রাখেজে। এহি বাত, তুম সমকা হো তো তোমরা সাবা বস্তা হাম অতি আগসে আলগর দেস। জুলো মাত যে হামরা নাম মহীন্দ্র বাবু হায়। আউর এ ভি খেয়াল রাখা যে পুরানো জমাদানী বল লাভ। উসি সাখ হোমলোককে পুরানো চাল ভী ছোড়নে পড়েগা। আজ হিঞা করে ভি তো তুমলোককো হাম বাঁচানে নেহি সেকথা। হাও আতি সবকই তুম লোক থানেকে লক আপ'মে। এই মোহন সি। সে বাও ইলোককো হাজ্জন্তমে।'

খানার বড় বাবু মহীন্দ্র বাবুর শেষ কথা কয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সত্য সত্যই তিনি একটি যুগের সন্ধিক্ষেপে ঝাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করতে পারলো যে পুংখানো যুগ তার দেখি-গুণ সহ স্বেইবু বৃষ্টি বিলায় নেবে এবং তার পরিত্যক্ত স্থল অধিকার করবে নিজস্ব দোষ-কটী সত একটি নতুন যুগ। প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবুবা যে সেই অনাগত যুগের অগ্রদূত মাত্র, তা বৃদ্ধিমান বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর বৃত্ততে বাকি থাকে নি। নানা কারণে তাদের পুলিশি কার্য সখ্বে নতুন চিন্তাধারা তিনি মনে মনে পছন্দ না করলেও তাদের কার্যে সক্রিয় ভাবে বাধ্য পানেন তিনি কোনও দিনই প্রয়োজন মনে করেন নি। তাই তাদের এই সকল আদর্শজনিত কার্যের জন্য বিপদ উপস্থিত হলে তিনি তাদের এই সব বিপদ থেকে বারে বারে মুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছেন।

বড়বাবু আদেশ মত জমাদার মোহন সি আসামিগণকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলে স্মিত হাস্তে বড়বাবু প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে তার সামনের চেয়ার দু'খানার বসতে অনুরোধ করে দরজার দ্বিলাহীকে তাদের ও নিজের লজ্জা কয়েক কাপ চা আনিতে দেবার

জ্ঞপ্তি আদেশ দিলেন। তারপর চায়ের কাপটি সেখানে নিয়ে আসা মাত্র তা পান করতে করতে তাঁরা ঐ দিনের মামলা সজ্ঞাত আলোচনা শুরু করে দিলেন।

'বাক, ঝামেলা বদন বাখিরেছো তখন তার সমুদীন হতেই হয়ে স্মিত হাস্তে বড়বাবু প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে উদ্বেগ করে বললেন, 'এখন এসো কেস কটা একে একে লিখে ফেলা বাক।' 'চ্যা, তাই। বড় সাহেব খানি ভিসিট করতে আসার আগেই ওগুলো লিখে ফেলা ভালো।' প্রণব বাবু আশস্ত হয়ে বড়বাবুর কথাই প্রত্যুত্তর করলেন, 'তবে এখনো অনুরোধে হচ্ছে এই আত্মারামকে নিয়ে। ও লোকটা সময় মত পাগিয়ে খানার এসে খবর না দিলে চিরঞ্জীব বাবু আজ আর প্রাণ নিয়ে খানায় ফিরতে পারতেন না।'

'সত্যি ত্রায়।' সাহস পেয়ে এইবার চিরঞ্জীব বাবু বললেন, 'বদিও লোকটা অজ্ঞাত আসামীদের ভ্রায়ই ওখানে বে-আইনীভাবে জুয়া খেলতে এসেছিল তাহলেও মানবতার দিক থেকে বিচার করে শুকে আমাদের পক্ষে যে কোনও রকমে মুক্তি দেওয়া উচিত হবে।'

বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু ছিলেন একজন পুরাতন কদম্বক এবং অভিজ্ঞ অফিসার। মানবতা প্রভৃতি চোখাচুপি বুলির কোনও দিনই তিনি ধার ধারেন নি। বস্ত্রীয় কাগের সহিত এই সবেব কতটুকু সম্পর্ক তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এই সব অকল্পে ও কাঁকা বুলিগুলির উদ্দেশ্যে উঠতে না পারলে আজ পুলিশ বিভাগ এতো নাম-ভাক তিনি কোনও দিনই অজ্ঞান করতে পারতেন না।

'দেখ চিরঞ্জীব।' তুমি দেখছি বাজকল্প কোনও দিনই শিখবে না,' বিরক্ত হয়ে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বললেন, 'একটা সিপিএল থিওকে ক্লামিস করে তোলাব লজ্জা একটা বিশেষ তাক তুমি অজ্ঞান করে ফেলেছো। বতোই তুমি মানবতা এবং উচিত্য ও অনীচায়ের কথা ভাববে ভতোই একটা সামান্য বিহয়কে তুমি উটলি হতে জটিলতর করে নিজের এবং সেই সঙ্গে আমাদের জঙ্কও তুমি অকার্যণে বিপদ ডেকে আনবে। ট্রামে করে আসছিল তো খানার দিকে স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করবার জঙ্কে। ধামকা ট্রাম থেকে নেমে পড়ে এই এঞ্জিলিটিটা না দেখালেই কি চলতো না? এই সব ঝামেলা না বাথলে আজ একটু সিনেমা-টিনেমা দেখে আসা চলতো তো। এই সব ঝামেলা বাখিরে আবার মানবতার বুলি আওড়াতে তোমাদের লজ্জাও করছে না? এদিকে আবার একজন ভালো কাজ-জানা অফিসার হয়েও প্রণব পর্যন্ত তোমার বায়ে রায় গিরে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই কেসটা তো একটা খুবই সিপিএল কেস। কতোকগুলি জুয়াড়ী রাস্তায় বসে জুয়া খেলছিল আর তাদের মধ্যে এই আত্মারাম নামে আসামীটাও ছিল একজন। বাস। এদের সকলের নামে একত্রে জুয়খেলার একটা কেস লিখে দাও। এর পর বাহির হতে কয়েকজন শুণ্ডা পুলিশদলকে আক্রমণ করেছিল। এই তো? এই সম্পর্কে আরও জনকতক লোককে ঘটনার পর তোমরা সবেশক্রমে এখন-ওখানে থেকে পাকড়াও করে এনেছ। বেশ ঠিক আছে। তাদের নামে একটা রাষ্ট্র-টারেটের কেস লিখে রাখো। অবজ কেসটা কোর্টে পাঠানোর কোন সার্থকতা নেই। আখেরে সমধিক প্রেমারের অভাবে তোমাকে তাদের ছেড়ে দিতেই হবে। এর পর তোমাদের ঐ পোষারের গদীর মজুর আত্মারামের নামে আরও একটা অতিরিক্ত মামলা তোমাদের রথ

করতেই হবে। যে উদ্দেশ্যেই হোক পুলিশের আইন সজ্ঞত হেপাজতী হতে অলক্ষ্যে সে পলায়ন করেছিল। এই বিশেষ অপরাধের জন্য উপরোক্ত রূপ অতিরিক্ত একটি মালা আমরা তার নামে চক্কর করতে বাধ্য। এ কেসটি অবশ্য তার বিরুদ্ধে খুবই টাইট কেস। তার বিরুদ্ধে যা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাতে করে আদালতের বিচারে এর সাক্ষ্য হয়ে বাওয়ার কোন বাধাই নেই।

‘এ্যা! বলছেন কি স্যার?’ এক রকম আঁতকে উঠে চিরঞ্জীব বাবু বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ! ও না বলে আমাদের হেপাজত হতে থালায়েছিল বটে; কিন্তু এতে ওর উদ্দেশ্য বা মোটিভ ছিল তো অতীব সূত।’ ‘কি বাজে বকচো, চিরঞ্জীব বাবু!’ টেবিল থেকে একটা আইনের কিতাব উঠিয়ে নিয়ে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বললেন, ‘সাধারণ ভাবে অপরাধ প্রমাণের জন্য তার পিছনে যে একটা উদ্দেশ্য বা মোটিভ থাকে তা সর্বপ্রায়ে যে প্রমাণ করা প্রয়োজন তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই পুলিশ হেপাজতী থেকে পলায়নরূপ অপরাধ সম্পর্কে দায়িত্ব দণ্ডবিধিতে যে ধারাবিধি সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে মোটিভ বা উদ্দেশ্য-বাক্যটি কি কোথায় লেখা আছে? দেশের আইনপ্রণেতারা যদি তোমার এই মানবতার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্য তো আমরা দায়ী হতে পারি না? ভুলে যাবে না যে দেশের আইন দয়ালু-দাম্ভিক বা কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য কোনও অপকার আমাদের এখনও দেয়নি। সাও বাও! এইবার এদের বিরুদ্ধে বদাধিক্য ভাবে কেস করাটা চটপট লিখে ফেলো গে। এখনি বড়সাহেব এসেই চাকলাকার বিধায় এই সব মামলার স্মারকলিপি (ডাইরী)-গুলি এখনি দেখতে চাইবেন। আমরা এখানে একটা নিরাকরণ সফিক গুপের মধ্যে বাস করতে সক্ষম করেছি। এখানে কোনও ভাবপ্রবণতার তিলমাত্র স্থান নেই। ইনসিডেন্ট বা ঘটনা, এখানে ঘটনা মাত্র। তাই এদের ঘটনারূপেই আমাদের মনে নিতে হবে। এখানে দয়াপরবশ হয়ে যদি তুমি আদালতের বিরুদ্ধে মামলার তাকে বাঁচাবার জন্য নিজ খরচে উকিল নিয়োগ করো, তা হলেও তুমি একজন পুলিশ অফিসার বিধায় তোমার পক্ষে সেই কার্য হুণনীয় ও সমাজজন্য এক অপরাধ হবে। তবে সে এই মামলার দৃষ্টিতে হওয়ার পর তুমি যদি তার ফাইনের টাকা বহুটা আদালতে কাটতে দিয়ে পাঠিয়ে দাও তো সে কথা স্বতন্ত্র।’

বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের বিরুদ্ধে কার কিছু বলবার ছিল না, তবুও চিরঞ্জীব বাবুর মনে হলো চারিদিকে যেন অন্যতর ও অবিচার ঘিরে রয়েছে। চিরঞ্জীব বাবুর চিন্তাধারার সঙ্গে প্রণব বাবুর চিন্তাধারার ওই দিন কোনও অমিল ছিল না। তাদের দুজনেরই এই সময় মনে হলো যে এই সব অবিচার অবিচার হলেও উপর বিরুদ্ধে প্রতিকার করার সাধ্য তাদের কারোই নেই। ‘এই সব আইন রীতা রচনা করেছেন তারা, এখানে সকলেই নাগালের

বাহিরে। একশে আইনের মূল কিতাবগুলির উপর মাথা খুঁটে ফ্রিলেও সেখান থেকে এই সম্পর্কে কোনও সংশ্লিষ্ট মিলবে না। অগত্যা তাঁরা দুজনেরই বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর উপদেশ মত পার্শ্ববর্তী ঘরে এসে আসামীদের মুখের দিকে না তাকিয়েই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি একে একে লিখে ফেলতে শুরু করে দিলে। তবুও শাস্ত্রারম্ভের বিরুদ্ধে ‘পলায়নের’ মামলাটি লিপিবদ্ধ করতে করতে চিরঞ্জীব বাবুর মুখ থেকে অলক্ষ্যে একটি শব্দ বার হয়ে এলো—‘উঃ কি অবিচার! চিরঞ্জীব বাবুর মুখে এই কথাটা বোধ হয় ঠিক এই সময়েই প্রণব বাবুরও মনে জেগে উঠেছিল। তাই অজ্ঞানমততার মধ্যেও চিরঞ্জীব বাবুর কঠিনিঃসূত আক্ষেপজনক সত্যেই প্রণব বাবুর কানে পৌঁছেয়েছিল। কিন্তু প্রণব বাবু ছুনিঘার হাল-চাল সবকিছু চিরঞ্জীব বাবু অলক্ষ্যে অধিকতার রূপ অতিক্রম ছিলেন। তাই তিনি ইনারায় তাঁকে চুপ করতে বলে পুনরায় আপন কার্যে মনোনিবেশ করছিলেন। এমন সময় পিছন হতে কে একজন ভয়ালোক এসে বলে উঠলেন, ‘নমস্কার প্রণব বাবু। বাধ্য হয়েই আসতে হলো। একটু বিরক্ত করবো, স্যার!। প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু তাঁদের কলমের গতি ধারিয়ে সচকিতে চেয়ে দেখলেন তাঁদের পরিচিত শ্রীত্রজহরি কলেক্টর অধ্যাপক এবং স্থানীয় মনোরমা থিয়েটারের মালিক শ্রীত্রজেন ঘোষ কখন তাঁদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

‘আরে। ঘোষ সাহেব বে,’ টেবিলের উপর হাতের কলমটি নামিয়ে রেখে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনিও থানায় এসে উপস্থিত? ব্যাপার কি, কিছু খবর আছে?’ ‘না না। খবর থাকবে আর কি? খবর দেওয়া আমাদের পেশা নয়। ও সব বাজে ব্যাপারে কোন দিনই আমরা থাকিনি’ একটু অপ্রস্তুতার সহিত প্রফেসার ঘোষ সাহেব বললেন, ‘এই আপনাদের ভ্রাতাই আজ থানায় আসতে বাধ্য হয়েছি। কচুয়ী গলির মোড় ঝাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাব না দেখালে আপনাদের কাছে আসবার আমার কোন দরকারই ছিল না! এখনি আমাকে থাকতে হয় ওই গুপের সঙ্গে ওদেরই ঐ পাড়াতে তো। তাই ওদের অসুযোগে আসতে হলো—একবার আপনাদের কাছে। যদি দয়া করে অন্ততঃ

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগোঁরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারুন একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত

বাকলা
আরও গভীর রোগী নং ১৬৮৩৪৪

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আরোগ্য
লাভ করেছেন

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, তেজুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাশ্বাস, বুকজ্বালা, আহায়ে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্য্য সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশেষতঃ শূল্য ফেব্রুয়। ৩২ জোনার প্রসিদ্ধি কোটা ও টোকা, একটো ও কোটা টোকা ৫০ নং। ডা. মা. ও. পাইকরী দূর পুখরি।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-বাহিনীশাহ (পূর্ব পাকিস্তান) ঢাকা-১৪২, মহাশ্বে গান্ধী রোড, কলি।-৭

যুগ। কেন্দ্রে আসারী কণ্ঠের ভাষায় যিরে বেন। তা ব্যক্তিগত ভাবে ওদের উল্লস আমায় বিশ্বাস আছে। তাই আমি নিজেই ওদের ভক্ত ভাষায় হতে পারবো।'

প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু বহুক্ষণ নির্বাক ভাবে প্রফেসার বোবের দিকে চোখে বসলেন। তাঁর মতন একজন নামকরা অশিক্ষিত রাক্ষসও এই সব গুণা বনমায়েরদের সহিত যোগাযোগ তাহলে হলে। তাহলে কি এই সব গুণা জুয়াড়ীরাও অত্যন্ত দিক হতে কিছু কিছু সংস্কারও অধিকারী? যখন প্রফেসার বোবকে চোনার মতি এবং হীবার অসীম সুর অক্ষত দ্বীপে তাঁর চরিত্রা ইহার দ্বীপেই তাহা প্রতিদিন দ্বীপায়িত করতে দেয়, তখন তাহের দ্বারা যখন সত্যিক তাহলে দিকও কিছু আছে বৈ কি? এ উপভাষ্যকৃত্য ভক্ত এবং প্রোঁ বোবের সিন্ধু কোমল স্ত্রি একটি কর্পসও দাবী করেনি। অধিকতর এই সব চোয় গুণা পাণ্ডাপটুকের তিনু পাণ্ডার বনমায়েরদের জ্ঞান হতে হারেসাই বন্ধা করে এসেছে। অতঃ পরে প্রফেসার বোবকেও তাঁর পক্ষলন বা চরিত্রহীনতার ভক্ত সত্যিক বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই দাবী করা যায় না। রূপজীবনী নারী উষাকে একনিষ্ঠ জীবন বাপনের সুযোগ দিয়ে প্রোঁ বোব তাকে অধিকতর অধ্যাপন হতে যে বন্ধা করেছেন, তা নিঃশেষ চিত্তেই বলা যেতে পারে। আর ঐ হতজািনী নারী উষারাবীরও কি বহু সংস্কার নেই? আছে বৈ কি। তা না হলে কি সে শিল্পের পূজারী হয়ে এতো নাম করতে পারতো? সেদিনও তো প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু ঐ নারীর অভিনয়-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবুর মনে হলো, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে খুঁজে বার করতে পারলে পাক জঙ্গল বা ডেবরিসের মধ্য থেকেও বহু মনিমাসিক তাহলে উদ্ধার করা যায়। এই সব জুয়াড়ী বনমায়েররা একত্র পশ্চিম পরিবেশের মধ্যে থেকেও যে তখনও পর্যাপ্ত কণ্ঠকণ্ঠ গুণেরও অধিকারী থাকতে পারে, তা তখনও পর্যাপ্ত প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর কল্পনারও বাইরে ছিল। কৈ, যে অপকার্য্য তারা পেশারূপে গ্রহণ করেছে তার বাইরে তো তারা অতঃ কোনও অপরাধ করে না? বরং এমন বহু বৌনজ ও অর্বোজন অপরাধ আছে, বাকি তারা অতঃ পরের সঙ্গে দুগাই করে থাকে। তাদের সায়োজ্য করার ভক্ত প্রতিশোধের মনোবৃত্তি নিয়ে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু তাদের উদ্যোগ মধ্যে মধ্যে হানি দিয়েছে। কিন্তু আলও পর্যাপ্ত কোনও বুদ্ধিবাক্য বা সমাজসেবী তাদের যে-ও ন্যস্ত উদ্ধার করার জন্যে সেইখানে বাওবার কল্পনাও করেনি। প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু সব দিক ভেবে কাকুর উপর রাগ তো করতেনই পারলো না, বরং সকলেরই প্রতি তাঁরা প্রণামোৎসাহ হয়ে উঠলো। মাহুরের যদি বায় মারার অধিকার থাকে তাহলে বাবেরও আত্মরক্ষার হুঁচকি দাঁড়াবার অধিকার আছে বৈ কি। পুলিশের আক্রমণের প্রকৃত্তরে তাদের উপর গুণায়নের প্রতি আক্রমণের মধ্যে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু আর বেন কোনও অস্ত্রের দেখতে শেলেন না।

'নিশ্চয়ই জীবনী ওদের দেবে। এতে আপত্তি নেই আমাদের।' বিধামুক্ত চিত্তে প্রোঁ বোবকে উদ্দেশ করে প্রণব বাবু বললেন, 'কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ দ্বিগ্ন প্রমিত আত্মরক্ষারও আপনাকে জীবনে নিয়ে যেতে হবে।' এঁ। এই আবার

কি হুঁসিলে ফেললেন 'আমাকে', সন্তুষ্ট হয়ে প্রোঁফেসর বোব উত্তর দিলেন, 'ঐ লোকটাকে তো আমি তিনি না, জাব? না, মশাই। ও সব বাইরের লোকের ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথাই নেই।'

প্রোঁফেসর বোব সাহেবের সত্য কথাই বলেছিলেন। যে যুগে বহু হাপানের সময় প্রাণেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে বৈ ঐ বহুক্ষণ ব্যক্তির কতটুকু মাহুরের উপকার করার ক্ষমতা আছে আর কতটুকুই বা তার অপকার করার ক্ষমতা আছে, সেই যুগে অল্পগ্রহণ করে দ্বিগ্নাশ্রিত পণ্ডিত প্রোঁফেসর বোবের পক্ষে এর চেয়ে অধিক উদারতা দেখানো সম্ভব ছিল না। তাই প্রণব বাবু একবার শব্দ করবার জন্যে সন্ধ্যা পঞ্চাশদশ কণ্ঠী পালিত প্রাণায়িত গুণা দ্বারা বিলম্বারকে 'জিলালা কলেন', 'কোঁ সর্দার। আত্মরক্ষারকোঁ জীবনীয়ে লে লোনা।' গুণা-সর্দার বিলম্বার বিষ প্রণব বাবুকে এ বিষয়ে একেবারেই নিরাশ করলো না। সে খুশী হয়ে প্রণব বাবুর প্রাণের উত্তরে বলে উঠলো, 'জব্বর বাবু সাব। উনকো জীবনীয়ে লে লোকে। উনকো ইসি অপারকো বাস্তে হামি লোকই তো দাবী জাব। বেইমানী কাম হামলোক কতি নেহী করলো, বাবু সাব।'

প্রোঁফেসর বোব সাহেবের মত গুণা-সর্দার বিলম্বারও আত্মরক্ষারকোঁ মাত্র এইদিলই লেখেছে। সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে গুণা-সর্দার বিলম্বারের একবিধ ব্যবহারের ভক্ত দাবী গুণু তাদের বেশরোয়া মনোভাব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার স্বভাবসুলভ বেশরোয়া মনোবৃত্তির সহিত যে বর্ষেই দরদেবও হোঁরাই ছিল তাতে অভিন্ন অক্ষার প্রণব বাবুর কোনও সন্দেহই ছিল না। তাঁরা খুশী মনে তাকে বাহবা দিয়ে কি একটা কথা বলতে চাইছিলেন, এমন সময় দরজার সিপাহী ছুটে এসে সেলাম করে জানালেন, 'হুজুর বড় সাহেব আগরা।' এর সঙ্গে সঙ্গে বাহির হতে পাহারার বহুকণ্ঠারি সেক্টর বন্ধু উঠানো ও নামানোর খটখট আওয়াজের সঙ্গে একটি যেটির গাড়ির দরজা খুলা ও বন্ধেরও একটা খটখট আওয়াজ শুনা গেল। প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে দ্রুতগতিতে বড় সাহেব রমেশ বাবু খানার জুনিয়ার অক্ষারের ঘরের মধ্যে ঢুক পড়লেন। বড়সাহেবের পিছন পিছন তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু এবং সেই সঙ্গে প্রোঁফেসর বোব সাহেবও বড় সাহেবের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আসন গ্রহণ করার পর বড় সাহেব রমেশ বাবুর প্রোঁফেসর বোবের উপর প্রথম দৃষ্টি পড়লো। একটুখানি পাঁড়িয়ে উঠে উৎসাহ হয়ে বড় সাহেব বলে উঠলেন, 'হালো প্রোঁফেসর বোব। আপনি এখানে, ব্যাপার কি?' প্রোঁফেসর বোব সাহেবের বক্তব্যটুকু বীরভাবে শুনে নিয়ে বড় সাহেব রমেশ বাবু খানার বড়বাবুকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'এঁ। এ আবার কি? এ ভেরী ব্যাড কেশ, উঃ। পুলিশকে জুয়াড়ী হয়ে পিটিয়ে দিলে। ডেপুটি সাহেব শুনে তো বেগে আগুন হবেন। এঁ। আমি জানতে চাই কে ওখানে জুয়া চালাচ্ছিল। ওদের কাছ হতে বুঝের পরমা খেয়ে ওদের দরতে গেলেই শুণু ওরা মারপিট করে থাকে। তা না হলে ওদের মহাশয় কোঁ অহুয়ারী ওরা শুণু দ্বারা জেতে পুলিশের গারে হাত বন্ধনই তুলবে না। আমার মনে হয়, এই সব ঐ চিরঞ্জীব বাবুরই কাজ। আমি এঁখনি ওকে

দাপেণ্ড করে রেখে। সামনের সোমবারের সকালে আপনি ওকে চাকরাণীমের বিশেষ্টের ক্রমে হস্তি করবেন। এখন আশ্চর্য্যম
মো আবার সকলকেই আপনাবা জামিন দিয়ে দিন। এদের বিক্রে
শা মাত্র ঐ জুয়ার পেটা কেস। আশ্চর্য্যমের বিক্রে তো বেখি
সিয়ারস কেস দেখা হয়েছে। ওর জামিন টামিন কিন্তু এখন হবে না।
পালিয়ে থানার এসে খবর দিয়েছে না হাতী করেছে। ও সব
শাকী কোমরা না বুকা, আমি তো বুঝি। ও হোঁড়ে এসে থানার
দেব হতে পরে নিতে এসেছিল, হাতে ওদের সকলেরই বিক্রে না
টোট কেস রুজু করা হয়। ও সব ডাঁড়তার আমি ভুলি না।
মাত্র বিশ বছর চাকরী হাতে চললো আমায়। একটু তখির
হাফ হাতে আদালত থেকে অজ্ঞত এ লোকটা না খালস পার।
বড় সাহেব রমেশ বাবু পরিকল্পনের স্তম্ভ সব করজন আসামীকে
চিহ্নিতকোঁ তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর
সকলের মত বড় সাহেবের উপদেশ ও আদেশ সবলিত বড়বাবু
ঐ সকল আসামীদেরও কানে গিয়েছিল। শুণ্ডা-সর্দার বিটলরাম
ছাত্রাণ্য সম্পর্কীয় উপদেশটি শুনা মাত্র অবাক হয়ে মনে মনে
বিস্মিত উঠলো, হা রে থোরা। এই সব বড়বাবুরে তুমি আমাদের
মত খোয়ানা করে তুলতে পারলে না? শুণ্ডা-সর্দারের একজন
দায়ের আসামীও কানে বড় সাহেবের শেষের আদেশটি শ্রবণ
করছিল। তাই সে-ও যেন একবার ভাবের অবগে অশ্রু হয়ে
দে উঠলো, সব বেইমান ছায়। আর সকলের মত চিরঞ্জীব বাবুও
একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় সাহেবের উপদেশ ও নির্দেশ-
বাকী শুনেছিলেন। নিজের বা কিছু অপমান তা কিছুক্ষণের
মত ভুলে গিয়ে তাঁর টোঁটের কোণে মাত্র একটা কথাই
শুণিয়ে এলো 'এ কি বিচার না বিচারের প্রহরন।' কেবলমাত্র
ধানার বড় বাবু মরমে মরে গিয়ে মধ্যে মধ্যে চিরঞ্জীব বাবু
খিকই মাত্র চেয়ে দেখছিলেন। বড় সাহেব রমেশ বাবু
কিন্তু কে কি ভাবে তাঁর উপদেশ এবং নির্দেশবাকী গ্রহণ করছে, তা
জেনে দেখবারও প্রয়োজন মনে করলেন না। ক্রমতায় আসীন
বক্তাদের এই সব আজেবাজে বিষয় ভেবে দেখবার লজ পধ্যাপ্ত
গম্যও থাকবারও কথা নয়। তিনি ভাড়াভাড়ি কয়েকটি প্রয়োজনীয়
খাপপড়ে মস্তব্য সহ দস্তখত করে যেমন বেগে প্রবেশ করেছিলেন
তেমনি বেগে ধান থেকে বহির্গতও হয়ে গেলেন। শিকন শিকন
সত্যবিক বেগে ধানার অফিসারের দল তাঁদের শেষ অভিধান
জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে তাঁর গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে
একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পুনরায় তাঁরা একে একে
ধানার ভিতর ফিরে এলেন। ততক্ষণে ধানার অধস্তন
বড়চাকরীর দল বড় সাহেব রমেশ বাবুর নির্দেশ অনুযায়ী এক আশ্চর্য্যম
বাকীত অপর সকল আসামীকেই প্রোকসার ঘোষ সাহেবের
জামিনতে জামিন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রত্যাপ্ত অফিসারের গা
যেন আসামীরা একে একে ধান হতে এতক্ষণে বেরিয়ে বাচ্ছিল।
তাদের নিক্ত নির্ধিকার দৃষ্টতে একবার চেয়ে দেখে বড়বাবু মহীজ
বাঃ সন্থেই চিরঞ্জীব বাবু তাঁদের উপর হাত রেখে বলে উঠলেন,
'বড় সাহেবকে কিন্তু কোনও প্রকারেই এজ্ঞত দোষ দেওয়া
যায় না। তাঁর ধান ধারণা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে
বিচার করলে তাঁর এই ভুল বিবেচনার লজ তাঁকে কোনও

দোষই দেওয়া উচিত হবে না। বা কিছু দোষ তা আমার আর ঐ
হেতু জমানার মোহন গি-এর। মিছামিছি আমাদেও কৃত দোষগুলি
বড় সাহেব নির্ধিকারে হোমার উপর চাপিয়ে দিলেন। সত্যই
চিরঞ্জীব, আমি এজ্ঞত বড় লাজিত ও দুঃখিত। ঠিক আছে, বাওরা
যাবে আখুন তোমাকে নিয়ে সোমবারে তাঁর বিশেষ্ট ক্রমে। হত
বড়ই ঠোঁট বাবু ভাঙ্ক হোন তাঁদের খঞ্জর হতে তোমাকে বার করে
আনবার যথেষ্ট ক্রমতা তোমাদের বড়বাবুর আছে। হ্যাঁ, তাই—

নিজের জুনিয়ার অফিসারদের কাছে এমন প্রোজস তায়ে
বড়বাবু স্বীকারোক্তি করলেন তা প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু ধারণার
বাইরে ছিল। তাঁর সত্যবাদিতা এবং জুনিয়ার অফিসারদের
প্রতি অনন্য দোহ ও কর্তব্যবোধে সত্য সত্যই তাদের মুগ্ধ
করে তুলেছিল। সন্তোষিত ভাবে 'না স্তাব, ঠিক আছে' বলে
উভয়ে তাঁদের প্রিয় বড়বাবুকে প্রণাম জানাবো মাত্র, তিনি শ্রুতহস্তে
প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখো সচেষে
উত্তরাকলে আজ আমার এর জরুর গোছের আমন্ত্রণ আছে।
ধানার ফিরতে আজ আমার অনেক হাত হয়ে যাবে। ঐ জারগটার
টিকানাটা মাত্র এই ধানার সিপাহী করিমবন্দের জানা আছে।
যদি একান্তই দরকার হয়ে পড়ে তা'হলে তাকে দিয়ে ভাড়াভাড়ি
আমাকে ডেকে পাঠাবে। আচ্ছা, এখন ভাই তা'হলে চলি আমি।

বড়বাবু ধান হতে বার হয়ে গেলে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু
নিজেদের নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরে এলেন। বহুক্ষণ তারা চুপ করেই

বাসবী বন্ধুর

© বন্ধনহীন গ্রন্থি ©

দাম—দু' টাকা

বলাকা প্রকাশনী

২৭-সি, আমহার্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৯

“সৈনিকার প্রথম উপভাস, তাই” ছদ্মনামে ভীক পদক্ষেপ।
শ্রীমতী ভক্তি দেবী বইয়ের ভূমিকায় ছদ্মনামে নিজেই কাটিয়ে
উঠেছেন, সন্তবতঃ তারাক্ষরের ভূমিকায় কেটে গেছে।
প্রাণতোষ খটকও ভক্তি দেবীর শক্তির পরিচয় জেনেই এ
কাজে তাঁকে উৎসাহিত করে এই বই লিখিয়েছেন এবং
বন্ধুত্বীতে প্রকাশ করেছেন। কাহিনী পরিবন্ধনয় দুঃসাহসের
পরিচয় আছে—এবং শেষ অবধি তা নিশ্চিত সংসাহসের
নির্দেশরসে ফুটে উঠেছে। এই বইয়ের ছুটি পুরুষ-চরিত্র
এবং একটি নারীচরিত্র, সংসাহস, উদারতা এবং আন্তরিকতার
সঙ্গে সমাজের একটি অতি বড় সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত
দিয়েছে। বইখানা একটানা শেষ না করা পর্যন্ত থামা যায়
না। ভাষা সরল এবং জোরালো; এ রকম সুন্দর ভাষা বইতে
ছাপার ভুল অব্যাহিত।—যুগান্তর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯।

বসে হইলেন, তারপর সহসা দীর্ঘশ্বাস তুলি কবে চিরঞ্জীব বাবু বলে উঠলেন, দেখুন প্রথম বাবু! সত্যই তা'হলে হিট্টি রিপোর্টস ইন্টেলেক। কচুবিগলিতে গুণ্ডাদের আক্রমণের সময় যেমন একসময় আত্মাধার্য ছাড়া আমাদের হেপাডতে কিছুকণের জ্ঞান আর কোনও আসামীই অবশিষ্ট ছিল না, তেমনি থানাডতে এখানে এই হতভাগ্য অসুগত আত্মাধার্য ছাড়া আমাদের দ্বারা দূত আর একজন আসামীও অবশিষ্ট রইল না। এই কি হচ্ছে তা'হলে ঈশ্বরের চুলচেরা বিচার? আমার নিজের দুর্যোগের কথা না হয় বাদই বিলাম।

‘ঈশ্বরের অকারণে আমাদের মধ্যে টেনে এনে। না, চিরঞ্জীব’, একটু হেসে ফেলে প্রথম বাবু উত্তর করলেন, ‘যাহ্নবের জীবনটা হচ্ছে একটা বিরাট অজ্ঞানতা। ঠিক হিসেব দত্ত চলতে না পারলে এই রকম গোলমাল ও জুল বায়ে বায়ে হবে। আসলে আমাদের কাজকর্ম যুগোপযোগী না হওয়ায় জন্মে বায়ে বায়ে আমরা বিশপে পড়ে থাকি। তাই আমার মনে হয় যে যুগের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কিছুকাল আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত হবে। তবে দিন আগত ঐ, কিন্তু একথাও ঠিক যে, সাধ্যমত আমাদেরই ঐ আকাঙ্ক্ষিত যুগের আও আগমনের সূচনা করে দিতে হবে। তবে এই জ্ঞান কিছু কিছু বিভ্রম ও লালনা আমাদের মধ্যে মধ্যে সহ করতে

হবে বৈ কি? আমরা তো কোন হার, তাই। পৃথিবীর প্রাথমিক অবতাররা পর্যন্ত যুগের বিকল্পে পাড়তে সকল ক্ষেত্রে সাহসী হন নি। তবুও, ঐ সব ব্যয়োগ্য ঐশ্বর্যগুরু ও অবতারদের প্রায় সকলেই অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস বলে যে, ঐ সময় ক্রীতদাস প্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই চালু ছিল। কিন্তু ঐ সকল অবতাররা বহু ভালো ভালো বাণী মাহ্মকে প্রদান করলেও ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের বিকল্পে একটি কথাও উচ্চারণ করে তাঁদের পূর্ণপোষক ধনী ভক্ত শিষ্যদের বিরাগভাজন হতে বোধ হয় কোন দিনই সাহস করেন নি। তাঁরা মহায়া সমাজকে প্রাগাভ্যুতপে ভালবাসলেও ভগবানীয় যুগের পরিবর্তনের জ্ঞান অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করছিলেন বোধ হয়। ধারা তা করেন নি তাঁরা নিশ্চয়ই ঐ সময়কার জনসমাজের হাতে জঘন্যভাবে নিপুত্রীত হয়ে বসবাসের জ্ঞান গ্রহণ করণকেই বেছে নিয়ে থাকতেন। থাক এখানেও সব তত্ত্বকথা, ঈশ্বর ও তাঁর অবিচ্যয়ের কথা তুলে এইবার মামলার ডাইরী ক’টা চটপট লিখে ফেলতে হবে আমাদের। তা’না হলে আমাদের আরও এমন সব অপমান সহ্যে হবে, যা এখনও পর্যন্ত আমাদের দারদার বাইরেই আছে।

[ক্রমশঃ]

বিদায়

তরুলতা ঘোষ

বশনের ঘোর তেজে গেছে মোর—
বাই তবে চলে বাই,
বাসনার নীল আকাশের শেষে
রামধনু আর নাই।
নীল নভোপটে মেলে দেব পাখা,
দূরে চলে যাব রিক্ত বলাকা
অসীম শূন্যে খুঁজে দেখি যদি
শান্তির নীড় পাই।
বেদনা-বিধুর শূন্য ক্ষনয়ে
বিদায়ের গান গাই।

দূর-দূরান্ত ভ্রমণ-ক্রান্ত
শ্রান্ত বলাকা আমি,
ছায়া-হনিবিড় আশ্রয় লাগি
তব শাখা 'পরে নাথি,
মনে ছিল আশা দেখা গা'ব গান,
কুহুম-স্ববাসে করে নেব স্নান,
গোপন-পুলকে ডেলে দেব প্রাণ
পল্লবহারে ধামি।
বহু আশা করে তব শাখা পরে
নীড় বেঁধেছিলাম আমি।

কানন-কুঞ্জে কুহুম-পুঞ্জ
অন্তু গেয়ে যায় গান,
ভাষা দিশাহারা স্বয়ং-স্ববাসিত
বিবল আমার প্রাণ,
নয়নের জল ঢালি তরুলে,
আশা করেছিলাম শূন্য ও ফুলে
ললিত মাধুরী উঠবে গো ফুলে,
নিঃশেষে দিব দান—
বকনহীন বজ্রাধারার
পুলকাকিত প্রাণ।

ভক্ত-শাখার স্বয়ং আশ্রয়—
শ্রায় কিশলয় হারা
সে তো নিশ্চয় কঠিন বীধন,
সে তো নির্ভর কারা।
তাই তো আমার শাখা-নীড়ে আমি
ককণ-রাগিণী উঠিতেছিলাম বাঁজি,
গোপনে ব্যাখ্যায় করে পড়ে হার
গলিত বেদনা-ধারা,
বহু দূরে তাই আমি চলে বাই
স্বয়ং হোয়েছিলাম সারা।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



**রেক্সোনা
সাবান**

**আপনার ত্বককে
আরও সুন্দর করে**

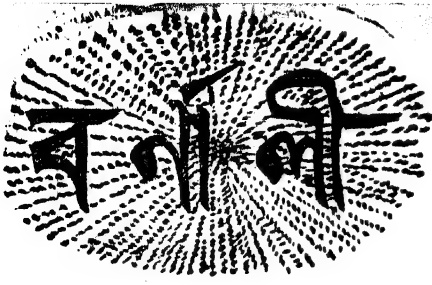
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ
ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম
বেরাবে। তার কারণ, রেক্সোনাতে থাকে ব্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি ত্বকের এক বিশেষ দ্রবীভূত যা আপনার লাগপকে
সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে শুষ্ক রাখে। রেক্সোনার
সবের মত ফণা মাপুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও শুষ্ক হয়ে উঠবে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্মে... রেক্সোনা



রেক্সোনা কো., লিম., অস্ট্রেলিয়া থেকে বিতরণ দিবার দ্বারা, কর্তৃক ভারত প্রাপ্ত

RP. 168-X62 BQ



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]
মুলেখা দাশগুপ্তা

সুগত পাটিটা মজুর কাছে এতোই অরুচিকর লেগেছিল যে, ও নিয়ে কথা বলতে ওর আর মন ছিল না। মইলে বলে দা গেলেনও এসে বলতো। বরং বলতো আরো বং চড়িয়েই—বসি ও রক্তের এই হাতকীর লোক পাটির হাতকীর অপহরণের উপর আর কিছু কারিগরি চালাবার শক্তি ওর ছিল না। তবু হুচৌখ বড় বড় করে তুলে বুদ্ধ-বিশ্বাসের ভাণ করে বর্ণালী দিকে সেই পূরমাশ্চর্য ঝাট-তালিকার। দরজায় বাগত সম্ভারদরজা মড়েলের মতো কাঁড়িয়ে থাকাকার। মেরেটি হতে আরম্ভ করে প্রতিটি বিভিন্ন মারী-পুরুষের বিভিন্ন বকমের পোষাক-পরিচ্ছদের আর চলন-বলনের ব্যয়ের অঙ্কের। বলত, আঁহা তোরাই দেখলিনে! আমার এমন দুঃখ হচ্ছে, আপসোস হচ্ছে। এ্যা বলব আর একদিন এমনি একটা পাটির আয়োজন করতে? ওদের পক্ষে কি আর এমন। আমাদের পাঁচ লাভ টাকা ওদের পাঁচ লাভ হাজার টাকা এক কথা তো—বলবো? দেখবি প্রতিটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে তোর কেবল মনে হবে—

‘নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বৃন্দা নরী রূপসী,
হে অনন্ত যৌবনা উৎসী।’

মুনিগণ ধ্যান ভাজি দেয় পদে তপস্তার ফল,
তোমার কটাক্ষপাতে ত্রিত্ববন যৌবন-চঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আঁতুহারা,
নাচে রক্তধারা।’

যাবি দিদি? আমি বললে ভুললোক ঠিক আর একদিন এমনি একটা পাটির ব্যবস্থা করবেন। এতো ভালো না—একেবারে ভীষণ। তারপর লজ্জার বং মিলিয়ে খেয়ে থমকে বেন বলতে চায় না, ভেতরের আবেগ চেপে রাখতে পারছে না বলেই বলে ফেলেছে, এমনি করে বলত রক্তের কথা আর দেখত যৌবরী মুখের চেহারা বলল। কেপানোর এমন একটা বিষয় হাতে পেরেও যে ছেড়ে গেল মজু, তা একেবারেই তিক্ত বাখে।

তবু কিন্তু মজুকে দেখা গেল একদিন রক্তেরই হোটেলের করিডোর দিয়ে দ্রুত পার প্রবেশ করতে এবং রক্তের বন্ধ দরজার কাঁড়িয়ে ঢোকা দিতে।

লাজ ছুটি দিন দেখে সকাল বেলা বেরিয়েছিল সে তার এক ছদ্ম নেওয়া ছুটে ঠিকানা নিয়ে টুইলনের খোঁজে। হুঁ জারগা থেকেই নিরাশ হয়ে কিনতে হয়েছে তাকে। ইয়োয়োপীর দেশগুলোয়

ইজি-জাজিরের পড়তে পড়তে উপার করার নানী জুয়োগ-প্রবিধার কথা চিন্তা করতে করতে পথ চমকিল মজু আর দুক ভাবে ভাবছিল, একটা বি, এ অনার্সের ছাত্রী সে, একটা সামান্য যোজগানের পর মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেও করে উঠতে পারছে না।

বুঝা কিন্তু হঠাৎ করে একটা বেশ ভালো টুইলন পেয়ে গেছে। একটা এ্যালো যেকেরে বাংলা শেখানো। সপ্তাহে তিন দিন। পঁচাত্তর টাকা মাইনে। ও যদি এমনি একটা জোগাড় করতে পারতো। হঠাৎ পনের মাসেই থমকে কাঁড়িয়ে পড়ল মজু। রক্তের সেই লোকে বহু ইয়োয়োপীয়ান মহিলার জিড় দেখেছে সে। তারের তের তো কাক বাংলা শেখার প্রয়োজন না থাক, সখ থাকতেও পারে। যদি না-ও থাকে তবে কথটা মনে হচ্ছে না বলেই হয়ত নেই। বললে উৎসাহবোধ করতে পারে। বিশেষ করে কথটা যদি আবার রক্ত বল। হা নিশ্চয়—বুজার মতো একটা কাক রক্ত ওকে ঠিক করে দিতে অনায়াসে পারে, এই দুহুঁতে পারে।

মজু যখন গিয়ে রক্তের ঘরের মেহগনি কাঠের তারি দরজার বন্ধ কপাটে টোকা দিয়ে পাঁড়ালো, তখন দশটা বেজে না গেলেও বাজে। এই কিছুক্ষণ হলো মাত্র বিছানা ছেড়ে সোফার এসে বসেছিল রক্ত। বয় লেবুর বস লেওয়া ব’কফি দিয়ে গলে বসে বসে ভাতে গলা ভিজোছিল আর বিবাহ—বিবাহ যেন তার মাত ভোর পিপিট ঢালা জিবে মনে শব্দে, বিবাহ যেন তার পুরো জীবনটার প্রতি এমনি ভাবে প্রতিটা চুহুকের সঙ্গে মুখ বিকৃত করতে ঝাঁ হাতে কুক এলোমেলো চুলগুলোকে পেছন দিকে ঠেলছিল। এমনি সময় দরজার টোকার শব্দ হলো। যে ভাবে হুঁকে বসেছিল তেমনি ভাবে বসে থেকে চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে বিস গলায় লাড়া দিল সে—কাম ইন—কাম ইন। মজু ভেতরে ঢুক বেশ কয়েক পা ঘরের ভেতর এগিয়ে এলে মুখ তুলল সে। প্রথম মুহূর্তটার যে মজুকে কোন সম্ভাবণ করে উঠতে পারলে না রক্ত সেটার কারণ বোধ হয় অবিদ্যাত আনন্দ। তারপর একেবারে উঠে কাঁড়িয়ে ডান হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে আহ্বান জানালো—আবে এসো এসো।

মজু আরো কয়েক পা এগিয়ে এলে সন্নত ভক্তিতে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিল বসন্ত।

মজু বসলে সে-ও বসল মজুর মুখোমুখি কোচে। টেবিলের উপরে টিনটা থেকে একটা সিগারেট টেনে বের করে ছুই টোটার চাপে ঘরে লাইটার জ্বালতে জ্বালতে বলল—‘প্রভাত্তে উঠিরা ও মুখ দেখিহ, দিন বাবে আজ ভালো’ কি বলা?।

লাইটারের পলক আলোর রক্তের মুখের বা সব আগে মজুর চোখে পড়ল তা হলো, তার ছুই চোখের কোল-গড়ানো গভীর কালি—সুখা-ঢালা কালি।

লাইটার নামিয়ে মজুর দিকে তাকালো রক্ত—ককি খাবে?

—না। ককির গন্ধ আমার ভালো লাগে না।

—বাঙ্গাল আর ক’কে বলে। আচ্ছা, চা আসছে। চাই খেয়ো। মজুর দিকে একটু হুঁকে বসল রক্ত—তারপর বসো দেখি তুমি, তোমার সে দিনের প্রার্থনার জোর ধরেছিল?

হাসল মজু।

—অবধি তুমি বলবে তোমার প্রার্থনার জোর ছিল, কি না তার পথ তো হবে আমাদের বিশেষ। আশা হয় তোমার?

—হর। হাসিমুখে জবাব দিল মঞ্জু। তবে প্রার্থনার ফলান্ত
তো হাতে হাতে হর আ কিন্তু একদিন না একদিন নাকি হয়ই।
হরর ভক্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

—কখনে অপেক্ষা?

সরল ভাবে 'হী' বলতে গিয়ে রক্তের চোখের দিকে তাকিয়ে
থেকে গেল মঞ্জু।

হাসল রক্ত। ছেলেমানষি করছি। বেন আপনাকে আপনি
বলে উঠে পড়ল রক্ত সোফা ছেড়ে। ইটাংটি করতে করতে
বললে—মামি তো জানি আমাকে হুমকি দিয়ে নিজে তুমি বাঁচী
কিরে গিয়ে দিয়া পেট পূরে খেয়েছ। তাই তোমার প্রার্থনায় জোর
না ধরলেও আমারটায় নিশ্চয়ই ধরেছিল। একে তো নির্জলা
উপশাস করছি। তার উপর জানতো, সাধনার বসবার আগে
সাধকরা সিঁচি গাঁজা ভাস্ক কাশন যা হোক একটা নেশায় বুন হয়ে
বসেন। তাতেও ত্রুটি রাখিনি আমি। আচ্ছা, সেদিন তোমার
খুঁই খাটাপ লেগেছিল না?

—লেগেছিল।

—কিন্তু কেন?

—ভালো লাগছিল না বলে।

তবে কেসল রক্ত।—তোমার কি ভালো লাগে বলা?

—ভাবতে হবে।

—বেশ ভেবেই বল। বলল রক্ত।

—একটা তাড়াতাড়ি হবে না। মনে সর্বদাই তো কত
চাওয়া ভিড়ি লেগে রয়েছে কিন্তু যদি দৈববাণী হয়, 'বর
দাও' তখন কি আমরা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারি কি ছাই!

—পারো না?

—না। মাথা নাড়ল মঞ্জু। পারি না। আমি আকুল হয়ে
ভেবে দেখছি, খুঁজে পাইনে। সব চাওয়া কেমন বেন তুচ্ছ হয়ে
উঠে চোখের উপর দিয়ে, একের পর এক করে মিলিয়ে বেতে থাকে।
হাসল মঞ্জু। আপনাতরটাও ভেবে দেখতে সময় লাগবে। এটা ওটা
একটা কিছু বলে ঠিকে যেতেও তো পারি।

দুইটাকে একটা কিছুর ওপর বেখে রক্তকে অগমনক ভাবে বসে
বসে চুল পেছন দিকে ঠেসতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—কি ভাবছেন
একটা?

—তোমাকে। তোমার কথা অনেক সময়েই আমি এমনি
ভাবি। আচ্ছা মঞ্জু তুমি কখনো কাউকে খুব ভেবেছ—ভীষণ ভাবে
ভেবেছ?

তৎক্ষণাৎ টেনে টেনে জবাব দিল মঞ্জু—হী—আ—আ।

—কে সে?

—বলবো?

—বলো।

—আমার নজরটা সব দিকেই সাংঘাতিক রকমের উঁচু।
সাধারণ মানুষের আমার মন নেই। রাজা মহারাজার কাল তো
কালিদাসের কালের মতো হারিয়েই গেল। অগত্যা মন্ত্রীসের
মধ্যে বিনি মহামন্ত্রী তাঁর কথাই ভীষণভাবে ভাবি আমি।
প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে মালা গাঁথা, প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে দে
মালা আমার জলে ভাসানো। ঈতে গাঁবি যেতপন্থ। বসন্তে

কামিনী। বর্ষায় সন্ধ্যামালতী। গ্রীষ্মে ভাসাই কাশের গুচ্ছ।
চোখের জলের চাইতে পবিত্র বারি নেই। তাই সে মালা রাতে
চোখের জলে ভিজিয়ে বেখে ভোরে ভাসাই জলে। যেদিন আমার
মালা আমার নিঃশ্বাসের, আমার চোখের জলের উকতা সঙ্গে নিয়ে
গিয়ে তাঁর গলার ছাঁপিয়ে পড়তে পারবো—সেইদিন ধন্ত হবো আমি।

—এসো দিচ্ছি আমি মালা দেবার ব্যবস্থা করে।

—উহু, তেমন দেওয়া নয়—দশের মধ্যে একজন হয়ে দেওয়া
নয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার বার্ষ হবে তবু আমার মালা, আমার মালা
বলেই এসে এসে হাতে গলার না পরা পর্যন্ত সে মালা জলেই ভেসে
যাবে।

—আচ্ছা, তোমার মালা তিনি তোমার মালা বলেই একান্তে
গলার পরসেন। কিন্তু তারপর করবে কি তাকে নিয়ে তুমি?
সকালবেলা আলু-পটল মাছের ফর্দ হাতে বাজারে পাঠাবে?

—না। তাঁর রাজকাজই তিনি করবেন। শুধু দিনের কাজের
গুরুতে চুপি চুপি কানের কাছে মুখ নিয়ে বলবো, রাজকাজে ধাবার
আগে আমার কথাটা একটু শুনে যেও গো।

হেসে উঠল রক্ত—তোমার রাজার কানে কানে বলা কথাটা কি,
নিশ্চয়ই সেটা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে শোভন হবে না। কিন্তু
তারপর?

—তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারিনে। রাজার
রাজত্বের চেহারাও বাবে বসলে। ওঃ, আপনি ভাবছেন তো কি ঘুট্টা
কি ল্পর্দা মেয়েটার! কিন্তু শিক্তি নাসের চাইতেও যেমন মঙ্গল
ইচ্ছার জোরে আর হৃদয়ের জোরে মূর্খ মা সন্তানের পক্ষে অনেক বেশী
মঙ্গলের হয়ে থাকেন, তেমনই রাজার রাজত্বের মঙ্গলের পক্ষেও সব
চাইতে বেশী মঙ্গলের কাজ করতে পারে শুভ ইচ্ছার জোরে, আর হৃদয়
পারে না?

—রাজার গলার মালা দেওয়া তোমার ঘটক আর নাই ঘটক—
তুমি অনেক কাজ করবে মঞ্জু—নিশ্চয়ই অনেক কাজ করবে।

যেমন বসেছিল তেমন বসে থেকেই ডান হাতটা মঞ্জু রক্তের
দিকে বাড়িয়ে বললো, করবো একটা প্রণাম?

—আরে, কি পাগল! একেবারে ওপুড় হয়ে মঞ্জুর বাড়ানো
হাতটা ছু' হাতে মুঠো করে ধরল রক্ত।

ওয়েটার এসে প্রীতবিশ হাতে ঘরে ঢুকলে মঞ্জুর হাত ছেড়ে
দিল রক্ত। হাতের টে টেবিলের ওপর নামিয়ে বেখে ওয়েটার চলে
গেল।

—এই এগারোটার সময় ভোরের খাওয়া? আমি এ সময়ই চা
খাই। আজ নিশ্চয়ই তোমার উপোসের দিন নয়।

—না বলে এগিয়ে বসে টেটা মঞ্জু টেনে নিল কোলের কাছে।
তারপর ফলের ডিসটার ফল নামিয়ে খাবারগুলো কিছু কিছু গ্রেটে
তুলে নিয়ে নিজের ভক্ত বেখে বাকি সব বরে দিল রক্তকে।

—এটা কি হচ্ছে? আমি খেল কি আমি নিয়ে নিতাম না।
সকালে আমি শুধু চা খাই। ওদের দেবার নিয়ম, দিয়ে বার।

—আচ্ছা আজ খান। ডিম-কটীর ডিসটা তার হাতে তুলে
দিয়ে বলল—সকালে এখন না খাওয়াটা কিন্তু ভালো নয়। তপুয়ে
খান কটার?

—একটা দুটো তিনটে।

—আঁ—হুঁ চোখ বড় করল মজু। আমার দিদির জন্মাবধানে থাকলে দেখিয়ে দিত লিভার নষ্ট করা, আপনার এই খালি পেটে চা-কফি খাওয়া।

মাথা একেবারে এ কাত ও কাত করল রজত—হ্যাঁ খাওয়া হয় এমন কান্ড আমি কখনো করিনে। লিভারের উপর আমার মায়ার ধবর তুমি কি জানবে? চা-কফি খাবার আগে হুথানা এয়াকুট-বিশুট খেয়ে নিতে আমার কোন দিনও ভুল হয় কিনা ভেবে জিজ্ঞাসা করা ওয়েটারকে। চামচে দিয়ে ডিমের পোচটা তুলে মুখে ফেলে কামাল দিয়ে মুখ মুছল রজত। আচ্ছা মজু, সেই আশ্চর্য্য নীল চোখের ছেসেট কি? যদিও তার চেহারার আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু তার চোখের নীল রঙটাই সেদিন আমার দুটি টেনেছিল সব চাইতে বেশী। কে সে?

হাতের টোষ্ট নামিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মজু—কোথায় দেখলেন আপনি তাকে?

—কফি-হাউসে।

—আমার সঙ্গে?

—অবগুই।

—কখনোই কফি-হাউসে আমার সঙ্গে তাকে আপনি দেখতে পারেন না।

—তবে লেকে?

—তাও না।

—পার্কে?

—কোন পার্কে? তারপর রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—না তা-ও দেখেন নি। মিথ্যা বলছেন।

—মিথ্যা বলছি? এই চেহারার কাক সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই?

—তা আছে। কিন্তু কোথায় দেখলেন, তাই বলুন?

—সেদিন তুমি বধন না খেয়ে বেরিয়ে এলে আমি তোমার পেছন পেছন এসেছিলাম। তুমি দেখনি। একেবারে একরোপে চলেছিলে তো? হঠাৎ মস্ত একটা গাড়ী থেকে এক ভদ্রশোক বেরিয়ে এসে তোমায় নমস্কার জানালে, তুমি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে বলে উঠলে—‘জারে, আপনি কোথা থেকে! ভারি মজা তো!’ তখন আমি তোমাদের পেছনেই ছিলাম।

—তাই বলুন। আবার টোষ্ট হাতে তুলে নিল সে। গাড়ী থেকে নামলেও সে কিন্তু আপনার দরজার কেউ নয়। আমাকে বাঙ্গাল বলছিলেন তো, ইনি তার চাইতেও বাঙ্গাল। দেশ ছেড়ে এখানে এসেছেন দেশ ভাগেরও বহু পরে।

—তারপর?

—তারপর বাস করেন উত্তরবঙ্গের গোয়ালে। খান আকীড়া চালের ভাত আর কচুর তরকারী।

রজত ভর দিকে তাকিয়ে গুর কণ্ঠা শুনতে শুনতে যে একে একে তার ডিমের সমস্ত খাবার গুর ডিসে তুলে দিতে লাগল, মজু লক্ষ্যে তা পড়ল না। সে খেতে খেতে নিজের তৌকে বলে চললো—মনে আছে দিদির বিয়ের দিন সন্ধ্যার ধবর দিতে এসেছিলাম যিরে না হবার। আপনি এক ডিসভর্তি হুথানু খাবার সামনে ধরে দিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত দিন তোমার

খাওয়া হয়নি।’ সেদিন এই ভজলোকটির স্থল তৈরীর কল্পনা পরিকল্পনা শুনতে শুনতে দিন-এমনই গড়িয়ে গিয়েছিল যে, তার মধ্যাহ্নের খাণ্ড-তালিকার প্রদান মেয় সেই অনবদ্য কচুর তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু সে তরকারী গলার এখনই হল কোটাতে লাগল যে আমার পক্ষে হুঁ গ্রাসের বই তিন গ্রাস মুখে তোলা সম্ভব হলো না। শুধু এঁর ক্ষুধার্ত খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম।

—স্থল কেমন চলছে তার? বেকনের টুকরোগুলো মজু ডিসে তুলে নিজের গ্রেট খালি করে রজত হেলে বসল সোফায়।

—স্থল হয়ই নি।

—কেন?

সংক্ষিপ্ত ভাষণে নীলের স্থল পরিকল্পনা কাজে পরিণত না হবার ঘটনা বলে খাওয়া শেষ করল মজু। তারপর টিপ-পট থেকে চা ঢেলে রজতের হাতে একটা কাপ তুলে দিয়ে নিজের কাপটা হাতে নিয়ে সোফায় পিঠ রাখলো সে-ও। বর্তমানে ইনি এখন সাহিত্যিক নামমণিপানী কোন এক ধর্মীর মন্তব্য করছেন। তার ঠাণ্ডা ঘরে মূল্যবান সিগারেট আর বিলিতি নম্রাতোলা কাপে চা খেতে খেতে নাম-শুদ্ধ লেখা বিলি করে চলেছেন। সামনে পুজোর মরশুম, তাই নাকি এখন তার নিশ্চিন্দ ফেলবার সময় মিলছে না। বলেন, উপাস্যের খাবার খাই। গাড়ীয়ে বাতায়ত করি। ঠাণ্ডা ঘরে বসি—সন্ধ্যার মতো কাটাই দিনগুলো। বেচারী!

—এই সৌভাগ্যবান বেচারার নাম?

—কি? বলে রজতের দিকে তাকাতোই রজতের কৌতুকোজ্জ্বল চোখের সঙ্গে চোখ মিললে হেসে ফেলল মজু। তার নাম? তার নাম নীল। ‘চাটা চক-চক করে খেয়ে নিয়ে কাপটা রাখতে রাখতে বললো—বত বাজছে কথায় সময় নষ্ট করছি। যে ভর আসা তাই এখন বলা হলো না। আমি কিন্তু একটা বিশেষ দরকারে আজ আপনার কাছে এসেছিলাম।

—বেচারার সঙ্গে পরিচয় করা বাবে একদিন কিন্তু বিশেষ দরকারে এসেছিলে? কি বলতো? অত্যন্ত উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করে মজু দিকে ঝুঁকে বসল রজত।

—একটা কাজ চাই।

—কাজ? যেন ‘কাজ’ শব্দটার অর্থ হৃদয়সম করে উঠতে পারল না রজত।

—হাঁ কাজ। একটা ছোটখাটো কাজের ভাষণ দরকার আমার। অবগু কলেজের কঁকে। আমার এক বন্ধু একটি এ্যাংলো মেয়েকে বাংলা শেখানোর চমৎকার কাজ জোগাড় করেছে। সেটা দেখেই আমার মনে এলো আপনার সে দিনের পাটিতে বহু বিদেশিনী সমাবেশ দেখেছিলাম। এমন একটা কাজ হয়তো জোগাড় হয়ে যেতে পারে আপনার কাছে এলে। আর শুধু বিদেশীরাই বা কেন, দেখলাম দেশীরাও তো প্রায় অনেকেই আপনারা—বালা জানেন না।

—আমরা বাংলা জানিনে।

—কোথার জানেন। ইংরেজিতেই তো। নিজেকেই ভেতরও কথা বলছিলেন।

—সে কি জানিয়ে বলে?

চুলের গোছা আঙ্গুলে জড়তে আর খুলতে খুলতে বিরত কর্তে রক্ত বললো—মুসকিলে ফেললে দেখছি।

অত্যাঁধ মাথার সব কিছু ঠেলে আগে এসে দাঁড়ায়। এই করতে গিয়ে যে সে নিজের দরকারী কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে খেয়াল মঞ্জুর হইল না। বললো—জ্ঞানেন, ঝাঁরা নিজের ভেতরও নিজের ভাষা ছেড়ে ইংরেজী ব্যবহার করেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। বলে চোঁটে মুখে একটা অবজ্ঞার বাজনা প্রকাশ করল মঞ্জু। কিন্তু ঝাঁরা তা করেন না তাঁরাও অজ্ঞাতব্যী হলেই সোজা চলে যান ইংরেজীতে। আজও এ কেন করে চলেছেন আপনারা?

বিস্মিত কর্তে রক্ত বললো—যাদের কথা তুমি শরীর থেকে আরশোলা ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো মুখ করে ঝেড়ে ফেলে দিলে, তারা কেন তাদের মায়ের মুখের কথা ছেড়ে অপরের মায়ের মুখের কথায় কথা বলে, এ তুমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে পারো। কিন্তু যারা বিদেশী তাদের সঙ্গে ইংরেজী বলা ছাড়া উপায় কি?

—উপায় না বলা। আপস্বাভির্য়ে যদি কেউ নিজের ভাষায় কথা বলতে শোনে তবে সে তো তাদের মস্ত সুবিধার কথা। কষ্ট করে অপার ভাষা শিখতে বসবে তারা কেন? জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে কোন শিক্ষাটা আমাদের। কিন্তু ইংরেজী না জানলে যেমন ইংরেজদের দেশে বসবাস অসম্ভব হয়, হিন্দি না জানলে হিন্দিভাষীদের রাজ্যে, তেমনি বাংলা না জানলে বাংলা দেশে চলাও অসম্ভব হবে—এই তো হওয়া উচিত—এই তো কবে তোলা উচিত।

মঞ্জুর মুখের চার পাশে এসে উঁকি-বুকি দিয়ে দাঁড়ানো বিন্দু-বিন্দু উত্তেজনার ভিড় দেখতে লাগল রক্ত।

—কিন্তু আপনাদের ভেতরই যদি থাকে অবজ্ঞা থাকে অন্যদর, তবে কি করে কি হবে?

রক্তকে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই বাড়তে দেখে বলল—কি, হাতের ঐ সিগারেটের ছাই-ঝাড়ার মতোই ঝেড়ে ফেলে দিলেন তো কথাগুলোকে আমার একেবারে টাটকা টাটকা?

—না। তুমি একথাই তো বলতে চাচ্ছ যে, প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োজনের চাপেই আমরা শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় ভাষাগুলো শিখে থাকি। বাস্তব ভাষার পেছনেও একটা প্রয়োজনের চাপ বা তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে—আর কোথাও না হোক বাংলাদেশটুকুর মধ্যে নিশ্চয়ই। ঠিক। কি করতে হবে বলো?

—আমি বলবো কি করতে হবে।

—তুমিই বলবে। আমার কাছে তো এ-সব অচেনা জগতের চিন্তা।

—তবে সে কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি উঠবো। বৌদিরা অপেক্ষা করবেন ঝাওয়া নিয়ে। যদি আপনার বান্ধবীদের কেউ বাংলা শেখেন তবে আমি শেখাতে পারি এবং বর্তমানে দেশের প্রয়োজনে নয়, নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই বসছি। পাছে রক্ত কথাটার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, তাই ব্যাগ খুলে হ' টুকরো কাগজ বের করে রক্তের সামনে ধরে বললো, এই দেখুন না হ'-টুকো কাজের জন্ত ঘুরে নিরাশ হয়ে তারপর আপনার কথা মনে পড়েছে, আপনার কাছে এসেছি। একটা টাকা বোজগারের উপায় না করতে পারলে চলবেই না যে।

রক্ত সোকায়ে বসেই হাত বাড়িয়ে পাশের দেয়ালটা টেনে খুলল। তারপর তার ভেতর থেকে বের করল একটা চেক-বই আর একটা কলম। টেবিলের উপর লম্বা চেক-বইটা মেলে ধরে প্রথমে লিখল মঞ্জুর নাম। তারপর একটা টানা সই দিল নিজের। কাগজটা ছিঁড়ে কাগজ চাপা দিয়ে রাখল মঞ্জুর সামনে।

বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—কি এটা?

—চেক। তোমার প্রয়োজনটা আমি জানিনে। একটা তুমি বসিয়ে নিও।

চেকটা হাতে তুলে নিল মঞ্জু। কিছুক্ষণ নীরবে রক্তের নাম সইটা দেখলে, তারপর চোখ তুলে বললো—পাঁচ দশ বিশ হাজার—বসাবো?

—বসাবো।

—কিন্তু তারপর আর যে কোন দিনও আমাকে দেখে দিন ভালো বাবার কথা আপনার মুখে আসবে না?

—আসবে।

—আসবে?

—হ্যাঁ আসবে। তুমি বোজ এসো।

—এমনি সাদা চেক সই করে কেবল একটা করে?

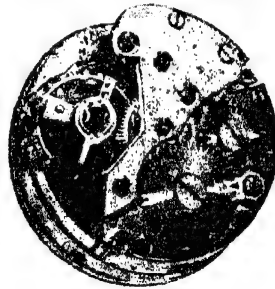
—দেবো।

—তারপর?

—তারপর যে দিন না পারবো সে দিন তুমি ঝাওয়াবে আমার।

—আমি? কিন্তু টাকা নিয়ে তো আমি জমিয়ে রাখবো না?

GUARANTEED



WATCH REPAIRING
UNDER EXPERT
SUPERVISION

ROY COUSIN & CO

JEWELLERS & WATCHMAKERS

4, DALHOUSIE SQUARE CALCUTTA-1

OMEGA, TISSOT & CO. SWITZERLAND

তখন আপনার এক সন্ধ্যার উপকরণ সংগ্রহের সাধ্যও যে আমার
মত বিশটা মঞ্জুর হবে না।

—ছেড়ে দেবো।

—পারবেন না।

—পারবো। দেখো তুমি।

—ততশ শীঘ্রম্। আজ থেকেই। বার বার চেক কাটার
দরকারটা কি। কেটে দিন একবারে। আপনার কিছু নয়।

হাসল রজত—না আমার কিছু নয়।

আজ সন্ধ্যার আসবো আমি দেখতে। ঠিক?

উঠে মঞ্জুর সোকার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রজত তাঁর তামাটে
হাতের লম্বা লম্বা আঙুলে মঞ্জুর মাথাটা সয়েছে একটু চাপড়ালো।
তারপর হু-হাত পেছনে রেখে পায়চারী করতে লাগল ঘরের
এ-মাথা ও-মাথা।

টেবিলের ওপর থেকে রজতের কলমটা তুলে নিয়ে মঞ্জুরের
উঁটানো শেখমের মতো গোটা নয় দশ শেখমধরা নয়ের সারি
চেকটার মধ্যে লিখে কলম বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু।

—নিলে না।

—কাজের খোঁজ নিতে আসবো। মনে থাকবে তো আপনার?

—থাকবে। সেই খোলা দেয়ালটার ভেতর একসঙ্গে ভাঁজ করা
সামনে যে দশ টাকা নোটের পাঁজাটা ছিল সেটা তুলে মঞ্জুর ব্যাগটা
ওর হাত থেকে নিয়ে তার ভেতর ভরে দিতে দিতে রজত বলল—ধার
দিলাম। কাজ পেয়েই শোধ দিও।

এ টাকা যে ওর পক্ষে এখন কি, জানে শুধু মঞ্জু। কিন্তু এ ঘর
থেকে টাকা হাতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। এর চাইতে অসুন্দর
বৃত্ত ওর ধারণা ও আর কোন দিন কিছু দেখেনি। শুক হয়ে দাঁড়িয়ে
বইল মঞ্জু।

ব্যাগটা নিজ হাতে মঞ্জুর কাঁধে বলিয়ে দিয়ে রজত বলল—সব
কিছু নিয়ে এতো অধুনা ভাবতে নেই। বিশেষ করে তোমার মুখে
চিন্তা মানার, ভাবনা মানার না একবারেই।

প্রয়োজনের চেহারা এক এক সময় এমন দুর্দান্ত হয়েই দেখা
দেয়, এখন অসুন্দরকে শুধু বুঝি চোখ বুজে আর ঢোক গিলেই
এড়াতে হয়।

বাড়ীতে ঢোক আর আগে টাকাগুলো ব্যাগ থেকে বের করে
কমালে জড়িয়ে বুকের ভেতর ঢোকালো মঞ্জু। কোথায় রাখবে,
কে দেখে ফেলবে কে জানে! কথার বলে, সাবধানের মার নেই।
সে টাকা আর মঞ্জু বেরই করল না জামার ভেতর থেকে।
বিকলে গা বুকে গিয়ে মনের ভুলে গায়ের জামা খুললে নামে
ভোলা কমালগুচ্ছ টাকা পড়ে গিয়েছিল মোকের উপর। টাকাটা
তুলে হাতে নিয়েও কতক্ষণ চূপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে। যদি ও
দেখতে না পেত, খেয়াল না করত! এই তো মৌরী এসে দরজার
দাঁড়িয়ে তাকা দিয়ে গেল তাড়াতাড়ি করবার জন্য। ও বেকসই
তো সে এসে চুকতো। তার চোখেই তো পড়ত কমালে জড়ানো
এই টাকা। সেই তো উপড় হয়ে তুলত। তারপর পাগল হয়ে
উঠত না সে। কেশমি শুরু করত না সে। গুনত কোন যুক্তি?
মানত কোন কারণ? রজতের এই দেওয়ার পেছনে কোন মতলব
নেই, ওর এই নেওয়ার পেছনে কোন অমর্থনা নেই—দুই টোটে
সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো বিদ্রোহের ঢেউ তুলে ছুড়ে ফেলে দিত না
কথাগুলোকে মৌরী ঢেউ-এর মাথাবাই বস্তুর মতো। দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে মঞ্জু যেন যে দুর্ঘটনা ঘটতে বাচ্ছিল, তার ত্রাস আর
অন্ধের জন্য বলা পাওয়ার আরাম এই হুই অজুত্বিতর উপর দিয়ে
একবার সাধের পদচারণা করে এলো।

[ক্রমশঃ]

মানসতীর্থে

বাণী পাণচৌধুরী

হে বাব্বী মহান,

চলেছো গতির পথ অব্যাহিত করি, ভরে নিতে প্রাণ

বিরাট বজ্রের আফ্রানে,

অসীম লক্ষ্যের পানে

তাই বিদ্যারিত পথ।

অরণ্যের নিঃসঙ্গ মর্গে

যে বাণী রাধিয়া গেলে অশরীরী স্বরে

উপল-নির্ধরে

কীণ প্রোতধ্বনি বীচিত্র 'পরে

যে ধ্বনি রণিরা উঠে আত্মহারা

সে তোমারই গতিহীন প্রাণধারা

মর্গের নিবেদন অনন্তে।

বস্ত্রের অস্পষ্ট প্রভাতে

পটাস্তরে, নিঃশব্দ অন্ধ রাতে

পেরেছিলো তোমার অন্তর

আগ্নিবৈতার পরম নির্ভর

হে পবিত্র, তাই সেই বিচ্ছুরিত হর্ষে

দ্বিষ্যজ্যোতি অপ্রমের বিরাটের স্পর্শ

জীবনের প্রথম দীক্ষা।

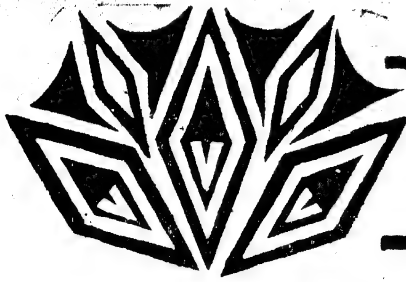
তোমার চরণপাতের শতান্তর চিহ্ন

করিবে না অশাস্ত এ দীন মালিঙ্গ?

করিবে না আর বার বীর্ঘ্যে, ভেঙ্গে, ক্রমে

প্রসারিত জগতের প্রবেশ

পূণ্যপুত তব আত্মরীক্ষা?



সাহিত্য পরিষদ

১৩৬৫ সালের উল্লেখযোগ্য বই

ভ্রমণ ও অভিযান

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| অকারণের পথ ৪-৫০ | জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মিত্র ও ঘোষ |
| আজকের পশ্চিম ৪-৫০ | ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এশিয়া |
| জাপানে ৬-৫০ | অরবিন্দকর রায় এন, সি, সরকার |
| নতুন ইয়োরোপ : | |
| নতুন মাহুঘ ৫-০০ | মনোজ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| নেপোলিয়নের দেশে ২-০০ | দিলীপ মালিকার এ |
| বিদেশ-বিভূই | দক্ষিণারঞ্জন বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫-৫০ | গোপালদাস মজুমদার (সম্পাদিত) |
| | গোপালদাস পাবলিশার্স |
| তিমুরী ৩-৫০ | সুকুমার রায় বেঙ্গল পাবলিশার্স |

জীবনালেখ্য ও মনীষী প্রসঙ্গ

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ১-৫০ | কুব্জরঞ্জন রায় এল রায় এণ্ড কো |
| কবি শ্রুতান্ত ২-৫০ | অশোক ভট্টাচার্য সারস্বত লাইব্রেরী |
| কেশবচন্দ্র সেন ১-০০ | বোগেশচন্দ্র বাগল বঙ্গীয় সাঃ পঃ |
| ফ্রাঙ্কজিপ্তে দিকপাল বাঙালী ৩-৫০ | অজয় বসু দেবদত্ত এণ্ড কো |
| দরদী শরৎচন্দ্র ৪-৫০ | মণীন্দ্র চক্রবর্তী বসুধারা |
| ৬৭ জীবনের পুণ্য কাহিনী ২-০০ | আবদুল আজীজ আল আমান |
| | জাগরণ প্রকাশনী |
| নজরুলকে যেমন দেখেছি ২-৫০ | বেগম শামসুন নাহার ভারতী সাঃ |
| নজরুল প্রসঙ্গে ৪-০০ | মুজাফ্ফর আহমেদ বিশ শতাব্দী |
| বাবার কথা ৩-০০ | উমা দেবী মিত্রালয় |
| বাঘা যতীন ২-৭৫ | শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় আই, এ, পি |
| বিজ্ঞানী স্বয়ং জগদীশচন্দ্র ৬-০০ | দীনেশ চট্টোঃ (সম্পাদিত) বিজ্ঞানদর |
| বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১২) ৫-০০ | অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এম, সি, সরকার |
| বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ৩-০০ | মণি বাগচী শ্রীগুরু |
| ভারতের সাহক (৪র্থ খণ্ড) ৬-৫০ | শতরনাথ রায় প্রাচী |
| রামমোহন ৪-০০ | মণি বাগচী জিজ্ঞাসা |
| শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ২-৭৫ | অসমঙ্গ মুখোপাধ্যায় আই, এ, পি |
| সরসীর | সুশীল রায় ওরিয়েন্ট |

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ৬-০০ | দীপ্তি ত্রিশাঈ নাতানা |
| উনিশ শতকের বাংলা | |
| সাহিত্য ৫-০০ | ত্রিপুরাশঙ্কর সেন পণ্ডুরা লাই: |

উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| বাংলা সাহিত্য ১-০০০ | অসিতকুমার বন্দ্যোঃ বুকল্যাণ্ড |
| কবিতার ধর্ম ও আধুনিক বাংলা | |
| কবিতার আত্মবদল ৪-০০ | অরুণ ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা |
| কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫-০০ | মনজীলা খাতুন ভারতী লাইব্রেরী |
| কলিকাতার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র | বোগেশচন্দ্র বাগল শ্রীগুরু |
| চলচ্চিত্র ২-৫০ | রাজশেখর বসু মিত্র ও ঘোষ |
| জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ৩-০০ | সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ পাইওনিয়র |
| ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও | |
| সাহিত্য ৫-০০ | মোহিত পুরকারস্ব কার্মা কে, এল |
| ২য় প্রসঙ্গ ৫-০০ | সুশীল রায় (সম্পাদিত) পঃ প্রঃ ভবন |
| বঙ্গ যুগের রস ২-৫০ | শ্রোমেন্দ্র মিত্র কথামালা |
| বাংলা নাট্য বিবরণে | |
| গিহিচন্দ্র ৫-০০ | |
| বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা | |
| (২য়) ৫-০০ | অহীন্দ্র চৌধুরী বুকল্যাণ্ড |
| রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের | |
| প্রভাব ৫-৫০ | গোপাল হালদার এ, মুখার্জি |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ৭-০০ | |
| সাহিত্যে ছোট গল্প ৮-০০ | বিমলকান্তি সমদার গুরুদাস |
| সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা ৫-০০ | খগেন্দ্রনাথ মিত্র বিজ্ঞানদর |
| | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ডি, এম |
| | শৈলেন্দ্র সেনগুপ্ত কার্মা কে, এল |

রম্যরচনা

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| অজ্ঞ ও প্রত্যাহ | নীলকণ্ঠ বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| উপল-উপকুলে ২-২৫ | নিমাইলাধন বসু এ, কে, ঘোষ |
| একটি স্রবের কাহা ২-৫০ | ভারতপুত্রম্ সাহিত্য |
| নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ৩-৫০ | বাণী রায় মুখার্জি বুক হাউস |
| ব্যান ও বস্তা ৩-০০ | শশিভূষণ দাশগুপ্ত বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| ভেলিকি থেক ভেজ ৬-০০ | আনন্দকিশোর মুন্ডী এ |
| যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪-০০ | বিক্রমাদিত্য এ |
| লৌহকপটি | জয়াসঙ্ঘ এ |
| সত্ত্ববত্তির গল্প ২-৫০ | সত্ত্ববত্তি এ |
| হরেকরকমবা | নীলকণ্ঠ এ |

রসরচনা

| | |
|----------|----------------|
| প্রবৃদ্ধ | বলাকা প্রকাশনী |
|----------|----------------|

ধর্ম ও দর্শন

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| দর্শন প্রসঙ্গ ৭-০০ | ইন্দু মজুমদার | আণ্ডতোষ বুক ষ্টল |
| দর্শনের ভূমিকা ৬-০০ | নীরদবরণ চক্রবর্তী | এ, মুখার্জি |
| পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও | | |
| মার্ক্সীয় দর্শন ৫-০০ | রবি রায় | সিগনেট |
| দ্বিত্যপ্রজ্ঞ দর্শন (বিনোবা) ১-৭৫ | বীরেন্দ্র গুহ | সর্বোদয় |
| হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা ৪-৫০ | স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরি | সত্যাপ্রসন্ন |

সংগীত

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| সবীজ সঙ্গীতের ভূমিকা ২-০০ | কবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও | |
| | বীরেন্দ্র বন্দ্যো: | এম, সি, সরকার |
| হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের | | |
| স্থান ২-৫০ | বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ডি, এম | |

অভিধান

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------|
| পৌরাণিক অভিধান ৭-০০ | স্বধীরচন্দ্র সরকার | এম সি সরকার |
|---------------------|--------------------|-------------|

রচনাবলী

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| প্রভাত গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ১০-০০ | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | শ্রীভবন |
| বনফুল-রচনা-সংগ্রহ ৭-৫০ | বনফুল | মিত্র ও ঘোষ |
| মাইকেল-রচনাসম্ভার ১০-০০ | প্রমথনাথ বিষ্ণী (সম্পাদিত) | ঐ |
| রচনা-সংগ্রহ (১ম খণ্ড) ১০-০০ | তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় | বেঙ্গল পাবলিশার্স |

ইতিহাস

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের | | |
| সাধনা ৪-০০ | অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য | পপুলার |
| সম্রাট বাহাদুর শাহ বিচার ৩-০০ | অপূর্বমণি দত্ত | মিত্র ও ঘোষ |

নানা নিবন্ধ

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| আধুনিক ইয়োরোপ | দেবজ্যোতি বর্মা | বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| গণতন্ত্র প্রসঙ্গে ২-০০ | অম্লান দত্ত | মিত্রালয় |
| গ্রন্থাগার পরিচালনা ২-৫০ | রাজকুমার চক্রবর্তী | শ্রীগুরু |
| জেল ডায়েরী ৩-০০ | সতীন সেন | মিত্রালয় |
| টি বি সম্বন্ধে ৪-০০ | ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় | মিত্রালয় |
| নারীর উক্তি ২-৫০ | ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী | বিষভারতী |
| পূরমাণু শক্তি ৪-০০ | অমলেন্দু লালগুপ্ত | |
| | গোপালদাস পাবলিশার্স | |
| ঐতিহাসিক মনোবিজ্ঞান | ঐনিবাস ভট্টাচার্য | বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা | নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত | ঐ |

কবিতা

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| অনিলা থেকে মিলে ১-৫০ | মণীন্দ্র রায় | এম, সি, সরকার |
| আলাপ ২-৫০ | বিষ্ণু দে | এম, সি, সরকার |
| আলাপিত সমগ্র ২-০০ | আলোক সরকার | মিত্রালয় |

ব্যঙ্গ কবিতা ৬-০০

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| যে আঁধার আলোর অধিক ২-৫০ | | |
| রক্তগোলাপ ২-৫০ | | |
| শেষ সংগীত ৪-০০ | | |
| শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪-০০ | | |
| সন্ধ্যামণি ৫-৫০ | | |
| সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা ৪-০০ | | |
| স্বনির্গাচিত কবিতা ৪-০০ | | |

বনফুল

| | |
|------------------------|---------------|
| বুদ্ধদেব বহু | এম, সি, সরকার |
| বিমলচন্দ্র ঘোষ | |
| নজরুল ইসলাম | আই, এ, পি |
| সুনির্ভল বহু | মিত্র ও ঘোষ |
| কালিদাস রায় | এ, মুখার্জি |
| কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদিত) | গ্রন্থগৃহ |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য | আই, এ, পি |

নাটক

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| অপরাজিত ১-৭৫ | রমেন লাহিড়ী | জাতীয় সা: প: |
| আকাশবিহঙ্গী ২-০০ | অজিত গঙ্গো | সেনগুপ্ত বুক ষ্টল |
| উটরোগ ২-০০ | উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো | ডি এম |
| কঙ্কণ ২-৫০ | তারানন্দর বন্দ্যো | শ্রীগুরু |
| কালরাত্রি ২-০০ | চিত্তবরুণ ঘোষ | বিংশ শতাব্দী |
| ক্ষুধা ২-৫০ | বিধায়ক ভট্টাচার্য | শ্রীগুরু |
| গৃহদাহ (শরৎচন্দ্র) ২-০০ | অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল | গুরুদাস |
| চোর ২-০০ | ছবি বন্দ্যো গোপালদাস পাবলিশার্স | |
| ছায়ানট ২-৫০ | উৎপল দত্ত | পপুলার লাইব্রেরী |
| তিন সর্গ ১-৩২/২-০০ | অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | |
| | আর্ট অ্যান্ড লেটার্স | |
| তিনয়ন ১-০০ | সুনীল দত্ত | জাতীয় সাহিত্য প: |
| থানা থেকে আসছি ২-০০ | অজিত গঙ্গো | প্রকাশনী |
| নব একাদশ ৩-৫০ | মদ্যধ রায় | গুরুদাস |
| বহিঃপতঙ্গ ২-০০ | শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীগুরু |
| বারো ঘণ্টা ১-২৫ | কিরণ মৈত্র | রাইটস কর্ণার |
| রাজলক্ষ্মী (শরৎচন্দ্র) ২-০০ | দেবনায়াগ গুপ্ত | গুরুদাস |
| সকাল-সন্ধ্যার নাটক ৩-৫০ | সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী | মিত্রালয় |

গল্পগ্রন্থ

| | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| অন্তর্যম্য | বীরেন্দ্রনাথ দাশ | বেঙ্গল পাবলিশার্স |
| অপরূপা ৪-০০ | শৈলজানক মুখো | ত্রিবেণী প্রকাশন |
| আনন্দনট ৩-০০ | বিভূতি মুখো | শ্রীগুরু |
| উত্তরণ ২-৫০ | নরেন্দ্রনাথ মিত্র | গুরুদাস |
| এক অঙ্গে এক রূপ ৩-০০ | অভিত্যকুমার সেনগুপ্ত | নাভা |
| এলাজি | প্রমথনাথ বিষ্ণী | বিষবাণী |
| কাঠের ঘোড়া ২-৫০ | কুমারেশ ঘোষ | শতাব্দী |
| গল্পপঞ্চাং ৮-০০ | আশাপূর্ণা দেবী | মিত্র ও ঘোষ |
| গল্পগুহন ৪-০০ | প্রবোধকুমার সাম্যাল | শ্রীগুরু |
| চন্দ্রমঞ্জিকা ২-৫০ | ভবানী মুখো | এম সি সরকার |
| চৈত্রদিন ৪-০০ | ননী ভৌমিক | ভ্রাশনাল বুক এ: |
| ছিলৈন বাবুর দেশে ২-৫০/৩-০০ | ধনঞ্জয় বৈরাগী | আর্ট এণ্ড লেটার্স |
| জলপায়রা ৪-০০ | প্রোমেন্দ্র মিত্র | ত্রিবেণী প্রকাশন |
| দিবারাত্রি ৩-০০ | বিমল কর | শ্রীগুরু |
| দম্ভমধুর ৩-৫০ | হুজুতাবা আলী ও রজন | |

প্রকাশিত রঙ ২'৫০
বরনারী ২'৫০
বিয়ের প্রদ বউ ২'৭৫
বিবশাধর ২'৫০
মনোমুকুত
মহয়া কথা

মহয়া মিলন
মহাকুরঙ্গী ৩'৫০
মেঘলা ছপু ২'২৫
মৃগশিরা ৩'৫০
রূপার শেষক ২'৫০
রূপের দায় ৩'৫০
সেই চিরকাল ৩'৫০

প্রবোধবন্ধু অবিকারী নিউ ক্রিপ্ট
চিত্তরঞ্জন ঘোষ কিশ শতাব্দী
শিবরাম চক্রবর্তী কথামালা
তারাপ্রসন্ন বন্দ্যো শ্রীগুরু
সমরেশ বসু ক্লাসিক প্রেস
আন্তোতা মুখোপাধ্যায়
গুপ্ত প্রকাশিকা
বীরাঙ্গ ভট্টাচার্য কারেট বুক শপ
শরদিন্দু বন্দ্যো শ্রীগুরু
প্রতিভা বসু এসো: পাবলিশার্স
হরিনারায়ণ চট্টো শ্রীগুরু
দীনেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগুরু
জয়দেব রায় এম সি সরকার
দেবেশ দাশ মিত্র ও ঘোষ

উপন্যাস

অনমিতা ৪'০০
অজ দিগন্ত ৫'০০
অরণ্যবাস ৬'০০
আনোবীলাল পাণ্ডেটয়া ২'৫০
আমার কীসি হল ৩'৫০
উত্তরাংশ ৪'০০
একটি আশ্বাস ৬'৫০
একটি স্বাক্ষর ৩'০০
কলপথ ২'৭৫
করলাকুটির দেশ

কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪'৫০
কেরী সাতবেশের মুন্সী ৮'৫০
চায়না টাউন ৪'৫০
চারপ্রহর ২'০০
জলন্তবঙ্গ ৪'০০
ঝড় ও বিহঙ্গ

ডাকহরকরা

তামসী
বাঁপতাল ২'৭৫
তুমি সন্কার যেথ ৫'৫০
ত্রিগাথা ৮'০০
তৃতীয় ভ্রম ৪'৫০
পাঁড়ের ময়না ৩'৫০
নক্ষত্রের রাত ৩'৫০
নীলদিগন্ত ৩'০০
নীলরাত্রি ৩'৫০
পার্ক ৪'৫০

নবোদ্যোগ মিত্র মিত্র ও ঘোষ
হরিনারায়ণ চট্টো শ্রীগুরু
বিশনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
বিক্রমদিত্য আই এ পি
মনোজ বসু ত্রিবেণী প্রকাশন
তারাপ্রসন্ন বন্দ্যো মিত্র ও ঘোষ
সুবোধ চক্রবর্তী শ্রীগুরু
রামপদ মুখো এসো: পাবলিশার্স
সুনীল সরকার এশিয়া
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
শক্তিধর রাজগুরু গুরুদাস
প্রমথনাথ বিন্দী মিত্র ও ঘোষ
বাবীন্দ্রনাথ দাশ বেঙ্গল পাবলিশার্স
মাহমুদ আহমদ সাধারণ পাবঃ
বনফুল আই এ পি
তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
জয়সিন্ধু বেঙ্গল পাবলিশার্স
নীলা মজুমদার ঐ
শরদিন্দু বন্দ্যো নিউ এজ
সমরেশ বসু ক্যালকাটা পাবলিশার্স
দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্রালয়
পূর্ণন্দু পাত্রী সাহিত্য
মতি নন্দী আই, এ, পি
নারায়ণ গঙ্গো: গোপালদাস পাবঃ
জ্যোতির্বিদ্য নন্দী আই, এ, পি
সরিন্দেব মজুমদার প্রাচী

প্রদক্ষিণ
ফায়সের আয় ৫'৫০
বইডুবির খাল ৩'০০
বন্ধনহীন গ্রন্থি ২'০০
বেগম ৩'০০
বন্দীক ৪'০০
মন্তাগলা ৫'০০
মহারাজী ৩'৫০
মন কেমন করে ৩'৫০
মন নিয়ে খেলা ৫'০০
মনে মনে ২'০০
মৃগতৃষ্ণা

মেঘ পাহাড়ের গান ২'৫০
মেঘ ডব্বর ৩'০০
মেঘের পরে মেঘ ৩'৭৫
মৌসুমী ৩'০০
মধুর মধুর ৫'৫০
মধুমিতা ৪'৫০
রূপার রাত্রি ৫'০০
বোয়াক ৩'৫০
শতকিয়া ৮'০০
শেষ পদন্ত ৩'০০
সমুদ্র সফন
সিদ্ধপারে ৭'০০
স্বপ্নাশ্রমে চেষ্টা
সোহাগপুরা
সিদ্ধপারের পাখি ১'০০
মুতি ৩'০০
বেলোয়ারী ৬'৫০

স্বাধীনজন মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
বিমল কব কথামালা
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীগুরু
বাসবী বসু বলাকা প্রকাশনী
স্বপ্নাশ্রম বন্দ্যো: ক্যালকাটা পাবঃ
নারায়ণ সাত্তাল বেঙ্গল পাবলিশার্স
অচ্যুত গোস্বামী ডি, এম
বনফুল ঐ
বিমল মিত্র নিউ এজ
বীরাঙ্গ ভট্টাচার্য এম, সি, সরকার
সত্যজিত মৈত্র মুখার্জি বুক হাউস
স্বপ্নাশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স

অনিলকুমার ভট্টাচার্য ডি, এম
প্রশান্ত চৌধুরী বলাকা
প্রতিভা বসু নান্দনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র আই, এ, পি
মহাশেতা ভট্টাচার্য এ, মুখার্জি
সরোজকুমার রায়চৌধুরী বিজ্ঞানদয়
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত আনন্দ পাবলিশার্স
দীপক চৌধুরী এম, সি, সরকার
সুবোধ ঘোষ আনন্দ পাবলিশার্স
দৌরীন্দ্রমোহন মুখো: শিশির পাবঃ
আন্তোতা মুখোপাধ্যায় মিত্র ও ঘোষ
নীলরঞ্জন দাশগুপ্ত নিউগিটি
নবোদ্যোগ মিত্র বেঙ্গল পাবলিশার্স
গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রীগুরু
প্রমুদ রায় বেঙ্গল পাবলিশার্স
সঞ্জয় ভট্টাচার্য শ্রীগুরু
প্রবোধকুমার সাত্তাল মিত্র ও ঘোষ

শিশু-সাহিত্য

অথ ভারত কথকতা ২'২৫
আলি ভুলির দেশে ২'০০
আত্মিকালের বহির্ভূত
আধুনিক ম্যাজিক ২'০০
এ দেশ আমার (২য়)
খুশির হাওয়া ১'৫০
খোশাল, খুশি অসম্ভব ৩'০০
চামড়ার কাজ
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
(বনফুলের) ২'০০
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
(হেমেন্দ্রকুমার) ২'০০

শ্রীকথক ঠাকুর বিজ্ঞানদয়
সুখলাতা রাও
জয়ন্তকুমার ভায়ুড়ী ক্লাসিক প্রেস
এ. সি. সরকার মিত্রালয়
দেবীপ্রসাদ চট্টো: বেঙ্গল পাবলিশার্স
নারায়ণ গঙ্গো: অত্যাশ্রয় প্রঃ মন্দির
অমির চক্র: (সম্পাদিত) ঐ
ননীগোপাল চক্র: বেঙ্গল পাবলিশার্স
বনফুল অত্যাশ্রয় প্রকাশ মন্দির
হেমেন্দ্রকুমার রায় ঐ

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

(দৈনিক বঙ্গবন্ধু :) ২'০০

ছোটদের জীকাজ ২'৫০

ছোটদের বড়মহল ৩'৫০

ঝড়ের হাতী ১'৬০

জ্ঞান থেকে অজ্ঞান ১'৬০

নিশ্চিন্তপুর ১'৬০

পদ্মসোলাপ ২'০০

পাকল পাকল পাকলটি

প্রাণী ও প্রকৃতি

বনের ডাক ৫'০০

বাংলার ডাকাত (২য়) ২'৫০

মায়ের বাঁশি ৪'৫০

মামা ভায়ে ০'৭৫

মামাবাড়ি ১'৫০

রঙিন রূপকথা ১'৬০

সদাশিবের তিনকাণ্ড ১'৭৫

সহজ গল্প

সাত রাজ্য ১'৮০

রবেরঙ ৩'৫০

রূপকথার বাঁশি ২'২৫

দৈনিক বঙ্গোপাধ্যায়

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির

এম, সি, সরকার

অনুলিখিত সম্পাদিত জাতীয় সাংগ:

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এসো: পাবলিশার্স

বুদ্ধদেব বসু এ

প্রমোদ মিত্র এ

মনোজিৎ বসু মিত্রালয়

অমিতাভ সেন অক্ষর

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

স্বামী বিশ্বাসানন্দ অক্ষর দে

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বুদ্ধাবন ঘর

বিমল ঘোষ (মোহাছি) মিত্র ও ঘোষ

শিবরাম চক্র: এম, সি, সরকার

অরবিন্দ গুপ্ত অভ্যুদয় প্রঃ মন্দির

প্রবোধ সান্ডাল এসো: পাবলিশার্স

শরদিন্দু বঙ্গোপাধ্যায় নিউ এজ

জীলেশা গুপ্ত বেঙ্গল পাবলিশার্স

সুকুমার দে সরকার অভ্যুদয় প্রঃ ম:

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ

সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: আই, এ, পি

প্রাচীন সাহিত্য

বিহারীলাল গোস্বামী মিত্র ও ঘোষ

কুমারসম্ভব

অনুবাদ

অভিসার (জাঁ পল সার্ত)

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়জ্ঞ ভাট্টা

কাম্বীর প্রিন্সেস (কারশিক)

বিমল দত্ত

কাসানোভার স্মৃতিকথা ৫-৭৫

শান্তা বসু

চিড়িয়াখানার খোকাধুকু

আর্ট এণ্ড লেটার্স

(ডেরা চ্যাপলিন) ৩-০০

প্রতিভা দাশগুপ্তা

হু কুনকে ঘান

পপুলার

(শিবশঙ্কর পিল্লাই) ৩-০০

ত্রিবেণী প্রকাশন

বাগ্মীকি রামায়ণ ১২-০০

শিশিরকুমার নিয়োগী এ, মুখার্জি

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

সময় রায়চৌধুরী

(এ, এন, কাবানড) ৭-০০

জ্ঞানদাস বক এ:

মাটির মাহুয় (কালিন্দীচরণ

জ্ঞানদাস বক এ:

পারিগ্রাহী) ২-৫০

সুখলতা রাও

সাগরে মিলায়ে ডন

জ্ঞানদাস বক এ:

(ললোথক) ৬-০০

রথীন্দ্র সংকর

সাহিত্য শিল্প প্রসঙ্গ

জ্ঞানদাস বক এ:

(মাস্টার্স এন্ড স্টুডেন্টস) ৩-০০

এ

স্মৃতিকথা

খড়ির লিখন ২-৫০

সুখলতা

ছেলেবেলার দিনগুলি ৩-০০

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

তত্ত্বাবিলাসীরা সাধুসঙ্গ (৩য়) ৬-৫০

নিউ এজ

যা বলে তাই বলে ৩-০০

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি, এম

রবি-তীর্থে ৫-০০

শংকর

স্মৃতিচিত্রণ

নিউ এজ

এখন নিশ্চিত জানি, কোন দিন আর

তনবে না' তনবে না কেউ

কোন স্বর

আগের বীণার।

সে আজ নীরব কণ্ঠ। ভাবাহীন নিরুত্তর কবি

আজকে সবার কাছে। সে জীবন্ত

একথানা

অত্যাশ্চর্য ছবি।

তাই তো, এখন তাঁর

চায় পাশে বসে সব বারোয়ারী পাণ

অকত, বিরক্ত হয়ে কমে ওঠে।

বিজোহী এখন জীব

হারিয়েছে প্রাণের উত্তাপ।

কাজী নজরুলকে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

বা কিছু উপমা জানি সবই, মনে মনে

ভাবি। তবুও তুলনা তাঁর মেলে না, মেলে না।

আমি যে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য ছবি।

কখনো উপমা দিই—

তাকে,

স-গাভীর অর্জুনের সাথে।

আবার কখনো বলি,

হলো না, হলো না।

কারণ, গাভীর নয়

হাতে তাঁর ছিল অগ্নিবীণা

প্রাণে ছিল আগ্নেয় উত্তাপ।

হঠাৎ কি জামি হল! কি যেন কি কুল!

আগ্নেয় বীণায় তারে

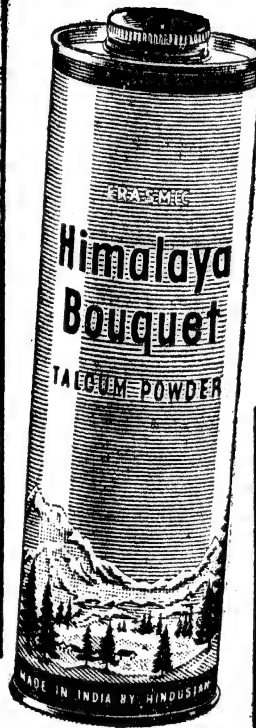
হাতের আঙল

তাঁর

জ্বল হতে গেল।



ব্যবহার করুন
হিমালয় বোকে
ট্যালকাম পাউডার



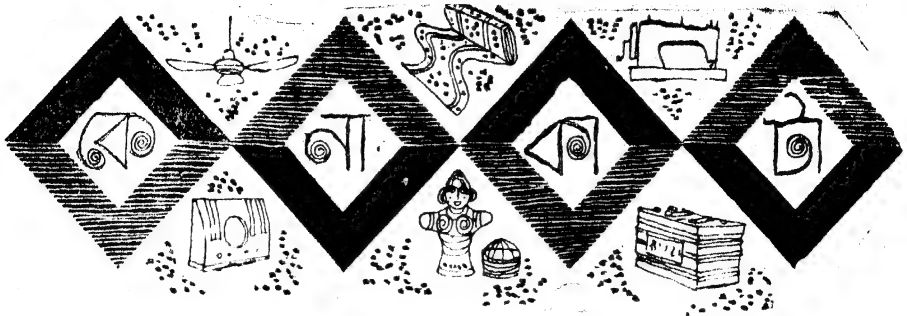
সারাদিন
সতেজ
থাকার জন্যে

- এত সুগন্ধ
- এত কম খরচ
- সারা পরিবারের
পছন্দই আদর্শ



এসাদিক লভসের পক্ষে হিন্দুস্তান লিটারি লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

HBT-19-K52 BC



শিল্প ও কারিগরী বাত্য়ঘর

শিক্ষা ও সমুন্নতির ক্ষেত্রে বাত্য়ঘরের গুরুত্ব ও উপযোগিতা যে কতখানি, এ বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানশিপায় মানুষের বিভিন্ন চাহিদা মেটাবার একটি স্থলর ব্যবস্থা যেমন গ্রন্থাগার, তেমনি অত্যন্ত প্রধান উপায় নিম্নলিখিত বাত্য়ঘর। আধুনিক শিল্পায়নের যুগে যে কোন দেশে শিল্প ও কারিগরী বাত্য়ঘরের মূল্য তুলনায় নিশ্চয়ই আরও বেশী।

আমাদের একটি সাধারণ ধারণা—বাত্য়ঘর হল কতকগুলি বিষ্মত ও সচল বস্তুর সমাবেশ বা সংরক্ষণ কেন্দ্রবিশেষ। কিন্তু বাস্তব উপযোগিতার দিক তাকিয়ে এই ধারণা অত্যন্ত বলে মনে নেওয়া চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন বাত্য়ঘরই একটি জীবন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে বা কিছু থাকুক জড় কি জীবন্ত, তাই মানুষের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করবে বরাবর। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনামূলক বিচার-নিরীক্ষার সুযোগও দিবে থাকে এই বাত্য়ঘর। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান যুগে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলতে গ্রন্থাগার আর বাত্য়ঘরকে বুঝায়। বাত্য়ঘরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা লক্ষ্য—নানা দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সংগৃহীত ও সংরক্ষিত দ্রব্যাদির পরীক্ষাচরার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার এবং সাধারণ জীবন সমৃদ্ধির জন্য পদ্যাপ্ত জ্ঞান বিকাশ।

পশ্চিমী জগতে শিল্প ও শিল্প-বিজ্ঞানের বাত্য়ঘর বহু কাল আগে থেকেই চলতি। সহজ কথায় যে সকল বাস্তব শিল্প বিষয়ে সমৃদ্ধ ও অগ্রণী, সেখানেই সেখানে পাওয়া যাবে একাধিক বাত্য়ঘর। এই ধরনের বাত্য়ঘর অবশ্য প্রথমে সংস্থাপিত হয় ইউরোপে, কিন্তু এক্ষণে সমূহ মাণিক্য যুক্তরাষ্ট্রেই এর সংখ্যা অধিক। একমাত্র নিউইয়র্ক সহরেই বিভিন্ন রকমের বিজ্ঞান বিষয়ক বা শিল্পকলার বাত্য়ঘর রয়েছে কুড়িটির উপর। এ ছাড়া আছে চারটি উদ্ভিদ বিষয়ক বাত্য়ঘর (বোটানিক্যাল গার্ডেন) ও সতেরটি ঐতিহাসিক বাত্য়ঘর। আমেরিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত বাত্য়ঘরখানি একটি মন্ত বিষয়—বিভিন্ন তথ্য ও ইতিহাসের নজীর সম্বলিত এমন প্রকাণ্ড জাদুঘর বা সংগ্রহশালা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া—ইউরোপের এই তরুণ জায়গা এবং অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষামূলক বাত্য়ঘর বিস্তারিত আছে কোনও না কোন ধরনের।

এই প্রসঙ্গে শিল্পায়নে ব্রতী স্বাধীন ভারতের কথা আগনিই ওঠে। এত কাল অস্বাভাবিক নাগণ্য ভারত আঁধার ছিল, এদিকে বাওনার পথে স্বভাবতই তার ছিল নানা বাধা ও প্রতিবন্ধক। এখন জাতীয়

সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছে এই দেশটিকে—কৃত শিল্পসমৃদ্ধ করার দাবী রাখছেন পৃথিবীর অপ অগ্রণীর ও স্বাধীন জাতগুলির মতো। বস্তুতঃ, বিত্তীয় পক্ষাঘরি পরিকল্পনার শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অনেকট বেশী। যে কোন শিল্পায়নের প্রাথমিক প্রয়োজন যেটি—সর কারিগরী বিভাগজনের ব্যবস্থাও এরই ভিতর কিছু কিছু যেন হয়েছে তা' নয় কিন্তু উন্নত শ্রেণীর শিল্প-সংগ্রহশালা বা বাত্য়ঘর অভাব সেট থেকেই এ দেশে খুব প্রকট।

অবশ্য একটি আশার কথা—সরকারী উদ্যোগীণায় সম্প্রতি কোলকাতা মহানগরীতে একটি শিল্প-বাত্য়ঘর (বিভিন্ন শিল্প-কারিগর বাত্য়ঘর) স্থাপন করা হয়েছে। যতই ধরে নেওয়া যায়, শিল্প বাত্য়ঘর বা সংগ্রহশালা অশরিতার্থ প্রয়োজনীয়তা থেকেই সরকারে (কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ) এই উদ্ভাব বা প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত আলোগ বাত্য়ঘরের পরিকল্পনা কমিটির নির্ধারণ মতে এতে সব সময় (১) কারিগরী বিষয়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, (২) মানব-সমাজের কল্যাণার্থ কারিগরী বিষয়ক অবদান এবং (৩) ভারতীয় শিল্প কারখানার আধুনিক কারিগরী পদ্ধতি প্রয়োগ—এ সকলের চিত্রাঙ্কন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সার্বিক ঋতুপন প্রথমাবস্থায় নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি কারিগরী বিষয় যের নিয়েছেন: বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ, বিজ্ঞান-শক্তি উৎপাদন ও পরিচালনা, পরমাণবিক জ্ঞান, সিলিল ইঞ্জিনীয়ারিং, চন্দ্রমণিক বয়ন ইঞ্জিনীয়ারিং পরিবহন, রসায়ন বিভা আর খনি ও খনির সম্পদ। পরিকল্পনা কমিটির যোগা অল্পাধারে এই বাত্য়ঘরে উদ্দেশ্য এক কথায় দর্শকদের কারিগরী বিভা শিক্ষা দেওয়াই নয়, তা ছাড়া আরও কিছু। বিষয়কর বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পর্কে দর্শকসমূহের অল্পসঙ্কীর্ণা বুদ্ধি উদার মূল উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পবিজ্ঞান বাত্য়ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিভাগীয় সচিব শ্রীচন্দ্রান কবীরের একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে প্রয়ো। বাত্য়ঘরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েই তিনি বলেন—বাত্য়ঘর শুধু 'অতীতের দৃশ্যাদা ধ্বংসাবশেষ-ভাণ্ডার' মাত্র নয়। বাত্য়ঘর সব সময়ই জীবন্ত থাকবে এবং তার পাণের জীবনর সজ্জা পড়ে উঠবে। শিল্পকলার বাত্য়ঘরে শুধু অতীতের শিল্পের সংগ্রহ করে রাখলেই চলবে না, বর্তমান শিল্পের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণও সেখানে থাকা চাই। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কল

জন্ম প্রত্যেক বহুদত্ত মনুনের জন্ম আনতে হবে। অতীতের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত এবং বর্তমান আলোকনের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখবার জন্য মাঝে মাঝে চলে সাংলাতে। হবে পুরনো জিনিষগুলি। মোটের উপর, নানা ধরনের চাট, ছবি, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য জিনিষের সাহায্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অগ্রগতি এবং অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ সংস্থাপনই হতে হবে বাহুবলের প্রধান কাজ।

সরকারের পক্ষ থেকে শিল্প ও কারিগরী বাহুবল সম্পর্কে বা বলা হয়েছে এবং দাবী রাখা হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে এর সকল রূপায়ণ যদি হ'ল, তা' হলে নিশ্চয়ই আশার কথা। ভারতবর্ষ সবে শিল্পারনে ব্রতী হয়েছে—অনেক বাধা রয়েছে তার অগ্রগতির পথে। এই বৃহত্তর একটিমাত্র কারিগরী সংগ্রহশালা হলেই এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেশের অভাব মিটেবে না। ভারতের শিল্পপ্রধান অপর অঞ্চলগুলিতেও অল্পরূপ বাহুবল প্রতিষ্ঠিত না হলে নয়, আশা করা যেতে পারে, জাতীয় সরকারের এ বিষয়ে উত্তম থাকবে আর জনসাধারণও সেই উত্তমকে জোরদার করার জন্য তৎপরতা দেখাবেন।

কাঠের পোকা ও এর প্রতিকার

সাধারণ অবস্থায় কাঁট বা পোকায় আক্রমণ থেকে কারও প্রায় রেহাই নেই, গাছেরও নয়। কাঁটবিধজ্ঞ হয়ে কত গাছের অকালমৃত্যু ঘটছে, কে বাতছে তার হিসাব! আমাদের বাসগৃহ সমূহেও কাঁট বা পোকায় উৎপাত কম নয় কিছুমাত্র। গাছ কাটার পর যে কাঁট এনে সবচেয়ে আসবাবপত্র তৈরী হল, বা দিয়ে সাজানো হ'ল পছন্দমত নিজ নিজ গৃহখানি, পোকায় মারাত্মক আক্রমণে সে জী নষ্ট হয়ে যেতে পারে অল্পসময়েই। এই ভাবে কত লব্ধের জিনিস কত গৃহস্থানীকেই না হারাতে হচ্ছে, অমনি বলা নিশ্চয়ই কঠিন।

অবশ্য একথা ঠিক—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে গাছের কাঠের পোকা দমনের ব্যবস্থাও নিশ্চিত হয়েছে নানা ধরনের। এ-যুগে ঘরে কোন কাঠের জিনিস নেই, এমন প্রায় দেখা যায় না। গৃহ-নির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহসজ্জা অবধি সব ক্ষেত্রেই কাঠের প্রয়োজন একরূপ অপরিহার্য ভাবে। ঘরের কড়ি, বর্গা, খিলান দরজা-জানালা প্রভৃতি যেমন কাঠের হয়ে থাকে, তেমনি চেয়ার, টেবিল, আলমারী ইত্যাদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় কাঠেরই। সেজন্য ব্যবহৃত কাঁট বা কাঠের জিনিসটিকে অক্ষত ও মজবুত রাখবার খাতিরে প্রত্যেক গৃহস্থানীরই সর্বদা সতর্ক নজর নিবন্ধ না করলে নয়। পোকায় আক্রমণের প্রতিকার বা প্রতিরোধ হিসাবে প্রথমেই তোল। যেতে পারে এইটি।

সাধারণ নিয়মামুসারে যে গাছ সাধারণ, তাতে কাঁটশ্রেণীর সহজে আক্রমণ হয় না। গৃহের জিনিসপত্র যদি অসার কাঁটে তৈরী হয়, তা হলেই বিপদের আশঙ্কা বেশি। সাধারণ বটেই সেগুন, শাল ইত্যাদি কাঁট দিয়ে বাই তৈরী হোক না, তাই দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করবে। অন্যতর: এমন শ্রেণীর কাঁট বা কাঠের তৈরী জিনিস পোকায় আক্রমণে বিক্ষুব্ধ হয় না কিংবা কোন কাঠের পক্ষে এদের সঙ্গে দৃষ্টান্ত করা সাধারণ নয়।

কিন্তু, গৃহে সংরক্ষিত সকল কাঁট বা কাঠের জিনিসই যে পোকায় আক্রমণে অমনি অক্ষত থাকবে, সে নিশ্চয়তা মোটেই দেওয়া চলে না। সত্তর যেমনই হোক, পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত বেশির ভাগ কাঁট বা কাঠের জিনিসই কাঁট-কবলিত হয়ে বিনষ্ট হয়। কাজেই গৃহস্থানীকে হ'লিয়ার থাকতে হয় সর্বস্বপণ, জেনে রাখতে হয়—এর সত্যি কি প্রতিকার, শোচনীয় অবস্থার কি প্রতি-ব্যবস্থা।

কাঠের কতকগুলি সাধারণ শত্রু—উই, ঘূণ, কড়া-পোকা ইত্যাদি। উইপোকা যে কাঁটকে ধরে, দেখতে দেখতে ছারখার করে দেয় এর সকল জী ও অস্তিত্ব। কারণ উইপোকায় বসে বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত, এদের দলবদ্ধ আক্রমণ বড় মারাত্মক। ঘূণ যে কাঁটে আক্রমণ চালায়, বাইরে থেকে প্রথমে নজরে না পড়লেও সেই আক্রমণ উদ্ভাবন। কত অসার কাঁট ও কাঠের জিনিসই এদের কবলে পড়ে বিক্ষুব্ধ হচ্ছে অবিরাম। ঘরে কোথা থেকে কি ভাবে যে এ সকল রিপু এসে হাজির হয়, বলতে পারা যায় না। তবে যত্নের অভাবে এবং কাঠের নিজস্ব গোব্দেই এই আক্রমণ হয়ে থাকে, এ বলা বাহুল্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে—কতকগুলি সারালো কাঁট যেমন মেহলশি, এ সকলে কখনই পোকায় আক্রমণ হয় না। আবার, উইলো প্রভৃতি গাছের কাঁটে সহজেই পোকায় আক্রমণ চালায়। ওক, ওরালনাট, বীচ প্রভৃতি কতকগুলি কাঁট বহু বৎসর পেরিয়ে বাওড়ার পর কাঁটবিধজ্ঞ হবার কারণ হয়। আমাদের দেশের নিম্নলিখিত পোকা সহজে আমল পায় না, এমনি দাবী চলে এসেছে।

কাঠের পোকায় আক্রমণ রোধে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সহজেই। ঘরের জিনিসপত্রগুলি প্রায়ই ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা—এইটি অবশ্য করণীয়। ক্ষেত্র-বিশেষে আলকাতরা, কেরোসিন তৈল বা বিভিন্ন রঙ ব্যবহারেও উপকারিতা লক্ষ্য করা যায়। কাঁটনিরোধক তৈল জাতীয় পদার্থ আজকাল বাজারে অনেক রয়েছে। পোকায় কবলে থেকে রেহাই পাবার জন্য সে সবের নিয়মিত ব্যবহারও জরুরী। মোট কথা, এই ব্যাপারে সতর্ক দারিদ্ৰ্য্য নিতে হয় গৃহকর্তা আর গৃহকত্রীকে। চেয়ার টেবিলের তলার, দরজা জানালার কাঁকে, ছবির কাঠামোতে সাধারণত: পোকায় বাসা হয়। সে সব স্থানে নিয়মিত ডি-ডি-টি প্রভৃতি ছড়িয়ে দিলে উপকার না হয়ে পারে না।

বিষ দেখিয়া হাটরা বাওয়া, তব প্রাণনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে
কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা বশত: সঙ্কল্পিত অহুষ্ঠান পরিভ্যাগ
করা কাণ্ডকরতা।

—শিবদাস শাস্ত্রী

॥ মাসিক বসুমতীর এজেন্ট-তালিকা ॥

বর্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশ্বয় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেন্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্ত আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেন্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এজেন্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র কলিকাতা অঞ্চলের আনুমানিক পাঁচ শত বিক্রেতার নাম এই তালিকায় নাই।

॥ বাঙলা দেশ ॥

| | | বীরভূম ● | | নদীয়া ● | |
|---|--|---|---|--|---|
| হাওড়া ● | | শ্রীমণিকচন্দ্র সাহা শ্রীমণিমোহন চন্দ্র শ্রীমদ্ব্যকুমার ব্যানার্জী | —রায়পুরহাট —নলহাটা —শিউড়ি | শ্রীগোপালচন্দ্র সেন শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক | —শান্তিপুর —নবাবী |
| শ্রীকানীনাথ সাহা শ্রীঅলোককুমার চ্যাটার্জী | —আমতা —বেলুড় | | | মুর্শিদাবাদ ● | |
| হুগলী ● | | শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র কন্দকার শ্রী বি. পাল শ্রীবিজয়পদ দাস | —বিক্রপুর —সোনামুখী —বাঁকুড়া | শ্রীঅহিভূষণ মাল্যাকার শ্রীবিদ্যনাথ দাস শ্রীকীর্ত্তনচন্দ্র গুপ্ত শ্রীহরিপদ সাহা মে: ঘোষ লাইব্রেরী | —বেলডাঙ্গা —ধুলিয়ান —মুর্শিদাবাদ —জিয়াগঞ্জ —বহরমপুর ও ঝাংগড়া |
| শ্রীঅমূল্যচরণ ঘড়া শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী শ্রীগজাধর দে শ্রীবিদ্যনাথ ভট্টাচার্য শ্রীললিতমোহন দত্ত শ্রীসৌবিন্দচন্দ্র কুমার শ্রীমণিভূষণ সি শ্রীবৈভবনাথ মুখার্জী | —শেওড়াহুলি —মগরা ও ত্রিবেণী —শ্রীরামপুর —ভদ্রেশ্বর ও বৈভববাটা —হুগলীঘাট —সিন্ধুর —আবামবাগ —নবগ্রাম, কোননগর | | | মালদহ ● | |
| বর্দ্ধমান ● | | শ্রীগঙ্গানন চৌধুরী মে: মিশ্র নিউজ এজেন্সী শ্রীভাস্করচন্দ্র পাল শ্রী জে. এন. আচাৰ্য শ্রী আই. বি. ঘোষ শ্রীহরিশাধন পাইন শ্রীমতী কনকলতা দেবী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী | —বাড়গ্রাম —কলাইকুণ্ডা —গড়বেতা —মহিষাঙ্গল —চন্দ্রকোণা রোড —ঘাটাল —খড়্গপুর —মেদিনীপুর | শ্রী এম. এম. চক্রবর্তী শ্রীমুনীলকুমার শেঠ শ্রীঅমূল্যবর্তন রায়গুপ্ত শ্রীঅনিলরঞ্জন চক্রবর্তী | —হরিশ্চন্দ্রপুর —মালদা কোট —কুচবিহার —দিনহাটা —কুচবিহার |
| শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত মেসার্স বাগচী আদাস শ্রীভূতনাথ দাস শ্রীকৃষ্ণাধন সরকার শ্রী এস. প্যাণ্ডে শ্রীজয়দেব মুখার্জী শ্রী কে. সি. নাথ শ্রীরেণুপদ পাল শ্রীতারাপদ রায় শ্রীভপনজ্যোতি চ্যাটার্জী শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে শ্রী বি. কে. আইচ শ্রীপঞ্চানন মৈত্র শ্রী এইচ. সি. শেখ শ্রীহরনাথপাল সেন শ্রীসুশীলকুমার রায় চৌধুরী | —চিত্তরঞ্জন —কুলটি —দাইহাট —ধাত্রীগ্রাম —বর্দ্ধমান —ওয়ারিয়া —পানাগড় —জে. কে. নগর —বরবশি —সীতারামপুর —রাণীগঞ্জ —বর্দ্ধমান —কালনা —বার্ণপুর ও আসানসোল —গলসি —জামুয়া | | | জলপাইগুড়ি ● | |
| | | | | শ্রী এ. ধর চৌধুরী শ্রীসত্যীশচন্দ্র বোস শ্রী এস. এন. নন্দী শ্রীমতিলাল সরকার | —আলিপুরহাট —মল-জংশন —জলপাইগুড়ি —কালচিনি |
| | | মানভূম ● | | দাঙ্গিজলি ● | |
| | | শ্রীবিমলকান্ত রায় শ্রীঅবনীমোহন দাশ | —কুমারখুঁচি ও বরাকর —পুলিয়া | শ্রী ডি. এন. বড়াল শ্রীমতী শচীরাণী দেবী | —কালিয়া —শিলিগুড়ি টাউন |
| | | চবিশ পরগণা ● | | প: দিনাজপুর ● | |
| | | শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস মে: বি. এল. সাহা এণ্ড সন্স শ্রী রায় বৃন্দাবনাথ চৌধুরী | —ইছাপুর —কাকদীপ —ব্যাঘাকপুর —টাকী | শ্রী এ. কে. চ্যাটার্জী শ্রীমণিক আচার্য | —বাগুয়াবাট —আদমপুর |

আসাম ●

শ্রীমোহনচন্দ্র সেনগুপ্ত
মসাস' শিল্প শোভা
শ্রীমহেন্দ্রনাথ কোথ
শ্রী বি. কে. চৌধুরী
শ্রীমতী কনকরাসী গাঙ্গুলী
শ্রী এম. আর. ভট্টাচার্য
শ্রীচিত্তরঞ্জন ভায়েল
মে: পি, এস, জৈন এণ্ড কো
শ্রী জে. চক্রবর্তী
মে: ক্রাশাভাল লাইব্রেরী
শ্রীজাত্তোব মিত্র
শ্রী বি. চক্রবর্তী
শ্রীকালচাঁদ বসিক
শ্রীত্রিলোচন বসিক

—হাইলাকান্দি
—শিল্প
—কমলপুর
—শিলচর
—তিনমুকিয়া
—মাকুমজ
—তেজপুর
—ইম্ফল
—গোয়ালপাড়া
—ডিব্ৰুগড়
—চব্বা
—মোহনবাড়ী
—করিমগঞ্জ
—ধুবড়ী

মে: ক্যাপিটাল বুক ডিপো

মে: গয়া মিউজিক্যাল ট্রোবস

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীবাধারমণ মিত্র

মে: অমৃতলাল খাংকায় এণ্ড কো

শ্রীরামপ্রসাদ

শ্রী এইচ. এন. চাট্টাৰ্জী

মে: চক্রবর্তী এণ্ড কো

শ্রীদেবনাথায়গলাল

শ্রীবাক সিং

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

শ্রীকল্পশাসিন্দু রায়

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গাঙ্গুলী

শ্রীদীনেশচন্দ্র বিখাস

মে: ইউনাইটেড ডিস্ট্রিবিউটর্স

সীওতাল পরগণা ●

শ্রী জে. এন. সাহা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস

শ্রীবটুক মিত্র

—রাঁচী

—গয়া

—কাটিহার

—মুজের

—বরিয়া

—লোহারদাণা

—ধানবাদ

—হাজারীবাগ টাউন

—দিনাপুর

—পাটনা

—সিঙ্গি ও পাথারদিয়া

—বেরমো

—জামালপুর

—বরজামদা

—টাটানগর

বোম্বাই ●

শ্রী জি. এম. ঘোষ চৌধুরী

—বাইকুদা, বোম্বে

উত্তর প্রদেশ ●

মেসার্স মিকাদোস বেনারস নিউজ পেপার

এজেন্সী —বেনারস

শ্রী এস. বি. মৈত্র —লক্ষ্ণৌ

শ্রীপ্রচীনমোহন গোস্বামী —নিউ দিল্লী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস —নিউ দিল্লী

মে: সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী —নিউ দিল্লী

মে: কিতাব ঘর —নিউ দিল্লী

মে: ইন্টারক্যানাল ট্রাস্ট —এলাহাবাদ

মধ্য প্রদেশ ●

মে: এ. এইচ. মিত্র সরকার এণ্ড কো

—ভিলাই ও ডাণ্ড

উড়িষ্যা ●

শ্রী বি. দত্ত

—বৌদকেলা

মে: এ. এইচ. মিত্র সরকার এণ্ড কো

—ব্রজব্রজনগর

প্রতিমা নিউজ এজেন্সী

—খুড়া

শ্রীউদয়নাথায় দাস

—প্রয়ক

মা সিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিস্ময়!!

মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে — ২৪
বাৎসরিক " — ১২
প্রতি সংখ্যা " — ২

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রায়) বার্ষিক সডাক — ১৫
" বাৎসরিক সডাক — ৭.৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১.২৫

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে — ১.৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ — ২১
বাৎসরিক " " " — ১০.৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " — ১.৭৫

● মাসিক বসুমতী কিছন্ন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিমতে আর পড়তে বসুন ●



কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা

উনিশ শতকের ইংরেজ দৈনিক ঐতিহ্য সন্থকে অপরিচয় হেতু ও বেনেঙ্গাসের নতুন আলোর প্রদীপ্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে তলানীন্দন দৈনিক সংস্কৃতির রূপ দেখে হতভম্ব হয়েছিল। তলানীন্দন দৈনিক সংস্কৃতির একটি শাখা দল কবিগান। পাশ্চাত্যের সমুদ্র সাহিত্যের আদর্শন করে নব্য বাংলা কবিগানকে অবজ্ঞা ও ত্যাগের সঙ্গ অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তখনই কয়েকজন ঐতিহ্যগত এক অস্বীকার করে নিয়েছিলেন ও মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন। ইংর ওপ্ত, রঙ্গলাল, রঙ্গনারায়ণ বসু সাহিত্যের আসরে একে প্রতিষ্ঠা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক চেষ্টা করেছিলেন। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনা'র রবীন্দ্রনাথ 'কবিগান' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা ও স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করবার প্রথম প্রয়াস পান। এর পর 'নব্যভারত'র পাতায় ব্রজবন্দর সান্যালকে কবিগানের পরিচয়নে আগ্রহের হতে দেখি। বর্তমানেও অনেক কবিগান ও তাঁদের কবিগানের বিষয়ে আলোচনা করছেন। আমরা এখানে কবিগানের পরিচয় বা কবিগানের ব্যাকরণ নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই না। এ প্রবন্ধে কবিগানের ঐতিহাসিক সমুদ্রবের পটভূমিকা ও তার সাংস্কৃতিক ভূমিকাটি নির্দেশ করবো মাত্র। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কবিগানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের তিন দশক পর্যন্ত কবিগানের সাক্ষ্য আসর সর্বগ্রহণ হয়ে উঠে। হঠাৎ এমন সাক্ষ্য বৈঠকে গানের মাতোয়ারা হয়নি, বীরে বীরে অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণে হয়েছে। দিনের কাজের শেষে রাতের আঁধারে চণ্ডীমণ্ডপে সাহিত্যের আসর—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চিরচরিত রীতি। তাতে পাঁচালী চণ্ডে বাহারণ গান, মল গান চলত। সে বাহারেই কবিগান চলে এসেছে। এটি মিসিস্টা নতুন কোনো

সমুদ্র নয়। সেই পুরনো বাহারে কায়দা অক্ষর রূপমাধ্যম কি ভাবে সেই ধারা কবিগানের রূপনির্মাণ করতে পারলেই কবিগানে স্বরূপটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

যোগলরা বাঙালী সংস্কৃতির ভাবলোকে নতুন কোনো দিগ দেখাতে পারে নি, নতুন কোনো ভাব-উৎসের মুখ খুলে দিতে পারেনি। বাঙালী বিলাসের সমারোহে নগরগুলোকে কেবল বিলাস করে তুলেছিল। সেই বিলাসের রসম জোগাতে গ্রামবাংলা ধন। গ্রামের সম্পদে বিজ্ঞতার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। দ্বারা রসের রসিক নগরী নাগরীর স্বপ্নে চুলছিল। রাজনৈতিক দায় নিম্নত বিজ্ঞানে আক্রমণে চকল, তাই গ্রামবাংলার বুক সব সম উপদ্রুত, সমাজের স্থিরাবধি অস্থিরতার বিভ্রান্ত, আর সামাজিক বিন্যাসের বৃথাকে নীতির নিগড় খসে পড়ছিল, নগরের দ্বারা তার বিভ্রান্ত ছেড়ে অনাবৃত কালিদা নিয়ে দেখা দিয়েছিল গ্রাম সমাজে, বিজ্ঞানমন্ডলের জনপ্রিয়তা দেখা দিল। জীবনধারণের নিষ্ঠা সংগ্রামে ধর্মের মোহ ক্রমে দূর হচ্ছিল। রামানন্দের বৈরাগী পীড়িত কণ্ঠে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল,—

বস্ত্রহীন বিগ্রহে সেবির নাহে কাজ।

নিজ কষ্ট দায় আর লোক মাথা লাজ ॥

তৎ দিনবাগানের গ্রানি ঐকান্তিক হয়ে উঠেছিল—“আমার সত্য যেন থাকে দুধে-ভাতে।” ওদিকে আত্মকানের দূর প্রান্তে লৌকিক প্রণয়কাহিনীর প্রতি বাঙালী মুসলমান কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান কবিদের বস্তু জীবনের স্মৃতি-স্মৃতি, হাসি-কান্না প্রেম-বিবাহ পরিকল্পনা বাস্তব কাহিনী ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। সত্যের শতক গোড়া থেকেই সজীব ভাবপ্রবাহ মন্দীভূত হয়ে আসছিল, পৌরাণিক কাহিনীর অমুদ্রিত ক্রমেই একটি হচ্ছিল, ভাবের ঘর চূরি হওয়া কাব্যরূপের বহিরাবরণ সন্থকে অতি মনোযোগের তৌক দেখা দাখিল বাংলা সাহিত্যের গতিবেগ আবর্তন হয়ে আসছিল। নগরকল্পিত তার দীপ ধারা উচ্চকিত হতে চাইছিল। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবা ক্রমাগত ভেঙে পড়ার সাহিত্য চর্চা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য চর্চার পক্ষে তাই রাজস্বব্যবস্থা বা ধর্মমত নাগরিক সমাজ একা হয়ে উঠেছিল। আর এক দিকে লোপুণ ইংরেজ বিদ্যের পদ সঞ্চার—শায়েস্তা খাঁর আমলেই নিবিঘ্নে বাণিজ্য চালাবার অধিকার লাভ, জা চার্ণকের নেতৃত্বে স্ত্রীসমূহের বীতি স্থাপন, শোভা সিন্ধের বিজ্ঞানে অরাজকতার সাধু স্রাবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে সামরিক আশ্রয় স্থাপনের অমুদ্রিত লাভ ও কোট উইলিয়াম গঠন, স্ত্রীসমূহ গোবিন্দপুত্র কলকাতা এই তিনটি প্রায় ক্রম ও তদারক শাসন অধিকার লাভ দেখানো নাগরিক ব্যবস্থা ও বাহ্যিকতার নতুন নিয়ম প্রবর্তন, এভাবে কলকাতা নিরাপত্তার সুরক্ষিত আশ্রয় হয়ে উঠে। শোভা সিন্ধের বিজ্ঞানে ও বঙ্গোড়কামার তাত্ত্বিক লোক সমাগম অতি ক্রম বেড়ে চল কলকাতার চারদিকে নতুন মাহু ও নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি গড়ে উঠল। ১৭৫০-এ এখানে এক লক্ষ লোকসংখ্যা হোল। তারপর আচার্য বহুনাথ সর্কারের কথায়—In 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world; কিন্তু—it was the beginning slow and unperceived of a glorious dawn.

এই দাত ভাবের ব্যাকুল প্রতীকা করতে করতে অর্ধ শতাব্দী কেটে যায়, এই অর্ধ শতাব্দীতে—বিজ্ঞানের বিপ্লবের দাত

হয়ে ইংরেজের হাতে রাজ্যভার আসে, ক্রাইমের বৈত শাসন নীতি চলে, কে করে দুষ্টের মন শিষ্টের পালন? অর্থশিপাসার লেলিভান ভিন্সা সারা দেশকে প্রাণ করতে উদ্বৃত্ত হয়। এসবের পশ্চিম—হিন্দুস্তানের মনস্তত্ত্ব, প্রায় সমাজ বিদগ্ধ। বিপ্লবাত্মক, এক-তৃতীয়াংশ স্থানান পর্যবসিত হয়। কর্ণওয়ালিশের আমলের পর দেশে শান্তি-শুখতার আবহাওয়া কিছুটা ফিরে আসে। মোট কথা, আঠার শতকের ইতিহাস অবিমিশ্র ধ্বংস ও অবক্ষয়ের পীড়ন ও শাষণের ইতিহাস। বাঙালী জাতির প্রাণ কঠাগত হয়ে এসেছিল, তার ক্ষীণ-প্রাণ দীন সাহিত্যিক প্রয়াসে জানান দিচ্ছিল কেবল আর খুঁজিলা নতুন পথ, নতুন আলো।

তদানীন্তন ইংরেজরা উন্নত যুরোপীয় সভ্যতার প্রোঞ্চল আলোক বহন করে আনেনি। তারা কলকাতা ও তার বাহ্যে পাশে কুট-কৌশল ও অর্থশিপাসার রক্তিম শোষণ, নীতিহীন জীবনের এক নতুন পরিবেশ গড়ে তুলেছিল—সমস্ত দেশের 'অন্ধকারে সেই এক আলোর প্রসাদ। কলকাতার আদিবাসিন্দা ছিল চীনবৃত্তিকীর্ণ নিম্নস্তরের অধিবাসী; আর কলকাতার বৃক হারা জমায়েৎ হোল তাদের জীবনে শিক্ষানীকার প্রোতোপথ অবক্ষ, প্রাচীন সংস্কৃতিজাত জীবনানন্দ বিনষ্ট, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক বংশগুলি অবলুপ্ত। শুধু অর্থের দৌলতে সমাজে নতুন প্রতিষ্ঠা দেখা দিল। ঐতিহ্যহীন, রক্তচিহ্নবর্তিত, শিক্ষানীক হীন এই নব প্রতিষ্ঠিত বণিকধর্ম সমাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতি পূরণপোষকতা লাভ করে সাক্ষ্য আসরে যে রূপ নিয়ে দেখা দিল, তা-ই হোল কবিগান।

কবিগানের রূপটা তেমন হবে বাস্তবনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা থেকেই তার আভাস পাওয়া গেছে। আধুনিক চেতনার ক্রমসঞ্চার ব্যতীহে অস্ত্রলোকে, বিদ্ব তখনো আধুনিক জীবনবোধ ও কাব্যিক বিস্তার নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি, তাই কাব্য উপাদানের নিকে তারা ছিল পুরাতনের গৃহস্থস্বামী। আর পুরাতন ভাবসম্পদ অস্ত্রসামগ্র্য হয়ে উঠেছিল। আধিভৌতিক চেতনা, মানবিক কামনা বাসনা নির্বাণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বচ্ছতা ও শাসনিতার আভিজাত্যও আশা করা যায় না, কেন না সেই কালটাই হোল ও কুল ভেঙেছে অধঃ এ কুল গড়ে উঠেনি, এমনি একটা অস্থির রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতির দিশস্তের কাল। তাই কোনো সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক উপাদানই স্থিতিশীল রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারবে না। আর বিরাট কাব্যের আকারও নিতে পারে না। তাই খণ্ড কবিতার রূপ নেবে। কিছু কবিতাহস্তি হতে পারে না সেকালে, তাই উপরি-উক্ত উপাদান উপকরণ মিলে মিলে যে জিনিষটা গড়ে তুলল তা হোল কবিগান, তা কবিগান না হয়ে পারে না। সেটা গড়ে উঠল যেমন, তেমনি গড়া হতে লাগল। কবিপ্রতিভা অমনি পরিবেশে সাক্ষ্য আসরে ফরমাস মত তৈরী করতে লাগল কবিগান।

কবির কারিগরের মত কবিগানকে কত বিভিন্ন রূপে গড়ে ভেঙে, নানান উপকরণ জুড়িয়ে মিলিয়ে তৈরী করতে লাগলেন, সজনীকান্ত দাস যশার তার ফিরিতি দিয়েছেন। তরঙ্গা, পাড়া কবি, খেউড় একদিকে, অল্পদিকে পাঁচালী, টপকীর্জন, কুঙ্কবাড্রা, আর একদিকে আবছাই, হাফ আবছাই, টপ পা তদানীন্তন কালের

নানান স্পীকবার মিলে মিলে এই বিভিন্ন কার্যকর নির্বাসিত হয়েছিল। তরঙ্গা, পাড়া-কবি, খেউড়ের আধিভৌতিকতা, মানবিকতা; পাঁচালী, টপকীর্জন, কুঙ্কবাড্রার গায়তীন ভক্তিতার ও ভার-হীন ধার্মিকতা; আর এই দুই হাজার খণ্ডরূপ নির্বাণ, সচেতন কার্যকলা স্ববলীয়। তৃতীয় ধারার পান, বাজনা, সুরের কেমারতি, বিশেষ করে টপ্পার সাক্ষিত্য অবনমিত বাগসঙ্গীতের মধ্যমা গতি স্ববলীয় এখানেই আধুনিক গানের প্রথম সূচনা। আধুনিক গানের বাজনা ও সুরেরও। তখনকার দেওদান বেনিয়ারন রাজারা এর পত্তন করেছিলেন। একটা উদাহরণ দিলেই এটা স্পষ্ট হবে। ১৭১২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের "কালকাতা ক্রপিক্যাল" মহারাজা সুধময় বারের বাতীর নাচগানের আসরের বিশেষ একটি বৈনিষ্ঠা নির্দেশ করে বলেছেন, The only novelty that rendered the entertainment different from those of last year, was the introduction, or rather the attempt to introduce, some English tunes among the Hindoostanee music. শ্রীযুক্ত বাজোবদর মিত্র নিম্নাবৃত টপ্পার মানবিক আবেগনের প্রাণান্ত নির্দেশ করেছেন (বিষভারতী পত্রিকা, বৈশাখ আষাঢ় ১৩৬৩)। আর প্রথম হাজার মানবিকতা, আধিভৌতিকতা, খণ্ডরূপ, সচেতন কার্যকলা গুণগুলি নিরে ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক ঘটনারাজির বর্ণনালীপু হয়ে, মধুসূদনের হাতে প্রতীচ্যের সনেট, এপিটল (পত্র কবিতা), লিরিকের সমুদ্রত ডলী লাভ করে, তেমজের হাতে দেশপ্রেম আর

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়াকিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের আভি-
জতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বছরের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
জ্ঞান লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এল্ড্র্যান্ডেট ইস্ট, কলিকাতা - ১

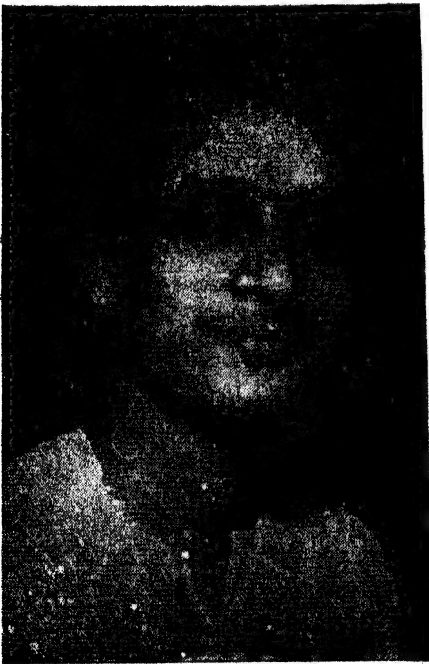
সেদের কটাক্ষে অগ্রসর হয়ে, নবীনচন্দ্রের হাতে নোয়াটিক চেতনার ভূমিষ্ঠ হয়ে বিহারীলালের হাতে আধুনিক গীতিকবিতার লীলা লাভ করে আধুনিক কালের হাতে এসে পৌঁছেছে। অতএব প্রথম দু'বাণের মাঝে আধুনিক কবিতার যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি শেষ বাণের মাঝে আধুনিক গানের প্রথম উৎসাহ এভাবে কবিগান একাধারে আধুনিক কবিতা ও গানের ভগ্নাংশ থেকে এক বীজ দুই সুগের মত উদ্ভিন্ন হয়ে প্রসারিত ও বিকশিত হয়েছে, তাই সে সার্থকনামা, কবিতা ও গানের সম্মিলনে সে কবিগান। বতাই তার তুল, অমার্জিত, অশালীন, অনতিক্রান্ত রূপ তোক না কেন, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথের তাই যথার্থ নির্দেশ,—বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিগোলাদের গান। এই নষ্ট পরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ। বলা বাহুল্য, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও।

—দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫২)

শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩ সালে এক বিশেষ ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ত-জরতী উৎসবে বর্ষক হিসাবে উপস্থিত থেকে তারকখ্যাত প্রবীণ গায়কদের মধ্যে ত্রয়ো তরুণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এত অল্প বয়সে সাধনার মাধ্যমে জনপ্রিয় হওয়া



শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যায়। পরদিন হতে তিনি স্নক করলেন কণ্ঠসঙ্গীত—বহুসঙ্গীত বন্ধ রেখে। কিশোরীট হলেন আজিকার ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর ত্রয়ো তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কুমারগুপ্ত, ডি, ভি, পাণ্ডসকার ও শরৎকৃষ্ণ হোসেন। বলেন প্রসূনকুমার—

পঞ্চাশ বৎসর আগে বাবা শ্রীহরীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাথ্যবাগদেশে পাটনার এসে স্থায়ীবাসিন্দা হলেন তথাকার। চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান আমার জন্ম হয় সেখানে ১৯২৩ এর ১৫ই আগষ্ট। নিজেরের বাড়ী আছে এখনও বারাকপুর মহকুমায় এড়িয়াহরতে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশ করি ১৯৪২ সালে, আই এস সি '৪৪ সালে। বিদ্যালয়ের আন্দোলনে যোগ দিরাছিলাম বলে কলেজ থেকে নাম কেটে দেওয়া হয় সত্য কিন্তু যোগ দিই নাই। বি, এস-সির কোর্স ইয়াংয়ে পড়ার সময় অসুখ হল—তজ্জ্ব ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হল না। গানের বোকও কিছুটা দারী ছিল এতদ।

ছেলেবয়সে বাবা ও কাকাবাবুকে গান গাইতে শুনেছি। কিন্তু খুব গভীর ভাবে তাঁরা সাধনা করেননি। বঙ্কিম-বৈষ্ণবের কথা মা জীমতী অক্ষমতী দেবী বাগ-বাগিনী ভালই বোঝেন—কিন্তু নিজে কখনও গান করেননি। তবে গান শুনতে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু বড়দাদা শ্রীপ্রব ব্যানার্জির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি গান শেখার উৎসাহ। '৩১ সালে বাড়ীতে এলো বেতারযন্ত্র আর দিলির পরীক্ষায় 'মিউজিক' ছিল অতিরিক্ত বিষয়, তাই বাড়ীতে আসতেন গানের শিক্ষক। বেতারে গানের প্রতিটি প্রোগ্রাম শুনে ও মাষ্টার মহাশয়ের গান শেখান শুনে আমার মনে এল 'বাগ' ও 'তাল'এর জ্ঞান। দিলির গান গাওয়ার সময় 'ঠেকা'ও দিয়েছি কত দিন। সেকণ্ড রূপে পড়ার সময় এপ্রাজ ও বাঁশী বাজানর চেষ্টা করতাম। কিছুদিন বাদে পাটনার বাঁশী বাজিয়ে বলে একটু-আটু নামও হল। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় এপ্রাজ ও বাঁশীতে প্রথম হলুম।

নিজের গলায় গান গাইব—এ বোধ কোন দিন হয়নি। কিন্তু এব পতন হল ১৯৪৩ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ত-জরতী উৎসবে কৈদার খাঁ, গোলাম আলী খাঁ, ওকারনাথ পটবর্ধন, নারায়ণ রাও ব্যাস প্রভৃতি নিকপালগণের সঙ্গীত শুনে। কিন্তু মোহিত হয়েছিলাম শুধু গানে নয়—তারগণের উচ্ছলতায়—বহন শুনলাম কুমারগুপ্ত, ডি, ভি, পাণ্ডসকার ও শরৎকৃষ্ণ হোসেনের কণ্ঠস্বর। প্রায় প্রতিজ্ঞা করলাম যে গায়ক আমাকে হতে হবে। '৪৫ সালের শেরাশেখি গান আরম্ভ করে দিলাম এপ্রাজ ও বাঁশীকে এক পাশে সরিয়ে রেখে—সোরাযুঁর কলে গাইড ও শিক্ষকও পাই পণ্ডিত রামপ্রসাদ পাণ্ডেকে। কিছুদিন পরে এক বড়ুর প্ররোচনার কলিকাতার হাজির হলুম কিন্তু বাড়ীর লোক হলেন অধুনা। এখানে চেষ্টা করলুম প্রায়মোকোন কোম্পানীগলিতে গান ও কিংম অভিনয়ের জন্ত। তাতে সুবিধা হল না। হঠাৎ সুবোধ হল শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহিত সাক্ষাতের। তিনি আমার পাঠালেন রেডিওতে—'অভিষেক' দিলাম কিন্তু জবাব না পেয়ে কিংলুম পাটনার। সেখানে '৪৬র সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'বেতার জগৎ'এ মেসি ১৫ মি: জন্ম 'প্রসূন ব্যানার্জি' খেলায় গানের জগৎ দিখি

হয়েছেন। তাই আমি বা অন্য কেহ খোঁজ নেওয়ার জন্য এদায় কলিকাতায়। অল্পসন্ধানের পর আমাদের গান গাইতে হল।

এর পর প্রখ্যাত ভবলা বাড়িতে শ্রীহীক গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর গৃহে দেখা—তিনি পাঠালে ডক্টর শ্রীধামিনীমাথ গাঙ্গুলীর কাছে। প্রথমেই স্বগৃহে বসে দয়ী শিক্ষক হিসাবে আমার শিখিয়েছেন তিনি আর সেই সঙ্গে 'টিউশানী'রও ব্যবস্থা করে দেন। মধ্যে মধ্যে যেতার কেন্দ্রে থেকে গান গেয়েছি। দু'বৎসর বাদে নিজ বাসস্থানে চলে আসি মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে। সেটা ১৯৪১ সাল। তাঁরই উত্তোগে প্রথম 'অলবেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স' ও পরে 'অল ইণ্ডিয়া তানসেন কনফারেন্স'-এ যোগ দি। বলাতে হল্লা করে কিছু আমার demonstration-এ শ্রোতারা হয়েছিলেন খুব খুসী। এর পরেই 'বন্ধার' ও 'সঙ্গীত' চক্রদ্বারা যোগদানের সুযোগ পাই। সেই সময় শরীফা বিশেষ ভাল বাজছিল না। কিরলুখ পাটনার। কলিকাতা যেতার কেন্দ্রে গান গাওয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে আসতুম। পরে পাটনা কেন্দ্রে যোগদান করি। ১৯৪১ সালে প্র.ছর শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। '৫০ সালে কলিকাতায় এসে তাঁর শিক্ষাবীন ছাত্র হলাম। তাঁর পরিচালনার ও সাহচর্যে আমরা প্রিয় খেয়াল ও কুঁবীর উন্নত স্তর, বিভিন্ন রূপ, উচ্চতর শিক্ষা পাই। মনে হল যেন এত দিনে সঠিক সন্ধান পেয়েছি আমার গায়না, আমার সঙ্গীতঃ চিন্তাধারা, আমার ভবিষ্যতের স্বপ্নক সঙ্গ সার্থক রূপায়ন করার জন্য। আর যেতারশিল্পী হিসাবে দিন দিন আমার লোকপ্রিয়তা বেড়ে গেল। মনের বাসনা হল পূর্ণতর। ১৯৫৭ সালে সঙ্গীতগুরু হিসাবে শেলুম ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ সাহেবকে। আমার গায়না খাঁ সাহেব ভবিষ্যৎপ্রদী, আজ তিনি ভারতীয় সঙ্গীতরাজ্যে বা দিয়ে যাচ্ছেন—তা ভারতবাসী পূর্ণ উপাসকি করবে ত্রিশ বৎসর বাদে। এত বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ আমরা পাব কি না জানি না। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

এর কাছ নির্ধাণেও জ্ঞানপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে এখনও।

'চুপি' ফিল্মে আমার নেপথ্য সঙ্গীত আমার জীবনে এনে দিল এক বিরাট পরিবর্তন। সরকার বাতিল সরকারের সাহচর্য—শ্রোতাদের নিকট আমার গাওয়া গানের উচ্চ-প্রশংসা—আর আমার নিজের দরদ দিয়ে গানগুলি গ্রহণ করা—বহু ভট্টর নেপথ্য গায়ক হিসাবে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠা করল আমায়। এর পর হল 'আশা' ও আরও বহু ছবিতে কাজ করার সুযোগ। ক্লাসিকাল গায়ক হয়েও চর্যকভাবে চল আমার প্রচুর পরিচিতি আর সুযোগ এনেছিল চিত্রে নারক হিসাবে অবতরণ কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে করেছি জীবন-পাথর—তাই বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছি।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীতসরে যোগদান করেছি। দিল্লী যেতারের 'জাতীয় প্রোগ্রামে' ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে প্রথম যোগদান করি।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিমহেশ্বরী শ্রীশৈলেশ্বরীমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ভারতযাতা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী মীরা দেবীকে বিবাহ করি। স্বামী, এ. কানন, চিম্মেরা' ও বাবিতাদার' সাহচর্যে আমার সঙ্গীত পরিবেশকে করেছে সমৃদ্ধ।

ভগিনী করুণা মুখার্জি, জাতা প্রোজোং বানার্জি, বেলা রাই আমার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছে। 'আরও ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিই। বর্তমানে আমি Calcutta Academy of Indian Music শিক্ষকতা করি।

কলিকাতায় অঙ্কুরিত গানের আসরগুলিতে হিন্দী শিল্পীদের সুযোগ না দেওয়া বড়ই দুর্ভাগ্য লাগে আমার কাছে।

শেষে তিনি বলেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আজ লোকপ্রিয় হয়েছে। যথেষ্ট—কিন্তু রসগ্রাহী শ্রোতার প্রয়োজনও রয়েছে সেই সঙ্গে।

গ্রামে

কেশব চক্রবর্তী

আমি এখনই গ্রামে বাবো। সেখানে ডালপালা

দিয়ে একটি কুটীর গড়বো।

আর মাঠে গারি সারি বীজ বপন করবো।

আর কুটীরের সামনে, রঙ-বেরঙের ফুলের বাগান করবো।

আমি এখনই গ্রামে বাবো, সেখানে উষার ঘোমটা তুলেই স্বপ্ন খুলবো।

সেখানে প্রথম সুখের আলো পড়বে।

তখন আমরা সবাই,

বনবীথিকার ভ্রমের মতো আপন মনে গান করবো।

আমি এখনই গ্রামে বাবো, সেখানে ফিলের ভলে তান করবো।

আর জলের ডেউরের-সাথে আপন মনে দোল খাবো।

সেখানে কর্পোরেশনের জলের হস্তাধি নেই।

সেখানে ভাড়াটেনের জলের চীৎকার নেই।

আমি এখনই গ্রামে বাবো,

সরকারী পল্লী উন্নয়নের সাথে হাত মিলাবো।

অথবা গরীবদের পয়সায়ে বসে শ্রীতির অর্থ দেবো।



মৃণালিনী সেন

[বর্ষায়ী বশিষ্ঠী কবি ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম
বাঙালী বিমানাবাহিনী]

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙালী কবিতার আজ বিপুল সমার।

বাঙালী কবিতার অসাধারণে বিশ্বের মানুষের মন-প্রাণ আজ ব্যাকুল। বাঙালী কবিতার সারমর্ম উপলব্ধি করার অগ্রে পৃথিবীর কত মানুষ যে আজ উন্মুখ তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্বজোড়া অভিনবকমে বাঙালী কবিতা আজ পরিপূর্ণ, বরীন্দ্রনাথের দেশে যে কবিতা জন্মায় তার প্রতি মর্ত মানবের আজ অসীম শ্রদ্ধা, জগত সাহিত্যের আকাশে আজ সর্বত্র উড়ে চলেছে বাঙালী কবিতার বিজয় পতাকা।

এই যে সমার, এই যে প্রতিষ্ঠা, এই যে জয়যাত্রা—একোন পটভূমিকার উপর রূপ নিয়েছে? জগতের সাহিত্য-সভায় বাঙালী দেশের কবিতা সমানের আসন লাভ করেছে কোন একক প্রচেষ্টায় নয়, হুঁ-চাটি ভাষার কোশলে শব্দচাতুর্যে নয়, কয়েকটি গুরুগম্ভীর স্বাক্ষর সমাবেশে নয়—এ জিনিষ আজ সন্তব হয়েছে বহু শিল্পীর, বহু শ্রমীর, বহু সাধকের কল্যাণে, সন্তবপর হয়েছে অসংখ্য কবির সাধনার, হয়েছে সরস্বতীর অগণিত ভক্তের হৃদয় তপস্তায়। বীষের অমৃত্যু অবদানে বাঙালী সাহিত্য এক নতুন পথের সন্ধান পেলে, তাঁরা কালজয়ী, সকল কালের নমস্ত।

এ কথাও অনস্বীকার্য নয় যে, বাঙালী কবিতার গঠনকর্মে, পুষ্টির ক্ষেত্রে, বিকাশের পথে সহায়তা করার জন্যে প্রাণী সমানে কেবলমাত্র বাঙালী দেশের ছেলেদেরই অধিকার নেই। বাঙালী দেশের মেয়েদেরও তাতে সমান অধিকার। সরস্বতীর সেবার পূর্ববর্তে সঙ্গ নারীও সমান অংশ গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তে মতই নারীও সমান অংশ লাভ করেছে সরস্বতীর আশীর্বাদে উদ্যমিকার।

সাধারণ পাঠক নারী-কবিতার থেকেও অম্লপ্রেরণা, নতুন পথের নির্দেশ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যেক পরিচর কিছু কম পান নি।

বাঙালীর বরণা নারী-কবিতার মধ্যে আজ "চারজন" এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কাহিনী আলোচনার প্রবৃত্তি হয়েছে। তাঁর নাম মৃণালিনী সেন মহাপরী। আজকের দিনের অস্বীতিবোধী বনামধন্য কবি মৃণালিনী সেন, প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে বাঙালী দেশের মহিলাদের মধ্যে প্রথম বিমান আয়োজকবিশিষ্ট মৃণালিনী সেন ও কবি মৃণালিনী সেন পৃথক নম, অভিন।

১৮৭১ খৃস্টাব্দের ৩রা আশ্বিন মৃণালিনীর জন্ম হয়। মৃণালিনীর শিশুদেহের মায় স্বর্গীয় লাডলীমোহন ঘোষ। মাত্র তেমন বছর বয়সে মৃণালিনী বিবাহকালে আবদ্ধা হল। মৃণালিনী ঘোষ হলেন মৃণালিনী সিংহ। পাকপাড়ার দেশবিখ্যাত অভিজাত সিংহ-পরিবারের দেওয়ান গজাগোবিন্দ সিংহ ও স্বর্ভাগ্যী নৃপ-তাপস কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবুর স্ত্রীযোগ্য কণ্ঠধর বশষ্ঠী ভূমাবিকারী সাহিত্য-অভিনয়-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহধর্মিণী।

হুর্ভাগ্য সিংহ-পরিবারের বিবাহের দু' বছর পরেই ইন্দ্রচন্দ্র অত্যন্ত অকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলে শিশাহারা হয়ে পড়লেন বালিকা মৃণালিনী আর সেই পঞ্চদশীর ভয়ঙ্কর হয়ে কবিতার জন্ম হ'ল। বিববা মৃণালিনীর মধ্যেই তখন আর এক মৃণালিনী ফুটে উঠলেন, কবি মৃণালিনী। বিরহের তীব্রতার উপশম যেন খুঁজে পেলেন কবিতার মধ্যে, কবিতার মধ্যেই আকর্ষণ ভূঁবে গেলেন মৃণালিনী, কবিতার মধ্যে তাঁর আকর্ষণ নিমজ্জনের ফলে অদ্ভুত পরিমাণে উপকৃত হ'ল বাঙালী সাহিত্য, উন্নত হল, পুষ্ট হ'ল, সমৃদ্ধ হল। পর পর কয়েক বছরের ব্যবধানেই তাঁর লেখনী থেকে জন্ম নিল প্রতিধ্বনি, নির্বোধী, কল্লোলিনী (গীতিকাব্য), মনোবিপা প্রমুখ কাব্যগ্রন্থগুলি।

প্রায় এগারো বছর কঠোর বৈধব্য জীবন বাপনের পর তিনি পুনঃপরিণীতা হলেন স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র সেনের সঙ্গে। স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র অজ্ঞানক বৈশ্যচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে কবি মৃণালিনী দীর্ঘদিন ইউরোপে অতিবাহিত করেছেন। সমাজসেবার কার্যে, নারী জাতির সর্ববিধ উন্নয়নকর্মে, জনগণের সেবার মৃণালিনীর উৎসাহ আত্মরিকতা ও কাব্যাবলী যেমনই প্রশংসনীয় তেমনই সাধুবাদার্য। কয়েক দিন পূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে পৃথ্বীর অজ্ঞানত্বের পাণ্ডুলিপি ইান জাতীয় গ্রন্থাগারে উপহার দিয়েছেন।

মৃণালিনীর কাব্যাবলীকে সাধারণতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম জীবনে প্রথম স্বামীর পরকালগমনের ফলে যে নিরাকরণ আঘাত বালিকা-বধূর মনে বিবহ যেমনকে ঘনীভূত করে তুলেছিল তারই সমাচ্ প্রতিজ্ঞাবি ফুটে ওঠে প্রথম ভাগের কবিতাগুলির মধ্যে। দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র বল্লমাবিলাসী হয়ে থাকতে মৃণালিনীর কবিমন নারাজ, কর্মময় জগতে কর্মের মধ্যে চিয়েই আপন জীবন সাধনার সিদ্ধিলাভ করতে চান কবি মৃণালিনী। সকলের মত নিজেকেও কর্মের মধ্যে নিয়োজিতা রেখে জগতের সেবা করে যাওয়াই তাঁর মতে জীবনের মুখ্য কর্তব্য।

এই অস্বীতিবোধী মহিলা-কবির আরও দীর্ঘজীবন কাম্যদ করে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রেভারেণ্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়

[কলিকাতার বিশপ ও ভারত-রক্ষা-সিঙ্ক-পাকিস্তানের
প্রধান বর্ষাধ্যক্ষ]।

অন্যবাস্য, সন্ততা, সেবাত্রত, বর্ষপ্রবণতা, মানবতাবোধ, সম্ভবতা ও প্রচারবিমুখতা বীহার মধ্যে দেখা যায় নিঃসন্দেহে তিনি দেশের মধ্যে এক বছর মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণকর্তব্য হয়ে বৈশিষ্ট্যবান। কলিকাতার বিশপ এক ভারত, বর্ষা, সিঙ্ক

পাকিস্তান, এর মেট্রোপলিটান প্রথম ভারতীয় যেতারেও অবদান রাখা যুগোপাধ্যায় তাঁহাদেরই একজন।

যেতারেও যুগোপাধ্যায় ১৮৯২ সালের ২৩শে মে কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম বংশবাটি ও মাতুলালয় বলাগড়। তিনি ১৯১০ সালে কলিকাতা সেন্টপলস বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, ১৯১২ সালে সেন্টপলস কলেজ হইতে আই, এ ও ১৯১৪ সালে ডিটন চার্চ কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। দুই বৎসর ভাগলপুর টি, এন, স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া তিনি কলিকাতার ফিরিয়া আসেন এবং ১৯১৭ সালে বি. টি, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন।

পরবর্তী দুই বৎসর আগ্রা সেন্ট জন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর তিনি ১৯১৯ সালে দিল্লী সেন্ট ট্রিফেন্স বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া সাত বৎসর তথায় অবস্থান করেন। ১৯২৬ সালে দিল্লী ইউনাইটেড ক্রিস্টিয়ান উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি উহার অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত থাকেন।

ছাত্রজীবন হইতে যে: যুগোপাধ্যায় বাজকবৃত্তি (Priesthood) গ্রহণের জন্য নিজেকে যোগোপযোগী গঠনে প্রয়াসী হন। দীর্ঘদশ বৎসর কৃষ্ণসাধন, মানসিক গঠন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন ও ধর্মপুস্তক পঠনে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পর ১৯২৪ সালে দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি বাজক হিসাবে পরিগণিত হন। ইহার বার বৎসর পরে তিনি এক বৎসরের সন্ন্যাস (শ্রম) কেমব্রিজ মিশনের অস্থায়ী প্রধান হিসাবে কাৰ্য্য করেন। তৎপরে উহার অর্থ-বিষয়ক সচিবরূপে দুই বৎসর থাকার পর প্রথম ভারতীয় হিসাবে ১৯৩১ সালে পাকাপাকিভাবে উহার সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি মনে করেন যে, Rev. Canon U. King এর শিক্ষা তাঁহাকে উক্ত পদের উপযোগী করিয়া তোলে। ১৯৪৪ সালে লাহোরের সহকারী বিশপ ও ১৯৪৭ সালে দিল্লীর বিশপ হিসাবে কাৰ্য্য করিয়া তিনি কলিকাতার বিশপ ও ভারত-বর্ষা-সিঙ্কল-পাকিস্তানের মেট্রোপলিটানরূপে ১৯৫০ সালে কাৰ্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রথম ভারতীয় হিসাবে উক্ত দুই পদে তাঁহার নিয়োগ বাঙ্গালীর বিশেষ গর্বের বিষয় বলিয়াই মনে হয়। স্রষ্টা-স্বাক্ষর কথোপায়া, স্রষ্টার ব্যবহার, স্রষ্টা-আলাপ-আলোচনা, স্রষ্টা-বাচনভঙ্গী ও নিয়ন্ত্রণ সাধনা—তাঁহার যেরূপ ও প্রতিভাকে বিশ্বাসিত করিয়া তোলে। তাই কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয় সাদরে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন Doctor of Divinity উপাধিতে আর গত বৎসরে লণ্ডন সহরে যে: যুগোপাধ্যায়কে সম্মানিত করা হইল Doctor of Divinity Laureate শ্রীর্ষক বর্মার জগতের সর্বোচ্চ সম্মানে। সেই সভার উপস্থিত ছিলেন আর্চ বিশপ অক্সফোর্ডের বী ও বিশ্বের অজ্ঞাত মেট্রোপলিটানগণ। অবদান রাখা হারিয়েছে হকি, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি উর্দু ভাষাও দক্ষতার সহিত আদৃত করিয়াছেন। তিনি কয়েক বার যুরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

সিঙ্গলার পাইনকল্‌সের দৃষ্টিভঙ্গী শ্রীমতী প্রদয়প্রতিমা দেবীকে অবদান রাখা বিবাহ করেন। জননী ১৩বৎসরব্যাপী দেবীর কথার সোম্যমুখি যে: অবদান রাখা বলেন যে, মাত্র সাতটি বৎসর বয়সে পিতৃদেব অকালমৃত্যু যুগোপাধ্যায়কে হারাই—তাই তাঁর কথা বিশেষ মনে পড়ে না। কিন্তু স্রষ্টা-স্বাক্ষরসাধনা ও বিশেষ ব্যক্তিগতদৃষ্টি



যেতারেও অবদান রাখা যুগোপাধ্যায়

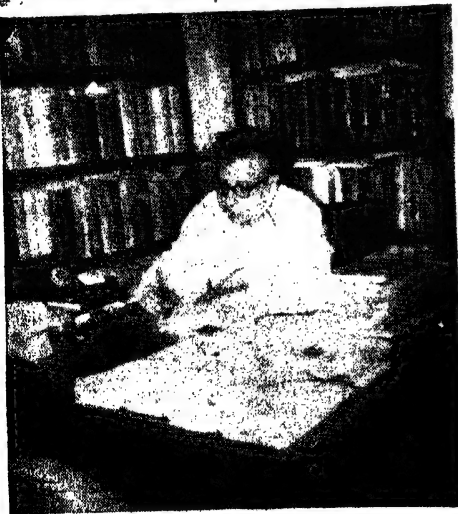
যা আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে দায়িত্ব করেছিলেন নিজের স্বথ বিসর্জন দিয়ে বাবার সামান্য পুঁজি সঞ্চয় করে—আর তাঁর অপাধ উগবৎ সাধনার উপর নির্ভর করে। ডাক-কলেজে পড়ার সময় বাবা বধন খুঁটাব্য গ্রহণ করেন—তখন রক্তবশীল হিন্দু-পরিবার তাঁকে গ্রহণ করতে পারেনি—কিন্তু পরিবারের ছোট বড়টি সেদিন অজ্ঞত দিয়েছিলেন আর সাধন যুগিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। জীবনের প্রথম থেকে আমাদের মায়ের হওরা পর্যন্ত মা কি কষ্টই না করেছিলেন! শেষের কথাগুলি বলার সময় তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন আর বাস্পাক্ত কণ্ঠস্বর, অকপটে স্বীকার করি আমাদের বীতিমত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বিচারপতি বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[নিরপেক্ষ, ভায়নিষ্ঠ, সত্যপ্রতি আইনবিদ]

ঠিক দেখলুম কি? ভুল দেখলুম না তো? কিন্তু তা কি করে হয়—অথচ নিজের চোখকে অবিধানেই বা করি কি করে? বীরে বীরে আমার মনটা পরিণত হল এক বংশধরে—আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে থাকে এই ঠিকে আর ভুলে। কিছুকাল পর এই সংগ্রামের হল সমাপ্তি বধন তিনি নিজেই বলতে লাগলেন তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা—তিনি বললেন, আগে হাত ডিনটের সময় এই টেবিলে আমার দেখা যেত। এখন একটু দেবী হয়—ভবে চায়টের পর বিদ্যানার আর আমাকে পাওয়া যায় না, ভোরে পররকে আমি বেডাতে বাই, তারপর বাড়ী ফিরে আসি ট্রামে চড়ে জাট লাইক এক কমন ম্যান। পঞ্চাশ পেরিয়ে এসেছি তবে

এখনও আমি অনায়াসে অন্ততঃ সিকি মাইল দৌড়তে পারব। দুখলুম চোখ আমার ভুল করে নি, ঠিকই দেখেছে কোন এক সকালে একটি ট্রামে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে চোখ পড়ে হাটুয়ার চোখ ফুটো। যমকে গিয়েছিল, ভাল করে চক্ষু করতেন না। কখনোই ট্রাম ছেড়ে দিয়েছিল, সেই আর দেখার মধ্যেই ব্যক্তিটিকে এ বিয়ে সেদিন মনে মনে যে অল্পমান করেছিলুম তাঁর কথা শুনে দুখলুম অল্পমান আবার অজান্তে, গিয়ারলহের নিকটবর্তী রক্তাকার অঞ্চলে একটি বাড়িতে নানাগ্রন্থ লেখিত একটি ফ্রেমে বসে কোন এক হবিষ্যের সকালে বীর সঙ্গে তাঁরই জীবন-ভাষিনীকে কেন্দ্র করে আদ্যায়ের আলোপ-আলোচনা চলছে, আমি তাঁকেই দেখছি। কেথেকেই হিন্দারক বক্ষোপাধ্যায়কে। দেখছি কলকাতা হাইকোর্টের অপরূপ মিটারপতি জীবিনায়কমাধ বক্ষোপাধ্যায় কাব্যার্থ মতালয়কে। মাছুয়ে মাছুয়ে ঘিলে একদিকে যে জটিলতার উত্তর ভার অসমানকারেই তার, মিরশেকতা ও সত্যের আসনে যিনি লক্ষ্যসীল, মাছুয়ের সকল বস্তু সমস্তার মীমাংসা করার জন্যে যিনি লক্ষ্য গ্রহণ করেছেন, মাছুয়ের করকে উপলক্ষ্য করে থাকে এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় দুখ বিলম্বের সাহায্যে তাঁর গতিবিধি তো মাছুয়ের জগতের মধ্যেই, তার থেকে দূরে নয় সাধারণ মাছুয়ের পরিচিত সীমার মধ্যেই তাঁর পদক্ষেপ। মাছুয়কে নিয়েই তাঁর কারবার, মাছুয়ে মাছুয়ে দৃষ্টি করে কখনো কখনো যে জটিলতা গড়ে তোলে তারই সমাধান করার ভার বীর উপর শুধু—তাঁর চলার পথ হবে মাছুয়ের কাছেরই, মাছুয়ের আলোপাশে, মাছুয়ের মধ্যেই। তাইতো সেদিন বিচারপতি বিনায়কনাথকে ট্রামে দেখলুম, সকলের সঙ্গে চলাছেন যেন তাঁদেরই একজন, তাদের পর নন। তাদের কথা শুনেও শুনেও, তাদের ভাষা বুঝতে বুঝতে, তাদের চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে করতে।



বিচারপতি বিনায়কনাথ বক্ষোপাধ্যায়

আদিনিবাস চকিল-পরগণার বাগসতে। প্রাতিমহ বাগসতে কোর্টের মোড়ার স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বক্ষোপাধ্যায়, পিতামহ টাইবাসার উকীল স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বক্ষোপাধ্যায়, পিতৃদেব আলীপুরের উকীল স্বর্গীয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ বক্ষোপাধ্যায়। সমগ্র পরিবারটি এক রূপার আইনজ্ঞের পরিবার, এরা ভাড়াও পরিবারের আরও অনেক সন্তান আইন ব্যবসার মধ্যেই জালতিপাত করেছেন। পূর্বপুরুষদের যে অনলস সাধনা ভিলে তিলে সমৃদ্ধির অভিযুগে এগিয়ে গেছে, সেই সাধনারই ফলস্রা, বিকাশ, ও পূর্ণতা দেখা দিল উত্তরপুরুষের মধ্যে। আইন ব্যবসায়ের লাকল্য লাভের দীর্ঘ বিনায়কনাথের রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে ছড়িয়ে রয়েছে, আইনজ্ঞ মহাশয় ভ্রমি রমণী, লক্ষ্যবিশিষ্ট স্বনাংগ হবেন না তো বলেন কে?

বাগসতে আদিনিবাস হলো জন্মোচ্চন জন্মগণের। ১৯০৬ সালের ২৪এ জুন জন্মিছে। মায়ের নাম শতরলবাগিনী দেবী। এঁর পিতামহ কলকাতার মগর-জীবনে বিশিষ্ট পুত্র বহুভাষার স্বর্গীয় নাগরিক পরলোকগত রায়বাহাদুর অগলানন্দ বক্ষোপাধ্যায়।

বিনায়কনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হিসেবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন, সেখান থেকে আই, এ পাশ করলেন ১৯২৫ সালে। এর পর অল্পস্বতা বশতঃ এক বছর পড়াশুনা করতেই পারেন নি, সেই জন্মে ১৯২৭ সালের পরিবারে ১৯২৮ সালে বি, এ পাশ করলেন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। ১৯৩০ সালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করলেন। আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩১ সালে, ফায়ডোকেট হিসেবে গ্রহীত হলেন ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে।

ছাত্রজীবন দেখা বাড়ি ইতিহাসের প্রাতি বিনায়কনাথের প্রবল অমুরাগ, পরবর্তীকালে তাঁকে দেখা গেল খ্যাতিমান আইনজ্ঞরূপে— কিন্তু তাঁর বহুবুখী প্রতিভার পরিচয় শুধু এইটুকুই নয়। ইতিহাস ও আইনের অমুরাগ সংকৃত শাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা কম নয়। রীতিমত টোলে অধ্যয়ন করে সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্তভাষ্যের টোলের ছাত্র ছিলেন বিচারপতি বিনায়কনাথ। ১৯২২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত উপরোক্ত শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছেন অপরিমিত নিষ্ঠা সহকারে। কাব্যার্থ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৮ সালে।

আইনজ্ঞ হিসেবে ইনি গোড়া থেকেই সহকারী ছিলেন প্রতিভাবর আইনজ্ঞ স্বর্গীয় বীরেশ্বর বাগচীর। (স্বনামধন্য ডাঃ সতীনাথ বাগচী ও অধ্যাপক হরিদাস বাগচী এঁরই জ্ঞাতা) ওর প্রাতি তিনি যে কতখানি প্রাণাঙ্গীল তা সেদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনার মধ্যেই বোকা গেল। ১৯৪০-এ বীরেশ্বর বাগচী মহাশয়ের স্বর্গলাভ। এর পর হ'বছর এঁকে দেখা গেল প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জীব কবিদ্বন্দ্ব চক্রবর্তীর সহকারী হিসেবে। দুখলতা, নিপুণতা ও তীক্ষ্ণতাকে মূলধন করে বিনায়কনাথের সাধনার ধারা এগিয়ে চলে থাকে দিগ্বির অভিযুগে। আপন প্রতিভার অপরূপ উজ্জ্বল গৌরবের স্রষ্টা আসনে অধিষ্ঠিত হলেন বিনায়কনাথ, চতুর্থা

দায়িত্ব হ'ল কীভাবে বিনায়কনাথের আইনজ্ঞ-খ্যাতির মূর সারতে। অবশেষে ১৯৫৭ সালের শেষ মাসটিতে উকীল বিনায়কনাথের নাম ঘোষিত হ'ল বিচারপতিরূপে। বিনায়কনাথের ক্ষেত্রে শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীউমাকান্ত লাহা মহাপ্রসঙ্গেরও বিচারপতিপদে নিযুক্ত হলেন, এঁরা তিনজন বিচারপতিপদে নিযুক্ত হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আরও দু'জনের নাম বিচারপতিরূপে ঘোষিত হ'ল, তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅজিতনাথ ায় মহাপ্রসঙ্গ।

১৯৫৯ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্কোত্তর (বাবিজ) শাখায় অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন বিনায়কনাথ। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ইনি ছিলেন কলকাতার জেলার সরকারের প্রধান কৌশলী। ডিসেম্বর ১৯৫৭ থেকে জালিপুর ডিভিডাংশনার পরিচালক সমিতির ইনি অত্যন্ত সমস্তের পর অলঙ্কৃত করে আছেন। ১৯৫১ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রোগ্রামের আলনে ইনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। হাতজীবনে টেনিসভাদিটি ইন্সটিটিউটের ইনি একজন আত্মার সেক্রেটারী এবং কার্ধনির্বাহক সমিতির অত্যন্ত সমস্ত ছিলেন। বর্তমানে বার মাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীপদেও এঁকে দেখা গেছে।

সেন্সিটার আলোচনার কক্ষে বিনায়কনাথের কাছে তাঁর নিজের বিচারকজীবনে লক্ষ অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু জানতে চেয়েছিলুম। তিনি জানানলেন যে, আজকাল জজের প্রতি তাঁদের দৈনন্দিন কাজের সময় বাড়াবার চাপ পড়ছে এবং সভাবতঃই তাঁদের ছুটির পরিমাণও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে—অভিজ্ঞ বিচারক বিনায়কনাথের অভিজ্ঞতাজ্ঞাত অভিমতে এই নিয়ম থেকে দুটি কুফল দেখা দিতে পারে, প্রথমতঃ জনসাধারণ ভাবতে পারেন যে এতাবৎকাল তাহলে বিচারকরা আপন আপন কর্মে শৈথিল্য দেখিয়ে এসেছেন বত্বকণ কাজ করার কথা তত্বকণ তাহলে তাঁরা কাজ করতেন না, এটি একজন বিচারকের কাছে সম্মানের দিক থেকে অত্যন্ত হানিকর। দ্বিতীয়তঃ, একটি লোকের তার বত্বখানি সামর্থ্য তার চেয়ে বেশী কাজ যদি তাকে দিয়ে করানো যায়—তাহলে সেই বাড়তি কাজের নমুনাদিই সভাবতঃই নিরর্থক হবে। বিনায়কনাথ বলেন, দেখুন সাধারণতঃ হাইকোর্টে আপীলের মোকদ্দমা আসে দু'টি স্তর অতিক্রম করে (মুদ্রক কোর্ট ও ডিফিক্ট কোর্ট) অর্থাৎ হাইকোর্টে অধ্যায়টি হচ্ছে সেই মামলার তৃতীয় স্তর বুঝে দেখুন পর পর দুটি কোর্টে যে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে আছে সেই মামলার নিখুঁত বিচার করতে গেলে কি পরিমাণ প্রযুক্তি ও অধ্যয়ন দরকার—হাইকোর্টের আগেকার লক্ষা দুটিগুলিই ছিল ঐ অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট অবসর। আইনজগতের সঙ্গে বিনায়কনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছরব্যাপী। বিচারশালার পারিপার্শ্বিক আবহৌনীর সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়ায় তার কাছে থেকে জানা গেল যে, অসংখ্য আইনজীবীর মধ্যে কেউ কেউ কেউ গতাত্মগতিকভাবে কাজ করে বাচ্ছেন তাতে স্পন্দন নেই, নতুন নেই, বৈচিত্র্য নেই। কেউ কেউ হুল রসেই মজে আছেন আবার কেউ কেউ সত্যিকারের সাধনার আশ্রয়। জিগ্যাস করলুম—আইনজগত সর্বত্র বাইরে থেকে তো নানারকম গল্পের কথা শোনা যায়, এর সভ্যতা কতখানি—বিনায়কনাথ বলেন, গল্প তো সব

জগতেই আছে, শুধুনা এ জগতে যে নেই এ কথা কোর করে বলা থাক না; তবে এর কারণ জানেন? প্রধান কারণ অর্ধসঙ্কট, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ছেলেরা উকীল হয়ে আসে, মস্তকের পক্ষে কাজ করে যায়, অনেক কিছুই ভারী ভার উপর ভক্ত হয়—বেচারারা ভুল, করে বসে, তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় হিসেবে হয় ঠিকে ভুল ফলে এমনি করেই বাইরের জগতে আইনজগত সর্বত্র এক-প্রতিকূল মস্তের সৃষ্টি হয়। আরও একটি গ্রন্থ করেছিলুম তাঁকে আজকের দিনে সরকার পক্ষ থেকে দেশের আইনের উন্নতিকল্পে যে প্রচেষ্টা চলছে আপনাতঃ মস্তে তা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বা কতদূর বা আনন্দ সার্থক কিনয়। বিচারপতির কাজ থেকে উত্তর আসে—বিচার বিভাগের ক্রটি-নিচুটি অজ্ঞাত-অভিযোগ দৃষ্টিকরণের ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ মিশ্রন করেছেন, এঁরা সার্থক হয় তো এখনও হয়ে উঠতে পারেননি—তবে চেষ্টা করে চলছেন, ঐ কমিশন থেকে এতাবৎ একটিমাত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, রিপোর্টটি অগ্রহণন করলে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, অভ্যন্তর-অভিযোগগুলির প্রকৃত স্বরূপ তাঁদের কাছে অগ্রহণ্য হইত নয়; তা হাতা এই মহৎ কার্যে এখনও পর্যন্ত তো তাঁদের কোন বকম ঠান্ডাস্তের পরিচর পাওয়া যায়নি?

দেখীর পণ্ডিত সমাজের অশেষ প্রজ্ঞাজ্ঞান বাঙালীর নম্র বাগীসেবক, পুণ্যজ্ঞান বিভাগের মহাপ্রসঙ্গের প্রথম গুরুদের পূজনীয় ভাবনাথ তর্কহাস্পতি। তাঁরই প্রাণের স্বপ্নীয় পঞ্চানন ভট্টাচার্য কলা শ্রীযুক্তা ইশিরা দেবীর সঙ্গে পরিচয় লুপ্ত আবহ হইতে বিনায়কনাথ। সে আজ হেত্রিশ বছর আগের কথা। বিংশ শতাব্দী তখন পঁচিশটি বছর অতিক্রম করে ছাট্বিশ পা দিয়েছে।

ডাঃ শ্রীনাথকুমার মূলী

[প্রখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী]

পেশার সঙ্গে সমাজসেবা চিকিৎসককে এনে দিয়েছে ডাঃ আসন—তাকে অল্পই রাখার জন্ত চাই স্বপ্নভীর জ্ঞান শিষ্টাচার, মানবতাবোধ আর আর্দ্র আত্মার সেবা—নিজের সুসজ্জিত চিকিৎসাগারে কথা ক'টি বললেন ভারতের অত্যন্ত বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ নাথকুমার মূলী।

১৯০৩ সালের ২৮শে জাহ্নবীরী নাথকুমার টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। শৈত্বক নিবাস ছিল কালিহাতি গ্রামে—বাব জনীন্দকুমার ব্রজীর স্বর্ধক্ষেত্র রাজশাহীতে তাঁর বাবা ও কৈশো কেটেছে। দাদামহাশর ছিলেন বিদ্যাবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ডোগেবিদ্যচন্দ্র নিরোগী। ১৯২০ সালে নাথকুমার রাজশাহী কলেজিয়েট হুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২২ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই, এস-সি পাশ করে কলকাতা ক্যামবাইকেল (বর্তমানে আর, জি, কয়) কলেজে ভর্তি হন ১৯২৮ সালে এম-বি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এক বছর হাউ সার্জেন ও এক বছর রেজিষ্টার হিসাবে কাজ করে ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ড গমন করেন। যুবকিত চক্ষু হাসপাতালে দু'বছর দশ মা অবস্থান করে তিনি D. O. M. S ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৩৫ সালে ক্যামবাইকেল কলেজে (আর, জি, কয়) জুনিয়র



ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী

চক্ষুচিকিৎসক হিসেবে যোগদান করে পরে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের Prof. of Ophthalmology ও বিভাগীয় প্রধান হন। এ ছাড়া চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ইসলামিয়া ও ডাঃ এম. এন. চ্যাটার্জি চক্ষু-চিকিৎসালয়ে তিনি যুক্ত ছিলেন বা আছেন।

ছাত্রজীবনে তিনি সুবিখ্যাত প্রাণন শিক্ষক ও চিকিৎসক চক্ষুবর্তী ও গৃহশিক্ষক জিমাখনলাল সাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন আর বাড়ীতে মা হিরণ্ময়ী দেবীর অসীম পৈধ্য, বাবার সুকঠোর নীতিবোধ ও সন্ততা এবং জ্যাঠামশার ও জন্মভূমির মুন্সীর উদ্যোগ তাঁর মানসিক গঠনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে তিনি নানাব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন—তাই ক্রমশঃ তিনি বিশিষ্ট বাস্তবনৈতিক নেতা ও কলেজের তৎকালীন ছাত্র সভাপতির বক্তব্যোপাখ্যায়ের সম্পর্কে এসে সমাজসেবক-সম্মান গঠন করেন। তাঁর পরিবারে কেউই চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু এ বিষয়ে রাজশাহীর সার্জেন ডাঃ উপেন্দ্র রায়চৌধুরী ও প্রখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ মুন্সীকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব তাঁর উপর ছাড়াপাত করে।

বাহারী হুঃ খবর বীকার করিতে পরাভূত তাহার। কোনদিনও জাতির দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হইবে না। বাহারী ভগীরথের মত তেজোময় দুর্ধর্ষ-গদা-প্রবাহ চালিত করিয়াছেন, তাঁহার। কেহই সতর্ক ও অস্বাভাবিক সেই হুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌ঘাপন করিতে পারেন নাই। পদে পদে পরাজিত ও বিফল হইয়াও তাঁহার। অবচলিত চিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন, সচল বিশ্ব-বিপ্লবের মধ্যেও শির উন্নত করিয়া বহিয়াছেন।

১৯৩৫ সালে আসামের চিকিৎসক ও সুরেশ দায়ের বক্তা ও কলিকাতার অল্পতম বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ডাঃ সুনীল দায়ের ভগিনী জীমতী অরুণা দেবীকে ডাঃ মুন্সী বিবাহ করেন। নীহারকুমারের জন্ম হলেন প্রমিষ্টনেতা জীসুনীল মুন্সী।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অল্পতম পরিপ্রমের পর ডাঃ মুন্সী নিজের পেশার প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। চক্ষু গঠন হয়েছে শিশু শিবা-উপলিয়ার দ্বার—আর চক্ষু মাধ্যমে সাহায্য করে ভগবানের সৃষ্টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে ও শ্রদ্ধা কর্তৃ সম্পাদনে। তাই নীহারকুমার আকৃষ্ট হয়েছেন চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভে—আর দুটিভারদের পুনঃ দুটিলাভে সহায়তা করতে। বিলাতে তিনি প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক মুব, তার ডিউক এন্টার, তার জন পারসনস প্রভৃতির প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ও সহপাঠীদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার জন্য ডাঃ মুন্সী, জীৱশেষ হজুমদার (সিনী বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ উমাশ্রম বসু (বেঙ্গল ইমিউনিটি), জীৱশীৱ অধিকারী (বেঙ্গল কেমিক্যাল), জী. কে. শাস, সেন, জী. বি. কে, বসু প্রভৃতির সহায়তায় Science Club গঠন করেন ১৯৪০ সালে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছে বাজাসরকার, জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতির আর্থিক সাহায্য আর জনসাধারণের সহায়ভূতি। এর মুখপত্রের “বিভার হগলী”, “কলিকাতার স্বাস্থ্য” ইত্যাদি বিশেষ সংখ্যাগুলি সরকারী ও বেসরকারী মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কলিকাতায় আগত ছাত্রদের চিকিৎসার অনুরোধে দ্রুতকরণে সহায়তা ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী কয়েকজন ছাত্রসহ নিজের বাড়ীতে ১৯৫২ সালে Students Health Home সৃষ্টি করেন। কয়েক বছরের মধ্যে এটি জনসাধারণের ও সরকারী সাহায্য লাভে সক্ষম হয়েছে। কলিকাতা করপোরেশন নামমাত্র ঋণের ভিত্তি, “আন্তর্জাতিক ছাত্রপরিষদ” বস্ত্রপাতির ও পিকিংস্থ এশিয়ান ইন্ডিয়ান আনাটোবিয়াম প্রতি বছর পঞ্চাশটি ভারতীয় ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৫৪ সালে ডাঃ মুন্সী চীনদেশের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ডাঃ নিখিলেন্দু রায়, ডাঃ মোহিনীকান্ত মজুমদার, ডাঃ অরিন্দম সেন, উড়িষ্যার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মনসাচরণ মালাকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮ সাল থেকে ডাঃ মুন্সী ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্য এবং ১৯৫০—৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির বকীয় শাখার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি অটোমোবাইল এসোসিও অব বেঙ্গলের সভাপতির আসনে সমাসীন।

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ণ-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বোম্বাইয়ের ছায়াছবির বাজারে প্রবেশক হিসেবে চিমেনলাল বি. দেশাইয়ের নাম ঘোষিত বিশিষ্টতার দাবী রাখে। এক কথায় চিমেনলাল বোম্বাইয়ের তখনকার দিনে পুরা নব্বয়ের প্রবেশকদেরই একজন। তাঁর পুত্র সুব্রহ্ম বি. দেশাই। আমরা কলকাতায় ফিরে আসবার পর মধুর কাছে সুব্রহ্ম রীতিমত দাসা-বাওয়া শুরু করলেন। বাতায়ত ঘনিষ্ঠ থেকে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল। এই প্রসঙ্গে, আজ দীর্ঘ বিশ বছর বাসে একটি মজার কথা মনে পড়ছে, এই তরুণ ভরপ্রোকটকে বুলবুল লুখা তাঁর ডাকনামে ডাকা হোত। তিনি আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাবার পরেই আমার বেশ মনে পড়ে মধুকে জিগেস করতুম যে বুলবুল বার নাম সঙ্গীতে তার তো একছত্র আবিপত্য থাকা উচিত তা এই বুলবুল গান গাইতে পারে তো? এই রকম মজা করতুম প্রায়ই। কোথায় চলে গেল সেই সব দিনগুলো, কোথায় মিলিয়ে গেল সেই সব পরিবেশ, কোথায় হারিয়ে গেল সেই অসংখ্য চেনা মুখ—হাল এসিয়ে চলছে যথানিয়মে তার সঙ্গে তালে তাল রেখে চলতে বাহুব বাধ্য—যে সেই বাধ্যতাকে মানতে চায় না বা পারে না—তবেই ঠকতে হয় সব চেয়ে বেশী। বারা মিলিয়ে গেল, বারা মিলিয়ে গেল, বারা হারিয়ে গেল তারা আসন পেল স্মৃতির স্বপ্নিহাসনে। ফুলের দিক দিয়ে তারা অবলুপ্ত, স্মৃতির দিক দিয়ে তারা মৃত্যুঞ্জরী।

মধুর কাছে দেশাইয়ের দাসা-বাওয়ার পিছনে আত্মপোষণ করেছিল একটি প্রস্তাব, যথাসময়েই প্রস্তাবটির হ'ল আত্মপ্রকাশ। 'অভিনয়' ছবিটি দেশাইয়ের মনে ছায়াপাত করেছিল গভীরভাবে, সেই থেকেই মধুর কাছে তার দাসা-বাওয়ার সূত্রপাত। মধুর কাছেই শুনলুম যে এখন তার ইচ্ছা যে মধু বোম্বাই গিয়ে তাদের গগর মুভিটোনের পক্ষে একটি চিত্রনির্মাণে হাত দেয়, ছবিটি বাঙলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই তোলা হবে। স্বভাবতঃই গগর মুভিটোন থেকে ছবি তুললে আমাদের বোম্বাইতে বাস রাখতে হবে, কলকাতার বাস তুলতে হবে। কলকাতা ত্যাগ যেনেই চৌরঙ্গী প্রেসের বাড়ী ছাড়া। এই বাড়ীতে প্রায় ছ'টি বছর আমাদের কেটেছে, আমাদের দৈন্য জীবনে এর প্রভাব অনতিক্রম্য, এ বাড়ীর গুরুত্ব আমাদের কাছে যে কতখানি তা বর্ণনার অতীত, তা উপলব্ধির বিষয়। আমাদের জীবনের কত হাসি, কত গান, কত কথা, কত কাহিনী, কত টুকরো টুকরো ঘটনার গরিব স্মৃতি এই বাড়ীর ঘরে ঘরে, এখানে-সেখানে, জানাচে-জানাচে, প্রতিটি ইট-পাথরে অঙ্গীভায়ে একীভূত হয়ে গেছে। এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছে আমাদের পক্ষে যে কতখানি কষ্টকর তা আমরা ছাড়া বিনি জানেন তিনি স্বয়ং অন্তর্ধামী ছাড়া কেউ নন। এই বাড়ীতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমার একান্ত পরিচিত, কতকালের আগুন, তিরকালের ঢেনা। এ বাড়ী ছাড়তে হবে—এই চিন্তাই যে আমার মনের সমস্ত উদ্দীপনাকে দমকা হাওয়ার মত হুংকারে একেবারে নিবিয়ে দিল। আমাদের যে সব মঞ্চাভিনয় চিত্রাভিনয় সাধারণের অনাবিল রহস্যে অভিসিক্ত হয়েছে—



সবই এই বাড়ী থেকেই, আর একটি চিন্তাবও ঘিরে ঘিরে আবির্ভাব ঘটল আমাদের হৃদবিদ্যাপ্রসঙ্গ মনে—কলকাতা ছাড়া মানে আমাদের মঞ্চাভিনয় প্রচেষ্টারও ইতি মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আমাদের যে অপরিণীত অম্লভাগ—তার সেইখানেই শেষ বঙ্গমঞ্চের সেবা করার দোভাগ্য থেকে আমাদের হতে হবে বঞ্চিত, একান্ত রক্তমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে সুবোধা জনমণ্ডলীকে প্রাচীনমঞ্চার জানাবার যে সুযোগ এককাল ধরে শেষে এসেছি—এবার তো তাও হারাতে হবে।

আবার এরিক উভয় ভাষার ছবি করার বাসনাও অন্তরে প্রবল, বিশেষ করে হিন্দী ছবির নির্মাণে অসাধারণ আগ্রহ। উভয় ভাষার এবং বিশেষ করে হিন্দীতে ছায়াছবি তোলায় একটা অন্য বাসনা মনের মধ্যে লুকিয়েছিল, দেশাইয়ের সঙ্গে



দর্পণ দীর্ঘকাল উদ্ভাষণ ও স্মৃতি সাধনা বসু
"স্মৃতি"এর একটি দৃশ্য

যোগাযোগের এবং তাঁর প্রস্তাবের ফলে সেই বাসনাটাই বেন শাখা-প্রশাখায় একটা বিরাট বিশাল রূপ নিল। বাখাই বাওরাই আমরা ঠিক করলুম। মধু এঁরা যেতে, চাইল না, সে চাইল সম্প্রদায়ের যেতে, ছবি সে হিন্দীতে নয়বে, সাগর মুক্তিটানের পক্ষেই, তবে সেই ছবিতে স্পর্শ থাকবে তার নির্বাচিত কুশলীদের কুশলী হাতের, সেই ছবিতে মিশিয়ে থাকবে তার নির্বাচিত কুশলীদের কর্মকৃতিবের স্বাক্ষর, ছবির প্রথম দুটটি থেকে শেষ দুটটি পর্যন্ত গৃহীত হবে তার নির্বাচিত কুশলীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সে চাইল তার সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে যেতে—শিল্পীদের, কলাকুশলীদের, শিল্পনিদেশক, সূত্র-সংযোজক এবং সহকারীদের। আমরা মনে আছি, এই প্রসঙ্গে আলাপ আলাচনায় সে কি সমারোহ, মধুর সঙ্গে এ বিষয়ে অপর পক্ষের তখন কথাবার্তার সে যে কি বাস্তবতা তা ভালোই বিষয় মনের মধ্যে জন্ম নেয় আজও। চিঠিপত্র হার মানল, ট্রান্সল চিঠির শূণ্য স্থান পূর্ণ করল তুলনামূলক প্রবীণ ও সময় সাক্ষেপের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। আমাদের মধ্যে এক কথায় তখন বাস্তবতার সমারোহ, জীবনীশক্তি যেন তখন বেগপ্রাচুর্যের জয়গান আর কর্মোত্তম যেন ক্রততার নিদর্শন।

আশেবে মধুর প্রত্যেকটি প্রস্তাব যেনে নিলেন প্রযোজকবর্গ। সে বা চেয়েছিল, তাই সরবরাহ করতে তাঁরা হলেন প্রতিশ্রুত, তার প্রতিটি সর্ভ তাঁরা যেনে নিলেন সম্পূর্ণরূপে। নির্মিতব্য ছবি হিসেবে নির্বাচিত করা হল—“কুমকুম দি ডালার” বার স্ট্রী হয়েছি শ্রীমদ্রথ ধারের লেখনীর মাধ্যমে।

আগেই বলেছি, ছবিটি উভয় ভাষাতেই (বাঙলা ও হিন্দী) তোলায় কথা হয়েছিল অর্থাৎ গল্প একটি হলও দেখা যাচ্ছে ছবি হচ্ছে দুটি। একটি কাহিনীর ভারতীয় দুটি পৃথক ভাষায় চিত্রায়ণ এই দুটি ছবিতেই নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত শক্তিধর অভিনেতা বীরাজ ভট্টাচার্য, সেকালের অপরিসীম চিত্রনায়ক। শক্তির টুকরোতে এই প্রসঙ্গ (বিশেষ করে বীরাজের প্রসঙ্গ) বধন লিখে চলেছি তখন মনের মধ্যে বিগত কালের অজস্র স্মৃতির মধুনে একটা অনগ্রসরধারণ আনন্দ জন্মেছে ঠিকই, সেই সঙ্গেই বাদের ঘিরে সেই সব কাহিনীর স্মৃতি, বাদের স্পর্শে সেই সব কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে, বাদের কলাণে সেই কাহিনীগুলি অবিচলিত হতে পেয়েছে অমরতবে আসনে তাদের অনুকেই আজ পার্থিব নোনা-পাওনা, হিসেব-নিকেশ সব চুকিয়ে এক অজানা মহাশক্তির উদ্দেশ্যে বাড়া করল, কায়িক উপস্থিতি তাদের কোনদিন ঘটবে না এই পার্থিব পৃথিবীর বৃকে, ধরবার অনিত্য এই খেলাঘরের হানিতে, কান্নায়, আনন্দে, বেদনায়, হর্ষে, বিবাদে অংশগ্রহণ করতে তাদের আর দেখা যাবে না—এই বিরাট হুঃখ সমস্ত আনন্দকে ছাপিয়ে উঠে মনকে ভীতভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই তাদেরই মধ্যে নিঃসন্দেহে বীরাজ অগ্রতম। শক্তির টুকরোর গত যে কিস্তিতে বীরাজের নামোদ্যোগ করা হয়েছে তখনও সে জীবিত। হৃদয়ে ভাবি নি যে এত আকস্মিক ঘটবে তার জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি। তার আত্মার শক্তি হোক।

উভয় ভাষাতে গৃহীত কুমকুম মুন্সিলাভ করল ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে।

বিশ শতাব্দী তখন উনচল্লিশটি বছর অতিক্রম করে চল্লিশের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। [ক্রমশঃ।]

অনুবাদক—কল্যাণাক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্টারে ডাকবাংলো

প্রথিতযশা সাহিত্যশিল্পী শ্রীমেনোজ বসুর ‘বৃষ্টি বৃষ্টি’ শীর্ষক উপন্যাসটি বহুজন-সমাদৃত। ‘ডাকবাংলো’ এই উপন্যাসটিরই ন্যায়রূপ। বর্তমানে ষ্টারে সগৌরবে অভিনীয়মান।

এক ডাক্তারের ইতিহাসের গবেষণারত পুত্র এর নায়ক ও এক আত্মজোলা ঐতিহাসিক গবেষণায় নিমগ্ন সমাহিত স্মৃতির কভা এর নায়িকা। নায়ক ও নায়িকার পিতার আদিনিবাস এছই গ্রামে। বৃষ্টির বেগ বৃদ্ধিতে বাধা হয়ে নায়িকা ইরা আশ্রয় নেয় নায়ক অরুণাকের বাড়িতে। এই ভাবেই উভয়ের প্রথম মিলের প্রথম পরিচয়। অরুণাকের বাবা অমৃত্যাক নির্বাচনপ্রার্থী। কিন্তু মনোনিয়নপত্র পাওয়ায় তাঁর প্রবল বাধা হল তিনি কালীখরের পৌত্র যে কালীখর ইংরেজের চর বগে বাসত এবং গ্রামের সকলের ধারণা যে নির্দোষ, সত্যপরায়ণ ও দৃঢ়চেতা রামনিধির ক্যাসির মূল তিনিই—এই রামনিধিই নায়িকা ইরার বাবা বিদ্যেশ্বরের পিতামহ। বিদ্যেশ্বরের লেখা ‘ভারত ও ইংরেজ’ গ্রন্থে তিনি অবশ্য কালীখরের কলঙ্কমোচন করেছেন। কালীখরকে তিনি আগাগোড়াই রামনিধির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই উল্লেখ করেছেন। এই গল্প শাঠে বিদ্যেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হন অমৃত্যাক তিনি স্বগ্রামে নির্ধীন কেন্দ্রে বিদ্যেশ্বরকে নিয়ে বান সোমানে গবেষণার উপকরণ স্বরূপ দীর্ঘকাল ধরে সন্সকৃত বহু কাগজপত্র বিদ্যেশ্বরের হাতে সমর্পণ করেন সেইগুলি দেখতে দেখতে বিদ্যেশ্বর আবিষ্কার করেন যে কালীখর সঙ্কে তাঁর ধারণা ভুল, তিনি ইংরেজকে সাহায্য না করলে ইংরেজের সাধ্য ছিল না জনপ্রিয় রামনিধির বেশসম্পন্ন করে! সপুত্র অমৃত্যাক সেদিন বিদ্যেশ্বরের বাড়ী এগিয়েছেন ইরার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কিন্তু সেইদিনই বিদ্যেশ্বর জানানেন যে সন্তোর প্রকাশ তিনি করবেনই, কালীখরের প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন না করলে তাঁর ঐতিহাসিক সাধনার প্রতি চরম বিধাসম্ভাবকতা করা হবে। স্বভাবতঃই মিত্রতার অবদান। বাসগৃহ অমৃত্যাকের হস্তগত হওয়ার তাঁর দ্বারা অপর্যায়িত হতে পাবেন এই আশঙ্কার দ্রষ্টাক্ষা নিয়ে পৈত্রিক ভিটের ফিরে গেলেন বিদ্যেশ্বর। এরপর অরুণাকের মায়ের দ্বারা প্রেরিত তাঁর পিতৃদেব (অরুণাকের মাতামহ) গোবিন্দ ঘোষের প্রচেষ্টায় অরুণাকের সঙ্গে ইরার বিবাহ। পথিমধ্যে আবার এক ঝড়বৃষ্টির রাতে ঘটনাচক্রে সস্ত্রীক অমৃত্যাকের সঙ্গে নবদম্পতির সাক্ষাৎ এক ডাকবাংলোর এবং পুত্রবধূদর্শনে অমৃত্যাকের মন থেকে সকল বিরোধের সূত্রনাশ।

এদিকে সারা নাটক জুড়ে আরও দুটি বিশেষ ধরনের চরিত্রের সন্ধান মেলে। এই দুই পরিবারের সঙ্গে তাঁদের সমান যোগাযোগ (অবশ্য বিদ্যেশ্বরের সঙ্গে একটু বেশী নিবিড়) এবং এই প্রসঙ্গ এঁদের উল্লেখও বিশেষ ভাবে করণীয়। এঁরা দুজন হচ্ছেন মূলচক্র পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর সহকারী। এই সম্পাদকই বিদ্যেশ্বরের গ্রন্থের প্রকাশক।

নাটকটি রসিকমহলে যথোচিত সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে এ বিশ্বাস আমাদের রাধি। নাটকটির পরিণতি জানার ভিত্তি বর্ণনাকল্পিত বাস্তব হয়ে ওঠে। মনোজ বহুব্র মনোজ কবিতা ও কবিতা নাট্যকার এবং যথাস্থ সাহিত্যিক দেবনাথবাণ গুপ্তর সার্থক নাট্যরূপকান ও পরিচালনা এই চমকে মিলে এক অপরূপ রস সমৃদ্ধ নাট্যসম্মানের সৃষ্টি করেছে। নাটকটি মূলতঃ তিনটি ধারায় বয়ে চলেছে—একটি বিবেচনামূলক ও তৎপরিবারকে কেন্দ্র করে, একটি অসুখাক ও তৎপরিবারকে কেন্দ্র করে এবং আর একটি কৃতান্তকে কেন্দ্র করে, সঙ্গীতীয় এই, তিনটি ধারা সমান তালে তাল রেখে চলেছে অসমতার চিহ্ন কোথাও ধরা পড়ে নি। শিল্পকলায়, রসকল্পিত, প্রয়োগ নৈপুণ্যে চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনাসমাবেশে নাটকখানি এক অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। কি ঘটনা, কি প্রয়োগনা, কি পরিচালনা, কি অভিনয়ে এক কথায় সারা নাটকটিতে এক অমুগম হৃদয়গ্রন্থি আত্মবিক্রমপূর্ণ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়, কৃত্রিমতার, আড়ম্বরের, অসাব্যতার লেশমাত্র নেই। নাটকটির উত্তরাবৃত্তি সংস্কার আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

নারক নাটিকা ভূমিকায় ৪টি রূপ নিয়েছেন যথাক্রমে আদীশ্বর ও সন্ধ্যা বায়। বিবেচন ও অসুখাকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যথাক্রমে ছবি বিশ্বাস ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রদায় কৃতান্ত ও তপীর সহকারী পঙ্কজনের ভূমিকায় দেখা গেছে যথাক্রমে ভাদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরকুমারকে। এঁরা ছাড়া আরও যে সা শিল্পী ভূমিকালিপিতে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমাক্ত বসু, কৃষ্ণন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, তুলসী চক্রাভী, জাম দাস, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজন উট্টাচার্য, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতা দে, সখনা বারচৌধুরী, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকটির স্বয়ংসমাজনা ও নৃত্যগিরিকলা করেছেন যথাক্রমে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মিতা চট্টোপাধ্যায়।

রঙমহলে—এক মুঠো আকাশ

“এক মুঠো আকাশ” এই বিষয়বস্তু সবে মাসিক বহুমতীর সন্ধ্যার পাঠক-পাঠিকাকে নতুন করে কিছু বলা অনাবশ্যক। স্বরণ থাকতে পারে অল্পকাল এই সর্বাঙ্গসুন্দর উপজাতি ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বহুমতীর পাতায় প্রথম প্রকাশ লাভ করে। মনজয় বৈরাগী চন্দ্রনামের অন্তরালে শক্তিমান নাট্যবিদ ও সাহিত্যিক তরুণ রায় এর রচয়িতা। আজকের যুব সমাজের চারিদিক আবেগপূর্ণ নৈতিক মানের ক্রমাধীন, উজ্জ্বলতা ও অসংযমের পায়ে আত্মসমর্পণ প্রবৃত্তি সমাজের একাধিক ঘন চূর্ণাঙ্গের এক বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে উপজাতিটির মাধ্যমে। এই উপজাতির নাট্যরূপ বর্তমানে প্রভূত খ্যাতিও সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে রঙমহলে। আজকের দিনের সমাজের যৎসামান্য দুর্নীতির বিবরণ্যের প্রভাব আর তারই হার্যাপাত ঘটছে অপরিস্রব শিশু মনে, বাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্তে অপেক্ষা করে আছে আগামী দিনের সোনালী সকাল তারা আজকের এই কাল-যাত্রিতে সর্বনাশা রূপের কাঠির স্পর্শে জ্বলে জ্বলে বিনাশের দিকে

এগিয়ে চলেছে। আর তরুণ সম্প্রদায়কে এই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাতে, উৎসাহ দিতে, সত্যতা করছে মাসিকের মুখোপাধ্যায় কতকগুলি দানব—নিজের স্বাধীনতার জন্তে লগতে করতে পারে না—এমন কোন কাজ নেই।

আজকের দিনের এই কবিতা, যুগের সমাজের বাস্তব চিত্র অল্পের অপরিণীত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন রচয়িতা। এর কাহিনী কাগজ-কালি কলমে লেখা বলে সমগ্র বিশেষে মনেই হয় না, বরদ, অসুখাক, স্বয়ং মিলে লেখা বলে মনে হয়। তাঁর নাট্যরূপকানও যথার্থ বসোভারী হয়েছে। নাটকটি আবেগে সমৃদ্ধ, পতির দিক দিয়ে বেগবান, স্বতঃস্ফূর্ত। নাটকটির সব চেয়ে বড় সম্পদ নতুনত্ব। আজকে বিভ্রান্তি, প্রেরণা কুশলতার সকল দিক দিয়েই নাটকখানি যেন এক মালিন্যহীন নতুনত্বের দৃষ্ট জন্মবিন। নাটকখানির অন্তর্নিহিত আবেদন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অসুখাক সম্পন্ন যে কোন বর্ণকের মনে গভীর ভাবে যথোপাত করতে সমর্থ হবে। উৎসর্গ, উজ্জ্বলতা বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে, শোভনতার ইত্যাদির সমন্বয়ে সমগ্র নাটকখানি এক প্রভাববান বস্তু। রসসৃষ্টিরই নাথাস্তর মাত্র। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলার আছে প্রেমের নামকরণ সবে “এক মুঠো আকাশ” নামকরণের তাৎপর্য লেখকের স্বাধীন বিশ্লেষিত হয়েছে মূল উপজাতি এবং সেই অধারে তরুণধারী যথোপাত পুরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু নাটকের বর্ণ অল্পসংখ্যে উপজাতিতে অনেক অঙ্গন বহন করতে হয়, এই কাহিনীটির বহন নাট্যরূপ দেওয়া হাল তখন যে আশে প্রেমের নামকরণটি বিশ্লেষিত হয়েছে সেই আশেটিও বার দেওয়া হয়েছে, ফলে উপজাতির মধ্যে যে পরিবেশের সাহায্যে নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে, নাটকে তা হয় নি, সেই আশেটি নাটকটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; ফলে সেই পরিবেশটিও এখানে অল্পপরিমিত (যার সাহায্যে নামকরণের অর্থ স্পষ্ট হবে ওঠে) এবং সবিনয়ে বলছি আগাগোড়া নাটকের মধ্যে ঐ নামকরণের কোন অর্থই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে তরুণবাবু দৃষ্টি দিলে আমরা খুশী হতুম। বাড়লার সুবোধ প্রাণবন্ত রসিকসমাজে এই যুগোপযোগী নাটকটি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হোক এই কামনাই করি। বাক্যের কেন্দ্র করে এই কাহিনীর সৃষ্টি, বাদের অংশতন সারা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, বাদের ক্রমনিয়মিততা তরুণ রায়ের শিল্পমনকে ব্যাহত করে তুলেছে এই নাটকটি দেখে তারা অর্থাৎ পঙ্কজনাথ মুখ বৃদ্ধি যদি আত্মসমর্পণে হয়ে অনিবার্য কালের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন তা হলে তার চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছু থাকতে পারে না।

কই ও গৌরীর অর্থাৎ নারক নাটিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তরুণ রায় স্বয়ং ও তাঁর সুযোগ্যসহধর্মী শ্রীমতী রায়। বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে দেখা দিয়েছেন রবীন মজুমদার, নবসোপাল লাহিড়ী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শিকলু, সমরকুমার, মিতা, কেতকী দত্ত, কবিতা সরকার, শীলা পাল, জ্ঞান দাস, প্রভৃতি। এঁরা ছাড়াও অজ্ঞাতভাবে ভূমিকাগ্রহণ করেছেন কাতিক সরকার, সোপাল মজুমদার, প্রমীত মুখোপাধ্যায়, অক্ষ উট্টাচার্য, বলীন্দ্র সোম, আশা দেবী ইত্যাদি নিম্নবল।

এই প্রাণম্পর্শী নাটকটি দর্শক সমাজে উপহার দেওয়ার জন্য আমরা রত্নমহলের অভিজ্ঞ কতৃপক্ষ এবং তরুণ বয়সকে সর্বাস্বত্বকরণে অভিনয়িত করি।

দীপ জ্বলে যাই

তাপস, সেবা ও কল্যাণই বাঙলা দেশের নারী সমাজের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য, এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যেই বাঙলা দেশের নারীদের বিকাশ। বিশেষ করে সেবার নারীদের প্রধান কাজ। বশবর্তী সাহিত্য শিল্পী আন্তর্জাতিক মুখোপাধ্যায়ের লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় এই চিরকালের সত্যটিই নতুন করে দেখা দিয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে “নাস মিত্র” অন্যতম। স্বরণ থাকতে পারে, বহুকাল আগে মাসিক বহুমুখীতেই এই গল্পটি প্রকাশনা লাভ করেছিল। বর্তমানে ঐ অসিত সেনের সুপরিচালনায় এ গল্পটি “দীপ জ্বলে যাই” নাম নিয়ে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সমাবেশে প্রদর্শিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুখোপাধ্যায়কে কেবলমাত্র কুশলী সাহিত্যিক বললে তুল করা হয় এক অতুলনীয় অভিনব অঙ্কুশুতি সম্পন্নের তিনি অধিকারী। নারীর একটি রূপ তিনি জনসংসারণ দক্ষতার সঙ্গে এখানে ফুটিয়েছেন। নারীজীবনের বাস্তবতা, অঙ্কুরণ এবং পরিণতির এক নিখুঁত চিত্র এখানে উদ্ঘাটিত। যে সব জীবনে দীপ নিজে বার সেই নিজে বাওয়া দীপ আবার জলে ওঠে যে কল্যাণময়ীদের মঙ্গলমার্শ সেই মমতাময়ীদের জীবনের সবকটি দীপ যদি এক এক করে নিজে বার তখন তাদের জীবনদীপ আবার আলিয়ে দেবে কে? তাদের জীবনের শুকুর্মির উপর কল্যাণবাহার মত হবে কার আবির্ভাব জন্মের সেই শুকুনো মরুভূমির উপর কি এক কঁটা জলের মতও পড়বে না কারোর সহায়ত্ব, অঙ্কুরণ বা সাধনার চিহ্ন? এই প্রশ্নটি লেখক এখানে উপাশিত করেছেন পাঠক সাধারণের দরবারে।

নারীরা বাধা মিত্র এক মানসিক চিকিৎসালয়ের এক প্রধান গুপ্তপ্রাধিকারিণী। মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে তাপস এল চিকিৎসার জন্যে। আপন প্রশ্রয়িনীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কলে তার এই অবাভাবিক অবস্থার ডাক্তার বিধান ছিলেন যে সাধারণ ওষুণ পত্রর তো চলবেই তা ছাড়াও গুপ্তপ্রাধিকারিণীকে অভিনয় করতে হবে প্রেমিকার আর বোম্বার স্নহতা লাভে সাধারণ ওষুণ পত্ররের তুলনায় সেই অভিনয়ই সহায়তা করবে সব চেয়ে বেশী। বাধা মিত্রের উপর তাপসের ভার পড়ল, বাধা সে ভার নিল না, তাপসের আগে

দেবালীক এসেছিল, এক অবস্থা, অভিনয় করতে করতে বাধা অনেক পরে বুঝতে পারল যে অভিনয়ের সীমা তো তার কাছে অতিক্রান্ত তখন সে চরম সত্যের মুখোমুখী। কিন্তু দেবালীককে তো সে পেল না, দেবালীকও দিতে পারল না তার প্রেমের মূল্য, সেইজন্টেই আর অভিনয়ের মধ্যে বেতে চাইল না বাধা। বীর হাতে তাপসের চিকিৎসার ভার পড়ল তিনি তাকে সামলানতে না পারার সেই বাধাকেই নিতে হ'ল তার চিকিৎসার ভার। তাপস সেবে উঠল তারপর? তারপর বাধার আলকাত্তি সত্যে পরিণত হ'ল। তাপসকে ডাক্তার জানালেন যে বাধা তাকে আসলে ভালবাসেনি, তাকে সারাবার জন্যে অভিনয় করেছিল মাত্র। তাপস কথটা বিশ্বাস না করলেও ঘটনাক্রমে করতে বাধ্য হল। কিন্তু বাধার মনের প্রকৃত ভাষা একমাত্র অন্তর্গামী ছাড়া কেউই বুঝতে পারল না। এদিকে ক্রমান্বয়ে মানসিক আঘাতের কল বাধা মিত্র নিজে হয়ে পড়ল মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় তাপসের পরিচালনা করায় সে স্থান নিল, গুপ্তপ্রাধিকারিণী হিসেবে নয় গুপ্তপ্রাধিকারিণী হিসেবে। গল্পাংশটি যথোচিত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। পরিচালক সেন বাধাধ মুন্সীরামার পরিচয় দিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণও উচ্চাঙ্গের। স্বর যোজনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলা-কৌশলে, অভিনয় সম্পর্কে এবং কাহিনীর গভীরতার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে দীপ জ্বলে যাই একখানি যুগোপযোগী, প্রাণম্পর্শী ও সার্থকনামা ছায়াছবি। কাহিনীর সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলির যথোচিত বিকাশ ঘটনাটির সুবিচ্ছাসে, রূপালী পদ্যর বৃক গল্পের মূল বস্তুরোর সম্যক-প্রাক্টনে ছবিটি সর্বতোভাবে সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করেছে।

এই ছবির বা সবচেয়ে বড় সম্পদ তা হচ্ছে স্রচিত্রা সেনের অনবদ্য অভিনয়, শ্রীমতী সেন বাধার চরিত্রটিকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, শ্রীমতী স্রচিত্রার অভিনয় সমস্ত ছবিটিকে নানা দিক দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে। নায়কের ভূমিকার অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী অন্যান্যোশে অবতীর্ণ হয়েছেন পাহাড়ী সান্তাল, বিলীপ চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জাম সাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায় পরিতোষ রায়, চন্দ্রা দেবী, মমিতা সিংহ, কাজরী গুহ, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে একটি কথা বলতে হচ্ছে যে ছবিটির গতির দিকে পরিচালক দৃষ্টি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। ছবিটির গতি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বলতে বাধ্য হচ্ছে, অত্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে।

তোমরা দেখিতেছি সবাই সমান। যেমন সঙ্গীতে, তেমনই অজ্ঞান সকল বিষয়ে। তোমরা ব্রিবিবার চেষ্টামাত্র কর না। তোমরা বল আমাদের দেশের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, নর্শনশাস্ত্র নর্শনশাস্ত্রই নয়। আমরা ইয়োবোশের সকল জিনিবই ব্রিবিবার এবং আদর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিও না যে, ভারতবর্ষের জিনিষকে আমরা অশ্রদ্ধা বা অনাদর করি। আমাদের কাব্য, ধর্মশাস্ত্র, নর্শনশাস্ত্র যদি শূন্য, তবে দেখিতে পাইবে যে আমরা ‘হিদেরন’ নই। সেই অচিন্ত্য অনির্ধরনীয় ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধে আমাদের ধারণা তোমাদেরই মত,—চাই কি, কোন কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান তোমাদের চেয়েও গভীরতর ও নিবিড়তর।

—বারনান্দ ঠাকুর।

১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন।

মুম্বাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর (কলিকাতা) গলিতে নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত একাডেমী ভবনের উদ্বোধন।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) : কেরল শিক্ষা বিল অমুহাযী করলে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সরকার-বিরোধী সভা বা আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ।

৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল) : বম্‌ডিল ত্যাগ করিয়া তিরুভী থম্বক্কু দালাই লামার খেলা উপস্থিতি।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল) : অরিয়ুগের বিপ্লবী নায়ক ও দৈনিক বহুমতীর প্রাক্তন সম্পাদক জীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের জীবনীমণি নির্মাণ।

খালের জলের বিরোধ সম্পর্কে পাক-ভারত অন্তর্কর্তৃত্বকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৫ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল) : দালাই লামার নিকট মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের পত্র (সীল করা) প্রেরণ।

দুর্গাপুরে ডি. ভি. সি. কণ্ঠস্বরীদের সভায় ডি. ভি. সি'র সদর দপ্তর স্থানান্তরকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল) : দিল্লীর অদ্রবত্তী হিসার জেলায় পাক বিমান কর্তৃক পুনরায় ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন।

ভারতের সমগ্র পূর্ব সীমান্ত সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে রক্ত। লোকসভায় অর্ধসচিব জীমোহরজী দেশাই কর্তৃক ব্যাক সমূহ জাতীয়করণের কমুনিষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

৭ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল) : মুসৌরীতে সদলবলে দালাই লামার উপস্থিতি এবং বিড়লা ভবনে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা।

লোকসভায় জীনেহরুর ঘোষণা—কেনপ্রেকার পাঞ্জাবী সুরা (পাঞ্জাবী ভারী রাজ্য) গঠিত হইতে দেওয়া হইবে না।

বরাহসচিব পণ্ডিত পদ্ম হরদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া উইলিংডন নাসি হোমে (দিল্লী) ভর্তি।

৮ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল) : সসদীয় সরকারী ভাষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ—কেন্দ্রে ইংরেজীর স্থলে হিন্দী ও রাজ্য সমূহে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুপারিশ।

৯ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) : ভারত কর্তৃক আমেরিকার নিকট পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির সম্মতি ব্যাখ্যা দাবী।

১০ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল) : তিরুত এসঙ্গে মুসৌড়ীতে দালাই লামার সহিত প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর জল্পনী বৈঠক।

বিবাহে যৌতুক দেওয়া ও লগুয়া নিষিদ্ধ করিয়া লোকসভায় আইন সচিব জীশোককুমার সেন কর্তৃক বিল উপাধান।

১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল) : কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার জী বি. কে. সেন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের মুম্বাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ।

মুসৌরীতে উচ্চপদস্থ তিরুভী উপদেষ্টাদের সহিত দালাই লামার বৈঠক।

১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল) : জলের নিদারুণ অভাবে শ্যাম, জি. কর.হালপাতালে (কলিকাতা) অগ্নিসংহার উদ্ভব।

◎ দেশে-বিদেশে ◎

/বৈশাখ, ১৩৬৬ (এপ্রিল-মে, '৫৯)

আগরতলার অনতিদূরে হরিহারকুলায় শপথ পাকিস্তানীয়ে হানা ও ভারতীয় পুলিশের সহিত গুলী-বিনিময়।

পশ্চিমবঙ্গের খাত পথিস্থিত সম্পর্ক মুম্বাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত কেন্দ্রীয় খাতসচিব জীঅজিতপ্রসাদ জৈনের বৈঠক।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল) : দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় ১৩ জন হতাহত।

১৪ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল) : পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র জলের জন্ত হাহাকাহ—আসানসোলে এক টাকায় এক বালতি জল বিক্রয়।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল) : কলিকাতা কর্পোরেশনের নলকূপ বড়োয় মামলায় আসামীগণ (কয়েকজন অফিসার ও ১ জন কাউন্সিলার সমেত ১৮ জন) বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল) : সরকারী শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতীক ধর্মঘট ও অনশন।

১৭ই বৈশাখ (১লা মে) : আসামের পাখারিয়া বনাকুলে পাক সশস্ত্র বাহিনীর পুনরায় গুলীবর্ষণ।

ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনার্থ লোকসভায় বাণিজ্য ও শিল্পসচিব জীলাবাহাদুর শাহী কর্তৃক বিল উপাধান।

১৮ই বৈশাখ (২রা মে) : কলিকাতার বিড়লা পার্ক ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বাত্বঘরের (সংগ্রহশালা) উদ্বোধন।

বিষড়ায় কেন্দ্রীয় অর্ধসচিব জীমোহরজী দেশাই কর্তৃক ভারতের প্রথম পলিথিন কারখানার উদ্বোধন সম্পন্ন।

১৯শে বৈশাখ (৩রা মে) : কলিকাতার 'বিশ্ব মিলন উদ্‌যোজিত বিশ্ব কংগ্রেস'-এর উদ্বোধনে ভারত পাকিস্তান পুনর্মিলন মহাসভায় দ্বিতীয় অধিবেশনের অন্তর্ধান।

দক্ষিণ কলিকাতার বরীন্দ্র সরোবর (তেক) মনোনে কলিকাতা ইমপ্রেসমেন্ট ট্রাস্ট পরিকল্পিত ট্রেডমার্কের ভিত্তিতে স্থাপিত।

২০শে বৈশাখ (৪ঠা মে) : হাওড়া জেলা শাসকের ভবনের সম্মুখে শ্রমিক-বিক্ষোভকালে পুলিশের লাঠিচালন—২৪ জন আহত ও ৩৯ জন গ্রেপ্তার।

প্রধানমন্ত্রী জীনেহরু কর্তৃক ভারত-পাকিস্তান যৌথ প্রতিনিধিকার পাকিস্তানী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

২১শে বৈশাখ (৫ই মে) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রটিপূর্ণ খাতনীতির জন্ত রাজ্যের বিভিন্ন বাজার হইতে চাউল উত্তোলন।

ভারতে তিন লক্ষ সেবা সময়র গঠনের জন্ত রাজ্যসভায় সরকারী ভাবে ঋণ্ডা পরিকল্পনা পেশ।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে) : নবীয়ার কাজিলনগরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১১জন নিহত ও ১৫ লক্ষ গৃহ তলোদ্ভূত।

২৩শে বৈশাখ (৭ই মে) : মাধাই এসঙ্গে ভদ্রত রিপোর্টের উপর জীনেহরুর মন্তব্য—জীমাধাই (প্রধান মন্ত্রীর কৃতপূর্ব বিশেষ সচিব জী এম ও মাধাই) সরকারী পদমর্যাদার সর্বোপ গ্রহণ করেন নাই।

বাওয়ালপিস্তির নিকট ৩০শে বর্ষের ভারতীয় 'ক্যানবেরা' বিমান
ফ্রান্সের জঙ্গ পাকিস্তানের নিকট ভারতের কতিপয় নাবী।

২৪শে বৈশাখ (৮ই মে) : কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার
এনকোর্সমেন্ট পুলিশ ও রাজ্য-সরকারের খাজ দপ্তরের অধিসারগণ
কর্জুক যুগপৎ চাউলের মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ অভিযান চালান।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে) : দেশের সর্বত্র বিশ্বকবি
রবীন্দ্রনাথের নব নবতিতম জন্মজয়ন্তী সাধুভাবে উদ্‌যাপন।

লোকসভার বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জঙ্গ স্থলভূমী।

২৬শে বৈশাখ (১০ই মে) : হাওড়া পৌর এলাকার পানীর
জলের তীব্র সঙ্কট উদ্ভব।

নয়াদিল্লীতে জিম্মা ইন্ডিয়া গান্ধীর সভানেত্রীত্বে নিখিল
ভারত কংগ্রেস কমিটির তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ।

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে) : কলিকাতার প্রখ্যাত
কবি ও সাহিত্যিক জীবনসত্ত্বকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

২৮শে বৈশাখ (১২ই মে) : উত্তেজিত জনতার উপর নাগপুর
পুলিশের লাঠিচালনা ও কাঁচুনে গ্যাস প্রয়োগ।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে) : বাংলার জলের বিরোধ-মীমাংসায়
নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী জিনেহক ও বিধি ব্যাক্স প্রেসিডেন্ট মি:
ইউজেন ব্র্যাকের বৈঠক।

৩০শে বৈশাখ (১৪ই মে) : সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী
জিনেহকের ঘোষণা—“বাংলার জল সম্পর্কে বিধিব্যবস্থার সর্বশেষ
প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে।”

ভারত সরকার কর্তৃক শিলিগুড়ি-মালদহ নতুন রেলপথ
নির্মাণের সিদ্ধান্ত।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে) : কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব
জিনেহকেরাণা খান্না কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত শিবিরগুলি অপর্যাপ্তত:
বন্ধ না করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

উড়িষ্যার কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন সরকার গঠনের
প্রস্তাবিত জঙ্গ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ-পত্র পেশ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার জীবনকরদাস ব্যানার্জীর পদত্যাগ।

বহির্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) : অসহ্যতা নিবন্ধন মার্কিন
পররাষ্ট্র সচিব মি: জন ফট্টার ডালসের পদত্যাগ।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) : তিব্বতে বিদ্রোহীদের সহিত
চীনা সৈন্যদের অব্যাহত প্রচণ্ড সংগ্রাম।

৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল) : শিকিং-এ চীনের গণ-
কংগ্রেসের (ভূতীয় জাতীয় কমিটি সংঘলন) অধিবেশন শুরু।

ম্যাঙ্চেস্টার বিমান দুর্ঘটনার ২৬ জন আরোহী নিহত।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল) : পাক্ প্রেসিডেন্ট জেনারেল
আব্বা খাঁ কর্তৃক নিরাপত্তার নামে সংবাদপত্রের কঠোরভাবে নতুন
অভিভাষণ জারী।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক মি: ডালসের
স্থলে পররাষ্ট্র সচিব পদে মি: ক্রিস্টিয়ান হাটারকে নিয়োগ।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল) : মন্ত্রিসভা সহ 'আজাদ কাস্মীর'
প্রেসিডেন্ট সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁর পদত্যাগ।

৭ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) : তিব্বত প্রদেশে ভারতীয়
'সংশোধনবাদীদের' বিক্ষোভ চীনের হুঁ সিয়াসী।

১০ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল) : পাক্ প্রেসিডেন্ট জে: আব্বা
খাঁর নতুন আদেশক্রমে অযোগ্যতার জঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের দণ্ডের
ব্যবস্থা।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল) : চীনের রাষ্ট্রপতিপদে মাও
সে-তুং-এর স্থলে মার্কসীয় তত্ত্ববিদ লি শাও-চী নিযুক্ত। প্রধান
মন্ত্রীর পক্ষে পুনরায় চৌ এন-লাই-এর নিয়োগ।

জার্মান প্রদেশে ওয়াশ-এ ওয়াশর চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের
(রুশিয়া সহ) পররাষ্ট্র পরিষদের বৈঠক এবং এই বৈঠকে বিশেষ
আমন্ত্রণে গণ-চীন প্রতিনিধির উপস্থিতি।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল) : তিব্বতের পাঞ্চে লামা
ভারত পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত।

হুগম গিরিপথে তিব্বতী উদ্বাস্তদের পশ্চিমবঙ্গ অভিবাসে বাড়া।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল) : নেপালের রাজা মহেন্দ্র
কর্তৃক ভীমগরে কোম্পী বাঘের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন।

১৮ই বৈশাখ (২রা মে) : ব্রহ্মে গণতন্ত্রকে রক্ষার জঙ্গ
প্রাণ্ডল প্রধান মন্ত্রী উ হু কর্তৃক আহংস আন্দোলন আরম্ভের
সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

করাচী বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে পাক্ সামরিক শাসনের
নিষা এবং অবিলম্বে পাকিস্তানে গণপরিষদ গঠন ও গণতান্ত্রিক
সরকারের প্রবর্তনের দাবী।

২০শে বৈশাখ (৪ঠা মে) : ইন্স-মার্কিন জঙ্গী বাহিনীর
সহযোগিতায় করাচীতে পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের বৃহত্তম বিমান
মহড়া।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে) : তিব্বতের প্রজ্ঞে ভারতের প্রধান
মন্ত্রী জিনেহকের সহিত বাদ-প্রতিবাদ হওয়ায় 'শিকিং ডেলী'
দুঃখ প্রকাশ।

কেনিয়ায় বন্দী শিবিরে মাউ মাউদের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-
বাদীদের চরম অত্যাচার।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে) : রুশ প্রধানমন্ত্রী ম: নিকিতা
ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—“পুনরায় যুদ্ধ বাধিলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিশ্চিহ্ন
হইয়া যাইবে।”

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে) : জার্মান প্রদেশে জেনেভার প্রাচ্য-
প্রতীচ্য চতুষ্পক্ষি (রুশিয়া, ব্রুটন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) পররাষ্ট্র
সচিবদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আরম্ভ।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে) : পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার
ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট—কমতার লড়াই-ই
পূর্ব পাকিস্তানে শাসন ব্যবস্থা বিপর্যয়ের কারণ।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে) : করিমগঞ্জ সীমান্তে নবোত্তম পাক্
সরকারজার আরোহণ।

'ক্যানবেরা' বিমান-ফ্রান্স সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ ও
কতিপয়দের দাবী পাকিস্তান কর্তৃক অগ্রাহ্য।

“যিনি ভুল করিয়াছেন, তিনি পদত্যাগ বেঙ্কার করিবেন

না—অধিকতর আপনার অন্তর কাজের সমর্থনচেষ্টা করিবেন। পণ্ডিত নেহরু অস্বীকার করিতে পারেন নাই প্রস্তাবানুসারে যে ভূমি হস্তান্তর হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্তানেরই লাভ হইয়াছে—“It was some what in favour of Pakistan in regard to the territory gained although not much territory was involved.” পাকিস্তানেরই লাভ হইয়াছে। তবে সে লাভ অল্প। পাকিস্তান যেমন অল্পে তুষ্ট হইতে পারে না—পণ্ডিত নেহরুও তেমনই পাকিস্তানকে অল্প দিয়া তুষ্ট হইতে পারেন না। কাজেই বেকবাড়ী দিতে হইবে। ইহাই পণ্ডিত নেহরুর দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত। সুতরাং ভারতবাসীকে সাবধান হইতে হইবে। সাবধান হইয়াও অনেক উপায় আছে :—(১) লোকসভার প্রতিনিধিগণকে নির্দেশ দিতে পারা যায়—তাহারা যেন বেকবাড়ী—ভারতের হৃদয় ভূমি দিতে সম্মত না হ'ন। (২) তিনি যে অঙ্গসভা কাৰ্য্য করিয়াছেন, সে জন্ত প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বলা। (৩) তিনি পদত্যাগ না করিলে তাঁহার সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব লোকসভার উপস্থাপিত করিয়া বহুমতে তাহা গ্রহণ করা। এ সকলের কোন উপায় ভাল সে সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের মত জানিবার প্রয়োজন নাই। মালুম কি ভাবে আর কি হয় বলা যায় না। পার্লেমেন্ট একদিন আইনিস নেতৃত্ব তাগণ করিতে অসম্মত জানাইয়াছিলেন। ফল—কি হইয়াছিল? তগবানের বিচার স্থল।”

কথা উঠিতে পারে

“বাহা হউক, ভারত-পাক সীমাক সম্মেলনে রাজী না হইয়া পণ্ডিত নেহরু কেবল সম্মত কাজই করেন নাই, ভারতের জন-সাধারণকেও উদ্বেষ্ট ও আশঙ্কিত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। কারণ, পাক প্রধান মন্ত্রীর সহিত শান্তি ও বন্ধুতার আলোচনার মাধ্যমে আমাদের উদার এবং বিশ্ব-মৈত্রীর সাধক প্রধানমন্ত্রী ভারতের আবার কোন অঞ্চল হান করিয়া আসেন কিনা, কে বলিতে পারে? কথটা স্বভাবতই উঠিতে পারে বেকবাড়ী সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক অভিমত শুনিয়া। আলোচ্য সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের আশস্তির উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সুপ্রীম কোর্ট বেকবাড়ীর সম্বন্ধে আইনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য কেবল আইনের গণ্ডগোল এড়ান। কিন্তু বেকবাড়ী পাকিস্তানকে হান করার কথা ঠিকই আছে। অর্থাৎ বেকবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে খুসী করিবার জন্ত বেকবাড়ী হস্তান্তর করিতে বদ্ধপরিকর।”

—যুগান্তর।

চুরি! চুরি!।

“পাকিস্তান নব-উৎসাহে বিভা প্রচারে, বিভা বিতরণে লাগিয়া গিয়াছে। সেই সবাদ আমরা বহুদিন হইতেই পাইয়া আসিতেছি। তবে সেই বিভাটা কে-সে বিভা: নয়, একেবারে বিভার সেরা, চুরি-বিভা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বদয় কর্তা জনাব আইয়ুব খান একবার ঢাকা গিয়া পুস্তকপত্রের সাহিত্যিকদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন কলিকাতার লেখকদের পুস্তকাদি পাঠ না করেন।

সাময়িক
প্রসঙ্গ

আমরা তাঁহার উপরোক্ত উক্তিটির প্রসঙ্গেই বলিয়াছিলাম—কলিকাতার প্রকাশিত পুস্তক না হয় নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু কলিকাতার প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থ গ্রন্থকারের বিনা অজুমতিতে যেসব চুরি করিয়া যে পাকিস্তানের পুস্তক ব্যবসায়ীরা ছাপাইতেছে, তাহার প্রতিকার কি? সম্প্রতি কলিকাতার পুস্তক পাকিস্তানে কি ভাবে ছাপা হইয়া বিক্রয় হইতেছে, তাহাই ঢাকা আদালতে আনীত এক মামলার প্রকাশ। কলিকাতার প্রকাশক এ টি দেবের প্রখ্যাত অভিধান (১) English to Bengali (২) Bengali to English,—ঢাকা, মহম্মদসিহ ও লাহোরের পুস্তক ব্যবসায়ীগণ বিনা অজুমতিতে হুবহু ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে স্বীকৃত হইতেছে। ঢাকা জেলা জজ মি: এম ইব্রাহিম বাবী এ টি দেবের অভিযোগ অনুযায়ী পাকিস্তানের এ টি বিভা বিতরণকারী পাবলিশার্সের উপর উপরোক্ত দুইটি অভিধান প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া এক সাময়িক ইনজাংসন জারী করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত মামলার ফল বাহাই হউক, চুরি বিভা প্রচারের বিরুদ্ধে এইরূপ মামলা দায়ের করিয়া কলিকাতার উক্ত প্রকাশক কর্তব্যই করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভিকৃত সম্মেলন

“পরম ভবিষ্যাবাদী পার্টির উদ্যোগে কলিকাতার এক ভিকৃত সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। আচাৰ্য্য কৃপালনী এবং জয়প্রকাশ নাথায়ণ উহার উদ্যোক্তা। ভারতের উপর পাকিস্তানী আক্রমণে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ চাকচাক্য কিছু দেখা যায় নাই। সম্মেলনে দলাই লামার প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। কলিকাতার এই সম্মেলনে আমাদের যৌবতর আগন্তি আছে। উনকিশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজনীতি ছিল রাজার রাজার বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা। ব্যক্তিবিশেষের বন্ধুত্ব, স্বার্থ এবং শত্রুতার উপর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সুখশান্তি এবং জীবনধন সব কিছু নির্ভর করিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গণতন্ত্রের যুগে এই রাজনীতি বদল হইবে, রাজার রাজার বন্ধুত্ব বা শত্রুতার উপর গোটা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিবে না, তার স্থান গ্রহণ করিবে জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব, এই বন্ধুত্ব অসম্ভব করিয়া তুলিবে ঠান্ডা এবং গরম উভয় প্রকার বৃদ্ধ। কতকগুলি মতলববাজ এবং বিশেষায়িত ভাণ্ডারীরা লোক যদি এই ধারার বিরুদ্ধে ষাঁহাইতে চায় তবে তাহাদিগকে আমরা দেশের শত্রু বলিয়াই অভিহিত করিব। বাঙ্গলাদেশে এই সম্মেলনের অবিবেচনে আমাদের আরও আপত্তি আছে। আধুনিককালে স্বাধীনতা চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর জন্ত শান্তিনিকেতনে চীন সংস্কৃতি ও চীনাভাষা চর্চার কেন্দ্র চীনা ভবন স্থাপন করেন। যে বাঙ্গলা দেশ ভারত-চীন মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই বাঙ্গলা দেশে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার চুরিকা উত্তত করিতে দেখা যুব ভুল হইবে।”

—যুগবান্দী।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্যের ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দিবার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় সরকারের বার্ষিক ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে সরকারের উদ্যোগে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহর্যঞ্চলে এই ব্যবস্থা পৌরসভাগুলির উপর ব্রত। তাহাদের এই বিষয়ে উদাসীনতা সর্বজনবিদিত। এই কারণে সহর্যঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমতাবস্থায় সরকারের এই আদর্শ পরিকল্পনাটিকে সকলেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বহু শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রয়োজন হইবে। বর্তমান বেকার সমস্যার মধ্যে বহু শিক্ষিত বেকারের বেকারত্ব ঘটিবে। ইহার ফলাফল অবশ্যই—বাহাদের উপর ইহার পরিচালন ভার অর্পিত হইবে তাহাদের সততা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করিবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষানীতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। সরকারের শিক্ষা বিভাগ বর্তমানে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করার জনসাধারণ অপেক্ষা দুর্দশায় পতিত হইয়াছেন। সামগ্র্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাধিক পুস্তক “কিশলয়” পাওয়া এক দুর্ভাগ্য ব্যাপার। উহা নাকি চাহিদা অল্পপাতে ছাপা হয় না। গ্রামাঞ্চলে উক্ত পুস্তকের দর্শনও মিলে না। ফলে গ্রামবাসীদের একাধিক “কিশলয়” আনিতে কলিকাতার রাইটস বিজিয়ে বাইয়া লম্বা লাইন দিতে হয়।

—বর্তমান ভারত (ভগলী)।

একটি আবেদন

“বর্ষা শুরু হইয়াছে। সেই সঙ্গে পঞ্চাচারের অবস্থাও হইয়াছে শোচনীয়। ইহারও কারণ আছে। পঞ্চবাটে জল জমিয়া যায়—জীপ-লরী মোটরকার নির্বিবাদে তাই কাপা ছিটাইয়া চলিয়াছে। মশার উপদ্রব অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে—অথচ কোন প্রচেষ্টা নাই—কোন কার্যক্রম নাই সকলেই বেন জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অজ্ঞাত বছরের মতন বর্তমান বছরেও মানুষ দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইবে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের দুর্দৈব ক্রমবর্ধমান। করলার কচুরীপানার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছিল। অজাববি ঐ আবর্জনা পূর্ববৎ রহিয়াছে। সানিট কর্তৃপক্ষ হয়তো বা আরও অবদানীয় বর্ষণের অপেক্ষায় আছেন—তাহা হইলে বিনা পরিশ্রমে কচুরীপনা ভাসিয়া বাইবে। পরিশ্রম (কার্যক) করিতে হইবে না। মশা জমিতেছে তাহাতে কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের করিবার কিছুই নাই। প্রকৃতির কল্যাণে কচুরীপানা পরিষ্কার হইবে এবং বিশ্ব আশায় কর্তৃপক্ষ অপেক্ষমান থাকিতে পারেন কিন্তু মশার উপদ্রব ও পঞ্চবাটের অব্যবস্থা কিরূপে দূরীভূত হইবে? করদাতাদের বর্তমান অবস্থা বুঝি শাচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কলে জল নাই, মশার উপদ্রব, অল্প বর্ষণে পথে জল জমিয়া যায় এতলম্বও যদি অধিক দুঃখ কামা হয় তাহা হইলে ‘নাচ: পদা।’

—বার্ণা (জলপাইগুড়ী)।

আসানসোলে সরকারী দরদ

“আসানসোলে জলকষ্ট যেমন চরমে উঠিয়াছে খাত-সড়টও তেমনি প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের আসানসোলার স্বাবদগতা জানাইতেছেন, আসানসোল বাজারে কন্ট্রোল দরে চাউল একবারেই পাওয়া বাইতেছে না। খোলা বাজারে মোটা চাউল ২৬ টাকা দরে এবং সূক চাউল ৩০ টাকা দরে বিক্রয় করা হইতেছে। মডিকারেড র‍্যাশন দোকানে চাউল একবারে দেওয়া হইতেছে না। নিম্নমধ্যবিত্ত ও গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থায় এই দরে চাউল কিনিয়া সংসার প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আসানসোল প্রজা সোশালিষ্ট পার্টি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল সরবরাহ করিবার জন্য সরকারের নিকট গণদরখাস্ত সহ দাবী করিয়াছেন। আসানসোল প্রজা সোশালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আসানসোলার দারুণ জলকষ্টের প্রতিকারের দাবীতে বিগত কয়েক বৎসরই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে এবং এ বৎসরও কয়েকটি গণ-অভিযান পরিচালিত হইয়াছে। বিধান সভায় প্রজা সোশালিষ্ট সদস্যবৃন্দ আসানসোলার জলকষ্ট নিবারণের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিবার দাবী করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিক্রিয়া দান ছাড়া সরকার হইতে এ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। বর্তমানে আকাশছোঁয়া চাউলের দর সম্বন্ধে সরকার এখনো উদাসীন! আসানসোলার শ্রায় শ্রমজগতীতে এবং উহার লস্করী পল্লী অঞ্চলের খাড়াভাবের অবস্থা পূর্ন হইতে জানা সম্বন্ধে সে বিষয়ে সরকারের কোন দায়িত্ববোধ নাই।”

—লম্বোদর (বর্ধমান)।

সমবায়িক সমাধান

“কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে বোধ চাষ লইয়া সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছে, পণ্ডিতজী মহোৎসাহে বোধ চাষ চালাইবার জন্ত কৌমার বাবরিয়াছেন। এমন কি যদি কংগ্রেস বিধাযুক্ত হয় তাহাও তিনি গ্রাহ করেন না। কংগ্রেসের গুন্ডাকিং কমিটির প্রস্তাবে অবশ্য সুর একটু নরম হইয়াছে। সমবায়িক কৃষি প্রবর্তনের পূর্বে সার্ভিস কোপারেটিভ থলিয়া বোধ চাষের বিনিয়োগ গঠনের কথা বলা হইয়াছে। কংগ্রেস দল শুধু কৃষিতেই সমবায়ের প্রবর্তন করিয়া ফাট হইবে না, তাহারা শিল্পকে ও সমবায়িক করিতে চান। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতিকে বহোচিত ক্ষমতা দিয়া দেশকে পুনর্গঠন করাই বর্তমান কংগ্রেস দলের লক্ষ্য ও সাধনা। সমবায় ভারতবর্ষে নুতন নব। যদি কংগ্রেস দল এই রূপে সমবায় সমিতি হাঙ্গারে হাঙ্গারে খোলে তবে বলিবার কিছুই থাকে না। কিন্তু পণ্ডিতজী সব কিছুই সমবায়িক সমাধান চান। এখন দেখা যাক সমবায়িক সমাধান কি? আমাদের মতে প্রথমে স্থানীয় লোকেরা তাহাদের সমস্যাগুলি বাহির করিয়া, নিজেরই সমাধানের উপায় বাহির করিবেন ও খেছায় একযোগে কাজ করিয়া সমস্যাগুলির সমাধান করিবেন। রাষ্ট্র কেবল তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, রাষ্ট্র কোন কাজের সূচনা করিবে না, উদ্যোগ স্থানীয় লোকের নিকট আসিবে। ইহাকেই বলে বিকেন্দ্রীকরণ; কারণ ইহাতে ক্ষমতা স্থানীয় লোকের হাতে বিচ্ছিন্ন হইবে। কয়েকজন সত্যি ব্যা

পঠিত প্রাণিঃ কম্পনের কোন পরিকল্পনাকে সাহায্য করাকে সম্ভাব্যিক সাধন বলা চলে না। যত দিন না স্থানীয় লোকের পরিকল্পনা রচনা ও সম্পাদনে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে তত দিন সম্ভাব্যিক সাধনের কথা বলা নিম্নোক্ত। — জনমত (বাটাল)।

প্রসঙ্গক্রমে

“সহরের বাজারগুলির নরকসূদ্র অবস্থার প্রতি পৌর বর্জপক্ষের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁহারা করেন নাই। একে ত রাজ্য ও দেশের অবস্থা। সন্ধান, তাহার উপর যদি নিত্য অল্পস্রু আবেক্ষনা দেশ অবলম্বন করিয়া, বাস্তব অধিকাংশ দখল করিয়া দিবারাত্র বিরাজ করে তাহা হইলে সহরের স্থায্য কি ভাসিয়া পড়িবে না, কলেরা, বসন্ত মহামারী আকার ধারণ করিবে না, পথচলা কষ্টসাধ্য হইবে না? পৌরপতি আশাস দিয়াছিলেন যে পৌর উপবিধি সংশোধন করিয়া বাজারের পরিচ্ছন্নতা বন্ধক জন্ত বিহিত ব্যবস্থা শীঘ্রই অবলম্বিত হইবে। সে আজ কয়েক মাস পূর্বের কথা। আজ পর্যন্ত কোন সড়ক-শব্দ ও বিষয়ে পাওয়া যায় নাই। কয়েকবার পৌরপতি স্বয়ং বাজারগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরপতি যদি ভাবিয়া থাকেন পরিদর্শন করিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে তাহা হইলে বলিতে হয় ঐ কথার আশ্বস্তাস লাভ হইতে পারে, কদলতা ও সহরবাসীর কোনো লাভ হইবে না।” — বর্ধমান বাণী।

তৃণার জল ও আমলাতন্ত্র

“মহকুমার চারিদিকে সামান্য পানীয় জলের জন্ত হাহাকার। এই লক্ষ্যকর বেদনাময় আন্তানাদের মধ্যে আমলাতন্ত্রের এক অব্যবস্থা এবং বেথাবেরির গোপন ইতিহাস আমরা পাইয়াছি, বাহার ফলে পানীয় জলের জন্ত সরকারী বরাদ্দ অর্থ খরচ না হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় নাই। ‘করাল ওয়াটার প্রাপ্তি’ বিভাগটি পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ছিল কিন্তু গত ১৯৫৭ সালের ১লা নভেম্বর হইতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে পাবলিক হেলথের টাক ইঞ্জিনিয়ারের হাতে গেল। আরম্ভ হইল গোলমাল। সেই সময়ের এবং তাহার আগের কাজের বকেয়া কোন টাকা টিকাদারেরা আজও পায় নাই, কেন না দপ্তর গেলেও হিসাব নাকি হস্তান্তর হয় নাই। কেবল তাহাই নকে ১৯৫৮ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৯ সালের মার্চ পর্যন্ত বাজুগ্রাম মহকুমাতে ৩১টি কুয়ার মঞ্জুর হইয়াছিল, টাকাও আনিয়াছিল। ‘৫৮ সালের এপ্রিল মাসে কয়েকটির ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হইল, কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যে একটিরও কাজ হয় নাই। কীম মঞ্জুর করা ও টাকা দেওয়ার মালিক পাবলিক হেলথ কিন্তু কোন গ্রামে হইবে এবং গ্রামের কোনখানে হইবে তাহার ব্যবস্থার মালিক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। হান নির্বাচনে না হওয়ার জন্ত কাজ হয় নাই, দরিদ্র গ্রামবাসীদের পানীয় জলও কোটে নাই। অথচ দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ হইতে এই মহকুমার জন্ত পাবলিক হেলথ বিভাগের কেবল বেতন বরাদ্দ মাসিক খরচ হয় শত টাকা। জন্ত সব খরচা ঘরিলে মাসে হাজার টাকা। উদাহরণস্বরূপ আমরা বাজুগ্রাম মহকুমার নাম করিলাম। সারা জেলাতেই এই অব্যবস্থা। উল্লেখ্যত্রে প্রাণ যাইবে তাহাতে

অনুভবের কিছু নাই, তবে রাজস্ব ভালই চলিতেছে স্বীকার করিতে বাধ্য। — নির্ভীক (বাজুগ্রাম)।

সুভ বিবাহ

“উত্তরপাড়া রাজ-পরিবারের শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শমীক্সনাথের সহিত পাকুড় পরিবারের শ্রীপ্রীতিকুমার হকুলের কন্যা কস্তা স্ত্রীচিহ্নিতার স্ত্রু বিবাহ উপলক্ষে উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্র বিজ্ঞানে এক মনোজ্ঞ প্রীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এবং বিবাহ বাসরে যে সকল বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও ক্রীড়াবিদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অথবা নব দম্পতির সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করিয়া শুভেচ্ছা বাকী প্রেরণ করিয়া প্রীতি অনুষ্ঠানটিকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তোলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ বাধাকৃষ্ণন, ভারতের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ, শ্রীপ্রমুদচন্দ্র সেন, শ্রীঅমল্য বোব, মহারাজাধিরাজ, শ্রীউৎকৃষ্ট মহতাব বাহাদুর, বর্ধমানের মহারাজী অধিরাজী, মহারাজকুমার সন্নয়চাঁদ মহতাব ও মহারাজকুমারী, লালসোলায় রাজারাজীও বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শিল্পী প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাসিক বন্ধুসভার সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, পাইকপাড়ার শ্রীঅঙ্গনীচন্দ্র সিংহ, শ্রীজীবনীতোষ ঘটক, শ্রীনিরুদীতোষ ঘটক, শ্রীপ্রিয়তোষ ঘটক, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ বোব, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীসমরীকান্ত দাস, শ্রীমতী সুধার্মা দাস, শ্রীমুকু প্রদোষকুমার বাজপেয়ী ও রাজকুমারী রম্য বাজপেয়ী, মহিষাদলের বধূবাণী তটিনী দেবী (পূর্ণ), রাজকুমারী রেণুচটোপাধ্যায়, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, কবি নরেন্দ্র দেব, মহিষাদলের কুমার শক্তিপ্রসাদ গুপ্ত, ব্যারিষ্টার সোমনাথ চটোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার স্বয়ংব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীমতী সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য ও বিচারপতি ডাঃ শমুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলিপুরের ব্যবহারজীবী শ্রীহনুলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন এম-এল-সি, শ্রীহনুলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত চটোপাধ্যায়, অভিনেতা শ্রীনীতীশ মুখোপাধ্যায়, পাণবিরহাঘাটার শ্রীঅমরনাথ বোব, কালীপুরের শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, চকৌবির রায়বাহাদুর নিত্যানন্দ সিংহরায়, শ্রীপ্রভানাথ সিংহরায়, শ্রীশুপতি সিংহরায়, শ্রীহনুলকুমার সিংহরায়, শ্রী ও শ্রীমতী সারদা দাস, শিল্পী শ্রীমতীপ্রনাথ লাহা, শ্রীকল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মল্লিক, বকৌর সান্তিয়া পরিবদ সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহামপুরের শ্রীকলাইচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীহরীপ্রনাথ গোস্বামী, কেলিনীপাড়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার শ্রীবোপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীভ্রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পৌরপতি প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহিরিশ শেঠ, ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় ও বর্ধমান অধিনায়ক শ্রীসমর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া পৌর সহ-সভাপতি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বোব, শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীবীর প্রমোদ (পৌর সভাপতি), ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পাঁচু বসু ও ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (২), ডাঃ নীলকণ্ঠ বোবাল, ডাঃ বারীন রায় ও ডাঃ চিত্ত রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, শ্রীকলাইলাল মুখোপাধ্যায়;

(সিঃজেডার) শ্রীসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খণ্ডেননাথ মুখোপাধ্যায়, বি পি সি সি সদন্ত শ্রীসুবাহি মিত্র, শোভার কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, সাংবাদিক শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রীবিজ্ঞ রায়, সলিসিটর আরাধন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীহৃদীশকুমার মুখোপাধ্যায়, নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভবানীমোহন মতিলাল, এডভোকেট শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমৎসেনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুখীরা মুখোপাধ্যায় সকলকে আদর অভ্যর্থনাদি করেন।

শোক-সংবাদ

বারীশ্রকুমার শোষ

ভারতের সুপ্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে উৎসর্গীত-প্রাণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অঙ্গতম প্রদান পুরোধা বারীশ্রকুমার শোষ ৪ঠা বৈশাখ সন্ধ্যায় ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বারীশ্রকুমারের জীবনচিহ্নসমূহ সঙ্গ তদানীন্তন বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পুণ্যম্রোঃ স্ববি রাক্তনারায়ণ বসু এর মাতামহ, যুগধ্বি শ্রীঅরবিন্দ এর অলঙ্কার। ১৮৮০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠবারী ইংলণ্ডে এর জন্ম। যৌবনের বর্ণিত দিনগুলি অশ্ব ও ভোগের সহজ পথ ত্যাগ করে ধীরা অতিবাহিত করেছেন বিপ্লবের দুঃস্বপ্নে স্বাধীনতার অনন্ত তপস্যার দেশের স্বাধীন জাগরণকল্পে বাঙালার সেই নম্র সন্তানদের মধ্যে বারীশ্রকুমার অঙ্গতম। আন্দোলনের দীপান্তরবাস শেষ করে দেশে ফিরে এসে বারীশ্রকুমার প্রত্যেক বিপ্লবের পথ ত্যাগ করেন এবং কিছুকালের মধ্যেই দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন; 'বিজ্ঞান'র সঙ্গেও বারীশ্রকুমারের যোগাযোগ বিস্তারিত ছিল। কেবলমাত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে এবং পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বারীশ্রকুমারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। শেষ জীবনেও তাঁর লেখনী সচল ছিল। একাধিক আন্তর্জাতিক মূলক তথ্যপূর্ণ স্থপাঠ্য গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বারীশ্রকুমার দৈনিক বসন্তমতীর সম্পাদকের আসনে সমাসীন ছিলেন। আমরা বিপ্লবীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রী উদ্যানাথ সেন

গ্যাসোনিয়রেটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া (বর্তমানে প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া) ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভারতীয় রেডক্রসের ভূতপূর্ব সভাপতি, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী উদ্যানাথ সেন ৬ই বৈশাখ ৭১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ভারতের সাংবাদিক-জগতে এক বিরাট আসনের অধিকারী ছিলেন শ্রী উদ্যানাথ, সাংবাদিক জগতের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপগুলি সুপরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্যানাথের অবদান অনেকখানি। সাংবাদিক-জগতের কর্পোরেশন পদ্ধতির নবগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর

নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইনি ভারত সরকারের চীক প্রেস স্ট্যাডাউটসার ছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগ অফ নেশানস ইউনিয়নের অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদও কিছুকাল তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৪ সালে একে ব্রিটিশ সরকার 'শ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

চন্দ্রকুমার সরকার

বহীরাণ বাঙালীজাতিশাসন ও স্বাধীনতা-স্বপ্ন চন্দ্রকুমার সরকার ৫ই বৈশাখ ৮৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। ইন্ডিয়ান ও স্বপ্ন-সমাজে ইনি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং দেশে উচ্চ শিল্প দুটির উন্নয়নকল্পে এর আন্তরিক প্রচেষ্টা একে অমূল্য করে রাখবে। কর্মজীবনের প্রথম অধায়ে ইনি লোকমাত্র তিলকের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন। ইনি বারাদনী ও ব্রজদেশেও দীর্ঘদিন কর্মরত অবস্থান করেন। দেশের ও বিদেশের বহু অগ্রগামী, জলাধার, চলার পথ এর অনন্ত স্বজন প্রতিভার পরিচয় বহন করছে।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বাধাত কবি, 'দীপালি' ও 'মহাল'র প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৭শে বৈশাখ ৬৮ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে লোকান্তরিত হয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টাশিল্প গায়ক 'বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়' এর পিতামহ। ইনি সবসময় প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থের রচয়িতা। কবিতা, উপভাষা, গল্প, কিশোর-সাহিত্য, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই এর সমান দক্ষতা ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী দীপালির সম্পাদনার ক্ষেত্রেও ইনি যথোচিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। বসন্তকুমারের মৃত্যুতে বাঙালদের অমায়িক সন্দেহাঙ্গী নিরহঙ্কারী প্রভৃতি নানাবিধ গুণের অধিকারী একজন যথার্থ বাণীসেবককে হারাল।

হেমন্তকুমারী দেবী

বিগত ১১ই বৈশাখ ১৩৬৬ সাল (ইং ২৫শে এপ্রিল ১৯৫১) শনিবার সকাল ৫:৪৫ মিনিট সময়ে স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল বাগ্‌চীর সহধর্মিণী হেমন্তকুমারী দেবী তাঁহার ৭১ম চৌর্য টেবেসে বাসভবনে সজ্জনে সাধনোচিত ঘাঘে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। ইনি শ্রীমৎপুত্র স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় নন্দলাল গোস্বামীর কনিষ্ঠা কন্যা ও স্বর্গীয় বাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর ভাতৃপুত্রী ছিলেন। ইনি ধার্মিক, দানশীলা, পরোপকারিণী ও ভক্তিমতী ছিলেন। গৃহিণী হিসাবে ইনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বহু দুঃস্বপ্ন পরিবার তাঁহার নিকট নিয়মিত সাহায্য পাইত। মৃত্যুকালে ইনি তিন পুত্র, তিন কন্যা, দুই জামাতা, শোভা, শৌভ্রী, শৌভ্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন বাথিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার সঙ্গতি কামনা করি।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৩৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, 'বসন্তমতী বোটারী মেলিনে' শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



চার জন

মাসিক বহুমতীর প্রতিস্থাপার 'চার জন' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালী-পরিচিতির যে বিবরণ দিয়া আসিতেছেন তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক এবং আশোপযোগী, এই প্রসঙ্গে আমাদের অমরোপ, অধুনা বিমুতপ্রাণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের জীবনকাহিনীও বসিষ্ঠ বহুমতীতে বাহির হউক। আচার্য্য মহাশয়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর ধর্মগুরু', 'বাঙ্গালীর প্রতাপ', 'বাগী ভবানী' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'জুলেভার্ণের' অমরোপ 'চন্দ্রলোকে হাতা', 'বেলুন পাঁচ সপ্তাহ', '৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ' প্রভৃতি এককালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, তাহার রচিত 'বাঙ্গালীর বঙ্গের' সমতুল্য গ্রন্থ আশি ও বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় নাই। প্রায় অষ্টতিশর বয়সে তিনি বর্তমানে বাগকপুর সহরে বাস করিতেছেন। ইহার জীবনী সংগ্রহ করা কি আপনাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর? ঠিকানা দিলাম, ৭৬নং খুর্দামহাল রোড, সদরবাজার, বাগকপুর। বাগকপুর কোটের কাছে বাস হইতে নাথিলে বাড়ি পাইতে দেবী হইবে না, আশা করি অল্পগ্রন্থপূরক আমাদের অমরোপ রক্ষা করিবেন।—ঐনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী। ডিষ্ট্রিক্ট ইলিক্ট অফিস, বাগদহ।

সাহিত্যিকের ছদ্মনাম

১৮৬৮ (১৩৬৮) সালের মাসিক বহুমতীতে পাঠক-পাঠিকার অন্তর্ভুক্ত ঐকিমলয় সেনের উল্লিখিত, ছদ্মনামের তালিকায় একটি ভুলের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। '৫৩৭ লাহিড়ী' বর্টিশি কাকী খাঁর (শ্রীশ্রদ্ধাঙ্গের লাহিড়ী) ছদ্মনাম নহে। কাকী খাঁর অপর ছদ্মনাম 'পিসিএল' ব্যতীত অন্য কোন ছদ্মনাম নাই। 'প্রচল' কাকী খাঁর শিবি-জীবনের প্রথম দিকে 'শনিবাবের চিঠিতে' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহানী এই ছদ্মনাম তিনি ব্যবহার করেন না। অপ্রচলিত 'প্রচল' ছাড়াও কাকী খাঁর অন্ততম ছদ্মনাম Diogenes ও ইহানী অপ্রচলিত। ঐচণ্ডী লাহিড়ী, বাঙ্গালায় নগরগত শিল্পী। এঁর আসল নামই ঐচণ্ডী লাহিড়ী। ইনি বর্তমান দৈনিক 'লোকসেবক' সংবাদপত্রে চাকুরী করেন। ঐচণ্ডী লাহিড়ী, কাকী খাঁর অন্তর পদ্ধতিকে পূরাপূরি অনুসরণ করেন। সত্যতঃ সেইসকল ঐকিমলয় সেন, ৫৩৭ লাহিড়ীকে কাকী খাঁ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। বাঙ্গালাশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। এঁদের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

ছদ্মনাম

- ১। এলিয়ান
- ২। বে
- ৩। সুরকার

আসল নাম

- ঐশৈল চক্রবর্তী
- ঐরোবর্তীভষণ ঘোষ
- ঐকমল সরকার

ঐশ্রী/রতিন ভট্টাচার্য্য। ১০নং বাবুগান সেন, চাকুরিয়া।

পত্রিকা-সমালোচনা

আপনাদের সঙ্গে যদিও আমার প্রত্যেক পরিচয় নেই, তা সত্ত্বেও বহুমতীর প্রতি প্রবল অমরোপ বশতঃই অপরিচয়ের সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে সাহসী হইছি। বাঙালা দেশে বহুমতীর বা জয়জয়কার তা তো আপনাদের নিজেরই দেখছেন—কিন্তু বাঙালা দেশ থেকে বহু দূরে এই রায়গড় জঙ্গলে তার জনপ্রিয়তা যে কতখানি তা বোঝান যায় না। এখানে আমার বাস আজ বছরখানেক হতে চলল, এই এক বছরে তার জনপ্রিয়তা আমি নিজের চোখে বা দেখছি তাতে বিশ্বাস করুন আমি অভিজ্ঞত হইতে পড়ছি।

এ কথা মিথ্যা নয়, অতিরঞ্জনও নয় যে, দ্বাসয়ুক্ত হিমালয়বাণী বহুমতীর এই জনপ্রিয়তা আপনাদের বৈশিষ্ট্যবান খুশী সম্পাদনার সার্থক পরিণতি। নতুনকে খুঁজে ধার করে পত্রিকায় স্থান দিতে তার স্তম্ভ প্রতিভার সুরণ ও বিকাশে সহায়তা করাই সম্পাদক হিসেবে আপনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে যে সম্প্রতি কালের নবগতদের উপজাতি রচনায় আপনাদের সুযোগ দিতেছেন—এটি পাঠক সমাজে তাদের পরিচিতি করেছেন আনন্দের কথা—আপনাদের দেওয়া সুযোগের অমরোপ কেউই করেন নি।

মাসিক বহুমতীতে আপনাদের সৃষ্টি বিভাগগুলি অনুধাবন করলে বেশ বোকা যায় যে, নতুনদের সাধনায় আপনাদের কতদূর আশ্বাসমহিত। মাসিক বহুমতীকে কেন্দ্র করে বাঙালা দেশের প্রায় সমস্ত সুখাত ও অরুণাত সাহিত্যিক নির্ণিশেষের যে অভাবনীয় সমাবেশ আপনাদের ঘটিয়েছেন তা আপনাদের শক্তির স্বাক্ষরই বহন করছে। বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মনে বহুমতীর বসিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীকে সাড়া জাগিয়েছে, তার স্থায়িত্ব নষ্ট হবার নয়। একজন সাধারণ পাঠিকা হিসেবেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে বাঙালায় গণজীবনে আপনাদের সুযোগ্য সম্পাদনার সম্পূর্ণ মাসিক বহুমতীর প্রভাব অনতিক্রম্য। আমার সন্তোষ নমস্কার নেবেন। মীনা ব্রহ্মচারী, রায়গড়।

আমি আপনাদের 'মাসিক বহুমতীর' একজন গ্রাহিক। নয় কিন্তু নিয়মিত পাঠিকা, আমাদের বাড়ীতে আরও ৩/৪টি পত্রিকা নেওয়া হয়, কিন্তু মাসিক বহুমতীর তুলনায় হয় না, আমরা একখানি মাসিক বহুমতী কিনে বছরজনে পড়ে থাকি, মাসিক বহুমতীর নতুন ধরণের নতুন লেখকের লেখা ছোট ছোট গল্পগুলি যতই পড়ি ততই আনন্দ পাই। সুলোচনা-শঙ্কর-বর্ণালী আমাদের মনে দিন দিন এক নতুন আনন্দ সৃষ্টি করছে। বারি দেবীর 'বাতিকর' ১৭ খণ্ড প্রকাশিত হবার পর তাহার পনের আশে আশে মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হয় নাই কেন? বারি দেবীর এই 'বাতিকর' উপজাতি

আমার ও আমাদের বাড়ীর অজ্ঞাত পাঠক-পাঠিকাদের বড়ই ভাল লেগেছে। তাই এই উপজ্ঞানের নারক-নারিকা ও অজ্ঞাতদের শের পরিণতি কি তা জানতে আমার মন বড়ই উৎসুক। আপনি আশা করি এ বিষয়ে যত্নসীল হইবেন। আপনারা মাসিক বসুমতীতে 'কেনাকাটা' 'খেলাধুলা' প্রভৃতি কত কি প্রকাশ করেন। আপনি যদি মেয়েদের ব্যাঘাম সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করেন, তবে আমাদের মতন ঘরোয়া মেয়েরা তা থেকে অনেক কিছু শিখা পেয়ে নিজেরদের শরীর সম্বন্ধে যত্নসীল হতে পারে। আশা করি, আপনি আমাদের কথাটা চিন্তা করে দেখবেন। পার্শ্বী বানাজী, ভট্টাচার্য্য পাড়া, ভালপুকুর, বারাকপুর।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতী পড়ে আনন্দ পাচ্ছি। ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠালাম। অল্পগ্রহ পূর্বক বৈশাখ '৬৬ থেকে আরও ছ' মাসের গ্রাহিকা ক'রে বধাবীতি বই পাঠিয়ে বাধিত করবেন। স্রীমতী প্রতিভারাবী গুপ্তা, রাণাবীধ হেলথ সেন্টার (বাঁকুড়া)।

১৩৬৬ সালের মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টালা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সন্বাদ দিবেন। Sm. Rama Chatterjee, Belure.

My annual subscription for M. Basumati from Baisakh 1366 is remitted herewith—Miss Suprava Kar, Cuttack.

আমি অজ্ঞাত বাৎসরিক বসুমতীর টালা ৭।০ টাকা পাঠাইলাম—Sm. Chabi Mondal, Burdwan.

১৩৬৬ সালের মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টালা ১৫ টাকা পাঠাইলাম, নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—স্রীমতী সিং, গজেন্দ্র মহাপাত্র, মেদিনীপুর—

Subscription for 1366 B. S. amounting Rs. 15/- is sent herewith—Preeti Rani Roy,—Jalpaiguri.

Sending herewith Rs. 7-50 n. P. as subscription for the month from Baisakh to Aswin—Kalyani Bose, Bangalore.

Sending herewith Rs. 7-50 being the half yearly subscription from Baisakh.—Geeta Banerjee, Hazaribagh.

এই বৎসরের টালা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। অল্পগ্রহ পূর্বক বৈশাখ ১৩৬৬ হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। Mrs. B. Roy Ghoudhury, Surajpur.

আমি ১৩৬৬ সনের মাসিক বসুমতী পত্রিকা বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাসের অজ্ঞ ৭'৫০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—Mrs. Ila Sen, Madras.

চৈত্র মাস হইতে মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম। আশা করি বধাবীতি বসুমতী পাঠব।—Sreemati Dipali Dutta, Ambala Cantt.

১৫ টাকা পাঠানো হইল। দয়া করিয়া মাসিক বসুমতী এক বৎসরের অর্থ ১৩৬৬ (বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত) পাঠাবেন—Sreemati Arati Das, Cuttack.

Kindly continue to send the magazine—United Missionary Training College, Calcutta.

আগামী বৎসরের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টালা পাঠাইলাম—Sm. Nirmala Roy, Havelock Rd. Lucknow.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। টাকা পাঠাইলাম বৈশাখ মাস হইতে বই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Miss Mira Auddy, Grand Road, Puri.

১৩৬৬ সনের টাকা পাঠালাম। অল্পগ্রহ পূর্বক বই পাঠিয়ে বাধিত করিবেন—Mukul Rani Das—Gorabazar, Berhampur.

১৩৬৬ সালের বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা মণিগ্রহণ যোগে পাঠালাম। আপনারদের আকর্ষণ অদমনীয়। প্রতিবাবই সে পর্যন্ত গ্রাহকস্রোত বৃদ্ধি হ'য়ে পড়ি।—Sm. Renuka Roy, Dhanbad.

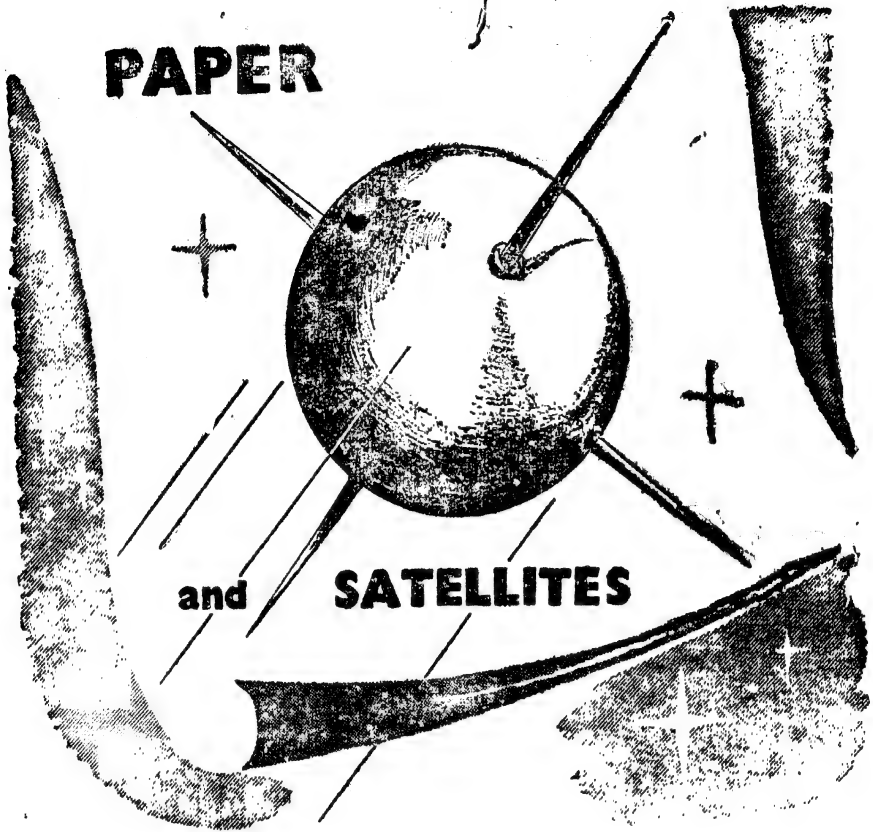
মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টালা ১৫ টাকা পাঠালাম। ঠিকমত পত্রিকা পাঠাবেন। গত বৎসর আমি গ্রাহিকা ছিলাম—নমিতা সমুদ্রদার, হাজরাবিগা।

Remitting the amount Rs. 15/- for the current Bengali year as my subscription for your Masik Basumati. I am a regular subscriber of the Magazine. Please see that I get the numbers from Baisakh to Chaitra regularly for the current year—Mrs. Sumitra Roy, Ranigunj, Burdwan.

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীল কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্বিষহ বোঝা বহনের মামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মন্ত্রবের সঙ্গে মন্ত্রবের মৈত্রী, প্রেম, ঐতিহ্য, শ্রদ্ধা আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বাধিক্যে, নবমুখো কারও কোন কৃতকাৰ্য্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধ'বে তার 'স্বস্তি' বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী।' এই উপহারের অজ্ঞ সুদৃশ্য আবেশের ব্যর্থ আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই পারেন। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে বুঝি হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক এখনও কমছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন জ্ঞাতব্যের অজ্ঞ লিখন ও প্রচার রিত্যে মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



কাগজ ব্যতীত উপগ্রহের অভিযান সম্বন্ধে চিন্তা করাও যায় না, এ কথা বলিলে বোধ হয় কোন অভ্যক্তি হইবে না। সীমাহীন গণনা করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের হিসাব ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে, নক্সা ও ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করিতে হইবে এবং অপরাপর অসংখ্য কাজ করিতে হইবে—এই সকল করিতে রীমের পর রীম কাগজ খরচ হইবে।

**ORIENT
PAPER
MILLS
LTD.**

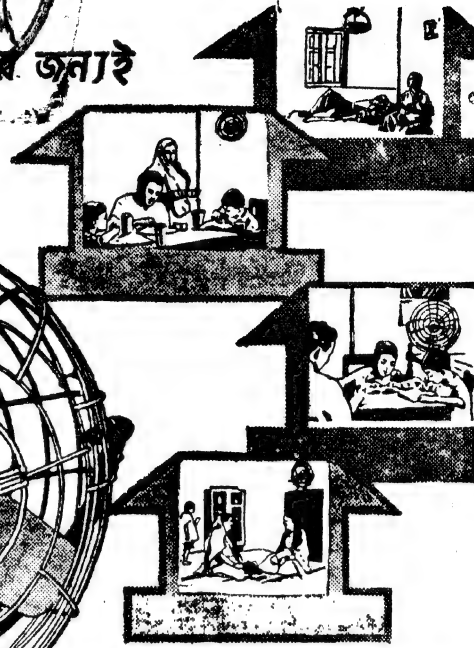
আধুনিক জগতে কাগজ অপরিহার্য : ইহা শাতীত
আদিম মানুষ অপেক্ষা এখনকার মানবজাতি
মাত্র সামান্য উচু স্তরে জীবনযাপন করিতে পারে।

ব্রজনাথ নগর, উড়িষ্যা।

ভারতের আঁতি ঘরের জন্যই
এ পাখা



১৬" সুইপ্.
এ. সি.



যেমন খুশী ব্যবহার করুন

মূল্য ৭০ টাকা
আবগারী শুধু ৫০ টাকা
স্থানীয় কর অন্তর্ভুক্ত

ওরিয়েন্টের অল-পারপাস পাখায় বিবিধ ব্যবহারোপযোগী গুণ আছে। এ পাখা
সিলিং, ওয়াল ব্রাকেট, টেবিল এবং এয়ার সাকুলেটর রূপে ব্যবহার করতে পারেন।

একটিনাত্র পাখার এতো রকমের ব্যবহার এর আগে
আর হয়নি। এই অল-পারপাস পাখা দামেও
সস্তা অথচ হাওয়া দেয় কত বেশী।

অল-পারপাস পাখায়
এই প্রতিশ্রুতি আছে যে
ভারতের ঘরে ঘরে এ
একদিন বিরাজ করবে।

Orient

অল-পারপাস পাখা
আশাতিরিক্ত কাজ দেয়

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

৬, ঘোঁর বিলি লেন, কলিকাতা - ১১

সূচীসংগ্রহ

৩৭শ বর্ষ] ১৩৬৫ সালের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| পূর্ববাণী— | ১. ১৭৭, ৩৬১, ৫৩৭, ৭২১, ৯১৩ | | প্রবন্ধ— | | |
| প্রবাসী— | | | ১। অবকাশরঞ্জিনী | | |
| ১। অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরঙ্গ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২০২, ৩৬১, ৫৫৪, ৭৭১, ৯২৮ | | অপূর্ণ আশ | দীপককুমার সেন | ৭৪১ |
| ২। আচার্য ভগদীশচন্দ্র বসু | নীলরতন দত্ত | ৭৩৭ | ২। অজ্ঞাতশত্রু ও পূজারিণী | ববীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী | ৯১৪ |
| ৩। আমার কথা— | | | ৩। ইন্সটিটিউট ভারতীয় সভ্যতা | নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | ১৫, ২০১ |
| চরিত্রবর্ণ বন্দোপাধ্যায় | ভগবানদাস পুরোহিত | ৭৩১ | ৪। একটি ভেড়া চিঠি | সুধাস্ত দে | ১১৬ |
| ৫। বিদ্রোহিতা কৰ্মন জা মিলতা | অমল সেন | ৫৫১ | ৫। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ : | | |
| ৬। বেগম সমর | কুঞ্জবিহারী সাতা | ৭৩৯ | 'পথের পাঁচালী' | সুধাকর চট্টোপাধ্যায় | ১১১, ৪১৬ |
| ৭। বাণপুটিন | অজয়কুমার নন্দী | ৫৪৬ | ৬। কমল ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ | | |
| ৮। শ' | ভবানী মুখোপাধ্যায় ১৪০, ৩৩২, ৩২১, ৭১৩, ৮৭৪, ১০৬৫ | | নারী-কবি মহাদেবী অঙ্ক | বতীন্দ্রিয়াল চৌধুরী | ১ |
| উপজ্ঞাস— | | | ৭। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | সুধীরকুমার মিত্র | ৭৪৮ |
| ১। অদন্তন পৃথিবী | পঞ্চানন ঘোষাল | ৯৭৩ | ৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে | | |
| ২। অভিযাত্রী | নবগোপাল দাস | ৪১, ২৪২, ৭১৯, ৫৯৮ | আমার কাষাবলী | শত্ৰুনাথ বন্দোপাধ্যায় | ১৩২ |
| ৩। অনিকেত | সাত্তাকি | ২৫১, ৫৪০, ৬২৬, ৮২০, ১০৭৭ | ৯। চার চিত্রশিল্প | গোবিন্দন আশ | ৩৯৬ |
| ৪। ইন্দ্রাবীর প্রেম | নীলিমা দশগুপ্ত | ১২৩, ২২০, ৪২৮, ৬০৮, ৮০০, ৯৫৮ | ১০। জন্মমৃত্যু | বরদাচরণ ভট্টাচার্য | ১১৪ |
| ৫। চম্পা তার নাম | মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য | ৫৭৭, ৭৮১, ৯৫০ | ১১। রিতীৎ পঞ্চাবাসিনী | | |
| ৬। বর্ণালী | সুলেখা দাশগুপ্তা | ১৫৪, ৩২৬, ৫২৪, ৬১৮, ৮১৮, ১০৮২ | পরিকল্পনায় শিক্ষা | শত্ৰুনাথ বন্দোপাধ্যায় | ৫৩৮, ৭৬৪ |
| ৭। বন কেট বসত | মনোজ বসু | ৩৮৬, ৫৬০, ৭৫৭, ৯৩৩ | ১২। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা- | | |
| ৮। ভাবি এক তরু আর | দিলীপকুমার রায় | ৬২, ১৩৪, ৪৬৪, ৬৪৮, ৭১৩, ১০১২ | শাস্ত্র শিক্ষাপদ্ধতি | বৈষ্ণবনাথ ভট্টাচার্য | ১৮৩ |
| ৯। সিদ্ধপায়ে | নীরদবরুণ দাশগুপ্ত | ৪৮, ২১৪ | ১৩। বাম্পী বিপিনচন্দ্রের জাতীয় | | |
| রম্যরচনা— | | | শিক্ষা প্রচাৰ | অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য | ২ |
| ১। স্বপ্নোক্তি | প্রশান্ত চৌধুরী | ৫৪, ২২৭, ৪০৩, ৫৮১, ৭৭৫ | ১৪। 'বিপিনদা' | বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় | ৩৬৭ |
| ভ্রমণ-কাহিনী— | | | ১৫। বাউসা সাহিত্যে কবি | | |
| ১। আধুনিক ইরানে এক মাস | পি. সি. সরকার | ৩৬৫ | প্রিয়নাথ সেনের দান | সাবরলজ্জন পণ্ডিত | ৫০১ |
| ২। কুলু মনালী উপত্যকা | নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ৭৭২ | ১৬। বকেট ও মহাকাশ ভ্রমণ | বিনুমাধব বন্দোপাধ্যায় | ৩১৩ |
| ৩। লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় | হিমালীশ গোস্বামী | ১৮, ৩০১, ৪৮৮, ৬৫১, ৮২৬, ১০৩৪ | ১৭। সিমলা কালাবাতার | | |
| বিজ্ঞান-বার্তা—(ক) বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিজ্ঞান | | | লোকপ্রিয়তা | সুধাস্ত ঘোষ | ৪০১ |
| সংস্কৃত-বিবিধ আলোচনা | পঞ্চদশ মিশ্র | ৩১৬, ৫১১, ৬১৬ | ১৮। সঙ্কৃত ও আধুনিক বিজ্ঞান | প্রিয়কান্ত ভট্টাচার্য | ২৪ |
| বীজের বন্দোপাধ্যায় | ১১৬, ৮৬৬ | | ১৯। সন্তোষায় সরস্বতী নদী | সুধেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল | ২২০ |
| বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও | | | ২০। হিন্দুর অতীত ও বর্তমান | অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ৫৭৫ |
| অশোককুমার দত্ত | ১০৪০ | | ২১। তরিতরুণের মেলা | সত্যকিঙ্কর গুপ্ত | ৫৭১ |
| | | | ২২। ১৮১৭ সালের ভূমিকম্প বিনাশক সেন | | ১১ |
| | | | বিবিধ রচনা— | | |
| | | | ১। একটি ছুরির কাহিনী | ললিত গোস্বামী | ৫ |
| | | | ২। না-জানা-কাহিনী | তালবেতাল | ৫৪০, ১৪৫ |
| | | | ৩। পান বেচে খায় কৃষ্ণপাক্তী বাস্তবের পাল | | ২০৮ |
| | | | ৪। বিভাগস্বরের কৌতুকপ্রিয়তা | অশোককুমার ভট্টাচার্য | ৬ |
| | | | ৫। বিপ্লবের সন্ধান | নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় | ১৭৮, ৪১০, ৬৭০, ৮৫১, ১০১৮ |
| | | | ৬। বস্তুরা বনে সুর | বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী | ৩১৮ |

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|--------------------------|-----------------------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| কবিতা— | | | | | |
| ১। অস্ত সর্গ | হুগাঁদাস সরকার | ৭৮০ | ৪২। বাতাসের আসে | পবন মণ্ডল | ৭১১ |
| ২। অস্ত মত | রাধামোহন মজুমদার | ৪০২ | ৪৩। ভালোবাসা | বংশীলাজীবন ভট্টাচার্য | ১১১ |
| ৩। আমার কবিতা | সোমনাথ মুখোপাধ্যায় | ৩৫৬ | ৪৪। ভাষা | রমলা দেবী | ৩১৭ |
| ৪। আন্তরিক মেয়ের | | | ৪৫। ভুল | মণ্ডল লালচন্দ্র | ৩৮১ |
| এই তো দশা | ঈশ্বর হোসেন জাসিম | ৬০৭ | ৪৬। ম'ন মনে | অসীম বসু | ৮৬৭ |
| ৫। আমার গানে | গোবিন্দ প্রসাদ বসু | ৭১ | ৪৭। মিছে সবই ম'রাময় | শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৮৭ |
| ৬। আমার বীণার সুর | বকুল বসু | ২৩৩ | ৪৮। মজুব | মীনা বন্দ্যোপাধ্যায় | ১১৮ |
| ৭। একটুপানি | মাধবী ভট্টাচার্য | ৩১৫ | ৪৯। মকচাঁরী | বিভূতিভূষণ বাগচী | ৫১৫ |
| ৮। একটি কবিতায় যা থাকবে | প্রীতিযুগা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৭৬ | ৫০। বখন হারাবো আমি | গোবিন্দ গোস্বামী | ৪১৮ |
| ৯। এখানে সন্ধ্যা নামে | অসীম বসু | ৬৭৬ | ৫১। যাতনার ক্লি গারে মেঘে | বুদ্ধদেব গুহ | ১১৭ |
| ১০। এবার কথা বল | চিত্তরঞ্জন সরকার | ৭৬৩ | ৫২। যেও না | সলিল মিত্র | ৭১৬ |
| ১১। একটি কল্পন কামনা | শেফালি সেনগুপ্তা | ১৪১ | ৫৩। রূপক | দীপ্তি সেনগুপ্তা | ১৬৭ |
| ১২। একটু রোদ | সোমনাথ মুখোপাধ্যায় | ১০৪৪ | ৫৪। বারি : আমি : ট্রেন | অনীতা গুপ্ত | ৫০০ |
| ১৩। কবিতা | শেখ সিরাজুদ্দীন আহমদ | ১৬২ | ৫৫। রোদ্দরদগ | বন্দে আলী মিয়া | ৬২২ |
| ১৪। কবি | সঙ্কলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩২০ | ৫৬। লীনাংকে | বিদ্যাংকুমার রায় | ৫৩ |
| ১৫। কলঙ্কিনী | বিমলচন্দ্র সরকার | ৩৭৪ | ৫৭। লব্ধ মুহূর্ত | সমীর সেন | ১৪৫ |
| ১৬। কবি | বুদ্ধদেব গুহ | ৬৪৭ | ৫৮। শেষ ঘুম | মিত্রা মুখোপাধ্যায় | ৪২৩ |
| ১৭। গোপন কথা | অনন্স বাগচী | ৩২০ | ৫৯। সপ্তপদী | বিমল সেন | ৪৮৭ |
| ১৮। গানের সুর | গোবিন্দ গোস্বামী | ১৫৬ | ৬০। শূন্য | আবদুল মজিদ | ১০ |
| ১৯। ছায়াচিত্রিত | চিত্ত দাস | ১০০৪ | ৬১। সেই বিড়ালের চোখ | অভিজ্ঞামল | ৫২৩ |
| ২০। জলছবি | মিমতি মোহান্ত | ৪৬২ | ৬২। সেদিন বা বসিনি | মিত্রা মুখোপাধ্যায় | ৩১২ |
| ২১। জয়তু নেতাজী | সত্যেন্দ্রনাথ বসু | ৫৮৮ | ৬৩। সুব্রহ্মসারী আসে | শেখ আবদুল করবর | ১০৭৪ |
| ২২। জিজ্ঞাসা | বুদ্ধদেব গুহ | ৮২৪ | ৬৪। সুখ সাধক | তপন চট্টোপাধ্যায় | ৮৭১ |
| ২৩। টুক টুক টুক লাড়ুকলা | বাসুদেব পাল | ৪৭২ | ৬৫। হাসমুহানা | নিহালা দেবী | ৫০১ |
| ২৪। তিরন্তের গান | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ৭৪৭ | ৬৬। ২৩শে জাম্বুয়ারী | মালতী সেনগুপ্তা | ৩১৭ |
| ২৫। তুমি যে শিব তাতা | | | দীর্ঘ-কবিতা— | | |
| বুদ্ধিতে সিঁও | শান্তি সেন | ১০১১ | ১। যেদিন ফুলো বিয়ের ফুল | বিবি | ১৩৮, ২৮২, ৩০০ |
| ২৬। তোমাকে | জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০৭৬ | ২। রাজধানীর পথে পথে | উমা দেবী | ১১১, ১১৫ |
| ২৭। দিনান্ত | সুধেন্দু মল্লিক | ১২২ | চারণন (বাঙালী-পরিচিত) — | | |
| ২৮। হুটি কবিতা | অধেন্দু বিশ্বাস | ৬১৫ | ১। শ্রীদীপকুমার রায়, শ্রীনিবাসরঞ্জন দাশগুপ্ত, | | |
| ২৯। দূরতমাস | জগন্নাথ ঘোষ | ১৭২ | শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীবৃষ্ণ ঘোষ | | ৫৫ |
| ৩০। নটী | দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩০ | ২। বিচারপতি জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র, ডাঃ জানেন্দ্রনাথ মজুমদার | | |
| ৩১। নিরুদ্দেশ | ধরনীধর লাহা | ৭৩৬ | জীকালচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, বিনয়চন্দ্র সেন | | ৫৪৭ |
| ৩২। নিশান্তিকা | অমলেন্দু ভট্টাচার্য | ১০৫ | ৩। জীসৌরভমোহন মুখোপাধ্যায়, ডক্টর নবগোপাল দাস, | | |
| ৩৩। পশারিণী | রুক্ষা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩১৫ | শিলাচাঁদ অসিতকুমার হালদার, শ্রীরমেশচন্দ্র পাল | | ৩১২ |
| ৩৪। প্রতীকার শেষে | সেবদাস ভট্টাচার্য | ৬৬৪ | ৪। শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে, জীবেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, | | |
| ৩৫। প্রস্রাব | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ৭৪৭ | শ্রীনিরেন দে, সুখা সেন | | ৭০৮ |
| ৩৬। পুষ্পধ্ব | বন্দে আলী মিয়া | ৭১২ | ৫। জীমেন্দ্রচন্দ্র সেন, অধ্যাপক নির্বলচন্দ্র ভট্টাচার্য, | | |
| ৩৭। পাখী | রত্নাবতী সেনগুপ্ত | ১১৪ | সোণাপাচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমহিষকুমার সেনগুপ্ত | | ৮৮২ |
| ৩৮। প্রতিবিম্ব | প্রভুব্রহ্মনাথ ঘোষ | ১০২৪ | ৬। শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, | | |
| ৩৯। বিবাহ | অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় | ২৫০ | ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রাণী ঘোষ | | ১০৮২ |
| ৪০। বসন্তসন্ধ্যা | সন্ধ্যা গুপ্ত | ৮৫৫ | নাটক— | | |
| ৪১। বাসর | স্বকুমারী দাশ | ৪১২ | ১। চৌকিদার | তুষার চট্টোপাধ্যায় | ৪৮২, ৭৮৭ |
| | | | সাহিত্য-পরিচয়— | | |
| | | | ১। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গতি ও সত্তা প্রকাশিত | সাহিত্য | |
| | | | সম্পর্কে অভিমতসমূহ ১১১, ৩২২, ৫২০, ৭০৫, ৮১৫, ১০৬৪ | | |

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| অনুবাদ— | | |
| উপন্যাস— | | |
| ১। ব্যাবিলনের রাজবস্ত্র | ডক্টর হার : রামেন্দ্র দে | ১৮, ২৫৮, ৪৫৪, ৬১৬, ৮০৮, ১৬৫ |
| সংস্কৃত-কাব্য— | | |
| ১। অনিল-বৃন্দাবন | কবি কর্ণপুর : প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর | ৩১, ১১১, ৩৭৫, ৫৬৬, ৭৬৬, ১০৪১ |
| কবিতা— | | |
| ১। অখের পুষ্ঠা | মির্টন : শিপ্রা শিরালী | ১১১ |
| ২। অনন্তিক্রমণীয় | অর্পিত : তপতী চট্টোপাধ্যায় | ৫১২ |
| ৩। অপরিবর্তনীয় | সেক্সপীয়র : | |
| | দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৭৪ |
| ৪। আমি সুন্দরকে ভালবাসি | ব্রিজেস : গুপ্তা মুখোপাধ্যায় | ৬৬৪ |
| ৫। উপনিষদমালা | পুষ্প দেবী | ২৬৫, ১০৫৪ |
| ৬। উইলিয়াম কার্লেস | উইলিয়াম : পৃথ্বী সরকার | ৭৪৬ |
| ৭। তীর্থযাত্রা | জুলিয়স সীজর : | |
| | মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় | ৬৫৪ |
| ৮। স্বা অপরী সযুজা সত্যায় | পুষ্প দেবী | ৫১৬ |
| ৯। নাম | কোলরিজ : | |
| | অনিলকুমার সমাজদার | ১৫৬ |
| ১০। প্রেম ও পরমায়ু | ব্রাউনি : অকুমারী দাশ | ১০০৪ |
| ১১। ফেদারিকো গার্সিয়া | কমলেশ চক্রবর্তী | ১০৮৬ |
| সোহকার হুইট কবিতা | লেশলি : ভাস্কর দাশগুপ্ত | ২১১ |
| ১২। ফ্রাট ফ্রিট | ট্রিভেনসন : | |
| ১৩। সমাধিসঙ্গীত | অদিত্যকুমার বসু | ৩০০ |
| ১৪। স্বাধীনতা | শেলি : জীবনকৃষ্ণ দাশ | ১১২ |
| গল্প— | | |
| ১। অদৃষ্ট দ্রুত | কেবোলাই কিসফাগুলি : | |
| | বিভূতি রায় | ৮৪৪ |
| ২। ওস্তাদ | আনাতোল ফ্রান্স : রবি গুপ্ত | ১০০৫ |
| ৩। হুন ভিউ হোটেল | দেবেন্দ্রকুমার বাশল : | |
| | গুপ্তা রত্ন | ৫০১ |
| ৪। নেতা | হরনামপ্রসাদ বাজপেয়ী : | |
| | অজুনাথ ভট্টাচার্য | ৬৮ |
| প্রবন্ধ— | | |
| কাঙ্কিক, অগ্রহাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র | | |
| আলোকচিত্র— ৩২ক, ১৫২ক, ২০০ক, ৩১২ক, ৩৭৬ক, ৫০৪ক, ৫৬৮ক, ৬৭২ক, ৭৬৮ক, ৮৫৬ক, ১৪৪ক, ১০৪৮ক। | | |
| পরিচিতি— ১২, ১৮৬, ৩৫২, ৫৬১, ৭৬১, ১২৫ | | |

গল্প—

| | | |
|-----------------------|--------------------------|------|
| ১। অজ্ঞ | নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য | ৮৪৮ |
| ২। অজগলি | সদর্শন রায় | ২৭৪ |
| ৩। অভিনেতা | মিতা বসু-মজুমদার | ৭২ |
| ৪। আকাশগঙ্গা | অশু চট্টোপাধ্যায় | ৬৭ |
| ৫। চুল | দুর্গাদাস ভট্ট | ৬৩৮ |
| ৬। দ্বিতীয় পক্ষ | শ্রেনিসার স্ত্রুত দত্ত | ১৮৬ |
| ৭। নিউন সাইন | বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য | ১২ |
| ৮। পদার্থবিদ্যা | রবীন্দ্রনাথ দাস-মহাপাত্র | ৬৬৫ |
| ৯। পদার্থবিদ্যা লোকাল | সদর্শন রায় | ৮৪০ |
| ১০। পদার্থ | বাসব ঠাকুর | ১৮২ |
| ১১। বৃন্দাবন | সোমেন্দ্রনাথ রায় | ৮৬ |
| ১২। বকুল-বিছানা পাথ | মহাশ্বতা ভট্টাচার্য | ২১৪ |
| ১৩। জলটিয়ায় | প্রভাস দাশ | ৬৫৬ |
| ১৪। মাতোয়ারা | রজত সেন | ২৮৪ |
| ১৫। মার্গাট | সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য | ৬৪২ |
| ১৬। রং বদল | কুকা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫০৫ |
| ১৭। সোমেন্দ্রনাথপুরে | আব্দুল আজিজ আল আমান | ১১৬ |
| আবেশা খাতুন | মঞ্জু দাশগুপ্ত | ১০০৮ |

রঙ্গপট—

বিবিধ—

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|------|
| ১। চলচ্চিত্র সম্পর্কে | শিরীষের মতামত | বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট | ১৭১ |
| ২। নাটক রচনা প্রসঙ্গে | গণিতচন্দ্র ঘোষ | | ১০২ |
| ৩। বাঙলা ছবি ও ১৩৬৫ | | | ১০১৬ |
| ৪। শিশিরকুমার ও পদ্মভূষণ প্রসঙ্গে | | | ৭১৬ |
| ৫। সাংস্রতিকী | | | ১০০ |

রঙ্গপট প্রসঙ্গে—

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ১। নিম্নোক্ত চিত্রসমূহের বিবরণী | ১৭১, ৩৫৬, ৫৩৩ |
|---------------------------------|---------------|

অনুবাদ-স্বত্বিকথা—

| | |
|------------------|---|
| ১। স্মৃতির টুকরো | সাধনা বসু : ১৬৮, ৩৫২, ৫৩০, কল্যাণক বন্দ্যো : ৭২০, ১০৪ |
|------------------|---|

রঙিন চিত্র—

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| ১। প্রকৃতির স্বাক্ষর (জলরঙ) | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত | কাঙ্কিক, অগ্রহাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র |
| ২। অর্থানান | মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী | অগ্রহাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র |
| ৩। মোহন | পঞ্চানন রায় | পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র |
| ৪। শিল্পী (তৈলরঙ) | বি. বি. পালাচৌধুরী | মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র |
| ৫। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | (গেজিল স্কেচ) চাক রায় | ফাল্গুন, চৈত্র |
| ৬। হারেম সঙ্গিনী (তৈলরঙ) | বিনয় গুহ | চৈত্র |

খেলাধুলা—

| |
|-------------------------------|
| ১১২, ৩১৮, ৫১৩, ৬৮৪, ৮৫৬, ১০৪৬ |
|-------------------------------|

কেনাকাটা—(ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা)

| |
|-------------------------------|
| ১৪৮, ৩৪২, ৫১৬, ৬১৩, ৮৮৬, ১০১৩ |
|-------------------------------|

সাময়িক প্রসঙ্গ—

| |
|-------------------------------|
| ১৭৩, ৩৫৭, ৫৩৪, ৭২৩, ১০৬, ১০১৩ |
|-------------------------------|

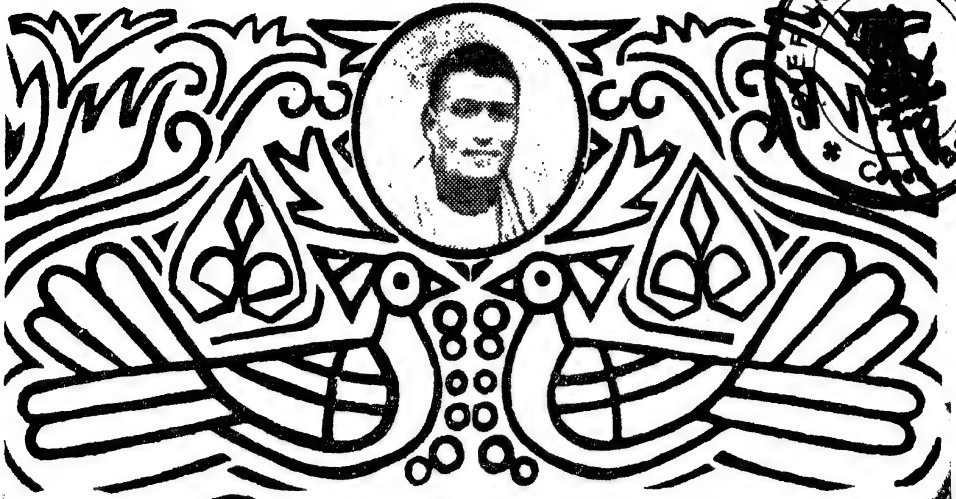
| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা | বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ছোটদের আসর— | | | অজন ও প্রাঙ্গণ— | | |
| উপভাস— | | | প্রবন্ধ— | | |
| ১। সোনালি স্বর্ণা | শৈল চক্রবর্তী | ১৪৬, ২৬৬, ৪৭৪, ৬৩১, ৮৭৮, ১০৫৬ | ১। অনাদৃত কাব্যানাদিকা | পূর্ববী চক্রবর্তী | ১০৫ |
| গল্প ও কাহিনী— | | | ২। বৌদ্ধ-শঙ্কীল | আশা বায় | ১০২৫ |
| ১। গেটম্যান | তারাপদ মুখোপাধ্যায় | ১০৫৮ | ৩। মারিয়া মন্তেসরী | কলাগী দত্ত | ৩০৬ |
| ২। গল্প হলেও সত্যি | ভাস্কর দাশগুপ্ত | ৪৭৭ | ৪। ঝাঙগাংকর ভাঙতল | সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮৩২ |
| ৩। জয় পরাজয় | বাসুদেব পাল | ১৪৯ | ৫। শ্রীশ্রীমকুকের পরীকা | রমা দে | ৬৭৮ |
| ৪। নেতা | তারাপদ মুখোপাধ্যায় | ৮৮৫ | ৬। হিন্দু মেয়ের স্বামি-সংস্কার | অরুণিমা মুখোপাধ্যায় | ১০১৮ |
| ৫। পরগাছা | সুধাংশু ঘোষ | ৮৮৪ | গল্প— | | |
| ৬। বিদেশী পণ্ডিতের গল্প | সুধাংশু কুমার ভট্টাচার্য | ১৪৮ | ১। অমনোনীতা | অমিত্রজ্ঞান সেন | ৪২৪ |
| ৭। বীর কুন্তের দেশপ্রেম | সুজিতকুমার নাগ | ২৬১ | ২। উপহার | সাগরিকা গাম | ৪১৭ |
| ৮। বনবিজ্ঞান | সরলা বসু | ৪৭৮ | ৩। কয়েক দিন | সীতা মুখোপাধ্যায় | ১০৮ |
| ৯। মুগুহীন উপত্যকার কাহিনী | দেবব্রত ঘোষ | ২৭০ | ৪। কবোটি | প্রতিমা দাশগুপ্ত | ১০২৯ |
| ১০। বখাৰ্ণ সেবা | সুলাভ কব | ৬৩৬ | ৫। ঠগী ও পিণ্ডারী | অমিতাকুমারী বসু | ১০২৭ |
| ১১। রসিকতা | বিজয়কুমার ঘোষ | ২৬৮ | ৬। ত্রয়ী | শুভা দাস | ৮৩০ |
| ১২। লক্ষ্মীর কাঁপি | পরিতোষ মুখোপাধ্যায় | ১০৬০ | ৭। কাঁকি | গীতা গুহ | ১০১ |
| ১৩। সেখানে-সেখানে | নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী | ৮৮২ | ৮। মাধুরী আছে ছড়িয়ে | ইন্দুমতী ভট্টাচার্য | ৮৩১ |
| ১৪। সোনার দেশে | অশোক মুখোপাধ্যায় | ২৭২ | ৯। যে নদী মরুপথে | প্রতিমা বায় | ১০১ |
| ১৫। হীরা-মাণিক্যের সন্ধান | দেবব্রত ঘোষ | ৬৩৩ | কবিতা— | | |
| ১৬। জনান | ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় | ৮৮১ | ১। এখন ফাঙ্কন মাস | নচিকৈতা ভরদ্বাজ | ৮১১ |
| প্রবন্ধ— | | | ২। কাল | গীতা দেবী | ৮১১ |
| ১। চাঁদ | হরপ্রসাদ ঘোষ | ২৭৩ | ৩। চিরন্তন | প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় | ৮১১ |
| ২। চাঁদের দেশে | " " | ১০৫৯ | ৪। বসন্ত | রেনা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮১১ |
| ৩। টেলিপ্রিটার | ননী গোপাল চক্রবর্তী | ১৫১ | অনুবাদ-কবিতা— | | |
| ৪। পেঙ্গুইনের জন্মকথা | সুধাংশু ঘোষ | ২৭১ | ১। আমি ছুটেছি | অলোছায়া পিছু পিছু | নগুচি : মানসী চট্টোপাধ্যায় |
| ৫। বা কিছু ছলভ | অশোক মুখোপাধ্যায় | ৮৮৩ | ২। কুল হুদে রাজহাস | ইংরেজ : গীতা মিত্র | ৮১১ |
| ৬। সাহিত্যিক বিভাগাগর | সমীকুমার চট্টোপাধ্যায় | ৪৭৯ | নাচ-গান-বাজনা— | | |
| ভীষনী— | | | বিবিধ— | | |
| ১। আমায়ের বিভাগাগর | কমলকুমার মিত্র | ১৪৯ | ১। কবিগান ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | অশোকবরেন সেনগুপ্ত | ৮৭০ |
| ২। আচার্য অগ্নীশচন্দ্রের শিশুবেলা | তারাপদ মুখোপাধ্যায় | ৪৭৬ | ২। গীতিকার রামপ্রসাদ | কালীপদ জাতিড়ী | ১৬৪ |
| ৩। লক্ষ্যবাচ্য | বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ৬৩৭ | ৩। গিরিজাশঙ্কর স্মৃতি-সংকলন | | ৬১১ |
| ৪। হাকের আত্মজীবনী | সুনীলকুমার নাগ | ৬৩৬ | ৪। নোয়াখালি গীতিকার | মনোরঞ্জন চৌধুরী | ১০৭২ |
| যাদু-তথ্য— | | | ৫। বাউল গান | উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | ৪৮১, ৬৮১ |
| ১। জাস্ত সিগারেট | এ. সি. সরকার | ১০৫৯ | ৬। ভীষ্মদেব সঙ্গীত পরিষদ | | ৪৮১ |
| ২। টাকা অদৃষ্ট করা | " " | ১৪৮ | ৭। সঙ্গীতালয় | | ৪৮১ |
| ৩। টাকার নাচ | " " | ৬৩৩ | ৮। শ্রবণী অঙ্কুরপ্রসাদ | কালীপদ জাতিড়ী | ১০৭ |
| ৪। ব্যালেন্সিং ট্রাস | " " | ৪৭৭ | আমার কথা—(শিল্প-পরিচিতি) | | |
| ৫। মাচবন্ধের জলজ কাঠি | " " | ৮৮২ | ১। গুস্তাভ মুস্তাক আলি খাঁ | ১৬৬ | ২। কালোবরণ দাস |
| ৬। রু মটেনটের কুমারের ভেদী | " " | ২৬৮ | ৩। গোবিন্দগোপাল মুখো: | ৬১১ | ৪। প্রজ্ঞা দাস |
| কবিতা— | | | ৫। বিষ্ণুনাথগণ ভাষাংশু | ১০৭৪ | ৬। ভীষ্মদেব চট্টো: |
| ১। খোকার প্রায় | বাসন্তী বসু | ২৭৩ | রেকর্ড-পরিচয়— | | |
| ২। চারজনের ছড়া | বর্ণজিতকুমার দত্ত | ৮৮৫ | | | |
| ৩। বাবলী | মালিক মুখোপাধ্যায় | ৪৮০ | | | |
| ৪। বিক্রম | বীথিকা বসু | ৮৮২ | | | |
| অনুবাদ-গল্প— | | | | | |
| ১। সত্যিকারের রাজকুমারী | বঙ্কল ঘোষ | ৮৮০ | | | |



মাসিক বসুমতী
॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ ॥

(৪৫)

জননী
—ঐমহিতোষ বিশ্বাস অঙ্কিত



সামিক বসুসতী

৩৮শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীমতঃ শ্রীমতঃসদেব তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বিনগকে কত সময়ে বলিয়াছেন—“আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে এরূপ হওয়া দূরে থাকুক উহার এক-চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর তাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মা'র কোন না কোনরূপ দর্শনাকি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই বক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা ধাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চোঁটা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না। কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাগাইয়া চলিতে হইবে এ কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। শরীরের দিকে যখন একটু-আঁটু দৃষ্টি পড়িত তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিমম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্শনের সম্মুখে পাঁড়াইয়া চক্ষু অস্থির প্রেমান পূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উঠাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—‘মা, তোকে ডাকার ও তাঁর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিমম ব্যাধি দিলি?’ আবার পরক্ষণেই বলিতাম, ‘তা যা হবার হক্কে, শরীর বায় বাক, তুই কিন্তু আমার হাড়ি নি, আমার দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তাঁর পাদপদ্মে

একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার বে আর অত গতি একেবারেই নাই!’ এরূপে কাদিতে কাদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তৃচ্ছ দেখে বলিয়া মনে হইত এবং মা'র দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশঙ্ক হইতাম।”

শ্রীশ্রীজগদাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অব্যাহিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্তি সম্বন্ধে পূর্বক তাঁহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্তর্জ্ঞ বলিয়াছি। ঐ দিন হইতে তিনি যেন বৈবশক্তি প্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সরল ভক্তি-বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্টন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আত্মকৃপার বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জগদাতা তাঁহানিগের উত্তরকে অবিলম্বে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ, অভ্যবাদ ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্তমান যুগে বর্ধমান দূর করিয়া জীবন্ত অধ্যাত্মশক্তি সক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীর-মনরূপ বস্তুটিকে শ্রীশ্রীজগদাতা কত বড় ও কি অদ্ভুত উপায়-অবলম্বনে নির্মাণ করিয়াছিলেন, এরূপ ঘটনা সকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

জাৰ্মানীতে প্ৰথম ভাৰতীয় মুক্তি কামী

ডক্টৰ অৰিনাশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য

অৰ্ধ শতাব্দী অতিক্ৰান্ত হইতেছে। ১৯১১ আৰম্ভৰ জুলাই মাসৰ শেষ দিকে জাৰ্মানীৰ হালে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেমিক্যাল ইনষ্টিটিউট গ্ৰীথেৰ দৰুণ বন্ধ হইলে আমি আমাৰ অধ্যাপক প্ৰফেচৰ ডক্টৰ ফৰল্যাণ্ডাৰেৰ (Vorlander) নিকট হইতে একখানা পত্ৰ লইয়া হামবুৰ্গে গমন কৰি। তথাকার কলেগিয়াল ইনষ্টিটিউটেৰ ল্যাবৰেটৰীতে অধ্যাপক ফয়েগটল্যাণ্ডাৰ (Voegtlander) আমাকে বিভিন্ন প্ৰকাৰ উপনিবেশিক পদাৰ্থ—যথা চা, কফি, কোকো, ঠৈলবীজ, লাক্সা এবং সেই সকল উপাদানৰ উপযোগী মাটি পৰীক্ষায় অভিজ্ঞতা অৰ্জনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰেন।

এ সময়ৰ হামবুৰ্গে আমাৰ পৰিচিত কেহ ছিলেন না। এজন্য হালেৰ ভাৰত-হিতৈষিণী মহিলা সেখিকা ফ্ৰাউসিমন মেৰী সিমন্ (Frau Anna Marie Simon) তাঁহাৰ ভগিনীপতি হাৰ নিদেমায়াৰেৰ (Herr Niedemayer) নিকট একখানা পৰিচয়-পত্ৰ দিয়া দেন। হাৰ নিদেমায়াৰ তৎকালে কলিকাতাৰ জাৰ্মান এশিয়াটিক ব্যাংক (Deutsche Asiatische Bank, যাহা কলিকাতাৰ ডাচ এশিয়াটিক ব্যাংক নামে বৰ্ণিত হইত), শ্ৰোডাৰ শ্মিথ (Schroeder Schmidt) প্ৰকৃতি ব্যবসা প্ৰতিষ্ঠানৰ সঙ্গ সন্নিহিত একজন খ্যাতিমান ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহাৰ সহিত সাক্ষাতে তাঁহাৰ এবং তাঁহাৰ বিদ্যুৎ পত্ৰীয় উদায় মধুর বাক্যলাপ ও আদৰ আশায়নে আমি সবিশেষ মুগ্ধ হই এবং তাঁহাৰেৰ অতুল্যে তৎপৰে সন্তুষ্ট হৈ-একবাৰ তাঁহাৰেৰ সঙ্গ আলোচনায় নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ কৰিতে সক্ষম হই।

হাৰ নিদেমায়াৰ কয়েক দিন পৰ আমাকে লইয়া জাৰ্মানীৰ প্ৰেষ্ঠ শ্বীয়াৰ কোম্পানী হামবুৰ্গ-আমেৰিকা লাইনেৰ জেনায়েল ম্যানেজাৰ হাৰ আলবাৰ্ট বালিনেৰ বাটীতে বাইয়া তাঁহাৰ সঙ্গ পৰিচিত কৰেন, হাৰ বালিন জাৰ্মানীৰ একজন বিখ্যাত কৰ্মীৰ পুৰুষ ছিলেন। জাৰ্মানীৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তৃতি, জাৰ্মান ভাৱধাৰাৰ সূত্ৰসাৰ, এবং শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি কৰাৰ জন্ত অহিনিশি কাৰ্য কৰিতেন। তিনি খ্ৰীষ্টপ্ৰকৃষ্ট স্বদেশে আমাকে সন্ধান কৰিলেন এবং প্ৰথম সাক্ষাতেই তাঁহাৰ পত্নী এবং একমাত্ৰ পালিতা কন্তাৰ সঙ্গ পৰিচয় কৰাইয়া নিলেন। একুণ একজন আভিজাত্য গৌৰৱেৰ অধিকাৰী সাম্ৰাজ্যবাদী পুৰুষ দীনা ভাৰতমাতাৰ একটী দীনন্ত হোৱাকে কেন এক সৌজ্ঞাত প্ৰদৰ্শন কৰিলেন, তাহা তখন উপলব্ধি কৰিতে পাৰিলাম না।

প্ৰত্যাবৰ্তন কালে গাড়ীতে হাৰ নিদেমায়াৰ বসিলেন, হাৰ বালিন প্ৰাচ্যৰ পৰপ্ৰদানত জাতি সমূহৰ তত্ত্ববিদগেৰ সঙ্গ নিয়ন্তাই সাগ্ৰেহে মেলামেশা কৰেন। তাঁহাৰেৰ দুঃখ-দৈন্তেৰ প্ৰতি তিনি সবিশেষ সহানুভূতিশীল। তাঁহাৰ বাটীতে চীন, মিশৰ, ইণ্ডোচীন, জাপান, সুমাত্ৰা এবং অন্তৰ্দেশেৰ বিভাবী, বাবসা প্ৰতিনিধি এবং সৰ্বশ্ৰেণীৰ লোকজন আগমন কৰেন। তিনি তাঁহাৰেৰ পিতৃভূমিৰ অৰ্থাৎ স্বদেশেৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰেন এবং কি ভাবে দেশেৰ মঙ্গল হইতে পাৰে, সে-সব বিষয়ও আলোচনা কৰেন।

সন্ধ্যাই এক দিন নিদেমায়াৰ তাঁহাৰ গাড়ী নিয়ে অপৰাহু ৪টায়

ল্যাবৰেটৰী ছুটি হওঁৱাৰ প্ৰাক্কাৰে বাইয়া আমাকে লইয়া বালিনেৰ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

ল্যাবৰেটৰী হইতে বালিনেৰ বাটী নিকটেই, শহৰেৰ মধ্যস্থলে আলষ্টাৰ হ্ৰদেৰ তীৰে আলষ্টাৰডাম (বৰ্তমানে 'বালিনডাম') নামৰ স্তম্ভা স্থানে অবস্থিত।

চা ও জলযোগেৰ পৰ হাৰ বালিনই আলোচনা আৰম্ভ কৰিলেন যাত্ৰি ৮টা পৰ্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়েৰ অবতারণা কৰিলেন। প্যাৰিয়ে গ্ৰাম্যজী বুকবন্ধা, ম্যাডাম কামা, বীয়েল্‌নাথ চট্টোপাধ্যায় প্ৰভৃতি বিশ্লিষ্টগণ সন্মুখেও বিবিধ তথ্য জ্ঞানিবাৰ জন্ত উদ্গ্ৰীব হইলেন, কিং আমি বাহা উত্তৰে বসিলাম, তিনি তাহা হইতে সঠিক তথ্যই অংগৰ ছিলেন।

সাক্ষা ভোজেও ফ্ৰাউ বালিন আমাৰিগকে আশ্বাসিত কৰিলেন বহু দুঃখ স্বাৰ্থনৈতিক বিষয়েৰ আলোচনায় যাত্ৰি ১১টা বাজি গেল। আমি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি কৰিলাম যে, তিনি জাতীয়তাবাদী ভাৰতীয় দল গঠনেৰ প্ৰয়াসী। হাৰ নিদেমায়াৰ গাড়ীতে বসিলে যে, হাৰ বালিন নব্যতুকী নাৱক এনভাৰ বে (পৰে পাশা), মিশ্ৰেৰ জাতীয়তাবাদী ফৰিদ বে এবং অন্তৰ্দেশেৰ মুক্তি কামী যুবকগণৰে অৰ্ধ ও অন্তৰ্দেশেৰ দিয়া সাহায্য কৰেন। আমাৰ ভাৰতীয়গণ যদি গোপনে ভাৰতে কিছু অন্তৰ্দেশেৰ প্ৰেৰণ কৰিতে অভিলাষী হই, তবে তিনি হাৰ বালিন হইতে সাহায্য লইয়া ব্যবস্থা কৰিতে পাৰেন।

ঐ দিনেৰ আলোচনাৰ পৰ হইতে হাৰ বালিনই আমাৰে ল্যাবৰেটৰীতে ফোনে তাঁহাৰ বাটীতে বাইবাৰ জন্ত অতুল্য কৰিলেন।

সন্ধ্যই ত্ৰিপোলী নিয়ে ইটালী তুৰস্ককে আক্ৰমণ কৰিল। বালিন আমাকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন, ইহাতে ভাৰতীয় মুসলমানগণেৰ উপৰ কিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হইবে? তাঁহাৰ সঙ্গ আলোচনাৰ জ্ঞাত হইলাম যে গ্ৰেট বুটেনই ইটালীকে এই কাৰ্য প্ৰেৰণিত কৰিয়াছে যেন জাৰ্মানী দু দিক বন্ধা কৰাৰ চেষ্টায় বে-কাহদায় পড়ে, ইটালীৰ সঙ্গ জাৰ্মানীৰ মিত্ৰতা আবাৰ নব্য তুকী দলকেও জাৰ্মানী স্তগীত কৰিতেছে, এই যুদ্ধে জাৰ্মানী হয় ইটালীকে নয় তুৰস্ককে ত্যাগ কৰিতে বাধ্য হইবে। বালিন ও নিদেমায়াৰ ইংৰাজ এবং ফৰাসীৰ দুই শত বৎসৰেৰ ইত্যাকার স্বাৰ্থনৈতিক আধিপত্যেৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ যত্ন কৰিলেন, আমাৰ মনে হইল যেন তাঁহাৰ উক্ত দুই জাতিৰ প্ৰাধাৰ স্বৰ্ধ কৰাৰ জন্ত যে কোন পন্থা অবলম্বন কৰিতে প্ৰস্তুত।

হাৰ বালিন ছিলেন জাৰ্মান নেভি দীগেৰ উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং পৃথিৱীতে জাৰ্মান-প্ৰভাৱ বিস্তাৰ সমিতিৰ প্ৰেসিডেণ্ট। জাতিতে তিনি ইহুদী ছিলেন। কিন্তু জাৰ্মান কাইজাৰেৰ অন্তৰঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কাইজাৰ তাঁহাকে মিত্ৰভাবে ক্যাৰিনেটে গ্ৰহণ কৰাৰ জন্ত পুনঃপুনঃ স্তো কৰিয়াও সফল হন নাই। তিনি সৰ্বদাই বলিতেন যে, তাঁহাৰ 'দীনসেবা' পিতৃভূমি এবং কাইজাৰেৰ জন্ত আমৰণ অৰাহত থাকিবে। সেইৰূপই ছিল। প্ৰথম মহাযুদ্ধেৰ শেষে কাইজাৰ সিংহাসন ত্যাগ কৰিয়া হল্যাণ্ডেৰ 'আমাৰোংগেন' (Amarongcn)

চলিয়া গিয়াছেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র তিনি বিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

১৯১১ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একদিন মিশরের ফরিদ বে ও অল্প কয়েকজন মিশরীয় যুগের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন। হামবুর্গে তখন মনিষ্ট (Monist) কংগ্রেস হইতেছিল। দুই জন আইরিশ বিপ্লবীর সঙ্গেও তিনি আমাকে আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেন। এই কংগ্রেস উপলক্ষে যেমন শান্তিকামী এবং ‘এসপারেণ্টো’ (Esperanto) ভাষা প্রচারকামী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন, তেমনি নানা দেশের বিপ্লবীরও আগমন হইয়াছিল। হার বালিন একদিন মনিষ্ট নামক বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর আর্নেস্ট হ্যাকেল (Ernest Hackel) নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বাসায়নিক ওষ্টওয়াল্ড (Ostwald) প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকালে সন্নিবিষ্ট করেন, তাহাতে দেশবাসী ভাবিল বালিন শান্তিকামী হইতেছেন।

ত্রিপোলীর যুদ্ধ

ত্রিপোলীর যুদ্ধ সম্পর্কে হার বালিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। নব্য তুর্কী দল (Young Turks) কিছুতেই ত্রিপোলী ইটালীর হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত ছিল না। এই সময়ে দিল্লীর ডক্টর আনসারী (পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী বাহার বাটীতে প্রায়শঃ আশ্রয় গ্রহণ করিতেন) ত্রিপোলী যুদ্ধ লইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছিলেন। ইহা অবগত হইয়া হার বালিন বিশেষ উন্নীত হইলেন। কারণ আনসারী তুরস্কের আহত দৈনিকগণের সেবার জন্য “বেড ক্রিস্ট সোসাইটি” গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মোগলা আবুল কালাম আজাদ ইটালীর বিরুদ্ধে এমন কি ইংরাজ নীরব ইটালী কর্তৃক তুরস্কের অবমাননা সম্বন্ধে করিতেছিলেন বলিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধেও আলামদারী বক্তৃতা দিয়া ভারতের মুসলমানদিগকে “রোমের বাদশাহের” রাজ্য রক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন।

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সাহায্যার্থ একদল খেজাউনিক প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলে ভারত গভর্নমেন্ট তাহাদের নিরপেক্ষতা ভুল হইবে বলিয়া তাহাদের উত্তরাগ বন্ধ করেন। ইহাতে স্থানে স্থানে মুসলমানগণ বিশেষ উত্তোজিত হয়। এই সকল সংবাদ শুন্যের সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া হার বালিন জিজ্ঞাসা করেন যে মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ইংরাজ-বিরোধী দল গঠনের মত যুবক সংগ্রহ করা সম্ভবপর কি না।

বালিনের বক্তৃত্ত-জয়ন্তী ১৯১২ অব্দে বালিনের “হামবুর্গ আন্দোলন” লাইনের কর্তৃত্বভার গ্রহণের ২৫ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে তাহার সহকর্মী, বন্ধু বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ একটি বক্তৃত্ত-জয়ন্তী অনুষ্ঠান করিতে উত্তোজিত হন। হার বালিন এই কার্যে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বিশেষভাবে অস্বরণ করেন, কিন্তু উত্তোজিতগণ ভাবিলেন যে, ইহা মায়ুলী মোহন প্রকাশ মাত্র। তাহারা সোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জার্মান কাইজারকেও উৎসবে উপস্থিত হইতে সম্মত করাইলেন। হার বালিন অতি বিনীত ভাবে এই অবস্থিত ব্যাপার হইতে

তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য কাইজারের নিকটও নিবেদন করিলেন। কাইজার তখন তাহাকে বর্ডাশ্চীভুস্ত করার জন্য “হার ফন” (Herr Von) উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব দিলেন। বালিন সম্মানে তাহা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কাইজারের আটোগ্রাম সন্নিবিষ্ট একখানা ফটো পাঠিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। দেশবাসী তাহার এই বিনীত আচরণে মুগ্ধ হইলেন।

জুভিলী উৎসবের অনুষ্ঠানাগণ কিছুতেই উৎসবের আয়োজনে বিরত হইলেন না। কিন্তু অকস্মাৎ তাহাদের সকল উত্তোজ আয়োজন বাতায় পধ্যবসিত হইল। হার বালিন তাহার স্ত্রী ও কন্যাসহ একখানা ছোট সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িয়া অন্ত্যস্ত পথে যাত্রা করিলেন। এক পক্ষকাল তাঁহাদের কোন সংবাদ দেশবাসী পাইল না। উৎসবের নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হওয়ার ১০ দিন পর জাহাজীর তৎকালীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ‘উলফ বুয়ো’ প্রচার করিল যে হার বালিন হামবুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তিনি গৃহে উপনীত হইয়া পুনরায় এক বিনীত টেলিগ্রামে কাইজারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই নিরাড়ম্বর আলবাট বালিন।

গুপ্তদল গঠনের প্রস্তাব

অক্টোবরের প্রথম দিনেই হার বালিন এবং হার নিদেমায়ার পরিবার ভাষায় বলিলেন যে যদি আমি কতিপয় ভারতীয় বন্ধুসহ একটি গুপ্ত দল গঠন করিতে পারি, তবে তাহারা কোন কোন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। এমন কি, জল্পাদি প্রেরণ করিবারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু আমি উৎসাহ প্রদর্শন করিলাম না। কারণ ১৯০৬ অব্দে অতি নগণ্য কারণেই তৎকালীন ‘গোলামখানা’ খুলে বন্দিত বাধাইয়া ছাত্রজীবনে বহু লাঞ্ছনা গণনা সহ করিয়াছি। গঠনমূলক কার্যের মধ্যে বহুপ্রাপ্তি অকালে ত্রিকাল হ্রাস বিতরণ, সন্তান সমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবশেষে সহকর্মী ও অর্থের অভাবে দারুণ অশান্তি ভোগ করিয়াছি। সর্বশেষ নিজের উন্নতিসাধন মূলমন্ত্র লইয়াও কত বাধা বিপত্তি লক্ষ্যন করিয়া জোষ্ঠ ভ্রাতাগণের বস্ত্রসম অর্থ লইয়া জার্মানীতে আসিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া শিক্ষার দিকে আশ্রিত লাভ সাফল্য লাভ করিয়াছি। আশা ও আকাঙ্ক্ষা ‘ওক্টরেট’ লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিব, এর মধ্যে বৈপ্লবিক কার্যে ওত্তাপ্রোতভাবে নিযুক্ত হইলে নিজের ও পরিবারের প্রতি দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সুতরাং আমি ইতস্তত করিলাম।

১৯২২ অব্দে আমার বাচনিক অন্তঃপ্রেরণের সুযোগ সুবিধার বিষয় অবগত হইয়া অল্প কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বধা দাদা চাক্রী কেরাসান্স, জ্যানেব্রেক্স লানগুপ্ত প্রমুখ হার বালিনকে পত্র দিতে বলিলেন। বালিন তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মতে কয়েকটি প্যাকেট বিভলবার ও পিন্ডল ভারত উপকূলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সে সকল কলিকাতার শ্রোতার শিখ কোম্পানীর বেনিয়ন বরানগরের

নারায়ণচন্দ্র দত্ত আন্দোলন সমিতির সচিব প্রভাসচন্দ্র দেব (বি, এ) প্রমুখ সদস্যগণকে দিয়াছিলেন।

কিন্তু তখন দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিকার হইয়াছে। সূত্রস্বাং প্রকৃত বিপ্লবগণ ব্যতীত সাধারণ স্বদেশকামিগণ বৈপ্লবিক কার্যের দিকে দৃষ্টি দিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেন। নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই যে বৃটিশ জাতিস মাটি ফুড়িয়া বাহির হইয়াছে, তাহার প্রচার করিতেছিলেন। বঙ্গিও স্বগৌরব মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকা ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দেওয়ারকে বাংলার পুনর্বিভাগ (Re-partition of Bengal) বলিয়াই দৃঢ়ভাবে অভিযত প্রকাশ করিতেছিল, তথাপি বীরপন্থী নায়কগণ সর্বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। স্বদেশী যুগের উগ্র “সঞ্জীবনী” পত্রিকা পাঠে সন্তোষের পর সন্তোহ লর্ড হার্ডিঞ্জের সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত জ্ঞাত হইতাম।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের বীরপন্থী নায়কগণকে নানা ভাবে পকেটভার করার সুযোগ দিতে লাগিলেন। শ্রাব আন্তরিকতা বুঝাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলারী আমলের বহিষ্কৃত ছাত্রদিগকেও ভর্তি করিয়া লইলেন, জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই শিক্ষা বিভাগে কর্ম-সংস্থান করিতে সক্ষম হইলেন। সূত্রস্বাং আশাতদৃষ্টিতে মনে হইল, দেশে শান্তির হাওয়া বহিতেছে। বিপ্লববাদী বা উগ্রপন্থী বহুগণও পক্ষে জানাইলেন যে, দেশের পরিবর্তন হইয়াছে, সূত্রস্বাং অধিক সংখ্যক প্যাকেট অস্ত্র ভারতে প্রেরণ করা হইল না।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

১৯১৩ অব্দে চীনে নব্যচীন বল উত্তর সান ইয়াং সেনের নায়কত্বে প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লব চালাইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া আমরা উল্লসিত হইলাম, ভাবিলাম “দিন আগত এ”, এশিয়ার কালধুম ভঙ্গ হইবে, কোটি কোটি নবনারীর মহাদেশ গাথাড়া দিয়া উঠিবে, হয়ত বা এই গা বাড়াতেই ভাংতবর্ষও নড়িয়া উঠিবে।

সহসা আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা ভারত-হিতৈষিণী ফ্রাউ সিমেন আমাকে কোনে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার ভগিনীপতি হার নিদেমায়ারের এক পত্র দেখাইলেন, পত্র বিশেষ জরুরী, আমাকে পঞ্চধরত দিয়া অবিলম্বে হামবুর্গ পাঠাইবার নির্দেশ তাহাতে রহিয়াছে। আমি পরদিন প্রথম গাড়ীতেই হামবুর্গ বাড়া করিলাম। বৃদ্ধা ফ্রাউ সিমেন ঠেঁপে ভাড়া ব্যতীত হোটেল চার্জের জন্য অর্থ দিয়াছেন, নিদেমায়ারকে একখানা টেলীও করা হইয়াছে, লক্ষ্যপাত্র ২টায় হামবুর্গ ষ্টেশনে পৌছিয়াই বিষয়-বিস্তারিত নেড়ে লক্ষ্য করিলাম যে, প্রাক্তম হার নিদেমায়ার স্বয়ং উপস্থিত। তিনি ‘আলষ্টারডায়ে’ হার বালিনের বাটীতে আমাকে লইয়া গেলেন। হার বালিন অগোণে বাথরুমে বাইরা আমাকে হাত-বুখ খুঁয়া আসিতে বলিলেন, তারপর টেবিলে বসিয়া ভোজনের খাদ্য পরিবেশন করাইলেন। হার বালিন ব্যতীত তথায় অস্ত্র এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পোষাকে মনে হইল ‘লেডি অক্সিয়ার’—নাম গেসস’ বাওয়ার। তাঁহার তিন জন গুজ ফেনিল বিয়ার পান করিতে লাগিলেন।

হার বালিন বলিলেন যে, এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত।

চীনের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কয়েকজন আইরিশ বিপ্লবী চীনদেশে বাইতেছেন, আমরাই প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি এ সময়ে দুই-চারি জন বহুদল তাঁহাদের সহবাত্রী হইলে বিশেষ ভাবে বিপ্লবের জারলাভ করিতে পারিবেন, এ জন্যই আপনাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। এমন কি, ভাষায় অন্তর্বিধাও যে কিছু নয়, কারণ নব্যচীনের কর্মবীরগণ ইংরেজী এবং জাওয়া ভাষায় দক্ষ, তাহাও বলিলেন।

বালিনের প্রস্তাব শোনামাত্র আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইউনিভার্সিটির অবকাশকাল পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া আমার গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছি। আশা করি, ১৯১৪ অব্দেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বচ-আকাঙ্ক্ষিত ‘ডক্টর’ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইব। এই সময়ে আমি অবশ্যই সব বন্ধ করিয়া চীন বাড়া করিব? আমার খাচ এবং ছুরি-কাঁটা জাল হইল। মুহুর্তে ভাসিয়া উঠিল আমার চক্ষুর সমক্ষে বিপুল স্নেহের আধার আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবের সৌম্য মূর্তি, অন্তরে জাগিয়া উঠিল ভাতা ও ভাতৃবৎসলের সাধনমনে বিনাহাদনের করুণ দৃশ্য। বাল্যকাল হইতেই আমি ছিলাম অসহিষ্ণু, উচ্চুৎসাহ এবং বিচারবুদ্ধি-বিবর্তিত অর্কটচীন। যখন জ্ঞান লাভের সময় তখন জ্ঞান বিস্তারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার শূন্য রাখিয়াছি। আবার কি উদ্বাহ হইবে? আবার কি আত্মীয়-অজ্ঞান সকলকে হতাশ করিব? আমার পিতৃদেব অধ্যাপক আমার গবেষণা পরিচালনা কার্যে নিস্তা উৎসাহ দিয় আমাকে অগ্রসর করিতেছেন। আমিই তাঁহার প্রথম হিন্দু ছাত্র (ভারতীয়)। আমা দ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির আশা তিনি পোষণ করেন, তাঁহাকেও প্রতারণিত করিব?

না, কিছুতেই না, আমি অসম্মত হইলাম, পরিহার্য বিনোদ ভাষায় বলিলাম, ‘আম্বা হতে এই কর্ম হবে না সাধন।’

আমার আরও একটি কথা যুগপৎ মনে উদয় হইল। তাঁহার কি আমাকে গুপ্তচরে পরিণত করিতে প্রয়াসী? আমা দেশসেবা, দেশবুদ্ধিকে কামনার কি এই দক্ষিণা?

হার বালিন অন্তর্ধামী। তিনি বলিলেন, হার ভট্টাচার্য্য! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। বিপ্লবের সাক্ষ্য জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে নব্যচীন নায়কগণের নিকট আপনাকে প্রেরণ করিতে চাই। আইরিশ বহুগণের বিশেষ অজুহাতেই আমরা এই ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি সেখানে আমাদের বিষয় বহুগণের সঙ্গে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, ইত্যাদি বহু কথা তিনি বলিলেন। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম, সর্বপ্রথম আমাদের ‘ডক্টরেট’ পাঠিতে হইবে, ইহার জন্তই আমার বিদ্যুত পরিবারের সকল উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ১৯০৬ অব্দের মত অবিস্মৃয়াকারিত্যায় পুনরায় হতবুদ্ধি করা আমার পক্ষে অমঙ্গলীয় অপরাধ হইবে।

হার নিদেমায়ার এ সময়ে কথা বলিলেন। তিনি আমাদের পরিবার, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্রাউ সিমেনের নিকট হইতে বিশেষ ভাবেই সকল তথ্য জ্ঞাত আছেন। ফ্রাউ সিমেনের গৃহে

ভারতীয় ছাত্র সর্বাধিক হইয়াছে। তাঁহার বাটতে ভারতীয় ভোজ্যে বহুগুণ পরিভৃশ হইয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ডক্টর জানেক্সট্রের দাশগুণ, ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর তুকারাম লাভডু, ডক্টর হরিশ্চন্দ্র, অধ্যাপক গুনে, ডক্টর সোরাবজী, (ইনি পরে নাম পরিবর্তন করিয়া ডক্টর তারাপোরওয়ারা নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন) এমন কি বর্তমানে বেবে ষ্টেটের গভর্ণর ঐপ্রকাশণে সিমন্-পরিবারে আদৃত হইয়াছেন। সুতরাং ফ্রাউ সিমন্ যেমন আমাদের পারিবারিক বন্ধন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, নিদেয়ারার ততটা না হইলেও কতকটা জ্ঞাত ছিলেন। তিনিই আমার পক্ষ ঘরিয়া বালিনকে বুঝাইলেন। বালিনের আজ দুই বৎসর পর সম্ভবতঃ প্রতীতি হইল যে, আমার দেশপ্রেম প্রকৃত নহে। দেশোদ্ধারের চেষ্টা আমি বাম হস্ত করিতে ইচ্ছুক, দক্ষিণ হস্ত নিয়তই আত্মপ্রতি ও পরিবারের উন্নতির জন্য কর্মে রত থাকিবে।

নিদেয়ারারের বাটতে নৈশভোজন সমাপ্ত করিয়া রাত্রি ১১টার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে বাত্রা করিলাম এবং পরদিন প্রাতে ৬টার হালে পৌঁছিলাম। হালে পৌঁছা পর্যন্ত আমার উৎসেগ ঘুচে নাই।

ভৎপরে হার বালিনের সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে এরূপই মনে হইতেছিল, কিন্তু পূর্তমাসে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। অধ্যয়ন শেষ হইলে বালিনের সাহায্যে অনেক কার্য উদ্ধার হইবে, এই কথাও মনে জাগিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ

১৯১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। সে সময়ে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জার্মানীতে ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে আমরা বালিনে ভারতে বিপ্লব সংঘটনের জন্য যে দল বাঁধি তাহার প্রেসিডেন্ট পদে হার বালিনকেই নির্বাচিত করা হয়। বালিন তখন বালিনেই ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সহ আমি হার বালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বালিন দীর্ঘকাল বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে করানী ভাষার আলোচনা করেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রত্যাবর্তন কালে বীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিরাট প্রতিপত্তিশালী পুরুষের সঙ্গে কি ভাবে আমার পরিচয় হইল। সকল বিবরণ শুনিয়া তিনি আমাকে ভৎসনা করিলেন। কারণ তাঁহার প্যারিসে থাকিয়া দক্ষিণ অর্ধকন্ঠের মধ্যে কোন প্রকারে সামান্য অল্পশব্দ ভারতে প্রেরণ করিতে পারিতেন আর আমি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কিছু করিতে পারিলাম না, ইহা যে আমার পক্ষে গহিত অপরাধ হইয়াছে, তাহা বলিলেন। ১৯১২ অব্দে আমি বখন প্যারিসে তাঁহার দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাই, তখন আমারই মত আর একজন সংসারী বিপ্লববাদী সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র ছাত্র ডক্টর তুকারাম কৃষ্ণ লাভডু। বীরেন্দ্রনাথ তখন অল্পশব্দিত ছিলেন। ম্যাডাম কামা, সর্দারসিংহ রাওজি বাণা, জানচাঁদ বর্দা প্রমুখ করেকজন বিপ্লববাদীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করি। তিনি বলিলেন, তখন যদি তোদের ম্যাডাম কামার নিকট হার বালিনের প্রস্তাব ব্যক্ত করত তবে আমরা করেকজন অধ্যাতকর্মী পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থাই করত

পারতাম যে, প্রচুর অল্পশব্দ ভারতের বিভিন্ন উপকূলে পৌঁছে আমাদের ভারতে অবস্থিত সহকর্মী দলের শক্তি বৃদ্ধি করতো।

তিনি আমাকে ডক্টর উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষার জন্য নিন্দা করিলেন। এমন কি হেলায় সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করার অপরাধী এবং বিশ্বাসঘাতক পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রুহ ভার করিলেন!

তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন, সুতরাং তাঁহার বিশ্বস্ততা সব্বয়ই কাটিয়া গেল।

হার বালিন আমাদিগকে সতর্ক করিলেন যে তিনি বা জার্মেন গভর্ণমেন্ট আমাদের বিপ্লবী দল "ভারত বন্ধু জার্মান সমিতি"র পশ্চাতে আছেন, এই কথা যেন প্রচার না হয়। কারণ কোন দেশেই গভর্ণমেন্ট অন্য দেশে বিপ্লব বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা জ্ঞানসন্মত বিবেচিত হয় না। যদিও প্রত্যেক দেশই নিরস্ত এরূপ চেষ্টা এক একটি তথাকথিত কমিটি দ্বারা করান, যেমন ইংল্যান্ডের বাস্টন কমিটি। দিবারাত্রি বালকান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বালকান যুদ্ধে প্রতিনিয়তই বাস্টন কমিটির লর্ড বাস্টনের গতিবিধি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাঙালেও তিনি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে বিপুল অর্থরাশি সহ উপস্থিত থাকিয়া বুলগেরিয়াকে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য দিতেছিলেন। অবশেষে জার্মান বন্ধু জনৈক তরুণ কর্তৃক তিনি নিহত হইলে বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে।

মাঝে মাঝে বীরেন্দ্রনাথ সজ্ঞানিষ রাও, বীরেন সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভ্রাতা) কেবলশান মনপুর আহমদ এবং অন্যান্য সহকর্মী সহ আমি হার বালিনের বাটতে উপস্থিত হইতাম। তিনি ভারতে বিপ্লব স্থপ্তির সম্পর্কে নানারূপ পরামর্শ দিতেন।

অয়ারলণ্ডের উপকূলে তার রোজার কেইসমেন্ট (Sir Rojer Casement) যে সশস্ত্র যুদ্ধজাহাজ লইয়া অবতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বার্থ হয়। বিচারে কেইসমেন্টকে কীসী-যজ্ঞেতে প্রাণ দিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে আর বাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে আমার পরিচিত ডে কুটিন (De-Curtin) নামক একজন বিপ্লবী ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হয়। একজন ডে কুটিনকে আমি বালিনের বাটতেই জ্ঞানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি ছিলেন শতকরা ১০০ ভাগ দেশপ্রীতিপূর্ণ ভগ্নহের অবিকারী। আমরা বালিন ত্যাগ করার পূর্ব অকস্মাত্বে এক মোটির ধাক্কায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সহাস্ত্রে বলেন, আপনারা যে পথের বাতী আমরাও সে পথের। আপনাদের গাড়ী এবং কুরিয়ার (Courier) আমাদের পরিচিত, কারণ বহুবার এই গাড়ী আমরা পেয়েছি।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, হার বালিন তার রোজার কেইসমেন্টকে অর্ধ ও অল্পশব্দ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনি আমাদের পরম হিতৈষী ছিলেন। ১৯১১ অব্দে যুদ্ধের আবহাওয়ার পরিবর্তন হইলে আমি ফ্রাউ বালিনকে এক পত্রে তাহার যুত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তিনিও একখানা পত্র লিখিয়া স্বামীর আত্মহত্যার কাহিনী জ্ঞাপন করেন। তিনি এবং তাঁহার পালিতা কন্যা উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। একটি মাত্র বিবাহিতা দৌহিত্রী বর্তমানে ইন্সব্রক (Innsbruck) আছেন। ইন্সব্রক রাশিয়ার অধীন।

বেঙ্গবাড়ী-আইনের চোখে

ডক্টর শত্ৰুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

বেঙ্গবাড়ী হস্তান্তর প্রশ্নটির তিনটি দিক রয়েছে :

(১) আইনগত, (২) রাজনৈতিক ও (৩) নৈতিক বা

নীতিগত। প্রশ্নমাত্র বিষয় থেকে দুটি কথা ওঠে : (ক) ইহা কি সীমানা পুনর্নির্ধারণ সক্রান্ত একটি প্রশ্ন? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে এর সমাধান নির্ভর করবে রাডক্লিফ ও বাগে রোয়েদাদের ব্যাখ্যার উপর। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট—বাগে রোয়েদাদের পূর্বে পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোন বিরোধ তোলে নি। আলোচ্য বিষয়ে রাডক্লিফ যে রোয়েদাদ দেন, তা বেশ পরিষ্কার। পাকিস্তানের যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকতো যে, তার অঞ্চলের একটি অংশ ভারতে চলে গেছে, এ অবস্থায়ও সে বিরোধ তুলতো না, এমনটি ভাবাই যায় না। আমরা প্রায় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের বিবৃতি শেয়েছি। ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সকল ব্যাপারটা সম্পর্কেই এই ভুলসোক অবগত ওয়াকিবহাল থাকবেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, তিনটি পরিকল্পনা (১৯১৬, ১৯২৩ ও ১৯৪৭ সালে রচিত) অনুসারে পাকিস্তানের এক একর জমিও ভারতের দখলদারীনেই। বাগে রোয়েদাদের আগে বেঙ্গবাড়ী সম্পর্কে পাকিস্তান কেন কোন দাবী ওঠায় নি, সে প্রশ্নের জবাব এইখানেই রয়েছে। কোন বিরোধ ছিল না বকেই বাগের পক্ষে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসার কারণ হটে নি। স্তবরাং বাগে রোয়েদাদের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় এক্ষণেই হতে পারে না।

(খ) সীমানা পুনর্বিভাগের প্রশ্ন যদি এইটি না হলো, তা হলে এ নিশ্চয়ই ভারতভূমির একাংশ পাকিস্তানকে প্রত্যাপনের প্রশ্ন। গত ৩০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রশ্নটি যখন উপস্থাপিত হয়, সে সময়ে পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে আমি আমার অমিত প্রকাশ করি। আমি বলি যে, ভারতের সংবিধান অনুসারে এরূপ হস্তান্তর চলতে পারে না। ভারতের কোন একটি অংশকে বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তে প্রত্যাপনের অধিকার রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান মন্ত্রীর নেই। এমন কি, এ কার্য সম্পাদনের জন্য বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টও কোন আইন প্রণয়নের অধিকারী নহেন। পরে অপর আইনজীবীদের প্রকাশিত অভিমত সংবাদপত্রে পাঠ করে আনন্দ পাই। ৩০শে ডিসেম্বর আমি যে বক্তব্য পেশ করি, তাঁরা সকলেই তার সঙ্গে একমত হন। আলিপুর বাবের একজন দাখিল ব্যবহারকারী জাহাঙ্গীরের মাঝামাঝি আমরা অভিভূতেরই লক্ষণ মত ব্যক্ত করেন। পরে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্যান্য আইনজ্ঞদের মুখেও একই অভিমত প্রকাশিত হয়। এ প্রশ্নে আমরা কিন্তু একে জ্ঞানের সাথে পরামর্শ করি নি। অথচ আমাদের সব ক'জনই একই মত হয়ে ঝাঁড়ায় যাতে আমাদের ব্যক্ত অভিমতটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই প্রমাণিত হয়।

সংবিধানের ৩নং ধারার পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের অধিকার বিবেচনা করা আছে। আইনের একটি সুবিধিত সূত্র রয়েছে, যার মর্ম—যে আইন সম্প্রতি, সেখানে নতুন কোন ভাষ্যের অবকাশ নেই। আইনের শাসনের ক্ষেত্রে পরিষ্কার কথা যেটি, সে হচ্ছে—আইনসভা যখন সম্প্রতি সক্রান্ত ব্যাপার নিষ্পত্তির এক বা ততোধিক পদ্ধতি

স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অপর যে কোন পদ্ধতিই বর্জন করতে হবে বরাবর। সংবিধান দ্বারা স্পষ্ট ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে পার্লামেন্ট কোন আইন প্রণয়নে সক্ষম নহেন। ভারতের একটি অংশকে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তে হস্তান্তরকল্পে আইন প্রণয়নের অধিকার সংবিধানে পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়নি।

(২) রাজনৈতিক : ব্যাপারটি সেক্ষেত্রে ভারতের একটি আভ্যন্তরীণ সমস্যা, সে অবস্থায় এর সমাধান খুব সহজেই হতে পারে। ইহা বেশ স্পষ্ট যে, নিজের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ও তথ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আলোচ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। তিনি ভাবেন যে, তাঁর ক্ষমতা হয়েছে, কিন্তু সংবিধান অনুসারে চলতে পারে—অবগত এ খুব একটা বেশিরকম কল্পনা, তবু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইন সভার মতামত না নিলেই নয়। আবার বলতে হয়, এই বিষয়টিও সংবিধানের ৩নং ধারায়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রধান মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, তাঁর ধারণা ছিল যে, এই হস্তান্তরে পশ্চিমবঙ্গের সম্মতি রয়েছে।

অথচ আমাদের মুখ্য মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ কখনই এতে সম্মতি দেয় নি। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার মতামত সুবিদিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানকার আইন সভা এক ব্যাক্যে উক্ত হস্তান্তরের বিরোধিতা জানিয়েছেন। এমনটি মনে করা চলে না যে, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মির নূন আমাদের সংবিধানের ৩নং ধারাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিও ভুল ধারণার বশবর্তী ছিলেন। এই অবস্থায় কোন চুক্তি হলেও সেটি নাকচ হয়ে যায়। আর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এমন ক্ষেত্রে আপন আপন দায়িত্ব পালনে অব্যাহত করলেও কাউকে গোল দেওয়া চলে না।

এ ছাড়া আমাদের ধারণা—প্রধানমন্ত্রী একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাতেই ভারতের নামে কাজ করতে পারেন। অন্তর্গত এরূপ ক্ষেত্রে তাঁকে পার্লামেন্টের মতামত গ্রহণ করতেই হবে। চুক্তি অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের ভেতর পত্র-বিনিময় হয় নি, এমনটি কিছুতেই ভাবতে পারা যায় না। আমি মনে করি, আলোচ্য প্রসঙ্গে স্ব স্ব দেশের অভিমত জানাবার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পাক প্রধানমন্ত্রীর হাতে সময় ছিল প্রচুর। বলতে কি, সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামত না নিয়ে এ ধরণের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণই ছিল না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সামনে।

বলা হয়েছে যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চুক্তিটি যদি কার্যকরী করা না হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। আমি বুঝি যে, দেশের কল্যাণের মতামত নেবার সময় যেখানে নেই, সেক্ষেত্রে—অন্তর্ভাবে বলতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের নাম করে বা কিছু করবেন, তা কার্যকরী করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

প্রধান মন্ত্রী যদি ঘোষণা করেন যে, তথ্য ও আইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তিনি চুক্তি করতেন, সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মর্যাদা ফুঁদে হবার কি কারণ থাকতে পারে? মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, ভুলের স্বীকৃতিতেই মহত্ত্ব। প্রধানমন্ত্রী যদি আন্তর্জাতিক ঘোষণাটি করেন, তা হলে আন্তর্জাতিক মর্যাদা তাঁর ফুঁদে হবে না। পক্ষান্তরে বিভিন্ন জাতি বলবে: “এই একজন মহাপুরুষ যিনি মহাবাহুল্য ভুল করতে পারেন কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করার সাহস তাঁর আছে এবং দেশের সবিধান-বিবোধী কোন কিছুই তিনি করবেন না।” নেপোলিয়নের মতো একজন পক্ষম প্রতিভাবান ব্যক্তি—ইতিহাসে ঝাঁক জুড়ি নেই, তিনিও ভুল করেছিলেন, যার জন্য তাঁর সাম্রাজ্যের বিশেষ পর্দা ঘটেছিল।

মিউনিক চুক্তির সঙ্গে এই চুক্তির তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু কোনরূপ তুলনাই হয়ত সম্ভব নয়। তার উইলহেল্ম চার্লিস তাঁর ‘দি গ্যাপারি ষ্টর্ড’ গ্রন্থের ‘দি ট্র্যাজেডি অব মিউনিক’ (‘মিউনিকের সর্বনাশ’) শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন—সর্বোপরি চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিরক্ষার বুটেনের কোনরূপ চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা ছিল না কিংবা কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল না তাঁর দিক থেকে, এমন কি বেসরকারী ভাবেও। কিন্তু জাঙ্গালি যদি চেকোস্লোভাকিয়াকে আক্রমণ করে, সে ক্ষেত্রে তার উপর যুদ্ধ অভিযান চালানোর স্পষ্ট দায়িত্ব চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সের ছিল। এরূপ বলা হয় যে, ঠিক যুদ্ধের ফ্রান্স নিজের বাধ্যবাধকতা অনুসারে কাজ করেনি। এই বিরোধ প্রামাণিক গ্রন্থ-রচয়িতা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে এইরূপ বলেন: “চেকোস্লোভাকিয়া যদি আত্মসমর্পণে (জাঙ্গালির নিকট) স্বীকার করে থাকে আর তার পরিণতিই যদি হ’ল যুদ্ধ, সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পক্ষে তার প্রতিশ্রুতি বন্ধ করা উচিত ছিল। তবে চেকরা যদি চাপে পড়ে আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়ে থাকেন, সে অবস্থায় ফ্রান্সের মর্যাদা টিকে গেলো।”

তৎপরে তিনি বখারীতি বলেন, “আমরা এই ব্যাপারটির (প্রতিরক্ষা) বিচারের ভার ইতিহাসের হাতেই ছেড়ে দেব।”

স্পষ্টই মিউনিক চুক্তির সমর্থনে বুটেন ও ফ্রান্সের স্বপক্ষে কিছু বলবার রয়েছে কিন্তু বেলুবাড়ী চুক্তির সমর্থনে বলবার মতো কিছু আছে কি? বেলুবাড়ী ভারতেরই একটি অংশ। আমাদের সবিধানের তশলীলেই এইটি স্পষ্ট করে বলা আছে। বর্তমান চুক্তি অস্বীকারের আগে পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোন দাবী পেশ করে নি। স্মৃত্যুতাপ শেলের জনগণের মতামত না নিয়ে এই যে চুক্তি হয়েছে—মিউনিক চুক্তির সঙ্গে একই পর্দায়ে এ ঠাণ্ডাতে পারে না। সেই কারণেই একটি অচল চুক্তি অনুসারে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে বলে বলা হচ্ছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি উহা কাঙ্ক্ষণী করতে নারাজ হন, সেক্ষেত্রে তাঁর আন্তর্জাতিক মর্যাদা বাহত হওয়া সম্ভব নয়।

(৩) কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—বিবহট্টর নৈতিক বা নীতিগত নিক। এক্ষণে এইটি ছয় ভাগে সমর্থিত হয়েছে যে, ভারত দালাই লামাকে এদেশে আশ্রয় দিয়েছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী স্মরণ ভাষণ বলেছেন—কোন অবস্থাতেই ভারত দালাই লামাকে চীনের হস্তে তুলে দিবে না। ভারত যে স্বাধীনতা অর্জনের পর একজন উদাত্তকে আশ্রয় মঞ্জুর করেছে, এ সত্যি একটি

চমৎকার কাজ, একটি বিরাট অস্বীকার। নিজের যে প্রেই ঐতিহ্য রয়েছে, তার সঙ্গে মিল রয়েছেই হয়েছে এই ব্যবস্থা। কাহিনী চলতি আছে—ভারতের এক মহান নৃপতি একটি বাজ পাখীর আক্রমণ থেকে একটি পারাবতকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের দেহ-মাংস বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আক্রান্ত পারাবতটি রাজার নিকট আশ্রয় চাইলে পরই এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। আমাদের ধারণা যে, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর এই একটি কাজেই ভারতের মর্যাদা অনেকগুণে বর্ধিত হয়েছে। নেপোলিয়ানের পতনের পর তিনি যথেষ্ট সম্রম ও সাহস নিয়ে পত্র মারকত বধন আশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন, গ্রেট ব্রিটেনও তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেনি—হতে পারে তিনি ছিলেন ব্রিটেনের পরম শত্রু। সেদিনে গ্রেট ব্রিটেনের উত্তর ছিল সেট হেলেন।

দালাই লামাকে আশ্রয়দানের পরিণতি আমাদের প্রধান মন্ত্রী বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। চীনের এ অসন্তোষ কারণ ঘটতে পারে—আমি বলি না যে, ঘটবেই। এই নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব বাধতে পারে অথচ সেদিন মাত্র ছটি বাট্টই ‘পঞ্চশীল’ স্বাক্ষর করেছে। পরিণতি কেমনও আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভারতের পক্ষে কাজ করার জোর সাহস দেখিয়েছেন এবং আশ্রয় মঞ্জুর করেছেন দালাই লামাকে। তিনি এ-ও বলেছেন যে, মহান লামার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

দালাই লামা একজন মহান ধর্মীয় নেতা ও তিব্বতের রাজা। আলোচ্যক্ষেত্রে অবশ্য তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আশ্রয় চেয়েছেন এবং ভারত তা দিয়েছে। বেলুবাড়ীর আট হাজার নয়নদার প্রতি আমরা কি একই নীতি সম্প্রসারিত করতে পারি না? প্রায় বারো বছর আগে এই হতভাগ্যরা পাকিস্তানে তাদের পৈতৃক ঘর-বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হন। তারা ভারতে চলে আসে এবং আশ্রয় চায়। ভারত সে সময় তাদের আশ্রয় দেয়। হিম্মত হতভাগ্য এই মানুষগুলি থাকবার ঠাই পেয়ে ঘরদালা ও কুঁড়ে তৈরী করে নিয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ আশ্রয়ের ভারতের নাগরিক বলেই নিজেদের ভাবে। তারা এ-ও ভেবে নিয়েছিল যে, পাকিস্তানের দুর্ভাবহার তাদের আর পেতে হবে না। তারা কঠোর শ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করে চলেছে। ভারতের প্রতি রয়েছে তাদের আনুগত্য। তারা ভোটাধিকারও পেয়েছে এবং গত সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেও। এতে তারা যে ভারতের নাগরিক, সেইটি পরিহার প্রমাণিত হচ্ছে। এক্ষণে, তাদের একথা কি বলা ঠিক হবে—পাকিস্তানে কির বাও? ভারত তোমাদের যে আশ্রয় দিয়েছিল, এখন আর তা দেবে না? মানবতার দিক থেকে দালাই লামার ব্যাপার ও এ ব্যাপারটির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে কি? আমি অবশ্য কোন পার্থক্য দেখি না। এই মন্ত নৈতিক প্রশ্নটি উঠেছে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা যেন সমস্ত সমাধানে এগিয়ে বাই।

একথা যদি ঘরেও লওয়া গেল যে, সবিধানের উপযুক্ত সমোদন মারকত আবহুজ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পালমেটকে দেওয়া হয়েছে, এ-ও যদি বলা গেল যে, একটি অচল চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভারত বন্ধ করতে পারলো না বলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের

প্রধান মন্ত্রীর মধ্যাংশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তখনও জিজ্ঞাসা ওঠে—আপনি কি ভাবে এই বিরাট নৈতিক প্রশ্নটির সমাধান করছেন? প্রশ্নটি হলো—কতকগুলি মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার পর বাদের কাছ থেকে তারা পালিয়ে এসেছিল, তাদের হাতেই আবার প্রত্যর্পণ করা।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, ভারতের খাতিরে বেঙ্গবাড়ীকে উৎসর্গ করা প্রয়োজন। এই ক্ষুণ্ণ ভূখণ্ডটি যদি পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে পাকিস্তান সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু তোষণ নীতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে কখনই কাজ হবে না। ইহা খুবই স্পষ্ট। গত বারো বছরে যা ঘটেছে বলে আমরা জানি, তা থেকেই এ ধারণা সন্দেহাতীত হয়। আমাদের স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত গঙ্গু বা বলেছেন এবং দেশরক্ষা সচিব শ্রীমেননের যে উক্তি—এক ইঞ্চি পরিমিত ভারতীয় জমির উপরও বিদেশী আক্রমণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন না, এর পর জেনারেল খিয়ারা সেদিন বলেছেন যে, ভারতের সৈনিকরা পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, একবার পরও বেঙ্গবাড়ী হস্তান্তরের কোন কৈফিয়ৎ থাকতে পারে কি? পারে বলে অন্ততঃ আমি মনে করি নে।

সুতরাং বাংলার জনগণ এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট একমত ও

বঙ্গবন্ধুর হয়েছে। বেঙ্গবাড়ী পাকিস্তানকে কোন অবস্থাতেই দেওয়া হবে না। পাকিস্তান তার বা ইচ্ছে হয়, করুক।

আমি আবার এ বিষয়ে বিশ্বের জীবিতদের ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য লেখকের কয়েকটি স্মরণীয় কথা উদ্ধৃত করব: অপর জাতিগুলির সঙ্গে আচরণে মন্ত্রীদের প্রথম করণীয়—সংঘর্ষ ও যুদ্ধ এড়িয়ে চলা আর সর্ববিধ আক্রমণ পরিহার করা—সে জাতীয় কার্যেই হোক, কি আদর্শগত লক্ষ্য থেকেই হোক। ১৯৬৬ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বদেশের জনগণ বাদের নিকট থেকে তাঁরা ক্ষমতা পেয়েছেন, তাঁদের রক্ষার নিমিত্ত সর্বশেষ উপায় হিসাবে এইটি যেখানে সম্ভব ও অপরিহার্য মনে হবে কিংবা যে স্থলে মনের সঙ্গে চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ বোঝাপড়া হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বাদ দিলে হবে না। অবস্থা তেমনি অনিবার্য হয়ে যদি দাঁড়ায়, তা হলে বলপ্রয়োগ চলতে পারে।

ভারত যদি এই নীতি অনুসারে কাজ করলো, একটি বৃহৎ, সম্ভবত ও অনিশ্চিত ভিত্তির উপর সে দাঁড়াতে পারবে। এই শুষ্ক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই ভারত আপন কর্তব্যের স্থির করুক, আর তাতে করেই সে সমগ্র বিশ্বকে টেনে আনতে পারবে নিজের দিকে।

মনের আকাশ

হুম্মিয়া

খুব বেশী দূরে নয়,

এক দিন চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা উঠেছিল ফুট

খুব কাছাকাছি।

মনের আকাশে লাগে তার

এ আলোর কলকানি

নীচের নিখরের মাঝে বহে চলে শুধু

না-বলা ইখারের বাণী।

ঈশ্বরের বিদ্যাম্পর্শে উঠেছিল ভাসি

একটুকু হাসি

হৃদয়ের মুখে।

এক কলি গান আর একটুকু ছোঁয়া

হৃদয়েরই প্রাণে এনেছিল

বসন্ত রাগিণী।

একখানি বাঁকা চাঁদ আর একটি কবিতার

কালো আঁখির স্বপ্নালু মায়ার

আর শুভ্র রজনীগন্ধা

মনের আকাশকে ভরিয়ে দিয়েছে

পরিপূর্ণ আলোর অন্তল ছায়ায়।

হঠাৎ থেমে গেল গান

এলো বুঝি বিচ্ছেদ-প্রহর

নিবে গেলো আলো

কবিতাও হ'ল না পূর্ণ।

আচন্কা বড়ের হৃদয় ঘূর্ণিতে

মনের আকাশে নেমে এল

ঘন কালো মেঘ।

কালো মেঘের অন্ধকারে বড়ের কটকার

চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা হয়ে গেল লীন

মদের পেয়ালা গেল ভেঙে

স্বপ্ন গেলো টুটে।

খামলো বড়, কালো মেঘ গেল দূরে সরে

মনের আকাশ ঘিরে চলছে

শুধু খমখমে হাওয়া।

হাওয়ার আফালনে

বড়ের ঘূর্ণাবর্তে

চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা কিন্তু রয়েছে

ঠিক সেই ভাবে

যেমন হৃদয়ে উঠেছিল ফুট

জীবনের প্রথম সন্ধ্যায়।

হায়, নেই শুধু আলো আর গান

শুধু নেই ইখারের অদৃষ্ট পালক

নেই তবু একটু ছোঁয়া আর একটি কবিতা

মনের আকাশ হারিয়েছে সব মনুভূতা।

মনের আকাশ ঘিরে রয়েছে শুধু

হিসাবের খাতা।

প্রতিষ্ঠান মাঝেই আজ-কাল বিরোধ-বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাদি প্রায় লেগেই আছে। বিশেষ করে শিক্ষায়তনগুলিতেও তার ধারা প্রবহমান হতে চলছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আকারে বৃহৎ হতে বৃহত্তর হতে গিয়ে প্রকারে সংগতি রেখে চলতে পারছে না; দিনের পর দিন স্থানে-স্থানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার্থী বা শিক্ষাসেবী-কর্মী সাধারণের নানাদিক দিয়ে বোঝা পড়াতেই কাল কেটে যাচ্ছে, কাজ এগুচ্ছে অল্পই; সমস্তার সমাধান কোথায়, অনেকেই তা ভাবছেন। কম-বেশি এমন ঘটনার আভাস বহন প্রায় প্রতিষ্ঠানের পিছনেই ধুম্বিত, তখন এটিকে সাধারণ সমস্তার মতো ধরে নিয়ে সমাধানেরও স্বয়ং-নির্ণয় করা আবশ্যিক সাধারণ ভাবেই।

মনে করা যাক, 'নিম্নলিখ জ্ঞানায়তন' একটি বহুদিনকার শিক্ষাপীঠ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভাগ চর্চা হয়ে থাকে সর্বত্রই; কিন্তু বিভাগের সঙ্গে প্রত্যাহের জীবনযাত্রাকেও সুরক্ষিত করে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার মনুষ্যকে বিকশিত করে ভোলাবার লক্ষ্য গ্রহণ করেছিল এই 'জ্ঞানায়তন', এবং এই মর্মে তাকে বিশেষ ভাবে একটি আশ্রমের আবাসিক রূপও দেওয়া হয়েছিল প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই। কালের ধারায় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গঠন-কার্য্যমোটি ঠাঁড়িয়েছে এসে এইরূপ : ১। সর্বোচ্চ প্রতিনিধি-পরিষদ ২। ব্যবস্থাপক সমিতি ৩। বিভাগসমিতি ৪। প্রাক্তন-মণ্ডলী। এ ছাড়া আরেকটি সংস্থাও এর মধ্যে এক পাশে গড়ে উঠেছে। সেটি শিক্ষা-সবক-সংঘ; শিক্ষক বা অশিক্ষক বিনিই হোন, কর্মীমাজেরই এটি সাধারণ মিলনক্ষেত্র। প্রস্তাবিত সমাধান-চেষ্টার সূত্রটি নিহিত রয়েছে শেখোক্ত এই সংঘেরই মধ্যে। এজন্য এই কথা আজ বিশেষ করে খালাসে রাখা যায়।

সেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির বিভাগের দিকের ব্যবস্থার জন্ম সক্রিয় রয়েছে একটি বিশেষ মণ্ডলী—'বিভাগসমিতি'; অল্পকাল ভাবে এর দিন-চর্য্য দিকটিরও দেখা-শুনা প্রয়োজন, কিন্তু সেজন্য কোনো বিশেষ মণ্ডলীর ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। অপর পক্ষে, বিশৃঙ্খলা বনীভূত হচ্ছে দিনচর্য্যের দিক থেকেই বেশি। দিনচর্য্য হচ্ছে দিনের চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্মের সুবিধিত উদ্ভাবন ব্যবস্থা। 'জ্ঞানায়তনে' এই দিকের বিশৃঙ্খলা বিভাগচর্য্যের দিকটাকেও দিনে দিনে ব্যাহত করে তুলছে। যতই মনে হয়, 'বিভাগসমিতি' আছে বলেই পড়াশুনা ও পরীক্ষাবাহিত পাঠের কার্য্যমো তবু একটা কিছু খাড়া রয়েছে, কিন্তু, সেক্ষেত্রে নৈমিশ্র জীবনযাত্রা বা পরিবেশ ব্যবস্থার জন্ম তেমনি একটি সমিতির অভাবেই কি তবে জন্ম দিকে ভাঙন লাগল? পরিবেশের দায়িত্ব-স্বাক্ষর থেকে-আবোপিত আদর্শ নিয়েছে সেখানে শিক্ষাসেবী-সংঘ। কিন্তু কর্তৃত্ব নৈমিত্তিক উৎসবাহি অনুষ্ঠানমেরী তাঁদের কাজকর্ম রয়েছে সীমাবদ্ধ। পরিবেশের এই দিনচর্য্যগত নিত্য অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও বর্তায় অস্থায়ী এক নিজস্ব সংবিধানে লিখিত আদর্শ অনুসারে, স্বভাবত সাধারণ কর্মীদের সংস্থা এই 'শিক্ষাসেবী সংঘ'ের উপরেই। সে স্থলে, কথায় থাকলেও, কাজে সেই দায়িত্ব স্বাক্ষর সূত্র পরিচর্য্য কিন্তু তেমন সুগোচর নয়। এখন, পরিবেশের দায়িত্ব স্বাক্ষর বলতে কথটা কতদূর যায়, সেটুকুতে অবহিত হওয়া আবশ্যিক। কেন না, সেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি বহন সূত্রভর ছিল,

সেদিন সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বিভাগ ও জীবন সমন্বয় অর্থও আর্থশেই প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাগচর্য্যমূলক ছোটখাট সাপ্তাহিক রচনা পাঠ সভার পাশাপাশি জীবনচর্য্যমূলক মাসিক শিক্ষার্থী সম্মিলনের ব্যবস্থাটিও প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠান এখন বড় হয়ে গেছে; কেবল বয়সে বা সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী সমাজই নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশটিও বদলেছে এবং বেড়েছে। সুতরাং এখনকার আয়োজনও সবদিকের অল্পরূপ হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু ছোট কি আর বড়োই কি, স্থানীয় লোকসমাজ সমগ্রভাবে সমস্তালে মূলত: এইরূপ সর্বাঙ্গীন চর্য্যের অন্তর্কূল ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত হয়ে না চললে, কোনো দিকটাই সুপরিণত হয়ে উঠবার নয়; তাতে দু-একদিকের কাজ চলাটোও ক্রমে অচল হয়ে আসে; বিশেষ করে এ কথাটা ক'জনে সেখানে ভাবছেন, তাও আজ প্রতিষ্ঠানের হালচালে স্পষ্ট বোঝাবার উপায় নেই।

পাঠানির্বাচন, প্রতিদিনের পড়শুনা, সাময়িক পরীক্ষা, পাশ-ফেল,—এ সবের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন সেখানে 'বিভাগ-সমিতি'। কিন্তু আদর্শ বা উদ্দেশ্যে ধাই বিভাগিত থাকুক, স্বভাবচরিত্র সমন্বিত জীবনযাত্রার দিকটার কর্তৃত্ব উদাসীন হ'তে হ'তে আজ এই 'নিম্নলিখ জ্ঞানায়তনে'ও শেষে পাশ-ফেল-এর অর্থাৎ ডিগ্রি-কেন্দ্রিক মাহুলি লক্ষ্যেই এসে ঠেকেছে বিভাগচর্য্যের বা-বিচ্ছিন্ন উজ্জম। এর প্রতিক্রিয়া সমূলে প্রতিষ্ঠানের আদর্শধর্মী। সেই প্রতিক্রিয়া থেকে বোধ করতে পারে এবং একই কালে বিভাগচর্য্য থেকে বোধ, চরিত্র ও ব্যবহারের সঙ্গে সুসংগত ক'রে সর্বাঙ্গীন শিক্ষাকে জীবনে সর্ব-ভাবে সার্থক করতে পারে,—'বিভাগ-সমিতি' ও 'শিক্ষাসেবী সংঘ'—এর সহযোগমূলক কৃত্ত-ব্যবস্থাই তার একমাত্র উপায়। এই জন্মই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই দুটি-সংস্থারই সমন্বয়সাঙ্গম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক। তাই যদি হয়, 'শিক্ষাসেবী সংঘ'ও কাজ হবে তখন, 'বিভাগসমিতি' কতক নিধারিত পাঠ্যসূচীর মতো প্রতিষ্ঠানের সকলের আচার্য্যস্বত্বের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ নির্ণয় করা এবং প্রতি মাসে বড়োদের নিকট থেকে সংগৃহীত প্রত্যেকটি পরিবার ও ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীদের দিনচর্য্য-লিপি,—অর্থাৎ বিভাগবিবরণী রূপ প্রোগ্রাম রিপোর্ট-এর মতো চার্ট একটি পূরণ ক'রে জড়বা বা বেঘনে সেগুলি (ক্রমে সমস্তমতো বড়দের নিজেদের চার্টও) পরীক্ষা করা। সে সঙ্গে কর্তৃপক্ষেরও স্বাভাবিক হবে,—'বিভাগসমিতি' পরিচালিত বিভাগপরীক্ষার নথ্যের সহিত সমান গুরুত্ব দিয়ে 'শিক্ষাসেবী সংঘ'—পরিচালিত এই দিনচর্য্যালিপি পরীক্ষার নথ্যের মিলিয়ে দু'দিকের বাচাই-করা ফলের উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বোচ্চ মানের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরই শেষ পাশ-ফেল নিরূপণ করা।

মনে রাখা দরকার, শিক্ষা জিনিষটি যেমন একটি সাধনা, তেমনি শিক্ষা একটি বিজ্ঞানও। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবে এ বিষয়টির অনুশোধন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। নথ্য-দেওয়ার বৈজ্ঞানিক রেকর্ডের ভিত্তিতে বিভাগের দিকটা যদি চলতে পারে, তবে সেখানে ঐ পদ্ধতিক্রমেই আচার-ব্যবহারের জন্ম-অবকাশও

সমান ডাই নিয়ন্ত্রণপক্ষে। অতএব এটা অব্যবহিত কিছু নয়।
পঞ্চম এরূপ দিনচর্চার চার্ট-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলেই আশা করা চলে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা এর পর থেকে 'জানায়তনে' এসে আর কিছু না হোক, অন্তত বিজ্ঞান মতোই পাশের নথ্যের অনিবার্ণতার দ্বারা পড়ে হলেও, মনন এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে চরিত্রবানকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়রূপে জানাবে এবং গুরু থেকে শেখাবি, বিজ্ঞান ও জীবনযাত্রার দুটুক দিয়েই সমভাবে উৎকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত থেকে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে চলবে। তখন সেই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা যেমন তাদের বিজ্ঞান উন্নতিলাভের সাহায্য হবে, তেমনি সুনিয়ন্ত্রিত সেই পরিবেশে সংঘত ও নিবিষ্ট-চিত্তের বিজ্ঞানিষ্ঠাও জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তুলবে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আজ-কাল যেমনই দেশে দারিদ্র্য বাড়ছে, জীবনে মাছের চরছাড়া হচ্ছে, তারই পাশে তেমনিমতর স্থল কলেক্টর এলাকার বাড়ি ঘর, আসবাবপত্র, বই খাতা, সংগ্রাম, পরীক্ষা, ও প্রাইভেট মাষ্টারী কত না বহিঃসীমার দিকে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানকেন্দ্রিক বিষয়গুলির বাতল্য দেখা দিয়েছে এবং তা বেড়েছে ব্যয়বহুল ছন্দছাড়া রূপে; সবই ভালো, এবং অনেক কিছুই প্রয়োজন না আছে এমনও নয়, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিজ্ঞান মান, এবং তৎসঙ্গে অমুখ্য এবং নিষ্ঠা যে সেই পরিমাণেই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এইটুকু ভাববার বিষয়। একে তো জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে এসব বহিঃসীমার আড়ম্বরের সংগতি থাকার প্রশ্ন একটা আছে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার কথাও মনে রাখতে হয়। সময় বুঝে কাজের বহর বাড়ানো কমানোর কথাটাও নেহাৎ অব্যবহিত নয়—তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। ছাত্রছাত্রীদের মন আজ এমনিতেই বাইরের বহু বিষয়ের আকর্ষণে বহাদকে বিক্ষিপ্ত; বিষয় ও ব্যবস্থা প্রাচুর্যের প্রভাবে পড়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রেও মনের নিবিড়তা ও একাগ্রতা তাদের বাড়ছে না কমছে, সেটাও দেখবার বিষয়। এক কথায় বিজ্ঞান মন বসছে না, এইটাই পীড়াক্ষে সমস্যা। ব্যক্তি আছে, বিষয় আছে, ব্যবস্থারও কাণ্ডা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অভাব দেখা যাচ্ছে একটি জিনিসের; সেটি হচ্ছে সাধনার বিষয়ে মন বসানোর উপায়—এক কথায় আছে সবই,—নাই! শুধু সব দিকে সামঞ্জস্য রাখা নিয়মিত মনোযোগ ও যত্ন।

মনোযোগ ও যত্ন দ্বারা বহিঃবিষয়কে অন্তরে আয়ত্ত করা যায়। বিষয়ে সহজ অমুখ্য ও অধিকার স্বভাবতঃ ধীরে জন্ম থেকেই পেয়ে থাকেন তাদের কথা আলোচনা। ধীরে তা থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত, তাদের জন্ত, কুজসাধ্য হলেও, কৃত্রিম উপায়ের পথ একটি থাকে—সেই পথই হচ্ছে শিক্ষা বা মনোযোগ ও যত্নের পথ। বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই যত্ন ও মনোযোগের প্রত্যক্ষা আমোদ করি, কিন্তু প্রক্রিয়ার দিকে কিছুই বিশেষ করি না, উপদেশ দিয়েই খালাস,—তাদের উপরই আর-সবটা ছেড়ে দিই। অথচ দেখা যায়, স্বভাবে যাদের সে-ভিনিস নেই, সমাজে তাদের সংখ্যাই বেশি। এবং শিক্ষারও প্রয়োজন হয় মেধাবীদের চেয়ে এই সাধারণদের জন্তই বেশি মাত্রায়। এই সহজ সংস্কারবজিতদের মন বিজ্ঞান সমুদ্রত করাত হলে, শুধু বিজ্ঞান দিকে পড়াশুনার বিশেষ একটি ক্ষেত্রেই নয়, উঠন্তে-বসন্তে চলতে-বিরতে এমন কি খেতে-শুতে—সব দিক দিয়েই সর্ববিধে তাদের সর্বসময়ে মনোযোগ

ও যত্নের অভ্যাসে অভ্যস্ত করানো দরকার। কেন না,—বিশিষ্ট শিক্ষার্থী বলছেন,—‘যার নাম দেখা, তারই নাম শিক্ষা। ইহাও জানি, অভ্যাস দ্বারা, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ করিয়া কর্ম শিক্ষা। যাহা-যার এই যে শক্তি দ্বারা কর্ম অভ্যাস হইয়া যায়, সেহেই বৃত্তিবিশেষে পরিণত হয়, যে কর্ম ইচ্ছাপূর্বক যত্নপূর্বক করিতে করিতে অনিচ্ছাকৃত ও অব্যবহিত হইয়া পড়ে, সে শক্তি হেতু মাছের পত্তকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। (যোগেশ বিজ্ঞানিধি, শিক্ষাপ্রবন্ধ, পৃ: ২০)

প্রাত্যহিক অভ্যাসের দ্বারা মন স্বভাবতই নিষ্ঠাবান না হ'লে সেই বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা বিজ্ঞানসাধনাও চরিত্রনৈমিত্তিক বাহ্যিক হয়ে, তাতে আশ্চর্য নেই। এইজন্যই কেবল বিজ্ঞান উন্নতির প্রদ্বের ক্ষেত্রেও, বিজ্ঞানী ও তার পরিবেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা আবৃত্তিক রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানকে ধীরে জীবনের লক্ষ্য না করে লক্ষ্যশাভের একটি উপায়-স্বরূপ মাত্র দেখে থাকেন, সেই জীবনধর্মীদের অর্থশূন্য-বৃত্তিতে জীবনযাত্রার সংগতি শিক্ষাটাই, নিছক পুণ্ডিত্য বিশেষ শ্রেণীর বিজ্ঞান চেষ্টা, মহত্তর মনে হবে। তাদের কাছে দিনের প্রতিটি চলফেরাই হবে বিশেষভাবে মূল্যবান। স্তব্ধতা তাঁরা স্বভাবতই 'বিশেষ-বিজ্ঞান' চেষ্টা সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রাকেই 'একমাত্র-বিজ্ঞান'রূপে সাধনা করবেন, যার মধ্যে বিশেষ-বিশেষ বিজ্ঞানও এক একটি বিশেষ স্থান পাবার কথা। তাঁদেরই অভিমত এই যে, 'বিজ্ঞান জাহাজ, ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হওয়া অপেক্ষা স্তব্ধ-অভ্যাস লক্ষ্য ভ্রমে প্রায়। সন্ধ্যার ও সন্ধ্যাব্যবহার বাবতীর ধর্ম 'মূল'।—(যোগেশ বিজ্ঞানিধি, শিক্ষাপ্রবন্ধ পৃ: ৭।)

দেখা যাচ্ছে, বিশেষ-বিজ্ঞান বা সর্বাঙ্গীন-জীবন যে—লক্ষ্য হতেই যিনি দেখেন না কেন, শিক্ষারসম্মত জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে বিজ্ঞান ব্যবস্থা সংগতিপূর্ণ হওয়া চাই,—একথা স্বতঃসিদ্ধ।

এখন কথা হচ্ছে চরিত্র বা জীবনযাত্রার এই দরকারী ব্যবস্থাটি সমাজে চালু করবার তার গ্রহণ করবেন কে, এবং কিতাবেই বা তিনি চালু করবেন। একের নয়, একাধিক প্রয়োজন আছে—সকলের। প্রতিষ্ঠানের কোনো-বিশেষ এক-শ্রেণীর কর্মীও নয়, পরিবেশের সর্বাঙ্গীন বিস্তৃতির জন্ত শিক্ষাক্ষেত্রী ছাড়াও, নানাক্ষেত্রের নানাপ্রকার কমি-সমাবেশে গঠিত সর্বাঙ্গীন-সমাজের পরিচালনার চলেবে প্রতিষ্ঠানের এই সর্বাঙ্গীন-জীবন। নানাদিক থেকে নানা অভিজ্ঞতার সাহায্য দিয়ে নানাজনে ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক-কর্মী-সংশ্লিষ্ট এই গোষ্ঠীজীবনটিকে রচিত, নিয়ন্ত্রিত ও সেবাসমুদ্র করে বিচিত্র ঐশ্বর্যে দশ দিকে প্রসারিত করে তুলবেন। তাহলেই দেখা যাচ্ছে 'জানায়তনে'র বিশেষ ক্ষেত্রেও আসে এই বিশেষ কাজে 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'ই দারিদ্রের কথা। এবং সেই দারিদ্রের মুখাবিচারে স্বতই পরিস্ফুট হয় প্রতিষ্ঠানের 'ব্যবস্থাপক-সমিতি'তে 'শিক্ষাসেবী সংঘ'ও প্রতিিনিধি থাকার গুরুত্ব। বিশেষ এই আনন্দিক গুরুত্ববিষয়েই দেখা যায় 'জানায়তনে'র গঠনতন্ত্র অস্বীকৃতির কঁক পড়ে আছে।

অতদিকে দেখা যায়, স্বীকৃতি আছে প্রতিিনিধিসভা এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে বাইরের লোকের, এবং পরিবেশ-পরিভাগী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর আর ভিগ্নধারী বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রীও। এই গঠনতন্ত্রই সাক্ষ্য দিচ্ছে কোন বিশেষ-বিশেষ কোঠার এসে ঠেকেছে এখানে মাছের মূল্য। চাক্ষুসিত্রা দ্বারা

প্রত্যক্ষ-সংশোধন-ছাড়া হয়েও বহু মানুষই আছেন পরিবেশের মধ্যে,—প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয় নানা কাজে। জীবনযাত্রা প্রশালীর মূলা আজ শিক্ষার বর্ধি প্রকৃত প্রভাবই স্বীকৃত হচ্ছ, তবে ভালমন্দ-প্রভাব সাধারণের দিক থেকেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়ে থাকে বলে, শিক্ষক বাতিলিত সাধারণ কর্মী ও অভিভাবকদেরও অবশি প্রতিনিষিদ্ধের অধিকার প্রতিষ্ঠানের সকল স্ফায় স্বীকৃত হত। তাঁরাও তাতে বস্তু ও বসমান্নে থাকার কর্তব্যের মতোই প্রতিষ্ঠানে বাস করার ও কাজ করার সমগ্রণীর দায়িত্ব উপলব্ধি করার তাগিদ ভিতর থেকে পোতেন এবং উপযুক্ত হয়ে চলবার কিছু-কিছু চেষ্টাও করতো আপনা থেকেই তাঁরা করতেন। সেই ব্যবস্থা না থাকতে, এক-পাখাওয়ালা পাখির মতো বিজ্ঞা এখানে জীবন-নিরপেক্ষ হয়ে, উড়তে গিয়ে মূলোর গড়িয়ে এগোবার উপক্রম করছে। অথচ, ইতিহাসের নজির ইটলে দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানেই একদিন প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে সাধারণ-কর্মীদেরও পক্ষে প্রতিনিষিদ্ধের সেই সুযোগ ব্যবস্থিত ছিল; ‘শিক্ষক-সভা’ বলতে শিক্ষক ও সাধারণ সকলেরই সম অধিকারের একটি টালাও-ক্ষেত্র বোঝাত। কর্মীমাত্রই তখন ছিলেন ‘শিক্ষক’-নামাঙ্কিত। এতদূর ছিল এখানকার স্বীকৃতির পরিধি। এখন মহোচ্চ-ডিক্রিয়ারী হলেও চাকুরীতে ছাপমারা ‘শিক্ষক’ না হলে ‘বিজ্ঞাসমিতি’তে প্রবেশাধিকার পাবার উপায় নেই। সাধারণ কর্মীর স্বীকৃতি তো কোন দূরের কথা। ঠিক এই অবস্থায় একটা কথা ভেবে দেখবার আছে যে, গোড়া থেকে বিজ্ঞার সঙ্গে জীবনযাত্রার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে, কার্যত শুধু বিজ্ঞার একটা দিক মাত্র সরকারী স্বীকৃতিতে ব্যবস্থিত রেখে জীবনযাত্রার অন্ত দিকটাকে বেসরকারী ভাবে এমনি শিল্পিতার পথে গড়াতে মিলে সেটাকে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতারই পরিচয় বাড়ানো হয় কি না। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞাননিরপেক্ষ জীবনযাত্রার কথা এ-আলোচনার উদ্দেশ্য নয় মোটেই। তবে আশু-আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, জীবনযাত্রামানের দায়িত্ব এড়ানোর ফল এখনই অবিতারূপে ব’লে এসে বিজ্ঞার বাড়ি চাপছে,—এইজন্য এদিক দিয়ে প্রস্তুত হওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাত্রেরই অবিলম্বে প্রয়োজন, আর সেই প্রয়োজনেই, শুধু শিক্ষক আর ছাত্রসম্প্রদায় নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজের সাধারণের সক্রিয় ভোগ অবগতাবী। তাঁদের সকলেরই মধ্য থেকে পরিচালক-সমিতিতে সঙ্গত গ্রহণ ক’রে, বোধে ও ব্যবহারে বিজ্ঞা ও জীবনের সংগতির ব্যবস্থা করা প্রেরণ।

এই বিচারে দেখতে গেলে, স্বতঃই প্রতিভাত হতে যে, আজ কোনো মতে খুঁড়িয়ে চলতে থাকলেও সমগ্র ‘জ্ঞানায়তন’-প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম কল্যাণ ও গোঁবরের বিষয় হচ্ছে একাত্তরের অবহেলিত ‘শিক্ষাসেবী-সংঘ’ই। কেন না, প্রতিষ্ঠানকে আগমনর নীড় ব’লে সকলেই যাতে অমুভব করেন ও পরস্পর সেই অভিন্নতার আবেশ থেকে এর জন্ত কাজ করতে প্রত্যেকে আনন্দ পান, প্রত্যেক সেই সফলতার বিকাশের ক্ষেত্র হচ্ছে এই ‘শিক্ষাসেবী-সংঘ’। উক্ততম থেকে নিম্নতম,—সকল কর্মীই এখানে বহুক্ষেত্র স্বাধীনমত-প্রকাশের ক্ষমতা অধিকারী—এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বদিকের গুণ-আগন্তব্য ইচ্ছাটি সর্ববিধেই তাঁদের সেই অধিকার প্রেরণ করতে পারার

কথা কর্মীদের মতো অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজের স্থায়ী-বাসিন্দাদের পর্যন্ত এই ‘সংঘের অন্তর্ভুক্তি’ ক’রে গ্রহণ করলে ভালো হয়। প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে এঁদের সকলকে পারিপার্শ্বিক সভার অংশ নিতে বলতে হলে মতামত প্রকাশের এই সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র একটা-কোথাও তাঁদের জন্ত কিছু থাকাই চাই। এইটাই হচ্ছে ‘শিক্ষাসেবী সংঘ’ের মুখ্য সার্বকর্ম। সে সঙ্গেই থাকা চাই হৃদয়-বুদ্ধির জন্ত সামাজিকতা-প্রসারের আয়োজন। উৎসবাহুষ্ঠান খেলাধুলা, ভ্রমণ, বনভোজন, বৃত্ততা, পাঠসভা, অভিনয়, জলসা শুধে হুঁপে পারস্পরিক সহায়তা ও সেবাশ্রম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যৌথ মেলোমেলো ও চিন্তাধারা বিনিময়ের সাহায্যে এই সামাজিকতার প্রসার হতে পারে। কিন্তু নিত্যকার জীবনযাত্রা সফলতার চাঁট-পরীক্ষার প্রেরণে সন্মুখীন হলেই তখন দেখা বাবে ‘স্বীকৃতি’র কার্যকরী আসল দায়িত্বের বাহেলা রয়েছে কোন্‌খানে। এই কাজটির স্বীকৃতি পেলে পাড়ার পাড়ার ও ছাত্রাবাস সমূহে আঞ্চলিক কমিগণ ‘শিক্ষাসেবী সংঘ’ের পক্ষ থেকে নিজ নিজ অঞ্চলে শাখা স্থাপন ক’রে চাঁট পরীক্ষার কাজ চালাবেন। শুধু পরিবার বা ছাত্রাবাস থেকে সোজাভক্তি ঘর পুরণ ক’রে চাঁট পাট্টিয়ে দিলেই চলবে না, অভিভাবকদের দেওয়া সেই নব্বর আঞ্চলিক শাখার সভ্যদের দ্বারাও পরীক্ষিত হওয়া চাই, তারপরে তা আসবে ‘সংঘের কেন্দ্রীয়-সমীক্ষাগারে’; সেখান থেকে অমুমোদিত হ’য়ে যাবে তা নগুরাধাক্কের অফিসে। সেখানেই বিজ্ঞার নব্বরের সহিত বাচাই হবে সেন-নব্বরের পারস্পরিক প্রভাব ও উপযোগিতা। কে কি ভাবে চল-কিরে, শুধু ঘরোয়া ব্যক্তিগত দিক থেকে নয়, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানবাসীর সামাজিক বিচার থেকে অভিমত এভাবে চোলাই হয়ে এলে জার মূল্য হবে। সে অমুমোদিত-সকলের জীবনযাত্রা এবং বিজ্ঞাসাধনায় একই সঙ্গে এর দ্বারা পরিস্ফুট ও উন্নত হতে পারবে, তাতে সন্দেহ নাই। এই মূর্ত্তে বাড়ির অভিভাবক এবং স্থল কল্লের শিক্ষকদের কাজের পরিচয় পরস্পর অজানা থাকবে না। ভাল কাজ মন্দ কাজ,—সকলেরই সর্বকছু উপযুক্ত ব্যবস্থা পাবে। কোন পক্ষই কোনো পক্ষের উপর অবধা-দোষ চাপিয়ে রেহাই পাবেন না। সাধারণ ক্রটি-অভাব-অভিযোগাদি সমবেত সকলের উদ্ভাবিত স্ফুটিত উপায়ে ও সহযোগী ব্যবস্থার ক্রমে ক্রমে নিশ্চয়ই নিরাকৃত হবে।

২

শিক্ষাসেবীসংঘ

সাধারণ সমতার শিক্ষাসেবী-সংঘ আলোচনার ক্ষেত্র বিশেষ একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠানের কার্জনিক উদ্বোধনের অবতারণা করার সার্বকর্ম এই যে মূল সমতার উদ্ভব সাধা-পের বাচ্ছ এতে লুগম হবে। জীবনযাত্রার দায়িত্ব-নিরপেক্ষ বিজ্ঞাচর্চার বেগুজাই আজ ঘরে-বাইরে পুরাণে চলছে; তেমনি, আর সকল স্থলে দুর্গতিও বা ঘটছে তার তো কথাই নেই, কিন্তু যেখানে আটবাট-বীধা হয়ে হাতের মুঠোর রয়েছে সন্নীত ছাত্রছাত্রী-অধ্যাপক-কর্মী ইত্যাদির সমগ্র দিনযাত্রার হাল, চোখের উপরে চলছে সকলের চলাফেরা সেখানেও চোখ কেয়ালে মিলবে আজ একই ধারার অমুদ্বর্তন ইতিহাস। তত্ত্বায় সকলে কৃতে পাবেন সমতার এক

শক্ত, সামাজিক এবং গভীর ভাবে ব্যাপক, আর সেইজন্যই সমাজের সকলে মিলে কত শীঘ্র তার সাধনায় চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া আবশ্যিক।

সমগ্রী সমাধানের জন্য যে উপায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটি কেবল চিরাচরিত মতে ছাত্র ও শিক্ষকে কেন্দ্রিক নয়, তাঁরা তো আছেই, তৎসহ অভিভাবক এবং কর্মীদেরও এতে ডাক পড়েছে—এক কথায় প্রস্তাবটি হচ্ছে সমগ্রীত সফলতাই সহযোগিতা সাধারণ পরিবেশ-কেন্দ্রিক। বোধ চেষ্টায় অঞ্চলে অঞ্চলে সর্বাঙ্গীন-শিক্ষামূলক সামাজিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ হল তার সার কথা। একবিধে একত্র চাই সমাজ-সংস্কারণ একটি সুগঠিত সাধারণ জনমণ্ডলী, জ্ঞানায়তনের সীমাবদ্ধ আবাসিক ক্ষেত্রে থাকে বলা হয়েছে 'শিক্ষাসেবী-সংঘ' অঙ্গদিকে চাই তাইই সামাজিক কৃত্য—যে ঘরে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা বা দিনচর্যায় সংগঠন ও তদনুযায়ী চার্চ সংগ্রহ ও তা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

গুরু শিক্ষকদের উপর শিক্ষার ভার সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকার মধ্যে আসলে দারিদ্র এড়ানোর ভাব বতটা থাকে, তাও বুটিয়ে দেখা দরকার। বর্তমান সামাজিক বিপর্যস্ত অবস্থায় সবদিকেই সকলে বানচাল। বস্তুত, শিক্ষকমণ্ডলীও সামাজিক লোকবিশেষ; জীবিকা এবং জীবনের নানা দায়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত অনেকেই তাঁরা শিক্ষাকেই একমাত্র জীবন সাধনার বিষয় করে নিতে পারছেন না, নিলেও অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছেন না। জীবনসংগ্রামে যুঝে যুঝে আপনাদের ব্যক্তি ও পরিবারগত সীমাবদ্ধ সত্তাকে বজায় রাখবার বা বাড়ানোর জন্য সমাজের আর দশজনের মতোই তাঁদেরও থাকতে হয় ব্যস্ত। সমাজের কাজে আসা নেহাৎ টেটুকু না হলে নয়, অনেকেই আগে তাঁরা কঠোরভাবে ক্রান্তের কটিন মাফিক সেইটুকুতেই চুপ্তি রাখেন নিবন্ধ; শিক্ষকতা এতে জাতীয় সাধনার মর্যাদা হারিয়ে ব্যবসার ছাপ নিতে চলেছে—এটা আদর্শ বা কামা না হতে পারে, কিন্তু বিচার্যজনক। এই শিক্ষকসমাজের মর্যাদা ও সর্বাঙ্গীন ভরণপোষণের বৈধতা দারিদ্র্য পালন থেকে সমাজ বখন হাত গুটিয়ে নিয়েছে, তখন শিক্ষকরাও দেখা যায় নিজদের সাংসারিক সর্বাঙ্গীন দায় নির্বাহ করতে নিজেরাই অন্নবিস্তার উদ্যোগী হয়ে চলেছেন। এর পরিণতিতেই তাঁরাও এরূপ বৈষয়িক হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, চাকুরির হিড়িকেও এপথে বেনোজলের মতো কীকে কীকে চুকে পড়েছেন অনেক লোক,—শিক্ষার আদর্শ বা সাধনার ধারা সত্যতাই উল্লাসীন। তাই ব্যাপারটা এখন পক্ষাপক্ষ-দোষাবোপের ব্যাপার নয়; সমগ্রী যে বস্তুই বাস্তবকে গ্রহণ করা ভালো। এর মধ্যে কাজের কথাটা হচ্ছে এই যে,—শিক্ষক-সমাজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিজের দায়েরই এ অবস্থায় ব্যবস্থাকার নিতে হয়ে এখন অভিভাবক-মাত্রকেই; এবং পারিপার্শ্বিক সমাজকেও সমগ্রীপন্থ-ভাবে এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় কল্যাণার্থে জাতির ভারী বিনিয়োগ সম্বলিত করার জন্য। শিক্ষার ইমারতকে সর্বাঞ্চলেই উন্নতিকর কার্যধারায় সুবৃত্ত রাখতে দশে মিলে দেখে শুনে বৈধাতি সাহায্য দান করা চাই;—'জ্ঞান-জীবনদানের' চেয়ে এ দান আরো সামগ্রিক, মৌলিক ও জরুরি। কারণ, এ মাটির জমি নয়, এ যে 'দানব জমিদার'। এই দানেরই প্রাথমিক কার্যকরী রূপ দেবে,—কি আবাসিক

আর কি-বা শহর-মফঃস্বলে, সর্বত্রই আঞ্চলিক পাড়ায়-পাড়ায় সংগঠিত 'শিক্ষাসেবী-সংঘ' ও তার পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে দিন-চর্য চার্চ-পরীক্ষার কাজে। নিজ নিজ পাড়ার দায়িত্বশীল ছেলেমেয়ে, অভিভাবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমবায়ে যদি পাড়ার সকলের দিনচর্য দায়িত্বপালনের কাজটি সত্যিই দৃঢ়নিষ্ঠায় সুসূক্ষ্ম ভাবে পরিচালিত হয় তবে দেশের ভারী নাগরিক ছেলেমেয়েদের এরূপ 'বয়ে বাওরা'র দিন যে ফিরে যাবে, এ কথা নেহাৎ আকাঙ্ক্ষ্যের পোষকতা নয়, কেন না, জাতীয় আন্দোলনের প্রায়শ্বেক স্বামী বিবেকানন্দের ও গান্ধীর সংগঠনী প্রেরণার যুগে এই ধরণের অল্পকাল নজির পাড়াগাঁয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল-অবধি কিছু-কিছু পরিচুতমান হয়েছিল। তেমনি হবার আবহাওয়া সৃষ্টি করা চাই আগে। পক্ষ বা বস্তু—কোনো 'বাবিকী' পরিচরনার ছাঁপের অপেক্ষারই এ কাজ পাঁড়ে থাকবার নয়।

পাশ্চাত্য দেশাদারী শিক্ষকের যেমন আছেন যেমনি থাকবেন রূপ নিয়ে—পাশ-অপাশ সবাইই আপোষে কাজ করার নূতন স্থান হবে এই প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'। গুরু শিক্ষক নন, শিক্ষার সঙ্গে ধারাই সঙ্গীত থাকবেন, তাঁরাই শিক্ষাসেবী নামের অধিকারী; আর ঠিক মতো তাঁরা তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে দেখা যাবে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড়দের সমাজেরও আবহাওয়া ফিরে গেছে; যত্নের থেকে, পাড়ার থেকেই পূর্বোক্ত সংগঠক কর্মীদের উত্তোগে নূতন ধরণের আনন্দময় এক সুনির্মল শিক্ষাজীবন গড় উঠেছে—ভুল-কলেজ আশ্রম বৃত্তিভার্গি ইত্যাদি বানদী বা সরকারী শিক্ষালয়গুলি তখন কেবল সাহিত্য-বিজ্ঞানীদের টেকনিয়াল এডুকশনের স্থান নিয়েছে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষ কর্মমূল্য বা 'বৃত্তি'র এবং 'আজিকের' (কৌশলের) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানটুকু বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে বৃষ্টি নেবার স্থান বিশেষ হাওয়াতেই তাদের সীমাবদ্ধ মূল্য দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা চলছে ভুল-কলেজের বাইরেই। অগোচরে সেখানেই গড়ে উঠেছে ঘরে ঘরে যে নূতনতম এক বিশ্ববিদ্যালয়, তার নাম গৃহভাট। আর বলাও গেলে এই 'গৃহভাট' আর চার্চ, উপাচার্য হবেন অল্প কেউ নন,—অভিভাবক পিতামাতা; এমন কি, নিরক্ষর মায়েরাই কার্যতঃ নতুন ভার মানুষ-গড়ার; সে কাজে আশ্রিত বিদ্যা তত নয়, যত বেশি আবশ্যক হবে দারিদ্রবোধ ও দারিদ্র পালনের নিষ্ঠা। যেমন পরাকারী দেখিয়েছেন মহীশয়ী মহিলা বিভাগসার জননী ভগবতী দেবী। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই আরো মনে হয় কবির কথা কত সত্য—'না জাগিলে আজ ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না।' রাষ্ট্রীয় জাগরণের এক পালা চুকিয়েছি, কিন্তু মানুষের বুনরাণী পালায় আসর তেমন জমছে কৈ? তত্ত্বাবধানে দাপাদানি করি, জাগরণ নয়, অনেকটা এর ঘুরে ব্যারামেরই নানা প্রতিক্রিয়া মাত্র। ঘরে ঘরে মায়ের কাছ থেকে মানুষ বখন দৈহিক জীবনের অন্নের সঙ্গ মানসিক জীবনের অন্নরূপ সর্বিষয়ে বস্তু ও মনোযোগের প্রসঙ্গত অভ্যাসে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ বাহ্য ও মনুষ্যত্ব প্রকৃতি হতে সকল মানুষ। একত্র শিতামাতা বিশেষ করে মায়েরই বেশি উল্লেখ্য করে তোলা চাই।

এমনিতেও দেখা যায়, দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৫.৭ ঘণ্টা ঘোরা হচ্ছে ভুল-কলেজে, বাকি ১৭.১৩ ঘণ্টার বড় পর্বটিই

মেয়েদের কাটছে ঘরে বা বাইরে-বাইরেই। পুস্তক সেখানকার পরিবেশ ও শিক্ষার সম্ভাবনা কিছুমাত্র উপেক্ষণীয় হতে পারে না। একদিন ঘরে বাইরের সেই মহৎ সম্ভাবনা শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত উপেক্ষা পেয়ে এসেছে বলেই ছাত্রছাত্রী তথা সমাজেরও পক্ষে এই দুর্গতিভোগ অনিবার্য হয়ে এসেছে। প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী সংঘ' সম্মিলিত হয়ে সাধারণ সকলে দেশকে এই দুর্গতি থেকে শুষ্ক বিপদমুক্ত করতে পারেন তাই নয়, তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান এক সৌরভময় ভূমিকা নিয়ে জাতিগঠনে নিজেদেরও নতুন মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই আত্মশক্তির উন্নত চেতনা ও অভিজ্ঞতাই হবে প্রতিষ্ঠান বা সমগ্র সমাজের প্রকৃত প্রাণশক্তি। আজ সেই শক্তির উদ্বোধনই দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনের পরিবেশে একান্ত কামনায় বিষয়।

কিন্তু এ-ও জানা কথা, কামনা হলেই হয় না, কাজে লাগবার উপযোগিতা দেশ-কাল-পাত্রানুসারে সে কামনা নিজের মধ্যে বহন করে কি না সেটাই আসল কথা। কোনো দিক দিয়ে অসুপযোগী হলে কামনায় কান দেবার লোক মিলবে না, যদি বা তা মিলে, সে অসুপায়ের কাজ করবার লোক মিলবে ক'জন, তা বলা কঠিন। এজন্যই বলে বলে অনেকের অনেক কামনাই উবে যায়, কিন্তু লোকসাধারণকেই তার জ্ঞান দায়ী করা সব সময় ঠিক হয় না। তবে দেখা যায়, সকলেই যে প্রথমে একযোগে সব কাজে বহুশীল হয়, তাও নয়; অনেক ক্ষেত্রে নতুন কিছু প্রবর্তনায় সমাজের দূর একদলই অগ্রণী হয়ে ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের দায় বাড় পেতে নেন এবং সেই করেই কাজের পত্তন করেন। জেল, কাঁসি, কবর চাপায় তাঁরা তলিয়ে গেলেও তাঁদের মৌলিক দায়টি তল পড়ে না। ক্রমে সেই মণ্ডলীই এক এক স্থলে আত্মপ্রসারের দ্বারা স্বাধীকৃত করেন বৃহৎ সমাজকে। দেশে এই অগ্রণীদের জাত আজ নেই এমন হতে পারে না,—আছে তাঁরা,—নানা কারণে আছেন স্রুপ্ত হয়ে; স্বাধীনতার প্রথম ধাপ জয় করে দিয়ে তাঁদেরই পূর্ব-একধারা জাতিকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন মহত্তর সম্ভাবনাময় উত্তর পাথে। অতঃপর স্বাধীবাগ্যে ভাবে প্রমাণ দিয়ে দিয়ে রাপে রাপে সে-পথ অতিক্রম করে মানবমহিমার মিলন-মন্দিরে আমাদের বধাশ্রিত পৌছতে হবে। এই সংগঠন ও উত্তরণের কাজে প্রধানত স্রুপ্ত সেই দায়িত্ববাহী অগ্রণীদের ভরসাতেই দেশব্যাপী চার্ট-পত্রীকক 'শিক্ষাসেবী সংঘ' প্রসারের এই আন্তরিক কামনাটির বহিঃপ্রকাশ।

আর এক ক্ষেত্রেও কিছু কাজের প্রস্তাশা থাকে,—সেটি সংস্কারী দপ্তর। সেখান থেকে অনেক কিছু পরিকল্পনাই আজ চালু হচ্ছে। অঞ্চলে অঞ্চলে এই প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী সংঘ' বিস্তারের সার্থকতা তাঁদের বিচারের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারলে তাঁরাও এই প্রচেষ্টায়, শুষ্ক প্রোৎসাহ নয়, একে বর্ধাচিত প্রগতি দান করতে পারেন। তবে কিনা, সাধারণ হোক, ছাত্রসমাজ হোক, আর শিক্ষক কিম্বা সরকারী মহল যেমিকেরই লক্ষ্য-বুল খুঁড়ে দেখা বাক্য—দেখা যাবে সকলেরই নিগূঢ় যৌক আজ—টাকার উপর। টাকা চাই, আর তারই জ্ঞান চাই ডিগ্রি এবং চাকরি;—এই হচ্ছে শিক্ষার যৌক। এ লক্ষ্য ভোলাতে পারে এমন পরিবর্ত এখন আর-কিছুই নেই ঘরে-কাছে। ডিগ্রির জন্মই যেটুকু বিচার দায়। সেই দায়-সারা কাজে শেখাবিধি, চুক্তিমারি, ঘুস, জালিয়াতি, দায়শিট, রাহাছাদি, খুসখদাং বে-উপায়েই হোক,

পড়াশুনার পরিবর্ত-হিসাবে স্বাগত করা হচ্ছে সকল পথকেই। আবার এর পাট্টার গুনা বাচ্ছে, কোন্ প্রদেশে নাকি সপ্রতি আইন হচ্ছে,—ছাত্র ফেল করলে সরকারকে জরিমানা গুণে দিতে হবে মাষ্টারদের পকেট থেকে। কিন্তু সমাধানটা কি এতই সহজ? 'ফেল-করা'দের নিয়ে ব্যথেলা আছে; ভাববার কথা এই যে, 'পাশ-করা'রাই কি নির্ভরযোগ্য? যে-যোগ্যতার মান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ ক'রে বেতবেন এবং অপর ভবিষ্যতে সেই যোগ্যতার বলে এরা রাজ্য পরিচালনার যে-সব পদ অধিকার করবেন তার কল হুদিন বাদে এঁদের হাতে প'ড়ে গোটা রাজ্যের দশাটা হবে কি? তখন যে জরিমানার উট্টা ফেরে শুভয়েন সরকার নিজেই। তবিল থেকে ক্ষতির খেসারি গুণতে হবে তাঁদের পদে-পদেই; সে দুঃদৃষ্টী লজ্জা খাটলে, এভাবে একশ্রেণীর উপরেই শিক্ষার দায়িত্ব আরোপ ক'রে দিয়ে তাঁরা দায় সাহতেন না। হ'—সাত ঘটীর জ্ঞান আছে পেয়ে শিক্ষকরা বতই ভালো পড়ান, আর বতই 'কড়াডাঙি' ক'রে পড়া আদায় করতে লেগে থাকুন, বাড়ির ১৮ ঘটীর ধবলারি করা তাঁদের পক্ষে কতদূর সাধ্য, সেটা সহজেই অসম্ভব। সেই ১৮ ঘটীরই কাঁকে দশ দিকের প্রতিক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে উদ্ভোমনের শাকা-দগ্ধল কায়েম করে চলেছে,—পড়াশুনা বা কোনো নিষ্ঠাসাধ্য গভীর বিষয়ই কোনোদিন তার কাছে আমল পাবে না। বিষয়ে মন না বসলে কেবল উপদেশের তাগিদেই কাজ হবার নয়, ঘরে-ঘরে সে তো প্রমাণিত হয়েই চলেছে। কেবল অভিভাবক, বা, পাড়াপড়শী,—বিশ্বপুভাবে করো কথাতেই কিছু হবার নয়। অথচ ঘরে-ঘরে প্রত্যেকেই এবং দেশেরও প্রধান লক্ষ্য এই ছাত্র-ছাত্রীদল। তাদের চরিত্র ও বিচার বর্ধাচিত উজ্জিত না হলে, সকলেরই পক্ষে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা। এই দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীন মনোবাগ ও বহু অভ্যাস-বিধায়ক 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'র সারবত্তা যদি কিছুমাত্র বিবেচিত হয়, তবে সকলেরই একযোগে সাংঘব্দ হলে একাজে লাগতে হবে। কে শুনবে, কে না শুনবে, বলা না গেলেও, এর সারবত্তা বিবেচনার জন্মই সকলের গোচরে প্রস্তাবটি বলে রাখার কাজ সেবে রাখা গেল, এই সার্বকর্তৃত্বই আপাতত বখালাত।

ছোটোরা স্বভাবতঃ এমনিতেই চকল আর বহিঃস্থ। তার উপর আজ ঘরে-বাইরে চারিদিকে যে চাকল্যকর পরিচ্ছন্নতা, এর আকর্ষণ তাদের উপর হুঁধার; তারা যদি বেসামাল হয়, কাজ বত কঠিনই হোক তাকে সামলাবার দায়িত্ব প্রধানতঃ বড়দের; কারণ, সংসারে তাঁরাই এসেছেন আগে, আর পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান দায়ীও অনেকটা তাঁরাই। তাঁদের দায়িত্ব ছোটোদের বর্ধাচিত পরিচালনা ও প্রতিপালন দ্বারা সংসারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বাওয়া। সত্যই তাঁরা ছোটোদের কতখানি আপনায় এবং কতটা তাঁরা দমনী ও দায়িত্বশীল, তাই সত্যতা-প্রমাণের আহ্বান এনেছে এই 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'ের প্রবর্তনা। এর মধ্যে অভিভাবক, শিক্ষক, পাড়াপ্রতিবেশী ও সরকার—সকলেরই কর্তব্যের দায় আছে, একথা কোনোমতেই ভোলাবার বা এড়াবার নয়। ভিতরের চাকল্য ও বাইরের বিষয়-প্রাচুর্যকে আজ ঠিক মতো ব্যবস্থার কাজে লাগিয়ে ছোটোদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ভেদনি বিপুলবিভিন্ন ভাবে বিকশিত ক'রে ভালোবাসার দিন আজই; এই আধুনিক-কালের

সুযোগের দিকটাও আমাদের স্বাগত ক'রে নিলে, সবই আবার তেমনি মঙ্গলকর হবে। টাকা, পয়সা, জমিজমা, মানসম্মান, মুকবি,—সব কিছুই চেয়ে বড়ো মূল্যবান হচ্ছে মানুষ। মূলধনকে ঠিক মতো না খাটিয়ে দেউলে-সাদা বৃদ্ধমান বা অধ্যবসায়ীর পরিচয় নয়।

আর, বাদের জন্ত এত কথা, বড়দের ভারী স্থান অধিকারী আজকের এই ছোটরা যখন একবার ভেবে দেখবেন যে তাঁরা জাতির কতখানি, এবং কী সম্পদের উৎস তাঁরা, আর সেজন্য কী

তাঁদের দায়িত্ব, তখন নিজেকেই উন্নতির সহায়ক এই 'সংঘের' সাফল্যের কাজে তাঁদের স্বাগত-সহযোগ ক্রমে অক্ষরস্থ হয়ে শক্তি জোগাবে। কিন্তু তার আগে বুদ্ধিব্যবস্থা ক'রে কাজের কথাগুলি তাদের শোনানো চাই; বড়দের কাজ হবে বৈধ ধ'রে সহ ক'রে ছোটদের ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বের সম্বন্ধে ছোটদের সচেতন ও অভ্যস্ত ক'রে তোলা। এ কাজে পরাধীন হলে জাতির ক্ষয় অনিবার্য, অগ্রসর হলে জাতির উন্নতি অব্যাহত।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

তিনটি চিত্রিত পুতুল

উত্তর চিংপুর বোডের
অন্ধকার কৃষ্ণ পটভূমিতে
কড়া রঙের ছোপ নিয়ে জাঁকা
লাল নীল সবুজ শাড়ীপরা
গাড়িয়ে আছে তিনটি চিত্রিত পুতুল।
—চমকে উঠল চাবুক-খাওয়া মন।

যেন অন্ধকারের সমুদ্রে ঠেলে সামনে আসতে পারছে না তিনটি রক্তপল্লব,
তিনটি রক্তিম হারয়ের অস্তিম বাসনা হারিয়ে গেছে রক্তির হতাশায়,
তিনটি জীবনের রতিন মোমবাতি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে অতলান্ত খাদে,
যেন যেমনা পদ্মা বৃড়ীগঙ্গার তিনটি হারিয়ে যাওয়া টেউ
আছে পড়েছে এ গলির অন্ধকারের সমুদ্রে।

অন্ধকুল গ্যাসের আলোর ঝাম বেঁসে
ট্রামের তার চলে গেছে টলতে টলতে
দোকান-পথরার বিচিত্র সজ্জারের পাশ দিয়ে।
সেখানে তামাকের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে ফুলুরিভাজার গন্ধ—
বাজনার দোকানের শিরীরের আঠা তৈরীর গন্ধ মিশেছে
ফুলের দোকানের বেল-চাপার গন্ধ।
ট্রামে চলেছে কিমিয়ে কিমিয়ে স্বপ্নের স্বপ্নের শব্দ তুলে,
জলে উঠে সরে যাচ্ছে বেলায়াড়ি চুড়ির রঙ-বলসানো দোকান—
তারই মধ্যে মধ্যে এক একটা সর সর কানো গলি—
অবচেতন মনের কান। ইচ্ছের মতন।
আর সেই অবচেতন মনের অন্ধকারের পাকে জড়ানো গুটিপোকায়
প্রজাপতি হওয়ার স্বপ্নের মতন—
সেই গলির অন্ধকারের পটভূমিতে জাঁকা হ'য়ে আছে—
লাল-নীল-সবুজ শাড়ী-পরা তিনটি চিত্রিত পুতুল।

জানি ঐ অন্ধকারের সমুদ্রে জোরার এসেছে অনেক বার,
অনেক বৈশালী উজ্জয়িনীর রাজগৃহ বারানদীর
আশ্রপালী জামা সুলসা শালবতী পদ্মাবতীর দল
ভাসিয়ে দিয়েছে সুরভি কামনার মন্দির মালিকা বোঁবনের উদ্ধাম শ্রোতে,
বাদের চোখে অগস্ত নীলকান্তমণির রক্তিমাত জ্যোতির 'সুজিঙ্গ',
অথরে সুরিত হত পদ্মরাগমণির কঠিন রক্তমা,
বাদের টঙ্ক-বিচূর্ণিত মনঃশিলায় তুলনা রক্তবর্ণ চীনাগুকের বহ্নিতে
দগ্ধ হয়ে যেত শ্রেষ্ঠিনন্দনের রক্তের ভাঙার।

জানি এই অন্ধকারের জোয়ার হয়তো কোনো দিনই নিঃশেষ হবে না,
ছড়িয়ে বাবে গঙ্গার জীর থেকে মহানগরীর দক্ষিণে পূর্বে উত্তরে
রাজপথের কঠে-উপকঠে বিঘ্নমুক্তের আলো-মধুর যন্ত্রণা টেলে দিতে,
—জানি হয়তো ঐ তিনটি চিত্রিত পুতুল চিরদিনই জাঁকা থাকবে
নিশীথের কৃষ্ণপটে উত্তর চিংপুরের অন্ধকার গলিতে—
বেথানকার অন্ধকারের সমুদ্রে ঠেলে ঠেলে ডুবে বাবে তিনটি রক্তাক্ত কুহর,
তিনটি রতিন মোমবাতির বিমর্ষ আলো গলে গলে নিবে বাবে
অনন্ত জিতাসার

তাদের চৌটে রঙ, চোখে কাজল, বেষীতে রতিন ফুল,
তবু তাদের দৃষ্টিতে শিশাহারা বিহ্বলতা—
চরজামিত দেহবরীর অস্থির কম্পন তাদের আঁতলে আঁতুলে
—দীরব—নিখর তিনটি চিত্রিত পুতুল।
উত্তর চিংপুর বোডের এক অন্ধকার গলির হারায়।

তারপর—আবার পাঁড়াবে আবার তিনটি চিত্রিত পুতুল
বাদের চৌটে রঙ, চোখে কাজল, বেষীতে রতিন ফুল,
তবু বাদের দৃষ্টিতে শিশাহারা বিহ্বলতা,
আর দেহবরীর কম্পনে কম্পনে দৃষ্টির শিশালা।

সাহিত্যে ও শিল্পে চিরন্তনতা

জ্যোতির্ময় রায়

সাহিত্যের মূল্যবিচার সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, না তার মধ্যে একটা সর্বকালীন আছে, তা নিয়ে অনেক বাস্তববাদীর মনে একটা প্রশ্ন আছে। এতকাল সত্য শিবম্ সুন্দরম্ সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং সত্য ও শিব যেহেতু নিত্যবস্তু, কাব্যরসও গণ্য হয়েচে কালমালিন্যের উদ্ধে। আধুনিক বাস্তববাদীরা খোঁচাতে সংজ্ঞার বিধানী নয়, তারা বস্তুটাকে লোকান্তর থেকে লোকান্তর ভরে নামিয়ে এনে বাস্তব ব্যাখ্যায় পরিচ্ছন্ন করে দেখতে চান। তাঁরা বলেন সাহিত্য হল সমাজসম্প্রদায় বস্তু—সংস্রাভের ভেতর দিয়ে সময়ের সঙ্গে সমাজের কাঠামো বিবর্তিত হচ্ছে এবং সেই বিবর্তনই নিয়ন্ত্রিত করছে সমাজ-মানসের সত্য, কল্যাণ এবং রসবোধকে—অর্থাৎ সত্য শিব সুন্দর সময়োচিত। কৃতি-কল্যাণ-রীতি নীতি এবং রসবোধই যখন পরিবর্তনশীল তখন একযুগের কাব্য অজুগুণে 'মমি'রই মতো মৃত জীবনের সাক্ষ্য দেবে মাত্র। অনেকে এমন কথাও বলেন, যে-সাহিত্যের সৃষ্টি আশ্রয়বাদের আওতায়, যার ভিত্তি পরমমূল্যের আধ্যাত্মিক অবস্থার—যখন জানা গেল পরম বলে কিছুই নেই, সবই পরিবর্তনশীল, তখন এই নব চেতনার আলোতে অজ্ঞতা-প্রসূত সেই আনন্দলোক অর্থহীন হয়ে যেতে বাধ্য।

দ্বাদশিক বস্তুবাদকে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য সত্য বলেই মনে করি, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার এজাতীয় প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ধার্য জীবন-দর্শনের পরিবর্তন দিয়েই প্রোক্তন এবং প্রোক্তবিত্ত আধুনিক সাহিত্যকে বাস্তব করতে চান—অর্থাৎ ধারা গাণিতিক নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেন এক জীবনদর্শনে পুষ্ঠ সাহিত্য সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী জীবনদর্শনের জগতে গিয়ে পড়লে কোনো আবেদনই তার ধাক্কাতে পারে না, মূল ভিত্তি ধ্বংস গেলে কাঠামো ঝাঁড়াবে কিসের ওপর—তাঁদের অবাবটী খুব সহজেই দেওয়া যায়। প্রকৃতির চরিত্র মানুষের বিশ্লেষণ বা তত্ত্ব আবিষ্কারে নির্ভরশীল নয়। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বাস্তব হয়ে গেলে বস্তুর পতন পদ্ধতি শালুটে বাবে না, পলার্শ-বিজ্ঞানের পূর্বতন ধারণা অস্বাভাবিক বস্তু ও শক্তির বিভেদ আধুনিক মতে লোপ পেয়ে গেছে, তাতে প্রাকৃতিক হালচাল কিছু বদলে যায়নি। তা বলে তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্তন মানুষের জীবনে নিষ্ক্রিয় এমন কথা আমি বলছি নে। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এ খুবই বড় কথা, প্রকৃতিকে আয়ত্তে ধারা প্রয়োজনে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। সাহিত্যিকের কারবার কি ভাবে ঘটছে তার বিচার-বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে নয়, তার বিষয়বস্তু মানুষের মৌলিক ভাবাবেগের বিভিন্ন বিকাশ নিয়ে—নৈসর্গিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল ঘটনা নেহাৎই তাব কাছে অবলম্বন মাত্র। স্বাভাবিক প্রয়োজন আর বৈজ্ঞানিক এ দুয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এই অবলম্বন তার রসসৃষ্টির বেধানে বস্তুটুকু অঙ্গ ভুড় বসে ততটুকু মূল্য যে স্থায়ী নয় সে কথাও সত্য।

বিষয়গতের প্রতিটি বস্তুতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন চলছে, নিমেষের ভেত্রে তা বদল হলে বিঘটা রসীক্সনাথের বাঁধির মতোই

চেঁচিয়ে উঠতো 'হারিয়ে গেছি আমি' বলে। এই পরিবর্তনের বোহাই দিয়ে হেবালিস্ট উপাওনাধারদের দেনা অস্বীকার করার মতো বাতুলতাও করে বসেছিলেন—সত্যোপলব্ধির প্রথম উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগের এজাতীয় বাড়াবাড়িও হয়ে গেছে। পরিবর্তনও কতকগুলো অপরিবর্তনীয় বিধি মেনে চলে বলেই নিজেকে এক বহির্জগতকে প্রতি বহুর্ভূত নতুন করে আমাদের চিনে নিতে হয় না। প্রতিনিয়ত সে পরিবর্তন চলছে তা পরিমাণগত, এই পরিমাণগত পরিবর্তনই পূজ্যকৃত হয়ে একদিন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। ধারা রসসৃষ্টি এবং রসবোধের আপেক্ষিক চিরন্তনতায় বিশ্বাসী নন, তাঁদের মতে সেই গুণগত পরিবর্তন আমাদের সমাজমানসে এসে গেছে, যদিও এখনও তাকে আমূল বলা চলে না। যদি প্রশ্ন করা যায়, প্রাচীন মহাকাব্য পড়ে আজও আমরা রস পাই কেন? তাহলে তাঁদের জবাবটা হয়ে পড়ে অজানা রকমের। আমরা রস যে পাইনে সেটাও নাকি বুঝি না, 'ওটা' নাকি বিভ্রান্ত সাহিত্যরস নয়; ঐতিহাসিক কৌতূহল, পুরাতনের প্রতি মোহ, ইত্যাদির ধুববোচক একটা মিশ্রিত পানীর মাত্র। আনন্দ পেয়েও যদি স্বীকার করতে হয় পাইনি, তবে সেক্ষেত্রে ভর্তুকি না তোলাই প্রেরণ। তবে এটা দেখা যায় কাব্যের মূল্য বিচারে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিক মনের আজও কোনো বৈষম্য ঘটে নি। বাম্মীকি, হোমার, কালিদাস, শেক্সপীরকে আজও আমরা মহাকবি বলে গণ্য করি—কালপ্রবাহে অপরিবর্তিত এই অজিতমত রসবোধে মিলেই পরিচায়ক।

সাহিত্যের কারবার মানুষের চিত্তবৃত্তি নিয়ে, অন্তঃকরণ সেখানে—পরিবর্তনের প্রত্যাব কতটা পড়ে, সেটাই আগে বিচার্য। সেদিক দিয়ে মানুষ যেদিন থেকে আবেগকে ব্যক্ত করতে পেরেছে উপযুক্ত ভাষার, তারপর থেকে আজ অবধি তার চিত্তধর্ম পরিবর্তন ঘটছে। তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রেম-ঈর্ষা-স্নেহ-দ্বेष-কাশ-ক্রোধ-সেহন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, বদলেছে শুধু আবেগগুলোকে উদ্ভুক্ত করার উপকরণ আর উদ্ভুক্ত আবেগের প্রকাশভঙ্গি। এককালে যে ভাব বা ভক্তিতে মনে প্রেম সঞ্চারিত হতো আজ হয়তো তা ক্রোধ বা হান্সরসের কারণ হয়ে ঝাঁড়ায়। উপকরণ ও পারিপার্শ্বিক এ ধরণের ভ্রান্তিকারী পরিবর্তন হয়েছে অসংখ্য কিন্তু সে পরিবর্তন মানুষের আদি চরিত্রকে স্পর্শ করেনি—কবে করবে, আজও তা আমাদের ধারণাতীত। পণ্ড বিবর্তিত হয়ে মানবীর স্বাতন্ত্র্য পৌছতে প্রয়োজন হয়েছে কল্পনাতীত কাল—মানুষ দেখে বা মনে বিবর্তিত হয়ে কবে চিত্তান্তরকারী ভক্ত কোনো স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে বা ঘোটেই করবে কি না সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো সঙ্গল আজও আমাদের হাতে জমা হয়নি। ক্রমবিবর্তনে বানর মানুষ হয়েছে আবার বানর বানরই থেকে গেছে, অন্তঃকরণ-প্রকৃতিতে নতুন শ্রেণী উদ্বোধক পরিবর্তন আসবেই, জ্ঞান বয়ে বলা চলে না। যদি কোনো দিন আসে তবে সেদিন হয়তো আজকের চিত্তবৃত্তির চাহিলা তখনকার চিত্তধর্মের কাছে একেবারেই অর্থহীন হয়ে বাবে। এমন কি, অল্পকালের যোগসূত্রটুকু কোথাও ছিল ও লুপ্ত হলে আমরা

বে তাদের পূর্বপুরুষ সেটাই আবিষ্কার করতে হবে গবেষণা দ্বারা। কিন্তু আমাদের কথা এই, বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের বয়সটা নিতান্তই নগণ্য এবং তার মূল আকৃতি-প্রকৃতির ওপর পরিবর্তনের প্রভাবটা শীতলতামুখী পৃথিব্যেই মতো নির্ভাবনায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

শক্তির স্রস সমবিকতার বীরা বিশ্বাসী, তাঁরা অত-বড় জৈব বিপ্লবের দোহাই দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, সমান্তরগত বস্তুসমাজ বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত হতে বাধ্য। যুক্তি তাদের গ্রাহ্য হতো কাব্য বা শিল্পের এক মাত্র অবলম্বন হতো যদি সমাজের পরিবর্তনশীল বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ সেখানে উপকরণ মাত্র, তাই এই উপকরণের স্বল্পতা সর্বকালীন শিল্পের একটি প্রধান লক্ষণ। শিল্প উপকরণ সংগ্রহ করে চট্টা তহবিল থেকে, এক প্রকৃতির আর মানুষের। প্রকৃতির তহবিল থেকে যে উপকরণ সংগৃহীত হয় সে যে অমরত্ব, মাত্রের তৈরী তহবিল থেকে যতটা আসে সে করে তোলে ততটা অনিত্যময়ী। আদি যুগল-শিল্পের অভ্যাস প্রকৃতির দেওয়া উপকরণকে অবলম্বন করেই। স্রব আর চিত্রে মানবনিয়ন্ত্রিত উপকরণ আশ্রয় পায় কিন্তু এক মাত্র অবলম্বন হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাকে দেশগত জাতিগত বা কালগত করে তোলার মতো প্রতিপত্তি চড়াতে পারে না। বস্তুসমাজ সঙ্গীতের সর্বকালীনত্ব এবং সার্বভৌমিকত্বের অবিস্বাদী পণ্ডিত। এই দুইগুলোকে বিভিন্ন স্থান-কালের বিভিন্ন ভাব-ভাষা চ-চাল আশ্রয় নিয়ে আমাদের স্মৃতিতে যতই বিভ্রান্ত কল্পক আপাত বিচারে তাকে বতই দেশ বা কালগত মনে হোক মৌল সত্তার সর্বকালীনত্ব তার অক্ষুণ্ণ থাকে। কেউ হয়তো বলতে পারেন সঙ্গীতে আবার সার্বভৌমিকত্ব কোথায়, জাপানি গান বা বাজনার তো তার হাসি বা বিরক্তির উল্লেখ হয় মাত্র। তা হুয়াই কথা। সঙ্গীতের রসটাই সার্বজনীন, ভাষাটা নয়। বিজাতীয় ভাষাও হাসির কারণ হয় কিন্তু সেই ভাষার দেওয়াল ভিত্তির অমরত্ব তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো মাত্র তাকে অজ্ঞের আশ্রয় বলে চিনে নিতে হুহুত দেয় হয় না—শাব্দিক কোড়কের ক্ষুদ্রত্বটিই হুহুত তখন অজ্ঞহিত। তাইই সার্বভৌমিক কিন্তু ভাষাটা নয়। প্রত্যেক শিল্পেরও স্তম্ভনি একটা আনন্দবাহী ভাষা আছে বার সঙ্গে অপরিচয় আনন্দলোকের পথ রোধ করে থাকে। এরকম আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে স্বজাতীয় শিল্প-কলায়ও সার্বজনীনতার সাক্ষাৎ মিলবে না। প্রতি শিল্পের উন্নত স্তরের ভাষা বিশেষ একটা শিক্ষার দাবি করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা যামিনী বাবের ছবিও বহু লোকের কাছে অর্থহীন বা হাস্যকর। কিন্তু বধনী দেখা যায় কোনো শিল্পের ভাষার সঙ্গে একবার পরিচিত হলে তার বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ এক জাতীয় আনন্দ যে-কোনো লোকের মনেই সঙ্গার করতে পারে, তখন মানতেই হবে সব শিল্পের মৌল শিল্পকেই সার্বভৌমিকত্ব বর্তমান। ব্যাপ্ত ভাবে মানবচিতে এই এক্সা আছে বলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই জাতীয় কতকগুলো শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। অবিধি কোনো কোনো শিল্পের ভাষার স্বভাবতই একটা সার্বজনীনতা বিস্তারিত, যেমন চিত্রকলায়।

চিত্রের উপকরণ রং আর আকৃতি-প্রকৃতির ভাষার এই দুটি উপকরণই নিত্য বস্তু। কালাপ্যায়গী অভিযুক্তি এবং পরিবর্তনশীল

সমাজোপকরণ বতই তাকে আশ্রয় কল্পক তা গোঁই থেকে যায়—সেখানে আনন্দলোক স্থাপি করে যোবাব্ব বা বর্ণবিভক্ত বস্তুসত্তা। বস্তুসত্তার রূপাংগ সার্বক হলে চিত্র চিত্রজন হতেই বেঁচে থাকে। গুহাবাসীরা চিত্রও অতি আধুনিক চিত্রসমালোচকের নয়নকে নশিত করার ক্ষমতা রাখে—গুহা থেকে অভ্যর্থনা করে তাকে এনে আসন দিতে হয়, সভ্যজগতের সুউন্নত চিত্রকলার আসরে। মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র বা অজন্তার গুহাচিত্র আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা, আধুনিকতম বিষয়বস্তুর পাশে অপুমান্ত দান মনে হবে না। মহাকাব্যের কিছুটা আংশের রং সময়ের সঙ্গে ফিকে হয়ে যায় কিন্তু মহাচিত্রের রূপ কালিকের যোবানের মতোই কালম্পর্পহীন। এ দিক দিয়ে শিল্পের জগতে চিত্রের সর্বকালীনত্ব এবং সার্বভৌমিকত্ব সর্বাধিক।

সঙ্গীত এবং চিত্রকলার বিষয়বস্তু এবং রীতিপদ্ধতি সমাজজীবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, তবু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূল্য পরিবর্তিত হয়ে যায় না। কারণ এ দুটি শিল্পের কোনটিরই সমাজজীবনের উপকরণকে সবিস্তারে বা স্থলভাবে অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা নেই। পরিবর্তনশীল উপকরণ ক্ষুদ্র হতে গিয়েই সময়ের উর্দ্ধে চলে যায়। কাব্যও এ গুণ বর্তমান, যদিও সঙ্গীত বা চিত্রের মতো অতথানি নয়। কাব্যে চিত্রবৃত্তি তার প্রকাশের অবলম্বন হিসেবে সমাজ-জীবন থেকে বহির্ উপকরণ আহরণ করে তথাপি পুরোপুরি বস্তুনির্ভরশীল নয়—বিশেষ করে লিঙ্গিক কবিতায়, পরিবর্তনশীল উপকরণের নির্ধারকে শাব্দিক বাজনা এবং ইঙ্গিতময়তার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করাই তার ধর্ম। উপাখ্যান-কাব্যের উপাখ্যানভাগকে দ্রাবিয়ার হাত থেকে বাঁচায় তার হৃদয়ের স্বাক্ষর, শাব্দিক বাজনা এবং ইঙ্গিতময়তার আনন্দলোক। কিন্তু উপজাতি বা গল্প-সাহিত্যের বেলায় সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোই সবিস্তারে স্থা অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় চিত্রবৃত্তিকে সাড়া দেবার। গল্পের আবার আতিথেয়তার তাৎকালিক সমাজ-জীবনের রীতিনীতি সমস্ত। সব এসে ভিত্তি জমিয়ে বসে কথালিঙ্গের আসরে, তাতে করে সমসাময়িকের অভ্যর্থনার অতিশয়তাই দেখা দেয় কিন্তু পরবর্তীকালের পাঠকের কাছে তার রূপ ও রস বহুলাংশেই ফিকে হয়ে যায়—কারণ তখনকার সমাজ-জীবনের রীতিনীতি হয়তো গেছে পাণ্টে, সেদিন বা ছিল সমস্তা তা হয়ে এসেছে সহজ, তাই অত জাঁকিয়ে অত কথা বলার কোনো সার্বকতাই বুঁজে পাওয়া যায় না। তবু এই পরিবর্তনশীল ঘটনার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্রবৃত্তির কতকগুলো অপরিবর্তনীয় অভিযুক্তি প্রকাশ পায় এবং তারই জোরে গল্প-সাহিত্য সময়ের পিছল পথে ঢলে পড়লেও একেবারে গড়িয়ে যায় না। পল্লী-সমাজের সমস্তাগুলো একালের, কিন্তু রমা-রমেশের সম্পর্কের মাদুর্ঘ্যটুকু সর্বকালের।

কবিতা এবং কথালিঙ্গের তফাৎটা হোমিওপ্যাথিক আর এ্যালোপ্যাথিক ভয়ুরের মতো, হোমিওপ্যাথিক ভয়ুর বস্তু তার স্বাদ-গন্ধ-রূপ হারায় বটে কিন্তু বৈশিষ্ট্যটুকু তার পুরোমাত্রায় বজায় থাকে স্মৃতিতম সত্তার, এ্যালোপ্যাথিক-এ বস্তুর স্থল অভ্যুত্থের অংশও অনেকটা পরিমাণেই থেকে যায় এবং গ্রহণকালে আপাতস্মৃতিতে সেই স্থল অভ্যুত্থটাই স্বাদ-বিশ্বাসের অবতারণা করে। কিন্তু একবার উদয় হলে মূল কিয়ার দুটোই সমান। জীবন প্রবাহের উপকরণের নির্ধার

নিয়মে গড়ে গুঠে কবিতা আর কথাসাহিত্যের অবলম্বন তাদেরই স্থল প্রকাশ—বার বহিরঙ্গের গুণের পড়ে কালের ছাপ। তবু বিগত যুগের কথাসাহিত্যেও মনটাকে একবার প্রবেশ করতে দিলে রস আমরা সেখানেও পাই, তবে কিনা সেটা অবিচ্ছিন্ন এবং অনাবিল নয়, পরিবর্তিত সমাজ-জীবনের উপকরণগুলো প্রতিপক্ষে রসবোধকে ব্যাহত করতে চায়। কিন্তু শিল্পমাত্রেরই এমন একটা গুণ আছে, যা আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে সাময়িক ভাবে ক্ষুণ্ণিত করে মনটাকে তুরীয় অবস্থায় উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে—অলঙ্কারশাস্ত্রে থাকে বলা হয়েছে বিচ্ছিন্নিত রস। মাল্লবের মৌল চিত্তবৃত্তির প্রবাহে আজও কোথাও ছেদ পড়েনি বলেই যে কোনো কালের সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ তার বাহু বিস্তার করে এসে স্পর্শ করতে পারে যে কোনো কালের মনকে—সমর্থনের এ এক অপূর্ণ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা যা আশাতবৈষম্যের গাথকে অতিক্রম করেও আনন্দিক যোগসূত্র স্থাপন করে। রূপকথার মলৌকিক নর-নারী বা জীব-জন্তুর মধ্যেও সমর্থ চিত্তবৃত্তির পরিচয় যাইমাত্র পাই, অমনি আনন্দমনের প্রেক্ষাপট দিয়েই সেই কল্পনাকে আমরা আপনায় করে তুলি এবং তা থেকেও আনন্দ পাই

প্রচুর। চিত্তবৃত্তিতে মিল পাওয়ায়ই কল্পনাই সাহায্য করে মনকে অতিক্রান্ত বা অনাগত যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। প্রগতিশীল সাহিত্যের অনাগত কালের কল্পনায় যদি আমরা আনন্দ পাই তো বিগতদিনের সত্যের সম্পর্শই বা আমাদের আনন্দকে উৎসৃষ্ট করবে না কেন? ছুটোর কোনোটিই উপস্থিত জীবনে সত্য নয়।

সাহিত্যে চিত্তবৃত্তিসত্তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তার সার্বজনীনতায়। ভাবার প্রাচীর ঘেরা জাতীয় আরতনে আবদ্ধ থেকেও সুযোগ পাওয়ায়ই অল্পবাদের গব্যরূপ ধরেও সে তার আত্মীয়তা ঘোষণা করে বিবর্তমানবের সঙ্গে। যা সার্বজনীন তাই সর্বকালীন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন পরিবেশ যে একে লাগ কাটতে পারেনি কালের বৈচিত্র্য ও তাকে যুগবৈষম্যের রেখায় বাঁধতে পারবে না। তাই কথাসাহিত্যকেও বঙ্গীয় আমি বলব না, বলব তার বহিরাঙ্গিক যৌবন দীর্ঘ নয়। মাল্লব যত কাল মাল্লব থাকবে তত কাল তার সৃষ্টিতে কোনো সার্বক শিল্পকর্মের সূত্র নেই, যৌবনোচিত রূপ-রস কম বেশী ক্রিকে হয়ে যেতে পারে মাত্র।

মন

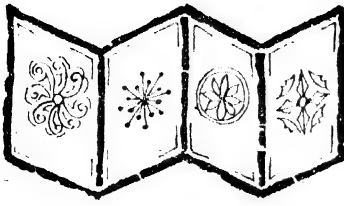
নীহাররঞ্জন হালদার

ট্রেণ চলে, প্লেন চলে আর চলে মন ;
মনের সমান দ্রুত কে করে ভ্রমণ ?
হাঙ্গার মাইল দূরে—শত্রুর দেশ
কলের বোতাম টিপে কর তুমি শেষ !
মন বলে, সব মিছে
আমি যদি খাই পিছে
সব কিছু হয়ে যাবে ছাই ;
মনের সমান জোর আর কারো নাই।
কতো দিন কতো কথা !
মাঝে মাঝে নীরবতা গড়ে গুঠে স্তম্ভের মিতালি।
দেখিবে তাহার শেষে
সুপ্নোপনে কেঁদেছে সে
মন হবে হয়ে যায় খালি।
দেখা-শোনা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা,
জানা নেই তার ভাষা ;
কতো বাধা মনে জাগে
বিদেশেতে বিদায়ের আগ !

জানি না কিসের তরে
বেদনায় আঁধি করে
নাহি বুঝি তার কোন মানে।
হয়তো তাহার মন দেখেছে সবুজ বন
উত্তর মরুর মাঝখানে।

মনের জোরেই ত সে রকেটে চড়ে,
চাদের সাহায্য-টিপ কপালে পরবে।
মনের নাবিক হয়ে কতো উল্কাভ্রম
কতো বাধা পার হলো কতো যন্ত্র-প্রান্ত !
মনেতে ভ্রমসা রাশি
প্রিয়জনে দূরে ছাড়ি
কতো জনা কতো দূরে দিয়েছেন পাড়ি ;
বারে বারে পরাজয়,
প্রতিকূলে শ্রোত বয়,
তবু ত বিলীন নয় লক্ষ্যের পথ ;
জোগেছে কেবল মনে নুতন দপথ।

মন—মন—মন, হে আমার মন,
তুমি হাজা এ জগতে কে আছে আপন ?
আমার কথার মানে
একজনা ভালো জানে
সাপর বে ছয় বারে পাড়ি দিয়েছেন,
হয়তো তুমিও জানো,—বীর সে মিহির সেন।



পত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৬

জিয়ালাগোড়া পোঃ,
জেঃ মানডুম, বিহার,
১০ই এপ্রিল, ১৯৩১।

প্রিয় মহাশয়,

তাৎপর্য এবং সাক্ষিপূর্ণ পত্র ব্যতীত আমি আপনাকে চারিটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র দিয়েছি—৭শা, ২৫শে মার্চ (২৬শে মার্চ ডাকে ফেলা হয়), ২১শে মার্চ, ৩১শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিল। পত্রগুলিতে সাধারণভাবে কংগ্রেসের বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। পত্রালাপ দীর্ঘ এবং বিলম্বিত হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। একটিমাত্র দীর্ঘ পত্রের মধ্যে সকল কথা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু দুইটি বাধার জন্য তাহা হয় নাই। প্রথমতঃ একটি দীর্ঘ এবং সম্পূর্ণ পত্র লিখিতে গেলে শরীর মনের উপর চাপ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ আপনার পত্রে উল্লিখিত নূতন নূতন বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার পক্ষ হইতে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন। আশা করি এইটিই আমার শেষ পত্র হইবে। যে বিষয়ে আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে, এই পত্রে আমি সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব। ইহা ভিন্ন, আমার পূর্ববর্তী পত্রগুলির মূল বক্তব্যগুলির পুনরাবলোচনা করিয়া, আপনার নিকট শেষ আবেদন জানাইব।

(১) দুর্নীতি এবং হিংসা

আমি যদি আপনাকে ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে চরমপত্র দেওয়া এবং সত্তর জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার আপনি বিরোধী, কারণ আপনি মনে করেন যে, আমাদের মধ্যে যথেষ্ট দুর্নীতি এবং হিংসাত্মক মনোভাব প্রকট। গত কয়েক মাস বাবং ওয়ার্কিং কমিটিতে এই দুর্নীতির বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়া আসিতেছি এবং আমার মনে হয় এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত—পার্শ্বক্য শুধু এইটুকু যে, আমার মতে, উহা (দুর্নীতি) এত ব্যাপক নহে যে, পূর্ণ ঘরাজ লাভের জন্য সত্তর সংগ্রাম আরম্ভ করা তাহা অসম্ভব করিয়া তুলবে। অপরপক্ষে, আমরা যদি নিয়মতান্ত্রিকতার পক্ষে আরও দীর্ঘকাল গা ভাসাইয়া চলি, জনসাধারণ যদি আরও দীর্ঘকাল বাবং উক্ত পদের সুখ-সন্তোষের মোহে আচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে আরও অধিক পরিমাণে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। আরও, আমি একথা বলিতে পারি যে, বর্তমান কালের ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া আমি এ দাবী করিতে পারি যে, নৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে উভাদের অপেক্ষা কোন অংশেই আমরা নান নহি বরং কয়েক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতও বটে। সত্তর্যং দুর্নীতির বিভীদিকা আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে না। অধিবাস, দেশের মুক্তির জন্য আরও আত্মত্যাগের ও হৃৎকণ্ঠভোগের আহ্বান দুর্নীতির সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক হইবে এবং প্রসঙ্গতঃ উহা আমাদের মধ্যে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি চূপিসাড়ে প্রবেশ করিয়া থাকিলে বা পদাধিকার করিয়া থাকিলে, জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহাদের মুখোমুখি ফেলা সম্ভব হইবে। তুলনামূলক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসে এইরূপ উপাধরণের অভাব নাই যখন ধর্মের কটনীতিজগৎ ঘরের শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব থাকা সম্পর্কে, আমি আমার পূর্ববর্তী পত্রে উক্ত মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করি। কংগ্রেস-সদস্যগণের তথা কংগ্রেসের সমর্থকগণের মধ্যে, মোটের উপর, পূর্বোক্তা এখন হিংসার ভাব তরুই। অন্ততঃপক্ষে পূর্বোক্তা হিংসার ভাব অধিক নাই—এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। এবিষয়ে আপনার মতের সমর্থন আমি কেন করি না, সে সম্পর্কে যুক্তি দেখাইয়াছি; তাহা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব বর্তমানে হ্রাস আছে, বাহ্যিক ফলে হাসা-হাসামা ঘটতেছে এবং বাহ্যিক কংগ্রেস সরকারগুলিকে কর্তার হস্তে দমন করিতে হইতেছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। উহা হইতে আমাদের এই অভিমত পোষণ করা ঠিক হইবে না যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে বা তাহাদের সমর্থকদের মধ্যে হিংসার মনোভাব বাড়িয়াছে। যে সকল রাজনৈতিক দলের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই, যেমন মুসলিম লীগ,—তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাবে এবং কর্মে অহিংস হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম মূলতঃ বাধা কি মাত্রা ছাড়াইয়া বাওড়া হইবে না?

(২) পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে আমি আপনার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, যে-রূপে উক্ত প্রস্তাবটি উপস্থাপিত এবং শেষ পর্যন্ত পাণ হইয়াছিল, সেই রূপটি আপনি সমর্থন করেন কি না অথবা কম-বেশী আমাদের নির্দেশানুযায়ী উহারই একটি সংশোধিত রূপ আপনি পছন্দ করিতেন বাহা সর্বসম্মতিক্রমেই পাণ হইতে পারিত। আমি আরও জানিতে চাই যে, আপনি পছন্দ প্রস্তাবটিকে আমার প্রতি

মনোহাযুচক বলিয়া মনে করেন কি না। আপনাদের অবগতির জন্য আমি উক্ত প্রস্তাবটির মূল খসড়াটি এবং তাহার একটি সংশোধিত খসড়াও উল্লেখ করিলাম।

মূল খসড়া

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল বাস্তববাদ চলিতেছে এবং যে জ্ঞাত কংগ্রেস মহলে এবং দেশের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা আবশ্যিক।

অতীত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মূল নীতিগুলি কংগ্রেসের কার্যাবলীতে প্রভাবিত করিত, বর্তমান কংগ্রেস সেই নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আস্থাভাজন করিতেছে এবং এই মূল নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আস্থাভাজন করিতেছে যে, সেই মূল নীতিগুলির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা চলিবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যাবলীতে তাহা যেন প্রভাবিত করে। গত বৎসর যে-ওয়ার্কে কমিটি কাজ চালাইয়াছিল তাহার কার্যক্রমভার এই কংগ্রেস আস্থাভাজন করিতেছে এবং তাহার যে কোনও সমস্তের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকিলে, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

“আগামী বৎসর সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে মনে করিয়া এবং একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই সেই সঙ্কট কংগ্রেসকে এবং দেশকে উপযুক্ত নেতৃত্বের দ্বারা জয়যুক্ত করিতে পারেন মনে করিয়া, কংগ্রেস ইহা অত্যাবশ্যক মনে করে যে, তাহার কার্যনির্বাহক সমিতি তাহার পূর্বা বিশ্বাসভাজন হওয়া প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্র রাষ্ট্রপতিকে এই অনুরোধ করিতেছে যে, গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই যেন তিনি ওয়ার্কে কমিটি গঠন করেন।”

সংশোধিত খসড়া

“রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল বাস্তববাদ চলিতেছে এবং যেজন্য কংগ্রেস মহলে এবং দেশের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা আবশ্যিক।

অতীত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মূল নীতিগুলি কংগ্রেসের কার্যাবলীতে প্রভাবিত করিত, বর্তমান কংগ্রেস সেই নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আস্থাভাজন করিতেছে এবং এই মূল নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আস্থাভাজন করিতেছে যে, সেই মূল নীতিগুলির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা চলিবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যাবলীতে তাহা যেন প্রভাবিত করে। এই কমিটি গত বৎসরের ওয়ার্কে কমিটির কার্যক্রমভার আস্থাভাজন করিতেছে।

“আগামী বৎসর সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে ভাবিয়া, এই কংগ্রেস মনে করে যে, অতীতের ভায় ভবিষ্যতেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব এবং সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।”

(৩) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল

গত ৩১শে মার্চের পরে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহা এই সময়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ

এবং সাংবাদিক জল্পনা-কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই করিয়াছিলাম। আমার তৎকালীন এই ধারণা হইয়াছিল যে, সি, এস, পির একান্ত নেতারা মনস্থির না করিয়াই চলিতে থাকিবেন এবং তাহার পরিণামে ভবিষ্যতে এক নতুন নীতি অনুবর্তন করিবেন, যেমন, পূর্বাভাস নেতৃত্বক সমর্থনের নীতি। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তাহা হইতে আপনাদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত যে, সমগ্র সি, এস, পি পুর্বাভাস নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে চলিয়া যাইবে। সেই জন্যই আমি আপনাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, সি, এস, পির উপরের তলার নেতারা বাহাই করুন না কেন, এই দলের এক বৃহৎসং আমাদের সহিত কাজ করিয়া যাইবেন। ত্রিপুরীতে এই নেতাদের নিরপেক্ষতার নীতির প্রতিক্রিয়া তাহাদের দলের উপর বিরূপ হইয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলাম বলিয়াই আমি ঐরূপ বলিতে পারিয়াছিলাম। কয়েকটি প্রদেশ এই নেতাদের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সাধারণ সভাদের অনেকেই তাহা করিয়াছিলেন। অনেকে আবার নিয়মাবলীভিত্তিক ভ্রমরোধে অথবা নৈতিক চাপে নেতাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। আপনাকে পত্র লিখিবার পর যে সাংবাদ আমি পাইয়াছি তাহাতে সি, এস, পির নেতাদের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে ভ্রান্তদের প্রভা উঠিতেই পারে না।

(৪) একদলীয় বনাম সর্বদলীয় ক্যাবিনেট

এ-সম্পর্কে আপনাদের যুক্তিগুলি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি এবং বিচার করিয়াছি কিন্তু তৎসঙ্গেও এ-পর্যন্ত আমার মত-পরিবর্তন হয় নাই। হয়ত আপনাদের আরও যুক্তি আছে বাহা আপনাদের অভিমত আমার পক্ষে স্বীকার করার সহায়ক হইতে পারে। আপনাদের মূল বক্তব্য এই যে, প্রধান প্রধান বিবরণগুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ এতই গভীর যে, আমাদের পক্ষে একযোগে কাজ করা অসম্ভব। হরিপুরা কংগ্রেসে আপনি আমাদের সহিত একমত ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের পক্ষে একযোগে কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাহার পর হইতে কি এমন ঘটনা ঘটয়াছে বাহার ফলে একযোগে কাজ সম্ভব নহে? আর, আপনাদের মতে, আমাদের মধ্যে মূল বিষয়ে মতানৈক্যগুলিই বা কি কি?

আমি জানিতে চাই, একদলীয় ওয়ার্কে কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনাদের প্রতিবাদ কি নীতিগত না আমার ২৫শে মার্চ তারিখের পত্রে উল্লিখিত ৫০-৫০ আনুপাতিক ভাৱের জন্য? এই পক্ষে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমি সাতটি নাম উল্লেখ করিব আর সর্দার প্যাটেল করিবেন সাতটি, আপনাদের সমর্থনের জন্য। কিন্তু আপনি যদি উপরিউক্ত অনুপাত স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষেও এই চৌদ্দটি নামের প্রস্তাব করা সমতাব্যেই সম্ভব। আপনি যদি পূর্বোক্ত অনুপাত স্বীকার না করেন এবং যদি মনে করেন যে, সর্বসম্মত সর্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠনের পক্ষে তাহা অসম্ভব, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন। বিষয়টি তাহা হইলে পুনরিবেচনার সুযোগ আমি পাইতে পারি।

(৫) জীৱনৰ বন্ধনৰ প্ৰতি উপদেশ

২৪শে মাৰ্চৰ পত্ৰ আপনি আমাৰ জাতিকে লিখিছিলেন : “সুতৰাং আমি এই পৰামৰ্শ দিতেছি যে, হয় তোমরা সকলো এক বৈঠকে সমবেত হইয়া প্ৰাণখোলা আলোচনা-মাধ্যমে একটা বোঝাপড়া কৰ অথবা বিবেচন অল্পপ্ৰবেশ যদি এতদূৰ হইয়া থাকে বাহাৰ কলে তাহা বাহিৰ কৰা অসম্ভব হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।” আপনাৰ পৰবৰ্তী পত্ৰগুলিতে কিন্তু এই যুক্তিৰ অল্পপ্ৰবেশ কৰেন নাই। আমি আপনাকে একাধিক বার লিখিছাছি যে, আমাদেৱে দিক হইতে, কংগ্ৰেছেৰে মধ্যে একা পুনঃস্থাপনৰে জন্ত চৰম চেষ্টা কৰিতে আমাৰা প্ৰস্তুত। আমি আৰও বলিছাছি যে, আমাদেৱে পক্ষে, আমাকে লইয়া এমন বহু ব্যক্তি আছেন বাহাৰা আপনাকে পক্ষপাতভূষ্ট বলিয়া মনে করেন না। ইহাৰা মনে করেন যে, যুদ্ধমান বলগুলিকে আপনি একাবদ্ধ কৰিতে পাবেন। আমি আৰও বলিতে পাৰি যে, একমাত্র পুৰাতন নেতৃত্বকে এবং তাহাদেৱে অল্পগামিগণকে আপনি গান্ধীবাদী মনে কৰিবেন—ইহাৰা কোনও যুক্তি নাই। আপনি যদি আমাদেৱে কয়েকটি ভাবাবৰ্ণ এবং পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰেন, তাহা হইলে সমগ্ৰ কংগ্ৰেসকেই গান্ধীবাদী মনে কৰিতে পাবেন।

আমাৰ বিকল্প প্ৰস্তাবগুলি

(ক) আমাৰ প্ৰথম প্ৰস্তাব এই যে, যুক্তিসংগ্ৰাম পুনৰায়ন্তৰে জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কৰা উচিত। এই বিষয়ে আমাদেৱে নিকট হইতে যে কোনরূপ আন্তৰ্জাত্য প্ৰয়োজনবোধে দাবী কৰিতে পাবেন—এমন কি বৰ্তমানে যে সকল পদাধিকাৰ আমাদেৱে আছে তাহাৰ পৰিত্যাগও। যুক্তিসংগ্ৰাম পুনৰায়ন্তৰ কৰিলে, তাহা বিনাসৰ্বে সমৰ্থনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰা দিতেছি।

(খ) আপনি যদি মনে করেন যে, সগ্ৰাম এখন আৰম্ভ কৰা সম্ভব নয় এবং আপনি যদি পুৰাতন নেতৃত্বকে পদাধিকাৰ দিতে চান, তাহা হইলে আমাৰ অল্পপ্ৰবেশ এই যে, আপনি চাৰি আনাৰ কংগ্ৰেস-সভা হউন এবং গুৱাকি কমিটিৰ পৰিচালন-ভাৱ নিজৰ হাতে গ্ৰহণ কৰুন। উহা দ্বাৰা কতকগুলি বাধা দূৰ হইবে, যে বাধাগুলি দূৰ হইবাৰ আগে সম্ভাবনা থাকিব যে না যদি আপনি নিজেৰে কৰে সৰহিয়া বাখিয়া পুৰাতন নেতৃত্বকে গান্ধীনীকৰণ কৰেন।

(গ) আমাৰ এই প্ৰস্তাবও যদি আপনাৰ নিকট গ্ৰহণযোগ্য বিবেচিত না হয় এবং আপনি যদি আমাকে একমুখীৰ ক্যাৰিনেট গঠনেৰে জন্ত পীড়াপীড়ি কৰেন, তাহা হইলে আমাৰ অল্পপ্ৰবেশ এই যে, আপাৰী কংগ্ৰেস পৰ্যন্ত আমাৰ প্ৰতি আত্মজ্ঞাপন কৰুন। আপনি আত্মজ্ঞাপক ভোট দিলে, আপনাৰ “গোড়া” অল্পগামিগণও এ, আই, সি, সিতে আমাকে সমৰ্থন কৰিতে বাধ্য হইবেন। উহা দ্বাৰা তাজন এডান এবং নিৰ্ভৰাটে কাজ কৰিয়া বাওৱা সম্ভব হইবে। গত ৬ই এপ্ৰিলেৰে চিঠিতে আমি আপনাৰ নিকট সবিনয়ে জানাইছাছি যে, পণ্ডিত পুৰে প্ৰস্তাবদ্বাৰাৰে শুধু যে আপনাৰ ইচ্ছাৰেই গুৱাকি কমিটি গঠন কৰিতে হইবে তাহা নহে, উহা আপনাৰ বিশ্বাসভাজনও হওৱা চাই। একবাৰ যদি এই প্ৰস্তাবটি অল্পপ্ৰবেশ কৰেন, তাহা হইলে আপনাৰ পুৰাপুৰি বিশ্বাসভাজন নয়, এমন গুৱাকি কমিটি গঠনে পৰামৰ্শ দেওৱা আপনাৰ পক্ষে সম্ভব হইবে না।

(ঘ) আপনি যদি তিনিট প্ৰস্তাবই বাতিল কৰেন, তাহা হইলে আৰ একমুখীৰ পথই খোলা থাকিব—আপনাকে গুৱাকি কমিটি গঠনেৰে পুৰা দায়িত্ব লইতে হইবে। আপনাৰ সিদ্ধান্ত বোঝাবাৰ পৰ আমাৰ ভবিষ্যৎ কৰ্তব্য স্থিৰ কৰিবাৰ ভাৱ আমাৰ উপৰই থাকিব।

(৬) আপনাৰ মৌনতা

আপনাৰ এক পত্ৰ লিখিছাছেন যে, আমাৰ অল্পপ্ৰবেশই আপনি মৌনত্ৰত অবলম্বন কৰিছাছেন। কেন এৰূপ অল্পপ্ৰবেশ কৰিছাছিলম তাহাৰ ব্যাখ্যা কৰা প্ৰয়োজন। ত্ৰিপুরীতে পৰিস্থিতি একপ পীড়াইয়াছিল এবং কংগ্ৰেসীদেৰে মধ্যে বিভেদ এত গভীৰ হইয়াছিল যে, আমি মনে কৰিছাছিলম যে, একাৱক্ষাৰ একমাত্র আশাশ্বল আপনিই ছিলেন। তখন ভাবিছাছিলম যে, সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটো নিরপেক্ষ এবং শান্ত মন লইয়া বিচাৰ কৰা আপনাৰ পক্ষে কৰ্তব্য। পত্ৰ-প্ৰস্তাবেৰে সমৰ্থকগণ তখন দিল্লীৰ দিকে ছুটিতেছিলেন। তখন আমি স্বভাবতঃই ভাবিছাছিলম যে, ত্ৰিপুরীৰ ঘটনাবলী সম্পৰ্কে একতৰফা একটা ব্যাখ্যা দিয়া তাহাৰা আপনাকে প্ৰভাৱিত কৰিবাৰ চেষ্টা কৰিবেন। সেই জন্তই আমি আপনাকে অল্পপ্ৰবেশ কৰিছাছিলম যে, ত্ৰিপুরী সংক্ৰান্ত সমগ্ৰ ঘটনাটি অৰ্থাৎ এ সম্পৰ্কে বিভিন্ন কাহিনীগুলি শ্ৰবণ না কৰিয়া আপনি যেন কোন সাংবাদিক বিবৃতি না দেন বা কোনও উক্তি না কৰেন। আমাৰ অল্পপ্ৰবেশ বন্ধ কৰাৰ জন্ত আপনাৰ নিকট আমি অন্ত্যস্ত কৃতজ্ঞ। উহাৰ ফল এই পীড়াইয়াছে যে, সমগ্ৰ দেশ কংগ্ৰেসকে গৃহযুদ্ধেৰে হস্ত হইতে বন্ধা কৰিবাৰ জন্ত এবং একা পুনঃস্থাপনৰে জন্ত আপনাৰ মুখেৰে দিকে চাহিয়া আছে। ভগবান না কৰুন কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বশতঃ যদি সেই সময় আসে, যখন আপনাৰ দৃষ্টি পক্ষপাতভূষ্ট হইবে, তখন একোৱে সকল আশা ধূলিসাৎ হইবে। এবং সম্ভবতঃ আমাৰা গৃহযুদ্ধ লিপ্ত হইব।

এখন আমি অল্পপ্ৰবেশ কৰিতেছি যে, আপনাৰ মুখে চাপা দেওৱা আৰ আমাৰ পক্ষে উচিত হইবে না। আপনি যদি মনে করেন যে, আপনাৰ মৌনতা ভাঙা উচিত অথবা আপনি যদি মনে করেন যে, ত্ৰিপুরী সংক্ৰান্ত সকল কাহিনীগুলিই আপনি শুনিছাছেন, তাহা হইলে আপনি আপনাৰ খুশিমত বিবৃতি দিতে পাবেন। আমি শুধু আপনাকে এই অল্পপ্ৰবেশ কৰিতেছি যে, কংগ্ৰেছেৰে সকল দল (মাত্ৰ পুৰাতন নেতৃত্ব নহে) আপনাৰ সন্মুখে কি ভাবে এবং আপনাৰ নিকট কি আশা কৰে, তাহা সৱণ বাখিবেন।

পৰিপূৰ্ণে আমি বলিতে বাধ্য যে, ৭ই তাৰিখেৰে সহসা ৰাজকোট বাইবাৰ প্ৰাক্তালে দিল্লী হইতে যে তাৱবাৰ্তী পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও আমি অন্ত্যস্ত নিৰাশ হইছাছি। ৭ই সপ্তাহে আমাৰ পক্ষে ডাঃ ৰাজেন্দ্ৰপ্ৰসাদ বিড়লা হাউসে টেলিফোন কৰিয়া জানাইয়াছিলেন, আমি আপনাৰ সহিত সাক্ষাতৰে জন্ত কতখানি উৎক্ৰোধ ছিলাম। আমি বুখিছাছিলম যে, আমাদেৱে পত্ৰালাপে কোনও ফল হইতেই না; প্ৰাণখোলা, মুখোমুখি আলোচনা দৰকাৰ। ঐ দিনই একটু বেলাৰ আমাৰ ডাক্তাৰ বিড়লা হাউসে আপনাকে টেলিফোন কৰিছাছিলেন। অপৰ প্ৰান্ত হইতে শ্ৰীমহাদেৱে শোণাই তাহাকে জানান যে, এখানে আসিবাৰ জন্ত আপনি প্ৰাণপণ চেষ্টা কৰিবেন।

অন্ততঃপক্ষে আশামী দিনের পূর্বে অর্থাৎ ১ই পূর্বে আপনি দিল্লী ভ্যাগ করিবেন না। রাজকোট আপনাকে সরাইয়া লইয়াছে,—একজ্ঞ আমি চুখিত। আমি শুণ্ডু এইমাত্র আশা করিতে পারি যে, রাজকোটের নিকট বাহা আশীর্বাদ স্বরূপ হইবে তাহা বেন কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক না হয়। কেন্দ্রস্বায়ীতে রাজকোট বহি আপনাকে সরাইয়া লইয়া না হইত, তাহা হইলে ত্রিপুরার ইতিহাস অন্তরূপ হইত। এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার ছিল কিন্তু আমার নিকট হইতে এবং অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে পুনঃপুনঃ অসুস্থরোহ সন্দেহ আপনাকে পাওয়া গেল না। বর্ধন আপনি ঠাকুর সাহেবকে চরমপন্থ দিয়াছিলেন তখন যদিও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমগ্র দেশ আপনার পাশে আশিয়া গাঁড়াইয়াছিল, তথাপি আপনার দেশের এক বিরাট অংশ মনে করিয়াছিলেন এবং এখনও মনে করেন যে, রাজকোট রাজ্যের অধিবাসীদের কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়াও আপনি রাজকোট সংগ্রাম করেক সন্তোহ পিছাইয়া দিতে পারিতেন।

(সার মরিস গারারের রায়দান সম্পর্কে আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্ট-আকর্ষণ করিতে চাই যে, তিনি উহা ব্যক্তিগত ভাবে স্বাক্ষর করেন নাই, করিয়াছেন ভারতের প্রধান বিচারক রূপে)।

আমার শত্রু অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, এখানেই থামা উচিত। আশা করি অম্মণে কোনওরূপ কষ্টবোধ করেন নাই এবং স্বাস্থ্যেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। আমি বীরে বীরে সূস্থ হইয়া উঠিতেছি।

প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের স্রোতঃ

পাক্ষীকীর উত্তর—৪

প্রিয় স্রোতঃ, রাজকোট, ১০।৪।৩১

তোমার ৬ তারিখের পত্র এইখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাণ খুলিয়া পারস্পরিক আলোচনার জন্ত বিরোধীদের এক বৈঠকের প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর এত ব্যাপার ঘটয়াছে বাহার ফলে আমি জানি না উহার এখন কোনও মূল্য আছে কি না, বৈঠক হইলে তাঁহার পরস্পরের প্রতি লুপথব্যাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং তাহার ফলে ভিত্তিতা বাড়িয়াই যাইবে। বিতের অত্যন্ত ব্যাপক এবং অবিখ্যাস অত্যন্ত গভীর। মিলনের কোনও পথই আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমার মনে হয় একটি মাত্র পথ আছে এবং তাহা হইতেছে এই মতপার্থক্য স্বীকার করিয়া প্রতি দলের নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করিয়া যাওয়া।

আমার বোধ হইতেছে, সুগম্য দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক বোঁগে কাজ করা ইবার ক্ষমতা আমার আদৌ নাই। আমি এই আশা করিতে পারি যে, তাঁহার শালীনতা বজায় রাখিয়া নিজ নিজ নীতি কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি তাঁহার তাহাই করেন, তাহা হইলে দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমি ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বহুই আমি তাহা পড়িতেছি ততই উহার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। প্রস্তাব-বচনাকারীদের উদ্দেশ্য ভালই ছিল। কিন্তু বর্তমান সমস্তার মীমাংসা উহার মধ্যে নাই। প্রত্যয় নিজ বুদ্ধিমত্তে তুমি উহার ব্যাখ্যা করিও এবং কোনওরূপ ইতস্তস্ত না করিয়া কাজ করিয়া যাইও।

তোমার উপর একটি ক্যাবিনেট চাপাইয়া দিতে আমি পারি মা,

দিব না। তোমার উপর ক্যাবিনেট চাপাইতে দিও না। তোমার নির্বাচিত ক্যাবিনেট এবং তোমার নীতি এ, আই, সি, সি, সমর্থন করিবে এমন কথাও আমি দিতে পারি না। উহা অবদমনেরই সমতুল্য হইবে। সমস্তগণ নিজ নিজ বিচার বুদ্ধিমত্তে কার্য করুন। তুমি যদি ভোট না পাও, তাহা হইলে স্বতন্ত্র পন্থা না অধিকাংশ সমস্তকে নিজ মতানুযায়ী করিতে পারিতেছ ততক্ষণ বিরোধীদের নেতৃত্বের কাজ করিয়া যাইও।

তুমি কি জান না যে, যেখানে যেখানে আমার প্রভাব আছে, সেখানেই আমি আইন অমাত্র আলোচনায় বদ্ধ করিয়া দিয়াছি? ত্রিবাঙ্কুর এবং জয়পুর তাহার উল্লেখ্য চূড়ান্ত। এখানে আশিবার পূর্বে রাজকোট আলোচনায়ও বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, বাতাসে আমি হিসার গন্ধ পাইতেছি। অহিংস আলোচনার উপযোগী আবহাওয়া আমি দেখিতেছি না। রামচরণের শিক্ষা কি তোমার পক্ষে বর্ধিত নয়? আমার মতে, উহা অসম্ভব ক্ষতিসাধন করিয়াছে। আমি বহুদূর বৃদ্ধিতে পারিতেছি, উহা পূর্বকল্পিত ছিল। উড়িষ্যার রণপুরের ভায় এখানেও কংগ্রেসেরাই দারী। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, আমরা দুইজনে একই বিষয়কে দুইটি বিশ্রীত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেছি এবং এমন কি, বিশ্রীত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতেছি? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি করিয়া আমরা মিলিত হইতে পারি? ঐক্যে আমাদের বিভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। সামাজিক, নৈতিক এবং পৌরশাসনের ব্যাপারে অবশ্য আমরা মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারি। অর্থনৈতিক দিকটির কথা আমি এখানে উল্লেখ করিতে পারি না। কারণ, এই বিষয়েও যে আমাদের মতানৈক্য আছে তাহা আমরা সবিশেষ বৃদ্ধিতে পারিয়াছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের নিজ নিজ মত ও পন্থানুসারে যদি আমরা কাজ করিয়া যাই তাহা হইলে আমরা দেশের সেবা ভালভাবেই করিতে পারিব। জোড়াতালি দিয়া জোরপূর্বক একটি সর্বদলগ্রাহ্য নীতি এবং কার্যসূচী প্রস্তুত করিয়া তাহা বিভিন্ন বিরোধী দলকে দিয়া কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা উহা শ্রেয়ঃ হইবে।

দিল্লী হইতে তার-বর্ত্তায় আমি তোমাকে জানাইয়াছিলাম যে, ধানবাদ হইতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। রাজকোটকে অগ্রাহ্য করিবার সাহস আমার নাই।

ভাল আছি। কস্তুরা ভীষণ ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। আজ লইয়া পাঁচদিন হইল। অসুখ বধন সূত্র সবেমাত্র হইয়াছিল, তখনই আমি তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।

আমার ইচ্ছা এই যে, স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কলাকল ভগবানের উপর ছাড়িয়া দাও এবং তদ্বারা তোমার স্বাস্থ্যরক্ষা কর। তোমার পিতার সন্ধে উল্লেখ আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

একটা কথা বলিতে চুলিয়া গিয়াছি। কেহই আমাকে তোমার বিরুদ্ধে লাগায় নাই। সেবাগ্রামে তোমাকে বাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবশেষ। তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, পূর্বাতন নেতৃত্বের মধ্যে তোমার একটি ব্যক্তিগত শত্রু আছে, তাহা হইলে তুমি ভুল করিতেছ। ভালবাসা জানিও। —বাপু

হেঁচু হেঁচু শ্রীমদ্রামায়ণ অষ্টমোহর্ষ

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

১১

সামান্য ক'দিনের অন্তরে জগন্নাথ মারা গেলেন।

শোকে মূহিত হয়ে পড়লেন শচী দেবী।

নিমাই বললে, 'মা, চোখ চাও। আমাকে দেখ। আমি যত দিন আছি তত দিন তোমার সব আছে। তুমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। হরি-হরি বলো।'

হরি শব্দের দুই মুখ্য অর্থ। এক, সর্ব-অমঙ্গল হরা করে; দুই, প্রেমে মনোহরণ করে। আর কৃষ্ণনাম? 'কোটি অশেষ এক কৃষ্ণনামসম।' অশ্রমেধ্যের ফল কি? সর্বপাপবিনাশ। কিন্তু সর্বকর্ম অমুষ্ঠানেই ক্রেটিবিচ্যুতির ভয়, উচ্চারণে স্বরভ্রংশের ক্রেটি, নিয়মে ক্রমভঙ্গের ক্রেটি, দেশকালপাত্র প্রসঙ্গে বস্তু ও দক্ষিণাদির ক্রেটি। সমস্ত ক্রেটির প্রতিহারের উদ্দেশে 'অচ্ছিন্ন-মন্ত্র' পাঠের নির্দেশ। 'এই অচ্ছিন্ন-মন্ত্র আর কিছু নয়, হরিনাম-সঙ্গীতন। 'মন্ত্রস্তত্ত্বতচ্ছিন্নং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্বং করোতি নিশ্চিৎসং নামসঙ্গীতনং তব।' নামের ফল শুধু পাপনাশ নয়। আরো আছে। নামের ফল চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব। আর প্রেমের আবির্ভাবে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। সাত্ত্বিক ভাব আট রকম। স্নেহ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ আর প্রলয়। তাছাড়া আর কী লাভ? 'অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥' প্রেমের উদয়ে ঘুচে যায় সংসারবন্ধন, দূরে যায় দুর্বাসনা। একমাত্র কামই তো হৃদরোগ, নামে সেই রোগের অন্তর্ধান।

কল্যাণ কি? ভক্তিবিরোধী কর্মই কল্যাণ। যে কর্মের উদ্দেশ্য শুধু আত্মোজ্জ্বলিত্ব তাই ভক্তি-বিরোধী। হয় পার্থিব ভোগ দাও, নয় স্বর্গ দাও,

নয় বা মোক্ষ এই কামনায়ই তো ধর্মানুষ্ঠান। তাৎপর্য স্বমুখসাধন বা স্বহৃৎনিবৃত্তি। যতক্ষণ মনে ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা, ততক্ষণ ভক্তি নেই। ভক্তি তো আত্মমুখ নয় কৃষ্ণমুখ। ভক্তি তো আত্মপ্রীতি নয় কৃষ্ণপ্রীতি। ভজ্জ ধাতু থেকে ভক্তির উৎপত্তি। আর ভজ্জ ধাতুর অর্থ সেবা। সেবার উদ্দেশ্য শুধু সেবার প্রীতিসাধন। সুতরাং ভক্তি মানে কৃষ্ণকে সুখী করা। কিসে কৃষ্ণ সুখী? মমত্ববুদ্ধিতে। কৃষ্ণ আমারই, আমারই একলার, আমি ছাড়া কৃষ্ণের কেউ নেই। কৃষ্ণ আমারই লাল্য, পাল্য, অহুগ্রাহ্য। আমার লালন-পালন-অহুগ্রহের বস্তু। কৃষ্ণ আমার ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই না বা স্বমুখবাসনা। শুধু প্রেমাত্মিক সেবা। ভক্তপক্ষপাতিকই ভগবানের গুণ।

'আমার দিকে তাকাও।'

বাছ তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।

করিয়া কল্যাণ-নাশ প্রেমতে ভাসায়॥

মন্দ-মন্দ হাসি নিমাইয়ের কটাক্ষে আর সেই দৃষ্টি যার উপর গিয়ে পড়ে তার সর্বশোক দূরে পালায়। শোকের মূলই হচ্ছে কল্যাণ। সে কল্যাণ, সে ভক্তি-বিরোধী কর্মের বাসনা বিধ্বস্ত হয়। আর তার তখন ব্রজপ্রেমে নিমজ্জন। গৌরের কথা বলবে কি, বলতে উত্তোষ করা মাত্রই, কুশল-পটলী অর্থাৎ সর্গবিধ মঙ্গলের অভ্যাদয় ঘটবে।

শুন মাতা! মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।

সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥

ব্রহ্মা-মহেশ্বরের যে ছল ভ লোকে বলে।

তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিব হেলে॥

কিন্তু ক্রোধে একেবারে তপ্ত তাওব। সংসারের অবস্থা বুঝতে চায় না, একটা জিনিসের আবদার

করেছে কি, তখুনি তা মেটানো চাই। নইলে ঘর-দুয়ার ভাঙা বাড়ির আকার ধারণ করবে নিমাই।

গঙ্গান্নান করতে যাচ্ছে, মাকে বললে, ‘মা, মালা-চন্দন দাও। গঙ্গাপূজা করব।’

প্রমাদ গালেন শচী। বললেন, ‘বাবা, একটু অপেক্ষা কর, মালা নিয়ে আসি।’

‘নিয়ে আসি! এখন তুমি আনতে যাবে?’ নিমাই, এগারো-বারো বছরের ছেলে, রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। ‘এতক্ষণ আনোনি কেন? কী করছিলে ঘরে বসে?’

ক্রান্ত শব্দে ঘরে ঢুকল নিমাই। যত গঙ্গাজলের কলসী ছিল একের পর এক ভাঙতে লাগল। ছোট-বড় যত ঘট ছিল ঘরে, কোনোটার মধ্যে বা তেল নুণ বা বি, সকলের গায়ে মারতে লাগল লাঠির বাড়ি। যত সিকা ছিল, বড়ি বা মশলাপাতির, সব ছিঁড়তে লাগল টেনে-টেনে। শুধু সিকা নয় হাতের কাছে যত কাপড় পেল একটাও আস্ত রাখল না। তারপর আর যখন ভাঙবার কিস নেই তখন আক্রোশ গিয়ে পড়ল খোদ ঘরের উপর, তার দরজা-জানলার উপর। ঘর-দোর ভেঙেও ঠাণ্ডা হল না। সামনে যে গাছ ছিল তাকেই পিটতে লাগল নিমৈর মত। গাছ গেছে, এবার মাটিকে প্রহার করো। লাঠির ঘায়ে জর্রর হল পৃথিবী।

জননী শচী দেবী ভয় পেয়ে গৃহের উপাস্তে গিয়ে লুকুলেন।

ভঙ্গন-যজ্ঞ সাজ করে নিমাই দাঁড়াল অঙ্গনে। অতৃপ্ত রোমে ধুলোয় গড়াপড়ি খেতে লাগল। কনক-অঙ্গ কালি হয়ে গেল মুহূর্তে। বৈকুণ্ঠপতি ধরিত্রীকে শয্যা করলেন।

চারিবেদে যে প্রভুরে করে অঘেষণ।

সে প্রভু যান্নন নিদ্রা শচীর অঙ্গন ॥

শচী দেবী মালা আনালেন। নিদ্রিত পুত্রের জীহ্বে হাত রেখে ধীরস্বরে বললেন, ‘ওঠ বাপ ওঠ, এই তাত মালা এসেছে। যা এবার গিয়ে ইচ্ছেমত পূজা কর।’

খড়মড়িয়ে উঠে বসল নিমাই। ছি ছি, ঘরদোরের এ কী হাল কবেছি! লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

শচী দেবী বললেন, ‘বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে। তোর আপদ-বালাই কেটে গেছে।’

ভাল হইল বাপ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।

যাউক তোমার সব বালাই লইয়া ॥

সংসারের এত অযথা অপচয় করল নিমাই, তবু জননীর আপশোষ নেই। ক্রৌড়াময় চঞ্চল বালকের জন্তু আবার রান্নার আয়োজন চলল। পোকুলনগরে যশোদাকে কত সহ্য করতে হয়েছিল কুকুটাপলা। আমিও সহ্য করি।

গঙ্গান্নান করে বাড়ি ফিরল নিমাই। তুলসী-জল দিয়ে বিষ্ণুপূজা করল। খেয়ে-দেয়ে হঠমনে পান চিবুতে বসল।

শচী দেবী কাছে এসে ভয়ে-ভয়ে বললেন, ‘ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করে লাভ কি? এ সব তো তোমার নিজের জিনিস। নিজের জিনিস কি কেউ নষ্ট করে?’

মুহু-মুহু হাসতে লাগল নিমাই।

‘ঘরে আর কিছু নেই, কাল খাবে কি?’

‘কৃষ্ণ খাওয়াবেন।’

প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পোষণ।

সন্ধ্যার আগে মাকে নিভুতে ডাকল নিমাই। ‘হু’ তোলা সোনা মার হাতে দিয়ে বললে, ‘কৃষ্ণ পাঠিয়ে দিলেন। এ দিয়ে যত দিন চলে, সংসার খরচ করো।’

‘সে কি!’ অবাচ হয়ে গেলেন শচী: ‘এ সোনা তুই কোথায় পেলি?’

নিমাই উত্তর করে না। পাশ কাটিয়ে চলে যায় হাসতে-হাসতে।

এ কি বিপদের মধ্যে এনে ফেলল। শুধু একবার নয়, যখনই অভাব হয় সংসারে, সম্বল-সঙ্কট হয়, নিমাই সোনা নিয়ে আসে। কার সোনা কোথা থেকে আনে কে বলবে! ধার করে, না, এ কি কোনো অমানুষী বিভূতি! ভাঙাতে ভয় পান শচী। কিন্তু না ভাঙালেই বা চলবে কেন? যাকে সোনা দিয়ে পাঠান বাজারে, তাকে বলে দেন, পাঁচ-দশ ঠাঁই দেখিয়ে-শুধিয়ে তবে ভাঙাবি। আমার ভারি ভয় করছে।

ভয়ের কিছু নেই, নিমাইই সব ধরে আছে, আচ্ছাদন করে আছে।

ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিল কৃষ্ণ। মহেশ্বর: কিং করিষ্যতি? জীবের পাশন-পোষণের ব্যাপারে ইন্দ্র কি করবে? সুতরাং ভয় পেয়ে ইন্দ্রকে পূজা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বয়ং ঈশ্বর বলে ইন্দ্রের গর্ব, তাই কৃষ্ণাধীন গোপদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হল

দেবরাজ। প্রায়শ্চর্য মেঘসমূহকে আদেশ করল, প্রবল বেগে বর্ষণ করো, বিকলিত করো গাণপতী। বাচল বালক, অবিনীত, পণ্ডিতমানী, অজ্ঞ, মর্ত্য কৃষ্ণকে অবলম্বন করে গোপেরা আমার পূজা বন্ধ করেছে, এ অপমান অসহ্য। বনবাসী গোপের ধর্মবর্ধা বেশি হয়েছে বুঝি? ওদের ঐশ্বর্য্যমদ নিশ্চিহ্ন করে দাও।

মেঘসমূহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে এল দিগ্বিদিক ছেয়ে। ছুটে এল প্রচণ্ড প্রভঞ্জন। বিদ্যামালায় উজ্জলীকৃত হয় ছুটে এল বজ্র। জল আর শিলা বরতে লাগল অবিচ্ছেদ্যে। গোপগোপীরা প্রথমে গৃহমধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করল কিন্তু ক্রমে সমস্ত পৃথিবী পরিপ্লাবিত হলে, উচ্চাবত সমস্ত স্থান একাকার হয়ে গেলে তারা বাতে ও নীতে কাঁপতে-কাঁপতে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। বলতে লাগল, 'হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ, হে ভক্তবৎসল, কুপিত ইন্দ্রের থেকে এখন আমাদের রক্ষা করা তোমারই কর্তব্য।'

'গ্রামরা ইন্দ্রের যজ্ঞ হতে দিইনি, তাই ইন্দ্র আমাদের ধ্বংস করতে অকাল প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই এই অত্যাধি অতিাতসহ শিলা-জল বর্ষণ।' কৃষ্ণ অভয় দিল সকলকে। 'আমি নিজ ক্ষমতায় এর প্রতিকার করব। যে সব দেবতার সদ্ভক্তি আছে তারা পর্বতার কখনো নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবে না। কিন্তু ইন্দ্রের মোহ জন্মেছে। আমি অভিমান ভঙ্গ করি, অসাদুর তাতে বিনয়ই উৎপন্ন হয়। আমিই গোষ্ঠের শরণ্য ও নাথ, গোষ্ঠই আমার পরিবার, আমিই আত্মযোগ দ্বারা এই গোষ্ঠ রক্ষা করব, এ আমি নিশ্চয় করছি।'

বালক যেমন অনায়াসে একহাতে ছাতা মেলে ধরে তেমনি অবলীলায় সাত বছরের কৃষ্ণ বাঁ হাতে গোবর্ধনগিরি উত্তোলন করল। দক্ষিণ হাত দক্ষিণ কটিতে রেখে দাঁড়াল বহ্নিম হয়ে। গোপগোপীদের সম্বোধন করে বললে, 'সমস্ত লোকজন শকট-গোধন নিয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করুন। আপনারা ভয় করবেন না যে আমার হাত থেকে পাঁহাড় পড়ে যাবে। বাত ও বৃষ্টি থেকে আপনাদের উদ্ধার করবার জন্মেই এই ব্যবস্থা।'

যথাস্থে ব্রজবাসীরা ভূত্যা পুরোহিতসহ সমস্ত উপজীবীদের নিয়ে গিরিকন্দরে আশ্রয় নিল। ক্ষুধা

তৃষ্ণা ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করে কৃষ্ণ সাত দিন পর্বত ধরে রইল, মুহূর্তের জন্তোও স্থান থেকে বিচলিত হল না। কৃষ্ণের বিক্রম দেখে ইন্দ্রের মোহ দূরীভূত হল, ভ্রষ্টসঙ্কল্প হয়ে মেঘসমূহকে প্রত্যাহার করল। বাতবর্ষণ থেমে গেল, নির্মেঘ আকাশে দেখা দিল সূর্য। ব্রজবাসীরা স্ত্রী-পুত্র ধনসম্পত্তি গো-শকট সব কিছু নিয়ে বেরিয়ে এল একে-একে। সকলে স্তব করতে লাগল, ইন্দ্রের পর্বাপহারী গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। 'পিতাশুক্লং জগতামধীশ—' এই বলে ইন্দ্রও শরণ নিল কৃষ্ণের।

সকলের সমক্ষে কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধনকে তার পূর্ব-স্থানে নাগিয়ে রাখল।

'এই অনাথ ছেলটাকে তোমার হাতে মঁপে দিলাম।' শচী দেবী কঁদে পড়লেন গঙ্গাদাসের কাছে। 'একে যদি তুমি একটু যত্ন করে লেখাপড়া শেখাও—' 'নিশ্চয়ই শেখাব।' গঙ্গাদাস মহা খুশি। 'নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনি কিছু ভাববেন না। এর বাপ নেই বলে কোনো বিঘ্ন হবে না।'

টোলে সর্বোত্তম প্রথম ছাত্র নিমাই। বয়স আর কত হবে? তেরো-চৌদ্দ। ঢের-ঢের বুড়ো-বুড়ো ছেলেরাও পড়ছে সেই টোলে, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি। কিন্তু বিদ্যায় নিমাই সর্বপ্রধান। সর্বাঙ্গ ডুবে আছে বিদ্যারসে। স্নানে ভোজনে পর্যটনে সর্বত্র শাস্ত্রকথা। সকলকে তর্কে নামাও। তারপরে পরাস্ত করো। অগ্নি টোলের ছাত্র হলে তো কথাই নেই। গায়ে পড়ে যত্ন করবে। স্নানের ঘাটে হলেও ছাড়বে না। এ ঘাট থেকে ও ঘাটে ভেসে যাবে। এমন কি দরকার হলে সাঁতারে গঙ্গা পার হয়ে চল যায় ওপারে, সূত্র স্থাপন করে নিজের ব্যাখ্যা আবার নিজেই খণ্ডন করে আসে।

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।

পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন।

ললাটে শোভয়ে উর্দ্ধ তিলক স্মরণ।

শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব-মনোহর।

স্বক্কে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।

হাস্তময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত।

কিবা সে অদ্বুত দুই কমল নয়ন।

কি বা সে অদ্বুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন।

যেই দেখে সেই এক দৃষ্টো রূপ চায়।

হেন নাহি ধন্য যন্ত বলি যে না যায়।

অদ্বৈত আচার্যের আশ্রিত কমলাকান্ত। কমলাকান্তর উপরই অদ্বৈতের ব্যবহারিক বিষয়ের ভার। কমলাকান্তই অদ্বৈতের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখে। অদ্বৈতের সঙ্গে কমলাকান্ত এসেছে নীলাচলে। অদ্বৈতের তপন কোথায় তিন শো টাকার মত ঋণ ছিল, অদ্বৈতকে না জানিয়ে কমলাকান্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে চিঠি লিখে পাঠাল টাকা চেয়ে। লিখে পাঠাল, অদ্বৈত স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, দৈবে তার কিছু ঋণ হয়েছে—তিনশোর মত টাকা পেলে তার ঋণ পরিশোধ হয়, রাজা যদি অনুকূল হন।

চিঠি প্রতাপরুদ্রের কাছে পৌঁছবার আগেই কি ভাবে কে জানে গৌরীন্দ্রের হাতে এসে পড়ল। এ কি অম্ভায় কথা। পত্রে অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে, তাতে না হয় কিছু দোষ নেই, কেননা, ‘আচার্য দৈবত ঈশ্বর’ কিন্তু তাই বলে দৈগ্ধ্য জানাবার কী হয়েছিল? যে ঈশ্বর সে কি দরিদ্র? অদ্বৈতের দারিদ্র্যের ইঙ্গিত করে কমলাকান্ত তার ঈশ্বরত্বকে খর্ব করেছে। এ অপরাধের শাস্তি বিধেয়।

মহাপ্রভু তাঁর সেবক পোবিন্দকে বললেন, ‘জীজ থেকে কমলাকান্তকে এখানে আসতে দেবে না।’

‘দারমান’ হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে কমলাকান্ত রান হয়ে গেল। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য আনন্দিত। বললে, ‘কমলাকান্ত, এ দণ্ড তোমার প্রতি প্রভুর অসীম অনুগ্রহ। স্নেহ না থাকলে কি এমন দণ্ড কেউ দেয় কখনো? তাই এ তোমার দণ্ড নয়, এ প্রসাদ। তুমি ভাগ্যবান।’

কমলাকান্তকে ডেকে পাঠালেন গৌরাজ।

দণ্ডিতকে আবার ডেকে পাঠালেন। অদ্বৈত অমুযোগ করতে লাগল, ‘এর উপর আবার দর্শন দিচ্ছেন কমলাকান্তকে!’

মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

‘কমলাকান্ত তু ভাবে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে।’ বলতে লাগল আচার্য, ‘প্রথমত আমাকে না জানিয়ে রাজার কাছে অর্থভিক্ষা করেছে; দ্বিতীয়ত, আমি ঈশ্বর নই অথচ আমার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছে।’

প্রসন্নবরদ মুর্তিতে তাকিয়ে রইলেন মহাপ্রভু। এ তো অদ্বৈতের অভিযোগ নয়, কৃপালুর প্রতি প্রণয়কোপ। যে দণ্ডই তার প্রতিও করুণার উৎসার। যে বিভ্রান্তিত তাকেও আবার নিমন্ত্রণ।

‘ও রকম করো কেন?’ মহাপ্রভু কমলাকান্তকে বললেন, ‘এতে আচার্যের লজ্জা ও ধর্মহানি হয়না? নিজের অভাব জানানোই তো লজ্জা আর রাজার ভিক্ষা গ্রহণ করাই তো ধর্মহানি। শোনো, বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর রাজার মত বিষয়াসক্ত আর কে আছে? আর চিন্ত যদি মলিন হয় কৃষ্ণস্মরণ হয় না। আর কৃষ্ণস্মৃতির স্মৃতি যদি না হয় তা হলে জীবন অর্থহীন।’

প্রতিগ্রহ না করিয়ে কত রাজধন।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে ছুট্ট হয় মন॥

মন ছুট্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।

কৃষ্ণস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নিফল জীবন॥

শুধু কৃষ্ণভজন করো। অশ্রু কামনা করেও যদি কেউ কৃষ্ণভজন করে, কৃষ্ণরসে কাম ধুয়ে যায়। কাচের অঘোষণ করতে-করতে ধ্রুব পেয়ে গেল পরমরস। পিতৃসিংহাসন পাবার জগ্গে কৃষ্ণকে ডেকেছিল, কৃষ্ণ এসে দাঁড়াতে আর সিংহাসনের বাসনা রইল না। বললে, আমি কৃতার্থ, আমার আর অশ্রু বয়ের প্রয়োজন নেই।

কৃষ্ণ তো বলতে পারতেন, তুমি সিংহাসন চেয়েছ, সিংহাসন নিয়েই তুষ্ট থাকো, আমাকে চাইছ কোন হিসেবে? কিন্তু না, কৃষ্ণকৃপার এই তো বৈশিষ্ট্য। না চাইলেও দিয়ে দেন যা সত্যিকার চাইবার। ছেলে মাটি খাচ্ছে দেখতে পেয়ে মা তার মুখের মাটি ফেলে দিয়ে মিষ্টি পুরে দেন—এও তেমনি। বিষয়শুখের জগ্গে কৃষ্ণভজনা করেছে, অমৃত ছেড়ে বিষ, এ তো মুখের আচরণ। কৃষ্ণ তো সর্ববিজ্ঞ, তিনি মুখতাকে অনুমোদন করবেন কেন? সর্বকামনার আচ্ছাদক, সর্বকামনার পরিপূরক নিজ পাদপদ্মব দিয়ে দেবেন। ‘আমি বিজ্ঞ, এই মুখের বিষয় কেনে দিব। স্বচরণায়ত দিয়া বিষয় ভুলাইব।’ ‘অশ্রুকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥’ সাধক প্রার্থনা না করলেও যা সত্যি প্রার্থিতব্য, সেই তুলভ সেই অপ্রাপ্য সেই অগোচর বস্তুই তাকে দিয়ে দেন বাসুদেব। ‘কামলাগি কৃষ্ণ ভজ পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে।’

রায়-স্বরাণের গলা ধরে মহাপ্রভু কঁাদছেন আর বলছেন, বান্ধব, আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা শোন। আমার কৃষ্ণ সর্বচিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্থন-মন্থন।

‘শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর। আশ্রয় পর্যন্ত সর্বচিত্তহর।’
যে আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা কণামাত্র শুনেবে তার
এই মাধুর্যের লেভে সব কিছু ছাড়তে হবে, লোকধর্ম,
বেদধর্ম, দেহ-পেছ-ভোগ-তৃষ্ণা। নিষ্কিঞ্চন যোগী হয়ে
ভিক্ষা মেগে খেতে হবে। কায়ক্লেশে জীবন ধারণের
জন্তেই তো ভিক্ষা, দেহ না থাকলে কৃষ্ণমাধুর্য
আন্বাদন করব কি করে? গোপীরা আর
কী তপস্যা করেছিল? শুধু নেত্র ভরে কৃষ্ণরূপমাধুর্য
পান করেছিল আর নিজেদের নয়নমন-তমুকে শ্লাঘা
করেছিল অনুক্ষণ। ‘কান্তাভাব সাধ্যশিরোমণি।’
যে রাগমার্গে থেকে শুধু অমুরাগে কৃষ্ণকে ভজনা করে
তারই কাছে কৃষ্ণমাধুর্য সুখলভ্য। ‘কেবল যে
রাগমার্গে, ভজ্ঞে কৃষ্ণ অমুরাগে, তার কৃষ্ণ-মাধুর্য
সুখলভ্য।’

মুরারি গুপ্তের সঙ্গেই নিমাইয়ের বেশি ঝগড়া।
শিশুজ্ঞানে নিমাইয়ের সঙ্গে তর্কে নামতে চায় না
মুরারি, আর তারই জন্তে নিমাইয়ের আক্রোশ!
আমি শিশু!

‘যাও, যাও, বজির ছেলে, রুগী পুত্র নিয়ে
থাকোনা।’ নিমাই গল্পনা দিয়ে ওঠে, ‘লতা-পাতা
ঘাঁটো পে যাও। এ ব্যাকরণ শাস্ত্র, এতে তোমার
কফ-পিত্ত-অজীর্ণের কথা লেখা নেই। যাও ফিরে
যাও, তোমার রুগীদের নিয়ে পড়ো পে।’

রুজ-অশ মুরারির হঠাৎ চটে ওঠার কথা।
কিন্তু মুরারির কি হয়েছে, নরম হয়ে গিয়েছে।

বেশ, যখন বলছ এত করে, ধরো তর্কের সূত্র
ধরো। অর্থ বলো, আমি তা খণ্ডন করব এবং
যখন আমার যুক্তিতে তোমার আস্থা হবে তখন
দেখবে তোমার প্রথম অর্থই আবার প্রতিষ্ঠিত করেছি
নতুনতরো যুক্তির জোরে। বেশ তো, এ পদ্ধতি
উভয়ত।

কেউ কার সঙ্গে এঁটে উঠছে না। তখন হঠাৎ
নিমাই মুরারির গায়ে হাত রেখে স্পর্শ করল।

শিহরভরা সর্বাঙ্গে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মুরারি।
প্রাকৃত মানুষ নয় এই পুরুষ। তা না হোক, কিন্তু
মুরারি কি জানে কার প্রভাবে তার এত পাণ্ডিত্য।
এত চাতুর্য-প্রাচুর্য।

‘মুরারি, কৃষ্ণ ভজনা করো।’ দিনের পর দিন
বলছেন মহাপ্রভু।

‘কৃষ্ণ?’ ভিখারি জড়ানো মুরারির কণ্ঠস্বর।

‘হ্যাঁ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়,
সর্বরসময় নির্মল প্রেম।’

‘তুমি বলছ, কৃষ্ণকে ধরব?’

‘হ্যাঁ, কৃষ্ণ বিনা উপাসনা নেই। কৃষ্ণই বিদগ্ধ-
মধুর রসিকশেখর।’

‘আচ্ছা, তুমি যখন বলছ—’ মহাপ্রভুর প্রতি
গৌরববুদ্ধির বলে শেষ পর্যন্ত রাজি হল মুরারি।
বললে, ‘আমি তোমার ক্ষিপ্র, কত আর তোমার
আদেশ লঙ্ঘন করব। কালই দীক্ষা দিও আমাকে।’

ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসল মুরারি। সমস্ত রাত
কাঁদে কাটাল। তার রঘুনাথের কাছে প্রার্থনা
করতে লাগল, ‘হে রাম, রঘুনাথ, তোমাকে আমি
কেমন করে ছাড়ব? তোমার চেয়ে আমার কাছে আর
কেউ বড় নেই, কারর হাতে নেই। তোমাকে ছেড়ে
আমি বাঁচব না কিছুতেই। যদি তোমাকে ছাড়তে হয়
তা হলে আজ রাতেই যেন আমার প্রাণ যায়।’

পরদিন সকালে উঠে কাঁদতে-কাঁদতে মহাপ্রভুর
পায়ে এসে পড়ল মুরারি। বললে, ‘তোমার বাক্য
লঙ্ঘন করি এ আমার সাধ্য নয় অথচ আমার
রামত্যাগও অসাধ্য। এখন তবে উপায় কী!
একমাত্র উপায় আমার মৃত্যু। আমাকে এখুনি শেষ
নিশ্বাস ত্যাগ করতে দাও।’

মহাপ্রভু মুরারিকে তুলে নিলেন ধুলো থেকে।
আলিঙ্গন করে বললেন, ‘গুপ্ত, তুমি শয়। আমার
কথায়ও তোমার মন টলল না, তোমার সূদৃঢ় ভজ্ঞকে
সাধুবাদ করি। তুমি শ্রীরামকিঙ্কর হনুমান, তুমি
কেন আমার কথায় তোমার রঘুনাথকে ত্যাগ করবে?
তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখবার জন্তেই আমি তোমাকে
কৃষ্ণভজনের কথা বলেছিলাম। তোমার রামই
তোমার তত্ত্ববস্ত।’

মুরারি রাম বলুক, রাম ভজুক, তুমি দেহ ধরেছ
কি করতে, যদি না কৃষ্ণ বলো। ‘একই বিগ্রহ ধরে
নানাকার রূপ।’ আর তোমার এই দেহই সেই
বিগ্রহের মন্দির। এই দেহের মধ্যেই সেই আনন্দ-
সম্প্রদায়ের বাসা।

হেন দেহ পাইয়া না হইল কৃষ্ণের রতি।

কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি ॥

যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।

তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা স্মৃতির বিহারে ॥

[ক্রমশঃ]

মহামহোপাধ্যায় ঐহরিদাস ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ

[বেদবাসকৃত সটাক মহাভারতের একক বঙ্গানুবাবক]

মুগ্ধবি শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদবাস লিখিত মহাভারতের বাট লক্ষ শ্লোকের মধ্যে এক লক্ষ পেয়েছিল এই মর্ত্য ভূমি। যুগ যুগ ধরে মরলোক রসান্বাদন করেছে পঠনে বা শ্রবণে এই অমৃতময়ী লেখনীসম্ভার। কিন্তু স্বর্ষিদের ভাষা সংস্কৃতের হতে লাগল রূপান্তর সারা আর্ধ্যস্থানে—উত্তর চল বিভিন্ন ভাষাভাষীদের। যুগপৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, বর্ণসংস্কারোচনা, নর্শন ইত্যাদির আধার মহাভারতের প্রাদেশিক ভাষার অল্পবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ইদানীং কালে বর্ধমানের মহারাজা জারিশ বহুরে, তের জন পণ্ডিতের সহায়তায় মহাশ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ সতর বছরে, সতের জন পণ্ডিতের মাধ্যমে পূণ্য ভারতবর্ষের সমিতি সতের জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় মূল ও অল্পবাদ করেছেন—কিন্তু একক প্রচেষ্টায়—বিশ বছর দশ মাস সতের দিনের পরিশ্রমে—এক লক্ষ শ্লোকের মূল, সংযুক্তি নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা আর শেষে মূলের পাঠান্তর—বর্তমান শতাব্দীর এক অগাধাশ্রম ও স্তমহান অবদান। এই দুর্লভ কর্তব্যসম্পাদনায় হোতা হলেন মহামহোপাধ্যায় ঐহরিদাস ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়—ত্ৰিরাশি বৎসর বয়সে বৈ মহামানবকে প্রথম দর্শনে আমার প্রণতি জানাতে তিনি উচ্চারণ করলেন স্বস্তিবাচন।

৬গঙ্গাধর বিজ্ঞানস্বাক্ষর ও ৮বিধুধরী দেবীর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিদাস করিমপুর জেলার কোটালিগাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামে ১৮৭৬ সালের ২৪শে অক্টোবর রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। নব ভারতের নৈমিষারণ্য কোটালিগাড়া পরগণার কল্যাণে আমরা পেরেছি রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শশিকুমার শিরোমণি, আত্মোৎসাহ তর্করত্ন, হারিকানাথ স্মারকপাণ্ডিত প্রভৃতি নৈমিষারিককে, নীলকণ্ঠ তর্কবাগীশ, সীতানাথ বিজ্ঞানভূষণ প্রভৃতি স্মার্তকে, কালীচন্দ্র বাচস্পতি, দুর্গাধন স্মারকভূষণ প্রভৃতি বৈয়াকরণিককে, কালিদাস বিজ্ঞানবিনোদ প্রভৃতি আলঙ্কারিককে, গঙ্গাধর বিজ্ঞানস্বাক্ষর প্রভৃতি জ্যোতিষীকে। পান্ডিত্য বৈদিক শ্রেণীর যজুর্বেদীয় কাত্তপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর জ্যেষ্ঠ সহোদর হারদবানন্দ স্মারকচর্চার অধস্তন হারদ পুরুষ হলেন ঐহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে শিতামহের নিকট অগায়ন আরম্ভ করেন। পরে পাঠশালায় বাংলা—এগার বৎসরে কলাপব্যাকরণ ও টোলে সন্ধিবৃত্তি—পরে ব্যাকরণ পড়া শেষ করেন। পনের বৎসর বয়সে গ্রামের আর্ধ্যশিক্ষা সমিতিতে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাবিকারী হিসাবে শকাচাৰ্য্য উপাধি ও ছ'শ টাকা পান। সেই সময় তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষার গভ ও পত্ত রচনা করতেন এবং কংসবদ নাটক রচনা করেন। আঠার বছরে সংস্কৃতে 'জানকীবিক্রম' নাটক, 'বিরোজ বৈভব' ষষ্ঠভাষ্য ও 'বৈদিকবাদ-মীমাংসা' ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন, ক্রমশঃ তিনি কাণ্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা পিতার নিকট পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ, আনন্দচন্দ্র বিজ্ঞানস্বাক্ষর নিকট স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ, ঢাকা সারস্বতসমাজের পূরণশাস্ত্র উপাধি পরীক্ষা, স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষা, সাংখ্যরত্ন উপাধি, সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি প্রভৃতিতে অংশ



গুণপণ্যের পরিচয় দিয়ে বৃত্তিলাভ করেন। ১৩২৩ সালে কালীগ্রামস্থ ভারতবর্ষ-মহামণ্ডল তীর্থে 'মহোপদেশক' উপাধি দেন।

তার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতও প্রকাশ পায়। যখন তিনি স্মৃতিশাস্ত্ররত, তখন সেনদিয়া গ্রামে অধিকাচরণ মজুমদারের মাতের শ্রাদ্ধবাসরে শশধর তর্কচূড়ামণির তত্ত্বশাস্ত্রপাঠন বক্তৃতার বিকল্পে এবং পরে চন্দ্রপ্রভাপ পরগণার রমণীমোহন রায়ের বাড়ীজ্ঞানের সভায় মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ও জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়বয়ের সঙ্গে সমতাপূরণ বিষয়ে আলোচনায় বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিকট সমাদৃত হন। ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসে এক অহুষ্ঠানে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মহাভারতের পাঠক হিসাবে এক দিনে এর পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৩১২ সালে কোটালীগাড়ার আর্ধ্যবিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে পনের বছর তর্ক উপাধিলাভের জন্তে কলকাতায় আসেন। সেই সময় কালীঘাট যত্তরালয়ে থেকে তিনি নটকোত্তী উদ্ধার ও হস্তলেখা বিচার করতে আরম্ভ করেন। ১৩১৪ সালে তিনি নকীপুত্রের জমিদারগৃহের পুরোহিত, ও সভাপণ্ডিত এবং স্থানীয় টোলের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এখানে থাকার সময় তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সত্বকে নানাবিধ কীর্তিকাহিনী ভূনস্তেন এবং 'বঙ্গীয় প্রতাপ' নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। এর



ঐহরিদাস ভট্টাচার্য্য

পর কল্পিতরূপ মহাকাব্য ও স্মৃতিচিত্রমাণি ব্যবস্থাপ্রণয় রচনা করেন। নকীপুত্র থেকে কলকাতার বই ছাপাখানায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৭ সালে তিনি একটি মুদ্রণাগার স্থাপন করেন।

১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে ডাক্তার স্ত্রীর দেহপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্মৃতিরূপ মহাশয়ের উত্তোগে তিনি স্ত্রী লেনে বসবাস আরম্ভ করেন। কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী ও স্ত্রীর দেহপ্রসাদের উৎসাহ উদ্বীপনায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বসবাস প্রণীত সটীক মহাভারতের মূল, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা ও সর্বনিম্নে মূল্যের পাঠ্যগ্রন্থসহ বঙ্গবন্ধু ১৩৩৬ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ ও ১৩৪৭ সালের ১১শে জ্যৈষ্ঠ সমাপ্ত করেন। আদিপর্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ১লা শ্যেখ ও স্বর্গরোহণ পর্বের শেষ খণ্ড মুদ্রিত হয় ১৩৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাগজের অভাব ও ১৩৪৬ সালের দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুন সাত বছর কাগজ বন্ধ থাকে। ১৪১তম খণ্ডে সম্পাদিত গবেষণামূলক অমূল্যে আছে ১০০ উপপর্ক, ২১৬০ অধ্যায় ও এক লক্ষ শ্লোক (হরিবংশ-সহ), এই দুইই কথ্যে তিনি ব্যয় করেছেন দেড় লক্ষ টাকা—তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার দিয়েছেন ঊনপঞ্চাশ হাজার আর জনসাধারণ দিয়েছেন ছ' হাজার টাকা।

সাংসারিক অভাব-অনটন, অর্থাভাব, দ্বীর্ণ ও মায়ের মৃত্যু, পর পর মারাত্মক বসন্ত ও কলেরায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রাত্যহিক পূজার্তনায় পর প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা মহাভারতের অমূল্য কর্মে মগ্ন থাকতেন।

প্রথম আরম্ভের সময় তিনি প্রায় ছ'শো জনকে মহাভারতের গ্রাহক হিসাবে পাবার নিশ্চয়তা পান। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ, প্রেমচন্দ্র তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ আনন্দমোহন শাস্ত্রী বৈদ্যভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, অচ্যুত চন্দ্র রায়, স্ত্রীর দেহপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের কাজ সমাপ্ত হ'ল, তখন পুরোন গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই পরলোকে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিভিন্ন সময়ে বারটি মূলগ্রন্থ, পাঁচটি অমূল্যিত মূলগ্রন্থ ও চৌদ্দটি মুদ্রিত টীকাগ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে কল্পিতরূপ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে এবং তৎপ্রণীত 'বল্লীপ্রস্তোত', ও 'মেঘার প্রস্তোত' নাটকসহ মিনার্ভা ও ষ্টার মঞ্চ সূচ-অভিনীত হয়। ভগবান শঙ্করাচার্যের পর তাঁর মত সঙ্কতে বহু গ্রন্থকার ভারতে আর দেখা যায় না।

সারা বাঙ্গালার সংস্কৃতির বিশিষ্ট অধ্যাপকদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর ছাত্র এবং বিভিন্ন স্থান থেকে এ পর্যন্ত তিনি এগারটি উপাধি ধারী ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর প্রথম ছই ছেলে শশিশেখর ও হেমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তৃতীয় যোগেশচন্দ্র ছিলেন জিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ও চতুর্থ ভবেন্দ্রচন্দ্র করেন অধ্যাপনা।

অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বীর আদর্শ ও নিষ্ঠা অমূল্য! আরকরুণ হৃদয় হওয়ায় আজ তিনি আনন্দিত—বংশের সংস্কৃত শিক্ষাধারী অধ্যাহত রাখার মহাকাব্যি সঙ্কট কিন্তু বিগত

ত্রিশ পুরুষের এই গরিমা কি ভবিষ্যতে বজায় থাকবে? আসার সময় মনে হ'ল বাংলা তথা ভারতের এই কৃতী সন্তানের স্মরণে যেন এই চিন্তাই বার বার ছায়াপাত করছে।

ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র

[বিশিষ্ট দ্ব্যৈবোগবিশেষজ্ঞ ও বাত্মীবিজ্ঞাবিশারদ]

“প্রত্যেক চিকিৎসাধীন রোগীকে তোমার মাতা বা ভগিনীর স্তায় দেখিবে ও তাদের সহিত সেই মত ব্যবহার করবে—নিজের মা বা বোন কখনো ছাড়ে না তোমার ঘেরণ মানসিক অবস্থা হয়—রোগীকে বাত্মীয়জনদেরও ঠিক সেই রকমই। সেই জন্য শেখোজ্ঞানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে—আর চিকিৎসাভাবনে অর্থলোভ করিবে না”—বাবার দেওয়া উপদেশবাণী আজও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন বাংলা তথা ভারতের স্মরণীয় চিকিৎসা



ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র

দ্ব্যৈবোগ-বিশেষজ্ঞ ও বাত্মীবিজ্ঞাবিশারদ ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র। নিজের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থাভাবগ্রন্থ দুঃখা রোগীদের প্রায়ই তিনি চিকিৎসা করে থাকেন বিনা দক্ষিণায়।

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বশোহর জেলার সামটা গ্রামে শ্রীসত্যনাথ মিশ্র ও শ্রীমতী রামলতা দেবীর বড় ছেলে শিবপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয়ও সেই গ্রামেই। বাবা সত্যনাথ বাবু ১৯০৫ সালে আবিষ্কার করেন চকুরোসের জগদ্বিখ্যাত ঔষধ 'পদ্মরত্ন'। এঁরা হলেন কান্তকূজীর ব্রাহ্মণবংশ। বাঙ্গালার আসেন সম্রাট আকবরের সময়। শিবপ্রসন্ন গ্রামের সুলে, বশোহর জেলা সুলে ও মিত্র ইন-এ কিছুদিন পড়িবার পর ম্যালেব্রিয়ার আক্রান্ত হওয়ায় কুলটি বিভ্রান্ত হয়ে বোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা ও এমটিস চার্জ

কলেজ হইতে ১৯২১ সালে আই-এস-সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কায়মাইকেল (বর্তমানে আর-জি-কর) মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে পড়ার সময় তিনি বরাবর পদক ও ধাত্রীবিভার বৃত্তিলাভ করে ১৯৩৫ সালে এম. বি. পাশ করেন। পরে সেখানে দু বছর দু মাস রেসিডেন্ট হাইস সার্জেন হিসাবে যুক্ত থেকে ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন। সেখানে মূল মাসের ভিতর L. R. C. P. M. R. C. S. ও M. R. C. O. G. তে উত্তীর্ণ হয়ে এডিনবরাহর গমন করেন কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ভারতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। আর, জি, কর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম M. R. C. O. G. এখানে এসে তিনি উক্ত কলেজেই প্রথমে প্রসূতিবিভাগে রেসিডেন্ট সার্জেন, পরে ভিজিটিং সার্জেন ও বর্তমানে অধ্যাপকরূপে কাজ করছেন। এছাড়া তিনি অস্থায়ী ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট (১৯৪২), ভাইস-প্রিন্সিপাল (১৯৫৭) ও অধ্যক্ষ (১৯৫৮) পদে বৃত্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি F. R. C. O. G. হন। দ্ব্যয়োগ ও ধাত্রীবিদ্যা সংক্ষেপে লেখা বহু প্রবন্ধ ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর লেখনী ঢালদায় যুদ্ধ হইয়া নিউইয়র্ক মেডিক্যাল কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা ডাঃ রিসি (Rice) ডাঃ মিশ্রকে নিজের লেখা কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। ১৯৫২-৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি আর, জি, কর কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ছাত্রমহলে, অধ্যক্ষ-কর্তৃপক্ষেরািমহলে, সহকর্মীদের সঙ্গে ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্যদের মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা, স্নেহময় ব্যবহার, পরিচালন-দক্ষতা ও দরদর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

নিজের পেশা ছাড়াও সমাজসেবী হিসাবে শিবপ্রসন্ন এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। প্রথম বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান I. N. A. C. ১৯৪৫ সালে কয়েকজন সহকর্মীসহ ডাঃ মিশ্র গঠন করেন। ১৯৪৬ সালে ডাঃ সুবোধ মিশ্র, ডাঃ মিশ্র ও অজ্ঞাত কয়েকজন মিলে R. W. A. C. প্রতিষ্ঠা করেন। ঐনহক এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কলিকাতার দাঙ্গায় পাড়াবা, দিল্লী, আশামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমাজ-সেবার কাজে সরকারী ও বেসরকারী মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ডাঃ মিশ্র প্রতিটি স্থানে দলের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি ইন্ডেস্ট্রিয়াল হেলথ হোম, রামকৃষ্ণ শিশুশ্রমল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সহায়র সঙ্গে কার্যকরী ভাবে জড়িত আছেন।

পাঠ্যবহুর তিনি নাট্যাঙ্গিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন এবং বর্তমানে খেলার মাঠে ও বিশিষ্ট মঞ্চাঙ্গিনয়ে তিনি নিয়মিত দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ ছাড়া ছবি তোলা ও রঙীন মণ্ডা-পালন—তাঁর অবসর বিনোদনের অন্যতম অঙ্গ।

ভারত বিভাগের পর তাঁর স্বগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার তিনি আর সেখানে যেতে পারেন না—কিন্তু বালা, কৈশোর ও বৌবনের অধিকাংশ সময় সেখানে কেটেছে—সেই বাড়ী, বাগান, গাছপালায় কণা অংশে তাঁর মানসক্ষে উদ্ভিত হয়—দার যে পৃথক দিকপাল সাহিত্যিক ও বুদ্ধিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিধি হতেন—যে স্থানে সুবিদিত মধুসূদন কিরকের ঢাপ প্রথম স্রুত হয়—সেই স্থান,

অসম্ভিত, কলে-আগা প্রায়ের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ মিশ্রের প্রাণস্পন্দী বেননাবোধ সমগ্র অন্তরকে অভিভূত করে তোলে।

ঐযতীন্দ্রনাথ সরকার

[অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক]

সংবাদপত্রকে বলা হয় Fourth Estate. কারণ সমাজ গঠনে, জাতি গঠনে, দেশ গঠনে ও জনমত গঠনে ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু সুপরিচালিত সংবাদপত্রের পিছনে থাকেন একজন নিরসল প্রচারবিদ্যুৎ কর্মী—বাহাদুর দেশাত্মবোধ রাজনৈতিক নেতাদের অপেক্ষা কোন আশে কম বা হীন নয়। এইরূপ একজন হইলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও বর্তমানে অস্থায়ী সম্পাদক ঐযতীন্দ্রনাথ সরকার।

৩রা মার্চ সরকার ও ৩রা ধারাবাগী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র ঐযতীন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে উড়িষ্যার জাজপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃভূমি বাণাঘাট কিন্তু ডাক বিভাগে চাকুরী কর্তৃক পিতার সহিত তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বহু স্থানে অবস্থান করেন। দাদামহাশয় ৩কৃষ্ণকান্ত সরকার কটক সহরের একজন বিশিষ্ট বাসিন্দা ছিলেন। ঐযতীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালে বিহার শরীক স্কুল হইতে প্রবেশিকা, ১৯১৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজ ও ১৯১৮ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ সেন্ট পলস কলেজ হইতে বর্ষাক্রমে আই, এ ও বি, এ পাশ করেন। ১৯২১ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন চাকুরী করার জন্ত মধ্যে চারি বৎসর পড়াশুনা বন্ধ রাখেন।

বিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ অল্পবিস্তর সাংবাদিকতার প্রতি অধুঃকৃত হন। সুযোগ পাইয়া তিনি ১৯২৩ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রক রীডার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে উহার সহঃ-সম্পাদক ও ১৯২৮ সালে এ্যাসিষ্টেন্ট এডিটর ১৯৫৩ সালে তিনি প্রথম অস্থায়ী সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন।

মার্কিন সরকারের ট্রেড ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ১৯৫৮ সালে দুই মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। তথায় সুবিখ্যাত সংবাদপত্রগুলির দপ্তরে তাহাদের উন্নততম কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করেন কিন্তু উহাদের স্বাধা পরিবর্জন (Display of News) তাঁহার ভাল লাগে নাই। তাছাড়া ভারতবর্ষের স্বাধা খুবই কম প্রকাশিত হয়। সেই সময় ট্রেড ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থাপনায় তিনি



ঐযতীন্দ্রনাথ সরকার

আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। এই কেন্দ্রগুলির বেদান্ত চর্চা আমেরিকার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য হইয়াছে এবং পরমপুঙ্খ ঠাকুর রামকৃষ্ণসেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবসাধনা তাঁহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জীসরকার লক্ষ্য করেন। তিনি মনে করেন যে, তথ্য ভারতের বেদান্ত চর্চার প্রসারের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে উক্ত মিশনগুলি হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা একেবারে পরিবর্তিত জীবনধারা বাপন করিয়া থাকেন। ফিরিবার পথে তিনি দুই সপ্তাহ ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করেন কিন্তু যুদ্ধান্তর গ্রেট ব্রিটেনে তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করে নাই।

বর্তমান বৎসরে তিনি পশ্চিম জাঙ্গাণ সরকারের নিয়ন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কিছুদিন তথ্য অবস্থান করেন। তথ্যকার সংবাদপত্র সমূহ আকারে এদেশীয় সংবাদপত্রাদেশকে অনেক দূরত্ব কিন্তু তদেদেশীয় ভাষা আয়ত্ত না থাকায় জীসরকার সংবাদ পরিবেশনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। তিনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন যে, যুদ্ধবিধগত জাঙ্গাণীয় বিদেশীয় আর্থিক সাহায্যে পুনরুত্থান। আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু জাঙ্গাণ জাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পরিশ্রম, বুদ্ধি ও আবাসবুদ্ধ-বনিতার কর্তৃত্বপরতার তথ্যকার বেকার সমস্যা নিশ্চিহ্ন। আজ জাঙ্গাণী শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে অন্ততম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতের বাহিরে যদি কোন উন্নত দেশ দেখিতে হয়, তবে প্রথমেই জাঙ্গাণী পরিদর্শন প্রয়োজন। কারণ, অল্প সময়ে একটি পণ্ডিত দেশ ও জাতি কি ভাবে সর্বদিকে উন্নয়নের পথে আগুমান হইয়াছে তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত পশ্চিম জাঙ্গাণী।

বর্তমান আকাশবাণী হইতে “আন্তর্জাতিক বিষয়ে” প্রায়ই বক্তৃতা দিয়া থাকেন। “দালিক বহুমতী” যে বিবিধ ঘটনাসম্বন্ধে প্রায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা জীসরকার বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার কাছে ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মাস্তা

[প্রাক্তন ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুবিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়]

সুখান ও অরুণ উক্ত শিখরে উঠেও অসমিকাকে চূরে ঢেলে নিজের নিরতিমান ব্যবহার ও মধুর স্বভাবে লক্ষ লক্ষ ছন্দকে জয় করেছেন এমন এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন সুবিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মাস্তা।

হাওড়া জেলার বাঁটার গ্রামে ১৯২৪ সালে জীমাস্তা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীকীশেন্দ্রনাথ মাস্তা। ছোটবেলা থেকেই জীমাস্তার ফুটবল খেলার বেশ রসিক ছিল। তিনি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কলকাতার রিপন (বর্তমানে হুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পড়তে আসেন। তাঁর খেলার খ্যাতি তখনই এখানে ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, এর কিছুদিন আগেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে Wallace Regiment-এর বিরুদ্ধে খেলোয়াড় তিনি সকলের মনে সাড়া জাগিয়ে দিলেন। কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ গ্রহণ করতে থাকেন এবং পরিশেষে আন্তঃবিভাগীয় প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিভাগীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। ১৯৪২ সালে তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন। তাঁর উন্নত ধরনের খেলা

ক্রমেই দর্শকদের চিত্ত জয় করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে তিনি লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক মনোনীত হন এবং ইংল্যাণ্ডে বহু প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যোগদান করে বিশ্বের দরবারে নিজেকে তুলে ধরেন। অলিম্পিকে যদিও ভারতীয় দলের পরাজয় ঘটেছিল তবু মাস্তার ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের পরলোকগত রাজা বর্ড জর্জ মাস্তাকে অভিনন্দন জানিয়ে



শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মাস্তা

ব্যাকিংহাম রাজপ্রাসাদে এক চা-এর আসরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৫২ সালে তিনি হেলিসিকি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের সুদীর্ঘ কালের অধিনায়ক শৈলেন্দ্র মাস্তা, এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রাশিয়ার আমন্ত্রণমূলক খেলায় ভারতীয় দলকে পরিচালনা করেন। ভারতের ফুটবল খেলার ইতিহাসে ঐতিহ্যময় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টিকারী মোহনবাগান দলে তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে খেলে আসছেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর প্রিয় দল বহু বার লীগ ও আই, এক, এ শ্রীতে জয়যুক্ত হয়েছে। তিনি রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়। দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করাই হল তাঁর কাজ। দীর্ঘ খেলোয়াড়-জীবনে তাই স্তম্ভ পরিচর তিনি সব সময়েই দিয়ে এসেছেন। তাঁর বসিষ্ট ক্রিকেট ভারতের যে কোন গোলরক্ষককেই আতঙ্ক। বহু বার তাঁর ক্রিকেটে বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলা নিশ্চিহ্ন হয়েছে; এমন কি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপও। তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে কোন খেলাটি জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা বলে মনে হয়েছে, প্রশ্ন করায় তিনি জানান, ক্রাসের বিরুদ্ধে খেলাটি তাঁর জীবনের সর্বোৎসাহ উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণের বহু বণ ও কীর্তির অধিকারী জীমাস্তা বিশ্বের নানা প্রান্তে খেলেছেন। লক্ষ লক্ষ দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা তাঁকে সব সময়েই উৎসাহ দিয়েছে। তিনি খেলেছেন—ইংল্যাণ্ড ওয়েলস, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, জাঙ্গাণী, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং কলম্বো, বাংলা, পাকিস্তান ইত্যাদি স্থানসমূহে। তাছাড়া ভারতে আগত বৈদেশিক দলগুলির বিরুদ্ধে ত খেলেছেনই, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মধুর স্বভাবে ও মিষ্ট ব্যবহারে তিনি সকলেরই প্রিয়। বর্তমানে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একটি বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বহু বৃদ্ধে বয়ী সেনাপতি শৈলেন্দ্র মাস্তা ক্রীড়াঙ্গণে খেলোয়াড় হয়ে হরত আয় নায়েব না, তবে তাঁকে খেলার মাঠেই দেখা যাবে এবার অজ্ঞপ্তে। আই, এক এ ও মোহনবাগান কর্তৃক মনোনীত হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড চলেছেন ফুটবল কোচিং শিক্ষা করতে। আমমা তাঁর উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে মানব গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিবার
পদ্ধতি কল্পনা করিল অথবা নিজের প্রয়োজন মত জমি বন্টন
চিন্তিত করিয়া লইল, যখন আয়তক্ষেত্র (Rectangle) আকারেই
করিল। তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবুদ্ধি তাকে এইরূপ আকার
নির্ধারণ করিবার চেষ্টাই প্ররোচিত করিল। এই কারণে দেখা
যায় আয়তক্ষেত্রই মানবের চক্ষু সুলভ দেখায়। হয়ত উহা চক্ষুর
পেশী ও ধমনীর উপর অঙ্গুল ক্রিয়া করে। আমরা চক্ষুর সমুদ্র
সচরাচর যে সমস্ত জিনিস দেখি, অথবা যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার
করি তাহার অধিকাংশই আয়তক্ষেত্র আকারের বস্তু—ঘর, জানালা
টেবিল, আলমারী, খাট, কপাট, চৌকাত, বই, কাগজ, ছবি,
বাল্ল, খামগোষ্ঠীকার্ড, দীঘি, খেলার মাঠ প্রভৃতি। এ সমস্ত
জিনিস আমরা গোলাকার ত্রিকোণাকার বা সমচতুর্ভুজ বস্তুনা
করি না তাহার কারণ তাহাতে সুলভ দেখাইবে না বলিয়া
মনে করি। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কিরূপ অনুপাতে হইলে
অধিক সুলভ দেখায় ইহাও মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়
হইয়া গাঁড়িয়াছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে অসম
আকারের জিনিসও উদ্ভাবিত হইয়াছে বটে।

মানব সাধারণতঃ একটি জিনিসকে মনে মনে দুইটি সমান ভাগে
বিভক্ত করিয়া দেখে এবং একটি ভাগের সহিত অল্প ভাগের কোনও
বিষয়ে পার্থক্য হইলে তাহা অসুলভ বলিয়া মনে করে। এই কারণে
দেখা যায় সামন্ত্র্যের কল্পনা সৌন্দর্য্যবুদ্ধির একটি ধর্ম। আমাদেরকে
কেহ যদি একটি কলসীর চিত্র আঁকিতে বলে তাহা হইলে আমরা
তাহা একেবারেই আঁকিতে আরম্ভ করি না। আমরা প্রথমতঃ
কলসীর দৈর্ঘ্য অনুসারে একটি লম্বা (vertical) রেখা আঁকিয়া
তাহাতে কলসীর মুখ গলা ও পেটের স্থানে একটি করিয়া
সামান্ত্র্য (horizontal) রেখা টানি এবং গলা ও পেটের মাপ
দুই দিকে সমান ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া একদিকে যে স্থানে বেলুপ
ভাবে বঁকাইয়া রেখা টানি অপরদিকেও তদ্রূপ ভাবে টানি অর্থাৎ
লম্বা রেখায় কাগজটা ভাঁজ করিলে যেন দুইটা দিক সর্বতোভাবে
মিলিয়া যায়। অবশেষে ভিকরের রেখাগুলি রবার দ্বারা মুছিয়া
দিই। একটি মানুষের ছবি আঁকিতে গিয়া যদি আমরা একটি
হাত একটি চোখ ও একটি কান বিশিষ্ট মানুষ আঁকি তাহা সুলভ
হইবে না, অসহ্য হইতেই সৌন্দর্য্য হানি হয়। কোটের একদিকে
একটা পকেট আছে এবং অপর দিকে পকেট নাই, একটি পায়জামার
একদিকের পা তিন ফুট লম্বা ও অপরদিকের পা দেড় ফুট, অথবা
একদিকের বড় সাদা অপর দিকের বড় লাল, একটি নারীর
একদিকের কানে একটি ফুল এবং অপর দিকের কানে একটি
ফুল সৌন্দর্য্য বিধান করে না কারণ এখানে সামন্ত্র্যের অভাব।
অসামন্ত্র্য হস্তবর্গ কারণ হইয়া থাকে।

এইবার একটি অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দেখুন, এখানেও দেখা
যায় আমরা উক্ত দুইটি সামন্ত্র্যপূর্ণ সমান ভাগে কল্পনা করিতেছি।
সৌখিন্যের একদিকে যদি একটি পুকলের পানী, সিংহ বা সৈনিক থাকে
তাহা হইলে অপর দিকেও তদ্রূপ একটি করিয়া থাকিতে হইবে।
একদিকে একটি সৈনিক, অপরদিকে একটি গাধা একদিকে একটি চূড়া
অপরদিকে একটি গম্বুজ, এক দিকে একটি গোলাকার আয়ত অপর দিকে
একটি ত্রিকোণাকার আয়ত থাকিলে সৌন্দর্য্যহানি ও হস্তবর্গ
কারণ হয়। শুধু একই প্রকারের জিনিস হইলেই চলিবে না, একই

আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি

শ্রীমদেবেশ্বনাথ মিত্র

মাণেরও হওয়া চাই। একদিকে একটি বৃহদাকার সিংহ এবং অপরদিকে
একটি হুইরের মাণের সিংহ বসাইলে চলিবে না। ইচ্ছারতের মধ্যেও
একটা সঙ্গীত থাকে বাহ্যিক architectural harmony বলে।

একই জিনিসের নিয়মিত বিস্তার সৌন্দর্য্যের কারণ হয়। রাজ্যের
দুইদিকে অথবা পুষ্করিণীর চারিদিকে যদি সমান্তরাল গাছ থাকে তাহা
হইলে সুলভ দেখায়, একই রকমের গাছ হইলে আরও সুলভ দেখায়
এবং একই মাণের গাছ হইলে আরও সুলভ দেখায়। একই রকম
পোষাকে সম্মিত একটি সৈন্তের সারি সুলভ দেখায়, তাহার একসঙ্গে
একই রূপ পরাধে চলিলে ভাল দেখায়। কিন্তু সারিগুলির
প্রত্যেকটিতে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য না থাকিয়া কোনওটিতে ১০ জন,
কোনওটিতে ৩ জন, কোনওটিতে ৭ জন এইরূপ বিভিন্ন সংখ্যায় হয়
অথবা একটি সারির মধ্যে একজন সৈন্তের পরিবর্তে একটি বাড়ি বা
মন্দির রাখা হয় তাহা সুলভ দেখাইবে না। একই ছত্রে মধ্যে
ছাপা বা ছদ্মলেখিত ছোট বড় অক্ষর ভাল দেখায় না। বাড়ির
মধ্যে সিঁড়িগুলির ব্যবধান একই মাণের না হইয়া ৫, ৬, ৭, ৮
ইঞ্চি প্রভৃতি বিভিন্ন মাণের হইলে শুধু যে উঠানমার পক্ষে
অপ্রবিধানজনক হয় তাহাই নহে, চোখেও ভাল দেখায় না।
পুকুরের শানবাধান ঘাটের একদিকে একটি বিসিবার স্থান থাকিলে
অপরদিকেও তদ্রূপ একটি থাকিতে হইবে।

রঙও চক্ষুরদ্বিধের গ্রাহ্য একটি জিনিস। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও
জিনিস হইতে মানবের মনের মধ্যে রঙের অল্পভূতি জাগিতে
লাগিল। তাহার রঙ চিনিতে লাগিল এবং তাহাদের নামকরণও
করিতে লাগিল, শুধু তাহাই নয় তাহার রঙ রঙ মিশ্রিত
বিভিন্ন নূতন নূতন রঙের পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহার
মধ্যে ফিলা ও গাঢ় রঙের স্তরও উপলব্ধি করিতে লাগিল।
কোন জাতি কোন রঙটি পছন্দ করে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছুই
বলা যায় না তবে মানব সাধারণতঃ মিশ্র রঙ অপেক্ষা মৌলিক
রঙটাই অধিক পছন্দ করে। আবার কোন রঙের পাশে কোন
রঙটি দিলে মানবের অর্থাৎ দেখিতে সুলভ হয় তাহার পরীক্ষাও
হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের যেমন বাদী সুর থাকে রঙেরও পরিপূরক
রঙ আছে বস্তু হালু ও নীল। সাধারণ ভাবে দেখা গিয়াছে
পরিপূরক রঙ পাশাপাশি থাকিলে ভাল দেখায়।

অন্তঃপার কর্ণপ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের সৌন্দর্য্যের কথা মানব
প্রথমতঃ সাতটি স্বর উপলব্ধি করিতে পারিল বাহ্যিক আমরা
সা বে পা মা পা বা নি বলি। তৎপরে তাহার আরও পাঁচটি
বিকৃত সুরেরও উপলব্ধি করিতে পারিল। ক্রমশঃ তাহার তিনটি
গ্রাম আবিষ্কার করিল বাহ্যিক আমরা উদাহরণ স্বরূপ ও তার্য বলি।
তৎপরে তাহার বাদী সঙ্গীতী ও বিবাদী সুরের সম্বন্ধও পার্থক্য
বুঝিতে পারিল। তার বস্ত্র সা অর্থাৎ সুরের বাঁধিয়া তবলা যদ্য
পদ্যর বাঁধিলে অতিমধুরস্বরের ব্যাঘাত হয় না কারণ যদ্য
একটি বাদী সুর কিন্তু তৎপরিবর্তে তবলাটি কোমল ধৈর্য
বাঁধিলে অতিমধুর স্বর নষ্ট হইয়া যায় কারণ উহা বিবাদী সুর।
বিভিন্ন সুর বস্ত্রকে বিভিন্ন সুরের বাঁধিয়া কয়েকজন গায়ক যদি

একসঙ্গে বিভিন্ন সুরে গান গাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে বেশরূপ অবস্থা হয় তাহা কল্পনা করা যায় না। এইরূপে কণ্ঠসঙ্গীত ও বাতাসঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হইল এবং ভারতবর্ষে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, তান, মান, লয়, গমক, একুশ মুহুর্তা, উনশতাব্দী কূটতান প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

কণ্ঠ সঙ্গীত ও বস্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্যও পরিপূরক হিসাবে তালেরও সৃষ্টি হইল। সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগের নাম তাল এবং এই নির্দিষ্ট নিয়মে বিভাগ মাধুর্য্যের কারণ হয়। একটি রাগিণীতে যেসব পদ্য লিপ্যঙ্কিত হইলে তাল কাটিয়া যায় তালেও নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে তাল কাটিয়া যায় এবং মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। গানের রাগিণীতে রাগিণীতে মিশ্রণ চলে বধা ছায়াসংগীত, কিছু এক প্রকার তালে আর এক প্রকার তাল মিশাইলে বিপুলতা সৃষ্টি হয় এবং কোনও তালে থাকে না। ঝাঁপতালের সহিত ধামার মিশাইয়া ঝাঁপ-ধামার নামক কোনও তালের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাল-বস্ত্র বিষয়ে দেখা যায় অষ্টাদশ দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে সমস্ত তাল-বস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের আওতাধীনও একটা পূর্বক মিষ্টত্ব আছে বধা—পাখোয়াজ, খোল, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি।

কবিতার রাজ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই এখানেও নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা এবং বিভিন্ন স্থানে শব্দাক্ষরের মিল প্রভৃতি সৌন্দর্য্য উপাদান করে। কবিতাতেও সেই তালের খেলা। অক্ষর সংখ্যার ছন্দ বাহ্যকে সংজ্ঞতে বৃত্ত বলা হয় তাহাতে বিভিন্ন ছন্দে যদি বিভিন্ন সংখ্যক অক্ষর দেওয়া যায় অথবা মাত্রা সংখ্যার ছন্দ বাহ্যকে সংজ্ঞতে বর্তি বলে তাহাতে যদি বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা দেওয়া যায় তাহা হইলে মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্যবোধ সৰ্ব্বত্র আমরা এত কথা বলিলাম বটে তথাপি দেখা যায় অধিকাংশক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা ও অর্থশীলন সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সেজন্য বিভিন্ন দেশের লোকের বিভিন্ন বিষয়ের সৌন্দর্য্যজ্ঞান কতকগুলি ব্যাপারে বিভিন্নরূপ

হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের ইয়ারতের style বা রীতি বিভিন্ন প্রকার। পাকিস্তানের মহিলার গাউন পরা ও ভারতীয় নারীর শাড়ি পরা বিভিন্ন রকমের। রঙ পছন্দ সৰ্ব্বত্রই রুচি বিভিন্নরূপে দেখা যায়। আবার একই সমাজে বয়সের ভায়েতম্য অনুসারে রঙের রুচির ভায়েতম্য দেখা যায়। একটি শিশু চড়া লাল রঙের জামা পরিয়া আসিলে যেমানান দেখায় না, কিন্তু একজন বৃদ্ধ একটা লাল জামা গায়ে দিয়া একটা আসরে উপস্থিত হইলে সকলের উপহাসের পাত্র হইয়া উঠে। সঙ্গীত সৰ্ব্বত্রই ঐরূপ। আমরা ভারতবাসীগণ হারমোনিয়মের যে পরদার পরে যে পরদা বাজাইলে বেশত্বা হইয়া গেল বলিয়া মনে করি অন্য দেশে হয়ত সেইটাই মধুর বলিয়া গণ্য হয়। একজন বিলাতী যেম গান গাহিতে থাকিলে আমরা মনে করি তিনি নাকী সুরে কাঁদিতেন, পাকিস্তানে বিলাতিগণও আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধিকরিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন, একদেশের লোকের নিকট অন্য একটি দেশের সঙ্গীত প্রথমতঃ উৎকট মনে হয় বটে কিন্তু সেই দেশের সঙ্গীত দীর্ঘকাল শুনিতে শুনিতে তাহাতেই রুচি আসিয়া যায়। আরও দেখা যায় একটা style বা রীতি পরিবর্তিত হইয়া অন্য রকম রীতি সৃষ্টির বলিয়া গৃহীত হয়। বধা সেকালের গহনা ও এ কালের গহনা। নারের ভঙ্গী সৰ্ব্বত্রই। বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিভিন্নরূপ।

তবে বাস্তব সৌন্দর্য্যবোধ বিষয়ে কবিগণের কল্পনাকে বাদ দিতে হইবে। একটি আজাহুলখিত বাহ, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন শালগ্রাম মানব যদি সহসা সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় তাহা হইলে আমাদের গম্ভীর মুখী বাইতে হইবে।

মাত্রিকরুচি মানব শব্দের জিনিসই দেখিতে চায়—এবং মধুর শব্দই শুনিতে চায় এবং তাহার তাহার মনও স্তম্ভ হইয়া উঠে। তাই উপনিষদের কথায় বলি—

ভদ্রং কণ্ঠতি: শৃণুয়াম ধ্বম।

ভদ্রং পশ্যামাক্ষতি ধ্বম।

হে শ্রমিকবৃন্দ !

‘হে ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায়! তোমাদেরই নৈরব, নিরলস পরিশ্রমের কলে ব্যাবিলন, পারস্ত, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনোয়া, বাগদাদ, সমরখন্দ, স্পেন, পতুগাল, ক্রাঙ্গ, ডেনমার্ক, ইল্যাণ্ড এবং ইল্যাণ্ড পর পর ধ্যাতি ও অবিপত্য লাভ করিয়াছে। আর তোমরা? তোমাদের কথা কে ভাবে? বাহারা বুকের বস্ত্র দিয়া জগতের সর্ববিধ উন্নতির উপকরণ যোগাইতেছে, তাহাদের সুখ্যাতি করিবার জন্ত কে মাথা ঘামায়? কাব্য, সংগ্রাম বা ধর্মের ক্ষেত্রে জগৎস্বামী বীরগণের প্রতিই সকলের দৃষ্টি। বহু লোকের উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কাপুরুষও অন্যায়সে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে। ঘোর স্বার্থপর ব্যক্তিও নিঃস্বার্থ আচরণ করিতে পারে। কিন্তু সকলের দৃষ্টির আগোচরে সামান্য কাজও যে ব্যক্তি ঐ প্রকার স্বার্থশূন্য কর্তব্যপরাহণতার পরিচয় দিতে পারে সেই স্বার্থবান। হে ভারতের চিরপদলিত শ্রমিকবৃন্দ! তোমাদের কর্মবাস্তবিকই এই পূর্ণাঙ্গের। তোমাদের অভিবাদন করি।’

—স্বামী বিবেকানন্দ।



ফুল ওয়াড়ী

—অরুণকুমার দত্ত

কাজল-দিঘী
—মাতোয়ারা সিন্ধা



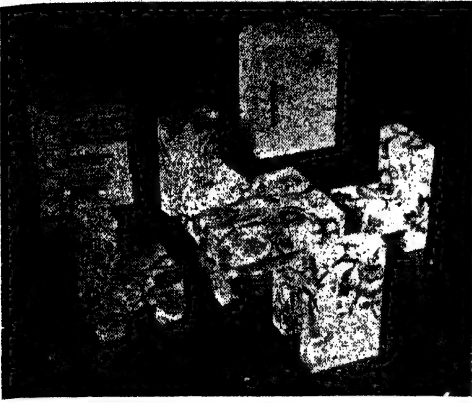
॥ আলোকচিত্র ॥

স্থিতি

—ব্রজেন দাস







ডুই রুম (সিগারেটের প্যাকেটে তৈরী)

—শিল্পী রবীন্দ্র নাথ-চৌধুরী (সন্তোষ)



কাঙ কার আনন্দে



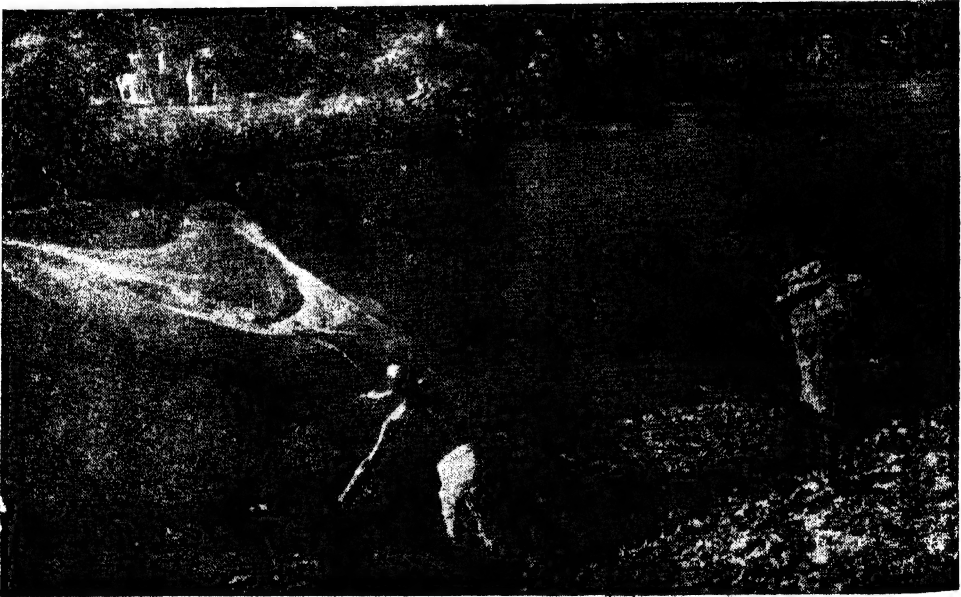
—অমিত্রেশ্বর চক্রবর্তী





সিমলার তুষারপাত
সংস্কৃতি

—শান্তি কল
—মহীল বন্দোপাধ্যায়



কী খিচ্ছি প্রত্যাশাই না মায়ের মনের অন্যরে বুকবুক করে। কাল সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মীনাঙ্কীর মন

ওধু একটা প্রশ্নই বিলম্বণ করে ফিরেছে : সুপ্রিয় কী ওর কাছে আর আসবে ? মীনাঙ্কীর শিথিল ওষ্ঠ অকুটে উচ্চারণ করেছে—না। সেই সুরের সুর মিলিয়ে প্রতিধ্বনি করেছে ওর অন্তর, নানা-না। তবু, কাকডাকা ভোরে উঠেছে মীনাঙ্কী, আর সন্দের কবট বতবার আওয়াজ তুলেছে—ততবারই কক্ষাশে ছুটে গেছে ও। তারপর দুপুর হলো, দুপুর গড়ালো, বিকেল হলো, রাত্রি কাটলো, একটি ভীক উমুখ মন তার ক্ষীণতর প্রত্যাশাকে প্রাণের উত্তাপ জীয়ে রাখলো দীর্ঘ সাতটা দিন, লম্বা সাতটা রাত। আর তার পরদিন দীপ্ত মধ্যাহ্নে এসে সুপ্রিয়ের বার্তা বিকাস করলো ওর বাক্যবী স্রমনা। স্রমনাকে একান্তে নিজের ঘরে ডেকে এনেছিলো মীনাঙ্কী, কিন্তু ঘর যেন ওর পছন্দ হলো না।

চল না বাবাঙ্কার বসেই গল্প করিগে, ঘরে বড্ড গরম,—হস্তাশ হ'লেও আপত্তি করেনি মীনা। একটা বিরাট ব্যগ্রতার ভাব মুখে নিয়ে সুবর্ণবালা মেয়ের ঘরের দিকে আসছিলেন। স্রমনাকে নিয়ে মীনাঙ্কে বেরিয়ে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, এখনি চললে নাকি স্রমনা ?

না, মাসীমা, ঘরে বড্ড গরম।

এসো, এসো, দক্ষিণের বাবাঙ্কার বসো এসে, ভারি মোলায়েম ঠাণ্ডা এখানে—পরম সমাদরে মেয়ের বাক্যবীকে ডাক দিলেন সুবর্ণবালা।

ওধু তাই নয়, ওর পক্ষে বস্ত্র-দ্রুতগতিতে চলা সম্ভব ততখানি ক্ষিপ্ৰাণে নিজের ঘর থেকে ওর দুপুরে গড়ানো শীতলপাটখানা এনে বিছিয়ে দিলেন। ওখানে বাবাঙ্কার এক কোণায় বসে শিশিরকণা মহাভারত পড়ছিলেন। কোনো বাধা-বিপত্তি না ঘটলে এসময়টা শিশিরকণা মহাভারতই পড়ে থাকেন। কাকীমা, আপনিও পাটিতে উঠে বসুন, আরাম পাবেন—সুবর্ণবালা বললেন শিশিরকণাকে।

শিশিরকণা হাসিমুখে বললেন—না বোমা, তোমরাই বস। গরমের দিনে ধোওয়া-মোছা সিমেন্টই আমার ভাল লাগে বেশি—তাবপর মীনা স্রমনার দিকে তাকিয়ে সম্মেহে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বস মা তোমরা সব বস।

মীনা ভেতরের অস্থির চাকল্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো, স্রমনার হাত ধরে টেনে পাটির ওপরে দুজনে বসে পড়লো। সুবর্ণবালার আচরণে মনে মনে বেশ বিস্মিত হলেন শিশিরকণা। প্রথমতঃ সুবর্ণবালার দুপুরের টানা ঘুমে কেউ বাবাঙ্কাত ঘটলে তার আর রকে ছিলো না, মায়ের দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত হীতিকে দেখে এনাঙ্কী একদিন দুপুরের ঘুমের মুহু-প্রতিবাদ করতে গিয়ে বকুনি খেয়েছিলো খুব। আর দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মের দুপুরে গড়ানো ওর শীতলপাটখানি উনি প্রাণ ধরে কাউকে কখনও হাতই নিতে দেন না, নিজেই শীতলপাটখানি গামছা ভিজিয়ে ভিজিয়ে মোছেন, সেই পাটি নিজের হাতে বিছিয়ে মীনার বাক্যবীকে বসতে দিলেন এবং নিজেও না ঘুমাতে গিয়ে বসলেন সেখানে। অবাক লাগে বৈ কি ! মীনাঙ্কীর অস্থিরতা আরো বাড়লো, মার সামনে মষ্টারমশাইর কথা জিগোস করাও যায় না, আবার খেমে থাকাও যেন যায় না। কিন্তু সুবর্ণবালাই শুক করলেন।

ই

স্রা

নী

র

★

প্র

★

ম

(উপভাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

তোমাদের মষ্টারমশাই আজ-কাল তোমাদের ওখানে আসে-টাসে ?

ও মা ! সুপ্রিয়দা'র কথা বলছেন ? রোজ আসেন, একটি দিন ছাড়া যায় না।

রোজ এসে এখন করে কী ? পরীক্ষার পরও পড়ার নাকি তোমাকে ? সুবর্ণবালার সুর পেঁচালো।

সুপ্রিয়দা' হাবার বন্ধু তো, তাছাড়া এখন আবার 'সুপ্রিয়দা' পড়াবেন কী মাসীমা ? এক মাসে আমাদের বাড়ি থেকে যে টাকা পেতেন, একবেলার তার চেয়ে বেশি খরচ করেন সুপ্রিয়দা'। রোজই বিকেলে বের হবার মুখে ফিরপোতে হয় চা, না হলে কিরবার মুখে ডিনার থাকি।

রোজই বেড়াতে যাচ্ছে বুবি তোমরা ? সুবর্ণবালার প্রশ্ন।

রোজ, জানিস মীনা, নাইস একখানা বুক কিনেছেন সুপ্রিয়দা', রোজ সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমরা ঐ বুককে চেপে বেড়াই। একটু কাকি নেই, এক কৌটা শব্দ নেই, ব্যাও গাড়িখানা হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁর এখানে আসবো আমার প্রোগ্রাম ছিলো, কিন্তু সুপ্রিয়দা' তখন বললেন—অসম্ভব, বিকেলের ট্রিপে তোমাকে আমি বাক দিতেই পারিনে, তুমি সকালে দুপুরে যখন যেখানে খুশি যাও কিন্তু বিকেলে নয়। মীনাঙ্কী ঠোট বুলেই আবার মুখ বন্ধ করে ঢোক গিললো একটু।

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন সুবর্ণবালা, তোমাদের বয়সী সব মেয়েদের সঙ্গেই বুবি খুব ভাব তোমাদের মষ্টারমশাইর ? সুপ্রিয়দা'র বয়স দুইখটা দেখে নিয়ে স্রমনা সম্ভ্রান্ত উত্তর দিলো, আপনি সেকথা জানলেন কী করে মাসীমা ? কিন্তু সব চেয়ে সুপ্রিয়দা'র বেশি ভাব হয়েছে মেজর জেনারেল চৌধুরীর মেয়ের লগে, না ভুল বললাম, তার চেয়েও বেশি হয়েছে জাঙ্গিস ফিরের মেয়ের

সঙ্গে। 'সুপ্রিয়লা' তৈরী বাড়ি কেনার জন্য দালাল লাগিয়েছিলেন, তা শুনে মিস মিত্র বলেছেন,—তোমার আর বাড়ি কিনে দরকারটা কী? বাবাই বখন অত বড় বাড়ি বৌতুক দিচ্ছেন আমাদের বিয়েতে। মিস মিত্রের বুদ্ধিতে খুব খুশি হয়েছেন 'সুপ্রিয়লা'—সুবর্ণবালার চৌকটের হাসি একেবারে ফিকে হয়ে গেলো, বিরসরূখে জিগ্যাস করলেন, বিয়ের দিনও কী ঠিক হয়ে গেছে নাকি?

—না, কিন বোধ হয় এখনও ঠিক হয়নি, তাহলে দালাল কাছে ওনতাম।

তা সে মেয়ে দেখতে কেমন? দেখেছ নাকি তুমি? সুবর্ণবালার জলধি গলা এবার শিশিরকণার কানে পৌঁছুলো, মহাভারত পাঠ বন্ধ করে হাসিরূখে শুভালালেন, বউমা, কোন মেয়ের কথা জিগ্যাস করছো সুমনাকে?

সুবর্ণবালা বীকা হেসে বললেন, মৌচূড়ের মাষ্টারমশাই বড় বড় সব জায়গায় এখন টোপ ফেলাছে কি না বিয়ের জন্য—তাই জিগ্যাস করছিলাম।

আহা, ভগবান কব্বক, তাই হোক বাছায়, অমন চমৎকার ছেলোট যেন অকুলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো, মানে! খণ্ডর পোলে হিমালয় পর্যন্তের আড়াল পাবে বাছা—কাকীমার আশীর্বাদীতে মনে মনে ভয়ানক চটলেন সুবর্ণবালা, কিন্তু বিরক্তি চোখে সুমনাকে উদ্দেশ্য করে একটু বেশি বোঁক দিয়ে বললেন, তা বাই বল সুমনা, টাকাকড়ি হলো বেনো জল, ও দুদিনের কিন্তু সৌন্দর্য হলো চিরদিনের—কথা বলতে বলতে মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলেন সুবর্ণবালা, তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, তা, তোমার সেই মিত্রর মেয়ে দেখতে কেমন?

সুমনা মুখের চেহারা নিরীহ করে বললো, খুব সুন্দরী না-ও হতে পারে, কিন্তু দেখতে অদ্ভুত সুন্দরী লাগে। বড়লোকের বউ-কিয়েরা তো নানান কৈতায় সাজগোজ করে, ঠিক স্নানের পরমুহূর্তে ছাড় গুণের বিউটি কোনামতে ধরার বো নেই!

খুব বুদ্ধি গায়েল চৌকটে হং চড়িয়ে পগিণী সঙ্গে বসে থাকে দিন-রাত? কথা শেষ করে সুবর্ণবালা মেয়ের সাধারণ আটপোরে শাড়িপরা চেহারাখানির দিকে গর্ভমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকালেন। উত্তরে নীরবে একটু একটু হাসলো সুমনা। চিরচঞ্চলা শ্রোত্বিনী যেন হঠাৎ গতিবেগ কন্ড করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে, শুধু চোখ দুটিতে কিসের একটা বাতুল প্রত্যাশা জেগে রয়েছে এখনও। মেয়ের চোখের ভাষা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলেন না সুবর্ণবালা, অপরিষ্কৃত একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন, নিজের ঘরের দিকে বেতে বেতে ভাবলেন: মৌচূড় মত সুন্দরী মেয়ে আর পেতে হয় না। আর সুমনা বিদায় জানিয়ে বখন বাড়ি বাওয়ার জন্য উঠে পাড়লো, তখনও মীনাকী মৌন রইলো, আর সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বখন তার বাত্বরীকে একা পেলো মীনাকী, তখন ওর জুখপিশুর গতি দ্রুতভর হলো, বৃকর আলোড়ন এত প্রচণ্ডতর হইলো যে তা ঢাকবার প্রাণাত্মিক তাগিদে ও ওর বাত্বরীকে সামান্য কোনো কুশলও জিগ্যাস করতে পারলে না, সাধারণ সীমাহীনও দেখাতে পারলে না।

আরো সাত দিন কাটলো মীনাকীর। তারপর আরো দুদিন। মনে মনে জাবে মীনাকী, সেদিন সুমনার সব কথা কান পেতে

শুনলো ও আর মনে মনে শুধু সহ্য করলো, প্রশ্নের কোনো ভাবা কেন ও বুঝে পায়নি? একটা প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই ওর মন এখন আকুলি-বিকুলি করে ফিরছে: মাষ্টারমশাই আমার কথা কিছু বলেননি সুমনা!—মাষ্টারমশাই আমার কথা কিছু—। সারাদিন এই প্রশ্নটা ওকে ঘেঁষে শুধু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় আর নিস্তরক বাজ্রে ওর অভয় চোখের পাতার সেদিনের সেই আবেগতপ্ত সুন্দর মুহূর্তগুলো অবিরত তরঙ্গারিত হয়ে ওঠে আর তারপর নিশ্চয়ই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কীমতে থাকে মীনাকী।

সেদিন ছপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার মুখে আবার এলো সুমনা, ওকে দেখে মনে হলো অনেক সময় দিয়ে আর অনেক মন দিয়ে আজকের বেশত্বা সম্পন্ন করেছে ও। মীনাকীকে সঙ্গে করে নিয়ে বাওয়ার জন্য অস্বস্তি প্রার্থনা করলো ও সুবর্ণবালার কাছে, মাসীমা, আজ আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব, মীনাকীকে আমি নিতে এসেছি, আবার আমি নিজে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে যাব।

উৎসবটা কিসের শুনি? বার তিনেক সুমনার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন সুবর্ণবালা।

এই আমার পাশের উপলক্ষ্যে—একটু আমতা-আমতা করে বলে শেষ করলো সুমনা, বা না পাশ—তার জন্য আবার উৎসব—বাবার যেমন কাণ্ড! মেয়েকে সাজিয়ে শুভ্রের পাঠানোর জন্য একটা মৌন প্রতিশ্রুতিটা ঠেলে তুললো সুবর্ণবালাকে। কিন্তু এ এককোঁটা মেয়ের জেদের সঙ্গে আজ আর শেষে উঠলেন না সুবর্ণবালা। মীনাকে—সুমনার সঙ্গে যেতে বাজি করাতেই সুবর্ণবালার অনেক শক্তি খরচ করতে হলো, ঠিক যে সম্ভাবনা মনে করে সুবর্ণবালা মেয়েকে পাঠাতে এক উৎসাহী ঠিক সেই কারণ মরণ করেই মীনাকী এত অনাগ্রহী। শেষ পর্যন্ত সাধারণ একখানা আকাশী রংয়ের শাড়ি পরে আর মাথার চুলে ছবার চিকণী বুলিয়ে টান করে একটা হাতখোঁপা বেঁধে সুমনার সঙ্গে গেলো মীনাকী। বাড়ীর বাছাটা পেরিয়ে বামদিকে বাক নিতেই অদূরে দাঁড়ানো একটা মোটর গাড়িকে সুমনা হাতছানি দিয়ে আহ্বান করলো। গাড়ি এসে দাঁড়ালো সামনে, মীনা তীব্র প্রতিবাদ করলো, আবার গাড়ি চেপে অনর্থক খরচ করা কেন? বাসেই দিবি বাওয়া বাবে। দ্রুত হাতল ঘুরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে তাগিদেবর হয়ে বলল সুমনা, চটপট উঠে পড় মীনা, মেলাই দেবী হয়ে গেছে তোকে খোসামদ করতে করতে। দেবী দেখে বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছে। আর আপত্তি করলো না, মীনা গাড়িতে উঠে বসলো, গাড়িখানা যে বাড়ির গাড়ি, আনমনা মীনা তা খেয়াল করলে না আসে। সারা পথ মীনাকী একেবারে অদ্ভুত নিস্তরক। হঠাৎ একটা স্বপ্নের নেশা ওকে এখন পেয়ে বসেছে যেন, যেন নিস্তরকতার প্রতিটি মুহূর্ত ও সেই সোনালী স্বপ্নের নেশার হাতাল 'হ'য়ে থাকতে চায়, স্বপ্নের নেশার তৃপ্তি এত, এত সুখানুভূতি?

মীনা! নাম, এসে গেছি আমরা—

টুটে গেলো দিবাবস্র। সুন্দর আধুনিক ভিজাইনের একখানা বাড়ির গাড়ি বায়ান্দার নিচে এসে থেমেছে। কিছুটা আন্ধারের মত মীনা সুমনার পেছন পেছন গাড়ি থেকে নেমে এলো, তারপর চোখ বিক্ষারিত করে তাকিয়ে রইলো এল পাটারের বাড়িখানির দিকে, এ আমরা কোথায় এলাম সুমনা?

চল চল—খুসীর কোয়ারা বেন হুজি পেলো স্রমনার গলায়, বুসলিনে, এটা স্রিয়রপা'র বাড়ি। নিজেই বাড়ি কিনে কেলেছেন স্রিয়রপা', আর স্রিয়রপা'র প্রেরিত গাড়ি চেপেই আমরা এলাম—মাসীমা বরি কোনো আপত্তি তোলেন, সেজ্ঞ আগে বলিল।

আবার এক ক'ক ভ্রমর গুণ-গুণ শুরু করলো মীনাকীর মনে—
আছে, আছে, স্রিয়র ওরই আছে। এদিক সেদিক তাকিয়ে মীনা উজ্জল প্রাসর মুখে বাঁকবীর পাশে পাশে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। স্রমনা পাশে না থাকলে, ও ছুট দিয়ে সিঁড়ি পার হ'য়ে ওপরে উঠে যেতো কখন। বাড়ি সাজানোর ব্যাপারে ভারি স্রমর শিল্পিমনের পরিচয় দিয়েছে স্রিয়র। সিঁড়িতে গুণু রঙীন তেলরঙের পাখির আর ফুলের ছবি। সেদিকে চেয়ে চেয়ে মীনাকীর টোটার কোণায় একটা ছোট্ট হাসির ঢেউ উঠলো। 'ওপরের চান্না বারান্দা পার হ'তে হ'তে অনেকের উজ্জল কলগুজ্ঞন কানে এলো। আর তারপরই মীনাকী দেখলো ওরা ভাইনিংকমের উগুতু কবাটের সামনে ভেতরে বিরাট ডিহাকৃতি আকারের টেবিলকে ঘিরে ওর অনেনা মেয়ে-পুরুষ সবাই ব'সে আছে, কী অজ্ঞত তাদের জৌলু আর কী অনর্গল তাদের কথা'র ঝংকার! ন বরো ন তহো ভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো মীনা। ভ্রমরকুল হল ফুটিয়ে উড়ে গেলো ডানা মেলে। টেবিলের দৈর্ঘ্যের একদিকের মাঝখানে চেরারে স্রসজ্ঞতা মেয়েদের মধ্যমণি হয়ে আসীন স্রিয়র। স্রিয়র দিকে ঝুঁক সকলের কথা বলার আশ্রয়ী ভক্তি লেখে প্রথম দৃষ্টিপাতই মনে হয় যে স্রিয়রই সেখানে বিশেষ ব্যক্তি। আর মেয়েরা এমন চোখের চোখারা ক'রে স্রিয়র বক্তব্য শুনেছে যে, এ তো কথা নয়, এ বেন মহাপুরুষের বাণী।

স্রিয়র কথা খামিয়ে মীনাকীর আত্মখানা মুখ পৰ্ব্বত চোখ তুলে বললো, গুণু তোমাদের অজ্ঞতা থেকে আমরা বিলম্ব করছি, সীগ'গির চটপট বসে পড়ো। একবার চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হলো মীনাকীর সঙ্গে। স্রিয়র স্বর্ষের ভাবে কিছু পেলো না মীনাকী। স্রমনার হাতের আকর্ষণে পাশাপাশি হুটো চেরারে এসে বসলো ওরা। চাপর্ক শুরু হলো। বক্তৃতাশিল্পের মত একটু-আধটু খেয়ে চলছে মীনাকী, আর অপাঙ্গে আলাপময় উজ্জল স্রিয়রকে বায়ে বায়ে দেখছে।

'হুয়ো...হুয়ো...হুয়ো' গুণু এ হুটো শব্দে ওর মন ওকে একেবারে কারু করে ফেলেছে। খাওয়ার মাঝখানে বয় এসে সেলাম দিয়ে একটা কার্ড স্রিয়র হাতে দিলো। কার্ডের ওপরে ছাপার হরকে লেখা স্রনীল বসাক, বি-এস-সি, গ্র্যাসপো। টোটার কোণে অজুত বিভিন্ন একটা নীরব হাসি ফুট-ফুট করে মিলিয়ে গেলো স্রিয়র। কার্ডখানা স্রমের হাতে ফেরৎ দিয়ে মধুর গলায় বললো, সাবকো কহেনা, আপকা কুহ গড়বড় হোগিয়া, আপকা সাখ সোম সাবকা বিলকুল জানপরহান নেহি ছায়—কার্ড হাতে নিয়ে বয় আবার সেলাম দিয়ে চলে গেলো। হুর্দমনীর ইচ্ছে হচ্ছিলো স্রিয়র, ওর জবাবে স্রনীল বসাকের গোল মুখখানি আরো কতখানি গোল হয়, ছোটো ছুটি চোখে আরো কতখানি ছায়া অনার—তা দেখার, কিন্তু না, না দেখেই ও তা বেশ কল্পনা করতে পারছে। বহু অকপোষের কথা বায়ে বায়ে মনে পড়লো, আহা! আজ যদি

অকপোষ এখানে থাকতো! যে মেয়েটির সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে স্রিয়র বসিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তার সাজের দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলো মীনাকী, কানের দুপাশ কাঁকা।

সজ্জায় মার্কিনীদেরও হারিয়েছেন তিনি। ও মেয়ে হয়ে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না, আর ও মেয়েটি কিনা এত অসংখ্য পুরুষের সামনে ঐ পোষাক প'রে অনারাস ভঙ্গিতে বসে হেসে হেসে কেবল গল্প করছে স্রিয়র সঙ্গে। তারপর চোখে পড়লো মীনাকী, সজ্জায় প্রতিটি মেয়েই মার্কিনী গুণু ওর বন্ধুণী স্রমনা ছাড়া। স্রমনার বেশভূষা চটকদারী হলেও অতখানি প্রমোদন পারনি এখনও। ভরা পেয়াদা শেষ হলো, কিন্তু সৌজন্যসূচক এমন বাজে গল্পের কী শেষ নেই। এত তীব্র অব্যাহত বোধ করছে মীনাকী। আদম! আদম! এত অজ্ঞত আনন্দের হাট বসেছে এখানে, কিন্তু ও ওর হৃৎপিণ্ডের রক্তক্ষরণের পরিমাপ চেষ্টা করছে বেন নীরবে, আর প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ কেটে আসা অজ্ঞটাকে ঠেকিয়ে রাখছে; তাই চারের আসরের কোনো উজ্জ্বল আলোচনাই ওর কানে পশলো না। আর, তারপর, সবাই বখন চেরার ছেড়ে ডাইনিং হলের এক দেয়ালের হাতে-আঁকা অনবত একখানি ছবির নিচে দাঁড়িয়ে আলোড়ন তুলে নানান ভাবার তারিফ করতে লাগলো, আর স্রিয়র সেই পাশে বসে মেয়েটির একেবারে পা ধেসে দাঁড়িয়ে অজুত কণ্ঠে কী একটা কথা বলে গলা মিলিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠলো, তখন পেনেদে দাঁড়ানো মীনাকী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

এই রাগুণির মেলায় ও গুণু নিশ্চত প্রাণহীন পুতুলই নয়, ওর উপস্থিতি অব্যাহত, হান্তকর। এই আনন্দের হাটে ওর প্রবেশ নিবেশের অদৃশ বিভ্রাণ্ট বেন সর্বত্র ঝুঁছে।

: হুয়ো...হুয়ো! আবার ওর অলস মহলের সিংহ দরজার ঢাকের বাড়ি দিলো কে বেন! নিশ্চয়ই ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে এলো মীনাকী। কোনো শব্দ না তুলে পাগল-পায়ে নামতে লাগলো নিচে। রিভলভি ট্রেনের মঞ্চ ঘুরে গেলো বেন। পর্কোজির দিয়ে বেন স্রিয়র মীনাকীর অভিব্যক্ত্য অনুভব করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের বাইরে চলে এলো স্রিয়র আর তারপরই পেছনের ঘোরানো সিঁড়িতে দ্রুত অদৃশ হয়ে গেলো স্রিয়র স্রনীল শরীর। স্রমর দরজার কাছে পৌঁছে মীনাকী দেখলো, হাত দুখানি জড়িয়ে বৃক্কের ওপর বেখে পা দিয়ে দরজা আটকে স্বজুতলিতে দাঁড়িয়ে আছে স্রিয়র। মুখে মিটি মিটি হুইমার হাসি। চোখের জলের দ্রবত প্রানটা কিছুতেই আর বোধ করতে পারলো না মীনা, তাড়াতাড়ি হুহাত তুলে মুখ ঢাকলো। সরে এলো স্রিয়র, নিজের হুহাত দিয়ে মীনাকীর চোখ থেকে হাত দুখানি নামিয়ে কৌতুকের স্রবে বললো, হি: হি: মীনা, এমন বোকা তুমি! একটু হুইমি করছিলেম ভোমার সঙ্গে—মীনাকীর হাত ধরে সামনে আকর্ষণ করতেই, ওদের সামনে ছুটে এলো স্রমনা, স্রিয়রপা', আমা-অভিনয় সাফল্যের বকশিস? তারপর হাসতে হাসতে বেন কৌতুকে কেটে পড়লো স্রমনা।

তুই তো ভাবি ইয়ে যে মীনা, তোকে বাড়ি থেকে কায়দা করে এনে স্রিয়রপা'র কাছে পৌঁছে দিলেম, আর তুই আমাকে না বলে পালাচ্ছিলি? ওদের একলা থাকার সুযোগ দিয়ে আবার

ছুট লাগালো। সুননা, কিন্তু ঘর পার হবার আগেই সুরিয়র ডাক দিলো।

সুননা, শোনো, শোনো। ভেতরে বাওরার দরজার কাছে ঠাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করে তাকালো সুননা।

মলয়কে বলো যে একিটো বেন সে মানেজ করে নেয় অর্থাৎ সম্মানিত অতিথির সমাধির বিদায় জানার বেন, আমি এখন মীনাঙ্ককে পৌঁছে দিতে চললাম। সুননা বাধবীর উদ্দেশে চোখ টিপে একটু হেসে নিয়ে উত্তর দিলো। ঠিক আছে সুরিয়র, আমি দাদাকে বলে দেব।

মৌন মীনাঙ্কর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলো সুরিয়র। গাড়ি চললো। আন্তে হাত ছাড়িয়ে গাড়ির এক পাশ বেঁসে বসলো মীনাঙ্ক।

এ কী! এমন গিরি-সাগর ব্যবধান কেন বচনা করলে মীনা?

সুরিয়র সরে এসে বাঁ-হাত বিছিয়ে মীনাঙ্কর কাঁধে হাত রাখলো। মীনাঙ্ক মুখ ঘুরিয়ে পথের চলমান শখিকদের খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলো, হো হো করে হেসে মীনাঙ্কর চিরুঁক ডান হাত দিয়ে ধরে মীনাঙ্কর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলো সুরিয়র, চোখের দীর্ঘির বাঁকে বাঁকে অনেক জল জমেছিলো, আবার শুরু হলো প্রাণন, মীনাঙ্কর কাঁধে আবেগের সঙ্গে একটু চাপ দিয়ে সুরিয়র সুরিয়র মুখে বললো, মীনাঙ্ক, মীনা! শোনো, কেন না লক্ষ্মীটি, আমার দুটো কথা আগে শুনে নাও—আমি একটা দিন তোমার কাছ থেকে আত্মগোপন করেছিলাম, সমাজের আর একটা পিঠ দেখার জন্য শুধু দেখলাম, কী অভূত পৃথিবী। কী ভাঙ্গব সমাজ। নিচুগলির মানুষ আমি, চাল নেই, চুলো নেই, ঘর নেই, দুয়ার নেই, সেই মানুষ বাতায়তি হয়ে গেলাম সমাজের মুকুটমণি, শুধু তাই নয় মীনা, অনেকের আশা-ভরসার পাত্র পঙ্খ। বলোতো মীনা, কী অভূত মজাদার দুনিয়ার আমরা বাস করছি!

মীনাঙ্ক নিরুত্তর। চোখের দীর্ঘির কান থেকে জল অঙ্গ নিচে নেমেছে। সুরিয়র তাকিয়ে আছে মীনাঙ্কর দিকে। বেন হিমে ভেজা জোরবেলার শিউলী ফুলের মত শান্ত মুখখানি। হঠাৎ কী বেন মনে পড়ে গেলো সুরিয়র। মুখ টিপে হেসে পকেট থেকে একটা ভারি ওজনের মুখখোলা খাম টেনে বার করে মীনাকে উদ্দেশ্য করে বললো, নিজেকে এমনভাবে ধরে না রাখলে তোমার মার কাছ থেকে এমন একখানি অপরূপ হস্তর চিঠি আর এমন আশ্চর্য সম্মান পেতেন কী করে? একেবারে অজিতীয় আমি, আমার দ্বিতীয় নেই। এমন কোনো বিশেষণ নেই বালা ভাবার বা না কি আমার নামের আগে পিছে খোজা লাগানি তিনি। প্রথমেই আমার কল্পকাক্ষি দিয়ে শুরু করেছেন আর একবারে শেষ পাঠাটার, আমার প্রতি তোমার অন্তর অতুল অতুল আর আমার বিরাহ তোমার স্নান ছোটকটানীর করেকটা হালকা টান আছে—নাও পঙ্খ দেখো, অন্ততঃ শেষের পাঠাটা শুধু পড়ে।

মীনাঙ্ক এবার নিজের ভজিমার খিল-খিল করে হেসে উঠে চিঠিখানা সুরিয়র হাত থেকে নিয়ে সুরিয়র পকেটে রেখে দিলো। মীনাঙ্কর অপরাধ মুখখানি হাত দিয়ে তুলে ধরে গুনগুনিয়ে বলল সুরিয়র, এমন ভোরে আকাশের আভা যে মুখখানিতে, এমন নিরুত্তর প্রমাণ চাটনি যে চোখ ছুটিতে, এর তুলনা আর কোথাও মিললো

না মীনাঙ্ক! অসহ আনন্দে মীনার মুখ বামধরু রঙে রাঙা হয়ে গেলো। সুরিয়র পেছনেকরা পাঞ্জাবী ডাইভারের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে মীনাঙ্কর আরো কাছে সরে এলো। মীনাঙ্কর কাঁধে আয়ে একটু চাপ দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে অসুট গলায় বললো, তা হলে মীনা কি ঠিক করলে? ক্যানসর ভাত খাবে না ভাতের ক্যান গালবে?

লজ্জার পলকে ডাইভারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সুরিয়র প্রশস্ত কাঁধে মুখ লুকালো মীনা।

সিমলার কালীবাড়ির প্রখ্যাত ঠেজে সংঘমিত রূপের শিটচাকনার 'চিট্রাঙ্গনা' নৃত্যনাট্য অঙ্কুরিত হচ্ছে। অভিনয় শুরু হবার মিনিট কুড়ি বাকী এখনও। সংঘমিতের সমস্ত এবং সমস্তারা সকলেই নিঃশব্দে ব্যস্ত, তবে ব্যস্ততাটা বিশেষভাবে প্রকট। বাড়তি অসংখ্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে অভিনেত্রীরাতে তবু বেন তিল ধারণের স্থান নেই। প্রায় হাজার লোকের ভিড়। রমেন সর্দারীয়া বখন এসে পৌঁছোলেন, তখন আর জায়গা বিশেষ নেই। রমেনকে প্রী-বস্থা নিয়ে এগোতে পিছোতে দেখে কেশবশংকর বাবু অচ্যুতকণ্ঠে ডাক দিলেন, এদিকে চলে আসুন—দ্বিতীয় সাহির প্রথম সোফায় বসেছিলেন কেশবশংকর, তার পরেই আর একটা ছোটো সোফার অঙ্গশেষ তারপর বড় সোফাটার এক পাশে বসেছিলেন মিসেস তরুবালা বিখাস। সে সোফার আরো দুজনের জায়গা খালি রয়েছে। মীনা আর শেলি গ্রীণকমে। কেশবশংকর বাবু তরুবালা পাশের জায়গা নির্দেশ করে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তোমরা ওখানে গিয়ে বসো আর খোকন—খোকনকে জায়গা ছাড়ার কথা বলার আগেই লোকা ছেড়ে সরে এসে ঠাঁড়িয়েছে ও। বিব্রত রমেন অরুণেশের সোফায় বসতে বাবে বাবে অস্বীকার করলেন। কেশবশংকর বাবু উদাত্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি বসে পড়ুন রমেন বাবু, ইয়ম্যানদের বুঁজে টুঁজে নিয়ে জায়গা ধোঁপাড় করে বসে ভাল। তরুবালা স্বামীর এ-হেন আচরণে মধ্যস্থিত চটে গেলেন। ছিলাপারা হজুরের মত ভুরু দুটো বন্ধিত হলো মিসেস বিখাসের। একটু ইতস্ততঃ করে সর্দারীয়া, ইন্দ্রাণী এগিয়ে এলেন লম্বা সোফাটার দিকে।

সেই ভুরু বাঁকানো অবস্থায় চোখে বিরক্তি-মিশ্রিত তাচ্ছিল্য দৃষ্টি তেনে তরুবালা বিখাস ধর গলায় বললেন—এখানে বসবে কী করে তোমরা? এ জায়গা মিসেস তালুকদারের জন্য রাখা আছে এবং পাছে ওরা কাণ্ডজানহীন হয়ে কেউ একজন বসে পড়ে, সেজ্ঞা এই গলাতেই দ্রুতলয়ে শেষ করলেন।

মিসেস তালুকদার ঠেসাঠেসি করে সকলের সঙ্গে বসতে পারেন না—স্ট্রীয়া কথা কানো না গেলেও, তরুবালা যে ওর পাশের খালি জায়গাটা ছেড়ে দিলেন না, সেটা বুঝতে পেরে কেশবশংকর তাঁর বিরাট শরীরা নিয়ে বাস্তবসম্মত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনারা এখানেই বহুন, আমরা পেছনে গিয়ে বসছি। এবার রমেন শুধু বিব্রতই বোধ করলেন না, খুব বেশি রকম লজ্জিত হলেন। সে লজ্জার দায় উদ্ধার করলেন সর্দারীয়া, ভাড়াটাড়ি বলে উঠলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, এই যে মিসেস গুপ্তার পাশে জায়গা রয়েছে আমরা সেখানেই গিয়ে বসছি—কেশবশংকরকে লক্ষ্য

করে কথা ক'টি বলে দ্রুত ও পাশে বাঁওয়ার জন্য চলতে শুরু করলেন সর্বাণী, ইন্দ্রাণীও চললো। মালতী গুপ্তা বসেছেন দ্বিতীয় সারির ওমিকের কর্ণারে। প্রথম সারির মাঝখানে হিমচল প্রদেশের দুজন বিশেষ অতিথির সঙ্গে বসেছেন মিঃ গুপ্ত। হিমচল প্রদেশের প্রধান অতিথিদ্বয়কে আজকের অভিনয়টি ইংরাজীতে ইন্টারপ্রেট করবার ভার নিয়েছেন উনি। নৃত্য-নাট্যে বোঝাবার ব্যাপার খুব কমই থাকে, ঘটনাটার জিষ্ট বলে দেওয়া আর কি। সামনে ভয়ংকর ভিড়। সর্বাণী মেয়েকে নিয়ে পেছন দিক দিয়ে ঘুরে চললেন। গতকাল মালতী গুপ্ত দুপুরে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বাণীদের ওখানে কাটিয়ে গেছেন, শুধু তাই নয়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে পাঞ্জাবীদের একটি বিশেষ প্রিয় খাবার 'বাটায়া' বহুজ্ঞ বানিয়ে সর্বাণীদের খাইয়েছেন। কালকের দিনটা ভারি আনন্দে কেটেছে তাঁদের। সর্বাণীর কাছে আগের দিনের প্রস্তুত পিঠা মজুত ছিলো, সে পিঠার নাম ভারি মজার—পরচিত্তহারিণী। অফিস-করং মিঃ গুপ্ত ত্রীকোণে নিতে এসেছিলেন, সেই রকম কথাই ঠিক ছিলো আগে থেকে। এই পিঠার নাম নিয়ে চায়ের টেবিলে হাসির ঝড় তুলেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গ কত মজার মজার পিঠার নাম শ্রবণ হয়েছিলো চায়ের টেবিলে তার পর। তার পর অত্যন্তের কত কাহিনী উল্লেখ্য হলো—মিঃ গুপ্ত ছোটো ভাইকে পাহারা রেখে ছোটোবেলায় তাকে বেয়ে পাটিলপাট চুরি করতে গিয়ে তাকের আলগা তক্তা খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কি ভাবে চিংসটাং হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন আর তার পর পিঠা খাওয়ার বললে পিঠে কেমন ঘা কতক খেয়েছিলেন, সে ঘটনা বর্ণনা ক'রে হেসে আর বাঁচেন না মিঃ গুপ্ত। মালতী-সর্বাণী জুয়েটলি বড়বন্ধ ক'রে একটি লাঠি ঠাণ্ডা মেয়ের টিফিন থেকে আমার আর আনারসের আচার চুরি ক'রে খেয়েছিলেন। হীরের কুটির মত অসংখ্য অতীত কাহিনী বিকসিবিয়ে উঠেছিলো কাল চায়ের পেছালায়। বিদায়কালে মিঃ গুপ্ত সহস্রাং বললেন: বান্ধবী শৈল তোমার মুখের আনন্দের আলো বলাই ও ভাবে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, তখন বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগটা আরো ঘন ঘন করলেই তো পার। তার পর, সপ্তাহে এক দিন ক'রে কে কবে কার কাছে যাবে, সেই ব্যবস্থার রক্ষা হলো মালতী-সর্বাণীর মধ্যে। পেছন দিক থেকে প্রায় তৃতীয় সারির কাছে বসাবার এসে সর্বাণী হাসিমুখে অসুটে ডাক দিলেন, মালতী!

মিসেস গুপ্ত বাড়ি ফিরিয়ে বান্ধবীকে দেখে চোখের তারা নাক পর্যন্ত নামিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন। তার পর মুখের ভাব হাসি হাসি ক'রে অলুচকটে বললেন, সা—বি, দেরি করিস নে আর, ঐগগিরি চোয়ার দেখে বসে পড় তোরা—এত দেরী ক'রে আসতে হয় কখনও? মুখ ঘুরিয়ে বাঁ পাশে বসে মিসেস আয়াসদের সঙ্গে আগের মতই কথা বলতে লাগলেন মিসেস গুপ্ত। বিয়ুট-বিশ্বের তৃতীয় সারির আরম্ভই সক্তা সর্বাণী শুরু হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অল্প সর্বাণীরা নিয়মমাসিক আসতে পারেননি, একটু দেরী ক'রে ফেলেছেন ঠিকই। মিসেস বেঁদের স্তম্ভ ওরা অপেক্ষা করছিলেন, একসঙ্গে মিট ক'রে কালীবাড়ীর হলে আসার কথা হয়েছিলো তাঁদের। আজ মিঃ বেঁদ এক মাসভূতো বোন ও ভগিনীপতি দিল্লী থেকে মাত্র সাত দিনের স্তম্ভ বেড়াতে এসেছেন। কথা ছিলো তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সবাই একসঙ্গে হ'য়ে আসবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিঃ বেঁদের প্রোগ্রাম কামিল

করতে হলো, বোন-ভগিনীপতি দুজনেই শারীরিক কিছু অসুস্থ বোধ করছেন। সেই স্তম্ভ সর্বাণীদেরও দেরী হ'য়ে গেলো। কিন্তু তাই বলে বান্ধবী মালতী তার পাশে জায়গা থাকা সহ্যও। চিন্তাহীন ছিন্ন হলো একজন ভলেন্টারীর আহবানে। পাশ দিয়ে দেখলেন একজন ভলেন্টারীর হুটো হাতলাবিহীন চোয়ার হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর তার একটু দূরে অরুণেশ দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখে। বোকা গেলো অরুণেশই ভলেন্টারীরকে বলে বলে চোয়ারের ব্যবস্থা করেছে। ভলেন্টারীর অসুস্থবোধে স্তম্ভালিভের মত একটু সরে গেলেন সর্বাণী, ইন্দ্রাণী আগেই দেখাল যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, সেই সারিতে পাশাপাশি হুটো চোয়ার পেতে দিলে ভলেন্টারী। সর্বাণী বসে পড়লেন কিন্তু ইন্দ্রাণী বললো, আপনি ও চোয়ারখানা নিয়ে যান, চোয়ার আমার লাগবে না। ভলেন্টারীটি বিনীত গলায় প্রতিবাদ জানালো।

না, নিয়ে যান বলছি, এখানে চোয়ার পেতে লোক চলাচলের অসুবিধে করবেন না—ইন্দ্রাণীর কঠিন কঠোর শুনে ভলেন্টারী হকচকিয়ে চোয়ার নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে অদৃষ্ট হ'য়ে গেলো। সর্বাণীও বাধা দিতে গিয়ে মেয়ের গলা শুনে চূপ করে গেলেন। মেয়ের জেদের সঙ্গে উনি সবিশেষ পরিচিত। তাছাড়া বান্ধবী মালতীর বহুসময় ব্যবহারের ঘোর বেন তখনও উনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আঙুলে আঙুলে বিশ্লেষণের বন্ধ আলোর প্রতিভাত হলো সব সর্বাণীর কাছে। পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী-জায়ার আচরণ শ্রবণ ক'রে একটা নিখাস ফেললেন সর্বাণী। মকপদা উঠে গেলো। সর্বাণীর চিন্তার দিক্‌পরিবর্তন হলো কিছুটা। মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলেন দৃষ্ট এবং দৃষ্টগটে।

দেখাল যেসে আরো অনেকের সঙ্গে একেবারে স্বজ্ঞাতভাবে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী। অভিনেত্রীদের উজ্জ্বল আলো নির্ভেছারা অন্ধকার ঘনালো, তারপর কিংক হলো আরো, অরুণেশ কখন এসে যেন দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণীর পাশে। বৃষ্টি থেমে যাওয়া অথচ আবার যেন এখন বৃষ্টি নামবে আকাশের মত ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তারিয়ে আছে অরুণেশ। সকলের কান বাঁচিয়ে খুব অসুটে ডাকলো, ইন্দ্রাণী! তখন ঠোঁটে অর্জুন বলছে,—‘অহো কী হুঃসহ স্পর্ধা!’ অরুণেশের মনে হলো পাশ করা ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ চিরে এ শব্দ চারটে বার হ'য়ে এলো, কণ্ঠধর তো নয় বেন ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করলো। অথচ পাশাপাশি-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী, নিখাস-প্রাধাসের উপান-পতনটুকু পর্যন্ত যেন বোঝা যায় না। এর আগে আর একদিন এখন গ্রানিকর ঘটনার সামনে উপস্থিত ছিলো অরুণেশ। সেদিন ইন্দ্রাণীর অসহিষ্ণুতা উত্তেজনার বিকি-থিকি করে ফলে উঠেছিলো ওর হুঁ চোখের মণিত, মুখের রেখায়। সে ছবি এতটুকু স্মান হয়নি অরুণেশের কাছে। মার আশ্রয়প্রাসাদের এমন স্থল প্রকাশ নিয়ে অনেক ভেবেছে অরুণেশ, প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধেও ভেবেছে অনেক। মাকে একলা পেয়ে কত দিন অরুণেশ দুঃপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে এগিয়ে গেছে, কিন্তু ওর বস্তবের বিন্দুমাত্র উচ্চারণ না করে হুঁ-চারটে বাজে কথা বলে আবার ব্যথিত-গভীর মুখে ফিঁসে এসেছে নিজের ঘরে আর নিজের ভীকৃতাকে নিঃশব্দে তারপাশে লাগালো দিয়েছে। মার কাছে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আঙ্গি পেশ করতে গেলেই কী একটা অদৃষ্ট লজ্জা ও সঙ্কোচে কঠোর হয়েছিলো বার বার।

নিজের নির্জন ঘরে এসে অনেক বিশ্লেষণ করেও সঠিক কারণ অজ্ঞান করতে পারেনি অরুণেশ। ওর প্রতি মায়ের অল্প ভালবাসাই ওর কঠোরতা করছে নাকি কথার কাকে ওর গোপন প্রেম প্রকাশ হয়ে বাওয়ার আশংকা?

এক হাত দূরে দাঁড়ানো পাশকেয়া ইন্দ্রাণী, অস্থিরতার বিকৃততার কোনো একটা ডেউনি ওর মুখের রেখার, শরীরের ভলিমায়ে। ছ'চোখে উদগ্রীব ব্যাকুলতা নিয়ে তাকিয়ে আছে অরুণেশ পাশাণ-প্রতিমার দিকে। সেদিন অপরাহ্নের আভাষ ওর নিজের চোখের আলো দেখেছিলো ও ইনার দুই চোখে, সে আলো নিবৃত্ত পারে না—নিববার নয়, বিশ বছরের অরুণেশ তা মন দিয়ে জানে, বুক দিয়ে বোঝে, তবে কী ও ভুল দেখেছিলো? না, ভুল ওর হয়নি। নিয়তি ওর জীবনটা কী আশ্চর্য ভাবেই না নিয়ন্ত্রিত করছে। ও আর ইন্দ্রাণী কাছাকাছি হলেই নিয়তি তার নিষ্ঠর হাতের ধারা মেলছে ওদের মাঝখানে, টেনে-হিঁড়ড়ে সরিয়ে নিচ্ছে একজনকে আর একজনের কাছ থেকে। প্রেমের কিশলয় জেগে উঠলেই সমূলে কঠিন কর্কশ পায়ে নিশ্চিহ্ন করছে। নিজের মনও নিঃশব্দে ঘেন বাটাই করে চললো অরুণেশ। না, এই ভক্তা-গড়ার অজুত সম্রা থেকে ওদের আর বেহাই নেই। এক হাত দূরে অল্প আর এক মৃতিতে দাঁড়ানো ইন্দ্রাণী ক্রমে ক্রমে বাপসা হয়ে একেবারে ঘেন মিলিয়ে গেলো অরুণেশের চোখে। অরুণেশ বিফারিত চোখে দেখলো, সেখানে শুধু একটানা না অন্দরটা দৈর্ঘ্যে প্রবেশ বড় হ'তে লাগলো ক্রমশঃ। 'স্বীত হতে হতে না শব্দটা ওর স্মারনে এসে সজোরে ধাক্কা দিয়ে গেলো ওকে। ও ঘেন সঙ্কুস সাগরের মধ্যে নির্জন দীপে রয়ে গেলো একাকী। কুড়ি বছরের অরুণেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বাপসা চোখে বেরিয়ে এলো কালীগাড়ির অডিটোরিয়াম হল থেকে। অডিটোরিয়ামের বাইরে এলেই কি সব কিছুই বাইরে আসা যায়? একটা অসহ্য রাত্রি বাইরে বিভীর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিলো ঘেন। তারপর কখন ও পা বাড়াণো, গেটের কুণ্ডলী-শাকানা কুকুরটিকে মাড়িয়ে চলে গেলো, কিছুই খেয়াল নেই। সমস্ত চেতনায় শুধু অন্ধকার, ধূসর, সবুজ, অসহ্য অন্ধকার।

'চিত্রাঙ্গরা' অভিনয়ের তিন-দিন পর বেশবশংকর অফিস থেকে বখান কিরলেন, তখন সিমলার আশ্চর্য স্থলর বিকল শেষ হয়ে গেছে। লাকের পর একটা জরুরী মিটিং কল করতে উনি বাধ্য হ'য়েছিলেন। একজন কর্মচারী তার নিজের অপরাধের প্রমাণযুক্ত কতকগুলি অফিসিয়াল রেকর্ড পোড়াতে গিয়ে ঘরা পড়ে যার। সেই সব বাপসারের বিলি-ব্যবস্থা করে বেশবশংকরের অফিস থেকে দ্রুত অনেক দেবী হয়ে গেছে। তারপর, ম্যালোগে মোতাতে মজে ছিলেন বহু-বাক্যের সঙ্গে, খোদা বখান হলো তখন হুতবাড়িতে চোখ দেখে দেখলেন বিলম্ব হ'য়ে গেছে প্রচুর। হলে বাড়ি ফিরে আর কাউকে পান না, ইউনি-ওয়ারকে বেরিয়ে দেন সবাই। বাবুটি বৈজ্ঞানিক খালি বাড়িতে মনিবকে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে চা-খাবার পরিবেশন করে, বয় দিলারাম দাবের আফ্রান শোনার জন্য অনেক বেশি উৎকর্ষ হয়ে থাকে, কিন্তু তবু, সেদিন বয়-বাবুটির অস্বাভাবিক গলতি ওর চোখে পড়বেই।

এ নিয়ে কখনও কিছু বলেননি উনি বৈজ্ঞানিক-দিলারামকে। কিন্তু, সাবের না বলা মুখের রেখার, কপালের খাঁজে বে বিরক্তি ফুটে ওঠে, তার জন্য ওরা সভয়ে সজ্ঞ হয়ে মেমসাবের আগমনের দণ্ড গুণতে থাকে। আজ ঘরে ঢুক জ্যোকে দেখতে পেয়ে বিম্বিত হওয়ার চেয়ে আনন্দিত বেশী হ'লেন, হাসিমুখে বললেন—

একটা মজার খবর শুনেছো তরু, আমাদের রমেন বাবু'র স্ত্রী সর্বাণী দেবী ফিলোজফিকে ইশান-দলার। তরুবার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়েও বেশবশংকর খুশিমুখে বলে চললেন।

দিল্লী থেকে মিঃ রে'র বোন আর ভগিনীপতি এসেছেন—মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস রুজ। মিসেস রুজ ছিলেন সর্বাণী দেবীর ক্লাসমেট। সঞ্জীক এবং সবোন ভগিনীপতি ম্যালিং এ বেরিয়েছেন মিষ্টার রে, আমাদের পরিচিত প্রায় সকলেই ছিলেন সেখানে। সাহেব সিং-এর লোকান থেকে রমেন বাবু ও সর্বাণী দেবী কি ঘেন ওধুধু কিনে বেরিয়েছেন। বাস্করীকে চিনতে পেয়ে মিসেস রুজ হৈ-হৈ করে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলেন, তারপর সব প্রকাশ হয়ে গেলো— একেবারে অলপ অরুণ হ'য়ে জ্যোকে বসে থাকতে দেখে উচ্ছাস স্তিমিত হয়ে গেলো বেশবশংকরের। স্ত্রীর একেবারে সামনে এসে—সম্রাট গলায় প্রায় করলেন, কি হয়েছে তরু, তোমার সেই পুরোনো মাথার যন্ত্রাটা আবার শুক হ'য়েছে বুঝি? তরুবারা নীরস গলায় তবু ছোটো উত্তর দিলেন, না। তরুবারা এ সময় বাড়িতে বসে থাকার আর মুখভারের কি কারণ ঘটতে পারে, মনে মনে তাই চিন্তা করতে করতে 'বেশবশংকর পাশের ঘরে জামা-কাপড় ছাড়তে গেলেন। বছর দু'য়েক আগে তরুবারার দ্বয় সম্পর্কের এক ভাই ইতিহাসে ইশান-দলার হয়েছিলো। সে খবর বখান উনি ট্রেইসম্যান মারফৎ পেলেন, কাগজে ইশান-দলারের পিতৃশরিচর পড়েই উনি হিসেব করে দেখলেন, ছেলেটি সম্পর্কে ওর ভাই হয়। তখন কিছুদিন ওর গর শুধু গরম হয়ে থাকতো অদোষ ভাই-এর ইশান-দলারশিপের আলোচনায়। একদিন অফিস-কেবৎ বেশবশংকর পাশের ঘর থেকে স্ত্রীর আলোচনার কিছু অংশ শুনে ফেলেছিলেন।

: বাকে এডুকেশন এ্যাটমসফিয়ার বলে, সে হলো গিরে আমার বাপের বাড়িতে। যে ঘরেই আপনি চুকবেন, দেখবেন স্ত্রীপুত্র হই খাতা টেবিলে ছড়ানো আর তার মধ্যে ময় হয়ে আছে হর আমার কোনো ভাই না হলে কোনো বোন। আর কলও সব করছে তেমনি, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলোতে ফাঠ' সেকেও ছাড়া হয় না কেউ! এই তো আমার ভাই অভিজিৎ এবার ইশান-দলার হয়েছেন—ট্রেইসমানে দেখছেন নিশ্চয়ই? ফটো দেখে মনে হয় ঘেন এখনও বোলা বছর শেরায়নি ওর। গরগর হয়ে আরও কিছু বলতে মিসেস তরুবারা বিশ্বাস কিন্তু কথার মাঝখানে ঘরের অনেকের মধ্যে কে ঘেন একজন জিগেসো ক'রে বললেন, আপনার নিজের ভাই? মনে মনে চট্টলেন তরুবারা। কথার মাঝখানে এ ধরণের সওয়াস সিমলার সমাজে কেউ করেন না। খুড়ততো ভাই বলতে গিয়ে গলায় থিরা জাগলো। কারণ, পরিচিতদের মধ্যে অনেক ওর পিতার পদবী জানেন। কিছুটা খতিয়ে গিয়ে তরুবারা জবাব দিলেন, না, নিজের ভাই নয়, মাসতুতো ভাই—তা অজু আমার নিজের ভায়ের চেয়েও অনেক বেশী। অভিজিৎকে ওজু বলে তরুবারা। নিজের উদ্ভিঙে অবন্ত একটু জোর পেলেন কিন্তু অঙ্গেকার কথা

গটীর যে আস্তো বোগাযোগ রইলো না, তা বিদ্রুত হলেন সম্পূর্ণ। পাশের ঘরে চা খেতে খেতে কেশবশংকর দুধ টিপে হাসলেন এবং জাগ্রততার বিদার জানিয়ে চলে গেলে দ্বীপ কাছে এসে সহান্তে বললেন, তবু, অভিজ্ঞতের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ঠিক মাসভুক্তো না শিসভুক্তো, হিসেব কবে দেখো দিকিনি, গ্রায়দেশের একটা মজার ছড়া আছে জানো তো? ‘মামার ক্ষেতে বিরোলো গাই, সেই সম্পর্কে মাসভুক্তো ভাই’—কথা শেব ক’রে হো-হো ক’রে হেসে উঠছিলেন কেশবশংকর।

খুব বেশি সেদিন রাগ করতে পারেননি তরুণী। আড়াল থেকে ঊরু কথা স্বামী কতখানি শুনেছেন তা জানেন না এখন, তখন চেপে বাগরাই ভাল। ‘চট ক’রে অল্প একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। কেশবশংকর রমেনদের বাড়ির সকলের প্রতিই একটি প্রেমের প্রদ্বা করেন এবং নীলা যে ইউনিং ওয়ার্কের নাম ক’রে ইঙ্গ্রাণীর কাছে বাংলা শিখতে যায় সে খবরও সবিশেষ জানেন, প্রকাশ করেননি তা মেরের কাছে। ঐ এক কৌটো মেয়ে ইঙ্গ্রাণীর প্রতিভার এক ব্যক্তিতে মনে মনে ইঙ্গ্রাণীকে আনন্দিক ব্রহ্ম করেন কেশবশংকর। দ্বীপ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাবার জন্যই ইঙ্গ্রাণীর পরীক্ষার খবর সেদিন বাড়িতে এসে বাবু বাবুর উল্লেখ করেছিলেন এবং আশ্রকেও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গীতের খবর ব্যস্ত করার শেখনে ঐ একই উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, কিন্তু ত্রীক এমন ধর্ম্মে দুধে নির্বাক থাকতে কখনও দেখেননি কেশবশংকর। কোনো অন্তঃস্বাদের আশংকায় ফিলিত হ’য়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্তন ক’রে ফিরে এলেন দ্বীপ কাছে। উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তবু? একটু নড়ে চড়ে বসে তরুণী ধরা-ধরা গলায় বললেন, তুমি, চা খেয়ে নাও, তারপর শুনো—কেশবশংকরের কপালে রেখা পড়লো কয়েকটা। হাঁক দিয়ে বৈজ্ঞানিক ডেকে চা-জলখাবার এ ঘরে দিয়ে যেতে বললেন। দ্বীপ দিকে সশ্রদ্ধ চোখে তাকিয়ে শুভালেন, কী বাপীর ঘটেছে তাড়াতাড়ি বল তবু, ভয়ানক অস্থিরতা শুরু হয়েছে—সেই আগের গলাতেই তরুণী বললেন, খোকন কিছুতেই বিয়ে করবে না, শুধু এখনই নয়, ও নাকি জীবনেও বিয়ে করবে না।

হেসে ফেললেন কেশবশংকর। ও! এই কথা, আমি ভেবে মরিচ না জানি কী কাণ্ড ঘটবে বলেছে। তোমার মাখার পোকা হুকেছে, না হলে খোকনের বিয়ের জন্য এমন করে কেপো তুমি? এই ব্যরসে কোনো ছেলে আজকাল বিয়ে করতে চায় না কি?

এ কথাই তরুণী কঁদে ফেললেন, না গো, তুমি জানো না, খোকন বলেছে আজীবন ও চিরকুমার থাকবে আর—আর বলেছে ওর সিমলা ভাল লাগছে না, ও সাত দিনের মধ্যেই কলকাতার ফিরে যাবে। যে ছেলে মা-বাবাকে ছেড়ে কতকালের জন্য বিলেত বাছে কে জানে, তার বাবা-মা-বোনদের কাছ ভাল লাগছে না, তার ভাল লাগবে কলকাতার এই ডায়াপসা গরমে শূণ্য হোটেলবাড়ি, এমন রক্তি খোকনের কবে থেকে হলো! হুঁপিয়ে উঠলেন তরুণী। বৈজ্ঞানিক চা-খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকাতে তরুণী দুধ খুঁড়িয়ে নিলেন। কেশবশংকর ছেলের কথা আর হাসি দিয়ে উড়তে পারলেন না। চিন্তিতমুখে চায়েই শেষা হুল চুষল দিলেন একটা, খোকন আজ গেছে কোথায়?

চোখের জল বুছে তরুণী ভয়-ভয় ব্যস্ত গলায় বললেন, ও মা তাইতো! এককণ তো খোকনের কোর উচিত ছিলো, ওতো দুপুরে খাওয়া লাগেই করেই তোমার বন্ধু নিয়ে বেরিয়েছে।

মানা করলে না কেন তুমি? ক’দিনই বা খোকন হাতের টিপ প্র্যাকটিস করেছে, ওতে কী পানী মারা যায়? কেশবশংকরকেও ভাবিত হ’তে দেখা গেলো।

তরুণী বললেন, নীলার কাছে খোকন বলেছে, কাল কিবা পরণ্ড ‘চুফট-নালার’ ও লন্ড্রাবাধ শিকার করতে যাবে, আর তুমি বলছো কিনা, ওতে কী পানী মারা যায়? আমাদের কথাই কাজ হবে না, তুমি বাপু ছেলেকে ‘চুফট-নালার’ যেতে মানা ক’রে দিও, আবার তো শুনে অবধি বুক কাঁপুনি শুরু হয়েছে। কেশবশংকর চিন্তিত মুখেই চা-জলখাবার শেষ করলেন। কলিংবেল তার অন্তিম ঘোষণা করলো। একটু পরেই দিলারাম এসে সবিনয়ে জানালো,—টেলার জন্মতি-প্রসাদ এসেছে। দিলারাম মারফৎ টেলারকে বসতে বলে কেশবশংকর উঠে পড়লেন। খোকন না বললে কি হবে, উপকালের কোটটা একটু আঁটো-আঁটো হয়েছে, আজ টেলারকে বাড়ি আসতে বলেছিলেন সেজন্য সন্ধ্যার পর। খোকন এ সময়ের অনেক আগেই রোগ বাড়ি ফিরে আসে। এক মিনিট কি ভেবে নিয়ে কেশবশংকর ছেলের ঘরে চলে এলেন। ওয়ার্ডরোব খুলে দেখলেন, না, উপকালের কোট প’রে যারনি খোকন, ওটা ছাড়াইই বসছে। ছেলের মাশ তো জন্মতিপ্রসাদের কাছে আছেই, কাজেই খোকনের গায়ের মাশ এখন না গেলেও কিছু এসে যাবে না। ছায়ায় থেকে কোট খুলে নিয়ে হুঁপা এগিয়ে আবার পাড়িয়ে গেলেন কেশবশংকর, পকেটে কিছু আছে কিনা হাত গলিয়ে দেখতে লাগলেন। বাইরের পাশের দরজা পকেট ও বুকপকেট—তিনটেই খালি। কোটের ভেতর-পকেট থেকে কাল কাগজে মোড়া একগোছা ফটো বেরিয়ে এলো। কাগজের আবরণ উন্মোচন করতেই অসুত বিম্বয়ে একেবারে স্তব্ধ হ’য়ে গেলেন কেশবশংকর। প্রথম ফটোখানা ফুলের বাগানের মাঠখানে বসে ইঙ্গ্রাণীর ফটো, তারপর একে একে আরো ছ’খানা ফটো দেখলেন, সব ক’খানাই সালোয়ার কামিজ পরা ইঙ্গ্রাণীর বিভিন্ন ভঙ্গিমার ফটো। ফটোর চোখ রেখে অনেকক্ষণ একেবারে স্থির হ’য়ে পাড়িয়ে যতলেন কেশবশংকর। হঠাৎ খেয়াল হলো জন্মতিপ্রসাদকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন। দিলারামকে আবার ডাক দিয়ে বলে দিলেন—টেলারকে আর একদিন আসতে বলে দাও, ছোটো সাব এখনও ঘরেই ফেরেনি। দিলারাম আদেশ জানাতে চলে গেলো। ইঙ্গ্রাণীর বসে ফটোখানা ছাড়া বাকী আর ছ’খানা ফটো বখাছানে রেখে দিলেন। বসে ফটোখানা নিজের পকেটে ভরে ফিরে এলেন দ্বীপ কাছে।

খোকন কিভাবে? উৎসব-ব্যাকুল গলা তরুণী। চোরার টেনে দ্বীপ খুব কাছাকাছি বসলেন কেশবশংকর।

শোনো তবু, আমি যদি তোমার ছেলেকে বিয়েতে মত করাতো পারি, তাহলে আমাকে কী খাওয়াচ্ছে? বল? এ বেন ভুতের মুখে রায়নাম শুনলেন তরুণী। শুধু ছেলের মত করানোই নয়, পুত্রের বিয়ের পুরো সন্ন্যতির সুখ এত দিনে স্বামীর গলায় পেলেন। আনন্দে

অবীর হয়ে বললেন তরুণী, তুমি বা বা খেতে ভালবাস এক মাস ধরে যোজ তাই খাওয়াবো—তারপর যুগ টিপে হেসে বললেন, ছেলে বধন আমার, তখন তোমাকে খাওয়াতে হবে বৈ কি !

ছেলেমাছের মত উচ্ছল গলায় হেসে উঠলেন তরুণী। স্বামীর কথাই প্রচুর আছা আছে। যুগ দিয়ে বধন একবার ওকথা বলেছেন তখন খোকনের মত আলায় করে ছাড়বেনই।

কিন্তু গলায় গাভীর্ণ আনলেন কেশবশংকর, বনে পছন্দ করতে ছেলেকে ঢালা স্বাধীনতা দিতে হবে।

নিশ্চয়ই, আমি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছি ও বিষয়ে, ছেলেকে পারাবো না ?

মুহু হাসলেন কেশবশংকর, বললেন, এ ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের প্রায় ঠিক এক দাঁড়ায় না তরু, তুমি ভুলে যাচ্ছে সে কথা। বাই হোক, ধরা—ইতিমধ্যে খোকন যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে থাকে ?

তরুণী বললেন, তুমি হাসলে দেখছি। খোকনের কোনো মনোনীত থাকলে অমৃত: তার একখানা চিঠিও তো আসবে কলকাতা থেকে ? জানাই তো, চিঠির বাস্তব তাল আমি নিজের হাতে খুলি ?

আহা, সিমলায়ও তো খোকনের মনোনীত থাকতে পারে ?

তরুণী লজ্জিত বললেন, সিমলায় থাকলে তো কথাই নেই, মেয়ের বাবার স্বাক্ষরিতের পরদা খরচ হবে না। তোমার কথা আমি বুঝছি, ছেলের বিষয়ে অত অমত শুনে তুমি মনগড়া ভাবনা জেবে এসব কথা বসছে।

কেশবশংকর হাসলেন, তোমার বধন ছেলের বিষয়ে দিতে ইচ্ছে নেই, তখন আর কব কী ?

এবার তরুণী ভুরু কৌচকালেন, ব্যাপার কী বলতো ? তুমি কি খোকনের টেবিলে কোনো চিঠি-কিটি দেখে এলে নাকি ? মুহু মুহু হাসতে লাগলেন কেশবশংকর।

তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রগলায় বললেন, বাই, খোকনের আদার আগে আমিও দেখে আসি তাহলে।

বসো, বসো, ব্যস্ত হয়ে না—বাধা দিলেন কেশবশংকর। নিদর্শন আমি পকেটে করেই নিয়ে এসেছি।

তরুণী ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে ব্যস্ততার সঙ্গে স্বামীর দিকে হাত প্রসারিত করলেন। দেখি দেখি চিঠিখানা—কেশবশংকর বললেন, এবার তুমি হাসালে তরু, ছেলের লাভ পেটার বাবা লুকিয়ে পড়ে এমন ভাঙ্করের কথা আমার জানাও নেই, শোনাও নেই, ওসব মায়ের একতিয়ারে। তরুণী হতাশ হয়ে আবার গুটিয়ে বসলেন।

তবে ? কেশবশংকর স্মিতমুখে বললেন, চিঠি নয় ফটো।

দেখি দেখি ? আগের মতই ব্যস্ততা ফুটে উঠলো তরুণীর কঠরয়ে। পকেট থেকে কাগজে-মোড়া ফটোখানা তরুণীর হাতে তুলে দিয়ে স্থিরমুদ্রিতে দ্বার দিকে চেয়ে রইলেন কেশবশংকর। আবার সরাসরি একেবারে বেন রক্তশূন্য কাশশে হয়ে পেলো তরুণীর মুখ। কেশবশংকর তরুণীর মনকে তার নিজের মুখোমুখি হবার সময় দিয়ে পকেট থেকে পাইপ বার করে ধীরে-বাহু তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। হঠাৎ কি বেন

মনে পড়লো তরুণীর, চোঁটা করে মুখে কীপ হাসি ফুটিয়ে বললেন, এ ফটো খোকনের টেবিলে থাকলে কি হবে, এ নিশ্চয়ই নীলার কাণ্ড ! ইন্দ্রাবীর সঙ্গে ওর ভ্রাতানক ভাব কি না, ওই ফটোখানা ভুলে টেবিলে রেখে গেছে। কেশবশংকর পাইপ থেকে ধোঁয়া উদ্গীরণ করে বললেন, আর ফটো যদি খোকনের কোটের বুকপকেটে থাকে, তাহলেও কি তুমি বলবে—নীলী ভুলে ফেলে গেছে ওখানো ?

খোকনের বুকপকেটে ! তরুণীর কঠরিয়ে ধীরে ধীরে কথা ক'টি বার হলো। কেশবশংকর আবার সময় দিলেন তরুণীকে। ইন্দ্রাবীর এই ফটোখানা অনেক ছালামা করে যোগাড় করতে হয়েছে অরুণেশকে। মিসেস রে নীলী ও ইন্দ্রাবীকে নিজের বাগানে বসিয়ে যুগ ফটো তুলছিলেন একখানা। অরুণেশ একদিন বেড়াতে গিয়ে ফটোখানা দেখে ফেলে। তারপর, নীলার ফটোর পোছের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একদিনের কড়াবে নেগেটিভখানা নিয়ে আসে মিসেস রে'র কাছে থেকে। সেই যুগ ফটো থেকেই অরুণেশ ইন্দ্রাবীর আশা ফটো প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছে। অবশ্য যুগ ফটোও প্রিন্ট করিয়েছে একখানা। নাহলে নীলার কাছে যদি মিসেস রে কোনো দিন ফটোর কথা ভুলে বসেন, তাহলে বেয়াক্স বিপদে পড়ে যাবে ও।

এক-পাইপ তামাক পুড়লো, তবু তরুণী ফটো কোঁলে ক'লে, একই ভাবে বসে আছেন !

কী হলো তরু ? পাইপ থেকে ঠুকে ঠুকে ছাই বার করতে করতে প্রায় করলেন কেশবশংকর। তবু নিশ্চয়ই রইলেন তরুণী।

ইন্দ্রাবীকে পছন্দ হচ্ছে না তোমার ?

ওগো না—না—যেন কেঁপে উঠলেন তরুণী।

আমরা রাজি হ'লে কী হবে, ওরা সম্মতি দেবে না।

ওরা মানে রমেন বাবু, সুরাবী দেবীর কথা বলছে ? নিঃশব্দের সুরে বললেন কেশবশংকর। নিশ্চয়ই মত দেবেন, অমত করবার কোনো কারণ তো বুঁজে পাচ্ছিনে আমি। বিয়ের পর খোরন বিলতে থেকে না ফেরা পর্যন্ত ইন্দ্রাবী ওদের কাছে থেকেই পড়াশুনা করবে। তরুণীর তততরে যেন অস্বস্তিকর ছটকটানি শুরু হলো, কী ক'রে মুখ ফুটে পরামর্শ ঘোষণা করেন স্বামীর কাছে ! কি ক'রে বলেন, রমেন-সুরাবীর মতামতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে না, আরো একজন আছে, আরো একজন থেকে যায়—সে ইন্দ্রাবী। মেয়েমাছ হ'য়ে মেয়ে ঠাঁড়ি করতে দেবী লাগে না। দু-চারবারের দেখাতেই উনি বুঝছেন কী ইন্দ্রাবীর মত শক্ত এই বোলা বছরের এককোঁটা ইন্দ্রাবী, কী উদ্যোগ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। যেদিন কোয়ার্টারেল পার্টির পর ফটোতোলায় জন্ম আর সবাইকে আহ্বান করেছিলেন, সেদিন ঐ এককোঁটা মেয়ের ঠোঁটের বাঁকে অজুত বাঁকা হাসির খেলা দেখেছিলেন তরুণী। এই মুহূর্তে সেই দৃষ্ট স্পষ্ট ভেসে উঠলো তরুণীর মনের আয়নার। এ সমস্তা এমন ভাবে দেখা দেবে ওঁর সামনে, এবে একেবারে অকল্পনীয় তরুণীর কাছে ! ছেলের হঠাৎ মন খারাপের কারণ, 'চিত্রাঙ্গনা' নৃত্যশিল্পী না দেখেই বাড়ি ফেরা এবং না খেয়েই ওঁরা আসার আগে দরজা বন্ধ ক'রে গুয়ে পড়া, এবং অনেক ভাড়াভাকি করেও কেন সেদিন পুরের কাঁহ থেকে সাড়া পাননি, একে একে সব স্বচ্ছ হ'য়ে থা

দিলো তরুণালার কাছে; আর কোনো কুয়াশা হইলো না। তরুণালার মন অসহ উবেগে ছটকট করতে লাগলো। এ্যাঁকাউটেট-জেনারেল-জারা, মিসেস তরুণালা বিশ্বাস, বিনি বেমলোর বাড়ীলোতে থাকেন, তিনি ঘেরে গেলেন ক্যাথলিক ক্লাবের সাত নম্বর স্ট্রাইটের এককোঠা ইন্ড্রাগীর কাছে? তরুণালার রেহাফ মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

: ওর জন্ত ওর নাড়িহেঁড়া ঘন অস্থখী থাকবে—তাও কী হয়? ক্যাথলিক ক্লাবে বাওয়ার জন্ত শাড়ি পাখীতে উঠলেন তরুণালা। দ্রুত কাশড় হাটার ঘরের অভিমুখে যেতে দেখে, তরুণালার উদ্বেগ জাঁচ ক'রে ফেললেন কেশবশংকর। শিঙ গলায় বললেন, শোনো 'তরু, তোমার বাওয়া এখন ট্রিক হবে না, কাল জমিসে আমি রমেন বাবু কাছ কখাটা পাড়ি, তারপর বেও।

তুমি বুঝবে না, আমায়ই আগে বাওয়া দরকার—ডেসিক্রমের দিকে এগিয়ে আবার স্বামীর কাছে সরে এলেন তরুণালা।

এই নাও, ফটোখানা আগে ঠিক জায়গার বেখে দাওগে, আর খোকন-নীলার গলা গুনছি, তুমি কিন্তু আমায় বাওয়ার কথা জানিও না ওবেদ, কিন্তু তরুণালা সেট-পার হবার আগেই কেশবশংকর ছোট কভাকে ডেকে চুপি চুপি শুধালেন, নীলা, তোমার বাক্সী ইন্ড্রাগী যদি তোমার বৌদি হয়, কেমন হয় বল দেখি?

এর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না বাবা! লাকিয়ে উঠেই নীলা ভীকশংকর চোখে বাবার দিকে তাকালো, কিন্তু, যা কিছুতেই বাক্সি হবেন না, আমি জানি—

বাক্সি হবেন না কি রে? তোমার মা এই বিষের প্রস্তাব করছেই তো ক্যাথলিক ক্লাবে এখন গেলেন।

সত্যি বাবা? আর এক লাফ দিয়ে ছুটে বাড়িলো নীলা, ঘরের এক হাত টেনে ধরে বেখে কেশবশংকর হাসি-হাসি মুখে আবার বললেন, আর একটা নোড়ুন খবর শোন, ইন্ড্রাগীর মা সর্বাপী দেবী ফিলোজাকিতে ইশান-ফলার। বা, দাদাকে খবর ছুটো দিলে বা—ভতকণে নীলা অদৃষ্ট হ'য়ে গেছে, একটা আরামের নিখাস ফেলে কেশবশংকর পাইপ ধরালেন। এই বিয়েতে তরুণালা এত সহজে সম্মতি দিয়ে বিষের প্রস্তাব করতে নিজেই ক্যাথলিক ক্লাবে যাবেন, এতটা আশা করেন নি উনি। ক'দিন ধরে ছেলের মুখে হাসি নেই, খুশি নেই, খাওয়া নেই, স্ত্রী নেই, বোনেশরাসে রাসরক নেই, মা-বাবার সঙ্গে কোনোরকম ছুইমী নেই—কোনো কিছু আশংকার জাঁচ ক'রে ক'রে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন কেশবশংকর। পাইপ মুখে দিয়ে প্রশান্তমুখে কেশবশংকর আরামকোয়ারার পা এলিয়ে দিলেন।

[ক্রমশ:]

সূর্যকবি

আবদুল মজিদ

হে অক্ষয়ন্ত জ্যোতির উৎস,
তোমার যৌক্ত-করোজ্জল সে এক প্রভাতে
প্রথম দেখলাম সূর্য্যী এ পৃথিবীকে।
তোমার আলোর বিচ্ছুপে
আমার কুঞ্জে-কুঞ্জে ছুটলো অসংখ্য কিশলয়;
সবুজ সবুজতর হলো।
প্রতিদিনই অল্পস্র আলোর উত্তাপ
অহুত হ'লো ধমনীতে।
তোমার আলোর কণিকা
আমার আকাশে আকাশে রচনা করে
অপরূপ ইন্দ্রধনু-সেতু।
উত্তাপের উত্তেজনায় তুলে গেলাম
জঠরের নির্মম-ভ্রুকৃতি।
তোমার আলোর আবীর মুষ্টি-মুষ্টি
ছড়িয়ে দিলাম আকাশে-আকাশে।
আলোর তীক্ষ্ণতীর কবিতা তোমার
বিদ্য করে আঁধার-ঈশল।
হে সখিতা সূর্য্য,
তোমার সকল সুলভ-ভরসে অবগাহন করে
তৃপ্ত, মহাতৃপ্ত আমি।
নিত্য বিকিরণে এত আলো-প্রেম-তাপ
তোমার অভয় দীপ্তি হবে না নিশেব?
হে সূর্য্যর জ্যোতির্ময়, লহ যোর সূর্য-প্রণাম।

গরীব

অশোকা দেবী

ছুটপাতে পড়ে থাকা জীবন,
করেছে অনেক আশা সে-ও।
নিবে গেছে ছোট দীপশিখা
ছোট হাওয়া লেগে।
অর্ধহীন জীবনের পটে
একে বেওয়া-আছে—
ব্যর্থতার ছবি। কাড়ালের
রক্ত ঘায় তবু
কথা কর, আখো-আখো ঘরে।
রাজ্জিভরা কঠোর জীবন
মধুও ঢেলেছে অন্তরে।
হীনতার নাই বরনিকা—
তবু তারা সহিছে বেনা
লাঞ্ছিত বিবেক পৃথিবীতে।
গভীর চুঃখের কল্লনার
তারা কাঁদে।
ব্যর্থতার মন্দিরে
নিরাশার স্বপ্নের জাল ঘূনে।
হুঃখের চিত্তার
ফলে-পুড়ে হয় হাই
তবু সবে ঘায় নীরবেতে।



[Osamu Daza's "The Setting Sun"-এর অহুবাদ]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আগুন

সাঁপের ডিমের ব্যাপারের পর দিন দশেকের মধ্যে একটার পর একটা ছুঁটনি ঘটতে লাগল—কলে মায়ের শোকবৃদ্ধি ও আত্মকর সমান তালে এগিয়ে চলল।

এরই মধ্যে একদিন এক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। বাড়ীতে আগুন লাগানোর মত এমন অপকর্ম আমার দ্বারা সম্ভব হতে পারে এ ধারণা যন্ত্রেরও অতীত ছিল। আমার চারপাশে আর পাঁচজনের জীবন বিপন্ন করে, নিজেকে কাঠগড়ায় পাঁড় করাবার জ্বলন্ত নিজেই ডেকে আনলাম।

ছেলেবেলা থেকে এমন একটি "শিশুমহিলা" তৈরী হয়েছিলাম যে অনবধানতা থেকে অসুখপাণ্ড হতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। একদিন অনেক রাতে হাত বুতে উঠে বসার ঘরের পরদা পেরিয়ে এগুতে গিয়ে স্নানের ঘর থেকে আসো চোখে পড়ল। এমনি একটু দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সে ঘরের দরজার কাঁচ পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে—এতকণে সন্ধ্যা ফাটতে শুরু করল। পাশের দরজা দিয়ে খালি পায়েই ছুটে বেরিয়ে সেলাম। তখন আমার নজরে পড়ল চুন্নীর পাশে জ্বলন্ত কালানিকার কাঁচ-পাট করে জ্বলছে।

বাগানের প্রান্তে এক কৃষক-পরিবারের বাস—সেই বাড়ীর দরজার প্রাণশক্তি শক্তিতে ধাক্কা দিয়ে চোঁচাতে লাগলাম—মিষ্টার নাকাই, আগুন! আগুন! দয়া করে উঠে আসুন, আগুন লেগেছে।

মিষ্টার নাকাই বোধ হয় সবমাত্রা শুয়েছিলেন, ভেতর থেকেই টেঁচিয়ে জবাব দিলেন—একুশি আসছি। আমি তাঁকে আবার তাগাদা দিতে বাছি, এমন সময়ে রাতের পোষাকেই তত্ত্বলোক বেরিয়ে এলেন।

আমরা আগুন লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। পুকুর থেকে দুজনে বালতি ভরে জল তুলেছি, এমন সময়ে মায়ের ঘরের পাশের বেলিং-এর কাছ থেকে সাড়া পেলাম। জলভরা বালতি ছুঁড়ে ফেল দিয়ে দৌড়ে গিয়ে মাঁকে ঘরে ফেললাম, নইলে তখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। বাস্তব হঠাৎ না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুয়ে থাক। কোনরকমে তাঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আগুনের দিকে ছুটলাম। এবার আমি স্নানের ঘর থেকে বালতি বালতি জল মিষ্টার নাকাইকে এগিয়ে দিলাম, উনি জলন্ত কাঁচের বোঝার ঢালতে লাগলেন। কিন্তু আগুনের এত জোর হয়ত ঐ ভাবে নেবানো যেত না।

নীচে 'আগুন আগুন' রব উঠল। হঠাৎ চার-পাঁচ জন চাষা আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতে হাতে বালতি বালতি জল ঢালু হয়ে গেল। আগুন নিবল। আর একটু বেশী হলে আগুন ঘরের ছাতে গিয়ে ঠেকত।

প্রথমই মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু পরমুহুর্তে এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ডের কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্তরাস্ত্রা ধিক্কার দিয়ে উঠল। এতকণে মনে পড়ল গতরাতে চুন্নী বেড়ে পরিদায় করে আধোপাড়া কাঠগুলো নিবে গেছে ডেবে হাতের কাছে জড়ো করা জালানিকাঠের স্তূপের কাছে রেখেছিলাম। এই তথ্য আবিষ্কার করে আমার চোখ ফেটে জল এল। চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুনলাম সামনের বাড়ীর মেয়েটি টেঁচিয়ে বলছে—কেউ নিশ্চয়ই চুন্নী ঠিকমত সাক করে নি। জায়গাটা একেবারে পুড়ে থাক হয়ে গেছে।

প্রায়ের মেঘর পুলিশের লোক, দমকল বিভাগের বড় বর্তী সবাই এসেছেন। স্বভাবোচিত বৃহৎ হেসে তত্ত্বলোক জিজ্ঞেস করলেন—খুব ভয় পেয়েছ মা! কি করে এমন হল?

আমারই দোষ। ভেবেছিলাম কাঠগুলো বুঝি একেবারে নিবে গেছে।

এর বেশী কিছু বলা তখন আমার সাধ্যের বাইরে। মাটির দিকে চোখ নীচু করে, বাস্তুশক্তি রহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল পুলিশ আমার এই দশে হাতকড়া পরিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে হঠাৎ খেয়াল হল আমার পায়ে জুতো নেই, গায়ে ভদ্র পোষাক পর্যাপ্ত নেই। রাতকামিজ পরে কি দরজার অবিস্তৃত চোখা নিয়েই না এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি! দিশাহারা হয়ে পড়লাম। মেঘর মশায় দরজতরা কঠরবে বললেন—বুঝি। তোমার মা ভাল আছেন তো?

মা নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন, তাঁর ওপর মাঝামাঝি ধাক্কা গেল।

অল্পবয়সী পুলিশটির কথায় সাধনা দেবার চেষ্টা—বাক গেল—বাড়ীটার যে আগুন ধরেনি—এ এক ভয়ঙ্কর কথা।

ইতিমধ্যে মিষ্টার নাকাই পোষাক বদলে এসে প্রতাপ চেঁচামেচি ছুড়ে দিলেন—যাপার কি? এত গণ্ডগোল কিদের? খানিকটা কাঠ পুড়ে গেল, একে তো আর আগুন লাগা বলে না। বেচারী ভুলসাক আমার লেব ঢাকার আশ্রয় চেষ্টা করছিলেন।

মেঘের মশায় মাথা হেলিয়ে সার দিলেন—বটেই তো। এর পর পুলিশকে কয়েক মিনিট কি সব বুঝিয়ে আমার বললেন—এবার আমরা আসি। মাকে আমার নমস্কার দিও।

সবাই এগিয়ে গেল, কেবল সেই পুলিশটি আমার কানের কাছে এসে কিস-কিস করে জানিয়ে গেল—আজকের ঘটনার কোন রিপোর্ট করা হবে না। সে চলে যাবার পর মিষ্টার নাকাই খমখমে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, পুলিশটি কি বলে গেল?

আমি উত্তর দিলাম, ও বললে কোন রিপোর্ট হবে না। প্রতিবেদী যারা এককপ ভিড় করেছিল, তারাও সম্ভবতঃ আমার জবাব শুনল। কারণ এর পরেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে বার ঘরে ফিরে গেল। মিষ্টার নাকাই আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপর ভয়ঙ্কর কাঠের স্তূপের পাশে। একাকী শূন্য মনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের জলের ভেতর দিয়ে আকাশের নিকে চেয়ে দেখি ভোর হয়ে আসছে।

আমি হাত-মুখ ধুতে গেলাম। মার সামনে স্নিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় পাচ্ছিলাম, ভ্রানধরে চুল বেঁধে খানিক সময় নষ্ট করলাম। রান্নাঘরে ঢুকে রান্নার বাসনপত্র গুছিয়ে নিতে আরও কিছুটা সময় গেল, একটু হাফা বোধ করলাম।

তারপর পা টিপে টিপে মায়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, এরই মধ্যে জামা-কাপড় বদলে পরিপাটি হয়ে আরামচোরায় গিয়ে বসেছেন, মুখে অপরিচীত স্নানোদ্রাহ। আমার বেধে হাসলেন বটে কিন্তু সে মুখ কাগজের মত সাদা। প্রত্যুত্তরে আমি কিছু হাসতে পারলাম না। চুপ করে তাঁর চেরারের পেছনে গিয়ে দাঁড়লাম। খানিক পরে মা বললেন, বিশেষ কিছু হয়নি—না? শুণু এ জালানি কাঠলোর জেঙ্কেই তো—আমার সারা মন ছুড়িয়ে গেল। জেলেবেলার রবিবারের ইস্কুলে দেখা বাটবেলের লাইন মনে পড়ে গেল, একটি সমরোপযোগী বাক্যের মূল্য বোধ্যমণ্ডিত চিত্রে স্বর্ণময় অপেলের সমান। আমার এ-হেন মাতৃভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ দিলাম।

জলখাবারের পাট দেবে পাড়া কাঠ সাক করার কাজে হাত দিলাম। গ্রামের সেই হোটেলের বুদ্ধি ওসাকি বাগানের দরজা ঠেলে হুকল—কি হয়েছিল? আমি এইমাত্র খবর পেলাম। গতরাত্রে কি সব গোলমাল হয়েছিল? বলতে বলতে ওর চোখে জল ভরে এল।

অপরূপ স্বীকারের ভঙ্গীতে আমি উত্তর দিলাম, আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

লজ্জা পাবার কি আছে? কিন্তু পুলিশ কি বলল?

ওরা বলল সব ঠিক আছে।

আঃ বাঁচলাম। অকৃত্রিম পুলিশি ভাব ওর মুখে-চোখে ফুটে উঠল। কি করে পাড়া-প্রতিবেদীকে ধন্যবাদ জানান যায় আর আমার অপকর্মের ক্ষম্য মাপ চাওয়া যায়, ওসাকির সঙ্গে সেই পরামর্শ করলাম। সে বুদ্ধি দিল যে, টাকাই এর সবচেয়ে ভাল দাঁড়ায়।

কয়েকটা বাড়ীর নাম করে বলল, সেই সব বাড়ীতে আমি যেন টাকা নিয়ে গিয়ে মাপ চেয়ে আসি। বেচারী এর পরেও বলল—তোমার যদি একা ঘুরতে খারাপ লাগে, আমি বরং তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

বোধ হয় আমার একা যাওয়াই সবচেয়ে ভাল দেখায়, কি বল?

একা পারবে? পারলে সত্যি খুব ভাল হয়।

আমি একাই বাব।

পাড়া কাঠের জঞ্জাল সাক করে, মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একশ' ইয়েনের কয়েকটা ছোট ছোট থলি বাঁধলাম। বাইরে লিখলাম—কুট স্বীকার করতঃ। প্রথমেই গ্রামের সদরে গিয়ে মেঘরের থোঁক করলাম; তাঁকে না পেয়ে অভ্যর্থনাকারিণী মেয়েটির ডেজের কাছে গিয়ে বললাম—আমার গতরাত্রে অপরাধ ক্ষম্য অর্থাৎ, কিছু এর পর থেকে আমি ঢের বেশী সাবধান হব। অল্পস্বল্প করে আমার মার্জনা করবেন এবং মেঘরের কাছে আমার অন্তঃপুং-অন্তরের সংবাদ পৌঁছে দেবেন।

এর পর সেলাম গ্রামের মোড়লের কাছে। ভুললোক নিজে দরজার এসে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর অধঃপ্রান্তে ককণ হাসির রেখা ফুটে উঠল কিন্তু কোন কথা বললেন না। কি জানি কেন আমি বেঁচে কেললাম, অল্পস্বল্প করে আমার গত রাত্রে অপরাধ মার্জনা করল।

কোন বকমে বিদায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড় দিলাম—আমার গাল বেয়ে অঝোরে কান্না ঝরে পড়ছিল। মুখ-চোখের এমন বিশ্রী অবস্থা হ'ল যে বাড়ী গিয়ে আবার নতুন করে প্রসাধন করতে হল। বেকতে যাব, ঠিক সেই সময়ে মা এগিয়ে এলেন—এখনও শেষ হ'ল না? এবার কার কাছে যাচ্ছ? মুখ না তুলেই জবাব দিলাম—এই তো সবে শুরু।

তোমার এক শান্তি হল। মায়ের মত এমন দরদ নিয়ে আমার বুঝবেই বা কে? তাঁর ভালবাসার জোরে মনে বল পেলাম এবং পংবত্তী বাবতীর সাক্ষাৎ নির্বিঘ্নে চোখের জল না ফেলেই সঙ্গে করলাম।

সর্বত্র সবাই আমার সহানুভূতি দেখাল, সাহায্য দিতে চেষ্টা করল একমাত্র মিষ্টার নিশিয়ামার (Nishiyama) তরুণী স্ত্রী, বলছি তরুণী, আগলে বয়স তাঁর চঞ্জিশের কোঠায়—আমার তিরস্কার করলেন, দয়া করে ভবিষ্যতে সাবধানে চলো। আমি বন্ধুর জানি, তোমরা বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছি। তোমাদের যেমন আনাড়িপণ। তাতে যে এত দিন আগুন লাগেনি সেই আশ্চর্য। দয়া করে এর পর থেকে খুব সাবধান হতে চেষ্টা করো। গতরাত্রে জোর বাতাস থাকলে সারা গীধানা জলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

নিশিয়ামা-গিন্নির তিরস্কারের মর্ম বুঝতে কষ্ট হ'ল না। তিনি বা বললেন তার এক বর্গও মিথ্যা নয়। এত রূঢ় কথার পরেও তাঁর প্রতি আমার মন বিরূপ হয়নি।

জালানি কাঠ জলবে এ আর বিচিত্র কি! এই বকম পরিহাসের মধ্যে দিয়ে মা আমার অপরাধের বোঝা হাফা করতে চেষ্টা করলেও নিশিয়ামা-গিন্নির কথটাও না মেনে পারলাম না। বাস্তবিক হাওয়ার জোর থাকলে রাজ্যে প্রলয়কণ্ড ঘটতে যেতে পারত। তাই যদি হ'ত

তবে আমার আত্মহত্যাও কোন কমা থাকত না, কারণ শুধু যে আমার সঙ্গে থাকেও শেষ করতাম তাই নয়, স্বর্গত পিতৃদেবের নাম পূর্ণাঙ্গ কলুষিত হ'ত। জানি আজ বংশধর্যাদার মূল্য ভেদ হয়েছে, এর ফলে অবদারিত, তবু বীরে বীরে হুঠু ভাবে সমাপ্তি নেমে আসুক, এইটুকুই আমার প্রার্থনা। অগ্নিকাণ্ডের পূরপাতের 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে গিয়ে মরেও আমি শান্তি পাব না।

পরদিন থেকে উঠে-পড়ে মাঠের কাজে লেগে গেলাম। মাকে মাকে মিষ্টার নাকাই-এর মেয়ে আমার সাহায্য করতে আসত। সেবারের সেই লজ্জাকর ঘটনার পর থেকে কেমন যেন মনে হ'ত, আমার রক্তের রং গাঢ় হয়ে গেছে—আমি দিন দিন আমার হোয়ার বিলি জলী ছাপ পড়তে। যেমন ধরুন বারান্দায় মায়ের পাশে বসে উল্ল বোনার সময় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, বহু 'মার্চ' গিয়ে কোদাল কুণ্ডিরে নিলে নিজেকে বেশ সহজ মনে হয়। লোকে বলে শ্রমিকের কাজ। আমার পক্ষে এই কিন্তু প্রথম নয়। যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়ে। সেখানে কুলির কাজ করতে হয়েছে। এই যে রবারসোল দেওয়া কাপড়ের জুতো পরে মাঠে কাজ করি, এটা যুদ্ধের সময় পাওয়া। জীবনে সেই প্রথম এ ধরনের জিনিষ পায়ে দিলাম কিন্তু বেশ আয়াম লাগে। এই জুতো পায়ে দিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াবার সময় আমি যুক্তপক বিজ্ঞানের মত হাডা বোধ করি অথবা বন্ধনহীন জন্তুর মতোই চরে বেড়ানোর অকৃত্রিম আনন্দের স্বাদ পাই। যুদ্ধের এই একটি মাত্র সুখের স্মৃতি আমার আছে। উঃ, যুদ্ধ কি বিজ্ঞস্য ব্যাপার।

গত বৎসর কিছু হয়নি

তার আগের বছর কিছু হয়নি।

এক তারও আগের বছরও কিছুই হয়নি।

যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই ধবংস-কাগজে এই মজার কবিতাটি বেরিয়েছিল। অবশ্য অনেক ঘটনাই ঘটেছিল, কিন্তু মনে করতে গিয়ে সেই একই উত্তর পাই, হয়নি কিছুই। যুদ্ধের কথা বলতে বা শুনেও আমার বিতৃষ্ণা আসে। জানি 'বহু প্রাণ নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সবই এই মারাত্মক ব্যবসার অঙ্গ এবং যুদ্ধের কথা শুনে শুনে এখন আমার একঘেয়ে লাগে, লোকে ভারবে এ আমার স্বাধিপনের মত কথা হ'ল। শুধু বধন আমার জোর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড়ের জুতো পরিয়ে কুলির মত খাটিয়ে নিল, সেই সময়ে এর বিজ্ঞস্যতা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ আমার চোখে পড়েছিল। বুটে মজুরের কাজকে অনেক সময়ে যুগার চোখে দেখছি—কিন্তু এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার বাস্তব জিনিস গেল এবং এখনও মাঝে মাঝে জাতি, উপাধির অসুবিধা যদি কখনও ঘটে, আমার হুটেগিরি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

একদিন, যুদ্ধ বধন ঙ্গসাহসিক মোড় নিচ্ছে তখন বোম্বার পোষাকপরা এক জ্যেষ্ঠ আমদের নিশিকাতা স্ট্রিটের বাড়ীতে এসে আমার যুদ্ধে বাবার বাধ্যতামূলক এক পত্র দিলেন—তাতে যে কয় দিন আমার কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে তার তারিখ দেওয়া ছিল। আমি দেখলাম একদিন অন্তর আমার তাকিকাওয়া (Tachikawa) পাহাড়ের নীচে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। চৌ

করেও চৌকের জল রাখতে পারলাম না। কীভাবে কীভাবেই জিজ্ঞেস করলাম,—আমার কার্যপার আর কাউকে পাঠালে চলবে না?

জ্যেষ্ঠলোক কাঠের ঘরে উত্তর দিলেন—সৈন্য বিভাগে কাজ ঠিক হয়েছে—তোমাকেই যেতে হবে।

পরদিন বুড়ি পড়ছিল। পাহাড়ের নীচে সবাই জড়ো হয়েছিল, সেখানে এক অফিসার বক্তৃতা দিলেন। জয় অবশ্যবাহী—এই দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন,—জয় অবশ্যবাহী—কিন্তু সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের আদেশ পূর্ণাঙ্গপূর্ণ মেনে না চললে আমাদের সমস্ত কার্যপ্রণালী বিপর্যয় হবে এবং বিতীয় ভূকিনাওয়া সংগঠিত হ'তে পারে। তোমাদের নির্দিষ্ট কাজ অবশ্যই তোমরা সম্পন্ন করবে। বিতীয়ত: পরম্পরের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কোথায় যে শুণ্ডচর ঘুরে বেড়াচ্ছে—এখবর কেউ জানে না। এখন থেকে প্রকৃত সৈনিকের মত তোমরা কাজ করবে এবং বা লেখবে তা কোনমতেই বাইরে কাকুর কাছে প্রকাশ করবে না—এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করে দিতে আমরা সব বকম শক্তি প্রয়োগ করব।

আমরা প্রায় 'পাঁচ' নরনারী পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে অব্যবস্থিত ভিজতে লাগলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে সব ভিজে গেলো এট বাগী আমরা সশ্রদ্ধ অন্তরেই গ্রহণ করেছিলাম। এর মধ্যে ইকুলের ছেলে-মেয়েও ছিল—বোটারদের কচি কচি সব মুখ শীতে কীদ-কীদ অবস্থা। বৃষ্টির জল আমার কোটের ভেতর দিয়ে ঢুক গায়ের জামা ভের করে শেষে অন্তর্গত অবস্থি জবজবে করে ভিজিয়ে দিল।

সৈন্য সারাটা দিন পিঠের ওপর মাটির ঝড়ি বয়েই আমার কাটল। পরদিন পাহাড়ের নীচে একদল শ্রমিকের সঙ্গে দড়ি টেনে টেনে কাটলাম। এই কাজটি আমার সবচেয়ে পছন্দ ছিল।

পাহাড়ে কাজের সময় দু' তিনবার আমার মনে হয়েছে ইকুলের ছেলেরা আমার দিকে কেমন যেন চেয়ে চেয়ে দেখে। একদিন মাটির ঝড়ি কীধে চলছি এমন সময়ে হুটী ছেলে আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কিস্কিন্স করে বলল—তোমার কি মনে হয় এ মেয়েটি শুণ্ডচর?

খুব অবাক হয়ে পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম কথা কেন বলে ওরা?

সে গভীর মুখ করে জবাব দিল—বোধ হয় তোমার দেখে বিদেশী মনে হয়, সেইজন্য।

তাই নাকি? তুমিও কি আমার শুণ্ডচর ভাব নাকি? এবার একটু হেসেই সে জবাব দিল—না।

আমি তো জাপানী! বলে নিজের বোকার মত কথা শুনে নিজেই হেসে ফেললাম।

এক দিন সকালে ছেলেদের সঙ্গে কাঠের গুড়ি টেনে টেনে জড়ো করছিলাম, এমন সময়ে এক অল্পবয়সী অফিসার তুর্কু চুঁক আমের দিকে চেয়ে আত্মল নেড়ে আমার ডাকল—এই তোমার ডাক্তি: এদিকে এস।

তাড়াতাড়ি পা চাঙ্গিয়ে পাইন-বনের দিকে সে এগিয়ে চলল, আমি তার পেছন পেছন গেলাম—এদিকে তো ভয়ে, আতঙ্কে বুক টিপ টিপ করছে।

কারখানা থেকে সড় চেরা স্তূপাকার এক কাঠের গাদার বাহে

এসে সে আমার দিকে ফিরল, প্রতিদিন এত ভারি কাজ করতে নিশ্চয় খুব বঠি হয়। আজ শুধু এই চেরা কাঠি পাহারা দাও—কেনন? স্বকসকে ধাঁতের পাটি বেয় করে হাঙ্গল।

তার মানে এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?

এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা, গোলমাল নেই—কাঠের গাদার ওপর উঠে একটা ঘুম দাও। যদি একা—একা খায়াপ লাগে—এই বইখানা পড়ে দেখতে পার। এই বলে একখানা বই পকেট থেকে বের করে সঙ্গেহাতে তক্তার ওপর ছুঁড়ে দিল। বই এমন কিছু নয় তবে পড়া বার।

বই-এর নাম ছিল ‘টাইকা’, আমি তুলে নিলাম। অনেক বস্তাবাদ, আমাদের বাড়ীতে একজন আছে, খুব বই পড়তে ভালবাসে, এখন অবস্থা সে দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে।

সে আমার কথা ধরতে পারেনি,—তোমার খামি? দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে? কী কাণ্ড! সমবেদনার মাথা নেড়ে বলল—বাই হোক, আজ ভূমি পাহারা দাও, খাবার সময়ে আমি নিজে গিয়ে তোমার ভাগ নিয়ে আসব। এখন তোমার কিছু ভাবতে হবে না, চুপ করে বিশ্রাম কর। এই করেকটা কথা বলে হন-হন করে চলে গেল।

গাধার ওপর বঁসে প্রায় আধখানা বই পড়া হয়েছে, এমন সময়ে মচমচ জুতোর শব্দে ব্রহ্মা অফিসার আসছে। তোমার খাবার। একা-একা খুব খায়াপ লাগছে না তো? খাবার বাস্কাটা রেখে দিয়ে আবার হন-হন করে চলে গেল।

খাওয়া শেষ করে কাঠের ত্তপের ওপর লম্বা হ’লাম। বই শেষ করে ভূমিয়ে পড়লাম। বেলা তিনটার সময় ঘুম ভাঙতেই মনে হ’ল, হেলোটিক আগে দেখছি—কিছু কোথায় কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। ওপর থেকে নেমে সবে চুলটা গুছিয়ে নিছি—আবার সেই মচমচ শব্দ কানে এল।

আজ এখানে আসার জন্য অনেক বস্তাবাদ। ইচ্ছে হ’লে এবার বাড়ী বেতে পার।

আমি দৌড়ে গিয়ে বইখানা বাড়িয়ে দিলাম, বস্তাবাদ জানাবার জন্য মনটা আকুল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও কিছুই বলতে পারলাম না। চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, তার চোখে চোখ পড়তে, আমার চোখ জলে ভরে এল—তার চোখও শুকনো ছিল না।

নিশ্চয় ঐ ভাবে আমরা বিদায় নিলাম। এর পর আমার কাজের জায়গার ওকে আর কখনও দেখিনি। সেই একটিমাত্র দিন আমি ছুটি পেয়েছিলাম, তারপর থেকে আবার একদিন অন্তর তাত্কাওয়ার গিয়ে নিজের ভাগের কটিন পরিশ্রম সেরে আসতাম। আমার স্বাস্থ্য সবক্ষে মায়ের হৃদিত্তার অন্ত রইল না। কিন্তু আসলে কটিন পরিশ্রমে আমার শরীর আগের চেয়ে অনেক শক্ত হ’ল এবং আজ অবধি মাঠে, ময়দানে শারীরিক পরিশ্রম আমার কাব করতে পারে না।

যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে বা শুনতে আমার অসহ্য লাগে, একটু আগে সেই কথাই বলেছিলাম—এখন দেখছি আমার জীবনের ‘অমূল্য অভিজ্ঞতা’র কথা সহই বলা হয়ে গেছে।

কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতির মধ্যে এই ঘটনাদুটু বলতে আমার ভাল লাগে। বাহবাধী সবটা সেই কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ :—

গত বৎসর কিছুই হয়নি,

তার আগের বৎসর কিছুই হয়নি,

এক তারও আগের বৎসর কিছুই হয়নি।

বললে বোকার মত শোনাবে—যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আমার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা হ’ল একজোড়া কাপড়ের জুতো। এই জুতোর কথায় প্রসঙ্গান্তরে চলে এলাম। যুদ্ধের অপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন এই জুতো পরে মাঠে ময়দানে ঘুরে ঘুরে মনের উল্লেগ ও স্বপ্নের পতী অনাতি ফুল থাকতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু মা আমার দিন দিনা রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

সাপের ডিম।

আগুন।

মায়ের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভয়াবহ রকম খায়াপ হয়ে চলেছে, এদিনে উঠে আমি আবার দিন দিন নিয়ন্ত্রণের মেরুদের মত খটখট শব্দ হয়ে উঠছি। মায়ের জীবনীশক্তি শোষণ করে মোটা হচ্ছে। খায়াপা বহুমূল্য হয়েছে।

জালানি কাঠ জলে বাওয়ার হাশুকর মন্তব্য ভাড়া এ পর্বা আগুনের ব্যাপার নিয়ে মা আর একটা কথাও বলেন নি। আমাকে তিরস্কার করা ঘরে থাক, করণাই করে চলেছেন। কিন্তু তার মনে এই বাক্য আমার চেতন গুলন বেশী বেজোছে। অগ্নিকাণ্ডের পক্ষে মা ঘুমের মধ্যে আর্জনাৎ করে ওঠেন, যেদিন বাতাসে জো থাকে, সেদিন মত রাতেই হোক, বার বার বিছানা থেকে উঠে এসব ঠিক আছে কিনা দেখে যান। কোন সময়ে তাঁকে সুস্থ দেখা না। কোন কোন দিন মনে হয় তাঁর মনে ঠাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে মাঠের কাজ আমার সাহায্য করার কথা বলেছিলেন, জানিবেব কথা সত্ত্বেও কুহো থেকে জল এনে দিলেন। পরদিন পি। এড অসহ্য বস্তাবাদ হ’ল যে নিখোঁস নিতে পর্বাণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। তারপর শারীরিক পরিশ্রমের খেয়াল তিনি ছেড়ে দিলেন। থেকে থেকে মাঠে নেমে এসে দেখে যেতেন আমি কি করছি।

আজ আমার কাজ দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন—লোকে বা গ্রীষ্মের ফুল বারা ভালবাসে তাদের সুত্বাও ভাল গ্রীষ্মকাল—জানা কথাটার কত দূর সত্যি!

আমি কলের চারবার জল দিছিলাম, কোন উত্তর দিলাম না সবে গরম পড়ছে। যুদ্ধকর্ত্তে মা আবার বললেন,—হিবিবাস আমি অত্যন্ত প্রিয় ফুল, আমাদের বাগানে একটাও দেখি না।

ইচ্ছা করে নীরস কঠেই জবাব দিলাম, বাগানভরা গুলিয়েও আছে।

ও ফুল আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। গ্রীষ্মের প্রায় সব ফুল আমার ভাল লাগে, কিন্তু গুলিয়েস্তার বড় বেশী রঙাও।

গোলাপ আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কিন্তু সে ফুল তো সা বহুরই কোটে। কে জানে গোলাপ বাদে প্রিয় তারা হয়ত বহু বার চারেক হয়ে।

হ’ জন্মেই হোসে উঠলার। হাসতে হাসতেই মা জিজ্ঞাস করলে তুমি একটু বিশ্রাম করবে না? তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

কোন কথা? তোমার সুত্বার খবর হ’লে শুনতে চাই না।

মতরফুলের মাচার নীচে থেকে গিয়ে দু' জনে বললাম। ফুলগুলো প্রায় শেষ হয়ে এল, বিকেলের বোর পাতার ছাঁকনি দিয়ে মোলায়েম হয়ে এসে আমাদের কোলে জামা-কাপড় সবুজ বাগিয়ে দিল।

অনেক দিন থেকে তোমার একটা কথা বলি-বলি করছি, কেবল দু' জনেই মন কখন হাফা পাব তারই অপেক্ষা ছিলাম। বুঝতেই পারছি চট করে এসব কথা বলা যায় না কিন্তু আজ কেমন মনে হচ্ছে এখন হয়ত বলা চলে। শেষ পর্যন্ত বৈধা ধরে কথাটা শোন,—নাওজি বেঁচে আছে।

আমার সারা শরীর পাখর হয়ে গেল।

পাঁচ-ছয় দিন আগে তোমার ওরাদা আমার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে ওর কোন কর্তব্যচ্যবী দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর থেকে ফিরেছে। সে তোমার বাবার অঙ্গিনে দেখা করতে এসেছিল, হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে পড়ে লোকটি নাওজির সঙ্গে একই ইউনিটে কাজ করত। নাওজি ভাল আছে, শীগগিরই ফিরবে। একটা মস্ত খবর তার কাছে পাওয়া গেছে। লোকটি বলছে নাওজি দারুণ আফিমখোর হয়েছে।

আবার ?

আমি তেতো বাওয়ার মত মুখ বঁকালাম। হাইস্কুল থাকতে নাওজি কোন এক ঔপত্যাসিককে নকল করে নেশা আরম্ভ করে। শেষ অবধি ডাক্তারখানায় এমন একটা মস্ত বড় দেনা করে বসে যা মাকে দু' বছর ধরে শোধ করতে হয়।

হ্যাঁ, আবার নেশা করছে বোঝা গেল। কিন্তু সেই লোকটি বলছে যে এখানে আসার আগেই নেশা তাকে ছাড়তে হবে, নইলে দেশে আসা তার বন্ধ। তোমার মামা বলছেন যে ভাল হয়ে ফিরলেও তার যে মনের অবস্থা ভাঙে এখনি কোন চাকরি হওয়া সম্ভব নয়। আজকের দিনে টোপিকও সহরে সুস্থ মানুষ কাজ করতে এসে বিগড়ে যায়। আর তার মত ছেলে—আধপাঙ্গলা ছেলে, সব নেশা কাটিয়ে উঠেছে, ও তা হ'লে দিনেই বড় উদ্ভাদ হয়ে উঠবে। সে কি করে কি না করে, কিছুই বোঝা যায় না। নাওজি কিবে এলে কোথাও যেতে না দিয়ে আমাদের এই পাহাড়ী জায়গার ধরে রাখাই ভাল। এই গেল এক নম্বর।

আরও একটা কথা, তোমার মামা লিখেছেন যে, আমাদের সব টাকা ফুরিয়েছে, যেখানে বা পুঁজিপাটা ছিল, সবই প্রায় ফুরিয়েছে, আগের মত টাকা পাঠানো আর সম্ভব নয়। নাওজি এলে আমাদের তিন জনের মত খরচ পাঠানো তার পক্ষে অসম্ভব। তার প্রশ্রাব হ'ল এই যে, বখাশীরা সম্ভব হয় তোমার পাজি করা, নয় কাকর বাড়ীতে কোন কাজ জোগাড় করে দেওয়া উচিত।

কি-গিরি ?

না, তোমার মামা আমাদের দু' সম্পর্কের জমিদার আন্ডারের কথা লিখেছেন—তার বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনা করতে পার। তাতে তোমার খুব মন ঘাষণা বা সন্ধ্যা হবে না।

আর কোন কাজ করা যায় না ?

তোমার মামার মত, আর যে কোন কাজ তোমার পক্ষে অসম্ভবজনক হবে।

অসম্ভব কিদের ?

স্নান হেসে যা চূপ করই বইলেন।

আমি এলোপাথাড়ি চোঁটে উঠলাম—না, এ ধরনের কথা আমি অনেক শুনেছি। বুঝতে পারছি আমার পক্ষে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই—এর জন্য পরে অনুতাপ করতে হবে, তবু নিজেকে ধামাতে পারলাম না—আমার পায়ের দিকে চেয়ে দেখ, এই বিলী কাপড়ের জুতার দিকে তাকাও। আমার দুচোখ যেসে কান্না বরে পড়ছে, হাত দিয়ে বুছে নিয়ে সোজা মায়ের বুকের দিকে তাকিয়ে বইলাম, আমার ভেতর থেকে কে যেন বাঁলে উঠল,—কখনও না, একাজ আর কখনও করব না।

কিন্তু বা বলতে চাইছি, তার সঙ্গে এ কথাগুলোর কোন বোগা নেই, কাজেই আমার অবচেতন মনের অন্তস্তল থেকে টেঁচিয়ে উঠলাম, তুমিই একদিন বলেছিলে যে, আমার জন্য, শুধু আমার জন্যই তুমিই ইচ্ছুক এসেছ ? তুমি বলেছিলে আমি না থাকলে তুমি মৃত্যু বরণ করত। শুধু সেই ভয় আমি তোমার পাশ ছেড়ে এক পাও নড়িনি। আর আজ আমার পায়ে কাপড়ের জুতা, কারণ তুমি যেসব তরকারি খেতে ভালবাস, আমি কেবল সেই সব ফল ফলাবার কথাই চিন্তা করছি। আজ হঠাৎ বেই শুনলে তোমার নাওজি আসছে—অমনি আমি তোমাদের স্নেহের পথে কাঁটা হয়ে গেলাম। তুমি কি করে উদ্ধারণ করতে পারলে—বাও কি-গিরি করগে বাও ? অসম্ভব, এ সহ করা অসম্ভব ! নিজের কানেই কথাগুলো যৎপরোনাস্তি কটু শোনাল, কিন্তু কোথায় যেন তার বাস বেঁধেছিল, অজান্তে বেরিয়ে এল, ধামাতে পারলাম না।

অবস্থা বখন পড়ে গেছে, তখন আমাদের দামী দামী জামা-কাপড়গুলো বেচে দাও না ! বাড়ীটাই বা বেচব না কেন ? আমি যা হোক কিছু তো করতে পারি। গ্রামের আফিস চাকরী করতে পারি, মুটেগিরি করতে পারি। দারিদ্র্য এমন একটা কি বাপার ? বতরুণ তোমার ভালবাসা আছে, ততক্ষণ তোমার পাশে জীবন কাটিয়ে বাওয়াই তো আমার একমাত্র বাসনা। কিন্তু তুমি তো নাওজিকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাস। আমি চলেই যাব ; নাওজির সঙ্গে আমার কোন দিন বনবে না, মায় থেকে তিনজনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আমরা দু'জন একদিন একসঙ্গে আছি, তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধন তার মধ্যে ডেজাল নেই। এখন তুমি আর নাওজি, শুধু তোমরা দু'জনে থাক। আশা করি, তোমার জন্য অন্তত সে তার চরিত্র সশোধন করবে। আমার আর সহ হয় না, আমি চলে যাব। আমি আজই একুশি চলে যাব। যাবার জায়গার অভাব হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

কাজুকে ! কঠোর স্বরে মা ভাকলেন। তাঁর বুকে এতখানি ব্যক্তিহ এর আগে কখনও দেখবার অবকাশ হয়নি। বুখোয়ুধি দাঁড়াতে আমার চেয়ে মাথায় যেন উঁচুই দেখাল।

কমা চাইবার ইচ্ছেয় বুক কাটতে লাগল কিন্তু মুখ ফুটল না। বরং উন্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বললাম, তুমি আমার ঠকিয়েছ মা, তুমি আমার ঠকিয়েছ। নাওজি বত দিন আসেনি, তত দিন তোমার আমার প্রয়োজন ছিল। আমি তোমার দাসদাস ছিলাম। এখন বখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আমার দূর করে দিলে।

দু'পিরে উঠে আমি পরম্পরকে কান্নায় জেগে পড়লাম।

তুমি অত্যন্ত নির্দোষ—রাগে, উত্তেজনায় মায়ের স্বর কঁপে উঠল। আমি মাথা তুলে চাইলাম।

হ্যাঁ, আমি তো বোকাই। আমার বোকা পেয়ে সবাই ঠকিয়ে নেয়। আমি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, না? দ্বিভাষাই বা কি, বাচ্চুলাই বা কি? আমি ওসব বুঝি না। তিরদিন আমার মায়ের স্নেহটুকুই একমাত্র ভরসা, সেইটুকুই আমার জোর।

আবার আমি এমন নিকোঁষের মত কথা বললাম তার কোন মানে হয় না। মা হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন—চোখে জল। আমার ঠোঁট হঠাৎ গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাই, কিন্তু মাঠের কাছে হাতে ময়লা ছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপ্রস্তুত হয়ে দূরে সরে রইলাম। আমি এখান থেকে দূরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বাবই, আমার বাবার জাবগা আছে।

এই কথা বলতে বলতে কলহের গিয়ে কীদতে কীদতে হাত-মুখ ধুলাম। ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়ে আর এক দফা কঁপে নিলাম। সারা শরীরে বত কাগ্না ভরে আছে সবটুকু উজাড় করে দিতে ঠোঁট হল। দোস্তলার বিদেশী পাটটারের ঘরে ঢুকে বিছানার উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা পর্যন্ত কবল মুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে কীদতে লাগলাম। তারপর আমার মন যন্ত্রস্ত হয়ে বেড়াতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ঘুমেঘর ভেতর দিয়ে একটি বিশেষ মানুষের রক্ত মন আমার পড়তে লাগল, তার মুখখানা একবার দেখতে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ভক্তার বধন পাথের নীচের চামড়া লোহা দিয়ে শোড়তে বলেন, তখন যেমন পা এতটুকু না কুঁচকে রাখা সইতে হয়, আমার কেমন যেম তেমনি একটা আশ্চর্য্য অমুড়তি হল। সন্ধ্যাবেলা নিশেদে ঘরে ঢুকে মা আলোটা জ্বলে দিলেন। বিছানার কাছে এসে খুব মিষ্টি করে আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি বিছানার ওপর উঠে বসে ছই হাত দিয়ে ঘুমেঘর ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলাম। তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গেল ফেললাম।

মুহূর্ত্তে সে মা জানালার পাশে একটা সোফায় বসে পড়লেন। জীবনে এই প্রথম তোমার আমার কথার অন্তর্ধা করে এলাম। তার চিঠির উত্তর আমি লিখলাম, আমার সন্তানদের তার আমার ওপরেই সে যেন ছেড়ে দেয়। কাজুকা, আমরা আমাদের সব দামী পোষাক বেচে ফেলব। একটা একটা করে ভাল-জামা সব বিক্রি করে আমাদের যেমন খুশি তেমনি খরচ করব। অদরকারী যা ঠোঁট তাই কিনব। বেশী বেশী খরচ করব আমরা। তোমায় আর মাঠে কাজ করতে দেব না। হোক না তরকারীর দাম চড়া, তবু আমরা কিনেই খাব। রোজ তুমি চাবার মত ঝাঁটবে, এরকম আশা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সত্যি বলতে কি প্রতিদিন মাঠে খেটে খেটে ইদানীং আমার শরীর ধারণা হয়ে আসছিল। আমার দুটো বিধাস, এই জন্তই আমি এত সামান্য কারণে এমন একটা কুসংস্কার কাণ্ড করে বললাম। তখন আমার মাথার স্থিতি ছিল না, তার সঙ্গে শারীরিক চরম সাদৃশ্য আর আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, সব মিলিয়ে আজ-কাল আমি সব কিছুকেই বুগা করতে, প্রতিবাদ করতে শিখেছি। চোখ ফিরিয়ে আমি বিছানার ওপর বসে রইলাম। কাজুকা! বল।

তুমি যে তখন বললে, কোথায় যেন তোমার বাবার জায়গা আছে?

টেব পেলাম আমার বাড়ি অবধি লজ্জার লাগ হয়ে উঠেছে।

মিষ্টার হোসাডা?

আমি এর কোন জবাব দিলাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম বললেন—বহু কাল আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল—শুনবে?

বল। কি-কিস করে জবাব দিলাম।

নিশিকান্তা ট্রিটের বাড়িতে বধন তুমি স্বামী ভাগ করে ফিৎ এলে, তখন আমি তোমার একটা কথাও বলিনি। কারণ তার কয়েক সন্তান ছিল, চিত্রকর হোসাডার সঙ্গে তোমার পতীর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কথা শুনে যৎপরোনাস্তি আঘাত পেয়েছিলাম মিষ্টার হোসাডা বিবাহিত পুরুষ, সন্তানের পিতা। আমি জানতাম তোমার দিক থেকে বত ভালবাসাই থাকে না কেন, এ প্রেম ব্য হতে বাধ্য। প্রেম? কি অজ্ঞার কথা! এ আমার স্বামীর মিশে সন্দেহ ছাড়া কিছুই নয়।

বোধ হয় তাই। আমার ধারণা ছিল আজ অবধি মিষ্টার হোসাডার কথা তোমার মন থেকে মুছে যায়নি। তবে তুমি কোথা বাবার কথা বলছিলে? মিষ্টার হোসাডা নয়।

সত্যি? তবে কোথায়?

মা, সম্ভ্রুতি আমি এমন এক পথ আবিষ্কার করেছি, যেখানে মাহ অজ্ঞাত প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জানি, মাহুয়ের ভাষা, ভাব ধর্মবুদ্ধি, সামাজিক ব্যবস্থা সব আছে, কিন্তু এ সমস্তই কি অল্পবিস্তৃত পরিমাণে জীবজগতের সর্বত্রই বর্তমান নয়? বোধ হয় জগৎয়ে ধর্মবুদ্ধিও আছে। মাহুয়ের গর্ভে সে বিশ্বজগতের অধিকর্তা, কি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত পশু-পক্ষ সঙ্গ তার বিশেষ প্রভেদ নেই। কি মা, আমি এক উপায় চিন্তা করেছি, হয়ত তুমি বুঝবে না। এ মাহুয়া জাতিতেই বর্তায়। সে হ'ল গোপন করার ক্রমভা। এব বুঝলে তো, আমি কি বলতে চাই? অপ্রস্তুত হয়ে মা মু হাসলেন—তোমার গোপন কথা যদি মঙ্গল করে আমে, তবে তে অধিক কামা আমার কিছুই নেই। প্রতিদিন সকালে জা তোমার বাবার আত্মার কাছে প্রার্থনা করি—তুমি স্বামী হও।

হঠাৎ মনে পড়ল, বাবার সঙ্গে 'নাসুনো' (Nasuno)-র গা করে বেড়াতে বেরিয়ে পথে এক জায়গায় নেমেছিলাম। শরৎে মাঠ-ঘাট কি অপূর্ণই না লেগেছিল সেদিন। এ্যাটর, শিং জেনসিয়ান, ডেলেরিয়ান শরতের সব ফুলে ফুলে চারিদিকে শোভাই না হয়েছিল। বুনা আঙুরে তখনও রং ধরেনি।

পরে বাবা আর আমি 'বিওয়া' (Biwa) হ্রদে মোটর-বো নিয়ে বেড়ালাম, আমি জলে কাঁপ দিলাম। জলের মধ্যে আগাছা যে-সব ছোট ছোট মাছদের বাসা, তারা আমার পায়ে পায়ে ধার খেল, আর কাকচক্ষু জলের তলে আমার পা ছ'বারের ছায়া কে ফেলে সাতারে বেড়ালাম। মায়ের আর আমার বর্তমান আলোচন সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, কিন্তু হঠাৎই কেমন ছবির মত সবট মনের মধ্যে তেলে উঠেই মিলিয়ে গেল! আমি বিছানা ছেড়ে উ এসে মায়ের হাঁটু ছুঁতে জড়িয়ে ধরে বললাম—মা শো, আমার ক করো, শেব পর্যন্ত ঐটুকুই আমার মুখ দিয়ে বেরুগা।

আজ মনে পড়ে, সেদিন পর্যন্ত আমাদের নিরন্তর আনন্দ দিনগুলির শিখা তখনও পুড়ে শেষ হয়নি। নাওজি দক্ষিণ প্রাশ সাগর থেকে কোয়ার পর আমাদের নরকবাস শুরু হ'ল। [ক্রমশঃ

অনুবাদ : কল্পনা রায়

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ত্রিশ

পূজব এ পর্বত আইরিনের ঘরে একদিনও যায় নি। পূজব
যেতে যেতে ভাবে : নাতাশা! যে ওকে আইরিনের ঘরে একা
যেতে মানা করেছিল, আইরিন কার কাছে গুনল? নিশ্চয় কাতিয়া
কি শাশুর কাছে। ওর ভাবির হৃৎক হয় নাতাশার কথা ভেবে।

আইরিনের ঘরটি নিচের তলায়—এক কোণে। একটা
করিডোর দিয়ে যেতে হয়—পর পর চার-পাঁচটি ঘর পেরিয়ে।
আইরিনের ঘরের সামনেই লম্বা ওর নাম। দোরে ঘটার বোতাম
টিপতেই দোর খুলে গেল, কিন্তু দারী কই?

ও একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরে ঢুকল। কী ব্যাপার? কেউ
কোথাও নেই। কী হৃদয়ের ঘর। এক কোণে একটি কটেক
পিরানো। তার উপরে ফুলদানীতে গতকাল ওরই দেওয়া গোলাপ
ফুল। পিরানোর পাশে একটি টিপরে রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো পল্লবের
ছবি। তার সামনে একটি ওরই উপহৃত মোরাদাবাদী ধূপলানীতে
হুটি ধূপ জ্বলছে। আর এক কোণে একটি বিছানা। আর এক
কোণে একটি সোফা নীলরঙের। তার পাশেও একটি 'জাপানী
ফুলদানীতে সাধা লিলি। আর এক কোণে একটি পরিপাটি ডেস্ক।
টেবল্‌ আয়না ও টুল। ঠিক হারখানে একটি চমৎকার টেবিল।
ছবির মতন ঘরটি—চুকলেই শুধু চোখ জুড়িয়ে বাওয়া। নয়, মনও
ভূতান্তে ভরে ওঠে। গৃহের প্রত্যেকটি আসবাব শুধু যে বহুযত্নে
নির্বাচিত তাই নয়, প্রত্যেকেই যেন গৃহিণীর কঠির সাক্ষ্য দিচ্ছে
যেঁনি আত্মগোপনে।

পল্লব খানিক পরে বাড়ি কোঠেই রূপালী হাসির বান ডাকিয়ে
হুটি হাত পিছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। পল্লব ফিরে
হেসে ওকে বাহুবন্ধনে বন্দী করে বলে : এমন করে বৃষ্টি ভর
দেখায়?

আইরিন সাভিমানে বলে : আদরের মানে বৃষ্টি ভর দেখানো?
বেশ! আর দেখাব না। ছাড়ো।

পল্লব হেসে বলে : আমাদের শান্ত্রে বলে—বুড়ের মধ্যে ঢোকা
সোজা, কিন্তু রেকনো ভার।

আইরিন না হেসে বলে : আর আমাদের দেশে বলে—যে পাখী
ধরা দিতে চায় না তাকে খাঁচার লোভ দেখানো বুধা।

ভুল। অনীয় চিরদিনই মাথা কুটছেন সীমার খাঁচা মধ্যে ঠাই
পেতে। প্রমাণ—সুই।

আর যে চায় অনাসুই?

তার নাম অঙ্গেল : আমাদের ভাষায়—মোহিনী, রোমিওর
ভাষায়—ইনকানট্রিচে।*

আইরিন রাগ করে ঠোট ফোলায় : বা—ও!

পল্লব ওর ওঠে চুপন করে বলে : অমন করে লোভ দেখালে বাই

কী করে বলে? রক্ত-মাসের শরীর তো! বলেই খেমে:
আমাদের দেশের এক গ্রাম্য কবি গেয়েছেন—বলে গুন-গুন করে :

আমি যে বেসেছি ভালো আমারি কি দোষ?

ঠাকুরাণী। ঠেকাইরা বুধা করে যোব।

বলে মানোটা বৃষ্টিয়ে দেয় করাসি ভাষায়।

আইরিন হেসে ওকে প্রতীচুপন করে বলে : আচ্ছা, এ বাত্ৰা
কমা করলাম—কিন্তু আর অমন কোরো না, সাবধান!

কেমন?

পরের কথাই কান দিয়ে আমাকে দূরে সরানোর চেষ্টা—আর
কেমন?

আমি বৃষ্টি তাই করি?

করো না তো কী? আমি বৃষ্টি টের পাই না ভাবো?

বুধা?

বোসো, বলছি। ওরা পাশাপাশি সোফায় বসে। আইরিন
বলে : দুহুত এইমাত্র টেলিফোন করেছিল আমাকে।

দুহুত? হঠাৎ?

বলল : তুমি তার সঙ্গে দিন কয়েকের জন্তে রোম যেতে রাজি
হয়েছ, আমি যেন বাধা না দিই—এই তার মিনতি। বলে একটু
চুপ করে থেকে : কী? কথা কইছ না যে? আর একটা অছিল
খুঁজছ বৃষ্টি?

অছিল? কিসের?

আর কিসের? আমাকে ছেড়ে কোথাও বাবার—আমাদের
প্রেমকে বাচাই করতে। বলে তো—কাল সকালে কেউ দেখনি
তোমাকে এ-উপদেশে?

তুমি জানলে কী করে?

তুমি ক্রাউফ্রামারের ওখান থেকে চলে বাওয়ার পরেই আমি
বাই তার কাছে পড়তে। তখন তোমার সঙ্গে তাঁর কী কী কথা
হয়েছিল বলেছিলেন আমাকে। বলেই রাগ করে : বাও তুমি—
যেখানে তোমার প্রাণ চায়।

পল্লব ওর কটি ঝেঁন করে বলে : ভালোই হ'ল—কথাটা তুমিই
ভুললে। কিন্তু শোনো বলি। আমার এক বন্ধু—বার কথা
তোমাকে বলেছিলেন মনে আছে? যে রিতা বলে একটি ফরানী
মেরেকে বিয়ে করেছে?

আছে। নাম মোহনলাল না?

সেই। ওরা আসছে রোমে—আজই সকালে তার চিঠি
পেলায়। রিতার শরীর ভালো নয়। তাই ভাবছিলাম—যদি তুমি
অল্পমতি বাও তবে দিন কয়েকের জন্তে রোম দূরে আসি।

আইরিন ওর চোখের দিকে সোজা চেয়ে বলে : অছিলটা খুঁজ
পেয়েছ ভালো—মানছি।

অছিল! যোটেই নয়।

আইরিন ঝর-ঝর করে কঁদে ফেলে : পল! শেষে তুমিও?
...না, ছেড়ে দাও আমাকে। বাও—বাও যেখানে যেতে চাও।

কেবল—নিজেকে সামলে নিয়ে অজ্ঞকৃত্য কর্তে : কেবল এ-নিথো
অজুহাতের কী দরকার ছিল? না, তোমার কোনো কথা গুনব না।

আসল কথা—তুমি সময় চাইছ—না থাক, দেয় হয়েছে। যে
ভালোবেসেও ভেবে অস্থির—এ প্রেম, না মোহ...আমাকে না বলে
আগে রোম বাওয়া ঠিক করে পরে ছটা করে অল্পমতি চাইতে আসে—

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য না মনে এক পাঁচাল হুজির উপস্থিতি করে।
দ্বিতীয়—তার পক্ষে কী না সম্ভব? বাও তুমি যোম—কিছা
আর কোথাও গিয়ে চুপটি করে বসে দেখতে থাক একটি বৎসর—
আমার প্রেমের জোয়ারে ভাটা আসে কি না।

পল্লবের মন কোমলতার ছেয়ে বার। ওকে আলিঙ্গন করে
বলে : এমন কথা বলতে নেই, আইরিন। আমি নিজের মনকে
অবিশ্বাস করলেও করতে পারি—কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমার
কাছে ষড়ংগিছ। না, শোনো লক্ষ্মীটি! আমার সত্যিই কিছু বলার
আছে। কিন্তু তুমি এমন অবীর হলে কী করে বলব বা বলতে
চাই? আমি তোমার কাছে আজ এসেছি প্রাণী হয়ে—বিবাস
করো।

আইরিন কমালে চোখ দুহুে বলে : প্রাণী? কিসের?

বলব।

বল?

হ্যাঁ বল। তবে যদি শুনতে না চাও, বলব না। হাব না
ফোপাও।

আইরিন আশ্চর্যের বলল : বলা, আমি শুনব অবীর না
হবে—কথা দিচ্ছি। না, এখন আর চুপ করে গেলে চলবে না,
বলতেই হবে।

পল্লব ওর হাত দুটি গালে ঠেকিয়ে বলে : শোনো আইরিন।
আমি বা বলতে এসেছি বলতে বাধে—কেন না এ ধরনের কথা বলব
ভাববার সময় এক বকম মনে হয়—কিন্তু বলতে বাবার সময় কেন
কুঠা আসে—মনে হয় যেন ছোটবেলায় কখনো। ভাব চোঁটা করব
সহজ ভাবে বলতে—না ফেনিয়ে—বলি—

হয়েছে, হয়েছে, বলা—আমি কথা দিচ্ছি—শান্ত হয়েই শুনব।

পল্লব ওর হাত দুটি নিজের দুহাতে মথোঁঠোনে নিয়ে বলে চলে :
আমাদের দেশে বলে—নারী পুরুষের শক্তি। এদেশে এসে দেখি,
নারী পুরুষের চিত্তবঞ্জিনী, সংসার-সঙ্গিনী। কিন্তু আমরা তাকে
দেখি আরো বড় করে, বলি—সহধর্মী। কুসুম বলে এ যুগের
পুরুষ—বিশেষ আমাদের মতন পরাধীন দেশের পুরুষ—তার কাছে
আরো কিছু দাবি করে, চায়—সে হবে সহধর্মিনী—মানে দেশের
সেবার সহায়, প্রেরণা—এক কথায় বললারী।

কুসুম? তোমার সেই দেশভক্ত বন্ধু?

বন্ধুর চেয়ে অনেক বড়। তাকে কী উপাধি দেব জানি না।
তুমি বলতে পারি—তার কাছে আমি গভীর ভাবে স্বামী। তার ভক্তি
করতেও আমার ভয় হয় পাছে ছোট করে ফেলি। ওর বশবর্তী
হয়ে আসে : যৌবনেই যে বড় চাকরি ছেড়ে বৈদ্যের দেশের জন্তে,
হৃৎকণ্ঠে জন্তে করল দুঃখবরণ—যে বিলাসের কোলে মাহু হতে ও ব্রত
নিপ পরাধীনতার—এই কাজই বন্ধুর মধ্যেই হু বৎসর কাটিলো
জেনে—কেল থেকে সেবে ছাড়া পোহে ছাড়াভুলের দরশন—তবু ভরকে
যে ভয় করে না—কে জানে হয়ত কের জেনে বাবে হু-চায়কিনের
মধ্যে—

জেনে? মানে সে বিপ্লবী?

তাই। শোনো। কাল রাতে তার এক চিঠি পেয়েছি, তাতে
সে আমাকে লিখেছে যে, আমার কাছে বেশ অনেক কিছু চায়, আমাকে
গান গেয়ে দেশকে জাগাতে মাতাতে হবে। আরো লিখেছে, যে

কথা বললাম এইমাত্র, যে আমাদের প্রত্যেকের সহধর্মীকে হতে হা
সহধর্মিনী... এই সব বলে দুই নামিয়ে নিয়ে : ওকে আমি লি
খিতে চাই—বলি তুমি অল্পমতি লভ—যে তোমাকে সব কথা বা
খাজি কমিয়েছি—তুমি হবে আমার সহধর্মী তথা সহধর্মিনী
এত বড় ভাবে দেবে না তুমি সাজা?

আইরিন দুহাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, পরে
তুলে শান্তকণ্ঠে বলল : তুমি তোমার কথা বললে ঢাকাঢাকি
করে। না পল, তোমার আশ্চর্যকথাকে অবিশ্বাস করবার ক
আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু যে প্রশ্ন তুমি করছে খোলাখু
—তার উত্তরে আমারও যা বা মনে হয় বলব খোলাখু—কিন্তু
ঢেকে। তারপরে তুমি বা বলবে—করব। কেবল একটা কথা
আমি বা নই আমাকে তাই তেবো না ভাবতে ভালো লাগে বলে
যাক শোনো বলি।

বলে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আইরিন বলে চলে : সব আ
একটা কথা তোমাকে আমার বলতেই হবে—তুমি মনে আর
পেলে কথা কোরো আমাকে নিঃস্বপ্ন বল—কথাটা এই যে আ
বর্তাবে দেশভক্ত নই। দেশভক্তির নাম এত মিষ্ট রস, শো
হীনতা, মিথ্যাচারের জয়কলি শুনে এসেছি ছেলেবেলা থেকেই... বি
দে অল্প কথা। আমার বলবার কথা এই যে, আমার চোখে
নেই বলব না, কিন্তু সে স্বপ্ন দেশের সেবা নয়। আবারো আ
চেরেছি—শিল্পীর জীবন বরণ করতে, গানে সৃষ্টি করতে। মাতা
উঠতে বসতে বলে—মেয়েরা গানে সৃষ্টি করতে পারে না, আমি
একথা অশ্রমণ করতে। এখানে পারার কথা হচ্ছে না কিন্তু, আ
বলছি আমার দুঃখনার কথা—দুঃখনা বলছি এই ভগ্নে যে, হা
পারব না বা হতে আমার প্রাণ চায়। কিন্তু সে যাক, এবার তোম
কথার আসি।

তোমাকে আমি কেন ভালোবাসলাম বলতে পারি না জোর ব
—তবে একথা বলতে পারি যে, তোমার বশবর্তী শুনে যখন আমি
হই তখন থেকে কেবলই চেরেছি—তুমি আমার সাক্ষী হও সহধর্ম
রূপে। না, সবটা বলা হল না। আমি ঐ সঙ্গে চেরেছি তোমার
আমার জীবনের সহযাত্রীরূপে, বৈদ্যের ব্যাধার ব্যাধীরূপে পথে
পাথেররূপে, আনন্দে নিত্যসাক্ষীরূপে। দেশ—ভগ্ন তোমার দেশ
আমার নিজের দেশও—আমার কাছে, অন্তত এখন পর্যন্ত, ভগ্ন
বলব। তোমার কাছে স্বদেশ জীবন্ত মা, আত্মার আত্মীয়, আ
করে বড় জোর ভূমিও—যে স্বপ্নর হলে চোখকে মুগ্ধ করে, জর
হলে—বিরক্ত। যুব অমন কোরো না লক্ষ্মীটি। নৈলে বা বলা
চাই বলব কেনম করে? আমাকেও একটু ব্যস্ত করে দাও।

করছি—কেবল একটা কথা : দেশকে নিত্যপা ভূমিও হা
আর কিছু মনে করা তোমাদের পক্ষে এক কঠিন কেন? ইংলণ্ডে
তো প্রকৃতিপূজা আছে তার প্রধান পুরোচিত গুরুত্বসংবর্ধ
Something far more deeply interfused.

জানি জানি। আমাদের দেশেও আছে। তুমি আছে ন
এমন প্রচণ্ডভাবে আছে আমাদের ভূমিকের * মধ্যে বারা দেশ
বেশ আকর্ষণকর পূজা করে। ভাঙ্গিন যেটির সামনে ধূপ

আলাদা, বস্তু-স্বভাব—এক কথার সব কিছুই যথার্থি যথেষ্ট বা খুঁট খুঁটানোর আবর্তন। উভয়েরই বস্তুই হলে হলে পাবে এই নেচা-ভাষিণী—আমাদের অনেক বিদ্যার মতোও সে-ভাষার হোঁচল লেগেছে। আমার দাদাটাই এক বস্তু ছিলেন এই জাতের বিদ্যার— তিনি পাহাড়-নদীর সামনে ঠার চেয়ে চেয়ে থাকতেন আর দু'গলে বেয়ে চোখের জল গাড়ির পড়ত—ইরাজিতে থাকে বলে ঠাণ্ড। কিন্তু আমার মনে সে ভাবের হোঁচল কোনোদিনই লাগেনি যে—কী করব বসো? তাই বলছিলাম—আমি বা নই আমাকে তাই বল করনা করে আমাকে তোমার হানসী প্রত্যাশা গাড় করিয়ে না, কেন না, করলে শেষে মনে যা পাবে। তোমাকে আমি আনন্দ দিতেই চাই পল, বাখা দিতে নয়।

পল্লব চূপ করে বসল মুখ নিচু করে। আইরিন ওর গালে গাল রেখে কোমলকণ্ঠে বলে: আমাকে কমা কোরো পল, কিন্তু আমি বা—পারি তার চেয়ে বেশি তো পারি না—উপায় কী? তাই তোমাকে শুধু বলতে চাই যে, আমি তোমার সহদেশিনী হতে পারব কি না ভাব করে বলতে পারি না এখন। কেবল সত্যের অপলাপ না করে এইটুকু বলতে পারি যে আমি চেষ্টা করতে চাইছি—আর সে শুধু এইজন্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, নৈলে তোমার মনের মতনটি হতে চাইবই ব কেন বসো? কিন্তু আমার নিজের কথা যদি বসো তবে আমাকে বলতেই হবে যে, আমার প্রাণের কামনা তোমার সহদেশিনী হওয়া নয়—আমি চাই তোমার সত্যমিথী হতে।

সহমিথী?

হ্যাঁ। সহমিথী কথাটা আমার কাছে এখনো—কী বলব? বড় জোর একটা স্মরণ কথা, রতিন ছবি, তার বেশি নয়। ও আমার মন টানে না কারণ ধর বলতে যে ঠিক কী বোঝায় আমি জানো জানি না। করনা দিয়ে তাকে বুঝতে যে চেষ্টা করিনি তা নয়। করেছি—হুঁহুহুহু। কিন্তু করনা তো বাস্তব নয়, উপলব্ধির কোঠার পড় না, কাজেই ধর আমার বৌতুলের উল্লেখ করলেও মন টানতে পারে নি—মস্তত আজ পর্যন্ত। আমার মনকে টানে—তোমার ব্যক্তিকরণ, অর্থাৎ তুমি বা হ'য়ে উঠেই তাই। এই তোমাকে—বাক্য আমার প্রেমের চোখে দেখছি, প্রেমের কানে শুনেছি, প্রেমের স্পর্শে চিনেছি—চাই আমি আজ আমার হৃদয়ের বেনীতে বসাতে: তোমার দেশ আমার কাছে অবাস্তব। আমাকে 'তুল বুঝো না—এটুকু অস্বাভাবিক করবার করনা শক্তি আমার কেন, তোমার বা তোমার আশ্রয় বস্তু বাছ দেশ একটা জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু আমি যদি কোনো দিন তোমাদের দেশকে সে ভাবে দেখতে পারি—যদিও জানি না শেষ পর্যন্ত পারব কি না—তবে দেশ-পারটা সম্ভব হবে শুধু তোমার জন্তে। অর্থাৎ তোমাদের দেশকে যদি পরে কোনো দিন ভালোবাসি—তো বাসব তুমি তুমি দেশকে ভালোবাসো বলে। আর আমার মনে হয়—এই-ই প্রতী প্রেমিকার মনের কথা। আদর্শবাদী পুরুষ আদর্শকে ভালোবাসে আদর্শের টানে, প্রিয়জনতা নারী সে-আদর্শকে বরণ করে শুধু বরণের টানে। তাই আমার মিনতি—তুমি আর বাই বসো না কেন একথা বোসো না যে, তুমি বা চাও আমাকে ঠিক তাই টাইতে হবে, তুমি যে-জন্তে চাইছ হৃদয় সেইজন্তে। যদি বসো

তবে বুঝব—আমাকে তুমি ভালোবাসো নি, তুমি চেয়েই নিজের ভাবশিলাদের ভোগনাশ কর। জানি না আমার মনের কথাটা পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পেরেছি কি না—তবে মনে হয় তুমি যদি একটু খোলা মন দিয়ে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো, তবে বুঝতে পারবেই পারবে কোথায় আমাকে বাধ্যছে। আইরিন অল্প গোপন করতে মুখ ফেরায়।

পল্লব ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একটু চূপ ক'রে থেকে বসল: আমি বোধ হয় বুঝছি তোমাকে—আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন খালি খালি লাগছে—ঐক্য বৃত্তে পাংছি না—কী বলব এর উত্তরে—শুধু এই কথা ছাড়া যে আমাকে একটু সময় দাও।

আইরিনের মুখ শাদা হ'য়ে গেল: সময়? কী জন্তে?

পল্লব একটু ইতস্তত ক'রে বসল: আমি নিজের মনের সঙ্গে একটু যুখোমুখি হ'তে চাই—একবারে একলা।

আইরিন সব বস ক'রে কেঁদে ফেলল।

পল্লব ওর মুখ বুকের মধ্যে টেনে বলল: তুমি চোখের জল ফেললে আমার কী হবে, কেমন ক'রে বোঝাবো আইরিন? বলছি—আমাকে শক্তি দিতে হবে তোমাকেই। তা ছাড়া আমাকেও তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো, সন্ধ্যাট। আমি... আমি... মানে, তুমি আজ বা বললে তার জন্তে—আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আইরিন জলজরা চোখে পল্লবের চোখের দিকে তাকিয়ে বসল: আর আমিই কি প্রস্তুত ছিলাম তুমি বা বললে তার জন্তে? আমি তোমাকে ভালোবাসি মনেও বললে কেমন ক'রে—সময় চাও নিজের মনের সঙ্গে যুখোমুখি হ'তে?

পল্লব কী বলবে ভেবে পায় না। আইরিন বলে: কিন্তু না, তোমাকে দোষ দেব না। হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ—জানি না। আমি এখন পরিষ্কার ক'রে ভাবতে পারছি না। বলে পল্লব নামিয়ে নিয়ে খেমে খেমে ফের বলে: হয়ত তুমিই ঠিক হয়ত একেই এ ছাড়া উপায় নেই, কারণ কিসের টানে যে আমরা চলি কেমন যোগাযোগে যে কে কী ভাবে গ'ড়ে ওঠে কেউ কি জানে? তাই তোমার কথাই থাক, তুমি বাও যেখানে যেতে চাও—এমন কি যদি সোজা দেশে ফিরলে তোমার পক্ষে নিজের মনের সঙ্গে একলা যুখোমুখি হওয়া সহজ হয় তবে তাই করো, আমি তোমার পিছুটান হ'য়ে থাকব না।

পল্লবের বুকের মধ্যে গল ক'রে ওঠে: তার মানে? বিদায়?

আইরিন গাড় কণ্ঠে বলে: ছিঃ, এমন কথা বলে? পল্লবের বেলার কী হয় কেমন ক'রে বলব? কিন্তু মনে হয় কি এক কথার বিদায় দিতে পারে পল? বলতে বলতে ওর চোখে ফের জল ডরে ওঠে: তুমি কী জানবে পল, তোমাকে আমি কোথায় বসিয়েছি? তা ছাড়া ওর কণ্ঠে ফুটে ওঠে 'উদাস সুর—তা ছাড়া জীকড়ে বরা আমাদের স্বভাব, তুমি কাছে থাকলে হয়ত তোমাকে আরো বেশি করে কাড়িয়ে ধর, কে বলতে পারে? বলে চোখ মুছে শান্ত কণ্ঠে বলে: আমাকে আমার 'দুর্ভাগ্যতার জন্তে কমা কোরো তুমি। বাবা মুক্তি চায়, প্রেম হয়ত 'তাকের বল দেয় কিন্তু বাবা বন্ধনের মধ্যেই আশ্রয়মগ্ন আ ক'রে পাবে মা তাকের প্রেম শক্তি দেয় না—বিজুই বলে।

পল্লব অধীর হ'য়ে ওর কণ্ঠে যেমন ক'রে বলে: আমি এ পারব

না। কুমুমক আজই গিবে দিচ্ছি যে এখন থেকে তোমাকে নিয়েই মোটা দেশে কিরব। আর আগ-পাছু করব না।

আইরিন জান শান্ত কর্তে বলে : সে হয় না পল। একবার যখন হুখ কুট সময় চেয়েছ—সময় তোমাকে নিচ্ছেই হবে। আমি বাই হই—তোমার দুর্বলতার কীক দিয়ে তোমার মনের দুর্গ দখল করব না, চোখের জল দিয়ে তোমাকে বাঁধব না। এমন কি, বুঝে গিয়ে যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও—তাও মেনে নেব—যদিও হু' দিন আগেও কেউ যদি আমাকে বলত আমার ভালবাসাকে বাগাই করবে, তা হ'লে তাকে বলতাম : বলবাদ! যতবাদ! তোমার নিজের পাশেই চলে। কিন্তু তোমাকে সে কথা বলার সাধ্য আমার নেই—তোমাকে যে ভালোবেসেছি আমার দেহ-মনের প্রতি ক্ষুণ্ণি দিয়ে। না, তোমাকে কথা-দিচ্ছি তুমি যা চাও তাই করব—জাতে বতাই কেন না বাধা বাজুক। বলে কের চোখ মুছে সোজা হ'রে ব'সে হুখে হাসি টেনে বলে : তা হলে সুখের সঙ্গে যোমেই যাই—না, সোজা দেশেই কিরবে?

দেশে। সে কি কথা?

আইরিন জান হাসে : ক্ষতি কী? তুমি যোমে থাকলেও চোখের আড়ালে দেশে থাকলেও চোখের আড়ালে, তাই বং সেখানেই বাও না কি?—বিশেষ যখন তোমার আদর্শ বন্ধ এমন প্রাণকাড়া পুরে ডাক দিচ্ছেন?

পল্লব ওর হাতের পরে হাত রেখে বলে : তার উপর কেন অনবরত রাগ করছ আইরিন? সে তো তোমার বিচ্ছেদে একটু কথাও বলে নি?

আইরিন কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই খেমে বলে : থাক, তুমি বুঝবে না।

না, বলে। বলতেই হবে।

না, পল। তোমার মনে কেন আর মিথ্যা হুখে দেই? কেবল আমাকে একটা কথা দেবে?

কী কথা?

যে, যেখানেই থাকো না কেন, প্রতি সপ্তাহে আমাকে অন্তত একটু কবে তিষ্ঠি দেবে? আমি পথ চেয়ে থাকব।

পল্লব ওর হাত ধরে বলে : আমি যাব না।

আইরিন পল্লবের হাত ছুঁষ ক'রে বলে : সে হয় না। এখন তোমাকে বেতেই হবে। তোমার বন্ধু-বান্ধবী ইতালিতে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।

তাগা এখানে আসবে।

সুখকে কথা দিয়েছ?

টেলিফোন ক'রে দেব—সময় আছে।

যদি আমি তোমার বন্ধুর মনের মতন মেয়ে না হই? না, ঠাট্টা নয়। তুমি যাও—আমি প্রসন্ন মনেই বলছি। এত ভয় কিসের—যখন আমাদের এ ভালোবাসা সত্য? আত্মনকে খারই, ডরায়, সোনা ডরাবে কী হুখে? ব'লে জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা ক'রে : কেবল তিষ্ঠি লেখার কথাটা এখনো দাঁও নি, মনে রেখো।

দেব—কেবল এক সন্তে।

কী?

কথা দাঁও যে, আমি ডাকলেই তুমি আসবে।

আইরিন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে : তুমি ডাকবে অথচ আমি আসব না, এ কথা কি তুমি সত্যি ভাবতে পারো যে কথা চাই?

পল্লব আইরিনের কঠালিখন ক'রে বলে : আমি জানতাম—তুমি বুঝবেই বুঝবে।

বোকা তো কঠিন নয় পল, কঠিন হ'ল অভিমানকে ভয় করা। ম'লেই আইরিন ছেড়ে পড়ে, পল্লবের কোলে হুখ চুবিয়ে কেবল চাপা কান্নার ওর দেহলতা থেকে থেকে কঁপে ওঠে।

পল্লব ওকে সাধনা দেবার চেষ্টা করে না, ওর শিঠ, মাথার, চুল হাত বুলায়। ঘরের মধ্যে শুধু বড়ি করে টিক টিক টিক।

আইরিন যখন হুখ তুলল তখন ওর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। পল্লব ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

আইরিন ওর চোখে হাত বুলাতে বুলাতে বলে : আমাদের হানি-কান্নাকে বেশি বড় ক'রে দেখা না। এমনই মন আমাদের—শরতের আকাশ : এই আলোর আলো, তার পড়েই ঘনঘটা। তোমরা আমাদের কৃপাদৃষ্টি ত দেখ কি সাধে?

পল্লব ওর হুখ চেপে ধরে : নিজেকে অমন ক'রে ছোট করে না।

কিন্তু যে সত্যিটা ছোট—

তোমার মতন যে ভালোবাসতে পারে সে ছোট?

আইরিন বিষন্ন হাসে : কোথায় ভালোবাসা পল? সত্যি ভালোবাসার এক ময়—'তুমি তুমি'। যে 'আমি আমি' করে সে মিথো—দুর্বল ভালোবাসা।

তা হলে আমাকে ছেড়ে দেবার বল পেলে কোথেকে?

বল পাই আমার আমবা কোথায়? শুধু পাবার ভঙ্গি করি বৈ তো নয়।

ভঙ্গি ক'রে?

নয় ত কী? ভাগ্য কি—ছেড়ে না দিয়ে যদি বেঁধে রাখছে পায়তায় তা হ'লে তোমাকে চোখের আড়াল হ'তে দিতাম আজ?

চোখের আড়াল মানে কি মনের আড়াল?

কী জানি? কিস কী হয় কেউ কি বলতে পারে? বলে একটু খেমে : আর তাই তো ভয় আসে পল। দিনের পর দিন শুধু উদ্বেগ থাকবে আমার সঙ্গী হ'য়ে—যদি নিজের মনের সঙ্গে যুখাধি হতে না হতে আমি তোমার পর হ'য়ে বাই—যদি তোমাকে পেরেও হারাই?

পল্লবের বুকের মধ্যে কি একটা তার বেজে ওঠে, বলে : না—আমি যাব না—কিছুতেই না।

আইরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে : এখন আর হয় না—এখন তোমাকে যেতেই হবে—অন্তত কিছু দিনের জন্যে।

কেন শুনি?

কাষণ—এখন যদি তুমি না যাও তবে সে হবে আমার তোমাকে জোর করে ধরে রাখারই সার্মিল—যাও ফলে তোমার চোখে আমি ছোট হ'য়ে যাবই যাব। ক্ষমার ভিৎ বিনা কি প্রেমের ইয়ারত গড়া যায় পল?

পল্লব কী বলবে ভেবে পায় না। আইরিন একটু পরে বলে :

এই মাত্র তুমি বলছিলে মারীকে তোমাদের লাঞ্ছনা পূর্বের লজ্জা বলে। আমার তখন কি মনে হয়েছিল বলব ?

কী ?

বে আমরা তোমাদের লজ্জা হতে পা... কেবল তখন বখন কোঁচরা পাশে এসে দাঁড়ায়। তোমরা তার নিলে হবই আমার পরলা, ইনলে স্নানলা। এক রূপার : তোমরা দাঁড়ায় নিজের পায়ে জাধরা দাঁড়ায় তোমাদের পায়ে—আইভিলতার মত—তোমাদের জ্বালাতে ধরে। ব'লে ঈশ্বর ব্যক্ত হেসে : এই-ই হ'ল লজ্জাময়ী লজ্জার নিজ মুক্তি, মুখলে ?

পল্লব লাভ হুত্ব করে বলল : আইবিন। আমি বাব না। মুহুরকে এখন টেলিকোলে জামিরে দিছি, আর মুহুরকেও আজই লিখে দেব সব কথা খোলাখুলি—এই কথা বলে যে, দেশের কাছে আমাকে যদি ও তার ভবে তোমাকেও গ্রহণ করতে হবে। তোমাকে বিদায় দিয়ে আর্থখানার দম দিয়ে কী দেশের কাজ করব বলে ?

আইবিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেই লিখে গেল : বলল না পল, সে তুমি পারবে না। কারণ এখন হঠাৎ মুহুরকে সব কথা লিখে দিলে সে মুখ ফেরাবেই ফেরাবে—আমাকে তোমার 'শনি' জেব। তখন দেশের কাছে যোগ দেওয়ার পথও তোমার বাবে বন্ধ হয়ে। পূর্বব মাহুত বল পার মেয়েদের কাছে থেকে নয়—ও একটা কথাই নয়—তোমরা বল পাও তোমাদের ধর্ম থেকে, আদর্শ থেকে, ভগ্নতা থেকে। এই সবই তোমাদের সর্বস্ব। তা হাজার আমাকে সেটিমেটাল হুত্ব থেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তুমি সর্বস্ব হও তা হ'লে মনে করো কি—আমাকে ধনী করা হবে ? মেয়েরা বড়ই দুর্বল হোক না কেন—যেখানে সত্যি ভালোবাসে সেখানে সব আগে ভাবে নিজের কথা নয়—বাক্যে ভালোবাসে তাইই কথা। তাই তো যুগে যুগে মারিকার নায়ককে নিজে হাতে বর শরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বৃত্তার মুখে। পাঠিয়েছে কেন না ভায়া তাদের অন্তর-পতীরে একটি কথা জানতে : যে, বলভকে যদি নিজের জন্তে রণছোড় হ'লে প্রাণে বাঁচতে বলে তবে সে হবেই হবে অসুখী, আত্মবিকারে দান, অবসর—আর তখন এ অবসাদের কারণ হবে কে ? প্রিয়া, বার জন্তে সে কর্তব্যজ্ঞ হয়েছিল। তার পরে কী হবে তাও সে প্রিয়া জানে—যে, অবসরকে নিয়ে বর করলে প্রসন্নতা আসতে পারে না, খতিয়ে জ'মে ওঠে শুধু আত্মদ্বন্দ্বি : কী করলাম ? , বাক্যে ভালোবাসি তার জীবন বার্থ ক'রে দিলাম নিজের সুখের জন্তে ? না পল—আইবিনের মুখে ফুটে ওঠে বিবর হাসি—আমি তোমাকে মন থেকেই বলছি—বাও যেখানে যেতে চাও, নিজের মনের সঙ্গে হও হুত্বাযুগি, তোমার শুভাশিসের, বন্ধু-বান্ধবের, আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ নাও যদি চাও—আমার সুখ-সুখের কথা শুনেও না, হিসাব ক'রে দেখ—কিনে তোমার জীবন সার্থক হবে। যদি জেবে-টিঙে ছিঁব করো—তোমার বাজাপথে আমি তোমার সহবান্ধিনী—তোমার ভাবার, সহলেন্দিনী হ'তে পারব না—তবে আমাকে জানিও, আমি তোমাকে পিছু ডাক দেব না—নিজে এগিয়ে আসতে।—না, এ মহাবের কথা নয়, শক্তিময়ীর অপরাধের শক্তির কথাও নয়—এ হ'ল হুই আর হুতে চারের কথা, অপ্রতিবাত্ত শক্তির কথা : অর্থাৎ নিজের সুখের ব্যবস্থা করতে যদি আমি তোমাকে অনুমতি দিই, তবে তাকে ক'রে আমার সুখ

হবে না, হবে শক্তি। আত্মবিকারের মধ্যে বাঁচার চেষ্টা গতিই বেসনাকে বরণ করাও দেখে : কারণ সেখানে অন্তত আছে দু'তির লাঞ্ছনা—এ নিঃসংশয়তার ভগ্নতে বার লাগ কম নয়।

আইবিন উঠে দাঁড়ায়, পল্লবও। আইবিন জোর ক'রে হেসে বলে : এই দেখ—আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখবে কথা দিলে না।

পল্লবও জোর ক'রে হেসে বলে : লিখবে—কেবল তুমিও ঈশ্বর দাঁও—আমার চিঠির জবাব দিতে দেয় করবে না।

হিক। তোমাদের গীতার দ্বীপ নিয়ে না কথার কথার গর্গ করো—নিজাম বর ? না, আমি চিঠি লিখবই কথা দেব না। দীর্ঘপূর্ব। এতুত পারবে না—সত্যিই একটি ক'রে চিঠি লিখে যেতে—আমার চিঠি পাও বা না পাও ?

ওর প্রোথের জলের মধ্যে দিয়ে হাসি ফুটে ওঠে। পল্লব ওকে আসিঙ্গর করে, আইবিন ওর মুখ মাখা ঘেঁষে খামিক চূপ ক'রে গীতিয়ে থেকে বলে : এসো পল, একটা গান গাই হুত্বনে মিলে... কে জানে আর কখনো একসঙ্গে গাওরা হবে 'কিনা'—না না, জমন কথা বলব না আর, জমন মুখ কোরো না, লক্ষ্মীটি। এসো, খুশিমনেই বিদায় নিই—'কিরে এসো' ব'লে অবজ্ঞা। উচ্চাসের ইন্দ্রধনুবিলাস তো চেব হ'ল, এবার মাটির মাছুব মাটিতে নাদুক একটু।

পল্লবের মনের ভার একটু কমে আসে, সহজ হেসে বলে : তুমি বড় চমৎকার কথা বলে আইবিন। মজ্জি কি সাথে ?

আইবিন আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে : এবার আমাকে ছোট করছে কে শুনি ? শুধু কথা ? তোমাকে গান শুনিয়ে শিখিয়েও কি মজাইনি ?

পল্লব হেসে ফেলে : একশো বার। তবে কি জানো ? তোমার তুলনা এক তুমি—বখন বেরুগ ধরো মনে হয় সেই তোমার সে রূপ। বখন গান গাও—গান করি তোমার কণ্ঠ, বখন হেসে হুলে চলো—গান করি তোমার দেহলতা, বখন কটাক করো—অনুভব করি তোমার বিদ্রোহ, আবার বখন বিদায় দাও তখনো শুনি সেই সঙ্গে তোমার 'কিরে এসো' বলা—যা এক তুমিই পারো—যেন গানের সুরে।

আইবিন ওর হাতে ছোট একটি চড় মেরে বলে : আর তুমিই বুঝি মুখচোরা ভালো মাহুতটি। গান ভালোবাসলাম আরো কার জন্তে গো ?

এই দেখ—আর একটা রূপ—বহনময়ীর।

আইবিন কুপিত সুরে বলল : 'বহন' ? তোমাকে বলি নি—তোমাদের গানের সুরে আমার ছদর কী ভাবে হুলে ওঠে ? না, তোমার কাছে তোমাদের দেশের কয়েকটি গান শিখতে গিয়ে আমার মন যে কোন্ রঙে রঙিয়ে উঠেছে—তুমি কী জানবে ? হয়েছে—এসো এই গানটি আর একবার গাই হুত্বনে—ওর শেষ স্তবকটির কয়েকটি মীড় আমার গলায় এখনো তুলতে পারিনি—এ তোমার—বলে বীরে বীরে বাংলায় উচ্চারণ করে : 'শ্রিত, তোমার কাছে যে হার মানি'—কী সুন্দর গান—ভালো, সুরে, ভালো, দুর্লভ চালে। ব'লে ওকে টেনে নিয়ে বার পিরানোর কাছে : তুমি গীতিয়ে পোনো, আমি গাই, কেমন ? তুমি প্রথমেই ধোরো না কিন্তু—তোমার কণ্ঠ শুনেলেই আমি সুর-তাল ভুলে বাই। একবার আমি একলা গেয়ে নিই, তারপর তুমি ধরবে—তুয়েই জ্বালা, কেমন ?

এবার কেলবার সন্মত
লেখকগণের বিলাস
হুতল

পিলখার-প্রথম ক্যাপ যুক্ত দোষে কিতবেল

এম, এল, বঙ্গ য়াও কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

পল্লব আঁতর্ হ'য়ে ওর আনন্দলীলায় হুবে পানে চেয়ে থাকে।
এ কি সেই ঘরে যে হুমিনিট আপে ভেঙে পড়েছিল কানায়?
আইরিন শিরানোর হুঁতিন মিনিট কর্তে গিয়েই হর হয়ে, কিন্তু
পল্লব ওর সুরতালের তুলতুলের কথা ভুলে গিয়ে হুত হ'য়ে চেয়ে
থাকে। কী অপরাধ হুং, বড়, চাহনি। এই ঘেরেকে ও বিদার
দেবে কেমন ক'বে—কী অপরাধে?—তারতরকৈ ভালোবেসে যদি
ও পল্লবের 'সহপেশিনী' হ'তে না পারে এই ভরে? মোহনলালের
একটা আয়োজিত মনে পড়ে যায়: মাহুং বড়, না দেখ? কিন্তু
আগর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কুতুমের কথা: First things
must come first—আগে স্বাধীন হই, তারপরে তাবা বাবে
বিষয়ানবের কথা। উত্তরে মোহনলালের তরুণ্যিক মনে পড়ে: 'সবার
উপরে মাহুং সত্য, তাহার উপরে নাই।' দেশের সেবা করতে
পারে মাহুং তখনই যখন সে মাহুং হ'য়ে ওঠে: 'কিসের শোক
কবিস জাই? আবার তোরা মাহুং হ': গিয়েকে দেশ, দুঃখ
নাই—আবার তোরা মাহুং হ। প্রত্যন্তরে উদ্দীপ্ত হুখে হুহুম
বলত—মনে পড়ে—কিন্তু মাহুং হুবে কী করে গুনি যদি দাসত্বের
চাপে আত্মদামান মারা পড়ে? Putting the cart before
the horse? ও হর না মোহন, হর না। স্বাধীন দেশের
লোকের হুখে যে-কথা সাজে পথাবীন দেশের হুং সে-কথা
সাজে না। জাতিই পড়ে উঠল না—আত্মজাতিকতার বপ্ত
গা-ভাণ্ডিরে চলণায় মহামানবের সাগরতীরে। বা নয় তাই! পল্লব
গান শুনে শুনে অজমনক হয়ে পড়ে।

হঠাৎ আইরিন খেমে হুম-হুম ক'রে শিরানোর করতল গিয়ে
বাড়ি মেয়ে বলে: তুমি কিছু শুনেছ না। বাও!

পল্লব চমকে বলে: কী?—হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি বই কি।

হাই শুভহ! আমার এ-তালটার কেবলই ভুল হর আমি
জানি। হুই-তিনের কম তো আমাদের সন্ধ্যাতে নেই—কী যেন
এ-তালটার নাম? এই বোধ ভুলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—
জাঁপডাল, না?

জাঁপডাল। জ-ব পরে হু জুতলেই বা হয়—ক. বাঁপ, যাঁপ।

আইরিন বাগ করে বলে: ও আমি পারব না উচ্চারণ করতে।

পল্লব গেসে বলে: দুঃদৃষ্ট বাংলা ভাষার। না, লম্বাটি, বাগ
কোনা না। আমি শুনছিলাম বৈ কি।

কেব মিথ্যা কথা? তুমি কিছু শোনো নি—ভাবছিলে
আখাল পাখাল।

না না, বলে পল্লব ভরে ভরে, তোমার শেষ অজ্ঞারটির উচ্চারণ
এখনে নিখুঁত হয়নি। আচ্ছা আমি গাইছি—গাও সঙ্গে সঙ্গে—
কয়েক বাব গাইলেই জিভের আড় কেটে বাবে।

আইরিন হেসে উঠে পাঁড়িরে বলে: আচ্ছা। আবার তুমি
শিরানো ধরো; আমি পাঁড়িরে গাই। আমরা পাঁড়িরে ভালো গাই,
জানো তো?

পল্লব 'জানি' বলেই হেসে টুলে বসল শিরানো বাঁজাতে।
আইরিনের নিখুঁত সরলতায় মন ওর আত্ম হ'য়ে ওঠে। কী অপরাধ
কিন্নরী-কর্ত্ত। একে বিদার দেওয়ার কথা কি তাবা যায়? অথচ
তবু কিরে কিরে মনে ধরার মতন বাজে আইরিনের একটা কথা:
যদি তোমাকে পেয়েও হারাই?

আইরিন খেমে জলে: কের অজমনক? ধরো।

পল্লব চমকে উঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ', বলেই ওর সঙ্গে ধরে:

প্রিয়। তোমার কাছে যে-হার মানি—সেই আমার জয়।

প্রোমে জয় গরব সাথে যে—জয় নয় সে জব্বী নয়।

মানি তোমার কাছে যে পরাভব, সেখা আমারি অরোহণসব,
পরের হুখে বিজয় হব চিন্তে বিস্মে বর:

তবু তোমার সাথে আমার নহে নহে সে পরিচয়।

প্রিয় তুমি যে বরদানে আমার ভয়েছ এ-জগত,

তার প্রতিদানে সে নোয়াতে মাথা বাসে কি লাগ তব?

তুমি যরণমালা দিরে আমারে নিরতিমান হুতিলারে।

দেখালে আলো অন্ধকারে—নাই তো তার লয়:

দিলে দীপা—প্রোমে জিতিলে হাবি, হারিলে সেই জয়।

গানের শেষে পল্লব হুং ভুলতেই দেখে—আইরিনের চোখে জল।
ও উঠে পাঁড়িতেই আইরিন ওর বুক মাথা রেখে কর বর করে
কঁদে কেলে...

ক্রিঃ...ক্রিঃ...ক্রিঃ...

আইরিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছে, ধোর খোলে।

নাতাশা। কী ব্যাপার?

পল্লব সুরুত বলে: এই যে নাতাশা, এলে ভালোই হ'ল।

আমি তোমাকে টেলিফোন করব ডাবহিলাম—মানে আজ রাতের
ট্রো আমি বোম—

নাতাশা ম্যান হেসে বলে: জানি—সেই ভয়েই আমার আসা—
হুতুক তোমার শুধানে টেলিফোন করে না শেষে আমাকে টেলিফোন
করছিল—তোমার নাকি এখন বিসম্বাক শ'ত্রা সে—

ওহো! দেখ দেখি—শ্রেক ভুলে বলে আছি—পাসপোর্ট অফিস—
হ্যাঁ—সেইজন্তেই—হুতুক সেখান থেকেই টেলিফোন করে বলল

যে আজ শনিবার—একটার পরে অফিস বন্ধ। আজকে যদি যেতে
হয়—একুণি বাও ছুটে ট্যান্ডি নিয়ে—এখন শ' বাতোটা—জাব দেরি
কোনা না। বলেই খেমে: তুমি আজ রোম বওনা হুছ; কাল
সকালেও তো বলে নি?

কাল জানতাম না—আজ সকালেই হঠাৎ বাওরা দ্বিহ হল—
হুতুক হঠাৎ এসে এমন ভেঁকে বরল—

নাতাশা ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল: আভই?

আইরিন। বলল: নৈলে কি ওঁ মিথ্যা কথা বলছে?

নাতাশা ভ্রুকুটি করে বলল: না। মিথ্যা কথা কি এ জগতে
কেউ কখনো বলে থাকে? সবাই প্রতি পদে সত্যি কথা বলে বলেই
না জগতের আভ এ অবস্থা।

পল্লব কুণ্ঠিত সুরে বলল: সত্যি বলছি নাতাশা, বিশ্বাস না হয়
হুতুককে জিজ্ঞাসা করে—

নাতাশা বাধা দিয়ে বলে: আমার বিশ্বাস করা না করার কী
আমের-বার পল? বতেই কেমন একবকম হেসে: ইতালি এ সময়ে
বড় সুন্দর। আইরিনকে নিয়ে বাও না।

আইরিন বলে: আমি। তোমার মাথায় কখন বে কী দ্রুত
চাপে—

নাভাশা ভীতবর্তী বলে : কত আর অভিনয় করবি আইরিন।
হলেই নিজেকে সামলে নিয়ে পল্লবের দিকে ফিরে : কিরছ
কবে ?

আইরিন বলে : ইহঁত না কিরছতেও পারে।

না কিরছতেও পারে ? সে কি।

আইরিন বলে : সে কি—মানে ?

নাভাশা বলে : তাও কি বলে বলতে হবে না কি ?

আইরিন লাল হ'য়ে উঠে বলে : বলা না বলা তোমার ইচ্ছা—
কেবল ওকে জেরা করা কেন ?

নাভাশা মুখও রাঙা হ'য়ে ওঠে : জেরা আবার কি ? আমার
বোনের সঙ্গে তার আবার যবে এসে যে গলাগলি করে—তাকে
জিজ্ঞাসা করার আমার অধিকার আছে।

আইরিনের মুখও লাল হ'য়ে ওঠে : না, কোনো অধিকার
নেই—দাঁদি কি বোনের অভিভাবক নয় ?

নাভাশা একবার জবাব মূলত্বি রেখে পল্লবকে বলে সরাসরে :
ওর কথা আমি ধরি না। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্ন আমার
করবার আছে।

আইরিন বাধা দিয়ে বলে : না, কোনো প্রশ্ন নয়। ব'লেই
ফিরে : পল তুমি বাও, পাসপোর্ট আফিন—

নাভাশা বাধা দেয় : না, আমার কথাব উত্তর দিয়ে তুবে
যাবে। ব'লেই পল্লবকে : শোনা পল, এদেশেও কুমারীর

দোখার যবে কেন্দ্র আসে না। তুমি যদি ওকে রেখেই যাবে তবে
কি জিজ্ঞাসা করি—এউদিন ওকে নিয়ে শুধু খেলাচ্ছিলে ?

ফিদি। আর যা করে করো—ওর আমার মাথা হেঁট কোরো না।

মাথা হেঁট—এর পরেও ? কে-মেয়ের এতটুকু আশ্বাসমান বোধ
আছে—

আইরিন বীকা হেসে বলে : আশ্বাসমানের কথা তোমার মতল
মেয়ের মুখেই আমার বটে—যে—ব'লেই নিজেকে সামলে পল্লবের
দিকে ফিরে : তুমি আর দেরি করলে পাসপোর্ট পাবে না পল।
বাও এফুণ।

পল্লব বলে : বাচ্ছি। ব'লে টুপি উঠিয়ে নিয়ে নাভাশার
দিকে ফিরে : বাবার আগে কেবল একটা কথা ব'লে বাই নাভাশা।
আমি আইরিনকে নিয়ে খেলাই নি। রোম থেকে ফিরেই
আইরিনকে নিয়ে দেশে ফিরব—কিবাঁহ এখানেই হবে কিবা সেখানে
—ওর বা ইচ্ছা।

নাভাশার মুখ চা-বড়ির মতন শাদা দেখায়, আইরিনের দিকে
ফিরে বলে : সত্যি কথা ?

সত্যি হোক, মিথ্যা হোক—তোমার কী ভনি ? ব'লেই
পল্লবকে : বাও তুমি—আর পারো তো ওকে কমা কোরো—ও
বড় হুঃখ পেয়েছে। হাঁ, পাসপোর্ট নেওয়া হ'লে আচ্ছ এখানেই
থেরো—আমার যবে, কেনন ?

পল্লব বেরিয়ে যায় : নাভাশা ছ' হাতে মুখ ঢাকে। [ক্রমশঃ।

অভিসারিকা

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

রাত্রির নিত্য অভিসার

বনানীর বৃক শান্ত আশার,

অরণ্যে অরণ্যে আর পাহাড়ের অবুধ নীড়ে

সুগু ভয় পায় জন-অরণ্যের ভীড়ে ভীড়ে।

তাই—

রাত্রি নামে না হেথা অভিসারিকা

ওপারেই থাকে শুধু আলোক-পরিধা।

বিজলীর খির-খির আলো

সারি সারি বলে বেন 'এই ভালো।'

মৃতের নিশ্চিন্ত আঁখি

জীবনে দেয় কাঁকি।

তবুও পরিবার ওপারে নিত্যই আসা চাই

বসিও হেথাই অভিসারিকার প্রবেশ নাই।

এ কথাই কানাকানি আকাশে বাতাসে

মরুতে-মরুতে-নড়ে হৃদয়ে হতাশে।

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশেতা ভট্টাচার্য

৬

এ বেন দুজনে মিলে বাসুর ঘর বাঁধা। কত কণহারা এর আয়ু, সে হিসেব কে করে? সে হিসেব চন্দ্রা আর চন্দনের মনে নেই।

ঘরের ছেলে ঘরে বুঝিয়ে মিলে ফিরে গিয়েছে চন্দন। বড় দুঃখে স্বীকার করে গিয়েছে প্রতাপের কাছে, যে—না, আমি বুঢ়া হয়ে গিয়েছি। আমার বা শেখাবার শিখিয়েছি তোমার ছেলেকে। ভাল ভাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। সেলাম লাগাতে আর শ্রালুট বাজাতে শিখিয়েছি—পারেড কাওয়ারের কারদাটা যদি ভাল করে রপ্ত করতো তাহলে রকট থেকে রেগুলার সিপাহী হতো এই হতভাগা। কিন্তু বাড় বঁকা, বুনো ঘোড়ার সামিল। ডিল হাবিলদার সব রকটকে দাবড়াচ্ছে, তা ওর সহ হলো না। যেসে কুঁসে বেরিয়ে এসো। আমি থেকে গিয়েছি প্রতাপ।

বাণের কথা শুনে প্রতাপ মনে মনে ভাবে, ছেলেকে এই শব্দাব দিয়েছ তুমি। আমার সঙ্গে ওর মিলাটা কোনখানে?

মুখে বলে—তুমি আর কাজ করো না পিতাজী। তুমিও ছুটি করিয়ে চলে এসো।

চন্দন পাগড়ী-পর্য মাথা নাড়ে। এ বড় দুঃখের কথা। তবু স্বীকার করতেই হয় যে বাপ আর ছেলের মিল কোনখানেও নেই। ছেলে বোকে কিছু টাকা জমিয়ে নিয়ে ঘরে বসে ঘি-মিঠাই খাও, মামলা করো। পূজো-ধ্যান করো। সে জীবনের কথা ভাবলে গায়ে ঘর আসে চন্দনের। তার শরীর আজও শক্ত। দেখে আলগা চবি এতটুকু নেই। কাজ ছাড়া কিছু বোকে না চন্দন। কোকীজীবনটা তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার ভাববটা-ও তো নিয়েছে বদলিয়ে। তার মধ্যে সেলে নিয়েছে ছটকটানি, অস্থিরতা। ডিল পারেড আর উড়ি কুনলে লাকিয়ে উঠে ঘুমচোখে পারে পট্টি বেঁধে তৈরী হয়ে বাওয়া। নিজেই কাজের মাছব করে তৈরী করা আর সর্বদা হুই পোড়ালি মাটিতে বিঁধে নিষ্পলক কাজের পুকুল হয়ে পাড়িয়ে থাকা। কোন উন্নতি হলো না। অবশ্যের ছেড়ে হাবিলদার হয়েও উঠতে পারলো না চন্দন। বেইমানী ক'রে তাকে কিরিয়ে দিলো কেতী আর মাটিতে। তাই বলছি যে কিবাণ বদল বাবে চন্দন, তাই বা কেমন ক'রে হয়? চন্দন তা পারবে না।

চন্দন চলে বাবে নিশ্চিত জেনে প্রতাপ সাসারী লোকের মতো বাণের কাছে হিসাব দাখিল করতে বসলো।

—চাচাজীর দরশ যে জমিটা ছিলো ভাতো এ বছর অতবহু আর বুট দিলাম। দিখুণ হুঁখানা লাভল দিলো। বলদ আমার। গের এবার ভাল পাব না বলে মনে হয়। মতুন জমি এ বছর গড় থাকবে? তাই মনে করছি তুটা দিয়ে দেব কিছু—

চন্দন এ সব সাসারী কথা শোনে না। হঠাৎ বলে—একটা সন্দের মেরে দেব।

—কি বললেন?

প্রতাপের দিকে চেয়ে হঠাৎ চন্দন কুঁধে উঠে। বলে—চাপ নেই? দেখতে পাও না? সন্দের মেরে নিয়ে এসো বোঁ ক'রে। ও ছেলেকে ঘরে রাখতে পারবে না।

চন্দন ছেলের বিম্বিত মুখের দিকে চায় না। বলে—ছুটি ফুরিয়ে গেল, আমি চলে বাছি। ছেলেকে এবার পাঠিয়ে দিতে বোঁ করো না। তিপ্পান নম্বর নেটিভ ইন্সপেক্ট্রি কানপুরে রয়েছে। হুইলার সাহেবের রেজিমেণ্ট বাবুকে আমার ডাক্তার সাহেব জানেন। ঘ'রে ক'রে যে ক'রে হোক, আমি ঠিক ভর্তি করে দেব। জোয়ান ঘোড়া, জওয়ানীর মন্তিতে বিগড়ে যেতে কতকণ? তোমার ছেলের গরম বেশী, এ পারেড হাবিলদারের ছপটি না খেলে ও ঠিক থাকবে না।

চন্দন চলে গিয়েছে, আর স্বামীর জন্তে অপেক্ষা না ক'রে দুর্গা দাই লাগিয়েছে মেয়ে খোঁজবার জন্তে। দাই পান-ভামাক আর শুড়ের নাগরী বেঁধে নিয়ে ভরসা দিয়ে গিয়েছে বর্বাটা কাটলেই সে এমন একটি মেয়ে এনে দেবে, বার 'বদন উজালা, নৈন বিলালা, চন্দ্রাক বরণী গৌরী।' এক বোঁ ঘর আলো করবে।

সেই ভরসার বুক বেঁধে রয়েছে দুর্গা। একটা সন্দের মুখের দারা দিয়ে ছেলেকে বাঁখতেই হবে। নইলে শাড়ি নেই তার। এবার ছেলের মনও কিরিয়ে কাজে, চাবে বাসে। কেতী দেখানো করতে সে নিত্য বার আর সীক কাটিয়ে কেয়ে।

প্রথম বৌবন। বড় মুখ ভালোবেসে। শৈশবের হুই সাধী মাঝে করে কোকী ভেঙে গিয়েছিলো। মনে মনে চন্দ্রা ভাবে, ভালই হয়েছিলো। নইলে বুকি এত ভালোবাসা যেত না।

নবীন প্রেম। নিশাপাণ ও পরিপুষ্ট ভালোবাসা। চোখে চোখে করে কত সময় কেটে যায়। চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দন কেমন বেশ হাফিয়ে যায়। টানটান বাঁধ ছুঁ, বাঁহু-লাবণ্য

ভরপুর এক কিবাণ-ঘরের গরীব মেয়ের এত ঐশ্বর্য? বসেছে ব্যাল গাড়ীর ছই-এ হেলান দিয়ে। জলে-ভেজা সবুজ ক্ষেতের পটভূমিকায় এই কালো গুড়ুনী আর লাল আঙ্গিয়ার সঙ্গে চম্পাকে মনে হচ্ছে যেন কোন গল্পকথার মেয়ে। কোনো বাজকড়াই বা হবে। নইলে চম্পানের প্রায়ে এমন ঐশ্বর্যময়ী সে হলো! কেমন করে? এমন সুলভ! ভকীটি চম্পার যেন এই সবুজ ক্ষেতী, নীল আকাশ আর পুখুরী বাতাসে ধোওয়া ছুনিয়াটুকু সে কিনে নিয়েছে। গমের শীষ ভেঙে সে ছলনা ভরে চৌকা দেয় চম্পার গালে। বলে, —এত অহঙ্কার কিসের? যেন মালকিন সাহেবা তুই!

—নিশ্চয়।

চম্পা একটু হাসে। বলে হাত ছাড়িয়ে, সবটুকু দেখিয়ে—
এই সব কিছু আমার, জানো?

—আমাকে দাও কিছু। হাত পাতে চম্পন। সহজাত লীলা-বিন্দয়ে রাখিকা হয়ে ওঠে চম্পা। চোখ টান করে বলে—চাও? এই নাও দিলাম।

—কি দিলে?

—এই, যা ছিলো আমার।

—সব দিয়ে দিলে?

—নিশ্চয়। ভয় পাই না কি? আমার কি ফুরিয়ে গেল ভাঁড়ার?

মেঘ বধন ঘনঘোর হয়ে কেঁপে আসে, হু-হু বাতাসে সূচনা করে দুর্ধোগ। তখন চম্পা আর চম্পন নির্ভয়ে চলে যায় গ্রাম ছাড়িয়ে। নির্জন অরণ্যের সীমান্তে। এখানে গায়ের মাছুর কোন দিনও আসে না। বহু অপবান আছে এই মাঠটুকুর নামে।

কিন্তু সে ভয়ের কথা এদের মনে থাকে না। আকাশে বিদ্যুৎ কিলিক দেয়। বাজ গর্জে ওঠে। চম্পা আর চম্পনের গলার গান বেগে যায় বাতাসে। দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটে চলে। চম্পার চেরে চম্পনের গলার গান অনেক শ্রেয়ী খোলে।

‘বিছড়ী জোড়ী মিল বাতি সৈয়া’,—এই গানটি সে আহরণ করে এনেছে। এই গানটি বার বার শুনেও তৃপ্তি হয় না চম্পার। চম্পনও গলা ছেড়ে গায়। মুখে বৃত্তির ঝাপটা নিতে নিতে চম্পা খুশীতে হাসে।

আবার কখনো কোনো আবেগ-মধুর হিপ্রহর বা সন্ধ্যা। কথা নেই মুখে। হুট-একটি কথা, তাও যেন সুরে বাঁধা মিঠি মিঠি বোল। দুজনে দুজনকে দেখা আর অবাক হয়ে বাঁওয়া। ভালবাসার প্রতিশ্রুতি—ভুলব না, কোন দিন ভুলব না। যখন যেখানে থাকি, যতদূর থাকি।

—চম্পা, কোন দিন নয়।

তবু যেন বিশ্বাস হয় না। আবার কণিক বিরতি বাদে ভীক শব্দ—যদি আর দেখা না হয়?

—চম্পা, তবুও নয়।

এবার গলীর সুখে নিজেদের এলিয়ে দেওয়া চলে গাছের গায়ে। চম্পন বলে—এত দেশে গেলো, এত মাছুর দেখলাম, এত বকম জীবন কাটলাম, তুলতে পারলাম কই চম্পা? তুমি আমার মনে ছিলে।

—তবে কেন চলে গিয়েছিলে?

এ কথাই জবাব নেই। চম্পনের বড় কাছে চম্পা। এবার চম্পার শব্দের মণিকোঠার যে কথা মাথা কুটে মরছে দিবা যাত্রি, তাই-ই জয় ভয়ে উচ্চারণ করে—আমাকে ওরা দিয়ে বাবে, জানো?

—কে বলেছে?

—আমি জানি।

চম্পন হাসে। বলে—কেন? তোমার সঙ্গে মিশলে আমার জীবনে দুখে আসবে? কেন এসব কথা বিশ্বাস করো চম্পা! আমি বিশ্বাস করি না। দেখো, আমি এবার কাজ করতে চলে বাব। আর তারপরে তোমাকে ঠিক নিয়ে বাব।

—কোথায়?

অবুঝ এক বালকের সঙ্গে যেন খেলা করছে চম্পা। চম্পনের গলার কিছু কৌতুক নেই। চম্পন বলে—কত জায়গা আছে! ছুনিয়াটা কি ছোট?

তা হয় না। ছুনিয়া যত বড়ই হোক না কেন, এক ছুনিয়ার চম্পা আর চম্পনের ঠাই কোন দিনও হবে না। কিন্তু সেকথা বলে এই মধু মুহূর্ত নষ্ট করে কে? চম্পা তা করবে না। কেন করবে? জীবনে সে কি ভালবাসা আর দরদ এমনই অজলি ভাবে পেয়েছে? যে ভবিষ্যতের কথা তুলে এই সময়গুলোকে সে আশঙ্কায় ভারাক্রম করবে? চম্পন যতই ভবিষ্যতের কথা বলে আর সুখশব্দের ছবি আঁকে, চম্পা ততই বর্তমানের মুহূর্তগুলোকে হুট্টা করে ঘরতে চায়। চম্পন বলে—ছুনিয়াটা তো এই সেলারনদীর ধারে ছোট ডেরাপুর গাখানার মধ্যে কয়েদী নয়? অনেক দেশ আছে। তুমি আর আমি সেখানেই চলে বাব চম্পা!

—তা হয় না।

—কেন?

—না।

আসলে অন্তর্ধান সুখের স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় চম্পা। অন্ত বড় কথা ভেবে কি হবে? তা হ'লেই তো তার দুর্ভাগ্য কোন দিক থেকে কথা তুলে ফুঁসে উঠবে আর জরম করবে চম্পনকে। অর্ধট সে কথা বললেই চম্পন হা-হা করে হাসবে। ঐ বকম মাছুর চম্পন। সে ভাবে, সবগুলো কালো মেঘই বুঝি ঐ হাসির হাওয়ার উড়িয়ে দেওয়া চলে।

চন্দ্রসহস্রের দিন। বেশরোয়া জোয়ারের তেউ বুকো নিয়ে উত্তাপ স্তবয়। কে জানে আজকের সন্ধ্যা কালই মিথো হয়ে বাবে কি না নদীবের খামখেয়াল। তাই আজ, এই মুহূর্তটাই সন্ধ্যা। চম্পন বলে—বহুলাবাসে বুলনের মেলায় বাবে চম্পা? শোন, তুমি যেও ঐ বুড়ী কৌশল্যাদের সঙ্গে। আমিও বাব। ঠিক বুঝে নেব।

—ইস, গ-শুভ মাছুর বাবে না?

—গেলেই কি। আমি পাখোরা করি? তুমি দলছুট হয়ে যেতে পারো না!

মেলা, লোকজন, বাজনা, বাতি, কাচের চুড়ি হাত ভাঁবে পরবার লোভ, সবগুলো একসঙ্গে মনে করে চম্পার চোখ ছুটো তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু চম্পা কণিক ভাবে। বলে—তার চেয়ে সেদিন আমি তুমি নাকো নিয়ে ওপারে বাবো, কেমন? কেউ থাকবে না গায়ে। বেশ ভালো হবে।

বুলনের রাত। এমন রাতে আকাশ ভরে তারা থাকতে পারতো। তারা নেই। মেঘলা আকাশ। টিপ-টিপ বৃষ্টি। তবু চম্পার মনের খুশীতে এ আকাশকেও পয়ম স্তব্ধ মনে হয়। বাতাসকে মনে হয় সুগন্ধে বদরি। মাটিতে উগড় হয়ে শুয়ে কাঁচ

হয়ে চেয়ে থাকে চম্পা। এমন রাতে তার চোখে ঘুম আসবে না। আন্ধার দিনটা তার মন এখনো ভরে রেখেছে।

আজ তারা দুজনে চলে গিয়েছিলো বনে। জয় হারিয়ে বনের নিগূঢ় অন্ধারে পৌঁছে, সবুজ বাসের ওপর বসেছিলো। শ্রাম ও বাঘের কুলনের দিনে তাদের মনও মেতেছিলো, তুলেছিলো তালে তালে। চন্দনের বৃক লীন হয়ে ভালবাসার প্রতিটি কথা নিজের বৃক ভরে শুনেছে চম্পা। অন্ধির হয়ে অশান্ত হয়ে চন্দন বলেছে—মনে হয়, তুমি বেন আমার ভেতরে আছ। গাইলেও বেন উপড়ে ফেলতে পারি না তোমাকে, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না চম্পা।

সে দুভাগিনী। তার নিঃশ্বাসে বিষ। তার স্পর্শে মৃত্যু। তবু আন্ধার দিনে চম্পা সে কথা বলতে পারেনি। বলেছে—তুমি বাবে তোমার পথে। আমি আমার ভাগ্য নিয়ে থাকবো। তার চেয়ে বেশী আমি চাইতে পারি না। ভয় পাই।

—ভয় পাও, চম্পা? ভয় পেও না।

—কিন্তু চন্দন...

—দেখো। এইদিন ওদিন নয়। আমি একদিন তোমাকে এই সব কিছু থেকে উপড়ে টেনে নিয়ে চलो বাবো।

—তোমার বাবা, মা...

—কিসের কে চম্পা? আমি তো একবারই বাঁচবো। এই জীবনই যদি বুঝা চলে গেল—

—বেশ। বলে গভীর হয়েছ চম্পা। দুজনেই গভীর হয়ে গিয়েছে। তার পর সময় চলে যায় দেখে নৌকা নিয়ে ফিরে এসেছে।

চম্পা ভাবে, ভালাম তো ভাল করেই ভাসবে। ডুবলেও আঁকসোব করবো না।

‘জা কো শিরা চাহে ওহি সুসাগর’—প্রিয় বাকে কামনা করছে সেই রমণী সৌভাগ্যবতী—সেই প্রেমসী। চম্পার বোঁদন বেন অন্যদিকে মলিন ছিলো। সহসা একজনের প্রেমে সে বোঁদন মুগ্ধিত হলো। চম্পার সেই বন্ধ অনমনীয়তা ঢাকা পড়লো লাবণ্য ও সুবাসায়। এখন তার চলনে রাজহাসীর গরিমা। চোখে অতল রহস্য। কাজল বিনাই সে চোখ কালো। প্রসাধনের উপকরণ নেই। তবু গভীর কিবাণী-মেয়ের মাসুলী পোশাকেই তাকে মানায় ভালো। যে সৌরবর্ণ রক্তের এত বদর সেও বেন চম্পার উজ্জল শ্রাম মুখখানির কাছে হার মেনে যায়। চন্দন বলে, ‘লায়লী কো মজহুকে আঁখোসে দেখনা চাহিয়ে।’ বারা তোমার মধ্যে রূপ দেখে না চম্পা, আমার চোখ দিয়ে তাদের দেখতে বলি।

না। একেই গায়ের মাসুলের মুখে ভর করে চম্পা। কথা ছড়ালে বড় ভাল।

তবুও কথা উঠলো। প্রথমে মুখে মুখে চুপে চুপে। তারপর ছড়িয়ে পড়লো কথা। মাসুলে আগে দেখলো চন্দনকে। প্রতাপের জোয়ান ছেলে, যে নাকি এত বেশ-বিশেষ ঘুরে লাহকে হয়ে কির লা, সে কেন এই গাঁয়ের মধ্যে এমন আটকে রইলো, কোন আকর্ষণে পড়ে, তাবতে স্বক করলো হু—একজন। বুড়োর অবিভি প্রতাপের উত্তানে চওড়া হাতে চন্দনের পিঠ চাপড়ে তারিক করলো যে ধী,

বেটার মতো বেটা। এমনিবারা ছেলেই চাই। যে এত সাহেব দেখেওনে, এত বেশ-বিশেষ ঘুরে, তবুও নিজের শিখাবৎ-সহবৎ ভোলেনি। নিজে জোয়ান, তবু পাকচুলকে প্রাপ্য সম্মান দিতে জানে। তারা বলে গেল—হী প্রতাপ এই ছেলের হাতের আঙন পেলে বাপ-দাদার মনটা শান্তি পায় বটে পরকালে। এবার ছেলের বিয়ে লাও।

ছেলের প্রাণসার জবাবে অন্ধর থেকে কাঁঠকরলার আঁকোটি, আগ্রার মশহর তামাক আর ছিলিম এলো। কিন্তু সকলে তো বিভ্রান্ত হয়নি। তারা দেখলো চন্দনের চাল-চলন। আর দেখলো চম্পাকে। দেখলো যে মেয়েটা আছে কি না আছে বোঝা যেতে না এত দিন, সেই মেয়েই সহসা পাখখোলা ছুরির মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। কূলে কূলে ভরে উঠেছে বোঁদন আর ধলত-কিরতে লাভ বেন উঠলে পড়ছে।

কানে কানে কথা উঠতে দেবী হলো না দুর্গার কানে।

চম্পাকে অনেক ভরসা দিয়ে চন্দন তখন এলাহাবাদে গিয়েছে। চন্দনের পুরনো জিয়ারেংদার বুড়ো মাকমোহন সাহেব এলাহাবাদে রয়েছেন। তার কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে চন্দন কাজির ভক্ত আসবে কানপুর। সে চন্দনের নান্দি। সেটা একটা ছাড়পত্র বুড়োর কাছে। তা ছাড়া কাজ যদি পায়, তা সে ডাক্তার সাহেবের ফুলী হবে। রংস্ট হয়ে রেজিমেণ্টে চুক্তি সে চায় না। এমন কি, রেজিমেণ্টের ফুলসী হতে-ও তার আপত্তি নেই। তারপর চম্পাকে বিয়ে করে সে শহরে ঘর বাঁধবে। চম্পা তত দিনে নিশ্চয় ঘুরে আসবে লাশার মাসের সঙ্গে। বাচ্ছে তো দুই-তিন মাসের জতা।

চম্পা সেই আশায় বসে রয়েছে। নদীও তাকে তবুই ঠোঁক লাগাচ্ছে। এবার সেও নদীবকে দেখিয়ে দেবে।

তীর্থে বাবার সব ঠিকঠাক। লাল বৈজনাথের দোরে বহাল-পাড়ী তৈরী। লোকজন জোগাড় হয়েছে। গাঁয়ে এমন ঘর নেই, যে ঘর থেকে দুই-একজন মানুষ জোগাড় না হয়েছে। ব্রাহ্মবর্গে স্থান-দান করে তীর্থ স্তম্ভ। পুঙ্খুয়ে স্থান। আবার উত্তরে হরিদ্বার দ্ব্যবকাশ। তীর্থযাত্রার পাথের সঞ্চয় করে সকলেই এনে দিয়েছে লাশার মার কাছে। সব টাকা নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে রেখেছে বুড়ী। পথের জতা কিছু বদল নেওয়া হয়েছে। কয়দিন ঘরে বাওয়া-আসা কলহ কলরব আর হাঁকডাকে সবগরম রয়েছে মহলা।

বাঘে বলে চম্পাও তৈরী। এমন সময় দুর্গা এলো বিভ্রাৎ ও বজ্রবাহী মেঘের মতো ধমধমে মুখ করে। চম্পার ওপরে ফেট পড়লো। তীব্র আর বিবাক্ত কথাগুলির বায়ে প্রথমটা কালো হয়ে গেল চম্পা। কিন্তু সে তার হাতের মতো সহনশীল নয়। দুর্গা যখন বললো—সর্বনাশী, এবার নিঃশ্বাসের বিাে আমার ছেলেটার অনিষ্ট করবি—ভেবেছিল?

চম্পা প্রথম আঘাতের থাক্তা সামলে নিলো। তারপর জবাব দিলো—ক্ষমতা থাক তো ছেলেকে কয়েক করে রাখো। আমার ওপর হামলা করবার তোমার এজিয়ার কোথায়?

দুর্গা আঁপা করেনি চম্পা তার কথার জবাব দেবে। তাতেই সে আরো চটলো। একে সে স্বভাবিকলজিহ্বর। তাতে সে আত্মরিক ক্রুদ্ধ হয়েছে। দুর্গার গলা এবার খুলে গেল—এই যে

তুই হাছিস আর বেন গীরে মুখ দেখাতে না হয়। হতভাগী, তুই রাজারে বা। বমজানী হ'। শহরের মাছুবের কাছে রশ্মীবোনের বসন্তী করগে বা! গীরের মশকনকে আলাবি কেন?

কথা শুনেতে শুনেতে চম্পার মুখ-চোখে লজ্জার অপমানে রক্ত কেটে পড়তে লাগলো। দুর্গা বেতে বেতে কিরে বিষ ঢেলে দিয়ে গেল—চিরদিনের মতো বা।

মনের বিষ ঢেলে দিয়ে দুর্গা কোনো শান্তি পেলো কি না তা চম্পা জানে না! তবে তাকে সর্বনাশী বিবকতা ব'লেই জানে দুর্গা। সেই যদি একবার কিরে এসে দেখতো তাকে তবে নিশ্চয় সে ভাস্ত দারণা পরিহার করতো দুর্গা। যে মেয়ের মনে গরল, নিঃশ্বাসে মৃত্যু ও দুর্ভাগ্য, সে সামান্য কয়টা কথাই বারোই এমন করে লুটিয়ে থাকে মাটিতে? নিঃশ্বাস থেকে শরীর তার এমন হিম হয়ে যায়? চোখের জল কীটা কীটা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে? এ কেমন বাৎসল্য দুর্গার, যে বাৎসল্য তাকে নির্ভর ও স্বার্থীক করেছে? এ কেমন মা, বার মন আর এক দুর্ভাগিনীর মুখে কীদে না? দুর্গা জানলো না সেই দিন সে অজান্তে চম্পাকে চলে দিলো তব্রিষাতের হাতে। চম্পা আর চম্পার রইলো না। দুনিবার কোনো আকর্ষণে চম্পার চারি পাশ থেকে গভী গেল ভেঙে। আর তব্রিষাতের সুখ প্রাপ্তে চম্পার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গারও সুখ-দুঃখ এক গ্রন্থিতে বাঁধা হয়ে রইলো।

আজ অবশ্য চম্পা-ও তা জানলো না। তব্রিষাৎ নয়, বর্তমান

ছাপিরে আর কোন কিছু দেখতে পেলো না চম্পা। সত্যিই তো, সে তো দুর্ভাগিনী-ই। মনে পড়লো ছোটবেলা থেকে কেমন করে দুর্ভাগ্যের রাহুছায়াতে সে বড় হয়েছে। মনে পড়লো তার জন্মের সূচনাতে-ই তার পরিবারে নেমেছিলো অভিশাপ। মনে পড়লো তার সঙ্গে বিবাহের কথাতে-ই কেমন করে অনেক কথা উঠেছিলো। মনে হলো সত্যিই তো, কোন মা কামনা করে যে তার ছেলের সর্বনাশ হোক? যদি চন্দনেরও কোন বিপদ হয়? চম্পার বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত মাথায় মনে হলো, এত দিন ধরে সে স্বার্থীক হয়ে নিজের বকিত জীবনটার কথাই ভেবেছে। তাই চন্দনকে সে নিজের জীবনে টানতে চেয়েছে।

চম্পার মনে হলো, যদি কপালে থাকে সে বমজানী হবে। অথবা বা হয় হবে তার। কিন্তু চন্দনকে তার মধ্যে টানবে কেন? এই কি ভালবাসা? তার চেয়ে চম্পা চলে থাক লালার মা-র সঙ্গে। এত তীর্থ, এত দেবদান, সেখানে এত মাদ্রুপ রয়েছে— তার একলা জীবনের একখানা কিস্তি কি কোন বাটাই বাঁধতে পারবে না? তা কখনো হয়? চম্পা মনে মনে সংকল্প করলো, আর কখনো ফিরবে না সে। মা-কে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে; বড় দুঃখে হাসি পেলো তার। কীপ চান্দখানির মতো হাসি চোটে লেগে রইলো। চম্পা ভাবলো, আমাকে নিয়েই মা-র বস্ত ভাবনা ছিলো। আমি না থাকলে মা-ও দায়বদ্ধ হতে পারবে।

আর কিসে কষ্ট হবে? চম্পা তার মনখানি নিয়ে সব দুই

অমিত লাভণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাভণ্যময় প্রকাশ্যেই আপনার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী হান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বকে মখমলের মত কোমল ও মসৃণ কোরে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক: জি. দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনবিহু লেন, কলিকাতা-১

ছুরে দেখলো, অনেক দিন ধরে চলনের দৃষ্টিজড়িত মাঠ, বন, বটগাছ আর নদী—এস জায়গার মনটা শিকড় বেঁচেছে বাটে। তবে সে বাঁধন উপড়ে ফেলতে হবে। সে না থাকলেও এই সবই থাকবে। এমন সুন্দরই থাকবে।

আর কে রইলো? চন্দন? হ্যাঁ। তার কষ্ট হবে বটে প্রথমে। কিন্তু তার পরে সে-ও ভুলে যাবে। পালাকিতে বৌ বসিয়ে নিজে খোড়া চড়ে পাশে পাশে আসবে। হুগাঁর হাতে বৌ ভুলে দিতে দিতে হয়তো তার একবার-ও মনে হবে না, এই মা যদি মাঝখানে না থাকতো তবে আজ চম্পা থাকতো তার পাশে। রাতে বৌয়ের মুখ থেকে ওজনী সরিয়ে মুখখানা দেখে হয়তো চন্দন বলবে—‘জা কো পিয়া চাহে ওইই সুহাগণ’। তখন চন্দনের এমন কথা একবার-ও মনে হবে না, এই কথা সে আর একজনকে আর একদিন বলেছিলো। চম্পা কোথাও থাকবে না! না এ গাঁয়ে। না চন্দনের মনে।

সেই নিঃশেষ বিস্মৃতির কথা মনে করতে বুঝখানা ভোগ গেল চম্পার। তা যদি সত্যি হয়, তবে? তবে চম্পা সেদিনই মরবে। জ্বরপর আর বেঁচে থাকবার কোন মানে হয়? চন্দন যদি চম্পাকে অমন করে-ই ভালো, তাহলে চম্পা তার সমাধিতে কোন সামান্য সৌধ-ও চাইবে না। সে সমাধিতে কোন রক্তগোলাপ ও বুলবুল পরম্পরের প্রেমে আব্বুল হয়ে সৌরভ ও সজীব বিস্তরণ করবার দরকার নেই। তেমন সমাধিতে কাঁটাগাছই ভালো।

আকাশ-পাতাল ভাবে চম্পা। তারপর পিছিম খেলে হাত-আয়নাখানা ধরে। নিজেকেই দেখে। এই কপালে দুর্ভাগ্যের লিখন? কোথায় কোন আখরে লেখা?

চোখে ত পড়ে না। চোখে পড়ে একখানা অজ্ঞানস্রষ্ট অপরূপ মুখ। আয়নাখানা ত’ মিথ্যে কথা বলছে না। সুন্দর মুখখানি এখন বেদনা-মলিন, চোখের দুটো আহত। এই মুখ আরো সুন্দর হতে পারে, যদি একজন পাশে থাকে। সে নেই বলে-ই তো জোর পাচ্ছে না চম্পা। সে নেই বলেই তো অসম্ভব সাক্ষরে বুক বেঁধে চম্পা নদীবের কালোবিরিয়ার ঝাঁপ দিতে চলেছে।

তাকে-ও বিস্তার নিলো চম্পা। সুখের ঘর বাঁধবে ‘বলে কোথায় গেল চন্দন—এদিকে বে বাঁধা ঘর ভেঙে গেল, চম্পার সাধ্য কি একা এই দুঃখ প্রতিকূল জোয়ার ঠেকায়?

চম্পা এক দিনে ভাসলো।

আজমীর পর্বত আর পৌছনি চম্পা। চম্পাকে পল ধরে বাজি ফেলছে যে বাজিকর, তার খামখেয়ালীর নিশানা কে করবে? আজমীর পৌছবার আগেই সেই তীর্থবাজীর দলে ডাকা পড়লো। অবিকৃত পথ-বাট। রাজহানের মরুভূমি আর নির্জন বসতিবিরল ধূবু বিস্তৃতি ভারতের অজাভ ঠাই-এর মতোই দস্যুর উপদ্রবে ভীতি-সঙ্কুল। তীর্থবাজীদের সঙ্গে লাঠি হাড়া অন্ত ছিলো না। অলঙ্কার ও অর্ঘ ছিলো বিস্তর। অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যয় হল ছত্রভঙ্গ হলো। কয়েকজন মাটি নিলো সেখানেই। চম্পাকে দস্যুরা ঘরে নিয়ে গেলো। মাঝপথে বোরা মনে হওয়াতে চোট দিয়ে ফেলে রেখে গেল তাকে। উদ্ধার করলো কোম্পানীর জমিজমির

একটা দল। মেমসাহেব আর সাহেবের বাড়ি সন্ধ্যা হলো। চম্পা কিন্তু গ্রামে আর সে ফিরলো না। ক্যাপ্টেন ও মিসেস ঠক্কের সঙ্গে এলো কানপুর। সেখান এক রিসালার বাবুর মাধ্যমে চিঠি লিখিয়ে খবর জানালো লালা বৈজনাথের বাড়ী থেকে। চম্পা না কি ডাকাতদের দলের সঙ্গে চলে গিয়েছে। ছয় মাস কোন খবর না পেয়ে এই সৈনিক মনের দুঃখে মরেছে চম্পার মা শোধ-অন্ন বিমারীতে ভুগে ভুগে। সে বাড়ী সম্পর্কে আর কোন খবর জানাবার নেই।

খবর জেনে চম্পা বেন বাঁচলো। বাঁধন কেটে নিশ্চিন্ত হলো। আর কিছু ভাববার নেই। রেজিমেন্টে বাজারের কাছে ঘরভাড়া নিলো। ঠিক সাহেবের বিবির কাছ থেকে যে টাকা মিলেছিলো, থানিকটা তাই দিয়ে আর থানিকটা নিজের বাছুরী বৌরনের টানে সাবেকীরা জোঁটালো। চোখে বিলিক মুখে হাসি। গামে স্তর কমতি পড়ে বা নাচতে ভাল কাটে—সে শেষ বৌরনের বিক্রম দিয়ে পুরিয়ে দেয় চম্পা। কটাক্ষের বাণ মুঠো-মুঠো ছুঁড়ে মাঝে। রাতারাতি ডাক পড়ে রেজিমেন্টে, রিসালার। মাসে দু’চারটে ডাক পেলেই চলে যায় চম্পার।

কি বাজালী বাবুরা, কি কোঁজী দিল্লী অফিসাররা বা দু’চারজন ফিরিজী গোরা, চম্পার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হ’তে সকলেরই সাধ যায়। কিন্তু কোমরে বিদ্যুয় নিয়ে ঘোর চম্পা। কথা কইতে সে নারাজ নয়, তবে মাঝখানে থাকে ঐ ছুরিখানার অস্তিত্ব। বড় ধারালো মেয়ে—রটে বেতে দেবী হয় না।

এ এক জীবন। তেমন তেমন হয় তো বিতুর অবধি চলে যায় চম্পা, তার সাবেকীরা নিয়ে। পেশোরা প্রাসাদে কখনো সখনো গেলে সোনার বালাটা, রূপোর তোড়াটা, মিনে-করা পান-ভাবরটা ঘেলে।

সকলে বলে চম্পা বড় পরলা চিনেছে। চম্পা ঘরে এসে হাসতে চায়। একদিন বলেছিলো না হুগাঁ? যে রমজানী হবে চম্পা, বাজারে নাচ দেখাবে?

তাই হয়েছে চম্পা। এখন সে পুরোনস্তর বাজারের মেয়ে। কানপুরে থাকে না জানে কে? সত্যীচৌরার প্রান বরে চম্পা। শিবচন্দ্রশ্রীতে আঙ্গাফে পানফলের জিলিপী জলপানি দেয়। সে কার চেরে কম যায় না।

দুর্গার কথা মনে করে হাসতে চায় চম্পা। কিন্তু ঘরে এসেই হাসিটা বেন কেমন করে নিবে যায় তার। জানালা দিয়ে চেরে গন্ধা নয়, আর একটা নদী মনে পড়ে। আর একটা ঘর মনে পড়ে, একখানা মুখ মনে পড়ে। সৈনিক আর ঘরে বাতি জ্বালে না চম্পা।

কানপুরের বাজার-মাতানো রমজানী চম্পার কেন যে সহসা ডেরাপুরে বাগার ইচ্ছে হলো।

গিয়েছিলো ক্যাপ্টেন ট্রাইটের বিবি ত্রিভুলাতীর কাছে। এই একটা জাঙ্গাভেই বাঁধ বাঁধ বাঁধ চম্পা। ত্রিভুলাতীরকে ভালোবাসে বলে নয়। একটা কেঁতুল জন্মেছে তার মেয়েটার সম্পর্কে। আর সামান্য পরিচয়ের পর মনে একটা অবোধ কল্পণও জেগেছে। ত্রিভুলাতী কি জানে, যে চম্পা তাকে মনে মনে কল্পণ করে? সম্ভবতঃ নয়। ত্রিভুলাতীরকে কানপুরের সকলেই

চেনে, জানে। এই সাতার সালে কানপুরে রেজিমেন্টে ভারতীয় সিপাহীরা আছে অনেক। আর কোঁজ ও কোঁজী-জীবনের সঙ্গে খনিট এবং অন্তরঙ্গ বন্ধ ভারতীয় হয়েছে। তারা ব্রিজহুলারীকে ঘেঁরা করে। ঘেঁরা করে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। কেন করে না, সে সব কথা চম্পা ভাসা-ভাসা শুনেছে। আর সব কথা উছ রেখে এই বলা চলে যে ব্রিজহুলারী যে-সাহেবের বিবি, সেই ট্রাইটকে কেউ দেখতে পারে না। নিজের আচরণে ট্রাইট সবলের ঘৃণা এবং অপাণ্ডিত্যের। রক্তে বেশ খানিকটা ভারতীয় জেনারেল আছে বাপের সিক থেকে। তার বাপ, ট্রাইট সিনিয়র হলো। মাত্রাজ পোশ থেকে চালাই হাত-কেহতা গোরা। গোরা বললে ভুল বলা হবে। কোনো মাত্রাজী কনকামা এবং কোন প্রয়োজ্যের গোরাই বিচারিত কলে সিনিয়র পৃথিবীতে আসে। বাপের কাছ থেকে বর্ষণ লাগতে চামড়া আর মাসের কোঁজডানো কালো চুল নিয়ে। আরকানো বড় হয়ে রেজিমেন্টের ইংরেজ সার্জ হলে জোনপুর হলট-এ ম্যাকমোহনের বোনের সঙ্গে আলাপ। এমিলি মার্গারেট ম্যাকমোহনের সৌন্দর্য ছিল না। স্বভাবতঃ ভীক হওয়ারে ট্রাইট সিনিয়র সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারলো তার ওপরে, ভারতে কোঁজী-ইংরেজদের বিয়ে বরবার উদ্বেগে বিলেত থেকে যে সব মেয়েরা আসতো এমিলি তাদেরই একজন। তবে লক্ষ্য-এ লা মার্গিনিয়ার আর কলকাতার ম্যাদাম জেনারি ফুলে সেলাই ও বাইবেল-টচার হয়ে বরসটা কেমন করে ছাফিখ থেকে ছত্রিশ হয়ে গেল। বিয়ে আর হলো না। আদা লেসের কলারে বুকটা ঢাকা আর খাড়া কুঞ্জী কাখে 'He loveth best' লেখা ক্রচ খাঁটা। তবু এমিলির বুকও যে পাখির সাথ-আহ্বানের কাহনা কিছু বেঁচে ছিলো, তার প্রমাণ হলো সহসা ভিত্তির আলবাট ট্রাইটের সঙ্গে বিয়ে হওয়ারে। ডিক্শন এবং লর্ড ইলিয়াট পড়া ক্যান্টনমেন্ট-সমাজ বিষয়ে মুহূর্ত্ত গেল খেলি-সেট এবং নসিহান ত'কে। ম্যাকমোহনকে প্রচুর সমালোচনা শুনেতে হলো। অপমান ম্যাকমোহনের খাড়া লিকারী গৌক ফুলে গেল বটে। তবে তা একান্ত সাময়িক। পরক্ষণেই বোনের জন্তে চিন্তিত না হয়ে পারলেন না তিনি।

এমিলিরও বলবার ছিলো। সবটাই কিছু প্রেম নয়। আর জোনপুরে সে ছিলো একলা। ট্রাইট ডুবে ছিলো ধা:-দনায়। এমিলি যে ভাইয়ের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা পাবেই, তা সে জানতো, এমিলির নীতিমূলক উপদেশ শুনেতে বৈধ ছিলো না তার। এমিলির জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। ট্রাইট সিনিয়র তার সুযোগ নিলো নির্ভর ভাবে। এমিলি পড়লো বিনপদে। এক চূড়ান্ত অবস্থার বিয়ে হলো তারের। আট মাসের বিবাহিত জীবনে অসুশোচনা করতে করতে এবং ট্রাইটের খেচ্ছাচারী স্বভাবকে ঘণা করতে করতে ট্রাইট জুনিয়রকে পৃথিবীতে এনে মাথা গেল এমিলি।

সিনিয়রের আর হাই হোক, বাচ্ছাকে মাহুয় করবার বৈধ ছিলো না। কিছুদিন দুখ-খাই আর তারপর লক্ষ্য-এ মিসেস ব্রুসের হোম। বাঁচবার কথা নয়। তবুও যে বাঁচলো ট্রাইট, সে শুধুই জীবনীশক্তির জোরে।

এখন অবশ্য অনেকেরই কটাক্ষ করে নেপথ্যে, বলে—ভগবান নয়, শয়তান গুণে বাঁচিয়েছে আমাদের আলাবে বলে।

সিনিয়রের কপালে এমিলির ভাইয়ের টাকা ভুটলো না। বেশী দিন সং-জীবনের বিধি-নিষেধ যেনে চলতে পারলো না সে। রেজিমেন্টের ইউরোপীয় অফিসারদের রঙ্গ সববাহারের তার নিয়ে কয়েক শো' টাকার গোলমালে পড়ে বরখাস্ত হলো সিনিয়র, উপযুক্ত কার্যকারণ না দেখিয়ে।

এমিলির ছেলে মিসেস ব্রুসের ওখানে টাকা বিনে কষ্ট থাকবে? সব হলো না ম্যাকমোহনের। বোনের অসুতপ্ত হৃদয়ের চিঠিগুলো তাঁর কাছে জমা করা ছিলো। হাজার হলেও তাঁরই বোন! আর তাঁরই ভরসায় এসেছিলো ভারতে।

মিসেস ব্রুসের হোমে এবার টাকা আসতে লাগলো ম্যাকমোহনের কাছ থেকে। কিছুকাল পরে। বছর ছয়েক হবে—সিনিয়রের যুত্ম-সংবাদ এলো বম্বের বন্দর থেকে। জনশ্রুতি শোমবার দিকে কোঁজ ছিলো না ম্যাকমোহনের। তবু সংবাদ কানে এলো। জানতে দেই হলো না যে, হঠাৎ বড়লোক হবার সব চেষ্টা বিফল হলে পরে সিনিয়র ঘুরে ফিরে পোর্ট-এর জুয়াড়ী-মাজা এবং অন্তান্ত চোরাই মাল পাচার ও বেচা-কেনার কাজে ডুবেছিলো। ১৮২০ সাল। এ দেশ ও দেশের মহুবা-সমাজের আবর্জনা বোকাই করে তুলে ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর—এই সব উপনিবেশের বন্দরে বন্দরে নামিয়ে দিয়ে হার লাহাজগুলো। পতু গীজ, কাহনিয়ান, ইংরেজ, করানী, ডাচ—ভিন্ন ভিন্ন দেশের মাহুয়। স্বভাব-চরিত্র এবং জীবন-বাগানের রীতিনীতি কিছু একেবারে এক। লাহাজের উলকি-খাঁকা ধালানী নাবিকদের সঙ্গে এদের দোস্তি। ভারতের কাঁচা মাল চলে যায়। বিলেত থেকে আসে সৌধিন হুগন্ধি, মদ, সিক, কাচের ভিনিষ। ভারতবর্ষে থাকতে হচ্ছে, সে 'ত' কাজের খাতিরে—এক জাতীয়-কর্তব্য পালন করবার তাগিদে। তাই বলে এই বোণী, তাত্ত্বিক, সত্যিলাহ, সাপ ও বাঘের দেশে এসে তো জীবন-বাগানের মান নামিয়ে ফেলা চলে না। আর স্বদেশে যার যেমন অবস্থাই হোক না কেন—এখানে এসে সকলেই শিল-পাশি জন চাকর-দাসী আর শিলাল বালো-বাড়ীতে পাকলাহেব। দেশের হাজারটা জিনিষ তাদের প্রয়োজন।

তাই ভারতের বন্দরে বন্দরে—বম্বে, মাত্রাজ, কলকাতার মাল-বোরাই লাহাজ আসছে আর নামিয়ে দিচ্ছে মাল।

কাদার পা দুঁতে পাঁড়িয়ে কালো গা ভারতীয়-কুলী সেই মাল নামাচ্ছে পাঁঠরি-পাঁঠরি। চাবুক হাতে পাঁড়িয়ে আছে যে সোঁরা কুলী-কট্টার তার জানা-জানিততেই ছুটো-একটা পাঁঠরি চলে বাচ্ছে এদিক-ওদিক। কিছু মাল চলে বাচ্ছে আর হাত-বলল হয়ে বাচ্ছে টাকা। সকলেই যে সেই চোরাই-মাল নিয়ে বৈধ ঘরে বাসনা করছে, তা নয়। ট্রাইট-সিনিয়রের মতো তারা কুস্তির পক্ষপাতী মাহুয়—তারা হাতে টাকা নিয়ে সোঁজাফজি চলে যায় কার্টের দোতলা ঘরে—সেখানে কেবোসনের ডিবরি ঝোলে ছাদ থেকে, আর গলায় কালো সূতোর ক্রশ-বাঁধা, হাতে নীল উলকি খাঁকা নানা জাতির মাহুয় একই মাতোয়াল কুস্তির ভাবার কথা কয়।

সে সব মাহুয় শেষ অবধি একই পথ ধরে। কেউ শেষ হয়ে যায় শিঠে চাকু খেয়ে—সেহটা তার জেলে-জিঙ করে নিয়ে ছুব সহজে ফেলে দেওয়া হয়। অথবা লাঠব্য মিশনারী হোমে—যোসে ভুসে শেষ হয়ে যায় মাহুয়।

ব্রাইট সিনিয়রের শেষ পরিণতিটার আসল কথা জানেননি ম্যাকমোহন। নোংরা অশ্রু, না পিঠে-পেটে ছুরি, না আরো বিজ্ঞী কিছু! তবে বলনা করে নেওরা চলে—গলার কালো স্রোত, বলিষ্ঠ লাল চেহারা; নোংরা এবং বদমাইস কোন পুরোন খালানীকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিশ্চয় বলতো—He has gone the old way ?

সিনিয়রের যুক্তান্তে নিশ্চিন্ত হয়ে ম্যাকমোহন জুনিয়রের দিকে তাকাতো সময় পেলেন। বোনের প্রতি অকল্পন হয়ে যে দিনগুলো গিয়েছে, সেগুলোর জন্মে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। এমিলির ছেলেকে মাদ্রাস করে তুলবেন। হাজার হলেও মাত্র আট বছর বয়স সে বালকের। বাগের ছেলে তো বটেই! কিন্তু সে কলঙ্কই কি সব? তাঁর বোনেরও ছেলে তো? মায়ের ভায়ে সে শিশু বড় হয়েছে। মায়ের সবুজপালীর কিছুই কি পায়নি? আর তাকে যদি ভিন্ন পথে, ভিন্ন শিক্ষার মাদ্রাস করা যায়, নিশ্চয় সফল হবেন তিনি। পর-জন্মে তাঁকে বিবাস করতে নেই। কিন্তু এমিলি যেন তাঁকে কমা করেনি। স্বর্গেই কি যাবেন তিনি? না গেলে শাস্তি পাবেন?

ব্রাইট জুনিয়র কিছু বাগের গুপের-ও টেকা দিতে পারে। বন্ধুত্ব: এ কথা বললে অভ্যক্তি হবে না যে, ব্রাইট সিনিয়র বাদ্যের মধ্য-পরে ভিড়েছিলো, যারা তাকে মুক্ত করেছিলো—সেই সব খালানী ও বয়খান্ড আহাজী-গোরা-র চরিত্রের সবটুকু নিষ্ঠুরতা, এবং পশুপক্ষি সমবেত হয়েছিলো জুনিয়রের চরিত্রে। ম্যাকমোহনের নিরাশ হতে বেশী দিন লাগেনি।

ইতি—ব্রাইট-কথা। বর্তমানে ক্যান্টন ব্রাইটের অবস্থিতি জানপূরে। আর তার নিভাসজিনী এক স্থলরী উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থানী মেয়ে ত্রিভুজলারী। ব্রাইটের জীবনে ব্রাইট অনেক মেয়ে নাড়া-চাড়া করেছে। এই মেয়েটা টিকে গিয়েছে যেমন করে যেন শেষ অবধি।

ত্রিভুজলারীর চোখের নীচে কালি। পাণ্ডুর ফর্সা রঙ। স্থলরী, কিন্তু নিকুশাপ ও মলিন। সর্বাঙ্গে গহনা। ব্রাইটের কোন কুৎসিত কৃতি সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত হয়। তার বিধিকে সে মালকুতা রাখতে এবং দেখাতে ভালবাসে।

ব্রাইটের সম্পর্কে বৃত্ত অবিখ্যাপ ও ঘৃণা আছে জানপূরের ভারতীয় ফৌজ ও ফৌজী-জীবনের মনে—সবটুকু ত্রিভুজলারীর গুপের এসে পড়েছে।

ব্রাইটকে ঘৃণা বা উপেক্ষা দেখাতে তারা ভয় পায়। কিন্তু ত্রিভুজলারীকে সুযোগ পেলেই উপেক্ষা ও তাহিল্য দেখিয়ে আঘাত করে।

ব্রাইটের কাছে কোন সুযোগ-অবিখ্যাপ দরকার হলে তারা আসে ত্রিভুজলারীর কাছে। ত্রিভুজলারী বখাসাঘা চোঁকা করে। মাদ্রাসগুলো পরিবর্তে তাকে কুঠরতা জানায় শুধু মুখে। কিন্তু এতটুকু অন্তরঙ্গ হতে দেয় না তাকে।

তার সম্পর্কে চম্পার কোঁড়ুল হোলো। ত্রিভুজলারীও তাকে জানতে উৎসুক ছিলো। দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎকার এবং পরিচয় হয়েছিলো বেশ মনে রাখবার মতো এক পরিস্থিতিতে।

দু'টি মেয়ের মধ্যে যেমন হওয়া স্বাভাবিক, তেমনই ভাবে। সম্ভবের ডেতার মিলে। [ক্রমশঃ]

তোমার বৃদ্ধকালে

[When you are old কবিতার ভাবানুবাদ]

(W. B. Yeats লিখিত)

চকল বোঁবনের শেষে প্রৌঢ় হয়েছ;

তোমার দেহের সীমানায়।

বোঁবনের মস্তন দেহবেশায় পড়েছে ভাঁজ

অকালে অঁধি ঘোর তন্ত্রায়।

সোনালী বেশমী ঢুল হয়েছ পটপট,

এমনি সময় একদিন ভাগ্যনের ধারে,

তুমি আমার বই পড়বে, তোমার মন

ছুটে যাবে বিগত বোঁবনের ধারে।

তোমার এই বৃদ্ধীকে কত জন

ভালবাসতো, দেহের সুবাসায়

কত জন ছিল বৃদ্ধ। প্রভাতে বিহঙ্গকাকীলীতে

যেমন স্তম্ভিত হয় মন,

তোমার কথার বরণাধারায় কত জন

জেগেছিল পড়ে মনে সারাক্ষণ।

একজন শুধু একজন ভালবাসতো তোমার,

তোমার বৃদ্ধীকে নয়, আশ্বাকে,

জ্বর দিয়ে সে তোমার ভালবাসতো।

বোঁবনের বুধরবি আর এই বৃদ্ধকালের ছবি

সভা গিয়েই সে ভালবাসতো।

আজ শ্রুতির সন্ধ্যার আশুনের ধারে যবে

তাঁকে তোমার মনে পড়বে।

তার প্রেমময় বুধ, তার স্বপ্নের প্রেম,

তোমার মনে আজ, বরা কুল হয়ে যাবে।

কিন্তু তবু তার প্রেম সে আজি অতি দুর্ভাগ।

সে যেন উঠেছে পর্বত-চূড়ায়।

অন্তরবির মত সে মিলিয়ে যাবে,

তোমার বোঁবন প্রেম তখনই কুরায়।

অনুবাদক—ত্রিভুজলারী সরকার

আজ ৩১শে ডিসেম্বর। বছরের শেষ দিন। রাত্তি বিছানায়

ওরে বছরের হিসাব নিকাশ চলছে। অকৃষ্টের তাকানার কথাই ভাবছি। বিছানা মাল, জাহাজের ভিতরকার দোলনা। উপর নীচে ছুটে। মোটা পাইপ দিয়ে সমুদ্রের তাল্লা হাওয়া আসছে। পাশ্প করে পাঠানো হয়। পাশে অনেক কোকর। ও দিয়েও ফুৎ-ফুৎ করে তাল্লা হাওয়া চুকছে। ওর ভিতরে সমুদ্রের দৃশ্য চোখে পড়ছে। বড়-বড়কানের সময় ওগুলো বন্ধ করে দিতে হয়।

মনে পড়ছে পুরোন দিনের কথা। এ সেই বোখাই সহর। এখানে চাকুরী করেছি বহু দিন। সেই চাকুরী ছেড়ে আর্মিতে। আবারও সেই বোখাই। এখানকার এক ধবের কাগজ। মালিক ছিলেন একদা এক কাগজেরই হকার। রাত কেটেছে কোনো সময় কারও বাড়ীর বাবাশায়, দিনের অবিকার কাগজের পাঠাগুলো পেতে। অতি দরিদ্র। অকৃত চরিত্র! আরও অকৃত তাঁর কপালের যোগাযোগ। ক্রমে চুকছেন এক বইয়ের কারখানায় কম্পোজিটার হয়ে। মাইনে খুব কম। সন্দের প্রেমের জোয়ার ঢেউ খেলে যায়। ওটা বখাসময় আসবেই। বাণা পায়ে না দাঁড়িয়ে। বরং হুঃখের সময় বান ডেকে আসে। প্রেম জোরালো হয়। বুদ্ধিও যোয়ালো হয়। কথার বলে—শিঁপড়ের বল, আর প্রেমের বুদ্ধি। ছুটোই খুব বেশী। প্রেমে না পড়ে বুদ্ধি খোলতাই কম হয়। এত করেও কিছু বিয়ে হয়নি। প্রেম গভীর হলে তখন না কি তা ফস্কার। “বাল্য প্রেমে অভিশপ্ত”—বলেছেন এক মহিলা-বন্ধু। বুদ্ধির জাহাজ। নিজের হৃদয় চিরে তা দান করেছেন এক বন্ধুকে। নিজে রয়েছেন চিরকুমার। পূর্বের বন্ধু নিকট হলেন। বন্ধু পেলেন বান্ধবী। বন্ধু বান্ধবী সবাই এক বাড়িতে, খুব অন্তরঙ্গ ভাবে কাছাকাছি। বান্ধবী হলেন নিকটতম। বন্ধু প্রেম। বন্ধু প্রেমের বিভিন্ন গতি।

“হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবে ক্ষুদ্র জলাশয়ও সমুদ্র হয়”—কে যেন বলেছেন। উনিও প্রেমের জাহাজে চড়ে বুদ্ধির সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছেন, চা খাইয়েছেন, দল গড়েছেন। নেতাদের ‘দান’ বলে অজ্ঞান হতে হয়। তাও হয়েছেন। তারপরই ছাপাখানার মালিক, কাগজের মালিক, এবং কাগজকলেরও মালিক। মস্তিষ্কে গোবরের স্রাব পদার্থ কম থাকলে ও থেকে অনেক কিছুই মালিক হতে পারা যায়। স্তব্ধতা অনেক কলকারখানা, অফিস আদালত, গাড়ী বাড়ীরও মালিক হয়েছেন ক্রমে। আমার এবং আমার মত অনেক হস্তভাগ্যারও মালিক হয়েছেন। জরুলোক টাকার কুমার এবং আজও কুমার। ছকে আঁটা টাকার কান। ধনভাগ্য, অর্থভাগ্য, সাহায্যভাগ্য, দরিদ্রভাগ্য, দানভাগ্য ইত্যাদির ভাগ্যের খুলেছেন হাজারে হাজার। দাতাকর্মী আর কি। শেষে সমস্ত ভাগ্যের গিরে এক ভাগ্যের জমত। সর্বদা তিনি চিনি হাসি। আর সব চাইতে মজার, তাঁর মনভুলানে মিলি কথার তুবড়ী। দিনে-রাত্তি সে ঐ খোঁটার বিরাট নেই। হাতে স্বর্ণ পাইয়ে ছাড়েন আর কি। কিন্তু কাজের পেছাই হাত-পা ঝেড়ে থালায়। তখন শরণশক্তি কমে যায়। চিনতে পারেন কম। Bluff এর বাহুকর। কথাও কাজে যায় দুঃস্বপ্ন ব্যবধান। সেই বাহু পলিটিনিরান! ওঁদের কথার চোখ বুজে সার বেওয়া যায়। দিতে হয়। কিন্তু মনে মনে বাক দিতে হয় পারসেন্টেজ—আপনাদের খুশী মত।

না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ভাল-বেভাল

কথার দাম বার। তার চাকুরীর ভরসা কি? স্তব্ধতা ও মারা ছাড়তে হোল।

ননষ্টপু রিডিং

পূবে বুকের সব নুকা। জাপানীরা বুকে নেমেছে। ঢালের বাজারে হঠাৎ আগুন। তিন টাকা থেকে এক লাখে সাত টাকা। একেবারে ডগলেরও বেশী। ঢালের বাজারে ঢালের বুদ্ধ। কোথায় পৌছবে কেউ জানে না। মহাশয় বলেছেন—নিউট্রাল। আমরা লোক দেব না। চার্চিলের সেই হুদার—“I know how to recruit.” “তরবারি দিয়ে আমরা ভারত জয় করেছি, তরবারি দিয়েই আমরা তা দখলে রাখবো।” বাঙলার Famine হলো। কবি যে তার আগেই গাইলেন—সুজলাং অকলাং শতজাংলাং—সেই সেনার বাঙলার ছড়িক। কারণ, বাঙলার যেহান হাত ছাড়া করা যায় না। বর্ষার শিক্ষা। জাপান পুরো বর্ষা জয় করেছে সাত সাত দিনে। বাঙলার ছুই নেতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার। কেলে আসা ভারতীয় সৈন্ত দিয়ে লিবারেশন আনি তব্বের হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার জন্ত। সে খবর বুটশ জানে। সুভাষের নামে বাঙলার যেহান পাগল হয়ে যায়। সেও বুটশ জানে। পাগল তাই ওরাও হয়েছে। স্তব্ধতা ধান চাল সব হাতের মুঠোর পুয়তে চায়। At any cost. তিন টাকা ঢালের মণ! একশ টাকা হলোও কতি নেই। সে টাকা দেবে গবর্ণমেন্ট। উপরন্তু খরচা আরও লাভ। জুটে গেলেন কনট্রাকটার। সরকারকে সাহায্য করতে। চাল বাগাবার কনট্রাকট। স্বক হলো কর্ডন। চাল গিয়ে পৌছল আশিতে, আর শব্দে। বিজাপনের চটক। বুকেদের ধরা হোল সেই কান পেতে। ধরে ধরে পাঠান হোল পাহাড়েরা ভারতের নিরাপদ পশ্চিম সীমা। কাটনী জরুলপুর আর পিণ্ডি। বিজাপনের মোহ, আর পোড়া পেটের টান। বুতীরাও বন্ধী কোল ওয়াকাইতে। ওরা অফিসারদের চোখের রক্তনী সুরমা। বাধক্যে রিডুভেশন। কাজে জানে উৎসাহ, আগ্রহে দেয় উদ্যোগ। সামনে বতকণ অন্তহীন উৎসাহ Fatigue কম। মনও বলে কানে। বাঙলা আর আমাদের টাকা ছড়ানো হলো প্রতি ইকি মাটিতে বর্ষা জয়ের পুনরাবৃত্তি ভারতে ঠাণ্ডা করতেই হবে। বাঙলা ও আসামে বুকেরা বুকে দাঁড়াতে পারে সুভাষের নামে, বদি ওরা জানে, স্তব্ধতা আছে ক্রটে। ওদের ‘দিল্লী চলো’ ধ্বনি ফুটেই হবে বিহারে। বাঙলা আসাম এত করেও বদি যায়। বাক।

চাল ধরার কনট্রাক্টে ধারা এগিয়েছেন সাহায্য করতে, কঁয়া সবাই উপর তলার প্যাসেজার। বসেছেন আরও উপরে ভূঁড়ি ছলিয়ে কুলিয়ে। নীচের তলার হাহাকাধের মর্যদম। আরও নীচে পথের উপর। শিও বুদ্ধ নারী পুকেদের মিছিল। বত সব হস্তভাগ্যার দল। গান ধরেছে—মা, কান হাও। একটু কান হাও মা, করে। এ বুকের বাজার। টাকা আরের সময়। সে কি ঐ গানের সময়?

টাকা চাই। আরও টাকা চাই। এখন শুধু টাকার গান চলবে।
সুতরাং সে ভাতের ক্যানের গান কারো কানে ঢুকলো না। ছড়িয়ে
পেল অনন্ত শূন্যে। এবং আজও তা ঘুরে বেড়ায় হাওয়ার।

হস্তভাণ্ডারী ফান পারনি আজও। সুজলা সুফলা শতভায়লা
না কি বাঙালদেশ। সে তৈরী হলো আশান। বুজা চললো প্রেতের।
মনুষ্টপ্, রিভি।

এপ্রিল ফুল!

একদা এপ্রিল মাসে। এক ক্রিপস্ এসেছিলেন ভারতে!
কী উদ্দেশ্য নিয়ে?

এক বাঙালী মস্তিষ্কের চিন্তাধারার প্রাবনে। সমস্ত খেতহস্তী
জেদে চলছে এশিয়া হতে। ওরা তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।

পূর্বোদা ইতিহাস। ডিসেম্বরে পাল্ হারবার কংস হোল
জাপানের হাতে। শরৎ বহু চার দিন বাদে বন্দী। জাহ্নঘারী
সুভাষের অন্তর্ধান, ব্রিটশের কড়া পাহারায় কলা দেখিয়ে।
শেখারায় কারুলের পথে তিনি রালিনে। কেক্রয়ারী মাচর্ সিঙ্গাপুর,
রেন্নের পতন। অতি ক্রুত জাপানীরা এসে পৌঁছেছে ভারতের
হারপ্রান্তে। এসে হাঁক দিয়েছে।

প্যারীর পতনের পর। ইউরোপেও ব্রুটনের চরমতম
হুমসম। লণ্ডন বোম্বার উড়েছে। রাজধানী শিকট হয়েছে, শুধু
অফিসিয়াল স্বীকৃতি নেই। প্যারীর বেশায় কনসীরা স্বীকার করে
ঠেকেছে। সুতরাং ব্রিটিশ ঠকতে পারে না। (ব্রিটিশ রাজধানী
সরিয়ে দিল কলকাতা থেকে দিল্লী। তারও স্বীকৃতি দিয়েছিল,
পরে।) এদিকে জাপান, ওদিকে জাৰ্মান। দুটিক থেকে
সাঁড়াই নিয়ে কোণঠাসা। ভারতের অসন্তোষ। ক্রিপসের
ভারতে না এসে উপায় ছিল? বে ক্রিপস কলকে লাগিয়েছে
কাজে—জাৰ্মানীর বিপক্ষে।

চরমতম হুমসম ব্রুটনের। চার্চিলের চুকটের ঘোঁরা
গোলা পাকায় শূন্য। বাঙলা কি করে ঠাণ্ডা হব, সেই চিন্তায়।
গোল্লায় বাক্ বাঙলা। সুজলা সুফলা সোনার বাঙলার সেই গোল্লা
টেনে আনলো হুভিক। চার্চিলের মনোনীত পাঁচজন কনট্রাক্টর।
ধান-চাল ধরে ধরে হুভিক স্ট্রীর কাজে মতেছেন ঠাণ্ডা।

অতি ক্রুত ঘটে চলছে ঘটনার সংঘাত। আবর্ত উঠেছে গভীর,
গভীর হয়ে।

এ-হেন পট ভূমিকায় ক্রিপস এসেন ভারতে। হাতে করে
স্বাধীনতার স্বর্ণ সুযোগ! নেতাদের মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার
মোরা খাওয়ার কথা। স্বাধীনতার প্রস্তাব। কথায় বলে—‘সেধো,
সেধো, ভাত খাবি?’ ‘না, পাতা পেড়ে বসে আছি।’ পাতা নিয়ে
বসে রয়েছেন দলগুলো সব। ভাতের ধামা কাঁখে নিয়ে বোরা-
কেরা করছেন বিনি, তিনি ক্রিপস। কারো পাতে পড়েনি কিছু।
‘ভাত খেতে পারে সবাই। তার আগে কথা দাও। তোমরা কি
জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চাও?’ সবাই সমস্বরে কানে তাল লাগিয়ে,
চোখে দুটি পরে—‘না, না, না, না!’

‘তবে এ যে সুভাষ আসছে জাপানী সেনা নিয়ে?’

(ওরা মনে করছে নেতাজীও জাপানে। বালিন থেকে অদ্ভুত
পথে আকাশের বুক চিরে পৌঁছেছে। ওখানে বে বাসবিহারীর
চিন্তাধারা কাজ করেছে বহু দিন ধরে, ব্রিটিশ ভা স্বপ্নেও ভাবেনি।)

কেউ বললো—ও কিঞ্চ কলামনিষ্ট। কেউ বললো—আমার
হাতে বিভলভার দাও। আমি ওকে নিজ হাতে গুলী করবো।
কেউ চাপালো উন্টো গাধার পিঠে। কেউ করলো নেতাজীর
বহুৎসব। ভাতের ধামা ধামা-চাপা বইল। মহাসভার পাতা ঝড়ে
উড়লো। ঝিলু ঝিলু ঝিল চাপা হাসি হেসে ভোজের সভা ছেড়ে
বেরিয়ে এসেন বিনি, তিনি ক্রিপস।

শরৎ বহু আর ধারা তাল্লা খুন সরবরাহ করেছেন বুক চিরে
স্বাধীনতার যুদ্ধে, তাঁরা সবাই জেলে পচছেন। ভাতের লোভে
ধারা কথা বলছেন, তাঁরা সবাই নেতা। পাওয়ার পাওয়ার
লোভে। জেলের ভেতর বন্দী মাছুষ। জেলের বাইরে প্রান করে
ডেকে আনা হুভিক। আর এই শটভূমিতে ঠাণ্ডা চালিয়ে চলছেন
বা, তার নাম—আলোচনা। আ-লোচনা। আর অদ্ভুত। কেউ
বলেন নি, রাজবন্দীর বন্দী থাকতে আলোচনা চলতে পারে না
কেনো। উচিতও নয়। আরও অদ্ভুত, ক্রিপস জাহ্নঘাৎ ফিসির
ফিসির, কানাকানী আলাপ—সুভাষের মৃত্যুতে মহাসভার শোক
প্রকাশ উচিত হয়নি।

‘সুভাষের মৃত্যু হয়েছে বালিনে’—ধবর বটার রয়টার। আর
মহাসভার শোক প্রকাশ শরৎ বাবুর কাছে, সেই সবাদ শুনে।
ওরা লোক চেনে। তাই বেছে বেছে আমাদের কানে কানেই
কথাটা বলেছে। কোন্ কথা কোথায় বলতে হয়। নার্ভ চেনে
তার ভাল করে। সুভাষের মৃত্যুতে আমাদের শোক প্রকাশ
করতে নেই। সে আজও আমরা তার অন্তে ভাবি না। ট্রেটর।
সুভাষের মাথায় ব্রিটিশ তাড়ানোর প্রান। আর আমরা তাড়িয়ে
চলেছি ঠাকৈ। প্রান করে। তাঁর প্রান বানচাল। দুই বাঙালী
জেনের বিকছে গলা চিরে চিরে গলা কাটগেছি, তাই আমরা না
নেতা নামে অভিহিত হতে পেরেছি। ঠাকৈ চাপিয়েছি উন্টো
গাধার পিঠে। প্রদক্ষিণ করাও সহ্য। দাহন কর সদয় রাস্তার
গাধার টুপি মাথায় দিয়ে। সর্বস্বত্যাগী সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সন্ন্যাসীর
সন্ধান কি আমরা দিইনি? ডুয়ো স্বাধীনতা প্রস্তাব। তার
পেছনে করে আনা জাশনাল আমির কবরখানা।

চার্লিস হেসে নিয়েছেন প্রাণপণে। মিশন শেষে ক্রিপস,
কিরেছেন বেশে বার্ষতা নিয়ে? ইতিহাস বলে,—তাই।

কিন্তু ঠাণ্ডা নাটিকা! অলস্ত অক্ষরে লেখা তার স্বনিকায়
ছিল—

“APRIL FOOL!”

কে?

ক্রিপস্, চার্চিল?

না, নেতারা?

নার্ভবিহীন নেতৃত্ব। চার্চিলের প্রেতাত্মা হাসছে—

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ধমকে গেছে যে ক্রুতগতি ইতিহাসের ঢাকা। ভারতের
হারপ্রান্তে পৌঁছে। মাচর্ পৌঁছেই হট। ক্রিপসের ভারতে না
এসে উপায় ছিল? নেতারা বন্দী হলেন আগষ্ট। হিড়িকের
মাঝে হাতীর খাওয়ার অনেক দরজার গড়তে গড়তে ঠেকেরি
এসে আশিঙে।

ক্রিপস, গিয়েছেন বিকলতা নিয়ে। তাইই নাম এপ্রিল ফুল।

বর্ধ-বিদ্যায়

কখন নিম্নোক্তবীর আকর্ষণ ঘটেছিল। ঘুমের মাঝে চাউলির
শ্রেতাঙ্ক। দুঃখপ। অখণ্ড চাউলি আজও বহাল অবস্থাতে বৈতে।

হঠাৎ বিকট শব্দের আকর্ষণ। দুঃখপের ঘোর কাটনি? হাজার হাজার সাইরেন আর জাহাজের বাঁশী। বেজে উঠলো একসাথে। সমুদ্র ও সহর থেকে। জাপানীরা এসেছে বোমা ফেলতে। হঠাৎ মাঝরাতে অতঃশো বিকট আকর্ষণ হতচকিত করে দিয়েছে সবাইকে। কর্কশ সেই আকর্ষণ আজও আমার মনে মনে বাঁধা। উঠে বসেছি। শত শত সাইরেন আর বাঁশীর রেশ। ছুটে আসছে জাহাজ জীমার আর সহর থেকে তীক্ষ্ণ করে। সে তরঙ্গে ভুবে গেছে সমস্ত পৃথিবী, বেরিয়ে এসেছি, জাপানী গেন থেকে বব পড়ার আগেই।

আকাশের দিকে চেরে আছি। গেনের আওরাজ শোনার আশায়। মাথার উপর সীমাহীন অনন্ত আকাশ। নীল, নক্ষত্র-খচিত। কিন্তু শুষ্ক। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। গেন কোথায়? মাথার উপর মাথ-ঝাঞ্জে একখানা চাঁদ হেসে চলেছেন লুটোপুটি খেয়ে। আমাদের অবস্থা দেখে। তার রক্তধারার সমস্ত পৃথিবীর মানপর্ব চলেছে। খণ্ড খণ্ড রৌপ্য গলে গলে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁদ থেকে। সমস্ত সমুদ্রে। বর্ণনাতীত সে বোঝাই সহঃ। সে-ও হাদি পড়েনি সে সুধাবুধি হতে।

বাঁশী। রেশ তখনো ধামেনি। টেন চলেছে সমানে। সমুদ্রে লীত কম। তবু সে নিঃশব্দ। একমাত্র আওরাজ ঐ সাইরেন আর বাঁশীর। একটানা আর বিকট হয়ে। আকাশে চাঁদের চাঁদি নিয়ে খেলা। কিন্তু বাতাসের ঐ আমন্ত্রণ? যড়িতে হাত বাঁটা। জানা গেল, এ বর্ধ-বিদ্যায়ের ধনি।

পুরাতন, জীর্ণ রাস্তা, অশেষ দুঃখের, অন্তত অভিশপ্ত দীর্ঘ বৎসরের বিদায়। আর নব বৎসরের সাধর আবাহনী। ওঃ! তাই এত সাইরেন আর বাঁশীধনি। নমস্তে! বিদায়!

জাপানী টর্পেডো

সকালে সূর্য জ্ঞার আগেই জাহাজ চসতে শুরু করেছে। বিকি যিকি এজিন চলার শব্দ আসছে। জাহাজ চলেছে, কিন্তু থুব আন্তে। কারণ জলে শব্দ হবে না। শব্দ করার উপায় নাই। বর্গ জাপানের দখলে। আর ভারত মহাসাগরে জাপানী সাবমেরিনের অপ্রতিহত রাজত্ব। ওরা অনেক জাহাজ ডুবিয়েছে। বর্মী জয়ের পর। এখন অনেক জাহাজ এক সাথে ছাড়ে কনভয়ে। ডেট্রয়ার থাকে। ভারতের উপকূল বরাবর দক্ষিণ চলেছি। ক্রমে জাহাজ পূবে ঘুরেছে। কোন দিকে চলেছি? মনে হয়, এবারও সেই বর্ধার জঙ্গল। সূর্য জাহাজের মাথায় ওঠেন, আর লেজের দিকে অন্ত বান। ক্রমে ভারতের উপকূলও অন্ত গেছেন, দুই-একদিন আগে। এদিক, ওদিক, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে যেদিকে তাকাও সমানে জল। শুধু জল আর জল।

ও-আর-সি-এল এর



কুমারেশ

নিজের ও দেউড়ীর পীড়না

৬৫

দি ওরিয়েণ্টাল ডিসার্ড্র অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কলকিনিয়া গাছ-পালা বা খড়-কুটা কচুরী পানা, কোথাও নজরে আসে না। কোনো চিহ্ন নেই। সব লেগে পুছে একাকার। এক কথায় অকল পাখার। ভাসছি আমরা, আমাদের জাহাজখানা খোলামথুচি।

চার দিনের দিন। জাহাজের গতি আরও মন্দ। শব্দ আরও গভীর। চারি দিক নিস্তর। চার পাশের জাহাজগুলো বড় দূরে দূরে, ওরাও তেমনি নিশেধে চলেছে। দূর থেকে দেখা যায় মাত্র। কোনো কাজ নেই, নিশ্চিন্ত আমরা। খাও দাও ঘুমাও। তান পেট, বই পড়ো আর গল্প করো। বা খুশী। কাল রাতে হাওয়া ছিল। জাহাজ চলেছে। আহাড় খেয়েছে খুব। কি বিল্লী আওয়ার। কে যেন খোপার পাটে আছড়েছে মনে হয়। সারারাত ঐ আওয়ার তান কেটেছে। ঘুম হয়নি। ওরকম আহাড় খেলে ঘুম হয়ও না। গল্পকে মাঝে মাঝে হাওয়া হয় ঐ রকম। বড়-বর্ধা হলে ত' কখাই নেই। জাহাজ খুব দোলে। বমি হয়। তাই জাহাজের ঠিক মাঝখান বরাবর এক গোপন ভায়াগা খুঁজে পেয়েছি। ওখানে দোলা কম হয়। সী লিকনেন নেই। নতুবা এ-ওর ঘাড়ো হড়-হড় করে অঙ্গপ্রাণনের পদার্থ তুলছে। কিছু বলবারও নেই। কারণ, সকলকার ঐ এক অবস্থা।

সেদিন কি বার ছিল? মনে নেই। সকালে কার মুখ দেখে উঠেছি। তাও মনে পড়ে না। তুপুরের আহার সেরে সব দোলনায় ঢেপেছি। মাথার কাছে ফোকর। খুলে দিতে এক বলক সন্দের ঠাণ্ডা হাওয়া। প্রাণ জুড়ায়। মাথাটা পবিত্র মনে হচ্ছে, ওর ভিতর দিয়ে সন্দের দেখ। কি চমৎকার দৃশ্য! যেন একখানা ছবি। সন্দের আর আকাশে মেলামেলা। দুই অনন্ত এক সাথে। ঐ এক ঝাঁক উজ্জ্বল মাত্র। তা দুই ভিন মাইল ভায়াগা জুড়ে ওরা ভেসে চলেছে। ওরা কি জানি কেন, উড়ে উড়ে জাহাজও পার হতে চাইছে। মনের আনন্দে ওরা জলের উপর দিয়ে বহু দূর উড়ছে। আবার জলে গিয়ে পড়ছে। জাহাজে ঠাকুর থাকছে অবিরত। ক্রস্কেপ নেই। সাদা সাদা রূপের মত গা। চকচক করছে। দেহ-সমান লম্বা গলা। ডেকের উপর পড়ছে। আর ছুটুটু করছে। খালানীকের মহা স্মৃতি। ওরা সেগুলো ধরে খলয় পুচ্ছে। পরে রাগা করে খাওয়া হবে।

দেখতে দেখতে ঘুমও এসেছে। বিরাট একটা কাপু'নী দিয়ে আমাদের জাহাজ ধেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। বজ্রের আর্তনাদ কি এর চাইতেও কঠোর? সেই আওয়াজে তক্তার বোর কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসেছি দোলনায়। এঞ্জিনের আওয়াজ ধেমেছে। বদলে বেজে উঠেছে এলা। সবগুলো এলাই একসঙ্গে বাজছে। এ হচ্ছে চরম পরিস্থিতির এলা। প্রস্তুত হও। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে—জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা, বন্ধু-পরিজন। বন্ধু-বান্ধব পরিত্যক্ত হেঁড়ে। চরম ডাকের প্রতিক্রিয়া জন্মে এলা। এখন নেওয়া চলবে শুধু মাত্র লাইফ জ্যাকেট। আর কিছুই রাখা করা চলবে না। তিলা'র সময় নেই। জাপানী টর্পেডো বসান দিয়েছে জাহাজের ঠিক মাঝখানটিতে।

আমাদের জাহাজখানা ছিল খুব বড় আর ভারী। টনের কথায় বলা ঠিক হবে না। নীচে থেকে উপর পর্যন্ত পাঁচতলা সযান উঁচু।

সবের নীচে ওর নিজের কল-কল। তার উপর বেশান, টোর, কর্মচারীদের বায়গা। ভিনের তলার গোলন্দাজ। আর চারের তলার আমরা। এর মাঝখানে সাজান গোঁহান বিরাট ডাইনিং। পাঁচের তলার কমাণ্ডারদের কেবিন। আর একেবারে উপরে নীচ গভীর ব্যাণার। বড় বড় কামান আঠাশ পাউণ্ডার। এ্যাক এ্যাক মানে এ্যাকটি এয়ার ক্রাকট। রেডিও ব্যাডার প্রতিক্রিয়া এ্যাসটেন। আর আছে জাহাজের নাক। যা দিয়ে ভিতরে হাওয়া পাঠানো হয় পাম্প করে। দেখতে ঠিক যেন কান। অব্যর্থ গুদের লক্ষ্য। ভেঙ্গে সমান দুই টুকরো হয়েছে। জলে ক্রমাগত ডুবে। রবার-নলে হাওয়া ভরে নিয়ে আমিও উপরে উঠছি সবাই মতো।

উপরে উঠবার নিশ্চিতে পা দিয়েছি। অভূতপূর্ব সে দৃশ্য! কল্লণ, আর বীভৎস। আমাদের ক্যান্টেন বোর। ছোটো ঠ্যাং সিঁড়ির ধাপের উপরে দিয়ে মাথাটা ডেকের পাটাতনে, নীচের দিক দিয়ে গুয়ে আছেন। ওর মাথার splinter লেগেছে। সেই অবস্থায় উপরে উঠতে গিয়ে মাথা বুরে পড়েছেন মনে হয়। আর মাথার খুলিটা হু ফাঁক হয়ে খুলিটার ছড়াছড়ি। কাপড়-চোপড় প্রচুর রক্ত। উরুতে না কোথায় আরও splinter লেগেছে। মস্তিষ্কের পদার্থ ছড়াছড়ি হয়েছে যে লোকে বাকরোধ হয় না, তা দেখলাম এই প্রথম। ওই অবস্থাতেও তাঁর পিপাসা। "পানি দেও" "ওয়াটার ওয়াটার" বলে চীকার। কে কাঁকে পানি দেয়? চাচা আপনার প্রাণ বাঁচ। সবাই নিজের নিজের প্রাণ পদার্থ হাতে নিয়ে পলায়নে তৎপর। কিন্তু বাবে কোথায়?

ধড়মড় করে সবাই উপরে হাওয়া করেছে। লক্ষ্য সেই লাইফবোট। চোদখানা লাইফবোট ছিল এই জাহাজে। সাধারণতঃ পাঁচ ছয় খানার বেশী থাকে না। এই জাহাজে সব চেয়ে বেশী দেখছি। বড় বড় কমাণ্ডার চীকনের জাহাজ বলে সম্ভবত এই ব্যবস্থা। অতি-বিষম এক শূন্য। সব চেয়ে মূল্যবান এই শূন্যত্বটুকু। একজনের অস্তিত্ব মরান। তার শেষ প্রার্থনা এক কীটা জল। তার জন্ত কত কাকুতি। কিন্তু কে দেয়? সমর কোথায়? আপনার জীবনের চাইতেও কি ও মূল্যবান? এক লাফে এর পর উপরে উঠেছি। কিন্তু লাইফবোট কোথায়? একখানায়ও নেই। নামিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে সব কখানায়। শেরখানায় ছাড়ছে লোক-বোঝাই। অনেক হালকা কাঠ ছিল। লাইফবোট ছিল। কিন্তু নেই। সব জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতাকে নিজের প্রাণ বাঁচানর ষ্টোয় অস্থির। কে কাঁকে দেখে? কত সময় লেগেছে আমার উপরে আসতে? মাত্র এক পলকও ক্যান্টেনের দিক চেয়েছি। তার ভিতর এত কাণ্ড। জাহাজের কর্মচারীরা নীরবে বগায়মান সারিবদ্ধ ভাবে। জাহাজও ডুবুড়ু। জলের তলার ঠাই পাতবায় আশায় ও অতি ক্রম নেমে চলেছে। উপরে এখনও হাজার হাজার প্রাণ—প্রাণের আশার আকুলি বিকুলি ছুটোছুটি করছে। উদ্ভাসের মতো সে ছুটোছুটি। শুধু নিজের প্রাণটুকু নিয়ে একটুখানি বেঁচে থাকার আশায়। নিরস্তির অমোঘ বিধান। কারও পরিজ্ঞান নেই। এবার জাহাজ ডুববে। মাথার উপর পূর্ব কিংবা বেলেছে। আর উপার নেই কোনো। জলে কাঁপ দিচ্ছেই হবে। দেখানোই আরও অনেক। আগে থেকে

যাবারনলে হাওরা ভরে নিরেছি। ওটা একটা করে ঐতোককে দেওয়া হয়েছে জাহাজে ওঠবার সময়ে। ওটাই একমাত্র ভরসা। কোমরে জড়িয়ে নিরেছি। সীতার কাটতে আর পাঁচ জনে আমাকেই আঁকড়ে ধরেছে। সুরু হোল জীবন-সগ্রাম। সত্যিকারের জীবন-সগ্রাম।

অকূল সমুদ্রের মাঝখানে। তিন-চার দিন কূল ছেড়ে এসেছি। সামনেও তিন-চার দিনে কূল পাবার কথা। যদি জাহাজ চলতো। বারো দেখাদেখি জলে বাঁপ নিয়েছে, বেকীর ভাগট পাজাবী আর মাজাবী। ওরা সীতার জানে না। ওরা নিজেরা পরম্পর জড়াজড়ি করেছে, ধরেছে, মরেছেও। ডুবছে সবাই। আমাকেও ধরলো। সীতার জানলেও অবস্থার ভুলে যায় সবাই। ভয়ে ভুলে যায়। জাপটা-জাপটা করে সবাই বাঁচার আশায়। করে মরে। কিছু বা হোক ধরে বাঁচার আশা, আর সীতার জানলেই বা কি! অকূল সমুদ্রে সীতার কেটে বাঁচার আশা যে কতখানি? বিশেষতঃ হাল্লর কুমীরের দেশে? ওদের জাপটা-জাপটের হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়েছি বহু কষ্টে। মুখ তুলে দেখি, জাহাজের অস্তিত্ব ততক্ষণে বিলুপ্ত হয়েছিল। এ কয় দিন বে ছিল সাধী, ডুবে যাবার সময় সে একগাছা খড়-কুটো বা বেশলাইয়ের কাটিটা পর্বন্ত রেখে যায় নি বা ধরে বাঁচতে পারি। সবটী সাধে নিয়ে ডুবছে। সরে এসেছি আগেই। নতুবা আমাকেও টেনে নিয়ে যেত সমুদ্রের তলায়। ওর সাধী হব বলে।

শেষ প্রাণতরঙ্গী ছেড়েছে আমার চোখের সামনে। আর একটু আগে এলে ওতে আমার জায়গা হোত। বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি ক্যাপ্টেনকে দেখতে গিয়ে। কিন্তু সে-ও তো বৃহত্তমাত্রা। আর সহজ মানবিকতাবোধ। হেলার অসুযোগ হারিয়েছি। সীতার কাটছি প্রাণপণে। শেষ তরঙ্গী কোথায় আছে? কিছুই দেখা যায় না। অন্ন অন্ন ঢেউ, চোখে-বুকে আছাড় খায়। হাত তুলে মাড়ছি। যদি ওরা দেখতে পায়। দয়া করে একটু তুলে নেয়। অকূল সমুদ্র। লক্ষ্য বিহীন সীতার। ওদের সাথে লড়াই করেও খুব ক্লান্ত। প্রতি বৃহত্তে মনে হচ্ছে, হাল্লর আর কুমীরের আর্মিগ্রন। শেষ পর্বন্ত দল বেঁধে আক্রমণ চালাবে। আর সাবড়ে বেলে। আচ্ছা, কয় মাইল জল পারের তলার? সে কথা মনে নিয়ে আঙ্গুও প্রাণ খালি হয়ে যায়। কুমীরের ভয় তার কাছে অতি তুচ্ছ। অগাধ অপার সমুদ্র। আর আমি কুস্রাতিকুস্র মাহুয়। হীনবল হাল্লর প্রাণী মাত্র। ঘটীর পর ঘটী সীতার কেটে বাঁচার আশা। হাল্লর কুমীর তিমির দেশে। আরও কত রকমের প্রাণী আছে, বারো মাহুয় খায়। ওর তলায়, কে জানে! হার বে জীবন।

ভারত মহাসাগরের মাঝখানে। জলের সাথে লড়াই চলছে

প্রাণপণে। প্রাণের আশা ছেড়েছি। যতক্ষণ ভেসে থাকি যার, সেই একমাত্র আশা। ততক্ষণ এ-ও আশা করছি হাল্লরের দল বেঁধে আগমন। ওরা জাহাজেই মহাব্যসর চালিয়ে বাচ্ছে। নতুবা হুই-একটার দেখা এতক্ষণে মিলতো। এই ক্ষুদ্র দেহ। ওদের সবার প্রয়োজন হয়তো মিটবে না। দুব হাতে তেড়ে আসমন। আর দেহ হতে এক খাবলা মাস তুলে নেওয়া। দেহ থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। যনের আনন্দে লেজ নেড়ে নেড়ে তাই খাওয়া। যন্তে চার দিক ভাসছে। হুবিতে দেখেছিলাম। তাইই প্রত্যাক অহুত্বিত আজ মিলবে। নাঃ। ওরা এড়িয়ে গেল। হয়তো দেখেনি। পরস্পরের অসীম দয়া! শেষ তরঙ্গী দেখা গেল। সেই তরঙ্গী কাছে এলো। অথবা আমিই কাছে গেলো। অথবা স্রোত বা হাওয়া আমাকে ঠেলে নিয়েছে। সে রহস্য আজও অজ্ঞাত। ভগবান শেষ পর্বন্ত সাহায্য পাঠালেন। কী প্রয়োজন ছিল? প্রাণতরঙ্গী হাতের কাছে। প্রাণের ভার নিয়ে তিনিও ডুব-ডুব। 'ঠাই নাই, ঠাই নাই, ভরা সে তরী।' সোনার ধানে নয়, প্রাণের ভারে। কাজেই কষ্ট করে আর নৌকোর উঠতে দিলো না কেউ। কারণ ইকি কয়েক তুলে তিনিও মহাসাগরের তলার দিকে গিয়ে আসার জমাবেন। অনেক দড়ি ছিল তার চার পাশে। তখন তার মানে বুঝিনি। এখন ঐ ধরেই ঝুলে আছি। ভালো। অনেক সীতার কেটেছি। খুব ক্লান্ত। ফলেই বইলাম ঘটীর পর ঘটী। একলা নয়, এই বা মুখ। আরও হুই-তিন জনা ঝুলছেন। শীতের সন্ধ্যা। ঠাণ্ডার সমস্ত শরীর অসাড়, অবসর। দড়ি ধরেও যে ঝুলবো, সে আশাও কম। আর বেকীকণ আশা নেই।

পূরোপরি অন্ধকার হতে তখনো বাকী। মাথার উপর দেখা গেল প্রেন। আমাদের না ওদের? ঘুর-ঘুর চক্কর দিল কয়েক। কি বেন দেখল। কি দেখল না। বলতে পারি না। চলে গেল প্রচণ্ড শীতে, সমুদ্রের জলে ভিলে কয়েক ঘটী। আর জল খেয়ে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে, আমার তখন চরমতম অবস্থা! প্রাণ যায়-যায়। বেঁচে আছি, কি মরে আছি সে অতৃষ্ণিতও তখন লুপ্তপ্রায়। একখানা জাহাজ এসেছে। দড়িও কেলেছে। কিন্তু আমার শরীর মন, সমস্ত সত্তা তখন আচ্ছন্ন, অবসর। যখন জান কিয়তছে, তখন জাহাজের নরম বিছানায়, গরম কাপড়ে জড়ানো, শুয়ে। কখন কি ভাবে জাহাজে উঠেছি, সে আমার জানবার কথা নয়। সিঁটার খানিকটা গরম দুধ আর ত্রাণি দিলে মনে হোল, বমপুত্রীর দক্ষিণ দরজা দেখে কিবে এসেছি। কিছুটা আরাম মনে হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছি ক্লান্তিতে।

শুভ-দিনে মাসিক বহুমতী উপহার দিন

এই অধিমূল্যের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা বেন এক দুর্লভ বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মাহুয়ের সঙ্গে মাহুয়ের মৈত্রী, প্রেম, শ্রীতি, বন্ধ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বাধিকত, নরতো কারও কোন কৃতকার্যতার আপনি 'মাসিক বহুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার দৃষ্টি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বহুমতী'। এই উপহারের জন্য অতৃষ্ণা আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই থালায়। প্রথম ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা ভ্রমের ভূমি হবেন, সশ্রুতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের প্রাহক-প্রাহিকা আমরা লাভ করেছি একা এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিবরে নেকোন জাতবোঝা জন্য লিখন—প্রচার বিভাগ, মাসিক বহুমতী। কলিকাতা।

কবি কৰ্ণপুৰ-বিৱৰ্টিত আনন্দ-বন্দাবন

[পূৰ্ব-প্ৰকাশিতৰ পৰা]

অম্ববাদক—শ্ৰীপ্ৰবোধেন্দুনাথ ঠাকুৰ

৫২। পূৰ্বেও, যে বাঁৰ গৃহ খেকে বেরিয়ে এসে, বালাসহচৰেয়া মিলিত হতেন কৃষ্ণ-বলৰামেৰ সঙ্গে। কিন্তু অধুনা, শ্ৰীকৃষ্ণ যখন স-বলৰাম স-বালাসহচৰ, ও স-বালকদাস চল বাঁহলেন খেতুড়েদেৰ নিধে, তখন তিনি হয়ে উঠলেন রাজা আৰ অস্তিত্ব সকলেই যেন তাঁৰ মতী। তাৰপৰ ব্ৰজপুৰেৰ প্ৰত্যেক অলিতে গলিতে ধূলা নিয়ে সে কী তাঁদের ধূলাটি-খেলার ধূম! কী ছড়াছড়ি, মন্ততা! সঙ্গীদের মধ্যে কৰ-দণ্ডেৰ চপল তান্তব দেখিয়ে কৃষ্ণ যখন নাচতেন, নিজের গায়ে পৰেৰ গায়ে ধূলা মাখাতেন, ধূসৰ কৰে দিতেন সকলকে, তখন মনে হত শুভ উচিতের গজৰাজের বাছাটি এ নাচছেন।

আৰ তাঁৰ খেলার সঙ্গিনী হতেন ব্ৰজবালিকাৱ। নিঃসঙ্কোচে তাঁরা খেলতেন। সকলেই শিশু, একত্রে ভয়ে-বসে সবাই মাছুৰ। সঙ্গীদের যে চোখে দেখতেন শ্ৰীকৃষ্ণ, সেই চোখেই দেখতেন সঙ্গিনীদের, তাঁৰ চোখে যে সবাই সমান। সকলেই মহাখুসী হয়ে উঠতেন খেলায়।

কখনও কখনও ছেলের দলের আৰ মেয়ের দলের সঙ্গে কৃষ্ণের ঝগড়া লেগে যেত। তখন তিনি তাড়া লাগাতেন তুটে দলকেই। কিন্তু তাঁরাও কেউ কম বান না। উলটে তাঁরাও কৃষ্ণকে তাড়া মেয়ে বসতেন। কখনও হোঃ হোঃ করে হাসি, কখনও মুখ ধমধমে ছেলেমাছুৰী বাগ। বাগতেন না কিছু কৃষ্ণ।

৫৩। নন্দ-বল্লাল কখনও ধূলা জড় করে করে পাঁচিল ঘৰ গড় ইত্যাদি তৈরী করে বসতেন, কখনও আবার অস্ত্ৰের গড়া ধূলায় পাঁচিল গড়া ইত্যাদি ভেঙে দিতেন। বাঁসের গড়া ভাঙতেন তাঁরাও আবার তাঁৰ গড়া ভাঙতেন। ফিরে আবার কৃষ্ণকে বসে যেতেন ধূলায় গড় ইত্যাদি গড়তে। আবার নিজেই ভাঙতেন। এই বকবের ভাঙাগড়া গড়াভাড়া খেলা খেলতেন বালকৃষ্ণ, আৰ দ্বিষালোক খেকে দেখতারা দেখতে থাকতেন সে কোঁতুক। তাঁদের কোঁতুলন বেড়ে যেত, আপনমনে তাঁরা বলতেন—বাঁৰ একটা কটাক্কে না-মানি কত-শত ব্ৰজাণ্ডেৰ স্ফুট হয়, স্থিতি হয়, লয় হয়, তাঁৰ আজ সে বিষয়ে বড় নেই এতটুকু! তিনিই এখন ধূলি-দুৰ্গ ধূলি-ভবন গড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন! অতিশ্ৰান্ত হয়ে বামছেন, তবুও নাম নেই বিৰামের। গগনপারের দেখতারা দেখতেন আৰ হাসতে থাকতেন আনন্দে।

৫৪। দীৰ্ঘ দিন ধরে ধূলাট চলত শ্ৰীকৃষ্ণেৰ। ঘরে ফিরতেও তিনি ভুলে যেতেন। পথে পথে গলিতে গলিতে তিনি খেলতেন। আকাশে খেলা করে যে ঐ শিশুপুৰ তাঁরই মন্তন সুখের আবেশে তিনি খেলতেন। খেলা দেখতে দেখতে ব্ৰজপুৰের পুৰবাসিনীদের মনে সকার হত মাতৃভাবের, আশ্রয়তঃ তাঁরা বলতেন—আৰ রে আৰ, আমাদের নন্দবল্লাল আৰ। আমাদেরও আঙিনাটি ভারী দুন্দর, ভারী ময়র। ছেলেদের নিয়ে খেলা করবি আৰ। আহা কিছু খা না।

শুন একগাল হেসে বলে উঠতেন শ্ৰীকৃষ্ণ,—না, আমি আসব না। আমার যে এতটুকুও সময় নেই।

৫৫। কিন্তু তাঁরা কানও নিতেন না কৃষ্ণের কথা। তাঁরা যে বিভ্রাময়ী মায়ের জাত। অধীর আগ্ৰহে তাঁদের গ্ৰেস্তার করে ফেলত। তাঁরা জোৰজবরদস্তি করে কৃষ্ণের পদ্যেৰ মত হাত হুধানিকে ধরে ফেলতেন; ঘরে ঘরে নিয়ে তুলতেন কৃষ্ণকে,--কল্পী যেমন করে ঘরে তোলেন সোভাগ্যকে। তাঁৰ পরে ঘটা করে দ্বান করিয়ে দিতেন, গা মেজে দিতেন কৃষ্ণেৰ। চতুর্দিকে যেন অব্যাহত করে পড়ত সোমাহারা এক মেহসার। দয়্যাবতীরা কৃষ্ণকে ধাইয়ে দিতেন সর-ননী-ছানা। ধাইয়ে-দাইয়ে সহচরদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন ঘরে।

৫৬। সেদিন ধূলাখেলায় যেতেছিলেন শ্ৰীকৃষ্ণ। হঠাৎ তাঁর কী যেন কী খেয়াল হল। অম্ববাগিনী ব্ৰজভূমির মাছাছা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই হোক বা নিজের জঠরগত বিশ্বক্সাণ্ডটিকে পবিত্র করবার উদ্দেশ্যেই হোক, এক ধাম্ভা মাটি তুলে হঠাৎ তিনি পুরে দিলেন মুখে। আশ্চৰ্য্য, খেয়ে ফেললেন মুক্তিকা। শ্ৰীবলরাম দেখে ফেললেন কীৰ্তি। সহচরোৱা সকলেই স্তবোধ বালক। তাঁরা আৰ সহ করতে পারলেন না। গ্ৰহণ করলেন চরের বৃত্তি। তাঁরা যে সবাই শুভেৰ চৰ, অন্তভেৰ চৰ। বলরাম তাঁদের সঙ্গে নিয়ে একদোড়ে পৌছে গেলেন ব্ৰজাধীৰ কাছ। বললেন—মা, মা, কৃষ্ণেৰ লোভ কিছুতেই কমবার নয়। এই একুশি সে মাটি খেয়েছে। আমাদের কথা গ্ৰাহ্যই করছে না। বতই বলি খেও না যেও না, ততই তাঁর প্ৰবল হচ্ছে লালাস।

৫৭। এমন কথা শুনতে ভাল লাগে কোঁ মায়ের? শুনই তো মা একেবয়ের বেগে টঙ। দোড়ে গিয়ে একগাছি লাঠি নিয়ে চললেন। চোখের উপর ভুৰ্জ বাঁকিয়ে 'চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়ে বললেন—ওরে অলম্ব ছেলে, মাটি খাচ্ছিস কী বলে? পৃথিবীতে চিনি-মিছরি কি কিছু মেলে না? মাটিতে কোন খাদ? পরের ঘরে চুকে, চুপি করে অপরাধ করে, সেদিন আমার ঠাকোৱা হয়েছিল, এবাৰ আৰ পাৰ পাবে না। দোষ ঢাকা দেখাচ্ছি। আগো তো এমন ছিলি না? এই তোমার দাদা রয়েছে, এই তোমার সাথীয়া রয়েছে, সবাই তো তারা সাকী।

৫৮। জননীৰ ভয়ে কৃষ্ণ তখন অস্বীকার করলেন সমস্ত। অপরাধী হয়েও নিরপরাধীৰ মত চল করে দু'নয়ন ভাসিয়ে ফেললেন অলীক নয়ন-জলে। যেন অনীতি দোষ থণ্ডনের জেটেই বললেন—মা, কই, আমি তো মাটি খাইনি। এরা সবাই মিথ্যা কথা বলছে। যদি না বিশ্বাস হয় আমার মুখের তিতরুটো, দেখ। ব্ৰজরাজমহিৰী বললেন—বেশ, ধী, কই দেখি?

বলতেই, নিখিল সোভাগ্যবান শ্ৰীজগদ্বান অনন্তগুহন বাঁৰ তথ্য

তিনি প্রথমে একটু হাসলেন, তারপর ব্যানান করলেন তাঁর বদন।
এবং সেই হাঁটুর মধ্যে বশোমতী প্রথমে দেখতে পেলেন ডুল্লোক।
সেই অটো পৃথিবীতে কত পারাবার! সাগরবেরা সন্তোস্তরীণ!
তরী তাঁর মাহুধ! গভীর গর্জনে ছুটে চলেছে নদ-নদী! বিপুল
তাদের দৈর্ঘ্য। কত কানন, কত উপবন! বাতাসে দুলছে লতা
তরুণ্য। মৃগ, মৃগবাহু ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুর মেরুলোক পর্যন্ত কত
পাহাড়।

তারপরে তিনি দেখতে পেলেন নাগলোক। নাগনারকেরা
উচ্ছল করে বয়েছেন পাঠাল, কাছে বসে সেবা করছেন নাগ-
নাগরীরা।

তারপরে বশোমতী দর্শন করলেন ডুল্লোক। সেই অন্তরীক
পথকে দিন করে রেখেছে কত তারকা, কত গ্রহ, কত নক্ষত্র!

তারপরে দেখলেন স্বর্লোক। গর্দ্বব সিদ্ধ কিম্বার চারণ
বিভাবেরা সেখানে রাজমান। বিভার আধাবড়ত মহাচি আদি
মুনিগণ তথায় ধ্যানলীন। তাঁদের দিবা অন্তিবেই বর্ণ এত
শোভাময়, বর্ণের এত আভাসময়।

দেখলেন মহালোকাদি অস্ত্র লোক। দেখলেন অখোগারী ও
উর্গামী জীব নিকরের কাহার ভরা এই অখিল উল্লাস।
তারপরে দেখতে পেলেন নিজেকে নিজের পন্থিকে, নিজের ছেলেকে,
এমন কি সমগ্র ব্রহ্মলোকটিকেও।

৫১। দেখেই,—

এ কি আমার ভ্রম না স্বপন?

এ কি দেবতার মারা, না ইচ্ছাকৃত?

না, না, এ কি আমার এই গোপালেরই প্রাক-শক্তি?

ভেবে কিছুই নির্ব করতে না পেরে বশোমতী খোর ঘোছে
আছুর হয়ে পড়লেন। তারপর প্রবিশান করলেন অনন্তবেগময়ের
বৈভব! কিন্তু এত দর্শন এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি কিছুই বেন
ডুলতে পারলেন না। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল—বীর আমি
অবীন, বীর কাছে আমি আ-নতা, তাঁর কৃপাতেই আতা, আমার
এই দর্শন হল। তিনিই আমার শরণ। তিনি অদ্বুত, অত্যাশ্চর্য,
মহান। অলৌকিক ঐশ্বর্য দেখিয়ে তিনি নিশ্চয় মোহে ফেলাতে
পারেন মহেশ্বরকেও। এই প্রজ্ঞাই তাঁকে বেন জানিয়ে দিল,
তাঁর নন্দনটি অতএব ঈশ্বর।

কিন্তু জননী জীবশোণার মন চাইল কুককে পুত্রভাবে। ঈশ্বরভাবে
ও পুত্রভাবে—তাই ভাবের শোভার অতি ভাবে তিনি বেন একেবারে
ভেঙে পড়লেন। পুত্রভাবটিকে বিসর্জন দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইলেন
চরম ভাবটিকে। যেমন করে আঁকড়ে ধরে রইল তাঁর কোল—
তাঁর লীলা-লিঙটিকে, তাঁর নন্দ-দুলালটিকে।

ইতি মৃৎকল্প-সংকো নাম পঞ্চমঃ স্তবকঃ।

ষষ্ঠ স্তবক

১। একদা,—বাল-ভগবান তখন দৈশব-কলার কোললী হয়ে
উঠেছেন, নন্দরাগীর সখ হল, নিজেই দ্বিমহন করবেন।
যতন্তি দানী। তিনি তাদের কাষ্যান্তরে পাঠাতে চাইলেন,
বললেন, বা ভোয়—কিন্তু বলসেই কি তারা বেতে চায়?
শেবকালে হকুম করলেন। হকুমেরই জয় হল। হেরে পালালেন
দানীরা।

বা তখন বসলেন দুই মইতে। আর নন্দ-দুলাল পাড়িয়ে
পাড়িয়ে দেখতে লাগলেন—দ্বিমহন।

শোভার খবর

সুন্দর মনোহর—

সেই দ্বিমহন।

নন্দরাগীর অমলকোষল দুখানি করণর একবার টানে একবার
ছাড়ি মন্থনাম, তারপরে আরও জোরে, বামার আর নাম নেই।
একটু একটু করে ভেরে আসে হাতের পাতা। তবুও এই
আকর্ষণেরই কেমন বেন একটি মহিমা আছে। জাগার আনন্দ।
মনিবকের বলনিতে তাই স্বতার গিরে নাটুকে নাচ নেচে গুঠে
পায়ার গোছা-গোছা বাসা, আর স্বতারের ললিত দুখরতার স্নান
হয়ে যায়—পায়ের পাশড়িকে ঘিরে ভ্রমের নেলা ঘরাল গুজন-গান।
হাতজনক হয়ে গুঠে নন্দরাগীর দুখানি সেই ভোগের বাহর
ব্যবহারের বহর। দুটিই বেন দণ্ডন-পন্থিত। বামে ভেসে যায়
জীবশোণার পা।

দুই মইতে থাকেন যা।

আর তাঁর কপালের অলকগুহ লাকিয়ে লাকিয়ে নাচে
থাকে ললিত-ললিত। যে মনিহার কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর
পীর স্তনভট ঘিরে নেমে এসেছে, ঘন-ঘন আলোলিত হতে
থাকে সেটি; কোলনের মিজহুদে সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে তাঁর
কঙ্কলিকা।

তখন কী সুন্দর যে দেখতে হয় কানপাশার মণি-কিরণ মজরী।
দু'কানের স্বককে পাশ বেয়ে অবিক্রির স্বরে পড়ে সে লাবণ্যের
সুধাধারা। মাধুর্যের আলো ছিটিয়ে আবে বেন মোহন করে তোলে
নন্দরাগীর বাড় আর কাঁধ।

আর তখন মণি-মেখলা বাজতে থাকে কণ, কণ। মঞ্জলা ও
পৃথুলা শ্রোণির শোভার গরবে গরবিনী সে। মণিমেখলা বৈকে
বৈকে বাজতে থাকে কণ, কণ,।

দুই মইতে থাকেন যা।—

শিখিল হয়ে যায় কবরীর শির-বিভাস, চুল থেকে খসতে থাকে
মণি আর ফুল; রাত্রির তারাদল বেন সোপান বেয়ে নেমে আসেন
বাণীতে।

আর একটা মন্ত হাঁ-করা দধির ঘড়ার দুই মইতে থাকেন যা।
ঘড়ার মধ্যে দুলে দুলে ফুলতে থাকে ঘন-ঘোর এক লক্ষের
সমূহ। হল্যা হল্যা উথলে উঠে ছিটকে পড়ে ঘোল।
সোনার শাড়ীর ভেসে যায় আঁচলা। আর সেই সঙ্গে মায়ের
মনেও চলকাত থাকে গরু। বলি, এমন নতুন চড়ে আর কি কেউ
তুলতে পারেন ননী! এক ননী? আঃ মরি মরি, তনরটি আবার
লুতী চোখে পাড়িয়ে পাড়িয়ে দেখছেন, বামে ভেসে যায়
নন্দরাগীর পা।

মায়ের চোখে চোখ পড়তেই বালককের কেমন বেন হঠাৎ
ছলছল ভরল হয়ে যায় মন। তাঁর সাধ হয়, মায়ের বুকের
দুখ থাকেন। তাই নেই-কিন্তু অজনির করে বলেন—

মা মা, আর দুই দিলনি মা। দেবী হয়ে বাছে। আর
আমাকে কষ্ট দিলনি মা। আমি যে ভোর দুখ ধাব। বলতে
বলতে মায়ের হাতের মন-দণ্ডটিকে আঁকড়িয়ে ধরেন কুক। আর

সে কি যে আঁকড়ে-ধরা! উপস্থিত দাসীদের এক নিমেষেই যেন হয়ে যায়—মনোমহন।

২। কী অনন্ত রমণীয় চরিত্রের বাবা ছেলের! হেসে উঠলেন দাসীর দল।

এ এক রক্তি হলে হবে কি!

ব্রহ্মাণী তখন মন্থনগুটকে বিসর্জন দিয়ে কোলে তুলে নিলেন তাঁর কুককে। কী কৌকড়ানো কৌকড়ানো একমাথা চুল! হৃদয় দিতে লাগলেন মা।

এমন সময় শ্রীবিশ্বনাথর কানে এল, কোথায় যেন সোঁ-সোঁ করে একটা শব্দ হচ্ছে। ঐ যে, ঐ বুঝি হুব উৎখালো। নিজের ঘরের কাছেই উদ্ভূত হুধ চাশিয়ে এসেছিলেন—পুত্রের জন্ম। বাতাস শেষে ঝলে উঠেছে উদ্ভূত, গনগনে আঁচে সোঁ-সোঁ করছে হুধের কড়া! কুককে স্তন-তাগ করিয়ে তিনি তখনই তাঁকে বসিয়ে নিলেন ঘরের ভিতর এবং ছেলে কেলে চলে গেলেন হুধ সামলাতে।

নন্দহুলাল বেগেই লাগল। নিমেষে এঁটে ফেললেন মতলব। তারপর উটে পড়লেন সেখান থেকে। ভাড়াভাড়ি। তার পরে শিলের নোড়া দিয়ে ফাটিয়ে দিলেন দই-এর বড় খোঁরা। ভাঙলেন তো বটে, কিন্তু রাগে আর ভয়ে তাঁরও মনখানি ভাঙতে লাগল। কারণ, চকুদিকে তখন সাপের মত একে-বেকে ছুটে চলেছে মাঠা-ভোলা দই-এর শতধারা। ধূয়ে যাচ্ছে চৌকাঠ, এখন কি করা যায়?

নন্দহুলাল বজ করে লক্ষ দিলেন পাশের ঘরে। ঘরে লুকানো ছিল, মাছঘের চোখে না পাড়ে এমন স্থানে, নবীন নবনীতোলা বৃত্ত। নব প্রবৃত্তে নবীর ষি-টিকে নামালেন। একটু খেলেন, হাতের তেলোর সংগ্রহ করলেন একটু। নিতে নিতেই যেন মন থেকে সম্পূর্ণ পূর হয়ে সেল রাগ। মা দেখলেই কিছু বিপর! অতএব তিনি, বিনি দেব-দেবস্রাবি-বসিত নন্দহুলাল, তিনিও মায়ের জরে ষি-টিকে হাতে নিয়ে চরণ কেলে পালালেন।

পলারনের সপক্ষে ঘরের পাশেই ছিল পক্ষরার। দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরের আড়িনায়। রক্তমঞ্চে দেখাবার মত কীর্তি বটে নন্দহুলালের! আড়িনায় ছিল উদ্ভূত। গম ভাঙবার সময় নয় তখন। তাই অধোমুখী ছিল। সেই উদ্ভূতের শিঁটে হস্তদন্ত হয়ে চড়ে বসলেন খলনিহুধা শ্রীকৃষ্ণ। এবং জননীর শুভাগমন-পরের পানে সাবধানী নয়ন হানতে হানতে খাওরাতে লেগে গেলেন নবনীত, বান্দব-ছানাসের।

৩। এদিকে নন্দরাণী ঝাল থেকে হুধের কড়া নামাতে এসেছেন।

নিজের সৌভাগ্যমহিমায় জগৎজনের বিনি ত্রাণকর্তা, তিনিও কড়া নামাতে নামাতে ভাবতে লাগলেন—

ভাগ্যদেবতার কী অপার করুণা! এমন ছেলে কি কারো ঘরে রয়েছে, না কেউ পেয়েছে? জন্মান্তরের পুণ্যের জোরেই আজ আমার এত মান, বশ:। ভাবতে ভাবতে বশোবিভার সৌন্দর্য-স্নাতা হয়ে উঠলেন শ্রীবিশ্বনাথ।

হুধের কড়া নামিয়েই, কুককে কোলে তুলে নোবায় অন্তে নন্দরাণী ক্রিয়ে গেলেন সেই ঘরে, যেখানে তিনি বসিয়ে রেখে এসেছিলেন

তাঁর দুলালকে। গিয়েই দেখেন তনয় নেই। চমকে উঠল অন্তর কোথায় গেল সে, অল্পসন্ধান করলেন। তারপরে হঠাৎ তাঁ: হস্তটিকে বাধিত করে দিয়ে তাঁর চকু দুটি তাঁকে দেখিয়ে দিল সামনে ভেঙে পাড়ে রয়েছে দধি-গর্গরী; ঘোলের মোটা মোটা অল্পস্রাবারা ছুটে চলেছে; ধারার ভেসে গেছে ঘরের ঘেকে, শাধ হয়ে গেছে, শিখল হয়ে গেছে। গুরুতর বাপাথর! কী জোরেই না ভেঙেছে বড়া! খোলামকুচি হয়ে গেছে।

মায়ের বিষয় বলে উঠল, কী করে হল? হঠাৎ কেমন করে ভাঙল এত বড় ঘোলের বড়া? রীতি নির্ণয় করতে পারল না। তারপরে ফিরতেই বিষয়ের চোখে পড়ল, নোড়া!

এ আমার দুইটির কাজ ছাড়া আর কারো নয়।

...বিষয়-চিকুর হেসে উঠল মায়ের নয়নে। বাম হাতের ললিত তজ্জনীট টকিকরে গেল নাসার শিখরে। চকিত অভিমানে আঘাত লাগা সত্ত্বেও মলিন হল না শুভ্রদেহ। বরং হৃদয়ের দয়া হল।

কৃত্রিম ক্রোধে হস্তার দিয়ে বেই তারপরে নন্দরাণী ছেলের সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, অমনি তিনি দেখতে পেলেন—তাঁর ছেলেটি—তজ্জের প্রতাপ ধীর অপ্রতিহত, চূরির লীলায় বালাই নেই বার গর্কের, তিনি সত্ত্বেও লাফিয়ে নেমে চকল পায়ে ছুটে পালাচ্ছেন।

মায়ের বকুনিকে বড় ভর, না? পরাক্রমের অঙ্ক নেই, না। পাছু পাছু ছুটলেন জননী। কিন্তু জননীটি পটায়সী মহারসী মহিষী হলে হবে কি? তিনি তাঁর প্রায় বড়ের হুধের শিশু মোহন দেবতাটিকে ডাকতে লাগলেন—

দাঁড়া, দাঁড়া, জগতের পরলা ধৃত, ওরে আর দৌড়স নি।

৪। মা বত ডাকেন, ছেলে তত পালায়। বাঁকা অভিমানে উচিয়ে উঠেছে ছেলের মন। দৌড়ন আর কিরে কিরে বাঁক কিরিয়ে তাকান, মা আসছেন কি আসছেন না। বখনি দেখেন, খেরে আসছেন মা, আলোর বলমল করছে মায়ের পা, ডখনি আবার নতুন করে অতি ভয় জাগে মনে। আবার কৃষ্ণ পালান। ঐ দেখ—

নন্দহুলাল তুর্ণ গতিতে দৌড়ছেন, মায়ের দিকে হুতুহুত: চকিত নয়ন চাইছেন, মনোহরণ ভঙ্গিমায় শ্রীবাখানি ঘুরোচ্ছেন। তার পরে ঐ দেখ কাও—শিখন দিকে চোখ দুটিকে নাচিয়ে যেন ছুঁড়ে কেলে দিয়ে—ভম, ও:, জা:, হা: কাঁতরাতে কাঁতরাতে যেন চেষ্টার ঘটেছে কতই না বাবাভাত—হঠাৎ তিনি জমে গেলেন! চলে পড়লেন আড়িনায়। আর, কৃত্রিম ক্রোধে তরা জননীর মন শীতল হয়ে গেল ব্রুহুর্ভে।

৫। নন্দরাণী তখন বললেন—ওরে ধৃত ছেলে, অমনি করে আর কত-দৌড়বি, কোথায় যাবি? আর দৌড়সনি বাছা, জিরে।

কথাও বলছেন মা, আর তাঁর নন্দহুলালও ততক্ষণে হাত ফসকিয়ে নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে বলছেন—বদি মা আমার না মারিস—আর হাত থেকে লাঠিটা বদি কেলে দিস, তবেই আমি পালাব না...জোরে...পুয়ে।

মা। মার খেতেই বদি তোর এত ভয়, তাহলে আজ খোলের বড়া ভাঙলি কেন?

কু। সত্যি বলছি মা, আর আমি কবর মা, হাত থেকে মা লাঠিখানা ফেলে দে।

৬। পুত্রের কথা শুনে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ব্রজবাণী। বাইরে কোথের ভাগ ফলিয়ে যেই কাছে এগিয়ে গিয়ে ধরতে যাবেন তাঁর ছেলেকে, অমনি কুক টেনে দৌড়। পাছু পাছু দৌড়লেন মা। মায়ের দৌড়নি দেখে সত্যিই ব্যাকুল হল কুকের মন। এবার বললেন—মা, তোর হাত থেকে ঐ ভয়ঙ্কর ধরতরে লাঠিখানা ফেলে দে মা। আগে সত্যি করে বল আমার মারবি না মা, তাহলে আমি তোর কাছে বাব। তুই তো বা আর পাপ করিস নি।

কচি কচি কাতর কণ্ঠের মিনতি শুনে ব্রজবাণী হাত থেকে শেষে ফেলে দিলেন লাঠি।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বালকৃষ্ণ দেখলেন, দৌড় বন্ধ করে এবার বললেন জিরোতে।

৭। কৌতুকের এই আভিষাট দূর দূরালোক বসে অবলোকন করছিলেন দেবতায়া। প্রথমে তাঁদের মুখে চুটে উঠল পরম বিষয়, তারপরে বিষয়ের হাত, তারপরে হাতের স্রোতির প্রসঙ্গতা। অহো অহো, করে তাঁরা মুখচাঁওয়া-চাঁওরি করে বলতে লাগলেন—অত্যাশ্চর্য্য, অত্যাশ্চর্য্য! অস্তুর কথা ছেড়ে দিন। যে ভয় পরাক্রিয়গের অবসানে ব্রজারও স্রবয়ে নিয়ে আসে পরম বৈকল্য, সেই ভয়ই আবার নিত্যকাল ধরে ভয় করে চলেছে থাকে, সেই তিনিই কি না স্রুতি ভীত হয়ে পড়েছেন—মায়ের হাতে! ঠালা দেখে! অত্যাশ্চর্য্য, অত্যাশ্চর্য্য।

৮। নন্দবাণীর তখন নিঃশ্বাসের বাতাসে বল ঘন কাঁপছে কপলিকার অঙ্গল, স্রমজলের কপিকায় অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে বরন-সমোজ। শিখিল হয়ে পড়েছে কুন্তলকলাপ; ঐ একটুখানি দৌড়োনতেই অবসর হয়ে পড়েছে চরণ-কমল।

বীরে বীরে তিনি ছেলের হাতখানি ধরলেন। নীন-নয়নে কুন্ত তখন বলে উঠলেন—মা, আর আমাকে মারবি না মা, বল! আমার ককণো মারিসনে মা!

বলতে বলতে পুত্রের পদ্ম-অঁখি পূর্ণ হয়ে গেল অশ্রু-কণায়। নবীন পদ্মের পাপড়ির মত দুখানি করতল দিয়ে ছেলের তখন সে কী চোখ-পোঁয়াবার ঘট! কণ্ঠের দে ছী আখ-আখ গুলন! কোলা-কোলা চারমুখে সে কি স্রাবাবিশ্রু নিশ্বাস! ভীত-ভীত সে এক অভিনব ক্রন্দন। বিলোকনীয় হয়ে উঠলেন শ্রীমান নন্দদুলাল।

মা তখন ঠিক করলেন—কিছুকণ একে বঁধে রাখতে হবে। যদি না বাঁধি, তাহলে বা বাণী ছেলে, কখন আবার কোথার বনে জঙ্গলে বাগের ঝোঁকে পালাবে। সম্প্রতি ওকে বাঁধি। ছেলের মইমা বোঝা ভার!

অতএব বিকশিত চাক-দন্ত রুদ্রত দুলালটিকে নিয়ে নন্দবাণী নিকটে এলেন উরুখলের। কখন আবার কি ষেকরে বসবেন ছেলে। বন্ধনের বিহিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তিনি ডাক দিলেন—

ওলা কুংসবতি, লংসবতি, বেশ নয়ম আর হোলায়েম দেখে এক গাছি পাটের দড়ি নিয়ে আর তো...তাড়াহাড়ি।

১। পট-দায় নিয়ে তাঁরা এলেন। জগতের বিনি অধিতীর বন্ধু, তাঁকেই বাঁধবার জন্তে এত বড় ব্রজেশ্বরী! হাতের ভিতরে দড়ির কোমলতা অল্পভব করে তিনি আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

দেখতে দেখতে আঙিনার উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজপুরের কয়েকটি পল্লীবাসিনী। তাঁরা সকলেই যেন সম্পদের সীলাবনী, বাৎসল্যসের সারমণি। তাঁদের ছেলেরাও এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। তারপর বা বাণীর ঘটল! সেটি এই—

পটদায় নিয়ে প্রথমে যেই কুংসর কটরেশটিকে বেঁধেন করতে গেলেন ব্রজবাণী, দেখলেন দু'আঙুল কম পড়ে গেছে ঘেরে। আর একগাছি দড়ি আনিয় গিরো দিয়ে আবার জড়ালেন কটরেশ, দেখলেন সে দড়িও ঘেরে কম পড়ে যাচ্ছে দু'আঙুল। আর একগাছি ভোড়া দিলেন দড়ি। তাতেও সেই দু'আঙুল কম। ব্রজের মত হাস-বুড়ি রহিত হয়ে হইল পটদায়।

১০। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠায় দেখতে লাগলেন পুরকীরা। কিন্তু ব্রজবাণীর কোণাবেশ কিছুতেই কমছে না দেখে কোণাবেশে নিমূল করবার উদ্দেশ্যে পল্লীবাসিনীরা বলে উঠলেন—

ধন্ত মহাবাণী ধন্ত! জগতে এমন ভাগ্যি আর কেউ তখনও করেনি। আশ্চর্য্য কাণ্ড! কুংসর কোমরে ঐ তো...দুতোয় মত...পড়ে রয়েছে সোনার মেথলা! ঐ তো অক ছোট। কিন্তু অবাধ কাণ্ড, এখন বাতর সমস্ত দড়ি দিয়েও...বাঁধন তোলা না গো, ...কুলালো না! বলেন কি মা-জমনী, সারা দড়ি জুড়েও সেই দু'আঙুল কম! নিশ্চয়ই রহস্য আছে মা, রহস্য আছে। আর থাক...এবার কান্দি গিন।

পল্লীবাসিনীদের কান্ড হল বচন, কিন্তু অনন্ত হল ব্রজবাণীর বিষয়। কুংসর কীতিটি কতদূর গভীর, দেখতেই হবে, এই স্থির করে মুখে হাসি টেনে তাই বললেন, আমার ঘরে এই বকয়ের আর তো দড়ি নেই। আপনাদের বীর বীর ঘরে আছে, নিয়ে আসুন তো সেগুলো।

পুরকীরা পল্লীবাসিনীরা দড়ি আনতে যে বীর ঘরে দৌড়লেন। বাগের মাধায় বা শরুতা করে বা ব্রজেশ্বরীর আদেশে ভয় পেয়েই যে তাঁরা দড়ি নিয়ে ফিরে এলেন তা নয়, আনন্দের পরম কৌতুহল এবং লোকাতীত চরিত্র দর্শনের উগ্র আগ্রহ, তাঁদের দড়ি হাতে ফিরিয়ে নিয়ে এল ব্রজবাণীর আঙিনায়। নন্দদুলালের কান্না তখনো ধামেনি। শৈশব-নাট্যের পারিপাট্য দেখিয়ে তিনি তখনও অব্যোরে স্বরাজেন নয়নকমলের জলকণা, চোখ ঘরতে কতই না যেন বাধা পাচ্ছে তাঁর পদ্মের মত কোমল হাত। তাই কঁদছেন। কান্নাও এত মিষ্টি হয়! সেই কান্নার সারগাম কোমলের চেয়েও কোমল, সেই কান্নার অ আ ক ষ যেন গদগদগদন-বাণী ভাষার।

[ক্রমশঃ।

পুণ্য-পাপে মুখে-মুখে পতনে-উপানে

মায়ের হইতে দাঁও তোমার সজ্জানে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পূর্বদিন যথানিয়মে শুরু হলো ওদের বাত্ৰা। একটু পরেই তিয়েলিং বললেন, আজকের আকাশটা বড় ভালো মনে হচ্ছে না। আকাশের বটো যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। বৃষ্টি শুরু হলে আমি আশ্চর্য হবো না।

সত্যিই তাই, আধ ঘণ্টার মধ্যে ঝিম-ঝিম করে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। একে ঐ দুর্গম পথ, আপনা হতেই পা দ্রিগ্ন করে, তার ওপর আবার বৃষ্টি। একটা টাট একবার পা হড়কে হুমড়ে পড়লো।

সকলেই আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ভয়ে। খুব সাবধানে হাঁটছে আর পাখের দিকে প্রেধর দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

ক্রমে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তিয়েলিং বললেন, বেশী দূর বাওয়া বাবে না এভাবে।

উপায়? জিগেস করে শান্তনু।

কোনো জায়গায় তাঁবু খাঁটিয়ে বসে অপেক্ষা করতে হবে। বললেন তিয়েলিং।

কিছু, কোথায় বসবে তারা, পাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত নেই। এদিকে একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছে। চোখের সামনে সমস্ত



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অশৈল চন্দ্রবর্তী

দৃশ্যপট যেন মুছে দিয়েছে কে। একটা ঘোলাটে পাণ্ডু রংয়ের বাষ্প-বনিকা যেন চারি দিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হঠাৎ একটা শ-শ-শ করে শব্দ ভেসে এল সবার কানে। শেরপাদের নেতা চাঁৎকার করে উঠলো, সাবধান! ধস নামছে!

কোথায়? কোন দিকে? সকলের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে ঐ একই প্রশ্ন।

চোখের সামনে তিরিশ গজ দূরের জিনিস নজরে আসে না। দেখবেই বা কি করে? ওদের পায়ের তলার মাটি সরছে নাকি? যদি সরেই বা, যদি ওদের ঠিক ঐ জায়গাটি পাহাড়ের গা থেকে খসে নেমে যায়, তা হলেই কি? করবার কি আছে? আগে সেলেও বিপদ। পেছনে হটলেও বিপদ থাকতে পারে। তিয়েলিং বললেন, চণ্ডা! রাস্তা ছেড়ে সরু পথটার এসে পাঁড়াও, রক্ষা পেতেও পারি।

লালীর মনে হলো, যেন তার সর্বাঙ্গ পাখর হয়ে গেছে। কিশোরেরও বুক শুকিয়ে গেল। ঘেঁষাঘেঁষি করে পাঁড়ালো সকলে, যায় তো সকলেই মরবে একসঙ্গে।

আবার একটা আওয়াজ খশ-খশ। আকাশের দক্ষিণ দিকে মেঘের একটা কান দিয়ে এক বলক স্ফাটলোক এসে পড়লো। সে আলোটা বেধানে এসে পড়ছে, গলানো রূপোর মত সেখানটা ঝক-ঝক করে উঠলো। সেই আলোয় দেখা গেল প্রায় দু'শ হাত দূরে পাহাড়ের গা থেকে পাখর আর বরফের বিরাট একটি অংশ ঝরে যাচ্ছে নীচে। ক্ষীণ একটি আওয়াজ আর তার সঙ্গে মনে হলো, কী ঘোলায়েম ভঙ্গিতে নেমে চলেছে। সঙ্গে বা পড়ছে, তাকে নিষেই নামছে। দু'হাজার ফুট নীচে এক বরফগলা নদীর প্রোতের সঙ্গে নিধে গেল ও-গুলো।

ওরা দেখলো ঐই দৃশ্য পাঁড়িয়ে পাঁড়িয়ে। এ যেন নৃত্যর প্রতীক্ষার পাঁড়িয়ে থাকা।

কতক্ষণ যে ঐই ভাবে ছিল তা ওরা জানে না। তবে কুজ-খটকা সারে গিয়ে আবার যখন রোদে বল-মল করে উঠলো চারদিক, আর আকাশটা হয়ে গেল ঘন নীল, তখন ওরা বুঝলো যে ওরা নিরাপদ হয়েছে। অন্তত: তখনকার মত।

তিয়েলিং বললেন, মনে রেখো, আমরা বরফের রাজ্যে পা দিয়েছি। যে দৃশ্য তোমরা দেখলে, এ সব এখানকার নিত্য ঘটনা। এখানে আছে বরফনদী, আর আছে ছুটন্ত বরফের পাহাড়, থাকে বলে গ্রেসিয়ার। এরা হচ্ছে সৃষ্টির দৃশ্য। আমাদের জীবন এখানে অতি তুচ্ছ জিনিস। এক ফুৎকারেই তা নিবে যায়। আমাদের দেহের কতটুকু সামান্য উত্তাপ। এক নিমেষেই তা ভষে হিম হয়ে যেতে পারে। বৈচে থাকো এ রাজ্যের নিয়ম নয়। তাই তাকে গ্রাস করতে শত শত হুতাহুত ছুটে আসে।

তিয়েলিং-এর কথাগুলি ওরা মন দিয়ে শুনছিল। চোখের সামনে ওরা দেখলো, তুষারধবল শিখরের পর শিখর। উঁচু-নীচ সারে সারে পাঁড়িয়ে। তাদের গায়ে অপরাহৃত স্ফাটলোক যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে।

ঐ হচ্ছে কাকনজত্ৰা। বললেন তিয়েলিং। কত কাছ অচ্যুত কত দূরে। রূপকথার কত গল্প আছে ওকে দিয়ে। ঐ যে দেখছো বরফের ওপর সাদা ঘেঁষা, ওগুলো নাকি হিমপল্লবের নিঃশ্বাস। হাছবের প্রাণের উত্তাপ নেই এখানে।

একটি মাত্র ছেলে এখানে এসেছিল। কত দিন আগে, কেউ তা জানে না। তার মা ঐ রূপালি বাপ হয়ে তাকে নাকি ঘিরে ঘিরে থাকতো।

সেই স্মৃতি, আশ্চর্য্য ছেলে ঐ স্মৃতিং। শুধু বরফের ওপর দিয়ে নেচে নেচে বেড়াতে। খেলা করতে ডুবায় নিয়ে, সাতার কাটতে হিমপ্রবাহের জলে। তবু সে জমে বাতনি। তার বুক ছিল মাহুঘের হৃদয়। ছিল সেখায় ভালবাসা। কাকুনজ্ঞার সোনালি সোনালি পরীরের সঙ্গে ছিল তার ডাব। হুটু হিমপরীরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। দিনে দিনে স্মৃতিং বড় হলো। নীৰ্ব্বাণ পাইন গাছে উঠে বেত তর-তর করে বুনো ভালুকের মত। আবার তেমনি অবলীলাক্রমে তর-তর করে উঠে বেত পাহাড়ের খাড়া চূড়ার। কী হুটুই ছিল স্মৃতিং।

কাকুনজ্ঞা তখন নাকি ছিল শুধু সোনার পাহাড়। তাই নাম হয়েছে কাকুনজ্ঞা। শুধু তাই নয়, সেখানে এক রাজার নাম সোনা বার বার গুহার গুহার ছিল অপরিমিত সোনা। সেই সোনা দিয়ে সে তার সমস্ত প্রাণাদ বুড়ে রেখেছিল।

তোমরা বলবে, এই কনকনে ঠাণ্ডা বরফের দেশে এ কেমন রাজা! এ কেমন রাজ্য? প্রশ্ন করতে পারো। কিন্তু, যে সময়ের কথা বলছি, তখন হয়তো এমন মাহুঘ ছিল বারা বরফের রাজ্যেই বাস করতে পারতো। আজও ত চিরহিম মেয়াদেবর কাছে এক্সিমোরা বাস করে। পৃথিবীতে কোনটাই বা অসম্ভব।

তিয়েলিং একটু চুপ করলেন। হঠাৎ তাঁর দুই পড়লো বুঝে কিসের ওপর।

লালী অধীর ছুরে বলে উঠলো, কই, লামাজী মারপথে ধামলেন কেন? আপনি স্থলর গল্প বতেন কিন্তু একটা আপনার দোষ, আপনি শেষ করেন না।

কিশোর বলল, ঠিক তাই। মিমি আর এর গল্পটা যেমন। ওদের শেষ পর্যন্ত কি হলো, তা আর বললেন না।

তিয়েলিং একটু হেসে বললেন, ও তাই নাকি? এটা আমার ভাবী অন্তর্য্য হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু, কি জানো, ওদের শেষটা আমারও জানা নেই। আমার মনে হয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ গল্পই শেষটা অজানা থেকে যায়। কি যেন একটা রহস্তের ঢাকা পড়ে যায় শেষটা। জোর করে শেষ করলেও একটা রহস্তের শেখ থেকে যায়। বাক, এখন আমি অল্প কিছু ভাবছি—ঐ যে নীচে একটা কি পড়ে আছে মনে হচ্ছে? শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে তোমরা কি একটু অহুসন্ধান করবে?

নিশ্চরই। কিশোর লাকিয়ে উঠলো। শান্তজুকে নিয়ে আমি যাই।

ওরা দুজনে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলো নীচে। অনেকটা নীচে নামতে ওরা প্পষ্ট দেখতে পেল, একটা বৃত্তসেহ পড়ে আছে। আর সেটা আর কেউ নয়, সেই শংকরীপ্রসাদের। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হলো ওরা, বধন দেখলো যে শংকরীপ্রসাদ কোনো আকস্মিক ঘটনার দ্বারা বার নি। পরীক্ষা করে তারা দেখলো, কোনো আততায়ীর শিল্পের ভুলিতে দ্বারা গেছে।

এ অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে থাকার দরকার নেই, বললে কিশোর। চলো আমরা তিয়েলিংকে ধরটা দিই।

শান্তজু বললে, না, শংকরীপ্রসাদের দেহটা খুঁজে দেখতে হবে। আমাদের সেই নক্সাটা যদি পাওয়া যায়। তা হ্যাঁ! অল্প কিছু গোপন তথ্যও পাওয়া যেতে পারে। এই বলে সে মৃতদেহের আশ্রয় মধ্যে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো। একটা খড়ি, কিছু কাগজপত্র, পেন্সিল, একটা বড় ছুরি। অস্ত্রভেদের সরঞ্জাম ইত্যাদি আছে দেখা গেল। তাড়াহাড়া একটা ব্যাগ ছিল। সেটার হাত নিতে বাবে এমন সময় শুড়ুম করে এক আগুয়াল! শান্তজুর মনে হলো তার কানের কাছ দিয়ে যেন একটা গুলী চলে গেল। ব্যাগটার অভ্যন্তর গুলুতর। শান্তজুর বুকতে দেহী হলো না যে, তার ঐ এখানে এসে একটা মস্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। আশে-পাশে একজন বা একাধিক শত্রু লুকিয়ে আছে।

চিন্তা করার সময় নয়। শান্তজু পকেট থেকে শিল্পটা বার করে নিল। তার পর আশে-পাশে তাকালো। বুঝে একটা আঁকা-বাঁকা খাড়া কুৎসিত পাহাড়ের চূড়া। ঠিক হালকের মুখের মত দেখতে। তার ধারে ধারে কালো কি এক গাছের বোঁপ-ঝাড়। এখানেই কোনো শত্রু লুকিয়ে আছে, আন্দাজ করলো শান্তজু। ঐ দিকে পিছন ফিরে পালানো কাপুরুষের কাজ, নিরুদ্ভিতা ত বটেই।

শান্তজু শিল্প সামনে ধরে এগুতে লাগলো, পিছনে কিশোর। হালকরুখো শিলাখণ্ডের কাছাকাছি হাতেই ওরা দেখলো দু জন যেন ঝোপের আড়াল থেকে সরে গেল একটা গুহার মধ্যে।

বাক, আততায়ীরা ভয় পেয়েছে, শান্তজু আশ্বস্ত হলো। লে একটা কাঁকা আগুয়াল করলো। তারপর ওরা শত্রুদের অহুসরণ করলো গুহার মধ্যে। গুহার অভ্যন্তর ভিজ়ে স্নাতসেতে আর অন্ধকার। শুধু একদিক থেকে দেখা গেল একটা আলোর আভাস। সেই দিকে অগ্রসর হতে ওরা এসে পড়লো একটা খোলা আঁকারের মধ্যে। এখানে ওপরের জল চুইয়ে পড়ে পড়ে অসংখ্য ধামের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সব ধামের আশ-পাশ দিয়ে দেখা যায় নানা ব্রুড়ল-পথ। হাজার হাজার বছরের ভাঙলো জমে আছে কোঁথাও। কোঁথাও বা জল বালু পাথরের জমে বাওয়া নানা আঁকারের বিচিত্র স্থাপত্য।

দুই বন্ধু বিমিত্ত ভক্তিত হয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলো। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটবার পর, কিশোর বলে উঠলো, মিথ্যা অহুসন্ধান, শান্তজু, চলো আমরা ফিরে বাই। ফেরবার রাস্তাই তো আমি খুঁজছি, কিশোর! শান্তজু বললে, কৃধা কৃধা ও পরিপ্রসঙ্গ কাতর দুই বন্ধু বহির্মুখের পথ পেলো না। যেমিকেই বায় সেখানটাই নতুন মনে হয়। অপরিমিত স্নাত্তিতে বলে পড়ে কিশোর।

এদিকে লালী অনেকক্ষণ ওদের আশ্রয় পথ চেয়ে থাকে। কিন্তু বেলা বধন পড়িয়ে পড়লো তখন তার চোখ ভরে এলো জলে। সে কাঁদতে থাকে। তিয়েলিং সাধনা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, শংকরীপ্রসাদকে কেন্দ্র করে এ কী নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। বুদ্ধ লামার কপালের চর্চ কুণ্ডিত হয়ে কয়েকটি চিত্তাবেধা ফুটে উঠলো। না, এখনই কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। শেরপাদের ডাকলেন।

চার জন শক্ত-সমর্থ শেরশা বেরিয়ে পড়লো। হাতে তাদের আলো আর ধারালো কুড়রি।

তারি জানতো, ওখানে ঐ হাঙ্গরমুখ কুৎসিত শিশাখণ্ডের ভলম্বে এক ভয়ঙ্কর গুহা আছে। লোকে তাকে কুৎসিত বলতো। তার মধ্যে যে প্রবেশ করবে, সে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওদের মনে হলো, নিশ্চয়ই ওর গহবরে পথ হারিয়ে ফেলছে শাস্ত্রমুখ আর কিশোর।

আর তা না হলে কোনো হিংস্র ইয়েতির কবলে পড়েছে ওরা।

বাই হোক, অন্ধ-তার করে চারদিক খুঁজে দেখতে লাগলো। কিন্তু কোথাও ওদের কোনো চিহ্ন নেই। অবশেষে সতর্ক পদক্ষেপে তারা প্রবেশ করলো কুৎসিত গহবরে।

একজন শেরশার হাতে ছিল একটা শাদা নরম পাখর, যেটা দিয়ে খড়ির মত দাগ টানা যায়। গুহা-গহবরের দেয়ালে দেয়ালে সে শুণু দাগ দিয়ে যেতে লাগলো। পথ চেনার নিশানা।

বহুক্ষণ নিঃশব্দ অবেশের পর, তাদের কানে গেল অদ্ভুত আওয়াজ। মাছুষের কথাবার্তা গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্ গম্ করে উঠছে।

এই স্বর লক্ষ্য করে চলছে শেরশারা, হাতে ঝুলছে আলো! আর অন্ধ হাতে উভত কুড়রি।

কাছে গিয়ে তারা বা দেখলো, সে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য! কিশোর আর শাস্ত্রমুখ দুজনেই দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর তাদের ঘিরে আছে তিনটি বলিষ্ঠ চেহারা। আগন্তুক শেরশাশব্দ দেখে তারা শিঙল উঠিয়েছে।

[আগামী বারে সমাপা]

আকাশপারের দেশে

সুখান্ত ঘোষ

অমল পড়ছিল—‘পৃথিবীর বহু স্থান হইতে “উদ্ভূত পীঠিচ” হুই

হইবার সাধারণ পাওয়া যাইতেছে। অনেকের ধারণা,

পীঠিচগুলি মঙ্গলগ্রহ হইতেই আসিতেছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহে বখন পৃথিবীর অতি নিকটে আসিবে এবং পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইবে মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল, তখন সম্ভবতঃ অধিক সংখ্যক উদ্ভূত পীঠিচ পৃথিবীর আকাশে উড়িতে দেখা যাইবে।’ অমল ভাবল, ওদের একটার চড়ে মঙ্গলে পাড়ি জমতে পারলে বেশ হয়।

মার্চের ওপরে ছাড়ায় ঢাকা গ্রাম। যেখানে অমলের দ্বিদির বাড়ী। অমল চলছে সড়ক পথে একা। প্রায়ই ত যায়। হঠাৎ অমলের চোখে পড়ল আকাশে বলয়-বৈচিত্র্য গুলু। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে নেমে আসছে মাটির দিকে, যেন ভাকই লক্ষ্য করে। আশ্বিনের পরিষ্কার সূর্যালোক বসন্তের কবলে তার দেহ। অবাক হয়ে অমল চেয়ে রইল জিনিষটির দিকে; পালিয়ে যেতে ইচ্ছে থাকলেও, পা তার নড়ল না। এদিকে গুলুটি মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই একজন বেতকার ব্যক্তি অমলকে টেনে তুললে তার মধ্যে। অমল বুঝলে সে ঘরা পড়েছে। তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে কে জানে। কিন্তু অমল ভয়ে চীৎকার করবার পূর্বেই গুলুটি ভয়ানক বেগে সোজা আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ে গেল। অমলের দৃষ্টি হতে ভায়ল

ধরিত্রী কখন সরে গিয়েছে। শুধু নীল আকাশ দেখা যায় বহু জানালা দিয়ে।

অমলের এবার মনে হল গুলুটি আর যেন উড়ছে না। কারণ, পৃথিবীর উড়ে জাহাজের মত গুলুটি গর্জনও করছে না নড়ছেও না। এ যেন কপকপার বাত্ কাপেট। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর আঘোহীবাহী ‘মিটিওর’ উড়োজাহাজ অপেক্ষা এই গুলু ওড়া অনেক আরামের। অমলের তুল হয়নি—অমল উদ্ভূত পীঠিচের বন্ধী।

উদ্ভূত পীঠিচ ক্রমশঃই উঁচুতে উঠছে। তবুও অমলের মাথা ঘুরছে না। অমল জানে, পৃথিবীর বিমান-চালক ও আঘোহীকে অনেক উঁচুতে উঠলে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে যতই উপরে ওঠা যায় ততই অক্সিজেনের অভাব অদ্ভুত হয়। কিন্তু উদ্ভূত পীঠিচটির নির্ধারিত কৌশলই নিশ্চয় আঘোহীকে সকল হাওয়ার স্তরেই বাসকট হাতে রাখা করে। এখন হতেই অমলের ধারণা হল, মঙ্গলের মাছুষ পৃথিবীর মাছুষ অপেক্ষা বিজ্ঞানে অনেক উন্নত। অমলের বাসকট হয়নি অবশ্য, কিন্তু সে একটু বাতাই ঘুমিয়ে পড়ল, আর বখন চোখ খোলল, দেখল পীঠিচটি আবার মাটি স্পর্শ করেছে। অমল এদিক ওদিক চেয়ে বুঝলে এ মাটি পৃথিবীর নয়, মঙ্গলের।

হ্যাঁ, মঙ্গলই ত, সেই মঙ্গলগ্রহ থাকে অন্ধকার রাতে, পৃথিবী হতে আকাশের গায়ে সাধারণতঃ লাল দেখায়। আর লাল দেখাত বলেই সুসভা বৈয়াকরণ যুদ্ধের দেবতা মনে করে মঙ্গলকে ভয়ে পূজা করত। কারণ যুদ্ধ মানেই ত রক্তারক্তি, সব লাল লাল। মঙ্গলের সব কিছুই অমলের চক্ষে শুধু নতুন নয়, অদ্ভুতও ঠেকল। অমল এখন লক্ষ্য করল তার বশিকারীর, তার পরিবারবর্গের এমন কি কোন মঙ্গলবাসীর মাথায় একটুও চুল নাই। বিবর্তনের সঙ্গে নাকি প্রাণীর দেহ হতে চুলের ও লোমের পরিমাণ কমতে থাকে। যদি তাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে মঙ্গলবাসী পৃথিবীর মাছুষ অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক, সুতরাং অধিকতর সভ্য ও প্রকৃতির স্বামিত্ব-লোভের মনে করেন মঙ্গলে অতিশয় বুদ্ধিমান প্রাণীর অবস্থিতি থুই স্বাভাবিক।

বিমানবাঁটি হতে অমলকে যে মোটরগাড়ীতে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল তা বেশ ছোট এবং চলবার সময় সামান্য শব্দও করল না। বাস্তবতার জায় পদার্থ তৈরী, পরিষ্কার, মসৃণ, কোথাও একটুও উঁচু-নীচ নয়। বাড়ীও ছোট, মঙ্গলের সব বাড়ীই ছোট এবং অপেক্ষাকৃত নীচ। বাড়ীগুলি বাতিনির্ভর এবং উজ্জল কিন্তু তাদের উজ্জলতা চকুর পীড়াদায়ক নয়। কারণ প্রত্যেকেই নীলাভ, বাতুর তৈরী হলেও বাড়ীগুলি সীতে অত্যধিক সীতল হয় না। কারণ সূর্য্য মঙ্গল হতে প্রায় চৌদ্দ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত হলেও মঙ্গলের উপরের বায়ুস্তর মাত্র বাট মাইল পুরু অথচ পৃথিবী ও সূর্য্যের ১২৫,০০০,০০ মাইল দূরত্বের মধ্যে প্রায় ৩০০ লক্ষ মাইলের বায়ুস্তর রয়েছে।

বাড়ীর প্রত্যেক অমলকে ঘিরে পাঁড়াল। বেশ বোঝা গেল সকলেই খুব আশ্চর্য্য হয়েছে। গলিতারের মত অমল যেন অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছে—অবশ্য বেশটি লিলিপুটও নয় ব্রহ্মভিলাগও নয়। তবে মনে হচ্ছে এদের কাছের চেয়েই কম আশ্চর্য্যজনক নয়। বুদ্ধিমান বালক ভয়ানক বেশ শীঘ্রই মঙ্গলের ভাষা কতকটা ব্যাখ্য

করে ফেললে, সারাটা মঙ্গলে একটি মাত্র ভাব। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করতে অমলের কোনরূপ অসুবিধা হল না। শীত্রেই অমলের নাম মন্ত খেলোয়াড় বলে মঙ্গলের সহরে, সহর ছাড়িয়ে দূর গ্রামেও পৌঁছে গেল। বাবেই না বা কেন? পৃথিবীর বালক হয়ে অমল অনেক উঁচু ও দূরপাল্লা লাফাতে পারে এবং সে মঙ্গলবাসী অপেক্ষা দ্রুত ছুটেতে পারে। কারণ অমল শুধু মঙ্গলের যে কোন শিশু অপেক্ষা মাথার উঁচু নয়—পূর্ববঙ্গ কোনও মঙ্গলবাসীই পাঁচ ফিটের অধিক লম্বা নয়—পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলে মাথাকর্ষণ শক্তি অনেক কম। যদি কেও পৃথিবীতে উচ্চ মাত্রা দেড় ফুট লাফাতে পারে তাহলে সে মঙ্গলে কমপক্ষে চার ফুট লাফিয়ে উঠতে পারবে। পৃথিবীর সাধারণ খেলোয়াড় হয়ে অমল মঙ্গলে কতকগুলি রেকর্ড করে ফেললে।

উৎসুক বর্ষকদের প্রেরণা এড়াবার জন্য গুণ্ডা এত দিন অমলকে বাড়ীতে রেখেছিল কিন্তু এখন অমল গুণ্ডার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বাইরে যায়। গুণ্ডার স্ত্রী যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা এবং বাচ্চাদের ব্যবহারও চমৎকার। অমল এদের সাথে মোটরে ঘুরে বেড়ায়। মঙ্গলে কত মজার জিনিষ। মঙ্গলে পৃথিবীর মত এত বেশী লোক নাই। বাড়ীগুলি প্রায়ই সবই একতলা। মাটির অভাব নেই বলে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা কলকাতার মত আকাশ দখল করবার হিড়িক মঙ্গলে নাই। সহর হটক বা গ্রাম হটক, বেশ সাফান—এখানে ওখানে মনোরম উদ্যান, দূর থেকে ছবির মত মনে হয়। অধিবাসিগণ বেশ সস্ত্রী ও বলিষ্ঠ। মঙ্গলে লম্বা পাছ নাই বললেই চলে। সেখানে এক প্রকার শাওলা খুব বেশী, মাঠে মাঠে শাওলার চাব হয়। ওই শাওলাই মঙ্গলবাসীর প্রধান খাদ্য—পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণও আবিষ্কার করেছেন যে এক প্রকার শাওলার সর্বাপেক্ষা অধিক খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। শান্তাগুলি সবই সোজা। বালক-বৃদ্ধ নর-নারী সকলেই বেশ বিনয়ী। রাস্তার মোটরবাস আছে, তবে কোথাও ভিড় নাই। ধাক্কাধাক্কি নাই। পদচারণা রাস্তা বটে কিন্তু ধাক্কা দিলে এগিয়ে চলে না—এটা শান্তিপ্রিয়, কেহ কলহপরায়ণ নয়। হটবাক্যর আছে কিন্তু দরদরি নাই। কোনও কোনও লোকের মালিক নাই, তবে লোকেরা জিনিষ কিনে দাম একটি বাস্কে ফেলে নিচ্ছে—সেই বাস্ক নিয়ে কেউ সরে পড়ছেনা। রাস্তার কচিং পুলিশের লোক বৃষ্ট হয়—অথবা বানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য চৌমাথাগুলিতে পুলিশ আছে। উদ্ভূত পীরিটগুলি, অবশ্য যারা আকারে ক্ষুদ্র, রাণার সাধারণ মোটরের মতই চলাফেরা করে। আকাশে ছোট-বড় অনেক পীরিট, তারা অনেক রকমেরও, দূরপাল্লা ও কাছাকাছি উড়ে বাবার জন্য। মোটরবাস ও উদ্ভূত পীরিটের অনেকগুলি কারখানাও অমল দেখল। একটি কারখানার প্রতি দশ সেকেন্ডে গড়ে একটি করে উদ্ভূত পীরিট তৈরী হচ্ছে—আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানী গড়ে প্রতি সাত সেকেন্ডে একটি করে মোটরকার তৈরী করে মাত্র।

প্রতি গৃহে কমপক্ষে একটি বেতার-গ্রাহক-বস্তু রয়েছে। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল বিশেষ শোষণশীল নাই, সুতরাং অমল ওখানে রেডিও শুনে ভরী খুশী। বহন পৃথিবীর পাশ দিয়ে উদ্ভূত পীরিট উড়ে যায়, তখন তার আকর্ষণশক্তি পাশ দিয়ে পাল পৃথিবীর বেতার প্রোগ্রাম।

কিন্তু মঙ্গলবাসী অন্য কোন গ্রহের ভাষা জানে না—মঙ্গলবাসিগণ মনে করে সবগুলিতে না হলেও, অন্ততঃ কতকগুলি গ্রহে তাদের মত মানুষ থাকা আশ্চর্য নয়। পৃথিবীর বেতার প্রোগ্রাম মঙ্গলবাসীর নিকট অবোধ। মঙ্গলে যে পশু হ্র দেয় দেখতে পৃথিবীর গন্ধ-মোষের মত নয়, কিন্তু হ্র দেয় অনেক। মঙ্গলে চৌর-ডাকাত নাই। মঙ্গলে রাজা নাই, সমগ্র মঙ্গলে একই শাসন এক নির্বাচিত শাসক। এতদ্যেক প্রান্তে স্বায়ত্তশাসন বর্তমান এবং শাসকগোষ্ঠী নিজদের জনসাধারণের সত্যিকারের সেবক ভেবেই শাসনকার্য চালায়। মঙ্গলবাসীরা মনে করে, তারা একটি উচ্চতর শক্তি দ্বারা পরিচালিত, তবে তারা কোনও ঋণ নিয়ে দলদলি বা চৌচায়েচি করে না।

মঙ্গলবাসিগণ ভয়ানক শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করতে জানে। পৃথিবীর এটম ও হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক বোমাও তৈরী করতে পারে। তবে নিজেদের ধ্বংস করার জন্য তারা এরূপ ভয়াবহ সৃষ্টিধ্বংসী মারপাছ তৈরী করতে চায় না। তারা আণবিক শক্তি দেশের মঙ্গলের জন্যই ব্যবহার করছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মঙ্গলের বান-বাহন কোথাও শব্দ করে না। কারণ এরা চলে আণবিক শক্তির সাহায্যেই। মঙ্গলবাসীদের ডুবো-জাহাজ নাই, এদের প্রয়োজনও নাই। মঙ্গলবাসীরা বলে, আমাদের গ্রহে শান্তি বিধাজিত এবং কোন গ্রহের প্রতি আমাদের লোভও নাই। বিশেষ করে সূর্য-শরিরারভুক্ত পৃথিবী আমাদের নিকটতম আশ্রয়। পৃথিবীর প্রতি মঙ্গলবাসিগণ সত্যই খুব বড়ভাবাপন্ন। তবে যে কোন গ্রহ থেকে মঙ্গলের বিকল্পে অভিযান চালালে সেই গ্রহের অধিবাসীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার ক্ষমতা মঙ্গলবাসীদের বশেষ রয়েছে। মঙ্গলের ছেলে-মেয়েরা পারা থেকে সোনা তৈরী করতে জানে কিন্তু মঙ্গলে সোনা চুচুর; সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরীর প্রয়োজন কোথায়? বাচ্চারাও এটম ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করার পদ্ধতি শুলে শেখে। কাণ বিজ্ঞানের প্রতি শাখার উপরই স্থূল হতেই তাদের কিছু কিছু দখল ঘটে। বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা এ-ও শেখে যে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে জীবের ধ্বংস অনিবার্য। মঙ্গলের স্থূল-কলেজে জীবকে, বিশেষতঃ মানুষকে, ভালবাসতেও শেখান হয়।

মঙ্গল আয়তনে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৭ মাইল, মঙ্গলের ৪২১৫ মাইল। মঙ্গলে সাগর আছে গভীর ও প্রশস্ত, নদীও ওখানে অনেক। মঙ্গলের মাটি লালচে, তবে বসন্তে মঙ্গলকে আকাশ হতে কতকটা সবুজ দেখায়। কারণ নতুন লতাপাতার ও খাদ্য-শাওলার প্রাচুর্যে মঙ্গল তখন ভরে ওঠে। মঙ্গলে মাত্র তিনটি ঋতু: শীত, বসন্ত ও শরৎ। অমলের খড়ি জম্মার মঙ্গল নিজের কক্ষের উপর ২৪ঘণ্টা ও ৩৭২ মিনিটে একবার আবর্তন সম্পন্ন করে। সেকেন্ডে ১৫ মাইল বেগে মঙ্গল ৬৮৭ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে—পৃথিবী সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে, প্রতি সেকেন্ডে ১৮ মাইল বেগে। মঙ্গলের দুইটি চান্দ—পৃথিবীর তো মাত্র একটি। একটি চাঁদ মঙ্গলকে ৩০ ঘণ্টার সময়ান্তর একটু বেশী সময়ে একবার প্রদক্ষিণ করে কিন্তু অপরটি মাত্র ৭২ ঘণ্টায় এক পাক নিয়ে নেয়। ইহা ছাড়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য মঙ্গলবাসী বেশ কয়েকটি

কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলের আকাশে সর্বদাই উড়িয়ে রাখে। মঙ্গলে আবহাওয়ার পূর্ণাভায়ে সামান্য গরমিলও হয় না।

মঙ্গলে অত্যুচ্চ পর্যটনমালাও আছে—কমুচো ওদের সর্বোচ্চ পর্যন্ত। মিষ্টি জলের বর্ণা ও অনেক মরুভূমিও আছে, তুষার-ক্ষেত্রও আছে। আকাশে মেঘও ওড়ে, বৃষ্টিও হয় সারা বছরই; বর্ষা বলে খড়ু নেই। মঙ্গলে অক্সিজেন নেই বললেই চলে। মঙ্গলের বাতাস মাইক্সোজেন ও অর্গন গ্যাসেই প্রায় পূর্ণ। সামান্য কার্বন ও হাইড্রোজেন গ্যাসও আছে। মঙ্গলবাসীরা, এমন কি অমলও কিরণে ঐ প্রায় অক্সিজেন শূন্য বাতাস সেবন করে জীবিত আছে, তেবে অমল কম আশ্চর্য্য হয়নি। গণ্ডার্য্যর স্ত্রী অমলকে বললেন তোমাদের পৃথিবীতেও নিশ্চয় নানা প্রকারের আবহাওয়া আছে। পৃথিবীতেও বালুকাময় মরুভূমি ও তুষারভূমি কম নেই। মরুভূমি ও তুষারভূমির বৃক ও তৃণভূমাদির মধ্যেও অনেক পার্থক্য। আবার যে লোক পাহাড়-পর্বতে থাকে তারা সমভূমিতে থাকতে কষ্টবোধ করে। আমরা এই আবহাওয়ার থাকতে পারি এবং বেঁচে আছি। কারণ এখানে বা জন্মায় আমরা তাই পাই। তোমার কি এখানে শারীরিক কোন কষ্ট হচ্ছে?

নিশ্চয় না, অমল বললে।

কারণ কি? কারণ এখানে বা থাকে তাতে এমন পর্দা আছে যা তোমাকে এখানকার আবহাওয়ার বাঁচতে ও বাড়তে সাহায্য করছে এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে ১৮° ডিগ্রীর পার্থক্য থাকলেও তোমার বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না।

অমল বললে, মনে হচ্ছে মঙ্গলবাসীরা বিজ্ঞানে খুবই এগিয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানে আমাদের উন্নতির নমুনা ত তুমি যত্নে অনেক দেখলে। তোমাদের উঁচু বাড়িগুলো আমাদের শক্তিশালী দূরবীণগুলো দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। দেখবে না কি? তোমাদের ঐ বাড়িগুলো দেখলে মনে হয়, তোমরাও বিজ্ঞানে অনেক এগিয়েছ।

ভদ্রমহিলা অমলকে নিকটবর্তী একটি মানবশিরে নিয়ে গেলে সেখানে একটি বৃহৎ দূরবীণের সাহায্যে—দূরবীণটির ব্যাস ৪০০ ইঞ্চি—পৃথিবীর বালক মঙ্গল থেকে দেখতে পেল পৃথিবীর বৃক একটি সু-উচ্চ অটালিকা। অমলের মনে পড়ল শিশু ভারতীর কল্পিত চিত্র—যাতে একটি শিশু অসীম আকাশের এক কোণে বসে গোলকাকৃতি পৃথিবীকে লক্ষ্য করছে।

অমল প্রশ্ন করলে, ভটা কি নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং?

নাম ত জানি না। গত বছর আমাদের জন হুই লোক ঐ বাড়ীর নিকটে কোথাও নেমেছিল কিন্তু নাম না জেনেই ফিরে এসেছে। কারণ, অত্যধিক সাহস দেখাতে গেলে ঘরা পড়বার ভয় ছিল যে। বিশেষে সম্পূর্ণ আনন্দে অজানাদের হাতে ঘরা পড়া কি বিশজ্ঞানক নয়? ঐই ত সেদিন আমাদের জনৈক। মহিলা বৈমানিক পৃথিবীতে নেমে সেখানে একটি লিপিকা রেখে ফিরে এসেছে।

অমল বললে, ঐ চিঠি পড়েছি। পৃথিবীতে কেউ ভটা পড়তে পারেনি। কিনে গিয়ে চিঠিটা পড়ে শোনাল।

অমল মঙ্গলে বেশ ছিল কিন্তু মাকে না দেখে আর কত দিন থাকবে? একদিন গণ্ডার্য্যর স্ত্রী গলা জড়িয়ে ভারি গলায় বললে, তোমার কাছে কত আদর পাচ্ছি! মঙ্গলবাসীরা সবাই আমার

ভালবাসে। আমার আরও অনেক দিন মঙ্গলে বাস করতে ইচ্ছা। কারণ মঙ্গল শুধু অমলের দেশ নয়, অধিবাসীরাও বেশ শান্তিপ্রেমী। কিন্তু তবু মনে চাইছে পৃথিবীতে ফিরতে। কারণ আমার মা সেখানে আমার জন্ম কত কাঁদছেন নিশ্চয়।

গণ্ডার্য্যর স্ত্রী অমল চলে যেতে চাইছে তখন খুব হৃৎশিথ হলেন কিন্তু হৃৎশিথ চেপে বললেন, ভালবাসা—মা ও সন্তানের মধ্যে যে ভালবাসা—নিশ্চয় এখানে বা কিছু দেখছ 'সবার চেয়ে তা অনেক উঁচু। তারপর স্বামীকে ডেকে বললেন, অমল মার কাছে যেতে চাইছে। ওকে পৃথিবীতে রেখে এস।

গণ্ডার্য্যর উত্তর দিলে কিন্তু আমরা যে ওর ভাষা ভাল করে শিখতে পারিনি। পৃথিবীর ভাষা শেখবার জট্টাই ত ওকে এখানে নিয়ে আসা। যদি আমরা পৃথিবীকে ভাল করে জানতে চাই, এবং জানা উচিতও, তাহলে আমাদের উচিত ওখানকার অন্তত একটি ভাষার সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করা।

অমলের কাছে আমরা ওদের একটি প্রাধান ভাষা, ইংরেজী, কতকটা শিখেছি, অমলও আমাদের ভাষা বেশ শিখে ফেলেছে। এতই আমাদের ছুই গ্রহের মধ্যে প্রাথমিক সংবাদ আদান-প্রদানে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমরা স্বার্থপর নই। স্বার্থের জন্ত পৃথিবীর ছেলেটিকে কত দিন আর আটকে রাখবো?

এবারে অমল বললে, কিন্তু আমি যে এখনও যথেষ্ট বয়স হইনি। যদি বলি মঙ্গলের ভাষা শিখেছি পৃথিবী লোকে আমাকে পাগল বলে উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, মা, আমাকে সম্পূর্ণ বিদায় করবে।

বৈজ্ঞানিক হয়ে উপযুক্ত বয়স তৈরী কর, বার সাহায্যে পৃথিবী থেকে আমাদের সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে। পৃথিবীর থেকে সেই কথাবার্তা তখন আর তোমাকে অবিদায় করবে না। আর পৃথিবীর লোককে বলতে তুলো না যে, আমরা সৌর জগতের কোন গ্রহেরই শত্রু নই।

অমল ভারি গলায় বললে, তোমাকে ও তোমার উপদেশ বন্ধনও তুলব না মা!

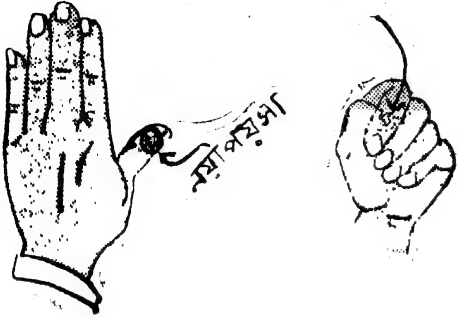
অমল বন্ধন চোখ খুললে, দেখল মা তার মুখের উপর রুয়ে। মা বললেন, রুয়ের মধ্যে কি সব বকছিলে, অমল? অমল চারদিকে একবার চোরে নিয়ে বললে, আমি যে একুশি মঙ্গলে ছিলাম মা। মা অমলকে চুমু দিয়ে বললেন, বড় বৈজ্ঞানিক হবার চেষ্টা কর। চেষ্টা করলে মঙ্গলে হয়ত একদিন সত্যিই যেতে পারবে।

নয়া পরসার নয়া যাত্রা

যাত্রাভ্রমার এ, সি, সরকার

নয়া পরসার বাজারে নয়া পরসার একটা খেলা না শিখলে চলে কেমন করে বল? তাই তো আজ এখন একটা খুব মজাদার নয়া পরসার ম্যাজিক দেখাচ্ছি। খেলাটা যদি ভাল করে অভ্যাস করে উপযুক্ত পরিবেশে দেখাতে পারা, তবে ধারা দেখবেন তাঁরা খুবই অবাক হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খেলাটোতে কী দেখাটো হবে

বাহুর তার বা হাতের চোটা খুলে দেখাবে তার দর্শকদের। এর পরে হাত মুঠো করে ফুঁ দেবে আর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়বে :



চিচি কাঁক,
চিচি কাঁক,
নয়া পয়সা আর।
উই চিড়ি,
ডুই চিড়ি,
প্রকট্যে ধার।

মন্ত্র বলে হাত খুললে দেখা যাবে যে, বাহুর হাতে সত্যি সত্যিই একটা নয়া পয়সা এসে গেছে। এ দেখে কি দর্শকেরা অবাক না হয়ে পারবেন?

কেমন করে এই খেলাটা ক'রবে তাই বলি এবার শোন। খেলা দেখানোর আগে গোপনে একটু ভেজা কাপড়কাটা সাবানের টুকরা লাগিয়ে রাখবে বা হাতের বুড়ো আঙুলের নখে আর এই সাবানের উপরে সেঁটে রাখবে একটি নয়া পয়সা। হাতের চোটা খুলে দর্শকদের যখন দেখাবে তখন নয়া পয়সা থাকবে পেছনের দিকে। কাজেই তাঁরা দেখতে পাবেন না। হাত মুঠো করার সময়ে বুড়ো আঙুলটাকে কনিকের জন্তে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেই আপনা থেকেই নয়া পয়সা খসে পড়বে মুঠোতে। হাত মুঠো করার সময়ে যদি হাতটা একটু আন্দোলিত করা যায়, তবে বুড়ো আঙুল ঢোকানো আর বের করা দর্শকেরা বুঝতে পারবেন না।

বাহুবিন্যাস উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা জবাবের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ আমার সঙ্গে পত্রালাপ করতে পার A. C. Sorcar, Magician Post Box 16214, Calcutta-29 এই ঠিকানায়)

প্রান্তরের সুর অশোককুমার চৌধুরী

আজও বুঝি বাজে সেই সুর...

ভোরের টুকটুকে লাল আলোর পর্দার স্পষ্ট হল সিংহগড়। মারাঠা-মাতার অন্তর ভরে উঠল অজুত আনন্দে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ হয়ে এলো বর্ষাকাল মেঘের মত বিষম-গভীর। দূত ছুটল। মারাঠা-রাজা এসেন তাঁর ঘরে। এক মুহূর্তের জন্যে কি ভাবলেন নারী। তার পর হঠাৎ দাবা খেলার আয়তন কানালেন আগন্তুককে।

আগন্তুক কোঁচুক মনে করে খেলতে বসলেন। তার পর হেঁবে গিয়ে বললেন—কি বাবা চাও তুমি?

সিংহগড়। গভীর সুরে কথাটা বলেই মুখ ঘুরিয়ে উঠে পাড়ালেন। এ আদেশ রাখতেই হবে, মনে মনে বুঝলেন মারাঠা-রাজা। তবু তবু শেষ চেষ্টা করলেন,—কিন্তু ওটা যে এখনও যোগলদের হাতে।

তার জন্তেই ত আরও চাই, সিংহগড় আমার চাই-ই।

চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেলেন রাজপুত্র। মনের আয়নার খুঁজতে লাগলেন একটা মুখ, যে পারবে এই অসাধ্য সাধন করতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি—‘ডাক...কে’, হঠাৎ চিংকার করে উঠলেন মারাঠা পুত্র, আবার ছুটল দূত। সেই ভাগ্যবান পুত্র তখন কাজে ব্যস্ত, তাঁর ছোট ঘোলের বিয়ে। রাজার ডাক পৌঁছল তাঁর কানে। তেড়ে দিলেন বিয়ে, ছুটে এলেন কর্তব্যের ডাকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সারা রাত্তা চিংকার করতে করতে এলো একটা ‘কপারমুখ’ পাখী। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললেন, ‘অমৃত লক্ষণ’। মারাঠাবীর হাসলেন—হোক, তবু কর্তব্য বড়। এগিয়ে গেলেন তাঁর রাজার সামনে। অভিযান করে জিজ্ঞাসু চোখে তুলে ধরলেন। ‘আমার নর ভাই, আমার প্রয়োজন’—রাজা বললেন।

কপালে পক্ষিশখার মঙ্গলস্পর্শ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মারাঠা-রাজমাতা—‘তুমি কি ওই সিংহগড় আমার জয় করে দিতে পারবে?’ এক মুহূর্ত। না, তাও বুঝি না। বাড়ি নেড়ে মাথার শিরশ্চাপ রাজমাতার পায়ের কাছে রেখে বললেন—না, সিংহগড় আপনাই হবে।

—মারাঠার ঘুর, কক্ষ, বন্ধুর পথে আবার উঠল ঘুলোর কড়। চলেছে একদল পাহাড়ী বোঁদা। সামনে তাদের অধিনায়ক, বীর, গভীর, সদাহাস্যময়, অশ্রু কর্তব্য-কঠোর। ওই হুগুটি কাদের গো? যোগলদের না কি গো? ওতে কত লোক হবে গো? ওখানে যায় কি করে গো? এই রকম নানা প্রশ্নকার প্রশ্ন করছিল একটা চাষাভূষা মানুষ। এই হয়ত প্রথম দেখল অত-বড় হুর্গ, তাই অত কোঁচুক, সিংহগড়ের আশে-পাশের লোকেরা ভাবল।

—পাহাড়ী কর্ণাঙলার শেষ বিলিকটুকু কেটে মিলিয়ে গেল দিনের আলো। ঘনিয়ে এলো অন্ধকার, গাছের আড়ালে আড়ালে, ঝোপের কীচে লুকিয়ে আছে তিনশো মারাঠা বোঁদা। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে বনের দিকে এগিয়ে এলো সেই চাষা। কিস-কিস করে সবাইয়ের কানে কানে কি কথা হল।

এখনও কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হবে। রাত গভীর হোক, বোঁদার ওপর চেপে চাপাঙ্গলার বলে উঠল সেই চাষা। মাঘ মাস, প্রচণ্ড শীত, কাঁপন-ধরানো হাওয়া। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপ, তার নীচে তিনশো বীর, নির্ভীক, নির্ভর। হুতীরার বাঁকা চাদের বিবর অভা তাদের কঠোর মুখগুলোকে আরও কঠোর করে তুলেছে।

এগিয়ে চलो সব, রাত্রির বিতীর বামের মাঝামাঝি আদেশ হলো। সিংহগড়ের দিকে এগিয়ে চলল তারা, তখন যদি সেখানকার কোন লোক তাদের দেখতো তা’হলে সেই নিভাত বোঁকা চাষাটাকে তাদের সর্দার দেখে সে নিশ্চয় বাথড়ে যেতো।

আলো-আঁধারীতে দৈত্যের মত পিড়িয়ে আছে আকাশ-ইঁদো

হুগ্গা। মশ্ণ, বাঁহীন, প্রায় খাড়াই বিরাট পটিলটা চকচক করছে চাঁদের আবছা আলোর। কোন মাছের পক্ষেই এ ঘরে ওঠা সম্ভব নয়। নিয়ে এসো ওটা, আদেশ করলেন চাষারঙ্গী মারাঠা বীর। বাঁচার মত একটা জিনিষ নিয়ে এসো ক'জন মারাঠা। খুলে দাও, খুলে দেওয়া হল বাঁচ। বেরিয়ে এলো চিত্রবিচিত্র বশোবস্ত। মারাঠা-বীর তাঁর গলার সুলিরে দিলেন নিজের যুক্তোর মালা, তারপর তার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল একটা দড়ির মই। মারাঠা-বীর আদেশ দিলেন, উঠে পড়।

অঙ্গশে উঠতে আরম্ভ করল বশোবস্ত, গিরগিটার মত। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অ'ঘোরপান'গুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মশ্ণ খাড়াই প্রাচীর ঘেঁরে উঠতে পারে।

কিন্তু আকর্ষ্য, অত শিকিত বশোবস্ত হঠাৎ কেন ভাড়াভাড়ি ভয় পেয়ে নেমে এলো। 'অকুট গুজন শুক হলো মারাঠাদের মধ্যে—না, না, আপনি বাবেন না সর্দারজী, এটা বিজী সক্ষেত, তবুও কর্তব্য-কর্তার মারাঠা-বীর। 'উঠে পড়, তা না হলে তোকে কাটব।' তিনি ভয় দেখালেন জম্বটাকে—বশোবস্ত ভয় পেয়ে ভাড়াভাড়ি উঠে অকুত হয়ে গেল দুর্গপ্রাচীরের ওধারে। শুধু মূলে রইল দড়ির মইটা।

এই, তুমি এদিকে এসো; মারাঠাবীর একজন বক্টি, নির্ভীক মারাঠা-বোদ্ধাকে আদেশ করলেন, ভাল ভাবে বেঁধে এসো ওই মইটা।

আর একটু! আর একটু! কল্প নিঃশ্বাসে অপরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে 'তিন ন' লোক। দুর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে ছ-একটা আলোর রেখা। গগুজে গগুজে তাক্সে প্রহরী। প্রাকারে প্রাকারে সশস্ত্র পাঠান প্রহরীর দল। খুব সাবধানে উঠতে হবে। একটু! আর একটু! হঠাৎ লাড়িওলা একটা মুখ ওপর থেকে মুখ বাড়াল, দেখতে শেল সেই বুক মারাঠাকে। চাঁৎকার করতে গেল...করলেও চাঁৎকার—একটা অকুট আর্জিনাদ মাত্র। মারাঠাবীরের অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর কণ্ঠ কল্প করে দিয়েছে চিরদিন। দুর্গপ্রাচীর থেকে তাঁর দেহটা ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ল—বপ।

যুবক বীর দড়ির মইটা ভাল ভাবে বেঁধে দেওয়ার পর, তিন জন বাছা বাছা বোদ্ধা নিয়ে সেই মইয়ের সাহায্যে দুর্গে ঢুকলেন মারাঠা-বীর। তাঁর মুখ পাগড়ীতে ঢাকা, হাতে তলোয়ার।

কিন্তু সেই দুর্গরক্ষকের চাঁৎকার ও পতনের আওয়াজ দুর্গ-রক্ষকের সচেতন করে তুলল। গগুজে গগুজে জলে উঠতে আরম্ভ করল মশালগুলো। কয়েক জন মোগল শাস্ত্রী সেই মারাঠাবীরকে নামনে শেষে হত্যা করল। পড়তে পড়তে চাঁৎকার করে উঠলেন মারাঠাবীর; দুর্গ জয় করতেই হবে। তারপর তাঁর প্রাণহীন দেহটা ধপ করে মাটিতে পড়ল।

ইতিমধ্যে কিন্তু মারাঠা বাহিনীর দুর্গপথ খোলা হয়ে গেছে, ঢুকে পড়ল তারা, রাত্রির নিশ্চলতাকে ভঙ্গ করে চাঁৎকার করে উঠল 'হর, হর মহাদেও।' আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দিল এক হাজার দুর্গবাসীকে মাত্র তিন ন' সৈন্য। সৈন্যদের খড়ের বরগুলোর আশ্রয় দিয়ে দিল। তারপর জয়ধ্বনি দিল, 'হর, হর, মহাদেও!'

রাত্রি নিশীথে সেই আশ্রয়ের শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মারাঠা-রাজা হর থেকে সেই আশ্রয় দেখে মার দিকে চেয়ে বললেন, ওই দুর্গ এখন তোমার।

হুড়ুম! হুড়ুম! তোপধ্বনি হল সিংহগড় থেকে, এবার আর মোগল নয়, মারাঠার করছে তোপধ্বনি। অস্তিম-শয়নে অভিভূত তাদের সর্দারের মৃত্যুকে সম্মান জানাচ্ছে হুড়ুম! হুড়ুম!

সমস্ত মারাঠা জনতার মুখে কান্নার আভাস, কণ্ঠের মারাঠা-বাহার চোখটাও জলে ভরে উঠল। সিংহগড় পেয়েছি কিন্তু সিংহ আমি হারিয়েছি, কান্না-ভেজা কণ্ঠে বললেন মারাঠারাজা, এক কাপটা হাওয়ার কান্নার স্রব উঠল বেজে।

আজও বুকি বাজে সেই স্রব ভয়দুর্গের প্রাকারে, শিলাপ্রাকারে, পর্বতের কন্দরে, মহারাষ্ট্রের পথে-প্রান্তরে, হঠাৎ উদাস হওয়া চাষার মনে, পথচলা বাউলের অতীত-স্মৃতিসুখের গানে—মহারাষ্ট্র তোমার ভোলেনি, তানাজী! ওগো মহাবীর তানাজী!

ভক্ত কবীর

বাসুদেব পাল

রা'মানন্দের শিষ্যদের মধ্যে কবীর অগ্রতম। কবীরের জন্মকালীন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

বখা:—কবীর ছিলেন এক ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র। ব্রাহ্মণকন্যা নিজের বৈধব্যের কলঙ্ক কালিমা মোচন করবার জন্তেই সত্যোজাত পুত্রকে কানীর 'লহর-তালার' পুষ্করিণীতে একটি পদ্মপাতার ওইরে ভাসিয়ে দেয়। পরদিন অতি প্রত্যুষে নিমা নামে একজন জোলা-জাতীর দ্রলোক ও তার বামী মুহাম্মাদি এই পুষ্করিণীর ধার দিয়ে নিমগ্নে বাড়িল। লহমা নিমা তৃপ্ত হইয়া এই পুষ্করিণীতে জল পান করতে গিয়ে অকস্মাৎ একশ অত্যানবীর দৃষ্ট অত্যন্ত দুঃখ ও স্নেহাজ্ঞ হইয়া উক্ত সত্যোজাত কন্যার শিশুটিকে গৃহে নিয়ে গেল। অতঃপর জোলা-দম্পতি শিশুটিকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুটির নামকরণের জন্তে তারা একজন কাজীকে ডেকে আনিল। শিশুটির নাম-নির্কর্তাচরণে 'কোরাণ-শরিক' বুলতেই লহমা কাজী সাহেবের দৃষ্টিপাত ঘটিলো—'কবীর' নামের উৎস। সেই থেকেই শিশুটির নাম হ'লো, কবীর। কবীর আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, মহান, বৃহৎ বা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

কানী হিন্দুগ্রন্থান স্থান। নিরু শেখের (কবীরের পালক পিতা) প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। কাজীই বালক কবীরের খেলার সাথী ছিল অবিকারশই হিন্দু বালকরা। কিন্তু তাদের খেলা সাধারণ খেলা ছিল না। ভগবৎ-পূজন ও ভগবানের নামকীর্তনই ছিল তাদের খেলাধুলার বিষয়বস্তু।

কবীর জাতে জোলা বলে অনেকেই তাঁকে উপহাস করতো। কবীর কিন্তু তাতে জোলা স্ক্র হতেন না। কারণ তাঁর কথায়:—

ধরনী আকাশ কী কারণই বানারী—

চক্রে সুরজ দুইনাগ চালায়।

অর্থাৎ, এই পৃথ্বী ও নীল অশ্বও আকাশকে ভগবান কারণই বানিয়ে চক্রে-সুদ্বারগণ মাঝে চালাচ্ছেন অবিরত। কবীর লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু সরল জ্ঞান ও বুদ্ধি বুদ্ধির বলে পুশ্চাত্তিহুস্ত গভীর ভাবের শাখত-রূপকে সত্য ও মনুষ্য করে তিনি প্রকাশ

করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার বাহ-বহিষ, কৃষ্ণ-করিম, কাকী-কাবা সবই একই! একের-ই ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন :—ময়লা ভিন্নিটি এক। কিন্তু তা থেকে আহার্য প্রস্তুত হ'ব বিভিন্ন প্রকারের। কবীরের সময়েই হিন্দু-মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী হওয়ার একের ধর্ম-প্রভাব অপরের উপরে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবাবিষ্ট করেছিল। মুসলমানগণ তখন দেশের শাসক। তাঁদের ধর্ম-প্রভাব ও গোঁড়ামির-প্রোবলা হাজিরকির বলে অত্যন্ত প্রকট। এ-হন অংকায় দেশের সমাজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিজদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সময়েই রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ 'এক ধর্ম-আলোড়ন তুলে সর্বধর্ম-সমবয় করার এক মহান প্রচেষ্টার সূচনা দেখিয়েছিলেন।

কবীরের প্রভাব অনেক মহাপুরুষ ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আহমদাবাদের দাদু সাহেব কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কবীরপন্থী শিষ্যরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। হিন্দী রামায়ণ রচিত্তা তুলসীদাসও তাঁর বাণীমাধুর্য্যে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একদা বৃন্দাবনবাসিনী মীরা বাঈও কবীরের ভক্তিদ্বারা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়েছিলেন! গুরু নানক বিভিন্ন দেশ পর্যটন করে অবশেষে কাকীতে উপস্থিত হয়ে কবীরের ধর্মচর্চার ব্যাখ্যা শ্রবণে তন্ময় হয়েছিলেন। অধোধ্যায় জগজীবন দাস কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে 'সংনামী সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া মালবদেশের বাবলাল বাবলালি সম্প্রদায়, বীরজন সাধু-সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, আলোয়ারের চরণদাস-চরণদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে কবীরের মহৎ উদ্দেশ্যকে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের ধর্মব্যাখ্যার মূলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের একটি সমবয়-সাধনের চেষ্টা দেখা গছে।

অপর দিকে মনকে পবিত্র, কলঙ্কমুক্ত না ক'রে কেবল বাহ্যিক গুরুগম্ভীর আত্মত্বের প্রোতলাভের ঈশ্বর-দর্শন পাওয়া যায় না। এই বাণীই কবীর প্রচার করতেন। তিনি বলতেন,—

তীরথ-মে তো সব পানী হৈ

হো বৈ নহী কিছু হার দেখা।

প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,

বোলে নাহি বোলার দেখা।

অর্থাৎ, তীর্থ তো খালি জল। আমি তাতে ডুব দিয়ে দেখছি। কল তো কিছুই হয় না? প্রতিমাকেও ডেকেছি, কোল সাড়া পাইনি!—

পূরণ কোরণ সববাত হৈ

রা ঘটকা পরদা খোল দেখা।

অনুভব কী বাত কবীর কই—

বহ সব হৈ বৃত্তী শোল দেখা।

পূরণ-কোরণ সব তো কেবল কথা। আমি পরদা খুলে তাঁদের আসল রূপ দেখে নিয়েছি। কেবল অনুভব করবার কথাই কবীর বলেছেন। আর সব মিথ্যা, নিছক জ্ঞান!

অকস্মাৎ মুসলমানগণ কবীরের ব্যাক-বিশেষ বিজ্ঞত হ'য়ে রাজার কাছে নাগিল জানালো। দিল্লীর সম্রাট তখন সিকন্দর শাহী। তাঁরই আদেশে কবীরকে বন্দী ক'রে জৌনপুর দরবারে হাজির করা

হ'লো। বঙ্গগম্ভীর নিনাদে কবীরকে শুধোলেন সিকন্দর শাহী, 'তুমি হিন্দু না মুসলমান?'—সম্রাটের এ-হেন প্রশ্নের জবাবে ঈশ্বর ব্রহ্মহুত্তে কবীর বলেন,—

হিন্দু কহ'তো মায় পই, মুসলমান তী নাহি।

পাঁচ তত্বকা পুতলী গৈবী খেলে মাহি।

আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চতত্ত্বাত্মক পুতলিকা আমার মধ্যে অদৃশ্য বহস্তের খেলা খেলে চলেছে! তাই,—

হিন্দু খাটবে দেহরা, মুসলমান হ' মসীত,।

দাস কবীর তর্কী ধাবহী জঁহা দোনকী পরতিত,।

হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যান করে। মুসলমান করে মসজিদে।— দাস কবীর সেইখানেই ধ্যান করে, যেখানে উভয়েরই প্রার্থিত।

সিকন্দর শাহী সন্তুষ্ট, বুদ্ধিমান, কৌশলী-সম্রাট। অতএব তিনি সম্মানেই কবীরকে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

কবীরের জীবন নাম ছিল লোড়। তিনি ছিলেন বনশতী বৈদ্যায়ী কব্জা। তাঁদের এক পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। কবীর পুত্রটির নাম রেখেছিলেন 'কমাল' আর কন্যাটির নাম 'কমালী'। কমালী এক দিন কুপ থেকে জল আনতে গিয়ে কোন এক ব্রাহ্মণের জলের কলসীতে একটু জলের ছিট লাগে। এতে উক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হ'য়ে কবীরের কাছে অভিযোগ করেন। কবীর সমস্ত ঘটনা স্বয়ংসম ক'রে, সত্যসত্তা ব্রাহ্মণকে বলতে থাকেন :—

পশুত তুম বৃক শিরপানী।

তোহে ছুং কহী লপ্তানী?

জামাটিকে ঘরমে বৈঠকী তোমে সৃষ্টি সমানী।

হে পশুত, তুমি বৃক-স্বরে জল খেও। এ জলে কোথা থেকেই বা ছুং লাগলো? যে মাটির ঘরে তুমি বাস করো, সেই মাটির সঙ্গেও তো সমগ্র পৃথিবীর সংযোগ রয়েছে! এই ভাবে কবীর সমাজশ্রেষ্ঠ পশুত ও মোজারদের মহামূল্য উপদেশ দান ক'রে, তাঁদের জ্ঞানভেদ বিকশিত করতেন!

একদা কবীর তাঁর প্রশ্নের জ্বালা জুড়াবার জন্যে কোন পরম-পুরুষের সন্ধানে তিরুত, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, বুখারা, ইরান প্রভৃতি বহু দেশ পর্যটন ক'রে শেষে পৌরকপুরের কাছে হিমালয়ের পাদদেশে 'মগহর' গ্রামে উপনীত হন এবং তথ্যই নির্জনবাসে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেন। প্রবাদ আছে, কাকীতে দেহ রাখলে নাকি শিব হয়। তেমনি মগহরে মরলে মানুষ নাকি সাধা হয় পরজন্মে। তাই কবীর কাকী ত্যাগ ক'রে মগহরে বাস করতই স্তব্ধ করলেন। শিষ্যদের ভিনি বলেন, 'ভগবানের সাক্ষ-ভজন না ক'রে কেবল হানুমান-হস্তো দেহ ত্যাগ ক'রে মুক্তিলাভ আমি চাই না। যদি আমার ভগবৎ-প্রেম অটুট থাকে তবে মগহরে থেকেই আমার মুক্তিলাভ আমি আশার ক'রে নেব।'

অবশেষে একদিন মগহরে এক নদীর তীরে পুণ্পশয্যা ক'রে কবীর তাঁর শেষের গান গাইলেন,—

গাউ গাউরী হুলহনী মললচারা।

মেরে গৃহে আয়ে রাজারাম ভভারা।

অর্থাৎ, হে কতাব্রাজিগণ। তোমরা আমার বিবাহের মললচারা গান করো। কারণ; আমার গুপ্তী রাজারাম আমার গৃহে এসেছেন।

এই ব'লেই কবীর নিজের শরীরে ব্রাহ্মচাষিত ক'রে বিদেহ

হ'য়ে গেলেন। তারপর সেই দেহের সংকার নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বর বাকবিতণ্ডা শুরু হ'লো। হিন্দুরা দাবি করতে চায়। মুসলমানেরা চায় কবরস্থ করতে। কিন্তু, অকস্মাৎ ব্রাহ্মাধ্বানন উদ্ভূত করতাই এক অত্যাশ্চর্য্য, অজাবনী ও অলৌকিক কৃষ্ণ ভীষণ ছটায় সমবেত ভক্তবৃন্দ পরম-বিষয়ে পাবানবৎ ঝাড়িয়ে থাকল। সেই বস্ত্রের তলদেশে কবীরের শবদেহের পরিবর্তে প'ড়ে আছে শুষ্ক শুষ্ক পুষ্পাশি।

সেই পুষ্প ভাগ ক'রে কতকগুলি পুষ্প হিন্দুগণ কানীতে দাখ ক'রে, বর্তমানের কবীর চৌরা—নামক স্থানে সেই ভাষ সমাধিস্থ করে এবং অর্ধেক পুষ্প মুসলমানগণ 'মগহর'ে কবরস্থ করে।

সেই থেকেই কানীর 'কবীর-চৌরা' ও 'মগহর' উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে চিরসংবীর হয়ে বিরাজ করছে।

ঐতিহাসিকদের মতে :— কবীরের জন্ম—১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু—১৫১৮ খৃষ্টাব্দে।

গিবনের আত্মজীবনী

শুনীলকুমার নাগ

ইংরেজী ভাষায় ত বটেই এবং গোটা পৃথিবীর আত্মজীবনী— সাহিত্যের ও অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ রচনা গিবনের (Edward Gibbon 1737—1794) আত্মজীবনী।

গিবনের মৃত্যুর দু' বছর পর তাঁর এক বন্ধু এ বইখানা প্রকাশ করেন। কাগজ-পত্র ঘেঁটে দেখা গিয়েছিল যে, গিবন তাঁর আত্মজীবনীখানা দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখে রেখে গেছেন।

গিবনের বইয়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম কারণ, তাঁর জীবনের জানা ঘটনাক্রম হুবহু তাঁর আত্মজীবনীতে স্থান পেয়েছে দেখা যায়। কাজেই নিজের সবকিছু কোন প্রসঙ্গ বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলার বদনাম তাঁকে কেউ দিতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, গিবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি *The Decline and Fall of the Roman Empire*—এর যেমন তার ব্যক্তিগত ফুটে এই আত্মজীবনীতেও স্পষ্ট থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত আমরা সেই ব্যক্তিত্বের আত্মা পাই। বৈধ ও সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও প্রমত্ততা, জানবার অনন্তসাধারণ ইচ্ছা আর সেই সঙ্গে সব মিলিয়ে সাক্ষ্যের মূলমন্ত্ররূপ নিজের কাজ সঠিকভাবে চালু করার জন্য একটা অনক, মৃদু ও স্থির প্রতিজ্ঞার পরশ আমরা এ আত্মজীবনীর সর্বত্র পাই। গিবনের আত্মজীবনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উনি যে ভাবে নিজে তাঁর বিরাট ইতিহাস একেবারে গোঁড়ার কথা থেকে আঁড় করে রচনা শেষ করা প্রকাশ করা এবং সে বইয়ের জনপ্রীতি, বিক্রম সমালোচনা এবং নিজের নাম ধাম খ্যাতি প্রভৃতির কথা বলে গেছেন, খুব কম লেখকই সাধারণতঃ এ কাজ করে থাকেন।

একবারে ছেলোবেলা থেকে বোল বছর বয়স পর্যন্ত গিবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অজ্ঞাত হঠাৎবাছার গিবন একবার ক্যাথলিক হ'য়ে বাবোন মনস্থ করেছিলেন। বাস্তব ক্যাথলিক না হ'য়ে যান সেই জন্ত তাঁর বাবা গিবনকে পাঠিয়ে দেন জেনেভায়। একেবারে বালা বয়স থেকেই গিবন নানা রকম বই পড়তে আরম্ভ করে দেন। কি পড়া উচিত না

অনুচিত, এ কথা বলে দেবার কেউই ছিল না। গিবনের ক্রিয়াক্রমঃ ইতিহাসকেই করে গড়ে উঠতে থাকে। "My indiscriminate appetite subsided by degrees into the historic line, and arrived at Oxford with a stock of erudition that might have puzzled a doctor,....." এ হলো গিবনের স্বপ্ন মাত্র পনেরো বছর বয়স। কাজেই রোমান সাম্রাজ্যের অধিতায় ঐতিহাসিক যে অজ্ঞাতসারে কত দীর্ঘ দিন ধরে তৈরী হচ্ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

ক্যাথলিক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য বাবা গিবনকে সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন। এখানে পাঁচ বছর থাকেন উনি। ফরাসী ভাষাটাও গিবন এই সময় ভালো ভাবে শিখে নেন। পড়াশুনাটাও একটা নিয়মের আওতায় আনবার চেষ্টা করলেন। আনকে বলতেন, পড়ার সঙ্গে লিখে গেলে পাঠিত বিষয় দীর্ঘ দিন মনে থাকে। কিন্তু গিবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকটা ডাঃ জনসনের মত। অর্থাৎ কি না লিখবার কোনই প্রয়োজন নেই—পর পর দু'বার পড়লেই জিনিসটা ঠিক ঠিক মনে থাকে।

সুইজারল্যান্ডে থাকবার সময়ই গিবনের জীবনে প্রথম প্রণয়ের সূচনা হয়। বর্ণিত এ একটা নিত্যস্থাবর প্রেমের কাহিনী, কিন্তু তবু সেদিনের কথা মরণ করে শ্রোতা, জানবুধ ঐতিহাসিক লিখছেন : I am rather proud that I was once capable of exalted sentiment.

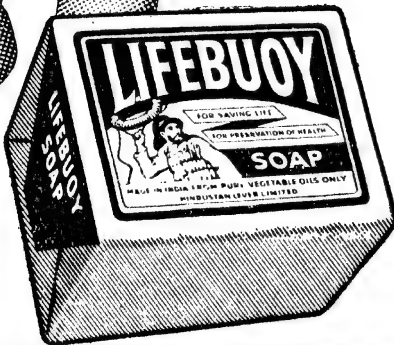
স্থানীয় এক পুরোহিতের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে গিবনের প্রেম জন্মে। মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য গিবন কম চেষ্টা করেন নি— কিন্তু বাবার অমতের জন্য শেষ পর্যন্ত এ বিয়ে হলো না।

কয়েক বছর গিবন সৈনিকের কাজ করেছিলেন। সৈন্য বিভাগ থেকে ছুটি পাবার পরই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন রোমে। রোমে এসে After a sleepless night, I trod, with a lofty step, the ruins of the Forum ; each memorable spot, where Romulus stood, or Jolly spoke, Q Caesar fell, was at once present to my eye. ১৭৬৪ খৃঃ-অব্দের পনেরোই অক্টোবর রোমে বসেই গিবনের মনে রোমান সাম্রাজ্যের একখানি ইতিহাস লিখবার প্রেরণা আসে।

রোম থেকে দেশে ফেরবার পাঁচ বছর পর ১৭৭০ খৃঃ-অব্দের নভেম্বর মাসে গিবন তাঁর *The Decline and Fall of the Roman Empire* লিখতে আরম্ভ করেন। বইখানা লেখা শেষ হয় ১৭৮৭ খৃঃ-অব্দের ২৭শে জুন। এ বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় সারা দেশে, সে সবকিছু গিবন লিখছেন : I am at a loss to describe the success of the work.....My book was on every table ; nor was the general voice disturbed by the barking of any profane critic. গিবন তাঁর বইয়ের শেষ খণ্ড প্রকাশ করার পর আত্মজীবনীতে লিখছেন : Twenty happy years have been animated by the labour of my history ; and its success has given me a name, a rank, a character in the world to which I should not otherwise have been entitled.

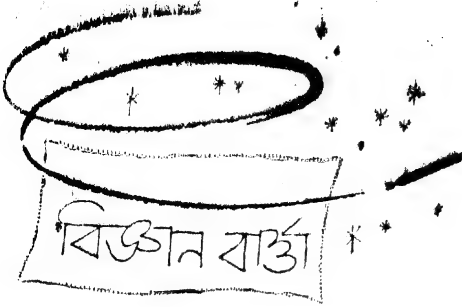


যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন



খেলাধুলাই বলুন বা কাজকর্মই বলুন
আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরা-
পদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের
বীজ। যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের
পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই
বীজগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং
আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
এটি আপনাকে এত বরকরে করে তোলে।



ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গোষ্ঠ মানুষের গল্প নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। পৃথিবীর

এক অঞ্চলে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেল, অমনি দলে দলে লোক বাত্রা করলো সেই অঞ্চলের দিকে। উদ্বেগ বর্ণ আহরণ। এবার আর গোষ্ঠ রাস নয়—সোনার চেরেও দামী হীরের কথা বলছি। আগামী যুগে একদল মানুষ হয়তো হীরের সন্ধানে মহাশূন্তে বাত্রা করতে পারে। আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী সম্রাট চাঁদের দেহে হীরের খনি খাকার সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছেন। এই বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ জি পি কুইপার (Dr. G. P. Kueiper) এবং তাঁর কর্মস্থল উইসকনসিনের ইয়র্কস (Yerkes) গবেষণাগারে। তিনি জানিয়েছেন যে, চাঁদের উপরে অবস্থিত আয়েনগিরির জালামুখ সমূহের কতকগুলি দেখতে অনেকটা বিরাট বড় আইসক্রীমের কোণের মতো এবং সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরের খনির যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। জালামুখ জ্যাকারামি অফ সায়ালের এক জ্যাকারামি-চক্রে বিজ্ঞানী কুইপার তাঁর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে, চাঁদের দেহে অবস্থিত আয়েন-গিরির জালামুখ সমূহকে প্রধানত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর খুঁচ হলো বাটির মতো, সাধারণত: বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, মহাশূন্ত ভূমণকারী দেহপিণ্ড সমূহের আঘাতের ফলেই এই শ্রেণীর জালামুখ সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জালামুখ সমূহ হলো কোণাকৃতি। চাঁদের অভ্যন্তরের গ্যাসের বিক্ষোভের ফলেই তাদের সৃষ্টি। এই বিক্ষোভ বন্ধন হয় তখন চাঁদ যথেষ্ট গরম ছিলো। টেলিস্কোপের দ্বারা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জালামুখ সমূহের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণই ডাঃ কুইপারের আবিষ্কারের প্রধান ভিত্তি। অবশ্য হীরে যে দেখানো আছেই, তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। তার নিশ্চিত ধারণা অর্জনের জন্য মানুষকে প্রথমে চাঁদের দেহে অবতরণ করতে হবে।

বিজ্ঞানের কর্মধারা এবং প্রগতির সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করার জন্য আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের চেষ্টার অন্ত নেই। এ বিষয়ে বিজ্ঞানকর্মীরা গভীর ভাবে চিন্তা করেন। প্রতিষ্ঠানগত ভাবে তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সবোৎসাহে যোগাযোগ করেন এবং বিজ্ঞানের কল্যাণকর পথে তাঁরা কি ভাবে কাজ করছেন, তা সকলের সামনে উপস্থিত করার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহী। বিজ্ঞানের প্রগতির উদ্ভব হওয়া উচিত জ্ঞানের সম্রাটের এবং মানব-কল্যাণে সেই

সব সম্রাটের জ্ঞানের প্রয়োগ। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানকর্মীরা সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিদিশিধরণে জ্ঞানের এই সম্রাটের পথে কাজ করেন। সুতরাং মানব-কল্যাণে তাঁরা কি করছেন বা না করছেন, তার এক উপলব্ধি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা দায়িত্বও তাঁদের আছে। তার একটা খোলা দিক এ দেশে আমার চোখে পড়েছে—গবেষণা-মন্দির বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্বকে স্বীকার করে এগিয়ে যেতে চান। কিছুদিন আগে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্ণ অ্যাণ্ড হোম উইক পালন করা হোল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিজ্ঞানের বিভাগটি খুবই বড় এবং তাঁরা কৃষি-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রের নানা সম্রাট নিয়ে কাজ করেন। বছরে তাঁরা একটি সপ্তাহ ব্যয় করেন, কি করছেন তা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করার জন্য। এই সপ্তাহে তাঁদের সমস্ত গবেষণা-মন্দির জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকেরা এবং কৃষি-বিজ্ঞানের কর্মধারার উৎসাহী লোকেরা এসে দেখে বান যে তাঁদের কল্যাণে বিজ্ঞানীরা কি ভাবে প্রকৃতির জটিল জ্ঞানভাণ্ডারের উন্মোচন ঘটানো। এর থেকে তাঁরা নিজেরা যা করছেন, তার শেখানো অবস্থিত মূল সত্যটি উপলব্ধি করার পথের সন্ধান পান, তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রকৃতি-রাজ্যের মৌলিক জ্ঞানভাণ্ডারের সম্মেলন ঘটে। চারি দিক ঘুরে দেখে—বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনে আশ্চর্য ভাব জাগে—সকলে বিশ্বাস করতে পারেন যে, তাঁরা যা করছেন তার উদ্ভতির জন্য বিজ্ঞানের সম্রাট নিয়ে একদল কর্মীও কাজ করে বাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে এদের জ্ঞানভাণ্ডারের সহায়তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন না।

কর্ণেলে একটা সপ্তাহের শেষ পালন করা হোলো অভিব্যবহারের দিন হিসাবে। এ আরেক ভাবে জনসাধারণের কাছে নিজের কর্মধারা উপস্থিত করার আয়োজন। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য এখানে পাঠানো—কি ভাবে তারা এখানে থাকে, কি ভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারা এগিয়ে চলেছে তা একটা সপ্তাহ শেষে তাঁরা নিজেরা এসে দেখে বান। কিছু জ্ঞান রাখলে এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন করে অভিব্যবহার তা জানতে পারেন। প্রমাণ করে তাদের সন্দেহ এবং ভ্রান্ত কল্পনা নিরসন করতে পারেন—সত্যই হলো নতুন কিছু পরামর্শও দিতে পারেন। সকলের সঙ্গে এই রকম যোগাযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে মঙ্গলকর। এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে।

M. I. T অর্থাৎ ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন? কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে এক মর্যাদাপূর্ণ আসনের অধিকারী। 'মে' মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা দিন ছিলো তাদের 'ওপেন হাউস' যে কোন লোক সেদিন তাদের শিক্ষা ও গবেষণা-মন্দিরের কর্মধারা ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। ইচ্ছা সেদিন গিয়ে পড়েছিলাম বোষ্টন—গিয়ে ডনলাম সেদিনই M. I. T-এর 'ওপেন হাউস'। অজ্ঞাত কাজ কলে চলে গেলাম M. I. T। জনসম্মেলনের দিন সেদিন—সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখার এবং তাদের কর্মধারা এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক সুযোগ ঘটনাটিকে মিলে গিয়েছে এ হারানো উচিত নয়।

আমার এতো কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের দেশেও প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং গবেষণা-মন্ডির জনসাধারণের কাছে নিজেদের এই ভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা থাকা উচিত। বেশী নয়, বছরে একটা কি দুটো দিন তারা এই ভাবে জনসাধারণের মত আলোচনা করে রাখতে পারেন। অনেক হয়তো বলবেন—এতে অনেক অসুবিধা আছে। এর জ্ঞান সময়ের প্রয়োজন, তাছাড়া জনসাধারণ সব সময় উৎসাহী নাও হতে পারেন। আমার ক্ষুদ্র ধারণা কিন্তু অন্য—মনে হয় বহু লোকই এতে উৎসাহী হবেন এবং জ্ঞান কলেক্‌ থেকে ছাত্ররাও দল বেঁধে এসে খাতানামা বিজ্ঞান-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞান দিয়ে সেদিন শুধু গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর পরিচয় সকলের সামনে খুলে ধরা। নতুন কিছু করার জন্য এবং দেখাবার জন্য সময় ব্যয় করার দরকার নেই। বা আছে তাই কেবল একটু সাক্ষিয়ে শুঁড়িয়ে সকলের সামনে রাখা। প্রথমে হয়তো লোকসমাগম কম হতে পারে। কিন্তু মনে হয় ক্রমেই জনসাধারণ এতে উৎসাহী হয়ে উঠবেন এবং এই ভাবে গবেষণা-মন্দির এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে জনসংযোগ বেড়ে যাবে। সাধারণ লোক গবেষণা-মন্দির সমূহের কার্যকলাপের ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠবেন। এর সঙ্গে দেশের আর একটি মস্ত বড় উপকার হবে—এর মধ্যে দিয়ে বীরে বীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘটেবে বিজ্ঞান-চেষ্টনার সম্প্রসারণ।

‘ওপেন হাউসে’ আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি। এরা নিজেদের কর্মচারীর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান-চিন্তাটাকে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরতে চায়—বিজ্ঞান-জগৎটাকে সঠিক ভাবে লোকের চোখের সামনে উপস্থিত করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তের পেছনে প্রকৃতির কি অলৌকিক রহস্য বিরাজ করছে তা লোকের চোখের সামনে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত করা এবং বিজ্ঞান-রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রহস্যের সঙ্গে লোককে পরিচিত করে দেওয়াই হলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

‘ওপেন হাউসের’ দিনে—নানা রকম পরীক্ষামূলক জনপ্রিয় বক্তৃতাবলীরও আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশেও ‘ওপেন হাউস’ জাতীয় কোন কিছু অনুষ্ঠান করতে হলে এদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে—কারণ ম্যাজিক দেখানোর স্বভাবটা আমাদের মজার মজার।

বিজ্ঞানের কোন কিছু পরিবেশন করতে গেলে এমন কিছু আয়ত্তা উপস্থিত করতে চাই, যাতে লোকের তাক লেগে যায়। এই কলার টিপল্যাম—একটা অল্প কিছু হয়ে গেল। লোক বাঁহবা দিলো, আর পাঁচজনকে তাকে এনে দেখাল। এর কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দিকও আছে। এর ফলে লোক তুলে যায় যে বিজ্ঞানের পরিবেশটা তার আপন পরিবেশ এবং কিছুটা তার নিজের হাতে গড়া পরিবেশ। বিজ্ঞানকে সে অলৌকিক ভাবে—সমগ্র্যে বুঝে রাখে। বিজ্ঞান-চেষ্টনার সম্প্রসারণ খটোতে গিয়ে এই ভাবে বিজ্ঞান পরিবেশ সৃষ্ট করে প্রায় অল্প সাধারণ লোককে বিজ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্রে থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোক বিজ্ঞানের আপন পরিবেশ সৃষ্টে খুবই কম সচেতন—সুতরাং সেই অবস্থায় সরল সহজ সত্য পরিবেশন করার পরিবর্তে ম্যাজিক দেখানোর প্রচেষ্টার বলাবল খুবই মারাত্মক। সুতরাং মনে হয়, রাজসিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর দুর্ভিক্ষের পরিবর্তে সাধারণ বিজ্ঞান-চেষ্টনার সম্প্রসারণ এবং নিজেদের কর্মচারী ব্যাখ্যার দিকে যদি গুরুত্ব রাখা হয়, তাহলে মনে হয় ‘ওপেন হাউস’ দিন উদ্‌ঘাটনের জন্য কোন অসুবিধারই সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় এবং তার প্রস্তুতিতে সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কম।

দেশের একটা ধরনের এদেশের পত্রিকাতে আমার চোখে পড়লো। নতুন করে তা আমার আপনাদের পরিবেশন করছি। বড় প্রস্তুত করার জন্য বোঝাইয়ে এটিক ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড (Atic Industries Private Ltd.) নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারখানা খোলা হয়েছে গত ১ই এপ্রিল। এর নির্মাণে সময় লেগেছে দু’ বছর এবং এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই কারখানায় নীল, কালো, বাদামী, অনিভ, হলুদ, কমলা ইত্যাদি নানারকম রঙ প্রস্তুত করা হবে। ইম্প্রিভাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং অতুল প্রোডাক্টস লিমিটেডের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটিক ইণ্ডাস্ট্রিসের জন্ম হয়েছে। বহু প্রকার শিল্পসত্ত্বাব্যয়ের মধ্যে বড় হলো একটি—যার জন্য বাবী ভারতবর্ষকে অল্প দেশে সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং নতুন এই শিল্প প্রতিষ্ঠান যে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের মর্যাদা সম্প্রদায়িত করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বারিয়ার আঘাতে

কাকলী চট্টোপাধ্যায়

এবারেও আশা যে ছিল মনে
বারিয়ার আঘাতে ছুটি রক্তগোলাপ যোরা
দেব হৃৎজনে।
দেবে তুমিও
দেব আমিও,
দেব হৃৎজনার ভালোবেসে

হৃৎজনে; বুঝি হ'ল না শেষে
হায়, সেই দেওয়া নেওয়া—
নিরাশার ছুটি কথা কওয়া,
আজ মনে হয় তোমা হ'তে তুমি যেন যোরে
সরায়ে দিয়েছ বহু দূরে;
তাই তো আমার দীর্ঘবাসের তপ্ত রঙে!

জন্ম-সাধার স্বপ্ন-বকুল পথপ্রান্তে স্বপ্নে পড়ে।

এস সে ফুল কুড়িয়ে নিতে

আমায় দিতে।

একটু একটু কঁাদ

ললিতা বিশ্বাস

একটু কঁাদ। কেবল আমারই জন্মে একটু চোখের জল ফড়ক তোমার। তুমি পৃথিবীর মমতা নিয়ে জন্মেছো। তুলনাশা পেয়েছো। আমি মমতা পেতে চাই, আর তুলনাশা।

আসি! দুখা হাচনি আমার। কেন না, আমার জন্মে এক জনও পোঁছেছে। আমার চলে বাড়ায় তার চোখের জল টেনে এসেছে। আমি মেনা কুল চলে হাই।

কুল নাই বা ফুটল জীবনে। আরেকটা একটা ফল ফলতে পারে না কি? আমি জন্মের জল দেখি। একটা মুহূর্তের জন্মেও পৃথিবী আমাকে দাঁড়িয়ে আমার চলে-বাড়ায়। পথের দিকে কি থাকিবে থাকতে পারেনা? তুমি পৃথিবীর মমতা পেয়েছো, তুমি এবটু শুক হও।

আর তুমি একটু কৈশো—আমার জন্মে চোখের জল কেলো।

হ-হ করে গভীর রাতের বাতাস বয়ে বার। মহানগরীর পাঁচখানা বাড়ির উপর দিকে মাথার দাঁকা খেয়েও সে বাতাস এসে আছড়ে পড়ে এ বাড়ির জানলার। বড় জানলাটা খোলা থাকলে ঘরের ভেতর ঢোকে বাতাস। ঘরের ভেতর ঢোকে আর খাতা-বই-পতরের পাতা উড়তে থাকে। আলগা পাতাগুলি ও পাশের দেওয়ালে গিয়ে জড়ো হয়। দেওয়ালে টালানো ক্যালেন্ডারের মাসগুলো জীবন ভাবে ছটকট করে। সময় বেন দ্রুত চলে যেতে চায়—আরও দ্রুত। মে মাসের আজ উনিশ আর বারটা দিনও অপেক্ষা করে যেতে চায় না। ও-পাশের খাটের মাথার উপরে এবড়ো-খেবড়ো করে গুটোনো মশারিটা এলোপাখাড়ি ওঠা-নামা করে।

ক্রিয়ের গভীর রাতের বাতাস বয়ে বার। এত বাতাসেও ঘাম যেন না গায়ের। কপালের ঐতিহ্য শিরা জেগে ওঠে। শেঁকুলো! পদ-পদ করে। ঘাম জমে কপালে, নাকের ওপর আর বুকে, শিটে, পাড়ে। এত বাতাস, তবুও গুমোট-গরম কাঠে না একটুও।

বিলাস ইজিচেরারের মধ্যে পড়ে পড়ে ছটকট করে ঘামে। তবুও চটে না।

বিলাস। আমবাআরের বিখ্যাত মজুমদার-বংশের শেষ সন্তান।



অবজ্ঞা এখনও তার আলো দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কেন না, যেগুলো একবার জলেছিনো তারা এখনও তেলে-তাল চপ-চপ করে ফটিক আলোর হলুদ বিকিরণ করে আছে। ঘেঁষালকের চক্কুমাথের জীর্ণ ও ঘোঁষনের সার্বক উত্তরাধিকারের অভাব নেই, সেই জন্মেই সর্বশেষ সন্তানের দিকে আভাও বেঁটে বড় একটা আশার না। প্রাচীন কাল দিন হবে হ'লেও মনে হয় না। অভ্যাস বিলাসের ছাট্টা হাংগা। এ ধারণা তার কাছে অভিমানে হতে মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় বলেই বেঁচেছে বিলাস। না হ'লে বিলাস চ্যাট্টির মত একটা ব্যক্তি হ'লে উঠলো পাড়ার, পাড়া থেকে বে-পাড়ার, জন্মের দেহাংশকের সর্বশেষ পুত্র হয়ে লজ্জা করতে পারতো কি করে? সজ্জ করতে না হরত। হরত অনেককে সে শুকি করে মারতো। বিজ্ঞ তাকে ব্যক্তি করে বেউ মারা গেছে, এমন অপবাদ বেউ তাকে দিতে পারবে না। তার অতি-বড় দৃষ্টিও না।

সে ব্যক্তির পাড়া। আশ্চর্য! মাতৃশ্রমের যুগকে কেনি গুণ থাকলে উপেক্ষা করা যায়? ভেবে দেখা হয়নি বিলাসের, এত দিন শূন্যে জিশটি বছর পেয়েও সে ভাবেনি। নিজের সম্বন্ধে এতটুকুও ভাবেনি। অথচ সে তো ঠিক উঠেছিলো সূর্য্যের মত না হ'লেও তার গভীর মধ্যে নীপ্তি ছিলো না কি? না হ'লে স্বপ্ন আর আশা ভর জীবনকে খিয়ে ধরবে কেন? কিন্তু বাড়তে না বাড়তেই মোহ-চাকা সূর্য্য দিকে লোকে যেমন করে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়, তেমনি ওর দিকেও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়েছে। আর দেহাংশকের ছোট ছোট বিলাস নীরবে সজ্জ করেছে সে অপমান। অবজ্ঞা।

অবজ্ঞা-বহিত চুলগুলি কপালে এসে আছড়ে পড়েছে। বিলাস গভীর মমতা চলে নিজের চুলগুলি সরিয়ে দিলো। যেন নিজের চুল নয় এগুলি। এই ত সেদিনের কথা। মাত্র ক'টা দিন আগেও যদি আর একটা কপালে জমনি ভাবে চুল উড়তো শুক-বিশ্ময়ে চেয়ে থাকতো বিলাস। এই চেয়ে থাকাই তার বিলাস। যুথোযুথি চেয়ে থাকাই তার আভিখ্যাত্য।

একটু কঁাদ। আমারই জন্মে একটু কঁাদ তুমি।

নড়ে-চড়ে বসলো বিলাস। মাতৃশ্রমের জীবনে অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটে যায় যা পরে ভেবে দেখলে নিজেরই কেমন বিষাদ হয় না। এই বিলাসই কি এক অজুহাত—এক আর্দ্রতার জীবনে কখনও গুনছিলো? শোনেনি। যে ভারতী সেন গুকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো তার হৃদয়ে শোনেনি। নন্দিতা নন্দীর মুখও না। সেখানে শোনেনি, কেন না তাদের ছিলো জীবনের আশা—আর পাখি বসাকের হৃদয়ে গুনলো, কেন না এখানে যুদ্ধার হতাশা।

আমি আর থাকিনি—থাকবো না। আর এ বিলাস আমার বড় পীড়া দেবে যদি জানতে হয় আমি ছিলামও না। কোন দিন থাকতে চাইনি। তোমার বেদনার অঙ্গুর মধ্যে আমি থাকার ভাবা কখনও চাই। আমারই জন্মে তুমি একটু কঁাদ।

বিলাস চমকে ওঠে। কতো দিন পরে আবার ওদের কথা মনে পড়লো। ভারতী সেনকে মনে পড়লো। পাখি বসাকের পাশে। এর মধ্যে কি ভালগারিটি আছে? ভারতী জনসে হযত বলবে, আছে। তুমি নোংরা, তাই আর একটি অভিজাত থেকেক বসিয়েছো ঐ নোংরা পলি মেয়েটার পাশে। এক সাহস পাও তুমি?

সাহস না পাবে কেন বিলাস? তুমি ঘেঁষে নও? পাখি কি ঘেঁষে নর? ঘেঁষে। নারী। এই ত তার বড় পরিচয়। সে সুখা গালতে পারে। বিষও। সদর-বিলেবে বিষও সুখ। কেন না, আমি কি শুধু পুটাই চাই, কর চাইনে? কর করতে না পারাটা যে আমাকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। সকলেই কর করে। টাকা। দেহ। মন—

কি বা-তা বলছো বিলাস? তোমার দিকটা বাঁধ। ভারতী সেন নিশ্চয়ই নাক কুঁচকাবে।

বাঁধ? না ভারতী। কেন না এ দিকটা কেউ দেব না। এ দিকটা আমার শেখিতে, হক্ক, আর ধমকে মাথার একটা টোকা দেব বিলাস, আর এখানে, বৃষ্টিতে। ব্যাপারটা একটু নাটকীয় হয়। তা হোক। তবু যদি একটু বোঝে ভারতী সেন। বুঝলো না। ওর মত একটা ডালহেডেড মেয়ের পক্ষে অবজ্ঞা বোঝবার কথাও নয়। ও ভয় পেয়েছিলো। বিলাসের ক্ষয় কবীর প্রবল বাসনা বৃষ্টি বা ওর চেহের উপর এসে লাগতে পড়লো হাউ ননসেন্স। একটু টোটোজোড়া এগিয়ে নিলে আর একটু বৃক্কে মুখ তুলে দিলেই কি ক্ষয়ের পথগুলো সব আসগা হয়ে পড়লো নাকি? তা হয় না কোন পুরুষের। বৈখানর যে মাগুন অগ্নিতেজে দগ্ধ হয়েছিলো,—কেন? হ্যাঁ, তার বসলে যদি একটা চড় মারতো ভারতী সেন, খুসী হতো বিলাস। বুঝতো, না, ভারতী সেনেরও কিছু দেওয়ার আছে। কিন্তু তা ও করেনি। কেবল ভয়ে পালিয়ে গেলো। নিছক ভয়ে—বোকামি নিয়ে। বিলাস হাসলো, দেবকী হাজ স্পেট এ্যাওয়ে ক্রম মাই ক্যাটাল গ্র্যাশুশ। ভালো হচ্ছে। বেঁচেছে ভারতী সেন। এম-এ পাশ করে কোন বিলত-কেনত ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেছে। আজ এই মুহূর্তে একটা বড় প্রশ্ন তাকে করতে ইচ্ছে হয়, কেননা আজো ভারতী সেন!

ভারতী সেন হযত বলবে, খুব ভালো আছি বিলাস! গাফি-বাড়ি, গয়না-শাড়ি, সোশাইটি, অভিজাত্য,—আর আমার সোহাগ, ছেলপুলে আর কি?

এমন ঘেঁষেকে জিজ্ঞেস করাও বুঝা। যে আর কিছু চায় না, তাকে ওর জারগায়েই থাকতে দাও। কিন্তু এমন কি হয় না? হতে পারে না? সুখ সত্যিই নেই বিলাস, মাত্র এইটুকু বুঝছি। কেন নেই একটু বলবে?

এমন হ'লে বেশ হয়। কিন্তু ওরা বলবে না। বলতে ভয় পায় ওরা। পাছে পেছনের টুকু হারায়। কিছু হাতে রাখি নয় ওরা। কেন না পেয়েছে যে সামান্যই। ওটুকু হারিয়ে বিস্ত্র হওয়ার সাহস কোথায় সামান্য একটা মেয়ের? স্বার্থপর সে।

কিন্তু এই পাখি? একটু কীলো। আমারই ভেত্রে একটু গোখর জল কেলে তুমি।

ওপাশের দেওয়ালে সেই থেকে ছাংগাটা কেবলই খট-খট শব্দ করছে। যেন ওর চেষ্টা রয়েছে। ও যেন কিছুই সাক্ষী হতে চায়—বিলাসের বেসনার সাক্ষী থাকবে সে।

কিন্তু ও কি ভুলতে চাইছে কিছু? পাখি বসাক কে? পাখি নামটি ওর দেওয়া। বলেছিলো, তুমি পেছনের, তোমাকে ভুলতে পারিনি, কিন্তু তোলা উচিত নয় কি? তাই তুমি পাখি। অলকা নামটা ভুলে যেতে হবে যে তোমার।

পাখি তখন হুটকি হাসে। কবেই তো ভুল পেছি, তোমাকে পেয়ে ভুলছি। তুমি তো সমাজের, তোমার ছোঁয়ার আমি সমাজের স্পর্শ পাই। শিকার আর অভিজাত্যের। অহংকার করি। অহংকার কর। কিন্তু সেদিন অঘনি করে ভেগে পড়লে কেন? অঘনি করে বললে কেন?

ভারতী ভেত্রে তুমি দারী। তুমি দরদী। আমার কথা তুমি না শুনেও বের? জানবে না কেন আজও আমি অভিজাত্য দিই স্বাধীন? বাবাকে আর সমাজকে। আমার বিশ্বাস যদি আগুন থাকে তবে ওরা পুড়বেই এতদিন। ওরা জলে-পুড়ে থাক হ'লে বায়েই; তুমি দেখো।

এইটু ভার একমাত্র অহংকার। এ জীবনের সবই যখন বুঝে ফুটে গেছে, মান-সন্মান, সামাজিক মর্যাদা সব, তখন ঐ একটা মাত্র গর্ব। সচেতন বিশ্বাস। পাখি বলে, তুমি ক্ষয়ে যাচ্ছে, এতে আমি আনন্দ পাই। আমার কাছাকাছি তোমাকে দেখতে পাই বলে। বুঝছে?

ভেভো! বিলাস ওর শির চাপড়ে দেয়। আরেগে উচ্চাসে ওর মাথাটা টেনে আনে বুকের উপর। গন্ধাতলের একটা উগ্র কাঁধ

বাসবী বস্তুর

বন্ধনহীন গ্রন্থি

“প্রতিভার প্রদীপ নিয়ে সাহিত্যের আকিনায় যে সমস্ত শক্তিময় লেখিকার পদস্পর্শ পড়ছে শ্রীমতী বাসবী বসু তাঁদেরই একজন। ‘গন্ধার নয়’ নামক লেখিকার নিবেদন পাঠে জানা যায় যে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। কালাচ্য গ্রন্থটি মাসিক বন্ধনহীনতেই এক সময় প্রকাশিত হয়েছিল; স্মরণ্য এর বিষয়বস্তুও আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাদের অজানা নয়, আনন্দের সাথে সংগে লক্ষ্য করেছি যে মাসিক বন্ধনহীনতে প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধনহীন গ্রন্থি যখন গ্রন্থরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখন সে যথোচিত পরিবর্তিত, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। লেখিকার রচনাশৈলী বর্ণনাত্মক এবং ঘটনার ধারাবাহিক বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে, সহজেই বোঝা যায় যথাযোগ্য গান্ধীধ্বংস—এক রসবোধের তিনি অধিকারিণী, তাঁর রচনায় কোন কৃত্রিমতা, জটিলতা ও আড়ম্বরণের সন্ধান মেলে না। লেখিকার ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বরসম্পন্ন ও মনোময়। চিত্রিত চরিত্রগুলি অতি স্বাভাবিক, এক সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে। লেখিকার বক্তব্য অন্তরস্পর্শ করে এবং বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের আলোয় উদ্ভাসিত এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিচ্ছি কথামিত্রী ভারতবর্ষের বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধ করেছেন। অতীত সুপাঠ্য এই উপন্যাসটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি এবং প্রসঙ্গত জ্ঞানিয়ে রাখি যে লেখিকার কাছে বাংলা সাহিত্য আরও অনেক কিছু আশা করে।”—মাসিক বন্ধনহীন, পৌষ, ১৩৬৫।

দাম ছ' টাকা মাত্র।

প্রকাশক : বঙ্গাকা প্রকাশনী, ২৭শি, আমহার্ট-স্ট্রীট।

মাক লাগে। সেই জন্তেই তো ওদের থেকে স্পষ্টভাবে এত বড় করে দেখি। অথচ ভগ্নপাড়ার মেয়েরা এটা বুঝতে পারে না। ভাল হেডেড ননসেন্সগুলো। ওরা ভাগাতে পারে না কোন পুরুষের চেনাক। কেবল জীবন দিতে চায়। আরে, একটা মাসপিশু ঘাড়ে নিয়ে বিলাস মজুমদারের কোন্ কর্ম লাগবে, বলো ?

পাখি আবার হা মা। অজুত স্থলর করে হায়ে।

কিন্তু ওর জীবনেও বেদনা আছে। উপর থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই এতটুকু। সকলকে বলাও ত বার না সে কথা। টাকা দিয়ে স্মৃতি করতে এসে কেই-ই বা হিঁচকিহুনি শুনেতে চায় ? কেউ না। ভেমন কাটকে পারিনি অলকা। অথচ সে বলতে চেয়েছে, শুনেতে চেয়েছে, ও তাদের কথা করেনি। ওর বামিকে আর সবকারের বড়ো অভিশাপ, ওর বাবাকে ও বাজ করে। ওর নিরীকার সমাজকে ও অভিসম্পাত করে। মাত্র এটুকুই ওর বক্তব্য।

বিলাস কিছু আরও দেখেছে। শুনেতে বেশ ভালোই লেগেছিলো তার। বিলাস পাখি বসাকের মধ্যে নিজের জীবনের সমর্থন পায়। ইচ্ছার হোক, অনিচ্ছার হোক, কেউ বন্ধু-বান্ধব, সমাজ-সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে জানলে ওর আনন্দ হয়। ও নিজেও তো তাদের কেউ নয়। জান চওয়ার সঙ্গে সংগেই নিজের ভেতরকার একটা মাতাল খেয়াল ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ধরা যে পড়েনি, বাঁধা যে পড়েনি, সাঙ্গারের আর পাঁচটা লোকের মত, এর জন্তে মনের গহন কোণায় কি বেদনা নেই ? আছে হয়ত। কিন্তু আকস্মিক আর করে না ও। কেবল সে সাধী খোঁজে। নিজের জীবনের কাছাকাছি এক জনকে পেতে চায়। অলকাকে ঠিক এইজন্তেই ওর এত ভালো লাগে।

তাই শুনেছে সে। মন দিয়ে শুনেছে অলকার জীবনের কয়টি কথা। সে-ও একদিন একজনের মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলো। ওর দেহ-মনে সেদিন জোরাবের কন্ডোল শুরু হ'য়েছিল। কুলে কুলে উঠেছে ডেউ। ডেউ-এর পর ডেউ, তাই দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলো পাড়ার কলজে-পড়া সুকান্ত বসাক। অলকাকে সে কাছ ডেকেছিলো, কাছে নিয়েছিলো। বিখ্যাত পুলিশ-অফিসারের মেয়ে সে ডাকে পাড়া দিতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে ফেললো। সুকান্তর কাছে সে ভাড়া পেয়েছে। পড়াশুনা পড়ে থাকলো ! জীবনটাই যদি একজনের হাতে তুলে দিতে পারে সে, কি হবে ছাই কতকগুলো আজো-বাজে বুলি মুখর করে ?

এই জন্তেই ওর পড়াশুনা বন্ধ হ'লো। আর তাতে খুসিই হ'লো অলকা। য-মরা মেয়ে অলকা বাবার কথা শোনেনি, দাদার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, বৌদির উপদেশকে করেছে বাজ। জীবনটা ও কোন ভাবেই গলা টিপে হত্যা করবে না। মিথ্যে হ'তে দেবে না ওর প্রেমকে।

সেই কথাটাই একদিন সে শুনিতে দিলো সুকান্তকে। আমাকে তুমি উদ্ধার কর। বাবা-দাদার সঙ্গে এক যুহুর্তও আমি থাকবো না। অলকা সুকান্তর বৃক মাথা রেখে আশ্রয় খোঁজে।

আজ্ঞা, কেন ? বিলাস উৎসাহ দেখায়।

সুকান্ত এমনিতে খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান। কিন্তু বিয়ে ? বাবা মা কি এ বিয়ে স্বীকার করে নিতে পারবেন ? একটু বেশ মনে যায় সে।

কিন্তু সে কথা অলকা শুনেবে কেন ? আর শুনেলে যে তখন চলবে না অলকার।

বললাম, এখন তো পিছ-পা হ'লে তোমার চলবে না ? আমাকে অত কাছে টানলে কেন তখন ? একটু দূরে রাখলে তো পারতে ! সুকান্তর মুখের একেবারে কাছে মুখ এনে অলকা ছোট করে বলেছিলো, আমি যে মা হ'তে চলছি।

বিলাস থমকে চেয়ে থাকে অলকার মুখের দিকে। অলকা একটু খেমে বলে, তার পর এক দিন সুকান্তর হাত ধরে দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়িলাম, আর পেছনের সব ক'টা দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেলো। সুকান্তর মনে জোর ছিলো, সে বললো, ঠিক আছে তোমাকে নিয়ে আমি নতুন বাসা বাঁধবো। নতুন বাসায় কেবল তুমি আর আমি—কেমন ?

বৃকটা সেদিন যেন একটু কঁপে উঠেছিলো অলকার। মাথার ডেউরটা একটু ঝিম-ঝিম করে উঠেছিলো বৈ কি। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ,—রহস্যের অন্ধকারে হাতড়ে অলকা কুল-কিনারা দেখতে পারিনি। এক ভরসা সুকান্ত। অলকা বললো, আমি ওর হাত ধরে অন্ধকারেই এগিয়ে চললাম। তুললে চলবে কেন, আমি যে তাকে ভালবাসি।

একটু খেমে অলকা বললো, তা আলো অলেছিলো বৈ কি ? অলেছিলো, কিন্তু তা কত দিন আর থাকলো ? যে আলো এক দিন সামনে অলেছিলো, দপ করে তা নিবেও গেলো। পৃথিবীটা মনে হলো বন-বন করে ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে। আর আমি সেই ঘুরণাকে ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়লাম সেখান থেকে বহু দূরে তাকালাম—কোন স্থানেই আমার স্বামীকে দেখলাম না। সে তখন বাবার তপুত্র হয়ে বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সেখান আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। বললাম, আমাকে আর ভালো লাগে না সুকান্তর। কিন্তু বিলাস, ভেবে দেখো, তোমাদের ভালো লাগা যদি এমনি খেরালো হয়, আমাদের প্রাণটা কোণার ঠাই পায় ? বল ? পাখি হাসি-হাসি মুখ করে বলেও মনে হয় সে যেন কঁাদছে। তার সারা দেহ-মন যেন অপরিণীম বেদনার তুলে তুলে উঠছে। বাবার আশ্রয় থেকে আগেই বঞ্চিত হয়েছি। তোমাদের এমন সমাজ, আমাকে কোন বাঁচার পথই বাতলে দিতে পারলো না বিলাস ! তাই এই পথ,—সুকান্তর পথ ছাড়া আর কি-ই বা গ্রহণ করতে পারি বল ? এই ভাবেই মৃত্যুর দিকে চলছি।

এই অলকার কাহিনী। তার পর পাখি। বিলাস এমন কিছু মাথা ঘামায় না পাখির অতীত জীবন নিয়ে। ওর অভিশাপ আর ওর অভিমান দুটোই সমান হাসির ব্যাপার। ওর প্রেমের কাহিনীও সম্ভা এক প্রেমের উপভাসের কাহিনীর মত। অত কেউ এ কাহিনী বলতে এলে মাঝপথেই বিলাস হরত ধামিয়ে দিতো তাকে। কিন্তু পাখিকে সে ধামাতে পারেনি। পাখিকে ওর নিজের চাইতেও অসহায় মনে হয়। কেবল সাদা-পা পাতলা অরগ্যান্ডির একটা ছোট ব্লাউজ গায়ে যে নারীদেহটা বিলাসের বুকর উপর পড়ে পড়ে সেদিন কঁদেছিলো, তাকে দেখে বিলাসের মনে হ'য়েছিলো, পাখির বুকও সত্যি বন্ধা আছে। তাই সে পাখি শিঠি হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো, আদর করে হুলুন্ডি নাড়াতো

না, না! এ 'ডালডা' নয়! 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয় না!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা
টিনেই কিনতে পাবেন। এই জনোই এতে কোনও ধুলো
নয়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা
হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা'
কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য
ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও
½ পা: টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।



হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা'! এর হলদে টিনের ওপোর খেজুর গাছের ছবি দেখলে সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম।
আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য অক্ষিত
রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা
বক টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষযুক্ত
হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে
রাখবেন সেই সব খাবারের
প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

কোন প্রয়োজনেই তুমি এসে না। তুমি তোমার নিজের কোন প্রয়োজনেও আসনি। তবুও ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার লগ্নত শৈশুগুলি এখন শিথিল হোক। তোমার জেতরকার যে অপদেবতাটি তোমাকে কোনো দিনও শাস্তি দিলো না, সে করেক যুহর্তের জন্তেও তোমার দেহ ছেড়ে চলে থাক।

পৃথিবী তোমার দেহ-মনে স্নেহের হাত বুলোচ্ছে, প্রেমের স্পর্শ দিচ্ছে।

তন্ত্রার আবেশে তুমি চলে পড়। তোমার জন্তে পৃথিবীর করুণা আছে, মমতা আছে। এই মহাকাশের অকুপণ দান—প্রকৃতির অকুপণ দান। তুমি তো সুর্য চাও না, বরষা চাও। তুমি যে ঝানস চাও না, বেদনা চাও। কিন্তু তুমি যে যুগ চাও। তোমার মন বলছে তুমি চাও। না হলে তুমি পাগল হয়ে যাবে যে! তুমি পাগল হয়ে না, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। স্নেহ-প্রেমের স্পর্শ লাগছে।

—অতীত ভুলে যাও। গত কাল বিমুত হও। বেদনা ভুলে তুমি বিশ্বস্তির কোলে চলে পড়ো।

কিন্তু কে কীদে না?

—কীদে। ওকে কীদতে নাও। ও বে তোমার থেকেও হতভাগা। ও কীদবে না? ও বে তোমার থেকেও দীন-রিক্ত। জীবনে সে কিছুই পায়নি, আরও পেতে চেয়েছিলো, তাই সে হতভাগা। ও পৃথিবীর সুর্যের আশ্বাস পেতে চেয়েছিলো, পায়নি বলে কীদছে। ওর অন্তরাঙ্গা মাছুষের বুসন্ত ঘরের দরজার দরজার করুণা-ভিক্ষা করে কিরছে। একটু ভালবাসা চায় সে। আর, মাছুষকে সে ওর জন্তে একটু কীদতে বলে।

না, তুমি উত্তেজিত হয়ে না। তন্ত্রা তোমার জেলে যাবে। তুমি ঘুমোও।

প্রকৃতির অকুপণ দান স্বরছে।

নতুন বৌদি বিলাসকে এখনও বোধ হয় ভালো করে ঢেননি। এই তো সে দিন সে এ-বাড়ীর বধু হ'য়ে এসেছে। এনেই সে হরে চাকরটাকে সকালের বিড়বনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বাবু থমকানি প্রত্যেক দিন সকালেই তার ভাগ্যে ছুটে আসছিলো। বধু সেদিন নিজের চোখেই দেখে ফেলেছিলো। সেই থেকেই তার এ নব পরিকল্পনা। বিলাস প্রথমেই রাজি হয়নি। বাড়ির কারো সঙ্গে

তার যোগ বাধা দেওয়ার না। কিন্তু এ বধুটি ছাড়বার পাত্রী নয়। একটাই তো মালু দেবর—তারও মন সে পাবে না, কেন সে ঘুরে ঘুরে থাকবে? বিলাসকে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে হয়েচে। তবে অন্তত: সাজে আটটার আগে তার ঘরে যেন কোন প্রকারেই চা না আসে। কেন না তার আগে সে উঠতে পারে না।

নতুন বৌদি স্বীকৃত। কেন যে এই কিছুতকিমাকার দেবরটিকে তার খুব ভালো লাগে। সে এ বাড়ির কেউ নয়। বাড়ির এক প্রান্তে এই নির্জন ঘরখানা তার পরিচিত। আর পরিচিত হয়ে চাকরটা কেন তার এ পালিয়ে থাক। কেন সে আর সকলের মত নয়? বধুর কেঁতুহল বাড়ি। কেমন যেন মমতাও হয়। সকলেই আছে, অচম তার কেউই নেই। একমন কথা।

নিত্যকার মত আশ্রম সে এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে হাসি-মুখে ঘরে চুকেছে। আর চুকেই সে থমকে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। বিছানা ঝালি। মশারিটা খাটের উপর ঝুলছে। বালিশ দুটো একিক গুঁকি ছড়ানো। সারা ঘরময় বই-খাতাপত্র ছড়ানো। জলের কুজোটা আলগা হাঁ হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। মেঝেতে করটা সাঁট আর প্যাঁট নুটেছে। বধুর মনটা কেমন যেন বেদনার ভরে যায়। কিন্তু সে আজ করেনি না কি? সারা রাত কোথায় থাকলো সে?

কিন্তু না, কিরছে বিলাস। ওপাশের দরজার পাশ ঘেঁসে যে একটুখানি ব্যালকনি, ওখানে তার ইজিচেয়ারখানার মধ্যে পড়ে আছে বিলাস। অসাড়, স্পন্দনহীন লোকটা। দেখে মারা হয় বধুর। সারা রাত সে এমনি ক'রে পড়ে আছে। মা গো! পুঙ্খ মাছুষের বিয়ে না হলে কি ছরছাড়াই না তারা হয়।

চারের কাপ হাতে নতুন বৌদি আরও এগিয়ে এসে। কীড়ালো বিলাসের পাশে। সুর্য অনেকটা উঠে এসেছে। উঠে এসে ও পাশের কাচের জানলাটার উপর থমকে দাঁড়িয়েছে। আর তারই একটা লাগতে আঁধা এসে পড়েছে বিলাসের মুখে, ঘরের পাশে। একি রাস্তা মুখের চোহা। বৌদির বুকটা হাহাকার ক'রে ওঠে।

একটু বুক পড়ে মাথার হাত রাখতে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে বৌদির চোখে পড়লো বৃত্তটি। রই গালের পাশ দিয়ে রই সারি অক্ষর ধারা গড়িয়ে এসে থমকে আছে চিকের শেষ প্রান্তে।

এক পা পেছনে সরে বৌদি অনেকক্ষণ দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস আশনা হতেই তার বকের কাছটা থেকে বের হ'য়ে আসে, কতো অসহায় ও, আহা!

আকাশ : মাটি

কৃতী সোম

তোমার স্বপ্নের পেলে বার কথা জাগে

সে তো নর রাজপুত্র, আমি।

উজ্জল হীরের মতো দীপ্ত অলঙ্কারে

তুমি তো প্রেমিকা এক, আমি।

তোমার বোঁদন-চুক্তি মহামূল্য দান

কেন না তা স্বচ্ছ আর খাঁটি।

অথচ এখনো ডাখো, কত ব্যবধান

তুমি তো আকাশ, আমি মাটি।



(মোপাসাঁ অবলম্বনে)

বহর হই আসেকার কথা।

বসন্তকালে ভূমধাসাগরের উপকূলে বেড়িয়ে বেড়াছি। আহা, কি মধুই না লাগে জনহীন পাথ একা-একা ঘুরতে। যে কোনো পৃথিবীর চরেও এ মনোরম। সমুদ্র-সৈকতে বেড়াবার কিংবা পর্বতশৃঙ্গে আরোহণের সময় বৃহৎ-মণ্ড বাতাসের সমাদর, তপ্ত সূর্যকিরণের চুবন হৃদয়-মন ভরিয়ে তোলে। এই পথচলা হয়ত হৃৎকটর জ্বরে, কিন্তু তারি মধ্যে কতো সম্ভব অসম্ভব, দিব্যাবগ, রত্নিন কল্পনা, রোমাঞ্চকর অল্পভূতি জাগে পথচলা মানুষটির মনের গোপনে। বাসনা কামনা, আলো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে দোলা লাগায়, ব্যথাও বয়ে আনে। ভ্রমণের কল্যাণে দুধার মাঝা যেমন বেড়ে যায় ঠিক তেমনি ভূপ্তির পাত্র কানার কানায় ভরে ওঠে প্রকৃতির চিত্তহারিণী শোভার সুখোন্মুখি হয়ে। প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে যতো সঙ্গ দলীভূত হয় ততোই অনাখাদিত আনন্দে অভয় হয় পরিপূর্ণ।

সেইট ব্যাকেল থেকে ইটালী অভিমুখে যে রাস্তাটি এগিয়ে গেছে সেই পথেই আমি অগ্রসর হতে থাকি—না তুল বলা হোলো, বরং বলা যায়, সেই অপরূপ সখি দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম, যার বন্দনার কবির মুখের হন সব সময়। অর্থাৎ সে পথটি এমনই সুন্দর যে, কবির কবিতার ছাড়া অন্য কোথাও তার দর্শন পাওয়া সহজ নয়। কেনস থেকে মোজাকোর বেতে ভুলেও কেউ এ দেশে পা বাড়ায় না, লোকগুলির মনোবৃত্তি দেখে করুণা হয়। এমন উদার আকাশ, ফুলে ফুলে ভরা গোলাপ, কমলা-বাগিচা—কিন্তু ওরা মিথ্যা অহমিকার, নির্বোধের অবিবেচনার অনার্যাসে এড়িয়ে চলে প্রকৃতির নিবিড় সঙ্গ। অজুহাত ওদের সুন্দর—অজ্ঞ আশঙ্কায় মানুষের যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে।

প্রবহমান উপসাগরের একটি বীকে সহসা চোখে পড়লো কতকগুলি কুটারকে—পাশাপাশি তারা বেন ভটলা করছে। সন্ধ্যার তায়া চারটি কি পাঁচটি হবে, পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্রের নিকটে ঘুর করে ঠাঁড়িয়ে। এর পেছনে পাইনের জঙ্গল—তার প্ৰদীপ্ততার বিগাট ছাউ উপত্যকার পথের নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এরাই কুটারের দরজার সামনে আমি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঠাঁড়িয়ে পড়ি। হবধরে শাদা বাড়িটির গায়ে বাহারী রঙের কাককার্য, গোলাপওহি লতনের উঠেছে হাতের আলিসায়—কী সুন্দরই না দেখতে হয়েছে। পাশের বাগানটি বেষ্টিত অবিভক্ততার নানাজাতের নানা আকারের ফুলে সাজানো। সামনের ল্যানটিও

পরিচ্ছন্ন পরিপাটি—বাহারার সিঁড়ির ওপর পায়ে খচিত জাকালতা, জানলার ওপর খোঁকার খোঁকার আভর ফলে আছে। রক্তরাঙা মনিং গ্লোরিতে এই মনোরম বাড়িটির বাকী দেওয়ালগুলি সমাকীর্ণ। ওখানে পেছন দিকে প্রস্তুতি কমলাবীধি দূরের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

কুটারের দরজার গিঁট করা হোট হরকের কথাগুলি আমি পড়লুম : ভিলা ড্যানটান।

এ কোন কবিকল্প না পরীক্ষান—আপন মনে প্রশ্ন করে উঠি। কোন অল্পপ্রেরণায় এমন স্থান নির্বাচন সম্ভব হয়েছে, এই স্বপ্নের বাসভূমি রচনাই বা হয়েছে বাস্তবায়িত।

অনুরে পথের ধারে ভটনৈক শ্রমিক বসে বসে পাখর ভাঙছিলো। তাকে জিগগেস করার জানতে পারলাম ওই কুটারের মালিক হচ্ছেন খনামখণ্ড জুলি রোমেন—মাগায় জুলি রোমেন।

জুলি রোমেন। হেলেনেলোর কতোই না শুনেছি বিখ্যাত এই অভিনেত্রীটির নাম। ব্যাসেলের ব্যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জুলি রোমেন। জনজ্ঞতি ও সমাদর এর মতো এতোটা আর কারুর ভাগ্যে তখনকার দিনে ছুটেছে বলে আমার জানা নেই—বিশেষ করে সমাদর। ওঃ, কতো দম্ভ-বৃদ্ধ আত্মহত্যা কতো প্রতিযোগিতা না অহুষ্টিত হয়েছে শুধু ওই নারীটিকে কেন্দ্র করে। এখন এর বয়স কতো হোলো? বাট, না, সন্তর পঁচাত্তর হবে। জুলি রোমেন তাহলে এখানে, এই কুটারে। গোটা ক্রান্তে যে তার আলোড়ন জেগেছিলো (তখন আমার বয়স বড়ো জোর বাথো) এক কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে সিনিলিতে এর পলারন উপলক্ষ্য—অতীতের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী আমি স্মরণ করি। ওই ঘটনার ঠিক আগেই অপর এক প্রেমাপ্পদের সঙ্গে হয়েছিলো ঐ বিজী রকমের কলহ। বাই হোক, উনি ঠর নতুন প্রেমিকটির সঙ্গে একদিন সন্ধ্যার সুরে পড়লেন। সে সময় বগমকে খাতি ঠর ধরছিলো না। ঠিক ওই ঘটনার আগের সন্ধ্যার অভিনয়ের সময়ে আশ্চর্য হয়ে একটানা অভিনয়ন জানিয়েছিলো যার জেৎ এগারো বার, একে দর্শন দিতে হয়েছিলো গুণমুগ্ধ দর্শকদের।

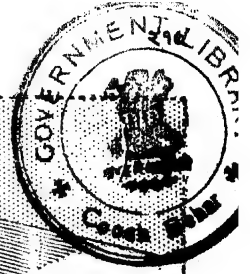
ঐর উদ্যোগ হওয়ার খোঁজাখুঁজি চললো, ঐরা সমুদ্র পার হয়ে কনক ডিওভ-এর কমলাকুঞ্জে—সেই প্রাচীন বাগে পৌঁছলেন। জনজ্ঞতি রটে গেল, হাত ধরাধরি করে উভয়ে বাঁপ দিয়েছেন বেন বহি-সাগরে।

সেই স্বপ্নগ্রাহী কাব্য-রচয়িতা এখন পরলোকে। ঐর কৃতিত্ব সবচেয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। বাস্তবিক ঐর মনোরম মোহময় রচনার সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো, উনি অজ্ঞাত কবিরে সামনে অন্ত এক জগতের দ্বার খুলে গিয়েছিলেন।

অপর প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকও বেঁচে নেই। তিনিও তাঁর প্রণয়িনীর মনোরমরনের জ্বরে যে অসুখ সুখের স্বকার ভুজেছিলেন, তার বেশ আভাও জেগে আছে প্রোত্যাদের কানে।

তিনিই—সেই নারীই এই কুহুমাত্রী কুটারে বাস করেন। আর থিবা না করে ঘটনাক্রমি করলাম। বছর আঠারো একটি লাফুক কদাকার পরিচারক এসে দরজা খুলে দিলো।

আমি আমার কার্ডের ওপর অতীত দিনের রূপশিল্পীর লগ্ন অংশসাবাকী লিখে শেষে আত্মকি অল্পবোধ জানালাম দর্শন দেখার



যা একমাত্র ভিনই করতে পারে!

ঝকঝকে, নিখুঁত পরিষ্কার মেঝে সুরক্ষীসম্মত জীবনযাত্রার পরিচায়ক। আপনার বাড়ীর মেঝে ভিন দিয়ে পরিষ্কার করে দেখুন—ময়লা আর তেলতেলে ভাব তাড়াতাড়ি উবে যাবে—আপনার বাড়ীর মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। অল্প কোন উপায়ে আপনি কখনই মেঝে এত পরিষ্কার করতে পারেননি। আপনার বাড়ীর মেঝে আপনার গর্বের বিষয় করে তুলুন—সপ্তাহে একদিন মেঝে ভিন দিয়ে পরিষ্কার করা অভ্যাস করুন। আপনার চিমেমাটির বাসন, কাঁচের জিনিষ, রান্নাঘরের বাসনপত্র এবং বেসিন পরিষ্কার করার জন্তেও ভিন ব্যবহার করুন। সর্বদা ভিন হাতের কাছে রাখুন।

আপনার বাড়ীর জন্তে দরকার ভিন



জন্মে। হয়তো আমার নাম তাঁর 'অমর' নয়। কাজেই এই সাক্ষাতে অসম্ভব হবে না।

ভূত্য কিংবে এসে আমার একটি সুসজ্জিত কৈকথানার পৌছে দিলো। দেহালম, ঘরটির আসবাবপত্র বিশেষ ফাসান-দুহস্ত। সেগুলিকে আমার সম্মানে আবরণযুক্ত করে একটি মাথারি চোহারায় বোড়শী পরিচারিকা ঝাড়িয়ে দিলো।

আমি আসন গ্রহণ করতই ভূত্যের অন্তর্ধান করলো, আমিও সাগ্রহে ঘরের প্রতিটি ক্রিনিস পুখাদুপুখ ভাবে লক্ষ্য করতে থাকলাম। দেহালে ছবি টাঙানো রয়েছে তিনখানা। অভিনেত্রীটির একখানা, বিশেষ অভিনয়ের ভঙ্গীতে গৃহীত, একখানা কবি-প্রেমিকের তৎকালীন সাজসজ্জার, অপরটি অর্থাৎ তৃতীয়টি সেই সুবিশদী, ক্লাভিকার্ডের সামনে মাথুটি বসে আছে।

ভূমহিলাসর ছবিতে তাঁর রূপের প্রমাণ এখনও বিস্তারিত, কিন্তু ওই হাণ্ডাব এখনকার দিনে সমালোচনার দাবী রাখে। তাঁর আকর্ষণীয় মুখশ্রী, নীল আঁকিতারকা আপন মহিমার উজ্জ্বলিত, চিত্রকরের নৈপুণ্যও তাতে বড়ো কম নয়। ছবি তিনটি বিশুদ্ধ অতীতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মাঝে আগামী দিনের বংশধরের দিকে যেন তাকিয়ে আছে।

দরজা খুলে একটি ব্রহ্মচারী নারী ঘরে ঢুকলেন, বাদ্যকের চিহ্ন তাঁর স্র-বৃগলে, মাথার কেশে পরিষ্কৃত। এতো বয়সেও তাঁর সলজ্জ ভাবটি অটুট রয়েছে। হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে ভক্তমতিসা অস্পৃহ সুরেলা কণ্ঠে বললেন : ধন্যবাদ ম'সিয়ে! বিগত দিনের একটি নারীকে আজকের লোকের ম'ণ করা বড়ো কম কথা নয়। ঝাড়িয়ে বইলেন কেন, বহুন।

আমি বললাম, তাঁর বাড়ির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গৃহস্থামীর নাম জানতে গিয়েছিলাম। এক তাঁর পরিচয় পেয়ে কিছুতেই নিজেকে স্বপ্ন বলতে পারিনি।

আপনি আসার আমি খুবই খুশি হয়েছি ম'সিয়ে, জানালেন বুঝা : কেন না, এ বয়সের ঘটনা প্রথম ঘটলো। আপনার স্ততিত্বা কার্ডখানি হাতে পেয়ে আমি তো একেবারে চমকে উঠেছিলাম। স্বরীক কুড়ি বছর পরে যেন কোন পরম বাদ্য আমার আহ্বান জানাচ্ছেন। আমি তো বিশ্বস্ত—সম্পূর্ণরূপে জন-মনের অন্তরালে চলে গেছি। কাকুর শ্রুতিপটে আমার কথা উদ্ভিত হয় না। আর এটাও জানি, যতো দিন না আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে এই ভাবেই চলবে। আমি মায়া গেলে দিন তিনেকের জন্মে পত্রিকার-পত্রিকার জুলি রোয়েনের জীবন-কথা ছাপা হবে, আলোচনা করা হবে তার সবচেয়ে সজ্ঞ-অসজ্ঞের কাহিনী-উপকথা-কুলা—হু-টারখানা বইও ছাপা হবে। ব্যস, সেইখানেই চিত্রতরে নবম আসবে বিশ্বাসিত বরনিকা। তার পরেই আমি শেষ হয়ে যাবো।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর আবার তিনি শুরু করেন : আর সেদিনের বেশি দেখিও নেই। কয়েক মাস কিংবা কয়েক দিনের ভেতরেই এই ক্ষুদ্র নারীটির সজীব হেঁচ শব্দে পরিণত হবে।

দেহালে টাঙানো নিজের ছবির দিকে তাকালেন জুলি রোয়েন—আজকের এই বিশিষ্ট পরিপাতির দিকে ব্যঙ্গ ভরে সে যেন চেয়ে আছে। পর দুহুতে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো দার্ভিক কবি এক উৎসাহী

সুবিশদীর দিকে। তারিও যেন বলছে : এই কর কি প্রাণ করে আমাদের ?

অবর্ণনীয় একটা বিবাদের ভায়ে মন আমার আজন্ম হয়ে যায়—যারা আজ আর মরজগতে নেই এবং যারা অতীতের শ্রুতির সঙ্গে ভুবন্ত মাথুয়ের মত প্রাণপণে সঙ্গ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের গভীর বেদনা আমাকে আবেগ-আকুল করে তোলে।

নাইস হতে মন্টি কার্লো অভিমুখে ছুটে চলেছে কতো বিচিত্র যানবাহন—ঘরের ভেতরে বসে স্পষ্ট দেখতে পাই সুরবেশা আনন্দমুগ্ধ আরোহীদের। জুলি রোয়েন আমার দৃষ্টি অমূল্য করে ওই দৃশ্যে দেখে অমূল্যমান করলেন আমার চিন্তাধারা। শ্রিতহাত্যে মুগ্ধ হয়ে বললেন : কতোকণের জন্মেই বা এই সুখের জীবন!

আমি বলি : আপনাদের জীবন নিশ্চয়ই খুব রমণীয় ছিলো।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলাটি। বললেন : প্রকৃতই সুন্দর ছিলো—ছিলো মধুর। আর সেইজন্মেই তো আমার এই আকস্মিক।

অমূল্যব করলাম বুঝা তাঁর জীবনকথা বেছায় জানাতে পারেন, প্রয়োজন শুধু হৃদয়-সজ্জাতে আঘাত করা। গভীর সহানুভূতি ভরে সজ্ঞপণে ব্যথা পাওয়া জায়গাটি যেমন ছুঁয়ে দেখতে হয়, সেই বকম মমতার একে একে প্রাণ করে বাই। তিনিও অকপটে বলে যান তাঁর অতীত কাহিনী, তাঁর বর্ণোচ্ছল অভিজ্ঞের কথা। সে যে কী অপরিণীত আনন্দ, কী অভূতপূর্ব সাদৃশ্য—তার পরিচয় পাই তাঁর বর্ণনায়।

আজ্ঞা আপনাদের পরম আনন্দ এবং চরম সুখের জন্মে কি আপনি থিয়েটারের কাছে বিশেষ ভাবে স্বীকৃত?—প্রশ্ন করি আমি।

কখনোই নয়—তৎক্ষণাৎ উত্তর পাই।

হাসির আভাস জাগে আমার মুখে।

জুলি রোয়েন বিবাদভারাক্রান্ত চোখে দেহালে বিলম্বিত ছবি হুটির দিকে কিরিয়ে বলেন : ওই দুজনের কাছে সেক্ষেত্র আমার বাবতীয় স্বপ্ন!

কিছুতেই আশ্বাসবরণ করতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, ওদের মধ্যে কার কাছে ?

দুজনের কাছেই ম'সিয়ে! সময় সময় মনের মধ্যে ওদের দুজনের বিবয়ে সশয় জাগে, তা ছাড়া আজ পর্যন্ত আমি একজনের কথা ভেবে অমূল্য করেছি।

তাহলে মায়া, আপনার কৃতজ্ঞতা ওঁদের প্রতি নয়, ভালোবাসার কার্যকলাপের প্রতি। ওঁরা তো ছিলেন প্রেমের ক্রীড়ক।

তা হতে পারে। কিন্তু অশ্রুণ সেই ক্রীড়ক! আহা!

ভালোবাসা পাইনি, বা পাবার উপায় ছিলো না—এ কথা কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন? ধন্য কোনো সাধারণ মানুষ তার জীবনের সকল আশা-আকাংখা দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে—এক কথায় বর্ধাসর্ব্ব দিয়ে কি আরো বেশি ভালোবাসতে পারত না! অবিশ্রিত সুরাসাধক এবং কাব্যের উপাসকরূপে এই দু'জন যৌতর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আপনার জীবনে দেখা গিয়েছিলেন।

চৈতন্য করে উঠলেন জুলি—এখনো ওঁর মধুর কণ্ঠস্বরে রোমাক জাগে। বললেন : না ম'সিয়ে, না। সাধারণ মানুষ হয়তো বেশি ভালোবাসতো, কিন্তু ওদের মতো করে পারতো না।

আহা, অপরাধ! প্রেমের রাগিণী এ পৃথিবীতে একমাত্র তারাই দিয়েছিলো, সে হুবে আমার মাতাল করে তুলেছিলো তারাই। কথা এবং হুয়ের সঙ্গের মাঝে তারা বা বাস্তবায়িত করেছিলো তা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? পাখি, অপাখি অল্পভূতি কাব্যে ও সংগীতে যদি মূর্ত না করতে পারে তাহলে তার পক্ষে ভালোবাসার সম্ভাবনা কোথায়? জানতো—নারীকে আনন্দে বিহবল করতে জানতো একমাত্র ওই মানুষ ছাড়াই। গান-কথার-আচরণে ওয়া তাকে সার্থক করতে পারতো। আমাদের বাসনা-কামনার মাঝে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার আধিক্য থাকলেই ওই কল্পনার মন উর্দ্ধগামী হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবের পাকে পড়ে মন মাথা খুঁড়ে মরে এই পৃথিবীর ধুলোবালিতেই। ওদের ভালোবাসায় চিনেছিলোম ভালোবাসাকে, শিখেছিলোম ভালোবাসতে; তাইতো অন্তের পক্ষে আমার আরো বেশি ভালোবাসা সম্ভব হতে পারতো।

সহসা নিশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি—হুঃসহ বেদনা উৎসারিত হতে থাকে অশ্রুর আকারে। আমি সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে চেয়ে থাকি খোলা জানালা-পাশে। কয়েক হুহুত অতিবাহিত হয়, আবার উনি শুরু করেন : জানেন মিসিয়ে, সাধারণত মানুষের চেহের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় ভরাগন্ত হয়ে থাকে—কিন্তু আমার বেলায় তা হতে পারেনি। আমার এই শরীরের বয়স উনসত্তর হলেও হৃদয়ের বয়স কুড়ি পেরোয়নি। এই যে ফুলের হাটে স্বপ্নের সাথে মিতালি পাতিয়ে নিঃসঙ্গ পড়ে আছি—এর কারণ হচ্ছে ওই-ই!

দীর্ঘ সময় নীরবে কেটে যায়। উনি ইতিমধ্যে ভাবাবেগ সঞ্চয় করে নেন। এক সময় সহাস্তে বলতে থাকেন : প্রকৃতি-পরিবেশ বখন চিত্তহারী হয়ে ওঠে, তখন কি ভাবে আমি সময় কাটাই, সে কথা তুললে আপনি হয়তো হাসবেন মিসিয়ে! আমি নিজেই নিজের নিরুদ্ভিড়ার হাসি, কল্পনা করি নিজেকে।

দেখলাম, আর কিছু বলবার জন্তে অল্পবোধ করা বুধা, উনি রাজী হবেন না। অন্তঃকরণ উঠে পড়লাম।

উনি চিঠিয়ে ওঠেন : সে কী! এতো তাড়াহাড়া?

মিষ্টি কালোতে সাদা-ভোলন সেবে নেবার অভিপ্রায় জানালাম। উনি তৎক্ষণাৎ কিছুটা ভয়ে ভয়ে বলে ফেলেন : আমার সঙ্গে যেতে কি আপনার আপত্তি আছে? আমি কিন্তু খুবই খুশি হবো।

ধিকৃতি না করে তাঁর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করি। খুশি হয়ে উনি ঘটাস্থান করলেন। সেই অল্প বয়সী পরিচারিকাটি হাজির হতে তাকে নিয়ন্ত্রণে কি সব আদেশ করলেন। তারপর আমার জানালেন, তাঁর বাড়ির সব কিছু দেখাবেন।

বাবার-ঘরের সামনে বিশেষ ধরনের কাচে-ঢাকা বারান্দায় রাজ্যের গাছপালা; তারই অধরে কমলাকুহল একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। লতাগুণ্ডের আড়ালে একটি নীচ আসন পাতা—গৃহের

কত্রী মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন—এ তারই নীরব সাকী।

এরপর হাজির হলম আমার বাগানে ফুলের শোভা দেখতে। মিনের আলো দীরে দীরে স্নান হয়ে আসছে, কোমল চরণে নেমে আসছে মনোরম উষ্ণ সন্ধ্যা—ঠিক এমন কয়েকই পৃথিবীর সব কিছু মধুর বলে মনে হয়।

খাওয়ার টেবিলে এসে স্থান গ্রহণ করলাম আমার, ঠিক অক্ষরায় বনিরে আসার পরই। এখানে কাটলো দীর্ঘ সময়—আরোজনও হয়েছিলো খুবই সুন্দর। অন্তরংগতা গভীর হয় আমাদের মধ্যে, এক পাত্র মদের কল্যাণে উনি আরো অন্তরংগ হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রতি অন্তরের অন্তস্তলে আমার গভীর সহানুভূতি জেগে ওঠে।

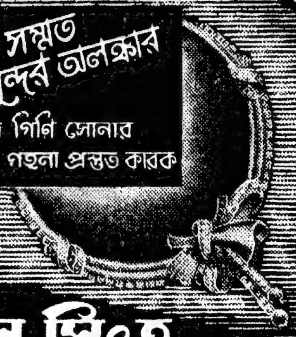
অবশেষে জুলি বোমেন কথা কইলেন। বললেন : চলুন বাইরে গিয়ে চাঁদ দেখিগে। চাঁদ আমার বড়ো প্রিয়—ওই পাগল-করা চাঁদ! আমার শ্রেষ্ঠ সুখের নীরব সাকী একমাত্র ও—ওর মাঝেই অতীতের রমণীয় স্মৃতির সন্ধান সঞ্চিত হয়ে আছে, ওর দিকে চাইলেই তারা আমার এসে বসে দেয়। আর সময় সময় এই সন্ধ্যাবেলায় আমার নিজের জন্তে এমন একটি মধুর স্মৃতির আরোজন করি, তুমি যদি জানতে—না না, তুমি খুব ঠাট্টা করবে—সে কথা আমি বলবো না—আমি সাহস করি না—না না, কিছুতেই তোমায় তা বলবো না!

অল্পনয় করি : লোহাই আপনার, ধামধেন না! কি সে গোপন ব্যাপারটা? আমাকে বললে কিছু হবে না, প্রতিজ্ঞা করছি হাসবো না—এই শপথ করলুম।

তবু তাঁর বিধা যায় না দেখে তাঁর হিম-শীতল কুঙ্গ হাত ছাটি তুলে নিলাম; স্বপ্নের অতীতের সেই প্রেমিক-বুগলের মতো গভীর চুপনে হাত ছাটি প্রাবিত করে দিই। উনি অভিভূত হয়ে পড়েন—তারি

ফোন: ৩৪-৫০০২

সর্বকৃষ্টি সম্মত
সুন্দর তালব্রার
এক মাত্র গিনি সোনাব
নিখুঁত গহনা প্রস্তুত কারক



জৈনগোঙ্গ
কে. এল. সিংহ এণ্ড সন্স
 ১৩৭ বি. বহু বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-২২

KIS

মাঝে জেগে থাকে সংকোচ। কীপ কঠে প্রায় করেন : প্রতিজ্ঞা করছে তুমি হাসবে না ?

হ্যাঁ করছি—শপথ করছি।

হাসি ফুটে ওঠে মুখে। আহ্বান জানান : তাইলে এসো।

আমরা উঠে পাড়ালাম। সবুজ পোষাক-পরা সেই কলাকার চাকরটা তাঁর চেয়ার সরিয়ে দেয়। উনি সেই অবকাশে ক্ষিপ্তকণ্ঠে কি বেন তার কানে কানে বলে বেন।

সসন্মানে সে উত্তর দেয় : হ্যাঁ মাধাম, একুণি।

উনি আমার হাত ধরে বারান্দা অভিক্ষেপ করে চললেন। কমলাবীথি পথটি ভারি রমণীয় ? চাঁদের রূপালি হাসি কীপ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বৃন্তাকার গাছগুলির শাখার-পাতার, বুকুলিত কমলা-সুয়তি আকুল করে তুলেছে আকাশ-বাতাস। অদূরে ঘোশের অন্ধকারে অগণিত জোনাকিকে মর্ত্যের তারকা বলে মনে হচ্ছে।

জামি - টেবিলে উঠি : অপরাধ ! প্রেমের উপযুক্ত এই পরিবেশের তুলনা হয় না।

সহাতো জুলি বলেন : তাই নয় ? তাই নয় ? এখনি দেখতে পাবে তুমি।

ওঁর ঠিক পাশটিতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বিড়-বিড় করে বলেন : এই সকল দৃশ্যের স্মৃতিই আমার জীবনে চুৎপ্রভাবকাজ করে তোলে। আজকালকার মানুষ তোমরা সে সব ভিনিস স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, টাভা-জানা-পাইএর কারবারীদের গঞ্জে তা সম্ভব নয় মোটেই। আমাদের সংগে—মানে আমার মতো বৃদ্ধা নয়, তরুণীদের সংগে তোমরা কথা কইতে পর্বন্ত জানো না। প্রেম আজ কেহেব ক্ষুধার পর্ববসিত হয়েছে ; নারীদের পণ্য হিসেবে যদি তোমরা মনে না করে দাও প্রকৃত সম্মান সুলভ ব্যবহার তবেই তো।

আমার হাতটা হাতে টেনে নিয়ে এক সময় উনি বললেন : ওই, ভাষণ।

অপরাধ এক দৃশ্যের অবতারণা হতে দেখে বিষয়ে আনন্দে

অভিকৃত হয়ে গেলাম। আমরা যেখানে পাড়িয়েছিলাম তাহা নীচের দিকে গলিপথে চাঁদের আলো শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারি শেষ প্রান্তে অল্পবয়সী একটি পুরুষ ও নারী আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আরো অগ্রসর হলে দেখতে পেলাম উভয়ের হাত দৃঢ় আবদ্ধ—আর মাডাল করা জোঁতাধারায় বান করে তাদের দেখতে হয়েছে অপরূপ।

কয়েক মুহূর্তের জন্তে তারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, তার পরই আরো নীচের রাস্তায় দেখতে পাওয়া গেল তাদের। যুবকটির পরনে শাদা সার্টনের পোষাক, মাথার চওড়া ছাট উটপাখির পালক লাগানো—সবই গভ্র শতাব্দীর নিদর্শন। মেয়েটির সাজসজ্জার রিজেক্টর আমলের ছাপ।

ওরা ছ'জনে আমাদের কিছুটা দূরে থেমে পড়লো, তারপর মধুর অভিবাধন জানিয়ে নিবিড় আলিঙ্গন আবদ্ধ হলো।

হঠাৎ ওদের দুজনকে এ বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা বলে চিনতে পারলাম। সংগে সংগে সজোরে হেসে ওঠার অদম্য ইচ্ছা হতে লাগলো, বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করলুম। অপেক্ষা করতে থাকলাম পরবর্তী দৃশ্যের জন্তে।

এইবার প্রেমিকযুগল সেই সঙ্গপথের প্রান্তে এগিয়ে যায়, আবার তাদের স্মৃতি রমণীয় হয়ে ওঠে। দূরে বহুদূরে মিলিয়ে যেতে যেতে এক সময় স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মতো হারিয়ে যায় তারা।

আমিও আর অপেক্ষা করি না, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ি। ওরা বেন আর আমার দৃষ্টিপথে না পড়ে। স্রূর অতীতকে আহ্বান জানাবার জন্তে আমাকে অবলম্বন করে বৃদ্ধা এই রূপশিল্পীর অন্তরে হারিয়ে বাওয়া স্রুথের আলোড়ন জাগাতে এই যে মিথ্যা দৃশ্যের অবতারণার ব্যবস্থা—নিশ্চয় এ বহুকণ স্বাধী হবে। কাজেই আমি বিদায় নিই নীরবে বিশেষ তৎপরতার সংগে।

অনুবাদক—রমেন চৌধুরী।

খেরাল

(সরোজিনী নাইডুর কবিতা)

আহা! অমৃশম বনের কুসুমটিরে
ধরেছিলে তুমি হুটি অজুলি দিয়ে,
উদাসীন টোটে ছুইয়ে অকস্মাৎ
কি খেরালে তুমি কেলোছিলে হি'ড়ে হি'ড়ে ?
জানলে না তুমি, কোনো দিন জানবে না—
এ বার্তা জানি স্রুগোপন প্রিয়তম !
নয় নয় তাহা এতটুকু বনকুল—
সে আমার মন, সে যে অন্তর মম।

হু' আঁতলে ধরে মনের পাত্রখানি
অবহেলা ভরে হৌরালে তোমার টোটে,
ছু'ড়ে কেলে দিলে স্রুজিতে অবসাদে—
ভাঙা-ভাঙা কাচ ওই তো ধুলার লোটে।
জানলে না তুমি, কোনো দিন জানবে না—
এ বার্তা জানি স্রুগোপন প্রিয়তম !
নয় নয় তাহা মনের পাত্র শুধু—
সে আমার প্রাণ, সে যে গো স্তন্য মম।

অনুবাদ—শ্রীমঞ্জু দাশগুপ্ত



পিয়াজ

...সুন্দরী

নারীদের

ঐতিহ্য

“পিয়াজ” নামটা সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়াজে
তাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়াজ সাবানের সাহায্যে
তাদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়াজ আসল
মিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিত্ত্ব এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মুখমলের মত মোলায়েম পিয়াজ ট্যাগক
পাউডারে অর্ধ হুগড হাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিত্ত্বতা।



অপব্যয় পৌষ
চর্চায় নিঃশি
গিয়ান ব্যবহার করুন

হাইড পার্ক কনসার্ট

শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য

অপবাদে ভরা এ নাম, তবু সময় কাটার সন্ধ্যার প্রায় রোজই হাইড পার্ক কর্ণারের এক বেকিতে। বিচিত্র আবেষ্টনী! একঘেয়েমীর হাত থেকে বাঁচার সব চেয়ে সোজা পথ তার কাছে এটাই। ব্যক্তিবাদীনতা উগ্র রকমের। ছোট-ছোট টুলের ওপর ঝাঁড়িয়ে বস্তুতা করে চলেছে বহু জনেই, নানান বিষয়ে জোতার গাথো নির্ণয় না করেই। ক্ষুণ্ণ পরিবর্তনের ঘোষণা করে চলেছে মোহমরী নাগীরী বেশভূষার মধ্য দিয়ে। দিনের আলো, রাতের সন্ধ্যা—বাধা বলে কিছু নেই। মাটির নীচে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে সহজে মনে চলে যাওয়ার পথও পরিষ্কার। স্রষ্টার অপরিচিন্তার বাগানে আগেরই সাথী ভুটে-বার অনেক সময়েই। দোকান বাজার সাজানো রয়েছে বলয়ল-করা আলোর মাঝে—ক্রেতার অভাবও নেই এখানে।

নরেন বসে আছে অনেকক্ষণ। সিনেমা যাওয়ার কথা—সময় শেষ হতে চলেছে তবু দেখা নেই ডরশির। হাইড পার্ক কর্ণারেই আলাপ। প্রথম দিনে ভয় যে ছিল না তা নয় কিন্তু প্রলুব্ধ করা রূপের জৌলু আর স্থান কাল আলোড়ন এনেছিল—ভয়কে ছাপিয়েই সামান্য পরিচয় ছাড়া আর কিছুই হয়নি সেদিন। মিথ্যা ভাবনা জানেনি কিছুই, বরং মন আরও চকল হয়েছিল বিলম্ব হতে দেখে। বিশেষ এসে প্রেমের ছোঁয়াচ লাগার মত অবকাশ থাকলেও অবলম্বন মেলেনি এত দিন। আকস্মিক আকর্ষণ লক্ষ্যভুক্তিকে তাই বাসিরে তুলেছে অনেকখানি। বাহুর বন্ধনে বিলিয়ে দিয়ে অনেকেই চলেছে পার্কের ভেতর দিকে—অন্তিম



বাওয়ার কামনা সন্তবতঃ। প্রকৃতির মোহিনী ছন্দে মধ্য মায়াজাল ছড়িয়ে প্রকৃতি-বিলাসিনীর মিলিয়ে গিয়েছে রূপ-বোঁদন, মাছুষের সাজানো কৃত্রিম আলো উপহাসের নীচে। প্রকৃতির অমুশাসন মানার চেষ্টাও নেই কোথাও এতটুকু। অসময়কে বিলাসিতা দিয়ে সমরোপযোগী করার প্রচেষ্টাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

মোহ কেটে যায় মিষ্টি ডাকে—কারো জন্ত অপেক্ষা কয়ছো বুধি? উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা হয় না ঐ মিষ্টি সুরের পরে বেহুয়ো তাল জানতে।

খুব মিষ্টি না হলো বেশ স্বন্দরী বলা চলে। বেকির ঘায়ে এসে কখন বসেছে নরেন জানতেও পারেনি।

আবার প্রশ্ন হয়—অনুবিধা কবলম্ব বসে?

—অনুবিধা হলোই বা ওনুকে কে? পার্কের আসন তো আর আমার একার জন্ত নয়?

—তা সত্য, তবু তারি মধ্যে অনু-অবিধা দেখার চেষ্টা করা মজল। আপত্তি না থাকলে বসতে পারি।

—আলাপেও আপত্তি নেই।

—বিদেশীরা সত্যিই সুন্দর। আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের এমন সম্মান দিতে জানে না।

বিদেশী সে নিজেও। আরল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছে নানান কারণে। লণ্ডনের সমাজের খাতার নাম না উঠলেও পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে অনেকখানি। তাই বলে স্থায়িত্ব নেই বসবাসের। বহু জারগার আছে তার নাম ও থাকার কাহিনী। আপাততঃ ঘর ভাড়া করেছে লণ্ডনেই। ছপুর্ন পর্যন্ত এক পোষাকের দোকানে থাকে বিকালের দিকে প্রায়ই আসে পার্কে। বেশি দূর নয়। হেঁটেই আসে আবার বেড়িয়ে ফিরে যায়। বাঁধন কোন নেই নেই, কোন বাধাও।

নরেন জিজ্ঞাসা করে, এই একক জীবন ভাল লাগে?

যৌবন হয় শিকরণ আসে প্রেরের বাঁকে। উদ্ধামতা প্রকাশ পায় রমণীর মুখে-চোখে।

জেনী বলে—একক জীবন ভালব বলেই তো আমি বহু নার্শে ঘেরা এই চকলতার মধ্যে। তাইতো নিজেই আলাপ করতে চাই অপরের সঙ্গে।

—ভয় করে না?

—ভয় তো বোঁবনের। কিন্তু এককম্ব বোঁচাতে গেলে বোঁবনকে উপচোঁকন দিতেই হবে।

—সে হলো প্রতিক্রিয়ার উপহার। অথচ লান-প্রতিক্রিয়ার কথা ওঠার আগেই তো হারানো পায় তোমার এত দিনের সাজিয়ে রাখা সম্পদ অজানিত অভ্যাসের আলিঙ্গনে।

—বোঁবন চিরস্থায়ী কিছু নয়। হারানো একদিন হবেই। ক'দিন আগে না হয় পরে। তখন আর সুযোগের অপব্যবহার করে

লাভ? এই ধর না তোমার কথা। তোমাদের আচার বিচার গনি না, না যিনি তোমাদের ধর্ম। তবু আলাপের লোভে পড়ে গলবাসীর খেলার বধি তুমি চেয়ে বস আমার সকল সন্তাকে—যৌবনকে বাঁচিয়ে রাখব মনে করে প্রতিহত করব তোমার যত্নসরকে। অমন যৌবন থাকার মূল্য কিছুই নেই।

—তা হয়তো সত্য। কিন্তু এ-ও তো হতে পারে, শুধু যৌবনকে রচাই গেলে; মূল্য কিছু না পেয়েও।

—মূল্য পাবই, কেন না তার বিনিময়েই যে বেচা-কেনা। রের ব্যবসা অস্ত্র সব কিছু নিয়ে হতে পারে কিন্তু নারীও নিয়ে য়। বলতে পার তবু থেকে যাব অচেনার রাজ্যে। বাক্য সব কথা। বল কার জন্ত অপেক্ষা করছ?

—নাম বললেই কি চিনতে পারবে?

—নাম জানার উৎসাহ আমার এতটুকু নেই। সম্পর্কটুকু শুধু গনতে চাই।

—সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগই মেলেনি।

—তার মানে স্মরণাপত্ত শুধু।

—তাও ঠিক বলা চলে না। এই প্রথম আলাপের অভিলাষ প্রকাশ্যে অপেক্ষমান অতিথির আরাধনা ব্যর্থ হতে চললো আর একজনের দাঁত পথচলার গোষে।

—আমারও যে এমন তুল কোন দিন হয়নি তা কে বলবে? তাই। ক্রটি সম্বন্ধে যুক্তির অবতারণা করে কোন লাভ নেই, বরং অহুয়োধ হব আমাকে অন্ততঃ একবার আলাপের সুযোগ দেবার জন্ত। স্পর্কহীন আমিও—বিধাণ কিছুই জানতে পারিনি তোমার মনে। যে অবিশ্বাসের কোন কথাও তো তুলতে পার না আমার বেলার? দুই কামনাই বধি উদ্ভেদ হয়—বাধা কেন আসবে তোমার আমার বিধানে?

নরেন কথার জোয়ারে ভেসে যায়। বাধা দিতেও পারে না আর। হনি দূরত্ব কমানোর বাসনার কাছ আসে।

আকাশের নিকে তাকালেও অন্ধকারের কথা মনে হয় না। ত্রিখতা মাটি ছেড়ে অত উঁচু পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পার্কের বিনিক্কার বাজা পেরোলেই চোখে পড়ে ভরাটকরা গাছগুলো। গুল্মেরই আনা আচ্ছাদন আড়াল করে রেখেছে প্রসারিত দৃষ্টিকে। গরই নীচে চোয়ার পাতা, বসতে হলে সময় অহুসারে অর্ধ দিতে হয়। গিড় নেই সেখানে। আমাদের মাঝে অমন সীমারেখা টানার ইচ্ছা য় না। নয়ম ঘাসের উপর বসে পড়েছে সবাই প্রায়।

হাতের পরশ পেয়ে বিচলিত হবার আগেই ভুলতে পায় জেনির কথা—তোমরা তো হাতের রেখা বিচার কর?

—যদি বলি তোমার জাগ্যে ভারতীয় স্বামী আছে?

—অবাক হব না।

—সত্যিই পার বলনা করতে?

—বাস্তবতার স্বীকার করলেও আপত্তি নেই।

—তোমার সাহস আছে।

—সাহসের পরিচয় কি পেলে?

—আমি তো পারতাম না।

—পরে দেখা যাবে। আপাততঃ প্রথম পরিচয়ের শুভকণ্ঠকে শ্রীণয় করার কি করছ বল?

—সাহস হয় না আমার, বাড়ীতে তোমার নিয়ে বেতে।

—সাহস তেঁমার নেই, তা বুঝছি।

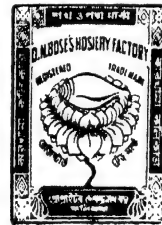
—তার চেয়ে তুল কোন সিনেমায়।

—সে তো হবে ছবি দেখা। আমাদের আলাপের মাঝে প্রয়োজন কি তৈরী করা কথাবিতাসের। তোমার তো বাড়ী নিয়ে বাঙার সাহস হয় না কিন্তু আমার হয়। বাবে আমার ঘরে?

—খুশী হব।

—স্লিপেট্টা নই কিন্তু। রূপ-বোঁবনের পরিচয় পেয়েছ, সেই সঙ্গে প্রলোভন-ভরা মনের দেখা পেয়েছ কি না তুমিই জান। তবু বলব, সে মাদকতা নেই, বাতে এটিচিনিওর মত সব কেড়ে নেওয়ার স্পর্ধা করতে পারি।

বেকি খালি হয়ে যায় নিমেষেই। পড়ে থাকে মন-বিনিময়ের চিহ্ন—ভবিষ্যৎ বচনা করার প্রয়াস। ব্যস্ত কোলাহলের মাঝে হিসাবও থাকে না, কারা কণিকের চাহনীতে ভরিয়ে নিল নিজেদের সব কিছু ফাঁকগুলোকে, জীবনের বাঁধ বুঝতে শিখল বরফের মত জমাট হয়ে থাকা অব্যবহৃত মনের জালা দিয়ে। অভ্যাস করা লোফেরার মাঝে মাঝেও আসে আকস্মিক পরিবর্তন—সময় নেবার অবসর দেয় না—ভাসিয়ে দিয়ে বার উদ্দাম উচ্ছলতার বজায়। একের ব্যবসা অপরের সমতা এনে দেয়, তবু পরিতৃপ্তির খোঁজ মেলে না। আহ্বান দিতেই শুধু ক্ষান্ত হয় না, তার পরের কথা ভেবে রসঘন গণ্ডী টানে ঠিকই।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিশ্রাস্ত
'শঙ্খ ও গদ্য'

মার্কী গেম্ভী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২২২৫

চলার ছন্দে ছিল তাদের পরিকল্পনা অথচ চলার আনন্দ মধুর থেকে মধুরতর হবার আগেই এসে যায় খামার ইঙ্গিত।

লোক-সমাগম ভালই বলা চলে। হাতের মধ্যে হাত রেখে চলতে গিয়ে দৃষ্টির অপব্যয় হয়। দরজার কাছে এসেও নরেন খেয়াল করতে পারেনি পথের নিশানা কিংবা পথিকের আনিগোণ।

অন্ধকার সামান্য একফালি গলি দরজার পরে।

সিঁড়ি নিয়ে উপরে ওঠে আরও কয়েকটা বারান্দা। ব্যস্ততা যেন সকলেই ওসব কাজেই—

চাবী খুলতে যেটুকু সময়। বিদ্যর কাটার আগেই আলো জলে উঠে ভরিয়ে দেয় মনের জ্ঞান। জানার স্পর্শকে।

স্বপ্নর করে সাজানো সে ঘর।

—বস!

নরেন অপ্রতিভের মত বলে ওঠে—জেনী তুমি কোথায়?

—আমি আসছি। তুমি দয়া করে বস একটুখানি।

নানান ভক্তিমায় তোলা ছবি সারা ঘরময়। নিজেইই দৌলখোর ওপর মোহ আছে বলতে হয়। ছোট টেবিলের মাঝে এক শিশুর ফটো। বিছানা ঢাকা রয়েছে বেশমের কাজ-করা চমৎকার এক চাদর দিয়ে।

এত ঐশ্বর্যের মধ্যে একক উপস্থিতি বোঝার মতন হয়ে উঠছিল নরেনের কাছে।

ডায়ের টানতেই গুমরে ওঠে কাঠের শাঁজরগুলো। সে আওয়াজ পৌঁছায় গৃহস্থামিনীর কানেও।

ঘর ভেসে আসে—ভর পেও না যেন।

নরেন ভাল করে দেখে। কালো এক রিডলবার। ভয়ে ভাঙাভাঙি বক করে দেয় ডাল।

জেনী ঘরে ঢোকে। বলে—কি সত্যিই ভর পেলে নাকি? দেখছ তো একা বাস করতে হয়। তাই বিপদের দিনে ছাতিয়ার রাখা আর কি।

নরেনের জড়ত্ব যায় না তবু।

জেনী কাছে আসে। সোকার বসিয়ে দেয়। নিজেও বসে। এই মধ্যে পোষাক বদলে এসেছে। মিষ্টি গন্ধ বেরছে বুকের চারিপাশে। বলমালানি লেগেছে সারা জঙ্গে।

—কি কথা, বলবে না বুঝি?

নরেনের কাণে অদ্ভুত এক স্বর।

—জেনী, আমার সন্দেহ হয়—

—খামসে কেন?

—আমি বক্স বাই। আর এমন ভুল করব না।

জেনী বাধা দেয়—কিসের এত কুণ্ডা তোমার?

সামনে পড়ে রয়েছে 'রিভলার' এক ছবি। সিনেমার কোন অংশ হয়তো। সঙ্কল্পের বেলাজুড়িতে প্রেমের খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে প্রণয়িগুণ। ভুল গেছে সমাজ সংস্কার।

নরেন প্রায় করে—সত্য জবাব দেবে?

—সত্য মিথ্যা বাচাই করবে কোথা থেকে?

—সে ভাবনা আমার। তুমি সত্য উত্তর দাও।

—তোমার ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা যদি না থাকে আমার? তোমার খুশি করতে যদি তোমার মনরাখা কথা বলি?

—সে তুমি বলবে না।

জেনীর চোখে-মুখে কিসের প্রতিচ্ছবি।

বলে—যাকে সন্দেহ করছ তার ওপর আবার এতখানি বিশ্বাস।

জেনীর হাসি বিহ্বল করে তোলে নরেনকে। জেনী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নিজেই ইতিহাস রচনার চেষ্টা করে।

—তুমি কি সত্যে চাইছ জানি। ভাবছ আমি হয়তো তোমারই একজন, যারা পূর্বের মনোরঞ্জন করেছে দিন কাটার। চলার পথ মিথ্যা দিয়েই তৈরী—সম্মানের চেয়ে অসম্মানের বোঝাই বেশি।

নরেন বাধা দেয়—না আর সত্যে চাই না। শুধু বল তুমি আমারই মতন সাধারণ একজন।

জেনী ইঠে বার। পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসে ছোট এক খাতা। অনেক লেখা—অনেক ছবি তার মধ্যে। নরেনের হাতে তুলে দেয় সে স্মৃতিময় চিহ্ন।

বলে—অবসর সময়ে পড় এখান। সত্যকার পরিচয় পাবে আমার। তবে এটুকু জেন, কলকিনী হলেও স্বার্থসন্ধির উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করি না মানুষকে। বন্ধুত্বই আমি চাই—চিরস্থায়ি হলে খুশিই হবে কিন্তু না হলেও আপত্তি নেই কিংবা না হওয়ার শোকে গিছিয়ে পড়ব না পথের পাশে প্রয়োজনের পায়ে কুতুল মেয়ে।

নরেন খুব তোলে। জানায়—এ পরিচয়ের পরও তুমি আশা কর বন্ধুত্ব?

—আজই না হয় পরিচয়ের কথা উঠেছে। কিন্তু শুধু নারীত্বই যখন অতীতের ছবি ছিল, তখনও তো বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে পণ্ডর এসেছিল আমার ঘরে। ভোগ আর ভোগের মধ্যে ছিল না কোন ব্যবধান। সময় বসে হইল না। পড়ে হইলাম আমি আর আমার সেই আশা—বন্ধুত্ব।

আদম শূন্য হর আবার। নরেন পাতা উলটাতে শুরু করে। ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হতে চায়। লেখাগুলো ক্রমশঃ বড় হতে আরম্ভ করে। সমস্ত দ্রাব্য একেবারে হবার উপক্রম। পরিচয় পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পরাজয় আসে তার সকল শক্তি নিয়ে।

জেনী ফিরে আসে স্নিগ্ধ কৌমল্য নিয়ে। মেহের ছায়া পড়ে তার মুখ চাহনিত। হাতে পানীয়-ভর্তি গেল্লাস। তুষার আগেই তুষা হরণের আয়োজন।

নরেন এক নিঃশ্বাসে শেব করে অল্পরোধ ব্যতিরেকেই। নিবেদ-বাধা-নীতি, সময়কালে কোথায় ভেসে যায়, বোধ হয় স্রষ্টাও জানে না!

জেনী হাসতে হাসতে এগিয়ে দেয় আবার। বলে—কত খুশি হলুম তুমি নিজেই নিলে বলে।

নরেন আবেশে স্পর্শ করে নেহেমীর মাথুখেকে। উত্তর দেয়—আমার ক্ষমা কর। তুমি সত্যিই বন্ধুত্বের বোণ।

—কি তোমার এমন করেছি বন্ধু, যার জন্য এত অবিধান গুচ গেল এক লমহায়?

—উপহাস করছ?

—তোমার উপহাসও তো বুঝলাম না এখনও?

—উপহাস নয়, বিশ্বাস কর। কি হবে তোমার অতীত নিয়ে, কি করব তোমার ইতিহাস নিয়ে? ছুঁয়ে কি আমার

অক্ষন ও প্রাক্ষন



মুবারিকা বিবি

শিবানী ঘোষ

প্রীকে একে দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে মুসাকিরের দল।

তাদের দান করা হচ্ছে কুটি আর মাংস। আজ ঈদ। বছরের এই দিনটিতে শাহ, মনসুর আগন্তুককে পরিভূক্ত করেন এই ভাবে। তাঁর একমাত্র কন্যা মুবারিকা বিবিও তত্ত্বাবধানে দাসীরা কুটি আর মাংস দিয়ে আসে মুসাকিরের হাতে।

আজ বাজার দেশের ওপর ঘনিয়ে এসেছে চরম দুর্দিন! বাদশাহ, বাবর ভারতবর্ষ জয় করার অভিপ্রায়ে বণ্ডনা হয়েছিলেন কাবুল থেকে। হঠাৎ বাবার পথে তাঁর শেনদুটি পড়ল দুর্ভাগা এই দেশটার ওপর। এর অপরাধ, এর অধিবাসিবল ইসলাম ধর্মের অঙ্ক বিধাস অঙ্করণ করে না। তাই বাবর ছিন্ন করেছেন, ভারতে বাবার পূর্বে তিনি নিশ্চিহ্ন করে বাবনে এর ইউগুজাই অধিবাসীদের।

এই চরম দুর্দিনে সকলের মুখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে হাসি। তবু আজ বছরের পবিত্র দিন। শত দুঃখের মাঝেও তাই বিবি মুবারিকা অঞ্চলো করেননি তাঁর মুসাকির সেবার কাজে। তিনি দাসীদের হাত দিয়ে হাসিমুখেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাদের প্রাণ্য বস্ত্র।

হঠাৎ এক সময়ে চমকে উঠেছেন মুবারিকা বিবি। এ কি! দরজার এক কাছে এসে একজন মুসাকির এ ভাবে তাঁর পানে তাকিয়ে দেখছেন কেন? মুসাকিররা তো এমন বেরাদশি কখনও করেন না? তিনি তাড়াতাড়ি মুখের ওপর নেকাবটা টেনে নিয়ে তাঁর এক দাসীকে বলেন—কিরোজা, বা ঈগুগির কুটি আর মাংস দিয়ে আর দরজার নিকট দণ্ডায়মান ঐ মুসাকিরকে। আর আসবার সময়

বলে আসবি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ঘেরের পানে তাকিয়ে থাকো। অত্যন্ত গহিত কাজ, ভবিষ্যতে তিনি যেন একাজ আর না করেন।

কুটি ও মাংস নিয়ে চলে গেল কিরোজা। মুসাকিরের হাতে সেগুলি দিয়ে কিরে আসতে তার বিলম্ব হল কিছুক্ষণ। তার আসতে দেরি দেখে মুবারিকা বিবি বলেন—এতক্ষণ মুসাকিরের সাথে কি করছিল কিরোজা?

কিরোজা বলে—তিনি কতকগুলো প্রাণ জিজ্ঞেস করছিলেন, তার উত্তর দিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল।

বিম্বিতা হয়ে মুবারিকা বিবি বলেন—প্রাণ জিজ্ঞেস করছিলেন? কি প্রাণ?

—এই জিজ্ঞেস করছিলেন তোমার সব্বচ্ছেই, মানে তোমার নাম কি, বয়স কত, তোমার মেজাজ কেমন, তুমি বিবাহিতা কি না, এই সব প্রশ্ন।

—ছি ছি ছি, মুখটা বিকৃত করে মুবারিকা বিবি বলেন—আমার সব্বক্ষে এই সব প্রশ্ন করছিলেন মুসাকির? তা তুই কি বললি?

কিরোজা বলেন—বা সত্যি কথা তাই বললাম। বললাম তোমার নাম মুবারিকা, বয়স বোল বৎসর, তোমার মেজাজ এমন শান্ত ও ধীর বা খুব কম ঘেরের মধ্যেই দেখা যায়। আর তোমার এখনও বিবাহ হয়নি এবং উপস্থিত তুমি কারও বাগ্‌দস্তা নও, সে কথাও বললাম।

—ছি ছি ছি, এ সব কথা বলে তুই মোটেই ভাল করিনি কিরোজা! কোথাকার কে একজন মুসাকির, তার কাছে আমার পরিচর দেওয়াটা অত্যন্ত অশ্রায় হয়েছে। আজ্ঞা এখন বা তুই।

চলে গেল কিরোজা। বিবি মুবারিকা তখন একাকিনী বসে ভাবতে থাকেন ঐ মুসাকিরের কথা। উনি তার সব্বক্ষে এত প্রশ্ন কেন করলেন? তবে তাকে কি তাঁর মনে ঘরেছে? হি! হি! হি! ঐ আশ্ববুড়া লোকটাকে স্বামিরূপে কল্পনা করতেও যেন গা শির-শির করে।

বাজার দেশের অধিকর্তা মালিক আহমেদ, শাহ, মনসুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ বশনে বসে রয়েছেন একটি কক্ষে। বাবরের হাত থেকে ইউগুজাইদের বন্দা করা আর বোধ করি সম্ভব হবে না। তিনি যে মূর্তি নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে আর সাত দিনের মধ্যে এক মহাশ্মশান ভূমিতে পরিণত হবে এই বাজার।

—সলাম আলেকুম।

চিন্তার জাল হিঁড়ে বার মালিক আহমেদের। তিনি চেয়ে দেখলেন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বাবরের এক লুত। হঠাৎ তাকে দেখে অত্যন্ত বিম্বিত হলেন আহমেদ। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি আছে?

বাবরের বাতীবহ পুনরায় তুর্গিণ জানিয়ে বামশাহের ফরমানটা এগিয়ে দিলেন মালিক আহমেদের নিকে। পত্রটি পড়ে চমকে উঠলেন বাজার-অধিপতি। তিনি পত্রবাহককে বললেন—আজ্ঞা তুমি আসতে পার, এর জবাব আমি এখনই সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পত্রবাহক চলে গেলে মালিক আহমেদ তাঁর সহকর্মী শাহ, মনসুরকে বলেন—অত্যন্ত সাংঘাতিক এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন বাদশাহ, বাবর।

—কি প্রস্তাব ?

—সে প্রস্তাব হচ্ছে তোমার ঘেরে সুবারিকা বিবির পানিগ্রহণ করতে চান সজ্ঞাট। শাহ্, মনসুর গর্জে ওঠেন—অসম্ভব, এ হতেই পারে না।

মালিক আহমেদ বলেন—অসম্ভব বলে গর্জন করে উঠলে কোন ফল হবে না। তাতে বাজার অধিবাসীদের পক্ষে হবে আরও ক্ষতিকর ! তার চেয়ে এই মর্মে বাদশাহ্কে পত্র লিখে দেওয়া থাক যে সজ্ঞাটের সহযোগিতা হতে পারে এরূপ মেয়ে শাহ্, মনসুর বা অন্তান্ত অধিকর্তাদের নেই। এই কারণে সজ্ঞাটের অভিপ্রায় গ্রহণ না করতে পারায় তাঁরা দুঃখিত।

মালিক আহমেদের যুক্তি সকলেই সমর্থন করলেন সর্বাঙ্গকরপে। কাজেই তখন পত্র চলে গেল বাবরের নিকট। কিছু শরদিন্দু আবার এল সজ্ঞাটের কর্মমান। তাতে তিনি লিখেছেন, শাহ্, মনসুরের সুবারিকা বিবির নামী এক বোড়ী কত্তা আছেন, এ খবর তিনি ভাল করেই জানেন। গত ঈদের দিন তিনি মুশাকিরের ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তাঁর গৃহে। সেখানে তিনি অন্তঃপুরের দ্বার পঞ্চ গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন কুমারীকে এবং তাঁর দাসীর মুখে তিনি সব কিছুই অবগত হয়েছেন সুবারিকা বিবির সম্বন্ধে। পরে তাঁর পাঠানো কটি ও মাংস নিয়ে তিনি চলে আসেন সেখান থেকে। সেই কটি ও

মাংস মনসুরের গৃহের পশ্চাদ্দেশে ছুটি প্রস্তরখণ্ড পাড়ে আছে, তার মাঝে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি রেখে এসেছেন ওগুলি। কাজেই শাহ্ মনসুরের কত্তা নেই, এই বলে তাঁর চোখে মিথো বুলো দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এক সুবারিকা বিবিকে যদি তিনি না পান তবে তিনি সমূলে উৎপাটন করবেন ইউরুফজাইদের।

সজ্ঞাটের পত্র পাঠ করে অবাক হয়ে গেলেন সকলে। তাঁর কথা প্রকৃত সত্য কি না, তা বাচাই করবার ক্ষমতা শাহ্, মনসুর লোক পাঠিয়ে দিলেন তাঁর গৃহের পশ্চাদ্দেশে নিক্ষেপিত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে কটা ও মাংসের সম্বন্ধে। খবর পাওয়া গেল এক কথা মিথো নয়। এবং সুবারিকা বিবির কাছে লোক পাঠিয়েও যে সংবাদ পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল, বাদশাহ্, বাবর মুশাকিরের ছদ্মবেশে সত্যিই দেখে গেছেন তাকে। তবে এখন উপায় ? যদি ঐ মেয়েকে তাঁর হাতে না দেওয়া যায় তবে বাজার তথা ইউরুফজাইদের যে কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। এখন এই চরম বিশদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র শাহ্, মনসুরের কত্তা সুবারিকা। তখন তাঁকে ধরে বসলেন সকলে। বাড়ী গিয়ে তিনি বাত মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবরের সহযোগিতা হতে রাজী করান, তবে এ এক চরম উপকার করা হয় বাজার-এর পক্ষে। আর তাঁর কত্তা বখাখই

মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে ?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

দিলি সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-অলঙ্কার
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



বিবেক-বুদ্ধিদম্পত্য, কাজেই দেশের এই বিপদের কথা শ্রবণ ক'রে তিনি এতে নিশ্চয়ই অমত করবেন না।

শাহ, মনসুর গৃহে ফিরে সেই দিনই একবার প্রবেশ করলেন কজা সুবারিকার কক্ষে। মেয়েটি তখন একাকিনী বসেছিলেন জানাশার পাশটিতে। হঠাৎ পিতাকে ঘরে আসতে দেখে ভাড়াভাড়া উঠে এসে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে।

শাহ, মনসুর একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখেন মেয়ের মুখের পানে। রূপে গুণে অতুলনীয় এমন মেয়ে বোধ করি সারা আকগানিস্তানে আর দ্বিতীয় নেই। যেমন স্থির, তেমনি বিচক্ষণ। কিন্তু এই মেয়েকেই আজ সপ্তে দিতে হবে এক মোগলের হাতে। ইউরুফজাই হযে এ অশমান সে হস্ত স্বীকার ক'রে নেবে নিজগুণে কিন্তু তিনি পিতা হযে এ কথা মেয়েকে কেমন ক'রে জানাবেন?

—বাবা, আমাকে কিছু বলবেন?—ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন সুবারিকা বিবি।

—হাঁ মা, একটা কথা বলতে এলাম তোমাকে। শুনেছো বোধ হয় কাবুল-অধিপতি বাবর খান ক'রে দিতে চান আমাদের এই বাজীর দেশ এবং নির্গণ ক'রে দিতে চান এর ইউরুফজাই জাতিকে। তা' এই দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করতে পার মা, একমাত্র তুমি।

—আমি? বিমিত্তা হযে সুবারিকা পিতার মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—পিতা, আমি অবলা নারী, আমার কি এমন শক্তি আছে যে বাঘশাহ, বাবরকে পরাজিত করবো?

মনসুর বললেন—শক্তি দিয়ে নয় মা, তোমাকে সে কাজ করতে হবে হস্ত দিয়ে। অবশ্য আজ তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি তা তোমার পক্ষে কেন সমস্ত ইউরুফজাইদের পক্ষেই একটা অশমানমুচক কথা। তবু এই বাজীরের মুখের পানে চেয়ে তা তোমাকে মানতেই হবে মা।

সুবারিকা বললেন—আপনি বিধা বোধ করছেন কেন পিতা। আমি তা আপনায় কথায় কবনও অব্যাহত হইনি? আমাকে বা বলবেন তা আমি হাসিমুখেই মেনে নেবো।

মুহূ হেসে মনসুর মেয়ের মাধার্য হ'বার হস্ত সঞ্চালন ক'রে বলেন—আমার কথা তুমি যে হাসিমুখে মেনে নেবে তা আমি জানি। কিন্তু কথাটা বলতে যে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

—তবু বলুন পিতা।

শাহ মনসুর আর একবার স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন মেয়ের মুখের পানে। তারপর বললেন—সম্রাট বাবর তোমাকে সহধর্মীকরণে শেতে চান। যদিও এতে আমাদের কারও আন্তরিক মত নেই। তবু দেশের প্রতি চেয়ে তুমি এতে রাজী হও মা।

কথাটা শুনেই কেমন বেন শিউরে ওঠেন সুবারিকা বিবি। ইতিপূর্বেই তিনি কিরোজার মুখে শুনেছেন সেনিনের সেই মুসফিরই সম্রাট বাবর। তাঁর সেনিনের বেরাশপি তিনি মোটেই ক্ষমা করতে পারেন নি। তা ছাড়া তাঁর যৌবনকাল গেছে উত্তীর্ণ হ'য়ে, আর ত্রীও আছে গুটি পাঁচকে। এ অবস্থায় তাঁকে স্বামিরূপে বরণ করতে অন্তর হ্রেশে ওঠে কারায়। তবু নিজেকে সন্তত করে নিয়ে সুবারিকা বলেন, তাই হবে পিতা।

ব্যথিত কণ্ঠে শাহ, মনসুর বলেন—বেশ, তবে এর ক্ষতে প্রস্তুত হয়ে নাও মা।

পরদিন সকলের নিকট বিদায় নিয়ে শিবিকার গিরে উঠলেন সুবারিকা। আজ আর বাধা মানছে না অশ্রু। গুডনাকলে ঘন ঘন বৃষ্টিতে হয় চোখ। আজ তিনি রাজনীতির দাবাখেলায় একটি ঘূটি ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁকে লোকে যে ভাবে চালিত করছে তিনিও সেই ভাবেই চালিত হচ্ছেন। তাঁর নিজস্ব সত্তা বলে আজ আর কিছু নেই। হায় বিধাতা! শেব পর্যন্ত এই কি ছিল তোমার মনের বাসনা!

এগিয়ে চলল শিবিকা। সাংগে চলল তাঁর তিন জন দাসী। পশ্চাতে চললেন মাসিক আহমেদ শাহ মনসুর প্রমুখ অধিকর্তাগণ। এবং তাঁর পশ্চাতে চলল বাজীরের অধিবাসিবৃন্দ।

শিবিকা এগিয়ে চলল খানা গ্রাম থেকে চাকদারা গ্রামের পথে। সেখানে এক ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠত্বভী প্যার হ'য়ে তাঁরা গিয়ে পৌঁছালেন তাভাস গ্রামে। এখানে সান্দাং হ'ল সম্রাটের দলটির সাথে। তাঁরা এদের আন্তরিক-স্বদ্বন্দী জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন বাবরের শিবিরের দিকে। মাসিক আহমেদ, শাহ মনসুর কুমারীকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলেন সেখানে থেকেই।

বাবরের শিবিরে একটি তাঁবুতে অজ্ঞাত আতিথ্যের মাধ্যমে নিয়ে গিয়ে বসানো হল সুবারিকা বিবিকে। সেখানে এসে জড়ো হলেন দেশের প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সহধর্মীগণ। তাঁরা প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন নববধূর রূপে দেখে। কিন্তু তাঁদের সাথে আলাপ করবার মত মনের অবস্থা তখন সুবারিকা বিবির ছিল না। তিনি নীরবে বসে থাকেন অবনত মস্তকে। তাই দেখে বিবি-বেগমরা মন্তব্য করেন রূপের সাথে এর অহঙ্কারও কিছু কম নেই। না হলে হু'-একটি মুখের কথাও কি খসতে নেই? এর কোন উত্তর দিতে পারেন না সুবারিকা। তবু হু'পিয়ে উঠতে থাকে তাঁর অন্তর। তাঁরা একে একে চলে গেলেন তাঁর থেকে। তখন একজন দাসী এসে জানালো—আপনি প্রস্তুত থাকুন বেগম সাহেবা, এখনি এখানে সম্রাট আসবেন।

দাসীর কথা শুনে চমকে ওঠেন সুবারিকা বিবি। বাঘশাহ এখনি আসবেন এখানে? তাঁকে সে কেমন কবে বরণ ক'রে নেবে স্বামিরূপে? কিন্তু না, না, না। এখন একথা তাঁর মনে আসছে কেন? আজ সারা বাজীর দেশ চেয়ে আছে তাঁর মুখের পানে। এ অবস্থায় তাঁর কাছে কামের বলি না হয়ে উপায়ই বা কোথা?

—আসতে পারি বেগম সাহেবা?

বড়মড়িয়ে জাভিম ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুনিশ জানাল সুবারিকা। বাঘশাহ বাবর মুহূ হেসে প্রবেশ করেন তাঁবুর মধ্যে। সুবারিকা তাঁকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অবনত মস্তকে। বাবর জাভিমের ওপর বসে বলেন—আকগানিয়া, বোস আমার পাশে।

সুবারিকা তবু দাঁড়িয়ে থাকেন অবনত মস্তকে। বাবর চেয়ে দেখেন তাঁর নেকাব-ঢাকা মুখের পানে। তারপর আবার বলেন—বোস আকগানিয়া।

এবারেও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আকগান-রমণী। তখন বাবর উঠে তাঁর কাছে এসে বৃথ থেকে সরিয়ে দেন নেকাবটি। সুবারিকা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সঙ্কটভিত্তি হয়ে। বাবর একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তাঁর গোলাপের মত আরক্ত কোমল

মুখের পানে। তারপর আবার বলেন—আমার পাশে বসবে না আফগানি।

এইবার কল্পিত অথবা স্থাবরিকা বলেন—আমার একটা নিবেদন আছে।

বাবর অত্যন্ত সর্বাঙ্গভূতির কণ্ঠে বলেন—কি নিবেদন আছে বল না প্রেরসি, তুমি অত ভীত হচ্ছ কেন?

স্থাবরিকা এইবার একবার সম্রাটের মুখের পানে চেয়ে পুনরায় মত করে নিলেন মাথা। তারপর বীরে বীরে খুলে ফেললেন তাঁর পরিধানের বোঁধাটা। বহিঃপ্রকাশ হতে মুক্ত হয়ে তখন বেরিয়ে আসে স্বচ্ছ মসলিনে-ঢাকা তাঁর হৃদয় দেহটি। বাবর হতবাক হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর অর্থনয় দেখেই পান। নেশা লাগে তাঁর চোখে। স্থাবরিকা তখন তাঁর দেহ সম্রাটের সমুখে এগিয়ে ধরে বলেন—জাহাঙ্গীর, আপনার বাক্যের ক্ষেপের প্রতি বত ক্রোধ আজ তা আমার এই দেহের মধ্যে বিসর্জন দিয়ে ইউরুফজাইদের রক্ষা করুন।

বাবর সানন্দে তাঁকে বাছ আবেষ্টনে জড়িয়ে ধরে বলেন—তাই হবে আফগানি, ইউরুফজাইদের আর কোন অপকারই আমি করবো না।

তখন আশ্রয়ের অঙ্গুর করে পড়ে স্থাবরিকার চোখ থেকে। সত্যি তবে আজ বাক্যের রক্ষা পেল নিশ্চিত মুহুর হাত থেকে। কাঁপতে থাকে তাঁর অধর। বাবর সেই কল্পিত গুণে একে দেন তাঁর প্রীতির চুম্বন।

ক্রমশঃ নেমে আসে বিপ্রহর। হয়ে আসে প্রার্থনা করার সময়। সম্রাট উঠে পাঁড়ান জাফ্রিম ছেড়ে। স্থাবরিকা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পাছকা এনে পরিবে দেন তাঁর পায়ে। তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন বাহালাহ। তাঁর ভিকৃ হয়ে মাথাটা অঙ্গ একটু দুলিয়ে দিয়ে আরম্ভ করে তিনি বলেন—তোমার প্রতি আমি এত সম্ভ্রম হয়েছি যে তোমার বেশবাসীর অপকার তো দুয়ের কথা, তাদের বাত্রে সকল বিষয়ে উন্নতি ঘটে সেই চেটাই আমি করবো।

সেই কথা শুনে স্থাবরিকার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে সমবেদনার অঙ্গ।

দিনে দিনে স্থাবরিকার প্রতি ভালবাসা গভীর হয়ে ওঠে সম্রাটের। ইতিপূর্বে অল্প কোন মহিষীই তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারেন নি এর মত। আরোশা, মাহান, মাহুমা, গুলশাহ বা দিলদর এই পাঁচ বেগমের তুলনায় স্থাবরিকা যেন মূলে প্রভেদ। যেমন তাঁর স্বভাব তেমনি ব্যবহার। তাঁর চরিত্রের সাথে তুলনা করবার মত কোন মহিষী তাঁর চোখে পড়ে না।

সে'বার ভারতবর্ষ অভিযানে মাওরা আর সম্ভব হল না বাবরের পক্ষে। তিনি বাক্যের থেকেই ফিরে এলেন কাবুলে। কিন্তু কাবুলে এসে তাঁর অভ্যস্ত মহিষীদের বাগ গিয়ে পড়ল স্থাবরিকার প্রতি। কোথাকার একটি মেয়ে বুড়ো বয়সে সম্রাটের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠবে এ তাঁদের সম্ভ হয় না। তাঁরা প্রত্যেকেই চেট্টা করেন ঐ নবযুগের ক্ষতি করতে। কিন্তু স্থাবরিকা আপন চরিত্রগুণে ব্যুত পাবেন না তাঁদের শক্রতা।

এরিক আর একটা অসুবিধা যোগ করেন স্থাবরিকা বিবি।

সম্রাট তাঁকে বত বেদী ভালবাসেন ততই তাঁর ছোট মনে হয় নিজেকে। সম্রাটের ভালবাসার প্রতিদান তিনি ঠিক মত দিতে পারেন না। কত বার তিনি তৈরী করে রেখেছেন নিজের মন। কিন্তু সম্রাটের বিগত যৌবনের পানে তাকাতাই তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তথুনি। তাই এক একবার তাঁর মনে হয় সম্রাটের একটি সন্তান যদি তাঁর কোলে আসে, তবে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তিনি পূরণ করে দেবেন এই অপরাধ। কিন্তু সত্যিই কি তিনি জননী হতে পারবেন কোন সন্তানের?

সেদিন সম্রাটের পাঁচ মহিষী প্রবেশ করলেন স্থাবরিকার ঘরে। তাঁর চিত্তাধিত মুখমণ্ডলের পানে তাকিয়ে মাহুমা স্নলতানা বেগম বলেন—কি ভাবছিলি সে ছুটি?

হজ্জায় যেমন ওঠেন স্থাবরিকা। দিলদর বেগম বলেন—কি ভাবছিলি বল না সো?

স্থাবরিকা বলেন—আচ্ছা দিদি, আমার একটি সন্তান হবে কি না বলতে পারেন?

মাহুমা বেগম বলেন—তা আবার হবে না? তোমার সন্তানই যে হবে ভাবিকালের সম্রাট, কাজেই তা না হয়ে কি থাকতে পারে?

তাঁর কথা শুনে অভ্যস্ত লজ্জিতা হয়ে স্থাবরিকা বলেন—হি! হি! হি! একি আপনি বলছেন দিদি, আপনারা উপযুক্ত সন্তান থাকতে আমার সন্তান ভাবিকালের সম্রাট হবে কেন? আমি শুধু সম্রাটের প্রেমের প্রতিদান দেবার জন্তেই একটি শিশুর মা হতে চেয়েছি।

মাহুমা স্নলতানা বেগম বলেন—তা সে বার জন্তেই চাও। তুমি শিশুর মা হতে চেয়েছো বলেই তো আমরা হাকিমকে বলে ওষুধ আনিয়েছি। আনাও এটা খেয়ে নাও।

স্থাবরিকা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকেন বেগমদের মুখের পানে। এঁরা এ'বার জানলেন কি করে। এর আগে তিনি এ কথা কাউকে তো বলেন নি? মাহুমা বলেন—ভয় নেই, এ বিব নর, তোমাকে মাংসার বড়বড় করে আমরা আসি নি।

—হি! হি! হি! এ কি কথা বলছেন। স্থাবরিকা তাড়াতাড়ি বাটিটা নিয়ে নিঃশেষে পান করে নেয় ওষুধটুকু।

এবার হাসি ফুটে ওঠে বেগমদের মুখে। তাঁরা একবাক্যে বলেন—এবার তোমার কোলে নিশ্চয়ই সন্তান আসবে আফগানি, এতে আর কোন ভুলই নেই। বলেই তাঁরা হাসতে হাসতে বিদায় হন একে একে।

তাঁরা চলে বাবার পর্ব হঠাৎ এক সময়ে ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে কিরোজা। বাপের বাড়ীর লোক বলতে এই একটি মাত্র দানীই আছে তাঁর সাথে। আপনে বিপদে অভ্যস্ত বেগমদের বড়বড় থেকে সে প্রতিদায়িত্ব রক্ষা করে চলে তাঁর মনিব ঠাকুরপকে। সে এসেই সামনের উদ্ভিত বাটিটা দেখিয়ে বলে—এটা কি সাহজাদী?

স্থাবরিকা হেসে বলেন—জানিস কিরোজা, আজকে সম্রাটের সব বেগমরাই এসেছিলেন আমার ঘর। আমি সন্তানের জননী হতে চেয়েছি জেনে তাঁরা হাকিমের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে গেলেন আমাকে। আমি একটু আগেই তা পান করেছি।

—কি সর্বাংশ। চমকে গঠে কিরোজা।

বিম্বিতা হয়ে যুবারিকা বলেন—কিসে সর্বনাশ হল কিরোজা ?

—উঃ শাহজাদী, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন খেতে গেলে বেগমদের দেওয়া ওখ ?

—কেন ওখুে কি ছিল কিরোজা ?

—আঃ শাহজাদী, তোমাকে ওয়া আজ যে ওখু খাইয়ে গেল, তাতে আর কোন সন্তানই আসবে না তোমার গর্ভে। তোমাকে ওয়া ওখু খাইয়ে করে দিয়ে গেল বক্ষ্যা।

—বক্ষ্যা ! শিউরে ওঠেন যুবারিকা বিবি। তিনি বিম্বিতা হয়ে বলেন—সত্যি না কি কিরোজা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব সত্যি, তাদের বড়রক্তের কথা শুনেই তো আমি ছুটে এলাম তোমার কাছে। কিন্তু শয়তানীরা যে তার আগেই কাজ হাসিল করে চলে গেছে তা ভাবতেও পারি নি।

কিরোজার কথা শুনে নির্ধাক হয়ে বসে থাকেন যুবারিকা বিবি। আজ আর তিনি কিছুই ভাবতে পারছেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি আপন জাত-কুল-মান বিসর্জন দিয়ে বরণ করে নিলেন এক বিগতধৌবন পুরুষকে। তারপর একটি সন্তানের জন্ম নেই হওয়ার আশাও তাঁর নির্মূল হয়ে গেল চিরন্তনে। হায় এর পর নারী হয়ে বেঁচে থাকার আর সার্থকতা কোথায় ? যুবারিকা বিবি কাদবার শক্তিটুকু পর্যন্ত বেন হারিয়ে ফেলেন। তাঁর অন্তরে তখন শুধু প্রবাহিত হয়ে চলে হুঃ-বেদনার ত্রুফান ঝটিকা।*

মহিলা কবি চন্দ্রাবতী

ঐতিহাসিক চক্রবর্তী

অনেক বাঙ্গালী মেয়েই কবি হিসাবে বেশ নাম করেছেন।

কিন্তু অনেক দিন আগে যখন বাঙ্গালা দেশে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল, তখন একটি বাঙ্গালী প্রামাণ্যে যে কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। অথচ এমনই দুঃখের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছাড়া আর বিশেষ কেউই এই প্রকৃতিভাষিনী কবির নাম শোনেননি।

এই মহিলা কবির নাম চন্দ্রাবতী। বোড়িশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার এক গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে চন্দ্রাবতীর জন্ম হয়। বাঙ্গালা দেশের পাড়া-পাণের সাধারণ একটি গৃহস্থঘরে জন্ম নিয়েও চন্দ্রাবতী যে কবিপ্রতিভা ও চরিত্রবলে দেখিয়ে গিয়েছেন তা প্রত্যেক মেয়েরই জানা উচিত। চন্দ্রাবতীর জীবনী থেকে প্রত্যেক মেয়েরই অনেক কিছু জানবার ও শেখবার আছে।

মৈমনসিংহ জেলার পাড়ারী গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল গায়ক ও রচয়িতা বংশীদাস বক্ষ্যাপাণ্ডার (উপাধি চক্রবর্তী) চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী ও তাঁর পিতা এক সঙ্গে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসাদেবীর ভাগান-গান রচনা করেন। এ ছাড়া চন্দ্রাবতী মল্লী ও

কেনারামের পালা নামে দুইটি গাথাকাব্য রচনা করেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী একটি রামায়ণ রচনা করেন। এ সমস্ত কাব্যই তিনি নিজের দেশের প্রচলিত ভাষায় রচনা করেছিলেন। সাধারণ প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় যে কত উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যেতে পারে, চন্দ্রাবতীর কাব্যগুলি তাঁর নিদর্শন। চন্দ্রাবতীর রচিত পালাগীতি মল্লী ও কেনারামের পালা বাঙ্গালার প্রত্যেক নারীরই পড়া উচিত। এত অল্প জায়গার পালাগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মল্লী পালাতে চন্দ্রাবতী একটি আদর্শ পতিব্রতা রমণীর ছবি অতি সাধারণ বর্ণনা ও প্রোঞ্চল ভাষার মধ্য দিয়ে সূত্রে তুলেছেন। মল্লীর হুঃ-সবাই চোখে জল আসবে আবার সঙ্গে সঙ্গে মল্লীর কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ও পতিভক্তি প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েরই অম্লকরণীয়। কেনারামের পালায় বিখ্যাত দম্ভ্য কেনারাম কি করে বংশীদাসের মনসাভাসান গান শুনে দম্ভ্যবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে বংশীদাসের শিষ্য গ্রহণ করেছিল, তারই বর্ণনা করেছেন চন্দ্রাবতী। এই পালাটির ছত্রে ছত্রে পিতার প্রতি চন্দ্রাবতীর প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ রচনা করেন তাতে অনেক নতুনত্ব পাওয়া যায়। দেশপ্রচলিত অনেক কাহিনী তাঁর এই রামায়ণে স্থান পেয়েছে। রামায়ণ রচনার প্রচলিত কুস্তিবাণ ও বাস্তবিক রামায়ণকে সর্বাংশে অহুসরণ না করে তিনি সে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর নিজস্ব প্রতিভার পরিচায়ক। চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণটি পড়লে তাঁর গভীর সমবেদনামূলক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েরই চন্দ্রাবতী রচিত এই কাব্য ক'টি পড়া উচিত। আমাদেরই মত একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে কি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাব্যগুলি স্মৃতি করে গিয়েছেন তা প্রত্যেক মেয়েরই জানা উচিত।

চন্দ্রাবতীর নিজের জীবন বড়ই দুঃখময় ছিল। আর সেই দুঃখের ছায়া তাঁর কাব্যগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। মল্লী, সীতা, এঁদের হুঃ তিনি নিজের অন্তরের হুঃ দিয়ে অল্পতব করেছেন ও তাকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন। জয়চন্দ্র নামে একটি ব্রাহ্মণপুত্র চন্দ্রাবতীর ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মে। তখন বংশীদাস জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতীর বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললেন। কিন্তু হঠাৎ এই সময় জয়চন্দ্রের কি দুর্ঘটিত হোল, তিনি একটি মুসলমান যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন। এ ধারণে চন্দ্রাবতী পাঁচবছর মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী বড় পিতৃভক্ত মেয়ে ছিলেন। তাই তিনি বংশীদাসের উপদেশে অহুসারে জগতের অজ সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করে একান্ত মনে শিবপূজার রত হ'লেন ও রামায়ণ রচনা করতে শুরু করলেন। নিষ্ঠা ও চরিত্রবলে চন্দ্রাবতীকে রামায়ণ, মহাভারতের সীতা, সাবিত্রীর সঙ্গে এক আসনে বসান যায়। কিছুদিন পরে জয়চন্দ্র অল্পতব হ'য়ে কিয়ে এলেন চন্দ্রাবতীর কাছে। কিন্তু হুঃ-ই চন্দ্রাবতীর বুক ভেঙ্গে গেলো পিতার অসম্মতি জেনে তিনি জয়চন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারলেন না। তিনি তাঁর পিতার স্মৃতির জন্য অন্নানবদনে সর্বকণ্ঠ হুঃ-সইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এখনকার দিনে এরকম দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। চন্দ্রাবতীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অল্পতব জয়চন্দ্র চলে

* (1) Asiatic Quarterly Review, April 1901, An Afghan Legend.—Mr. Beveridge. (2) The Humayun-Nama of Gulbadan Begam—Mrs. Beveridge. (3) History of India (Vol. 1) —Erskine.

হুয়ে আত্মহত্যা করলেন। এ আত্মহত্যা চন্দ্রাবতী সইতে পারলেন না।
দীর্ঘবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে একদিন তিনিও অকালেই
পৃথিবীর মারা কাটালেন।

এত অল্প বয়সে এ ভাবে চন্দ্রাবতীর মৃত্যু না হ'লে তিনি আরও
অনেক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারতেন। জয়চন্দ্রের দ্বন্দ্বিক
আত্মবিস্মৃতির ফলে এত বড় একজন প্রতিভাশালিনী বালকী মেয়ের
প্রতিভা প্রায় অসুবেই বিনষ্ট হোল।

চন্দ্রাবতীর বামায়ণ এখনও ঐমমনসিংহের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা
অনেকেই মুখস্থ বলতে পারেন। আমরা আজ স্কুল-কলেজের শিক্ষা
ও ডিগ্রী নিয়ে গর্ব অহুভব করি। কিন্তু স্কুল-কলেজে শিক্ষা না
পেয়েও সাধারণ গ্রাম্য আবহাওয়াতে সেকালের মেয়েরা কত জানী,
গুণী ও আদর্শপূরণী হ'তেন, কবি চন্দ্রাবতীর জীবনী তার উজ্জল
দৃষ্টান্ত।

পথে পথে

শ্রীমুনীতা দত্ত

শীতের বেলা হ'য়ে এল শেখ, সন্ধ্যাকাশে অস্তমান সূর্যের
শেখ আলোকজটা—বাতাসে শিরশিরে ঠাণ্ডা। আকাশ ভরা
মেঘ-স্তবকের দিকে তাকিয়ে ধূমীর আনন্দ উল্লে উঠল। বিকেল
তখন পাঁচটা—আমাদের বাতাই হ'ল শুষ্ক। উদ্বেগ পথে পথে হুয়ে
বেড়ান—দৈনন্দিন জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য আনা।

২২শে জাছুয়ারীর আসন্ন সন্ধ্যা আমাদের চোখে রঙিন হয়ে
উঠল। আমরা দেখলাম মেঘের বৈকালের রক্তিম আভা—হু-হু
হাওয়ার নতুন ধূমীর ইঙ্গিত, পথের বাঁকে বাঁকে জীবনের সড়া।
ছুটে চলেছে গাড়ী বর্ষমানের দিকে। মেঠো রাস্তায় ধূলা উড়িয়ে,
আগে-পাশের স্তম্ভটাকে মুখের ক'রে আমরা এলেম বর্ষমানে।
এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেম, ডাল, ঘোটা আর গোল্ড খেয়ে
আবার গাড়ীতে। রাত তখন ঘন হয়ে এসেছে, বড় বড় গাছের
বাঁকড়া পাতার কঁকে কঁকে চাঁদের আলোর আলপনা। কলকাতার
আকাশে চাঁদ বেশি কিন্তু এমন ভাল লাগার মোহ কই খুঁজে পাইনে
—এ ঘন নতুন আবিষ্কার। ভাবে ভরা কবিতায় নতুন ছন্দ
বাগ। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে চুল এল—
রাস্তা অবসর হ'য়ে এল দুটো চোখ। আমি স্পষ্ট অহুভব করলেম,
মনোবীণার ছুটি ভাবে ছুটি বন্ধার। একটির হুয়ে রাস্তার আমেজ,
অন্তর্গত নতুন মোহের লহরী। তাই সেই আনো-বুম আনো-
আগরণে অনেকখানি পথ পার হতে হতে দেখলেম, মিটমিটে আলো-
বগা হুঁড়ুয়ের, কেটে-মেওয়া ধানের জুপ, হু-একটা প্রায় ভেঙে পড়া
পাকা বাড়ী, জাম্বামান মেঘস্তবকের খেলা—আরও কত কি।
রাত তখন সাড়ে দশটা—অজয় নদীর ওপরে অসমাপ্ত বীণের সঁকে
পেলসো আমাদের গাড়ী। আর তারপরই একই একই ক'রে
স্পষ্ট হ'ল ইলমবাজারের ছোট ডাকবাংলো। সবুজ ঘাসে-ডাকা
লনের মাঝে চারটি ঘরের বাংলো। চেরে চেরে দেখলেম নতুন
আত্মনাটিক। বাইরে তখন চাঁদের আলোর স্বকরক করছে
নীল আকাশ। পাছে পাছে অর্ধচুট কলি—গোলাপের হালকা
মদ্যি গন্ধ। অনেক রাত অবধি শুনেলম ঝিকিঝিকারি অবিদ্রোহ
একাতন—হুয়ে কোথাও শেরাল ডেকে গেল—পাছে হঠাৎ ডানা

ঝাপটে উঠল কোনো পাখী—তারপর আর মনে নেই—আমি
ঘুমিয়ে পড়লেম।

২৩শে জাছুয়ারীর সকাল এল ছুটির সড়া নিয়ে। সোনালী
আলো কুয়াশা তেঁকে করে এসে আমাদের স্বাগত জানলে। শিশির-
ভেজা সবুজ ঘাসে আর রাস্তার শেষ জাঁধারে জাত কুমুমকলি
চোখে নেশা ধরাল। শীতের হাওয়া এসে বহিরে দিয়ে গেল
শুকনো মরাফুলের পাণড়ি। হালকা রোদের ফিকে গরমে আর
ছুটির আলসে আমেজে ঘন বৃষ্টি আবার নতুন করে হুট হুট—
হয়তো সেই জন্তেই ডাকবাংলোর সন্ধ্যা ঘোটা কাদের শ্রীহীন
কাপের গঙ্গাজলের মত পাতলা চাঁও মন্দ লাগল না।

বেলা হ'ল—রৌণ্ড গরম হ'ল। সেই গরম রোদে আমাদের
আলসেমি কেটে গেল—প্রসাধন সেরে আমরা সঙ্গে আনা কেক
প্যাটিস খেয়ে বোলপুরের পথে পাড়ি দিলেম।

অনেক হুয়ে পড়ে রইল ইলমবাজার, আমরা দেখলেম ঘন শাল
গাছের মাঝে পড়ে থাকা রাস্তা। আরও দেখলেম, গাছের বাঁকড়া
মাথা ভরা সূর্যর, সতেজ, নবীন পত্র আর তাইহ তলে শুকনো বরা
পাতার জুপ। ভাবলেম, এমন কেন হয়? শুকনো পাতার
জুপে হাওয়া বইছে, কেনম ঘন এক বিচিত্র হু-হুহুহুহুহুহুহু
করলেম :

কার ঘন এই ঘনের বেদন চৈত্রমাসের উত্তল হাওয়ার
ঝুঁকো লতার চিকণ পাতা কীপে যে কার চমকে চাওয়ার।

হারিয়ে হাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের সুরধানি,
আমের বোলের গন্ধ মিশে বাননকে আঁজ কারা পাওয়ার ?

ভাবছিলাম, শব্দচলার এই সুরহুঁক থাকলে অনন্তকাল পথ চলতে
পারি আর বাঁধাবর জীবন বদী এমনি মধুর হয়, আমি ছাড়তে পারি
ছারী নাগরিক জীবন। হুয়ে বখন নীল নিসন্তের শেখ প্রান্তে
ভেসে উঠল বোলপুরের ঘোরাগড়া চিমনি, ঠিক সেই সময়ে গাড়ী
খেয়ে গেল। দেখা গেল পেটলের টাঙ্ক শূন্য। হঠাৎ ঘন
আমাদের মনটাও শূন্য হয়ে গেল। সমস্ত সৌন্দর্যবোধ স্তিমিত
হ'য়ে এল, ধবর এল তিন মাইলের মধ্যে নেই পেটলের দোকান।
ছুটি ছেলে বাচ্চিল রায়পুরের দিকে সাইকেলে, তাদেরই একজন
রাজি হ'ল সাইকেল দিতে। সেই সাইকেলে পেটল বখন এল,
তখন বেলা প্রায় ১১টা।

মাঘের সূর্য ঠিক বাঁধার ওপরে, আমরা মুখ তুলিয়ে ফিরে
এলেম বিশ্বযাত্রীর অতিথি-ভবন থেকে। জায়গা নেই। কিন্তু
কপাল ভাল বলতে হবে, প্রায় শাণ্ডিনিকতনের পাশেই একটি
আধপূরোন বাংলোর আমরা জায়গা পেলেম। বাংলোর চারপাশে
ধু ধু মাঠ, নিশ্চিন্ত আত্মনা শেষে বীরভূমের রাজা মাটিতে আবার
নতুনদের সড়া পেলেম।

বিকেল চারটে। ঠোঁটে চারের গরম জল চেপেছে। পড়ন্ত
রোদে অল্প ঠাণ্ডা—অনেক হুয়ে সূর্য প্রায় নেমে এসেছে দিগন্তে।
ভাস খেলতে খেলতে ভাবছিলাম, কি কবি সারা সন্ধ্যা।

খুব ছোট জায়গা বোলপুর, দেখবার মধ্যে শাণ্ডিনিকতন, কিন্তু
সেও তো কাল সন্ধ্যার আগে হবে না। এখন সময়ে মাইকে গানের
সুর ভেসে এল—আমরা ঘন ঘির করে কেলসেম। বোলপুরের

একবার চিত্রপুত্র "বিচিত্রা"র সঙ্গেটা কাটালেম। কখন রাত এল জানতে পারিলাম না। সাড়ে আটটার ছবি শেষ হ'লে বেরিয়ে দেখি ফুটফুটে চাদের আলো। সেই বহু আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল, বড় ক্লান্ত—বিশ্রাম চাই।

নতুন জায়গার নতুন মাধুর্য ব'রে আনল ২৪শে জানুয়ারী। আজ সরকারি ছুটির দিন নয় কিন্তু তবু ছুটি—বেআইনী ছুটি। এই অবৈধ ছুটিটাকে গেয়ে আজ অনেকেই দৈনন্দিন আটপোরে জীবনের একঘেরেমি থেকে মুক্তি পেতে, সৌন্দর্য আর কল্পনাকে উপভোগ্য করতে এসে পাড়িয়েছে, মাথা নত করেছে কবিত্বের শান্তনিকেতনে। শান্তনিকেতনের লাল মাটিতে পাড়িয়ে মনে হ'ল কল্পনার এমন বাস্তব রূপ কখনও দেখিনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর শিল্পমনের সৃষ্টি-সৌন্দর্যের কি অবাধ মেলামেশা! "উত্তরায়ণের" সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করতে করতে ভাবিলাম—কবিত্ব—

"ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্রাম ধরা,

তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা।

মিলি নিখিলের শ্রোতে জেনেছিলে খুসী হ'তে,

হৃদয়টি ছিল তাই হৃদি প্রাণধরা।

তোমার আপন ছিল এই শ্রাম ধরা।"

"উত্তরায়ণে" কবি থাকতেন। এখানে তাঁর সব ক'টি রচনা প্রকাশ্যে আছে, সেই সঙ্গে অল্পবাদও। ঘুরে ঘুরে মুক্ত-বিশ্বয়ে দেখলাম।

তারপর এলেন সুন্দর সাজান বাগানে একটি ছোট কৃত্রিম ঝিলে—তাতে ভাসমান দু'-একটি পদ্মকলি। সেই ঝিলের ট্রিক মাঝখানে ভাল পালা-ঘেরা ছোট দ্বীপ। এ দ্বীপ থেকে তাকে আবার একটি সেতু ছাড়ে, তার অপরূপ গঠন দেখে মনে হয় এক-একটি নিটোল পদ্মপাতা বুঝি পড়ে আছে এ পারের বাত্মিকে ওপারে পৌঁছে দেবার জন্তে। সেই দ্বীপে পাড়িয়ে কবির শান্তনিকেতন দেখে চোখ জড়িয়ে গেল, মনে মনে বললাম—কবি! যে মন আর চোখ নিয়ে তুমি এই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিলে, আমার দাও তোমার সেই মন, সেই চোখ! নাম-না-জানা বিচিত্র কুলের মাঝে আমার চোখ গেল হারিয়ে; সমস্ত ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের ঘনিষ্ঠ হ'ল আনন্দ, বিস্ময়, তৃপ্তি, শান্তি। আবৃত্তি করলাম—কবি!

"তোমার সে ভাল লাগা মোর চোখে আঁকি

আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছে বাঁধি।

আজ আমি একা একা দেখি দুজনের দেখা,

তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—

আমারে ভাষার তব বৃদ্ধ দৃষ্টি আঁকি।

বড় বড় গাছের তলায় শীতের রোগে শিথ দিয়ে বসেছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। মাঝে মাঝে আসছিল তাদের হাসির লক্ষ, আনন্দ যেন উড়ছে পড়ছে... কি যে ভাল লাগল ওদের সমস্ত বেশভূষা—রূপের চটকে নত, মস্ত কল্যাণশ্রীতে মন বেন ভরিয়ে দেয়।

কলাভবনে চুকলেম গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে। ভাবগভীর ভবনটি বেন শিল্পশ্রীতে ঝলমল করছে। নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রই এখানে বেশী। তাঁর সার্বিক শিল্পসৃষ্টি মনকে ছুলিয়ে দেয়,

চিত্রাচিত্রিত বাস্তব পৃথিবী, যেন স্বপ্ন হয়ে গিয়ে নতুন হল ওঠে, কল্পনিক জগত বাঁচে আছে রূপ রসের ইন্দ্রধনু—বা শুধু শান্তিতে ভরা।

তারপর ঘুরে ঘুরে ছাত্রাবাস দেখলাম; চীনভবন, হিন্দীভবন কিছুই বাদ গেল না। আমার মনে হল প্রত্যেকটি ভবনের গঠনভঙ্গি যেমন আলাদা, তেমনি পৃথক তার ভাবগাভীর।

আন্তর্নায় ক্রিস্লেম সকলে, সারলেম হুপুরের খাওয়া। পূর্ব পশ্চিমে বহন প্রায় বাব-বাব করছে আমরা এসে হাজির হলেন ঐনিকেতনের ঘরে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা কারিগরি বিদ্যা হাতে-কলমে শেখে। তাদের তৈরী নানান জিনিস সাজান দেখলাম। এখান থেকে বাড়ীর কাছ বরাবর এসে আমরা ইটতে বেরোলোম। যেটা পথে চোরকাটা ডিঙিরে অনেকখানি ইটলেম—ঠাণ্ডা হাওয়ায় সোঁদা মাটির গন্ধ ভাল লাগার লেশম মন বেন মাতিয়ে দিলে। তারপর ধীরে ধীরে বিশ্বচরাচর ঢেকে গেল পাটলা আঁধারে, ঘরে কেয়ার আগেই হালকা চাদের আলোর আকাশ ডরল।

দেড় দিন কাটালেম বোলপুরে। ২৫শে দুপুরে আবার পথকে আশ্রয় করে আমাদের গাড়ী ছুটলো। পথের পর পথ পেরিয়ে আমরা সিউড়ি এলোম বহন তখন দুপুর শেষ হয়ে বৈকালের আমেজ লেগেছে এই ছোট সহরটির পথে-ঘাটে। কিছু চোঁটা করতে হ'ল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ডাকবাংলোটির জন্তে। চমৎকার সাজান ছোট বাংলা—সামনে একফালি কুলের বাগান, ঘরগুলি আধুনিক আসবাবপত্র মান্যরম। শান্তনিকেতন দেখে মন উচ্চতানে বাঁধা ছিল। মাসীর ঘরে খড়ের ঢালার কবিত্বময় পরিবেশ থেকে এক বৃহত্তর আধুনিকতম পরিবেশ। এ পরিবেশে এসে যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেল কলকাতাকে, যেখানে ঘরে ঘরে চকচকে পালিশকরা সোফা-কোচ, মোজেকের বকবক মেঝে, ক্যানের হাওয়া। তবু আমরা এই বিরকম জীবনধারাই অভ্যস্ত—কবিত্বকুরের মত আমরা বলনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারি কই?

কিছু ঘুরেই কুলকুল করে বইছিল নাম-না-জানা নদীর কণ শ্রোত—তারই তীরে ঘুবলুয় কিছুকণ, তারপর কি যে খেয়াল হ'ল বাঁধকুম টকজি গিয়ে টিকিট কিনলেম থিয়েটারের—সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শুনলেম ছটায় থিয়েটার গুল, নাম—সরমা। পোঁপে ছটায় হাজির হ'য়ে দেখি—হা ভগবান। সব লাইট ফিট করা হচ্ছে। কেঁটা চেয়ারে বসে আছি ক'জনে, মাঝে মাঝে মশা তাড়াচ্ছি, ছারশোকা মারছি, এমন সময়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলো এতটা রাজার কুকুর, রোঁয়া-উঠা, বিল্লী! সবাই মিলে তাড়াগুণ তাকে। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে ৭টার কাছাকাছি। আগে লাগান হ'ল, এবার পদ্ম খাটাবার পালা। দেখতে দেখতে মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠল, দিগন্ত পার হ'য়ে এল মাধার ওপর, চাঁটা বাজল। এবার গুল হ'ল বেকর্ডে গান। আমরা মনে মনে অবীঘ হয়ে উঠছি। সারা হলে জনা কুড়ি মাত্র লোক। সাড়ে ৮টার থিয়েটার গুল হ'ল অবশেষে। কেমন লাগল বলতে চাই না, শুধু বলি রাত সাড়ে ৯টার অসমাপ্ত নাটকের রসভঙ্গ ক'রে আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

২৬শের সকাল এল সমস্ত মাথুঁটুকু মুছে নিয়ে। আজই কলকাতা ধোয়ার কথা—কাল থেকে আবার সেই পুরোন জীবন। কিন্তু আলস্য কাটিয়ে পাথে বেরিয়ে খুব ভাল লাগল। শীতের সকালকে উপেক্ষা করে ছোট ছোট ছেলেরা মিছিল করে চলেছে তেরডা পতাকা হাতে জাতীয়তা দিবস পালন করতে। সিউড়ি থেকে মেলেঞ্জের বাঁধ অবধি একাধিক মিছিল চোখে পড়ল। অনেক ঘরেই দেখলেম পতাকা উড়ছে। মন থেকে দু'শের সুরটা কেটে গেল।

চৌধ-মন জুড়িয়ে খেল মন্থাকীকে দেখে। স্মৃতি-বিস্তৃত লাল জল—শান্ত নিরাই ডেউ-এ ভরা। ঈষৎ কুন্দন জাগিয়ে বাতাস বহছে। তারই ওপর বাঁধ—বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এখানে ছুঁটি বাংলা আছে (বাংলা ও বিহার)। সে ছুঁটির অবস্থান যেমন সুন্দর, তেমনই মনোহরুকের প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমরা এখানে বৈশীষণ থাকিনি, একটু ঘুরে পাথে বেরিয়েছি।

এর পর তাড়াহুড়া করে ছুটেছি। অনেক জনপদ, ছোট-খাট নগর পেরিয়ে তিনটে নাগাণ এসেছি আগানসোলে।

যাত্রা শেষ হ'ল রাত সাড়ে আটটার কলকাতা পৌঁছে। ক্রান্ত দেহে বিগত তিনটি দিনের নুতি যোগদান করতে করতে ভারসাম্য—বর্ষমুখর দিনের এক্ষেপেই থেকে মুক্ত পেতে তিনটি দিনের চিন্তা আবার চিরদিনই আনন্দ আর বৈচিত্রের বাদ দেবেই—এ পাথের তো হাবিরে বাবার নয়।

ভক্তকবি জয়দেব ও ভাগ্যবতী পদ্মাবতী শ্রীপূর্বী পাঁজা

এপারে কেন্দ্রিষ, ওপারে শিবপুর। মাঝে জয়দেব নদ। যেন গোহুল আর মথুরা। মাঝে যমুনা। এপার হতে ওপার দেখায় যেন মথুরা। ওখানে যেন সেই কুঞ্জবন, সেই ভক্ত-সাহী পাখী, 'সেই বাঁকা স্তম্ভ বিরাজমান। বর্ষাদিনে জল পড়ে, বিছাৎ দেয়, অজস্রের বান শন-শন করে ডেকে উঠে। ওপারের ভাসল গাছপালার দিকে চেয়ে কবি দেখতে পান তমাল বিপিনে স্তম্ভাচ্ছায়া, পূর্ণমেঘে মেঘের জ্বর।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান কেন্দ্রিষ। এরই আশপাশকে নিয়ে একদিন গড়ে উঠেছিল ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী। মধ্যযুগীর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রাচীন ধর্মসাধনের আজও বিকিপ্তভাবে গিরে আছে কেন্দ্রিষকে। ধর্মমঙ্গলের কথা বাদ দিলেও কেন্দ্রিষ আশপাশে আপনি বিকাশ।

মধ্যযুগের বাংলা, সুলতা সুলতা শত্ৰুগামলা বাংলা। নাই অশন বসনের ঘনঘটা, ছিল না বর্ষমান যুগের মৈস্তের নিদারুণ নিম্নেবণ। সাধারণ ভাত-কাপড়ই সম্ভট সকলে। অল্পই সম্ভট সব। এতদিন এক সাধারণ পরিবারে আবিস্কৃত হন জয়দেব গোঁসাহী। জয়দেব তাঁর এক সাধারণ কুটারে তাঁর বাস। সাধারণ জীবন যাপন। বাড়িতে আছেন পদ্মাবতী আর আছেন আরাধ্য দেবতা রাধামাধব। কুটারের অনতিদূরে রাধামাধবের মন্দির। পদ্মাবতী পুষ্পের ঘোণাড় করেন, নৈতেজ্ঞ সান্নাৎ, জয়দেব ভোগ দেন। নিজ জুতে পুষা না দিলে যেন জয়দেবের ভক্তি নাই, মনে শান্তি নাই, পুষা ঘোণাড় করতে না পেলে পদ্মাবতীও যেন মনে শান্তি পান না।

ত্রয়োদশ শতাব্দী। ধর্মসাধনের সভাকবি জয়দেব। সরল জনাঙ্কুর জীবন যাপন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা। প্রাণ মন তাঁর সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের চরণে। তাঁর উপর ভরস থাকলে আবার চাই কি? তিনি যে পতিভক্তিপাশন হুঃখরূপ। তাঁর উপর ভক্তি থাকলে, তাঁকেই প্রাণ-মন সমর্পণ করলে তিনি যে নেমে আসেন ভক্তের বাড়ীতে।

শ্রী পদ্মাবতীও হিন্দুনারী প্রতিমূর্তি। স্বামিসেবাই তাঁর পরম ধর্ম। পতিই পরম গুরু। নিজের হাতে স্বামিসেবা করতে তাঁর মত পুণ্যবতী আর কে আছে? তাই স্বামিসেবাতোই প্রাণ-মন সমর্পণ করেছিলেন তিনি। বাড়ীর প্রতিটি কাজ তিনি করতেন, আবার পুজা-অর্চনা, ব্রত-পার্বণ তাও তিনি বাহ দিতেন না।

স্বামী গিয়েছেন গঙ্গাতীরে। এইমাত্র তাঁকে পুঁথি হতে তোলা হল। ত্রান সেরে আসবেন। পদ্মাবতী নিজ হাতে তাঁর সেবা করবেন। তারপর প্রসাদ নিয়ে নিজে খেতে বসবেন—'কিছু এ কি। আজ এত তাড়াহুড়া কিয়লেন।' আশ্চর্য হয়ে ভিজাসা করেন পদ্মাবতী। আজ আর ত্রান বাঁধা হয় নাই। পাথে মনে পড়ল সেই মোকটা। তাই তাড়াহুড়া করে এলাম। পদ্মাবতী সরলমতি। বুঝে না অত-শত লীলা। তাই বুঝেন তিনি। তাই হবে হয়ত। এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? চলে গেলেন বাঁগার বাঁগাড়ে। তারপর বাইরে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

পদ্মাবতী সেবার মতিমতী, কিন্তু এ কি। আশ্চর্য হয়ে গেলেন জয়দেব। 'একি। পদ্মাবতী। আজ আমার আসেই খেতে বসেছ?' হতভম্ব হন পদ্মাবতী। 'এ কি দেব। এ কি তোমার বাক্য? এই মাত্র সেবা সেবা বিশ্রাম করতে গেলে।' জয়দেব বিম্মিত, পদ্মাবতী নিস্তব্ধ। পুঁথি লিখে সেবা সেবা এই ত বিশ্রাম করতে গেলে!

অবাক হলেন জয়দেব। হুহুর্ভে চৈতন্য কিরে আসে তাঁর, জয়দেব পাগলের মত ছুটে বান বেখানে অসমাপ্ত পদ পড়েছিল। দেখেন, ঈ। সত্যিই, পুঁথি লেখা হয়েছে। তবে বুঝি তাঁর প্রাণের ঠাকুর এসেছিলেন তাঁরই বেশে? সেই অসমাপ্ত পদ পূরণ করতে, 'দেহি পদপল্লবমুখ্যং'। ছুটে বান পদ্মাবতীর নিকট। বলেন, 'পদ্মাবতী! তুমিই ভাগ্যবতী, তুমিই শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছ, তুমি সত্যিই তাঁর প্রদান পাবার অধিকারী। আমি অশ্মম, আমি পাশিষ্ট, নাও নাও আমাকে তাঁর প্রদান খেতে নাও।' বলে বান জয়দেব পদ্মাবতীর সাথে।

জয়দেবের এই গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা আর পদ্মাবতীর এই পতিপরায়ণতা যুগ যুগ ধরে মানুষকে মোহিত করে আসছে। পৌরুষের শেষ দিন কেন্দ্রিষে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। অজস্রের তুহিন জলে ত্রান করে জয়দেব-পদ্মাবতীর রূপ দর্শন করে। রাধা-মাধবের মন্দিরে গিয়ে সকলে বস্তু হয়। আর সাথে সাথে মাথাটা আপনা আপনি ছুরে পড়ে সেই পরম-পুরুষের দিকে।

জলযাত্রা

কুমা দেবী

নাটো শুনে আপনারা বিরাট একটা কিছু মনে করবেন না যেন। জলযাত্রা মানে বিশেষ যাত্রা, সাধারণত মাঠে মনে করে থাকে, আমি লিখছি সামান্ত একটা যাত্রা। যাত্রার উদ্দেশ্য জয়

এবং বনভোজন করে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ উপভোগ করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ-দুঃখ আছে, তার মধ্যে আমরা আনন্দ পেতে চাই সব সময়। আমাদের গন্তব্যস্থান একটি বিশেষ স্থান নয়, খ্যাতিও তার বিশেষ নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য স্ট্রিক্টরি সেখানে চেলে দিয়েছেন অরূপ হস্তে।

কটক সহর থেকে আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে প্রায় ৩০ জন। একটি বড় লঞ্চ ঠিক করা হল। ভ্রমণ ও বনভোজন করতে বাগিয়াতে অনেকে একসঙ্গে না গেলে আনন্দ পাওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে সব রকম বয়সের ছিলাম। ছোট মেয়ে কয়েকটি ছিল, তাদের চেয়ে বড় ছেলে কয়েকটি ছিল, আমরা মেয়েরা ছিলাম, বয়স্ক ভ্রমণলোক কয়েকজন ছিলেন, সব রকমের সমাবেশ, কান্নাই অসুবিধা নেই, সকলেই পেয়েছে তাদের বন্ধু।

বাজার আগেই এক বাথার স্ট্রিক্ট হল, সেইটাই আগে বলি। খুব জোরে উঠে রঙনা হবার কথা, মাঝ রাত্রি থেকে আরম্ভ হ'ল মুসলবারে বৃষ্টি। আমরা আশা করে রইলুম। সকালবেগার নিশ্চয়ই বৃষ্টি থেমে যাবে, সকাল হ'ল, বৃষ্টি ধামলো না, নিরাশ হয়ে বসে রইলাম, বৃষ্টি বোধ হয় আর ধামবে না, বাওয়াও বোধ হয় আর হল না। দু-তিন জন বন্ধু এসে বৃষ্টি দেখে কিরে গেলেন, শেষ পর্যায়ে তাদের আর বাওয়াই হ'ল না। কিছুক্ষণ পর বেলা প্রায় ৮টার সময় বৃষ্টি থানিকটা কমে এল, বর্ষণমুখর প্রভাতবেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ধামিকটা শান্ত হল। আমরা ষিয়ারঘাটে বাবার জন্ত সাইকেল-রিজ ভাকতে পাঠালাম। রিক্সাওয়ালাও বৈকে বসেছে, সাধারণতঃ ছয় আনাতে অন্তটা পথ যায়। সেদিন এক টাকার কমে যাবে না, আমরা তাতেই রাজি। ঘাটে এসে দেখি অল্প বন্ধুগণ এসে গিয়েছেন, সকলকে দেখে তখন মনে বেশ আনন্দ হল। লঞ্চ প্রস্তুত, সকলে ওঠা হল। বাওয়ার জিনিষপত্র, ষ্ট্রোট চায়ের সরঞ্জাম, খিচুড়ির সরঞ্জাম সব ওঠান হল। প্রায়োফোন তাস ইত্যাদিও নেওয়া হয়েছিল। তার পর বাড়া হল শুরু। আমরা বাজি মারাজ নামক একটি স্থানে। মহানদী ও কাটজুরি উড়িয়ার হ'লি বিখ্যাত নদীর সংযোগস্থল ওটি। মহানদীতে আমরা চলেছি বেয়ে, সামান্য বৃষ্টি তখনও পড়ছিল। নদীর এক পায়ে সমতল ভূমি ও গাছ, অপর পায়ে দূরে পাহাড়। পথে একটি শুদ্ধ শিবমন্দির পড়ে, নাম ধবলেশ্বর। ঐ অঞ্চলে খ্যাতি আছে, শিবরাত্রির সময় দলে দলে বাত্রী ওখানে বার শিব দর্শন করবার জন্য। নদীর ধার থেকে বেশ উঁচু জায়গাতে মন্দিরটি অবস্থিত।

আমরা বেতে আরম্ভ করলাম, তাস খেলা শুরু হয়ে গেল। তারপর রসগোলা, ডিম, ডালমুট সহযোগে চায়ের পর্ব আরম্ভ হল। বাড়ীতে তো সর্সাদাই মেয়েরাই চা খাবার রান্না-বান্না করে, এখানে এই সব কাজ পুরুষরাই করতে আরম্ভ করলেন। এই সব ব্যাপারে এখানে আমাদের ছুটি।

বেলা প্রায় ১১টার দরম আমরা নারাজে এসে পৌছোলাম। নদীর ধার থেকে থানিকটা উঁচুতে ডাকবাংলোটি অবস্থিত। বাংলোটি খুব সুন্দর, টেবিল-চেয়ার বারনিশ করা, সামনে গোল বড় বারান্দা, বাধকম তিন-চারখানা ঘর, সুব্যবস্থা। এখানে কার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর, পাহাড় নদী গাছপালা সবের সমাবেশ। দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যাবে দূরের পাহাড়, সবুজ আকাশ, ইটের বাঁচা এসে বাধা দেবে না। সেই দিনটি ছিল মেঘলা, সেজন্ত আরও সুন্দর লাগছিল।

রান্নার ভার দেওয়া হয়েছিল ছেলের ওপর, সেজন্ত আমরা বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। পাহাড়ের গাঁ বেয়ে চলছে আঁকা-বাঁকা পথ, সেই পথ বেয়ে আমরা গল্প করতে করতে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বেড়াবার পর আমরা ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম। বেড়াবার পর নদীতে স্নান করা হল, বার সাঁতার জ্ঞানেন, তাঁরা সাঁতার কাটলেন, খুব হৈ-চৈ করে স্নানের পূর্ব সমাধা হল। স্নানের পর এবার ভোজনের পালা, রান্না প্রস্তুত, মেঘলা দিন, খিচুড়ী পাণড় ভাজা, ডিমের তরকারি আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি ও চাটনি, ছুরিভোজন আর কি। সবলে খেতে বসি হবে, এমন সময় দেখা গেল আমার স্বামীর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তার ওর অপেক্ষা করা হল। এমন সময় তিনি এলেন, হাতে প্রায় পাঁচ সের বড় বড় চিংড়ি মাছ, ব্যাপার দেখে তো সকলের চক্ষু স্থির। সবাই ফুগার্ত—মাছের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

উনি সোজা চলে গিয়েছিলেন প্রায় দুই মাইল দূর গ্রামে, সেখান থেকে মাছ জোগাড় করে এনেছেন। বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে ওর উৎসাহই সব চেয়ে বেশী। কাছেই সকলে হল ওর অতিথি, অতিথিদের মাছ খাওয়াতে না পারলে থাওয়ানোর অলহানি হবে যে। মাছগুলো বেশন দিয়ে ভেজে খাওয়া হল। রান্নার পক্ষে এটা সব চেয়ে শীঘ্র হয়ে গেল, খিচুড়ি দিয়ে টাটকা চিংড়ির মাংস পোয়ের ভাজা সুব্যবস্থা খুব।

বাওয়া দাওয়ার পর তাস খেলা, প্রায়োফোন গান শোনা, গর চললো কিছুক্ষণ। আর একজনের কথা একক্ষণ বলাই হয়নি। সে আমাদের 'পপি', সেও এসেছে আমাদের সঙ্গে, তার আনন্দ সবচেয়ে বেশী। সাঁতার, বেড়ান সবের মধ্যে বোগ দিচ্ছিল সেও। বেলা গড়িয়ে এল, এবার কেয়ার পালা। আমরা সব লঞ্চে এসে বসলাম। একক্ষে আমাদের খোরাক হল দুইটি ছোট মেয়ের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের খোঁজ করবার জন্য লঞ্চ থেকে নামা হবে, এমন সময় দেখা গেল, দূর পাহাড়ের ওপর তাদের ক্রকের লাল ও নীল রং। তারা বৃষ্ণত পেয়েছে, আমাদের যাত্রার আয়োজন, তারা তাড়াতাড়ি নেমে আসছে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে, আকাশের তারা কলমল করছে নদীর বুকে। এবার আমাদের যাত্রা বাড়ীর পথে।

সমস্ত জীবনে ব্যস্ত জীবন। সমস্তি নুখে ব্যস্তি সুখ।
সমস্তি হাড়িয়া ব্যস্তি অস্তিত্বই অসম্ভব। এই অনন্ত সত্য
কণ্ঠের স্মৃতি।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



**রেক্সোনা
সাবান**

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ
ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম
হবে। তার কারণ, রেক্সোনাল গ্যাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি তৈলীয় এক বিশেষ গুণবিশিষ্ট যা আপনার ত্বককে
সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার
সবের মত কথা মানুষ দেখেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপনার সৌন্দর্যের জগতে... রেক্সোনা

Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL

রেক্সোনা সো, গিল, অটোম্যাটিক স্ক্রাব, ফিউজিয়ন সিলার, গিল, স্কর্ভ, বার্ডার ওয়াশ

R.P. 148-X12 BQ



বর্ষশক্তি মাঠে এবারকার প্রথম ডিভিশন খেলাগুলি বেশ জমে উঠেছে বলা যেতে পারে। মধ্যে মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু 'হু'-একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া এবারকার ফুটবল মরশুম এখনও বেশ শান্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে।

মোহনবাগান দল এ পর্যন্ত অপরাধিত থেকে লীগ কোঠার শীর্ষে আছে। ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং প্রত্যেকেই একটি করে খেলায় পরাজয় বরণ করেছে। গতবারের লীগবিজয়ী রেল দল ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের নিকট পরাজয় বরণ করেছে।

রাজস্থান দল এবারে মোটেই আশাশ্রয় খেলতে পারছে না—তবে বর্ষশক্তি মাঠে ইষ্টবেঙ্গল দল ৩-১ গোলে পরাজিত করে এবারকার লীগ মরশুমে চমকের সৃষ্টি করেছে।

মরশুমের প্রথম দিকে খেলার মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, তাতে আশা করা যাচ্ছে বিশেষ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলে এবারকার ফুটবল মরশুম দীর্ঘদিন বাদে বেশ জমে উঠবে আশা করা চলতে পারে। কারণ বড় বড় দলগুলির সঙ্গে ভুল্লন খেলোয়াড়-পুষ্টি দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

তরুণ খেলোয়াড়পুষ্টি বালী প্রতিভা ও ইন্টারজাশানাল দল দুটি লীগ কোঠার সর্বনিম্নে আছে। এই দলগুলির শক্তি কম হলেও বড় বড় দলগুলিকে এদের বাছ থেকে পরেট নিতে বেশ ঝগপেতে হচ্ছে। ১ই জুন পর্যন্ত কোন দলের ছান লীগ কোঠার কোথায়, তা নিয়ে দেওয়া হইল।

| | খে: | জ: | ড: | পর: | প: | বি: | পয়েন্ট |
|-------------------|-----|----|----|-----|----|-----|---------|
| মোহনবাগান | ১০ | ৮ | ২ | ০ | ১৩ | ১ | ১৮ |
| ইষ্টবেঙ্গল | ১০ | ৭ | ২ | ১ | ১৮ | ৭ | ১৬ |
| ইষ্টার্ন রেলওয়ে | ৮ | ৬ | ১ | ১ | ১৩ | ৪ | ১৩ |
| মহা: স্পোর্টিং | ৭ | ৬ | ০ | ১ | ১৬ | ২ | ১২ |
| বি. এন. আর | ১ | ৫ | ১ | ৩ | ১৩ | ১৩ | ১১ |
| হাওড়া ইউনিয়ন | ৭ | ৩ | ২ | ২ | ৭ | ৫ | ৮ |
| রাজস্থান | ১ | ৩ | ২ | ৪ | ১০ | ১৩ | ৮ |
| ওয়াড়ী | ৮ | ৩ | ১ | ৪ | ৭ | ৭ | ৭ |
| খিরিপুর | ১০ | ২ | ৩ | ৫ | ৫ | ৮ | ৭ |
| স্পোর্টিং ইউনিয়ন | ৮ | ৩ | ১ | ৪ | ৬ | ১০ | ৭ |
| এসিয়ান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ২ | ৭ | ৭ |
| জয় টেলিগ্রাফ | ৮ | ১ | ২ | ৫ | ৪ | ৮ | ৪ |
| পুর্নিশ | ৬ | ০ | ২ | ৪ | ১ | ১ | ২ |
| বালী প্রতিভা | ৭ | ০ | ২ | ৫ | ৩ | ১২ | ২ |
| ইন্টারজাশানাল | ৮ | ০ | ২ | ৬ | ১ | ১৩ | ২ |

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভা বঙ্গোপশিলা-এর শৈলাবাসে। দুদিনের অধিবেশনে বর্ষকর্তা নির্বাচনের শরৎ ছাড়াও ১১৬০ সাল থেকে ভারতীয় রেল দলকে সার্ভিসেস টিমের অল্পতপ মর্যাদা দান করেছে আর 'কেমাল ট্রফি' ও 'নিজাম গোল্ড' কাপের খেলোকে প্রথম শ্রেণীর খেলা বলে মর্যাদা দান করেছেন। জুয়াগু বোতাস, আই, এফ, এ, সীড প্রমুখ খেলোক্তির সময় নির্দেশ করে দিয়েছেন এ ছাড়াও জাতীয় প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক বিভাগের পুনর্বিভাগ ও নানা উপসমিতি গঠিত হয়েছে কিন্তু এবারকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাদ দিয়েছে এ আলোচনার আসর থেকে। সেটা হল একই ব্যক্তি বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনস্বায়ং স্বাধীন হয়ে থাকতে পারবেন কি না। আলোচনা না হওয়ার কারণ কিছু জানা যায়নি। শৈলাবাসে বোধ হয় ঘামাচাপা বা বরফ চাপা পড়েছে ব্যাপারটির উপরে।

বাইটন কাপ

এবারকার বাইটন কাপের ফাইনালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দু'টি দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গিয়েছে। ষোণ্যতর দল হিসেবে বিরকির কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দল ফাইনালে ইণ্ডিয়ান আর্মি টিমকে ২-১ গোলে হারিয়ে এবারকার বাইটন কাপ লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দল গতবারে বাইটন কাপের খেলার বার্ষিক কাপ লাভ করেছিল।

এবারকার বাইটন কাপের খেলা ঠিক মত জমে উঠতে পারেনি। তার কারণ কয়েকটি শক্তিশালী দলের খেলার অংশ গ্রহণ না করা। হাই হোক্, এবারকার খেলার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ভারতের সফরকারী ক্রিকেট দলের প্রথম টেষ্টের আলোচনা করব।

কিরকির ইঞ্জিনিয়ারিং দলটি সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত। এবার এরা চতুর্থ রাউন্ড খেলার সুযোগ লাভ করে। চতুর্থ রাউন্ডে পাঞ্জাব পোস্টসকে ১-০ গোলে, কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের বাইটন কাপবিজয়ী মোহনবাগান দলকে ৩-০ গোলে এবং সেমিফাইনালে কাঠমন্ডু দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। গতবারের মাত্র ৬জন নামকরা খেলোয়াড় ছাড়া তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং দলের এ অসাধারণ প্রদর্শনীয়। অন্যদিকে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার বার্ষিক শক্তিশালী আর্মি দল ফাইনালে মোটেই আশাশ্রয় খেলতে পারেনি। এবারকার তালিকার মোট ৪১টি দলের নাম ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক খাতনামা দল অংশ গ্রহণ করেনি।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড সফরকারী ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দলটিকে নানান সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইংলণ্ডের দুঃস্বপ্ন ক্রিকেট সমালোচকেরা নানান মতামত প্রকাশ করছেন, তা দৈনিক সাবাধপত্র মারকং পার্কমাত্রই সবিশেষ অবগত আছেন। এই দলটির বিশেষ সফরকালীন সময় ভারতের নানান পত্র-পত্রিকার সমালোচনা হয়েছিল।

কয়েকটি কাউন্টি খেলায় ভারতীয় দল বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছে। কাউন্টি খেলাগুলির বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, তাই এবার প্রথম টেস্টের আলোচনা করব।

প্রথম টেস্ট—নিউহামের টেস্টগ্রীভ মাঠে ৪ঠা জুন থেকে প্রথম টেস্ট মাঠের খেলা শুরু হয়। নির্দিষ্ট দিনের একদিন পূর্বেই এ খেলার সমাপ্তি ঘটে। এই খেলার ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৫১ রানে পরাজয় বরণ করে।

এবারকার টেস্ট ইংলণ্ড দলে প্রভুত খেলোয়াড়ের যতবল হয়। তরুণ খেলোয়াড়দের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ দান করে ইংলণ্ড দল আশাচ্যুর ফল লাভ করেছে। যেইলী, লেকার, গ্রেভেনী, লক, টাইসন প্রভৃতি ইংলণ্ডের দুঃস্বপ্ন খেলোয়াড়রা এবারকার টেস্ট খেলার নির্দোষিত হননি। এঁদের পরিবর্তে যে সমস্ত তরুণ খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উষ্টারশায়ারের অফ ব্রেক বোলার মার্টিন হটন, ল্যাঙ্কাশায়ারের টমি গ্রীন হফ এবং ইর্কশায়ারের গুপেনিং ব্যাটসম্যান কেন টেলরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাউন্টি বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংলণ্ডের নির্দোষিতমণ্ডলী মিডিল সেক্সের পেস বোলার এ্যালান মসকে দলভুক্ত করেছেন। ইংলণ্ড দলের এই যতবল আগামী 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' দলের বিরুদ্ধে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা বলে ধরা যেতে পারে। অপর পক্ষে ভারতীয় সকলেই তরুণ খেলোয়াড়।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে 'টপে' জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান। কিন্তু স্রুতই ইংলণ্ড দলের ব্যাটিং-বিপর্যয় ঘটে। মাত্র ৬০ রানের মাধ্যমে ইংলণ্ড দলের টেলর, মিন্টন ও কাউন্টি তিনটি দুগ্ধাবান উইকেট হারায়। এর পর অধিনায়ক মে, ব্যারিটন ও হটন দলের পতন রোধ করেন। অধিনায়ক পিটার মের সেফুরী প্রথম দিনের খেলার সর্বাঙ্গিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিটার মে সেফুরী করার কিছু পরেই আউট হয়ে গেলে গজরু ইভাল বোগদান করেন। বেশরোজা ভাবে গিটিয়ে খেলে ৪২ মি: ৫০ রান তোলেন। এর পর ৭৩ রানের মাধ্যমে নানকার্ণির বলে উল্লিগড়ের হাতে ক্যাচ তুলে বিলার গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে ইংলণ্ড দল ৬টি উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রান সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড দল ৪টি উইকেটের বিনিময়ে আরও ৬৪ রান সংগ্রহ করলে ৪২২ রানে ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হয়। এর পর ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামে। কিন্তু ভারতীয় দলের সূচনা খুব আশাশ্রয় হয়নি। ভারতীয় প্রথম দুই রায় ও কলকটর উইকেটে ১০০ মিনিট টিকে খেলে মাত্র ৩৪ রান সংগ্রহ করেন। কলকটরের ব্যক্তিগত ১৫ রানের মাধ্যমে

আউট হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে ভারতীয় দল তিন উইকেটের বিনিময়ে ১১৬ রান সংগ্রহ করে। এর মধ্যে পঙ্কজ রায়ের ৫৪ রান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঙ্কজ রায় বখেট বৈধ্য সহকারে ও সতর্কতার সঙ্গে খেলে ৫৪ রান সংগ্রহ করেন। প্রথম টেস্টে পঙ্কজ রায়ই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি নিজের উপর বখেট আস্থা রেখে ভাল খেলেছেন।

তৃতীয় দিনে টুয়ান, মস আর ষ্টাথামের মারাত্মক বোলিং-এ ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিপর্যয় হয়ে পড়েন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক গাইকোয়াড় এই বিপর্যয়ের মুখে বৈধ্য সহকারে উইকেটে টিকে থাকতে চেষ্টা করেন। তিনি ২ মি: ৩৩ মি: কাল উইকেটে টিকে থেকে ৩৩ রান সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ভারতীয় অন্ততম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান চাই বোরদে টুয়ানের চাম্পায় বলে হক করতে গিয়ে হাতে আঘাত পাওয়ার অবসর গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল ২১৬ রানে পিছিয়ে থেকে 'ফলো অন' করতে বাধ্য হন। দিনের শেষে তিনটি দুগ্ধাবান উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৬ রান সংগ্রহ হয়। তদন্তে রায়ের ৪১ রান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, পঙ্কজ রায় টেস্ট ক্রিকেটে দু'হাজার রান করার পৌরব অর্জন করলেন।

একদিন বিরতির পর ৪র্থ দিনের খেলা শুরু হোল। এই দিন ষ্টাথাম মারাত্মক মারমুর্তি ধারণ করলেন। মাত্র ৩১ রানের বিনিময়ে ভারতীয় দলের ৫টি উইকেট লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত ৬১ রান বোগ করে ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ হয়। হাতে আঘাত পাওয়ার দরুণ বোরদে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার অংশ গ্রহণ করেন নি। ১৫৭ রানে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি হয়।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস—৪২২—(পিটার মে ১০৬, ইভাল ৭০, হটন ৫৮ ব্যারিটন ৫৬, গুপ্তে ১০২ রানে ৪ উইকেটে নানকার্ণি ৪৮ রানে ২ উইকেটে)।

ভারত ১ম ইনিংস—২০৬, (পি, রায় ৫৪, গাইকোয়াড় ৩৩, উল্লিগড় ২১, বোশী ২১, টুয়ান ৪৫ রানে ৪ উইকেট, মস ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ভারত—২য় ইনিংস—১৫৭, (পি রায় ৪১, মজেরকার ৪৪, গাইকোয়াড় ৩১, ষ্টাথাম ৩১ রানে ৫ উইকেট টুয়ান ৪৪ রানে ২ উইকেট)।

(এক ইনিংস ও ৫১ রানে বিজয়ী)



ক্যালকাটা অ্যাপার্টিক্যাল স্টো (প্রাইভেট) লিঃ

ফোন-৩৫-১১১, প্রতাপ: অ: সার্কিট স্ট্র: কল: অ: বি: ১৫
প্রশ্ন-কল: অ: বি: ৪৫ নং সার্কিট স্ট্র: কল: অ: বি: ১৫

বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো কঠিন ব্যাপিতে আক্রান্ত হলে দেহটার সঙ্গে মনের অবস্থাও এমন হয় যে, মনে হয় না দেহটা আবার সুস্থ-সবল হবে, বেন ভাবতেই পারা যায় না সুস্থসেহের আশ্রমটা ঠিক কি রকম। কিন্তু ব্যাধি সাধে, আবার সুস্থসেহের আশ্রম ফিরে আসে, —আর তখন আবার বেন ভাবতেই পারা যায় না ব্যাধিগ্রস্ত দেহের অবস্থাটা ঠিক কেমন লাগতো।

টিক তেমনি,—দেড় মাস বয়স, অগমান, নির্জন কারাবাস ভোগের পর অন্তরীণের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার খোলা হওয়ার বেরিয়েই একখাটা ভুলতে বেশী দেবী হল না যে, ঐ দেড় মাস কী গভীর অন্ধকার আমার সমগ্র অন্তর বাহির জুড়ে জগদলের মতন চেপে ছিল,—ভবিষ্যতের আশা-আবক্ষা-বন্ধনা ঘুরে থাকে, চিন্তাও খেই খুঁজে পেতুম না।

অন্তরীণে এসে অঙ্গদিনের মধ্যেই মনটা আবার ঢালা হয়ে উঠলো —আগের ধারার চিন্তা শুরু হল। মনে হল বিপ্লব প্রচেষ্টার এক অঙ্গ শেষ হয়েছে প্রথম বার্ষিকায়,—এখনও স্বনিকাশপাতের অনেক দেবী,—নতুন অঙ্গে নতুন সাজে আবার বিপ্লবের শুভপূর্বসূচনার উদ্বোধন হবে,—কবে, কেমন করে, জানি না—কিন্তু হবেই—তার জন্তে বেন প্রস্তুত থাকতে পারি।

অবস্থাটা ছিল অসুস্থ হৃদিক থেকে। দাবোগা আনন্দমোহন মিত্রের দ্বীপ জনস্ব বা ঐ রকম কি একটা ব্রত,—খানাটা শান্তিপুত্রের এক সীমানার ধারে,—হাতের কাছে ব্রাক্স নেই, আমি রোজ সকাল ১টা হাজিরা দিতে বাই—সুতরাং আমিই হলুম ব্রাক্স,—সারা বৈশাখ মাস ডাব, সন্দেশ, পৈতে ও পুসি প্রভৃতি পেলাম,—শেষ দিনে বোধ হয় একখানা কাপড়ও। অত্যন্ত নিরীহ তবু এক ব্রাক্স সন্তানকে গোয়েন্দা বিভাগের শয়তানগুলো যে মিহিমিহি কটী দিচ্ছে,—ভয়মহিলায় এ বিষয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সন্দেহ ছিল না। যারের জাত তো।

ব্রজত সাধারণ লোকের ধারণাও সাধারণত এই রকমই। কিন্তু যারা কিছুটা ওয়াকিবহাল, তারা আমাদের সুদীর্ঘ—কনাইলালেরই সগোত্র মনে করে প্রজ্ঞা করতো, ভালবাসতো,—আমি সত্যি কতটুকু, সে খোঁজে তাদের কোন গরজ ছিল না। বিশেষত শান্তিপুত্র বিপ্লব আন্দোলনের ঐতিহ্যেও দরিদ্র ছিল না। “যুগান্তর” পত্রিকা এবং আলিপুর বোমার মাথলা

সম্পর্কে যে কার্তিক দত্ত ছিলেন এক বিখ্যাত কর্মী, তিনি এই শান্তিপুত্রেরই ছেলে। ১১-৭ সালে যুবাবিরূপে বোমার আজ্ঞা খুলে যখন বারীন বোব, উপেন বানার্জি প্রভৃতি যুগান্তর পত্রিকার কাজ ছাড়েন, তখন থেকে “যুগান্তর” পরিচালনের ভার পড়ে তারানাথ বারচৌধুরী (সিনিয়র—বসুহতীর ভ্রাতৃপুত্র ম্যানেজার জুনিয়র তারানাথ নয়), নিখিল দাস (মৌলিক, কিরণ মুখার্জি এবং কার্তিক দত্তের উপর)। আলিপুর বোমার অন্ততম আগামী ছিলেন এই শান্তিপুত্রের কার্তিক দত্ত। তুগলি জেলার বিখ্যাত গ্রামে এক ডাকতি হয় এবং সেই মামলার কার্তিক দত্ত সাজা পান। শান্তিপুত্রের পাশে বাঘ-আঁড়ো গ্রামের নিরাপদ রাস্তার কথাতো আগেই বলেছি। তাঁর বোমার মামলার ১০ বছর বীপান্তর সাজা হয়েছিল।

সুতরাং বোমালুম আগের মতন ছেলে রিক্ট করা হান্দা আবার দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্তরীণে পাঠাবার সময় গোয়েন্দা অফিসাররা ঠাট্টা করতো,—“বান,—সরকারী ধরচে আবার হল গড়ন গিয়ে।” আমরায়ও বলতুম, “আমরা ধরবট করলে তো ইলিশিয়াম যো-তে ঘুঘু চাবে!”

বাই হোক, আমাদের সময়েই হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্টও ডিফেন্স অ্যাটে আটক হয়েছিলেন। কলে কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁকে সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়, এবং তাঁর অবর্তমানে সরোজিনী নাইডু অধিবেশনে নেত্রীত্ব করেন।

মহাত্মা গান্ধীও ঐ সময়েই ভারতে আসেন এবং চম্পারনে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সত্যাগ্রহ সঙ্গ্রাম সংগঠন করেন। ‘২০ সালে কিছু শাসন সংস্কার দিয়ে ভারতবাসীকে একটু ঠাণ্ডা করার পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সচিব মণ্টেও ভারত পরিদর্শনে আসেন, এবং কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ তাঁর হাতে এক সম্মিলিত দাবী-পত্র পেশ করেন। আমাদের দলে পড়তো—“আবেদন আর নিবেদনের খালা বহে বহে নতদ্বির।”

জেলে তখন রাজবন্দীরা সহনাতীত অবস্থার মধ্যে সঙ্গ্রাম করতেন। কারাবাসের অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার সশোণনের জন্তে, প্রবানত হাজার ঠাইক করে। কুপেলকুমার দত্তের ৭৮ দিনব্যাপী হাজার ঠাইক এবং জোর করে খাওয়ারামের বিরুদ্ধে দলভাষ্যক্তি একটা ইতিহাস রচনা করেছে।

বাই হোক,—বহু তিনেক অন্তরীণ থেকে ১৯১৯ সালে

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

ধমে কিরে এলুম। কেবলুম, পাড়ার সকলেই কিরেছে।
দি আগে থেকেই মনে মনে তাঁজছেন এইবার একটা বিরে
তে পারলেই এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

একদিন সকালে হঠাৎ দিবি বলছেন, ভামাটা পায়ে দিবে
কিবার ওপরে বা। আমার সঙ্গেই হয়েছ, বললুম কেন?

দিবি বললেন, দেখতে এসেছ। আমি বাবো না বলাতে দিবি
ংপে পড়ে জোড়হাত করে বললেন, একবার দখা করে মানটা
টাও, আর এ শুখরি করবো না। একটু ভেবে নিয়ে গেলুম।

দেখি দুজন ভুললোক এসেছেন। নাম জিজ্ঞাসা করার পর
ললেন, কাজকর্ম কিছু কর? আমি—না ঠিক করেছি, ব্যবসা
নয়বা।

ব্যবসায় কিছু জান? আর মূলধন কত, কিসের ব্যবসা?

ব্যবসা, করতে করতেই শিখবো, কিসের ব্যবসা করবো, তা
খনো ঠিক করিনি। আর মূলধন সংগ্রহ করতে পারবো এই
টাঁ বেচে।

ভুললোকদের চকু চকুগাছ। ছোটটি ভাল, আর কলকাতায়
টাঁ—এই দুটি খুঁটির ওপর তাঁরা ভর করেছিলেন। এখন আমার
খা তুলে ত্যাগাচাচা খেয়ে দুজনে মুখ চাওয়া-চাওরি করে আঙুলে
পাশে সবে পড়লেন। আমিও বীরবর্ষে দিকিকে শাসিয়ে নিলুম
পর এমন কাজ করলে আমি বাড়া ছেড়ে পালাবো। দিবি একা-
কা আঁখি বটা ধরে গজর গজর করে ঠাণ্ডা হলেন।

তখন সারা দেশে একটা ধ্বংসে ভাব—কোথাও কোনো
পান্ডোলন নেই। শুধু মৌলবী লিয়াকত হোসেন রোজ বিকলে
কদল ছুলের ছেলের প্রোসেশন নিয়ে বাস্তব বাস্তব গুরে poor
students fund-এর টাকা ভুলে বেড়ান। ছেলের দল বদশৈ গান
ধরে চলে, ২৪ জন বাস্তব লোকও পেছন পেছন চলে। পথে
কাজা খানা পেলে প্রোসেশন। সেখানেও ঢেকে এবং বলে মাতরম্
নি দেয়। মৌলবী সাহেব খানার অফিসারদের কাছে থেকেও
হুজু টাকা না নিয়ে হটেন না—বলেন, “ইস কাণ্ডে তুমলোক কেঁও
বহি টাকা দেগা? ইয়ে কুজ বোখওয়াবি ছায়?” পুলিশ অফিসার
াভাতাড়ি কিছু দিয়ে রেহাই পান। ভর্ক করলে, ছেলের দল
লে মাতরম্ খনি দিয়ে হাবিয়ে দেয়।

মেছুয়া বাজারের বাস্তব মার্কাস খোতারের সামনে একাও একটা
পতলা ব্যাংক টায়র এক খুশরীতে ছিল তাঁর আভানা।
জোটাতে ২৩ মো গরীব হুসলমানের বাস ছিল। নিঃস্বপ্ন
রীর ছাত্রেরা হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে তাঁর কাছে সাহায্য
পত। বৃত্তাকাল পর্যন্ত তিনি এই কাজ নিয়েই ছিলেন।
ই একজন দরিদ্র একনিষ্ঠ বদশৈ নেতা, শূন্যে বাঁড়িয়ে—
ধিনি পালের মতই বাক আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর
হুইই আন্তরিক প্রাধা করতো। তিনি ছিলেন বেশরোয়
শটগুণ্ডা।

বাহাজ্রাহকর বক্তৃতা দিয়ে তিনি অ ক বার জেল খেটেছিলেন।
যে মহাবুজর সময়ে যখন এখানে মডারেট নেতারা এবং
প্রতিকার গান্ধী সরকারকে রিজুটিয়ে সাহায্য করছিলেন, তখন
ক বিরোধী সভায় এক বক্তৃতার মৌলবী সাহেব বলেছিলেন,
। ইংরেজের পক্ষে লড়াইয়ে যাবে, সে “বাপকা পুত রেহি—হুজ কা

হুজ।” (অর্থাৎ তাঁর জন্ম বাপের বীর্য থেকে নয়, প্রভাব থেকে
এই বক্তৃতার কলে তাঁর হু’ বহুর সঙ্গম কারাগার হয়। জেল
বেরিয়ে তিনি ঐ “বদশৈ” কাজে আত্মনিয়োগ করেন—ডিক।
টাকা তুলে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করা।

রোজ বিকলে বেড়াতে বেরিয়ে আমি মৌলবী সাহেব
মিছিলের পিছনে চলতুম। মৌলবী সাহেব থাকতেন সামনে,
কিন্তু তাঁর নজর থাকতো সব দিকে, এবং অনুবর্ত্ত প্রয়োজনমত
নির্দেশ দিতেন। কয়েক দিন তিনি আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন।
একদিন হঠাৎ আমাকে ধরে বলেন,—“এই—তুমি সিখাইটি ছার?
পিছে পিছে কেঁও চলতা?—বাও—সামনে বাও।” আমি
অপ্রতিভ হয়ে সামনের সারিতে গেলুম, এবং ছেলের দলের সঙ্গে
বলে মাতরম্ খনি দিয়ে রেহাই গেলুম। এই ছিল তাঁর কাজের
ধারা।

সকল বিষয় জানবার বোখাবার আগ্রহ তখন অসীম। যবিবারে
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যেতুম—প্রাথমিক বক্তৃতাও ধর্ম ও সমাজ
সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা বড় ভাল লাগতো। বিশেষ
ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম আচার্য ভাস্কর প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বক্তৃতা।
শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর হারিসন রোডের বাড়ীতে হানা দিয়ে
আলাপ করলুম। তিনি “হুজজিজাস” পড়তে মিলেন। হিন্দু
গৌতলিকতার আধুনিক ধর্মব্যবস্থার অন্ত্র অদ্বুত তথ্য ও
কেলেক্টারীতে বইটা ঠাণ্ডা। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা
সম্পর্কিত আরো কয়েকখানা বইও পড়লুম। শেষ পর্যন্ত আমাকে
এক ছুনিয়ার আচার্য দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতে ভিড়িয়ে দেওয়া হল।
তিনি আমাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে
দিলেন। আমিও বাওয়া বন্ধ করলুম।

করালীর সঙ্গে আমার তখন ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। তারা
ছিল শান্ত—এবং তার বাবা ছিলেন একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত ও
সাধক। আমি করালীর কাছে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে ওকালতী
করে হিন্দু, শান্ত, তান্ত্রিক-ধর্ম ব্যাখ্যাও তুলতুম এবং তাদের
যুক্তিগুলো ব্রাহ্ম আচার্যের কাছেও হাজির করতুম। মজা হত
এই যে, এই দুই পক্ষের সমস্ত যুক্তির মধ্যে নিজ নিজ স্বপক্ষের
যুক্তির চেয়ে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোই হ’ত জোঝালা,
—আর আমার মনে দুই পক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোই বীরে বীরে
শেকড় গাড়াছিল।

সঙ্গ সঙ্গে একটা কথা মনকে অবিকার করছিল,—এই সব
তথাকথিত আধ্যাত্মিক, পারত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাপারগুলো আমার
জীবনদর্শনের বাস্তব ইহলৌকিক দাবী,—দেশের দুর্দশা, পরাধীনতার
বিড়ম্বনা, স্বাধীনতার আদর্শ, বিপ্লব প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক ও
অর্থনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতির পক্ষে একেবারে অবাস্তব। ফলত, ছুনিয়ার
সর্বপ্রকার আধুনিক ধর্মের সবচেয়ে সর্বপ্রকার মোহ মন থেকে
একেবারে মুছে গেল। মনটা যেন একটা ব্যাবিহীন হয়ে পরম
সত্ত্বায়ে গেয়ে উঠলো,—“দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ।”

নিজেকে তৈরী হতে হবে—অল্প বাটতি পূরণ করতে হবে।
বর্তমানে সর্বপ্রধান কাজ লেখাপড়া। অবকাশযোজনী নাটক-নটেল
ময়,—“দীপ” প্রবন্ধ—বই এবং মাসিকপত্র। বক্তৃত, লোকে থাকে

সাধারণত নীরস বলে, সে সব বিবয়ের মধ্যেই আমি সবচেয়ে রস খুঁজে পেতুম। একটা নতুন কথা বুঝলে, নতুন কিছু শিখলে পড়া সার্থক মনে হত, আনন্দ পেতুম।

লেখাও অভ্যাস করা দরকার,—ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে। ১৯১৩/১৪ সালে লাইব্রেরীর সলিষ্ট ডিবেটিং স্লাবে আমি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে একজন উৎসাহী সভ্য, বাংলা প্রবন্ধ লেখক বা সমালোচনা লেখক। তার পর ‘অঞ্জলি’ নামে হাতে-লেখা মাসিক বেরুলো—তাতেও লিখতুম। সে কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯ সালে আবার কাগজ বেরুলো—নাম ‘প্রাঞ্জলি’—এবার সম্পাদক করা হল আমাকে—দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে যে ঠিক সময়মত কাগজ বেরোবেই,—এটা সকলেই বুঝতো। কিন্তু সময়মত লেখা আদায় করা শক্ত—কাজেই একটা প্রবন্ধ, একটা কবিতা,—কিছু ‘ধব’ এবং কিছু ‘চাটনী’—আমাকেই লিখতে হত।

লাইব্রেরীর অ্যানিভারসারী এল। অভিনয়ের জন্তে নবীন সেনের ‘বৈবর্তক’ এবং ‘প্রতান’ থেকে কয়েকটা ‘সিন’ নিয়ে ‘অভিলাপ’ নামে এক নাটক খাড়া করে অভিনয় করলুম। মহাত্মার তত্ত্ব রাজনীতি—কত্ৰিয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বাসা-বাহুরিকির বড়লক্ষ্য। আমি দুর্বাসা, এবং বহুরালা নন্দলা’ বাহুরিকি। নর্থ সুবায়ান কুলের চিবগজীর হেডমাষ্টার আমার সঙ্গে আলোপ ও অভিনয় করলেন। কিছু দু’দিন পরে এক I B officerও বই-এর সন্ধান এলেন। বৈবর্তক-প্রভাসের নাম করে তাঁকে হাকিয়ে দিলুম।

উক্তিমাধো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলো বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। রুশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়েছে—নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠাচারতন্ত্রী জাতির শাসনের উচ্ছেদ করে বিপ্লবী বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহাত্মার অবসানের (নভেম্বর ১৯১৮) পর সেভার্স সন্ধিতে বিজয়ী বুটেন-শ্রাফ তুরস্কের রাজ্য ভাগাভাগি করে গ্রাস করে নিয়ে মুসলমানকে ক্ষুদ্র এশিয় অংশটুকুতে কোণঠাসা করেছে। কিন্তু নবীন তুর্কীমল্লের নেতা কামাল পাশা বিজ্ঞোহ করে সেভার্স চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন—রুশিয়ার বলশেভিকরা তাঁকে মরণ দিচ্ছে।

বৃহৎ আংগ ভারতে সৈন্ত সংগ্রহের সময় বুটেন সরকার ভারতের মুসলমানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তুরস্কের মুসলমানের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করা হবে না—কারণ মুসলমানরা তাদের ধর্মগুরু খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু এখন সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খলিফার হাড়ির হাল করাতে ভারতীয় মুসলমানেরা কেপে গেল—মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রভৃতি বেকুঁষে তারা বিলাফৎ আন্দোলনে সংযুক্ত হতে লাগলো—একটা বিজ্ঞোহর স্বভাব আসর হয়ে উঠলো।

আর এক দিকে,—ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদের জন্তে সরকার এক বহেচ্ছাচারী বে-আইনী আইন—(রোলট আইন) পাণ্ড করে পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে সর্বসাধারণের অসন্তোষ জাগিয়ে তুললো।

কলে একদিকে কলকাতার টাইম হলে ব্যামকেশ চক্রবর্তী ও সি আর দাশের নেতৃত্বে এক বিরাট সভা করে প্রতিবাদ করা হল,—এবং অনেক দিন পরে যেন বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নব জীবনের সঞ্চার হল—জয় কেটে গেল—উত্তেজনা বাড়তে লাগলো।

আর এক দিকে হল এক বিরাট ব্যাপার। মহাত্মা গান্ধী রোলট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্তে ‘১১ সালের ৬ই এপ্রিল সারা ভারত জোড়া হরতাল সংগঠিত করলেন। এই উপলক্ষে বিপ্লবী পাঞ্জাবের বিপ্লবাকাজা কেটে পড়লো—অনুতসরে—এবং দিল্লীতেও—জনগণ সরকারী ভবন, ব্যাংক, রেলস্টেশন প্রভৃতি আক্রমণ করে ডেকে পুড়িয়ে একাকার করলো। সরকারও হার শুরু করলো বেরোয়া। অনুতসরে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা পর্যন্ত হয়েছিল।

১৬ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সরকারের নির্দিষ্টর অভ্যুত্থারের প্রতিবাদে সভা হল, এবং জেনারেল ডায়ার সেখানে যেদিনপান চালিয়ে ১২০০ লোককে হত্যা করলেন। তারপর চললো মার্শাল ল’র অভ্যুত্থার। কলকাতা জনগণের অসন্তোষ হয়ে উঠলো প্রায় সার্বজনীন। উপায় কি?

মার্শাল ল’র আমলে এক এক গাঁ তত্ত্ব লোককে বাড়ার বার করে পুতুগলোকে বুকে হাঁটানো হচ্ছিল। অসংখ্য লোককে প্রকাজ হানে খোঁটার বেঁধে বেত মারা হচ্ছিল। নেতাদের সামরিক বিচারের প্রেহসন করে নও দেওয়া হচ্ছিল বাবজীবন বীপাত্তর। তার মধ্যে সত্যপাল কিচলুর সঙ্গে সরলা দেবীর স্বামী পণ্ডিত রামকৃষ্ণ দত্ত-চৌধুরীও ছিলেন।

এই অভ্যুত্থারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে এক চিঠি লিখে সার উপাধি বর্জন করেন। তাতে তিনি লেখেন, ভারতবাসীর অসহায় অবস্থা পাঞ্জাবে বেরকম নরভায়ে ফুটে উঠেছে—তাতে সরকারী খেতাবে কৃত্রিম হয়ে চূপ করে বসে থাকার লক্ষ্য সহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব—আমিও এই লাহিত অসহায় ভারতবাসীদেরই একজন,—এবং আমার স্থান তাদের পাশেই।

তার ভাষাটা ঠিক মনে নেই—কিন্তু তার মর্মকথা ওই। সারা ভারত ধস্তাধস্ত করে উঠলো। নতুন যুগে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জনগণের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। পরবর্তী কালে হিজলী বন্দী নিবাসে সরকারী গুলী চালাবার প্রতিবাদে সভারও রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব করেছিলেন।

কিন্তু আমার কিছু একটা করতে হবে তো। বসে খেলে তো চলবে না, কিছু যোগসারের ব্যবস্থা দরকার। চাকরীর চেষ্টা বুঝা—কয়েকটা টাকার বিনিময়ে সমস্ত সময়, শক্তি, সম্মান খুঁয়ে ‘যেমন তেমন চাকরী খিঁজাত’ বলে মাথুলী সংসার ধরুর বাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া পোষাবে না। স্তব্ধতা ব্যবসায় কিছু করতে হবে, এবং তার জন্তে বাড়ী বিক্রিও করতেই হবে।

যন স্থির করে বাড়ী বেচে কেললুম,—এবং কোটের inside পকেটে নগদ ১৮৫০০ টাকা নিয়ে হেঁটে কাশীপুর সাবরেজেন্সী অফিস থেকে বাগবাজারে এসে ট্রামে জ্যালহাউসী কোয়ারে টাটা ব্যাংক পুলিশের কাছে এসে ব্যাংক টাকা জমা দিলুম। সে ১৯২০ সালের কথা,—তখন টাটা এবং কার্পানী ব্যাংক নতুন হয়েছে, এবং পুলিশ আলাহাবাদ ব্যাংক থেকে টাটা ব্যাংক Passing officer হয়ে এসেছে।

পুলিশ অফিসে বসে অতি সতর্পণে কিছু কিছু share কেনাবেচা করতো। সে পরামর্শ দিলে,—আমি যদি share marketএ বাতারাতি করি এবং তাকে information এনে দিই,

ভাষে হু'জনে-মিলে কিছু ব্যবসা করা বেতে পারে। ভবনস্বারে তার সঙ্গে কিছু দিন অন্তর shareএর ব্যবসা করলুম, এবং লাভ লোকসান হেরফের করে টারে টারে টাকা বজার রেখে ভরবই পরামর্শে ছোট পড়লুম।

লোকে বলে, বাতী গেলে আবার বাতী হওয়া শক্ত। মাথা মৌজার ঠাই থাকা চাই। হুতরা বরাহনগর কুঠিবাটার কাছে এক র'তী এবং শি'খিতে সাতপুতুরের বাগানের পিছনে কিছু জমি কিনলুম। বাতী টাকার কিছু ছোট পোকারদারী ব্যবসা করাই দ্বিধ করলুম। পরস্য নষ্ট করে ব্যবসা শিখতে হবে,—হুতরা রিল-দরাজী চলবে না। ভেবে গিয়ে প্রামাণ্যে প্রথম মন্ত্রকের রক্তে বাতীর ওপর একখানা ঘর খালি পেয়ে তাকী করে ফেললুম। ভবনও টাকার খাতি।

বরাহনগরের বাতী ঘোষাঘর করে নিলামে কিছু কার্ণিটার কিনে ঘর সাজিয়ে তুললি। নিলামে বাওরার সেধা হয়েচে,—কিছু ঘরের কিছু দাল না বেচে কেনেতে পারলে আর কিছু কেনা চলে না—এই হয়েছিল অবস্থা।

শান্তিপুত্রের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কারিগর তাঁতীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তার পরামর্শ গিয়েছিল শান্তিপুত্রের কাপড়ের ব্যবসা করার। প্রথমে ঠিক করলুম তাই করবো। কয়েকশো টাকা র'মী হুজি, শাড়ী এবং চানরও কিনে ফেললুম। কিন্তু কাপড়গুলো ছুঁলে জুয়াড়ের কাঁক করে দিলে।

একদিন বাতীর এক বেকার জ্বলোক সাহায্য তিকা চাইলে,—ছেলে মেয়ে নিয়ে অনাহার চলছে। একটি সিকি গিয়ে নাম-ঠিকানা জেনে নিলুম এবং দু-একদিন পরে আমার ঠিকানায় দেখা করতে বলে দিলুম। তার ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখলুম—পাকপাড়ার এক বস্তির একটা খোলার বাড়ীর ডাড়াটে—বা বা বলেছিল সব সত্যিই।

হুতরা হুগিন পরে সে বখন আমার কাছে এল,—একটা নতুন চামড়ার স্টকশ ভরে তাকে একগালা দামী কাপড় দিয়ে বলে দিলুম—বড় বড় বাড়ী দেখে ঘরে যদি বোজ একখানা কাপড়ও বেচে আসতে পারো, তাহলে এমন কমিশন দেব, যাতে তোমার চলে যায়। সে ভক্তির পরের ধূলা নিয়ে বিদায় হল।

কিন্তু সেই প্রথম দিন যে গেল, আর তার সেধা পেলুম না,—কোনো রকমেই ধরতে পারলুম না। তার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিই—তিনি সে করে দিন অন্তর এসে কিছু খরচপত্র দিয়েই আবার চলে যায়। মনকে প্রবোধ দিলুম,—ব্যবসার বাই হোক, কাজ তো কিছু হল।

বাঁকি কাপড়ের বেকীর ভাগ ধারে কিনলে টালার কপী মুখোয়র ছোট তাই পাগলা—আমাদের ছেলেবেলার একজন খেলার সাথী। বিকী ভো হল,—দামটা না হয় পেতে একটু দেবীই হবে। কিন্তু কিছুতেই একটা পরস্য আদায় করতে পারলুম না। হুতোর বলে কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললুম। ততদিনে ব্যবসার আর একটা মতুন নূর পেয়েছি। সে কথা পরে বলছি।

এদিকে কংগ্রেস থেকে একটা অসুস্থান কমিটি তৈরী হল, পান্ডায়ে সরকারী অত্যাচার সবচে ভয়ঙ্কর জন্মে। তাদের বিশপোঁও বেতলে। ১৯২০ সাল শেষ হয়ে আসছে। সেপ্টেম্বরে কলকাতার

কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হল। আমেরিকা থেকে সত্ৰ অত্যাগত লালো লাভপং হার হলেন সভাপতি।

কংগ্রেসের মূলপ্রস্তাব হল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ। উদ্ভেদ পান্ডাও বিলাফ সংক্রান্ত অত্যাচারের প্রতিকার। বিলাফ আন্দোলনে মূলমন্ত্রের পাছ হিংসার পথ অবলম্বন করে, তাই মহাত্মা গান্ধী তাদের কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিজ্ঞাতি দিয়ে গলে টেনে নিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত আন্দোলনে পরিণত করার ব্যবস্থা করলেন।

বাংলার মোতারা মূল-প্রস্তাবের সংোধনী প্রস্তাব করে বরাহনগর দাবীটাকে ছুড়ে ফেলে চাইলেন। কারণ স্বরাজ না হলে কোন অত্যাচারই স্বাধী প্রতিকার হবে না। গান্ধীজী এটা যেনে নিলেন।

প্রস্তাব অনুসারে মূল-কলেজ, আদালত বরকট করতে হবে, বিলাতী কাপড় বর্জন করতে হবে, জাতীয় বিতালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সালিশী আদালত করে দায়দার শিশুতির ব্যবস্থা করতে হবে, চরকার প্রচলন করে খন্দর উৎপাদন করে বস্ত্রস্বতন্ত্র সমাধান করতে হবে, হিন্দু-মুসলমান একা মূহুত করতে হবে।

মহাত্মা বললেন, এই কার্যক্রম একটা বছর রীতিমত ভাবে চালাতে পারলেই স্বরাজ হবে বাবে। কিন্তু তার জন্মে কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র তৈরী করে কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে এবং কংগ্রেসের আদর্শেরও পরিবর্তন (creed change) করতে হবে। স্থির হল এছোটো ব্যবস্থা ডিসেম্বরে নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে করা হবে।

একটা বড় আন্দোলন আসছে বোঝা গেল, কিন্তু স্বরাজ-মরাজ বাই হোক, স্বাধীনতা যে অহিংসপন্থায় হতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সরকারবিরোধী একটা দেশজোড়া লড়াই তো বটে। দেখা বাক—

আন্দামান থেকে সত্ৰ-প্রত্যাগত শচীন সায়াল ছিলেন কলকাতা কংগ্রেস ডেলাটিয়ারদের ক্যান্টেনে। মহারাজীয় ডেলিগেটরা ডেলাটিয়ারদের ঘেরেছিল, তিনি ধামাচ্ছে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর মাথারও তারা লাঠির বাড়ি ঘেরে মাথা কাটতে দিয়েছিল। ডেলাটিয়াররা পাণ্টা মার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের ধামানো হয়েছিল এই বলে যে, যদি মারতে হয়, তাহলে নাগপুর কংগ্রেসে গিয়ে মারবো।

তখন নববিধান ব্রাহ্মদশিরের পিছনে (মোহোবাকার ট্রীট) বোধ হয় পুলিশ দাস থাকতেন। শচীন বাবুও বোধ হয় সেইখানেই উঠেছিলেন। আমি ঠিকানা নিয়ে দেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এলুম।

২০ সালের আগস্ট মাসে নতুন শাসন সংস্কার (মস্টেড চেমসকোর্ড) ঘোষিত হয়েছে। বিপ্লবীরা হুজ হয়েছেন। বিপ্লবীদের ভরক থেকে লাভপং হারকে ইন্ডিয়ান ন্যাসোসিয়েশন হলে সম্বর্ধিত করা হল। সেই সভার বসন্ত যজ্ঞমন্ডার সর্বাগ্রথম বৌদিকে (হেমপ্রজা যজ্ঞমন্ডার) প্রকাত সভার হাজির করলেন বৌদি কিন্তু একগলা ঘোমটা দিয়েই বসে থাকলেন, কোলে শিশু, বোধ হয় স্ত্রীল। স্মরেন বোধ (মহু), নবশ চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হল।

আমি কংগ্রেসের ডিভিটের টিকিট কিনেছিলাম। দেখে মনে পড়ে বললেন, কেন? এই বৎস টাকাতাই তো ডেলিগেটের টিকিট পাওয়া যেত—চাইলেই দিত। এই ছিল ভখনকার কংগ্রেসের গঠনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা। যে কেহই ডেলিগেট হতে পারতো তুমি ডেলিগেটের নাম টিকানা খাতার লেখা থাকতো।

এই সময় জীবনও জেল থেকে মুক্ত হয়ে এল, টালার তার হামার বাড়ীতে উঠলো। ওদিকে হামার দেশের (নড়িয়া, কবিরপুর) লোকগোপাল ভট্টাচার্য (জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সম্পাদক, বোম্বে ট্রাইবিউনের অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষক, পবিত্র পোখারীর 'নৃতিকথা' গোপালনা) কলকাতার এসে এখানেই উঠেছেন প্রাণা আশ্রমে। আসার পরে কয়েকদিনের মধ্যেই কাশীপুরে দাদী হালসের ওষধিগৃহে টেলিফোন ক্রাফের কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন।

জীবনের দ্বাবন্ধ আপ্যন হল। নির্ভেজাল বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে বেশ ভাল লাগলো এবং হৃ-তার সিনেই বহু বৎস উঠলো। বিজ্ঞান ও কামিসরীবিজ্ঞান দিকে তাঁর ছিল অসাধারণ ঝোঁক, এবং প্রায়ে থেকেই বৈজ্ঞানিক ও কামিসরী সজ্জাত পুঁথিগ্রন্থের সাহায্যে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি হয়ে উঠছিলেন বেশ একজন ছোট খাটো বৈজ্ঞানিক ও বস্তুর। ঈশ্বরভক্ত বিশেষত বাক্তসংগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার ও নানা অদ্ভুত রীতিনীতিসম্বন্ধে তাঁর পূর্ববন্ধনের কলাকল সম্পর্কে তিনি 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধ লিখতেন,—এবং ছুদিনকণ সাহায্যে বড়ি মেয়ামতও করতেন।

আমি ব্যবসা করতেন নেমেছি,—পদক্ষেপ নেহাৎ কম হয়নি,—কিন্তু ফল এশবৎ হয়েছিল অগ্রগতির বলে দুঃখপাকমাত্র—তবে তিনি বললেন—কলকাতার বড়ির কাজ প্রচুর—বড়ি বড়ি মেয়ামতের দোকান করেন, আমি সকালে-বিকালে গিয়ে বসতে পারি।—আমিও কাজ করবো, আপনি শিখে নিতেও পারবেন। উদ্যোগের চোটে ভাই ছির করে ফেললুম।

নিলাম থেকে আলমারী-সেকেন্স কিনলুম, বাথবাজার থেকে, একসেট যন্ত্রও নিলুম। এক সাইন বোর্ড বানিয়ে ফেললুম, গোপাল বাবু পরামর্শ দিলেন, রং ও ভুলি কিনে দিলে তিনি সাইন বোর্ড লিখে দেবেন। সেই ব্যবস্থাই হল।

প্রথম দিন তাঁর সঙ্গে হাত লাগিয়ে বোর্ডটার জমি রং করা হল। পরদিন সকালে তিনি খড়ির দাগ দিয়ে নাম লিখে (নাম হল B. Narayan & Co.)—প্রথম অক্ষরটায় রং দিয়ে অকসেস চলে গেলেন—এক বিকালে এসে দেখলেন, আমি লেখা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি—নানাহার হয়নি। এসেম এবং অধ্যবসায় দেখে তিনি খুব ভারিক করে বললেন,—হুদেই হাল্কা হুদেই এই সব ব্যবহারিক কাজের পথ ধরলে আমি খুব কাজের লোক হতে পারি।

লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে অনেকগুলো নানারকমের ছোট বড় বিকল বড়িও বোণাড় করে ফেললুম। কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যা পরিস্থিতি পেল বদলে—বড়ির দোকান হল না।

বিপ্লবী নেতা পুদিন দাস গোপাল বাবুর দেশের লোক। আচার্য মদন পুত্র তাঁকে অর্থ সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করেছেন, প্রত্যয় বৈকালে পুদিন বাবু বোম্বে ইনস্টিটিউটের কর্মীদের একটু করে

লাঠি খোলা দেখাবেন—পরেরকনের ওপরও তাঁর হুদুম, সকলকেই বিকালে একবার লাঠি নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

গোপাল বাবু সেখানে গিয়ে পুদিন বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সাহায্যে Laboratory Assistant এর এক চাকরী জোগাড় করে ফেললেন। তাঁর আর লোকানে বসে সম্ভব হল না। লুতার বলে বাড়ী থেকে কিছু কার্ণিটার নিয়ে দোকানে তুললুম—এই ব্যবসাই করবো। ভারীজামাইকে বলালুম দোকানে।

ইতিমধ্যে এসে পড়লো নাগপুর কংগ্রেস। মনটা চকল হয়ে উঠেছে। মেনুম ডেলিগেট হয়ে। জন পঞ্চাশেক বাছা বাছা ডেলিগেট চলেছেন, হাতে এক একটা মস্তবুত ছোট লাঠি। সেখানে দাদাট্রির সঙ্গে বসভাও হল, তাদের বীতিমত মার দেওয়াও হল—কলকাতার জবাব বেওয়া হল।

নাগপুর কংগ্রেস চুটো বড় বড় দল কাক হল—(১) কংগ্রেসের আদর্শের (creed) পরিবর্তন,—আর (২) মনুম -ঈশ্বরভক্ত। ব্যবস্থা হল,—কংগ্রেসের আদর্শপত্রে সট দিলে এক বাৎসরিক তার আনা টাল দিলে যে-কেহই কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে। এইভাবে কংগ্রেস হবে সারাজাত্যবাসী জনকগণ। বিস্তারিত ভাবে পঠনতন্ত্র রচনার জন্যে কমিটি তৈরী হল।

আর,—কংগ্রেসের creed আগের ছিল—“Attainment of Self Government within British Empire by Constitutional means.” পরিবর্তন প্রস্তাবিত হল—“Attainment of Swaraj by peaceful and Legitimate means.” আপত্তি করলেন দুজন নেতা—বিপিন পাল ও জিন্না। বিপিন পাল বললেন,—এতে সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী করে দেবে—আমাদের সর্বনাশ হবে।

মহাত্মা জবাব দিলেন,—এই বে-আইনী করার ভয়টা তুল, এতে বে-আইনী কিছু নেই। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকবো কি না,—সেটা একটা খোলা প্রশ্ন থাক—তার মীমাংসা নির্ভর করুক সরকারের ব্যবহারের ওপর।

জিন্না বললেন “within British Empire” কথাটা তুলে দাও, কতি নেই,—কিন্তু তার হুদে লিখে দেওয়া হোক, “ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বাধীন—কারণ তা না হলে কমীরা ও জনসাধারণ বিশেষহার হবে,—কেউ “within,” কেউ “without” মনে করে কাজ করবে,—কাজে গণগোল ও বিশৃঙ্খলা হবে। সরকার বে-আইনী ঘোষণা করে তো, আমরাও তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।”

মহাত্মা জবাব দিলেন, “আমরা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেই যেতে চাই, একথাই কি ঠিক? একথা ঠিক করার সময় এখনো আসেনি—বধন স্বাধীন হবে, তখন জনগণ সেটা ঠিক করবে।”—প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

কিরে এসে দেখি, দোকানের চেহারা যেমন ছিল, অবিকল তেমনি—আছে। কার্ণিটারের ব্যবসায় আমার পণ্ডিত্য নিলাম চেনা পর্যন্ত, ভারীজামাই ততোধিক পণ্ডিত—তিনি নিলামও চেনেন না।

লোকানের গিছনে চকের মধ্যে ছোটো বড় বড় ডেকরেটর-এর ব্যবসা ছিল। দেখতে দেখতে মনে হল—এই ব্যবসাতা বেশ! একদিন ছির করে ফেললুম—এই ব্যবসাই করতে হবে। [ক্রমশঃ

শীতের

পড়ন্ত

বেলায়

মাধবী জটোর্য্য

শ্রীকৃষ্ণ ওজলোক। একজন ওজমহিলা।

ওজমহিলার বয়স অল্পমান করে বলা যায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। চেহারাটা ক্রীণ, কক—যতাবিকল্প সংযমের টানে জীহীন। গাল দুটো বন। চোখালের হাড় বেহিরে পড়েছে। যট্টা ময়লার দ্বার খোঁসে গেছে। চেহারা বাঁধনী বলতে কোথাও কিছু নেই—সমস্তটাই লম্ব, ডিল-ঢালা। চোখের দুটো এমনিতে মনে হবে উল্লাস, কিন্তু একটু নিরীক্ষণেই ধরা পড়বে সে দুটোতে রয়েছে ছালা—একটা সর্বাঙ্গী কুখার ছালা।

ওজলোকটির বয়স অল্পমান-সাপেক্ষ নয়। কেন না, সৌম্য, প্রাণান্ত মুখখানার দিকে এক নজর তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় ওজলোক এই লবে পঞ্চাশের কোঠার পা দিয়েছেন।

মহিলাটি বসে আছেন। সামনে চায়ের পেয়াল। পেয়ালার চা পেয়ালোকেই জুড়িয়ে আছে। মহিলা বসে আছেন। বসে আছেন টেবিলের ওপর কুইট-এর ভর দিয়ে বাঁ হাতখানা গালের ওপর রেখে। দুটি মেলে দিয়েছেন জানালা পার করে অনেক দূরে।

দরজার সামনে বসে আছেন ওজলোক। তাঁর সামনেও এক পেয়াল। চা। ধীরে ধীরে সেই চা তিনি আয়েস করে পান করে যাচ্ছেন। সর্বাঙ্গে একটা আয়েসী ভাব।

মধ্য প্রদেশের পাহাড় আর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি সহর, আর সেই সহরের উপকণ্ঠে একটি নির্জন সরাইখানা। সরাইখানার মালিক এক বৃদ্ধ গড়জাতি রাজপুত। মেয়ে তার কল্পিণী। মা-মরা মেয়ে। বাপের আদরে, পাহাড় আর জঙ্গলের পরিবেশে বড় হোয়ে উঠেছে। যেমন পাহাড়ী, তেমনি বড়।

ওজলোকটির নাম অমিয় বাবু—অমিয়কুমার ঘোষ। উড়িষ্যার কোন এক জেলায় বাড়ী। জমি জরীপ সংক্রান্ত কাজ নিয়ে এখানে এসেছেন। আত্মনা নিয়েছেন এই সরাইখানাটিতে।

ওজমহিলাটি সবকারী গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ নিয়ে এসেছেন। মাথা শুজবার ঘিঠার টাই না থাকায়, তাঁকেও এইখানেই অস্থায়ী ডেরা বাঁধতে হোয়েছে। ওজমহিলার নাম মণিকা ওস্ত।

শীতের এক পড়ন্ত বেলা। সেই পড়ন্ত বেলায় আধো-অন্ধকার সরাইখানার নির্জন এক কক্ষে প্রায় পাশাপাশি বসে রয়েছেন বাবু অমিয়কুমার ঘোষ—পঞ্চাশের কোলবেঁস এক প্রৌঢ়, এবং কুমারী মণিকা ওস্ত, বি, এ—জীবনের তিরিশটি বসন্তকে অস্তিত্ব বিনি অসীর উল্লাসে উপেক্ষা করে এসেছেন।

অমিয় বাবু আয়েস করে চা পান কোরছেন আর আড়চোখে লক্ষ্য কোরছেন মণিকা দেবীর হাব-ভাব।

অনেকটা সময় কেটে গেল। অমিয় বাবুর চা-পান পূর্ব শেষ হোল। নির্জন ঘরের অন্ধকার আর একটু বনীভূত হোয়ে এল।

মণিকা দেবীর জ্ঞাপন নেই। তিনি বাইরের পৃথিবী হ'তে জ্ঞাপন দেখে নিচ্ছেন।

এক সময় অমিয় বাবু উঠে পাড়ালেন। লক্ষ করে দেখলোই আলিমে সিগারেট ধরালেন। বুখা, মণিকা দেবীর স্পন্দন নেই। অমিয় বাবু আর থাকতে পারলেন না। কঠোর এক পর্শ ওপরে ফুলেই বললেন : আপনাদের চা জুড়িয়ে গেল মিস ওস্ত।

চমক নয়। দীর্ঘশ্বাস। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস কেসে মণিকা দেবী বাইরের দুটিটাকে জুটির নিয়ে চায়ের পেয়ালার বস্ত্রীকৃত কোরলেন। বুখ বিয়ে ভলু অসুট আঁতরান বেলো ধন্যবাদ।

বুট্টা নায়েলো। পাহাড়ী বুট্টা। অমিয় বাবু কথা জমাবার জন্তে বোললেন : এ সময় এখানে বুট্টা হয়, জানা ছিল না তো?

অপার কক্ষে নীরব। বাইরের অল্প দুটিধারার মধ্যে চোখে বুট্টা আবার কোথায় গিয়ে হারিয়েছে।

ঘরে চুকলো কক্ষিণী। গড়জাতের পাহাড়ী রাজপুতানী মেয়ে—তার সন্তোষে বহুরের বৌবনকে নপ, কপিয়ে হাতের হারিকেন লটনটাকে উঠিয়ে একবার দেখে নিলে ঘরের পরিবেশ, তারপর হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত নামা দ্বাধরাটা বলমলিয়ে সোলা অমিয় বাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে এক কাপ চা ঠক করে নামিয়ে দিয়ে বোললেন : এই নাও বাবুজী, তোমার চা।

প্রায় হান্তে অমিয় বাবু চকল হোয়ে উঠলেন।

—বাঃ, বাঃ, বাঃ, তাই তো বলি, কক্ষিণী নইলে মনের কথা আর এমন করে কে বুঝবে।

চায়ের কাপে চুষক দিয়ে বললেন : এই জঙ্গলে তোমার মতো একটি মেয়ের দেখা যে পাখো কক্ষিণী, একি আমি কখনো কল্পনাতেও আনতে পেরেছিলাম?

—নসীব তাহলে তোমার ভালই বল বাবুজী!

হেসে হেসে মণিকার দিকে একবার কটাক্ষ করে কথাটা বলল কক্ষিণী।

—হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে? অর্ধপূর্ণ হাসি হেসে ওঠেন অমিয় বাবু।

হঠাৎ এই সময় মণিকা দেবী চেয়ারটা সশব্দে পেছন দিকে ঠেলে, উঠে পাড়িয়ে গট গট করে দর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মণিকা দেবীর এই চলে যাওয়াটা এমনই বেখাড়া আর বেখাড়া ধরণের যে, অমিয় বাবুকে রীতিমত অপ্রতীত হতে হল। তিষ্ঠ খিল-খিল করে হেসে উঠলো কক্ষিণী। তাৎপর্য এক সময় বললো : বাবুজী ও বাড়টা ভাল নয়। ও একটা ট'ডাই।

—ট'ডাই? ট'ডাই কি ব্যাপার কক্ষিণী! অমিয় বাবু সখ হবার জন্তে হেসে কেলেন।

—কুমি হাসছ বাবুজী! কুমি জানো না ট'ডাই কি জিনিষ। চোখ-বুখ ঘুরিয়ে কক্ষিণী বলতে থাকে : ট'ডাই কানের বল জানো! ট'ডাই বলে সেই মেয়ে মানুষের—বারা বস্তুর-সস্তুর ভানে। পূর্ব মানুষ বেশলেই বাঁদের জিত লুক লুক করে ওঠে। অন্ধকার ছাড়া বারা আলোতে বেরোতে চায় না। বেরোলেও—বাঁদের একমাত্র গন্তব্য স্থান শূ শূ শূ অশান।

—বটে। তা' হোলো তো খুবই ভয়ের কথা! অমিয় বাবু কোঁকুলে বলে বলেন।

—ভয়ের কথাই তো। মাথা কাকিয়ে বলে কক্ষিণী : তুমি সাবধান।

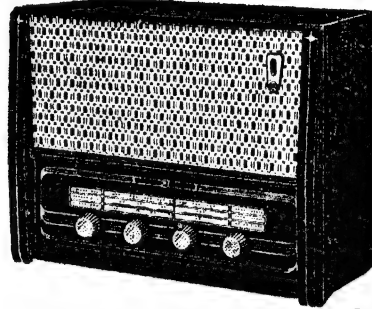
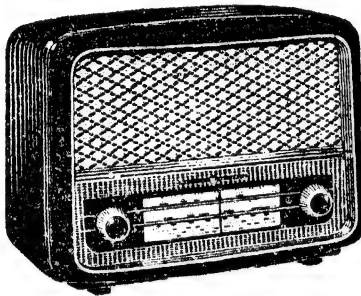
মাগের মাগের কাজ পেতে হ'লে



কাজে সেরা ও দামে অবিধে ব'লেই ক্রাশনাল-একো রেডিও এবং ক্রিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

ন্যাশনাল একো

রেডিও



ক্রাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ক্রাশনাল-একো-র বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনসুনাইজড ২৫০ টাকা

ক্রাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি অথবা এসি/ডিসি; ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড; খুব ভাল কাজ দেয়; এই ধরনের রেডিওর মধ্যে সেরা।
মনসুনাইজড ৩০৫ টাকা

Kleertone ক্রিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম

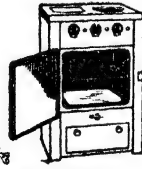
ক্রিয়ারটোন
বৈদ্যুতিক
ওয়াটার হীটার—
কল ঘুরালেই গরম জল
পাওয়া যায়; ৫ থেকে
১০ গ্যালন জল ধরে



ক্রিয়ারটোন
সিংক্রোনাল
বৈদ্যুতিক
দেওয়াল ঘড়ি—
অসাধারণ নির্ভরযোগ্য।
৭ রকম সাইজে এবং সুনন্দ
দুল্লর রঙে পাওয়া যায়



ক্রিয়ারটোন
কুকিং রেঞ্জ—
দুটো মেট বেকিং
উত্তম, প্রত্যেকটির
আলাদা নিয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থা আছে।
শক্তি ৫, ৫০০ ওয়াট পর্যন্ত



ক্রিয়ারটোন
বাতি,
ফ্লুরোসেন্ট টিউব
এবং ফিল্ম চার—
পরিষ্কার স্বচ্ছ
আলো অথচ খরচ কম পড়ে



ক্রিয়ারটোন
ঘরোয়া ইঙ্গি—
ওজন ৭ পাউন্ড;
২৩০ ভোল্ট—খুব
পুঙ্খ ক্রোমিয়াম
কলাই করা



ক্রিয়ারটোন
বৈদ্যুতিক
কেটলি—
গোমিহাম কলাই করা;
৩ পাইট জল ধরে;
২৩০ ভোল্ট—৪৫০ ওয়াট



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই • ফ্রেজার রোড, পাটনা
১/১৮ মন্টিগ রোড, কলকাতা • ৩৩/১০ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, কলকাতা
যোগাযোগ কলোনি, টার্মিন চক, দিল্লী • হাইপার রোড, লেকসবারা

—কেন, আমার গুণটা কিদের ?

—বাঃ, তবু তো তোমাকে নিয়েই। তুমি যে পুণ্য মানুষ—
দরদ।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারেন না গুণীলোক—সংকুচিত হোয়ে পড়েন। স্বাভাৱী মহিলা সক্রান্ত আলাচনাতার এইখানেই ইতি টানবার ইচ্ছে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন : আজই তোমাদের দেশে এসে পৌঁছলাম কুকুমিণী—কিন্তু দেখ কি বৃষ্টি! একটু বে বাইরে বেরিয়ে চারিদিক ঘুরে-ফিরে দেখবো—তার উপায় নেই। কুকুমিণী অভয় দিয়ে বলে : এ বর্ষার ভয় পাবার কিছু নেই বাবুজী। পাহাড় দেখে মেশ—ও এখন সাক হোয়ে বাবে।

—বাবু বাঁচা গেল। উঠে পাড়িয়ে বলেন অমিয় বাবু : তা কোন দিকে বাওয়া যায় বলা তো কুকুমিণী। জলী জায়গা। বাজা-বাটও চিনি না। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়বো। শেষটা হয়তো বাঘের মুখেই প্রাণটা বাবে।

বাইরের দিকে কানটা খাড়া করে কি একটা শোনবার চেষ্টা করে কুকুমিণী, তারপর বলে : তুমি একটু পাড়াও বাবুজী, আমি আসছি। আমি তোমার সঙ্গে বাবো।

—সে কি। তুমি কোথায় মাঝে আমার সঙ্গে ? বিমিত কণ্ঠে অমিয় বাবু প্রশ্ন করেন।

দয়জ্ঞা পৰ্ব্বত এগিয়ে গিয়েছিল কুকুমিণী। সেখান থেকেই ঘুরে পাড়িয়ে বলে : বাবোই তো। পাহাড়-জঙ্গল বেশ। জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছেই, আর আছে টিঁড়াই। একলা বদল কি এমন এমনি ছেড়ে দিতে আছে ?

খিল-খিল করে আর এক ঝলক হেসে ছুটে মেরেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিষয় বতখানি, তার থেকে অনেক বেশী পলকে নিৰ্ভর ঘরের মধ্যে অমিয় বাবু শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন।

পাহাড়ী রাত। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। শিথিল জ্যোৎস্নার মাঠ, বন, পাহাড় ভরে গেছে। চারিদিকে একটা নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যলোক।

অমিয় বাবু হেঁটে চলেছেন। পাশে কুকুমিণী। কুকুমিণী এক নাগাড়ে বকে চলেছে। অমিয় বাবু শুধু হাড় নেড়ে লায় দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এক-আধখানা শ্রবণ কোরছেন। কুকুমিণী বোঝাচ্ছে : এই যে এখন আমরা যে জায়গাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বাবুজী, এটা হচ্ছে ভাঙ্কর আশ্রয়। এখন অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কেন না ভাঙ্কর এখন শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। কিয়বে সেই ভোরের দিকে।

অমিয় বাবুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে : আর এর মধ্যে যদি কিরেই—তাতেই বা কি। আমরা তো আর ওর কোন ক্ষতি কোরতে যাচ্ছি না। ওই বা শুধু শুধু আমাদের কোন ক্ষতি কোরতে আসবে, না বাবুজী।

—হ্যাঁ। অতদূর ভাবে অমিয় বাবু উত্তর দেন।

কুকুমিণী বলে চলে : বুঝলে বাবুজী, ভাঙ্কর হোচ্ছে সব থেকে শান্ত জানোয়ার। ওর ডেয়ার গুণ গিয়ে হামলা না কোরলে, ও কাউকে কিছু বলে না। আচ্ছা বাবুজী,

তুমি ভাঙ্কর দেখেছো? আচমকা অমিয় বাবুর চোখে জল যেনে প্রশ্রুটি করে কুকুমিণী।

চাকরী-জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেছে বনে-জঙ্গলে। অমিয় বাবু হাড় বেড়ে বলেন : দেখছি।

—দেখে ? সত্যি দেখেছো বাবুজী ?

প্রশ্নের দরদে এবার হেসে ফেলেন অমিয় বাবু। বলেন : হ্যাঁ, সত্যিই দেখছি।

—আচ্ছা, কখনো সামনা-সামনি পড়েছ ?

আবার হেসে ফেলেন অমিয় বাবু। বলেন : না। তা' পড়িনি।

—পড়ামি ? সত্যিই পড়ামি ? হঠাৎ এক বিচিত্র ধরণে কৌতুকে কুকুমিণীর চোখ দুটো চক চক করে ওঠে। অমিয় বাবু পথ আগলে ও রাস্তার মাঝখানে পাড়িয়ে পড়ে। অমিয় বাবু বিমিত হোয়ে ওর দিকে তাকান। কুকুমিণী এক পা এগিয়ে আসে। ঘন হোয়ে মুখোমুখি পাড়ায়। কঠোরকো নাড়িয়ে নিয়ে আসে নিশাধ জঙ্গলে। বলে :—আজ একটা ভাঙ্কর দেখবে বাবুজী—পাহাড়ী জলী ভাঙ্কর—একেবারে সামনাসামনি।

চার পাশে একবার সচকিত দৃষ্টি নিদ্রাপ্ত করেন অমিয় বাবু। তারপর বলেন কিছু কিছু কোরে : কই, কোথায় ?

অমিয় বাবুর চোখের দিকেই তাকিয়েছিল কুকুমিণী। এবার খিল-খিল করে হেসে ওঠে। তারপর সমস্ত শরীরে একটা ত্রিভুজ তুলে অমিয় বাবুর একখানা হাতকে নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে, ঢালু পথটা বেয়ে তবু কুকুমিণী তব, তব করে এগিয়ে যেতে যেতে বলে : চলো, তোমাকে দেখিয়ে আনি।

ভারী দেহটা নিয়ে বিজ্ঞান অমিয় বাবু অগত্যাই অহুসরণ করেন।

পথটা কিছুদূর নেমেই একটা বালির চরে ঠেকে গেছে। আর একটু নীচেই ছোট-বড় অজস্র পাখরের মাঝখান দিয়ে পথ করে বয়ে যাওয়া একটি ঈর্ষ জলধারা। পাহাড়ী নদী এবং তার বালুচর। অমিয় বাবুর হাত ধরে কুকুমিণী তাঁকে সেইখানে টেনে নিয়ে আসে। নিজে গড়িয়ে পড়ে ভোলা-ভোলা নরম বালির চাদরে। হাত বাড়িয়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলে : এইখানে চুপটি করে বসে থাক বাবুজী। এখন ভাঙ্কর আসবে—তুমি দেখতে পাবে।

কুকুমিণীর আকস্মিক বিচিত্র ব্যবহার প্রৌঢ় অমিয় বাবুর হিসেবে বাইরে। অতদূর নির্ভর হোয়েই তিনি ছিলেন। এবার বললেন : ভাঙ্কর না হয় দেখবো কুকুমিণী, কিন্তু—হঠাৎ থমকত খেয়ে চুপ করে বান ভঙ্গলোক। এমন বিজ্ঞি আর বেয়াদব ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা।

আবার খিল-খিল করে হেসে ওঠে কুকুমিণী। অমিয় বাবু হাতের আঙুলগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া কোরতে কোরতে বলে : কিন্তু কি, বলা না বাবুজী, কি বলছিলে ?

চাঁদের আলো পড়েছে পাহাড়ী নদীর জলে। সেখানে এক দাঁত ঝিকমিকি। চাঁদের আলো পড়েছে পাহাড়ী মেঘের চোখে। সে চোখেও অজস্র প্রতিবিম্ব। কিন্তু অমিয় বাবু আর ওদিকে ফিরে তাকালেন না। সোজা নদীর ওপাশে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলেন :

না, এই বলহিলুম কি—ভিজ়ে বাসির ওপর ভয়ে পড়লে—ঠাণ্ডা ফাণ্ডা লেগে ভেঙে পাবে তো ?

ভিজ়ে ? ভিজ়ে কোথায় দেখলে বাবুজী ! কী সুন্দর আর নরম বিছানা ! তুমিও শুয়ে দেখো না বাবুজী ! আমি বাবুর ল'ডুলগুলোকে যুহু আকর্ষণ করে রুক্মিণী ।

—আঃ রুক্মিণী ! প্রগলভা মেয়েটাকে শাসন করবার চেষ্টা করেন আমি বাবু ।

—বোকা না বাবুজী ! তুমি বোকলে আমি কেনে ফেলবো । বোলেই পাশ ফিরে সরে এসে বা হাতখানা দিয়ে আমি বাবুর একটা হাঁটুকে জড়িয়ে ধরে দুখখানা বাসির মধ্যে ভ'জ়ে দিল রুক্মিণী ।

পাহাড়ী রাত আর পাহাড়ী নদী । সময়কে সজে করে শ্রোত বয়ে চলেছে একটানা শব্দের স্রষ্ট করে, আর অসহ্য একটা নীরবতার উদ্ভূত চেতনা নিয়ে আড়ষ্ট হোয়ে বসে আছেন আমি বাবু ।

আঃ, মেয়েটার কি কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নেই ! পাহাড়ী বোলে কি শালীনতার ছিটে-কোঁটাও অবশিষ্ট রাখতে নেই ?

নদীর ওপারে দৃষ্টি বাপসা ! কুয়াসা জমতে শুরু কোরেছে । আকাশের মাথায় রয়েছে চাঁদ । সেই চাঁদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ঘন কালো মেঘ । ওটাকে দেখাচ্ছে একটা কৈদো ভাঙ্কের মতো ।

আমি বাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন । আলতো ভাবে রুক্মিণীর গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকতে চেষ্টা করেন । আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাণ্ডটা ঘটে যায় ।

বিজ্ঞাপ্তিতে উঠে বসে রুক্মিণী । হুই হাতে আমি বাবুর কণ্ঠ বেঁটন করে সবলে তাকে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল । অকুট বিচিরা হয়ে কানে কানে বলে : বাবুজী, ভাঙ্ক—পাহাড়ী জলো ভাঙ্ক—শিকার খুঁজতে বেরিয়েছিল—জিশ্ণু পহেলা শিকার । সেই শিকার ওর বুকের সামনে এসে গেছে । তুমি বাধা দিও না বাবুজী—শুধু দেখে নাও—সামান্যসামান্য দেখে নাও ।

সময় বুকে মাথার ওপরের কৈদো ভাঙ্কটা প্রকাণ্ড একটা খাবা জমিয়ে বসলো চাঁদ মাথার মুখে ।

বিশ্রান্ত সময় গড়িয়ে চললো । গড়িয়ে চললো পাহাড়ী নদীর শ্রোত—ভাঙ্কের মতো কৈদো কৈদো পাখরের তলাকার মাটা ফহিয়ে, গলিয়ে, ঝাঁঝা করে ।

—সেদিন রাতে সবাইখানায় নির্জন ঘরে বসে আমি বাবু বখন মনে মনে আঙ্কের সন্ধ্যার ঘটনাটা পর্যালোচনা করছেন—নিশেফ ঘরে ঢুকলো রুক্মিণী । বিজ্ঞাপ্ত আমি বাবু উঠে পাড়ালেন । কিছু একটা বোলতে বাবেন—রুক্মিণী টোটে আঙুল তুলে ইঙ্গিতে তাকে নীরব করে দিলে । তার পর নিশেফ দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, টেবিলের ওপর বাধা ছাড়িয়ে-কণ্ঠনটাকে হাত দিয়ে নিবিয়ে, আমি বাবু বুকের কাছে বৈসে এসে পাড়ালো । আমি বাবু বোবা হয়ে গেছেন । তাঁর কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই । অভাবিক বাদ্যগীতনে ইতিমধ্যেই তিনি ক্লান্ত, অবসর—কিন্তু রক্তের স্বাধ পেয়েছে বজ্রব্যাধী—সে তাকে রেহাই দেবে কেন ? হু হাতে আমি বাবুর গলাটা জড়িয়ে ধরলো রুক্মিণী ।

মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও
সুনিদ্রার সহায়তা করে



ভূঙ্গল শুধু যে
কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী
তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও
শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে ।

ভূঙ্গল

সুগন্ধি মহাভূঙ্গল কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২০

৫ আউন্স শিশি কার্টন সমেত ও
১০ আউন্স শিশি কার্টন ছাড়া
পাওয়া যায় ।

অমিয় বাবুর ঘরের দরজা খুলে রুক্মিণী বধন বেঁধিয়ে এল, মনে হোল একটা ছাত্রামূর্তি বেন হন হন কোরে বারান্দার ওপাশের অন্ধকার কোণের দিকে গিয়ে অদৃশ্য হোয়ে গেল।

রুক্মিণীর পেছনে অমিয় বাবুও বাইরে বেঁধিয়ে এসেছিলেন। ফিসফিসিয়ে ভীক্সলায় বোললেন : নিচুই কেউ তোমাকে এ ঘরে ঢুকবার সময় দেখেছে।

কে আবার। ওই টাঁড়াই আউরবাংটা হবে। চাপা কঠে রাজ্যের বিবেচ আর যুগা ফুটিয়ে নিজের ঘরের দিকে রুক্মিণী পা বাড়ালে।

মণিকা গুপ্ত নামে একটা বালালী মহিলা যে এই সহরে তাঁর সঙ্গে একই ছাত্রের নীচে বাস কোরছে—এ কথা অমিয় বাবু বেন ভুলেই গিয়েছিলেন। রুক্মিণীও তাঁকে সর্বক্ষণ নখল করে আছে। অল্প দিকে তাকাবার তাঁর সুবসংই নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় একটু আগে অমিয় বাবু নদীর ধারে পায়েচাঠী কোরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ পেছন কিরতেই নজরে পড়লো—চালু পথটা ধরে তর তর কোরে নেমে আসছেন মণিকা দেবী। বিম্মিত অমিয় বাবু হাত উঠিয়ে নমস্কার কোরতে যাবেন, আকস্মিক ভাবেই পাশের একটা পায়েচলা পথের দিকে বাক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেলেন মণিকা দেবী।

পরের দিন দুপুরেই কিন্তু মণিকা দেবীর আবির্ভাব—আর কোথাও নয়—একবারে অমিয় বাবুর শরন কল্কে।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম কোরছেন অমিয় বাবু, দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে ভেঙে ঢুকলেন মণিকা দেবী বিনা অনুমোদন। অমিয় বাবু বিম্মিত হোলো, সে ভাব কাটিয়ে, তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বেংসে, হুহাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে সন্মুখী জানালেন : আসুন মিস গুপ্ত। বসুন। দরজার পাশেই চেয়ার। সেটা দেখিয়ে গলার অস্তরঙ্গতার সুর এনে বোললেন : কি খবর বলুন তো মিস গুপ্ত। আপনায় যে দেখা পাওয়াই ভার। সাবানিনটাই ডিউট করেন নাকি ?

অমিয় বাবু মণিকা দেবী দেখাবের ওপর বাসে অপ্রতিভের হাসি হাসেন।

—না, ডিউট আর এমন কি। কথাটা অর্থসমানুই থেকে যায়। মণিকা দেবী হাতের নখ খুঁটতে থাকেন। অমিয় বাবু নীরবে একটা মাসিকের পাতা উন্টে বান।

এক সময় মণিকা দেবী উঠে দাঁড়ান। বলেন : আমি বাছি। নমস্কার। অমিয় বাবুকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি বাইরে বেঁধিয়ে আসেন।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা। অমিয় বাবু বেড়িয়ে ফিরছেন, সবাইখানায় যুখেই মণিকা দেবী। ঠঁব ভংগীটা প্রতীক্ষণার। অমিয় বাবু কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে বাছিগেলেন—বাধা পড়লো।

—একটা কথা ছিল। আর ফিস-ফিস শোনালো মণিকা দেবীর গলার আওয়াজ।

—বলুন। অমিয় বাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

—এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। একটু যদি—ভীক্স আর কাঁপ-কাঁপা গলার এই পর্যন্ত বোলই থেমে পেলেন মণিকা দেবী।

—বেশ তো চলুন না আমায় ঘরে। সপ্রতিভ কঠে আহ্বান জানালেন অমিয় বাবু।

—না, না, ওখানে নয়। বাড়ি নেড়ে প্রবল আগন্তি জানান মণিকা দেবী।

—তার চেয়ে ওই নদীর ধারটার—আবার কথা হারিয়ে কেনে ভ্রমহিলা।

—বেশ তাই চলুন।

হু'জনে পাশাপাশি হেঁটে স্বেচ্ছেন। কথো যুখে কোন কথা নেই। ভিতরের কৌতুহল আর উৎসাহকে চাপা দেবার ভ্রমে চোখে যুখে একটা নিবাসক ভ্রমাদীপ ফুটিয়ে পথ হাঁটছেন অমিয় বাবু। মণিকা দেবীর দৃষ্টি দূরায়ত, ভারলেশহীন।

কখন সন্ধ্যার আবেদন অন্ধকার ক্রুশপঙ্কের রাজির ঘন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, কখন দূরগত পাঠাড়া নদীর কুল-কুল ধনি, অনবরত পাখর আছড়ানো গর্জনে পরিণত হোয়েছে, কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা বনবীধি ধু-ধু বিস্তার বালুচরে রূপান্তরিত হোয়েছে—মণিকা দেবী তো নয়ই, অমিয় বাবুও যে এদিকে তেমন সচেতন ছিলেন—ওদের ভাব-ভঙ্গী দেখে অন্ততঃ একথা মনে করবার কারণ নেই। এমন কি, জলের প্রায় ধার ঘেঁসে দৃষ্টি প্রায়ী বধন যুগ্মযুগ্মী দাঁড়িয়ে আছেন—তখনো বেন চেনা-জানা এই চেতনার রাজ্য থেকে ঠরা বেশ খানিকটা দূরে।

শান্তি ভঙ্গ করলো নিশাচর এক পাখী প্রচণ্ড অর্জুনাদ তুলে।

অমিয় বাবু চমকে উঠে তার পাশের অন্ধকার পরিবেশটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর রুক্মিণী বোললেন—এবার আপনায় যা বলবার আছে বলুন। তাড়াবাড়িই বলে ফেলুন। বৈশিষ্ট্য এ জায়গায় থাকা নিবাপন নয়।

মণিকা দেবী বেন এই বৃহত্তর অশেপক্ষেই ছিলেন। হঠাৎ দূরায়ত দৃষ্টিকে একটু নীমিত্ত কুচিত রেবার প্রসারিত কোরে বোলে উঠলেন : কেন বলুন তো, জায়গাটা হঠাৎ এমন বিশঅন্ধর হোয়ে উঠলো ?

অমিয় বাবু নির্বাক। মণিকা দেবীর কাছ থেকে এ ঘরের কথা তাঁর প্রত্যাশায় বাইরে।

অতঃপর উত্তর-ভরিশের ক্রুশা মণিকা দেবী তাঁর বিচিত্র ক্রীড়া সকালন ও পুষ্ক গুণ্ডাঙ্গের তির্যক হাসি দিয়ে পক্ষ্যোত্তর প্রৌ অমিয় বাবুকে আহ্বান জানালেন :—আসুন না একটু বসি। কাজ তো কিছু নেই।

সচকিত হোয়ে ওঠেন অমিয় বাবু।—না, দেখুন, আমার যথেষ্ট কাজ বোয়েছে। আমার এবার কেবা দরকার।

—কাজ তো রুক্মিণীকে নিয়ে এবং দরকারটাও বোধ করি তারই সঙ্গে।

—তার মানে ? কঠে জোর না পেলেও বিরজিতা অমিয় বাবু সুশ্রী ফুটিয়ে তুললেন।

—মানেটা কি আমিই বোলে দিবো অমিয় বাবু ?

খলিত বুকের ওপর হাত হুঁটো জড়ো করে নিঃশব্দে অমিয় বাবুর যুখের পানে চেয়ে থাকেন মণিকা দেবী।

—দেখুন, আপনি অনর্থক অনর্থক আর চর্চা বোয়ছেন। আপনায় যতো একজন ভ্রমহিলা—

—পকে যেটা একান্ত ভাবেই গহিত, এই তো? কথাটা সমাপ্ত হয়ে বিচিত্র হয়ে যেলে ওঠেন মণিকা দেবী। তারপরই গভীর হয়ে বলেন: আচ্ছা, কোনটা গহিত, কোনটা গহিত নয়— সে জানাটা তো আপনাবও থাকা উচিত। হাজার হোলও আপনি একজন প্রীণ, বিজ্ঞ ভ্রমলোক।

বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো ছাড়তে থাকেন মণিকা দেবী: আপনি হয়তো বুঝতে পেয়েছেন, কোন কথা বোলতে আপনাকে আমি এখানে ভেঁকে এনেছি। একথাও হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন, কোন প্রয়োজনে আজ দুপুরে আপনার ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন যে কথা বোলতে পারিনি সকেচে, এখন এই রাতের অন্ধকারের আড়ালে পাড়িয়ে সেই কথাই বোলছি আপনার মুখের ওপর অসকেচে—আপনি অত্যন্ত অজ্ঞার কাজ করেছেন। কুকুম্বীর মতো নিতান্তই একটা বাচ্চা বরসে যে হয়তো আপনার দ্বীপ কোলের মেরের বয়সী, তারই সঙ্গে কিনা আপনি—।

আমচকা থমকে থমে পড়েন ভ্রমহিলা।

—কিনা আপনি—কি? হা হা কেবের হেসে ওঠেন অমিয় বাবু।

—বোলতে পারলেন না তো। আবাবো সেই সকেচ? অমিয় বাবুর উচ্চহাস্ত নদীর ওপারে প্রতিক্রমিত হোয়ে কিয়ে বাসে।

আম কিছুকণ অমিয় বাবুর মুখের ওপর অলঙ্ঘ্য দুটা দৃষ্টি নিক্ষেপ কোয়ে মণিকা দেবী বলেন: আপনি যে এত হীন আর এত নীচ তা আমার জানা ছিল না। বুড়ো হোল লোকের ভীমরতি হয় তনেহি—আপনারও তাই হোয়েছে।

বলেই আর পীড়ান না তিনি সেখানে। ক্রত পা চালিয়ে বািলর চড়া ভেঙ্গে ওপরে উঠতে থাকেন। অমিয় বাবুর উচ্চ হাস্ত ততক্ষণে নীরব হোয়ে গেছে।

সবাইখানার কিয়ে এই গল্পই অমিয় বাবু বেশ বলিয়ে বলিয়ে চমকেছিলেন কুকুম্বীকে। মণিকা দেবী সটান ভেতরে ঢুকে কোন কুমি না কোয়ে বোললেন: হঠাৎ উদ্ভ্রমনার মুখে অনেকগুলো কথা আজ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, আপনি সেক্ষেত্রে আমাকে মার্জন কোরবেন অমিয় বাবু! কথাগুলো বলার আমার সত্যিই ইচ্ছে ছিল না। অমিয় বাবুকে উদ্ভ্রমের অবকাশ না দিয়ে, যে ভাবে এসেছিলেন মণিকা দেবী, সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন।

অমিয় বাবু মুচকি হাসলেন। পীত দিয়ে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি কোরলেন কুকুম্বী: বুড়ী! তাইনি।

কিন্তু একটু পরেই কুকুম্বীর মুখভাবের পরিবর্তন হোল। একটা কিছু আবিষ্কারের আনন্দে গুকে উজ্জ্বল দেখাশো। জ মাচিয়ে, জাখ হুবিয়ে বোললে: বাবুজী, আওরাখটা একেবারে দিওয়ানা হয়ে গেছে।

—সেটা কি ব্যাপার?

—মুহুরৎ বাবুজী, মুহুরৎ।

—কায় সঙ্গে?

—তোমার সঙ্গে, আবাব কায়।

—বটে! তবে তো বড় বিপদ হোল দেখছি! একটা লোক

ক'টাকে সামলাবে! পরিহাস-ভরল কণ্ঠে অমিয় বাবু হাসতে থাকেন।

—হাসতো বাবুজী, বেশ। কিন্তু কথাটা আমার ঘোটেই মিথো নয়। তুমি পরীক্ষা কোরে দেখতে পারো।

—পরীক্ষা! মুহুরৎের? ডব্বকেই বান অমিয় বাবু।

—হ্যাঁ। একটা কাজ কোরবে বাবুজী?

অমিয় বাবু জিজ্ঞাসুভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

কুকুম্বী চট করে একবার উঠ গিয়ে বাইরেটা উঁকি মেয়ে দেখে আসে। তাংপর ঘনিষ্ঠ হোয়ে কাছে বোসে বলে:—কল বিকলে ওই অউরাখটাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে তুমি বেড়াতে যাও।

—না, না ও সব আমি পারবো না। প্রবল আপত্তি তোলালেন ভ্রমলোক। আব তা' ছাড়া আমার সঙ্গে বাবেই বা কেন ও?

—যাবে বাবুজী, যাবে। তুমি একবার ডাকলেই যাবে। মিনতিতে গলে পড়ে মেয়েটা—একবার ডেকেই দেখো না বাবুজী! আমার মাখার দিবা—তুমি একবার গুকে ডাক।

নাহিচরিত্রের এই বৈচিত্র্যের সামনে পাড়িয়ে, অমিয় বাবু আপত্তি করার ভাষা হারিয়ে কেলেন।

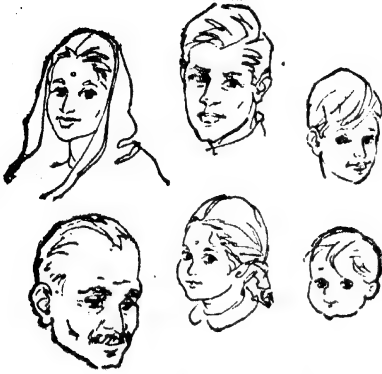
বৈচিত্র্যের ধানিকটা বাকী ছিল, কেন না পরদিন বিকলে বেড়াতে বাবার মাত্র দায়সার পোছের আমন্ত্রণ নিয়েই মণিকা দেবী চোখ-মুখ উজ্জ্বল কোরে বেরিয়ে এলেন।

অমিয় বাবুকে আজ কথার পেয়েছিল। জীবনের কলঙ্কারিষ এবং উত্তর ও মণিকা দেবীর এই জঙ্গল-পাহাড়ের দেশের এক নিভৃত সবাইখানার স্বল্পহাষি মিলনের সংগতি দেখিয়ে তিনি পথ চোলতে চোলতে একটা ছোটখাট বড়ুতাই দিয়ে ফেললেন।

মণিকা দেবী আজ দিবা সন্ধ্যা বেরিয়েছেন। অনভ্যস্ত হাতে মুখে পাউডারের প্রলেপ বেশ স্পষ্ট হোয়েই ফুটে বেরোছে। সাড়ী আর ব্লাউস—হুটোই বহু আয়াস স্বীকার কোয়ে নির্বাচন করা, কিন্তু পরবার ঘরপটা হাস্যকর ভাবে আনাড়ি। চ্যাটালো বুকটা ভয়ংকর বকমের বেশদাঁ। অশাস্ত সেই দিকে চেয়েই চোখটা কিরিয়ে নেন অমিয় বাবু। বড়ুতার গতিতে যতি পড়ে। অজুত বকমের একটা গ্রানিতে মনটা বী-বী কোয়ে ওঠে।

মায় পথেই থমকে পীড়ান ভ্রমলোক। অসংবত বণ্টে বলেন: চলুন, এবার ফেরা যাক।

ডাঃ বন্ধু
অশোক কার্ডিয়ল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও পৌর্ণক বর্ধন করে
প্রথম প্রস্তুতকারক:
ডাঃ বন্ধুর ল্যাবরেটরী লিং
কলিকাতা-৯



আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠানে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে ধসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

“দাখ, আমি না হয় মুখাখুখা মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজ্ঞে বাজ্ঞে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুবুর পোরা! হ্যাঁ : যত সব—”।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সহজে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন “আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট করে কিছু ঢোকে না।”

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন টেঁচিয়ে ওঁদের পড়া মুখস্থ করে উনি তখন ওঁদের মানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম

কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন “আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?”



আমি অভয়াস বলে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—“এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিন্ধের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!”

“কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামাকাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।” রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে

থেকে বীর্ধনিবাস

ফেলে বললেন—

“বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা।

আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?”

আমাকে ভাড়াভাড়া ফিরাতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না।

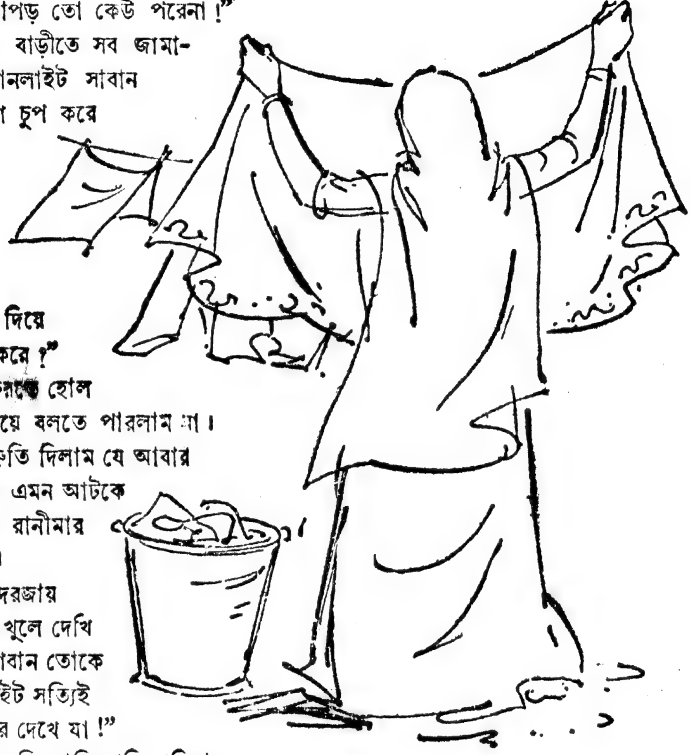
আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—“ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সতিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!”

রানীমার উঠানে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—“আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে...এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।”

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন “আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফোয়া

ঘষেই জামাকাপড় কেটেছি...তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে...হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম; আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত



ভাল হোল কি করে?” আমি রানীমাকে বোঝালাম—“রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফোঁা হয় প্রচুর। আর এ ফোঁা কাপড়ের স্তুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।”

“ও! এখন বুঝছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় কি করে এত ভাড়াভাড়া এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।” কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—“এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।”



সুনিয়ম দিয়া পরিষ্কার করুন।

G. M. & Co. Ltd.

মণিকা দেবী এক সুহৃৎ ঔর চোখের দিকে ফিরে দেখেন।
তারপর বলেন : বেশ চলুন।

দিনগুলো বেশ ভালই কেটে যাচ্ছে অমিয় বাবুর। সরকারী কাজ—সে সামান্যই। হাতে যোগেছে অসুস্থ অবসর। আর রোয়েছে সবাইখানার নির্জন একটি কক্ষ আর তার অভ্যন্তর পাঁচাড়া একটি ঘরের উদ্দাম সাহচর্য।

প্রথম প্রথম নিজের ওপর ক্রোধ হোয় উঠছিল ভ্রমলোক। মনে হোয়েছিল, জেনে-জেনে একটা কৃত্রিমক তিনি প্রকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। ইমানী সে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। জাম-নীতির হিসাব—সে তোলা থাক লোকালয়ের ভিত্তি। এখানে, এই বস্ত্র পরিবেশে তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

মাথা ঠাকে মাঝে মাঝে কিছু ঘামাতে হোচ্ছে। না ঘামিয়েও উপায় নেই। হেতু—মণিকা দেবী। অথচ মজা এই, দু'জনেই দু'জনের ব্যবধান বাঁচিয়ে চলতে সমান ভাবে উৎসুক।

মণিকা দেবী যদি এপথে হাঁটেন—অমিয় বাবু দশ কদম ফারাকে পাশ কাটান। নড়বড়ে খাবার টেবলটা দু'জনের কেউই ব্যবহার করেন না, কোরলেও সময়টা দু'জনেই বদলে ফেলেছেন। তবু কি যে হয়। কখন কোন অসতর্ক সুহৃৎ হয়তো পাশ দিয়ে জাকালেন অমিয় বাবু। দেখলেন এক জোড়া চোখের দৃষ্টি স্থির ভাবে তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ। হয়তো কোন রাজ্যে ককুমিণী এসেছে তাঁর ঘরে। বসেছে তাঁর শয্যার ওপর। মাথাটা এগিয়ে দিয়েছে তাঁর কাঁধে। রোমন্থ ভাবী হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে শুনি নিশ্চয় জরীপ করে যাচ্ছেন তার সর্বাঙ্গ—হঠাৎ নজর গিয়ে পড়লো উঠানের দিকটার জানালাটার দিকে—যেখানে বসেছে এক জোড়া তীর চোখের দৃষ্টি—অমিয় হাতটা সত্যোতে গুটিয়ে নিতে হয়; ঠেলে সরিয়ে দিতে হয় ককুমিণীকে। ককুমিণীর চোখ বোজা, রোমাঞ্চিত দেহ আগন্তু ভরে হাতটাকে টেনে শয্যানে নামাতে চায়—কিন্তু অমিয় বাবুর আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হবার প্লহা নেই। ক্ষমতাও নেই।

বাইরে বেরিয়েও স্বস্তি নেই। মণিকা দেবীর চোখের দৃষ্টি তাঁকে অহরহ অনুসরণ করে চলেছে।

কাজে গিয়ে পুথ নেই। ডেয়ার ফিরে শান্তি নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ককুমিণীর হাত ধরে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে মনের এই অসহ্য অবস্থাকে একটু বে হুঁতু দিবেন ভ্রমলোক—তার পর্যন্ত অবসর ছিলেন না জগ্নমহিলা।

হুঁতু হুঁতু এক দৃষ্টির বহনে পড়ে পড়ে শেষ হোতে লাগলেন ভ্রমলোক।

অবশেষে তিনি ছুটির দরখাস্ত কোরলেন। কয়েক দিনের জন্তে স্থান পরিবর্তন একেবারেই অপরিহার্য হোয় উঠেছে।

সরকারী ছুটি মঞ্জুর হোল। ক্যাসাদ বাথলো ককুমিণীর কাছে ছুটি মঞ্জুর ককান্তে গিয়ে। কৈদে, ককিয়ে, মাখার দিবা দিয়ে রীতিমত একটা বিতোপান্ত নাটকের ব্যাপার কোরে তুললো মেয়েটা। শেষে বোললে : আমি জানি তুমি কেন যাচ্ছ। যাচ্ছ ওই বৃত্তি ডাইনীর ভয়ে। আমি ওটাকে খুন করবো। ও তোমার লোক খেতে চেয়েছিল—এবার আমি ওর লোহ খাবো।

অনেক কষ্টে ককুমিণীকে শান্ত কোরতে হয় অমিয় বাবুর।

পরদিন সকালে অমিয় বাবু বাজা কোরলেন। জিনিসপত্র বাঁধা হোয়ে গেছে। বাইরে সরকারী জাপ অপেক্ষা কোরছে তাঁকে ষ্টেশন পর্যন্ত নিয়ে বাবার জন্তে।

শেষ বারের মতো ককুমিণীর মাখার গায়ে হাত বুলিয়ে, অনেক 'কিরা' আর লগন উজারণ কোরে, অমিয় বাবু বেরিয়ে এসে জাপে উঠতে গিয়ে দেখেন—মণিকা দেবী ভেতরে বোসে সত্যোতে তাঁকে সন্ধ্যাষ জানাচ্ছে : আহন, বড় দেবী কোরে কেললেন। মাইল পরনো পথ তো ভাঙতে হবে।

অমিয় বাবু বিস্ময় সীমা ছাড়িয়েছে। ধতিয়ে বলেন : আপনি।

—হ্যা, আমিও আজ ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছি। হাসিমুখেই বলেন মণিকা দেবী : ছুটি কি সহজে পাওয়া যায় ? পর্বমেন্টের ব্যাপার। জানেন তো সব। তারপর ছুটি যদি বা পেলাম, ভেবে মরি—এতখানি পথ একা-একা যেতে হবে। নিলোয় ত্র ছুটো নাচিয়ে বলেন : কিন্তু কি বিচিত্র যোগাযোগ দেখুন ! আপনিও ছুটি নিয়েছেন, আর ষ্টিক আমার সঙ্গেই একদিনে বাজা কোরছেন। কিন্তু আপনি আর দেবী কোরলেন না। গাড়ীতে উঠে পড়ুন। ডাইভারের দিকে একটু চেপে বোসে অমিয় বাবুর বসবার জায়গা কোরে দেন মণিকা দেবী। কলহাতে বলে ওঠেন : ষ্টেশন মিস কোরতে চাই না বাবু।

নিশ্চয় অমিয় বাবু গাড়ীতে ওঠেন। ডাইভার ষ্টাট দেয়। অমিয় বাবু সামনের উঁচু-নীচু পথের দিকে চোখ মেলে বসে আছেন। সবাইখানার দরজার বাপের পাশে এসে পাড়িয়েছে ককুমিণী। তার হুচোখে নিবোধ দৃষ্টি। অমিয় বাবু আর ওদিকে ফিরে তাকান না।

একটি জার্মান কবিতা

(বোসক ফন আইশেনদরক')

যেন মনে হয় আকাশ
পৃথিবীকে নীরবে করেছে চুবন,
আর পৃথিবী বক্তিমহ্যাতিতে
আকাশের স্বপ্নে হয়েছে বিভোর।
বাহু বয়ে চলছে প্রান্তরের উপর দিয়ে
কানে এসে লেগেছে তার বহু দোলা,

বনে বনে উঠেছে বহু-মর্মর
নক্ষত্রখচিত আকাশ হয়েছ উজ্জ্বল
আর আমার জ্বর মেলেছে
দুবাস্ত তার পাখা
চলেছে উড়ে স্বপ্ন প্রান্তরের উপর দিয়ে
যেন সে চলেছে ফিরে ঘরে।

অনুবাদ—ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায় ও রাজল রায়।

বুবার্ট দুই টিভেনসনের একটি গল্প আছে—সেটি এখন পৃথিবী
বখ্যাত। গল্পটির নাম ডক্টর জেকিল আণ্ড মিষ্টার হাইড।

একই লোকের কান্ডিনী। ওয়ুথ খেয়ে ডক্টর জেকিল হ'তেন মিষ্টার
হাইড। ডক্টর জেকিল ডক্স, কিছু মিষ্টার হাইড শিশাচ। একই
মাছুয়ের মনের মধ্যে এই দু'রকমের ডাবই আছে। ডক্টর জেকিল
দয়ার অবতার, কিছু মিষ্টার হাইড খুনে। ব্যাপারটা একটু
অস্বাভাবিক মনে হয়, একই লোক কেমন করে তার চেহারা পছন্দ
ওয়ুথ খেয়ে পালটে ফেলতে পারে? কিন্তু বীরা লগুন অদ্ভুত এক
বন্ধর থাকেন তাঁরা বৃহতে পারেন যে-তা সম্ভব। গ্রীষ্মকালের লগুন
প্রকৃতির রূপসাজ, ফুল গাছের সবুজ পাতায় মৌমাছির গুঞ্জন,
খোলা হাওয়ার খিয়েটায়ে, টেমস নদীর ধারে, হাইড পার্কে বা
রোজেক্টস পার্কের কনসার্টে, বিদেশী লোকদের গল্পগুজবে হাসিতে
লগনের একরকম সাজ কিছু শীতকালে লগুন বদলে যায়।
ডক্টর জেকিল যেমন বীভৎস হয়ে মিষ্টার হাইডের রূপ গ্রহণ করে
লগুন তেমনি হ'রে পড়ে।

ঠাণ্ডা, ব্রো, তুষার-গলা জল, তার সঙ্গে ধূসো মিশে কানার
ফুটি হয় কিন্তু সেগুলো সহ্য করা কঠিন নয়। সহ্য করা কঠিন
লগুনের কুয়াসা। সে কুয়াসা দাক্ষিণাত্যের সাদা কুয়াসা নয়।
লগুনের কুয়াসার রঙ হলুদ। কুয়াসার বাস খেয়ে বায়, ট্রেন চলা
বন্ধ হয়, এয়ারোপ্লেন নামতে পারে না। এই ঘোঁরা আর কুয়াসার
কলে ফুসফুসের নানারকম বাধি হয়, বহু লোক মারা পড়ে। কুয়াসা
লগুনের অভিযাণ। কুয়াসা হ'চ্ছে মিষ্টার হাইড। এই সময়
হরসেরা তৎপর হ'য়ে ওঠে, অদ্ভুতকারের স্রোতগো বাতাসানি হয়
পুলিশ সেখানে নিরুপায়। খুব শক্তিশালী আলোও কয়েক গজ
দূর থেকে দেখা যায় না। হঠাৎ কুয়াসার আটকে পড়া বাসগুলি
চলে ধীরে ধীরে—সায়নে কণ্ঠাটব মশাল জ্বলে চলে। তাতে পথ
দেখা যায় না, কিছু মশালটা একটু জোখে পড়ে।

এমন কুয়াসা বেশিখণ থাকে না। সাধারণতঃ আট মশ বটা
বা একদিনের মধ্যেই চলে যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর
মাসের কুয়াসা লগুনে ইতিহাস ফুটি করেছিল। এর ফলে প্রায়
চার হাজার লোক মারা পড়ে নয় বহু করে। এর ছাড়াই ছিল
তিনদিনের বেশি। পোক, ভাড়া, শূরোরদের প্রদর্শনী হচ্ছিল
তখন লগুনের অসিল্পিয়া হলে (এজন্যের বোডের খুব কাছে)।
কয়েকটি পোক তাতে মারা পড়ে। হাজার হাজার গাড়ি লোকেরা
হাঙ্গার কলে চলে যায়, অফিসে লোকেরা দেরি করে আসে, কোন
লোক বাড়ী থেকে বের হ'তেই ভয় পায়। এই ধরনের কুয়াসার
নতুন নামকরণ হয়েছে smog—Smoke এবং fog এর
সমষ্টি। Smokeই বেশি বলে মনে হয়। কুয়াসা সম্পর্কে
প্রচুর কথা হ'য়েছে লগুনে। চার্লস ডিকেন্স কুয়াসার অদ্ভুত বর্ণনা
দিয়েছেন। টি, এস, এলিয়ট কুয়াসা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।
আবহাওয়া বিশারদেরা কুয়াসার পূর্ণাভাব খবরের কাগজে, রেডিওতে
প্রচার করেন। বার বার প্রচার করা হয় রেডিওতে: কুয়াসা
আসছে...সাবধান।

কুয়াসা কেমন করে আসে? একবার তাও দেখেছিলাম। আমি
এক নটরাজ শর্মা শেফার্ডস ব্লক থেকে বাড়ী ফিরছি হেঁটে। রাত্রি
তখন বারোটা। দুই তিন মাইলের বেশি। বাস সমস্ত চলে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হিমালীশ গোদামী

সিরেছে, টিম্বর বন্ধ হয় হয়। পরদিন ছুটি, অতএব নিশ্চিতে আমবা
কোন এক বিষয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করতে করতে পথ
ইটকিলাম। কিছুদূর এভাবে ইটবার পর নটরাজ হঠাৎ উত্তেজিত
হয়ে বললো, ঠপ! ঠপ!

অর্থাৎ আমার মতামত তার সম্মত হচ্ছিল না। আমার মত
গ্রহণীয় নয় একেবারেই, অতএব ঠপ! অর্থাৎ, অমন কথা বলা
বন্ধ করে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটি ট্যাক্সি বাড়িল—শরীর উত্তেজিত
হয়ে হাত নেড়ে ঠপ! ঠপ! বলাতে ট্যাক্সি খেয়ে পড়ল।
শর্মা হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল। এমন সময় এমন একটা কাণ্ড
সে আশা করেনি। ট্যাক্সিতে গেলে মশ মিনিটে বাড়ী পৌঁছে
যাব, এবং এত কম সময়ে তর্কের কোন মীমাংসা হবে না মনে
করে দুহুনেই দমে গেলাম। কিন্তু তবু আমবা ট্যাক্সিতে বসলাম।
ট্যাক্সিওয়ালাকে হত্যা করতে ইচ্ছে হ'ল না।



কুয়াসা (খুব ঘন নয়)

ট্যান্ডিতে আমরা আধ মিনিট উঠছি যাত্র, ট্যান্ডি অল্প একটু চলেছে হঠাৎ ট্যান্ডি একেবারে অ্যাবাউট টার্ন। একওয়ারে যোড় চওড়া ছিল—ডাইভার অতর্কিতে ট্যান্ডি হুগিরে নিয়েছে। ট্যান্ডি ডাইভার বললো : নেমে পড়—আমি বাব না।

নটরাজ আমাকে বলল, ব্যাটা মধু টেনেছে নিশ্চয় ?

আমি ট্যান্ডি ডাইভারকে বললাম, নামব না।

ডাইভার বললো, ব্রাইমি। (কী বিপদ!) কুয়াসা আসছে—তার ভেতর দিয়ে গাড়ি বাবে না।

আমরা আবার ফুটপাথে দাঁড়ালাম। বলতে হয় পথে বসলাম, কারণ একটা ঘন কুয়াসার দেওয়াল আমাদের ঘিরে ফেলল। ট্যান্ডি ডাইভার পালিয়ে গেল বিছাৎ গহিতে।

কুয়াসার ফোলাটা এল আস্তে আস্তে। এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। অস্বাভাবিক জায়গাটি হঠাৎ এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। তরু ফুললাম।

এবার?

নটরাজ লম্বা উষ্মেগের সঙ্গে বললো, এবারে আর বাড়ীতে পৌঁছানো বাবে না। বিছু দেখা যাচ্ছে না। এ কুয়াসা কখন বাবে কেউ কখনো বলতে পারে না।

আস্তে আস্তে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। লণ্ডনের ফুটপাথ কোলাকাতার মত নয়, প্রতি ছুটু ঘুরে সেখানে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয় না। ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যজনক বলেই এখানে উল্লেখ করলাম। অনেকেই এজন্য ইংরেজদের বুদ্ধিতে পাবেন না। ফুটপাথে যদি গর্ত না থাকবে তাহলে আদৌ ফুটপাথ রাখা কেন? কিন্তু যে কোন পরিস্থিতিতে মানুষ নিজেকে মানিয়ে নেয়, তত্বেব গর্তহীন ফুটপাথকেও আমরা মানিয়ে নিয়েছিলাম। নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা হাঁটছি। সে পথের শেষ নেই বলেই মনে হল। আলো, স্ট্রিটলসনের জ্বালা glimmered like carbuncles—বোধ হয় মিনিট পোনেনরো চলেছি। এমন সময় হঠাৎ কান্না এল কথাবার্তার আওরাজ।

এই রাত দুপুরে হঠাৎ তা অসম্ভব বলেই মনে হল। একটু এগিয়েই বৃষ্টি পায়লাম যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক। এবটা সারারাত খুলে রাখা 'ন্যাকবার' সেট—ভাতে প্রচুর লোকের সমাবেশ। প্রত্যেকেই বিষাদ চা খাচ্ছে আর কাশছে। কাশছে অবশ্য কুয়াসার জ্বা। সেখানে আমরাও গাড়িয়ে পড়লাম আর বিষাদ চা খেতে লাগলাম। বিষাদ না হলে সম্ভবত ইংরেজরা সেটকে চা বলেই মনে করে না।

সেখানে হু-চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ হল। বিপদে ইংরেজরা ফুলে বায় যে জাত হিসেবে তাদের গভীর থাকবার কথা, আলাপ না করিয়ে দিলে কথা বলা উচিত নয়। তারা তখন প্রপলভ হয়ে ওঠে—কথা কইতে শুরু করে। খুব ধারণা আবহাওয়া, তাই নয়?—এক জন পরতাল্লিষ বছরের বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো আমাকে। পঞ্চাশ বছর পর্বস্ত বা অনেক সময় পঞ্চাশ বছর বয়সের লোকও বিলোতে ইঙ্গা ম্যান। আমি উত্তর দিলাম, না বেশ ভালই ত লাসে এই বকম আবহাওয়া। শুনে ইংরেজরা আর কথা বলল না। লণ্ডনের আবহাওয়ায় খারাপ না বললে যে চটে না সে ইংরেজই নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভয়েলোকের কাছ প্রচুর কমা প্রার্থনা করলাম। বললাম, লণ্ডনটা নরকের সমান। এমন আবহাওয়া শরতাবেরই কেবল পছন্দ হ'তে পারে। এই শুনে ইংরেজটি বেজার খুসি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাবিস্তানী? আমি বললাম, না আমি ইণ্ডিয়ান।

প্রায়ই এমন প্রোগের জবাব দিতে হয়েছে। পাকিস্তান ব্যাপারটা বহু ইংরেজ ঠিক বুঝতে পারে না। তাদের ধারণা ও-হুটি একই দেশ। ভারতীয় মানেই পাকিস্তানী, পাকিস্তানী মানেই ভারতীয়। আমরা বলি, তাই ছিল বটে কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন ভারতবর্ষ ছোট হ'য়ে গেছে—সমস্তা আরো বেড়েছে। সীমান্ত-সমস্তা, জলসমস্তা ইত্যাদি।

ঘন কুয়াসার পথ চলা যায় না, অথচ বাড়ীতে পৌঁছতেই হয়। আমি এবং নটরাজ বাড়ীর পথ খুঁজতে আবার চেষ্টা করলাম ন্যাকবার থেকে বেরিয়ে। কিন্তু হাঁটাই সার হল। কয়েক ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরলাম—একই পথ ধরে বত যে ঘুরপাক খেলাম তার তার সংখ্যা নেই। অবশেষে রাস্তার ধারের একটি বেঞ্চি শ্রান্ত হয়ে বসে বসে বৃষ্টিতে লাগলাম। পরদিন সকালে কুয়াসা কেটে যাওয়াতে দেখতে পেলাম আমরা বাড়ী থেকে মাইল ধানেক ঘুরে একটা কবরখানার কাছে বসে আছি। এই কবরখানাটির নামে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড।

কুয়াসার অনেক গল্প আছে। চুবি ডাক্তারি রাহাংজানি ছাড়াও অন্ত গল্প। গভীর কুয়াসার গাড়ি সব আঁড়ে আঁড়ে চলেছে। একটি গাড়ি অল্প গাড়ির শেহেনের আলো দেখে এগুচ্ছ আঁড়ে আস্তে। হঠাৎ সামনের গাড়িটি থেমে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ—শেহেনের গাড়িচালক তখন অস্থির হয়ে উঠেছে—বলছে, কী হ'ল, এখানে হঠাৎ গাড়ি থামল কেন? উত্তর এলো। গাড়ি হঠাৎ থামেনি—আমি ইচ্ছে করেই থামিয়েছি, কারণ এটা আমার প্যারাল।

আর একটি গল্প আছে—কুয়াসার দিগ্‌জ্ঞান একজনকে সেবে অল্প একজন অপরচিত লোক বললো, আপনি কোথায় বাসেন?
—আমি বাব প্যাড্‌জিটন টেনে।

—আমার হাত ধরে এসো, আমি নিয়ে যাবি।

নানা পথ ঘুরে প্যাড্‌জিটন টেনে পৌঁছে দিল লোকটা অতি সহজেই। আবাক হয়ে গেল লোকটি। বললো, আপনি নিশ্চয়ই এই ঘন কুয়াসাতেও স্পষ্ট দেখতে পান?
লোকটি উত্তর দিয়েছিল : না, তা নয়। এমন ভাবে যাওয়া আমার অভ্যাস আছে—কারণ আমি অন্ধ।

লণ্ডনের বেশি পাড়ায় আমি থাকিনি। ট্রানমোর, একওয়ার, মিলহিল, টটেনহাম, জারিড, ইলফোর্ড, গ্রীনিজ, ট্রিট, স্প্যাপার, রিমেন্ট, উইলডন, ইলিং হেন্ডন, কেন্টন, পপলার ইত্যাদি কত পাড়া যে আছে তার হিসেব নেই। লণ্ডনে সাতাশ হাজারের বেশি বাস্তাই আছে—বাস্তাগুলির নাম প্রচুর পরিমাণেই বিদেশী। আর্ভিসিনিয়া রোড, অ্যাবিট্টল রোড, বাটাভিয়া রোড, ব্যাডেরিয়া রোড, বেলল রোড, বেরমুডা স্ট্রীট, বর্নিও স্ট্রীট তো আছেই, এমন কি মন্ডো রোড পর্যন্ত আছে। মন্ডো রোডটি বেকওয়ারটার টিউব ঐশনের কাছেই। সেখানে আমি জাহাজীর আবেলসেরিয়ার সঙ্গে একটি ক্লাবে যেতাম। জাহাজীর জাতে পাশি, ধর্ম কমিউনিষ্ট-বিরোধী।

অভিনয় করার দক্ষতা ছিল, বি. বি. সি-তে টেলিভিশনে কিছু অভিনয় করেছে। কিন্তু তার কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিজম সম্পর্কে এত ঘৃণা ছিল যে মস্তো রোডে কখনো যায়নি। ঐ রাস্তাটির হোয়াটস বাঁচিয়ে চলবার জন্য সে অপর দিকের ফুটপাথ দিয়ে যেত। আমরা তাকে এই ব্যাপারে খুব ঠাট্টা করতাম। বলতাম, জাহাঙ্গীর, একটি ফ্লাট পাওয়া যাচ্ছে, হুশানি ঘর—ঠাণ্ডা জল গরম জল সব পাওয়া যায়, নিজস্ব ফোন আছে, কার্পেট দেওয়া মেঝে ভাড়া মাত্র তিন পাউণ্ড। ফ্লাটটা নেবে?

জাহাঙ্গীর বলতো, নিশ্চয় নেব। কোথায়?
—মস্তো রোডে।

জাহাঙ্গীর তা শুনে মারতে আসত। বলতো, এমন ঠিকানা আমি কিছুতেই থাকব না।

লণ্ডনের প্রতিটি পাড়ার বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আছে প্যারিসে বাসিন্দে বা কোলকাতায়। কিন্তু চার্চ এবং মন্দের দোকান সবত্রই এক রকম মনে হয়েছে। চার্চগুলি সংখ্যায় এত বেশি কেন তার অর্থ প্রথমে বুঝতাম না, পরে বুঝছি। চার্চগুলির মধ্যেও জাতিভেদ প্রচুর। ক্যাথলিক চার্চ, মেথডিস্ট চার্চ, চার্চ অফ ইংল্যান্ড, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি নানা জাতের চার্চ আছে। কিন্তু মন্দের দোকানে যেমন বিক্রি কমছে বিশেষ করে বীয়ার, তেমনি চার্চেও লোক কম যাচ্ছে। বেকার না হলে চার্চে বাবার কি প্রয়োজন আছে? চার্চে অবশ্য গিয়ে এককালে প্রচুর লোক বিয়ে করত, এখন তা কমে যাচ্ছে। চার্চের বদলে হয় টাউন হল। চার্চগুলির আর হয় সব চেয়ে বেশি তখন, যখন দেশের লোকেরা বেশি মাত্রায় বেকার হয়। বেকার হলে লোক দুর্বল হয়ে পড়ে, বলে, ডগবান আমাকে একটা চাকরি দাও। চার্চে গিয়ে রীতিমত প্রার্থনা শুরু করে। অবস্থা খুব খারাপ হলে হতো দিয়ে পড়েও থাকবে হয়ত কাতারে কাতারে লোক। ওজ্জ্বল চার্চের বীরা মোহাম্মদ তাঁরা চান যাতে দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়। আর তাহলে বেশি হয়। শিক্ষিত হওয়াটাও তাই চার্চ পছন্দ করে না। কারণ শিক্ষিতেরা বড় অগ্রযিধেজনক প্রশ্ন করে বলে।

একটি অসম্ভব জিনিস আমার চোখে পড়েছে। একজন লোক বিনা চিকিৎসার বা কর্তৃপক্ষের অধবেশার এদেশে মারা পড়লে তা নিয়ে এমন হৈ-চৈ করে ওঠে লোকেরা যে তা একজন ভারতীয় হিসেবে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। এর কলে গবর্ণমেন্ট সম্ভ্রম হ'য়ে ওঠে, গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমন বাস্তব আর না হয় তার ব্যবস্থা করে। এতে গবর্ণমেন্ট দুর্বল দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামান্য মানুষের অবহেলায় মৃত্যুর জন্য যদি গদি ছাড়তে হয় তাহলে সে দেশের লোকেরা নিতান্তই বিজ্ঞত তাতে আর সন্দেহ কি। লোকেরা না খেয়ে রাস্তার পড়ে থাকবে, বুড়িতে, কাবায়, জলে বিনা চিকিৎসার বহু লোক মরলেও আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট কেমন টিকে থাকে। এ যে শক্ত গভর্ণমেন্ট তাতে আর সন্দেহ কি। ইংরেজদের উচিত আমাদের দেশে এসে এসব শিখে যাওয়া। আমাদের দেশের রীতিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা। কিন্তু ইংরেজের কি শেখবার মত সামান্য মাত্র বুদ্ধিও আছে?

লিওল্ড গার্ডেনে আমরা প্রায় এক বছর ছিলাম। মিসেস মেসের পোশাক বা চরিত্র গুর মধ্যে পরিবর্তন হয়নি। আমাদের

ভাড়াটে হিসেবে গেয়ে তাঁর ভালই লাগত। কিন্তু তাঁর ছেলে হলকোর্ড হঠাৎ ছিন্ন করল আমাদের ঐ বাড়ীতে সে অল্প একটি ভাড়াটেকে আনবে। তারা নাকি আরো বেশি ভাড়া দিতে রাজি হয়েছে। আমরা নোটিস শেলাম অতএব। আমরা কালো বলে নয়। বারা টাকার দাম বোঝে তাদের কাছে কালো সাধারণ ভেদ না থাকারই কথা।

কালো সাধারণ সম্পর্কে ইংল্যান্ডে নতুন করে চিন্তা করা হচ্ছে। ফ্যাসিষ্ট মোসলের দল বলছে, বুটেনকে সাদা রাখো। আন্দোলন করছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বেন তেন প্রকারেণ তাদের মারতে হবে। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করতেও এরা উদ্ধান দেয়।

খুবই খারাপ। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতীয়রা খুব আশঙ্ক পা়। সায়েবরা যে ভারতীয়দের কালো মনে করে না এতে তারা খুব খুশি। নিগ্রোদের জন্য খুব কম ভারতীয়ই সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলে। কালোবিরোধী আন্দোলন হলে ভারতীয়রা বড়জোর বলে, কী বিপদ আমাদের জন্য আমাদেরও কবে বিপদ হয় কে জানে।

মামা, অর্থাৎ কালো আফ্রিকান বা জামাইকান। বাঙালীর আবিষ্কার এই কথাটি ব্যঙ্গ করে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বলা হয়। সাধারণদের জন্য নাচ ঘরে ভারতীয়রা সহজে যেতে চায় না, তারা নাচের বিরুদ্ধে বলে নয়, বা তাদের মেয়েদের সঙ্গে মিশবার ইচ্ছে নেই বলে নয়, কারণ সে সব নাচ ঘরে আফ্রিকানদের বাতায়ত।

কেবল বাতায়ত নয়—আফ্রিকান ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজ মেয়েরা বেশি নাচতেও চায় কারণ সাধারণত তারা নাচতে জানে, ভারতীয়রা নাচতে জানে না তখন।

কালোর বিরুদ্ধে আর্কোণ ভারতীয়দেরই বেশি, সেটা আমি বিশেষ করেই লক্ষ্য করেছি। দিল্লিতে চার জন আফ্রিকান ছাত্রও দেখেছিলাম আমাদের ঘোরতর কালোবিদ্বেষ।

আফ্রিকানদের মামা বলা ভাই আজীব্য সম্বোধনে নয়। কথাটি মাউ মাউ নামক আফ্রিকার অল্পমত সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেই তৈরী।

লণ্ডনে গিয়ে যখন ল্যাণ্ডলেডি কালো রঙ বলে কোন ভারতীয়কে ফিরিয়ে দেয় তখন রাগ না করে এই কথাটি বেন মনে রাখেন।

বর্ণবিদ্বেষ আমাদেরও কম নয়। এর পর যে বাড়ীতে শেলাম এবং তারপর আরো পাঁচ বছর ঘরে কোন কোন

বাড়ীতে কেমন তাইে ছিলাম তার ইতিহাস বলবার ইচ্ছে রইল। আগাতত: আমরা কাহিনী এখানেই শেষ করছি। কারণ অনেক কিছু বলা হলেও অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। অতএব আসলে কাহিনীর কোনদিনই শেষ হয় না। আমি হু—একজন জঙ্গলোকে জানি তাঁরা ইংল্যান্ড আমেরিকা সবচেয়ে হু—একটা কথা, কথাপ্রসঙ্গে না বলে পারেন না। একজন বলেন, যখন লণ্ডনে ছিলাম

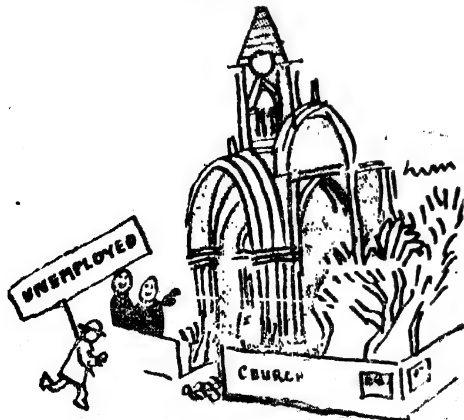


আকেল সেহিয়া

তখন খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। বলে একটি ঘটনা শোনান। তাঁর সঙ্গে বহুদিন এর আগে দেখা হয়েছিল অথচ সেই আশ্চর্য ঘটনাটি আগে বলেননি। আগে তাঁর মনে পড়েনি। খুবই স্বাভাবিক। আমি কাহিনী বলতে গিয়ে দেখছি ব্রেনিম ফ্রেন্সেট সম্বন্ধে হয়ত আরো অনেকখানি বলা যেত। এজন্যের রোডেও তো আরো কত কি ঘটেছে সেগুলো বলা হ'ল না। এজন্যের রোডের কাছাকাছি অসিম্পিয়া একজিবিশন হল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিনি। তা ছাড়া শুনলি চ্যাটার্জির ১৯৩১ সালের বিশাল এক বোর্ড গাড়িতে চড়ে লণ্ডনের গথে গথে নানা কাণ্ড করে বেড়ানো (দুইটানা করতে করতে বৈচ বাওয়ার প্রায় পঁচিশটি ঘটনা হু' ঘটায় ঘটেছিল), আব বীয়া বোসের নানারকম আশ্চর্য্যবী গল্প। বীয়া বোসের আসল নাম কেউ এখন জানেন না—বরস তাঁর পঞ্চায়—বহুর চরিত্রকে বিলেতেই আছেন।

লণ্ডনের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল প্রায় অবাধ স্বাধীনতা। আর ভাল লেগেছিল এর ছুটি গরম কাল আর ছুটি বসন্ত কাল। ভাল লেগেছিল সন্ধ্যার রাস্তাগুলি। যেখানে টিচারদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ ছিল প্রচুর। ছাত্ররা রাস্তা পাইপ এবং সিগারেট বা চুকট খেতে পারত। এত বহুখপূর্ণ আবহাওয়া আমি আর কোথাও কর্তব্য করতে পারি না।

ভারতবর্ষ থেকে যে ইংল্যান্ডে প্রতি বছর প্রচুর ছাত্র যাচ্ছে তার এই একটা কারণ। আরো অল্প অল্প কারণ আছে। আমাদের দেশের টিচারদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় আছে। কিন্তু একেবারে অহেতুক বোধ হয় নয়। বুঝতে না পারলে কানমলা, টাটি, বেকের উপর ঠাড়ানোর ব্যবস্থা আমাদের দেশে। অতএব ছাত্ররা বুঝতে না পারলেও বলে থাকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নকল করতে না পারলে টেবিল চেয়ার ভাঙে। ইংরেজরা যে সবাই খুব শিক্ষিত হয় তা নয়, কিন্তু শিক্ষিত হতে তাদের বাধা নেই। স্বাধীন বৃত্তিগুলিকে হুমড়ে ভেঙে দেয় না তারা। আমাদের দেশে শিক্ষা বলে একটা জিনিস চলে—যা বিলিতিও নয়, এসেসীয়ও নয়। একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। গুরুমার বার হয়ত একটা নামকরণ করতে পারতেন। তবে বিলেতে রাস্তা সিগারেট চুকট খাওয়ার লজ্জাই যে দেশের শিক্ষা ভাল তা বলছি না।



কিন্তু বিলিতি শিক্ষার দোষও আছে। আমাদের দেশে বিলিতি শিক্ষা চলবে না, কারণ আমাদের দেশের সমাজ অন্তরকম। তাই অনেকেই বিলেত থেকে ফিরে এসে বেশ কই পান নানা ব্যাপারে। হু' তিন বছর ওখানে থেকেই এখানে এসে কাটা-চামচ-চুরি ছাড়া তাঁদের খাওয়া হয় না। বিলিতি খাবার বা অথচ তাই শ্রেষ্ঠ বলে এরা গ্রহণ করেন। তারা কুটি মাখন দিয়ে মাংস সেদ্ধ খান। বিলিতি নাচ নাচেন।

তবুও অধিকাংশ লোকেরই বিলেত দেশটা দেখা উচিত। বিলেত আমেরিকা বা যে কোন বাইরের শিল্প উন্নত দেশে থাকলে সে সব দেশ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়—সেই সঙ্গে ভারতবর্ষকেও চেনা যায় ভাল করেই। ভারতবর্ষকে চেনবার লজ্জাই ভারতীয়দের বাইরে খাওয়া উচিত এবং বেশ কিছুদিন থাকতে উচিত। অবশ্য আত্ম-সম্মান বজায় রেখেই সেটা করা উচিত। অনেকেই এখানে সাহেব দেখলে গর গর ভাবে—সে অফিসের মেসেঞ্জারই হোক বা হোটেলের যি চাকরই হ'ক। এই গর গর ভাবটি বতদিন না কাটবে ততদিন আমাদের উন্নতিও হবে না, চরিত্রও গড়ে উঠবে না। ইংরেজদের মধ্যে অনেকগুলি ভাল জিনিস আছে—যেমন আছে জার্মানদের মধ্যে, রাশিয়ানদের মধ্যে বা আমেরিকানদের মধ্যে, সেগুলি নিতে হবে—নকল নয়, গ্রহণ করতে হবে। তবে ভ্রমণ সার্থক হয়।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী রূপের নীতিসত্তা যেমন খুলে দরতে হবে, তেমনি তাদের দেশের শিল্পপ্রিয়তা, সাহিত্য, মানবিকতা বোধকেও প্রশংসা করতে হবে। নানাস্থিত বিচার করতে হবে—নানা সময়ে, নানা ভাবে। লণ্ডন বা পারিসকে বুঝতে চেষ্টা করতে তো হবেই—যেমন বুঝতে হবে মস্কো ওয়াশিংটন বা পিকিংকে, কিন্তু তুললে চলবে না আমাদের স্থান কোলকাতায়, দিল্লিতে বা বোম্বাইতে—এই ভারতবর্ষে। বিলেত দেশটা সম্বন্ধে নানারকম লেখা বিরিয়েছে। নানা ভাবে নানা লোকে দেখেছেন—এবং দেখা ফুরায়নি, কোনদিনই ফুরাবে না। নতুন ঘটনা, নতুন মাহুদ নতুন ভাবে লিখবেন সে দেশের কথা। ইংরেজরা নিজেরাই তাদের দেশ সম্পর্কে কত বই যে বার করে তা একজনকে পক্ষে পড়ে ফেলা সম্ভব নয়। নানা সমস্তার কথা, রাস্তার কথা, আলোর কথা, যোগের কথা, কালোবিষের কথা, বেকার সমস্তার কথা। তার নিভীক ভাবে অল্পত নিজেদের মত প্রকাশ করে। অল্প দলের বলে তার মতামত প্রকাশে বাধে না। হাইড পার্কে কনসারভেটিভ থেকে আরম্ভ করে আনাকির্ভি পর্যন্ত সবাই বক্তৃতা দেন। লোকেরা প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু বক্তাকে লক্ষ্য করে ইট হোঁড়ে না। এই দেশে মাহুদের অল্প নানারকম ব্যবস্থা আছে—যেমন আছে কুকুরদের জন্য। অনেকে অবাক হন এই ভেবে যে এদেশে কুকুর বিভাগের এত খাতির কেন? তাদের জন্য এত খরচ না করে পূর্ব আফ্রিকায় যে বুটশ প্রাণা না খেয়ে মরছে বা জীতাসারের মত অবস্থায় আছে তাকে বাঁচানো হয় না কেন? প্রশ্নটা ভাল এবং এমন প্রশ্ন করাও হয়। তার জন্য নানারকম কাগজ রয়েছে যেমন ডেলি-ওয়ার্কার, ম্যাগেটর গার্ডিয়ান বা নিউ ট্রেসম্যান। একথা বলতে তাদের কেউ দেশজোহী বলে আখ্যা দেয় না।

ইংরেজরা বক্তৃতা দিতে ভালবাসে, তার প্রমাণ পাওয়া বাবে সভা সমিতির বিজ্ঞাপনে। আমাদের দেশের মত সেখানে মেট্রো

সভা প্রায় হয় না। সভাতে বক্তৃতা শুনে গলে সাধারণত টিকিট লাগে। সাধারণত বক্তাদের বক্তব্য বলে কোন বস্তু থাকে। আমাদের সভার সঙ্গে তুলনা করা ভুল। আমাদের সভা সমিতিতে প্রায় সময়েই উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না বিশেষ করে রবীন্দ্র জন্মতিথির সভাগুলিতে। শেজপীয়ারের বেশে শেজপীয়ার সম্পর্কে এত সভা হয় না, কারণ সেজ্ঞ পড়াশুনা করতে হয়। একমাত্র বিশেষজ্ঞেরাই সেখানে বক্তৃতা দেন।

লণ্ডন সম্পর্কে এসবই হয়ত পুরনো কথা—আমাদের কাছে লণ্ডন এখন অতি নিকটে। খুব কম লোক আজকাল পাওয়া যায় যারা লণ্ডন যাননি বা যাওয়ার কথা ভাবছেন না।

লণ্ডনকে অবজ্ঞাই ভোলা শক্ত। লণ্ডনকে পুরো চেনা যায়না, কিছু না কিছু রহস্ত এর আছেই। যত বই-ই লেখা হোক, এর পুরো চরিত্র একদিনে ধরা পড়বে না। যেদিন পড়বে সেদিন

লণ্ডনও পুরনো হয়ে যাবে। তাই লণ্ডনকে চেনাটার উদ্দেশ্য আমি কিছু লিখছি—সে চোঁটা করা বোকামি। লণ্ডনের ল্যাণ্ডলেভিদের আমি কিছু চিনেছি, তারই বর্ণনা করতে গিয়ে সে প্রসঙ্গে কিছু কল্পনা এসে গিয়েছে। ছয় বছর বাস করে দেড় বছর আগে লণ্ডন থেকে কিয়েছি—এখন মনে হয় (অতীত হামারষ্টাইনের পার্যাসিক বদল করে) লণ্ডনকে শেষ বন্ধন দেখেছি তখন তার ছন্দ ছিল উচ্চ এবং আনন্দময়। তাকে বতাই তারা বদল করুক না কেন আমি সেই ভাবেই তাকে মনে রাখব :

The last time I saw London
Her heart was warm and gay
No matter how they change her
I'll remember her that way.

সমাপ্ত

শুধু রাতটুকু পার হ'লে

কৃষ্ণ ধর

রাতটুকু পার হ'বে বলে'
সেই তিরদিনের অন্ধকারের মাহুৎগুলি
এক জল-বোঁদন নদীর পায়ে জটলা করছিল
রাতটুকু পার হ'বে বলে।

সারাটা জীবন ওদের কাটল বন্ধনার,
এ ওর মুখের আদল ঠাহর করতে পারে না
সবই অন্ধকার,
এক বখির দৃষ্টির জগত।
কোনো শব্দও যেখানে পৌঁছয় না,
কোনো পাখির ডাকও না।
এক পাল বুনো মোবের মতো জমিটি রাতের পাঁচিল,
ওরা এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

কোথায় কখন ভোর হ'ল
তার খবর ওরা রাখে না।
এক কবজ অন্ধকারের পাশে শুয়ে আছে
যেন কতকগুলো জীবন্ত মাহুৎয়ের শব্দ।

একদিন কী করে যেন টের শেল,
কাঁবা যেন ফেরী নৌকায়
সেই টাল-টাল নদীটা পার হচ্ছে।
ওরা বললে : আমরাও যাবো,
আমাদের এই রাতটুকু পার করে দাও।
আমরা নদীর শব্দ শুনে পাচ্ছি
টেউয়ের কোলাহল কানে লাগছে।
আমাদের পার করে।

তারপর সেই রাত আর দিনের
নদীর ওপর তৈরী করল ওরা
বিশ্বাসের এক সেতু,
সেই পুলের ওপর দিয়ে
হাত ধরাধরি করে মাহুৎগুলি
নদী পার হ'ল।
সেখানে এক উজ্জ্বল দিন
অটেল-খুঁশি নিয়ে বসে আছে,
ওরা এতদিন আনন্ডেও পারেনি,
শুধু রাতটুকুর জন্ত।
বিশুদ্ধ বন্ধুর মতো দিন
ওদের গ্রহণ করল,
ওদের জীবনের রাত এবার শেষ হ'ল
এক উজ্জ্বলতার দিনের আলোতে।
ওরা জীবনের ভিতরে গিয়ে বসল,
এক গলা আলোর ভিতরে।
মাথার ওপরে এক কাক পাখি
শিশু দিতে দিতে উড়ে গেল,
ওরা বললে, এসো আমরা গান গাই।
অন্ধকারের মাহুৎগুলো তখন
গভীর বিশ্বাসে,
গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগল,
হৈ হৈ আনন্দে,
শুধু রাতটুকু পার হলেই
এতদিন, এত তার অসুখ খুঁশি।
হে ঈশ্বর, আমরা বেঁচে গেছি,
আমাদের অন্ধকার বুকেছে,
শুধু রাতটুকু পার হ'য়ে



ভবানী মুখোপাধ্যায় পঁচিশ

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের প্রচণ্ড উত্তাপ সারা যুরোপকে দাবানলে জ্বালাচ্ছে, সেই দাবানলের মধ্যে প্রশান্ত চিত্তে নীলকণ্ঠের মতো সেন্ট লরেন্সের শান্তি নীড়ে সমাহিত হয়ে আছেন বার্নার্ড শ'। Common sense about the war-এর জন্য একদিক থেকে আসছে গালাগালি আর অপরদিক থেকে জাতি সত্তার প্রশস্তি-মূলক প্রস্তাব, সারা দেশ জুড়ে যেখানেই তাঁদের সভা হয়, তারা বার্নার্ড শ'কে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করে।

এমনই একদিনে হেসকেন্থ পীরসন বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি মেসোপটেমিয়া বাবোন তাই একবার দেখা করতে এসেছেন। কথায় কথায় শ' বললেন, সৈন্য জীবন কি রকম লাগছে তোমার?

পীরসন বললেন, ভালো নয়, তবে প্রতিবাদ করার সাহসও নেই।

শ' বললেন, ওদের অবস্থা ডিসপ্লিনটা চমৎকার, কিন্তু সেটা হল উলটো দিক। যুদ্ধ যে কেন হচ্ছে ওরা বোঝে না। একজনের পক্ষে অগ্নি নিবোধের মত বধাসাধ্য প্রতিবেদকের ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিন্তু বাড়িতে আশুন লাগলে আর প্রতিবেদক ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? তখন সে আশুন নিভানোর চেষ্টা করবে। কে এই যুদ্ধ বাধালো, কার জন্য এই যুদ্ধ, এই সব বলে বা এই যুদ্ধ করাটাই অন্তায় এ সব কথায় যুদ্ধ থামানো যাবে না। আমরা সবাই জানি এটা অন্তায়, তবু আমাদের সকলকে আশুন নেবানোর কাজেই লাগতে হবে। তবে এ কথাও বলবে এ আশুন অনেক তাড়াতাড়ি নেবানো যাবে যদি ছ'চায় জন রাজনীতিককে হত্যা করা যেত।

পীরসন প্রশ্ন করলো—এখন নতুন কি লিখছেন?

শ' জবাবে বললেন—শেখতের ভঙ্গিতে অবসর সময়ের একটি নাটক রচনার হাত দিয়েছি। এ আমার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি। তোমার শেখতের নাটক পড়া আছে। অদ্ভুত নাট্যকার! একেবারে তোমার উপযুক্ত। থিয়েটার সম্পর্কে অসুখ

জান। শেখত পড়ে মনে হয় যেন নাটক রচনার আশার সবে হাতেখড়ি হয়েছে। একটা ধর্মমূলক রচনার হাত দিতে হবে। হাতে সময় থাকলেই বাইবেল পড়ছি।

পীরসন বললেন—ছোটবেলার বা পড়েছি ও-সব তাড়াতাড়ি আমার জীবনটা কেটে যাবে।

—এই বই ছোটদের বই নয়। বস্তুতঃ না নাভেল আর নাটক ইত্যাদি অসংখ্য ট্রান্স পড়ে ক্লাস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ এই বই তুমি কি করে বুঝবে?

Heart break House নাটকের ভূমিকার শেষে বার্নার্ড শ' লিখেছেন—You cannot make war on war and on your neighbour at the same time. War cannot bear the terrible castigation of comedy, the ruthless light of laughter that glares on stage.

এই নাটকটি আকারে স্মরণীয়, এই নাটকটি নাট্যকারের মতে শেখতের ভঙ্গিতে রচিত—A Fantasia on english themes in the russian manner—এই নাটকেই বার্নার্ড শ'র পৃথিবী সম্পর্কিত হতাশা ও অবিবাসের প্রথম অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। এইচ, জি ওয়েলসের মতো প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পরিত্যক্ত বার্নার্ড শ' বিশ্বাস রাখতেন যে মহাজাগতিক বিপর্যয় অবশ্য ঘটেবে কিন্তু প্রগতি অনিশ্চিত। কিন্তু এই কাব্যের পর তাঁর বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এল, একেবারে অবশ্য ভাঙলো না, এই কারণেই বার্নার্ড শ' আরো ঘনিষ্ঠভাবে কমুনিজমের প্রতি অভিযুক্তী হলেন।

Heart break House যখন লেখা শেষ হল তখন বার্নার্ড শ'র বয়স বাট অতিক্রম করেছে। Heart break House বার্নার্ড শ'র চোখে দেখা ১৯১৩-র ইংলণ্ড। লাইট হাউসের সতর্ক-আলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ইংলণ্ডের তহনী এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের গায়ে চূর্ণ হচ্ছে। তেকটব হুসারি তাই—ক্যাপ্টেন দট ওভারকে বলে—And this ship we are all in, this soul's prison we call England?

নাটকের মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে, কিন্তু অদ্ভুত এবং ভূমিকা। নাটকটি লিখিত হওয়ার দশ বছরের আগে অভিনীত হয়নি, কারণ মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নাটকটি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে সফল হল স্মরণীয় উত্তেজনা।

W. H. Auden বলেন—For all his theatre about propaganda, his writing has an effect nearer to that of music than the work of any of the so-called pure writers.

বার্নার্ড শ'র ব্যবহৃত সলাপের হৃদয় এবং সুর মানুষের তাঁর বস্তুবাক্যে দৃঢ়তর করেছে। Auden-এর উক্তি বার্নার্ড শ'কে সঙ্গীতকার হিসাবে বিচারে সহায়তা করে। বার্নার্ড শ'র সমসাময়িক বন্ধু, সতীর্থ ও শিষ্যবৃন্দের রচিত 'সমসাময়িক' নাটকের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র মৌল প্রভেদ অনেকখানি।

শ'র পরিণত রচনার সঙ্গীত একটি বিশেষ লক্ষণ। নাটকে তার উপস্থিতি পাদপুঙ্খের প্রয়োজন নয়। সর্বপ্রাণী সার্বভৌমত্বের দাবীতে। সমালোচকদের মতে এরই নাম sharian sonata

বার্ণার্ড শ'র এই জাতীয় সকল নাটকাবলীর অন্ততম Heart break House, আর এই নাটকে শেভিয়ার ভাববাদের প্রাধান্য বেশী। এই নাটকের উপ-নামকরণ a Fantasia in the russian manner on english themes দেখেই বোঝা যায় যে এই সময় বার্ণার্ড শ' প্রচুর পরিমাণে টলষ্টয় পড়েছেন, শেখভের নাটক দেখেছেন। Heart break house রচনার সময় The Light shines in darkness এবং The Cherry Orchard তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

বার্ণার্ড শ'র খেয়াল এবং রসিকতা থেকে যুক্ত Heart break House, নাটকটি পরিপূর্ণ ভাবে শেখভীয়, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, ভঙ্গ, সংঘত, এরা ক্ষয়মান বনেনী-বংশের নমুনা, তারা সবাই লকনা, নাটকের বৃদ্ধ গ্রামের বাড়িতে নাটকের ভূমিমা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংলাপের বিভিন্ন মালা সুরের সূত্যের বাঁধা। কিন্তু এই নাটকের শেখভের বাহ্যিক, গভীর ভাবে বিচার করলে এই নাটক পরিপূর্ণ রূপে শেভিয়ার। The shewing up of Blanco Posnet নাটকে বার্ণার্ড শ' হস্ত লেইয়ের Power of Darkness অনুসরণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু আসলে তিনি The Devil's Disciple নাটকই নতুন করে লিখেছেন। Heart break house-এ বার্ণার্ড শ' আপনাকে ইংরাজ শেখভ মনে করলেও আসলে তিনি Getting Married এবং Misalliance-এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই তিনটি নাটক নিয়ে একটি trilogy এবং Heart break House তার চূড়ান্ত পরিণতি।

আদিক ও বক্তব্যের দিক থেকে এই তিনটি নাটকে এর অর্থও যোগসূত্র রয়েছে। এই তিনটি নাটকই বিপরীতমুখের চিত্র রচিত। তিনটি নাটকেই আছে একই ধরণের আদি-রসাত্মক চর্যাহাসিকতা। তিনটিতেই উদ্বিগ্নতার কথাবার্তার ভিতর নাটক গড়ে উঠেছে এবং উচ্চতার সমাজ সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র অপরিবর্তনীয় মনোভাব স্পষ্টতরো হয়ে উঠেছে।

Getting Married বা Misalliance এই দুটি নাটকের মধ্যে এতটুকু সাফল্য ঘটেনি। তবে ১৯৫৪ খ্রষ্টাব্দে যখন টেলিভিসনে প্রদর্শিত হয় Misalliance তখন তার অসীম জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেল, যেন হয়েছিল বার্ণার্ড শ' যেন যেভাবে প্রচারের জন্ত সত্য এই নাটক লিখেছেন। শেখভের যে সব নাটকের আদর্শে বার্ণার্ড শ' এই Heart break House নাটক রচনা করেছিলেন মৃত্যু বা সেট পিটসবার্গের রক্তমুক্ত তার যেমন সমাধির হয়েছিল বার্ণার্ড শ'র নাটকেরও সেই দুর্দশা ঘটেছিল লণ্ডনের রক্তমুক্ত। শেখভ এই অসাক্ষ্যে এমনই মনস্তাপ পেয়েছিলেন যে আত্মহত্যা করতে সক্ষম করেছিলেন, কিন্তু কোনো রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা বার্ণার্ড শ'কে হতাশ করতে পারতো না।

এই নাটক ছায়ায় মীথের গিরিক ধিয়েটারে অভিনীত হওয়ার কথা ছিল, এলেন শু'মালিকে এলি ডানের ডুমিকা দেওয়া স্থির হয়, এই আইরিশ মুন্সেরীর বয়সটা কিংবদন্তী হওয়ার নিগেল প্রে ফেরার ও আর্গণ্ড বেনেটের মতে এই ডুমিকার জন্ত আল বয়সী মেয়ে প্রয়োজন। কম বয়সী মেয়ে খুঁজতে গিয়ে এত সময় লাগল

উৎসাহের আনন্দে

কে. হোডের

মানোবদল প্রজাধিনী



কি. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪



বে আলবার্টের নাট্যকার জেমস ফাগান যখন কোর্ট থিয়েটারে এই নাটক যক্ষ্ম করবার প্রস্তাব করলেন বার্ণার্ড শ' রাজী হয়ে গেলেন। ১৯২১-এর ১৮ই অক্টোবর লণ্ডনে এই নাটক প্রথম যক্ষ্ম হল। ততদিনে ছা ইয়র্কে এই নাটক ১২৫ রজনী অভিনীত হয়ে গেছে।

এই নাটক লণ্ডনে অসফল হল। প্রথম কারণ চরিত্র বর্ণনের ফ্রী, দ্বিতীয় কারণ লণ্ডনের লোকের গ্রহণ ক্ষমতার অভাব। এই অসাক্ষ্যে বার্ণার্ড শ' ভূর হয়েছিলেন যা তাঁর পক্ষে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, কিন্তু কারণও আছে, বার্ণার্ড শ' এই নাটকটিকে তার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন, সেই কারণেই তাঁর দুঃখটা এত তীব্র হয়েছিল।

বার্ণার্ড শ'র ১২তম জন্মদিনে একটি নতুন নাটক রচনার হাত দিচ্ছেলেন। ২৬শে জুলাই তারিখে নি আর্ট থিয়েটারে জাব—Too me to be good অভিনয় করলেন। প্রোগ্রামে হেসকেথ পীরয়সন একটি ছোট নিবেদ্য লিখেছিলেন—The main theme of too true to be good is the wretchedness of the rich, and the play is therefore a variation of development of Heart break House, ইত্যাদি।

এই Programme কেউ বার্ণার্ড শ'কে হস্ত পাঠিয়েছিলেন তিনি হেসকেথ পীরয়সনকে একটি পোষ্ট কার্ডে লিখলেন Why? বুঝতে না পেয়ে পীরয়সন লিখে পাঠালেন What? বার্ণার্ড শ' জবাব দিলেন—The Note পীরয়সন লিখলেন Oh, that! বার্ণার্ড শ' আবার লিখলেন Yes, এবার পীরয়সন লিখলেন God knows! সন্ধ্যা সন্ধ্যা জবাব দিলেন শ' He does not—পীরয়সন কি আর করেন লিখলেন—Nor do I:

বার্ণার্ড শ'র এই সাক্ষিগু চিঠি লক্ষ্য করার মতো।

নি: ই. ট্রাউন Bernard Shaw's Art and Socialism নামক চমৎকার গ্রন্থে বলেছেন—Back to Methuselah আর Heart break House বার্ণার্ড শ'র সাহিত্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বার্ণার্ড শ' নিজে বলতেন আমার কোন বইটা যে শ্রেষ্ঠ তা শেব বিচারের (Judgement Day) দিন পৰ্ব্বত বলা বাবে না। আমার মাঝে মাঝে সোজাছকি বলতেন। ফ্রাঙ্কহারিসকে প্রসঙ্গ গ্রন্থে লিখেছিলেন Rightly spotted by the infallible eye of Frank Harris as my best play—" Back to Methuselah লেখার আগে পৰ্ব্বত বার্ণার্ড শ' Heart break Houseকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকার করতেন। বর্ষা প্রবানময়ী থাকিন হুকে একখণ্ড Back to Methuselah উপহার দিয়ে বলেছিলেন—এই আমার মাঠার পীল।

বরষের সঙ্গে শ' ক্রমশঃই যে আকৃতি এবং জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতিতে যে তাঁর পিতৃদেবের মত হয়ে উঠছেন এটা দূর্ব ছিলেন। বার্ণার্ড শ'র পিতৃদেব কার শ' সব কিছুতেই স্নেহ করে বলতেন—everything was a pack of lies, Heart break House এক বৃদ্ধ কার শ'কে আদর্শ করে গুলজ, টেসটামেন্টের বৃদ্ধের মতো পৃথিবীর সব কিছুই বিরোধী Captain Shotoverকে এঁকে ছিলেন। Captain Shotover সর্বদাই

বাক্য, আসলে পথের ধারের মস্তপান কংটাটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বর, যেখানে এসে অপেক্ষাকৃত মাহুঘের উদ্দেশ্যে বাণী নিবেদন করে জবাবের জন্ত আর পাঁড়াতেন না।

Captain Shotover বলেছেন It confuses me to be answered, it discourages me, I cannot bear the men and women, I have to run away, I must run away now,

তরুণদের সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র মনোভঙ্গী Captain Shotover এর মুখ দিয়ে বলা হয়েচে—I see my daughters and their men living foolish lives of romance and sentiment and snubbery...I did not let the fear of death govern my life, and my reward was, I had my life—

সার্লেট এই নাটক সর্বপ্রথম পড়েছিলেন। মস্তপ মাহুঘকে তিনি চিরদিনই সইতে পারতেন না। Captain Shotoverকে পছন্দ না করলেও তার উচ্চারিত প্রতিটি কথা তাঁর ভালো লাগতো।

চেকোভাভাকিয়ান সৈনিকরা একটা চিঠিতে লিখতেন—Your work has always philosophical basement of our life, day by day, endeavouring to follow our great Irish teacher...

বলাবাহুল্য এই চিঠিতে শ' সম্প্রতি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু Heart break Houseকে গ্রহণ করার জন্ত মাহুঘ তখনও তৈরী হয়নি। জীবনের কঠোরতা, বিশদ, আতঙ্ক, মৃত্যু ইত্যাদি আলস্য তারা এখন বিব্রত। জীবনের গভীরতার দিকে মাহুঘের তেমন আগ্রহ নেই, তারা চায় আনন্দ, হাসি এবং সরসতা। তারা চায় সব কিছু লঘুভাবে গ্রহণ করতে, Shotoverএর বাণী শোনার মতো উপযুক্ত মনের অবস্থা নয় তখন। ক্রান্ত তরুণ দল প্রশ্ন করে—And who was Shaw to preach to us? তারা বর্ণাক্ষরে মৃত্যুর বুধোমুখি হয়ে ফিরে এসেছে Arms and the Man পড়ে তারা আনন্দ পেয়েছে, তারা হাসতে চায়, হুঃ হুঃ ভুলতে চায়। গুরুগভীর বিষয়কে বিধ মনে করে দূর পরিহার করতে চায়।

বার্ণার্ড শ' এই মনোভঙ্গীতে কিন্তু বিভ্রান্ত হননি। তিনি জানতেন, জোরারের পর ভাটা আছে, এমন কি যে তরুণ লেখক তাঁকে এখন তাঁর ভাবার আক্রমণ করছে, সেই লিটন ট্রাটিকেও তিনি প্রংশসা করছেন।

কিছু দিনের জন্ত লেখনী ধাওয়ালেন বার্ণার্ড শ'। এর প্রয়োজন ছিল। এখন একটা বড়ো নাটক লিখতে হবে যা অভিনয় করতে বারো ঘণ্টা সময় লাগবে। নাস্তিকতা, অবিশ্বাস এবং নিহিলিজম ইত্যাদির ভস্মাবশেষ থেকে বিশ শতাব্দীতে যে নতুন ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে, এই নাটকের ভিত্তি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাটক অমর রচনা হবে এবং তাঁকে অমরও বান করবে। Candida, Man and Superman এক Heart break House এ সবই সেই নতুন নাটকের প্রস্তুতি। বার্ণার্ড শ'র মতে এই নতুন নাটক Exploit the eternal interest of the philosopher's stone which enables men to live for ever—

মাসিক বসুন্ধরা—বোর্ড

অত্যামার্শ্য
কালড কাচার
পাউডার



মূল্যঃ
বড় সাইজ ২ টাকা ১২ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(দ্বিগুণ কর ছাড়া)

নীল
সার্ব

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যামার্শ্য কাপড় কাচা পাউডার সার্ব কাচা জামা-
কাপড়ের অপূর্ব সাদতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে
যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মনিতেই
হবে যে

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে মাল,
এত ফুলের উল্লেখ করে। সার্ব, চামড়, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু
কাচার জন্মেই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত বেশী—ঠাণ্ডা বা গরম

করে, ফেয়ার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্ব জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন
ফেয়ার এক সস্ত্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড়
কাচা যায়। বেশী পরিচয় নেই এতে! সার্ব জামাকাপড় কাচা
মানে এটি সহজ প্রক্রিয়া: ভেজানো, ঢেপা এবং ধোওয়া মানেই
আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনার পরগার মূল্য এত চমৎ-
কারভাবে ফিরে। একবার সার্ব ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা
বোনে বোনে! সার্ব সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ।

আপনি নিজেই পরখ করে দেখুন **সার্ব জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে লেগা যায়!**

EU. 25-X52 B9

বিশ্বস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

Heart break House-এর বড় কুটীল খাতক নাটক হিসাবে অপূর্ণ। Captain Shotover বার্গার্ড শ'র অপূর্ণ সৃষ্টি। এই চরিত্রের মাধ্যমে বার্গার্ড শ' মানুষের প্রকৃতি তাঁর ব্যক্তিগত অবিধান কুটীয়ে তুলেছেন। এই নাটকে তিনি এক অপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাই এই নাটকের শেষে এলি বখন বলে—This silly house, this strangely happy home, this agonising home, this house without foundations. I shall call it Heart break House—তখন পাঠক ও দর্শক নিজের মনে তার প্রতিধ্বনি পায়।

ছািবিশ

১৯২০, ২৭শে মার্চ...

সাতউষ লগুন ডেনমার্ক হিলে বার্গার্ড শ' মৃত্যুশয্যা শায়িত যোন লুসীকে দেখতে গেলেন। এই ডেনমার্ক হিলের কাছেই জন্মেছিলেন রবার্ট ব্রাউনিং এবং রাসকিন তাঁর বালাজীবন কাটিয়েছেন।

লুসীর বয়স তখন ৬৭ বছর, বার্গার্ড শ'র ৬৪। বার্গার্ড শ' পৌছে দেখলেন, লুসী অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গীতে রোগশয্যা পড়ে আছেন। বার্গার্ড শ' কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর লুসী মুহূর্ণা গলায় বললেন—আমি এইবার মারা যাব। আর বেশী দেরী নেই।

বার্গার্ড শ' সাশ্বনার ভঙ্গীতে বলেন—না, না, ভয় কি, সীগ'গির সেয়ে উঠবে।

তারপর দুজনই নীরব। চারিদিক নিস্তব্ধ। পালের বাড়ীতে কে একজন অতি বিস্ত্রী ভাবে পিয়ানো বাজাচ্ছে। চমৎকার সঙ্গীত, চার দিকের জানলা উন্মুক্ত। লুসী বার্গার্ড শ'র হাত ধরে আছেন। সহসা মনে হল যেন তার আঙুলগুলো লজ্জা হয়ে গেছে। লুসীর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে।

বার্গার্ড শ' সবিররে ভাবলেন কি করা যায়! ভাস্কর্যকে ডাকা হল। বার্গার্ড শ' বললেন—সম্ভবতঃ টিউবার কুলেসিসই মৃত্যুর কারণ। কিছু দিন আগে নিউমোনিয়া হয়েছিল, তার পরই টি, বিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন লুসী।

ভাস্কর্য গভীর পলায়ন বললেন—না, মৃত্যুর কারণ অনাহার টি, বি সেয়ে গিয়েছিল।

বার্গার্ড শ' প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—সে কি! আমি একে খাওয়া-দাওয়া বাবদ যথেষ্ট টাকা দিই। অনাহারে মরবে কেন?

ভাস্কর্য তবু বললেন—না, অনাহারই একমাত্র কারণ।

মহাযুদ্ধের পর লুসীর ক্ষুধা একদম হ্রাস পায়, অনেক কষ্টে তাকে কিছু খাওয়ানো যেত। তার মনে এবং দেহে 'পেন-সক্' অর্থাৎ পোলো-বাক্সের বিভীষিকা লাগে। বিমান আক্রমণের সময় বাগানে বিমান প্রতিরোধকারী এ্যাণ্টি এয়ারক্রাফট-এর বিকোরেণে ঘরের জানালা-দরজা, খালা-বাসন সব ভেঙে চূর্ণমার হয়ে যায়। সেখান থেকে ভিত্তোনে পাঠানো হল কিন্তু আহায়ে অনিচ্ছা বৃদ্ধো না।

এই লুসী একদিন উদীয়মান লোক জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত বার্গার্ড শ'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আর শেষ দিন পর্যন্ত সেই তাই—বোনটির সমস্ত ধনচ বহন করেছেন এমন কি শেষ সময়ে

পর্বস্ত হাজির থেকে বচকে হুতা দেখলেন। সংসারের এই সর্বশেষ আত্মীয়।

লুসীর নির্দেশ ছিল অক্সটিকালে কোনো প্রার্থনা ব্যবস্থার আয়োজন না করা। বার্গার্ড শ' ক্রিমেন্টোরিয়মে পৌছে দেখলেন লুসীর বন্ধুবান্ধবে সেই শশ্মানভূমি পরিপূর্ণ। তাঁরা কেউ হয়ত বার্গার্ড শ'কে চিনতে পারেন নি। এই জনতা একটা কিছু প্রার্থনা ব্যবস্থার জ্ঞান করলেন। তখন বার্গার্ড শ' বেলীর ওপর দাঁড়িয়ে দেহসঙ্গীর Cymbelline থেকে উদ্ভূতি দান করে বললেন—

Fear no more the lightning flash,
Nor the all-dreaded thunder-stone.

বহুমান শব্দেহের দিকে তাকিয়ে বার্গার্ড শ' দেখলেন যে অতি স্নান সেই আগুনের শিখা, কয়লার অভাব। হতাশ হলেন শ'। তিনি বললেন—Steady white light like that of a wax candle।

শ' পরিবারের এই ঘেরটির মাথার চুলের রং ছিল শালা। বার্গার্ড শ' জননীর ধারণা ছিল সে একদিন নাট্য-সম্রাজ্ঞীর সম্মান লাভ করবে, কিন্তু ভ্রাম্যমান পেশাদারী দলের হালকা ধরণের অপেরার ছোটখাটো ডুমিকা ভিন্ন আর কিছু পাননি লুসী। সারা জীবনটাই স্বার্থভার ভরা। আঘাতের পর আঘাত জীবনটাকে ভেঙে-চুরে বিপর্যস্ত করেছিল, আজ একান্ত আপন জন ছোটভাই বার্গার্ড শ'র হাতটি ধরে শান্তির পারাবারে পৌঁছলেন।

বার্গার্ড শ' বললেন সেদিন ডেনমার্ক হিলে নিত্যান্তই Life-force এর নির্দেশে তিনি গিয়ে পড়েছিলেন। বেশী বাওয়া আসা করতে পারতেন না, একরকম অবহেলিত ছিলেন। বার্গার্ড শ' বললেন—property, property, property, the real secret of my withdrawal from all human intercourse except with people I have actually to work with. ঐশ্বর্য্য আমাদের এমনই ভুলিয়ে রাখে যে, আত্মীয় স্বজনকে বিস্মৃত হয়ে, কাজ আর কাজের লোক জনেই আমরা কর্তব্যবনটাকে ভরে রাখি। বার্গার্ড শ'র জীবনেও তাই তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

হেসকেল গায়রসন বর্ধার্বাই বললেন শিল্পী এবং মহাপুরুষ এই দুই সত্তার মধ্যে একটা বন্দ উপস্থিত হয়, কলে শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে, মহাপুরুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বার্গার্ড শ' উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে বলেছেন। আমাদের দেশে ববীন্দ্রনাথকে এই হিসাবে বার্গার্ড শ'র সমকক্ষ বলা চলে। মানসিক ভারসাম্য তিনিও শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। আর রেখেছিলেন ভলটেরার। তাই ১৯১৪—১৮-র মহাযুদ্ধের কঁাকে শ' Heart break House রচনা করতে পেরেছেন আর মনে মনে পরিকল্পনা করেছেন Back to Methuselah মহানটকের। Heart break House প্রথমটার কাউকে পড়তে দেননি বার্গার্ড শ' বন্ধুদেরও নয়, অথচ তিনি সব নাটক সবাইকে পড়ে শোনাতে ভালোবাসতেন। লী ম্যাথুজ ১৯১৬ বৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অল্পবোধ জানিয়ে বললেন—আপনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ঐ

সোসাইটিতে নাটকটি পড়ে শোনাম। উত্তরে বার্নার্ড শ' নিখলেন...

...এ একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। ট্রেজ সোসাইটি যদি তার সদস্যদের নিয়ে At-home-এ আয়োজিত করতে চান, কোন সাফল্যের উৎসব উপলক্ষ্যে তাহলে একজন প্রখ্যাত লেখকের অগ্রপ্রাণিত, অ-অভিনীত নাটক পড়ে শোনালে শ্রোতার হরত গলাধঃকরণ করবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্য-প্রদর্শনের জন্য টাকা আদায় করে টাকা প্রদানকারীদের শুধু নাটক পাঠ করে শোনালে, পচা ডিম এক মৃত বিড়াল ছাড়া লেখকের জাগো আর কিছুই ছুটবেনা। সভ্যতা বধন সাক্ষাৎপন্ন তখন আমি আমার জনপ্রিয়তা ক্লান্ত করতে পারি। এ তোমার জানা আছে, কিন্তু সভ্য অংশীদারদের থেকে এনে তাদের বলা যে তোমাদের টাকা উদ্ধরণ হয়েছে, সেই সভ্য সভ্যপতিত্ব করা অভিশয় কঠিন।...

নাটকটি প্রযোজিত হয় বার্নার্ড শ'র সেট ইচ্ছাও ছিলনা। লীলা মাককাথিক শ' বলেছিলেন—We must be content to dream about it. Let it lie there to show that the old dog still bark a bit. বার্নার্ড শ' বলতেন Captain Shotover হলেন কিং লীরয়ের আধুনিক সংস্করণ। একজন বললেন, তার মানে ?

বার্নার্ড শ' জবাব দিলেন—“আমি কি করে জানবো ? আমি ত লেখক মাত্র।”

১৯২১-এর ১১শে অক্টোবর তারিখে আরনল্ড বেনেট লিখেছেন “গত রজনীতে শ'র Heart break House দেখতে গিয়েছিলাম। সাড়ে তিন ঘণ্টা অতি দ্রুতকর অবস্থায় কাটিয়েছি। পোভাগ্যক্রমে দুবার বুমিরে পড়েছিলাম।”

সারা সপ্তাহে বিক্রী মাত্র ৫০০ পাউণ্ড। ক্যাগান শেষ পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

এর পরেই বার্মিংহাম রোপারটরী থিয়েটার-এর থারী জ্যাকসন বধন Heart break House মঞ্চ করেন, বার্নার্ড শ' ম্যাটিনী দেখতে গিয়েছিলেন।

তার থারী জ্যাকসন বলেছেন—অভিনয়ক্ষেত্রে বার্নার্ড শ' বেশ খুশী হয়েছেন দেখে সাহস করে বললাম Back to Methuselah মঞ্চস্থ করার অমুখ্যত দিন।

বার্নার্ড শ' ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এর কিছু আগেই জাইর্ক থিয়েটার গিলড, Back to Methuselah অভিনয় করেছেন।

বার্নার্ড শ' তার থারীর অমুখ্যত শুনে শুধু বললেন—তোমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করা আছে ?

থারী জবাব দিলেন—সব ব্যবস্থা আছে।

বার্নার্ড শ' হেসে বললেন—তথ্য।

বার্নার্ড শ' এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, শেষ রিহাসেসেল্ড এসেছিলেন। অথচ তাই কিছু দিন আগে আয়ারল্যান্ড পড়ে গিয়ে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে দাঙ্গা বেগনা।

Saint Joan দেখার কালে বার্নার্ড শ' কাউন্টি কেরীর পার্কনাশিলার থাকতেন সেই সময় টাং হয়ে একদিন পড়ে বান, কীথে যে ক্যামেরা ঝোলানো ছিলো, সেটি পিঠে হুকে যায়। পিঠে প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গিছিল।

সার্লেট বললেন—পিঠে এতবড় একটা গর্ত হয়েছিল যে, তার ভিতর অমায়ালে একখানি চিঠি বেলা যায়। আইরিশ ভাষায়না কিছু করতে পারেন নি, বার্মিংহামের অধিবিশায়দ ডাঃ এলবার কেলিস ৭২ মি: চেষ্টা করে কোনো রকমে বার্নার্ড শ'কে ধাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় বার্নার্ড শ' Back to Methuselah নাটকের রিহাসেসেল দেখেছেন। [ক্রমশঃ]

বৈধবা

সজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু দিন আগেতেও দেখেছি তো তাকে,
অলঙ্কৃত, ঔদ্ধত্যের চিম্বরী মৃতিতে।
কাঁকন কনকন, চোখে যারা জাঁকে,
সে এক অপূর্ণা নারী আপন কীর্তিতে
দেখে তার বসন্তের উদ্‌গদ প্রাণন,
চোখে তার উজ্জ্বল বিরহী শ্রাবন।

সেদিনও তো দেখলাম তাকে,
চিম্বরী-মুদ্রার বেন নিঠুর আঘাতে।
মনে হ'ল পত্রশূন্য কোন বৃক্ষশাখে,
বহির্ভূত ছিলেম হাওয়া, পানী নাই তাতে।

এর মধ্যে ঘটে গেছে বিরাট ভাঙন,
যে ছিল বৈত-পূর্ণা, আজ সে একেলা।
হুটি প্রাণ এক ছিল, ছিল দুটি মন,
আজ নেই, বেলা গেছে, আজকে অবেলা।
বসন্ত দেহেতে তবু শীতের উল্লাস,
মনে হয় বার্থ প্রেম কেল দীর্ঘবাস।

নারীঘের উজ্জলো যে ছিল উজ্জল,
নিঠুর বৈধবা তারে করেছে বিকল।
বিলাসিনী ছাড়ি আজ দেহের বিলাসে,
উপভোগ-মৌন মন-বৈধব্যের উল্লাসে।



শর্করা-শিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

জাতাবলক পণ্য-তালিকার মধ্যে শর্করা বা চিনির স্থান নিশ্চয়ই প্রথম পর্যায়ে। অন্ততঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত চিনি ও গুড় কিছু না কিছু চাই-ই। অতঃ সব বাদ দিয়ে সকাল-বিকাল চা খেতে এর প্রয়োজন, হৃদয়ের সঙ্গেও এর সামিশ্রণ না হলে হয় না। চিনি বা শর্করা-শিল্পের গুরুত্ব এই থেকে অবগত থাকিচু উপলব্ধি করা যায়।

একটি কথা আগেই বলতে হয়, বিশ্বের চিনি উৎপাদক কেন্দ্র হিসাবে ভারত মোটেই পিছিয়ে নয়। এই উপ-মহাদেশটিতে শর্করার মোট উৎপাদনের পরিমাণ কিছু দিন পূর্বেও ছিল ১১ লক্ষ টনের বেশী। ভারতের ভেতর উত্তর প্রদেশেই (প্রাক্তন যুক্ত প্রদেশ) চিনির সংখ্যা তুলনায় অধিক রয়েছে। তার পর ক্রমান্বয়ে বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের নাম করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা চলে, এখানে লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি আর বছরে চিনির প্রয়োজন কম পক্ষে ৭০ হাজার টন। চিনি বা শর্করা উৎপাদনেও এই রাজ্যে উত্তম রয়েছে অনেকখানি।

এ কথা স্বীকার্য যে, চিনি বা শর্করার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাইরে থেকে প্রচুর চিনি আমদানীর প্রয়োজন হয় এখানে আজও অবধি। এই অবস্থার অবস্ কতকগুলি কারণই রয়েছে। একটি মূল কারণ—এই রাজ্যটিতে শর্করা উৎপাদনের জন্ত আবলক পর্যাপ্ত ইক্ষু অব্যব।

অতিষে দেখা গেছে—এতদকালে (পশ্চিমবঙ্গ) যে ইক্ষু উৎপাদিত হয়, গড়পড়তা তার প্রতি মণ টন থেকে চিনি পাওয়া যায় এক টন। এভাবে এখানকার সমস্ত ইক্ষুটাই যদি চিনিতে রূপান্তরিত করা গেলো, তাহলে সেই চিনির পরিমাণ ঝাড়োতে পাবে ২৫ কোটি পাউন্ডের মতো। বিপুল চাহিদার তুলনায় এই উৎপাদনও যথেষ্ট বলা যেতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি মজ্ঞ প্রশ্ন—এখানে জন্ত অনেক অঞ্চল থেকে ঘন বসতি, চাষের উপযোগী জমির অভাব স্বভাবতই এখানে বেশী। সেদিক থেকে ইচ্ছে করলেই বাতারাতি ইক্ষুর উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নেই। উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার—এ সকল রাজ্যে ইক্ষুর চাষ খুবই অধিক, এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান উচ্চায়ের পর। কিন্তু একটি বিবির লক্ষ্যীয় যে, ইক্ষুর ফলন পশ্চিমবঙ্গে বহু বেশী অজ্ঞর অনেক জায়গায় ভেমনটি দেখা যায় না। এখানে এক একর জমি থেকে ইক্ষু উৎপাদিত হয় প্রায় ২০ টন।

শর্করার সঙ্গে ইক্ষুর সম্পর্ক একান্ত নিবিড় বলেই ইক্ষুর প্রসঙ্গে এত কথা। পশ্চিমবঙ্গে শর্করাশিল্পকে আরও ব্যাপক ও দৃঢ়-ভিত্তিক করতে হলে ইক্ষু চাই আরও বহুল পরিমাণে। চাষের জমি যেখানে ইক্ষু মাত্র বাড়ানোর উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে না পেলে নয়। প্রথমতঃ একটি পরীক্ষা চলতে পারে—একর-পিছু উৎপাদনের হার আরও কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায়, এই নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই জন্ত উপযুক্ত সেচ ও সার সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা চাই। সরকারী দায়িত্বের কথা এইখানে আপনি উঠেই বিশেষ ভাবে।

পশ্চিমবঙ্গের সব অঞ্চলই ইক্ষু চাষের সমান উপযোগী নয়, উৎপাদনও সর্বত্র একই হারে হয় না। ইক্ষু চাষের কয়েকটি স্বার্থ উপযোগী স্থান—বর্মানের কাটোয়া, কালনা প্রভৃতি এলাকা, মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা, বীরভূমের একটি বৃহত্তর অংশ আর পশ্চিম দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ। এই অঞ্চলগুলিতে ইক্ষুর চাষ বাড়ানোর জন্ত আরও সাহায্য উত্তম, ও সুচিন্তিত পরিবহন দায়কর।

আরও একটি কথা, ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির সকল চেষ্টা যেমন থাকবে বা থাকতে হবে, তেমন পশ্চিমবঙ্গের শর্করার বিপুল চাহিদা জন্ত ভাবেও কিরূপে মোটানো যায়, না দেখলে নয়। এই রাজ্যের সীমানার ভেতর বহু অঞ্চলে তাল ও খেজুর গাছের চাষ আছে। আর এই গাছের সংখ্যাও অবজ্ঞি কম নয়। তাল ও খেজুর গুড় আশায়রূপ পানির জন্ত এই চাষও বাড়তে হবে আরও বহুলাংশে—বাড়ানো সম্ভবপরও। বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা যদি থাকতো অব্যাহত ভাবে, তাহলে শর্করার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুরোপুরি স্বাবলম্বী না হোক আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে, এ নিশ্চিত।

পারিবারিক বাজেটের কয়েকটি দিক

বাজেট কথাটি বললে সাধারণতঃ সরকারী বাজেটের কথাই মনে হয়। কিন্তু সরকারী বাজেটের মতো পারিবারিক বাজেট বলেও একটি কথা আমরা জানি—পরিবারের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বার মূল্য একটুকু কম বলা চলে না।

যে কোন বাজেটের মূল কথাই—অজ্ঞিত বা লক্ষ আয়ের ঠিক অল্পপাতে ব্যয়-বরাদ্দ। ব্যয়ের মাত্রা যেন কোদ অবস্থাতেই আরও অতিক্রম করে না যায়। কি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বাজেট, কি জাতীয় বা সরকারী বাজেট—সর্বক্ষেত্রে এই নীতিই প্রযোজ্য।

বেখানে এইট অল্পসরণ না করা হলো কিংবা অল্পসরণের সক্তি
সুযোগ না থাকে, সেখানেই গোলবাগ, সেখানেই অসুস্থি।

আর বুকে ব্যর করার দাবীটি অবস্ত বহু যুগ থেকেই চলে আসছে।
এইট অমূল্য শিক্ষাই বলতে পারা যায়—প্রতিটি মানুষ বা পরিবারকে
সাধ্যমত বিতবারী হতে হবে, ব্যয়ের উপর চাই বখোচিত নিয়ন্ত্রণ।
এর সঙ্গে বাজেট কথটির যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ
রকম। অথবা সহজভাবে এ-ও বলা চলে—বাজেটের মূল সত্যটি
এই তেতর নিহিত।

একথা ঠিক বহু পরিবার রয়েছে, নিয়মিত দ্বারত বেখানে জমা-
ধরত রাখা হয়। সকলেই একই পদ্ধতিতে এইটি (জমাধরত বা
আয়-ব্যয়ের হিসাব) রাখেন, তেমন দাবী করা চলে না। এই
ধরনের হিসাবী পরিবারের সংখ্যা আশাভ্রমণ বঞ্চিত নয়। কেন না,
‘এক কুলা বৃত্তঃ পিতং’ শ্রমীর লোকও কিছুমাত্র কম নয় সংখ্যায়।
পরন্তু বলা যায়, বেশির ভাগ লোক বা পরিবারই বেহিসাবী পর্যায়ে
না পড়লেও সঠিক বাজেট করে চলতে অভ্যস্ত হয় নি এখন অবধি।

বাজেট করে চলার বে চিরন্তনী দাবী রাখা হয়েছে সামনে—দাবী-
হরিত্ত মধ্যবিত্ত—কাজকে কিন্তু এর বাইরে ধরা হচ্ছে না।
জীবনযাত্রার সর্বস্তরে সকলের ক্ষেত্রেই আয়ের মধ্য থেকে ব্যয়-
মিটানোর চেষ্টা নিত্যন্ত প্রায়ঃ। হিসেবের লাগামটি ছেড়ে দিলে
বাজার দৌলতও ফুরিয়ে যেতে কতক্ষণ। ‘গৌরী সেনের টাকা’তেও
নির্ধন অমনি চলতে পারে না। মোটের উপর খরচের আগেই বাজেট
করা চাই। জীবনের অপর সকল ব্যাপারে যেমন, এই ক্ষেত্রেও
সহজ অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিক্ষণ প্রয়োজন। আর
আয়ভূগোলিক ব্যয়—একটু আগেই বলা হল, যে কোন স্বচিন্তিত
বাজেট পরিকল্পনার ইহাই মূল কথা।

এ প্রসঙ্গে এ-ও বলতে হয়—বাজেট করতে বেখানেই চাওয়া হবে,
কার্ধ্যাজ্ঞের আগে মনের ভিতরে কয়েকটি বিশেষ নুত্র রাখা না
থাকলে নয়। মাস মাসিনার অক্টট একদিকে রাখা হ’ল, অপর
দিকে প্রথমেই ধরা চাই খরচের অপরিহার্য বড় বড় বিষয়গুলি।
যেমন, বাড়িভাড়া, খাদ্য-ব্যবস্থা, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ, ছেলে-মেয়েদের
শিক্ষা-সংগ্রাম, ও স্কুল-কলেজের মাইনে, ঔষধ-পত্রের বিল, জীবন-
বীমার প্রিমিয়াম—এগুলির ব্যয়-ব্যয়াদ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। এ
সকল দায় মিটিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে (মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-
মধ্যবিত্ত পরিবারে অবস্ত সে আশা বুধা,) তখনই অস্ত্রান্ত খাতে
ব্যয়-ব্যয়াদের প্রায় উঠতে পারে।

এমন অনেককে দেখা যায় যারা, কোনরূপ বাজেটের দায়
ধারে না, খরচ যে খরচের প্রয়োজন হয় বিনা ভ্রক্ষেপে করে যান।
অচেন টাকা থাকলে এমন সাহস, কতক কাল চলতে পারে, কিন্তু
আর যদি সীমাবদ্ধ হয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেটি সত্য), সেখানে
এমনি করতে চাইলে অর্থাৎ জবিযাতের দিকে না তাকিয়ে বখোছ
খরচে উৎসাহী হলে, খণের বোঝা মাথার উপর চাপলেই। আসল
কথা—অমিতব্যয়ী হলে কিছুতেই চলবে না, অমিতব্যয়িতা
যেব অবধি হু-থকে ডেকে আনে। বস্তুর সম্ভব আয়
অধারাই ব্যয় করতে হবে, জানতে হবে মিতব্যরী হলেই বিশদে
যঁকি কম।

এ অনস্বীকার্য বে, পারিবারিক বাজেটের প্রচলন এদেশে

ততখানি সেই, বতটা দেখা যায় অগ্রগামী দেশগুলিতে। ইউরোপের
বিভিন্ন স্থানে এই নিয়ে চিন্তা-আলোচনা ও গবেষণা চলে আসছে
প্রচুর। স্বাভাবিক অবস্থার বাজেটের ধরণও হবে স্বাভাবিক—
সেখানে ঋণ হতে পারে, এমন ভাবে ব্যয়-ব্যয়াদ চলে চলবে না।
আয়ের তুলনার ব্যয়ের দাবীগুলি যদি অত্যধিক থাকে, সে ক্ষেত্রে
হিসেব করে যে বে দাবীটি বাহ বেগুরী সম্ভবপর, সে কয়টি ছঁটকটি
করতেই হবে। অগ্রয়োজনীয় বা নিম্নর্যক খরচের অবকাশ যেন না
থাকে, সেদিকে পোড়া থেকেই দৃষ্টিবলীল গৃহস্থায়ী প্রবৃত্ত চাই।

ভুক্তভোগী ও অস্তিত ব্যক্তির বেধে এসেছেন—সীমাবদ্ধ আয়
বেখানে, সীমার বাইরে যেবে খরচের বাজেট বা আর্থিক ব্যয়-ব্যয়াদ
সেখানে করতে বাওরাই নিত্যন্ত ভুল। অন্ততঃ একশ ক্ষেত্রে কার্ধ্য-
ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে বহুবার মিথিড়ভাবে না ভাবলে নয়।
অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হলে ব্যবস্থাও অস্বাভাবিক নিতে হবে,
এ প্রায় অবস্ত বহু ভুলে লাভ নেই। সরকারী ক্ষেত্রেও জরুরী
অবস্থায় জরুরী বাজেট প্রণয়নের স্বীতি চলতি আছে। কিন্তু
সাধারণতঃ আয়-ব্যয় বা বাজেট-ব্যবস্থার মূল নীতিটি অল্পসরণই
সর্বপ্রথমে সমীচীন। মোটের উপর—আর্থিক সীমাবদ্ধতা বেখানেই
থাকছে, সকল রকম সৌধিন বা অগ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিবর্তন না
করলে সেখানে চলতে পারে না।

আদর্শ-বাজেট কি ধরণের হতে পারে, বিশেষ ভাবে বিলেডের

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



প্রতি প্যাকেট
২৪ টি
বড় আকারের

- কলমে প্রস্তুত
- ক্ষীর্ণে সেকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, চিন্তি
ও সর্বস্বয় রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী

কলিকতা - ২৯

মাসিক বসুমতীর এজেন্ট-তালিকা

ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে

বর্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেন্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্ত আমরা বর্তমান লক্ষ্য হইতে আমাদের এজেন্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সমস্ত পাতক-পাঠিকা এজেন্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

॥ বাঙলা দেশ ॥

কলিকাতা (বৃহত্তর) ●

| | |
|-----------------------|------------------|
| জিহ্নাকর ভট্টাচার্য | —টালিগঞ্জ |
| জিহ্নাকর পাল | —টালিগঞ্জ |
| জিহ্নাকর ভট্টাচার্য | —টালিগঞ্জ |
| মে: জাতীয় পুস্তকালয় | —টালিগঞ্জ |
| জি এ. বি. দাস | —লেক রোড মার্কেট |
| জি তপ: সি | —বালিগঞ্জ |
| জি ভাটগার হাইডি | —গড়িয়াহাট |
| জি ভাটগার | —বালিগঞ্জ |
| মে: দামোদর লাইব্রেরী | —বেহালা |
| জি কটকর পাল | —টালিগঞ্জ |
| জি নির্মলচন্দ্র ঘোষ | —টালিগঞ্জ |
| জি রাক্ষসর সি | —বালিগঞ্জ |
| জি হুম্মার ব্যানার্জী | —বালিগঞ্জ |
| জি শঙ্কর দত্ত | —চেতলা |
| জি হুতাশচন্দ্র উকিল | —বালিগঞ্জ |
| জি শঙ্কর দত্ত | —আলিপুর |
| জি মাধনলাল নাথ | —টালিগঞ্জ |
| জি কীবনকুমার হুগ | —টালিগঞ্জ |

পূ: কলিকাতা (বৃহত্তর) ●

| | |
|----------------------------|--------------|
| জি সর্বৎ ব্যতিক | —বেলিয়াঘাটা |
| জি বিমল সরকার | —বেলিয়াঘাটা |
| জি লক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জী | —বেলিয়াঘাটা |

হাওড়া ●

| | |
|-------------------------|----------------------|
| জি কানীনাম সাহা | —আমতা |
| জি অলোককুমার চ্যাটার্জী | —বেলুড় |
| জি এস. বি. সি | —ফুলেশ্বর |
| জি রামচন্দ্র সি | —ডেসাইল |
| জি রামহরি নাথ | —সাঁতরাগাছি |
| জি পি. কে. সিংহ | —বেলিয়াঘাটা |
| জি পি. জি. ঘোষ | —অন্নদায়ণ সরকার সেন |
| জি এম. দাস | —পূর্বাননতলা রোড |
| জি মাতাঙ্গিনী পাণ্ডে | —চিহ্নামি দে রোড |
| জি সত্যকুমার দাস | —নরসিং দত্ত রোড |

| | |
|-------------------|------------------------|
| মে: কক বুক ষ্টল | —হুগলী |
| মে: জামের সাখী | —কেন্দ্র মিত্র সেন |
| জি জি. ব্যানার্জী | —অমৃতলালী সেন |
| জি বি. ভট্টাচার্য | —সারকুলার রোড |
| জি বি. সি. শেঠ | —রামদোপাল দ্বিতীয় সেন |
| জি বি. সি. পাল | —জি. টি. রোড |
| জি এ. এম. মল্লিক | —শিবপুর |

হুগলী ●

| | |
|------------------------|----------------------|
| জি অমৃতচরণ ঘড়া | —শেওড়াকুলি |
| জি মদনমোহন গাঙ্গুলী | —মগরা ও ত্রিবেণী |
| জি গঙ্গাধর দে | —জি রামপুর |
| জি বিখনাথ ভট্টাচার্য | —ভদ্রেশ্বর ও বৈভবাটা |
| জি ললিতমোহন দত্ত | —হুগলীঘাট |
| জি গোবিন্দচন্দ্র কুমার | —সিঙ্গুর |
| জি মণিভূষণ সি | —আরামবাগ |
| জি বৈভবনাথ মুখার্জী | —নবগ্রাম, কোননগর |
| রবীন্দ্রনাথ ঘোষ | —গোঘাট |
| জি বি. ভূষণ চ্যাটার্জী | —হরিপাল |
| জি মুহারীমোহন মুখার্জী | —কোন্নগর |
| জি পি. মুখার্জী | —জি রামপুর |
| জি প্রভাত ব্যানার্জী | —চন্দ্রনগর |
| জি পি. চন্দ্র | —বাহী |
| জি হুগলী চক্রবর্তী | —জি রামপুর |
| জি বি. সি. তালপত্র | —উত্তরপাড়া |
| জি. পি. ব্যানার্জী | —চন্দ্রনগর |

মুর্শিদাবাদ ●

| | |
|----------------------|-------------------|
| জি অহিভূষণ মাল্যাকার | —বেলুড় |
| জি বিখনাথ দাস | —মুর্শিদাবাদ |
| জি কীরোরচন্দ্র গুপ্ত | —জি রামপুর |
| জি হরিপাল সাহা | —বহরমপুর ও খাগড়া |
| মে: ঘোষ লাইব্রেরী | —বহরমপুর ও খাগড়া |
| জি এম. এম. চক্রবর্তী | —হরিচন্দ্রপুর |
| জি হুগলীকুমার শেঠ | —মালদা কোট |

মালদহ ●

বর্ধমান ●

| | |
|-------------------------|---------------------|
| জি অমরকুমার দত্ত | —চিহ্নামি দে |
| মে: দাস বাগাটী ব্রাহ্মণ | —ফুলটি |
| জি কৃতনাথ দাস | —দাইহাট |
| জি কল্যাণ সরকার | —খাইগ্রাম |
| জি এস. পাণ্ডে | —বর্ধমান |
| জি হুগলীকুমার | —কে. কে. নগর |
| জি তারাপাল দাস | —বরষা |
| জি তপনজ্যোতি চ্যাটার্জী | —সীতারামপুর |
| জি হুগলীকুমার দে | —স্বাধীন |
| জি বি. কে. আইচ | —বর্ধমান |
| জি পূর্ণানন্দ মোদক | —কালনা |
| জি এইচ. সি. ঘোষ | —বার্ণপুর ও আসানসোল |
| জি হুগলীকুমার সেন | —গলসি |
| জি হুগলীকুমার বাগচী | —আমুখিয়া |

নদীয়া ●

| | |
|------------------------|------------|
| জি গোপালচন্দ্র সেন | —শান্তিপুর |
| জি হরিচন্দ্র প্রামাণিক | —নবাবী |
| জি এ. বি. মুখার্জী | —হনগী |
| জি এস. কে. চৌধুরী | —রাণাঘাট |
| মে: পত্রিকা প্রতিষ্ঠান | —বৃন্দাবন |
| জি এন. এন. ঘোষ | —রাণাঘাট |
| জি বি. কে. সাহা | —আড় ঘাটা |
| মে: চাকদহ বুক ডিপো | —চাকদহ |
| জি বি. চন্দ্র দাস | —রাণাঘাট |

মেদিনীপুর ●

| | |
|------------------------|-----------------|
| জি পূর্ণানন্দ চৌধুরী | —বাড়গ্রাম |
| মে: মিত্র নিউজ এজেন্সী | —কলাইকুণ্ডা |
| জি জে. এন. ভট্টাচার্য | —মহিষদল |
| জি আই. বি. ঘোষ | —চন্দ্রকোণা রোড |
| জি হরিদাস পাট্টন | —ঘাটাল |
| জি মতী কনকলতা দেবী | —বঙ্গপুর |
| জি প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী | —মেদিনীপুর |

প: দিনাজপুর ●

| | |
|----------------------|-----------|
| জি এ. কে. চ্যাটার্জী | —বালুরঘাট |
|----------------------|-----------|

চক্ৰবৰ্ত্তী পৰগণা

| | |
|----------------------------|---------------------|
| শ্ৰীমদীশকুমার ভট্টাচাৰ্য | —ইছাপুৰ |
| শ্ৰীপ্ৰবালক দাস | —কাৰ্বীপ |
| মে: বি. এল. সাহা এণ্ড সন্স | —ব্যাৰাকপুৰ |
| শ্ৰী বাৰ ব্ৰহ্মজনাথ চৌধুৰী | —টাকী |
| মে: এ. বি. ষ্টল | —দক্ষিণ-বাবাসত |
| শ্ৰী বি. চৌধুৰী | —বাহুবুৰ |
| শ্ৰী বি. সি. ঘোষ | —ৰাংবুৰ |
| শ্ৰী বিজয় ভট্টাচাৰ্য | —বি. ডি. কলোনি |
| মে: বি. এন. লাইব্ৰেৰী | —কাৰ্বীপুৰ |
| শ্ৰীকমলেন্দু দাশগুপ্ত | —কল্যাণী |
| শ্ৰী ডি. এন. ভট্টাচাৰ্য | —বাহুবুৰ |
| শ্ৰী ডি. সি. পণ্ডিত | —বাহুবুৰ |
| মে: ডি. জি. লাইব্ৰেৰী | —মধ্যমদ্বাৰ |
| শ্ৰী জি. সি. দাশ | —ভানুপুৰ |
| মে: এছ-স্কট | —বজ্জৰ |
| মে: ওহ ষ্টোৰ | —ব্যাৰাকপুৰ |
| শ্ৰীহৰিশদ ঘোষ | —ব্যাৰাকপুৰ |
| শ্ৰীইক্ষপাল সিং | —দমদম |
| শ্ৰী জি. এন. দাস | —কল্যাণী |
| শ্ৰী জি. আৰ. সিংহ | —নৈহাটি |
| শ্ৰী জে. বাৰ | —কসবা |
| শ্ৰী কে. সি. ব্যানাজী | —বৰাহনগৰ |
| শ্ৰী কে. জি. দত্ত | —দমদম (মাগেৰ বাজাৰ) |
| শ্ৰীকাশীনাথ শৰ্মা | —হেট্টিং ষ্টাট |
| শ্ৰীলোকনাথ চক্ৰ | —বজ্জৰ |
| শ্ৰীমাহনলাল নাগ | —বাবাসত |
| শ্ৰী এম. চক্ৰবৰ্তী | —বেলুং'ৱা |
| শ্ৰী এন. পি. সাউ | —ভানুপুৰ |
| শ্ৰী এন. চাট্টাজী | —ব্যাৰাকপুৰ |
| শ্ৰী এন. লি. মুখাজী | —চাকুৰিয়া |
| শ্ৰী এন. কে. কুহু | —বৰাহনগৰ |
| মে: নবাবগঞ্জ নিউজ এজেন্সী | —ইছাপুৰ |
| শ্ৰীনিমাইচক্ৰ দাস | —দমদম |
| শ্ৰী এন. জি. দাস | —বাদবপুৰ |
| শ্ৰী এন. এন. ঘোষ | —ব্যাৰাকপুৰ |
| শ্ৰীমদানন্দনাথ দীক্ষিত | —বাটানগৰ |
| শ্ৰীজিৎকুমার বসু | —বৰাহনগৰ |
| শ্ৰী এম. বি. বায়চৌধুৰী | —বেলুং'ৱা |
| শ্ৰী এম. বি. বায়চৌধুৰী | —খড়লাহ |
| শ্ৰীসন্তোষ ঘোষ | —ভাটপাড়া |
| শ্ৰী এম. ডি. প্ৰদীপ সি | —ব্যাৰাকপুৰ |
| শ্ৰীশশীচক্ৰ ভৌমিক | —বাদবপুৰ |
| শ্ৰীমদচক্ৰ বান | —দমদম |
| শ্ৰীধীৰ বিশ্বাস | —হাবড়া |
| শ্ৰীহৰিশদ দাস | —দমদম |
| শ্ৰীমত্ৰ ভৌমিক | —বাদবপুৰ |

চক্ৰবৰ্ত্তী পৰগণা

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| শ্ৰী এস চাকলাদাৰ | —খড়লাহ |
| শ্ৰীকুমার অধিকাৰী | —বৰাহনগৰ |
| শ্ৰীতাৰাশন পাল | —পানিহাটি |
| শ্ৰীতাপস ব্যানাজী | —কাঁচড়াপ ডা |
| শ্ৰীবুধনবাম | —দমদম |
| বীৰভূম | |
| শ্ৰীমাদিকচক্ৰ সাহা | —বামপুৰহাট |
| শ্ৰীমমিমোহন চক্ৰ | —নলহাটি |
| শ্ৰীমদ্বজকুমার ব্যানাজী | —শিউড়ি |
| মানিকু | |
| শ্ৰীবিমলকান্ত দাৰ | —হুমাৰুখি ও বৰাকৰ |
| শ্ৰীঅবনীমোহন দাশ | —পুলিয়া |
| বাঁকুড়া | |
| শ্ৰীগজেশচক্ৰ কৰ্মকাৰ | —বিকুপুৰ |
| শ্ৰী বি. পাল | —সোনামুখী |
| শ্ৰীবিজয়দাস | —বাঁকুড়া |
| জলপাইগুড়ি | |
| শ্ৰী এ. থৰ চৌধুৰী | —আলিপুৰহাৰ |
| শ্ৰীসতীশচক্ৰ বোস | —মল-জংশন |
| শ্ৰীমতিলাল সরকার | —কালচিনি |
| দাৰ্জিলিং | |
| শ্ৰী ডি. এন. বড়াল | —কালিম্পাং |
| শ্ৰীমতী শচীমণী দেবী | —শিলিগুড়ি টাউন |
| ৰামপ্ৰসাদ সেন | —দাৰ্জিলিং |
| কুচবিহাৰ | |
| শ্ৰীঅমল্যবতন বসুগুপ্ত | —দিনহাটা |
| শ্ৰীঅনিলব্ৰজ চক্ৰবৰ্তী | —কুচবিহাৰ |
| সাঁওতাল পৰগণা | |
| শ্ৰী জে. এন. সাহা | —পাৰুড় |
| শ্ৰীমদ্বজনাথ দাস | —বৈতননাথাম |
| শ্ৰীবটকুম্ভ মিত্ৰ | —মথুপুৰ |
| ত্ৰিপুরা | |
| শ্ৰীমাদিক ভট্টাচাৰ্য | —আগৰতলা |
| উড়িয়া | |
| শ্ৰী বি. দত্ত | —ৰৌঢ়কল্লা |
| মে: এ. এইচ. মিত্ৰ সরকার এণ্ড কোং | —ব্ৰজবাজনগৰ |
| বোম্বাই | |
| শ্ৰী জি. এম. ঘোষ চৌধুৰী | —বাইকুলা. বোম্বে |
| এস. বি. মোদক | —বোম্বে |
| মধ্য প্ৰদেশ | |
| মে: এ. এইচ. মিত্ৰ সরকার এণ্ড কোং | —জিলাই ও ডাগ |

আলাহ

| | |
|--|--------------------|
| শ্ৰীমদীশকুমার মজুমদাৰ | —বৰপুৰ |
| শ্ৰীমদীশ চক্ৰবৰ্তী | —ডিব্ৰুগড় |
| শ্ৰীপ্ৰমোদব্ৰজ সেনগুপ্ত | —হাইলাকাপি |
| মেসার্স শিলা শ্ৰোটাৰ্স | —শিলা |
| শ্ৰীনেত্ৰনাথ গোস্বামী | —কমলপুৰ |
| শ্ৰী বি. কে. চৌধুৰী | —শিলচৰ |
| শ্ৰীমতী কনকৰাসী গাঙ্গুলী | —তিনিমুখিয়া |
| শ্ৰী এম. আৰ. ভট্টাচাৰ্য | —মাকুমজা |
| শ্ৰীচন্দ্ৰব্ৰজ ডায়েল | —তেজপুৰ |
| মে: পি. এস. জৈন এণ্ড কোং | —ইন্দল |
| শ্ৰী কে. চক্ৰবৰ্তী | —গোৱালপাড়া |
| মে: ভাসাভাল লাইব্ৰেৰী | —ডিব্ৰুগড় |
| শ্ৰীঅমৃতোষ মিত্ৰ | —চমুয়া |
| শ্ৰী বি. চক্ৰবৰ্তী | —মোহনবাড়ী |
| শ্ৰীকালচাঁদ বৰিক | —কৰিমগঞ্জ |
| শ্ৰীজিলাচন দাৰ | —বুৰগী |
| শ্ৰীমেশচক্ৰ আইচ | —কোকাৰাখড় |
| বিহাৰ | |
| শ্ৰীসতীশচক্ৰ বায়চৌধুৰী | —বনুনাথপুৰ |
| শ্ৰীপৰিতোষ মুখাজী | —ধানবাদ |
| শ্ৰীমজিতকুমার সরকার | —কাতৰাগড় |
| শ্ৰীমদমোহন চাট্টাজী | —মজঃকৰপুৰ |
| মে: ক্যাপিটাল বুক ডিপো | —ৰাচী |
| মে: গয়া মিউজিক্যাল ষ্টোৰ | —গয়া |
| শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদাৰ | —কাটিহাৰ |
| শ্ৰীবাধায়ম মিত্ৰ | —মুন্সেৰ |
| মে: অমৃতলাল খাৰ্কাৰ এণ্ড কোং | —খৰিয়া |
| শ্ৰীৰামচন্দ্ৰসাম | —লোহাৰদাগা |
| শ্ৰী এইচ. এন. চাট্টাজী | —ধানবাদ |
| মে: চক্ৰবৰ্তী এণ্ড কোং | —হাজাৰীবাগ টাউন |
| শ্ৰীদেবানন্দনাথলাল | —দিনাপুৰ |
| শ্ৰীবাসু সিং | —পাটনা |
| শ্ৰীসৰোজনাথ ঘোষ | —সিদ্ধি ও পাথৰদিহি |
| শ্ৰীকৰুণাসিকু দাশ | —বেংমো |
| শ্ৰীকুজবিহাৰী গাঙ্গুলী | —জামালপুৰ |
| শ্ৰীলীলেশচক্ৰ বিশ্বাস | —বৰজামলা |
| মে: ইউনাইটেড ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্স | —টাটানগৰ |
| উত্তৰ প্ৰদেশ | |
| মেসার্স মিকাডোৰ বেনাৰ্স নিউজ পেপাৰ এজেন্সী | —বেনাৰ্স |
| শ্ৰী এম. বি. মৈত্ৰ | —লক্ষ্ণৌ |
| শ্ৰীমদ্বজমোহন গোস্বামী | —নিউ দিল্লী |
| শ্ৰীনগেন্দ্ৰনাথ দাস | —নিউ দিল্লী |
| মে: সেন্ট্ৰাল নিউজ এজেন্সী | —নিউ দিল্লী |
| মে: কিতাব শৰ | —নিউ দিল্লী |
| মে: ইণ্ডিয়ানশালাল ষ্টোৰ | —এলাহাবাদ |
| মে: শ্ৰীকৃষ্ণ বুক হাউচ | —লক্ষ্ণৌ |

অর্থনীতিক মহলে এই নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে বেশ কিছুটা। অবশ্য সকল পরিবারের ক্ষেত্রেই একটি ধারাবাহিক বাজেট থাকতে পারে না, বাকি বলা যেতে পারে আদর্শ বাজেট বা কল্পনামূলক বাজেট। এর প্রধান কারণটাই হল—সকল ক্ষেত্রেই ব্যয়ের চাহিদা একরূপ নয়, মাসিক আয়ও হয় না সকল পরিবারের হুবহু একই প্রকার। কেউ অল্পরকম বলে দিতে পারে না এই অবস্থার সাময়িক খরচটি ঠিক এমনি হবে; গৃহস্থানী ও গৃহকর্তার এবং সেই সঙ্গে পরিবারের লোকদের ভূমি ও দায়িত্ববোধই একেত্রে বড় কথা।

যেমন দেখা যায়, এমন অনেক আছে, বাকি খরচা (হাউস-খরচ) বলতে বাকির কিছুই ভেদন নেই—পানি, সিগারেট, চাক-কি কিছা সেট পাউডার এসবের জন্য হারা ভাগির অসুস্থত্ব করে না। আর একটি ক্ষেত্রীয় মায় করা চলে, বাকির বাকি খরচার অবস্থা সেই, যা সিগারেট ইত্যাদি প্রায় সর্বজন হুখে হুখে, সেট পাউডার ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রীও না হলেই নয়। একটি পরিবারকে হঠাৎ হেলেনমেরের সর্বোত্তম শিক্ষাদানে প্রচুর অর্থ ব্যয়েও বহুপরিচয় দেখা গেলো, আবার অন্তর্য এও দেখা দেখতে পাওয়া বিচিত্র নয়, যেখানে হেলেনমেরের শিক্ষাদানের ব্যাপারে রয়েছে একটা অজানা বা উদাসীন কিংবা নিতান্ত সাধারণ চোঁটা ও অর্থব্যয় মাত্র। পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্য-দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়ে থাকে কোন কোন পরিবারে, আবার অনেকগুলি পরিবারে এসব অত্যাবশ্যক খাতও বেশ ভেবে-চিন্তে অর্থব্যয় আয়ের দিকে তাকিয়ে

খরচ করতে দেখা যায়। সামান্য ডাল-ডাতেই সস্তা এমন পরিবারের যেমন অভাব নেই, অপর দিকে তেমনি কতকগুলি পরিবার দেখা যাবে, বাকির দৈনন্দিন খাততালিকার মাছ-মাংস দুই ডিম এগুলি প্রায় থাকা চাই-ই।

বহু সংসার বা পরিবারেই একটি অভিযোগ বা পরিতাপের সুস্থ ভনতে পাওয়া যায়—বাকিবক্ষেত্রে তাদের বাজেট অচল অর্থব্যয় আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় মিল বা সমতা নেই। বিশেষজ্ঞা একেত্রে বলতে চেয়েছেন, এমনি যেখানে অবস্থা, সেখানে হয় খরচের বিষয়গুলি কাট ছাট করতে হবে, নয় তো পারিবারিক আয় বাড়াতে হবে যেমন করেই হোক। জীবনযাত্রার মান বড়টা উন্নত রাখতে চাওয়া হবে, আয়ের পরিমাণও সেই অনুপাতে বর্ধিত করার ব্যবস্থা যদি না হলে, একেত্রে বাজেট অর্থহীন না হয়ে পারে না। একা পুরুষের যোগদানে স্ত্রীত্বাবে সংসার চলা যেখানে বটম, মারীকেও সেখানে আগিয়ে আসতে হবে অর্থ উপায়ে জড়, প্রসঙ্গতঃ এইট বলতে হয়।

সর্বোপরি ঘরোয়া বা পারিবারিক বাজেটের সাক্ষ্য নির্ভর করে পরিবারের কর্তা ও আর সদস্যদের গুণবুদ্ধি ও ঐক্যমতের উপর। যে কোন মোটা ব্যয়ের বেলার প্রত্যেকের মনের ভেতর পরিচয় বোঝাপড়া হওয়া চাই এবং সেটি আগেভাগেই। বাজেট করে চলার পরিবর্তে জীবনে বাধ্যতাকার ও অমিতব্যয়িতাকে হান দিলে সুখের আশা স্তূর্ণপরাহত, এ ভুলে চলবে না।

ক্লান্ত বীণায়

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ষ প্রাণের বার্ষতা নিয়ে
কি হবে গো আজ গান গেয়ে ?
জীবন-যুদ্ধে হাস ভেঙে গেছে
মিহরা আজ আমি নেয়ে।
কিবে গেছ তুমি যুদ্ধে গেছে প্রেম,
মিটে গেছে সব ভালবাসা।
সব কিছু মোর নিয়ে গেছে হার
অতৃপ্ত বড় সবনাশ।
তবুও বলছি তুমি বন্ধু
হবে হবে শেষ এ ব্যথারই।
তাই তো এখনও ক্লান্ত বীণায়
শেষ করিনিকো দরবারী।
এমনি দিনে যে তুমিও বন্ধু
আত্মগ্রাহীর গোপন বেশে
মিথোই ঘুরে মরবে বেথেছি
নিজেকে কি পর করবে শেষে ?
তবুও ভাকছি তুমি বন্ধু
কিবে এসো তুমি আমার মাঝে।
তাপিত এ প্রাণ ছুড়াও ছুড়াও
তুমি দিতে হবে জীবন-সাঁকে।

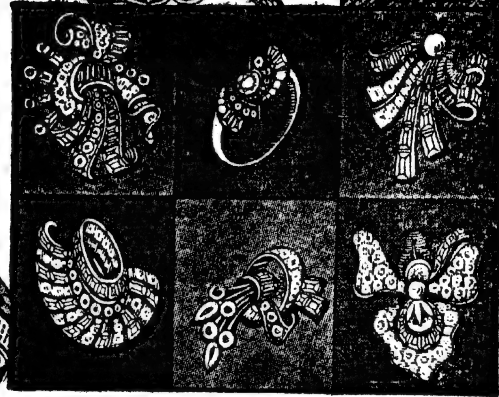
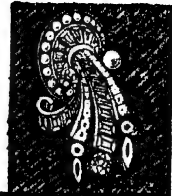
বেকার

বীথি বন্দু

বন্ধু, তুমি এ দুর্দিনে
টিকানা দিয়েছ বার,
শতক চোঁটা করেছি তবুও
দেখা হয় নাই তার !
আমি যে বেকার, বড় ঘৃণা তাই
জেগেছে তাহার প্রাণ,
তাই বুঝি আর দেখিয়া দেখে না
বুঝি কোন অভিমান।
মাথা নীচু ক'রে বাই আমি তাই
তবুও তাহার প্রাণ—
একটু গলে না, ভাবি আজ বসে
এই কি প্রীতির দান ?
সিন্ধু-প্রাণের বিহীন ভাবা
খুলিয়া বলেছি যাবে,
রুদ্ধ-কারার গোপন ব্যথাটি
অর্থ দিয়েছি তাতে।
প্রীতির আবাসে শ্রুতিবে চেয়েছি
বেলে নাই কিছু মোর,
সকলে যেমন চাহিয়াছে বৃক
তেমনি চেয়েছি তোমার।



সৌন্দর্যে মাদুর্য



গিনি চান্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি. সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলাস্

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭ সি/১ চকুজার টাই কলিকতা-২ গ্রাম-কুশিয়ার
ডাক-বালি গও-২০৭/সি গ্রামবিহারী এডিনিউ কলিকতা-২ ফোন-৪৬-৪৬৬৬
মোড়ামের পুরাতন চিত্রনা ১২৪, ১২৫/১, মতলাজার ট্রাফ, কলিকতা-২
কেন্দ্রময় রবিবার খোলা থাকে
ডাক-জামসেদপুর ফোন-জামসেদপুর- সিটি-২৪৫৮-এ

জন্মান্তর কি সম্ভব ?

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

জন্ম বলিতে সাধারণত উৎপত্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। যে বস্তু পূর্বে ছিল না তাহার সত্তা সৃষ্টি (লাভ) বা পূর্বে বস্তুটি থাকিলে ও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির দ্বারা বাহ্যর জানিবার মত অবস্থা ছিল না, তাহারই (সেই বস্তুই) ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জানিবার মত যোগ্য অবস্থা। পূর্বের মতটি অসংস্কারবানীর মত। এই মতের সমর্থক চার্বাক, বৌদ্ধ, নৈয়ারিক, বৈশেষিক প্রভৃতি। দ্বিতীয় মতটি সংস্কারবানীর মত। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত * ইত্যাদি। পূর্বমতে উৎপত্তির পূর্বে বস্তু কখনই ছিল না। দ্বিতীয়মতে উৎপত্তির পূর্বেও বস্তুটি অনতিব্যক্ত অবস্থা বিশিষ্টরূপে ছিল। এই প্রবন্ধে জীবের জন্ম, জন্মান্তরই আলোচ্য; অপরের উৎপত্তি আলোচনীয় নয়। আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জীবের জন্ম জানিতে পারিতেছি, সুতরাং এবিষয়ে সাধারণত সন্দেহ নাই; কিন্তু জন্মান্তর অর্থাৎ এই বর্তমান জন্ম ব্যতীত পূর্ব ও পরজন্ম সম্ভব কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য। আবার জন্মান্তর বলিতে একই সত্তানের (দ্বারার) ভিন্ন ভিন্ন সত্তানী অর্থাৎ ব্যক্তির জন্ম, এইরূপ, বৌদ্ধমত অনুসারে জন্মান্তর বুলিলেও সন্দেহ দূরীভূত হইবে না। কারণ বৌদ্ধমতে সত্তানী ব্যতিরিক্ত সত্তানের পৃথক সত্তা না থাকায় আবার সত্তানী মাত্রই কণিক বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কাহারও জন্মান্তর নাই। অথচ জন্মান্তর লইয়া যে বাদান্তবাদ তাহা এক ছারী আত্মাকে সন্দেহ করিয়াই তাহার পৃথক পৃথক নূতন, পুরাতন জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে উদ্ভূত।

কেহ কেহ বলেন, 'জন্মান্তর নাই অর্থাৎ একটি জীবের এই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব কিছুই আরম্ভ, আর তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ।' এই মতের সমর্থকগণ লোকায়ত বা চার্বাক নামে প্রসিদ্ধ। এই নাম কোন ব্যক্তি বা গণের নাম নয়, কিন্তু যে মত লোকে আরম্ভ অর্থাৎ ব্যাপ্ত তাহার নাম লোকায়ত। মোট কথা, বাহ্য অধিকাংশ লোকই মানে তাহাই লোকায়ত মত। অধিকাংশ লোকেই শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে আত্মা মনে করিয়া তাহারই স্রষ্টাধিগাণ ও হুঃখ দুঃখ করিবার চেষ্টা করে।

আবার কেহ কেহ বলেন, এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত একজন আত্মা আছে।

অপূর্ব দেহের সহিত সেই আত্মার সম্বন্ধকে তাহার (আত্মার) জন্ম বলে। এই বর্তমান দেহ ভিন্ন পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দেহের সম্বন্ধই জন্মান্তর। ইহা ভ্রায়, বৈশেষিক সাংখ্য, পাণ্ডুল, মীমাংসা, বেদান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতির মত। কিন্তু জন্মান্তর তবেই সম্ভব হয়, যদি দেহের অতিরিক্ত আত্মা থাকে ও দেহ-উৎপত্তি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দেহধারীর উৎপত্তি বিনাশ না হয়। দেহই আত্মা হইলে যে দেহের জন্ম বা মৃত্যু হয় ঠিক সেই দেহের পূর্বজন্ম সম্ভব

নয়। যেহেতু আমরা কোথাও এমন কেহি না—সামান্য বা প্রকৃতির মধ্যে যে বস্তু নষ্ট হইয়া যায়, সেই বস্তু পুনরায় উৎপন্ন হয়। শরীরও সামান্য, সুতরাং তাহার পুনরুৎপাদ সম্ভব নয়। আবার দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেহের ছায়া বা রূপ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়, আত্মাও যদি সেই ভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও তাহার জন্মান্তর সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং পাণ্ডুল এই যে, দেহাশি-অতিরিক্ত আত্মা থাকিলে এবং তাহা অবিনাশী হইলে জন্মান্তর সম্ভব নতুবা জন্মান্তর অসিদ্ধ। এখন দেখা যাক এই দুইটি সম্ভব কি না।

পূর্বপক্ষ

দেহ-অতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। কারণ, সকলেই দেখেছে আত্মা বলিয়া অস্বত্ত্ব করে; দেহের অতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। দেহের মৃত্যুর পর দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক ভাবে বাহির হইয়া বাইতে বা জন্মের সময় দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায় না। সকলেই শরীরকে আমি বলিয়া বুঝে এবং তাহারই স্রষ্টাধিগাণ প্রভৃতিতে নিজেকে স্রষ্টা, হুঃখী প্রভৃতি মনে করে। যেমন লোকে মনে করে আমি মাছব, আমার নাম স্রষ্টাধিগাণ, আমি কলিকাতার বাস করি, আমি খুব সুখী, আমি হুঃখী ইত্যাদি। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত মাছব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, বা স্রষ্টাধিগাণ নাম, কলিকাতার বাস প্রভৃতিও শরীর হইতে কোন অতিরিক্ত আত্মার সম্বন্ধ বুঝায় না। আর আমি বলিতে আত্মাকেই বুঝায়; আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থকে লোকে আমি বলে না। সুতরাং এই যেই আত্মা এবং তাহা চৈতন্য। যেমন এই সাধারণ জল বিদ্যুৎ পরিলক্ষিত না হইলেও এখন তাহা মেঘ-রূপে পরিণত হয় তখন তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে পঞ্চভূতের দ্বারা দেহ উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্চভূতে চৈতন্য না থাকিলেও দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হওয়ার কোন বাধা নাই।

উত্তরপক্ষ

যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে 'আমার শরীর' এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইত না। কারণ আমি বলিতে যখন আত্মাকে বুঝান হয়, আর সেই আত্মা যখন শরীর হইতে অভিন্ন, তখন 'আমি শরীর বা মাছব' এইরূপ ব্যবহারই সম্ভব, 'আমার শরীর' এই ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে? কেহ কি 'বটের বট, বা বটের কলস' এইরূপ ব্যবহার করে? অথচ লোকে সকলেই 'আমার শরীর' এইরূপ ব্যবহার করে। যেখানে বস্তু ও প্রথম বিভক্তির প্রয়োগ হয় সেখানে বস্তুভেদ ও প্রথমভেদ পদার্থ দুইটি পরস্পর ভিন্নই হইয়া থাকে। আমার পিতা, আমার গৃহ ইত্যাদি। অতএব 'আমার শরীর কলস, খুল' ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা শরীর হইতে যে আত্মা অতিরিক্ত তাহা বুঝা যায়। যদি বলা যায় একই অভিন্ন বস্তুতে লোকে অনেক স্থলে গৌণ ভেদ ব্যবহার করে। যেমন রাছর মস্তক, পাখরের প্রতিমা ইত্যাদি। রাছ ও মস্তক অভিন্ন বস্তু, পাখর ও প্রতিমা একই বস্তু। তথাপি লোকে রাছর মস্তক, পাখরের প্রতিমা বলিয়া ভেদের ব্যবহার করে। সেইরূপ শরীর ও আত্মা অভিন্ন পদার্থ হইলেও 'আমার শরীর' এইরূপ গৌণ ভেদ ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না। যেখানে পরিষ্কার ভাবে সকলের অভিন্ন জ্ঞান থাকে সেখানেই গৌণ ভেদের ব্যবহার হয়। যেমন—রাছ ও মস্তক অভিন্ন বলিয়া সকলেই জানা আছে, এইরাছর মস্তক—এইরূপ গৌণ ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হয়; কিন্তু দেহ ও

* অর্থেতবেদান্ত ভিন্ন অন্যান্য বেদান্তবাদীদের মতে কার্য সৎ।

অর্থেতবেদান্তে যে সংস্কারবাদের কথা আছে তাহা অসংস্কারবাদ বস্তুদের অস্তিত্বের। অর্থেতবাদী বাস্তবিক পক্ষে সংস্কারবাদী। ভ্রমতে কারণ হইতে কার্যের পৃথক সত্তা নাই।

আত্মা যে অভিন্ন, তাহা পরিহার্য ভাবে সর্ববাসিসম্বন্ধরূপে জানা নাই। অতএব এখানে দেখেই অবলম্বন করিয়া ‘আমার শরীর’ এই ব্যবহার সম্ভব হইবে না। দেহ ও আত্মার অভিন্ন জ্ঞান অবিসংবাদিরূপে সকলেরই আছে—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও দেখকে আত্মা বলা বাইবে না। বলা—দেহকে আত্মা বলিলে প্রশ্ন হইবে যে, আত্মা চৈতন্য বলিয়া দেহও চৈতন্যসিদ্ধ হওয়ার সাধনবৎ দেহের প্রত্যেক অবয়বে এক একটি পৃথক পৃথক চৈতন্য আছে অথবা দেহের সমস্ত অবয়বে মিলিয়া একটি চৈতন্য। দেহ যে সাধনবৎ তাহা প্রত্যক্ষগিষ্ঠ। যদি বল প্রত্যেক অবয়বে এক একটি পৃথক চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে এই দোষ হইবে যে একটি দেহে অনেক চৈতন্যের সমাবেশ হওয়ার, বহু চৈতন্য পদার্থের নিরন্তর ব্যক্তিব্যেক ঐক্যমত না হওয়ার, শারীরিক ব্যবহার স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। একজন চৈতন্য যদি পৃথিকে বাইতে ইচ্ছা করে আর একজন সুবকও পশ্চিম দিকে বাইতে ইচ্ছা করিতে পারে। তাহার ফলে শরীরটি বিধ্বস্ত হইয়া বাইবে নতুবা সকলের সম্মান বল হইলে শরীর আর কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারিবে না।

আর যদি বল শরীরের সমস্ত অবয়ব অর্থাৎ রক্ত, মাস, মেদ, অস্থি, নীড়ী, স্নায়ু, বক প্রভৃতি সমস্ত অংশ মিলিয়া শরীরে একটি চৈতন্য উৎপন্ন হয়—তাহার উত্তরে বলিব—যেমন প্রাণী, সন্ধ্যা, তেল, অগ্নি মিলিত হইয়া একটি প্রকাশ-কার্য সম্পাদন করিলেও কোন একটি বা দুইটির অভাব হইলে আর প্রাণী ঘলে না, সেইরূপ শরীরের কোন একটি হাত বা পা কাটিয়া গেলে, তাহার অভাবে চৈতন্য নষ্ট হইয়া বাড়িক। অথচ বহু লোকের কাটা হাত ভাঙ্গা পা ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকে বা চৈতন্য থাকে। যদি বল শরীরের রূপ সমস্ত শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, শরীরের একাংশ নষ্ট হইয়া গেলে সেই অংশের রূপ না থাকিলেও অস্ত্র অংশে যেমন রূপ থাকে সেইরূপ চৈতন্যও সর্ব শরীরের গুণ বলিয়া শরীরের একাংশ নষ্ট হইয়া গেলে ও অপর অংশে চৈতন্য থাকিতে বাধা কি? তাহার উত্তর এই যে, মৃতশরীর বধন পড়িয়া থাকে, তখন তাহাতে রূপও থাকে; সেইরূপ চৈতন্যও থাকে না কেন? সুতরাং চৈতন্য, রূপের মত, দেহের গুণ নয় বা দেহের ধর্ম নয়—ইহা সিদ্ধ হওয়ার, দেহ-অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিয়া চৈতন্যকে তাহার ধর্ম বা স্বভাব বলিতে হইবে। যদি বল, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত চৈতন্য থাকি শরীরের স্বভাব, এই অস্ত্র মৃতদেহে চৈতন্য থাকে না। ইহার উত্তরে বলিব—বস্তু নষ্ট (অবৃত্ত) না হওয়া পর্যন্ত যে ধর্ম বস্তুতে অমুদৃত হয়, তাহাই জাহার স্বভাব হয়। যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের ঈতলতা ইত্যাদি। বস্তু বিত্তমান থাকিতে তাহার স্বভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং মৃতশরীর পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও বস্তু চৈতন্য অমুদৃত হয় না, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, চৈতন্য শরীরের স্বভাব নয়।

পূর্বপক্ষ

বস্তু অমুদৃত হইলেও কোন প্রতিবন্ধক বস্তু অনেক সময় জাহার স্বভাবের আদর্শ দেখা যায়। যেমন উষ্ণতা ও দাহকত

বহির স্বভাব কিছ সেই বস্তু বিশেষ মণি বা মাস্তুর বৃত্ত হইলে বহি থাকে সত্ত্বেও তাহার দাহকতা বা উষ্ণতা অমুদৃত হয় না। কারণ বিত্তমান, সত্ত্বে বাহার অস্ত্র কার্য উৎপন্ন হয় না—তাহাকে প্রতিবন্ধক বলে। বহিরূপ কারণ থাকা সত্ত্বেও মণি বা মাস্তুর বস্তু দাহকার্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া দাহের প্রতি মণি প্রতিবন্ধক। সেইরূপ শরীরের স্বভাব চৈতন্য; কিছ মৃত্যু, মুচ্ছা বা অস্থিরূপ প্রতিবন্ধক বস্তু মৃত্যু শরীরে চৈতন্য অমুদৃত হয় না। এই ভাবে চৈতন্যকে শরীরের স্বভাব বলিলে কোন অমুদ্রপণ্ডি না থাকার শরীরের অতিরিক্ত আত্মার কল্পনা করা অনর্থক কল্পনামাত্র।

উত্তরপক্ষ

কারণ বিত্তমান সত্ত্বে, বাহার অস্ত্র কার্য উৎপন্ন হয় না—অথচ বাহাকে পরিহার করিয়া কার্য উৎপাদন করা সম্ভব তাহাকেই প্রতিবন্ধক বলে। বহি বিত্তমান সত্ত্বে চক্ষুকান্ত মণির সযোপ বস্তু দাহ উৎপন্ন হয় না, সেই চক্ষুকান্ত মণিকে সরাইয়া দিয়া বা সূর্যকান্ত মণির দ্বারা চক্ষুকান্ত মণির লজ্জা অভিভূত করিয়া বহির দাহ-উৎপাদন করা যায় বলিয়া চক্ষুকান্ত মণিটি প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিছ শরীর বিত্তমান সত্ত্বেও মৃত্যু বস্তু শরীরের চৈতন্য উৎপন্ন হয় না—এই কথা বলিলে চৈতন্যের প্রতি মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক বলা বাইবে না। যদি এমন হইত, মৃত্যুকে দূর করিয়া বা অভিভূত করিয়া শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন হইত তাহা হইলে অবশ্য মৃত্যুকে চৈতন্যের প্রতিবন্ধক বলা বাইত। কিছ তাহা সম্ভব হয় না।

JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA TRUST
& CO. LONDON
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

আজ পর্যন্তও কেহ মৃত-শরীরে চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারেন নাই। অতএব মৃত্যু চৈতন্যের প্রতিবন্ধক নয় কিন্তু শরীরের সহিত প্রাণের শেষসংযোগের অংশই মৃত্যু। আরও কথা এই যে, ভাবপদার্থ ভিন্ন হাজার অভ্যস্তাভাবটি কার্যের প্রতি কারণ হয়, তাহার প্রতিযোগীকে প্রতিবন্ধক বলে। যেমন চক্ষুকাত্ত মণির অভ্যস্তাভাব দ্বারাই প্রতি কারণ হয় বলিয়া তাহার প্রতিযোগী চক্ষুকাত্ত মণিটি প্রতিবন্ধক হইতে পারিল। মৃত্যু হইতেছে প্রাণের শেষ সংযোগের অংশ। ঐ সংযোগের প্রাগ্ভাবকে অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাগ্ভাবকে শরীরে চৈতন্যের প্রতি কারণ বলিলেও বেহেতু মৃত্যুটি প্রাগ্ভাবের প্রতিযোগী আবার মৃত্যুর প্রাগ্ভাবটি ফলত, শরীরের সহিত প্রাণের শেষ সংযোগরূপ ভাবপদার্থ হওয়ার, তাহার প্রতিযোগী মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক পদার্থ বলা বাইবে না। আর মৃত্যুর অভ্যস্তাভাবটি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহার প্রতিযোগীরূপেও মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক বলা বাইবে না।

পূর্বপক্ষ

হুই বা তাহার অধিক বস্তুর সংযোগে নূতন নূতন গুণ বা স্বভাব উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন চূণের সহিত হলুদের সংযোগ হইলে লাল রং উৎপন্ন হয়। কেবল দধি কফাদি বর্ধক হইলেও শর্করাদি সংযুক্ত ঐ দধি ঘরাদি নশক ও পুষ্টিকারক হয়। আয়ুর্নিক চিকিৎসকগণ মাছের শরীরের অংশবিশেষ অকরণ্য হইয়া গেলে অনেক সময় বানর প্রভৃতি পশুর অংশবিশেষ শরীরে সংযুক্ত করিয়া দেন। তাহার ফলে অনেক সময় তাহার (বোগীর) পূর্ব স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া যায়। বুড়ের শরীরেও বোনের আবির্ভাব হয় ইত্যাদি। সেইরূপ কেবল শরীরে চৈতন্য না থাকিলেও প্রাণ, মন, বিশেষ দ্বন্দ্ব বা শরীরের কোন দ্বন্দ্ব অংশ (যাহা মৃত্যুকালে থাকে না) প্রভৃতির সংযোগ বশত শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। মৃত্যুকালে শরীর হইতে ঐ প্রাণ প্রভৃতি বিযুক্ত হওয়ার, কারণের অভাববশত চৈতন্য থাকে না ইহাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ইত্যাদি হইতে অভিব্যক্তি আত্মার প্রেরণ না থাকার জগাদ্ভয়বাদ অসিদ্ধ।

উত্তরপক্ষ

চূণ বা হলুদে পূর্ব হইতেই লাল রঙি অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল; ঐ উভয়ের সংযোগরূপ অভিব্যক্তির ফলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যদি চূণ বা হলুদে লাল রং না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সংযোগ বশত উহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারিত না। কারণ গুণ বা স্বভাব কখনও কেবল সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। গুণ ত্রয়ের ধর্ম এবং ত্রয়াকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া গুণের প্রতি ত্রয়াকে অবজ্ঞাই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ত্রয়া গুণের প্রতিকারণ না হইত, তাহা হইলে চূণ ও হলুদের সংযোগের ফলে লাল রঙি ঐ চূণ বা হলুদে উৎপন্ন না হইয়া আসত বা মাটিতে উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে, লাল রংের প্রতি চূণ এবং হলুদও কারণ। আর চূণও হলুদকে যখন লাল রংের প্রতিকারণ বলিয়া স্বীকারই করিতে হইল, তখন তাহাদের সংযোগকে কারণ স্বীকার না করিয়া অভিব্যক্তক মাত্র স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আর এইরূপ দেখাও

যায়—কুহ্মে পূর্ব হইতে গন্ধ থাকে, গন্ধ মৃত সংযোগ করিলে সেই গন্ধ অভিব্যক্ত হয় বলিয়া গন্ধ মৃত বা তাহার সংযোগটি গন্ধের অভিব্যক্তক মাত্র। দধি শর্করার সংযোগ, মাছের-শরীরে বানরের খায়র্ড গ্রাণ্ড সংযোগ ইত্যাদি ফলেও এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে। শরীর বা মনে নানা প্রকার গুণ বা স্বভাব অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে। যথোচিত অভিব্যক্তক (Operation প্রভৃতি) দ্বারা সেই সব গুণ বা স্বভাবের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। কেবল সংযোগবশত কোন স্বভাব উদ্ভিয়া আসে না। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির সংযোগ বশত যদি চৈতন্য উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ চৈতন্য, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বা প্রাণ প্রভৃতি বস্তুর এক বা তত্তাত্ত্বিক বস্তুতে পূর্ব হইতে অনভিব্যক্ত ভাবে ছিল। সংযোগের ফলে অভিব্যক্ত হয়; যিরোগের ফলে পুনরায় তিরোহিত হয়। কিন্তু শরীরে যে চৈতন্য থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য স্বীকার করিলে শরীরের বেলায় যে দোষ হয়, ইন্দ্রিয়রূপেও সেই দোষের আপত্তি হইবে। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যকে আরও দোষ এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় পূর্বে বহু বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল; পরে যখন চক্ষু ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া যায়, তখন মাছের পূর্ব প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুগুলি স্মরণ না করুক; কারণ চক্ষুরূপ আত্মা ত মরিয়া গিয়াছে। কর্ণ প্রভৃতি ত চক্ষু হইতে ভিন্ন। চক্ষুর অক্ষুণ্ণ বস্তু কর্ণ প্রভৃতি স্মরণ করিতে পারে না। অস্ত্রের অক্ষুণ্ণ বস্তু অস্ত্র কর্ণও স্মরণ করে না। অথচ মাছের পরে যখন চক্ষু হারায় তখনও চক্ষুর দ্বারা পূর্ব অক্ষুণ্ণ বস্তুর স্মরণ করে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন দ্বারা কোন চেতন পদার্থ আছে; বাহ্য পূর্ণাপর বিষয়ের অক্ষুণ্ণ স্মরণ করিতে পারে।

চৈতন্য যে মনের ধর্ম নয়, তাহা একটু পরে দেখান হইবে। বাকি থাকিল প্রাণ। এখন দেখা যাক চৈতন্যটি প্রাণের ধর্ম বা স্বভাব কি না। প্রাণে চৈতন্য থাকে না। কারণ স্রুষ্টির সময় প্রাণ শরীরে সংযুক্ত থাকে অথচ ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না বা স্রুষ্টি কালে কোন জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য থাকে না। যদি বলা যায়—স্রুষ্টি হইতে উঠিয়া লোকে নিজের সত্তা বা আনন্দ প্রভৃতি স্মরণ করে বলিয়া স্রুষ্টি সময়ে সামান্যভাবে চৈতন্য বা জ্ঞান থাকে, মনের সংযোগ না থাকায় বিশেষ জ্ঞান হয় না। প্রাণরূপ আত্মার সামান্য জ্ঞানের প্রতি শরীর সংযোগটি কারণ, আর বিশেষ জ্ঞানের প্রতি প্রাণে শরীর ও মনের সংযোগই কারণ। সুতরাং চৈতন্য প্রাণের ধর্ম হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিব, তোমাদের (পূর্বপক্ষীর) মতে প্রাণে চৈতন্য স্বীকার করায় প্রাণকে আত্মা বলিতে হইবে। কারণ আত্মা চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। অথচ জগাদ্ভয় স্বীকার না করায় প্রাণকে বিনাশীল বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব প্রাণকে নিত্য স্বীকার করিলে শরীরের জন্মের পূর্বে বা পরে প্রাণের সত্তা থাকায় জগাদ্ভয় নিষ্ক হইতে পারিবে। প্রাণ বিনাশী হইলে, বিনাশী ভাবপদার্থ মাত্রই উৎপত্তিশীল হয়, এবং উৎপত্তিশীল ত্রয়া সাধারণ হয় বলিয়া প্রাণের উৎপত্তি এবং সাধারণ স্বীকার করিতে হইবে।

সাধারণ স্বীকার করার পূর্বের মত প্রশ্ন হইবে যে প্রাণের প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য উৎপন্ন হয়, অথবা সমস্ত

অবরবে একটি চৈতন্ত উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক অবরবে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্ত স্বীকার করিলে এক শরীরে অনেক চেতনের সমাবেশ বশত পূর্বের মত শরীরস্বাত্রার অব্যবস্থা হইবে। আর সমস্ত অবরবে একটি চৈতন্ত স্বীকার করিলে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য অবস্থায় প্রাণের এক বা একাধিক অবরবের বিনাশ বশত চৈতন্তও নষ্ট হইয়া যাইবে। অথচ তাহা হয় না। সুতরাং প্রাণে চৈতন্ত নাই যদি বলা যায় সমস্ত বস্ত্রে একটি রূপ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; বস্ত্রের একাংশ ছিন্ন হইলে বা বস্ত্রে কিয়দংশ বোপ করা হইলে নূতন নূতন রূপ উৎপন্ন হয়; বস্ত্র কখনও নীরূপ হয় না; সেইরূপ প্রাণের সমস্ত অবরবের একটি চৈতন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার (প্রাণের) একাংশ নষ্ট হইলেও চৈতন্ত নষ্ট হইবে কেন? বতঙ্গ প্রাণের একটি অবরবও থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে চৈতন্ত থাকিবে; অথবা নূতন নূতন চৈতন্ত উৎপন্ন হইবে। সুতরাং চৈতন্তের একেবারে বিনাশের আশঙ্কি হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলিব যে, জীবের অবরবের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে অবরবী পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ পূর্ব-অবরবী থাকে না নূতন অবরবীই উৎপন্ন হয়। পূর্বে যে বস্ত্রে বতঙ্গ ছিল, পরে এক-দুই বা অধিক স্তরে যদি সেই বস্ত্র হইতে বিচ্যুত হয় বা তাহাতে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঠিক পূর্ব-বস্ত্র আর থাকে না, নূতন বা অন্য বস্ত্রই উৎপন্ন হয়, মোট কথা, বস্ত্রটি ভিন্ন

হইয়া যায়। বস্ত্র ভিন্ন হওয়ার কালে তাহার রং-ও পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অন্য রং তাহাতে উৎপন্ন হয়। জন্ম ভিন্ন হইলে তাহার গুণও অবজ্ঞাই ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ প্রাণ সাবয়ব বলিয়া বাল্য যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থাতে তাহার অবরবের হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়ার অবরবী রূপ প্রাণও ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন হয়—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অবরবী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হওয়ার তাহার চৈতন্তরূপ গুণও ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন হইবে—ইহা অনস্বীকার্য। তাহা হইলে বাল্যে যে চেতন প্রাণরূপী আত্মা ছিলেন যৌবনে সেই আত্মা না থাকায়, পরন্তু ভিন্ন আত্মা উৎপন্ন হওয়ার লোকে বাল্যের অল্পকৃত বিষয় বা ঘটনাকে যৌবনে স্মরণ করিতে পারিব না। কারণ বাল্যের প্রাণাত্মা ভিন্ন, যৌবনের প্রাণাত্মা ভিন্ন বলিয়া বাল্যে অল্পকৃত আত্মার বিষয়কে যৌবনের আত্মা স্মরণ করিতে পারে না। অথচ সকলেই বাল্য যৌবনের ঘটনা রোগাদি বিশেষ-প্রতিবন্ধক না থাকিলে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে স্মরণ করিয়া থাকে। এই স্মরণের নিয়ম বশত স্বীকার করিতে হইবে—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এক অপরিবর্তিত স্থায়ী নিরবয়ব আত্মা থাকেন—বাহার কলে পূর্ব-স্মরণ প্রভৃতি সত্ত্ব হয়। শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাবয়ব বলিয়া পরিবর্তনশীল হওয়ার স্মরণের ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ইহারা আত্মা নয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।]

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রভাতী বিশ্বাস

যে চিরপথিক, পথ চল, পথ চল।

হুটি নয়নের কাজল মায়ার

ছি ছি বেহুইন, বাঁধিবে তোমার

স্মরণ ডাকিছে হাতছানি দিয়ে

চল চল তুমি চল।

ভুবন-ভরা সে রূপের মাধুরী

পান কর তুমি, হুটি আঁধি ভরি

পিপাসা মিটিবে; অমিয়-ধারাতে

প্লাবিত হবে স্তনয়তল।

অরুণ রতনে খুঁজে নেবে যদি

পথ চল, পথ চল।

ওই শোন স্তার বাঁশরীর ধনি

ভুবন ভরিয়া উঠে রশ্মি' রশ্মি'

মধুর সে বাণী শুনিতে দেয় না

ধরণীর কোলাহল।

তোমার আশার, ডাকে সে তোমার

চল তার কাছে চল।

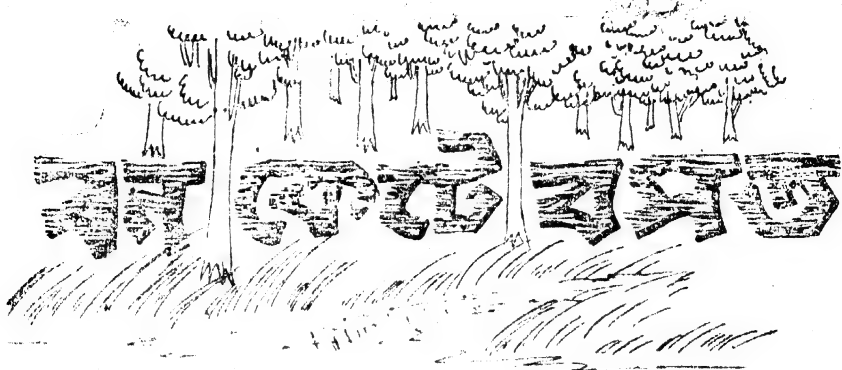
সারাটি জীবন বায়ে ফির খুঁজে

মরণের বেশে আসিবে সে নিজে

মিলন-সোহাগে ধস্ত হবে যে

বিরহের আঁধিজল।

তীর্থরাজের চরণে ঢালিবে সকল তীর্থকল।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

তেরে।

চৌধুরিগঞ্জ অবধি রাস্তার নিশানা। জগা সেই রাস্তা ধরে চলেছে। চলা আর কি, একরকম দৌড়ানো। রাস্তায় বেরলেই জগার এই কাণ্ড, বীরে ব্রহ্মে পা ফেলা কোঠিতে লেখে না। শিঙনে বলাই, সে হাঁপাচ্ছে। আন্তে বে জগা, আন্তে। আবার ওই মধ্যে বসিকতা করে'নৈয় একটু: এত ছুটছিল কেন বে? দজ্জাল মেয়েটার ভরে? উঁহ, সে পিঙনে নেই। আন্তে চল।

উঁহু জায়গা হল তো বন-জঙ্গল, নাবাল হল তো জল। বনের গাছ-পালা কেটে নাবাল জমির উপর মাটি ফেলে হাত চারেক চণ্ডা রাস্তা টেনে নিয়ে গেছে। সেই আরো বিপদ। কাটা গাছের গোড়াগুলো শুলের মতন পায়ে খোঁচা দেয়। নতুন তোলা মাটিতে ঠোঁড় লাগে পায়ে। জগার লাগে না, বোধ করি শহুরে ঘোড়ার মতন পায়ের তলায় লোহার নাল বাঁধিয়ে নিয়েছে। নয়তো ছোট্ট কেমন করে ঐ রাস্তায়? বলাই পারে না—রাস্তা ছেড়ে সে পাশে অপথে চলে যায়, জলে নেমে পড়ে। গোটা দুই-তিন খাল বাঁধা হচ্ছে, কাজ শেষ হয়নি এখনো। তা জগার কাণ্ড দেখ, তিলেক খিচা না করে খালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তবতর করে সাঁতরে চলে গেল পানিকোড়ির মতন। রাস্তাটা করেছে কিন্তু নাকের দোজা। বারোবেঁকির প্যাঁচে প্যাঁচে বত ঘুরতে হত, সংকেপ হয়ে গিয়ে বোধ করি তার শিকিতে ঝাঁড়িয়েছে। আর সত্যি সত্যি বখন পাকা রাস্তা হবে মোটার চলবে, তখন কুমিরমারি একেবারে ঘরের দুয়ারে। শলক কেলতে না কেলতে পৌঁছে দেবে।

সাঁইতলা পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিস্তর ক্ষণ আগে এসেছে তবু। নৌকো হলে দিনের মধ্যে আসা ষট না। জগা বলে, আলায় চল বে বলাই আগে। এত বেশি উত্তপা হয়ে পড়ল কেন বড়দা? পনের-বিশ হাত বাঁধ ভেঙেছে, তার মধ্যে আজব ব্যাপার কি হল? মাটির বাঁধ ভাঙবেই জলের তোড়ে। ধানকর নদ বে লোণা জল ঢুক সবুজ ধানচারা রাঙা হয়ে মরে বাবে। চারা মাছ কিছু বেতোতে পারে, কিন্তু শুঁড়ে ডিমও ঢুকবে তেমন জলের সঙ্গে। ভাঙনের বুখে গোটাকরেক খোঁটা পুঁতে খোঁটার গারে খড় জড়িয়ে দিয়ে জলের টান ভাঙে দাঁও আগে। মাছ টেঁকাও। বীরেব্রহ্মে মাটি এনে চালো ভাষণবে। ধানচাষীর মজল বুক চাপড়ে হাহাকারের কোন হেতু নেই।

আলায় একলা পচা। গগন বাঁধে গেছে লোকজন জোগাড় করে নিয়ে। ভাঙা জায়গার মাটি ফেলছে, আর খুঁজে খুঁজে দেখছে যোগ হয়েছে কিনা অস্ত কোথাও। অর্থাৎ কোনখানে ছিল হয়ে গাস্তে জল চুইয়ে আসছে কিনা ভিতরে। মাটি ধুয়ে ধুয়ে ঐ সরু ছিল এক সময়ে বড় হয়ে নবীশ্রোতের পথ করে দেয়। গোড়া থেকে সতর্ক হলে আঁখেরে হাল্কা মাও খরচাত হয় না। বাঁধের আগাগোড়া চাকার দিয়ে বেড়াচ্ছে তাই গগন। পচা বাবু-মামুদ—শেটের দারে জাসে যায় বটে কিন্তু জলকানি মাথতে সে বড় নারাজ। আলায় পাহাযর রয়েছে সে। বলে, কালীতলার ঐ দিকটা চলে বাও জগা-না। বেশি দূর বায়নি, পেয়ে বাবে।

বলাই বলে, গিয়ে কি হবে? হাল্কা হলে এসে আমরা তো আর কোণাল ধরতে বাব না। পেট চোঁ-চোঁ বরছে—যাবে চলে জগা, ভাত চাশিয়ে কি গে। চালও বুরি বাড়ন্ত! চাঁট চাল দিয়ে দে পচা।

ভাত নাখিয়ে লজ্জা-স্তেভুল এবং গুড়-স্তেভুল দিয়ে খেয়ে নিল। এই তো দু-খানা তরকারি। চেষ্টা করলে মাছও মিলত, কিন্তু দত সবুর সর না। পরিতোষের খাওয়া সেবে গড়িয়ে পড়ল মাহুর পেতে। ঘুম তো নয়, কেউ যেন ঘেঁরে বেখে গেছে নৈন্তাসম ছোঁড়া ছটাক। ছুটোছুটি করে কত কাতর হয়ে পড়েছে, ঘুমের এই ধরন দেখে বোকা বাচ্ছে। অনেকদূর ঘুমিয়ে চোখ বগড়ে জগা উঠে বসল, তখন বেশ রাজি হয়ে গেছে।

ওঠ বে বলাই! কি হল? জাগবি নে মোটে তুই?

বলাইর পা ধরে ঝাঁকি দেয়। উঁ—বলে একবার চোখ মেলে দরাজ মাহুর পেয়ে পা ছড়িয়ে সে পাশ ফিরল।

এক ছিলিম তামাক খাওয়ার দরকার মউল করে। ঘুমের আগু বেটুকু হল, তাতে জুত হয়নি। তামাক আছে, কিন্তু গুড় তুকিয়ে গিয়ে বিষাদ। তামাক টানছি না শুকনো লাউপাতা—সেইই লাগে না গলায়। ক'টা দিন ছিল না, সমস্ত গুণগোল হার গেছে এর মধ্যে।

বলাই বুম্বাক, জগা আলায় চলল। গগন কিয়তই টিক এতক্ষণে। আজ্ঞা জন্মে, তামাক কত খাবে খেও না।

গগন দাসের আলা বেছেবেধির আর দশটা আলায় মতন নয়।

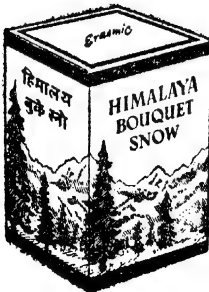


অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য...

হিমালয় বোকে

শ্রেষ্ঠ

প্রসাধন



শ্রীমতী এবং অগুরু হিমালয় বোকে স্নো আপনার

অবকে মন্থণ এবং যোজায়েম নাথেন। মর্ষমলের মত হিমালয় বোকে টয়লেট

পাউডার আপনার লাভ্যার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে

বাড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার



হু-চালা ঘর। সাঁইতলা তল্লাটের মধ্যে ঘরের মতন ঘর বটে একখানা! বাহারটা আস্তে আস্তে জমেছে। তিন দিকে এখন মাটির দেয়াল। এক পাশের দাঁওয়া গরানের ছিটের জদ করে ঘিরে নিয়ে চৌকাঠ-দরজা বসিয়েছে। গগনের শোবার ঘর, খাতাপত্র এবং হাতবাক্স সেখানে। এই ঘরে তালি দিয়ে রাখে বখন সে বাইরে কোথাও যায়।

আলা চূপচাপ একেবারে। এ সময়টা এমন হওয়ার কথা নয়। কালমাটি-মাথা জন তিন-চার পুরুষাটে হাত-পা হুঁছে। জগা জিজ্ঞাসা করে, মাটি কাটছিল তোমরা? কাজকর্মের কত দূর?

আজ শেষ হয়ে গেল।

বড়না নেই?

আছে বই কি? হিসেবপত্র হল একতৃণ। পরস-কড়ি মিটিয়ে দিয়ে ঘর ঢুক পড়েছে।

কামরার উকিতুকি নিয়ে জগা হেসে উঠল : একা একা ঘানে বসে নাকি বড়না? আলা ভৌ-ভৌ করছে, মাহুজনের কি হল?

সত্যি, হাসির ব্যাপার নয়। এত দিন সঙ্গে সঙ্গে আছে, এমন ধারা বেধা বায়নি আর কখনো। কামরার মাঝখানটার টেমি জলছে, সজা লাল কেরোসিনের ঘোঁরা উঠছে গলগল করে। আলোর সামনে হু-হাতে মাথা চেশে গগন কিম হয়ে বসে। খাওয়ার সময়টাও আলো জ্বলে না, মাছের কাঁটা জ্বক করে আলোকে বেছে ফেলে, সেই মাহুজ অহেতুক কেরোসিন পোড়ালে। ভর হল জগরোধের।

হল কি তোমার? কি ভাবছ?

গগন কণিকণে বল, আর জগা! মনটা মিইয়ে আছে। জলের নিচে বধাসর্ব্ব টলে দিয়েছি। হু-চার পরস! একদিন বা রোজগারপন্থার হল, বাঁঘের মাটি খেয়ে নিল সমস্ত। উক্টে পাচ-ছ' টাকার মতন বেনা। তার উপরে শিওন এসেছিল আজ আবার। তুল আমায়ই। বড় বড় পারশেমাছ খাইয়েছিলাম সেদিন, সেই লোতে শিওন নিত্যা নিত্যা আসতে লেগেছে। এসে মাথার মূল ঘেরে গেল।

চিঠি?

একদর আসছে, খালি হাতে আসে কি করে! সেদিন, এই ঘরো, তিনটে খামের চিঠি নিয়ে এলো। উল্লুনে দিয়ে অবসর হলাম। আবার আজ। আগের চিঠি বরারখোলায় তৈলকের বাড়ি থেকে টিকানা কেটে এখানে পাঠায়। এবারে সরাসরি চলে এসেছে। তার মানে, এই আত্মনাও জেনে ফেলেছে। কেমন করে জানল, রোজ রোজ এত সমস্ত কি লেখে—দেখিই না খুলে। বুঝিল জগা, ঐ ইচ্ছেটাই হল কাল। চিঠিপড়ে ফেলে সেই থেকে মাথা ব্যর্থ আমায়। জগার ভাল লাগে না। জুত করে এক ছিলিম'তামাক খেতে এসে একঘরে কাঁহুনি ভনবে এখন বসে বসে? সজার কোটানোর সময়টা মনে ছিল না যে ফাটাং আছে শিছনে? বলে, কবে ফুড়ি লাগাও বড়না। মাথা ঘোঁরা জবর ওহুহ। মাহুজজন দেখতে পাচ্ছিলে—কটা সিম ছিলাম না, তার মধ্যে ঘরে গেছে নাকি সমস্ত?

মাছের খাতা বন্ধ হবার লখিল। মাহুজ আসতে বাবে কোন কাজে এখন?

বলতে বলতে গগন কীলো-কীলো হয়ে পড়ে : বাপাবনের ঘেঘোবে এনে সত্যি সত্যি ঘেরে ফেলবি? এই তোর বখ হল রে জগা?

জগা বলে, আমি ছাড়া আর লোক নেই?

বলাইটাকেও যদি রেখে যেতিস—

জগা-বলাই একই কথা। এ তোমার অজ্ঞার বড়না। জগা তোমায় চিরকাল আগলে এক জায়গায় বসে থাকবে?

কিন্তু চলার কে? হু-হবার এর মধ্যে লোক বদলেছি। ছাগলের পায়ে যদি ধান পড়ত। বারোবেঁকি পাণ দিয়ে মাছ নিয়ে পৌছতে বেলা দুপুর করে গেলো। খন্দের নেই আর তখন, মাটির দর। ব্যাপারিরা তাই মাল কিনবার গা করে না এখানে। লোকও তেমন জাল নিয়ে বেতছে না।

জগা উটে দাঁড়াল বলে, বারোবেঁকি আর ক'দিন? তোমার রাজা—ভাঙার পথে আমরা এলাম। মাছ এর পরে এক দণ্ডে পৌঁছে দেবে। বেরিয়ে এসো দিকি। গানবাজনা হোক একটু। নয় তো পড়। কী ঘরের মধ্যে বসে প্যানপ্যাননি!

বাইরে এসে উজকণ্ঠে বলাইয়ের নাম ধারে ডাকে। পচাকে ডাকে। রাধেজামকে। খোল দেহালে টাঙানো। চাটি মেয়ে পাড়ামর জানান দিয়ে দিল। গগনকে বলে, জুত করে এক ছিলিম চড়াও দিকি বড়না। তামাক না খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। হুম ভেঙেই তোমার কাছে ছুটেছি।

তামাক সেজে টানতে টানতে এসে গগন জগার হাতে হুকো দিল। হুকো দিয়ে শুক কর্তে বলে ওঠে, দশটা টাকা কর্ত দিতে পারিস জগা?

জগা বলে, বড়মাহুজ ছুঁমি বড়না। ঈতলপাটি বিনে হুম হয় না। হর বড়ই কাঁহা-কাঁহা মূলক থেকে তোমার জন্ত ঈতলপাটি বয়ে আনে। তোমার আবার টাকার কি টান পড়ল?

ঈতলপাটির কথায় গগনের লজ্জা হয়। কৈফিয়ৎ মিছে ফলাও করে : সে এক কাণ্ড হল। দুপুরবেলা হুম হচ্ছে না, পরমে এপাশ-ওপাশ করছি। হর বড়ই সেই সময়টা এসো। বলে, সামনে বোলেখ মাল, গরমের হয়েছে কি এখন? ফুলতলার তোকা ঈতলপাটি পাওয়া বাচ্ছে। চোদ সিকের পরস! তখন গীটে, পাশ ফিরতে গায়ে কোটে। বড়াকসে বের করে দিলাম বড়ইয়ের হাতে। আখের ভাবলাম না। আবার তা-ও বলি তখন তো জানি নে বাঁধ ভেঙে এক কাঁড়ি পরস! গুণোগার বাবে। আর শিঠি শিঠি শিওন লালা এসে পড়বে। মাছ খেতে এসেছে। মাছ না দিয়ে ভুজো খেলে দিতে হয় বেটার বসে।

শয়ক্কেই আবার অল্লুনের ঘরে বলে, দশটা টাকা দিবি আমার জগা? শিওন বেটা অনেক দূর থেকে আশা-হুধে এসেছিল। কিন্তু খাতা একমার বন্ধ এই ক'দিন—ভাল মাছ কোথা? বুসো-চিড়ির ঝোল খেয়ে গেল বেচার। কোটালের মুখে আবার আসতে বলে দিলাম। হয়তো বা রাত পোয়ালে এসে পড়বে। দশ টাকা তার কাছে দিয়ে দেবো মনিজ্ঞার করতে।

বলার ধরতে জগা অবাক হয়ে তার মুখে ভাকার : হুমই তোমায় বত ফড়কানি। বউয়ের জন্ত মন কেমন করছে—ঠ?!

গগন মা-না করে না অভ দিমের মতো। একটুখানি চূপ করে বইল, বলে ঘবেছিল ঠিক। চিঠি পড়ে ফেলেই মূলকিল হল। বউ একা লেবেলি। আমার বোন সিখেছে। মেজো দবখী

দিবেছে। সেটা এক গৌরায়গোবিন্দ, সবুজ না খাকলেও ওটাকে শালা বলতাম। সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আমি নাকি পালিয়ে বসে আছি।

সন্জার নিশাং কেল একটা। জগার হাত থেকে হঁকো নিয়ে কড়কড় করে দ্রুত কয়েকটা টান দেয়। বলে, বউ আছে বোন আছে, ঘরবাড়ি বাগান-পুকুর পড়শী-কুতুং সমস্ত নিয়ে দিবি এক সংসার রে। কেউ কি শব্দ করে সে জিনিস ছেড়ে আসে, বাইরে তাকাবার জন্য সকলে ওরা উঠে পড়ে লাগল। আমি নড়ব না, ওরাও ছাড়বে না। গাঁয়ে জ্ঞাত বন্ধেকালী ঠাকরন, কালীভক্ত আমরা। তাঁর পাশপাশে বেধে চলে এলাম। ঠাকরন দেখেও আসছেন এত বছর। মাগুগি গভীর বাজারে ইদানীং একেবারে অচল অবস্থা নাকি, ঘন ঘন চিঠি হাটছে। ধানাইপানাই করা মেয়েমাছুবের স্বভাব—আমি আমল দ্বিষ্ট। চিঠিই খুলিলে, দেখেছিল তো। নিজের একটা পেটাই চলে না, বারো বাটে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, খুলে কি হবে?

জগার মনটাও কেমন হয়ে গেল আজ। কোন এক দূরদেশে গগন ঘরসংসার ফেলে এসেছে, টাকা পাঠানোর সরকার। সেই টাকার বান্ধার কত জায়গার দুরল, কত রকম চোঁচটরিজ করছে—কিছুতে কিছু হয় না। আর জগার ট্যাকে টাকাপয়সা আপনি গড়িয়ে আসে। বাদ্যবনে তোমরা দেখ শুণু জঙ্গল—জঙ্গলে বাণ-কুমির দেখতে পাও, আর শুশোর খোঁচার পা জখম করে বাণ-বাণ বলে চেঁচিয়ে ওঠ। ভিতরের মজাটা জান ক'জনে? বাদ্যর ঢোকবার মুখে টাঁকা দিয়ে লাইসেন্স করবার আইন। অদৃষ্টে কী ঘটে ঠিকঠিকানা নেই, আগন্তুগে গাঁটের টাকায় সরকার সেলামি দিয়ে যাও। আচ্ছা আইন রে বাপু। বাণ-কুমির তো লাইসেন্স করে ঢোকে না, বিনা ট্যাক্সের খেয়েদেয়ে চরে বেড়িয়ে এই তাগাড় হচ্ছে। তাদের কারদার চলাচল করে লোকসানের ভয় নেই, বা-কিছু সওদা বোলঝালা লাভের অঙ্ক পড়ল। টাকা আর নোট কোথার হাথা বার, সেই তখন সমস্তা হয়ে ঝাঁড়বে। ও-বছর গগনের এসে পড়বার আগে—সোলপাতা কাটতে গিয়ে কি হল? সরকারি খাতার বোকা পুত্র, বনকরের বাঘুদের পান-খাওয়া বারন বারো কি তেরো টাকা সর্বস্বাকুল্যে। নিঃসান্ডে মাল বেয়িরে এলো বিশ কাহন। বড়লোক হতে ক'দিন লাগে হেন অবস্থার? মোটাহুটি রকমের গঁথে নিয়ে বোসো; তাৎপরে পারের উপর পা চাপিয়ে খাওনাও আর ফুঁতিলে ঢোলক বাজাও। শহর পাক'দিয়ে এসো মাঝে মাঝে দু-পাঁচ দিন। টাকা ফুরোতে চায় না। আর এমন কপাল জগার, মনিঅর্ডার করে কিছু বে হালকা হয়ে বাখে, ভুবন হুঁড়ে ভেমন একটা লোক মেলে না। গগন বিদ্যান্ মাছুব—বাদার কাজ তাকে দিয়ে হয় না। তার কাজ ডাক্তারি কিম্বা মাঠারি। বড় জোর এক মাহের খাতা খুলে মটার উপর হাতবাগ কোলে নিয়ে খুঁড়ি প্রতি এক এক পয়সা উপার্জন। বিভাই কাল হয়েচ্ছে, এর বেশি এ মাহুকে দিয়ে হয় না।

হিমিল শেব করে জলা উঠল। গগন বলে, বাস কোথা?

চেঁচিয়ে গলা চিরে কেললাম। পাড়াহুত্ব ঠিক মরেছে, নরতো এমন নিবন্ধম হয় না। দেখে আসি বড়না।

আর ঐ বে টাকার কথা বললাম। স্তায় নুদ দেবো।

হবে, হবে। সে তো কালকের কথা।

হন-হন করে সে বেলল। পাড়ার নর, চলল উঠো মুখো—কালীভলা বেদিকটার। খানিক দূরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৌরোবনের ভিতর ঢুকে পড়ে। কাটারি নিয়ে এসেছে গগনের বান্ধাবর থেকে। চিহ্নিত করা এক গাছ, তার গোড়ার মাটি খুঁড়ছে। এদিক-ওদিক তাকায়, আর নিঃসান্ডে মাটি তুলে রাখ করে। বেলল মাটির খট একটা। খটের মুখ টাটি দিয়ে ঢাকা—আখাআখি টাকার জরতি। মোট নয়, রূপোর টাকা শুণু। মাটির নিচে কাগজের নোট নষ্ট হয়ে যায়, নোট ভাঙিয়ে টাকা করে খটের ভিতর চোকার। আজকালকার টাকা—রূপা নামে মাত্র, খামবস্ত বেশি। টাকার রং কালো হয়ে যায় দু-পাঁচ দিনে। তেঁতুল বা আমফল-পাতার ঘবে চকচকে করে, নরতো বাজারে নিতে চায় না।

কম নয়, খোক কুড়ি টাকা নিয়ে এলো জগা। গগনের হাতে দিয়ে বলে, মেকি নয়, রঙা এই রকম। বাজারে দেখে নাও বড়না। স্তম্ভও সস্তা করে দিচ্ছি—এক পয়সা হিসাবে। বিশ টাকার দরুন পাঁচ গুণা পয়সা খাতা থেকে বোজ ফেলে দিও। চুকে গেল। আসল বদিন খুলি দেখে লাগে, তালিন করব না। স্তম্ভা ঠিক ঠিক দিয়ে যেও।

টাকা গগন বাজারে দেখে না। শুণে নিল। কুড়িই যটে। চাইল নয়, দিয়ে দিল তার ডবল। সাক্ষাৎ কয়তক। এক দিনের স্তম্ভ এক পয়সা—এক রকম বিনা স্তম্ভই বলা যায়। এমন হলে বাদা অকলের সবাই খণ করে হাতি কিনে বসে একটা। জগার ওদারে গগন অবাক হল। খুলিতে আকর্ষণীয় হাসি হেসে বলে, আজকের দিনের স্তম্ভ কুড়ি পয়সা—নিয়ে সে সেটা নগদ—খুলি বেড়েখুঁড়ে পয়সা সাক্ষাটার বেশি হল না। তাই তো। তখন আর এক পস্থা মনে এসে গেল।

ডেকে এলি, তা আসে কই ওরা? গানবাঁজন নয়, খেলা হোক এখন। খোপার বোজগার করে তোর স্তম্ভ খাখো। স্তম্ভই বা কোন, আসলে আখাআখি বেড়ে দিচ্ছি এখনই।

এগিয়ে গিয়ে নিজের টোমেটি করে এলো : চলে আর কোন কোন মরনের বোটা আছিল। পয়সা নিয়ে আসবি।

শেব কথার মধ্যে ব্যাপাতিটা পরিহার। জগা ইতিমধ্যে মেজের মাহুর বিচারে হুক পেতে বসেছে। বলাই এলো। আরও জন

স্ত্রীরোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের ব্যবহার রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায়

পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্রাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৩

সন্ধ্যা ৬।—৮।টা। কোন নং ৪৬-১৩৫৮

চার-পাঁচ—আজকে বারী জালে ধরনি। গাঁটে বাঘের পরলা তারা খেলবে, বাকি লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে সন্তপনেষ ছাড়বে,—যে লোক জিতবে তুড়িলাক দেবে তার পক্ষ হয়ে।

কুড়ি কুড়িটা টাকা গগনের হাতে এক সঙ্গে, অতিশয় উঁচু মেজাজ, আশাতত সে খোঁড়াই কেয়ার করে ছুনিহাটাকে। বলে, দশ টাকা এই আলাদা করে কাপড়ের খুঁটে বাঁধি। বাগের হাড় রে বাবা। পিওন এসে গেলে তখন গাঁট খুলব। বাকি দশ এই ছুঁড়োর—রশে এসে বাগধনের। দেখিস কি জগা—আখাআখি নয়, তোর পুরো দেনা শোধ করব। দেনা ঠাঁড়াতে দেবো না।

চলল ফড়খেলা। ক্রমেই গগনের মুখ শুকাচ্ছে। বা: শালা! কি বিজী পড়তা, উল্টোপাটা দানই পড়ে কেবল। টাকা সমস্ত খোয়া গেল, একলা জগাই তা'র মধ্যে আট টাকা পনের আনার মত জিতে নিল। বেটা সব দিকে তুখোড়, ফড়ের গুঁটিও বেন কথা শোনে ওর। এখন কি উপায়? কানে জল চুকলে আবার খানিক জল চুকিয়ে আগের জল বের করে ফেলে। ইতস্তত করে গগন শেষটা কৌটার খুঁট খলে বাকি দশ টাকা বের করে ফেলল।

তা-ও খতম। নেশা জমে গেছে তখন। ছাড়বি না কি যে জগা আর কিছু? বাঁহা বাহার তাঁহা তিপার। বিশ বর্জ হয়েছ, না হয় পচিশই হবে। সবাই তো চেটেপুঁছে নিলি তুই।

জগা চটে গিয়ে বলে, বেটা দেবার কি আছে বড়না? চুখি-জোচুরি করেছি? আইনদস্তুর খেলা খেল জিতে নিইছি।

গগন বলে, তাই দেখলাম যে জগা, পরসাকড়ি তোর পোষমাণা। তোকে বিষম চেনা চিনে ফেলেছে। বার কাছে যা থাকুক, পায়ে হেঁটে বেন তোর গৈল্লের গিয়ে উঠে বসে। তা পাঁচ টাকা না হোক, দুটো টাকা ছাড়। পিওন বেটাকে আসতে বলছি—পোড়া অদৃষ্ট হবে না কিছু জানি—আরও একটুখানি চোঁটা করে দেখো।

জগা উঠে ঠাঁড়াল তো গগন তার হাতে চপে ধরে। জগা মুখ ঝিটরে বলে, টাকার আমি গাছ নাকি—নাড়া দিলে জমনি বুঝব করে পড়বে?

এই তো জিতে নিলি এতগুলো টাকা। ধরপথেই জিতেছিল, আমি বলছি। বউ বা হোক, বাঘের পেটের বোন আমার মিছা কথা লিখবে না। বড়লোক শালায়া দেখানো করত। কী নাকি বগড়াবাটি হয়েছে—এক পরসাকও নেবে না শালায় কাছ থেকে, না ঘেরে কাঁত কাঠি দিয়ে পড়ে থাকবে। তা সে পারে, বড় জেদি ঘেরে। উঠগনে জগা, বোস আর একটু। টাকা দিয়ে লোকসান কিসের তোর? খাতা রয়েছে, ভেতির মাছ বড় হচ্ছে—ঐ কটা টাকা তুলে দিতে পারব না?

হেন কালে হাংস্বরের শব্দস্রা উঠানে। খেলার যয় ছিল, নজর তুলে দেখেনি।

কারা গো?

হর ষড়্‌ই স্বীতলপাটি বাড়ে নিয়ে আগে আগে আগছে। বলে, বাইরে এসে দেখ বড়না, তোমার আশন লোকেরা সব এসে পড়ল।

বাদারাজ্যের ভিতর কুটুখ আসা একটা সমারোহের ব্যাপার। ছড়ছড় করে সবাই দাওয়ার চলে এসে। জগার চকু কপালে উঠে

গেছে। কী আশ্চর্য, কুমিরঘারি অবধি টাপুরে নৌকায় বাজে সঙ্গে এসেছে সেই দুটো মেয়ে লোক এবং পুরুষটি। তাদেরও যে সাইতলার গতি, কে ভাবতে পেরেছে?

চাকর একেবারে চোখোচোখি পড়ল জগা। বিনি-বউকে চাক বলে, সেই লোকটা বউদি। চিনতে পারছ না—ভামার যে বাদার মধ্য ফেল দিল। দাদার কাছে এসে ছুটেছে শরতান।

যে জগা বাঘ দেখে উরায় না, মেরেলোকের মুখোমুখি সে জবুজবু হয়ে গেছে। চেহারায় মেরেলোক, বয়সও কম বটে—বিন্দু পিত্ত আলা করে কথাবার্তার। নতুন জায়গায় পা দিয়েই সকলের সামনে তার সম্বন্ধে পরলা উল্লংহ হল শরতান বলে। নেহাৎ লোকে কি বলবে, নয় তো ছুট দিয়ে পাপাত। তবে বউদি মাছুষটি দেখা গেল মিটমাটের পক্ষপাতী। চাপা গলায় তাড়া দিয়ে ওঠে, বগড়া বাধাবিনে বলছি ঠাকুরখি। চুপ কর। যেখানে পা দিবি সেইখানে গণ্ডগোল।

জগাকে ছেড়ে চাক তখন নিজের ভাই গগন দাসকে নিয়ে পড়ল: কী মাছুষ তুমি দাদা! আমরা আছি কি মরেছি, চিঠি লিখে একটা খবর নাও না। জায়গা একটা বেছে নিয়েছ বটে। সত্যি সত্যি খুঁজে পাব, একবারও তা ভাবতে পারিনি।

নগেনশশী পিছনে পড়ে ছিল, পা টানতে টানতে দাওয়ার ধারে এসে ঠাঁড়ায়: হুঁ, খুঁজে পাব না! আজ মানবে চান-তায় তাক করে ছুটোছুটি করছে, এ তবু মাটির উপরে। খুঁজে পাবে না তো আমি সঙ্গে রয়েছি কি জন্তে? বিনিকে তাই বললাম, চোখ-কান বুঁজে আমার পিছু পিছু চলে যায়। হাজির করে দিলাম কি না বল এবারে।

গগন গরম হয়ে বলে, বা লিখেছ নগেনশশী, সেইটে অক্ষরে অক্ষরে করে ছাড়লে? ছি-ছি, গেরস্তবরের মেরেছেলে জলসে এনে তুলেছ? তোমার বোনকে নিয়ে এসেছ, আমি কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু আমার সোমন্ত বোনকে নিয়ে এসে কোন বিবেচনার?

নগেনও সমান তেজে জবাব দেয়, তোমার বোনেরই তো গরম বেশি। তার ঠোয় ঠিঠানো যায় না। তখন বিনি বলে, চলো মেজলা, পৌছে দেবে আমাদের। সাধী না ছুটলেও একা-একা চলে যাবে চাক।

চাক বন্ধার দিয়ে ওঠে: আসব না? কাদের কাছে কোন্‌ ভরসার রেখে এসেছিল তুমি? এদিন তবু চাটি চাটি ধাম হয়েছে, ভেন-কুটে চলে গেছে এক বকম। এবারে খরার মাঠ শুকনো, এক চিটে খরে উঠল না। বড়লোকের হাততোলা হয়ে থাকার চরে মরে যাওয়া ভাল দাদা।

ষাড় বৈকিরে তাকার নগেনশশীর দিকে। নগেন সরে গিয়ে হরর কাছে ঠাঁড়ায়। গগন বেকুব হয়েছে, ঠাণ্ডা করতে পারলে বাঁচে। জিত থিয়ে টোট ভিটরে বলল, চলে এসেছিল সে তো ভালই। ক্ষেতখামারের এই হাল, আমি ভা জানব কি করে? কুটুখর হাততোলা কেন হতে হবে? কাল সকালেই মণি জর্ডার হয়ে টাকা চলে বেতো। খবর আসতেই লাগল কত দিন।

জগা হঠাৎ কতকগুলো টাকা ছুঁড়ে দেয় গগনের দিকে। না বুঝে গগন ক্যাল-ক্যাল করে তাকায়।

তোমারই টাকা বড়।। একটু আগে বা তোমার থেকে আমার থেকে চলে এসে। যবে তোমার কুটুম—টাকা নইলে মজ্ব হব কি দিয়ে ?

দাওয়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে উঠে। পেঠা দিয়ে নামবার ভাগত নেই, চাক সেই দিকে। ও না বন্ধ—চোখ দিয়ে পোড়াচ্ছে—নাগালের মধ্যে গেল কি করে বসে, টিক কি ?

অন্ধকারে যেন ঢেউ তুলে দিয়ে তার মধ্যে অগা ডুবে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। বাইরের সবাই চলে গেছে, আপন লোকেরা এইবার কথাবার্তা বলছে নিজেরদের মধ্যে। জগা জালাঘরের কানোতে এসে পাড়াল।

বোন বলছে, দাশ, কি করছিলে এতজনে ঘরের মধ্যে মিলে ?

জারি মজালায় অব্যব ভাইয়ের : নাহগান হচ্ছিল।

কই, আওয়ার পাইনি তো ?

বিড়বিড় করে হচ্ছিল। তাতে বা ভাব আসে, টোমেচিতে তেমন হয় না।

মেয়ালে-খোলানো খোলখানো—আঙল তুলে নিশ্চয় সেটা দেখিয়ে গিয়েছে। বড় কান্নে লেগে গেল খোলটা—পশার বড়ল আছজনের কাছে। বিছা ফড়ের ছবঙটি কোন্ কায়দার তিন কোড়া চকুর নামনে থেকে বেমানুম সরিয়ে ফেলল, সেইটে এক দিন বড়দাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

চোন্দ

ভোররাত্রে ডাকডাকি, জগা কোথা ? বলাই কোথা রে ?

জা দিচ্ছে না ওরা ঘরের ভিতর থেকে। পচা জাল বেগিহেছিল, ফেছও বা-হোক কিছু। তার বার্থ রয়েছে, তাইকেই পটাল খাতা থেকে। অজ কেউ এসে ঘুম ভাঙালে জগা কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে টিবে, ভাবের মাহুঘ পটাকে কিছু বলবে না। মাহের আমদানি ডি কমে গেছে। সে-ও জগার দৌব। ফুলতলার নিজে গেল, দাবার ফেলুড করে নিয়ে গেল বলাইটাকে। দু-দিন বলে পুরো পাঁচ পাঁচটা দিন কাটিয়ে গেল। মাহের নৌকা এদিকে কুমিরমারি পাঁছতে দুপুর হয়ে যায়। ভাল খন্দে তখন থাকে না, কিছু পাচড়া খন্দের ঘোরাফেরা করে। ঐসব মাহুঘ ছিছে করেই মেছোহাটে দেরি করে আসে।

এসে হয়তো দেখে মাছই নেই তখন। বহিন থাকে, সত্তা হয়ে পাওয়া যায়। বেশি থাকল তো বেশি সত্তা। কাঁচা মাল রখে দেওয়া চলে না, দরদায় বাই হোক হাঁতেই হবে। দর পাচ্ছে না বলে মাহ-বাগারেরও উৎসাহ নেই জলে নামার। দাবার কাজকর্ম তাই বসতে না বসতে চুক গেছে। গাড়ে একপো জোরায়। এই বেরে হচ্ছে, সে কেবল জগারই জতে।

জগা চোখ বন্ধে বন্ধে সোজা গিয়ে ডিঙির গলুরে বোটে ধরে বসল। অজ দিন পাথর বসে একটি হিলিম অজত ডাক

যেবে তবে বাটে নামে। জাজকে—ওরে বাবা, লাওয়ার কামরায় চাকবালা বাটি পেতে রয়েছে হয়তো। তা ছাড়া দেখিছ হয়ে গেছে, মাহের বোড়া নিয়ে হয় বড়ই উঠে বসে আছে অনেকক্ষণ।

কাহ্নি বলে দে বলাই। গাজি বদর বদর।

চাকবালা উপর থেকে ডাকছে, শোন, কানে বাজে লা ডলোকটা ? বোটে একটু থামাওনা—

নাম থাকে মাহুঘের। নাম না-ই যদি জান, তবে কি তাচ্ছিল্য করে 'লোকটা' বলে ডাকবে ? যবে গেছে বোটে থামাত। বলাইকে বলে, তুইও বর বোটে। বাংলার এইটুকু উজান, কবে টান দে।

চাক বাব থেকে বাংলার গাড়ে নামল। হাত উচু করে চোঁচছে : শোন, কাঁটা নিয়ে এসে একগাছ। বাবা বাটা না পাও তা মারকলের শলা। রাগার জন্তে হাতা, খুঁটি আর কাঁটা এনা—

কর্দ বলতে বলতে আসছে। কুট-কাট-ভাটাস আওরাজ উঠছে কালার ; বায়ে—বেই ভগবান, আর বানিচটা বায়ে নিয়ে ফেল দজ্জাল মেরোটাকে। বায়ে বিঘম বোপি—উপর থেকে কিছু মানুষ হবে না। কোরর অব্যব বসে বাবে, কালার মধ্যে আটকে থাকবে। জনা চারেক ময়ম-কোয়ান পাঠার ছাল ছাড়ানোর কায়দার টানটানি করে তবে তুলবে। এই কাজটি করে পাও হে মা কানী। চাকবালায় দুর্গতি দেখতে দেখতে আর বোটার আগায় জল ছিটাতে ছিটাতে মনের খুঁজিতে ওরা গাড়ে গিয়ে পড়বে। ভোরবেলাকার সূর্য্যার দিনমানটা তাহলে কেটে বাবে ভালো।

গাড়ে পড়ে জগা বলে, কাঁটা চার কেন রে ?

বলাই হেসে বলে, পেটাবে। যে রকম শিরীত তোমার সঙ্গে—তু-হাতে সুখ পাবে না, হাতের কাঁছ অস্ত্রের ছুটিয়ে রাখছে।

হয় যড়ই বিঘম খাড় নাড়ে : উঠ, কি বলছ তোমরা। ভাল ঘরের মেয়ে—আমাদের আবাদ জাহগার বগতী পেয়েছে নাকি ? কোস্তা দিয়ে কাঁটা দিচ্ছিল—ভাড়া কোস্তা, মাথা কয়ে গেছে। কাঁটা দিতে দিতে কাঁটার কথা মনে হয়েছে বাব হর। রাগা করবার সময় অহবিধা হয়েছে, হাতা-খুঁতির গরজ তাই।

আরও গদ গদ হয়ে বলতে লাগল, এসেছে কাল রায়ে। সকালবেলা তুমি—দেখলে না জগা, খুলামাটি পোড়া-বিড়ি ম্যাচের

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগোরাই শুধু জানেন !
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আশ্বাস
লাভ করছেন

তারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, চোখের ওঠা, বমিডাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দ্যারি, ব্রুকজ্বালা,
আহায়ে অরুচি, স্বপ্নানিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত প্রকৃতিই হোক তিন দিনে উপশম।
হুই সত্তায়ে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু ঔষিকংসা করে যারা হতান হয়েছেন, তাঁরাও
আশ্চর্য্যের সেরন করলে নবজীবন লাভ করবেন। নিম্নলিখিত মূল্য ফেরতৎ।
৩২ কোলার প্রতি বোটা ৩ টাকার, একমাত্র ৩ বোটা ৮ টাকার ৫০ নং পাঃ ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দূর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়।

হেড অফিস-নবিশ্বাস্ত্র (পূর্ব পাকিস্তান)
১৯৩৯-১৯৪১, মহাত্মা গান্ধী স্ট্রাট, কলিকাতা-১

কাটি কিছু আর নেই। লক্ষ্মীর অংশ ইন্দেন ওরা তো, লক্ষ্মী-ঠাকরনের পা পড়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কুমিরমারির গঞ্জে এসে মাছ সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। পরসী হর যড়ইয়ের গাঁটে। ভরা জোরায়। কিন্তু জগার কেরবার চাড় দেখা যাচ্ছে না। হর স্বাগিন দিচ্ছে : উঠে পড় তোমরা এবার। পোন বয়ে যায়, দেবি কোরো না।

জগা বলে, খাব না ?

খাবে বই কি। হুজি কিনে নাও, আর বাতাস। দানাদার কিনে নাও কিছু। কৌচড়ে করে খেতে খেতে বাবে।

হুজি নয়, ভাত খাব।

উহু, ভাতের হাল্কা মা কেন আবার এখন ? ভাত খাবে সাইতলা গিয়ে। পুরো পোন তার উপরে পিঠের বাতাস—ভিতি তো উড়ে গিয়ে পৌঁছবে।

জগা বলে, হাল্কা মা তো সেখানেই। উছন ভালো, বাঁধো-বাড়ো, বাসন খোঁও—হরেক ব্যাপার। এখানে কি, গদাধর ঠাকুরের হোটেল ভাত রেখে বসে খাওয়ার মাছের ডাকছে।

কিন্তু অল্প দিন তো সাইতলা গিয়ে বাঁধাবাড়ি কর। হোটেলের ভাতে মন যায় না।

জগা এবারে বীতিমতো চটে গিয়ে কুল, জান তো যড়ই, নিয়মের বাঁধাবাঁধ আমার সব হয় না। দুটা দিন সাইতলা গিয়ে বেয়ে থাকি তো পাঁচটা দিন খেয়ে বাঁধ গদাধরের হোটলে।

জেন এখন ধরেছে নিরস্ত করা বাবে না। হর যড়ই হোটলে গিয়ে তাকা দেয় : হাত চালিয়ে ভট্টাঙ্গি। ভাত আর ডালটা নেমে গেলেই বসিরে দাও এদের দুজনকে।

জগা-বলাইও শিছু শিছু এসেছে। জগা বলে, উঁহু, মাছ খাব, হুজিযত খাব, অল্প খাব।

বেশ, খাও বোড়শোপাচারে। বেগোন হয়ে বাবে, বুঝবে তখন টেলা।

তোমার কি ভাবনা যড়ই ? আমার ভিতি আবি কি মাঝপথে ফেলো বাব ? বেগোন হোক বা-ই হোক এমন কথা বলব না যে যড়ই মদার ভাটার নেমে গিয়ে দুটা বাক গুণ টেনে দাও।

গদাধর কাঁটা পাকাত্তে কুটুঙ ভালে। কম পরিমাণ ডাল দিয়ে খনখনে খন কববার এই কায়দা। জগা বলে, খালের নাম কে যে বারোবেঁকি রেখেছে। সে বেটা শতকে জাত না। গণে দেখেছি ভট্টাঙ্গি, বারো দুনা চবিশ বাকও বেড় পায় না।

বলাই বলে, উঃ, বোঁঠে মেরে মেরে লবেজান। রাজ্যটা এক রকম গাড়িয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এবারে খোঁরা কেসে দিক। নৌকো ছেড়ে তাহলে গাড়ির কাজে লেগে বাই, জল ছেড়ে ডাঙার উপর উঠি।

ডালের কড়াই নামিয়ে দিয়ে গদাধর বলে, খোঁরা ফেলা পৰ্ব্ব লাগবে না রে। বর্ষা কেটে গিয়ে বাস্তা খটখটে হয়ে থাক। ধানও পেকে বাবে তদ্বিনে। সাত রাজি দুই নৌকোর এবারে ধান বোঁরাবরি নয়। গরুর গাড়িতে। এর মধ্যেই সব গাড়ি বানাত্তে লেগে গেছে। কত গাড়ি নেমে যাবে দেখো সবকনে। আমি

ভাবছি, দু-জোড়া গরু কিনে গরুর গাড়ি করে বেশি যান ছুই। ভাড়া বাটবে।

বলাই পুলকে ওগমগঃ : বয়ে বেশ ভট্টাঙ্গি, দুনা কা হবে। গাড়ি টালানোর মজা। ভাড়া-ভাড়া, ডাইনে-বয়ে—খালি দুধের খাটনি। বাবুদানবের কাজ। বোঁঠে মারতে মারতে হাতে এমন কড়া পড়ে যার না।

আদরমণি পুগনের কথা জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তারের কি খবর ? জগা বলে, ডাক্তার এখন নয়, ঘেরিদার। মাঝে ওরুমশাই হতেছিল।

আদর ফেসে বলে, এর পরে আবার কোনটা ধরবে ?

বলাই বলে, আর কিছু নয়। শরমস্ত মাছের বড়লা। ছোটখাট এক খাটাও জমে উঠছে। হচ্ছে এবারে দুটা পরসী।

জগা দ্রুতজি করে বলে, হতে আর দিল কই ? নানান শত্রু। এক শত্রু চৌধুরি। নায়েব পাঠিয়ে চুরি করে ঘেরির বাঁধ ভেঙে নানান রকমে নানানাবু করছে। তার উপর নতুন উৎপাত—বাড়ির মাছবজর এসে পড়েছে। নতুন ব্যবসা, এত থকল কাটাত্তে পারবে কেন ?

গদাধর বলে উঠল, হোটেলের প্রাণ্য এগারো টাকা ছ' আন দিয়ে দিতে বোলো দু-পাঁচদিনের মধ্যে।

জগা বলে, টাকা কেউ বাড়ি বয়ে দিয়ে যার, শুনেছ কখনো ? নিজে গিয়ে পড় একদিন, বদর পারো খাবা মেয়ে নিয়ে এসো।

বলাই বলে, টাকা না পাও আকঠ মাছ ঠেসে খেয়ে উত্তল করে এসো খানিকটা।

জগা বলে, বজুলোক তোমার তো ! বড়দার বুদ্ধি মতোই গজের উপর বা-ই হোক জমিয়ে বসে আছে। বিশপে পড়েছে—জাঁতকলের মতন হুঁসিককার গাঁতে এসে জাঁকড়ে ধরছে। এ সময়ে একবার চোখের দেখাও দেখে আসা উচিত। যেও ভট্টাঙ্গি, বুঝলে ?

পনের

সাইতলা কিরতে বেশ খানিকটা রাত হল সেদিন। বলাই বলে, আলা চুপচাপ, গানবাজনা নেই। বোধ হয় ভরা যড় খেলছে।

জগা নজর করে দেখে বলে, খেলা হলে তো আলো থাকবে। নয় তো কোঁট দেখবে কেমন করে ? গালে-হুখে হাত দিয়ে বসে আছে বড়লা। নয়তো কোনখানে যদি বেরিয়ে থাকে। কিন্তু রাস্তিরবেলা শব্দ করে বেকবার মাছের তো বড়লা নয়।

সোলা চলেছে ঘরের দিকে। বলাই হাত ধরে টান দেয় : এদুপি ঘরে ঢুক কি হবে ? চলো, আমরা গিয়ে জমাই গে।

গুরে পড়ব। পা ব্যথ-ব্যথা করছে।

বলাই হি-হি করে হাসে : তা নয়। খাঁণ্ডরনি মেটেটাকে ডর লেগেছে তোমার। বাঁটা দিয়ে পেটের নি তো এখনো, এর মধ্যে পা ব্যথা কেন ?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জগা চলল। ঘরে গিয়ে সত্যিই পড়িয়ে পড়ে। বলে, তুই বসে বসে কি শাহারা মিসি ? তুই চলে বা, আমি বুঝাব। আমি গিয়ে কি হবে ? তুবি না হলে হুজি জমে কখনো ?

জগা চটে উঠল : হুজি না হলে যেতে নেই ? তোরা কেবল হুজির সাধী। বড়লা মাছবজা কিম হয়ে কোথায় পড়ে আছে—অদময়ে দুটা ভাল কথা বলে আসা মাছের হয় না।

চিকিৎসকদের মত

নিখুঁত লাবন্য

আপনারও হতে পারে

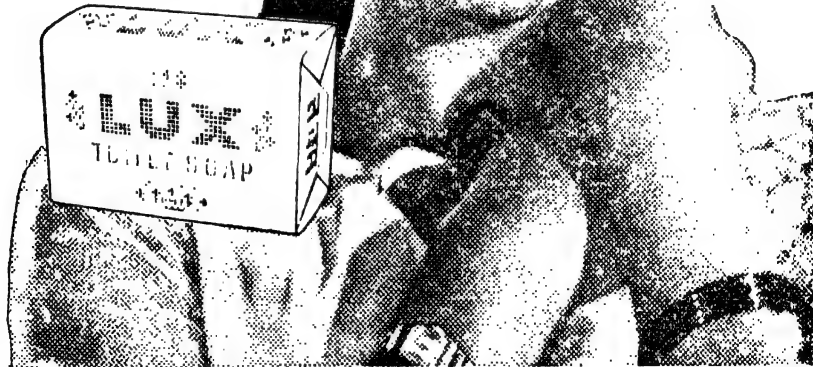
সাবিত্রী চ্যাটার্জীর মত লাবণ্যময়ী চিকিৎসক
জানেন যে নারীর সৌন্দর্য নির্ভর করে নিখুঁত ত্বকে ওপর।
সাবিত্রী চ্যাটার্জী বলেন—“লক্স টয়লেট সাবানের সতের
মত ফোঁটা আর প্রিয় হৃৎক আমি গছল করি। আমার
ত্বকে এটি মোলায়েম আর মৃদু রাখে।” আপনার
লাবণ্যের জন্যও প্রগল্ভ লক্স সাবান কেন না কেন?
যদি রাখেন, হানের সময় লক্স সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ

লাক্স

টয়লেট সাবান

চিকিৎসকদের সৌন্দর্য সাবান



বলে পাশ কিরে ওস জগা। আর কথাবার্তা বলবে না। একটুখানি বলে থেকে বলাই উঠল। দেখে আসা হাক গগনের দশা। আপন হাছবনের সঙ্গে কেমন মজার ডুব এম নিধার। নিঃসাড় হয়ে পড়ল।

নিশ্চয় রাত। কীকা আকাশের মধ্যে বাতাসও হঠাৎ কেমন হুত—গাছের ডালশাখা নড়ে ফিসফাস শব্দটুকুও উঠছে না। গাছের কোয়ার—ভাঁটার জল নামার বে কলকল শব্দ, তাও নেই এখন। আবার দিক থেকে—হাঁ, খোলের আওয়াজ আসছে চুটে। বলে দিতে হবে না, বাজাচ্ছে বলাই। হাছবনার ব্যাধায়ে যে একটু-আটটু জগার সাগরেতি করে, খোলে চাটি ঘেরে খোল ভুলতে গিয়ে গালি খায়। জগা সেই আশ্রয়ে, অতএব পশার জমিরে আশ সে বাজাচ্ছে। গানও যেন বাজমানার মতো—বড়বড়িরে উঠে জগা বাইরে চলে এলো। বিড়বিড় করে গান—কান পেতে থেকে একটু একটু শুনতে পাওয়া যায়। বাতাসের বলাই, এবং গানের হাছবও পেয়ে গেছে। জগাকে বাস দিতেই আসির করতে পারে ওরা। কোন দরকার নেই তবে আর জগার।

টিপটিপি চলেছে সে তোরের মতো। দেখে আসা হাক—বলাই এসে বলবে, ততক্ষণের সব সয় না। সোজানুজি বাঁধ হবে না গিরে কুশি জলজলের আড়ে-আবডালে চলেছে। কেউ না দেখতে পারে। আলাখরের ধানিকটা ঘুরে গিরে পাঁড়াল। হালুয় পাওয়া হাচ্ছে এবার—গগনের গলা। আরও আছে—কিছু জিন্ন সোঠের গরুর মতো তার কণ্ঠ একেবারে জিন্ন পথ ধরেছে। হার মা বনবিধি, হার মা রকেকালী, তোমাদের মহিমায় বড়নাও কিনা পায়ক হয়ে উঠল। গান অবশ্য নয়—হরেকুক হরেকাম রাধেগোবিন্দ—নামগান। বিড়-বিড় করে গাইছে কতকটা মন্ত্রের মতো।

বলাই এলে জগা হাসিতে কেটে পড়ল : দেখে এসেছি। চার জন দেখলাম আসরে। তুই ছিলি, বড়না ছিলি, আর দুটো কে রে ? একজন আমাদের পচা। পচা ওদিকে মুখ করে ছিল। আর ছিল বড়নার মেথো সবকী, নগেনশশী তার নাম।

বলে গভীর হয়ে বাস : পাঁচ কেলোছে বড়নাকে। কড়ের গুটি মুকিরে কেলো কাল সেই যে নামগানের কথা বলেছিল, সেইটু হল কাল। পচা আগেভাগে গিরে গরুড় পক্ষীর মতো অন্ধকারে বলে আছে। আমায় দেখে বলল, এই যে, খোল বজানোয় মাছব এসে গেল। আর সেই সবকী বলে, বোঝ নামগান কব, আনকেই বা হবে না কেন ? লাগাল। পচা ধরল, সবকী ধরল—বড়না কি করে, ভারও বেশি টোঁট নড়তে লেগেছে। আমায় মুখে ওসব বোঝার না, খোলটা কোমের মধ্যে টেনে নিলাম। তাই তো বলছি যে, বড়না হুত গান গায়। বানার কী তাজব রে বাবা।

বলাই বলে, সাথে কি বাবা বলি, শুঁতোর চোটে বাবা বলার। বাইরে ঐ সবকী, আর কামরার ভিতরে বউটা আর বোনটা টেমি খোলে বলে গান শুনছে, আর ভাঁটার মতন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। কি করবে বড়না ? একবার হয়তো একটু খেমেছে, চমক খেয়ে তকুপি আবার হরেকুক হরেকুক করতে লেগে যায়। ভাল করে দেখিনি তুই—বড়নাও কটে পাখান কেটে বাস।

জগা বলে, ভুল করল বড়না, আখের ভেবে দেখনি। দেশে ঘরে বন্ধন বেধে এসেছে—হাতে টাকাপনসা আসা যাতোয় ওদিকে কিছু কিছু ছাড়লে তবে এই খোয়ার হত না। বেড়াল ত্যাগাবার ভাল

কিরি হল, মাছের কাঁটাছুটি ঘুরে ছুঁতে দেওয়া। ঘুর থেকে কাম্ভা-কামড়ি কতক, কাছ বেঁসে খামেলা করতে আসবে না। টাকা পাঁচেরে বড়না গাফিলতি করল, তার এই ভোগাতি। সবকী কালকেও আবার বেতে বলে দিল। বলে, গেরুতখরে বজার পর ঠাকুরের নাম, খুব ভাল কাজ করছ তোমরা। কখনো কামাই পড়ে না যেন।

জগা দিউরে ওঠে : আরে সর্বনাশ। একদিন দু-দিন নয়, বোঝ বোঝ এখন অতগুলো পাহারার মধ্যে বড়নাকে হারানি হয়ে বলে থাকতে হবে। বড়না বাঁচবে না।

আজ তোমারাজেও আগের দিনের মতো। জগা সোজানুজি ঘাটের উপর ভিত্তি তেপে বসেছে। বলাই আসা ঘুরে আসছে। গগন তরঙ্গ লিখে দেবে, কত খোঁকা মাছ হাচ্ছে কি রকম হয়ে কেনা। এবং ঠিক আগের দিনের মতো বাঁধের উপরে চাক। আনকে আর কানার নাহল না, মোমা কানার মহিমা কাল বুঝে নিয়েছে। বাঁধের উপর থেকে টোচ্ছো, বাঁটা আর হাডা-খুঁড়-কাটা। হাল ফুলেছে, আজকে ফুল মা হয়। এমন ফুলো মাছব কেন তুমি ? জগার মুখে হীন্দা কিছু নেই, লোহার মুক্তির মতো স্থির। কানে গেল কিনা বোকা বার না। পচা নেমে আসছে, সে বাবে। কুমিরমারির হাটবার আঁক। ডিঙিতে এই দিনে কিছু ভিড় হয়। লোকে হাটবেলাতি করতে বাস, ঘোরাঘুরি করে নতুন মাছবজান দেখতেও বাস অনেক। পচাকে ডেকে চাক বলে, কালা নাকি নোকোর ঐ লোকটা ? বা কাড়ে না। একগাছ বাঁটার কথা বলছি কাল থেকে—

জগা কাল নয়, সে তো ভাল মতোই বুঝে নিয়েছে সেদিন। ফুলতলার ঘাটে, টাণুরনোকোর ভিতরে, এবং বিশেষ করে কুমিরমারিতে। এটা হল নিজের মনের ভাল মেটানো কথা। আকাশে সূর্য ওঠেনি—নতুন দিনের সবে সূচনা—এর মধ্যে অকারণ গালিগালাজ শুনিবে মনটা খিঁচড়ে দিল একেবারে। ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে। পচা বলে, খেরাল করে বাঁটা আনতে হবে আজ।

জগা গর্জন করে ওঠে, আনবিন তো থাক। মেরে ফেল দেবো তোকে গাঙের জলে। মরন হয়ে মেরেমাছবের বাঁটা বইতে লজ্জাকরে না ? পচা বলে, পুরুবে না আনলে মেরেমাছবই বা পায় কোথায় ? বুঝে দেখ সেটা। দুটো দিন মাত্র ওরা এসেছে, ঠাট বদলে গেছে, এর মধ্যে আলাখবের। মেরেজাত হলেন লক্ষী—লক্ষীর চরণ পড়েছে আর লক্ষীজী কুটে উঠেছে। বাও না তো ও-বুথো, দেখে এসো একটুবার গিরে।

বলাই হেসে ওঠে : খবরদার জগা। দেখতে পেলে তাকেও কিছু ছেড়ে দেবে না। গানের গলা শুনেছে সেদিন নোকোর মধ্যে। আলাখবের সকলে আমরা নামগানে যাতোয়ারা হয়েছিলাম, তাও শুনল ঘরের মধ্যে প্রথম পি দিয়েই। বাবাজি করে তাকেও ঠিক আমাদের সঙ্গে বসিয়ে দেবে।

জগা বুঝ চিতিয়ে বলে, কে বলাবে ? কার বাড়ি কটা মাথা ? টের পাবে আমার সঙ্গে লাগতে এসে। বলে দিস সেকথা।

বলাই বলে, বড়নাও অমনি কবত। কী হাল হয়েছে এই দুটো দিনে। যেন এক জিন্ন মাছব। কিছু বলা বার না রে ভাই, গায়ের কোরের কথাও নয়। কামরুপ-কামাখ্যার পুরুষকে ভেড়া বানায়। পাহাড়ের নিচে শুনেছি, বত ভেড়া সারি সারি দড়ি ঘিরে বেঁধে রেখেছে। হল কি করে ?

[ক্রমশঃ]

শৌখিন অথবা এক কুকুরের বাবু। হোল, হুসক,

এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, ম্যালেরিয়া অফিসার কুকুস সাহেব।

ডাকে নিতে হোল—কারণ তাঁর হাতে বিশাল ওয়েপন্স
কেরিয়ার আছে। ঘোঁর কেন, জীপও সে পাখ বেতে পারে না।
সামনের জল নদীতে পুল নেই, নৌকাও নেই, তবে বারজীর
বড় ট্রাক্টর সাড়ে চার ফিট জল দিয়ে বেতে পারে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে
হায়ে আমাদের পাড়াকে টেনে নদী পার করবার আর বালি বা
কাঁচার আটকে গেলে টেনে বার করবার জন্তে। সিঞ্জীও কম ধান
না, তাঁর খাঁতালো হাতী যেমনার, একটি ভোটেরা ঘোড়া ও
একটি ভালো ঘোড়া থাকবে। গভর পাড়ীতে বসল আসেই বগলা
করে দেওয়া হোল। এবার কোথামানার পালা। বারজীর
কোয় ও কোয় মশার হাইকেল আর টু টু বোর হাইকেল, বোমলা
দুইগুন আর বিতলভার। সিঞ্জীর বোমলা আর তাঁর ডাইএর
এমনল। আমার ভ্রাতা ফিল্ড হাইকেল, আর অটোমোটিক বনুক
অফিসারদের মধ্যে ডি-এস-পির বনুক, হাইকেল, বিতলভার,
এস-ডি-ওর বিতলভার ও বনুক। ভয়ের ভণ্ড বিতলভার।
হুসকের কিছুই নেই। ওরা হুসক আমাদের বনুক, ওলা ব্যবহার
করবেন।

অল্পপত্র সমেত বধন আমরা দুপুর বেলায় পাড়ীতে উঠলাম,
সে এক দেখবার জিনিষ। কিন্তু একটা হিসেবে তুল হয়েছিল,
প্রত্যেক ভজ্ব বে একটি করে আর্দ্রালী নেবেন সেটা ভাবিনি।
কাছেই তাদের রসদের কথা ওঠে নি। বারজীকে চুপি চুপি
বলতেই, তিনি অভয় দিলেন, বা বসল আছে তাতেই কোনোমতে
চলে যাবে—আর আমার মত শিকারী থাকতে ভাবনা। শিকার
ক্ষেত্রে পৌছবার আগেই ঘুঘু মারতে মারতে বাবে। আর
পৌছবামাত্র একটা শূঁয়ার বা হরিণ মেরে ফেললেই হবে।

কুকুস সাহেব গাড়ী দিয়েছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া ধরার আসতে
পারেন নি। আকস্মিক জানিয়েছেন। আর নিশ্চিত হতে
বলছেন, হুসলমান ডাইভার আছে, কোনোই অসুবিধে হবে না।
সে বে কোনো আহত জানোয়ারকে এক নিমেষে জবাই করতে
পারে। আর—কাবারও ভাল রাখতে পারে।

সহর ছেড়ে ওয়েপন্স কেরিয়ার ও ট্রাক্টর নদীর ধারে এল।
দেখি—এক বাক শাহুরখোর পাখী বসে আছে। দেখতেও
যেমন বেরাড়া মাংসও তেমনি আঁশটে গন্ধ। ডাইভার গাড়ী ধামিয়ে
বসলে, সাহেবের জন্তে করেকটা মেরে দিতে। একসঙ্গে তিনটে কাবার
হোল। চারটে তৎক্ষণাৎ বসল, আর পাঁচটা আহত হয়ে ডানা
ঝাপটাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ডাইভার, দেড়ফুট লম্বা এক
ভরকর ছোঁরা নিয়ে—মরাগুলোকে জবাই করে, জ্যান্ডগুলোকে বসল।

পাখী তো হোল—এবার কাঠী গীয়ার আর কোয় হুইল ডাইভে,
বালি উড়িয়ে অন্ধকার করে আমরা নদীতে প্রবেশ করলাম। নদীতে
মাত্র তিন ফিট জল ছিল, অল্পসে সেটা পার হয়ে বেতে, ডি-এস-
পি, প্রস্তাব করলেন, ট্রাক্টর কেনং বাক কোনো দরকার নেই।
ওয়েপন্স কেরিয়ার বজ্রলে এ সব নদী পার হয়ে, আর ট্রাক্টরের
বজ্রনিদানে, একমাইল দূর থেকে পাখী আর জানোয়ার পালাবে।

এ কথা বারজীর মনঃপূত হোল না। তিনি বললেন, কেন এই
শাহুরখোরগুলো ত পালালো না।

শিকার কাহিনী

ত্রিকমলেশ তাহড়ী

জঙ্গলাহেব বার দিলেন বে—তারের বুকু এসে গিয়েছিল, তাই
ওড়েনি। আসলে তুমি আমি কে মারবার। হঠাৎ সিঞ্জী টেচিয়ে
উঠলেন—হরিহাল।

সত্যি—সামনে বটপাহে এক বাক হরিহাল। ঠিক হোল,
এস-ডি-ওই মারবেন। তাঁর নিশামণ্ড ভাল। এক কাঁরায়ে
তিনটে পড়ল। আর আবার ডাইভার সেই ভরকর ছোঁরা নিয়ে
ছুটল—জবাই করতে। পেছন পেছন হুসক। গাছতলার পৌছে
হুসকে বসলেন, পাখী তো হয়ে পাখর জবাই করে কি হবে।
ডাইভার দূর ভারী করে পাখী নিয়ে ফিরল।

হুসকে কিস কিস করে বারজীকে বসলেন, ডাইভারের উদ্দেশ্য
ধাওয়াপ। আমাদের খেতে দেবে না। অর্থাৎ হুসকে পৌড়া হিন্দু,
জবাই মাংস খান না।

চলেছি—সামনে কিছুদূর মরুকুমির মত, লাল বক্ বক্ করছে
বড়ানা বালি, অজকুচি যেখানে। পাড়ী আবার শেপাল গীয়ার
কোর হুইল ডাইভে, গর্জন করতে করতে চলল। পারও হোল,
না হলেও ভর নেই—সঙ্গে ট্রাক্টর আছে। সামনের প্রায়ে একটি
লোক, হাত তুলে গাড়ী ধামিয়ে চিংকার করে বলল, সে ছ'জানা
পরসা দেবে, তাকে সাচাসা পৌছে দেওয়া হোক। ডাইভার দাঁত
খিঁচিয়ে উঠল। আবার চললাম।

কুশীর অসখা ধারা বইত আগে এখন তাইই মরা খাঁতগুলো
রয়ে গেছে। শ্রোত নেই, কোনোটার এক হাঁটু, কোনোটার
এক কোমর জল। না যেমেই চললাম গোরতো নদী পার হয়ে।
এই গোরহো দশ বছর আগে অবধি কুমীরের ডিপো ছিল,
এখন কেবল ধু-ধু বালি আর মধ্যে এক হাঁটু জল। গোরহো
পার হয়ে শুকনো ধুলোর বালির রাজ্য শেষ করে, বধন
আমাদের গম্ভব্য মহিষি গ্রামের তিন-চার মাইল কাছাকাছি
এলাম, ভখন সবাইই পারে খাঁতালানো, টাটানো বাধা,
আর ধুলোর নাক-চোখ ভাল করছে। এ জেলার এতদিনে
পথ তৈরী আরম্ভ হয়েছে, এখনো দুঃসম পথ নেই। ১৯৩৪-এর
ভূমিকম্প আর সেই সময় কুশী আগমনের পূর্ক খুব ভাল পথ অবস্থ
ছিল। এখন থেকে আরম্ভ হোল বর্তমান কুশী রাজ্যের সীমা।
শঙ্কগাচায়া দামিণাত্য থেকে শান্ত আলোচনা করতে পায়ে ধেঁটে
মহিষি গ্রামে এসেছিলেন। মণ্ডন মিশ্র আর উভয়ভারতীয় গ্রামে—
তার দেবীর মহাপীঠস্থানে।

মহিষিতে মন্দির আছে। দেবীর কাল পাখরের মূর্তি। পুকুর
খুঁড়তে গেলে অনেক মূর্তি ও স্তম্ভ বেতায়। অর্থাৎ সভ্যতার অসখ্য
অশ্বানের মধ্যে মহিষিও একটি। জ্ঞান সভ্যতা, সম্পদ, সুখ, আনন্দ
—মাহুদের, গোষ্ঠীর, সমাজের, দেশের স্বর্ণকের জন্তে আসে। আর
স্বর্ণভ্রমর মতই মিলিয়ে যায়।

শঙ্করের ও জ্ঞানদের বাতিল করা অনেক বুদ্ধমূর্তি মন্দিরের
বাইরে হিন্দু দেবতাদের হস্তাবেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে খুব ফুল,
সিঁদুর আর প্রণাম পাচ্ছেন ময়েময়ে।

আর একবার শিকার করতে গিয়েছিলাম এখন থেকে বহু দূরে উত্তর-পশ্চিমে, হাংতাকা জেলার নীমানায়। সেখানেও এক হস্তবলী বিগ্রহ দেখেছিলাম। সে বার চার বছর ছিলাম। এক তেপান্তরে বাড়ির হয়ে গেল, আমরা ক্লাস্ত হয়ে দুবতে বুরতে এক গ্রামে পৌঁছাই। সেখানে এক মন্দিরে রাজির মত আশ্রয় নিই। মন্দিরটি বহুতাল আগের তৈরী। পাশে ছোট দরদালান, বোধ হয় রাজীনিবাস ছিল। বর্তমানে সেখানে গ্রামের যোড়সের দুটি বলর আর দুটি মহিষ থাকে। সারা দিন দুয়ার আর বাড়ি গভীর ভলই বাঘের মত পথের কসলে গিয়ে পড়ে। ভোর হলে ফেরে। কলে ভাসের পকিবের উঠে:গ্রবার আর সাইজ গ্রীবাতের। আমরা বহন সেখানে পৌঁছলাম, গো-পালক ভবন পত্তনের দটি থুগেছে। বললে—এ কোদের খড়ের পানার ওপরে আশা নিশ্চিত হয়ে ঘুমাতে পারি। তার পরই লাইট খিগেডের চাকের মত, নাটক পত্ত হকার দিয়ে ভীমবেগে উদ্ভুপে টাট করল। সবচেয়ে হাতকর মহিগটার পিঠে গো-পালক। ভোরবেলার ফিরে আসা মহিষদের পর্জনে ঘুম ভাঙল। বেরিয়ে দেখি, চমৎকার ইসারা, পরিষ্কার জল, পাশেই কড়ে জল, বুড়ার আর সাল গোলাপ। চারদিকে সবুজ শস্যের শোভা, বেন একখানি মস্ত বড় কাপেট বিড়ানো রয়েছে। কেবল উত্তর-পশ্চিম দিকে কানের জল, হাতদুই দেখা যায়।

বহুবলী—সোজা উত্তরে গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ আর উত্তর-পূর্বে কাকনজজা ভোরের আলোর বলমল করছে। মন্দিরের দরজা খোলা, দুই থেকে গ্রামের পুরোহিত এসেছেন, পূজার বসেছেন, ঘেছার কাঁজ। আমিও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ভিক্ষা গারে ভিজে আশারওয়ারে, পূজা করতে মন্দিরে ঢুকলাম। পুরোহিত অগ্রসর হুটিতে আমার বর্ষোচিত বেশের দিকে তাকালেন, তার পর কি ভেবে মুখ ঘুরিয়ে পূজার মনোনিবেশ করলেন। তাঁর পূজা শেষ হবার পর, ঘুরে বসে আমার অঙ্গদ্যাস প্রভৃতি করতে দেখে নিশ্চিত হলেন। পূজার শেষে তাঁকে নৈবেদ্যের জন্ত আঁধ সেৱ তিনি, শিকারের কোলা থেকে দিয়ে খুশী করলাম, গল্প শোনার উদ্দেশ্যে। পুরোহিতের পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ এ বিগ্রহের পূজা করেছেন, কিন্তু কেউই মন্দিরের বা বিগ্রহের ইতিহাস জানতেন না। পুরোহিতকে জিজ্ঞাস করার বললেন, মূর্তি হ'ল শিবের।

বললাম, তা কি করে হয়। চতুর্ভুজ, লাড়ি আছে, গলার উপবীত, হাতে কণের মালা আর কমণ্ডলু হস্তবাহন, এ তো ব্রহ্মার মূর্তি। ব্রহ্মার মূর্তি কদাচিৎ দেখা যায়। আর এত স্মরণ আর বড়, কাল-পাথরের নিখুঁত মূর্তি, আমি ত দেখিনি।

অন্তমনস্ত হয়ে অস্তবায়ের শিকারের কথা ভাবছিলাম। সবাই, এই অঞ্চলের নিস্তর প্রকৃতির মধ্যে এসে উল্লাস বোধ করছিলেন। এমন সময় ডাইভার একটা জলামত আরগার সামনে গাড়ী থামালো। কতটা জল আর পান আছে দেখার জন্তে। ট্রাক্টর খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল, তবে তার ব্রহ্মার পোনা বাঁধিল। ডাইভার জুতো খুলে জলে নেমে দেখল, জল এক হাঁটুর কিছু বেশী তবে নীচে নয়, পেছল কালা। বাই হোক, আবার কোর ভইল আর শেশাল গীয়ার দিয়ে মত যাতনের মত গাড়ী প্রায় দুশ

গজ জলার ভেতর যেতে, কুট বোর্ড ছাড়িয়ে জল উঠল। গাড়ী ক্রমশ পানক বসছে, সাইসেলারের জল চুকে, এলিন থামবার মত অবস্থা ভবন হাককাট আর জল এলিনটোর দিয়ে রাখতে গাড়ী আনা-খানিকটা এগিয়ে গেলে, জল প্রায় এককোমর হল। হাক জলার এলিন বড় হল বলে। কিন্তু ট্রাক্টর এসে পড়ল আর সামনে গিয়ে, ভারী মোটা কাঁহি দিয়ে টানতে লাগল। গাড়ী কাঁহা, দলিত মথিত কং আকষিত হোল। তারপর অহঙ্কার দেখে কে। বেন তিনিই টানছেন, বললেন, দেখা দালা। বলতে বলতেই, ট্রাক্টরও থামার উপক্রম গিয়ার নিউট্রাল রেখে, শীঘ্র এলিন চালু রাখা হল একবার বহু হয়ে ওখানে আর ট্রাট হবে না।

কি অবস্থা! সামনে পেছনে ছন্দ 'আড়াইশ' গজ জলা আর দু'পাশে কয়েক মাইল জলা। দুই বছর আগেও দুখন শালবন ছিল আর তার মধ্য দিয়ে কুশীল ছোট লাখা পুখানী নদী ছিল। হঠাৎ 'কৌমিকি' মহাবাগীর, কি ইচ্ছা হল, তিনি পুখানীর খাত দিয়ে আ জল নেবেন না, অবিলম্বে বানী দিয়ে পুখানীর মুখ বন্ধ করে, এক অবি লজা জলার সৃষ্টি করেছেন।

এদিকে অবস্থা সঙ্গী, মতিহি তো কাছে, কিন্তু সঙ্গী হয়ে আসছে, আমরা সকলেই মুখ-তুফার কাতর। হাতী সিন্ধীর মুখ শুকিয়ে গেছে, তাঁরা চুপি চুপি পতাম্ব করছেন উষ্যের উপার, ডাইভার গজগজ করছে শেইল পোড়ায়। মা ভেঁ—মহিবি থেকে আমাদের লোকেরা ট্রাক্টর, লরীর গর্জন শুনে পেয়েছে। দেখা গেল বিশাল কালো মেঘের মত মেঘনাদ মতিবির দিকের শালবন থেকে বের হচ্ছে। চার চার ফুট লম্বা দুটি শীত, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত বলসে উঠছে। পেছন পেছন আমাদের লোকজন, আদালী ও গ্রামবাসী ছেলেরা। মেঘনাদ জলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে এল। স্থির করলাম, গাড়ী মাথা দিয়ে ঠেলবে, পেছন থেকে। আর সামনে থেকে ট্রাক্টর টানবে। মেঘনাদ হাতের ইসাবার গাড়ীর বডির নীচে শীত দুটি ফিট করে, গাড়ীটা আগে পান থেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর ট্রাক্টরের টান মারার সঙ্গে সঙ্গে কপাল দিয়ে গাড়ীকে ঠেলতে লাগল। জল ভেদ করে, পাশে ডেউঘর মত কাঁহা উঠতে লাগল। আর মধ্যে মধ্যে ঢাকা স্লিপ করে ফোয়ারার মত জল ফেলে গাড়ী এগিয়ে চলল। জলা থেকে গাড়ী বের হল। বার হতেই মেঘনাদ গাড়ী ছেড়ে দিয়ে, শুড় উঁচু করে ভীম বৃহৎ করে উঠল। আনন্দে অধীর হয়ে বহু সিজী গাড়ী থেকে নেমে তাঁর হাতীকে আদর করতে গেলেন। আর হাতীও আহ্লাদ করে বসে পড়ল তাঁকে পিঠে নেওয়ার জন্তে। বহু হস্তবলের অল্পমতি ক্রমে, হাতীর পিঠেই চললেন। আগামী কাল বিকেলের মধ্যে যাতে জলার মধ্যে ঘোঁর বাবার মত পথ ককি, ডালপালা আর বড় কাঁহ শেতে তৈরী থাকে তার বন্দোবস্ত করা হল।

নালা, বন্দ, মাঠ দিয়ে গটকাট করে হাতীর পিঠে সিজী, আগেই মহিবি ডাকবাংলার পৌঁছলেন। আর আমরা প্রায় দেড় মাইল পথ, চার মাইল ঘুরে, পৌঁছতে দেখি ডাকবাংলার মেলা বসে গিয়েছে। কয়েকটি শ্রেয়াম্মার আর কারবাইড জগে। গ্রামের ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ভামসা দেখতে এসেছে।

গাড়ী থেকে নামলাম সবাই, অবস্থা গতিই কাহিল আর মেজাজ

গারাপ। চা-খাবার খেয়ে ভরেই পড়লাম। ওরিকে 'ভাস' আরজ হল।

অন্ধকার থাকতে ঘুম জেগে গেল। জলায় হাঁসের বোঁকে চললাম, একলাই। আবহা অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে একলা চলেছি, গাছের পাতা থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে আর হু-হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে। মিনিট আটকের ভেতর জলায় ধারে গিয়ে দেখি ঘন কুয়াশার জলা আছে। আর সেখান থেকে আসছে বহু বিচিত্র শব্দ। একটা টিপির আঁড়ালে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছি—দেখি সামনেই মাঝ ত্রিশ গজ দূরে এক কাক চোখা অল্পবল বসে আছে। টিপির পাশ থেকে নীচু হয়ে, রাইফেল জলের সমান্তরাল করে নিশান নিয়ে ত্রিগার টিপতেই, সামান্য কট করে শব্দ হোল, আর সামনের চোখা নিশেধে বাড় গুঁজে পড়ল, তার পেছনেরটা একবার ক্যাও—কয়েই ছিঁর হয়ে গেল। পাখী ছুটে হাতে নিয়ে দেখলাম প্রথম চোখটির মাথা ফুটো করে, দুটো দ্বিতীয়টির বৃক প্রবেশ করেছে।

সুখাবাদের একটু পরেই আরো তিনটে হাতী এল, যেমনাদ ভ' আছেই। সব চেয়ে বড় হাতী পনকুয়ারে চলেছে জেলাজল ও বাকী। যেমনাদে আরোহণ করলেন এস-ডিও এবং ডি-এস-পি সেক হাতীতে স্লোক আর সাকী। হাতীতে উঠবার আগে স্লোক চুপি চুপি আমার বললেন, মিঞা ড্রাইভার থাকে আমি সঙ্গে নিছি, সে যেন ভাল পাখীগুলো আর হরিণগুলোকে জবাই করবার সুযোগ না পায়। সব চেয়ে ছোট একটা খুবখুরে হাতীতে চড়ে আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম, পড়ে গেলে খুন হবো না। কোন হাতীতেই হাওয়া নেই, শুধু গরম। ড্রাইভার আমার পেছনে বসল।

গ্রামের বাইরে যেতেই শতক্ষেত থেকে একটি ফুল'ড পাখী 'কক্সিকার্ট' উড়ল। তৎক্ষণাৎ ডি-এস-পি এবং এস-ডিও একসঙ্গেই ফায়ার করলেন। পাখী পড়ল। কিন্তু কার শটে? হাওয়া গরম, বিদ্রোহের স্বাক্ষর, খদখদে ব্যাপার। ড্রাইভার নেমে, পাখী তুলে জানতে, ছোট ছুঁচী দিয়ে আঘাতের স্থান চিহ্ন করে পাঁচটি ছুরা পেলাম। তিনটি, চার নম্বর ও দুটি বি, বি ছুরা। ছ'রকমই রয়েছে। হাওয়া ঠাণ্ডা হল, বিদ্রোহ মিলিয়ে গেল, আর সবালবেলাকার পনের ফুঁড়ি মিনিট সময় নষ্ট হোল।

এক ঘণ্টা পরে বোঁচা নদীর তীরে পৌঁছলাম। সবাই হাতী থেকে নেমেছি, এমন সময় আমার অভ্যস্ত চোখে পড়ল। জলের ওপার ঘেঁষে তিনটি বিন্দু আর তার পেছনে কয়েকটি কীটা—স্রোতেও স্থির—এক জায়গার রয়েছে। অর্ধাং মাছবৎসে কুমীর জল খাণটি মেয়ে রয়েছে। কাউকে কিছু না বলে—ব্রোজ পরেক্ট বৃগট রাইফেল ভরে, তিনটি বিন্দু—সামনেরট নাক আর পেছনের দুটি চোখ পেছনটায় ফায়ার করলাম। জলের মধ্যে যেন বোমা ফাটল। বৃগট কুমীরের চোখে হুকে, মাথার গুলির খানিকটা হাড়—নদীর পাড়ে ফেলে, বোঁ করে ওপরে উঠে গেল। আর দানবীর শক্তিতে জল মথিত করে, চাপা, ক্রুদ্ধ গা গাঁ লম্বা করে কুমীরটা ডুব মারল। এস-ডিও জামেন, কনকাল, মললাম, এখন খানিকটা উজিরে গিয়ে উঠবে আহত কুমীর

বৌকপ জলের দীর্ঘ থাকতে পারে না, উজিরে বেতে চেষ্টা করে। মিনিট বানেকও হয় নি, আর দূশ' গজ উজিরে কুমীরটা ওপারের কাছে উঠল। নিম্নে 'হাইড্রোসিটি মসক' বৃগট ওর বাড় আশ্বাস করে ফায়ার করলাম। ডিগবাকী খেয়ে আবার ডুব মারল। কঠিন প্রাণ বটে! স্লোক আর সাকী একটা নৌকা নিয়ে কুমীরের পেছনে খাওয়া করলেন। পাড় দিয়ে তাঁদের হাতী চলল। বড় কর্তারা রায়জীসহ নৌকার পার হয়ে গেলেন। হাতীরা সাঁতার দিল। ওপারে আবার সবাই হাতীতে চললেন। আমি এপারেই হাতীর পিঠে, নদীর পাড় দিয়ে, দক্ষিণ দিকে চললাম।

মাইল পাঁচেক গিয়ে কাশের জল আর মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যা নালার মত, অল্প গভীর জল, কুমীর অসংখ্য ধারা। বরফের মত ঠাণ্ডা। জলের তলে সাধা বাসি চক্ চক্ করছে। ছোটবড় বকমারি মাছ ছুটোছুটি করছে। হাতী খামিরে মাছ দেখছি, এমন সময় মাছত চাপা গলায় বলল, সামনে 'এক' (মলাছাড়া পাতাল বনুয়ার) আমার মনে হল, ছোট মহিব বললাম তাই, তবু মাছত ভিল্ করায়, পাঁচটা রাইফেল স্লাগ ভরা, অটোমেটিক গান তুলে ভাল করে রেখতে লাগলাম। কারণ এরকম ক্ষেত্রে কখনো কখনো বোনের ভেতর মাছুর, আর গরু ঘোষ খুন হয়। ইতিমধ্যে বনুয়ারটি বনে প্রবেশ করল।

খানিকটা এসিয়ে আবার প্রকৃতি ছোট হাঁস আর মনুয়ের মত স্লোক কিছু পেখমহীন, অতি সুবাস 'কারণ' পাখী (প্যাড কাউল) পেলাম।

এখানে কিছু গোয়াল অনেক গরু মহিব নিয়ে কাশের জলে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আর ট্রাকটরের কল্যাণে পড়তি গোচর কুমি আর কোথাও নেই। সেজন্তে এইখানে দু'ব বিনা পরসার খাওয়া যায়। এই গোয়াল আর গরু মহিবের ভেত, বতই ভাল লক্ষ্য হোক না কেন, শিকার একেবারে পরিহার নজর না হলে দুর্ঘটনা হতে পারে। তাই মধ্যে মধ্যে চকিতে হরিণ দেখা গেলেও গুলি চালালাম না। উদ্ভিড়াল (ভোরড) মায়ার চেষ্টা করলাম, কারণ, পাখী মরে যেই জলে পড়ে অমনি টপ করে নিয়ে জলে ডুব মারে। হু'বার মিস করলাম। চলমান হাতীর পিঠ থেকে, অব্যর্থ লক্ষ্য সেই দাবী করতে পারে, যে কুমিকলেশের সময় জল ভরা স্লাগ হাতে নিয়ে বেড়ানো পায়, না ফেলে।

বেলা তিনটে আশ্বাস, গোটা ত্রিশেক সুখাত পাখী নিয়ে, বাটের কাছে কিরে দেখি স্লোক ও সাকী কুমীর উদ্ধার করে, গোরগাকী বোঁগাড় করে রঙনা হবার উপক্রম করছেন। একটু পরেই, ডি-এস-পি আর এস-ডিও একটা বড় হরিণ নিয়ে এলেন। আবার তাতে হু'জনের গুলী। এবার সলে লোকলের আনা বাস্কেট, খাওয়ার সব সরঞ্জাম ছিলই, দ্রোত বেলে দু'ব গরম করে, ককি, রুটা, মাখন, জ্যাম প্রভৃতি খেয়ে ভুপ্তি করে সিগারেট ধরিয়েছি, আর—জল ও রায়জীর অপেক্ষা করছি, এমন সময় কয়েকটি গোয়াল মহিবির দিক থেকে লাঠি বাড়তে করে উঠে:খেরে গাইতে গাইতে আসছিল :

‘বেলর পর বেলা যোটা,
ধাধি ভঁটা, হাকিম যোটা।’

আমাদের দেখেই হুল হয়ে গেল। হুঁতুর কারন জিজ্ঞাসা করায়, যেটারীনের হুল শুকিয়ে গেল। বলল, তারা হুলন হাকিমকে, বরেন গাড়ীতে মহিষি পৌঁছে দিয়ে আসছে—বরেন গাড়ীও আসছে, পেছনে আছে।

ব্যাখ্যা এই যে, হাতীর শিঠ থেকে জঙ্গ সাহেব আর বারজী একটা দাঁতাল বনওয়ারের ওপর কাছার করেন, শুনী ঠিকমত লাগেনি, সামান্য আহত ক্রুদ্র দাঁতাল ভীষণ ভাবে হাতীকে আক্রমণ করে আর তার বড় দাঁত ছুটি হাতীর গোলা পায়ে এমন গাঁথে দেয়, যে হাতী কেশে শুঁড় দিয়ে আটকান মগ ভারী দাঁতালকে তুলে আছাড় মারে। দাঁত ছুটি দাঁতালের ভেঙ্গে হাতীর পায়েই থেকে যায়। হাতী বরজীর কেশে শুঁড় দিয়ে মাহতকে ধরার চেষ্টা করতে থাকে, না পেরে পাগলের মত উত্তরে তার গ্রামের দিকে ছুটে থাকে। পথে একটি শুকনো আমবাগান ছিল, তার নীচু ডালে আঘাত লাগার সম্ভাবনার মাহত ডাল ধরে উঠে যায়। বারজী মাহতের অঙ্কুরণ করতে গিয়ে, হাতে-মুখে ডালের আঘাত পেয়ে নীচে পড়ে যান আর পা মচকে যায়। জঙ্গ সাহেব বুদ্ধি করে গরীর ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন, কলে তাঁর কোথাও চোট লাগেনি।

তাঁর দেহ ডালে আটকে যায় আর অজ্ঞান হয়ে হাতী থেকে পড়ে যান। নীচে কাশা থাকার কেউ পুন হননি। হাতী আর মাহত কেয়ার। বরেন শুনে গয়লাদের গানের অর্থ বুঝলাম, কিন্তু আমাদের হুল শুকিয়ে গেল। অবিলম্বে বগুনা হলাম। মহিষি ফিরে দেখে স্থানীয় ডাক্তার তাঁদের ওয়েপশু কেবিরারে তুলে, ট্রাক্টরের ডাইভার দিয়ে চালিয়ে সাহাসী চলে গেছে। বাবার সময় কোনো ক্ষতবিধে হয়নি। ঝাউ আর কাশ বিছিয়ে, জলার পথ ঠিক করাই ছিল।

আমাদের খাবার তৈরী ছিল, বললাম ট্রাক্টর চড়ে আমি সাহাসী বগুনা ছিছি। দেখব, বাতে ভোরবেলাতেই ওয়েপশু কেবিরার তাঁদের নেবার জন্তে এসে যার। সাহাসী হাসপাতালে গিয়ে দেখি, জঙ্গ আর বারজীর জ্ঞান ফিরে এসেছে, তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি। বারজীর হুল-হাত ব্যাওজে মোড়া, পায়ে স্পিষ্ট। জঙ্গ সাহেবের শুধু উন্নয়নশীল ব্যাওজ।

আমরা গাড়ী আর ডাইভার নিয়ে রাত এগারোটায় মাইপুথার বাড়ী ফিরলাম। গাড়ী পেট্রল তরে আবার মহিষি চলল, ভোরবেলায় সেখানে পৌঁছতে হবে।

ফুল ফোটানোর গান

অশোক ভট্টাচার্য

কিসের স্পর্শ খুঁজে বেড়াই সারাটা দিন—

সারাটা পথ কার সন্ধানে হাঁটি ?

সে কী জীবন না যুত্যা !

বৈশাখের রোদ মানি না, মাঘের বাত কাটাই

খোলা আকাশের নিচে। তবু তাকে পাই না।

বাকে পাই না

কিসে মন ভারী করে থাকে ?

বাতের চাপোয়া খসে পড়ে।

ঝিরিঝিরি বাতাসে

পাখি তার ভোরের গানে স্তব্ধ চড়ায়।

দূরে কাছে ঘীরে ঘিরে কোলাহল জাগে—

বার্ষ তবু, অসম্ম যত্নে ফিরে আসি।

দূর শহরের পিচ-গলা পথে ক্রান্ত আমি

দেহ টেনে টেনে পথ চলি। বেলাশেষে

পার্কের বেকিতে বসে বিজ্রাম মিই—

অজলি ভরে জল করি পান। তারপর শুক

আবার সে দৃপ্ত অভিজান। কিন্তু, কিসের বাসনা বল

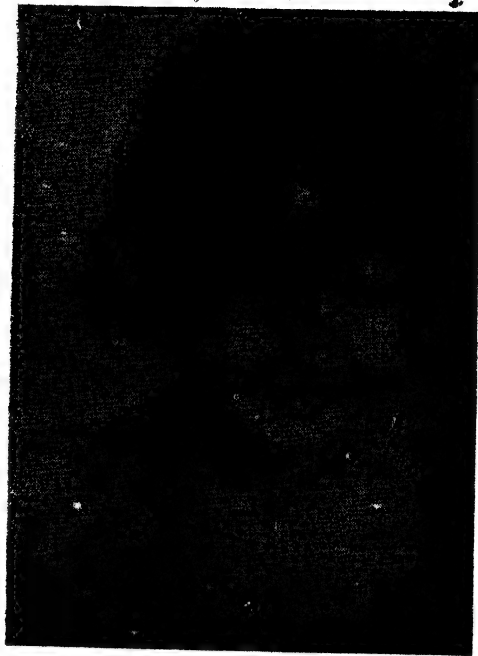
আমার এ বুকে, সে কি ভালোবাসা ?

যরা পাছে ফুল ফোটানোর গান।

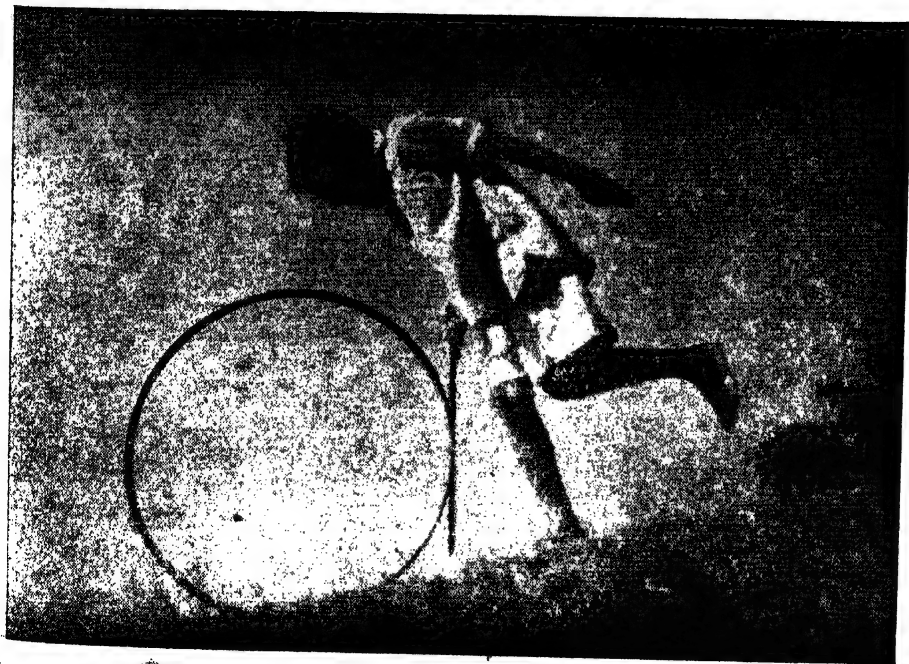
আলোক চিত্র

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না।]

ছোট
—বিভাগ মিত্র



কেবল খেলা
—রায়কিষ্কর সিংহ





জল থেকে ডালীয়

—হামকু (যেদিনীপুর)



सूर्यास्त

—सूर्यास्त कलाकाम



পারাপার

—বি. দাশ (পুলিহ)

অজয় নদী (বীরভূম)

—নিয়াইবল্লভ গুপ্ত





সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রবীন্দ্রার্থে

রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের মনীষী, সর্বকালের কোবিদ, সর্বকালের প্রণয়ী। ভারতীয় সনাতন সভ্যতার তিনি ধারক, বাহক, ধারক, শাখিত সংস্কৃতির তিনি বাণীমূর্তি, নবচেতনার তিনি জন্মদাতা। এই তাঁর দেহাত্মের পূর্বে যেখানেই ঘটেছে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত পুষ্টি, সেই স্থানই ভরে উঠেছে এক মাহাত্ম্যে, উদ্ভাসিত হয়েছে আলোর, পরিপূর্ণ হয়েছে তীর্থে। এই রবীন্দ্রতীর্থের তীর্থস্রবের ধোঁয়াবের স্থান সকলের পুরোভাগে তাঁদের মধ্যে ভারতের প্রবীণ রোচ্য প্রকৃতি ঐ অসিতকুমার হালদার অন্ততম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থত বসে জীবনের রীক্ষালাভ করেছিলেন যে জীবন-পথিকের ম অসিতকুমার তাঁদেরই একজন তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনযাত্রার সঙ্কেত বন্ধনেও অসিতকুমার আবদ্ধ। শিল্পীর মাতামহী সেন কবির সহোদর। শিল্পীর জন্মও জ্যোতিষিকার ঠাকুর-জীতেই, সুতরাং সঙ্গমিক খেতেই দেখা বাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথকে কাছের মানুষ হিসেবেই শাবার সৌভাগ্য হয়েছিল অসিতকুমারের। জ্ঞানার্থকে কেন্দ্র করে নিজের চোখে দেখা বিগত দিনের নাগালকে স্মৃতির পাত্র থেকে সাহিত্যের আসনে অবস্থিত করেন অসিতকুমার উপগোষ্ঠ গ্রন্থের মাধ্যমে। শাস্ত্রনিকেতন ক অসিতকুমারের বিদ্যারগ্রহণের পূর্বসূরীটি পর্যন্ত এই গ্রন্থে সিতকুমার স্মৃতিপুণ্য দক্ষতার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। শাস্ত্রনিকেতন আশ্রমের গোড়ার দিকের প্রায় সমগ্র জ্ঞান এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া হালদার পরিবারের ক্রুর পরিবারের বহু কীর্তিমান পুঙ্খ ও কীর্তিমতী মহিলাদের দ্বা পায়গর্ত আলোচনাও গ্রন্থের অন্ততম সম্পদবিশেষ। তকুমার শিল্পী, তাঁর তুলি কথা কর, কিন্তু কলমও তাঁর বনয়। তাঁর ভাষা, বর্ণনভঙ্গী, রচনাশৈলী যথোচিত প্রতিভার, র বহন করে। গ্রন্থটিকে ঠাকুর পরিবার, হালদার পরিবার, নোব শাস্ত্রনিকেতন, শাস্ত্রনিকেতনে আগত বিশেষ পকগণ, অভ্যাসগতবৃত্ত, বিভিন্নর কাহিনী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ক্রিয়ের অবদান বলে অভিহিত করলে অতুক্তি হয় না। কুমারের নিজস্ব বর্ণনার রবীন্দ্রনাথ বেন নতুন মূর্তিতে বিজ্ঞান শাস্ত্রনিকেতন বেন আবার ফিরে গেছে তার বেশে। নানা দিনগুলিতে, আলোজ্যমান ঘটনাগুলির বেন ক্রিয় ২২ পাঠকের চোখের সামনে। তবে কয়েকটি

গুরুতর বুলঙ্গ প্রমাদ বিশেষভাবে চোখে পড়ে, ভারপ্রাপ্তগণ এ দিকে একটু অবিক মনঃসংযোগ করলে আমরা খুশী হতুম। অসিতকুমারের আঁকা বহুজনের রেখাচিত্র গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করে। অসিতকুমারের পরিকল্পনামুযায়ী প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন ঐ প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সর্বাঙ্গসুন্দর তথ্যবহুল, সুবর্ণিত গ্রন্থটি ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করুক এই আমাদের কামনা। প্রকাশক—অঞ্জনা প্রকাশনী, ১৮ জামাচরণ রো ট্রাট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র

একথা আজ নতুন করে বলতে হবে না যে, শরৎচন্দ্রের চমকপ্রদ জীবনের প্রথমার্ধের অনেকগুলো দিন অতিবাহিত হয়েছে ব্রহ্মদেশে। সাহিত্যিকরূপে বাঙলা দেশে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করার আগে শরৎচন্দ্র বর্ষার প্রায় ছাব্বী বাসিন্দাই হয়ে গিয়েছিলেন। বর্ষা, সেখানকার মাহুঘ, সেখানকার জীবনযাত্রা, সেখানকার ভাব কল্পনাও তাঁর সাহিত্যে নানা পরিবেশের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে। তবে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাসের খুঁটিনাটি ঘটনা সক্রান্ত বিশদ ধারাবাহিক বিবরণ খুব বেশী জানা যায়নি—বা জানা গেছে তা খুব বিস্তারিত নয়, উপরোক্ত গ্রন্থখানি সেই অভাব পূর্ণ করবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থটির মাধ্যমে লেখক বর্ষার যোগেন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাস সংক্ষেপে অনিসন্ধিৎস, জিজ্ঞাসু ও সন্দানী ব্যক্তির কৌতুহল নিরসন করে বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস লাভ করার দাবী রেখে গেছেন। যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন সেখানে শরৎচন্দ্রের কর্ম-জীবনের সত্যিকার যোগেন্দ্রনাথের কলাহুরাগই তাঁকে শরৎচন্দ্রের মনের একটি বিশেষ স্থানে উপনীত করেছিল, লেখক দীর্ঘদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন, ব্রহ্মদেশে বাস করা কালীন শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটে যাওয়া এমন অনেক ঘটনা, কাহিনী আছে যা হয় তো সাধারণে অবিদিত নয়। সেই সকল তথ্যগুলি গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থটিতে ব্রহ্মদেশ সর্বক্ষেত্রে তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বর্ষা সংক্ষেপে তথ্যাদি এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি শরৎচন্দ্রের প্রতি লেখকের অসীম শ্রদ্ধার ছাপ বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠাতে ফুটে ওঠে। প্রকাশক—মিতালয়, ১২ বহিম চ্যাটার্জী ট্রাট। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

বাঙলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র

সকল দিক কেন্দ্র করা বাঙলার ও বাঙালীর নব জাগরণের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর অবদান অসামান্য। সৃষ্টির, প্রগতির ও অগ্রগমনের এক অভিনব চেতনা বাঙালীর জনজীবনে যে কি অভূতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল তা বর্ণনার অতীত। বাঙলার দিকপাল সন্তানদের কল্যাণে ঐ সময় দেশের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক, অভিনয় প্রভৃতির ক্রমোন্নয়নের ফলে জাতীয় সংস্কৃতি ভরে উঠল এক মহিমান্বিত নীতিতে। জাতীয় সংস্কৃতির এই ব্যাপক জয় বাঙলাই দেশের জীবন্ত ন্যায়সম্মত। এই দিকপাল সন্তানদের মধ্যে নট-ঐক্যের গিরিশচন্দ্র বোধ জাতির নমস্কার। বাঙলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের পাতায় গিরিশচন্দ্র বোধ একটি বিশেষ স্বাক্ষর। ১৮৭২ খ্রষ্টাব্দ থেকে অভিনয়জগতে যে ধারার সূত্রপাত হল গিরিশচন্দ্র সেই ধারার প্রথম পুরুষ। বাঙলা নাট্য বিবর্ধনে তাঁর অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে উপরোক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে মনোজ্ঞ, সারগর্ভ, তথ্যপূর্ণ আলোচনা পরিবেশন করেছেন তাঁরই প্রদর্শিত পথের আর একজন বয়সী পথিক বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা, নাট্যবোদ্ধা নটস্বর্গ্য জীহাদী চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ সেকাওয়ার হিসেবে তিনি যে অতিশ্রুতি ভাব্য দেন, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই বক্তৃতামালার গ্রন্থরূপ। অহীন্দ্র চৌধুরী এই প্রসঙ্গে নাট্যাঙ্গনের উদ্ভব, বিকাশ, ব্যাপক জয়যাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করে সুপ্রাচীনকালের এক দারাবাহিক ইতিহাস এখানে তুলে ধরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে লেবেদেশের আবির্ভাবের পর ও গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে শহরের বিভিন্ন বিজ্ঞানসাহী ধনবান ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়, সহযোগিতায় ও পুষ্টিশোষণায় বাঙলাদেশের রঙ্গমঞ্চ কি ভাবে তিলে তিলে গড়ে উঠে সমৃদ্ধির আলোকধারায় স্নাত হয়েছে সে সম্পর্কে আনুগুণিক ইতিহাস বর্ণনায় লেখক অনন্তসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ বাক্স, পাঁজন, পাঁচালি পালাগান প্রমুখ লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গিগণও সুদীর্ঘকালের এক ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকের অভূতপূর্ণ শ্রমবীকারের নিদর্শন, নানাবিধ তথ্যের সমষ্টি এই জ্ঞানপ্রসূ গ্রন্থটি কেবলমাত্র নাট্যরসিকদেরই তৃপ্ত করবে না, গবেষকমাত্রই এই গ্রন্থের যথোচিত মূল্য দিতে কার্পণ্য করবেন না বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। এই জাতীয় গ্রন্থের বহু সংখ্যাবৃদ্ধি হয় শুভই মঙ্গল। পরিশেষে জাতীয় দরবারে এই গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার জন্তে নটস্বর্গ্যকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রকাশক—বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর বোথ লেন। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

সাহিত্যে ছোটগল্প

সাহিত্যের অঙ্গগুণ্ডিতে ছোটগল্পের অবদান অনন্তসাধারণ। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙলাসাহিত্যের যে ব্যাপক প্রভাব তার জন্তে বাঙলা ছোটগল্প অনেকখানি দায়ী, শুধু বাঙলাদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বহু দিকপাল সাহিত্যসেবকের আবির্ভাব ঘটেছে। ভাবভববর্ষকে ছোটগল্পের অমৃতমুখি বলে অভিহিত করলে অভিযুক্তদের দোষে চুষ্ট হতে হয় না, একথাও অনস্বীকার্য যে ইয়োবোপীর ছোটগল্প সাহিত্যের জন্মদাতা ভারতীয় ছোটগল্প

সাহিত্য। প্রাচীনকাল থেকে ছোটগল্পের আনুগুণিক ইতিহাস ইতিপূর্বে ক্রোড়ে ও মার্কিনব্লুকে রচিত হলেও আমাদের দেশে ঠিক ঐ জাতীয় গ্রন্থ এতাবৎ কাল রচিত হয় নি বললেই চলে। আনন্দের কথা, বাঙলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের ক্ষুদ্রতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সুখ্যাত অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের এই অভ্যর্থনা মোচন করলেন। তাঁর এই বিষটি ও মহৎ প্রচেষ্টায় ভিত্তি জয়লাভ করলেন—এ কথাও আমরা অনাস্বাসই বলতে পারি। গ্রন্থটি লেখকের প্রাণপাত পরিশ্রমের নিদর্শন। যুগের পর যুগ ধরে অসংখ্য ঘটনার প্রবাহের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময়কে সাক্ষ্য রেখে মানুষের ধ্যান-ধারণার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প কি ভাবে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধ হতে লাগল তারই এক আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস কুশলী সাহিত্যিকের দ্বারা লিখিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে। ছোটগল্পের এই ইতিহাস গ্রন্থটিকে যুগের ইতিহাস বলে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশীয় ছোটগল্পের ক্রমবর্ধন এরকম তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, বিস্তারিত ইতিহাস সাহিত্য সমাজে পরিবেশন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠক সমাজের সন্তোষজনক লাভ করবেন—এ বিশ্বাস আমরা মনে মনে পোষণ করি। এই সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থটি পাঠকমহলে যথোচিত সাড়া জাগাক ও সমার-লাভ করুক—এই আমাদের প্রার্থনা। প্রকাশক—ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—আট টাকা মাত্র।

এক অঙ্গে এত রূপ

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে লব্ধপ্রাপ্তি কথানি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক বিশেষ পুরুষ। বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর দান অপরিমিত। তাঁর সাতটি ছোট একত্রিত করে উপরোক্ত গ্রন্থটির সৃষ্টি। গল্পগুলি অচিন্ত্যকুমারে স্বজনী প্রতিভার স্বাক্ষরে উদ্দীপ্ত। তিনি যে একজন প্রাঞ্জলী জীবনশিল্পী, জীবনসঙ্গী ও জীবনপূজারী গল্পগুলি এই সত্য প্রমাণিত করে। গল্পগুলি অভিন্নবন্ধে মনোহর, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, বর্ণন প্রাণবন্ত। জীবনের এক-এক দিকের প্রতি লেখক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের অন্তত্বনীর বৈচিত্র্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুি প্রাণের তিনি নি উপাসক তাই জীবনকে জটিলতার বাঙলাস থেকে উদ্ধার করা তিনি যেন কৃতসঙ্কল্প। সর্বাঙ্গপরি দেখা যায় অচিন্ত্যকুমার সন্দর্ভ জীবনের এক দুর্বার বহুস্তরের উল সন্ধানে তাঁর লেখকচিত্ত বাস্তব স্তর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জীবনের গহন অন্তরালকে বাসী বাস সমর্থ হওয়ার জীবনরহস্যের অনেকগুলো সূক্ষ্মস্তরের উলস ও অচিন্ত্যকুমারের কাছে আর দুঃখিগম্য নয়। প্রচ্ছদের বর্ণ নির্ধারিত কেবলমাত্র লক্ষ্যের সাহায্যে প্রচ্ছদচিত্র পরিবর্তনের জীবনীয় গ বর্ধেই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণ ও বর্ণিত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—নাতানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র হা ভিদিই দাম—তিন টাকা মাত্র।

সিদ্ধপারে

অনেক বছর আগে বাঙলা সাহিত্যের দরবারে প্রথম একা সঙ্গে সঙ্গেই 'স্বপ্ন' সা' যে অভূতপূর্ণ আলোড়ন এনেছিল

শ্রুতি মিলিয়ে বাবায় নয়। সুশাস্ত সার সর্বাঙ্গীণ অভিনব লেখক প্রখ্যাত আইনজীবী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তকে সাহিত্য জগতে এক বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আলোচ্য উপন্যাসটি সুশাস্ত সার শৌর্য বিকাশকে কেন্দ্র করে লেখা। ভাস্করী পাঁচ করে অতিরিক্ত অধ্যয়নের ভ্রমে বিকাশ বিলেত চলে যায় দেশে ছুটি ও শিশুপুত্র রেখে। বিলেতেই সে রয়ে গেল দেশে আর ফিরে এল না, এখন বিলেতে তার জীবন কি ভাবে কাটল, কি পরিবেশে, কি ধরণে—তারই ইতিবৃত্ত উপরোক্ত উপন্যাসটির আলোচ্য। উপন্যাসটি আশাগোড়া চিত্রের আকারে লেখা। বিলেত জীবনকে কেন্দ্র করে বিকাশের আত্মকাহিনী অকপটে কোন কিছু না লুকিয়ে খোলাখুলি ভাবে সে চিত্রের সাহায্যে জানিয়ে যাচ্ছে তার বোন বুলাকে। চিত্র সৃষ্টি, ঘটনাবিকাশ, বর্ণনভঙ্গী নীরদরঞ্জনের দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। একটি ভারতীয় উচ্চশিক্ষা লাভার্থে বিলেত গেল, সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হ'ল, যার বোঝে সেই মেয়ের আকর্ষণ তার কাছে অনতিক্রম্য হয়ে উঠল তারপর ঘনিষ্ঠতা পরিণত হল বিবাহ—এ দিকে তার অতীত জীবন, তার ঘর-বাড়ী, দম্পতি, তার সাক্ষী অম্বরকান্ত্রী, প্রাণাধিক শিশুপুত্র সব হচ্ছে গেল তার মনে থেকে। এই ঘটনাগুলি যে ভাবে ব্যাখ্যায়ী সাজানো হয়েছে এবং কাহিনীর গতি যে ভাবে লেখক পরিচালিত করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। উপন্যাসটির আরও একটি কৃতিত্ব আছে—মানবতার দিক দিয়ে এর আবেদন অনস্বীকার্য। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে দীর্ঘ জীবনের জীবনাবস্মার্ত্তই কীকে কীকে প্রতিটি ছত্র ফুটে উঠছে, একান্ত আপনজনদের প্রতি চরম অবিচারের জন্ত অশ্রুশোচনা, দেশের প্রতি একটা অকৃত টান, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাণাধিক শ্রীর পুত্রকে দেখার এক অদম্য ব্যাকুলতা, হৃদয়ঘর্ষের দিক দিয়ে এর আবেদন অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও লণ্ডন ও ইংল্যান্ড সম্বন্ধীয় বহু তথ্য এখানে পরিবর্নিত হয়েছে, লণ্ডনের ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও লেখক আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে এই উপন্যাসটিই অল্পকাল আগে মাসিক বঙ্গমতীতে ব্যাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন জীবাঙ্গন চৌধুরী। প্রকাশক—নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ কলকাতা রো। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সমুদ্র সফেন

আন্দামান—বহু হতভাগ্যের অসমর্থের নির্গাসিতের নীড়—
প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই নামটি রীতিমত আতঙ্কের বড় তুলত।
ভারতের সঙ্গে সংগ্রাম এই দ্বীপপুঞ্জটাই যেন আত্মল আগ্রহে, পরম
যেহে হাত বাড়িয়ে লগাটে অপরাধের শাস্তি চিহ্ন আঁকি। হতভাগ্যদের
কোলে তুলে নিত, বুক দিয়ে রাখত তাদের আগলে। দেখতে
দেখতে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্দামানের বুক নতুন স্পন্দন
এল, আন্তে আন্তে যেন নতুন জীবনের সন্ধানে গেল, মনপ্রাণ যেন ভরে
গেল নব নব স্বপ্নে। সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দামানও
পরিণত হল। তার রূপ, তার অঙ্গসজ্জা, তার পারিপার্শ্বিক
শোষণ, তার নৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার চিন্তা-কল্পনা-ভাবধারা
সব কিছুই পরিবর্তনের ছোঁয়ার ক্রমেই উন্নত থেকে উন্নততর হতে
থাকে। বহুদূর জানি, এ বাবৎ সাহিত্যে আন্দামান একদিক

কল্পপন্থিতই ছিল বর্তমানে বঙ্গবী সাহিত্যিক আন্ততঃ্যে মুখোপাধ্যায়ের
কল্যাণে আন্দামান সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকায় পরিণত হল।
আলোচ্য উপন্যাসটি, আন্দামানকে কেন্দ্র করে লেখা। একদিকে
বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, অন্যদিকে আন্ততঃ্যে মুখোপাধ্যায়ের লেখনীর
চমৎকারিত্ব—এই দুইয়ের সম্মিলনে এক হৃদয়শোণী অভুলনীর সাহিত্যের
জন্ম হল। তাঁকে কেবলমাত্র লেখক বললে বললে তুল হবে এক
অভাবনীয় অমুদ্রুতি সম্পদেরও তিনি যোগ্য অধিকারী আর এই
অমুদ্রুতির উদাত্ত আলোকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের
জীবন, তার প্রেমের স্বরূপ, তার ভাবধারার বৈচিত্র্য—এই সত্যের
প্রতিষ্ঠাই আমরা দেখতে পাই এই উপন্যাসের বিভিন্ন পাত-পাতীর
মধ্যে। ইন্দুমতী, মহাদেব, ধ মিন, মাশাইন, হেওর্ডার্ড প্রভৃতি
চরিত্রগুলি লেখকের অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টির কয়েকটি নিদর্শন মাত্র।
সেদিন অপরাহ্নের কোলে তুলে নিত আন্দামান, আরও আর
এক বরণের হতভাগ্যদের আশ্রয় দিচ্ছে আন্দামান। এই আন্দামান
সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার কৌতুহল থাকটা আশ্চর্যের নয়
বীর। সেই কৌতুহল পোষণ করেন এই উপন্যাসটি পড়লে কীরা উৎকৃত
হবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই পৌরাদিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ,
ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আন্দামানের সংক্ষিপ্ত
ইতিকথা সংযোজিত হয়ে সাহিত্য পাঠকদের ইতিহাস সম্বন্ধে
জ্ঞানলাভেও সহায়তা করেছে। ক্রীকনাই পাল প্রচ্ছদ চিত্র অঙ্কন
করেছেন। প্রকাশক—মিত্র ও শোষ, ১০ গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট,
দাম—সাতো চার টাকা মাত্র।

কথাকলি

বাঙলাদেশের শক্তিমান সাহিত্যিকদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরীর
নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। ছোট গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙলা
সাহিত্যকে বীরা ক্রমেই সমৃদ্ধির পথে অগ্রগমনে সহায়তা করছেন
অক্লান্তভাবে, রমাপদ চৌধুরী তাঁদেরই একজন। উপরোক্ত
গ্রন্থটি রমাপদ চৌধুরীর কয়েকটি সার্বকন্যামা ছোট গল্পের সংকলন।
প্রতিটি গল্প লেখকের স্বজনীশক্তির পরিচায়ক। গল্পগুলি স্বপ্নপাঠ্য,
উচ্চাঙ্গের ও ভাবসমৃদ্ধ। এদের আবেদন স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও জোরালো
রমাপদ চৌধুরীর কল্পনা অমুদ্রুতি ও ব্যঙ্গনা বোধোচিত বৈশিষ্ট্য বহন
করে। নতুন চন্দ্রমা, স্বর্গ, রায়, পরজ বসন্ত, উন্নয়ন, চুখের স্বাদ,
সুখা, পল্লী, ছুটি বোন প্রাচুর্য গল্পগুলির মধ্যে নতুন চন্দ্রমা, পরজ
বসন্ত, উন্নয়ন, চুখের স্বাদ, ছুটি বোন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।
প্রকাশক—দ্বিবেণী প্রকাশন, ২ গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম তিন
টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী

জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী
অন্ততম। যদিও গোড়ার দিকে রক্তকরবী দুর্বোধ্য বলে অভিহিত
হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এর অবর্ণনীয় আবেদনের পাঠক-পাঠিকা
সাড়ো না দিয়েও থাকতে পারেন নি। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন
আঙ্গিকে এর সমালোচনা করেছেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ
দেখেছেন, বিভিন্ন ভাব অবলম্বন করে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটন
করেছেন। রক্তকরবীকে কেউ বলেছেন গীতি নাট্য, কেউ

রূপক, কেউ বা সঙ্কেতময়, কেউ বা বাস্তব, বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের ফলে রক্তকরবীর সন্ধে এক ঘোঁরাটে ধারণার সৃষ্টি হল, আশার কথা সে ধারণা এখন ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। প্রেমবাদের সঙ্গে বন্ধুবাদের, দেবশক্তির সঙ্গে পশু শক্তির, উন্মুক্ত প্রাণের জয় গানের সঙ্গে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলের দাঙ্গা সংঘর্ষ রক্তকরবীর প্রধান উপজীব্য। একদিকে শক্তি ও সম্পদের প্রতি মানুষের কুংসিত লোলুপতার অন্তরিক কঠোর নিয়মানুযায়িতার শৃঙ্খল মানুষের প্রাণের আবেদন বার্থ হতে চলেছে, স্বাভাবিকতা মরে যেতে বসেছে, সহজতা লোপ পেতে বসেছে, এ অবস্থায় মানুষকে হুজি দিতে পারে প্রেম, সঙ্গীত, যৌবন। যুত্থা সন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যে কতখানি গভীর তারই প্রমাণ মেলে রক্তকরবীতে। রক্তকরবীর মধ্যে যুত্থার যে অগ্নান আলোধ্য আমরা দেখতে পাই এক কথার তা অনবদ। কবির মতে যুত্থাই মানুষকে অন্ধকার থেকে নিয়ে যায় আলোয়, যুত্থা যোচন করে জীবনের জড়ত্ব, যুত্থা মানুষকে দেয় পূর্ণতা। অধ্যাপক, বিভাস রায়চৌধুরী বাঙলাদেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সাহিত্যক্ষেত্রে বহুবী পুংগব। উপরোক্ত গ্রন্থটি রক্তকরবী সন্ধে তার আলোচনার গ্রন্থরূপ। রক্তকরবী সন্ধে তাঁর আলোচনা যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। সমগ্র নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাব, মর্মার্থ, মূলসূত্র অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। লক্ষ করবার বিষয় যে গ্রন্থটি অথবা ভাবে ভাবাক্রান্ত নয় বরং বলা দরকার ঠিক ততটুকুই বলা হয়েছে ফলে আলোচনাপ্রাপ্ত হিসেবে বইটি সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যবৈজ্ঞানিক এবং ছাত্রছাত্রী এই উভয় সম্প্রদায়ই এই গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরীর স্মৃতির বিশ্লেষণে রক্তকরবীর নাট্য ও সাহিত্যরস আবাদনে সাধারণ পাঠক সফলকাম হবেন বলে আশা করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পরিচিতি' গ্রন্থের মর্বাদাবুদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। প্রকাশক—শ্রীপঙ্কজ রায়চৌধুরী, ১২৮ সেলিমপুর রোড, কলকাতা—৩১, প্রাপ্তিস্থান, মডার্ণ বুক এজেন্সী আইডেটে লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম দুটাকা মাত্র।

জেলভায়েরী

সত্য, স্মরণ ও বিবেকের সেবার বঁদের জীবন অতিবাহিত, আরামশয্যা ছেড়ে ত্যাগের কঠিন পথে বঁরা পা কেলছেন, দেশের সর্বত্র কল্যাণকামনার ব্যক্তিগত সূত্র-বাছল্যা বঁদের মনে বিন্দুগ্রন্থ রেখাপাত করতে পারে নি তাঁরই আদর্শ নেতা। ভারতের এই বয়সীর সন্তানদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ সেন অন্ততম। দেশবাসীর তিনি নম্র। সকলেই অবগত আছেন যে মাত্র চার বছর আগে ১৯৫৫ সালের ২৫শে মার্চ জেলের মধ্যে কতখানি ঔপানীতের মধ্যে,

উপেক্ষার মধ্যে, অবিচারের মধ্যে এই প্রজন্মের নেতাকে যুত্থাবরণ করতে হয়েছে। আজীবন সর্বতোভাবে দেশ ও জাতির সেবা করে এসে বিপ্লবী বীরকে যুত্থা বরণ করতে হল অসহায় বন্দী অবস্থায়। ১৯৫৪ সালের ১লা জুন অর্থাৎ বেদিন তিনি বন্দী হন সেইদিন থেকে যুত্থা পর্বন্ত জেলের মধ্যে কি ভাবে তাঁর দিন কেটেছে উপরোক্ত ভায়েরী পাঠে সে সন্ধে বিস্তারিত ভাবে খুঁটিনাটি পর্বন্ত জানা যাবে। দেশকে আর জাতিকে সত্যেন্দ্রনাথ যে কতখানি ভালবাসতেন, দেশীয় ও জাতীয় মঙ্গলকর্মে নিজেকে তিনি, কতখানি নিরোজিত রেখেছিলেন বা আরও রাখতে চেয়েছিলেন দেশপুত্র ও জাতিগত কল্যাণে তিনি কতখানি উৎসুক ছিলেন ভায়েরীর প্রতিটি ছত্র সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। এই দেশপ্রীতি তাঁর অন্তিমযুত্থার পর্বন্ত অগ্নান ছিল। পাকিস্তান সরকারের মঙ্গলনীতি, অজ্ঞতা, ভ্রান্ত পথাবলম্বন, হঠকারিতা ও রাজশাসনে সর্বতোভাবে অন্ধমত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই ভায়েরীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এই মূল্যবান ভায়েরীটিকে গ্রন্থরূপে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রকাশক নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদভাজন। সত্যেন্দ্রনাথের ঘটনাবল্ল জীবনের একটি সন্ধিপুত্র কাহিনী গ্রন্থে সন্নিবেশিত হ'লে গ্রন্থের মর্বাদা আরও বৃদ্ধি পেত। দেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্ততম বরণ্য স্বত্বিকের অন্তিমকালীন আত্মবিবরণী এই গ্রন্থটি বাঙালার ঘরে ঘরে স্বাধীনতা সন্মার লাভ করুক এই আমাদের কামনা। প্রকাশক—মিত্রাল, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

খেরসা

বিশ্বসাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ অবদান এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। পৃথিবীর সকল কালের সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে এমিল জোলা অন্ততম। খেরসা তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির এক অসামান্য নিদর্শন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জোলা মানুষের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অহুভূতির উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন, উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবন সন্ধানী রূপটি ফুটে ওঠে, জীবনের গোপন রহস্যের আবরণ তিনি উন্মোচন করেছেন প্রকৃত আলোয়। মানুষের নিজের অজান্তে তার অবচেতন মন ভিতরে ভিতরে কাজ করে যায়, এই ক্রিয়ামূল্যতাই জীবনসম্পন্ননের নামান্তর। উপরোক্ত উপন্যাসটিকে তারই বিশ্লেষণাত্মক কাহিনী আমরা বলতে পারি। উপন্যাসটির অগ্রবাদে যথার্থ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও প্রমথীকার অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর অগ্রবাদও উচ্চাঙ্গের, গ্রন্থে মূল গ্রন্থকারের একটি সন্ধিপুত্র জীবনী সন্নিবেশিত হয়ে গ্রন্থের মর্বাদাবুদ্ধি করেছে। প্রকাশক—বীরাঙ্গ কণ্ঠার, ৫ শঙ্কর ঘোষালেন। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

‘ছি’ ডিয়ারে পাল, কে ধরবে হাল, আছে কার হিয়ায় ?

কে আহ জোয়ান, হও আশ্রয়ান হাঁকিছে তবিস্য।

এ তুকান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তবী পার।’

—কালী নন্দন ইসলাম।

কবি ও গীতিকার নজরুল ইসলাম

বাংলার প্রতিভাবান কবি নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের

১১ই ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু জেলার চুকলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী কবির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। শৈশবকালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁর বালাজীবন দুঃখের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। ১৩১৩ সালে দশ বৎসর বয়সে গ্রামের মজব্ব হ'তে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন এবং পরে ঐ মজব্বই শিক্ষকতা করেন। পুলিশ সাবইন্সপেক্টর কাজী রফিকুদ্দিন সাহেবের চেষ্টায় তিনি ময়মনসিংহ জেলার দরিয়ামপুর হাইস্কুলে এবং পরে ১৩২০ সালে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হল। তিন বৎসর অধ্যয়ন করার পর ১৩২৩ সালে তিনি ৪১নং বাগালী পন্টনে বোম্ব নিয়ে করাচী গমন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই কাব্য চর্চা করতেন। একজন পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের সাহায্যে তিনি কাশ্মির কবিরের বিখ্যাত কাব্যগুলি পড়েন এবং 'রিক্তের বেদন' গল্পসমষ্টি লেখেন এবং দেশে ফিরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১৩২৬ সালের প্রাণ সংখ্যায় 'বুজি' নামক তাঁহার একটি গাথা-জাতীয় দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি অবিরাম গান, কবিতা, নাটক ও গল্প লিখতে থাকেন। তাঁর সম্পাদিত ধুমকেতু, লাভল প্রভৃতি পত্রিকা রাজস্বোষে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। রাজস্বোহমুসক কবিতা প্রকাশ করে তিনি এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর নিজের জীবনবলীতে বিস্তারিত ভাবে পরিলক্ষিত হয়। জেলখানার তাঁর রচিত 'শিকল পরার গান' রচিত হয়—

‘এ শিকল পরা ছল মোদের

এ শিকল পরার ছল।

এই শিকল পরেই শিকল তাদের

করবে বিকল।’ ইত্যাদি

প্রথম যৌবনে বিদ্রোহী কবিতা লিখে তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে তাঁর যে কাব্যরূপ হয়, তাঁর অসম্য প্রাণ-স্তর বলে কাব্যধারা বজ্রার আকার ধারণ করে এবং মোসলেম ভারতে সেগুলির প্রকাশে সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষা ও ছন্দ নামক কবিতায় কবি প্রতিভা সন্দেহ সন্তাবণী উচ্চারণ করেছেন—

‘অসৌকিক আনন্দের ভার

বিধাতা বাহ্যারে দেয়, তার বক্ষে বেধনা অপার,

তার নিত্য জাগরণ।’ অগ্নিসম দেবতার দান

উজ্জ্বল আলি চিত্তে অহোরাত্র দহ করে প্রাণ।’

আজ পর্যন্ত কোন কবি বা সঙ্গীত রচয়িতা এককভাবে এতগুলি গান রচনা করতে সক্ষম হন নাই। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও এত গান রচনা করেন নাই। সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। অসংখ্য জামা সঙ্গীত ও নাটক রচনাতেও তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অগ্নিবীণা, বিবেক-বাঈ, সর্বহারা, সফিতা, ভাঙার গান, বুল বুল, সিঁদু-হিজোল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রবীন্দ্র যুগে যে কয়জন কবি নিজেদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নিজেদের স্থায়ী আসন প্রাপ্তিষ্ঠিত করতে সমর্থ



হয়েছেন, নজরুল তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্র যুগে নজরুল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিভার ভাষায়। বিস্তৃত প্রকৃত পক্ষে নজরুলের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় অন্তর। পল্লী, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে তিনি যে বহুনিষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রামী প্রতিভার প্রভাব হ'তে মুক্ত হয়ে যে একটি স্বতন্ত্র কবি পরিচিতি গড়ে তুলেছেন, সেইটাই নজরুলের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। এ ছাড়া জাতিগত বৈষম্যের প্রকাশ কবির সার্থক রচনাকে অনবদ্য করে তুলেছে আলোড়িত করেছে সমাজচেতন ও সংবেদনশীল কবিত্ত্বকে। জগতে আজ অসৌকরিক অসাম্যের উগ্রতা সর্বত্র। কৃত্রিম বিভেদের প্রাচীর মাথা তুলে সর্বত্র বিস্তারিত এবং এরাই কল স্বরণ আজ মানুষকে মানুষকে বিধম বিচ্ছেদ, দুস্তর ব্যবধান। মানুষের মধ্যেই আজ এক দল আক্রমণকারী, আর একদল আক্রান্ত; একদল নিপীড়ক আর একদল নিপীড়িত। এ বেদনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কুট উঠেছে তাঁর কবিতায়।

‘এই ধরণীর বাহা সফল

বাসে ভরা ফুল, রসে ভরা ফল

সুখসাল মাটি, সুখ সম জল, পাখীর কণ্ঠ গান,

সকলের এতে সম অধিকার, এই তার করদান।’

যাঁরা আত্মকেন্দ্রিক ও বার্ষিকেন্দ্রিক, পার্থক্য বলের সহায়তায় যাঁরা মানুষের আত্মর উপর সৌধ নির্মাণ করতে কুঠি বোঝ করে না, কবির বিকোভ তাদেরই বিরুদ্ধে, ইতিপূর্বে এমন বিকোভের সুখ ও অপরাধের বিস্তারের রূপ কখনও বাংলা ভাষায় দেখা যায়নি, দেখা যায়নি কখনও দুখীর যৌবনের জয় ঘোষণা। এই বিকোভ ও বিস্তারের শিখনে আছে সব বকর অন্তর অভ্যাসের ও নিরাশ্রয়তার নির্ধম অভিধান। তাই এ সবার বিরুদ্ধে কবির বিস্তার, তাই তিনি বিদ্রোহী কবি বলে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব কাল বাংলা দেশ ও ভারতের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে অসহযোগ ও বোলাং আন্দোলনের যুগ। সেই সময়ে কবি জাতীয় আন্দোলনকে দিয়েছেন অদ্বুতপূর্ণ প্রেরণা তাঁর গানে।—

‘দাদিবনা মোরা বাও কারা মাঝে
বাও তবে বীর সজ্জা হে,

ঐ শৃঙ্খলই বরিবে মোদের
ত্রিশ কোটি জাত অজ হে !

মুক্তির লাগি মিলনের লাগি
আহুতি বাহারা দিয়াছে প্রাণ

হিন্দু মুসলিম চলছে আমরা
গাহিয়া তাদেরই বিজয় গান ।’

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আরম্ভ—এই কুড়ি বৎসর কালই নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টির যুগ। এই যুগে বিশ্ববাসিত কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টির অজস্রতায় যুগশ্রেষ্ঠ এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সৃষ্টিশীল। এই কাব্যযুদ্ধের যুগে দেখা দিলেন কবি নজরুল তাঁর জনজাগরণের বাণী নিয়ে, গণজাগরণের গান নিয়ে।

দেশাত্মবোধের বলিষ্ঠ প্রভাব তাঁর কবিতায় ও গানে লক্ষ্য করা যায়। দেশাত্মবোধের আদি গুরু স্ববি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞান ভের্যুচ্ছিন্ন, উর্দ্ধ দেশসেবার কাজে উদ্ভূত হতে এবং এক মায়ের সম্ভানরূপে গণ্য করবার উদ্ভাত আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। জাতীয় জীবনের সঙ্কটময় কাল কবি দেশমোহন ও দেশ কর্মীদের প্রতি সাধবান বাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর স্রবিস্থাত কবিতায়,—

‘দুর্গমগিরি কান্তার মরু, দুস্তর পাথরাব
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, বাড়ীরা হুঁশিয়ার !
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরবে হাল, আছে কার হিম্মত ?
কে আছে জোহান, হও আশ্রয়ান, ইংকিছে ভবিষ্যৎ।
এ ভূফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শাজীরা, সাবধান !
যুগযুগান্ত সঙ্কট বাধা ঘোষিয়াছে অভিমান।
ফেনাইয়া উঠে বসিত বৃকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাধে, দিতে হবে অধিকার।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সমুদ্রণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃহুন্তি পণ !
হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন ?
কাণ্ডারী ! বসো, ডুবছে মানুষ, সম্ভান মোর মার ।’

বিক্রোহ, বিপ্লব ও যৌবন শক্তির জয় ঘোষণার অন্তরালে, সাহিত্য সৃষ্টির মূল দেখা যায় তাঁর সাংবেদনশীল স্তবয়। তরুণ দলের অগ্রগতির ‘স্রব’ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানে,—

‘চল চল চল ! চল চল চল !

উর্দ্ধগগনে বাজে মাদল

নিম্নে উত্তলা ধবণীতল

অকণ প্রান্তের তরুণ দল

চলবে চলবে চল।

চল চল চল।

উষার দুয়ারে হানি আঁচাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা টুটার তিমির রাত
বাধার বিদ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাআশান
আমরা আনিব নতুন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চলবে নওজোহান শোনেবে পাতিয়া কান
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান !
ভাঙবে ভাঙ আগল চলবে চলবে চল।
চল চল চল !’

কেবল যৌবন শক্তির নয়, দেশের সব বরকম শক্তিরই উদ্বোধন সঙ্গীত গেরেছেন কবি। ‘প্রমিক, কুবক, নারী ও ছাত্র সমাজ যুগিয়েছে কবি মানসে অক্ষরন্ত কাব্য ও সঙ্গীতের প্রেরণা। শত দুঃখ দৈন্ত ও লাহুনা জর্জরিত মানুষকে তুলিয়েছেন তিনি আশার বাণী, কোথাও তাঁর কাব্য বা সঙ্গীতে নৈরাশ্রের বিলাপ ধ্বনিত হয়নি। সব জায়গায় তিনি তুলিয়েছেন উজ্জলতর ভবিষ্যতের বাণী ! কবি কণ্ঠে ছাত্র জীবনের মর্মবাণীধ্বনিত হয়েছে এক অপকণ ভাবায় ;—

‘আমরা শক্তি আমরা বল

আমরা ছাত্রদল।

মোদের পায়ের তলায় মুছে তুফান

উর্দ্ধে বিমান বড় বাদল।

আমরা ছাত্রদল।

আমরা রচি ভালবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গপথের আভাষ দেখায় আকাশ ছায়াপথ !
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সকল
আমরা ছাত্রদল।’

জাতিভেদ প্রথা, ছাত্রমার্গ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি গেরেছেন সমাজ সংস্কৃতি মূলক গান,—

‘জাতের নামে বজ্রাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে ডুরা
ছুঁলেই তোরা জাত বাবে ? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোরা !
হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবাল এতেই জাতির জান,
তাইত বেঁকুব, করলি তোরা একজাতিকে একশ’ ধান।

এখন দেখিস ভারত জোড়া

পড়ে আছিল বাসি মড়া,

মানুষ নাই আত, আছে শুধু জাত শেরালের হুজুরা !’

ঈশ্বরায়ুভূতিও কবির কাব্য প্রেরণা হতে বাদ যায়নি ;—

‘বহু পথে কিরিয়ছি প্রভু

আর হইব না পথ হারা

বহু স্বপ্নন সব ছেড়ে যায়

তুমি একা জাপো দেবতারা ।’

ভূতের ভয় নাটকে কবি রূপকের বাহায্যে দেশের নির্ধাতিত অশুশ্রুজকে জানিয়েছেন জাগৃতির আহ্বান, তাঁর গানের মাধ্যমে,

‘মোরা মায়ের চোটে ভূত ভাগাব

মর দিয়ে নরু।

মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি

আর প্রাণে না সর ।’ ইত্যাদি—

মানবাহার নানা আকৃতি, বেদনা, ও বিভিন্ন অহুত্ব নানা সুরে, ছন্দে, কাব্যে ও গানে কোমলে কঠোরে কল্পভাবে রূপায়িত হয়েছে তার অন্তে নই। দাসত্বের বিরুদ্ধে, পরাবাদিতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কার নির্ধাতন ও গভীরগতিকতার বিরুদ্ধে কবি বঙ্গকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বিদ্রোহ। জাতীয়তা ও বীরবলের সঙ্গে সঙ্গে কবি পৌঁছেছেন অস্ত্র গানের মালা, যা আজও মহানগরীর প্রয়োজনীয় হতে সুরের পল্লীগ্রামের কুঁড়েঘর পর্যন্ত সমভাবে জনপ্রিয় ও আদৃত। কাজী নজরুল ইসলামের গানের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে গীতিকারদের সবার আগে নজরুল ইসলামের নামই মনে পড়ে। কারণ, তাঁর গান যে নানা সম্পদে সমৃদ্ধ। এই ভাবের সঙ্গে সুরের ও বাণীর সমন্বয় সাধন কবি মানসের শক্তিশালী প্রতিভার পরিচায়ক। বাংলার মুসলমান সমাজে সংগীত বিধুখতা ভেসে গেল তাঁর অস্ত্র গানের বৈচিত্র্যে ও ভাব বক্তার। তিনি বহুগান রচনা করেছেন নতুন সুরে, নতুন ছন্দে। বাংলা ভাষায় গজল গানেরও তিনি প্রবর্তক। এ ছাড়া তিনি বৈদেশিক ভাষা সহযোগে ও সুর সংযোগে রচনা করেছেন অস্ত্র বালা গান। তাঁর বহু গান রেকর্ড সংগীত ও সিনেমা চিত্রের জুড়ি তিনি রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি অস্ত্রের রচিত বহু গানে সুর বোঝনা করেছেন—তাঁর নিজস্ব সুর। একদিকে তিনি যেমন প্রতিভাবান কবি অপরদিকে তেমনি গীতিকার ও স্রষ্টা সুরশিল্পী।

কেবল নজরুলের গান নয়, বাঙলা গানের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙলা গান কোনদিনই সুরসর্বধ নয়। এ গান কোনদিনই সুরসর্বধ নয়। এ গানে কথা বা পদই প্রধান, সুরের সঙ্গে থাকে তার অপূর্ণ সঙ্গতি। জয়কেশ ও চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে আমরা রামপ্রসাদ, নিধুবাণু, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, বাউল-সরবশের গান, আগমনী ও বিজয়া গান, আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান প্রভৃতি যে গানই হোক না কেন, তার পরগলি সর্বদাই সুরের সঙ্গে ভাব ও কাব্যবলের সঙ্গতি রেখে চলেছে। তাই বাঙ্গালীর গান শুধু গানই নয় সাহিত্য রসেরও খোরাক। কবিকৃতির মৌলিব্য ও অভিনব ছিল বলেই রবীন্দ্র যুগের পরিপূর্ণ প্রভাবের মধ্যেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নজরুলের কবিকৃতিতে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়েছেন। জনপ্রিয়তার তিনি কবিগুরুকেও ছাড়িয়ে গেছেন, সবাই স্বীকার করে নিল তাঁকে গণজাগরণের কবি বলে। কবি লিখলেন,—

‘মহা বিদ্রোহী রণকান্ড

আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎসীড়নের ক্রন্দন বোল

আকাশে বাতাসে ধনিবে না

অত্যাচারীর খড়গ রূপাণ

ভীম রণভূমে রবিবে না

বিদ্রোহী রণকান্ড

আমি সেই দিন হব শান্ত।’

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তিনি দেশ ও জাতিকে সৃষ্টি করে তুলেছেন একধা অনস্বীকার্য। আজ যদি তিনি স্নেহ দেখে থাকতেন তবে কবিকৃতির নব বিবর্তন হয়ত দেখতে

পেতাম। কাব্য সাহিত্য ও সংগীত জগতে হয়ত আরও নতুন সৃষ্টি দিয়ে অর্থা সাজাতে পারতেন, ভবিষ্যে তুলতে পারতেন ফুলের সাজি নতুন নতুন ফুল, কিন্তু তা আর সম্ভব হ’ল না তাঁর অসুস্থতার জড়।

আরবী ও ফারসী সংগীত থেকে তিনি একাধিক সুরসৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে গজল গানে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সংগীত-জগতে। গজল গান বাঙলার সংগীত-জগতে এক অমূল্য সম্পদ। কেবল তাই নয়, শ্রামা-সংগীত রচনায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা সংগীতে নজরুলের অকুপ দান প্রচুর সঙ্গে স্রবণযোগ্য। স্বরশিল্পি সহযোগে তাঁর গানগুলিকে শাস্ত ক’রে রাধা দেশবাসীর অঙ্গ কর্তব্য। আর সেই সঙ্গে নজরুল সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা কবিকে স্রবণীয় করার ব্যবস্থা করাও দেশবাসীর কর্তব্য। কবির গান স্রবণে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি বাঙালী জনসাধারণের একান্ত আপনাতর, একান্ত অন্তরঙ্গ গীতিকার। তিনি তাঁর গানকে সহজবোধ্য ক’রে রচনা করেছেন। সেই জুড়ি নজরুলের গান এত প্রিয়।

তাঁর হাসির গান বাঙলা সাহিত্যের এক বিরাট সম্পদ।

‘চর্যকার আর মেঘের চাঁড়াল ধর্ম্মবটের কর্ণপুঙ্ক!

পুলিশ শুধু করছে পরখ কার কতটা চর্যপুঙ্ক!

চাঁটুঘোরা হাথকে দাড়ি,

মিঞায়া যান নাশিত বাড়ী!

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই স্বাভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জতার ফলে

তাদের প্রতিষ্ঠা যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন্ যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ ক’রে মূল্য-তালিকার
জ্ঞান লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এন্ডার্সনস্ট্রীট, কলিকাতা - ১

বোট কাগসী ভোজপুরী কয় বাঙালীকে, '২২ ছুইয়ে।'
(কোয়ারস) :—দে গরুর গা ছুইয়ে।

বাঙালী চাকুরি-জীবীর সবচেয়ে তাঁর হাসির গান—

'নখ-নক্ত-বিহীন চাকুরী অধীন আমার বাঙালী বাবু।
পারে পোদ পারে মালেকিরি,
বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু।
চিলে ঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভূঁরি বয়ে ছুটি নিট শিটে পারে,
আকিসে বসিয়া কলম শিহিয়া
ঘরে এসে খাই সাবু।'

চা-শ্রীতি বিধরক আর একটি গানে প্রচুর হাস্য রসের খোরাক
জোগান হয়েছে।

'চারের পিয়ানী পিপাসিত চিত্ত আমার চাতক দল।
দেবতার কন সোমবস বাধে, সে এই গরম জল।
চারের প্রসাদে চার্লসক দুনি খবি বাক রণে হল পাশ
চা নাহি পেয়ে চারপেয়ে জীব চর্রণ করে ঘাস।
লাধ কাপ চা খাইয়া চালাক
হর, সেই প্রমাণ চাও কত লাধ ?
মাতালের দাঁধা আমার চাতাল, বাচাল বলিস বল।'

ইত্যাদি—

শ্রালক নামক মধুর সম্পর্কিত ব্যক্তিটি তাঁর ব্যঙ্গ মধুর গানে
হাস্য রসের ও শালা শব্দের নানা অর্থের প্রয়োগ নৈপুণ্যে মধুর হয়ে
উঠেছে,—

'শালায় কোথায় পাই—

গিন্নীর ভাই পালিয়ে গেছে গিন্নি চটে কাঁই।
আমার বাড়ি কোষ চাপিয়ে কামিছেন সদাই।

* * *

খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম সমুখে আটশালা,
আটশালাতে মোর শালা নাই বসেছে পাঠশালা
গো-শালাতে গরু বাধা, আমার শালা নাই।

খুঁজতে গেলাম শহর, দেখি শালায় ছড়াছড়ি।
পান শালাতে পান করে বার মাতাল গড়াগড়ি,
বর্ষাশালা অতিথিশালা শালায় অন্ত নাই।

হাতীশালা, ঘোড়াশালা রাজার ডাইনে বাঁয়ে,
হঠাৎ দেখি বাচ্চে বাবু কোঁশালা গায়ে,
শো-শালা ত চাইনে বাবা, একশালাকে চাই।

দশশালা ব্যবস্থা ঝুলে গরুর চাবীর ভাঙ্গো,
নিরাশালাই পেয়ে জাবি, শালাই পেলাম বাকগো।
চাইছ শালা, বুদ্বিলিল পরম মশালাই ॥

ঢেঁকি শালায় ঢেঁকি গুয়ে পাকশালাতে ছাই,
হায়! শালায় কোথায় পাই ॥'

কাব্যে বীর ভাবের গভীরতা চান, তাঁদের জন্ম নজরল নন।
তিনি মূলত বোঁবনের কবি, তাই তিনি গেয়েছেন বোঁবনের জয়গান।
তাঁর কবিতায় বসন্তনাথের মত অনবদ্য শিল্পরূপ, পরিমিত বোধ ও
ছন্দাদি সম্বন্ধে সচেতনতা না থাকলেও নজরল যে তাঁর যুগের
একজন শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বোঁবনের কবি,

সহজপ্রাণ ধর্মের কবি, দুঃখী নিপীড়িত জনগণের দুখপাত্র কবি,
বিজোহী কবি নজরলের কবিতা বাঙালার কাব্যসাহিত্যের অগ্রভাগ
শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কালীপদ লাহিড়ী।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাস্টার ভয়েস

N 82820—জামল মিত্রের গাওয়া হু'খানি আধুনিক গান—
'মন যেতেছে' ও 'স্বর্ঘস্থলী স্বর্ঘ বোঁকে।'

N 82821—'গীতালি গীতাঞ্জলি' ও 'একটি ফুলের মত'—
আধুনিক গান দুটি মিষ্টি স্বরে পরিবেশন করেছেন কুমারী বাণী
ঘোষাল।

N 82822—হু'খানি আধুনিক গান—'কালো মেঘে ডমক' ও
'ওগো শকুন্তলা' গেয়েছেন খ্যাতিমান শিল্পী সত্যী সেন।

N 82823—কুমারী পূরবী দত্তের 'সুরেলা কণ্ঠের সুরের হু'খানি
আধুনিক গান—'আজ মনের মালকে' ও 'হারিয়ে গেল জীবন।'

N 82824—কালার মাধুদেব গাওয়া মধুর হু'খানি গান—
'তুমি সুরঙ্গ যদি নাহি তব' ও 'বেধা বামধু ওঠে।'

N 82825—নবগঙ্গা মঞ্জুলা সেনগুপ্তের মধুর কণ্ঠের
আধুনিক গান—'স্বর্ঘস্থলী সোনামুখী' এবং 'মেলা যদি সারা হলো।'

N 76083 to N 76085—রেকর্ডগুলিতে 'দেড়শো খোকার
কাণ্ড' বাণীচন্দ্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলহিয়া

GE 24943—শ্রীমতী গীতা দত্তের (বায়) কণ্ঠে আধুনিক
গান—'জানিতে চেরেছ তুমি' ও 'মাটির তুবনে যদি।'

GE 24944—'তুমি মধুর স্বপ্নে' এবং 'ওগো আমার নবীন
সাবী'—গান হু'খানি অন্তরপ্রসাদী, সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন
শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 24945—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া হু'খানি
মধুর আধুনিক গান—'স্বয়ং নামে পথের ছাত্রায়' ও 'হাতে কোন
কাঁজ নাই।'

GE 30420 এবং GE 30421—রেকর্ড দুটিতে 'জল প্রসঙ্গ'
বাণীচন্দ্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫৩)

শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

কোন কোন শিল্পী সঙ্গীতকে নিয়েছেন জীবনব্যাপী সাধনার
মাধ্যমে—তার জন্ম তাঁরা দুর্কশাত করেন না অভাব, অসুবিধা
অর্থগম ইত্যাদির প্রতি। এইরূপ একাগ্রতাই তাঁদের উপস্থাপিত
করে জনসমক্ষে পূর্ণরূপে আর শ্রোতার তাঁদের গ্রহণ করেন
প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে। শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আমি
তাঁদেরই একজন বলে মনে করি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নিজের
কথায় বলি :—

“১৯০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আমার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করি। বাবা কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় শেরার মার্কেটে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আমাদের পরিবারে গানের চর্চা বরাবর ছিল। ছেলেবেলা থেকে আমিও গানের দিকে ঝুঁকে পড়ি। সেইজন্য যেকোনো এ্যাডভোকেট শ্রীপদ্মলাল চট্টোপাধ্যায় আমার কেবল উৎসাহ দিয়ে কাজ করেন নি—আমার মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুপিচুপি আমায় গান শেখাতেন।

বাংকপুুর মহকুমার আলমবাজারে আমাদের নিজবাড়ী। সে বাড়ীতে বরাবর গানের আসর বসত। বরাহনগরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅমূল্যধন দত্তকে প্রথম আমার শিক্ষাক্তক হিসাবে পাই।

সেক্ষেত্রে ক্লাসে উঠিয়া আমি বিপণ কলেজিয়েট স্কুল থেকে বরাহনগর ভিক্টোরিয়া বিজ্ঞানস্নেহে উত্তীর্ণ হই ও সেখান থেকে ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হই। তারপর কিছুকাল নানারকম কাজকর্ম করি। কিন্তু গান শেখার আগ্রহে পড়াশুনা বা কাজকর্মে ঠিকমত মনযোগ দিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে একদিন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের গৃহে গানের আসরে আসকাক হোসেন ও তাঁহার ছই মামা যুক্তাক হোসেন খাঁ ও স্বর্গত আসাক হোসেন খাঁর গান শুনিয়া মুগ্ধ হই। ইহার কিছুদিন পর আসকাক হোসেন সাহেবের ছাত্র হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকি। আর দুইজনের নিকট বহুদিন শিখিবার সুযোগ পাই। শ্রী বড়ালের উৎসাহ ও সাহায্য আমার সঙ্গীত সাধনার অত্যন্ত পথপ্রদর্শক। মধ্যে কিছুকাল (সেনী) বরোয়ানার ওজাদ দরীর খাঁর কাছে ঋণদ ও ধামার শিক্ষা করি।

এইসঙ্গে আর একজনের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি হলেন স্বামীমন্ডল ১মমন্ডলনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার মেহমন্ত আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সদালাপী, বন্ধুবৎসল শ্রীহীক গাঙ্গুলী ও আমি একত্রে কতদিন সঙ্গীত-সাধনা করেছি মন্ডল বাবুর গৃহে। হীক বাবুর গায় এমন উচ্চমনা শিল্পীকে বন্ধুরূপে পাওয়া খুবই আনন্দের কথা।

নিখিলবঙ্ক সঙ্গীত সম্মেলনের ১৯৩৭ সালের অধিবেশনে আমি প্রথম শিল্পী হিসাবে যোগ দিই। তাহাতে আমার গাওয়া উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শ্রোতাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। এ ছাড়া



শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ও বর্হিবাংলার বহু সঙ্গীতাসরে আমি অংশ গ্রহণ করেছি। ১৯২১ সালের ৫ই এপ্রিল প্রথম আমি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে গান করি। বিগত কয়েক বৎসর কলিকাতায় বহু সঙ্গীত-সম্মেলন অস্থগিত হইতেছে। এগুলি বাঙ্গালী শিল্পীদের একত্রে উপকার ও অপকার করিতেছে। উপকার হয়—কারণ কয়েকজন সত্যকারের প্রবীণ গায়ী সমাবেশ হয়—বাঁদের গাওয়া গান থেকে ওরূপ শিল্পীর অনেক কিছু শিখতে পারেন—আর অপকার হয়—কারণ এই সব আসরে সমাগত কিছু সংখ্যক অবাকালী নূতন শিল্পীদের পরিবেশিত গান শোষমুক্ত হয় না।”

পরিচ্ছন্ন অথচ অল্পসজ্জিত শিল্পীর গৃহে ক্রমশঃ উপস্থিত হতে লাগলেন তাঁহার শিক্ষাবীন ছাত্রবৃন্দ আমাদের আলোচনাও শেষ হয়ে এসেছিল তাই বিদায়ান্তে চলে এলাম।

গীতাপাঠ

শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসীড়িতের উপর রূপায়, তোমার যদি চোখেই আসে জল,
ছাড়োই যদি নিজের ধারী, ভীতের মত থাকতে দেহের বল।
যত তোমায় বলবে লোকে, উদ্বেগে না পরের শাতা আর
পড়বে গীতা, পালিয়ে গিয়ে, থলবে শুধু প্রথম পরব ত্যার।
নিভা মায়াব হত্যা করার এখন যদি শেখাই তোমায় হয়,
সাধ্যা যোগই দেখবে পড়ে “আত্মা অমর মরার পরেও রয়”।

সিঁদ কাটা বা পকেট মারো, কণ্ঠ সবই বন্ধবোলেই পাবে,
“সত্যব তাহার কণ্ঠ করায়” বন্ধুর নিজে বর্জ্য বলে তারে।
কণ্ঠ মানো নাই মানো আর সত্যব যদি তাগ লাগাতে চাও
গীতার থেকে ছুঁ-চোর শ্লাক নিজের মতে ব্যাখ্যা করে বাও।
বোকার হয়ে ছাড়তে হলে, অপোগণ্ড আত্ম-পরিজন,
রাজার হালে থাকতে মঠে, বাকার যদি বোকাই প্রয়োজন,

ভক্তিযোগে মুক্তি পাবে, শিষ্যশ্রী পড়িয়ে বাবে সেটি
উইল লিখে তোমার নামে ছুটেবে এসে দেখবে কতো বেটা।

● দেশে-বিদেশে ●

জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৬ (মে-জুন, '৯২)

অন্তর্দেশীয়—

১লা জ্যেষ্ঠ (১৬ই মে): কলিকাতার ইডেন উতানস্থিত রঞ্জি ট্রেডিয়ামে সাড়থরে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবের নয় দিবসব্যাপী অধিবেশন শুরু।

২রা জ্যেষ্ঠ (১৭ই মে): প্রিন্সেস জাহাজ ঘাটের (কলিকাতা) নিকট ডক-প্রমিকের উপর পুলিশের গুলীচালনা—১ জন নিহত ও ২৫ জন আহত।

৩রা জ্যেষ্ঠ (১৮ই মে): পুলিশ-জনতা সংঘর্ষের ফলে হাওড়া-ব্যাণ্ডেল ও তারকেশ্বর লাইনের সমস্ত ট্রেন তিন ঘণ্টাকাল আটক।

৪ঠা জ্যেষ্ঠ (১৯শে মে): শিক্ষা আইন বার্ষ্য করার জন্য হুল বদ্ধ রাধা হাইলে বধোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে করা হইবে বলিয়া কেরল সরকারের সতর্কবাণী।

৫ই জ্যেষ্ঠ (২০শে মে): কাটিহারের নিকট ট্রেন (নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস) দুর্ঘটনায় ১ জন নিহত ও ৩০ জন আহত।

৬ই জ্যেষ্ঠ (২১শে মে): কলিকাতা ও সহরতলীতে অভ্যন্তরীণ বড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে ৮ জন নিহত ও শতাধিক আহত।

৭ই জ্যেষ্ঠ (২২শে মে): ডা: হরেকৃষ্ণ মহতাবের নেতৃত্বে উদ্ভিয়ার তিনজন সন্যাস সমন্বিত কোয়ালিশন (কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ) মন্ত্রিসভার লগ্নগ্রহণ।

মুর্সোরীতে তিস্তা রাষ্ট্রপঙ্ক দালাইলামা কর্তৃক '২৫০০'তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন।

৮ই জ্যেষ্ঠ (২৩শে মে): বিধান স্কোয়ারে (কলিকাতা) পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ রাজনৈতিক (কংগ্রেস) সম্মেলনের তিনদিবস ব্যাপী অধিবেশন শুরু। উদ্বোধন—কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সভানেত্রী—শ্রীমতী সুরেন্দ্রা কৃপালনী।

৯ই জ্যেষ্ঠ (২৪শে মে): পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে দুই দলের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ—১৫ জন আহত।

রাউরকেলা ইম্পাত কারখানার ধর্মঘটা শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁচনে গ্যাস প্রয়োগ।

১০ই জ্যেষ্ঠ (২৫শে মে): মহাজাতি সননে কলিকাতার মেয়র জীবনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ৭৪ তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত।

১১ই জ্যেষ্ঠ (২৬শে মে): কলিকাতা পৌরসভায় একটা প্রস্তাবের উপর ভোটভাট্টির সময় কংগ্রেসী কাউন্সিলরদের অকস্মাৎ সভাকক্ষ ভাঙ্গা।

বিরোধী কবি কাজী নজরুলের ৬১তম জন্মদিবস স্মৃতি ভাবে পালন।

১২ই জ্যেষ্ঠ (২৭শে মে): ভারতীয় রেলওয়েসমূহের চীক ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট—১১৫৭-৫৮ সালে ভারতে রেল দুর্ঘটনায় ৮০ জন নিহত ও ৫৬১ জন আহত।

১৩ই জ্যেষ্ঠ (২৮শে মে): প্রথম ভারতীয় নৌবাহিনী অভিযাত্রী দলের শাকল্যের সহিত নন্দাকোট শুল্কের দীর্ঘ (২২.৫০০ ফুট) আরোহণ।

১৪ই জ্যেষ্ঠ (২৯শে মে): বার্তাজীবী সাংবাদিকদের বেতন হার সম্পর্কে বেতন কমিটির সুপারিশ (ভারত সরকারের অল্পমোদিত) প্রকাশ।

১৫ই জ্যেষ্ঠ (৩০শে মে): রাউরকেলা ইম্পাত কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহত।

১৬ই জ্যেষ্ঠ (৩১শে মে): জীবনবিদ্যা কর্পোরেশন-মুদ্রা লেনদেন ব্যাপারে ভিত্তিমান বহু তদন্ত বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশ।

১৭ই জ্যেষ্ঠ (১লা জুন): ভারত ইন্সত্যুরেলের তর্ক সম্পর্কে যজ্ঞরত ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে রামকৃষ্ণ ডালমিয়া দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাবাদে দণ্ডিত—দিল্লীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের দায়।

দিল্লী কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীমতী জরুনা আশফ আলির পদত্যাগ।

১৮ই জ্যেষ্ঠ (২রা জুন): রাইটার্স' রিভিউস-এ পশ্চিম-বঙ্গ খাত-উপন্যাস কমিটির বৈঠকে তুলুল উদ্‌জেননা—চাঁদলের মূল্যনিয়ন্ত্রণ সরকারী চেষ্টা বার্ষ্য হইয়াছে বলিয়া খাতসচিব শ্রীপ্রফুল্ল সেনের স্বীকৃতি।

১৯শে জ্যেষ্ঠ (৩রা জুন): প্রয়োজনীয় বাণ নির্ধারণ সাপেক্ষে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্তৃক ফরাক্কর নিকট গঙ্গা-ভাগীরথী মোহনায় দীর্ঘ খাল খননের প্রস্তাব।

শ্রী সি. রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কংগ্রেসী শাসক দলের বিরুদ্ধে জাতীয় বিরোধী দল ('বহুদল দল') গঠনের সিদ্ধান্ত।

২০শে জ্যেষ্ঠ (৪ঠা জুন): রাজ্যের সর্বজনক খাত পরিষিতি সম্পর্কে দাঙ্গিলিং পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার দীর্ঘ আলোচনা।

২১শে জ্যেষ্ঠ (৫ই জুন): কেরলে কম্যুনিষ্ট শাসনের উচ্ছেদকল্পে কেরল কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম পর্ষায় ১২ই জুন 'রুক্তি দিবস' পালনের আহ্বান।

কলিকাতা পৌরসভায় কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভয়াবহ খাত সঙ্কট সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

২২শে জ্যেষ্ঠ (৬ই জুন): করিমগঞ্জে জি এন, সি, চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সমন্বিত সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন শুরু।

২৩শে জ্যেষ্ঠ (৭ই জুন): পশ্চিমবঙ্গে সেবা সমবার ও বোধ ধামার পরিচালনার রূপায়ণের জন্য আবুলক্ব আউন প্রণয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিব ও অফিসারদের সহিত দাঙ্গিলিং মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের বৈঠক।

২৪শে জ্যেষ্ঠ (৮ই জুন): কেরলে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বন্কনের ব্যবস্থাকল্পে বিধান সভায় আইন-বিধি গৃহীত।

২৫শে জ্যেষ্ঠ (৯ই জুন): ভারত পাকিস্তান খালের জল বিরোধ মীমাংসা চেষ্টায় বিশ্বব্যাপ্ত কর্তৃক বিপাশা নদীর জলাধার নির্ধারণের নতুন প্রস্তাব।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): জম্মু শেখাল জেলে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহর সহিত কাশ্মীরে সফররত দু'জন নেতা আত্মঘাতী বিনোবা ভাবেবের সাক্ষাৎকার।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১১ই জুন): গুণীবর্ষণ বিরতি চুক্তি জঙ্গ করিয়া করিমগঞ্জ সীমান্তবর্তী হরতকটিলায় পাকিস্তানের পুনরায় গুলীবর্ষণ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন): কংগ্রেস সহ কেরলের বিরোধী দলগুলির সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে রাজ্যের (কেরল) বিভিন্ন স্থানে আশিক হরতাল।

পশ্চিমবঙ্গের শোভনীর ঋতু পরিস্থিতি সম্পর্কে রাইটার্স' বিজিন্স-এ কেন্দ্রীয় ঋতু দপ্তরের সেক্রেটারী জিবি, বি, যোষের সহিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানেন্দ্র রায় ও ঋতুসচিব অশ্রুফুলচন্দ্র সেনের জল্পনী বৈঠক।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন): কেরলের এর্গাকুলাম জেলার বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ:—আই, এ পরীক্ষায় ৩৮.৩ ও আই, এম-সিতে ৫০.১ জন উত্তীর্ণ।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): ত্রিবাঙ্গম (কেরল) জেলার দুইটি স্থানে পুনরায় পুলিশের গুলীবর্ষণ—নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য সরকার কর্তৃক সৈন্য আহ্বান।

মূল্যবৃদ্ধি ও ভূমিক প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে সরকারী অগণতান্ত্রিক ঋতুনীতির প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী 'প্রতিবার দিবস' উদ্‌যাপিত।

বহির্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): থালের জলের বিরোধ প্রসঙ্গে করাচিতে পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আব্দুর হানের সহিত বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট মি: ইউজেন ব্র্যাকের বৈঠক।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): আণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: হারল্ড মাকমিলানের নিকট রূপ প্রধান মন্ত্রী মি: নিকিটা ক্রুশ্চেভের নতুন প্রস্তাব পেশ।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): ব্রুক-খাইল্যাও-লাওস সীমান্তে পুনরায় চিয়াং বাহিনীর হামলা ও বর্মী বাহিনীর সহিত সংগ্রাম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): তিব্বতে বিদ্রোহ চালনার জন্ত বিদেশ (সাদাভাবানী) হইতে সাহায্য সংগ্রহ সম্পর্কে ভূতপূর্ব তিব্বত সরকারের বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগ।

১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে): ভূতপূর্ব মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মি: জন ফষ্টার ডালেসের মৃত্যু।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মি: নিকিটা ক্রুশ্চেভের ১২ দিনের জন্ত আগবেনিয়া সফরে বাত্মা।

মি: ডালেসের মৃত্যুর দরুণ জেনেভা চতুষ্পাক্ষি পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন (আধাংশ প্রসঙ্গে) দুই দিনের জন্ত স্থগিত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): জি বি, পি, কৈরালার নেতৃত্বে নেপালের সর্বপ্রথম নির্বাচিত সরকারের শপথ গ্রহণ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): 'জুপিটার' নামক মার্কিন ক্ষেপণাস্রো মধ্যাশুনা পর্যটনাভ্যে দুইটি বানবীর জীবন্ত প্রত্যাবর্তন।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণরের অভিজ্ঞাঙ্গে ছয় মাসের জন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভা বন্ধ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): মকো-এ ভারত-সোভিয়েট নতুন অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশিত কিরণ—বর্তমানে পৃথিবীর জন সংখ্যা ২৪০ কোটি—তন্মধ্যে চীন ৬৪ কোটি এবং ইহার পরই ভারত ৪০ কোটি।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): নিরাপত্তার নামে রুশানে দুই জন মন্ত্রীসহ ১৮ জন অফিসার গ্রেপ্তার।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): অযোগ্যতার জন্ত পূর্ব পাক সরকার কর্তৃক ৭ জন অফিসারকে শাস্তিদান।

১১শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): কমনওয়েলথভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সিঙ্গাপুরের অভ্যুদয়—বামপন্থী পিপলস একশন পার্টি কর্তৃক নতুন সরকার গঠন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): লাওস পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জেনেভার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মি: সেলুইন লয়েড ও রূপ পররাষ্ট্র সচিব মি: আন্দ্রে গ্রোমিকোর বৈঠক।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): তিব্বতীদের মৌলিক মানবিক অধিকারে চীনা হস্তক্ষেপ হইয়াছে বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনবিশ্ব কমিশনের বিপোর্টে মন্তব্য।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের আমাদেবলাম শৃঙ্গ (২২,৩০০ ফুট) জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ—দুইজন সদস্যের মৃত্যু।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): তিন দিবসব্যাপী নেপাল সফর উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী জিনেহকুর কাটমাণ্ডু উপস্থিত।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন): তিব্বত ও অজ্ঞাত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কাটমাণ্ডু-এ প্রধান মন্ত্রী জি বি, পি, কৈরালার সহিত প্রধান মন্ত্রী জিনেহকুর (ভারত) আলোচনা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): ইয়েমেনী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইয়েমেনের প্রধান বন্দর হোদিদা ও অল্পতম বৃহত্তম সহর তায়াজ দখলের সন্ধান।

... এ মাসের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রাক্কালে কাশ্মীরের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রটি গ্রহণ করছেন জীবিতাস মিত্র।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

বনাম

কলকাতা পুলিশ

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

যে সকল মামলা সম্বন্ধে এই কাহিনীগুলিতে বলা হয়েছে উহার সব কয়টিই তদন্ত-কার্য কলিকাতার আরক্ষা পুলিশের দ্বারা সমাধা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে কয়েকটি বিষয়ে কলিকাতা পুলিশ বহুখণিত ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ড অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ, যে সকল তদন্ত-কার্য যুরোপীয় ‘ববি’গণ অত্যধিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের সাহায্য করে থাকেন সেইরূপ তদন্ত-কার্যই ভারতীয় পুলিশকে করে বেতে হয়েছে। এই সকল আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকেই। বস্তুতঃ বেতার-যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই দেশের স্বাধীনতার পরই মাত্র প্রকৃতপক্ষে গ্রহীত হয়েছে। উপরন্তু লণ্ডন পুলিশ জনসাধারণের নিকট যে সহযোগিতা বহুকাল পূর্বে হতেই পেয়ে এসেছে, সেইরূপ স্বয়ংক্রিয় সহযোগিতা ভারতীয় পুলিশ বহু দিন পায় নি। এছাড়া কলিকাতা পুলিশের অপর আর এক অসুবিধাও আছে। কারণ তাদের অনেককেই এই শহরে মানুষ হয়ে ও দেখাপড়া শিখে এই শহরের পুলিশেই ভর্তি হতে হয়েছে। শহরে অগণিত পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাজ করার সুবিধার ভায়ে অসুবিধাও অনেক থাকে। এই কারণে তাদের হুজুর্হঃ লন্ড ও ডিউটির মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে ডিউটিকে। এছাড়া এদের পুরাতন ট্রেনিং স্কুলগুলিতে পুলিশি আইন-কানুন, ড্রিল, প্যারেড ও ডিসিপ্লিন দেখানো হলেও পুলিশি তদন্ত নীতি কোনও দিনই শিখানো হয়নি। এই তদন্ত-কার্য তাদের শিখে নিতে হয়েছে ট্রেনিং স্কুলের বাহিরে এসে তৎকালীন সুলক্ষ্য দেশীয় অফিসারদের নিকট হতে। এই সকল পুরাতন অফিসারগণ গুরু পরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করতেন, সেই জ্ঞান আবার তাঁরা দিয়ে যেতেন এই বিভাগের নবাগত অফিসারদের। এই জ্ঞান কর্তৃপক্ষের অগোচরে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, কিন্তু উহার সবটুকু বহননি পর্যাপ্ত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এখানকার এই সকল শিক্ষাগুরুদের নবাগতদের শিক্ষিত করে তুলতেও বেশ কিছু বেগ পেতে হতো। কারণ ইহাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত সহরের যুবক। বহু প্রকার চিত্ত-প্রকৃত্তির কারণে এই সকল আত্মভিমানী যুবক আপন আপন ধারণা অনুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করত। এই জন্য তাদের এই সব বহুদল ধারণা বদলে তাদের মধ্যে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে তাদের এরূপ শিক্ষা দিতে গুরুদের বহু সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে।

—কিন্তু এতো অসুবিধার মধ্যেও কলিকাতা পুলিশ বৈরুপ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তা বিলুপ্ত। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিশের কৃতিত্বের তুলনায় কমরীতো নয়ই বরং উহাদের অতুলনীয়ই বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ পুলিশের পিছনে বৈরুপ ধরচ-ধরচা করেছেন, তাঁরা সেইরূপ ধরচ-ধরচা তাঁদের ভারতীয় পুলিশের জন্য কোনও দিনই করেন নি। এই সকল স্বল্প বেতনভোগী ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারদেরই বরং তদন্ত-কার্যে সাফল্যের জন্য এবং জনসাধারণের উপকারার্থে নিজস্বের পকেট হতেই পয়সা খরচ করে বনাতত্তা দেখাতে হয়েছে।

ভারতীয় কৃতি অনুযায়ী এই সকল পুরাতন অফিসারগণ তাঁদের সহকারীদের তাঁদেরই মত তদন্তকার্যে শিক্ষিত করে তোলা তাঁদের গুরু কর্তব্য নয় বরং মনে করতেন। এই জন্য প্রতিটি তদন্তকার্যে এরা নবাগতদের তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। এই নবাগতরা গুরু দেখে যেতো তাঁরা কেমন করে কি করছেন এবং কি-ই বা তাঁরা করছেন না। বহুক্ষেত্রে তারা নবাগতদের জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘বলতো এইবার কি করতে হবে?’ নবাগতগণ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাতঃ তাঁরা বলে দিতেন, এইরূপ করলে এই এই অসুবিধা আছে।

নচেৎ এই এই অসুবিধা হয়—যুগে? এই ভাবে কলিকাতা পুলিশ তাদের বা কিছু শিক্ষা নীকাতা পুঁথিগত ভাবে পায় নি, স্মৃদক ও অভিজ্ঞদের কাছেই তারা এই তদন্ত-কার্য শিখেছে হাতে কলমে।

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে অধুনাতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে কলিকাতা পুলিশ এত বেশী দক্ষতা দেখাতে পারে কি করে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, কলিকাতা পুলিশ যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর নির্ভর না করে তাঁরা নির্ভর করেছেন উহাদের ব্যবহার চাতুর্যের উপর। স্বল্প লাইন দ্বারা যে ব্যক্তি অধিক এফেক্ট প্রকাশ করতে সক্ষম সেই প্রকৃত আর্টিষ্ট। তাই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেও নিজস্বের তৈরী অতি সাধারণ (Simple) যন্ত্রপাতিই তাঁরা তদন্ত কার্যে ব্যবহার করেছেন। তবে যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে তাঁরা নির্ভর করেছেন, নিজস্বের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব পূর্ণ-অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ংলব্ধ সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যকালে জর্নৈক আমেরিকান জেনারেল বহুগুণ সহ কলিকাতার এসে কালীঘাটের মন্দির পরিদর্শনে যান। মন্দির কর্তৃপক্ষ অবশ্য ছুটা খুলে তাঁদের প্রাঙ্গণে ঘুরাফিরা করার জন্য কোনও আপত্তি করেন নি। তাঁরা বেঠনীর দুহাবের নিকট ছুটা খুলে রেখে প্রাঙ্গণের চতুর্দিক পর্য্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে দেখলেন যে, জেনারেল সাহেবের মূল্যবান ‘সু’ জোড়টি অপ্রত্যা হারিয়েছে। মনঃস্কুর ভাবে জেনারেল সাহেব কলিকাতা পুলিশের যুরোপীয় কমিশনারের নিকট ছুটা চুরি সম্বন্ধে অভিযোগ জানানো মাত্র পুলিশ বিভাগে তোলাপাড় শুরু হয়ে গেল এবং তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ঘণিত গতিতে এই ছুটা উদ্ধার করে দিতে না পারলে বিদেশীয়দের নিকট কলিকাতা পুলিশের মান-ইজ্জতের সমধিক হানি হবার সম্ভাবনা। এই তদন্ত-কার্যে বিশেষ করে আমারই ডাক পড়েছিল। আমাকে কমিশনার সাহেবের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে, তিনি বললেন, ‘লণ্ডন পুলিশ এই ছুটা তিন ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করতে পারত, তুমি কতক্ষণে উহা উদ্ধার করতে পারবে?’ উত্তরে আমি তাঁকে জানাগুম, ‘তারা, ঐ ছুটা পূর্বে দিন বেলা তিনটা আশাঙ্ক সময় অগস্ত হইবে। তাই তিন ঘণ্টার উদ্ধারে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, কারণ ইতিমধ্যেই বহু দেরী হয়ে গিয়েছে। আমি অন্ততঃপক্ষে ছয় সাত বা নয় ঘণ্টা সময় চাই।’ কমিশনার সাহেবের মনে কি ছিল জানি না, তিনি আমার উত্তরে বরং খুসী হয়েই বলে উঠলেন, ‘বেশ বেশ সে তো ভালই। এখন সকাল দশটা—আজ্ঞা, তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই একটা সুধবর পাব আশা করি।’

এর পর মল্লবাজার হতে সোজা আমি ভবানীপুর থানায় চলে এলাম। সেখানে এসে দেখলাম ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই ছুটা-চুরি সম্পর্কে বিশেষ চিহ্নিত, কারণ তাঁরই এলাকাবীন স্থানে এই

অপকাণ্ডটি সাধিত হয়েছে। আমি তাঁকে সাধনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক ক'টার সময় এই চুরিটে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?' উত্তরে হতাশ হয়ে তিনি জানানলেন, 'ঠিক দুইটার সময়। তিনটার আধেরিকান মিসিটারি পুলিশ এসে কেস লিখিয়েছে।' 'হঁ' তাহলে ঠিক হয়েছে;—আমি উত্তর করলাম, 'আপনি এক কাজ করুন একুবিই। জন দশবারো জমাদার ও পুরানো অভিজ্ঞ সিপাহী একুশি পাঠিয়ে দিন। তারা একটা হাতে তিনটা পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে সময়ে চুরি হয়েছে ঐ সময়ে মন্দির ও উহার চতুর্দিকে ঘুরাকিয়া করে যে কোন ব্যক্তিকে ভাগাবণ্ড বা জুতা-চোররূপে সন্দেহ হবে, তাদের সব ক'জনকেই ছাঁকা জালে মাহ তুলার শায় ধরে ধরে ধানায় নিয়ে আসুক।' অফিসার-ইন-চার্জ ওস্তলোকের নানা কারণে আমার উপর আস্থা ছিল। তাহাড়া গ্যোয়েন্না বিভাগের ব্যক্তি বিধায় আমাকে সাহায্য করা ছিল তাঁর এক অন্ততম কর্তব্য। তিনি সানন্দে বাছা বাছা দশ বারো জন জমাদার সিপাহীকে অল্পরূপ আদেশ সহ ঐ সময়ের মধ্যে মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্ত মনে ও স্থির মস্তিষ্কে একটি পুঁটলী হাতে নিয়ে ধানায় এসে দেখি, প্রায় ত্রিশ জন অল্পরূপ ব্যক্তিকে ধরে এনে ধানার একটা পৃথক কামরায় জমা করা হয়েছে। আমি ঐ নির্দিষ্ট কামরায় এসে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ওদের মধ্যে হতে মাত্র এগারো জন ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে বাকি সবলকে মুক্তি দিতে বলে ধানার অফিসার-ইন-চার্জের হস্ত নির্দিষ্ট ঘরে এসে বসলাম। এই ঘরে আমার সঙ্গে করে আনা পুঁটলীটি ইতিপূর্বেই আমি রেখে গিয়েছিলাম। সকলে বিম্বিত হয়ে দেখল, আমি পুঁটলী খুলে ভাল ভাল আনকোরা নুতন মরক্কো ও অজান্তে কোদারের দশ বারো পাটি জুতা বার করে ঘরের একপাশে দেওয়ালের ধারে জড়ো করে রাখছি। সকলে জিজ্ঞাস্যনেজে আমার দিকে তাকালে, আমি তাদের কথা বলতে বাধন করে পাশের ঘর থেকে আমার বাছাই করা এগারো জন ব্যক্তিকে এই ঘরটিতে এনে দেওয়ালের এমন এক ধারে সারিবন্দী ভাবে তাদের দাঁড় করাতে বললাম, যেখন হতে উল্টো দিকে রাখা জুতা কয়টি সহজেই তাদের নজরে পড়তে পারে। এইভাবে ঐ এগার জন সন্দেহমান ব্যক্তিকে দেওয়ালের পাশে সারিবন্দী ভাবে দাঁড় করানো হলে, আমি বহুক্ষণ হুতা করে একটি কাগজ দেখতে লাগলাম, বিস্ত্র মধ্যে মধ্যে আমি তাদের হাবভাব যে লক্ষ্য না করছিলাম তাও নয়। এর পর আমি মুখ তুলে অজমনক ভাবে অথচ তীক্ষ্ণ চুষ্টিতে সন্দেহমান প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখের দিকে চেয়ে দেখতে থাকি। হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ল এদের এক ব্যক্তির মুখ-চোখের দিকে। লোকটি ঘন ঘন প্রলুব্ধ চুষ্টিতে ঐ নুতন জুতা জোড়া কয়টির দিকে বারবার চেয়ে দেখছিল। ঐ স্থানে অন্তর্গত জুতা দেখে খাত্ত-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যেমন বৃত্তক্ মাছকে উতলা করে ঠিক তেমনি করে ঐ জুতা-সন্ধানিকে উতলা করে তুলেছে। কারণ, জুতা-চুরি করে করে (অজ্ঞাস জনিত) তার জেনের 'সেট-আপ' আশনিই এমন হয়ে গেছে যে, সহজেই তার মাছকের পায়ের দিকেই আগে নজর পড়ে। এই অবস্থায় তার চক্ষু চক্কে হরে উঠবে এবং মুখে নাল পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্যেরই বা কি আছে। আমি

বীরভাবে উহার অপরাধের সন্ধানের মুখাবরণের সহিত উহার মুখ চোখের তুলনা করে বললাম যে, আমি কোনও তুলনা সিদ্ধান্তে আসি নি। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে রেখে বাকি সকলকে বললাম, 'বাও তোমরা। বা কিছু ঘোব এই লোকটির; তোমরা কোনও অপরাধ করো নি।' ঐ সকল ব্যক্তিদের বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি নিভুতে সেই জুতা-চো-টিকে বললাম, 'বাপু জুতা-চোর! দেখচো তো এতগুলো লোকের মধ্যে হতে আমি তোমােই কেমন চিনে নিলাম। এতেই বুঝতে পারছো যে, আগে থেকে আমাদের এ খবর জানা ছিল যে, তুমি ঐ দিন ঐ ঘোজী সাহেবের জুতা দু'টো মন্দির হতে চুরি করেছো, তা না হলে কি এতগুলো লোকের মধ্যে শুধু তোমাকেই বেছে নিতে পারতাম? দেখলে তো শুধু তোমাকেই বেছে নিয়েছি। এখন এতটা বখন জানি তখন এ'ও জানি তুমি কোথায় ও-দু'টো বিক্রি করে এসেছ। এখন তুমি নিজেই যদি দোকানটা দেখিয়ে দাও তা'হলে আর আমাদের ইন্সপেক্টরকে কষ্ট করে সেই বেলেগেছে থেকে ডেকে আনতে হয় না। কেন মিছামিছি অপ্রীতিকর (?) ব্যাপারের সৃষ্টি করবে তার চেয়ে নয় একটা বিড়ি টিঁড়ি খাও, আর শান্তিষ্ট হেলের মত সেই দোকানটা দেখিয়ে দেবে চলো।' জুতা-চোর মহাশয় সত্য সত্যই আমাদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার এ'ও মনে হয়েছিল যে, ঐ চোরাই জুতা কোথায় আছে তা ঐ ইন্সপেক্টরের সাহায্যে আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি। একটু এদিক ওদিক চেয়ে বিস্ত্র-বিস্ত্র করতে করতে জুতা-চোরটি অতুযোগ করে জানালো, 'হাঁ হ'জুর সবই বখন আপনারা জেনে গেছেন, তখন আপনাদের আমি আর কষ্ট দেবো না। তবে একটা কথা, এ তজ্ঞাটের সেরানায় সব আমাকে একজন বড়দরের চোর বলে জানে ও খাতির করে। আমি যে জুতা-চোর তা জানি জানি হলে সকলের কাছে আমার বড় বদনাম হবে। চলুন, তার আমি দূর হতে সেই হিন্দোমানটার দোকানটা দেখিয়ে দেবো। খুব সম্ভবতঃ এর মধ্যে সে ও-দু'টো বিক্রী করতে পারে নি।' আমি উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ এক ট্যান্সি ডেকে অপরাধিকে নিয়ে ঐ দোকানের নিকট বাই এবং ঐ দোকান হতে দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সামনে অপহৃত জুতা জোড়াটি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এর পর আমেরিকান জেনারেল সাহেব ঐ জুতা দু'টো আপনদ্রব্য বলে সনাক্ত করে স্বীকার করেছিলেন যে, চুরির পর এক শীত্র চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করতে যুরোপীয় বা ব্রিটিশ পুলিশ কয় কয়েই লক্ষ্য হয়েছেন।

এইখানে সাধারণ মনোভঙ্গ বা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সহিত আমাকে গুরুপরাম্পরায় অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতাও কাজ লাগতে হইতছিল। এই লক্ষ্যে আমাদের পূর্ক-অভিজ্ঞতা ছিল যে, জুতা-চোরগণ একক চোর হয় এবং তারা বলবৎ চোর নয়। ভারতীয় অপরাধী সমাজে ইহা এক অতি ছোট ও নোয়া কাজ বিধায় একে অপরের অজ্ঞাতে এই প্রকার চুরি করে থাকে। এইজন্য একজন জুতা-চোর যেখানে কর্মরত থাকে, সেইখানে অপর এক জুতা-চোর প্রায়ই তিষ্ঠায় পর্য্যন্ত না। এদের একজন অপর জনকে এই ছোট কাজে লিপ্ত দেখলে উভয়েই লজ্জিত হয়ে উঠে। এইজন্য এরা পরস্পর পরস্পরের

অগোচরেই ঘুরে চলে গিয়ে পৃথক কর্তৃক্ষেত্র বেছে নেয়। এঁহাড়া বড় বড় চোরদের মনের বে 'গার্ট' থাকে জুতা-চোরদের তা থাকে না। তারা স্বভাবতই ভীক প্রকৃতির ও সরল স্বভাবের হয়ে থাকে। এইজন্য আমি তদন্তরূপ বাকবিশ্লেষই তার উপর প্রয়োগ করেছিলাম। আমার এবং বিধ কৃতকার্যতার ইহাও একটি অস্বতম কারণ।"

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে কিরূপ সরল ভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে কলিকাতা পুলিশ কার্য করতে সক্ষম। কিন্তু এইস্থলে লণ্ডন পুলিশে হতুস্থল পড়ে যেতো। তাঁরা প্রথমেই ঘটনাস্থলে এসে ঐভিত্তের মধ্যে পদচিহ্ন সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন। তারপর তাঁরা বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও হিন্দী না পেলে ছুটে যেতেন মোড়ান অপারেশনই বুঝতে বা অপরাধীদের কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় রেকর্ড অন্বেষণ। এই কার্য-পদ্ধতি অকস্মে বিভিন্ন অপরাধীদের বিভিন্ন কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় সহস্র সহস্র কার্ড থাকে বিভিন্ন খোঁপে বা শিঞ্জিয়ন-হোলে রক্ষিত আছে। এইখানে কোন অপরাধী কত লম্বা, কায় চুলের রঙ কিরূপ, কোন ব্যক্তি নেংটা বা খন্ড, ইত্যাদি সংবাদও নথিভুক্ত আছে। সাধারণতঃ অপরাধীদের অপপদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে উহাদের নাম ধাম সম্বন্ধে অভিহিত হওয়া যেতে পারে।

এইরূপ বিবরণ সম্বন্ধিত বহু কার্ড পরীক্ষণ করে তাঁরা সম্ভবমত প্রায় আট নম্বর অপরাধীর নাম ধাম বিবরণ ও উহাদের বন্ধুবান্ধবদের নাম" সংগ্রহ করে ঐ অপস্রত জুতার বিবরণ সহ ঐ সকল সংবাদ তৎক্ষণাৎ গেজেটে ছাপিয়ে উহা জ্ঞান, মেল বা লোক মারিৎ প্রতিটি ধানার পাঠিয়ে দিখা টেলিকোন বা রেডিও বোগে ঐ সকল ধানার এই সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করতেন। তার পর একে একে তাদের পাকড়াও করে অকৃতস্থলে লোকজনদের এবং করিয়াদীকে সমাজিকরণ মিছিলের (Test Identification Parade) সাহায্যে তাদের সনাক্ত করার চেষ্টা করতেন। এরপর লণ্ডন পুলিশের অপর একদল হয়ত প্রকৃত্তে বা হস্তবশে ঐ জুতার বিবরণ সহ ছুটতেন সাগা লণ্ডন শহর বা শহরতলীর সম্ভবমান জুতার দোকান বা উহার গ্রাহকদের সন্ধানে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে ঐ জুতা কোনও এক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কিনে নিয়ে দেশের বিরাট জনসমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকবে কিংবা 'বামাল-গ্রাহক'গণ উহা ক্ষত কোনও এক নিরাপদ স্থানে ছুরিত গুপ্তিতে পাচার করে নিয়ে থাকবে। এঁহাড়া এই সকল ক্ষতভূত ধনী বামাল-গ্রাহকগণের দিকে দিকে চর আছে এবং তারা ঐকান্তিক কান খুলে রেখেই বাবলা চালায়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে তাদের সাবধান হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এর পরও যদি কোন দোকান হতে মাত্র উহার বিবরণের সাহায্যে ঐ জুতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তাহ'লে উহা বে করিয়াদীর জুতা তা প্রমাণ করা হবে এক সমস্তার বিবরণ। কারণ, ঐরূপ জুতা বাজার সমূহে গুল্লের কাছেই নিষিদ্ধারে বিক্রয় করা হয়। তখন পুলিশকে দেখতে হবে ঐ জুতার শ্রুততলার করিয়াদীর পায়ের অনুরূপ চিহ্ন পড়েছে কিনা? অন্তর্ধায় তাঁরা ঐ জুতার তলদেশ-সলর মুদ্রিকা চোখে বার করে রাসায়নিক পরীকার পর প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে, ঐ মাটির কেমিক্যালের সহিত ঘটনাস্থল বা করিয়াদীর গৃহপ্রাঙ্গণের মাটির কেমিক্যালের সাক্ষ্য আছে। করিয়াদীর পায়ের একটি লোম ঐকক্রমে ঐ জুতার মধ্যে পাওয়া পেলেও হয়ত

তাঁরা ঐরূপ পরীকা দ্বারা প্রমাণ করতেন ঐ চুলটির জ্বাণও করিয়াদীর পায়ের অনুরূপ চুলের অনুরূপ। এই সম্পর্কে ফোরেনসিক সায়েন্সের সাহায্যে ঐ জুতা জোড়াটির বর্ণচ্ছটা সহিত করিয়াদীর গৃহের অনুরূপ জুতা বা জ্বাণের বর্ণচ্ছটা তুলনা করেও হয়ত তাঁরা প্রমাণ করতেন যে, ঐ জুতা ঐ করিয়াদীরই। কোনও প্রকারে বিবিধ-বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ জুতাটি করিয়াদীর অপস্রত জ্বাণরূপে কথকিত প্রমাণ করার পর তাঁদের এইবার অবগত হতে হবে, ঐ জুতা অপরাধীমত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চুরি করে ঐ দোকানে বিক্রয় করেছে। অবশ্য ঐ জুতার কোনও স্থানে ভাগাক্রমে যদি তাদের কোনও একজনের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। তবে সূক্ষ্ম জ্ঞান নয় বলে ঐরূপ কোনও ছাপ না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু বর্ণ-সিদ্ধ হস্তে জুতা ও কাগজ প্রভৃতি স্পর্শ করিলে উহাতে আঙ্গুলের ছাপ সন্নিবেশিত হওয়াও অসম্ভব নয়। সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে ঘটনার অব্যবহিত পরেই অপরাধী ধরা পড়লে তাও একটি স্বীকৃতি দিলেও দিতে পারে। কিন্তু বহুদিন বা বহুক্ষণ সময় অন্তিবাহিত হইয়া গেলে তাদের মনোবল অটুট হয় এবং তারা কোনও স্বীকৃতি প্রদান করে না। এইরূপ অবস্থায় জ্বাণাদির চোর ও উহার গ্রাহক; উভয়েই প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অপরাধসমূহ অস্বীকার করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সোপানীকরণের পর বিচারের সময় ডিফেন্স হাতে একটামাত্র কথা বলা হয়, 'হা, এ কথা সত্য; জুতার আসামীরই অঙ্গুলিটি পাওয়া গিয়েছে।' কিন্তু ঐ আসামী ঐ দিন সকালে হয়তো জুতা কিনতে গিয়ে ঐ জুতাটি সে পরেই কিনেছিল এবং সন্নিবেশ পঙ্ক না হওয়ার কারণে সে আর উহা কিনে নাই। ঐ সময়ই তার আঙ্গুলের ছাপ ঐ জুতার বস্তিরে থাকবে। ঐ জুতার গ্রাহকটিও সমর্থনীয় ব্যক্তিবিশেষ অপরাধীটিকে সমর্থন করে বলবে যে, তার ঐ উক্তি সর্বত্র সত্য, উপরন্তু আশ্চর্য সমর্থনে সে এও বলবে যে, পূর্বদিন কঠিনক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ঐ জুতা তাকে বিক্রয় করেছে এবং দস্তরমত খাতাপত্রে এই সম্পর্কে লিখে উচিত মূল্যে সে উহা ক্রয় করেছে। বহু বর্ণিত ব্যক্তি পরসার অভাবে এইরূপ জুতা বিক্রয় করে থাকে, সুতরাং সে এই বিষয়ে একান্তরূপে নির্দোষ।

এইরূপ অবস্থায় আদালতের বিচারে উভয় আসামীরই সম্ভবমত প্রমাণের অভাবে মুক্তি পাওয়াই স্বাভাবিক। এইবার এই বর্তমান যুগোপায় এবং প্রাচীন ভারতীয় তদন্ত-পদ্ধতির এবং সোপানীকরণ রীতির তুলনামূলক আলোচনা করলে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় পুলিশ সরল, সহজ ও অকট্যা সাক্ষ্য প্রয়োগ করে এই উভয় আসামীর বিরুদ্ধেই মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম। উপরোক্ত ভারতীয় তদন্তরীতি অনুধাবন করলে এই সত্যটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে। এই ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বলে থাকেন যে, আসামী তাঁর নিকট একটি বিবৃতি দেয় এবং ঐ বিবৃতি অনুযায়ী সে ঠিক যে স্থানটি হতে ঐ জুতা চুরি গিয়াছিল, সেই স্থানটি তো সে দেখিয়ে দেয়ই এবং উপরন্তু সে তাকে ঐ চানামানের দোকানেও নিয়ে গিয়েছিল এবং ঐ আসামীর বিবৃতি অনুযায়ী ছ'জন স্থানীয় সাক্ষীর সমূহে সে ঐ দোকান হতে ঐ জুতা জোড়া উদ্ধার করতে পেরেছে। তদন্তকারী অফিসারের এই বিবৃতির সহিত করিয়াদীর এবং তৎসহ তদানী-সাক্ষীর বিবৃতির ধারা

অপরাধীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহজে প্রমাণ করা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিচারকের মনে মাত্র এই প্রশ্ন উঠবে যে, চোর নিজে ঐ দোকান না দেখিয়ে নিলে ঐ অপসৃত জুতা কিরে পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং চোর নিজে না চুরি করলে সঠিকভাবে ঘটনাস্থানটিই বা সে দেখিয়ে দিতে পারে কি করে? এবং চোর নিজে যখন ঐ দোকান ঐ দোকানিকে দেখিয়ে দিয়েছে তা'হলে ঐ দোকানীও নিশ্চয় ঐ দ্রব্য তার নিকট হতে কিনেছে। এবং ঐরূপ নিয়ন্ত্রণীয় ব্যক্তির নিকট ঐরূপ দামী যুরোপীয় জুতা যখন লোকানী কিনেছে তখন সে চোরাই দ্রব্যরূপেই তা তার নিকট হতে কিনেছে। এইভাবে আমরা আরও দেখতে পাবো যে ভারতীয় পুলিশ সাক্ষ্য পর্বাঙ্ক নিজস্ব পন্থায় মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে পরিবেশন করতে সক্ষম। এই হলে আমরা দেখতে পাবো যে, যুরোপীয় পুলিশ কামান-বন্দুকের সাহায্যে যে সাক্ষ্য অর্জন করেন, ভারতীয় পুলিশ তার চেয়েও অধিক সাক্ষ্যলাভ করে থাকেন রিক্তহস্তে। তাই আজও প্রাণী ভারতীয় পুলিশরা যুরোপীয় পুলিশদের কার্ধ্য-পদ্ধতিকে উপহাস করে বলে থাকেন যে, তাদের কার্ধ্যসমূহ 'মশা' মারতে কামান দাগা'র সমপর্যায় পড়ে। এইরূপ সাক্ষ্যের সম্পর্কে যদি কেহ চাক্ষুষ কথা তুলেন তা'হলে আমি বলব যে, উত্তর পদ্ধতিতেই চাক্ষুষ ভাগ থাকে প্রায়ই সমান। তবে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় তদন্তরীতি অতি সরল এবং যুরোপীয় তদন্তরীতি অতীব বক্র এবং উহা সময় ও ব্যয় সাশেক্ষ। যে সাক্ষ্য ভারতীয় পুলিশ তদন্তের সাহায্যে কারণে বিনামূল্যে অর্জন করে, সেই সাক্ষ্য যুরোপীয় পুলিশকে অর্জন করতে হয় বহু রাষ্ট্রীয় মুদ্রার বিনিময়ে। যারা অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় পুলিশ আসামী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিবৃতির উপর বহু নির্ভরশীল তত নির্ভরশীল তারা অপরাধ সম্প্রদায় সূত্রে উপর নয়; তাঁদের সময় ও অর্থের এইরূপ অর্থনা অপচয়ের দিকটাও ভেবে দেখতে আমি অনুরোধ করি। ভারতীয় আদালত সমূহে প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরাধীর স্বীকারোক্তির ফলেই মামলা বিশেষের কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করে কি কেউ নিজের সুভাষণে নিজ বাতলে দেয়, ভারতীয় পুলিশ শুধু তাদের মধ্যে নীতি ও ধর্মবোধ এনে তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করে না, তাদের মধ্যে নীতি ও ধর্মবোধ এনে তাদের স্তবরেও দিয়ে থাকেন। তবে আইনের দাস তারা তাই আদালতে এদের শেখ করতে তাঁরা বাধ্য। এর পর যদি আদালত তাদের শোধরাবার সুযোগ না দিয়ে জেল পাঠায় তা'লে উচিত্য বা অনৌচিত্যের যা কিছু দাবি তা রাষ্ট্রের (ব্রিটিশ প্রবর্তিত) আইন সভার। কারণ যুরোপের ভার ভারতীয় আদালতসমূহও বাধ্যধরা আইনের দাস মাত্র; কিন্তু প্রাগ-ব্রিটিশ ভারতীয় প্রায় পঞ্চায়েত ও অজ্ঞাত আদালতসমূহ এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ব্যবস্থাই আ'হমানকাল হতে করে এসেছেন। এ সম্পর্কে স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, ভারতীয় পুলিশ অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে (তাঁদের ব্রিটিশ শাসকদের অজ্ঞাতেই) প্রাচীন ভারতীয় রক্ষিবর্গের ঐতিহ্য সন্ধান ও সংস্কৃতির অধিকারী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মাধ্যমে এসে উহা বিকৃতরূপে প্রকাশ পালেও অবিকাশ ভারতীয় পুলিশই অপরাধীদের প্রতি অতীব সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিতে থাকেন।

এইবার ভারতীয় পুলিশ-বলদ অতীব সহজ তদন্ত-প্রণালী অনুযায়ী

কিরূপে অপর একটি দুঃস্থ মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছিল, তা নিয়ে বিবৃত করা হল। ঘটনাটি ভারতীয় পুলিশের অন্যমৈত্র্য, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

কোন এক জঙ্গ সাহেবের বাড়ী হতে তাঁর এক পুত্রবধূ মূল্যবান স্বর্ণ-হার চুরি যায়। আমাকে বিশেষ করে এই মামলার তদন্তে পাঠানো হয়েছিল। আমি জঙ্গ সাহেব মহাশয়ের রাটীতে আসিলে তিনি সাদরে আমাদের তাঁর উপরের বৈঠকখানায় বসিয়ে জানালেন, 'এ মশাই, পাকা পেশাদারী বাইরের চোরেরই কাজ। কি আশ্চর্য্য, আমার মত লোকের বাড়ীতেও দিন দুপুরে চুরি! তা দেখুন, কি করতে পারেন। বাপরে বাপ! এ তো এক ভীষণ কাণ্ড!' জঙ্গ সাহেব আরও হতত অনেক কথা আমাদের তনাতেন কিন্তু ইত্যবসরে পাশের ঘর থেকে খবর এলো যে তাঁকে টেলিফোনে কে ডাকছে। তিনি চলে গেলে আমি ও আমার সহকারী নিম্নস্থরে এই চুরি সম্পর্কে কথাবার্তা বলজিলাম এমন সময় আমাদের লক্ষ্য পড়লো একটি উড়িয়া চাকরের দিকে। সে দুয়ারের এপারের বায়ান্দার দ্বারে ঘর খোঁটার অছিলার জল শুদ্ধ বালতি হাতে দুয়ারের কাঁক দিয়া আমাদের বাঁরে বাঁরে দেখে বাজিল; আমি এই দেখে নিম্নস্থরে আমার সহকারীকে জানালাম, ঐ লোকটাকে তো সুবিধের মনে হচ্ছে না, কাঁড়াও দেখি। এর পর ঐ উড়িয়া চাকরটিকে কাঁড়ে ডেকে আমি বললাম, 'আর এদিকে আয়। তুই অত ভর পাচ্ছিস কেন? এঁা : তোকে তো আমরা ঘরতে আনি নি! বোস বোস, এইখানে বোস। হাঁরে তোর দেশ কোথায়, আছে কে কে তোর সেখানে?' আমতা আমতা করে ভূত্যাতি জানালো যে তার দেশ কটক জিলার অমুক গ্রামে। দেশে তার নাওয়ালিকা স্ত্রী ও একটি শিশুকে সে রেখে এসেছে। তার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কথা শুনে আঁতকে উঠে আমি বলে উঠলাম, 'এঁা! বলিস কি রে? বাড়ীতে তোর সেই বালিকা যু ও ঐ একরকম পুত্র আছে, আর তুই এমন একটা কাজ করে বলসি। আহা আহা, তাই তো কি করা যায় বল দিকি এখন। তা তোরকে তা'হলে তো একরকম করে বাঁচিয়ে দিতেই হবে। তোকে জো বাপু দেখলে ভালো লোকই মনে হয়, তা তুই—' এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভূত্যাতি এমন একটি পরিস্থিতিতে এসে পড়লো যে সে অপরাধ স্বীকার করে আমার পা জড়িয়ে ধরে বাঁরে বাঁরে তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে থাকলো। ঠিক এই সময় জঙ্গ সাহেব সেইখানে এসে পড়ে তাঁর ঐ ভূত্যাটিকে ঐ অবস্থায় দেখে আমাদের অনুরোধ করে বললেন, 'আরে মশাই, আশানার্য্য আবার ঢুক নিয়ে পড়লেন কেন? ও'লোক খুবই ভালো ওকে ছেড়ে দিন। ওর উপর আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। যারে, ভজু যা, বাড়ীর ভিতরে কাজ করগে যা।' উত্তরে আমি জঙ্গ সাহেবকে বললাম, 'না ও কিছু জানে না। তবে ও এঁরা; লোকের ঠিকানা জানে, তার বাড়ীটা শুধু দেখিয়ে দেবে। একুণি ওকে নিয়ে আমরা আবার এখানেই ফিরে আসছি।' এর পর আর জঙ্গ সাহেবকে কোনও প্রতিবাহ করবার অবসর না দিয়েই আমরা ঐ উড়িয়া ভূত্যকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এর পর ঐ ভূত্যাটি আমাদের চিৎপুর রোডে এসে সেখানকার এক সারি পোদারের দোকানের মধ্যে একটি অঙ্গল বন্ধ দোকান দূর হতে দেখিয়ে বললো

যে, সে এই বর্ণহারাটি চুরি করে এনে এই দোকানে এক শত টাকা মূল্যে তা বিক্রয় করেছে। এবং সে এই দিনই বিক্রয়লব্ধ এক শত টাকা স্ত্রীপুত্রের প্রাসাদ্দান ও তাদের ভরণ্যায় কুটির ঘরামত করার জন্য দেশের ঠিকানার মনি আঁড়ার করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের সকলেই বেউদীতে তদন্তরত ছিলাম। আমি সহকারী জিফার উড়িয়া ভূতাতিকে ঘুরে সরিয়ে নিয়ে সাধারণ নাগরিকের বেশ পার্শ্ববর্তী দোকানের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আজ্ঞে মশাই এই দোকান তো বন্ধ দেখছি, কিন্তু এর মালিকের বাসার ঠিকানা বলতে পারেন?’ এই সব করটিই দোকানীটী ছিল এক দলেরই দলী, তাদের ব্যবসায়ই হচ্ছে চোরাই গহনা কিনে দ্রুত পণ্ডিতে তা গালিয়ে ফেলা। এই কারণে এই স্থানের কোনও দোকানীই—এ ভজলোকের ঠিকানাটা জেনেও তা বলতে চাচ্ছে না বুঝে আমি ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলাম, ‘এই মুহুর্তে পড়া গেলো মশাই। ভজলোকের হাতটাকরণ ঠর স্বপ্নামে মারা গেছেন। আমি তাঁর সেই গ্রাম থেকেই তাঁকে খবর দিতে এসেছি।’—‘ও: তাই নাকি,’—এই কথা শুনে এঁদের একজন বলে উঠলেন, ‘চল হান ঐগ’গির তা’ইলে। ঠর ঠিহারা হচ্ছে অসুখ লেনের অত নবর বাড়া।’ এই কথা শুনা মাত্র আমরা দ্রুত পণ্ডিতে ভজলোকের ঐ ঠিকানায় এসে তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিলাম। কিন্তু সেই ভজলোক ছিলেন একজন অত্যন্ত চালাক ব্যক্তি। সহসা তাঁর নাম ধরে ডাকার বোধ হয় তিনি সন্দেহই করে থাকবেন। ওদিকে ঐ বাড়ীর অস্ত্রাঙ্ক ভাড়াটিয়ারাও আমাদের বিশেষ আমল দিতে চান না বলেই মনে হল। অতঃপর ঘরের এক একটিকে এক একটি পরিবার বাস করে। কোন ঘরটিতে যে ঐ ভজলোক থাকেন তা প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। এদিকে আমাদের খোঁজা-খুঁজির বহর দেখে ভজলোকটিও হুত গা-ঢাকা দিরে সরে পড়তে পারেন। আমি তখন আর অপেক্ষা না করে ব্যস্ত হয়ে চৌকিরে উঠলাম, ‘আরে মশাইর ঠাড়িয়ে দেখছেন কি? ঐগ’গির অসুখ বাবুকে ডেকে দিন। আমি চিবুর বোড থেকে আসছি, তাঁর দোকানে আন্তন লেগেছে।’ আন্তন লাগার বাড়ী কানে বাওয়া মাত্র ভজলোকটি কোণের একটি ঘর থেকে নয় পদ ও গায়েই বেরিয়ে পড়ে বলে উঠলেন, ‘এ্যা; কি বললেন আন্তন লেগেছে?’ বলা বাহুল্য তিনি আঁথকে উঠে বেরিয়ে আসা মাত্রা আমরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে উঠলাম, ‘আজ্ঞে না আমরা পুলিশ। দেখুন তো, নেনেন ঐ উড়িয়া ভূতাতিকে?’ এরপর ভজলোকটিকে একজন পশ্চাদাগত সিপাহীর জিম্মা করে দিয়ে ভজলোকের কক্ষে ঢুকে তাঁর দ্বীকে বললাম, ‘আজ্ঞে, ভয়ের কিছু নেই। ঐ চোরটা এ সব কিছু না জানিয়েই একটা গহনা এঁকে বিক্রী করে গিয়েছে। গহনাটা আপুনি আপনার আলমারী থেকে বার করে দিন, তা’হলেই বা কিছু সন্তোষাল তা চুকে যাবে।’ এর পর আরও একটু ব্যুরিয়ে বলাতে ভজলোকের দ্বী গহনাটি তাঁর আলমারী থেকে বার করে এনে আমাদের হাতে ঐ বাটারই দুই জন সাক্ষীর সামনে তুলে দিয়েছিলেন।

এইখানে ভারতীয় পুলিশদের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানসহ সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় পুলিশ জ্ঞানে, প্রথমেই অপরাধীমত ব্যক্তিকে তার অপরাধ সন্দেহ জিজ্ঞাসা করলে কোনও কল হয় না। তার সহিত অপরাধের সম্পর্ক রহিত কথাবার্তা

প্রথমে বলা দরকার। এইরূপ কথাবার্তার মধ্যে তার মানসিক দুর্ভাবতা সন্দেহে জ্ঞাত হওয়ার পর তার চিত্তপ্রকৃতি (Predisposition) অনুযায়ী তার প্রতি প্রয়োজনীয় বাকাবিজ্ঞান প্রয়োগ করলে তবেই সে তার এক দুর্ভাব মুহুর্তে অপরাধ-সম্পর্কীয় এক স্বীকৃতি প্রদান করবে। ছ’ছাড়া ভারতীয় পুলিশ ইহাও অবগত আছে যে, ভারতীয় সমাজে কোনও কোনও পুরুষের অপরাধ-প্রবণ হলেও তাদের দ্বীরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ঘূর্ণাই করে এসেছে। এইজন্য এক শ্রেণীর অভ্যাস, অপরাধীরা তাদের আপন আপন দ্বীরা অজ্ঞাতেই অপকণ্ড করে থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীটির দ্বী সরল বিশ্বাসে এই ভাবে পুলিশকে সাহায্য করেছিল। অপরাধীটি তার দ্বীকে বধা সময়ে সাবধান করে দিতে পারলে অবশ্য সে এইরূপ সাহায্য পুলিশকে করত না। কারণ একজন ভারতীয় দ্বী স্বামীরা জীবন ও মান রক্ষার জন্য যে কোনও কার্য করতে প্রস্তুত। ইহাও ভারতীয়সমাজ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিক। এই কারণে প্রত্যাপন্যমতভাবে সহিত ঐ ব্যক্তিপুত্র তাঁর স্বামীকে অগ্রেই তাঁর দ্বীরা সম্মিহান হতে ঘুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে, যে রীতিতে ইঙ্গস্থানীয় পুলিশ তদন্ত করে সেই রীতিতে ভারতে তদন্ত-কার্য করা হয় নি। ইহার কারণ সন্দেহে ইতিপূর্বেই আমি বলেছি। এইজন্য ভারতীয় পুলিশকে অপরাধী ও তাদের গোষ্ঠীরদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি তো জানতে হয়েছেই, উপরন্তু ভারতীয় নিরাপরাধ সভ্য সমাজেরও রীতিনীতি সন্দেহে তাদের অবহিত হ’তে হয়েছে। কোনও অপরাধ সাংঘটিত হওয়া মাত্র তদন্ত-কার্য শুরু হলে ঘূরোপীয় বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ যে বিশেষ কার্যকরী তা’তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন বহু অপরাধ সাংঘটিত হয়েছে বাহার খবর পুলিশের কাছে ছরমাসের পর কিংবা এক বৎসর পরে পৌঁছিয়েছে। এই ক্ষেত্রে এমন কোনও সূত্রের সন্ধান প্রায়ই পাওয়া যায় নি বার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশের নিজস্ব তদন্তরীতিবই প্রয়োজন সর্বাধিক। তবে ভারতীয় পুলিশ বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল না হলেও প্রয়োজন মত তারা সকল ক্ষেত্রেই তদন্ত-কার্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পদ-চিহ্ন-শাস্ত্র এই দেশেরই প্রাচীন বংশায়ুগত টিটেকটিভগণ কর্তৃক সৃষ্ট। আঙ্গুলের টিপ-চিহ্ন শাস্ত্রও সর্বপ্রথম এই দেশে সৃষ্ট হয়ে এই দেশেই সর্বপ্রথম চালু করা হয়। বঙ্গীয় ফিসার প্রিন্ট ব্যুরো পৃথিবীর মধ্যে সর্বপেক্ষা প্রাচীনতম ব্যুরো। উক্ত বিজ্ঞানধর সহ, অশপদ্ধতি বিজ্ঞান, ফোরেনসিক শাস্ত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধ-তদন্ত সম্পর্কীয় আধুনিক বিজ্ঞান সমূহের সাহায্য অনুকালে ঘূরোপীয় পুলিশের দ্বারা ভারতীয় পুলিশও গ্রহণ করে থাকে। তবে তাদের এই সকল শাস্ত্রকে ভারতের উপযোগী করে টেলে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় পুলিশ তদন্ত-কার্যে নিজেদের মূল পদ্ধতি আজও হ্রাস করে নি। আমি এই কাহিনীসমূহে যে সকল বিখ্যাত মামলার তদন্ত ও উহাদের বিচারের কাহিনী বিবৃত করবো তাহাদের প্রায় সব করটির তদন্ত, অবিক ক্ষেত্রেই ভারতীয় নিজস্ব তদন্ত-পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে।

—আগামী সংখ্যায়—

পাগলা ইত্যাদি মামলা

চুপরিচালনাই বলুন, অনর্থক অভিনয়ই বলুন বা কলা-

কৌশলের চমৎকারিখই বলুন—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে

ছবি সাক্ষ্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে দর্শকদের ভাল লাগার উপর, দর্শকদের নির্বাচনের মধ্যেই ছবির সাক্ষ্যের চাবিকাঠি। সকল দিক দিয়ে ছবি পূর্ণ হওয়া সম্ভব যদি সে দর্শকদের দরবারে গৃহীত না হয়—ভেবে দেখুন তা হলে—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ছবি বার্থ। ঈশ্বরের কল্পনার কুমকুম দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সমাদর পেল—অভিজ্ঞ সমালোচকের দলও কুমকুমকে বৃত্ত:কৃত অভিনয়ন জানাতে কুঠাবোধ করলেন না। দর্শক-সমাজে ঠাকুরের আশীর্বাদে, বিপুল সমাদরে গৃহীত হ'ল কুমকুম। আমাদের জীবনকে বেঠান করে সেই একই করের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তাতে লাগে না কোন পরিবর্তনের হোঁচল।

বলতে বাধা নেই, সম্মান, খ্যাতি, বশ সেই সময়ের মধ্যেই আমি বা পেয়েছিলুম তা ধারণার অতীত, আমাকে দর্শক-সমাজ যে এত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তা আমি ইতঃপূর্বে ভাবতেই পারি নি। আমার মত একজন নগণা শিল্প-উপাসিকার প্রচেষ্টা যে দর্শক-সমাজকে তৃপ্তি দিতে পারবে—এ আমি সত্যি বলছি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি কিন্তু আজও বলতে পারি না কেন—কি কারণে—কি জন্তে—ওই সম্মান, ওই খ্যাতি, ওই বশ আমার মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া সকার করতে পারে নি, খুব যে আশয় আকর্ষণ করেছে তাও মনে হয় নি, আমার মনে খুব একটা বোধগাত করতে পেরেছে বলেও বোধ হয় না, কিন্তু দর্শকের মহাত্ম্যের উপর আমার সুগভীর আস্থা তাতে নিম্নমাত্র কমে যায় নি, আমার সম্বন্ধে দর্শকের সুচিন্তিত মহাত্ম্য আমি আশীর্বাদের নামান্তর বলেই ভেবে এসেছি। বৈচিত্র্যের মধ্যেই জগতের সৌন্দর্য, এ-ও বোধ হয় সেই শাস্ত্র সত্যের একটি উদাহরণ বিশেষ। আজ প্রৌঢ়ের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করবে কিছুতে আমার বোধগম্য হচ্ছে না কেন সেদিন সাধারণের দেওয়া সম্মান আমার মনে বোধগাত করতে পারে নি, এই রহস্যের সূক্ষ্মজ্ঞান এখনও আমার মন মাকে মাকে যেতে গুঁটে। নিজেকে সরিয়ে রাখার স্পৃহা আমার বাল্যকাল থেকে, এক কথার চিরকাল যে কোন ব্যাপারে নিজে সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ভিত থেকে, ওতঃপ্রোত ভাবে তার সঙ্গে মিশে থেকে আশ্চর্য ভাবে নিজেকে তারই মধ্যে থেকে আবার সরিয়ে রাখা আমার স্বভাবই বলুন ইচ্ছাই বলুন বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলুন। সার্বিক চকলতাও এর জন্তে কম দায়ী—এমন কথাও জোর দিয়ে আমি বলতে পারি না; বোধ হয় সেই জন্তেই আমার মনে হয়, সাধারণ দর্শক আমাকে সরিয়ে খুব বেশী একটা দেখতে পেলেন না। বক্তৃকনের 'সিগিন্স থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার স্পৃহা আমার মধ্যে ছিল সর্ঘসিক, আর সেই স্পৃহার বিকাশে বখেট পরিমাণে সত্যরক্তিক করল আমার সার্বিক চকলতা-বোধ। আমাকে ধীরা স্নেহ করেন, আমার ধীরা শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার অভিনয়ের ধীরা উৎসাহজ্ঞা, এই সাধারণের মাঝখানে নিজেকে মিশিয়ে দেবার অজস্র সুযোগ এসেছে আমার জীবনে, বিভিন্ন অস্থান উপলব্ধ করে বিভিন্ন স্থান থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাংক্ অজস্র আমন্ত্রণ এসেছে আমার কাছে, জানি না সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার মন উদ্বুদ্ধ হয়েছে কি না। তবে এটুকু বেশ জানি যে যদি বা কখনও সাধারণের আমন্ত্রণে আমি সাজা



যথপট

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

দিতে গেছি সঙ্গে সঙ্গে আমার কঠোর করেছি আমার আলাল-লালিত নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার স্পৃহা। আমার মধ্যে বিশেষভাবে তখন জেগে উঠল এক অস্বাভাবিক সার্বিক চাকলা-বোধ। কিন্তু সেদিনের আমার সঙ্গে আজকের আমার আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ধ্যান ধারণা, চিন্তা কল্পনা, স্বপ্ন সৃষ্টি, ভাবতলীর দিক দিয়েও সেদিনকার সাধনার সঙ্গে আজকের সাধনার কোনও মিলই পাওয়া যায় না, আজকের সাধনার কাছে সেদিনের সাধনা শুধু স্মৃতি শুধু ইতিহাস, শুধু পিছনে কেল আশা বৃণ তাই সেদিনকার সাধনার এই আচরণ আজকের সাধনার মনে জন্ম দেয় এক অরণীর অশ্রুশোচন্য, আজকের সাধনা ভাবছে যে সেদিনকার সাধনার এই আচরণ বোকামি ছাড়া কিছুই নয়, জাতির পরিচায়ক সেদিনকার সাধনার সেই আচরণের জন্তে আজকের সাধনা সবিসেব অস্থতপ্ত। সত্যি কি ভুলই না করেছি তখন? আজ তার জন্তে অহুকাপ করছি, কিন্তু এই অহুকাপের পূর্বাভাস যদি সেদিন পেতুম এবং সেই অহুসায়ে যদি চলেতে থাকতুম তা হলে নিশ্চয়ই আজ আমাকে বেচনার বাণে বিদ্ধ হতে হোত না। এই প্রসঙ্গ আজ সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে বাবাকে "Chautaux Marine" এ সে সময়ে তিনি আমাদের কাছেই ছিলেন। সাধারণ্যে আমি যাতে বখেট মেলামেশা করতে পারি সেজন্তে বাবার সে কি আগ্রহ, কি তৎপরতা, কি ব্যাকুলতা বা জাবলে আজ হুঁচোখ দিয়ে ক্রমাগত জলের ধারা নামতে থাকে। আমার বেশ মনে আছে, সাধারণ্যে মেলামেশার বাসনা আমার মনের মধ্যে দুর্ভাব্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত বাবা প্রোহই বলতেন, "পেইশনমেটস আর ত ওয়াসট মিনাটক ওয়ান কুড মেক সাধনা"—শুধু মনে আছে বললেই ভুল হয় কথাটি যেন কর্কটরূপে চিরকালের জন্তে হারিছ নিচ্ছে।

আমার প্রকৃতির একটি দিকের হারোপাটন করলুম আপনাদের সামনে কিন্তু আমার সর্নির্ভক অহুকাপ এই বিবরণী থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে আমি মিথ্যক নই। সাধারণ্যে মেলামেশা করতে

আমি একোচবোধ করতুম কিন্তু তাই বলে এ ধারণাও আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় যে, লোকের সঙ্গে আমি মিশতুম না। তবে কি জানেন, সবই একটা নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে। রামায়ণ মনে করুন, গণ্ডীর মধ্যে সীতার পরম শাস্তি কোন ভর নেই, যেমন ভাবে ইচ্ছে চলাফেরা করতে পারেন, গণ্ডীর বাইরে পা দিয়েছেন কি সাম্প্রতিক বিশপ, আমার বেলারও কথাটা নেহাৎ অপ্রযোজ্য নয়। আমার বন্ধু-বান্ধবী জনেকেই ছিলেন, সখ্যার দিক থেকেও তাঁরা নগণ্য নন, তাঁদের সঙ্গে আমার মেলামেশাও ছিল যেমনই গণ্ডীর তেমনই নিবিড়। কিন্তু এ যে আগেই বলেছি—গণ্ডী—সবই সেই সীমার মধ্যে, সীমা অতিক্রমণ ভো বাস অমনি সঙ্গে সঙ্গে

রাজ্যের সত্ত্বাচের সজবন্ধ অক্রমণ। সেই বন্ধুদের কথাও কি আজ কম মনে পড়ছে, তাঁদের কেন্দ্র করে কতগুলো দিন যে কি আনন্দের মধ্যে কেটেছে তা বক্ত ভাবছি অলস মুহূর্তগুলো যেন তত ভাবক্রান্ত হয়ে উঠছে। তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে, তাঁরা তো আজ সর্বপ্রকার ধরা-ছোঁওরা, আসা-যাওয়া, যোগাযোগের উর্ধ্বে, তবে ধীরে আস্তে ইহলোকে বর্তমান সেই সব দিনগুলোর সাক্ষী হিসেবে—কালের চক্রে তাঁরা কে কোথায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছেন তার না আছে ঠিকানা, না আছে নিশানা না আছে সঠিক স্থান।

Chautaux Marine এ আমার ছাড়া চিত্তজগতের আরও বহু জন বাস করতেন। প্রখ্যাত প্রযোজক পরিচালক মিঃ কার্ণার,

স্বনামধন্য গায়িকা ও অন্ততম প্রথম মহিলা প্রযোজিকা পরিচালিকা জদন বাদ্যের নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আর ধাঁ-ধাঁ এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা 'বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। একটি মেয়ের কথা, তখন সে বালিকামাত্র, কৈশোরের স্বারপ্রাচ্য উপনীত। সবুজের দিকে মুখ করা আমার বারান্দা থেকে সেই ফ্রক পরা মেয়েটিকে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে প্রায়ই খেলতে দেখতুম। সে দুঃখ তো আমার চোখে সামনে ভাসছে। তার নাম উল্লেখ করা মাত্রই আপনারা তাকে চিনতে পারবেন, কারণ চলচ্চিত্র-জগতের একজন প্রথম স্ত্রীমুখ অভিনেত্রী হিসেবে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও আজ সে সুপরিচিত। পুরোজা জদন বাদ্যের মেয়ে সে। তার নাম স্মৃতি নাগসিং। [ক্রমশঃ]

অনুবাদ—কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর সংসার

দিকপাল সাহিত্যশিল্পী বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিধর্মী লেখনীর অনবদ্য নিদর্শন অপূ-কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে এইবার সমাপ্তির রেখা পড়ল। অপূর সাত্ত্ববিরোধ পূর্ববর্তী ছবি অপরাধজ্ঞাতে দেখান হয়েছে। এখানে, এই ছবিতে ছবির প্রথমভাগে টালি অঞ্চলে এক ভাড়টে বাড়ীর অন্তর বাসিন্দা, জীবিকাধর্মী এবং গৃহস্থানীর শিকার হিসেবে অপূকে দেখানো হচ্ছে পরবর্তী অংশে দেখছি বন্ধু প্রথমে এক বোনের বিবাহোপলক্ষে বন্ধুর সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে অপূ গেল ও ঘটনাচক্রে পাত্রীকে সেই বিয়ে করে নিয়ে গেল—এবং ওক হ'ল তাদের যুগ্মর দাম্পত্যজীবন, তারও [পরবর্তী অংশে দেখছি সন্তানের জন্ম দিয়ে

এসিয়ান ফিল্মস্-এর নিবেদন



উত্তম-সাবিত্রী



অভিনীত



গলি থেকে রাজপথ

সংযোজক

অনুপ-ছবি বিশ্বাস-বিকাশ রায়-জহর রায়
তুলসী চক্রবর্তী-হায়া দেবী-দুর্গা-হেলেন

পরিচালনা—প্রমুদ চক্রবর্তী • সঙ্গীত—সুধীন দাসগুপ্ত

গীত পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড পটভূমিকা

রূপবাণী - অরুণা - ভারতীতে

পরবর্তী আকর্ষণ!

অর্ণণার সৌক্যবাহিতা ও সেই সবাদে অর্ণণর মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়, এবং সে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে, বহুর নীচে বাদে অনেক অল্পসংখ্যক করে প্রণব তাকে খুঁজে পায় বহু দূরে কোন একটি স্থানে উপাসনর অর্ণকে, অর্ণণর "বৃষমণ্ডল তখন নৌক-নাড়িতে ভর্তি। পুত্রের সবকে অর্ণণ বেন কেবলমাত্র টাকা পাঠিয়েই থালাস। অর্ণণার মৃত্যুর জন্তে পুত্রকেই সে দায়ী করে, প্রণব বুঝ দক্ষতার সঙ্গে অর্ণণ-নন্দন কালস সবকে অর্ণণ চেতনার গভীরে ঘা মারে; সর্বশেষ অর্ণণ দেখছি যতদূর অর্ণণ আগমন ও অনেক মানবীর পরমা পলায়নপর পুত্রের সঙ্গে পিতার বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন ও পুত্রকে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে অর্ণণর যাত্রা।

অর্ণণ-কাহিনীর অমর প্রভা বিভূতিভূষণের লেখনীজাত একটি দাঁটন আজ বার বার আমাদের মনে পড়ছে—“গতিই জীবন, গতির নৈশই মৃত্যু”—বঁারাই তাঁর কাছে স্বাক্ষরের জন্তে খাতা পেশ করতেন তাঁদের প্রত্যেকের খাতাতেই (আমরা বতদূর জানি) বিভূতিভূষণ এই কথাটিই লিখে দিতেন। গতির উপাসক বিভূতিভূষণের অজন্তম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির পরিণতি-অধারের চিত্রায়ণে গতির অভাব যে কল্পধানি ব্যাপক ভাবে ঘটেছে পারে, তা বলে বোঝানো যায় না। তবে সে বিষয়ে বঁারা মনে মনে জিজ্ঞাসা পোষণ করেন, “অর্ণণর সংসার” তাঁদের সেই জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ উত্তর। সীলা কই? অর্ণণ যে চরিত্রের বিভূতিভূষণ রূপ দিয়েছেন, সেই চরিত্রের সার্বক বিশাশে সীলার আবির্ভাব অর্ণণহারা, সীলাকে বাদ দেওয়ার ফলে অর্ণণ-চরিত্রের সম্যক প্রকৃষ্ট অসম্পূর্ণ, অর্ণণ-চরিত্রে সীলার প্রভাব অসামান্য। অর্ণণ-চরিত্রের উপর সবচেয়ে অবিচার করা হয়েছে অর্ণণকে নিয়ে এই চড়াই মারিয়ে। এই পরিবেশে চড়াই মারানোর ফলে হবির গুরুত্ব, সন্তম, মধীলা যে ভাসের ঘরের মত খুলিলাং হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারে? চিত্রপরিচালক ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের আর একটি পরিচয় আছে তিনি শিল্পী, শিল্পমনের অধিকারী একজন শিল্পীর দ্বারা এ জিনিষ যে কি করে সম্ভব হ’ল স্বীকার করছি সত্যিই তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। প্রহারকে যদি শেকের অভিযুক্তি বলে মেনে নিতে হয় তা হ’লে সব চেয়ে অপমান করা হয় মাছের আত্ম-অভিযুক্তি। পৃথিবীর মধ্যে অর্ণণর সব চেয়ে প্রিয় অর্ণণ। তার মৃত্যু অর্ণণর কাছে নিজের মৃত্যুরই ন্যায়স্তর। সচরাচর মনুষ্যসমাজে আমরা দেখে থাকি যে এই অবস্থার, আকস্মিকভাবে এই সবাদ প্রবণে মাছের হতবাক হয়ে পাখরের মত হ’য়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অবশ হ’য়ে যায়—সে হ’য়ে যায় বিমূঢ়, প্রাণ খুলে তখন সে কীভাবে পাবে না—সে অবস্থার তার মনে প্রহার-প্রবৃত্তির উন্নয়ন অস্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, ট্রেনে অর্ণণর কাছে অর্ণণার শেষ বিদায়ভূতি পরিকল্পনা ও পরিবেশন স্বয়ংকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। এই ভূতটিকে সাক্ষ্যের স্বাক্ষর বলা যায়।

সত্যজিৎ রায় প্রমোদিত—পরিচালিত এই ছবিতে সুরকাররূপে দেখা গেল পণ্ডিত রবিশঙ্করকে আলোকচিত্র গ্রহণে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন সুরত মিত্র। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন আমরা জানাই।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকার উন্নয়ন শিল্পীরাই এই প্রথম চিত্রাবতরণ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপভাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাওলি হাওয়ার উদ্দেশ্যে দেওয়ার দৃষ্টে অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর চড়া মারার দৃষ্টে অভিনয়ে সব চেয়ে ব্যর্থতা বরণ করলেন সৌমিত্র। এই দৃষ্টান্তে তাঁর অভিনয় জতি পীড়াদায়ক আর বশেষে কৃত্রিমতাসোধে ছুট। অর্ণণার ভূমিকার রূপ দিয়েছেন শমিলা ঠাকুর, প্রণবের ভূমিকার নবগত স্বপন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিনয় করে চরিত্রটির মধীলা অল্প পেয়েছেন। এছাড়া বীরেন ঘোষ, বীরেশ মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, শেখালিকা, বেলারীণী, আশা প্রভৃতি শিল্পীদের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে। ছবিটি নায়কপ্রধান এবং ছবিটিকে one man show বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষুধার পাঁচ শ’ সাত রজনী অভিক্রম

বাঙলাদেশে একটি নাটকের পেশাদারী ভাবে একটানা মঞ্চাভিনয়ের সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করল “ক্ষুধা” অল্পকাল আগে পাঁচ শ’ সাত অভিনয়-রাত্রির অভিক্রমশে। এর আগে আর কোন নাটক একই মঞ্চ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এককাল ধরে একটানা অভিনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নি। সে জন্তে ক্ষুধার সাফল্য নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এই উপলক্ষে বিবরণার এক প্রীতি উৎসবের সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অঙ্কুরত করেন বখাফ্রমে রত্না শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও পৌরপ্রধান শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চস্থানে বক্তৃতা করেন প্রত্নাভাষন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, শ্রীঅরীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীহেমেন্দ্র গাঙ্গুল। সভাশ্রেষ্ঠ অভিনয় গুরু হয়। এই দিনে এই উৎসব উপলক্ষে বিবরণার সাহিত্য জগতের, অভিনয় জগতের ও মহানগরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থবীর আগমন ঘটেছিল। অল্পস্থানে বিবরণার অজন্তম কর্ণধার শ্রীরাশবিহারী সরকার সকলকে বাগত জানান ও অভ্যাগতদের প্রতি বশেষে বক্তৃতা করেন। এই অল্পস্থানের কয়েক দিন পরে বিবরণার চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষেও এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হয় সেদিন সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে দেখা গিয়েছিল বখাফ্রমে শ্রীঅরীন্দ্র চৌধুরীকে ও শ্রীশচীন মিত্রকে। ক্ষুধা নাটকটিকে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি সেই জন্তেই এবার বিশদ আলোচনা থেকে বিয়ত রইলুম। তবে এক কথা বার বার বলি—ক্ষুধার মত যুগোপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ নাটকের জয়যাত্রা পরোক্ষ ভাবে জাতীয় জয়যাত্রা। সংস্কৃতির পুজারী বাঙালী উচ্চশ্রেণীর এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোপহার আবেদনে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন না, ক্ষুধার বিজয়বৈজয়ভীই প্রমাণ। বাঙালীর জাতীয় জীবনের কল্যাণকর ক্ষুধা, অজ্ঞানিহিত বক্তব্য আবেদন ও আদর্শ এবং কর্তৃপক্ষের শুভপ্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যপূর্ণ ও জয়যুক্ত হোক—সর্বাঙ্গীন ভাবে আমরা এই কামনাই করি।

“বর্ষ অল্পবয়সে—অল্পস্থানে নহে। স্বপ্নের পশ্চিম ও অগণিত প্রেমই ধর্ম।”

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ফাঁকি।

“পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যবাণী হবতালের প্রতি সহায়ত্বিত
জানাইয়া মন্ত্রীরা কি গত বৃহস্পতিবার হরতাল পালন
করিয়াছিলেন? রাষ্ট্র-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে কেহই প্রায় ঐ দিন
নিজ নিজ দপ্তরে আসেন নাই। মন্ত্রীদের মধ্যেও অধিকাংশ অনুপস্থিত
ছিলেন; কয়েকজন আবার একবার করিয়া হাজিরা দিয়া চলিয়া
গিয়াছিলেন। একমাত্র পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকালীন্দ্র
মুখোপাধ্যায় বধারীতি দপ্তরে হাজির ছিলেন। একা কুন্তের উপর
নতল ব্রিগিড বন্ধার ভার পড়িয়াছিল কেন কে বলিলে? অন্ততঃ
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অবস্থার কোন কারণ ব্যাখ্যা করিতে
পারেন নাই। অনেকে বলিতেছেন, অবস্থা অনেকটা ‘যাযুজ গেল
ঘর তো লাভল তুলে ধর’ গোছে। কষ্টা দিল্লী, তাই কাজে
ফাঁকি দিবার লোভ কেহই নাকি সামলাইতে পারেন নাই।”

—দৈনিক বহুমতী।

উপদেশামৃত

“কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম গয়া রাজেন্দ্র-শ্রাস্ত্রমে
কংগ্রেসকর্মীদের এক সভার বক্তৃতাকালে বলেন, কংগ্রেসকর্মীদের
উচিত, অপরের দোষ দেখানোর চেয়ে নিজদের দোষ সন্শোধনই
বেশী অবহিত হওয়া। কেননা, তাঁহার মতে, সরকারী মহল
অপেক্ষা অনেক কংগ্রেসী আছেন, বাহারা লশগণ বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত।
শ্রীজগজীবন রামের এই ভাবের লক্ষ্য কাহারো জানি না।
নিশ্চয় তিনি এই হিতবাক্য কোলা কংগ্রেসীদের উদ্দেশে বলেন
নাই। আর সরকারী মহলের তুলনায় যে কংগ্রেসীদের মধ্যে
তিনি লশগণ দুর্নীতিপরায়ণতার সন্ধান পাইয়াছেন, নিশ্চয় সে
তালিকার তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ধরেন নাই। প্রকৃষ্ট সমালোচনা
ত তাহাকেই বলে, বাহা সংশ্লিষ্ট মহল ছাড়া আর সকলেরই
চরভেদ করে।”

—যুগান্তর।

জনকল্যাণী সরকার

“উপর হইতে দেখিলে দীর্ঘ নিম্নস্বংস, কিন্তু তাহার তলার
শৈবালদায় প্রচুর থাকে, অনেক পক্ষ, পিছল রেন। সমাজেরও
অনুগ্র-গোপন স্তরে স্তরে অনেক গ্রানি, বন্ধনা আর বিভ্রম, ইত্যাশা
আর পাণ জমিয়া আছে, আমরা সব সময় টের পাই না। দীর্ঘিতে
মাঝে মাঝে বৃহৎ সূত্রিয়া উঠে, তাহার অন্ধকার অন্তঃস্বলের ধবর দিয়া
চকিতে মিসাইয়া যায়। সমাজজীবনের ও নীচের মহলের দুই-একটা
ধবর জানা-জানি হইয়া আমাদের চকিত বা স্তম্ভিত করিয়া তোলে।
কেহ দিভার দেয়, কেহ লীধ্বাস ফেলে। কর্তব্যের ওইখানেই শেষ।
মীরা মুখোপাধ্যায় নামে এক রমণীর বে কাহিনী গত বৃহস্পতিবার
আমাদেতে শুনা গিয়াছে, তাহা লাহনা ও বন্ধনার ইতিহাস।

আপাতদৃষ্টিতে কল্লিনী এই নারী মহানগরে এক যুগ পরিবেশে
উচ্ছ্বল আচরণের দ্বারা অভিযুক্ত হয়। আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে
গিয়া সে কি ভাবে তাহার স্বামী তাহাকে তাগ করিয়াছে, তাহার
মর্মস্পর্শী বিবরণ দেয়। দুই নাবালক পুত্রের ভরণপোষণের লব্ধই
তাহাকে লজ্জাকর জীবন বাপন করিতে হইয়াছে, সে কথা সে অকপট
বলে। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।
কিন্তু কাহিনী একা মীরা মুখোপাধ্যায়ের নয়, কলিকাতার ইষ্টের
পাঁজরে আর রাজপথের পাথরে এমনই বহু স্বামি-পরিত্যক্তা নারীর
করণ কাহা হস্ত চাপা পড়িয়া আছে। ইহারা বিবপান করিয়াছে,
কিন্তু নীলকণ্ঠ হইতে পারে নাই, অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া আমাদের
সমাজবাবুস্বায় যে বিরাত একটা ফাঁক আছে, তাহা দেখাইয়া দিচ্ছে।
মীরা মুখোপাধ্যায়কে যে বিচারক মুক্তি দিয়াছেন তিনিও বলিয়াছেন,
পাণপথ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ সে হয়ত খুঁজিয়া পাইবে না।
বিচারকের এই আশঙ্কাকে মিথ্যা করিয়া তোলায় দায়িত্ব সমাজের
এবং সরকারের, জনকল্যাণের ভার বাঁহারা লইয়াছেন।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

হুঁসিয়ার

“কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এই ভাবে শ্রীনেহরু মাহুয়ের মন
তৈরী করার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে ভারতের গণতন্ত্র ও
সংবিধানকে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আঘাত করিতে চায় তাহাই
সাহায্য করা হয় মাত্র এবং শ্রীনেহরুর উপরেও এই আঘাত যে পড়িবে
তাহা তিনি ভুলিয়া বাইতেছেন অথবা তিনি স্বেচ্ছায় ভারতের
রাজনীতিতে এই হুঁদৈব ডাকিয়া কানিতেছেন। কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষের
ফলে শ্রীনেহরু নিজহাতে এই ভাবে ফ্রান্সেনষ্টাইন তৈরী করিতেছেন।
তাই আমরা বলি, পরিস্থিতি অতীব জটিল করিয়া তোলা হইতেছে।
অবস্থা আরও ভাবিতে চলিয়া বাইবার পূর্বেই শ্রীনেহরু ও কংগ্রেস
হাইকমান্ডকে আমরা হুঁসিয়ার হইতে বলি। আপনাদের নিজদের
তৈরী সংবিধানকে, আপনাদের নিজদের প্রতিক্রিয় গণতান্ত্রিক
পদ্ধতিকে নিজহাতে আঘাত করার পথ আপনারা পরিত্যাগ করুন—
ইহাই আজ সমগ্র ভারতের দাবী।”

—স্বাধীনতা।

কেরলে কংগ্রেস

“সংবাদে প্রকাশ, কেরলে শিকা বিল নিয়ে অশান্তির স্রষ্টা
হয়েছে। এই অশান্তিতে কংগ্রেস, পি, এস, পি, মুসলিম লীগ ও
ক্যাথলিক দল অংশ গ্রহণ করেছে। বিলের উপকারিতা বা
অপকারিতা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। কারণ একদল
এটাকে ভাল মনে করে দেশের মঙ্গলের জন্য এই আইন চালু
করতে চলেছে। অপর দল এটাকে মন্দ বলে আইন চালু না করার
জন্য কমিউনিষ্ট সরকারকে চাপ দিচ্ছে। তারা বুঝে এটা
চালু হলে দেশের চরম সর্বনাশ হবে ইত্যাদি। আজ সব চেয়ে
আশঙ্ক্যের বিষয় হয়েছে কংগ্রেস কেরলে মুসলিম লীগ ও ক্যাথলিক
দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে। বর্ধের উপর ভিত্তি
করে দাঁড়িয়ে আছে বাহা বর্ধের শোহাই বিদে তারা ভারতের চরম
সর্বনাশ করেছে। তাদের সঙ্গে হাত মিলাবার কথা কংগ্রেসীদের
নয়। কংগ্রেস বর্ধনিরপেক্ষ দল। মুসলিম লীগ চার ভারতের
ভিতরে খোঁলমাল লাগিয়ে অশান্তির স্রষ্টা করে কোন পুণোপ
ঘটিয়ে নিতে। যে প্রতিক্রিয়া ভারতের বুকে মাহুয় হয়ে ভারতের

অরুণে বড় হরোছে সেই প্রতিষ্ঠান ভারতের বৃক্কে ছুরি বসিয়ে বিভক্ত করেছে। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রতি বেইমানী করেছে, সেই বেইমানীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন চালাচ্ছে না নিজের খেয়াল-খুশি মত তারা কাজ করছে, সেটা জানবার বিষয়। যদি নির্দেশ না নিয়ে তারা এই আন্দোলন চালাচ্ছে তবে তাদের কাছে কৈফিয়ৎ করা হোক, কেন তারা বেইমানীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে।”

—গ্রামের কথা (দুবরাজপুর)

খাতসঙ্কট

“করক বৎসরের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতার দেখা গিয়াছে যে এদেশে অজ্ঞা বা শত্ৰুহানি স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে অথচ খাত-সঙ্কটের স্থায়ী প্রতিকার পাওয়া বাইতেছে না এবং বাঁহারা উৎপাদক তাঁহারা ই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছেন। জমির মালিক আজ রাষ্ট্র বা সরকার। সরকার যেমন তাঁহার অধীনস্থ চাকুরিদের মাহিনা ছাড়াও তবিবাতের আপদ বিপদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন অল্পরূপভাবে খাত বা খাত উৎপাদকদের জন্যও প্রতি গ্রামে প্রভিডেন্ট গোলা বা সঙ্কটগ্রাণ গোলা স্থাপন করত উৎপাদকদিগকে আপদ বিপদে রক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। প্রতি গ্রামে উৎপাদকদের জন্য প্রভিডেন্ট বণ্ডশ্রুণ স্থায়ী ধর্ম বা সর্বোদয় গোলা বা সঙ্কটগ্রাণ গোলা স্থাপিত হইল ও উৎপাদকরাই খাতসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে না, তদ্বারা পল্লীর অভ্যন্তরীণ খাতসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে।”

—প্রাণাণ (মেদিনীপুর)

জানিতে চাহি

“পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য হরিজন সম্মেলনের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ আদান বোধ করিতেছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানে স্থানে গ্রাম্য যাতসরগণ এখনও তাহাদের পূর্ব-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া হরিজনদের উপর নির্ভর্যতন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও সরকারী কর্মচারিগণের অসহায়তার ফলে অজ্ঞ হরিজন ভোটারগণের ভোট লইয়া নানারূপ কারসাজি করা হইয়াছে। রাজনৈতিক দলের দ্বারা পড়িয়া দলীয় প্রচারে সাহায্য করা হইয়াছে ও পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া বাইতেছে। গুজরা, খাঁড়গ্রাম ও ভাতাড় শ্রামীর নারায়ণপুর হইতে এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ আযোগ অসামান্য সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহাই আমরা জানিতে চাই।”

—বর্ধমান।

সত্যের অপলাপ

“বকরি ঈদ ১৮ই জুন বৃহস্পতিবার। এই ঈদ উপলক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে যে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন পড়িবে যদি কোন দোকানী ইচ্ছা করেন তিনি ঐ দিন খুলিয়া ঈদের সওয়া সাধারণে সরবরাহ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে বর্তমান বৎসরের ঈদের বিবতি

লইতে মুসলিম হইতে বহু হিন্দু দোকানীরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। আবার কলিকাতায় বর্তমান দোকানীরা ঈদের বিবতি নাম করিয়া ‘জামাইবৎসর’ মনস্তম্ভের এক দফা কেনাবেচা করিয়া লইয়াছেন। ঈদের প্রতি প্রচার দোহাই দিয়া জামাইবৎসর জন্য ছুটির দিনে দোকান খুলিয়া সাধারণের গাঁটের পরগা শোষণ করিয়া লইবার দোকানীদের এই কপি একেবারে নূতন! দোকান আইনের নিয়মাবলীর বিধান জামাইবৎসর জন্য কোন বিবতি নাই। কাজেই বকরি ঈদের দোহাই দিয়া জামাইবৎসর বিবতি লইয়া দোকান খুলিয়া কেনাবেচা করা কত অপমান বা সত্যের অপলাপ সাধিত হইয়াছে, ইহা ধারা এই কণ্ড করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে সকলেই জানেন যে ঈদের নাম করিয়া জনসাধারণ ও শ্রমিক ঠাকুরাণের বিরুদ্ধে অজ্ঞত মারাজাল বিস্তার করিয়া সাধারণের চোখে ধূলা দিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ বলা বাইতে পারে ধারা ঈদের নামে জামাইবৎসর করিয়াছে তাঁরা ঈদের পূর্বদিন বা ঈদের দিনে দোকান খুলিবেন না। কারণ তারা সরকারী খতে লিখিয়া দিয়াছেন পরবর্তী সপ্তাহে ছুটির সাত পূর্বের কতিপয় ছুটি অবসর কর্মচারিগণকে দিবেন। বাঁহারা বিবতি লইয়া আসেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মালিক বিবতিতে অতিরিক্ত খাটুনির মজুরী বা ছুটি শ্রমিকগণকে দেন না। এবং ঐ সব আদায় করা যে বিধান আছে তাহা সম্পূর্ণ অচল ও মালিকের অঙ্কুল। এই অপকোশল বন্ধ হওয়া সঙ্গত।”

—দোকান-শ্রমিক (কলিকাতা)।

পরীক্ষার অপূরণীয় অপচয়

“গতবার আই-এ পরীক্ষার শতকরা ৫১জন পাস হইয়াছিল। এবার শতকরা ৬২জনকে ফেল করান হইয়াছে। পাশাপাশি আই-এস-সি পরীক্ষার হার কিন্তু ৫১জন। কে ইহার রহস্য ভেদ করিবে? ছেলেরা না পড়িলেও পাস করা হইতে হইবে, এমন কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু ছুই বৎসর কাল খরচ বহনের পর এই শোচনীয় ফলের জন্য কৈফিয়ৎ দাবী সকলেই করিতে পারেন। শিক্ষার্থীর বিষয়, ইহাদের পাসের যোগ্য বলিয়া যে সব প্রকেষার সুপারিশ করেন, এবং যে সব প্রিন্সিপাল টেট পরীক্ষাতে ইহাদের উপযুক্ত বলিয়া ছাড়পত্র দেন, তাহাদের শতকরা ৬২জন ফেল হয় কেমন করিয়া? একথার কোনই জবাব নাই। কাইয়াল পরীক্ষার তো কলেজের এই সব প্রকেষার ও প্রিন্সিপাল মহাশয়েরাই খাতা দেখেন। টেটে তাহারা বাহাদের উপযুক্ত সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, হু-এক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রম হইতে পারে, কিন্তু শতকরা ৬২জন লক্ষ্যেই বা তাহাদের মারাত্মক তুল হইয়াছিল কি করিয়া? আর যদি তাহারা টেটে অল্পযুক্তই ঠাকুরাইয়া থাকেন, তবে তো না পাঠাইলেই অভিভাবকের আর সমধিক অর্থও হইত না? আচ্ছা যদি কর্তৃপক্ষের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম দেখাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তো পরীক্ষার্থী নির্বাচনের পূর্বেই কতক আটকানো উচিত। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়েরও দুর্নাম বন্ধ হয়, অভিভাবকদেরও অপূরণীয় অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ দিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া চাকরলা বিভাগের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হস্তা কি ঠিক? পেটের ভাতের জন্য বিজ্ঞানের চাহিদা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু জাতির মর্যাদার জন্য সাহিত্য ও

সত্যতির দিকটা উপেক্ষা করা যায় না। তা'হাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী সম্ভা বস দিন না বাড়িতেছে, তত দিন এরিকে উপেক্ষা বৃদ্ধি থুই কৃত্তিকর নহে কি? সমাজ আজ অস্বাভাব্যে মুখু। অস্তিত্ববোধের অস্তিকষ্টে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ জোগাইতেছেন।

—পল্লীবাসী (কালনা)

সেটেলমেন্ট

“কৃষিপ্রধান অঞ্চল আমাদের এই মহকুমায় জমিজমার মালিকানা স্বত্বাধ্ব সাধারণের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, জীবন-মরণ সমস্তা পর্যায়ভুক্ত বলিলেও চলে। এ-হেন বিভাগের কার্যকলাপ আরম্ভ হইতে বেন এক তীব্র অবদোবস্ত রাজত্বের কাণ্ড কারখানার মতই চলিতেছে। এরকম মাছুষ এতদেশে বোধ হয় বুজিয়া পাওয়া বাইবে না যে এই ত্রিতাপনক সংসারে সেটেলমেন্টের খর তাপে তাপিত হইয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ করেন নাই। মাঠের কার্যারম্ভ হইতে ধারার পর ধারার কার্যক্রমে অতিক্রম করিতে করিতে এখন ৪৪ ধারা ও ৪৪:১ ধারার ও ৪৪:২ ধারার বিচার ব্যাপার এমনভাবে হইতেছে যে জনসাধারণ উহাকে অজ্ঞানতার মতই মনে করিতেছে। বিশেষ ঐ ধারার বিচার কালের নোটিশ জারি ও নকল পাওয়ার ব্যাপার নাকি অসহনীয় অবস্থার উল্লেখকর। প্রকাশ, নকল পাইতে ২১ মাস বা ততোধিক সময়ও প্রায় লাগিয়া যায়। আর সে নকল যদি জেলার হইত ২৩ মাস বা ততোধিক সময়ও যায়। জরুরি কি দিয়া ও তথিরে মাসাধিক সময়ের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা হয়। সাধারণের ধারণা বহুদামত অনর্থক অর্থব্যয় জন্ম, ধামের জমি জামের নামে বা কমবেশী করা হইয়াছে এবং পিতা-পুত্রের পদবী তুল লেখা হইয়াছে, ইত্যাকার কার্যাদিও বাহা অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করা বাইতে পারে তাহার জ্ঞাতও পক্ষ সাধারণকে প্রায় ইচ্ছাকৃত ভাবে একাধিক বার হায়রাণ হইতে বাধ্য করা হয় যে তাহা সম্ভাব্যীত-প্রায়। এমনি ঘটনার ব্যুৎপত্তি আছে যে, প্রথমে বা সরজমিনে যে নাম বা বাহা লেখা হইয়াছিল তাহার রদবদল হইয়াছে বা খাতার পাতাটাই বদল হইয়া গিয়াছে কোন অজ্ঞাত ব্যবস্থার হস্তস্পর্শে। সর্বোপরি আছে পুত্রের চুরির মত কথা। কাঁধি অফিস হইতে গোটা দুই হাতে লেখা বেকর্ড ভলিউম উধাওর কথা, বাহা লোকে বিশ্বাসই করিতে চায় না, প্রকাশ তাহা সম্ভাব্য হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে এই বিভাগে কি দুর্নীতির ব্যাপার চলিতেছে ও কত দুর্নীতিপরিমাণ লোক ইহার মধ্যে বহিয়াছে। সেইজন্য মনে হয়, বিভাগের কর্ত্তব্যচারী অধিকাংশই কি নিজেদের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন?”

—নারায়ণ (কাঁধি)

পাঠ্যপুস্তক ও ব্যবসা

“এ বৎসর এত বেশী সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়াছে যে উহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন! কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক

বিভাগে এই জ্যেষ্ঠে ছাত্র-ছাত্রীদের হরেক বকম বই দেখিলে আশ্চর্য্যবিত হইতে হয়। নতুন পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের দাড়া অভিভাবকগণকে বিব্রত করিয়াছে। কোন কোন ছুলের পড়ার দেখা যায়, একখানি বইর হইত আংশিক পড়া হইয়াছে বা বইটির পড়ার অনেক অসমাপ্ত বহিয়াছে নতুন সেসনে স্থল কর্ত্তৃপক্ষ উহা পরিবর্তন করিয়া পুনরায় নতুন বই চালু করিতেছেন। ইহাতে অভিভাবকবৃন্দের মনে একটা বিতৃষ্ণা ভাব জাগিতেছে এবং ছেলে-মেয়েদের পুস্তক সংগ্রহ বেন সমস্তাঙ্গপেই দেখা দিয়াছে। দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার পুস্তকসংগ্রহের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। পুস্তক প্রকাশকগণ স্থলে স্থলে ক্যাননহার পাঠাইয়া বইগুলি বত বেশী তথির করিতে পারিয়াছেন, তাহারে বইগুলিও সেই মত মনোনীত হইয়াছে দেখা যায়। বই মনোনয়ন লইয়া বেন একটি ব্যবসা চলিতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও বেন উহার প্রসারলাভ ঘটতেছে। কিছু সংখ্যক শিক্ষক নাকি এ বৎসর প্রাথমিক স্থলে পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় দ্বারা ব্যবসায়ী নীতি অনুসরণ করিয়াছেন জানা যায়। ইহাতে শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের পথই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষামুখী ও শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

—নীহার (কাঁধি)

শৌক-সংবাদ

প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী

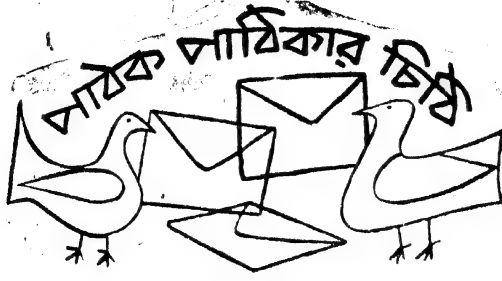
বাঙলার বহ্মান শিল্পশক্তি প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ব্যবসায়ী হিসাবে ক্ষুদ্র পরিসরে জীবন শুরু করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অল্পসং সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীকালে ইনি শওভালস প্রবন্ধ একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের আসন গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন ও ভারতের একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিল্পশক্তি হিসেবে বহুজনের প্রশংসা লাভ করেছেন। সমাজোন্নয়নে এর দান কম ছিল না, বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এর দানে পুষ্ট হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা ছিলেন।

নির্মলাবালা ঘোষ

মহাত্মা শিবিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় পরিমলকান্তি ঘোষের সহধর্মিণী এবং বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী ঐশ্বর্যমলকান্তি ঘোষ ও ঐশ্বর্যমলকান্তি ঘোষের জননী নির্মলাবালা ঘোষ মহাশয়া গত ২২এ জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। ইনি অতিশয় ধর্মপ্রাণা ছিলেন, অপরের দুঃখ-কষ্ট এঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করত, সমাজোন্নয়নেও জনহিতকর মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি এঁর সহায়ত ও আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। শোভাবাজারের প্রান্তঃসংগীর বাজা তার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কণ্ঠে ইনি অঙ্গগ্রহণ করেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রট, “বসুমতী রোটারী মেসিনে” ঐতরকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত চৈত্র সংখ্যার (১৩৬৬) শ্রীমতী আশা হারের 'বৌদ্ধ পঞ্চশীল' নিবন্ধটি স্মরণীয়। তবে কয়েকটি বিষয় আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি। আধুনিক Political দার্শনিক 'Panch Sila' নয়—বৌদ্ধশাস্ত্রে দশটি শীলের উল্লেখ আছে। পালনীয়—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। বর্জনীয়—সুবাশন, অপরান্ন ভোজন, নৃত্য-গীত, উচ্চাসন গ্রহণ এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ধারণ। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের ভিতরই এই দশ বনাম পঞ্চশীল এমন কি আরও অধিক সংখ্যক শীলচরণের বর্ণনা আছে। বুদ্ধ-জন্মের হাজার হাজার বছর আগে হিন্দু বনাম আর্যধর্মের ঋতি ও স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। স্মৃতি-গ্রন্থ বলতে—গীতা, ভাগবত, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদিকে বুঝায়। এ সব গ্রন্থে অহিংসা থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধশাস্ত্রে বৃত্ত শীলের উল্লেখ করা হয়েছে, এ ছাড়াও আরও বহু পালনীয় ও বর্জনীয় লৌকিক শীল-জ্ঞানের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। বস্তুত পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ ও বৌদ্ধ পালনীয় পঞ্চশীলের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অতএব শীলতত্ত্বের দিক থেকে উহা 'সর্বপ্রথম ভগবান বুদ্ধেরই শ্রীহৃৎ-নিঃসৃত' এরূপ উক্তি ঠিক নয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। বৌদ্ধধর্মে বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্ম-পরমাচ্ছত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-সামুদ্রাদি পঞ্চবিধ যুক্তিতত্ত্ব একেবারে বর্জিত। আছে—'জীবের আত্যাত্মিক হৃৎস্বের হাত থেকে যুক্তি পাবার সম্ভব একমাত্র নির্ণায়কত্ব'। কেবলমাত্র 'শীল' সাধনাই 'অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, শান্তি, শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি আনয়ন' করতে সমর্থ হয়। শীল-সাধনা লৌকিক বা ব্যবহারিক সত্য সাধনার প্রতীক। পারমাণবিক সত্য সাধনার আশ্রয় যে শীলসাধক নয়—এ কথা শক্তিশালী বৌদ্ধ লামা-বোবীরাও (অবশ্য 'God-King' নয়) স্বীকার করবেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বোপাচার আছে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা নির্বাণ যুক্তির সমস্ত ধ্যান, প্রজ্ঞান, প্রাণিধি, পরিমিত। ইত্যাদির অমুশীলন বা সাধনার প্রয়োজন বীকৃতিও আছে। অজ্ঞতার নিকারে যোহিলাখ বগণে ও বিভ্রান্তি মার্গে এই সাধন প্রণালীর উল্লেখ আছে। অবশ্য সব সাধনই গুরুত্বপূর্ণ। পুণিগত নয়। বৌদ্ধধর্মেও এর ব্যতিক্রম নাই। যুক্তিতত্ত্ব সত্যকে ঋতি মতে—'তমবে বিদিত্বাতি যুক্ত্যেতি নানাঃ পন্থা বিত্তভেদ্যনায়'—সন্নিধানলব্ধন পরজ্ঞাকে জানাই সঙ্গার নিবৃত্তির কারণ। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। 'হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ' কি করে বৌদ্ধধর্মে হল—এ দুর্বোধ্য। অধ্যাত্ম রাজ্যের তত্ত্ব অনন্ত। হিন্দুধর্ম যে সকল তত্ত্বলাভ করেছে তন্মধ্যে—জ্ঞানতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বা আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক তত্ত্ব, অর্থেত ও বৈততত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-সামুদ্রাদি পঞ্চবিধ যুক্তিতত্ত্বের স্থান

বৌদ্ধধর্মে নেই। যদিও হিন্দু-শীল ও বৌদ্ধ-শীল একাকার হয়ে গিয়েছে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের এই নির্বাণ যুক্তি ও হিন্দুধর্মের ব্রহ্মসামুদ্রা, সাত্বি, সামোপ্য, সাত্বপ্য ও সালোকা যুক্তি এক জাতীয় নয়। নির্বাণের লক্ষ্য—জীবের আত্যাত্মিক হৃৎস্বের নিবৃত্তি। হিন্দু চায়—বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি। 'আবৃত্ত: জ্ঞানমেতেন...কামরূপেণ...দৃশ্পূরণানলেন চ।' গীতা, ৩।৩১। বিষয় বাসনা জ্ঞানকে অর্থাৎ আবৃত্তজ্ঞান বা পরা-জ্ঞানকে আবৃত্ত করে রেখেছে। এই কাম বা কামনা বা বিষয়তৃষ্ণাকে জয় করতে পারলেই সমস্ত হৃৎস্বের শান্তি হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নিবৃত্তির পরে আর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে হৃৎস্ব-নিবৃত্তিই একমাত্র চরম তত্ত্ব নয়। হৃৎস্ব নিবৃত্তির অতীত হয়েও হিন্দু চায় মুখ। অবশ্য উহা এই ভগবতের Materialistic 'মুখ' নয়, উহা 'ব্রহ্মানন্দঃ পরমমুখম্'—মুখ তথা ভগবৎপ্রেম-বাসনা মুখ। অতএব 'পরিপূর্ণ বিকাশ' বা 'Fulfillment of Hinduism' শুধু মাত্র ভাব প্রেধ উদ্ভাস বা কৈতববান ছাড়া আর কী হতে পারে? হিন্দুধর্ম একটি Democratic ধর্ম। মহাদেশের মত এটিও একটি মহাদর্ম। অতঃ সব তত্ত্ব ধর্ম। ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ বা creed নিয়ে হিন্দুধর্ম তথাকথিত Religion নয়। এ ধর্মের ব্যাপ্তি ও প্রসার করনাতীত। এ ধর্মে আছে স্বাধীন চিন্তাবাদ ও যুক্তিবাদ। আছে—আত্মিক্যবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, সর্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদ, চার্ধাকার নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্ম বিশাল হিন্দুধর্মের একটি অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও বৌদ্ধধর্মকত হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে—অবশ্য কারণটা Political. পরিশেষে, 'মানবের জীবন-মরণ মুখহৃৎস্বের হৃৎস্বের হেতু পরম্পরায় জটিল সমস্তার সকল সমাধান যদি কোথাও হইয়া থাকে, তাহা ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গেই হইয়াছে। এ উক্তি অতি উচ্চ-প্রশস্তি বাচক—সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃৎস্বের বিষয়, হিন্দু ধর্মের কষ্টপাথরে এই অত্যাতিরিক্ত স্বর্ণ-মেঘলা থেকে বহু অসঙ্গতির খাদ নির্গলিত হবে। অতএব সৌখিন্য বোদ্ধাধর্মন, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পাতঞ্জল দর্শন এবং মহাত্মারন্তের সমস্ত শাস্তিপট্টা পাঠ করন; তবে বিচারসহ প্রকৃত 'মার্গ' উপলব্ধি করতে পারবেন।—হেম মহাপ্রসাদ, মহাজ্ঞানিনগর কলোনি, কলিকাতা—২৮।

জানতে চাই

আপনার কাছে বিনীত নিবেদন এই যে—(১) আপনার সম্পাদিত 'মাসিক বসুধাতী' বেশ ভাল মাসিক পত্রিকা। আমি বইখানি এইখানে জীপার্কভিশ্বর হারের নিকট হইতে লইয়া পড়ি। ইহাতে জীপার্কভেশ্বর ঠাকুর লিখিত 'জানম-বুঝান'এর বাংলা অনুবাদ পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইয়া থাকি। অনিলাদ, পুস্তকাকারে

প্রতিপাদিত হইয়াছে। (২) বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত বার্ষিক তত্ত্বমূলক গ্রন্থের একখানি Catalogue দিয়া করিয়া আমার নিকট পাঠাইলে বিশেষ অগ্রগৃহীত হইবে। আমি কয়েকখানি তত্ত্বগ্রন্থ বাংলা পড়ে জীবনভাপবত, জীবন, ভক্তমাল, নীলমণ্ডল জীবন চৈতন্যদেব ইত্যাদি বৈকব সাহিত্য ও জীবনী জীবন পদাবলী সাহিত্য বাহা আপনারা হাপাইয়াছেন তাহা আমাদের বাজবাজার লাইব্রেরীর জন্য কিনিবার ইচ্ছা পোষণ করি। আমাদের Superintendent, Jambari Estate (Sri Jagannath Dhabal Deb)-এর নামে আমাদের এণ্ট্রেট হইতে "দৈনিক বসুমতি" নিয়মিত ভাবে লওয়া হয়। (৩) একটি কবিতা, আমার স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—উবার বর্ণনা ১ম লাইন "প্রভাতস্মৃতিতায়কা কুন্তলটি-উবা করোত্ময়তি" (বা মঙ্গলম) উবা বাত্রার সময় উহার প্রয়োজন হয়। আপনারা লক্ষ্যচাৰ্য্য মহোদয় অবজ্ঞা জানেন, মনে করি। আর একটি কবিতা "হরিরেব জগৎ জগৎ হবিঃ হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতঃ" ইতি বস্তু মতিঃ পরমার্থগতিঃ স নরো ভবসাগর-মুক্তমতি। এই শ্লোকটি কোনখানে আছে দয়া করিয়া সন্ধান দিলে বাধিত হইবে। আপনার মাসিক বসুমতী একাধারে বহু বিষয়-সম্বন্ধিত, বাস-বুদ্ধ-মহিলা সকলেরই উপযোগী খাত উহাতে সম্মিলিত। বর্তমানে উহা যে অভুলনীয় তাহা অনবকার্য্য—প্রশংসা—জিজ্ঞাসীকেশ পাল। (M. A. B. T. Guardian Teacher to the Raj Estate for past 3 decades)

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, ছেলাবেলা থেকেই আমি 'মাসিক বসুমতী' নিয়মিত পাঠক। প্রতি মাসেই বসুমতীর জন্ম উল্লেখ্য হয়ে প্রতীক্ষা করি শুধু আমি নয়, বাড়ীর অনেকেই। কিন্তু এক বছরের উপর ভাল বোগলখ্যার বসুমতীর জন্ম ব্যগ্রতা বেন আরো বেড়ে গেছে। দিলীপকুমার বাবের 'ভাবি এক, হয় আর,' সুলেখা দাশগুপ্তের 'কালী,' নীলিমা দাশগুপ্তের 'ইন্দ্রাণীর প্রেম, হৃদযাচা।' বাবির দেবীর 'বাক্যের কি আর বের হবে না?' হিমালীশ গোস্বামীর 'লগনের পাড়ার পাড়ার' অনেক বালাবন্ধুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। দিনগুলি মোর কোথায় গেল! সাধনা বসুর 'স্মৃতির টুকরো' মনটাকে দুয়ের অত্যন্তে টেনে নিয়ে যায়, আনন্দের সঙ্গে বিবাদের সন্মিশ্রণ মনে এক অদ্ভুত অহুত্বভিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে—এ বেন sweetest song telling of saddest thoughts. আমার এ বোগলখ্যার সহচর আমার মত আরো অনেকের প্রাণে আনন্দের উৎস হয়ে উঠুক।—জীভেন চক্রবর্তী, গুয়াড বি—১, কাঁচড়াপাড়া টি, বি, হাসপাতাল, নদীয়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am now sending Rs. 15/- towards next one year's subscription and have to request you to kindly continue sending me copies of Monthly Basumati from the month of Baisakh.—Mrs. Kamala Ganguly, Balajinagar, Madras.

Please accept my half yearly subscription of M. Basumati.—Mrs. Suprova Chowdhury M. A. D. Litt.—Delhi

I am remitting herewith the subscription of Monthly Basumati for the year 1366, kindly arrange to send the magazine.—Arati Rani Sinha—Allapalli P. O. Dist. Chanda.

বার্ষিক মূল্য ১৫/- পাঠালাম। বিলম্বে ক্রটি মার্জনা কোরবেন—জিনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, জবলপুর।

Sending Rs. 7/8/- by M. O. as six monthly subscription from Baisakh. Please continue Masik Basumati—Mrs. Kanak Maitra, M.A.—Kanpur.

Remitting Rs. 15/- only towards yearly subscription for the Monthly Basumati for the year 1366 B. S.—Hena De, Berhampore, Murshidabad.

বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাসের বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Gouri Gupta, Dhanbad.

Reading Basumati reminds me of my childhood days in Bengal. Kindly renew subscription for another year.—Mahasveta Dutta, Sholapur (Bombay State).

বিশেষ কারণবশতঃ টাকা পাঠাইতে দেয়ী হইল। সন্তোষ কাম করিবেন।—Bina Dutta, Ahmedabad.

আপনারা সহিত সুদীর্ঘ কালের সম্পর্ক আরও ৬ মাস বাড়াইতেছি—মাধবী ঘোষ, কলিকাতা।

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। বৈশাখ থেকে পাঠাবেন—জীমত্যা লতিকা বিশ্বাস, নৈহাটি মিত্রপাড়া।

বৈশাখ মাস হইতে এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫/- টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—অর্ণা জিবেকী, Churchgate, Bombay.

নতুন বৎসরের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত বাৎসরিক টাকা ১১০/- পাঠাইলাম।—জীমতী অর্ণা সায়াল, হাঙ্গারিবাগ।

বৈশাখ ১৩৬৬ হইতে ১ বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫/- টাকা পাঠাইলাম।—মায়া দাশগুপ্ত, Assam.

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের অগ্রিম মূল্য ১১০/- টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—জীসাবিত্তী বাজপেয়ী, মুল্লিগাবাদ।

Remitting half-yearly subscription of my monthly Basumati from Baisakh to Aswin.—Nilima Bose—Thanjhora Tea Estate.

Kindly continue to send Masik Basumati for a further period of one year.—Mrs. Lilabati Mukherjee.—Kanpore.

Sending herewith Rs. 7-50 N.P. as subscription for the monthly Basumati for six months from Baisakh to Aswin—Sm. Alo Sen Gupta. B. A.—Bombay.

অন্ত বার্ষিক দেয় ১৫/- পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে সংখ্যাগুলি লগ্নর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।—Sm. Lakshmi Rani Devi, Midnapore.



মাসিক পত্রিকা
সংস্করণ: ১৯৩৩

(১৯৩৩)

পুষ্পবিচিত্রা

—মহাশয়ী জগদীশ্বর মল্লিক

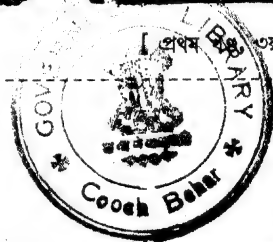


সামিক বসুসতী

৩৮শ বর্ষ—আবার, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত



রাত আর সাড়ে আটটা। মায়ের তরুণোবের পাশে নীচে মাটির পাভা হয়েছি। মা শোবার উত্তোপ করছেন। আমি বেতেই বললেন, "এস, এস, আমার কাছে এসে বস। একে একটু মিষ্টি দিয়ে জল খেতে দাও ত সবলা, সারা দিন খেটে আবার এই ছুটে লাগছে।" আমি জল খেতে আপত্তি করলুম, কিন্তু তা কানেও তুললেন না; বললেন "সেহের প্রতি একটু নজর রাখতে হয় মা, হয়তি ভিন তুলে মা হয়েই যেন বুড়ী হয়ে গেছে।" মা তাঁর আমবাতের কথা তুলে বললেন, "এ কি হল মা, লোকের হয় বার, আমার যেট হব সেটি আর ছাড়তে চায় না। ঠাকুর ব বলতেন বত লোকে বোগ, শোক, পাণ, তাপ নিয়ে কত কি করে এসে হৌর সেই সব এই দেখে আশ্রয় করে, তাই ঠিক মা—আমারও বোধ হয় তাই হবে। ঠাকুরের তখন অরুণ, কে সব ভক্তেরা (দক্ষিণেখরে) মায়ের (কালীর) ওখানে পুজো দেবে বলে জিনিষপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কানীপুরে জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে এসাদ গেল। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দেখে, কি অভয় করলে? কলনদ্যার জন্তে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে।' আমি ত ভয়ে রবি, জাবি—এই ক অরুণ, কি জানি কি হবে। এ কি বাপু, কেন

ওরা এমন করলে। ঠাকুরও তখন বার বার তাই বলতে লাগলেন। কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছিল তখন আমাকে বললেন, 'দেখ—এর পর ঘর ঘর আমার পুজো হবে। পরে দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোন চিন্তা কোরো না।' সেই দিনই 'আমার' বলতে শুনলুম। কখনও 'আমার' বলতেন না। বলতেন 'এই খোলটার,' বা আপনার শরীর দেখিয়ে 'এই এর।' সন্সারে কত রকমের লোক সব দেখলুম। ত্রৈলোক্য আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর লেহ রাধার পর (দক্ষিণেখরের) দীক্ষা বাজাকী ও অভয় সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। আশ্রয় বাবা ছিল তারাগে হাঙ্ক-বৃদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে বোগ দিলে। নহেনও কত বলেছিল, 'মায়ের ও টাকাটা বন্ধ কোরো না।' তবু করলে। তা দেখ, ঠাকুরের, ইচ্ছায় এমন কত সাত গুণা এস, গেল। দীক্ষা কী সব কে কোথায় গেছে। আমায় ত এ পর্যন্ত কোন কষ্টই হয় নি। কেনই বা হবে। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না।'

—ঐতীমায়ের কথা।

রাষ্ট্রভাষা বিজ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি

ত্রীপুলিনবিহারী বসু

ভারতীয় ভাষাসম্ভার মূলে প্রধানতঃ তিনটি প্রকার (১)

ভারতে কোনও জাতীয় ভাষা সম্ভব কিনা (২) সর্বভারতের সংযোগ সাধনের জন্য এবং কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য কোন ভাষা গ্রহণীয় (৩) প্রাদেশিক শাসন ও শিক্ষা কোন ভাষায় হইবে ?

জাতি হিসাবে ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব কোনও দিন ছিল না, বর্তমানেও নাই। হযত একটা জাতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে। সাক্ষ্যের আশা কতটুকু বা গৃহীত ব্যবস্থা আমাদেরকে সত্যি কোন পথে লইয়া যাইতেছে সে আলোচনা বর্তমানে না করিলেও ভাষা আন্দোলনে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। কারণ, ভাষাগত এক্ষা সাধন শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত উপায়গুলির মধ্যে একটি।

যাঁহারা এক ভারতের স্বপ্নে বিভোর তাঁহারাও এই অবিসংবাদিত সত্য স্বীকার করিবেন যে, ভারতে বিভিন্ন জাতি বাস করে। ভারতীয় মহাজাতি বিভিন্ন জাতির সমষ্টি মাত্র। এই সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একটা ঐক্যের ভাব থাকিলেও পার্থক্যের অভাব নাই। স্বাভাবিকভাবে, সামাজিক আচরণ-ব্যবহারে এমন কি জীবন বাপন প্রণালী ও আদর্শে এই পার্থক্য স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। এই সব পার্থক্যের মধ্যে ভাষা একটি। ভারতে একটি জাতীয় ভাষা প্রচলিত হইলে এই সব ভাষার পরিণতি হয় অবলুপ্তি না কবিত ভাষারূপে অবস্থিতি। আইনের বলে ইহা কি সম্ভব হইবে ? এই সমস্ত ভাষাই বহু পূর্বে সাবালক্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই ভারতে বাঁচিয়া থাকিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে।

ভাষাগত ও অজ্ঞাত পার্থক্য একদিনের সৃষ্টি নয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তি স্থানীয় প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য, বহির্দেশ হইতে আগত নতুন নতুন জাতির সহিত সংমিশ্রণ ইত্যাদি নানা কারণে এই পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই বলেন যে, সংস্কৃত আমাদের আদিভাষা। যখন সেই এক আদিভাষা হইতে এতগুলি বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে তখন ইহা মনে করিলে অস্বাভাবিক হইবে না যে, আজ যদি সর্বভারতের জন্য একটি ভাষা গৃহীত হয় তাহাও কালক্রমে বিকৃত হইতে হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইবে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানও এই পার্থক্যের জন্য অনেকটা দায়ী। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বহু অবজ্ঞানী এই বাঙ্গালাদেশে পুঙ্খবাহুল্যে বাস করিয়াও এই দেশের নামটা ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না এবং বাঙ্গালীরাও বহু হিন্দী কথা হিন্দীভাষীদের মত বলিতে পারেন না। অহু থেকে হাম্ হামি, আমি ইচ্ছাকৃত নয়, বৈশিষ্ট্যের ফল। অতীতে যেমন এক ভাষা হইতে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহারই পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত। আজ যদি বাহুবলে এক ভারতীয় জাতি ও এক ভাষার সৃষ্টি হয় কাল সেই একই থাকিবে কিনা সন্দেহ। বাহ্যিক দ্বিধা সন্দেহের বিবরণ তাহা গভীর চোখে দেখিলে পরিষ্কার মাত্র।

আশার চশমা চোখে পরিয়া ভবিষ্যতের দিকে না তাকাইয়া নগ্নচক্ষু বর্তমানের উপর নিবদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ। আশার চশমা পরিয়া দেখিলাম, দেশ ভাগ করিলে হিন্দু-মুসলমানের সব ধর্ম মিটিয়া যাইবে আর চারিদিকে বিরাজ করিবে চিরশান্তি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই বন্দ্য হাঙ্গামা হইতে মুক্তের পর্ধ্যায়ে উন্নীত হইয়াছে আর শান্তির মাধুর্য্যে মানুষ হারাইতেছে মনুষ্যত্ব, নারী হারাইতেছে নারীত্ব; চতুর্দিকেই উৎপাটিত ছিন্নমূল মানুষ—বাহাদের পক্ষে জীবন ধারণ হইয়াছে যানি ও অপমানকর। দশ বৎসরের স্বাধীনতা ভারতবাসীকে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা বর্ধমানের ভাষায় আকলিকতা হইতে কতটা মুক্ত করিয়াছে এবং জাতীয়তার কতটা অল্পপ্রাণিত করিয়াছে তাহা নগ্নচক্ষু দিয়া দেখিলে এবং ভাব ও সংস্কার-বজ্জিত মন দিয়া বিচার করিলে এই কথাই বলিতে হয় যে, এক ভারতীয় জাতি আজও স্মৃতির আশা ও কর্তব্যের বিষয় এবং একজাতীয় ভাষা অসম্ভব।

কিন্তু জাতীয় ভাষার অভাবে সর্বভারতের জন্য একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ, এই ভাষা যারা ভারতের বিভিন্ন জাতির সংযোগ সাধিত হইবে এবং ইহাই হইবে কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা। এই ভাষাটি এমন হওয়া চাই যাহা প্রদেশগুলি নিজ স্বার্থে ও প্রয়োজনে বহুত্ব সম্ভব জন্য আদ্যাসে এবং বেছায় গ্রহণ করিতে পারে।

ভাষা সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা সকলেই স্বার্থহীন ভাষায় বলিতেছেন যে, প্রাদেশিক শাসন ও শিক্ষা প্রদেশের মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শাসন ও শিক্ষা যে কারণে আপত্তিজনক, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শাসন ও শিক্ষা ঠিক সেই কারণেই আপত্তিজনক। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য সব ভাষাই বিদেশী। হিন্দীভাষীর পক্ষে ইংরাজী যেমন বিদেশী ভাষা, বাংলাও তেমনিই বিদেশী ভাষা; মাত্রাজীর পক্ষে ইংরাজী ও হিন্দী দুই বিদেশী ভাষা। হইতে পারে, একটা বিদেশী ভাষার সঙ্গে নিজ মাতৃভাষার সখ্য নিকটতর কিন্তু তাহার বৈদেশিকতা ক্রমে লোপ পায় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশভাষা বিভিন্ন জাতির সর্বস্বত্ব উন্নতি এবং স্বজাতীয় শক্তি বিকাশের জন্য শাসন ও শিক্ষার মাতৃভাষায় ব্যবহার যে অপরিহার্য এবং মাতৃভাষা ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়, ইহা সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা নিস্তয়োজন। এই প্রশ্ন শেষ করিবার পূর্বে এইটুকু বলিতে চাই যে, মাতৃভাষার শাসন ও শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা হইবে পরাধীনতার শৃঙ্খল। যেহেতু কি কেহ এই অধিকার বর্জন করিবে এবং পরাধীনতার নিগূঢ় আবদ্ধ হইবে ?

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কোনটাও এত উন্নত নয় যে তাহার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্ভবপর। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বহুদিনের জন্য ইংরাজী বর্জন অসম্ভব। অতি যৌর ইংরাজী-বিষয়ীরাও বলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ইংরাজী আবশ্যিক হওয়া উচিত। সুতরাং আপাতত শিক্ষাবোর্ডে দুইটা ভাষা শিখিতেই হইবে—মাতৃভাষা ও

ইংরাজী। কিন্তু ইংরাজীকে চিরকাল এই উন্নত স্থানে বসাইয়া রাখিলে চলিবে না। শাসনকার্যে ইংরাজীর ব্যবহার বন্ধ হইলে তাহার গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যাইবে। বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য হইবে বত শীত্ৰ সম্ভব শাসনকার্যে মাতৃভাষার পূর্ণ প্রচলন এবং তাহার মাতৃভাষার উপর রাস্তানৈতিক গুরুত্ব আরোপ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘরে ঘরে ইংরাজীর উচ্ছেদ।

ইংরাজীর আর একটি দিক আছে। ইহা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সহিত আদান-প্রদান সম্ভবপর এবং পৃথিবীর প্রকৃত্তম ভাষার কয়েকটির মধ্যে ইহা অন্যতম।

চীন জাপান প্রকৃত্তি দেশে যাহারা ইংরাজীভাষী নয়, তাহারা। বহির্বিষয়ের সহিত সংযোগ সাধনের জন্ত এই ভাষা ব্যবহার করে। ইংরাজী ভাষার এই গুরুত্ব আমাদের উপর নির্ভর করে না; আমাদের শত বিবেকে তাহার এই গুরুত্ব কমিবে না এবং সৌরবও ক্ষুদ্র হইবে না।

সধন দেখিতেছি যে, দুইটি ভাষা মাতৃভাষা ও ইংরাজী আমাদেরকে শিখিতেই হইবে এবং এই দুইটি দ্বারা বধন আমাদের সব উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখন কেন্দ্রীয় শাসন ও সর্বভারতের জন্ত আর একটি ভাষার প্রয়োজন কি? অথবা আর একটি যোঝা লোকের মাথায় দিতে বাই কেন?

হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করিবার ব্যগ্রতার আমাদের রাজনৈতিকগণ অন্তরঙ্গ বাসক-বালিকাদিগকে হিন্দী শিখিতে বাধ্য করিতেছেন। কলে তাহাদের মস্তিষ্কের উপর কি কঠিন চাপ পড়িতেছে এবং প্রকৃত্ত-শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিতে অসুযোগ করি। তিনটি ভাষা শিখিতে আমাদের যে শক্তি ও সময় নষ্ট হয় তাহা অজ্ঞ শিক্ষার প্রয়োগ করিয়া তাহাদের এক শিক্ষার প্রকৃত্ত উন্নতি বোধ হয় বেশী কাম্য।

এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, ভারত সরকার প্রদেশের শাসন ও শিক্ষার প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারে সন্তুষ্ট আছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনের জন্ত তাহারা হিন্দী ব্যবহার করিতে চান। স্ততরা আমাদের তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে। এখন প্রশ্ন—কেন্দ্রে হিন্দী বনাম ইংরাজী এবং কেন্দ্রীয় ভাষার ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ।

কেন্দ্রীয় ভাষা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হইবে যে, তাহার রাজনৈতিক গুরুত্ব জনসাধারণের মনকে যেন তারাকান্ত করিয়া না 'তোলে। প্রদেশের শাসনকার্যে প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত হইলে জনগণ অনেকটা ভাষাগত স্বাধীনতা পাইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ও রাজনীতির বাপায়ে এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যে, তাহাদের এই স্বাধীনতা বস্ততা সম্ভব ক্ষুদ্র না হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার সমস্তদিককে যে কোনও ভারতীয় ভাষার বস্ততা দিবার অধিকার দিতে হইবে, আইনসভার দায়িত্ব হইবে তাহার সঠিক অর্থায়ন করা। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহিত পরামি বিনিময় ও আলাপ-আলোচনা কেন্দ্রীয় ভাষায় করিবে কিন্তু প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকারের ভাষায় করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জনসাধারণের জন্ত বাহা প্রচার করিতে হইবে তাহা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় দুই ভাষাতেই হওয়া

চাই। কেন্দ্রকে কোট নিজ মাতৃভাষার বস্ততা পেশ করিবার অধিকার সকলের থাকিবে। অর্থাৎ এইরূপ সুযোগ ও ব্যবস্থা সর্বদাই রাখিতে হইবে—বাহাত কেন্দ্রীয় ভাষা অনতিক্ত লোকও কেন্দ্রীয় শাসন ও আলোচনার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এক কথায় কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে ভাষার বাপায়ে সর্বদাই একটা নমনীয় ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দীকে কেন্দ্রীয় ভাষা করিলে এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন আরও বেশী। কারণ প্রাদেশিক ভাষার শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে বহু অহিন্দীভাষীর হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

এইবার প্রশ্ন, হিন্দী কি ইংরাজী? হিন্দীর পক্ষে যুক্তি এই (১) স্বাধীন ভারতে ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করাই উচিত (২) ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে হিন্দী সংযোগ্যবিশিষ্ট ভাষা এবং বহুলোকের বোধগম্য; স্ততরা হিন্দীই একমাত্র গ্রহণীয় ভাষা। এই যুক্তির প্রথমার্শ বিবেচন করিলে বস্ততা এই পাঁড়ার যে, স্বাধীন জাতি জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে, আমরা স্বাধীন কিন্তু আমাদের কোনও জাতীয় ভাষা নাই; স্ততরা আমরা একটি প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহার করিব। জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার সমিশ্রণ এই যুক্তির উৎপত্তি। এই যুক্তি এক দলের প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেয় অন্য দলকে জাতীয়তাকে বিসর্জন দিতে বলে এবং দুই দলের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বিরোধের সৃষ্টি করে। সেই বিরোধের আভাস পাইয়াও হিন্দী-সমর্থকগণ যুক্তির অসারতা স্বীকার করিতেছেন না, সর্ব, সীমা ইত্যাদি আরোপ করিয়া তাহাদের পুরাতন সিদ্ধান্ত স্থির রাখিতে চান।

যুক্তির দ্বিতীয়ার্শ হিন্দী সংযোগ্যবিশিষ্ট ভাষা। দলীয় শাসনে সংখ্যা দ্বারা নীতি নির্ধারিত হয় সত্য কিন্তু ধর্ম, ভাষা, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে সে নিয়ম অচল। সেই জন্য সংযোগ্যবিশিষ্ট জন্ত রক্ষাকর। এই যুক্তি জাতীয় আধিপত্য বিস্তারের বা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের যুক্তি এবং ইহার মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা শক্তিই বেশী। যদি অহিন্দীভাষীরা বেচ্ছার হিন্দী গ্রহণ করেন, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এক ভোটের পার্থক্যে হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার হিন্দীভাষীদের শক্তিরই পরিচয় পাই আমরা।

ভারতীয় হিন্দী বহুলোকের বোধগম্য। কিন্তু এই বোধগম্যতা এক অভিক্ষুদ্র গণীয় মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাময়িক একটা প্রয়োজনের কথা কোনওরূপে বুঝিতে পারি বা বুঝাইতে পারি। কোনও আলোচনার অংশ গ্রহণ করা যুগের কথা, সব সময়ে মনের ভাষা প্রকাশ করিতেও পারি না। নগরবাসীর কতকাংশ সম্বন্ধে ইহা হয়তো প্রয়োজ্য নয় কিন্তু সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে ইহার কোন ব্যতিক্রম আছে কি না সন্দেহ। হিন্দীর প্রকারভেদে আমাদের বোধগম্যতাও কম-বেশী হয়। যে হিন্দী আমরা বলি বা বুঝি তাহা আমাদেরই স্ত একটি কথিত ভাষা, বাহার সহিত প্রকৃত্ত ভাষার স্পর্শ খুই কম।

মধ্যে মধ্যে হিন্দীর সমর্থনে কতগুলি ব্যবহারিক সুবিধার কথা শুনি। সেগুলি যে কি, তাহা কোথাও স্পষ্ট শুনি নাই। ভাষা-কমিশনের রিপোর্টে হিন্দীভাষীদের সুবিধাগুলি বৃত্তিতে পারি—কিন্তু অহিন্দীভাষীদের সুবিধা কি, তাহা বুঝিলাম না।

ভাষা হিসাবে হিন্দী ও ইংরাজীর তুলনা নিম্নোক্ত। ইংরাজী গ্রহণে আমাদের প্রধান আশক্তি, ইহা আমাদের জাতীয় ভাষা নহে।

হুই শত বৎসরের ইংরাজ শাসন ইংরাজীকে যে আমাদের বিভিন্ন মাতৃভাষা করিয়াছে অন্ততঃ জাতীয় ভাবার ঠিক নিম্নেই যে তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইংরাজ-বিবেক আমাদের থাকিতে পারে কিন্তু ইংরাজী বিবেকের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বহু বিষয়ে এই ভাবার অবদান অনস্বীকার্য।

ইংরাজী বনাম হিন্দী এই বিতর্কে এই বলিলে বখেট হইবে যে, একটির সমর্থন ভাবপ্রবণতার অপরটির সমর্থন ব্যবহারিক সুবিধার। এক্ষেত্রে জ্ঞানকে হিন্দী সমর্থন করেন। এক্ষেত্রে ভাষা বা

ধর্ম আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে না। সর্বাস্বক এক্ষেত্রে বাস্তবে হয় না, জাতিতে জাতিতেও হয় না। এক্ষেত্রে উৎপত্তি উপলব্ধি ও অল্পভূক্তি হইতে গড়িয়া উঠে এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া। এক্ষেত্রে জন্ম চাই এক দেশ, এই উপলব্ধি এক ভাবার কোনও প্রয়োজন নাই।

হিন্দী সমর্থকগণের নিকট আর একটি নিবেদন—হিন্দী রাষ্ট্রভাষার উন্নীত হইয়া যে উচ্চতা, অসহিততা ও কোনও ক্ষেত্রে যে নীচতা দেখাইয়াছেন ভারতীয় এক্ষেত্রে উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া, তাহা অন্ততঃ এখনও বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

সনাতন গোস্বামীর গৃহত্যাগ

উমাগ্রাসন্ন দাশগুপ্ত

বান্দার বিশেষ অল্পরোধ উজ্জীর সাহেব, আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখুন—এই শব্দমর্যাদা, বিপুল ঐর্ষ্যা এসব কি শুধু মাত্র একটা আদর্শের জন্ম ছেড়ে বাওয়া উচিত?

আমি খেচ্ছার ছেড়ে বাচ্ছি না কোতোয়াল সাহেব, সেদিন রামকলি গ্রামে আমি আমার সব হারিয়ে ফেলেছি। সেই তপ্তহাফ-পৌরাজ সন্নানী আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। এই যে দেখছেন দেহটা—এটাও তাঁর সম্পত্তি, এটাকে তাঁর চরণে ফেলে দিয়ে আমি স্বপ্নমুক্ত হতে চাই।

মাক করবেন উজ্জীর সাহেব, আমি আপনায় কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনি জানেন না—গৌড়েশ্বরের অমাত্যরূপে এঁর সবকিছু পূর্বে আমি অনেক কথাই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম দিবিজয়ী পণ্ডিত, সরস্বতীর মাসপুত্র কেশব কান্দীরীর শোচনীয় পরাজয়—শুনেছিলাম পরাজিত পণ্ডিতের অলৌকিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত। পরাজিত পণ্ডিত সাজ্জেনরনে সরস্বতীর ধ্যান করে বলছেন—মা, শেষে তুই একটা বালকের দ্বারা আমার পরাজিত করলি। সরস্বতী উত্তরে বললেন, ওবে, এই পরাজয়ই তোকে অমর করে রাখবে। দুঃখ করিস না, আমি নিজেই যে তাঁর কাছে নিত্য পরাজিতা, তুই আমার পুত্র আর তিনি—তিনি আমার স্বামী, সাক্ষ্য নারায়ণ। তখন বিশ্বাস করিনি। তারপর সেদিন রামকলি গ্রামে সতশ সতশ লোকের মধ্যে হস্তাবেশী আমাদের দু'ভাই-এর হাত হুট ঘরে বধন তিনি বললেন, ওরে ভোরা বে আমার ব্রজের সাধী, কেমন করে তুলে রয়েছিস? আমি মুক্তি হতে পড়লাম। জান হতে অল্পভব করলাম—আমি সম্পূর্ণ রিক্ত—নিঃস্ব। হাক, অল্পগ্রহ করে আপনি আমার মুক্তি ব্যবস্থা করে দিন কোতোয়াল সাহেব।

আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। মবাব যদি বুঝাচ্ছেন এই বড়শ্বরের কথা জানতে পারেন তবে আমার প্রাণকণ্ড নিশ্চিত। আবার এও আমি ভুলতে পারছি না উজ্জীর সাহেব যে, আপনায় নিকট আমি অনেক উপকৃত। আপনায় অল্পগ্রহে আমার এই পদোন্নতি। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আর আপনিও জানেন সাকর মল্লিক জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, আপনাকে

আমি এমন উপায় বলে দেব যে সবলেই জানবে সাকর মল্লিক যুত। এই নিরপরাধ বন্দীকে মুক্তি দিলে আপনায় পুণাই হবে—তাছাড়া আমি অর্থ দিয়ে আমার মুক্তি মূল্য দেব। আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

নিভৃত কারাগারে, গভীর নিশীথে কথা হচ্ছিল এক বন্দীর সঙ্গে কারাবন্দী কোতোয়ালের। বন্দী হিন্দু, তাঁর সর্বাক্ষে আভিজাত্যের ছাপ, শোষক-পরিচ্ছদও তদনুরূপ।

ধর্ম ও অর্থ একসঙ্গে প্রাপ্তির সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না, তাই কোতোয়ালের পক্ষে এ লোভ সংবরণ করা একটু কঠিন হয়ে ঠাঁড়ালো। সে একটু ভেবে উত্তর দিল—তাই ত! আমি ঠিক অর্থের কথা ভাবছি না—আমি ভাবছি আপনি আমার ভূতপূর্ব মনিব—যদি কোনরকমে আপনায় একটু উপকার করতে পারি। বলুন কি উপায় আপনি স্থির করেছেন?

বন্দী চারি দিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বীরে বীরে বললেন, কাল সন্ধ্যায় আপনায় লোক আমাকে গজার ভীয়ে ছেড়ে দিয়ে এসে প্রচার করবে যে সান্দ্যাকৃত্য করতে বাবায় সময় হস্ত-পদ-শৃঙ্খলিত বন্দী গজায় বাঁপিয়ে পাড়েছে—উদ্ধারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে বন্দী ধরশ্রোতে ভেসে গেছে। আমি নদী পার হয়ে বনপথে বৃষ্টিবনের দিকে ব্রাহ্ম করব। কেউ দেখবে না—কেউ জানবে না। আপনি শুধু এই পত্রখানা আমার ভৃত্য ঈশানকে দেবেন, তবেই সে আপনায় হাতে নির্দিষ্ট মুদ্রা দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

কোতোয়াল একটু হেসে উত্তর করল, টাকার লোভ আমার দেই মল্লিক সাহেব, তবে আপনি ত' জানেন, সাধারণ প্রহরীরা বড় গরীব তাই—।

বন্দী বুঝতে পারলেন যে ওবুধ ধরেছে, তাই তিনিও একই হেসে বললেন, তা ত' নিশ্চয়ই—তারের জন্ম আমি আরও দু'হাজার টাকা দেব—আপনি আর বিধা করবেন না।

কোতোয়াল এদিক-ওদিক চেয়ে কিস-কিস করে উত্তর দিল, তা আপনায় অল্পরোধ কেমন করে অবহেলা করি? তবে একথাই স্থির—কাল সন্ধ্যায়—

সৌভাগ্যের ভূতপূর্ব প্রবান অমাত্য সাক্ষর দলিচ চলেছেন অজানার পথে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে। পরিধানে শতদ্বির মণির বসন, শুভে ততোধিক মণির বহা আর সঙ্গে চলেছে পুরাতন ভূত ঈশান। সে জানে না কোথায় চলেছে তার প্রভু, কোন হুতুরী মোহন তান তাঁকে এমন করে পাগল করেছে!

প্রভুর কণ্ঠে তার চোখে জল এলো। কয়েক দিন আগেও বীর একটি অজুলি হেলনে সারা সৌড়ে একটা ভূমিকম্প হয়ে বেত—বর সৌভাগ্যের ছিলেন বীর হাতের ক্রীড়নক—তিনি কি না চলেছেন দিনের পর দিন কটকাঁকী বনপথে, পদব্রজে—অনাহারে—জর্জাহারে। কোন দিকে দ্রুক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে বধন সুখার তৃকার অবসর হয়ে পড়েন, ক্ষতবিক্ষত রেহটাকে আর টেনে নিয়ে বেতে পারেন না, তখন হুতর কোন বটজায়ার বসে পড়ে বলেন, ঈশান, বুঝাবন আর কতদূর? আর কি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—আমার ঋণ কি শোধ হবে না? ওগো প্রভু! তুমি আমার দক্তি দাও। চোখ মুহুতে মুহুতে প্রভুকে সাধনা দিয়ে ঈশান ভিকার চলে যায়।

হুতরের লজ ও সনাতন ভুলতে পারেন না যে তিনি পলাতক রাজবন্দী। ঘরা পড়লে জীবনে আর তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে না। ঋণ শোধ হবে না, তাই তিনি সবচেয়ে বজ্রন করে চলেন রাজপথ আর জনবহুল লোকালয়। বেছে নেন খাপদলসুলু নিবিড় অরণ্য। কোন দিন ভিকা জোটে—কোন দিন বা জোটে না।

এ ভাবে কয়েক দিন চলার পর তাঁর পাতড়া (বজ্র-বিহা-সীমন্তে) পুরুতের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন। ছানটা অতি ভয়ঙ্কর এক ক্ষুণ্ণর জমিদারী। বনরত্ন নিয়ে কোন পথিক এ পথে চলা-কোরা করতে পারত না। সনাতন এ সবাব জানতেন কিন্তু তিনি নিরুপায়—একান্ত রাজপথে চলার উপায় নেই, তাছাড়া এখন তিনি কপর্দকশূন্য ভিখারী ব্রাহ্মণ; তাই ভয়েরও বিশেষ কারণ নেই।

হুতর ভিকা জোটেনি—দরীর অবসর—আর চলেতে পারেন না। ঈশান প্রভুকে এক গাছতলার বসিয়ে চলে গেল ভিকার সন্ধানে। আজ কিছু জোটাতেই হবে। এমিকে ভূঞা কোন রকমে জানতে পেরেছে যে তার জমিদারীতে এসেছে হুতর নিরস্ত্র গোড়ার—আর তাদের নিকটে আছে আটটি মোহর। গোপিতের লোভে শাদলের মন যেমন নেচে উঠে তেমনি উৎকুল হয়ে উঠল ভূঞা। কোন ছলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রেখে রাজের অধিকার কার্য শেষ করতে হবে।

মতলব ছির করে সে সনাতনের কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল ও তার আতিথ্য গ্রহণের লজ বিশেষ অঙ্গুরোধ জানাল। তাঁর ইচ্ছিতে এলো নানারকম উপাঙ্গের আহাতি। সনাতন কিছুই গ্রহণ করলেন না, শুধু বললেন আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—এক দুই আতপ তুলসী আমার পক্ষে বধেই এবং তাও আমার ভৃত্য ভিকা করে সংগ্রহ করেছে। আপনি যদি একাডই আমার অঙ্গগ্রহ করতে চান তবে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে পুরুতটা পার করে দিন—আমি কৃতার্থ হবে, হুতর তুলে আশীর্বাদ করব।

ভূঞা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বলল,

আপনার নানাহার করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যার আহার লোকেরা আপনারদের বাজার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে, তখন ভূঞা সেখানে হুতর প্রহরীকে রেখে প্রস্থান করল।

সৌভাগ্যের ভূতপূর্ব অবাত্য সনাতন—বিধান, বুদ্ধিমান, কূট। তাঁর মনে সন্দেহের একটা কালো-ছায়া উঁকি দিতে লাগল—কেন এই অতিরিক্ত সৌভাগ্য অস্বাভাব্য ভক্তি! তিনি ঈশানকে একটু আড়ালে থেকে নিয়ে বজ্রসত্তীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশান, তোমার সঙ্গে বন-মত্ন কিছু আছে?

প্রভুর এই কণ্ঠের ঈশানের পরিচিতি—তাঁর চোখের এই অন্তলম্পর্শী দৃষ্টি বহু বার দেখবার সুযোগ তার হয়েছে। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল প্রভু, যদি আপনার সেবার প্রয়োজন হয় তাই সাতটা মোহর সঙ্গে এনেছি—আমার অপরাধ নেবেন না।

সনাতন তখন দীরভাবে বললেন মূর্খ, এরই লজ্জা আজ আমাদের জীবন বিপন্ন। জানিস না অর্থই অনেক সময় মনুষ্যের মূল হয়ে পড়ায়, সে আমাকে। ঈশান তার উত্তরীরে প্রান্ত থেকে সাতটা মোহর বের করে প্রভুর চরণে রাখল।

কোন রকমে তাড়াতাড়ি নানাহার সমাপন করে সনাতন সেই জমিদারের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ভাই, তোমার সৌভাগ্যে আমি পরম পরিভূক্ত হয়েছি—আশীর্বাদ করি চৈতন্য হতি হোক—এখন দয়া করে আমার সঞ্চিত এই সাতটা মোহর গ্রহণ করে আমাকে পুরুত পার করে দাও। তাঁর বদন প্রশান্ত, ভাবে ভাবার অভিযোগের কপটতার লেশমাত্র নেই—সরল, স্বচ্ছ নীল আকাশের মত।

সেই ভূঞা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল—সেখানে মিথ্যা বা ভীতির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না—শান্ত, সৌম্য, সুন্দর। তখন সে নতজাহ্নু হয়ে তাঁর পা দুখানি ধরে বলল, ঠাকুর তুমি কি মাহু? আমি তোমার হত্যার বড়ব্রত করেছিলাম আর তার বিনিময়ে তুমি করলে আমার অব্যাহতি আশীর্বাদ—আমার হাতে তুলে দিলে তোমার সারা জীবনের সঞ্চয়। বল ব্রাহ্মণ, এ দিকা তুমি কোথায় পেরেছ?

সনাতন তাকে আলিঙ্গন করে উত্তর দিলেন, ভাই! আছেন। আছেন—এ অগতে শুধু একজনই আছেন বিনি দিকা দিতে পারেন।

কে তিনি ঠাকুর? তিনি কি তোমার চেয়েও মহৎ?

মহৎ আমি কোথায় পাব ভাই! তবু যদি বিদ্যুদ্রাও আমার মধ্যে দেখে থাক তবে জেনো—এ তাঁরই অপার কল্পনার এক কথা। বাক ভাই! দয়া করে আমার পুরুতটা পার করে দাও।

আমি তোমার পাতড়া পুরুত পার করে দেব কিন্তু ব্রাহ্মণ, তার আগে আমার প্রতিজ্ঞা দাও তুমি আমার সন্সারসাগর পার করে দেবে—আমি মহাপাণী।

তর কি ভাই—তিনি যে পাণীদের সখীচক্রে বড় আপদারু জন—আর তাঁর তরীতে সকলেরই সমান অধিকার! সময় হলে আমি তোমার তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

নিশাবোসে ভূঞার সাহায্যে পাতড়া পুরুত পার হয়ে পরদিন

প্রভাতে সনাতন আবার ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে আর কোন ধনস্বত্ব অবশিষ্ট আছে কিনা।

ঈশান ভীত-কম্পিত ভাবে উত্তর দিল আছে—আর একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট আছে। আর সেটি সে রেখেছে একান্ত ভাবে প্রভুর সেবার জন্য—যদি কখনও তেমন সময় উপস্থিত হয়।

সনাতন একটু হেসে ঈশানকে আলিঙ্গন করে বললেন ঈশান, বন্ধু আমার! ভাই আমার! স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন আমার চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে—তোমার সেবারও আর প্রয়োজন হবে না। প্রার্থনা কর, আমিই যেন সকলের সেবা করতে পারি।

ঈশানের মুখে কোন কথা বেরল না—সে তার প্রভুর পায়ে ধুৎ ধুৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁদতে লাগল।

সনাতন তাকে সম্মুখে বুক জড়িয়ে ধরে বললেন ভাই, তুমি দীর্ঘ দিন আমার সেবা করেছ, প্রতিখানে আমি দিয়েছি শুধু কাচ—এবার ঘরে ফিরে সোবিলের সেবা কর, তিনি দেবেন তোমার কাকন—আর সেই হবে তোমার পাথের।

ঈশান তার প্রভুকে ভালরকমই জানে, তাই আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ও কয়েক কঁোটা তপ্ত অশ্রু দিয়ে সে জানাল তার বিদায় সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ। নির্জন অন্ধকার বনপথে মাঝে মাঝে শুধু শোনা যায় বস্ত্রপকীর কর্ণক চিৎকার। এক স্তম্ভায় অবেশ যুবক দ্রুত অন্ধারোহলে এগিয়ে আসছিল। তার পোশাক পরিচ্ছদে প্রচুরমান হয় যে, যুবক একজন হিন্দু—উচ্চগদহ রাজকর্ণচারী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো এক কল্পন ক্রন্দন। সে বোড়া ধামিয়ে ইতস্তত দেখতে লাগল—এই অন্ধকার রাত্রে স্বাপনদম্ভল নির্জন বনে কে কঁদছে! জাড়াভাঙি মশাল ধেলে এদিক তদিক ঘূঁতে ঘূঁতে সে দেখতে পেল—এক বুলি-খুসিহিত ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত পথিক গাছতলায় পড়ে কঁদছে আর বলছে ওগো প্রভু, আর বৃষ্টি দেখা হ'ল না। খণ বৃষ্টি আর শোষণ করতে পারলাম না। উঃ, বৃন্দাবন আর কতদূর!

যুবক ধীরে ধীরে সেই অবসর পথিকের কাঁধে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কার সন্ধানে চলেছ পথিক? কে তোমার মহাজন—কার কাছে তুমি শ্রী?

হঠাৎ সম্মুখে পেরে, দরদরায় কঠোর শুনে সনাতন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, কে তুমি ভ্রাতা, আমার প্রভুর করুণা-ধারার মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ! আমাকে বাঁচাও—আমি আজ তিন দিন উপবাসী, এক মুষ্টি অন্ন আর রাজের মত একটু আশ্রয় আমার ভিক্ষা দাও। আমাকে যে বাঁচতেই হবে—প্রভুর অমৃত্যু বাস্তব মরবারও যে আমার অধিকার নেই।

যুবক সেই অবশ পথিকের একখানা হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল স্থায় প্রাঙ্গণ, ভ্রাতার নারায়ণ নিবিলেবে তাঁর সেবা করল।

পরদিন প্রভাতে রাজার পূর্বে পথিক গেলেন সেই স্তম্ভায় যুবকের নিকট বিদায় নিতে—তাকে আশীর্বাদ করতে। তার কক্ষ প্রবেশ করেই সনাতন চমকে উঠলেন। আনন্দে চিৎকার করে

বললেন এ কি! কে তুমি? আমি কি ঠিক দেখছি—তুমি, জীকান্ত!

যুবকও ভাল করে লক্ষ্য করে পথিককে চিনতে পারল। তাঁর পায়ে লুট্টে পড়ে বলল একি দাদা তুমি! শেষে ভিখারীর বেশে তুমি আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছ? এ-ও কি তোমার পরীক্ষা নাকি? হলেও তুমি ত তা সসমানে উত্তীর্ণ হয়েছ আর তা যদি হয়েই থাকি, তাও ত তোমার আশীর্বাদেই দাদা! আমার বেশ মনে আছে, যেদিন তোমারই প্রদত্ত রাজকর্ণ নিয়ে বিদেশে যাত্রা করি সেদিন তুমি আমাদের স্বামিনীর মাথার হাত দিয়ে বলেছিলেন—জীকান্ত, সব সময় মনে রেখো অতিথি নারায়ণ আর অতিথিসেবাই গৃহস্থের সব চেয়ে বড় ধর্ম। দাদা, অনেক দিন পরে তোমার শেরেছি আর ছেড়ে দেবো না—কিন্তু দাদা তোমার এ বেশ—এ চেহারা কেন?

জীকান্ত ভাই—আমার যে যেতেই হবে, আমার ব্রত ভুল করবার চেষ্টা করো না ভাই! আমি যে সব সময় আমার প্রভুর ডাক শুনতে পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি কল্পন নয়ন আমার দিকে চেয়ে বলছেন—রপ, সনাতন! তোরা যে আমার ব্রজের সাধী—কখন করে তুলে রয়েছিস? ওরে আর, আর তোরা, না এলে যে আমার লীলা পূর্ণ হবে না—কাজ সায়া হবে না।

যুবকের চোখে জল এলো—সে কম্পিত কণ্ঠে বলল দাদা, আমি তোমার ঘরে রাখব না কিন্তু কয়েক দিন এখানে থেকে শ্রুত হয়ে যাও।

ভাই, আমাকে আর মায়ায় বেঁধে না, তাছাড়া আমি পলাতক রাজবন্দী। আমাকে আশ্রয়দানের বিপদ নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই।

আবার পরীক্ষা দাদা? যেদিন এক সহায়-সম্বলহীন যুবক তোমার ঘরে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিনও তাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলে—তারপর দিয়েছিলে তাকে আশাতীত পুরস্কার—সম্প্রদান করেছিলে তোমার প্রাণের পুতলি কন্ঠা ভগিনীকে।

আমার নির্বাসনে তুল কিছুই হয়নি ভাই—আশীর্বাদ কবি নিরাজয়ের আশ্রয়স্থল হয়ে দীর্ঘজীবী হও। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও ভাই।

কিন্তু দাদা, পশ্চিমের এই প্রচণ্ড শীতে কেমন করে তোমার প্রভুর কাছে পৌঁছবে? অমৃত্যু কর অন্তত একখানা শীতবস্ত্র তোমাকে দিই। আর কিছু না হোক ছোট ভাই—এর প্রণামী হিসাবে তা তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে। একথা বলেই জীকান্ত কক্ষান্তর থেকে নিয়ে এলো একখানা বহুমূল্য ডোটকম্বল, তারপর সনাতনকে প্রণাম করল।

চৈতন্য মতি হোক, বলে সনাতন তাকে আশীর্বাদ করলেন ও শ্রুত করলেন তাঁর যাত্রা। এ রেহের বন্ধন আর তিনি সহ করতে পারছিলেন না।

জীকান্ত সাঙ্গনয়নে তাঁর পথের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবল—কে সেই নরকপী নারায়ণ, যিনি সৌভাগ্যের প্রধান অমাত্যকে করেছেন সর্বস্বাধা পথের ভিখারী—আকাশচুম্বী মহীকক্ষ নিয়ে এসেছেন তুণের চেরেও নীচে—স্তায় চরণে কোটি কোটি প্রণাম!

বারাণসী—শঙ্করের মহিমামণ্ডিত, বরণা অসি প্রকাশিত পুত তাঁরহান। দ্বিতীয় কৈলাস। এই বারানসীতে এসে সনাতন লোকহুখে শুনলেন এক নবাগত অলৌকিক সন্ন্যাসীর কথা—বারাণসীতে বরণ ভেদ করে ফুটে উঠে নীলকান্ত মণির জ্যোতি, যিনি রূপে কল্যণের চেয়েও সুন্দর, বিজ্ঞার সব্বভীর চেয়েও বড়, প্রেমে যরণ জীরাধা। সনাতনের বুঝতে দেবী হল না যে, ইনিই তাঁর হারানিধি—সেই প্রাণের ঠাকুর, প্রেমে ঠাকুর, দীনের ঠাকুর। কিন্তু এই বিশাল সহরে কোথায় তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন। তিনি নিজ দেখা না দিলে কে তাঁকে দেখতে পারে, নিজে ধরা না দিলে কে তাঁকে ধরতে পারে? তিনি দিন-রাত তাঁকে খুঁজে বেড়ান—কখনও বিশ্বনাথের মন্দিরে, কখনও অন্নপূর্ণার চরণে—কখনও বা জনাকীর্ণ রাজপথে কিন্তু কোথাও খুঁজেও পেলেন না তাঁর হারানিধিকে।

দিনের শেষে অবসন্ন সনাতন গাছতলার তীরে তীরে ডাকেন—ওগো ঠাকুর, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—আমার সব চেষ্টা কি বার্থ হবে? আমি যে অনেক দিনহুঃখীকে কথা দিয়ে এসেছি তোমাকে তাদের সামনে তুলে ধরব—তোমার মহামন্ত্র তাদের বিস্তরণ করব। ওগো, তারা ত জানে সাকর মল্লিক মিথ্যা কথা বলে না?

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন প্রভাতে তিনি চন্দ্রশেখরের বাড়ীর সামনে এক গাছতলার বসে বসে ভাবছেন—ঠাকুর, ধরা যদি দেবে না তবে কেন দেখা দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল দুটি বাহ—আর যদি দেখাই দেবে না তবে এ চোখ দুটি এখনও অন্ধ করে দাওনি কেন?

এমন সময় চন্দ্রশেখর সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে এমিক ওরিক চেয়ে আবার ভিতরে চলে গেলেন। ভাগ্যবান পুরুষ চন্দ্রশেখর। যিনি চকস গোবিন্দকে অন্তত একদিনের জন্তও অচকল করতে পেরেছিলেন—স্বয়ং ব্রহ্মস্রনমন বীর গৃহে অন্তত কয়েক দিনের জন্তও অতিথি হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর জীরণে নিবেদন করলেন, কই কোন বৈফরকে ত দেখতে পেলাম না প্রভু। মহাপ্রভু হতাশার সুরে উত্তর করলেন কেউ আসেনি—তবে আমার মন আজ এত চকস কেন? নিশ্চয়ই আসবে—আমার প্রিয় কেউ আসবে।

অন্নকণ পরে আবার চন্দ্রশেখরকে আদেশ করলেন ভাল করে খুঁজে দেখতে। ব্যাকুল হয়ে বললেন নিশ্চয়ই কেউ এসেছে—আমার ডাকছে—আমি যে আর থাকতে পারছি না—বাও, বাও।

চন্দ্রশেখর আবার ঘুরে এসে বললেন প্রভু, কোন বৈফর ত আসেন নি—তবে গাছতলার একজন দরবেশ বসে আছেন। মহাপ্রভু একটু ইতস্তত করে সেই দরবেশকে ভিতরে আনতে অমুরোধ করলেন।

চন্দ্রশেখরের আমন্ত্রণে সনাতন বীরে বীরে অঙ্গনে প্রবেশ করলেন—তারপর ভিকুর সামনে উদ্ভুল হল অকুরত্ত রয়ের ভাঙার—যুগ-যুগান্তের তুহিত চাতক পেল নব জলধরের সন্ধান। সনাতন হুঁহিত হয়ে পড়ে গেলেন মহাপ্রভুর জীরণে।

দীর্ঘ দিন পরে সনাতন কৌরবর্ণ করলেন—করলেন প্রাণতরে

গঙ্গায়া। শুভ হল তাঁর মন—দেহে কিংবে এল নতুন শক্তি। চন্দ্রশেখর তাঁর জন্ত সাগ্রহ করে এনেছিলেন নতুন পটবস্ত্র ও উত্তরীয় কিন্তু তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে সেই সিন্ধু বসনেই চললেন মহাপ্রভুর পশ্চাতে তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে।

তপন মিশ্র এই নবাগত অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন—নিয়ে এলেন নতুন বস্ত্র ও উত্তরীয়। সনাতন তাঁকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন—মহাশয়। যদি এই ভিক্ষুককে একান্তই বস্ত্র দানে বাসনা, তবে দেও তোমার নিজের পরিত্যক্ত একখান ছিন্ন বসন। তপন মিশ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন গোসাই। তুমিই পেয়েছ চৈতন্যের প্রকৃত রূপ।

বহুজনের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে সনাতন চললেন মাধুকরী করতে—পরিধানে শতছিন্ন মলিন বহিরীস—কক্ষে বহুমূল্য ভোটকম্বল। বাবার পূর্বে তিনি মহাপ্রভুক প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু কৃপে মতিরন্ত বসে আশীর্বাদ করে একটু হাসলেন।

এই ইঙ্গিত ধরতে না পারলেও সনাতন বুঝলেন এ তাঁর সহজ সরল হাসি নয় কিন্তু বুঝতে পারলেন না কি তাঁর অপরাধ—কোথায় তাঁর জটি। এ ভাবে বিব্রণ চিত্তে গঙ্গার মহাঘাট কুতা সমাপন করলেন। উঠে বাবার সমর হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল বহুমূল্য ভোটকম্বলখানার প্রতি, তিনি নিউরে উঠলেন। নিজেকে শত শত বিস্তার দিলেন—কেন এতদিন তাঁর খেয়াল হয়নি যে তাঁর অঙ্গে এখনও রয়েছে বিলাসিতার পঙ্কতিলক। ভিখারী এই বিলাসিতা শুধু মাত্র অশোভন নয়—অপরাধ। সেই কম্বলখানা তখন তাঁর কাছে মনে হল উত্তমমণা বিবধর কালসাপের মত। এবার তিনি বুঝতে পারলেন কেন মহাপ্রভু হেসেছিলেন। কিন্তু বিনা গাভবস্ত্রে বারানসীর প্রান্তে শীতে কেমন করে দেহ ধারণ করবেন। তারপর মনে স্থির করলেন যে যদি শীতে মহাপ্রভুর জীরণে দেহপাত হয় তথাপিও তিনি উহা আর অপর্গ করবেন না।

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন আশার আলোক। অঘুরে এক বৃদ্ধ গোড়ীয় তার শতছিন্ন মলিন কদ্বাখানি শুকোতে দিয়ে বসে আছে। তিনি বীরে বীরে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ভাই, আমার একটা উপকার করবে?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে উত্তর দিল বাবাঠাকুর, আমি নিজেই ভিখারী—এ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে কোনো উপকার চারনি? বল কি তোমার প্রার্থনা—যদি সম্ভব হয় নিশ্চয়ই করব।

তখন সনাতন আরও কাছে এসে বীরে বীরে তার হাত দুটি ধরে সজাতরে বললেন ভাই, আমার প্রার্থনা অতি সামান্য, ধরা করে আমার এই কদ্বাখানা নিয়ে তোমার কাঁধাখানা আমার দাও।

বৃদ্ধ এবার গভীর হয়ে গেল—অত্যন্ত মর্দাহত হয়ে তাঁকে বলল বাবাঠাকুর। আমি অতি দরিদ্র, মূর্খ আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি পণ্ডিত, অতি সজ্ঞাত—আমি ত তোমার পরিহাসের যোগ্য নই?

সনাতন বুঝে কাঁধে একখানা হাত বেঁধে সরস্বে বললেন, আমার বিধাস কর আমি তোমার পরিহাস করছি না। এই কদ্বালটা আমার কাছে বিবধর সাপের মত মনে হচ্ছে, আমি আর এটা বহন

কমতে পারছি না। তোমার পারে পড়ি, দয়া করে এটার বললে তোমার কাঁধাখানা আমার দাঁও।

এবার তাঁর আন্তরিকতার বুকের আর কোন সন্দেহ রইল না। ভাই সে বলল, তোমার বা ইচ্ছা কিন্তু দেখো বাবাঠাকুর, পরে আবার চোর বলে ধরিয়ে দিযো না বেন।

সনাতন একটু হেসে জবাব দিলেন চোর! ভাই আমি যে নিজেই এক চোরের সন্ধানে আহা-নিক্রা ত্যাগ করে গুহুর সৌভাগ্য থেকে বারাগনী পর্যন্ত ছুটে এসেছি। তার দেখাও পেরেছি কিন্তু ধরতে পারছি না।

তা দেখা বখন পেরেছ—ধরা সে নিশ্চয়ই পড়বে।

না ভাই, তুমি জান না সে অতি পাকা চোর—আর শুধু এ জীবনে নয়। জন্মজন্মান্তর থেকে সে চুরি করে আসছে। কত নারীর, কত পুরুষের কত কি যে সে চুরি করেছে তা বলে শেষ করা যায় না।

তা হোক—তোমার এত চেষ্টা এত কষ্ট কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। সে হত বড় চোরই হোক না কেন, তোমার হাতে তাকে ধরা দিতেই হবে।

তোমার আশীর্বাদ ভাই, বলে সনাতন সেই কাঁধাখানা একবার মাথার ঠেকালেন, তারপর বহুমুখ রক্তের মত বুক জড়িয়ে ধরলেন। কবির ভাষায় বলতে গেলে 'দরিদ্র পাইল বেন ষটভায়া হেম'। তিনি মনে মনে বললেন—প্রিয় আধার, তুমি আমার শেষ বিবরকণ্ঠক উপাটিত করছে।

বুঝ সেই বহুমুখ্য কবলখানা গায়ে জড়িয়ে বেশ আরাম উপভোগ করল, তারপর বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলল বাবা, তুমি নিজের পাগল আর তোমার মত কত পাগলই না সংসারে সৃষ্টি করেছ।

আনন্দে সনাতন আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, সেয়ে উঠলেন আর এক পাগল সন্ন্যাসীর অন্তরময় মহামন্ত্র—আধিযাধির মহৌষধি।

'ভক্ত গৌরঙ্গ কহ গৌরঙ্গ লহ গৌরঙ্গের নাম রে

যে জন গৌরঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।'

সেদিন আর মাধুকরী করা হল না। অনেক দিন উপবাসে কেটেছে, নয় আরও একদিন কাটবে কিন্তু এ অপায় আনন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন না করে থাকতে পারলেন না। ক্রমপক্ষে চলে এলেন চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে।

মহাপ্রভু তখন ডিকার বাবার উভোগ করছিলেন, এমন সময় সনাতন তাঁর চরণে পড়ে কাদতে কাদতে বললেন ওগো ঠাকুর! ওগো প্রভু! এবার আমি তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আধ-নিবেদন করলাম—তুমি আমার গ্রহণ করো।

মহাপ্রভু বিস্মিত হয়ে দেখলেন ভোটকবলের পরিবর্তে সনাতনের অঙ্গে রয়েছে একখানা শতছিন্ন মলিন কদা! তিনি তাঁকে বুক জড়িয়ে ধরে বললেন সনাতন, আমার প্রাণের গোস, এবার ত তোমার আমার মিলনে আর কোন বাধা নেই!

তাঁর নীলনলিন নয়নখুল জলে ডরে উঠল।

পুণ্যভূমি ভারত

বহি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে বাহাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা হইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে জগব্রহ্মাভাকাকী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মহুধ্যাজ্ঞতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, হুতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্ভূতির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি! অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বস্তার ভাসাইয়াছেন। এখান হইতে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এইখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বত্র সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দৈবী লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়গন্ধকারী জড়বাসনগণ অনল নির্কোপ করিতে যে অনন্ত-সলিলের প্রয়োজন, তাহা এইখানেই বর্তমান। বহুগুণ, বিখাগ কর্তন ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ ভলাইবে।

—দ্বারী বিবেকানন্দ।

শি শি র=সানি থে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

পশ্চিম আকাশের অন্তর্গামী সূর্য, শুধু একটু স্থান বজ্রিমালা, তার আলোর অন্ধকারের প্রথম স্পর্শ। তার সেই দাহ, শুধুই যুগ উত্তাপ। সেই চোখ-ধাঁধানো ঊজ্জ্বল্য, শুধুই কান্তিহারা মিত্র আলো। তবু কপিকের জগৎ উপযুক্ত পাত্রের মধ্যস্থ মার্ভের প্রচণ্ড তেজের প্রকাশ দেখা যায়, একটি প্রচণ্ড শক্তির আবেষ্টন সর্বত্র অক্ষুণ্ণ হয়। সন্ধ্যার অন্ত্যচল-আরুত রান রবিই প্রভাতের প্রশান্ত মিহির, দ্বিপ্রহরের রক্ত ভাস্কর এই কথাটিই নতুন করে মনে পড়ে যায়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যেদিন হাসি-কান্নার রক্তমুখিত প্রথম নেমেছিলেন আমরা তখনও রূপ নিইনি। এমন কি, আমাদের জন্মপ্ৰভাও তখনও বোধ হয় কল্পনা, তখনও ইচ্ছা হয়েই ছিলেন। তারপর দিনে দিনে শশিকলার মত বেড়ে উঠলেন তিনি, বালা কৈশোরের নানা রঙ্গ সেরে যৌবনের প্রথম উজ্জ্বলের আমেজে ভরপুর হয়ে আছেন। তিনি তখন শিক্ষক, বসিক, নাট্যলক্ষীর দীনভক্ত। তখন চলেছে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। তারপর একদিন এলো সেই বিশেষ দিন, যে দিনটির কথা জন্মলগ্নেই বিধাতাপুরুষ তাঁর ললাট-সিঁপিতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন—তাঁর জীবনের মহাকাব্য। সে পথম লগনকে তিনি হেলা করেননি আর তাই দিকে দিকে সেদিন জয়ডঙ্কা বেজেছিল। সেদিনকার আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

আমরা যখন ধরণীর আলোক দেখলাম শিশিরকুমার তখন মধ্যাহ্ন মার্ভের প্রবল তেজে দেরীপামান। তিনি নিজেই বলেছেন ১৯২১ পর্যন্ত তাঁর কোন নাটকই অক্ষল হয়নি। তাঁর সেই অপ্রতিরূপিত বিজয় অভিযানের কিছু কিছু হয়ত অবোধ আমরা মা'র কোলে বসে দেখেছি। দেখেছি কিন্তু বুঝিনি; বুঝিনি কারণ বোকার বয়স সেটা নয়, তখন মায়ের স্নেহ-আবরণের দাম পুথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি। অবশ্য বয়স হলেও যে ব্যক্ত্যাম-এমন কোন কথা নেই, কারণ বোকার চোখ সকলকার থাকে না।

তারপর বয়স যখন বাড়ল, বোকার সময় যখন হ'লো, তখন শিশিরকুমার আর সাধারণ পর্যায়ের মানুষ নন, তিনি তখন উপকথার দেশের মানুষ। তাঁর সবকিছুতেই তখন একটি অতিমানবীয় স্পর্শ লাগতে শুরু করেছে। তাঁর কথা তাঁর চলন, তাঁর বলন, এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সবক্ষেপে তখন এমন সব কথা মুখে মুখে চলতে শুরু করেছে বাতে তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক বলেই মনে হয়েছে।

তখনকার দিনে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরের হাতে নাট্যকালকার মত এত সহজে পরমা আসত না। অনেক খোসামোদ, অনেক দরবার করে তবে হু-চারটে পরমা পাওয়া যেতো। কাজেই থিয়েটারের সব চেয়ে কমবাসী টিকিট এক টাকা পরমা পাওয়াও কমবাসী ব্যাপার ছিল। তাছাড়া থিয়েটার বায়োকাপের উপর গুরুত্ব দেওয়া যেতেই খুবী ছিলেন না; ওসবে নজর গেলে ছেলেরা উপর যায়। তাই থিয়েটার দেখা আর বিশেষ হয়ে উঠত না।

যাযে মাঝে গুরুজনদের সঙ্গে এনিক-ওনিক থিয়েটার দেখিনি এমন নয়, আর তার মাঝে শিশিরকুমারের অভিনয়ও হু-একবার দেখেছি।

অবশ্য বিচার করে দেখবার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি, তবু এখনই তাঁর অভিনয় দেখেছি, তখনই মনে হয়েছে অজ্ঞদের থেকে যেন পৃথক তিনি। অল্প দামের সীটে পেছনে বসে কদাচ কখনো তাঁর গলা যদি কানে নাও পৌঁছে থাকে, কি বলতে চাইছেন বুঝতে কষ্ট হতো না। আর তাতেই মনে হতো সত্যিকার বড় অভিনেতা নিশ্চয়ই, নইলে অজ্ঞরা যেখানে হে-টে করে চেঁচিয়ে অজ্ঞত্ব করে একটি চরিত্রকে পুরোপুরি খাড়া করতে পারে না, সেখানে কত সহজে কত সামান্য পরিভ্রমে পুরো চরিত্রকে চোখের সামনে জীবন্ত করতে পারতেন। তাই কুড়ি-পঁচিশ বছর পরেও আলমগীরের স্বপ্নসুখ আমাদের চোখের সামনে ভাসে, আজও যেন দেখতে পাই বন্দী আলমগীরকে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে রামের সেই ব্যাকুল কথা—কায় কঠোর।

আরো বড় হলান, বুদ্ধির বিকাশ ঘটল কিনা জানি না, তবে মনের ভিতর আধুনিকতার নানারকম প্যাচ খেলতে শুরু করল। বুঝি না বুঝি বিদেশী কিছু কিছু লেখা পড়ে পড়িতখন্য বনে গেলাম। তখন মনে হল, শিশিরকুমারের অভিনয় গ্রীক বাস্তবিক নয়, তাঁর প্রয়োগবীতি সেকলে বস্তাপচা, তাঁর শিক্ষাদানের বীতি অচল হয়ে পড়েছে। সে যুগটি নবনাট্য আন্দোলনের গুরুত্ব যুগ, নবায়র যুগ, গণনাট্য-সংঘের প্রসারের যুগ। আমাদের মত তরুণদের বোকানো হয়েছিল আর আমরা বুঝেও ছিলাম যে, বাংলার নাট্য আন্দোলনের নতুন মোড় ঘুরছে।

কোন কিছুর অপ্রতুত হবার একটি আনন্দ আছে, আছে উদ্ভাষনা, আছে উজ্জ্বল্য। এই তিনটির একত্র সমাবেশ আমাদের মধ্যেও হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞদের মধ্যেই নতুন কিছু করার মোহটি চলে গেল, দেখলাম নতুন বলে বাক্য ধরতে গেছি সেটি আসলে নতুনই নয়। তুলটি ডাল করেই ভেজে দিলেন শিশিরকুমার—নবায়রই সমশ্রেণীর হুখার ইমান প্রবোজন করে। দেখা গেল বাক্য বাস্তবের দলে ফেলা হয়েছিল তিনি সেদিনও সকলের আগে।

বাঁদের আমাদের চেয়ে জানী মনে করতাম, হঠাৎ তাঁদের জ্ঞানের পরিমাণ ও গভীরতা সবক্ষেপে সন্দেহ জাগল। থিয়েটারের বিষয়ে বিদেশী লেখকদের লেখা বই কিছু কিছু পড়তে শুরু করলাম, তার থেকে এই বোধটুকুই জন্মাল যে, নাটক সবক্ষেপে বত আলোচনাই করা বাক না কেন, নাটকের অভিনয়ের মূলত্ব তা থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এর মত প্রবোজন নিয়মিত ভাবে নাটক পড়ার, অভিনয় দেখার ও সম্বন্ধে অজ্ঞদের করার।

এবার থেকে সেই প্রচেষ্টাতেই রত হলামিয দেশী বিদেশী বহু নাট্যকারের বহুরকম নাটক পড়লাম আর তার থেকে আরো বিশদে পড়তে হলো। এতদিন পর্যন্ত একটি ভাসা-ভাসা ধারণা

ছিল যে, বক্তব্যের উপরই নির্ভর করে নাটক, একই কথা বার বার বললে বক্তব্যের মাহুর্ষ নষ্ট হয় আর বক্তব্যবিহীন নাটক নাটকই নয়। অবশ্য বক্তব্য বলতে, কেন জানি না, বুঝতাম—প্রগতিশীল বক্তব্য। কিন্তু পৃথিবীর বহুবিধাৎ নাটকের মধ্যে অদ্ভুত রকম মিল নজরে পড়ল আর আমাদের ধারণা অল্পব্যাপী তাড়ের মূল কথাও বক্তব্য বলে স্বীকার করাও কঠিন ছিল। তাহলে কি সেগুলো ভাল নাটক নয়? তাহলে ভাল নাটক বলব কাকে?

মনের মধ্যে বর্ণন এই রকম কোটানা, তখন আমাদের প্রত্যাশাদ একজন এসে বললেন—ওহে, শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করবে? মনে হলো যেন উত্তর এবার পাওয়া যাবে। শিশিরকুমারের বিরাটবাহী আর বাই বলুন, নাটক সম্বন্ধে যে তাঁর পড়াশুনার অভাব ছিল এমন অপবাদ অতি বড় নিলুওও দিতে পারত না। তাই এক কথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে গেলাম।

কোন বিখ্যাত লোককে কাছে থেকে দেখতে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু অবিকাশ্য ক্ষেত্রে দূরের মানুষ কাছে এসে দূরত্বের মোহজাল কেটে গিয়ে রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শে করনার স্বপ্নমন্দির ভেঙে যায়। ওয়ার্ডগওয়ার্থ তাই বোধ হয় বলেছিলেন যে, “ইয়ারো” না দেখাই ভালো। অবসরকালে মন বধন ক্রান্ত হয়ে পড়বে তখন আমাদের না দেখা “ইয়ারো”র কথা মনে করলেই ক্রান্তি দূর হবে। (কথামতো শ্রুতি থেকে বলছি, কাজেই আকস্মিক সত্য না-ও হতে পারে, তবে ভাবটি ঘোঁরাটু বোধ হয় ঠিকই আছে।)

শিশিরকুমারের কাছে গেলে যে আশাভঙ্গ হবে এটি ধরেই নিয়েছিলাম আর নিয়েছিলাম বলেই খুব বেশি আশাহত হইনি। মনের মধ্যে অনেক দিন আগে যে অভিমানবীর কথাটি বাসা বেঁধেছিল, সেটিও অভাবই প্রথম চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম মধ্যযুগের শিক্তি কৃতিবান একটি মানুষকে, বীর ঘর বই-এ ঠাসা। ইঞ্জিনের বেসে চুপ্ত হাতে, মোটা চশমা চোখে এই মানুষটি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু কথা বলতে বলতে চোখের বিদ্রোহ বধন খসলে উঠেছিল তখন বুঝতে পেরেছিলাম—touch of madness তাঁর ভিতরেও আছে।

প্রথমেই বলেছিলেন—নাটক পড়তু? আমতা আমতা করে বলেছিলাম—একটু একটু। খুশি মনে বলেছিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। পড়বে। নাটক বত পড়বে ততো ভাল বুঝবে। তারপর নাটক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের মালিনী পড়েছ? মাথা নেড়েছিলাম, অবশ্য তাত্ত হ্যাঁ, কি না বোঝার তা বোঝা যায় না, আমাদের মধ্যে একজন বলেছিল—পড়িনি তবে অভিনয় করেছি। ধানিকটা নেন অবাক হয়েছেন এই ভাবে আবার হেসে বলেছিলেন—বলো কী রে, তোমার ভো খুব সাহস দেখছি? রবীন্দ্রনাথের বই-এর মধ্যে মালিনীর কদমই সবচেয়ে কম, অথচ তুমি তা অভিনয় করছ। তা পড়িনি কেন? সেই চপট জবাব দিয়েছিল—বুঝতে পারি না। হেসে উঠেছিলেন—বুঝতে পার না কেন? বেশ, পড়ে শোনানি। বই নিয়ে এসে বলেছিলেন—নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি, অথচ এর কোন বোজই রাখে না কেউ।

সেদিন তাঁর পড়া শুনে আর তাঁর ব্যাখ্যা থেকে নাটকের রস

গ্রহণ সহজ হয়ে গিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রসঙ্গ সমাধান হয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম বক্তব্যই নাটকের মূল কথা নয়, মূল কথা স্রষ্টা বিভাস আর চরিত্র স্রষ্টা। এই দুটি গুণের সঙ্গে নটের অভিনয়কলা আর স্রষ্টাযোগ্যবীতি বদী মেলে তাহলেই নাটক শ্রেষ্ঠ নাটক হয়ে পীড়িতে পারে।

সেমিনারের পর বহুবার বহুভাবে শিশিরকুমারের সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয়েছে। মাকে তাঁর দিনের পর দিন অভিনয় দেখেছি; তাঁর পরও বহুবার আমাদের তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথম দর্শন থেকেই তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে তার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। কিছু হুর্ভাগ্য বশত: তার সবটাই আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘোঁরাটু উনিশ শ’ ছাত্রালয় শেষ দিক থেকে আটাল্ল সালের শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে তারই কিছু কিছু অন এখানে আমাদের কাছে আছে।

উনিশ শ’ আটাল্ল সালের জুন মাস নাগাদ নাট্যরসিক ও নাট্যমোহী একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলবার জন্ত তিনি নব্য বাংলা নাট্যপরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পুরোনো ‘নাটক পাঠ, নাটক সম্বন্ধে আলোচনা ও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে বর্তমান যুগের বাঙালী নাট্যরসিকদের পুরোনো যুগের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের ইচ্ছা তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে বেশ-সব আলোচনা করতেন তিনি সেগুলো সবই লিখে রাখবার চেষ্টা করেছি। প্রথম প্রথম সঙ্গে সঙ্গে লেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষের দিকে এত কথা বলতেন যে, সঙ্গে সঙ্গে লেখা বাতুলতার নামান্তর মাত্র হয়ে পীড়িত। তাই পরে শ্রুতি থেকে লিখেছি। তার ফলে হয়ত অনেক সময় কোন কোন কথা একটু-আধটু অনুল-বরল হয়ে গেছে। তবে বতদূর সম্ভব তাঁর মুখের কথাই লিখে রাখতে চেষ্টা করেছি। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ঠিক মত বুঝতে না পেরে ভুল করেছি। তার জন্ত দোষটা আমাদের।

অনেক বিযুক্তপ্রায় কাহিনী সম্বন্ধে শিশিরকুমারের মতামত কোঁতুলোদোপক মনে হবে। বাঙলা দেশের কোন কোন মনীষীর কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি, তাঁদের সম্বন্ধেও শিশিরকুমারের কাছ থেকে অনেক কথা জানা গিরাজে। আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলা দেশের তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের আচার-ব্যবহার আলোচনা-আলোচনা সম্বন্ধেও কিছুটা আলোকপাত করবে বলে মনে হয়।

তবে শিশিরকুমারের জীবনী-গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা আমরা করছি না বা শিশিরকুমারের নাট্যজীবনের মূল্যায়নের দায়িত্বও এখন নয়। এসব কাজের জন্ত উপযুক্ত পাত্র অনেকেই আছেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষ শিশিরকুমারের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর তাঁরই কথার সাহায্যে কিছুটা আলোকপাত।

তাঁর কোন কোন কথা স্পষ্টত: অতিভাষণ দোবে হুঁই বলা যেতে পারে। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তিনি কথাগুলি বলতেন তা বিবেচনা করলে বোধ হয় তাঁর এ দোষ অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। তিনি বলতেন আমাদের মত বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছে, যাদের গুরুত্ব অস্বীকার করার স্পৃহা অত্যন্ত উগ্রভাবে বর্ধমান; তাহা ছাড়া যিকোনো এমনই একটা জায়গা যেখানে, নটগুরু শিষ্যশিক্ষার বসে

বসুমতারও পদধ্বনি হয়, কাজেই কোমলমতি তরুণ-তরুণীরা যাতে গম না হারায় তার জন্তই অনেক সময় অনেক কথা হরত কিছুটা বেশে-ঢেকে বলতেন।

আমাদের কথা হরত একটু বেশী বলা হয়ে গেল, কিন্তু শিশিরকুমার সন্দেহ আমাদের কিছু বলবার অধিকার স্থাপন করবার জন্তই এত কথা বলতে হলো। অধিকারী বিবেচনা করলে হরত বলবার অধিকার আমাদের কিছুই নাই, তবু তাঁর স্নেহ আমরা পেয়েছিলাম এবং সেই স্নেহের দাবীতে এই লেখাগুলি প্রকাশ করছি।

শিশিরকুমারের কথা বলার আগে বোধ হয় সে সময়কার বাংলা রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বর্ণনা করা অজ্ঞার হবে না। শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণের সময়কার অবস্থার সঙ্গে আজকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবস্থার বেশ একটা মিল আছে। মাত্র এক যুগ আগে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের নেতৃত্বাধীনে বহু-বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী জনসাধারণকে আনন্দদান করতেন। অথচ আজ তাঁদের প্রায় কেউই আর রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন না। সেরিনও রঙ্গমঞ্চের এইরকম অবস্থা। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুকুমার, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ প্রথম যুগের দিকপাল অভিনেতারারা তখন গত হয়েছেন। রসরাজ অমৃতলাল বর তখনও জীবিত, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অবতরণ আর বিশেষ করেছেন না। সেই যুগের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দানীয়াবু তখন নিঃশ্রুতি অভিনয় করতেন। কিন্তু গিরিশযুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তখন স্বল্পকথার পর্ববসিত হয়েছে।

গিরিশযুগে সাধারণ অভিনেতারারাও শরবতীযুগের বহু সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতার চেয়ে ভাল অভিনয় করতেন। কথাকাটা শিশিরকুমার নিজেই বলেছেন। কিন্তু মিলিতভাবে অভিনয়ের উন্নতির কোন প্রচেষ্টা তাঁরা করেননি। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলতেন—এগিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে, বৃষ্টি। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিনয়ের মান অল্প খুবই উন্নত ছিল, কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে কোন রকম উন্নতির চেষ্টা তাঁদের ছিল না। এমন কি, অনেক সময় বরি মনোমত দর্শকসমাগম না হ'তো তাঁরা অভিনয় সংক্ষেপ করে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে শেষ করতেন। অভিনয়ে একটি ভোলেরও প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা। প্রথম যুগের বিখ্যাত অভিনেতারারা অবশ্য এ ভোলে আবদ্ধ থাকতেন না। কিন্তু শরবতীযুগের প্রায় সকলেই এ ভোলের ফেরে পড়ে গিয়েছিলেন। এমন কি, দানীয়াবুও তার প্রভাব নড়াতে পারেন নি।

ক্ষমতাশালী ক্ষমতা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, লোকে তার ক্ষমতার কথা জানে বলেই তাকে সমীহ করেই চলে, কিন্তু অক্ষম যখন তার ক্ষমতার কথা বলে তখন স্মৃতিহীন গণ্ডীর মধ্যেই ক্ষমতার প্রকাশ করে। সেইজন্য অক্ষমের ক্ষমতা প্রকাশ একটি জোলেই হয়। শক্তিশালীরা সে জোল মেনে চলবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তারাই জোল বেঁধে দেয়। শিক্ষক-ছাত্রের গ্রন্থবোধ্য করেই শিক্ষা দেন, কেতাবী শিক্ষার সে হিসাব থাকে না, কাজেই সেখানে মুড়ি-মিছুরির একই দর হয়ে পড়ে। মিছুরির অবস্থা জাতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু বিপদে পড়ে মুড়ি। দুর্বল অভিনেতারারা তাই ভোলের বাঁধনে পড়ে ধাঁসকাঁস করত আর সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের অবনতিই ঘটত।

অল্প বয়স থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই দুর্বলতা শিশিরকুমারের

নজরে পড়েছিল। পরীক্ষার পড়ার দিকে তাঁর যৌক না থাকলেও কবিতা ও নাটক জাতীয় অপরূপ বইয়ের উপর যৌক ছিল খুবই বেশি। তাছাড়া অভিনয়, নাট্যপ্রয়োগ ইত্যাদি সবকিছুও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। সে সৈমন্তের বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রায় সব নাটকই তিনি দেখেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতার অভিনয়কলাও তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। বার ফলে দীর্ঘ আটচল্লিশ—পঞ্চাশ বছর পরেও বিভিন্ন অভিনেতার বাচনভঙ্গীর নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারতেন। এতদিন পরে যদি অতকাল আগের কথা মনে থাকে, তবে সেই সময় আরো কত বেশি মনে ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

ঊষা কলেজে ছাত্র থাকাকালীন শিশিরকুমার সর্বপ্রথম জুলিয়াস সিজার নাটকে ক্রটাসকে রূপায়িত করেন। কিন্তু বতবুর ভানা বায়, সে সময় প্রয়োগের কোন দাবিও বোধ হয় তাঁর উপর অসিত হয়নি। পরিচালক হিসাবে শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব বকুবু ভানা বায়, নবীন সেনের কুরুক্ষেত্রের নাট্য-রূপায়ণে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এর পর নাট্য-পরিচালক ও নট হিসাবে শিশিরকুমারের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হতে থাকলো।

ইতিমধ্যে এম-এ পাশ করে শিশিরকুমার তদানীন্তন মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমানে বিভাগগর কলেজ) এ ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনার কাজ নেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অধ্যাপনার ভূতী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নাট্য-পড়ানো তিনি পছন্দ করতেন না আর সেজন্য ছাত্ররা তাঁর কাছে অছবোগণ করত। অধ্যাপনার কাজে লেগে থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার প্রধান অধ্যাপক হওয়া অসম্ভব ছিল না। শোনা যায়, তিনি যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করতে প্রস্তুত হচ্চেন, তখন আশুতোষ তাঁকে নিবৃত্ত হতে অমুরোধ করেন এবং তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ দেবার প্রতীক্ষাও দেন। অধ্যাপনার কাজে খুব বেশি চাপ না থাকায় তাঁর পক্ষে অল্প কাজ করে অধিক অর্থোপার্জন করাও সম্ভব ছিল, আর তিনি তা' করতেনও। তবু আর্থিক দৃষ্টি স্বীকার করেও তিনি রঙ্গমঞ্চে বোগ দিলেন। তাঁর রক্তে যে তখন অভিনয়ের ডাক এসেছে। কাছুর বাঁশী শোনার পর বাধা কি আর করে থাকতে পারে।

শোনা যায়, ইনষ্টিটিউটে তাঁর নাট্য-প্রয়োগের কাজে তিনি অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন। বিনয় বাবু তাঁকে অভিনয় করা ও করানোর কাজে উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জীবিত থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বোধ হয় সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতরণ সম্ভব হতো না। হার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন—You are wasting yourself, Sisir, your true vacation is on the stage. কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতরণের উচিত্য সন্দেহ যখন প্রশ্ন করলেন শিশিরকুমার, তখন গুরুদাস বাবু তৎকালীন রঙ্গালয়ের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে বললেন—পারতেননি যে, ভূমি নেবে যাও শিশির! বরক বোধ হয় বারংবারই কয়েকবার।

আজকে বিশ শতকের বই রচনাকৌশল, শিক্ষিত বাঙালী তার আত্মীয়-বন্ধনের কাউকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গণ্ডী পেরিয়ে বাঙালী

পছন্দ করে না। কাজেই আরও চল্লিশ বছর আগেকার কথা সহজেই অল্পসের। অথচ আশ্চর্যের কথা, সেই সময়েও শিশিরকুমারের মাতা তাঁর কৃতী সন্তানের এই জাতিচ্যুতির কথা জেনেও কোন আপত্তি করেননি, বরং তাঁকে আশীর্বাদই করেছিলেন। শিশিরকুমারই বলতেন যে, বত রাত করেই কিরুন না কেন তিনি, তাঁর জন্ত জেগে বসে থাকতেন মা।

মায়ের আশীর্বাদ মাধার নিয়ে, পদের মোহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ করতলগত আমলকের মত ভাগ্য করে, নিশ্চিত বর্তমানকে ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বৃকে নাট্যকলার উন্নতির মন্ত্র মুখে নিয়ে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে সেই যে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি আর কোন দিনও পিছন দিকে ফেরেননি। বার বার বাধা পেয়েছেন, বার বার সাকল্যের ভুল শিখর থেকে চরম অসাকল্যের মধ্যে হারিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু কখনো হার মানেননি।

ম্যাডান কোম্পানীর চাকরীতে ঈর্ষাতুর সঙ্গীদের চোঁয়ার নিজের ইচ্ছামত উন্নতি করা সম্ভব হয়নি বলে চাকরী ছেড়ে দিতে বাধেনি তাঁর। একজীবিশনে থিয়েট্রালারে “সীতা” অভিনয় করার পর যখন তাঁর অভিনয়খ্যাতি, পরিচালনখ্যাতি আর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল আর সেই খ্যাতির সুযোগ নিতে তাঁর বিচ্ছিন্নপন্থ যখন আইনের কাঁকে কৌশলে সীতার অভিনয়ের স্বয়ং কিনে নিয়েছিলেন তখন যেমন অদম্য উৎসাহে অজানা অচেনা যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে রাতারাতি নাটক লিখিয়ে অভিনয় করেছিলেন, তেমনি অল্পকাল আগে জয়জর্জর ডরসেহে “নব্য বাংলা নাট্যপরিষদ” স্থাপন করে আমাদের উপর যুগ সম্প্রদায়ের দায়িত্ব চাপিয়ে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের “মালিনী”র রিহাসারালের কাছ নিজের কাঁখে নিয়েছিলেন এবং দিনের পর দিন যৌবনের শক্তি নিয়ে সুপরিচিত ও অপরিচিত অভিনেত্রী-অভিনেতাদের একই ভাবে অভিনয়ের নৃন্দ কাকর্ষ্য দেখাতে চেয়েছেন।

উৎসাহের আধিক্যে ভাড়া হাতের কথা ভুলে গিয়ে, বয়সোচিত সৌন্দর্যের কথা ভুলে, প্রায়শ্চন্দ্র দৃষ্টির কথা বিস্মৃত হয়ে যেভাবে তিনি লাকালিকি করতেন তাতে তাঁর পরিচিতির কথা কি দুর্ঘটনা ঘটে এই ভেবে সশঙ্কিত হয়ে পড়তেন তিনি কিন্তু তাকে ভ্রূকপও করতেন না। যে যন্ত্রশক্তির প্রভাবে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাঙ্কড়ি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাঙ্কড়িতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাঁর সেই ক্ষমতার পরিচয় জীবনের প্রায় শেষ দিনটিতে পর্যন্ত দিয়ে গেছেন।

শিশিরকুমার ছিলেন চির আশাবাদী; বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না তাঁর। তবে তিনি এ কথাও বিশ্বাস করতেন যে, নতুন নতুন পথ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, একথাও তিনি জানতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, উপযুক্ত অর্থাভাবেয় জন্ত কোন এক বা একাধিক সৌধীন নাট্য সম্প্রদায়ের পক্ষেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না। এ কাজের জন্য প্রয়োজন সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাতীয় নাট্যশালা। সরকারী পরিচালন ব্যবস্থার তিনি আশাবান ছিলেন না। তিনি জানতেন সরকারী লালকিতার চাপে অনেক সবিদ্ধা লোকচক্রের অন্তরালে আঁতে আঁতে লোপ পায়। এই জাতীয় নাট্যশালা সরকারের অর্থ

সাহায্যে গড়ে উঠলেও তার দায়িত্ব থাকবে পুরোপুরি নাট্যবাসিক মহাদ, হাতে। তাঁর খিরেটার বাবার পর এই জাতীয় নাট্যশালায় বধাই বার বার বলতেন তিনি।

কিন্তু একলা অরণ্যে বোধন সার হয়ে পড়েছিল। বহু জন তাঁর মতের যৌক্তিকতা যেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর বলনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন প্রতিশ্রুতিই কার্যকরী হয়নি, বার বার এই ভাবে আশাহত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আর আমাদের মনে হয় এই হতাশাই তাঁর মহাপ্রয়াণকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিশিরকুমারের স্মৃতি যে চরিত্রটির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের মিল সব চেয়ে বেশি তা বোধ হয় বাংলাদেশের আর এক দুর্ভাগ্য প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত্র। সেই জন্তই বোধ হয় জীবনের শেষ পর্যন্ত মাইকেলকেই সব চেয়ে ভালো করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। বিরূপ নিরন্তর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ যে হয় না এ ধর শিশিরকুমারের অজানা ছিল না। তাই নিজেই দুঃখ করে বলেছেন, হাজার বছরে এমন একজন লোক আসে যাকে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মনিরাকর পথ ছেড়ে দেয়, সে সৌভাগ্য আমার নয়। তবু যৈবের কাছে হার স্বীকার করেননি বধনো, কর্ণের মত মৃত্যুকণ পর্যন্ত যুদ্ধই করেছিলেন।

অনেকের মুখেই শোনা যায়, শিশিরকুমার যে সম্মান পেয়েছিলেন সে সম্মান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী পাননি। কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়, হয়ত, হয়ত কেন, দেশবাসীর প্রীতির দানে তাঁর ভাণ্ডার ভরে উঠেছে, কিন্তু তিনি রাজোচিত মতাবের অধিকারী, মুষ্টিভিকার দানে তাঁর মন উঠবে কেন? অছাড়া সাধারণ পাঁচ জনের মত ভাণ্ডার ভরে রাখতে তো শেখেননি তিনি। তিনি তো কেবল দিয়েই গেছেন, যে ভাবে তিনি দিয়েছেন তাতে কুবেকের ভাণ্ডার ফুরাতেও দেবী লাগে না, এ তো সামান্য মানুষ। একদিন বীরা তাঁর দান নিয়েছেন তাঁরা তাঁকে বেহিসারী বলতে পারেন, মুখ বলতে পারেন, কিন্তু অস্বাভাবিক বলেন কি করে?

মানুষ হিসাবে শিশিরকুমারকে বিচার করা আমাদের পক্ষে ঠুঠো মাত্র, কাজেই সে চেষ্টা করবো না। শুনেছিলাম তিনি দর্পী, তিনি লাড়িক। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্যে, আমরা তাঁর স্নেহাতুর রূপটাই দেখেছি। অস্বাচিত অপ্রাপ্য স্নেহের দানে আমাদের মন ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর কাছ থেকে যা পেরেছি তা অমূল্য।

শিশিরকুমারের পঞ্চভূতের নখরদেহ প্রকৃতির বৃকে মিলিয়ে গেছে কিন্তু নাট্যাচার্য অমর হয়ে রইলেন আমাদের মধ্যে। বতরিন বাঙালী জাতি থাকবে, বাঙালা জাতি থাকবে, বাঙালার খিরেটার থাকবে, তত দিন শিশিরকুমার ছিন্ন অমিনখর কবতারার মত বাঙালী-মনে উজ্জল হয়ে থাকবেন।

শিশিরকুমারের অমর্য প্রস্রাতীত হলো সাধারণ মানুষ তাকে খুশি হতে পারে না। তারা চার স্রবীর ও বরবীর মাঝেই মুক্তিচিহ্ন হিসাবে ইন্দিরাপ্রাছ কোন কিছু। তাই আজ নানাসিক থেকে প্রস্তাব আসছে, শিশিরকুমারের নামে রাত্তার নামকরণ করা হোক, বা শিশিরকুমারের নামে পার্কের নামকরণ হোক বা

শিশিরকুমারের নামে অধ্যাপক নিযুক্ত হোক বা শিশিরকুমারের চতাব্দীতে শ্রুতিচক্র গড়া হোক।

এই ধরণের শ্রুতিচক্রের উপর শিশিরকুমারের মোহ তো ছিলই। উপরন্তু ছিল বীতর্যাস। তিনি বলেছেন যে, তাঁর মত দেখতে যে কি না হবে এমন একটি মূর্তি খাড়া করে বছরে গলায় একদিন পালা দিয়ে বাকি তাকে দিয়ে প্রাচীর না করাই সমীচীন। রাস্তার নামকরণও তাঁর বিশেষ আগ্রহী ছিল। বলতেন, প্রজ্ঞার নামে গাধা মারানোর দরকার কি? যে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে একদিন তিনি নাট্য উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই অধ্যাপকের পদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করলেই কি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হবে তাঁকে?

একদিন যেমন গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ নিয়ে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের শ্রুতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছিলেন, তেমনি শিশিরকুমারের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিতে পারলেই বোধ হয় তাঁর শ্রুতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়, অবশ্য আজকালকার দিনে ঠিক শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের সমপ্রণীত মাহুয় পাওয়া কঠিন, কাজেই তাঁরা যে কাজ একলা করেছিলেন সে কাজ পাঁচজনে করতে হবে। তাছাড়া বৃগটাও গণতন্ত্রের, এখন কাজ করতে হলে পাঁচজনের সাহায্য সর্বাঙ্গে প্রয়োজন। শিশিরকুমারের শ্রুতিরক্ষার

জন্য একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত বোধ হয় তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হতো। তাঁর শেষ কথা বলতে গেলে, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত প্রস্তাব। কাজেই শিশিরকুমারের নামে কলকাতার জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত করার চেষ্টাই বোধ হয় আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে।

হয়ত কোন দিন আমাদের জাতীয় সরকারের টনক নড়বে, আমাদের রাজ্যে রাজ্যে স্থাপিত হবে জাতীয় নাট্যশালায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্বতের মুখিক প্রসবের মত বাঙলা নাটকের উন্নতি কতদূর হবে তা সহজেই কল্পনীয়। বাংলা দেশে রসিক লোকের অভাব বোধ হয় এখনও ঘটেনি, আর বাংলা দেশের আকাশে বতাই চূর্ণোপ ঘনিয়ে আসুক, আজও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হাত পাতেল খালি হাতে যে ক্রিয়েতে হয় না এ কথা আমরা বিশ্বাস করি। নাট্যাচার্যের শ্রুতিরক্ষার দায়িত্ব কেউ নিলে জাতির স্বপ্ন শোধের দায়িত্বই নিয়ে ধস্ত হবেন একথা বলা যায়।

নাট্যাচার্যের কথা শুনে নতুন কোন মাহুয় যদি এগিয়ে এসে তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তাহলেই আমাদের কর্তব্য কিছুটা পালন করা হয়েছে বলে মনে করবো। অকাষণ যে মেহ আমরা পেয়েছিলাম তাঁর প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, তবু গুরুত্বপূর্ণ পালন করে অন্ততঃ স্নেহের স্বপ্ন শোধের চেষ্টা করছি। [ক্রমশঃ]

ত্রয়ী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মনে রেখো মহাপ্রলয় তিমিরে জীবন মৃত্যুহারা,
আগুনের রস শুবে শুবে বাঁচে মরুতে খেজুর চারা।
মনে হয় পাহাড় চিবুই,
প্রহসিত গুড়ো করি ধাঁতে।
স্বর্শিখা ফুঁ দিয়ে নিবুই,
ব্যোম চেটে খাই তমিশ্রাতে।

টোকে টোকে নোণা সমুদ্র
খরস্রোতা ক্যাপা নদ-নদী,
গিলে খাই বজ্র মরুভূমি
গতিময় কাল নিরবধি।

দিয়ে মধু বিশ্ব-ভূত্বমেয়
এ কঙ্কালে বানাই মৌচাক।
বাজাই প্রচণ্ড প্রলয়ের
বজ্র দিয়ে আকাশের ঢাক।
একের সাধ্য নেই দুই হ'তে পারে।
একে একে তিন হয় প্রেমের পাখারে।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রী অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, একটি পোস্টকার্ড হাতে এসে পড়ল।

মহাশয়,

পত্র পেলাম। আমি কিছুদিন কলিকাতার বাহিরে ছিলাম তাই উত্তর দিতে দেরী হোলো। আগামী শনি ও রবিবার, ২২শে ২৩শে মার্চ আমি বাড়িতে থাকিব। বিকালে কার্যবশতঃ বাহিরে থাকিতে হইবে। সকালে ১২টার মধ্যে আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইতি—

শিশিরকুমার ডাহুড়ি

পুঃ ব্রহ্মস্পতিবার ও শুক্রবার ২০শে ও ২১শে মার্চও ওই সময়ে আসিলে নিশ্চয়ই দেখা হইবে।

শিঃ

সেদিন ছিল মংগলবার। অজিত চিঠিখানি দেখে বলল— সেও আমার সঙ্গে বাবে, শুধু তাই নয়—যেতে হবে নিকটতম ব্রহ্মস্পতিবারেই।

চিঠিখানি দেখে একটু বাঁধায় পড়েছিলাম। ভাবলাম শিশির বাবু হয়ত ভুলক্রমে মার্চ মাস লিখেছেন, কারণ ফেব্রুয়ারিতে ঐ দিন-তারিখগুলি হুবহু মিলে যায় আবার মার্চের পাতা তুলে দেখি ২০, ২১, ২২, ২৩ একই বার। তবু আমার ভোর না হতেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম ঐ নিকটতম ব্রহ্মস্পতিবারেই।

নাম বলব না, পথে বেরুতেই কিন্তু এক ভয়লোক আমার ভীষণ চমকে দিলেন। বললেন—হাছ বাও কিন্তু শিশির বাবুর অর্ডারে তোমাদের কপালে আছে। এও বললেন—সাবধান! শিশির বাবু 'লৌহমানব' কাউকে বেরাত করে কথা বলেন না।

নিরুৎসাহিত হলেও গাড়ি চাপলাম।

দরমদ থেকে ঠর বাড়ি পৌঁছলাম—তখন আটটা। একটি বুক পড়ছিলেন—তিনি গংবাহ দিলেন। প্রায় দু'মিনিটের মধ্যেই শিশির বাবু দ্বিতল থেকে নামলেন। সিঁড়িতে পা দেবার পূর্বেই তিনি আমাদের জন্য একটু বিশেষ ধরনের কণ্ঠস্বর পাঠিয়ে দিলেন যেন। আমরা ততক্ষণ হয়ে বললাম।

তিনি চেয়ারে বসতে বললেন—কি দরকারে আসা হয়েছে—অমির কার নাম?

কণ্ঠস্বরে কল্পনাভীত গাভীর্ষ। তবু পারাবাই কথা। স্বপ্নকাল আমার মৌন হয়েই রইলাম।

শিশির বাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন—বলো কি প্রয়োজনে আসা হয়েছে। আবার যেন মেঘ গর্জন করে উঠল।

গভরে কি নির্ভয়ে বলি এই চিন্তা তখন মনে তুকান তুলেছে আর কি দিয়ে কথা স্তব্ধ করি তারও দিশা পাছিলাম না যেন।

মাথা চুলকে সবিনয়ে বললাম—হেমন বাবু একটা বইয়ে আপনার কথা খুব ভাল টুকরো টুকরো পড়েছি। ভেবেছিলাম উনি হয়ত দ্বিতীয় পর্বে আপনার জীবন কাহিনী বিস্তৃত লিখবেন। কিন্তু ঠর দ্বিতীয় পর্বে আপনাকে পেলাম না। দ্বিতীয় বইটি আপনার নামেই কেবল উৎসর্গ হয়েছে।

—তুমি কি হেমনের বাড়ি গিয়েছিলে? প্রশ্ন করলেন উনি।

—ঠকে চিঠি দিয়েছিলাম, অবশ্য দেখা পাইনি। তাই আপনার কাছে এলাম। যদি আপনার জীবন কাহিনী—

—পাড়ার লোকের কাছে আমার জীবন কাহিনী বলতে বাবো কেন? সূচনার শিশির বাবুর মুখ থেকে এরকম কথা শুনে সত্যিই এবার খুব খাবড়ে গেলাম। এর পর তিনি দশ পনেরো মিনিট ধরে আমাদের একটু টু' শব্দ পর্যন্ত করতে দিলেন না। সাইক্লোন বইয়ে দিলেন নিজেই।

সীথির চৌরাস্তার মোড়ে শিশির বাবুর বাড়ি। বহি কেউ ভেবে থাকেন একটু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব, তিনি আমাদেরই মত অবাক হবেন। দ্বিতল। আপনার আমার মতই বাড়ি। সেখানে আভিজাত্য বা মুন্সিয়ানা খুঁজে পাবেন না কেউই।

চুপচুপা নিয়ে বসলেন চেয়ারে। মোটা কাচের চশমার ভিতর দিয়ে পুণ্যাত্মপুণ্যরূপে দেখে নিলেন আমাদের আপাদমস্তক।

সেই পড়ুয়া ছেলোট গোপনে বাইরে কাঁড়িয়ে, বাসন মাজতে মাজতে একটা স্ত্রীলোক তফাৎ হতে আড়ে আমাদের দেখছিল। হয়ত ভাল ওয়া, এ দুটোর আজ মরণ শাখা উঠেছে।

সোজা কথা সাক কথা শিশির বাবু বললেন—আমি কাজের মানুষ, বাজে কথা পছন্দ করি না। আমার কাছে যদি কাজের কথা থাকে চটপট বলে। হাতে আমার পাঁচটা কাজ আছে। আমার পড়াশুনো, ঠাণ্ডি করতে হয়, বিহাসাল দিতে হয়, পাঁচটা চিঠি লিখতে হয়, আড্ডা দিতে পারব না। সন্তর বছর হ'ল আর তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারার বয়সও নেই।

আমি অভিনয় করি, কাহিনী লিখি, প্রযোজনা করি। এই বিষয়ে কিছু জানতে চাও তো বলো। যদি বইয়ের নাম চাও দু-একটা বইয়ের নামও দিতে পারি।

আমি হতবাক। অজিত তখন নতরুখে বসে আছে। শিশির বাবু মুখ ঘুরিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন—কি কি অভিনয় দেখেছ?

বললাম—আপনার শেষ অভিনয় দেখি প্রচুর। সম্মিলিত অভিনয়।

—সম্মিলিত অভিনয় আবার অভিনয় নাকি। সম্মিলিত অভিনয় হয় না যেমন হয় না সম্মিলিত ক্রিকেট খেলা। তবে ওয়া বলে, অভিনয় করি। ভাল টাকা দেয়। জীবনে সক্ষম করতে পারলাম না। আমাকেও তো বাঁচতে হবে।

অজিত বলল—আপনার শেষ অভিনয় দেখি চমকপুষ্ট। আমি সীতার কথাও বললাম।

উনি বললেন—থাক সে কথা।

ভাবলাম শিশির বাবুর কোণ বোধ হয় একটু প্রশমিত হয়েছে। চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ ঠর জজ সামাজ নিয়ে গিয়েছিলাম। অর্পণ করে কিছু বলবার আগেই বললেন—না না, এ সব সন্দেশ-টন্দেশ আমি পছন্দ করি না। তোমরা কেন বেণ সব আনো। মনে হল সেগুলি একুশি বৃষ্টি আবর্জনাহুও ফেল দেবেন।

বললেন—বাজে বকে কি হবে? তোমাদের মত বহি বিশ জন

আসে অত সময় কোথা আমার? তাহাজ্জা মধ্যে মধ্যে আমার হাইরে যেতে হয়।

হুজুগে মেনে না। আমার বড় হুজুগপ্রিয়। কে কোথায় কি একটা কাজ করল অমনি আমার তাকে মাথা ঘুসে নাচি। আমাদের দেশের সুবন্ধের কোন হুজুগা পরিকরনা নেই। শুধু উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়।

আবার সব বে এই সট নেভ, আচ্ছা এই সই নেওয়ার কি মূল্য আছে বলতে পারো? দু' বছর, পাঁচ বছর, আট বছর পরে কেউ আর সইয়ের খোঁজ রাখে? তবু খাতা নিয়ে সইয়ের জন্তে সামনে ধরে—এ সব কি?

শিশির বাবু অভিমানী আর কুক মন বায়ে বায়ে আমাদের প্রতিহত করে, নতুন কিছু বলতে কইতে পারি না। অথচ যেটুকু সময় পেয়েছিলাম বাড়ি থেকে ভেবে গিয়েছি এক রাশ কথা।

শিশির বাবু বললেন—আজ বাঙালার সব চেয়ে দুর্দিন। বাঙ্গালীর ছেলের আজ একটি চাকরী পাওয়ার উপায় নেই, তবু এটাই তার নিজের দেশ। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষার উন্নতি হয়নি এক কোঁটা। শুধু হয়েছে শিক্ষা সত্যতেন। ছোট ছোট ছেলের পড়ার পথ বন্ধ করে শুধু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাইনে চার টাকা, ছুটাকা।

পৃথিবীর জন্ত কোন দেশ শিক্ষা আহরণের এ রকম বন্দোবস্ত আছে কি বলতে পারো? আমার অন্ততঃ জানা নেই। সব দেশে কিশোররা বিনামূল্যে শিক্ষা পায় শুধু তাই নয়, বাধ্যতামূলক ভাবে। আর আমাদের দেশ।

পাঞ্জাবে মাসজাহ বা পারেনি, বোম্বাইয়ে বা হয়নি তা হ'লে পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দী জোর করে তাদের শিখতে হ'বে।

বাঙালীর সর্বনাশ সামনে। তোমরা যুব সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ প্রতিকার করছ না কেন? তোমরা সংবত হও সংঘী হও। দেশে ছেলে নেই এমন কথা বলছি না, কিন্তু এই 'করু'র দলে ভিড়ে মাটি হয়ে গেছে।

এক্কেবারে অচেনা পরিবেশের মধ্যে এরকম নির্ভেজাল অভিনব আলোচনা চলতে পারে আমাদের করনার তা আসেনি। আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, সত্যি কথা অবশিষ্টও বোধ করছিলাম বেশ। উত্তরে এই কীকে ভেবেছিলাম এখানে কোন কথা না বলাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে।

সত্তরের আরেক জরান এই মাহুঘটি কিন্তু তেজদীর সাতাশের মতই। তাবলে বিস্ময় হয় এই বরসেও মাইকেল এবং রায়ের ভূমিকার ঠাঁকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সত্তর আমাদের কাছেই আসে সময়।

মনে হ'ল চুকটটা হয়ত নিয়ে গেছে। কিন্তু শিশির বাবু টান দিয়ে বললেন—পড়ো ভাল করে। যদি অভিনয় করতে চাও, বা অভিনয় করবে সেই চরিত্র ভাল করে বুঝতে হবে প্রথমে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। 'সত্যি নাটক'—সেই বই নির্বাচন করতে হবে।

বললেন—সবই হুজুগে। বারোয়ারী সার্বজনীন পূজো-টিক যেন থিয়েটারও তাই। আরে বাণু, ভক্তি থাকে পূজা করা, ভক্তি না থাকলে পূজা করা না।

হঠাৎ বললেন—এতদূর থেকে যখন সময় আর পরমা নষ্ট করে এসেছ হুটো প্রের কর, সাধ্যমত জবাব দেব।

—আপনি কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখছেন?

এই প্রশ্নে তিনি বললেন—তখনকার দিনের চেয়ে এখন বেশী নাটক হয়। তখন পরমা পাওয়া যেত না, এখন পরমা পাওয়া যায়। তখনকার দিনে একাংক নাটক ছিল না কে বলে? তবে তোমরা মনে কর রিভলুজি টেক্স মানে কি না কি। মৃত্যু বোঝে না যে, রিভলুজি টেক্স মানে—ছোট টেক্স। শিশির বাবু এই সময়ে হাত দু'টি স্কন্ধর করে কেমন ছোট দেখালেন।

নাটকের উপযোগী নয়, অথচ সাজাহান, টিপু সুলতান, এই দু'টো নাটক অভিনয় হয়। সব চেয়ে মজা ১৮৮০ সালে যে নাট্য প্রতিষ্ঠানটির অভিনয় ছিল আজ তারা এমন অভিনয় করছে যে নাটকটির মধ্যে নাটকীয় পদার্থ কিছু নেই। বিশটা চরিত্র আর বিরাট ব্যাপার নিয়ে অভিনয় হয় না, তবু তাই হচ্ছে।

শিশির বাবু বললেন—তোমাদের নতুন করে কি আর বলব, সবই তো পুরনো কথা। অজ্ঞ দেশে যে রিভলুজি টেক্স নেই তা বলছি না। তাড়াতাড়ি এবং বিশেষ কোন দৃষ্টির ভিত্তি হৃদয় বোয়ান প্রয়োজন হয়, কিন্তু তা নিয়ে সর্গসর্বাদী কাজে লাগানো কোথাও হয় না।

একটি কথা বলতে ভুলে বাছি। শিশির বাবু একবার বললেন—আজকাল সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না কেন জানো? তাতে দেশের কথা নেই বলে।

আমরা তো পূর্বেই কথা বন্ধ করে বসেছিলাম এবার নাট্যাচার্য নিজেকে একবারে খেমে গেলেন।

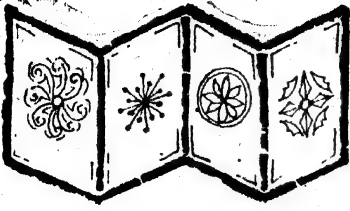
ভাবলুম আমরা আসব জেনে আমাদের জন্ত বরাদ্দ বতগুলি কথা ছিল তা তিনি সবই নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

শিশির বাবু উঠে পড়লেন। বললেন—এখন তাহলে উঠি?

আমাদের উঠে পড়তে দেখে তিনি বললেন—আবার এসো, কল্যাণ হোক।

অতি কল্পকণ বড় জোর আধ ঘণ্টা প্রবল প্রতিভাধর মাহুঘটির সান্নিধ্য পেয়েছিলাম কিন্তু সেই স্মৃতিটুকু এমনই বৈচিত্র্যময় আমি তো নয়ই, অজিতও কোন দিন ভুলতে পারবো কি না সন্দেহ।

৮ই মে গিয়েছিলাম মহাভাতি সদনে। সেদিন ভাবতেই পারিনি আমাদের ভিত্তি এক মধ্যান্তিক সংবাদ প্রতীক্ষা করছে। সর্বজনপূজ্য মহান শিল্পী আমাদের প্রিয় নাট্যাচার্য সে দিন এসে গাড়িয়েছিলেন মঞ্চের আভিনায়। আমরা দেখেছিলাম আলমগীরকে। আজ ব্যথিত মর্মান্বিত। আলমগীর আর নেই শুধু তাঁর শূন্য সিংহাসন পড়ে আছে। কালের এ এক কল্প বিচার।



পত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেন মহাকবিযুগলের পত্র-বিনিময়

Rangoon, 11 York Road.

ভাই গিরিশ,

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১১০৬।

২০ বৎসর বয়সে পলাশীর যুদ্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি সিরাজদৌলা লিখিয়াছ তুমিরা তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছ। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন পলাশীর যুদ্ধ লিখি তখন সিরাজের পত্রচিত্রিত আলোখাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের যুদ্ধ আরও উজ্জ্বল করুন।

আমি নব যুবক সিরাজের পত্রের যুদ্ধে শোকসঙ্গীত প্রথম সংস্করণ পলাশীর যুদ্ধে দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত যুদ্ধে আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বন্ধিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই ভিত্তি আমি সঙ্গীত পথে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গৌর্য্য। দেখিলাম তুমি সেই সন্ধিত পথ অবলম্বন করিয়াছ।

তোমার জীতাবলীর সহিত তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহার একগুণও পাঠাইতে গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম। এই প্রদূর প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অল্পত জীবন যেন সুখশান্তিতে শেষ হয়।

মহোদায়ী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

১৬ নং বনুগাড়া লেন, কলিকাতা।

১৫ মার্চ ১১০৬

কবির শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাদেব—
ভাইজী।

তোমার পত্র পেয়ে আমার পত্রের উত্তরের আনন্দে নয় সত্যই আনন্দ হয়েছে। তার বিশেষ কারণ, যখন তোমার সঙ্গে হামেশা দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল তখন তোমার প্রতি আমার যে কিরণ প্রভা ও ভালবাসা আমি ভুলিতে পারি নাই, কিন্তু যখন বহুদিন তোমার কোন সংবাদ পেলুম না, আর কোথায় আছ, তাহাও জানিতাম না তখন আমার মনোভার আমি আপনি বুঝতে পারলুম। আমি অনেক দিন হতে মনে করি যে আমার ছন্দের সন্ধে তোমার সহিত একটা বাদাছুবাদ করব কিন্তু আমার কাজের কাল বা করলে হয়, আজ তা করব না। এরকম প্রকৃতির লোকের ক্রোধ-প্রবৃত্তি কখনো না। আমার মনোপাত ইচ্ছা সাহিত্য সন্ধে এই দুই হতে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কই, কিন্তু কতদূর হয়ে উঠবে ঈশ্বর জানেন। তুমি আমার সিরাজদৌলার প্রশংসা করেছ,

আমি তোমার একটি প্রশংসা করি, তোমার “পলাশীর যুদ্ধ” সিরাজদৌলার চিত্র অঙ্কন হলেও তোমার বঙ্গেশ-অনুগাণ ও সেই হৃদয় সিরাজদৌলার প্রতি অসীম দয়া রাগী ভাবনার যুদ্ধে প্রকাশ পায়। আমার ধারণা, অনেক দেশাত্মবাসী লেখকের তুমি আনন্দ। আমার উপর তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা, এ আমার গুণ নয়, এ আমি সম্পূর্ণ বুঝি তুমি তোমার মাহাত্ম্য। লেখা ও ব্যবহারে তুমি একজন প্রকৃত বৈক্য। তোমার পত্রখানি আমি সকলকে দেখাই, তারা আনন্দ করে কিনা জানি না। কিন্তু আমার বড় আনন্দ হয়।

তুমি আমার বই কিনে পড়েছ; আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হতে তুমি জানো, আমি একটা ‘বাইটুলে’ তুমি আপনার গুণে আমার কমা কর। কেমন আছ? পরিবারবর্গ কেমন? উত্তরে আমার সংবাদ দিও। আমি হাপানিতে ভুগছি। ঈশ্বরের রূপার বহি আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার মনে হচ্ছে তিন দিনেও তোমার সঙ্গে আমার কথা ফুরাবে না। তুমি জানো কি না জানি না, আমার বন্ধুবান্ধব বড় কম, সে অল্প কারো দোষে নয়, আমার দোষে। আমি মনে মনে তোমার পরম বন্ধু বলিয়া জানি। এ পত্রখানি আমার হাতের লেখা নয়, আমার হাতের লেখা পত্র আমি না পড়ে দিলে হামুয়ের সাধ্য নাই যে পড়ে। বার হস্তাক্ষর সে আমার সম্ভানের তুল্য। আমার সঙ্গে বসে লেখে। আমি যে যে কথা বললুম, তাহা আমার অন্তরের কথা, এই লেখকই তার সাক্ষী। আমি সিরাজদৌলার ভূমিকায় তোমার সন্ধে অক্ষরবাহু যে কটাক্ষ করেছেন—তারই প্রতিবাদ লিখিলাম কিন্তু এই লেখকই আমার নিবৃত্ত করে। এর নাম অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অবিনাশ আমার একটি উপদেশ দিলে; বললে—হমাই স্বভাবকবির “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্য আর সিরাজদৌলার ওকালতি দুইটিতে বিস্তর প্রভেদ, আপনি সে সন্ধে সমালোচনা করিলে কাব্যের সম্মান বৃদ্ধি না করে, ওকালতির সম্মানই বেশী বাড়াবে।

আমার “পলাশীর যুদ্ধ” সন্ধে বক্তব্য ছিল, বা ইতিপূর্বে বললুম—তোমার সিরাজের প্রতি ঘেহ ও তোমার দেশাত্মবাসী। জীমান নিখিলনাথ রায় ও সমাজপতি আমার এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আজ রাত হয়েছে ওইপে। শরীরে বড় ভালো নয়। হুঙ্গ নিয়ে একটা বাগানবাদ করব শাসিয়ে রাখলুম। কাজ এ বাইটুলে দ্বারা কতদূর হবে তা ঈশ্বরকে মালুম। ইতি।

দেহপ্রাপ্ত

গিরিশ

ভাই গিরিশ,

তোমার ১ই মার্চের পত্রখানি বঙ্গবাসীরে পাইয়াছি। তুমি বেশ ভালোনাথ তুমি যে আমার পত্রের উত্তর দিবে, আমি কখনো মনে করিয়াছিলাম না। অতএব এই ত্যাস বীকারের জন্য আমার বক্তবান বলিব কি? তাহার অর্থ তো বুঝি না, আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর।

পৌরাণিক কাল বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব এখন কলিকাতা-বসুন্দের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়া তোমার হৃদয় সন্ধকে একটা লড়াই চলিবে কি না বড় সন্দেহের কথা। আমি একজন চিরবোগী। শীত্রে যে কলিকাতা বাটব, সে আশা নাই। তুমিও কলিকাতার বঙ্গবাসীর বঙ্গপূর্ণ বৃহৎ উদয়টি লইয়া সন্ধ্যায় এখানে আসিবে তাহাও অসম্ভব। আমার বোধ হয় এ জীবনে তুমি 'মহারাত্রী' পরিধারি বাহিরে, কলিকাতার পাঁচ বকমের আমল ও পাঁচ বকমের দুর্গন্ধ ছাড়িয়া কখনও বাও নাই। বহি একবার মহারাত্রী দুর্গের বাহিরে এই ব্রহ্মদেশে আসিয়া বৃহৎ হাত, তবে একবার হৃদয় লইয়া বৃহৎ করি, ব্রহ্মদেশ প্রকৃত Land of Pagodas and Palms দেখিবার বোগ্যস্থান। তোমাকে একবার এখানে পাইলে ভালো চাষি দিয়া দুই মাস বন্ধ করিয়া বাহিয়া একখানি নাটক লিখাইয়া লই। আমার বিশ্বাস, বঙ্গবাসীর দ্বারে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভার পূর্ণ স্তুতি চইতেছে না।

কেবল সিরাজদৌলা নচে, তোমার বন্ধন বহি বাহির হয়, আমি তাহা কিনিয়া আনিয়া আগ্রহের সহিত পড়ি। শুনিয়াছি, অনেক "সাহিত্যসিংহ" আগ্রহের লেখা বাঙলা বহি পড়েন না। কেবল নিজের বহিত পড়েন। অনেকের বহির পাঠকও বোধ হয় নিজে গ্রহণকার। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র লোক, আমার সে বড়মাত্রা নাই। তোমার 'গীতাবলী'র একখণ্ড আনাইয়া তোমার জীবনীটি পড়িলাম। ঠিক কথা, তোমার বন্ধুত্ব বড় কম। তুমি পীঠস্থান কলিকাতার এক জীবন বলিদান করিলে। কিন্তু কলিকাতার অগ্রগণ্যকেই বোধ হয় তোমাকে চিনে ও আমার মত তোমার প্রণাম করে।

স্বদেশের (সমাজপতি) দ্বারা অক্ষর বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন ঐক্যভাবে সিরাজদৌলার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লগ্না চওড়া কৈরিয়ং চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—তিনি লিখিয়াছিলেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য। ভবন পড়িয়াছিলেন মার্সিয়ান। তথ্যনি বাঙালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম পুরী সিরাজদৌলার জন্য এক কৌটা চক্ষের জল ফেলিয়াছিলাম। অক্ষর বাবু তাহার পর আমাকে ক্রমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র হাশাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে পলাশীর যুদ্ধের জন্য পূর্বমেস্তের বিষয়কে পড়িয়া এক জীবনে অপেক্ষ দুর্গভিত্তোগ করিয়াছি। পত্রখানি হাশাইলে আমার আরও দুর্গভিত্তি বাড়িবে মাত্র।

ভাল, আমার বুদ্ধকেন্দ্রখানি কি তুমি অভিনয় করাইতে পার না? তাহার বাজা হইয়া তো শুনিতেছি কলিকাতা ও সমস্ত বঙ্গদেশ কাঁদাইতেছে।

হাতের লেখা সর্বদে আমিও তোমার কনিষ্ঠ কি মোট জাতি। চাকার কালীপ্রসন্ন যোব একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার বিরা হইত না।

ভরসা করি এখন ভালো আছ। গীতাবলীর ছবিতে দেখিলাম যে শরীফটি একেবারে খোয়াইয়াছে এবং বৃত্তিখানি পশুপেশের মত করিয়া তুলিয়াছে। এখন কোন নতুন খেলায় লইয়া নিজে নাচিবার ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টায় আছ।

অনুতবাবুকে ২ খানি পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই। লেখা হইলে বলিও। ভায়া, বোধ হয় এখন স্বদেশী রসের মসিক।

তোমারই
নবীন

১০ নং বঙ্গপাড়া লেন, কলিকাতা।

২৩শে এপ্রিল ১৯০৬

কথিয়ার প্রীত নবীনচন্দ্র সেন সমীপে
ভাইজী,

তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ 'দীরকাসিং' লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। 'কুককেন্দ্র' ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না। মনের নাটক হয় নিশ্চয়, কিন্তু এখন তেজে বাবে। এখনো স্বদেশের মৌখিক অস্থায়ী খুব উত্ত। বক্তব্য নাটক হোক বা না হোক, নাটোপাধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের ঐক্যপ মৌখিক ফাঁক এখন সাধারণের প্রিয়। মহাভারতের বেশপ প্রকৃত খাণ্ডা তোমার কুককেন্দ্র হয়েচে, তা যদি সাধারণে বুঝতে পারত, তাহলে প্রকৃত নীতিশিক্ষা ও কর্তব্য অহুষ্ঠান শুরু হোত। বুঝতো বর্ণপ্রাণ হিন্দুর বর্ণ ব্যতীত উপার নেই। সময় বুঝে—মহাভারতের দিন স্মরণ করবে। কাব্যখানি নাটকাকারে পরিণত করার ইচ্ছা আমার রহিল। হুটি প্রবোধ উত্তর হ'ল। দেহের অবস্থা নিজ দেহের অবস্থার অন্তর্য করে।

তুমি যখন না করিলে কি হয়? আমি যখন করবো বৃহৎ আর কিছু নয়, সেইমুখি হৃদয়ের একটা কৈরিয়ং, 'সৈরিন্দী হৃদ' বলে যে একটা উপহাস আছে তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি নিজের চোটা করে দেখছি, গভ লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু হৃদোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা কথা কইতে পারি না। চোটা করলেও, ভাষা কথা কইতে সেটাই হৃদয় হবে। সেইমুখি হৃদে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা হোক, কোন হৃদে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিশদী লঘু ত্রিশদী বা বে বে হৃদয় বাঙলার ব্যবহার হয়, সকলগুলি পরাবের অন্তর্গত। অমিতাক্ষর হৃদয় পড়িবার সময় আমার যেমন ভালো লেখা, তেমনই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্তা, সেইখানেই হৃদয় জালা। তারপর দেখা বাউক কোন হৃদয় অধিক। দীর্ঘ ত্রিশদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হইয়া অবিকার্য কথা হয়।

"দেখিলাম সন্ধ্যাবে কমলিনী বান্ধিয়াছে কহী।"

লঘু ত্রিশদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক সময় মিলিত হয়।

"বিরস বদন বাগীর নিকট বাহু।"

এ সওয়াই পয়ার লঘু ত্রিশদীর এক-এক পদ বিলম্বত: শেষ পদ

পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এখানে নাটকের চৌক অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌক অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময় সময় সরল বসতি থাকে না!

“বীরবাহু চলি যবে গেলা বসপুরে
অকালে।”

এরূপ হামেসাই হবে। বাঙলাভাষার কিরা “হইরাহিল”, প্রভৃতি অনেক সময়েই বসতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নেই। বসতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা বাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ’তে বিনা চেষ্টায় উচ্চ স্বরে সহজেই উঠবে। সে সুবিধা চৌকর কিছু কম। কারো তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময়ে তার প্রয়োজন। তাই তো পাতনামা করিলাম। যদি তুমি দুই-এক বা তীর ছাড়, আমিও দু-একটা কাটান তীর ছাড়ব। তবে যদি তোমার কুহসং না হয়, শরীর ভালো না থাকে, যুদ্ধ আহ্বান করি না। “আমি গেলে আমসি, বৌবন গেলে কাঁদতে বসি।” বতসিন তোমার সঙ্গ করা অনার্যসাম্য ছিল ততদিন তা উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন এই দুরূহ ব্যবধানে কথা কইতে ইচ্ছা করে। তোমার তো পত্র লিখতে রুত্তি নেই। যদি মাঝে মাঝে লেখ, শোবার সময়ে পাঠ করে শুতে বাই। তোমার সমস্ত কুশল সংবাদ প্রতীক্ষার রহিলাম। ইতি—

গুণাক

গিরিশ।

১৩ নং বরপাড়া লেন, কলিকাতা।

২০শে জুলাই, ১১০৬

কবির বীজ্ঞ নবীনচন্দ্র সেন।

ভায়া,

তুমি আমার যুদ্ধ আহ্বান ঠিক বুঝতে পারো নাই। যুদ্ধ আপোষে অস্ত্র পরীক্ষা করবার আমার ছিল, হারজিতের প্রতি কখনো আমি লক্ষ্য রাখি নাই। বাই হোক, তোমার শরীর অসুস্থ এ সবকিছু করার আর প্রয়োজন নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আশু আন্তে সময়সূচ্যে এ বিষয়ে কথাবার্তা কহিলে ভাবার কোন না কোন উপকার হইতে পারে। এই তো যুদ্ধের কথা।

সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনও আছি। মীরকাসিম লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, এখন আবার পুরের কাজে পড়িয়াছি। “মীরকাসিম” সবকিছু বাজারে সুখ্যাতি গুনিতে পাইতেছি। আর যে কয় বাক্সি অভিনয় হইয়াছে, লোকেরও যথেষ্ট ভীড়। ব্রাহ্মণ পর্বন্ত সন্ধ্যা। এ আমার সামান্য ভাগ্য নহে। আমার ছেলে দানী, মীরকাসিমের বেশ লইয়াছিলাম, তাহার সুখ্যাতি একবাক্যে।

মীরকাসিম হাণ্ডাখানার পাঠাইয়াছি, তবে কতদিনে প্রক হোখিয়া উঠিতে পারিব, তাহা আমার আমারী মেজাজের উপর নির্ভর। তুমি তো জান “Never do to day what you can put off till tomorrow”—আমার মতো। এইতে বতসিনে হাণ্ডা হয়। তবে অবিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক তার কল্যাণে নেহাৎ আশীর্বাদে চলবে না। মীরকাসিম হাণ্ডা হইলেই আমার “বলিদান” ও “বাসবের” (বিজ্ঞানবিদ্যা) সহিত পাঠিয়ে দিব।

আমি তো ইংলিশ ভূগৃহি। তোমার কোম ২৫ আশ্রয় করেছি। আমার এক দানীর কথা বললুম, আর তো কারো কথা বলবার খুঁজ পাই না। তোমার পরিবারবর্গে ছেলেপুলের আশুপুত্রিক সংবাদ লিখবে। সকলের শুভ-সংবাদ শুনে মনটা একটু খুশী হবে, তাহা বা হোক একটা বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু লাঞ্চিত কাটায়। বোধ হয় বুঝতে পেরেছ যে, এ পত্রের লৌকিক উত্তর নয়। বড়বাক্যব তো বেশী নাই—এ একজনর সঙ্গে তবু কথা কই। কবিসিহি—কাজটা কি বুঝলে? আমি কি বুঝি বলি—একটু দৃষ্টি খোলে তাতে একটু আনন্দও আছে। কিন্তু অস্ত্রদৃষ্টি খুলে আপনার পেটের ময়লা দেখে ঘোর অশান্তি হয়। মনে হয়, বুড়ো হলুম, তবু স্বভাব শুকরোলো না। ইতি—

সেহাস্পদ

গিরিশ

Rangoon, 11 York Road,
“Palm Grove”, ২৭।৮।০৬

ভাই গিরিশ,

তোমার ২০এ জুলাইয়ের পত্র পাইয়াছি। আমি কিছু অসুস্থ ছিলাম। তুমিও মীরকাসিম লইয়া ব্যস্ত, তাই এতদিন উত্তর লিখি নাই। সংবাদপত্রেও দেখিতেছি যে, মীরকাসিমের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে। তুমি অক্ষম লোক, এই বয়সেও যেন তোমার প্রতিভা দিন দিন আরও বদ্ধিত হইতেছে।

আমার অসুখবোধ, তুমি সাত দিনে এমন না করিয়া, কিছু বেশী দিন সময় লইয়া আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, বর্ধনীতি, দরিদ্রতা, অরহীনতা, শিক্ষাবিজ্ঞান, চাকুরী-বিজ্ঞান, উকীল-ডাক্তার-বিজ্ঞান, বিচারবিজ্ঞান, উপাধি-ব্যাপি—সকল বিষয়ের আদর্শ ঘরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি Comico-tragic নাটক লিখিয়া দেশরক্ষা কর। বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনটা ছারি করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ যে বদেশ লইয়া কাঁদিয়াছি, এতদিনে গ্রীষ্মগবন যেন তাহা তুলিয়াছেন এবং দেশের স্রব্দে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি বেরুগ ছারি ও বদ্ধিত করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। নীলদর্পণের মত এই একখানি বহি তোমাকে জমর করিবে। উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অভিনীত হইয়া দেশে নতুন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা বর্ধে ও প্রেমে দেশ বহবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবনরত উদ্ভাষণ কর। তুমি এই বহিধানিতে নিরমিত অমিতাক্ষর ও মিতাক্ষর পত্রের সহিত চালাইবে। আমার কুশলশ্রুতিতে বতস্র পারি তোমার উচ্চ রচনায় আমি সাহায্য করিব। আমার অল্পবোটা বন্ধা করিবে কি? আমার একশ শেড়াপেড়ির মরণ বন্ধি বাবু আনন্দলট লিখিয়াছিলেন। তাহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পুরে উহার কি অমূল্য ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি আনন্দলট দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপুত্রার সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।

দানীবাবাজীর মীরকাসিমের অভিনয় এত ভালো হইয়াছে

উনিয়াহি, বড় সুখী হইলাম। বাবাজীর অভিনয় দেখিয়া বহুপুর্বে আমি ছির করিয়াছিলাম যে অভিনয়ে বাবাজী শিতার বোণাপুত্র হইবেন।

আমার আর ছেলপুলে কি? যদিও জীভগবান একটি কুজ সৈন্তের প্রতিপালনতার আমি দরিদ্রের হৃদে অর্পণ করিয়াছিলাম আর উহাই আমার জীবনের এক সাধনা—আমার নিজের এক সন্তান মাত্র। নির্মলকে তুমি কলিকাতায় বড় ডালোবাগানিতে এবং তাহার গানের প্রকাশ্যে করিতে। বিলাত হইতে ব্যাঙিটার হইয়া আসিলে এক বৎসর কলিকাতায় শিক্ষানবিশী করিয়া, নির্মল এখানে ব্যবসায় করিতে গত বৎসর আসে। আমিও Extension of service লবীকার করিয়া তাহার সঙ্গে এখানে আসি। তুমি উনিয়া সুখী হইবে—নির্মল প্রথম মাসেই ১২০০ টাকা পার এবং এই লেড় বৎসর দ্বাবৎ তাহার আর ১২০০ হইতে ২০০০। তাহার মাসিক ব্যয়ই আর ১৫০০। তাহার এই আশাতীত কৃতকার্বতা জীভগবানের কৃপা, আমার শিতার পুণ্যকল। জীভগবানের অসীম দয়া আমার পিতৃহৃৎ বুড়িয়া এখন দ্বিতীয় পুত্র অবস্থা। কি আশ্চর্য, এই মাত্র ৪ বৎসরের বড় নাতনী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল—“তাতা, তাতা, এই গ্রামবলী নেও”—দেখিলাম—“মিরিষ গ্রামবলী।”

জীনবীনচন্দ্র সেন।

York Road, Rangoon

১২।১০।৩০

ডাই মিরিষ,

তুমি এই নির্বাসিতের সঙ্গ্রেম বিজয়ার আলিঙ্গন গ্রহণ করিও। বাড়ীতে পুজা, কিন্তু পুত্র ছুটি বড় মরুদমায় আবদ্ধ হওয়াতে এ বৎসর বাজী বাইতে পারি নাই। পুজা—এই নির্বাসনের দেশে নিরাপদে কাটায়াছি। ইহার মধ্যে আনন্দ বাহা—তোমার পাঁচখানি নাটক পুজার উপহার পাইয়া অল্পভব করিয়াছি। কিন্তু এ অপব্যয় কেন? তুমি তো মহাপুরুষ কখনো আমাকে তোমার কোন বহি উপহার পাঠাও নাই। আমি বরাবর তোমার বখান যে বহি বাহির হইয়াছে কিনিয়া পড়িয়াছি। আমিও কখনো তোমাকে উপহার পাঠাই নাই, কারণ তুমি পড়বে না। বাক মীরকাসিম নূতন পড়িলাম। অজ বহি সকল আর একবার এই নিরানন্দের সময় পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। ‘জাতি’ ও ‘বলিদান’ আমার বড়ই ভালো লাগিল। ‘বর্ণলতা’র পূর্বে কি পরে হতভাগিনী বাউলার অংশপতনের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর দেখি নাই। একজন ‘কুজসেন’ নাম দিয়া সেনাপীরয়ের গুণেদের অল্পভাব করিয়াছেন। তুমি উহা একবার পড়িয়া দেখিবে কি? ভরসা করি তাহাতে তুমি অমিত্রাক্ষর হন ও তোমার অমিত্রাক্ষরের তারতম্য কি বুঝিতে পারিবে।

মীরকাসিমও সিরাজুল্লার সবকক্ষ বলিয়া বোধ হইল। তবে মীরকাসিমের প্রস্তাবনা (plot) অধিকন্তর জটিল। ভাল, ইঁহারা উভয় যে একগুণ দেশচরিত্র ও দেশহিতৈষী (Angel and Patriot) ছিলেন, তাহার প্রশংসা কি? যদি কিছু থাকে সে সকল একটা পরিশিষ্টে দিলে ভালো হয়।

উপহারের সঙ্গে তোমার কোন পত্র পাই নাই। ভরসা করি, তাহার কারণ শারীরিক অসুস্থতা নহে। আবার কি কোন নাটকী দেশার পড়িয়াছ?

তোমার জাতি নাটকের বটোটাও কি জাতি? এক-একটা বটো বেন নিত্যজ জাতিই বোধ হইল। আপনি মহাপুরুষ বলিয়া দুটিটাও এক-এক সময়ে এক রকম হয়।

দেহাকাজলী

জীনবীনচন্দ্র সেন

পুঃ—কাউন্টেন পেনের কল্যাণে লেখাটাও আগাগোড়া তোমার ফটোর মত নান। দুটি ধারণ করিল। কমা করিও।

13 Bosepara Lane,
Calcutta
16th October 1906.

কবিরষ জীভুজ মবীনচন্দ্র সেন

ডায়,

ঠিক ধরছ, শরীরের অল্পধের রক্ত পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। সহজ উত্তর সহজেই দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু তোমার কন্যাস লম্বা হুঁকখা বলব ও হুঁকখা ভিগেস করব, এই জট্টই শরীরের আরাম অপেক্ষা করছিলাম, সে অবধি আর সে আরাম পাই নাই। পুরীতে হাওয়া বদল করতে গেলাম, লম্বাগত হয়ে ফিরে এলাম। লাভের মধ্যে জগন্নাথ র্শন হয়েছে। ব্যামো আমার পুরোনো কুটুম। হাঁপানি। পরস্য ব্যয় করে তার পরিচর্যা হচ্ছে।

নির্মলের উদ্বিগ্নতা আমি আশ্চর্য হই নাই। তোমার টেবিলে আমার পাশে সেই বালককে এখানে আমি দেখছি। সে যে Mathematics তখন পারত না, তার মানে Drudgery করা তার স্বভাবসঙ্গত নয়। তোমার বলা বাহুল্য Mathematics এর সার্বজন্য লইয়া আইনের তর্ক করিতে হয়। সে তর্কে অবশ্যই নির্মল সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে তাকে আশীর্বাদ করলাম। তাকে জিজ্ঞাসা কোর এ বুড়োকে কি তার মনে আছে?

সাত সহস্র তেরো নদীর জল ধরে তুমি যে তোমার পুত্রের কল্যাণে একগু সুখী হয়েছ, এ তোমার বজ্রমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এ সুখ বুড়ো-বুড়ীতে অবাধে ভোগ কর। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে এমন তাল্লা প্রাণ কি করে রেখেছে? আমার ধারণা সচরাচর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যে রূপ দেখি, তাছের সংসর্গে যদি পনেরো দিন বাস করতে হয় তা হলে পাগল হয়ে বাই। কোন কাজের কথা বলবার শক্তি নাই।

তোমার প্রস্তাবিত নাটক যদি ভগবান আমার দ্বারা লেখান আপনাকে বজ্র জ্ঞান করব। কিন্তু লেখবার আমি কতদূর যোগ্য, তা বিশেষ ভাবনার বিষয়।

তোমার বই যে আমি পড়ি না—এমত নয়। কিন্তু পড়ব পড়ব করে অনেক সময় পড়া হয় না। অনেক দেখলে ওনলে বটে কিন্তু আমার জোড়া আলসে-কুড়ে দেখেছি কি না সম্বন্ধ! পিঠে চাকু না পড়লে আমি নড়বার বালা নাই। তোমার পত্রের উত্তর লিখব করনা কয়েছি, এমন সময় তোমার পত্রের উত্তর এল। সহস্র ব্যবধানে যদি মনে মনে কোলাকুলি হয়, তুমি নিশ্চয় জেন, সে কোলাকুলি হয়েছে। আর এক মজার কথা, আমার হাওয়া বদলাবার প্রয়োজন, তাই ডাবলিলাম, বেতুন বাব। অনেকেই যেতে পরামর্শ দেয়, তবে ‘রাধা নাচবে কি না জানি না।’ সকল সকলে গুতে চললুম, প্রস্তাবিত নাটক লম্বা আমার অনেক কথা আছে, একটু শুধু হয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো। নয়তায়।

দেহাকাজলী
গিরি

প্রশ্নোত্তর
শ্রীমদ্রামায়ণ
অষ্টমোহর্য্যঃ সূত্রঃ

১২

হে প্রাণপ্রিয়, আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, আমাকে আলিঙ্গন করো, নয়তো মর্দন করো পদতলে। নয়তো অদর্শনে রেখে মর্মান্বিত করো। হে প্রেমলম্পট, যা করলে তুমি সুখী হও, তাই করো নির্বিচারে। কেন না তোমার সুখই আমার একমাত্র কাম্য যেহেতু ছুমিই আমার একমাত্র। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

যদি চিন্তা স্থির না হয়, নির্জিত না হয় তবে তপস্তায় কি দরকার? আর যদি চিন্তা হরিস্মরণে না মগ্ন হয় তবে চিন্তা স্থির হবে কি করে? আর যদি চিন্তা আত্ম না হয় তবে আর হরিস্মরণে প্রয়োজন কি? আর যদি কামনা ক্ষয় না হয় তা হলে চিন্তাই বা আত্ম হবে কি দিয়ে?

বিজ্ঞা কি? হরিভক্তিতেই বিজ্ঞা। বেদাদিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের নাম বিজ্ঞা নয়।

কীর্তি কি? ভগবৎপরায়াণ বলে খ্যাতির নামই কীর্তি। দান বা সেবা থেকে যে খ্যাতি তা কীর্তি নয়।

ঐ কি? কৃষ্ণপ্রেমই ঐ। কুয়িষ্ঠ ধনজনগ্রামও বিস্ত নয়।

দুঃখ কি? ভক্তের বিরহই দুঃখ। হৃদয়গের বহুগাও দুঃখ নয়।

মুক্ত কে? ভক্তসামীপ্যে যার অবস্থিতি, প্রেম-ভক্তিতে যে প্রীতিমান, লিঙ্গলোহের প্রীতি যার আস্থা, হরিনাম স্তনে যার চিন্তা সরসজব, সে।

পান করবে কি? ব্রজকলি।

এই বিশেষ জ্ঞেয় কি? সাধুসঙ্গ।

স্মরণীয় কি? নাম।

অনুধ্যায় কি? ঐক্যচরণ।

স্বৈর কি? তার মানে, বাস করবে কোথায়? ব্রজধামে।

অবশ্যের আনন্দী কি? ইন্দ্রাবনলীলা।

উপাস্ত কে? রাধাকৃষ্ণ।

বলো বলো, আরো বলো। রসে যারা অনভিজ্ঞ তারা নির্বাণ বিদ্যমান চুপুচ, আমরা রসতত্ত্ববিদ, আমরা কেন তা করতে যাব? মদনমদুরা গোপরামা নয়লাকালে যে স্ত্রীমায়ুত পান করেছে, আমরা তার অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করব।

মোল বছর বয়স, পল্লবাসের টোল ছেড়ে নিয়ে টোল খুলল নিমাই। নিজের বাড়িতে জায়গা নেই, মুকুন্দসঙ্করকে ধরল। তোমার চণ্ডীমণ্ডপ আছে, সেইখানে একটু স্থান দাও না, একটা বিজ্ঞান মন্দির তুলি।

নবদ্বীপে কত বড়-বড় পণ্ডিতের টোল, এই কোমলকান্ত কিশোরের স্পর্শ কি নতুন টোল চালাবে। তবু, কি জানি কেন, রাজি হল মুকুন্দসঙ্কর। যিনি ধন দিয়েছেন তিনি যদি আমার গৃহে বিজ্ঞান সমাজ বসান আমি তো কৃতকৃতার্থ।

‘আমার ছেলেরাও কিন্তু পড়বে।’ আবদার করল মুকুন্দ।

‘তা আর বলতে।’ সায় দিল নিমাই।

কিন্তু শিখবে কি? লোকে দেখবে, শাস্ত্র আর ব্যাকরণ, কিন্তু প্রস্তরের নিচে নির্যাস, শিখবে আসলে ভক্তির মধুরিমা।

ভগবান একই বস্তু কিন্তু জ্ঞানী যোগী আর ভক্ত—তিন জনের তিন রকম অনুভব। একজন আম দেখল, আরেকজন আম শুঁকল, তৃতীয় ব্যক্তি আম খেল। সব চেয়ে বেশি জিতল কে? নিঃসন্দেহ, তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তিই ভক্ত।

জ্ঞানী অনুভব করে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে, যোগী অনুভব করে ভগবানের অংশস্বরূপ পরমাত্মাকে আর ভক্ত অনুভব করে ভগবানের সর্বৈক্যপর্যাপ্ত বিগ্রহস্বরূপকে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের রূপ নেই লীলা নেই বিলাস নেই। পরমাত্মার রূপ আছে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে লীলাও আছে কিন্তু জীব সৎকে সে নিষ্প হ, উদাসীন, সাক্ষিমাাত্র। কিন্তু ভক্তের ভগবানে জীব লীলাবিনোদ বৈচিত্র্য, অখণ্ড

জানকদেব আশ্বাদ। তন্তের অহুতাব ভিতরেও তলবার
বাইরেও ভগবান আনে।

জানীর কাছে দুধ শুধু শাদা, যোশীর কাছে দুধ
শাদা আর তরল, কিন্তু তন্তের কাছে দুধ শাদা, তরল
আর মধুর।

তোমার কাছে পড়া মানে কৃষ্ণসেবার পাঠ
নেওয়া। কৃষ্ণসেবার জন্তে যে বেগবতী বলবতী
হাসনা তার নামই প্রেম। 'কৃষ্ণেন্দ্রীয়া-প্রীতি-ইচ্ছা
ধরে প্রেম নাম।' প্রিয়ের প্রীতিবিধানই প্রিয়োপাসনার
তাপর্ষ। যদি প্রিয়ের কাছে নিজের জন্তে কিছু
চাই তা প্রিয়বর্ণনপন্থী। তা হলে তা প্রিয়ের জন্তে
সাধন নয় নিজের জন্তে প্রসাধন। 'আত্মানমেব
প্রিয়মুপাসীত।' যারা মোক্ষ চায় তাদের কি কৃষ্ণে
মনতা আছে? মমত্ববুদ্ধি ছাড়া প্রেম কোথায়?
তুমি আমার আপন জন অহুতাব এই তীব্রতা না
এলে তোমাকে ভালোবাসি কি করে? তুমি আমার
সখা। তাই তো আমি তোমার কাঁধে চড়ি, চড়তে
সাহস পাই, মুখের ফল মিষ্টি লাগলে সেই উচ্ছ্রিষ্ট
ফলই খাইয়ে দিই তোমাকে। তারপর তোমাকে
যখন গোপালরূপে বাৎসল্য করি তখন তোমাকে
তাড়ন-ভৎসন করতেও ছাড়ি না। তারপর আবার
তোমার সঙ্গে মধুর হই। আর এই মাধুর্যেই আমার
আশ্বাদের আধিক্য। উজ্জলতম সমৃদ্ধি। জ্ঞানে-
যোগে কাম-মোক্ষে এই সমৃদ্ধি কোথায়? তাই
মধুমত্তম রসই হচ্ছে প্রেম।

বনমালী ঘটক শচী দেবীকে এসে বললে, 'ছেলের
এবার বিয়ে দাও।'

'না, না, ছেলের এখন বিয়ে কি।' শচী দেবী
কথা মোটে গায়ে মাখলেন না : 'ছেলে আমার আরো
বড় হোক, বিদ্বান হোক।'

বনমালী বললে, 'যে পাত্রীর সন্ধান এনেছি তার
জুড়ি তুমি পাবে না নবদ্বীপে।'

শচী দেবী তবু কান পাতলেন না।

'বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী। একেবারে লক্ষ্মীর
প্রতিমা। রূপ-শীলে কুল-মানে অদ্বিতীয়া।
নিমাইয়ের সঙ্গে অপরূপ মানাবে।'

তবুও প্রশ্নর দিচ্ছেন না শচী।

রাস্তায় নিমাইয়ের সঙ্গে বনমালীর দেখা। নিমাই
ওখেল : 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'তোমাদের বাড়িতে।'

'কেমন, কি ব্যাপার?'

'তোমার মাকে তোমার বিয়ের কথা বলতে।
হাতে একটা খুব ভালো সবুজ ছিল তার হৃদয় দিতে।'

'তা মা কি বলল?' যুহু-যুহু হাসতে লাগল
নিমাই।

'জ্ঞানী করে কথাই কইলেন। উড়িয়ে দিল এক-
বাক্যে।'

পত্নীর মুখে বাড়ি ফিরে নিমাই মাকে জিপপেস
করলে, 'বনমালী আচার্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে কেন?'

এ কী ইজিত। উৎকৃষ্ট চোখে ছেলের মুখের
দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'হাঁ, আমি তো এখন গৃহস্থ। তাই আমার
গৃহধর্ম পালন করা উচিত।' নিমাই বললে, 'আর
গৃহিণী ছাড়া গৃহধর্ম কোথায়?'

বনমালীকে তদুনি ডেকে পাঠলেন শচী দেবী।
বনমালী বল্লভ মিশ্রকে খবর দিলে।

বল্লভ লাফিয়ে উঠল। 'সেই পরম পণ্ডিত সর্ব-
গুণের সাগর বিশ্বস্তর আমার জামাই হবে? কিন্তু
বনমালী, আমি যে নিধন, পাঁচটি হরীতকীর বেশী যে
আমি দিতে পারবনা।'

'দিতে হবেনা তোমাকে।'

পক্ষয় যাচ্ছে লক্ষ্মী আর টোল থেকে ফিরছে
নিমাই, পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। যুহুর্তে
'পূর্বসিদ্ধ ভাব' মনে পড়ে গেল ছুজনের। নিমাই
ঐকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মী। আর তাদের স্বাভাবিক
ভাব কাস্তাভাব। 'কাস্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' ব্রজের
প্রীতিই কেবল প্রীতি। কাস্তাভাবের সেবা
প্রেমামুগ্ধা। তাতে আছে নিষ্ঠা, পরিচর্যা, মমত্ববুদ্ধির
পাততা, পৌরবুদ্ধির হীনতা, নির্বিচার অমুগতি।
কাস্তাভাবেই মধুরতার সর্বাতিশয়।

শুভদিনে গোদুলিসময়ে বিয়ে হল। চারদিকে
'লেহ-দেহ' রব পাড়ে গেল। পড়ে গেল হরিধ্বনি।
গন্ধে মালায় চন্দনে কঙ্কালে উজ্জল হয়ে বসল ছুজনে।
কেউ বললে, হর-গৌরী, কেউ বললে রতি-মদন, কেউ
বা শচী-ইন্দ্র। কেউ বা রাম-সীতা, কেউ বা রাধা-
মাধব, কেউ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ।

মা-শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। যিনি লক্ষ্মীর ধব বা পতি
তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ বিজ্ঞ। বিজ্ঞা
বা সরস্বতীর যিনি পতি তিনিই মাধব। লক্ষ্মীর মত
সরস্বতীও বিষ্ণুর পত্নী। শ্রুতিতে ব্রহ্মবিচার নাম

মধুবিভা। যে বিভায়ে আনন্দচিন্ময়রসের আনন্দান করা যায় তা মধুবিভা নয় তো কি। মধুবিভায় যিনি অবগম্য তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ, ধী, বুদ্ধি। যিনি মৌনের সাহায্যে বুদ্ধির ধবন বা দূরীকরণ করেন তিনিই মাধব। অর্থাৎ স্বল্পফলস্বায়ী কর্ম থেকে যিনি জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন তিনিই মাধব। ধব-শব্দের আরেক অর্থ বস্ত্র। বস্ত্র শরীরকে আচ্ছাদন করেই শরীরের শোভা বিস্তার করে। তেমনি যিনি মা-কে বা জীয়াধাকে ঢেকে রেখেছেন আলিঙ্গনে, সেই নিত্য লীলাপরায়ণ জীবসমূহই মাধব। মা-শব্দের অর্থ ফ্লাদিনী বা আনন্দিনী শক্তি। সেই শক্তিই শ্রীমতী।

মুখে করবে মাধবের নাম, মনে করবে মাধবের ধ্যান আর সকল কাজে স্মরণ করবে মাধবকে। মাধবই পরমানন্দ, তাকেই বন্দনা করো—তারই কৃপায় মুক বাচাল হয়, পঙ্ক যায় গিরিলজ্বনে। তিল-ভুলসী দিয়ে এই দেহ মাধবকে উৎসর্গ করে দাও আর বলো, হে মাধব, তোমাকে বার বার মিনতি করছি, তোমার দয়া যেন আমাকে না ছাড়ে।

আর নারায়ণ কে ?

নর থেকে উদ্ধৃত বলে নার। তাই নার অর্থ জীবসমূহ। অয়ন অর্থ আশ্রয়। সমগ্র জীবসমূহের আশ্রয় বা আশ্রয় বলে নারায়ণ। নার-শব্দের আরেক অর্থ জল। জলে অর্থাৎ কারণ-জলে অবস্থান করেন বলেও নারায়ণ। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। অধীশ, অখিললোকসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণই সর্বধাম—জগদ্ধাম। অনাদিরাদি-গৌবিন্দ, সর্বাশ্রয়, সর্বকারণকারণ। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও আদি, নারায়ণেরও মূল, নারায়ণেরও অবতারী। নিখিল শক্তির অধিষ্ঠানই শ্রীকৃষ্ণ।

গৌবিন্দ কে ?

গৌ অর্থ গরু, গৌ অর্থ পৃথিবী, গৌ অর্থ ইন্দ্রিয়। আর বিন্দু ধাতুর অর্থ পালন। যিনি গৌ-পালন করেন তিনিই গৌবিন্দ। বিশ্বের পালনকর্তা বলেও গৌবিন্দ। সর্বইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলেও গৌবিন্দ। পরিকরবর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে আনন্দে পালন বা পোষণ করেন বলেও গৌবিন্দ।

শরীর গৃহ পদ্বীগন্ধে ভরে উঠল, দূরে গেল দারিদ্র্যের মালিন্য। আনন্দের বিহীন খেলতে লাগল অন্ধকারে। বৃষ্টি কমল এসেছে দীনের আলয়ে।

দীন কে ? নিরুপম লাভণ্যের আত্মাদমুতি নিমাই, মেঘমালিন্যের লেশমাত্র নেই। কোটি কন্দর্পের রূপকেও যেন হার মানিয়েছে। ব্যক্ত হয়েও যে ব্যক্ত নয় তাকে বোঝে এমন শক্তি কার ? নিমাই নিজেকে জানাচ্ছে না বলে লক্ষ্যও মুখ ঘেঁষে আছে। না জানালে জানে এমন সাধ্য কার ? যার প্রতি কৃপা হবে শুধু সেই পাবে জানবার অধিকার। 'যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে।'

বিভারসে কখনো নিমাইয়ের পরিহাস কখনো বা অটল নিটোল গাভীর্ষ। নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত নেই যে ছন্দও তার টোলে এসে না বলে, শুনে না যায় তার আখ্যান-ব্যাখ্যান। বুদ্ধ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিখ্যাত কেউ উপেক্ষা করতে পারে না নিমাইকে। সাহস নেই কোথাও দস্তফুট করে। বিভার নিশ্চিহ্ন শুভ। কিন্তু যখন বিভার আসনে নেই তখন চাপল্য-তারল্যের প্রতিমূর্তি। শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গায় লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে, কখনো বা রাজপথে ছুটোছুটি করছে। এত বড় পণ্ডিত, আর অধ্যাপক, তার এ কী লঘু-চিত্ততা। কে কার কথা শোনে! পালমন্দ করলেও নিমাই চটে না। বরং উটে সে নিজের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, বিশেষত যাদের বাড়ি শ্রীহট্ট, যাদের কথায় পূর্বাঞ্চলের টান। আর নবদ্বীপে শ্রীহট্টের লোক তো কিছু কম নয়।

'তুমি যে ঠাট্টা করো তোমার বাড়ি কোন জেলায় ?' শ্রীহট্টেরা পালটা আক্রমণ করে।

প্রশ্ন শুনে আবার নিমাইয়ের পরিহাস।

লাঠি নিয়ে ভেড়ে আসে শ্রীহট্টেরা, নিমাই ছুট দেয়। সাধ্য কি তার সঙ্গে পাল্লা দেয় কেউ। অনুপায় হয়ে শ্রীহট্টেরা আঁজি করে দেওয়ানে। তদন্তে দারোগা-পেয়াদা আসে, কিন্তু তারাও নিমাইয়ের পক্ষ হয়ে হাসে। বলে, এ আবার একটা মামলার বিষয় নাকি ?

কিন্তু এত বিভায়েই বা হল কি, কি বা হল এত সারল্যের ভূমিকায় ?

কৃষ্ণরস কই ?

'হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।

কি করিব বিভায় হইলে কালবশ ॥'

কৃষ্ণই সমস্ত রসের বিকর ও আশ্রয়, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তার কথা কই ?

সাধন-ভক্তির থেকেই রত্নির উদয়, সেই সাধন-ভক্তি

কাথায়? শ্রবণ-কীর্তনাদি! অমুষ্ঠানই সাধন-
গতির অঙ্গ, তাও ত দেখি না। ও সব অমুষ্ঠানে
চিন্তাশক্তি হলে রতির আবির্ভাব। রতি গাঢ় হলেই
প্রেম। যাতে চিন্তা স্নিক হয়, কৃষ্ণে অত্যন্তিকী মমতা
হয়ে রতির সেই প্রগাঢ়তাই প্রেম। প্রেম যখন চিন্তাকে
দূষিত করে তখন তা স্নেহ। স্নেহে ক্ষণকালিক
বিস্ফোরণ সন্ধানীত। স্নেহ থেকে মান। মাধুর্যকে
নবীনতর আশ্বাদ করবার চেষ্টায় যখন অস্বাভাবিক
ধারণ করে তখন তা মান। মান যদি বিশ্বাস করে
যে প্রিয়জন এই অস্বাভাবিক মোচন করবেই তখনই
তা প্রণয়। প্রণয় থেকে রাগ। মিলনের আশায়
যখন চুখ ও মুখ বলে অমুভূত হবে তখনই তা রাগ।
রাগের বৃদ্ধি অমুরাগ। প্রিয়জনকে যখন বারে-বারে
নিত্য-নতুন বলে আশ্বাদ হবে, প্রতি দর্শনেই সে
অভূতপূর্ব, তখনই অমুরাগ। অমুরাগে সমস্ত চিন্তা
যখন বিজ্ঞের, টাইটুস, তখনই তা ভাব। আর ভাবের
পরমকারী মহাভাব।

এসব লক্ষণ কোথায় নিমাইয়ে?

মুকুন্দ দত্ত কেমন কৃষ্ণগীত গাইছে। যে শুনেছে
সেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। কেউ কঁাদছে কেউ হাসছে
কেউ বা উদ্দাম নৃত্য করছে। কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে,
কেউ বা হুঙ্কার করে মালসাট মারছে, কেউ বা
মুকুন্দের ছুঁপা ধরে লুটিয়ে পড়ছে। ও সব কিছুতেই
যেন নিমাইয়ের মনোযোগ নেই। মুকুন্দ তার
সহপাঠী, পাশে দেখা হলেই তার সঙ্গে শুধু ব্যাকরণের
ডব্বি চালায় নিমাই। যে অদ্বৈতসভায় মুকুন্দের গান
হচ্ছে তার ধার দিয়েও সে হাঁটে না। জীবাস পণ্ডিত
যার শ্রবণে কীর্তনে আনন্দ, যে নিজের ঘরে কীর্তন
করে ও শ্রবণ করে গিয়ে অদ্বৈতসভায় তার সঙ্গে
দেখা হলেও নিমাই শাস্ত্রের ধাঁধা জিগপেস করে,
জিগপেস করে ব্যাকরণের ফাঁকি। কৃষ্ণকথা মুখেও
আনে না। সবাই কৃষ্ণকথা শোনবার জন্তে উৎসুক
কিন্তু নিমাইয়ের কাছে কেবল ভাষাতত্ত্বের কচকচি।
এই মিথ্যা বাক্যে কারু রুচি নেই। ঐ 'ফাঁকি'
আসছে রে, দূর থেকে নিমাইকে দেখে সকলে কেটে
পড়ে।

একদিন অমনি পালিয়ে যাচ্ছিল মুকুন্দ।

'ও আমাকে দেখে পালায় কেন?' পাশের
লোককে জিগপেস করল নিমাই।

'গঙ্গারানে যাচ্ছে বোধ হয়।' বললে পার্শ্ববর্তী।

'ওদিকে গঙ্গা কোথায়?'

'তবে বোধ হয় অগত্য কাজ আছে।'

'না, না, আমাকে দেখে পালাচ্ছে।' বললে
নিমাই, 'দেখা হলে আমি শাস্ত্র-ব্যাকরণ বলব কৃষ্ণকথা
বলবনা, তাই এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে।' 'ওহে মুকুন্দ
পণ্ডিত'—গলা তুলে হাঁক দিল নিমাই।

মুকুন্দ শুনেও শুনলনা, বেরিয়ে গেল হনহন করে।

'আমার থেকে পালিয়ে পালিয়ে এমনি থাকবে
কদিন?' মুকুন্দের উদ্দেশ্যে হেঁকে বললে নিমাই,
'কদিন পর এমনি বাঁধনে বাঁধব ছেড়ে যেতে পথ পাবে
না। দেখবে বৈষ্ণব কাকে বলে। দেখবে এ বৈষ্ণবের
ঘরের দরজায় "অত্র ভব" দাঁড়িয়ে আছেন পাহারায়।
দেখবে—'

যারা শুনল তারা রুটি হল নিমাইয়ের উপর।
কী সম্পর্ক, ব্রহ্ম আর শিবকে ছারছড় করে! দেবদেবী
মানেনা নিমাই। নিমাই নাস্তিক।

জীবাসেরও সেই আক্ষেপ। আহা, নিমাই যদি
বৈষ্ণব হত কত সুখের হত। বিচার নেশাই ওর
কাল হল। বিচার তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই ওর
কাছে লোভনীয় হল না। এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু
সারশস্ত্রশূণ্য, কৃষ্ণে রতি নেই একবিন্দু। 'মহুয্যের
এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞ্ছি। কৃষ্ণ না ভজেন তবে
এই চুখ পাই।' সকলে মনে মনে প্রার্থনা করে,
হে কৃষ্ণ, নিমাই অধ্যয়ন ছেড়ে তোমার রসে মগ্ন
হোক, নিরবধি প্রেমভাবে ভজনা করুক তোমার।
'কেহো বলে, হেন রূপ হেন বিজ্ঞা যার। না ভজিলে
কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার।'

সমস্ত নদীয়া তখন ধন-পুত্রসে মগ্ন, কিন্তু জীবাস
আর তার তিন ভাই—জীরাম, জীপতি আর জীনিধি
—রাতে নিজগৃহে উচ্চস্বরে কীর্তন করে একত্র।
কীর্তনের গোলমালে পাষাণী ঘুমুতে পারে না।
বাপু, ধীরে ধীরে যত্নস্বরে কৃষ্ণনাম করলে হয়না, প্রমত্ত
হয়ে নাচতে কঁাদতে লাফাতে-ঝাঁপাতে হবে? দাঁড়াও,
তোমাদের বাড়ীঘর গঙ্গায় টেনে নিয়ে ফেলব, সবংশে
ভাড়িয়ে দেব নবদ্বীপ থেকে।

জীবের কৃষ্ণহীনতা দেখে বুক ফেটে যায় জীবাসের।
দীনদয়াজি'নাথ, কবে আসবে তুমি, কবে জাগবে তুমি,
অলোককাতর আমরা, কবে দেখব তোমাকে?

একদিন পথের মধ্যে নিমাইয়ের সঙ্গে জীবাসের
দেখা। সশিষ্য চলছে হন-হন করে, জীবাসকে

দেখে নিমাই ক্ষত একটা নমস্কার করল। জীবাস বললে, 'কি হে উদ্ধতের চূড়ামণি, চলেছ কোথায়?'

নিমাই কোনো উত্তর দিলনা। যুঁহু যুঁহু হাসতে লাগল।

জীবাস বললে, 'কি ছার বিচার লোভে দিন কাটাচ্ছ? বিচার কি হবে যদি কৃষ্ণভক্তি না হয়? 'পড়ে কেন লোক—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নছিল তবে বিচার কি করে।' কতই তো পড়লে কিন্তু পেলো কী? যদি কিছু পেতে চাও তো কৃষ্ণভজন শুরু করো। 'ডেকে সর্বথা ব্যর্থ না গোড়াও কাল। পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।'

নিমাই দাঁড়াল না। চলে যেতে যেতে বললে, 'পণ্ডিত ধৈর্য ধরো, তোমার কৃপায় তাও নিশ্চয়ই হবে একদিন।'

তারপর সেদিন আবার গদাধরের সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা।

গদাধর পালিয়ে যাচ্ছিল, নিমাই ছুটে গিয়ে তার চুহাত চেপে ধরল। 'কি হে পণ্ডিত, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যাও। মুক্তির লক্ষণ কাকে বলে?'

কিছু না বলেও ছাড়ান নেই। আমতা-আমতা করতে লাগল গদাধর। বললে, 'আত্মত্বিক হৃৎ-নাশই মুক্তির লক্ষণ।'

আর যায় কোথা। নিমাই গদাধরকে পেড়ে ধরল। ব্যাখ্যার এমন সব দোষ ধরতে লাগল যে গদাধরের সাধ্য নেই তা খণ্ডন করে। সাধ্য নেই খুলিজালের মধ্য থেকে মুক্তির পথ দেখে।

'বাবা, পালাতে পারলে বাঁচি।' মনের গোপনে মিনতি করতে লাগল গদাধর।

ছেড়ে দিল নিমাই। বললে, 'আজ ছেড়ে দিলাম বটে কিন্তু কাল আবার ধরব।'

সবাই অধৈর্যসকাশে গিয়ে নালিশ করে, 'কই, তোমার কৃষ্ণ কই?'

হুকুর করে ওঠে অধৈর্য। 'আসছে, আসছে, ধৈর্য ধরো, নদীয়া শহরেই আছে সে প্রচুর হয়ে। কী হয় দেখবে সকলে চোখ খুলে—তাই চোখে সে দেখা আর শেষে কুলিয়ে উঠবে না। 'করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর। তবে সে অধৈর্য নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর। আর দিন কথো গিয়া থাক ভাই সব। এখাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অমৃতভব।'

শিষ্টকার্য করে গয়া থেকে গৌরান্ধ্র যখন ফিরে

এল তখন তার হৃদয়ে প্রেমবিকার। শরী মাতা মনে করলেন তার বায়ুরোগ হয়েছে, আত্মীয়-বন্ধুরাও তাঁকে সমর্থন করল। কেউ বললে, ডাঃ-নারকেলের জল খাওয়াও, কেউ বললে শিবাঙ্গি-ঘৃত মাখাও এবং কেউ বললে বেঁধে রাখো দড়ি দিয়ে। জীবাসকে ডাকা হল—তোমার কী মনে হয়?

তুলসী প্রদক্ষিণ করছে গৌরান্ধ্র। জীবাসকে দেখে কাঁদতে লাগল গৌরান্ধ্র, কম্প আর রোমহর্ষ হতে লাগল সবাক্কে। জীবাসকে নমস্কার করতে গিয়ে মুহুঁহু হয়ে পড়ল। বাহজ্ঞান ফিরে পেয়ে গৌরান্ধ্র জীবাসকে উদ্দেশ্য করে বললে, 'সবাই বলছে আমি বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছি, আমাকে বেঁধে রাখতে চাইছে। তুমি কী বুঝ?'

'তোমার শরীরে মহাভক্তিরোগের আবির্ভাব হয়েছে।' গগগদস্বরে বললে জীবাস, 'মহাকৃষ্ণ-অমৃতগ্রহ।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গৌরান্ধ্র। বললে, 'তুমিও যদি বলতে আমার বায়ুরোগ হয়েছে তাহলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করতাম।'

'আহা, তোমার যেমন বাই তাহা আমি চাই।' জীবাস বললে যুক্তকরে।

আর গদাধর?

গদাধর ছায়ার মত ফিরতে লাগল গৌরের সঙ্গে। সেবায় ঢেলে দিল মন-প্রাণ। নীলাচলে এসেছেন মহাপ্রভু, সেখানেও গদাধর। নীলাচল ছেড়ে যাচ্ছেন বৃন্দাবন, গদাধরও সঙ্গ নিয়েছে।

বাধা দিলেন মহাপ্রভু। বললেন, 'গদাধর, তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস নিয়েছ, নিয়েছ টোটাগোপীনাথের সেবা। তোমার নীলাচল ছাড়া চলবে না।'

প্রভুর আদেশ কোনদিন লঙ্ঘন করেনা গদাধর, আজ কি হল কে জানে, বললে, 'না, থাকব না নীলাচলে, প্রভুহীন প্রাণহীন নীলাচলে। যাহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাক রসাতল।'

'ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই।' প্রভু প্রবেশের সুরে বললেন, 'গোপীনাথের সেবা করবে কে?'

'জানি না। তোমাকে দর্শনই আমার গোপীনাথের সেবা।'

'তুমি যদি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করো লোকে আমাকে নিন্দে করবে।' প্রভু বললেন অমুনয়ের সুরে, 'আমার উপর দোষ আনুক তুমি কি তাই চাও?'

‘সব দোষ আমার। যদি তুমি সঙ্গে না নাও
আমি একা-একা চলি যাব।’

মহাপ্রভু সঙ্গে নিলেন না গদাধরকে। দলছাড়া
গদাধর একা-একা চলল।

ফটকে তাকে ডাকালেন মহাপ্রভু। বললেন,
‘তুমি শুধু নিজের সুখ চাও? আমার সুখ চাওনা?’

অশ্রুভরা চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর।

‘বলো, আমি যাতে সুখী হই তা চাওনা তুমি?
তুমি নিজের সুখ চাও বলেই আমার সঙ্গে থাকতে চাও
অহনিশ। যদি আমার সুখ চাইতে—’

গদাধর মাথা নত করে রইল।

‘চাও আমার সুখ? যদি আমার সুখ চাও
নীলাচলে কিরে বাও। আর কোনো কথা বোলো
না।’ বলে মহাপ্রভু ক্রতপায়ে নৌকোর গিरे
উঠলেন।

নৌকো ছেড়ে দিল।

নৌকোর উদ্দেশে ছুটতে পারলনা গদাধর।
পা উঠলনা। ছিন্ন বস্ত্রের মত পড়ে গেল বৃহত্ত
হয়ে।

[ক্রমশঃ।

নীল পাখি

জয়ন্তী সেন

কালকে সে এসেছিল—সেই পাখি বার ডানা নীল
অনেক সাগর ছেনে—অথবা সে আকাশের রঙ
জমাট মোমের মত জমা করে ডানার পালকে,
আমাদের ছোট মাঠে নীল পাখি এসেছিল কাল।
টেউ-এর ফেনার মত সাদা বুক—অথবা সে মেঘ,
সুখবতী মন কারো খেলালের প্রাতে জেসে চলা
চোখের স্মৃতি বলে লাল তারা—ইসারার মত।
হয়তো কোথাও কোন দিশাহারা বীণের ভগ্নপত্র
নীল টেউ বেঁধে মাটি, নীল ছায়া আকাশ বরানো
আলো দিয়ে নীড় বেঁধে তার পর নুতন আবেশে
অনেক পৃথিবী ঘুরে আমাদের ছোট মাঠে এসে
সারা বেলা ইসারার বলে গেল আলোর ঠিকানা—
যে আলোর অভিসারে তারা নিয়ে রাতের বিলাস।
আমার হৃৎ হাত্তে তাকে ধরি নাই, মনের নগীতে
স্মৃতির নীল ছায়া বয়েছিল সোনালী বেলায়।
নিমেষের রূপকথা শেষ হলে হঠাৎ আকাশ
হারানো শিশুর মত টেনে নিল আদরের হাত্তে।
দিন কাটে তারপর—ছোট মাঠে সকাল দুপুর
বিকেলের রেশটুকু বলে আর কত বার নেবে।
তবু স্মরণের পাতা বার বার খুলে কত ভাবি
কালকে সে এসেছিল—সেই পাখি, বার ডানা নীল।

... এ সনের প্রচলন ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বাঙলা ভাষা ভাষ্যের গর্ব ও সৌখিন বিশ্ববিশিষ্ট
নাট্যাচার্য শিবিরকুমার ভট্টাচার্য মহাপ্রবন্ধ মহাপ্রবন্ধ উপলক্ষে
তার একখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ'ল। চিত্রখানি বিখ্যাত
সাহিত্যিক জীপারিনল পোখারী কর্তৃক গৃহীত।

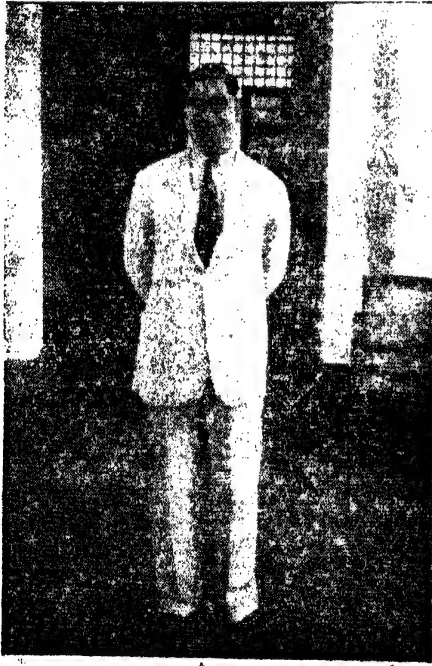


ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত

(প্রখ্যাত স্বঃস্বঃবিদগুরু)

ছাত্রীরাও আর্থিক অনটন সত্ত্বেও স্ত্রঃস্বঃ ডাঃ গুপ্তের গভীর আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের ব্যবধানে এনে দিল নাম, বংশ, অর্থ ও পশার। ভারতের অগ্রতম বিদ্যুৎ চিকিৎসক ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্তের সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলাচি।

বিশাল ভিলার গৈলা নিবাসী উম্মাচরণ গুপ্ত ও মুন্সেঙ্গী গ্রামের কস্তা অসামান্যতার দেবীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠতম যোগেশচন্দ্র ১৯০২ সালের ১৭ই নভেম্বর স্বঃস্বঃ জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন বঙ্গলাটের শাসন দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে বাবা উম্মাচরণ ছিলেন



ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত

অগ্রতম। এই সময়ের মধ্যে সন্তান উত্তর-ভারতের সিংলা, লখিমপুর জেলায় স্থানে স্থানে তিনি উচ্চ ও হিন্দী ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত করেন। যোগেশচন্দ্র গৈলা উচ্চ ইংরাজী বিভাগের হইতে ১৯২১ সালে প্রবেশিকা ও কলিকাতা কলেজার্জি কলেজ হইতে ১৯২২ সালে আই, এস, সি পাশ করেন। অর্থাভাবের জন্য কলেজ পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারেন নি এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে পাঠ্যভাষ্য করেছেন। পরে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (আর, ভি, কং) ভর্তি হন এবং ১৯২৮ সালে সন্মানে এম, বি, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অগ্রতম শিষ্য হইয়া ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে 'হাউস-ফিজিসিয়ান' ও পরে মেডিক্যালের কার্যভার গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি বেঙ্গল ইন্সটিটিউটে বর্ণনাধী হন, এবং সেখানকার অগ্রতম পরিচালক ও তাঁহার অধ্যাপক ডাঃ ইন্দ্রকুমার বসু চাকুরীর জন্য চেষ্টা হন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগেশচন্দ্রকে নিরাশ হইতে হয়। ইতিমধ্যে পথে উপস্থিত এক বৃদ্ধ জ্যোতিষী একদিন ডাঃ গুপ্তকে ডেকে বলেন যে, তিনি তিন মাসের মধ্যে বিদেশে যাবেন—তিন বছর পরে ফিরিয়া ক্রমশঃ পশার জমিতে তুলিতে পারবেন আর বর্তমানে চাকুরী পাত্যের কোন সম্ভাবনা নেই। ভাগ্যের পরিহাস মনে করেই যোগেশচন্দ্র বৃদ্ধের কথাগুলি অগ্রাহ্য করেন। কয়েক দিন পরে বন্ধু ডাঃ গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় জার্মানী থেকে সেখানকার Deutsche Akademie-তে বৃত্তিলাভের জন্য তাঁহাকে একটি আবেদনপত্র পাঠাইতে লিখেন। আবেদন পাওয়া মাত্র আকাডেমী রবীন্দ্রনাথ, আচাধ্য জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজী, সি, ভি, রমণের একটি সার্টিফিকেট অবিলম্বে পাঠাতে অগ্রদূত করেন। মহাসমস্তা উপস্থিত হইল—কারণ চার জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গেও কোন পরিচয় যোগেশচন্দ্রের ছিল না। একদিন সাহসে ভর করে তিনি আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সার্টিফিকেট পান "I know Dr. B. M. Gupta, the brother of Dr. J. C. Gupta". এই প্রশংসাপত্রই তাঁকে এনে দিল উক্ত আকাডেমী থেকে জার্মান সরকারের বৃত্তি। সেই সময় ডাঃ তারক দাস ভারতীয় ছাত্রদের সুযোগ সুবিধার জন্য বঙ্গাধ্য চেষ্টা করিতেন।

১৯৩১ সালের আগস্টে তিনি জার্মানী পৌছান এবং জ্যোতিষ মাস হইতে কলোন (KOLN) বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, কিন্তু সেখানকার সহকারী হিসাব বিভাগ তাঁহার বৃত্তি পাওয়া সম্বন্ধে আশপ্তি তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার Kuske সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে Guest-Professor করে দেন। কয়েক মাস পরে অল্প তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়া হয়। সেখানে প্রথম বছরে তিনি Prof. Epinger অধীনে Medical Clinic & Pharmacology Instt. এ ও দ্বিতীয় বছরে সম্পূর্ণ কান্ডিগলজী শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরের বছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম চর্চনা হিসাবে স্বাধীকলোজীর উপর ডক্টরেট পান। অধ্যাপক এশিন্ডারের আর্থিক সাহায্য ও শিক্ষাদানের কথা ডাঃ গুপ্ত আজও সজ্ঞাতভাবে বল করেন। এই স্থানে থাকাকালীন অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি হাইড্রেনবার্গ, লিপ্সিগ, ও ব্যাডলান্‌হাইম-এ ব্যাহারিক শিক্ষালাভ করেন। এই সময় জার্মান জাতির ভাগ্যবিধাতারূপে হিটলারের অত্যাচার হয়। কল হিটলারের তিনটি আদেশ ডাঃ যোগেশচন্দ্রের উপরও জারি

রা হল—(১) ইতালী সহকারীদের আবশ্যকন্য করার ইন-
ডিক্টর অব্যাপক Epingerকে সঙ্গে চাকুরী ছাড়তে হয়—(২)
লিপ, জিপে Vinisection সরকারী আদেশ বন্ধ করা হয়—(৩)
“Winter Hilpe” (গ্রীষ্মের জল প্রথম রবিবার উপবাস) আদেশ
পড়েন। বিদেশগত শিক্ষার্থী হিসাবে ডাঃ গুপ্ত বেহাই পান।
শিক্ষা শেষে তিনি যুরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করে ১৯৩৪
সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। ডাঃ রায়ের পরামর্শানুযায়ী তিনি
চারমাইকেল কলেজে বিনা বেতনে জেনারেল মেডিসিন ও
Stomach Juice পরীক্ষা করিতে থাকেন। এ ছাড়া তিনি যথা
চলিকাতায় নিজস্ব চিকিৎসালয় খোলেন। কিছুকাল পরে ডাঃ
গুপ্তের তোলা একটি রোগীর ইলেক্ট্রিক কার্ডিওগ্রাম সবচেয়ে
কর্মণ্য ডেনহাম হোয়াইট ও অব্যাপক V. R. Vrehodge বিদ্যপ
রক্ষা করেন। আইনজ্ঞের পত্র পাইয়া Prof. Vrehodge ডাঃ
গুপ্তের সহিত বোগাযোগ স্থাপন করিয়া স্বদানীন্তন মেডিকেলের
মাসে নিজে ১৯৩৬ সালে লৈশেল চক্রকে মেডিকেল কলেজের
অব্যাপক হিসাবে নতুন পদে গ্রহণ করেন। নানা অন্তর্বিহার
মধ্যে সেখানে ছ’ বছর থাকেন। ১৯৪০ সালে আর. জি. কয়
কলেজে কার্ডিওলজী বিভাগের প্রধান হিসাবে বোগদান করেন ও
সেখান থেকে ১৯৫৫ সালে পি. জি. (বর্তমানে S.S.K.M.)
হাসপাতালে Director of Cardiology রূপে যুক্ত হন।

১৯৩০ সালে তিনি শ্রীমতী আশালতা দেবীকে বিবাহ করেন।
অব্যাপক ৮৩তমী দাশ ছিলেন ডাঃ গুপ্তের খুড়তত বোন।

পিয়নো বাজান ও খেলাধুলা দেখা তাঁহার অবসর বিনোদনের
উপায়-বিশেষ।

শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী

[কলিকাতা পুলিশের সদর কার্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার]

লোক ভাবে এক আর হয় এক। যিনি একদিন রাজ্য
পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে
পারতেন, ঘটনাক্রমে দেশের আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের কঠোর
দায়িত্বের গ্রহণ করতে হ’লো প্রত্যেকভাবে তাঁকেই। স্বাধীন
নাগরিকদের বনসম্পত্তি মান ও প্রশংসা করেই যিনি তাঁর জীবনের
শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন আজও শিক্ষা বা প্রশংসার অপেক্ষা
না করে, তাঁকে ঠিক সাধারণ পণ্য্যে ফেলতে পারি না। স্বাধীন
রাষ্ট্রে পুলিশ জনসাধারণের সেবকমাত্র। এ উন্নত বুদ্ধিভঙ্গী ও
আদর্শের ভিত্তিতে যিনি পুলিশ বাহিনীকে গড়ে তুলতে চাইছেন
এবং একে রূপায়িত করছেন প্রতিদিনের কার্য্য ও প্রচেষ্টায়, এমনি
একজন পুলিশ অফিসার হচ্ছেন কলিকাতা পুলিশের হেড
কোয়ার্টার্স-এর ডেপুটি কমিশনার শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী।

বাঁকে কলেজ-জীবনে একদিন বৃটিশের হাঙ্কতে বেতে
হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগঠিত থাকবার অভিযোগে এবং
একতে বৃটিশ আই-বিদের প্রধান কার্যালয়ে তিন দিন
হাস্ত বাস করতে হয়েছিল (অবশ্য তৎকালীন কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর ভাদামোদন যুগোপাধ্যায় ও
তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের অব্যাপক শ্রী বি. এর সেনের
প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বৃত্তি বন্ধ হয়নি), তাঁকেই যে একদিন

আবার পুলিশ বিভাগে চাকরি গ্রহণ করতে হয়ে, বোধ হয় শ্রীবাগচী
কখনও স্বপ্নেও এ ভাবেন নি, একেই বলে অদৃষ্ট! তারপর
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইশান হলার হয়ে পুলিশ বিভাগে চাকুরী
গ্রহণ খুব সম্ভব এরও প্রথম পথ প্রদর্শক বিষ্ণু বাবুই।
সাধারণতঃ ছাত্র ও শিক্ষক অব্যাপক সমাজ আশা করেন যে
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইশান হলের হ’লে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি
শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্ততঃ অব্যাপক কিংবা অব্যাপক হয়ে তিনি শিক্ষা
বিভাগের উন্নতি বিধান করবেন কিন্তু একেত্রেও তাঁর জীবনে
হয়েছে ব্যতিক্রম।

শ্রীবাগচীর জীবনে মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্য লাভ কথায়
সুযোগ এসেছিল। নোয়াখালীর নারকীর দালাব অব্যাবহিত পরে
সাধারণ ও উচ্চাচার্য্যের সহায়তা করবার জন্য তৎকালীন লীগ
সরকার তাঁকে নোয়াখালীতে নিযুক্ত করেন। শ্রীবাগচী দিনের
পর দিন নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সঙ্গে অতিবাহিত করেন। মহাত্মা
গান্ধী বাগচীকে খুব স্নেহ করতেন। আজ একথা বললে কেউ
বিশ্বাস করবে কি না জানি না কিন্তু এই নোয়াখালী দালাব কার্য্যের
সময় শ্রীবাগচীর সরকারী চাকুরী ছাড়ার উপক্রম হয়েছিল। এ
সময় তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও দালা-
বিষয়ক এলাকার সাহায্য ও উচ্চাচার্য্যের তারপ্রাপ্ত অফিসার।

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন কলিকাতা হত্যাকাণ্ডের
নায়ক কুখ্যাত শহীদ সরাবদি সাহেব। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের
কলে সেবারের মত শ্রীবাগচী লীগের মহিমার শহীদ হ’তে পারলেন
না। এবারে এই কর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মদক্ষ পুলিশ অফিসারের সাক্ষ্য
জীবন-কথা পরিবেশন করবে বহুবলীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে।
শ্রীবাগচী একজন আদর্শ অফিসার।



শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী

১৯১০ সালের ২১শে জুলাই অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন নবীরা জিলায় অন্তর্গত কেরানপুর থানা এলাকার আলমপুর গ্রামে বাবুলালকে জন্মগ্রহণ করেন। হারটি কর্তব্যে পূর্ণ পাকিস্তানে পড়েছে। অবিভক্ত বাংলার নবীরা জিলায় কেরানপুর থানা এলাকার বোলাহি গ্রামে। পিতা বিজিবী সত্যচরণ বাগচী। মৃত্যুদান নবীরা জিলায় শিবপুরের উক্ত ইয়ারী বিজালরে প্রধান শিক্ষকের কার্য করে অবসর গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুকাল থেকেই অবিভক্ত বাংলার জীবনে তাঁর পুণ্যার্থ পিতৃদেবের প্রভাব পড়ে। নবীরা জিলায় শিবপুরের উক্ত ইয়ারী বিজালরে থেকে তিনি ১৯৩০ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। তারপর তৃত্বি হলেন এনে বাবুলারী গভর্ণমেন্ট কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে। সেখান থেকে ১৯৩২ সালে প্রথম বিভাগে আই. এল. সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। গভর্ণমেন্টের ছাত্র হিসেবে মতে অবিভক্ত রাে এসেন কলিকাতার এম এ ডি হলেন কলিণ চার্ড কলেজে বি-এ রালে। গবিত্যন্যে অনান' সহ ১৯৩৪ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হ'য়ে ইলান কলার হন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯৩৬ সালে এম-এ পরীক্ষার অন্ত্যালে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এখানেই অবিভক্ত বাংলার কলেজীয় জীবন শেষ হ'লো। ১৯৩৮ সালে জুনিয়র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে কর্কক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং সাবডেপুটির চাকুরী গ্রহণ করেন। তারপর অভিবক্ত বাঙ্গালার কয়েকটি স্থানে কার্য করে ১৯৪৬ সালে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নোরাখালীর দায়কীর সাম্প্রদায়িক হান্ডার অব্যবহিত পরে দালালবন্দিত এলাকার সাহায্য ও উদ্ধারকার্যের তারপ্রাপ্ত অকিসার হিসাবে কার্য করেন প্রায় এক বৎসর। এই সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রভৃৎ বহু নেতার সঙ্গসর্গে আসেন। দিনের পর দিন অবিভক্ত বাংলার সুখ-বাঙ্খ্যা ত্যাগ করে দাদাপীড়িত আর্জুনগণের সেবা ও সাহায্য করেন নিরলস ভাবে। বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী হ'য়েও তিনি মাহুয়ের যে কর্তব্য তা বিশ্বস্ত হননি। মহাত্মা গান্ধীর নোরাখালী সফরের সময় অবিভক্তী তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই দিনগুলির কথা অবিভক্তী আজিও স্মরণ করেন বিশেষ ভাবে। অগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মানবের সঙ্গে দিনের পর দিন অভিবাহিত করা সকলের ভাষণে হয়ে উঠে না। এখিক থেকে অ বি বাগচী ভাগ্যবান—এ কথা অবশ্যই বলতে হবে।

তারপর বেশ বিভাগের পর অবিভক্ত রাে আসেন পশ্চিমবঙ্গে এবং ১৯৪৮ সালে উচ্চ পুনর্বাসন বিভাগের পেন্ডাল অফিসার হিসেবে বোম্বাইয়ে কর্মরত, 'রাইটস' (বিজি) এ। তারপর পশ্চিম-বঙ্গে পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের একাধ সচিবের কার্যও তিনি কিছুদিন করেন। ১৯৪৯ সালে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং এপিটাক-সেক্টরীর হিসাবে উচ্চ পুনর্বাসন বিভাগে কার্য অবসিত থাকেন। এই সময় সর্বভারতীয় চাকুরীতে বোম্বাইয়ের সুযোগ রাে অবিভক্তরাে। তিনি ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের অন্তর্নির্ভুক্ত হলেন ১৯৪৯ সালে এবং আবু মাইটি শিক-শিবিবে ছয় মাস শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪০ সালে চার মাস

জিবি থানাখুরের মহকুমায় পুলিশ অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫২ সালের যে মাস পর্যন্ত হুদীবাব জিলায় পুলিশ অধিকর্তা ছিলেন। তারপর রাে এসেন দাখিলি-এ পুলিশ অধিকর্তা হ'য়ে। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত দাখিলি-এ থেকে কলিকাতার রাে আসেন পেন্ডাল রােকের ডেপুটি-কমিশনার হ'য়ে এবং ১৯৫৮ সালের যে মাসে কলিকাতা পুলিশের সার কার্যালয়ের ডেপুটি-কমিশনারের চাকুরিয়ার তার গ্রহণ করেন। সেই থেকে অসামান্য তিনি কলিকাতার নাগরিকদের ধন, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার ও চাকুরিয়ার বহন করে চলেছেন নিরলস ভাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে অবিভক্তী সত্যবাদী, নিরহংস, কর্তব্যনিষ্ঠ প্রভৃতি সন্তোষ প্রবৃত্তি। "Plain living and high thinking"-এর একটি বলন্ত বৃত্তান্ত অবিভক্ত বাংলার। উচ্চগত অধিকর্তা হ'য়েও তিনি যে ভাবে জীবন-গাণন করেন তা দিক্-সমাজে আশ্চর্য এবং যুবকদের অনুপ্রেরণার একটি বলন্ত উদাহরণ। আমরা আলা করণে অবিভক্তী চিরদিনই যেম এমসিভারে দেশের ও দেশের সেবা করেন।

অবিভক্ত বাংলার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক

[অনুভবকার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক]

অনুভবকার, মাহুটির মেজাজ নাকি সর্বদা চড়া—মুখাবয় নাকি সব সময় গুরুগভীর—আর হাত-পরিহাসের ধার দিয়েও নাকি বান না। এই মনোভাব নিয়েই কয়েক দিন পূর্বে সেখা করি কলিকাতার উপকণ্ঠে গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে গৃহদেবতার মনোম মন্দিরসহ আপন গৃহে সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। খানিকটা পরিচয়ের পরই প্রকাশ পেলে নরম মেজাজের—সংল প্রভৃতির—হসবতা সাংবাদিক ও অনুভবকার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক অবিভক্ত বাংলার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক

ফরিদপুর জেলার কালিয়ুরা গ্রামের ৩৭মহনচন্দ্র চৌধুরী ও শেরপুর জমিদারীর সেরেস্তাদার ৩গগনচন্দ্র রাইয়ের কন্যা স্বর্ণগতা মনোমায়ী দেবীর বড় ছেলে রবীন্দ্রনারায়ণ ১৩১০ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গুয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশ করে স্থানীয় আলমখোহান কলেজে তিনি ভর্তি হন। কিন্তু দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম ১৯২১ সালে কলেজ ছেড়ে দেশের কাজে লিপ্ত হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের, বাবার বড় ছেলে—তাই অবিভক্তী স্থির করেন যে কলিকাতার সন্তপ্রতিষ্ঠিত National Medical School থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে গ্রাম্য চিকিৎসক হবেন। কিন্তু মাহুৰ তাঁর এক হর আর এক। বাবার স্বহস্তের পর তাঁর উপর পড়ল এক বিরাট সঙ্গার প্রতিপালনের ভার, নিজের ছোট ছোট ভাইবোনের মাহুৰ করে তোলা লাঠি। তাই পড়ার আগ্রহকে ভিত্তি রেখে চাকুরী বোজা আরম্ভ হল। ১৯২২ সালের ১১শে সেপ্টেম্বরে হুডি টাকা যেতেন অনুভবকার পত্রিকার Copy Holder হলেন। তখন সম্পাদক ছিলেন ৩গোলাপলাল ঘোষ। কিছুদিন পরে হলেন প্রফ রীতায়—১৯২৪ সালে উক্ত পত্রিকার সহ-সম্পাদক। সেই সময় তাঁকে রিপোর্টারের কাজও করতে হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে বঙ্গুপক

শ্রী চৌধুরীকে এক নতুন পথে বসালে। কর্তৃত্বভার গ্রহীত্বাদে—
 দীর্ঘ ২৫ বৎসর স্থানীয়ভাবে সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন
 বরীন্দ্রনারায়ণ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকরূপে। বিভাগবৈষম্যের পত্রিকা
 প্রকাশের মধ্যে সাংবাদিকতার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল
 বরীন্দ্রনারায়ণের মধ্যে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল তাঁর পরবর্তী
 জীবনে। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের কলকাতা বক্তৃৎপত্রের আহ্বানে
 সেখানকার কর্মদায়ক হুতাশত্রেয় (নেতাজী) সঙ্গে তাঁর
 বিশেষ পরিচয় হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যোগ দেন নাই।
 অহুতবাক্যে তাকে কাজ হওয়ার দিনের অবসরে বর্ণসংস্থানের
 জন্য ১৯২৪ সালের মধ্যেই তিনি "বঙ্গবন্ধু-সাহিত্য-মন্দির"-এর
 প্রকাশিকারী পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে
 সাক্ষাৎ করে পত্রিকা টাকা বেতনে একটি পয়সা লাভ করেন।
 কিছুকালের মধ্যে সতীশ বাবু শ্রীচৌধুরীর রক্তভার জন্ত তাঁর বেতন
 দুটি টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ১৯২৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে
 মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে ইংরাজী "দৈনিক বঙ্গবন্ধু"র সম্পাদকীয়
 বিভাগে কাজ দেন, তখন শ্রীচৌধুরী "পত্রিকা"র কাজটি ছেড়ে
 দেন। এই বছর 'কংগ্রেস' কাগজ পুনরায় তাঁকে আহ্বান করেন।
 ইতিমধ্যে তাকে অস্থায়ী হওয়ার 'পত্রিকা' কর্তৃপক্ষ
 পঁচাত্তর টাকা বেতনে বরীন্দ্রনারায়ণকে রাজকালীন সম্পাদক হিসাবে
 পুননিয়োগ করেন।

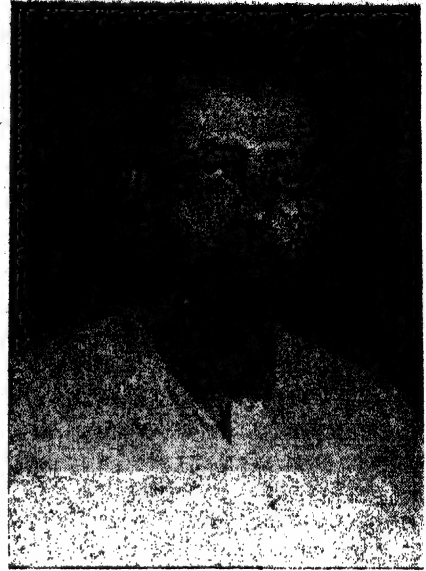
শ্রীচৌধুরীর কর্তব্যনিষ্ঠার একটি ছোট ঘটনার কথা বলি।
 ১৯৩০ সালে নির্বাক ভবি দেখানোর মানসে একটি রাইড
 দেওয়া হল "Gandhi-Irwin Pact Signed." দর্শক বরীন্দ্র-
 নারায়ণ তখন উঠে পড়লেন—বাগবাজারে কাগজের দপ্তরে
 পৌঁছলেন—সম্পাদক গোলাপলাল বোমকে জানালেন মনের কথা।
 পরদিন সোমবার, বঙ্গের দিন—হঠাৎ পাঠকেরা পেলেন দু'পাতার
 'পত্রিকা'—গাভী আকইন চুক্তির কথা জানলেন। এতবড় খবর—
 পূর্ণ একদিন দেশের লোক জানতে পারবে না—সাংবাদিক
 বরীন্দ্রনারায়ণের চিন্তার বাইরে ছিল।

১৯৩৪ সালে তাঁরই উদ্যোগে 'পত্রিকা'র রবিবারের
 সাহিত্য-বিভাগ হল—পর পর এল শিশু-বিভাগ, মহিলা-বিভাগ,
 সিনেমা-বিভাগ, খেলাধুলা পাতা।

বরীন্দ্রনারায়ণ "মাসিক বঙ্গবন্ধু"র শুধু একজন পুণ্ডিত অস্থায়ী
 পাঠকই নন—"বঙ্গবন্ধু-সাহিত্য-মন্দির"-এর সৃষ্টিকর্তাও বহু
 ছোট ছোট ঘটনার কথা আবার বললেন তিনি—একজন ভূতপূর্ব
 কর্মী হিসাবে।

Life & work of J. M. Sengupta (বাক্যেপুত্র),
 Ploughboy to President (V. J. Patel),
 Mahatma Gandhi & India struggle for Swaraj,
 Motilal Nehru প্রভৃতি পুস্তক সমূহ শ্রীচৌধুরী লিখলেন
 করেন।

১৯৩০ সালে পরিস্রাব্যমার প্রবর্তার কথা শ্রীমতী লাবণ্যলতা
 দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। বাগান করা ও সব রকম পুস্তক
 পাঠের মধ্যে তিনি অবসর বিনোদন করেন। শেষে সাংবাদিক
 শ্রীচৌধুরী অস্থবোধের দ্বারা বসেন, "আজ সাংবাদিকরা" হাডির কাঁটার
 কাজ পছন্দ করেন—কিন্তু প্রকৃত সাংবাদিক হলে হলে প্রতিটি



শ্রী বরীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

বিভাগের কাজ জানা—প্রচুর পড়াশুনা—আর নিজের সত্যকে
 কর্তব্যের মধ্যে ঢুবিয়ে দিতে হবে। তাতে সাংবাদিক ও সাংবাদপত্র
 যুগপৎ হবে জনপ্রিয় ও লোকরঞ্জক।"

শ্রী আবদুস সাত্তার

[পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রমুখ]

১৯১১ সালের ৩রা মার্চ বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত
 টোলা গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে পশ্চিমবঙ্গের প্রমুখ শ্রী আবদুস
 সাত্তার জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে গ্রাম্য পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি
 লাভ করে বৈজ্ঞানিক হাইস্কুলে তিনি ভর্তি হলেন। ১৯২১ সালে
 দেশব্যবসায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল বৈজ্ঞানিক গ্রামেও তার
 চেটে এসে পৌঁছলো। ১০ বৎসরের কিশোর সাত্তারের প্রাণও সে
 খবরে উতলা হয়ে উঠলো; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন দেশের সেবা
 করবো। তখন থেকেই তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল বিভিন্ন বর্ণশ্রী-
 সভার স্বেচ্ছাসেবকরূপে। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় পরিষদের নির্বাচনে
 তাঁকে স্বরাজ্য দলের প্রার্থীর অঙ্কুলে কাজ করতে দেখা গেল।
 ১৯২৫ সালে সাক্ষাৎকার নিয়ে তিনি বর্ধমানে ছুটলেন মহাত্মা
 গান্ধীকে দেখা ও তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্তে। আস্তে আস্তে
 তিনি রপ্ত করতে লাগলেন কিভাবে দেশসেবা করবেন। ১৯২৬
 সালে মেদিনীপুরের বক্তার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে বক্তার্তদের
 সেবার জন্তে যে সর্বত্র প্রাণ সমিতি গঠিত হল, সাত্তার সাহেব নিজের
 অঙ্কলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে সমিতিতে পাঠিয়ে গেলেন।
 ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনকে বর্জন করার জন্তে তিনি
 বৈজ্ঞানিক একটি আন্দোলন সংগঠিত করে দেশকে তাঁর কর্তৃত্বভার
 কথা জানিয়ে গেলেন। এই বৎসরই বৈজ্ঞানিক হুল থেকে গ্যাং ট্রাক

পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধমান হাইকলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজে পড়াকালীন তিনি বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা জীবনবেন্দ্রনাথ পাণ্ডার সান্নিধ্যে এসেন। ১৯৩০ সালে যে আইন অমাত্য আন্দোলন শুরু হয় সাতার সাহেব তাকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন এবং তখন থেকেই স্বকল্প হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

তাঁর ডেকারবী বক্তৃতার ইংরেজ সরকার পর্ষদ বিচলিত হয়েছিলেন এবং সভ্য-সমিতিতে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করার জন্যে কালনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারী করলেন। কিন্তু তিনি মহকুমা শাসকের সে আদেশ মানলেন না, বৈভূষর হাসতলার জীবনবেন্দ্রনাথ পাণ্ডার সভাপতিত্বে অহুত্বিত এক জনসভায় তিনি আইন অমাত্য করে বক্তৃতা করার প্রেরণা দেন। বিচারে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা, অন্যদিকে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হল। সাতার সাহেব জরিমানা দিলেন না, ফলে তাঁর কারাবন্দের মেয়াদ হল আড়াই মাস। এরপর ১৯৩২ সালে আইন অমাত্য আন্দোলনে যোগদান করে তাঁকে সাতো চার মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই জেলের কটকের কাছে আবার তাঁকে নিরাপত্তা আইনে প্রেরণার করা হল, এবার কারাদণ্ডের মেয়াদ হল ৬ মাস।

১৯৩৫ সালে তিনি সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলেন এবং ১৯৪০ সালে কোলকাতার ল' কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিনের জন্য বর্ধমান আদালতে ওকালতিও করেন। '৩৫ সালে তিনি বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। তারপর সভাপতিও নির্বাচিত হন এবং ঐ পদেই আসীন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। '৩৫ সালে বর্ধমান টাউন হলো তার নলিনী চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে ক্যানেল করের বিক্ষেপে যে সভা হয়, তাতে সাতার সাহেব এমন বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে তাৎনাজিমুদ্দিন পর্যন্ত হুঁক হয়েছিলেন। তার নাজিমুদ্দিন সাতার সাহেবের মতের পরিবর্তনের জন্যে



শ্রী আনন্দ কুমার সাতার

জেটা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। বেশে বধন হুসলি লিপের আধিপত্য তখনও সাতার সাহেব পাকিস্থান দ্বীপ বিক্ষেপে নির্ভীকভাবে করে কাটিয়েছিলেন।

সাতার সাহেব ১৯৩৭ সাল থেকে এ আই সি সি সভা নির্বাচিত হয়ে আসছেন; '৪২ সালে বোম্বাইয়ে এ আই সি সি বৈঠকে যোগদান করে মহাদেব দেশাইয়ের শোকসভার বক্তৃতা করার জন্যে বর্ধমানে এসেন কিন্তু পুলিশ তাঁকে প্রেরণার করলো, বিচারে এক মাস জেল হল; কিন্তু নিরাপত্তা আইনে তাঁর জেলের মেয়াদ গিয়ে পাঁচালো ১৫ মাস। কংগ্রেস বধন বৈধ হ'ল জেল থেকে ফিরে এসে পুনবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এই সময় থেকে বর্ধমান জেলা বোর্ড, হুল বোর্ড এবং বহু স্থানীয় জনপ্রিয়তার সাহায্যে তিনি ভূষিত হলেন। ১৯৫০ সালে অস্থায়ী পার্লামেন্টের তিনি সভ্য নির্বাচিত হলেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার কালনা-কাটোয়া কেন্দ্র থেকে নিকটতম প্রার্থীকে ২২ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হলেন। '৫৭ সালের নির্বাচনে তিনি কেতুগ্রাম কেন্দ্রে থেকে বিধানসভার আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নিকটতম প্রার্থীকে ১১ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রমাণ করে দিলেন যে কেন্দ্রের শক্তকরা ৭৫ জন হিন্দু তাঁদের কাছেও তিনি কত প্রিয়। তাঁর বলিত মতবাদ ও উনার দৃষ্টিভঙ্গী যে এই জনপ্রিয়তার অন্তরত কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রমমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ বলমত নির্দেশেই সকলের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শ্রমমন্ত্রী হিসেবে তিনি মনে করেন—মেহনতী জনতার জায়গাসত অধিকার বন্ধা করাই তাঁর কাজ, কাজেই যে কোন শ্রমিক তিনি যে ইউনিয়নেরই অন্তর্ভুক্ত হোন না বেন, তার অভিযোগের প্রতিকার করতে তিনি বা তাঁর দপ্তর সকল সময়েই সচেষ্ট। শ্রমদপ্তরকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে তাঁর চেষ্টায়ও অন্ত নেই। শ্রমদপ্তর থেকে এখন 'লেবার গেজেট' 'শ্রমিক বাজী' প্রকাশিত হচ্ছে, শ্রমিক আইনগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

সাতার সাহেবের সভাপতিত্বে রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়েছে শুধু কলকারখানার শ্রমিক বা সওদাগরী অফিসসমূহের কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, দোকান কর্মচারী ও কৃষিশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত আজ আইন তৈরী হচ্ছে। শ্রমিক নেতা হিসেবে সাতার সাহেবের এক সময় যে খ্যাতি ছিল সে অভিজ্ঞতাকে তিনি এখন কাজে লাগাচ্ছেন।

সাংবাদিক হিসেবেও সাতার সাহেবের খ্যাতি কম নয়। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি 'বর্ধমান কথা' কাগজের সম্পাদক ছিলেন; তাঁর পরিচালনাধীনে 'বর্ধমানবাণী' ও জনসমাজ প্রকৃষ্টি লাভ করেছে।

সাতার সাহেব বলেন, 'যে জনসেবার পথে পা নিয়েছি তাকে মনে করি আমি বৃন্দাবনের পথ, এ পথ শেষ না হাওয়া পর্যন্ত তাতেই আমি চলবো, এই পথে চলাতেই আমার আনন্দ।'

শেখ মুহুরুদ্দ জমমতী জীপাতার 'মাসিক বহুমতী'র কথা তুললেন। বললেন পরিচায়—'মাসিক বহুমতী আমার কাছে থাৎ প্রিয়। আমি আগ্রহ নিয়ে বহু-প্রচারিত এ সাহিত্যপত্রটি নিয়মিত পড় থাকি। অবসর বিশ্রামের প্রচুর বোমাক আমি এতে পাই এবং এই পত্রিকাটির আয়ত উন্নতি হবে, এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।'

কলাকৌশল-সহকারে সমস্ত দৃষ্টিগোচরে ধারণা করলেন। একটি করে প্রত্যেকটিতে। আগে জড়ানো দৃষ্টির সঙ্গে মিলে দৃষ্টিতে জুড়ে দিয়ে কৃষ্ণের কটিতে যেই পাক দিয়ে গিয়ে বীথিতে গেলেন ব্রজবাসী, অমনি গহনবন এক আন্তর কোঁকুকে বিলসিত হয়ে উঠল পরীবাশিনীদের দ্বারা। হরিণের মত বিলাসী চোখ করে তাঁরা হাসতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বালক-সখার দল বড়-কৃষ্ণের কাছা দেখে যেই তাঁদের বন্ধকে পাত চমকিয়ে সমবেশনার কারা জুড়েছেন অমনি সকলে দেখলেন...অত দৃষ্টি কিং সেই দু-আঙুল বম।।

ব্রজবাসীরও তখন দর্শনার দশা। তিনি পুনর্বন্ধনের উপায় চিন্তা করতে বসলেন। চিন্তার খাগল-সমীরণেই বেন বেগে বেলামাল হতে লাগল তাঁর বন্ধুঃ, কিশলয়ের মত শ্রীমদ থেকে বয়ে পড়তে লাগল শ্রমজলের শিশির, কবরীভার থেকে ধসে পড়ল মালতীর মালা।

ব্রজবাসী বুঝতে পারলেন, এত রাগ দেখিয়েও তিনি কেবল কল পেয়েছেন কপালের ঘাম, নিফল হয়েছে তাঁর সমস্ত প্রয়াস। ভবুও উপায় চিন্তা করতে লাগলেন কৃষ্ণকে বাঁধবার।

এবার খেলার রাগ জ্বলেছে মায়ের মনে। অজুত শিশুটিকে পুনর্বার বাঁধতে গেলেন ব্রজবাসী।

আর আতীর-সুন্দরীরা? কী হৃদয় তাঁদের ভূতর ভঙ্গিমা। তাঁদের রাঙা-রাঙা চোখগুলি নীর্থ হয়ে গেল; গলে গেল, বয়ে গেল ঘরের প্রতি তাঁদের মানসিক শ্রদ্ধা; সমস্ত বিঘ্নে পূর্ণলুপ্ত হয়ে গেল সখার; বেন বন্ধনঃজুস্ত হয়ে গেল তাঁদের ভবনগুলিও।

১২। কেউ কি কখনও চৈতন্যকে বাঁধতে পেয়েছেন? না।

আনন্দকে? না।

জ্ঞানকে? না।

ভক্তকে (মহাকে) না।

তাহলে ব্রজবাসী বা কেমন করে বাঁধবেন চিরাঙ্গজ্ঞান মহোদয় বৃন্দাং ঐ তাঁকে? তথাপি—ধীর অস্তর নেই ধীর বাহির নেই, অগচ্চ বিনি আনন্দে ও ভক্তে অস্তরে বাহিরে সমান, বিনি পূর্ণ, বিনি অপরিচ্ছদবান ধীর পূর্ণ নেই, পর নেই;—তাঁরি কৃপাশক্তি আজ বিকিরিত হলেও ভাবতে লাগল, আছা মা কি আদ্য কখনও বাঁধতে পাবেন রাগ করে?

১৩। তাই বন্ধন প্রসঙ্গে জননীর পরিগ্রহলুলিত অঙ্গবানি নিরীক্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সজাত হল কল্প-রস। ওরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে পারে দুটি গুণ, ভক্তের পরিশ্রম, ও নিজকৃপা, অস্তথা নেই। বন্ধন এই দুয়ের অমুৎপত্তি ঘটেছিল ততক্ষণ দু-আঙুল কন্ডই ছিল রজ্জ্ব কিন্তু সত্যি হুটাই যেই আবির্ভাব ঘটল, অমনি নন্দহলাল বীকার করে নিলেন জননীর উত্তর পুনর্বন্ধন।

১৪। সিদ্ধার্থ হলেন ব্রজবাসী। সহচর বালকদের বললেন—আমি এখন আসি। তোমরা একে দেখো। নিজে বেন নিজের বাঁধন কেটে না পালায়। যদি পালায়, আমায় ডেকা। অভিনায় থেকে উঠে ঘরের ভিতর চলে গেলেন ব্রজবাসী। রা-ও গেলেন আর কৃষ্ণের টান-মুখ থেকে কলঙ্কের মত কলনটিও মিলিয়ে গেল শূন্য। এবং অতি প্রসন্ন মুখে বাণী বেলল—মায়ের দেওয়া বাঁধন তবে আর এক কাজে লাগাই।

হুৎ পাকিয়েছিল দুটি তরুণের। কৃষ্ণের-পুত্র 'নন্দকুবর' ও 'দণ্ডিপ্রবেশ' তারা হুতরুটি। ভাবানের পরমজ্ঞির তরু নায়ে বিনি

আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

একটা শাপছলে খণ্ডন করেছিলেন মদিরার বিদেপ—সেই নীতি-প্রাপ্ততা পরম বৌদ্ধির বচনাত্তক সত্যসত্যই সত্য-প্রতীতি কববার উদ্দেশ্যে এঁরা দু জনে লাভ করেছিলেন ঐ অভিশপ্ত তরু জন্ম।

হঠাৎ কৃষ্ণের খেয়াল হল, ঐ দুটি তরুকে তিনি অমুগ্রহ করবেন। অতএব হামাত্তি দিয়ে, বীরে বীরে উল্লুখটিকে টানতে টানতে তিনি চলতে লাগলেন তরু দুটির দিকে।

১৫। পিছনে শিঙনে চলতে লাগলেন বালক-সহচররা।

বহু প্রাচীন তরু দুটির একটি মাত্র মূল, সলসতের মত; পৃথক পৃথক দুটি কাণ্ড বেন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ণকাণ্ড; সামবেদ বজ্রবেদের মত অজস্র ভাসের শাখা। ব্রহ্মরাজের কীতি-প্রভাপের মত বহুদূর তাঁদের বিস্তার; মহাসারথান বেন পাহাড় বেন মেঘ, মহামূল ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাটের বেন বিগ্রহ। ভীমাহুজ ও কার্তবীর্যের একই অর্জুন নামের মত এ দুটিরও নাম অর্জুন। মূল ও সহসেবের মত এ দুটিও বমজ।

সেই বমলাজ্জনের দিকে কৃষ্ণকে বেতে দেখে বালক-সহচরদের মনে হলে উঠল সংশয়।

ভবে কি কৃষ্ণের অসহ্য হয়ে উঠেছে রোজের তাপ, তাই আজর নিতে চলেছেন তরুমূলে? বিতর্কের মধ্য পাখেই ফার নেড়ে তাঁরা দেখতে গেলেন তরু দুটির মূলের মধ্যস্থলে উপবেশন করলেন কৃষ্ণ, ত্রিধাক ভাবে স্থাপন করলেন উল্লুখটিকে। তারপরে এতটুকুও আদাস না করেই সেই বলনিহতা অপূর্ণ চিত্রচরিত্র আশ্চর্য্য বালক নীচের দিকে লুখা হয়ে তঁকে পঙ্কজে ধীর চূর্ণকুন্তল, অরান ধীর শ্রীমঙ্গের লাগনি, উল্লুখের এক সংঘটনেই সমূলে উল্লুখিত করে ফেললেন বমলাজ্জুন তরুধরকে।

১৬। কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করলে যেমন বাসনা ও পাণ-...হুই-ই সহুগ্লিত হয়ে যায় তেমনি হল সেই তরুধরের দশা। মত্তমত্ত করে লাকিয়ে উঠল এক চূর্ণাঙ্ক বনি। সে ধানিতে বেন নির্ধাশিত হয়ে গেল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড-বিবরবতী লক্ষগ্রাম। প্রলয়মেঘ-নিরুক্ত মহাবজ্রের ভৈরববরের অমুকরণ করতে করতে ভেঙে পড়ল বমলাজ্জুন।

হু দুটো বিরাট মহাক্রমের পতন হল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকে বালকসহচররা দেখতে গেলেন—দুটি গাছের মাফখানে তিনি বসে রয়েছেন, পট্টায়ে পূর্ববং বাঁধা রয়েছেন উল্লুখলে, বিরাট তৈরব বয়েও এতটুকু ঘটেনি তাঁর মানসিক উবেগ, এতটুকুও চমকিত হন নি ভয়ে, হুৎ হাসি, স্থির থাকিয়ে রয়েছেন তরুধরের দৃষ্টিবস্ত্র মূল আদ্যার মত, পরম ভেজবী দুটি বিদ্যাপুরুষের দিকে।

এবং তারপরে তাঁরা অবাক হয়ে গুললেন,—অভিশাপমুক্ত বিদ্যাপুরুষ দুটি ভব করছেন তাঁদের নন্দহলাল কৃষ্ণকে।

ভগবদনুশোচক হয়েও যিনি আজ বহুদন স্বীকার করেছেন
সাক্ষাৎসল্যে।

নিভাত্ত্ব হয়েও যিনি আজ বহু, নিভাত্ত্ব হয়েও যিনি আজ
ননীচুরির অপরাধে অপরাধী সেই তাঁদের নন্দহলাল কৃষ্ণকে।

১৭। ধনিত হয়ে উঠল তব,—

“জর জর সচিদানন্দ-ধন, ধনবটামেহর, জর হে জর হে জর হে।

হে হুববগাহ লীলাময়, লীলার শ্রেষ্ঠ সাধন-পথে তুমি অবতরণ
করছ ধরাধামে। হে রণ-নবীন, তোমার চাতুর্ঘ-চটুল ভুবন,...
সুগ্রামে ঘটবে হু দানবদের পরাভব। বেগ-বলের কণামাত্র দিয়ে
তুমি উৎখাত করেছ মহান বমলাধ্বন।

হে অবিভার, অসীম অশেষ তোমার রূপ। হে রূপগজ-
বন্দল, সাধারণ-মহুঘোর মতই তুমি আজ ধারণ প্রকাশ করেছ
ললিত-বিনাস। ব্রহ্মপুত্রের তুমি মল্লাবতার। তোমার আনন-
আভার ব্যাধি পায় আকাশের চাদ। বিস্কল ও বাঁধলীকুলের
মত এই রূচির অববের মাধুর্য হৃদিয়ে তুমি অপরূপ করে রেখেছ
ধরাভল। অকাষণ রূপা-রূপাণে তুমি অনাদি অবিভার উচ্ছেদ
করে দাও বসেই আনন্দিত হয়ে শুঠেন মতিমানেরা। বিবরাতিত
তোমার লীলা-নন্দুত, সেখার দান করে আনন্দময়ী প্রজা। ধারা
পারমহংস পথের পথিক একমাত্র তাঁরাই জেনেন তোমার পারের
পথটিকে। তোমার গুণগুলিকে কঠোরণ করে রেখেছেন কমলাসন-
শিতিকঠারি দেবগণ।

হে গপনাভীত লোকান্তরপ্রভাব। হে প্রভাবহল। হে
বহুলভিত্তবিহার। যুগচক্রে আপনাই অবতীর্ণ হয়েছেন অপরূপে।
আপনার নাম ও রূপ নক্ষত্রের মত অপরূপে। নির্বল বশ্যমহিয়ার
আপনি শুভ্রাশিত। আপনাই দান করেন বিশ্বের আকাঙ্ক্ষিত
অভিমানের বিশ্বগুণিকে। হে অশিলোকনাথ, হে প্রভু, নমস্কে,
নমস্কে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি ছাড়া আর কে রয়েছে, কোথায়?
হে পরমপুরুষ, কে না তোলে তোমার কৃষ্ণকে? কার জগদ না আতুর
হয়ে ভাটে তোমার হৃদ-অটনের চকুরতায়?

হে মনোহর। হে মূর্তিনন্দ নন্দনন্দন। হে নন্দনবন-
বিহারীদের মৌলিব্রহ্মমহামারকত। ছন্দে ছন্দে কে গাঁথতে পারে
তোমার বশ্যমাণ্য? মূর্ত ও অমূর্ত আনন্দময় রূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত
আকারময় রূপে তুমি বিস্তারিত। তুমিই আনন্দ তোমার ভক্তের,
অধ্যাত্মবিশেষ। অতএব তোমার এই চৈতন্যকর-নন্দাকিনীর
অব্রাহ্ম-বারা-মেহুর চরণাবলিষে চিরলর হয়ে থাকুক আমাদের উত্তরের
রতি। এক অসীম রূপার হে প্রভু, হু করে দাও অরতি।

হে আর্ন্তজনের বহু, আমাদের বহু কোনো প্রার্থনা নেই, একমাত্র
প্রার্থনা—...ৎ-পাপপঙ্ক-নিষেধি সদ। আমাদের পক্ষে আজ প্রার্থনা
হবে পাড়িয়েছে হুনিখর নারদের অভিলাষ। অতএব বহু-প্রসঙ্গের
সদায় অনিবার্য।

আমাদের বাণী তোমার গুণীগীতে লীন হোক, আমাদের বন
তোমার ঈশানপদ্মের ধ্যানে সমাহিত হোক, আমাদের কর্ণ তোমার
কীর্তীকুজিত অচল হোক, হে হরীকেশ, আর কত চাইব, আমাদের
ইচ্ছিবর্ক সেবারদের মহানীরতায় মলিক হোক।

দেবধি নারদ, যিনি তোমার চরণকমলের বহুক, তাঁর অভিলাষ
আজ বন হয়ে আমাদের প্রভুত্ব অঙ্গীকার করেছে। সেই প্রসাদটুকু

পেলে আমরা কি চক্রেই দেখতে পেতেম সেই আশ্চর্য-বালকে
খেলা, ধীর লীলার একটি কবিকার বিবৃত রয়েছে সহজ সহজ
বঙ্গীত?

হে ভগবন, বর্ণনাভীত আপনায় জননীর সৌভাগ্য। তাঁর
মহা-মহা সৌভাগ্য যে তিনি আপনাকে বেঁধেছেন। সেই সৌভাগ্য-
কবিকার শতাব্দের একাংশও ইহলোকে লাভ করেননি ব্রহ্মা, শিব,
এমন কি ইন্দ্র ও মহাবিরাট।

হে ভূমন, জ্ঞানীদেব, সর্ববৈদ্যবিদ্যানদের ও বৌদ্ধকনিষ্ঠিতদের
সুখলভা নন আপনি। ইহলোকে আপনি তাঁদেরই নিভাত্ত্ব সুখলভা,
ধাঁদের রতি পূর্ণ-নিবেদিত হয়েছে আপনাকে, যিনি আজ নর-শিওর
আকারে নন্দাশ্বকরণে লীলাখেলার বিজ্ঞার।

১৮। অতএব হে প্রভু, আমাদের উত্তরকে অজ্ঞতা কখন,
কী এমন মনস্কামনা করি আপনায় চরণে, ধীর প্রভাবে আপনায়
চরণপদের আধারেই শাশ্বত রতি বহন করতে করতে, এবং
বধোচিত প্রারক ফল উপভোগ করতে করতে কালান্তিপাত করতে
পারি আমরা হুজনে?

১৯। অবসান হল বন্দনার। অতঃপর হুজনেই নিভেদের
অন্তর্হিত করে নিয়ে প্রস্থান করলেন উত্তর দিকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অভিলাষহুজ বমলাধ্বনের ঘোর পতন শব্দ
জন্ম হয়ে উঠল নিখিল পৌন্দ্র, যেন বিশ্ব হলেন বর্ষের দেবতার,
সিদ্ধিমাগেরা,—পাতালের নাগিনীরা। বালক-বৃদ্ধ-মহানারী এমন
কি ত্রৈলোক্যবীরও যেন শুকিয়ে গেল রস। কয়েক জন অধীর
হয়ে লেগে দৌড়লেন। দৌড়লেন বাটে, কিন্তু তাঁদের পুরোভাগে
যেন ঘেঁষে চলল বিতর্ক, কেমন যেন নৃত্য-পরাদুখ হতে চাইল তাঁদের
হৃদয়, যেন তাঁদের হৃদয়ের উপর চড়ে বসল পরম শব্দ।

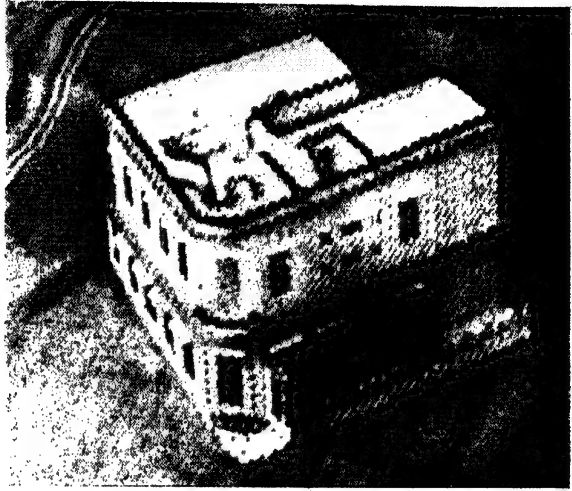
২০। তাঁরা এসে লেগলেন,—হুটি মহাত্ম্য পড়ে রয়েছে।
যেন বালকক ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছে ধরীদেবীর
হৃদয়। হুট, যেন পাতালের বিবর থেকে যুগপৎ উদ্ভূত লাক্ষ্মী উঠে
হুটিকে পালাতে চাইছে হুটি প্রকাণ্ড অঙ্গুর নর্প, যেন ভগবদ্রিপাতিত
আদিদৈত্য মণ্ড-কটকের এ হুটি সাফাৎ প্রতিবর্তি।

আর হুটি গাছের মাথবানটিতে লেগলেন বলে রয়েছে তাঁদের
বালব্রহ্ম...অভিনিধির যেন অস্ত্রতম নিধি হুটুক। একটুকুও চাক্ষু
নেই, একটুকুও বিয় নেই, একটুকুও ভর নেই, বরং তিনিই যেন
ধরীদেবীকে দান করছেন অস্ত্র। বিশ্বর কুটে উঠল তাঁদের ঠোঁট,
বললেন—

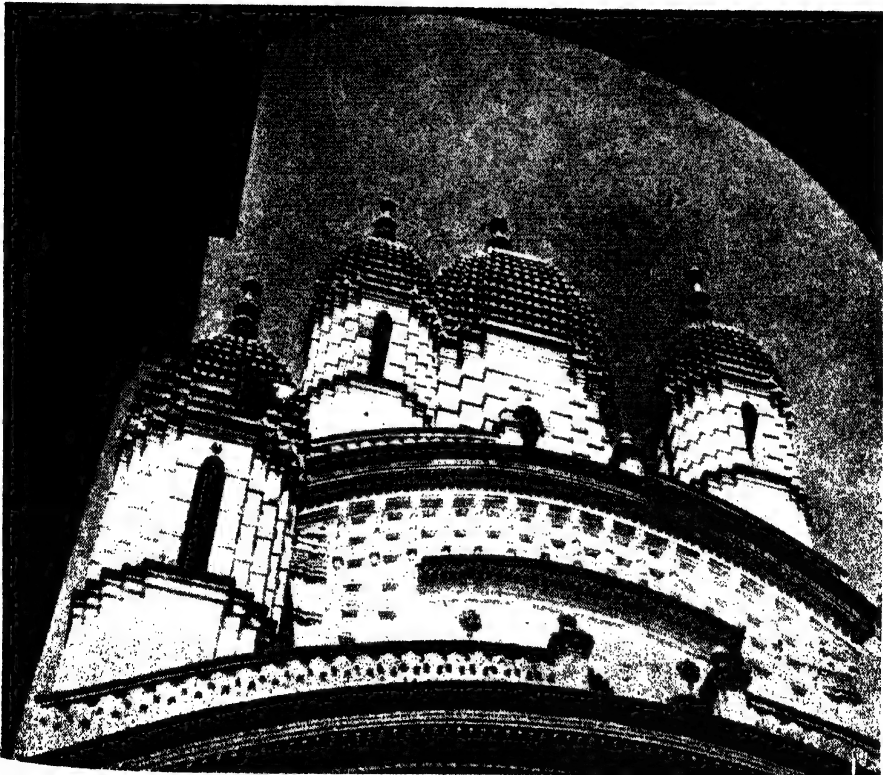
কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য। বড় নেই, বাহল নেই, হুটো
বহাজ্জিন গাছ হঠাৎ মড়মড় করে উপড়ে পড়ে গেল মাটিতে? এ যে
একবারে প্রলয়কণ্ড। হুটিক থেকে হুটো পড়ছে। একটিকে
যেন ভর, অস্ত্রটিকে যেন বাধা। আর তার মধ্যে বলে রয়েছে
আমাদের শিতটি যেন পটে-জাঁকা এক টুকরো নতুন মে।
বাড়ছেন। বলতেই হবে এ আমাদের কপালের জোর। আশ্চর্য,
একটুকুও আতুল হয়ে পড়নি ছেলে। মহাপ্রাণীরা এই হুটি গাছ
ডবে কি জয়ার প্রকাণ্ডে হুল থেকেই করে গেল? না আপন
বিজ্ঞার ভায়ে আপনাই নিশাভ গেল? তা তো মনে হয় না।
হুটিমই হুল মরল রয়েছে, শিকড়গুলিও তেমনি দ্বিত, তেমনি হুল।
কী করে এমন বে হয়? [কথন।



বোতামের বাড়ী
—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র



দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির
—বিমল হোড়

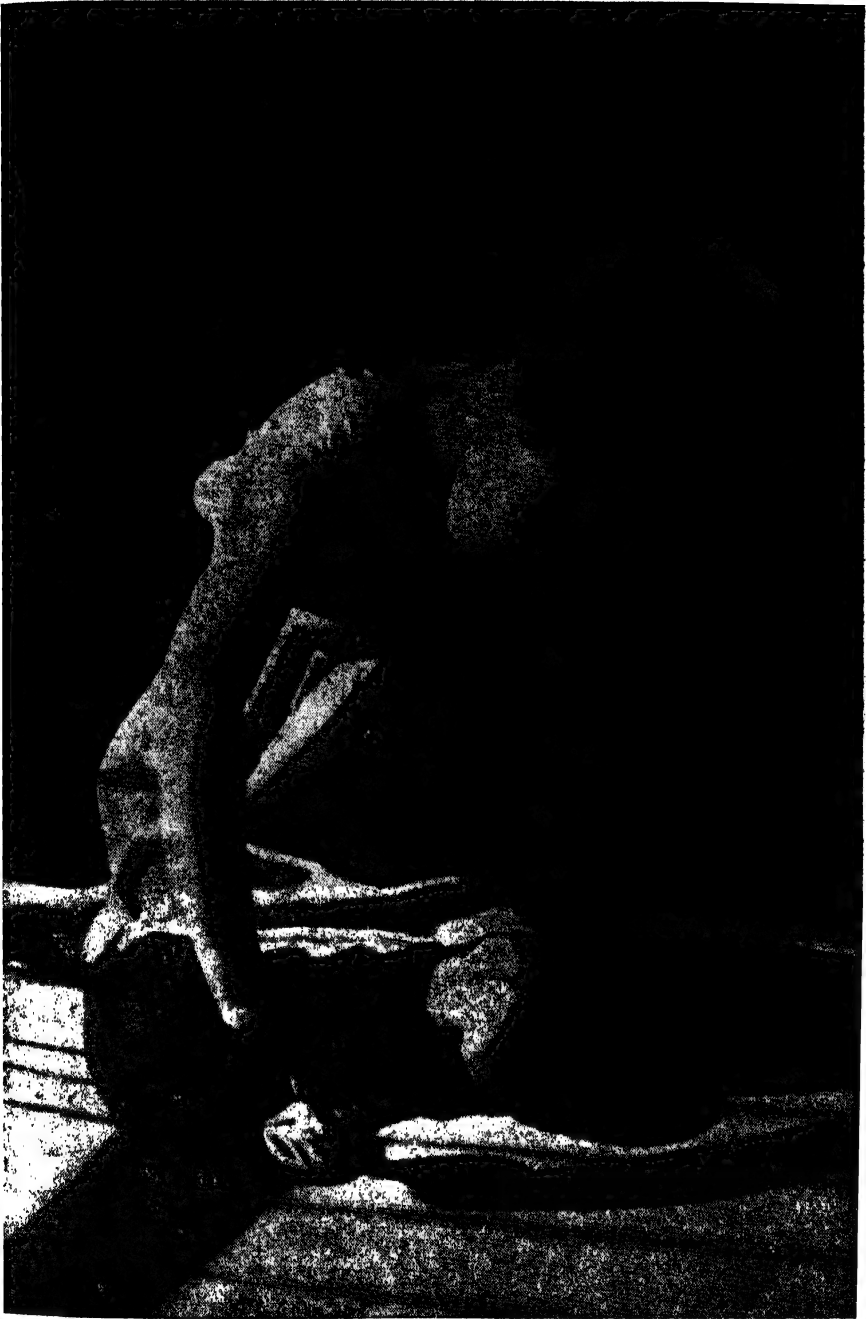




ভাস্কর্য;
একাকী

—মীরেন অধিকারী
—বিশ্বরূপ সিংহ





ঘুমন্ত

—বিবজিৎ দেব



माता

—बटौर (जालंधर)

চিত্র-চরিত্রে বর্ণবোধ ও সাম্যদর্শন

ত্রিগোবর্দন আশ

সুভাবে ভাবিত হ'য়ে সৃষ্টি হ'ল রূপ, রস, গন্ধ ভরপুর বিধাতার বৈচিত্র্যময় জগৎ। সৃষ্টির সেরা-জীব রূপমুগ্ধ মানুষ পেল তার স্বাদ, গন্ধ। প্রকাশভঙ্গিতে বেকুল অসুট স্বর, তাৎবুল যে বার জাপনে। গভীর মধ্যবেদনা অমুগ্ধ হ'ল মানব-চেতনামূলে, কি করে সবাই সবাইকে জানাবে আপন মনের কথা ও ব্যথা। পেল প্রকৃতি-সহায়তা,—একই দৃশ্য দেখে সকলে হাসে কাঁদে। একই ঘটনার সকলে চমকিত বা আতঙ্কিত হয়। 'একরূপে' বহর মিলে কিছু 'এক' যে কি বস্তু তা তারা জানে না। বাত্মা সুরু হ'ল জ্ঞান। সন্ধানে জানবার প্রয়াসে। বাস্তব-প্রতিপাত মধ্যে ঠেকে ঠেকে পৌঁছাল এসে এক সীমানার, প্রকৃতি বলে দেয় ইঙ্গিতে বিশ্বপ্রকৃতি গ্রহ পাঠ করতে। সবাই যে, বার কৃতি, বিজ্ঞা বুদ্ধি সমর্থ ব্রতী হ'ল একর সাধনার বিভিন্ন পথের পথচারী হ'য়ে। গেতে চার সহস্র—সুন্দরকে প্রকৃতি সাহায্যে। চলার পথে সঞ্চিত বস্তুগহ সমবেত হ'ল সংযোগনে। সর্ববাদিসম্মত বাহ্য গ্রহণ করে গঠন হল সমাজ ও গ্রহণ-বর্জনরূপ-প্রকৃতি, যাহা নাকি গড়ে তুলবে কালে শিল্প-চিত্র। রং-এ ভরপুর প্রকৃতি শিখাল বরণ করে গ্রহণ করতে আর প্রাণের গুণন নুর আলপনার ছন্দে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে। রূপমুগ্ধ প্রাণের আবেগ প্রকাশ হল আলপনে,—সুর শব্দে। জয়ন্ততী সুর-বক্তারে সুর্তি হল বাণী, কণ্ঠে এল স্বর। চেতনামূলে হল বোধোদয় সন্ন্যাস ও নীরস। রূপ, রসসম্ভারপূর্ণ বরণ-ডালায় বরণ করল সর্বস্বতীকে, কণ্ঠে হল তার আসন। ইনিই বাগদেবী, বীণাশাণি সর্বস্বতী, বিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রূপসম্ভার সম্ভিত প্রকৃতি শিখাল প্রকাশ করতে রূপ বর্ণনার জীবনের অভিব্যক্তি শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে। রসবাদে মাতোয়ারা হয়ে চাইল রূপকে স্পর্শ করতে। বিজ্ঞা চিনাল বস্তু অবস্থা, দর্শন পেল দিয়া-দৃষ্টে সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি,—সৌন্দর্য, বার জ্যোতি ঘূচায় এক নিমেষের অজ্ঞান-অন্ধকার।

কিছু কেমন করে রূপায়িত হবে জীবন্ত সত্য জীবনগতিত্বকে, অহসিকিৎসু মন সুরু করল বাত্মা রহস্য উদ্ঘাটনে। সাধনায় পেল পথের সন্ধান রূপ ও শব্দে।

রূপ, রস, গন্ধ প্রেমস্পর্শনে রূপকাব,—চিত্রশিল্পী আর শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রেমাকর্ষণে শব্দকাব,—কথাশিল্পী ব্রতী হল সৌন্দর্য উপাসনার, হ'ল বোধোদয় ছন্দোবদ্ধ গতি-জন্মদায়; পেল পরিচয় পৌঁতে। জয়ন্ত-দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখে বোধ ও বোধ্য বোধীমূলে সৃষ্টির শেষ পরিণতি (Perspective) পরিত্রেক্তিরূপে ত্রিভুজ প্রত্যেক করল বোধন ঘটাপনে, পূজার অর্থ, ভাব ও ভক্তি। ভাব, পুষ্প; ভক্তি,—চন্দন; ভাব ভাবায় প্রকাশ, ভক্তিরূপে প্রকাশ। ভাব বিশ্বাস ও রূপ বিলাস। ভাব অপ্রত্যাক, রূপ প্রত্যাক; ভাবে রূপ দর্শন আর রূপে ভাব কখন। এ যুগ কালনিক ভাববিশ্বাসের যুগ নয়, বিজ্ঞানময় বাস্তবতায় রূপ বিলাসের যুগ; তাই বিধকে ফুলে ফলে অশোভন করে রূপকাব। বাস্তবে জীবন্ত সত্য রূপায়িত করবার গুরুদায়িত্ব রূপকারের উপর জ্ঞাত।

রূপমুগ্ধ তার জয়ন্তসরীষ উজাড় করে সাধারণ পূজা-অর্থ, রসসম্ভার বরণডালা। আবাহন সজীত সুর-গুঞ্জে মুগ্ধরিত করে

আকাশ-বাতাস। সেই সুরমুচ্চনায় মানুষ জাগে, ঘুমায়; হাসে, কাঁদে। শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, কাব্য, উপনিষদ একই সুর, ভাল, মান, লয় বিভিন্ন প্রকাশ। সব কিছুই বিভিন্ন ধারার বর্ণ-বিকাশ বা রূপবিলাস। স্থান, কাল, হেতু—অবস্থাতোলে মানুষে এল কামনা, চাইল ভোগ-বিলাস। পূজার অর্থ—উপচারে ভোগ্যবস্তু সন্ধানে প্রমুগ্ধ যুগ-মন গাছিল বেহুলা সন্তত। সজীত হার মেনে হারাল সঙ্গতি। বিধা হল সৃষ্টি। অভ্যেদ পুরুষ-প্রকৃতি হল ভেদ। ভোগলিপ্সামত অমুরে পরিণত হ'ল সুরলোক, প্রকৃতি বিকল্প বড়রিপু প্রকাশে। বর্ণ বিবর্ণ হ'ল ভাব হ'ল স্বভাবহার্য অভাব প্রকাশে। অভাবের অর্থ ঘটাল অনর্থ। মানবধর্মে ধর্ম্মিষ্ঠ, সৌন্দর্য পূজারী ভাব, ভাবায়, আচার, ব্যবহারে এবং কথ্যে কুরুণ ও কদম্বের দারস্থ হয়ে জড়সরীয় হ'ল কদম্বরূপে। সেদিন হতে মানুষ বস্তুপুস্তলিকার মত মানবধর্ম্ম কুরুণে ও কদম্ব ব্যবহার করে আসছে এবং আমাদের সমুখে জীর্ণ, ভবিষ্যৎ শূন্য কেউলিয়া 'বর্তমান' জয়ন্তাত্মা সুরু করেছে দিগ্বিজয়ে। জ্যোতিষের যুগধরা, মরিচাপড়া কাঠামো আজ রং-শুভ্র মৃতপ্রায়। মনুষ্য-সমাজ আজ কুরুণ, কদম্বপূর্ণ জীবন বাপনে আপতিত জানার না, তার মূল কারণ, মনের দেয়ালে হিসা, দেব ও স্বাধিপত্যরূপ মূল, কালি, আলকাতরা প্রলেপে রং গেছে লুপ্ত হ'য়ে, রং আর ধরে না। মৃতকল—ভাববোধের পরিচয়গত ক'রে জীবন্ত সত্য জীবন গতিত্বকে রূপায়িত করবার জ্ঞাত প্রকৃতির কড়া জাগিৎ।

বিধবানী বিপরীতগামী প্রগতি-প্রোতে গা তাসিয়ে, কল্পতরু যুগের মত ছুটেছে আজ দিগ্বিধিগ, জ্ঞানমুগ্ধ হ'য়ে। জানে না নিজেই মধ্যে সেই রূপ, রস, গন্ধে ভরপুর সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি;—সৌন্দর্যরূপ বিরাজমান। প্রকৃতিত্ব হলেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ প্রতিবিম্বিত হবে জয়ন্ত-দর্পণে। এ-হেন বিপর্যয়ে যদি জাতিকে জাগতে হয় তবে মনের ভিতর বাহির সকল মলিনতা দূর ক'রে বর্ণ বিকাশ করতে হবে। অজ্ঞানের বর্তমানে সর্বপ্রথম চাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো মেয়ামত। কাঠামোতে আছে কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রবৃন্দ।

তদানীন্তন বিজ্ঞাতীয় প্রাণহীন মানুষী নীতিবিধান,—কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গের অধীনে শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষকমণ্ডলীর অধীনে ছাত্রবৃন্দ। এটা পূরাপুরি মেনে চললেই শিষ্টাচার পালন করা হ'ল, ব্যতিক্রমে বিপরীত। কথাটা সন্ততই বটে, কিন্তু যদ্যেৎ স্বজাতীয় নীতি-সাম্য আত্মস্বের ঐতিহ্যবহন পরিবর্তে মনোবোধ-শূন্য কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাতীয় নীতিবৈষম্য হুতুম তামিল হুমকি আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও জাতিজগরণে অগ্রদূত সুরচিদম্পন্ন সৌন্দর্যের পূজারী ত্যাগিনী স্বদেবায় শিক্ষাব্রতী শিক্ষক এবং সৌন্দর্যের আধার অনাত্মাত পবিত্র স্বদয়-কুসুম আত্মবলিদানে দুর্গমিন্দ্র ছাত্রমনোবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্র তৈরী না করে দাসমনোবৃত্তি-সম্পন্ন মেকসুওহীন কুয় স্বদয়দৌর্বল্যে 'পাণ্ডিত্যের স্বাধীয়েবী প্রতিদ্বন্দ্বী' কেরাবী তৈরী করারানায় পরিণত করেছে।

চিত্র-শিল্পের গঠন-পরিচর্যায় ত্রিধারা সমর্থিত—হসুদ, নীল আর লাল মূল তিনটি বর্ণ, পোড় সাম্য পরিচয়ে স্বজাতীয় নীতির অর্থবোধ।

হলুৎ—এহ অর্থঃ কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গ; নীল,—শিরা উপশিরা অর্থঃ শিক্কমণ্ডল। লাল,—রক্তপ্রবাহ অর্থঃ ছাত্রবৃন্দ। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের ত্রিধার-সম্বন্ধিত প্রচেষ্টার মূলে শিল্পীর গঠনমূলক ক্রটিবোধের উৎস,—সর্বজনীন ভাবধারার সার্বজনীন অর্থবোধ ও বর্ণবোধে সার্বজনীন গ্রাম উন্নয়ন করা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাহ্যিক সত্য, একটি গোটা রাষ্ট্রের পক্ষেও তাহা অকাট্য সত্য।

সংবিধানে—রাষ্ট্রপরিচালকগণ,—বেহ, বঙ্গিগণ,—শিরা উপশিরা; সমগ্র দেশবাসী,—রক্তপ্রবাহ। এই রক্ত যদি দূষিত ও চূর্ণাল হয় তবে সুবৃহৎ হরকে বিজ্ঞাপনী অভয়বাণী ও নীতিবাণী শুনিয়া দেশবাসীকে বৃহৎ ও শান্ত রাধা সম্ভব নয়।

আজকের বর্তমানে যুগোপযোগী সার্বজনীন ভাবধারার জীবন-বিজ্ঞান শিক্ষার কোন কথার কি অর্থ, কোন বর্ণের কি রূপ-বর্ণনা তার বার্থ তাৎপর্য অমূল্যলন করে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। চিত্র-শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্য সবকিছুর কার্যকরী অর্থবোধ ও বর্ণবোধ একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য, কাব্য রচনার বার্থ অর্থ প্রযুক্ত না হলে জীবনের সহিত সম্পর্ক-রহিত হবে। চিত্রশিল্পে বর্ণব্যঞ্জনায় কোন বর্ণের কি গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি তাহা সম্যক জানা না থাকলে ব্যবহৃতক্ষেত্রে স্থাবিন সত্তার পরিবর্তে দাসমনোভাবপূর্ণ পরিবেশে শান্তির আসনে শ্রান্তি আসবে, শ্রান্তিতে অবসাদ এনে জড় করে ফেলবে। প্রয়োজন মনুষ্যোচিত সার্বজনীন চরিত্র গঠন। নিষ্ঠা সহকারে চিত্রশিল্প মাধ্যমে রূপ বর্ণনায় স্বরূপকে আঁকতে আঁকতে স্বভাব প্রকটিত হয়ে সার্বজনীন চরিত্র গঠিত হয়।

বিশিষ্টা রচিত, চিত্রিত বিচিত্রিত জগৎ সংসারে আমরা আত্মপরিজন, প্রতিবেশী সহ আবহমান বাস করে আসছি এবং নানা প্রচেষ্টার পরস্পর মিলিত হতে পারছি না। কেন না, পরস্পর পরস্পরকে সর্বোৎসাহে চিনি না বা জানি না বলে।

আজকের দিনে দেশজোড়া সার্বজনীন উৎসবের ছড়াছড়ি কিন্তু সার্বজনীনতার অর্থ করণে ব্যবহৃত হয়ে সর্বজনীনতার পর্যাবসিত হয়েছে। তবু আমরা গরীবান্, দুঃস্থান্। বলি কম কি না!

কোন উদ্বেগ সাধনের জন্য কার্য প্রারম্ভে বিশেষ আয়তনে কিছু সংযুক্ত ব্যক্তি সর্ববেত হয়ে বটে, কিন্তু অলতিবিলম্বে পরস্পর দেখা দেয় ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্বেগ পণ্ড করে। উদ্বেগ সিঁহিলাত করতে হলে সর্বজনতার গরমিলের কথা জুলে কোথায় আমাদের সাধারণ মিল ও মিলনসূত্রটি কি, তাহা জানবার জন্য আগ্রহী হতে হবে এবং স্বরূপ সত্তার সন্ধান করতে চাই চলার পথে বাধা-বিপত্তি দমনকারী চরিত্রের শিষ্টাচারপূর্ণ মনোভাব কাঠামো। আমরা সকলেই শিল্পী, সৌন্দর্যের উপাসক, একথা মরণ বাথতে হবে। আমরা যে বা কাজ করি তাহার ভিতর যে অঙ্গন ও বর্ণন বিধি আছে তাহা খুঁজে বাহির করতে হবে।

মাজিত ক্রটিবোধে কণ্ঠের বিষয়বস্তু ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে প্রাণবন্ত কোথায়। বাহ্যতে আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে, চিন্তায়, কল্পনায়, আচার-ব্যবহারে, আকার ও প্রকারে সত্তার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, সৌন্দর্য বিকাশ হয়, তাইই নম্রা দেখে পড়ে সেচেতন হয়ে পথ অতিক্রম করতে হবে।

জড়—চিত্তা, কার্য, ক্রিয়া অতিক্রম করতে না পারলে বসন্ত লাভ করা সম্ভব নয়। চারু চিত্রশিল্পে বর্ণবিধান জড় অতিক্রমণের পথে পূর্ণ সহায়তা করে ও সকল বৈষম্য দূরীকরণে সাহা প্রস্তুত করে। চিত্রচারিত্রে যে সমতা বা একত্ব তাহা মুক্তিপূর্ণ বর্ণবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিরহস্ত একই বর্ণবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই প্রকৃতিপুঞ্জে বিভিন্ন রূপ একককাতনে শান্ত সৌম্য প্রোশান্তমুখিতে বিরাজমান। সৌন্দর্য উপাসনায় মানব-জীবন-মূলে বর্ণবিধান উদ্ভব হলে বিজ্ঞান লাভ হবে। বিজ্ঞানময় জীবনে সৃষ্টির বিভিন্ন রহস্য বর্ণব্যঞ্জনায় একতান, সামান্যলন একত্রীভূত হয়ে সকল সমস্তা লয় প্রাপ্ত হবে।

"What is really essential to the modern conception of a state which is also a nation, is merely that the persons composing it should have, generally speaking, a consciousness of belonging to one another, of being members of one body, over and above what they derive from the fact of being under one government, so that if their government were destroyed by war or revolution, they would still tend to hold firmly together. When they have this consciousness, we regard them as forming a 'nation', whatever else they lack."

—Sidgwick

‘সিহ মশাই, সিহ মশাই’
মাংস যদি চাও।

রাজহাস খেতে দেব
হিংসা ভুলে যাও।”

আমার জীবনে সিহ শব্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, একেবারে ছোট কালে হাসিখুসী ছড়াছড়ির পাতায় অল্পবয়স (২) শিশুর সময়। তখন সুর করে বুধ্ব করেছি, সিহ বা হিংসা কোনটিকেই ভাল করে বুঝি নাই। গ্রামের পাড়ার রাম বাবুর বাড়ীতে দুর্গা-পূজার, আর বৌদ্ধ দাসের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় সিহের বাটির মূর্তি দেখেই ভিনতে পেরেছিলাম যে ওগুলি সংই সিহ। পরে সার্কাস পার্টি এলো, বাবার জামার কোণ লুপ্ত করে ঘরে গেল গালাবীর উপর থেকে আকিত-খাওরানো নিমন্ত্রণ সিহের খেলা দেখে তৃপ্ত হতে পারিনি, যেমন তৃপ্ত হ’তে পারিনি কুমলগরের কুমোরদের তৈরী আলমারী সাজানো সিহ দেখে। আলীপুরের ডিড্ডাখানার সিহ দেখেছি, সেও ঐ সার্কাসের আর আলমারী সাজানো সিহেরই রূপান্তর। একটি সামান্য নড়াচড়া করে, অপরটি পাখরের মত নিশ্চল—বেশ দেখেছি রাজবাটার বৈঠকখানার ‘ষ্টাককরা’ সিহ বা পুরীর মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পাখরের তৈরী সিহ। নড়াচড়া না করলে, না ডাকলে, সেটা সিহ হ’ল কেমন করে! তাই বলে কলিকাতা নিউ এম্পায়ারে আমার ইন্ডিয়ান প্রদর্শনীতে (Lady and the Lion খেলাতে) যে সিহ দেখানো হয়েছিল সেটাও আসল সিহ নয়, বরই ভাতুক আর নড়াচড়া করুক না কেন। হিংস না হলে মন তাকে সিহ বলে মানতে রাজী নয়। রাজভোগ খাবার লোভে হিংসা ভুলে গেলে সে সিহের সিংহব থাকে না। আবার শুষ্ক মৈষের উপর নির্ভর করে থাকেও কানুকৃত্যের লক্ষণ। উত্তরাঙ্গী পুরুষসিহই লক্ষ্যক লাভ করতে পারে। বীণাবান, পৌরুষবস্পর লোকেরাই সিহ উপাধি পায়। বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্রকে লোক খুবসিহ বলে করতো, ইলানী কালে সর্দার প্যাটেল সিহ বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

সিহ কথাটাই শক্তিমত্তার পরিচায়ক। অনেক দিন আগে মালয়ের জঙ্গলের প্রান্তে এক ছোট বীপ দখল করতে গিয়ে ইংরেজ-সৈন্যরা বেশ প্রথম প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল—তাই বীপ দখল করে মার দিয়েছিল City of the Lions সিহপুর, আর বা’ সিঙ্গাপুর নামে পরিচিত। ভারপর থেকেই ঐ সিহপুর (সিঙ্গাপুর) ব্রিটিশসিহেরও প্রবল প্রতিরক্ষা-বাটিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজরা ক্ষুদ্র বীপের অধিবাসী হয়েও, পৌর্য-বীৰ্য্যে পৃথিবীতে নৃতম বেকর্ড স্থাপন করেন, তাঁদের রাজঘরে দূর্য্য অস্ত্র ব্যয় নি। কাজেই তাঁদের প্রতীক চিহ্ন ‘সিহ’ বখাবোগাই বলা চলে।

আমরা আফ্রিকাত এসে সত্যিকারের সিহের চাক্ষু্য পরিচয় পেরেছি। আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ, এ দেশের রাজা শুধু ব্রিটিশসিহ নয়—লজ্জাকায়র জঙ্গলের রাজা পিঙ্গলজটাগারী গণরাজ সিহ। আফ্রিকার জঙ্গল আর আফ্রিকার সিহ তাই আজ অপূরণহীন। অনেক সন্দের মনে হয়—এই গভীর বনভূমিতে কত রকম জন্তু-জানোয়ার আছে। হাতী, গণ্ডার, জলহাতী, ঝং, আরও কত শত গজ বাসে অদ্বৈতম সিহের চাইতেও অলসক বড়, বাসের গায়ের শক্তি সিহের চাইতেও বেশী, কাজেই আদিম নীতি

আফ্রিকার সিংহ

যাহুসন্ডাট সি, সি, সরকার

‘জোর বার হুলুক তার’ অল্পবয়সী এই রাজ্যের অধিবর্তা সিহ অপেক্ষা হাতী, গণ্ডারেরই হওয়া উচিত ছিল। ‘জোর বার হুলুক তার’ নীতি আদিমকালের হলেও, বর্তমানের সত্য সুসঙ্গত বিংশ শতাব্দীতেও তার পরিবর্তন দেখছি কোথায়? নইলে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মারাত্মক অন্তর্গত তৈরীর জন্য এক ঘটা কেন? নরবাতী বোমা কাটানোর আতঙ্কযাতী প্রতিবোধগিতা হচ্ছে কেন চারদিকে? যদি গায়ের জোরই পৃথিবীতে বড় কথা হ’ত তবে আজ জঙ্গলের রাজা হ’ত ঐ হাতী অথবা গণ্ডার। যদি বুদ্ধি বা কৌশলই শ্রেষ্ঠত্বের মান নির্দেশ করতো তবে জঙ্গলের রাজা হত বানর, শূগাল বা কাক। যদি তুরতাই এর মানকাটি হত তবে জঙ্গলের রাজা হ’ত আজ বিঘর গোখুরা লাগ বা অলপার।

হিংস্রতাই যদি প্রাধান্যের মানকাটি হত তবে ঘাঘ বা বনমন্দিরই ঐ স্থান অধিকার করতো। ব্রাহ্মণখেলোটা বিষামিহ লত চোটা করবেও বশিষ্ঠের নিকট স্বীকৃতি পান নাই,— তাঁর পৌর্য-বীৰ্য্য দেখিয়েও কোন বল হয় নাই—কিন্তু সর্বশেষে ক্রমাগত প্রমাণিত করে তিনি ‘ব্রাহ্মণ’ নামে স্বীকৃতি পান। ‘কীতের বদলে দাঁত নেব’ এটাই বড় কথা নয়। ক্রমাগত চাই। শক্তিমত্তা বহন অশেষ ক্ষমতালালী হয়েও ক্রমাগতের অধিকারী হয়, তার বিচার করে, দুর্বলদের বন্ধ ও অন্ত্যের প্রতিরোধ করে, তখনই সে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায়। ভারতের নীতিশাস্ত্রেও সেইরূপ উল্লেখ আছে। দুই পক্ষ অসি-বুদ্ধ করা কালে হঠাৎ এক পক্ষের অন্ত ভেঙ্গে গেলে তাকে অল্পরূপ নৃতম অন্ত না দেওয়া পর্যন্ত বুদ্ধ স্থপিত রাখাই হ’ল ভারতীয় নীতির লক্ষণ। মিজিত লোককে ছুরিকাঘাত করা, বিশ্বাস্য দিয়া বুদ্ধ করা, আর্থিক বোমা দিয়া সারা জগৎকে উজাড় করে দেওয়া, এটা আধুনিক কালের ব্যাপার। পিতাকে বন্দী করে, ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ, লক্ষ্যপক্ষের উৎকোচ নিয়ে আমবাগানে নিজের নবাবকে বিশ্বাসঘাতকতা করা এটা ভারতে ঘটলেও অভ্যর্থনীয় ঘটনা। আজকালের বুদ্ধে অসি অপেক্ষা মসীই বেশী চলেছে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ে এই নীতিজ্ঞানের অভাবই চকুতে পড়ে বেশী।

জঙ্গলের রাজঘে সিহ গণরাজ। তার বেমন গায়ের জোর





সত্যিকার Lions' Club-এতে সভ্য হতে চান দিতে হবে
না। প্রাণ দিলেই যথেষ্ট।

আছে—হিংস্র আছে—সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত আছে। দু'ধা নিরস্ত্র
জন্তু সিংহ জঙ্গলের পশু শিকার করে। সে কখনও দুর্বল
ছাগল হত্যা করে না—তার ক্ষমিত্বের জন্তু হত্যা দরকার তার
চাইতে বেশী হত্যা করে না। বাঘ যদি একটা হরিণ খায় সে দশটা
হরিণ মারতে ঘিষা করে না—পাইকারী ভাবে নিরপরাধ হত্যা
শক্তিমান ব্যাজকে সমাজে উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করেছে। “কাজের
সময় কাজে কাজ ফুরালে পাজী”—বা উপকারীকে খেয়ে নিয়ে
বাঘ জঙ্গলে দুর্নাম রটিয়েছে। সিংহ উপকারীকে ভোলে না।
জঙ্গলের হাতীও তার প্রবল দৃতিশক্তির জন্তু প্রাণি—কিন্তু এই
ছুইয়ের এই মনে রাখা ব্যাপারে অনেক স্বর্ণ-মর্ত্য পার্থক্য আছে।
সিংহ তার বন্ধুকে ভুলে না, আর হাতী তার শত্রুকে ভুলে না।
জঙ্গলের ইতিহাস নিলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

একবার একদল শিকারী জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে
একটা হাতীকে গুলী করে,—হাতীটা গুলীবিক হয়ে গভীর
জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অনেক বছর পর শিকারীদল আবার
বধন জঙ্গলে আসে তখন ঐ হাতীটা তার সেই পূর্বস্বিকার
গুলীকর শত্রুটিকে চিনতে পেয়ে দৌড়ে এসে তাকে তড়ি
দিয়ে ধরে পায়ে মাড়িয়ে হত্যা করে চলে যায়। হাতী
কখনও ভুলে না Elephant Never Forgets কথাটা



সিংহ-মহিবীর আহারের নিয়ম, স্বামী কোথায়
রাজকাৰ্য্যে গিয়েছেন

প্রবাদে পরিণত হয়েছে। সিংহের সখ্যেও তেমনি গল্প আছে—
সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল, জঙ্গলের লোক এণ্ড্রুসিস সেটা গুলে
দিয়ে যে উপকার করেছিল সিংহ তা ভুলে যায়নি। উপকারীকে
ভুলে যাওয়া রাজোচিত গুণ নয়! বহু বৎসর পর পিঞ্জরাবদ্ধ হিশ
ঐ সিংহের বাঁচাতে এণ্ড্রুসিসকে হত্যার জন্তু পাঠিয়ে দিলে সিংহ
সেই উপকারী বন্ধুকে স্বীকৃতি দিয়ে তার পশুরাজ আধার সমাক
পরিচয় দিয়েছিল। সবলের পক্ষে ক্ষমাগুণ সর্বাগ্রে প্রযোজ্য।
হাতে বন্ধু আছে—যাকে তাকে গুলী করলাম। তোমাদেখার
জন্তু ঢিল ছুড়লাম কিন্তু ভেকের দল ভাতে প্রাণ দিল—এটা অস্বাভাবিক।
তোমাদের প্রবল অন্তঃপ্রাণ আছে—তোমরা বোমা কাটিয়ে পৃথিবীর
আকাশ বিধাক্ত করবে কেন? আমরা নির্দোষ নিরীহরা দলে দলে
মরবো কেন? এই পৃথিবী সকলের সমান—আমাদের বৃদ্ধ,
আমাদের গাফী সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।

সিংহ জঙ্গলের প্রাণী কিন্তু আমাদের মানবের সমাজ-জীবনের
সঙ্গে এদেরও অনেক মিল আছে। বাড়িতে কর্তা বাজার করে
আনেন, আর গিন্নী তাকে রান্না করে খাবার তৈরী করে পরিবেশন
করেন। বাড়ির কর্তা না খেলে গিন্নী তা খান না। জঙ্গলের
শিকার যেমন হরিণ, জেব্রা বা জিরাফ বা মহিষ তাড়া করে আলাদা
করে বের করে এগিয়ে নিয়ে আসে পুরুষ-সিংহ। আড়ালে লুকিয়ে
থেকে সিংহী তা দেখতে থাকে, পরে স্ত্রীবাগ বুকে স্বহস্তে সেটিকে
বধ করে। সিংহী নিজে বধ করলেও সিংহ মশাই নিজে না
খাওয়া পর্যন্ত সে উহা লম্পা করে না। সিংহ খেয়ে গেলে তারপর
সিংহীরা দল বেধে খেতে আরম্ভ করে। এক পুরুষ-সিংহের এক
বা একাধিক স্ত্রী-সিংহ থাকতে দেখা গেছে। বড় বড় লোবনের
যেমন মোসাহেব থাকে, আজ-কাল যাদেরক ‘স্ট্রাটোলাইট’ বললে
সহজে বুঝা যায়। সিংহদের ‘স্ট্রাটোলাইট’ হ’ল শৃগালদল
(black-backed jackals) সিংহ-সিংহী উদরপূতি করে খেয়ে
বধন দূরে বিশ্রাম নিতে যায়—তখন ঐ উজ্জিষ্টভোজী মোসাহেব-
দলের আবির্ভাব হয়। অস্ত্রের কটাঙ্কিত খাণ্ডের উত্তীর্ণ আলয়ে
তখন ঐ শৃগালদলের মধ্যে মারামারি বাধে। গালভন্দলও এসে
হাঙ্গির হয় ঐ খাবার টেবিল পরিষ্কার করতে—তার হাড়-গাড়
পরিষ্কার করে দিয়ে দল বেধে চলে যায়। সত্যিই শকুনিয়া গুপের
বাকী অংশ, গলিত দৃষিত, দুর্গন্ধময় সব অংশ খেয়ে পরিষ্কার করে
দিয়ে সমাজের খালডের কাজ করে যায়।

আফ্রিকাতে প্রায়ই কালমাথা শকুনি (griffon vulture)
এবং এক জাতীয় সারস (Marabau stork)কে এই
খালডের কাজ করতে দেখা যায়। পুরুষ-সিংহ সাধারণতঃ
লম্বায় (নাকের থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত) নয় ফুট হয়
এবং এদের দেহের ওজন হয় ৩০০ থেকে ৫০০ পাউণ্ড। স্ত্রী-
সিংহ লম্বায় ফুটখানেক ছোট হয়। পুরুষ-সিংহের গলায় বড় বড়
কেশর থাকে, বার জন্তু তার জন্তু নাম ‘কেশরী’। স্ত্রীসিংহ দেখতে
বাতের মত। তবে জঙ্গলবাসে পুরুষ-সিংহেরও কেশর থাকে
না—তৃতীয় বৎসরে কেশর জন্মাতে আরম্ভ হয় আর ৫৬
বছর বয়সে সেগুলি বড় হতে থাকে। সিংহী দেখতে বাঘের
মত হলেও বাঘের পায়ে জেব্রার মত ডোঁহাকাটা থাকে
অথবা ফুল-ফুল ছাপ থাকে কিন্তু সিংহীরা গা সমস্তটা ধূসরবর্ণ

রকম। সিংহ-শিকার গায়ে কিছু বাঘের গায়ে মত ভোর-ভাটা ছাপ থাকে। প্রাপিত্ত্ববিদগণ বলেন যে, ঐ দাগ বড় হলে মূলিয়ে যায়। কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা আসলে দুর্বলপুষ্পে একই প্রকৃতিভুক্ত ছিল। সিংহীরা দুই বৎসরে একবার গরে সন্তান প্রসব করে এবং দুটি থেকে চারটি করে বাচ্চা একসঙ্গে জন্মায়। জন্তাঙ্ক জন্ত-জানোয়ারের তুলনায় এদের জন্মসংখ্যা খুবই কম—এরা ভগবানের নিয়মেই ‘পরিবার পরিবর্তন’ করে নিচ্ছে, দাইন করতে হয়নি।

প্রসংগতঃ এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে সিংহ কি মানুষ খায় না? জিম কোরবেট তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে (The Man-eaters of Kumaon) লিখেছেন—“হিসাব করে দেখা গেছে যে দশটি বাঘের নয়টি বাঘ নরখাদক হয়েছে আবার পেয়ে, আর দশমটি হয়েছে বৃদ্ধ হয়ে।” সিংহের বেলাতেও তাই হয়ত শিকারীর গুলী, সজ্জার কাঁটা, হরিণের বা বনমহিষের শিং-এ আঘাত পেয়ে সিংহ তার স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্বপরতা হারিয়ে ফেলেছে নতুবা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, নিজের গৌরবময় বলবান ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে, দাঁত ক্ষয়ে গেছে—তখন সে মানুষ খেতে আরম্ভ করে। বেউ কেউ মনে করেন, হঠাৎ মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ, চিতাবাঘ ও সিংহ নরখাদক হয়ে উঠে। কোরবেট সাহেব লিখেছেন যে, নরখাদক বাঘ বা সিংহরা পুরুষায়ুক্রমিক ভাবে নরখাদক হয় না। বাবা-মা মানুষ খেয়েছে, ছোটবেলায় তার সন্তানরাও সঙ্গে সঙ্গে নরখাদক ভোজন করেছে—কিন্তু উত্তরকালে ঐ সব সিংহকে কখনও নরখাদক খেতে দেখা যায়নি—এমন প্রমাণ অসম্ভব আছে। মোট কথা সিংহ দুর্বলকে হত্যা করে নিজের মর্যাদা নষ্ট করতে চায় না। সে সমুখ যুদ্ধ করে জেতা জিরাফ বনমহিষ হত্যা করে, তাকে উদ্ধ



জঙ্গলের বৈকুণ্ঠানার ছবিটা সিংহ আরাম করছে

করে হত্যা করে। বাঘের মত পেছন থেকে পালিয়ে অন্তর্ভুক্ত আক্রমণ করে হত্যা করে না। সেদিন দুই জন লোক সাইকেলে আসার পথে হঠাৎ সিংহের সঙ্গে খান্ধা খায়। ভয়ে দুজনেই সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সিংহের মুখের সামনে বৃত্তার জন্ত প্রস্তুত হয়ে বিমর্ষমুখে নীচ হয়ে বসে থাকে। সিংহ ঐ নিরীহ বিপদগ্রস্ত মানবদেহীর প্রতি অমূল্য প্রদর্শন করলো। তাদেরকে কিছু না বলেই চলে গেল—দুর্বল, নিরস্ত, আশ্রয়প্রার্থী, অনস্বাদকে অভয় দিয়ে রক্ষা করে সিংহ তার রাজ্যচিহ্ন গুণ প্রকাশ করলো। আফ্রিকাতে সব সিংহই কি প্রজাদের প্রতি রাজকর্ভব্য, রাজ্যচিহ্ন জায়গিষ্ঠি তাই পালন করছে? নইলে সেখানে এত চাঞ্চল্য কেন?

বৈশালী

শ্রীমদ্রোহনাথ রায়চৌধুরী

তিন হাজার বছরের আগের কথা। নৃধ্বংস ইক্ষাকু নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর রাণী ছিলেন অলম্বা। ঐরই গর্ভে বিশাল নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মে। এই রাজা বিশালই ছিলেন বহুবিশ্রুত বৈশালীর প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণে আবার এই নগরী বিশাল ও বিশালা নামেও অভিহিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবত অষ্টমায়ে মহারাজা বিশাল কিন্তু ইক্ষাকুর পুত্র ছিলেন না। ইক্ষাকুর ভাই দিষ্টের ২১তম বংশজ রাজা তুণবিল্লের পুত্র ছিলেন তিনি। ভাগবতেও বিশালরাজের মাতার নাম ‘অলম্বা’ রূপে বর্ণিত হয়েছে। ইনি ছিলেন বিষ্ণুপূরণ মতে পরমা সুন্দরী অপ্সরা। শতপথ ব্রাহ্মণ অবস্থানে জানা যায়, সরস্বতী-তটবাসী বিদেহ মিথি নামে এক রাজা ছিলেন। গৌতমরহস্যগণ তাঁর পুত্রোচিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন দেব বৈশ্বানরের জন্ত। কোনো এক দিন এঁরা বৈশ্বানরের অমৃতসরগ করতে করতে সদানীর নদীর তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। বৈশ্বানর অবস্থান করার রাজা মিথিও সদানীর তীরে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা যেখানে বসবাস করতে লাগলেন, সে ছিল সদানীর পূর্ণশায়। সেই থেকে ঐ দেশের নাম হল বিদেহ অথবা মিথিলা। কালক্রমে

এই স্থান পূর্ব ও পশ্চিম-মিথিলার বিভক্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণযুগের এই মিথিলার পশ্চিম অংশই পরে বৈশালী নামে খ্যাত হয়েছিল; আর বৈদিক যুগের সদানীর নদীই বর্তমানে গণ্ডকী নাম ধারণ করেছে। রাজা বিশালের প্রতিষ্ঠিত বলে এই নগরকে ‘রাজা বিশাল-কাগড়’ও বলা হত।

বরাহ, মার্কণ্ডেয়, নারায়ণ পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভগবত ও রামায়ণে বৈশালীর প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথা লিপিবদ্ধ আছে। রামায়ণের আদিকণ্ডে দেখা যায়, দেব ও দানবেরা ক্ষীরসমুদ্র মনন করবার জন্ত এখানে বসে মন্ত্রণা করেছিলেন। তা’ ছাড়া দানবমাতা তেজস্বিনী দিতি আপন পুত্রদের নিঃশঙ্ক করবার জন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের বধোপযোগী পুত্র কামনার ঘোর তপস্তা করেছিলেন। আর তাঁর তপস্তার স্থান ছিল শ্রাম-নিকুঞ্জের পরম-রমণীয় এই বৈশালী। অবশ্য ইন্দ্রের চাতুরীতে দিতির তপস্তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

রামায়ণ অষ্টমায়ে রাজা বিশাল হস্তে বংশাধিকারিক দশম এবং শ্রীমদ্ভগবত অষ্টমায়ে লণ্ডন দুগতি ছিলেন স্মৃতি। ইনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক। মহারাজ দশরথের অত্মমতি নিয়ে

মহাবলি বিশ্বামিত্র বধন বজ্রদামকারী বাক্সদের নিধন করে শ্রীম-
লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার (জনকপুরে) বাইতেছিলেন, সেই সময়
শ্ববির তাঁদেরকে অনেক নদীর নিখুঁত পরিচয় দিয়েছিলেন।
তিনিই ছিলেন, গঙ্গা, যমুনা, শোণ ও কৌশিকী নদীর কথা। শ্ববির
বর্তমান হাকীপুরের নিকট গঙ্গার নৌকা চড়ে পার হয়ে বর্তমান
রামচৌড়া নামক স্থানে অবতরণ করেন। আর এর ঠিক পাশেই
গণ্ডকী নদী গঙ্গাকে মিলিত হচ্ছে। এই গণ্ডকী নদীর তটোপরে
ভাঁড় দেখতে পেয়েছিলেন বৈশালীর অজ্ঞেয়ী স্রম্য সৌধরাজি।
বৈশালীর দৃষ্ট দেখে তিনি দৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যে
নদীতটোপরে এই প্রাচীন বৈশালী বিরাজিত ছিল তাঁর কথা
রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেননি আর শ্ববিও অনেক নদীর পরিচয়
দিয়েছিলেন কিন্তু গণ্ডকী নদীর নাম পর্যন্ত করেননি। ইহা ইহঁতে
অনেকে অনুমান করেন, হয়তো তখন গণ্ডকী নামের উৎপত্তি হয়নি।
শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে অবশ্য ইহা জানা যায় যে, সঙ্গারী নদী
কৌশল ও বিদেহকে আলাদা করছে আবার রামায়ণ প্রভৃতি
কাব্যে সযথ্যে কৌশলরাজ্যের পূর্বসীমা বলা হয়েছে। এর
দ্বারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ বেবর অনুমান করেন যে বর্তমানের সয
অথবা গণ্ডকীই প্রাচীন কালের সঙ্গারী। এই নদীর বিস্তার
ছিল ৭০-৮০ মাইল।

বিশালনগরের পূর্বে ছিল পূর্ব-বিদেহ আর পশ্চিমে ছিল পশ্চিম-
বিদেহ ও কৌশলরাজ্য—এই উভয় রাজ্যই ছিল বৈদিক-সভ্যতার
কেন্দ্রস্থল। আর বৈশালী এদের মাঝখানে অবস্থিত থাকায়
অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। আর তাছাড়া তিনটি
রাজ্যেই একই ইক্ষাকুবংশের রাজারা স্বায়ত্ত্ব করতেন। সেই সময়
বৈশালীর রাজা ছিলেন স্রমতি। শ্ববি বিশ্বামিত্রের উদ্ভৃতি হতে
জানা যায়, বৈশালীর সকল রাজাই নীর্ণায়, মহাত্মা, নীর্ণবান ও
সুধামিক ছিলেন।

প্রাচীন যুগের বৈশালীকে কেন্দ্র করে কতকগুলি পুরাণ-কাহিনী
আজও অস্তিত্ব হয়ে আছে। এই স্থান কাম্যাক্ষম নামে খ্যাত ছিল।
আজ হতে চার হাজার বছর পূর্বে শিব-দুর্গার এই মিলনক্ষেত্রে মদন
ভরীভূত হয়েছিলেন। এই স্থানই ছিল দ্বিতীয় পুত্র মকন্তের
জন্মস্থান। এই মকন্ত ও অজ্ঞানদের দ্বারা মনস পর্বতকে দগ্ধ করে
পূর্বদাগর মদন করা হয়েছিল। গঙ্গা ও গণ্ডকী সময়ে অবস্থিত
বৈশালীকেই পৌরাণিক “গজকঙ্কশের” বৃদ্ধকেন্দ্র বলে বর্ণনা করা
হয়েছে।

অজি হতে খৃ-পূ- ২০০০ বছর পূর্বে হহেম-জো-নরোর সভ্যতার
শেষভাগে অথবা প্রাক-আর্য সভ্যতার সময় উত্তর-ভারতের এক
কিটি অংশ কোনো রাজাদের দ্বারা শাসিত হত না। বস্তুতঃ
নির্বাচিত মহুয়াই তখন দেশ শাসন করতেন। খৃ-পূ- ২০০০—
২১০০ শতাব্দীর মধ্যে ৬ জন মহুর বিবরণ পাওয়া যায়। আবার
সকল মহুই একই বংশোদ্ভূত ছিলেন। পুরাণ অনুসারে বলা চলে,
মহু তাদের পরিবারের সময় ও ঘটনার কথা বৈশালীকেই কেন্দ্র

করে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। আদিপিতা মহুর পরে রাজা
নাভাগের বংশধরেরা রাজত্ব করতে থাকেন সমগ্র উত্তর-ভারতে।
আর এঁদের বিশিষ্টতম বংশজ রাজা তৃণবিনের পুত্র অলমুখা নামক
অস্পার্য পর্বতজাত রাজা বিশালই ছিলেন এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।
বা’ হোক, এই স্থানে মহুদের যে সব কাহিনী ছাড়িয়ে আছে তাদে
আলোচনা করা হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আদিমহুর প্রপৌত্র ছিলেন বিশ্বাত রাজা উত্তানপাদ। এঁর
দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে উত্তম নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁর মাঝে
বান্দবরা পরিবারের বেহুলায় বিবাহ হয়। এই বেহুলা ছিলেন
অসামান্য সুন্দরী। মহারাজ উত্তম তাঁকে খুবই ভালবাসতেন কিন্তু
বেহুলায় স্বামীর প্রতি কোনো অসুযোগ ছিল না। কল মহারাজ
তাঁকে নির্বাসিত করেন। এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। বিশাল
নগরে অশ্বখন নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর স্ত্রীকে বলাকা
নামে এক বাক্স চুরি করে নিয়ে যায়। তখন তাঁর মুক্তি
আপার ব্রাহ্মণ মহারাজ উত্তমের দায়িত্ব হলেন। বলাকার কল
হতে মহারাজ বাহুবলে ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করলেন। বলাকা তাঁর
বীর্যে দৃষ্ট হয়ে বহুদূর স্থাপন করেন। আবার ঠিক এই সময়ই
নির্বাসিতা রাণী বেহুলা ও পাভালের নাগরাজ কপতকের দ্বারা
হত্যা হলেন। রাণীর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, তাই নাগরাজের কল
নন্দা তার দায়ের মঙ্গলার্থে রাণীকে লুকিয়ে রেখে নিজে বোবার
ভাগ করে বইল। এই সবাদ পেয়ে উত্তম অবিলম্বে বহু বলাকার
সাহায্যে পাভাল হতে বেহুলাকে উদ্ধার করলেন। এর পর হতে
উত্তমের মনের সুখে বাস করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে
এঁদের এক পরমসুন্দর পুত্র জন্মে—তিনি পৌরাণিক ইতিহাসে
দ্বিতীয় মহু নামে খ্যাত।

মহারাজ উত্তানপাদের দ্বারা এই বংশ আরও একজন রাজা
ছিলেন, তাঁর রাণীর নাম ছিল গিরিভদ্রা। আনন্দ নামে তাঁদের
এক পুত্র জন্মে। এই আনন্দই বর্ত্ত মহুরূপে পরিচিত। উগ্ররাজ-
কথা বিবর্তার গর্ভে উক নামে তাঁর এক পুত্র জন্মে। অসামি
প্রখ্যাত রাজারা ছিল তাঁর পরবর্তী বংশধর। এইরূপে প্রথম
মহুর কয়েক পুরুষের মধ্যে শ্ববত এবং তাঁর পুত্র ভরত রাজত্ব করেন।
শ্ববত হিমবর্ষের রাজা ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে ভরতকে
রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর প্রধান আশ্রম
ছিল বৈশালীর উপরে গণ্ডকী নদীর তীরে। সেই স্থানটির নাম
ছিল শালগ্রাম। মহারাজ ভরতও বধ্যাসদরে পুত্র স্রমতিক
রাজ্য দিয়ে এই আশ্রমে সন্ন্যাস-জীবন অতিবাহিত করেন।
পুরাণযুগের এই সব স্মৃতিকথা আজও তাকে অমর করে
রেখেছে।*

* বাস্তবিক রামায়ণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, মার্কণ্ডেয়,
শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, ডাঃ এস. সি. সরকার এবং রাহুল
সংকৃত্যায়নাদি প্রবন্ধ ও পুস্তক।

“কি সামাজিক, কি আধ্যাতিক, কি রাজনীতিক—সকল ক্ষেত্রেই স্বার্থ
ফল স্থাপনের একটাই পদ্ধতি বিস্তারিত—সে পদ্ধতিই এইটুকু জ্ঞান
যায় যে ‘আমি ও আমার ভাই এক।’” —স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাণাজ্জলি

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যান্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

যীশুখৃষ্ট ও নবযুগ

আমার সমগ্র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিন এল, যেদিন শেষ পর্যন্ত কেম্ব্রিজ মিশন প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করব বলে আমি মন স্থির করলাম। স্থির করলাম, কোনো বিশেষ অধীনে নির্দিষ্ট ধর্মব্রাজকবৃত্তি আর আমি করব না, জীবন-তরঙ্গকে অন্ত্যস্ত সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব বৃহত্তর ও মহত্তর পৃথিবীর সন্ধানে। বৈধবীন হঠকারিতার সঙ্গে এই পন্থা আমি বেছে নিইনি। মানসিক অস্থিরতা ও সংশয়ের মধ্যে বহু বৎসর কেটেছে। সমুদ্রে অগ্রসর হয়েও শারীরিক কারণে আমি নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে পশাদপদ হয়েছি। কিন্তু হ্রদতটে আমার জীবন-প্রভুর সেই প্রভাব মুহূর্তের ডাক বারে বারে আমার কানে বেজেছে,—প্রাণের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে সেই আহ্বান, চলো চলো, অগ্রসরগণ করো আমাকে। শেষ পর্যন্ত সাদা দিয়েছি সেই আহ্বান।

আমার জীবনের এই পরিবর্তন সামান্য একটা ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনার বিবরণ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তার পূর্বে বহুদিন আমার অন্তরের অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে আমি কাটিয়েছি, সিদ্ধান্ত এবং শাসনের দোলায় তুলেছি, ততোদিন আমার শব্দ যীশুখৃষ্টের যে মূর্তি আমার অন্তর-নরপণে অহরহ প্রতিকলিত হয়েছে, সেই মূর্তির পরিচয় আমি দিতে চাই। খৃষ্টর এই প্রতিকৃতির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আলবার্ট হুইটবার্ণের গ্রন্থে স্পষ্টরূপে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি আমার নিজেরই দেখা। সেই মূর্তি আমার অন্তর্ভূতির সামনে উজ্জাসিত হয়েছিল, সেই মূর্তির বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে কোন পথে আমি চলেছিলাম, কেন নিরাপদ আশ্রয়কে পরিভ্রমণ করে অপরিচয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, কে আমাকে জীবনের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যকর গ্রন্থের নির্দেশ দিয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর বধন আমি দিল্লীতে ছিলাম, তখন দেখিছি এই ভারতবর্ষের চেহারা ঠিক বেন উনিশ শতাব্দী পূর্বকার রোমক সাম্রাজ্যের মতো। বাহিরে এক বিরাট নিশিদ্ধ সাম্রাজ্যবাহী শক্তি, অস্থিরতার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না সেই কঠোর শক্তির রাজত্ব। কিন্তু এই শক্তি নিতান্ত বাহ্যিক। মাটির নিচে আগ্নেয়গিরির গল্লরে যেমন লাভা-প্রবাহ কোটে, তেমনি এই শক্তির গোপন কন্দরে এক মহা অশান্ত অস্তরঙ্গা জীবন প্রবাহে

উৎসর্গ করে ফুটছে, কোথাও কোথাও মাটি কেটে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে ছুরত্ব আবেগে। লোকমুখে এর নাম জাতীর আন্দোলন,—কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই আন্দোলনের শক্তি ও বিস্তার নিতান্ত আন্দোলনের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আমি স্থির হয়েছিলাম, এক বিরাট মহাদেশব্যাপী মানবসমাজ এক অন্তর্গত সাধনার আবেগে মগ্নিত হচ্ছে, সে সাধনা নূতন রূপে নূতন ধারার আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা।

মানবতার এই আত্মসম্মানের নিগূঢ় আবেগ বাইবেলের আভ্যন্তরে সুস্পষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্বের নিরাবরণ অন্ধকার বিশৃঙ্খলার রাজ্যে পরমাত্মার অনন্ত স্বকীয় শক্তির কী অনির্বচনীয় প্রকাশ! 'সেই চরিত্রবিশীন অন্ধকার-সমুদ্রে পরমেশ্বরের স্পর্শ জাগল, ঈশ্বর বললেন, আলোকের জন্ম হোক। আলোকের জন্ম হোলো।'

রোম সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শক্তি ও শৃঙ্খলার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু গ্যালিলিও সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে তখন বিক্ষোভের নিগূঢ় আবেগে স্পন্দিত হচ্ছিল। সেই সময়ে খৃষ্টের আবির্ভাব হোলো। মানব-সমাজের এই অন্তর্বিপ্লব গ্যালিলিতে ধর্মের পথে অগ্রগতি খুঁজে পেল। ভাঙ্গারেলের তরুণ হৃদয়ের বীণা তাঁর গভীর অন্তর্ভূতি মেলে মানবমনের এই বিশাল উন্মেষন প্রত্যক্ষ করলেন, লক্ষ্য করলেন সমাজের মধ্যে নব নব শক্তির সত্তা জাগরণ। অকুতোভয়ে তিনি বাঁপিয়ে পড়লেন সেই বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে—সেই আন্দোলনকে পরিচালনা করলেন ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে।

বীণা একলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন জননেতা, নিঃসঙ্গ পথিক নন। ঈশ্বররাজ্যের ঘোষণা তখনই ধ্বনিত হয়েছিল আত্মমানবের অন্তর-অন্ধকারে। ঈশ্বর আসবেন, যুগে যুগে মানবাত্মার বিপক্ষে তিনি যেমন এসেছেন, উদ্ধার করেছেন হৃদয়কে, তেমনি আবার তিনি আসবেন। গ্যালিলির দিকে দিগন্তের পথে প্রান্তরে সর্বমুখের মন এই আশার উন্মুগ্ন হয়েছিল। হাটের পথে বা সন্ধ্যা সভায় গ্রামের চাষাবাড় এই আশার কথা আলোচনা করত।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বাঁপিয়ে পড়ছিলেন বীণা। এক বিপুল যুগমোটের অবতারণা করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন উৎসব

প্রাণের সেই মহা স্রবণবাহু—তিনি আসছেন, যুক্তির আর বিলম্ব নেই। ডাক দিয়েছিলেন তিনি অজ্ঞাত নিবীড়িত সাধারণ মানুষকে। প্রাণের কৃৎসন আর ক্রুরের দীর্ঘরসের মধ্য থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর তরুণ শিষ্যগোষ্ঠী। বীণা ছিলেন সমর্থ যুগা, তাঁর শিষ্যরাও ছিলেন বলিষ্ঠ তরুণ, পরিভ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। মনুষ্যস্বরূপ কর্তব্য করবে তারা, তারা হবে—মহাভাগ্যাঙ্গণবির নিঃশব্দ দীঘর।

কুরু হোলো বীণার অভিধান। অন্ধ পেল দৃষ্টি, যোগী পেল পরিজ্ঞাপ। অবমানিত দরিদ্রের কানে ধ্বনিত হোলো যুক্তির মহাধ্বনি। ঈশ্বরের নবরাজ্যের স্বর্গসিংহাসর ঐ বৃষ্টি দেখা যায়!

ঐ বৃষ্টি নবজীবনের ইশারা। তরুণ ভক্তগণের বাঁধনছোঁড়া উন্মাদনা। পুরাতনের অর্গলকে তারা খসায়, সঙ্কারকে তারা পাশে ছুঁড়ে ফেলে জরবার উন্মুক্ত পথ থেকে। জীবনে লেগেছে নব জোয়ার, চৈতন্য ও আত্মপূর্ণের নব নব রূপ তারা সৃষ্টি করে চলে। ঈশ্বরবাক্যের আনন্দমহা অন্তর পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি পড়ে,—প্রাচীরের ছিদ্রভিন্ন জীর্ণ বসনকে পরিত্যাগ করে উৎসবের নবীন রঙিন শোবারকে সজ্জিত হয় মানুষ। যৌবনের অমিত বলিষ্ঠতার যুক্তির এই অভিধানে সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বীণা।

এই বিপুল আনন্দনাট্যের প্রদীপ্ত চলিষ্ণুতার মধ্যে প্রথম বেগনার ছায়া পড়ল, বধন মু শিশুর মতো তথাকথিত পণ্ডিত আর ফরীশীর দল কোনো আহ্বানে কর্ণপাত করল না, প্রাচীন জীর্ণ ধারণাকে আঁকড়ে ধরে মুগ্ধ কিরিয়ে রইল অন্ধকারে, নবজীবনের উদ্ভাসিত ক্রীড়াঙ্গনে জনগণের সঙ্গে এসে যোগ দিল না। বায়ে বায়ে তাদের ডাকলেন সাধু জন, ডাকলেন প্রভু বীণা নিজে,—কিন্তু ঈশ্বরবাক্যের পরম সত্যের আহ্বান তাদের নিরুদ্ধ অন্তরে কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। যুগ-সজ্জিত সঙ্কারের ভূগুণ পাথরের মতো তাদের বৃক বসে আছে। জাতিভেদের সংকীর্ণতায় তারা আবদ্ধ, তাদের অনড় চৈতন্য বিরে সৃষ্টিভেদ পৌরাণিক অন্ধকার, সেই অন্ধকারে নবাকর্ণের আলোক-স্পন্দন জাগে না। অন্ধ প্রজ্ঞার অন্ধ রাজ্যের মতো তারা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, হুর্ন আত্মদ্বন্দ্বের ভাবে যে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি বৃষ্টি তাদের হাতেই আছে। সে চাবি চিরকালের মতো তাদের বহুমুখী থেকে কবে খসে পড়েছে তা তারা জানেও না।

কিন্তু বীণা ও তাঁর শিষ্যরা যৌবনের অকুতোভয় অভিধানে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। মৃত অস্তিত্বের মলিন চীর খসে পড়েছে তাঁদের দৃষ্ট অঙ্গ থেকে। তাঁরা নবীন যুগের প্রতিকৃতি। ঈশ্বরের রাজ্যে নতুন শক্তি নবোন্মাদনার সুরূপ লক্ষ্য করে বীণার উল্লাসের অবধি নেই। এই নবযুগের বাতাসকে ছুঁতে ঝটিকার মতো দিকে দিগন্তরে বিস্তৃত করতে বীণা চান, এই নবযুগের নবীন বিশ্বাসীদের তিনি সাগ্রহে আহ্বান করেন। একথাও তিনি বলেন, 'যারা হুদাম, স্বর্গরাজ্য তাদেরই, শক্তির ধারা এই রাজ্যকে জয় করতে হয়।' বুকের এই বাণী যৌবনের প্রতি যৌবনের আহ্বান। সমুদ্রে জীবন-মরণের লড়াই, হয় জয় না হয় পরাজয়, হয় আলোক না হয় অন্ধকার।

বীণা খুঁট নব বিশ্বাসের যে অভিধানে আওতান হলেন, সেই অভিধানে অন্তরপ্রাণী আনন্দ ছিল পাথের। যুতুপণ জীবনদীপা এই অভিধান, এ যেন এক বিবাহ-উৎসব। বাঁশী বাজছে, চলেছে বরষাভীমের শোভাযাত্রা। এসো এসো, বিলম্ব কোরো না কেউ। ধ্বনিত হচ্ছে আশার গান, চোখ কান বন্ধ করে উপবাসী মন নিয়ে ঘুরে সরে থেকে না কেউ। আজ উৎসব-ভোজের দিন, উপবাসের দিন নয়।

উপবাস করতে হবে বৈ কি, সইতে হবে অনেক যন্ত্রণা। আত্মাহুতির বজ্রাণ-শিহরিত আগর যুতুপ্ত বীণা তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এই বেদনা এই আত্মদান ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠারই ভিত্তি। কিন্তু সেন্সনা দুঃখ নেই, ভয় নেই। সূত্র আশ্রক দুঃখ আশ্রক, যন্ত্রণা আশ্রক আনন্দ আশ্রক, ভাগ্যে ভুঁকু আহার বা অনশন, ভক্তের কণ্ঠে নিত্য ধ্বনিত হোক পিতার নাম, স্বর্গরাজ্যের মতো মর্ত্যমুখিতও প্রতিষ্ঠিত হোক পরম পিতার সিংহাসন। ত্রিভুবনে বিস্তৃত হোক তাঁর এবছত্র সাম্রাজ্য।

এই নাটকের পরমতম ঘটনা, শ্রেষ্ঠতম সংলাপ বীণার একটি কথা একটি ডাক। পিতা বলে তিনি ডেকেছিলেন ঈশ্বরকে, এই ডাকই নবযুগের নববিধান। নিগুণ স্রষ্টার যেমন তাঁর বিগাহর একটি বাগিণী বাবে বায়ে বাজান, খেলাচ্ছলে বাগিণীর মধ্য থেকে অমৃতসঙ্গীতের সৃষ্টি করেন তেমনি বীণা নানা ভাবে নানা মুহূর্তের ঐ 'পিতা' নামটি উচ্চারণ করেছিলেন, এক অনন্ত গোঁয়ে মহিমাযিত করেছিলেন ঐ নাম।

বীণা অপেক্ষা এই আহ্বানের মহত্তর অবিকারী কে? তাঁর মতো করে ঈশ্বরকে পিতা বলে আহ্বান করতে আর কে পারে? বীণারই মধ্যে শিশু মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, যে শিশু নিভীক ও নিত্য বিশ্বস্ত দৃষ্টি মেলে ঈশ্বরের সৃষ্টির দিকে তাকায়, যে শিশু সবল যে শিশু সত্যকাম, অকুণ্ঠ আস্থা ও সহজ সাহসে যে শিশু স্রষ্টার চরণে প্রণমিত। যে শিশু তার সহজাত অমৃতভূত দিয়ে জানে যে এ সংসার স্নানর, কেন না এ সংসার তার পিতার স্রষ্টা। পিতার প্রাসাদে সে জন্মেছে, কতো বিচিত্র ধর্ম, কতো মনোহর প্রকোষ্ঠ এই প্রাসাদে, এ কী মনোহর তার আশ্রয়! পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আগ্রত তার স্তবর, স্থির বিশ্বাসে সে শিশু-রাজ্য পালন করে।

পরমপিতাকে বীণা যেমন জানেন তেমন আর কেউ জানে না। পরমপিতার মহিমা বীণা যেমন প্রকাশ করতে পারেন, তেমন আর কেউ পারে না। বীণার এই শক্তির মূলে রয়েছে তাঁর আশ্রয় জয়রহস্য। বীণা ও তাঁর পিতা, তাঁরা দুজনে এক। পরম-পিতার সাক্ষাৎ পূজে তিনি, এ কোনো তত্ত্ববন্ধ নয়, এ কোনো পণ্ডিতের তর্কের বিষয়বস্তু নয়, এ উপলব্ধির কথা। তিনি পরম-পিতাকে ব্যানোপলব্ধি করেছেন, পরমপিতার অভিধানে মধ্যে বিশীন তাঁর অভিধা, কী চরিত্রে, কী ইচ্ছায়, কী সাধনার বীণা ও পরমেশ্বরের মধ্যে কোনো অনৈক্য নেই।

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বীণা জগৎ-সংসারের সমুদ্রে পরমেশ্বরের যে রূপ প্রকাশ করেছেন তাঁর তুলনা নেই। সৃষ্টিকর্তা লব্ধে পূর্বযুগের সমস্ত ধারণা ও সঙ্কারকে দূর করে এক

পরমার্থ বর্ণনাস্থির প্রতিষ্ঠা করেছেন বীত। মানব জাতির এই যে পরিমর্জন—এ পরিমর্জন এতো মৌলিক, এতো উদার অথচ এতো সহজ! ধর্মীয় ধর্ম পূর্বতন বর্মবিকাশের চরিত চর্ষণ নয়, এই ধর্ম মানব-ইতিহাসের এক-নবীন অধ্যায়ের সূচনা।

কেন না, বীত খৃষ্ট যোষণা করেছিলেন—ঈশ্বরের চরিত্র শিশু-চরিত্রের মতোই সরল, অন্তর বাদ্যের পবিত্র তারা জ্ঞানের ধ্যান-দৃষ্টিতে ঈশ্বরের শিশুরূপই দেখতে পায়। শিশুর মতো নিঃশব্দ বার চরিত্র, সেই লাভ করে ঈশ্বর-সম্মতি। ঈশ্বরের রাজ্যে সেই পায় প্রবেশাধিকার। এই রাজ্যের নামই স্বর্গরাজ্য। বীত বলেছেন—‘যতদিন না তোমাদের মনের পূর্ণ পরিমর্জন ঘটে, যতদিন না তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতো হও, ততদিন কিছুতে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে না।’ পাছে কোকে না বোকে তাই এই উপদেশ তিনি বার বার দিয়ে বলেছেন—‘ছোট হও, অবনত করে নিজে; যে ঐ ক্ষুদ্র শিশুর মতো অবনত, সেই পাবে স্বর্গরাজ্যে সর্বোচ্চ স্থান। আবার তিনি বলেছেন—‘ঐ ক্ষুদ্র শিশুর মতো না হলে সে স্বর্গরাজ্য লাভ করবে না, সে করবে না আর কিছুতেই।’

আমরা সকলেই জানি, শিশুদের মধ্যে সংস্কারের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। অর্গল ভাঙার সরলতা শিশুদের মধ্যেই আছে। ঈশ্বরের সত্যের কেন্দ্রেও এই সংস্কারবিহীন সারল্য। আধুনিক যুগের বিরাট বস্তুতাত্ত্বিক প্রগতি যেমন বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি সরল পূর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়েছে, তেমনি এই অসীম আধ্যাত্মিক অগণ্ড ঈশ্বরের অতি সহজ ও অবিনশ্বর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যকে বীত মানবজীবনের বাস্তবতার সমুখে উদ্ঘাটিত করেছেন।

বীত এই আশ্চর্য সত্য প্রচার করেছেন যে, যেমন স্বর্গরাজ্য তেমনি ঈশ্বর। স্বর্গরাজ্যে সরল শিশুদের প্রবেশাধিকার সর্বত্র। ঈশ্বরও এই শিশুই মতো সরল। শিশুই মতো তিনি সহনশীল, শিশুই মতো তিনি আত্মসমপিত। তিনি নক্ত, তিনি নম্র। ভক্তের হৃদয়কে তিনি বধন বাঁচ-এণ করেন, তখন তাঁর নম্রতার স্পন্দ নেই। ভক্তের ভক্তে তিনি প্রীতীক করে থাকেন, অনন্ত সহিষ্ণু এই প্রীতীক। তাঁর সবচেয়ে বিস্তারী সন্তানদেরও তিনি শাসন করে বশে আনতে চান না। প্রেমেরই তাঁর শাসন, প্রেমেরই তাঁর ক্ষম।

বিপণ্যমী সন্তানের প্রতি তাঁর কী আশ্চর্য মধুর ব্যবহার! কী প্রেম, কীতিকা! পুত্র আবার গৃহে ফিরে আসছে এই সংবাদ পেয়ে শিশু ছুটে বার হলেম পাখে। এখনো অনেক পথ বাকি, শিশু সেই পথ পার হলেম দৌড়তে দৌড়তে। রেহালিসনে পূত্রকে জড়িয়ে ধরলেন বৃকে। না, না পুত্র, অপরাধ স্বীকার করতে হবে না, অস্বস্তাপ করতে হবে না, বা ঘটেছে তা সূত অতীত, অতীতকে ভুলে বাও।

সত্যই বীত বলেছেন, অমৃতপুত্র পানী বৈদ্য শিশুগৃহে ফিরে আসে সেদিন স্বর্গরাজ্যে মহা উৎসবের দিন।

ঈশ্বরের অমৃতপুত্র সীমা নেই, ক্ষমার সাগর তিনি। এই ক্ষমার কণাটুকু মাত্র মাহু তার হৃদয়ে রাখণ করুক। বীত বলেছেন,—

‘যারা তোমাকে পূর্ণ করে তাদের কল্যাণ করে। যারা তোমার সঙ্গে মল ব্যবহার করে, তোমাকে অত্যাচার করে তাদের ক্ষম প্রার্থনা করে। তবেই তুমি পরমপিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে। ভালো ও মন্দ, উভয়েরই মাধ্যম ঈশ্বরের পূর্ব কি গুণে না? সং ও অসং, উভয়েরই শিরবে ঈশ্বরের বর্ধা কি করে না? পরমেশ্বর সর্বদ্রুতিহীন, সর্বদোষহর তিনি। তোমাকেও হতে হবে তোমার পিতারই মতো।’

এমন সহজ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সব কথা বলতে বীতের পূর্বে আর কোনো মানব-সন্তান সাহস করেনি। কিন্তু ঈশ্বরের এই যে সহজ সরল প্রেমবিস্মল চরিত্র, এই চরিত্র নিজেই স্বর্গের মর্মসূত্র তিনি জানতেন। তিনি উপলব্ধি-পাথের দূর-দূরান্তের উল্লাসী স্বর্গকর্তা নন। একটি পানীর যত্ন-বোনা তাঁর প্রাণে স্পন্দিত হয়, একটি মাহুয়ের মাধ্যম বটি চুল তাও তিনি গুণে রেখেছেন। তাই বধন নবর মাহু তার অন্তরাত্মার অমোঘ আহ্বানে পুরাতনকে বর্জন করে নবীনের অভিবানে আত্মহীন হয়,—সে আহ্বানে ঈশ্বরেরই আহ্বান। সেই আহ্বান স্বর্গের প্রথম বাণীর প্রতিধ্বনি, যে বাণীর নির্দেশে চরিত্রব্যাপী অন্ধকারের গর্ভে আলোকের জন্ম হয়েছিল। সে আহ্বানে যারা অবিশ্বাস করে, তা ঈশ্বরের স্বর্গ-প্রতিজ্ঞাকে অস্বীকার করে, আলোককে অস্বীকার করে অন্ধকারে মুগ্ধ কিয়দে বসে থাকে। আলোকেই দৈব ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ। এই ভবিষ্যৎকে ভয় করতে নেই। স্বল্পনয়মী আবেগে এই ভবিষ্যতের পথে আত্মদান হতে হয়।

ঈশ্বরের স্বর্গলীলার ছেদ নেই। পুরাতনকে তিনি নবীন করেছেন, সূতকে তিনি সঙ্গীভিত করছেন পুনরুজ্জীবনের মাঝে। মাহুয়ের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান নিত্য-আত্মদান শিশুমন আছে সেই মন তাঁর আপন মনের আবেগে স্পন্দিত হোক, এই তাঁর অভিলাষ। এই শিশুমন নিয়ে বধন তাঁকে শিশু বলে ডাকি, তখনই তাঁর মনে মন মিলাই, তখনই তিনি চরিতার্থ হন।

ঈশ্বরের এই পরম-সুত নব-আহ্বানের প্রমাণ যদি আমরা চাই, দার্শনিক তত্ত্ব ও তর্কের বাগাড়ম্বরে বীত সেই প্রমাণ দেননি। প্রমাণ তাঁর জীবন। ঈশ্বরের বাণীই তাঁর জীবন। তাঁর জীবন দিয়েই তিনি তাঁর পরমপিতার সেই আহ্বানের সত্য প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর নিজের পার্থিব জীবনে প্রতি দুহুর্তের পরীকার মধ্য দিয়ে তিনি সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই পরীকার পথে কোনো বাধা কোনো বিপদকে তিনি মানেননি। এই পরীকার চরম আত্মনিবেদনের অটল সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন। মাহুকে কোনো মহৎ বিষয়ে উদ্ভুদ্ধ করতে হলে সে বিশ্বাসের জন্ম জীবন নিবেদন করতে হয়। বীত তা করেছেন।

বীতের এই দৃঢ় প্রত্যয় আর সাধারণ মাহুয়ের সুলভ ভরসাধার এক নয়। তিনি জানতেন, জীবনের প্রতি দুহুর্ত জানতেন, যে চরম মূল্য তাঁকে দিতে হবে। তবু ঈশ্বরপুত্র হয়েও অন্তরে অন্তরে তিনি মাহু, তাই আশংকাকেও তিনি গোপন করতে চাননি। চরম বহুতার দুহুর্ত বধন ঘনিষে এল, তখন তাঁর নির্ভীক অশ্রুও বিহরিত হোলো,—পরমপিতার উদ্দেশ্যে আর্ত নিবেদন

কানিত হোলো,—‘হে শিতঃ, তোমার দ্বারা সকলই সম্ভব, এ পানপাত্র
সবাত্ত তুমি আমার হৃৎকের সামনে থেকে।’

আবার বেদনার অবসানে সজ্জি বধন করে এল তখন তিনি
মহান কড়ংগের সঙ্গে শিতারকে বললেন, ‘খাশের মধ্যে গুরে ফেলো
তোমার তববারি। যে পাত্র শিতা আমাকে দিয়েছেন, তার
পানীয় আমি পান করব না।’

এক নিঃশ্বাসে শেষ চূষক পদ্বী পান করলেন বীত।

বর্ষগ্রহে খেত পাথরের পাত্র ভাঙার একটি কাহিনী আছে।
তখন নিস্তার সন্তাহের প্রায় অবসান, বীতের চরম আত্মদানের
ক্ষণ বনিয়ে এসেছে। সেই আসন্ন প্রহরে বীতের মনোভাবের
পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে মেলে। মহাশয় গন্ধজ্ঞপূর্ণ খেত
পাথরের রক্ত পাত্রটি চূর্ণ করে এক নারী বীতের মস্তকে স্নগন্ধি তৈল
মাখিয়ে দিল। পাত্রটি চূর্ণ হবার সঙ্গে বীতের মনে হোলো তাঁরও
মৃত্যু বনিয়ে এসেছে। স্নগন্ধি আসব লাভ করতে হলে যেমন
নিরুদ্ধ প্রস্তর-পাত্রকে চূর্ণ করতে হয়, তেমনি তাঁর মরদেহকেও
চূর্ণ করতে হবে। তবে না তাঁর অন্তর-স্নগন্ধি বাপ্ত হয়ে দিকে
দিকে। ভক্ত নারীর এই অবদান লক্ষ্য করে বীত বললেন,—
‘আহা, এ আমার প্রতি অতি সংকার্য করেছে, আমার দেহে এই
স্নগন্ধি তৈল ঢেলে আমার সমাধির উপযোগী কাজ করেছে।’
বিরক্ত ভক্তরা অশ্রুতরয়ে অমুখোণ করল, এ বে অপব্যয়।
এই অপব্যয় কথাটি বীতের মর্মে গিয়ে বিধল। না, না, অপব্যয়
নয়। তাঁর বিধাহীন আত্মদান, তাও অপব্যয় নয়। নারী তাঁর
মুখ্য অমৃতভূতিমূল মন নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাটি বৃষ্টি ঠিক বুঝেছে।
স্পর্শকাতর অন্তরের কোমল অমৃতভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছে তাঁরই
অন্তরের বেদনা। কিছু না ভেবে মূর্তিমাত্র সঙ্কম না করে উদার হাতে
সব কিছু বিলিয়ে বেওয়া, এ তো অপব্যয় নয়—ঈশ্বরপুত্র বীত দান
করেছেন তাঁর জীবন, বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সন্তা, জুংগের কাঠ চূর্ণ
করেছেন তাঁর দেহ—পুরুষের বশিষ্ঠতার আর নারীর অকুণ্ঠ দানিক্যো।

ঈশ্বরও কিছুই রাখেন না। তাঁর উদার কল্যাণ-আশীর্বাদ
তাঁর অনীম করুণা তিনি আত্মহারা আনন্দে মমুয়াসমাজে বিতরণ
করেন, এই সত্য বীত পাখি বনরনারীর প্রাণে আগ্রহ করতে
চেয়েছেন। বীত যেন কবি, বীত যেন শিল্পী, সমগ্র জীবন ধরে
শিল্পমণ্ডী প্রেরণার তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছেন, আশ্বিনীর
অনমনীয় প্রস্তর-কটিন মনকে ঈশ্বরের প্রেমসম্পর্নাভর উপযোগী
নমনীয় করে গেছেন। যে মন অনড় নিশ্চল, সেই মনকে তিনি
আপন প্রাশাস-কুংকারে সজ্জবিত করেছেন, সেই মনকে আপন
শিল্পাস্থি স্পর্শে গঠন করেছেন, ভাস্কর যেমন অবয়বহীন জড়শিশু
থেকে রূপসৃষ্টি করে। কবি যেমন কাব্য রচনা করে, শিল্পী
যেমন বীণার তোলে সুরের লতরী, তেমনি তিনি রচনা করেছেন
মহান জীবনকাব্য। তেমনি মানবভাগ্য জুড়ে তিনি বহিয়েছেন
অনির্ঘনীয় সুর-মহাকাব্য। বীতের এই সৃষ্টিলাল্য আমবা বাস্তব
ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করিনে, অন্তর দিয়ে অমৃতব করি।
মানবভাগ্যে বৃষ্টজন্মের ঝংক দেখে বিমিত হই।

ঈশ্বরের কল্যাণ স্পর্শ কেবল মাত্র কোমল নয়, অজ্ঞায়ের
হৃৎকোষে এই স্পর্শ বরকটিন। বীতের প্রেম শিথিল ভাবালুতা

নয়। এ প্রেম কখনো বা ব্যর্থার মতো, বহুপার মতো। যখন
আফ্রিকার আলবার্ট বুইটজারকে বহু সময় তাঁর ছুরিকার আগর
দিয়ে শলাচিকিৎসা করতে হয়। সেই আঘাত কেবল মাত্র ক্ষত
সৃষ্টি করে না, ক্ষতের গভীরে প্রবেশ করে ব্যাধির মূলকে নির্মূল
করে ক্ষতকে সারিয়ে তোলে। ঈশ্বরের করুণাও একই প্রকার।
এই করুণা যেকোনো ক্ষয় করবার জগ্জেই বেদনা হানে। এই ক্ষত
পথম বহু বৈশ্বস্ত ক্ষত।

ঈশ্বরের এই কঠোর প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন সাধু পদ।
হিরুগণের প্রতি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—‘অত্ৰু যাবে
প্রেম করেন তাকেই তিনি শাসন করেন,—বে পুত্রকে তিনি গ্রহণ
করেন, তাকেই তিনি প্রহার করেন। ঈশ্বরের শাসনকে যদি সহ্য
করো, তাহলেই হবে ঈশ্বরের পুত্রোপম। পিতা থাকে শাসন করেন
না, এমন পুত্র কোথায়?’

বীতও বলেছেন,—‘যে সমস্ত তত্ত্ব তাঁর শিতা গোপন করেনি,
সেই সব তত্ত্বকে নিমূল করতে হবে। এই সংসার জ্ঞান ও পাণে
উৎস চেতনার গভীর অন্ধকারে, পাণের রহস্যকে মুক্তিকর্কের সোনা
কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না।’ আশ্চর্য, উপমার সাহায্যে প্রভুগুর
এই পাণের অবদানকে চিত্রিত করেছেন। গভিনী নারীর প্রসব-
বহুপার আনন্দময় অবদানকে তিনি চিত্রিত করেছেন, শুদ্ধ ভূগবে
পরিভাগ্য করে হেমন্ত-ক্ষেত্রের সোনার ফসল সংগ্রহের ছবি তিনি
এঁকেছেন, বীজের মূহুর সঙ্গে সঙ্গে ফলের জন্মের গান তিনি
গেয়েছেন।

বীতের প্রাণ ছিল কবির প্রাণ, তাঁর প্রকৃতিতে ছিল কবির
অমৃতভূতি। নিজেরই অজ্ঞাতে কখনো তাঁর মন হোতো হৃৎকোষে
উৎসঙ্গ, কখনো বা হতাশা বিরহতার স্রোতমালা। এইখানেই তাঁর
মানবত্বের পরিচয়, মানুষেরই হৃৎ-স্রোত আগ্রহ ছিল তাঁর স্রব।
তাঁর স্বপ্ননী-প্রতিভা ছিল বিশাল, নির্ভীক দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে
আকাশচূষী সৃষ্টি তিনি করে গেছেন, একমাত্র শিল্পীর হৃৎকোষে
আবেগেই তা সম্ভব। যে আশ্চর্য দূরদৃষ্টির ফলে তিনি মানব-ভাগ্যকে
প্রদীপ্ত ভবিষ্যতের পথে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন, সেই দৃষ্টি বলস
নিখার মতো। সে দৃষ্টিনিখার দিকে চোখ রেখে আমাদের ইন্দ্রিয়
বুঝি বিশ্বদ্বাঘাতে অন্তর হয়ে যায়। কিন্তু সেই অনড় প্রাণ সত্য
করেন তিনি। তিনি দেখেন, তিনি কাজ করেন, মানব ঐতিহ্যকে
তিনি গঠন করেন নতুন রূপে।

শিবাব্দ-স্বর প্রত্যাবর্তনে তাদের সঙ্গে জন্মের আনন্দে উল্লসিত
হয়ে বীত বললেন,—‘আকাশ থেকে বজ্র যেমন ধসে পড়ে, তেমনি
আমি শরতানকে খস পড়তে দেখেছি।’ ঈশ্বরকে উদ্বেগ করে
তিনি বললেন,—‘পৃথিবী ও বর্ষের একেবারে হে পরমপিতা, আমি
তোমাকে বহুবাদ জ্ঞাপন করি, কেন না বাহা প্রবীণ, বাহা তথাকথিত
জ্ঞানী, তাদের কাছে না প্রকাশ করে শিশুর কাছে নিজেকে প্রকাশ
ক’হে তুমি।’

আবার এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন বৃহত্তে তাঁর মনের পরিবর্তন আমরা
লক্ষ্য করতে পারি তাঁর ক’টি কথা,—‘আমার মনে হৃৎকের শেষ
দেই, মৃত্যুতে যে হৃৎকের সমাপ্তি।’

কখনো হতাশা, কখনো আশা, কখনো আনন্দ, কখনো বিয়তলা
—যাদের এই আলো-অন্ধকারকে বীত আমাদের কাছে ঢেকে রাখেন

না। শিশুর মতো সরল তাঁর জীবন। বধন বা তিনি অল্পবয়স্ক করেন, তা তিনি অকপটে প্রকাশ করেন। তবে মনের দাপট তিনি করেন না। সসীতশিল্পী যেমন প্রতিটি স্বাক্ষরকে আয়ত্ব রাখে, তেমনি আপন মনের প্রতিটি অল্পকৃতি তাঁর আয়ত্তাধীন। নিগূণ গীতকারের মতো ছোট-বড়ো বাদী-সবাদী প্রত্যেকটি স্বর বাবহার করে তিনি মহাসঙ্গীত সৃজন করেন। জীবনের সর্বপ্রকার অল্পকৃতি দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ করেছেন নিজের জীবন, এমন কি বধন ক্রুশি হয়েছেন, তখনো কোনো বেদনা-নিবারণ ঔষধ তিনি চাননি। তিনি ঘোষণা করেছেন,—‘মাহুঘ বাতে জীবন লাভ করে, বিচিহ্নতার বিস্মৃততার জীবন, তাই আমি এসেছি।’

চরিত্রের এক অপরূপ ভারসাম্য ছিল বীণার। কখনো আনন্দ কখনো বেদনা,—কিছু এই দুই-এর মধ্যে সমতা বন্ধ করে চলেছে তাকে। জীবনের বা গভীর ঐশ্বর্য,—তার মহাপ্রভা নেই, তা সরল তা মৌলিক। এই গভীর ঐশ্বর্যের কথা বীণ তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন,—‘তাই তাঁর বাণী চিরকাল মাহুঘের অন্তরে জাগরুক থাকবে। সেই জন্তে তাঁর বাণী ভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েও সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তরে স্পর্শ করে। মানবজন্মের তার মহাপ্রথম মুহূর্তে যে বাণীর প্রত্যাবাস্তা করে, সে বাণী বীণ গৃহের বাণী।’

শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোঠা ভাঙা বিজ্ঞানসন্ধান গৃহবাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই আমাকে বলতেন। বিজ্ঞানসন্ধান ছিলেন বুদ্ধ দার্শনিক ও কবি,—যৌবনকালে তিনিও ছিলেন স’খ্য কবি। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের সকলের কোঠাভাঙা ছিলেন, তাঁর পরিচিত আমরা সবসঙ্গেই তাঁকে বড়দাদা বলে ডাকতাম। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পরবর্ষের প্রতি ঐশ্বর্য ছিল তাঁর বিশিষ্ট অন্তর-ভূষণ! তা ছাড়া তাঁর মন ছিল শিশুর মতো। দার্শনিক হিসেবে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, কিন্তু ছিল অনীম। বুদ্ধ বয়সে তিনি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুক হয়ে বারান্দার বসে থাকতেন,—পানী আর কাঠবিড়ালীরা নির্ভয়ে তাঁর আশেপাশে বেলা করত। এই ভাবে নিতরুণ ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর মরজীবনকে পরিসমাপ্তির পথে নিয়ে চলেছিলেন। এই শেষ জীবনে প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে নীরব সাধনায় তিনি কালাতিপাত করতেন,—এই সাধনায় তাঁর আত্মা ঐশ্বর্য-সামীপ্য লাভ করত।

প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সারল্য ও বিনয় ছিল তাঁর অন্তর-ভূষণ, বধন যে কথা তিনি বলতেন সে কথায় সত্য উদ্ভাসিত হতো। প্রতিদিন সূর্যাস্তকালে সারা দিনের মতো সামান্য আহার সাজ করে তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকতেন। সাগরিন যেতো প্রকার চিন্তা তিনি করতেন বিনাশ্তে সেই সব চিন্তাকে তিনি গ্রহিত করে আমার হাতে দিতে ভালো বাসতেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি কেবলই ‘সায়মন অন দি মাউন্ট’ পাঠ করতেন ও এই গুরূপদেশের সারসংসার নিয়ে আলোচনা করতেন।

বিজ্ঞানসন্ধান একদিন আমাকে বলেছিলেন, ‘বীণের এই উপদেশাবলী আমার খাত আমার পানীয়। বীণের বাক্য এতো সরল সে শিশুও তা বুঝতে পারে, কিন্তু আবার অন্তর্নিহিত অর্থ

সে বাক্য কতো গভীর। উপনিষদের মতো পৃথিবীর দুষ্টিমের মহাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বীণের এই বাক্য। কতো বড়ো স্পর্শাত্মক বীণ বলেছিলেন, আমার বাক্য কখনো বুঝে যাবে না। কতো বড়ো সত্য কথা তিনি বলেছিলেন। সত্যই অবিনশ্বর তাঁর বাক্য। দিনের পর দিন তাঁর বাণী নিয়ে আমি চিন্তা করি, গভীর রাত্রে নিদ্রাভীত প্রহরে তাঁর বাণী আমার অন্তরে এসে বাজে। তাঁর বাণীর ব্যাখ্যার জন্তে কোনো টীকার প্রয়োজন নেই, অথচ তাদের অল্পগুট অর্থহীন কোনো সমাপ্তি নেই। বীণের বাণীতে সেই সত্যের স্কুলিক আছে বা মাহুঘকে চিরদিন পথ দেখায়, মৃত্যুর অন্ধকারকেও অপনোদন করে।’

বীণের যে বাণীটি বিজ্ঞানসন্ধানের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তা হোসো এই,—

‘অন্তর বাহ্যের পবিত্র তারা ভাগ্যবান, কেননা, ঈশ্বরের দর্শনলাভ তাহা করবে।’

এই বাণীর পরম সম্পূর্ণতা তাকে চরম তৃপ্তি দিত,—তিনি বারে বারে এই বাণী উচ্চারণ করতেন। আর একটি বাণীও তাঁর অল্পরূপ প্রিয় ছিল,—‘ঈশ্বর র রাজ্য তোমারই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত।’ এই বাণীটি বধনই তিনি আমার সামনে উচ্চারণ করতেন, তাঁর শ্রদ্ধা-বিস্ময়জনক রকমে এই বাক্য যেন অচিন্ত্যপূর্ণ রহস্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেত। ঈশ্বরের রাজ্য কোনো বাহ্যিক বাস্তব রাজ্য নয়, মাহুঘের মনোবাস্তবই সেই রাজ্য,—প্রতি মাহুঘের দলবলকণ্ঠেই ঈশ্বরের সিংহাসন—এই সব কথা বারে বারে বক্তে গভীর আনন্দ লাভ করতেন বড়দাদা।

গভীর দার্শনিক উপলব্ধি ও নির্ভীক কবিচরিত্রের সহযোগে বিজ্ঞানসন্ধান গৃহবাণীর মধ্যে নূতন অর্থ ও নূতন ইঙ্গিতের সন্ধান পেতেন। তাঁর ভাষ্য ও আমার হারণুর সঙ্গে কখনো কখনো মিলত না;—কিন্তু তিনি তর্ক করতেন না, শান্ত ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলতেন যে বীণের মতো মহাপ্রভুর বাণীর গভীরত্ব অপরিণীম। কোনো মাহুঘ এক নিঃশ্বাসে ঘোষণা করতে পারে না,—তাঁর বাক্য আমি সব বুঝে নিয়েছি। বীণের বাণী অসুত-নির্কণ্ঠী—শিলাসী মানব যুগে যুগে সে নির্বাহী পানীয় গ্রহণ করে। প্রতি যুগের মাহুঘ প্রতি বার নূতন করে এই সত্য—উৎসের সমুখে অজলি পাকতে,—এবং মাহুঘের পরম প্রত্যোজনের তৃষা হতোদিন না নিবৃত্ত হবে ততোদিন যুগে যুগে মাহুঘ এই মশাকিনীর তীর্থসলিলে পুত হবে।

বীণের জীবনে বধন ক্রুশের আঘাত পড়েছিল তখন তিনি যৌবনের শীর্ষদেশে। যৌবনাবস্ফাতেই তিনি আত্মদান করেছিলেন। মধ্য বয়সের দীর্ঘ ছাড়া তাঁর জীবনপথে পড়েনি। তাই তাঁর প্রতি বাক্যে যৌবনের স্পর্শ। এইখানেই ক্রুশের সবচেয়ে বড়ো বেদনা,—এই ক্রুশ যৌবনকে হনন করেছিল, মানবপ্রেমিক কবিকে হনন করেছিল। দৈব বক্ষার কথা বীণের বেদনার চরিতার্থ হতেছিল,—‘লক্ষ্য করো আমার বেদনার চেয়ে গাঢ়তর বেদনা আর কোথাও আছে কি না।’

বীণের আনন্দ-বেদনা বিকশিত যৌবনের প্রথম ইন্দ্রিয়োপলব্ধির বেদনা। এই জন্মেই এতো আনন্দ তিনি বিজুহিত করেছিলেন,

একো বেগম। তিনি সহ্য করেছিলেন। বুদ্ধ বৈরাগ্যসাধকের মতো তিনি ইঞ্জিরের ঘাটকে রক্ত রাখে ননি,—পতিভাগ করেননি ‘পান-ডোলনের’ পরিতৃপ্তি। জীবনের বর্ণিত সুখমার প্রতি তিনি পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। তীরের মতো তীক্ষ্ণ ছিল তার বাস্তব বিচারবুদ্ধি, উদাসীনতা নিয়ে এই বুদ্ধিক্তি তিনি আবিল ছয়ের নি। মানসিক স্বাধীনতার অমর ঘোষণা তিনি করেছেন,—‘সত্যই তোমাকে হুক্তি দেবে, মিথ্যাই বন্ধন।’ ঠীক সেই নিত্যকালের নির্ভীক যৌবনের প্রতিচ্ছবি, যে যৌবন জন্মোত্তর আত্মবিধ্বাস অকরুণীয় বাণীর সন্ধানী হয় এবং আত্মার অপরাধের বীর্ষে সব বাধা ভর করে। অস্তিত্ব বিধ্বংসের দ্বারা প্রবর্তক, নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারাত মহান পুরুষ, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকের পৃথিবীতে তরীর্ণ জীবন বাপস করেছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের অবসানে লুপ্তবসে দেহবন্ধা করেছিলেন। কিন্তু বীণব চরিত্রে এক অলভিতময়ীর উদ্বর্তন প্রতিষ্ঠিত,—চিরন্তন যৌবনবীর্ষের সিংহাসনে তাঁর আসন।

প্রতিযোগের সাধারণ মানুষ খুঁটচরিত্রের এই উজ্জ্বল উচ্চতাকে নিজের সাধারণ স্বর্গতার স্তরের নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে,— তাঁর বাণীর নির্ভীক মহত্বকে শূন্যতায় করতে চেয়েছে আপন সমস্ত অভিজ্ঞতার কাগাগারে। কিন্তু খুঁটকে বাধা যায় না, মানুষের চিত্তকন্দরের অসম্ভবের নিযুক্ত প্রেরণাকে তিনি জাগ্রত করেন। বারে বারে যুগে যুগে তিনি ঘোষণা করেন,—বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে অসম্ভবকে সম্ভব করে, বিশ্বাসের আকর্ষণে স্বাণু পর্বতকে করা চলমান।

‘প্রথম স্বর্গ ও প্রথম মর্তের অবসানের পর এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী আমার চেয়ে প্রতিভাত হোলো।’—খুঁট বাণীর এই সঙ্গীত নব নব যুগের মানুষকে নব নব কর্মের অভিযাত্রার উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনন্ত স্রবনির্বরে অন্তরীক ও পৃথিবীর বৃকে জাগিয়েছে চলিত্যতার চলিত স্পন্দন।

যীত খুঁট জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ধর্মপ্রবর্তক, এই তাঁর আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে আমি ইউরোপে থাকতে ততো বুঝিনি যতো বুঝি প্রাগ্যদেশে এসে। মানবসমাজে বুদ্ধের প্রসঙ্গ প্রশান্তিরও সত্য প্রয়োজন আছে—এই প্রয়োজন জানবুদ্ধ। কিন্তু যীতের প্রয়োগ্রাধ আহ্বান যৌবনের ভাষা। এই বাণী কটিকার মতো বেগবান, বিদ্রোহের মতো প্রেধর,—মানুষকে চলিত্যতার অপ্রাপ্তিক করতে হলে এই আহ্বানের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের রাজ্যে অস্ত্রাঘের প্রতি বিদ্রুদ্ধে যুগ্মগণ্ড স্থান আছে, যে যুগ্ম যৌবনের বলিষ্ঠতা থেকেই সম্ভব। আত্মতরী ক্রাসীমের বীজ যে ভাষায় জন্মনা করেছিলেন যে ভাষা বিদ্রুদ্ধে কটিকার মতো

ডগ্গের, সে বিচারে অন্তর্ভুক্ত পর্বত কেঁপে ওঠে। এই ডগ্গের জন্মনার পেরে বীজ আবার বৃকফাটা বিলাপ করেছেন, ক্রোধ তখন অক্ষতলে হয়ে গেছে। দীর্ঘবাস আর অক্ষতলের সঙ্গে তিনি বলছেন,—

‘হা জেক্সসালেম! ঈশ্বর যে সব সত্যপ্রভাণের তোমার কাছে প্রেরণ করেন তাদের তুমি পাখর ছুঁড়ে হত্যা করে। বুদ্ধি যেমন তার লাবকদের পক্ষের নিচে একত্র করে, তেমনি আমি কতোবার তোমার সম্মানদের একত্র করেছি। টুকা করেছি। কিন্তু তুমি ভাতে সম্মত হলে না। তাই রেখ, আজ উজ্জ্বল বিদ্রুদ্ধে মধ্যম জোয়ার গুল।’

বীজের মানসিক উত্তেজনা প্রোধ দিয়ে তারত, কচণায় তার অবসান। মানবাত্মার প্রতি তাঁর মর্দাং মল্লময় ধান প্রাণের ডগ্গের বহুবিদ্রোহের মতো আঘাত করে, পরে তা লাভে বর্ষাধার মতো কলশাভ্রমে প্রাণিত করে। তখন পাঞ্জির হুত বহুতী, মেঘবীরীম নীলাকাশ কলকিত হয় জ্বরের উজ্জল গাফিলে। জগতের গভীরতর কলরবে পবিত্র করার রক্ত চুপের বলাগাত প্রয়োজন, সেই সঙ্গে প্রয়োজন আনন্দ ও আশ্বাসের সত্য প্রেরণ।

খুঁটচরিত্রের বিশিষ্ট গুণ সাহস, বীর্য, অকুতোভরতা। এই গুণ মানব-অস্ত্রের গভীর গুহাঘারে আঘাত করে, জাবার হস্তর আকাঙ্ক্ষাকে অসীম উচ্চতার প্রতি আকর্ষণ করে। খুঁটচরিত্রের এই মৌলিক মতিমা ধর্মপ্রাণের মূল সূত্র। খুঁটমহিমা এক সর্বজনীন বিপ্লবের হুস্ত প্রাণন যা প্রাচীন জীর্ণতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বস্তার মতো তা পুরাতনকে বিলুপ্ত করে। ঈশ্বরের নবীন রাজ্যের অমৃত লুপাধারকে প্রাচীন পাত্র অবরুদ্ধ রাখা যায় না। সেই পাত্র চম নিমিত্তই হোক আর প্রস্তর নিমিত্তই হোক, বিক্ষোভের মতো চূর্ণ হয় তার আবরণ।

খুঁটের চির অস্ত্রত বীজসে বিকৃতভাবে মাঝে মাঝে চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্র আঙ্গুরে তিনি রক্ষণশীল নীতিবাদী, সাংবাদী ধর্মপ্রাণ ও অসহ্য রকমের শাস্ত্রসম্ভ্র। এই চিত্র মিথ্যা, এই চিত্র ইতিহাসকে বিকৃত করে। এইরূপ বৈশিষ্ট্যহীন দুর্বল চরিত্র কখনো পৃথিবীর অস্ত্রাঘের শক্তিকে পরাভূত করতে পারত না, যুগে যুগে যৌবনের উদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে পারত না।

নবজন্মের বীজকে সম্ভারের খোসা সর্বজ বন্ধী রাখতে চেষ্টা করে। সেই আচ্ছাদনকে বিদীর্ণ করে জীবন নবায়নের আলোকে চোখ মেলে। প্রাচীনের জীর্ণ আবরণে সর্বদাই চোখ করে মানুষের অভিব্যক্তি আচ্ছাদকে অনড়তার কাগাগারে বন্ধী করে রাখতে। কিন্তু প্রতি যুগে নতুন করে বীজ এসে উপস্থিত হন। তিনি আসেন আমাদের সঙ্করের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। [ক্রমশঃ]

অমুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

“A great city is that which has the greatest men and women. If it be a few rugged huts it is still the greatest city in the whole world.”

—Whitman.



লাতাকি

১৪

ঠিক আমি বা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হোল শেষ পর্যন্ত। বোতলে সামাজিক গুণগোলের সুরপাত করলো পামার উপস্থিতি। অথচ এতে পামার দোষ কতটুকুই বা।

নিমন্ত্রিতেরা জলস্পর্শ করতে অস্বীকার করলেন। আমাদের দল অসুস্থ, অসুস্থের ভাদের টলাতে পারলো না। এই অভ্যাগতদের মধ্যে কতজন যে খাটি চরিত্রের অধিকারী, কে তা বলবে? কে তার হিসাব করবে?

চোখের জল ফেলে পামা বাড়ির বাইরে চলে গেল। পামার সামাজিক মূল্য স্বীকৃত হলো না। ওর ত্যাগ, সেবা, স্নেহ কেউ মর দিয়ে বোকবার চেষ্টা করলো না।

কানাই দুঃখিত হলো। দুঃখিত হলুম আমার সবাই।

কখন সুরদাস অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে, টের পাইনি। অনেক রাত বাড়ি ফিরে যবে ঢুকতে বাব, এমন সময় সুরদাসের কঠোর গুনতে শেলুম—দেখলে তো, তোমার সমান ওদের কাছে কতটুকু? কেউ তোমার হয়ে একটা কথাও বললে না। অন্ততঃ নয়নের উচ্চিক ছিলো, তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসা।

পামার উত্তর গুনতে শেলুম না। পরে সুরদাসের আরো কথা থেকে বুঝতে পারলুম যে, পামা ছিল নিরুত্তর। সুরদাস বলে চললো, এ বকম ভাবে অপমানিত হবার চেয়ে আমার সঙ্গে চলে চলো। আমি তোমার রাগীর মতো করে রাখব।

পামা বলল, সুরদাস বাবু, আমার এতটা অসুগ্রহ করবেন? উৎসাহে বলল করে উঠল সুরদাস, আরে, আদেশ কর। এত হুঁচক কেন?

—আপনি এবার যান। আর কখনো এখানে আসবেন না।

—হুমি আমার যেতে বলছি?

—হ্যাঁ। নিরুত্তাপ গলার পামা বলল।

এত সহজে এমন মর্যাদিক কথা গুনতে হবে, সুরদাস বুঝি জীবনে কখনো কল্পনাই করেনি। জীবনে যে নারীর মূল্য কেবলমাত্র টাকা নিয়ে মেপেছে, সে স্তম্ভাবগে কী জিনিস, তা জানবে কেমন করে? সুরদাস বখন দেখলো পামার মন কোন কিছুই বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সে অস্ত রাত্তা ধরলো। সমাজের ওপর বিবিরে দিতে চাইলো পামার মন। ভেবেছিলো সামাজিক আঘাতে নিকরই ওর মন ভেঙ্গে পড়বে। তাই আমার ওপর দোষ

চাপিয়ে দিলো অমায়ালে। আমি দাবিহীন। পামার প্রতি উল্লাসী। তার সম্মান আমি বধ্যবধ রাখতে পারি না। আমি তাকে বাড়ির দাঁড়ানী কিংবা যির চেয়ে বেশী মর্যাদা দি' না। পক্ষান্তরে সুরদাস পামাকে রাগীর মর্যাদা দেবে বলে প্রতিজ্ঞা দিল।

বেশ ধানিকরণ সুরদাস ঘর থেকে বেরল না। আমি আমার উপস্থিতি জানাবার জন্যে গলাথাকারি বিলুম। ওরা কেউ গুনতে পেরেছে বলে মনে হোল না। কারণ কোন পক্ষ থেকেই বাস্তবতার লক্ষণ দেখা গেল না।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পামা বললো, কৈ গেলেন না?

মরিয়া হয়ে সুরদাস বললো, আমি বাবাবর জন্যে আসিনি। বাই তো তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

সুরদাসের সীমাহীন স্পর্ধার আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলুম। অসহ্য একটা মেয়ের ওপর তাহলে সে বলপ্রয়োগ করছেও কুচিত হবে না। একেমন মাহুয়? ভালবাসা দিয়ে যাকে পাওয়া গেল না, তাকে জোর করে পাবার প্রবৃত্তি হয় কেন? দেখ কি মনের বিদে মেটাতে পারে? সুরদাস কী মারাত্মক ভুলই না করল। সে যে আর কোন দিন পামার মন ভয় করতে পারবে না, তাতে আর আমার কোন সন্দেহ হইলো না। সুরদাসের চাওয়া দেখ-সর্বস্ব। যে—রাত্তা দিয়ে গেলো পামার মন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারতো, হুঁত্যাগক্রমে সুরদাস সে-রাত্তা মাড়াল না। আমি তা হলে জিতছি। সুরদাসের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। নিজেকে এমন শোচনীয় ভাবে সুরদাস হারিয়ে দেবে ভাবতে পারিনি। পেশা ওর দালালী। একটা দালালের পেশাগত যে বাক-চাতুর্য, বৈধ্য আর সত্বন থাকে সুরদাসের তা নেই বোঝা গেল।

আর বাইরে কীভাবে থাকা বৃক্তসঙ্গত মনে করলুম না। পামার মন নিয়ে যে পরীক্ষা আমি করেছিলাম, তাতে পামা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর পর আমি একুণি যদি নিজের উপস্থিতি না জানাই, তবে সুরদাস একটা কিছু করে ফেলতে পারে। সুরদাস এখন একটা আহত বাঘের মতোই হিংস্র হয়ে উঠেছে।

পায়ের আঙঠাজ তুলে আমি ঘরের ভিতর ঢুকতেই হুজনে সচকিত হয়ে উঠল। সুরদাসের উদ্ভাত্য তখন স্পষ্ট অসহ্যর সজ্জার ছাপ। আমি সহজ সরে বললুম, আরে সুরদাস যে। পামাকে পৌছে দিতে এসেছিলে বুঝি?

আমতা-আমতা করে, সুরাস বললো, এই—ইয়ে, মানে—
মনের মধ্যে যে গুমোট হাওয়া জমেছিল, সেটা কাটিয়ে দেবার
জন্তে পামাকে বললুম, এক গ্রাস জল দাও তো।

পামা জল গড়িয়ে আনতে গেল রাগাবার থেকে। এই অবসরে
সুরাসকে আমি বললুম, তা হলে, সুরাস, তুমি ঘরে গেলে?
জবাব হয়ে গেল সুরাস।

রবীন্দ্র হালাল সুরাস এখনো বুঝে উঠতে পারছে না আমি কী
করে ওই মনের কথা বুঝতে পেরেছি। ওর চোখে প্রথমে কুট
উল বিষয়, তারপর ঊর্ধ্ব আর তারো পরে লজ্জা। মাথা নীচু
করে রইল সুরাস।

এ অবস্থার পরাজিতের মনে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়।
তবে সমবেদনার জেলে পড়লেও ইচ্ছে হলো না। নিজের
শক্তির ওপোর অগাধ বিশ্বাস ছিলো সুরাসের। কোনদিন
কোন মেয়ের কাছে মাকি হার স্বীকার করেনি। তাই হেরে বাওয়া
কী জিনিস সুরাসের তা জানতে বাকী ছিল। আজ বখন বুঝতে
পারলো পামাকে লোভ দেনিরে বন্ধীভূত করা সম্ভাব্য নয়, তখন আর
তার কৌশল বললাবার সময় ছিল না। বড় কেহীতে সুরাস তার
তুল বুঝতে পারলো। ভালবাসার বেলায় যে-কোন তুলই খুব
ক্ষতিকর। সব মেয়েই যে এক বকম হবে, সে মেয়ে ভালোই
হোক আর মন্দই হোক, তার কোন মানে নেই। আচ্ছা,
সুরাস যদি এটা আগে একটু বুঝতে পারতো।

পারলেই বা। কী আর হোত? আমাকে না হয় আর একটু
সতর্ক হতে হোত। আরো তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হতো পামার মনের
ওপোর। যে স্বভাবতই গভীর অথচ পরিহাস-নিপুণা তার সঙ্গে
সাদামাটা সুরাস পামা দিতে পারবে কেন?

জল খাবার পর পামাকে বললুম, তুমি শুয়ে পড়। আমি
আসছি। চলো সুরাস, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে
আসি।

—না না। রাত অনেক হয়েছে। তোমার আর কষ্ট করে
বেতে হবে না। সুরাস তাড়াতাড়ি বললো।

বুঝতে পারলুম, সুরাস আমার সঙ্গে এখন এড়িয়ে বেতে পারলেই
বাঁচে। কোন কথা বলতে রাজী নয়। মনে মনে সে যে কী প্যাঁচ
করছে বুঝতে পারলুম না। সামাজিক কিছু আবার করে বসবে
না তো? অবশ্য আজকের মতো বা হবার হয়ে গেছে। তবে
ডিম্বাশয়ের কথা বলা যায় না। যদি এ পরাজয়ের প্রতিশোধ
দিতে গিয়ে পামার দৈনিক কোন ক্ষতি করে বসে? আজকাল
তো প্রায়ই এসিড দিয়ে খুব পুড়িয়ে দেওয়া, ছুরি দিয়ে
কেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া একটা বেওহাজ হয়ে গেছে।
আমি বুঝতে পারি না, এ আবার কী ধরনের ভালবাসা যে,
বাহিত্র জনকে না পেলে তার কোন ক্ষতি করতে হবে!
এটাকে মনের কোন বিকার হয়তো বলা চলে। কী জানি।
আমি মনস্তাত্ত্বিক নই। হয়তো মনস্তত্ত্ববিদেরা এর কোন মানে
খুঁজে বার করতে পারেন। বাই হোক, পামাকে মোট কথা
সাধন করে দিতে হবে।

সুরাস চলে যাবার পর ভারী মন নিয়ে পামার কাছে ফিরে
এলুম। এতো রাত হয়ে গেছে, অথচ বুঝ আসছে না। পামা

আমাকে দেখে উঠে বসল। হাঁটুর ওপোর খুঁতনি রেখে আমা
দিকে চেয়ে রইল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু অল্পমনস্ত হবার ভান করলুম।
কোন বকমেই পামার সঙ্গে আর সুরাসের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা
করবার প্রস্তুতি আমার হলো না। বেশ বুঝতে পারছি, পামা
আমার পতীকার ব্যাপার অস্বাভাবিক করে কেলেছে এর মধ্যে। নইলে
যে-কোন পুরুষ একত্রে একটা কুকক্ষেত্র বাধিয়ে তুলত।

—তুমি তা হলে জিতে গেলে, না? পামা তির্যক হেসে বলল।
আমি আগে বুঝতে পারি নি, কেন সুরাসকে তুমি এত প্রচুর
দিতে। আজ বুঝতে পারলুম।

—কী বুঝলে তুমি?

—বুঝলাম, মেয়েদের তোমরা বাজারের পণ্য ছাড়া আর কিছু
ভাবো না।

—তা হলে তুল বুঝেছ।

—মেয়েরা যে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নিয়ে জন্মায়, তাহলে সেটাও
তুল, কী বলা?

—কী অস্বাভাবিক নিয়ে মেয়েরা জন্মায় জানি না। তবে এইটুকু
জানি যে, মেয়েরা সত্যিকারের কাউকে ভালোবাসলে, তার প্রতি
কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

—পরিবেশ কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করতে সময় সময় বাধ্য
করে।

পামাকে আর ঘাঁটাতে সাহস হলো না। হয়তো বিগত
জীবনের কথা মনে পড়বে। আর একবার বা হারিয়ে গেছে, বা
কোন দিন কোন অবস্থাতেই ফিরে আসবে না, তা মনে পড়লেই
কানতে বসবে। ওকে হুঁখ দিতে মন চাইল না। এমনিতে
আজ ও অনেক হুঁপ পেয়েছে। আশ্চর্য্য এক অস্বাভাবিক হয়ে
গেল মন।

—তুমি ঘুমোও। আমি পামাকে বললুম, আমি একটু কাঁচ
সেয়ে নি। অল্প সময় তোমার কাঁচর উত্তর দেওয়া হবে।

উত্তর ওর জানা আছে। মর্মান্তিক ভাবেই জানা আছে।
পরিবেশ কেমন করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করায়। আমার উত্তর
অপেক্ষায় ওকে থাকতে হবে না।

ভোর হবার একটু পরেই কানাই-এর বাড়ির উদ্দেশে বেগিয়ে
পড়লুম। কানাইকে সাহায্য করা আমার উচিত। তাছাড়া ওর
আত্মীয় বলতে, বন্ধু বলতে আমি ছাড়া আর কে আছে? ঘর-
সংসার গুছিয়ে দেবার জন্তে অবশ্য স্ত্রীলোকের সাহায্য ছাড়া চলেবে না।
তবু একজন পুরুষমহাশয়ের উপস্থিতি মনের জোর অনেকটা বাড়িয়ে
দেয়। আর কিছু না হোক পরামর্শ দেবার মত একজনকে চাই-ই
চাই। অনেক সময় নিজের মনের কথা কাউকে শোনাতে পারলেও
শান্তি পাওয়া যায়।

কানাই উপহার পাওয়া লরীটার তদারক করছে দেখে খুশি
হলুম। নতুন বো নিশ্চয় দিন করেক বাদেই বুঝতে পারবে
যে সে বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় একটা সতীন সঙ্গে
করে এনেছে। তখন নিশ্চয়ই তার আর লরীটকে ভালো
লাগবে না।

আমাকে দেখে কানাই হাসিমুখে এগিয়ে এলো।

—নয়ন, পাড়ীটার একটা নাম দাও।

—নাম তো বা হয় একটা দিলেই হোল।

—না না। নামকরণের জন্তে দস্তুরমতো আমি খটা করব।

—শেকি! আমি কানাই-এর উক্টো খেয়াল দেখে অবাক হলাম।

—তুমি বুঝে পারছো না, নয়ন! খাবার দাবার তো অনেক বেঁচে গেছে। তাই নিয়ে আজই আমি একটা উৎসবের আয়োজন করতে চাই। বাড়তি খবটা তো আর লাগতে না। মাঝখান থেকে বাবের বাবের বলা হয়নি, তাদেরও নিমন্ত্রণ করা হবে এই উপলক্ষে।

আমি ওর বুদ্ধির প্রশংসা করে চললুম, বেশ তো। এটা উত্তম প্রস্তাব। খাবারের সঙ্গতি করতে আমি কোনদিন পেছপা হইনি। লাগাতো ধুম খাড়াগা।

—সে তো হোল। কিন্তু আগল কাজটা কর। একটা নাম ঠিক কর।

—নামের জন্তে তাবনা কি? 'দীনবন্ধু' 'পথের সানি', এরকম বা হয় একটা দাও।

—উহু! ও সব বস্তাপচা নাম চলবে না। আমাদের জীবনের সঙ্গে মিল আছে, এমন একটা নাম দাও।

—সেটা ভাট, ভেবে বলতে হবে।

—ভাবো একুশি।

—আরে একুশি ভাবা বায় নাকি? আমি অসহায়ের মতো বলি। জীবনে এরকম অবস্থায় কখনো পড়তে হবে জানলে দু'-চারটে নাম না হয় আগে থেকে বানিয়ে রাখা যেত। কোনদিন কেউ নামকরণের জন্তে আমার সাহায্য এভাবে চাইবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। নাম দেয় নামী লোক। আমি তো অতি সাধারণ একটা লম্বাওয়ালা। অহত্বার একটু হোল মনে মনে।

কানাইকে অস্তর দিয়ে বললুম, তুমি জোগাড় বস্ত্র করে কেল উৎসবের। আমি তোমার লম্বা একটা অসাধারণ নাম দেব। বায় মানে বলতে বলতে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে কানাই কয়েক জায়গায় নিমন্ত্রণ করার পর বললো, চলো আমাদের পুরানো বাসার বাওয়া বাক।

বাড়িতে এসে কানাই পামার কাছে বসে পড়ে বললো, বৌদি, আমার ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, কালকের বাণ্যারে আমার বিনুমাত্র দোষ ছিল না। আমি খুব অসহায় ছিলাম বলেই তোমার চোখের জল কেল আমার বাড়ি থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। আমি আজ একটা উৎসবের আয়োজন করেছি। উৎসব আর কিছুই নয়, আমি বিয়েতে যে লম্বাটা পরেছি, তার নামকরণ করা হবে। তুমি হবে প্রধান অতিথি। ভয় নেই, আজ তোমাকে কেউ কিছু বলার সার্থা দেখাতে পারবে না।

—কেউ কিছু বললে, তার মুখ আটকাবে কেমন করে, ঠাকুরপো? পামা বিষমহয়ে জানতে চাইল।

—সে ভাব আমার ওপরে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, বৌদি! আমি জান কুল করলাম তোমার কাছে। দেখে নিও, তোমার ঠাকুরপো আজ তার কথা বাঞ্ছতে পারে

কি না পারে। দুট গলায় কানাই পামাকে আশ্বাস দিলো।

—ঠাকুরপো, কিছু মনে করো না। আমাকে আর কিছুই যথো জড়াতে দেও না। তুমিও দুঃখ পাবে, আমিও পাবো। তুমি জানো না আমি কী দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি। ভাল হবে কেনে যে জিনিসে হাত দিতে চাই, তাই মল হয়ে পাঁড়ায়।

—তার জন্তে তুমি তো দারী নও, বৌদি।

—কাউকে আমি দারী করতে চাই না, ভাই! আমি শুধু একীবন থেকে মুক্তি চাই।

মুক্তি চাই বললেই—

আমি এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা ছিলাম। কানাইকে বাধা দিয়ে বললুম, কানাই এখন এত করে বলছে তখন আজকের দিনটা অন্তত কানাই-এর আশ্রয় তোমার রাখা উচিত। পামা, চলো আমরা সবাই মিলে সকলের স্বাস্থ্য পান করে বিগত দিনের খালা ভুলে যেতে চেষ্টা করি।

কানাই আমার দিকে চেয়ে বাগতবরে বললো, স্বাস্থ্যপান আজ সকলের সঙ্গে বৌদি করতে পারবে না। অন্তত আমি তা হতে দেবো না।

—বেশ বেশ। তোমরা নিজেরা ঠিক কর কী করবে। আমি ওতে আর নেই। আমাকে নাম ঠিক করতে বলেছ। আমি নাম ঠিক করে পামাকে দিয়ে দোব? পামা নামকরণ করে দেবে।

আমি ওদের রেখে বাটরে বেরিয়ে পড়লুম কাজের সম্মানে।

শেষ পর্যন্ত কানাই পামাকে হাজির করলো নামকরণ অমুঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে। সভাপতি হলো মহিম হালদার। লোকজন বেশী নয়—শ্রম তিরিশেক হাজির হলো। বেশী ভাগ মহাজন আর লম্বাওয়ালা। তা ছাড়া দর্শক হিসাবে মজা দেখতে এলো দুড়ি-পটিল জন। আর কোথাও কখনো লম্বা নামকরণের উৎসবমুঠান হয়েছি কি না জানি না! এই অমুঠান ব্যাপার দেখবার জন্তে আরো বেশী সংখ্যক লোক দর্শক হিসাবে উপস্থিত হবে এ আশাই করছিলাম।

পুরোহিত স্তোত্র পাঠ করা শেষ করবার পর, নামকরণের জন্তে পাঁচটা গি-ব প্রদীপ জ্বালানো হলো।

লম্বা বনের সামনের দিকে সিঁদুরগোলা দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে পামা ভয়ে-ভয়ে গলায় যে ঘণা কলো, নাম দিলুম, 'ঐরাবত'। সঙ্গে সঙ্গে নারকেল ভাজার আওয়ার মিশলো শাঁখ আর কাসর-ঘটার শব্দে। দুপধুনা গুগল চারদিকে একটা পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো। হে-হে করে জয়ধ্বনি দিলো উপস্থিত সকলেই।

কানাই-এর অমুঠানে পামা সবাইকে মিষ্টি দিলো। আমি আলস্য করছিলাম, হয়তো বৌভাতের রাত্তি যে কুসংস্কৃত দৃষ্ট অভিনীত হয়েছিলো আজো তাই হবে। কিন্তু দেখলুম আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি কানাইয়ের। এটা কোন সামাজিক অমুঠান নয়। কানাই পামাকে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলো যে সমাজসংস্কারে নিজের অহমিকা বজায় রাখবার জন্তে যে-দুস্তর অবতারণা করেছিলো, ব্যবহারিক জীবনে তার কোন দামই নেই। বারা পামার উপস্থিতি সহ করতে পারেনি, আজ তারাই নিঃশব্দে বিনুমাত্র প্রতীহার না করে তারই হাত থেকে মিষ্টি নিয়ে খেতে আগন্তিক করলো না।

পামাকে লালপাড় গরুর শাড়ীতে আঁতি খুলার মানিয়েছিল। ওকে দেখে যে-কোন লোকের মনে হবে যে বড় একজন মোটরওয়ালা সমাজসেবিকা—যে অবসর বিনোদনের জন্তে একটা কিছু করার দরকারে সমাজ কল্যাণের পথ বেছে নেয়। আহা, প্রাণের তাগিদে ক'জনই বা কাজে হাত লাগাতে চায়। তাই যদি হোত তবে দেশের অবস্থা কত আগেই না ভাল হয়ে যেত। বার আগে বতরু পড়েছে, সে যদি ভতরুই ভাল ভাবে করতো, তবে পঞ্চাবধিক কল্যাণগুলির সার্থক রূপায়ণ কত সহজই, কত কম পরচেষ্টা না হোত। যদি ইঞ্জিনিয়ার কাজে কানেক না দিতো, অথবা ঠিকাদার কমদামের মাল না চালাতে চেষ্টা করতো।

সভার কোন জারগা থেকেই যখন কোন গোলমাল দেখা গেল না, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। সুদাস এক অবসরে আমার চুপি চুপি বলে গেল, বাক পামার সমাজ-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। আর কোন ভয় নেই।

ভয় নেই বললেই তো আর ভয় চলে যায় না।

সংগী চলে বাবার পর পামাকে মহিম বললো, শোন বোঁমা, বৌভাতের রাতে যে অভয় ব্যবহার পেয়েছো, তার জন্তে মন খাঁচাও করো না। আমার সবাই তার জন্তে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

পামা ঘোমটা শুণ্ড একটুখানি টেনে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কানাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে সৌজন্যসূচক দু-চারটে কথা বলে আমরা—আমি আর পামা ফিরে চললুম বাড়ির দিকে।

মৌনী পামা অত্যন্ত ভয়বহ। আজ এতদিন ধরে ওকে দেখছি, কখনো, হাজার দুঃখের মধ্যেও, হাসি ছাড়া কথা বলেনি। আমার অকমতা ওর কাছে প্রচণ্ড কৌতুক। কখন কখন আমাকে রাগানো ওর বিলাস। ওর মানসিক পরিবর্তন আমার দারুণ ভাবিয়ে তুলল।

হঠাৎ গলা পরিষ্কার করে পামা আমার বললো, রাগ করোনি তো?

আমি ব্যস্তে পারলুম, কেন এ প্রশ্ন পামা আমার করল। কানাইয়ের লরীর নাম আমি বা ঠিক করেছিলুম, পামা তা রাখেনি। ও নিজের ইচ্ছে মতো একটা নাম দিয়েছে। নিশ্চয় ওর কোন মতলব আছে তবে আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি।

—না। রাগ করবো কেন? তা ছাড়া, তোমার দেওয়া নাম খুব সুন্দর হয়েছে। আমি ওকে সাধনা দিয়ে বলি।

কৃতজ্ঞতার ওর চোখ ছলছল করে উঠল। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ নীচু হয়ে প্রণাম করলো।

আমার বিব্রত ভাবকে আমল না দিয়ে পামা বলে চললো, তুমি তো কৈ জানতে চাইলে না, কেন আমি তোমার দেওয়া নাম পাঠে দিয়েছি? তুমি জানতে না চাইলেও আমার বলা দরকার হয়ে পড়েছে। তুমি তোমার দেওয়া নামের যে মানে করেছ, তা তোমাদের জীবনে খাপ খায় না। ঠাকুরপোা বিয়ে করে সৎসারী হল। তুমিও মনে মনে সৎসারী হতে চাও, কেন না আমাকে তুমি বহুবীর অহুবেদ্য করেছ। ঘর ছেড়ে তোমরা বাইরে বাও, কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন বাসে কিরবার জন্তেই। কিন্তু ভাবোতো সত্যিকার 'অনিকেত' কে? তুমি তো ঐ নাইই আমার বলতে বসেছিলে?

পামার মানসিক স্বাস্থ্য অস্বাভাবিক ভাবে ওর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বসেছে। ও আজ কেবল দুঃখের কথাই আমাকে বলবে। আর বলে শান্তি পাবে। যদি এভাবে ও শান্তি পায়, পুরানো ঘটনা তুলে যেতে চায়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কাউকে না কাউকে মনের কথা বলে বলা দরকার। তাতে গুলীভূত বেনার খানিকটা উপশম হতে পারে।

কিন্তু তুল ভুল পামার পরের কথা।

—তোমার জিমিষপত্র কোথায় কী আছে দেখে নাও। পামা আমাকে একেবারে ধরাধারী করে দিলো।

—সে সব যে বোঝবার তাকে বোঝাও গে। আমি কোন দিন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আজও ঘামাতে পারব না। আমি পত্রিকার জবাব দিয়ে দিলুম।

বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না পামাকে। আমাকে এক গ্রাম মিছরির সবকট এনে দিলো। তারপর সন্ধ্যানীপ জালিয়ে দাঁখ বাজালো। ঘরের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সে যখন মন দিলে, তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলুম। একটা ক্ষণ মাল পৌঁছে দিতে হবে কলকাতার।

গোলা থেকে মাল বোঝাই করতে করতে ভাবছিলাম, এবার যখন আমাদের দুটো লরী হল, তখন একটা সমবার সমিতি করে পরিবহন ব্যবস্টাটকে আরো বাড়িয়ে দিলে কেমন হয়। কানাইকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা। তাহলে 'শিশুকেটওয়ারা'র সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দেওয়া হবে।

ঝড়ুয়া চালান হাতে নিয়ে ফিরে এলো। মাল তোলা বেশ তাড়াতাড়ি তা হলে শেষ হয়েছে বলতে হবে। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে কলকাতার দিকে এগুতে লাগলুম। আবার সেই নিশ্চিন্ত রাত। হারেনার থেকে থেকে বিজী হাসি। হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গিয়ে রাস্তা পিছল হয়ে গেছে, ধারে ধারে অনেক জারগার ভল জমেছে গর্তে, কাদায় ভক্তি জারগায় গাড়ীর চাকা একবার পড়লে তুলতে বেশ বেগ পেতে হবে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে বেশ আসছিলাম। পথের ধারে দেখি গঙ্গারাম ঠেলাঠেলি করতে তার একটা লরী। চাকা পিছলে যাচ্ছে। রাস্তার উঠাতে পারছে না। আমি নিজে থেকেই গাড়ী থামিয়ে এগিয়ে এলুম ওর দিকে।

—কী ব্যাপার, ভায়া? নীচে কী জরুর খুঁজতে নেবেছিলে নাকি? আমি ঠাটা করে বলি।

—না ভাই। একটা গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে এই হাল হয়েছে। গঙ্গারাম আমার বলল।

—খেলুপাতা লাও চাকার তলার-ভইলে চাকা উঠবে না।

—তুমি একটু তোমার গাড়ী দিয়ে ঠেলে লাও না, ভাই! সত্যতরে অহুবেদ্য করলো গঙ্গারাম।

—আরে বাপস। আমার বোঝাই গাড়ী। বোঝাই গাড়ী নিয়ে আমি 'রিসক' নিতে পারবো না, ভাই!

—তবু তুমি জাহারমসে বাও। একেবারে রাষ্ট্রত্যাগী হাফল গঙ্গারাম।

‘জয় রামজীকি’ বলে গাড়ী ছাড়লুম।

‘ভাগলিয়া’ চেক-পোস্ট এসে গাড়ী থামিয়ে আমি একবার গ্রেট কালীতারা কেবিনে ভাঙড়ী মশারের কাছ থেকে একটা বোতল নিয়ে চললুম পামার উদ্দেশ্যে। গ্রেট কালীতারা কেবিনের জমজমাট জনতা কে পেছনে ফেলে যেতে এতটুকু মায়া আমার হোল না।

ভাঙাভাঙি বাড়ি কিরে দেখি দরজা খোলা। অশুভ হয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি সন্ধ্যাদীপ তখনো ঘলছে। এমন তো কথানা হয় না! পামা কোন দিন এরকম অববেচনার কাজ করেছে বলে তো মনে পড়লো না? পামা! পামা! বলে নিজের অজান্তেই আমি জোরে চীৎকার করে উঠলুম। ‘কা-কস্ত-পরিবেদনা!’ কেউ নেই, কোথাও নেই। মাথা আমার ঝিম-ঝিম করে উঠল।

শোবার ঘরের মাঝখানে একটা জলচৌকির ওপোর চাবির গোছা চাপা দেওয়া একটা চিঠি পেলুম। মিটমিট করে জ্বলা হারিকেনটার পলতে আরেকটু বাড়িয়ে পামার লেখা চিঠিটা পড়তে লাগলুম:

‘প্রিয়চরণঃ,

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন কতই না বদলে যায়! কাল বা সত্য ছিল, সুন্দর ছিল, আজও তাই তা থাকবে—এ আশা করা যায় বটে, কিন্তু আশা আশাই থেকে যায়।

প্রথম যেদিন তোমার হাত ধরে এ বাড়িতে উঠি, তখন আস্থা ছিল, বল ছিল, ছিল বিশ্বাস। আজ আমি চলে যাচ্ছি, এখনো তোমার ওপোর সবটুকু কোষ চাশিয়ে দিয়ে যেতে মন সায় নিচ্ছে না। কোথায় বাবো জানি না। কিন্তু যেতে আশায় হবেই তোমার শক্তির জোরে তুমি আমার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছ। সুদাস বাবু তোমার বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে নাচ্ছেন। আমিও রাস্তা হয়ে পড়েছি। যেখানে, যে-সমাজে আমার স্থান নেই, সেখানে, সে-সমাজে আমার মন আর সমাজস্থি হয়ে উঠতে পারলো না। আমার আকশোষ রয়ে গেল।

তুমি আমার জন্তে কত কী করেছ। কিন্তু বা করে উঠতে পারেনি, হয়তো সেটা একান্তই তোমার দোষ নয়, সেটার প্রতি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সুদাস বাবু ঠিকই বলেছেন; তুমি অসুস্থ আমার হয়ে বোভাতের দিন কিছু একটা করতে পারতে। শাঙ্ক, দুটো সাধনার কথাও কী বলতে পারতে না?

ঠাকুরপো বুদ্ধি করে আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলো। আর তুমি? ওগো, তোমার ওপোর যে আমার অপাধ বিশ্বাস ছিলো!

নামকরণের দিন তুমি অদ্ভুত একটা নাম দিলে লরীটার—‘অনিকেত’। মানে বলল, গৃহহীন। আমি তা মেনে নিতে পারি নি। তাই তোমার দেওয়া নাম বদলে দিয়েছি। আমার কমা করে।

আজ আমার যেতে কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্তে, কানাই ঠাকুরপোর জন্তে। জানি না কোথাও আবার আমার ঠাই হবে কি না। তবে আবার আশায় ঠাই দিয়ে কী হবে? আমি তো তোমার ভাষায় ‘অনিকেত’ নিকেতন হীন পথই আমার সখল, তাই পথের মেয়ে পথেই বেরিয়ে পড়লাম।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নাই—পামা”

চিঠিটা পড়ে অমন ভয়ে বসে রইলুম। চাবির গোছার হাত বুলিয়ে দেখলুম কী ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার চটকোড়া, গামছা, বিছানা পরিশাটি করে সাজানো। মনে হলো কে বেন আমার জন্তে ঘর সাজিয়ে প্রতীক্ষা করছে।

কী হোল? পামার হঠাৎ এ ধরণের মতিগতি কেন হল? আমি তো ওকে ভালবাসি। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালায় ও অসম্মত হয়েছে বলে আমাকে একবারও জানাবার দরকার মনে করলো না? কী নিমকহারাম মেয়েরা?

আবার ঘরের দিকে দৃষ্টি কিরে এলো। মেয়েটা কী সুন্দর পরিষ্কার আর স্বকসকে। হারিকেনের চিমনি অদ্ভুত ভাবে সালা।

না! আমি আর ভাবতে পারলুম না। একটানে বাতলের ছিপি খুলে গলার মতো নির্ভেজাল মন ঢেলে দিতে লাগলুম। বুক জলে গেল। এ জলার সঙ্গে সঙ্গে যদি পামার স্মৃতি, তার স্পর্শ বিলুপ্ত হয়ে যেতো? যদি যেতো বিগত দিনের সব হাসি-কান্নার যুহুর্ন্তগুলি এমনি করে পুড়ে থাক হয়ে। যে জীবন কামনা করেছিলুম অথচ পাইনি আর কখনো পাবো না বলে জানি, সে জীবনের কথা যদি আর ভাবতে না হোত!

যাক সব শেষ হয়ে। যাক নিঃশেষ হয়ে চেতনা লোপের নয়ম বন্ধু। জান হারিয়ে ফেলতে চাই, অনাগত ভাবে অভাবনার আশার নয়, বর্তমানকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে। জীবনের পাত্র শূন্য হতে আর কতটুকুই বা বাকী!

শেষ

“আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশ অনেক ঘুরিছি, জগতের সবক্ষে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূল ভিত্তিস্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও কাহারও আবার মানসিক উন্নতি-বিধান, কাহারও বা অস্ত্র কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, তাহাই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাণাদেয় মূল ভিত্তি স্থাপিত।”

—বামা বিবেকানন্দ।

পাগলা হত্যার মামলা

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

যে সকল মামলা কলিকাতা তথা ভারতীয় পুলিশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, "পাগলা মার্ডার কেস" বা পাগলা হত্যার মামলা উহাদের মধ্যে এক অন্যতম। এই মামলাটি সম্পূর্ণরূপেই পারিবারিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে আদালতে সোপানকৃত হয়। মাহুয় মিথ্যা কথা বললেও, পরিবেশ মিথ্যা বলে না। তাই এই হত্যাকাণ্ডটির কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও এই মানলার একজন আসামীর প্রাণরক্ষা এবং দুই জন আসামীর ব্যবস্থাবিনয়ী দীপান্তর সম্ভব হয়েছিল। এই থেকে বুঝা যাবে, কিরূপ বৈধ ও চাফুধার সহিত এই মামলা তদন্ত ও সোপানকৃত হয়েছিল। এই মামলার তদন্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাধা করা হলেও এই তদন্তরীতি পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। তাই মহাধর্ম্মাদিকরণ জাটলি খেলকার সাহেব হাইকোর্টের সেন্সে কোর্টে উহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই অসলিল তদন্তকে পুলিশি তদন্তের জঘন্যত্বরূপে অভিহিত করেছিলেন।

এই মামলা সম্পর্কিত ঘটনা ও উহার তদন্ত জনসাধারণের মনকেও কম আলোড়িত করে নি। কারণ, এই মহাতদন্তে পুলিশের জায় জনসাধারণেরও বহু ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ ঘটনার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই হতভাগ্য নিহত ব্যক্তি ও উহার হত্যাকাণ্ডের বিষয় জনসাধারণ আজও ভুলে নি। উত্তর-কলিকাতার গৃহে গৃহে এই ঘটনাটি আজও আলোচিত হয়ে থাকে। এই ঘটনার নারিকা ছিল এই শহরের এক অসুখী স্ত্রী নারী। এই নারীর অদম্য ভালবাসা একাধারে নিহত ব্যক্তি ও তাহার হত্যাকাণ্ডের উপর পড়ে। ইহাই ছিল এই অভাবনীয় ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ। তাই বহু বৎসর ধরে বহু সাহিত্যিক ও ঐ ঘটনাটির সল্যাবহার করেছেন। উপরন্তু এই মামলার তদন্তে পুলিশ বিশেষরূপে জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্যলাভ করেছিল। তাই মামলাটিকে এই সম্পর্কে আজ পর্যন্ত একটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

এইবার মূল ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক। এই সময় আমি গ্রামপুত্র থানায় একজন অফিসাররূপে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন তারিখ ছিল ১৯৩৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। সকাল আটটার সময় আমরা থানার অফিস-ঘরগুলিতে নিজ নিজ কাজকর্মে মনোনিবেশ করছি, এমন সময় কলিকাতা করপোরেশনের ওভারসিয়ার বাবু বিনয়কুমার দাস হস্তান্তর হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ভ্রমলোকের সঙ্গে আমার পূর্বে হতেই পরিচয় ছিল। বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরে ব্যাপার কি মশাই! আপনার আবার কি হল?' ভ্রমলোক নিজের 'স্বপ্নে' কোনও কথা বলতে আসেন নি। তিনি চোখ দুটি বড় বড় করে বলে উঠলেন, 'সাহায্যিক কাণ্ড মশাই, জীবনে এ আমি দেখিনি। খুড়টা পর্যন্ত কেটে দিয়েছে।' এক সঙ্গে

আমাদের সব কর্মজনেরই হাতের কলম খেঁচে গেল। ঘটনাটি নিকট শুনা মাত্র আমি হবিলদারকে একজন জমাদার ও দশজন কনেষ্টবল তৈরি করবার জন্ত আদেশ দিয়ে, ব্যস্ত গতিতে সংবাদবহিতে প্রাথমিক সংবাদরূপে তাঁর নিম্নোক্ত বিবৃতিটি লিখে নিলাম।

"আমি একজন করপোরেশনের ওভারসিয়ার। সকাল ছয়টার সময় আমি প্রতিনিয়ের মত এই দিনও মেথরদের কাজে খবরদারী করতে বার হই। ঘুরতে ঘুরতে আমি বলরাম মজুমদার স্ট্রীটে এসছি, এমন সময় আমাদের বাড়িদার মোহন সমুখের মেথর-গলি হতে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, 'বাবু বাবু, ভিতরে একটা খুড়কাটা শাদ পড়ে রয়েছে।' আমি সাহস করে ঐ গলির ভিতর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা খুড়হীন দেহ দেওয়ালের ভিতর একটা গর্তে ঢুকানো রয়েছে। এর পর আমি মোহনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে আপনাদের খবর দিবার জন্ত ছুটে ছুটে থানায় এসেছি।"

উপরি-উক্ত প্রাথমিক সংবাদটি থানায় নথিভুক্ত করে আমি ইনস্পেক্টার সুনীল দাস এবং অস্ত্রাস্ত্র অফিসারদের সহিত ব্যস্ত গতিতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা ছিলাম। কোনও গুরুতর অপরাধের তদন্তে সর্কাসপেক্ষ প্রয়োজন বশাসত্ব ঘটনাস্থলে গমন, তা না হলে বিলম্বের কারণে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট বা অস্তিত্ব হারায়। ঐ সময় অধুনাকালের জায় থানায় থানায় হস্তশক্ত দেওয়া ছিল না। এই জন্ত নিজ খরচায় ট্যাক্সি করেই আমরা ঘটনাস্থলে গমন করি। তা'ছাড়া অধিক অফিসার সঙ্গে নেওয়ার একটি কারণও ছিল। কারণ, ঘটনাস্থলে এমন অনেক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে, যার জন্ত এক একজন অফিসারকে এক এক দিকে বিদ্যুৎগতিতে পাঠানোর দরকার হতে পারে। এইজন্য সকল বলে মাত্র পাঁচ বা ছয় মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছিয়েছিলাম।

ঘটনাস্থলটি ছিল একটি অফিসারের মেথর-গলিতে। এই অর্থাৎ (পরে প্রমাণ্যত) গলিটি কুমারটুলি অঞ্চলের বলরাম মজুমদার স্ট্রীট হতে নির্গত হয়ে দুই সারি বৃহৎ বিনতল অটালিকার পশ্চাদ্ভাগের মাধ্যমে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এর অপর খুড়টি ধরে কিছুটা দূর এগিয়ে গেলে শোভাবাজার স্ট্রীট পর্যন্ত অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ সকল বাটার পশ্চাদ্ভাগে এমন একটিও দরজা ছিল না, যেখান দিয়ে কেহ এই গলিতে বেরিয়ে আসতে পারে। বস্তুত: পক্ষে এক করপোরেশনের মেথর ও বাড়িদার ছাড়া এই মেথর-গলি বা সুর্য্য-ডিউ অপার আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হবার কথা নয়।

এই মেথর-গলিটি দিয়ে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে আমার মনে হল যে, এই গলিটার সহিত একমাত্র 'নিউ' চোরগণ ব্যতীত আর কারও পরিচয় থাকবার কথা নয়। এইজন্য যেতে যেতেই আমি

ইনসপেক্টর বায়কে বললাম, 'দেখুন আমার মনে হয় হত্যাকারী একজন সিঁদেল চোর বা ডাকাতও বটে।' বিস্মিত হয়ে আমাকে সুনীল বাবু বললেন, 'এ কি বলছে! তুমি? যে সিঁদেল চোর সে তো খুন-ডাকাত কখনও হয় না? এই সম্পর্কে বিলাতী বইগুলো তো জ্ঞান রকম বলে।' এই সথকে করে একটি বিলাতী ক্রান্তার আমারও পড়া ছিল। কিন্তু তাদের সহিত সব কয়টি বিষয় আমি একমত হতে পারিনি। কারণ ঐ সবকে আমার নিজেরও অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। তাই উত্তরে আমি বললাম, 'লেখুন সিঁদেল চোর, ডাকাত ও খুন আমার মতে এক শ্রেণীরই তিনটি উপশ্রেণী। কারণ এরা সবাইই বধু কিংবা ব্যক্তির উপর বলপ্রকাশ করে থাকে। এইজন্য যে সিঁদেল চোর সে খুনও করতে সক্ষম। তালাতোড়রা নিশ্চর্যজনে আঘাত না হানলেও প্রয়োজন হলে আঘাত হানে। এইজন্য উদ্ধারের মধ্যবর্তী অপরাধী বলা হয়ে থাকে। ডাকাতরা একাধারে দরজা-জানালা বা দেওয়াল ভেঙে সম্পত্তি অশ্রবণ করে এবং প্রয়োজন হলে ভয় দেখায় বা খুনও করে। তবে একজন নির্দল চোর, অর্থাৎ যে কোনও বস্তু কিংবা ব্যক্তি, কারও উপর কোনও অবস্থাতেই বলপ্রকাশ করে না, সে সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধী। এইজন্য এরা কখনও হত্যাকাণ্ড করবে না। এই কারণে আমার মনে হয় যে, এমন ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ড করেছে যে ঐ অঞ্চলে সব বা সিঁদেল চোরের কার্যের জ্ঞান এই গলিটি পূর্বে ব্যবহার করেছে।'।

এই ভাবে কথাপকথনের মধ্যে আমরা মূল ঘটনাস্থলে এসে তত্ত্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গলির তলদেশ হতে প্রায় চারি ফুট উর্দ্ধে একটি বাটার পিছনের দেয়ালের ভিতরকার একটা গর্তে উপড় অবস্থার একটা মুণ্ডহীন দেহ রাখা রয়েছে। মস্তকটি বেশ বয়স্ককারে স্বচ্ছদেখা যেন পেঁচিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে। ঐ মৃতদেহের নিয়ে কোনও রক্ত দেখা না গেলেও উহা হতে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দুইটি রক্তের চাপড়া দেখা যায়। সতর্ক দৃষ্টির সাহায্যে আমরা উহাদের বাটার দেওয়ালেও রক্তের কঁটা দেখতে পেলাম। বেশ বুঝা গেল, এইস্থানেই ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং তার ফলে রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠে দেওয়ালের গায়ে লাগে। এর পর ঐ মৃতদেহটিকে ধরাধরি করে তুলে ঐ গর্তের মধ্যে ঘূসে রাখে। কিন্তু ঐ ভাৱি মৃতদেহটি অত উপরে তুলে রাখার জন্য একাধিক লোকের প্রয়োজন। এইজন্য আমরা ঐ সময়েই বুঝে নিই যে, হত্যাকারী একজন নয়, তারা নিশ্চয় দুই তিন বা ততোধিক ব্যক্তি।

এইবার কেহ কেহ ঐ দেহটি নীচে নামিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কিন্তু আমি ও সুনীল বাবু এই সথকে একমত হতে পারলাম না। এইজন্য আমরা ফটোগ্রাফার, প্রানমেকার ও ফিসার ও ফুট প্রিন্ট এক্সপার্টের জ্ঞান অপেক্ষা করা সমুচিত মনে করলাম। বলা বাহুল্য, আমরা ঘটনাস্থলে রওনা হবার পূর্বেই ঐ তিন ব্যক্তিকে সোজা ঘটনাস্থলে আসবার জন্য ফোনে বলে দিয়েছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ এক্সপার্টের অকুস্থলে উপস্থিত হলে আমরা প্রথমেই ঐ গর্তস্থ মৃতদেহটির একটি আলোকচিত্র তুলবার বন্দোবস্ত করলাম। কারণ তা না হলে জজ ও দুবিগণ প্রয়োজনবোধে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে হয়ত আপন আপন ধ্যান-ধারণা বশতঃ বলে বসন্তেন যে, ঐ অপরাধের গর্তে অত

বড় একটি দেহ প্রবেশ করিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। আমার বেশ মনে পড়ে, এই সম্পর্কে আমার সহকারীদের ঐ সময় আমি বলেছিলাম, 'আমাদের প্রতিটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে তাদের কথা ভেবে বাদেই কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা না হলে আমাদের সকল পরিশ্রম এক দিন ব্যর্থতার পর্যায়সিদ্ধ হবে।'।

এইখানে ফটোগ্রাফার কার্যের পর ঐ গর্ত, মৃতদেহ, অঙ্গুষ্ঠ রক্তের চাপ এবং দুই পার্শ্বের বাটারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ গলিটির আরও দুই-তিনটি ফটোগ্রাফ আমরা উঠিয়ে নিলাম। এর পর প্রানমেকার এসে উপরোক্ত প্রতিটি পদার্থের পারস্পরিক দৃশ্য দেখিয়ে অতি সাবধানে ঐ গলির পরিধি ও দৈর্ঘ্যের মাপসহ ঐ গর্তেরও একটি প্রান একে নিলেন। এ ছাড়া সমন্বিত আলোকের অভাবে ফটো তোলায় অসুবিধা হওয়ার আমরা কুমারটুলির বিখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল ও তাঁর ভ্রাতৃপুত্র মণি পাল মহোদয়দের ডাকিয়ে এনে ঐ গর্ত ও গলিটির একটি প্রাণবন্ত পেনসিল স্কেচও তাঁদের দ্বারা আঁকিয়ে নিই। এই দুই ভ্রাতৃলোক সানস্কেই বিনা পারিশ্রমিকে এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এর পর সাবধানে আমরা ঐ মৃতদেহটিকে নামিয়ে এনে উহা তাকদুস্তিতে পরীক্ষা করতে থাকি। আমরা প্রথমে রক্তের চাপের উপর বা অন্য কোনও স্থানে কোনও ফিসার বা ফুট প্রিন্ট পড়েছে কিনা তা খুঁজতে চেষ্টা করি; কিন্তু কোথাও এরূপ একটি টিপচিহ্ন আমরা পাইনি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, হয়ত কোন বাড়ীতে হত্যাকাণ্ড করে মাথার করে কিংবা লুকাটে তুলে দেহটি ঘটনাস্থলে আনা হয়েছে। কিন্তু যদিও দেওয়ালে রক্তের কঁটা সন্নিবেশিত থাকায় ঘটনাস্থল সথকে আমরা ধিমত ছিলাম না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ গলির বাইরের দিকের উপর শকটাদির চাকার চিহ্ন আবিষ্কার করতেও চেষ্টা করি। কিন্তু কোথাও এরূপ কোনও চিহ্ন আমরা বুঝে পেলাম না। এর পরে দেহটিকে উল্টোপাল্টে পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, উহার বক্ষে দুইটি গভীর দাগ আছে। এবং তদুপরি উহার উভয় পায়ে তেঁতন বা শিরাও কটে দেওয়া হয়েছে। দেহটি পুরাপুরি নয় থাকলেও তলদেশ হতে আমরা একটি রক্তসিক্ত গেঞ্জি ও একটি পৈতা আবিষ্কার করি।

এই মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমে আমাদের বার করতে হবে, ঐ নিহত ব্যক্তিটি কে? নিহত ব্যক্তির নাম, ধাম ও পরিচয় বার না করতে পারলে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা তো শক্ত হবেই, উপরন্তু এই মামলাটিও সম্যকরূপে প্রমাণ করা যাবে না। এক্ষণে মৃতের দেহাবয়বের ও উহার সন্নিবেশিত প্রাপ্ত পৈতাটি পরিলক্ষ্য করে মাত্র আমরা এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, লোকটি একজন ২৭ বা ২৮ বৎসরের দেশীয় ব্রাহ্মণ যুবক, কিন্তু সে একজন দেশবাসী, মাজাজী, উদ্ভিগা কি বাঙ্গালী তা বুঝা গেল না। এখন আমাদের প্রথম সমস্যা হল, মৃতব্যক্তির পরিচয় বার করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা মৃতদেহের পায়ে ও অঙ্গুলির ছাপগুলি সযত্ন সংগ্রহ করতে থাকি। কারণ বহু ক্ষেত্রে বার নিহত হয়, তারও সং ব্যক্তি থাকে না। এদের কেহ কেহ বিবিধ অপরাধ করার তাদের অঙ্গুলি ও পদচিহ্ন গৃহীত হয়ে পুলিশ দপ্তরে রক্ষিত আছে। অনেক সময় প্রকৃত অপরাধী না হলেও এরা মীতলামী গোলমাল বা মারপিট করার অপরাধে ধান্না সহ্যে দ্রুত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে এদের জামিনের কাগজে এদের সন্নিবেশিত

টিপসহি পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোনও দলিল প্রত্নতত্ত্বে এদের সম্বন্ধে বলা অসম্ভব নয়। যেহেতু দেহ পুড়িয়ে ফেলার পর এই সকল চিহ্ন পরে প্রয়োজন হলে আর আমরা পাবো না, সেই হেতু আমরা প্রত্নতত্ত্বই এগুলি সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। অনেক সময় নিহত ব্যক্তিদের পদ-চিহ্ন তাদের ব্যবহৃত জুতার স্মৃতিস্মারকও সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। পরে যদি আমরা এই নিহত ব্যক্তির একজোড়া জুতা আবিষ্কার করতে পারি, তা'হলেও এই স্মৃতিস্মারক উপর অঙ্কিত পদচিহ্নের সহিত এই মৃতের পদ হতে সংগৃহীত চিহ্নের তুলনা করে বলে দিতে পারবো যে, এই মৃত ব্যক্তিটিই ছিল জুতার অধিকারী।

এর পর ইনসপেক্টর রায় দেহটি আরও পরিদর্শন করে দেখলেন যে, মৃত ব্যক্তির একটি পা কুশ-শা, এবং উহার বাম বাহুর উপর একটি ফুলের উকিচিহ্নও আছে। এ'ছাড়া আমরা মৃত দেহের বক্ষে ও বাহুতে প্রচুর লোম দেখতে পেলাম। কিন্তু এইখানেই আমরা দ্বন্দ্ব হইনি। আমরা মৃতদেহের ওজন, বৈধ ও প্রস্থের মাপও গ্রহণ করতে ভুললাম না। কারণ কে বলাতে পারে যে সন্দের কারণে বা চুরি করার জন্য কোথাও তার দেহের ওজন গৃহীত হয়নি। এ'ছাড়া অন্য কোথাও হতে মৃতব্যক্তির জামা প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করে উহাদের মাপ হতে আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে, এগুলির অধিকারী এই মৃতব্যক্তিই। এইজন্য আমরা একটি ভাল দৃষ্টিকোণে ডাকিয়ে এনে এই মৃতব্যক্তির দেহদ্বয়ী কোটের ও সা-টর এক একটা মাপ তুলেও নিই। এই ভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য সমাধা করে মৃতদেহের বিভিন্ন অবস্থার আরও দুইটি আলোকচিত্র গ্রহণ করে আমরা আমাদের পুলিশ সার্জেনকে ডেকে জানাবার জন্য ট্যাক্সি সহ একজন জুনিয়ার অফিসারকে পাঠিয়ে দিলাম। কারণ সঠিকভাবে কোন সময় হস্তভাণ্ডা লোকটি নিহত হয়েছিল তা তদন্তের কারণে আমাদের আশু জানা দরকার। ডাক্তার সাহেব অনতি-বিলম্বে ঘটনাস্থলে এসে মৃতের দেহের কাঠি ও রক্তের জমাট পরীক্ষা করে বলে দিলেন যে, এই ব্যক্তিকে গতকাল সন্ধ্যা নয়টা আশ্রয় সময়ে নিহত করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইনসপেক্টর রায় নিজে একজন ডাক্তার না হলেও স্বকীয় অভিজ্ঞতা প্রসূত ইতিপূর্বেই খুনের সময়রূপে এই সময়টাই নির্দেশ করেছিলেন।

এর পর ধরাধরি করে আমরা মৃতদেহটি রাস্তার উপর এনে হাজির করলাম। স্বভাবতই প্রথম হতে একটি বিরাট জনতা সেখানে জড় হয়েছিল। এক্ষণে এই জনতা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে উঠল। আমরা জনতা অপসারিত ত করিইনি বরং চাইছিলাম যে, আরও অধিক সংখ্যক লোক এসে মৃতদেহটি দেখে যাক। বহুতপক্ষে কয়েক ঘণ্টা বাবৎ নিকট ও দূর হতে আগত বহু নাগরিককে আমরা এই মৃতদেহটি দেখে বাবার স্রবিশেষ করে দিলাম। এই খুন সম্পর্কিত সবাদ ইতিমধ্যে শহরের নানা দিকে রটে গিয়েছিল। এইজন্য বিশেষ করে নির্বোধ ব্যক্তিদের আশী্রয় দলে দলে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। কিন্তু হুভাগ্যের বিষয়, তাহাদের মধ্যে কেহই এই মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারলো না। এই কারণে বহুদূর ভাবে স্বভাবতই গারগা হবার কথা যে, এই মৃত ব্যক্তি এই অঞ্চলের কোনও বাসিন্দা ছিল না। কিন্তু শান্তিরক্ষীদের যন কখনও চিত্তপ্রভতির দ্বারা অভিভূত রাখা উচিত নয়। এইজন্য

আমরা তখনও পর্যন্ত কোনও স্থির অভিমত মনের মধ্যে পোষণ করিনি।

এর পর আমরা এই মেঘর-গলিটি পুখারপুখারপে আর একবার পরিদর্শন করি। কিন্তু খুন সম্পর্কে কোনও প্রমাণ বা চিহ্ন আমরা আর একটিও পাই নি। তবে নিকটে অপর একটি প্রাচীরের গায়ে মধ্যে আমরা একটি কুকুরকে মোহাচ্ছর অবস্থায় শায়িত দেখি। সম্ভবতঃ আমাগিগণ ব্যতীত এই একটি মাত্র জীব এই বীভৎস হত্যা দেখে থাকবে, কিন্তু এই ভীত ও ক্রম্ভ কুকুরটি মুক বিধায় সে আমাদের কোনও উপকারেই আসিল না।

আমরা প্রথমে এই কুকুরটির মালিক সন্ধান খোঁজ খবর করবার মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু করপোরেশনের মেম্বর মোহন আমাদের জানিয়ে দিল যে, এই কুকুরটির কোনও মালিক নেই এবং সে উহার প্রতিদিনই এই গলিতে ঘুরাফিরা করতে দেখেছে। কুকুরটিকে এই স্থানেরই একজন পুরাতন বাসিন্দারূপে বুঝে আমরা তদন্তের এই সম্ভাব্য পথটি তখনই পরিত্যাগ করি।

এর পর আমরা অকুস্থলের আর প্রতিটি বাড়ীর বাসিন্দাদের এই খুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তারা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনও সংবাদ দিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে এই হত্যাকাণ্ড রাত্রিযোগে এই নিরালা গলিতে সমাধা হওয়ার এই সম্পর্কে তাদের পক্ষে কোনও ধর না রাখা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

এই দিন এই দুগুহীন দেহটি পরিদর্শন করে মাত্র এইটুকু জেনেছিলাম যে, মৃতব্যক্তি জর্নেক ২৭ বা ২৮ বৎসরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। এবং উহাকে সম্ভবতঃ পূর্বরাতে আট বা নয় ঘটিকা আশ্রয় সময়ে নিহত করা হয়ে থাকবে। এই মৃতদেহ সন্ধ্যা বজোপর্যন্ত (পৈতা), রক্তের অসম্পূর্ণ জমাট এবং মৃতদেহের হাতের ও পায়ে ঢেটো সহ দেহাবয়বের স্বরূপ প্রত্নতত্ত্ব হতে আমরা এই কয়টি সিদ্ধান্তে আসি। এই দিন তদন্ত সম্পর্কে আর কোনও সরাসরি লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে পরে মৃতদেহের লোমাকর্ষ বাম বাহুতে উদ্ভিগার উৎকর্ষ একটি বেগুলা আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। মৃতদেহের বাহুর এই উকি-চিহ্ন হতে একদিন তাকে সনাক্ত করানো সম্ভব হবে বুঝে আমরা মৃতদেহটি কলিকাতার পুলিশ মর্গে পাঠিয়ে দিই। এই সম্পর্কে এই পুলিশ মর্গের রক্ষককে আমরা আরও অনুমোদন জানাই যে, শব-ব্যবচ্ছেদের পর যেন এই দেহটি তাদের বরক-বৃদ্ধ ঠাণ্ডা ঘরে অন্ততঃ পনের দিন রক্ষা করা হয়।

এর পর স্বাধীন মৃতদেহের শেঠমটমের জন্য পুলিশ সার্জেনের নিকট প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়ে আমরা তখনকার মত একটা অক্ষমতার গুনি নিয়ে ক্ষুদ্র মনে ধানায় ফিরে এলাম। প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করতে করতে এই দিন রাত্রি নয়টা বেজে গিয়েছিল। এইজন্য তদন্তসম্পর্কীয় পরবর্তী কার্যকরণ সন্ধ্যাে চিন্তা করতে করতেই আমরা যে বার নির্দিষ্ট বাসভবনে বিশ্রামের জন্য ফিরে এলাম।

পরদিন ৬ই সেপ্টেম্বর—প্রত্যুষে ভোর হটার সময় আমরা যে বার কোয়ার্টার হতে নেমে ধানার অফিসে এসে পুনরায় এই হত্যাকাণ্ড সন্ধ্যাে তদন্তের হল্যাম। ইতিমধ্যে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ হতেও দুইজন অফিসার আমাদের সাহায্য করবার জন্য এসে গিয়েছিলেন। ইনসপেক্টর শ্রীল রায়, আমি বরং এবং তাঁরা—

এই চারজন অফিসার দপ্তরমত সেখানে একটি বাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, টিমওয়ার্ক ভিন্ন এই সকল দুরূহ তদন্তের সমাধা করা দুসোধ্য ছিল। আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল তিনটি, যথা,—প্রকৃতপক্ষে খুনি কে? কে খুন হলো? এবং কখন কোথায় বা কিরূপে এই খুন সমাধা হলো? এই সময় কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগে উন্নত ধরনের কার্যপদ্ধতি বেশ এবং ক্রৌঞ্চিক ল্যাবোরেটরী স্থাপিত হয় নি। এইজন্য এরূপ আলোচনার জন্য আমাদের বাকী অভিজ্ঞতাসমূহই একমাত্র সঞ্চল ছিল। তবে হতা বৈজ্ঞানিক সাহায্য পাওয়া যায় ততটাই সুবিধা। এইজন্য দুই জন গোয়েন্দা অফিসারকে আরও তদন্তের জন্য বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ও সুনীল বাবু পোষ্টমর্টমের রিপোর্টের অপেক্ষায় থানায় উপস্থিত থাকলাম। বেলা প্রায় নব্বইটার সময় দেহব্যবচ্ছেদ সমাধা হবার পর আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত পোষ্টমর্টম রিপোর্ট থানায় এসে পৌঁছল; এই রিপোর্টের সারসংগ্রহ একটি অল্পসিপি নিয়ে উদ্ভূত করা হলো।

মৃতবক্তির বয়স অল্পমান সাতাশ বা আটশ। পাকস্থলীর পাচ্যমান খাদ্যের স্বরূপ ও রক্তের জমাট প্রভৃতি হতে বুঝা যায় যে ৪৪১ সেক্টরের ব্রাভি আন্দাজ আট বা নয় ঘটিকার এই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। অধিরিক্ত ইহাও জানা গিয়াছে যে, প্রথমে এই মৃতবক্তির বকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এই সময় মৃতমস্ত ভাবে সে পতিত হলেও তার মৃত্যু হয় নাই। ইহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি কেটে নেওয়া হলে সে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বরণ করে। অর্থাৎ তার মুণ্ডটি তার জীবিত অবস্থাতেই বর্জন করা হয়েছিল। বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গিয়েছে যে মুণ্ডটি তার মৃত অবস্থাতে বর্জন করা হয় নি।

এইবার আমরা বুঝতে পারি যে, ৪৪১ সেক্টরের ১১৩৬ সনে ব্রাভি ৮ বা ৯ ঘটিকার এই মেধর-গলিতে একজন ২৭ বা ২৮ বৎসর বয়স্ক যুবককে হত্যার করে বা ফুলিয়ে নিয়ে এসে প্রথমে ছুরি দ্বারা আহত ও পাতিত করা হয় এবং তাহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি বর্জন করে তাহার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা আরও একটি বিষয়েও বিবেচনা করি। এই ভাষি মৃতদেহটি মাত্র একজনকে শব্দে দেওয়ালের এই গহবরের মধ্যে দ্রুত করা সম্ভব ছিল না। মৃতদেহ নিশ্চয় একাধিক ব্যক্তি এই কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। এই তথ্যটি হতে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, হত্যাকাণ্ডটি দুই তিন বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই সকল বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সম্মুখে মূল তিনটি প্রশ্নই অসীমাসিত হয়ে গেল। যথা—খুন হলো কে? কে বা কারা খুন করল? এবং কি উদ্দেশ্যে তারা এই খুন করলো? এই তিনটি বিষয় অবগত হওয়া মাত্র যে, এই খুনের কিনারা করা সহজ হয়ে উঠবে তা একজন সাধারণ মানুষের বোঝে, কিন্তু এই দুরূহ তথ্য তিনটির সমাধান কে আমাদের করে দেবে? কোনও এক অভ্যাস্ত বিষয়-বস্তু অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হতে হলে গবেষণাগণ গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকটি সম্ভাব্য পরিসংখ্যাকল্পনা করে নিয়ে থাকেন। তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণাকার্য্য এই নিয়মেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তদন্তকারী রক্ষিণ এক একটি করে প্রতিটি খিওরী অনুসরণ করে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পেরে থাকেন।

একটি খিওরী কিছুটা দূর অনুসরণ করে যদি বুঝা যায় যে, সম্মুখে আর পথ নেই বা উহা বন্ধ, তাহলে তাকে কিরে এসে দ্বিতীয় এক খিওরী অনুসরণী তদন্তের কার্য্য করে যেতে হয়েছে। এমনি করে একটির পর একটি খিওরী পর্যালোচনা করে রক্ষিণ পরিপেষে দেখতে পান যে, তাদের একটি খিওরী অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে কলপ্রদ হতে চলেছে। অর্থাৎ এই অপরাধ সম্বন্ধে তারা বা অনুমান বা খিওরী করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি মিথ্যা নয়, সত্য। এইজন্য এই হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে তদন্তের সুবিধার জন্য প্রথমে আমরা নিয়ন্ত্রকরণ কয়েকটি খিওরী তৈরি করে নিই। বলা বাহুল্য, যে সকল তথ্য বা ভাটা আমরা পরিদর্শন ও অনুমান দ্বারা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম উহাদের উপর নির্ভর করেই আমরা এই সকল খিওরী সৃষ্টি করি।

(১) নিহত ব্যক্তি হয়তো নিকটস্থ কোনও জমিদার বা ধনী বাড়ীতে রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ছিল এবং তার নিয়োগকর্তারা ধনী হবে, তা না হলে রাঁধুনি রাখবে কি করে? এদেশে ব্রাহ্মণদিগকেই রাঁধুনি নিযুক্ত করা হয়। চাকররূপে তাদের নিয়োগ প্রায়শঃ করা হয় নি। পূর্বে-অভিজ্ঞতা হতে আমাদের এই সত্য জানা আছে। অতএব এই খিওরী অনুসারে নিহত ব্যক্তি যে রাঁধুনি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই জমিদার বা ধনী ব্যক্তির কোনও বিধবা বা অনুচর কন্ডার সম্বন্ধে হয়তো এই নিহত ব্যক্তির প্রেম হয়ে থাকবে। এঁদিন রাতে বাড়ীর লোকেরা এই গোপন প্রেম ধরে ফেল এঁরা রাঁধুনি বামুনকে তাদের বাড়ীতে বা এই মেধরগলিতে হত্যা করে তার পাঁচ জন মিলে দেহটাকে রাতে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই খিওরী অনুসরণী আমরা সম্মুখ এবং বিশরীত, এই উভয় প্রকার তদন্ত শুরু করি। আমরা চর লাগিয়ে জানতে চেষ্টা করি যে, অকুস্থলে কেহ এইরূপ অস্বাভাবিক প্রেমের ব্যাপার অবগত হয়েছে কি না বা এইরূপ গুপ্ত-প্রেম সম্বন্ধে পাড়ার কোথায়ও রঞ্জনও কানাকানি বা জানাজানি হয়েছে কি না? এই খুন যদি কারও বাড়ির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে এখানে প্রভূত রক্ত পড়বে এবং এই রক্ত তারা গোপনে ঘুয়ে বা মুছে ফেলে দেবে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানবার চেষ্টা করি, কেউ কারও বাড়ীর সম্মুখের নালা বা নদমার জল অস্বাভাবিক ভাবে লোহিতভাৎ দেখেছে কি না? আমরা করপোরেশনের মেধরদের জিজ্ঞাসা করতে থাকি, কেউ রক্তমাখা জাকড়া কোথাও পড়ে থাকতে দেখেছে কি না? যদি আমরা উপরোক্তরূপ কোনও সবাদ পেতাম তাহলে বুঝে নিতাম যে, আমাদের উপরোক্ত খিওরীটিই সত্য এবং উহাকেই আমরা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত করে—এই বিশেষ পক্ষেই আমরা তদন্তরত থাকতাম। কিন্তু তথ্য-তজ্ঞাস ও অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এইরূপ কোনও সন্ধানই পাই নি। ব্যর্থমনোরথ হয়ে আমরা তখন নিয়ন্ত্রকরণ আমাদের দ্বিতীয় পরিসংখ্য বা খিওরী অনুসরণী তদন্ত শুরু করে দিই।

(২) নিহত ব্যক্তি হয়তো কোনও এক দুর্ভিক্ষ অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তির জ্ঞাত। শৈতৃক সম্পত্তি হতে চিরন্তনে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এখানে বা অন্য কোথাও তাকে হত্যা করে, পরে সহকারীদের সাহায্যে তাকে এইখানে এনে ফেলে রেখে

গিয়েছে। ইহা সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে, ঐ নিহত ব্যক্তি কোনও এক তত্ত্ব ধনী পরিবারের পুত্র ছিল। কিন্তু ঐ নিহত ব্যক্তির দেহটায় এবং হাতের ও পায়ে ঢেটো পরিদর্শন করে বুঝা গেল যে ঐ ব্যক্তির ধনীর ঘরে বসিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তার পায়ে চামড়া স্থূল ও কর্কশ এবং বিকৃত দেখা গিয়াছে। এই থেকে নিহত ব্যক্তিকে বরাবর একজন ভবঘূণে বা অধঃপতিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলেই প্রতীত হয়। এইজন্য ঐ খিওরী বা পরিসংজ্ঞা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

(৩) হয়তো নিহত ব্যক্তি একজন অসংযত্নিত যুবক। কোনও দ্বীলোক ঘটিত ব্যাপারে তার কোনও এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকপ্রবর স্বয়ং কিংবা লোক মারফৎ তাকে নিহত করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই ব্যাপারে আমরা পুলিশ সার্জেনকে শবাব্যবচ্ছেদের সময় তার বৌদেহ পরীক্ষা করে জানাতে অনুরোধ করি যে, ঐ নিহত ব্যক্তির কোনও বৌদেহ-রোগ ছিল কি না। এবং নিকটস্থ বেতালয় সমূহে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধবসহ হামেসা কোনও বেতালগৃহে গমন করত কিনা, তাও আমরা অবগত হতে চেষ্টা করি। এইরূপ দুই-একটি বগড়া-বাটির সংবাদ আমরা কয়েক স্থানে পাই বটে; কিন্তু অমূল্যকানে জানা যায় যে বিবাহীরা বহাল তবিরতে জীবিত আছে। এইরূপ কোনও এক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে একদিন জানা যায়, কিন্তু ঐ বেতাল-নারী এবং দালালেরা মৃতদেহটি ঐ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির নয় বলে বিবৃতি দেয়।

(৪) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক ব্যবসায়ী বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার এবং তাকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধিকার হতে বঞ্চিত করার জন্য ঐভাবে হত্যা করেছে। ঐ খিওরীটি বিশ্বাস করলে বুঝে নিতে হবে যে নিহত ব্যক্তি অপুত্রক বা আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী বিহীন।

উপরোক্ত খিওরী অনুযায়ী অনুসন্ধান করে ঐরূপ কোনও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাইনি। বড় বাজারে ঐরূপ এক নির্খোজ মাড়োয়ারী ভক্তলোকের সংবাদ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তদন্তে জানা গেল যে নিরুদ্দেশের সময় ঐ ব্যক্তির বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। তদুপরি বৃত্ত যুবকের দেহাবয়ব ও আকৃতিও ঐ খিওরীর পক্ষে অমূল্য ছিল না।

এই সকল কারণে এই সকল খিওরী সম্পর্কীয় তদন্ত আপাতত স্থগিত রেখে আমরা নিম্নোক্ত খিওরী বা পরিসংজ্ঞা অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(৫) হয়তো বা সে কোনও রাজনৈতিক দলাদলি বা প্রমিক-বিজ্ঞানের কারণে নিহত হয়ে থাকবে। কিন্তু নিকটে কোনও কলকারখানা ছিল না এবং তার চেহারা হতে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হলো না। এইজন্য ঐ বিষয়ে কোনও তদন্ত আমরা নিম্নরোজন মনে করেছিলাম।

(৬) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও পুরানো জোর বা তত্ত্বর ছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে কিংবা দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার কিংবা অপরের হিন্দা আত্মসাৎ করার জন্য তার দলের অপরাধের ব্যক্তিত্ব তাকে ঐভাবে হত্যা করে ঐ স্থানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই সম্পর্কে আমরা রক্ষিপুলবদের তাদের কোনও জানা চোর বা 'ইনকরমার' এঁদের হাতে নির্খোজ হয়েছে কি না সেই সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য অনুরোধও করেছিলাম, কিন্তু কোনও স্থান হতেই এইরূপ কোনও সংবাদ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

বর্মিও উপরোক্ত কয়টি খিওরী বা পরিসংজ্ঞার উদ্ভাবক আমি নিজেই ছিলাম, তাহলেও পরিপূর্ণভাবে উহাদের কোনটি, আমরা নিজেই মনঃপূত হচ্ছিল না। কারণ একটি বিষয় পুনঃপুনঃ আমাদের মনোমধ্যে আঘাত হানছিল; সাধারণতঃ মৃতদেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, যাতে তাকে কেউ সনাক্ত না করতে পারে। বন্ধুর হতে মৃতদেহ ঐ স্থানে নীত হলে মুণ্ড কর্তনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এইজন্য শবাবতঃই মনে হতে পারে যে নিহত ব্যক্তি ঐ স্থানেরই কোনও বাসিন্দা ছিল। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই মত সম্পর্কে আমার মন সাংগত না। কারণ হত্যাকাণ্ডী এমন এক বিজাতীয় ঘৃণার সহিত ঐ হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছিল যে, প্রথমে সে তাকে ছুরিকাঘাত করে বধেই মনে করে নি। সেইজন্য মুণ্ডটি কেটে নেওয়ার পরও মৃতদেহের দুইটি পায়ে শিরা পর্যন্ত কেটে রেখে গিয়েছে। এই কয়টি তথ্য হতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হত্যাকাণ্ডী একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি তো বটেই, অধিকন্তু সে মানব-মনের একজন অসাধারণ অবস্থার সম্ভূতি। এই ধরনের ব্যক্তি প্রেম ঘটিত ব্যাপারে কোনও এক ভয় নারীর সহিত নিশ্চয়ই জড়িত থাকবে না। তাহলে কি ঐ নিহত ব্যক্তি এবং উহার হত্যাকাণ্ডী, এই উভয় ব্যক্তিরই বাস্তবায়ন হামেসা বেতালগারী অফলেই সীমাবদ্ধ ছিল? এই সকল বিষয় চিন্তা করে ইনসপেক্টর সুনীল রায়কে আমার অভিমত জানানো তিনি আমাকে সর্বাঙ্গতঃ করণেই সমর্থন করেছিলেন। এইজন্য পরদিন হতে সোনাগাছি প্রভৃতি বেতালগারী প্রতিটি গৃহে আমরা জোর তদন্ত চালাতে শুরু করেছিলাম।

এইভাবে তদন্ত করতে করতে সত্য সত্যই একদিন আমরা অক্ষকরের মধ্যে আলোকের সন্ধান পেলাম। এই সময় সোনাগাছি অক্ষকের অধিকা নামক এক বাসিন্দা একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রদান করলো। বস্তান্তঃক্ষেপে অধিকার বিবৃতি আমাদের তদন্তের মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সাক্ষী অধিকার বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উল্লিখ করা হলো।

“আমি অতুল বাবু ভরকে পাগলা নামক এক ব্যক্তিকে চিনতাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাড়ী ফিরবার সময় আমি তাকে ভীত ও ত্রস্তভাবে সোনাগাছি অক্ষকের একটি বাটার রোয়াকে মগীন্দ্র বাবু নামক পাড়ার এক মাতঙ্গর ব্যক্তির নিকট বসে থাকতে দেখেছিলাম। ঐ সময় উহাদের চতুর্দিক ঘিরে কয়েকজন গুপ্তা ব্যক্তি তাকে বকাবকি করছিল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললো, মনে রাখিস, আমি যে সে লোক নই। আমি হচ্ছি খোকা। আমার নাম শুনেছিস তো? আমি তোকে খুন তো করবোই, ‘সেই সঙ্গে জোর নাকও কেটে নেবো।’ উত্তরে পাগলা বললিস, আমাকে আপনি এবারকার মত মাগ ককন। আমি জীবনে আর ঐ দ্বীলোকটির জিন্দাঘাতও বাব না।’ মগীন্দ্র বাবু মধ্যস্থতা করে ঐ সময় লোকটিকে অনুরোধ জানালো, আচ্ছা থাকগে থাক। এবারকার মত গুকে মাগ করে দিন। মগীন্দ্র বাবুর অনুরোধে ঐ লোকগুলো পাগলাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেল।

পাগলা আমার পাশে পাশে চলে গরাণহাটা স্ট্রীটের দিকে এগুতে থাকলো। আমরা কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ঐ খোকা নামক ব্যক্তি গৌরবর্ণের অপর আর এক ব্যক্তির সহিত একটি বাড়ীর রোয়াক হতে পাগলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খোকা পাগলার বাড়ীয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ওই গৌরবর্ণের লোকটিকে হতুম করলো। এই জননী গিয়ে একটা ট্যান্ডি ডেকে নিয়ে যায়। ব্যাপার বেগতিক বূরে আমি সরে পড়েছিলাম। কিন্তু গৌরবর্ণের লোকটি আমার পথ আগলে বলে উঠলো, তুই খালা বাস কোথায়? আমি প্রতিবাদ করে তাকে বললাম, গালি দেন কেন, মশাই। উত্তরে সেই লোকটি বলে উঠলো, আর একটা মাত্র কথা কইলে তোকেও খুন করবো। এই সময় খোকা ওই লোকটিকে বললো, ওকে এখন যেতে দে, ওকে পরে ঠিক করা বাবে এখন। তুই তাড়াহাড়ি একটা ট্যান্ডি ডেকে আন। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে আমি ফিরে গিয়ে ঘটনাটির কথা মঞ্জী বাবুকে জানিয়ে আমি। এর পর বাড়ী ফিরবার পথে আমি দেখতে পাই যে খোকা ওই গৌরবর্ণের লোকটি এবং আরও চার পাঁচ ব্যক্তি পাগলাকে একটি ট্যান্ডিতে বসিয়ে গরাণহাটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ট্যান্ডিটির নবর নেবার কথা একবারও আমার মনে আসেনি।

ভারতীয় পদ্ধতিতে ভদ্রসত্ত্বাতির নিয়ম প্রথমে সাক্ষীকে বিনাবাধার তার বক্তব্য বিষয়ে বলে যেতে দেওয়া। তার পর তাকে জেরা করে সে যা বলেন বা বলতে পারে নি তা বার করে নেওয়া। এইজন্য প্রথমে একজন সৌম্যবৃত্তি বন্ধী হাতালাপ দ্বারা সাক্ষীদের প্রারম্ভিক বিবৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু ওই প্রথম বন্ধীর পক্ষে সহসা ভিন্ন বিবৃতি গ্রহণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়; সেই হেতু জেরার অন্ত পরে গভীর স্মৃতিতে অপর একজন বন্ধীকে আসরে অবতীর্ণ হতে হয়। এইজন্য ভারতীয় অফিসারদের অভিনয়চাতুর্য্যেও শিক্ষিত হতে হয়েছে। এঁহারা মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণ অমুখারী তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশেরও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এইজন্য ভারতীয় অফিসারগণ সমাজ-বিজ্ঞান ও লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। প্রথম অফিসারটি বহুভাবে সাক্ষীদের কিছুটা তাঁবে রাখে, দ্বিতীয় অফিসার গভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে তার কাছ হতে কথা বার করে।

এই ভাবে ভারতীয় পন্থায় আমরা ওই অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষীর নিকট হতে যে সকল বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করি তাহা নিয়ে উৎকৃষ্ট প্রস্তোত্তর হতে বুঝা বাবে।

প্রঃ—হুঁ, তুমি যে সত্য কথা বললে তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কয়েকটা কথা আরও তোমাকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো। এখন সত্যি করে বলো কবে ও কোথায় তোমার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয়েছিল?

উঃ—জাঙ্কে, বন্ধন কিছুটা বলেছি, তখন বাকিটাও বলবো। পাগলার সঙ্গে আমার এই পাড়ারই এখানে ওখানে দেখা হতো। তার ভালো নাম ছিল অভুল বাবু। এসব পাড়ার মেয়েরা তাকে আদর করে পাগলা বলতো। লোকটা বাবু ভালো তবলা বাজাতো। তবলচিহ্নে এপাড়া ওপাড়া, সব পাড়াতেই সে নাম করেছিল।

প্রঃ—জাঙ্কা! তোমার তো সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তুমি কি শোননি যে সম্প্রতি ঐ পাড়ার কোনও স্ত্রী নারীর

সঙ্গে তার ভালবাসা জমেছিল? এইরূপ কোনও গল্প কি সে তোমায় কখন বলে নি?

উঃ—জাঙ্কে, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না। তবে তার সঙ্গে আমার সাধারণ ভাবে জানাশুনা ছিল। এ পাড়ার মেয়েরা তাদের গুরুজী বা ওস্তাদের সঙ্গে ঐরূপ কোনও কাজ করে না। এতে ঐ সব মেয়েদের মত তাদের ওস্তাদেরও বদনাম হয়। এইজন্য ঐরূপ কোনও ঘটনা ঘটলেও লজ্জার খাতিরে সে তা আমার নিকট গোপন করেছে।

প্রঃ—জাঙ্কা, তুমি তো অনেক বার পাগলাকে দেখেছো। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার মুণ্ডহীন দেহটা দেখে কি তুমি তাকে সনাক্ত করতে পারবে? তুমি যে তাকে কিছুটা স্নেহ করতে তা তো বুঝতেই পারছি। এখন পূর্ববক্তৃত্বের খাতিরে তার উপর তোমার একটা কর্তব্য আছে; এখন তুমি যদি তার কোনও প্রেম্যাপদ নারীকে বুঝে বায় করতে পারো তাহলে ভাল হয়। হয়তো তারা তাকে বহুবীর নগ্নগায়ে দেখে থাকবে। সেইজন্য তাদের পক্ষে নগ্নগায় মৃতদেহটি বধ্যাযোগ্য ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

উঃ—জাঙ্কে, অধিকাংশ সময়েই আমরা তাকে বৃত্তি, জামা ও চাদরে আবৃত দেখেছি। তাকে নগ্নগায়ে ভালোরূপে না দেখলে তার মৃতদেহ সনাক্ত করার অসুবিধা আছে স্বীকার করি। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে সত্যতাতে তাকে নগ্নগায়েও বহুবীর আমাদের দেখার সুযোগ ঘটছে। ইদানীং পাগলা অতিরিক্ত মত্তপান করতে আরম্ভ করেছিল। কয়েক বার মাত্রা ছাড়িয়ে তাকে জানহারা ও অর্জনয় অবস্থায় রাজপথে গড়াগড়ি যেতে আমরা দেখেছি। এইজন্য তাকে ভাসনা করে ও পথ থেকে উঠিয়ে নিকটের কোনও নারীর বাড়ীতে এনে আমরা তার শুষ্কবাও করেছি। এই সময় আমরা তার সারা দেহ ও বাহ্য লোম দ্বারা আবৃত এবং তার বাম বাহুতে উড়ি দ্বারা ফুল-চিহ্ন উৎকর্ষ আছে দেখেছি। তার শরীরের গঠনসহ ঐ সকল চিহ্ন হতে তার মুণ্ড না থাকলেও তার দেহ আমরা সকলেই সনাক্ত করতে পারব।

সাক্ষী স্বীকার উপরোক্ত বিবৃতিটি আমাদের অনেকটা আশ্বস্ত করলো। আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ সাক্ষীর ভায় সোনগাহি অঞ্চলের বহু নারীও পাগলার মৃতদেহটি ঐ একই কারণে সনাক্ত করতে পারবে। বলা বাহুল্য যে, মৃতদেহটি সত্যি কাহার তা প্রমাণ করতে না পারলে এই খুনের কিনারা করা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে পুলিশমর্গের বরক-ঘরে আমরা মৃতদেহটি রক্ষা করার এই কয়দিন উহা অবিকৃত অবস্থাতেই ছিল। এই কারণে আমি প্রস্তাব করলাম যে এখনই ঐ পাড়ার বাড়ী বাড়ী তদন্ত করে কোন্ কোন্ নারীকে পাগলা গান শেখাতো বা তাদের কার কার বাড়ীতে সে তবলা বাজাতো তা জেনে ঐ সকল নারীদের পুলিশমর্গে নিয়ে গিয়ে তাদের সাহায্যে ঐ মৃতদেহটি সত্যি পাগলার কিনা তা অবহিত হওয়া বাকি। কারণ তারা যদি বলে যে ঐ মৃতদেহ আশপাশেই পাগলার নয়, তাহলে তখনই বুঝে নিতে পারবো যে আমরা এই কয় দিন তুল পথেই ভুল চালায়ে এসেছি। এইরূপ অস্বাভাবিক অনর্থক আর সময় নষ্ট না করে আমরা তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে অগ্র আর এক পথে তা পরিচালিত করতে পারবো। কিন্তু ইনস্পেক্টার সুনীল বাবু এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন যে এই পাড়াতে

বধন আসাই হয়েছে তখন সাকী মণীষকে বুঁজে বার করে তার বিবৃতি নিয়ে যাওয়া উচিত। সনাক্তকরণের পরে সব আরও দুই একদিন পরে করলেও চলবে। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বললেন যে তার অন্তরাখা তথা ইনিস্ট্রিক্ট বলে যে এইবার আমার ঠিক পথেই তদন্ত শুরু করছি।

বস্তুতঃপক্ষে অভিজ্ঞতা হতে আমরা দেখছি যে, ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিবৃত্তি ভুল করলেও সহজাত বুদ্ধি (ইনিস্ট্রিক্ট) বা প্রেরণা কদাচিৎ ভুল করেছে। স্ব স্ব ব্যবসায়ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী সাধারণ্যে আসে এই প্রেরণা। প্রত্যেক প্রফেশনাল ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রফেশনের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রেরণা লাভ করে থাকে। সফল প্রফেশনের লোকেরাই স্ব স্ব প্রফেশন বা ব্যবসা সফলতা বাপারে পৃথক পৃথক ইনিস্ট্রিক্ট অর্জন করেছে। এমন অনেক ডাক্তার আছে যারা দূর হতে রোগীকে দেখে বলে দিতে পারে যে তার রোগ কি। এমন অনেক পুশারিফিক্টোকে আমি জানি যে খরিদারদের দেখে বলে দিতে পেরেছে, 'সে ফুল কিনবে কি না। এবং কিনলেও সে তার দাম দেবে কত? বহুদিন একই প্রফেশনে নিযুক্ত থাকলে মানুষ এইরূপ পেশাগত ইনিস্ট্রিক্ট লাভ করে। এমন বহু পুরাতন পুলিশ-অফিসার আছে, যাদের নিকট দশ বার জন গৃহ-ভৃত্যকে ধাঁড় করিয়ে দিলে তাঁরা বলে দিতে পারেন যে এদের মধ্যে ঐ লোকটিই চুরি করেছে। এ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তাদের একমাত্র উক্তি হয় যে তাদের মন বা ইনিস্ট্রিক্ট এই কথা বলেছে। পরে প্রমাণিতও হয়েছে যে ঐ পৃথকীকৃত ভূতটিই মাত্র ঐ চুরির জন্ত দায়ী ছিল। বহুদিনের অভিজ্ঞ ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি দায়ী প্রায়ই এই সহজাত প্রেরণা লাভ করে। কারণ মানুষের জন্মেরভাব তাদের মুখের ভাব, চালচলন ও ভূমিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা পরিস্ফুট হতে বাধ্য। কিন্তু এগুলি এতো সূক্ষ্মভাবে পরিস্ফুট হয় যে সাধারণ দৃষ্টিতে সকল মানুষের নজরে পড়ে না। তবে যে সকল পুলিশ-অফিসার পুলিশ-কার্যকে চাকুরীরূপে গ্রহণ না করে প্রফেশন বা পেশারূপে গ্রহণ করে, তাদের চক্ষে এগুলি নিজেদের অজ্ঞাতই থরা পড়ে।

এই সকল কারণে পরবর্তীকালে এই সকল কথনক পুলিশ-অফিসারদের মধ্যে যারা পুলিশ-কার্যকে নিজেদের প্লাপ্ত-কতা—এমন কি নিজেদের প্রাণের চেয়েও ভালবেসে ফেলে তাদের মধ্যে ঐরূপ এক প্রেরণা জন্মায়। ঐরূপ অবস্থায় কোনও একটি ঘটনা দেখে বা শুনে তারা বলে দিতে পারে যে ঘটনাটিতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলম ভারতে এবং বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে গোয়েন্দাগিরী করা ছিল এক শ্রেণীর নাগরিকদের প্রফেশন বা ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এই একই কারণে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঐরূপ সহজাত বুদ্ধি দেখা যেতো। এইজন্য ভারতীয় পুলিশ আজও পর্যন্ত তাদের ঐ সকল পূর্ববর্তীগণের অধিকরণে তাদের অভিজ্ঞতাস্বরূপ প্রেরণার উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল থাকে।

এই সকল কারণে আমি অভিজ্ঞ অফিসার ইনস্পেক্টার হুদাল বাবুর মুতেই মত দিই। বস্তুতঃপক্ষে বস্তুপূর্বক হুদাল বাবুর মধ্যে আমি পুলিশ তদন্ত সম্পর্কীয় বহু অত্যন্ত্রিয়তা (Hyper Sensibility) লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর চক্ষু ও কর্ণ আমি সামান্য একটু সন্দেহের উল্লেখ হওয়া মাত্র শিকারী মানুষের দ্বার সতর্ক হয়ে উঠতে

দেখেছি। এই জন্য আমি তাঁর উপদেশ মত মণীষ বাবুকে বুঁজে বার করে তার একটি গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করে নিতে মনস্থ করলাম। এই মণীষ বাবু ছিলেন ঐ পাড়ার একজন শক্তিশাল ব্যারামবীর। এইজন্য তাঁকে বুঁজে বার করতে আমাদের কিছুমাত্রও দেরী হয় নি। তাঁর বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

আমার নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল, পিতার নাম শ্রী-পাল। *নং-১১৩৫ আমি সপরিবারে বাস করি। আমার পেশা— এই দিন (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) আমি ঐ রাস্তার অতো নজরে বাড়ীর রোয়াকে সন্ধ্যা আশ্রিত সাত বা সাড়ে সাতটার সময় বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় পাগলা দৌড়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ে বলে উঠলো, কর্তা, রকে করো আমাকে। ছুটি ছাড়া আর কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এদিকে তার শিঁড়-শিঁড় খোঁকাও তার সাত আট জন সাকরেন্দ্রসহ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। খোঁকা চিচিরে উঠে বললো, আজ আর কারোও সাহা নেই যে ওকে বাঁচায় আমার কবল হতে। ওকে আমি অনেক বার সাবধান করেছি "কিন্তু ও কোনও কথা আমার শুনেনি। কালও ও গোপনে মলিনার ঘরে গিয়েছিল।—না, আজ আর আমি ওকে কিছুতেই ছাড়বো না। আমি তখন খোঁকাকে অমরোধ করে বললাম, আরে ভাই! এবারকার মত ওকে ক্ষমা করে দে। আর ও কক্ষণে মলিনার দ্বিতীয়মান্তেও যাবে না। মলিনার সঙ্গ তোর প্রকৃত সম্পর্ক কি, তাও নিশ্চয়ই জানে না। আমার মধ্যস্থতার খোঁকা একটু শান্ত হয়ে বলল, আচ্ছা। আপনার কথা মত আজ ছেড়ে দিলাম ওকে। কিন্তু পরে ওর কপালে কি আছে তা আমি বলতে পারছি না। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে পাগলা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে সরে পড়লো। ঐ সময় সেখানে পাগলার বন্ধু অধিকাও এসে গিয়েছিল। আমার বস্তুর মনে পড়ে, পাগলা ও অধিকা একসঙ্গেই গরানহাটার দিকে প্রস্থান করলো। এর পর খোঁকাও তার সঙ্গোপাল নিয়ে ঐ একই দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার প্রায় আশ ঘট্টা পর অধিকা হস্তদস্ত হয়ে এসে আমাকে জানালো যে খোঁকা ও তার সাকরেন্দ্র পাগলাকে একটা ট্যান্ডিতে তুলে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

এই পর্যন্ত বলে মণীষ বাবু চুপ করলেন। বেশ বোরা গেল, তাঁর আরও কিছু বলবার ছিল। কিন্তু বসি-বসি করেও তিনি তা আমাদের বলতে চাইছিলেন না। আমরা তখন চতুরতার সহিত কয়েকটি প্রশ্ন করে তাঁর নিকট হতে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলাম।

প্রঃ—পাগলাকে আপনি কত দিন পূর্বে হতে চেনেন? আর ঐ খোঁকাবাবু? খোঁকাবাবু লোকটা কে? সে থাকেই বা কোথায়? আপনি এই খোঁকার পরিচয় কতটুকু জানেন? তাড়াতাড়ি এই সন্ধান কয়টি দিলে আমাদের উপকার হয়। আমরা তাইহলে এখনি খোঁকাকে গ্রেপ্তার করে তার বাড়ীতে থানাভ্রমণ করতে পারি।"

উঃ—পাগলার পিতৃমাতৃ পরিচয় আমি জানি না। তবে শুনেছি তার এক ভাই যশোহরে ডাক্তারী করেন। তার ভালো নাম ছিল অতুল বাবু। লোকটি ভ্রমরংগজাত হলেও খুশীমত অধঃপাতিত হয়ে এই পাড়াতেই এখানে ওখানে বাস করে। এই পাড়ার

নারীদের বাচিতে বাচিতে উৎসবে ও জলস্নান সে তবলা বাজাতো। তবলা সখ্যে সে একজন গুণী ছিল। সে যে চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিল তা আমি বলবো না। বরং সে চরিত্রহীনই ছিল। তবে চরিত্রহীনরাই একনিষ্ঠ হয়ে একটি নারীর সঙ্গে বসবাস করতে চেষ্টা করে। এইজন্য আমার মনে হয়, সে মলিনাকে গান শিখাতে গিয়ে ভালবেসে ফেলেছিল। তবে তাকে এই পাড়ার সকল মেয়েরাই পাগল বলে ডাকতো। শুধু তাই নয়, তাকে তারা ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। এ ছাড়া পাগলা সখ্যে আর কোনও সংবাদ আমি দিতে পারবো না। এই তো গেল পাগলার কথা। এইবার খোকার কথা বলবো। এই খোকা হচ্ছে—তারা, একজন জেলখারিজ গুণ্ডা। কিছু দিন বাবু পুলিশের নজর এড়িয়ে সে বঙ্গভাষায় কিয়ে এসেছে। এখন তার এই পাড়াতেই আনাগোণা বেশী। আমি শুনেছি, সে মাঝে মাঝে মলিনার ঘরে এসে রাত্রিবাস করে। এই মলিনা হচ্ছে একজন নূতন চিত্রাভিনেত্রী। ৩৫নং ইমামবাড়ী থানাদার লেনে সে থাকে।

প্রশ্ন—পাগলাকে তো আপনারা এতাহই দিনে ও রাত্রে এই পাড়াতেই দেখতেন। ঐ দিন সন্ধ্যা হতে এখন নিশ্চয়ই আর তাকে বাগানরা এ পাড়ার দেখেননি। তবু ভই ঘটনা সখ্যে অবস্থিত হয়েও আপনারা কেউ থানার গিয়ে এই সম্পর্কে সংবাদ দিলেন না কেন? তা'হলে কি বুঝতে হবে আপনার সঙ্গে খোকার বিশেষ বন্ধু ছিল?

উঃ—জান্নে না না, তা নয়। পাড়ার কেউ কেউ হিংসা করে আমাকে মণি গুণ্ডা বলে। আমি একটু ব্যায়াম-টায়াম করি কিনা, তাই লোকের এতো হিংসা। তবে কি জানেন? কোনও গুণ্ডালোক রাতবিহেতে এসে এখানকার মেয়েদের উপর ছলুয় করলে সেই সব বাড়ীর বাড়ীওয়ালীরা চাকর মারফৎ আমাকে ধর পাঠায়। আমি তখন ঐ সকল অবস্থিত ব্যক্তিদের বাড়ি ঘরে বার করে দিয়ে তাদের বকে করি। সপরিবারে এই পাড়াতেই আমি বসবাস করি, তাই গদের পড়শী হিসেবে গদের উপর আমার কর্তব্য করি, এই বা। তা না হলে থানা হতে পুলিশ আসতে আসতে এদের অনেকেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা বলে এই সব জেল-খারিজ খুনে গুণ্ডাদের সঙ্গে কে পেরে উঠবে বলুন? এদের কি কোনও বাড়ী-ঘর আছে যে আপনারদের তা জানাবো? অস্ত্র নিকে এই সব ব্যাপার থেকে আমাদেরই প্রাণটা বেহিয়ে বাবে। এই বাড়ীওয়ালী মায়েরা একটু চক্ৰি-টক্ৰি আমাকে করে, তাই তাদের কাছে বা বা শুনেছি তাই আমাকে জানালাম।

প্রঃ—“হঁ, একশে বুঝতে পারলাম আমি সব। এখন এই মামলাতে আর কোনও সংবাদ তুমি আমাদের দিতে পার কি না বলো।”

উঃ—“জান্নে। আর একটা কথা আমার জানা আছে। পরে শুনেতে শেলায় পণ হতে একবার মুক্তি পেয়ে পাগলা এই পাড়ার ‘নাকি-বীণা’ নামে একটি নারীর বাড়ী চুক পড়ে আজর ভিক্ত করে। কিন্তু তারা তাকে আজর তো দেয়ই নি বরং খোকার হুকীতে ভয় পেয়ে চাকর দিয়ে তারা তাকে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন একথা তারা স্বীকার করবে কিনা জানি না। কারণ এ পাড়ার কেউ সহজে এসব কামেলাতে জড়াত চাইবে না।”

এ পাড়ার ভয় পরিবারের লোকেরা হচ্ছে সংখ্যালঘু। একজন এখানকার সাক্ষীদের চরিত্র সখ্যেও কিছুটা ভগ্নতর প্রয়োজন হয়। কারণ আমাদের বাবতীর ভগ্নতর করে বেতে হবে তাদের কথা ভেবে তাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা'না হলে একটি মাত্র ভুলের জন্য আমাদের বাবতীর পরিশ্রম একদিন বাবতীর পর্যাবসিত হয়ে বেতে পারে। কোনও এক সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা পূর্বেই আমাদের জেনে নিতে হয়েছে। অবশ্য সমাজের বিভিন্ন ভর আছে এবং উহার প্রতিভদের মাল্লেরই একটি নিজস্ব মূল্য আছে। একথা স্বীকার্য্য হলেও সাক্ষী সমাজের কোন ভরের ব্যক্তি, তা জুরীদের পূর্বাভূই জানিয়ে দেওয়া ভালো। অজ্ঞতার বিচারের সময় বিপরীত তথ্য প্রকাশ পেলে বিচারকমণ্ডলীর দ্বন্দ্ব ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়।

আমরা সংবাদ নিয়ে জানলাম যে, মণীন্দ্র বাবু হামেসা এখানকার নারীদের সম্পর্কে এসেও নিজে তিনি একজন সাধু চরিত্রেরই লোক। এছাড়া এ-ও জানা গেল যে, এই ব্যায়ামবীরকে পত্নীর গুণ্ডাশ্রমীর লোকেরা রীতিমত ভয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজে জেল-খারিজ খোকা গুণ্ডার ভয়ে সর্বদাই ভীত ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি প্রাণভয়ের কারণেই ঘটনাটি পুলিশের নিকট জানাতে পারেন নি। যদি বাবুর মত সাহসী ও শক্তিমান ব্যক্তিও হার ভয়ে সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত, সে যে একজন সহজ ব্যক্তি নয়, তা আমরা যদি বাবুর কাণ্ডপকথন হতে বুঝে নিতে পারলাম। এই সঙ্গে আমরা এ-ও বুঝতে পারলাম যে, এখানকার ভীতা ভ্রাতা নারীরাও এই একই কারণে ঐ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোনও বিবৃতিই প্রকাশ করবে না। সকল দিক বিবেচনা করে সহকারীদের দূরের একটি মোড়ের নিকট অপেক্ষা করতে বলে আমি এক-স্রনীল বাবু ছদ্মবেশে হত্যা সম্পর্কে কিছুটা গোপন তদন্তে মনোনিবেশ করলাম। [ক্রমশঃ]

“Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riots there, undigested, all your life. We must have life-building, man-making, character-building, assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library.” —Swami Vivekananda.

ই

স্রা

নী

র

প্র

ন

(উপভাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

তরুণালকে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন মিসেস অনীতা বে।

অনীতা বসেছিলেন টেটব্যাকের একেবারে সামনের লম্বে।
সবো-নামা সন্ধ্যার আলোর সামান্য-হিলের সাজসজ্জা বেধেছিলেন।
তরুণাল। উইংসমে যেতে নারাজ। একটা লন-চেয়ারে বসে বললেন,
“এখানেই বসি মিসেস বে, বেশ ভাল ওয়েদার আজকে”—

“বেশ তো”—তরুণালার পাশে বসে অনীতা অল্পচললায় বয়কে
ডাক দিলেন। দ্রুতগলার বাধা দিলেন তরুণাল, আজ আর কিছু
খাওয়া চলবে না মিসেস বে—

“শুধু এককাপ কফি নাহলে একটু ককো—
না না, আজ একেবারে কিছু না। একটা অল্পবোধ করবে
আপনাকে, যদি একটু কষ্ট করে—

ঠিক এই গলার আর এত দ্রুতলয়ে তরুণাল কখনও কথা
বলেন না, অন্ততঃ অনীতা মিসেস বিখাসের এ কঠোর কখনও শোনেন
নি। চোখ বড় করে অনীতা তাকালেন তরুণালার মুখের
দিকে, চোখের দিকে—মিসেস বিখাসের যে পরিভূক্ত মুখের
চেহারা দেখতে অভ্যস্ত অনীতা—তা নয়, একেবারে অন্তরকম।
যেন মেঘে মেঘে ধ্বংসে হয়ে উঠেছে তরুণালার মুখ,
আর চোখে যেন কেমন হটকটে একটা অস্বস্তির ছায়া।
স্বস্তিত মুখে অনীতা বললেন, আপনি অমন করে কেন
বলছেন মিসেস বিখাস, বলুন না কী করতে পারি আপনার
জন্ত—তরুণালার চোখের হটকটে ছায়াটা আরো যেন চকস
হলো, আরো ব্যাকুল। অনীতার চোখের দিকে তাকিয়ে
নিজের বক্তব্যটা আবার যেন গুহোতে লাগলেন, তখনই বোধ হয়,
আমি খোকনের বিয়ে দিয়ে তারপর ওকে বিলম্ব পাঠাবো—

তরুণালার কথার অনীতা হাসিমুখে বললেন, বা বে। সেদিন
আমাকে কত মেরেই কষ্ট দেখালেন আপনি, আমি ভাবছি,

অনীতার কথা কে-ও তরুণাল বিখাস গলা বলে উঠলো,
ইঙ্গাণীর সঙ্গে খোকনের বিয়ে দেব—অনীতার চোখ ছটি আরো
বড় হলো। চোখেই মণিতে ভর করলো অনেকটা অবিশ্বাস, কিছুটা
বিস্ময় আর ছিটেফোঁটা কৌতুক। অনীতাকে নিরন্তর দেখে
তরুণাল। আগের গলাতেই বলে উঠলেন, আপনি কী বলেন?
ইঙ্গাণী কেমন মেয়ে? আপনার তো ওবাড়িতে অনেক
বাতারাত—

এক মুহূর্ত বিরতির পর অনীতা বললেন, “অত্যন্ত চমৎকার
মেয়ে, সব মিলিয়ে এত ভাল মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না”—

—কথা শেষ করলেন অনীতা, কিন্তু যেন শেষ হলো না।
অনীতার কণ্ঠে এই দ্বিধাটুকু তরুণালার কানে এড়ালো না। তুচ্ছ
ছটি নিজের অভ্যন্তরদেই স্পষ্ট হলো, মুখে ছায়া ঘনালো,
“আপনি কী খোকনকে ইঙ্গাণীর অযোগ্য মনে করছেন?”

তরুণালার গলার জোরালো অভ্যন্তরকচাণা দিয়ে সজোরে
হেসে উঠলেন অনীতা, “কী-ই যে বলেন মিসেস বিখাস...
অকণ্ঠশ! অকণ্ঠশের তো তুলনাই মেলে না—সেদিন আমার
কাছ থেকে ফটার নেগেটিভ নিতে এসে গল্প করছিলো;
ওর কথার আর ব্যবহারে আমি আর উনি তো মূগ্ধ একেবারে।
ভারি ভাল, ভারি সুন্দর মনের ছেলে আপনার অকণ্ঠশ।”

তরুণালার স্পষ্ট তুচ্ছ একেবারে সোজা, মুখের ছায়া একেবারে
নেই, আনন্দ-আপ্ত কঠোরতা কিন্তু হোঁচট খেয়ে গেলো জিতের
আগায় এসে, তাকে সরিয়ে অহুস্কারী গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো,
“কিসের নেগেটিভ নিলো খোকন আপনার কাছ থেকে?”

“ঐ, নীলার আর ইনার একখানা ফলা তুলেছিলাম বাগানে,
নীলার নাকি অত ভাল ফটা আর গুটনি। অকণ্ঠশ নীলার ফটা
এনলার্জ করবে বলে নেগেটিভখানা নিয়ে গিয়েছিলো।”

“ও!” তরুণালার কণ্ঠের ছোট শব্দটা যেন শাক দিয়ে
বার হয়ে এলো। অনীতার চোখের দৃষ্টি চট করে একবার
তরুণালার মুখের চারি পাশ ঘুরে এলো, “আমাকে ভাবলে খটকা
হ’তে বলছেন?” অনীতার গলার হালকা সুর।

“শুধু খটকা হ’লে চলবে না, বরের বরের পিসি ক’নের হয়ে
মানী হ’তে হবে, কোমর বেঁধে খাটাখাটুনি করতে হবে কি
আপনাকে—” অনীতার মত হালকা সুরেই কথা শুরু করেছিলেন
তরুণাল। কিন্তু কথার শেষে গলাটা যেন হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠলো।
আবার চকিতে অনীতার দৃষ্টি তরুণালার চোখ-মুখ জরীপ করলো।
উঠে দাঁড়ালেন অনীতা, “চলুন না, দুজনাই একসঙ্গে যাই, একেবারে
বিয়ের তারিখ ঠিক ক’রে কিরবে।”

“না, আজকে আপনি একলাই যান, কথাবার্তা পাকা হ’লে
সেলে তারপর আমি যাবো—হ্যাঁ ভাল কথা মিসেস বে, যদি
ইঙ্গাণীর বাবা-মা মেয়ে ছোটো বলে আপত্তি কোলেন, বসন্তে,
ইঙ্গাণী বিয়ের পর ওদের কাছে থেকেই পড়াশুনো করবে,
—খোকন বিলম্ব থেকে না ফেরা পর্যন্ত ওদের কাছেই থাকবে
ও আর না, আর কিছু নয়—একেবারে বিয়ের কথা পাকা করে
আসা চাই কিন্তু মিসেস বে।”

হাঁক-ধরা গলাটাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই বোধ হয় তরুণাল
তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে লম্বের এক পাশে এগিয়ে এসে
পাইচারি শুরু করলেন। বিস্মিতা অনীতা কাপড় বদলায়ে

ভেতরে চলে গেলে আর তাঁতে লাগলেন—কত কিছু যে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু হুই আর হুই—কিছুতেই যেন আর চার হয় না। আর, অনীতা রায়ের শরীফী যেই পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে ক্যাথলিক ক্লাবের পথ ধরলো, তরুণীলা পাইচারি বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসে পড়লেন। কেবলই একটা বধা পাক খেতে থাকলো ঠহ মনে। উনি নিজে গেলেই ভাল করতেন বোধ হয়, ক্যাথলিক ক্লাবের গেট থেকে ফিরে না এলেই পারতেন।

সুতরাং নেকের মধ্যেই ফিরে এলেন অনীতা রায়। বললেন, যখন শরীফীর কোনো অমত নেই, এ বিষয়ে সারাতে সম্মতি দিয়েছেন ঠহা, অবশ্য যখন প্রথমে এত ছোটো বয়সে মেয়ের বিয়ে নিয়ে একটু কিস-কিস করছিলেন, কিন্তু অনীতা যখন তরুণীলায় জরানীতে বললেন—যিয়েটা এখন হয়ে থাক, ইঙ্গারী যেমন পড়তে তেমনি আপনাদের কাছে থেকেই পড়বে, তারপর বি-এ পাশ করার পর আসবে শ্বশুরবাড়ি, তত দিনে অল্পবেশও বিলতে থেকে ফিরে আসবে পড়াশুনা শেষ করে। এ কথাই সানন্দে সার দিয়েছেন যখন শরীফী। তাহলে বিয়েটা কবে হলে সুবিধে হয় এই নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হলো, এই আলোচনার মাঝখানেই পাশের ঘর থেকে ইঙ্গারী মা বলে ডাক দিলো। শরীফী সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন এবং তার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এলেন শুকনো মুখ করে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে নীরস গলায় বললেন,—ইহু এখন একেবারে বিয়েতে মত নেই। যখন স্ত্রীর সঙ্গে দুই-তিনমিনিট করে ভাবতে লাগলেন। কারণ, ইঙ্গারীর বয়স বত অরুই হোক, বিয়ে নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে ঠহা নৈকি কেউই পারবেন না, ঠহের অস্ত্রের ধর্মে তা বাধে। অনীতা তারপর বলছিলেন,—চলুন মিসেস রায়, ইঙ্গারীর সঙ্গে আমি নিজে একটু কথা ক'য়ে দেখি। কিন্তু, ঠহা সবাই পাশের ঘরে এসে দেখলেন, ইঙ্গারী সে ঘরে নেই, তারপরের ছোটো ঘরেও না, বাহালান্তেও না। ততকালে ভাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেলো—মিস সাব বাওয়ার সময় বাস গেছে, মা'কী গুলে যেন বলে দেওয়া হয়, ও ভীনা কাপুজীর কাছে বেড়াতে গেছে। যখন বাবু এবং শরীফী হু'জনে যখন লজ্জিত হ'য়েছেন তেমনি বিব্রত, বার বার আপনাকে বলতে বলছেন, কথাটা এখন পাকা হ'য়ে থাক, বিলতে থেকে অল্পবেশ ফিরে আসার পরই বিয়েটা হবে।

: দাদা আর জান করবে কত? বাধকদের বন্ধ দরজার কাছে পীড়িয়ে ছুটক করছে নীলা। ওর মনের অসহ উল্লাসটা যেন একটা আছন্দে পাখি হ'য়ে ডানা বাগাচ্ছে। দাদাকে যেমন ক'রে হোক এ বিষয়ে মত ক'রতেই হবে, কিছুতেই কোনো আশপ্তি শোনা হবে না দাদার—উঃ।—কী যে মজা হবে তাহলে—ইনা যদি আমার বৌদি হয়, কী মজা। কী মজা। নীলার মনটা যে হাততালি দিতে শুরু করলো। তব-তব ক'রে নিচে নেমে গেলো নীলা। নাঃ! দিদিটা এখনও আসেনি, কী যে এত বেজার দিদি বুঝিও না আমি—সিমলার আবার দেখার কিছু আছে নাকি! আনন্দ-পাখিটার ডানার বাগটে নীলা বেচারি অস্থির, ও আর করে কী—ডেকে ডেকে পরিচারক পরিচারিকাদের সুসবায়ন বিভাগ করলো, তারপর আবার লাকতে লাকতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরে। বাধকদের কবান আলগা দেখেই

ওকল পায়ে দাদার ঘরে ছুট দিলো, “হু, হু, দাদা, কী খাওয়াচ্ছে। বল? তোমার বিয়ে এখনম পাচ্চা। এবার এক ঠোড়া কাজুবালামে চলবে না, এক-বুড়ি চাই—”

ক্লাস্ত অল্পবেশ চোখ বন্ধ রেখেই মিন-মিন ক'রে বললো, “তবে তো একবুড়ি ভালের খোঁজ করতে হয়, সিমলার কি ওকল মিলবে?”

“আহা, চোখ খোলোই না দাদা—” চেয়ারের পেছন ঘরে বার কয়েক অল্পবেশ থেকে বাকি দিয়ে দিলো নীলা।

ও, ভারি তো দুটো তিত্তির মেয়ে এনেছো, এমন চেহারা ক'রে বসে আছো চেয়ারে যে মনে হচ্ছে যেন সুন্দর-বনের রয়েল বেবল টাইগার বুঝি মেয়ে এলে তুমি—চোখ বুজেই উত্তর দিলো অল্পবেশ, কাল দেখিস চুটকনালার জল থেকে লজ্জা বাথ শিকার ক'রে কাঁখে বুলিয়ে কিরবো। বিয়ের কথাই দাদা মোটেই আমল দিচ্ছে না দেখে, নীলা চেয়ারের বাজু ছেড়ে অল্পবেশের গলা জড়িয়ে ধরলো, দাদা লক্ষ্মীটি, এ বিষয়ে রাগি হ'য়ে বা, আমার কী যে মজা লাগছে।

আঃ নীলা, গলা ছাড়, বিজ্ঞান করতে যে আমাকে। ডম্বারে টকি আছে, বা নিগে বা। অল্পবেশের গলা ছেড়ে দিয়ে বাগ্পকৃত গলায় নীলা বললো, আমার কোনো একটা আবদার রাখবে না, আর তোমার কেনা টাকি আমি খাব, আমার বয়ে গেছে। বোজ বোজ এক ক্রোশ ঠৈলিয়ে বালা শিখতে যেতে হবে না, বাড়িতে বসে বসে মজা করে শিখতে পারবো, ইঙ্গারী আমার বৌদি হবে এত ভাগ্য কী আমি ক'রেছি না কি?

কে? কে বৌদি হবে? চোখ খুলে ইঙ্গিচেনার থেকে একেবারে পিঠ-টান করে বসলো অল্পবেশ।

ইঙ্গারী। মা তোমার সঙ্গে ইঙ্গারীর বিয়ের প্রস্তাব তুলতে ক্যাথলিক ক্লাবে গেছেন—নীলার গলায় অভিমান। অবিদ্যার হাসি হাসলো অল্পবেশ, বললো, কী আজ-বাজে বকছিল নীলা! মা যাবেন ক্যাথলিক ক্লাবে—নীলা জোরে দিয়ে উত্তর দিলো, দাদা আমাকে নিজে ডেকে খবরটা দিলেন, বাবা বুঝি মিছে কথা বলবেন? অল্পবেশ ফাল-ফাল ক'রে বোনের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোধগম্য করার চেষ্টা করতে লাগলো। দাদার মুখের ভাবের অঙ্গ অর্থ করলো নীলা, আরো অনেক বেশি জোর দিয়ে বললো দাদা, তুই রাগি হয়ে বা লক্ষ্মীটি, এমন মেয়ে আর হয় না। তুই তো একদিন বাজে বাজে কথা বলে শুভু চুটিয়েই দিলি ইঙ্গারীকে, না হলে একদিন ভাল ক'রে আলাপ করলেই দেখতিল এমন মেয়ে আর হয় না। লক্ষ ক'রে হেসে উঠলো অল্পবেশ।

না দাদা হাসিস না, সত্যি সত্যি বলছি আমি। অল্পবেশ কৌতুক গলায় বললো, তোর সেই ডেপো বন্ধুকেই বিয়ে করতে হবে শেবকালে?

নীলা দ্রুত গলায় বললো, অল্প বয়সে অনেক বেশি জানা খুবই আশ্চর্যের দাদা, তাকে ডেপো বলে না।

বোনের মুখের চেহারা এক পলক দেখে নিজে অল্পবেশ সহ্যে বললো, আহা, বোনে না নীলা পীড়িয়ে অল্পবেশ কেন? বসে বসে শোর বন্ধুর গুণাবলী দাবিল কর দিগিন, আমি ভেবে-চিন্তে দেখি ও আমার ক'নে হতে পারে কি না। নীলা ঘরের কোণ থেকে একটা মোড়া হিড়-হিড় করে টেনে এনে দাদার সামনে মুখোমুখি বসেই বললো, আনিস, দাদা, ইঙ্গারীর মা মানে মাসীমা কিলোজফিত

ইশান-দগার, এ সবাবৈ অকণেশও মনে মনে কম বিমিত হলো না। কিন্তু বুধের ভাব সহজ রেখেই চোখে দুইমির হাসি ফুটিয়ে বললো, ইশানীর মা'র গুণ নিয়ে আমার কী হবে?

না, মানে, মাসীমার কথা এমন বললুম, ইশানীও কি ডিক্রিতে কিছু কম বাবে না কি মনে করিস? ইংরাজীতে ইউনিভার্সিটিতে কাঠ হয়েছ।

আচ্ছা, এক হলো, খামিসনে তুই নীলা, তোর বড়ুর গুণাবলী দাবিল করে বা।

অমন সুন্দর বুঝ বাঙালীদের মধ্যে চোখেই পড়ে না!

আচ্ছা তুই, তারপর? এমন সময় সিঁড়িতে তরুবারা পায়ের শব্দ হলো। এ যে, মা এসে গেছেন—মোড়া ছেড়ে উঠে দৌড় লাগলো নীলা। চেয়ারে বসে অকণেশের বুক বেন বেতলা মাদল বাজতে লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বের হবার আগের রাত্রিতেও এমন বেতলা বাজনি। আর নীলা মায়ের ঘরের দরজায় ঢুকই বেগ খামিয়ে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়েছেন তরুবারা, কী করণ আর বিদ্যাবিধুর মায়ের বুথ! অভিমানিনী নীলা নিঃশব্দে কিরে এলো মায়ের ঘর থেকে। নিজের ঘরে বিজ্ঞান আশ্রয় করে কৌটা কৌটা চোখের জলে উপাধান ভিজিয়ে দিতে লাগলো। দানার কষার সুরে অনেক ভরসা পেয়েছিলো নীলা, বুঝলো, দাদা ইশানীকে বোধি করে এনে দিতে রাজি হলে কী হবে, ইশানী ওর বোধি হ'তে রাজি নয়। বাছুরী প্রক্তি গোপন অভিমানে ফুলে ফুলে কান্ডকে লাগলো নীলা। এর পর, সবিস্তারে সব গুনসেন অভয়শংকর। নীলা শেলির মাথকতে অকণেশের কানেও সব কিছুই এসে পৌঁছুলো।

পরদিন অপরাহ্ন বেলায় রামদয়াল ইশানীর হাতে একটা মুখ-বন্ধ করা সাদা খাম দিলো। খামটা উন্টেপাতে দেখে নিয়ে ইশানী ভুক ভুক জিগোস করলো, চিঠিখানা ওর হাতে দিতে কে বললো? রামদয়াল সবিনয়ে জানালো, যে, সাব ওর হাতে চিঠিখানা দিয়েছে, সেই বারে বারে বলে দিয়েছে যে, চিঠিখানা বেন শুধু মিস সাবের হাতেই দেওয়া হয়।

ও আচ্ছা—বলে চিঠি নিয়ে নিজের ঘরে চুকলো ইশানী।

: নিঃশব্দে অকণেশের চিঠি এখান। অকণেশ ওকে চিঠি লিখেছে, অকণেশ-অকণেশ, নিশ্চয়ই অকণেশ। খুববো না। যথার্থজি দিয়ে মনের দুয়ারে কপাট দিয়ে দিলো ইশানী। ও-খাম আমি খুববো না—খুববো না—খুববো না। টেবিলের ডগার টেনে বন্ধ খামখানা ঠেলে একেবারে ভেতর দিকে রেখে কণাণ করে বন্ধ করে দিলো ইশানী। আবার তখুনি অধিক খুলে আবার বন্ধ করলো। আবার খুললো।

: নিজের শক্তিতে বিশ্বাস থাকলে কালির অক্ষর কী করতে পারে ওকে। খামখানা বার করে ফস করে একটানে ছিঁড়ে ফেললো ইশানী। বার হলো চিঠি। ভাঁজখোলার আগে ওর হাত কাঁপলো নাকি?

: না, ও কিছু নয়।

ইশানী,

তোমার কাছে এই আমার প্রথম চিঠি। লিপিটিকে অস্ততঃ লাবণ্যালি করার প্রয়াসে এক প্রহর রাজি খরচ করলুম—কিন্তু

আজ বাগদেবী আমার প্রক্তি নিতান্তই অকণেশ, টেবিলের ওপর, এশাশ-ওশাশ সবটুকু এলোমেলো কাগজে ভরে গেলো কিন্তু, আমার মনোমত একটা সম্বোধনও আমার কলমের বুথে এলো না।

তবু মনের কথা জানাবো তোমাকে। যে করেই হোক শুরু করি।

আজ সকলো থেকে রাজি আটটা পূর্বজ আমি বেন অকণেশ প্রতিকূল দুই বিপরীত দ্রোতে ভেসে বেড়িয়েছি। আজ বারে বার বাল্যের দেখা হ'খানি ছবির কথা মনে পড়েছে। ছোটবেলার চার পরলা বাজআলাকে দিয়ে কাচের ঢাকা বাজের ছবি দেখবো বরং বড় সেই গোল চোজার চোখ রেখেছিলাম। বাজের মালিক পরসট পকেটে থেকে তার স্বভাব অম্বয়ারী চিত্রবিত্তাস শুরু করে দিলো।

: রামরাজকে রাজ্য দেখো—নীতা মায়ীকি প্রসন্নতা দেখা আমি দুখানা ছবি দেখেছিলাম, বকবকে সেনার সি হাসনে সীতায় পাশে নিয়ে রামরাজ্য বসে আছেন, সে ছবির জৌলুস বর্ণনার কা নেই, সে বয়সে অস্ততঃ আমার চোখে মনে হয়েছিলো—এমন সুখ ছবি আমি আর দেখিনি, রাম-সীতার দিব্যকাকিত, ওদের দাদা সুন্দর বলমলে ভূবন, রামের শৌর্য, সীতার বুকের প্রসন্ন সীতি—হঠাৎ ঘুরে গেলো ছবি—হুটবুটে কালো রঙের একখানি ছবি আকাশের পূজীভূত কালো কালো মেঘগুলিই বেন সমস্ত ছবিটাকে কালো করে দিয়েছে। সেই আশ্চর্যসুন্দর বসন-ভূষণে শাজান প্রসন্ন সীতিময়ী সীতা—একেবারে রক্তা এ ছবিতে, কুর কর্ণ রাক রাক্ষস এক হাতে কী নিদ'রভাবে জ্বাল্টে ধরেছে সীতাকে আর এ হাতে ততোধিক নিদ'রভাবে শকুধন করছে জটায়ুশকীর, আকাশ থেকে ক্রমাঘরে শকুর ছিন্ন অংশ পড়েছে আর তার সাথে তালো তার লাল রক্ত। এ কী অদ্ভুত ভীষণতা! এক দুহুতের বেশি আমি সে ছবিতে চোখ রাখতে পারিনি, বাকী ছবিগুলি না দেখেই দুটা ঘরের ভেতর পাগিয়ে এসেছিলাম। সেদিন সেই বাজআলাটাকে একটা নিষ্ঠুর কসাইয়ের চেয়েও বেশি সাংঘাতিক মনে হয়েছিল আমার। অমন সোনা-রঙা বলমলে অদ্ভুত সুন্দর ছবির পা এই কিভূত কিমাকার কাঠের ছবি। একটু পরে দেখালো ক' হতো! বার এতটুকু সামঞ্জস্য, এক বিন্দু সজ্জিবোধ নেই তাকে ও ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে—তাই বোধ হয় তরু ভেবেছিলো আমার মন। কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে বাজ অম্বরক এমনি ঘটে থাকে এবং ঘটছে। বেশ তো শিকারের খেলা যেতে গিয়েছিলেম আমি। সেই অভিনয়ের পরদিন থেকে এ ক'দিন আমি আমার শরীর ও মন দুটোকেই ভাড়িয়ে কিয়ো পাখির পেছনে। তারপর অবিস্রাজ্য ছুটোছুটি করে একটা মি ছুটি পাখির জুখিপণ্ড বীর্কণ করে বাড়ি কিয়োছি অম্বর রাজি নিয়ে আর বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এসেছি, জুখিপণ্ড কি রক্তত হয় শুধু গুলীতেই?

কালও সন্ধ্যার পর যত্নের মত রাজি নিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছি চেয়ারে, নীলা ছুটে এলো। দাদা কী মজা ইশানী আমার বোধি হবে, মা বিয়ে ঠিক করতে নিজে ক্যাথলি র্নাবে গেছেন। কথাটা বিবেশ করতে সময় লাগলো একই নীলা বাবার জবানী উল্লেখ করার আর সময় রইলো না। তখুনি মনে হলো, আমার কোনো পুণ্যফল কোনো দেবতা কি

আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে বর দিতে এইতেন। আমি এ ছাড়া আর কি চাইতাম? আর তারপরই নিশ্চিত হায়ের পাহের জনি তনলাম—কিন্তু বড় যেন চিলা-ঢালা-‘স্বপ্ন’ পায়ের জনি। নীলা ছুটে ‘গেলো। আমি একলা যাবে বসে বসে তনতে লাগলাম নিজের বুকের শব্দ। নীলা আর কিরলো না দেখে বুঝতে আমার দার কিছু বাকি রইলো না।

তারপর সবই শুনে ফেললাম, যে সুরভি কান্তনীকে সাড়বরে হাসতম জানানোর ভক্ত প্রজ্ঞতি শুরু করেছিলো মন, অকস্মাৎ লজ্জা হিম বরিয়ে কে যেন সমস্ত বসন্ত-স্রাব নিমেষে লুপ্ত ক'রে দিলো, মনের সাতরঙ্গা স্বপ্নটা যেন দ্রুত চিলা হ'য়ে ক্রুদ্ধ কাপট লাগিয়ে হঠাৎ উগাও হলো শূন্যে। মনে হলো ‘প্যাগডাইস্‌ট’ আর অসংখ্য বার মনে পড়লো বালোর দেখা সেই ছবি দুখানির কথা।

কিন্তু, এটাই ঠিক ইঙ্গাণী! তোমাকে পেয়েছি বলেই তোমাকে হারাতে চাইনে। ছিন্ন চিত্তে ভেবে দেখলেম, তুমি যদি

এখন সম্মতি দিতে, তাহলে তোমার নিষ্ঠার প্রতি আমার বোধ হয় স্রষ্টাবোধ ক'রে যেতো। খাওয়ার টেবিলে বাবা মাকে পুরো আশাস দিয়েছেন—তুমি ভেবে না শুক, কাল বিকেলে আমি নীলকে নিয়ে ইনায়াতের সম্মতি আদায় ক'রে তবে বাড়ি-কিরবো। আমার চিঠিলেখা শুধু এইজন্য—‘বুঝিল হলো এই—আমার বাবাকে তুমি বোধ হয় তেমন চেনার সুযোগ পাওনি ইঙ্গাণী, আমার নিজের বিশ্বাস, বাবার কথার কিছু বাহু আছে, বাবার কথার না করতে আমি কাউকে এ পর্যন্ত দেখিনি। কিন্তু, আমি এ ভাবে পেতে চাইনে তোমাকে। অনেক দিনের অনেক ছোট বড় অভিব্যক্তি তোমার মনে জমে জমে পাহাড় হ'য়ে গেছে—সেগুলি মূলিসাৎ হ'য়ে গেলে তোমার খোলা পরিপূর্ণ মনখানি আমি চাই।

আমার স্বপ্নের এক মহলা প্রাসাদ তত দিনে হ'তে থাকবে সাত মহলা। আমি আছি, আমি থাকবো ইঙ্গাণী, আমার সাত মহলার সাতটা দরজাই তোমার জন্য খোলা রইলো।

— অরুণেশ।

সমাপ্ত

তিমিরাভিসার

(Last ride together. R. Browning.)

জেনেছি জেনেছি আমি প্রিয়তম,
প্রতীকার দীর্ঘ দিন গিয়েছে হারিয়ে
নিফল সন্ধ্যার। কোন কোভ নেই;
জন্মের পাহিছে আজি তোমার মধুর নাম
আকাশে বাতাসে। ভরছে পেয়ালাখানি
মুত্তির সৌরভ নিয়ে। কিরিয়ে দিহো না
তারে। নিয়ে বাও আর বস্তু আকুল
কামনা স্বপ্নের বৃত্ত ‘পরে ফুটেছিলো
রজনীগন্ধার সম। শুধু যোরে
দিয়ে বাও—একবার—তোমার
পরশস্বরা রজনীতিমির মাঝে
বৈত-অভিধারে।

ভ্রমর বাকিল তার। গভীর-কাজল
জ্বালা রিক্ত করি মাথুর্ষের শেষ বিন্দু
রাতিয়া রক্তিম রাগে নির্নিমেয় নির্ভাবন
চেরে থাকে মোর মুখ পানে।
স্বপ্নের ভটপ্রান্তে প্রাণের হরিণ নির্বাণ-
বিস্ময়ে স্থির। ‘তাই হবে’—চকিতে হরিণ
গেলো জীবনের স্বাদ পথম আশ্বাসে
প্রিয়জন-স্বপ্নে। অস্তিত্বকামনা মোর হাওয়ারনি
অনারব-ভীড়। মোর স্বর্ণ হ'তে বিদায়ের
কণ আসিনি এখনও; প্রেথ-পাত্র রিক্ত নয়;
আরো আছে দোশর রাত্রির কোলে
নিঃশ্বাসনিবিড়-স্পর্শ। কে বলিতে পারে

পৃথিবীর পরমানু-কথা? শেষ যদি হয়ে
যায় এ রজনীসাথে।

প্রতীচ্য গগনবন্ধে তরলিত মেঘমালাসম,
সহস্র আশ্রির ভায়ে আনমিত বরতন—ভাঙ্কর
কিরণ যেন গোখলি-লগনে, মেলে আসি
যোছনার সাথে উদার আকাশে। সেই
সুভক্শে, প্রেমের পুলকে রাতি, কামনার
দীপশিখামাধে, সাথে লয়ে মেঘমেঘনতা,
দূর-অন্তাচল-পারে তপনের রক্তরাশি-লোখা,
নিঃশব্দ অরুণোদয়, তারকার জ্যোতি,
ধীরে ধীরে নেমে এলো মোর বন্ধ
সত্তর-আনন্দে দেহভারহীন বেতস-ব্রততী
রচিতে অক্ষর স্বর্ণ।

যাত্রা হ'লো সুফ। দূরে ফেলে
হতাশার আবর্জনা, পুলকে জাগিল
আশা অন্তর-আকাশে। জীবনের
লেন-ধেন—কী পেরেছি আর
কী পাইনি—লাভ ক্ষতি, টানটানি,
মিলনবিহব হুছে কেলে, ভাবনারে
দিয়ে নির্ধারন, পথম লগনে জাগি
প্রিয়তমা পাশে।

এ জীবনমাকে অক্ষমজ-অভিশাপ
আহারই ত নয় শুধু? হাজার জীবনে

তার বিবাদের ছায়া। কত দেশ এলো
কত নদী গেলো। ঘোরা শুধু বহি
কাছাকাছি চেতনাবিহীন-সম নীলাকাশ-মাঝে।
মনে হলো জীবন-সাধনা কত বার্থ নয়।
বার্ধ নয় আঁকুল কামনা। বা কিছু
সেখেছি ঘোরা সে ত এক অতি
ক্ষুদ্র ভগ্ন-অংশ ভাগ—অজানা
বৃহৎ। শুধু জানি অতীতের
লুপ্ত আশা বাঁচিয়ে রেখেছে তার
শিশু-বর্তমানে অন্তর-মার্ঘ্য দিয়ে।
কেন জানি মনে হলো এইখানে এই ক্ষণে
হারানো সে প্রেম ফিরিতে পারে ত কতু ?

ভাবনার সত্যরূপ দিয়েছে কি
কেউ আপনায় হাতে ? তু্যিতস্বয়
পেয়েছি কি তার আপন-প্রয়াসে
বিনা-আকর্ষণে ? কর্ণের বারিবি-মাঝে
কতক্ষণ থাকে চিন্তার তরঙ্গ ? শারীর-
পাষণে বন্ধী মানববিহঙ্গ কোথা যেতে
পারে ? কাছে পেয়ে দয়িতের তল্লব্দেহ ;
নীরবে হেরেছি তার গতিপ্রাণ পীণারত
পর্যায়। সাক্ষাৎ রয়েছে সেখা-
কে পৌঁছিতে পারে ? কত বোঝা হারিয়েছে
প্রাণ। অস্থির করবে শোভে বিজয় নিশান।
জীবনের বিনিময়ে পাষণ ফলকে লেখা
শুক নামধানি এই কি সাধনা ? কামনার
ধন সাথে রজনীতিময়-মাঝে
এই অভিসার, মোর কাছে অতি প্রেরণতর।

অভিসারলিপি কে বুঝিতে পারে ?
কবির ভাবনা, প্রাণ পায় ছন্দের বন্দনে
জানি। অমৃত-গীতা মধুর স্মরণ
হয় কবির লেখনী-স্পর্শে। হয়ত
অনেক কিছুই আছে নয়ত বিশেষ
কিছুই নয়। শুধু বল দেখি কবি,
তুমি কি পেয়েছো কত স্মরণের
প্রাণস্পর্শ ? বুঝি বা বেদনা-গভীর প্রাণে
ছেলে রেখে দীনতার দীপ চলেছে
মৃত্যুর পানে ? তাই যদি হয়,
জেনে রাখো ছন্দের সাধনা নয়,
প্রাণের সাধনা এই আনন্দের
অভিসার, প্রিয়তমা-পাশে।

হার রে'ভাস্যম। তোমার
সাধনা বার্থ। আরাধ্য দেবীর রূপ
পায়নি একাংশ অরূপ প্রেমের শেষে।

হের আজ প্রেমের মৌদের লগ্নপরে
অতিক্রমে ক্ষীণ প্রোতোধারা।
কোনো ক্ষতি নেই যদি তোমার বিবর্ণ
মুষ্টি না বুঝিতে পারে ?
সঙ্গীতসাধক ! নীরস সঙ্গীত-লিপি
নিরে কেটে গেলো সাধনার দিন।
কী পাইলে বলো ? প্রশংসার স্তোত্রবাণী ?
সঙ্গীতের রূপ কোথা ? সে যে এক
অরূপ সাগর। তোমার সঙ্গীত-শিখ
ভূবে গেলো গভীর অন্তলে।
দিয়েছি যৌবন আমি। পেয়ে গেছি
তাই অভিসার-অধিকার, হোক তাহা
মুহূর্তের তরে।

নিয়তির কথা কে বলিতে পারে ?
কে জানিত হায় এই ক্ষণে ভবিষ্য উঠবে
হৃদি সহস্র আশীরে ? করে নাই কেউ
হেন অঙ্গীকার ? এ জীবন থেকে
অনন্ত-বাত্মার ক্ষণে মানব বাত্মীরা ভাবে
এ জীবনকথা। মনে পড়ে দূর মৃত্যু সম
করে কোন অজানা লগনে লক্ষ্য পৌঁছেছিলো
তার অনন্ত কামনা। বিজয়ের পূণ্যস্পর্শ
লভেছিলো কবে কার অন্তরের গৃহলক্ষী।
অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগে আঁকুল পরাণে।
সভর আনন্দে চূর্ণ করে রয়ে
প্রাণের হরিণ। মধুর বরষীর বুলি ;
পুলকিত নভতল অনিন্দ্য সুখমারাগে।
সে স্বরগ আর এ প্রেমের স্পর্শলোভ
ছুটেছে বিহঙ্গ মোর অনন্ত আকাশ-মাঝে
ধূমকেতু সম।

নির্ধীক বঁকুরে ঘিরে রচেছে
স্বপন মোর দূর নভোচারা। জীবনের
ঈর্ষোপরি অক্ষয় অনিন্দ্যবাস, যেথা
থেকে ক্ষণে ক্ষণে করে পড়ে জীবন-চেতনা।
প্রান্তবীর কালে, সেই যদি স্বর্গ হয়
তবে তাও মিশে গেছে কাষিত
দেহেরে ঘিরে। উক্ত পানে চেয়ে
আছি শঙ্কিত হৃদয়ে, কামনার
আতুর অঙ্গলি, শুধু যেন জীবনে মরণে
শাশাণাশি রাখে অর্চিহিত ধাবমান
প্রোতোধারাগে। মুহূর্তে মুহূর্তে যেথা
জন্ম লভে নতুন জীবন, তারি কোনো
প্রান্তে রাগে ঐক্যভাববহীন একক জীবন।

অমুবাদিকা—মুকুমারী দাশ।

এবার কেলবার সম্মান

লেখকগণের বিজ্ঞান

ইতল

পিলখার-প্রথম ক্যাপ

যুক্ত দোহা কিতবেত

এম, এল, বঙ্গু যোগ্য কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-



[Osamu Dazai's "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

তৃতীয় অধ্যায়

চন্দ্রমল্লিকা

অতঃপর এমন অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হ'লাম, যেখানে বেঁচে থাকি অসম্ভব। প্রচণ্ড ঝড়ের পর সাদা মেঘের দল যে ভাবে আকাশের গারে এলামেতো ভুটে বেড়ায়, তেমনি আমার বুকের ভেতর বেদনার তরঙ্গ উথাল-পাখাল করে করে। যারাস্বক এক অল্পভুতি, অজানা এক আতঙ্কে আমার নাকীর গতিতে ছন্দপাত হ'র, নিশ্বাস কিরা ব্যাহত করে বুকের ভেতরটা নিজে ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে চতুর্দিক অন্ধকারে কুরাশাছর হয়ে আসে, আর মনে হয় যেন আমার আঙলের প্রান্ত-পথে সারা দেহের শক্তি নিঃশেষে বেগিয়ে বাচ্ছে।

সম্প্রতি বিশিষ্ট একঘেয়ে বুটী স্বক হয়েচে। আমি বা করি তাতেই মন ধারণ হয়ে যায়। আজ আবার বেতের চেয়ারখানা বাগানবার টেনে নিয়ে বসলাম—ইচ্ছে গত বসন্তে গুরু করা সোয়েটারখানা এবার শেষ করব। হাতা গোলাপী রূ-এর সঙ্গে গাঢ় নীল উল মিলিয়ে জামা বুনছি। বছর কুড়ি আগে, আমি তখনও ইতুলে পড়ি, সেই সময়ে মা আবার একখানা ছাক বুন দিয়েছিলেন—গোলাপী উলটা। তারই ছাকের শেষের দিকে ছোট

টুপি মত করে বুনছিলেন, সেটা পরে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে নিজেকে মনে হত কুয়ে পরতান। আমার ইতুলের বছরা যে স্ন ছাক গারে দিত, আমারটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙ বলে ওটা আমার হুঁচকেব বিধ ছিল। ঐ ছাক গারে গিয়ে কাকুর সামনে বেরতে এত লজ্জা হ'ত যে বহু দিন ব্যবহার না করে বেহাজে কেসে রেখেছিলাম। সম্প্রতি বসন্তকাল পড়তে হঠাৎই আমি ওটা খুলতে বসলাম, বৃত সম্প্রতি পুনরুদ্ধারের সন্নিহিত নিয়ে, নিজের জন্ম একখানা সোয়েটার বুনব ছির করলাম। কি জানি কেন, ঐ কিক রঙটা আমার সুস্বপ্নের পথে অন্তরায় হওয়ার আবার উলটা বাস্তবতা হ'ল।

আজ অল্প কাজের অভাবে হঠাৎ বের করে বুনতে বসলাম। বুনতে শুরু করে খেয়াল হ'ল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গাঢ় রঙের পাশে উলের রঙটা চমৎকার খুলছে, রঙের এমন অপূর্ণ নিম্ন সামগ্র্য ভাবার বোঝান শক্ত। আকাশের রঙের সঙ্গে এ-হেন সামগ্র্যের প্রয়োজনীয়তা এর আগে কখনও বুঝিনি। অবাক হয়ে ভাবলাম, বিভিন্ন রঙের শোভন সংগতি কি অপূরণহীন না হ'তে পারে। আকাশের ধূসর নীলিমার সঙ্গে কিকে গোলাপীর যোগাযোগ, ছোট রঙকেই হুটিয়ে তুলেছে। আমার হাতে সে উল জীবন্ত হয়ে উঠল, মেঘলা আকাশ যখনমের মত নরম। ক্রাসী চিত্রকর মনে'র (Mone't) একখানা ছবির কথা মনে এল, কুরাশার মধ্যে একটি গির্জা; জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলাম স্মৃতি কা'কে বলে, মনে মনে উলটাকে যন্ত্রবাদ দিলাম। স্মৃতির তুয়াবাছুর আকাশের নীচে ঐ রঙ ব কত অপূর্ণ দেখাতে পারে সে জান ছিল বলেই মা কিকে গোলাপী পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু আমার নির্বুদ্ধিতায় আমি তখন বুঝতে পারিনি। চিরদিন নিজের খুঁসিমত চলেছি, মা কোন দিন বাগ দেবার চেষ্টাও করেননি। এত কাল ধরে আমার কখনও বোকাতে চাননি, শুধু অপেক্ষা করেছিলেন, কবে নিজে থেকে আমার চোখ খুলবে। ভাবলাম, আমার মায়ের মত এমন মা আর কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রারূপ ভয় আর আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, তবে কি নাওজি আর আমি দু'জনে মিলে মাকে অবহারিত যন্ত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছি? বতাই তারি ততই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় ভবিষ্যৎ আমাদের জন্ম দুর্দিন বয়ে আনছে। আত্মলুপ্তি অসাড় হয়ে এল, কোলের ওপর বোনার কাঁটা ছোটো পড় পেল। মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। চোখ বুজেই মাথা তুলে নিজের অজান্তে টেঁচিয়ে উঠলাম মা গো।

ঘরের কোণে বসেই পড়তে পড়তে মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি হ'ল?

কেমন যেন সব গোলামাল হয়ে গেল। অহেতুক উঁচু গলার জ্বাব দিলাম—শেষ অবধি গোলাপগুলো ছুটল, জান মা? আমি এইমাত্র লক্ষ্য করলাম—এত দিনে ছুটল তবে।

বহু কাল আগে ক্রান্ত কিরা ইল্যাণ্ড এরকম অনেক দূর থেকে ওয়াদামায়া এই কুল এনেছিলেন। আমাদের নিশিকাতা ট্রীটের বাড়ী থেকে তুলে এনে আমি এখানে পুঁতেছিলাম। সকালেই আমি একটা কুল দেখছি, কিন্তু বর্তমান অপ্রত্যাশিত ভাব কাটাতে বেশ একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বললাম—এইমাত্র দেখছি। যোগ বেগুনি রং-এর এই কুলগুলিতে কেমন যেন নড় ও শক্তির একশ আড়ে।

শান্ত কর্তে যা উত্তর ছিলেন,—আমি জানি, তোমার কাছে সবের দুলাই আলাদা।

বোধ হয়, আমার জন্তে তোমার দুঃখ হয়?

না, আমি শুধু বলতে চাই, এ তোমারই উপযুক্ত উচ্ছাস। ক'বেমনটি তুমি বাস্তবের বেশলাই-বাত্তের পায়ে বেনোরা'র ছবি টাট্টা, কিংবা পুতুলের লজ্জা কমাল তৈরী কর। বাগানে গোলাপের খা তুমি এমন ভাবে বল বেন কোন জীবন্ত মানুষের বিষয় বলছ।

আমার নিজের কোন ছেলে-মেয়ে নেই বলেই বোধ হয়। আমি কি বললাম? কোলের ওপর বোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া যে অপ্রস্তুত ভাবটা লুকাতে চাইলাম। মনে হল টেলিকোনে চান পুঙ্খ মাহুধ রুদ্ধ হবে আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন—এ আর কি কথা কি? ও মেয়ের বয়সের গাছ-পাখর আছে? উনত্রিশ ছয় তো হ'ল!

কোন কথা না বলে মা আবার বইয়ে মন দিলেন। কিছুদিন ব'ল মা দুধের ওপর দিয়ে একখানা পাতলা জালের ঢাকনা পরে দেন। সেই জন্তেই বোধ হয় কথা কওয়া আরও কমে গেছে। আসলে নাওজির কথার মা এ ঢাকা পরতে শুরু করেছেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে ও প্রশান্তসাগর থেকে ফ্যাকাশে চেতারা হয়ে ফিরেছে। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যার কোন ধবর না দিয়েই, গাঠের ফাটকখানা দড়ায় শব্দে বন্ধ করে দিয়ে নাওজি বাগানে হল।

কি কাণ্ড! বলিহারি তোমাদের পছন্দ। বাড়ীর গায়ে কটা সাইনবোর্ড টালিয়ে লাও না কেন 'চীনাভবন, চাওমিয়েন'?

প্রথম দর্পনে এই সম্ভাবণ। গত দু'-তিন দিন হল জিতে কটা ব্যথা হয়ে মা শয্যা নিয়েছেন। জ্বরের ওপর কিছু দেখতে পলাম না, কিন্তু মা বললেন, নাড়াতে গেলেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ক'র দিন খুব পাতলা নুপ খাচ্ছিলেন। ডাক্তার ডাকতে চাইলে। ব্যথা দিলেন, জ্বর করে হেসে বললেন—ডাক্তার আমার দেখে গিয়েন।

তুলি করে জ্বরের আগার লুগোল রাখিয়ে দিলাম—কিন্তু গতে কোন ফল হল না। মায়ের অন্তর্বে বিপন্ন বোধ করছি—কি এই সময়ে নাওজি এল।

মায়ের বিছানার মিনিট খানেক ব'সে বাগিষে মাথা হেলিয়ে টো সম্ভাবণের কথা বলল। বাস এ পর্যন্ত—পরব্রহ্মে লাকিয়ে ঠে বাড়ী দেখতে বেরিয়ে গেল। আমি পেছন পেছন গেলাম।

মাকে কেমন দেখলে? বলে গেছেন, না?

বলেছেন বৈ কি, বোগা হয়েছেন খুব। অনেক আগেই এ নিরা ছেড়ে মায়ের চলে বাওয়া উচিত ছিল। আজকের এই নিয়াতে মায়ের মত লোকের বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। ওয় দুধের দিকে ডাকাতে আমার মত হতভাগারও বুক কেটে যায়।

আমার কেমন দেখছে?

তোমার চেহারা রুদ্ধ হয়ে গেছে। দুধ দেখে মনে হয় না দু'-তিন পুঙ্খ-বন্ধু জুটেছে। এখানে যেনোমদ পাওয়া যায়? আজ রাতে মাতাল হ'ব ঠিক করছি।

প্রাণের হোটলে ঢুকে হোটেলওয়ালীর কাছে ভাই-এর নাম দিয়ে খোঁজাচ্ছি চাইলাম, কিন্তু সে বলল একুশি পারবে না বিডে,

ফুরিয়ে গেছে। নাওজিকে একথা বলতে রাগে ওর দুখ কালো হ'য়ে গেল—এমন আমি ওকে আগে কখনও দেখিনি, এ বেন অচেনা মানুষ।

খুব বোকা! ওদের কি করে সায়েস্তা করতে হয়, তুমি জান না। হোটেলের ঠিকানা ছেলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। এ পর্যন্ত। ওর জন্ত অপেক্ষা করে নিরাশ হ'লাম। নাওজির প্রিয় খাবার সঁকা আপেল, জ্বরের মামসেট আগলে বড় আলোখানা খেলে বসে রইলাম। হোটেলের মেয়ে ওসাকী বাস্তবের দরজার মাথা গলিয়ে জিজ্ঞেস করল—মাশ করবেন। এটা কি উচিত হচ্ছে? তিনি তো সেদিকে বসে বসে জিন্ টানছেন। ওয় ছানাবড়া চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

জিন—মানে মেথিল এলকহল?

না মেথিল নয় ঠিক, কিন্তু অনেকটা তাই।

খেলে অন্তর্বে করবে না তো?

না, কিন্তু তবু...

জা হলে থাকে গে।

মাথা নেড়ে ঢাঁকি গিলে ওসাকী চলে গেল।

মাকে জানালাম ওসাকীর ওখানে মদ খাচ্ছে।

মায়ের চোঁটের কোণে হাসির বোখা ছুটে উঠল—আজি ছেড়েছে নিশ্চয়ই। বাও খেয়ে এস। আজ আমরা তিন জন একঘরে শোব। নাওজির বিছানা মাথখানে দিও।

আমার বুক ঠেলে কায়া এল।

অনেক রাতে ধপ-ধপ করতে করতে বাবু বাড়ী ফিরলেন।

ঘরজোড়া মশারি ফেলা ছিল—আমরা তিন জনে ভেতরে ঢুকলাম।

শুয়ে শুয়ে বললাম—তোমার দক্ষিণ-সাগরের গল্প মাকে শোনাও না?

বলার মত কিছু নেই—একবারে কিছুই না। ভুলেও গেছি সব। জাপানে ফিরে ট্রেনের জানালা দিয়ে বানকেন্দে দেখতে ভারী ভাল লাগছিল। বাস। আলো নেবাও, ঘুমতে পারছি না।

অপত্যা আলো নিবিয়ে দিলাম। গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্না মশারি ভেদ করে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ছে। পরদিন সকালে বিছানায় শুয়ে সন্ধ্যার শোভা দেখতে দেখতে নাওজি সিগ্রেট টানছে। বেন এই প্রথম খেয়াল হ'ল মা অন্তর্বে—শুনলাম তোমার জিতে কি একটা ব্যথা হয়েছে! ব্রহ্ম হেসে মা চুপ করে রইলেন।

আমি ঠিক জানি, এ তোমার মনের বোগ। খুব সম্ভব রাতে হা করে ঘুমাও। বড্ড অশাবধান তুমি—একখানা জালি-ঢাকা দুধের ওপর পরে থেকো। রিভানালের (Rivanal) জলে ডাক্তারখানার শোখন করা এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে ঢাকাটার ভেতরে নিও।

আমি সজোরে প্রতিবাদ করলাম—এ তোমার কোন দক্ষি ডাক্তারী?

এর নাম সৌমিন চিকিৎসা।

আমি জানি ঢাকনা পরতে মা'র খুব খায়া লাগবে।

মা'দুধের ওপর কোন জিনিষ বসানো করতে পারেন না। চশমা পর্যন্ত না। চোখ ফুলে ব্যথা হলে চোখের ওপর কিছু বেঁধে

রাখতেও মায়ের আপত্তি, মুখের ঢাকা পরা তো ঘরের কথা। মাকে জিপ্সো করলাম—মা তুমি পরল?!

সেখানা হে মা জবাব দিলেন—পরব বই কি।

আমি তো হাঁ! নাওঞ্জির আদেশ পালন করার জন্য মা যেন বহুপটিকর হয়েছেন।

জলখাবারের পর নাওঞ্জির নির্দেশমত রিভানলের জলে ভিজিয়ে খানিকটা গজ-কাপড় মুখচাপা দেওয়ার মত তাঁজ করে মার কাছে নিয়ে গেলাম। বিলুমাাত্র আপত্তি না করে ঢাকাটা নিয়ে কানের পিছনে দড়ি টেনে বেঁধে নিলেন। তারপর ছোট্ট অসহায় বালিকার মত শুয়ে রইলেন।

সেরিন বিকলে টোকিওতে বজ্রবাহকের সঙ্গে দেখা করা দরকার—এই অভ্যুত্থানে মায়ের কাছ থেকে দুই হাজার ইয়েন (জাপানী মুদ্রা, ডলারের প্রায় সমান) নিয়ে নাওঞ্জি রওনা হ'ল।

এর পর দশ দিন কেটে গেছে, কিন্তু তার কেয়ার কোন লক্ষণই নেই। প্রতিদিন মুখে ঢাকা বেঁধে মা তার অপেক্ষা করেন। তিনি আমার বোঝানো—ভুখুটা বাস্তবিকই ভাল, বাখাটা অনেক কম। আমার মনে হয়, মা ঠিক বলছেন মা। বিছানা থেকে উঠেছেন বটে, কিন্তু খাওয়া গাঞ্জ কয়ে গেছে, কচিং কখনও কথা কন। মায়ের জন্য আমার চিৎকার অবশি নেই, এবং নাওঞ্জি কেন এত দেরী করছে ভেবেই পাই না।

নাওঞ্জি যে ঔপগাসিক উয়েহারার (Uehara) সঙ্গে হৈ-হৈ করে টোকিওর পাগলকরা আনন্দের স্রোতে গা ডাসিয়েছে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এসব কথা মনে এলে নিজের জীবন আরও দুঃখের ঠেকে। গোলাপের কথাগুলো উত্তেজিত হওয়া, বা সম্ভাবনের অভাব স্বীকার করার মত লজ্জাকর ঘটনা যখন আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে—তখন আমি যে ক্রমশ: নিজের ওপর সংযম হারিয়েছি—এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। নতুবা এ ধরনের ক্রটি আমার দ্বারা কখনই সম্ভব হত না। একটা হতাশাব্যঞ্জক লক্ষ্য করে উঠে পাঁড়াতে গিয়ে বোনটা পড়ে গেল। নিজেকে নিয়ে কি করা যায়, ভেবে পেলাম না। কান্ডে কান্ডে সিঁড়ি বেয়ে স্তম্ভলার বিশেষী প্যাটার্নের ঘরের দিকে উঠে গেলাম।

এ ঘরখানার নাওঞ্জি থাকবে। চার-পাঁচ দিন আগে মা আর আমি এই ঠিক করে মিটার নাকিই-য়ের সাহায্যে ধরাধরি করে নাওঞ্জির আলমারী ও বই, কাগজ, অসংখ্য অভ্যস্ত জিনিসে বোঝাই করা কার্টের বাক্স, আমাদের আগের বাড়ীতে তার বা কিছু ছিল, সব সে ঘরে এনে ফেললাম।

টোকিও থেকে কিরে এই আলমারী, বইয়ের বাক্স, কোথায় কি রাখতে চার সেই মত ব্যবস্থা করলেই হবে,—এই ভেবে আমরা অপেক্ষা করে রইলাম। ঘরের অবস্থা বা পাঁড়াল, তাতে সেখানে নড়াচড়া হুঃসাধ্য হ'ল। একখানা খোলা কার্টের বাক্স থেকে অস্ত্র-যন্ত্র ভাবে তার নেটবইখানা তুলে নিলাম। মলাটের গায়ে লেখা—“চন্দ্রমল্লিকা পত্রিকা”। যে সময়ে নাওঞ্জি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেশা করত—এ তার-সেই সময়ের নেটবই বলে মনে হ'ল।

এ কী মরণ-বরণ দহন-ঝালা!

বেদনার ভাড়নার ‘অসহ যন্ত্রণা’ কথাটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করা

অসম্ভব হয়। মানব-ইতিহাসে অস্বীকার, অভুলনীর, অভলম্পদী এ নরক যন্ত্রণার হাত হাতে মুক্তি পাওয়ার প্রয়াস কর না।

দর্শন? মিথ্যা! ধর্ম? মিথ্যা! আদর্শ? মিথ্যা! শূন্যতা! মিথ্যা! সত্যতা? মিথ্যা! সৃষ্টিতা? মিথ্যা! সর্গের মিথ্যা! লোকে বলে উসিখিমার মটর ফুলের বরষ সহস্র বৎসর এবং কুমানার মটরফুলের বরষ শত শত বৎসরেরও অধিক। তুনেছি উসিখিমার মটর লতা নয় কিট এবং কুমানোর লতা পাঁচ কিট পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। ঐ মটর ফুলের শোভায় আমার মন-প্রাণ নেচে ওঠে।

দেও তো কারও সম্ভান! তারও প্রাণ আছে।

যুক্তি, একমাত্র যুক্তির প্রতি অজ্বরগণ, মানবাত্মার প্রতি দয়সে একান্ত অভাব।

অর্থ ও নারী। যুক্তির সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে দ্বারা অস্তিত্ব হয়।

ডাক্তার ফাউন্টের তৈজোদীপ্ত এক উক্তি আছে—নারীর বিচ্ছিন্ন হস্তের তুলনায় ইতিহাস, দর্শন, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি আদি বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখা সকলই তুচ্ছ।

দেহের আব একটি নাম পাণ্ডিত্য। মানুষের আশ্রয় দেয়, মানুষ না হওয়া।

গোটের সামনে শূন্য করে বলতে পারি, আমার মধ্যে অসংখ্য সাহিত্য-প্রতিভা শূন্য আছে। নিতুল বাক্যবিজ্ঞান, রসের মাত্রাবোধ, পাঠককে অভিভূত করার মত করুণ রসের অবতারণা—অথবা ক্রটিহীন, অসামান্য এক উপজ্ঞান, উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যা পড়া যায় উদাত্তকণ্ঠে—(অথবা চলচ্চিত্রের আবহবাস্তব) এমন কিছু লেখা আমার দ্বারা অসম্ভব নয়, যদি না লজ্জা এসে বাধা দেয়।

আসলে প্রতিভার এই সচেতনতা ঘিরে কেমন যেন চাপসার ভাব আছে। পাগলেই শুধু গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে উপজ্ঞান পড়ে। এসব ক্ষেত্রে শোকবাতার বিশেষ শোখাক পরার রীতি চালু করা উচিত। দারুণ কিছু লেখার দম্পন বতকণ না থাকে, ততক্ষণই ভাল। আমার উপজ্ঞান হবে এলোমেলো। ইচ্ছা করে ভয়ঙ্কর লেখাই লিখব আমি, বজুর মুখে ফুটে উঠবে অনাবিল আনন্দ—মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অতল তলে তলিয়ে যাব। আঃ—বজুর সেই আনন্দবিশিষ্ট রূপ দেখে প্রাণ ছুঁড়াবে।

অত্যন্ত বাজে লেখা ও কুচরিত্রের ছেল-ভালানো বাঁশি বাজায় যে বলব জাপানের শ্রেষ্ঠ নির্বোধ এখানে উপস্থিত—আমার তুলনায় তোমরা সবাই ভাল—তোমাদের মজল হোক—এ কোন্ হলনা!

বজু, আশ্চর্য্যে মুখে তুমি যখন বল—‘ঐ তো ওর বদরোগ। আঃ! কি হৃদয়ের কথা।’—তুমি জান না এখন লোকে তোমার ওপর প্রেরণ হয়।

জানি না, কে দন্দ নয়।

স্রাস্ত্রিকর এই দুঃশিত্তা।

টাকা চাই।

টাকা না পেলে—

ঘুমের মধ্যে স্বাভাবিক দ্রুত।

ডাক্তারখানার হাজার ডলার খণ হয়ে গেছে। আজ এক বছরের দোকানে কেরানীকে বাড়ীতে হুকিয়ে আমার ঘরে এনে

জিগোস করলাম—এখানে বন্ধক দেওয়ার মত দাবী কিছু চোখে পড়লে তুল নিয়ে বেতে পার। এখন আমার টাকার বিশেষ দরকার। ঘরের মধ্যে আলগোছে চোপ বুলিয়ে কেবলিটা বোহারার মত বললে—এ মতলব ছেকে দিন বাবু, এ আসবাব তো আর আপনাদের নয়। আমিও কেশে উঠলাম—বেশ ঠিক আছে। আমার নিজের হাত-ধরতের টাকার বা বা কিনেছি, তাই তবে নিয়ে যাও।

টুকিটাকি অল্প জিনিষ তার সামনে জুপ করে দিলাম—যার কোন বন্ধকী মূল্য নেই।

জিনিষের তালিকা—প্রাচীরের তৈরী একখানা হাত—ভেনাসের ক্রিপ হাত। ষ্টাণ্ডণ্ড ডালিয়া ফুলের আকারে শুভ্র একখানা গুল। চক্রেখাবিহীন অঙ্গুলিশ্রোত, রেখাবিহীন করতল সমন্বিত এই তুষারশুভ্র স্রুমাংস হাতখানিকে লক্ষ্য করে বেদনা ও লজ্জার দীর্ঘ এমন অভিভূত হয় যে, ভেনাসের বেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তার পরিপূর্ণ নয়তা যে মুহূর্তে একজন পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়, ভেনাস সজ্ঞাতে দেহের ভঙ্গী পরিবর্তন করে। বিশ্বস্তের রোমাঞ্চকর প্রভেজনার আবৃত্তি অবস্থা, অপরিণীত লজ্জার তাড়না এবং নয়তার বরনা—একথায়ে সমস্ত অল্পভূতি বেন এই হাতখানির মধ্যে পরিস্ফুট।

ভাঙ্কায়ের এ অসামান্য নিদর্শনটির জন্ত কেবলি বৎসামাত্র পঞ্চাশ

সন (জাপানী তাহমুজা) দিতে রাজী হল।

অস্ত্র জিনিষের তালিকা—প্যারীর সহরতলীর এক বিরাট পানিচিত্র। প্রায় এক ফুট বেড়ের সেলুলয়েডের লাট। বিশেষ এক রকম কলমের মুখ—বা দ্বিধে পুতোর চেয়েও মিহি লেখা যায়। প্রথম সত্তার শাঙ্খি ভেবে এককালে আমি এসব কিনেছিলাম।

কেবলিটা হেসে বলল—এবার তবে আমি। পাঁচাও—বলে দায় করে একখাপ বই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাত্র পাঁচ ইয়েন দায় হল। সর্ক-সাকুল্যে আমার মূল্য প্রায় এই রকম পাঁচাও।

সিরি কথা নয়।

করেক জন আমার সমালোচনা করে আমার কাজকে সমর্থন করে লেন—অধঃপত্তনই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। এর চেয়ে আমার যত্নে বললে অনেক বেশী ধুপি হই। সে অনেক লোকা রাজা।

কিন্তু মাছের কখনও বলে না—মর।

অর্বাচীন, পণ্ডিত ভগুর দল। বিচার? এখানে তুমি জ্যেষ্ঠগত

শ্রম সন্ধান পাবে না। মনুষ্য? তুমি অস্ত্র নির্ধারণ। আমি

পানি, তোমাদের স্বার্থপর শ্রমের কারণে স্বপোজীয় মানব বলি হয়।

সে যে যত্ন। একমাত্র রায় সেখানে—যত্ন। এ ভিন্ন এর কোন

র্থ হয় না। প্রতারণা নিস্তরোজন।

আমাদের মধ্যে কোন ভুল্লোলক নেই। নির্বোধ, ভূত, প্রেত,

পুণ, উদ্যম, হামবড়ার দল, কেবল বড় বড় কথা বলে, মেঘের গুণ

থকে নাক উর্চু করেই আছে।

মর। শুধু এই কথাটি বীকার করতে পারলে আমার ভাষা

গিলা থেকে অনেক বেশী লাভ হয়। যুদ্ধ, জাপানী যুদ্ধ,

বিন-মরণ সমস্তার যুদ্ধ। এ রকম মরিয়া কাজের ভেতর আত্মদাং

য়ে নিয়ে মায়ের? ধর্মবাদ, তার দরকার হবে না, বরং নিজের

তে মরা ভাল।

মিথ্যা কথা বলার সময়ে মাছের গভীর হয়ে যায়। আমাদের

ওমান নেতাদের কি দারুণ গাভীর্বা! হিঃ।

যাদের লেখে সম্মানের কোন ঐশ্বর্য ওঠে না, আমি তাদের মধ্যে

বাঁচতে চাই।

যে সময়ে আমি অসামান্য বুদ্ধিমান হবার ভাণ করতাম, তখন

সবাই ধরে নিত, সত্যি আমি তাই। যখন অলস ভাবে দিন

কাটিয়েছি, তখন সবাই বলল ‘অলস’। যখন তাদের বোঝালুম,

উপভাস লেখা আমার আয়ত্তের বাইরে, সবাই ধরে নিল, হুত

তাই। মিথ্যা কথা বলতে শুরু করলাম, সবাই বলল, ‘মিথ্যাবাদী’।

যখন মস্ত বড়মামুদী চাল দেখালুম, লোকে বলল—‘বড়লোক’।

ঊদাসীজের ভাণ করতে, সবাই ধরে নিল—লোকটা ‘বৈয়ঙ্গী’। কিন্তু

অসতর্ক মুহূর্তে বেদনার কাতর হলে লোকে বলল—ওটা

ছলনামাত্র।

ছনিয়ার বীধন আলগা হয়ে এসেছে। তবে কি মোট-কথা এই

পাঁড়ায় না—যে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার গতি নেই? এত বস্তুর

মধ্যেও আত্মহত্যার কথা মনে হ’তে হ’ত করে কেনে উঠলাম।

একটা গল্প আছে, বসন্তের কোন সোনালী সকালে ছুঁ-তিনটি

সত মুকুলিত গ্রাম ফুলের শাখায় হিডেলবার্গ (Heidelberg)-এর

এক তরুণ ছাত্রকে মৃত অবস্থায় কুলতে দেখা যায়।

মা, লক্ষ্যটি আমার গাল-মুখ কর।

কেন?

সবাই বলে আমার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব আছে।

বলে না কি? দুর্লভচিত? আমার মনে হয় না, সেজন্তে

তোমার বকবার আর কোন কারণ আছে। মায়ের ভালমামুদীর

কোন সীমা নেই। তার কথা মনে হলেই আমার চোখে জল

ডরে আসে। আমার সূচ্যুর মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে কমা

চেরে নেব।

দয়া করে আমার ক্ষমা করো। এই একবার অন্ততঃ আমার

ক্ষমা করো।

(নববর্ষের কবিতা)

অসংখ্য বৎসর

তবু তো খোঁচে না জীবিতার

ছোট বকের ছান।

বাড়তে তাদের নেই তো মান।

হায়। কেমনে পার দেহের এমন পূর্ণতা।

মকিন, এট্রোমল, মার্কোপেন, কিলিপিন, প্যাটোপন, পাবিনল,

পানোপিন, এট্রোপিন।

আত্মমর্ধ্যাণা কি? আত্মমর্ধ্যাণা। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার

করে আছেন বীর্য, আমি তাঁদেরই একজন, আমার মধ্যে কত সঙ্গ

আছে—এ গারখা ভিন্ন মানবজাতি, বা কোন প্রকৃত মাছের পক্ষে

জীবনধারণ দুর্বল হয়।

আমি মাছবৎক হুণা করি, তারিও আমার হুণা করে।

বুদ্ধির লড়াই।

গাভীর্বা—নিবৃদ্ধিতার প্রতীক।

বাই হোক, বেঁচে থাকতে হলে মাছবৎক ছলনার আশ্রয় নিতেই

হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অপভ্রমণ করে লেখা একটি চিঠি।

তোমার উত্তর।

দয়া করে উত্তর দাও। এমন উত্তর যেম, আমার মন খুশি হয়ে ওঠে। অপমানের আশঙ্কার আপন মনে দখল মরছি। অভিন্ন নয়। আরও সেই নয়।

প্রতিদিন, প্রতিদিন তোমার উত্তরের অপেক্ষার কাটে; অজোয়ার ভরে কীপতে থাকি।

আমার ধূলা মাথতে বোনা না। দেওয়ালগুলো আমার দেখে চাপা হাসি হাসে। গভীর রাত্রি বিছানার হটকট করে কাটে। আমার অপমান করো না। বোন আমার।

এ অবধি পড়ে আমি 'চন্দ্রমল্লিকা পত্রিকা' বন্ধ করে কাঠের বাজের কাছে ফিরে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে জানালা ধুলে দিলাম এবং বুড়িয়ারার ঘোঁরাটে বাগানের দিকে তাকিয়ে সে-সব দিনের কথা ভাবতে বসলাম।

তারপর ছয় বছর পার হয়ে গেছে। নাওজির এই নির্দারুণ লেখাই আমার বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কারণ। না, একথা আমার বলা উচিত নয়—আমার মনে হয় ছয় বছর সময় থেকেই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমার কপালে লেখা ছিল। নাওজির বহিঃনেশা না-ও করত তবুও কোন না কোন দিন আর কোন কারণে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটত। ডাক্তারখানার স্বপ্ন করে নাওজির প্রায়ই আমার উত্থাপিত করত। আমার তখন সন্ত বিয়ে হয়েছে, কাজেই টাকা-পয়সা নিয়ে বা খুশি করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তাছাড়া স্বামীর টাকা এভাবে লুকিয়ে তাইকে দেব, ভাবতে খুব খারাপ লাগত। আমার বাপের বাড়ীর ঝি 'ওসাকী'র সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের বালা, হার, দামী পোষাক ইত্যাদি বিক্রি করাই স্থির করলাম। শেষ চিঠিতে নাওজির লিখেছিল—আমার অত্যধিক লজ্জা ও মানসিক উদ্বেগের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করা বা টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব নয়। ওসাকীর মারকৎ ঔপচাসিক উয়েহার জিরোর টিকানার টাকা পাঠিও। আশা করি জ্বরলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ অন্ততঃ নামের পরিচয় আছে। মিষ্টার উয়েহারার মূল লোক বলে বাজারে বদনাম আছে, আসলে জ্বরলোক ঠিক সে রকম মন, তার টিকানার টাকা পাঠাতে বিধা করে না। তাঁর সঙ্গে বন্ধোবন্ধ আছে টাঙ্কা গেলেই আমার কোন করে জানিয়ে দেবেন—কাজেই সেই রকম ব্যবস্থা করে। মায়ের কাছে থেকে অন্ততঃ আমার এই নেশার কথা গোপনে রাখতে চাই। তিনি জানবার আগেই আমি নিজেকে সশোধন করতে চাই। তোমার টাকা দিয়ে ডাক্তারখানার খার শুধব। তারপর স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে আমাদের পাঁচাত্তি বাসার গিয়ে উপস্থিত হব। সত্যি আমার এ রকম একটা-ইচ্ছে আছে। যে দিন আমি স্বপ্নমুক্ত হব, সে দিনই নেশা ছেড়ে দেব। ঈশ্বরের কাছে শপথ করছি—দয়া করে আমার বিশ্বাস করো। মাকে জানিও না, আর টাকা মিষ্টার উয়েহারার কাছে পৌঁছে দিও।

চিঠির মোট বক্তব্য এই। ওসাকীর মারকৎ মিষ্টার উয়েহারার কাছে টাকা পৌঁছালে বটে, কিন্তু বরাবরের মত এবারও নাওজির প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হল। স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আশার আমাদের বাসার সে গেল না; বরং তার নেশার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে ক্রমেই মারাত্মক অবস্থার দাঁড়াল। টাকার ব্যাগে তার চিঠির বারী উভেগের এমন রূপ নিল, বাকি আর্জিনার বললেও অতুলিত হয় না। প্রতি চিঠিতে আমি নেশা ত্যাগের শপথ নিলাম, এর পরেই এমন এক স্বপ্ন

বিহারক শপথ করে যে চিঠির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারি এবারও মিথ্যা বলছে, তবু নিজের আর একখানি গহনা ওসাকীর হাতে তুলে দিই, টাকাটা মিষ্টার উয়েহারার কাছে ঠিকই পৌঁছায়।

মিষ্টার উয়েহারার কেমন লোক?

বেঁটে, কালো, বিজ্রী বলে ওসাকী কিন্তু আমি যে সময়েই, বেকীর ভাগ দিনই তিনি সে সময়ে বাড়ীতে থাকেন না। তাঁর জী আর বছর ছয়েকের কচি মেরের সঙ্গে দেখা হয়, জী যে খুব সুন্দরী ছা নয়, কিন্তু ভারী মিষ্ট আর বুদ্ধিমতী। তাঁর মত মহিলার হাতে টাকা তুলে দিতে ভাবনা হয় না।

বর্তমান আমি'র সঙ্গে সেদিনের আমি'র যদি তুলনা কর, তবে দেখবে অসম্ভব, কোন সাধুই খুঁজে পাবে না। উচ্চশির আমার তখন আকাশে ঠেকত এবং অত্যন্ত বহুল ছিল আমার গতি। তা সত্ত্বেও দারুণ ভয় শেলাম, আমার শোষণ করে যে পরিমাণ টাকা এক একবারে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে রীতিমত হৃৎস্পন্দনের মত মনে হত। একদিন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গাড়ী কিরিয়ে দিয়ে হেঁটেই চললুম মিষ্টার উয়েহারার বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

মিষ্টার উয়েহারার নিজের ঘরে বসে খবর-কাগজ পড়ছিলেন। জাপানী পোষাকে তাঁকে একাধারে বৃষ্ণ ও তরুণ দেখাচ্ছিল। তেজীবে কখনও দেখিনি এমন এক জীবের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আমার জী মেরেকে নিয়ে রেশন আনতে গেছেন। ঈশ্বর নাকি মুরের কেটে কেটে কথাগুলি বললেন। আমায় দেখে জী'র কোন বৃ বলে ভুল করেছিলেন। নাওজির বোন বলে নিজের পরিচয় দিতে অটহাসি হেসে উঠলেন। শরীরের তেজের দ্বারা না জানি কেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

বেকলে হয় না? কথাটা বলেই, উত্তরের অপেক্ষা না করেই, একখানা ক্রোক গিয়ে চাপিয়ে নিয়ে, নতুন এক জোড়া চিট পার আমার আগে-ভাগে বারান্দা পেরিয়ে বসে গেলেন।

আমি স্বীকৃত সন্ধ্যা। হিমেল হাওয়া মনে হ'ল সোজা নদী ওপর দিয়ে বয়ে আসছে। মিষ্টার উয়েহারার হাতের বাঁচাতেই বৈ দুটো কাঁধ তুলে নিঃশব্দে ইটিছেন। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে তাঁর পেছনে চলেছি।

টোকিও থিয়েটারের এক হলায় গিয়ে চুকলাম। লম্বা দর ঘরখানার চার পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে ঝঞ্ঝেরা নিঃশব্দে বসে মগ্ন থাকে।

মিষ্টার উয়েহারার মনের শেরালার বদলে গেলাসে ঢেলে যেমনটা খেলেন। আর এক গেলাস আনতে বলে আমার খেতে অস্বস্তি করলেন। 'হু' গেলাস খেয়ে নিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু তৃপ্ত বৃদ্ধিলায় না।

মিষ্টার উয়েহারার নিঃশব্দে বেনো আর সিগ্রেট চালাতে লাগলেন। জীবনে প্রথম এমন ভায়গার পা দিয়েও আমার কিন্তু মোটেই ধারণা লাগছিল না। বরং ভালই লাগল।

ভাল মদ খাওয়াতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু—

বলুন।

মানে তোমার ভাই। সে যদি মদের দিকে খুবই ভাল হত। বহু কাল আগে কোন সময়ে আকি-এর নেশা আমার

ছিল, আমি জানি লোক একে কত হীন চোখে দেখে। মদ প্রায় একই জাতীয় পদার্থ, কিন্তু তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ পক্ষপাত দেখি। আমার ইচ্ছে আছে, তোমার ভাইকে মদের নেশা ধরাব। তুমি কি মনে কর?

আমি একবার এক মাতাল দেখেছিলাম। নববর্ষের দিন বাড়ী বাড়ী দেখা করতে বেরুব এমন সময়ে আমাদের গাড়ীর ভেতর কুৎসিত লাল মুণ্ডওয়ালা একটা লোক দেখলাম, নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে আমাদের ডাইভারের বন্ধু। আমি ভয়ে চিংকার করে উঠেছিলাম। ডাইভারের মুখে শুনেছি, লোকটা পাঁড় মাতাল। গাড়ী থেকে ছিটকে বের করে তার কাঁধে দুটো ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে লোকটার নদীর এমন ভাবে জেঙ্গে মুড়ড়ে পড়ে গেল, যে মনে হল—হাড়গোড় বৃষ্টি কিছু নেই।

আর সারাক্ষণ কি যেন বিড়বিড় করতে লাগল। সেই প্রথম আমি মাতাল দেখে খুব আন্দর্ধা হয়েছিলাম।

জান বোধ হয় আমিও মাতাল?

না, সে কথা সত্যি নয়। আমি আসল মাতাল দেখেছি। তার চেহারা ই ভিন্ন।

এই প্রথম ভ্রমলোক মন খুলে হাসলেন।

তাহলে হয়ত তোমার ভাইকে মদের নেশা ধরানো বাবে না, তবু মদ ধরলে ওর উপকার হবে। চল এবার ওঠা বাক।

দেবী করতে চাও না আশা করি।

তাতে কিছু এসে যায় না।

সত্যি বলতে এ জায়গাটা বড় বেশী ভিড়। ওয়েট্রেন,—বিল আনো।

অনেক খরচ হল? খুব বেশী না হলে আমার কাছেও তো কিছু আছে।

তবে বিলটা তুমিই চুকিয়ে দাও।

অতটা নাও থাকতে পারে। ব্যাগের ভেতর চোখ বুলিয়ে মিষ্টার উয়েরহারকে আমার টাকার আশঙ্ক দিলাম।

এ টাকার আরও হুঁ জায়গার মদ খাওয়া চলে, বোকা মেয়ে কোথাকার। ত্রু চুঁচকে বসেই ভ্রমলোক হেসে কেললেন।

আর কোথাও বাবেন মদ খেতে?

উনি মাথা নেড়ে আপত্তি জানানলেন—না যথেষ্ট হয়েছে। তোমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকি। তুমি বাড়ী বাও।

অন্ধকার নির্ভী ভেঙ্গে একতলা থেকে উঠে এলাম। মিষ্টার উয়েরহার আমার এক ধাপ ওপরে ছিলেন। হঠাৎ পেছন দিয়ে আমার অধর স্পর্শ করলেন। ঠোট লক্ক করে চেপে তাঁর চূচন গ্রহণ করলাম। তাঁর প্রতি বিশেষ কেনে আকর্ষণ আমার আসেনি, কিন্তু সেই সময় থেকে আমার গোপন কথার সূত্রপাত। মিষ্টার উয়েরহার নির্ভী বেয়ে তর-তর করে উঠে গেলেন, আমি ধীরে ধীরে তাঁকে অহসরণ করলাম, মনের মধ্যে সম্পূর্ণ কান্ধা। বাইরে বেরিয়ে নদীর হাওয়ার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

মিষ্টার উয়েরহার আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি পাঁড় করলেন, কোন কথা না বলেই আমার পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পুরনো নড়বড়ে ট্যাক্সিও বেতে বেতে মনে হল, এই বহুতে সমুদ্রের মত বিশালরূপিনী সমুদ্রের দ্বার আমার চোখের সামনে খুলে গেল।

একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে মন খারাপ করে বসে আছি, হঠাৎ কি মনে হতে বলে কেললাম,—একজন আমার ভালবাসেন।

জানি, হোসাতা না? তুমি কি তাঁকে ভুলতে পার না?

এ কথার কোন জবাব দিলাম না।

যখনই আমার স্বামীর সঙ্গে গোলমাল হত, তখনই এই কথা উঠত। মনে ভাবলাম—সব শেষ।

এ যেন পোষাকের জন্ত তুল করে কাপড় কেনা, একবার কেটে কেললে জোড়া দেওয়া চলে না। সবটা কেল দিয়ে নতুন করে কাপড় কিনতে হয়।

এক রাতে স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, আমার পেটের সম্ভানটি কার? হোসাতার? ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধর-ধর কঁপে উঠল। এখন বুঝতে পারি সে সময়ে আমি এবং আমার স্বামী দু'জনেই কত ছেলেমানুষ ছিলাম। সহজ প্রেম কথাটার তাৎপর্য আমাদের জানা ছিল না। মিষ্টার হোসাতার ছবির সবুজ এমন অন্ধ ভক্তি ছিল যে, চেনা-শেনা সবাইকে বলে বেড়াতাম এমন লোকের দ্বী হবার সৌভাগ্য থাকলে জীবনে প্রতিটা দিন অপকল্প সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। তাঁর মত কচি ধীর নেই, তেমন মানুষকে বিয়ে করা অর্থহীন। কাজে কাজেই সবাই ভুল বুঝত, আর আমি যেহে ভালবাসা সবুজ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম বলেই নিঃসঙ্কেত সবার সামনে বলে বেড়াতাম আমি হোসাতাকে ভালবাসি। এ ধরনের মন্তব্য কখনও প্রত্যাহার করার চেষ্টা পর্যন্ত না করার ব্যাপার জটিল হয়ে দাঁড়াল। সেই কারণেই মেহের মধ্যে ঘুমন্ত ক্ষুদ্র মানব-শিত্তর প্রতিও আমার স্বামীর মনে সন্দেহ জাগে। দু'জনের মধ্যে কেউই বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা তুললাম না, অথচ দিনে দিনে আবহাওয়া ধমধমে হয়ে উঠল। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে এলাম। মুত শিশুর জন্মের পর অম্বহ হয়ে শয্যা নিলাম, স্বামীর সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক শেষ হ'ল।

আমার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী হয়ে নিয়ে নাওজি গলা কাটিয়ে নিজের মরণ কাহনা ঘোষণা করল—কান্নার তার হুঁ বিকৃত হল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তারখানার আর কত ঋণ আছে? ধারণাতীত এক বিরাট টাকার ঋণ আমার কাছে সে স্বীকার করল। পরে শুনেছিলাম সে মিথ্যা বলেছিল, আসল অঙ্কটা তারও তিনগুণ।

আমি স্বীকার করলাম, তোমার মিষ্টার উয়েরহারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? চমৎকার মানুষ। মাঝে মাঝে তিন জনে মিলে বাবে আড্ডা দিতে বেরুলে মন্দ হয় না। ধেনোমদ এত সস্তা, আমার কোন ধারণাই ছিল না। এতে তোমার অঙ্কটি না হলে খরচ পোষানো আমার পক্ষে কঠিন হবে না। ডাক্তারখানার টাকার জন্ত জেবো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েই বাবে।

মিঃ উয়েরহারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এক তাঁকে আমার ভাল লাগে শুনে নাওজিও তো গমগম অবস্থা। সে রাতে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে ভ্রমলোকের বাড়ী গাওয়া করল।

নেশাটা বোধ হয় মনের রোগ। মিষ্টার উয়েরহারের প্রেমসংসার পক্ষস্থূপ হয়ে উঠলাম। ভাই-এর কাছ থেকে তাঁর লেখা 'বই ধার করে পড়তে শুরু করলাম। পড়া হলে মন্তব্য করতাম—এমন লেখক আর হয় না। আমি ভ্রমলোকের লেখার একজন সমর্থক,

এ কথা আবিষ্কার করে নাওজি তো অবাক। খুশির চোটে আঁমায়
ঠর আরও সব উপভাস জোপাড় করে দিতে লাগল। নিজের
অজান্তে আমি মিষ্টার উয়েহারার গুণগ্রাহী হয়ে উঠলাম, তাঁর সমস্ত
উপভাস মন দিয়ে পড়ে নাওজির সঙ্গে সমালোচনা করি। প্রায়
প্রতি রাতে নাওজি মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে মদের আড্ডার চলে
বার। ক্রমে ক্রমে সে মদের নেশার মশগুল হয়ে এল। নাওজিকে
না জানিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তারখানার ধারের কি হবে?
এক হাতে দুখ ঢেকে কিছুক্ষণ চুপ করে মা বলে রইলেন; তারপর
দুখ তুলে স্নান হেসে জবাব দিলেন উপায় কি? মাথায় তো
কিছুই আসছে না। জানি না কত বছরে এ বোকা নামবে।
বাই হোক, প্রতি মাসে সামান্য কিছু করে শোধ করতেই হবে।

এর পর দু'বছর কেটে গেছে। জীবন দুর্ভাব্য হয়ে উঠছিল।
চন্দ্রমল্লিকা। নাওজির পক্ষেও কথাটা সত্যি, আজ অবধি জ
উদ্ধারের সব রাস্তা বন্ধ, কি করে কি করা যায়, এ ধারণাই জ
নেই। মৃত্যুর আশাওতাই সে নিশ্চয় বোঝে মাতাল হয়। নিজেকে
নষ্ট হতে ছেড়ে দিলে আমিই বা কোথায় গিয়ে কাঁড়াতাম, কে জানে।
বোধ হয় তাহলে নাওজির পক্ষে সহ করা সহজ হত।

নাওজি নেট বইয়ে লিখেছে—কি বে মন্দ নয় তা তো জানি না।
এই কথা পড়ে নিজেকে আমার কাকাকে, এমন কি আমার মা
জননীকেও যেন বিশ্বাস করতে পারি না। বোধ হয় এখানে জ
কথাটির সাজা আমার বন্ধন বাড়ি হবে।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

চাঁদ ও চীনেমাটি

বড় রাস্তার ধারে ঐ বে সড় গলি—
বার সামনে ফুটপাথের উপর লোহার চৌকো ঢাকা দেওয়া
গলিগুলোর কল—
ঐটেকে ওরা তুলে কেলস অবলীলার,
বুকে বসল কাচের পেলাস আর সস্তা দামের চীনেমাটির বাসন।
আকাশে তখন চাঁদ জ্বলছে।
গ্যাসের বাতির চেয়েও অনেক জোরে আর অনেক নূরে জ্বলছে চাঁদ,
তার আলো ওদের গায়ে ছড়িয়ে গেছে—
ছড়িয়ে গিয়ে ঝিকঝিকিয়ে উঠছে চীনেমাটির চক্চকে স্ট্রেটে।
ওরা অনেক রাত্রে কাজ করতে বসেছে পথের ধারে
চায়ের পোকানের সামনে—কাঁচা-বরসের দুটি ছেলে—
বাদের বুকের ক্যাকাশে রঙে ভীতিজনক অবস্থার আশঙ্কা,
ঐ সামনের অন্ধকার আঁকা-বাঁকা গলির মতনই
বাদের ভবিষ্যৎ সর্পিলা ও অন্ধকার,
বাদের গায়ে এই শীতের রাত্রেও হেঁড়া পেঞ্জা,
রঙ উঠে বাওয়া বোতামখসা হেঁড়া প্যাট পরন,
ঐ কাঁচা বরসের ক্যাকাশে রঙের দুটি ছেলে—
বারা এত রাত্রেও হাসিহাসি বুকে কাচের ও

চীনেমাটির বাসন বুকে,
নিশীথপ্রায় শীতের রাত্রে কুরাশা ছড়ানো চাঁদের আলোয় তলায়।

ওদের বয়সী অনেক ছেলেই এখন ঘুমোছে
আরামে লেগেই তলায়—বাতি ছেলে অনেক পড়ার শেষে—
বারা জানে মিশরের পিরামিডে কারা থাকে
ঐ হলদে মলমল ছড়ানো প্রেতমূর্তির দল
সুগন্ধি মশলার কাঁখে বাদের দেহ জরজর হ'য়ে আছে,
আর বাদের গলায় ঢুলছে কীকি সবুজ পাখরের বহা মালা।
যেখানকার উদ্ভাস প্রপাতের কাছে নরম কাদায়
জল-হস্তীর দল পা ডুবিয়ে আরামে চোখ বুঁজ আছে।
এদের বাসন ঘোয়ার টু-টাং শব্দ মিশে গেছে ওদের শড়ার সুরে
বধন ওরা পড়েছে—কোথায় কোনো সিংহ দেশের আরক্ত চুপি
গোলাপের চেয়েও লাল আর বকবকে—
কোথায় গজমুক্তার মালা শাদা হাঁসের ডিমের মতন বড় বড়
কোথায় নীলা-পাখরের দ্যাকি সত্ত্বরের সুনীলতার চেয়েও প্রপাট
আর কোথায় নলবনে ছরস্ক হাওয়ার জল-ফড়িং-এর মাতামাতি।
ওদের কানে বার না এ সব কথা—
ওরা জানে আর এক সেট বাবু ব'লে আছে শিশাসার্ত হ'য়ে
জানে দোকানের মালিকের চড়া মেজাজ
আর চেনে দু-একটা পরসার বশিধ—
বা ওদের কাঁচা বরসের সমস্ত স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েছে—
জীবিকার দারে বোগা হাতে ক্যাকাশে বুকেও বারা খুশি।

ওরা চায়ের চীনেমাটির বাসনগুলি বুয়ে ঠেঁতে থাক দিয়ে সাজাল,
তারপর একটু আড্ডাল হয়ে দু-জনে দুটো বিড়ি ধরাল—
আগুন ধরিয়ে ধোয়া ছুঁড়ে দিল চাঁদের দিকে—
ছাই ঝরিয়ে দিল নীচের মাটিতে
তারপর বৈধবৈধি করে কাঁড়িয়ে বলল শীতের প্রকাশের কথা,
আর আমি পাড়ার লোক—আমাকে দেখে লজ্জার হেসে কেলস
আর ওদেরক্যাকাশে বুকের হাসি দেখে কান্নার দৃক আমার ডেকে গেল।

শেরপারা হাতে আলো আর কুকুর নিয়ে চুকলো সেই
অন্ধকার শুষ্কার। কাঁছে গিরে তারা বা দেখলো, সে
এক অভ্যর্থিত বৃদ্ধ। কিশোর আর শান্তনু দুজনেই দড়ি দিয়ে
বাঁধা। তাদের ঘিরে আছে তিনটি বলিষ্ঠ লোক। আগন্তুক
শেরপাদের দেখে তারা শিঙল উঠিয়েছে।

শেরপাদের মধ্যে কিশোর, শান্তনু দুজনেই আশঙ্ক হলো।
শিঙলগুলো অগ্নিবর্ষণ করার আগেই তারা চিংকার করে বলে
উঠলো: মারবেন না! ছুঁ নট কাহার আট ধেম। ওরা
আমাদের লোক।

কিছুক্ষণ ধরে সেই ভিত্তিত অন্ধকার গুহামধ্যে সকলেই শুব
হয়ে রইলো। তারপরে, কথা বললো প্রথম শান্তনু। সে বললে,
আমাদের নিয়ে কি করতে চান আপনারা?

তোমাদের উদ্দেশ্যটা আগে শুনতে চাই, বললে গুহের মধ্যে
বয়স্ক লোকটি। তার মুখখানা দাড়ি-গৌকে আচ্ছন্ন, চোখ দুটো
অগ্নিপ্রাণী—আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তোমরাও যদি সেই
মতলবে এসে থাকো তাহলে তোমাদের এখানেই থেকে যেতে হবে।

শান্তনু বললে, অনুগ্রহ করে বলবেন কি, আপনাদের উদ্দেশ্য
কি? আমাদের তরক থেকে বলতে পারি, আমরা অন্ধত স্বর্ণখনির
সন্ধানে বা পরশমণির সন্ধানে এখানে আসিনি।

তবে? অপর পক্ষ থেকে প্রশ্ন এলো।

শান্তনু বললে, আমরা পৃথিবীর উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।
আমাদের লক্ষ্য বলতে এক কথার বলতে পারি, সোনালি খরগ।

অপর পক্ষের একজন একটু হেসে বললে, এতো কষ্ট করে
সোনালি খরগ দেখতে শুধু কেউ আসে কি না আমরা জানি না।
এ কথা বিশ্বাস করাও শক্ত!

শান্তনু বললে, বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ওপর নির্ভর
করে। তবে আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ লামাজি আছেন। তিনি ত
মিথ্যা বলেন না?

কোন লামা? নাম কি?

তিয়েলিং।

তিয়েলিং-এর নাম শুনে ওরা একটু চুপ করে থেকে একটু দূরে
সরে গেল এবং সেখানে চাপা গলায় কিছুক্ষণ পরামর্শ করে ফিরে
এল। সেই বয়স্ক লোকটি বললে, তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি
দুটি সর্তে। প্রথম, আমাদের কাজে তোমরা কোনো বাধা দেবে
না। দ্বিতীয়, শংকরীপ্রসাদের হত্যার কথা তোমরা প্রকাশ
করবে না।

শান্তনু বললে, শংকরীপ্রসাদের সত্যতাে আমরা খুশি হয়েছি,
আপনারা তাকে হত্যা না করলেও আমার হাতে সে নিহত হতো।

ও! তোমাদের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছিল?

শান্তনু তখন সবিস্তারে শংকরীপ্রসাদের কথা বললো এবং
গুহের কাছে বা শুনলো, তা আরো চমকপ্রদ। ওরা আটজনদের
একটি দল এই অভিযানে বেরোর। তারপর, লক্ষ্যহলের বতই
কাহাণীই আমরা হয়েছি ততই শরতান হয়ে উঠেছিল সে।
গোড়ের কবলে পড়ে আমাদের কাঁক দেবার চেষ্টায় সে পর পর
তিন জনকে হত্যা করেছে। সুবোপ পোষা আমরা তিন
জনও থাকতাম না। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, তাকেই সরে যেতে
হলো।



শান্তনু বললে, তাহলে, আর কি বলার প্রয়োজন আছে যে
আমরা আপনাদের দুটি সর্তেই রাজি?

সকলেই একবার হেসে উঠলো এবং তাদের বাঁধনগুলো খুলে
দেওয়া হলো।

কিশোর এতক্ষণে বলে উঠলো, তাহলে আমরা এখন বন্ধু, তাই
নয় কি?

সকলে বলে উঠলো, নিশ্চয়ই। পাঠি হয়ে গেল।

শান্তনু বললে, আমাদের কিছু এখনি যেতে হবে ক্যাম্পে।
আমাদের এক বোন আছে আর লামাজি আছেন। ওরা আমাদের
জন্মে এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনারাও কিছু আসবেন,
চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো।

মোঠা, গ্রাউন্ডলি, বলে উঠলো এরা। একজন বললে, সোনালি
খরগ দেখবেন না? এখান থেকে সহজে বাওতার পথ আছে।

তাই নাকি? হরকো...! শান্তনু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।
দেখবো, নিশ্চয়ই দেখবো। কিন্তু সবাই মিলে... এই বলে
শেরপাদের নিয়ে শান্তনু, কিশোর ওপরে উঠতে লাগলো ক্যাম্পের
উদ্দেশ্যে।



[স্বর্ণপ্রকাশিতের পর]

প্রিন্সেল চক্রবর্তী

খুব থেকেই ওরা চিৎকার করে উঠলো, লালী, লালী, দাফন হুঃসহ স্তম্ভাবাদ।

লালীর যুগ্মধারা ভারী, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো।

তাকে বাঁকুনি দিয়ে শান্ত হুঃ বললে, খুব কারা হয়েছে, বুঝতে পাচ্ছি...কিন্তু, এবারে আর কারা নয়। একেবারে হাসি। স্বয়ংক বটা পরেই আমরা সোনালি স্বরণা দেখতে বাবো।

রাখো তোমাদের সোনালি স্বরণা, যুগ্ম বৈকিরে বললে লালী। এমন জানলে কে আসতো তোমাদের সঙ্গে!

কেন, কি হয়েছে?

বেশ ক্ষুধিতে মশগুল হয়ে আছে, আর আমাদের কাল থেকে কী দুঃস্থিত্যের কাটছে।

ও, এই কথা। আমরা আসতে পারলে তবে তো, ঐ শেরপাদেরই জিগ্যেস করা না। সে এখন থাক, পরে বলবো। কিছু খাবার আর চাবের জোগাড় করে দেখি, তিন জনকে নিমন্ত্রণ করে এলুম। চল কিশোর, লামাজির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

লামাজি সব বুজাছু শুনেও বিশেষ বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, এখানে এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়। মাহুদের অর্ধলোকের হিংস্রমূর্তি কত অনর্থই বে করেছে। লোভ তার প্রসারিত হাত দুটি হিংসার কলুষিত করে কত রক্ত যে বরিয়েছে, কত প্রাণ বিনষ্ট করেছে, কে তার পরিমাণ করবে? ভগবান বুকের অপর আশীর্বাদের তোমরা কিং এসেছ।

আর একটা স্তম্ভাবাদ আছে লামাজি, বললে কিশোর। ঐ শুদ্ধার মধ্যে দিয়েই সহজ পথ আছে, সেটা আমরা জেনে এসেছি।

তা হবে, বললেন তিয়েলিং। ওটা আমার জানা নেই।

বখামময়ে ভূগর্ভ থেকে তিন জন অতিথি এসে হাজির হলো।

তিন জনই ভারতীয়, বাঙালী নয়। দুজন বোখাই, একজন উত্তরপ্রদেশের লোক। ওঁরা ঐ নির্বাক জনহীন প্রদেশে মাহুদের সান্নিধ্য পেয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। চা-পানের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। লালী অনেক দিন পরে অপরিচিত অতিথিদের পরিবেশন করলো।

সেই দিন দুপুরে অনেকগুলি মাহুদের একটি দল ঢালু পথে পা বাড়ালো। কিন্তু দৈব-দুর্যোগের কি এখনও শেষ নেই? হঠাৎ আকাশ আচ্ছন্ন হলো মেঘে। কুয়াশার মত পাতলা মেঘ। বৃষ্টি এলেই বিশদ, নামার পথ শিথল হলে সে মায়াব্রত হয়।

বাই হোক, প্রকৃতি তাঁর চরম অভিশাপের মধ্যেও আশীর্বাদ রেখে দেন। তা না হলে পৃথিবীর বহু দুর্গম স্থান আজও মাহুদের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যেত।

শুভার অন্ধকার গমিল পথে কিছু দূর বেচেই একটা গর্জন ঝড়িগেটের হলো।

শুকসীপ্রসাদের দলের একজন মিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন তাঁর নাম মিঃ কাপুর। তিনি বললেন, আমরা স্বরণার নিচে দিকে বাজি বকেই এতো শব্দ পাওয়া বাজে।

স্বরণাকে মারশণ থেকে দেখার সব চেয়ে ভাল। আর একজন মন্তব্য করেন। ওরা বতই এগুচ্ছে ভতই গর্জনের শব্দও বাড়ছে। এভাবে পথের দুপাশে সেই স্তম্ভাবাদ গহবরের রূপও অস্পষ্ট।

জলের কোটীর সঙ্গে চুপ বা সিলিক, জাতীয় পার্শ্ব জমে জমে কক লক জ্বলের মত স্পষ্ট করছে। ওপর থেকে সেগুলি ফুলছে। কতকগুলি মাটি স্পর্শ করেছে, কতকগুলি করেনি। সেগুলির আকার আর গঠন কী বিভিন্ন।

কতক্ষণ চলার পর তীব্র আলো হঠাৎ বেন বলসে উঠলো ওদের চোখে। শান্ত হুঃ বললে, স্তম্ভাবাদ শেষ হলো। আমরা বাইরে এসে পড়েছি। এ আকাশের আলো।

তিয়েলিং বললেন, না শান্ত হুঃ, ভুল করছে, সামনে চেয়ে দেখ।

সত্যিই তাই পর্বতগর্ভের স্তম্ভাবাদ তখনও শেষ হয়নি। কিছু সেখানকার একটি রূপগুহ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা আলোকোজ্জ্বল জলধারা। শান্ত হুঃ আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। তিয়েলিং বললেন, এটিও একটি প্রসারণ, ধবলগিরির বুক থেকে নেমে আসছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে সত্যিই স্তম্ভাবাদ শেষ হলো। ওরা যেখানে দাঁড়ালো, তার মাথার আকাশ। সেখান থেকে ঘুরে দেখা গেল একটি সৰু সোনার স্তম্ভা ফুলছে—ওপরে নিকব-কালো পাখ্যের পর্বতশৃঙ্গ, হুঃ নিয়ে নীলাভ কুয়াশা। তিয়েলিং মন্তব্যের মত দাঁড়িয়ে পড়েন। লালী, কিশোর, শান্ত হুঃ বসে পড়ে... একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সকলে। বাক্যহীন।

কথা 'বলার প্রয়োজন কোথা? সবার মন তখন চোখের তারার।

অনুভূতি তাহার শুধু শান্ত হুঃ বললে, সোনালি স্বরণা, সোনালি স্বরণা...

একটি স্বর্ণবস্ত্র বেন স্বর্গচাত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে, সায়লী গতিতে, নিচে, অনেক নিচে যেখানে সে হুঃ গেছে কুয়াশার সম্প্রতিভার। মন-প্রাণ ভরে দেখলো ওরা।

মিঃ কাপুর বললেন, শুনেছি ওটা জল নয়, জল ছাড়া অন্য কিছু, এই যেমন সত্যিকার সোনাও হতে পারে।

সেটা কি কয়ে সস্তব? বাও বললে। গলিত সোনার টেম্পারেচার কত? বরং এটা হতে পারে যে স্বর্ণের মিশ্রিত জল।

কাপুর প্রতিবাদ করে, তাও সস্তব নয়। ওটা লাইটের কোনো অদ্ভুত প্রতিফলনের জন্মেই ওরকম দেখায়। আসলে হয়তো ওটা জলই।

তিয়েলিং এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন। শুধু তার গুঞ্জন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। উনি বললেন, কোনো ব্যাখ্যাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যেটি বিশ্বাসযোগ্য সেটি আমার কাছে শুভ নয়।

আসলে, ওটি কোনো সাধারণ স্বরণা নয়। অনেক কাল আগে কাকনমালা। কাকনজ্ঞার একমাত্র আদরের ঢুলালী কাকনমালা... কাকনজ্ঞার কটিদেশে ছিল নিকব-কালো কলিপাখার আর পরশ শিলার বেটনী।

শব্দকে শুধুকে গঁথে রেখেছিল তারা হিমালিরাজের ঐশ্বর্যটিকে। বাবা কাকনজ্ঞার রক্তে রক্তে জমে আছে সোনার রূপ। স্বর্ণবরী কাকনমালা ছিল উচ্চতম শিখরের একটি কক্ষে। কত রাণী, কত রাজপুত্র এলো তার পাণি প্রার্থনা করে...কিন্তু কেউই পারলো না তাকে লাভ করতে। দলে দলে তারা প্রাণ দিল, তাদের অস্থিগুহ পড়ে আছে ঐ রক্তকঠিন শিলারশির কন্ধের কন্ধে।

তারা এসেছিল স্বর্ণের আকর্ষণে। তারা চেয়েছিল কাকনমালাকে আত্মসাৎ করতে, তাকে লোভের কঠিন নখর দিয়ে ধরতে...

করমালা শুধু দিওয়ে উঠতে। মেঘলোকে ঢেকে রাখতে। তার হাতে...

শেষে এলো এক পৃথিবীর কুমার... টুংসাটুংসে কটন বর্ম তার পক্ষে... শুভা পণ কবে সে উঠলো ঐ-মস্তণ শিলাগাত্র বেয়ে। সে লে, ভালবাসা দিয়ে 'আমি জয় করবো' শুভাত্তরকে, কোনো বাঘাই নি না আমি।

শিসার পাঁজরে পাঁজরে তুল গজালো, তার পা রাখবার জন্তে। যে জয়ী হলো সে, কাকনমালার হাতে দিল একটি রক্তগোলাপ। হাতে বেঠন করলো সে কাকনমালাকে। বললে সোনা চাই না, হুটি চাই। আমি চাই তোমাকে, নিয়ে যাব পৃথিবীতে।

কোমল হরে গলে গেল কাকনমালা, প্রেমের স্পর্শে কি যে উত্তাপ ছেঁকে জানে। গলে ভরল হরে করে পড়লো... আজও পড়ছে। জও নামছে সে পৃথিবীতে।

কিরে লিঃ চূপ করলেন। বেন ধ্যানস্থ। সবাই নির্বাক।

তার পর? তার পর আর নেই।

শুধু আছে শান্তমুখের কিরে আসার পালা। সেটা কল্পনা করেই তে হবে। ওরা কিরে এলো কলকাতায়, নিরাপদেই কিরেছিল। শান্তমুখ বাগ ভর্তি হয়েছিল নানান পাথরে—তার কয়েকটি দেখা যেছিল খুই মৃশাবান। তাতে ছিল অক্লান্ত কয়েকটি জীবের বাস।

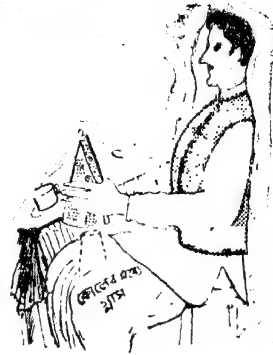
কিরে লিঃ কিরে গিরেছিলেন তার আস্থানা সেই বোধমতে, তার বাদরে কথা না বললেও চলে, সেই শাকরীশ্রাদেব দলের চন জন, কাপুং, রাও আর পাণ্ডে এঁরা এঁদের স্বর্ণধারি ভিমান ভাগ করে শান্তমুখের সঙ্গে কিরেছিলেন। শান্তমুখ সঙ্গে ক্রীড়ম বহুতা সূত্র আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

সমাপ্ত

গ্রাস অদৃশ্য করার যাত্রা

যাত্রারদ্বারক এ, সি, সরকার

সেবার টোকাগুতে থাকাকালে একটা মজার খেলা দেখিয়ে বন্ধু মহলে খুব চাকল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেবার চোখের মিনে একটা কাচের গ্রাসকে বেমালুম অদৃশ্য করে দেওয়ার যাত্রা। নটা ছিল মেঘলা-মেঘলা, মাঝে মাঝে ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। খবট ভেঙা আর বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজও ঘ্রোশানো ছিল তাতে। দু-তিনজন জাপানী সাংবাদিক বন্ধু এসেছিলেন দেখা করতে। তাদের সঙ্গে গল্প করছিলাম হোটেলের খাবার ঘরে বসে। কি খেতে খেতে। আসাহী সিন্থনের অস্ততমা রিপোর্টার মিস দত্তো কথা প্রসঙ্গে আমাকে অল্পবোঝ জানালেন একটা ম্যাজিক ধোনের জন্ত। আমি তাঁদের একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিলাম কটা একশ ইয়েন হুয়া আর সেটিকে রাখলাম টেবিলের উপরে। তার একজনের হাত থেকে নিলাম একটা খবরের কাগজ। এই গগল ঠোঁট পাড়িয়ে নিলাম আর কাচের গ্রাসটাকে উপড় করে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে ঢাকা দিসাম সেটিকে। এর পরে সবাই বৃষ্টি বর্ষণ করলাম হুজার প্রতী। আর কাগজের ঠোঁটায় মোড়।



গ্রাস (ঠোঁটাত্ত) তুলে এনে তাই দিয়ে চাপা দিলাম হুজাটাকে। হোঁতাল-শাকাস-হাকাস-পোকাশ বলে যেই যাত্রা ঠোঁটাত্ত গ্রাসটা (?) তুলে নিলাম তখন সবাই কী দেখলেন বলতো? হুজা অদৃশ্য হয়ে গেছে? না মোটেই তা নয়। যেমনকার হুজা তেমনি পড়ে আছে। তাই তো। তবে কি

ম্যাজিক ব্যর্থ হল? একটা অপ্রত্যাশিত হয়ে আমি বন্ধুদের বললাম যে আমার মন্ত্র কখনও বিফলে যায় না। হয়তো বা হুজার বললে অস্ত্র কোনও কিছুই উপরে এ মন্ত্র কাল করে থাকবে। কিসের উপরে? কাগজের ঠোঁটটি তুলতে দেখা গেল তার ভেতরে গ্রাস নেই। কাণ্ড দেখে সবাই হলেন হতবাক। এত বড় একটা গ্রাস চোখের সাধনে থেকে কেমন করে উঠাও হল?

খুই সহজ একটি কোল প্রয়োগ করেছিলাম। সেদিন আমার পরা ছিল হুটি। আর আমি বসেছিলাম টেবিলের এক ধারে। কাগজের ঠোঁটের ভেতরে গ্রাস ঢাকা দেবার পরে বন্ধু আমি সবাই বৃষ্টি হুজার দিকে আকর্ষণ করি, তখন সবাই অসোচনে ঠোঁটাত্ত গ্রাসটাকে টেনে আমি টেবিলের ধারের দিকে আর সেই অবসরে গ্রাসটাকে কেলে দিই কোলের উপরে—কোঁচড়ের ভেতরে তা নেয় নিরাপদ আশ্রয়। বলা বাহুল্য যে, এ কাজ আমি করেছিলাম বেশ কিশোরীর সঙ্গে আর আমার চোখ ছিল দর্শকেরই উপরে, শুধুমাত্র বা হাতেই সেরেছিলাম এই গ্রাস লোপাটের কাজ। হুতি পরা না থাকলেও যে এ খেলা আমি দেখাতে না পারতাম এমন নয়। তখন আমাকে কোলের উপরে বিছিয়ে নিতে হত একটি বেশ বড় সাইজের কুমাল বা ঝাড়ন। খেলা শেষ হবার পরে সকলের অলক্ষ্যে কোল থেকে গ্রাসটাকে সরিয়ে কোলাটোও বিস্তৃত কম অভ্যাসের কাজ নয়।

যারা যাত্রাবিজ্ঞা বিষয়ে উৎসাহী, তারা আমার সঙ্গে জবাবের জন্ত উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ পত্রালাপ করতে পার A. C. SORCER, Magician, Post Box 16214, Calcutta—29 এই ঠিকানায়।

অভিশপ্ত সুর বার্কোরোল

দেবব্রত ঘোষ

ফুৎগানী সুরকার জ্যাকি অফেনবাখ-এর নাম ইউরোপের সঙ্গীতানুযায়ী ও বিদগ্ধ সমাজে আজকের দিনে সুপরিচিত না হলেও একেবারে অপরিচিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর রচিত অপূর্ণ অরসমুদ্র লম্ব অপেরাগুলি ইউরোপের সঙ্গীত-বাসিক মহলে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কালের বৃষ্টিপাথরে তারা হরত সুগোষ্ঠী হতে পাবেনি, তবে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

১৯১১ খ্রিঃ ২১শে জুন কার্ণাটের কলিন মহলের এক সম্মেলনে জার্মান-ইহুদী পরিবারে জ্যাকি অফেনব্যাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিশুসময় নাম ছিল জ্যাকব লেভি এবাষ্ট। বাবু পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ভায়োলিন সেলা, নিক্সার জন্ম ফ্রান্সের হামবুর্গ প্যারী নগরীতে আসেন। পরে এই প্যারী নগরীই তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্র হয়ে পড়ায় ও তিনি কবাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

অফেনব্যাখ তাঁর সুদীর্ঘ সঙ্গীতময় জীবনে বহু জনপ্রিয় অপেরার সুর-সংযোজনা করে গেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—“পেপিটো”, “লা বেলে হেলেন”, “বল্লবের রু”, “লা প্রাণ্ডো ডাউস ডি জেরোল্টাইন”, “জেনেভিয়েভ ডি বারবারা”, “ম্যাগাল কাবরা” প্রভৃতি। তবে জীবনের শেষভাগে “টেলস অব হকম্যান” অপেরার সুর সৃষ্টি করে তিনি যে প্রভুত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন সেকালের ইউরোপে তাঁর তুলনা মেলা ভার। অথচ বড়ই দুঃখের বিষয়, অফেনব্যাখ তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতি এই অপেরার মকমাকল্য দেখে যেতে পারেন নি। কারণ যে মূল সুরটিকে ভিত্তি করে তিনি “টেলস অব হকম্যান” অপেরার সুর সংযোজনা করেছিলেন সেই সুরটি ছিল অভিশপ্ত। ফলে উক্ত সুরের অভিশাপেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৭০ খ্রিঃ অফেনব্যাখকে অষ্টাদশ শতাব্দীর জর্জনক বিখ্যাত জার্মান আইনজ্ঞের প্রথম কাহিনী অবলম্বনে রচিত “টেলস অব হকম্যান” অপেরার সুর সৃষ্টির ভার দেওয়া হয়। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি প্রথম দিকে কয়েক বৎসর আগে শোনা একটি বিদ্যুতপ্রায় গানের মিষ্টি সুরকে ভিত্তি করে “টেলস অব হকম্যান” অপেরার আবহ সঙ্গীত রচনা করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বহু চেষ্টা করেও অফেনব্যাখ কিছুতেই সেই পুরোনো গানের পুরো সুরটি মনে আনতে পারলেন না। এমন কি, সুরকারের নামটি পর্যন্ত তিনি বেরালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

এদিকে বিয়েটার কোম্পানী নতুন অপেরার জন্ম ক্রমাগত জাগ্রাস দিতে লাগলেন। কাজেই বাধ্য হয়ে একদিন অফেনব্যাখকে হারানো সুরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হল ইউরোপের দেশে দেশে। বিখ্যাত সুরকার ও পুরনো সঙ্গীত শ্রমসিপি বিক্রেতাদের দোকানে ঘুরে ঘুরে তিনি খোঁজ করতে লাগলেন তাঁর ঈশিত সুরটির। কিন্তু কেউ তাঁকে সন্ধান দিতে পারল না সেই হারানো সুরের। অবশেষে ভ্রম্যাংসাহ হয় তিনি ইউরোপের সঙ্গীত-নগরী ভিয়েনায় এসে উপস্থিত হলেন। এখানে ভাগ্যলক্ষ্মী যেন কিঞ্চিৎ কল্পনা বর্ষণ করলেন তাঁর উপর। ভিয়েনার এক পুরনো শ্রমসিপি বিক্রেতা অফেনব্যাখ-এর কাছে হারানো সুরের কয়েকটা লাইন শুনে তাঁকে জানালেন এর বচরিত্তা রুডলফ, জীমার। তবে তিনিও সুরকারের কোন সন্ধান দিতে পারলেন না। অফেনব্যাখ, সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে যেন সামান্য আশার আলো দেখতে পেলেন। তাই আবার উৎসাহিত হয়ে তিনি নবীন উত্তমে জীমারের খোঁজ করতে লাগলেন।

প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৮৭৬ খ্রিঃ অফেনব্যাখ জীমারের সন্ধানে এসে উপস্থিত হলেন হার্কিন রুডলফে। এখানে অনেক খুঁজেও তিনি জীমারের কোন হদিশ করতে পারলেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে আবার তাঁকে কিয়ে যেতে হল প্যারী নগরীতে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন গভীর রাত্রে অফেনব্যাখ, বিয়েটার-ফ্র্যাঙ্কাইল থেকে অহুতান সেবে বাড়ী ফিরছেন। পথবাট জনবিরল থাকার তাঁর ক্রোধে গাড়ীখানি যেন হাফা হাওরার ভর নিয়ে পানীর মত উড়ে আসছিল। হঠাৎ রাস্তার মোড়ের মাথার তাঁর গাড়ী থাক্তা মারলো একজন শব্দকারকে। থাক্তার বেশ সামলাতে না পেরে লোকটি একেবারে ছিটকে পড়লো পথের ধারে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থামিয়ে অফেনব্যাখ, ছুটে গেলেন আহত লোকটির কাছে। তারপর কালবিলম্ব না করে তিনি সম্ভ্রান্ত হীন অবস্থায় লোকটিকে গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে এলেন। বেচারী—কোন ভরপুরে হবে বোধ হয়। আনমনা হয়ে পথ চলছিল। তাই এই বিপত্তি। মাথাভর্তি একরাশ অবস্থ বহিত চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে শতছিন্ন পোষাক। যাই হোক, অফেনব্যাখের সেবা-যত্নের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে। হোজকার মত সেদিনও অফেনব্যাখ গভীর রাত্রে অহুতান সেবে বাড়ী ফিরছেন। ধরে চুকতেই অবাধ হয়ে তিনি শুনে পেলেন তাঁর শিয়ানোর কে যেন বাজাচ্ছে সেই বহু-আত্মশিত সুরটি—বার সন্ধানে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি সহর দীর্ঘদিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। আরো অবাধ হলেন যখন তিনি দেখতে পেলেন যিনি শিয়ানো বাজাচ্ছেন তিনি আর কেউ নন, গাড়ীর থাক্তার আহত সেই ভুল্ললোকটি। এ যে একেবারে অবিখ্যাত—অপ্রত্যাশিত। এক অবাক পুলকে অফেনব্যাখ-এর সারা দেহ যোমাকিত হয়ে উঠল।

উত্তেজিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ সুর আপনি কার কাছে শিখেছেন?

কারো কাছে নয়। এ সুর আমারই রচনা। আমার নাম রুডলফ, জীমার।

কী বললেন—আপনার নাম রুডলফ, জীমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ। যুহু হাসি ফুটে উঠল রুডলফের মুখে। কথটি শব্দ হতে না হতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে অফেনব্যাখ জড়িয়ে ধরলেন জীমারকে। ভগবানের অমায়িক কল্পনা, তাই আপনার দেখা পেয়েছি। আমি যে সুদীর্ঘ আট বৎসর ধরে ইউরোপ, আমেরিকার সহরে সহরে আপনাকেই খুঁজে বেড়াছি।

অফেনব্যাখের আত্মবিক্রমের দৃষ্টি হলেন জীমার। তাঁর পর অনেক কথা হল হুঁজনে। জীমার অফেনব্যাখের সব কথাই মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু প্রার্থিত সুরটির শ্রমসিপি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না। বললেন—সুরটি অভিশপ্ত। আমি চাই না আমার মত আপনাকেও সুরের সঙ্গরে আগুন লাগুক। কারণ ওই সুরটি রচনা করার পর থেকেই আমার স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুনাম, সামাজিক মর্যাদা সব কিছু নষ্ট হয়েছে। এমন কি, প্রাণোপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীকে পর্যন্ত আমি হারিয়েছি শুধু ওই সর্বনাশা সুরের অভিশাপে। বিবাস করুন আর নাই করুন।

এবার অফেনব্যাখ বাধ্য দিয়ে বললেন—কেন ও-সব একেবারেই বাজে কথা। সুর কখনো অভিশপ্ত হতে পারে না। আপনার হৃদয়গায়ক জন্ম লারী আপনাকে পানিপাখিক অবস্থা বা ওই জাতীয়

কোন ঘটনাবলী। অবশেষে অফেনবাখ-এর পীড়াদীতিতে জীমার কথা দিলেন স্বরলিপিটি সম্পূর্ণ করে দেবেন। বাড়ী ফিরে বাবার দিন বিদায় বেলায় তিনি অফেনবাখকে বলে গেলেন দিন দশ-বারো বাবে তাঁর বাড়ী থেকে স্বরলিপিটি আনতে। অফেনবাখও সানন্দে এই প্রস্তাবে সন্মতি দিলেন।

কথামত দিন দশ-বারো বাবে একদিন সকালে প্যারীর কুখ্যাত হুমার্ত অফলে জীমারের বাড়ীতে গেলেন অফেনবাখ। দরজার কড়া নাড়তেই এক সৌম্যবর্ণন বৃদ্ধ এসে দরজা খুলে দিলেন। অগ্রসর হুখ। অফেনবাখের প্রবেশের জবাবে তিনি জানালেন—গতকাল রাতে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে জীমার মারা গেছেন। জীমারের এই আকস্মিক মৃত্যু দাবান্দে অফেনবাখ বেন বিখ্যে হতবাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে একটু প্রতিক্রিয়া হলে তিনি শেখবাবের মত জীমারকে দেখার জন্য বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুক দেখেন, জীমারের বিছানায় উপর সেই অভিশপ্ত স্বরলিপিটা পড়ে আছে। তার এক কোণে ছোট করে তাঁরই নাম লেখা—জ্যাকি অফেনবাখের জন্য। তার পর অফেনবাখ, স্বরলিপিটা হাতে করে সেদিন ছেলোমাহুয়ের মতই কীদতে কীদতে বাড়ী ফিরে এলেন। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, তাঁরই ধামাধারদারী রক্ত একটি অমূল্য প্রতিভার এই ভাবে অকালে জীবনায়মান হল। একথা আর কেউ না জানলেও তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

বাই হোক, জীমারের স্বরলিপি মূল সুরটিকে ভিত্তি করে অফেনবাখ টেলস অব, হুম্যান অপেরার জন্য যে অপূর্ণ সুরসমূহ সঙ্গীতের সৃষ্টি করলেন তার নাম দেওয়া হল 'বার্কারোল' (Barcarole)। কিন্তু আগেই বলেছি এই অপেরার অভাবনীয় মঞ্চশাল্য তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের এই অক্টোবর অফেনবাখের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে লিওঁ তেলিবীর পরিচালনায় টেলস অব, হুম্যান অপেরা প্যারী নগরীতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্যারীর পর ভিয়েনায়। ভিয়েনায় বিং বিয়েটারে প্রথম অল্ট্রান-রকনোতে বার্কোরোল বাজাবার সময় হঠাৎ এক ভয়ানক অরিকাগুণের ফলে প্রায় দেড় হাজার নর-নারী প্রাণ হারান ও সেই সাথে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটিও ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনার ভীত হয়ে পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার আর কোন সুরকার বা বাদক বার্কোরোল বাজাতে রাজী হননি।

এর পর বার্কোরোল-এর অভিশাপে চীনদেশেরও বহু সুরকার প্রাণ হারিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশের মাংস রাজ্যে জুলাই নামে এক সম্রাজ্ঞী ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি একবার কয়েকজন ইতালীয়ান ভাস্করের হুখে বার্কোরোল শুনে এতই মুগ্ধ হন যে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন চীনা সুরকারদেরও এই সুর বাজাতে হবে। চীনা সুরকারেরা আশ্রয় চেষ্টা করেও চৈনিক বাস্তব্যে বার্কোরোল বাজাতে পারলেন না। ফলে রাজস্বায়ে পড়ে প্রতিদিনই দু-চারজন করে সুরকার প্রাণ হারতে লাগলেন। এই ভাবে চীনদেশের প্রায় আটশো সুরকার বার্কোরোল বাজাতে না পেরে প্রাণ হারান।

কিছুদিন বাদে জুলাই-এর মৃত্যু হলে সান ইয়ং সেন-এর

দেহে চীনদেশে নব প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি নব প্রজাতন্ত্রে প্রথমই আইন করে বার্কোরোল বাজান নিষিদ্ধ করেন। ১৯৮৮ সালে এই আইন বিদ্রোহ হয়। বতস্বর জানা যায়, এখনো পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার সুরকারদের মধ্যে অফেনবাখের বার্কোরোল ভীতি পুরোমাত্রায় বজায় আছে এবং তারা কখনো মনের তুলেও এই সুরটির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না।

নামের শক্তি

ঐশদানন্দ তত্ত্বাচার্য

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দারোয়ান এসেছে লরপাগতবৎসল ঠাকুরের কাছে। মন্দিরবের চেহারাখানি বড়ই দর্পণীয় হোক, লুপখানি কিন্তু বেন কোন এক অজ্ঞাত আশঙ্কার কেন্দ্র তুলিয়ে গেছে।

অহম্মতি পেরে সে সবিনয়ে ঠাকুরের ঐশ্বর্যে আপনার বিশদ বৃত্তান্ত নিবেদন করল। দ্বিধিক্রমী এক মস্ত বীর পালোয়ান এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারই আছবানে তাকে শ্রী এক শক্তির পরীক্ষার অবতীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষা যদি সন্তোষ-সম্পন্ন হয় তবে সে বড় শংকট। মন্দিরের দারোয়ান তাই বিপদভঞ্জন করণায়ন-বৃত্তি ঠাকুরের লরণ লওয়া ছাড়া আর সক্তি দেখিলে।

ঠাকুরের বাবস্থা—'খাওয়া কমতি করে দিবি। বেশী করে মহাবীরের নাম নিবি। দিবারাত্র নাম স্মরণ চাই।'

ও দিকে দ্বিধিক্রমী পালোয়ানের দিত্তা দিত্তা ডাল-কটীর বদান্ধ, দুবেলা কসবং আর হুস্তর ভাঁজার বহর দেখে ত দেশের লোকের চক্ষুস্থির। এমনখারি পালোয়ানের সাথে দারোয়ানজীর লড়াইটা নিভাত্ত ছেলেখেলা হবে, এইটাই তাদের সুস্পষ্ট অভিমত।

বখাসময়ে দুই পালোয়ান গুতকে স্মরণ করে নরম মাটিতে নেমে পড়ল। এমন একখানি লড়াই দেখবার জন্য লোক কম হয়নি। এ কথা বলা বাহুল্য। বিশেষ করে এই বিশ্বয়কর দ্বিধিক্রমীর বীরত্বের খ্যাতি ইতিমধ্যে প্রসার লাভ করেছিল—স্থানীয় এলাকায় কিছু চাকল্যের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। দারোয়ানজীর প্রতি সকলেরই অমুগ্ধম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল, ওই সাথে কারো কারো কিছুটা স্বাভাবিক সহানুভূতির খার বেশানো—সে বেন আরো

বোগা হয়ে গেছে, যদিও চেহারাটা আগের চেয়ে ইচ্ছল হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিভা জোরালো হয়ে উঠল। দ্বিধিক্রমী বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার ধারণা ছিল আজকের লড়াইয়ের বশভাগটা করতলগত করেই সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেমেছে। কিন্তু তার শাণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিটির চিত্তের দার্ঢ্য নিভীক লড়াই প্রচেষ্টা সুর থেকেই তাকে শঙ্কিত করে ফেলেছে। কল্পক্সাস দর্শকদের সমুখে দ্বিধিক্রমী দারোয়ানজীকে মাটিতে এক আছাড় দিয়েছে। কিন্তু

নীচু হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করবার মুহূর্তে সে এক ক্ষিপ্র কোশল প্রচেষ্টায় দ্বিধিক্রমীকে বরাশারী করে ঢোবে পলকে তার বুক চেপে বসল। এক অপ্রত্যাশিত আনন্দাতিশয্য সকল দর্শককেই অভিভূত করল। অবসর সময়ে বীর পরিক্ষেপে বিজয়ী বীর এল ভক্তবাহ্যিকল্পতরু ঠাকুরের চরণ বন্দনায়, বেন তার বশভার বখাছানে নামিয়ে দিয়ে ঋণহৃত হতে চার। ঠাকুর সঙ্গের দুইপাতে তার সর্কাজ স্পর্শ করলেন। কিয়র-বিনিশ্চিত, কঠে সদানন্দর পুঙ্খ শুখালেন—'কি রে, নামের কত শক্তি বেশি!'।

কৃতজ্ঞতাভ্যাহিত কৃতজ্ঞতা বীর ঐশদানন্দাতিশয্যে অবনত হল।



ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল



মুন্নি কৌপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশকাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিম্ন ওকে শান্ত করার আশ্রান চেষ্টা করছিল; ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—“কাদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—” কিন্তু মুন্নির ক্রক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির হুধে আলতার মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ক্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আতুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেন! তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন ‘একোর, একোর’ শুনে ওস্তাদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিম্ন—আহা বেচারী—ভয়ে জ্বরগ্রস্ত হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় দৌড়ে এলো নিম্নর মা মুনীলা। এসেই মুন্নির কোলে তুলে নিয়ে বলল—“আমার লক্ষী যেহেঁকে কে মেরেছে?” কান্না জড়ানো গলার মুন্নি বলল—“মাসী, মাসী, নিম্ন আমার পুতুলের ক্রক ময়লা করে দিয়েছে।”



“আচ্ছা, আমার নিছকে দাঁড়ি লের আর তোমাকে একটা মতন জ্বক এসে দেখ।”

“আমার কোনো নর বাসী, আমার পুতুলের কোনো।”

সুশীলা মুহুর্তে, নিছকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম শুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুহুর্তে তার পুতুলটি নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলাম। আরি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।



মখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম

“ভলের কোনো তোমার মতন জ্বক তেমন কি দরকার ছিল?”

“না বোম, এটা মতন নয়। সেই একই জ্বক এটা। আমি শুধু কেচে ইচ্ছী করে দিয়েছি।” “কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটা এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।”

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—“তার কারণ আমি ওটা কেচেছি সানলাইটে দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাটার ছিল তাই তাবলম্ব মুহুর্ত ভলের জ্বকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।”



আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিরে দেখা মনস্থ

করলাম। “তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি দোকান ঠাট্টায়েছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়া-নোর কোন আশঙ্কা পাইনি।”

সুশীলা বলল, “আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমার এক মজা দেখাবো।”

সুশীলা বেশ ধীরেহুছে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুক চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগালা ইচ্ছীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুন দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু হোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়েজামা, সাট, ধুতি, জ্বক আরও নানাবিধের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো

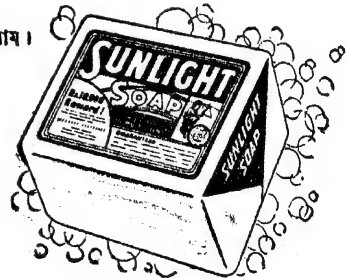
জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমার বুঝিয়ে দিল—“এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটু সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টা জামাকাপড় স্বচ্ছন্দে কাটা যায়।”

আমি তখন সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা হির করলাম।

সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের স্তরের কঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটু কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাটা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে ময়লা ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

৬. 2588-X52 ৪৪



সুশীলা দিল্লীর নিউমিউট, কর্তৃক প্রস্তুত

না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বোতাল

আমাদের কায়দা

যুদ্ধের ভয় বাতলা থেকে বেঁটের লোক নেওয়া হয়েছে ১১৪৩ সালে। হাজার, পাজার থেকেও এসেছে। কিন্তু বাতলা থেকে যে ভাবে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, ওদেশে তার তুলনা মেলে না।

মধ্যযুগের এক সঙ্গার। পোখা আছে। অথচ জমিও নেই, চাষাবীও নেই। কাজও মেলে না কিছু। সঙ্গার চালানো যায়। গ্রীষ্ম টাকার বিশিমেয়ে তখন এম-এস-সি মেলে প্রচুর।

সেদিন হাঁড়ি উঠবে চড়বে, কিন্তু হাঁড়িতে কিছু চড়বে না, জল ছাড়া। কোনো উপায় নেই। কর্তার এক পুর মাঠ থেকে গরু ঘর খোঁরাড়ে গিয়ে এসেন। কিছু বোলগার হোল। চাল এসেও তু। সেদিন বেশী পরগা দরকার, করেকটা গরু মাঠ থেকে দড়ি খুলে দাও। ওরা খুঁটার সাথে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। ই খুঁটা কেন্দ্র করে চার পাশে ঘোরে, বাস বায়। গরু কটা তাকিয়ে ঘুরেব কোনো হাটে নিলেই পরগা আসবে ডের। কি আর করা যাবে। এমনি করে বাহোঁক দিন শুকরান চলছে। এলো ওয়ার। ওয়ার বেঁচে থাকুক। সর্বনাশ। সে ওয়ার চুকলো বাতলা দেশে। কানা-বোড়া সবই গিয়ে ভর্তি হোল তাতে।

কর্তার দ্বিতীয় পুর একটু বিকটাক নিয়ে জন্মেছেন। খোঁড়া। কানা-খোঁড়া এক গুণ বাড়ী। ভর্তি হয়েছেন লড়াইয়ে। বরা ক্রেটে তখন জাপানীসের বসিও চলেছে পুরো মাত্রায়। জরলে ইটনিট পড়ে রয়েছে। মাসের শেষ দিন। পরদিন শে-ডে। হাজার লোকের মাইনে হবে। প্রায় ৮০ হাজার টাকার মত। এসে জমা হয়েছে কোষাটীর গার্ডে। জরলের লড়াইয়ে লোহার সিন্দুক থাকে না। ভারী বলে। টাকা থাকে রাইফেলের কাছুরজের খালি বাক্সে, নয়তো কাঠের বাক্সে। জরা থাকে গার্ডের কাছে, যেখানে সমস্ত আর্মসও থাকে। এক দিন দুদিনের মায়ালা। বিলি হয়ে যাবে টাকটা সেরে সঙ্গে। অবশিষ্ট বা থাকবে, ফেরত যাবে।

জরলের যুদ্ধ। গুলী, বালক, বন্দুক, পিঙ্কল, ট্রেনগান আর কাটিং প্রচুর। চারদিকে ছড়ানো। হিসেবের তিন গুণ বেশী। পাবী, বাধ, ভালুক বা খুশী শিকার করে। তার পর ছুঁড়ে ফেলে দাও রাইফেল জরলে। কে পরিচাল করে। আছে অপরাণ্ড। অবজ অর্ডার পূর্তে কেলার বা নষ্ট করে দেওয়ার। তাতে পরিশ্রম হয়। এখনও পড়ে আছে বরার জরলে প্রচুর। টাকটা থাকে তালাবদ্ধ হাডা বাক্সে। গার্ডকমে। গার্ডকম মানে, টেক্ট বা তালাপাতার কুঁড়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠেছে। জাপানী বহার। রাইফেলটা হাতে নিয়ে সবাই করত পাঁকড়ো। ওর শুধরান গার্ডে ডিউটি। ও গেল সবায় খেবে, বীয়ে-প্রছে। সম্ভবত ক্যানবাক্সটি পছন্দ নিয়ে সবায় অলক্ষ্যে। বোমার সমান কারগার পুতুর জন্মে, আর পুতুর থাকলে তা ভয়টি

হয়। বোমা গুলো পোটা-করেক। সব শুধরান হয়ে গেল। কত বাঁচলো, কত মরলো। কটা দুই বাসে আবার সাইরেন। এবার স্লিয়ারেল। সবাই কিরে আসছে। কে বাঁচলো, কে মরলো, এখন কোলো, তারই হিসাব চলছে। ও তখনো কেবলি। সম্ভবত হয়েছে, অথবা আহত হয়েছে। দেব পরীক্ষা কিরে এসেছে অনেক রাতে নিখুঁত অবস্থার। ক্যান মায়ালাছিল।

পরদিন খোঁজ পড়ল টাকার বাজর। মাইনে দিতে গিয়ে। টাকার বাজর নেই। শান্ত্রীরা পাহারা দিয়েছে। স্ততরং ওরা অর্থাৎ শান্ত্রীরা কেউ কিছু জানে না। সে টাকার কোমণ্ড পাতা পাওয়া গেল না। ও-সি বেথলেন অনেক বজাট। ক্রপ্ট-সাইনে বত বত অতিসার, কড়া হলে হাতের তেলোর প্রাণ। বাত-বেহাতে সে প্রাণ সবায় হাতে। তার হাশিল পাওয়া যায় না গয়ে। কান, সবায় হাতেই অস্ত্র নানা বকমের। স্ততরং বিশপেট গেল, বোমার ট্রসব টাকা অলে-পুড়ে গেছে। আরও টাকা দরকার। সৈন্তদের মাইনে। কাটা কান চুল দিয়ে টাকা বৃদ্ধিমানের কাজ। আবার টাকা এসেছে। ভাই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সবাইকে।

মাগশনেক পরে। ঐ সিপাহীর ছুটা হয়েছে—লানিত তিন মাস। পুরো টাকটা মাটা খুঁড়ে বাড়ী এনেছে। এখন অভাব নেই। ইটের দাম টাকা-টাকা। বাড়ী করে কিরে গেল চিটাগ। ওখানে হালিরা দিয়ে হারিয়ে গেল জনারশে, এক বোমা গড়ার বাত। পাতা পাওয়া গেল না। ক্যান্ডারলটা হলে তার বিশপেট যায় না। যায় দু-তিন বছর বাদে, লড়াই খেবে। বাড়ীতে টাকা allot করা থাকলে, তা ঠিক যার মাসের পর মাস। তারপর নাম লেখানো এয়ার ফোর্সে। অবজ নাম-টিকানা পালাটে। সেখানেও allotment করে সুযোগ বুঝে পালায়। ভর্তি হয় গিয়ে অস্ত্র। সেখানেই আছে, অথবা আবারও ভর্তি হয়েছে allotment কর, সে সবাদ জানা নেই।

জাপানী ক্রেটে কি ভাবে টাকা আর লোক ফলও করে ঢালি হয়েছে, এ তার নমুনা। মালপত্র? আমরা তখন বায়নাগায় রেষ্ঠ ক্যাম্পে। একটা বড় ইন্ডিরো ছিল ওটা। ওর পিছন ভোবার জলে এখনো বেথতে পাবেন হস্ত হাজার বস্তা চাটিল আর আটা পচে সার হয়ে আছে। সারপ্রাইজ ঠৌর ঢেকিয়ারের সময় ওগুলো পিছনের দরজা দিয়ে ওখানে গিয়ে জমত। আর সিজিলের লোক ফানের অভাবে রয়েছে। পাটার করার মতলবেই ঐ সাংগ্রাস টেক টানা হোত। সাগ্রাই থেকে আসবার পথে মাঝ বাস্তাতেই অনেক সময় বিক্ৰী হয়ে যেত।

ঐ পুতুর আশও পাবেন বিভলভার আর রাইফেল। জাপানী লড়াইয়ে বৃটিশের ইজ্ঞতের কাশড়ে ঘরে টান পড়েছিল সেইদিন। আবার কি তা আসবে কিরে?

জাপানী স্নাইপার

আরতন আর লোকসংখ্যার তুলনার জাপান পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম শক্তি। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ শক্তিগুলোতে বিলম্ব ছিল ওদের এই লড়াই। ওরা পা নিয়েছিল বৃটিশের লেজ। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর ওরা প দিয়েছিল আমাদের সিংহদ্বার—ভারতের পূর্বনীমাতে। এ

দাদামের নজির উৎস কোথায়? তবে পিছে তাঁকি দেবে
এই বুঁকি নিয়ে কিরে গেলেই বা কেমন?

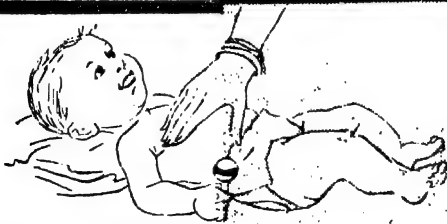
ভীর আর বন্ধু, বর্ষা আর তরবারি। আগেকার যুদ্ধের ধারা।
সে বহু আগেকার কথা। পুরাকালের স্মৃতি-বিমুগ্ধতার যুগে।
প্রস্তরের শব্দের যুগে। তার পরে, বহু পরে বাংলার কেরে এসেছে
রকমারী আয়েতাজ। গুলী বাক্স, কামান, বন্দুক আর টোটোর খটা।
অটোমেটিক সিগ্গেট গুলী ছুটবে তোড়ে। পৃথিবীজয়ের সময়ে প্রাথমিক
আয়রোজনের ব্যবহার ঘটেছে ভারতে মুসলমানের হাতে। আর
আজগাল ট্যাক, ফাইটার, বম্বার, এ্যাপিট এয়ার ক্র্যাফট বা
এ্যাক্রাফট, ভারী কামান, মর্টার, ডেপ্তার, সাবমেরিন, টর্পেডো
ইত্যাদি বহু বহু মারণাস্ত্রের প্রয়োগ, প্রয়োজন আর উদ্বোধন
ঘটেছে। সম্প্রতি এসেছে এটম বম্ব আর হাইড্রোজেন বম্ব। ইন্টার
কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, সংক্ষেপে আই-সি-বি-এম। জাপানী
যুদ্ধে এসে সব তৈরী বা প্রয়োগের অবসর কোথায়? অত লোকজনই
বা কোথায়? বর্ষার আমরা চালিয়েছি মেশিন গানে জলের ধারায়
গুলী। তার জ্বাবে ওরা কি দিয়েছে জানেন? তীক্ষ্ণ কলার ছোট
ছুরি। গুলীর অপোজিটে ছুরির যুদ্ধ—লড়াইয়ের সম্পূর্ণ নতুন ধারার
প্রবর্তন। পূর্বের ধারা, আর তাৎপর্যপূর্ণ। ওরা জিতেছেও সমগ্র
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। খুব ছোট ছুরি, এমন কি
যেরনেটের মতও নয়। তবু প্রাণবন্ত। কারণ ওতেই সাবাড়
হয়েছে বুটপ আর আমেরিকার বড় বড় ডিভিশন এবং ডিভিশানের
পর ডিভিশন। কোটি কোটি টাকার ব্যয়শক্তি সমেত।

এক ডিভিশনে বার সৈন্য থাকি আর পঞ্চাশ হাজার বা তারও
বেশী।

গুলীর যুদ্ধ। জাপানী যুদ্ধক্ষেত্রে খটা তৃতীয় শ্রেণীর। মানে,
বার্ড ক্লাপ। গুলী করে নরহত্যা? রায়ঃ। সে যে কোন বর্ষার
করতে পারে। বর্ষার যুগের পুরোনো কাহনায় ওস্তাদী কোথায়?
যে মানুষের হাতে রয়েছে দুয়পাজার রাইফেল আর মেশিনগান,
টেনগান আর রিভলভার। বরং ছুরি দিয়ে সেই মানুষ মারতে
পারায় বাহাদুরি আছে। আর একখানা মাত্র ছুরি দিয়ে অনেক
বেশী মানুষ মারাতেই আসল ওস্তাদীর পরিচয়। সেখানে একটি
গুলীতে মরবে মাত্র একজন। কিন্তু সত্যক হবে অনেক বেশী।
আশে-পাশে বহুব্র ওর দল থাকে ছড়িয়ে। সবাই দেখে বাবে সে
টাক পিটানোর সাবান—শত্রু এসেছে সরিকটে। আর ছুরির লড়াই
অতর্কিতে। রাতের আঁধারে। পাশের লোকই ঠিক পাচ্ছে না,
কে যংছে। যুদ্ধ অবস্থার গলার নলীতে ছুরি টেনে যাওয়া, আরাম
আছে। উত্তর পক্ষেই। হাতের সুখ তো আছেই। বার মরে,
আরামে মরে। ওরা মরতেই তো জঙ্গলে এসেছে। যুদ্ধ চার
পাঁচ দল লোক রাতারাতি সাবাড় হয়ে যেতে পারে একখানা মাত্র
ছুরির কারবার। আইপারের ছুরি চলেছে অজান্তে ভাবে। পাশের
বন্ধু অঘোরে ঘুচ্ছেন। টেবই পেলেন না, পাশের বন্ধুর মৃত্যু
ঘনিষে এসেছে অতি নাটকীয়ভাবে। এমন কি, পরমুহুর্তে নিজের
মুঠাও টের পেলেন না শেব পথিক। যেত অফিসাররা খুব চালাক।
ওরা থাকে ঠিক মাঝখানে—সবার কেন্দ্রস্থলে। বা ঘটবে, পাশ দিয়েই

বুকে সর্দি বসেছে?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায়
ভেপোলিন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।
কারণ ভেপোলিন স্বকের মধ্য দিয়ে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের
ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে
মাথাধরা ও গলাধরায়, বাথা ও বেদনায় ভেপোলিন আশ্চর্য
মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৬, বনফিল্ড লেন - কলিকাতা-১

বোরোলীন প্রস্তুত কারকের নামস্বামী

ঘটে থাক। মাঝখানে পৌছতে পৌছতে টিক বেঁচে হাওয়া বাবে। কিন্তু সকাল বেলায় দেখা গেল, খেত কৃষক সবাইই এক গতি করে রেখেছে গ্রাইপার। এই তো যুদ্ধ! বাট বৈধব্যী যুদ্ধ আর পুনের ধারা।

মনে করা যাক, ধর এয়েছে—পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ এই ফ্রন্টে। মানে, জঙ্গলের কয়েক ম' মাইল ব্যাপক জুড়ে যুদ্ধের কভার-আপ। ব্রিটিশ, আমেরিকান আর ভারতীয় সেনা বাধার জঙ্গলে। এবার টেণ্ডার ডাকা হবে। কে কত কম সৈন্য, যন্ত্রপাতি লটবহব নিয়ে এই বিরাট সৈন্যকে রুখতে বাবে। ওদের ছোট গেল, কম সাপ্লাই আর লোকও গোপাঙগতি। তুলনাত মিত্রপক্ষ ঘিরেছে চারদিক থেকে। অন্তর্গতি সৈন্যসংখ্যা আর স্তেমনি সাপ্লাই। টেণ্ডার পড়ছে—কেউ পাঁচ ম', কেউ তাজার বা কেউ দু-হাজার নিয়ে ওই পঞ্চাশ হাজার অশিক্ষিত সৈন্য কবাবে। ডাক পড়লো টেণ্ডারগতাদের। ওদের সুনানী হোক বৈধ ধরে জেনারেলদের কাছে। কার যুদ্ধের কার্য-কাম্বিন কি রকম। তারই বর্ণনা, আর গ্লান। বিবেচনা করে একজনের উপর ছেড়ে দেওয়া চরিত্রে সমস্ত ভার। সে হরত্যা নগণ্য একজন সেপাই। ওদের লড়াই থেকে বেঁচে কিলে এলে প্রমোশন পেরে বাবে। মাত্র হাজার বীর সঙ্গে নিয়েছেন সেপাইজী। বেশিও কবে পড়ে পঞ্চাশে মাত্র এক। পঞ্চাশ হাজারের অশিক্ষিত আর কামান বন্দুকের যন্ত্রপাতির ডিভিশানের সাথে লড়তে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ঐ ছুরি, গোটা কয়েক রাইফেল, হাতবোমা আর ডিনামাইট। বসনের জন্তে শিকনে আটা বা চালের গাড়ী নেই। ভাত জলে ফুটিয়ে শুকিয়ে খেলে করে রাখা আছে। খাবার সময় ঐটা নদীর জলে ভেজালে আবার ভাতে পরিণত হবে। বগাবর গুঁরা জিতোছেনও ঐভাবে লড়াই করে। বারা কামান, বন্দুক, গাড়ী ঘোড়া বসদ বোরাই, আর গুয়ারলেস, অগ্নীকণ, বুরবীকণ, বেজ ফাইগার আরও মালামাল নিয়ে এলো লড়তে, তারা জাপানী ছোট ছুরির কাছে জান কোরবান্ দিয়ে মহান্ এশিয়ার মান বাঁচিয়েছে। অনেকের কাছেই মনে হবে হরত্যা ছোট কলকের বড় ভামাকের গল্প। কিন্তু এ নির্ভেজাল বাটা সত্য।

এখন চলে কলামের যুদ্ধ। পেন বা কালির কলাম নয়, কিংখ কলাম—পঞ্চম বাহিনী। আমাদের ভাবার লাইন। তবে পাঁচ পাতার লাইন নিশ্চয়ই নয়। জাপানী কিংখ কলাম আসলে ইনটেলিজেন্ট। ওরা নারীবাহিনী। ঈড়ির ধবর নাড়ী চিরে বের করে। আর পেছনের লাইনগুলো সবই গ্রাইপার। মানে গুলুচর আর গুলুবাচকের সমবার। পর পর অনেক। এদের যুদ্ধের ধারাও রীতিমত অদ্ভুত! আর নূতন।

সেই হাজার সৈন্যের কিছু এয়েছে সামনে—কার্ট লাইন বা ফ্রন্ট লাইন। ওরা ফ্রন্ট বরাবর মাটিতে গর্ত কেটে তলা দিয়ে বসিয়ে থাকে ডিনামাইট। ছোট গর্ত। কিন্তু মাটিতে কোনো চিহ্ন নেই। একটু শুঁড়ে বা ঘুসো বা দাগ কিছুই নয়। এমন কি একটা ঘাসের পাতা কাটার চিহ্ন খুঁজলেও আপনি পাবেন না কোথাও। অর্থাৎ জঙ্গলে লোকের শূণ্যপন ঘটেছে কামিনকালে, বা কারকার্য করা হয়েছে আপনাব পায়ের তলায়, সে সন্দের অপরূপ ওয়া দেখে না। তার আগেই সে জমজমাট রাইফল্যে পৌছে বন্দব হবে। ডিনামাইট বরাবর কোথাও কাল দৃশ্য তার ঘাসের ভিতর চলে

গিয়েছে। ঐ ভাবে পায়ের, চপে বা ভারী গাড়ীর চাকার চাপে ডিনামাইট কাটবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতী ঘোড়া, লোক লম্বা, মোটির গাড়ী, কামান বা ট্যাক সবাই মিলে গুলে উঠবেন মর্টা ছেড়ে। আর পরক্ষণে ঘুলায় পড়ে ঘুলায় সাথে মিলে যাবেন শুড়িয়ে শুড়িয়ে। প্রথমে লখিমা পরে অনিমা, প্রান্তি, প্রাকাম্য ইত্যাদি ঐধর্ষ প্রাপ্তি।

ওরই কয়েক মাইল পরে ছড়ানো রয়েছে জাপানী লড়াইয়ের দ্বিতীয় লাইন। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। পুরো মিত্র-সৈন্য চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, সামনের দিকে লক্ষ্য রেখে। পায়ের তলায়ও নজর দিতে হচ্ছে মাঝে মাঝে ডিনামাইটের ভয়ে। আর সামনে নজর শত্রুর জন্ত। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ করে একটা গাছের ডাল নড়ে উঠছে সামনের দিকে। মিন দুপুরে গাছের ডালে ভুত নাকি? কিন্তু মিটিয়ারীর ভুত বিখাস নেই। 'তার পড়ে সব জমি নিয়ে' কেউ বললে—'জাপানী হতে পারে।' জন্তব চালাও শুকী। ঠাঠ—ঠাট—ঠ—ঠ—শুকী চাচ্ছে মেনি গানের সেই গাছকে লক্ষ্য করে। বেশ কয়েক বাক। হাঙ্গর চুপচাপ কেটে গেল দুই-এক বাক। আর কিছুই নড়ছে না। জাপানীরা মরেছে মনে করে সবাই উর্টছি ঘুলা য়েছে। 'ওঠা সব, চলো।' আবার চলতে শুরু করেছি। কয়েক পা যেতে না যেতেই, ও মা, ওটা আবার কি? আর একটা গাছও নড়ছে বে। জাপানী? স্তব্ধতা শুয়ে পড়তে হোল। শত্রুর দেখা পেলেই ভুতে হবে, সেই বকমই শিক্ষা আমাদের। কারণ শুকী। তখন বৃকের ভিতর দিয়ে রাস্তা না করে মাথার উপর দিয়ে রাস্তা বানাবে। সবাই শুয়ে শুয়ে মেনি গানের শুকী চালাচ্ছি মনের আনন্দে। গাছের ডাল-পাতা সমস্ত কেটে কেটে পড়ছে, দেখতে পাচ্ছি। দেখে আর শুকী চালিয়ে শুরও আছে। বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন খালি করা গেল; এর পর জাপানীরা নিশ্চয় মরেছে। মরা উচিতও। স্তব্ধতা এবার উর্ট চলা শুরু হোল। কিছুদূর বেতে আবার তাই। এবার অস্ত্র একটা গাছ। ওরা সব গাছে থাকতেই ভালবাসে? আচ্ছা মজাটা? আবার শুয়ে পড়ো এবং চলুক মেনিগান। কয়েকটা ম্যাগাজিন খালি করে ভাবছি। জমিতে কারো দেখা নেই। মাথার উপর আকাশ। সেখানে ওদের গ্লেন নেই। অশচ ওরা শুধু গাছেই বসে থাকে কেন?

এই ভাবে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিনের স্রাঙ্ক করতে করতে আমরা অগ্রসর হচ্ছি মনের আনন্দে। শুকীও থতম। জাপানী মরে নি? মরেছে নিশ্চয়। আমাদের হাজার হাজার শুকী ধরত করেও ওদের মুক্তা হবে না? ওরা কি অমর? অথবা অপরিণী। ভাবতে ভাবতে চলেছি। হঠাৎ একটা আওরাজ এলো উপর হতে। গাছের উপর স্বয়ং মহাপ্রভু বসে আছেন। এবং একজন মাত্র আমাদের ব্রিটিশ অফিসারটিকে উনি ততক্ষণ সাংঘাত করেছেন তাঁ রাইফেলের শুকীতে। আমাদের ওপর ওঁর দয়া হোল কেন এতজনে বহু লোক এই গাছের তলা দিয়ে গেছে। কাউকে কি বলনি। সব ভারতীয় সৈন্য। ওদের জীবনের মূল্য কতটুকু। সে কথা না বলাই ভাল। সিজের জীবন দিয়ে কতজন লোক সাধা বস্ত্রের অফিসার চাই। কাঁধে অস্ত্র তিনটে টায়। অর্থাৎ

ক্যান্টেন। ওদের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। লড়াইয়ের কী পরিস্থিতিতে আর সজ্জিত সমস্ত গুণ হারিয়ে। ওকে মারতে পারলে ভারতীয় সৈন্য অসহায় ও হতভাক হারে পড়বে। ওর হাতকা বাইস্কেলটা ও তুলে নিয়েছে। সারা চামড়ায় বন্ধুত্বের ভিত্তিকার স্থাপিত ও লক্ষ্য করে একটা মাত্র আওয়াজ—স্কিক! ব্যবহার ওদের হাতের টিপ। গোরা বরা নিয়েছে পাঁকাপাকি ভাবে। এবার বুনে শিয়ালের মহোৎসব। জললের শব্দ সংকার।

সত্ত্ব তরুণ ক্যান্টেন। বোচারার ভক্ত আজও আমার হৃৎক হয়। বিরকেই চলে আসতে হয়েছে লড়াইয়ে। শিকার পরই ছেড়ে দিয়েছে একবারে বর্ষার জললে। একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তার মুখ দেখাও ভাগ্যে ঘটলো না। এক নম্বর ইণ্ডিয়ান হোটেল। এবং তার ফলেই জলনী প্রমোদন। ছাদের তলার মৃতদেহ শয়ান। তারই ওপর গাছের মগডালে বসে আছেন মহাপ্রভু। আমরাও তো অনেক আগে ঐ গাছের তলা দিয়ে এসেছি। কিছুই দেখতে পাইনি। বুঝতেও পারিনি কিছুই। আমাদের জীবনকে ও ক্ষমা করে। ক্ষমামূল্যের জীবন। আমাদের জীবনের চাইতে ঐ সারা জীবনের মূল্য অনেক বেশী। তা ওয়াও বাসে। তাই যেকোনো। ততক্ষণে আমাদের 'উপরওয়ালাকে' সাবাড় করে গাছ থেকে নামানো হয়েছে। গাছের ডালে আটপুটে পাঁচছড়া বাঁধা। নিজে বেঁধে রেখেছে নিজেকে। দরকার মত চার হাত-পাই ব্যবহার করতে পারবে—অশ্বুনের মতো। সারা গায়ে ওভার জল—ফ্রেন্স পাতার রঙের আলখালা। আর মাথায় একটা ছোট টুপি। সুখও বড়।

দড়ি কেটে ওকে গাছ থেকে নামানোর বেলায় দেখা গেছে গাছে গাছে গাছকে সজ্জা তার। সোঁতা করে দুই হাতের কাছে বাঁধা। তারের অল্প প্রান্ত সোঁতা চলে গিয়েছে স্বাভাবিক ভানদিকের ও বামদিকের কয়েকটা গাছে। সেখানেও মগডালে বাঁধা। দরকার দিকে। আমরা যে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিন মেশিনগানের গুলীর শব্দ করে এসেছি, সে এই তার ধরে টান দেওয়ার কলে। আসলে এই একটি মাত্র লোক প্রে করেছিল চমৎকার ভাবে অনেকের ভূমিকার। অনেকখানি ব্যয়গা ও সময় জুড়ে।

কালো চামড়ার দাম ওরা দিয়েছে অনেক কম। সারা চামড়ার দাম আছে, অল্পত ওদের কাছে। কিন্তু তাঁরা আসেন সবাই শেষে এবং কালোর সাথে মিশে। সে পর্বত অপেক্ষার থাকতে হতো। অনেক সারা মুখে কালিও মেখেছে জাপানীর হাতে তার খেত পরিচয় চাকতে। ওদের নামের ক্যান্টেন মেজর পরিচয়ও মুছে দেওয়া হয়েছে জললে, বাজ পেরা থেকে। জাপানীদের নজর পড়ানোর জন্মে। সাদাকে গুলী করার পরই ওরা আত্মহত্যা করে বরা পড়ার ভয়ে। বুজের সময় জাপানী বরা পড়েছে খুবই কম, পেরের দিকে ছাড়া।

দলের ক্যান্টেন থাকেন সবাই পিছনে। তাঁর চাকেরই লাইন্স অব কন্ট্রিনেশনাল (L of C) সমস্ত ভার, খবরাখবর ও গোঁসাবোণের ব্যবস্থা। কোথায় এবং কে লক্ষ্য এবং কে মিত্র। কোথায় কি ভাবে খাদ্য, পানীয়, অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য আর পেট্রোল ইত্যাদি মিলবে। কোথায় এয়ার কোর্স, কোথায় নেভী, কার কি দক্ষত। তারই ব্যাপ আর সাংকেতিক ভাষা। কিন্তু তা ডিকোড

করবে কে? খাদ্য, জল, বিশ্রাম ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে এরা তখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। সব জলও ত আর খাওয়া যায় না। লক্ষ্যের বিষ অথবা বিবাক্ত জীবাপু মিশ্রিত থাকতে পারে। অবশ্য প্রাণ নিয়ে এ পর্বত বেঁচে থাকলে এর পর তৃতীয় লাইনও পার হতে হবে।

মিত্রসৈন্য ত্রিকূট হয়েছে কোটি কোটি। ওর শেষ নেই। বাঘে খেয়েও কুয়েতে পারে না, তো জাপানীরা। চারিদিক দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলেছে। কয়েক দিন কেটেছে জললে। অবশ্য যদি মিত্রপক্ষের গুলীতে না পড়েন হুই খেকে তুল করে। হুগুরে খাওয়া-দাওয়া সেসে সবাই চলেছে জললের বুক চিরে। অলস মধ্যাহ্নে সবই নীরব, নিশ্চল। নির্জন, নির্বাক। কোথাও কিছু নেই। সবাই চলেছে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ সামনে থেকে নেমে এসেছে চার পাঁচটা ভূত। ভূত, না বম্বুত? উড়ে এলো? ধরেছেও চকচকে বেয়েনটপান ঠিক আপনার নাকের উগায় বন্ধকটোর গুলীতে। নির্জন স্থানে হঠাৎ ভূত দেখলে আপনার ভয় হয়? ওরা পালালো খতমত খেয়ে। সোঁতা পিছনে মুখ করে দৌড়। কারণ, শাজ্জেই বলেছে বং পলায়তি স জীবতি। কিন্তু বাঘে কোথায়? সবাই উগুড় হয়ে মুখ ওজড়ে পড়ে আছে ওখানে। ঐ দেখুন। তাছাড়া ব্যাপার। সবই কি ভৌতিক? দৌড়তে গিয়ে ওরা সব মাটিতে উগুড় হয়ে শুয়ে কেন? আবার কি হোল? দেখা গেল, কতকগুলো শূঁচ মুখ ধারালো ষ্ট্রিলের ফলা মাটিতে পোঁতা রয়েছে কাত করে। লম্বা দাসের ভিতরে বলে দেখা যায় না। এদিকে আসতে গেলে পায়ে লাগে না। কিন্তু পেছন কিংবা দৌড়তে গেলে সোঁতা বিধে বাঘে হাঁটুর নীচে। সামনে ভূত দেখে ওরা পালাতে বাধ্য হয়েছে পিছনে। তাই এই অবস্থা। অবশ্য হঠাৎ ভূত দেখতে পেলে সাহস বৃদ্ধি কিছুই থাকে না। কারো নয়। সে জাপানীরাও জানে।

বাই হোক, সংখ্যার জোরে ওদের শেষ পর্বত সাবাড় করে দেওয়া হোল। কিন্তু সেই ভূতেরা উড়ে এলো কোথা হতে? গাছ থেকে পড়লো? ওরা গাছই ভালবাসে। আরও সামনে যেতে দেখা গেল একটা উইয়ের চিবি। তা মাছ-সমান উঁচু। একটা ছোট গাছ উঠেছে তার ভিতর দিয়ে ডালপালা মলে। চিবিটার একেবারে কাছে গিয়ে দেখুন একবার ভাল করে। উইয়ের চিবিই বটে। বর্ষার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে চিবিটা বেশ পুরোনো মনে হচ্ছে আপনার। তা হবেই। আপনি ঠকেছেন। ওটা উইয়ের চিবিই নয়। জাপানী স্নাইপারের হাতে তৈরী কৃত্রিম কারুকাঠ। আর ওর ভিতরটা একেবারে কাঁপা। কয়েক জন স্নাইপার ওতে আত্মগোপন করে থাকে। এক পাশে ছোট গোল একটা কোঁকর দরজা। তার ওপরে কাদামাখানো চটের টুকরো ঝালানো। কাদার প্রলেপে চিবির উপরকার সিঁদিলি বজায় থাকে। সেই কাদামাখা চটের ওপর একখানা ছোট তাক ডালও টেনে এনে বাঁধা। সেই ছোট গাছটার। বাতে কোনরকমে কৃত্রিম বলে সন্দেহ না আসতে পারে কারো মনে। ছোট ছোট ফুঁটা দিয়ে ওরা দেখে মিত্রসৈন্যের গতিবিধি। তারপর সময় বুঝে আঁপিয়ে পড়ে অকস্মিক। বিশেষ করে রাত্রিকালে।

নির্জন বনে হঠাৎ বম্বুতাকৃতি ভূত দেখতে গিছন কিংবা পলায়ন খুবই স্বাভাবিক। এবং তার পরই মুখ খবড়ে পতন। তাছাড়া ও অবস্থায় আর কি করণীর থাকতে পারে? বাকীটা বলার প্রয়োজন

থাকে না। ওদের কোমরে থাকে সেই চকচকে ধারালো কলার ছুরিখানা। প্রত্যেকে তখন চাঁকর জুড়েছে পড়ে গিয়ে সাহায্যের আশায়। সাহায্য মিলে আইপার। সেই ছুরিখানা নিয়ে প্রত্যেকের গলার নলীতে। একটা করে পৌঁচ। তারপর সমুখ সময়ে পতনের ফলাফল—অকস্মিক বর্ষাধার। যেহেতু অবশ্য টেনে নিয়ে হেঁচকা-হেঁচকি করবে শেরালো আর বুনা জানোয়ারে। তা হোক। ওটুকু তখন সইতেই হবে। ভাড়াটা আর উপায় কি?

বৈতে থাকলে বাপের নাম বজায় থাকবে, কিছুটা ভরসা করা চলল। কিন্তু বৈতে থাকলে এখানে সে ভরসাও কম। ওরা বাপের নামও ছুলিয়ে ছাড়বে। কারণ এখনও কয়েকটি লাইন পার হতে বাকী। এবার চতুর্থ লাইন পার হতে হবে। বৈতে থাকা বাকী মৈত্রীরা এসিয়ে পেলো এবং এক বায়গার জড়ো হয়েছে। ওরা খান কেটে তার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ উপায় দিয়ে ওলী আর বোমার টুকরোরা বড় খুশী বাড়ায়ত কলক। কিছু বলার দরকার নেই। রাতে তিনজন সেনাট্রি মালা করে পাহারা নিচ্ছে। বাতে কেউ না আসে ওদের ওই ঘুমের সময়। আর একজন বেশী থাকে, সে বরাব পার্চ কমাণ্ডার। বঙ্গুরের মাথার বেরনেট চড়িয়ে এককোমর বা বুকসমান খাদের ভিতর গাঁড়িরে থাকে বাইরের দিকে। হুই বটা পর আর একজনকে তুলে দেওয়া হয়। সে গিয়ে আবার গাঁড়িরে থাকবে। অমনি করে সমস্ত রাত। কিন্তু বরাব জললে, রাত একটা থেকে সাড়ে তিনটা মৈত্রীকের পক্ষে কালরাত্রি। জলল আর ঘন অন্ধকার। লোকজন নেই। নিবুয়। রাত্রি বেন কানে কানে কথা কয়। বাইরের দিকে একা একা গাঁড়িরে জেগে রয়েছে শুণু সেনাট্রি। নির্জন বঙ্গুরীর পাহারা বেন। ঐ সময়ে ভূত আর হুই একটা বুনা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। যে কোন শাস্ত্রীর পক্ষে ঐ সময়টাই মারাত্মক। এক মারাত্মক ঘুমের নেশায় পড়ে বসে। কিস্বোন গাঁড়িরে গাঁড়িরে তার পক্ষে একান্ত, এবং অনিবার্য। জাপানীরাও তা জানে।

আশা করি, আল-পাল দিয়ে একটি শেরাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাবেন। শাস্ত্রী হুই একবার ভাড়া দিয়েছে। একটা আখটা ঢিলও ছুঁড়েছে। ওটা পালিয়ে গেছে। খানিক বাসেই আবার দেখা দিয়েছে। এবং আশে-পাশে পায়তারা কবছে। এ এক আছা উৎপাত! শত্রু নয় যে, ওলী করবে। ওলীর শত্রু পুরো যুদ্ধ লোক জেসো উঠবে। নিকটে শত্রু থাকলে দশ পনের রাইলের ভিতর তারাত জেসো বাঁধে শত্রুর অভিয কোন দিকে। সবাই লশব্যস্ত হবে। খুবই risk ওলী করায়। ও ততক্ষণ কেসে আসা বাড়ীর কথাই হয়তো ভাবছে। জী-পুত্র পরিজনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়েছে। মাথাটা বঁকেই কয়েকবার বেরনেটের দিকে, রাইকলের মাথার লাগান মাথাটা এক একবার কাত হচ্ছে দেখে শেরাল ভাবছে, ঐই সুযোগ। কখন সে শাস্ত্রীর পেছনে এসেছে শাস্ত্রী টেরই পেল না। ঠিক ১-১০ হাত দূর থেকে এক লাফে ওইই বাড়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাহ হাতের

হুই আজলে চেপে ধরেছে ঠিক গলার নলীটা। ডান হাতে চকচকে ধারাল ছুরিখানা বের করে সেখানেই বসিয়ে দিয়েছে এক টান। অস্ত কোথাও নয়। গলার নলীটা খালি ওদের লক্ষ্য। শাস্ত্রী হুটকট করে কাত হয়ে পড়েছে মাটিতে। লশ করার উপায় নেই। গলার নলীতে ছুরির পৌঁচ। পরের শাস্ত্রীকে জানিয়েও পেল না যে, তারও টার্গ এসেছে। ততক্ষণে উপরের চামড়ার আবরণটা টান ঘেরে কেলে শেরাল নিজ বৃত্তি ধারণ করেছে। পাণ্ডব শিরিয়ে অশ্বখামার হাতের অভিযান চললো এর পর। বাকী তিনজন শাস্ত্রীরও ওই দশা কবে ও চুকেছে সমস্ত যুদ্ধ খাদের ভিতর। পর পর সব খাদেই নির্বিনাশে ওর সুরের কারিকুরি চালিয়ে সেদ রাতারাতি মনের আনন্দে। কার্য সমাধা হল ও চল গেল আগর স্থানে। সকালে উঠে দেখা গেল, বীজল কাণ্ড। সমস্ত খাদেই লোকগুলো তুরে রয়েছে তখনো গলা কাটা অবস্থায়। বয় দেবার জন্তেও কেউ বৈতে নেই।

কি ভাবে যে কী হয়ে গেল, কেউ তার হদিশ পেলো না। শুণু নির্দেশ এলো—সব বায়গার, সেনাট্রি পোষ্ট গুল কয়ে হবে। সেও ছয় মাস পরে। হুটো করে সেনাট্রি-পোষ্ট, একটা আর একটার বিপরীত দিকে। দুজন সেনাট্রি ঘুরে চকাকারে, একে অপরের বিপরীত মুখে। ফলাফল সেই একই। আইপার ও হুটোকে এক সাথে সাবাত করে কি জানি কোন কারণে ফেলে। আবারও নির্দেশ এলো শাস্ত্রীসংখ্যা তিনজনের বায়গার ছয় জন হবে একই পোষ্ট এবং একজনের হাতে থাকবে স্বার্থাতি রাইফেল। আর একজনের হাতে থাকবে ব্রেন গান। রাইফেল-মান আগের মতই বর্ষাধার। দুদিক থেকে দুজন ঘুরতে ঘুরতে এক বায়গার গিয়ে দেখা হবে। আবার সেখান থেকে পিছন করে পূর্বদানে ফিরে আসবে। দ্বিতীয়বার চলতে হবে বিপরীত দিকে। কিন্তু জাপানী আইপারের কাছে হাজারো জারি-জুরি ব্যর্থতার পর্ববসিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এটম বোমাই দিয়েছে এবং পিগ থেকে নিকৃতি। ওটার যদি আবিষ্কার না হোত?

এ পর্বত ওলীর কারবার মাত্র ঐ এক বায়গার। সেই তৃতীয় লাইনে। সে-ও একটা কি হুইটা মাত্র। আইপার ধরা পড়ছে নদীতেও। কুমারের পোষাকশরা অবস্থার নদীর জল থেকে তোলো হয়েছে দিনের বেলায়।

বায়সাহাবী অর্গানাইজেশনে বৃষ্টি। কুবি-শিল্প-বিজ্ঞানে রাশিয়া। আর যুদ্ধকৌশলে জাপান। জল-যুদ্ধে এরা পৃথিবীর অধিকারী। এই যুদ্ধে আসে পর্বত ধারণা ছিল। যুদ্ধের কোনসে জাণাধরা শ্রেষ্ঠ। বস্তত যুদ্ধের আসে পর্বত আমাদের ধারণা ছিল জাপানীরা শিল্পেই শ্রেষ্ঠ। এই যুদ্ধে নিরস্তম লোকসংখ্যা নিয়ে ওরা দেখিয়েছে, ট্যাংকক্যাল ওয়ার ফোরার নতুন। বিবে সেরা সেরা লড়িয়ে শক্তির সঙ্গে।

ঐই হোল ওদের লড়াই। বৃহৎ শক্তি ছোটের বিরুদ্ধে এক সূত্র প্রাচ্য শক্তির প্রাণবন্ত লড়াই। কিন্তু ওরা দিয়ে গেল ফেন, বোমা পড়ার আগসেই?

॥ মাসিক বঙ্গমতী বাঙলা ভাষার একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্র ॥



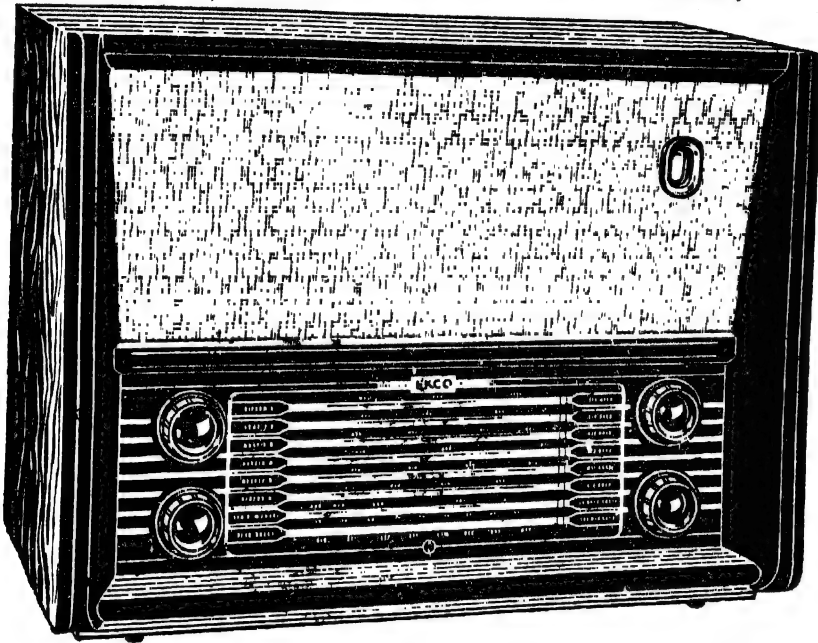
ন্যা শ নাল একো



মডেল ৭৩০

* নতুন 'ম্যাগনি-ব্যাণ্ড' টিউনিং।

* ৪১ মিটার-ব্যাণ্ডে বিশেষভাবে ব্যাণ্ডস্ট্রেড।



মডেল এ-৭৩০ : ৬ ভোল্ট, ৮-ব্যাণ্ড,
এসি। মডেল ইউ-৭৩০ : এসি/ডিসি।
সবককে পালিশ করা কাঠের কাবিনেট।
দাম ৪২৫/- টাকা মাত্র

স্থানীয় বর স্তত্র

শ্রাশনাল-একো রেডিওই সেরা—

ছোটখাটো স্টেশন ধরতেও আপনাকে আর সময় নষ্ট করতে
হবেনা—শ্রাশনাল-একোর নতুন মডেল ৭৩০ 'ম্যাগনি-ব্যাণ্ড' টিউনিং
সংযুক্ত! ৪১ মিটার-ব্যাণ্ডে আছে গুরুত্বপূর্ণ বহু স্টেশন, আর বিশেষ
ব্যাণ্ডস্ট্রেড ব্যবহার ফলে সহজেই সুপষ্টভাবে সেদব স্টেশন ধরা যায়!

আজই আপনার কাছাকাছি অহুমোদিত শ্রাশনাল-একো বিক্রেতার
দোকানে গিয়ে নতুন মডেল ৭৩০ দেখে আসুন!

এগুলি মনসনাত্তজ ড

জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড



৩ মাসলন ট্রাট, কলিকাতা-১৩। অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪। ফ্রেন্ডার রোড,
পাটনা। ১১৮ হাউস রোড, মাদ্রাজ। ৩৬৭২ সিলভার জুবিলী পাক
কোড, বাঙ্গালোর। যোগেশ্বিন কলেজ, টাঙ্গন চক, দিল্লী। রাষ্ট্রপতি
রোড, সেকন্দরাবাদ।



GRA 9117

জন্মান্তর কি সম্ভব ?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

পূর্বপত্র

সাঁবরব বস্ত্র উৎপত্তি ও বিনাশ হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সাবরব বস্ত্র এক বা একাধিক অবয়বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে যে সেই বস্তুটি জিন্ন হইয়া যায় বা তাহা নষ্ট হইয়া নূতন একটি বস্তু উৎপন্ন হয়—ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেহেতু কোন এক পরিচিত মাছের একটি আঙ্গুল কাটিয়া গেলে বা তাহার শরীর একটু মোটা হইলে তাহাকে লোকে পূর্ব ব্যক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝে না; কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিয়াই বুঝে। একটি বস্ত্রের কিয়দংশ ছিন্ন হইলেও লোকে সেই বস্ত্র বলিয়া মনে করে। একটি পর্বতের অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও লোকে সেই পর্বত বলিয়া বুঝে। যদি বলা যায় প্রতিক্রমে অবয়বের পরিবর্তন বশত অবয়বী বস্তুও পরিবর্তিত হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ। তবে যে লোকে 'ইহা সেই পর্বত' ইত্যাদি রূপে অল্পভব করে তাহা পূর্ণাঙ্গর বস্ত্র সাধারণ বস্তু ভ্রান্তি। পূর্ববস্তুটি (পূর্বকালের পর্বত) বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার সাধারণ পরকণে উৎপন্ন বস্তুতে থাকার ভ্রম বশত লোকে 'উহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে করে। যেমন কীপের শিখাগুলি পরিবর্তিত হইলেও 'সেই এই কীপশিখা' এইরূপ ব্যবহার হয়। সুতরাং কোন অবয়বীই স্থায়ী নয়।

ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্ত এই যে, পূর্ব অবয়বীর সহিত পরবর্তী অবয়বীর সাধারণতঃ কিয়দংশে অথবা অধিক অংশে। যদি বল কিয়দংশে সাধারণতঃ, তাহা হইলে সব বস্ত্রের সহিত সব বস্তুই কিয়দংশে সাধারণ থাকায় সব বস্তুকে সব বস্তু বলিয়া লোকের ব্যবহার হউক। অগ্নিকে 'ইহা সেই জল' বলিয়া প্রতীতি হউক। আর অধিক অংশে সাধারণ থাকায় করিলে পূর্ববর্তী পরবর্তী অবয়বীর যেমন প্রত্যেক কণে পরিবর্তন হইতেছে সেইরূপ সেই অবয়বীর অবয়বেরও প্রত্যেক কণে পরিবর্তন হয়, ইহা বস্ত্র স্বভাব স্বীকার করিতে হইবে, তাহার ফলে পূর্ব অবয়বী ও পরবর্তী অবয়বীর অধিক সাধারণ থাকি। অসম্ভব বলিয়া সাধারণ বস্তু 'সেই বস্তু' বলিয়া প্রত্যেক হইতে পারিবে না। আর শেষ অবয়ব (পরমাণু) নিত্য বলিয়া সাধারণ থাকিবে এরূপও বলা যায় না। কারণ শেষ অবয়ব নিত্য কি না তাহা নিশ্চয় করা যায় নাই। নিত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির ভেদ বশত তাহাদের সংযোগেরও ভেদ থাকায় পূর্ব-অবয়বী ও পরবর্তী অবয়বীর অবিকার সাধারণ থাকিবে না। শেষ অবয়বগুলির সংযোগকে অপরবর্তী প্রতি কারণ স্বীকার করিতে হইবে। বিনা সংযোগে কেবল পরমাণুগুলিই অবয়বীর প্রতি কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সাধারণতঃ দ্বারা পূর্ণাঙ্গর অবয়বীর একত্বভ্রান্তির উপাদান করা বাইবে না।

অতএব বলিতে হইবে যে সাবরব বস্ত্র প্রত্যেক কণে পরিবর্তিত হয় না; কিন্তু এক সময় উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থায়িত্ব অল্পসারে স্থির থাকিয়া শেষ সময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাবে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই ভাবে প্রাণটিও পিতার শরীররূপে

উপাদান হইতে পুনরুৎপন্ন হইয়া কালক্রমে শরীর মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া চৈতন্য জীবাত্মারূপে পরিণত হয়। তাবশর তাহার স্থায়িত্ব অল্পসারে স্থায়ী হইয়া অবশেষে ধরিয়া যায়। যতদূর পা তাহার আর জন্ম অসম্ভব। কারণ সাবরব বস্ত্র পুনর্জন্ম কোথায় দেখা যায় না। পিতার প্রাণাংশই পুনর্জন্মরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া জন্মের পর শিশু সন্তানের মাতৃভক্ত পানে প্রভুতি, হৃদয় ভর ক্রমে ক্রমে ক্রীড়া কৌতুক, রাগ, ঘেহ, হর্ষ সুখ দুঃখ, প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি গুণ সকল উদ্ভূত হয়। উপাদান কারণের গুণ উপাদানের কাণ্ডে উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুভিকার গুণ ঘটে; পুত্রের গুণ বস্ত্রে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। শিশু শৈশবে মাতৃভক্ত পান করিয়াছিলেন, ক্রীড়া কৌতুক ভর প্রভুতির দ্বারা আবিষ্ট হইতেন; যৌবনে নানা প্রকার শারীরিক কার্য ও বুদ্ধির কার্য করিয়াছিলেন। এই ভাবে মাতার কার্যও বুঝিতে হইবে। শিশু ও মাতার এই সকল অবিকার সাধারণ সন্তানে অল্পসহ্য হয় এবং শিশু বা মাতার প্রাণে যে চৈতন্য গুণ আছে, তাহা হইতে সন্তানের প্রাণরূপ আত্মাতেও চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সন্তানের জন্ম মাত্রেই তাহাতে পিতা-মাতার বাল্য, যৌবন প্রৌঢ়াভাব সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয় না কেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। যেহেতু উপাদানের গুণ উপাদানেই উৎপন্ন হইবার প্রতি কালও একটি কারণ। সেই কালের ভেদ অল্পসারে পিতা মাতার সন্ধারগুলি সন্তানে ক্রমে ক্রমে বাল্য যৌবনাদি অবস্থার উৎপন্ন হয়। এই ভাবে পিতা-মাতার সন্ধারের কলেই জীব সেই সেই স্বভাবের অল্পসরণ করে। বানরশিশু তাহার পিতা-মাতার সন্ধারের বলেই, জন্ম মাত্রে বৃক্ষ-শাখা ধারণ, মাতার উল্লসে কোললে সালগ্ন থাকি ইত্যাদি স্বভাব প্রাপ্ত হয়। হংসশিশু ডিঙি হইতে প্রসূত হইয়া জলে সন্মরণ করিবার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই ভাবেই দেখা যায়, বুদ্ধিমান পিতা মাতার সন্তান বুদ্ধিমানই হয়। বোকার সন্তান প্রায়ই বোকা হয়। বিদ্বানের গৃহে জন্মিয়া বিদ্বান হয়; মুখের গৃহে মুখ হয়। তবে যে অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ মুখ পিতার সন্তান বিদ্বান হয় বা বিদ্বান পিতার সন্তান মুখ হয়; চোরের সন্তান সাধু হয়। সং ব্যক্তির সন্তান দুষ্ট হয় বা একই পিতার নানা সন্তান পরস্পর বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাহার কারণ এই যে, সন্তানের জন্মান কালে পিতা ও মাতার বৈরত চিন্তা বা সন্ধার প্রভুতির উদয় হয়, সন্তানের স্বভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। একথা আধুনিক অনেক মনীষী বলিয়া থাকেন। আরও কথা এই যে, বেশ, কাল, স্র পরিবেশ প্রভৃতি কারণও একই ব্যক্তির সন্তানগণের পরস্পর বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হইবার আদর্শ নয়। সন্তানের দোষ গুণ, পারিশাধিক অবস্থা, দেশের আবহাওয়া প্রভৃতির ফলে যে জীবের স্বভাবের বিপর্যয় হয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

চিকিৎসকগণ বলেন মহামারী, হুজ্জিক বা রাষ্ট্রের বিপ্লবের সময় যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের যেমন শরীরের নানারূপ বৈকল্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বভাবেরও বিপর্যয় হইয়া থাকে। যেমন দৃষ্টান্ত অল্পসারে বলা বাইতে পারে, যখন ভারত পরাবীন ছিল, তখন অবিকার বালক-বালিকা ভীত হইত, কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে বালক-বালিকারা সাহসী হইতেছে। যদি বল, পিতামাতার প্রাণাংশ সন্তানগণে যখন উৎপন্ন হয়, আর সেই চৈতন্য প্রাণ, শরীর মনের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রাণে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, তখন মাতাপিতার শরীর ও মনের সহিত সংযুক্ত থাকাকালে যে প্রাণ

মাতাপিতার স্তম্ভ বিঘেরে অল্পভব করিয়াছিল; সেই প্রাণ বা প্রাণাংশ
যখন সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কালক্রমে সন্তানের শরীর-মনের
সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হওয়ার ফলে
মাতা বা পিতার অল্পভূত বিঘেরের (নিজের জন্মের পূর্বে ঘটনার)
স্মরণ করে না কেন? তাহার উত্তরে বলিব—দেহ, ইন্দ্রিয়,
প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতে অভিব্যক্তি আত্মা বাহারা স্বীকার
করিয়া জন্মান্তরবাদ মানেন, তাঁহাদের মতে জীবের পূর্বজন্মের
ঘটনা স্মরণ হয় না কেন? তাহারা যেমন বলেন, মৃত্যুরূপ
প্রবল প্রতিবন্ধক বশত পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না অথচ
বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে সকল স্তম্ভপান, ক্রীড়া, কৌতুক,
নিখোশ-প্রখোশ প্রভৃতি সংস্কার, তাহাদের উদ্বোধন হয়। সেইরূপ
আমাদের (জন্মান্তর-স্বীকারকারীর) মতে মাতা বা পিতার শরীর
হইতে প্রাণাংশের বিচ্ছেদই, সন্তানের পক্ষে মাতা-পিতার
অল্পভূত বিঘেরের স্মরণ না করার হেতু। মাতা-পিতার শরীর
হইতে প্রাণাংশের বিচ্ছেদ হইয়া সেই প্রাণাংশ যখন সন্তান
রূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার মাতা-পিতার বাঁচিয়া
থাকার সংস্কার, মৃত্যুভয়, দুঃখ, দুঃখ, অভিলষিত বস্তুর ইচ্ছা
বা তাহার উপায়ের ইচ্ছা সাধনের অবশ্যে ইত্যাদি সংস্কার
সকল প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাঁহাদের অল্পভূত বিঘেরের স্মরণ
হয় না। কতকগুলি সংস্কার আবার সন্তানের নিজ পুরুষকায়ের
অধীন। যেমন, বিজ্ঞা, ধন প্রভৃতির অর্জনজনিত সংস্কার। এই
জন্ম পূর্বে পিতার সন্তানও বিধান হয় বা চোরের সন্তান সাধু হয়
ইত্যাদি। সুতরাং প্রাণট আত্মা, চৈতন্য প্রাণের ধর্ম। অতএব
বর্তমান জন্ম ভিন্ন জন্মান্তর নাই। কারণ যে মাতা বা পিতার
প্রাণাংশ হইতে সন্তানের জন্ম হয়, সেই মাতা বা পিতা ভিন্ন ব্যক্তি,
আর সন্তান ভিন্ন ব্যক্তি। মাতা বা পিতার মৃত্যুর পর আর সেই
মাতা বা পিতারূপে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন না। মৃত্যুই তাঁহাদের সব
শেষ। আর যে সন্তান মাতা-পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিল, সে
তাহার পূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। সন্তানের মাতা বা পিতা
সন্তানের পূর্বেই জন্মিয়াছিলেন। তাহারা সন্তান হইতে ভিন্ন ব্যক্তি
বলিয়া এক আত্মার দুই বায় বা ততোধিক জন্মস্বরূপ জন্মান্তর নিছ
হইল না। অতএব জন্মান্তরবাদটি আকাশ-কুসুম কল্পনা।

পূর্বে যে ভাবে বলা হইল তাহা বার্য সামঞ্জস্য হইয়া
বাওয়ার জন্মান্তরবাদের সাধক যুক্তি ও ঋণিত হইয়া
বায়। অর্থাৎ জন্মান্তরবাদীরা বলেন—জীব জন্মগ্রহণ করিয়া
যে মাতৃস্তম্ভ পানে প্রযুক্ত হয়—তাহার কারণ কি? এই
জন্মে সে ত শিখে নাই? শিশু মাতৃকোষ্ঠ হইতে হঠাৎ
কোন কারণে নীচে পতিত হইবার উপক্রম কালে ভয়ে
মাতার বক্ষাকল বা নিজের গলদেশে রক্ষিত হস্ত ধারণ করিয়া
কপিত হয় কেন? এই জন্মে পূর্বে আত্মাত্মা জনিত দুঃখ
অনুভব করে নাই; বাহার ফলে পতনের উপক্রমে ভীত হইতে
পারে। পতরাশিও জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতার নিকট হইতে
পলাইয়া যার কেন? মাতার কঠিন জিহবার স্পর্শজনিত তাহার
পাক্কর্ষ ছিন্ন হওয়ার ফলে যে দুঃখ হয়, তাহা ত সে এই জন্মে
অনুভব করে নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, পূর্বজন্মের সংস্কার
ব্যতীত এইরূপ হইতে পারে না বলিয়া জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য

ইত্যাদি যুক্তি সকল হয়। যেহেতু স্তম্ভপাননিমিত্ত প্রযুক্তি প্রভৃতি,
যে জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া সম্ভব হইতে পারে—তাহার যুক্তি
আমরা পূর্বেই দিয়াছি। অতএব জন্মান্তর অনিছ।

উত্তরপক্ষ

অনিতা পদার্থ মাজেরই প্রত্যেক ক্ষণে পরিণাম হয়—ইহা
স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা কিছুকাল পরে বা পূর্বে পরিণাম
হয় বর্তমান ক্ষণে পরিণাম হয় না বা কতকগুলি ক্ষণে পরিণাম
হয়, আবার কতকগুলি ক্ষণে পরিণাম হয় না কেন? তাহার
কারণ কি বলিতে হইবে। ইহার কারণ স্পষ্টভাবে কেহই বলিতে
পারিবেন না। যেহেতু যে কারণ তিনি দেখাইবেন, তদ্বিবস্তেও ঐ
প্রশ্ন উঠিবে যে ঐ কারণটি তাহার পূর্বে কেন উপস্থিত হইল না।
মোট কথা যে ক্ষণে বস্তুর ধ্বংস হয়, ঠিক সেই ক্ষণের পূর্বেই তাহার
কারণগুলির উৎপত্তি হয় একথা বলা যায় না। কারণগুলি তাহার
পূর্বক্ষেণে উপস্থিত হইলেও তাহাদের উৎপত্তি তাহার পূর্বে বাস্তবাবে
সম্পন্ন হয়। যেমন কোন ঘটে মৃগেরের আঘাত করিলে, সেইক্ষেণে
তাহার অবয়বের ক্রিয়া জন্ম পূর্বস্থান হইতে অবয়বের বিভাগ,
তার পর পূর্বসংযোগ নশ, তাহার পরক্ষণে ঘটের নশ হয়। আর
স্বাভাবিক ভাবে যে ঘটের বিনাশ হয়, তাহা ঘটের সন্তানান্তের
পর হইতে প্রতিক্রিয়া তাহার অবয়বের পরিণাম হইতে থাকে, সেই
পরিণামের ফলে একদিন ঘট অদৃশ হইয়া যায়। সুতরাং বৌদ্ধদর্শন
মত প্রত্যেক ক্ষণেই বস্তু নষ্ট হইয়া নতুন নতুন বস্তু উৎপন্ন না
হইলেও ঘট প্রভৃতি বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরতার বোণা অণ
হইতে অদৃশ হইবার বোণা কণের পূর্ব পর্যন্ত একরূপ স্থায়ী থাকে
তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। এককণ স্থায়ী থাকিয়া হঠাৎ অদৃশ হইয়া
যায় না। লোক প্রত্যেক দেখাও যায় যে একটি ভট্টাঙ্গিকা বীরে
বীরে ভাস্কিতে ভাস্কিতে দেখে অদৃশ হইয়া যায়। একখানি বস্ত্র ছিন্ন
হইতে এককালে অদৃশ হয়। এই যুক্তি অল্পমাত্রের সাবয়ব প্রাণ ও
জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বীরে বীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ইহা স্বীকার্য।
এইরূপ হইলে বাল্যকালের আন্তে বোঁবনে সেই বাল্যের প্রাণরূপ
অবয়বী যে আর থাকে না, তখন এক নতুন অবয়বী প্রাণ
উৎপন্ন হয়—ইহা আমরা অল্পমানের দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি।
অতএব প্রাণ উৎপত্তির পর হইতে স্থায়ী থাকিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়, তাহার পূর্বে পরিবর্তিত হয় না—পূর্ণপক্ষীর
এই কথা হয়। সাবয়ব বস্তু মাজেরই স্বভাব এই যে, প্রত্যেক ক্ষণে
তাহার পরিণাম হয়। সুতরাং বোঁবনে প্রাণরূপী আত্মা বাল্যের
প্রাণাত্মা হইতে ভিন্ন হওয়ার বাল্যের ঘটনা স্মরণ হইতে
পারিবে না—এই পূর্বোক্ত দোষ থাকিয়াই বাইবে। যদি বাল
বাল্যের অবয়বী ও বোঁবনের অবয়বী ভিন্ন হইলে বাল্য ও
বোঁবনের শরীর পরস্পর ভিন্ন হওয়ার 'সেই এই দেহবস্ত' এইরূপ
জ্ঞান হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিব ঐ উত্তর অবয়বী ভিন্ন
হইলেও তাহাদের বহু অবয়ব অপরিবর্তিত থাকায় অধিক সাদৃশ্য
বশত লোকের 'সেই এই দেহবস্ত' এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্তিবশতই হইয়া
থাকে। আর বোঁবন ও বোঁবন শরীরে অবয়ব বিশেষ কোন
অপরিবর্তিত থাকে—এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে—ইহা
বস্তুর স্বভাব। অর্থাৎ সেই অবয়বগুলি চিরকাল অপরিবর্তিত না

হইলেও তাহাদের পরিবর্তনের কাল-মাত্রাটি একটু বিলম্বে হয়, ইহা সহজেই অনুমিত। যেমন আকাশের পরিবর্তন, পৃথিবী অপেক্ষা অতিবিলম্বে হয়—ইহা অনুমানগম্য। অথবা যেমন সিকতারাশি অপেক্ষা পর্বতারাশির পরিবর্তন অধিককাল সাপেক্ষ। ইহা বস্তু স্বভাব। স্বভাবের উপর অভিযোগ করা চলে না। অগ্নি কেন উষ্ণ? জল কেন শীতল? এইরূপ প্রশ্ন অনর্থক। যদি বল—এই বৃত্তিতে আয়তন (পূর্ণতা) বলিব অবয়বী প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের অবয়ব অনেক বিলম্বে অর্থাৎ সুস্থায় পূর্ণপৰ্বন্ত অপরিবর্তিত থাকায় পূর্ণাংশ প্রত্যভিজ্ঞা ১ স্বরূপ প্রভৃতির অনুপপত্তি হইবে না। ইহার উত্তর এই যে—একটি মাত্র অবয়বই অপরিবর্তিত বলিয়া প্রমাণিত না হওয়ার, দুই, তিন বা ততোধিক অবয়বকে অপরিবর্তিত স্বীকার করিলে প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য থাকায় পূর্ণকবিত ২ দোষের আপত্তি হইবে। আর সম্মিলিত অবয়বে একটি চৈতন্য স্বীকার করিলেও দোষ হয় এই যে, তাহারা অপরিবর্তিত থাকিলেও তাহাদের সংযোগ অপরিবর্তিত না থাকায় চৈতন্যের বিনাশ হইয়া যাইবে। আর তা ছাড়া প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলে, সকলের সম্মিলনে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার বৃত্তি পূর্বে দেখান হইয়াছে। ৩;

যদিও বা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে—অবয়বী প্রশ্ন পরিবর্তিত হইলেও তাহার কোন একটি অবয়ব সুস্থায় পূর্ণপৰ্বন্ত অপরিবর্তিত থাকে; আর সে চৈতন্য বলিয়া বাল্য, যৌবন অবস্থার ঘটনা যৌবন বা বার্দ্ধক্য স্বরূপ হওয়ার কোন বাধা থাকে না। তাহা হইলেও বলিব যে, না এরূপ হইতে পারে না। কারণ অপরিবর্তিত অবয়বে একটি চৈতন্য আর পরিবর্তিত অবয়বগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য রূপ অনেক চৈতন্য থাকায় সেই পূর্ণদোষের আপত্তি হইবে। আর যদি বল—অপরিবর্তিত অবয়বটিতেই চৈতন্য থাকে অন্যান্য পরিবর্তিত অবয়বে চৈতন্য থাকে না। তাহার উত্তরে বলিব একটি মাত্র চৈতন্য অবয়ব ও অন্যান্য অচেতন অবয়ব সমূহ; এইরূপ বিজাতীয় অবয়বের দ্বারা একটি অবয়বী প্রশ্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বলা যায় জলও পৃথিবীর দ্বারা এক অবয়বী উৎপন্ন হয় বলিয়া, জলও পৃথিবীর মধ্যে বৈজাত্য থাকিলেও ভূতত্ত্বরূপ সাক্ষাত্যও থাকায় বৈজাত্য বিজাতীয় অবয়ব সমূহের দ্বারা অবয়বী উৎপন্ন হইতে পারে। সেইরূপ চৈতন্য ও অচেতন রূপে প্রশ্নের অবয়বে বৈজাত্য থাকিলেও ভূতত্ত্ব বা প্রশ্নতত্ত্ব রূপ সাক্ষাত্য থাকায় তাহাদের দ্বারা এক অবয়বী প্রশ্ন উৎপন্ন হইবে—এ বিষয়ে আশ্চর্য কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—সেই একটি অবয়বেই এখন চৈতন্য আছে, আর অন্যান্য অবয়ব অচেতন এবং শরীর বা মনও অচেতন (এই পক্ষে মনকেও অচেতন স্বীকার করিতে হইবে) তখন শরীর বা মনের সংযোগ ব্যতিক্রমকেও তাহাতে চৈতন্যের অভিযুক্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে সুস্থতির সময় এবং পিতার শরীর হইতে (বীর মধ্যে) বিযুক্ত হইবার কালে ও সেই

প্রাণাংশে চৈতন্যের উপলব্ধি হউক। কারণ যে বস্তুর যে গুণটি স্বাভাবিক সেই বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব বা তাহার সত্যকালে সেই গুণটির অভিযুক্তির নিমিত্ত অপর কাহারও সংযোগসাক্ষ অপেক্ষা করে না। প্রশ্নের যে অবয়বটিতে চৈতন্য থাকে তাহা সত্যানের শরীরে অকস্মৎ আবির্ভূত হয় নাই, কিন্তু পিতা বা মাতার প্রশ্ন হইতে আসিয়াছে, বলিতে হইবে। তাহার ফলে সেই প্রশ্নাংশটিতে পূর্ণ হইতেই (সত্যানের শরীরে আসিবার পূর্বে) চৈতন্য ছিল বলিয়া উহা পিতৃ শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়াও চৈতন্য হউক। কিন্তু তাহা জানা যায় না। চূর্ণ ও হলুদের সংযোগে যে লাল রং উৎপন্ন অভিযুক্ত হয় তাহা সেই চূর্ণ ও হলুদে পূর্বে অনভিযুক্ত ছিল; আর ঐ সংযোগটিও লাল রং-এর আশ্রয়ভূত বস্তুদ্বয়ের সংযোগ এবং ঐ সংযোগের ফলে চূর্ণ ও হলুদরূপ উভয় জব্যেই লাল রং উৎপন্ন হয়। কিন্তু তোমাদের মতে (পূর্ণকীর মতে) সেই অপরিবর্তিত প্রশ্নাবয়বেই চৈতন্য থাকে, অজ্ঞাত অবয়বে চৈতন্য থাকে না বা শরীর ও মনেও চৈতন্য থাকে না। সুতরাং সেই অচেতন শরীর মন বা অজ্ঞাত প্রশ্নাবয়বরূপ বিজাতীয় বস্তুর সংযোগে অপরিবর্তিত অবয়বে চৈতন্যের অভিযুক্তি হইবে কিরূপে; আর যদিও বা তাহা হয় তাহা হইলে শরীর, মন বা অজ্ঞাত অবয়বেও চৈতন্য উৎপন্ন হউক; শরীর, মন প্রভৃতিতে ঔপাধিক চৈতন্য স্বীকার করিলে ঐ অপরিবর্তিত প্রশ্নাবয়বে স্বাভাবিক চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে যে দোষ হয়, উহা একটু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরও কথা—সেই অপরিবর্তিত একটি অবয়ব নিরবয়ব অথবা সাবয়ব। নিরবয়ব হইলে তাহার সহিত শরীর বা মনের সংযোগ হইতে পারে না। যেহেতু সাবয়বের সহিত সাবয়ব জব্যেরই সংযোগ হয়। সাবয়বের সহিত নিরবয়বের বা নিরবয়বের সহিত নিরবয়বের সংযোগ অসম্ভব।

আর ঐ অপরিবর্তিত অবয়ব সাবয়ব বলিলে ব্যাঘাত দোষ হইবে। সাবয়ব অর্থাৎ অপরিবর্তিত ইহা বিতৃষ্ণ কথা। সাবয়ব হইলে পরিবর্তিত হইবে। অপরিবর্তিত হইলে নিরবয়বই হইবে। অতএব কোন প্রকারেই প্রশ্নরূপ অবয়বী বা প্রশ্নের অবয়বে চৈতন্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বিনয়ের প্রশ্নকে অলম্বন করিয়া মাতা-পিতার সত্যার বশত সত্যানের স্তম্ভপান্যনিত্তে প্রবৃত্তি, সুস্থাত্তর প্রভৃতির উপপত্তির দ্বারা অসম্ভাব্যবাদ খণ্ডনই অলৌকিক কল্পনার পর্ববর্তিত হইল। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, সুস্থাত্তর প্রভৃতি চৈতন্যেরই ধর্ম। অর্থাৎ প্রশ্ন অচেতন। কোন্‌ই সেই সত্যানের প্রশ্নে কিরূপ মাতা-পিতার সত্যার গুণ উৎপন্ন হইবে? অতএব দেশ, কাল, সঙ্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া ইত্যাদির দ্বারা স্বভাবের পরিবর্তন হইলেও সেই স্বভাব বৈধ, ইন্দ্রিয়, প্রশ্ন মন ইত্যাদিতে থাকিলেও ইহাদের কোনটিতে চৈতন্যসিদ্ধ না হওয়ার এতদতিরিক্ত চৈতন্য আত্মা অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অসম্ভাব্যবাদও অনস্বীকার্য।

পূর্বপক্ষ

১ সত্যার সহকৃত প্রত্যেক জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

২ বহু চৈতন্যের ঐকমত্য না থাকায় শরীর নষ্ট হইবে অথবা কোন কথ নিশ্চয় হইবে না।

৩ মনের চৈতন্য পাবে বণ্ডিত হইতেছে।

শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রশ্ন ইহারা আত্মা না হইলেও মনই আত্মা, মনের অতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। আমরা দ্বারা কিছু অজ্ঞত বা স্বরূপ করি, সবই মনের দ্বারা করি। মনকে বাদ দিয়া কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব মনেই জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

জন্মেই পাড়াইল, চেতন মনই আত্ম। 'আমি বাম,' 'আমি শোকার্ত,' 'আনন্দিত'। আমি জানি। আমি মরণ করি। ইত্যাদি জ্ঞানগুলি মনেই উৎপন্ন হওয়ার মন আত্ম। অবশ্য এই মন উৎপন্ন বিনাশশীল। পিতার শরীরাল্প রূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তিম কালে একেবারে মরিয়া যায়। কাজেই জন্মান্তর অসিদ্ধ। বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। উহাই ইহাব (মনের) চরম পর্য্যবসান।

চৈতন্যটি মনের ধর্ম হইলেও সেই চৈতন্যের অভিব্যক্তির জন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের অপেক্ষা আছে। এই কারণে পিতার শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া পুত্রের শরীর সংযোগের পূর্বে তাহার চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না। অতএব মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা বা নিত্য আত্মা অসিদ্ধ হওয়ার জন্মান্তরবাদ টিকিতে পারে না।

উত্তরপক্ষ

মনকে আত্মা ও চেতন স্বীকার করিলে প্রশ্ন হইবে এই যে— উহা (মন) বস্তু নানিত্য, তখন সাধারণই হইবে। কারণ, নিরবয়ব জীব্যের বিনাশ হইতে পারে না। অবয়বের বিভাগ প্রকৃতি হইয়াই জীব্যের বিনাশ হয়। নিরবয়বের পক্ষে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মন সাধারণ হইলে তাহার প্রত্যেক অবয়বে এক একটি চৈতন্য অথবা সমূহ অবয়বে একটি চৈতন্য ইত্যাদি পূর্ণোক্ত দোষের আপত্তি হওয়ার চৈতন্যকে মনের ধর্ম বা স্বভাব বলা হইবে না। অতএব জড় মন আত্মা হইতে পারে না। আত্মা যে চেতন তাহা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। আর মনকে যদি নিরবয়ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাহা নিত্য হইবে। নিত্য হইলে জন্মান্তরবাদ প্রমাণিত হইয়া যাইবে। আর এমনও বলা যায় না যে— 'মন নিত্য, কিন্তু তাহার চৈতন্যটি শরীরের সহিত সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয়, শরীরের বিনাশ হইলে তাহার চৈতন্যও নষ্ট হইয়া যায়। তখন মনটি জড় হইয়া অবস্থান করে। আর জন্ম হয় না।' যেহেতু মনকে নিত্য স্বীকার করিলে এবং চৈতন্যকে তাহার আগচ্ছক (শরীর সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন) ধর্ম মানিলে প্রশ্ন হইবে এই যে অন্যান্য মনের সহিত বর্তমান শরীরের সংযোগ 'কি কারণে হইল? বিনা কারণে শরীরের সংযোগ হইতে পারে না। বিনা কারণে শরীরের সংযোগ স্বীকার করিলে এই জন্মের পূর্বে এবং পরেও বিনা কারণে শরীর সংযোগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, আর তাহার ফলে জন্মান্তর অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আর শরীরের সহিত সংযোগের কারণ স্বীকার করিলে—কর অর্থে ইত্যাদি সেই কারণ হওয়ার, শরীর ব্যতিরেকে কর্ম সম্ভব নয় বলিয়া বর্তমান শরীর সংযোগের পূর্বেও কর্মের আশ্রয়রূপ শরীর স্বীকার করিতে লইবে। সুতরাং তাহাতেও জন্মান্তর অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। অবশ্য মনকে নিত্য চেতনবাদ স্বীকার করিলে তাহাই আত্মা হইবে। তবে কেবল নামমাত্রের বিবাদ। ফলতঃ নিত্য চেতন একটি বস্তু সিদ্ধ হওয়ার—আত্মবাদীরা তাহার নাম দেন আত্ম। আর মনোবাদীরা তাহার নাম দেন মন। এইরূপ স্বীকারে বিশেষ বিবাদ নাই। কিন্তু মন বলিতে আমরা সাধারণতঃ বাহ্য বৃত্তি, বিশেষ ভাবে

চিন্তা করিতেও দেখা যাইবে যে কাম, কোথ, ভয়, দুঃখ, হর্ষ, উৎপন্ন প্রকৃতি বৃত্তিগুলি মনের ধর্ম বলিয়াই স্বীকার্য। আর এই বৃত্তিগুলি বা গুণগুলি উৎপত্তি-বিনাশশীল—ইহা আমরা অনুভব করি। বৃত্তি বা গুণ অনিত্য বলিয়া তাহার আশ্রয়ও অনিত্য হইবে। কারণ অনিত্য গুণের আশ্রয় পদার্থ অনিত্য হইয়া থাকে। যেমন গন্ধ প্রকৃতি গুণের আশ্রয় পুষ্পাদি নিত্য বস্তুর ধর্ম বা গুণ অনিত্য হয় না। যেমন আত্মার আনন্দ প্রকৃতি। সুতরাং কাম, কোথ, শোভ, মেহ প্রকৃতি অনিত্য গুণের আশ্রয়—মনটি অনিত্য হইতে বাধ্য।

যদি বলা যায় আশ্রয়ীভূত পদার্থ নিত্য হইলেও তাহার গুণ অনিত্য হইতে পারে। যে গুণগুলি সংযোগ, বিভাগ বা পদ্যাদি জড় হয় সেইগুলি অনিত্য। যেমন আকাশ নিত্য অথচ ঢাক, ঢোল কাঠের সংযোগে আকাশে অনিত্য শব্দরূপ গুণ উৎপন্ন হয়। অথবা যেমন আত্মা ও মনের সংযোগে আত্মাতে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রকৃতি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিয়মে কাম, কোথ প্রকৃতি গুণগুলি অনিত্য হইলেও তাহার আশ্রয়ীভূত মন নিত্য হইতে বাধ্য কি? ইহার উত্তরে বলিব, আকাশ যে নিত্য তাহা ত সিদ্ধ হয় নাই। বরং এই অনিত্য শব্দ গুণের দ্বারা আকাশ সাধারণ এবং তাহার ফলে অনিত্য হইবে। আর আত্মার সহিত মনের সংযোগ সম্ভবই নয় বলিয়া তাহার ফলে আত্মাতে অনিত্য গুণের উৎপত্তির সম্ভাবনাই নাই। আত্মা নিরবয়ব, মন সাধারণ; সাধারণের সহিত নিরবয়বের সংযোগ হইতেই পারে না। আর যদি বা আত্মার ও মনের সংযোগ স্বীকার করা যায় এবং সেই সংযোগকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রকৃতি গুণের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে আপত্তি হইবে এই যে, এককণে আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান বা ইচ্ছা উৎপন্ন হউক যেহেতু জ্ঞান বা ইচ্ছার কারণ, আত্মা ও মনের সংযোগ রহিত। কারণ থাকিলে কার্য অবশ্যভাবী। আরও দোষ হয় এই যে, আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়া তাহার সহিত সর্বদা মনের সংযোগ থাকার আত্মাতে সর্বদা জ্ঞান, ইচ্ছা, মেহ প্রকৃতি গুণ উৎপন্ন হউক, এমন কি সুবৃষ্টিতেও কাম, কোথ প্রকৃতি গুণের উৎপত্তি হউক। তবু তাহা হয় না, বলিয়া নিত্য বস্তুতে অনিত্য গুণের উৎপত্তিস্বীকার করা যাইবে না। আরও কথা এই কাম, কোথ প্রকৃতি বিকারাত্মক গুণ বাহ্যতে উৎপন্ন হয় তাহা বিকারী হওয়ার অনিত্য হইবে। বিকারের আশ্রয়ীভূত পদার্থ বিকারী, কাজেই অনিত্য হয়, যেমন ঘটি, মৃত প্রকৃতি। বাহ্য বিকারের আশ্রয় নয় তাহা নিত্য, যেমন আত্মা। সুতরাং প্রত্যক্ষের (মানস প্রত্যক্ষ) দ্বারা অনুভূত কাম, কোথ, ভয়, মেহ প্রকৃতি গুণ বা বৃত্তির আশ্রয়ীভূত মন অনিত্য হইতে হবে। অনিত্য হইলে তাহা সাধারণই হইবে। কারণ অনিত্য জীব্য সাধারণ হয়। আর সাধারণ হওয়ার পূর্ণোক্ত বৃত্তি অনুসারে ৪ তাহাতে চৈতন্য সিদ্ধ হইতে পারিবে না। অতএব মনও অনাত্ম। আরও কথা এই যে, কোন ক্রিয়ার প্রতি করণ এবং কর্তার অপেক্ষা থাকে। এইরূপ জ্ঞান

৪ প্রত্যেক অবয়বে পৃথক পৃথক 'চৈতন্য থাকিলে, অনেক চেতনের ঐকমত্যের অজ্ঞা বশত কার্য সম্পন্ন হইবে না। সমস্ত অবয়বে এক চৈতন্য স্বীকার করিলে কোন একটি অবয়ব নষ্ট হইলে, চৈতন্যেরও বিনাশের প্রসঙ্গ হইবে, ইত্যাদি।

প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রতি সাধারণতঃ মনকে করণ স্বীকার করার তত্ত্ববিশিষ্ট একজন বক্তা স্বীকার করিতে হয়। এক মনই করণ এবং কর্তা হইতে পারে না। এই অজ্ঞ মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার। আরও একটি বুদ্ধি এই যে—“আমার মন ভাল নয়” আমি কিছুতেই অজ্ঞ পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছি না ইত্যাদি—ব্যবহার হইতে বুঝা যায় মন হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে আমরা আমি বলিয়া ব্যবহার করি।

এই ভাবে বুদ্ধিকেও আত্মা বলা যায় না। কারণ মন ও বুদ্ধি প্রায়ই একটি পদার্থ। কিঞ্চিৎ জেন স্বীকার করিলেও আমার বুদ্ধি মোটা, তাহার বৃদ্ধি ক্ষুদ্র, সে বুদ্ধিমান, ইত্যাদি ব্যবহার হইতে বুঝা যায় আত্মা বুদ্ধি হইতেও অতিরিক্ত। আর যে যে বুদ্ধিতে মনের চৈতন্য ঋণিত হইয়াছে, সেই সেই বুদ্ধিতে বৃদ্ধিরও চৈতন্য ঋণিত হইবে। অতএব আত্মা এতদ্বিধ স্বীকার।

পূর্বপক্ষ

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি হইতে আত্মা অতিরিক্ত হউক তথাপি তাহা নিত্য কেন হইবে? সেই আত্মা অনিত্যই হউক। অনিত্য হওয়ার জন্মান্তর সিদ্ধ হইবে না। অথবা সেই আত্মা যদি নিত্যও হয়, তাহা হইলেও নিত্য ভাব পদার্থের উৎপত্তি না থাকায়, আত্মার জন্মই সিদ্ধ হয় না; জন্মান্তর ত দূরের কথা। কাজেই সর্বপ্রকারে জন্মান্তরবাদ অলীক।

উত্তরপক্ষ

আত্মা যে চৈতন্য, তাহা সর্বজনপ্রসিদ্ধ। অচৈতন্য বস্তুকে কেহ আত্মা বলিয়া বুঝে না। অনিত্য বস্তুমান্যই যে অচৈতন্য, তাহা পূর্বে বহু বক্তার দ্বারা দেখান হইয়াছে। অনিত্য বস্তুতে কোনরূপেই চৈতন্য থাকিতে পারে না। ঘট, পট ইত্যাদি সাধারণ, অনিত্য বস্তু চৈতন্য নয়। এইরূপ আত্মাকে সাধারণ, অনিত্য স্বীকার করিলে তাহা অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। অতএব আত্মাকে নিত্য, নিরবয়ব স্বীকার করিলে তাহার চৈতন্য অথবা তাহা চৈতন্যস্বরূপই সিদ্ধ হয়। বস্তুত আত্মার গুণ বা ধর্মই চৈতন্য—এই মত বৃত্তিযুক্ত নয়। যেহেতু গুণবা দ্রব্যমান্যই বিকারী, অনিত্য হওয়ার, চৈতন্যগুণবান্ আত্মার অনিত্যতার আপত্তি হয়। সত্ত্ব দ্রব্য নিত্য হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আরও কথা এই যে, আত্মা চৈতন্য অর্থাৎ চৈতন্যগুণবিশিষ্ট হইলে, সেই চৈতন্যের দ্বারাই আত্মার প্রকাশ হয়—ইহা বলিতে হইবে। আর তাহা বলিলে আত্মা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার তাহার (আত্মার) মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইবে। যেহেতু বাহ্য দৃষ্ট অর্থাৎ প্রকাশ তাহা মিথ্যা, অনিত্য। এইরূপে আত্মাও অনিত্য হইয়া পড়িবে। আত্মা অনিত্য হইলে পূর্বমুক্তি অমুসারে তাহার চৈতন্য সিদ্ধ হইবে না।^১ এই সব কারণে নিত্যজ্ঞানস্বরূপই আত্মা প্রতিপাদিত হয়।

যদি বল জ্ঞান মান্যই অনিত্য, কোন জ্ঞানই নিত্য নয়—ইহা অস্বত্ববিশিষ্ট। যেমন ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান; আমি ইহা জানিবা। তাহাকে জানিয়াছিলাম ইত্যাদি অস্বত্ববের বলে সমস্ত জ্ঞানই অনিত্য। ইহার উত্তর এই যে—ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান—ইত্যাকারক জ্ঞানগুলি বিশেষ জ্ঞান—ইহার অনিত্য। কিন্তু নির্বিশেষ জ্ঞান নিত্য। কখনও তাহার অভাব পাওয়া যায় না।

যেহেতু নির্বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে বা নাই হইয়া গিয়াছে—এই ভাবে জ্ঞানের প্রাগভাব বা ধ্বংসকে জানিতে হইলে, জ্ঞানের দ্বারাই জানিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানের জন্মের পূর্বে বা বিনাশের পরেও জ্ঞানের সত্তা থাকার জ্ঞান সামান্তের অভাব কোন কালেই উপস্থান করা যায় না বলিয়া নির্বিশেষ বা সামান্তজ্ঞান নিত্য। যদি বহু—একটি জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞ এক জ্ঞানের প্রাগভাবাদি জানা যাইবে। তাহার উত্তর এই যে প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকিলে তাহার অভাবে জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া, যে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞ জ্ঞানের প্রাগভাব জানা যায়, সেই জ্ঞানকে প্রাগভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের জ্ঞানের সত্তা কালে থাকিতে হইবে এবং তাহার ধ্বংসকাল পর্যন্তও থাকিতে হইবে। তাহার কলে এই প্রকাশক জ্ঞানকে দ্বারী স্বীকার করিতে হইবে। আবার এই দ্বারী জ্ঞানের প্রাগভাব বা ধ্বংসকে যে জ্ঞান প্রকাশ করিবে তাহাকে তদপেক্ষা দ্বারিতর স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত একটি অনাদি ও অনন্ত জ্ঞান অজ্ঞ স্বীকার। আর তাহাই আত্মা। আর যে কেহ কেহ বলে আমাদের স্রষ্টৃপ্তির সময় কোন জ্ঞানই থাকে না বলিয়া নিত্যজ্ঞান অসিদ্ধ। ইহাও বৃত্তিসঙ্গত কথা নয়। যেহেতু স্রষ্টৃপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে আমি স্রষ্টে ঘূমাইয়াছিলাম’ ‘কিছুই জানিতে পারি নাই’—এই প্রকার স্রষ্টা বা অজ্ঞানের স্মরণ করে। অজ্ঞত্ব ভিন্ন স্মরণ হয় না। অতএব অর্থাৎ স্রষ্টৃপ্তিতে অজ্ঞত্ববরণ জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। যদি বল স্রষ্টৃপ্তি হইতে উঠিয়া যে লোকে স্রষ্টের স্মরণ বা অজ্ঞানের স্মরণ করে। সেই অজ্ঞমানের ফলে স্রষ্টৃপ্তিতে জ্ঞান সামান্তের অভাব এবং দুঃখ প্রভৃতির অভাবই সিদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ এই ভাবে অস্বত্ববিশিষ্ট হয়। বলাঃ—স্রষ্টৃপ্তি কালের পূর্ব ও পরবর্তী কাল দুইটি মধ্যবর্তী কালযুক্ত যে হেতু এই দুই কাল পূর্ণাঙ্গের কাল।

যেমন যে রাত্রিতে আমি জাগিয়া থাকি, সেই রাত্রির পূর্ণাঙ্গের কাল দুইটি মধ্যবর্তী কালযুক্ত। এই ভাবে স্রষ্টৃপ্তির কালের অস্বত্ববিশিষ্ট। তার পর স্রষ্টৃপ্তি কালটি অস্বত্ববিশিষ্ট যেহেতু তাহা কাল। এই ভাবে স্রষ্টৃপ্তিকালীন আত্মা জ্ঞানসামান্তের অভাবমান যেহেতু তৎকালে জ্ঞানের কারণ ছিল না। এইরূপে স্রষ্টৃপ্তি কালে আত্মাকে জ্ঞানের অভাব সিদ্ধ হওয়ার আত্মা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিব স্রষ্টৃপ্তিকালে যে জ্ঞানের কারণ থাকে না—তাহা জানিলে কিরূপে? যদি বল জ্ঞানের অভাব হইতে জ্ঞানের কারণের অভাবের দ্বারা জ্ঞানের অভাব, আবার জ্ঞানের অভাবের অস্বত্ববিশিষ্ট অজ্ঞাতভাবের দোষ বশত—এইরূপ অস্বত্ববিশিষ্ট। সুতরাং স্রষ্টৃপ্তিকালেও কোনরূপে জ্ঞানসামান্তের অভাব প্রমাণিত করা না বাওয়ার, জাগ্রত, স্বপ্ন, স্রষ্টৃপ্তি, দিন, রাত্রি, মাস বৎসর ইত্যাদি কালের অতীত এক নিত্য জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। আর তাহাই আত্মা। যদি ও এই আত্মার স্বরূপও জন্ম অনিচ্ছ—তথাপি বর্তমান জন্ম আমরা অস্বত্ববিশিষ্ট বলিয়া বলিতে হইবে নূতন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির সহিত সেই আত্মার একটা কোনরূপ সঞ্চয় হইয়াছে; আর এই বর্তমান জন্মটি বধন দেখা যাইতেছে, তখন ইহার কারণরূপে করা অস্বত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কর্মের ফল যে অবশ্যজ্ঞাত তাহা প্রায়ই সকলের অস্বত্ববিশিষ্ট। সেই কর্ম নিজ আত্মার কর্ম বলিতে হইবে। কারণ অপরের কর্মের দ্বারা কেলা

মরণের কল হইতে দেখা যায় না। এই হেতু বর্তমান জন্মের শরীর হইতে শরীরের কারণ কর্ম, আবার এই জন্মের কর্ম হইতে এই শরীর উৎপন্ন হয়—এইরূপ বলিলে অজ্ঞাতাশ্রয় দোষ হয়। সুতরাং এই জন্মের কারণীভূত কর্মগুলির জন্ত পূর্ববর্তী শরীর স্বীকার করিতে হইবে। তাহাই পূর্বজন্ম। আবার তাহার জন্ত তাহার বৈজ্ঞানিক স্বীকার্য। এইরূপে অনাদি জন্ম বা সৃষ্টি অর্থাৎপ্রতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার জন্মান্তরবাদ অপরিহার্য। আবার এই জন্মের ধর্মের ফলে আগামী জন্ম অবশ্যজ্ঞাত। বতদিন না জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কর্মের ক্ষয় হয়, ততদিন জন্মাবস্থা আবর্ত্তনীয়।

পূর্বে দেখান হইয়াছে যে আত্মা চৈতন্যরূপ, কাজেই উহা দেখ, শ্রব, প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতে ভিন্ন। আর আত্মাকে সর্বব্যাপক বলিতে হইবে। কারণ যদি আত্মা মধ্যম পরিমাণ হন তবে সাবর হওয়ার (মধ্যম পরিমাণ বস্তু সাবরবই হয়) অনিত্য হইয়া পড়ে, আর সাবরর বস্তু চৈতন্যও হয় না। অতএব আত্মা মধ্যম পরিমাণ নহে। অণুপরিমাণও বলা যায় না। অণু বলিলে সমস্ত দ্বিগুণে দুখ প্রভৃতির অল্পতর যুগপৎ হইতে পারে না। যেহেতু অণু আত্মা শরীরের এক অংশেই যুগপৎ থাকিতে পারে বলিয়া যে দশে আত্মা থাকিবে সেই অংশেই দুখ হইতে পারে, অজ্ঞ অংশে দুখ হইবে না। কিন্তু কীম্বকালে মধ্যাহ্নে নীতল জলে স্নান করিলে বা শরীরে চন্দন অল্পলপন করিলে যুগপৎ সর্বশরীরেই দুখ হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা অণু নয়। সুতরাং অবশেষে পীড়াইল আত্মা বিহু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী হইলে কোন কর্ম বা ক্রিয়া সম্ভব নয়; সেরূপ দেখাও যায় না। প্রত্যক্ষ নিরবয়ব পদার্থের ক্রিয়া হয় না। আত্মা বখন নিরবয়ব, চৈতন্যরূপ তখন তাহার পক্ষে বাস্তবিক কর্ম, জন্ম, ভোগ প্রভৃতি সম্ভব নয়। অথচ আত্মার জন্ম, কর্ম, ভোগ প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ অহুভব করিতেছি। এই জন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জন্ম, কর্ম প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান বশতই হইয়াছে। অবজ্ঞা মিথ্যাজ্ঞান মাত্র হইতেই জন্ম হয় না কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান হইতে কামনা, কামনা হইতে কর্ম, কর্ম হইতে জন্ম, জন্ম হইতে ভোগ ইত্যাদি হইতেছে। আবার অপরের কর্মের দ্বারা অপরের ফলভোগ হয় না ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রাম থাকিলে ক্রামের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং স্বাধার কর্ম, তাহারই জন্ম বলিতে হইবে। এই যুক্তি অহুদারে প্রত্যেক আত্মার জন্ম দেখিয়া নিশ্চয় করা যায় যে এই জন্মের কারণরূপে প্রত্যেক আত্মার নিজ নিজ কর্ম অবজ্ঞাই ছিল। আবার কারণটি কার্যের পূর্ববর্তী হয় বলিয়া এই জন্মের কারণরূপ কর্ম এই জন্মের পূর্বে ছিল। আবার শরীর বাস্তবকে কর্ম সম্ভব

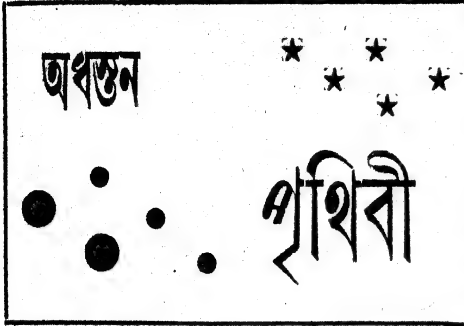
নয় বলিয়া, এই জন্মের কারণীভূত কর্মগুলির সাধনরূপ পূর্ব শরীরও বর্তমান শরীরের পূর্বে হইতছিল। আত্মার সহিত কল্পিত শরীরের সম্বন্ধই আত্মার কল্পিত জন্ম। কারণ আত্মার বাস্তব জন্ম বা কর্ম যে সম্ভব নয় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। অতএব পীড়াইল যে বর্তমানে জন্মের কারণরূপে কর্ম, সেই কর্মের কারণরূপে বর্তমান জন্মের পূর্বজন্ম; এইরূপ সেই পূর্বজন্মের কারণরূপে তাহার পূর্বজন্ম অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। আবার বর্তমান জন্মেও অনেক নূতন কর্ম কথা হইতেছে। তাহারও ফল অবশ্যজ্ঞাত। বালিয়া বর্তমান জন্মের পূর্ব আগামী জন্মও অজ্ঞমানসিদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে কর্মের কারণ কামনা, কামনার কারণ মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং বতদিন মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত না হইতেছে, ততদিন জীব কামনা বশত কর্ম করিতে বাধ্য, আর কর্ম করিলে জন্মও অবশ্যজ্ঞাত। এই মিথ্যাজ্ঞান আবার স্বার্থজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। সর্বত্রই ইহা আমরা দেখিতে পাই যে, যে বিষয়ের স্বার্থজ্ঞান হয় সেই বিষয়ের মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। যেমন দড়ির স্বার্থজ্ঞান হইলে দড়ির মিথ্যাজ্ঞান রূপ যে সাপের জ্ঞান তাহা চলিয়া যায়। প্রকৃত স্থলে আত্মার মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ কামনা ও কর্ম। সুতরাং আত্মাবিবয়ক স্বার্থজ্ঞানের দ্বারা ইহা আত্মাবিবয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; অজ্ঞ কোন কারণের দ্বারা আত্মার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না—ইহা যুক্তিসিদ্ধ।

মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহার কার্য কামনাও চলিয়া বাইবে, আর কামনা নিবৃত্ত হইলে কর্মও সম্ভব হইবে না। কর্ম না হইলে আর জন্মও সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মার স্বার্থজ্ঞান বতদিন না হয় ততদিন জন্ম অবশ্যজ্ঞাত। এই বর্তমান জন্মই সকলের শেষ জন্ম নয়। কারণ সকলের আত্মাবিবয়ক স্বার্থজ্ঞান নাই, বহুলোক আত্মার বরূপের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করে না, জ্ঞান ত দূরের কথা। আর পশু প্রভৃতির ত আরও দূরের কথা। অতএব আত্ম-সাক্ষাৎকারবান ব্যক্তি ভিন্ন সমস্ত জীবেরই ভবিষ্যৎ জন্ম সিদ্ধ হওয়ার, আর পূর্ব পূর্ব জন্মও অর্থাৎপ্রতি প্রমাণসিদ্ধ হওয়ার জন্মান্তরবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাহার ফলে মানুষের ধর্মের উপযোগিতাও সিদ্ধ হইল। বর্তমান জন্মে ধর্মের অহুষ্ঠান করিলে পরজন্মে দুখ হইবে। অধর্মের ফলে দুঃখ হইবে। জন্মান্তর না থাকিলে এই জন্ম যদি শেষ জন্ম হয় তাহা হইলে ধর্মের কোন উপযোগিতা থাকে না। যে ধর্ম অহুষ্ঠান করিল সে ত আর থাকবে না, ফলভোগ করিবে কে? আবার বিনা শরীরে দুঃখ-দুঃখ ভোগও হয় না। অতএব বর্তমান ধর্মের ফলে ভবিষ্যৎ শরীর অবজ্ঞাই স্বীকার্য।

সমাপ্ত

“সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কামনামোহাব্যাক্ষে যদি এক হয়, এককল্পে লোক পৃথিবী উল্টে নিতে পারে—এই বিখ্যাসিদ্ধি ফুলো না। বাধা বস্তুই হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলো কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস বত নূতন হবে, বত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্বসঙ্গ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অসমিতি।”

—বামা বিবেকানন্দ।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

জোঁড়াবাগানের রিপোর্ট-ক্রমে পুলিশের উপনগরপাল (ডেপুটি পুলিশ কমিশনার) প্রত্যাহ ঠিক দশটার সময় উপস্থিত হয়ে তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন থানাদারদের নিকট হতে তাঁদের য য এলাকার বাবতীর সংবাদ শ্রবণ করে তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় তহুমনায়া জারী করে থাকেন। এই দিনও তিনি ঠিক এই সময় তাঁর জন্ত নির্দিষ্ট ঘরখানিতে এসে 'রাজকীয় জাউন লাফিত' বর্ণায়মান রকিড চেয়ারটিতে উপবেশন করেছেন। তাঁর সমুখের প্রান্ত টেবিলখানার ডান পার্শ্বে রকিড একটি চেয়ারে বসে শহরের সহ-নগরপাল (এসিস্টেন্ট কমিশনার) বিভিন্ন থানার অফসারদের দ্বারা সমাধিত বিবিধ মাফলা সমূহের তদন্ত সবুজ তাক ওয়াফিহাল করে দিচ্ছিলেন। এক একটি থানা তাদের আসল নাম সহ ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি আকবিক নামেও পূরিত। তাই বথাক্রমে ক থানার পর খ থানা খ থানার পর গ থানার অফসারদের ভিতরে বাহার জন্ত ডাক পড়ছিল। সেই ডাক অমুখারী এক এক জন অফসার কাগজপত্র পেপ করার পর ঐ রিপোর্ট-ক্রম হতে বেরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন অফসার তাঁর ভাইবীপজ সহ সেই ঘরটির মধ্যে ঢুক পড়েছিলেন।

এই বিস্তীর্ণ রিপোর্ট-ক্রমের একাংশ একটি কার্টের পাটিশনের দ্বারা পৃথককৃত করে অপর একটি অপবিসর কক্ষের দৃষ্টি করা হয়েছিল। এই ঘরখানির ভিতর রকিড একটি লম্বা টেবিলের দুই পার্শ্বে চেয়ার ক'খানি অধিকার করে বিভিন্ন থানার অফসাররা তাঁদের ডাক আসা পর্যন্ত কাগজপত্র ও মারকসিনি সহ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের কেউ কেউ কার্টের পাটিশনের মধ্যকার কয়েকটি ছিন্নপত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ঐ রিপোর্ট-ক্রমের ভিতরকার আবহাওয়া সবুজ পূর্বোক্ত অবস্থিত হওয়ায় চোঁটা করছিলেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্ব হতেই এই সকল ছিন্ন তাঁরা তৈয়ারী করে রেখেছিলেন। সহসা ছিন্নশব্দ হতে হুখ সরিরে সহকর্মীদের উদ্বেগ করে এঁদের একজন নিয়মের বলে উঠলেন, 'উহ! স্মরণে ধনে হচ্ছে না।' ডেপুটি পক্ষেবের চম্বা কপালে উঠে গিয়েছে। ওরিকে বক্সহাের (এসিস্টেন্ট কমিশনার) তাক লাফ না করে তাঁর ক্রোধে ইত্বন বোণাচ্ছেন। আরও একটা ক্যান্সেলের বোদ হয় হলো। বলে আর কি—

উপনগরপালের চম্বা চোখের উপর হতে কপালে উঠলে বুঝতে হবে যে সেই দিন কারণ বা অকারণে নিশ্চয়ই ভিত্তি কাউকে না কাউকে সাহসিকি ভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করেন। কমপক্ষে জরীমানা প্রভৃতি বিভাগীয় শাস্তি দ্বারা এঁদের কাউকে না কাউকে তাঁর হাতে নাজহাল হতেই হবে। এই সকল বিষয়ে আইনসম্মত ক্ষমতা তাঁর অসীম। নির্দয় নিয়মতান্ত্রিকতার নামে এই ক্ষমতা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের এই ক্ষমতা অজ্ঞার ভাবে প্রযুক্ত হলেও কারুর কিছু বলবার বা করবার নেই। এমন কি, ডেমকসীর সুপেও পৃথিবীতে এই ক্ষমতা আয়লাতনের হাত হতে আজও পর্যন্ত কেউ কেউ নিতে পারে নি। নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও বিচারের নামে য য কর্তৃকপ্রেরণ করা আজও পর্যন্ত বৈষয়তান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা তাঁদের নিকট হতে কেড়ে নিলে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রই টেকে থাকতে পারে না। তাই বিধি দেশের গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ছাঁচে গড়ে উঠলেও তাকে তার অধীনস্থ উপনগরপাল কর্তব্যবাহিনীর হাতে অতীতের রাজকীয় ক্ষমতা দিতেই হবে। পূর্বকালীন রাজাদের দ্বারা এঁদের কেউ ভাল হলে রাষ্ট্র মঙ্গল অজ্ঞাচার উহার সর্বনাশ। রাজতন্ত্র উপরতলা হতে থিয়ার নিলেও নীচের তলার উহার ক্ষমতা আজও অপ্রতিহত। রাজবল ধনতন্ত্র সমাজ বা সাম্যতন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ রাষ্ট্রতন্ত্র আজও এঁদের হাতের কড়ক মাত্র। এর চেয়ে বোধ হয় রাজতন্ত্রই ভালো ছিল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রাজতন্ত্রই পৃথিবীর এক স্বাভাবিক ধর্ম অবদান। এই রাজতন্ত্র কখনও কোনও দেশ বা জাতিকে ধিরাবিজ্ঞত করেনি। বরং তাদের উহা একীভূত ও সম্মিলিত করে রেখেছিল। অন্য দিকে বিবিধ ইতিমের পাঞ্জায় গড়ে জাতির মধ্যে জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায় গড়ে দেশ ও জাতিতে টুকা করে দিচ্ছে। হুঁতন্ত্রধরপ একটা দুর্ব্বর্জ জাতি জাতি ও হুসন্ত কোথিহিন জাতির কথা বলা যেতে পারে।

এই সহকর্মী কর্তৃক প্রেরিত দুঃসংবাদটি কানে বাওয়া মাত্র উপস্থিত অফসারদের অনেকেই সম্ভ্রম হয়ে উঠে এসে একে একে ঐ ছিন্নপত্রে দৃষ্টি প্রসারিত করে ভিতরের ব্যাপার বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। এই সময় রিপোর্ট-ক্রমের ভিতর জনৈক দুনিয়ার অফসারের উপর তাঁর কাঁধের পাকলাতির জন্ত তর্জন-গর্জন চলছিল আর সেই অফসারটি পার্শ্বে তাঁর থানার ভারপ্রাপ্ত অফসার অমুখার অবস্থার কাঁড়িরে কাঁড়িরে সেই বকুনী-খকুনীর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলেন। তাই এঁদের মধ্যে ধারা উঠে এলেন না তাঁরা তাঁদের অন্তর্যাত্মকে তাঁদের কর্তৃত্বশীল মধ্যে অপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে রিপোর্ট-ক্রমের ভিতরকার উচ্চনা সমূহ কর্পণটিয়ে দ্বারা ধরে নেবার জন্ত উল্লুখ হয়ে উঠলেন।

এই সময় সহসা তাঁরা চমকতে পেলেন, ডেপুটি সাহেব বিচিটি হুচক করে 'খ' থানার সেকেন্ড অফসার হীরালাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তাহলে তুমিই এই মাফলাটির তদন্ত করেছিলে? জাহা! ঐ মথবের বাড়ীর সামনে একটা গ্যাসপোষ্ট দেখেছিলে? উ, কি বললে, দেখোনি। জাহা, ঐ বাড়ীর কাছাকাছি কোণ্ড ভাটবিন দেখেছো? তা'হলে তুমি তাও দেখোনি। তুমি একটি ওয়ার্পদেশ অফসার দেখনি। তুমি এই মাফলার এই এই সাক্ষীকে তা'হলে জিজ্ঞাসাবাদ করোনি, এ্যা? তুল পথে তুমি এতো দিন

চন্দ্র চালিয়ে এসেছে। আমি এখানে বসে বসেই যে সব খবর পাই, তুমি সরকারী তদন্ত করবে ও তা জানতে পারো না। মিছামিছি একটা নির্দোষী লোককে তুমি চালান দিতে চাও।’

এর পর তিনি একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রার তলা দিয়ে ঐ ধানার বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি বড়বাবু এর কাছ হতে তদন্তের ভার নিজে নিয়ে নিন। হ্যাঁ, ভালো করে এই সকল ছেলে-ছোকরাদের আপনারা কাজ দেখান না কেন? আমি চাই না যে আমার অফিসারদের বিরুদ্ধে কেউ কমপ্লেন করে। আচ্ছা, আপনারা এখন যেতে পারেন।’

সহ-নগরপালকে সাধারণ ভাবার বড় সাহেব বলে সম্বোধন করা হয়। এককালে তাঁরাও ক্ষমতার ছিল অপ্রতিরূধ্য। কিন্তু এক্ষণে আরও উজ্জ্বল অফিসার ডেপুটি সাহেবদের আওতার পড়ে তাঁদের ক্ষমতা কথঞ্চিৎ কমে গেলেও অগুস্তন অফিসারদের নিকট তাঁদের তায়তম্য উদ্ভিশ-বিশ মাত্র। নীচেওলাদের নিকট তাঁদের উজ্জয়েরই দমন বা দাঙ্খলিত্তি তখনও পর্য্যন্ত প্রায় সমান ছিল। অল্প সময় হলে তিনি ডেপুটি সাহেবের এইরূপ এক মন্তব্যকে সমর্থন করে অফিসারদের শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি ডেপুটি সাহেবের এই উপদেশবাহীটুকু চূপ করে বসে গলাধঃকরণ করলেন মাত্র। এর কথা হতে তিনি কি বুঝলেন তা বুঝা গেল না। তবে অলক্ষ্যে তাঁর টোঁটের কোণে

একটু মুহ হাসির রেখা ফুটে উঠে তা নিমিষে আবার মিলিয়ে গেলো। এর পর তিনি ডেপুটি সাহেবের দিকে না তাকিয়েই প্রথামত বলে উঠলেন—‘নেকষ্ট ম্যান। জলদী—’

রিপোর্ট-রুমের দরজার বাইরেই পথের ধানার অফিসার বুলুকাটা বাবু তাঁর ডাক পড়ার অপেক্ষায় পাড়িয়ে ছিলেন। ভয়লোক ঐ অফিস-ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য অগুস্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুতন ধান-অফিসারঘর ঘরিত গতিতে বেরিয়ে আসছিলেন। দরজার নিকট তাঁদের ব্যস্ততামুচক অস্বাভাবিক গতির জন্য তাঁদের দুইজনের মাথা দুইটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। কিন্তু এজন্য এদের কার্যকর অভিযোগ বা প্রতি-অভিযোগ করবারও সময় ছিল না। একবার মাত্র বুলুকাটা বাবুর চলার পথের দিকে তাকিয়ে অকৃতকিত করে ‘খ’ ধানার ‘বড়বাবু’ স্রবীর ঘোষ তাঁর সহকারী অফিসার হীরালাল বাবুর সঙ্গে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলেন। এর পর তাঁরা সেখানে উপবেশন করা মাত্র তাঁদের সহকারীদের একজন ব্যক্তির নিখাস ফেলে বলে উঠলেন, ‘আজকের মতন চাকরী তা’হলে আপনাদের রইলো। কিন্তু কি নিয়ে এতো চেঁচামেচি হচ্ছিল শুধানে?’

নির্দিকার চিত্তে হাতের কাগজপত্রগুলি ওড়িয়ে নিয়ে কয়েকটি মামলার আসামীদের নামে চালান লিখতে লিখতে ‘খ’ ধানার বড়বাবু স্রবীর ঘোষ উত্তর করলেন, ‘দু-উ-র, ওসব হুমকী আমরা

ও-আর-সি-এল এর

বুঘাৰেশ

নিজের ও দোস্তের পীড়ন

দি ওবিব্রেক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

বুঝি। সোজাসজি বললেই হয় যে, এই আসামীটিকে ছেড়ে দাও। তা না বলে ধমকে আমাদের কাছ হতে খুশীমত তিনি কাজ আদায় করবেন। কোনও এক দিক হতে এ সম্বন্ধে তাঁকে ধরাধরি হয়েছে আর কি? থাকগে, কর্তার ইচ্ছেই কর্তৃক হবে। এতে পাশ বা কিছু তা ওনারেই, আমাদের আর কি।’

‘খ’ থানার সেকেন্ড অফিসার ছিলেন এবজন নবীন যুবক অফিসার। স্বকীয় ধান-খারগা মত সন্ততার সহিত তিনি ঠিক পথেই তদন্ত করেছিলেন। এমন কি, এই মামলার আসামীর বিক্রেতা বখেরী সাক্ষ্যপ্রমাণও তিনি পেয়েছিলেন। এই জ্ঞাত তাঁকে আদালতে সোপান করবার জ্ঞান তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেছিলেন। ডেপুটি সাহেবের কাছে এই জ্ঞাত ত্যাগ খেলও তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এই বিষয়ে ডেপুটি সাহেবকে সন্নিহিত পক্ষের কেহ ভুল বুঝিয়ে থাকবে। তখনও পর্যন্ত এই তরুণ অফিসারের ধারণা ছিল যে, এঁরা ভুল করলেও অজ্ঞার করেন না। একশে তার বড়বাবুকে এইরূপ এক উক্তি করতে শুনে অবাক হয়ে সে বলে উঠলো, ‘সে কি ত্রার! কি বলছেন আপনি! তা’হলে সব জেনে-শুনেও আপনি এই রকম একটা অজ্ঞারের সঙ্গে আপোষ করবেন?’

‘আরে বামো হে হোঁকরা! ‘খ’ থানার বড়বাবু সুধীর যোঁষ রেহনুকে বরে উত্তর করলেন, ‘জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে তোমাকেও এইরূপ অজ্ঞারের সঙ্গে বায়ে বায়ে আপোষ করতে হবে। দেখলে না, আমাদের অতোষড়ো ছুর্দে বড়ো সাহেব পর্যন্ত চুপ করে গেলেন।’ সামান্য দারোগার পদ হতে শটন: শটন: উঠে তাঁকে বড়সাহেব হতে হয়েছে ব’লে এসব প্যাচ তাঁরও জানা আছে। এই ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? অপর দিকে ডেপুটি সাহেবকেও সব কথা না জেনে শোষ দেওয়া যায় না। এমনও হতে পারে যে, আরও ভবরদন্ত কোনও মহল থেকে অফিসারের নামে তার উপর এই ব্যাপারে জালপত্র এসেছে। এই সম্ভাব্য মহল স্বয়ং হারবার্ট সাহেব হতে পারেন।

টেবিলের এক কোণে একটি বেকির উপর ক্ষুর মনে বলে জোড়াপুকুর থানার খার্ড অফিসার চিরঞ্জীব বাবু এতক্ষণ নিবিষ্টমনে এঁদের এই সব কথাবার্তা শুনছিলেন। এইবার ‘খ’ থানার বড়বাবু সুধীর যোঁষের কথার সার দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ ত্রার! আমাদের বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু এবং আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার প্রণব বাবুও এই একই কথা বলেন। তাঁদের এই সব যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বায়ে বায়ে আমি প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ঐ-সব কথার আমার মন সার দিতে চায় না।’

‘না, তোমরা দু’জনেই দেখছি ছেলেরামুহ! এই সব তো কলোজ থেকে বের হয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে বৈ কি’, নির্বিকার চিত্তে সুধীর বাবু উত্তর করলেন, ‘কলোজ একজ্ঞ তোমাদের বা লার্ণ করছে! তা এখানে আনলার্ণ করতে হবে। বুঝে? থাক, ও-সব কথা। এখন বসো, তুমি এখানে এসেছো কেন?’

চিরঞ্জীব বাবুকে তার গাকলতির জ্ঞ ডেপুটি সাহেবের নিকট পেশ করবার জ্ঞ বড় সাহেব তাঁর থানার বড়বাবুর উপর স্যারপ করেছিলেন। চিরঞ্জীব বাবু তাঁদের হুকুম অস্বাধী ঠিক সময় বড়ই রিপোর্ট-কমে এসে দিয়েছে, কিন্তু যে তাকে ঐ সাহেবদের কাছে

পেশ করবে, সেই বড়বাবুরই তখনও পর্যন্ত দেখা নেই। কাল রাতে তিনি কোন নিমুগ্ধ পাটিতে নিমুগ্ধ রক্ষা করতে গিয়েছেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি থানার বা রিপোর্ট-কমে এসে উপস্থিত হতে পারেন নি। এই জ্ঞ বেশ একটু চিন্তিত মনেই চিরঞ্জীব বাবু প্রত্যুত্তরে ‘খ’ থানার বড়বাবুকে বললেন, ‘আমাকে আর রিপোর্টে বড়সাহেব পুটিআপ করবার জ্ঞ বসেছিলেন। কিন্তু যিনি আমাকে ওখানে পুটিআপ করবেন, সেই বড়বাবু তো এখনও এলেন না! ওদিকে আমাদের সেকেন্ড অফিসার প্রণব বাবু কটকে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছেন। আজ সম্ভার আগে তিনিও ফিরতে পারবেন না। থানার এখোন আমি একাই আছি। এদিকে তো আমাদের থানার ডাক পড়লো বলে। এখোন কি করা যায় যখন তো ত্রার!

চিরঞ্জীব বাবুর আশংকা অমূলক ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিপোর্ট-কমে হতে বড় সাহেব ডেকে উঠলেন, ‘কেই মান। ও থান—আ।’ বড়বাবুর হাঁক-ডাক অস্বরণ করে দম্ভার সিপাহীটিও চেঁচিয়ে উঠলো। তদুত্তরে ‘ও’ থানাকে ডাক হয়। ‘ও’ থানার বড়বাবু গরহালির থাকার আর দেবী না করে ‘চ’ থানার বড়বাবু কাগজপত্রসহ রিপোর্ট-কমে ঢুকে পড়ামাত্র হস্তান্তর হয়ে জোড়াপুকুর থানার বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। চোখ দুটি তাঁর তখনও পর্যন্ত লাল টকটক করছে। রাজি কাগজপত্র স্ফাজিত তখনও পর্যন্ত তাঁর সাঁরা অঙ্গে লেগে আছে। আর দেবী না করে তিনিও কাগজপত্রসহ রিপোর্ট-কমে ঢুকে পড়লেন।

‘ইউ আর লেট’ ভাষণভাবে বেকির উঠে ডেপুটি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এতোকণ কোথায় ছিলেন? কোনও কাগজপত্র আপনার আজ আমি দেখবো না। দূর করে কেলে দেবো ওগুলো। আমি আপনাকে সাপেণ্ড করবো।’

‘হা তাই করবেন ত্রার!’ বিনীত ভাবে মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, ‘আপনার দেওয়া শ্রাঘ্য শান্তি আমি মাথা পেতেই নেবো। কিন্তু এখোন এই সব আসামী ও কাগজপত্রের হোঁ একটা সুরাহা করতে হবে।’

নিম্নে এসে ওগুলো এদিকে, অধিকতর বিরক্তির সহিত মহীন্দ্র বাবু প্রেরণ কাগজগুলির উপর হুকুমনামা জারী করতে করতে ডেপুটি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় তুমি এতোকণ ছিলে, এতো দেবীতে এখানে আসা হলো কেন?’

‘হ্যাঁ, ত্রার, সেই কথাই আপনাকে এখানে বলবো’, নিমিত্ত ভাবে মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, ‘ত্রার, আপনি জানেন যে কামেলী এখানে রেখে আমার সেকেন্ড অফিসার কটকে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছে। এখোন হঠাৎ আজ সকালে তাঁর স্ত্রী সন্তান-সম্ভাবনা হয়ে উঠলেন, তাঁর বাড়ীতে অজ্ঞ কোনও পুরুষ লোক নেই। তাই আমাকেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হলো। আর একটু দেবী হলে ভ্রমমহিলাকে তাঁর সন্তানসহ বাঁচানো সম্ভব হতো না।’

এর পর আর কাকর কোনও কথা বলা চলে না। বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে ডেপুটি সাহেব বলে উঠলেন, ‘তা এতোকণ তা বলায় কেন?’ বিজ্ঞপ্তি মাথা উঁচু করে বড়বাবু উত্তর দিলেন, ‘আপনি তো তা জিজ্ঞাসা করেন নি আমাকে।’ ডেপুটি সাহেবকে বেশ একটু অপ্রতিভ করে দিয়ে মহীন্দ্র বাবু যেমন বেগে রিপোর্ট-কমে

প্রবেশ করেছিলেন, আগোছাল কাগজপত্রগুলি ভাঙিয়ে নিয়ে তিনি তেমনি বেগেই সেই ঘর হতে বার হয়ে এলেন। নিয়ম মত বিদায়ের পূর্বে পুলিশী প্রধায়ক গোড়ালির সহিত গোড়ালি ঠুকে আওয়াজ তুলে সেলামটুকু করবার সময় ব্যতীত আর একটু সময়ও তিনি সেখানে অতিবাহিত করার প্রয়োজন মনে করলেন না। কিন্তু প্রতিগতিতে পাশের ঘরে ফিরে এসে সেখানে চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর অপেক্ষার উপবিষ্ট দেখে তিনি একটু খতমত খেয়ে গেলেন। অমুঠ স্বরে তাঁর মুখ হতে বার হয়ে এলো, তাইতো! চিরঞ্জীব বাবুকে তো আজ পুট-আপ করা হলো না! কিন্তু ততক্ষণে রিপোর্টের কাজ-কর্ম শেষে ডেপুটি সাহেব জঙ্গ কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেখানে একাকী বসে আছেন বড় সাহেব রমেশ রাই। বড় রিপোর্টের পর তিনি সেখানে এইবার ছোট রিপোর্ট বসাবেন। এই ছোট রিপোর্টটি তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা সেখানেই জঙ্গ সম্প্রতি সৃষ্টি করা হয়েছে। তা ছাড়া তিনি এই জোড়াবাগানের প্রাসাদোপম বাটার দ্বিতলে সপরিবারে বাস করেন। একটু দেরী করে উপরে উঠলেও তাঁর ক্ষতি নেই। অগত্যা বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু চিরঞ্জীব বাবুকে বড় সাহেবের এই ছোট রিপোর্টই পেশ করে দিলেন। ‘কেন একে বড় রিপোর্টে পেশ করা হয়নি,’ চিরঞ্জীব বাবুকে সেখানে দেখা মাত্র বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু চীৎকার করে বলে উঠলেন ‘আমি জানতে চাই কচুয়ীসলিতে জুরা বন্ধ হবে কি না? জানো, আমি জোড়াবাগানে একটা সিংহ বসে আছি। এখানে হতে ছাড়া দেখো আর আমার অবনিহু ছুটা খানা কেঁপে উঠবে ঝর-ঝর-ধব, ঢালাকী পেয়েছো তোমরা?’

‘ধাক্কা শ্রার। এবারের মত ওকে আপনি মাপ করে দিন, অজুরোঘের ঘরে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বড় সাহেবকে বললেন, কচুয়ী গলির ভার আমি নিজে নিলাম। আমি কথা মিছি জুরা ওখানে বন্ধ হবে।’ দেখুন এখানে আমি শাসন করত এসেছি। কাউকে মাপ করবার জ্ঞতে এখানে আমি আসিনি’, পুনরায় চীৎকার করে উঠে বড় সাহেব বললেন, ‘পলে কিন্তু আমি কাউকেই ছাড়বো না, তা সে বন্ধো বড়ো লোকই হোন না কেন’। কিন্তু বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু অজুরোঘে পরিশেষে বড় সাহেবকে চিরঞ্জীব বাবুকে মাপ করে দিতে হলো। মহীন্দ্র বাবু এই সে দিনও ছিলেন বড় সাহেবেরই এক সমপর্যায়ের সহকর্মী। ভাগ্যগুণে বড় সাহেব রমেশ বাবু আগে প্রমোদন পেয়ে বড় সাহেব হয়ে বসেছেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের দোষ-গুণ ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন, তাই বড়সাহেবের পক্ষে চিরঞ্জীব বাবুকে বা বলা বায় তা বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুকে বলা বায় না। আসলে মহীন্দ্র বাবুর সহিত কচুয়ীসলির সম্বন্ধ বড়সাহেবের অজানা ছিল না। আপাততঃ তিনি যিকি যেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীটা বেছে নেওয়া সমীচীন মনে করেছিলেন। এইজন্য বড়বাবুর শেষ কথাটি শুনে আশ্চর্য হয়ে তিনি চিরঞ্জীব বাবুর সহিত বড়বাবুকেও কমা করে উঠ গেলেন। শাসনকার্যের বিবিধ প্যাচের মধ্যে ইহাও যে একটি প্যাচ মাত্র ছিল তা কিন্তু নবীন অফিসার চিরঞ্জীব বাবুর মনের অগোচরেই রয়ে গেল।

বতকণ বড়সাহেব রিপোর্ট-করে উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণ চিরঞ্জীব বাবু সেখানে শান্ত হয়েই পাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বড়সাহেব

হান পরিচয়্যাপ করা মাত্র তাঁর চোখ দুটো হতে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। ক্ষোভে ও অশ্রুমানের তাঁর কণ্ঠ ক্রম হয়ে এসেছে। তাঁর এই অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে পার্শ্ববর্তী ‘ব’ থানার নবীন অফিসার হীরালাল বাবু তাঁর কাছে এসে পাড়ালো। কিন্তু বন্ধুকে সাহায্য দেবার কোনও ভাবাই তাঁর মুখে এলো না। অবস্থা বুঝে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু এগিয়ে এসে চিরঞ্জীব বাবুর গিঠের উপর বীয়ে বীয়ে হাত বুলাতে বুলাতে সাহায্যের ঘরে বলে উঠলেন, ‘আরে এতে আপসোব করার কি আছে। এসো, আমরাও থানার ফিরে নীচেওরালা অফিসারদের আর নন্দজন পাবলিককে বিশটা গাল পেড়ে দেবো আখুন। এতে আমাদের মনের শান্তি ফিরে আসবে এবং সেই সঙ্গে রাড্ডে ভালো ঘুমও হবে। দশটা গাল পেয়েছি বিশটা গাল দেবো। এতে আমাদের বরং দশটা লাভ থেকে যাবে। এসো, মন ধায়াপ না করে চলে এসো।’

চকুলজ্ঞা ও আত্মসম্মানের অভাব নৈতিক অসাড়তার অন্তর্যময় কারণ। এই দুইটির অভাব ঘটলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে তখন পশুরও অধম হয়ে উঠে। বার নিজের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই সে পনের আত্মসম্মানের মর্যাদা কখনও দিতে পারে না। নির্দোষ জনসাধারণকে খুঁটুট গাল দেওয়া অপরাধেরই সাধিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবিরোধকে উদ্ভূতন অফিসাররাও এই অপরাধের জন্ত দায়ী কিনা তা বিবেচ্য। কারণ, অশ্রুজন অফিসারদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধের অভাব ঘটলে তাঁরা তাঁদের জনসাধারণের বন্ধু না করে শত্রুই করে তুলে থাকেন। কিন্তু এই সকল কথা এই সকল ক্ষমতার আসীন ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বা দেবে কে? সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করার জন্ত তাদের এই সব তত্ত্বকথা কারুর পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভবও ছিল না। অগত্যা অফিসাররা সকলে দ্বান হাসি হেসে একে একে রিপোর্ট-কর্ম পরিচয়্যাপ করে যে বার থানার ফিরে আসতে শুরু করে দিলেন। এখন তাদের একদম চিন্তা ছিল থানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার। বিশ্রামের লালসার তাঁদের সারা অঙ্গ ভরপুর হয়ে উঠেছে। অমুঠ যদি অন্ত কোনও মামলার সংবাদ তাঁদের এই কষ্টাঙ্কিত বিশ্রামটুকুর ব্যাঘাত না ঘটায় তবেই। আজকের মত যেন তাঁদের সকলেরই ঢাকসী রইলো। অক্ষত পরীরে তাঁরা যে বার বাসার ফিরে যেতে পারছেন। তাই তাঁদের পা যেন আর চলে না। [ক্রমশঃ]

ডাঃ বঙ্গুর
অশোক কার্ডিয়াল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে
সুখম প্রপ্লেডাকারক
ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিমি
কলিকাতা-৯



ভবানী মুখোপাধ্যায়

সাতাশ

ক্রাক হাফিস বলেছেন, বার্ণার্ড শ' Back to Methuselah

নাট্য-চক্র একেবারে অভ্যস্তের প্রেরণায় লিখেছেন। তাঁর The Philanderer নাটক জ্যাক গ্রীনের ভাগিদে রচিত, সে মঞ্চ করতে পারেনি। মিসেস সিডনী ওয়েব 'কিলমিডারার' নাটকের উৎকট-বৌদ্ধিক শীড়িত নারীতে বিরক্তি প্রকাশ করে বার্ণার্ড শ'কে বলেন আধুনিক যুগের অ-রোমাণ্টিক কঠোর প্রমী বাস্তব রমণীর ছবি আঁকুন, তাঁর আগ্রহে শ' লিখলেন Mrs. Warren's Profession, সেনসর তার কঠোরোপ করল। পুরাতন এ্যাভিছু বিয়েটারের দরজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তাই মিসেস হার্বিয়ান ও ক্রোয়েল ফারকে বাটানোর জন্ত লেখা হল Arms and the Man, জ্যানিট আচার্জ-এর জন্ত লেখা হল Candida। এলেন টেটীও হিচার্ড ম্যানসকীলডের জন্ত লিখিত হয়েছিল The Man of Destiny এঁরা কেউ শেষ পর্যন্ত এই নাটকে অভিনয় করেন নি। সিডনী ওয়েব নামকরণ করেছিলেন You Never Can Tell নাটকের, সিডলি ম্যাডের জন্ত এই নাটক লিখিত হয়, কিন্তু কুমিকা বটনের দোষে, বিহাসেদের পর এই নাটক তখন অভিনীত হয়নি। টেটীস ও ম্যানসকীলডের জন্ত The Devils Disciple লিখিত হয় এবং আমেরিকার এই নাটক বিরাট সাফল্য লাভ করে। কনবেস-ব্যাটসনের জন্ত Caesar and Cleopatra লিখিত হয়, হামলেট অভিনয়ের পর এই নাটক তাঁর খ্যাতিবৃদ্ধি করে। প্রথম পৌণ্ড্রেব জয়ের পর এলেন টেটী বার্ণার্ড শ'কে বলেন যে পিতারহীর জন্ত কে আর নাটক লিখবে, এই কথার বার্ণার্ড শ Captain Brassbound's Conversion নাটক রচনা করেন। Pygmalion নাটক রচিত হয় মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের জন্ত। ভেভার্নে-গ্রানজিল বার্কায়ের জন্ত John Bulls Other Island ও Androcles and the Lion লেখা হয়। Apple Cart লিখিত হয় তার ব্যারী জাকসনের জন্ত। সুতরাং এই সব নাটকের একটিকে বার্ণার্ড শ' কইছার কোনেন মি।

লিখেছিলেন অল্পকাল হবে, আরোজনেরই থাকিবে। ঠিকি হাফি প্রঙ্গ করেছেন যে ভাগিদে তাঁ পড়লে কোনো দিন বার্ণার্ড এই সব নাটক লিখতেন কি না সম্ভব। Man and Superman, Heart break House, এবং Back to Methuselah এই তিনখানি নাটক বার্ণার্ড শ' অভ্যস্ত ভাগিদে রচনা করেছিলেন। অবশ্য বার্ণার্ড শ'র সব নাটক সাফল্য অর্জন করেছে, এখনও সেগুলি মঞ্চস্থ হলে মঞ্চের সপ্রশং অভিনয় লাভ করে, কত দিন করবে সে কথা শুধু মহাকাব্য বলতে পারেন।

Man and Superman নাটকে বার্ণার্ড শ' creativeness evolution বা স্বকীয়মূলক বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত করেছেন, তা Back to Methuselah নাটকও এই স্বকীয়মূলক বিবর্তনের আর এক অভিব্যক্তি।

১১২০ খৃষ্টাব্দে ডিসিনী মৃত্যুর পর বার্ণার্ড শ' জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্গ Back to Methuselah নাটক রচনা শেষ হয়, বার্ণার্ড শ' এই নাটক Metabiological pentateuch অর্থাৎ জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্গ নাটক। এমন এক বিচিত্র বিবরণ নিয়ে নাটকের পরিচয়না করা হয় কঠিন, লেখ আরো শক্ত সম্ভব নেই। সুতরাং বার্ণার্ড শ'র নিজের মতে এ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, সে কথা অপরে অবশ্য স্বীকার করতে নারায় এই নাটক অভিনয় করতে তিনটি রজনীর প্রয়োজন। এমন এক নাটকের প্রয়োজন্য করতে প্রচুর অর্থ, প্রচণ্ড সাহস এবং অপরিণীত উৎসাহের প্রয়োজন।

Heart break House নাটকের অভিনয় দেখে বখন অতিশয় প্রভুহুত্বিত বার্ণার্ড শ' কিংছেন তখন তার ব্যারী জাকসন টেনে অপেক্ষারত বার্ণার্ড শ'কে অনুমোদন করলেন এই নাটকভিনয়ে অনুমতির জন্য। বার্ণার্ড শ' সেদিন বলেছিলেন—তোমা পরিবারবর্গের অন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে ত ?

তার ব্যারী জাকসন তাঁকে আশ্বস্ত করায়—বার্ণার্ড শ' বললেন ভগবন্ত। কাজ শুরু হল, বিহাসেলে হাফির থাকতেন বার্ণার্ড শ'। শারীরিক স্পেন উপেক্ষা করেও তিনি বখাসময়ে হাজি হতেন। আর হ'মাস লাগল এই নাটকের মূল্য শেষ করতে। ড্রেস বিহাসেদের সমস্ত অল্পটানে হাফির থাকতেন বার্ণার্ড শ'। ১১২০-এর ১ই থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত তিন দিন নাটক অভিনয় হল, শেষ বদলিকাপতনের পর অল্পও ভক্ততা বিরাগ করতে লাগল, তারপর কতগুলি এবং প্রাণসোষনিত রক্তময় স্থবিরত হয়ে উঠল। 'The Times' পত্রিকার সমালোচক 'মঃ শ' বখন এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে বে ভাবে অভিনয়িত করা হল তা সাধারণ গ্যালাতীর অভিনয়ন নয়—চাপা আবেগে মনোবৃত্তি, আকর্ষক এবং অনিচ্ছাকৃত উচ্ছ্বাস। কোনো রক্তময় এমনটি আর দেখা যায়নি। বার্ণার্ড শ' সাধারণতঃ এই জাতী উচ্ছ্বাসে সাড়া দেন না, এই দিন তিনি একই বক্তৃতাও দিলেন বললেন—লেখক হিসাবে আমার স্থান কোথায় তা জানি, লেখক স্থান রক্তময় নয়। রক্তময় শিল্পীদের আসন, তাঁরা লেখককে হঠিকে প্রাণপান করেন, রক্তপান করেন, এঁরাই লেখকের স্রষ্টা প্রাণ-প্রাণিতা করেন। আর আমার নাটকের অভিনয় দেখান



লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান

করলে পাবেন জেই

পরিস্কার ও ব্যাবারে আমেজ।

তারা একে সজীবিত করার আগে তারা ছিল, কিন্তু শিল্পীরা তাদের প্রাণ নিলেন। একটি প্রাণ করার আছে, আবার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া বার্মিংহামের অধিবাসী কেউ কি দর্শকদের মধ্যে আছেন? এ আবার জীবনের এক অপূর্ণ অভিজ্ঞতা। আমি গত চারদিনে পাঁচটি অপূর্ণ অভিনয় দেখছি, আশ্চর্য্য কাণ্ড বার্মিংহামেই ঘটা। আমি জানি, এই ধরনের নাট্য অভিনয়ের পক্ষে পৃথিবীর এক অসম্ভব অল্প হিসাবেই বার্মিংহামকে জানি। তাই প্রশ্ন করি আপনারা কি এখানে আগন্তুক, না তীর্থযাত্রী, না এর ভিতর হু-একজন বার্মিংহামবাসী আছেন? আশ্চর্য্য, নাট্যকার ও লেখক হিসাবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বার্মিংহামে ঘটলো ... দর্শকজনের সহযোগিতা ভিন্ন এই বিশ্বরত্ন ঘটনা সম্ভব ছিল না।"

হ্যা ইয়র্কের গার্লিক থিয়েটারে Back to Methuselah প্রথম অভিনীত হয় ১৯২২-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী। সপ্তাহব্যাপী অভিনয়, কিন্তু আমেরিকান দর্শকের কোথল অপরিসীম হলেও এক সপ্তাহ ধরে রাতের পর রাত অভিনয় দেখার অপরিমিত বৈধতা তাঁদের নেই। এই নাটক জন্মলো না-অসকল অভিনয়ের জন্য থিয়েটার গিল্ডের প্রতিষ্ঠানকে প্রায় বিশ হাজার ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হল। এই দুঃসংবাদে বার্লি শ' বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্ষমতা কতি হর, এ তাঁর কাছে দুঃখের। থিয়েটার গিল্ডের অন্ততম কর্তৃত্ব লয়েল লানার তাঁকে বোঝালেন, 'ন' সপ্তাহের অভিনয়ে বিশ হাজার ডলার ক্ষতির অর্থ বিচার করে দেখলে সার্থক হয়েছে, গার্লিক থিয়েটার আদতনে ছোট, যদি এর বিশপ আকারের কোনো প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যেত তাহলে ক্ষতির চাইতে লাভই হত। সুতরাং এই লোকসানকে ক্ষতি হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া এই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম আবার তৈরি করেছি তা আবার ব্যবহার করা যাবে, থিয়েটার গিল্ড-এর ক্ষতি চিহ্নিত নয়।

বিশ হাজার ডলার লোকসান দিয়ে কোনো সম্প্রদায়ই নাট্যকারকে এইভাবে আখ্যায় জানিয়ে পত্র দেয় না। তাই আমেরিকান ম্যানেজার লী বুবার বার্লি শ'কে বখান অল্পবোগ করে লিখেছিলেন, আপনার দাবী কিঞ্চিৎ বেশী। তখন বার্লি শ' জবাব দিয়েছিলেন—আমার নামের নামই দশ হাজার ডলার। থিয়েটার গিল্ডের গ্রিন হাজার ডলার ক্ষতি হওয়ার কথা, সেই কারণে তাঁদের মাত্র বিশ হাজার ডলার ক্ষতি হয়েছে, তাহলে লাভ হল দশ হাজার ডলার। শুধু আমার নামের ওপ।

বার্লি শ' দ্ব্যন্ত নাট্যকারীর মত Back to Methuselah ঘটনাকালে অনেক বার পরিবর্তিত হয়েছে। ২৫শে জুলাই ১৯১৮ তারিখে তিনি লিখেছেন—আমি একটি নাটক লিখেছি বার দুটি অঙ্কের যথাবর্তী বিরতিকাল হাজার বছর; এখন কিন্তু মনে করছি প্রতিটি অঙ্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকে রূপান্তরিত করব।

Back to Methuselah নাটক সম্পর্কে লয়েল লানার বার্লি শ'র কাছে থেকে এমন অনেক সুবিধা লাভ করলেন যা আর কেউ পায় নি। এই বিষয়ে অবশ্য নৈপথ্য থেকে সাহায্য করেছিলেন, শ'-পৃথিবী সালোটে। সালোটে'র দ্ব্যন্তায়তের

একটা বিশেষ দ্ব্যন্ত বার্লি শ' চিরদিনই দিয়েছেন। Back to Methuselah এক সঙ্গে পাঁচটি নাটকের মাসা, যেন পাঁচনবী হার। লানার এটিকে ছোট করতে চাইলেন, The Tragedy of Elderly Gentleman অংশটি তিনি বার দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়ে বললেন—এটা অতি বিলম্বিত অংশ, প্রোডারের কাছে এটা বিশেষ ভার মনে হয়।

অতি কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে এই কাটছাঁটের প্রস্তাব নিবেদন করলেন লানার। বার্লি শ' এই জাতীয় প্রস্তাব শুনে চিরদিনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। সেট জন আর্ডিন বলেছেন, তিনি ল্যানারকে উপদেশ দিলেন, তুমি নিশ্চয়কে কেটে বাদ দিয়ে অভিনয় করো।

উত্তরে লানার বললেন—হ্যা ইয়র্কে বার্লি শ'র জটিল ভক্ত মনসা। আছেন, তিনি প্রতি রজনীতে এক খণ্ড নাটক হাতে নিয়ে উপস্থিত থাকেন, কোনো অভিনেতা ডুল করে এক লাইন বার দিলেও তিনি বার্লি শ'কে তা লিখে পাঠান।

বার্লি শ' লানারের প্রস্তাব শুনে এই বিষয়ে তাঁর যে নিষ্পত্তি আছে তা বলতে শুরু করলেন—

সালোটে 'বলেন—তোমার Elderly Gentleman কি বলতে চান তা হয়ত মার্কিন প্রোডার শুনেও রাজী নন। জন নন্স সম্পর্কে একটা সুদীর্ঘ অংশ আছে, ইংল্যান্ড প্রোডারও হয় তাঁর বিষয় কিছুই জানেন না—

লানার এই কথা সমর্থন করলেন। তখন বার্লি শ' এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং লানারের আশাতীত অংশ বাদ দিতে রাজী হলেন। লানার বলেন, সবটা বাদ দিলেই নাটকটি আরো সুসংবদ্ধ হত।

আটদশ শতাব্দীতে ডারউইন লিখেছিলেন—The thinking few in all ages have complained of the brevity of life, lamenting that mankind are not allowed time sufficient to cultivate Science, or to improve their intellect—আর দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় হিসাবে বিধান দিয়েছিলেন সপ্তাহে দুবার গরম জলে স্নান। বার্লি শ'রও ধারণা মাছের জীবন অভিনয় কণ্ঠস্বর। তবে দীর্ঘ জীবন লাভ করলে মাছের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হবে তা নয়, তাঁর ধারণা বেশী দিন যদি বাচে তাহলে অন্ততঃ তাঁদের নিজের অবস্থার উন্নয়নে কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হয়, জীবনের স্থায়িত্ব কম বলেই মাছের এই চিন্তা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। জীবনের অভিজ্ঞতার উপর মাছের আবেশ নির্ভরশীল নয়, তার স্থায়িত্বের প্রত্যাশার তার সমগ্র কর্মচ্যুতি নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘ দিন ধরে বার্লি শ' কোনো জ্ঞাপকর্তার (Prophet) বিষয় নিয়ে নাটক লেখার চিন্তা করছিলেন। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খাইয়ে এমন এক সাংগামী সন্তানপুত্রের চরিত্র চিত্রণ করবেন যা অবিস্মরণীয় হবে। বার্লি শ'র মানসিকতার দিক থেকে এই দিক থেকে আদর্শ চরিত্র হবেন ধর্মগুরু মহম্মদ। ফরবেস-সবার্টসনের ক্ষমতা এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। সেনসর স্কাউল পার্লামেন্টারী কমিটির কাছে এই প্রস্তাব নিবেদনও করেছিলেন। কিন্তু তুর্কী রাষ্ট্রপতির কাছে থেকে সম্ভাব্য প্রতিবাদের আশঙ্কার মহম্মদের জীবনকে

ট্রান্স দেওয়ার বাসনা তাঁকে ভাগ করতে হয়। কিন্তু প্রকটের রিকল্পনা তাঁর মাথা থেকে নামতো না, Back to Methuselah চরিত্রের Elderly Gentleman—এই প্রকট, a truly rise man, for he founded a religion without a church। The Adventures of the Black Girl—এই লেখক স্বয়ং উপস্থিত, আর Saint Joan-এ কসেন এই সম্বন্ধে ছিলেন। কিন্তু Prophet চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা ভিন্নরকম, পশ্চিমে বীজবিরত্ব নিয়ে নাটক লেখা চলে না, গীর্জাঘরে মহান-চরিত্র নিয়ে নাটক লিখলে শুধু ব্যতকের ছবি বৃকে পড়ে। তাই বার্গার্ড শ' Saint Joan নাটকে হাত দিয়েছিলেন।

সামার্ক এবং সায়েল বাটলারের কাছ থেকে একটি বিবাস বার্গার্ড শ'র মনে বহুদ্রব্য হয়েছিল, মানুষ যদি সৃষ্টিতে কোনো মর্যাদা মনে চিন্তা করে তাহলে তার সব বাসনা পূর্ণ হয়। সায়েল বাটলারের Life and Habit গ্রন্থে এই তত্ত্ব আছে। কিন্তু অন্তত তার সমস্ত মানবমানে একটা নিরাক্ষর স্রবণ প্রকট করে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান তাহলে পৃথিবীতে এত মনো, ভালো, দারিদ্র কেন? তিনি ত সব কিছুই দ্রব্য করতে পারেন। তিনি সর্বজ্ঞ, একধা যদি সত্য হয়, তাহলে এত পাপ, ন্যাচার, অন্তত, অভাব ও দারিদ্র-পরিপূর্ণ পৃথিবী কেন সৃষ্টি করেন? সাধারণ মানুষ যে প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, যে প্রশ্ন সমাধান নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বার্গার্ড শ' জীবন সেই প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে বেড়িয়েছেন।

বার্গার্ড শ' বলেছেন, অতীতে সভ্যতা বার বার ধ্বংস হয়েছে, তার বর্ণ প্রাচীন পৃথিবীর বাসিন্দারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করেনি, যা ঘনী তীরা সহজাত প্রবৃত্তি বলে কেবল প্রার্থনা জানিয়েছেন আমাদের আহা! দাঁও, পানীর দাঁও, কারণ কাল আমরা মারা যেতে পারি (Let us eat and drink; for to-morrow we die) আর তারা দরিদ্র তারা কেঁদেছে—হে ঈশ্বর! আর কত কাল ত দেবী? অথচ এর অকল্প উত্তর ঈশ্বর তাদেরই পহারিতা করেন যা নিজেই সাহায্য করে। এর অর্থ এই নয় যে মানুষ যদি সমাধান খুঁজে না পায় তাহলে আর কোনো সমাধান পাওয়া বাবে না। নর সৃষ্টি আশাজনক হয়নি বলেই উন্নততর সৃষ্টি নয়ের আবির্ভাব উদ্ভূত, নর যদি আদর্শ মাসিক নর নবোত্তম সৃষ্টিতে বাধা কি?

বার্গার্ড শ'র সমালোচকদের মতে তিনি এইভাবে তাঁর নিম্নলিখিত কল্প করেন, মৃতবানকে তিনি প্রাণান্ত দিয়েছেন শিল্পের দশে পরিণত। তিনি বার বার বলেছেন যে মানুষকে উন্নততর এবং জ্ঞানসম্পন্ন করার বাসনা যদি না থাকতো তাহলে তিনি কোনো দিন ক'লাইনও লিখতেন না। Back to Methuselah নাটকের ৭ খণ্ডে তিনি শিল্পকে আবার স্ব-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বার্গার্ড শ' আশ্রয়-সংস্কারক, তাই তিনি ক্রিয়েটিভ এডল্ফাসনের মতো ক্রীড়া করতে পারেন নি। সংস্কারক হাইট্রি আশাবাদী, যার এই আশাবাদের ভিত্তি—We fail, We die, it does not matter; he ends we strive for will be attained at last by those who come after us. The individual is of no account.

বারা শাভ এবং বিল্ড মর্শনের পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে ১৯১০ বৃষের প্রবন্ধই বখেট, বার্গার্ড শ'র আর কিছু পড়ায় প্রয়োজন নেই। Man and superman (১৯১৩) এবং Back to Methuselah (১৯১১) নাটকে বার্গার্ড শ' বা বলতে চেয়েছেন তার ভিত্তি অ-বৈজ্ঞানিক। এর কৈফিয়ত হিসাবে বার্গার্ড শ' অন্তর বলেছেন— a passion of which we can give no account whatever—তাই Man and superman-এ তিনি Life-Force সম্পর্কে বা বলতে চেয়েছেন অস্ত্র আকারে নতুন রূপে সেই কথা আরো বিস্তারিত করেছেন Back to Methuselah নাটকে। এই বার ভক্তিতে বৈতত্য, এখানে জীবন (Life) এবং পদার্থ (Matter) এই দুটি দিকই বাস্তবতার ভিত্তি মূল। জীবন বহন পদার্থে প্রবেশ করেছে তখনই এই মহাজাগতিক (cosmic) নাটকের সূত্রপাত, তারপর সে তরকারি, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি পরিচিত বস্তুর আকৃতি লাভ করে। প্রথমত: জীবন পদার্থের দাস, ইতিহাসগত তাই বলে। কিন্তু পরম মানুষ এই দাস-সুখল থেকে মুক্তির (নির্করণ) জন্য সচেষ্ট হয় এবং পদার্থ থেকে মুক্তির নামই মুক্ত্য। আবার সে জীবনের নির্মল স্রোতে ফিরে যায়।

সমালোচকদের মতে এই দুটি নাটকই দার্শনিক বহুদ্রব্য হিসাবে অসমর্থক। এই নাটকের মধ্যে বিপরীতবৃত্তি উদ্ভি এবং প্রচুর কীক আছে। চেষ্টারটন বলেছেন। এরই নাম বক্তাই আড়ম্বর। না জন্মে এর যাবে থাকলে ভালোই হত। বার্গার্ড শ' Back to Methuselah নাটকে যে কথা মনোহর ভক্তিতে বলতে চেয়েছেন তাঁর চেয়ে একজন তরুণতর লেখকের কাছে তাই এক অসহনীয় Brave New World হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। (চেষ্টারটন আলডাস হাকসলীর বিখ্যাত উপন্যাসটির কথাই উল্লেখ করেছেন)।

বার্গার্ড শ'র মতবাদ যে দীর্ঘ জীবনই পরম মানুষের পক্ষে অসম্ভব অসম্ভব, সে কথা কিন্তু সর্বদা সত্য নয়, কীটস দ্ব্যক্সি বহুর বৈচ্ছেদ্যলেন, তাঁর চেয়ে আরো আনন্দদিন এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন এমন কবির অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা যে পরমাশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন একথা জানা যায় না। যে মেথুসেলাহ কথা বার্গার্ড শ' বলেছেন তিনি নাকি ১৬১ বছর বৈচ্ছেদ্যলেন, কিন্তু এই দীর্ঘজীবী মানুষটি কি মহৎ কর্ম করেছিলেন কিংবা কি পরম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা কেউ বলে না। তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভিত্তি বাদ দিলে এই নাটকের কিছু থাকে না। তবু নাটক হিসাবে Back to Methuselah উপাদায়। প্রথম খণ্ডের আদম ও ইভের কাহিনী চমৎকার।

এই নাটকের প্রতি নাট্যকারের অসীম মমতার কথা আগেই বলেছি। তিনি আগে বলেছেন Man and Supermanই আমার প্রের্ত নাটক, কিন্তু পরে বলেছেন Back to Methuselah আমার সর্বপ্রের্ত কীতি। তিনি এই নাটক রচনার পর বলতেন আমার শক্তি নিঃশেষিত। অথচ তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ষাট বছর। এর পর ১৯২৩এ তিনি Saint Joan নাটক রচনার হাত দিলেন।

আটটাশ

প্রতিমা গড়ে পুজো করতে হলে একটা মন্দিরের প্রয়োজন, সেইখানেই দেবতা প্রতিষ্ঠা করে শাশ্বতী বাজিরে সমারোহ করা চলে। তার ব্যতী দ্ব্যক্সন, বামিংহাম হোপারটরী থিয়েটারের

অধ্যক্ষ স্থির করলেন ম্যালভারগেট এমন একটি কেন্দ্র স্থাপনা করা যাক, সেই কেন্দ্রে বার্ণার্ড শ'র নাটকভিত্তিক করা যাবে। Back to Methuselah নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় করে ইতিমধ্যেই তিনি বার্ণার্ড শ'র বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, সুতরাং সহজেই তাঁকে মিলি করা গেল, ম্যালভারগেট জায়গাটি বার্ণার্ড শ' পছন্দ করতেন, তাছাড়া তিনি ভাষ্যলেন এইখানে অতীতের বিশেষতঃ শৈশবের সঙ্গীত ও শিল্পের যে উদ্ভাস স্পর্শলাভ করেছিলেন, আবার তার স্পর্শলাভ করবেন। সেই আনন্দ বা স্বপ্ন লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন।

তখন বার্ণার্ড শ'র বচস বাতায়ের পার হয়ে তিয়ান্তরে পৌছেছে, তাই ম্যালভারগেট উৎসব প্রাণে একটি নতুন আনন্দ ও উৎসাহ দান করল, প্রতি বছরই একখানি করে নাটক লিখবেন, বাকী পঁচিশ বছরে পঁচিশ খানি—(শ'র বিশ্বাস ছিল তিনি শতাযু হবেন) আশা ছিল যে এখানে ধীরা আসবেন তাঁরা প্রাণে সমান আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভ করবেন। জীবনের প্রথম দিকের সমসাময়িক ঘটনার স্পর্শ লাভ করবেন। এত দিনে সারা ভগ্ন বার্ণার্ড শ'র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, ঘনিষ্ঠতার ফলে—তাদের আগ্রহ আরো বাড়বে হয়ত।

উৎসবের উপযোগী নাটকের ব্যাপারে বার্ণার্ড শ'র অভিসন্ধি দ্বিবিধ। জনপ্রিয় সরকারকে হাতাপাঙ্গদ করার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। বার্ণার্ড শ' রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের সম্পর্কে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর ধারণা মানুষ এবং রাজনীতিকদের যা কিছু ধারণা তাই এর মধ্যে প্রতিকলিত। এর ফলেই রচিত হল তাঁর Apple Cart নাটক। তাঁকে ঘিরে যে সমস্ত কুৎসা প্রচলিত হয়েছিল তার জবাব দেওয়া আর এক উদ্দেশ্য। তাই এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'কিং ম্যাগনাস জ্ঞানী এবং চতুর সন্ত্রাস্ত। রাণী উন্নতমনা মহিমাময়ী রমণী। তবু রাজা অপর এক পরমা মূন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট। সার্লেট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেলকেও এই নাটকেই তিনি রূপায়িত করলেন।

ম্যালভারগেট এই নাটক অভিনীত হওয়ার পর বার্ণার্ড শ'র স্ত্রী সার্লেট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেল উভয়েই বিশেষ দৃষ্টি হলে। মিসেস বার্ণার্ড শ' নাকি বলেছিলেন—Fools who came to pray remained to scoff.

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল আগে থেকে সংবাদ পেয়ে বার্ণার্ড শ'কে বলেছিলেন, এক খণ্ড বই আমাকে দাও, পাড় দেখি। এডিথ ইভান্স ওরিনথিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তিনি তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে নিয়েই রসিকতা করা হয়েছে।

জবাবে বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন—ইতিহাসের পাতায় বিযাক্ত গালগল্প ও কুৎসার অঙ্কিত হয়ে থাকতে চাই না। পৃথিবী আমাদের কথা জেনে হাসুক। হাসি-তামাসার মধ্যে কুৎসিত কালিমা থাকার চেয়ে মনোহর সরস রসিকতা থাকা বরং ভালো।

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল এক খণ্ড বই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, বার্ণার্ড শ'কে এই সব 'mischievous vulgarity and untruthfulness' মুছে ফেলতে অনুরোধ জানালেন, নতুন করে লিখতে বললেন। 'লোকে বলবে অ-মাহুঘিক অহংকারে তোমার সাধারণ জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু যে বার্ণার্ড শ' একদা টলষ্টয়কে এক বিচিত্র রসিকতা করে

দৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বললেন—'better to have splendid fun than dirty fun.

আন্দর্ভ, সার্লেট বা প্যাট্রিক ক্যামবেল-এর মধ্যে কোনো রসিকতা খুঁজে পাননি।

ম্যালভারগেট অভিনয় হওয়ার পর সমালোচকরা উচ্চ প্রশংসা গগন মুগ্ধিত করে তুলল, কেউ বলে চমৎকার, কুণ্ডল প্রশংসা। উচ্চ ধরণের রসালোপ। তাঁকে যেন আবার নতুন করে আবিষ্কার করা হল। ওরিনথিয়া চরিত্র-চিত্রণের সহচরে বড় লাভ হল এই যে, বার্ণার্ড শ'র জীবনের গোপন হস্ত জ্ঞানীর ভঙ্গ জনসাধারণের আগ্রহ বর্ধিত হল। যেখানেই তিনি যেতেন, সেখানে রিপোর্টাররা ছোট গোপন তথ্য সংগ্রহের আশায়। সব জেনে-শুনলে বার্ণার্ড শ' প্রশংসিত এসবের প্রশংসা দিতেন।

অন্যরত, স্যালোকসেবা, নয়দেহ, মুষ্টিযোদ্ধা বা চিত্তস্তায়ক সঙ্গে আলাপেরত নানা ভঙ্গিতে নানা বিচিত্র শোষণক ইত্যাদি আলোকচিত্র সর্বত্র প্রকাশিত হতে লাগল। যৌনজীবন, নিক্ত জীবন, যুব-জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' নানা কথা বলতে শুরু করলেন। ফ্রান্স হারিস যখন জীবনী লেখার প্রস্তাব করলেন তখন বার্ণার্ড শ' সানন্দে to reveal everything সব কথা খুলে বলতে রাজী হ'লেন। বার্ণার্ড শ' সন্দেহ দ্বারা হারিসকে বললেন, লগুনে এসেই তিনি যে পাঁচখান উপক্ৰাস লিখেছিলেন তাতে যে যৌন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন পনেরটি ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে মানুষ সেই জ্ঞান অর্জন করে না। তাঁর সব অভিজ্ঞতাই আছে এর যৌন সম্পর্কিত যা কিছু জ্ঞাতব্য তা তিনি জেনেছেন। যেদিন থেকে উত্তম শোষণ-পরিচ্ছদ কেনার মত অর্থ উপার্জন করেছেন সেই দিন থেকেই অভিজ্ঞত পরিবর্তনের মহিলা থেকে শুরু করে অভিনেত্রীরা পর্যন্ত তাঁর পিছনে লেগেছে।

যখন এলেন টেরীকে লেখা পত্রাবলী প্রকাশ করতে রাজী হলেন বার্ণার্ড শ', তখন একেবারে চরম পর্যায়ে উঠলো। এলেন টেরী ছেলে গর্ডন ক্রেগ ভীষণ আপত্তি করেছিলেন এই সব পত্র প্রকাশ। 'ডেলী-এক্সপ্রেস' পত্রিকার রিপোর্টারকে এবং আরো অনেককে শ' বলেছিলেন যে তিনি কোনো দিনই এলেন টেরীকে লেখা পত্র প্রকাশ অনুমতি দেবেন না। এতদ্বারা বার্ণার্ড শ'র জীবনের আর এক দিক উদ্ঘাটিত হল। আরো যে সব অভিনেত্রীদের চিঠি লেখা হয়েছিল তাঁরা এগিয়ে এলেন সেই সব চিঠি নিয়ে, সেগুলির বক্তব্য আরো অন্তরঙ্গ, আরো স্পষ্ট। বার্ণার্ড শ' তাঁদের নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন।

এই সব কলরব ছাপিরে সেই Life force-এর বাণী যেন বার্ণার্ড শ'কে ক্রীণ কঠে বলে Fiddlesticks! what a frightful bag of stage tricks। কনষ্টেবল কোম্পানীর জন্ম ১৯৩০-এ বার্ণার্ড শ' তাঁর গ্রন্থাবলীর একটা বিশেষ সঙ্কলনের ব্যবস্থা করছিলেন, সেই সময়ে এই কথাটাই আরো গভীর হয়ে বাজলো। প্রথম জীবনের রচনা পড়তে বসে বার্ণার্ড শ'র মন মনে হয়েছিল তিনি মোটেই বয়সে বাঙেন নি, সেই মহামানব ড্যানডালিয়র লী তাঁকে যেন সমস্ত বিষয়বস্তু দিয়েছেন আর পিতৃসেব কার শ' তাঁকে দিয়েছেন রসজ্ঞান। উভয়ের বিরাট ব্যক্তিত্ব কাছে তিনি সেই চিরন্তন শিশু।

[ক্রমশঃ]

মাসিক বসন্তী—আখ্যায়িকা

আবার আশ্চর্যজনক সুস্থবোধ করুন!



ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপারিশিত স্বাস্থ্যপ্রদ
টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি
নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর
উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের
সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্ত বাড়তি
শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও
বৃক্কে শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হ্রাসস্বাস্থ্য দ্রুত
পুনরুদ্ধারের জন্ত চিকিৎসকেরা অমুল্যমোদন করেন।



এখন চুরি-নিরোধক কাপ
এবং নতুন লাল লেবেলযুক্ত
বোতলে পাওয়া যায়।

এক্ষেপে লাল মোড়ক বন্ধ
করিয়া দেওয়া হইয়াছে

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

স্বেরন করে নিজেদের সুস্থ রাখুন

বর্ণনা

[পূর্ণ-প্রকাশিতের পর]

মূলধা দাশগুপ্ত

সাক্ষ্যমান্তে মঞ্জু পোষাকটা এমন ভাবেই করলে যেন বাড়ীতে থাকার আঁর পড়াশুনা করতে বসারই বোঝায়। আবার হঠাৎ উঠে পাড়িয়ে যদি লাড়ী কাপড়টার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যায় না এ ভাবে একটু পার্কটির ঘুরে আসা? তবেও যেন কেউ আশপ্তি তুলতে না পারে। ছুটির দিন সমস্ত সকাল দুপুর বাইরে বাইরে কাটিয়ে ফের সন্ধ্যায় শান্ত করে বেকার জন্মই বেরিয়ে পড়বে বাড়ী থেকে, এতো সাহস মঞ্জু মৌরীর কাছে রাখে না। এমন বেকতে হলে একটু কঁাকি দিয়েই বেকতে হবে। আজ একেবারে একুশি না বেকলে যে তার চলতো না তা অবশি নয়। কাল সকালে কলেজে খাবার আগে সে অনায়াস জয়াদের বাড়ী টাকাটা পৌছে দিয়ে যেতে পারতো; তার পক্ষে সুবিধেও ছিল সেটাই। আজকের সন্ধ্যার পড়টা নষ্ট হতো না। কিন্তু প্রথমত টাকাগুলো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে বুক করে, দ্বিতীয়ত হুঃসময়ে কার হাতে প্রত্যাশার অতিরিক্ত টাকা তুলে নিতে পারার ভেতর যে একটা আনন্দ আছে সেই আনন্দটা কিছুতেই বিলম্ব সহ্যেতে চাইছিল না। তৃতীয়ত ওর ভেতরে এমন একটা চকলতা ছিল যে ওকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। এতোগুলো টাকা ওকে কেউ এভাবে দিতে পারে ও ইচ্ছেমতো টাকা তুলে নেবার জন্ত দিতে পারে সাদা চেক—ওকে দেবার জন্ত একজনকে এমন হাত বাড়িয়ে আসতে দেখার নতুন আদর্শটা কেবলি ওর হাত-পায়ের ভেতর চকলতার ডেট তুলে তুলে বয়ে বাচ্ছিল।

চমকলাগা ঘটনার প্রথম পর্ষায়ে মাহুঘের অমূল্যত্বটা নিশ্চয় হয়ে পড়ে। তার কাজ আরম্ভ হয় কিছু পরে। রক্তের চেক দেওয়া, সেটা দেখা, পড়া, টাকার অঙ্ক লিখবার শুল্ক সাদা জায়গার নম্বর সার বসিয়ে যাওয়া থেকে, রক্তের ওর ব্যাগে টাকা ভরে ওর কাঁধে নিজের হাতে কলিয়ে দেওয়ার সমস্তগুলো পর্বজ মঞ্জুর সমস্ত অমূল্যত্বটাও ছিল ভোঁতা হয়ে। কিন্তু তারপর দুপুর বেলা যখন বিদ্যালয় হয়ে তার চোখ বুজবার অবসর মিলল তখন জীবনের এই নতুন আশ্বাসনটা যে তার মনকে আন্দোলিত করে চলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তা বতাই জাহুক মঞ্জু, এমন না—পোণা টাকা রক্ত দিয়ে থাকে। তার এই দেওয়ার মধ্যে কোন বিষয় নেই, কোন নতুন নেই। বিষয় বসি থেকে থাকে তো রয়েছে ওর এই দেওয়ার মধ্যে—বতাই জাহুক সে কথাটা জানলে মৌরী

পায়রার মতো গুলার কঠিনালী কুলিয়ে তুলে প্রশংসার ভঙ্গি যে মাথা নাড়বে তার সবটাই নির্ভেজাল জেব বিক্রপ পরিহা শিকারীর শিকার ধরবার পদ্ধতির প্রাতি তারিক। মন এতো গুট এটা সেটা জানার ধার ধারে না। বরং উল্টোটা জানতে চায় না জানতে অস্বীকার করে। কে' কি রকম মাহুঘ তার চাইতে ব' কথা মনের কাছে মাহুঘের কোন ব্যবহারটা তার কাছে কেমন লাগে। বদরাগী মাহুঘের অহেতুক মেজাজ কী আমাদের মেজাজ খাণ্ড করে তোলে না? মুখ খুললেই মুখ আগলা কথা বল লোকের অনীলতা কী আমাদের মান্নিত কটিকে পীড়িত করে না? তোষামোদকে মিথ্যা জেনেও কী মন খুসী হওয়া থেকে বিরত থাকে। মিথ্যাচারিত্রের মাহুঘের মিথ্যাচারিত্রের কথা জেনেও তার মিথ্যা ভালোবাসার কথা শুনেও কী আমরা ভালোবাসিনে?

সত্যি মনের কাজ অত চবিত্র বিচার করে হয় না। যে ব্যবহারে যে কাজ তাই করে চলে। উত্তেজিত হবার মতো হলে ব' তোলে উত্তেজিত। চকল করে তোলার মতো হলে করে তোল চকল। শ্রমের হলে করে মুক্ত। ভালো লাগাব হলে যায় ভালো হারিয়ে দিয়ে। তাই সব জানা সত্ত্বেও এমন দেওয়ার যে স্বাদ মঞ্জুর মনে কিছু এলোমেলো হওয়া বয়ে আনলই। চুলগুলো সামনে এনে, ব'কা উপর ফেলে মুখ নিচু করে জটমট শুদ্ধ বিগুনী পার্কিয়ে চললো সে।

একটা মস্ত সবুজ বং-এর শুকনো তোয়ালে জেজ নাড়ের চাকি দিয়ে চাদরের মতো কুলিয়ে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মৌরী। ডেসি টেবিলের সামনে পাড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে কানের পেছনে জল মুছতে মুছতে বললো, জানিস মঞ্জু, ল'টা মস্তর মতো ইনটারেস্ট সাবজেক্ট। পড়ছি আর বিষয়টা যেন আমাকে শেষে বসাই। 'আইনের চক্ চকুলজ্জা নেই' কথাটা কি শ্রমর! একজন আইনজ্ঞ কাউকে পেলে বসে বসে তার কাছে পাঠ নিতাম।

মনোবোগী শ্রোতা নীরবে কথা শুনে চলতে পারে ব' কিন্তু অন্তরমস্ত শ্রোতার মনোবোগ বোঝাতে অবাস্তর কথায় যেতে হয়। বিগুনীতে জাহুক ঘোরাতে ঘোরাতে মঞ্জু বললো, 'চকুলজ্জা না থাকা কথাটাকে তোর শ্রমর কথা মনে হলো। তোর নিদারুণ মাহা-বোধটা তো চকুলজ্জারই রূপান্তরিত চেহারা।

আপত্তি জানালে মৌরী, কখনোই নয়।

জানেন মঞ্জু কখনোই যে নয়। তবু কথা বলতেই হবে তাকে। নইলে একুশি ওর দিকে তাকিয়ে মৌরী জিজ্ঞাসা করে বসবে, কি ভাবছিল অত?

বললো কেন নয়?

—মাহা-বোধটা হলো রুচিবোধ সৌন্দর্যবোধ এ একেবারে ভেতরের বস্তু। চকুলজ্জাটুকু তো নিত্যজ্ঞ একটা ছু চোখের পাতার ব্যাণার। সত্যিকারের সংস্কৃতির তার দরজা পর্বজ কখনো গিরে পাড়াতেই হয় না।

—তবু দরজা-জানালার পর্দার মতোই দরকারী জিনিষ এই চোখের ছু পাতার লজ্জাটুকু বা তার চাইতে দরকারী। টুকু বলই ঐটুকুও না থাকলে তার বজ্র ভয়াবহ।

জুজুি মাথা কাত করে স্বীকার করল মৌরী—সে নিশ্চয়। আর আমি এতকি দিয়ে কথাটা বলিওনি। ল'জাপালে এই আইনের চক্ চকুলজ্জা না থাকার উপর এমন কয়েকটা ইনটারেস্টিং ঘটনা পলায় না, তুই শুনে—

গল্প শোনার জন্য মঞ্জু স্নাতকের মধ্যরাত্রে লেপ ছেড়ে উঠে আসতে পারে কিন্তু এখন আর পোনোহোটা মিনিটও সে দিতে পারে না। এই মিনিট কতাই বাইরের সন্ধ্যার শেষ আলো আলো ভাবটার উপর আর বতটুই অন্ধকার ঢেলে দেবে, তাতেই বেকবায় কথা বললে ছু চোখ কপালে তুলবে মৌরী—এই রাতে। তা বলুক না মঞ্জু ঘরের কোণের পার্কার্টার কথা।

হঠাৎ একেবারে মৌরীর কাছে গিয়ে তার চুলের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে তাকাতে তাকাতে বলে উঠল মঞ্জু—দিরি তোর মাথার পাকা চুল না কি?

—না।

—হ্যাঁ, দেখলাম যে।

—তাহার? মৌরী আরনার একেবারে কাছে এগিয়ে গিয়ে চুলের ভেতর কঁাক করে দেখতে দেখতে নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললো—পাকলেই বা কি।

মঞ্জু স্তম্ভকণ্ঠে মৌরীর চুলের সামনেটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিয়ে বললো—না, ভিজ়ে চুলে বাতির আলো পড়ে চক্ চক্ করে উঠছিল। কিন্তু পাকলেই বা কি মান? কেন অসময়ের সব কিছু মিটি লাগার মতো অসময়ের পাকা চুলও মিটি নাকি?

হেসে উঠল মৌরী। ঘাড়ের তোয়ালে নামিয়ে রেখে চিকুণী হাতে নিয়ে চুলের জট ছাড়তে ছাড়তে বললো—বেশ মিটি। কাটা-শাকার মেশানো নয়, একদম সাদা, নয়তো একদম সোনালি

চুল আমার অপরূপ লাগে। পিসিমার মাথার সোনালি চুলগুলো তো, আমার দৃষ্টমতো লোভের বস্তু। কেটে নিয়ে গুঁড়ি বানাতাম যদি আমার চুলের রং অমনি করে তুলতে পারতাম। মনে মনে স্থির করে বেখেছি, পিসিমার এই চুল আমি রেখে দেবো। তার পর এক দিন এই রং তো ধরবেই চলে।

উপস্থাপন করছিল মঞ্জু। মৌরীর কথা শেষ হতেই উপড় হয়ে খাটের তলা থেকে চট্লেছোড়া বের করে এনে পা চোকাতে চোকাতে বললো—এত দিন বলিসনি কেন? কত অমন সোনালি চুলের গুঁড়ি জোগাড় করে দিতাম। তার পর বাগটা হাতে নিয়ে মৌরীর দিকে আর তাকালো না সে।—এই কাছেই এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা বই নিয়ে এক্সপুজি আসছি যে। বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে বারান্দা দিয়ে লম্বা হাঁটা দিলো।

আর মঞ্জু চলে গেলে আরনার দিকে তাকিয়ে ফের চুল আঁড়াতে গিয়েও বাতির আলোর রূপালী ঢেউ খেলে চলা সান্দ্রচুলের দিকে তাকিয়ে হাতের চিকুণী নামিয়ে ঝাড়িয়ে রইল মৌরী—হ্যাঁ, সে সত্যি বসে আছে 'উত্তর ত্রিশের' দিনগুলোর জন্ত। যৌবন পার হয়ে 'উত্তর ত্রিশের' কবির ভাষায় বলে উঠবে সে, বেঁচেছি—যৌবন পার হয়ে এসে বেঁচেছি আমি। বেঁচেছি আমি নিরন্তর বাত-প্রতিষেধ থেকে, কণ্টক আকস্মিক হাওয়ার আশঙ্কালিত হওয়া থেকে। একটি মুহূর্তের একটি অসুস্থতি আর মনকে আমার কানে ধরে নাচাতে পারবে না। আর আনন্দকে ঝামেলা মন-খাণ্ডানের হাওয়া

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীমুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ঘব, রাজজ্যোতিষী এম্-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত কলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীস্থ বারানসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেবিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিক্তহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রশস্ত এবং অন্তঃ ও দৃষ্ট এইগুলির প্রতিকারকরে শাস্তি-শুভায়নাতি, তান্ত্রিক স্মিতি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক কল্যাণ ও ভাঙ্গার কবিতাজ্ঞ শাস্তিভুক্ত কটন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত ও বাহ্য ভারতের বাহিরে, ভারত—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষীকৃৎ ভাষার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুক্ত হইতাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্জ, হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া ঘটমাতা মহারাজী জিপুরা টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় জ্ঞান সম্মতনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর জ্ঞান সম্মতনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কন্ত, কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল জ্ঞান ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংসাই নবরীর মিঃ কে. রূচপাল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বাত্ত্বিক অত্যন্তশ্রদ্ধা কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বাস্থ্যে প্রভুত ধনদাত, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তত্ত্বাত্ত্বিক)। সাধারণ—১৯৮০, শক্তিশালী বৃহৎ—২০১৮, মহাশক্তিশালী ও সত্ত্ব ফলদায়ক—১২০১৮, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের রূপা লাভের জন্ত প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কবচ)। সরস্বতী কবচ—অগ্রশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় ফল ৯৮%, বৃহৎ—৩৮৮%। মোহিনী (বলীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুত্র বলাভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১৮%, বৃহৎ—৩৮৮%, মহাশক্তিশালী ৩৮৮%। বর্ণজালক কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিহ্ন মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯৮%, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৮৮%, মহাশক্তিশালী—১৮৮%। (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাগ্যমাল সম্রাসী জরী হইয়াছেন)।

(শাসিতা ১০০ ধঃ) অল ইণ্ডিয়া এন্টোলজিক্যাল এণ্ড এন্টোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মতলা ষ্ট্রীট 'জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন' (প্রবেশ পথ গুরুলেসলী ষ্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৩৫।

সদর—বৈকাল ষ্ট্রীট হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০০, প্রে ষ্ট্রীট, 'বসন্ত নিবাস', কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৮৮৫। সদর প্রান্তে ৯টা হইতে ১১টা।

এসে মলিন করে তুলবে না। আজ আমি ডাব-উজ্জলতাকে বীথতে পেয়েছি বৃষ্টির দৃঢ়তায়। অল্পভিতর সঙ্গে মিলে গেছে আমার পর্যবেক্ষণ। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বৃষ্টির পরিপূর্ণ শক্তি এখন আমার দখলে। কেনেছি আমি আজ তাদের সম্মিত প্রয়োগ—বৈতে গেছি আমি। সোনালি রংধরা চুলে কশাল-টানা খোঁপা থাকবে তখন তার মাথায়। চোখে থাকবে পুরু কাঁচের চশমা। মুখে থাকবে মধ্য বয়সের গভীর গভীর একাগ্রতা—এইরূপ এই বৃষ্টি, এই বয়সের জ্ঞান বসে আছে সে। কিন্তু তার মধ্যে একে। স্মরণ! একেবারে আচমকা ঘরে ঢুকে স্মরণকে পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে একটা আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেবারে চমকে পেছন ফিরল মৌরী। বেন স্মরণের উলনিঃশ্বাস ওর ঘাড়ের অলকগুচ্ছকে হুলিয়ে দিল—তবু তাই নয়, ঠিক প্রথম দিনের মতো ছুরক্ত সাহসে ওর লম্বা ঘাড়ের উপর চেপে ধরলো সে তার চাপা টোট। হাতের চিকণী ফেলে দিয়ে ক্ষুদ্র ভাবে গিয়ে চেয়ারে বসে রইল মৌরী ঠিক আশ্চর্য্যের অব্যাহা ব্যবহারে অসম্ভব অভিব্যক্তির মতো। বৃষ্টি মানে না, ভালো মন্দ নিজেও বোঝে না—কেউ বোঝালেও শোনে না—এমন কাক সঙ্গে ঘর করার মতোই অপর আরাম এই নির্বোধ মনটাকে নিয়ে ঘর করা!

একসঙ্গে এমন ভাঁজ করা এক পাজী টাকা জয়ার মা ঈগগির দেখেন নি। কথা তো নয় বেন একটা কাগজ ছেঁড়া ফাস-ফাসে আগোজ বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে—কত টাকা এখানে?

তাই তো! কত টাকা এখানে জানে না তো মজু। গুণে দেখেনি তো সে। গুণে দেখবার কথা মনে হয়নি তো তার। জয়ার মার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গেলার আশ্রয় সময় নিতেই হলো মজুকে। এতে আছে, আছে দিন আর একবার দেখে দিচ্ছি ভালো করে। বেন বতই গুণে আনা বাক, টাকা কাক হাতে দেবার সময় আনা-গোপায় আর একবার গুণে তথ্যই দিতে হয়। জয়ার মার হাত থেকে টাকা নিয়ে গুণতে গুণতে এতক্ষণে ওর চৈতন্য হলো, টাকা গুণে না আনার মতো একটা বোকাখমিই যে সে করেছে তা নয়। একসঙ্গে এতোগুলো টাকা এনেও করেছে আরো একটা বোকামি। তার বোকা উচিত ছিল দশ-পাঁচ করে এনে হাতে দিতে পারার সংখ্যার ভেতর হঠাৎ এই পাজী-ভাঁজ টাকা স্বাভাবিক ভাবেই প্রায় ডেকে আনবে, এ টাকা কোথায় পেলো সে বা কে দিল তাকে এ টাকা। আর এ জিজ্ঞাসার সম্ভাব্যজনক উত্তর দিতে না পারলে জয়ার মা যে কি না কি জেবে বসবেন তাই বা কে জানে?

হলোও ঠিক তাই। তার জিজ্ঞাসার জবাবে মজুর আটকে বাওয়া বিব্রত ভাবটা জয়ার মার দৃষ্টি এড়ালো না। 'ঘর পোড়া গরু সিন্দুর মেঘ দেখলে ভয় পায়' ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কোন বিশদজনক পথে অজ্ঞাতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে না তো মজু। তার মতো বুড়ো মানুষটাই কি প্রথম বুঝে উঠতে পেরেছিলেন কিছু। তার ভয় মন তো ইচ্ছে করে এ পথ বেছে নিয়েছিল না—এমন কি অনিচ্ছা করেও নয়। অজান্তে গিয়ে পড়েছিলেন, ঠিক অন্ধকারে গিয়ে থানায় পড়ার মতো পড়েছিলেন। উপাধিকার

চেষ্টা করেছিলেন তিনি যেয়েকে নিয়ে নানা ভাবে। পারেন নি। মুদ্রা বাকী দেওয়ার বিস্তৃত জালে জড়িয়ে ফেলে যখন প্রতিদিনের অন্ন তার দ্বার উপর নিয়ে দাঁড় করালো তখন কোথা দিয়ে যে কি ঘটে চলতে লাগলো প্রথম কি তিনিই তা বুঝে উঠতে পেরেছিলেন। আর শুধু কি তিনিই—এখানকার দু'দিককার বাস্তার স্রাটগুলোর বহু ঘর তো ঠিক তাইই মতো না, না বুঝতে বুঝতে গিয়ে এই একই লোকের কঁদে পা দিয়ে আজ পাকে মুখ খবড়ে পড়েছে। মুদ্রার ব্যবসায়ী মুদ্রা দোকান নয়, আসল ব্যবসা তার পাড়ার অভাবী ঘরগুলোকে ধার দিয়ে, বাকী দিয়ে তাদের তক্তা কজার খণপরে এনে ফেলা—বুঝেছিলেন কি তিনি কিছু। এতো কিছু বোঝবার মতো শক্তিও ছিল না তার। চারটে গুণনো হাড় তখন তার দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুধু খুঁকতো। তারপর খাত শেষে, পথ্য শেষে শরীরের রক্তকণিকাগুলো যখন বল ফিরে পেয়ে সত্যে শরীর ময় চলা ফেরা করতে করতে তাকেও দেয়াল—নির্ভর ছেড়ে পিঠটান করে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তখন তার সেই মরতে মরতে বেঁচে ওঠা রক্তকণিকাগুলো বেঁচে থাকার কথা ছাড়া কোন কথাই গুনতে চাইল না। আর সেদিনই তিনি প্রথম জানালেন মানুষ বিচার পায় সব সম্বন্ধ সব বৃত্তি বলি দিতে পারে। তবু তারও মধ্যে বড় প্রশ্ন ছিলেন তিনি নিজে নন, সম্ভাব্য। এক সম্ভাব্যকে বলি দেওয়ার জ্ঞান মন প্রস্তুত করেছিলেন তিনি আর এক সম্ভাব্যের দিকে তাকিয়ে। তাই মজুর লোকটাকে চড় মেরে তাড়িয়ে দিলে—আতুল হয়ে কঁদে উঠেছিলেন তিনি একল ওকুল দু'কল বাওয়ার চরম আতঙ্কে। সব দায় নেবার মজুর দেওয়া ভরসায়ও কোন ভরসা কোন বল পাননি। কিন্তু আজ মজু তার সব চাইতে বড় বল। আজ মজু তার কের স্বস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারার সম্ভবনাময় স্বপ্ন। মদ্য ধর্ম দান উদারতার আজ আর বিশ্বাস নেই জয়ার মার। একমাত্র জৈব দুর্লভতার কারণ ছাড়া কোন কারণ বিশ্বাস করেন না পুরুষের দ্বার।

আগুও অব্যবহৃতিক জগতের একচ্ছত্র অধিপতি পুরুষ। সে ছাড়া কে দেবে মজুরক টাকা। আর তাই যদি হয় তবে তার দুর্লভতার ভিত্তর উপর পা না রাখলে তার মুঠো এতটুকুও থুগবে না—এতটুকুও না। আতুল উৎকর্ষায় বলে উঠলেন তিনি—কে দিলে মজু তোমায় এ টাকা, কে দিলে?

বুঝলো মজু সবই বুঝলো। মৌরীর ধারণা রক্তের মতো লোকেরা এই এক মতলবেই যা করে সব করে। জয়ার মার অভিজ্ঞতা আরো বেশী, তাই তাঁর ধারণা সবাই, সবাই তাই। রক্ত বলে পুরুষের জগতে কোন আলাদা জাত নেই। এই কি সত্য বলে মেনে নিয়ে মজুর রক্তের হাত থেকে টাকা নেওয়ার অপমানে মুখ নিচু করতে চলে?

না—দুর্লভতার দেওয়া মাত্রই নোয়া এই যদি তার বিশ্বাস হতো তবে যদিও রক্ত ধার শোধ দেওয়ার কথা বলেই টাকা নিয়েছে, মজুও শোধ দেবার কথা মনে রেখেই টাকা নিয়েছে—তবুও এ টাকা মজু গ্রহণযোগ্য মনে করতো না। তাহলেও সত্য বলা যায় না। জয়ার মার দিকে তাকিয়ে কাঁচমাচ খাওয়ার অভির করলো মজু—নেন বলবার ইচ্ছে ছিল না, তবু বলতে হচ্ছে এমনি ভাবে বললো—মার না ইয়া মোটা একটা হার ছিল। বুড়ো আজুল আর মধ্যমার বেড়ে একটা মোটার পরিমাণ দেখালো সে।

মনের ভেতরটা যেন শান্তিতে একবার চোখ বুজে মিল জয়ার মার। ছবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—সেটা তুমি নাকি বিক্রি করে এলে নাকি?

ঠিক আছে। এতক্ষণে শুঁড়িয়ে বসে শুঁড়িয়ে বলে চললো মঞ্জু। না, বিক্রি করতে বাবো কেন? রেখে টাকা এনেছি। সামনের মাসেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। ও হাঁ—ভালো কথা, আপনাকে বলাই হয়নি যে আমি একটা টুইশনের কাজ পেয়ে গেছি। আর একটাও হয়ত সামনের মাসে পেয়ে যেতে পারি। একটা হলে পঁচাত্তর টাকা পাবো। দুটো হলে পাবো পঁচাত্তর পঁচাত্তর করে দেড়শ। (ভেতরে ভেতরে রক্তের সাহায্যে এমন দুটো কাজ পাওয়া কিছুই যে অসম্ভব কথা নয়—হলেও হয়ে যেতে পারে এবং পঁচাত্তর পঁচাত্তর দেড়শ নয়, একশ একশ করে দু'শ টাকাও মাইনে হতে পারে। ইউরোপীয়ান মহিলারা এমনই মাইনেই দেয়। এই একটা উত্তেজনায়ও মঞ্জুর বুকেটা যেন বার বার দ্রুত তালে চলে মিল। যেন এ সংসারটার বেকার গৃহস্থানী সে।) বললো কাজ এমাসে হলেও মাইনে পাবো তো সেই সামনের মাসে। এ মাসটা চলতে হবে তো আমাদের। বাড়ীভাড়া জমে আছে, আরো কত কি জমে আছে। সামনের মাসে মাইনে পাবো, এ টাকা থেকেও ভরসে। থেকে যাবে—নিশ্চয় আসবো তার ছাড়িয়ে। জানকলৈ শারবে না কেউ। না রে জয়া? জয়ার দিকে তাকাতা সে। ঘরের মাঝখানে একটা মোড়ার বসেছিল জয়া। কিছু জড়িয়ে আনা কৌটকানো মোচড়ানো একটা পুরোনে কাগজের পাতা টান করে নিয়ে বসে নিবিষ্ট মনে যেন সে কি দেখছিল। মঞ্জুর সম্মুখনে চোখ তুলল। মঞ্জু বললো—সিন্দুক ভেতর মরা সাপের মতো পড়ে থাকে তো বিড়ে পাকিয়ে। মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে যদি মাছের কাজে এসে যেতে পারে, তবে ওরই নিজেকে ধ্বংস মনে করা উচিত, নয় জয়া? জয়া যেমন হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল। কোন সাড়া এলো না তার কাছ থেকে।

মঞ্জুর কাজ হয়ে বাঙার কথা শুনে এক দিকে যেমন খুশীর অন্ত রইল না জয়ার মার, অপর দিকে তেমনি পরীক্ষার বছর দু'টো মাপ্তির করলে মঞ্জুর নিজের পড়ার যে ক্ষতি হবে সে কথা ভেবে খুশীর অনেকটাই যেন উবে গেল তার। তত্ত্বশোধের তলা থেকে তেরগুটা টেনে বের করে টাকাটা তুলে রেখে বাঙার গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ আগে ধরিয়ে রেখে বাঙার ঘোঁরা ওঠা উনোনিটার অসমান কল্যাণগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে দিয়ে ওদের গজ চায়ের জল চাপালেন উনোনে। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সক্ষোভে যেন বলে চললেন আপন মনে কত কি। তার ভেতর একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে কানে এলো মঞ্জুর—নিজের যেকোন সর্বনাশ তো করে বসে আছি। আবার না অন্তর মেয়ের ভবিষ্যট্টাও নষ্ট করি।

জয়ার দিকে তাকালো মঞ্জু। মার এ জাতীয় কথা সঙ্গ করতে পারে না জয়া। শোনা মাত্র কখনো ওঠে তার মুখ একেবারে সাদা হয়ে, আবার কখনো ওঠে সে, ছুড়ছ কেনে। জয়াকে বাঁচিয়ে কথা বলতে পারেন না জয়ার মা। সে সতর্কতা বাও ওঁর নেই। কিন্তু মার কথা জয়ার কানে গেছে মনে হলো না। এতক্ষণ তার দৃষ্টিটা ছিল হাতের কাগজের দিকে, এখন দৃষ্টিটা পাঠিয়ে দিয়েছে সে বাইরের

অন্ধকারের দিকে। সে আঙ্গ-কাল শূন্য-দৃষ্টিতে বসে বসে কেবল ভাবে আর ভাবে। কি ভাবছে জিজ্ঞাসা করলে ততোধিক শূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্জু চৌকি থেকে ওঠে গিয়ে মেঝেতে বসে ওর পিঠের ওপর হাত রাখল। কি খবর আছে এই সাত বাসি খবরের পাতায় দেখি।

—খবর নয় ছবি দেখছি।

—কিসের ছবি? উঁকি দিল মঞ্জু।

পত্রিকাটা তুলে দিল জয়া মঞ্জুর হাতে।

ছবিটা মঞ্জুর না-দেখা নয়। বহুদিন আগে বেরিয়ে গেছে কাগজে। পতিতাবৃত্তি বন্ধের প্রতিবাদে পতিতাদের নীরব প্রতিবাদের ছবি। রাস্তা পরিষ্কার করে এসে মাঠের ওপর বসে আছে এক মাঠ মেয়ে, ঘোমটার মুখগুলো প্রায় আবৃত করে নিয়ে।

আচমকা ঝিল ঝিল করে হেসে ওঠল জয়া ঘরে মঞ্জুরকে চমকে দিয়ে বাইরে বসে থাকা মাকে চমকে দিয়ে। তারপর যেন তার সেই পাগলা হাসি খামতে চায় না আর। দেখলি ছবিটা?

যেন ছবিটা সত্যি হাসি পাওয়ার, এমনই ভাব দেখিয়ে জয়াকে খুশী করতে হাসল মঞ্জুও।

আর তক্ষুণি গভীর হয়ে গেল জয়া। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল—হাসিলি যে তুই? হাসিটা মুখের ভেতর—সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে জয়ার পিঠে হাত বুলাতে লাগল মঞ্জু—এমনি হেসেছি আমি।

—এমনি হাসবি কেন?

আমতা-আমতা করল মঞ্জু—ঠিক এমনি নয়। তাকে হাসতে দেখে হেসেছি।

—আমি কেন হেসেছি তুই জানিস?

—না তো!

—তবে কারণ না জেনে পাগলের মতো হাসতে গেলি কেন? তুই কি পাগল?

—সত্যি অর্থ হয় না; কিন্তু এক এক সময় কারণ না জানলেও কাউকে ভীষণ হাসতে দেখলে হাসি এসে যায় না?

ঠাণ্ডা হলো জয়া। আমি হেসেছি কেন জানিস?

সাংঘাতিক একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রইল জয়া মঞ্জুর দিকে।

ক্ষীণ ভাবে মাথা নেড়ে মঞ্জু বললো—না।

—কি করে জানবি। পাঙ্কিস, পরছিল মুখে আছিল। কিন্তু চিন্তা করবার যে কত কি আছে তোরা ভেবে দেখিস না। কেউ ভেবে দেখেছে না। আজ্ঞা এই দেখ—কাগজটা মেঝেতে পেতে আসুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—এটা দেখার পর সেই থেকে আমি কেবল ভাবছি—বলে হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল জয়া।

হুই টোটে এক করে বসে রইল মঞ্জু, যদি এই চুপ করে থাকার ভেতর জয়া বিষয়টা তুলে যায় সেই অপেক্ষায়।

কিন্তু আন্দর্য! অশ্রুশ্রল চিন্তায় কিংবদন্তি জয়া তার পূর্ব-বক্তব্য। বললো—আমি কেবল ভাবছি, এরা ঘোমটার মুখ ঢেকে বসেছে। কিন্তু পুরুষগুলো কি নিলজ্জ য়ে—এই ছবিটা নিয়ে সবার চোখের উপর ঘোমটা ছাড়া যুচ্ছে। পালের দু'পাশের, কপালের, দু চোখের তলার কালো রেখাগুলো আরো গভীর দেখাতে লাগল জয়ার।

এবার পত্রিকাটা টেনে নিয়ে আবেল-তাবেল ভাঁজ করে ছুঁড়ে ফেল দিল মজু টেবিলের উপর। আবেলের ঘরে বললো—জয়া, এসব নিয়ে আর কখনো মাথা ঘামাবে না তুমি। আমি যেমন এ জগতের নই তুমিও তেমনি এ জগতের কেউ নও।

আবার তেলে গড়িয়ে পড়ল জয়া—আমি নই এ জগতের ?

—না তুমি নও এ জগতের। পড়াশুনা আরম্ভ করতে হবে তোমার, পরীক্ষা দিতে হবে—তোমাকে।

—কি করে ? কি করে পরীক্ষা দেবো আমি ? বেন কেঁদে উঠল জয়া—আমার কিছু মনে থাকে না—কিছু না।

—মনে না থাকলেই যদি পড়াশুনা না হয় তবে আর কি। আমি ছেড়ে দিই পড়া। কারণ আমারও কিছু মনে থাকে না। এই তো এই মাত্র দেখলি গুণে আনা টাকাও দিতে গিয়ে কের গুণে দিতে হলো। ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে বৌদি দিদিরা বলেন, আমার নাকি ছুঁড়ি মেলা তার।

—না, না, ব্যাকুলভাবে মাথা নেড়ে উঠল জয়া। তোর ভুলে যাওয়া এক জিনিষ নয়। মাথাটাকে এক এক সময় আমার কীকা বেলুনের মতো মনে হয়—মনে হয় খেন শূঁতে উড়ে গেল বলে—মরে গেলাম বলে।

জয়ার মা চা আর হুড়ি ভাজার বাটি নামিয়ে রেখে গেলেন। মজু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তাকাল হুড়ি মুখে কেলে চলে গেল একেবারে অন্ধ কথার—দাবা খেলা জানিস ?

—দাবা ? হু চোখ বড় করলো জয়া।

—হ্যাঁ দাবা ! দিন রাত হাবি-জাবি ভাবলে মাথা এমন শূঁচ মনে হয় সবাই। কীড়া, দাবা খেলা শিখিয়ে দেবো তোকে। খেলায় মনের একাগ্রতা কেমন বেড়ে যাবে। অন্ধ কোন কথা মনে আসবে না। নে চায়ের কাপ নে। জয়ার হাতে কাপ তুলে দিল মজু। টেবিলে বসে থাকা জয়কে ডাক দিল—চলে এসো জয়, তোমার চা খাবার নিয়ে এখানে। টেবিলের সামনে সেই প্রথম থেকে বই নিয়ে বসেছিল জয়। শুধু বসে নয়, মজু জানে সে পড়ছিলও। শুনে ভর্তি হতে পারছে না সে, তার বই নেই। তার খাড়া নেই তবু সে পড়ছিল—কোন দিকে মন না দিয়ে পড়ছিল। শুধু ওর প্রথম বয়ে ঢোকান সময় একবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। তারপর এতক্ষণের ভেতর সে তার বই-এর পাতা থেকে চোখ তুলেছিল মাত্র আর একবার—দিদির অসহ্য হাসি শুনে। মজুর সাদর আস্থানে হাসি মুখে চা আর হুড়ির বাটি দু'হাতে নিয়ে উঠে এসে বসল সে মেঝের উপর। তার দিকে তাকিয়ে মজুর মনে হলো, ক্রুটে যুদ্ধরত সৈনিকের মুখের সতর্কতা সন্দেহ অবিদ্যাস আতঙ্কের মতো যে বেখাগুলো সে প্রথম এসে জয়ের মুখে দেখেছিল, সে বেখাগুলো যদিও আজ মিলিয়ে গেছে তার মুখ হতে, তবু এখনও সেখানে যুদ্ধশান্তির শান্ত স্পর্শ লাগেনি। বহু জীবন জিজ্ঞাসার ভেতরটা বেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা নিয়ে সে কাক কাঁড়ে বার না—যাবে না। বার জুগাব খুঁজে বের করাটা বেধে দিয়েছে সে নিজের অন্ধ।

যেদিন ক্রুটে শান্তি ঘোষিত হয়েছিল সেদিন হাতের অন্ধ নামাকে পেয়েই কি শান্ত হতে পেরেছিলেন যেমার্ক ? পায়ের নি।

হয়তো শান্ত হতে পেরেছিলেন কিছুটা। শুধু মাত্র সে দিন, যেদিন ‘অলকোয়াইট’ শেষ করে হাতের কলম নামিয়ে দিলেন। স্বাক্ষরের মুখের অশান্তি রেখার হয়তো শান্তির ঢিলে ভাব আসতো তখন, যখন তার কলম ছুটে চলতো—

কলম বিদ্রোহ তাখনি তুমি ?

রক্তে কিছু পাগনি শেখার ?...

কলম বিদ্রোহ আজ—

...এতো বিদ্রোহ কখনো দেখিনি কেউ,

দিকে দিকে ওঠে অব্যাহতার ঢেউ ;

স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—

শুনছো ? শুনছো উদ্‌ঘাম কলরব—

শুধু বুদ্ধি তখনই তার মুখের তীরের মতো বেখাগুলো গাঁড়ান্বিত হইবে !

এই কিছু বেশী টাকা জয়ার মা'র হাতে দিয়ে আসতে পেরে দিন-ন-চলো বেকার গৃহস্থামীর কিছু দিন নির্ভাবনায় কাটাবার মত সংস্থান করে উঠতে পারার আরামবোধ করতে লাগল মজু। মাথাটাই বেন হাড়া মনে হতে লাগলো তার। সে খেয়াল করলে না, এ টাকা কটা আর কাজ পাওয়ার একদিনের একটা ভিত্তিহীন অনিশ্চিত আলোচনার যতটা হান্ধাবোধ করা যায়, তুলনামূলক বিচারে তার হান্ধাবোধের পরিমাণটা অনেক বেশী হয়ে বাছে। আসলে ঐ টাকা নয় একটা কাজ হওয়ার ভরসাও নয়—সে যা সম্ভাবনা রয়েছে তো রয়েছেই। আর যদি না হয় ? মন তাতেও আর অন্ধকার দেখছে না—এই হলো আসল কথা। রক্ত অন্ধে, এমন একটা হিসাব, তার অবচেতন মন হিসাবের খাতায় ধরে বসে আছে এবং যে অসহায়বোধ সে করছিল তা এখন আর সে করছে না। “আছে”—পেছনের এই থাকার জোরের মত জোর আর কিসে ?

টেবিল বেড়ে, বইপত্র গুছিয়ে এমন অশুশ্রাব্য পড়াশুনা আরম্ভ করে দিল মজু, বিস্মিত হয়ে গেল মৌরীও। বার চোখকে কীকি দেওয়া যায় না, নিষ্ঠাও তার চোখেই সবার আগে বরা পড়ে। খুসী হয়ে উঠল মৌরী—হ্যাঁ এ ভাবে পড়লে আমি বলছি, ঠিক তুই একটা ফার্স্ট ক্লাস শেষে যাবি।

জানো না—মজু জানে না, ফার্স্ট ক্লাস না সেকেন্ড ক্লাস, কি সে পাবে। সে জানে পড়াশুনো তাকে ক'রতে হবে। বত কিছুই কল্পক, তার ভেতরে এ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে, তাকে পথভ্রষ্ট হ'তে হবে। বড় হ'তে হবে তাকে, অনেক বড়। কাজ ক'রতে হবে তাকে—অনেক কাজ। আর এই সবের একমাত্র পাথরই হ'লো অর্থপুঁজি নয় বিজ্ঞান পুঁজি। এ পুঁজি তার সকলের সর্ব্বের ভ'রে তুলতে হবেই। কিন্তু বর্তমান সময়টা মজুর ওপার নিয়ে এসেছিল একটা অশান্ত হাওয়ার ঢেউ। যেমন বৈশাখ নিয়ে আসে সঙ্গে ধ'রে ঝড়। ঠাণ্ডা হয়ে বসবার অবসর মিললো না তার। সময়ের উপর গ্রহনকন্ডের প্রভাবের আঁক-করা নিতুল হিসাবের মত হুঁত্যা মাল্লবের—তার জগৎপত্রিকায় ভেতন নিতুল আঁক হয় না। বরি হ'তো তাহ'লে এমন আয়োজন ক'রে পড়তে না বসে মজু তৈরী হ'তো সামনের হুঁত'বের জন্যে।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

যেহাউ আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুগ
দোবেন—আপনার ত্বক আরও নরম, আরও মোলায়েম
হবে। তাই কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
বহুকেটি তৈল। এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার ত্বককে
সুন্দর করে এবং আপনার ত্বকে সুর রাখে। রেক্সোনার
মালা মত স্বেগা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্মে... রেক্সোনা



রেক্সোনা সো, গিঃ, অট্টোমিয়ার পকে মিনুখান দিল্লার গিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

B.P. 155-359 BQ.

অক্ষন ও প্রাক্ষন



সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেন

এ্যাপোলো

স্পার্টার রাজা টিনডেরিয়াসের পত্নী লীডার রূপের সীমা নেই। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, দেশ বিদেশে আলোচনা চলে তাঁর রূপের, এমন কি অলিম্পাসের দেবতারও লীডার সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন অলিম্পাসের দেবীদের মধ্যেও এমন রূপ দুর্লভ। তাঁদের কথা শুনে দেবীরা হিংসায় জ্বলে মরেন।

অবশেষে দেবরাজ জিয়ুসের কানেও গিয়ে পৌঁছল লীডার সৌন্দর্যের খ্যাতি, লীডার রূপের কথা শুনে জিয়ুসের বাসনা হল তাঁকে দেখতে। এমন সুন্দরী যে নৌরা সে ত দেবভোগ্যা। দেবভোগ্যের উপভোগের জন্মই না তার সৃষ্টি। জিয়ুস তাঁকে দেখতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু তাঁর এই মনের কথা তিনি মনেই লুকিয়ে রাখলেন। কারণ দেবরাণী হেরা তাঁর ইচ্ছার কথা জানলে মহা অমর্ষের সৃষ্টি করবেন।

ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণা দেবী এই হেরা। দেবরাজ মর্ত্তের কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না তিনি। স্বর্গ-মর্ত্ত জুড়ে এক বিধম আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। হেরার এই মানবীমূলক ঈর্ষার কথা জিয়ুস জানেন। এর আগে দু'একবার মর্ত্তের নারীর প্রতি দুর্বলতার কলম তাঁকে ভুগতেও হয়েছে। তাই তিনি এখন বিশেষ সাবধান হয়েছেন।

জিয়ুস স্বহৃদেগের অপেক্ষার রইলেন। অবশেষে একদিন সে সুযোগ মিলেও গেল। সুযোগ পেয়ে হেরার অগোচরে চুপে চুপে

তিনি হাজির হন স্পার্টার, রাজা টিনডেরিয়াসের প্রাসাদে সেখানে তিনি স্বচক্ষে দেখেন রাণী লীডাকে। সত্যিই অপরূপ সুন্দরী তিনি। তাঁকে দেখে জিয়ুস মুগ্ধ হন। লীডার সজ্জা আবার হয়ে ওঠে তাঁর চিত্ত। কিন্তু লীডা তখন রাজা টিনডেরিয়াসের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। রাজার সাথে এক বিচিত্র কেলিতে যেরে উঠেছেন তিনি। অদৃষ্ট জিয়ুস গোপনে দেখেন সে দৃশ্য।

প্রেমকেলি সমাপনান্তে রাজা তুষুচিহ্নে বিদায় চান রাণী কাছে। রাজসভার তাঁর অনেক কাজ বাকী। রাণী লীডাও জুহু হয়েছেন তাঁর সঙ্গ শেষে। তিনি রাজাকে বিদায় দেন তখনকার মত। তারপর বীরে বীরে অগ্রসর হন প্রেমোদ উত্তানের দিকে। সর্বোপর্যে নান শেষ করে তিনি আবার নতুন সজ্জার ভূষিত হয়ে মিলিত হবেন রাজার সঙ্গে, তারপর আবার মন্থকৌড়ায় যেরে উঠবেন তাঁরা।

রাণী যান সর্বোবরের দিকে, সখীরাও সাথে আসতে চায়, কি মনে করে তাদের বারণ করেন লীডা। তিনি একাই যাবেন অগোচরে প্রিয়সঙ্গের নিবিড় স্নেহে তাঁর মন এখনো আচ্ছাদিত। অন্য সাহচর্যে তাঁর প্রয়োজন নেই। একা একাই জলকেলি করেন তিনি।

লীডা উপস্থিত হন সর্বোবরের তীরে। তারপর বীরে বীরে পড়ান জলে। নীতল জলের স্পর্শ তাঁকে আবিষ্ট করে। তাঁর মনে হয় তিনি যেন নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছেন প্রিয়সঙ্গ, আপন মনে একা একাই জলকেলিতে রত হন তিনি। এমন সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তীরের দিকে। তিনি দেখেন সর্বোবরের তীরে ঠাড়িয়ে আছেন এক অপূর্ণ সুন্দর জ্যোতির্মান পুরুষ।

তাঁকে দেখে বিমমিত হন লীডা। অসময়ে তাঁর প্রেমোদ সর্বোবরে তীরে কে এই সুন্দর পুরুষ। তিনি জল ছেড়ে হাড়াতাড়ি তীরে দিকে অগ্রসর হন, তাঁকে এসিয়ে আসতে দেখে সেই অপরিচিত পুরুষ হাসতে থাকেন মুহু মুহু, অপরিচিতের এই বৃহত্তায় বিস্মিত হন রাণী লীডা। রাণীর প্রেমোদ উত্তানে কি সাহসে চুকেছে এই ভজনা মাছবাট। সে কি জানে না তিনি কে? স্পার্টার রাজমহিষীর দেখে সমীহ করে না এমন দুঃসাহসী কে এই অপরিচিত?

রাণী ক্রোধভরে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে যান। কিন্তু এই অপূর্ণ সুন্দর পুরুষটির মধ্যে কি যেন এক মহিমা লুক্কায়িত আছে। তাঁকে তার প্রতি জুহু হতে দেয় না, তিনি ভালো করে তার দিকে তাকান, দেখেন যে অপরিচিত শুধুনা তাঁর দিকে তাকায় মুহু মুহু হাসছেন।

লীডার স্মরণ হয় তাঁর স্বপ্ন অঙ্গাবরণের কথা। ভাগ্য ভাল ভিলে তাঁর দেহের সঙ্গে মিশে গেছে। তিনি লজ্জিত হন মনে মনে। তারপর মুহু মুহু লজ্জাসা করেন, আপনি কে? আর কেনই বা আমার এই প্রেমোদ উত্তানে প্রবেশ করেছেন?

সেই অপরিচিত পুরুষ তখন রাণীকে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে তিনি দেবরাজ জিয়ুস, দেবসভার রাণী লীডার অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতেই অলিম্পাস ত্যাগ করে স্পার্টার এসেছেন। তিনি বলেন যে, রাণী লীডাকে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য দেবরাজকে মুগ্ধ করেছে, রাণী লীডার নিবিড় সঙ্গ কামনা করেন তিনি।

জিহ্বের কথা শুনে চমকিত হন লীড়া। তাঁর সম্মুখে ঠাঁড়িয়ে দাঁড়ান যব দেবরাজ। আর তিনি কামনা করতেন তাঁর, এক স্ত্রীর মানবীর সঙ্গ, তিনি বিচলিত বোধ করেন। কি উত্তর দেবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না লীড়া।

জিহ্ব আবার তাঁকে জানান, তাঁর কামনার কথা। লীড়ার হৃৎস্পন্দ দেবলোকেও হুলসিত। দেবরাজ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্ত।

তাঁকে কি উত্তর দেবেন, ঠিক করে উঠতে পারেন না লীড়া। দেবরাজ জিহ্বের মহিমায়িত মূর্তি তাঁকেও আকৃষ্ট করেছে। আর তা ছাড়া মস্তুর মানবীর পক্ষে দেবরাজের সঙ্গ পাওয়া ত' ভাগ্যের কথা। কিন্তু তাঁর মনে হয় তাঁর স্বামীর কথা। একটু আগেই স্বামীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধা ছিলেন তিনি। স্বামিসাহচর্যের পরিতৃপ্তি এখনো তাঁকে ঘিরে আছে। তবে কি করে আবার তিনি দেবরাজের আলিঙ্গনে নিজেদের বরা দেন। কোন উত্তর দেন না লীড়া। অবনত বসনে ঠাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন তিনি।

জিহ্ব বুঝতে পারেন তাঁর বিধার কথা, কিন্তু তিনি তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছেন লীড়ার সঙ্গ লাভস্বরূপ। তাই লীড়ার সব বিধাকে দূর করতে তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি তাঁকে পরিবর্তিত করেন এক রাজহংসীর আবেশে আর নিজেও এক রাজহংসের রূপ ধারণ করেন।

এই পরিবর্তনে লীড়া প্রথমে হতচকিত হয়ে যান। কিন্তু তারপরেই তিনি বুঝতে পারেন দেবরাজ জিহ্বের কৌশল। মানবীরূপে জিহ্বের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে তাঁর বিধা আছে বলেই দেবরাজ তাঁকে মরালীতে রূপান্তরিত করেছেন। যাতে নতুন রূপে জিহ্বের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে তাঁর আর কোন সন্দেহ না থাকে। এই সময় রাজহংসবোদী জিহ্ব আবার আহ্বান জানান লীড়াকে। লীড়াও এবার আনন্দের সাথে সাড়া দেন তাঁর আহ্বানে।

তারপর মরাল আবার মরালী সেই সরোবরে এক অভিনব দীড়ায় যেতে ওঠে। তাদের পক্ষ বিদ্যুতের সরোবরের জল হয় আলোড়িত। তারা কখনো পাশাপাশি ভেসে চলে, কখনো চঞ্চুতে চঞ্চু ঠেকিয়ে পরস্পরকে আদর করে। আবার কখনো বা একের উপর দেখা যায় আরেক জনকে।

লীড়ার সাথে দীর্ঘকাল কাটিয়ে অবশেষে দেবরাজ জিহ্ব ঘিরে যান দেবলোক অলিম্পাসে। রাজহংসী থেকে পুনরায় মানবীতে রূপান্তরিত হয়ে লীড়াও ফিরে আসেন প্রাসাদে রাজা টিনডেরিয়াসের কাছে। টিনডেরিয়াস তাঁকে সাগ্রহে বাহুপাশে টেনে নেন। লীড়াও ধরা দেন তাঁর বাহুবন্ধনে। কিন্তু তাঁকে সেদিন যেন কেমন আনমনা মনে হয়।

এর পরেই লীড়া গর্ভবতী হন। একা যথাসময়ে তিনি দুটি ডিম প্রসব করেন। এরই একটি ডিম থেকে জন্ম হয় হেলেনের।

স্বমাত্রি হেলেন অল্পপমা সুলভী, শিশু হেলেনকে যে দেখে সেই বিম্বিত হয়। মর্ত্যলোকে এ সৌন্দর্য্য একেবারে কল্পনাতীত। এত রূপ ত দেবলোকেও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট হেলেন তাঁর পিতামাতার নয়নমণি। তাঁদের আরাধনা আছে বটে, কিন্তু তারা কেউই হেলেনের মত তাঁদের প্রিয় নয়। অবশ্য একমুখ তার ভাই-বোনরা কেউই হেলেনকে ঈর্ষা

করে না। হেলেন তাদেরও সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্রী। এইভাবে সকলের আদর আর ভালবাসার মধ্যে হেলেন বড় হতে থাকে।

হেলেনের বয়স যত বাড়তে থাকে তার রূপের খ্যাতিও ততই বেড়ে চলে। শিশু হেলেনের স্বর্গীয় রূপ সকলকে কবচ বিম্বিত ও মুগ্ধ। বালিকা হেলেনের অল্পপমা রূপ ও লাবণ্য এবার পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করতে শুরু করল। হেলেনের যে রূপ এর পর অগণিত লোকের হৃদয় হরণ করেছে, অসংখ্য লোকের সর্বনাশ করেছে, বিভিন্ন রাজ্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে, হেলেনের বালিকা বয়সেই তার সূচনা দেখা গেল।

হেলেনের বয়স যখন সবে দশ, তখনই তাঁর রূপের আশ্রমে পুড়ে মরতে দেখা দিল প্রথম পতঙ্গ—গ্রীক-বীর বিসাস।

নানা দুঃসাহসিক এবং বীরত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য বিসাস ছিলেন দেশের সর্বত্র বিশেষরূপে খ্যাত। যৌবনে অনেক দুর্ঘাট দম্ভ এবং অভ্যাত্যাত্যরীক দমন করে সকলের প্রশংসা এবং সম্মান অর্জন করেছেন তিনি। কিন্তু বিসাসের এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল। নারীর প্রতি আকর্ষণ তাঁর অসীম, নারী বিশেষতঃ সুলভী নারীর সম্মান পেলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যেমন করেই হোক তাকে পেতে চেষ্টা করতেন, এর আগেও এয়ারিওডেন, এটিওপি এবং এনেম্নাকে তিনি হরণ করে এনেছেন।

এখেন্স নগরীর অন্ততম ঐতিহ্যবাহী প্রসিদ্ধ বীর বিসাসের বয়স তখন পঞ্চাশ। রাজ্যকার্য থেকে কিছুদিনের মত অবসর নিয়ে বন্ধু পেইরীথাসের সাথে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি। গ্রীসের বিভিন্ন নগরী রাজ্যগুলি দেখে বেড়াচ্ছেন তাঁরা।

বিসাস বিভিন্ন নগরী দেখেন আর তুলনা করেন তাঁর প্রিয় এখেন্সের সাথে তাঁর সাধের এখেন্সকে তিনি যেমন সুলভ করে গড়ে তুলেছেন সেমেন আর কোন নগরকেই তাঁর মনে হয় না। এখেন্স হল সব নগরীর সেরা। তাঁর সাথে আর কারোই তুলনা চলে না।

এইভাবে যুগে যুগে দুই বন্ধু অবশেষে একদিন এসে হাজির হলেন স্পার্টার, স্পার্টার তখন উৎসব শুরু হয়েছে আর্টেমিস আখিয়ার মন্দিরে। বিসাস আর পেইরীথাসও যান আর্টেমিসের মন্দিরে উৎসব দেখতে।

তাঁরা যখন মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন উৎসব বেশ জমে উঠেছে। সবাই উৎসবে মত্ত। বিসাস এবং পেইরীথাসকেও তারা সাদরে আমন্ত্রণ জানায় তাদের সাথে উৎসবে যোগ দিতে।

বিসাস ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে দেখেন তাদের উৎসব—এবার শুরু হয় বালিকাদের নৃত্য। কুমারী বালিকারা নানা ভঙ্গিতে নাচতে থাকে মন্দির-প্রাঙ্গণে। অস্ত্রাস্ত্রের সাথে বিসাস এবং পেইরীথাসও তাদের মনোহর নৃত্য দেখতে থাকেন।

হঠাৎ তাঁদের চোখ গিয়ে পড়ে অপরূপ সুলভী এক বালিকার ওপর। কুমারীদের সাথে সেও নাচে। কিন্তু তাঁর পাশে অপর সবাইকে যেন মর্শ্বন বলে মনে হয়। বিসাস বিম্বিত হন বালিকা হেলেনের রূপ দেখে।

এ যেন অপরূপ এক কুসর কুঁড়ি। কুঁড়িই যদি এত সুলভ হয় তবে ফুল না জানি কত সুলভ হবে, বিসাস ভাবেন মনে মনে। তাঁর জীবনে অনেক সুলভী নারী তিনি দেখেছেন। অনেক

দারীক তিনি বাছ বলে জ্ঞান করেছেন কিন্তু এখন রূপ তাঁর চোখেও আর আগে কখনো পড়ে নি।

বালিকা হেলেনের রূপের আগুন প্রৌঢ় খিসাসকে দগ্ধ করল। হেলেনকে পার্থক্য জ্ঞান হলেন বাতুল। বন্ধু পেইরীথাসকে তিনি জানালেন তাঁর মনের কথা।

পেইরীথাসও হেলেনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মনেও জ্বলো উঠেছে কামনার আগুন। ছুই বছর মধ্যে পরামর্গ চলে। ঠিক হর তাঁরা উৎসবকেন্দ্র থেকে হেলেনকে হরণ করে নিয়ে থাকেন। আদেশ তাঁর ওপর তাঁরা দুজনে বাছী রাখবেন। বাছীতে যিনি দ্বিভুবনে হেলেনকে তিলিলা লাভ করবেন।

খিসাস আর পেইরীথাস স্তবোধের অংশকার থাকেন। ভারপর এক সময় বিদারী বাজের মত বাঁশির পড়ে দুতায়তা হেলেনকে হরণ করে ছুই বছর পাগালে থাকেন। উৎসবমত জয়তা এই আকস্মিক বিপর্যয়ে বিদূত হয়ে পড়ে। তারা ভাল করে অপহরণ-কারীদের অঙ্গসংগ পর্য্যন্ত করতে পারে না, দেখতে দেখতে ছুই বছর হেলেনকে নিয়ে তাদের চোখের আড়ালে চলে যায়।

ভারপর হেলেনের ওপর বাছী রাখেন দুজন। দুজনেরই মনে আশা বাছীতে বোধ হয় সেই বিজ্ঞে, শেষ পর্য্যন্ত হেলেনকে পান খিসাস।

বালিকা হেলেন এতক্ষণ তাদের পাশে ঠাঁড়িয়ে ছুই প্রৌঢ়ের বাছী ধরা দেখতিল। হেলেনকে ওরা হরণ করে এনেছে উৎসবকেন্দ্র থেকে। ওদের ব্যবহারে সে বিস্মিত হয়েছে বটে কিন্তু ভয় পারিনি। ভয় তার কবনই করে না। নতুন কিছু ঘটলে সে স্তব্ধতা অঙ্গভব করে মাত্র। তাতে সে ভীত বোধ করেন না।

আর আজকের ব্যাপার খুব নতুন কিছুও ত' নয়। সে ত' মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করেছে তাকে দেখে পুরুষ কেমন বিস্মিত কেমন মুগ্ধ হয়। তার মনে হয়েছে তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন বসনা জানাচ্ছে তাকে। সে ভাল করে বুঝতে পারে না ঠিকই কিন্তু এ অল্পভূতি তার আগেই জগেছে। ঐ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আগুনের ঝিলিকও সে আগে লক্ষ্য করেছে কি? কি জানি হেলেন ঠিক মনে করতে পারে না। তবে আজ সে অঙ্গভব করে খিসাসের চোখে যেন হলুদ কিসের আগুন। হেলেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খিসাসকে কোতুলী চোখে।

খিসাসও ভালো করে দেখেন হেলেনকে, দশ বছরের বালিকা কুমারী হেলেন। কি সুন্দর, কি সুন্দর! খিসাস বলেন মনে মনে। এ যেন দেবী এক্সোদিতির মোহিনী মূর্তি বালিকারূপে ঠাঁড়িয়ে আছে তাঁর সম্মুখে। খিসাস আবার মুগ্ধ হন, আর মনে মনে আনন্দিত হন নিজের সৌভাগ্যে।

কিন্তু প্রবীণ খিসাসের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল, বালিকা হেলেন অপরাধী সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তখনো দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। খিসাস অচিরেই বুঝতে পারেন তাকে এখনো অপেক্ষা করতে হবে। হেলেনকে তখন তিনি নিয়ে যান এ্যাকিডনোতে তাঁর বা এ্যার্থার কাছে। মায় হাতে তিনি সমর্পণ করেন হেলেনকে। মাকে বলেন, অতি সঙ্গোপনে হেলেনকে লুকিয়ে রাখতে। কেউ যেন না জানতে পারে তার কথা। তারপর

এ্যাকিডনোের ওপর তাদের বন্ধার ভার নিয়ে পেইরীথাসের স খিসাস আবার বেহিরে পড়েন দেশ ভ্রমণে। বন্ধু পেইরীথাস তিনি কথা দিয়েছেন তাঁকেও তিনি সন্দরী কথা জোগাড় করেন। তারই যোজ্ঞে আবার বেহিরে পড়েন ছুই বছর।

এমিকে হেলেনের ভাইরাও তাঁদের অপহৃত। ভগিনীর ঐ বেরোন। খুঁজতে খুঁজতে তারা এটিকার এসে উপস্থিত হ। তাঁরা জানতে পারেন খিসাস হেলেনকে এখানেই কোথাও লুপ্ত রেখেছেন। তাঁরা সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন হেলেনের কথা। কিন্তু কেউই বলতে পারেন না, খিসাস তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন অবশেষে একান্তম্যাসের কাছে তাঁরা হেলেনের ঐচ্ছিক পায় বোনকে উদ্ধার করতে হেলেনের ভাইরা এ্যাকিডনী আক্রমণ করেন খিসাস নই। কে টেকাবে তাঁদের? এ্যাকিডনী পথল করে হেলেনকে উদ্ধার করে বিজয় গর্ভে তারা ফিরে যান স্পার্টার, আর সাথে যাত্রী করে নিয়ে যান খিসাসজননী এ্যার্থাকে। পুত্রের পায়ের ধারি জোগ করতে হয় এ্যার্থাকেও। ভীষনের অমলিষ্টাংশ হেলেনে ক্রীতদাসীরূপে কাটাতে হয় তাঁকে।

রাজা এডোনিয়াসের কড়া কোরকে অঙ্গহরণ করতে যে পেইরীথাস প্রাণ হারালেন। বন্ধুক হারিয়ে খিসাস এ্যার্থাকে দেখলেন হেলেনকে তার ভাইরা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন, এ্যার্থা এথেনীয়ানরা তাঁকে করেছে রাজ্যচ্যুত। হতরাজা অপহৃদিত খিসাস দেশভ্রমণ করে স্বাইরোসে গিয়ে উপস্থিত হেলেন এবং সেখানে রত লাটকোমিডিসের হাতে প্রাণ হারালেন। এই ভাবে হেলেনের প্রথম অপহরণকারী খিসাসকে লাঞ্চিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হল।

হেলেনকে উদ্ধার করে তাঁর ভাইরা আবার ফিরে এলেন স্পার্টার তাঁদের নগরের মণি হেলেনকে পেয়ে রাজা টিনোডরিয়াস এবং রাই লীড়া যেন প্রাণ ফিরে পান। আবার গিডুস্বেব নিশ্চিন্ত আবার মধো বড় হয়ে উঠতে থাকেন হেলেন।

দেখতে দেখতে বালিকা হেলেন কিশোরী হয়ে ওঠেন, কিশোরী হেলেন হন যুবতী। যে দেখে সেই বিস্মিত হয়। আর তার মণি মানবী এমন দেবদুর্গত রূপ কোথা থেকে পেল গো।

তাঁর রূপের খ্যাতি আর কেবল স্পার্টার মূল প্রান্তরে মণি আবদ্ধ থাকে না, তা ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রীসে, সমস্ত গ্রীসে আশেপাশে হয় তাঁর রূপের কথা। সবাই বলে এমন রূপ আর আগে কেউ বখান দেখেনি।

সারা গ্রীসের বীর এবং রাজাদের কানে পৌঁছায় হেলেনের খবর। তাঁরাও শোনেন বিগের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেলেনের রূপের খ্যাতি। শোনেন আর একে একে হাজির হন স্পার্টার। এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন রাজা টিনোডরিয়াসের প্রাণাদে।

স্পার্টার এসে তাঁরা দেখতে পান হেলেনকে। তাঁকে দেখে তাঁদের মনে হয় যে এতদিন বা শুনেছেন তা সত্যি নয়। সবাই তাঁর রূপের প্রশংসাই করেছে কিন্তু তিনি যে এত সুন্দর তা ত কেউ বলে নি। নারী যে এত সুন্দরী হতে পারে এত তারা নিজেরাই করনা করতে পারেন নি। তাঁদের মনে হয় বিরাটা যেন বিশ্বের সব সৌন্দর্যকে ভিলে ভিলে আচরণ করে তিলোত্তমা রূপে গড়েছেন হেলেনকে। তাঁরা আবার দেখেন হেলেনকে। বার বার দেখেন। আর বত দেখেন ততই মুগ্ধ হন।

হেলেনকে লাতের আবার মিনেলাস, ডায়োমিডি, ফিলোকটেটস, ইভোমেনাস, মেরিওণ, পেট্রোক্লাস, এ্যাকাজ, এক্টিলোকাস, ওডিসিয়াস আদি গ্রীসের তিরিশ জন শ্রেষ্ঠ বীর একে একে এসে হাজির হন স্পার্টায়। তাঁরা সবাই সাথে করে এনেছেন বহুমূল্য্য সব উপহার। মহার্ষ উপহার দিয়ে তাঁরা জয় করতে চান রাজা টিনডেরিয়াসের দ্বন্দ্ব।

রাজা টিনডেরিয়াস পানিপ্রার্থীদের তাঁর প্রাসাদে বাস করার জন্য যার আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের অর্থদ্ব্যাক্ষ্যের দিকে তাঁর মনেতে সন্নাহ দৃষ্টি। কিন্তু পানিপ্রার্থীদের এই বিপুল সমাগমে মনে মনে লজ্জিত হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি উদ্বিগ্ন চিন্তে জাবেন লগ্নাগত এই বীরদের মধ্যে ক'কে ভিগ্নি ক'ক রাজার সামিলে গল্পবাহী করবেন। এক জনকে তাঁকে নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু তাকে অল্প সবাই বিকৃত করেন। তখন তাঁরা যদি সমবেত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন তাহলে তিনি গ্রীসের রাজাদের সম্মিলিত এই আক্রমণকে ঠেকাবেন কি করে? টিনডেরিয়াস অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তিনি যিটু কথার কুট করেন সবাইকে। কিন্তু কারো উপহাসই তিনি গ্রহণ করতে সাহসী হন না।

এই বিপদ থেকে কি ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, চিন্তা করতে

থাকেন টিনডেরিয়াস। কিন্তু ভেবে ভেবেও কোন উপায় তিনি বের করতে পারেন না। এই সময় একদিন ওডিসিয়াস এসে তাঁকে বলেন যে তিনি যদি তাঁর ভাই ইকেরিয়াসের ক'ক পেনিলোপির সাথে তাঁর বিবাহ দিতে সম্মত থাকেন তাহলে তিনি তাঁকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। রাজা টিনডেরিয়াস সাগ্রহে গ্রহণ করেন তাঁর প্রস্তাব।

তখন ওডিসিয়াস তাঁকে জানান তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি বলেন, সমবেত পানিপ্রার্থীদের কাছে রাজা প্রস্তাব ক'কন যে, তাঁর ক'ক হেলেন হাঁকে প'ক'ন করবেন তাঁর সাথেই হেলেনের বিবাহ হবে। তবে গ্রীক বীরদের এই প্রতিজ্ঞা দিতে হবে যে হেলেনের মনোনয়ন তাঁরা বিদ্যা বিদ্যায় মেনে নেবেন। এবং হেলেনকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যদি কেউ হরণ করে নিয়ে যায় তবে তাঁরা সম্মিলিত ভাবে অপহরণকারীকে সাজা দেবেন এবং হেলেনকে উদ্ধার করতে তাঁরা তাঁর স্বামীকে সাহায্য করবেন।

ওডিসিয়াসের কথামত টিনডেরিয়াস সমবেত বীরদের কাছে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করলে তাঁরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পশ্চৎ করলেন যে, হেলেনের মনোনয়নকে তাঁরা অকুণ্ঠ চিন্তে মেনে নেবেন এবং তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কেউ অপহরণ করলে তাঁরা সম্মিলিত ভাবে তার বিদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথার গড়ালে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিচ্ছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সত্যতা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

শ্রীমদ মানস গহনা বিক্রীতা ও রত্ন-সংরক্ষণ
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



পাণ্ডিত্যবাদের মধ্যে ক'কে পছন্দ করবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না হেলেন। এঁরা সবাই গ্রীসের নামজাদা বীর। রূপে খুশে কেউই কম নয়। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর স্বামী হবার উপযুক্ত। অনেক চিন্তার পর গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ধনী রাজা এ্যাগাস্থেমেননের জাভা কুমার মিনেলাসকে তাঁর স্বামিরূপে বরণ করলেন হেলেন। বিপুল সম্ভোগভেদে মধ্যে মিনেলাসের সাথে হেলেনের বিবাহ হল। সম্ভোগভেদে তাঁদের সন্তকামনা জানিয়ে সমবেত বীররা স্পার্টা জাগ্রত করলেন।

এর কিছুদিন পরেই রাজা টিনডেরিয়াস মারা যান। পুত্র ক্যাটর আগেষ্ট মারা গিয়েছিলেন। তাই টিনডেরিয়াসের দুকৃত্য পর তাঁর জামাতা মিনেলাসই হন স্পার্টার রাজা, লক্ষ্মী রাণী হেলেনকে নিয়ে পরম সুখে দিন কাটতে থাকে তাঁর।

ঝাড় দারের বউ

[একটি মেথর মেয়ের জীবনের বোম্বাল ও ট্রাজেডি]

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

লারি কৈসে কৈসে হুচোখ লাল করেছে। শান্ত্তীর গল্পনা আর সহ হয় না। কারণে অকারণে কি বকুনিটাই না দেয়। সেই কোন বকালে মুখে ললটু পথ্যন্ত না দিয়ে কাড় হাতে বেয় হয় লারি।

শৈতের প্রভাত কুয়াশায় ভেয়ে থাকে চারদিক, রাস্তার ঝাড়, চালাতে হাত আর উঠে না। অবশ হয়ে যায়। আজ ঠাণ্ডাটা হুঁ-বৌ, গায়েব চৌলী ওড়না হিমবরফ হয়ে শরীরের রক্ত জমিয়ে মাঝে মাঝে লারি আবক্ষ লম্বা ঘোমটা তুলে এদিক ওদিক চাইছে। লারি এগিয়ে চলল কাড়ু লাগাতে লাগাতে পাকা সড়ক ধরে। কাহার-বস্তির দু-চারটে বউ উঠে বেরিয়ে পড়েছে কাজে, বাসন মাজতে হবে তাড়াতাড়ি বাবুদের বাড়ীতে। সবাইই অফিস আছে। বড় কাহার ছেলেটা পাড়ার আরো দু-চারটে ছেলে-মেয়ে জমিয়ে ঘরের দোরে রাস্তায় খড়কুটো জালিয়ে আঙন ধরিয়েছে। অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়েগুলো অয়িকুণ্ডের চারদিকে গোল হয়ে বসেছে। লারি আঙনটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে, সে যদি এই গরম আঙনটার পাশে বসতে পেত, ঐ লাল লকুলকে অগ্নিশিখাতে হাত-পাঙুলে একটি সৈকে নিতে পারত। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে ঝাড় চালাতে লাগল! এদিকে এক ঝাপটা। ওদিকে এক কাপটা। বা ময়লা ভাতে আসে সেটুকুই জমিয়ে নের। নিখুঁতভাবে ঝাড় চালাবার মত তার মনের অবস্থা নয়। লম্বা বাঁশের শলার ঝাড়ুটা দিয়ে যেন সে রাস্তাটাকে পিটিয়ে চলেছে, তার লাল ঘোঁটা মলিন পায়রাটা চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটোছে আর উঠছে।

চলতে চলতে লারি সিঁকির ছোট দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। সিঁকির ছোট কাড়ের দোকানের দরজা খুলে গেছে। দ্রুতত উঁচু কব্জার চুলাটোতে এরই মধ্যে কব্জার আঙন গনগন করছে। আর বড় কালা কেটলীটার জল ফুটে উঠে গরম করে। দু-চার জন খরিদার এসে, ছুটে গেছে, লারি হাতের কাজ স্থগিত রেখে

দোকানটার দিকে চেয়ে বইল। সিঁকি দোকানদার চট করে চা ডিঝিয়ে ফেলেছে ছোট ছোট চীনা মাটির পেরালাতে ধুমায়িত চা ঢেলে দিয়ে এক এক পেরালা খরিদারের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে আর পকেটে দু-হু আনা পরসি ফেলেছে। লারি লুক নরনে চেয়ে বইল ওই ধুমায়িত গরম চায়ের পেরালায় দিকে। আঁতা সে যদি এরকম একটা পেরালায় এখন একটু গরম চা খেতে পারত। আঁতা তার শরীরা কেমন চালা হয়ে উঠত তা হলে, কিন্তু তার অদৃষ্টে কি এই সুখ আছে? কি জন্মই না নিয়ে এসেছে সে। শুধু ঝাড় লাগাও, আর ঝাড় লাগাও, আর বাকী সমস্তটা শান্ত্তীর গল্পনা, আর তার কাজ।

লারি চায়ের টল থেকে চোখ ফিরিয়ে মন দিল নিজ কাজে, তাড়াতাড়ি ঝাড় চালায়ে ছুঁল বড় সাহেবের বাংলোর। সেখানকার কাজ শেষ করে বাবে কোর্টে ঝাড় লাগাতে, বাবোটার সব কাজ শেষ করে ফিরবে বাড়ী, একথা ভাবতে ভাবতে মনটা একটু খুশী হয়ে উঠে।

কিন্দেয় পেট চৌ চৌ করে উঠছে, বাড়ীতে গিয়ে লানাপানি পেটে পড়লে শরীরটা একটু তাজা হবে। খুশী মনে এগিয়ে চলে লারি, কম কম করে বেছে উঠে পায়ের পায়েজোড়। লারি জলদি চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারী লাল বাঘরাটাও তুলতে থাকে ত্রস্তে, মুখে একহাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে যথাস্থি মুখখানা মুছে, লারি ঘোমটা তুলে, এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলল। রাস্তা নির্জন দেখলে কখনও বা গানের এক দু কলি গেয়ে উঠে। তার বয়স খুব বেশী হলে অটোরো-উনিশ। মাসাদের দুখেকুট ওর মনের রস এখনও নিঃশব্দ করে শুয়ে নিতে পারে নি। অকালে দু-চারটে শিশুর জন্মটা হয়ে তার জীবন এখনও ভায়াফান্ত হয়ে ওঠেনি, তাই শান্ত্তীর গল্পনা খেলে এখনও মুখে হাসি ফুটে, ঘিটে গলায় দু-এক লাইন গান গেয়ে ফেলে।

আজ তার বছর হল বিয়ে হয়েছে লারির, স্বামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়। স্বামী রেলের ঝাড়দার, বেশ মাইনে পায়। সন্ধ্যার মদ খেয়ে চুপ হয়ে থাকে, বেশীর ভাগ রাতই মাতাল হয়ে এসে মাতলামী করে। যেদিন ঝাড়দার কিধাণের মেজাজটা থাকে বিগড়ে, সেদিন রাত্রে এসে যদি দেখে লারি ঘুমিয়ে পড়েছে তবে মেজাজটা যায় আরো খিঁচড়ে, ঘুমন্ত লারির গায়ে পা দিয়ে একটা ঠোঁকর দিয়ে বলে, এই বেগম-সাহেবা উঠ, মজাসে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে কেমন, আর আমি শালা, খেতে খেতে মরি। চা জলদি আন, কটি গরম করে নিয়ে আর, ঠাণ্ডা খাবার দিলে লাখি লাগাবো জোরসে।

লারির নামে লারির চোখের ঘুম ছুটে যায়, আচম্ভা লাফিয়ে উঠে ঠোঁকর থেকে, চোখ কচলাতে কচলাতে উঠানে ফুঁ দিতে থাকে। ধোঁয় আর মনের কাশাহ চোখের জল করতে থাকে। সাধারণ খেটেখুটে একটু আরাম ঘুমাও, সে উপায়ও নেই। মাসের মধ্যে দু-চার দিন তার লাখি খাবার সৌভাগ্য ঘটে। লারির মনটা এক এক দিন বিধিয়ে গুঠ, মাঝে মাঝে মার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু শান্ত্তী মাগী যেতে দেবে না, বলে, যার কাজকর্ম কে করবে?

কোন কোন দিন কিধাণের মেজাজটা বেশ খুশী থাকে, ফাঁট রাশ,

সেইকণ্ঠে জ্ঞানের ধনী আবেদনের কামরা খেঁড়ে দু-চার আনা বকশিস পেড়ে পেতে টাকা দেড় টাকার পৌঁছে যায়। খুশীমনে বাড়ী ফিরে। সেদিন লারির অন্তঃস্থতা ভাল থাকে। কিষাণের মিষ্টি কথার আদরে লারি অল্প জগতে চলে যায়।

এমনি এক স্তলগনে কিষাণ খুশীমনে বাড়ী ফিরে দেখে, লারি একটা কাপড়ের পুটলির মত মলিন শরায় শুয়ে আছে। মাথার লম্বা ঘোঁটটা অভ্যেসমত এখনও মুখের উপর পড়ে আছে বাজের ঢাকনার মত।

কিষাণ বীরে বীরে ঘোঁটটা সরিয়ে দেয়। সারা দিনের কষ্টক্লান্ত ঘুমন্ত গামল মুখখানা কিষাণের মন মায়ায় ভরে ভুলে। বীরে বীরে লারির লাল-নীল কাচের চুড়িভরা সুগোল হাতখানা টেনে ডাকে, লারি, ও লারি, ওঠ, চল সিনেমায় যাবি?

প্রথম যেন লারি বুঝতেই পারে না কিষাণের কথা। মিষ্টিগলার কিষাণ ডাকছে, সে বিশ্বাস করতে পারল না। চোখ বগড়িয়ে লারি ভাবে, সে স্বপ্ন দেখছে, কিষাণের হাতের এক হাল্কা খেয়ে লারি লাকিয়ে উঠে লাখি খাবার ভয়ে। কিন্তু কল্পমুষ্টির পরিবর্তে দেখে হাসিমুখ।

আশস্ত হয়ে চলে উঠানের কাছে বমকমারম করে, কিষাণ হাতটা টেনে ধরে বলে, কোথার ছাচ্ছিল বল, সিনেমায় যাবি? খুব ভাল খেলা আছে।

খুশীতে লারির চোখ-মুখে হাসি ঠিকের পড়ে। ধপ করে বলে যায় কিষাণের পাশে। মেহেন্দী-রাস্কানো হাতে কিষাণের হাত ধরে বলে, সত্যি যাবে?

সত্যি নয়ত মিছে নাকি? এই দেখ কতকগুলো পয়সা উপরি পেয়েছি, বলে লারির হাতের উপর ঢেলে দেয় কিষাণ।

স্বামীর মিষ্টি কথায়, ব্যবহারে লারি যেন স্বর্গে উঠে যায়। তাড়াহাড়ি কিষাণকে খাইয়ে পোষাক পরতে স্ত্রক করে। বিয়ের পর কিষাণ তাকে একটা বড় বড় গোলাপফুল-ছাপ দেওয়া বস্ত্রী টিনের বাস্র কিনে দিয়েছিল। লারির কোমরে একটা শিকলে তার চাবি ঝুলানো থাকত। লারি সেই চাবি দিয়ে বাস্রটা খুলে তার বিয়ের লাল টুকটুক কাঁচরাটা ও নকল জরির বর্ডার-দেওয়া ফুল-তাল্লা গুড়নাটা বের করলে।

লারির গায়ের সহরের হাওয়া লেগেছে, সে দেখেছে বড় সাহেবের মেয়ে মাথার মাঝখানে নীখি কেটে কি সুন্দর ছদিকে ছটা বেথী করে। আজ সে-ও অমনি করে ছটা বেথী ছদিকে ঝলিয়ে দিল। কপালের মাঝখানে একটা বড় কুহুম-কাঁটা দিলে।

কিষাণ অবাক হয়ে বলে বলে লারির সাজপোষাক দেখছিল। ছোট একখানা কামরা, তারই এক কোণাতে একটা উঠান, একপাশে একটা মাটির ভিটা; তাতে ধানকতক বাসন উপড় করা আছে। ঘরের চাল থেকে একটা বাঁশ লটকানো আছে, তাতে সকালে সব বিহানা চানর ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখে। আর এক কোণায় ছটা পেরেক বশি বাঁধা, তাতে কিষাণের ও লারির ব্যবহাধ্য কাপড়-জামা রাখা আছে।

দেয়ালে একটা সম্ভার আঁখনা টাঙ্গানো। পাশে একটা কেবাসিন কাঠের বাজের উপর দুটা চিকরী, এক টুকরা বস্ত্রী সাবান। ছটা চুলের ফিতা। দু'ভারটে ক্লিপ পড়ে আছে।

কিষাণের সামনে পোষাক পরতে লারির লজ্জা করতে লাগল, তাই কিষাণের একটা বৃত্তি বাঁশে ঝুলিয়ে আঁক করে সে সব্বেরে প্রসাদন করতে লাগল।

এত দিন কিষাণের চোখে লারি একটা বাঘরা-গুড়নার পুটলিই ছিল। আজ কুঁড়ে ঘরে সামান্য একটা কেবাসিন লঠনের যুহু আলোতে লারির স্তম্ভা অকুসেহ অপরূপ হয়ে দেখা দিল কিষাণের সামনে। অবাক হয়ে গেল কিষাণ।

তার। দুজনে যখন সিনেমার সেকণ্ড শোর জন্ত রাত্তার নেমে পড়ল, তখন কে বলবে এই দম্পতি দিনের সেই নীল কুঠী আর জাসিয়া পরিহিত কিষাণ। আর মোটা লাল কাঁচরা পরিত্তিতা কাঁড় হাতে লারি।

দুজনে নিরালা রাত্তার হাত ধরে চলল, বড়রাস্তার উঠে হাত ছেড়ে পাশাপাশি বেতে লাগল। কিন্তু সেদিন রাতে লারি আর কিষাণের মনে যে মধুর অমুভূতি খেলে গেল, সে অমুভূতি তার জীবনে আর কোন দিন বুঁজে শেল না।

গড্ডলিকা প্রবাহে দিন কেটে চলেছে দুজনের। কিষাণের আর আজ-কাল অনেক বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মদের পরিমাণ। কিষাণের মনের গতিয় সঙ্গে তাল রেখে লারি চলতে পারছে না। বতি ভেঙ্গে বাচ্ছে।

কখন কখনো কিষাণের আদর সোহাগে লারি মনে করে সে ডুসুর্গে আছে। আর কখন কখন লাখি-ঝাঁটা খেয়ে মনে হয় সে নরকে ডুবে আছে। শান্ত্তী মরও না তবও না। বলে বলে খেয়ে খেয়ে এই মোটা জ্বরবস্ত্র হয়েছ। তার জ্বরের বোগান দিতে লারি হয়রাণ হয়ে উঠল।

সেদিন লারি অকারণে শান্ত্তীর বকুনি খেয়ে বলে ফেনেরে সারাদিন ত খেতে মরছি, তবু কেন বকে চলছে?

শান্ত্তী তেড়ে উঠে বললে, হারামজাদী, আবার বুঝকরা শিখেলি? যা বলব তাই করবি, নয়ত নোড়া দিয়ে মুখ খেঁতো করে দেব।

লারি অজোরে কঁদতে থাকে। তার হৃৎকের কাহিনী কাক বলে? স্বামী বলতে থাকে বুঝায়, সে তো রাতে মাভাল হয়ে ঘরে ফিরে। লারি কঁদতে কঁদতে বাড়ী চালায় আর মুখে বিড়বিড় করে বলে, কি জমই না এনেছি আমি। শান্ত্তীর বকা আর স্বামীর মার খেতে খেতে মরলাম। মাঝে মাঝে লারির সেই রাতটার কথা মনে পড়ে, যেদিন দু'জনে সেজে-গুজে সিনেমায় গিয়েছিল। আহা সিনেমটা কি সুন্দর। শুধু ভাল ভাল সুন্দর পোষাকে সেজে-গুজে নাচ আর গান। আর শিয়ার সঙ্গে মিলন। এক একদিন হাতের কাঁড় চালানো দু-চার মিনিট বন্ধ রেখে লারি সিনেমার কথা ভাবে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

কিষাণ যেন ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। একদিন লারি বললে, চল না সিনেমায় যাই। কিষাণ ধমকে বললে, পরশা যেন সস্তা দেখেছিল, যা রাস্তা করগে ভাল করে।

লারিতে যেন কিষাণ আর কোন মাধুর্য্য বুঁজে পায় না। লারি তার কাছে ভাপসা হয়ে উঠেছে, যেন পাখা ভাত।

লারির কটিনবাঁধা জীবন চলেছে, সকাল ছয়টা ছেকে বায়োটা আর তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছয়টা অবধি বড় স্ত্রক কাঁড় চালানো।

আর বড় বড় দু'চারজন অফিসারের বাড়ী কাজ করা, তা ছাড়া যাদাবাদী বাসন খালা সব ত আছেই।

পুলিশ জমাদারের বাড়ীতে লারির ভিউটি পড়েছে মাসেক বাৎ। তার নন্দ ও বাড়ীতে কাজ করে। নন্দ এখন আঁড়ুঘরে, তাই লারি তার বদলে সে বাড়ীতে কাজ করছে। বাড়ীর গিল্লী কয়েক দিন হল বাপের বাড়ীতে চলে গেছে। লারি দু'বেলা কাজ করে। জমাদার তারি মিষ্টি কথা বলে মাঝে মাঝে লারির গুড়নাতে ঢেলে দেয় উৎকৃষ্ট কুটি তরকারী মিস্টি, এসব নিয়ে চলে যায় লারি স্বমুখমাক্ষ্ম করে পাতেল বাড়িরে।

সন্ধ্যার সময় জমাদার প্রায়ই উঠানে পারচারী করে, তার খাকী হাফপ্যান্ট আর চওড়া চামড়ার বেল্টটা যেন তার জুড়ির শরিবিটা বেঁধেন করতে পারছে না ভাল ভাবে। গোলকালো মুখখানাতে মস্ত একজোড়া গোফের নীচে দাঁত বের করে হাসে, আর কুংকুতে চোখ দুটো দিয়ে কেমন সাপের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অবশিষ্ট লগে লারির।

শীতের সন্ধ্যা, চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, লারি তাড়াতাড়ি কাজ শেষে বাড়ী ফিরছিল। এমন সময় জমাদার হাঁক দিয়ে বললে, কুটি-ভালি নিয়ে বা।

মুখের ঘোমটা আরো টেনে সজ্জিত ভাবে লারি গুড়না তুলে ধরলে জমাদারের সামনে। জমাদার গুড়নায় কুটি ঢালতে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলে, বললে, লারি, তুই বোল আমার কাছে আসবি, পা টিপে দিবি, আমি তোকে অনেক জামা কাশড় পরসা দেব, তোর ছুখ থাকবে না।

লারি হাত ছিনিয়ে ছুটে পালিয়ে এল। এই শীতের সন্ধ্যায়ও তার শরীর দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। পরের দিন জমাদারের বাড়ী যেতে লারির আর পা ওঠে না, কোনরকমে ভয়ে সে কাজ করে এল। সেদিন জমাদার আর কিছু বললে না বাটে, কিন্তু প্রায়ই তাকে নানা প্রলোভন দেখাতে লাগল।

বাড়ী ঢালাতে ঢালাতে লারি কোন কোন দিন ঘরের ভিতরটা চেয়ে দেখে, মাঝখানে হুটো টেবিল চোয়ার, এক পাশে একটা লোহার খাটে সালা ধবধবে বিছানা, কেমন পরিষ্কার ফিটকাটা। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের ছিন্ন মসিন শয্যার কথা মনে পড়ল। আহা, ঐ ঘরের মত সালা নরম বিছানায় শুতে না জানি কত আরাম! কিন্তু আবামের জীবন ত ভগবান লারির জন্ত রাখেন নি, নইলে লারি মেথরের ঘরে জন্ম নিয়ে কেন? লারি ছেড়ে দিল নন্দের বদলী কাজ।

কিন্তু ঘরেও লারির মন ঠেকে না, ঘরের আবহাওয়া যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। প্রায়ই অপরিচিত লোক আসছে থাকে, শান্ত্রী তাদের সঙ্গে কিসকিস করে কি কথাবার্তা বলে, লারিকে দেখলেই চুপ হয়ে যায়।

কিবাণ ত তার সঙ্গে কথা বলা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে, সেদিন নিজের থেকেই কিবাণ লারিকে ডেকে বললে, তুই বড় শুকিয়ে উঠেছিল, যা তোর মার কাছে কম দিন থেকে জিরিয়ে আয়। লারির ভিতরটা কেমন এক অজানা আশঙ্কার রক্বে উঠে। কিন্তু ছুদিনের ভিতরই সে সময়সী মেথর-বোর কাছ থেকে খবরটা

জামতে পারল। কিবাণ আবার বিয়ে করবে তারই আয়োজন চলছে। লারির হাত থেকে টুকরী আর ঝাড়ুটা খসে পড়ল মাটিতে, তার আর পাঁজাবার কমতা নেই, সে বশ করে মাটিতে বসে গেল।

হতভাগিনী লারির চোখের সামনে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। খুব বাজনা বাজিয়ে হলদি লাগানো হল কিবাণকে, লারি ঘরের পেছনে বসে তার পোষা ছাগলছানাটিকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে। ভগবান শুধু ঝাড়ু লাগাবার জন্তই তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নি। স্বামী মাতাল হোক, যাই হোক, তবু ত এত দিন তার নিজস্ব একারই ছিল, সেই মাতাল স্বামীকেও কেড়ে নিতে চলেছে আর একজন। যেন নতুন আসবে সে স্বামীর সাহায্যিনী হবে। আর তাকে হতে হবে তাদের দাসী। মন যোগাতে হবে নতুন বৌ-এর।

লারির চোখের জল আর বাঁধ মানে না। দু'দিনেই লারির মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে। চুলগুলো কক হয়ে উড়ছে, তেলের আর আঁচড়াবার অভাবে। জাতে মেথর হলেও সে নারী, সে অষ্টাঙ্গী। তার গ্রামল মুখখানাতে একটা কোমলতা আছে। কালো চোখের দৃষ্টি সুন্দর সরল, কিন্তু সেট গ্রামল মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে দুঃখের আগুনে। তার মুখের দিকে চাইবার, দুঃখিনীকে সমবেদনা জানিয়ে সরসে কাঁদে টেনে নেবার কেউ নেই।

কিবাণ বিয়ে করে ফিরে এসেছে, বউ ফর্সা, সুন্দরী। কিবাণ ভোসওয়াল থেকে একশ টাকা মুজরা দিয়ে বাড়ী আনিয়েছে, যাতে নাচ-গান হবে। আসব বসেছে চান্দোরা খাটিয়ে। নতুন বৌকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। মেথরের বড় জমাদারের মেয়ে সে। কাজেই সবাই তাকে একটু খাতির করছে। লারি বরকতকে দূর থেকে দেখতে লাগল, তার চোখে একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। আসরের চারদিকে গ্যাসলাইট আলিয়ে উজ্জ্বল করা হয়েছে, কিবাণ হাসিমুখে নতুন পোষাক পরে সব তদারক করছে। মেথরবোরা সাজগোজ করে মুখের ঘোমটা কমিয়ে এক পাশে বসে আছে বাড়ীকী নাচ দেখতে। অনাদৃত লারির খোঁজ কেউ করলে না। তাদের জাতে ত এমন হয়েই থাকে, তিন চারটে বিয়ে না করলে মরদ আবার কি? এ কি সহরে বাবু যে এক বউর আঁচল ধরে থাকবে? লারির ভাগ্য ভাল, তবু ত চার বছর একা স্বামীর ঘর করেছে।

এত সব যুক্তি লারির মন মানে না। ছুখে রাগে শুমরাতে থাকে। সে দূরে খুঁটি ধরে পাঁড়িয়ে থাকে, আসরের দিকে তীর দৃষ্টিতে চেয়ে।

বাড়ীকীর নাচ-গান আর নুপুর তবলার আওয়াজ শুনে শুনে হঠাৎ বহুদিন পূর্বের সেই সিনেমা-রাস্তার কথা লারির মনে হল, গানের লাইনটা মনে পড়ল, "পিয়া মিলন কো যানা হ্যায়"। কিন্তু হায়, তার পিয়া কোথায়? সে তো নতুন নিয়ে মশগুল। লারির হুঁচোখে আবার জলের গায়া নামে।

নতুন বৌকে দেখতে দেখতে হিসার রাগে লারির বুক ঝলতে

লাগল। লারির চোখের সামনে চোখের পলকে ভেসে উঠল একটা ঘর। পুলিশ জমাদারের মোটা গায়েবের নীচে বাকা হাসি। চোখে-মুখে একটা লোলুপতা, গা শিউরে উঠল। নতুন বোর দিকে চেয়ে চেয়ে লারি ভাবতে লাগল, হ্যাঁ, সে প্রতিশোধ তুলবে। কিষণ যেমন নতুন বোকে নিয়ে আনন্দে মগন হ'বে তেমনি সে-ও তার জীবনের সুখের পথ বেছে নেবে।

লারির দু'চোখে আগুন বেজতে লাগল। সে উঠল, নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলে। কোমর থেকে চাবি বের করে গোলাপ-ফুলওয়ালা টিনের বাজ খুলে তার সুন্দর বাঘরাটা বের করে পরল। কক্ষচুল সামনে টেনে নিয়ে বাঁধল। লঠন তুলে নিজের মুখখানা আয়নাতে দেখে ঘীর ঘীরে লারি বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

কিছুদূর গিয়েই লারি তার সংকল্পে পালিত ছাগশিশুর ম্যা-ম্যা ডাক শুনতে পেল। ধমকে দাঁড়াল। একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন ছেয়ে গেল। সে কিরে ছুটে চলল তার ক'ডেকে। বেগতে পেল দরজাটা দ্বিধা খোলা। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে তার ছাগশিশু অসহায় ভাবে ডাকছে ম্যা-ম্যা! লারি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বৃকে তুলে নিল। তারপর তার মলিন পরিত্যক্ত বিছানায় বসে পড়ল। নগর ছাগশিশুও পরমানন্দে লারির কোলে আগামে চোখ বুজল। আর লারি তাকে বৃকে জড়িয়ে ধরে হৃদ করে কুঁকিয়ে কঁদে উঠল বার্থ বোথে, ফোভে।

মেয়েদের ক্যাম্পে থাকা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

৫৭ টা—৫৮ টা—না, না, মন্দিরের কি গির্জার ঘটা নয়—সুসেরও না—ক্যাম্পের।

ক্যাম্পের ঘটা পড়ল, পতাকা অভিবাদন করবার। সকালবেলা উঠে এই জগৎ প্রস্থত হ'য়ে নিচ্ছিল মেয়েরা তাড়াহুড়ি—এখন কেউ বা চুল কেটে বা কাপড় ঠিক করতে করতে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল পতাকার সামনে।

'জয় হিন্দ' ব'লে অভিবাদন শেষ কর'য়ে মেয়েরা লাইন করে চলল মাঠে—প্রকৃ হ'ল দিনের কটন। ব্যায়াম-শিক্ষিকত্রীরা ব্যায়াম শিক্ষা দেবেন এখন মেয়েদের। ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, শুষ্ক হাতে ব্যায়াম অথবা কুচকাওয়াজ চলেবে কিছুক্ষণ।

কি উৎসাহ মেয়েদের—লাফাচ্ছে, নাচছে, ঘুরপাক খাচ্ছে—ছন্দোবদ্ধ সঙ্গ ফুলের মালার মত হয়ে অঙ্গ সকালন করছে—কখনও দাঁড়াচ্ছে সবুজ গালাচে বিছানো মাঠে শাদা শাদা ফুলের ভীষণ সুবন্ধ হয়ে। দেখছি গুদের সজীবতা, গুদের চকসতা, গুদের আনন্দ, গুদের প্রাণশক্তি।

কে বলবে এই মেয়েগুলিই আমাদের বিত্তালয়ে রূপে রূপে বসে থাকে। কোলকুঁজো, বিষাদের প্রতিমূর্তি হয়ে, কিমানো কিমানো চোখে নিশ্চই নিরাসক্ত দুটি নিয়ে তখন ছনিয়ার স্নান

অম্লিত লাভণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাভণ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী হান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বকে মখমলের মত কোমল ও মৃদু কোরে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

আর অবসাদ মাথানো থাকে, যেন ওদের দেহে-মনে সমগ্র সত্যায়।
সেই মেয়েগুলিই—

ওদের চা খাবার ঘটা পড়ে—তবুও আরেকটু ব্যায়াম করতে
পারলেই ওরা খুশী হয়—কিছু উপায় নেই—সব বাধা নিয়মের
হুকে—একটি মিনিট এদিক ওদিক হবার উপায় নেই ক্যাম্পে—তাই
মাঠ ছেড়ে এবার আসতে হয় খাবার ঘরে।

জলখাবারের খালা, চায়ের কাপ-ডিস নেবার ভদ্রী—খাবার
ভদ্রী—পরে পরিষ্কার করে ধুয়ে এনে ওছিয়ে রাখার ভদ্রীর ওপর
নয়র পাবে ওরা।

কি তৎপরতা, কি নিখুঁত করে কাজ করবার প্রচেষ্টা ওদের।
আর টেনার্সিটি নেই—আগে নিক্স নেব এ অভিসন্ধি নেই পিছনের
জনকে এগিয়ে দিতেই ব্যস্ত ওরা। আর অস্ত্রহীন। এই মেয়েরাই
করে টেনার্সিটি চীৎকার—আগে এগিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা অসভ্যতা।
আশ্চর্য লাগে। কোন বাই মস্ত্র যেন ওরা ক্যাম্পে ঢোকা মাত্র
শিখে নিচ্ছে যে এটা নিয়মের রাজত্ব। অথচ এখানে কেউ নিয়ম
চাপিয়ে দিচ্ছে না যাড়ে। কি ভাল, লক্ষী আমাদের মেয়েরা। অথচ
এদের নিয়মে আনতে হিমসিম খেয়ে বাই আমরা ফুলে—
কেন ?

চা খাবার পর ক্লাস। না, না, নীরস পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, 'দেখো
মেয়েরা, হিঃ, হিঃ, তোমরা কিছু জান না', করে আরম্ভ করা ক্লাস
নয়। ভোজর গোয়ালে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে বসে গলদহর
হবার মত ক্লাসও নয়। যা শুনতে ভাল লাগে—যেমন ভাবে শুনতে
ভাল লাগে শুদ্ধশ্রুত আরামে বসে, তাই শোনায় ক্লাস। গল্পের
মাধ্যমে জ্ঞানভাণ্ড উজাড় করে দেওয়া—ছবি, আবৃত্তি, গান, অভিনয়,
উৎসব নানা উপকরণের সাহায্যে। দেখাকে দেখা বলেই মনে হয়
না—শুধু আনন্দ, শুধু উৎসাহ, শুধু অল্পসঙ্কিতার মাধ্যমে কৌতুহল
জাগানো বিষয়ে অমূল্যকি বাড়ানো।

কোথা দিয়ে কেটে যায় পুরো একটি ঘটা, হুঁস থাকে না
মেয়েদের—শিক্ষয়িত্রীরও। আর ফুলে ? ৪৫ মিনিটের পিরিয়ডেই
প্রাণ জ্বাি মধুহরন ! দারোয়ান ঘটা দিচ্ছে না—টুলে বসে ঘুমিয়ে
পড়েছে ভেবে মনে মনে দারুণ অস্বস্তি, অশান্তি—ছাত্রীদের,
শিক্ষয়িত্রীদেরও।

ক্লাস শেষ হলে আলপনা আঁকা বা মাটির কাজ অথবা উই-এর
ক্লাস আরম্ভ হয়। বায়ান্দায় ভাগে ভাগে বসে পড়ে মেয়েরা, মনের
মাথুরী কুটীর তুলতে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে। কত সৌন্দর্যজ্ঞান,
কত সজ্জাবনা-সমুজ্জ্বল কোরক ওদের মধ্যে। সুযোগ-সুবিধা
সহায়ত্বের অলংকার গুণোটা হাওয়ায় তা আলোর খুঁশ দেখে না
কোন দিন অথবা দেখলেও অকালে শুকিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি
সমস্ত মন হুমুড়ে ওঠে হাতাকারে।

হাতের কাজ শেষ হলে তাতীর সঙ্গীত ও অস্ত্রাঙ্গ বদলী
গান অভ্যাস করে মেয়েরা। সবচেয়ে সমান উৎসাহ, সমান আনন্দ
ওদের।

এর পর বাগানে ধানিকটু কাজ করে, ঘর-দোর পরিষ্কার করার
কাজ সেরে হান করতে যায় মেয়েরা। যে দলের ওপর যেদিন ভার
থাকে সেই দল রান্নাবান্না করে বেখেছে ইতিমধ্যে। খেতে বসে ওরা।
নিজেরাই টাই করে—নিজেরাই ভাগে ভাগে পরিবেশন।

খাওয়ার পর বাধ্যতামূলক শৌচায়ার ব্যবস্থা এক ঘটা। তার
পর স্নান হয় কাঠি এড ও নার্সিং-এর ক্লাস। প্রত্যেক মেয়েটির মনের
মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি সেবাকাজিনী নারী—এই সময় তা
বোঝবার মেয়েদের শেখবার আগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক শাস্তি দেবার
উপায়গুলি জেনে নেবার আন্তরিকতা দেখে।

এই ক্লাসের পর আরম্ভ শেলায়ের ক্লাশের। অল্প সময়ের মধ্যে
সুন্দরভাবে সহজে যে সব সেলাই শেখা যায় তাই শেখানো হয়
ক্যাম্পে। তারপর আধ ঘটা ওদের নিজেরদের বই বা খবরের কাগজ
পড়বার সময় দেওয়া হয়।

রোদও পড়ে আসে ওদিকে—তখন ওরা মাঠে গিয়ে লাঠিখেলা
শেখে। সামান্যতম হলেও আত্মরক্ষার উপায় কিছু শিখতে হবে
বৈ কি মেয়েদের। যে হাত আলপনা আঁকে, সে হাত লাঠি চালানোরও
সক্ষম, এ দেখে আশায় মন ভরে যায় কত যে !

এর পর চুল বেঁধে গা ধুয়ে মেয়েরা ফল আর দুধ খেয়ে নেয়
তাড়াতাড়ি। শ্রম-শ্রমের পর ক্ষয়পরিপূর্ণ—বিশ্রাম ও খাদ্য নিয়ে
—এসত্য ক্যাম্পে মেনে চলা হয় সব সময়। আমাদের প্রাচুর্যের
জীবনে আমরা ইঞ্জিন চালিয়েই চলি—তাকে বিশ্রাম দেওয়া, তেল
দেওয়ার কথা ভেবেও দেখি না সব সময়, আমরা দেখলেও উপায়
থাকে না হয়ত তাই যেন ভাববার দরকারই নেই এমনি ভাবে থাকি
—তাই আমাদের কাজে প্রাণ থাকে না, উৎসাহ থাকে না, সৌভাগ্য
থাকে না—করতে হয় তাই কবি এমনি একটা ভারই শুধু থাকে।

ক্যাম্পে প্রতিদিন নানা বিশিষ্ট লোকের আগমন হয় বিকলের
দিকে। মেয়েরা বলে—তাদের কাছ থেকে শিক্ষামূলক বক্তৃতা বা
কাহিনী শোনে প্রত্যাহ। এই সব লোকদের সঙ্গে পরিচিত হা—
তাদের অহেতুক লজ্জা, জড়তা কাটিয়ে উঠে, সম্প্রতিভ, চটপট হয়ে
ওঠে চলায় ফেরায়, কথাবার্তায়—প্রেরণা পাঠ তাদের মত হওয়া—
আত্মপ্রত্যয় স্রুত হয়ে।

—বিকলের চা ও শুসখাবার মেয়েরা অতিথিদের সঙ্গে বস
থায়। তারপর সাধারণতঃ সিনেমা বা ম্যাজিক র‍্যন দেখানো হয়
—আবার মেয়েরা নিজেরা গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদির
মাধ্যমে আনন্দ করে। কিবা দিদিরা তাদের গল্প বলেন কি তারাই
গল্প শোনায়। এতে মেয়েদের বলার ক্ষমতা বাড়ে, সাচ্চা কাঠে—
নিজেকে প্রকাশ করবার প্রেরণা ও উৎসাহ আসে।

বাতের বাতরা হয় এর পর—একটু ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়ানো হয়
তারপর—সব শেষ পতাকা নামিয়ে শুতে বাওয়া। শোবার আগে
কিছু রোমন্থাচা দেখা চাই প্রত্যেক মেয়ের।

এই হল রোজকার মোটামুটি রুটিন ক্যাম্পে—সুবিধা অসুবিধা
অন্তরালে এর অদল বদল করা হয় সব সময়ই অবগত।

বাইরে বাওয়া এবং গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করা
ক্যাম্পের কটিনের মধ্যেই পড়ে—যেদিন তা করা হয় সেদিন ডেউয়ের
কটিনে কিছু কিছু বাদ পড়ে বাধ্য হয়ে। এই বাইরে বেহাওয়ার
মেয়েদের সব থেকে আনন্দ উৎসাহ।

ক্যাম্পের এক একটি কাজের এক একজন ভারপ্রাপ্ত দিদিমণি
থাকেন অবগত—তাদের নিয়ন্ত্রণ দৃষ্টি ও পরিচর্যে ক্যাম্পের সমস্ত
কাজ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়—কিছু তাঁরা নিজেরা কিছু না করে
মেয়েদের দিয়েই সব কাজ করান—এইটাই নিয়ম ক্যাম্পে।

কিন্তু ক্যাম্পে কি হয় না হয় তার বিবরণী দেখার জন্যেই শুধু প্রবন্ধ লিখছি না। ক্যাম্প কবে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছি সেটুকু প্রকাশ করবারই আগ্রহ আমার।

ছেলেমেয়েদের বর্তমান কালের সমাজ-জীবনে খাপ খাওয়াবার জন্যে মাঝে মাঝে ক্যাম্প থেকে শিক্ষা লাভ করবার প্রয়োজন যে তে বোঝে, তা সব সময় অনুভব করেছি ক্যাম্পে থেকে।

খুলে মেয়েদের সঙ্গে ভাল ভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ সুবিধা আমরা পাই না—কার মধ্যে কী সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে—হৃদয়বর্তী, সেবা, সন্তোষভার, সন্তানী প্রতিভার দিক দিয়ে তাদের চরিত্রের বিভিন্নমুখী ধারাগুলির সন্ধান পাওয়াও যায় না খুলে—পাটকারী হিসাবে মেয়েদের দেখি আমরা খুলে—প্রধানতঃ ভাল করে লেখাপড়া করলে ছ’-একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমষ্টির চাপে বাস্তব স্বাভাবিকতা চোখেই পড়ে না। ছাত্রীদের সাংখ্যিকতা, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও বিজ্ঞানের শরিকালার ক্রটি ও শিক্ষয়িত্রীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং উদাসীনতা অথবা অনেক পরিমাণে দায়ী একজন।

কিন্তু ক্যাম্পে প্রত্যেকটি মেয়ের স্বাভাবিক প্রকাশ করবার সুযোগ-সুবিধার অন্ত নেই। সেখানে ব্যক্তি হিসাবে তাদের দেখা হয় প্রত্যেকটি ব্যাপারে। আত্মবিশ্বাসযোগ্য তাই মনের ভাবে দৃঢ় হয়ে থাকেন। রাসে যে মেয়ে গঠিত থেকে বসে থাকে মুখ লুকিয়ে এখানে তার মধ্যেও দেখেছি অনুভব করে নিজে থেকে প্রকাশ করবার আগ্রহ আত্মপ্রত্যয়ে সমুদ্রল ও আত্মপ্রকাশ উদ্ভূত হয়ে।

ক্যাম্পে শুধু কাজ কাজ আর কাজ—বাক্যে সময় কাটাবার কৃপা নেই একটুকু, প্রত্যেকের গুণের দায়িত্ব প্রত্যেকের গুণের নজর। মাঝে মাঝে বোঝা যায়। নিঃসঙ্গতা ও গুণসংযোগ এখানে আশ্রয় বাধ্য। তারপর একসঙ্গে থাকে নানা রকমের মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার অভ্যাস পরস্পর পরস্পরকে সহ করে নেওয়া দায়িত্ব বিচার না করে, অন্তরে থেকে নিজে থেকে সংশোধিত করে নেওয়া মিলে-মিশে কাজ করে গঠনমূলক মনোবৃত্তির উদ্বেগ করা ইত্যাদি, অনেক কিছুই অভ্যাস হয়ে যায় আপন। থেকে।

খুলে আমরা হাজার নীতি উপদেশ দিয়েও সভ্য সমিতিতে গাড়িয়ে মক কাঁপিয়ে ফেলতে বা পারি না ক্যাম্পে থাকার ফলে সেগুলি অভ্যাসে পরিণত হয় অতি সহজে।

ঐচ্ছিক, সহজুতা, ক্ষমা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকৃতির বৃত্তিগুলিরও বিকাশ হয় এখানে। একের পর এক। টোলাটোলি ধন্যবাদভি না করে প্রত্যেকটি কাজ একজনের পর একজনকে করে যেতে হয় যথেষ্ট। ক্যাম্পে আসে সুবিধা নেব, অল্প মজক, এ প্রবৃত্তি জাগবার কোন সুযোগই নেই ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে মেয়েরা চোখ-কান খুলে রেখেছে সর্বদা—তটু হয় আছে সব কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে কি না দেখবার জন্য—তাই যিমিয়ে যিমিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে না ওরা, শ্রোণ আছে গদের চলার ফেয়ার কথার বাস্তব।

সমবায় প্রচার থাকতে থাকতে সহজ কর্তব্যজ্ঞান জেগে ওঠে গদের মধ্যে আপন। আপন। একজন একজনকে প্রতি সহায়ত্বভূমিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। ক্যাম্প শেষ হলে তাই গদের বড় ছাঁচ, বন্ধুদের জেঁড় থাকবে কেমন করে!

খুলে দেখি আজ-কাল বড় যান্ত্রিক হয়ে পাড়ছে মেয়েরা—সবই করতে হয়, তাই কোন রকমে করার পর্যায়ে এসে পাড়ছে—শ্রোণ নেই, উৎসাহ নেই, শ্রদ্ধা নেই অব্যবহিত চিন্তাভাব, অব্যবহিত অপ্রত্যাশিত, অবিখ্যাসের প্রকাশ সর্বত্র।

ক্যাম্পে সব সময় দেখেছি মেয়েরা বড়দের সামান্য নির্দেশটুকুও পালন করবার জন্য কত তৎপর—বল হয়ে বাঁচছে পুরের মত যেন তাদের বড়দের আদেশ পালনে। খুলে সেই মেয়েরা নিলে ধায়, গা এলিয়ে দিয়েছে—নির্দেশ আদেশ কয়েকই বাগ-বাগ ভাবে। এই পালন না করতে পারলেই বাঁচে—পড়াটুকু স্নেহেই যেন উড়ে গিয়েছে আমাদের। লিখে নিতে ব’লে, পড়া জিগস ক’রে বলা ছাড়া যেন অপরাধ করছি—মনের এমন ভাব প্রকাশ করা দৃষ্টিতে চোখে।

বড়দের মনে চলা—এবং মনে চলে গরু ও আত্মপ্রকাশ লাভ আজ-কাল উঠে বাছে যেন জগৎ থেকে—মনে চলাটাই নিজেকে ছোট করা এবং আত্মবিশ্বাসনা। এমনি একটা ধারণা বহুদূর হ’লে বাছে আমাদের ছোটদের মনেও। ক্যাম্পে কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব জেগে উঠতে দেখেছি, এটাই আশ্চর্য!

তারা কাজ করতে পারে, তাদের গুণের বিকাশ করে কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে, এনে বাহুমনের মত বরশক্তি প্রকাশের প্রেরণা। আমাদের বিজ্ঞানকে আমরা লেখাপড়াটুকুর গুণেই জোর দিই—অল্প কোন দিক দেখি না—তাই তার কল শোচনীয় হ’লে কাঁড়ায়। বাস্তব মত বই মুখস্থ করতে পারে যারা তারাই উৎসাহ দিয়ে বিজ্ঞানকে—আর সকলের অবস্থা বাস্তব হ’লে পড়ে। আমার মনে হয়, দারুণ অর্থব্যয় করে দরপণে নিরাক্রম অভাব আমাদের, তার ফলে ঋণ বস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুতে বিস্তৃত হ’লে হ’লে এবং বিস্তৃতদের অভিভাবককে থেকে আমাদের ছোটদেরও দেখে মনে আপন। থেকেই একটা জৈব এসে পাড়ছে—তাই কোন কিছুতেই আর শ্রোণ থাকছে না, আস্থা থাকছে না।

ক্যাম্পের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাছাড়া পেট ভরে খেতে পাওয়াটা একটা বিশেষ করণ। খুলে ক’টা ছেলে-মেয়ে ঠিকমত খেয়ে আসতে পার? শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরও সেই অবস্থা। তাই ভাল লাগানো ও ভাল লাগার ঘর শূন্য হ’তে বাধ্য। পুষ্টির কঠিনকর আচরণে পরিভ্রান্ত মেয়েদের দেখে একথা ক্যাম্পে আমার বেশী করে মনে হয়েছিল।

আমি শুধু মেয়েদের কথাই বললাম—ছেলেদের সহজেও ঠিক এই একই কথাগুলি প্রযোজ্য।—আমাদের দেশের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের, ক্যাম্পে পাঠানোর উপকারিতা সহজে বোঝা তো নেই-ই, আছে অজ্ঞতা-অশ্রুত সন্দেহ, আনাহু, অবিখ্যাস ও তাক্ষিক্য।

এদেশে এসব নতুন বলেই এরকম হয়—দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অভিভাবকরাও বুঝবেন, ছেলেমেয়েদের শুধু পুষ্টিগত বিজ্ঞান অজ্ঞান করবার সুযোগ নিলেই শিক্ষা দেওয়া হয় না—শিক্ষার অপরিসীম অঙ্গ আছে অসংখ্য। ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া তাদের মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

ভুতোদা: আহা! কি রান্না! কি খাদ! কিরে বিমল
বল বল।

পায়-বিমল: সত্যিই অপূর্ব রান্না! আমাকে আর একটু
হকে—হর মোল দিনতো।

মাঠ ছেড়ে: আমাকেও। আর একটু চচ্চড়ী। সত্যিই ভালনা,
জলখা

ভজী—পরে

নখর পাবে: ভাগ্যিস সেদিন মেনি-

কি তৎক্ষণে দেখা হয়ে গেল!

আর টলটলে এই পোড়া সহরে

এমন রান্না খাওয়া যায়।

সহরের কারমাজী

মেনিদি ৪ মাস আগে তোমার মধুপুরের বাড়ীতে গেয়েছি
সে রান্নার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মেনিদি: কি যে বল ভুতো। এত বিরাট সহর—এত

লোকজন; এখানে ভাল রান্নার আর অভাব কি?

বিমল: আপনাকে যে এত ভাল ভাল হাতের রান্না
খাওয়ালাম!

ভুতোদা: ছাঃ! এ সহরের লোকজনের তাড়াহুড়ো করেই
জীবন কেটে যায়। রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করবে কখন?
বিনয়: তার মানে?

ভুতোদা: সবসময় পথে ঘাটে প্রান হাতে করে চলা।

মেনিদি, সেদিন তোমার বাড়ী আসার জন্য প্রান হাতে
করে তো এক বাসে উঠে পড়লাম। গান্ধীগাদি ভীড়।

চৌরঙ্গীর কাছে, আমার পেছনের ভদ্রলোক গিটে খোঁচা
খেয়ে হাত বড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন” আপনি আমার
পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ৯ টা ৪৫ মি: এখন দোয়া
দশটা দয়া করে যদি নামেন তাহলে আমি অফিস
যেতে পারি।

বিমল: হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ

ভুতোদা: হাসছিল কি! এরকমভাবে বাঁচলে কখনও ফাইন
আর্ট, বাঁচ? রান্না খাওয়া এগুলো ফাইন আর্ট। অনেক
সময় লাগে, অনেক ব্যয় লাগে। মেনিদি, যদি এই পোড়া
শহরে বেশিদিন থাকেন, তাহলে এরকম রান্না করতে
পারতেন?

বিনয়: কেন না? তাড়াহুড়ো তো আমরা করছি। রান্না
তো করে মেয়েরা, তাদের আর তাড়াহুড়ো কোথায়?

ভুতোদা: ইকনমিক্স পড়েছিল? ডিম্বাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের
ব্যাপারটা জানিস। রান্না পাবে তারা যদি ভাল খাবার না
খায় তাহলে তারা রান্না করে তাদের ভাল খাবার করার
উৎসাহ থাকে?





D1/P. 3B-X62 BG

আর সারাদিন বাসে টানে আফিসে দৌড়ঝাঁপ করে আর ভাল খাবার সংক্ষে ভাবার উৎসাহ কোথায়?
বিমল: আপনি বলতে চান যে এখানে ভাল রান্না হতে পারেনা?

ভূতোদা: হয় তো হতে পারে কিন্তু আমাদের মধুপুরের মত নয়। ওখানে দৌড়ঝাঁপ নেই লোকে মনের আনন্দে থায়, মেয়েরা সব সময়ই নতুন নতুন খাবারের কথা ভাবে। এই মেনিদির রান্নাই দ্যাখনা।

মেনিদি: কেন বারে বারে আমার রান্নার কথা বলছেন ভূতো। রান্না সংক্ষে আমরা কি সহরের কাছ থেকে কম শিখেছি?

বিমল: দেখুনতো মেনিদি। নতুন জিনিষতো সহরেই আগে আসে তারপর যায় মফস্বল গ্রামে। ইলেকট্রিক গ্যাস' এ্যানুমিনিয়াম সবইতো সহরে প্রথম এসেছিল।

বিমল: আপনি রান্নাবান্নার কথা বলছেন তো “ডালডা” কথাই ধরুননা। “ডালডা” এখন সহরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু “ডালডা” প্রথম এসেছিল কোলকাতা সহরেরই বাজারে।

ভূতোদা: তুমিও কি “ডালডা” ব্যবহার কর নাকি মেনিদি: মেনিদি: নিশ্চয়ই। আজকের সব রান্নাই তো “ডালডা”য় হয়েছে।

ভূতোদা: এঁাঃ! ডাল, চকড়ি, শুকতো, মাছ, মাংস, সবই “ডালডা”য়? আমিতো জানতাম “ডালডা”য় শুধু ভাজা-ভুজিই হয়।

বিমল: কেন ভূতোদা আপনাকে তো আমরা আগেই বলেছি যে “ডালডা” সব রান্নার পক্ষেই ভাল এবং পুষ্টিকর। সেইজন্য এখন লক্ষ লক্ষ বাড়িতে “ডালডা” ব্যবহার হচ্ছে।

ভূতোদা: ও: সেইজন্যে! মেনিদি, আমি তাই ভাবছিলাম যে তোমার মধুপুরের বাড়ীর রান্নাটা এত বেশী ভাল হয়েছিল কেন। এতক্ষণে বুঝলাম

মেনিদি: আমার মধুপুরের বাড়ীতেও সব রান্নাই “ডালডার” হয়। তুমি যেদিন খেয়েছিলে সেদিনও সব রান্নাই “ডালডার” হয়েছিল।

বিমল: কি ভূতোদা, আর সহরের নিন্দে করবেন।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

এই অযাচিত নতুন জীবনটার সঙ্গে আপোষ করতে চাইলো সুমিতা। দুঃসহ পরিবেশকে চাইলো সহনীয় করতে। কিন্তু বা হবার নয় তা কেন কালে হয় না,—তাই ওর জীবনগ্রন্থির জটগুলো দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগলো।

সেদিন সকালে চিঠি লিখছিলো সুমিতা, সোমনাথকে। কখন নিঃশব্দে অসীম এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলো, বুঝতে পারেনি।

—বাবাকে চিঠি লিখছে বুঝি?

চমকে উঠে সুমিতা ফিরে চাইলো ওর দিকে,—অসুচুট ঘরে বললো হ্যাঁ।

—বেশ তো, বা লেখবার লেখ, আরও গোটাকতক কথা ওর সঙ্গে লিখে দাও।

—কি কথা? শুক কণ্ঠে শুভালো সুমিতা।

—এই কথা, মানে আমি বলতে চাইছি—এ তোমাদের লাল-কুটির কথাটা। অত বড় বাড়ীটা শুধু শুধু বসিয়ে রেখে কি হবে? তখন তুমি থাকতে, সে ছিলো অস্ত কথা। এখন দিদিমা থাকতে চান এক পাশে থাকুন, বাকি অংশটা ভাড়া দিলে প্রায় ছুঁতিন হাজার টাকা মাসে ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। আজকালকার বাজারে ওটা নষ্ট হতে দেওয়া পুষ্টিমানের কাজ নয়, তুমি বেশ করে গছিয়ে কথাগুলো লিখে দাও ভেঁকে, বুঝলে?

—বাবকে ওসব লেখা মিথো! কুণ্ঠিত ভাবে বললো সুমিতা, তিনি কাকর মতামত নিয়ে কাজ করেন না, প্রয়োজন মনে করলে নিজেই করবেন বাড়ীর ব্যবস্থা।

—হ্যাঁ ঠিকই বলছেো কথাটা। সাধু সেজে ভগ্নামি করে বেড়ায় যে লোক, সাংসারিক দায়িত্ব-জ্ঞান সে পাবে কোথায়? কিন্তু আমাদের তো ওসব মেনে নেওয়া চলবে না! ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সব কিছু বিচার করে চলতে হবে। বেশ তো সাধুগিরি করছেন, তাঁর এখন আর বিয়য় সম্পত্তির প্রয়োজন কি? একটা শুধু সই করে দিলেই সব কিছুর দায়িত্ব থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেবো, নিশ্চিত মনে ভীর্থাবাস করুন। যত খুসি নেড়োনেড়ি নিয়ে হৈ-ঠে করুন, আর কিসের টি বলতে যাবো না—বুঝলে? মাত্র একটা নাম সহিয়ে ওগাথা।

কথার জবাব দিলো না সুমিতা। গলাটা যেন কে ওর চোপে ধরেছে, চোখ দুটো তাঁৎ জলে ভরে এলো। সিগারেট বার করলো অসীম, বিষেক্তে ঘৌতুক পাওয়া সোনার সিগারেট-কেসের ভেতর থেকে। হু-টোটির কঁাকে সিগারেটটি চোপে ধরে এ পকেট সে পকেট খোঁজে রূপোর লাইটারটাকে।

—কি হোল? পাছি না তো লাইটারটা! দেখেছো তুমি?

সুমিতার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে, বিরক্ত ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলো অসীম,—মাই গড! সমিাসি বাপের

হোঁয়াট লেগেছে বুঝি? ধ্যান-ধারণাও কিছু যাড়ে চাপিগছে দেখছি, শুধু আসলের বেলাই লবড্ডা!

সিগারেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সুমিতার একখানি হাত নিজের মুঠোয় চোপে ধরে সগজ্জনে বললো অসীম—তোমার ঐ প্যান-শ্যানে স্বভাবটা পালটাও মিত্তা, ঠো আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে। কথায় কথায় রাজাপানি ঝরিয়ে অসীম হালদারের মন ভিজাতে পারবে না, ওসব জাকামি বাদ দাও। সত্যি বা দিয়ে মন ভেজানো যায়, পায়ে তো সেইটে করবার চেষ্টা করো।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সদ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো অসীম।

কি একটা কাজে এদিকে এসেছিলেন সুদামের মা যমুনা দেবী। সুমিতাকে নিশ্চল ভাবে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে ঘরে এসে বললেন—কি হয়েছে রে মিত্তা? অমন করে বসে কেন? কাকি লিখছিলি চিঠি? বাবাকে বুঝি? তা বসে কেন রে? শয় কর চিঠিখানা?

দর-দর করে চোখের জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো সুমিতার হুটি গাল বেয়ে। দশটি আঙল ঢাকা দেবার চেষ্টা করলো চোখের জলে ডেমে বাওয়া মুখখানাকে। হুঁহাতে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে টেনে নিলেন যমুনা দেবী।

—ও মা! এ কি কাণ্ড রে? কৈদে ভাসিয়ে দিলি? বলি হলে কি? বাবার জঙ্গে মন কেমন করছে বুঝি? না ঠাকুরপোয় সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? বলোতো সোনাযুধি কোনটা সত্যি?

যমুনা দেবীর গলাটা হুঁহাতে জড়িয়ে ধরে শব্দ বুকে মুখ কুঁকড়ে ফুল ফুলে বীরলো সুমিতা!

—ওকে নিজের ঘরে হাত ধরে নিয়ে গেলেন তিনি। দিকে ডেকে বললেন—যা তো, ছোটমার চুল বাঁধার বাস্কাটা নিয়ে খায়, আমি আজ চুল বেঁধে দেব। মেকের কাপেট বিছিয়ে সুমিতাকে নিয়ে বসলেন তিনি।

কি নিয়ে এলো একটা চন্দনকাঠের বাস্কা। ওর থেকে সোনা-বাঁধানো চিকশি বার করে সুমিতার একরাশ চেনেথলানো চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন তিনি,—চুলগুলোতে কি তেল দিস না, এত কণ্ড হয়ে আছে কেন রে? সত্বর মাকে বলবি, ভালো করে তেল মাখিয়ে দেবে।

সুমিতা জবাব দেয় না সে কথার। সে তখন স্বির দৃষ্টিতে দেখছিলেন সুদামের কটোখানিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো—দামোদ! কবে ফিরবে কাকীমা? ওঁর চিঠি ঠিকমত পাচ্ছেন তো?

বড় লজকে বড়দি বলতে পারেনি সুমিতা, চিরকালের ডাক কাকীমা পার্টে বড়দি বলা কিছুতেই সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। অসীমও অত ছোট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি, আর কদিন বা ওদের সঙ্গ?

—না, নিয়মিত চিঠি-পত্র আর পাই কই? মাসখানেক হল একখানা পেরেছি, তোদের বিরতে যোগ দিতে পারলো না বলে হুপে জানিয়েছে। কিরতে ওর এখনও বন্ধরখানেক দেয়ী হবে, একটা পরীক্ষা এখনও বাকি কি না। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন যমুনা দেবী।

সোনার চিকিৎসা দিয়ে মস্ত বড় খোঁপা বেঁধে সোনার কীটা গুঁজতে গুঁজতে বললেন তিনি—কি চমৎকার মানিয়েছে দেখতো? রোজ এসবি আমি চুল বেঁধে দেব, তেল নেই, জল নেই, কি হাল করেছিলি চুলগুলোর বল বেশি?

ওদের দু জনকে চমকে দিয়ে বড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো অসীম। মহা বিরক্তি ভরে টেটিয়ে বললো—আঃ, কখন থেকে যে ডাকাডাকি করছি ছুঁটায় পাটি আছে, দু জনের বেতে হাব অলকাপুরীতে। এদিকে দিবা আড্ডা জমাচ্ছে। এখানে বস। বাঃ চমৎকার ঢাকেশ্বরী খোঁপা হয়েছে তো? হি, হি, হৌদি, ঐ সেকলে খোঁপা বেঁধে ও পাটিতে বাবে না কি? হাঃ, হাঃ, হাঃ, করে বিদ্রূপপূর্ণ ঘরকীশানো হাসি হেসে বললো অসীম—তা বেশ, তা বেশ, অলকাপুরীর নামকরা নাচিরে মেয়ে দুমিতাকে একেবারে পাড়াগাঁয়ের কলসী কাঁধে বোঁ সাজিয়েছে, মন্দ লাগছে না।

সলজ্ঞ ভাবে মাথায় কাপড় টানতে টানতে বললেন যমুনা দেবী—৫ মা, তোমরা পাটিতে বাবে? তা তো জানতুম না। খুল ফেল যে মিতা, ঠাকুরপো যেমন বলে, তেমনি করে চুল বাঁধ।

—মামি এই খোঁপা বড় ভালোবাসি কাকীমা, এ খোঁপা বেঁধে যাওয়া কিছু মাত্র বেমানান হবে না। নরম গলায় জবাব দিলো দুমিতা।

—এই যে বেশ বোল-চাল শিক্ষা হয়েছে মিতা দেবীর। চমৎকার। এর কৃতিত্বটুকু অবগত আমার বৌদিরই পাওনা, কি বলো?

যমুনা দেবীর শান্ত ছুটি চোখে ফুটে উঠলো বিষয়। ঈশ্বর আরক্ত মুখে দেহের দিকে চেয়ে বললেন—ভূমি হঠাৎ অন্ত চটে বাজছে কেন ঠাকুরপো! মিতা তো কিছু জ্ঞাত্য বলনি?

—হ্যা, হ্যা, ওকে ভালো করে শিখিয়ে দাঁও বৌদি, কি করে আমার ওপর টেকা ঘেরে চলতে হবে। এ আমি অনেক আগেই খাঁচ করেছিলাম, বতটা বোকা ঠাউরেছে। আমার ঠিক ততটা আমি নই।

—মার নয়! আর নয়! মাপ করো এইবার, কান্নাভরা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো দুমিতা, অসীমও ছুটলো ওর পেছনে। ভাবগতিক ভালো নয়; ফিট তো হয়েছে আছে। সবলে দুমিতার একখানি হাত চেপে ঘরে ওকে টেনে ঘর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো খাটের ওপর। তারপর বানিকটা অডিকালন ওর মাথায় ঢেলে দিয়ে, পাখার বেতলেটরটা শেষ পর্যন্ত গুণিয়ে দিয়ে, গলায় স্বর মোলায়েম করে বললো অসীম—কিছু মনে কোরো না রাণী, ব্যবসার খামেলার জন্তে আজ মোজাটা বড় গরম ছিলো। বিশ্বাস করো, ও সব কথা সত্যিই আমি বলতে চাইনি। এবারও ওঠো, তৈরি হয়ে নাও লক্ষীট!

বারান্দা থেকে ভেসে এলো মস-মস ছুঁকোর আওয়াজ আর দামী সিগারেটের গন্ধ, তারপরই ভারি কণ্ঠস্বর, আসতে পারি? হুল উঠলো ঘরের পর্দাটা।

—আরে কে ও, অনিল নাকি, সত্যি সত্যিই কুটুম বনে গেছো দেখছি। এসো, এসো—

পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো অনিল। সুমিতা খাট থেকে নেমে এসে ওকে প্রণাম করে গেলো পায়ের ধূলো নিতে।

ছুঁপা পিছিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অনিল। আরে একি একি? ঘটা করে আজ আমার আবার শেরাম কেন রে? বোস বোস! ওর হাত ধরে সোফায় বসিয়ে নিজে পাশে বসলো অনিল।

—তারপর কেমন আছিল? বল। অনেক দিন তো বাসনি ওদিকে! কি হে অসীম, ওকে যে একেবারে হারেমের বিবিসাহেবা বানিয়েছে! দেখছি, বাইরে বেততে টেকতে দাঁও না, না কি? তোমাদের দুজন কান্নাই তো আর পাড়া মেলো না!

গলায় টাইটা বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিলো অসীম। ব্যবসায়ী মায়াবী কুলি-মজুর খাটিয়ে পেটের ভাত বোগাড় করতে হয়, সময় কোথায় বলা আড্ডা মারবার? মিতা কেন ঘরের কোণ ছেড়ে নড়তে চায় না সে কথা তাকেই জিজ্ঞেস করো। সারাক্ষণ খালি ঐ বুড়ি জায়ের পাশে বসে কি যে কথা কয় বুঝি না! এই খানিক আগেই এই নিয়ে আমার সঙ্গে একতরফা হয়ে গেলো।

—তাই নাকি? এমন গিন্নি মেয়ে হয়েছিল তুই? নাচ-গান সব কি বাতিল হয়ে গেছে?

—চিরকালই কি আর ও-সব ভালো লাগে ছোট মামা? স্নান মুখে জবাব দিলো সুমিতা।

—তারপর? অনিলের সর্বাঙ্গে কোঁতুহলী দৃষ্টি বুলিয়ে বললো অসীম—তারপর? তোমার খবর কি শুনি? সাজে-পোষাকে, চোখে-মুখে তো হাসিখুসি উপচে পড়ছে, বলি ব্যাশারখানা কি? মোটা বকমের ষাঁও টাও জুটিয়েছ বোম্ব হয়?

ওর সাজে-পোষাকে সত্যিই ছিলো আজ বিশেষত্ব! দামী নীলাভ স্কাট শরনে, আঙলে মূল্যবান হীরের আঙটি। গায়ে ভুব-ভুরে সেক্টর গন্ধ, আঙলের কঁকে চাপা ব্র্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট। চোখে-মুখে হলছে ওর খুসির আলো!

—ষাঁও? তা একরকম তাই বটে! হাতের আধপোড়া সিগারেটটা ছাইদানিতে চাপতে চাপতে বললো অনিল। খোলাখুলিই বলি তাহলে, সামনের সপ্তাহে বিয়ে করছি শুকতারাকে।

স্ত্রীরোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চন্দ্ররোগ ও চুলের যাবতীয় রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চার্টার্ডার ব্রাশন্যাল-কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

সন্ধ্যা ৬।—৮।টা। ফোন নং ৪৬৭১৩৫৮

বাড়ীতে হাস্যামা নয়, মানে সাতপাকের বিয়ে নয়, শ্রেক লেখাপড়া সকালে, আর সন্ধ্যাবেলার গ্রাণ্ড হোটেল একটা পাটি! বাফা, তোমাদের বিয়ের হাস্যামা দেখে, ও সাতপাকের বিয়েতে আঁতক ধরে গেছে, দু'মাস হয়ে গেলো গায়ের ব্যথা যেন মরতেই চায় না!

—তুস্তারাকে বিয়ে করছো? কেন হে, আর পাণ্ডী ছুটলো না? তুস্তা তুলে বললো অসীম।

—ভুট্টে না কেন হে, জোটাটাইনি। এক লাইনেই আছি দুজনে, কেউ কাউকে ছুঁতে পারবে না, বুঝলে না? দুজনেই রোজগার করবো, ভালোই চলবে। তবে মুখিল এই যে, মা'বড় কৌশ-কৌশ করছেন,—ইচ্ছে ছিলো অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্তে বাগাবেন ছেলের ভক্তে। কিন্তু এইটুকু বোঝেন না যে রাজকন্তে এই লক্ষ্মীছাড়া অভিনেতার গলায় মালা পরাবে কেন দুখে? বাকু—মনে হয়, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছবিটা কিন্তু আচ্ছা! ভোল্ পালটেছে যে মিতা, জামাইবাবু ওর কানে যে কি মন্তব্য রেখে গেছেন, দিন-রাত দেখো ঠাকুরদেব কি সব বিড়-বিড় করছে, আর লখা লখা উপদেশ ছড়াচ্ছে!

—আরে আমাকেও ও আসে হিতকথা শোনাতে? বলে অভিনেত্রী বিয়ে কোরো না ছোড়না, স্বপ্ন পাবে না। শোনো কথা!

—আমি বলি তোমার ঘাড়ে জামাইবাবু ভুত চাপিয়েছেন, সে ভুতটা কি এবার আমার ঘাড়ে নামাতে চায়? বেশ আছি বাবা, কেন ভালোছো, আমার মাথার চুকে না।

কলকর্ত্তে হেসে উঠে বললো স্মিতা—ভুতটার কাছে জোট মাসী নিশ্চয়ই ভালো কিছু পাচ্ছে, আমার কাছে সোটাতে পাঠিয়ে লাও না জোট মামা। আর তুস্তারাকে বিয়ে করছে শুনে সত্যিই ভালো লাগছেও, ঠিক তোমারই মত।

মনোমত কথাটার গাঙ্কায় সোফা থেকে শ্রী-এর মত ছিটকে উঠে সামনের টেবিলটাকে প্রচণ্ড একটা বৃশি মেরে বললো অনিল। ফুলদানীটা লাফিয়ে আছড়ে পড়লো মেঝেতে। এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা শোনালি মিতা! আরে সেই জ্ঞেই তো তোকে অত পেয়ার করি রে! তা না, মা আছেন হুজুম প্যাটার মত মুখ করে, বোন আসছেন খুটান পাখীর মত সুলমাচার হাতে করে, বাপ রে বাপ, বাড়ীতে বিয়ের খবর নিয়েছি না মরা খবর শুনিয়েছি!—মুখতে পারছি না। তারাকে অবশ্য বলিনি এসব কথা, শুনেলো ব্যাচারা মন খারাপ করবে।—হ্যাঁ ভালো কথা, জামাইবাবু ঈগির আসছেন, বিষয়-সম্পত্তির কি-সব ব্যবস্থা করবেন, চিঠি দিয়েছেন শ্রী জ্যোতির্গিরি খবর নিয়ে রাখতে।

একটা স্বস্তির বাতাস লাগলো যেন স্মিতার অন্তরে। কার্পেটে গড়গড়ি দিচ্ছে ফুলদানীটা, ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিকে। সেগুলো ছড়িয়ে তুলে নিয়ে ফুলদানীতে ঝেঁরে রাখতে রাখতে হাসিমুখে বললো স্মিতা—বাবাকেই তো চিঠি লিখছিলাম জোট মামা, বাকু তাহলে, ওটা আর শেষ করবো না, ভালোই হল, তাঁর আসার খবটা পেলাম!

—ওঃ, আসছেন তা হলে, অ্যাডিনে স্মৃতি হয়েছে! খবরটা বেশ ক্রটিময় বটে! তবে আমি একেবারে বাস্তবধর্মী কি না, ও-সব ক্রটিময়, বা দুঃমুহুর্তে আমার লোভ নেই, আরি চাই একেবারে

মধুভাণ্ডে লুট করতে। বুঝেছো চাঁদ, ও খবর টবের মন আমার টগবগিয়ে উঠবে না, বহুক্ষণ না সেই আসলটি—ছ'আঙলে টাক! বাজাবার ভক্তিতে টোকা মেবে, তুস্তা নাচিয়ে বিজয়ের হাসি হাসলো অনীম।

টেবিলের ওপর ফুলদানীটা বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলো স্মিতা।

—বাচ্ছো! কোথায়? ওকে মুখিয়ে উঠলো অসীম, কাপড়টা ছাড়বে করব? সময় তো শেরিয়ে গেলো।

অসীমের এমন বিকৃত মুখভঙ্গী অনিল দেখেনি আগে। মিতার সঙ্গে কথাবার্তার ঘরপটাও যেন কেমন ধারা! নাঃ, মনটা আজ-কাল একটুতেই কেন খারাপ হয়ে যায়, মাথার রক্ত যেন গরম হয়ে ওঠে। স্মিতার দিকে ফিরে চাইলো অনিল, স্নানমুখে সে ঝাড়িয়েছিলো দরোজার পাশে, হঠাৎ নজরে পড়লো—এই ক'টা মাসে বড় যেন রোগা হয়ে গেছে ও। চোখের কোল কালি পড়েছে।

বিবেকের আর অলশোচনার কীটা ছোটো খট-খট, করে উঠলো বুকের ভেতর!

—বা'রে মিতা, কাপড় ছেড়ে আর! শ্রোত্রার্কে কণ্ঠে বললো অনিল,—তোমাদের কোথাও বেলবার কথা ছিলো বৃষ্টি,—তা তো জানি না, মিছিমিছি দেবী করিয়ে দিলাম।

—আরে না, না, দেবী আর কি? এই তো মোটে হ'টা—সাড়ে হ'টার গেলেই চলবে। অলকাপুরীতে মাসীমার ওখানে নেমস্তন্ন! কেন তোমাদের ডাকেন নি?

—ঐ বাঃ! সত্যিই তো, একেবারে ভুলে গেছি, আজকাল কি সাংঘাতিক ভুলই যে ঘাড়ের চেপেছে আমার! ওদিকে তুস্তারা হয়তো বেড়ি হয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে! আচ্ছা আমি চলি তাহলে—

চঞ্চল পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, অনীমের জো হো হাসির লজ্জা শুনে চমকে উঠে ফিরে চাইলো ওর মুখের দিকে অনিল, হাসিটা যেন শোনালো অবিকল হায়নার হাসির মতো!

পরের সপ্তাহের শনিবারে গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের সামনে জমেই একটা কোঁচুহলী জনতা। ছবির মাহুতবরা আসছে পাটিতে। তাদের বর্শন করে মানবজমা সার্থক করার সুভাষী লালসা নিয়ে, ঘটটার পর ঘটটা ঝাড়িয়ে আছে পুণ্যপাপাত্তর দলটি অপরাধ কালে। লাল, কালো, শাদা, সবুজ নানা রং-এর চকচকে মটোর চড়ে আসছেন, সিনেমা-আকাশের চন্দ্র, সূর্য, তারকারা! আরো আসছেন ওদের বীরা আকাশে ভড়ান, পাতালে ডুবান ওদের বরফদ্বার অভিনব খবর পরিবেশন করে জনসাধারণকে তাক লাগিয়ে দেন, সেই সব সিনেমাশ্রয়ের সম্পাদক ও রিপোর্টাররা। এ ছাড়াও এসেছেন বন্ধু-বান্ধবী, শ্রী আর সাহিত্যিকবৃন্দ।

অনিলকুমার আর তুস্তারা সেন-এর বিয়ের খবরটা বেশ মুখবোচক ভাষায় অনেক আগেই বার করেছিলো সিনেমা পত্রিকাগুলো। তার সঙ্গে ছিল ওদের নানা ভঙ্গিমার ঘটোৎসব।

ঝিমিয়ে পড়া বাজারটাকে ওরা বেশ জাঁকিয়ে তুলেছিলো, সত্যি-মিথো দেশানো গরম গরম, নিত্যানতুন খবরগুলো পরিবেশন করে!

এমন ভ্রমকালো ভোক্তাসভায় শুধু আসেনি অনিলের কোনো আপনজন, একমাত্র অসীম ছাড়া।

সুমিতা আসতে পারেনি, অগ্রহ বলে! তবে অলকাপুরীর মাসীমা, একাই একশো হয়ে সবাইকে আদর-আপায়ন করছেন, এমন সর্বগুণসম্পন্ন মাসীমা বাবের সহায়, তাদের আবার ভাবনা কি! শুকতারা পরেছে বস্ত্র-বা বেনারসীর সঙ্গে মানিয়ে হীরে-চুনির গহনা! আজ আর ওকে দেশ মনেই হচ্ছে না যে এই সেই লাগমতী অভিনেত্রী শুকতারা সেন! ওর চন্দনজাঁকা কপালের উর্দ্ধভাগে ফুলছে মুক্তোর সীঁথি থেকে বৃত্ত হীরের বুড়ুকিটা। পাতিলা আসমানী ওড়নার অঙ্কঠনে বদ্বেশে ওকে দেখাছিলো কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মতো!

প্রমোদসম্বের ঝড়-তুফান বইছে যেন বনদি হোটেলটিকে যাতায়াতি করে! এক কোণে একটি টেবিলের দার ঘেঁসে বসেছিলো অনিরুদ্ধ, আর পশ্চিমা। দুজনের হাতে দুজনার হাত বাঁধা!

—এবার আমাদের বিয়ের পালাটা চুকিয়ে ফেলা যাক, কি বলে? হাতের চাপ দিয়ে বললো অনিরুদ্ধ।

—বিন-বিন! বিন-বিন! শব্দের বন্ধার তুলে হেসে উঠলো পশ্চিমা—

—আর, এত তাড়া কিসের অনি? বিয়ে হলোই তো সব

শেষ হয়ে গেলো, বা কিছু বোঝান তা তো ঐ বিয়ের আগেই! কেমন দুজনকে পাবার জন্যে দুজনের হটফটানি, আবার হাটাই-হাটাই ভয়, তার পরেই হঠাতো ক্ষণিক মিলনের বোম্বাটিক্ পরিবেশ—এই তো বেশ! ওর হাতের আজুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে জ্বাব দিলো পশ্চিমা।

ওর মুখের দিকে সন্ধির দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলো অনিরুদ্ধ, হাসলো একটু। তারপর আস্তে আস্তে হাতখানা সরিয়ে নিলো!

একটু দূর থেকে ওদের দিকে জেনদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলো রতনলাল, তার পাশে বসেছিলো অসীম! দুজনের হাতে ফেনিল পানপাত্র। এক চুমুকে পাত্রটি শেষ করে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে উঠে পাড়ালো রতনলাল—কি তে, এরই মধ্যে উঠে পড়লো? আরো কয়েক পেগ চলুক না! জড়িয়ে জড়িয়ে বললো অসীম!

—না! আর নয়, নতুন ক্যাডিলাকশনের ট্রাচাল দিতে হবে, একেবারে বেডস হবার উপায় নেই আজ, বুঝলে কি না! বলতে বলতে পশ্চিমার দিকে এগিয়ে গেলো রতনলাল—আপনি একাই এসছেন নাকি মিস রাও? বাজাবাহাদুর আসেন নি? বললো রতনলাল।

—তার আজ শরীফটা যে গোলমাল বাধিয়েছে, তাই তো একা আসতে পারলাম। তা না হলে কি বুড়ার হাত থেকে ছাড়া পাবার যে আছে? বাবরাং, যাকির মত আগলে বেড়ার, আমার যেন লাগে বাজাবাহাদুর যেন একটি মাত্র মণিক তঁর! বললো হেসে, সোফায় গড়িয়ে পড়লো পশ্চিমা।

উজ্জ্বল আনন্দে

কে. হোডের

মলোবন প্রজাধীনী



কে. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪



ওর ঘরে স্বর মিলিয়ে হেসে উঠলো। রতনলাল।

—তা ঠিক ভয়টা কিছু অমূলক নয় মিস বাও ! ও মণি-মাণিকের চেয়েও আপনি মূল্যবান, অনেকের কাছেই ! কি বলেন মিষ্টার বাহু ?

—হতে পারে। একটু হেসে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—চলুন না মিস বাও, নতুন ক্যাডিলাকবানার আজ ট্রায়াল দিতে যাযো,—ভাবি আত্মমস্কর গাড়ীখানা। যেমন রাজহাঁসের মতো গড়নটা, তেমনি তুলতুলে নরম সিটগুলো চড়লে আরো মজা, বেন হাওয়ার সমুদ্রে ভেসে চলেছি। আপনিও চলুন না মিষ্টার বাহু, বেশ ফুটফুটে চাঁদনী রাতটা পাওয়া গেছে।

—না, এখন তো আমার বাবার উপায় নেই মিষ্টার ফ্রেড্রিক, জরুরি কাজ আছে আমার, পরে একদিন দেখবো আপনার রাজহাঁসটাকে।

—প্রিন্সের মত লাক্ষ্যেরে উঠে পাঁড়ালো পম্পিরা। হাসি-খুসিতে চুলবুলিয়ে বললো,—চলুন, চলুন মিষ্টার ফ্রেড্রিক! আঃ! কি গুয়াণ্ডারফুল প্র্যান্টা বাতলেছেন আপনি,—তার পর অনিরুদ্ধর কাঁধটা এক হাতে চেপে ধরে দু'লিঃ দিয়ে আত্মী ভক্তিতে বললো—তুমি দিন দিন বড় বোজ হতে যাচ্ছে! অনি! এমন সুইট ইভনিংটা কি কাজ করবার জন্তে? আঃ, কি আলোর বজা, শুধু ভেসে যাওয়ার রাত আজ, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।

—আপাতত মামলার শ্রোতে ভাসছি পম্। সে জন্ত আর নতুন করে ভাসবার ইচ্ছে নেই। যুহু হেসে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—তবে আর কি করা যাবে? আশ্রম মিস বাও! হাতে হাত জড়িয়ে বেরিয়ে গেলো ওরা দু'জন। অনিরুদ্ধকে বাবার সময় হাত নেড়ে পম্পিরা বাই, বাই, করে যেতে ভোলেনি।

সুস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরালো অনিরুদ্ধ।

—কি দিতে বলবো তোমার? বিয়ার? রাম? হুইস্কি? না জিন?

একটু বেন চমক লাগলো অনিরুদ্ধর, কারণ অজ্ঞানত্ব হয়ে পড়েছিলো সে। কখন অসীম এসে যে কাঁড়িয়েছে পাশে, বুঝতে পারেনি। ওর প্রশ্নের জবাবে বললো,—নাঃ, কোনটাই নয়। বরং এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো?

—বলো কি? ঠাণ্ডা জলে কি মনের জ্বালা কমানো যায়? মন জুড়োবার অবার ওয়ু হলো তো এগুলো, যেটা হোক একটা নিয়ে বসো। পাঁচ মিনিটেই দিল্ খেলসা হয়ে যাবে।

—আপাতত মনটা আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে অসীম, আর সে সম্পূর্ণ সুষু। কাজেই কোনো দাওয়াই-এর প্রয়োজন তার হচ্ছে না। যুহু হাস্তের সঙ্গে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—মাই গড! তোমাকে কলা দেখিয়ে পালালো ওরা আর তুমি এখনও বলবে, তোমার মন সুষুই আছে? আর তা যদি বলো, তবে আমি বলবো, তুমি একটা আন্ত পুরুষমানুষই নও। বীরভোগ্য বসুন্ধরা, বুঝেছো হে?, বাকে চাও, নিজের পুরুষত্ব আহঁরি করো তার কাছে। একটা মেয়েমানুষকে বেশ আনবার জন্তে খুব বেশী শক্তি খরচ করতে হয় না, একটু চাই কলাকৌশল, বাস, সব ঠাণ্ডা। কথা শেষ করে ঢক্ ঢক্ করে থানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে বোতলটা টেবিলের ওপর সশর্ম বসিয়ে দিয়ে সোকার গা এলিয়ে দিলো অসীম।

—তোমার মূল্যবান উপদেশের স্তম্ভ হস্তবান অসীম! তবে আকস্মিকের কথা এই যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে কথার বীজগুলো বহিঃস্থতাতে, তাহলে খুব উত্তম ফসল লাভ হতো, কিন্তু এটা এক্ষেত্রে বাকে বলে পতিত জমি, বাক্যবীজগুলো তোমার ঐ মাঠেই মারা গেলো। আচ্ছা, চলি তাই, একটা জরুরি বেশ রয়েছে হাতে। উঠে পাঁড়ালো অনিরুদ্ধ। দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। একটু বুক পড়ে নিচু গলায় বললো—তোমার ঐ গাছের জোরে দখল-করা মেয়েমানুষ সম্পত্তির ওপর আমার কিছু বিন্দুমাত্র শোভ নেই অসীম! আমি হাজি মনের ব্যাপারী। ফুলের মতো ফুল মনের ওপরই আমার আকর্ষণ বেশী। সে রকম কিছুই সন্ধান পাও তো জানিও। প্রাণখোলা হাসির বড় তুলে অসীমের হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চকল পলকপলক বেরিয়ে গেলো অনিরুদ্ধ।

—হোপ্লেস। শালা এক্ষেত্রে মেয়েমানুষ বনে গেছে। বিকৃত স্বরে বললো অসীম।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাসীমা হি-হি করে হেসে উঠে স্তম্ভিত করলেন—কি কথা বলছো অসীম?

—আবার কল? ঐ অনিরুদ্ধটার। বিলতে বাবার আগে তবু মহাশয় বলে গুটার কিছু ছিলো, কিন্তু এই বুঝে আসবার পর দেখি একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছে—কতকগুলো বড় বড় কীকা বুলিতে পেটটা বোকাই করে এনেছে, আর এখন তখন ওগরাছে সেগুলো।

—সচ্ছা বাত! আমিও ভাবছিলাম তাই, অসীমের পিঠ চাপড়ে বললেন মাসীমা। কত ছেলেমেয়ের ভোল ফিরলো এই মাসীমার আঁখিয়ার, শুধু হল না কিছু ঐ ছোকরার! মদ নয়, কত ভালো ভালো মেয়েদের লেলিয়ে দিলাম, কিছুতেই কিছু নয়? এক্ষেত্রে কলির শুকনো ঠাকুর! তবে মন্দের ভালো বলতে হবে, পম্পিয়ার দিকে বেন ঝোঁক পড়েছে একটু! দেখি আবার কতদূর হল কতদূর বায়।

—হল না, মাসীমা হল না, আপনার টোপ গিলেছে এক্ষেত্রে বায়ব বোরাগে! কই-কাতলার জন্তে ও টোপ নয়! একটু হিসেবে ভুল হয়েছে আপনার। মুচকে মুচকে হেসে, চুল চুল চাখ চেয়ে বললো অসীম।

—মাই গড! তাই নাকি? ব্যাপারটা কি খুলেই বলো না ডারলিং! ডাবা-ডাবা চোখে চমক খেলিয়ে শুধোদেন মাসীমা।

—বিশেষ কিছু নয়। ঐ রতনলালের নতুন সঙ্গী করা ক্যাডিলাকে চড়ে এই চাঁদনী রাত্তে একটু হাওয়া খেতে গেছি পম্পিরা বাও। তা আমি বলি কি, ঠিকই করেছে সে, ঐ নিয়মিত বোষ্টমটার সঙ্গে ইপিয়ে উঠেছিলো ব্যাচারী! ছাঃ, ছাঃ, ওটা পুরুষও নয় মেয়েমানুষও নয়, একেবারে বাকে বলে স্ত্রীকল। কোনো মেয়েই বেশী দিন সইতে পারবে না ওকে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

—বাক্ বাচলো আমার। খড়ে প্রাণ এলো এককণে। আমি ডেবেলিয়ার বাইরের কেউ ছেঁ। মারলো বুঝি? রতনলাল তো আমাদের ঘরের লোক, পাওনা-কড়ি আমার মারবে না। বিধ অসীম, মাত্র পাঁচ হাজার ঠেকিয়ে তুমি যে চুপচাপ মেয়ে গেলে তো বাকিটার কি করছো?

পাঁড়ান, পাঁড়ান! সব কখন, যেওনা কলতেও পারে, আবার নাও পারে। আমি পোলাম কি? যে তার ভাগ দেব? শীগগির জানতে সন্ধানি বাটা, দেখি কি করে? মোটারকম আদার হরত জাননার মুঠোও ভরবে। আর তা না হলে এই মুগীকগীর পীতকপাটি যদি শুণু বরাতে আমার ঠক ঠক করে, তাহলে আপনার কপালেই বা বন-বন বাজবে কোথা থেকে বসুন?

—তা বটে! তা বটে! ঠিক আছে। বখন আসছেন সেমনাথ বাবু তখন নিশ্চয়ই এবার সব লিখে-পড়ে দিয়ে যাবেন! ঐ তো একটা ঘেরে, প্রচুর সম্পত্তি আছে শুনেছি, ভাগীদারও নেই কেউ! বুঝছে অসীম!

চোখ নাচিয়ে বিজ্ঞের হাসি হাসলেন মাসীমা।

—আরে চূণচাপ বসে কেন? ইটালী, ফরাসী, স্পেন, সব কিছু জানতে বলো, প্রাণ খুলে তোমার গুডলাকে রিসিভ করি।

—বেশতো অর্ডার দিন! হাসিমুখে বললো অসীম!

নিজের গেলেন মাসীমা। পছন্দ করে জানলেন, বেশ কয়েক বোতল দামী দামী মাল, বেওয়ারীর কাঁধে চাপিয়ে!

আর সঙ্গে করে জানলেন, অলকাপুরীতে নতুন ভিত্তি হওয়া করকত্তন ছেলে-মেয়েকে। লাঞ্চপতি, ক্রোড়পতির ছেলেমেয়েরাই মাসীমার সঙ্গে বসে পান করবার অধিকার পায়। কিছুদিন যেতে না যেতে ওরা মোটা আঙ্গুর বাজি বেখে মত্তশানের পাঁজা দিতে শুরু করে। এটা নাকি উচ্চমহলের দামী ফ্যানস! বাজি রেখে তাদের পুকার, ক্লাশ, আবার ব্রিজ খেলাও চলে অলকাপুরীতে। সকল ক্ষেত্রেই বলাইর ভাগ বিজয়িনী হন মাসীমা। টাকার তোড়া নামিয়ে রেখে, শুল্ক হাতে, কিন্তু আফ্রান্দে পূর্ণ মন নিয়ে কিরে বার ধীরে দুলাল-দুলাসীরা!

মাসীমার কাছে হেরেও সুখ!

নিজের হাতে মদ ঢেলে সকলকার গেলস পূর্ণ করে নিলেন মাসীমা।

সকলে গেলস ঠোকাঠুকি করে অসীমের সৌভাগ্য কামনা করলো!

তারপর হুজ করে খালি হতে লাগলো বোতলগুলো।

অক্রেষ্টার বাজছে ইংরিজি প্রেমের গান! কেউ কেউ জুতো ঠুকে তাল দিচ্ছেন বাজনার সঙ্গে। কোথাও কপোত-কপোতী নয়, নিবালার মুখোমুখি বসে বিরক্ত প্রেমিক-প্রেমিকারা! বিয়ের আগের পূর্বসংবাদ নয়, নিত্য-নতুন প্রেমের হাটের ফেরী ওরা! বত বিন দুজনে দুজনায় মনে বং হুড়তে পারে তত দিনই চাইবে পরস্পরকে, তারপর আবার হরতো দেখা বাবে ওদের সঙ্গী বদল হয়েছে!

আগেকার দিনের হতাশ প্রণয়ীরা বিব খেতো, লেকের জলে ডুব মরতো, এখন আর সে সব ফ্যানস চলে না,—হু-টারদিন বরজের মনের লেকে হাবুডুবু খায়, তারপরই চাক। হয়ে উঠে নতুন মুখের সন্ধান করে।

—চারি দিকে পানোৎসব চলেছে! শুণু আজ ওসবের প্রয়োজন নেই নব মঙ্গলভির! ওরা বেন সব পেয়েছির দেশ খুঁজে পেয়েছে। পৃথিবীর বিমল আভা ঠিকরে পড়ছে ওদের দৃষ্টিপ্রানীপ থেকে। হাতে হাতে রেখে পরম শান্তির কোলে আজ এলিয়ে দিয়ে

বসেছিলো ওরা দুজন! আজ বেন ওরা নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র আর ওদের সামনে একটি খিচুড়ী-সোসাইটির অভিনয় হচ্ছে।

ওদের চোখে আজ এ অভিনয় একেবারেই অর্থহীন বসহীন বোধ হচ্ছে, এ সবের প্রয়োজন আজ ওদের খুরিরেছে!

ক্লিক-ক্লিক—মাঝে-মাঝে আসে উঠে ছাশলাইট। কটো নিচ্ছেন সাংবাদিকেরা, আলোকচিত্রশিল্পীরা।

ডিনারের শেষে আবার চললো পানোৎসব।

জমজমাট পাটি ভাঙার মুখে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এসে পাঁড়ালো অসীমতা।

—আমি এসেছি ছোট মায়া!

—চমকে উঠে চাইলো অনিল অসীমতার দিকে। বেন কিরে এলো ওর মনটা কোন দূর-দূরান্তের স্বপ্নলোক থেকে।

—এত দেহোতে এলি মিডু? শরীর এখন ভালো তো? একটু হেসে বললো অনিল।

—হ্যাঁ, এখন একটু ভালো! বোধ করছি। বিকেলে বজ্র মাথাটা ধরে ছিলো, ভেবেছিলোম আসতেই পারবো না, কিন্তু বজ্র খারাপ লাগছিলো তাই চলে এলাম। নিজেকে গলায় বললো অসীমতা।

—কিন্তু এমন সাধামাটা বেশ কেন ভাই? এ তো বিয়েবাড়ীর সাজ নয়, এ বেন শ্রাব-বাড়ী বাওয়ার সজ্জা।

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি প্যাকেট
২৪ টি
ব্রড স্লাইসের

- কল্লে প্রস্তুত
- ফ্রীমে সেকা
- মেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সর্বত্রের রক্ষা করিতে

আর্য বেকারি অ্যান্ড কন্ফেকশনারি

কলিকাতা - ২২

মেকি খোঁসে ছেড়ে বেঁধিয়ে আসছে আসল শুকতার। হাঁট চেপে বাঁকা হাসি হেসে বললো—তোমার দিদিমা, মাসীমা কেউ তো এলেন না, তুমি যদি বা মনে করে এলে, এমন উলসিনীর বেশে কেন তাই ?

সত্যিই উলসিনীর বেশে এসেছে অমিতা ! লালপাড় সাদা ঢাকাই শাড়ী পরনে। সত্য সান-করা ভিজে চুলের রাশ ছড়ানো পিঠে। হাতে অন্ন কয়েকগাছি সোনার চুড়ি, আর অঙ্গে নেই কোনো অলঙ্কার। মুখখানি স্নান বিবর্ণ, তবুও কি অপূর্ণ লাবণ্যময় ! শাস্ত পবিত্র শুভ্র স্রোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন ওর সর্বাঙ্গ থেকে। সে রূপের আলোর স্নান হয়ে গেছে বহু প্রশ্রয়ন বিচিত্র বসন-ভূষণ সজ্জিত। অস্বাভাবিক রূপশ্রদ্ধা। তারা সকলেই নির্বাক দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলো ওর দিকে।

—স্বাথীরা ভালে ছিল না কি না, তাই এমনিই চলে এলাম—মিতহাস্তের সঙ্গে জবাব দিলো অমিতা। তার পর কাপড়ের চাপা সরিয়ে বার করলো একটি ভেলভেটের কেস। কেসটি খুলে শুকতারার মণিরন্ধে পরিয়ে দিলো একটি হীরের ব্রেসলেট, তার মাথো ছোট্ট বড়ি আঁটা। আর অনিলের আঁহুলে পরালো একটা হীরের আঁটি।

—এ কি ! এ কি ! করছিস কি মিথু ? বাপ রে, এ যে দেখছি বহু টাকার বাপার। ব্যস্ত ভাবে বললো অনিল।

—না না, এমন আর কি। ও তো আমার ঘরেই ছিলো, ব্যবহার হয় না, তাই—লজ্জিত ভাবে জবাব দিলো অমিতা।

শুকতারার নিজের হাতটি ঘুরিয়ে-কিরিয়ে দেখছিলো, বেশ খুশি হয়েছে মূল্যবান উপহারটি পেয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে অমিতার গলাটি জড়িয়ে ধরে বললো—কি চমৎকার জিনিষটি ! ভারি পছন্দ হয়েছে আমার ! বোসো ভাই, তোমার খাবার দিতে বলি।

—শুধু এক গ্রাস সযত খাবে। আজ আর কিছু নয় ভাই ! খাওয়া আমার পাওনা বইলো, বললো অমিতা শুকতারার হাতটা চেপে ধরে।

একটু দূরে কোণখোঁয়া সোফায় বসে বিমুগ্ধলেন মাসীমা। ডিকের মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছে, মতশানের কম্পিউটনে বাজি অবশ্য জিতেছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা উঠে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে অমিতার পাশে। শুধু অসীম ছিলো মাসীমার কাছে। হঠাৎ সামনে চাপা ভিড় আর যুহু গুলনের আওয়াজে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। চুপ-চুপ চোখে চেয়ে শুভালেন—বাপারটা কি হে ? কোথাও আকসিডেন্ট হল নাকি ?

—না, ঠিক তা নয়—দেবীর আবির্ভাব হয়েছে ওখানে—মানে অমিতা দেবার—অবজ্ঞার হাসির সঙ্গে জবাব দিলো অসীম।

—আঁ কি বললে ? মিতা ? বলো কি আঁ ?

ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন মাসীমা। টলতে টলতে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন অমিতার সামনে।

—ফুলো রাজা চোখ দিয়ে অমিতার আপাদ-মস্তক লেহন করে হঠাৎ হাউ-হাউ করে কঁদে উঠে গুকে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—তাই তো বলি, এ কি হতে পারে ? মিথু আসবে না ভা কি হয় ? আঁ, সে কি না এসে পারে ? ও মাই স্নাইট গাল ও

মাই ডারলিং, তোর জন্তে যে এককণ এই বুকেটা খাঁ-খাঁ করছিলো... জড়িত কণ্ঠে প্রলাপ, বিলাপ করতে করতে অমিতাকে চুমোর চুমোর ভরিয়ে দিলেন মাসীমা।

—কি পান করছো মাই ডারলিং ? তোমার গ্রাসে ওটা কি ? শেরি ? অর বিয়ার ? না, না, ও তেমন ভালো নয়—আমি দিচ্ছি সব চেয়ে সেরা মাল, তোমাকে আজ খাওজাবো। হ্যাঁ আজই খাবে, আমার সঙ্গে বসে এক গেলসে খাবে ডারলিং ! অমিতাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে বসলেন মাসীমা।

তড়িং গতিতে এগিয়ে গিয়ে অমিতার এক হাত চেপে ধরলো অনিল। গুকে ছেড়ে দিন মাসীমা, ও আজ বড় অসুস্থ, মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো অনিল।

—অসুস্থ ? তাতে কি ? খুব ভালো দাওয়াই দেব, ওসব রোগ-বালাই পড়পড়িয়ে পালাবে। হো-হা করে হেসে উঠলো আশে-পাশে ছিলো তারা।

—মাসীমাও বোগ দিলেন ওদের হাসিতে—ঠিক বলিনি ? কি বলো ভাই তোমরা ? হা, হা, হা, হা, হি, হি, হি, হি, হাসতে হাসতে বিবম খেয়ে ফেঁচকি তুলতে লাগলেন তিনি। সোয়গোল পড়ে গেলো ঘরে। নিয়ে আর জল, পাখা ? পাখা তো নেই—ঠাশা করা ঘর, বিজলী-পাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই। কখনো নেড়ে সবাই হাওয়া করতে লাগলো মাসীমার মাথার। স্তম্ভ হয়ে কখনো চোখ মুছে এ-দিক ও-দিক চাইলেন মাসীমা—মিতা ! মিতা কৈ ?

তাই তো অমিতা তো নেই ! গোলমালের ভেতর কখন সে চলে গেছে !

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন সফ গলায় টিল্লনী কাটলো—পানী উড়ে গেছে !

—কে বললে এমন কথা ? শূন্যের, গাখা, রাখেল,—ইউরেট ব্লাডি আস 'কোথাকার' হু' কোমরে হাত দিয়ে গজ্জন করতে লাগলেন মাসীমা,—নোরা মাতাল সব। মাতলামী করবার জায়গা না জোটে তো ভাঙিবে না, জাহান্নমে যা, এখানে কেন ?

আঙুলে আঙুলে ভিড় পাতলো হয়ে যেতে লাগলো। তসীম এগিয়ে এলো এক গ্রাস রাম হাতে নিয়ে। মাসীমার হাতে তুলে দিয়ে বললো—যেতে দিন মাসীমা, ও-সব নোরা খেঁটে কাজ কি ? বর আরেকটু—

—ইয়েস ! ইয়েস ডারলিং !

ফেনিল পাত্রটিতে চুমুক দিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন মাসীমা। পাত্রটি নিঃশেষ করে সোফায় মাথাটি হেলিয়ে দিলে, চোখ বুজে, স্তম্ভ ভাবে বসলেন তিনি—আরেকটু ঢালো ডিয়ার ! গরম করে দিয়েছে মাথাটা ছাঁবলা মাতালগুলো,—এই যে,—এগনি সব ঠিক হয়ে যাবে, মাসীমা ও-সব নেড়ি-কুত্তা খেউ-খেউতে কান দিচ্ছেন কেন ? আপনার মর্গ ওরা জানে কি ? গ্রাসে হইপি ঢালতে-ঢালতে বললো অসীম।

—তা বটে ! তা বটে ! আজ্ঞা দে মাথা ঝোলালেন মাসীমা।—করেক পেস শেষ করে চক্ষু বিফারিত করে চারি ধারে চেয়ে জড়িত কণ্ঠে বিশ্বয়াক্তি করলেন, মাই গড ! একেবারে শূন্য পুরী রে ! বানের জলে ভেসে গেলো না কি সব ?

[ক্রমশঃ]



ব্যবহার করুন
হিমালয় বোকে
ট্যালকাম পাউডার



সারাদিন
সতেজ
থাকার জন্যে

- এত সুগন্ধ
- এত কম খরচ
- সারা পরিবারের
পক্ষেই আদর্শ



এরাসমিক লগনের পক্ষে হিমালয় নিত্যের লি, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৭

দিনটা ছিলো কোনো এক পরবের। বুধ বা শিবরাত্রির পরদিনই হবে। ব্রিজহুলারি আর চম্পা দুজনেই এসেছিলো সতীচৌড়ার ঘাটে স্নান করতে। ঘাটে পুরোহিত বসে থাকেন ছাতার তলায় চৌকি পেতে। চোখ বুঁজে গঙ্গামাতার জ্বব গাইতে গাইতে তিনটে ছুব দিয়ে উঠে এলো চম্পা গঙ্গাজলে বড় একটি ঝটি ভরে নিয়ে। তারার ছোট একটি ঝড়া। গঙ্গার শালা বালিতে মেজে তাকে সোনার মতো ঝকঝক করেছে চম্পা। ঘটের কানার কানার জল। চম্পার দেহে-ও যৌবন ভরা-ভরা। একটি করে সিঁড়ি ভেঙে ওঠে চম্পা আর সীতের আমেজ লাগা ঠাণ্ডা বাতাসে তার চুল ঝাপটায়। পুরোহিতের সামনে ঈষৎ নিচু হয়ে প্রণামী নামিয়ে দিলো চম্পা একটি রূপোর সিঁকা টাকা। মনে বেন গর্গও ছিলো। এত জন তো দিচ্ছে। কই, এই সাতার সালে এমন করে এক টাকা দিতে পারে কে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নিচু হয়ে দিচ্ছিলো প্রণামী, সে মুখ তুলে তাকালো। তারিকের একটা নয় দুটো টাকা দিলো ব্রাহ্মণকে। অমনি অস্ত্রান্ত পুণ্যার্থিনি মেয়েদের মধ্যে ছোট ছোট গলায় শুভ্রন উঠলো। সোজা কথা তো নয়! একটা চেবুয়া পরশা, তারার লোহার মিশাল দেওয়া, তাই যদি পায় ব্রাহ্মণ দিনে চারটে, ছ-টা, তো তার দিন চলে যায়। এক মণ চাল এক টাকা, চল্লিশ সের আটা এক টাকা—তিন টাকা সকাল বেলা এমন বসে বসে পাওয়া পরম সৌভাগ্য।

চম্পা অধর নশন করলো অপমানে। ততক্ষণে তাদের দুজনকে ঘিরে এসেছে ভিখারীর দল। অন্ধ কিশোরীটি বসে আছে সিঁড়ির ওপরের চবুতরায়। তাকে তার মা বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে সকালে। সে শুধু বলছে—সুরদাসকে দমা কর! বলছে আর ঝুঁকি দিয়ে গেয়ে উঠেছে একই গানের কলি।

—বলো যেবে নৈনন নৈনমাল!

ভীকু মিষ্ট সেই কিশোরকণ্ঠ। গানের ঝঁকির শেষে সে উৎসুক মুখ তুলে তাকাচ্ছে সামনের দিকে। ওপাশে ভিখারীদের কলরব শুনে সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আজকে তার চাগরেও পড়বে চেবুয়া, পাই, আদলা। আর যদি আট-দশ পরশা কামাই হয়, তো মা তাকে দোকান থেকে পুরী-জিলাপী খাইয়ে নিয়ে যাবে। মুখ তুলে তাকাচ্ছে অন্ধ বালক। আর দুই অন্ধ চোখের ওপর সকালের আলো হয়ে বাচ্ছে।

চম্পা মনে মনে অপমানে ছলে বাচ্ছে। আজ তার কাছে বেকী টাকা নেই। সব পরশা, আদলা, পাই। একটি টাকা আছে, সে অন্ধবালককে দেবে, মনে মনে মেনে রেখেছে। এই অপরিচিতা গবিতার ব্যবহারে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সুরদাসের সামনে এসে চম্পা বালকের হাতে একটি টাকা দেয়। আর অমনি ব্রিজহুলারি দানী এসে দাঁড়ায়। বলে—বিবি তোকে দুটো টাকা দিলো। ধব, সুরদাস!

বড়লোকের দানী। তার অহংকার কতো! চম্পার দিকে চেয়ে সে চোখ ঘোঁরায়। বলে—আজ বিবি দান করবে কত! পঞ্চাশ টাকা।

চম্পা না বলে পারে না—কে তোর বিবি?

—ব্রাইটের বিবি ব্রিজহুলারি। কানপুরে তাকে না জানে কে?

চম্পা গ্রামের মেয়ে। বিধে বিধে কথা করে ছালা দিতে সে জানে। সে বললো—ও! উঠতে লাগলো সিঁড়ি ভেঙে, আর বলতে লাগলো—তবে তো হাজার টাকা দান করা উচিত। যার বত পাণ, সে ততো দান করবে। যার পুণ্য আছে সে কি পুণ্যের লোভে এমন কাভাল হয়ে বেড়াবে?

শরসন্ধানে ভুল হযনি। ঠিকই বিঁধেছে! ব্রিজহুলারি মুখ অপমানে রাজা হয়। নিশ্চয়, বিবধ এক মর্মর-প্রতিমা বেন সজীব হয়। কথা কইতে চেয়েও কর না সে। ক্রান্তে মুখ নিচু করে সতীনের শ্রুতিছত্রীতে জল ঢালে, মিঠাই-কুল দেয়।

কেন এমন হয়? আজ দুদিন ব্রাইট ঘরে নেই। গেছে ভগবানপুর। প্রতি রাত্রির সে তাণ্ডব, সে অত্যাচার দেখে যখন করে মরে যায় ব্রিজহুলারি। সর্বাঙ্গ সোনার গহনা, সেও তো ব্রাইটের একটা বর্ষ অহংকারের পরিচয়। ব্রাইট যে তার বিবিকে কত ভালবাসে তাই দেখাতে চায়। ব্রিজহুলারি কি জানে না, যে ব্রাইটেবে প্রতি বাহুবের ঘৃণা ও অবিশ্বাস, সবটাই তাকেও চিরতরে কলঙ্কিত করেছে। তাকে-ও সকলে ঘৃণা করে।

কিন্তু আজকের সকালটি যে তার ভালো লেগেছিলো? ভালো লেগেছিলো আজ স্নান করতে। মনটা ছিলো প্রসন্ন। কোনো এক শুভ সংবাদের প্রত্যাশা বেন মনটাকে সোনালী করেছিলো। আর এই যে মেয়েটি ও তো চম্পা! চম্পার নাচ সে দেখতে বটে ক্যান্টনমেন্টে। আজ এই তরুণী মেয়েটিকে দেখে বড় ভালো লেগেছিল তার। ব্রাহ্মণকে পরশা দিতে দিতে এখনও ভেবেছিলো সে, যদি মেয়েটি তার সঙ্গে ভাব করে তো বেশ হয়।

হলো কই? তার নির্বেদ্য দানী কি বললো, আর এ চম্পা

জন্ম করে যোগে উঠলো? বিজ্ঞানসূত্রের মনটা নিমিষে ভারী হয়ে গেল। চোখ নিচু করে সে জল দিতে দিতে চললো। আর পরসার প্রত্যাশায় একটি ছোট ছেলে, বুঝি বা ভ্রাক্ষণই হবে, বলতে লাগলো—এইখানে সতীয়া স্বর্গে গিয়েছেন। আগুনের শস্যায় বসে, বামীর পা বুক ধরে। স্বর্গ থেকে রথ এসেছে। সত্যকে নিয়ে গিয়েছে। এখন সতীয়া অনন্তকাল স্বর্গস্থ করছেন।

চম্পা এমন সুরোগ ছাড়েনা। বলে—বাডা! মিছে কথা বলিস না। কোম্পানী কাছনের অনেক পরেও আমার গাঁ ডেরাপুরে এক নির্বোধ মেয়েকে কেশবরামের মামা সতী করেছিলো। সে শুধু টেচিরেছিলো আর কৈদেছিলো ভয়ে। আমাদের গাঁয়ের সব বুড়ো-বুড়ীরা দেখতে গিয়েছিলো। কোথায় ছিল রথ? কোথায় ছিলো স্বর্গ?

বালক হেসে বলে—তবে তুমি জল দিচ্ছ কেন?

—দিচ্ছি এই জন্তে যে, বড় জলে-জলে মরেছে বেচারীরা! এখন একটু ঠাণ্ডা হোক। জানিস না তুই? যে রাত্তির বেলা এখান থেকে কাল্য আর চাঁকর শোনা যায়? সেইজন্তে দিচ্ছি। পুণ্যের দরকার কি আমার? আমি তো আর পাণী নই?

বিজ্ঞানসূত্রী আহত ও পাণ্ডুরূপে তাকায়। বলে—বহিন, তুমি না মান, অজ্ঞ ব্যাধি মানে, তাদের ছোট করে না।

—আমি কাকুর বহিন নই। বলে বিজ্ঞানসূত্রী মতো ভেজা শাড়ীর জাঁচল ঝাপ্টে চলে যায় চম্পা। ঘরে আসে সম্পূর্ণের জন্তে মিষ্ট কিনে। বলে—বুঢ়া, খাও। তারপর বলে—তোমাদের বিবিসাহাবকে আজ ঠাকুর লাগিয়ে এলাম।

আজ্ঞাপাশ শুনে সম্পূর্ণ বলে—শোন চম্পা, তুই ভুল করলি।

—কেন?

—ওর সঙ্গে ভাব কর তুই।

—ওর সঙ্গে?

সম্পূর্ণ হাসে। বলে—ও খুব ছুঃখী। তুই কথা কইলে এক মিনিটেই ভাব করবে। জানলি?

—তা আমি ভাব করবো কেন? বুঢ়া, কি মতলব?

—কি মতলব?

চম্পা হাসে। বলে—বুঢ়া, তোমার মতলব আমি বুঝি না? রাত-দিন তুমি জমায়ত করছ। বিসালো আর ক্যান্টনমেন্টের লোক আসছে। বাজারের গরম গরম গরম উড়ছে।

—দেখে এলি?

—নিশ্চয়। আমার চোখ নেই? তুমিও তার মধ্যে আছ।

সম্পূর্ণ বলে—মতলব নিশ্চয় আছে। কোন মতলব নেই, এমনই তোকে আগলে বসে আছি? তোকেও টানব।

—কেন, বুঢ়া?

সম্পূর্ণ টেনে টেনে শক্ত হাতে খাটিয়ার বশি বাঁধে। তারপর বলে—কিছু কাকুর কাজ করবি চম্পা! একটা জীবন তোর। টাকা-পয়সার অভাব নেই। যদি একটা ভাল কাজ করতে পারিস তো জানবি তোর ভাগ্য।

—আমার ভাগ্য?

—হ্যাঁ, চম্পা! ব্যাধি ভাল কাজ করে এ ছুটিরায়, তাদেরই

ভগবান এমন একলা পাঠায়। এক জীবনে তুই কত গহনা পরবি? কত শাড়ী পরবি? কত মিঠাই খাবি? তাতেই কি সুখ?

—বুঢ়া, তুমি আমাকে সুখের কথা বলো না। কাজ যা বলো, করে দেবো। কেন করবো না?

—তো, ঐ মেয়েটির সঙ্গে ভাব কর। মিশে যা ওর ঘরদোরে। আমি তোকে বলি চম্পা..... অনেক কথা চম্পাকে বললো সম্পূর্ণ। বললো—আমাদের কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বিশ্বাসী মানুষের বড় প্রয়োজন এখন। তোর মতো সুযোগ কার আছে চম্পা? আর বিজ্ঞানসূত্রী যে ওদের মধ্যে রয়েছে! তুই বিশপ্তে পারিস, ভাবগতিক বুঝতে পারিস, তবে বরা দিবি না, জানলি?

—কিন্তু কি আশ্চর্য কথা শোনালে বুঢ়া, তা কি সম্ভব? তা কখনো হয়?

—হয় না? হতেই হবে। ধর্ম গেল, জাত গেল, সবই নশ হয়ে গেল। আমাদের নবাবকে ওরা রাজ্য ছাড়িয়েছে। আর ফৌজের ওপর কি অত্যাচার! কথো আছে সবাই। আর কোঁজও হাত হয়েছে। কেপে আছে। জানলি?

—বুঢ়া, তুমি কেমন করে জানলে?

সম্পূর্ণ সে কথার ঠিক জবাব দিতে পারে না। একটু ভাবে। বলে—কেমন করে জানলাম? বলতে পারি না। তবে একটা নিশ্চয় জানবি যে, মস্ত একটা টালমাটাল আসছে। বতো রাজা আর সর্দার, তারা আমাদের হাতী-ঝোড়া বন্দ দেবে। কোঁজ আসবে হাতিয়ার নিয়ে। সবাই মিলে একজোটে কথো উঠলে। পাহাড় ধসে যায় তো এ তো কয়টা মাত্র শালা মাছুষ। তাদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারবো না?

চম্পা চিবুকে হাত রেখে ভাবে। তারপরে বলে—ওরা রাজা, ওরা সরকার, তো চালাবে না চাবুক?

—হ্যাঁ, জরুর চালাবে। তবে ক্ষেতীজমি নেই, পেটে শুধু ভুখা আর পিঠে চাবুক! এমন আর বেশী দিন চলবে না।

সম্পূর্ণের কাছে শুনে চম্পা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিজ্ঞানসূত্রীর সঙ্গে আলোচন করলো। উঠে এলো তার কুঠিতে নিঃসঙ্কেতে। বললো—বড় টাকার দরকার আমার। একটা বালা রেখে দেবে আমাকে টাকা? কুড়ি টাকা?

বিজ্ঞানসূত্রী আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্রাইট করে নেই, জেনে-জেনেই এসেছে চম্পা। আজ যে কি মনে আছে তার। বিজ্ঞানসূত্রীর দাসী উৎকুর হয়ে ওঠে। মনে ভাবে যে, সেদিন বাইরে পেয়ে অপমান করেছিলো চম্পা। আজ ঘরে পেয়ে বিজ্ঞানসূত্রী নিশ্চয় করে অপমান করার সুযোগ হারাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য হয় সে বিজ্ঞানসূত্রীর ব্যবহার দেখে। চম্পাকে চৌকিতে বসিয়ে আপ্যায়ন করে বিজ্ঞানসূত্রী। বলে—পান খাবে? তামাক খাও?

—না!

আলগোছে অগন্ধি এলাচি অপ্যায়ি তুলে নেয় চম্পা। তারপর একটু হেসে বলে—সেদিন ঘরে কিরে আমায় ওঁপের রাগ করেছিলো?

—না তো! ছুঃখ হয়েছিলো।

এবার ছুঃখ নেই হাসে। আর পর্দার বাইরে ঝড়িয়ে ছুঃখনের

মিলিত হাসি শুনে দানী বিষম্ব হয়ে পানের পিচ ফেলে মাথা নাড়ে।
শ্রুত-নির্যত সিপাহীটিকে বলে—মেয়েমাছুষটার সরমও নেই,
শরীরে যেন মাছুষের রক্তও নেই! হি! বাজারের একটা
রমজানী, তাকে অপমান করলো সেধে, আর তুই তাকেই
ঘরে ডেকে...

ত্রিভুজলারী প্রাসাদে দানীর কানে, হাতে, পায়ে ভারী
রুপোর গহনা! সে দিকে চেয়ে সিপাহীটি বলে—বিবিকে বলে
ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দাও না! একটিবার যুঁবে আসি চার
দিনের জন্তে?

—ওর পা ধরে কেঁদে পড়লেই হবে। আমি জানি তো?

—মজুধ করাবে ছুটি?

—নিশ্চয়! মেয়েটা বোকা তো! আমরা সবাই ওকে ঘরে
ঐ সুবিধেটুকু আদায় করে নিই!

তবে এত নিশ্চয় কেন ওর?

—কাজ আদায় করে গেলে কে মনে রাখে ওকে? ওকে সবাই
ঘেঁরা করে। ধর্ম নেই বার...

সেনিনকার আলোপেই সুরপাত হলো এক অভিনব ঘনিষ্ঠতার।
ত্রিভুজলারী একদিন পালকী চড়ে উপস্থিত হলো চম্পার ঘরে।
গাছের ছায়ায় বসে চম্পার সঙ্গে তার দেশ-বয়ের পল্ল করতে খুব
ভালো লাগলো। আর একদিন বে সে সহ করতে পারছে না, তা-ও
জানলো চম্পা।

চম্পা বললো—চলে গেলেই পার?

—সাহস হয় না। বলে স্নান হাসলো ত্রিভুজলারী। বললো

—যাবার জায়গা কোথায়? আমাকে কি আমার বাপ-ভাই আর
ঘরে ঢুকতে দেবে?

—দেবে না?

—না।

সেনিন আর কথাবার্তা হয় না। ঘরে কিরে ব্রাইট বখন জানে,
এতক্ষণ সে কাটিয়ে এসেছে চম্পার ঘরে, অভ্যাস বশত গালি দিয়ে
ওঠে না। বা মারে না। বরক বলে—মেয়েটা বেশ। কি রকম
টাকাপয়সা নেয় তা জানো?

—না। আর সে সব কথা তুমি ওর সম্পর্কে ভেব না।

ত্রিভুজলারী কোন দিনও এমন জবাব দেয় না, তাই ঈর্ষ্য আশ্চর্য
হয়ে চেয়ে থাকে ব্রাইট। পরে শীঘ্র দিয়ে বলে—আচ্ছা!

সেনিন ব্রাইট বাত্রির জন্তে অপেক্ষা করে না। যেমন পক্ষ,
তেনেই বর্বর হয় সে। আজ বলে কি, যেদিন, বখনই ত্রিভুজলারীর
মধ্যে সে কোন ব্যক্তিগতভাবে কোন নিজস্ব মতামত, কোন স্বতন্ত্র
সত্যের আভাসমাত্র দেখেছে, সেদিনই সে এমনই বর্বর হয়েছে।
মনটাকে তো হাতে ধরা যায় না। ছুই হাতের মধ্যে ধরা যায় যে
কেটাকে, তাকেই নিষিদ্ধ করে ব্রাইট গোটা মাছুষটাকে ভেঙে-
চুরে দেয়। আর সত্যি-সত্যিই দেখে-মনে পরাজিত হয়ে অবসর পড়ে
থাকে ত্রিভুজলারী। মনে হয় ভেঙে চুরে মরে গিয়েছে সে। এর
চেয়ে কোনো হুজু ভয়ঙ্কর হতে পারে না।

এখন ত্রিভুজলারী 'যেন তবু সাধনা পায়। মনে হয় চম্পার
সঙ্গে মিশে সে এতটুকু আলোর সন্ধান পেয়েছে। একেবারে সে
একাকী নয়।

চম্পার প্রাণে তাই আবার একদিন এসে নামে ত্রিভুজলারীর
পালকী। ত্রিভুজলারী স্বল্প কুণ্ঠিত, হেসে বলে,—আজ আমার
উপবাসের দিন। তাই দুই প্রহর সময় কাটাতে এলাম।

সম্পূর্ণ চম্পার কৃতিত্ব দেখে বড় খুশী হয়। ব্রাইটের বিবিক
একেবারে মাটির উঠানে এনে ফেলেছে সে! পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে
সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নিভুতে চম্পার কাছে বসে ত্রিভুজলারী নিজের মনখানি মেলে
ধরে। চম্পার উঠানে একটা আমগাছ। কোনো ঐতিহাসিক
ছাগলহানা সেখানে আলোছায়ায় লাফালাফি করে। কাজ করতে
করতে চম্পা স্তম্ভের হাতটি বাড়িয়ে এক মুঠো সব বাজরা ছিটিয়ে
দেয় মাটিতে। নেমে এসে কটা পায়রা সেই আবার খায় খুঁটে খুঁটে।
চম্পার ঘরের পাকা দেয়াল, শানের মেঝে আর উঁচু খড়ের চাল।
সেই চাল দিয়ে মুঠো কাঠবোড়ালী গুঠে আর নামে। ত্রিভুজলারীর
মনে হয়, এমন শান্তি সে অনেক দিন দেখেনি। এত অবসর কোথাও
নেই। কেন যেন তার চম্পাকে বিশ্বাস করতে সাধ খায়। বলতে
স্বল্প করে তার কথা। বলে—খুব ছোট গ্রাম আমাদের সিংগার।
আর ছোট গ্রামের ঠাকুরশাহেব আমার বাবা। শুনেছি আমার
শৈশবে বিয়ে হয়েছিল। আমি বিধবা। তবে সে আমার মনে
পড়ে না। বলে—দাদা পয়দানী সবাই সাহেবদের নিমক খেয়েছে।
বাপও তাই বড় সাহেবদের ভক্ত। বেশ কেটে যাচ্ছিলো আমার
জীবন। এমন সময় গ্রামে সাহেব তাঁবু ফেললো। সে তিন বছর
হলো।

তার পর টোক চেপে গলা পরিষ্কার করে। চম্পার দিকে চেয়ে
যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমন সাহুনের সুরে বলে—আমি বড় সন্দর
ছিলাম! আর জওয়ানীর জল বৃষ্টি ছিলো। বিপদ দেখেও আমি
বুঝতে পারিনি।

তার পর আর কিছু বলে না। কেমন যেন হয়ে যায়
ত্রিভুজলারী। পানও তামাকে কালো টোট বাশন করতে থাকে।
বা বলে না তা যেন চম্পাকে বুঝে নিতে অসুস্থ হয়ে। আর সেই
অব্যক্ত কথা যেন চম্পাও শুনতে পায়। বুঝতে পারে। বুঝতে
পারে, এক অনভিজ্ঞ কিশোরীকে ছিঁড়ে উপড়ে এনেছে ব্রাইট।
ছিন্নবুল সে গ্রামের মেয়ে এখানকার জীবনে বেঁচে আছে মাত্র—কিছু
বাঁচবার আশঙ্ক তার হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই কি? এত
অলঙ্কার, এত ঐশ্বর্যেও কি কিছুই ভরেনি তার? না, আরো কথা
আছে?

ত্রিভুজলারী বলে—আমার বাপ ভাই খুব বদী। কোঁজে তাদের
স্বযোগে সুরিখে আছে। জজ ফৌজী সিপাহী তাদের মান।
সাহেবও তাদের দিয়েছে অনেক।

—আর তুমি?

চৌকা আলিয়ে আগুনটা দেখে চম্পা। বলে—তুমি দুখী হয়েছ?
ছোট একটা ছুরি নিয়ে ত্রিভুজলারী হুনিপুণ হাতে কুচিয়ে কাটে
শাক-সবজী। বলে, হয়েছে তো!

চম্পার বলতে ইচ্ছে বার, তবে কেন তোমার স্বভাবগৌরব বর্ন
এমন পাণ্ডুর? কেন তোমার চোখের নিচে নিরন্তর কালিমা? কেন
এক শোকের বিষম বিভাজিত তোমার মুখে? দৃষ্টি যেন সর্বদা আহত।
তবে সে কথা মুখে কিছু বলে না। বলে—তবে গ্রামে বেতে বাধা কি!

—তুমি বুঝবে না। আমার সঙ্গে তারা কি খাওয়া-দাওয়া করে? আমাকে শাদী, গাওনা, ফ্রিডার্মার ডাকবে?

না ডাকবে না। তা জানে চম্পা। আরো দুটো-একটা কথা বলে উঠে পড়ে ব্রিজহুসারী। চম্পা বলে—ভালো লাগে তো বসো না। ভর কি?

—তুমি বুঝবে না। বলে জ্বড়ে চলে যায় সে।

ব্রিজহুসারীর সঙ্গে কথা করেই এক দিন চম্পার ডেরাপুরে যাবার হচ্ছে হলো। আসলে মনে মনে ছিলো চম্পনের খবর নেবার ইচ্ছা। ব্রিজহুসারীর সঙ্গে তখন তার খুব বনিষ্ঠতা। আরো অনেক কথা বলেছে ব্রিজহুসারী। বলেছে—আমার জীবনটা সবটাই পাশের। হুঁ তারই মধ্যে একটা খাঁটি মানুষ আমি দেখেছিলাম চম্পা। মুক্তি পাবার একটা সুযোগ আমার হাতের মধ্যে এসেছিলো। বড় দরবার দরী তার, মনে বড় দর-মায়া। আমাকে দেখে সে দুঃখ পেরেছিলো। কেন কে জানে?

অন্যক ভরে চেয়ে থাকে সে। বলে—আমি আজও বুঝতে পারি না যে সে কেমন করে বুঝেছিলো। অথচ তখন আমার হুটী, দানী, সোনা-চাঁদি কিছুই অভাব নেই। তবু দেখে চম্পা, সে ঠিকই বুঝলো যে আমার সুখ নেই। আমি সাহেবকে বলেছিলাম যে আমি তার কাছে উর্দু শিখবো। সেই সময়ই সে একদিন বললো, এত ছুটির মধ্যে থাকবার দরকার কি? কেন থাকবে তুমি? চলে এসো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। সে তৈরী ছিলো। কিন্তু আমি সাহস পাইনি চম্পা। সাহস পাইনি আর সেই একটা ভুলের জন্তে জীবনটা আমার বরবাদ হয়ে গেল। একবারে।

—আর ফিরে যেতে পারো না? আবার ফিরে গেলে হয় না? চম্পার সম্বন্ধেই প্রশ্নের জবাবে ব্রিজহুসারী মাথা নেড়েছিলো। না তা হয় না। আর সেই বিবর মুখখানার দিকে চেয়ে চম্পার মনে হয়েছিলো হতাশার বেননা এত গভীর, এমন সর্বব্যাপী, যে তার মুখ-কিনারা নেই। শুত হুতুর্ড একবার এসে চলে গেলে কি তাকে আর পাওয়া যায় না?

সম্ভবতঃ তার পরেই তার মনও ধারণা হয়ে গেল। সেই রাত্য়র আর সেই ছোট নদী তার জীবনের অনেক দিনের পৃথিবীজড়িত সেই গ্রামখানি দেখতে বাসনা হলো।

সম্পূর্ণরূপে তাই একদিন বললো সে—চল বুঢ়া। তোর চম্পা কোন্ বাগানের ফুল, দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ডেরাপুর গ্রামে ফিরে এসেছে চম্পা, ফিরে এসেছে রাণী হয়ে, দানী সঙ্গে নিয়ে, টাকা পরস্যা খরচাত করতে এসেছে, এ কথা কেন আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই। এ যেন রূপকথার গল্প হয়ে গেল। যে মানুষ বেঁচে আছে কি মরে আছে, তাই কেউ জানতো না। সে বসেই এমন জাঁকজমক দিয়ে?

চম্পার ভাড়াঘরে এখন বুড়ী কৌশল্যার পরিবার পরিজন শুধু আছে। সেখানে কেমন করে থাকবে চম্পা? গ্রামের মানুষের মতো সেই ভাড়া উঠানে। হ্যাঁ, চম্পাই বটে। কৌশল্যার স্নাতিকে টাকা দিচ্ছে তার মায়ের ভাড়াঘরখানি সেয়ে নিতে। ছোটবেলার সাধারণতঃ খবর নিচ্ছে। বসেছে জোনপুরী গালিচার সামনে। পান খাচ্ছে খাঁটি চাঁদির ডিবে থেকে। দুই হাতে

সাত আটটা আঁটে বলকাছে। পায়ে নাগরা জুতো। নাগরার ওপর ভারী চাঁদির তোড়া।

আর কথার বর্ত্তার বাকি রহীস তাব! দেখে-শুনে মানুষের ভাজব লেগে গেল। ভাজব দেখতে বেশবরাম নিজেই এলো। মায়ের নাম করে গৈবীনাথের মন্দিরে মোহর দিলো চম্পা। গায়ের দশ জনে টাকা দিয়ে বাঁধিয়ে দিচ্ছে পণ্ডিতজীর ঘর। সেখানে ছেলেরা পড়বে সকালে আর সন্ধ্যায় পূরণ পড়বেন পণ্ডিতজী। ছোটবেলার পণ্ডিতজীর বেত চুরি করে বেড়ে নদীর জলে ডালিয়ে দিয়েছে চম্পন কত বার, আর চম্পা তাকে সাহায্য করেছে। আজ সে কথা ভুলে চম্পা এক মোহর প্রণামী দিলো এই ভক্তকাজে।

আর অনেক দিন আগে, তাদের সকল সম্পত্তির সঙ্গে যে বাঁধানো ইঁদারা কিনে নিয়েছিল লাল, সেই ইঁদারা কিনে কিনলো চম্পা। গ্রামের দশজনের সামনে সে মোহর দিলো দুটি বেশবরামের হাতে। বললো—এতটুকু পিয়াদের জল ভরতে মা আমার বড় কষ্ট পেয়ে গিয়েছে। এই ইঁদারা দেখবে আমার ঘর্মভাই। কৌশল্যা নানীর নাতি। দেখবে কি, যে কোনো দুখিয়ানী যেন জল নিতে কষ্ট না পায়।

সব হলো, শুধু বার জ্বড়ে আসা, তার কোনো খবর শেল না চম্পা। আর বাকি দেখাবে বলে আসা, সেই দুর্গার সঙ্গে দেখা হলো না। প্রতাপসিংহের বৌ দুর্গার গর্ভ কি আজও জাড়ে নি?

দেখা হলো। দেখা হলো এমন পরিবেশে, এমন করে, যে কেমন করে দেখতে চম্পা চারনি। চম্পনের বাপকে দেখলো বটে বাস্তার। অকালে বাধকোর ছাপ পড়েছে। রগের ছই পাশে পাক ধরেছে চুলে। কিন্তু শুধু তাই-ই নয়। কোথার যেন হেরে গিয়েছে মানুষটা। পায়ে সে পেতলের ফুলসানো ভারী নাগরা আজও আছে। কিন্তু সে মনগবিত ভঙ্গী কোথার চলে? কিসে, কেমন করে হেরে গেল মানুষটা?

কৌশল্যার নাতির বাচ্চা মেয়ে ছিলো চম্পার সঙ্গে। সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে তার হাত ধরে বেরিয়েছিলো চম্পা। কৌশল্যার নাতি বলে গিয়েছে—চম্পাবহিন, প্রতাপ সিং রেগে গিয়েছে জানো? ভার ইঁদারা থেকেই জল নেয় মানুষ। তুমি ইঁদারা দিচ্ছ গ্রামকে, তাতে তার অশমান হয়েছে।

—হ্যাঁ, তিহাসের জলের সঙ্গে তার বৌ জিত দিবে আঙনের হলকা দিয়ে গিটো, সেটা তো আর হচ্ছে না। রাগ তো হবেই।

বুঝতে কিংবদন্তী চোখে পড়লো আকাশের শরীর মতো এই চম্পা এসেছে তাদের গেরস্থানীতে। বাচ্চা মেয়েটির মনে হচ্ছিলো এই লোকের মেয়েটির আঙল ধরে হাঁটতেও না জানি কত গরব। মনের খুসীতে সে কথা কইছিল আর দেখছিল চম্পার গহনা। এমন সময় চোখে পড়লো চম্পার।

সেই বটগাছ। তার গায়ে হেলান দিয়ে কপালে হাত রেখে ওপারের দিকে দিশা করে চেয়ে পাঁড়িয়ে আছে কে! মাথার কাশড় নেই। কক্ষচুল উড়ছে। পাশে গামছা নিয়ে ঘড়া নিয়ে পাঁড়িয়ে আছে একটি বালক ভৃত্য।

অনেক দিন বাক্যে দেখা। তবু চিনতে ভুল হয় না। যেটি মেয়েটি বলে—ঐ হলো প্রতাপসিংহের বৌ! ছেলে চলে গিয়েছে

সেই কবে। যোজ্ঞ আসে আর এমনি করে চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে যাবে চলে যায়। ওর ছেলে আর যবে আসবে না জানো ?

মাছঘরের গলা শুনে দুর্গা এদিকে তাকাল কি ? চকিতে পিছু ফিরলো চম্পা। তবু এক মুহূর্ত হুঁজনে হুঁজনে দেখল। দুর্গার বিমিত দৃষ্টি বেরনার ভারী। হুঁশে-চোখে কপালে সুগভীর দুঃখের রেখা। হতাশা আর দুঃখের কালিমা। কোথায় সে গর্ভিত নির্ভর দুর্গা ?

দুর্গা দেখলো একখানা তরুণ সুন্দর মুখ। সমব্যথায় কাতর, ঠোঁট সিমং কীক, বুঁধি বা কিছু বলতে চায়।

হায়, কোথায় গেল চম্পার পূর্বসঙ্গ ? সে না বলতে চেয়েছিলো, চেয়েছিলে যে দেখ দুর্গা আমি রমজানী হয়েছি। তুমি পূণ্যবতী, সকল চর্যেতে তোমার কথা। দেখ আজ আমিও ঐশ্বর্বে তোমার সমতুল হয়েছি। আজ কি তোমার গর্ব করা সাজে ?

সে কথা বলতে পারছে না চম্পা। সে চলে যেতে চাইছে এই হতাশ বিজ্ঞতার সামনে থেকে। কিন্তু পারছে কই ?

—চম্পা !

কানে হাত চাপা দেয় চম্পা। এমন গলায় তাকে যদি ডাকে চম্পনের মা তবে সে কেমন করে চলে যায় ?

—চম্পা শোন !

ছুটে নেমে এসেছে দুর্গা। মূল্যবান ছাপা খাড়ীর জাঁক মাখা ছেড়ে ধুলোর পড়েছে চম্পার সামনে, পাঁড়ায় দুর্গা। বলে—চম্পা, আমার চন্দন কোথায় ?

মাথা নাড়ে চম্পা। বলে—চাচী, আমি জানি না।

—তুই জানিস চম্পা।

দুঃখাধার অল-অল করে দুর্গার চোখ। বলে—তুই এসেছিস তুমি থেকে আমি একটা বার দেখা করতে চাইছি। তুই বল চম্পা। কোথায় আছে সে ?

—আমি জানি না।

—জানিস না ?

এবার হাহাকাঁকার করে ওঠে দুর্গার বিস্তর কণ্ঠ। বলে—ফিরে দে চম্পা, মাঘের ছেলে মাঘ কাছে ফিরে দে, তারপর আমিই ভোর হাতে আবার দিয়ে দেব তাকে। আমি যবে রাখব না।

সব সাকল্য ভেঙ্গে গিয়েছে। চম্পা দুর্গার দৃষ্টি হাত ধরে। বলে—চাচী, তুমি তার মা। আমি তার নাম কবে কসম খাছি, আমি তোমার ছেলের কোন খবর জানি না। যদি জানতাম—

রুচ হচ্ছে কেনেও না বলে পারে না চম্পা। বলে—যদি জানতাম তুমিও যবে রাখতে পারতে না, তা হলে হয়তো বা নিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি জানি না।

এবার দুর্গা বলে ওঠে। সেই তীব্র বাংলা ছড়িয়ে দেয় তার কণ্ঠ। সে বলে—মিথ্যা কথা বলছিস তুই। আমি জানি না, যে তুই বাজারে নেমেছিস আর তাকে-ও টেনে নামিয়েছিস সেই সঙ্গ ? কোন মন্তরে বাহু করেছিস সর্বনাশী। যে সে ছেলে মা ছলে গেল, বাপ ছলে গেল, আর এলো না ?

তবু চম্পা বলে ওঠে না। আর আঁতাত দেয় না। আজ বড় দুঃখে তার কণ্ঠ হাসি আসে। সে বলে—দুর্গাচাচী, তুমি পূণ্যবতী। তোমার কথা সত্যি হয়েছে। ঠ্যা, আমি ভেঙ্গে গিয়েছি, বে-দিশা হয়ে গিয়েছি। কিন্তু বা কৃতি করেছি নিজের কাছেছি। কোনো দুখিয়ারীর হেলেকে আমি কেড়ে নিইনি। সে পাশ আমি করিনি।

চলে আসে চম্পা। এত দিনের মধ্যে আজকে প্রথম সে শূভঘরের মেঝেতে শুয়ে কেঁদে নেয় খানিক। কান্দে তার চিরজুখিনী মায়ের জন্তে। কান্দে আর এক হতভাগিনীর জন্তে, যে দুঃখ অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে হেলেকে দেশান্তরী করে পলে পলে ভিসে তিলে পুড়ে মরছে। আর কান্দে নিজের দুঃখে। এতখানেকই শেখ হলো এক অধ্যায়। আর কোন দিন ফিরে দেখবে না সে চন্দনকে। শৈশব থেকে যৌবন অবধি চম্পার সবটুকু যে নিয়ে গিয়েছে, আর যে খেয়ালী ছেলে আবার বে-দিশা হয়ে হারিয়ে গিয়েছে।

কেঁদেকেটে সে উঠলো। পরদিন শজ্জুরণকে বললো—বুঢ়া চলে।

—কাজ বতম ?

—খতম না সুরু, জানি না।

বাবার কালে গ্রামখানিক বত দূর দেখা গেল ফিরে ফিরে দেখলো চম্পা। যেন মনে মনে জানলো এটী হলো শেষ দেখা।

কিন্তু এখানেকই শেষ হলো না। তারও পরে সচসা অপ্রত্যাশিত ভাবে বিহু'র দেখা হলো আবার চন্দনের সঙ্গে। চম্পা ও চন্দনের সে বিচিত্র সাক্ষাৎকার নিয়েই এক কাকিনীর মুখবন্ধ। কিন্তু শুণু পুনর্মিলনে নয়। সেই দিনেই নিজের অজ্ঞানতে ইভান্স আরষ্ট হলো তার প্রতি। নানার প্রাসাদে সে উৎসব ফুৎোল। কিন্তু আসরে প্রবেশ করেছিলো চম্পা মশাল হাতে, প্রাণীপাশাতে।

আগের সে বাতি শুণু সজ্জার, শুণু প্রদোষের। কিন্তু অনভিজ্ঞ দর্শক ইভান্স নিজের হৃদয়েও সেই প্রাণীপাশ ঘরে জ্বালিয়ে নিলো একটি শিখা। সে জানতো না যে আগুনের খেলায় যেতে যদি নিজেও অলসে স্তব্ধ করে কেউ, তবে সে আগুন নেবানো যায় না।

বিহু'র থেকে ফিরলো চম্পা। আর তাকে অহুসরণ করে কানপুরে এলো ইভান্স। সুরু হলো আর এক অধ্যায়। অগির্গত লতাবনের পটভূমিকায়।

[ক্রমশঃ]

"Europe, the centre of the manifestation of material energy, will crumble into dust within fifty years, if she is not mindful to change her position, to shift her ground and make spirituality the basis of her life and what will save Europe is the religion of the Upanishads."

—Swami Vivekananda

অত্যাশ্চর্য
কাপড় কাচার
পাউডার



মূল্যঃ
বড় সাইজ ২ টাকা ১২ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

নীল

সারফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য কাপড় কাচা পাউডার সারফ কাচা জামাকাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে সাদা, এত হালকা উজ্জ্বল করে। সার্ট, চাদর, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু কাচার জুড়েই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোঁটা—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, কোয়ার পক্ষে প্রতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফোঁটার এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়! বেশী পরিশ্রম নেই এতে! সারফ জামাকাপড় কাচা মানে ৩টি সহজ প্রক্রিয়া: ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

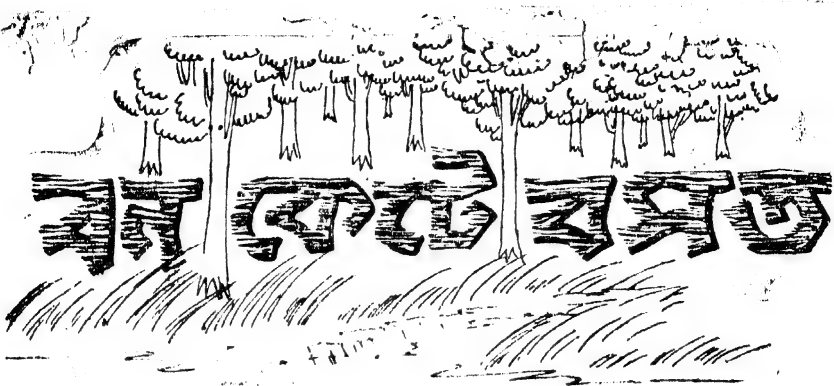
আপনি কখনও পাননি আপনার পছন্দের মূল্য এত চমৎকারভাবে ফিরে। একবার সারফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মেনে নেবেন! সারফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই পৰ্য্যবেক্ষণ করে দেখুন...

সারফে জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

বিশ্বব্যাপী লিডার সিনিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

৫৭১, ২২-২২৫ ২০০



[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

খোল

হ্যাঁ বলেছিল অন্নদাসী—ঘর করছে এতকাল, মাছঘটা চিনবে না ? বাথেকামের গারের ব্যাধা কিছুতে মরে না। খোঁজা তান পা খানাও ভাল হচ্ছে না। ঘরে বসেই যখন দু-বেলা দু-পাখর ছুটে যাচ্ছে, ব্যাধা মরতে বাবে কেন ? ভাল হয়ে গেলেই তো জাল-হাতে বেরতে হবে রাত্রিবেলা। মাছ মারে, মাছ না মিলল তো উপোস করে। সেই পুরানো ঝামেলা। দিবি আছে এখন। অন্নদাসী সকালবেলা বাড়ির পাট সেরে ছেলেটাকে রাতের জল-দেওয়া ভাত চাটি খাইয়ে দিয়ে চৌধুরীগঞ্জের আলায় চলে যায়। ডরঘাজের খাওয়া-দাওয়ার পর নিজে খেয়ে কীসরভতি ভাত-স্তরকারি নিয়ে ঘরে আসে। সন্ধ্যার পর বেরোর, রাতে আবার ভাত নিয়ে আসে হুপুবেলার মতো।

আছে ভালো বাথেকাম। একটা মুশকিল, অন্নদাসী চলে যাবার পর একেবারে চূপচাপ বসে থাকে। বাচ্চাটা ট্যা-ভ্যা করলে তাকে একটা-ছুটা চড়াশাড় দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। মন টেকে না ঘরের মধ্যে এমন ভাবে। তেবেচিন্তে এক কাজ করে। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সেও বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। বউ টের পাবে না, কিরে আসতে তার অনেক রাত্রি হয়। পায়ে-পায়ে বাথেকাম চলে গেল গগনের জালায়। নাম-গানের আসরে গিয়ে বসল। অস্বাক! বুড়ো হর ষড়্‌ই অবধি ইতিমধ্যে গৌরভক্ত হয়ে পড়েছে। 'হরেকৃষ্ণ হরোরাম গৌরনিতাই বাথেকাম'—বলছে সকলে বিভিবিড় করে। হারিকেন-সঠন বলছে আসরের একদিকে—এও জারি তাক্জব। গগন কত বড়লোক হয়েছে বোঝ তবে—অবহেলার অকারণে কেরোসিন পোড়ানো। আর সেই আলায় দেখা যায় তাববিহুল গগন এবং আলোপালে একগালা মাছঘ। বনরাজ্যে হাল্যমা তো কথায় কথায়। মেছোঘেরি হবার পরে কোন আলা অবস্কিত দেখলে বে-র করে আলায় পড়ে লোকজন পিটিয়ে শড়কিতে এ-কোঁড় ও-কোঁড় করে এখনো মাছ লুঠ করে নিয়ে যায়। আর খ্রুদিক তত সুবিধা হচ্ছে না বলেই নিশিরাছে টিপিটিপি ডেড়ির খোল জাল ফেলে। ডাকাত না হতে পেরে চোয়। সেই সব লোকই পরম শাড় তাবে গৌরান-জমন করছে কেমন দেখে : ডাক গৌরান, ডাক গৌরান, লহ গৌরানের মাথ—বাথেকাম জামছে, জা মশ কি।

ঘরেও তো একলা চূপচাপ থাকা, এখানে আর্থেক চোখ বুঁজে চূপ করে থাক, পরকালের পুণ্য লাভ হবে।

ভাছাড়া নগদ লভাও কিছু আছে, আসব ভাডবার যুখে সেটা জানা গেল। গুড়ো-ঢালা চিঁড়ে-ভাজা, কোন দিন বা হুড়ি-ফুড়ি। আবার এক একদিন হরিব লুঠ দেব, লুঠের বাতাসা কুড়িয়ে কবিতা পরিমাণ মাথায় দিয়ে দিবি কুড়কুড় করে চিবানো যায় অনেকক্ষণ। শুমুয়া পরলোকের আশাতেই, কতএব, ভক্তল এসে জমায়েত হল না। কিন্তু গগন দাস বল্লভ হরে হু-হাতে টাকা উডাতে লাগল, পোড়ো-টাকা পেল নাকি কোনখানে ? মা রটন্তী-কালিকা নতুন-আলার চাল ফুঁড়ে টাকার বৃষ্টি করে গেছেন ?

আলা থেকে ঘরে কিরে গিয়ে বাথেকাম বধারীতি মাছঘের উপর গিয়ে পড়ে। অন্নদাসীর ফিরবার দেরি আছে তখনো। ফুলতলার নৌকো রওনা করে দিয়ে তবে ডরঘাজ রাঁধতে বসেন। রাঁধাবাড়া শেষ করে তিনি ধাবেন, উচ্ছিষ্ট মুক্ত করে এটো-বাসন সরিয়ে রেখে বায়্যাবর গোবরমাটি দিয়ে পেড়ে লবে তো কিরবে বাড়িতে। বাথেকাম ঘুমায় ততক্ষণ। বড় সজাগ ঘুম—বউয়ের পায়ের শব্দ পেলেই জেগে উঠে কাতরাত্তে আরজ করে। অন্নদাসী এসে কীসের ভাত-স্তরকারি পাখরে বেড়ে বাথেকামকে দেয়। অন্ন চাটি কীসের থাকে, সেগুলো বাজান দিয়ে মেখে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে বসিয়ে গাল পুরে পুরে খাওয়ায়।

একদিন গণ্ডগোল হল। ভাত মেখে বাচ্চাকে তুলতে গিয়ে দেখে, নেই। কোথায় গেল ? বাথেকামকে জিজ্ঞাসা করে, তুই কোথা গো ?

আঁা, ছিল তো শুয়ে—

অন্নদাসী এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখে বলে, কোথাও তো নেই। ছেলের খোঁজ জানো না—তুমি ছিলে কি অন্তে তবে ঘরে ? বাথেকাম বলে, ঘুম এসে গিয়েছিল। বুঝি কি করে যে হারামজান! সেই কীকে অমনি কানে হেঁটে রওনা দেবে।

বালাবাজ্যে শিয়াল নেই যে ঘুমন্ত বাচ্চা শিয়ালে মুখে করে নিয়ে বাবে। আর হল বড়-শিয়াল—কিছু পাড়ায় মধ্যে এসে টুপ না করে ছেলের টুটি ধরে সরে পড়বে, স্তেনম চোরাই বড়াবে ভাব্য নয়। গেল কোথায় তা হলে ?

রাধেগ্রামও খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—বিষম কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়—ঘরের বাইরেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে এলো একবার। অন্নদাসী চরকির মতন পাক দিচ্ছে বগড়াবাটির সময় আপাততঃ নয়, তাঁটার মতন বড় বড় চোখ বুজিয়ে ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে যাচ্ছে শুধু। বাঁধ অবধি চলে গিয়ে হাঁক পড়েছে, তুই, তুইয়ে—

শিরোমণি সর্দারের বউ সুবোধবালা সাড়া দিয়ে উঠল : কিরলি নাকিরে বউ ? কী কাণ্ড, ওরে সে কী কাণ্ড !

বলতে বলতে এদের উঠানে চলে এলো। কাঁধের উপর তুই। ঘুচ্ছে। নেতিয়ে আছে একখানা ক্লাকডার মতো।

তুই তোমার কাছে দিদি। তুমি নিয়ে গিয়েছিলে ? আর দেখ, আমরা দাঁপালাশি করে মরি।

সুবোধবালা গালে হাত দিয়ে বলে, বজ্রহারি আক্কেল তোদের দিদি। ঘরের মধ্যে বাচ্চা বেধে হুঁজনে বেরিয়ে পড়েছিল। দুবোর হা-হা করছে।

আর বলে, দুজনে বাব কেন ? তোমার দেওর ছিল। তার জিম্মার বেধে আমি চৌহুরি-আলার বাই। পেটের আলার না গিয়ে উপার তো নেই ?

শিরোমণি আর রাধেগ্রামে ভাই ডাকাডাকি। বহুসে কে বড় কে ছোট এই নিয়ে বিরোধ আছে। হিসাব ও তর্কাতর্কি হয় মাঝে মাঝে। অন্নদাসীর স্বাধ, নিজের মরদের কম বয়স বলে জাহির করা। রাধেগ্রাম তাই হল সুবোধবারালার দেওর।

অন্নদাসী বলে, তোমার দেওর সেই থেকে নড়ে বসতে পারে না। আমিও ছাড়ন-পাত্তোর নই দিদি। জালে রাবে না তো ছেলে ধরে। সুবোধবালা বলে, নড়তে পারে না তো ঘর ছেড়ে চলে গেল কেমন করে ? তুইও যেমন দিদি—পুঙ্খ বলল, আর সেই কথাই ঘনি গেরো দিয়ে বসলি।

রাধেগ্রাম না-না—করে ওঠে : ছিলাম বই কি ! আলবৎ ছিলাম, তুমি দেখনি। ঘুচ্ছিলাম।

সুবোধবালা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, যা চোচান চোচ্ছিল, মরা মানুষও খাড়া হয়ে উঠে বসে। বিচ্ছেদ কামড়েছিল পাছাতে—কাটা শুনে ছুটে এসে দেখি এই বুত্তা। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাছার উপার মাখা-তামাক ভলে ভলে তবো আলাটা কমল। তার পরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে তুমি ঘুমিয়েছিলে—আমি কানা কি না, পর্ণন্তের মতন দেহখানা আবার ঠাঁহরে এলো না।

ছেলে দিয়ে সুবোধবালা চলে গেল। এইবারে এককণ্ঠে বোকা-বুঝি বোল-আনা—রাধেগ্রাম সেটা বুঝতে পারছে। মানুষের উপর পণ্ডন না কি বপাল করে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজ়ে মোকম ঘুম ? ভাতে খুব সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। আঁতড়াহুড়ে গিয়ে দাঁড়ালে ঘন রেহাই করে না, টেনে খাড়া তুলে বসিয়ে অন্নদাসী কথা শোনানো। তার চেয়ে উণ্টো চাপ দিয়ে সেই আগোভাগে শুনিবে দিক।

পাতখুঁচি বিচিরে রাধেগ্রাম বলে, এত রাত অবধি কোনখানে থাকা হল ঠাকরনের ? কি কম করা হচ্ছিল ?

অন্নদাসী এক দুহুত হকচকিয়ে যায়। শেষে বলে, ভাত এনে এনে খুঁচের কাছে ঘরি কিনা, খুঁচে তাই ট্যাঙল-ট্যাঙল বুলি হয়েছে। বার ভাত এনে খাওয়াই, সে মানুষটার খাওয়া শেষ না হলে চলে আসি দেখন করে ?

রাধেগ্রাম বলে, সাত জন্মের ভাতার কি না তোর, সামনে বলে আদর করে খাওয়াস। সেই শোভাটা দেখবার জন্য মরি মরি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পায়ের মরছে বেশি দূর পারলাম না। কিরে এলাম। কিরতে হল জিরিয়ে জিরিয়ে। তার ভিতরে এত সব কাণ্ড।

মোটামুটি একটা কৈফিয়ৎও হয়ে দাঁড়াল। অন্নদাসী বিষাস করল। রাতটা বেশি হয়েছে বটে, পুঙ্খমাছুদের ক্রোধ অঙ্গত নয়। দোষ ভরখাজের, গাড়িমবি করে রাত করলেন। উম্মন খরিয়ে অন্নদাসী ডাকাডাকি করছে—কাণ্ডকর্ম নেই, বসে রয়েছে, তবু রাগাখণ্ডে আসেন না। মতলব করে কি না কে জানে ? রাগা শেষ হবার পর খেতে বসতেও যেন অকাণ্ড দেখি করলেন। আলা নিবম তখন, সবাই ঘুচ্ছে। গা ছুঁছম করছিল অন্নদাসীর। ভয় ঠিক নয়। অন্তগুলো মরদ কৈতোর মতন পড়ে রয়েছে, চোঁচলে তড়াক করে লাকিরে উঠবে—ভয়ের কি আছে ? তবু যেন কী রকম। সতর্ক নজর রেখে নিজের ভাতগুলো গবাগব গিলেছে তার পর। বাকি ভাত-তরকারি কাসেরে তুলেই সাঁ করে বেরিয়ে পড়েছে। এসেছে বাতাসের বেগে। এসে তো এই সমুদ্র এখন।

চোঁচোমটিতে নিজের রাত করে ফেরাটা পাড়ার মধ্যে বেশি চাউর হবে। অন্নদাসী চোঁচল না। ভাত টিপে টিপে তুটকে খাওয়াচ্ছে। এর মধ্যে একবার হুঁকা কেটে উঠল :

একগুণ ব্যাঙ্গোনের তিন গুণ কাল,
নিশুর্গ পুঙ্খের বচন সার।

বাসবী বঙ্গর

বন্ধনহীন গ্রন্থি

দাম ছ' টাকা মাত্র।

‘বন্ধনহীন গ্রন্থি’ একখানি স্বল্প পৃষ্ঠার উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাস-খানির মধ্যে লেখিকা এমন একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন যার মধ্যে এতটুকু শিল্পিতা ও শালীনতার অভাব প্রকাশ পেলে বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বাস্তবতার পৃথক হ’ত। সাহিত্যক্ষেত্রে একজন নবাগতা লেখিকার পক্ষে আশ্চর্য সুলভ লিখন শক্তির পরিচয় পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। যে কাহিনীর তিনি অবতারণা করেছেন, সসারে এমন কাহিনী বিরল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অবাস্তবও যে নয়, লেখার মানুষী দিয়ে, মমতা দিয়ে আর বক্তব্যের দৃঢ়তা দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। এই প্রমাণের সাক্ষ্য নায়ক নাটিকা অজর ও কণিকার চরিত্র দু’টি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই অজর ও কণিকা স্বামী-স্ত্রী। দীর্ঘদিনে শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবন যাপনের পর দু’টি সন্তানের মা কণিকা একদিন স্বামী অজরের কাছে প্রকাশ না করে পারে না, বিবাহ-পূর্ব-কালে তার অনিচ্ছাকৃত পদাঙ্গলনের কথা ; শুধু পদাঙ্গলন নয়, তার এক মেসোমহাশয়ের ঔরসজাত জীবিত এক কস্তার কথা। অকস্মৎ মর্মান্তিক এই কথা ডাক্তার স্বামী অজরকে কিভাবে যে আঘাত করে তা সহজেই অজয়ের স্ত্রী কণিকাও যে অবস্থার মধ্যে দু’টি সন্তানের গর্ভধারিণী হয়েও প্রাণশির স্বামীর কাছে এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয় তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনামূলক, তেমনি সহরম্পর্শী—বঙ্গমতী ১৮.১.৫৯

প্রকাশক : বঙ্গাকা প্রকাশনী, ২৭সি, আমহাট্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ-৯

এই সামান্য কথার রাখেজামের নিজের ব্যাবৃত হওয়ার কথা নয়। শুয়ে পড়ে সে পাশ ফিরল। পাশ কিরতে নজর পড়ল, বাড়ী-ভাত পড়ে আছে, ভাতের ছ-পাশে তরকারি ছ-খানা। গগনের আলার মুড়ি-কুণুর অনেককণ হজম হয়ে গেছে। ভাত দেখে রাগের নিবৃত্তি করে সে উঠে বসে। দাঁওয়ায় নিয়ে গিয়ে তুটুর মুখ খোয়াছিল অন্নদাসী। ভিতরে এসে সে চোখ পিটপিট করে দেখে। ছেলে শোয়াতে শোয়াতে মধুর এক মস্তব্য ছাড়ল : অন্নদাসীর পুঙ্খ অন্নদাস।

সেই রাজ্জাই। আরও অনেককণ কেটে গেছে। বেড়ার গায়ে আঙু আঙু টোকা দেয় কে নেন। ছ-বার এক সঙ্গে। একটুখানি খেমে রইল। আবার। রাখেজাম একবার ঘুমালে তারপর ঠাণ্ডা ধরে টেনে নিয়ে গেলোও বোধ হয় জাগবে না। অন্নদাসীর ঠিক উঠো, গাছের পাতাটি পড়লে চোখ মেলে উঠে বসবে। উঠে পড়ে সে বাইরে চলে এলো।

কে র্যা ? কোন ডাকরা, হাড়হাবাতে—

কিসকিস করে ভরবাঙ্গ বলছে, আমি যে আমি। একটা দরকারে পড়ে এসাম।

রাজ্জি সুস্থ-জীব্যরি। এইবারে চান দেখা দিচ্ছে আকাশে। বাবলাতলার পাছের গুড়ির সঙ্গে একেবারে স্টেট গোপাল ভরবাঙ্গ পাড়িয়ে আছেন।

অন্ন বলে, আপনি যে সালতি ছাড়া চলেন না ঠাকুরমশায়। পায়ের মাটি কোটে। পায়ের হেঁটে কষ্ট করে এসেছেন, বলে কেন্দ্র দরকারটা।

রাখেজাম আছে কেমন ?

বড় ভালবাসেন মানুষটাকে। আমার সঙ্গে মোটেই তো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, রাত দুপুরে তাই খবর নিতে ঘর-কানোটে এসে পাড়িয়েছেন। বলতে বলতে অন্নদাসী ফিক করে হেসে ফেললো। বলে, তাড়াতাড়ি সেরে নিন। মানুষটা এমন ভালো। ভস-ভস করে ঘুমচ্ছে। জাগলো কিন্তু কুন্তকর্ণ।

ভরবাঙ্গ সত্যতঃ বলেন, তোর যেমন মতি হয় রে অন্ন—আমি কিছু বলতে বাবো না। কাঠ-কাঠ উপোস দিচ্ছিলি, আমার কে কোন কথা বলতে গিয়েছিল ? কানে শুনেই আমি মানুষ দিয়ে ঢাল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই বাবারে ফেলে ছড়িয়ে নিজে তুই তবপেট খাচ্ছিল, বতঃশো খাস তার লেড়া বাড়ি নিয়ে আসিস। ঢাল এক দিস যে বাড়ি উপছে পড়ে যায়। বিনা ওজর-আপত্তিতে আমি যে-যেবেড়ে দিয়ে বাড়ি। বল সে সমস্ত কথা।

অন্ন বলে, আপনার বড় দয়া ঠাকুর মশায়।

কিন্তু দয়া শুধু একতরফে হলে তো হবে না ! বিবেচনা করে দেখ। ব্রাহ্ম-সন্তান বট-ফেলেপুলে ছেড়ে পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নোনা জল খেয়ে পড়ে আছি। আমিই কেবল সকলের দেখব—আমার মুখ পানে কেউ তাকিয়ে দেখবে না ?

অন্নদাসী বলে, সব পড়ুন ঠাকুর মশায়। ঐ বা বললাম—আমাদের মানুষটা ভালো, কিন্তু বড় সন্দেহের ব্যক্তি। আমি রাত করে আমি বণে আপনাকে জড়িয়ে আঁককেই নানান কথা বলছিল। উঠে এসে আমাদের হৃৎককে এক সঙ্গে যদি দেখতে

পায়, বন-কাটা হোসো দিয়ে ছুটু ছুটো কড় থেকে নামিয়ে নেবে উঃ, পাড়ার মধ্যে এসে চুকেছেন—এত সাহস ভাল নয়।

পাড়ায় হবে না, আলার মধ্যে নয়, তা কোন দিকে বাবো দে তো বলে দিবি—

অন্নদাসী ক্রত পায়ে চলে যাচ্ছে।

ভরবাঙ্গ অবীর হয়ে বলেন, আহা, বলে বা একটা কথা। কষ্ট করে এদুই থেকে এলাম।

অন্নদাসী বলে, মাছ-মারা লোক কি হচ্ছে ঐ। গেরোবনের ভিতর ঢুকে বান, শিগগির। নয় তো দেখে ফেলবে।

গোশাল ভরবাঙ্গ সন্তুষ্ট হয়ে বাঁধের দিকে তাকান। অল্প জ্যোৎস্নায় অনেক দূর অবধি নজরে আসছে। কই, মানুষ কোথা ? হয় তো বা এই সময়টা মানুষ বাঁধের নিচে নেমে পড়েছে। নায়েব মানুষ, সধর ফুলতলা থেকে আসছেন—চিনে ফেললে নানান কথা উঠবে। ফুড়ৎ করে জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাপখোপ ধাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু উপায় কি ?

অন্নদাসী ঘরে ঢুকে পড়েছে ওরিকে।

সভের

শ্রীত পড়ি পড়ি করছে। সুরময় এখন মানুষের। দ্বৈত ধান পাকে। গাই বিদ্রোহ ঘরে ঘরে। নতুন শুড় ডালকলাই বকমারি তরিতরকারি পাইকারেরা দূর-দূরন্তর থেকে নিয়ে এসে কুমিরমারির হাটে নামায়। কাঠের আর বাউলেরা দলে দলে জঙ্গলে ঢুকে বোঝাই কিন্তু নিয়ে ফেরত আসে। মাল ছাড় করে নিয়ে রমায়ম খরচ করে দু-হাতে। তারি জমজমাট হাট এই সময়টা।

হাটের মধ্যে ঘুরছে জগা, কিনছে এটা-ওটা। হঠাৎ তৈলন্ধর সঙ্গে দেখা। বয়্যারখালার সেই তৈলন্ধ। বলে, তোমার খোঁজখি করছি জগগাধ। কোন বনবাসে গিয়ে রয়েছ, কেউ স্ট্রিক বলতে পারে না। বাত্রার দল খুল্লি, মনের মতো বিবেক জোটানো যাচ্ছে না। কী গাড়ে গাড়ে বোঁটে বেয়ে মরছ। চলে এসো। এইগা গলা তোমার—গেকুয়া আলখাল্লা পরে বিবেক হয়ে আসবের উপর দাঁড়ালে বধ-বধ পড়ে বাবে।

জগার হঠাৎ জবাব জোগায় না। পুরানো দিন মনে পড়ে। বাপমা-মবা ছেলে গানের নেশায় বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। কচি-কচি চোরা তখন, বাধা সামন্ত। আসর ভাঙবার পর একবার এক গৃহস্থ বাড়ির বউ তাকে কোতলার উপর ডেকে নিয়ে পায়ের খাইয়েছিল। তারপর এক নতুন পালা খুশল অভিমহা বধ। উত্তরার পাঠ দিল জগাকে। অভিমহা সময়ে যাচ্ছে, সেই সময়টা তার হাত ধরে কেলে গান :

বেগ-না বেগ-না নাথ করি নিবেদন

দাসীয়ে বরিয়া বাও, বিচার এ কেমন—

অভিমহায় হাত ছেড়ে দিয়ে তারপরে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম চতুর্দিকে কিরে কিরে গানের একটি মাত্র কলি কৈরে কৈরে গাওয়া : ও তুমি বেগ না বেগ না, ও তুমি বেগ না বেগ না...। আসরের মধ্যে সেই সময় একটা হুঁচ ফেলে গিলে বোধ করি লজ পাওয়া যেত।

তৈলন্ধ বলে, তাই বলছিলাম। চলে। জগা আমায়

ব্যয়বধালায়। কার্যমি হয়ে না থাকতে চাই, একজন বিবেক তৈরি করে নিয়ে তারপরে তুমি চলে এসো। আটকে রাখব না। তুমি তো দুটো বোল আনা নিবে, তেল-ভাত্যাক আর নগদ পনের টাকা। গারে হুঁ দিয়ে এমন বোজগার দুনিয়ার মধ্যে কোনখানে হবে না।

জগা এর মধ্যে সামলে নিয়ে বলে, কৈপেছ? সকলে মিলে বেঁচে বানানাম। অজ্ঞানি বনে মানবেলা হয়েছে। জ্ঞান-জানোয়ার আগে চরেকিরে বেড়াই, এখন মাছুষ। বতাই হোক, নিজের কোট—জোর কত ওখানে আমার! কোট ছেড়ে কোনও জায়গায় ছাড়াই। তবে একদিন গিয়ে দল কেমন হল দেখে আসতে পারি।

কোর পথে ডিঙির উপর বসে ঐ বাতায়নের কথা হচ্ছে। বলাই বলে, গান-পাগলা মাছুষ তুমি। একটু যেন মন পড়ে গেছে।

জগা বলে, দুঃ! আরও কিছু মাছুষ জমুক—পাল করতে হলে আমরা সাইতলাকেই করব। তৈলদ্রব্যকে বললাম, নেহাৎ যদি দার টাক বায় তো একদিন দু-দিন থেকে তালিম নিয়ে আসতে পারি। তার বেশি হবে না।

সাইতলার ঘাটে ডিঙি লাগল। ডিঙিতে কখনোমনো শোওয়া প্রয়োজন হয়, ছুইয়ের নিচে সেজ্ঞ একটা মাত্র গোটানো থাকে। কাঁধে সেই মাত্র এবং হাতে পোটলা পচা তবতর করে নেমে পড়ল।

জগা দেখল পাছ-পলুই থেকে: মাছুষ নিয়ে চললি কোথা যে? নৌকোর মাছুষ?

ও, তাই তো। এতক্ষণে যেন হাঁস হল পটার। মাত্র যেন হটে গিয়ে জোর কাঁধে উঠে পড়েছে। বেকুরি হাসি হেসে মাত্র নামিয়ে রাখার উপরে পচা কাঁড় কতাল। আঁটি-বাঁধা কাঁটার শলা ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আড়াল করে বস্তুটা বের করে নেবার মতলব ছিল, কিন্তু জগার নজরে পড়ে যায়।

উ, এই তোর কাণ্ড! যা মানা করলাম, তাই। কাঁটা কিনে তাই আবার মাত্র জড়িয়ে রেখেছ, আমি বাতে না দেখতে পাই।

পচা আশপাতত নিরাপদ। মুখ কিরিয়ে আলায় দুহুটা দেখেও নেয় একবার বুঝি। তাড়া কহলে ছুটেবে।

জগা বলে, আমরা হাটে ঘূছি, সেই কাকে তুমি চাকবালার কনাকাটা করছিলি। আমার লুকিয়ে আমরাই নৌকোর তার সগো নিয়ে এলি।

বলাই বলে, কি করবে? তুমি যে ভয় দেখালে, ধাক্কা মেয়ে গাড়ে ফেল দেবে। সামনাসামনি পারবে না বলে গোপন করে।

নিজ পচা দু-পাটি কাঁত বের করে হালতে হালতে বলে, আমরা ফেললে ক্ষতি নেই। কুরিয়ে কামটে না খায় তো সাঁতরে টিক ডাঙার উঠে যাবো। কাঁটা ফেললে মুলকিল। সারা হাট খুঁজেপেতে এই কাঁটা নারকলের শলা পাওয়া গেল। ফেলে দিলে আবার কোথা পেতাম এ জিনিস?

জগা বলে, ঐ কাঁটা তোর শিঠের উপর দেয় বেড়ে! কাঁটালার সেদিন আমি পাঁচ পরলার ভোগ দিয়ে আসব। আছে তাই তোর অদৃষ্টে। কামরূপের কথা বলছিলি বলাই, আমাদের সাইতলাকেও ভেড়া বানিয়ে ফেলছে। মেরেমানঘের ভেড়া দেখ ঐ একটা। ঐ পচা।

পচা দুকপাত করে না। কাঁধে কাঁটার আঁটি, হাতে পোটলা—

চাকর হাঁতা-খুঁচি সত্তবত পোটলার মধ্যেই—বীরবর্ষ সে আলায় অভিভূত হল।

অনতিপরে জগাদের ঘরের সামনে পচা এসে ডাকে, বলাই—
হাটের বোরাঘুরিতে কিবে আজ প্রেচণ্ড। রাতও হয়ে গেছে।
উম্মন ধরিয়ে বলাই ভাত চাপিয়ে দিয়েছে।

জগা বলে, পথে কাঁড়ের কেন বে পচা? ঘরে উঠে আর।
পচা বলে, না, তুমি গাল দেবে।

ডাকিনী গুণ করেছে, মরশদশা করেছে তোর। গাল দিয়ে আর কি করব? বোস ঘরে এসে।

পচা ঘরের ভিতরে এলো, বসল না। বলে, খোল বাজাবার মাছুষ নেই। একবার আর বলাই। বিনি খোলে নামগান খোলতাই হয় না।

জগা বলে, কাল নিয়েছিল খেয়ালখুশি মতো, তা বলে বোজ বোজ যেতে বাবে কেন? তুমি দাসখত নিয়েছিল, তুমি পা চেটে বেড়া ওদের—অজ মাছুষ ডাকিস কেন?

বউঠাকরন বলে পাঠালেন, গৃহস্থর একটা ভাল-মন্দ আছে। বাঁদা ভায়গা—শুধুমাত্র জ্ঞান-জানোয়ার নয়, কত লোক এসে বেঘোরে মারা পড়ে, তাঁরাও সব রয়েছেন। ঠাকুরের নামে দোষদৃষ্টি ছেড়ে যায়। তাই বললেন, আশঙ্ক হয়েছ বখন, কামাই দেওয়া ঠিক হবে না। রাত হয়ে গেছে বলে আজ না হয় কম করেই হবে।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিশ্রুত
'শঙ্খ ও গদ্য'

মার্কী গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন: ৩৪-২২২৫

বলাই বলে, আজকে তুই বা জগা। তুমিই আর বাজনা করে বলে। আমার ঐ হাত খাবড়ানের ওদের মুখে স্মৃতি থাকে না। তোর বাজনা শুনে দশা শেষে পটাশট ওরা উপুড় হয়ে পড়বে।

জগা বলে, রকে করে! শুধুরে আলা বাঁধলাম সকলে মিলে, আলাব মটকার বাজ পড়ল। বজ্জাতগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসছে।

পচা রাগ করে বলে, বাজ পড়েছে, না আর-কিছু হয়েছে। চোখে দেখ এসো গিয়ে। ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, পথের মুখে ঝাল খাবে কেন? সেমুখো বলাইটা—ওখানে ভাবে গদগদ, এখানে তোমার কাছে গিরে এসে কুছা করে। এসেছে মেরের দুটো-তিনটে দিন, সীত্‌হান এর মধ্যে একেবারে আলাপা হয়ে গেছে। বকবকে তকতকে ঘন-উঠান—এক কবিকা ঘুলায়লা থাকতে দেয় না। ইঁদুরে মাটি তুলে ভাঁট করেছিল, সেই উঠান লেপেপুঁছে কী রকম করে ফেলছে—নিঁদুটুকু পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। পানের শিক পোড়া-বিড়ি আগে তো যেখানে-সেখানে ফেলতাম, এখন মালাস পেতে দিয়েছে, ষা-কিছু ফেলবে মালাসার ভিতরে।

জগা বলে, বলছি তো ভাই। বিড়ি খাবো না, পানের শিক ফেলব না, হাসিমুখ করাব না, চোখ বঁজ্ঞে খালি হবকুক হবরাম করব—সে কাজ আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

বলাইকে বলে, মেরে মাছবের সামনে গিয়ে ফুই গদগদ হোস, এখানে আর চকুলজ্জা কিসের? চলে যা তুই।

বাবার মুখেও পচা বলে, গেলে পারতে কি জগা। দেখে খুব ভাল লাগবে।

জগা কালামুখ করে বলে, চোপ এসে বসেছে, সন্ধ্যা নতবে না। এক একে সন্ধ্যাকে নিয়ে নিচ্ছে। যাবোই তো বটে। গিরে পড়ব একদিন। তেড়েচুরে সমস্ত তহনক করে গিরে আসব।

ঐ একটা দিনেই বলাইর চকুলজ্জা ভেঙেছে। ডিভি ঘাটে বাঁধা হলে সে সোজা গিরে গুঠে আলায়। জগা একলা পাড়ার মধ্যে ঘরে গিয়ে ওঠে। পচা সেই একটা দিন বার করেক বলেই দায় দেয় গেল। এক সন্ধ্যা তো ঘোরাকেরা—ইতিমধ্যে মত পালাটাল কি না, একটা মুখের কথা বিজ্ঞাসা করার পিতাশ নেই। আনিড়ি লোকগুলোর আসবে বলাই বাজিরে মস্ত হয়েছে। বন-গীরে শিয়াল রাজা। সেই আমোদে মত্ত হয়ে আছে। জগনাথকে নিয়ে বাওরার কি গংজ আর এখন? সে হাজির হলে বরক পশার-হানি ওদের।

নামগান আগে মিনমিন করে হাঙ্কিল, গানের ভিতরে হুকার ফুটে ওঠছে ক্রমশ। অর্থাৎ দশ ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক গানের সম্পর্কে ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে। গানের পরে এক একদিন বাবদার হরিমনি। হরির লুঠ—হরিমনির পর উঠানে বাতাসা ছড়িয়ে দেয়, কাড়াকাড়ি করে লোকে বাতাসা কুড়ায়। বলাই ক'খানা বাতাসা হাতে ঘরে ফিরে বলে, নাও জগা, প্রগার নাও বাল্বনে বসত, বড়-মেক-ছোট কোন দেবতাকে চটানো চলবে না। হাত পেতে একখানা বাতাসা নিয়ে—একটু ওঁড়া মাথায় দিয়ে এক কবিকা ভিত্তে ঠেকিয়ে বাতাসাখানা জগা ফিরিয়ে দেয় বাবার।

মজা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আলা থেকে ঘরে ফিরে এখন রাত দুপুর। নামগানের পর গদগদ চলে বোধহয়। রাগা শেষ করে জগা বলে থাকে, আর গজীর মনে মনে। তাদের গড়ে-তোলা দাঁইজলা ঘেরিতে একঘরে করেছে তাকে সকলে। এমন কি বলাই অবধি। সকল পোলমালের মূলে চাকবান। সর্বশেষে মেরে রে বাবা।

শেষটা একদিন জগা রাগ করে বলে, ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ঠাকুরের নামে তো রাত কাবার করে ফিরিস। কাঁহাতক বলে আমি ভাত পাহারা দিই? এবার থেকে আমি খেয়ে নেবো।

বলাই সঙ্গে সঙ্গে হাত দু-খানা ঘরে বলে, তাই কোরো, খেয়ে নিয়ে তুমি গুরে পোড়ো। নরতো আমার মরা মুখ দেখবে জগা। হাঁড়িতে ভাত রেখে দিও। নিয়ে ঘরে আমি খাব।

নতুন ব্যবহার ভাল হল বলাইর। জগা না খেয়ে আছে, আগে তাই তাড়াতাড়ি কোর চাড়। হল একটা। এখন নির্ভাবনা। জগা ঘুমিয়ে থাকে। বুটখাট আগুতাজ হল একটু ভেজানো বাপ খোঁয়ার। ভিতরে এসে কপকপ করে ভাত বাচ্ছে। বাইরে গিরে জল ঢেলে আঁচিরে এলো। ঘুমের মধ্যে এই সমস্ত জগা স্বপ্নের মতন টের পায়। সমস্তটা দিন গাঞ্জে খালে আর কুমিরমারি গঞ্জে কাটে। বড়দাকে জপিয়েলাপিয়ে এই বাদা এলাকার নিয়ে এলো—সেই বড়দার পক্ষেও কি উচিত নয় রাতে জগার ঘরে এটাবার এসে খোঁজবর নেওয়া! গার জকল থেকে বড়দার আপনজনেরা এসে মিলেছে—আমোদে মিশেছে, আঁটির আর কি গরজ এখন? শেষ রাতে উঠে চোখ মুছতে মুছতে মাছের ডিভি নিয়ে কুমিরমারি ছুটুক, এই ছাড়া অন্য কোন গরজ নেই।

সেদিন ঘাটে কিরে ডিভি বাঁধতে বাঁধতে জগা ওচাক-ওচাক করে। বমি করে ফেলবে এমনি ভাব। স্রুত বাঁধে উঠতে উঠতে জগা শিহন ঘুরে তাকায়।

ঐ যে ওল-চিড়ি খাওয়া গদা ঠাকুর, ক-দিনের পচা চিড়ি, আর কি রকমের ওল কে জানে? পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে সেই থেকে।

বলাই বলে, ওল-চিড়ি আমিও তো খেলাম—

বলেই তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নের। অবিশ্বাস করা হচ্ছে, কেপে উঠবে জগা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলাই বলে, গুজের খেতে গেলে কি জন্তে? আমি ডাল দিরে খেয়েছি, ওল খেতে পারি নে, ওলের নাম শুনে আমার গাল ঘরে। তুমি ওক টেনো না অমন করে, গলার নলি ছিঁড়ে বাবে। ঘরে গিরে গুরে পড় একুণি।

আজকে আর বাসনে ভুঁই। আমি বাঁধতে পারব ন এই অবস্থায়।

বলাই বলে, রাগা আবার কি! তোমার খাওয়াদাওয়া নেই। একলা আমি। গদগদের খাওয়াদাওয়ার চোটে তোমার ঐ অবস্থা, আমারও গলায় গলায় হচ্ছে। চাট্টি মুড়ি-চিড়ে চিবিয়েও থাকতে পারি। আমোদের ঘরে না হোক, বড়দা ওখানে মুখের কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি বাটি ভরে এনে দেবে।

জগা আগুন হয়ে বলে, খাওয়াটা ভালি শুনু, আমার দশা দেখাচ্ছিস নে। বমি করতে করতে মরে যাচ্ছি—



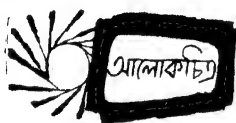
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—বর্তন দে



—ডাঃ রামজীবন বোষ

—মানিক দাস



খোকা-খুকু

—মধু বসাক





মিষ্টিমুখ

—বিশ্ব চক্রবর্তী



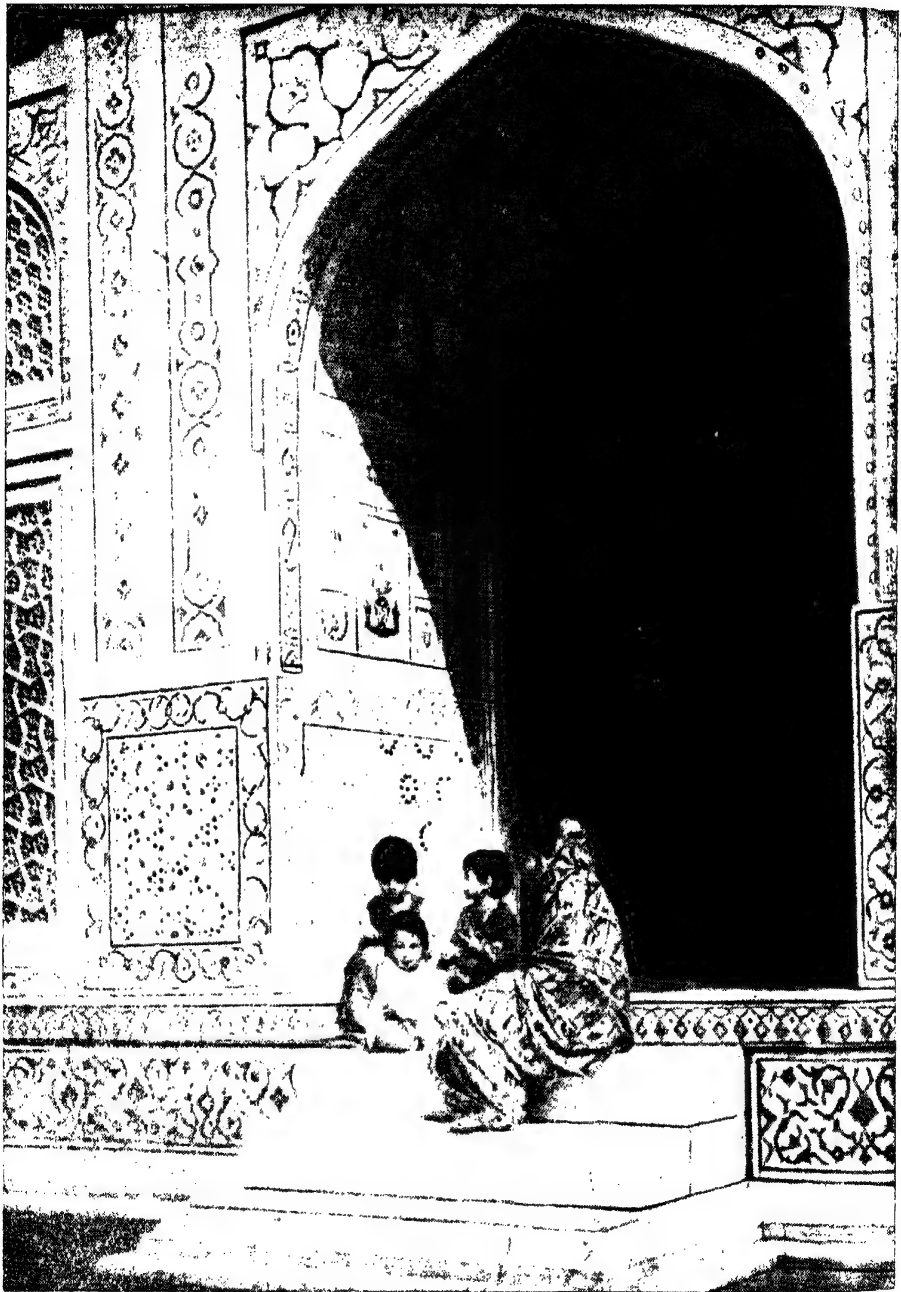
দিন আগত ঐ

—বি দাশ



—সজিতকমার'চট্টোপাধ্যায়

বালুকাবেলায়



বলাই বলে, আমি যেতাম না। মাইরি বলছি। বাওয়া বায় না হেন অবস্থার একলা মানুষ ঘরে কলে। কিন্তু না গেলে ঠাকুরের নাম বন্ধ। বাব আর চলে আসব। রীতরক করে আসি। রোজ নিয়ম মতো করে এসে মাঝখানে একদিন বন্ধ করা যায় না। কোন ভয় নেই, শুয়ে পড়লে জগা। ঠাকুরের কাছে বাচ্ছি তো,— তিনিই ভাল করে দেখেন।

বুঝিয়েঝিয়ে বলাই বখারীতি আলায়ুখো হাঁটল। ছাই হয়েচে জগার, অস্থখের ভান করে বলাইটাকে পরখ করে দেখল। পরীক্ষার ফল দেখে ঝিম হয়ে গেছে। অভ্যাস বশে তামাক সেজে নিয়েছে, কিন্তু টানবার বেজার নেই। কলকে নিভে গেল না টানার দহন। ঠকস করে উণ্ড করল কলকে মেজের উপরে। বাবা অস্থখ বড় বড় গুণীন আছে—মস্তার পড়ে আঁকচোখ কেটে বাববন্ধন করে। কিন্তু মেয়ে জাত যেন ভাদেবও বড় গুণীন—মস্তার পড়ে না, আঁকচোখ কাটে না, এমন-এমনি মাস্তা কতে ফেল।

আসি বলে তো বলাই চলে গেল। নামগানও আজ তাড়াতাড়ি সমাধা হয়ে গেছে, তবু কিয়ৎ না কেন? কি করে না জানি বিশেষ আবার ভিতর বসে বসে? পেটের মধ্যে পাঁক দিচ্ছে, জগা বলছিল। ঠিক উল্টো, ক্ষিপের পেটের নাড়ি চনমন করছে। সে ভাত রেখে বাখে, বাতহুপ অবধি প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়ে এসে বাঁধা জাত কতটা দেন। রোজ রোজ কেন এ রকম হবে? আড্ডা কামাই গিরে বলাই আজ বাঁধাঝাড় কলক, এই সব ভেবে বলছিল অস্থখের কথা। বাত বাড়ছে। পিছনের বনে বাজির কোন পাখির দল হটোপাটি লাগিয়েছে, রণাশ-রণাশ করে পড়ছে ডালের উপর। দুস্তোর, কত আর দেরি করব,—উত্তন ঘরিয়ে জগা ভাত চপিয়ে দিল। ভাত আর ঝিঙে-ভাতে। ভাঙ্কড়ার বেধে চাটি ভালও ছেড়ে দিল গুর ভিতরে। ভাত ঢেলে নিয়ে খেতে বসল, বলাইয়ের তবু নিশানা নেই। মরেছে নাকি? অস্থখ জেনে গেছে, তাড়াতাড়ি কিংবে আসবার কথা,—তা দেখি অন্ত দিনের চেয়ে বেশি দেবি আজকে। তাই দেখা গেল, জগা যদি সত্যি সত্যি মরে বায়, তিলকের তরে গুদের আড্ডা বন্ধ হবে না। গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে, বলাই আসার আগেই খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বে। যাত্রের মধ্যে কথা বলবে না, সকালবেলাও না—এক ডিঙিতে বাবে, তবু হুপ তুলে তাকাবে না তার দিকে।

খাওয়া শেষ হবে-হবে, হঠাৎ শোনা যায় শাঁখের আওয়াজ। ঘর জঙ্গলের ভিতরে শব্দধ্বনি শুনতে পাবে ভর সন্ধ্যাবেলা। বাদার নৌকায় গৃহস্থর রীতকর্ম করে। গায়ে-ঘরে দারে-বেদারে নিয়মের তবু বাত্যর আছে, কিন্তু বনবিধি দক্ষিণরায়েব এলাকার নীতিনিয়ম যেনে বোলআনা শুদ্ধাচারে থাকতে হয়। মা এবং বাবা কোণের কোন কার্য বুঝে না পান। কিন্তু মেছোবেরির আলার মধ্যে শব্দধ্বনি—হেন কাণ্ড কে করে শুনেছে? মেয়েমানুষ এসে পড়ে কটা দিনের মধ্যে নিজস্ব গাঁ-ঘর বানিয়ে তুলল।

শাঁখ বাজিয়ে নতুন কি একটা শুক হল এই রাত্রে। চুলোর বাকসে। বলাইয়ের বে ভাত রেখেছিল, জগা সেগুলো ঘেবির জলে ফেল দিয়ে এল। আছে থাক। ভাত রাঁধবার চাকর-নকর কে রয়েছে, খাবে তো কিংবে এসে কই করে রেখেবেড় থাক।

ভাত ফেল এসে জগা শুয়ে পড়ল। শাঁখ বাজছে, আর উলু পড়ছে

তার সঙ্গে। উলু দেবার মানুষ ভুটেছে বাসার। উলু-উলু, উলু-উলু—দীর্ঘ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জলের উপরে জঙ্গলের ভিতরে ছড়িয়ে বাচ্ছে। বিবধ জাঁক জালকে আলার, বাত কাবার করে দেবে মনে হচ্ছে। আবার উঠে পড়ল জগা। উত্তনে জল ঢালল, বাত্ভার কাঠ বা আছে জল ঢেলে আছা করে ভিজিয়ে দিল। বাঁধবে তো বন থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে নিয়ে এসো বাহুমণি। ভিক্সে উত্তনও ধরানো বাবে না, ডেলা সাজিয়ে তার উপরে হাঁড়ি রেখে কাজ সারবে। এত অব্যবসার থাকে তো পেটে পড়বে ভাত। নইলে উপাস।

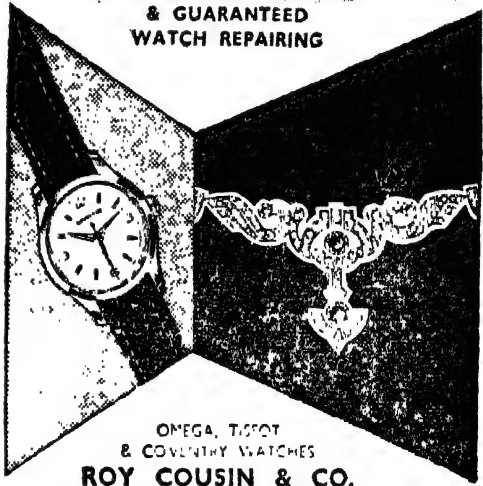
শুয়ে পড়ে ভাবছে এই সব। জ্যোৎস্না ফুটুফুট করছে, ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে জ্যোৎস্না। বাঁধের উপরে মানুষজন কলরব করতে করতে বাচ্ছে, বাড় তুলে জগা ভাকিয়ে দেখল। পাড়া বেঁটিয়ে গিয়েছিল যে আলার। জালে বেকবে আজ কখন—আলার স্মৃতিতে কালকের দিন অবধি পোত ভর থাকবে তো?

বলাই কিংবে। আর সর্গশন, মেয়েটাকে গেঁথে নিয়ে এসেছে যে। ও লোকটা, তুমি গেলে না কেন? লক্ষ্মীপুজা হল, সবাই গিয়েছিল। ওঠো, মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ নাও উঠে।

বয়ে গেছে শত্রুর কাছ থেকে হাত পেতে প্রসাদ নিতে। জগা তো ঘুমিয়ে আছে। ঘোরতর গুম। বলাই তাড়াতাড়ি বলে, অস্থখ করেছে, ভেবো না। রেখে বাও, পাটোরাটা কাল দিয়ে আসব।

ঘুম থেকে জগাকে ডেকে তুলতে চায় না বলাই। সম্ভব। জগা বেন দৈত্যদানো বিশেষ, উঠেই অমনি তোলপাড় লাগিয়ে দেবে চাকবালার সঙ্গে। চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জগা দেখছে। পিতলের

**JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING**



OMEGA, TISSOT
& COGNVINY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

বেকাবিত্তে পুজার প্রদান রেখে চাকরী চলে, শিছু শিছু বলাই আলা অবধি এগিয়ে গিয়ে চলল। তা বেশ হয়েছে। বলাই আবার বখন ঘরে ফিরবে, তাকে এগুতে আসবে না চাকরী? এবং তারপরে চাকরী বখন বাবে? চলুক না সারারাত্রি ধরে এই টানাশোড়েন।

বলাই কিংবা এসে এক বাটী জল হুড়হুড় করে পায়ে ঢেলে জগার পাশে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাত রাগা করা আছে কি না, দেখল না একবার তাকিয়ে। ভাতের গরজই নেই তার। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে বৃষি।

তখন জগাকেই কথা বলতে হয় : শাঁখ পেলো কোথা রে? ছুটিয়ে নিয়েছে। কাঠুরের নৌকো কালীতলায় নেমে মানসিক শোধ দিচ্ছিল। শাঁখের হুঁ স্তনে চাকরী গিয়ে পড়েছে। অনেক বলে-করে কিছু দাম ধরে দিয়ে শাঁখটা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিল মানিষেয়ার গিরে তার আবার কিনে নেবে। শাঁখ ছুটে গেল, তখন ঝাঁক হল, গেরস্তবরে লক্ষ্মীপুজা করলে তো হয়। দিনটাও আজকে বিয়ুংবার। এর পরে হস্তার হস্তার কী বিয়ুংবারে পুজা করবে।

জগা বলে, শাঁখ হল, ফুল-নৈবিত্তিও না হয় ছুটিয়েছে। কিন্তু বায়ুন নইলে তো পুজা হয় না। বায়ুন পেল কোথা? তুই গলায় জালার পুতো তুলিয়ে পৈতে করে নিলি নাকি?

বলাই বলে, লক্ষ্মীপুজা শিবপুজা বিনি বায়ুন হলে দোষ নেই। হস্তার হস্তার বায়ুন পাবে কোথা? কিন্তু পরলা দিন আজকে বায়ুনের হাত দিয়েই ফুল কেলেছে।

হেসে উঠে বলে, জাত-বায়ুন যে ভাই। একেবারে জাত-শোধের। চাকরী খবর রাখে সব, ওর সঙ্গে চালাকি চলে না। বলে, কাকেই তো বায়ুন রয়েছে—চৌধুরিগঞ্জের গোপাল ভদ্রাঙ্ক। বলে-করে তাঁকেই এনে দাও তোমরা। সে কী কম হাঙ্গামা! প্রথমটা রাজি হয়ে শেষে বিগড়ে গেল : জরুরি কাজ আছে, ভেড়ি সজ্জা ব্যাপার। এক পা নড়তে পারব না এখন আলা ছেড়ে। পাচা দুই পা জড়িয়ে একেবারে তুষ হয়ে পড়ল তো তখন অস্ত্র এক ছুতো; বলি, নৈকর্য্য কুলীন আমি, সেটা জানিস? কার নামে পুজার সত্ত্ব হবে, কোন্ জাত কি গোত্র, কিছু জানিনে। গেলেই হল অমনি। হুখ চূণ করে সবাই ফিরল। চাকরীও তেমনি মেয়ে। বলে, আমি হাঙ্কি নিজে—গিরে মুখোমুখি জবাব দেবো। সকলে মিলে দল হয়ে গিরে পড়লাম চৌধুরি-আলার। চাকরী বলে, ঠাকুরমশার, জাতজন্ম বত-কিছু মানিষেয়ার গিরে। বাঘ হরিণ সাপ স্ত্রীরের মধ্যে জাত-বজাত নেই, বাদ্যবনে মাছুবেরও তেমনি জাত নেই। বলতে পারেন, পৈতেওলা খুঁজি কেন তবে? সে আমার বউদিগির জন্তে, আর কাছ-পিঠে আপনি রয়েছেন বলে। বউদিগির সারা দিন উপোশি আছে, আপনি পুজা করে এলে খুঁতখুঁতানি গিরে গিরে প্রথমে সে প্রশ্নাব পাবে। তারের বেলা সেই জন্তে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ঠাকুরমশার। মেয়েটা বা তুখোড়, তাকে কী বলব জগা! মিষ্ট-কথায় নায়েককে একেবারে জল করে দিল।

শান্তি নিল না, বাঁধ ধরে পায়ে হেটে নতুন আলায় এসে পুজোজাজা করল। এর পরে কী বিয়ুংবারে এসে এসে পুজা করে বাবে, কথা দিয়ে গেছে।

জগা বলে ওঠে, কী কাণ্ড রে বাবা! আলা তবে আর হইল কোথা? আমাদের সাধের আলা বোলআনা এখন গেরস্তবাড়ি।

জগারাবের উমা বলাই ধরতে পারেন না। পূলকিত কঠে আংগ সে কলাও করে বলে, বিস্তার ক্ষমতা ধরে মেয়েটা। অমন দেখা যায় না। এই ধরে বাবা-জারগা—পুজার কোন জলে তা বলে খুঁত রাখেনি। মালসার মধ্যে টিকে ধরিয়ে ধুনো দিয়েছে। সেই বরাপোখা থেকে গাঁদাফুল জোপাড় করে এনেছে। ঘর ভরে আলপনা দিয়েছে—পদ্ম আর লক্ষ্মীর পা। লক্ষ্মীঠাকরুন পা ফেলে ফেলে উঠান থেকে ঘরে উঠে বসেছেন, তারই বেন ছাপ পড়ে গেছে।

বিরক্তিতে জগার মুখে জবাব আসে না। বলাই ঘুরতে লাগল। জগা ভাবছে। তারি বিপদের কথা হল যে। ভাতের গিরে দিশা পায় না। একচকু হরিণের মতো এতকাল শুধু একটা দিকের বিপদ ভেবে এসেছে। চৌধুরিগঞ্জের সজ্জা। অনেক আগে থেকে জমিয়ে আছেন তাঁরা—বাছের এলাকার শাহান-শা বলা যায়। অস্ত্র কারও আসার পথে কাঁটা ছড়ান। কিন্তু এটা দিশা জানা ব্যাপার—এবাও সনাসকর এইজন্ত, কাঁটা বতই ছড়িয়ে দিক খুঁটতে খুঁটতে এগিয়ে বাবে। চৌধুরিদের ডরায় না, কিন্তু গাঁ-গ্রাম থেকে মেয়েছেলেরা এসে পড়ে ঘরগৃহস্থালী বানিয়ে গগনকে সবলের থেকে আলাদা মাছুব—ভঙ্গমাছুব করে তুলবে, 'এটা কে ধরে ভাবতে পেরেছে?

ঘুম হয় না, ছটকট করছে। নানান রকম মন্তলবের ভাড়াগড়া। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়। সন্ধ্যারাত্রি মিথ্যা করে অস্ত্রের কথা বলেছিল, রাতছপুরে অস্ত্রের কথা বলেছে সত্যিই। সর্বাঙ্গ ললছে রাগে। রাগ মেয়েলোক ছুটোর উপর। বিশেষ করে ঐ চাকরী—সকলের বড় প্রতিপক্ষ সেই এখন। অহুকুল চৌধুরি চেয়েও বড়। রাগে রাগে বাইরে চলে এলো। বাঁধ ধরে চলল কয়েক পা।

নতুন আলা নিশেদ। ঘুরছে ওরা বিতোর হয়ে। জগা ঢাবের মস্তন টিপিটিপি এগোয়। বাবে আলায় উঠান অবধি—লক্ষ্মীর পা এঁকেছে বেলব জারগার। পা ডলে ডলে মুছে দিয়ে আসবে আলপনা। রাগের খানিকটা শোধ দিয়ে তার শরে বদি ঘুম হয়।

বাঁধের উপর রাখেজাম। আশ্চর্য, ঝোঁকা পা দেবি পরিপূর্ণ আরাম হয়ে গেছে। হনহন করে চলেছে। খানিকটা নিঃশব্দে অন্নদানী। ভঙ্গদানী হেঁটে তার সঙ্গে পারছে না।

জগাকে দেখতে পেরে রাখেজাম বলে, ভাল হয়েছে। চলে দিকি আমাদের সঙ্গে। হাতে লাঠি? বেশ হয়েছে, নিঃশব্দে বেরুতে নেই। বউকে বললাম, বাড়ি থাক। তা তুলল না। পূলক কত? বাচ্চাটাকে সেই সন্ধ্যাবেলা সুবোধবালার কাছে দিরে রেখেছে। রাতছপুরে এখন মজা দেখতে চলল। [ক্রমশঃ]

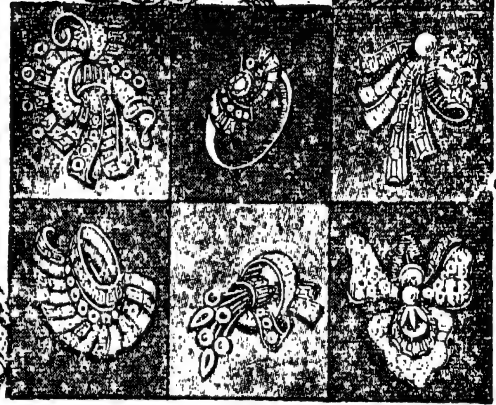
[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন]



জোদরো মাদিরা



Cash Bohar



গিনি চান্স জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭/সি/১ বহুতালার ট্রাই কলিকাতা-১২ গ্রাম-সিইদুলপুর
 ব্রাচ-বালি গঞ্জ-২০০/সি মাসবিহারী এড্ভিন্ট কলিকাতা-১২ ফোন- ৪৮-৪৪৬৬
 মোরামের পুরাতন সিংহলা ১২৪, ১২৪/১, মতলাকার ট্রাই, কলিকাতা-১২
 কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
 ব্রাঞ্চ জামসেদপুর কোল- জামসেদপুর- সিটি-২৪৪৮-এ

শ্রেতানিধি

রক্ত সেন

হেমন্ত আর একবার আরনায় তার গিলে-করা পাঞ্জাবী আর কৌচানো ঘুতি পরীক্ষা করল, ক্রমশে আর একটু এসেল ছড়াগো, তরুণ গৌকে আঙ্গুল বুলালো, ভাবল : বোধ হয় বার হয়েক কামাশে ঘন হবে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টুনকী তাকে পরীক্ষা করছিল। হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, কি রে! বাবি নাকি? ক্রকের প্রান্তটা আঙ্গুল দিয়ে ভটাছিল টুনকী, চোখ হুতুল করে উঠল, বলল, আমায় নিয়ে বাবে দাদা? নিয়ে চল না, দা-কে বল আসব?

তবে চ, কিন্তু তাড়াতাড়ি কর, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, তেরী হয়ে আর।

টুনকী গোড়ে গেল মা'র কাছে।

অনেক কষ্টে কাঠ ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে হেমন্ত, ফলেজের এক প্রোক্সেসরের কাছে ইংরেজী পড়তে বার। দিন হয়েক আগে তার বাবা প্রোক্সেসরের মাইনেটা তার হাতে দিয়েছিলেন গুকে দেবার জন্যে, দু'দিনেই টাকাটা কেমন করে ব উড়ে গেল কিছুতেই হিসেব করতে পারছে না সে। হুমত চমলোক তার বাবার কাছেই হাঙ্গির হবেন, বলা বার না। হেমন্ত অস্থির হয়ে উঠল, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল, দরজার দিকে কান আর চোখ রেখে ঘন ঘন টান দিতে লাগল।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনতেই সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল সে। ঘরে ঢুকল আগে তার মা সুরবালা, পিছনে টুনকী।

কোথার বাবি তোরা? জিজ্ঞেস করল সুরবালা।

আমি ত বাছিসাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি।

মিথো কথা। বলল টুনকী তার লম্বা বেণী হুলিয়ে, দাদা পাছে কাটলেট খেতে।

সে তোকে ক্যাপাছিসাম।

সুরবালার ছোটোখাটো গড়ন, শরীরের শক্ত বাঁধুনি। কমনীয়, হুকুমার হুশ, বুদ্ধিতে উজ্জল দুটি চোখ, ঘরের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি?

বাবার বৈঠকখানা থেকে আসছে! আচ্ছা মা, সব সময়ে একটা দামী নেকলেশ পরিয়ে বাথ কেন? রাস্তায় ঘাটে—

তুই ত সংগে আছিস।

চল যে টুনকী, বলল হেমন্ত।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সত্যিই হেমন্ত গুকে রেক্স'র নিয়ে গেল।

কি বাবি বল?

মাংসের কাটলেট, বলল টুনকী। অনেক কষ্টে আনন্দ চেপে রাখল সে, দশ থেকে এগারোয় পড়েছে; এটুকু বোঝে—বেণী হাসলে দাদা তাকে বেকুব বা লোভী ভাবতে পারে; বাতির আলোর হীরা-বদানো লকেট বলমল করতে লাগল।

কাটলেট এসে গেল, আড়চোখে তাকতে লাগল টুনকী।

নে, আর দেবী কিসের?

ছুবি-কাঁটা চলতে লাগল।

কাটলেট শেষ হবারপর হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, আর কি খাবি? একটা চপ।

চপ এল, আবার চলল ছুবি-কাঁটা।

বিল চুকিয়ে ওরা এল রাস্তায়। হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, পারো বাবি? ছুটো আইসক্রীম খেয়ে বাড়ি—

চল।

বড় পার্ক। চারিদিকে লোকের ভীড়; ছুটো আইসক্রীম কিনে ওরা পার্কের মাঝখানে এগিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট বসে থায়ে, আইসক্রীম খেতে খেতে ওরা কোন জায়গায় বসবে তাই ভাবছিল, হেমন্ত একটু জোরে পা ঢালাল, টুনকী পিছনে; হঠাৎ হেমন্ত বয়েসী একটি ছেলে কোথা থেকে একেবারে টুনকীর কাছে এসে পড়ল, হুথ কিয়াবার আগেই ছেলেটি ছুটি হাত বাড়িয়ে চোখের নিম্নে গুয় নেকলেশ খুলে নিয়ে দৌড়, টুনকীর হাত থেকে আইসক্রীম-লাপানো কাঠিটা মাটিতে পড়ে গেল, চীৎকার করে উঠল সে, কি হল? কি হল? হেমন্ত এগিয়ে এল, টুনকী তখনও চ্যাচাচ্ছে; কি হল বল না?

ঐ যে! ঐ লোকটা পালাচ্ছে আমার নেকলেশ নিয়ে। এতক্ষণে কৈসে ফেলেছে সে।

হেমন্ত তাকিয়ে দেখল—ছেলেটি দ্রুত পায়ে পার্কের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, চোর, চোর! বলে জোরে চীৎকার করে উঠল সে। লোক জড় হয়ে গেল অনেক; আরও অনেক হৈ-ঠে বিশৃংখলা। হেমন্ত হঠাৎ ছুট দিল গেটের দিকে, তার সংগে দুইল আরও কয়েকজন; টুনকী চোখের জল সামলে অজস্ত প্রাণের উত্তর দেবার চেষ্টা করল।

হেমন্ত কিরে এল, বলল, পালিয়েছে!

পুলিশে ডাইরী করে এসো হে! একজন বরফ লোক উপদেশ দিল।

কি হবে বলুন? বলল হেমন্ত।

তা অবগত বলতে পারি না; তবে হতে পারে কিছু! দামী নেকলেশ, বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়তে পারে।

টান্সী করে থানায় গেল হেমন্ত, সেখানে ডাইরী করে বাড়ি ফিরল; নিচের বৈঠকখানায় তার বাবা তারিঙ্গী বাবু মজলুমের সংগে কথা বলছিলেন; তাঁকে খবরটা দেবার সাহস হল না তার, উপরে এসে মা-কে বলল; সুরবালা একবার মাত্র ছোট একটি আর্ন্তিনাদ করে চুপ করে গেল। সত্যিই, আমারই ভুল হয়ে গেছে—ওটা পরতে দিয়ে গুকে; লকেটের হীরের নামই প্রায় হাতার দেড়েক টাকা।

ইস্! ও কি আর পাওয়া বাবে? বলল হেমন্ত।

টুনকী আর এক পশলা চোখের জল ফেলল।

কাঁদিস না। কাঁদলে কি ফিরে আসবে? আর একটা গড়িয়ে দেব'বন, আমার নেকলেশটা পরতে দেব তোকে, খবরদার! বাহুক বলিস না বেন!

মা, আমি বাছি প্রোক্সেসরের বাড়ি।

হা।

হেমন্ত বই শুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

লেকের কাছে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল সে, চারের দোকান ক'টা পেরিয়ে একটু নির্জন জায়গায় জলের ধারে এসে বলল হাতপা ছড়িয়ে, আঙুলে আঙুল একটা সিগারেট ধরাল।

পাট আয় ছিটের সার্টি-পরা একটি ছেলে এসে দাঁড়াল হেমন্তের পিছনে, কাঁকচা চুলের মধ্য আঙ্গুল ক'টা হুকিয়ে বলল, কতক্ষণ?

হুখ তুলে তাকাল হেমন্ত, হাসল; এই ত!—মিনিট পাঁচেক, বোস।

ছেলেটি বলল; বরষা উনিশ-কুড়ি হবে; সার্টির আঙিনা গুটানো, চান হাতে বড়ি; বুকপকেট থেকে চিক্কী নিয়ে বাধা আঁচড়ালে।

হেমন্ত সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল; অস্ত্র ছেলেটি একটা সিগারেট টোটে লাগিয়ে বাঁ হাতে দেশলাইটা একবার বাঁকুনি দিল। জান পাঁটা লম্বা করে পকেট থেকে নেকলেশটা বার করে হেমন্তের কোলের উপর ছুঁড়ে দিল, অস্পষ্ট বাতির আলোর সোনা আর পাখর চকচক করে উঠল; ছুঁহাতে নেকলেশটা চেপে ধরল হেমন্ত।

অস্ত্র ছেলেটি অচুচ গলার হেসে উঠল, ভিজ্জেস করল, কি রে বাবড়ে গেলি না কি?

না, আমায় দিলি কেন? নে, রাখ তোর কাছে।

ছেলেটি নেকলেশ চুকিয়ে রাখল পকেটে, পা গুটিয়ে নিল, সিগারেট ধরাল।

একটু সুয়েই ছেলে আর মেয়ের মিলিত হাসির লক্ষ্য শোনা গেল; লেকের জলে বাঁই মায়ল একটা বড় মাছ, তাল্লা চাঁদের ছায়া ডেউ-এর ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল জলের চারদিকে।

চাই-ই-ই গরম বুড়ি! বুড়ি দেব না কি বাবু?

মোটর ছুটছে, আর হাওয়া ছুটল।

কাছ!

কি বলছিস?

কাল ওটাকে বেড়ে দিতে পারবি ত?

তবে কি?

দেখিস যেন—

চুপ কর।

বাড়ি চুকবার আগে হেমন্ত দেখতে গেল ইংরেজীর প্রোফেসর হিমাংগ রক্ষিত উঠো। দিক থেকে এগিয়ে আসছেন তাদেরই বাড়ির দিকে। লম্বা লম্বা পা কেলে সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল; মাইনের জন্তে একেবারে বাড়ি ধাওয়া করতে হল তার? টাকাতা মারা বাবে ডাবছিলেন না কি?

চানকটা গুছিয়ে নিয়ে প্রোট অধ্যাপক কি একটা বলতে বাচ্ছিলেন, কিন্তু সুযোগ পেলেন না।

মাটারদের অবস্থা কি আজ-কাল এতই খারাপ হয়ে গেছে?

বদি বলি টাকার জন্ত আসিনি, তোমার খবর নিতে এসেছি, এক সপ্তা তোমায় কলজে দেখিনি, বাড়িতেও পড়তে আসিনি, তাইলাম—হয়ত—

চুপ করুন, মশাই, আমার এমন গভীর জলবাসবার কোনো কারণ নেই,—বদি না আপনার অস্ত্র কোনো মতলব থাকে; বান বাড়ি বান, কালকেই টাকা দিয়ে আসব।

একটু ইতস্তত: করে প্রোফেসর রক্ষিত বললেন, ডক্সলোকের ছেলে মনে-প্রাণে যে এমন অধঃপাতে বার—সেটা তোমাকে দেখেই বুঝতে পারলাম। কয়েক মাস লক্ষ্য করেছি তোমায় ভিতরটা তোমার পোকার খেয়ে গেছে! এক পা সরে দাঁড়ালেন তিনি, চাঁদর দিয়ে নাক ঢাকলেন—যেন কোনো অকথা দুর্গন্ধ নাক এসে লাগছে; তোমার বাবাকে বলতে এসেছিলাম—তোমার পেছনে যেন অকথা আর পরস নাই না করেন, পড়াগুলো তোমার হবে না।

গলার শব্দে তেমন জোর ছিল না, উত্তেজনাও নয়; কিন্তু হেমন্ত আজ এই প্রথম অস্থির করল—একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কি গভীর ঘৃণা করতে পারে! এমন ঘৃণা তাকে সাপের মত জড়িয়ে ধরল, দংশন করল তার সমস্ত শরীরে; বুদ্ধিমান, শিক্ষিত লোকের ঘৃণা এমনই, যে-লোককে তুমি হত্যা করতে পার, কিন্তু তবু সে-ঘৃণার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই। হুখ তুলে দেখল হিমাংগ রক্ষিত চলে যাচ্ছে আর একটি কথাও না বলে, আর একবারও তার দিকে না তাকিয়ে।

আস্তে আস্তে বাড়ি চুকল সে, বৈঠকখানার তখনও কয়েকজন মজ্জেল, কাজ সেরে তার বাবার উপরে বেতে এগারোটা বাজে। খাবার-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল টেবিল খালি। উপরে এল সে; টুনকী তখনও পড়ছে শিক্ষারিত্রীর কাছে, তাকে দুলে দেওয়া হয়নি, মেয়ে বড় হচ্ছে, চোখের বাইরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, আজকাল ঘটছেও। পদার বাইরে এক সুহৃৎ অপেক্ষা করে হেমন্ত ঘরের মধ্যে চুকল। বাইশ-তেইশ বছরের পরিচ্ছন্ন মেয়েটি চৌখ ধুলে তাকাল; হেমন্ত বলল, নমস্কার।

নমস্কার!

কেমন আছেন?

ভাল। এমন স্থলর হাসতে হেমন্ত কোনো মেয়েকে দেখেনি।

প্রায় নটা বাজে, আজ অনেকক্ষণ পড়াচ্ছেন?

কালো কিত-বাঁধা নিকলের হাত-বড়িটা একবার দেখল মানসী, বলল, হ্যাঁ, এবারে উঠতে হবে। আকগুলো করে রাখবে সব, কেমন? টুনকী বাড়ি নাড়ল।

কি. এল. সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২

মানসী ঈড়াল, হাত-বাগটা তুলে নিল টেবিল থেকে; শিঠের উপর জীটলটা তুলে নিল; জামার নিচে কিতে দেখবার দ্বিতীয়বার সুযোগ পেল না হেমন্ত; দীর্ঘ-দেহ, তৃতীয় শরীর আর পূজার প্রাণপণে ধূপ আর ফুলের গন্ধের মত মধুর অঞ্চল বিচ্ছিন্ন, অছত্বেব করা যায়, স্পর্শ করা যায় না; একবারও অঙ্গ কোনো দিকে না তাকিয়ে পর্দাটা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

সিঁড়ির কাছে হেমন্ত ডাকল, ঈড়াল।

প্রথম ধাপে পা দেবার আগেই ঘুরে ঈড়াল মানসী। আর হেমন্তর মনে হল এ একটি আসল মেয়ে, তাই তাদের ব্যবধান এত ছুস্তর, এত দূরত্ব; বাস্তব কুড়নো ঘৃণা তাকে আবার আকর্ষণে ধরল; আনাকে দেখছি আপনি মানুষ বলেই গণ্য করেন না!

কথাগুলি নিজস্ব হবার আগে তার ভিতটা পুড়ে গেল; কিন্তু বুঝতে পারল কাছে বাবার রাস্তা এটা নয়, এটা ভুল পথ, দূর-পথ। কোনো দিন আপনি আমার সঙ্গে একটি কথা বলেন নি, একটিবার তাকাননি আমার মুখের দিকে, আমি কি এতই ঘৃণ্য?

মানসীর চোখে বিষম দেখা দিল, আর কিছুই নয়; তেমনি প্রশান্ত হাসল সে। তেমনি দূর, তেমনি বিচ্ছিন্ন হাসি; আপনি ঘৃণা কি প্রশংসার বেগ্য—সেটা বিচার করবার আমার কোনো দিন প্রয়োজন ঘটেনি, এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আপনার সঙ্গে কথা বলবার বা বুকের দিকে তাকাবার কোনো প্রয়োজনও নয়, চাকরীর নিয়ম-কানুনের মধ্যে ওগুলো পড়ে না, আচ্ছা! মানসী নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে; আর হেমন্তর বুকের মধ্যে অঙ্গ একটা মানুষ নিঃশব্দে চাঁৎকার করে উঠল, বাবেন না। ঈড়াল এক মিনিট।

মানসীর পায়ে শব্দ মিলিয়ে গেল; হেমন্ত আচ্ছন্ন মন দিয়ে অসুট ভাবে বুঝতে পারল, তার পোষাক, চেহারা, বাবার টাকা এবং প্রতাপিত, তাদের বাড়ি এবং গাড়ি—এসব-কিছু সমস্তও হিম্মন্ত রক্ষিত আর মানসী মিলের ব্যবধান সে সাক্ষ্য করতে পারবে না।

অনেকক্ষণ সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দাদা, তুমি খেতে বাবে নাকি? আমি বাচ্ছি।

আমি পরে বাব, তুই খেয়ে নে।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

খেতে বা না।

টুনকী নেমে গেল নীচে। সে গেল তার ঘরের দিকে; মা'র ঘরের দরজা বন্ধ, জাকরীর দ্বিজে দিয়ে নীল আলো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা অসহ ঘৃণা আর রাগে নিঃশব্দ বন্ধ হয়ে এল তার, পাগলা কুতুরের মত লাফাতে লাগল স্বপ্নিণ্ড। আজও রাধিকা বাবু আর তার মা প্রানশেটে আছার স্নেহ কথা বলছে, দরজার কান পাঁতল সে। অস্পষ্ট হাসির শব্দ শোনা গেল; তার গালে বেন চাবুক মারল কেউ। রাধিকা বাবু তার বাবার তাত্ত্বিক বন্ধু, হেমন্তর শিষ্ঠ চাপড় একদিন বলছিল, তুমি বাচ্ছা ছেলে, এ সব তুমি কি বুঝবে হে! এক বলে প্রেতলিপি।

রাধিকারমণকে সে খাটীর দেবে প্রেতলোকে। ঘৃণা আর নপুংসক রাগে তার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল।

লেকের অন্ধকারে জলের বাবে হেমন্ত জ্বিৎসে করল, কত পেলি?

১—বাইশ শ, তাহলে ভোর ভাগে পড়ল এগারোশ, বশ টাকা ট্যান্ডি-ভাড়া, কাছ তার পাতলুনের পকেটে হাত হুকিয়ে নোটের বাতিগটা বার করল, নে এগারো শ নব্বই টাকা। সব এক শ টাকার নোট।

ফিতের-বাঁধা টাকাটা হেমন্ত হুকিয়ে রাখল পকেটে।

লেকের শান্ত জল, বৃহ বাতাস, পশ্চিম আকাশে ভাসা চাঁদ; আর পকেটে অনেক টাকা, এবার? এবার কি করা যায়?

কাছ বলল, বাবি এক জায়গায়?

কোথায়?

চল না, কত দিন আর বোকা হয়ে থাকবি? একটু অভিজ্ঞতা হোক।

কিসের অভিজ্ঞতা? হেমন্ত সিগারেট বার করল।

চল না।

ট্যান্ডিতে হেমন্ত বলল, একটা লোককে মারতে হবে।

কোন লোক? খুলে বল।

বলব, কেবল সময়।

কেমন মার?

বেন আর হেঁটে আমাদের বাড়ি না আসতে পারে।

এক সন্ধ্যা গলিতে ট্যান্ডি ধামানো হল। হেমন্তর সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে গেল, কাছ বাকী দিয়ে তাকে নামালো ট্যান্ডি থেকে।

এর দু'মাস পরে টিকানা খোঁজ করে করে একটি পলিশ ব্রিস বছরের মধ্যে একেবারে তারিগী বাবু বৈঠকখানার চুকে পড়ল; রাজি আটটা হবে, দু'-একজন লোকও রয়েছে হবে।

মেয়েটি নমস্কার করল হাত তুলে, বলল, আপনার নামই কি তারিগী বাবু?

সবাই তাকাল এক সংগে; পোষাকটা বখাস্তব জন্ম করবার চোঁটা রয়েছে, তবু কোঁধার বেন একটা অসম্পূর্ণতার ইংগিত থেকে গেছে, চুলের বাঁধনটা আর একটু আলগা হলে বেন ভাল হত; সাঁড়িটা জমকালো নয়, তবু বেন ওকে ঠিক মত মান্য নি; রং গুয়ে কেলার পর পাঁতলা টোট হুটি বিবর্ণ দেখাচ্ছে; পাউডারে প্রলেপেও চেঁষের চার-পাশের কালো দাগ ঢাকা পড়েনি; চোঁষ রাস্তা, শরীরের রাস্তা জগিতের বোঁবনের কিছু আভাস, ক্ষণের পরে তখনও কিছু ক্ষয়িষ্ণু মাদুর!

আপনার নামই কি তারিগী বাবু? গলায় ঘরে কোনো সাকোচ নেই, থিরা নেই।

হ্যাঁ, বহন।

না, বসব না, একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে।

তারিগী বাবু অপেক্ষা করতে বসলেন।

মেয়েটি সারি সারি আলমারির বই দেখতে লাগল।

চোঁষ সন্ধ্যার শব্দ হল, তারিগী বাবু দাঁড়িয়েছেন; গায় কতুরা, কৌণ্টা পেটের কাপড়ে হুকানো; মাঝারি আকরের লোক, মাঝারি পাঁতলা চুল—রঙের হু'পাশে প্রায় সবই সাদা; মোটা, কালো ক্রেমের চশমার ভিতরে অলম্বারণ বৃত্ত চোঁষ হুটি অনেক কিছুই দেখতে পেল, অনেক কিছুই বুঝতে পারল; চলল, আমরা বাইরে বাই!

সেই ভাল। সপ্রতিভ গলায় উত্তর দিল মেয়েটি।

বারান্দার প্রান্তে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে নিত্যন্ত পড়িবার গলায় মেয়েটি বলল, আপনার ছেলে হেমন্ত কাল রাতে আমার হাজার টাকা গরনা চুরি করে নিয়ে গেছে, আমার গ্রামে ঘুমের মূগু মিশিরে দিয়েছিল সে; আমার গরনা কেবল চাই, না হয় টাকা।

গল্পটা কিসের বুঝতে পারলেন না তারিণী বাবু, বাগান থেকে ফেরে না মেয়েটি কোনো এসেছে ছড়িয়েছে তার জামার। হলেন, টাকা শেলেই তোমার সুরাধে হয়, না? আবার নতুন ড্রাইনের গরনা গড়াতে পার। তোমার নাম কি?

সুভদ্রা।

ঠিকানা?

সতেরো নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র রোড, চাঁপুথ থেকে বেরিয়েছে, ধাবারের পোকানের পাশ দিয়ে ডানহাতি রাস্তা।

কাল সন্ধ্যাবেলা ব্যবস্থা করব।

ঠিক ত?

তারিণী বাবু তার কাঁধে হাত রাখতে বাঙ্ছিলেন, মেয়েটি সরে পড়াল।

ট্রাম থেকে নেমে প্রথম রাস্তাটা বাঁদিকা বাবু নির্বিবাহে পার হয়ে এলেন, দ্বিতীয় রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, গ্যাসের অন্ধকার আলোর রাস্তার অন্ধকার সম্পূর্ণ হুই হয়নি। পকেট থেকে ছোট শিশি বার করলেন তিনি, মোরকের একটা গুলি, হাতের তালুতে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন, তারপর বলে উঠলেন, কালী, কালী! মনটা তাঁর খুঁই ভাল আজ, বরানগর কালী-মন্দির তৈরী করছেন তিনি, সুরালা প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা দান করবে; আজই টাকাটা পাওয়া যাবে, মাটিতে পা পড়ছে না তাঁর, তিনি বেন হাজার ভেলে চলেছেন; মন্দির প্রতিষ্ঠা হলেই তিনি ধুতি ভাগ্য করবেন, গেকরা পরবেন, আর গলায় রক্তাক্তের মালা, নাম হবে বাঁদিকানন্দ গিরি-মহারাজ, কিছু মড়ার গুলি জোগাড় করতে হবে, টুনকী মেয়েটা দেবী করছে বড় হতে, আর ছোটো বছর; তিনি আর একটা গুলি মুখে পুরলেন, কালী, কালী, তোমার ইচ্ছে যা।

দেখুন ত। এই ঠিকানাটা চেনেন না কি?

প্রায় ছ'কুট লম্বা একটি জোয়ান ছেলে বাঁদিকার মনের সামনে এক টুকরো কাগজ বেলে ধরল।

কাগজটা হাতে নিলেন তিনি, কালী, কা—

শিচ্ছে বাড়ি আর গলায় মাঝখানে প্রচণ্ড আঘাতে অন্ধটা তাঁর গলায় আটকে রইল; সামনের ছেলোট ছ'পা সরে এসে চিবুকে ধুঁবি মারল, তিনটি ঝাঁকের বাঁধানো পাটি মুখ থেকে ছিটকে পড়ল রাস্তায়, মাটিতে ঢলে পড়ছিলেন তিনি, কোমরে শক্ত লাধি খেয়ে আবার সোজা হলেন, চিবুকে আর একটা ঘুবি; মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল; চাঁৎকার করে উঠতে গেলেন তিনি, এবারের ঘুবিটা পড়ল নাকের উপর, বড় নাকটা ছুমড়ানো টোমারের মত খেঁতলে গেল, মুখ দিয়ে একটা শব্দ বার করতে পারলেন না তিনি। চোখের দৃষ্টি তাঁর কাঁপসা হয়ে গেল, খানিকটা নোণা রক্ত গিলে কেললেন, চোয়ালটা বাঁকা হয়ে রইল; মাথার আবার আঘাত

লাগল, কাণড়-জড়ানো লাঠির আঘাত, গুলি কাটলো না, সমস্ত বিলু ওলট-পালট হয়ে গেল; হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন বাঁদিকা বাবু, পড়বার আগে কেউ জুতোপায়ে লাধি মারল মুখে, চোয়ালটা সোজা হল বটে, কিন্তু গাল কেটে মাড়ি বেবিয়ে গেল।

সব চূপচাপ; চারটি ছেলে বুকে পড়ে বাঁদিকা বাবুকে পরীক্ষা করল।

একটা কান কেটে নেব না কি?

ডান হাতটা ভেঙ্গে দে।

হেমন্ত হাত লাগারনি, কেমন বেন মেরুদণ্ডের মধ্যে তার শিরশিষ করছিল, সে বলল, এবার ছেড়ে দে কাহু, ছেড়ে দে।

বাঁদিকা বাবু তেমনি নিঃশব্দে পড়ে রইলেন রাস্তায়, তাঁর সোনার আঁটি আর মনিব্যাগ তাঁর কাছে রইল না।

চার বছর এমন কিছু একটা সময় নয়। হেমন্ত মার কিছু গরনা আর বাবার নগর করে ক হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, তারিণী বাবু খোঁজ করেননি; তবে সুরবালাকে শোকে হেমন্তের বন্ধু কাহু তাকে অনেক সাহায্য করেছে; পরিবারের সংগে অনেক অসুখগুণ হয়ে উঠেছে সে, সুরবালাকে হা বলে, আর পক্ষমৌ টুনকী কাহুনা' বলতে অজ্ঞান। তারিণী বাবুকে প্রহাভির কাঁকাবাবু বলে, কিন্তু তারিণী বাবু কাহুকে সবসময় পরিহার করেন। কাহুই একদিন হেমন্তের খোঁজ নিয়ে এল, সে বোকাইতে আছে, ব্যবসা করছে। তারিণী বাবুর অনেক পসার বেড়েছে, গাড়ির আকারটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে টাকার সংগে; চার বছরে মাথার চুল আরও পাতলা আরও সাদা হয়ে এসেছে। সুভদ্রা বালীগঞ্জে ছোট একটা বাড়ি কিনেছে, সামনের বছর একটা ছোট গাড়ি



আপনি ধ্যায় কি প্রায়সার বোণা—সেটা বিচার করার আমার কোন দিন প্রয়োজন ঘটেনি.....

কিম্বাদন্ত প্রতিক্রিয়া পেয়েছে সে। রানিকাবাবু তাঁর বরানগরের বাড়িতে আছেন, কালীর মন্দির তাঁর হয়ে ওঠেনি, সামান্য একটু মাধার দোষ দেখা গিয়েছে, সেটা আর সারবার নয়।

রানিকাবাধমণ গেছে, সুরবালার ভাত্তে কতি নেই, কাহ্ন মল্লিককে পাওয়া গেছে; কিন্তু সেদিন হেমন্ত ছিল, আজ আর হেমন্ত নেই। আর সুরবালাও কোনো দিন প্রেতান্ধার প্রেতাব থেকে মুক্তি পাবে না।

সেদিন সুরবালা বলল, কাহ্ন, হাওড়া থাকি, বাবে আমার সঙ্গে ? হাওড়ায় কেন মা ?

তুনকীর একটা বিয়ের সব্বন্ধ এসেছে, ছেলেটি বড় ভাল শুনেছি, বড় বংশ, তিন পুত্রব সন্তান, কথাবার্তা পাকা করে আসি। বাবে ? আমি আর বেতে পারলাম না তোমার সঙ্গে, বলল কাহ্ন, বিকলে বর্ধমান বেতে হবে, আমার বাড়ি ; কালই কিংব।

কৈ আমার ত একবারও বলনি ?

হঠাৎ আজকে ঠিক হল।

বেশ !

তানিকী বাবু আশান্ত থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, কাহ্ন মল্লিককে নিয়ে সুরবালা হাওড়া গেল এগারোটার সময়, ওকে নামিয়ে দিল ষ্টেশনে, ষ্টেশন থেকে আরও এক ঘণ্টার পথ বেতে হবে সুরবালাকে।

জমিদার-বাড়ির কাছাকাছি এসে সুরবালা ডাইভারকে বলল, গাড়ি খামাও।

বিরিট, স্বকণ্ঠে মোটর গাড়ির ছায়ার খামল, হাওড়া থেকে বাইশ মাইল দূরে, গাড়ির আশে-পাশে লোক জমতে লাগল; এমন বড় একটা হয় না, যদি বা এমন গাড়ি বৈবাৎ চোখে পড়ে, ঘরের দরজার খাকে কৈ ? কে জানে হয়ত গাড়ির মধ্যে মধুবালা কিংবা দিলীপকুমার।

সুরবালা চোখ বন্ধ করে বলল, আমার মাথা ঘুরছে, আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাব।

ডাইভার ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, একটা ঠাণ্ডা কোকো-কোলা দেখব ?

দেখ।

গাড়ি থেকে প্যাট-পরা ডাইভার নেমে পড়ল; কিন্তু ওরা শুনে বলল, এখানে কোকোকোলা কি মহার ? কলসীর ঠাণ্ডা জল হতে পারে, বড় জোর নেয়াপাতী ডাব।

না, ডাবের দরকার নেই, ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।

ঘটির জল মাধার ঢালল সুরবালা, গলার ঢালল; হাত-পাধার হাওয়া করল ডাইভার।

একটু সুস্থ হয়ে সুরবালা বলল, বাড়ি ফিরে চল।

ধূলা উড়িয়ে, হর্ণ বাজিয়ে গাড়ি নৌড় দিল। একটা হাড়-জিরাজিরে কুহর চাঁৎকার করে গাড়িটাকে তাড়া করল কয়েক কদম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার রাস্তা কাঁকা।

এমন গাড়ি যে দরজা বন্ধ করবার শব্দ পর্বত হল না। গাড়ির মধ্যে ভক্ত। এসেছিল সুরবালার, অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করছে সে; একবার মনে হল কাজটা চুকিয়ে এলেই হত।

গাড়ি চলে গেল আশান্তে; ছোট বাগানটা পার হয়ে সুরবালা দোতলার উঠে এল। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাইরেই থমক গাড়িয়ে পড়ল সে, তুনকীর ঘরের দরজাটা বন্ধ কেন ? ভক্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ঠেলে দেখল, ভিতর থেকে বন্ধ। বুকের মধ্যে বন্ধ করে উঠল তার, দরজার বাঁকা মারল কয়েক বার, লাড়া নেই। জোরে লাথি মারল কয়েকটা, বলল, লীগুগির দরজা খোল, তুনকী।

ভিতর থেকে তুনকী বলল, খুলছি, পাঁড়াও।

কিন্তু একটা যুহুস্তও পাঁড়ার বৈধ নেই সুরবালার, ছুরি ঘায়ে স্থবিশিত বেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দরজা খুলে দিল তুনকী; ঘরে ঢুকে সুরবালা একবার তাকাল তুনকীর দিকে, আর একবার কাহ্ন মল্লিকের দিকে। কাহ্ন মল্লিক পাড়িয়েছিল চেয়ারের পিঠ ঘরে, সাটটা মাটি থেকে তুলে কাঁধের উপর ফেলল সে। হিঙ্গ্র বাধিনীর মত সুরবালা ঝাঁপিয়ে পড়ল তুনকীর গায়ের উপর।

তুনকী এটা আশান্ত করেছিল, খণ করে মা-র হাত দুটো ধরে ফেলল সে, হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল সুরবালা, পারলো না। তুনকী তার মা-র চাইতে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা, আর তেমনি নির্ভীক স্বাস্থ্য। তুনকীর হাত কামড়াবার চেষ্টা করল সুরবালা, তুনকী কহুই দিয়ে জোরে আঘাত করল সুরবালার মুখে, সুরবালা স্বরবর করে কঁদে ফেলল।

হাত ছাড় বলছি।

না ছাড়ব না, আগে কুমি শান্ত হও।

সুরবালা তার পেটে লাথি মারল, তুনকী তার মা-র একটা হাত জোরে মুচড়ে দিল; চাঁৎকার করে কঁদে উঠল সুরবালা, বসে পড়ল-মাটিতে, জাঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কান্ডাতে লাগল, পিঠটা তার বার বার কঁপে উঠছিল।

কাহ্ন মল্লিক প্যাটের বোতাম ক'টা এঁটে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেটটা শেষ করে বাবার সময় সে দেখল ছ'হাতের মধ্যে মুখ শুঁকে সুরবালা তখনও পড়ে আছে মাটিতে, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, তুনকী বসেছে খাটের উপর পা স্কুলিয়ে, দৃষ্টি তার জানালার বাইরে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে জানালার নিচেই চিঠিটা পেল সুরবালা।

“এ-বাড়ির সমস্ত দেওয়াল, জানালা দরজা, সমস্ত জিনিষ, আসবাবপত্র—বিবে অর্জিত, তার ওপর আর এক কৌটার কি এমন এসে-বাবে ? আমার খোঁজ কোরো না। তুনকী।”

এই তো জীবন, মানব-জীবন, ফুল কোটা, ফুল বরা

সমুখে হাত, পিছনে অঙ্গ, শব্দাশ্রয়িনী জরা।

—কল্পনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহুতম ও উৎকৃষ্টতম উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অভূতপূর্ব

সর্বভারতীয় মহোৎসব

—শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী সঙ্গীত সম্মেলন—

নবজীবন আন্দোলনের (শৃঙ্খল) সাহায্যকল্পে

—স্থান—

মনোরম পরিবেশ
পার্ক সার্কাস ময়দান,

কলিকাতা

—তারিখ—

১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ও ১৮ই

আগষ্ট—১৯৫২



সিজন টিকিটের হার :

২০, ২৫, ৩৫, ৫০, ৭৫,

১০০, ২০০ ও

১০০০ টাকা

—যোগদান করছেন—

—কণ্ঠ সঙ্গীতে—

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ (বধে);
ওস্তাদ আমীর খাঁ (বধে); ভাগর ভ্রাতৃত্ব
(দিল্লী); শ্রীভীমসেন যোশী (পুণা);
শ্রীমতী হীরাবাই বরোদেকর (পুণা);
শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক (উড়িষ্যা); শ্রীমতী
লক্ষ্মী শঙ্কর (বধে); শ্রীমতী গিরজা দেবী
(বেনারস); শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী (কলিকাতা)
ও আরও অনেকে।

—যন্ত্র সঙ্গীতে—

সুরসজ্জাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (পদ্মভূষণ);
ওস্তাদ আলি আকবর খান; পণ্ডিত রবিশঙ্কর;
ওস্তাদ বিলায়েৎ খান ও ইমরাৎ খান; আশীষ
কুমার; পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বেনারস);
শ্রীনিখিল ব্যানার্জী; শ্রীপাশালাল ঘোষ (দিল্লী);
ওস্তাদ শুকুর খাঁ (দিল্লী); ওস্তাদ মুনীর খাঁ
(দিল্লী); পণ্ডিত শ্যামতা প্রসাদ (বেনারস);
পণ্ডিত কিরণ মহারাজ (বেনারস); কেরামতুল্লা
খাঁ ও আরও অনেকে।

এ ভিন্ন

বাংলার প্রসিদ্ধ
শিল্পীবৃন্দ

—মৃত্যে—

শ্রীমতী রোশন কুমারী (বধে)

শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী (বধে)

শ্রীমতী নয়না জাভেরী ও সম্প্রদায় (বধে)।

শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি (কলিকাতা)

—আরও অনেকে—

টিকিট প্রাপ্তিস্থান : শৃঙ্খল কার্যালয়, ৬৩, কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২ ফোন :—৩৪-১৩৫১
নবজীবন আন্দোলন (শৃঙ্খল) কার্যালয়—৫২বি, ইণ্ডিয়ান মীরর ষ্ট্রিট (ফোন :—২৪-৩৩১৫)

নবজীবন আন্দোলন কার্যালয়—৪-এ, মহানিবাণ রোড, কলিকাতা—২৯।

বসুশ্রী সিনেমা ফোন :—৪৬-৪৮০৮

বীণা সিনেমা ফোন :—৩৪-১৫২২

মডার্ণ ডেকরেটরস্ ৬৫এ, ডব্লু, সি ব্যানার্জি ষ্ট্রিট, ফোন :—৫৫-২৫৪৯

ভীমচন্দ্র নাগ ৬—৮, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রিট, ফোন :—৩৪-১৪৬৫



শ্রীবৈকরজন ভট্টাচার্য

মেয়েটির নাম গোলাপ। তাকে দেখতেও ঠিক গোলাপের মতন। সবাই শুধু ভাবে এ বস্তীর ভিতর অমন রূপ এলো কোথেকে? চোখ যেন কেরানো যায় না। তবুও তো একদিনও বেচারি একখানা ভালো শাড়ী পেলো না ভালোভাবে সাজবার। ছেঁড়া টুকরো টুকরো শাড়ীর কাঁক দিয়ে উজ্জল যৌবন যেন ঠিকরে পড়ছিল।

কক্ষকেশে শুকনো মুখে ও আজকাল সারাটা দিন বসে থাকে। বৃহত মাত্র যার কোনোদিন অবসর জোটেনি আজ কর্মমুখর সেই মেয়ে এত শাস্ত কেন? লক্ষ লক্ষ নর নারীর কলরব মুখরিত এ বিরাট শহরে এ ঘটনা কান্নার মনে কি বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করেছে? সবই ঠিক চলছে। জ্বরের এ বাসঙলো। কারখানার এক ঘরে ঠকাঠক আগুয়াজ। টান্ডাওয়ালাদের বাড়ী সঙ্গ্রহের মোগান। ফেরিওয়ালাদের মিষ্টি ও বর্কশ বঠ। পথচারীর আনাগোনা। সামনের বেকারীর টুকটাক আগুয়াজ। হারমোনিয়ম মেয়ামন্তের লোকানের টুং-টাং শব্দ। এ বিরাট শহরের দৈনন্দিন প্রোগ্রামের কোনো জায়গায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। তবুও কেন এ কক্ষকেশা আলুলায়িত বসনা গোলাপের সব কাজ কর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে? গোলাপের দিরা বামিনী কাজের মাঝে যে দরিদ্র জীবন প্রতিরূপ সংগ্রাম করে চলেছে তার হঠাৎ কি অপমৃত্যু ঘটলো?

—এই ত সেদিনের কথা। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই মেয়েটি বসে বসে মাটির পুতুল তৈরী করে যায়। ছোট শিশুটি তাকে পাশে বসে সাহায্য করে। নাম তার সুলন। ওরই ছেলে।

সকালে উঠে গোলাপ মাটির পুতুল বানায়। তারপর পাঁহাড় থেকে সঙ্গুরীত কাঠের আগুনে পুতুলগুলোকে ফেলে মাথায় সাজি নিয়ে ঘেরিয়ে পড়ে পুতুল বিক্রীর আশায়। ছোট ছেলেটিকে দরজার বন্ধ করে যায়। দরজা ঠিক নয় বাঁশ, লতাপাতা দিয়ে ঘেরা একটা বেড়া মাত্র। তাই বথেট।

বিকেল বেলায় প্রান্ত গোলাপ মাথার বুড়ি কিরিয়ে এনে মাথার হাত দিয়ে বসে থাকে। তার এ পোড়ামাটির সস্তা পুতুল কেউ কেনে না। শহরের লোকের কচি বদলেছে। ওর আদ্যে দামে তারা বিলিতি পুতুল পায়। তার পুতুলের চোখ কান নাক নাকি বোঝাই যায় না। গোলাপের কি পোষ? পুতুল বানানো কি চারটি কথা? না আছে ভালো মাটি। না আছে তুলি, রঙ। না আছে সাজবার স্তম্বর স্তম্বর কাগজের বাস। তার বাণ—নকুল কুমার কেমন স্তম্বর প্রতিমা গড়ত। ঠিক যেন জীবন্ত মাছ। নকুল আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে

কি তার গোলাপকে অমন অসহায় দিন বাপন করতে হত শহরে এ ছোট বস্তিতে। নকুলই গোলাপকে পুতুল তৈরী শিখিয়েছে। সে শেখা সেদিন ছিল কেবল সখের পুতুল খেলা। এতদিন সেই পুতুল তৈরী করেই গোলাপ তার ছোট সসারটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ সেই ছোট সসারেই যেন একটা কিসের বড় উঠেছে। যেন কোন মহাকালের প্রলয় নৃত্যে বেচারার বস্তীর কুটারখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু কেন? বস্তীর প্রায় সব মেয়ে পুতুলই সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়ে। সকালের দিকে কলতলায় ভাবি ভাড়। সকালে উঠলেও গোলাপ কলতলায় একটু দেবীতেই যায়। অল্প মেয়েদের মতন ঝগড়াটা সে পছন্দ করে না। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। সেটা খুব কম লোকই জানে। লোকজন একটু হান্ডা হলে পরিধানের শাড়ীটুকু রোজ সে পরিহার করে। ডাউডের ভিতর সেটুকু করার অর্থবিধে আছে। তার দ্বিতীয় শাড়ী নেই।

গোলাপ টুকটুক করে অষ্টপ্রহর কাজ করে। সুলন সারাদিন বস্তীটা চরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে গোলাপ উদকঠে তাকে ডাকে, সুলন, লক্ষ্মী বাবা সুলন। ছুটে আর বোদে ঘোরে না। লক্ষ্মী সোনার ছেলে সুলন।

সুলন বলে, খেতে দিবি? বল আজ ভাত খেতে দিবি? তিন দিন শুধু মুড়ি খেয়ে আছি। বল ভাত দিবি?

হুঁপ্রাস জাতের আশায় সুলন বস্তীর এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে। যদি কেউ ডেকে হঠাৎ কিছু দেয় খেতে।

এই হাংলামিটুকু সুলনের ছিল না। মা ছাড়া অল্প কেউ যে খেতে দিতে পারে এ ধারণাটুকুও তার ছিল না। সেদিন যৌবন হয় নবায়নই হবে। শুকনো মুখে ভাঙা লাটিম হাতে স্তম্বর ফুটকুটে ছেলেটিকে ঘুরতে দেখে বস্তীর বাতাসীর মা তাকে ডেকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছে। গোলাপ শুনে খুশীই হয়েছিল। নবায়ন মিন। সবাই সোনালী ধান খাবে ভুলছে গ্রামে। শহরের জীবনে তার ছোঁরা খেলতে দেখে খুশীই হল। তবুও মনটাকে প্রবোধ দিতে পারে না। সুলন তাকে চাইতে যায় না তো আজকাল! শহরের লোক এত দয়ালু নয় যে ডেকে খেতে দেবে। শিশুমন। ও সব বোঝে না। এদিক ওদিক উঁকি ঝঁকি করে। যদি কেউ ডেকে কিছু খেতে দেয়। মনের আশা মনেই থাকে। শিশুকে কেউ ডাকেও না। কেউ খেতেও দেয় না।

সুলন আবার বলে, বল, খেতে দিবি? মা সত্যি বলছি ভাবী খিদে পোয়েছে।

গোলাপ মাটির হাড়ি থেকে দু'হুটো মুড়ি এনে ঝুলনকে ধাওয়াতে বসে। ছেলে কিছুতেই থাকে না। গোলাপ বলে, লক্ষ্মী সোনা আজ শুধু খাও। সামনের মেলাতে কত পুতুল বেচবে। কত নীপ গড়বে। কত টাকা পাবে। সকাল বিকেল ভুঁমি আর আমি পেট ভরে ভাত খাব। শুধু ভাত নয়। কত মিষ্টি। কত মোরা। কত কি—চোখ দুটো আশার ভরে যায়। শিশু ঝুলন আবার করে নতুন জামা দিবি? লাল—নীল পুলিশ দিবি? বাঁশি—বেলুন দিবি—গোলাপ বলে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমার ঝুলনকে দোবো না? ঝুলনের পুলিশ নতুন পাগড়ী পরবে। নীল জামা পরবে। আনুক না মেলাটা একবার।

ঝুলন সত্যি কথাটি বলেছে। ঐ গেকরা রঙের পুলিশ কাকর ভালো লাগে? গোলাপ কি করবে? দু'পরসার গেকরা রঙ কিনলে ভালো ভিজিয়ে তাই দিয়ে মুংপাত্রগুলি যেমন রঙ করা চলে, তেমনই পুতুলও গেকরা-রঙিত করা যায়। শুধু পোড়া মাটি কেউ কখনো কেনে? সত্যি বলেছে ঝুলন—মেলায় পরে কিছু রঙ কিনতে হবে। পুলিশগুলো শুধু গেকরা রঙই নয় এবার তাদের রঙিন পাগড়ী দিয়ে সুন্দর সাজিয়ে বাজারে ছাড়তে হবে।

দু'হুটো মুড়ি খেয়ে ঝুলন পাড়া বেড়তে চায়। গোলাপ কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। বুড়ো মিত্রাটা আজকাল আবার কালো যায় না। কে জানে ওর কি হয়েছে? সেদিন ঝুলনকে ডেকে সে তার বাপ হবার ইঙ্গিত দিয়েছে। হি হি, লক্ষ্যার মাথাটা হেঁচ হয়ে গেল। ঝুলন বলল, বল না মা কেন তুই রাগ করলি? বুড়োটা তো বেশ ভালো লোক। বল মা—

এমনি ভাবেই দিন কাটে।

গোলাপ এবার আগ্রহে প্রতিদিন প্রহর গোণে—কবে আসবে মেলা। কবে তার পুতুলগুলো বিক্রী হবে। মাটির প্রাণীপ আজকাল কেউ বড় একটা আবার না। মোমবাতি চলে বেশী কেউ কেউ আবার ছোট ছোট রঙিন ইলেকট্রিক বালব দিয়ে ঘর সাজায়। শত আধুনিকতার মাঝেও মেলায় উৎসবটুকুই আজ শুধু পুরানোর ছোঁয়া নিয়ে দেখা দেয়। গোলাপ সমস্ত বছর ধরে মেলায় দিন ক'টির স্বপন দেখে। মেলায় সবাই তার জিনিষ কেনে, পুতুল, প্রাণীপ, কাপড়ের খেলনা কিছুই কিরিয়ে আনতে হয় না গোলাপকে।

কবে আসবে সেই মেলা?

গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লাল হলদে বাগরা পরা মেয়ের দল গল্প গাড়ী চেপে গান গাইতে গাইতে আসবে। সাথে তাদের স্বামী, দেবর অথবা স্বত্তর। গড়গড়া হাতে মাথায় পাগড়ী শোকাটা গ্রামের মোড়লও হতে পারে। গোলাপ তাদের ভাষা ঠিক বুঝতে পারে না। তাদের পোশাক পরিচ্ছদে, মুখের ভাব ভঙ্গীতে মনে হয় তারা নিশ্চয়ই সুখী। না হলে কখনো এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে। মনে হয় যেন জলের বড়া থেকে কল কল শব্দে জল গড়িয়ে পড়ছে। গাঁয়ের মেয়েগুলিই গোলাপের পুতুল কেনে বেশী।

কত লোক আসে দু'দেশ থেকে তার পুতুল কিনতে। তার গোলাপের পুতুল কেনে। কেউ কেউ আবার বাড়ি ফেলানো বুড়োটা দেখিয়ে বলে, আরে বহিনি এই পুতলিটাও তুই নিজের হাতে গড়েছিল?

বহিনি—আহা কি মিষ্টি লোকগুলো! গোলাপ বলে, হাঁ।

কত দাম বললি?

হু' আনা?

দে যে চারটে বেঁচে দে।

শহরে হু' পরমা দামেও কেউ একটা পুতুল কেনে না। তারা কেনে সস্তা বিদেশী প্রাণিকের খেলনা।

পুতুলগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রী করে গোলাপ এদিক ওদিক হরিণীয় মতন ছুটে বেড়ায়। ঝুলনকে মেলায় নিয়ে আসতে সাহস হয় না। এদিক ওদিক ছোটে।

বাঃ! কি সুন্দর চকিবাঁজীর মতন ঘুরছে ছেলেমেয়েগুলো। ওগুলোকে নাগরগোলা বলে। মাত্র দু'টো পরমা দামেই দু'মিনিট ঘোরাবে তোমাকে। ঝুলনকে নিয়ে এলে মন্দ হত না। ওকে কোলে নিয়ে বসলে বেশ হত। একবার ঐ উপরে ওঠো। আবার নীচেতে নামো। সে কিন্তু বিনি পরমাতেই বোজ বেশ চকিবাঁজীর মতন ঘুরছে। কিছুই চায় না সে। ঐ কোণের দোকানীর চা। বনমালী মিজের পাঁপর। মাংসের ঘুগুনি। ভসব সে চায় না। তার দরিদ্র জীবনে সে চায় দু'হুটো অন্ন। ছেলেটার হু' বেলা দুটি ভাত। তার জন্য এক বেলা হলেই বখেটে। এই বিরাট শহরের কেউ কি জানে অমন সুন্দরী মেয়ে গোলাপের জীবনে এক দিনে হু' বেলা আহার একটা কত বড় বিলাস? সমস্ত বছরে মাত্র মেলায় দিনকটি গোলাপ হু' বেলা পেট ভরে খায়।

মেলায় সার্কাস পাট আসে। বাঘ আসে, হাতী থাকে, ভালুক নাচে, সিংহ গান গায়। দোকানুলোর কথাও শোনো একবার। বলে কিনা, বাঘ হাতীর পিঠে চড়ে নাচবে। এক আনার পরমা দাও। তারপর ঐ ত্রিংশলের ভিতরে ঢুকে দেখো সত্যি সত্যি বাঘ হাতীর পিঠে চড়ে নাচছে। এও স্বপনও হয়?

নাচের দলও একটা আসে প্রতি বার। ঠিক লক্ষ্যার তাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়। সারাটি দিন সুন্দর সৌকরোলা একটা লোক

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগোঁরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বাবলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ জারত গড়া রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেঁকুর ওঠা, বমিডাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দায়ি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহেই সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাবলা দ্বারা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বদলে মূল্য ফেরৎ ৩২ টোলার প্রতি কোটি ৩ টাকার একডো ৩ কোটি — ৮।। আনা। ডঃ মাঃ ও পাইকগিড়ীর পৃথক।

দি বাবলা ঔষধালয়। হেড অফিস—আবিসাঝা (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ঘেরের গোঁবাঁক পরে ছুটো। আত্মা দিয়ে গোঁপটাকে চেপে, পায়ে ঘুরে বেঁধে হেলে ছলে নাচে। গান গেয়ে গেয়ে লোকটা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গৌঁক থেকে আত্মা সরিয়ে তখন সে একটা বিড়ি ধরায়। দু পাশের লোকগুলো তখন হি হি করে হাসতে থাকে। গোলাপও হাসে। বলনটা বড় হোক। সে চাকরী করে টাকা আত্মক। তখন গোলাপ একদিন ঐ নাগর-দোলাতেও চাপবে। কিন্তু তখন কি তার বয়স থাকবে ?

কত রকমের বেলুন দেখে। একটা বেলুনে আবার বাঁশি লাগানো। হুঁ দিয়ে বড় করে ছেড়ে দাও। আপনা থেকেই বাজতে থাকবে। আবার ঐ দেখে গ্যাস বেলুন। নিজে থেকে উপরে উঠবে। সুতো নিয়ে তুমি বুঁড়ির মতন ঝাঁড়িয়ে থাকো। ভারী দাম। হুঁ আনা দিয়ে কেনা যায় ? হুঁ পরসার একটা লাল বেলুন কিনে গোলাপ ঘরে ফেরে। বৃহত্তম বালনকে তুলে গোলাপ তার হাতে বেলুনটি দিল।

সে আজ তিন বছরের কথা।

বালনের জন্মই বোধ হয় মেলাটা একটু তাড়াতাড়ি বসছে এবার। এগারো দিনের মেলা। গোলাপের মরবার স্মরণটুকু নেই এবার আর প্রাণী বানাবে না। শহরে মাটিটুকু পর্যন্ত পরসার খরচা করে কিনতে হয়। পুতুলগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে বালনের হাত ধরে গোলাপ বেরলো। শাজীখানা বালনের মনিরেছে। সজা নকল সিঁদুই হয়ত হবে। বাতালীর মার কাছ থেকে বঁচা তিনেকের জন্ম শাজীখানা সে ধার নিয়েছে। শত ছিন্ন মলিন শাজী পরে কি মেলায় বাওয়া যায় ?

বালনের ভারী আনন্দ। আজ নিশ্চয়ই সে পেট ভরে খেতে পাবে। গোলাপ তাকে একটা বাঁশীও কিনে দিচ্ছে। আজকাল সে ভারী আনন্দ করতে শিখেছে।

কিন্তু কোথেকে কি বেন হয়ে গেল। অল্প বছরের মেলায় এবার ভীড়টা একটু বেশী হয়েছে। নিমেষের ভিত্তি গোলাপের পুতুলগুলো বিক্রী হয়ে গেছে। এদিক ওদিক ঘুর করে চলতে চলতে বালন কখন হাঁত ছাড়া হয়ে গেল। এদিক ওদিক ঘুরেও গোলাপ তার কোনো স্থান পেলো না।

সন্ধ্যা সমাগমে রাস্তার মোড়ে ভীড় দেখে গোলাপ একটু হুঁ দিয়েই চলছিল। বস্তীর হরলাল হঠাৎ তাকে দেখে হিড় হিড় করে টানতে টানতে টানতে নিয়ে বলল, দেখ দেখ, শহরের লোকগুলোর কাণ্ড দেখ। হুঁ বোলা পেট ভরে খেতে দেবে না। রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলব তাও দেবে না। দেখ এসে কাণ্ডা দেখ। লোকটাকে কেউ ধরতে পারল না। হাস করে গাভী চালিয়ে চলে গেল।

গোলাপ গিয়ে দেখলো একটি দৃত শিশুকে কেন্দ্র করে রাস্তার জনতা ভীড় করে ঝাঁড়িয়ে। ছেলেটির হাতে একটি বেলুন-বাঁশি। গোলাপের এক বিনু চোখের জল পড়ল না।

গোলাপের স্তম্ভভাৱ কেউ তাকে বলল, ডাইনি, কেউ বলল, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ রূপোপজীবিনী।

সে শুধু কক্ষ কেশে শুকনো মুখে দিবা বামিনী বসে থাকে। বস্তীর বুড়ো মিজীটা হুঁ একবার এদিক ওদিক ঘুরে ঘিরে গেছে।

দিন এলো। দিন গেল। বছর ঘুরে আবার মেলা এলো। গায়ের বধূরা গল্পের গাড়ীতে চেপে গান গেয়ে গেয়ে মেলায় এলো। - সার্কাসপাটি এলো। নাচের দল এলো। বেলুনওয়ালা এলো। নাগরদোলা এলো। কোণের দোকানের চা-ওয়ালা এলো। বনমালী মিশ্র পাঁপের নিয়ে এলো। মেলায় এবার কেউ শুধু দেখতে পেলো না কোনো অঙ্গটু হাতের শোড়া মাটির গেরুয়া রঙের পুতুল।

দামোদর

অধীর সরকার

লজ্জায় ঢেকেছে বুক ; কখনো বা আলোকের থেকে

নিজেকে আড়াল করে সজোপনে রেখেছে লুকিয়ে;

কুণ্ঠিত সলজ্জ পায়ে কখনো বা ভীক চিহ্ন রেখে

এঁকে-বঁকে গেছে চলে কে জানে সে কোন পথ দিয়ে।

কখনো সুবতী সে যে ঘোঁবনের রুদ্ধ বেদনার

আপনাকে দীর্ণ করে, মুক্ত করে, ব্যাপ্ত করে দিক ;

কী কঠিন বস্ত্রধার অবশেষে দিগ্বিদিক বায়—

কী যে ব্যথা সুবতীর !—অসহায় আমরা প্রেমিক।

অবশেষে বধু হল, অস্ত্রের তুর্দগ প্রকাশ

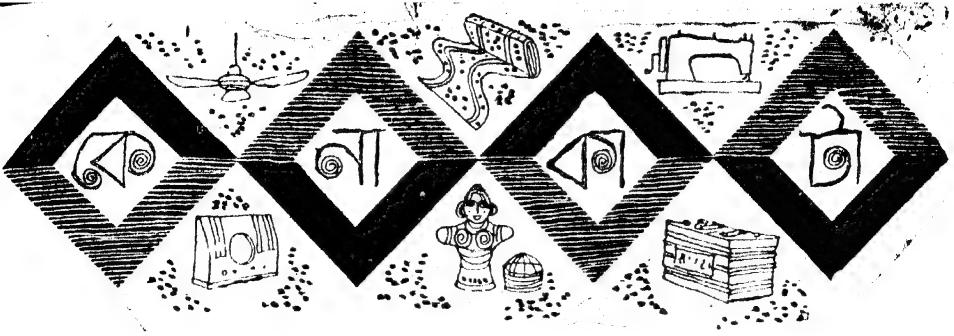
বেন কোন নীড়ে-বাঁধা আনন্ডিত আসক্তের মাঝে

প্রসন্ন কোঁচল হাতে ভরে দিল বুঁধি বারো ঘাস

সুন্দর মুক্তায় স্বপ্নে সসারের নানাবিধ কাজে।

কোলাহল ছিল বাহা, এতদিনে আজ হল বাঁশী

সুবতী সে বধু হল নবনীতা সুন্দরী কল্যাণী।



সিমেন্টশিল্প ও ভারত

আধুনিক যুগে সিমেন্টশিল্পের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইম্প্যাক্টের ভায় এর রয়েছে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। বলতে গেলে, যে কোন নির্মাণ কার্যেই (পূর্তকার্য ও গৃহ নির্মাণাদি) আজিকার দিনে সিমেন্ট না হলে নয়, দীর্ঘস্থায়ী মজবুত গাঁথুনির জন্যই এইটি অত্যাৱশ্যক।

ভারতে পরিকল্পিত ভাবে সিমেন্ট উৎপাদন শুরু হয়েছে, খুব বেশী দিন নয়। এখানকার সর্বপ্রথম সিমেন্ট তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয় মাদ্রাজে আর সেটি মাত্র চলিত শতাব্দীর প্রথম পাশে। উৎপাদন-ব্যয় বেশি পড়তে থাকায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায় অল্পকালের ভেতরেই। হারপার আবার এক একটি করে কারখানা (সিমেন্ট) গড়ে উঠতে থাকে দেশের এখানে সেখানে। ১৯২৫ সালের মধ্যেই ভারতে সিমেন্ট উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা ঠাঁড়িয়ে যায় ১২টি এবং উহাদের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা হয় ছয় লক্ষ টনের মতো।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সিমেন্টের চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে দেখতে দেখতে। চাহিদা মেটাবার জন্য কারখানার সংখ্যাও কিছু বাড়তে থাকল ক্রমেই। ১৯৪০ সালের ভেতর দেশে প্রায় ২০টি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা ভাল রকম ঠাঁড়িয়ে যায়। বিদেশী শাসনবৃত্ত হবার (১৯৪৭) পর ভারতে কয়েকটি নতুন সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে ১৯৫৭-৫৮ সাল মধ্যে সমগ্র দেশে প্রায় ৩০টির অধিক কারখানার পুরানমে কাজ চলে। উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে ঠাঁড়ায় ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার টন।

এখন অবধি বহুগুলো সিমেন্ট কারখানা এদেশে স্থাপিত হয়েছে, তাদের প্রায় সব কটিই বেসরকারী শিল্পসংস্থা। সরকারী উদ্যোগেও দুইটি বৃহৎ কারখানা চালু হয়েছে এর ভেতর—একটি উত্তর প্রদেশ সরকারের পরিচালনাধীন ও অপরটি মহীশূর রাজ্য সরকারের। বহির্ভারত থেকে সিমেন্ট আমদানীর বাতে প্রয়োজন না হয়, সেদিকে জাতীয় সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। তাঁরা তাই প্রতিটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সিমেন্ট কারখানার সংখ্যা বাড়ানো ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পাঁচ-সাল পরিকল্পনা কালে দেশে অন্ততঃ ৪৪টি সিমেন্ট কারখানার ব্যবস্থা ও এক কোটি ৩০ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদনের সময় তাঁদের রয়েছে।

সিমেন্টশিল্পে ভারত স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পেরেছে সকল দিক থেকে—এমনটি জোর করে বলা যায় না। যুটিন, আমেরিকা, জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে এখনও সিমেন্ট কারখানার উপযোগী বহু যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয়। অবশ্য দেশের অভ্যন্তরেও এই শিল্পের পক্ষে অত্যাৱশ্যক যন্ত্রপাতি ও কল-কজা তৈরী আরম্ভ হয়েছে আর সেটি জাতীয় সরকারের ব্যবস্থাবাহিনেই। এইরূপ আশা করা হচ্ছে, ১৯৬২ সালের ভেতর দেশের সিমেন্ট কারখানাগুলোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বেশীর ভাগই নিশ্চিত হবে দেশের ভেতরেই।

সিমেন্ট উৎপাদনে কয়লা ও কর্মম ছাড়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয় চূণাপাথর ও জিপসাম। এখন অবধি ভারতে বহুগুলো সিমেন্ট কারখানা চালু রয়েছে, সেগুলোর জিপসাম ও চূণাপাথরের চাহিদা দেশের অভ্যন্তর থেকেই মেটানো চলেছে। কিন্তু এই শিল্প আরও সম্প্রসারিত হলে, সিমেন্ট উৎপাদন অধিকতর বর্ধিত করতে চাইলে, উক্ত দুটি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। সেজন্য আগে থেকেই এ অপরিসীম প্রয়োজন কিভাবে মেটানো যায়, ভেবে রাখা দরকার। দেশের ভেতর অল্পসংখ্যক চালিয়ে জিপসাম ও চূণাপাথরের সরবরাহ যদি বাড়ানো না গেল, সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে, আগে থেকেই ঠিক রাখা চাই।

কিছুকাল থেকে দেশে সিমেন্টের চাহিদা অভিমাত্র বেড়ে চলেছে দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির এক অভিনব পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন নতুন কারখানা গড়ে তোলা অপেক্ষা এক্ষেপে সরকার যে কারখানাগুলো চালু রয়েছে, সেগুলোর কাজ সম্প্রসারিত করতে চাইছেন। নির্ধারিত ব্যবস্থামতো উৎপাদন সক্তি যদি সম্ভবপর হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে সিমেন্ট উৎপাদনের মোট পরিমাণ ঠাঁড়াবে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টন। এই পরিমিত সিমেন্ট সরবরাহ মারকৎ দেশের দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালীন চাহিদা মেটানো বাবে—অন্ততঃ কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী আশ্বিনীলাল শাহ, দাবী রেখেছেন এমনটি।

ইম্পাত সরবরাহ প্রয়োজন যত না হওয়ায় সিমেন্ট উৎপাদন হয়েছে ভারতেই, সম্প্রতি এরূপ একটি অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য এই ধরনের পরিস্থিতি সাময়িক মাত্র, ইম্পাত সরবরাহের মাত্রা বেড়ে সেলেই এদেশে এখন সে অবস্থা থাকতে পারে না। আর একান্ত যদি উন্নত হয়, সেক্ষেত্রে বিদেশী বাজার খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না ভারতীয় সিমেন্টের, এ ঠিক। এর ভিতর ভারতে উৎপাদিত সিমেন্টের একটি অংশ (প্রায় ১০ লক্ষ টন) অবশ্য রপ্তানীর ব্যবস্থাপ

হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহিত সান্টিষ্ট সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি সিমেন্ট রপ্তানী বৃদ্ধির ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অত্যাবশ্যক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য, সহজেই অর্জন করা চলে। সিমেন্ট উৎপাদকগণ রপ্তানী ব্যাপারে বাতে অসুবিধার না পড়েন এবং দেশে বাতে সিমেন্ট উৎপাদন অব্যাহত পদ্ধতিতে বেড়ে চলতে পারে, সান্টিষ্ট সরকারী দপ্তরের সৈনিক দৃষ্টি ও মনোযোগ না থাকলে নয়।

চাকরি প্রসঙ্গ—কয়েকটি কথা

বসে থাওয়া কিছুতেই চলবে না, কাজ করে খেতে হবে—এই নিয়ে যিমতের অবকাশ নেই। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সাধারণ অবস্থায় চাকরি বা উপজীবিকা চাই-ই একটা না একটা। কিন্তু প্রশ্ন থাকছে এর পরও—কে কি ধরণের কাজ করবে, কোন কাজ বা চাকরিটি সত্যি কার উপযোগী হবে? এর সম্ভব ও মীমাংসা আগে ভাগে মিলে গেলে কোন কথা নেই। যেখানে সে-টি না হ'ল, কাজ সেখানে স্রষ্টা ভাবে সম্পাদিত হবার আশা কম। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—এরূপ ক্ষেত্রে অসন্তোষের আবহাওয়া একটা থেকে গেছে কোথাও।

সোজা কথা যেটি ঠাড়াচ্ছে এই থেকে—মনঃপূত কাজ বা চাকরিটি খুঁজে পাওয়া চাই গোড়াতেই। এমন কার্যক্রম যেন না গ্রহণ করা হয়, যাতে করে পরে আকস্মিকের কারণ হবে। উপযুক্ত লোকের জন্য উপযুক্ত কাজের যদি ব্যবস্থা হল অর্থাৎ যিনি যে কাজের যোগ্য, বাস্তবক্ষেত্রে তিনি যদি পেয়ে গেলেন সেই কাজটি, সব দিক থেকে শুভ। সেক্ষেত্রে সহসা চাকরি রদবদলের প্রশ্ন ওঠে না, কর্তৃপক্ষ-কর্মচারী তথা মালিক-শ্রমিক অসন্তোষের অবকাশও খুব কম থাকে।

অনেক স্থলেই দেখা যায়, অন্ততঃ এই দেশে, কর্মজীবনে ঠিক লোকটি এসে ঠিক বারগায় পড়লো না। বার যেখানে থেকে কাজ করবার কথা নয়, কার্য-কারণে তাই হয়ত করতে হচ্ছে বহু চাকরি-জীবীকে। যিনি শিক্ষকতা করলে সত্যি ভাল হয়, তাঁর চললো বরাবর কেরানীর জীবন, এমন অনেক দেখা যায়। আবার, এমনও পরিদৃষ্ট হয়—বাবসাবুজিসম্পন্ন কোন লোকের বাবসায়ের সুরোগ হয়তো মিললোই না, তাকে গ্রহণ করতে হলো জীবিকার সুরহিসাবে শিক্ষকতা কিংবা অপর কোন বেমানান (তার পক্ষে) বৃত্তি।

সাধারণতঃ চাকরি রদবদলের প্রশ্ন ওঠে, কোথায় এবং কেন? যেখানে থেকে থেকে দেখা যায় যে, পদোন্নতি বা আর্থিক অগ্রগতির কোন সম্ভাবনাই নেই, সেক্ষেত্রে চাকরির ওপর বিতৃষ্ণা আসতে পারে। অপর পক্ষে, কাজের দায় ও মাসমাহিনার

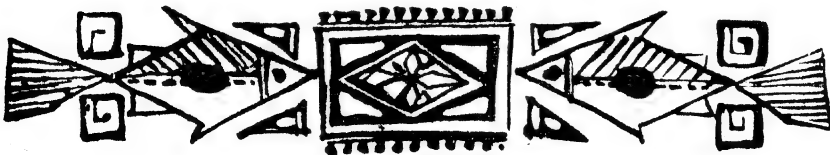
দিক থেকে পছন্দসই চাকরি যেখানে হল না, সেখানেও চাকরি রদ-বদলের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আরও একটি কথা—মনোমত চাকরি পেলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতিলাভ ও দক্ষতা প্রদানের জন্য চাকরিজীবী অবঙ্গ সচেষ্ট হবেন। অপরদিকে এও ঠিক যে, অসন্তুষ্ট বা অনিচ্ছুক মন নিয়ে কারো পক্ষেই কর্ম-জীবনে খুব বেশিখুব এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চাকরি রদবদল করেও যদি নিশ্চিত অবস্থান্তর ঘটানো যায়, অন্ততঃ যার বলে বিশ্বাস থাকে, তবে সৈনিক পা বাড়ানো সমীচীন বলতে হবে। কিন্তু এইখানে শ্রমণ রাখবার—যা কিছু করতে হবে, বয়স থাকতে থাকতেই, যৌবন ও উত্তম বিনষ্ট হবার আগেই। বয়স যদি পেছিয়ে গেলো, উৎসাহ-উত্তমের যদি পড়লো ভাঁটা, তবে নতুন জীবন গড়া তথা প্রতিষ্ঠা অর্জনের স্বপ্ন বুঝা।

সেই সঙ্গে এ-ও অবঙ্গ বলতে হবে—বেকারী যেখানে ব্যাপক, কর্ম সংস্থান যেখানে কর্মপ্রার্থীর তুলনায় স্বল্প বা সীমিত, সেক্ষেত্রে চর্চা করে চাকরি পেয়ে চাকরি ছাড়তে যাওয়া কঠিন। বিশদ বা অনিশ্চয়তার বুকি সেখানে অনেকটা থেকে যায়; এ অতি সহজেই অসুমেয় সে জগতই একটা কোন কাজ বা চাকরিতে চুক্তি হবার মুহূর্তেই যখন ভাবতে হবে ভালরকম, তেমনি সেই কাজটি (বই অপরূপ বা বেমানান হোক) ছাড়বার প্রশ্নও পূর্বাভাস বেশ নিবিড় ভাবে না ভাবলে নয়।

চাকরিজীবীদের মানসিক গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানের পেশা বিশেষজ্ঞরা গবেষণা ও আলোচনা চালিয়ে এসেছেন প্রচুর। তাঁরা দেখেছেন যে, মাঝামাঝি বয়সে পা দেওয়ার সময়ই চাকরি রদবদলের প্রশ্নটি সাধারণক্ষেত্রে মনকে ভালোদৃষ্টি করে বেশি। চঞ্জিশের কোঠায় বীরা পৌছলেন, একটি জিনিস লক্ষ্য পড়ে তাদের অনেকেই বেলার—যে পেশা বা উপজীবিকার তাঁরা নিয়ে আছেন, তার জন্য তাদের বতটা অস্বস্তি নয়, তার চেয়ে ঐ পেশা থেকে সারা মাস ষাটার পর বা তার পাচ্ছেন, তাই নিয়ে। এর কতগুলো সঙ্গত কারণ যেনা আছে, তা নয়। কেন না, সেই সময় মধ্যে পরিবার সম্প্রসারিত হয়, সংসারের আর্থিক দায়ও আগের চেয়ে ভাব্যতঃই বেড়ে যায়।

কর্মজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা হবার জন্য বা কিছু করতে হবে, প্রথম ভাগেই হওয়া চাই—এইটি একটি মূল সূত্র ধরে নেওয়া চলে। প্রকৃত প্রশ্নের, প্রথম বয়সে বতটা উত্তম থাকবে, দম থাকবে এগিয়ে বাবার, বয়স বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে তা হ্রাস পাবে, এ খুব স্বাভাবিক। সর্বোপরি, জীবনান্তে বতটা বুকি লওয়া যায়, পারিবারিক দায়িত্ব বর্ধিত হলে পর সাধারণ অবস্থায় ততখানি বুকি লওয়া সম্ভব নয়। চাকরির ক্ষেত্রে অন্তান্ত বিষয়ের সহিত একথাগুলো শ্রমণ রেখে কাজ করা যেতে পারে এবং এতে অনেক ক্ষেত্রেই সুফলও যে না মিলবে, এমন নিশ্চয়ই নয়।



বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ব্যবসার দৌড় দেখে একজন আপনারা বুধ টিপে হেসেছেন, কিন্তু এইবার আপনারা গভীর না হয়ে পারবেন। ডেকরেসনের ব্যবসাসী একটা পূর্ণাবয়ব বৃদ্ধ ব্যবসাই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে বিবরণের আগে স্বদেশী হাঙ্গামার বিকাশের বিভিন্ন দিকের বিবরণ কিছু দেওয়া দরকার।

বুটশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধে বোং দিয়ে প্রাণপাত করলে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হবে, এবং সে দাবীর সম্মান রেখে বুটশ সরকার যে ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই স্বায়ত্তশাসন পূরন্নার দেবে, একথা প্রচার করে যে নিষ্ঠাবান বিজুটিং এজেন্ট গান্ধী, তিলক, অ্যানী বেসান্ট প্রভৃতি কংগ্রেসী গরম দলের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন, বোল্ট আইন বিবিধ হওয়ার সেই গান্ধী বিগড়ে গিয়ে বললেন, এই সরকার আমার সকল বিশ্বাসের গোড়া কেটে দিয়েছে। কিন্তু বুটেন বা বুটশ সাম্রাজ্যের ওপর বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়নি। তাই সশস্ত্র বিপ্লবের আশঙ্কাকে তিনি অহিংস অসহযোগের পথে পরিচালিত করলেন।

মডারেট কংগ্রেস নেতা প্রভাস মিত্র ছিলেন বোল্ট কমিটির অগ্রতম সদস্য। ১৮ সালের শেষেই কংগ্রেসের এই মডারেট নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে পৃথক নতুন লিবার্যাল ফেডারেশন গঠন করেছিলেন।

২০ সালের আগষ্ট মাসে মটেম্-চম্সফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়, এবং সেপ্টেম্বরে কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয়। সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আশামান থেকে মণিকতলা বোমার আসামীরা—বারীন ঘোষ প্রভৃতি মুক্ত হন। ২১ সালে বারীন ঘোষ 'বিপ্লবী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হলে প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস অবতীর্ণ হয়ে বলে নেতারা স্থির করেছিলেন, এবং বাংলা দেশে নির্বাচন-প্রার্থীদের নাম পূর্বে ঠিক হয়ে গিয়েছিল,—বিশ্ব অসহযোগ প্রস্তাব অহমারে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত করা হয়, এবং লিবার্যাল ফেডারেশন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত দলের নির্বাচনের পথ নিষিদ্ধ হয়।

শাসন সংস্কার পরীক্ষা করে দেখা গেল,—কয়েকজন মিনিষ্টার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে জাতি গঠন সম্পর্কিত বিভাগগুলোর

জন্মে—যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি শিল্প প্রভৃতি। রাজস্ব, অর্থ, পুলিশ, প্রভৃতি প্রধান বিভাগগুলো সরকার নিজের হাতেই রেখেছে,—আগেকার মত এলেক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের যেতালকের সমস্তদের হাতে।

প্রথম বিভাগগুলোর নাম ট্রান্সকার্ড সাবজেক্ট, আর দ্বিতীয় বিভাগগুলোর রিজার্ভ সাবজেক্ট—তাই এই শাসন ব্যবস্থাকে বৈতশাসন বা ডায়ার্কি বলা হত। নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য কিছু বাড়ানো হয়েছিল।

ব্যবস্থা হয়েছিল, জাতি গঠনের বিভাগগুলোর ব্যয় বরাদ্দ করার দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর থাকবে না,—তাঁদের সংরক্ষিত বিভাগগুলোর ব্যয় নির্বাহ করে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে হস্তান্তরিত বিভাগগুলোকে কিছু কিছু বেঁটে দেওয়া হবে,—অন্তর্ভুক্ত হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রীদের নিজ নিজ বিভাগের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে—দরকার হলে তাঁরা সেজন্মে নতুন ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন।

প্রথম মন্ত্রী হয়েছিলেন সুরেন বাঁড়ুজো, প্রভাস মিত্র এক নবাব আলি চৌধুরী (বগুড়ার নবাব)। সুরেন বাঁড়ুজোর হাতে ছিল স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ। অর্থাভাবে তিনি দাঁতব্য চিকিৎসালয়গুলো থেকে কিছু টাকা তোলায় ব্যবস্থা করেছিলেন—প্রথম দিন নাম লেখানোর সময় রোগীদের কাছ থেকে চারটে করে পরস্য নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল—কলে 'দিশী' মন্ত্রীদের ওপর সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা হয়েছিল।

কিন্তু সেই প্রথম চাক্স পেরেই সুরেন বাঁড়ুজো কলকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন বিবিধ করেন—কলকাতা কর্পোরেশনের উপর মেয়রের শাসনের ব্যবস্থা করেন, যে ব্যাপারটাকে কংগ্রেস সম্মত সারা দেশ তাঁর জীবনের একটা বিরাট সাফল্য বলে অভিনন্দিত করে।

বাই হোক, ভার্যাক্রিয় সঙ্গে ভারতবাসীদের আর কয়েকটা বড় চাকরী-পুল দেওয়ারও ব্যবস্থা বুটশ সরকার করেছিল। কেন্দ্রে আর একজন ভারতীয় এলেক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার—বিলাতে ভারতসভার একজন ভারতীয় সভ্য,—বিলাতে একজন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রভৃতি। কলকাতা শাসন সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা প্রচারে কংগ্রেসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এদিকে যে ছয়জন বিপ্লবী নেতা এতকাল কোরা ছিলেন

(গোয়ার নিহত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বাদে) তাঁরা কিরে না এলে সরকারও নিশ্চিত হতে পারেন না,—আর বিপ্লবীদেরও বর্তমান অবস্থার পরিসংখ্যান হয় না। সুতরাং বারীনা' প্রভৃতি সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। একদিকে বিজলীতে বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগলো,—“ভাই অমর, বা ভাই অতুল, তোমারা যেখানেই থাক, আমাদের সঙ্গে পত্রালাপ কর”—আর একদিকে চন্দননগরের মতি রায়ের সঙ্গে অতুলনা'র গোপনে কথাবার্তা চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, চন্দননগরে ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার হবে, এবং কথাবার্তার পর বিপ্লবী নেতাদের নির্দিষ্ট কিরে যেতে দেওয়া হবে।

তদন্তদ্বারা বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এবং গোয়েন্দাটীকের সঙ্গে অতুলনা'র সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হয়ে স্থির হল, ফেরারীদের বিরুদ্ধে সকল চার্জ তুলে নেওয়া হবে,—অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের কথা তোলা চলবে না,—এবং আবার কখনো তাঁদের শ্রেণ্ডার করতে হলে, আগে তাঁদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য বলার সুযোগ দিতে হবে।

এই বন্দোবস্তের পর কিরে এলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাহুগোপাল বুদ্ধোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, সত্যীশ চক্রবর্তী (খুলনা) পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নলিনী কবী। বাহুদা মেডিক্যাল পড়তে পড়তে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, ফেরারী অবস্থার প্ররোজন হলে ডাক্তারীও কিছু কিছু করতেন,—এখন হঠাৎ ডাক্তারী (এম, বি) পরীক্ষা দিয়ে ক্যাঁ হরে স্বর্ণপদক পেলেন।

জীবনের সঙ্গে উত্তরপাড়ার গিরে অমরনাথকে প্রথম দেখলুম। উজ্জল গৌরবর্ণ, দীর্ঘাবয়ব, অগ্নি বাহ্যস্থান এক বিরাট পুরুষ, কেলে মনে হত—জহন্নম পাণ্ডুরানাং যেবাং পক্ষে জনার্দন—এমন বাহুব্য বাদের সহায়, তাদের জয় অনিবার্য।

দাঁড়ানো কোন্ কর্পশ্চতি অবলম্বন করবেন, তাঁর আলোচনা হল। দেশজোড়া প্রকাণ্ড গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছে,—সমগ্র বিপ্লবের আন্দোলন বা কর্পশ্চতির ক্ষেত্রেও নেই,—অহিংসার আদর্শ সামনে না রেখে “এই পরতানী শাসন ব্যবস্থাকে হয় নাশোদন, না হয় ধ্বংস” করার প্রকাণ্ড আন্দোলন চলতেও পারেনা,—এবং এতবড় আন্দোলন থেকে ছুঁয়ে সরে থাকাও ভবিষ্যৎ বিপ্লব আন্দোলনের পক্ষে সমীচীন হবে না।—সুতরাং তীরাটিক করলেন,—কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। কিন্তু গান্ধীর অহিংস সঙ্গ্রামের এক বছরে স্বরাজের আইডিয়াটা সখকে আর একটু ভাল করে জানা দরকার।

সুতরাং বাহুদা' অমর বৃদ্ধকে গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করলেন,—এবং সাক্ষাৎ করে আলোচনা করে এলেন। গান্ধী বললেন, একটা বছর তোমারা আমার কর্পশ্চতি নিয়ে আমাকে একটা চাপ দাও। সুতরাং দাঁড়ানো কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

আমি তার আগে থেকেই, ১৯২১ সালের গোড়া থেকেই, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলাম। হিসাব-অহিংসার কথা একটা বছর পরে ভেবে দেখা বাবে। সমগ্র বিপ্লবের আদর্শ ও আত্মজ্ঞা বৃদ্ধ পূর্বে রেখেও তো হয়ত এখনো বহু বৎসর অহিংসই থাকতে হবে। ইতিমধ্যে একটা বছর সারাদেশে প্রকাজিতভাবে সরকার-বিরোধী মনোভাব পড়ে তোলার

সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলে কি ভবিষ্যতের সমগ্র বিপ্লবে প্রভুত্বের ক্ষেত্রেই প্রশস্ত হবে না?

যুদ্ধের কটা বছর বিলাতী কাপড় আমদানীর অবস্থা হওয়ায় দেশে বস্ত্রাভাব হয়েছিল, দর চার গুণ বেড়েছিল। কিছু জাপানী কাপড় এবং কিছু দেশী মিলের কাপড়ের ব্যবসার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু দর বৃদ্ধির জন্ত গরীব লোক কাপড় কিনতে পারতো না—বস্ত্রাভাবে গরীব ঘরের মেয়েরা ঘরের বার হতে পারতো না—বস্ত্রাভাবে গরীব বাড়ি দিয়ে মরার খবরও কাগজে প্রকাশ হচ্ছিল। একটা অর্থনৈতিক জাতীয়তার ভাবও বীরে বীরে গড়ে উঠছিল। বিলিতি কাপড় আবার আমদানী শুরু হয়েছিল।

এই সময়ে বিলিতি কাপড় বরকট করা, এবং বন্দর উৎপাদন করে বঙ্গমতীর আংশিক সমাধানের পরিকল্পনা অস্তিত্ব সমরোপযোগী হয়েছিল। বারা নতুন উৎপন্ন মোটা বন্দর পরতে পারবে না,—তাঁরা বাস্তব অস্ত্র মিলের মোটা কাপড়ই পরে, তার জন্তে একদল লোকের বন্দর পরা প্ররোজন। সেটা হবে দেশ-প্রেমিকের কর্তব্য। এই একটা কাজের খাতিরেই তো আন্দোলন সামিল হওয়া চলে। চিন্তা এই লাইনে চললো।

এদিকে ডেকরেশনের ব্যবসার জন্তে নিলাম থেকে বড় বড় সতরফি, কার্পেট বড় বড় কয়েক স্রোড়া করে ফুলদান শাখাগান, পরমা প্রভৃতি কেনা চল,—কয়েকটা হাঁড়িবাতি (Punch light) এবং কিছু আসিটিলিন গ্যাসের আলো কেনা হল। বিয়ের প্রেসলনের আলো তৈরীর জন্তে একজন মিস্ত্রীও রাখা হল এবং মোটা দামে একগাডী পাইপ কেনা হল। দোকানে থাকে ভাগনী-জামাই এবং একজন ছোকরা। আমি out door কাজ করার অভ্যুত্থানে বাইরে বাইরেই থাকি এবং নানা আড্ডায় ঘুরে সমস্ত কাগজ ও মাগাজিনগুলো পড়ি এবং বিকালে কলেক্ট ঘোষার মিটিং দেখি। সেখানে পদমরাজ জৈন, জে, এল, ব্যানার্জি, হরিদাস হালদার, ললিত ঘোষাল, মৌলবী আহমদ আলী প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন। আহমদ আলী তাঁর মতো “নব্য ইটালী”র ম্যাটিনিয়ার বক্তৃতা শ্রবণ করে অসহযোগ ব্যাখ্যার নামে চালাতে শুরু করেছিলেন—পরে সেটা কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়েছিল।

হরিদাস হালদার বলতেন, যে সরকারী যন্ত্রটা আমরা হাতের জোরে চলে, হাত সরিয়ে নিয়ে সেটাকে অচল করে দিতে হবে। কাজটা অতি সহজ,—একটা negotiation, inaction মাত্র। যন্ত্রটা চালাবার লোকের অভাব যে এদেশে হবে না—৩২ কোটি লোকই যে অসহযোগ করবে না,—অচল হওয়াটাই যে শেষ নয়, সেটাকে দখল ও সলো করাই শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত,—এ সব কথা মনে হত না কারো,—সব হওয়াটা ‘যেন তখন দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। বক্তৃতা শুনে সকলেরই ভালো লাগতো।

সত্যার শেষে স্বতঃস্ফূর্তিত এক প্রেসেশন বৈত ওয়েলিংটন ঘোষারের পূর্বদিকে Forbes mansion এ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিসে—নতুন অফিস। জালালউদ্দীন হাসেমী থাকতো প্রেসেশনের সামনে। এক পা কাটা—crutch এ ভর দিয়ে চলে—বেশ একটা show হত। দ্রোপান ছিল,—বন্দে মাতরম্, ভারতমাতা কি জয়, হিন্দু মুসলমান কি জয়।

টোলা-বরানগর ছিল ২৪ পরগণার অন্তর্গত। ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ইংরাজী সাপ্তাহিক মুসলমান পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা বোলবী মজিবর রহমান। কড়েরাতে তাঁর বাড়ীতে ছিল অফিস।

আমরা কংগ্রেস অফিস থেকে নতুন-ছাপানো রসিদ বই এনে দেবার করতে সক্ষম করলুম। টোলার কংগ্রেস কমিটি সংগঠন করলেন পাটু বাবু, তাঁদের বাড়ীতেই অফিস (পর্যাপ্ত যুগ্মজোর বাড়ী)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দাদা হুশীল বাবু (ভাটুদা)—হাটবেড়ের (নড়াল) জমিদার জিতেন বাবের ছোট ছেলে, পাটু বাবুর বন্ধু হুটু,—আর ছিলেন জাপান প্রত্যাগত ‘জাপান’ লেখক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেশনা)—তাঁর মামার বাড়ী ছিল টোলায়। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কিছু মেঘাব করলুম টোলাতে।

কিন্তু বরানগরেও তো একটা কংগ্রেস কমিটি করা দরকার! আমি প্রথমে গেলুম বিশিনদার চৌধুরী, ভূতপূর্ব আটকবন্দী বিত্ত সেনের বাড়ীতে। তিনি বরসে আমাদের চেয়ে বড়,—তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে পড়লুম। তাঁরা বিশেষ আমল দিলেন না। কিন্তু সেখানকার আচ্ছাদ থেকে একটা হিন্দু সংগ্রহ করলুম। বড়বাজারের লোহাবাসায়ী প্রৌঢ়-ভ্রমলোক হরিশঙ্কর দে, এবং তাঁর ভ্রাতৃপুত্র কৃষ্ণন দেক গাঁথতে পারলে অনেক লোক আসবে,—কংগ্রেস কমিটি করা যাবে।

কৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করে অনেক প্রস্তাবের জবাব দিয়ে তাঁকে বোঝালুম, রাজী করালুম,—এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হরিশঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেখা করে বললুম, আপনি সভাপতি না হলে তো এখানে কংগ্রেস কমিটিই হয় না,—বরানগরের বরনাম হয়ে যার।

ভ্রমলোক, হাকে বলে hard not to crack, কিন্তু কয়েকদিন গভীরচিন্তার পর রাজী হলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট এবং কৃষ্ণন বাবু সেক্রেটারী—হল বরানগর কংগ্রেস কমিটি।

আলমবাজারে বিশিনদার আর একটো, ভূতপূর্ব আটকবন্দী ছিলেন তুলসী ঘোষ—তাঁর কাছে গেলুম আলমবাজারে কংগ্রেস কমিটি করার জন্তে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর দোস্তর (ছুনিয়ার) লেকটরজাট ছিলেন ধীরেন চাট্টোজা (বিনি এম্পুগে বরানগর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন)—তিনিও থাকলেন। শরৎ বাবু (বোধ হয় চাট্টোজা) নামক একজন গড় এম-এ পাশ ভ্রমলোককে সেক্রেটারী করে আলমবাজারেও এক কংগ্রেস কমিটি হল।

বরানগরের বিত্ত সেনের বাড়ীতে গুলুম, তুলসী ঘোষের বরনাম। বললুম, কংগ্রেস বা অসহযোগ আন্দোলন ও-সব করার ধার ধারে না,—কংগ্রেসের কাজ ভালই চলবে এবং সেই খেতে।

বরানগরের খগেন চাট্টোজারও (খগেন বাটুজা বা বাটুল বাবু নয়) বরনাম শুনেছিলুম—তিনি ছিলেন গরীব গৃহস্থ, অখট অন্তরাগ থেকে কিয়ে আসার পরে নতুন বাড়ী তৈরী করেছিলেন। Theoryটা হচ্ছে, ওর কাছে নাকি কোনো ডাক্তারি টাকা ছিল, ধরা পড়ায় সে টাকা আর পাওয়া যায়নি।

এ ধরনের কথা শুনেও কিছু দিন বাজারে চলেছিল তারপর আপনিত খেয়ে গেছে।

কিন্তু আধাণ যত্বসে গভীর ভাবে সন্নিহিত চক্রবর্তী চক্রবর্তী,—ধীর কথা আগে লিখেছি,—তিনি যুদ্ধের পর আমেরিকা থেকে কিয়ে এসে বিবেকানন্দ রোডে গিরীশ পার্কের কাছে এক বিরাট পাঁচতলা বাড়ী তৈরী করেছিলেন এবং এতদিন সেখানেই আছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

বাই হোক, Forbes mansion থেকে একটা চরকা কিনে এনে দিবিক দিয়েছিলুম,—তিনি বাড়ীতে চরকা কাটতেন। আমি সকালে একটা চরকা কেটে পাড়ায় বেড়িয়ে একবার সেক্রেটারী কৃষ্ণন বাবুর বাড়ীতে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে তাঁকে একটা তান্তিরে এসে খেয়ে দেয়ে কলকাতার চলে আসতুম। একবার লোকানো পদ্মলি দিয়ে সবে পড়তুম। খদ্দর প্রচারণার জন্তে টোলা-বরানগরে খদ্দরের বুদ্ধি ও শাড়ী ঘাড়ে করে লোকের বাড়ী পৌঁছে দিতুম। পাটু বাবু তো খদ্দর প্রচারণার জন্তে শ্রামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে এক খদ্দরের শোহানই কবে বসলেন।

লোকানো তিনি বসিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলীকে (বিনি এম্পুগে নারী আশ্রমের সেক্রেটারীরূপে rape case-এ জেল খেটেছেন)—এবং সেই সিদ্ধেশ্বরই শেষপর্যন্ত পাটু বাবুর খদ্দরের দোকান অঙ্গলিনেই ফাঁক করে দিয়েছিলেন। কিছু অর্থনীতি এবং কিছু মনঃকষ্ট হয়েছিল তাঁর নীট লাভ।

বরানগর ও আলমবাজার কংগ্রেসে উৎসাহ সঞ্চারের জন্তে কলকাতা থেকে বক্তা নিয়ে বাওহার চৌরী করলুম। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটিতে বক্তা খুঁজে কোন বয়ঃক্রোষ্ঠ নেতাকে পাওয়া গেল না—শেষে নিয়ে গেলুম ভগবতী সোমকে। আমার বয়সী বক্তা দেখে কৃষ্ণনবাবু হতাশ হইলেন—তবু একটা বৈঠক হল। আলমবাজারে ফুটবল গ্রাউন্ডে বড় মিটিংএর বন্দোবস্ত হল। প্রাদেশিক ডাইন-প্রেসিডেন্ট আক্রাম থাকে সকলের পছন্দ, কারণ Jute mill এর অনেক মুসলমানকে আকৃষ্ট করা যাবে। গেলুম আক্রাম ধীর কাছে; তিনি ঠেকিয়ে দিলেন এক-বোগা লম্বা ছোঁকরা নেতাকে—বোধ হয় তাঁর নামাই আনুদর রেজাক খাঁ—বর্তমান কমিউনিষ্ট নেতা। বড় ভোটা না পেয়ে উৎসাহ জমালো না।

এই বকম চলতে চলতে ফেরতবারী মাসে খ্রিঃ অক ওয়েলসকে ভারতে এনে সহকারী জনগণের রাজভক্তির উল্লেখের ব্যবস্থা করলেন। বোধ হয় ২০ সালের শেষে এই উদ্দেশ্যে ডিউক অফ কনটকে (রাজার ভাই) আনা হয়েছিল এবং কলকাতায় আগমন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আত্মবলিক কিছু মারামারি, পুলিশের লাঠিবাজী ও ধরপাকড় হয়েছিল। স্মৃতিস্মরণে খ্রিঃ অক ওয়েলস যেদিন কলকাতায় আসেন, সেদিন লোক বাতে দেখেই না যায়, হাওড়া থেকে গন্তমিটে হাউস পর্যন্ত রাজা বাতে কাঁকা থাকে, তার জন্তে কলকাতার সমস্ত পার্ক আটটা সভার বন্দোবস্ত হয়েছে, এক নিখিলভারত নেতারা এসেছেন। ঐ আটটা সভাতেই তাঁরা বক্তৃতা করবেন—মতিলাল নেহরু, গান্ধী, মহম্মদ আলী, সৌকত আলী, ডাঃ সত্য পাল, কিচলু, দেবগোবিন্দ প্রভৃতি। পার্ক পার্ক বিরাট জনসমাগম হুপুর থেকেই শুরু হয়েছে—ট্রাণ্ড বোড কাঁকা, বরকট সম্পূর্ণ সকল, বিনা গণ্ডগোলেই।

নেতারা এক এক সভায় বক্তৃতা করেই অল্প সভায় বসনা হচ্ছেন, এক সঙ্গে কয়েকটা পার্ক সভা চলছে। আমিও এক পার্ক থেকে

অন্ত পার্কে চলেছি মিটিং দেখতে। রাত আটটা পর্যন্ত এমনি চলে' সব মিটিং শেষ হ'লে আমি ইডেন হাসপিটাল রোডে এক মেসে যুক্তীগঞ্জের বতীন দত্তের ঘরে গিয়ে আড্ডা মেসে দেখানোই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছি। তার আগের দিনও বাড়ী বাওয়া ঘটেনি।

সকালে উঠে টালা হয়ে কাশীপুর দিয়ে ষ্টিমারে বাড়ী বাবো,— টালার পোল পার হয়েই দেখা একদল মহিলা গঙ্গানানাবার সঙ্গে— টালার গিন্নীবাবার দল। আমাকে দেখে এক দিদি জিজ্ঞাসা করলেন—“দাদা, তোর দিদির কি হয়েছিল?” বললুম, কিছু হয়নি তো। তিনি বুঝলেন, আমি বাড়ীর খবর রাখি না,—চলে গেলেন। আমি মনে করলুম, কথার ছিঁরি দেখা,—যেন দিদি মারা গেছে।

কাশীপুরে র্যালী ব্রাদার্সের গুমটিতে গোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—তিনি তখনও সে চাকরী ছেড়ে বেরোতে পারেননি। তিনি বললেন, বাড়ী বান শীগগির। বুকটার মধ্যে বড়াস করে উঠলো। বাড়ী চলে গেলুম। উঠানে পৌঁছতেই ভাগ্নী এসে হাউমাউ করে চাঁৎকার করে পারের কাছে আছড়ে পড়লো—পাশের বাড়ীর গিন্নী “লক্ষীর মা” তাকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। আফ-শাব করে বলতে লাগলেন,—“আহা, মেয়ে-জামাইয়ের কথা কিছু না বলে শুধু কৈশে,—খোঁকার সঙ্গে দেখা হল না।” দিদি আমাকে থোকা বলে ডাকতেন।

ছুটলুম রক্তন বাবুর ঘাটে—শালানবাট—এবং দেখলুম দাহ হয়ে গেছে—চিভায় জল দিলুম, এবং বাড়ী ফিরে বেকুবের মতন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লুম।

ঘটনাটা হয়েছে,—আমি বখন বতীন দত্তের মেসে হৈ হৈ করে—সভার বিবরণ দিয়ে মাতঙ্গরী করছি,—টিক সেই সময়ে কলোয়ার আক্রান্ত হয়ে দিদি আমার জন্তে বড়ফড় করছেন, আর ভায়ীজামাই সারা কলকাতার সব জানা ঠিকানার আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—বতীন দত্তের মেসটা তার জানা ছিল না। ভোরে দিদির মৃত্যু হয়েছে,—ট্রালাইন ইন্সপেকশন দেওয়ার ব্যবস্থার আগেই। অগ্নি ঘটনাটক!

ছদ্মনি বিছানায় পড়ে নিঃশব্দে কাঁদলুম, আর ভাবলুম, কি হবে। চারদিকে যেন একটা শূন্যতা, রিক্ততা, সহায়হীনতার অন্ধকার নেমে এসে সবকিছু বাঁশা করে দিয়েছে। দিদি যে কি ছিল, কেমন ছিল, সে কথা এখানে বলার অবকাশ নেই—সে একটা বৃহৎ উপভ্রাসের কাহিনী হতে পারে। অতি সংক্ষেপে মাত্র দু'একটা কথা এখানে বলবো।

আমি জমাদার বহুর খানেক আগে দিদির একটা ছেলে হয়ে জন্মনি বাঙেই মারা গিয়েছিল। স্মৃতরা আমি জন্মের পর সমানে মা ও দিদির মাই খেয়েছি, এবং শেষ পর্যন্ত দিদিই আমাকে ছেলের মতন করে মানুষ করেছিলেন। মার কাছে তাড়া খেলে দিদির কাছে পালাতুম, কিন্তু দিদির কাছে তাড়া, এমন কি মার খেলেও মার কাছে কখনো পালাইনি। তারপর মা মারা গেছেন, আমার বয়স বখন আট বছর। তার পর থেকে মানুষ হয়েছি দিদির হাতেই। ভগিনীপতি নেশাখোর হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমার বারো বছর বয়সে বাবা মারা বান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাড়ীর অধ্যাপক দিদির নামে লেখাপড়া করে দিয়ে বাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিই তাঁকে নিবৃত্ত করেন এই বলে, আপনি যদি এই ভাবে খোঁকার সঙ্গে আমার একটা “দেই” সম্পর্ক করে দিয়ে বান, তাহলে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধবেই, আজ সে-বিরোধের কোন সম্ভাবনাই নেই। এই ছিলেন আমার দিদি।

বাই হোক, ছদ্মনি পড়ে থেকে উঠলুম, চালা হলুম, এবং সন্সার ও ব্যবসায় দিকে একটু মনোযোগ দিতে মনস্থ করলুম। ব্যবসায় একটা সুযোগও এসে গেল।

টালার খানখানায় কাঁড়ির পাশে গুড়ের আড়তে একটা বড় বারোয়ারী হত, সেখানে অনেকদিন ধরে বাজা পুতুলনাট প্রদর্শিত হত। সেই বারোয়ারীর কতৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মারাপ প্রদর্শিত বনুটাই নিয়ে ফেললুম। একটা রীতিমত খাটুনির প্রয়োজন এবং কেরামতি দেখাবার scope সামনে পেয়ে মেতে উঠলুম। ১০ গাড়ী বাঁশ, ১৬০০ হোগলা, ৩ গাড়ী শালের খুঁটি, তিনটে বড় খুঁটি ৪০ ফুট করে, এইসব কিনে ফেললুম মারাপের জন্তে। সন্ধ্যা বেলা বান একগাদা কিনে লাল, নীল, হলদে রঙে ছুঁপিয়ে ফেস্টুন হল, বড় চওড়া বান একগাদা কিনে তৈরী হল বড় বড় চারদিক এবং ফুলকাটা রঙীন Ceiling এর কাপড়। বাজার আসরের খুঁটিতে খুঁটিতে পরদার ওপর জোড়া জোড়া জামাঙাল স্লাগ এবং আঁতর নেতাদের ত্রিবর্ণ ছবি—গ্রীন বোর্ড Oval করে কেটে আমেরিকান সালা নজাদার ফ্রেমে বাঁধানো। সকলে দেখে খুশী হল, আমার স্বদেশিভার সখও একটু মিটলো। সব মিলে কাঁটা প্রকাশ, এবং বেশ সুখ্ম্যে সুসম্পন্নও হল। টাকা পেতেও বেগ পেতে হল না।

এই কাজের মারফৎ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল, তাও সামান্য নয়। চারটে বিলুটে জেগীর লোক নিয়ে কাজ—মুটে, গাড়োয়ান, খরাদী আর মিত্রী—প্রায় একটা যুদ্ধ ম্যানেজ করা। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলুম।

রকমারির একটা উদাহরণ দেবার লোভ সঞ্চার করতে পারছি না। ধরুন আমার মিত্রীর কথা। সে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে টাকা নেয়, এবং মদ খেয়ে এক খোলার বস্তিতে পড়ে থাকে, তাকে খুঁজে ধরে আনতে হয়। একদিন টাকা পেয়ে মদ খেয়ে ফুটপাথের ওপর আড়াআড়ি রাডা বন্ধ করে শুতো,—কিছুতেই উঠবে না। ট্যাংকোলা করে তুলে তাকে নোকারের ভেতরে এক তক্তপোথের ওপরে বড় একখানা সতরফি ভাঁজ করে শুইয়ে দেওয়া হল। সকালে দেখা গেল, প্রস্রাব করে সতরফি ভাসিয়ে রেখে দিয়েছে।

ভয়ে কিছু বললুম না। অনেক বেলায় উঠে ছোকরাটাকে সঙ্গে নিয়ে কলতলার সতরফিখানাকে কাটার নামে ভিজিয়ে নিয়ে ছাতের ওপর ফেললে। সন্সার পর তাকে মিষ্টি কথার কিছু সহপদে দিলুম। চুপ করে খানিক শুনে, তারপর চটে গেল—বললে, কি আপনি উপদেশ দিচ্ছেন মশাই? এই করে আমার এককাল কাটলো, বুড়ো হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে কাঠহাঙ্গি হেসে রণ ডক দিলুম। ভাল মিত্রী, চটালে চলবে না। বিয়ের প্রস্তাবের আলো তৈরী হতে লাগলো।

এদিকে এসে গেল বরিশাল কনকারেল। চললুম বরিশালে, বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে পাটুবাড়ি এবং ষ্টুটাবুর সঙ্গে দেখা হল। বন্ধু ভারি ফুটি—এত বাঙ্গাল একসঙ্গে কখনো দেখিনি।

গাভীজি তখন মহাশা তরুতেন, এবং আমার বুধে গজিয়েছে এক প্রকাণ্ড চাপ দাড়ি, plain living এর রূপায়ণ। high thinking এরও বটে।

কনকারেলের নির্বাচিত সভাপতি বিপিন পাশ। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন এবং আন্দোলন থেকে স্বভাবতই দূরে সরে যাচ্ছিলেন। প্রতিনিধি ও দর্শকে বিরাট প্যাণ্ডাল পরিপূর্ণ—বাইরেও বিশাল জনতা। সি আর দাশ, অখিল দত্ত প্রভৃতি নেতাবাও উপস্থিত। সভাপতির ভাষণ শ্রুত হল। যেমন দরাজ কঠোর, তেমনি অকুঠ ওজস্বিনী ভাষা। বক্তৃতার মধ্যে তিনি যেই বলেছেন মিষ্টার গান্ধী, আমরা চারিদিক থেকে আওরাক উঠলো মহান্ন বলুন।

গোলমাল খামলে তিনি আমার শ্রুত করলেন, আরো দৃঢ়কর্ত্ত বললেন মিঃ গান্ধী। আমার আওরাক উঠলো মহান্না বলতে হবে। গোলমাল বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটু খামলে বিপিন বাবু বক্তৃতা নির্বাহে বললেন, বলবো না—বলে তিনি সভাপতির আসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। প্যাণ্ডালের মধ্যে এবং বাইরে উদ্‌গম ধ্বনি চলতে লাগলো মহান্ন গান্ধী কি জয়। কনকারেল প্রায় ভেঙ্গে যায়।

তখন বরিশালের জনপ্রিয় জুনিয়ার নেতা জীহরং ঘোষ (যিনি পরবর্তীকালে স্বামী পুরুষোত্তরানন্দ হয়েছিলেন) উঠে মহান্নার স্তুতি করে বক্তৃতা শুরু করলেন, এবং দু'ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করলেন, বিজ্ঞেয় ও নন কো-অপারেশনের অপূর্ণ মিশ্রণ। স্বরাজ পাণ্ডার অর্থ, তাঁর মতে, নিজেকে মায়াময় বহিবিষয় থেকে সরিয়ে এনে গৃহত করে আত্মস্থ হওয়া, স্বরাট হওয়া। মহান্না গান্ধীকি জয় হবে আকাশ-বাতাশ প্রাকল্পিত করে সভা ভঙ্গ হল। আমার যখন সভা বসলো তখন সভাপতিত্ব করলেন শ্রীঅখিল দত্ত। তিন মাসের জন্তে আদালত বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের স্বাক্ষরে যোগ দিতে উকীলদের আহ্বান করে প্রধান প্রস্তাব পাশ হ'ল।

সাবজেক্টস কমিটির সভার পর সি আর দাশ ও অখিল দত্ত কথা কইলেন, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গুনলুম। অখিল দত্ত বলছেন, তিন মাস আদালত ছাড়লে কী বা হবে। দাশ মহাশয় বললেন,—একবার সবাই আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আশ্রুক, তারপর তিন মাসে আমরা এমন অবস্থা করে তুলবো যে, কেউ আর ফিরে যেতেই পারবে না।

কার্ত্তব্য হয়েছিল কতকটা ঐ রকমই—অনেকে আদালত ছেড়েছিলেন, এবং তিন মাস পরে অনেকেরই আর ফিরে বাননি। অবশ্য একঘাটা মনে রাখা দরকার,—উকীল ননকোঅপারেটরদের অধিকাংশই ছিলেন উপার্জনহীন বৃদ্ধ জেবীর,—এবং তাঁদের অধিকাংশকেই মাসিক ১০০ টাকা পন্থা অ্যালাউন্সেল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন দাশ মহাশয়।

তিনি যখন প্রথমে ব্যারিষ্টারী ভ্যাগ করার ঘোষণা করলেন, এবং দু'মহাও রাজার মামলা ভ্যাগ করে তাদের অগ্রিম দেওয়া ১,০০০ টাকা ফেরৎ গিলেন, তখন স্বভাবতই সারা দেশ অবাক

বিশ্বয়ে ধস্তা ধস্ত করতে লাগলো। এমন একটা ভাবাবেগের সৃষ্টি হল যে, অসংখ্য লোক আদালত ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো—কলেজ বরকট মোটাসুট সফল হল, অসংখ্য আন্দোলনের কাজ হু হু করে সাকল্যের পথে এগিয়ে চললো। অনেকের বিশ্বাস, সি আর দাশ ব্যারিষ্টারী না ছাড়লে বাংলা দেশে গান্ধীর আন্দোলন সফল হত না। বস্তুত আমারও আরো আকৃষ্ট হলাম সত্যিকারের দেশপ্রেম, ভ্যাগ ও নিষ্ঠার বাস্তব উদাহরণ দেখে।

বরিশাল থেকে ফেরার পরই এলো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বেজোয়াদা প্রোগ্রাম—মে এবং জুন এই দু'মাসের মধ্যে সারা দেশে এক কোটি কংগ্রেস সমস্ত সংগ্রহ করতে হবে, তিলক স্বরাজ্য ভাষায় এক কোটি টাকা তুলতে হবে, এবং ২০ লাখ চরকা চালু করতে হবে। এই প্রোগ্রাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে এক স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট কর্মোদ্যোগনার বহা বয়ে গেল। সব কাজ ছেড়ে দিনরাত ভুতের মত বাটতে লাগলুম—প্রোগ্রাম সফল হল।

ব্যবলুম ব্যবসা এবং সঙ্গারের মাসা কাটাতে হবে। ব্যবসার ঠিক যখন দাঁড়িয়ে গেছে,—তখনই আমার সেটা তুলে দিলুম মালপত্র বাড়িতে নিয়ে গেলুম। বাড়ী থেকে ভাগনীজামাই যেটুকু পারে তাই চলতে লাগলো। ভারতে লাগলুম,—যদি বাড়ী ছেড়ে বেরোতে হয়, তাহলে অপোগণ্ডলোকে দেখবে কে?

গোপাল বাবু তখন বোস ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন, এবং ক্যামিলি আনার জন্তে ঘর খুঁজছেন। আমি বললুম, আমাদের বাড়িতে একটা ঘর থাকতে পারেন তো ভাড়াটা শাগবে না। তিনি বললেন বরানগর থেকে অফিসে বাতারাতে বড় অনস্বিধা, একখানা সাইকেল থাকলে চলতে পারে। তদুসারে ১১০ টাকা দিয়ে একখানা সাইকেল কেনা হল, আমি টাকা দিলুম, পরে গোপাল বাবু সেটা শোধ করলেন। মোটের উপর গোপাল বাবুকে বাড়ীতে বসিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হলাম, অন্তত একটা আঙুলগুলা লোকতো বাড়ীতে থাকলো।

একটা কথা এখানে বলে রাখতে চাই। শব্দের কাগজে নেতাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ হওয়া মাত্র দেশবাস লোক যে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সে সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, এমন কর্মোদ্যোগনা আমরা বারা ২১ সালে দেখেছি, আজকের চীনের কর্মোদ্যোগনা তাদের কাছে একটুও অসম্ভব বা দুর্বোধ্য নয়। বারা ২১ সাল দেখিনি, তারা হরত আজকের চীনের কর্মোদ্যোগনা বুঝতে পারে না। তারাই চীনের শত্রুদের এই অপপ্রচার বিভ্রান্ত হয় যে, লোকগুলোকে জোর করে খাটানো হচ্ছে।

জুনের পরেই এল বি পি সি সির ইলেকশন। সিঙ্গল ট্রান্সকারেল ভোট প্রথম প্রবর্তিত হল। অন্তত প্রধান কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে আমিও নির্বাচিত হলাম।

প্রথম বি. পি. সি. সির মিটিং হল Forbes mansionএ। সেখানে দাশ মহাশয় ঘোষণা করেন সুভাব বহু আই-সি-এস পাশ করে সরকারী চাকরী না নিয়ে দেশে ফিরছেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্তে। তাঁকে বি. পি. সি. সিতে নেতরা দরকার,—সুভাবা একটা সীট খালি করার জন্তে একজন সভ্যের পদভ্যাগ প্রয়োজন। শোনামাত্র কয়েকজন উঠে দাঁড়ালো,—আমিও—বিশ্ব হাতের কাছের একজনকে পদভ্যাগ দাশ মহাশয় গ্রহণ করলেন।

২৪ পরগণা কংগ্রেস কমিটিতে কয়েকজন মাতব্বর ছিলেন,— প্রকুর ব্যানার্জি (পরবর্তীকালে জেলাবোর্ডের ডায়েরী), দ্বিতীয় দামগুপ্ত (বেঙ্গল কেমিক্যাল-খাদি প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি, বাংদের কাজ ছিল জেলা কমিটির সভার প্রত্যেকটি খুটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, বক্তৃতাবর্ণন, সশোধন প্রস্তাব প্রভৃতি। জেলা কংগ্রেস কমিটি বলা হবে, না জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি বলা হবে, তাই নিয়েই তিন খণ্ড লড়াই।

কাজ কোন সুখ পেতুম না। বেঙ্গলগারী প্রোগ্রামে কংগ্রেসের আগল কাজ হয়ে গেছে। তার জের চলছিল সভা-সমিতিতে অসহযোগের ব্যাখ্যা প্রভৃতি। কলেজ ধোয়ার ছিল ৩০ দিনই সবগরম। অনেক নতুন বক্তা গম্বিরেছিল। বক্তৃতার পর কয়েকটা ছোট ছোট গুণ তর্কবিতর্ক করতো এবং একধা না বৈকিতে কয়েকজন বারোমেসে সিনিয়র বসে অসহযোগ আন্দোলনের বিক্ষম সমালোচনা করতো। ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীর অ্যাসিষ্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, নাম উপেন বাবু,—চন্দননগরে বাড়ী, হুইপুট, কুরুবর্ণ, ছোট করে চুল ছাঁটি,—তিনি নরম ভাবে প্রতীবাদ করে আন্দোলন সমর্থন করতেন।

আমি থাকতুম বিতর্কের একটা গুপের মধ্যে। বহু ড্যালহাউসী থেকে এসে জুটতো মাঝে মাঝে। একদিন এক ডব্রলোক খুব ইংরিজী বেড়ে তর্ক করতেন। বহু ইংরিজী জানে না মনে মনে চটে গেছে। এমন সময় তাকে লক্ষ্য করেই সাকী দানার ঢাএ ডব্রলোক কিছু ইংরেজী বলেছেন। বহু কটমট করে তাকিয়ে বললে,—ভাএ ইংরিজী বলছেন কেন? আগে বাংলায় বলুন,—না বুঝতে পারি, তখন ইংরিজীতে বলবেন। বিক্ষমশক হো-হো করে হেসে উঠে ডব্রলোককে তর্কে হারিয়ে গিলে।

স্বরাজের ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচনা চলতো সর্বত্রই। জীনগেন গুহ রায় (নোয়াখালী) এক বই লিখেছিলেন “স্বরাজ সাধনার বাঙ্গালী”—তাতে কতকগুলো প্রশ্ন ও নেতাদের জবাব ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয়শ্রেণীর নেতাদের জবাব। একটা প্রশ্ন ছিল “আপনি কি বিশ্বাস করেন, আন্দোলনের সাক্ষ্য হিসেবে এক বছরে স্বরাজ হবে?”—জবাবে প্রায় সকলেই বলেছিলেন “হ্যাঁ”। যোগ হয় কিশোরবর রায় এবং আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন “না”।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রচারের সহায় ছিল প্রধান স্লোগান “হিন্দু-মুসলমান কি জয়”। মাঝে মাঝে কোন হিন্দু নেতার সঙ্গে মেলবী ওয়াহেদ হোসেন বক্তৃতা করে ব্রিটিশে দ্বিষ্টেন, বেদ জার কোরাণ একই কথা বলেছে। হিন্দু আর মুসলমান ভারতবাসীর দুটি চক্ষুর মত। ইত্যাদি—

আন্দোলনের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা শুনে জ্ঞানার্জন করি, অর্থ পাই না। ঠেসে পড়াতনা করি। বন্ধিমের গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-খণ্ডগুলো ভালো করে পড়লুম, এবং মানস পেলুম। সবচেয়ে আনন্দ পেলুম ধর্মতত্ত্ব পড়ে। ছোটবেলার পড়েছিলুম একলো বাদ দিয়ে শুধু উপজাতগুলো।

একধা না বই পেলুম “বোপসাধন”। বড় ভাল লাগলো। হস্তদয় মিত্র-ভাবাবলী কথা একেবারে নেই,—বোপ করের কৌশল,

এটাই প্রতিপাদ। বোপের অষ্ট অঙ্গ—বম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রথম অঙ্গ বম হচ্ছে—অহিংস সত্য, অন্তের (অচৌর্য) ত্রাকর্ষ ও অপরিগ্রহ (বিলাস বর্জন), ত্রাকর্ষের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, স্মরণ কর্তব্য কৈনি: প্রেক্ষণ ওহভাষণ; সঙ্কল্পেংগ্যবসায়সচ্চ ক্রিটানিশ্চিতির বচ—এতসৌখনমষ্টাক প্রবদতি মনীষিঃ, বিপরীতঃ ত্রাকর্ষ্য মুষ্টক মুহুদুতি:।’ হিংসা তিন প্রকার—কৃত, কারিত এবং অহিংস। দোষ তিনটাতেই সমান।

একধা না একাদশই বকে এক কটিন লিখলুম,—বম সাধনের প্রাতিহিক রেকর্ড—হিংসা, সত্য, অন্তের, ত্রাকর্ষ, অপরিগ্রহ, এই পাঁচ খাতের সাক্ষ্য ও বার্তার পরিমাণ বোঝ লিখে রাখতুম।

দাদারা কংগ্রেসে যোগ দি়ারতেন, অন্তঃশত্রু শিকের তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। জীবন কিছু মাস বেখেছিল এক স্থলে, চেডমাটির স্থায়ী বাবু আমাদের লোক। জামবাজারে নীনেপ্র স্ট্রীটের মোড় যেখানে, ঐখানে তখন ছিল “গাঁজার গলি।” তার মধ্যে একটা হাকবস্তিতে ছিল ঐ স্থল। মালের মধ্যে একটা রাইফেলও ছিল—বাঁট আর ব্যারেল খুলে পৃথক করে খাটো করা ছিল। সেগুলো চন্দননগরে সরতে হবে। জীবনের ব্যবস্থার বোহিগী মুখুজো দার আমি সেগুলো নিয়ে গেলুম চন্দননগরে খোড়াপুতুরের পাশে কুণ্ড বাবুরের বাড়ীর পিছনে বলাই কর্মকারের বাড়ী। তিনি ছিলেন টালার পকাননের মাড়ুল, আর পকাননই রাইফেলটাকে খুলে দু টুকরো করে দিয়েছিলেন।

বোহিগী মুখুজোর বাড়ী জীবনের প্রায়ে, বিক্রমপুরে পক্ষার প্রায়ে। সেও আমাদের সঙ্গে প্রোভার ও অন্তরীণ হয়েছিল। কিং এসে মর্জাপুত্র স্ট্রীট সাবিক্তী এজেন্সী নামে এক স্টেশনারী লোককে করেছিল, যে লোকান ২৪ সালের কাশপুর বলশেভিক বড়য়র মামলার আসামীদের তরফের এক পোষ্ট-অফিস বন্দে’ বর্ণিত হয়েছিল। আসামীদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে জীবনের নামও ছিল। ২৪ সালে জীবন ছিল দ্বিতীয়বার জেলে, স্টেট প্রিজনার।

বাই হোক, ২১ সালের মাঝামাঝি জীবন দৌলতপুরে (খুলনা) কিশোরদা’ (কিশর মুখার্জি) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যাক্রমে বাতায়িত করতো। তার সঙ্গে আমিও একবার সত্যাক্রমে ঘুরে এলুম। তখন পটীন ঘোষ (পরে অমৃতবাজার পত্রিকার অ্যাসিষ্ট্যান্ট এডিটর) সবযাত্র ম্যাটিক পাশ করেছে—সত্যাক্রমে বাতায়িত শুরু করেছে—দৌলতপুর কলেজের ছাত্র।

ইতিমধ্যে বরিশাল শতরমঠের বন্দোবস্ত বরিশাল থেকে কলকাতার প্রেস আনা হয়েছে জাতীয় সাহিত্য প্রচারের জন্ত এবং সরস্বতী লাইব্রেরীও স্থাপিত হয়েছে মনোজ্ঞানা-অঙ্গ তহের পরিচালনায়। শতরমঠ ছিল বিপ্লবীদের বাঁটি—যামী প্রজ্ঞানানন্দ (ভূতপূর্ব খুলনাট্যের সতীর্ণ মুখুজো) ছিলেন নেতা। নিশি গাঙ্গুলী সেখানেই থাকতেন (এখন কলকাতার হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস করেন) আর মনোজ্ঞানা- (গুপ্ত বর্তমান এম এল সি) এক অঙ্গ গুহ বাতায়িত করতেন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কি একটা বই পড়েছিলুম, মনে নেই, তখু একটা কথার একটা টুকরো মনে আছে—“ধর্মপুসের হত্যা করিয়ে”—একটা সঙ্কত স্লোকের ব্যাখ্যা। আধা না “অজ্ঞানপ”

নাটক অভিনয় করেছিলেন, তার শেষ দৃষ্টে বাসদেব (সত্যাবাবু) কুক (করাসী) এবং অজুনের (পুলিন) সম্বন্ধে শিবোর কাছে বর্ষান্তের বাখা করেছিলেন—যাবী প্রজ্ঞানানন্দের বইটাও সেই বর্ষান্তের বাখা। আমাদের চোখে অহিংসের বিপ্লববিপ্লবী ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট।

বিশাল থেকে প্রেসটা এসেছিল সীমারে আর্থানীবাটে এবং সেখান থেকে এক গরুর গাড়ীতে এল বেনেটোলা সেনের বাড়ীতে। বাড়ীর উঠানে প্রেসটা নামাবার জন্যে দুটে ডাকা হল, তারা থাকলে ৬ টাকার কমে হবে না। তখন ছ'টাকা একটা বৃহৎ ব্যাপার। আমি উপস্থিত ছিলাম—মনোঃজননাল'কে বললাম, আমরা দুটোদের চেয়ে গায়েব জোরে খাটো, কিন্তু বৃদ্ধিতে বড়,—আমরাই নামাতে পারবো,—বন্ধি আপনিও হাত লাগান। তিনি বললেন, রাজী। আমি বললাম দুটে টাকা খরচ করতে হবে, রসগোল্লায়। তিনি বললেন, রাজী। আর কে কে ছিল মনে নেই—প্রসের সঙ্গে এসেছিল বোগা লিকলিকে মহেশ্ব নন্দ—তিনিও হাত লাগালেন। একটা বড় পিসই বেশী ভারী—প্রেস নামিয়ে ফেললাম উঠানে। তারপর হল ছ'টাকার রসগোল্লা খাওয়া।

হারিসন বোডের কাছে রমানাথ মজুমদারের স্ট্রিটের মোড়ে সবথী লাইব্রেরী হল। ক্রিয়ণদাকে এনে চার্জে বদানো হল। দু'জন তরুণকে সর্বকণের জন্যে রাখা হল, লাইব্রেরীতে বই বিক্রীর জন্যে। তারই মধ্যে একজন ছিল গোপী শা—ডে সাহেবকে টেগাট জমে হত্যা করে বার কীসী হয়েছিল।

এই সময়ে মুন্সীগঞ্জ (বিফ্রমপুর) থেকে জীবন প্রভুতির ডাক এল, শ্রাশাভাল ফুলের ভার নেওয়ার জন্যে। প্রাথমিক

সংগঠন করেছিলেন বৃদ্ধ "মাঠার মহাশয়" জীশচীন বোব, বাহেরকের জিন্তেন কুশারী প্রভৃতি। প্রথমে হাই স্কুল খালি হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার হাই স্কুলও চালু হল। শ্রাশাভাল ফুলে আড়াইশো ছাত্র, আর হাই স্কুলে ২০০র মতন। কালীবাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড টিনের চালাঘরে কীপ বেঁধে বেঁধে ক্রাসের ঘর প্রভৃতি ভাগ করা হয়েছিল।

যতীন দত্ত হারিসন বোডে graduates' union নামক sporting goods-এর দোকান করেছিলেন, পাটনার ছিলেন যোহিণী নন্দী—উভয়েই পঞ্চসারের লোক। যোহিণী বাবুর হাতে দোকান ছেড়ে যতীন দত্ত মুন্সীগঞ্জে গিয়ে শ্রাশাভাল ফুলের হেডমাষ্টার হলেন। জীবনও টিটার হয়ে গেল। কামারখারার পরেশ সেন মুন্সীগঞ্জের সরকারী উকীল উমাচরণ সেনের জামাতা—তিনি চটগ্রাম কালেকটরেটে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন—এখন চাকরী ছেড়ে শ্রাশাভাল ফুলে যোগ দিলেন। এমনি আরো অনেকে এসেছিলেন,—সে কথা পরে বলা বাবে।

জীবনকে এখানকার কাজের অবস্থার কথা বলছিলেন। মুন্সীগঞ্জে বাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল, আমাদের ওখানে কর্মীর প্রয়োজন হলে তোমায় লিখবো,—লিখলেই তুমি চলে এসো। তাই হিব হলো।

গোপাল বাবু আমাদের বরানগরের বাড়ীতে যৌমাকে এনেছেন,—বড় ছেলে পটলও (স্বরায় ?) এসেছে। তার তখন একটা বরস হয়েছে যে, সে হুড়া বলতে লিখেছে—“ঐত কলেলে দাদাবাই কাখা কিতা দে,—কাখাল মইদে বউ হইব, বউ কিতা দে।”

[ক্রমশঃ।

বৃন্দাবন

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বৃন্দাবনের শূন্য দেউলে মিলিল না তব দেখা,
ব্রজের ধূলায় আছে বটে সখা, তব পদরেণু মাখা;
শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন,
বেদনা মুছিত আজ নাহি ভার প্রাণের স্পন্দন।
গোধনশূন্য গোচারণভূমি বিরহ বেদনে কীদে,
অজবালা আর ছোট্ট না সেখায় সাজিয়া বিবিধ হাঁসে,
রাখালরাজারে নাহি দেখা যায়, মনুংপুচ্ছ মাখে,
হাস্ত লাভ লয়েছে বিদায় ব্রজের কাছর পাখে,
বহুনা-পুলিনে বীশরী বাজারে কেহ ডাকে না ক' অভিসারে,
নীপতকৃতলে মিলনের মেল ফুগিয়েছে, চিরতরে;
কোথায় গোশিকা কোথায় রাধিকা তোমায় পরায় প্রিয়া?
কত মধুমাস আসে আর বার আঁকুল করিয়া হিয়া,
নাই গ্রামটোল, নাই সে রাধিকা, নাহিক বশোলা মাতা,
শূন্য দেউলে বিরহবেদনে পথিক লুটায় মাখা,
কোথায় কুক কোথা রাধানাথ কোথায় লুকালে তুমি?
পথিকে কীদায় শত স্মৃতিবেদা আজি এই ব্রজভূমি।



লীগ আসরে ছন্দপতন

কলকাতা মহানগরে সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগের পালা প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর কয়েকটি মাত্র খেলা সাঙ্গ হয়েছে। লীগ মরশুমের ওপর বনবিন্যাসে খেলায় আর সেই সঙ্গে বহুজনের জয়না-করনা, আশা-নিরাশার যন্ত্রণাও অবসান হবে। এবার কিন্তু লীগ খেলার আসর কোন সময়েই জমে উঠেনা। নিত্যন্ত উদ্দীপনাহীন অবস্থার মধ্যেই এবারের লীগ মরশুম শেষ হলো। বিভিন্ন দলের উত্থান-পতনকে কেন্দ্র করে অমুহুরাগী ও সমর্থকদের মধ্যে যে প্রাণ-চাকল্যের বজা বয়ে থাকে, এবার তার কতকটা ব্যতিক্রম হয়েছে বলা যায়। অবিশিষ্ট এ ব্যতিক্রমের কারণও আছে। এবারের লীগ খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলই লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকর্ষণ অনেকখানি হ্রাস করেছে।

অনিশ্চয়তা ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য বলে জানা ছিল। এ উক্তিটি যে ফুটবল খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা চলতি মরশুমের কয়েকটি খেলা দেখে এ প্রতীতি জন্মেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা খেলোয়াড় নিয়ে কলকাতার কয়েকটি প্রখ্যাতনামা দল তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। সুতরাং এই সব খেলোয়াড়দের ফুটিয়ে ও নৈপুণ্যে সমৃদ্ধি দলগুলি গৌরব অর্জন করে থাকে। কিন্তু এহেন শক্তিলালী ও খ্যাতনামা দল যদি স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত অপ্রখ্যাত অথবা অখ্যাত দলের বিরুদ্ধে পরস্পর বিসম্মত করে অথবা পরাজিত হয়, তাহলে সমর্থক ও দর্শনারী যে উদ্ভ্রা প্রকাশ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? এবার সত্যিই তাই হয়েছে।

লীগ তালিকার ওপর তলার যে কয়টি খ্যাতনামা দল আছে তাদের কথা বলতে হয়। এর মধ্যে একটা দলকেও জয়লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নিশ্চিত আস্থা ও জয়লাভে অটুট মনোবল নিয়ে খেলতে দেখা যায় নি। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিরুদ্ধে যেভাবে কঠিন করে এরা পরস্পর সংগ্রহ করেছে তাতে জতি বড় গোঁড়া সমর্থক নিরাশ হয়েছেন। আবার যখন এই সব খ্যাতনামা দল দুর্বল দলের বিরুদ্ধে পরস্পর নষ্ট করেছে অথবা পরাজয় স্বীকার করেছে তখনই সমর্থক ও দর্শকদের ধৈর্যহ্রাসের কারণ ঘটিয়েছে। মনোব্যাগ খেলোয়াড়দের উদ্বেজিত (সময় সময় মারহুনা) দর্শকদের সামনে পড়তে হয়েছে। দ্রাবের কর্তব্যীদের জবাবদিহি হতে হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিগূহীত করার ছোটখাটো ঘটনাও হয়েছে।

অবিশিষ্ট কলকাতা মহানগরের এ হোল-নির্মিত ঘটনা। এধরণের ঘটনা-ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কলকাতা মহানগরে ফুটবল মরশুম যেতে ওঠে। এ সমস্ত কিছুকে হাণিয়ে একটি প্রশ্ন নিরপেক্ষ এবং সত্যিকারের ক্রীড়ামৌলিকে তাবিরে তুলেছে। ফুটবলের মান কোথায়?

ক্রীড়াধর্ম ও সংশ্লিষ্ট অমুহুরাগীমহলে সর্বত্রই একই প্রশ্ন। ফুটবল খেলায় বাংলা দেশের ক্রীড়ামান উন্নত না হয়ে ক্রমশঃ নিম্নগামী হচ্ছে এটা সর্বজনস্বীকৃত। এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু উপায় নির্ধারণ করা হয় নি। বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ভাগ্যান্বিতা হোল ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন বা আই, এক, এ। ফুটবলের মান উন্নত করার এবং খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবহন রচনা করার দায়িত্ব সুতরাং এই সংস্থার ওপর। কিন্তু ফুটবল খেলা পরিচালনায় প্রশাসনিক কাঙ্ক্ষা করেই এরা ক্ষান্ত। এর বাইরে এদের শর্ত পৃথিবীজনের কোন পরিচয় আজ অবধি পাওয়া যায়নি। হ্রস্ত এরা একাজে সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের অপেক্ষার বসে আছে। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে হ্রস্ত তুল করা হবে।

লীগবিজয়ের পথে মোহনবাগান

এ বৎসরের লীগ খেলার শুরু থেকেই জনপ্রিয় দল মোহনবাগান জয়লাভের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে লীগ অভিযানে দৃঢ় পদক্ষেপ এগিয়ে যায়। সমর্থকসুল দৃঢ় আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যে মোহনবাগান অপরাধিত আখ্যা নিয়েই লীগবিজয় করবে। বিশ্ব চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দল সে আশায় বান সাধলো। লীগের কিরতি খেলার তারা মোহনবাগানকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে অপরাধিতের গৌরব ম্রান করে দেয়। কারণ তখন পর্যন্ত মোহনবাগানই ছিল লীগ তালিকার একমাত্র অপরাধিত দল। লীগের পালা শেষ করতে মোহনবাগানের যখন আর ছটা খেলা বাকী তখন এই বিপর্যয় তাদের সামনে এসে হাজির হয়। এই বিপর্যয় মোহনবাগানের গতির পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও তাদের লীগ জয়যাত্রায় যত্নের চিহ্ন টানতে পারবে না বলেই মনে হয়। কেননা বর্তমানে পর্য্যয়ে মোহনবাগান তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে লীগ তালিকার যে অবস্থানে রয়েছে তাতে নিত্যন্ত অস্বাভাবিক ধরণের কোন অবতন না ঘটলে তারা যে শেষ পর্যন্ত লীগবিজয়ী হবে, তা একরকম নিশ্চয় করেছে বলা যায়। লীগ পাল্লার দোড়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দল, খ্যাতনামা মহম্মেডান স্পোর্টিং এবং গতবারের লীগবিজয়ী ইষ্টার্ন রেলওয়ে দল অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সুতরাং বাকী পর্যটক বিপর্যয় এড়িয়ে পার হলেই মোহনবাগানের লীগ জয়যাত্রা সফল হবে, সার্থক হবে। দরদী ও অমুহুরাগী দলও তাই পতীর আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে অপেক্ষা করছে সেই চরম কণ্ঠির জন্য, এদের আশা নিশ্চয়ই নিরর্থক হবে না।

ইংলও দলের "রাবার" লাভ

বর্তমানে ইংলও সবরকম ভারতীয় ক্রিকেট দল উপযুক্ত পিচিনটি টেস্ট খেলাকেই পরাজিত হওয়ার ইংলও দল রাবার

গাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এখনও দুটো টেট খেলা বাকী রয়েছে। “বাবার” প্রেরণ মীমাংসা হওয়ার অবশিষ্ট দুটো টেট খেলাও আকর্ষণ অনেকটা করে গিয়েছে। অধিকাংশ তরুণ এবং উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ভারতীয় দল অল্পকয়েকই নমুণা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল মোটেই সুবিধা করতে পারেনি এবং শোচনীয় ভাবেই তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতীয় দলের অসাফল্য উপলক্ষ্য করে ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অতি রুচক এবং নির্মমভাবে সমালোচনা করেছে।

কোন কোন সংবাদপত্র আবার বেশ চড়া হুজুই সমালোচনা করেছে যে ভারতের সঙ্গে টেট খেলার ইংলণ্ডের সময়ের অপচয় হয়েছে। শুধু ভারতই না, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের টেট খেলার বোগ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড এখনও টেট খেলার বোগ্যতার অধিকারী হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এদের সংগে খেলার ইংলণ্ড নিজেই জয়লাভ করে বলে একের বিরুদ্ধে টেট খেলার সময় পাঁচদিনের বদলে তিনদিন স্থির করার জন্য আবার জানানো হয়েছে। মনে হয় ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকাগুলো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেট খেলার ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভুলে গেছে। গত বৎসরের ঐতিহ্যে পাঁচটি টেট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড দল চারটিতেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে আসে।

যেদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টেট খেলার মেয়াদ কমিয়ে আবার কোন প্রস্তুতি ওঠেনি। স্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমান ইংলণ্ড সত্ত্বে ভারতীয় দল বাধ্যতার পরিচয় দিয়েছে। কয়েকজন খেলোয়াড় আহত ও অসুস্থ থাকায় তাদের বিপর্যস্ত অংগার সমুদীন হতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ভারতীয় দলের তরুণ খেলোয়াড়গণ মনোবল হারাননি।

আজকের এই পরাজয়ের মাঝ থেকেই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরবেন তা বখাখোঁগাভাবে কাজে লাগালে আগামী দিনের খেলোয়াড়রা তৈরী হবার প্রয়াস পাবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পদ ভারতীয় ক্রিকেটের কল্যাণে নিয়োজিত হোক এই কামনা করি।

ভারত-ইংলণ্ড টেট খেলার ফলাফল

প্রথম টেট—নটিংহাম

ইংলণ্ড এক ইনিংসে ও ৫১ রাশে জয়লাভ করে। পাঁচদিনের খেলা চতুর্থ দিনেই মীমাংসা হয়। ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে এই খেলায় ১০৬ রাশ করেন। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৪২২ রাশ করে। প্রত্যুত্তরে ভারত প্রথম ইনিংসে ২০৬ রাশ এবং ফলাফল আনয়ন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৭ রাশ করে।

দ্বিতীয় টেট—সর্ডস

ভারতের অধিনায়ক দাভাজীরাও গারকোয়াড় অসুস্থতার জন্য দ্বিতীয় টেটে খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে সহ-অধিনায়ক পঙ্কজ রায় দ্বিতীয় টেটে ভারতের নেতৃত্ব করেন। চাহ বোড়ে ও নানকার্মি গাছ থাকার জন্য এই খেলায় অংশ নেননি। ভারত টসে জয়লাভ

করে ১৬৮ রাশে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ২২৬ রাশ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৬৫ রাশে সকলে আউট হয়। ইংলণ্ড জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রাশ করলে তৃতীয় দিনে খেলার মীমাংসা হয়। বিপর্যয় গোখে মঞ্চেবকার (৬১ রাশ) ও কুশাল সিং (৪১ রাশ) প্রথমসরীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় টেটে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়লাভ করে।

তৃতীয় টেট—লিডস

তৃতীয় টেটে ভারত এক ইনিংসে ১৭০ রাশে পরাজিত হয়। এই খেলাটিও তৃতীয় দিনে শেষ হয়। ভারত প্রথম ইনিংসে ১৬১ রাশ করে। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৪৮০ রাশ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে, কলিন কাউন্ডে ১০০। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৪১ রাশে খেলা শেষ করে।

রামনাথন কৃষ্ণাণের অপূর্ব সাফল্যে টেনিস-জগতে বিশ্বাস

দক্ষিণ আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড় আলেক্স অলমেডো এবং বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে বিজয়ীর কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি পূর্ববাদের সিঙ্গলস ফাইনালে কুইন্সল্যান্ডের (অস্ট্রেলিয়ার) সের্ভারকে ৬-৪, ৬-৩, ৬-৪ সেটে পরাজিত করে এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

মহিলা বিভাগেও দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিযোগিনী মারিসা এন্ডার বুনা চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেন। দুটো বিভাগেই দক্ষিণ আমেরিকার সাফল্য এবারের উইম্বলডনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অলমেডোর পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার কোন খেলোয়াড় উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেননি।

ভারতের পরলা নম্বর খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণাণ তৃতীয় রাউন্ডের খেলার অলমেডোর কাছে পরাজিত হয়ে উইম্বলডন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তরুণ খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণাণ বোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই পরাভব স্বীকার করেন।

উইম্বলডনে পরাজিত হলেও কৃষ্ণাণ এই বছরই অলমেডোকে দু’দ্বার পরাজিত করে ক্রীড়াঙ্গণতে বিশ্বাসের সঞ্চার করেন। লণ্ডন গ্রাসকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণাণ ৮-৬, ৬-১ সেটে অলমেডোকে পরাজিত করেন। এই প্রতিযোগিতায়ই ফাইনালে তিনি বিশ্বের আর একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নীল স্ক্রেজারকে ৬-৩, ৬-০ সেটে পরাজিত করে লণ্ডন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের কৃতিত্বপূর্ণ সম্মানলাভ করেন। উইম্বলডনের বাছাই ভালিকার অলমেডো পরলা নম্বরের এবং অস্ট্রেলিয়া নীল স্ক্রেজার (ইনি গতবারের উইম্বলডন রাণীর-আপ) দুই নম্বরের খেলোয়াড়। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়ের এই সাফল্য ভারতকে নতুন আশার সঞ্চার দিয়েছে। পুনরায় হুইন্ডনে সুইডিশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণাণ আর একবার উইম্বলডন বিজয়ীকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণাণের এই অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গণতে বর্তমান বৎসরে এখনকার মত সবচেয়ে বড় সংবাদ। কৃষ্ণাণ ভারতের যুগ উজ্জ্বল করেছেন। বিদেশী পত্র-পত্রিকাও তাঁর নৈশুণ্য সম্বন্ধে উজ্জ্বল প্রশংসা করেছেন।



বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের জায় পূরাতন নয়। ভারতীয় সঙ্গীতে গীত, বাজ, নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্রের প্রচুর আলোচনা ও বিবরণের নির্দেশ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা, শারীরিক সঙ্গ বজায় রেখে এবং পারিবেশিক অবস্থার দিকে নজর রেখে কোন শাস্ত্রকার কোন শাস্ত্র রচনা করেছেন কিনা তার নজির নাই। তবে সঙ্গীতজ্ঞের বা গায়কের কণ্ঠের বিশেষ গুণ প্রভৃতির আলোচনা কখন কখন হয়েছে।

পরবর্তী যুগে ওস্তাদ ও পণ্ডিত মহলে স্বরসাধনার কিছু পদ্ধতির কথা শুনা যায়। তাঁদের মতামতেরে কঠসাধনা বা স্বরসাধনার প্রথম এবং প্রধান পদ্ধতি হ'লো 'মরজ-সাধনা'। অর্থাৎ উল্লার বা মস্ত-সপ্তকে গলার অভ্যাসই কঠসাধনা বা স্বরসাধনা। ঠিক এই প্রকার গলার অভ্যাস দ্বারা গলার কিছু উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়তো হ'তো কিন্তু এই প্রকার ক্রমাগত অত্যধিক অভ্যাস গলার স্বর স্রমশ্রু ও লালিত্যপূর্ণ হওয়ার বদলে ধরা, ভারী ও কর্কশ আওয়াজেরই উৎপত্তি হ'তো। এই সব কারণে, অবশ্য সমস্ত গায়ক মাঝেই নয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীর জনপ্রিয়তা লাভে বঞ্চিত হওয়ার নানা কারণের মধ্যে ইহা একটি প্রধান কারণ বলা যেতে পারে।

বাস্তবিক যুগে বস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে বেডিও মাইক্রোফোন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার গায়ক মহলেও তার প্রতিকলন দৃষ্ট হয়। বস্ত্রের প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়তো সঙ্গীতকে অনারাসে বেশী সঙ্গাক শ্রোতার নিকট পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু গায়ক মহলে 'তার' প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'মাইক্রোটেকনিক' নামক ভয়েসের উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতি হ'লো প্রধানতঃ গলাকে দাবিয়ে ও তার স্বরকে বধাসম্ভব সযত করে গান গাওয়া। আর বস্ত্রের সাহায্যে তা পরিবর্তিত হ'য়ে সবার নিকট উচ্চ আওয়াজে পরিণত হয়।

মতী

কোন কোন ক্ষেত্রে বস্ত্রের গুণাগুণ হিসাবে আওয়াজও সে রূপ ধারণ করে। আর শিল্পীর আসল পরিচয় চাপা পড়ে যায়। এরূপ ক্রমাগত অভ্যাসে কণ্ঠ ক্ষীণ হ'তে কীমতের হ'তে থাকে। কণ্ঠস্বরের আয়ুও এতে কমে যায়। চলচ্চিত্রশিল্পী ও কিছু সঙ্গাক যেতার শিল্পীর মধ্যে ইহা বিশেষভাবে পরিদৃষ্টমান। তাদের ধারণা, এই প্রথা গানে তার সার্থকতা করতে বেশী সহায়ক ও অল্প পরিভ্রম হয়। কিন্তু আসল দিকটার কথা তাঁরা ভুলে যান। কলঙ্করূপ আসল স্বরসাধনার পথ হ'তে বিপথগামী হয়। প্রকৃত স্বরকণ্ঠ হ'তে নির্গত না হ'লে সঙ্গীতের ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের তার সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না।

ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরোয়ানার চলন বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। ঘরোয়ানার উদ্দেশ্য কি এবং তার কি কি বিশেষ গুণ থাকলে একটি ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়, তার দিকে দৃষ্টি না রেখেই ভিন্ন ভিন্ন ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। বনেনী পরিবারের ঘর বা বাতী ভাগাভাগী হ'লেই পরিবারের বংশজাত পরিচয় যেমন আলাদা হয় তেমনি গায়কের সামান্য মতভেদ ছিঁ ঘরোয়ানার সৃষ্টি অমূলক। আর নিছক গায়কের মত ভেবে তির ঘরোয়ানার নিদর্শন হওয়া উচিত নয়।

সঙ্গীত সমাজে প্রকৃত কণ্ঠের বিনাশ সাধন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়ানার গায়কের বিশেষ গুণ দেখাতে গিয়ে। ওস্তাদী হয়তো যে কোন কারণে হোক তাঁর গলার স্বর মিষ্ট বা স্বরলালিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন বা পারেননি, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিল্পকলতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু শিষ্য তার ঘরোয়ানার বিশেষ গুণ দেখাতে গিয়ে তাঁর নিজের স্বকণ্ঠের অপব্যবহার করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু দৃষ্ট হয়। যে কোন বিষয়েই হোক গুণ অর্থাৎ ভাল জিনিষ নকল করা বড়ই শক্ত। কিন্তু ধারণাটা নকল করতে বেশী সময় লাগে না। তাই ওস্তাদীর শিল্পকলতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করার চেয়ে তাঁর দোষ-ত্রুটিগুলি বেশী বিদ্যমান দেখা যায় পুরুষাচর্য্যে।

আমাদের দেশে ও অন্তর্গত দেশে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দিনের দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণের দৃষ্টি শিল্পীর কণ্ঠের স্বরলালিত্য ও স্বরসাধনার দিকে সচেতন হ'চ্ছে। এই স্বরসাধনার বিষয়বস্তু নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং আজও হ'চ্ছে। এ সবকে তাঁরা বহু নির্দেশ পুস্তিকাকারে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। দ্বারা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিনা দ্বিধার শিক্ষা দিচ্ছে পরবর্তী যুগের কন্ঠীদের প্রতি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ও তাঁদের চিহ্নংসার পেশা এই বিষয়বস্তুর উপর নিবদ্ধ রেখে তাঁরা গায়কদের কঠসাধনার কাজে সচায়াতা করেন। এই ভাবে অমূল্যবস্তু শিক্ষাবিগুণ বিশিষ্ট শিল্পিগণ ও কঠসাধনার শিক্ষকগণ, দ্বারা নিজে গলার শারীরিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা পূর্ণভাবে নেননি, তাঁরা চিহ্নংসকের সাহায্যে প্রত্যেক কঠসঙ্গীতের সাধনার পথ ও পদ্ধতি অমূল্যবস্তু ক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। ফলতঃ কঠসাধনার বিশেষ উন্নতি পরিলাক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এই স্বরসাধনার পদ্ধতি সবচেয়ে অমূল্যবস্তু করলে জানা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ গলার স্বর ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে শিক্ষা ওস্তাদ উন্নত ধরণের শিক্ষকতায়। তাঁরা বলেন, কোন এক বিশেষ

ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি আছে বার বার। এই দোষটি মুক্ত গলায়
যে শুধু ধরে পরিণত হয়। কিন্তু সে সব শিক্ষাক্ষেত্র নিকট
গরে অল্পসন্ধান করলে তাঁদের নিকট হ'তে গলায় স্বয়ং সাধনার
পদ্ধতি ছাড়া অল্প কোন বিশেষ ধরণের পদ্ধতির আভাস পাওয়া
ায় না। এ বিষয়ে আরো বিশেষভাবে অল্পসন্ধানের পর জানা
ায় যে, মুকঠ ভগবানের দান। যে সব স্বর ক্রটিযুক্ত তা মুক
তেই এবং তা ভবিষ্যতে ঠিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।
যে ব্যক্তিক্রম হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন শিল্পীর গলায়
নিরুৎসাহতা সাধনার দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কি
দৃষ্টিতে তা সমুদ্র হয়েছে সে বিষয়ে সেই শিল্পী নিজেই জানেন
না। অনেক সময় আমরা শুনি যে গুণ্ডারদা তাঁদের বিশেষ
জ্ঞান রাখার জন্য তাঁরা তাঁদের পদ্ধতি ক'কেও জানতে দেন না।
কবলমাত্র তাঁদের নিজের পুত্র বা পুত্রবৎ শিষ্য ছাড়া। কিন্তু সে
ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শিষ্যের কঠে যে শিল্পকুলতা স্বচাচুর্ভূতা
টার পুর কিংবা পুত্রবৎ শিষ্যের কঠেও নাই। অবশেষে তাঁরা
দীকার করতে বাধ্য হন তাঁদের স্বসাধনার দৃষ্টিতেই অভাব এবং
নে করেন মুকঠ ভগবানেরই দান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ সম্বন্ধেও
টার একই মত পোষণ করেন।

পাশ্চাত্য দেশে একটি গবেষণাকারীর দল বীদেব মধ্যে বিশিষ্ট
সঙ্গীতজ্ঞ, কঠধ্বনি শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, শ্রবণশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, শরীর-
বিজ্ঞেয় বিজ্ঞাবিদ শারীরিক বিজ্ঞাবিদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের সাহায্যে
গবেষণার দ্বারা কঠসাধনার ও স্বসাধনার যে সব তথ্য আবিষ্কার
হয়েন, তার দ্বারা ভগবান প্রদত্ত কঠধ্বনের যুক্তি দ্বিগুণ হয়ে যায়।
এবে কঠধ্বনের যে গুণাগুণ থাকে তা ভগবান প্রদত্ত বলা যেতে
পারে। তা'কেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও কঠের ধ্বনিশাস্ত্রের দিকে
জয় রেখে শিক্ষিত করতে পারলেই মুকঠরূপে ও মুকঠভাবে মুকঠ
ধ্বনি করা যায়; বৈজ্ঞানিক গবেষণার কলহরূপ এই সিদ্ধান্তই আজ
প্রতিষ্ঠিত।

এখন প্রশ্ন উঠে, ভারতীয় কঠসঙ্গীতের স্বসাধনার পাশ্চাত্য—
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কিনা। কারণ এই বৈজ্ঞানিক
পদ্ধতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই
সই পদ্ধতি ভারতীয় কঠসঙ্গীতের স্বসাধনার গ্রহণ করলে ভারতীয়
কঠসঙ্গীতে পাশ্চাত্য কঠসঙ্গীতের প্রভাব এসে যাবে এবং ভারতীয়
কঠসঙ্গীতের আসল রূপ বিনষ্ট হ'বে, একদম ধারণা অনেকেই পোষণ
করেন মনের মধ্যে। আর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঠিক এরূপ
কোন গবেষণা হয়নি পূর্বে। তবে আজ কেন্দ্রীয় সরকারের সজ্জিত ও
বৈজ্ঞানিক গবেষণা-দপ্তর ভারতের বিশিষ্ট মেধাবীযুক্ত যুবক শিল্পীদের
হস্তরূপে তাঁদের দ্বারা এই গবেষণার সাহায্য করছেন অভিজ্ঞ
শিক্ষকের সম্পর্কে রেখে এবং তা'কেই আজ ঐ বিষয়ে অল্পসন্ধান
দায়িত্ব হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে অজ্ঞাত বিষয়ের উন্নতিয় সঙ্গে
দায়িত্ব বজায় রেখে কঠসঙ্গীতেরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা উন্নতি
দায়ন করা হয়েছে। তাই ভারতীয় কঠসঙ্গীতে স্বসাধনার ক্ষেত্রেও
উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভব।

এ বিষয়ে অল্পসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, আমাদের ভারতীয়
কঠসঙ্গীতের স্বসাধনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে পাশ্চাত্য
সঙ্গীতের প্রভাব আমরা নিজে প্রবেশ না করলে দাঁশার কোন

সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে অজ্ঞাত যুক্তি ছাড়াও সাধারণ যুক্তি
দিয়া আমরা দেখতে পাই যে কোন প্রকার শারীরিক অল্পসন্ধান
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার তার শরীরের রূপ রূপ হ'য় কিনা।
আর যে বিষয়ে যে দেশে গবেষণা বৈধ হ'য়ে তার উন্নতি সাধিত
হয়েছে ঠিক সেই বিষয়ে সেই দেশের নিজের বা পরামর্শ পৃথিবীর
সর্বশেষের সর্বলোকই গ্রহণ করে থাকে। তবে এই কঠসঙ্গীতের
স্বসাধনার ক্ষেত্রেও তাঁদের নির্দেশ কোন ক্ষতির কারণ হওয়া উচিত
নয়। মানুষের দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী
প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভেদে ভিন্ন নয়। যে প্রকার পাশ্চাত্য শিল্পীর
কঠধ্বন সমুদ্র হয় ঠিক সেই প্রকার প্রাচ্যের শিল্পীর কঠধ্বন সমুদ্র
না হবার কোন কারণ নাই। তবে প্রত্যেক ভাবে অভিজ্ঞ
স্বসাধনার ও ধ্বনি শ্রবণশাস্ত্রের শিক্ষকের নিকটেই শিক্ষা গ্রহণ
সহায়ক, অজ্ঞতার বিপরীত কল দৃষ্ট হয়। —নিমাইচাঁদ বড়াল।

রেকর্ড-পরিচয়

“হিজ মাস্টার্স ভয়েস” ও “কলম্বিয়া”র প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের
পরিচয় :—

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

N 82831—সত্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া নতুন ধরণের
আধুনিক গান—“তুমি যেথলা দিনের” ও “হু'টি এ কাকনের হুম।”

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে

ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন ব্যয়ের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
জন্ম লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—১/২, এঙ্গল্যান্ড ইন্সট, কলিকাতা - ১

N 82832—সুমন্থর হু'খানি আধুনিক গান "জনপদের ছাড়িয়ে সীমা" ও "স্বপ্ন রাত্তিতে কেন এলে"—সেয়েছেন তরুণ বন্দোপাধ্যায়।

N 82833—৩৮কুমার রায়ের জনপ্রিয় দু'টি কবিতা "বাবুবাঁস সাপুড়ে" ও "এই দুনিয়ায় সকল ভালো"—সুরের মায়ালালে পরিবেশন করেছেন সনৎ সিংহ।

N 82834—ভ্রামল মিত্রের কণ্ঠে হুম্মর দু'টি আধুনিক গান—"হয়তো সেদিন আগের মত" এবং "ভালোবাস তুমি ভনেছি অনেক বার।"

N 82835—চন্ডিদাস ও জগদানন্দ দাস রচিত হু'খানি যথু কীর্তনগান "সখি, কহিও নিচুঁর আগে" ও "কেন সেলাম বন্ধুনায়ে"—সেয়েছেন জীমতী সুরঙ্গীতি বোষ।

N 76086 এবং N 76087 রেকর্ড হু'খানিতে "শশীবাবু সঙ্গার" বাগীচির গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলহিয়া

GE 24957—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া হু'খানি আধুনিক গান—"সাগরের ডাট ডেট" ও "ওপো লজ্জাবতী।"

GE 24958—"এই রাত এই গান এই সন্ধ্যা" ও "নীল প্রজাপতি"—আধুনিক গান হু'খানিকে পরিবেশন করেছেন কুমারী গায়ত্রী বসু।

GE 24959—জীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়ের যথু কণ্ঠের আধুনিক গান—"কেন চলে যাবে" ও "ফুলের কানে কানে।"

GE 30422—"গুরু হরিদাস" বাগীচির হু'খানি গান সেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এক অভ্যন্ত শিল্পীরা।

GE 30425—মারা দে ও লতা মনেশকরের কণ্ঠে "লীপ খেলে বাই" বাগীচির হু'খানি জনপ্রিয় গান।

আমার কথা (৫৪)

কুমুম গোস্বামী

গানের কুমুমকলি জীবনশৈলীর সহজ হাসির দিনগুলিতে কুটে উঠেছিল পরিবারের একটি যমযুগ পরিবেশের প্রভাবে। জন্ম হয় বাংলা ১৩৩১ সালের ২৮শে ফাল্গুন ঢাকায়। পিতারই শরণে পোষারী ছিলেন ঢাকার সুপরিচিত সেতারী। তাঁর কাছেই প্রথম সংগীত শিক্ষার গোড়াপত্তন। পিতা হরিপ্রসন্ন গোস্বামী ভাল কীর্তন গাইতেন, তাই সংগীত চর্চার আদিপর্বেই কীর্তন নামগান দিয়েই আরম্ভ। এদিকে আবার বাতা লাবণ্যপ্রভা পোষারীও খুব ভাল গাইতে পারতেন কীর্তন ভজন। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবারের পরিবেশে থেকে আসলে গান করার বেওয়ার্জ ছিল না, তাই কতকাল শিক্ষার মধ্যে দিয়েই বাতার সংগীতচর্চা সীমিত হয়েছিল। আশ্রমের বৈকুণ্ঠ সাহিত্য ও কীর্তন সংগীত পারিবারিক প্রাচীন ঐতিহ্য-সুখে বতাবতই হানস গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। আজও মাঝে মাঝে স্মৃতি-রোমন্থনে মনে পড়ে পিতারই ধরেছেন সেতাবে তান আর পিতা হন্দ্রি হাতে গাইছেন কীর্তন গান।



কুমুম গোস্বামী

বাল্যশিক্ষার স্রবপাত হলো ঢাকার রাধাসুন্দরী গার্লস হাইস্কুলে। এখানে পরিচয় হয় বিজনবালা বোষ দত্তদ্বারের সঙ্গে। ঢাকার বহুর চারেক লেখাপড়া করার পরে পরিজনদের সঙ্গে চলে বেতে হলো তখন নারায়ণগঞ্জে। এখানে মরণ্যাম গার্লস হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়। ইংরাজী ১৯৩৭ সালে পরিবারবর্গের সঙ্গে চলে আসতে হলো কলকাতার বাগবাঁজারে মাতুলালয়ে। ছ' বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। বঙ্গিও লেখাপড়ার মধ্যে সংগীতচর্চাও বাদ যায়নি, তবুও এর পর থেকে বাসন্তী বিভাবীধি সংগীত বিভাগের ঠিক দ্বারাবাহিক শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সংগীত শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। বাসন্তী বিভাবীধিতে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা সংগীতবিদ রামকৃষ্ণ মিশ্র গ্রহণ কালে অভ্যস্ত সঙ্কট হয়ে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি অল্পমতি দান করেছিলেন। এ সময়ে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স, বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স প্রভৃতি বহু সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীর সম্মান ও পুরস্কার লাভ করার সুযোগ ঘটে।

ব্যক্তিগত ভাবে গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, উমাপদ ভট্টাচার্য, বাবিনী সন্দোপাধ্যায়, ইন্দ্রেন্দ্রনাথ মিত্র, তানসেন পাণ্ডে প্রমুখ

বহু সংগীত-শিল্পকের কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ আসে, কিন্তু সুগীতিকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল যে দিন নিজ গান লিখে, স্বর দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর ঘরচিত গান, সে কথা ভোলার নয়। হিন্দুস্থানি রেকর্ডিং কোম্পানীতেই নজরুলের সম্পর্কে আসার সুযোগ হয়। ১৯৩৮ সালে প্রথম হিন্দুস্থানি 'সই লো আমি করি কী উপার' এবং 'তোমার যে বঁধু আমি বাসিরাছি ভাল' গান দু'খানি রেকর্ড হয়েছিল। প্রথম বছরে আটখানার মত রেকর্ডে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা পারিষ্রমিক লাভ হয়। এই সময় শচীন বেববর্দনের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হওয়ার পরীণীতির প্রতি পূর্বের দরদ আরো প্রসার লাভ করে। নজরুলের চেষ্টায় মেগাকোন রেকর্ড কোম্পানীতেও যোগাযোগ হয়। 'মোর চুখনিশি কবে হবে ভোর' ও 'সন্ধ্যা ঘনালো আমার বিজন ঘরে'—সে সময়ের দু'টি জনপ্রিয় কাব্যসংগীত রেকর্ডিং হয়েছিল। এই সময়ে ভবানী দাসের সঙ্গে নীলিমা দাস ছদ্মনামেও কয়েকটি রেকর্ডিং হয়। দিলীপকুমার রায়ের সুর সংযোজনায়ও অনেক রেকর্ড হয়। হিন্দুস্থানি, মেগাকোন, হিজ মাস্টার্স ভয়েস প্রভৃৎ রেকর্ড কোম্পানীর নিম্নলিখিত কর্তন, পরীণীতি, নজরুলগীতি, আধুনিক, যুগ্ম, রাগপ্রধান, ভক্তিপ্রধান, ধর্মসংগীত, ভাট্টরাণী, বাউল, ভ্রাম্যসংগীত, ভজন, গজল, গীত, সারি ও অনেক ধারার বাংলা হিন্দী গানের রেকর্ড হয়েছে।

সর্বপ্রথম বেতারে গান প্রচারিত হয় নৃপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত গল্পবাহুর আসরে; তখন বিভাবীধির ছাত্রী। এর পর গীতজুবি প্রভৃতি অস্থায়ী ছাত্রী নিয়মিত বেতারে সংগীত পরিবেশন চলেছে।

বর্তমান সংগীতশিল্পী-জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে চলচ্চিত্রে নেপথ্যে (স্ট্রে ব্যাক) সংগীতশিল্পিরূপে সুনাম অর্জন। সে সময় 'বন্দী' কথাচিত্রের 'চোখে চোখে রাখি হার রে, তবু ভারে কুলে থাকি হার রে'—গানটি এতই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে যে পাঁচ ঘণ্টা তরুণদের হুধে বিশেষ করে বা অলস বিহানার শুনে তরুণীদের গাইতে শোনা যেতো। এটি পরিত্র চক্রবর্তীর সুরে জগদীশ মিত্রের সঙ্গে বৈভব কণ্ঠে গীত। চলচ্চিত্রে প্রথম অবত 'শত্ৰুঘ্না' চিত্রে মীরা দেবীর হয়ে নেপথ্যে গান করার সুযোগ হয়। এর পর থেকে রাইচাঁদ বড়াল, অনিল বাগচী, দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রভৃৎ বহু বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক তত্ত্বাবধানে এশার উপার, বন্দী, আহুতি, কবি, রামের স্মৃতি, বিরাজ বৌ প্রভৃতি অসংখ্য ছাত্রাচিত্রে নেপথ্য সংগীতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ্য হয়েছেন।

সোমপুরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একবার সাক্ষাতে তিনি তাঁর প্রার্থনা-সভার ভজন গানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেতে পারা যায়নি। পণ্ডিতেরী 'মা' একবার গান শুনে ভ্রমর হয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালে মহারাজা কুচবিহারের জম্মোত্সব-সভার আয়ত্তিত হয়ে যে সন্মান ও সমাদর লাভ ঘটছে তা একজন বাঙালী মহিলা শিল্পী হিসেবে অভাবনীয়। তারুজের বিভিন্ন ছানে বধা বিলাসপুর, নাসপুর, পণ্ডিতেরী, দায়কা, বোম্বাই, মধুবা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, দিল্লী ও কলকাতার বিচিত্রস্থানে সংগীত পরিবেশনের প্রভূত প্রশংসা ও অভিনন্দন আজও প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পাথে সংগীত সাধনার ও ছয় রাগ হরিশ্র রঙ্গিণীর পর্যালোচনার সঙ্গীত ব্যাপ্ত রেখেছে। সংগীতের সুরলোক জীবনকে আলোক-উজ্জ্বলিত করে অজানা একটি সুবর্ণ-সিংহবার খুলে দিয়েছে।

সেই প্রাগৈতিহাসিক মেয়ে

বিমলচন্দ্র সরকার

অন্ধকার গলিতার রয়েছে। শাড়ি
জানি তুমি প্রাগৈতিহাসিক সেই মেয়ে
কামনার বহির্লিখা নয়নের ছায়ে
প্রতীক্ষিতা আজ রূপের বেসাতী নিয়ে
আহা! কামায় ত্যাগে মৃতিমতী প্রতিমা
নিজেরে বিলিয়েও ঘুপাই করে জমা।
তুমি ঢাকার সেই ছাত্রী মালতী সেন
বিগত দ্বাদশ কি হ'ল কি করে যেন।

ছয়ছাত্রী তেলে এসে এই ক'লকাতা
হলে বাস্তবায়ন মাছেরই আর্জিতা
বৈভব মরলে তুমি ওদের চক্রে
পরিসরী সো পাঁড়ালে আসি পথপ্রান্তে!
নিজেরে আহুতি দিয়ে পাশব কামনার
সেবিধো লম্বা তুমি আজ মমতার
তবুও তোমার গুণ করে শুধু ঘুণা
জানি মূল্যে শোধ হবে না তোমার সেনা।

অনুত হুড়িয়ে পাও তবু অত্যাচার
হে কামার প্রতীক। তোমার নবতার।
তোমার ধননী দিরা ও উপদ্রব
জানি সীতা-সাবিত্রীর রক্ত আজো বয়
শক্তির অংশ তুমি দেবী মণ্ডিতা
সমাজকল্যাণী ওগো ভ্যাগের সখিতা।
দীপাধিতা তুমি সো মহিমার ভাষিতা
জননাই তোমারে লত সহজ প্রণতি।



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

ঢাকাই গল্প

ঢাকাই গল্প চলতি গল্প নয়—খোশ গল্প। অপবাদ আছে, বাঙালী শুধু কঁাদতেই জানে, হাসতে জানে না। কিন্তু ঢাকাই গল্প প্রেমাপন করবে বাঙালী শুধু কঁাদতেই জানে না, হাসতেও জানে এক সঙ্গে সঙ্গে হাসতেও জানে। ঢাকাই অমৃতি, ঢাকাই গহনা, ঢাকাই শাড়ী, এর সব কিছুই মথোই রয়েছে বৈশিষ্ট্যের ছাপ। ঢাকাই গল্প—এর মধ্যেও ফুটে উঠেছে সেই বৈশিষ্ট্য। পাঠক রুচ নিখোলে পড়তে পারবেন। লেখক শ্রীঅনিবাস সাহাও বাঙলা সাহিত্যে অপরিস্রুত নন এমন কি নবাগতও নন। তাঁর রচনার সঙ্গে বাঙলাদেশের পাঠক-পাঠিকার পরিচয় নেই। লেখার মধ্যে লেখকের বর্ণনাত্মক, রসস্থিতি ও বিজ্ঞানচাতুর্য প্রকাশের দাবী রাখে। প্রকাশক ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বক্স চট্টোয়া স্ট্রীট। দাম দুই টাকা মাত্র।

রোদ-জল-বড়

মানবজীবনে কয়রোগকে একমাত্র তুলনা করা চলে শূন্যের দুষ্টির সঙ্গে। এই রোগের আক্রমণ মানুষের জীবনকে কতখানি যে বিধিবে দিতে পারে সে বিষয়ে কেউই অবিস্মৃত নন। এর স্পর্শে মানুষের জীবনীশক্তি তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারে এই রোগের আবির্ভাব বিধাতার চরম অভিশাপেরই নামান্তর। আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমোন্নতির কলে এই রোগ দূরীকরণের নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এর কলে মধ্যবিত্তদের যে খুব বড় রকমের কোন উপকার হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেন না, এর ব্যয়ভার বহন করা সাধারণ মধ্যবিত্তদের পক্ষে প্রাথমিক ব্যাপার। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারে এর আবির্ভাব এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত, এই রোগ আসে অপ্রত্যাশিত, এক চরম সর্বনাশের বার্তাবহ রূপে, এই রোগ বিলম্ব নেয় অথবা বিপর্যক কেসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে—উপরোক্ত পটভূমিকা অবলম্বনে রোদ-জল-বড় উপন্যাসটির সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু এর শ্রুতি। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই অনন্ত প্রায়টি বখেট দক্ষতার সঙ্গে পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন দক্ষিণারঞ্জন শান্তনু ও মঞ্জুশ্রীকে কেন্দ্র করে। পঞ্চানন ও ফুল্লতার চরিত্র দুটি সৃষ্টি করে বর্ণোচিত চিত্র বস্তু ও অকিনন্দনযোগ্য 'মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন। চিকিৎসালয়ের পারিপার্শ্বিক পরিবেশটিও লেখনীর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থটির পাতার পাতায় লেখকের মানব-দরদী মনের আভাস

পাওয়া যায়, মানুষের অসহায় কল্পন অবস্থা লেখকের মনে ব্যাধার সৃষ্টি করে। চুঃখের ত্রিধাম রাত্রি অতিক্রম করে আনন্দের প্রভাত-স্বপ্নের আলোকরশ্মি মানব সমাজ প্রাণ ভরে উপভোগ করুক—লেখকের এই মনোবাসনাই গ্রন্থটির পাতার পাতায় ফুটে উঠেছে। প্রকাশক—পণ্ডার লাইব্রেরী ১১৫। ১-বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম সাড়ে চার টাকা মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধ্যাপনার ক্ষেত্রে জীভুৎবে চৌধুরী একজন বশবী পুরুষ। সাহিত্যের দরবারেও তিনি আগ্রহী নন। সাহিত্য বিষয়ক তাঁর বহু রচনা বাঙলা সাহিত্যকে বখেট সমৃদ্ধ করেছে। বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর সাম্প্রতিক নিদর্শন। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য যোগ। সাহিত্যের ইতিহাস মানুষেরই ইতিহাস। মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ব্যাপক জরযাত্রার ও ক্রমাগতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে। এক-একজন সাহিত্যিকার আপন আপন যুগকে—যুগ-সভ্যতাকে ফুটিয়ে তোলেন আপন আপন সাহিত্যে, বিভিন্ন কালের সাহিত্যিকদের লেখনীর কল্যাণে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সভ্যতার ছবি ধরা পড়ল সাহিত্যে, এমনি করেই বহু শতাব্দীব্যাপী জরযাত্রা এবং নব নব সৃষ্টির কলে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে—সেই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল সভ্যতার সর্বকালের এক সার্থক আলো। মানুষের ভাব-ভাষা, আনন্দ-বেদনা, চিন্তা-কল্পনা প্রকাশ করতে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থে অধ্যাপক চৌধুরী বাঙলা-দেশ বাঙলা ভাষা, চর্চাপন বাঙলা সাহিত্যের আদিম যুগ থেকে প্রকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের এক আলোকোজ্জ্বল যুগের বিবরণ শিপিষক করে গেলেন। গ্রন্থটি যুগপৎ পাঠক সমাজ ও ছাত্র সমাজের উপকার সাধন করবে। সাধারণ সাহিত্য পাঠকের দরবারে আমাদের সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের আলোচনা যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। সমগ্র গ্রন্থটি গ্রন্থকারের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে। গ্রন্থটি অসংখ্য অন্তঃসাহায্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের আলোচনা বখেট গুরুত্বপূর্ণ সারগর্ভ ও মনোবহ। এই গ্রন্থের বহুল প্রসার ও প্রচার আমরা কামনা করি। প্রকাশক

বুকলাও প্রাইভেট লিমিটেড। ১ নম্বর বোম্ব লেন, কলকাতা-৬।
দায় সাত টাকা মাত্র।

প্রেমতারী এবং এতটুকু আশা

হাজার হাজার মানুষকে অক্লান্ত আনন্দ দিয়ে চলেছে একদল শিল্পী বিপদের সভাবনকে চোখের সামনে রেখে। সার্কাসের শিল্পী। প্রতি মুহূর্তে এরা জীবন-চুর্বোলের মুখোমুখি ঝাঁড়িয়ে কিছু সেই অবস্থার দর্শক দরবারে এদের আনন্দরস পরিবেশনে এতটুকু হেঁচ পড়ে না। শিল্পী হিসেবে এদের কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয় এবং অনেকের থেকেই বেশী। কেন না চরম বিপদের সামনে ঝাঁড়িয়ে 'অসম্ভাব্য মানুষের মনে বারান্ন নিয়ত আনন্দ ছুঁগিয়ে চলেছে তারা যে কতখানি শক্তিশালী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু তার বিনিময়ে এরা কি পায়? এতখানি দুর্ভাগ্য সাহস কর্তার পরিশ্রম পরিপূর্ণ নিষ্ঠা দিয়ে এরা যে কাজ করে থাকে তার জন্যে এদের জীবনে কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিটুকু পর্যন্ত নেই, যে মুহূর্তে এরা ক্রীড়াভঙ্গি থেকে বিদায় নেয় সেই মুহূর্তেই তো এরা বুঁদে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে, এদের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য মানুষের স্মৃতির ইতিহাসে পায় না এতটুকু স্থান। এই পটভূমির ভিত্তিতে প্রেমমোক্ত উপজাতিটি রচিত হয়েছে বাঙালার প্রতিভাময়ী সাহিত্যশিল্পী ঐশ্বরী মহাশেখা ডাটাচার্জের লেখনী থেকে। বিভীষাক্ত উপজাতিও তাঁর লেখনীজাত। প্রথম উপজাতিটিতে লেখিকা সার্কাসশিল্পীদের জীবনের উপান-পত্তন চাওরা-পাওয়া লাভ-লোকসান এবং সর্বাংশের তাদের জীবনবৈশিষ্ট্যকে লেখনীর মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। সার্কাস-জগতের পূর্ণাঙ্গ এক অভ্যন্তরীণ চিত্রও এখান থেকে বর্ণিত নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় উপজাতিটিতে দেখা যাচ্ছে যে এই জাত-প্রতিবাদময় জগতের কটকাকর্ণি পথ দিয়ে মানুষ হাসিমুখে এগিয়ে চলেছে আলার একটুখানি আলো অঙ্গুরণ করে। মানুষের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি প্রাপ্তিতে এই একটুখানি আশারই প্রভাব অবর্ণনীয়। কিসের আশা? বিচবার আশা। জগতের বিরাটই আজ আর মানুষের কাছে অল্পলক্ষ্য নয়। জগতের মানুষ জগতের সঙ্গে তাল তাল রেখে চলতে চায়, গড়ে তুলতে চায় তারও একটি নিজস্ব জগৎ। ছোট হোক ক্ষতি নেই, কোণ হয় তো হোক না, তবু তো তার নিজস্ব, যেখানে তার সঙ্গে একত্রে বাসা বাঁধার আনন্দ, প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা এই সৃষ্টির স্বপ্ন অধিকার করে আছে মানুষের মন, মানবচিন্তা গঠনবাকুল। এই একটুখানি আশাকে অবলম্বন করেই মানুষ গড়ে তুলতে চায় তার আপন জগৎ। দেখা যাচ্ছে যে জীবনের বৈচিত্র্য থাকার ক্ষেত্রে ঐ একটু আশার আনন্দ অসামান্য। জীবনবাহ্যর এক নির্ভূত বাস্তব চিত্র উপজাতিটির পাতার পাতায় ফুটে ওঠে।

উভয় উপজাতিই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাষার। ঘটনাবিত্তাস, চরিত্রসংকীর্ণ, বর্ণনার প্রাজ্ঞতায লেখিকা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বক্তিত শিল্পিকুলকে সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের বখাওয়াপ্য সমান দিয়ে লেখিকা বহুজনের বক্তব্য লাভ করবেন। লেখিকার বিভাসজন্যী অপরূপ, প্রকাশ-সম্বদ্ধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আভ্যন্তরিকতা সাধুবাহার। এই চটি মুগোপযোগী বর্ণনায় আবেশন বহন করে। প্রাঙ্গনশিল্পের

দৃশ্যতার কম পরিচয় দেন নি। প্রেমতারার প্রাঙ্গনশিল্পীর নাম জানা গেল না। এতটুকু আশার প্রাঙ্গন একেছেন ঐশ্বরী মহাশেখা। প্রেমতারার প্রকাশক এবং, সি, সরকার রায়ও সল প্রাইভেট লিমিটেড, দায়—চার টাকা মাত্র। এতটুকু আশার প্রকাশক—কল্পনা প্রকাশনী, ১১ ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট। দায়—তিন টাকা মাত্র।

ক'টি কবিতা ও একলব্য

বর্তমান বাঙালার কবিত্বের মধ্যে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এক বিশেষ আসনের অধিকারী। বাঙলা দেশের শক্তিশালী কবিত্বের মধ্যে তিনি অন্ততম। বাঙলা কবিত্বের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও তিনি করেছেন বর্ধেই সহায়তা ক'টি কবিতা ও একলব্য তাঁর বর্তমান কাব্যগ্রন্থে। ক'টি কবিতা এবং "একলব্য" চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি কাব্যনাট্য এই গ্রন্থের অঙ্গ। কবিতাগুলি তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করছে, স্বকীয়তার আলোর উজ্জ্বল, ভাব-প্রাচুর্যের দিক দিয়েও অসাধারণ। কবিতাগুলি বেন কবির অন্তরের কোমলতা। পৃথিবীর প্রতি বিপুল ভালোবাসার বৈচিত্র্যের প্রতি অসীম আকর্ষণের এক-একটি অলঙ্কার দৃষ্টান্ত, একলব্যের জীবন গ্রন্থের সম্যক প্রস্তুত ঘটছে একলব্যের মধ্যে। ভাবের দিক থেকে ব্যঙ্গনার দিক থেকে প্রকাশের দিক থেকে গ্রন্থখানি সর্বতোভাবে এক অভিনবত্বের স্পর্শ বহন করছে। প্রাঙ্গনপটটি সুসজ্জিত, প্রাঙ্গনশিল্পী স্বনামধন্য ঐশ্বরী মহাশেখা চৌধুরী। প্রকাশক—ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দায়—চুটাকা মাত্র।

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা

সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতির জন্মে অনন্ত ঐশ্বর্য রেখে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্য সারা জগতের সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। রবীন্দ্রনাথের অল্পম সাহিত্যকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে যে সমালোচনার বিরাট ধারা বয়ে গেছে তার ধারাও সাহিত্য বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে, তার ফলে সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের হয়েছে ধারোদ্ঘাটন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা করে বহু জন লেখনী ধারণ করে পরবর্তীকালে অভিজ্ঞ সমালোচক হিসেবে সাহিত্যের দরবারে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছেন। বিশেষে এই জাতীয় গ্রন্থের নব্বুন আমরা শেরেহি (Shakespeare Criticism ও Chancery Criticism) কিন্তু বাঙলা দেশে ঠিক এই ধরনের গ্রন্থ এই প্রথম জন্মাল। এ কাজে গ্রন্থকার প্রাথমিক ভূ: সাহিত্য ওহেদেবার নিঃসন্দেহে আমাদের বক্তব্যবাহার। বিভিন্ন রূপে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্য কোন রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে বিভিন্ন সমালোচকের সামনে, ঐ সাহিত্য সমূহ কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করল সমালোচকের মনে, সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচকের কি মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া গেল, তদুপরি রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যর, ভাব, কল্পনা, স্বরূপ, সারবত্তা, চিন্তাবাহার কোন কোন সমালোচকের দ্বারা কি ভাবে বিশ্লেষিত হ'ল, ব্যাখ্যা কত হল, আলোচিত হ'ল, এই সকল বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করলে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত হওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রথমদে প্রকাশ

বখেই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, গ্রন্থকারের প্রভুত্ব
এম বীকার গ্রন্থটিকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছে। ১২৮০ খেকে
১৩৬০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ আশী বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে
কেন্দ্র করে যে বিরাট সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠল তার ইতিবৃত্ত এই
একটি গ্রন্থের মাধ্যমে বখেই স্পষ্ট ভাবে পরিবেশন করে গ্রন্থকার
শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেলেন। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন
ঐশ্বরী মৈত্রেয়ী দেবী। প্রকাশক—এভারেস্ট বুক হাউস, ১৪ সাউথ
সি বি রোড। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সৌধীন নাট্যকলার রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য সৃষ্টির যে বিভাগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী হাতের
ছোঁয়া লেগেছে সঙ্গ সঙ্গ সেই বিভাগ সমর্থ হয়েছে পূর্ণতার
রসাকালনে, সৃষ্টির সকল দুয়ারই সর্বদা সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল
কবিত্বের জন্ম, দেশীর নাট্যকলার ইতিহাস সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথের
অবদান অসামান্য। সৌধীন নাট্যকলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের
জীবনব্যাপী যোগাযোগের এক অনবদ্য আলোচ্য লেখনীর মাধ্যমে এই
গ্রন্থে অঙ্কিত করেছেন ঐহেমেন্দ্রকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-
জীবন সৃষ্টিতে তাঁর সুগভীর আলোচনা। এই গ্রন্থটির আকারে রূপ
নিরেখে। হেমেন্দ্রকুমার রায় কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যের বাহুরই
নন, রবীন্দ্রবোধের মধ্যেও তাঁর আসন প্রথম সারিতে; এ ক্ষেত্রে
তার চেয়েও বড় কথা যে আমাদের নাট্যশালায় এই সুদীর্ঘ কালের
ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ অধারিট তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন
ঘটনাবলী এবং কাহিনীর সঙ্গে তিনি সুপরিচিত, নাট্যশালায় সঙ্গে
জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিবৃন্দের বিবরণীও তাঁর অজানা নয়—সেইজন্মেই
আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সৃষ্টিতে হেমেন্দ্রকুমারের
আলোচনা যেমনই মূল্যবান তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে
আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে হেমেন্দ্রকুমারের অবদানের
প্রমাণও অসংখ্য তথ্যের মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন
সৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ছাড়াও এ দেশে নাট্যকলার ও
নাট্যশালায় উত্তরকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত তার
ক্রমবর্ধন, প্রভুত্ব প্রসার ও ব্যাপক জয়যাত্রার এক প্রামাণ্য ইতিহাস
পরিবেশনের ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রকুমার বখেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
"নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব" অধ্যায়টি মনে বিশেষভাবে
প্রভাব বিস্তার করে। নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের স্তম্ভ আবির্ভাব
বাঙালদেশের নাট্যলোককে সৃষ্টির সিংহদ্বার অভিযুগে আনুলেভ
হাতে যে কতখানি সহায়তা করেছে, সে বিষয়ে সম্যক জানলাভ
করা যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই গ্রন্থটি পাঠ করলে। দৃশিক
মহলে এই গ্রন্থ তাঁর বর্ণাশ্রম্য সমাদর লাভ করবে বলে আমরা
অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান হ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড। দাম—তিন
টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা মাত্র।

ভেলকি থেকে ভেজ

ভেলকিতে বার হুচনা ভেজতে তারই সৌরভের পরিণতি—
আজ বিশ শতাব্দীর আলোর ভেলকিগ্রন্থের যে রূপটি আমাদের
চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে, স্রষ্টাটিকে কাল এতখানি

আলোকোচ্ছল রূপ নিয়ে তখনকার মানুষের সামনে এই শব্দ
ধরা দেয় নি। কালের বসতি পথকেপের সঙ্গে ভালো ভাল বেধে
মানুষ যেমন বীরে বীরে তার আদিম বস্তু, অসভ্য, পশুভাব কাটরে
ক্রমে রূপান্তরিত হল স্তম্ভ, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত মানব,
তেমনই তাকে কেন্দ্র করে যে সব শব্দ গড়ে উঠেছে তাদের
ইতিহাসও অল্পরূপ। আজকে ভেলকিগ্রন্থের যে মহিমাযুক্ত রূপটি
আমাদের সামনে প্রতীয়মান তার ইতিহাসের প্রসঙ্গসুগের বর্ধনতার
অধ্যায় থেকে শুরু করে তার বর্তমানকালের ব্যাপক জয়যাত্রার
খুঁটিনাটি বিষয়ক সারবান আলোচনা গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য।
মানুষের চেতনা কেমন করে সজীব হয়ে উঠল, কবে, কোথায়,
কি পরিবেশে মানুষ প্রথম অল্পভব করল যে ভেলকিবাজার কাছ
শেব হয়েছে, জীবনটা পুতুলখেলা নয়, তারপর বহুকালের সেই
বন্ধ দুয়ার কেমন করে খুলে গেল, তার কলে মানুষের মনোমন্দিরে
প্রবেশ করল মুঠো মুঠো স্বপ্ন-সম্ভাবনা, প্রাণজয়ী প্রত্যাশা,
অগ্রগমনের অপ্রতিরোধ্য অভিল্য তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা
গ্রন্থের অল্পপুষ্টি করেছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন
যোগের অভিনব আবিষ্কার, ভেলকিগ্রন্থের ইতিহাসে দিকপাল
আবিষ্কারকদের আবির্ভাব তাঁদের সাধনার অনন্তসাধারণ কাহিনী,
ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক কাহিনীর উল্লেখ, অসংখ্য চিত্রের
সংযোজন সর্বতোভাবে গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধি করে। লেখক
আনন্দকিশোর মুন্ডার অনবদ্য বর্ণনা যেমনই রসসমৃদ্ধ, যেমনই
তথ্যপূর্ণ, তেমনই জলরসগ্রাহী। চিকিৎসাশাস্ত্রের অতুলনীয়
আবিষ্কারগুলির সরস, মধুর ও প্রাঞ্জল বর্ণনায় তিনি আশাতীত
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরম সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি সকল
শ্রেণীর পাঠকদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।
পাঠকসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠে শুধু পড়ার আনন্দই পাবেন না, প্রভুত
জ্ঞানলাভেও সমর্থ হবেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।
প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম
চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—৮ টাকা মাত্র।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে

অপরাজেয় কথাসিদ্ধী শরৎচন্দ্রের বসিষ্ঠ সম্পর্কে বীরা বীরা
এসেছেন বাঙলার বর্ষায়ান সাহিত্যিক ঐক্যসমাজ মুখোপাধ্যায়
মহাশয় তাঁদেরই একজন। খুব কাছের একটি কোণ থেকে
শরৎচন্দ্রকে বীরা প্রত্যক্ষ করেছেন, শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটে যাওয়া
বহু কাহিনীর সাক্ষিকরূপে আজও বীরা আমাদের মধ্যে আছেন,
এমন ঘটনা আছে হার বার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের উপর দিয়েও
সুপর্ণ ভাবে বয়ে গেছে, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন।
মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে
পারে যে বছর তিনেক আগে শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত অসমঞ্জ বাবু
স্মৃতিকথা ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে।
বর্তমানে তারই গ্রন্থরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থটিতে লেখক
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বসিষ্ঠতার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণী
বখেই দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ্যে অজানা বহু
তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। অসমঞ্জ বাবুর আন্তরিকতাপূর্ণ
দরদরতা বর্ণনা সৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ও

দয়ন্তরা বর্ণনার এবং সর্বোপরি তাঁর রচনামৈলুপে অতীতের অজ্ঞান রচনা নকুন করে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মানুষ শরৎচন্দ্রের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা যেমনই অনবদ্য, তেমনই মনোজ্ঞ এবং তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। বলা বাহুল্য, তাঁর স্মৃতিকথা রচনার তাঁর লেখনী যথোচিত শক্তির পরিচয়ই প্রদান করেছে। যে শরৎচন্দ্রের নিবিড় সান্নিধ্যে আপন জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে তাঁর বিরোগব্যথা যে লেখকের মনকে কতখানি বিধর করে তুলেছে তার সম্যক প্রতিচ্ছবিও গ্রন্থটি থেকে অদৃশ্যিত নয়।

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড। দাম দুটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

ভূষণের অভ্যন্তরে

আচার্য গ্রামাশ্রমদের অকাল প্রয়াণ বাঙালীকে কতখানি পুত করে দিয়েছে তার তুলনা মেলে না। সত্যি মানুষের জীবনের সার্থক পরিণতি, সত্যি আছে বলেই জীবন পূর্ণ, প্রত্যহ্ন কোভ সেজ্ঞে নয়, কোভ এই জ্ঞে যে, গ্রামাশ্রমদের জীবনে সত্যি যেভাবে এল তা যেমনই কল্প, তেমনই মর্যাদিক। বিচরণ ও বৃন্দশী ব্যক্তিমাতেই আশা করি এ বিষয়ে একমত হবেন যে গ্রামাশ্রমদের সত্যি এক কুৎসিত যজ্ঞবন্তর মর্যাদা পরিণতি। বিজ্ঞান, বিবেচনামূলক ত্রুণশী ভাষ্যত সরকার জনস্বার্থবিরোধী ভ্রমাত্মক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করার ফলেই গ্রামাশ্রমদিকে পুত্র কান্দীরে বৃন্দনহীন অবস্থায় এনে পরিণেপে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় সত্যবরণ করতে হল। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই প্রবীর জননেতার যুক্তিধর্মী সমালোচনার প্রমাণ গণলেন ভারত সরকার—তার পরবর্তী কালের ইতিহাস কালো অজানা নয়। পরত্যাগী যুক্তি গ্রামাশ্রমদের জীবনের শেষ অগ্নয় এবং প্রধানতঃ তাঁর কান্দীরে থাকাকালীন ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ ধারা খুঁটিয়ে জানতে চান এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা উপকৃত হবেন। সংক্ষেপে গ্রামাশ্রমদের বিতর্ক, তারপর তাঁর কান্দীরে ব্যক্তির প্রজ্ঞতি থেকে শুরু করে কলকাতায় তাঁর মৃতদেহ আনয়ন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ পর্যন্ত গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেলেন লেখক শ্রীজ্যোৎস্নাময় চৌধুরী। গ্রন্থটিকে গ্রামাশ্রমদের জীবনের শেষাংশের একটি প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জী অনায়াসে বলা চলে। তাঁর শেষ জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি বলে গ্রন্থটিকে অভিহিত করলেও ভুল হয় না। কান্দীরাজ্যের সকল বিষয়ক সন্ধিগু ইতিহাস, আবহুজ্জায় জীবনের পরিচয় এবং আরও বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লেখকের বলবার ভঙ্গী অপরূপ, আগাগোড়া ইতিহাসকে তিনি গল্পের রূপ দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। আরতনের দিক দিয়েও গ্রন্থটি নাতিদীর্ঘ। অল্প পরিসরে এত বড় একটি বিবৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও স্মরণগ্রাহী বর্ণনার লেখক অনন্তস্বাধীন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গ্রন্থের কৃত্রিমতা রচনা করছেন পরম প্রজ্ঞান্বিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ মহাশয়। এই সুপোষাগী গ্রন্থটির আশপাশে প্রচার আমাদের কাম্য। প্রকাশক—শ্রীকান্দীপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ২-এ কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম—তিন টাকা মাত্র।

অভিষেক

বিরোধের ইতিহাস স্মৃতিতে ধারাবাহিকী বিরোধের অবদান কম নয়। এর জন্ম ছিল ব্রহ্মদেশ। এতে ইন্দু ক্রোশাল সাইয়ন কবিশ্রমের স্মৃতিভিকার কৃত জনগণ আর স্রশোবিত কৃষকসম্প্রদায়। এই বিরোধের প্রধান নায়ক ছিলেন শেখা শান। সাধারণ মানুষের মনোবাক্যে এই বিরোধ কম প্রভাব বিস্তার করে নি। বর্তমানে এই বিরোধের পটভূমিকা অবলম্বন করে পূর্বোক্ত উপজাতি রচনা করেছেন শক্তিমান সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে হরিনারায়ণ বাবুর প্রত্যক্ষ পরিচয়ও অগভীর নয়। ব্রহ্মদেশের হরিনারায়ণ বাবুর জীবনেও ঘটেছে। বিরোধের পটভূমিকার উপজাতি স্মৃতি—বর্তমানেই রাজনীতিও উপজাতির মধ্যে এসে গেছে অবশ্য, তাই বলে সমগ্র উপজাতি কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ মানুষ তার জীবন, তার স্বপ্ন-কল্পনা, তার আশা, আকাংক্ষা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনাও উপজাতির পাতায় তাদের বর্ণাশ্রাণ্য স্থান পেয়েছে। এই সত্যের ওপানকার মানুষের মনের এক অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে হরিনারায়ণ বাবুর লেখনীর বলিষ্ঠতায়। উপজাতির নামকরণও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উপজাতির মধ্যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত করে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র উপজাতি বহুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীর শ্রুনাং বর্ধনে প্রভূত সহায়তা করবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম

প্রেম রবীন্দ্র-রচনার এক প্রধান অঙ্গ। প্রেমকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, ভাবধারা, কল্পনা রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরদত্ত লেখনীর কল্যাণে তাঁর স্মৃতি অনবদ্য চরিত্রগুলির মাধ্যমে সাহিত্যের মধ্যে প্রেম এক মহিমময় দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে। প্রেমবাদ রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছে এক অভিনব মূর্তিতে, তার ফলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোবাগারে প্রেম এক মহাধর্ম বৃত্ত হিসেবে পরিগণিত। ঈশ্বরী মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছে অপরিচিতা নন। ইতিপূর্বে মাসিক বহুমতীতে তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম সম্পর্কে আলোচনার তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের বিশিষ্টতা, বিশুদ্ধতা ও বিচিত্রতা সবচেয়ে তাঁর আলোচনা যেমনই সারগর্ভ, তেমনই মনোহর। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেমের স্বরূপ সবচেয়ে তাঁর মনোজ্ঞ আলোচনা স্বভাবের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমবাদের নিখুঁত বিশ্লেষণকর্মে লেখিকা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রপূর্ণ বাঙলা-সাহিত্যে প্রেমের রূপ ও রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রেম সাহিত্যের সূচনা সবচেয়ে লেখিকার আলোচনার ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের যে প্রতিচ্ছবি আমরা পাই, সেই সম্পর্কে লেখিকার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যান ও ভাব্যকরণ আরও স্পষ্ট জোরালো ও বিশেষত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাঙলার অস্তমত প্রথম প্রেমী রূপশিল্পী নাজানা প্রীতি ও ওয়ার্কস রূপকর্মে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—নাজানা, ৪৭, গণপল্লভ এজিনিউ। দাম—তিন টাকা মাত্র।

দেশে-বিদেশে

আষাঢ়—১৩৬৬ (জুন-জুলাই, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৬ই জুন): ছয় দিবস ব্যাপীসিঙল সফর উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সমলবলে কলকাতা উপস্থিত।

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন): কলিকাতা পৌরসভার বিশেষ অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের উৎসবজনক খাত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

৩রা আষাঢ় (১৮ই জুন): প্রবল বর্ষণ আসাম ও ইন্দলের বিতর্পিত অঞ্চল প্রাণিত—২৬ নদীতে জলোচ্ছ্বাস।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন): কবিমণ্ডল সীমান্তে পুনরায় সশস্ত্র পাক সৈন্যের হানা—পাখারিয়া অঞ্চলে গুলীবর্ষণ অব্যাহত।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন): মুম্বাইতে সাংবাদিক বৈঠকে দালাই লামা কর্তৃক তিব্বত প্রদেশের সমাধানকল্পে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর বৈঠকে আগ্রহ প্রকাশ।

৬ই আষাঢ় (২১শে জুন): জবলপুরে শ্রীনেহরু কর্তৃক সামরিক বান নির্মাণ কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

৭ই আষাঢ় (২২শে জুন): পশ্চিমবঙ্গে সেভা প্রথা ও খাতিশ্রয়ের মূল্যনিয়ন্ত্রণ-বাবস্থা প্রত্যাহার—সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

৮ই আষাঢ় (২৩শে জুন): নূনতম বেতন আদায়ের লক্ষ্য বিভিন্ন অঞ্চলে পৌর কর্মচারীদের ধর্মঘট।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের চলিত ১১৫১ সালের স্থল-ফাইনাল পরীক্ষার নিয়মিত ছাত্রদের শতকরা ৪৪.৬৭ জন এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ২৬.৬৬ জন উত্তীর্ণ।

৯ই আষাঢ় (২৪শে জুন): দিল্লী পৌরসভার মেয়র পদে কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত করিয়া প্রোগ্রেসিভ দলের নেতা শ্রীত্রিলোকচাঁদ নির্বাচিত।

১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন): মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে রাজ্য সরকারের অন্তর্গত-বিরোধী ষাণ্ডনীতির প্রতিবাদে কলিকাতা ও মক্কেল অঞ্চলে সর্বসাধারণের হরতাল।

১১ই আষাঢ় (২৬শে জুন): নবদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে কেবল পরিহিতি সম্পর্কে আলোচনা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক অবস্থা বিশ্লেষণ।

ভৃতীয় গণবাদনিক পরিকল্পনায় করাতা বাঁধ অসম্পূর্ণ করা হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় পরিবহন ও বাণোযোগ সচিব শ্রী এস কে পাতিলের ঘৃণাটী আশ্বাস দান।

১২ই আষাঢ় (২৭শে জুন): ভারতীয় কনুনিট পার্টি কর্তৃক কেবলে নতুন নির্বাচন (মধ্যবর্তী) অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রস্তাব প্রণয়ন।

বহুবিধ

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ধর্মঘটের আশ্রমে পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা কর্মচারীদের ৬ দিন ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার।

দিল্লীতে কেবল পরিহিতি সম্পর্কে কংগ্রেস হাই কমান্ডের সহিত কেবল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জরুরী বৈঠক।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন): নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাহাড়ির (৭০) স্বগ্রহণে বরাহনগরে জীবন-লীপ নির্ধারণ।

দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের বৈঠকে প্রস্তাব—সাংবাদিক নির্বাচনই কেবল সমস্ত সমাধানের একমাত্র গণতান্ত্রিক উপায়।

১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন): কান্দীর-সীমান্তে দুই জন ভারতীয় পাকিস্তানিদের দ্বারা অপহৃত।

পাঞ্জাব ইন্ডিয়ানিং কলেজ কর্তৃক মহাশূন্তে ৪টি বকেট উৎক্ষেপণ।

১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই): জুন মাসে (১২ই জুন হইতে ৩০শে জুন) কেবলে সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে ২৪,১৬১ জন প্রেষণার—কেবল সরকারের ইচ্ছাহার।

১৭ই আষাঢ় (২রা জুলাই): দ্বিভাষিক ঘোষাই রাজ্য গঠন আন্দোলন কালে আমোদবাদের বিগত বর্ষে পুলিশ বে গুলীচালনা করে, তাহা সন্ত হইয়াছে বলিয়া সরকারী তদন্ত কমিশনের (বিচারপতি শ্রী এস টি কোটওয়াল কমিশন) রিপোর্টে মন্তব্য।

১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই): নিকট ধরনের চাউল সরবরাহের অভাবগে দমদম সেনট্রাল জেলে কয়েদীদের অনশন ধর্মঘট।

১৯শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই): দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ আর জি মেজিসের পর পর বৈঠক।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই): অবিরাম বর্ষণের ফলে অবশিষ্ট ভারত হইতে কান্দীর উপত্যকা একরূপ বিচ্ছিন্ন।

উপররাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ফিলিপাইন, মারিণ যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জাভানী সফরে যাত্রা।

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) পশ্চিমবঙ্গের খাত পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খাতসচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের সভাপতিত্বে দিল্লীতে সর্বদলীয় বৈঠক।

২২শে আষাঢ় (৭ই জুলাই): সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—ভারতে কোন তিব্বতী সংস্কারের আন্তর্জাতিকায় করা চলিতে পারে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (অধ্যাপক শ্রীনিধি-কুমার সিদ্ধান্ত) হস্তক্ষেপের পর মহারাঞ্জা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের (কলিকাতা) ছাত্র ও অধ্যাপকদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহত।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই): আসাম সীমান্তের নতুন নতুন অঞ্চলে পাকসৈন্যের গুলীবর্ষণের সংবাদ।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত সমাজকল্যাণ ও অনুরক্ত প্রোগ্রাম কল্যাণ সক্রান্ত কমিটির রিপোর্টে সমাজকল্যাণ-কর্মী সংস্থা গঠনের সুপারিশ।

২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): রাষ্ট্রপতির নিকট কেবল প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেবল সরকারের (কনুনিট) বিরুদ্ধে অজিবাগপত্র (চাক্ষুণীট) পেশ।

মিষ্টি স্নরের : তা'লে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছনে, আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটএর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

কেবল পরিবর্তিত প্রসঙ্গে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত কেবলের মুখ্যমন্ত্রী জিই, এম. এম. জিনা মুখ্রিপাদের বৈঠক।

২৬শে আষাঢ় (১১ই জুলাই) : মণিপুরের ভায়েল্লভ-এ নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার মণিপুর চীক কমিশনার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকা 'উপদ্রুত অঞ্চল' বলিয়া ঘোষিত।

সিমলায় প্রধান মন্ত্রী জিনেহর সহিত কেবলের মুখ্যমন্ত্রী জিনা মুখ্রিপাদের (কম্মুনিষ্ট) সাক্ষাৎকার।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) : কেবলে সরকার-বিরোধী আন্দোলন প্রত্যাহত হইলে নির্বাচন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে— দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে কেবল মুখ্যমন্ত্রী জিনা মুখ্রিপাদের ঘোষণা।

২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই) : কেবলে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে ১২ই জুন হইতে এক মাস মধ্যে ১৮০ জন দণ্ডিত।

জনকলাপমূলক সংস্থাসমূহে (বিশেষতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল) বর্ধঘট নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিল প্রণয়ন।

২৯শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই) : প্রবল বর্ষণ ও ধ্বংস নামার ফলে কালিম্পাং মহকুমার ১ জন ফুটবল খেলোয়াড় সমেত মোট ৩২ জন নিহত হওয়ার সংবাদ।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : কেবল মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে কেবল রাজ্যপালের নিকট বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিত্ব ও বিমোচন সমর-সমিতির নেতা জীমাদাথ পন্নাজনের স্মারকলিপি পেশ।

প্রবল বড় ও বুলিতে কচ্ছের সদর ভূজ বহির্বিধ হইতে বিচ্ছিন্ন।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : ২৪-পরগণা জেলার বাগলা থানার একটি স্থলে পাকিস্তানী হানা—২জন ভারতীয়কে বলপূর্বক অপহরণ ও তিনজন লুণ্ঠন।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : কেবল পরিবর্তিত প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কেবলের রাজ্যপাল জীমাদাথক রাওকে দিল্লিতে আহ্বান।

বহির্দেশীয়—

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন) : বার্লিন সম্পর্কে ৩৮ দিনব্যাপী জেনেভা সম্মেলনের 'অচলাবস্থা' দূরীকরণে বৃহৎ চতুর্ভুজ (রাশিয়া, মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স) পররাষ্ট্র সচিবদের অস্বীকারী গোশন বৈঠক।

৩রা আষাঢ় (১৮ই জুন) : ডারবানে একদল আফ্রিকান নারী বিক্ষোভকারীর উপর পুলিশের রাইফেল ও ট্রেনগানের গুলী চালনা।

আইরিশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে মিঃ ইয়ন ডি ভ্যালেরা (কিরেন কেল দলের নেতা) ভোটাধিক্যে নির্বাচিত।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন) : জার্মানী প্রসঙ্গে পশ্চিমী ত্রিশস্তির প্রস্তাব রূপ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুসেভ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন) : বার্লিন ও জার্মান প্রসঙ্গে চতুর্ভুজ পররাষ্ট্র সচিবদের জেনেভা বৈঠক ১৩ই জুলাই পর্যন্ত স্থলভূবী।

৬ই আষাঢ় (২৪শে জুন) : মার্কিন সামরিক ও পররাষ্ট্র নীতি না মার্লিনে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে না—আমেরিকান কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রিপোর্ট।

১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন) : প্রমিক বর্ধঘটকনিজ অচলাবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে কলম্বো বন্দরের কাজ চালু রাখার নৈজবাহিনী আহ্বান।

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন) : দুর্নীতি; অসদাচরণ ও অব্যবহার্য দ্বারা পাকিস্তানে এ পর্যন্ত ২৭০ জন সরকারী কর্মচারী (অধিকাংশই অফিসার) দণ্ডিত হওয়ার সংবাদ।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন) : ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ক্রিশচয়ান হ্যাটসের সহিত সোভিয়েট প্রথম সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভে বৈঠক।

১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন) : দীর্ঘকালব্যাপী রাণা শাসনের পর নেপালে নতুন পরিধান প্রবর্তন—গণতন্ত্রের পক্ষে নেপালবাসীদের জয়জয়কার শ্রুত।

প্রতিরক্ষাধাতে ১৯৫১—৬০ সালের জন্য পাকিস্তানের ৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ।

১৭ই আষাঢ় (২রা জুলাই) : ফিলিপাইনের কাবাগারে ক্রু ককে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৬ জন কর্মেরী জীবন্ত দগ্ধ।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই) : গণপরিষদ বাতিল করিয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো কর্তৃক ডিক্টেটরী ক্ষমতা গ্রহণ।

করাসী-পশ্চিম জার্মান চুক্তি অনুসারে সার অঞ্চল পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত।

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) : দুইটি কুহর ও একটি ধরণাগল লইয়া মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত সোভিয়েট রকেটের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন।

করাচীর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮ লক্ষ ডলার ঋণদানের সিদ্ধান্ত।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই) : আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব প্রবর্তিত যুদ্ধ বন্ধ করিবে—মস্কো-এ ক্ষরতর মার্কিন গভর্নরদের নিকট সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুসেভের উক্তি।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই) : প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো কর্তৃক নিজেই ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষণা ও নতুন ইন্দোনেশীয় মন্ত্রিসভা গঠন।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) : বাগদাদে অল্পজীবন ইরাকী বিপ্লবের প্রথম বার্ষিক উৎসবে যোগদানে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক ইরাকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইলপাত কারখানাসমূহে বর্ধঘট—পাঁচ লক্ষ প্রমিকের যোগদান।

বিশ্বব্যাপক কর্তৃক ভারতকে দুই দফায় ছয় কোটি ডলার ঋণদানের ব্যবস্থা।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : জেনেভা পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকে সারা জার্মান কমিটি গঠনের সোভিয়েট প্রস্তাব পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গ (বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) কর্তৃক অগ্রাহ্য।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : কিউবার বিপ্লবী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ কাইডেল কাষ্ট্রো ও কিউবার প্রেসিডেন্ট ডাঃ উল্টারগাস পদত্যাগ।

নটগুরু শিরিরকুমারের আকস্মিক দেহান্তর সমগ্র জাতির পক্ষে এক অপরূপীয় কতি। শিরিরকুমারের মহাপ্রয়াণে কেবলমাত্র অভিনয় জগতই নয় বাঙালীর সংস্কৃতির জগতও হারাল একজন দিকপাল মহাবীরকে। শিরিরকুমারের মৃত্যু জাতীয় জীবনে রক্তধানি শূন্যতা এনে দিল তা ভাবার প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। বাঙালীর যে সকল কালজয়ী সম্ভানদের কল্যাণে সংস্কৃতির ইতিহাসে এক-একটি যুগের স্মৃতি হয়েছে, সংস্কৃতির কেন্দ্রে নতুন ইতিহাসের রয়েছে সৃচনা, সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালী পেরেছে নতুন পথের সন্ধান সেই পথপ্রদর্শক, ইতিহাসপ্রদর্শক, যুগপ্রদর্শকের শেষ পুরুষ শিরিরকুমার। নব নব চেতনায়, চিন্তাধারায়, যুগে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে জাতীয় জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণে প্রতিভা-মনোবা-মেধার রাজ্য থেকে যে নম্র প্রতিনিধিদের হয়েছে আবির্ভাব সেই প্রাণময় প্রতিনিধিদের শেষ প্রতিনিধি শিরিরকুমার। অসংখ্য মনোবীর স্মরণ অবদানে যে বিরাট ঐতিহ্যের স্মৃতি হ'ল শিরিরকুমার সেই পৌরষের ঐতিহ্যের শেষ নীপশিখা।

শিরিরকুমারের স্বজনপ্রীতি কেবলমাত্র অভিনয়কলার উন্নতি সাধনে বা নাট্যজগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তনই নীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র অভিনয় জগতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার আমূল পরিমর্জন শিরিরকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, জাতীয় দরবারে তাঁর অনবদ্য অবদান।

শিরিরকুমার অর্ধশতাব্দীর তখন লোকান্তরিত। অমরেন্দ্রনাথ দত্তও তখন জীবিত নেই, অমৃতলাল বসুও তখন বিদায় নিয়েছেন সাধারণ রঙ্গালয় থেকে। বলতে গেলে তখন একমাত্র দ্বীনীবাবু। অভিনেতা হিসেবে তিনি অসাধারণ ছিলেন, এ কথা বলাই বহুল। কিন্তু নতুন স্মৃতি করার ক্ষমতা তাঁর একেবারেই ছিল না। সাম্প্রতিক অবস্থা তখন বাঙালানেশের রঙ্গালয়ের। প্রেসকুমার ঠাকুর, নবীনচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রবোমেন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষণায় ও মধুসূদন দত্ত, বীনবন্ধু মিত্র, বামনারায়ণ তর্কভট্ট, জ্যোতির্জনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, প্রভৃতির স্পর্শ প্রভাবে বাঙালীর নাট্যজগতের যে বিরাট ধারার স্মৃতি হয়েছিল সেই ধারা তখন নিবর্তিতর ফাঁপ হয়ে এসেছে, এ ছেন সময়ে অসাধারণ প্রতিভার আধার অধ্যাপক শিরিরকুমার এই অজন্ম রক্তম্রিতে গণাগণ করলেন। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয় নিজেই শুধু বলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন অসংখ্য প্রতিভাধর শিল্পীকে, ধীরে ধীরে পদ-প্রাণে বসে অভিনয়ের আ-আ-ক-ক স্বচ্ছ পাঠ নিয়েছেন, নিয়ে এলেন অনেকাধিক গুণী বীরের ব-ব অবদানে রক্তম্রকের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল বহু গুণ রক্তম্রক সাদর আহ্বান জানাল বহু স্থবীরজনকে নাটক স্বপ্নে জাগ্রত হ'ল। মৃত্যু এনে দিলেন নতুন সম্ভাবনা, নতুন যুগ, নতুন উপহার। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনতা জয়মালা পরিয়ে দিল নাট্যাচার্যকে। শিরিরকুমারের জীবনেও ঘটল VINI—VIDI—VICI। বাঙালীর রঙ্গালয়ের হ'ল এক বর্ষ যুগের শুভ উদ্বোধন।

শিরিরকুমার অভিনয়কলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করলেন, নাট্যজগতের আবহাওয়া দিলেন একেবারে কলসে, সত্যহুগতিকতার মূল করলেন স্মৃতিসাক্ষ্য, নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী



স্মৃতি করলেন নাটক রচনা করালেন, নতুন নতুন নাট্যকার স্মৃতি করলেন। শ্রব বোজনায়, শিরিরকুমার, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সব দিক দিয়ে তাঁর নাট্যাগমার যুগান্তর স্মৃতি করল। তাঁর কল্যাণে বাঙালানেশ পেল বিশ্বনাথ ভাট্টা, যোগেশ চৌধুরী, মদোরজন ভট্টাচার্য, নির্বলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, অমিতাভ বসু, ইতল পাল, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু লাহিড়ী, বঙ্কা, প্রভা, মালিনী শেখালিকা প্রমুখ দিকপাল শিল্পীদের, শিরিরকুমারের কল্যাণে বাঙালীর রক্তম্রক পেল বিনোদনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরকার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শিল্প নির্দেশক চাকর রায় ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম, ভদ্র প্রমুখাণ গুণীজনের সেবা।

অটল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, প্রথম পাণ্ডিত্যের আধার, সাংস্কৃত সমাজের গর্ব ও পৌরষ এই বিরাট পুরুষের মৃত্যুতে ইতিহাসের একটি মৌরষের অধ্যায়ের বরনিকা পতন ঘটল। শিরিরকুমারের মৃত্যুতে বাঙালী যে সম্পদ হারাল বহু বছরের মধ্যে সেই মৃত্যুই পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। দেশ হারাল- তাঁর বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ সম্ভানকে, মাসিক বহুমুখী হারাল তাঁর একজন অশেষ শুভাকাঙ্ক্ষীকে, তাঁর একজন অকৃত্রিম কল্যাণকারীকে, তাঁর মতবাদের একজন বিশেষ সমর্থককে।

বর্তমানে, সারা জাতির কর্তব্য নাট্যাচার্যের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জার গ্রহণ করা। অত দেশ হ'লে এ বিবরে আমাদের সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করতুম, কিন্তু এ দেশে সরকার কই? এখানে সরকার বলতে বা বিতর্মান, তা প্রকৃতপক্ষে সরকার শব্দটির ব্যঙ্গ। তাই এদেশের সরকারের কাছে কি আবেদন করব? যে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, চক্ষুলাজ্ঞাহীন সরকার অতবড় বিরাট পুরুষের জীবদ্দশায় তাঁকে কোন সম্মানই দিল না, অত বড় প্রতিভাকে বধাধর সমাধির করতে পারল না—যে ভ্রানিষ্ঠ, আদর্শসেবী, তেজস্বীপুরুষের মৃত্যুতে সরকারপক থেকে কোনরকম শোক পালন করা হ'ল না, তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্ত সেই সরকারের কাছে আর্জি জামিয়ে মাসিক বহুমুখী তাঁর বিরাট আখ্যার অদমান কোনও দিনই করবে না। আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জনসাধারণের কাছে, জ্ঞানের সেবার তাঁর জীবন উৎসর্গিত, বীরের প্রচার উত্তম আসনে

তিনি সম্যক। অতঃপর হলে শিশিরকুমারের মত অসামান্য শিরীষ স্মৃতিরকার বখাওয়া ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকেই অবলম্বন করা হোত। এ সম্বন্ধে আমাদের ভাববার কিছু থাকত না, কিন্তু এই বাবীর মধ্যে তা তো হবার নয়, সেইখানেই তো আমাদের সব চেয়ে বড় বাধা, সব চেয়ে বড় বেদনা, সব চেয়ে বড় হতাশা। তাই জনসাধারণ ছাড়া এ দুঃখ কার কাছে জানাব, জনগণ ছাড়া এ বাধা উপলব্ধি করবে কে—কারণ তারা প্রত্যেকেই সমান অংশে এই বাধার ভাগীদার। শিশিরকুমারের অস্বাস্থ্য ও বৃত্তাস্থান জাতীয় সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইনস্টিটিউটে, বিভাগাগর কলেজে তাঁর বখাওয়া স্মৃতিরকা হওয়া উচিত, মহানগরীর প্রেক্ষাগৃহগুলির অর্থোত্তী পরিচালকবর্গের কাছ থেকে প্রকৃষ্ট কৈফিয়ৎ দাবী করা উচিত যে কোন শাসনে সেদিন তাঁদের প্রেক্ষাগৃহগুলি ছাড়া বরষে এতখানি অকৃতজ্ঞতার ভতোয়িক অমাহুতিকতার পরিচয় তারা নিতে পারলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের গুনহি নটগুরু নামাঙ্কন করে নতুন নামকরণ হবে, কর্ণওয়ালিস থিয়েটার নাম বদলে এ রাস্তার নামকরণ শিশিরকুমারের নামাঙ্কন হবে অনেক বলবেন—ও রাস্তা রবীন্দ্রনাথের নামে হচ্ছে যে, আমরা বলব হোক না, শ্রামবাজারের মোড় থেকে বিবেকানন্দর মোড় পর্যন্ত শিশিরকুমারের নামে হোক, সেখান থেকে কলেজ স্ট্রীট সহ বটবাজারের মোড় পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙালার সাহিত্যশালী হোক রবীন্দ্রনাথের নামে, আর একটি বেধার উপর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্ততম প্রধান ভাবশিষ্য শিশিরকুমারের নামাঙ্কিত রাস্তা দুটির পাশাপাশি অবস্থান হবে সকল নিক দিয়েই শোভন। শিশিরকুমারের নামাঙ্কনের স্মরণের অঙ্গুর নির্মাণমান একটি পার্কের নামকরণের ও সেখানে তাঁর একটি মমর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠেছে। জনসাধারণের দরবারে এই আমাদের বিশেষ অনুরোধ যেন তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রতিটি প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করে তুলুন বা নটগুরু স্মৃতিরকার জন্তে আরও বা বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সব বিষয়ও তাঁরা স্বরূপন হয়ে এই 'উপেক্ষিত, অনাদৃত, অভিমাত্রী অর্থ বাঙালীর রক্তালয়ের নতুন প্রাণের অমর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করুন।

সুভাষচন্দ্র শিরীষ অমর আত্মার উদ্দেশে আমাদের প্রাণের প্রণাম নিবেদন করে করিগুরু ভাষার বলি—

মরণ-সাগর পাশে তোমরা অমর

তোমাদের স্মৃতি—

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

আনন্দ-হিমালয়বাণী যে বিরাট ভারতবর্ষ—আমার জন্মভূমি, আমার মাতৃভূমি, আমার শিশুপুত্রের পুষ্পাধিকৃত ভূমি—তার বিশিষ্টতার বেন লব ধৌই, সীমা নেই, ইতি নেই। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতত্ত্ব বাস্তবে বৈশিষ্ট্যের বীজ। ভারতবর্ষ শিল্প-সৌন্দর্যের 'দেশ এক কথা' (কিন্তুই কাছ বিশেষ করে) সব পেয়েছির দেশ।

ভারতের প্রতিটি নগর-জনপদ-গ্রাম শিল্পসম্পদে ভরপুর। ভারতের শিল্পপ্রাচুর্য বিশেষীর মনে জুগিয়েছে 'ঈর্ষা' অর্থনৈতিক বিস্ময় ও সম্ভব। ভারতের এই শিল্পরূপী মণিমাণিক্য বিশেষের দরবারে ভারতকে এক প্রধান আসনে অধিষ্ঠিত করেছে (অবশ্য একেবারে ভারতীয় সংস্কৃতির অজ্ঞাত অঙ্গগুলির অবগাহনও কম নয়)। অজ্ঞাত ও ইলোরার নাম এই প্রসঙ্গে দাবী রাখে বিশেষ উল্লেখের। অজ্ঞাত ও ইলোরা, যেখানে সৌন্দর্য শব্দটি অভিধানের বন্ধ আবহাওয়া কাটিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভারতের ঐতিহ্যের এক মহিমাযিত রূপ যেখানে পরিদৃষ্টমান, ভগবৎপুত্র শক্তির অধিকারী শিরী ও ভাস্কর্যের কর্মকৃতিদের যেন অমলিন আঁকর। এই শিরীরা কালক্রীড়া ভাস্কর্যও নম্রত।

সুখর বাঙালী দেশের মেরে আমি। মাইলগত দুঃখের বিরাট ব্যর্থদান, কিন্তু যেখানে হৃদয়ের বোণ সেখানে সে একান্ত নিকটে। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি অজ্ঞাতের গল্প, ইলোরার কথা। কত গল্প দেখতুম অজ্ঞাত-ইলোরার উল্লেখ, কত জনের মুখে শুনতুম অজ্ঞাত-ইলোরার মাহুরের বর্ণনা, কত গ্রন্থে, কত পত্রিকায় দেখতুম অজ্ঞাত-ইলোরার অনবদ্য শিল্পসম্পদের নিম্ননিবেশ। এইভাবে হঠাৎ একদিন অল্পভব করলুম যে অজ্ঞাত-ইলোরা দেখার প্রবল এক ইচ্ছা বীরে বীরে বেড়ে উঠেছে আমার মনে। বছরের পর বছর কোট বায়, নিজের জীবনের ইতিহাসও কত বিভিন্ন পরিবেশে কত বিভিন্ন রূপ নেয়, কত কিছু ওলটপালট হয়ে যায় চোখের সামনে দিয়ে কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ডরে উঠতে থাকে এ জীবন, কত ঘটনা-কাহিনী অধিকার করে নেয় স্মৃতির মঞ্জুর। তবু সেই ছেলেবেলা থেকে মনে যে দুর্বীর বাসনা জেগেছে অজ্ঞাত, ইলোরা নিজের চোখে দেখার, সেই বাসনার এতটুকু ভাঁটা পড়ে না বরং বত দিন বায় অজ্ঞাত ইলোরা দেখার অভিপ্রায় যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তীব্র ভাবে যেন আমার আকর্ষণ করতে থাকে দূর থেকে অজ্ঞাত আর ইলোরা, মানসচক্রে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই অজ্ঞাত আর ইলোরার হাতছানি।

ছায়াছবির জগতে নিজেকে যুক্ত করেছি, সেই ছায়াছবিকেই উপসঙ্গ্য করে আমাদের বেতে হয়েছে বোঝাই। সেখানে কাজ করতে হয়েছে, সেখানে বাসা বাঁধতে হয়েছে। চিরকালের জন্তে না হলেও কিছুকালের জন্তে বোঝাইয়ের বাসিন্দা হতে হয়েছে।

অজ্ঞাত ইলোরা দেখার বাসনা এই সময় আরও তীব্র হয়ে উঠল, মনে পড়ে, ঐ সময় কাজে অকাজে প্রায় সকল সময়ই কথার কীকে কীকে প্রকাশ করে থাকতুম আমার বালাকাল থেকে অন্তরে লালিত এই ইচ্ছাটি।

কুম্ভুর শেষ হল। কাজের পর কিছুটাতে বিরতি, সাময়িক অবকাশ শুধু বিশ্রামই আনে না সঙ্গে সঙ্গে আনে এক অদৃষ্ট আনন্দও। এই আনন্দকে উপভোগ করা চলেও নান। রকমে। বছরের বুলবুল (সুরেন্দ্র শোহাই) তখন জানালেন অজ্ঞাত ইলোরা দেখার ব্যবস্থাদি তিনি করতে পারেন। তাঁর এক বন্ধিষ্ট বন্ধু স্রীসতীশ হোসালি তখন জলগাঁওয়ের (আবদ্যবাদের কাছে) ডি, এল, সি অর্থাৎ Deputy Superintendent of Police. তাঁর কাছ থেকে অজ্ঞাত-ইলোরা দেখার আমন্ত্রণ এল। বাবা, বন্ধু

সতীশ এবং আমি তলপাঁওর সতীশের বাড়ীতে কিছুদিন
হিলাম। ঐ সময় সতীশ আমাদের প্রতি যে কি বস্তু নিয়েছেন
এবং আমাদের স্ত্রী স্ত্রীশের দিকে যে কতখানি লক্ষ্য রেখেছেন
তার তুলনাই হয় না।

সতীশের বাড়ীতে থেকে আমরা বাত্মা শুরু করলুম অজন্তা-
ইলোয়া অভিযুগে অর্থাৎ প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে, কবিগুরু
জাবার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়—আমাদের বাত্মা হল
শুরু। আমাদের সকলের হৃষ্টি বা প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিল
—বিষয়ে বা হস্তাক করে দিয়েছিল আমাদের—বা আমাদের
একবারে আশ্চর্য করে দিয়েছিল, তা হচ্ছে এই অভিযানে
বাবার অসাধারণ আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, বাবার সে কি
কৃতি। প্রাণপ্রার্থী, স্পন্দনে, উল্লাসে বাবা যেম ভরে আছেন,
অনেক বছর পিছনে কেলে আসা দিনগুলোকে যেন আবার হাতে
হুট্টায় তিনি পেয়ে গেছেন, অতীতের তাক্ষণ যেন আবার নতুন
করে বাসা বেঁধেছে তাঁর মধ্যে। বাবার সে বৌবনোচিত চাক্ষু
আমি কোনও দিন তুলতে পারব না। এক অবর্ণনীয় গতিবগে
আমাদের অনেক পিছনে পিছনে কেলে যথেষ্ট তিনি এগিয়ে চলেছেন,
বাহ্যিক—আমরা উঠতে উঠতেই দেখি, সে জায়গা পেরিয়ে আরও
অনেকখানি তিনি এগিয়ে গেছেন। সেদিন আনন্দের এক অসুখ
উজ্জ্বল্যের অভিনব প্রকাশ দেখলুম বাবার মধ্যে।

অজন্তা-ইলোয়া দেখলুম। দেখলুম চর্যক, এতদিন যাকে
মনস্কে দেখেছি, আজ তাকে প্রত্যক্ষ করলুম চর্যক, আবার প্রথম
হুট্টে যাকে চর্যক প্রত্যক্ষ করলুম, তার পরহুট্টেই তাকে দেখতে
পেলুম মর্যক। এতদিনের বস্তু আজ দেখা দিল সার্থকতার রূপ
নিষে। আশা পূর্ণ হল, চোখ গভ্র হল, মন হুত্ব হল। দেখলুম
ভারতের অসামান্য শিরসস্পর্শ, শিরের মায়াপুরী, শিরের নন্দনকানন,
শিরের মহাতীর্থ। আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছিল
বোধ ভিক্টরের দেওয়াল চিত্রগুলি, ঐ দেওয়াল চিত্রগুলি
আমার মন প্রত্যাশা অধিকার করেছিল তা বল বোঝাতে
পারব না ঐ দেওয়াল চিত্রগুলির প্রভাব আমার নতুন
নতুন নৃত্যনাট্য রচনা করার সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করে, আমার
চোখে আবার নতুন স্বপ্নের জয় দেয়, আমার জোপাতে
থাকে অক্লান্ত অল্পপ্রেরণা আর আমি তা করেও ছিলাম
পরবর্তী বছরগুলিতে।

১১৪০ সালটি আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় বছর।

আমাদের জীবনে এর প্রভাব অমলিন, আমাদের জীবনের বহমান
ধারা এক ভিন্নতর স্রোতে বইতে থাকল এই ১১৪০ থেকেই,
আমাদের জীবনের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়ের সৃষ্টি
হলে এই ১১৪০ এর কল্যাণে। ভাগ্যবৈভাব হুট্টা হুট্টা
আমাদের আমরা জ্বরে উঠলুম, পরম কাঙ্ক্ষিতের অপার
করণায় আমরা গভ্র হলুম, জীবনের চঙ্গার পথের নির্ধারিত সীমানা
পেরিয়ে এসে আরও বৃহত্তর পথে পদার্পণ করে আমরা পূর্ণ হলুম।
ঐতিমল্যাল দেশাই প্রভাব আনলেন যে এমন একটা ছবি করা
যাক বার পরিচি, বার ব্যাপকতা, বার প্রসাধ হবে জগৎজোড়া।
এবার শুধু ভারত নয়—সারা জগৎ, এতদিন শুধু ভারতের দরবারে
চিত্রাঙ্গলি দিয়ে আসা হয়েছে। এইবার সেই অঙ্গলি পাঠাতে
হবে জগতের দরবারে—এক কথার বার পরিচি হবে আন্তর্জাতিক।
ঠিক এই জাতীয় ছবি করার বাসনা মধুর মনে বীর্ণকাল থেকেই
বাসা বেঁধেছিল। বাত্মাণীর ছেলে মধু, অল্পবয়সী বাত্মা মায়ের
সন্তান সে, স্বভাবতই দৈবিক সন্তান সে সর্বদেশের দরবারে উজ্জ্বল
করে দিতে উৎসুক, ব্যাগ্র, উদ্বুদ্ধ। আর মধুরের সঙ্গে তো
আমাদের বৈধি ঘনিষ্ঠতাই ছিল সেই জন্মেই এই প্রভাবে সেও
সম্পূর্ণরূপে সার দিল। ছবির প্রয়োজনার তার গ্রহণ করলেন
বোম্বাইয়ের ওয়াহিয়া মুজিটামের মি: জে, বি, এইচ, ওয়াহিয়া।
ছবির নির্মাণ করে অনেক কতিমান কুশলীদের নিপুণ হাতের স্পর্শ
পড়ল। আলোকচিত্রের তার গ্রহণ করে ছবির গল্পাংশকে রূপালী
পর্দায় জীবন্ত করে ছুটিয়ে তুললেন বাংলা দেশের দুই বিখ্যাত ভাঃ
প্রবীণ চিত্রকর—একজন শ্রীবর্তী দাস অজন্তন শ্রীপ্রমোদ দাস,
দুইয়ের মায়াজাল মনে ছবির সারাটি কাজ এক অনবদ্য রসজ্ঞার
করলেন প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ, সম্পাদনার দ্বন্দ্ব দারিদ্র্যতার
গ্রহণ করলেন ভায় দাস, ছবির শিরের অঙ্গরূপ ও শিরসজ্ঞার
ভাব নিয়োন অধ্যাত চৌধুরী। ওয়াহিয়া মুজিটামের মি: টাটাকে
পাওয়া গেল রেকর্ডিং এর কাজে। প্রযোজক মি: ওয়াহিয়া এবং
মিসেস ওয়াহিয়াও এগিয়ে এলেন স্বতন্ত্রভাবে হয়ে তাঁদের প্রসক্তিধর্মী
হুট্টাভরা নিষে, গোষ্ঠীর প্রতিটি কর্মীর জন্তে প্রাণত্যাগ সহযোগিতা
নিষে, উৎসাহ নিষে, অল্পপ্রেরণা নিষে। এই বিরাট পরিকল্পনার
বাস্তব রূপায়নরত্রে প্রতিটি কর্মীর মনকে ওয়াহিয়া সম্প্রতির এই
সহায়ত্বভূমিকায় মনোবাতাষ যে কত গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল—
তার উল্লেখ নিশ্চয়োক্তন, সে কথা বলাই বাত্মা। [ক্রমশঃ।

অজ্ঞানতঃ কল্যাণাক্ষ বন্দোপাধ্যায়

শিশিরকুমার

করঞ্জাক্ষ বন্দোপাধ্যায়

হু সেই অতীতের বঙ্গের মাঝারে

শিখি অর্ধেক আঁখি জ্যোতির্গর আলো

প্রাকৃতিক নিরমতে গেলে পরপারে

অমানিশা দেখা দিল রম্যকো কালে।

সেদিন তাইনি কেহ দীপ্তবর নব নব

দেখা দিবে আর বার প্রদীপ্ত প্রভার

বহুদূর হুত্ব বার দানে অভিনব

নাট্যচর্চা নটপ্রভট্টনটেক-সভার।

কিয়ার কিরণে বার আলোক-সম্পাতে

প্রভীতী বন্দনা কল প্রাচীর গরিমা

কৃতী শিরী অসংখ্য যে নবধারাতে

ভাগ্য করলোকে গুরু মহিমা।

বাচনে, প্রকাশে বার অসুখ সাধনা

দিকে দিকে গুনি বার জয়কনি বাক্য

শিশিরকুমার সে যে দূর্ত আরাধনা

রূপারিত আঁখি জ্যোতির্গর মাঝে।

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ইতালি

এক

কুপেতে উঠেই পল্লব দেখে বৃহক। বৃহক বলে জ্ঞানেন : Gott sei dank, mein Freund ! ভাবহিলাম কত কী ?

মানে ? আমি আসব না ?

কে জানে ভাই ? সাক্ষাৎ শেকসপীর বধন বলেছেন : গাথান, প্রেমিক, পাগল ও কবি এদের মধ্যে চেনা যায় না কোনটা ক।

পল্লব হাসে : বলে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি আসব বলে খন কথা দিয়েছি, তোমাকে দিয়ে টিকিট কিনিয়েছি।

বৃহক এবার ঘরে ইতালিয়ান বুকনি : L'amore é divina, na terribile ২ কথা দিয়ে কথা ভাঙা কোন কথা যে হৃদয় দিয়ে দর ভাঙে দান। কিন্তু ঠাট্টা থাক। তোমার কাছে আমার কাটি মিনতি আছে।

ট্রেন ছাড়ল...

বিনতি ?

ঈ। তুমি তোমার তাঁক লিখে দাও যে আমি জানতাম না।

কী ?

যে এমি মধ্যে তোমার হৃদয় তাঁর হয়েছে—তাঁর হৃদয় তোমার।

পল্লব ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বলে : খবরটা দিলেন কিনি, তুমি ?

বৃহক এবার ফরাসি বুকনি ঝাড়ে : Que vous êtes adieu, moncher ! ৩

নাভাশা নিশ্চয়ই ?

তবু জেরা ? শোনা, আমি সত্যিই হুঃখিত, বিখাস করে।

হুঃখিত কেন ?

তোমাকে তাঁর কাছছাড়া করলাম বলে।

ভাত্তে কী ? হুঃখিত বাদেই তো কের দেখা হবে।

কে বলতে পারে ভাই ? ঐ হুঃখিত কবিতাই কি কের হুঃখিত করেন নি—there is a tide in the affairs of men...?

পল্লবের বৃকের মধ্যে কের ধক করে গুটে। মনে পড়ে বিকেল লা আইরিনের একটা কথা : যদি আর দেখা না হয় ?

বৃহক ঝটকি হেসে বলে : ও কী ? আমি স্বভাবে প্রগলভ ট্রেনেই তো—চুমলাম করে কখন কী বলি। না না, বিরহিনীর জে বিরহীর দেখা হবে বৈ কি বধন ভরসা দিয়েছেন অকুতোভয়ে। সে কবি নয়, কবিরের রাজত্ব হাতে আলগিসেরি :

L'amor che move il sole e l'altre stelle ৪

১। ভগবানকে ধন্যবাদ, বহুব্রহ্ম।

২। প্রেম স্বর্গীয় বস্তু, কিন্তু ভরসানক।

৩। এমন প্রেম করবে, বহু ?

৪। যে প্রেমের চির নিদ্রা ঘোর ভয় ভয় ও ভয়ানক।

কেবল তবু তুমি তাঁকে লিখে দিও যে প্রেমের এ ক্ষমতা জান। সবেও আমি তাঁর পথের কাঁটা হয়েছি তবু না জানার দরুন।

পল্লব হাসে : ভয় নেই—সে নিজেই বলেছে আমাকে ইতালি ঘুরে আসতে।

বাঁচার চুকতে না চুকতে কোর খুলে দেওয়া ?

বাঁচাতোহের সে কী জানে তুমি যে চিরদিন গাছে গাছে হুঃ করেই বেড়ালো ?

বৃহক ওর দিকে একটু চেয়ে বলে : একটু কোণঠেসা করেছ যানছি। বলেই হাই তুলে : একটু কফি আনানো বাক, কী বলে ? সারাদিন যে ছুটোছুটি করিয়েছ। বলেই বোতাম টিপল।

উন্টো চাপ ? কব কারনা বুঝ ?

অথ পরিচায়কের অভ্যাস ?

বৃহক জ্ঞানেন বলে : Bitte eine kaffeekanne und Zwei tasse ! ৫।

Sofort, mein Herr ! ৬। বলেই অভিমান করে প্রস্থান।

বৃহক অভিজ্ঞ হাসি হেসে বলে : একটি কফিপট ভিন পেরাল ডরিয়ে দেয়, বহু। অথচ দাম দিতে হয় দু পেরালার মাত্র। বলেই খেমে : কিন্তু জ্ঞান ট্রেনের এই দাক্ষিণ্যের কথা জানে কেবল—নিজের বৃকে হাত রেখে—The duffer that has been taught to roam but not—পল্লবের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে—The duffer who sighs for home, sweet home !

পল্লব হেসে বলে : But who still entrains for Rome.

বৃহক হাসে।

দুই

ওরা বধন রোমে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা। আকাশে মেলে রয়েছে তার ক্রিমিক পাখা। ট্রেন রোমের ট্রেনে থামতেই একটি সুরপা সুবেশিনী মহাবরতা ছুটে এসে বৃহকের দুই পাশে চুপন করলেন। বৃহক পল্লবকে তাঁর সামনে পেশ করে বখাবিধি হাঁকল : সিজার পল্লব বাকচি—সিজারীনা এলিওনোরা জেনোনি—আমার বহুদিনের বাকবী তথা হুঃখিত আশ্রয়দাত্রী—I attrice famosa e graziosa ৭।

পল্লব বখাবিধি অভিমান করে টাঞ্জি নিল।

Albergo Luna, per favore ! ৮।

পথে মন ওর একটু প্রকৃত হয়ে উঠল ভাবতে যে মোহনলাল ও বিতা হুঃখিত ইতিমধ্যে এসে পড়েছে।

হোটেলটি বড় নয় কিন্তু ছবি মনন সুলভ। শহর থেকে একটু দূরে। সামনে একটি ছোট বাগান লজার-পাতার ফুল ভরা। জ্ঞানির কোলাহল ও শীতের পরে এ মনোমহ উত্তানবাটিকায় এসে পল্লবের কী যে ভালো লাগল—বিশেষ করে ইতালির নির্মল আকাশ আর হ্রদ হাওয়ায় দাক্ষিণ্যে।

৫। একটি কফিপট ও দুটি পেরালা, দয়া করে।

৬। এফুপি, মহাশয়।

৭। প্রখ্যাভা ও কমুনীরা অভিমন্যু।

৮। লুনা হোটেল, দয়া করে।

কেবল কোথায় মোহনলাল? সূনা ফোঁটেলের অধ্যক্ষ কোনো
ববই দিতে পারল না। একলা পড়ে কের ওর মন কেমন করে
ওঠে আইরিশের জন্তে।

রাস্তা হয়ে বিছানার ভেত্রে না ভেত্রে ঘুম। বৃন্দ বেশল :
আইরিশ নাতাশার ওখানে শিরানো বাজিয়ে গান গাইছে, মাশা ও
কাতিয়া সামোভার থেকে চা ঢালছে, আর নাতাশা এক কোণে হু'
হাতে মুখ ঢেকে বসে।

ঘুম ভেঙে গেল। আইরিশের কথা ভেবে ওর বুকের মধ্যে টন
টন করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে নাতাশার কথা : আইরিশের
ঘরে ছুহাতে মুখ ঢেকে তার সেই কারা, আর আইরিশের উক্তি :
পারো তো ওকে কমা কারো, ও বড় হুংগ পেয়েছে। পল্লবের মনে
বিবাদ ছেয়ে আসে—বেচারি নাতাশা!

তিন

পল্লব কুকুমকে রোমের ঠিকানা দিয়ে তার করল : মোহনলাল
রওনা হয়েছে কি না জানিও, আমি তার জন্তে রোমে অপেক্ষা
করছি। দু-দিন বাদে তার এল মোহনলালের কাছ থেকে :
ইতালী বাওয়া পেছিয়ে গেল। চিঠিতে সব লিখছি।

কিন্তু চিঠি আসতে তো অন্তত এক সপ্তাহ। কী করা যায়?
ভেবে-চিন্তে স্থির করল : অপেক্ষা করাই পড়া বখন এসেই পড়া
গেছে। রোজই ইচ্ছা হয় বাগিনে ফিরতে, কিন্তু আইরিশকে ব'লে
এসেছে যে নিজের মনের সঙ্গে সুখোমুখি হ'তে হবে একেবারে
একলা। এখন সাত ভাড়াভাড়া কিরলে মুখ থাকবে না। মনে
মনে আঙড়ার বিষয় হ'রে : নিয়তি: কেন বাধ্যতে?

কিন্তু মানুষের মন তার উপর বোঁবনের আরোগ্য শক্তি : পল্লব
দু-তিন দিনের মধ্যেই থানিকটা কিরে গেল ওর সহজ প্রকৃতি।
কেবল একটি চিন্তা ওকে বেঁধে ক্রমাগতই : কুকুমের চিঠির উত্তর
দিতে এত দেবি ও কখনো করে নি—চার পাঁচ দিন হ'রে গেল।
একবার তাবল আইরিশের কথা সব লেখে—কিন্তু তার পরেই
আসে কুঠা : থাক এত তাড়া কী? মনটা আগে একটু স্থিরই
হোক। তাছাড়া কুকুম সবে জেল থেকে বেরিয়েছে, তার উপর
অসহ—এ সময়ে কাজ কি ওকে 'লুক' ক'রে?

একলা একলা মন লাগে না। দু-চার দিনের মধ্যে ওর মন
আরো একটু সহজ হ'রে আসতে জনারশ্যের মধ্যে সিংসভার রস
বেন আরো বেশি ক'রে পায়। তবে একেবারে নিঃসঙ্গ বলা যায়
না—বেহেতু প্রভাহ ব'টা তিন-চার ক'রে কাটে কুকুমের সাহচর্যে।
এলিওনোরার ভিলা রোম থেকে মাইল পনের দূরে, কিন্তু সে ভরে
কম্পিত হয় কুকুম হৃদয় বলত কুকুম ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন ভাবে।
ব'লেই মুখে মুখে ছড়া কাটত পৈরিনী হচ্ছে (বহু ভাবাবিৎ হ'লে
হবে কী—ওর মাতৃভাষা তো বাংলাই বটে) :

এলিওনোরার ঘবে আছে বন্ধু, দুইটি মোটর,

ওর কারে আর?

সিনেমার প্রাক্কালে বাস যে দিনের পরে দিন
ফিরিতে সন্ধ্যার ঘর। চিত্রাঙ্কণে মোহিনী তারকা।

একটি মোটরে যার বাঁকবী বখন—

বাঁকবের ঘের যার দ্বিতীয় তখন খুশি মনে,
যার বে পোতলি বেগে সাড়ে সাত কোশ

অবলীলাক্রমে সখা, অবলীলাক্রমে।

সব চেয়ে ভালো গুণি এই ব্যবহারে

পরের মোটর বানে হওয়া জামামান :

মোটরের কতি নাই, আছে শুধু ভয়গ বিহার।

চলো তাই চলো

ইতিউক্তি—বধা প্রাণ চায়।

ঘটা ছই প্রতিদিন করা যাক রোম-পরিভ্রম,

দেখি' রাশি রাশি ধ্বংসভূপ, কাটাকাট,

জাকাসো ঐতিহাসিক চিত্রশালা, গির্জা, জ্যাটিকান

গম্বি চ্যাপেল-আদি—বাহা পেশাদার ইন্ট্রিয়ার

বহু লক্ষ্য ভবে—

বা দেখি' সে হয় কালচার, লভে জ্ঞান,

বহিও কী মূল্য সেই কালচারের অথবা জ্ঞানের

জান না কেহই আশো হায়!

ভাষাশি হবেই হবে দেখিতে সে-সবই,

বেহেতু এ সব দেখি' তবেই না বাবার উৎকৃষ্ট ডাকার

মহাগর্বে ওঠে কুলি, তারিয়া—'দেখনি

এ সব তো গৃহাসীন নিকুট ডাকার।'

পল্লব বতই কুকুমের সঙ্গে মেশে ততই বেন বোরে বেশি ক'রে
একটি কথা : হাসতে ও হাসতে পারা জীবনে আর একটি
প্রতিভার গামিল। অথচ কেন বেন ওর মনে হয় কুকুমের হাসি
একটা সুখোম—Laughter veiled in tears—আর তাই
জতেই ওর হাসি, রসিকতা হ'রে উঠেছে এমন সন্দেহ।"

চার

কুকুমের সঙ্গে মোটরে ঘুরে ঘুরে পল্লবের কটিতি উৎকৃষ্ট ডাকারের
পছন্দ লাভ হোক বা না হোক এই একটা লাভ হ'ল যে রোমের
পঞ্চাট অনেকটা জানা হ'রে গেল। এছাড়া প্রভাহ হু' তিন ব'টা
ক'রে ইতালিয়ান পড়তে পড়তে ইতালিয়ানে কনসি ডাকার বতন
বহুক্ষেপে কথাবার্তা চালাতে না পারলেও একতিমুহুর সাজাতিক
ডাকারটির মাধুর্যে ওর মন রসিয়ে উঠল। এখানে ওখানে
ইতালিয়ানদের কথাবার্তা শুনে শুনে ওর কানও ক্রমশই খুশি
হ'রে উঠতে থাকে—আর সঙ্গে সঙ্গে এ সুখপ্রিয় গান পাসল
জাভটির গুণাগুণ সফলও ওর অনেক কিছু জান লাভ হ'তে থাকে
যার মধ্যে শুধু তথ্যই নেই, রসও আছে। কুকুম মিথ্যে বলেনি :
এক একটা ভাষা শেখা মানে মনবিহ্বল একট ক'রে নতুন
আকাশের খবর পাওয়া। তাছাড়া শহর হিসেবে রোমের সৌন্দর্যও
সত্যিই বুদ্ধ হ'ল। এখানে নেই বটে লন্ডনের বা বার্লিনের
পরিচ্ছন্নতা, পকেট কাটার উপক্রম এখানে দারুণ, রাতারাট পার
হ'তে বেশ পেতে হয়, ট্রাফিক পুষ্টিনের চিহ্নও কোথাও নেই,
রেষ্টরান্টে পরিচারকদের ভৎসনতার একান্ত অভাব, বোনে সেখানে
পথিকদের রাস্তা—এক কথায়, গোলমাল, বিশৃঙ্খলা, অসুবিধা
অগুণ্ঠিত নে কি। কিন্তু তবু এখানে বেন সন্ধ্যার তেমনি প্রমোদপ্রিয়;

যেমন সদামিন তেমনি সৌন্দর্যবিলাসী; যেমন মজ্জ্বাক তেমনি সহজিয়া। আইরিশের ভাড়া না থাকলে এখানে ও সহজেই ছুতিন বংসর পরম সুখে কাটাতে পারত—নিশ্চয়ই পারত।

কিন্তু তবু আট দশ দিন যেতে না যেতে ওর কেমন মনে মনে হ'তে থাকে—কী করছি এখানে? ছুটি? কিন্তু ছুটি যখন দীর্ঘায়িত হ'তে হ'তে লক্ষ্যহীন আলসেমিতে পরিণত হয় তখন বিবেক ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। ও ঘির করল—যদি এখানে মোহলসালের আসা পর্যন্ত থাকতেই হয় তাব অন্তত একটু ইতালিয়ান গান শিখলে মজ কি? কয়েকটা ইতালিয়ান গান ও বালিনেই শিখেছিল ওর শিক্ষক ও আইরিশের কাছে কিন্তু সে তো উপর উপর শেখা। এখানে একটু রীতিমত শিখলে এক জিলে ছই পাখি মায়া যায়—ছুটির দলও সমুদ্র হ'রে ওঠে, বিবেকেরও সুখ চাপা দেওয়া হয়। সকালটা ইতালিয়ান পড়ে, দুপুরটা যুদ্ধের সঙ্গে জ্বলশ কাটে, কিন্তু বিকেল আর সন্ধ্যার করে কি? এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

রোজ সন্ধ্যাবেলা পরম লুনা হোটেল একাই খেতে বসত ভাইনি; ক্রমের এক কোণে। সেখানে পাশের টেবিলে সেখত একটি দীর্ঘাকৃতি, স্তম্ভবান, সৌরবর্ণ যুবককে। ওর মুখে কমনীয়তার সঙ্গে ছিল তেজস্বিতার আভা। পরবের ওর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ও পরবের সঙ্গে চোখোচোখি হলেই এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয় যে পরব ভয়সা পায় না এগোতে। একদিন হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করার সে বলল: সিন্তোরে-ব নাম পাপিরো, এর বেশি কেউ কিছু জানে না—E molto riservato।

দিনকয়েক বাদে যুদ্ধকে নিয়ে ভোজনকক্ষে চুকতেই চোখে পড়ে—‘সিন্তোরে পাপিরো’ দুপুর বেলায়ও হোটেলেরি বাওয়া শুরু করেছে। যুদ্ধ ওকে দেখেই চাপা সুরে পরবকে বলে: কব।

যুবকটি নিশ্চর ভনতে পেরেছিল, কারণ তৎক্ষণাৎ ওদের দিকে একবার তাকালো, তারপরে ভাড়াভাড়া আহাির সমাধা করে উঠে চলে গেল। যুদ্ধ ওর পাইল ঘরিরে হেসে বলে: বেশ চোহারা না?

বেশ? Damning with taint praise? আমার তো মনে হয় ওর মুখ হ'ল তাই থাকে কবাসীরা বলে distingue, নয়?

যুদ্ধ কেবে বলে: তা বলা যায়। কিন্তু—

তুমি যে কী! সব তাকেই কিন্তু।

যুদ্ধ হাসে: বলে না—ঘরপোড়া গরু মি'দুরে মেথ দেখলেও ভয়ার?

আমার ঘর পোড়েনি। স্তম্ভর্য আমি চাই ওর সঙ্গে ভাব করতে।

উঃ, ও ঘরা-ছোঁওয়া দেবে বলে মনে হয় না। বলেই একটু খেদ: জোর করে বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয়—ও হয় কোনো দারুণ কাজ নিয়ে আছে, নয় তোমার মতন কোনো সমস্তার পড়েছে।

আমি সমস্তার পড়েছি—কে বলেছে? নাতাশা?

কে?

না বলেতেই হবে, আমি ছাড়ব না আজ।

১। উনি বড়ই চাপা প্রকৃতির মানুষ।

যুদ্ধ একটু চুপ করে থেকে বলে: তুমি যখন ঘরেই কলেছ—আর লুকিয়ে কী হবে? হ্যা—বলেছে সেই যে সইতে পারে নি—তোমারই গান তাই—‘আপন বঁয়্যা আপন ঘরে যায় আমারি আঁড়িনা দিয়া’—না?

কী যে বলা যা তা। বলা—নাতাশা কী বলেছে?

অকথা কথা কিছু নয়। বা বটেছে তাই, আর কী?

বলল কবে? কখন?

আইরিশের শ্রম কক্ষে যে সীনটি হয়ে যায়—তার পরেই।

বিকেল চারটের ও আমাকে টেলিফোন করে দেখা করতে বলে আসতেই হবে—অত্যন্ত জরুরি ইত্যাদি। কী করি? বেতে হল।

কী বলল?

এ ঠিক তোমারি মতন কথা হল। আমাকে বা বলেছে তোমাকে বলতে পই পই করে মানা করে দেয়নি নাকি? বলেই হেসে:

এই আর এক রীতি মেয়েদের সার্বজনীন। তোমাকে বা বলবে যেন ঘৃণাক্ষরেও আমি না জানতে পারি, আমাকে বা বলবে তোমার কাছে উঠলেই সর্বনাশ। জানো না কি এখানে, হে ভূক্তভোগী?

জানি হে সবজাড়া! কেবল এইটুকু জানতেই বাঁকি তুমি এইমাত্র আমার সমস্তার কথাটা তুললে কেন? নাতাশার কাছে তনে, নিজেরি আশ্রয়?

যুদ্ধ একমুখ বোঁরা ছেড়ে হেসে বলে: কী নাছোড়বান্দা!

কী হবে বলা তো এসব কালতো কথার? বলে একটু হেসে: তুমি নিজেই বুঝবে একদিন।

কী? না, ছাড়ব না। এমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।

আরে তাই, আড়াল আছে বলেই তিন ভুবন চলছে।

যাও। তোমার সঙ্গে আছি। এরই নাম বন্ধু বটে।

যুদ্ধ পরবের হাতের উপর হাত রেখে বলে: আমি অনেক কিছু শিখেছি যে ঠেকে তাই। আর একবার নয় বারবার। অনেক পোড় খেয়ে তবে বুঝছি যে, পায়ে প'ড়ে বন্ধু তো বন্ধু জ্বরতমা বান্ধবীকেও কিছু বলতে যাওয়া তুল: তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি—ভয় যে বলে তার নয় থাকে বলবে তারও।

না। বলতেই হবে আজ। আমার লোকসান হয় হোক যুদ্ধ একটু চুপ করে থেকে নিচু সুরে বলে: আমার মনে হয় তুমি তুল করেছ আইরিশকে ছেড়ে এসে। তাই তো সেদিন ঠাণ্ডে তোমাকে বলছিলাম আমার খেদের কথা—মানে তোমাকে ছিনিয়ে আনার জন্তে।

কিন্তু ছিনিয়ে আনলে বলছ কেন? আমি তো এসেছি দুদিনের জন্তে বেড়াতে। নাতাশা বলে নি?

বলেছে, কিন্তু তাই... বলব?

না বললে—

আচ্ছা আচ্ছা বলছি। বলে কের পাইপে টান দিয়ে: আমার মনে হয় মাহবুবের জীবনে এক একটা লর একবারই আসে—ছ'বার না জানি বলেই থাকেই যে সে-লর দেখলেই চিনতে পারে। এ সময়ে দুদিনের জন্তেও তোমার ওকে ছেড়ে এত দূরে আসা উচিত হয়নি।

পল্লবের মনে কেবল সেই অসামান্য শকার দ্বারা বসিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—আজ সাত আট দিনের মধ্যে আইরিশের একটি চিঠিও পায়নি, অথচ ও তাকে লিখেছে প্রায় প্রতিরাত্বে! ও হুহুকে বলে একথা।

হুহুকে বলে : হ' বলেই কেবল পাইশ টানা গুজ করে।

হ'—মানে কী বলি তাই ভাবছি। তবে একটা কথা বলতে পারি যদি কথা নাও—কিছু মনে করবে না।

নিশ্চি।

তোমার মনে হয়, বলে হুহুকে খেমে খেমে, যে, তোমাদের মধ্যে বনিষ্ঠতা যে-ভাবে পৌঁছেছে সে ভাবে স্বপ্নের পরামর্শ চাওয়াই ভালো—বিজ্ঞ বুদ্ধির নির্দেশে চলতে যাওয়া বোকামি।

বোকামি!

Folie, folie mon ami ! কলসী ভাবার folie pure et simple. জরুরী থাকে বলে—Nartheit, Dummheit, ক্যাপিটাল হরফে, এদেশের ভাবার—follia—আরো ভাব্য করব কি?

পল্লব শু্য। হুহুকে ওর পিঠে হাত রেখে কোমলকণ্ঠে বলে :—তাই তো বলছিলাম তাই—জীবন এমন সময় আসে যখন প্রিয়তম বন্ধুর কথায়ও উটো উৎপত্তি হয়। আমি তো বলতে চাইনি।

না না। তোমার তিরস্কার আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। কেবল আমি কী করতে পারতাম বলে তো যখন—যখন আইরিশ নিজে জোর করল তার আদর্শের কথা বলে।

হুহুকে আরো নরম স্বরে হেসে বলল; তাই, তোমাকে দেখে সময়ে সময়ে আমার বড় মার্য হয়। আর কেন জানো? কারণ...বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, তবু এ সত্যি যে আমি এক সময়ে ছিলাম প্রায় তোমারই বয়স—মানে হিরো, আইডিয়াল, আট এই সব বুলিকেই মনে করতাম পথের পাথর, তুমানে দিশারি।

পল্লব আহত স্বরে বলে : বুলি? তুমি কী বলছ হুহুকে?

হুহুকের মুখে স্নান হাসি ফুটে ওঠে; বলছি তাই, অনেক যা খেয়েই। কিন্তু এ যা খাওয়াই আমার দরকার ছিল, নৈলে আমার হয়ত কোনো দিনই চোখ খুলত না—মানে, আমি এই পর্যন্ত সত্যকে সত্য বলে চিনতে পারতাম না যে, ঘোঁরাই চেয়ে বাস্তব বড়—নীতিবাদের চেয়ে মাহুত্ব। শোনো বলি আজ বা একদিন বলি বলি করেও তোমাকে বলতে পারিনি—এই বিশ্বাস যে তুমি বুঝবে না বা ভুল বুঝবে। আজ হয়ত বুঝলেও বুঝতে পারো—আমি কী বলতে চাইছি।

বলে নিবন্ধ টাইপ কেবল ঘুরিয়ে বলে চলে :—বহুদূর দেশে আসে যখন আমি তোমারই মতন 'সুজ' ছিলাম এই ইতালিতেই ভালোবাসি একটি অষ্টাদশী সরলাকে। সে যখন ছিল কাব্যিক—দেখতে প্রুতী, নাখটিও তেমন মিষ্টি—মারিয়া।

তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ—ঠিক তোমার বয়স। তাই ভাবতাম—'সুজ'দেরই মতন—যে জরাজীর্ণা পুরোনো পুঁথির পাতায় বা বা লিখে সেছেন তারই নাম জান দুরদৃষ্টিতা—জীবনের লক্ষ্যকে আলোর একাহার, আর এ সবের মধ্যে সেয়া একাহার—কোমরের বাগি। কলে আমি মারিয়াকে বলি ও ফুলমানে না হলে আমারই বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু সেও তো ছিল আমারই মতন

সুজ। কাজেই মনে করত বাইবেলই একমাত্র সত্য। পরিণাম বা হবার আমাদের প্রেমের মনে ধর এসে হানা দিল, আমি মারিয়াকে ছেড়ে চলে গেলাম অল্পকোটে দর্শন প'ড়ে অশান্ত মনকে শান্ত করতে।

দর্শন পড়তে পড়তে মন আমার উঠল জেপে, কিন্তু দর্শনের কোনো বাগীর দৃষ্টি নয়, তার মধ্যে কোনো বাগী খুঁজে না পাওয়ার দৃষ্টি। হ'ল কি, দর্শন পড়তে গিয়ে কেবলমাত্র দর্শন তা নয় তাকে বা ভেবেছিলাম—অর্থাৎ তার মধ্যে সত্য নেই আছে শুধু সত্য নিয়ে মারিয়ামি, কাটাকাটি, হানাহানি।

এ যুনি বলছেন জগৎ বিকাশ পেয়েছে একটা আইডিয়া থেকে, ও-যুনি বলছেন জগৎ একটা নাম-না-জানা আলোর দ্বারা, সে যুনি বলছেন এর সংগে ওর সংঘাতে থেকে জীবনের বিকাশ—ইত্যাদি।

এক কথায় শুধু কথা—কথা—কথা। কলে আমার মন ক্রান্ত হ'য়ে হাল ছেড়ে দিল যখন দেখলাম এককথার ফুলবুটির ঠাঁজ কিনকিতে না আছে জীবনের তাপ, না পথ দেখাবার আলো। তখন বুঝলাম—স্বদয়কে ধর্মের বুলির চাপে গিয়ে যেহে কী দারুণ ভুল করেছি। মারিয়াকে অল্পকণ্ঠ হয়ে লিখলাম যে আমি অভাব জ্ঞানি বলে, যদি সে আমাকে কমা করে তবে তার কাছে কিংবা যাব। কিন্তু তখন ঐ যে বললাম, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে লিখল—সেও ভুল করেছে বাইবেলকে গুজ মনে করে, কিন্তু আর হয় না, তার শরীর মন ভেঙে গেছে—এক লম্পটকে দিয়ে ক'রে। সেহে পুনর্নত নিয়ে লিখল : তোমাকে যদি বিবাহ করতাম তাহ'লে ফুলমানে হয়েও সুখী হ'তাম, কারণ তাহ'লে বর থাকত বুলি হয়ে মনের নেপথ্যে—অন্ধকারে, সামনের হলভ প্রেমের মিলনের পারদ্রোপ। আমি তৎকথায় রোম রঙনা হলাম, গিয়ে শুনলাম এলিও নোয়ার মুখে—যে মারিয়া টাইবারের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

এলিওনোয়া!

হ্যা—এলিওনোয়া মারিয়ার গিদি। তাই আরো ওর কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসি। এ লক্ষ্যহীন খুঁটিহীন জীবনে কেবল ওর নরমে ও স্নেহে বা একটু সাময়িক শান্তি না হোব—সান্ত্বনা পাই।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে কিন্তু বলেই খেমে যায়। হুহুকে বলে : তুমি কী বলতে বাচ্ছিলে আমি জানি। না, আমি বলি না দেশও ধর্মের মতনই ছাড়াবাগি। কারণ ধর্মের পনের আনা কবিকল্পনা হ'লেও দেশ ঠিক তা নয়, তার অন্তত কারা আছে—যাকে চোখে দেখা যায় দিনে দিনে, পলে পলে। কিন্তু তবু বলব জগৎজোড়া মাহুত্বের প্রাণ-শান্তিত সত্যের ভুলনার কেশাঙ্কবোধের সত্য একেবারে ছাড়া না হ'লেও সে-ধর্মের প্রত্যক্ষ-পোঁচর সত্য নয়—যাকে বলা যেতে পারে 'কাজীর্ড'—অপ্রতিভা। অন্ততঃ মারিয়ার অকাল মরণের পর থেকে আমার কেবলই মনে হয়েছে, উঠতে বসতে, যে মাত্র একটি মাহুত্বকে সুখী করার জন্য যদি দেশকেও ছাড়তে হয়, তবে দেশের চেয়েও যে বড়, স্বভাব বড়—মানে আমাদের অন্তরাত্মা, যে আছে বলেই জগৎ আছে—সে প্রসন্ন হ'য়ে আমাদের আশীর্বাদ করবেই করবে। আমি তার আশীর্বাদ পাইনি নিশ্চয় দেখতে চাইনি র'লে যে, একসময়ে লব

কিছুই আসে যায়, থাকে কেবল একটি জিনিষ—জ্বর। ব্যক্তিগত প্রেমের কেন্দ্র হ'ল এই জ্বর, তাই ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে বড় এ-সংসারে কিছুই নেই। অন্ততঃ এই হ'ল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি—এখন পর্যন্ত। পরে এর চেয়ে বড় উপলব্ধিকে আয়ত্ত করব কিনা বলতে পারি না। তবে যেটুকু জানি বললাম—মানে আমার আজকের credo:

শুনতে শুনতে পল্লবের মনে বিবাহ ছেয়ে আসে। সে একদুট্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে—বুড়ি বেমেছে...পাতার পাতার জেগে উঠেছে বর-বর শব্দ...বেন গুর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের প্রতিক্রিয়া। হৃদয়ও ধানিক বাইরের আকাশে বনখটার দিকে চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে। তার পর পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলে: ও কী? কী হয়েছে?

পল্লব হাসতে চেষ্টা করে: হবে আবার কী?

হৃদয় কোমল কণ্ঠে বলে: এই জন্মেই বলতে চাইনি তাই।

কী হবে দুঃখের কথা বলে? আঁধার দিয়ে আঁধার কাটে না।

তাহাড়া—ব'লে একটু থেমে—

পরের অভিজ্ঞতা যার ক'রে এমন মূলধন জোগাড় করা যায় না তাই, থাকে জীবনের বাজারে খাটিয়ে মুনাকা মিলতে পারে।

কিন্তু কাজে আসে—অন্ততঃ কোনো কোনো সময়ে।

হৃদয় চিন্তিত হারে বলে: আসে কি? জানি না। হয়ত কিছু কাজে আসতে পারে দৈনন্দিন লেনদেনের বেলায়—কিন্তু বখন আমাদের মূল শিকড়ে টান ধরে তাই, তখন সে বেদনার সত্যিকার আলো দিতে পারে—এক আমাদের অন্তরাত্মা—অন্ততঃ আমি শুধু তাকেই মানি দিশারি ব'লে—বাইরের কাউকে নয়। ব'লে একটু থেমে:

বুড়ি ধামল—আজ উঠি। হ্যাঁ, আমি এলিগনোরাকে বলব তোমার গান শেখার কথা। ওহো, দেখ দেখি—ভুলেই বসে আছি: কাল বিকেলে সে তোমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছে। চারটেয় তার ঘোঁটার আসবে তোমাকে নিতে। মনে রেখো, কেমন? কারণ কাল রবিবার, ওর ছুটি—আমি লাঞ্জে আসতে পারব না।

[ক্রমশ:]

উন্মনা মেয়ে

শেফালি সেনগুপ্তা

উন্মনা মেয়ে নীল বিলম্বিত আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে দিনগুলো। কিশোর বেলার অবসর কিছু পেয়ে। এ সংসারের রুটিনে অবস্ত অবসর মেলা তার মিলেছে আজকে কি জানি কেন যে অনেক ভাগ্য তার। ছন্দবিহীন নীরস কাজেতে বাঁধা সে যে দিনে রাতে কাজের পরিধি যার শুধু ঘর কলতলা উঠোনেতে। কাজ করছে তো জগতে সকলে কাজের অন্ত নাই শুধু দেখা চাই সে কাজ কেমন স্বাদ কতটুকু পাই। শত ব্যস্ততা তার মাঝেও তো অবাক প্রাণীরা ভ্রাপে, রূপ-রস-আশা-রং বাসনার চেউ অন্তরে লাগে। একদা অতীতে জেগেছিল ডেউ বধুর হৃদয়তটে—পূর্ণ সে হিয়া শূন্য আজকে জোরার আসে না মোটে। ঘর ঝাড়ামোছা, রান্না বাটনা, এঁটো বাসনের তলে জ্বরের নদী হারিয়েছে গতি পাক ঘোলা কাদা জলে। এই সংসার একখানি দাওয়া ঘর-দারী-ছেলেপুলে অনেক অভাব ব্যাধি-লোভ-কোভ সব কিছু আবহলে। অলস ভাবনা ভাববে আরামে সে সময় কি সে পায়? তোর রাতে উঠে করলা ভাতার কাজ কে বা বোলা নেয়। আরো আছে তার নিত্য ভাবনা অন্ন পাবে কোথায়? জোড়াতালি দ্বারা এত দারিদ্র্য। ভবুও বাঁচতে হয়। সে আছে বলেই এখনো এ ঘরে সৃষ্টির খেলা চলে বিকৃত কায়না: তার স্বাক্ষর শুটি ছয় সাত ছেলে। মনে করতে সে চায়নাকো ভবু কণিকের কীকে কীকে মনে পড়ে তার শত স্মৃতিতরা হৃদয় অতীতটাকে। হৃদয় হাওয়ার উড়ে আসে বেন স্মৃতির ছিন্নপাতা সেই কণাখানি হারান ঘ্রাম কিশোর কালের কথা।

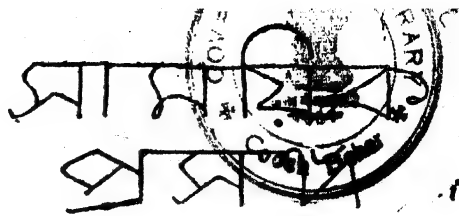
“সম্প্রতি কলিকাতা গড়ের মাঠে হইতে লর্ড রিপনের যে মূর্তি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে কোন পত্রলেখক কোন সহযোগীকে লিখিয়াছেন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড রিপনের জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—তিনি যে ভারতীয়দিগের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু—The purity of his intentions, the loftiness on his ideals, the righteousness of his policy and his hatred of racial discriminations were an open book to the people of India. এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। লর্ড রিপনের মূর্তিটি সুবোম্বাইয়াদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ভারতবাসীর অর্থে ভারতীয়দিগের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লর্ড রিপন এ দেশে হইতে চলিয়া বাইবার কয় বৎসর পরে ‘সঞ্জীবনী’, পত্র একখানি পত্র প্রকাশিত হয়—ভারতবাসীরা লর্ড রিপনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোন নিদর্শন দেন নাই। সেই পত্র উন্মেষচক্রে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবার দুই আকর্ষণ করে এবং তিনি দেখেন তাঁহার স্বামীর হিসাবে রহিয়াছে—লর্ড রিপনের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রহীত করা হাজার টাকা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ছিল। তিনি এই টাকা—চক্রবর্ত্তি হারে স্তরের সহিত তাঁহার এটর্নির নিকট রাখা হানে প্রেরণ করিয়া পাঠাইয়া দেন। এটর্নি তাহা জানাইলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা উত্তেজিত হইয়া এই মূর্তি প্রস্তত করাইয়া আনেন। কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই মূর্তির বৈদ্যুতিক উৎসাহ দিলে—সরকারের অনুমতি লইয়া মূর্তিটি কলিকাতার গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু লর্ড রিপন ইংরেজ বড়লাট ছিলেন আজ বধন ইংরেজদিগের মূর্তি অপসারিত হইতেছে তখন—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ার ?
বিস্তার দায়িক লোক ঠেকে সেল দায়।”

—দৈনিক বহুমতী।

বিশ্বভারতী

“সুরেন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আজ অনেক কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বভারতী পরিচালনার যে মূল পদ্ধতি ছিল, তাহাও যদি ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে তাহা কবিত্তর দেশবাসীর পক্ষে সত্যই খুব বেদনার কারণ হইয়া উঠে। কবিত্তর নিয়মকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিতেন না, নিয়মাহীনগতায় গুরুত্ববোধও তাঁহার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু নিয়ম অপেক্ষা ক্ষমতাবৃত্তাকে আরও ব্যাপক অর্থে বলা চলে মানবতাকে তিনি উপরে স্থান দিতেন। তাহার ফলে নিয়মতান্ত্রিক কাটিয়াশূন্য হইয়া আনন্দতার মধ্যেও একটা মুক্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। বিশ্বভারতীর পরিচালনে সেই বিশেষত্বটুকু বজ্জিত হইবে না ইহা স্বভাবতই দেশবাসীর কাম্য। কিন্তু বিশ্বভারতীর যে সব সবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তাহাতে সে বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া বাইতেছে, সে কথা অকৃত্তভাবে বলিতে পারিলে আমরা ভুলি হইতামি। বিশ্বভারতীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে বীজার নিরোপের ব্যাপারেও অন্যান্য মনের রূপ প্রকট হইতে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। কোন পদের জন্য আবেদন-আহ্বান করার সময় পদটি স্থায়ী কি



অস্থায়ী তাহার উল্লেখ না করার মধ্যেই প্রাচীর স্থিতি অন্তর্বিহার প্রতি অনন্যবোধের ভাব রহিয়া গিয়াছে। তদুপরি নির্ধাতিত প্রাচীর সত্ত্ব অন্তর্বিহার কথাও সন্তানতর্য সঙ্গ বিবেচিত হইবে না, কবিত্তর পুণ্য স্মৃতি জড়িত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একথা ভাবিয়া শুধু দুঃখিত নহে বিস্ত্রিতও হইতে হয়। বিশ্বভারতী বর্ত্তপক্ষ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহা কি আশা করা চলে না ?”

—জানক্যাবার পত্রিকা।

জুয়াচুরি

“জুয়া লাইসেন্স বা পারমিট লইয়া লোক অসাব্য ব্যবসা করে, মিথ্যা বিবরণ দিয়া কেহ কেহ নানা ব্যাপারে সরকারী ধন গ্রহণ করে, ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য টাকা আদায় করে, কিন্তু পরে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, এরূপ ব্যাপার ইতিপূর্বে অনেক ঘটিয়াছে, এখনও ঘটতেছে। বাহাদুর খোঁজ পাওয়া যায়, তাহাদের কেহ কেহ হস্তান্তর দ্বারা পড়ে এবং তাহাদের বিক্রমে মামলাও করা হয়। কিন্তু এই সকল প্রতারণা বা বড়বড় নিবারণের কার্যে বাহাদুরের হাতে তাহাদের বিক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে কমই দেখা যায়। বিভাগের উদ্যোগ ছাত্রদের নামে বহু সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে ভদ্রত্ব দ্বারা পড়িয়াছে যে, তত প্রকৃত উদ্যোগ সে বিভাগের নাই। জুয়া লাইসেন্স পারমিটই হউক বা ধন অথবা সাহায্যের টাকাই হউক, সহজেই বুঝা যায় যে, সঞ্জিত সরকারী কর্ত্তারিগণ বসেই তদন্ত না করিয়াই উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি এই সব ব্যাপারে কিছু সতর্কতা অবলম্বিত হইতেছে, তথাপি দুর্নীতিপরায়ণ কর্ত্তারী বা লোকের অভাব নাই। এজন্য বাহাদুরের মাঝেতে জ্ঞানভাবের অর্থ, লাইসেন্স বা পারমিট বাহির হয়, তাহাদেরও উপযুক্ত তদন্তের পরে কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।”

—সুশান্তি।

আবার শিক্ষা-কমিশন

“পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনে আবার একটি শিক্ষা-কমিশন গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব শুধু নিরর্থক নয়, প্রকৃত শিক্ষাজীবীদের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া আমরা মনে করি। স্বাধীনকল্প কমিশনের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ লইয়া গঠিত কমিশন আধুনিক কালে খুব কম হইয়াছে। এই কমিশনের রিপোর্ট ভাবত সরকারের রাজনৈতিক নেতারা হুমায়ুন কবীরকে দিরা পদস্থিত করাইয়া ছাড়িয়াছেন। যে শিক্ষানীতি সারা ভারতে আজ প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে তাহা উচ্চশিক্ষা-সংস্কারের নীতি এবং স্বাধীনকল্প কমিশনের সুপারিশের সম্পূর্ণ বিরোধী। অশ্রু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং

সিউকট অভিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে সরকারী নীতি মানিয়া নিরাহেন, রাষ্ট্রতন্ত্র কমিশনের বিপোর্টের ধর্ম্যাদা তাঁহারাও দেন নাই। কোন প্রতিক্রিয়াও শোনে নাই। এ বিষয়ে অধ্যাপক সমাজের যে দাবি ছিল তাহা পালনে এই সম্মেলনের কর্মকর্তারাই বাধা দিয়াছেন। সিউকট কমিটিতে সরকারী শিক্ষা ক্রমের প্রতিবাদে যে আপত্তিপত্র (note of dissent) দিয়াছিলেন সেইটুকুও বাতিল করিবার জন্য এই সম্মেলনের বর্তমান সভাপতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এঁদের উপর অধ্যাপকদের কিরূপ আস্থা আছে তাহাও এই সম্মেলনের কর্মকর্তা নির্বাচনে সাদা ব্যালট পেশার পড়ার দ্বারা প্রমাণিত। অধ্যাপক সমাজের একাধিক সক্রিয় ভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থার নীতিতে সাহায্য করিয়াছেন আর এক অংশ নিষ্ক্রিয় রহিয়া উদ্দেশ্যই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন—ইহাই আমাদের অভিযোগ। নুতন কমিশন গঠন ইহার সমাধান নহে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্যাটলের কলঙ্ককালনে যিনি ঢেঁড়া সহি দিয়াছেন তাঁহাকে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে জানা উহার কর্মকর্তাদের উপযুক্ত কাজ হইরাছে।

—বৃগবাণী (কমিকাতা)।

কোরালার বিরোধী পক্ষের রূপ

“কোরালার কংগ্রেস, ক্যাথলিক গীর্জা, নায়ার সেবাসমিতি, পি-এস-পি, আর-এস-পি ও মুসলিম লীগ সমগ্রাধীকৃত তড়িৎগতিতে কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার অবসান ঘটাইবার প্রাথমিক লক্ষ্যলাভে ব্যর্থতার আক্রোশে নিজস্বের বর্ধনরতায় ভ্রমবেশ খুলিয়া ফেলিয়া আত্ম নিলক্ষ্য হিসাবস্বত্ব নুস্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিমোচন সমিতির নেতৃবৃন্দ সম্মতি নয়াগীর্জাতে তথিহ-তদারকের পর কোরালার প্রত্যাভর্তন করিয়া পৃথিবীতরুতার বীভৎস চিংকার হাড়িয়াছেন—অহিন্দা, শান্তি প্রভৃতির কোনও আত্ম রাধিবার কোনও প্রয়োজন নাই; যে কোন প্রকারে সরকার দখলে অগ্রসর হও। এই নুতন নির্দেশ অনুসারে কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই গত কমিনি সমগ্রাধী-ত্বের কার্যকলাপে তাহাদের এতদিন গোপন করিয়া রাখা বিষয়ভেদ বিকট রূপটি বিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা মৃত উন্নয়নের যে সমস্ত কাজকর্ম, করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া কোরালার মুখ্যমন্ত্রী জীনাথদিগিপাদ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যে, যদি অন্য কোনও রাজ্যের বিরোধী বলগুলি এই ধরনের হিংসা ও হিংসাশ্রম কার্য করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কী করিতেন? সকলেই জানা আছে যে, ভারতের অন্য যে কোন রাজ্যসরকার যদি কোরালার সরকারের ভায় আইন-মুখতার গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইতেন। সংবিধানের নির্দেশও ইহাই। কিন্তু কোরালার সম্পর্কে তাঁহাদের আচরণে আগাশোড়া এমন কিছু দেখা যায় নাই বাহ্যতে মনে এই নিশ্চিন্ততা আসিতে পারে যে, দেশের সংবিধানের অথবা গণতন্ত্রের ও পাল্লামেটরী প্রচার মর্ম্মাদা রক্ষার জন্য তাঁহাদের মনে এতটুকু উবেগ রহিয়াছে।” —বাবীনভা।

বর্তমান পৌরসভার নানা কীতি

“বর্তমান পৌরসভার অবহেলিত অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত পানীয় সরবরাহ, রাস্তা নির্মাণ ও ড্রেজ ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা পৌরসভা করিতেছেন না। এই অঞ্চলগুলি পৌর এলাকাভুক্ত হইয়া কেবল

মাত্র ট্যাক্সের বোকাই বহিয়া আসিতেছে। এতদবশত হইতে নির্বাচিত সমস্তপণেরও কোনরূপ ধীচা নাই। দলীয় রাজনীতির গোপন ও লল রাধিতেই পৌরসভার অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। পৌরসভার এই অঞ্চলগুলির করদাতাগণের পক্ষ হইতে পৌরসভার এই নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা এই এলাকাগুলির করদাতাগণকে সংযত হইবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।” —বট্টমান।

রাতারাতি বাড়ী উঠাও !

“সিউকট সহরের উপকণ্ঠে সিউকট-দুবরাগঞ্জ পাকা রাস্তার পাশে একটি পাকা বাড়ী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক (P. W. D.) নির্মিত হয়। বাড়ীটি রাস্তার পাশে, সুতরাং এই পথে বাহারা সগা-সকঁদা বাতাসাঘাত করেন, এই নবনির্মিত নুতন সরকারী ভবনটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল, এই বাড়ীটি রাতারাতি উঠাও হইয়াছে। যে টিকাদার ইহা নির্মাণ করেন—তিনিই রাতারাতি স্থানীয় বিভাগীর কর্তৃপক্ষের বোগসাজশে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু এই বাড়ী সলগ্ন কুয়াটি এখনও রহিয়াছে দেখা গেল। তাহা কেন উঠাও হইল না বুঝা গেল না। জানা গেল, পূর্বাভূত স্থান নির্বাচনের অন্তিমটি উদ্ভূতন ঘল হইতে না লইয়া স্থানীয় বিভাগীর কর্তারা ইহা নির্মাণের আদেশ দেন। উদ্ভূতন কর্তৃপক্ষ ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন ও চাপিয়া ধরেন। কলে টিকাদার বিভাগীর কর্তাদের সহিত বোগসাজশে রাতারাতি ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই দৃষ্ট দেখিয়া সাধারণ মানুষ বিমিত হইয়া ভাবিতেছে—ইহা কি হইল? সরকারী বাড়ী এখন রাতারাতি উঠাও হইতে পারে, তখন এই রাজ্যে সবই সম্ভব। এই বাড়ী তৈরী ও ভাঙ্গার খোসারত কাহার পকেট হইতে বাইবে তাহা জানা না গেলেও গাই-বাছুরে মিল থাকিলে নাকি মাঠ গিয়াও গরুতে হু দেয়। এইরূপ প্রবাদ আছে। এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে বলিয়া ভ্রম ও ভনা বাইতেছে। জেলা-শাসক মহাশয় এই সম্পর্ক অনুসন্ধান করিলে সমস্ত রহস্ত প্রকাশ হইতে পারে।”

—বীরকুমার বর্মা।

অসহায়তার শূন্যোপ

“আদানসোলের নিকটস্থ বগুড়া উচ্চাধ শিবিরের চতুর্দিকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকার সম্মতি একদল গুপ্তা প্রকৃতির লোক নিয়মিত বাজিতে ক্যাম্পে হানা দিয়া অসহায় মহিলাদের ভয় দেখাইয়া সর্বত্র অশ্রয়ণ করিয়া লইয়া বাইতেছে। কয়েকটি পরিবার এইভাবে সর্বত্র নিঃশব্দ হইয়াছে বলিয়া সব্বাসে জানা গেল। প্রকাশ, ক্যাম্পের প্রেহরারত দারোয়ান মহিলাদের আয়েন সবেও গুপ্তাদলের আক্রমণ প্রতিহত করিতে উত্তোষী হয় না। ক্যাম্পের মহিলারা অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সশস্ত্র কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে। অপর এক সব্বাসে প্রকাশ, সরকারী নিয়ম উপেক্ষা করিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ৩০টি পরিবারের জেল বন্ধ এবং কয়েকজনকে ইনসিটি ক্যাম্পে প্রেরণের নির্দেশ দিয়াছেন। কয়েকজন মহিলা জানান যে, স্থানীয় রিপোর্ট

অসিয়ার মহিলাদের প্রতি সর্বসমর অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্যাম্পের মহিলারা অসহ্য অবস্থার আপন ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটিতে বাধ্য হইতেছে।”

—আদানসোল হিঠেবী।

গণতন্ত্র না পাণতন্ত্র ?

“বোটারিক্যাল গার্ডেনের মণ্ডকে বড় বড় রাজকর্ষট্যারি জড়াইরা পড়িবার পর নানাহানে অধুন কর্ণট্যারিদেরও তুল্য ব্যক্তির কাহিনী শুনিতে হইতেছে। কামিনী ও কাকন ইয়া সর্বত্র যে পাণচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, অসহ্য দেশবাসী শুধু তাহা ভুল ভুল করিয়া চাহিয়াই দেখিতেছে। প্রতিবার করিতে সাহস নাই, হয়ত সন্নিহাও নাই, আছে শুধু আদোলন ও দ্রোগান—ইন্সার্ব জিন্দাবাদ। বিজ্রোহ করিবে ? কর, সে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু কিসের বিজ্রোহ ? কহার বিরুদ্ধে ? বলিতে পার ? পাণের বিরুদ্ধেই বিজ্রোহ করিতে হয়। সমাজ হইতে চুনীতি বহনপোষণ চুরি জুয়াচুরি মুনকাধোরী কালোবাজারী—এই সব পাণ নির্মূল করিতে হইলে ধর্মবিধানী হইতে হইবে—পাটিপলিট্রন এ পাণ ছুর করিতে পারিবে না। কেবলে আজ যে অষ্টম এক হইয়া কমান্ডিটের ত্রাহি মণ্ডমুন ডাক হাড়ানো হইতেছে, উহারও মূলে তো ঐ রাজনীতির খেলা ! আজ যদি পাণের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম প্রমাণিত হয়, তবে ধার্মিক জনতা পাণশাসনের অবসান নিশ্চয়ই চাহিবে। কিন্তু তৎপূর্বে যে সব দল সংগ্রামে ঝাঁপাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই বলিতে হইবে—আমরা সারা দেশ হইতে পাণের রাজত্ব ছুর করিতে বহুশরিক। সর্বত্র পাণ রঞ্চে রঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে। উপর হইতে নীচে পর্যন্ত পাণের প্রবল প্রভাব। আদোলন করিতে তো হইবেই—সারা দেশব্যাপী প্রবল আদোলন কর। ঘূর, চোরাকারবার, ব্যক্তিচাৰ—নিঃশ্রমহস্তে বন্ধ কর।”

—পল্লীবাসী (কালনা)।

টেটে রিলিফ, মন্ত্রী, এম-পি, জেলাশাসক

“প্রচার দপ্তর, সরকারী দপ্তর থেকে আরম্ভ করে বহু জেলা শাসকমণ্ডার পর্যন্ত সকলে প্রায় এক মূরে এ সম্পর্কে একটা অদ্ভুত রহস্তজনক মনোভাব দেখিয়েছেন। টেটে রিলিফ সম্পর্কিত কোন খবর জেলাশাসক সরাশরি আমাদের দিতে চাননি। সারা জেলা ঘুরে এসম্পর্কে খবর নেবার জন্যে তিনি আমাদের সহপলেশ বিলিয়েছেন। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকার জেলা পরিক্রমার্ত ঠীক রিপোর্টার সরকারী দপ্তর থেকে অল্পকণ ব্যবহার পেয়েছিলেন বলে আমরা জানি। জেলাশাসকের মতে এসব খবর নাকি কাগজে সরকারী ভাবে বেওয়া যার না। অথচ অজ্ঞাত ব্যব টেটে রিলিফের কাজের অভিমান দিয়ে এত ইচ্ছার আমাদের কাছে এসেছে যে তা আমরা ছাপিয়ে দেব কোরতে পারিনি। আমরা জানি না এবছর বহুতমর টেটে রিলিফ কোন সূত্রপথে অথবা সূত্রমার্গে হচ্ছে কি না—একাত্ত দিবসলোকে উন্মুক্ত প্রাচুরে সে কাজ হবার খবর আমরা এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। টেটে রিলিফের কাজ আজকাল মিলিটারী সিক্রেসীর মধ্যে গণ্য হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হবার কারণ রয়েছে। তা না হলে সে খবরটুকু সরবরাহ করতে জেলাশাসন কর্তৃপক্ষের এরকম

লুকোচুরি মনোভাব কেন ? এই অবস্থার আমরা কীর কথার বিশ্বাস করবো ? মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের প্রতিজ্ঞাতিকে বিশ্বাস ভাষণ বলে অভিহিত না করলে জেলাশাসকের ওপর উদ্ভটন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রতিপালনে গড়িমসি মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করতে হয়। কিন্তু নির্দেশ থাকে বেওয়া হয়েছে তিনি নির্দেশ পেরেছেন কি না কিংবা সেলে প্রতিপালনে বাধা কোথায় অথবা ওপরতলা থেকে নির্দেশ না পৌঁছানোর কারণ কি, বহুতমর না জানতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ষাটভাবে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। প্রতিজ্ঞা এবং কাজের সামঞ্জস্য রেখে বিস্ময়াজ বিলম্ব না করে টেটে রিলিফের কাজ চালু করা হোক, এটাই আমাদের মূল বক্তব্য।”

—জনমত (মুন্সিবাড়)।

ক্যানাল ট্যাক্স

“সরকারের ক্যানালের জলের ট্যাক্স বর্ধ্য করিবার একটি বাধা-বরা নিয়ম আছে। ক্যানালের জল পাইবার পূর্বে চারী বিখ্য-প্রতি যে হারে কল পাইতেন তাহার উপরে ক্যানালের জল পাইরা যে উৎকৃত কল পাইতেছেন সে উৎকৃত কলের রাজার-দর হিসাব করিয়া বহু টাকা হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত সরকার ট্যাক্স বর্ধ্য করিতে পারেন। বর্তমানে কলদের দর এত বেশী হইয়াছে যে ঐ রূপ বাধা-বরা হিসাবে ট্যাক্স বর্ধ্য করিলে চারীকে আরও বেশী টাকা ট্যাক্স দিতে হয়—সেই জন্য সরকার হইতে প্রতি বৎসর এক একটি এলাকার জমিতে বিভিন্ন ভাবে ট্যাক্স বর্ধ্য করিতে হয়। কোথাও একর-প্রতি ৫।।০ টাকা কোথাও ৭ টাকা আবার কোথাও ৭।।০ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স বর্ধ্য হইয়াছে। অবশ্য এই ট্যাক্স প্রতি একর বা ৩/০ বিখা জুমির জন্য বর্ধ্য হইয়াছে। যে সমস্ত চারী মৌরাকী নদীর জল-ধারার সুযোগ পান এবং বাঁহারা এই জলের সুযোগ ঠিক সময় মত চাষের জল পাইরা উৎকৃত স্তরে চাষ-আবাদ করে বাহাদিগকে কেতোরাজ্য কোন চিন্তা করিতে হয় না—বাঁহারা বাত উৎপাদন জন্য বহু বার ইচ্ছা ততবার জল পাইরা থাকেন, তাঁহারা এই ট্যাক্স দিতে কাতর নহে। সময় মত সরকারের এই ট্যাক্স আদায়ে অব্যবহার্য জমি বহু এই সমস্ত চারীরা বিশেষ ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং এককালীন আদায় দিতে কষ্টকর হইবে মনে করে।”

—সেবা (শিউড়ী)।

ধর্মাদায় বা বৃত্তির টাকা অনাদায় ?

“বিশুদ্ধ মূত্রে প্রকাশ যে, এখানকার ব্যবসায়ী মহল নাকি বিগত কয়েক বৎসর ধারং ধর্মাদায় বৃত্তির টাকা দেন নাই। উক্ত টাকাটা তাঁহারা নাকি নিজ নিজ মূলধনে নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অভ্যর্থ এবং কোতের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, বৃত্তির টাকা কাহারো ব্যক্তিগত বন নয়, উহা সম্পূর্ণ জনসাধারণের প্রাপ্য অর্থ। অতএব উক্ত অর্থ জনকল্যাণমূলক কার্যে ব্যয়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখানকার ব্যবসায়ী মহলে দৈনিক প্রায় লক্ষ টাকার লেন-দেন চলে বলিয়া প্রকাশ, সত্তরটি বিগত কয়েক বছরের হিসাব ধরিলে একটা ঘোটা বকর অর্থ অভ্যর্থ ভাবে আটকাইয়া রাখিয়াছে। ব্যবসায়ী মহলে আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন নিজ নিজ আয়ের বৃত্তির টাকা

কাণ্ডে জমা দিয়া মানবতাবোধের পরিচয় দেন। এবিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সারিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্ষিপ্রাঙ্গী আকর্ষণ করিতেছি।

—মালক (আসানসোন)।

শিক্ষা ও শিক্ষকত্ব

“এককালে খুঁটা মিশনারী শিক্ষকের আন্তরিক চেষ্টায় ভারতবাসী শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বেঙ্গল্‌য়ের প্রিন্সিপালস বিজ্ঞান ও কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের আন্তরিক চেষ্টায় কলেই বেঙ্গল্‌ দেশবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। উন্নত ধরণের শিক্ষার জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের এতদিন যে সুনাম ছিল সামান্য কয় বছরের মধ্যে বেঙ্গল্‌য়ের নিকট প্রেসিডেন্সি কলেজের সে গৌরব জ্ঞান হইতেছে। সমাজের দুর্নীতি অথবা রাষ্ট্রের অব্যবস্থা। বেঙ্গল্‌য়ের শিক্ষকশ্রেণীর আন্তরিকতার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ বেঙ্গল্‌য়ের আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় কর্তব্য বোধের পালন করিলে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ শিক্ষকের বোধ্য মর্যাদা দান করিতে এবং তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইতে পক্ষান্তর হইবে না। রাজ্যের শিক্ষকশ্রেণী বা অজ্ঞাত রাজ্যের শিক্ষকদের বেতনের হার কত তাহাও বিবেচনা করা দরকার। আশা করি, সব দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষক সমিতি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।”

—বীরভূমবাসী।

শোক-সংবাদ

শিশিরকুমার ভাট্টা

বর্তমান বাঙালার তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, বাঙালার নাট্যজগতের নবযুগের স্রষ্টা, প্রতিভা-মণীষা-মেধার দিকপাল বরপুত্র পরম প্রাচ্যে নটগুরু শিশিরকুমার ভাট্টা গত ১৪ই আষাঢ় সোমবার রাত ১-২০ মিনিটে ৭০ বছর বয়সে দেহান্তবৃত্তি হয়েছেন। ১২১৬ সালের ১৬ই আশ্বিন মাতুলদলের সৌভাগ্যবাহিনীর স্বর্গীয় হরিদাস খাঁ ভাট্টার ছয় পুত্র ও এক কস্তার মধ্যে সর্বকণ্ঠে শিশিরকুমারের জন্ম। ১৯১৩ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগ্যগর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। জন্মকালের মধ্যেই ঐ বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ রক্তালয়ে পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাঁর প্রথম অভিনয়রত্ন নাটক আলমগীর (তখন নাম ছিল ভীমসিংহ)। ১৯৩০ সালে সম্প্রদায়ের শিশিরকুমার আমেরিকা বাত্রা করেন, সেখানে “নীতা” নাটকটি তিনি মঞ্চস্থ করেন। শিশিরকুমারের প্রতিভার স্পর্শসংস্কৃত যে অসংখ্য নাটক নাট্যজগতে যুগান্তর এনেছে, তাদের মধ্যে সীতা, আলমগীর, দিবিজয়ী, নরনারায়ণ, মাইকেল মধুসূদন, রীতিমত নাটক, প্রকুল, বোড়ী, সাজাহান, চিরকুমার সভা, বিরাজ বৌ, রঘুবীর, জীবনরত্ন, শেখরকা, পরিচয়, বিজয়া, সিরাজুল্লা, সখার একাদশী, চক্ৰগুপ্ত, হুসাইন ইমান, শিশিরকুমারী, রমা, তৎ-ত-এ-তাউস প্রমুখ

নাটকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের আদিযুগ থেকেই ঐ জগতের সঙ্গে শিশিরকুমারের যোগাযোগ, নির্ধারিত যুগে যোমিনী, কমল-কামিনী, আঁধারে আলো, বিচারক এবং সবাক যুগে পদ্মসমাজ, সীতা, মন্তরমত টকী, চাণক্য, শোষণপুত্র প্রভৃতি ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয় দেশবাসী দেখতে পোষেছেন—এদের মধ্যে আঁধারে আলো, পদ্মসমাজ, সীতা, মন্তরমত টকী, চাণক্য ছবিগুলির পরিচালকও তিনিই ছিলেন। ১৯৫৬ সালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং গত ১০ই যে মহাকাব্যটি সনদে নাট্যাচার্যের জীবনের শেষ অভিনয়। বর্তমান বছরে নটগুরুকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। বলা বাহুল্য, চিরউন্নতশির নাট্যাচার্য “খেতাব” এই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে সারা বাঙালার মুখ উজ্জ্বল করেন। শিশিরকুমারের লোকান্তরে দেশ, ভূমি যে একজন বিরাট অভিনেতাকে হারাল, তাই নয়—তাঁর দেহত্যাগে বাঙাল দেশ এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে, প্রথম পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক পুজনীয় পুরুষকে, বাঙালার রঙ্গমঞ্চের এক অনন্তসাধারণ যুগপ্রবর্তকে হারাল। এই জাতীয় ক্ষতি পূর্ণ হবার নয়। (নটগুরু সবুকে আরও বিস্তৃত আলোচনা রঙ্গমঞ্চ বিভাগে দ্রষ্টব্য)।

তুলসী লাহিড়ী

বাঙালার বিখ্যাত নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী গত ৭ই আষাঢ় ৬৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বাঙালার নাট্য ও চিত্রজগত দুর্দীর্ঘকাল ধরে তাঁর সেবা পেয়ে এসেছে ও তাঁর অবদানে রঙ্গজগতের নানাদিক তরে উঠেছে। নলডাঙার বিখ্যাত জমিদার-বংশে এর জন্ম। তুলসীবাবুর কর্মজীবন শুরু হয় রংপুর কাহারির আইন ব্যবসায়ী হিসেবে, আলীপুর আদালতে কিছুকাল তিনি ওকালতী করেন। ১৯৩০ সালে শিল্পজগতে প্রবেশ করেন সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে (এইচ, এম, ডি) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ পাট থিয়েটারের “শোষণপুত্র” নাটকের সুরকাররূপে। অভিনেতারূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ চিরকুমার সভার ক্ষুরের ভূমিকায়। তারপর তাঁর প্রতিভা নানাভাবে বিকশিত হতে থাকে, চিত্র-কাহিনীকার, নাট্যকার, অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রপরিচালক ও নাট্যপরিচালকরূপে। বাঙলাদেশের অসংখ্য নাটক ও ছায়াছবি এঁর প্রতিভার স্পর্শ বহন করছে।

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

তুলসী লাহিড়ীকে বাঙাল দেশ যেদিন হারাল সেই দিনই আরও একজন শক্তিশালী অভিনেতা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর নাম প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। ইনি তুলসী লাহিড়ীর মতই প্রথমে সুরকাররূপে চলচ্চিত্র জগতে যোগ দেন ও পরে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বোম্বাই চিত্রজগতেও সুরকাররূপে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ছবির কাহিনীকাররূপেও বাঙালার চিত্রলোক তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়েছে। স্বতন্ত্র পূর্বদিন তিনি জীবনের অবশ্যতাবী পূর্ণ করেছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

বঙ্গিকাজ ১৪৬ নং বিশিষ্টবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, “বহুভূমি মোটারী বেসিনে” প্রচারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত চৈত্র সংখ্যার ত্রিমতী বাংলা রায়ের 'বৌদ্ধ পঞ্চশীল' গ্রন্থ প্রসঙ্গে চৈত্র সংখ্যার ত্রিমতী সমালোচনার মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করলাম। তাঁর সমালোচনা ঐতিহাসিক সত্যকে বর্জন করে ধর্মাত্মতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে পুনর্বালোচনা কতদূর সমীচীন হবে জানি না। তবুও কিছু বলা আবশ্যিক মনে করি। সমালোচনার মহাশয়ের দৃষ্টিতে বাই প্রতিভাত হোক না কেন, বিশাল হিন্দুশাস্ত্র এক দিনে গড়ে ওঠেনি। বিশ্ববিধানের নিয়মামুখতনে তার রচনার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। 'বুদ্ধ-জন্মের হাজার হাজার বছর আগে হিন্দুধর্মের জন্ম ও মৃত্যুগ্রহ রচিত হয়েছে' সমালোচকের এ উক্তি পাঠ করে বিভ্রান্ত পাঠকবর্গ হাত সাংবরণ করতে পারবেন না। ভারতে আর্থ অভিধানের আশ্রয় খৃঃপূঃ বিংশ শতকের আগে নয় এক বছর আবির্ভাব খৃঃপূঃ পঞ্চ বষ্ঠ শতকে। আর্থ ধর্মের ভারতের মাটিতে বেদ রচনা করেন। ঐতিহাসিকগণ বৈদিক যুগের ব্যয়ক্রম নির্ণয় করেছেন খৃঃপূঃ ১৫০০ হতে খৃঃপূঃ ৫০০ শতক। বেদে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মিত্র বা সূর্যের উদ্দেশে স্তব-স্তুতি, পূজা-যজ্ঞ ও বলিদানের নির্দেশ। শীলচাচার উল্লেখ তাতে নেই। উপনিষদই সর্বপ্রথম বৈদিক স্তুতি ও প্রার্থনার সীমা অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় সত্তার কথা বলে এবং উপলব্ধির জ্ঞান শ্রম দম তিত্তিকার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে নির্দেশ সীমিত হয় বিভ্রান্ত আত্মসন্ধানীদের মধ্যে, গণমানসে তার রেখাপাতের কোন প্রমাণ নেই। দুই অতীতে কালের বিবর্তনে যখন ভারতের ধর্মজীবনে ও সমাজ-জীবনে গ্রানি নেমে আসে, ধর্মের নামে অধর্মের এক বিভ্রান্ত রূপ আত্মপ্রকাশ করে, অবাধ পতনভায়া এবং দিশিলা হয়ে আসে নীতির বাধন। অনাচারের আঘাতে, তখন ভারতের নীতিভিত্তিক আত্মা ভূবিত চাককের মত সে দুর্ভাগ্যের অবসান প্রার্থনা করে। সেই যুগসন্ধিক্ষেপে বুদ্ধ প্রবর্তন করেন পঞ্চশীল হস্ত। বলা বাহুল্য, এ মন্ত্র ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনে কল্যাণের উৎসরূপে পরিণত হয়। এ সবক্ষে ত্রিমতী রায়ের উক্তি একটুকুও অসঙ্গত নয়। প্রাক-বুদ্ধযুগের শীল-তত্ত্বের ইতিহাস দিতে গিয়ে শ্রী সমালোচনার মহাশয় পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলির জন্ম হয় খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতকে। তাঁর তিন শ' বছর আগে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধ কিভাবে পঞ্চশীলের জন্ম তাঁর কাছে খণ্ডি হলেন সমালোচক বলতে পারেন কি? প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ যোগবাশিষ্ট রামায়ণে ও পুরাণ শিবোদ্ভবরূপে সম্মানিত শ্রীমদ্ভাগবতে ঐতিহাসিক বুদ্ধ প্রসঙ্গে উক্তি রয়েছে। এ সব উক্তিকে উড়িয়ে

দিয়ে এদের রচনাকাল বুদ্ধজন্মের হাজার হাজার বছর আগে কি ভাবে নির্ণয় করলেন তা সমালোচক বলবেন কি?

কেবলমাত্র শীলসাধনার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আরও হয় এবং সত্যের উপলব্ধি হয়—এ কথা বৌদ্ধধর্মের কোথাও বলা হয় নি। শীল চারিত্রিক গুণের জন্ম। শীলের সাধনার চারিত্রিক উৎসর্ঘ লাভ হলে চিত্ত সমাধিবাবনার অঙ্গুল হয়। সমাধিবাবনার অঙ্গসর হলে লোভ ঘেব মদ মাংসখাদ্যাদি ত্রিপু মনে স্থান পায় না এক মন কলঙ্কবৃত্ত হয়ে সৌন্দর্যে সুবহার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এতাদৃশ মনে প্রজ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, তার গুণ আলোর জাগে স্তরে স্তরে নির্বাণের উপলব্ধি। এর বিশদ আলোচনা অঙ্গুলের নিকারের বোধিতসূ বর্ণণে না, রয়েছে বিশেষভাবে নিকার গ্রন্থসমূহের মধ্যে। সমালোচকের উক্ত বিভ্রান্তিমাগ্ন শরবতী যুগের রচনা, পিটকের অন্তর্ভুক্ত নয়। বৌদ্ধধর্মে গুরুবাদের স্থান নেই। উপবাস বুদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—ভগবৎ নিজেকে সত্যের পরিচালক ভাবেন না এবং তাঁর কাছে সত্যের আত্মনিবেদনও কামনা করেন না। তিনি আরও বলেছেন—অশুদীপা বিহরথ অন্তসরণা অনঞএ সংখা। বৌদ্ধশাস্ত্রে নিবৃত্তির পরে আর কোন উল্লেখ নেই, সমালোচকের এ উক্তি নিতান্ত অবাছুর। 'নিবারণঃ পূণ্যমং প্রথমং অজাতং অজরং অমৃতং যোগকথং নিবারণ' ইত্যাদি উক্তিগ্রন্থ সমালোচককে অগ্রহাবন করতে অগ্ররোধ করি। মহামানব বিবেকানন্দ যে তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় উদ্বাহ কঠে ঘোষণা করেছিলেন—Buddhism is the fulfilment of Hinduism, সে বাণীকে সমালোচক ব্যক্তভাষার ভাবপ্রবণ উদ্ধৃতি বা কৈতববাব বলে অভিহিত করেছেন। এ উক্তি স্বামীজীর উদার বাণীর উদ্দেশে ধর্মিক মনের বিবোধগার ছাড়া কিছুই নয়। 'স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন উপনিষদের সর্বভূত ব্রহ্মদর্শনের চিত্রা বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে বুদ্ধের মৈত্রী করণার উদার আদর্শে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতের বুদ্ধ সত্যত্বের যে বিরাট আধ্যাতিক বিক্ষোণ হয়েছিল, তা শূদ্র মিলিয়ে যারনি। ভাষতে তথাকথিত বৌদ্ধধর্ম সমাধি হয়েছে বটে, কিন্তু সেই বিরাট সত্যভিত্তি অন্তর্হিত হয়নি, তার ভাবগার ভারতবাসীর অংলখিত ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। সমালোচকের কাছে তা দুর্বোধ্য হলেও সত্যসদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছে দিনের বহু উজ্জ্বল। আর অধিক আলোচনার পত্রের কুলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। সমালোচককে উদার দৃষ্টি নিয়ে অনাঙ্কর মনে ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন করতে অগ্ররোধ করি।—শীলানন্দ ব্রহ্মচারী বনুদনগর, যথায়গ্রায়।

পত্রিকা সমালোচনা।

১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বসুমতী পাইলাম। অশেষ ধন্যবাদ প্রকাশ করিবেন। আমরা দীর্ঘদিন হইতে বসুমতীর শুভ পাঠিকা। বসুমতী কৃষি হস্তশিল্পের পর হইতে মায় আমার জন্মের পূর্ব হইতেই তাহার সহিত এবাড়ীর বোণাবোণ চলিতেছে। আমরা কেবল হর বর্ণপরিচয়-এর সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক বসুমতীর সহিত পরিচিত। প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে মা-সিক-বসু-ম-তী, বানান করিয়া পড়িয়াছি এবং প্রতি মাসেই মা-কাকিমার বসুমতীর অপেক্ষার উৎকর্ষা দেখিয়া ভিতরে ভিতরে নিজেদেরও উৎকর্ষিত হইয়া উঠিয়াছি। পিওনের কাছ হইতে এই বই কে মা-কাকিমার দ্বারা পৌছাইয়া দিবে এই লইয়া ভাইবোনদের মধ্যে বীভিন্নত দৃষ্টিতে বাহিয়া বাইত। মাসিক বসুমতী তাহার জন্মকাল হইতে এ ভাবকাল পর্যন্ত আমাদের গৃহে শুভমাত্র আমাদের গৃহেই বা কেন সমস্ত ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকার কাছে এইরূপ সম্মানের পাতি। স্ততরা ব্রিটিশেই পারিতোছেন, সেই বই-এর আগমন বখন অকারণেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল তখন মনের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া উঠিল। বিশেষ আগমনের পরিচালনার ইহা আরও মনোজ্ঞ আর চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। এবছরের 'বর্ণালী' প্রতি মাসেই মনের পরতে পরতে নানা বর্ণের ছটার আলোকিত করিয়া তোলে। এক এক সময় মনে হই মনের কলমে এত জোয় এত রস? কি অপূর্ণ ভাব। বন্ধ নয় কিন্তু সুন্দর সুস্বাদু বৈকি আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তাহার 'জিজ্ঞাসা' খুব ভালো লাগিয়াছিল, তাহার পর 'মিত্রা' মনের কোণায় চিরস্থায়ী লাগ বাধিয়া গিয়াছে, আর বর্ণালী? বর্ণালীর ত কথাই নাই সুস্বাদু দেবীর সোনার সোড়াস-কলম হোক, আমরা বেন তার আরও লেখা পাই এই কামনা। এমাসে বর্ণালী নাই দেখিয়া আমাদের মনের আকাশেও বর্ণাভাব বটিয়া কিকিৎ ঘেঁষ লেখা গিয়াছে। আগামী মাসের অপেক্ষার উল্লসিত হইয়া আছি। এছাড়াও আছে 'ইন্ডিয়ান প্রেস' অপরূপ ইনা মীনা বেন চোখের সামনে তাহাদের নব প্রেমের আনন্দ-বেদনা লইয়া চোখের সামনে নাতিরা বেড়ার আরও আছে 'বন কেটে বসন্ত' 'চম্পা তার নাম' কোনটা বাধ দিয়া কোনটা লিখিব? শুধু কি আমাদের? বাড়ীর কৰ্ত্তা ব্যক্তিরও উল্লসিত কর নয় 'আনন্দ বৃন্দাবন' 'অখণ্ড নিখাই' এবং চারজন মাসে প্রথম হইতে শেষ পাতার বেলা কেমিক্যাল পর্যন্ত সবটা পড়িয়া তবে কাজ হই। কাহার দর হইতে কে বইখানি চুরি করিয়া আসে পড়িলে তাহার প্রতিবেশিগণ চলে। মায় এ বসুমতীর সোলেতে পাড়ার বিস্তার বান্ধবীও বোণাৎ করিয়াছি বসুমতী পড়িতে দিবার লেখা দেখাইয়া। কি অল্পদায়ক সকলেরই এই বইখানির প্রতি। প্রথমে B. K. Banerjee নামে এবং পরে P. K. Banerjee নামে আমার স্বামীর নামে এই বই আমার ধন্যবাদীতে বোধ হই বসুমতীর প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা হইতে এবাড়ীতে আনিতেছে। তাই গত মাসে মা পাইয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়ি, আবার তেমনি আমাদের পূর্ববার বখন পাঠাইলেন তখন বেন আনন্দের অবধি ছিল না। সেই আনন্দই কিছু বেশ কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে জানাইলাম। নমস্কার প্রকাশ করিবেন। বিনীত, দ্বারা কল্যাণপাঠ্য। C/o. P. K. Banerjee, M- 46192. Hakim para, Jalpaiguri.

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে হর মাসের জন্ম চালা পাঠাইলাম।—S. S. Basu, Bombay.

বৈশাখ—আমিন এই হর মাসের মাসিক বসুমতীর চালা ১৫০ নং পঃ পাঠাইলাম।—Tripti Basu, Aminabad, Lucknow.

গত বৈশাখ ১৩৩৬ সাল হইতে মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—সুজাতা মায়, মালদহ।

১৫ টাকা পাঠাইলাম, এই বছরের গ্রাহক করিয়া লইবেন।—Mira Choudhury, Calcutta.

বৈশাখ হইতে আগামী চৈত্র মাস পর্যন্ত এক বৎসরের চালা পাঠাইলাম।—বকুলদেবী দেবী, Bombay.

Please accept subscription for Monthly Basumati for 6 months from Jaistha 1366 B. S.—Manjusree Ghose, Bombay.

মাসিক বসুমতীর আরও ৬ মাসের চালা পাঠাইলাম।—বাসন্তী জটাবা, United Mikir & N. C. Hills.

বৈশাখ—আমিন ৬ মাসের চালা পাঠাইলাম। পত্রিকা অবতাই পাঠাইবেন।—A. C. Chakravorty, Mongher.

হর মাসের চালা বাবদ ১-৫০ নং পঃ পাঠাইলাম। আশা করি সবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের ভিন সংখ্যা পাইব।—ঐপ্রভাবতী দেবী, দিনাজপুর।

বৈশাখ চাইতে আমিন পর্যন্ত চালা পাঠাইলাম।—Mrs. Purnima Chakravorty, New Delhi.

Herewith Rs. 15/- being the subscription for Basumati for the current year. Please send the Baisakh, Jaistha and Ashar issue of Basumati. Mrs. Anjali Ghose, Patna.

I am sending Rupees fifteen only as the annual subscription for Masik Basumati.—Mrs. Bani Guha, Nagpur.

Subscription for Monthly Basumati from Baisakh to Aswin. Please send the magazine regularly.—Mohammad Hydar Ali, Murshidabad.

১৩৩৬ সন বাংলা মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চালা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—Hiranmoyee Kundu, Cachar.

Subscription for 1366 B. S. amounting Rs. 15/- is sent herewith.—Rakha Banerjee, Calcutta.

বসুমতীর বার্ষিক চালা বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। পূর্ব স্টে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—Sudharani Choudhury, Cachar.

জ্যৈষ্ঠ হইতে কাক্তিক সংখ্যার সজাক মূল্য বাবদ ১-৫০ টাকা পাঠাইতেছি। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাবিত করিবেন।—Sm. Anima Banerjee, Calcutta.

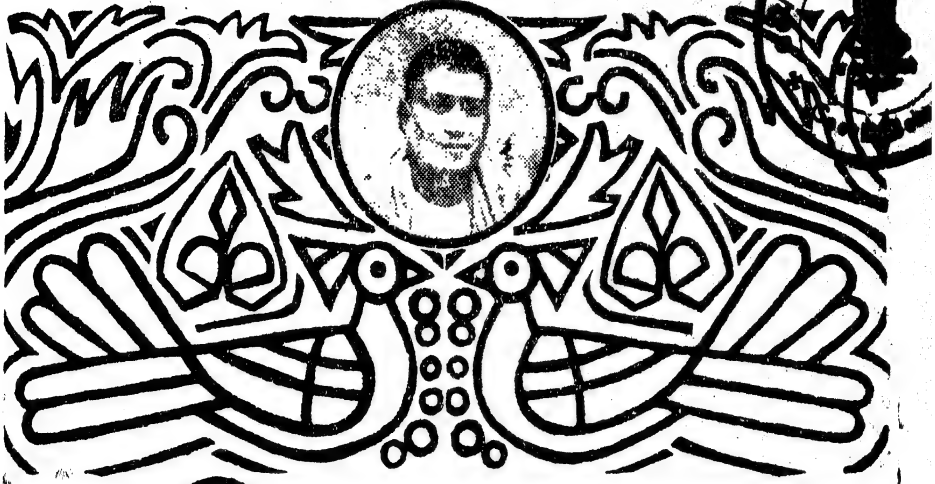


মাসিক পত্রিকা

১৯৩৬

(একটি ছবি পাঠ্য পুস্তক থেকে)

কলিকাতা
— স্বর্গত অমৃত লাভে বঙ্গোপসাগর অঙ্কিত



সামিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৬]

৥ স্থাপিত ১৩২৯ ৥

[প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথায়ত

১৯১৬ খৃঃ মঠে দুর্গাপূজা। খ্রীষ্টমা সপ্তমী পূজার দিন দুপুরে মঠে আগিয়া উত্তর পাশের বাগানবাড়িতে আছেন। অষ্টমীর দিন সকাল বেলা আটটা-নয়টার সময় মঠ ও প্রতিমা দর্শন করিতে আগিয়াছেন। রান্নাবরের পাশের 'হলে' ভক্তরা ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণ অনেক কুটনো কুটেতেছিলেন। মা দেখিয়া বলিতেছেন, "ছেলোয়া ত বেশ কুটনো কুটে!" জগদানন্দজী বলিলেন, "ব্রহ্মময়্যার প্রসন্নতা লাভই হল উদ্ভক্ত, তা সাধন-ভজন করেই হোক, আর কুটনো কুটেই হোক।"

এই দিনে বহু লোকে খ্রীষ্টমাকে প্রণাম করিতেছিলেন। খ্রীষ্টমাকে বার বার গঙ্গাজলে পা ধুইতে দেখিয়া যোগিনীমা বলিয়াছিলেন, "মা, ওকি হচ্ছে? সন্দি করে বসবে যে।"

মা বলিলেন, "যোগেন, কি লবো, এক একজন প্রণাম করে যেন পা ঠাণ্ডা হয়, আমার এক একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন জেল দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিলে।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে খ্রীষ্টমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, এক একজন প্রণাম করলে তোমার খুব কষ্ট হয়, একবার পূজার সময় তোমার এই কথা শুনেছিলাম।"

মা বলিলেন, "হাঁ, বাবা, এক একজন প্রণাম করলে যেন বোলাতায় হল জুতার দেয়। কাউকে কিছু বলিলে।" এই কথা বলিয়াই সমস্ত দৃষ্টিতে বলিলেন, "তা বাবা, তোমাদের বলছি না।"

আমি বললাম, "মা, তবু হয়, তোমার মত মা পেয়েও কিছু যেন হল না মনে হয়।"

মা—"ভয় কি বাবা, সর্বদায় তবে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের

পেছেন রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন—'বাবা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষ কালে এসে তাদের হাতে খেবে নিয়ে যাব।'"

"বে যা খুশী কর না কেন, যে যেভাবে খুশী চল না কেন, ঠাকুরকে শেষ কালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। বিশ্বর হাত-পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা ত ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।"

একবার ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে দেখি—ছবি হইতে একটা আলোর স্রোত নৈবেদ্যের উপর পড়িয়াছে। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যা দেখি সে কি মাথার ভুল, না সত্যি? যদি ভুল হয় তবে যাতে মাথা ঠাণ্ডা হয় তাই করে দাও।"

মা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না বাবা, ও সব ঠিক।"

আমি—"তুমি কি জান, কি দেখি?"

মা—"হাঁ।"

আমি—"ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই তা কি ঠাকুর পান? তুমি কি তা পাও?"

মা—"হাঁ।"

আমি—"বুঝবো কি করে?"

মা—"কেন গীতায় পড় নাই—ফল, পুষ্প, জল ভগবানকে ভক্তি করে বা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।"

এ উত্তরে বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি তুমি ভগবান?"

এই কথায় মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরও হাসিতে লাগিলাম।

—খ্রীষ্টমাদের কথা হইতে।

বৌদ্ধ দেবী

ঐশ্বরিকত্ব দাশগুণ

বাংলা দেশের দেবী-পূজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা আমরা নানা ভাবে বলিয়া থাকি। হিন্দু তন্ত্র-পুরাণাদিতে গৃহীত বহু দেবীকে আমরা বৌদ্ধ দেবী বলিয়া সন্দেহ করিতেছি। হিন্দু দেবী তারাকে আমরা বহুরূপে হিন্দু উপপূরণ-তন্ত্রাদির মধ্যে পাই; এই তারা দেবী যে বৌদ্ধ তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী, সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত। হিন্দু উপপূরণ-তন্ত্র এবং বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে এই দেবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষ্যীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পূজিতা প্রসিদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম—পর্ণ (হনুদ পাতা) পরিহিতা পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ ‘সাধন-মালায়’ও দেখিতে পাই। সুবন্ধুর ‘বাসবদত্তা’র আমরা বেতাল-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ তন্ত্রেও বজ্র-বেতালীর সন্ধান পাই। মার্কণ্ডের ‘চণ্ডী’তে শক্তির মায়ুরী, অপরাঞ্জিতা, বারাহী, ভামা, কপালিনী, কোবেরী প্রভৃতি নাম পাই, বৌদ্ধ ‘সাধন-মালা’র মধ্যেও মহামায়ুরী, অপরাঞ্জিতা, বজ্রবারাহী, ভামা কপালিনী, কোবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। চণ্ডীতে শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী ‘শিবদূতী’ নামে খ্যাতা, বৌদ্ধতন্ত্রে মহাকালের সহিত যুক্তা দেবীকে ‘কালদূতী’ নামে দেখিতে পাইতেছি।^১ প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধতন্ত্রের ‘বমদূতী’র কথাও স্মরণ্য। ছিন্নমস্তা হিন্দু দশমহাবিজ্ঞার এক বিখ্যাত মহাবিজ্ঞা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধতন্ত্রে কালিকা দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহাকালের সহিত সান্নিধ্য; ইহার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভরদ্বারী, নীলবর্ণা, ত্রিভুজা, অগ্নিকোণস্থিতা, একহস্তে কঙ্কাল এবং অপরহস্তে অস্ত্র। অলংকার ভঙ্গিতে ইনি শবের উপর দণ্ডায়মান।^২

এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্রাদিতে যে-সকল দেবীর নাম পাইতেছি, হিন্দু ধর্মে তাহাদিগকে গৃহীত হইতে দেখিলেই আমরা সাধারণভাবে একটা কথা বলিয়া থাকি—এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ দেবী—বৌদ্ধধর্ম হইতেই হিন্দুধর্মে তাঁহারা গৃহীত হইয়াছেন।

কিন্তু এই বৌদ্ধদেবী শব্দের অর্থ কি? বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লেখ পাইলেই কি সে দেবী বৌদ্ধ দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধতন্ত্রগুলিকে বৌদ্ধ বলিবারই বা তাৎপৰ্য কি? দেবদেবী সাদৃশ্য, বর্ণিত সাধনার সাদৃশ্য এবং গুণ যোগবিধির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দুতন্ত্রগুলি হইতেই নবাবিকৃত বৌদ্ধতন্ত্রগুলির বচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই হিন্দুতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ শোষণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে ও

আমরা এ ভিনিসটি স্মৃতি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে মূল হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া কোনও ভিনিস নাই, মূল দর্শন এবং সাধনায় এই উভয়বিধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র-বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রবাহিত একটি সত্ত্ব সাধনার ধারা; এই সাধন-ধারার সহিত বিভিন্ন কালে হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন তন্ত্র যুক্ত হইয়া ইহাকে হিন্দুতন্ত্রের রূপ দান করিয়াছে, আবার পরবর্তী কালের মহাবান বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবদেবী ও পূজা-অর্চনাবিধির কথা যদি ধরা যায় তবে দেখিব—উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবী, উপদেবী, ডাকিনী-যোগিনী, বন্ধুরূপ প্রভৃতির বর্ণনা, পূজা-বিধি বা ধ্যান-অর্চনাবিধি স্থান পাইয়াছে। এই সব দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর হিন্দু দার্শনিক তত্ত্ব বা বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার ক্ষমতা আস্তে আস্তে বিশদবর্ণনার বিগ্রহবত্তী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায় আমরা স্বীকার করি না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজস্তরের মানসিক প্রবণতায় বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত স্থানীয় দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রসিদ্ধি হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতেছি। বৌদ্ধ সাধন-মালায় ৪ যে সকল দেবীগণের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে দেবী হিসাবে বজ্র, শূঙ্খতা, কঙ্করা, বোধিচিত্র, প্রজ্ঞা প্রভৃতি কতকগুলি চিহ্নাঙ্কন ব্যতীত প্রচলিত হিন্দুদেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পরিকল্পনা দেখিতে পাই তাহার সহিত পদোচ্চ ভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের ‘ধ্যান’-পরিকল্পনা এবং যোগাশ্রিত মহাবানব ধ্যান-পরিকল্পনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু আসলে হিন্দু দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাস যেরূপ, বৌদ্ধ দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অস্বাভাবিক।

অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে হইবে। এই বৌদ্ধতন্ত্রের প্রচুর প্রচার ঘটাইয়াছেন মহাত্মনে—অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের কিছু অঞ্চল এবং নেপাল-তিরহত-স্থান প্রভৃতি অঞ্চলে; ফলে এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধা কিছু কিছু দেবীগণ বৌদ্ধতন্ত্রে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাও সম্ভবতঃ বৌদ্ধতন্ত্রের মাধ্যমে হিন্দু তন্ত্রাদিতেও দেবী বলিয়া গৃহীত এবং স্বীকৃত হইয়াছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবী বলিয়া উক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগীর বিশ্বাস।^৩ পর্ণশবরী দেবীও এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই গৃহীত বলিয়া কাহারও কাহারও মত।^৪ হিন্দুতন্ত্র বর্ণিত যটক্রুর অধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকিনী, শাকিনী দেবীগণের সকলে না হইলেও কেহ কেহ মহাত্মনাকল হইতে গৃহীত বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমানে আমরা বহু সংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্রের সন্ধান পাইতেছি:

১। ডক্টর বিনয়গোষা ভট্টাচার্য-লিখিত **Buddhist Iconography** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

২। এ. ১২২ পৃষ্ঠা।

৩। এই লেখকের **An Introduction To Tantric Buddhism** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

৪। গাইকোয়াড গুরিয়েটাল সিরিজে প্রকাশিত ডক্টর বিনয়গোষা ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, দুই খণ্ড।

৫। **Cultural Heritage of India**, চতুর্থ খণ্ডে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগী লিখিত **Evolution of the Tantras** প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ৬। ডক্টর বিনয়গোষা ভট্টাচার্য লিখিত ‘সাধন-মালা’ ভূমিকা এবং **Buddhist Iconography** বইখানি দ্রষ্টব্য।

হরতী অনুবাদ হইতে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা। মূলতন্ত্রাদির পরে টীকা-টিল্লনীর সংখ্যাও কম নয়। বাংলাদেশ তাত্ত্বিক গুরুত্বের একটি প্রধান বাঁটি ছিল, এ সত্য আজ ঐতিহাসিক তথ্যের পরেই প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বসমূহ এবং তাঁহাদের উপরে রচিত হরক টীকা-টিল্লনীর বাংলা দেশে এবং তৎসংলগ্ন দেশেই রচিত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য আমাদের যথেষ্ট নাই। কিন্তু পরবর্তী কালের যে বৌদ্ধসাহিত্য গোলা দেশেই লিখিত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি যেন হইল বৌদ্ধ সিদ্ধচারণা রচিত দোহা ও চণ্ডীগীতিগুলি। ঐ দোহা ও চণ্ডীগীতিগুলি যদিও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ মতবাদ ও ধর্ম পন্থা অবলম্বনেই লিখিত তথাপি পরোক্ষ ভাবে ইহার ভিতর তৎকালীন দেবীবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগুলি মোটামুটি ভাবে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বলিয়া গৃহীত; সুতরাং ঐগুলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন প্রচলিত বোধধর্ম বা শক্তিবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং গাঢ় ভাবে বুঝিতে সমর্থ হই।

বৌদ্ধ দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে আমরা এক 'দেবীর উল্লেখ' দেখিতে পাই; এই দেবী বহু স্থানে নৈরাখ্যা, নৈরামণি, ডোবা, গালী, মাতঙ্গী, শবরা নানারূপে অভিহিত। সাধনতন্ত্রের মধ্যে এই দেবীকে রূপকরূপেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যা দ্বারা সিদ্ধচারণণের মনোযোগের সর্বখানি বিচ্যুত পাতোয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তি-তত্ত্বের সহিত এই বৌদ্ধদেবীর নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি। সহজিয়া বৌদ্ধগণের এই দেবীতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মে এই দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সূক্ষ্ম পরিচয় দিবার প্রয়োজন মনে করি।

তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখিতে পাই, উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে—অর্থাৎ নেপাল-ভূটান-তিব্বত এবং কতক ভাবে মনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা এক আদিবুদ্ধ এবং তাঁহার নৈশাশক্তি আদিদেবী বা আদিশক্তির কথা জানিতে পারি। এই আদিবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবর্তী মহাবানের ধর্মকার-বুদ্ধ হইতে ঐক্য। যে রূপে বুদ্ধ সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক বস্তুর পরমাবিষ্টান কারণাত্মক ধর্মরূপে বিরাজিত, সেই কারণাত্মক অন্তর্যন্তই পরিকল্পিত হইয়াছে আদিবুদ্ধরূপে। তিনি নিজে নিবিশেষ, নিগূঢ়, নিরাকার—কিন্তু সকল বিশেষ, গুণ ও আকারের তিনিই পরমাবিষ্টান—অন্তঃপ্রাণ হইতেই নিখিল বিশ্ব প্রসূত। কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তিনি নিজে নিত্যা অবিকারী। কোনও কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকার-বুদ্ধই আদিবুদ্ধ নহেন; মহাবানের বিকারের শেষকার ধর্মকারকেই তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ হৃদয় চরমকায় বলিয়া স্বীকার করে নাই—ধর্মকার-বুদ্ধও যেন ধর্মকার। অব্যাক্ত হিরণ্যগর্ভ-স্তম্ভ; তাঁহারও উদ্ভূত হইল বুদ্ধের স্তম্ভ স্থিতি—তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় বুদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল অবিকারী শূন্যকায়—ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধই আদিবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তন্ত্রের

পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের শক্তি যেমন পরমেশ্বরী—তেমনিই আদিবুদ্ধের নিত্যা শক্তি হইলেন আদিদেবী। একেই হিন্দুতন্ত্রগুলি তাহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে আদিবুদ্ধ বা আদিদেবী বা আদিপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছে না বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হিন্দুতন্ত্রের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে সিদ্ধান্তকে মুগ্ধই ভুল বলিয়া মনে করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিমান ও শক্তির অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদ-কল্পনা করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব দেখিতে পাই, হিন্দুতাত্ত্বিক পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ-আদিপ্রজ্ঞা বা আদিদেবীর পরিকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শক্তিতত্ত্বের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাই।

প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈবশাস্ত্রে যে শক্তিতত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি প্রপঞ্চাত্মক যে বসিঃসৃষ্টি তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞা সমবায়িনী শক্তি হইতে হয় না; সৃষ্টি হয় বিক্ষেপ-শক্তি বা পরিগ্রহা শক্তি হইতে। এই তত্ত্বটি তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অজ্ঞরূপে। আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হইতে সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশক্তিক ধ্যানিবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত হইতে। আদিবুদ্ধের হৃদয়াত্মক পঞ্চ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেকটি ধ্যান হইতে প্রসূত হন এক এক জন ধ্যানিবুদ্ধ, ইহারা হইলেন বৈদোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অকোভা। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চবস্তুর দেবতা; সৃষ্টি এই পঞ্চবস্তুর কারণ। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের পঞ্চশক্তি; তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা বা বজ্রধারাবাহী, মামকী, পাণ্ডরা, অর্ঘ্যতারা এবং লোচনা। সশক্তিক পঞ্চতথাগত মহাব্যাসের মন্তক, মুখ, হৃদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পঞ্চস্থানে অধিষ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌদ্ধতাত্ত্বিক সাধনার প্রারম্ভে দেহতত্ত্বের দ্বারা যোগাভেদ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশক্তিক পঞ্চতথাগতকে দেহের বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়—তাহা দ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়—তথাগত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না।

বৌদ্ধতন্ত্র আদিবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সর্বেশ্বরী মহাদেবী আদিদেবীকে পাই। অজ্ঞভাবেও আমরা এই সর্বেশ্বর ভগবান এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীকে পাই—তাহারও একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

বৌদ্ধতন্ত্র মহাবান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পরিণতি। মহাবানী বৌদ্ধের বাঁহাধিপকে হীনযানী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ধ্যান বা মত এবং পঞ্চকে হীন বলিবার কারণ এই, তাঁহারা শূন্যতার উপরেই একমাত্র জোর দিয়াছেন এবং শূন্যতা-জ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মুক্তি—অর্থাৎ অর্হৎ লাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাবানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্ববৃত্তির প্রসঙ্গ—সুতরাং মুক্তিদাত্রী শূন্যতার সহিত তাঁহারা যুক্ত করিলেন কুশলকর্মের প্রেরণাভারক মহাকল্পণ। এই শূন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর কল্পণ হইল ইতিবাচক উপায় তর্ক্য কুশল-কর্মপ্রেরণা। তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ মহাবানের এই শূন্যতা-কল্পণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিহ্ন-লাভের সাধনা, আর বোধিচিহ্নের

তাহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, ‘শূন্যতা-কল্পাভিন্ন বোধিচিহ্ন’ তদুচ্যতে—শূন্যতা এবং কল্পনার অভিন্নতাই হইল বোধিচিহ্ন। তাত্ত্বিক বোধগ্গণ ধর্মাত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিহ্ন এবং শূন্যতা-কল্পাকে নানাভাবে বহুত্রে টানিয়া লইতে লাগিলেন। বোধিচিহ্ন-তত্ত্বই হইল তত্ত্বের যুগল বা যামল-তত্ত্ব; ইহাই মূল সামরস, ইহাই মিথুন-তত্ত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী—উপায় নিখিল ক্রিয়াত্মক ভগবান—এই ভগবান ভগবতী সামরস-রূপ মিথুন-তত্ত্বই হইল অপর বোধিচিহ্ন-তত্ত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃত্তি-লক্ষণা, শূন্যতাই পরম-সংস্খতি, শূন্যতাই বিন্দু; কর্মোদ্যোগরূপে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ—উপায় পরম-প্রকাশ—উপায়ই নান্দতত্ত্ব। শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞাই নৈরাশ্বারূপিণী নির্বাণ—উপায়ই সর্ববুদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরসই হইল যুগল-তত্ত্ব—সেই অপর যুগল-তত্ত্বই হইল পরম কামা।

তজ্ঞানব্রের (তাহা হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক—অথবা হিন্দু ব্রহ্মে বৈষ্ণব হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম সত্য অদ্বয়-স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু স্বয়ং অথবা নয়—তাহা স্বয়ং মিথুন-তত্ত্ব—স্বয়ং নিঃশেষ সমরসত্যা। যে স্বয়ং সমরসত্যা অদ্বয়সিদ্ধি হিন্দুতত্ত্ব মতে সে স্বয়ংতত্ত্বই হইল শিবতত্ত্ব এবং শক্তি-তত্ত্ব—একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; একটি জ্ঞানমাত্র তত্ত্ব নিবৃত্তিলক্ষণ—অপরটি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকাশাত্মিকা প্রবৃত্তিমূল। দার্শনিক ভাষায় শিবতত্ত্বই জ্ঞাতৃত্ব—শক্তি-তত্ত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম সঙ্কুচিত বিন্দু—শক্তিই পরম প্রসারিতা নান্দরূপিণী।

তত্ত্বের এই যে অদ্বয়তত্ত্ব এবং অদ্বয়ের মধ্যে অবিনাশাভে মিথুনীকৃত স্বয়ংতত্ত্বের বিখারা এই মৌলিক তত্ত্বটি বৌদ্ধতত্ত্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে বোধিচিহ্ন এবং শূন্যতা-কল্পাকে লইয়া। শুধু তফাৎ এই—বৌদ্ধতত্ত্ব ভগবতী-ই হইলেন নির্বাণরূপিণী বা বিন্দুরূপিণী প্রজ্ঞা আর সর্ববুদ্ধাত্মক ভগবানই হইলেন ক্রিয়াত্মক এবং প্রকাশাত্মক।

প্রজ্ঞাই গ্রাহক-তত্ত্ব, আর উপায়াত্মক করুণাই হইল গ্রাহ্য-তত্ত্ব। এই ভাবে দেখিতে পাই, হিন্দুতত্ত্বও যেমন শিব-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মিথুন সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধতত্ত্বও কল্পারূপিণী ভগবান ও প্রজ্ঞারূপিণী দেবী ভগবতীকে লইয়া তাত্ত্বিক মিথুন-সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগ-সাধনায় এই ভগবতী এবং ভগবান ইড়া-পিঙ্গলা গঙ্গা-যমুনা, বাম-দক্ষিণের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বয়তত্ত্বই ত অধনারীশ্বর-তত্ত্ব—বামে দেবী ভগবতী, দক্ষিণে ভগবান—হুই মিলিয়া এক। একে হুই—হুইয়ে এক; হিন্দুতত্ত্বও এই কথা—বৌদ্ধতত্ত্বও সেই একই কথা। ৭

জ্ঞানসাধনার এই ভগবান এবং ভগবতী পূর্বোক্ত আদিবুদ্ধ ও আদিদেবীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গেলেন; ফলে বৌদ্ধতত্ত্বও আমরা এক সর্বেশ্বর ভগবান এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীর কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। এই সর্বেশ্বর দেবতা সাধারণতঃ ত্রিভুবন ত্রিহেক্ষক ত্রিভুবন, ত্রিভুবন, ত্রিভুবন, মহাসত্ত্ব ত্রিমমমহাসত্ত্ব, ত্রিচণ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সর্বেশ্বরী দেবী দেখা দিয়াছেন তাহারই অক্ষবহারীকরণে—অথবা মিথুনাবস্থায় তাহার সহিত যুক্তরূপে তিনি

কোথাও বজ্রধারীকরণ, বজ্র-বারাহী, কোথাও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞা পারমিতা, অথবা দেবী নৈরাশ্বা। স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু মহেশ্বর—মহেশ্বরী এবং বৌদ্ধ। সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী বহু স্থানে মিলিয়া মিশি একাকার হইয়া গিয়াছেন।

মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহেশ্বর সংবাদের কথা দেখিতে পাই। সেখানে দেখিয়াছি, জগজ্জীবের প্রতি করুণায় বিগলিত জগজ্জননী পার্বতী সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর মহাদেবের নিকটে একা পূর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জীবের হিতকর সমস্ত তত্ত্ব জানি লইয়াছেন। সমগ্র হিন্দু আগম-শাস্ত্র এই ভাবেই রচিত হইয়াছে এখানে জগমাতা মহাদেবী স্বয়ং প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা ও জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেবই হইলেন এখানে বক্তা। তাবৎ হিন্দু তত্ত্বগুলি মধ্যে আমরা এই রীতিই লক্ষ্য করিতে পারি। প্রত্যেক তত্ত্বেই দেবী দেবী জীবের হৃদয়ে বিগলিতা হইয়া তাহাদের আত্মনির্মাণ, মঙ্গল, মুক্তিবিধানের জন্ত মহাদেবকে অমূল্য বিনয় করিয়া তাহার স্বয়ং হইতে সকল তত্ত্ব জানিয়া লইতেছেন। প্রসিদ্ধ অনেকগুলি বৌদ্ধতত্ত্ব আমরা এই রীতি অমূল্য হইতে দেখি। বৌদ্ধতত্ত্বের মধ্যে আদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেবজ্ঞ-তত্ত্ব দেখিতে পাই,—

কপাল-মালিন্য বীর্য নৈরাশ্বাশ্লিষ্টকন্দরম্।

পঞ্চমুদ্রাধারঃ দেব নৈরাশ্বা পৃচ্ছতি স্বয়ম্ ॥

এখানে ‘দেবের’ বিশেষণ ‘কপাল-মালিন্য বীর্য’ কথাটিও বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়। উক্তের দেখিতে পাই,—

চূষণিয়া তু নৈরাশ্বা—

—দেবো মণ্ডল সম্প্রকাশতে ॥৮

বজ্রবারাহী-কল্প-মহাতত্ত্ব, একমূলবীর্য-চণ্ড-মহারোষণ-তত্ত্ব, ডাকার্ণব তত্ত্ব প্রভৃতি বৌদ্ধতত্ত্বগুলি এই ভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবী প্রশ্নোত্তররূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৌদ্ধতত্ত্বগুলিতে আরও একটি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য হিন্দুতত্ত্ব পরম-সামরস জন্মিত কৈবল্যানন্দ লাভের জন্ত নব-নারী মিলিত সাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঠিক এই একই সাধনা বৌদ্ধতত্ত্ব গুলিতেও দেখিতে পাই। হিন্দুতত্ত্বগুলিতে এই-জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহার শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, সার্বিকাকে বিস্তৃত শক্তি-স্বরূপ হইতে হইবে। বিস্তৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও যামল-সাধনা সম্ভব নহে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধনাই হইল প্রচলিত ভৈরব-ভৈরবী সাধনার গূঢ়ার্থ। বৌদ্ধতত্ত্বগুলিতেও আমরা স্ব ভাবে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই। নারী মাতাই প্রজ্ঞারূপিণী—পুরুষ বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব; এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধনাই হইল প্রজ্ঞাপায় সাধনার তাৎপৰ্য। কোনও কোনও বৌদ্ধতত্ত্ব এই তত্ত্ব অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। ১ একমূলবীর্য-চণ্ডমহারোষণতত্ত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাই—

‘নরাঃ বজ্রধারাকারাঃ বোধিতঃ বজ্রযোষিতঃ ॥’

নাগার্জুনপাদদের ‘পঞ্চক্রম’ গ্রন্থে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞা সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, ‘স্ত্রী-সংজ্ঞা চ তথা প্রোক্তা।’ একমূলবীর্যচণ্ডমহারোষণ তত্ত্ব এক স্থলে স্বয়ং বজ্রধর চণ্ডরোষণ দেবীকে বলিতেছেন—

ভাবাভাববিনিমুঃকুচতুরানন্দ-তৎপথঃ।

নিম্পপক-স্বরূপোহং সর্বসত্ত্ববজ্জিতঃ ॥

মাং ন জানন্তি যে মুদ্রাঃ সর্বপুংবপুধি স্থিতম্।

তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সস্থিতাঃ ॥

আবার দেবীর দিক হইতে দেখিতে পাই—

অথ ভগবতী ধেরবতী সমাধিমাণ্ডেনম্ উদাজহার—

শূভতা-কল্পাভিরা দিব্য-কাম-মুখ-স্থিতা।

সর্ব-কল্প-বিহীনাং নিম্পপঞ্চা নিরাকুলা ॥

মাং ন জানন্তি যে নার্যঃ সর্বদ্রোদেহ-সস্থিতাম্।

তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সস্থিতাঃ ॥

এই তন্ত্রের এক স্থলে এমন কথাও দেখিতে পাই যে, মায়াদেবী-মুত বুদ্ধদেবী চণ্ডরোষণতা রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আর প্রজ্ঞা-পারমিত্যিকা দেবী হইলেন বুদ্ধপত্নী গোপা। বিশ্বের সকল জী হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমিত্যিকা দেবীরূপা এবং দেব চণ্ডরোষণ স্বরূপই হইলেন বিশ্বের সকল পুরুষ।

মায়াদেবীমুতশচাং চণ্ডরোষণতাং গতঃ।

স্বমেব ভগবতী গোপা প্রজ্ঞাপারমিত্যিকা ॥

যাবন্তস্ত ত্রিযং সর্বা বদরূপৈর্নৈব তা মতাঃ।

মদরূপেণ পুমাঃসন্ত সর্ব এব প্রকীর্তিতা ॥

এই সকল ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্র হইতে এই এই ধারণা বৌদ্ধতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে বা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে এই এই ধারণা হিন্দুতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ কতকগুলি কাটাছুটি কথা বলিয়া দিলেই সর্বপাশি কথা বলা হইল না। আসলে তন্ত্রসাধনাকে অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কতকগুলি ধারণা সমাজ-মানসে অন্ত্যস্ত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই।

শৌক সহজিয়াগণের তাত্ত্বিক-সংবাদের আবার দেখিতে পাই, এই ভগবান ও ভগবতী বাহিরের কিছু নহেন—সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান। সাধক-চিন্তাই স্বয়ং ভগবান—নৈরাশ্বাই গৃহিণী। ১০ স্টে নৈরাশ্বার সঙ্গে সাধক-চিন্তা নিঃশেষে মিলিয়া যায়—যেমন মিলিয়া যায় লবণ জলের সঙ্গে।

জিম সোণ বলিঙ্কই পাণিয়েই

তিম ঘরিলী সেই চিন্তা।

সমরস জাই তৎপথে

জই পু তে সম নিন্ত ॥

অদ্বয়-সিদ্ধি নামক বৌদ্ধ-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

ভগবানিতি নির্দিষ্টঃ চিন্তাস্থাধিপতিঃ প্রভুঃ।

তিল্লোপাদ তাঁহার দোহার বলিয়াছেন—

চিন্ত থসম জহি সমস্বহ পলটটই।

ইন্দ্রিয়-বিসম্ভ তহি মন্ত ৭ দীসই ॥

চিন্ত এবং আকাশ স্বরূপা (শূভতারূপিনী প্রজ্ঞা) যখন সমস্তকে গ্রাসিত হয় তখন ইন্দ্রিয়-বিষয় তাহাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আবার— মগহ ভগবাহা থসম ভাববদী

দিবারান্তি সহজে রহিঅই ॥

মন ভগবান—শূভতারূপিনী প্রজ্ঞা ভগবতী; ইহার দিবারান্তি সহজে (মিলিত) থাকে।

চর্চাগীতিকার কুঙ্করীপাদ একটি গীতিতে বলিয়াছেন—

ইউ নিরাসী খমণভতারী

মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।

এখানে দেবী নিজে বলিতেছেন, আমি হইলাম, আবার হইয়া বা আসন্নরহিতা, থ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী; আবার দেবী মিলনানন্দের কথা কথা যায় না। থ-মন শব্দের অর্থ শূভ মন—অর্থাৎ তাত্ত্বিকগণের চতুর্থ শূভ বা সর্বশূভ স্তরের প্রকৃতি-প্রভাবের মন।

চর্চাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানা ভাবে পাইতেছি। কোথাও তিনি দেবী বলিয়া আখ্যাতা—কোথাও যোগিনী বলিয়া, কোথাও 'ঘরিলী' (গৃহিণী) বলিয়া, কোথাও আবার ডোবী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি বলিয়া। বজ্রধরস্বরূপ সাধকের ইহার সহিত নাচ-গানের কথা দেখি, ১১ কোথাও ভাঁকজরক করিয়া ডোবীকে বিবাহ করিতে হাইবার দৃষ্ট দেখিতে পাই এবং সেখানে দিন-রাত্রি তাঁহার সহিত সুরত-প্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা পাই। ১২ কোথাও আবার বজ্রধর সাধক বলিতেছেন—

জোইগি উই বিং খণহি ৭ জীবমি।

তো হু চুখী কমলরস গীবমি ॥

'যোগিনি, তোমাকে বিনা স্পর্শমাত্রও বাঁচিব না, তোমার হুখ চুখক করিয়া কমল-রস পান করিব।'

কোথাও আবার ডোবীর 'ভাববিজ্ঞানী' অর্থাৎ চতুরালী দেখিয়া বজ্রধর সাধক তাঁহাকে কামচণ্ডালী বলিয়াছেন, তাঁহাকে 'ছিনালী'র অগ্রগণ্য বলিয়া গাল দিয়াছেন।

'অদ্বয় বঙ্গাল' গিয়া এই চণ্ডালীকে 'নিজ ঘরলী' করিয়া বজ্রধর সাধক একদম 'বঙ্গাল' ('বাঙাল'?) হইয়া গিয়াছেন। ১৩ কোথাও এই দেবীকে মাতঙ্গীরূপে পাটনীর বেশে গজা-সম্মার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগীকে লোভার পার করিয়া দিতে দেখি। ১৪ কোথাও দেবীকে নৃত্যকুশলা নৌকাবিহারিণী বেদনীরূপে বাঁশ-বেতের চূপড়ি-চাক্সাড়ি বিক্রী করিতে দেখি। ১৫ কোথাও তাঁহাকে দেখি উ'চু পর্বতের শিখরে ময়ূবল্লুছে সজ্জিত হইয়া গুজ্জার মালা গলায় শবরীরূপে—উন্নত শবরকে লইয়া তাঁহার ঘব-সংসার। ১৬

চর্চাপদে নানা রূপকে এবং কবিকল্পনা যোগে বিচিত্র রূপে বর্ণিত এই দেবী কে?

১১। নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী

বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ (১৭৭)

১২। ডোবী বিবাহিয়া অহারিউ জাম

জউতুকে কিম্ম আংহু গাম ॥

অহাণিসি সুবজ পসঙ্গে জাম

জোইগিজালে রএণি পোহাঅ ॥

ডোবীএর সঙ্গে জো জোই রতো

খণহি ৭ ছাডঅ সহজে উন্নতো ॥

১৩। ১৮ সংখ্যক পদ।

১৪। ৪১ সংখ্যক পদ। ১৫। ১৪ সংখ্যক পদ।

১৬। ২০ সংখ্যক পদ।

সাধকগণ বর্ণিত এই দেবীকে বৃষ্টিতে হইলে হিন্দুতান্ত্রিক সাধকগণ কর্তৃক বর্ণিত দেবী বা শক্তিকেও একটু ভাল করিয়া বৃষ্টিতে হইবে। হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে এবং বিবিধ বোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা জানিতে পারি; এই শক্তি সর্বনিম্ন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিত হইয়া নিম্নজিতা আছেন; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সূপ্তা শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা। দেবী মূলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিব্যাব পূর্ণ পর্যন্ত সাধনার সাধকের কোনও অমুভূতির স্পন্দনই নাই—দেবীর বা শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অমুভূতির স্পন্দন। শক্তির জাগরণের পরেই আরম্ভ হয় তাঁহার উৎখাত—একটি একটি করিয়া চক্রকে ভেদ করিয়া শক্তি উৎসে উথিত হন—সর্বোচ্চধামে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমাস্থিতি। শক্তির একটি একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নতুন নতুন আনন্দামুভূতির স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দামুভূতির স্পন্দন চরমবিশুদ্ধি এবং পরমপূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শক্তির স্থিতির সহিত। এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তির অধ্যাত্ম-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে দেখিতে পাই বোগ-জ্ঞানাদিতে এই শক্তির উত্থান ও গতি একটি বিচিত্র স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রতিরূপে সাধকের বিচিত্র দিব্যানন্দের অমুভূতি। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনায়ও এই জাতীয় একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্মিকা শক্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। এই শক্তির দ্বাৰাশ্রমের সঙ্গে যে আনন্দামুভূতির আরম্ভ, মস্তকস্থিত উকীষকমলে শৌছিয়া তাহারই পরিণতি বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের পরমকাম্য মহানুভব। এই মহানুভবই সহজানন্দ। 'সহজ'ই হইল প্রত্যেক প্রাণীর—শুণু প্রাণীর নয়—সকল ধর্মের স্বরূপ; আর এই স্বরূপ হইল বিশুদ্ধ আনন্দ—তাহাই মহানুভব; স্তবরাং আনন্দই হইল সহজের নিত্য স্বভাব। বৌদ্ধতন্ত্রমতে দেহমধ্যে চারিটি চক্র বা পদ্ম অবস্থিত, নিম্নতম হইল নির্মাণচক্র, ইহা নাড়িদেহে অবস্থিত; তৎপরে হৃদয়ে হইল ধর্মচক্র, কণ্ঠে হইল সন্তোগচক্র—আর মস্তকে উকীষকমলে হইল মহানুভব-চক্র। ১৭ নির্মাণচক্র শুণু নিম্নতম চক্র নয়—ইহাই স্থূলতম তন্ত্রের কেন্দ্র। কিন্তু শক্তির জাগরণ প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌষটি দলযুক্ত পদ্মে; এইখানে এই শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ বিশুদ্ধ নহে—বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জড়িত; উৎসে গতিতে এই আনন্দ পরমানন্দে, পরমানন্দ বিরমানন্দে, বিরমানন্দ সহজানন্দে পরিণতি লাভ করে; সহজানন্দের পরিপূর্ণ অমুভূতি উকীষ-কমলে। এই সহজানন্দদ্বারিনী শক্তিই হইলেন বৌদ্ধসহজিয়া—তথা বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের দেবী; এই জ্ঞান তিনি সর্বদাই সহজ-স্বরূপা বা সহজানন্দরূপিনী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাশ্র্যে প্রতিষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাশ্র্যরূপিনী বা আদরিণী 'নৈরামিণী'। এই আনন্দরূপিনীর প্রথম উদ্বোধনের পরে তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে (ধর্মচক্রে) দ্বারক—সেখান হইতে তাহাকে কণ্ঠে ধারণ (সন্তোগচক্রে)—এই সমস্তের ভিতর

দিয়াই দেবী বা বোগিনীর সহিত বজ্রের সাধকচিত্তের সুরতযোগ; এই সুরতযোগের পরিণতি দেহ-পর্বতের উচ্চশিখর উকীষকমলে অচ্যুত সহজানন্দের পূর্ণামুভূতিতে—সে অমুভূতিতে সাধকচিত্তের সহজ-স্বরূপিনীর ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অমর সামরন্তের উদ্ভব—তখনই দেবীসঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত বজ্রের যুগলদ্বিহিত।

এই আনন্দসন্দোহরূপিনী শক্তির যখন প্রথম নির্মাণচক্রে জাগরণ তখন সহসা জলিত অগ্নির জ্বার তাঁহার প্রচণ্ড দাহন; সেই চণ্ডস্বভাব দেবীকেই বলা হইয়াছে 'চণ্ডালী'। ১৮ আবার এই অতীন্দ্রিয় অমুভূতিরূপা দেবী ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা—এইজ্ঞাই দেবী 'ডোষী'। ১৯ দেহরূপ নগরের বাহিরে অবস্থিত হইল এই ডোষীর কুণ্ডেঘর—'ব্রাহ্মণ-নাড়িয়ার' দল তাহাদের সকল আচাৰ-বিচার ও পাণ্ডিত্যভিমান লইয়া ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যার—ঠিক সঙ্গলাভ করিতে পারে না; সঙ্গলাভ করিতে পারে নিম্ন 'নান্দ' (অর্থাৎ সর্ববিধ আবরণ রহিত) কাপালিক বোগী। একটি হইল পদ্ম, চৌষটিটি তাহাতে পাপড়ি (নির্মাণচক্রস্থিত চৌষটিদলযুক্ত পদ্ম), তাহাতে চড়িয়া নাচে এই 'ডোষী বাপুড়ি'। ২০ যে পর্যন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই 'ডোষী'র আনন্দ-স্পন্দনের নৃত্য সে পর্যন্ত 'ডোষী' খুব ভাল নহে—কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে বজ্রের সাধকচিত্তের যোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন উকীষদ্যন আরম্ভ হইল ততই ডোষী আদরিণী হইয়া স্বদয়ে—পরে কণ্ঠে স্থান পাইল; উকীষ-কমলে গিয়া—

ডোষীএর সঙ্গে জো জোই রতো

খগহ ছাড়াই সহজ উদ্ভবো ॥

চর্চাপাদিতে বর্ণিত এই সহজানন্দরূপিনী শক্তিরূপিনী দেবীর প্রসঙ্গে আরও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও কিছু কিছু তথ্য লক্ষ্য করিতে পারি। দেবী এখানে 'মাতঙ্গী', 'চণ্ডালী', 'শবরী'। দেবীর 'মাতঙ্গী' নামটি দশমহাবিজ্ঞার মধ্যে গৃহীত দেখিতে পাই। 'খ্রীষ্টিচণ্ডী'র সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে দেবী-ধ্যানের মধ্যেও দেবী 'মাতঙ্গী'। পুরাণাদিতে দেবীকে 'কিরাতী', ২১ 'শবরী' প্রভৃতি রূপে বর্ণিত দেখি। চর্চাপাদিতে বর্ণিত শবরী দেবীও কিছু উচ্চপর্বতবাসিনী, অতএব এই 'শবরী' দেবীও পর্বতস্থা পার্বতী। এই 'শবরী'র বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

উচা উচা পাবত উঁহি সিহি সবরী বাসী

মোরঙ্গি পাছ পরহিণ সবরী গিবত গুজরী মালী ॥

শবরী দেবী শুণু পর্বতের উচ্চশিখরবাসিনী নন, ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা শবরী, গলার গুজার মালী। সম-বিধান-ব্রাহ্মণে কুমারী বাক্সিদেবীকে আমরা 'কম্ভা: শিখিণী:' রূপেই দেখিতে পাই। এই শবরীর বর্ণনার আরও দেখিতে পাই—

নানা তরুণের মৌলিগেই গগনত লাগেলী ডালী।

একেলী শবরী এবং হিগুই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥

'নানা তরুণের মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল; একেলা শবরী এ বনে খুঁজিয়া বেড়ায়—সে কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।' পার্বতাবনে একাকিনী ঘুরিয়া বেড়ায় এই শবরী বালিকা—কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী

১৮। 'চণ্ডালী জলিতা নাচে'—হেবজ্ঞতন্ত্র। ১৯। অস্পর্শা

ভবতি যম্মা তম্মাং ডোষী প্রকীৰ্ত্তিতা—ঐ। ২০। ১০ম সংখ্যক চর্চা। ২১। খিল হরিবংশ।

এই শবরী। কর্ণকুলবন্ধধারী দেবীর বর্ণনা তত্ত্বপুত্রে
হৃদয় নহে।

সুখ তাহাই নয়, এই শবরীর স্বামী যে শবর সে নেশার উদ্ভ্রান্ত
পাগল, বাড়িতে বাধার হৈ-ট্টে, নিজের ঘরের সুন্দরী স্ত্রীকেই সে
নেশার ঘোরে চেনে না ; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম
দায় ! তাই অমনর-বিনয় করিতে হয়—

উমত সবরো পাগল সবরো না কর গুলী গুতাড়া তোতোরি।

নিম্ন ঘরবী নামে সহজ সুন্দারী ॥

শবরী খাট পাড়ে—মহাসুখে শয্যা বিছায়—তাহার পরে সেই
শবর-ভূজঙ্গের সহিতই এই নৈরামণি শবরী স্ত্রী ভাবে প্রেমের রাজি
পোহায়। শবরকে আদর করিয়া খাইতে দেয় তাড়ুল—আর কর্পূর ;
কবিকের জন্ত পোষ মানে মাতাল স্বামী—শবরীকে কণ্ঠে লইয়া
মহাসুখে রাজি পোহায়।

তিজ খাট খাট পড়িয়া মহাসুখে সেজি ছাইলী।

সবরো ভূজঙ্গ গইরামণি দারী পেঙ্গ রাতি পোহাইলী ॥

হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপূর খাই

সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাতি পোহাই ॥

কিন্তু থেরানী মাতাল স্বামীর কি আর কিছু ঠিক আছে, এই
শাস্ত্রখণি দিয়া মানুষ, আবার কখন গুরুবোলে উদ্ভ্রান্ত ; গুরুবোলে
ঘর ছাড়িয়া সে প্রবেশ করে গিয়া পর্বতের শিখর-সঙ্কিতে—কি করিয়া
আবার তাহাকে খুঁজিয়া ফিরিয়া আনা যায় !

উমত সবরো গরুজা বোহে।

গিরিবর সিহর সন্ধি পইসঙ্কে সবরো লোড়িব কইসে ॥

সমস্ত ছবিটি তুলিয়া ধরিলাম। ইহার মধ্যে পরবর্তী কালের
লৌকিক ভাবে বর্ণিত হর-পার্বতীর গাহ-স্থ্য জীবনের আভাস মিলিতেছে
কি ? পার্বতীর স্বামীকে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাইতেছি
নেশাখোর পাগলা ভোলা—বাড়িতে বাধান কোন্দল—নেশার ঘোরে
ঘুরিয়া বেড়ান কুচনী পাড়া, চেনেন না নিজের ঘরের সুন্দরীকে। কত
কণ্ঠে কত অমনর-বিনয়ে এই ভোলাকে খুশি রাখিয়া তাহার সঙ্গে
দাম্পত্য প্রেম রক্ষা করিতে হয় পার্বতীকে। তাহাতেও কি মানেন,
কখন আবার গুরু বোলে চলিয়া যান পর্বতের কোনো শিখর-সঙ্কিতে—
কে করে আবার তাঁহার সন্ধান। চর্যাপদটির বর্ণনায় কি
ভাষা-সাহিত্যে বর্ণিত লৌকিক শিব-পার্বতীর সন্ধান পাওয়া
যাইতেছে ?

চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতকে মিথিয়ার বিদ্যাপতি
মৈথিলী ভাষায় হর-গৌরী বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন ; লোকমুখে
হইতে এই জাতীয় কিছু কিছু পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার
কয়েকটি পদ এখানে উল্লেখ করিতেছি—চর্যার আলোচিত পদটির
সহিত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। মহাদেব গৌরীর প্রতি
বাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন ; গৌরী বলিতেছেন—

হমসৌ রুসল মহেসে।

গৌরী বিকল মন করখি উদেসে ॥

পুছিঅ পথক জন তোহী।

এ পথ দেখল কহ বৃঢ় বটোহী ॥

অজমে বিভূতি অনুপে।

কড়েক কহব ছুনি জোগিক সঙ্গপে ॥

বিদ্যাপতি ভন তাহী।

গৌরী হর লএ ভেলা যতাহী ॥ ২২

‘আমার উপরে রোষ করিয়াছেন মহেশ্বর। গৌরী বিকল মন,
উদ্দেশ করিতেছেন। হে পথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ
পথে দেখিলে কোনও বৃদ্ধ পথিককে ? অঙ্গে তাহার অল্পশ্রম
বিভূতি, কত আর বলিব, সেই সেই যোগীর স্বরূপ ? বিদ্যাপতি বলে
তাহাতে—হর লইয়া গৌরী হটলেন পাগলিনী।’
অপর একটি পদে দেখি—

উগনা হে মোর কতর গেলা।

কতর গেলা সি কি দহ ভেলা ॥

ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বেসলাহ।

জোহি হেরি আনি বেল হসি উঠলাহ ॥

জে মোর কহতা উগনা উদেস।

তাহি দেইও কর কল্পনা বেস ॥

নন্দন বনমে ভেটল মহেস।

গৌরী মন হরসিত মেটল কলেস ॥

‘আমার উগনা (উলঙ্গ) কোথায় গেল ? কোথায় গেল,
তাহার কি হইল ? বটুয়াতে ভাঙ নাই, কহিয়া ‘বসিল ; বেমনই
খুঁজিয়া আনিয়া দিলাম—হাসিয়া উঠিল। যে মোরে বলিলে আমার
উগনার উদ্দেশ তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ। নন্দনবনে দেখা
হইল মহেশ্বরের সঙ্গে ; গৌরীর মন হরবিত—মিটিল ক্লেশ।’
আর একটি পদে দেখি—

পীসল ভাগ রহল এহি গতী।

কথি লই মনাইব উমতা জতী ॥

আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতী।

আই বঢ়এ দেল কোন উদমতী ॥

আনক নীক আপন হো ছতী।

ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী ॥

ভহি বিদ্যাপতি সুন হে সতী।

ঐ থিক বাড়ি ত্রিভুবন পতী ॥ ২৩

‘পেরা ভাঙ এমন ভাবে রহিল ; কি করিয়া মানাইব এই উদ্ভ্রান্ত
যতিকে ? অন্তদিন ভাল ছিল মোর পতি, আজ কে বাড়াইয়া
দিল তাহার উদ্ভ্রান্ততা ? অপরের ভাল, নিজের হয় ক্ষতি ;
কোথায় এক ঠাকুর লাগিবে—পড়িবে বিপত্তি। বিদ্যাপতি বলে,
শুন হে সতি,—এ নহে পাগল—এ যে ত্রিভুবনের পতি।’

২২। অধ্যাপক ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী
মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতি।

২৩। ইহার সহিত পরবর্তী কালের কবি ঈশনাখের এই
পদটির তুলনা করিতে পারি।

বসহা-চড়ি কসিকত ভাগি পড়এলা, ত্রিভুবনপতি শিবদানী ॥ এবং ॥

ভাঙ ধখুর পীসি জাবে হম, আনক ঘরপ আনি।

তাবে অনট-বিনট বহইত রুসি, কতএ গেলা নহি জানী ॥

কতবও কুবচন কহখি তগপি হম, কনিও খেদ ন মানী।

তেহন বতাহ স্বামি মোর ভেলা, হোইছ মন জে কানী ॥ ইত্যাদি।

গীতিমালা, ত্রিভুবনপতি বা কর্তৃক সংকলিত।

তুমু বিভাপতির পদে নয়, মৈথিলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হরপার্শ্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের এই দৃষ্ট দেখিতে পাই। নিয়ে এই জাতীয় একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

সবকে সৌরি সৌরি পুছকিন ব্যাকুল গৌরী

এহি পাং দেখল দিগম্বর রে কী।

তোহার দিগম্বর কে কৈসন রূপ

হমরো দিগম্বর কে সন সন কেস হৈছি।

জীর সন গাঁত হৈছি

অগ মে ভাসম রমাবধি রে কী।

সবকে সৌরি সৌরি

হাথ মে ডমরু বগল মে ত্রিশূল হৈছি

জটা মে গলা বিরাজি রে কী—

অহো রামা এহি পাং দেখল দিগম্বর রে কী ॥ ২৪।

“সকলকে সৌড়াইয়া সৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী—
‘এই পাং দেখিলে কি দিগম্বরকে?’ (সোকে জিজ্ঞাসা করিল)—
‘জোমার দিগম্বরের কি রকম রূপ?’ ‘আমার দিগম্বরের শরীর মত বেশ। গাঁত আছে—আঁহ অঙ্গে আছে তুমু মাথা।’ সকলকে সৌড়াইয়া সৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী, ‘এই পাং দেখিলে কি দিগম্বরকে? হাতে তাহার ডমরু, বগলে ত্রিশূল; জটার বিরাজ করে গলা।’ ‘ওহে মেয়ে—এই পাং দেখিয়াছি দিগম্বরকে।’

সভকে সৌড়ি সৌড়ি পুছি বিকল গৌরী,

আহে এহি পাং দেখল দিগম্বর রে কী।

দেখইত বৃট সন বসধি সভক মন,

আহে লখইত পুরুষ পুরুষ রে কী।

অপনে নে অএলা শিব ঘর নহি কোড়ি থিক,

আহে গণপতি অউরি পসারল কে কী।

বসহা চড়ল শিব কিরখি আনন্দবন,

আহে ঘুমি ঘুমি ডমরু বজাবধি রে কী।

তনই বিভাপতি সত্ম গৌরী পারবতি,

আহে ইজো থিকা ত্রিভুবন নাথ রে কী।

গীতিমালা, ঐউমানন্দ বা কর্তৃক সঙ্কলিত।

আমরা আদিবৃদ্ধ এবং আদিপ্রজার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি যে আদিবৃদ্ধ এবং আদিপ্রজা এবং হিন্দু পুরাণ-তন্ত্রের হরপার্শ্বতী বা শিব-শক্তি লোকায়ত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালের বৌদ্ধতন্ত্রে স্থানে স্থানে আদিবৃদ্ধ ও আদিপ্রজা শিবশক্তিরূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। কোনও কোনও বৌদ্ধতন্ত্রে আদিপ্রজার ত্রিকোণাকৃতি মন্দেরও উল্লেখ পাই। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে এই আদিবৃদ্ধ এবং আদিপ্রজার প্রভাব সর্বাঙ্গের স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙলা বিবিধ প্রকারের সাহিত্যে বর্ণিত, আদিদেব এবং আদিদেবীর কল্পনায়।

এই আদিদেব আদিদেবীর সাক্ষাৎলাভ করি বাঙলা-সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যের মধ্যে আমরা এই সৃষ্টির বর্ণনা পাই। শৃঙ্গপুরাণ, ধর্মপূজা-বিধান এবং ধর্ম-মঙ্গলগুলিতে এই সৃষ্টি-প্রকরণের বিশদ বর্ণনা পাই। নাথ-সাহিত্যের ‘গোরক্ষ-বিজয়ে’ সৃষ্টি-আরম্ভের বর্ণনা আছে। মারিক মন্দের ও মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গলে’ এবং দ্বিজ মাধবের ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীতে’ সৃষ্টি-কাহিনী বর্ণিত আছে। “কিছু কিছু মনসা-মঙ্গলেও এই কাহিনীর ছায়া দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদা-মঙ্গলে’ও এই সৃষ্টি-কাহিনী বার পড়ে নাই। মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে এবং ওড়িয়া-সাহিত্যেও নানা ভাবে অল্পরূপ সৃষ্টি বর্ণনা দেখিতে পাই। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের বর্ণনা এবং সেখানে বর্ণিত তত্ত্ব ও কাহিনী সমূহের উদ্ভবের ইতিহাস সন্ধ্যা অন্ত গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ২৫

বাঙলায় বর্ণিত এই সৃষ্টি-কাহিনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছু কিছু তফাৎ সত্ত্বেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে দেখি, সৃষ্টির পূর্বে নিখিল নাস্তিত্বের অন্ধকার (ধূচ্ছকার); শৃঙ্গতার মধ্যে ছিলেন শুধু এক দেবতা—তিনি সর্বপ্রথমে ‘নৈরাকার নিরঞ্জন’—তিনিই আদিদেব। সিস্থু এই আদিদেব শৃঙ্গ-মূর্তি নিরঞ্জন হইতেই এক আদিদেবীর সৃষ্টি হইল। ‘শৃঙ্গ-পুরাণে’ দেখি, শৃঙ্গ নিরঞ্জন ধর্মের ঘর হইতে এই ‘আত্মশক্তি’র জন্ম; বর্ণনায় তিনি ‘আত্মা’ নামেই খ্যাত। সহস্রের চক্রবর্তীর ‘ধর্ম-মঙ্গলে’ও এই কথাই দেখি। সীতারাম দাসের ‘ধর্ম-মঙ্গলে’ দেখি, নিরঞ্জন নিজেই এক স্কন্দরী কন্টার রূপ ধারণ করিয়া নিজেই আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অজ্ঞাত ‘ধর্ম-মঙ্গলে’ দেখি, সৃষ্টিকাম নিরঞ্জন আদিদেবের বামপার্শ্বে ‘আচর্ষিত্তে’ দেবীর আবির্ভাব ঘটিল। রামদাস আদ্যের ‘অনাঙ্গি-মঙ্গল’ অধুনায় মহামায়া ধর্ম-নিরঞ্জনর গামপার্শ্বে হইতে উৎপত্তা হইলেন। নরসিং বসুর ‘ধর্মায়ণ’ মতে নিরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই প্রকৃতিক্রপা আত্মার উৎপত্তি। নাথ-সাহিত্যের গোরক্ষ-বিজয়ে দেখি, সৃষ্টির পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিঃস্রাভিভূত ছিলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্বে এক ছায়া-মূর্তিকে দেখিতে পাইলেন, এই ছায়া-মূর্তিই দেবী আত্মা। নাথ-সাহিত্যের কোথাও কোথাও দেখি, ‘অলেকনাথ নিজদেহের শক্তি হইতেই কাকতুকা দেবীকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন; এই কাকতুকা দেবী হইলেন আদিদেবী।

চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে দ্বিজ মাধবের ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীতে’ দেখি, ‘সৃষ্টি-সৃজিতে হাঙ্গে, দেবী জন্মিল নিঃশাসে’। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মতে—

আদি দেব নিরঞ্জন ধীর সৃষ্টি ত্রিভুবন

পরম পুরুষ পুরাতন।

শূন্যতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি

সৃষ্টির উপায় কারণ ॥

তখন— চিন্তিলে এমত কাজ এক চিন্তে দেবরাজ

তমু হইতে হইল প্রকৃতি।

এই আদিদেব মিরজানের তত্ত্ব হইতে উপরা প্রকৃতিই হইলেন আদিদেবী।

আদি দেবরাজ-শক্তি ভুবন-মোহন-শক্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
রচিয়া সম্পূর্ণ পাণি মৃত মন্মত-ভাবিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী ॥

একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে এবং কিছু কিছু ধর্ম-মঙ্গলও শিব এবং চণ্ডীর পৃথক বর্ণনা দেখিতে পাই—সে সব বর্ণনার পরে সৃষ্টি-প্রকরণকে অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাই আদিদেব আদিদেবীর বর্ণনা। তাহা হইতে

বেশ বোঝা যায়, এই সব ভাবা-সাহিত্যের কবিগণ ২৬ শিব-পার্বতীর পাশাপাশি আর একটি বৃগসের পৃথক দ্বারা একটি সামাজিক ঐতিহ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দ্বারা বৌদ্ধতন্ত্র অবলম্বনে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার দ্বারা বলিয়া মনে করি।

আদিদেবীর উৎপত্তির পরে সর্বত্রই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আদিদেবী আদিপ্রকৃতি রূপ গ্রহণ করিলেন। আদি-প্রকৃতিরূপে তিনি প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তিকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) প্রসব করিলেন; এই ত্রিমূর্তি হইলেন আদিপ্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণেরই ত্রি-বিগ্রহ।

২৬। সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ।

একটি কবিতা অবস্খী সাহালা

আমি বলেছিলাম আসব।
আমি আসব, যখন থা-খী বোদ্ধুরে
পিচ গলবে, পাতা উড়বে
ঘুর্ণী হাওয়ায়, কুকচুড়ার ডাল
সে কি দাউ-দাউ জ্বলবে, যখন
ঘাম ঝরবে, বুক কাটবে
তেঁটায়।
আমি আসব।

আমি আসব, যখন আকাশের অ্যাসফল্ট
সূচের মতন বিধবে। পথের কুকুর
লকলকে জিভে ক্লান্তি ঝরাবে।
তির্ধক ছায়া
পাছে পাছে মুখ গুঁজবে।
আমি আসব।
আহা, এই বোদ্ধুর, আগুন হুপূর, পাখির গান
বন্ধ।
এখন মধ্যদিন।
ঘাম-ধরধর মুখ,
গুঁড়ো-গুঁড়ো ঝুঁচুল
হাওয়ায় উড়ছে।
তপ্ত আঁচলে একটু বাঁচানো ছায়া
রেখে দিলে বুখি, আসব যখন
আঁড়ালে আমাকে ঢাকবে।
আমি আসব।

আমি বলেছিলাম, আসব,
তুমি ঠাঁড়িয়ে।



কত দূর, বসো, কত দূর! এই পথ
বাঁকে বাঁকে জট খুঁজছে।
অকুরান পথ,
পথ হেঁটে হেঁটে কাটছে। কখন
মোড়ে পৌঁছবে। প্রান্ত লগাট
ঘাম মুছে নেওরা মিঠে নিঃশ্বাসে
ছায়ায় স্পর্শ মাখবে।
আমি আসব।

আহা, এই বোদ্ধুর, হ-হ করা মন
তুমি ঠাঁড়িয়ে।
গবগবে নীল আকাশ পুড়ছে, পাতারা
উড়ছে।
মধ্যদিন।
তেঁটায় বুক কাটছে
তুমি ঠাঁড়িয়ে।

জননী জগদ্ধাত্রী ও জননী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী

অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

“জয়দে জগদানন্দে জগৎসকলপ্রসুজিতে ।

জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ত তে ॥

দয়াকরে দয়াদুহে দয়াদেহী দুঃখমোচনি ।

সর্বাণ্ডারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ত তে ॥”

জগদ্ধাত্রীকল্পে জগদ্ধাত্রীভবঃ ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্মা জননীকে স্তুতিমুখে বলেছেন—

“যচ্চ, কিঞ্চিৎ কচিবন্ত সদস্বাখিলাস্বিকে ।

তত্ত্ব সর্বত্ব যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং ভুয়েস তদা ॥”

অর্থাৎ হে বিখ্যাতিকে, যা কিছু বস্তু, সং হোক বা অসং হোক, আছে, সেই সমস্ত বস্তুর তুমিই শক্তি; সেই তোমাকে কি করে স্তুতি করা যায় ?

একই ভাবে জগদ্ধাত্রীকল্পে অবিস্তবে জননী জগদ্ধাত্রীকে সাংবোধন করে বলেছেন—

“বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি ।

সর্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্ত তে ॥”

অর্থাৎ ১৪ কোটি মন্ত্রের শক্তিরূপে সনাতনী তুমি সর্বশক্তির স্বরূপভূতা; হে জগদ্ধাত্রী! তোমায় নমস্কার। উভয় মন্ত্রেই জগদ্ধাত্রীকে সর্বশক্তিস্বরূপে বলা হয়েছে। যিনিই শ্রীশ্রীচণ্ডী-দুর্গা, তিনিই শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী—মন্ত্র বলে তাই প্রমাণিত হলো। ফলতঃ স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প প্রভৃতি সর্বত্র “জগদ্ধাত্র্যাঃ দুর্গায়াঃ” বলতে হয়। ব্রহ্মাওপুরাণ বলেছেন, “বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী বিশালাক্ষী বিরাগিনী।” দেবীপুরাণ স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন—যেহেতু জননী লোক সকল ধারণ করেন—এবং তাদের পরিপালনোদেষ্ঠে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দেন, সেজন্তাই দ্বিবিধাঙ্কুর ‘ধা’ ধাতুনিপাত্ত পত্র জগদ্ধাত্রী জননীর নাম। “ব্রহ্মাক্ষরয়তে লোকান্ বৃত্তিমেষাং দশতি চ ।

তু ধাঞ্চ ধারণে ধাতুর্জগদ্ধাত্রী মতা বৃধৈঃ ॥”

মার্কণ্ডেয় পুরাণও বিশ্বমাতাকে জগদ্ধাত্রী বলেছেন—“বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রীঃ স্থিতিসংহারকারিণী ॥”

দশপ্রহরধারিণী দুর্গাভিনাশিনী জননী দুর্গাকে দেবীপক্ষে আরাধনা করে আবার তৎপরবতী স্তোত্রপক্ষে কান্তিকী নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীরূপে আরাধনা করার বিধি-বিধানের কি হেতু থাকতে পারে, তা স্বভাবতই মনে জাগে। স্বর্গের দেবীসকল পরম্পরায় সনাতন ক্রমে আশ্বিনী শুক্লপ্রতিপদি বা শুক্লমাসিককল্পে জননীর পূজার বিধান, রাতি-সুস্তের ক্রমমুসারে মহানিশায় বা কান্তিকী কৃষ্ণ ত্রয়োদশমাসিককল্পে শুক্লপক্ষের ত্রিংশত মালার পূজা, তম্রধাবতী কোজাগরী পূর্ণিমা তিথি জননী লক্ষ্মীপূজার কারণ সব শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে তার আসোচনা করেছি। কিন্তু জগদ্ধাত্রীপূজা কে, কবে, কি কারণে কোথায় আরম্ভ করলেন, তার প্রমাণ পাইনি। কাত্যায়নীতন্ত্রে যে উপাখ্যান আছে, তা একান্তভাবে কেন উপাখ্যানের “উমা হৈমবতী” উপাখ্যানের, নামান্তরপূর্বক পুনরুক্তি মাত্র। তাতে চিন্তের ক্ষণ মিটে না। তবে একটি কথা নিরন্তর মনে হয় এ বিষয়ে—সেটি হচ্ছে, মহালয়ার পিতৃহান্ন কোনও কারণে প্রস্তুত না হলে দীপাধিতা অব্যবস্থাতে সে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গদানের বিধান আছে

শাস্ত্রে। যদিও জগদ্ধাত্রীপূজার বিষয়ে সে রকম কোনও শাস্ত্রী বিধানের উল্লেখ দেখতে পাই না, তথাপি যেন বারংবার না হয়—সাধক ভক্ত কোনও কারণে দেবীপক্ষে জননী দুর্গার বা কৃষ্ণপক্ষে জননী কালী বা লক্ষ্মী দেবীর চরণ বন্দনা করতে পারেননি তাঁদেরই জন্ত এ জগদ্ধাত্রী পূজার বিধান। অবশ্য এটি একাধি বিশেষ বিধানরূপে বিবেচনা করার কথা উপাধান করছি। ধীর উক্ত তিন ভাবে মাতৃদেবীর উপাসনা করেছেন, সামর্থ্য ও সুযোগ অনুসারে তাঁরা এই পূজাও সম্পাদনা করবেন, সে বিষয়ে অন্তর্য করবার কি আছে ?

আমার এই বিশেষ বিবেচনার মূলে দুইটি কারণ উল্লেখ করছি প্রথমটি হলো এই যে, জগদ্ধাত্রীপূজার ক্রম একেবারে ত্রিদিবসনিপাথ জননী দুর্গার পূজার একদিবসসাধ্য অনুক্রম, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিথির পূজা *এখানে দিনোদয়—মধ্যাহ্ন—সায়ংসন্ধ্যায় সমাপন করে একই শ্রীগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, হোমপ্রয়োগ প্রভৃতি করতে হয় মন্ত্রেও সর্বত্র “জগদ্ধাত্রী দুর্গা” বলতে হয়—স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, প্রভৃতি সর্বত্রই এই নিয়ম। বর্তমান যুগে প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে অকপাট একটি প্রমাণ আমি উপস্থাপিত করছি। সেটি হচ্ছে বর্তমান যুগের অবতীর্ণ ভগবান শ্রীশ্রীমদ্রুক পবনমহাসেবের সহধর্মিণী নিজে স্বয়ং অবতীর্ণা জগদ্ধাত্রী হয়েও প্রতি বৎসর জননী জগদ্ধাত্রী ত্রিদিবসব্যাপী অর্চনা করতেন। জননীর জননী শ্রীশ্রীশ্রীমদ্রুক দেবী জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা যথাসাধ্য উপচারে সম্পাদন করতেন কোনও বছর বাদ দেননি। পরবর্তী যুগে জননী সারদামণি নমঃ দেহ পরিভ্রাণের সময় পর্যন্ত কেবল এক বৎসর বিশেষ কারণে জগদ্ধাত্রীপূজা সম্পাদন করতে পারেননি। তজ্জন্ত পনের বৎসর বহু কাল আগে থেকে জয়রামবাটীতে উপস্থিত ঘোড়শোপাটে জননী জগদ্ধাত্রীর অর্চনা করিয়েছিলেন। জননী পূজার সময়ে তাঁর মাতৃদেবীর দেহাবসানের পরে সর্বত্রই আমার মা এই সময়ে এই করতেন, এই উপায়ে জননীর পূজার সামগ্রী মজুৎ রাখতেন—কালীপূজার তারিখ থেকে সন্মতে পাকাতেন, পৃথিবী কত শত জগদ্ধাত্রীপূজার গল্প পূজাপাদ শব্দ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), যোগীন্ডমা প্রভৃতিদের কাছে করতেন। সে সময়ে জননীর ভক্ত সন্তানেরা অনেকেই পূজামণ্ডপে উপস্থিত থেকে জননীর কর্মে সহায়তা করতেন। জননীর মাতৃপূজায় এত ছিল আনন্দ ও উৎসাহ। কিছুতেই তিনি ঐ সময়ে কলিকাতার বা অন্য স্থানে থাকতেন না; জয়রামবাটীতে পিতৃগৃহে গিয়ে যে কোনও রকমে উপস্থিত হতেন, এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে জননী জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পাদন করেন।

যা হোক—আমরা আমাদের বিশেষ বিবেচনার কথা এখন বলি যে কারণে মায়ের মাতৃ-পরিবারে সর্বপ্রথম জননী জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম অবতারণা হলো, সে কারণটিই বলা প্রয়োজন। একবার “জয়রামবাটার নব যুগজ্যোত্স্নামসম্বন্ধিত” বশতঃ মায়ের মা অর্থাৎ শ্রীমদ্রুকদেবীর চাল কালীপূজার জন্ত নিলো না। শ্রীমদ্রুকদেবীর পরম ভক্তি ও অপরিণীত মন্ত্রে সুরক্ষিত চাঁদল মায়ের পূজায় লাগলো না।

এই দুপে জননী-জননী জামাতন্দরী নিরন্তর অক্ষবিসর্জনে ধরনী সিক্ত করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, রক্তবর্ণা এক দেবী পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন এবং মাকে সন্তান দিয়ে বলছেন—“তুমি কীদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?” জামাতন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন—“কে তুমি?” দেবী উত্তর দিলেন—“আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।” পরের দেবীর বর্ণনা করতেই মা সারদামণি জননীকে বলতেন—“এ তো, উনিই তো জগদ্ধাত্রী।” সেই পূজার সূর্য হলে মা সারদামণির পিতৃ-পরিবারে। পূজার সময় সে সংবাদ জননী জগদম্বা কয়েকটি বিভূতিও প্রদর্শন করলেন। অল্প চাউলে চতুঃপার্শ্ব সমস্ত গ্রামের লোকেরা প্রসাদ পেল। জননী জামাতন্দরী মা জগাই-য়ের কানে কানে যাওয়ার সময় বলে দিলেন—

“মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি তোমার জন্ত সমস্ত বছর ঘরে সব জোগাড় করে রাখবো।” শাস্ত্রের মত—“মহাজনো যেন গত্যঃ স পন্থাঃ।” কাজেই বর্তমান যুগের স্বয়ং অবতীর্ণা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীরূপা খ্রীষ্টসারদামণির জননী যে শিষ্টাচার পালন পূর্বক লোকশিক্ষার পথ অব্যাহত করে গেছেন, সে মত যে ধর্মপ্রাণিতা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তাঁর আচারিত পথ বলেই তো এটি শাস্ত্রসিদ্ধ পথ।

জননীর পিতৃপরিবার এত দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে অতি অল্প বায়েও জননী জগদ্ধাত্রীপূজা প্রতি বৎসর চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই জননী পরের বছর “জগাই-”য়ের পূজায় আগন্তি করেন। স্বপ্নে জগাই সখী জগা বিজয়াকে নিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, সত্যি ঠাণ্ডা তা হ’লে যাবেন কি না। জননী অমনি বলবেন—“না, না, তোমরা যাবে কেন?”

প্রথম বছর বিসর্জনের দিন বৃহস্পতিবার ছিল। স্ত্রীমা আপত্তি করলেন যে লক্ষ্যাবারে মাকে বিদায় দেওয়া যায় না। পরের দিন সংক্রান্তি, তার পরের দিন শনিবার থাকায় মায়ের বিসর্জন হয়েছিল রবিবারে—চতুর্থ দিনে।

বার বৎসর পর পর জগদম্বা জননীর পূজা করে জননী ভেবেছিলেন আর জগদ্ধাত্রী পূজা করবেন না। প্রথম চার বৎসর জননী-জননী জামাতন্দরী, পরের চার বৎসর মা সারদামণি নিজে এবং তার পরের চার বৎসর ধূলভাত নীলমাধবের নামে পূজা হয়ে গেছে। কাজেই তিনি দরিদ্র পরিবারে আর পূজা চালাতে চাইছিলেন না। জননী সারদামণি যেদিন এই অভিপ্রায় প্রকাশ

করলেন, সেদিন রাত্রেই জননী জগদ্ধাত্রী স্বপ্নে মা সারদামণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি তিনি তা হ’লে মধু মধুজের পিসীমায়ের ওখানে চলে যাবেন কি না। জননী সারদামণি জননী জগদ্ধাত্রীর শ্রীচরণকমল জড়িয়ে ধরে বললেন—“আমি আর ছাড়ব না তোমাকে, আমি বছর বছর তোমাকে আনব।” এই সন্ধ্যাহুসারে পূজা চালাবার জন্ত জননী সাড়ে দশ বিঘার কিছু বেশী জমি দেবোত্তর করে গেছেন। এ জমির আরও সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে আরও জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দিরে প্রতি বৎসর খ্রীষ্টজগদ্ধাত্রীপূজা সম্পাদিত। স্বতন্ত্র আনন্দের বিষয়, বিগত কয়েক বছর ধরে পূজাপাদ স্বামী খ্রীযুক্ত বিমুক্তানন্দজীও বেলেড় মঠে সারদাতত্ত্ব মন্দিরে জগদ্ধাত্রী পূজার অহুষ্ঠান করছেন।

প্রথম বারের মত প্রতি বৎসর জননীর পিতৃবাটিতে তিন দিনে জগদ্ধাত্রী পূজা করা হই—প্রথম দিন বোড়শোপচায়ে এবং পরের দুই দিন সাধারণ ভাবে। দেবীর উভয় পার্শ্বে জগা বিজয়ার মূর্তি স্থাপিত ও পূজিত হয়।

জননী দেখতে জগদ্ধাত্রীর মত ছিলেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হুন্দের পুকুরের রামহরর ঘোরাণ উপস্থিত হলেন। উভয় জননীকে বারবার নিরীক্ষণ করেও কোনও পার্থক্য বুঝতে না পেয়ে পালিয়ে গেলেন।

শেষের দিকে জননী যখন জয়রামবাটিতে যেতেন ও ভক্ত সন্তানগণ জননীকে জগদ্ধাত্রীর মত পূজা করতেন, জননী জামাতন্দরী আর অক্ষসংবরণ করতে পারতেন না। একবার তিনি বলেছিলেন—“হী গো! তখন সকলেই জামাই কেপা বলতো, সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, আমিও কত কথা শুনা, মনের ছাখে মরে যেতুম। আর আজ দেখ, কত বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা-পূজা করছে।”

জননী জগদ্ধাত্রীর পূজার সময় জননী সারদামণি ঠাকুরকে সকাল সকাল ভোগ দিতেন এবং বলতেন যে, এখন পূজার জায়গার ঝেঁট হ’বে। সন্ধ্যারতির কয় দিন এবং মহাষ্টমীর সন্ধ্যাপূজাক্ষেপে জননী জগদম্বাকে দর্শনপূর্বক চানরব্যজন করতেন, ভক্ত সন্তানগণ উভয় জননীর মধ্যে কোনও প্রজ্জ্বলিত ধুঁকে পেত না।

ফলতঃ—এ রকম বহু প্রমাণ আছে—যাতে প্রমাণিত হয়, জননী সারদামণি জননী জগদ্ধাত্রীরই বর্তমান যুগের অবতীর্ণা আত্মরূপ। উভয় জননীকেই আজ এই পুণ্য জগদ্ধাত্রীপূজাক্ষেপে যুগপদ্ব ভাবে প্রণাম নিবেদন করি।

প্রেমের আদর জানি গো আমার জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি,
আমরা মানি না শিখা ত্রিপুর উপবীত ভরবারি,
জান্না খাতার খারি না কো ধার মোরা শুধু মমভারি।
মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুক নীতি,
নুতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন ভারতে গণিকা

বৈষ্ণনাথ ভট্টাচার্য

বিশেষ একটি সামাজিক শ্রেণী হিসাবে বারবনিতার উল্লেখ না করলে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার নারীজাতির স্থান নির্ধারণ অসম্পূর্ণ হয়ে বাবে। কেলিকলা-নিপুণা মুচাক-সেহিনী স্বধাক্ষী নৃত্যগা বোবনবতী গণিকাকুল প্রাচীন ভারতের নাগরিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার তুলনা একমাত্র প্রাচীন গ্রীসদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। চরম বৈদ্যবৃত্তের বেশ এই ভারতবর্ষ। এর একদিকে পবিত্র শাস্ত্র আক্য পরিবেশ সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে জিতেন্দ্রিয় তপস্বীরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ-সম্মত গভীর তপশ্চর্যা অকলঙ্ক পরমার্থের সন্ধান নিমগ্ন হতেন। অন্যদিকে নগরীর পথে পথে বিজ্ঞাননিপুণা, লুকা, লুঠকী, মদালসমুদ্রা, স্তম্ভমুকা নগরমোহিনীরা পুরুষ-স্বর্গর সহায়ের নিষ্ঠুর ছলপ্রণয়-বিলাসে মগ্ন হত। দণ্ডীর লম্বকুমারচরিত, কেমেশ্বরের সময়মাত্রকা, বাংশায়নের কামসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দামোদর গুপ্তের কুটনীতিমতম প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের বহু স্থানে নির্খুঁত নারীদের প্রতীকরূপে এই প্রমদা পণ্যাংগনাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ভারতীয় প্রেম-জীবন ও লাম্পাটা-লীলার প্রাণময়ী প্রতিমারূপে গণিকাকে চিত্রিত করা হয়েছে। বহুবলভা ও কামলা হয়েও তারা স্বাধীনরূপে পরিত্যক্তা হয়নি, বরং অপার কলা-কুশলতার জন্ত বিশেষ ভাবে আদৃত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের নগরজীবনে গণিকাদের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হত। অশিক্ষিতা ও মূর্খচিস্পন্নরা বরাদোহা গণিকারা সাধারণ্যে সমাদর লাভ করলেও, প্রত্যেকটি বারবনিতাই এই সামাজিক, সম্মানের অধিকারিণী ছিল না। 'কামসূত্র' ও 'উপমিত্তিবপ্রসঙ্গকথায়' সাধারণ ও অসাধারণ দু' শ্রেণীর গণিকার উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমার-চরিতে বর্ণিত রাগমঞ্জরীর অগ্রজা কনকমঞ্জরীর চরিত্র থেকে আমরা সাধারণ গণিকা সত্ত্বেও একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। প্রভুত লোভ আর পুরুষ-মুগ্ধতার ছলাকলার জন্ত সাধারণ গণিকাদের যথেষ্ট দুর্গম ভোগ করতে হত। শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের শিক্ষিতা করে তোলা হত। সেটি হচ্ছে, প্রণয়সজ্জ পুরুষের কাছ থেকে মিথ্যা প্রণয়ে অর্থ নিষ্পেষণ।

অসাহিত্যে, বিশেষ ভাবে মহানির্ধাণতন্ত্র বারবনিতাদের পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(১) রাজবেত্তা (নৃপতির উপভোগ্য)। নৃপতির আমোদ-প্রমোদের জন্ত তারা নিযুক্ত হত এবং রাজ-অন্তঃপুরের একাংশেই অবস্থান করত। জাতক থেকে জানা যায় যে, কোন কোন নৃপতির হোল সহস্র নর্তকী ছিল। কৌটিল্যও রাজবেত্তার উল্লেখ করেছেন। রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থান করলেও রাজা এদের মোটেই বিশ্বাস করতেন না। এদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্ত নারী-গুপ্তচর ও নর্তকী নিযুক্ত করা হত। এসেই আশ্চর্য-স্বজনকে পর্যন্ত এদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেওয়া হত না। এদের সম্পদের অভাব না থাকলেও ব্যক্তিগতজীবনভার অভাব ছিল।

(২) নাগরী বা নগরবেত্তা। এরা সাধারণতঃ নগরের একাংশে

বাস করত এবং নাগরিকেরা এদের গৃহে গমন করত। বিশেষ বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে বা প্রমোদ-বিহারে এদের আমন্ত্রণ জানান হত। রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্যের ও 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক থেকে জানা যায় যে, উৎসব উপলক্ষে নগরীর পথে বারাগনা সমাবেশ ঘটতো। বাংশায়নের 'কামসূত্র' ও 'রতিরহস্ত'ে বিভিন্ন প্রমোদক্রমে বারনারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রভুত সাক্ষ্য মেলে। সাধারণ নগরবেত্তার আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব না হলেও 'মুচ্ছকটিক' নাটক বর্ণিত বসন্তসেনার প্রাসাদের সমুচ্ছল সমৃদ্ধি থেকে রূপসী কলাবতী নগরবেত্তার বিলাস-উচ্ছল জীবনযাত্রা সত্ত্বেও একটা স্পষ্ট ধারণা করা চলে। বসন্তসেনার আবাসগৃহের গজদন্তশোভিত সু-উচ্চ তোরণদ্বার, মণিখচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, মুক্তাশোভিত কঙ্কাবলী, সুবর্ণলিপ্ত সোপানশ্রেণী, ফটিক-নির্মিত বাতায়নরাজি, মণিময় অক্ষ-সম্বিহিত ক্রীড়া-পীঠিকা—সর্বত্রই চরম ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) গুপ্তবেত্তা। ভদ্রপরিবারভূক্ত নারীরাও সমগ্র-বিশেষে গোপনে হেথবিকর ব্যবসায়ে লিপ্ত হত। এই প্রসঙ্গে আমরা 'কাঞ্চনবীরে' বেশমী ওড়না-আবৃত মুখে তরুনীকুলের পূর্ণিমা রাতে প্রণয়-সম্মিলনের গমনের উল্লেখ দেখতে পাই। বাংশায়নও উত্তানবাত্রা পানবাত্রা প্রভৃতি প্রমোদ বিহারে ব্যভিচারিণী পুরনারীদের পরপুরুষ-মস্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। 'রতিরহস্তেও' ভট্টা পুরন্দীর নৈশাভিচারের কথা বলা হয়েছে। 'অভিধানরত্নমালায়' একশ্রেণীর জায়াজীব নটের উল্লেখ আছে। দ্বীকো ব্যভিচারিণী করে তার উপার্জনের উপর এই শ্রেণীর নটের অঙ্গসংস্থান করত। 'রতিরহস্তেও' এই অসুখ পাণ্ডিত্যের অন্তিম সমাপ্তি হয়েছে। মেধাতিথি বলেন, বহু গায়কের পত্নী পরিপূর্ণ বৈরাগ্যে গ্রহণ না করলেও স্বামীদের জ্ঞাতসারেও পরিপূর্ণ সমর্থনে নিজের গৃহেই উপপতিদের আমন্ত্রণ জানাতে কৃতাধিকার করত না।

(৪) দেববেত্তা (দেবদাসী বা দেবমন্দিরের নর্তকী)। গণিকা বৃত্তির সঙ্গে সমভাবে যুক্ত দেবমন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের প্রথা প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিল। বাহুবল্লভে দেবনর্তকীরা দেবভোগ্যরূপে পরিগণিত হলেও, কাঞ্চনবীরে এদের বিগ্রহ-পূজারীসের আসন্নলিঙ্গা চরিতার্থ করবার জন্ত অপসারী-বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হত। কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল-মন্দিরে দেবদাসী নিযুক্ত ছিল। হিউয়েন-সাঙের সময়ও পূর্ব-সিদ্ধুর এক নগরের সূর্য-মন্দিরে দেবদাসীর অস্তিত্ব দেখা যায়। গুপ্তোত্তর যুগেও দেবদাসী, প্রথার বিলোপ ঘটেনি। মেধাতিথি ও তৎকালীন শিলালেখন থেকে এর যথেষ্ট সমর্থন মেলে। আবু জরিফও ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে গণিকাকে যুক্ত থাকতে দেখেছেন। রাণী চিত্রলেখার বায়ান স্তম্ভলিপি, পশ্চিম চালুক্যরাজ সত্যাক্রয়ের তুঙ্গগি শিলালিপি ও দাক্ষিণাত্যের চোলনৃপতি প্রথম পরাক্রম এবং প্রথম রাজরাজের শিলালেখন প্রাচীন ভারতে দেবদাসী-প্রথার অস্তিত্ব সত্ত্বেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

(৫) ব্রহ্মবেত্তা বা তীর্থগা। এরা প্রধানতঃ তীর্থক্ষেত্রের গণিকা। নারী ও ধর্ম্মদ্বারা পরস্পর সম্মুখ থাকার ভারত তীর্থস্থানগুলি সাধারণতঃ প্রেমের লীলাক্ষেত্ররূপে পরিচিত হত এবং তীর্থক্ষেত্রে প্রভুত জনসমাগম হেতু গণিকাকুলও তাদের সহ বিক্রম বৃত্তি অবশ্যে অঙ্গদগণ করবার সুযোগ পেত। এই প্রসঙ্গে বাস তাঁর 'কাঞ্চনবীরে' গ্রন্থে রক্তেশ্বর লিঙ্গ মাঠাংগ বর্ণনার কলাবতী নামে

এক স্থপতিতা, নৃত্যগীত-বাদননিপুণা নর্তকীর উল্লেখ করেছেন। জাতকও বারাদশী-তীর্থে শামা, সুলসা অর্ধকাশী প্রভৃতি গণিকার অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রেরজিতা বা ভিকুকা নামে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসিনীর উল্লেখ দেখা যায়। কামসূত্রে এদের নৈতিক চরিত্রে উচ্চসম্মানের অধিকারিণীরূপে চিত্রিত করা হয়নি। বিবাহিতা নারীদের এদের সংস্রব বিববৎ পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সন্ন্যাসিনী কলাবিজ্ঞায় যথেষ্ট পারদর্শ্য ছিল এবং প্রেমঘটিত ব্যাপারে কামোপহৃত নাগরিকেরা এদের সাহায্য নিতে কৃত্তিম হত না। বহু ক্ষেত্রে এরা কুটনীতি অবলম্বন করত এবং এদের কুটার প্রেমিকদের অভিসার ক্ষেত্রে ও সুরতলীরূপে পরিগণিত হত। অবশ্য সমস্ত প্রেরজিতাই এই দুর্নামের অধিকারিণী ছিল না। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে জনসাধারণের কাছ থেকে এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করতে দেখা গেছে।

বাংলায়নের কামসূত্র ও কাভ্যায়নের ভাটুকুসূত্রে গণিকা-সংঘের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিতে গণিকাদের লালন-পালন ও শিক্ষালান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। একটি গণিকাকল্যাকে জন্ম থেকেই নৃত্য, গীত, বাদন, অগ্নিয ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সূক্ষ্মার কলা, মালা ও সুগন্ধী পুষ্পসার প্রস্তুত প্রণালী, পটন, লিখন ও কখনবিজ্ঞা, ব্যাকরণ, জ্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদিতে অশিক্ষিতা করে তোলা হত। সঙ্গে সঙ্গে গণিকাসুলভ ছল প্রণয়কলায় তাকে লাভ করতে হত প্রাত্যক্ষ শিক্ষা, গণ-উৎসবে তাকে যোগদান করতে হত, মুক্ত নাগরিকদের মধ্যে তার উচ্চতম দেহস্বী ও গুণাবলী বিজ্ঞাপিত করতে হত এবং তার প্রণয়-লাভের উপর উচ্চ দর্শনী নির্ধারিত করতে হত। কোটিল্যও এই শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করেছেন এবং রাষ্ট্রকে শিক্ষিকাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুটনীতিমতের একটি কাহিনী থেকে আমরা গণিকাদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। মালতী তার প্রেমিকের কাছে যে দৃতী পাঠিয়েছিল, সে শুধুমাত্র তার বিকশিত যৌবনশ্রীর বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মালতীর আরও অনেক গুণের উল্লেখ করেছিল। গণিকা হিসাবে মালতীর বাৎশ্রায়ণ ও দণ্ডক বিবচিত কামশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল, প্রণয়-অভিনয়ের ছলাকলায় ছিল তার অনন্তসাধারণ নৈপুণ্য, ভেজবিজ্ঞান, স্টীকর্ষ, দেহ-রঞ্জন, মূর্তি রচনা, নৃত্য, গীত ও যন্ত্র বাদনে তার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

কুটনীতিমতের অপর এক স্থানে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনক্ষেণে গণিকার সাজসজ্জা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে। গণিকার পরিধানে থাকবে ধৌত, সুরভিত, কোমল ও সূক্ষ্ম পুরিচ্ছদ, দেহে থাকবে স্রুঙ্গ অলংকার, চোখে থাকবে কঙ্কাল, অধর হবে রজিত, মুখ-গহবর সুগন্ধিত হবে সুসিদ্ধ মুখত্বকিতে। কামসূত্র থেকে জানা যায় যে, একজন গণিকা হবে চৌবর্ষী কলায় অশিক্ষিতা, তার ব্যবহার হবে বিনয়নত্র, দেহস্বী হবে মনোলাভা ও পুরুষ-চিত্ত বিজয়ের অমূল্য। তার প্রসন্নতা, তার সংগ সকলের কাম্য হবে, আর সে হবে সকলের লক্ষ্যনীর। ললিতবিস্তার প্রস্তুত মহারাজ শুদ্ধোদন কর্তৃক

যুবরাজ সিদ্ধার্থের জন্ত সর্বপাক্ষিকতা ও গণিকাসুলভ কলাবিজ্ঞায় পারদর্শিনী বধু কামনার কথা লিখিত আছে। গণিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন, গণিকা হবে সম্বরী, শক্তিরাপা, বিনয়নত্র ও সুচতুর। সে হবে সুলক্ষেরূপা, সুভদ্রকা, কলাবতী, অপার রূগপারংগমা নারীরত্ন। তাকে খিরে সৃষ্টি হবে একটি রতন-ব্যাকুল উৎসব, উজ্জলিত হবে কামাতুর মস্ত-মুখপের গুঞ্জরগ।

মহাকাব্যের যুগ থেকেই গণিকার নগরজীবনে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে আছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধবাত্রার পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির নগরীর যৌবনরক্তচরিত্র রূপাতিশালিনী গণিকাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও গণিকার উপস্থিত থাকত। দুর্ধোধনের সৈন্যদলে শিরী, গায়ক, গুপ্তচর ও বারনারীরা অংশ গ্রহণ করেছিল। রামায়ণে নৃপতি দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের সৈন্যগঠনে গণিকাদের সৈন্যদলের শোভাবর্ধনের জন্ত আহবান জানিয়েছিলেন। কেবলমাত্র যুদ্ধাভিনানেই বারংবার হান পেত না, তারা ছিল নগরের প্রত্যেকটি উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেককালে মহর্ষি বশিষ্ঠ বারনারীদের উৎসব-আনন্দে যোগ দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের বনবাসের পর সমগ্র অযোধ্যা নগরীতে উৎসব নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে ভাটা ভরতও গণিকাকুল সহ সমস্ত নগরবাসীকে রামচন্দ্রের সুখচন্দ্রিমা দর্শনের জন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাজা বিরাটের পাণ্ডব সহায়তার ফলে যুদ্ধজয়ের শেষে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কালে নগরের সমস্ত যুবতীবৃন্দ বারবনিতা সহ বিজয়ীদের অভ্যর্থনায় জন্ত উপস্থিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বধন শান্তিহোপনাথে কৌরবশিবিরে বাত্মা করেছিলেন, তখন মহারাজ দ্রুপদাষ্ট্রের আদেশে নগর-মোহিনীরাও নগরপদে, মনোহরবেশে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

উজানযাত্রা বা যুগয়াকালেও বারবনিতার নৃপতির অঙ্গসরং করত। দুর্ধোধনের যুগয়াকালে দ্রাক্ষ, নর্তক, গায়ক এবং আনন্দদায়িনী নারীরাও অংশ নিয়েছিল। মেগাস্থিনিস ও কোটিল্য নৃপতির দ্রো-দেহবন্ধী হিসাবে গণিকাদের নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। বারহুত ভাঙ্কর্ষে এইরকম একজন অশ্রাব্য পতাকাধারিণী দেহরক্ষিণীর মূর্তি চিত্রিত হয়েছে। মৌর্যযুগে একজন কলাবতী স্রোবোনা গণিকাকে উচ্চ পারিশ্রমিকে গণিকা সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধায়িকারূপে নিযুক্ত করা হত। আবার তার ক্রিয়াকলাপ পৃথকক্ষেণের জন্ত অর্থ পারিশ্রমিকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী গণিকার নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক সুবিধার্থে গণিকাদের দ্রো গুপ্তচর হিসাবেও নিযুক্ত করা হত। রাজ-অস্ত্র-পুরেও উচ্চ পারিশ্রমিকে তারা কর্ম গ্রহণ করতে পারত। তারা রাজ-ছত্র, স্বর্ণময় জল-পাত্র ও ব্যজনী ধারণ করত, ভাণ্ডারকক্ষ, রত্নশালা ও স্নানাগারের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হত। 'উপমিত্তিবদপ্রপঞ্চকথা' থেকে জানা যায়, রাজকুমার নন্দীবর্ধনের সঙ্গে রাজকুমারী কনকমঞ্জরীর গুপ্ত-পরিণয়ে গণিকার নন্দীবর্ধনকে স্থান করিয়েছিল। আবু জরিফ ও ইবন জল ফাকী বিশ্রামাগারে পথিকদের আনন্দদানের জন্ত গণিকা নিয়োগের কথা বলেছেন।

সন্মানিত অতিথিদের সেবার জন্ত গণিকাদের নিযুক্ত করার

প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। বাসপুত্র জিতেন্দ্রিয় চকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বিশেষ-রাজ জনকের উদ্ভাবন-কৃত্ত প্রবেশকালে পঞ্চাশটি স্তম্ভনা, খরমোবনা, রক্তাক্ত ও গুরুনিতম্বিনী গণিকা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। স্বরত-লিপ্সা জাগিয়ে তোলবার জন্তু তারা স্ববিক্রম্যক নিবেদন করেছিল স্ববাহু খাণ্ড, বিলাস শয়নের জন্তু প্রস্তুত করেছিল কোমল শয্যাসন। রামায়ণে উল্লিখিত লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃত্তি নিবারণার্থে বিভাওকুমুদিনি পুত্র স্ববাহুগুণকে আনয়নের জন্তুও কোঁচকুমারী যুবতী বারবনিতাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ভ্রাতৃগণ, মন্ত্রী ও রাজকুমারগণের চিত্তবিনোদন ও সাময়িক উপভোগের জন্তু সহস্রাধিক নবমোবনা গণিকাকে নিযুক্ত করেছিলেন। যারকায় অজ্ঞানের মনোরঞ্জনার্থে ঐক্লব কর্তৃক বারবনিতা নিয়োগও দৃষ্ট হয়। জটনৈক রাজকুমারের ঔষাসীক দূর করবার জন্তু নর্তকী নিয়োগের কথা 'কুল্লপলোভন' ছাতকে লিখিত রয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভে গৌতমকেও এই ভাবে নর্তকীর ছলকলার সাহায্যে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

'কামবৃত্তে' বর্ণিত 'নাগরকের' জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে জানা যায় যে, গৃহে অমুগত প্রেমময়ী পত্নী থাকার সত্ত্বেও নাগরিকেরা বিহায়াত্রায়, উদ্ভানভ্রমণে, পানবাট্রায় ও গণিকালয়ে বারনারীদের সঙ্গে মিলিত হত।

'রক্তিরহস্ত' থেকে জানা যায় যে, নিশাকালে প্রমোদবিলাসী যুবকেরা আলোকোজ্জ্বল পুষ্পসার-সুরভিত কক্ষে নর্তকীদের সঙ্গে নিলজ্জ নর্মলীলায় মত্ত হত। 'উপমিত্তভবপ্রপঞ্চকথায়' দেখা যায় যে, বসন্ত সমাগমে পানোমত্ত নাগরিকেরা গণিকাদের সঙ্গে নগরের বহির্ভাগে উদ্ভানসমূহে যাত্রা করত। সেখানে তারা বকুল অশোক প্রভৃতি বৃক্ষতলে কামোদীকপ ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হত, বহুখচিত আধার থেকে স্বগন্ধী সুরা পানপাত্রে ঢেলে নিয়ে তারা ভট্টা পণ্যাগনারের রক্তিম অধরে তুলে ধরত। 'মেঘদূতে' বিদিশা নগরীর যুবকবৃন্দকে নিকটবর্তী শৈলদেশের শিলাগৃহে গণিকাদের সঙ্গে কাম-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হতে দেখা গেছে। কবি রাজশেখর বিবর্তিত 'কাব্যমীমাংসা' ও 'বিশ্বশালভজিক' গ্রন্থদ্বয়েও কেলিশয়ন-সুশোভিত লীলাগৃহ সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, নৃত্যস্থলীতে নর্তকীর লাভময় নৃত্যমুহুর্তন ক্ষণে ক্ষণে যুবকবৃন্দের চিত্তাক্ষয় ঘটায়। মুদ্রারাক্ষস, কুমারসম্ভব ও কাদম্বরী গ্রন্থ থেকেও গণিকাসক্ত যুবকদের ক্রীড়ামত্ততার পরিচয় মেলে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন সমাজ ছিল স্বরচিত সমাজ। এক শ্রেণীর গণিকার অপকল্প মেহলাবধা, বিনয়-মন্ত্র আচরণ ও বিভিন্ন কলাশাস্ত্রে অসাধারণ প্রজ্ঞার জন্তু সমস্ত কলারসিকেরাই তাদের সঙ্গ কামনা করত। বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ শিক্ষালভের মধ্য দিয়ে গণিকারা চৌষটি কলায় যেকল্প ব্যুৎপত্তি লাভ করত, অন্তঃপুরচারিণী বিবাহিতা নারীদের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না। কারণ, তাদের উপরে ছিল সংসার প্রতিপালন ও গৃহস্থালী সারক্ষণের গুরু দায়িত্ব। তাছাড়া যে সমস্ত কলাগৃহ বা গন্ধর্বশালায় পক্ষিকাকত্ভার্য বিবিধ কলায় শিক্ষালাভ করে ধনী সন্তানদের মাঝে মক্ষিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত, সে সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ করাকে বিবাহিতা নারীরা স্বরচিতসম্মত ও ভ্রজজনোচিত বলে মনে হত না। সে যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পবিত্রতা সারক্ষণকে উচ্চ

মর্যাদা দেওয়া হত এবং তাঁর স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে স্ত্রী পরিচালনার জন্তু বহুবিধ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা ছিল। যার ফলে এক স্বামী ছাড়া সে আর কারও কাছ থেকে কলাগ্রহণ শিকাগ্রহণ করতে পারত না। আর নাগরিক স্বামীও সামাজিক অমুষ্ঠানাদিতে এত ব্যস্ত থাকত যে তাঁর পক্ষে স্ত্রীকে কলারসিকা করে তোলবার অল্পই সুযোগ মিলত। সেই কারণে বিবাহিতা স্ত্রীদের চেয়ে গণিকারাই ছিল অধিকতর শিক্ষিতা, মার্জিতা ও কলাবর্তী। নগরবাসী পুরুষেরাও সেজন্তু গৃহে গতিপ্রাণা ঘরগী থাকলেও শিক্ষিতা বারবনিতার সঙ্গ অধিক কামনা করত। উদাহরণস্বরূপ চারুদত্ত বসন্তসেনার উপাখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। নগরবাসী পুরুষদের গৃহে অশান্তি ছিল না, অসহনীয় ছিল না গৃহ-পরিবেশ। তবু তারা গণিকার সম্পর্কে আস্ত তাদের রুচিসম্মত গুণাবলীর জন্তু। সাধারণ মানুষের গণিকা-জীবনকে ঘুরার দৃষ্টিতে দেখলেও, তার উচ্চ কলাজ্ঞানের জন্তু তারা তাকে সহ্য করত ও সময় বিশেষে সমাদর করতও কৃষ্টিত হত না। গণিকাদের অপার কলারসের পরিচয় পাওয়া যেত বিশেষ বিশেষ উৎসব অমুষ্ঠানে। এই সমস্ত অমুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জনসাধারণও আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পেত। দশকুমারচরিতে বর্ণিত রাগমঞ্জরী নাগরিকদের আনন্দবর্ধনের জন্তু প্রকাশ্যে সঙ্গীতামুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। মহাভারত ও ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'কলাবিন্যাসে' একটি কাহিনী থেকে জানা যায় যে, সম্রাটস্বর্গেশ্বরী নারীরা পর্যন্ত বিকচমোবনা আসন্নপ্রিয়া, সুরেশা রূপাঞ্জীবাদের সমাদরকে ইর্ষার চোখে দেখতেন।

পুরুষের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করবার জন্তুই গণিকার স্ত্রী। মনোহারী দেহসুখমা, কপট প্রেমের ছলকলা ও চটলতার সাহায্যে তারা দুর্বলচিত্ত পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। সাধারণভাবে তারা লুকা, লুঠকী ও স্বার্থপর। পুরুষ-মুগ্ধয়ার তারা পায় অপার আনন্দ, কামুক সম্পদশালীকে নিগূহাত করাই তাদের স্বভাব-বিসাতি। অবশ্য সমস্ত গণিকাই কপটিনী অসং ও অর্থলোলুপা ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও জাতক কাহিনীগুলিতে বহু গণিকাই তাদের দেহস্ত্রী, বুদ্ধিমত্তা ও ত্যাগব্রতের জন্তু অকুণ্ঠ প্রশংসা ও উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বহু বারবনিতাই বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে এসে প্রবৃত্তিক বিসর্জন দিয়ে আদর্শ জীবন যাপন করেছে এবং অবশেষে অর্হন্ত লাভ করেছে। জনসাধারণও তাদের স্ভাব্য অর্থ নিবেদনে দ্বিধাবোধ করেনি। ভগবান বুদ্ধ তাঁর সন্ত্রব থেকে ছিন্নমুদ্র ও নপুংসকদের বর্জন করলেও গণিকাদের বর্জন করেননি। এই প্রসঙ্গে 'মহাভাগ' জাতকে বর্ণিত অম্বপালী বা আম্রপালীর জীবনকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈশালী নগরীর এক বিস্তবান নাগরিকের কন্যা এই আম্রপালী। সে ছিল রূপসী, কলাবর্তী, সুকণ্ঠী ও নৃত্যপটীয়া। বহু যুবক আম্রপালীকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে উগ্রীব হওয়ার তার পিতা তাকে লিচ্ছবী-সাম্রাজ্যের সামনে উপস্থিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর আম্রপালী স্ত্রীরূপে অভিহিতা হয় এবং প্রচলিত প্রথাযুসারে তাকে সমগ্র সাম্রাজ্যের উপভোগ্য সভা-নর্তকীরূপে গ্রহণ করা হয়। আম্রপালীও এই বারাগনা-জীবন গ্রহণে স্বীকৃতি হয়। তার অবস্থান বৈশালী নগরীকে সমৃদ্ধ ও সম্রাজ্যে উজ্জ্বল করে তোলে। এক্ষণ একটি সুখোবনা কলাঙ্গীরা গণিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে রাজধানী রাজসভার গৌরববর্ধনের জন্তু জটনৈক বণিক নৃশক্তি বিধিসারকে

মুদ্রার জানিয়েছিল। মগধাধিপ বিহসারও বৈশালী গিয়ে
প্রাচীণ প্রণয়সক্ত হন। 'অবদানকল্পতায়' 'আত্মপাল্যাবদান'
গহিনী অনুসারে বিহসারের ওরসে আত্মপালীর গর্ভজাত পুত্র অভয়
মাসিক ঘণা লাভ না করে রাজসভায় সম্মানিত আসন লাভ
নাইছিল। এই প্রসঙ্গে 'ছান্দোগ্যোপনিষদের' সত্যকাম ও
বালার উপাখ্যানও উল্লেখযোগ্য। বহুভোগ্য ভক্‌ত্বীনা জবালার
পুত্র সত্যকামকেও ঋষি গোতম সত্যকুল-জাত দ্বিজোত্তমরূপে স্বীকার
করে ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষালাভে অধিকার প্রদান করেছিলেন।

যখন ভগবান বুদ্ধ বৈশালী নগরীর উপকণ্ঠে উপনীত হন,
তখন নর্তকী আত্মপালী তাঁর ধর্মোপদেশে শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে সমিধা
টাকে তার গৃহে অন্নগ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। ভগবান বুদ্ধও তার
দ্রুতবেশ রক্ষা করেন। 'বিনয়পিটক' থেকে জানা যায় যে, আত্মপালী
দ্বীয় নামের একটি প্রমোদকানন বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘকে উৎসর্গ করে।
এই আত্মপালীই পরে দিব্যজ্ঞান অর্জনের দ্বারা অর্হৎ লাভ করে
ছিল হয়।

খেরী পাণথ্য উল্লিখিত অনেক খেরী গণিকার জীবনও বুদ্ধের
সম্পর্কে এসে পরিশোধিত হয় এবং তারা অর্হৎ লাভ করে।
'মহাবংশ', 'ধর্মপদভাষ্য', 'সুত্ত-নিপাত', 'বোধিসত্তাবদান-কল্পলতা',
'মহাবিবদান' প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বহু নর্তকীর উল্লেখ রয়েছে।
উজ্জিনীর সভা-নর্তকী পচুমবতী ধার্মিক সন্ন্যাসী-পুত্রের মুখে ধর্মবাণী
শুনেন গণিকার ঘৃণা জীবন পরিত্যাগ করে ও পরিশেষে অর্হৎ অর্জন
করে। রাজগৃহের রূপকণ লাবণ্যময়ী নর্তকী সিরিমাও ভগবান
বুদ্ধের স্তম্ভ সম্পর্শে এসে পবিত্রতার প্রথম স্তরে উপনীত হয়।
বারাণসীর গণিকা শামী দম্ভ্য বজ্রসানার প্রণয়সক্তা হয়ে গণিকা-বৃত্তি
পরিত্যাগ করে। পরে দম্ভ্যর পাশে প্রবৃত্তি ও তর্কলোলুপতা দেখে
তার মোহভাগ হয় এবং সে তার পূর্বের জীবন ফিরে যায়।
বারবনিতা স্থলসার জীবনও শামার মত। একটিমাত্র পুরুষকে
আশ্রয় করে সাধুজীবন কাটাতে চাইলেও স্থলসাকে আবার তার
ঘৃণা জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। যৌবনমদে মত্তা নটী
বাসবদত্তার লাভা আত্মবান সন্ন্যাসী উপগুপ্ত প্রথমে প্রত্যাখ্যান
করেছিলেন। পরে বসন্তরোগাক্রমে বাসবদত্তা যখন নগর-পরিখায়
পরিভ্রমণে হয়েছিল, তখন একমাত্র উপগুপ্তই তাকে সেবা দ্বারা
বাধ্যমুক্ত করেছিলেন। কামীর বারবধু অর্ধকামীও বৌদ্ধধর্মের
প্রভাব ধর্মপথ গ্রহণ করেছিল এবং অর্হৎ লাভে ধ্বজা হয়েছিল।

'মুচ্ছকটিকের' বসন্তসেনা, দশকুমারচরিতের রাগমগ্নরী, চন্দ্রসেনা
প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর গণিকা যেহেতু তাদের দেহ-বিক্রয় বৃত্তি পরিত্যাগ
করে অজস্র নিগ্রহ স্বীকারের পর নিজেদের গচ্ছমমত প্রেমিকদের
সহিত মিলিত হয়েছে। 'মাবদানল-কামকল্পা-কথা' থেকে জানা যায়
যে, বালককুমার মাবদানল নর্তকী কামকল্পার প্রণয়সক্ত হয়ে সুদীর্ঘ
যুগময় বিচ্ছেদের পর রাজা বিক্রমাদিত্যের আত্মকুল্যে কামকল্পাকে
বিবাহ করেন। 'দশকুমারচরিতে' চম্পা নগরীর এক গণিকা-কন্ডার
সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। বিজাপুর জেলার
কাকুট মন্দিরের একটি শিলালেখনে বাদামীর চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের
'সদয়স্বরী' গণিকা বিনাপটীর দান-কর্মের কথা লিখিত আছে।

উপরোক্ত কাহিনীগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে
গণিকার মোটেই ঘৃণার পাত্রী ছিল না বরং শৌর্যবান নৃপতিকুল ও

অবিখ্যাত ধর্মরূপগণ তাদের যথেষ্ট সমাদর করতেন এবং বহু ক্ষেত্রে
তাদের অনুগ্রহ করতে বিধা করতেন না বা তাদের উপহার গ্রহণে
লজ্জিত হতেন না।

দেবায়তন নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, উদ্যান রচনা, সেতু নির্মাণ,
উৎসর্গ ও উৎসব মণ্ডপ নির্মাণ প্রভৃতি সংকর্মে অর্থ নিয়োগকে
গণিকার জীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করত। ব্রাহ্মণকে গোপালন
পরম পুণ্যকার্য বলে স্বীকৃত হত এবং পতিতার এই দান-কর্ম দ্বিতীয়
ব্যক্তির মাধ্যমে সমাধা করত, কারণ শাস্ত্রীয় মতে কোন ব্রাহ্মণই
গণিকার দান গ্রহণ করতেন না। 'বিক্রমুত্তি' অনুসারে বিদেশ বাত্রার
সময় গণিকার মুখদর্শন স্তম্ভ বলে গণ্য হত।

প্রাচীন ভারতে গণিকাদের কর্তব্য ও অধিকার (বেত্তাধর্ম) সম্বন্ধে
একটি বিস্তারিত বিবরণ 'মহত্তপুর্বাণে' লিখিত আছে। তৎকালে গণিকা-
বৃত্তিকে একটি আইন-সম্মত বৃত্তি বলে গণ্য করা হত এবং বিশেষ সর্ব-
যুক্ত কতকগুলি বিধি-নিষেধ গণিকাদের প্রতি প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল।
কৌটিল্যও গণিকাবৃত্তিকে 'সুনিয়ন্ত্রিত' করার জন্য কতকগুলি নিয়মের
উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক গণিকাকে তার দু' দিনের
উপার্জন মাসিক কর হিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হবে। উপপতিদের
সঙ্গে তাদের মতানৈক্য ঘটলে প্রধান গণিকা তার সহজ নিষ্পত্তি করে
দেবে। গণিকাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন, তাদের অভাব অভিযোগ
ও শ্রেণীগত দর্শনীয় হাচ গণিকাধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মীমাংসিত ও
নির্ধারিত হবে। নর্তকার বিনা সম্মতিতে তার উপর বলাৎকার করলে
বা গণিকাকন্ডার সঙ্গে বাতিলারে লিপ্ত হলে অপরাধীকে রাজদ্বারে
অভিযুক্ত হতে হবে। নারদ বলেছেন, গণিকার অস্বাস্থ্য সম্পত্তি
বাজেয়াপ্ত করা চললেও তার ব্যবসায়ের সহায়ক অলংকারাদি কখনও
রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগত করা চলবে না। রাজবন্দ্য বলেছেন, কোন
গণিকা যদি কোন ব্যক্তির শয্যাসংগিনী হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অগ্রিম
অর্থ নেয় এবং পরে তাতে অসম্মতা হয়, তবে সে অগ্রিমদাতাকে দ্বিগুণ
অর্থ প্রতারণা করতে বাধ্য থাকবে। অগ্রিমপূরণে রাজবন্দ্যের নির্দেশ
সমর্থিত হয়েছে। কৌটিল্যের মহাত্ম্যসূত্রে বেত্তাধর্মগুলিকে তালিকাভুক্ত
করা হত। বিগতযৌবনা গণিকাদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও ছিল।

শিক্ষিতা ও সুকচিসম্পন্ন্য বারনারীদের সাধারণ ভাবে যথেষ্ট সমাদর
করা হলেও মহাভারতের উপদেশানুসার অংশ, বিভিন্ন পুরাণ ও সংহিতায়
জনসাধারণকে এদের সম্পর্শ থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেওয়া
হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে, দশটি হত্যাগৃহ থেকে একটি তৈল-
নিষেধক চক্র অধিক মন্দ; একটি অতিথিশালা দশটি তৈল-নিষেধক
চক্র থেকে নিকৃষ্ট; একজন বেত্তা দশটি অতিথিশালা থেকে মন্দ, আবার
একজন নৃপতি দশ জন গণিকা থেকে নিকৃষ্ট। প্রত্যেক প্রজামুরজ্ঞক
নৃপতিকে পানশালা, বরাংগনা, জুয়াড়ি, ব্যবসারী ও বিশ্বকদের
অজ্ঞাত প্রভাব থেকে নিজরাজ্যকে মুক্ত রাখবার কঠোর নির্দেশ দেওয়া
হয়েছে। নইলে রাজ্যের ও প্রজাপুঞ্জের ধ্বংস অনিবার্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বহু স্থানে অশ্লীলতা ও বারংগনাকে
পরস্পর সংযুক্ত দেখান হয়েছে। দশকুমারচরিত থেকে জানা যায় যে,
তত্ত্বর ও অপরাধীদের সঙ্গে গণিকাদের 'অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক' বর্তমান
থাকে। রাজবন্দ্য বলেছেন, তত্ত্বরের চৌধুরীপাথের চারটি প্রমোদ
মধ্যে একটি হচ্ছে বেত্তাধর্ম 'বাস'। জৈনকাহিনী 'অগলদত্তে' তত্ত্বরের
উদ্দেশ্যে বেত্তাধর্মই প্রথম অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহাভারত থেকে জানা যায় যে মন্ত্রশাস্ত্র ও গণিকালয় পরস্পর সংযুক্ত। নারদ, মনু, বৃহস্পতি প্রভৃতি শাস্ত্রকার 'প্রকাশবধকদে'র মধ্যে জুয়াড়ি, অসাধু ব্যবসায়ী ও উৎকোচগ্রহীতার সঙ্গে গণিকার উল্লেখ করেছেন। বাৎসর্যন, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু প্রভৃতি শাস্ত্ররচয়িতা একব্যাক্যে ব্রাহ্মণকে গণিকার দান ও গণিকাগৃহে অন্নগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। পরাশরসংহিতা ও মহানির্বাণতন্ত্রে গণিকার সহিত ব্রাহ্মণের সুরতক্রিয়াকে জঘন্ততম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। অগ্নিপুৰাণেও এর সমর্থন রয়েছে। গৌতমের অভিমতানুসারে গণিকা-হত্যা অপরাধ বলে গণ্য হত না।

জাতককাহিনীগুণির উপদেশাত্মক অংশগুলিতেও গণিকাদের সম্পর্ক বিষয় পরিচয় করতে বলা হয়েছে। কেন না, মার্যাবিনী প্রস্তুতি ও অপ্সরা বৃত্তিই বারাগণনার উপজীবিকা। পুরুষ-চিত্ত বিজয়ের অভিধানে আত্ম তাদের মনোহর মদ্যলসমৃদ্ধ বোঁবনশ্রী, স্তম্ভকঠ, স্পর্শন, পরিবস্ত্র প্রভৃতি ছল-প্রণয়ের লীলাকলা। তাদের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের মত, গরলমিশ্রিত পানীয়ের মত, আত্মপ্রাণ-পরায়ণ পণ্যজীবীর মত, সর্বভূক হতাশনের মত, সর্বগ্রাসী প্রোতস্থিনীর মত, কুরঙ্গের বাকিম শৃংগের মত, চির-বৃত্তিকৃত কৃতান্তের মত, অনবরুদ্ধ-গতি স্বেচ্ছাসঙ্করমান কটিকার মত, দুস্তর কলুষ-তমিস্র নরকের মত এবং চির-অতৃপ্তা নিশাচরীর মত। এদের নিলজ্জ কেলিকপটাত্ম্য পতঃগবুস্ত্র ধনীসন্তান সম্পদহীন ভিক্ষুকে, হৃৎচরিত্র মন্তপে পরিণত হয়। অর্থলোপা কামুকী এই নারীদের চরিত্রে

শুধুমাত্র ছলনা আছে, অসন্তোষ আছে, কৃতজ্ঞতা নেই, মমতাবোধ নেই, নেই প্রকৃত প্রণয়ের মধুরতা।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে গণিকাদের সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী অভিমত ব্যক্ত হলেও, এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া সাধারণ গণিকা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকলেও, আম্রপালী, বসন্তসেনা, রাগমঞ্জরী, চন্দ্রসেনা, কামকন্দলা প্রভৃতি নর্তকীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্নতশ্রেণীর রূপাতিরম্যা, বিদূষী, ঐর্ষ্যশালিনী গণিকাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও জন-সমাদর সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এদের সংখ্যা অল্প হলেও অল্পক্ষেত্রে নয়। এদের কেউ বা স্বৈচ্ছায় দেহ-বিক্রয়-বৃত্তি পরিচাণ করে মনোমত প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, আবার কেউ বা প্রচণ্ড ভোগের পর সাধুসঙ্গের পরম-মুক্তির সন্ধান পেয়েছে।*

* এই প্রবন্ধ রচনার নীচের পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

1. History & Culture of the Indian people Volumes II, III & IV—Majumdar & Pusalkar.
2. Position of Women in Ancient India—Altekar.
3. Sexual Life in Ancient India—J. J. Meyer.
4. Kautilya's Arthashastra—Meyer.
5. Social Life in Ancient India—Chakladar.

প্রভু-শিষ্য-সমাচার

বিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রভু যখন হাই তোলে'ন'

শিষ্যেরা দেয় তুড়ি,

এমনি ক'রেই বছর বছর

প্রভুর বাড়ে ভুড়ি।

প্রভুর হাতে লাটাই যখন

শিষ্যেরা হয় ঘুড়ি,

শুভ্রে উড়ে ছুই পায়ের দেয়

নাক ঘষে' শুভুড়ি।

চালের কাকর যক্ষুণি হয়

বিষ-পাথরের ছুড়ি,

শিষ্যেরা দেয় সোনার বুড়ে

প্রভুকে শুভুড়ি।

অভিধান তৈরী করার মত সহিষ্ণুতার কাজ আর নেই।

পৃথিবীর মধ্যে নানা লোক নানা বিষয়কে পরম সুখ বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ বা অর্থসঞ্চয় করাকে পরম সুখ, কেউ বা বুদ্ধমূল্যে বসে নতুন কাব্য পড়াকে পরম সুখ, কেউ বা প্রথম ছেলের মুখের আধ-আধ বুলি শোনাকে পরম সুখ—আবার কেউ বা সমুদ্র তটে বসে তরঙ্গরাশি দেখাকে পরম সুখ বলেছেন—কিন্তু অভিধান তৈরী করার যে কত সুখ তা বীরা না করেছেন—তারা তা অনুভব করতে পারেন না।

অভিধান তৈরী করার মত পরিশ্রমও বৃষ্টি আর কোন কাজে দেখা যায় না—কেউ বলেন, বীরা অভিধান তৈরী করেন তাঁরা যেন বিস্তার মজুর—তাঁরা মাল-মসলা তৈরী করে দেন—অন্তরে সেই মসলা দিয়ে ঘর গাঁথেন। আবার কেউ বলেন—একটা সুবিশাল সৌধ। প্রবেশদ্বার তার তালাবন্ধ। সেই সৌধের প্রতিটি ঘর অগণিত শব্দ আর ভাবের ভাণ্ডার। কিন্তু প্রবেশদ্বার উন্মোচন করা চাই তো—তা করতে হলে চাই চাবি। এই শব্দ ও ভাবভাণ্ডারের চাবিই হচ্ছে অভিধান।

এক শব্দের অনেক মানে, এক মানের অনেক শব্দ। সেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে মুখস্থ করা দরকার। বেদের যুগে এ রকম শব্দ মুখস্থ করার প্রথা ছিল। এই শব্দগুলিকে সন্নিবেশিত করা হয় যে বই-এ, তাকে কোষগ্রন্থ বলা হয়।

ভাবকে সৃষ্টভাবে আয়ত্তে আনতে গেলে বিজ্ঞানীদের বহু বছর ধরে মুখস্থ করতে হত এই সব কোষগ্রন্থ, সে কোষগ্রন্থ আজকের কালের বর্ণনামূল্যে লেখা নয়। সুললিত ছন্দে শব্দ, শকার্থ ও লিঙ্গ প্রকরণে সজ্জিত। ভেবে দেখুন ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্রাভ্যাসের মাঝে মাঝে আহরণ করতে থাকে শকার্থ-সম্ভার। এমনি করে তার মোটামুটি শব্দ প্রভৃতি সঞ্চয় করতে সেগে যেত গ্রন্থ সাতটি বছর।

কালে সেই সব কোষগ্রন্থ রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রাচীন কালের কোষগ্রন্থ হয়ে পঁড়ায় আধুনিক কালের অভিধান। অভিধানগুলিকে মুখস্থ করার আর প্রয়োজন হয় না, সম্ভবও নয়। বত দিন যায় শব্দসম্ভারও বাড়ে, অভিধানের কলেরবও দীর্ঘ হয়। ধীরে ধীরে প্রাচীনকালের কোষগ্রন্থগুলির প্রচলন রহিত হতে থাকে। অনেকগুলি কোষগ্রন্থের নামও আজ শোনা যায় না অথবা সম্পূর্ণরূপে হুমুশ্য অবস্থায় আছে। তাদের কোন প্রাচীন মঠে বা মন্দিরে, টোলে বা হাটুঘরে অস্থানীয় করলে পাওয়া যেত পায়ে কিছু তা সাধারণের নাগালের বাইরে। আধুনিক ভাবে সজ্জিত অভিধানের কথা বলার আগে আগেকার কালের অভিধান কি রকম ছিল দেখা যাক। এতে দেখা যাবে বাঙলাদেশই আধুনিককালের অভিধান সঙ্কলনের এক কেন্দ্র। এই কেন্দ্রভূমিতে ছোট, বড় অনেকগুলি অভিধান তৈরী হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে বলার আগে প্রাচীনকালের কতকগুলিকে অভিধানের কথা বলা দরকার।

অভিধান কথাটির সাধারণ অর্থ নাম। সুতরাং নামের সংগ্রহ আর তার পরিচয়ই হচ্ছে অভিধান। একই জিনিসের অনেকগুলি নাম আছে আর একই শব্দের অনেকগুলি মানে আছে। ভাবার মধ্যে শব্দের ব্যবহারকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হলে এ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। বৈদিক যুগে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল দেখা যায়। ৩য় অর্থ নয়, লিঙ্গ সম্বন্ধেও প্রাচীন যুগের ভাবানিষ্করণ যতদূর

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

ঐশ্বরীশ্রীমুখার ঘোষ

ছিলেন। সত্যুত্তে প্রত্যেক শব্দেরই কোন না কোন লিঙ্গ হয়—বেদান্তে এটা সুপরিপুষ্ট হয়। তাই পানিনির আগে থেকে ব্যাকরণ বেদান্ত নামে অভিহিত হয়। ব্যাকরণ ভাবাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ব্যাকরণের কাজ আর অভিধানের কাজ এক নয়। সংস্কৃত অভিধানে তিনটি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন পর্ধ্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্ধ্যায় মানে এক জিনিসের অনেক নাম; নানার্থ একই শব্দের নানা মানে আর লিঙ্গ অর্থে কোন কোন শব্দের কোন কোন লিঙ্গ বুঝায়। প্রাচীন কালে এই তিনটি বিষয়ের পরিচয় এক সঙ্গে একই গ্রন্থে পাওয়া যেত না। এক একজন এক একটা বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন পর্ধ্যায়ের (বিভিন্ন নামের) সুপ্রাচীন পৃথিবী নাম নিখট। নিখট বেদেরই অঙ্গ। বেদেরই মত মুখস্থ রাখতে হয় বলে এর নাম আশ্রায় বা সমাশ্রয় (বেদান্তের অভ্যাস)। নানার্থের প্রাচীন পৃথিবীগুলির মধ্যে কালিদাসের নানার্থ-শব্দরত্ন, লিঙ্গের পৃথিবীগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ বরকচিই সুপ্রাচীন বলে মনে হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে যেমন পানিনি, তেমনি অভিধানে অমরসিংহের নাম সন্ধ্যাত ভাবায় সুবিদিত। অমর সিংহই সম্ভবতঃ অভিধানের তিনটি বিষয় বা কাণ্ড একত্রে সঙ্কলন ৯ ও গ্রথিত করেন। আর এই জন্তই তাঁর অভিধান 'ত্রিকাণ্ড' নামে খ্যাত। সাধারণতঃ অমরসিংহের 'অভিধান অমরকোষ' নামে সুবিদিত।

অমরসিংহকে ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলা হয়। প্রবাদ আছে—ইনি মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন। সম্ভবতঃ “ধ্বস্তরিকপণকামরসিংহনুঃ” এই শ্লোক হতে অনুমান করা হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে, ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এবং গয়ার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির, বা উর্ধ্বাবা গ্রামে (বোধগয়া) আছে, তা ইহার দ্বারা নির্মিত বলে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেবের মতে এই বৌদ্ধ মন্দির খৃঃ ৪র্থ হতে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। উক্ত মন্দিরে ক্ষোদিত আছে, ইনি ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

আরও প্রবাদ আছে, ইনি হেম সিংহের শিষ্য। এর ব্যতিক্রম অমরমালা ও অমরকোষ ব্যতীত বৌদ্ধবিষয়ী শব্দার্থার্থ এর সমস্ত বই পুড়িয়ে দেন।

অমরসিংহ তিনটি অংশ নিয়ে নামলিঙ্গাভ্যাসন এবং ত্রিকাণ্ড নামে যে কোষগ্রন্থ দেখেন তাহাই অমরকোষ নামে খ্যাত। বইখানি হচ্ছে গ্রথিত ও মুখস্থ করা সহজ।

বিভিন্ন কোষকার বিভিন্ন প্রাচীন কোষকার্যের নামোচ্চৈর্য করেছেন। এ সকল কোষকারগণের মধ্যে কাত্যায়ন, বাচস্পতি, বিশ্বকপ, মঙ্গল ভোগিন্দ্র, সাহসার, শুভাক, বরকচি, রত্নদেব, বিক্রমাদিত্য, ক্রত, মাধব, পোবর্ধন, ব্যাডি, ভাগুরি, গঙ্গাধর, তারপাল, রতন পাল, বাউট, ধর্ম, বামন প্রভৃতির নামই বেশী পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অমরকোষই অবিক প্রচলিত ও লোকপ্রিয় হওয়ার ভারতের সর্বত্রই এর আদর দেখতে পাওয়া যায়।

অমরকোষ তিন কাণ্ডে ও আটটা বর্গে বিভক্ত। কেহ কেহ এই কোষকে ত্রিকাণ্ড বা নামলিঙ্গাঙ্কন বলে। অমরকোষের বর্গগুলি এই—

১। স্বর্গবর্গ, ২। পাতালবর্গ, ৩। ভূমিবর্গ, ৪। পূর্ববর্গ, ৫। শৈলবর্গ, ৬। বনৌষধিবর্গ, ৭। সিংহাদিবর্গ, ৮। মহাবর্গ, ৯। স্ত্রীলবর্গ, ১০। ক্ষত্রিয়বর্গ, ১১। বৈষ্ণববর্গ, ১২। শূদ্রবর্গ, ১৩। প্রাণিবর্গ, ১৪। বিশেষ্যবর্গ বা নিয়বর্গ, ১৫। সংকীর্ণবর্গ, ১৬। নানার্ধবর্গ, ১৭। অব্যয়বর্গ, ১৮। লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গ।

কেউ কেউ বলেন, অভিধানের আদি অগ্নিপুরণ 'সর্ববাং কোবানামাদি অগ্নিপুরণোক্তাভিধানঃ' কিন্তু এটি ঠিক নছে। কারণ অগ্নিপুরণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হতে ৯ম শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলাদেশে অথবা বিহারের কোন স্থানে এই পুরণ লিখিত হয়। অভিধান সংকলনে অমরকোষ থেকে বহু বিষয় অগ্নিপুরণ গ্রহণ করেছেন। এটাকে অমরকোষের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে। বিশেষতঃ উভাদের মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের সমতা দেখা যায় আর অব্যয় বিভাগ-রীতিও একরূপ। অমরকোষের বর্গগুলির সঙ্গে মেলালে দেখা যায়, অগ্নিপুরণে অনেকগুলি বর্গ এক। যথা—

১। স্বর্গবর্গ। ২। পাতালবর্গ। ৩। অব্যয়বর্গ। ৪। ভূমিবর্গ। ৫। বনৌষধিবর্গ। ৬। মহাবর্গ। ৭। স্ত্রীলবর্গ। ৮। ক্ষত্রবর্গ। ৯। বৈষ্ণববর্গ। ১০। শূদ্রবর্গ। ১১। সামান্তনামলিঙ্গাদিবর্গ। ইত্যাদি—

অমরকোষের প্রায় ৪০খানি টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায়। কীর্ত্তীস্বামী (৮ম শতাব্দী) টীকা, ভাষ্করীকৃত কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ, অচ্যুত উপাধ্যায়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ভরতমন্ডের যুক্তবোধিনী প্রভৃতি।

এই টীকাকারদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী টীকাকার আছেন। তাঁর নাম সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১২ শতাব্দীর লোক। তাঁর পিতার নাম—আতিথর। গ্রন্থের নাম টীকাসর্ব্ব। ১১৫১ খৃঃ রচিত হয়। তিনি অষ্ট দশখানি টীকা আলোচনা করে এই টীকা রচনা করেন। তাঁর টীকার ৩০০ সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আদেশে এই টীকাখানি মুদ্রিত হয়। এই বইখানি বাঙলাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে মালাব্বারের কোন অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। বইখানি সবেমাত্র রায় বাহাদুর বোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানিধি ও বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বকল্লভ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যার যথাক্রমে 'সাতের সাত শত বছর পূর্বের বাংলা শব্দ' ও 'বাংল শতকের বাংলা শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১৪৩১ খৃষ্টাব্দে যুগ্মপতি মহিষা (মতিলাল) 'পদার্থচক্রিকা' নামে অমরকোষের একখানি টীকা লেখেন, এই টীকার তিনি মেদিনীকোষ থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রন্থকার নিজেরই বলেছেন—তিনি প্রাচীন ১৬টি কোষগ্রন্থ যেমন, কীর্ত্তীস্বামী, হুভূতি, কলিঙ্গ, কঙ্কট, সর্বধর, ব্যাখ্যামৃত টীকাসর্ব্ব থেকে বহু তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে। ইনি রাজা গণেশ (১৪০৫) ও তাঁর মুসলমান পুত্রগণের সভাসদ ছিলেন। এই টীকা লিখে গোড়ের মুসলমান সুলতানের কাছ থেকে তিনি 'রায়মুকুট' উপাধি পান। সেই হতে তিনি রায়মুকুটনামি নামেও পরিচিতি 'পদার্থচক্রিকা' বা 'অমরচক্রিকা' তাঁর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ,

মাতা নীলমুখারী দেবী এবং স্ত্রী রমা দেবী। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। মহাশয় হরপ্রশাদ শাস্ত্রী সাপ পত্রিকায় (১৩৩৮) সন্ধে আলোচনা করেছেন।

অমরকোষের পরিশিষ্টিকারদের মধ্যে পুরুষোত্তমদেবের (১২-১৩শ খৃঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুষোত্তম একজন বড় শাব্দিক ছিলেন। তিনি অমরকোষের পরিশিষ্ট 'ত্রিকাণ্ডশেষ' প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি একাক্ষরকোষ, দ্বিাক্ষরকোষ, হারাবলী নামে তিনখানা অভিধান সংকলন করেন। 'হারাবলী' একখানি ছোট অভিধান। আমাদের পকেট অভিধানের মত। এখানি লেখবার জন্তে তিনি প্রায় ২ বছর খাটেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের বাড়ীতে যাতায়াত করেন নতুন নতুন শব্দ সংগ্রহের জন্ত। যে শব্দ চলিত ছিল অথচ উঠে যাচ্ছে, সেই শব্দের অর্থ দেওয়া এই অভিধানের উদ্দেশ্য। ত্রিকাণ্ডশেষে কোন কোন স্থানে যেখানে অমরকোষ এক পর্ধ্যায় ১৭টি শব্দ আছে, পুরুষোত্তম সেখানে ৩৭টি শব্দ দিয়েছেন। এরকম ভাবে তিনি অমরসিংহের পরবর্তী অনেক চলিত শব্দ তাতে সংযোগ করেছিলেন।

নানা কারণে পুরুষোত্তমের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পানিনির বৈদিকসূত্র ছেড়ে দিয়ে ভাষাসূত্রগুলির বৌদ্ধমতে এক বৃত্তি লিখে যান। তার নাম 'ভাষাবৃত্তি'। বানান সংক্ষেপেও সেই প্রাচীন যুগেও তাঁর মন অস্তব্ধ হয়েছিল। সাধারণতঃ ব-কার (অস্তঃ ও বর্গীয়), য-কার (অস্তঃ ও বর্গীয়), স-কার (শ, য, স), ন-কার (ন, ণ) প্রভৃতি ভেদ করা শব্দশাস্ত্রে এক দুঃস্থ ব্যাপার। ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ ভেদে এইরূপ বানান বিভ্রাট সে যুগেও আরম্ভ হয়েছিল। অনেকে উচ্চারণ ধরে বানান করত আবার অনেকে বৈদ্য-পুরাণাদির বানান ধরে চলত। আবার লিখন পদ্ধতির সোহেও র ও ক, খ, ক্ষ ও য প্রভৃতি অক্ষরকে একরূপ দেখাত। পুরুষোত্তম এর সমাধান করেন 'বর্ণমোজনা' নামে এক বই লিখে। পরবর্তীকালে অমরকোষের টীকা আরও অনেকে লেখেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালীদের নাম পরে উল্লিখিত হবে।

অমরকোষের পরে বহু উল্লেখযোগ্য অভিধান রচিত হয়—যা মধ্যে কতগুলির উল্লেখ করা হল—শব্দচক্রিকা (১০-১১শ খৃষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থ চক্রপাণি দত্ত রচনা করেন। ইহার পিতা নারায়ণ কবিবারী পালবংশীয় রাজা নরপাল দেবের পাকশালার মন্ত্রী ছিলেন; নানার্দ্রসংগ্রহ (অজয় পাল কৃত—১১৪০ খৃঃ ইহার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে); বিশ্বপ্রকাশ (মহেশ্বর বৈষ্ণব, বঙ্গদেশ, ১১১১ খৃঃ); অভিধানচিহ্নামণি (হেমচন্দ্র সুরি)। ইনি ১১-১২শ খৃষ্টাব্দের লোক। অর্ধাষ্টম (আমোদসার) প্রদেশের ধলুক গ্রামে চাচিকের গুরসে ও পাহিনীর গর্তে ১০৮৮ খৃঃ জন্ম। শৈশবে হেমচন্দ্র 'চন্দেব' নামে অভিহিত হতেন। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। জৈনচার্য দেবচন্দ্র সুরি ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে চন্দেবকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। ২১ বছর বয়সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর জৈনচার্য তাঁকে 'হেমচন্দ্র' অর্থাৎ সোনার চাঁদ বলে সুরি উপাধি দেন। সেই সময় হতে চন্দেব হেমচন্দ্র সুরি নামে প্রসিদ্ধ। জৈনধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা ছিল। তিনি সিদ্ধরাজ ও পরে কুমারপাল রাজার সভাপণ্ডিত হন। ১১৭৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়; কবিকঙ্কর (বোপদেব মিত্র

৩শ শতাব্দীতে দৌলতাবাদে আবির্ভূত হন। পিতা—কেশব। নি ধনেশ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন। বাবররাজ মহাদেবের ভাগিন। ইহার ‘মুক্তাবাণ’ ও ‘কবিকল্পদ্রুম’ বাঙলাদেশে বিশেষ মনুত। অভিধানবন্ধমালা (হলায়ুধ ভট্ট। ১০-১১শ খৃঃ। ইনি জা লক্ষণসেনের সভাসদ হলায়ুধ হতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ভূরিপ্রয়োগ পদ্মনাভ দত্ত বিজ্ঞ। হলায়ুধ বাংশধর ত্রিপুরার প্রপৌত্র, দামোদর ভৈরব পুত্র। মিথিলায় ইনি ১৩-১৪শ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। কবী (সারসংগ্রহনামাকানেকাধিসমুদ্র, ধরনীদাস ব্রাহ্মণ কৃত); কামালা (রামেশ্বর শর্মা); বর্ণাভিধান (নন্দ ভট্টাচার্য); ভাবপ্রকাশ (জমিন্দ্র); শব্দরত্নাবলী (মথুরেশ পণ্ডিত); রাজবল্লভ (নারায়ণ দাস কবিরাজ); নামমালা (ধনঞ্জয় কবি), নানার্বর্থমালা (দণ্ডারিনাথ); পর্বাণনানার্বকোষ (জটাতারচাৰ্য)। নানার্বর্থনি-জ্ঞী (গদসিংহ), নিষট্ অর্থ্য রাজনিষট্ (নরসিংহ কান্দীর পিত্ত); উদাসিকোষ (রাম শর্মা); আয়ুর্বেদার্থবোধিত পর্বাণ কামালা (রত্নমালাকর বৈজ্ঞ) ইত্যাদি। উপরি-উক্ত কোষ-ছত্রের অধিকাংশই প্রচলন নাই বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙালী কোষকারের মধ্যে সর্বাঙ্গ বঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আগে উল্লেখ করেছি। বাঙালী কোষকার মহেশ্বর বৈজ্ঞ ১১১১ খৃঃ ষষ্ঠপ্রকাশ রচনা করেন। এর পর মেদিনীকোষ। এই কোষটি চিত হয় ১২০০-১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থের রচয়িতা মেদিনীকর। ইনি ষোল্ল শতকের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। মহামাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিখরভূমির রাজা গমচন্দ্রকৃত পুঁথিখানি হতে আবিষ্কার করেন যে প্রাণকর নামক পদক রাজা কর্ণগড় প্রদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র মেদিনীকর চাঁক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মেদিনীকরই মেদিনী-কোষের রচয়িতা। মেদিনীকোষই ইনি নিজ পিতার নাম উল্লেখ করেন। (১৮৬১ খৃঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মেদিনীকোষ সম্পাদনা করেন। মেদিনীকোষ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে)। কুবোত্তমদেব, যার সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি প্রদেশীয় কোন রাজা বা মহারাজা ছিলেন—সম্ভবতঃ ১২শ-১৩শ শতাব্দী। ইনিও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। বাঙালী এর পরে আরও অনেক অমরকোষের টাকা রচনা করেন। যেমন অমরকোষ টকা—নয়নানন্দ শর্মা ও তৎস্বাত্র রামচন্দ্র শর্মা। পদার্থকোষদ্বী—গায়ত্রীচন্দ্রবর্তী, ত্রিকাণ্ডবৈক্য—রামনাথ বিজ্ঞাবাচস্পতি, অমরকোষ টকা—রামনাথ চক্রবর্তী, ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি—রঘুনাথ চক্রবর্তী, মণিকোষ টকা—রামকৃষ্ণ, মালাখ্যা—পরমানন্দ শর্মা ইত্যাদি। গুলি সবই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

পুস্তকোত্তমদেবের অভিধান প্রায় ৮০০ বছর আগেকার লেখা। এর পর এদেশের ইতিহাসে অনেক ওলোট-পালোট হয়েছে। এখন

আর কেউই অভিধান মুদ্রণ করে না; অকারাদি বর্ণকমে শব্দমালা সাক্ষিয়ে অভিধান সংকলন করা হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের আগে শব্দগুলিকে বর্ণমালা অনুসারে সাজাবার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। ইংরেজরাই এই প্রথাটির প্রবর্তক বলে আমাদের মনে হয়। কারণ ১৮০৭ খৃঃ কোলব্রুক সাহেব (H. T. Colebrooke, ১৭৬৫-১৮৩৭) ‘অমরকোষ’কে সুসজ্জিত করে সম্পাদন করেন। তাতে তিনি পরিশিষ্টে বর্ণমালা অনুসারে অমরকোষের শব্দগুলি সাক্ষিয়ে দেন। ইংরেজ যুগের আদিপর্বে কোলব্রুক সাহেবের অভিধান সম্পাদনের প্রীতি জন্মাল কেন? তিনি ১৮২২-৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ত্রিহৃত পুঁথিয়ার এসিস্ট্যান্ট কালেক্টর হয়ে আসেন। তরুণ বালক বলেই হয়, ১৭ বছর বয়স তখনও হয়নি—তিনি আকৃষ্ট হলেন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি।

সংস্কৃত শাস্ত্র ভালভালেই শিখলেন, হিন্দুর আইন সম্বন্ধে, হিন্দু বিধবাদের কর্তব্য সম্বন্ধে, জাতি, শ্রেণী সম্বন্ধে বই লিখলেন। এর পর তিনি সদর আদালতের জজ হন। পরে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের আইন ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। এসিস্ট্যান্ট সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপতি হন (১৮০৭-১৮১৪)। এই সময় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন—তার সঙ্গে সম্পাদনা করেন অমরকোষ। তার (৩য় সংস্করণ) এইরূপ লেখা আছে—Kosha, or Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha, with an English Interpretation and Annotations, by H. T. Colebrooke, Esq., Calcutta, Dec. 1883 কোলব্রুক একাধারে হলে পাঁড়ালেন—গণিতজ্ঞ, জ্যোতিষি, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি গ্রন্থ আর প্রবন্ধ রচনা করলেন—বেদ সম্বন্ধে, সংস্কৃত অভিধান, ব্যাকরণ, জৈন ধর্ম, আইন, হিন্দুধর্ম, ভারতীয় বীজগণিত, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি। তাই অধ্যাপক পোন্ডটুকর একে Prince of Orientalists (প্রাচ্যবিজ্ঞাবিশেষ অধিরাজ) বলেছেন।

অমরকোষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা অভিধানিকদের কাছে তিনি হয়ে রইলেন অমর।

প্রায় এই সময় থেকেই বাংলা ভাষায় অভিধানের আবির্ভাব হয়। ইংরেজদের অনুকরণে বাংলা অভিধানের অকারাদিক্রমে সাজানর রীতি এই সময় থেকেই দেখা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কয়েকটি বাংলা ইংরেজি অভিধান তৈরী হয়। সেগুলি বেশীর ভাগ ইংরেজদের লেখা। পর্তুগীজেরাও তাদের সুবিধার জন্য অভিধান তৈরী করেছিলেন। তখনকার বাংলা অভিধান মানেই মূলগত সংস্কৃত অভিধান—কারণ শব্দগুলির মধ্যে ১০ ভাগ-সংস্কৃত শব্দ ও ৬ ভাগ বাংলা অথবা অল্প শব্দ থাকত। [ক্রমশঃ।

আসিছে সেদিন, আসিছে সেদিন,

চারি মহাদেশ মিলিবে হবে,

যেই দিন মহামানব ধর্ম

মহুর ধর্মে বিলীন হবে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।



আলোচনা নিম্নলিখিত কবিতার আলোচনা

চরুণ চট্টোপাধ্যায়

সেই ইউরোপের কথা বলছি না, নেপোলিয়ন বিদ্রোহ, মেটর্নিক বা হিটলার 'ইউরোপ' শব্দটি বলতে বা বুঝতে।

কিনমার্কেব মতে বাগের নিজেদের নামে যে জিনিসের দাবি করা সম্ভব মত তাদেরই সব সময় ইউরোপের দোহাই দিয়ে সেই জিনিস দাবি করতে দেখা গিয়েছে। জাৰ্মাণ ভূমি দখল করে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, তিনি শুধু ইউরোপের সীমান্ত সম্প্রসারিত করছেন মাত্র। রুশিয়া আক্রমণ করার সময়ও তিনি ইউরোপ রক্ষা করার দায়িত্বের কথা বলে রুশিয়ার গ্রামকে গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। ইউরোপের নামেই তিনি ইউরোপের অগ্রাঙ্ক দেশ আক্রমণ করেন। নেপোলিয়নের কাছে ক্রাভাই ছিল ইউরোপ। মেটর্নিকের ইউরোপও ছিল জার, কাইজার ও হাপসবুর্গ বংশের ইউরোপীয় রাজত্ব। নেপোলিয়নের অকম উত্তরসারক হিটলার-হিমলার-গোয়েবলস-রোজেনবের্গ কোম্পানীও ইউরোপের দেশের পর দেশ দখল করে লক্ষ লক্ষ লোককে বশীলালার জীবন্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলেন সেই ইউরোপেরই দোহাই দিয়ে। তাঁদের চেলারা আজ সেই ইউরোপীয় ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্যে ইউরোপের স্বার্থের নামে ইউরোপের অংশ-বিশেষের দেশগুলিকে একত্রোটি করে, "একাত্তর ইউরোপ" মার্কি মেরে সেই ইউরোপেরই অস্ত্র অংশটির বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ দেখি' বলে হুংকার ছাড়ছেন। সেই ইউরোপের অস্ত্রের বজায় রাখবার ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লড়াই এবং সেই ঠাণ্ডা লড়াইয়েরই সম্ভাবন পশ্চিম-জার্মানীর আদেনাউয়ের সরকার। ঠাণ্ডা লড়াইয়েরই উদ্ভূত জমি যদি সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাহলে আদেনাউয়ের সরকারের দেখে জমি থেকে রস পৌছানো খেমে বাবে। ঠাণ্ডা লড়াইকে গরম লড়াই-এ নিয়ে যাবার অগ্রবর্তী বাটী হিসেবে পশ্চিম-জার্মানীতে এবং অগ্রবর্তী বাটীর সবচেয়ে সামনের ডগা পশ্চিম-বার্লিনে জলীবাদের গারে বাতৈ আঁচড় না লাগে এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ বাতে নিবিবাদের চলতে পারে তার জন্তেই না হচ্ছে অস্ত্রহাস বা পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তি, না হচ্ছে যুদ্ধ শেষ হবার ১৪ বছর পরে জার্মানীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি। পশ্চিমী গোষ্ঠী পশ্চিম-জার্মানীর সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারে একেবারে পেরারের বন্ধুর মত মেলোমেশা করছেন কিন্তু এত গলায় গলায় ভাব হলেও তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে তাঁরা রাজী নন। বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু শত্রুতা শেষ হয়নি।

দশ বছরের ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে পাড়িয়েছে কী?

প্রথমতঃ, ইউরোপের দেশে দেশে মারণাত্মক গালা হুসেছে পৰ্বত প্রমাণ এবং সেগুলোর মারণশক্তি প্রচণ্ড ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। কথার বলে আজ হোক আর কাল হোক, কামানোরা নিজেরাই পোলা উপরোতে আরম্ভ করে। এমন কি, কোথাও কোন যান্ত্রিক গলদ বা ভুল কিবা কোন উদ্বাদ বৈদ্যনিকের খেয়াল যেন যদি একটা অ্যাটম বোমা বা রকেট গিয়ে পড়ে তাই থেকেই পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কিন অ্যাটম বোমা ও রকেট অস্ত্রের বাটী বানানোর ফলে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন বীমাংসা করার দায়িত্ব সেই দেশগুলির হাত থেকে আজ আমেরিকার হাতে

চলে গিয়েছে। সুতরাং যে কোন সময়ে নিজেরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়তে পারে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম-জার্মানীতে রাখা হয়েছে বলে পূর্ব-জার্মানীতে সোভিয়েত দেশ তার সৈন্য রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই ভাবে জার্মান ভূমিতে বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি জার্মানী ও ইউরোপে উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছে।

চতুর্থতঃ পশ্চিম-জার্মানীর সেই সব জলীবাদী ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে যারা বর্তমান শতকের মধ্যে হুটি মহাযুদ্ধ বাধিয়েছে। সেই সঙ্গে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে এই বলে ভীতুতা দেওয়া হচ্ছে যে, এসব ব্যবস্থা শুধু কমিউনিষ্ট দেশগুলির দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে তাদের "সীমাবদ্ধ" যুদ্ধের বিরুদ্ধে। প্রথম কথা, প্রথম লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি হলেও সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধের রূপ নিতে বাধ্য। আজকের দিনে সীমাবদ্ধ যুদ্ধ বলে কিছু নেই। ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইউরোপের হুটি মহাযুদ্ধই বেধেছিল হুটি মুদ্রা ঘটনাকে উপলব্ধ করে (সারিয়ার সঙ্গে অস্ট্রোহাঙ্গারীর সংঘর্ষ এবং জার্মানীর পোলাও আক্রমণ)। তবে হ্যাঁ, যে আমেরিকান কূটনৈতিক পাণ্ডুরা তাঁদের রণ পরিকল্পনার প্রথম ব্যূহের তরোয়ার হিসাবে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীকে এবং চার হিসাবে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে দেখেন তাঁদের কাছে ইউরোপের যুদ্ধ 'স্থানীয়' বা 'সীমাবদ্ধ' মনে হতে পারে। কিন্তু সে যুদ্ধের আগুন যে ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র নিষিদ্ধে ইউরোপের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং মার্কিন আক্রমণের অগ্রবর্তী বাটী হিসেবে আক্রান্ত পক্ষের অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং রকেট যে সেই দেশগুলির মাথার আগে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

এই বিপদ আজ এমন কি জর্জ কেনানের মত যখন সোভিয়েত বিরোধী মার্কিন কূটনৈতিক ও উপলব্ধি করতে পারছেন। তিনি শান্তিরক্ষার যে পরিকল্পনা দেন, তাতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র আফালনের ভিত্তিতে কূটনীতি পরিচালনা বন্ধ করা দরকার; কারণ আজকের যুগের অস্ত্রশস্ত্রের মারণশক্তি এত প্রচণ্ড যে সশস্ত্র শাসনিকে রক্তের টেকা হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য বাধ্যলতা। মিঃ কেনান (যিনি মহোদয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করার সময় গুপ্তচরবৃত্তির অভিব্যোগে সোভিয়েত সরকার তাঁকে 'অবাস্তবিক ব্যক্তি' বোঝান করেন) বলছেন যে, যুদ্ধ শত্রুর পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপ থেকে তাঁদের সৈন্য সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুই রকম সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলবে এবং তাতে শান্তির কোন বিঘ্ন হবে না এবং জাতিগুলিও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবার বিপদ থেকে রেহাই পাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ বহু দিন ধাবৎ ঠিক এই প্রস্তাবই করে আসছে, অস্ত্রহাসের বৈরিত্ব এবং জেনেভার পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনেও এই প্রস্তাবই করেছে। কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।

ব্রিটিশ নেবার পাটির নেতা হিউ গেইট ফেলের প্রস্তাবও গঠনমূলক। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানী, পোলাও, চেকোস্লোভাকিয়া

হাল্কারি থেকে চুক্তি করে ক্রমে ক্রমে বিদেশী সৈন্য সমিবে মিতে যা 'এ' সব দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করতে বলেছেন যা পশ্চিম ও পূর্ব-জার্মানীর নাটো ও ওয়াশ' চুক্তি থেকে বার হয়ে এসে একতাবদ্ধ হবার প্রস্তাব করেছে।

পশ্চিম-জার্মান প্যারামেটের সমস্ত হেব ফ্রেইডার (শান্তি পরিকল্পনা দেবার অপরাধে যাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়) যে পরিকল্পনা দেন তাতেও জার্মানী থেকে বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, চতুর্ভুজি সত্ত্বে পশ্চিম-জার্মানীর নাটো চুক্তি ভ্যাগ এবং পশ্চিম-জার্মান বাহিনীকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত না করা ও বিদেশী সৈন্য মণসারণের প্রস্তাব ছিল।

ভারত নিযুক্ত ভূতপূর্ব মার্কিন দূত মি: চেষ্টার বোলসও এই ধরনের পরিকল্পনা দিয়েছেন।

পশ্চিম-জার্মানীর সুপরিচিত ভাব্যকার পল সেথে, কেনান, বোলস, গেইট ফেল ও ফ্রেইডারের যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনার প্রশংসা করে দেখিয়েছেন যে কুণীতির ইতিহাসে বরাবরই দেখা গিয়েছে কোন জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যাই মীমাংসা একসঙ্গে বা রাতারাতি হয় না। শান্তিসূর্য আপোষ আলোচনার দ্বারা ধাপে ধাপে আংশিক ভাবে মীমাংসা হতে হতে শেষ পর্যন্ত চরম মীমাংসায় পৌঁছানো যায়।

আন্তে আন্তে সৈন্য সরানো, আংশিক ভাবে অস্ত্র হ্রাস করা, প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করা, নাটো ও ওয়াশ' চুক্তিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি করা, সর্বপ্রথমে পশ্চিম-জার্মানীতে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা এবং নির্দিষ্ট এলাকাকে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া, এই সব সোভিয়েত প্রস্তাব সারা দুনিয়ার শান্তিরক্ষার কর্তব্যের প্রথম ধাপ মাত্র। কিন্তু পশ্চিমীরা সেই প্রথম ধাপটুকু কিছুতেই এগোতে রাজী নয়, কারণ প্রথম পা বাড়ালে দ্বিতীয় পা-ও বাড়তে হবে। জার্মান জঙ্গীবাদ এবং পারমাণবিক অস্ত্র এই দুটাই আজ মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ! জার্মান জঙ্গীবাদের অগ্রবর্তী ষাঁট বা ব্রেস্তানা-ট্রেন-ভ্যাণ্ডের ভাব্যর Front Line City পশ্চিম-বাহিনীর বিধ দাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার (নিরস্ত্রীকৃত মুক্ত নগরী ঘোষণা করা) কর্তব্যটি তাই আজ প্রথম পালনীয়। পারমাণবিক অস্ত্রের সমস্তা মীমাংসা করার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই সব অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করা এবং অত্যন্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করা, এই দুটি ব্যাপার নিয়েই জেনেতার দুটি আলোচনা সম্মেলন বসে।

প্রথমে ধরা যাক পারমাণবিক অস্ত্রের প্রশ্ন। সমস্তাটির মীমাংসা যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যিই চায়, তাই প্রমাণ দেবার জগ্রে সে একাই পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করে সারা দুনিয়ার সামনে এক দৃষ্টান্ত রাখে। কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত অমুসরণ করা দুই বাক, আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে তার পরে আরো বেশী করে পরীক্ষা চালাতে আরম্ভ করে এবং বুটেনও বাদ যায়নি। সেই সঙ্গে চলতে থাকে সোভিয়েত সীমান্তের চার দিকে আমেরিকার যে সব বিদেশী ষাঁট আছে সেগুলিতে অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমাবাহী বিমানের মহড়া এবং পশ্চিম জার্মানীর পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা। এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে একা অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ রাখা আর সম্ভব ছিল না; কারণ তা রাখলে পশ্চিমীরা এই সব অস্ত্রপরীক্ষার সোভিয়েতের চেয়ে এগিয়ে যাবে এবং এগিয়ে গেলেই সোভিয়েতকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে।

বার ফলে কেথ বাবে মহাহুদ। সুতরাং সোভিয়েতের একা পরীক্ষা বন্ধ রাখা শুধু যে তার পক্ষে বিপজ্জনক তা নয়, সারা দুনিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক। 'বিশ্বশান্তি একপক্ষীয় চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না। কারণ 'শান্তি অবিভাজ্য' রাজ্যী বখন মি: ক্রুচফকে একাই অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার উপদেশ দেন তখন মি: ক্রুচফ ঠিক এই কথাটিই তাঁকে জানিয়েছিলেন।

পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার অজুহাত পশ্চিমীরা দেবার চেষ্টা করেন নানা ছলে। প্রথমে তারা বলেন, সোভিয়েতের একা বন্ধ করাটা প্রচারের খেলার একটা চাল মাত্র। জবাবে বলা যায়, বেশ তো তাই যদি হয় তো সেই প্রচারের ব্যাপারে সোভিয়েতের সঙ্গে তাঁদের পাল্লা দিতে আপত্তি কেন? তারা নিজেরদের 'মুক্ত পণতন্ত্র' কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন, সোভিয়েতের 'অমানুষিক' শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত প্রচার করেন কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করে নিজেরদের মানব হিতৈষণা প্রচার করতে তাঁদের বাধা কেন? এই প্রচারকার্য করলে পৃথিবীর মানুষ তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে অস্ত্রত কিছুদিনের মত রেহাই পেতে পারত। তাতে বখন তাঁরা রাজী নন, তখন মনে হয় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারই তাঁদের সাময়িক পরিকল্পনার মেরুদণ্ড।

আর একটি অজুহাত দেওয়া হোল যে, একপক্ষীয় কাজের কোন অর্থ হয় না। কারণ সেটা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা করা হয়নি তাছাড়া সত্যিই পরীক্ষা বন্ধ হোল কি না তা বাচাই করবার কোন উপায় নেই। এই অস্থিলা যোগে টেকে না, কারণ আমেরিকা বুটেন যদি নিজেরা একপক্ষীয় ভাবে পরীক্ষা বন্ধ করত, তাহলে ডিক পাক মিলে চুক্তি করার পথে কোন বাধাই হোত না। আর পরীক্ষা বন্ধ পড়ার প্রক্ষেপে এইটুকু বলাসেই যথেষ্ট যে, যে কোন পরীক্ষা আজকাল যথেষ্ট ধরা পড়ে। পরীক্ষা বন্ধ আছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে জগ্রে ১৯৫৭ সালের জুন মাসেই তো কনফ্রোল কমিশন গঠন করে সোভিয়েত, আমেরিকা, বুটেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরে কতকগুলি চৌকিদার-কাড়ি তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব সেদিন যারা গ্রাহ্য করেন নি আজ ঠিক তাঁরাই বলছেন যে একা পরীক্ষা বন্ধ করা কনফ্রোল এড়িয়ে যাবার একটা কৌশল মাত্র।

এই মিথ্যাও জাহির করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত আমেরিকার চেয়ে বেশি বার পরীক্ষা চালিয়েছে বলে সাময়িক ভাবে পরীক্ষা বন্ধ রাখলে তার কোন অসুবিধা নেই। আর জানা গেল যে, আমেরিকা ও বুটেনের পরীক্ষাগুলি এক সঙ্গে যোগ করলে যে সংখ্যা পাঁড়ার সোভিয়েতের পরীক্ষার সংখ্যা ছিল তার চেয়ে বেশ কিছু কম। অর্থাৎ পরীক্ষার সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমের চেয়ে পশ্চিমের থেকেও সে নিজের সমিচ্ছার পরিচয় দেবার জগ্রে একাই পরীক্ষা বন্ধ করেছিল।

শেষ পর্যন্ত জেনেতার পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার বৈঠক আরম্ভ হবার পর প্রায় ৬ মাস কেটে গেল। ৬-৭-১০ বার প্রতিনিমিত্ত এক টেবিলে বসে আলোচনা করলেন। কিন্তু কোন চুক্তিই আজ পর্যন্ত হোল না। সোভিয়েত পক্ষ প্রথমেই যে খসড়া চুক্তি দাখিল করে, তাতে পরীক্ষা বন্ধ করা এবং সর্ববাদিসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক চৌকিদার-কাড়ির সাহায্যে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলিতে কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ভিন সগুহ ধরে পশ্চিমীরা এই বলে টানবাহানা করতে লাগলেন যে, অস্ত্রপরীক্ষা

বন্ধ করা বৈঠকের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে কন্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা। ব্যাপারটা ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মত। কারণ, পরীক্ষাই যদি বন্ধ করা না হয় তো কন্ট্রোল করা হবে কী? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যখন তাঁদের বাধা হয়ে মেনে নিতে হোল যে বৈঠক বসেছে আসলে অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার জগ্রে, তখন তাঁরা অজুহাত দিলেন যে সোভিয়েত প্রস্তাবে কার্যকরী কন্ট্রোল ব্যবস্থার ভাল গ্যারান্টি নেই। সুতরাং কন্ট্রোল ব্যবস্থার সর্বগুলি ঠিক করে সেগুলি অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধের চুক্তির মধ্যেই লিখতে হবে, না হয় আলোচনা একটা ফ্রোডপত্র হিসাবে জুড়ে দিতে হবে। সোভিয়েত যখন ফ্রোডপত্রের প্রস্তাব মেনে নিল তখন পশ্চিমীরা নিজেরের কথা উড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে ফ্রোডপত্র নয়, চুক্তির মধ্যেই কন্ট্রোল ব্যবস্থাকে স্থান দিতে হবে। সোভিয়েত যখন তা-ও মেনে নিল তখন মার্কিন সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত নতুন এক মুক্তি বার হোল। তাঁরা বললেন, মাটির নিচে পারমাণবিক বিক্ষোভ সহজে ধরার উপায় নেই, বিশেষ করে সেগুলি যদি ছোট ধরনের হয়। সুতরাং মাটির নিচে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত ক্ষমতার বিক্ষোভ চুক্তির আওতায় পড়। উচিত নয় অর্থাৎ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে মাপের বোমা পড়ছিল সেই মাপ পর্যন্ত পরীক্ষা করা চলেবে নির্বিবাদে।

এই সঙ্গে মিঃ আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন যে, অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার আগে বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে বসে ঠিক করুন কন্ট্রোল ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত। অর্থাৎ অস্ত্রপরীক্ষা চলাতে থাকুক, সেই সঙ্গে চলতে থাকুক কন্ট্রোল ব্যবস্থার কচকচানি। কন্ট্রোল নিয়ে মাতামাতির আসল উদ্দেশ্য বৃষ্ণও সোভিয়েত মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষজ্ঞ বৈঠকের প্রস্তাব মেনে নিল। সোভিয়েতের এই মনোভাবের প্রকাশ্য করে নিউইয়র্ক টাইমস-এর ওয়াশিংটন সংবাদদাতা কেনওয়ার্থ লিখলেন যে, এবার আমেরিকা ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলির জাঘাতই অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার আলোচনায় থালা উচিত।

সোভিয়েত যখন বিশেষজ্ঞ বৈঠকের প্রস্তাব মেনে নিল তখন পশ্চিমীরা আর একটি সর্ব অর্থাৎ বাধা খাড়া করলেন। তাঁরা বললেন যে, সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার কোন পারমাণবিক খনিজ পদার্থ উৎপাদন না করার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার কথা উঠতে পারে।

সোজা কথায় পশ্চিমীরা প্রকট এমন আর একটি সমস্যা সঙ্গে পেরে বেঁধে দিলেন, যেটা সহজে মেটাবার নয়। কারো কিছু নতুন নয়। জেনেভার পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনেও একগালা সমস্যা বাণ্ডিল তাঁরা হাঁজির করেছিলেন, যাতে কোনটাই নীমাংসা করা না যায়। সেই সঙ্গে কন্ট্রোলের প্রশ্ন নিয়ে হেঁচটে চলতে লাগল। মাটির নিচে ছোট ধরনের বিক্ষোভ ধরা না পড়ার অজুহাত নিয়ে মার্কিন ধরনের কাগজগুলো বলতে লাগলো, এই সব বিক্ষোভ ধরা না গেলে পরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তির কোন পথ হয় না। প্রথম কথা, মার্কিন পরমাণু বৈজ্ঞানিক ডাঃ হাল্ড বেথে বলছেন যে, ১৮০টি কন্ট্রোল-কীড়ি নিয়ে যে কন্ট্রোল ব্যবস্থা খাড়া করবার কথা বলা হয়েছে, তাতে ভূগর্ভের অস্ত্রপরীক্ষাও ধরা পড়বে। দ্বিতীয়ত, ধরা যদি না-ও পড়ে তাহলে মাটির নিচে পরীক্ষা চালাবার সুযোগ তো আমেরিকাও পাবে। তবে চুক্তি না করার কারণ কী? কারণটা মার্কিন পারমাণবিক শক্তি

কমিশনের চেয়ারম্যানের মুখেই শুভ্র। তিনি গত ২২শে জায়াইরি বলেন :—“জেনেভার চুক্তি হোক বা না হোক, আমেরিকা তার ‘শান্তিপূর্ণ’ পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা চালিয়ে যাবে।”

সেনেটার গৌরবলেন যে, “প্রস্তাব মত এশিয়ায় ৩৭টি কন্ট্রোল-কীড়ি হবার কথা। প্রত্যেক কীড়িতে যদি ১০০ জন করে কণ্ঠস্বর থাকে, তাহলে সেই ৩৭০০ লোকের সেই বিরটি অকলের যে কোন জায়গায় বাবার ও তদন্ত করবার অধিকার থাকা চাই। সেই অকলের মধ্যে চীনও থাকবে। আমেরিকা চীনকে স্বীকার করে না বলে অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করা সম্পর্কে সে চীনের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি করতে রাজী নয়, একথা বললেই ত সে অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তি এড়িয়ে যেতে পারে।”

এই চুক্তি এড়িয়ে বাবার জগ্রেই মিঃ হারল্ড ঠাসেনকে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাঁর আলোচনায় ষোণ দেবার ফলে উভয় পক্ষের মত অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল।

আলোচনা যাতে নিফল হয়, সেজন্ত পশ্চিমীরা অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার প্রশ্নটি থামা চাপা দিয়ে কন্ট্রোলের প্রশ্নটি সামনে তুলে ধরে যখন দেখলেন যে তাতেও বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না, তখন কন্ট্রোলের ব্যাপারটা এমন ভাবে ঝাঁড় করালেন, যাতে নিজের সার্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে কোন দেশ সেই ধরনের কন্ট্রোল মেনে নিতে পারে না। পশ্চিমীরা প্রস্তাব করলেন যে, কন্ট্রোল কমিশনে সাত জন সদস্য থাকবে। তাদের তিন জন স্থায়ী সদস্য হবে মার্কিন, ব্রিটন ও রুশ। বাকি চার জন অস্থায়ী সদস্য চুক্তিকারীরা নির্বাচন করে নেবে। সেই সাত জন সদস্যের সাধারণ ভোটভূতির দ্বারা প্রত্যেকটি কাজের ব্যবস্থা হবে। এই চতুর প্রস্তাবের আসল মান হচ্ছে, চুক্তিকারী তিনটি প্রধান রাষ্ট্রের মতৈক্যের অর্থাৎ সমতার ভিত্তিতে কাজ হবে না এবং সোভিয়েতের একটি ভোটের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিনদের দু’টি ভোট সব ব্যাপারেই জিতবে এমন কি অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করার বেলাতেও। এই মতলব বৃষ্ণও সোভিয়েত চুক্তির চেষ্টা যাতে সফল হয় সেজন্ত বললেন যে, কন্ট্রোলের সবচেয়ে প্রধান বিষয়গুলিতে ত্রিশস্তির মতৈক্যের ভিত্তিতে কাজ করার প্রস্তাব যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে অস্ত্র ব্যাপারে পশ্চিমীদের প্রস্তাব মানতে সে রাজী আছে। পশ্চিমীরা তাতে রাজী না হয়ে বুঝিয়ে দিলেন কন্ট্রোল কমিশনে সোভিয়েতকে কোণঠাসা করার সুযোগ পেলে তবেই তাঁরা-চুক্তি করবেন, নাহলে নয়।

কন্ট্রোল-কীড়িতে কারা কাজ করবে? এই প্রশ্ন সম্পর্কে সোভিয়েত প্রস্তাব করলে যে, প্রত্যেকটি কীড়ির রূপ হবে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ যে দেশে কীড়ি থাকবে সেই দেশের এবং চুক্তিকারী অস্ত্র দেশ হটির থেকে কয়েকজন করে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে প্রত্যেকটি কীড়ির কমিটি গঠিত হবে। আমেরিকার দাবি হোল যে তা হবে না। কারণ, সোভিয়েত দেশের কীড়িতে যদি সোভিয়েত কর্মী থাকে তার ঠিক মত তদন্ত না-ও করতে পারে। সেই জগ্রে সোভিয়েত দেশের কীড়িগুলিতে যে সব কর্মী থাকবে তারা হবে অস্ত্র দেশের লোক এবং তাদের যেকোন খুঁসি বাবার অর্থাৎ স্বাধীনতা থাকবে। সোজা কথায় সেই কীড়িগুলিতে নাটোপোটার কিছু দালাল ভর্তি করে সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে সমস্ত রকমের গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ

না। এই হচ্ছে আমেরিকার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই রকম প্রস্তাব সোভিয়েতের পক্ষে হান্য সম্ভব নয়। এইখানেই শেষ হয়। সোভিয়েতের মতে কন্ট্রোল কমিশনের অধীনে যে তদন্তকারী দলগুলি থাকবে, সেগুলির মধ্যেও তিনটি দেশেরই লোক থাকা চাই এবং কমিশনের স্থায়ী সদস্য তিন জন একমত হলে তবে সেই দলগুলিকে কোন কিছু তদন্ত করতে পারান চলবে অর্থাৎ তদন্তকারী দলগুলিকে কন্ট্রোল কমিশনের অধীনে কাজ করতে হবে এবং কন্ট্রোল কমিশন ত্রিশক্তির ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে। তা ছাড়া তদন্তকারী দলগুলিকে পাঁচাপাঁচি ভাবে মোতায়েন রাখার দরকার নেই। দরকার পড়লে সেগুলি গঠন করা হবে। আমেরিকা তাতে রাজী নয়। তার মতে প্রথমত তদন্তকারী দলগুলি বরাবরের মত জেঁকে বসবে এবং কন্ট্রোল কমিশনের হুকুম মত তারা চলবে না। যে দেশে যে দল থাকবে, সেই দেশের কোন লোক সেই দলে থাকতে পারবে না। একজন পরিচালক নিযুক্ত করা হবে, যার হুকুম মত দলগুলি যে কোন জায়গায় তদন্ত করতে যাবে। এমন কি, পারমাণবিক বিক্ষোভ ঘটছে এমন সম্ভেহ না হলেও। অর্থাৎ কমিশনের মধ্যে ইস-মার্কিনরা দলে ভারী থাকবে এবং তার দরুন তারা যে সব লোককে পরিচালক নিযুক্ত করবে সাধারণ ভোটের দ্বারা তারা তাদেরই তাঁবেদার। সেই তাঁবেদারের দল সোভিয়েত দেশের কন্ট্রোল-কাড়িতে বসে রুশবিবর্তিত তদন্তকারী দলকে দিয়ে যেখানে খুসি এবং যা খুসি পরীক্ষা করাবে এবং সত্যি মিথ্যা যা খুসি বিবৃতি দেবে। কিন্তু আমেরিকা বা বুটনের বেলায় তারা মুখ খুলবে না। এই হচ্ছে পশ্চিমীদের কনট্রোল প্রস্তাবের স্বরূপ। এই প্রস্তাব সোভিয়েত মেনে নেবে না, নিতে পারে না। সুতরাং পশ্চিমীরা আওরাজ তুলবে আমরা তো চুক্তি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সোভিয়েত তার বেয়াদবী গো কিছুতেই ছাড়তে রাজী নয়। আলোচনা সকল না হওয়ায় জন্তে সোভিয়েতই দারী।

নিরস্ত্রীকরণের অন্ত্যস্ত বিবরণগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সৈন্যবাহিনী ও অন্ত্রশস্ত্র হ্রাস ইত্যাদির ব্যাপারেও পশ্চিমীরা একই মনোভাবের পরিচর দিয়ে আসছে আজ ১৩ বছর ধরে। সম্মিলিত জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন এবং কমিশনের অধীন সাব কমিটিগুলি বৃহৎ শেখ হবার পর ১৩ বছরে নিরস্ত্রীকরণ সমস্তার মোমাঁসার দিকে এক পা এগোন তো দূরের কথা বরং পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের ডাঁওতাঁবাজী করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই, এটা বুঝতে গেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন সেই কমিশন থেকে বার হয়ে আসে তখন পশ্চিমী মহলে সোরগোল ওঠে যে সোভিয়েত আসলে নিরস্ত্রীকরণ চায় না, তাই সে সম্পর্কে হাতে কোন চুক্তি হতে না পারে সেজন্তে সে কমিশন থেকে বার হয়ে গেল। যারা অন্ত্র ভাগ্যের চেয়ে অন্ত্র গ্রহণ বেশি পছন্দ করে, যারা মানুষ মারার অন্ত্র উপাশন করে ও রিক্রী করে কোটি কোটি টাকা কামায়, তারা সেই সোভিয়েতের ঘাড়েরই সমস্ত লোব চাপালে যে সোভিয়েত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েও একাই পরীক্ষা বন্ধ করেছিল যে তার সমস্ত বাহিনী থেকে কয়েক লক্ষ সৈন্য কমিয়ে দিয়ে নিজেই হাজারী, ক্রমান্বিত, পূর্ব-জাৰ্জারী ইত্যাদি দেশ থেকে ক্রমশই কিছু কিছু করে সৈন্য দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে নাটো এবং অন্ত্যস্ত সামরিক জোটের দেশগুলিরই প্রাধান্য। শতকরা ৫০ জন সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে নেওয়া হোক,

আগস্টেবিয়ার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। সোভিয়েত কমিশন থেকে বার হয়ে গেল বলে যারা হান-হস্তান্তর করছেন তাঁদের জিপোস করা যায় :—

প্রথমত তাঁরা যদি সত্যিই অন্ত্রহ্রাস কামনা করেন তাহলে পারমাণবিক অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার প্রস্তাব কেন তাঁরা মানলেন না? তবে কি কমিশনের বাইরে তাঁরা চুক্তি করতে নারাজ এবং সোভিয়েত কমিশনের ভিতরে থাকলে তাঁরা চুক্তি করতেন? হয়ত বা তাঁরা ‘অবজার্ডার’ পত্রিকাঃঃঃ হঠাৎ জেবেছেন যে ‘হুনিয়া এখনই তো ব্রিগজ্ঞনক অবস্থায় এসে পড়েছে। কিন্তু বুটন ক্রাশ এবং আরো গোটা পাঁচ-ছয় দেশের হাতে যখন অ্যাটম বোমা আসবে তখনকার বিপদের তুলনায় এখনকার বিপদ সামান্য?’ মিঃ ডালসের যোগ্য থেকেই আসল কথা জানা যাবে। তিনি কিছু দিন আগে বলেন যে বিশেষজ্ঞদের বৈঠকের ফলে সারা পৃথিবীর সব জায়গায় অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ হবে এমন কোন কথা নেই এবং বৈঠকের সাক্ষ্য পশ্চিমী শক্তিদের পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারে না। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা মন্তব্য করে : “আইসেনহাওয়ার ও ডালস মন্তব্যে মুখে এবং লিখে জানিয়েছেন যে জেনেভার বিশেষজ্ঞ বৈঠকে (যে বৈঠক তাঁরাই ডেকেছেন) পশ্চিমী শক্তির যোগ দিচ্ছেন বসেই যে আমেরিকা অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার চুক্তি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা নয়।”

দ্বিতীয়ত পারমাণবিক অন্ত্র ব্যবহার করার উদ্দেশ্য যাদের নেই তাঁরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে চুক্তি করতে নারাজ হবেন না। সেই রকম একটা চুক্তি করার জন্তে জেনেভা সহরেই নভেম্বর ও ডিসেম্বরে দেড় মাস ধরে নাটো ও ওয়াশ’ চুক্তির শেখগুলির আলোচনা চলে। তারপর পশ্চিমীরা বৈঠক ভেঙ্গে দেন। অত্যন্ত আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার প্রস্তাব সোভিয়েতের নিক থেকেই আসে। কারণ সে দেখলে যে পশ্চিমীরা অন্ত্র হ্রাস বা পারমাণবিক অন্ত্র নিষিদ্ধ করতে রাজী নয়। উটে অ্যাটম-বোমা-বোঝাই মার্কিন বিমান বিভিন্ন দেশের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। সোভিয়েত পক্ষ থেকে বলা হোল যে, এই ধরনের গুড়া সবচেয়ে আগে বন্ধ করা দরকার। পশ্চিমীরা তা মানতে রাজী হলেন না। সোভিয়েত প্রস্তাব করলে যে নাটো ও ওয়াশ’ চুক্তির সৈন্যবাহিনী যেখানে মুখোমুখি পাড়িয়ে সেখানে পূর্ব ও পশ্চিমে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গা হাওয়াই-কন্ট্রোগ্রাফি করে বড় বড় রেলকেন্দ্র, বন্দর ও সড়কে কনট্রোল-কাড়ি বসিয়ে, কোথাও হাতে আক্রমণের তোড়জোড় হতে না পারে সেদিকে সজাগ থেকে সেই সঙ্গে ব্রিগজ্ঞনক এলাকাগুলিতে বেশি অন্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামগ্রী জমা হতে না দিলে, সেই জায়গাগুলিকে পারমাণবিক অন্ত্রহ্রাস এলাকা হিসেবে মেনে নিয়ে এবং ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে ব্রিগজ্ঞন সৈন্যের অন্ত্রত এক-তৃতীয়াংশ সরিয়ে নিলে অত্যন্ত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু পশ্চিমীরা এর একটাতেও রাজী হননি। তাঁরা এই সব বাস্তব কর্তব্য এড়িয়ে কনট্রোলের পদ্ধতি নিয়ে কথার তুবড়ী জোটাতে লাগলেন। কনট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের আসল মতলবটা যে সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা, সে কথা আগেই বলেছি। সোভিয়েত ‘আন্তর্জাতিকীয় রকেট নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই তাঁদের বেশীক দেখা গেল সবচেয়ে বেশি। যদিও যে পারমাণবিক

অস্ত্রটির (war-head) লোকের রকেটের মারণশক্তি সেই অস্ত্রটি সম্পর্কে বিচিত্র করতে তাঁরা রাজী হলেন না।

কনট্রোল বলতে মার্কিন নেতারা কী বোঝেন, সে সম্পর্কে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ফটার বেশ খোঁসলা করেই বলেছেন; কনট্রোল ও তলস্তের মধ্যে দিয়ে প্রতাপক্ষের সামরিক ক্ষমতার খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করতে পারলে সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে প্রচণ্ড পাণ্ডা আঘাত হানার জন্তে আমরা তৈরি হতে পারব। সেই আঘাতের ভয়ে কেউ আর যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না বলে শান্তি বলার থাকবে।

মন্তব্য নিম্নরোজন। মিঃ ফটার 'ডেট্রয়েট এডিসন' পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। মার্কিন পত্রিকা 'টাইমস' এর মতে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা ও ব্যবহার বন্ধ হলে যে সব কোশাণী এই সব অস্ত্র তৈরি করার বায়না পেয়েছে তারা মার খাবে বলে 'পেটাগণ' বা মার্কিন সমর দপ্তর পরীক্ষা বন্ধের বিরুদ্ধে। 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' বোলে যে পেটাগনের হর্তৃকর্তাদের পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রমাণ হিসাবে ফটার এক মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান জন ম্যাক্সানের নাম করা হতে পারে। শুধু এঁরাই নয়। 'ট্রান্স উইকলি' পত্রিকায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুরিয়ার লিখছেন যে বহু মার্কিন সেনাপতিরও পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে মধ্যে ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে; যেমন সহকারী দেশরক্ষা সচিব জেনারেল লোপার এবং পরমাণু কমিশনের সামরিক প্রয়োগ বিভাগে অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ঠার্বার্ড। জেনারেল ম্যান্ডেল টেলার, অ্যাডমিরাল বার্ক ইত্যাদি।

এই সব দেখে শুনে আজ আবার 'লীগ অফ নেশন্সের' কথাই মনে পড়ে। চোখের সামনে আমরা ইতিহাসের এক মারাত্মক পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। 'লীগ অফ নেশন্স'-এ সোভিয়েতের নিরস্ত্রীকরণের সমস্ত রকমের প্রস্তাব নিরর্থক বাস্তবিত্যের সম্মুখে ভুবিবে দেওয়া হয়েছিল এবং আসল সমস্যা এড়িয়ে সমস্ত আলোচনাকে আত্মবাক্য ছোটখাটো দিকে, পৃথিবীমূলক প্রশ্নের দিকে পরিচালিত করা হয়েছিল। আজ যেমন অস্ত্রহীন, পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা

বন্ধ করা ইত্যাদি জরুরী প্রশ্ন নানা ছল ও অহিলায় এড়িয়ে গিয়ে কনট্রোল ও চৌকিদারীর চর্চা ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কের বৃদ্ধি পরিবেশন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি লীগ অফ নেশন্স-এও অস্ত্রভাঙ্গের প্রশ্ন এড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা ও যুদ্ধের হাতিয়ারগুলি লেবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখার হাজারো রকমের প্রস্তাবের আড়ালে যে অস্ত্রসজ্জার হিড়িক লাগানো হয়, তারই পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি বাধে, তার সর্বনাশা রূপের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে ছেলেখেলা মাত্র সে কথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা বাবে—যদি অবশ্য ঠাণ্ডা লড়াই-এর কাঁপসা চোখের দৃষ্টি স্থাপনা হয়ে না যায়।

একথা কেউ স্বীকার না করে পারবেন না যে কোন অস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন অর্থাৎ তার সহায়শক্তি বাড়ানোর জন্তেই সেটি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। অস্ত্রের মারণ শক্তি আরো শারিত করার শেষ লক্ষ্য যে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা সে সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই অস্ত্র ব্যবহার হলে ফল কী হবে সে সম্পর্কে ৭ জন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, একটিমাত্র তাপ-পারমাণবিক বোমা রটারডাম থেকে দি হাগ সহর পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা এক মহাশ্মশানে পরিণত করবে এবং সেখানে একটি ঘাসও বেঁচে থাকবে না। এখানেই শেষ নয়। সেই একটি বোমা থেকে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ কাঁড়াবে ৫০০ বটজেন। ১৯৫৬ সালে আইনস্টাইন পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলিত হবার জন্তে যে আহ্বান জানান, তারই ফলে কানাডার পুগওয়াশে এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক-সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে জানা যায় হিরোশিমায় ৫০ হাজার লোক তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে তিলে তিলে মারা যায়। পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা সারা দুনিয়ার মানুষকে শান্তিকালেই ক্যান্সার ও লিউকিমিয়ার কবলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সারা দুনিয়ার আবহাওয়া দূষিত হওয়া যদি এই মুহূর্তে বন্ধ করা না যায় তাহলে আমাদের যুগের কথা বাদ দিলেও উত্তরকালে এবং উত্তরাধিকার যুগে প্রত্যেক পুরুষে গড়ে ৭০ লক্ষ লোক তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে কালো ইছগুণ থেকে বিদায় নেবে।

ছবি

সঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

তখনো ছিল আকস্মিক আকাশ গোছলিতে
ক্রোধের আঁকা কাজল-কালো সে তার দুই চোখে
দেখল চেয়ে, সে-চাঁওরা যেন ছড়িয়ে দিতে সিতে
মনে, মনের গভীরে আরো! আবার ধীরে ধীরে
দৃষ্টি তার চাঁপার কলি আলো সাদা নখে
আনত হল। দোললো হাওয়া কর্তি যেন শাখা
গড়ালো তার চূর্ণ-চুল, আর সে ঝিক-ঝিকে
বহন-লো মহর্ষি বটল মনে জাঁক।

তেমনি ক'রে গোখলি আসে তেমনি ক'রে যায়
হাওয়ার হাতে হয়ত আজও স্বপ্ন বৃষ্টি করে
সেখানে সেই নিরালা নীল ত্বরে কিনারায়;
সে নেই তবু, নীলাত জলে যে ছায়া চেষ্টানাটে
ছড়িয়ে রাখে সেখানে আজও—তাকে যে মনে পড়ে—
মনে যে পড়ে সে ছায়া শুধু ছিল যে তারই চোখে,
শুষ্টির প্রেমে যে আজ ছবি; লাজুক পায়ে হাঁটে
—দল্লিত চাঁপার কলি আলো সাদা নখে!!

বিপ্লবের সঙ্ঘাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৯ সালের শেষ ও ২০ সালের প্রথমে যখন আটকবন্দীরা বঙ্গ প্রদেশ রাজবন্দীরা অন্তরীণ ও জেল থেকে ফিরে আসতে গেলো, তখন অনেকেরই অবস্থা হয়েছিল যেন জলে-পড়া। জেলে। অন্তরীণে তবু একটা "হিল্লো" ছিল, কিন্তু মুক্ত হয়ে আসার পর থা গেল, অনেকেরই আশ্রয় বা জীবিকার কোন সন্ধান নেই—ভী গিয়ে বসে থাবার অবস্থাও অনেকের নেই, আর নানাকারণে পর অন্তরবিধাও প্রচুর। সরকার থেকে অনেকের ফ্যামিলি গ্যালাউয়েন্স দেওয়া হত,—একজন উপার্জনশীল ব্যক্তিকে বিনাবিচারে গাটক রাখলে ফ্যামিলি গ্যালাউয়েন্স দিতেই হয়,—সে গ্যালাউয়েন্সও কু হল। ফলে এই সব মুক্ত দেশকর্মীদের নিয়ে একটা নতুন সমস্যা থা দিল। ২০ সালের শেষ দিকে বহু মুক্ত কর্মীর এমন অবস্থা।

এরকম আসন্ন অবস্থা বুঝে দেশের নেতারাও উদ্বিগ্ন, কেউ কেউ গরো কারো জন্তে কিছু চেষ্টাও করতেন। সরকারও দেখতেন, সের জন্তে কিছু না করলে এরা আবার কোন পথ ধরে, কে জানে—তাই তাঁদেরও মাথায় কিছু মতলব ঘুরছে। তাঁর ওপর অসহযোগ আন্দোলন একটা আসন্ন ঝড়ের মতন এগিয়ে আসছে—“দিশান দাপে ম্যাথ উঠছে, করতিছে গৌ গৌ—ওরে, ডিঙ্গা বেঁধে থো।”

এই অবস্থায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার এবং Y. M. C. A. রতা O. R. Raha এক বি সি চ্যাটার্জি, এস আর দাশ প্রভৃতি জরো নেতাদের নেতৃত্বে মুক্ত বন্দীদের জন্তে ইটালী-বেনেপুরুষের কটা বড় বাড়ী নিয়ে একটা ফ্রি মেসের মতন ব্যবস্থা হল। ঢাকা হুইলন পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সদ্যমুক্ত রাজবন্দী নলিনীকিশোর হকে সেখানে বসানো হল পরিচালক হিসাবে।

জীবন জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর, কার যেন খোঁজ সতে ঐ মেসে নলিনী বাবুর কাছে গিয়েছিল,—আমিও সঙ্গে গিয়েছিলুম—সেই প্রথম আমি নলিনী বাবুকে চিনলুম,—হয়ত তাঁর নে নেই।

সেখানে গিয়ে জমতে লাগলো অহুইলন পার্টির লোকেরাই। গীতের পার্টির ছোটকা ২১ জনও জুটেছিল, কিন্তু ওটা হয়ে উঠছিল, হুইলন পার্টিরই আড্ডা। অবশ্য অহুইলন পার্টিরও ২১ জন লোক দিকে বাওয়াটা পছন্দ করেননি।

ওই আড্ডা থেকেই নলিনী বাবু ‘শখ’ নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ দেন। তারপর পুলিশ দাসের নেতৃত্বে ওখানেই ভারত-সেবক-সং

সংগঠিত হয়, এবং তাঁর মুখপত্র “হক কথা” প্রকাশিত হয়। হক কথাও সম্পাদক হয়েছিলেন নলিনী বাবুই। অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারই ছিল এই সংঘ ও পত্রিকার কাজ। এ বিষয়ে পরে অনেক তিতরকার কথা আসবে।

এখানে আর কয়েকটা তিতরকার কথা বলা দরকার বোধ করছি, যা আগে দরকার বোধ করিনি। বাহাদুরা তাঁর বইয়ে লিখেছেন, “বাংলার মসনদে তিনজন মন্ত্রী জাতিগঠনের বিভাগ নিয়ে দিল্লীকা লাঙ্কু চুবতে লাগলেন।” এই অস্বাভাবিক মন্তব্য স্বরেন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গও বলা হয়েছে,—অথচ এই শাসন সংস্কার মেলে নিয়ে নির্বাচনে গাঁড়ানোর ব্যবস্থা কংগ্রেস থেকেও হয়েছিল, অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হওয়ার যে নির্বাচন পরিত্যক্ত হয়।

তা ছাড়া আগে গান্ধীজি নিজে তিলক, অ্যানি বেসান্ট প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও শাসন সংস্কার মেলে নিয়ে তাঁর সংশোধনের জন্ত চেষ্টা করার পক্ষপাতী ছিলেন।

আবার, তাঁর অসহযোগের প্রস্তাবের মূলও হচ্ছে খিলাফত কমিটির অসহযোগ প্রস্তাব। মোলানা মহম্মদ আলী খিলাফত সর্বস্ব স্ববিচারের দরবার করতে বিলিতে গিয়ে বার্ষ হয়ে ফিরে আসার পর সেই অসহযোগ প্রস্তাব খিলাফত কমিটির সভায় রচিত হয়। মহাত্মা গান্ধী আগে থেকেই হাওয়া বুঝে খিলাফত কমিটির বন্ধ ও পরামর্শদাতার ভূমিকা নিয়ে বিকৃত মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের সহযোগিতা দিয়ে বাগ মানাবার মতলব করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১১শে মার্চ খিলাফত কমিটির এক সভায় তাঁদের অসহযোগ-প্রস্তাব সর্বস্ব বন্ধুতায় গান্ধীজী বলেন,—“প্রস্তাবটাকে অতি স্বাভাবিকভাবে ও স্বাধীনভাবে আন্দোলনের কয়েকটা স্তর নির্দেশ করা হয়েছে,—যার শেষ পর্যায়ে হবে সশস্ত্র বিপ্লব। ভগবান কল্লন, এদেশকে যেন এমন সশস্ত্র বিপ্লব ও তার আর্থবঙ্গিক বিভীষিকার মুখ দেখতে না হয়। কিন্তু খিলাফত প্রের সম্পর্কে মাছুষের মনোভাব এত তীব্র যে, এ সমস্তার কথোচিত সমাধান না হলে, বা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বার্ষ হলে এমন এক সশস্ত্র বিপ্লব আসবে, যা এদেশ কখনো দেখেনি। আমি আশা করি, ক্রোধোদয়ত নির্বাচন দ্বারা সরকার সে অবস্থা টেনে আনবেন না।”

এই বক্তৃতা থেকে বোকা বার, কেন মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অহিস্যকে মূলনীতিরূপে জুড়ে দিয়েছিলেন,—এবং

কেনই বা বেপারোরা তাঁর ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হবে।"

তার অহিংস অসহযোগের প্রভাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল খিলাফত কমিটিরই কাজের দ্বারা। ১৯২০ সালের ২২শে জুন খিলাফত কমিটি বড়লাটকে প্রার্থনা—১লা আগস্টের মধ্যে তুরস্কের প্রতি স্বাধিকারের ব্যবস্থা না হলে তাঁরা অসহযোগের কার্যক্রম শুরু করবেন। গান্ধিজীও বড়লাটকে চিঠি লিখে ব্যাখ্যা করেন,—কেন তিনি খিলাফত কমিটিকে সমর্থন করছেন। ১লা জুলাই আবার গান্ধিজী হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের তরফ থেকে বড়লাটকে এই কথা জানিয়ে দেন।

তারপর ১লা আগস্ট পায় হলে হাকিম আজমল খাঁ তাঁর সরকারী সম্মান উপাধি বর্জন করেন। ৩১শে আগস্ট খিলাফত কমিটির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, এবং গান্ধিজী তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ পদক বর্জন করেন। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে "অহিংস" অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে খিলাফত কমিটির কার্যক্রমের সঙ্গে থাকলো অহিংসা, আর সৌচকে মানানো হল "এক বছরে স্বরাজ"—এর "প্রতিশ্রুতি" দিয়ে। বাহাদুর বহইয়ে "মহাশ্রাবী"র প্রতি ভক্তির অপ্রতুল নেই।

বাহাদুর প্রভুতি ফেরারী বিদ্রোহী নেতাদের যুক্তি সম্পর্কেও সুরেশব্রহ্মা এবং গান্ধিজীর তুলনার অবকাশ আছে।

কলিকাতা কংগ্রেসের সময়েই সম্মুখ রাজবন্দী অমরকুমার ঘোষ (অতুলদার জাই) এবং অরুণ গুহ প্রথমে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে এই সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁর সাহায্য চান। তিনি প্রথমে যথেষ্ট আপ্যায়ন করে পরে যখন স্তন্যলেন, ফেরারী নেতাদের নামে সরকারের ঘোষণা আছে, ধরে দিতে পারলে ১০।২০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে, তখন তিনি পাশ কাটানেন।

তার পর তাঁরা গেলেন গান্ধিজীর পরামর্শ নিতে। তিনি পরামর্শ দিলেন, ফেরারীরা যদি তাঁর কাছে অন্তর্গত সমর্পণ করে সর্বমতীতে থাকতে চান, তিনি তাঁদের গ্রহণ করবেন।

শেষে অমর বাবু এবং অরুণ বাবু গেলেন সুরেশব্রহ্মাখের বাড়ীতে, ব্যারাকপুরে। তিনি তাঁদের বৃকে করে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দিলেন, এবং সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই স্তন্যলেনগরে সেক্রেটারী নেলসন ও ডি আই জি আই বি গোস্তির সঙ্গে অতুলদার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল।

ইতিমধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং কুন্তল চক্রবর্তী গান্ধিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তিনি তাঁদের বলেন অন্তর্গত আত্মসমর্পণ করতে।

বাই হোক,—আমরা তখন এ সব কথা জানতুমও না, আর আন্দোলনে যখন বোগ দিয়েছি এবং এক বছর পরে পুনর্বিবেচনারও কথা আছে, তখন বিশ্বস্তভাবে প্রাণপণে আন্দোলনের কার্যক্রম নিয়ে খেটে উঠেছি।

জীবন ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধিজীর কাছে এক দীর্ঘ পত্র লিখে নিজের স্পষ্ট বিশ্বাস প্রকাশ করে পরামর্শ চেয়েছিল, কি কমায়ে। তিনি স্বস্তে জবাব লিখে দিয়েছিলেন,—অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রমের একটা কিছু বেছে নিয়ে একটা বছর কাজ করে বাও সে চিঠিটা

জীবন রেখে দিয়েছিল এবং পরে একদিন সেটা বিশেষ ভাবে কাজে লেগেছিল। সে কথা বখাসময়ে আসবে।

১৯২১ সালের শেষার্ধ্বে সারা দেশে চরকা চলতে শুরু করেছে—মোট খসদের নানা রকমের কাপড় তৈরি চলেছে—কলিকাতা সহরের পাড়ার পাড়ায়,—২১০ খানা তাঁতও বসে গেছে। টালার ব্যায়ামবীর প্রোফেসর কে, ডি লীল বাইরের ঘরে ছুঁখানা তাঁত বসিয়েছিলেন। কবি সত্যেন দত্তের বিখ্যাত কবিতা "চরকার ফর্ষর পাড়ার ঘর ঘর" টালায় পাটুবারুদের বাড়ীতে বসে তিনি লিখেছিলেন। "জাপান" লেখক সুরেশদার সঙ্গে তিনি টালার যেতেন। একদিন পাটুবারু ও তাঁর দাদা ভাটুদা একসঙ্গে চরকা কাটতে বসলেন, আর কবি সত্যেন দত্ত কবিতা লিখলেন।

অনেক ছেলে ছুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছে,—তাদের মধ্যে ভ্রাশাত্তাল কলেজ হল, গোড়ীয় সর্ববিভারতন (ভ্রাশাত্তাল ইউনিভার্সিটি)—সেখানে অধ্যাপক করে বসানো হল সত্যেনচন্দ্রকে। কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কয়েকজন হলেন প্রোফেসর।

মাখন সেন এবং এক শৈলেন ঘোষ বোধ হয় ছিলেন ম্যানেজমেন্টে। সত্যেন বাবু জেলে বাওয়ার পর (২১ সালেই) সেখানে কিছু টাকার গোলমাল ধরা পড়ে এবং শৈলেন ঘোষ উধাও হয়। পরে তিনি ভোটরক নামে কাগজ বার করেছিলেন।

ভ্রামহ্মর চক্রবর্তী সম্পাদনার সার্ভেট নামে ইংরাজী দৈনিক কাগজ বেরোয়। সুরেশ মজুমদারের গৌরাক প্রেস প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির ছাপার কাজ করে কিছু পয়সা পেতো। সেখান থেকে মাখন সেন ও সত্যেন মজুমদারের সহযোগিতায় বেরুলো আনন্দবাজার পত্রিকা।

সার্ভেট ও আনন্দবাজার হল পুরোপুরি কংগ্রেসী কাগজ। মহাশ্রাবী এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার এবং প্রাসঙ্গিক সংবাদই ছিল কাগজের প্রধান উপজীব্য। মহাশ্রাবীর ইংরেজি কাগজও বেরিয়েছিল—সে ছিল আন্দোলন পরিচালনের গাইড। পড়ে তারিক করতে হত—চমৎকার। কিন্তু মহাশ্রাবীর রাজনীতির অভিনব, অবিদ্বাদ প্রকৃতিও তাতে প্রকট হত।

সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও মডারেট হল তাদের কাগজগুলোতে অ্যাটিট ননকোপারেশন প্রোগ্রামগাণ্ডা করে চলেছিল। কিন্তু জনগণের মধ্যে তাদের প্রচারের উপযোগী কাগজ, সংস্থা বা কর্মীদল ছিল না। ফলে আন্দোলন বেড়েই চলেছিল, এবং সরকারও ক্রমশ নির্ভীক ব্যবহার দিকে ঝুঁকছিল। ফলে আন্দোলন দমার পরিবর্তে আরো জোরালো হয়ে চলেছিল।

২১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে গভর্নমেন্ট সভা বন্ধ করার জন্তে ১৪৪ ধারা জারি করতে শুরু করলে। সে বাধা গ্রহণ না করে সভা করে লোকে প্রেস্তার বরণও শুরু করলে। ফলে কোয়ারে এই রকম নিষিদ্ধ সভা ও প্রেস্তারদের একটা চিহ্ন আদি আগে লিখেছি, গত পৌষ মাসের বহুমতীতে।

খন্দর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বস্ত্র বরকটের জন্তে পিকেট এবং ধরপাকড়ও শুরু হয়েছিল। সেই মিলওয়ালারা টাণ্ডাও দিচ্ছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেশী মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা মিলনও লোকচক্ষুর আগেচর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল।

দরভী হুগে বেটার পরিণতি হয়েছিল বেশী ধনিকদের দ্বাৰেই সজে
কংগ্রেসের দ্বাৰেই পরিপূর্ণ মিলনে।

পুলিশ পিকটোরদের দ্বাৰেই সজে করলে সি, জার, দাশ নিজের
একমাত্র পুত্র চিরঞ্জন, স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবীকে
সিকিটএ পাঠালেন—পরেই ছেলেদের বিপদের মুখে পাঠাবার
জাগে আপনার প্রিয়জনদের পাঠালেন। তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে
গেলেন। আলোচন আয়োজার হল।

তখন সরকার ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করার জবাব দিতে
সুজ করলে লাঠি চার্জ করে সভা ভেঙ্গে দিয়ে। বল হল না,
মেয়েরাও সে সব সভার বক্তৃতা শুধু করলেন। তখন হেমপ্রভা
মজুমদার সভার বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। একদিন এমন এক
সভার লাঠি চার্জ হল, হেমপ্রভার একটা হাত লাঠির দ্বাৰে জখম
হল। তিনি ব্যাণ্ডেজ করা ভাল হাত নিয়েই সভার সভার বক্তৃতা
করে বেড়ালেন।

প্রথমে মেয়ে বক্তা বেশী ছিল না। বৃদ্ধা মহিলা কংগ্রেস নেত্রী
মোহিনী দেবী গোড়া থেকেই ছিলেন (ক্যালকাতা কেমিক্যাল
ওয়ার্কসের অজ্ঞাতম প্রতিষ্ঠাতা খগেন দাশগুপ্তের জননী—আমরণ
একনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত) আর ছিলেন বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী,
জ্যোতির্ধরী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি। ক্রমশঃ নতুন
নতুন মেয়ে-বক্তা তৈরী হচ্ছিল।

ডেলও ছিল, যেমন সর্বত্র থাকে। একটি ঘোয়ান মেয়ে
দিনকতকের জন্তে ধূমকেতুর মতন উদয় হয়েছিল—চমৎকার
গুজবিনী ভাষার উপযুক্ত অঙ্গসকলান সহযোগে লম্বা বক্তৃতা
গড়গড় করে আউড়ে যেতেন। এক লীডারের কথা। তাঁর
সভার তিনিই সাধারণত একমাত্র মহিলা বক্তা থাকতেন। তার
শিতাও বক্তৃতা করতেন। সভার শেষে চান্দর পেতে কংগ্রেস ফাগুর
জন্তে অর্থ সংগ্রহও চলতো। একটা কথা বাজারে ক্রমশ চালু হয়েছিল,
যেটো বাপের লেখা বক্তৃতা মুখস্থ করে ঘরে বড় আয়নার সামনে
দাঁড়িয়ে রিহার্সাল দিয়ে তৈরী হয়ে আসে। নামে বোধ হয় স্বর্গলতা।
বাক—

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ২১ সালের নভেম্বরে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস
ডেলাস্টার দলকে যে আইনী ঘোষণা করলে, এবং ডেলাস্টারদের
লীডাররূপে কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার শুরু করলে। সি আর দাশ
গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর ছেলে একে একে অনেক নেতা বসেন আর গ্রেপ্তার
হন, শেষ পর্যন্ত সত্যাব বাবুও গ্রেপ্তার হলেন।

এদিকে ২১ সালের ডিসেম্বর এক আহমদাবাদ কংগ্রেস এসে গেল।
গেনুয় আহমদাবাদে। বাংলার ডেলিগেট ক্যাম্প বেঙ্গের পণ্ডিত
মোক্ষা সামাধ্যারী প্রমুখ করেকজন স্বরাজ ঘোষণার প্রস্তার চাই বলে
হেঁচক শুরু করেছিলেন। কোথার স্বরাজ?

নির্বাচিত সভাপতি সি আর দাশের অস্থিতিতে হাকিম আজমল
খাঁ হলেন প্রেসিডেন্ট। মূল প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন স্বয়ং মহাত্মা
গান্ধী, কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মূল প্রস্তাব।
কেল ভর্তি করে দিতে হবে, এমন কি ধারা গঠন মূলক কাজ নিয়ে
আছেন, দরকার হলে তাঁরাও কাজ ছেড়ে জেলে যাবেন। The
battle may be prolonged—এই হল মহাত্মাজীর বক্তব্য।

হরকম মোহানী চরমপন্থী, তিনি সম্পাদনী প্রস্তাব এনেছিলেন

সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করার, সে প্রস্তাব ভোট টিকলো না।
কংগ্রেসের পাশেই চলছিল মোসলেম লীগের অধিবেশন। হরকম
মোহানীই ছিলেন সে অধিবেশনের সভাপতি। তিনি সেখানেও
ইতিপেপেল রেজলিউশন এনে পরাজিত হসেন। কংগ্রেসের মতাবলম্বী
খিলাফত ওয়ালারায়ে সেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই তারা কংগ্রেসের
লাইনেই চললো। তখন মুসলমানেরা কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ,
উভয় সংস্থারই সভা হতে পারতো।

এই উপলক্ষে মহাত্মাজী তাঁর ইংরাজি ইতিহাস কাগজে বা লিখেছিলেন,
সেটা আজও কংগ্রেসের ইতিহাসের পাঠ্য কালো করে অর্ক্য হয়ে
আছে। তিনি লিখেছিলেন,—“Moulana Haasrat Mohani
put up a plucky fight for independence on the
Congress Platform and then as president of the
Muslim League, and was happily each time
defeated. He wants to sever all connections
with British People even as partners and equals,
and even though the Khilafat question is
satisfactorily solved....It is Common cause
that if the Khilafat question cannot be solved
without complete independence....there is
nothing left for us to do but insist on indepen-
dence.....But assuming that Great Britain alter
her attitude, as I know she will when India is
strong, it will be religiously unlawful for us to
insist on independence.”

অর্থাৎ মোলানা হজরত মোহানী কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগের
সভাপতিরূপে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলে রীতিমত লড়াই করেছিলেন,
কিন্তু স্বার্থের বিবর, তিনি হুজায়াগাতেই পরাজিত হয়েছেন। তিনি
ব্রিটিশের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান, এমন কি সহান
জঙ্গীদার হিসাবেও, এবং খিলাফত সমস্তার ভাষ্য সমাধান হলো।
অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন যদি খিলাফত সমস্তার সমাধান না হয়,
তাহলে স্বাধীনতার দাবী করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।
কিন্তু ব্রিটেন যদি তার বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন করে, আমি
জানি, ভারত শক্তিশালী হলে তারা তা করবেই, তাহলেও স্বাধীনতার
জন্তে গীড়াপীড়ি করাটা আমাদের পক্ষে একটা অপ্রিয় কাজ হবে।

স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, অসহযোগ আলোচন যে স্বাধীনতার
সংগ্রাম নয়, তার আরো অনেক প্রমাণ ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল।
নাগপুরের কংগ্রেসের পর থেকেই লোকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু
করেছিল, স্বরাজ কথাটার সঠিক অর্থ কি? মহাত্মা জবাব
দিয়েছিলেন, যখন স্বরাজ পাওয়ার সরব আসবে, তখন ভারতবাসীই
সেটা স্থির করবে, আমি নয়। কিন্তু স্বরাজের ব্যাখ্যার দাবী
নিষ্পত্ত হচ্ছিল না। বোম্বাইয়ে পার্শী এসোসিয়েশনের বক্তৃতা
কালে মহাত্মাজী বললেন,—তিনি নিজে সন্তুষ্ট হবেন ডোমিনিয়ন
স্ট্যাটাস পেলেই। অসহযোগের বিরোধীরা প্রচার চালচ্ছিল,
আলোচনটা অবৈধ। তার জবাবে মহাত্মাজী মেলের প্রতিনিধির
কাছে তিনি বললেন,—“I do not consider non-
cooperation to be unconstitutional, but I do

believe that of all the constitutional remedies now left open to us, non-cooperation is the only one left for us." অর্থাৎ আমি অসহযোগ আন্দোলনকে অবৈধ মনে করি না। আমি মনে করি—অসহযোগের প্রতিকার আদায় করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ের মধ্যে এই একটা মাত্র উপায়ই আমাদের হাতে অবশিষ্ট আছে।

পটভূমিতে কেন কংগ্রেসকে কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়েছিল না—এ কথাটির উত্তরে পাল্লারনেটে কর্ণেল ওয়েল্ডউড বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের অসহযোগের অর্থ স্বায়ত্তশাসন, স্বতন্ত্রতা কংগ্রেসে কেন্দ্রবিন্দু করার কোন কারণ নেই।

অনেক কমিউনিস্টগণিতও যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তার কারণও এই। ভারতের তুলার ব্যবসায়ের রাজা হুদালাল বাজাজ ছিলেন কংগ্রেসের তিলক স্বরাজ্য আন্দোলনের কোষাধ্যক্ষ, দখাবাজীর পরম ভক্ত। তিনি ওয়ার্ধী কটনের একচেটিয়া কারবারী হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেস-চরকা-খন্দরের সৌলভে। কংগ্রেস ওয়ার্ধী তুলা লব্ধকে সুপাশিত করেছিল, সারা ভারতে গ্রাম্যজনের কোপার কোপার পর্যন্ত খন্ডের উপাধান কেন্দ্রে কেন্দ্রে ওয়ার্ধী তুলা বিক্রি হত—১২ হু' টাকা সের পর্যন্ত উঠেছিল। বাজাজ কোটির দ্বিতে টাকা রোজগার করে লাখের সঙ্গে কংগ্রেসকে চাঁদা দিয়েছিলেন। দখাবাজী একচেটিয়ার পাশ কাটিয়ে তিনি নিজের ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে।

আমরা এসব লক্ষ্য করেও একটা লড়াই চলাচ্ছে এবং এগোচ্ছে যথেষ্ট প্রাণপণে খেটে চলেছিলুম। অন্ন বস্ত্র, শিক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী সাহায্য বর্জন করে, নিজেরাই নিজেরদের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সরকারকে খাজনা-টেক্স দেওয়ার কোন বাস্তবিকতা বা দাবি থাকবে না—এক তখন খাজনা বন্ধ করা হবে, এই ভাবে একটা State within State গড়ে তোলা হবে, এ ধরনের প্রচারও চলছিল, কাজেই খেটে ব্যাঘাতের একটা প্রেরণাও বর্তমান ছিল।

ইতিমধ্যে আর একটা বৃহৎ ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল, বলা হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম জোয়ারের মুখে আসামের চা-বাগানের চিরনির্ধারিত কুলীরা ধর্মঘট করে একযোগে, এক মালিকেরা গদের ঘরছাড়া করে তাড়িয়ে দেয়। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রশ্রয় হিসাবে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মীরাও ধর্মঘট করে,—শব্দ পর্যন্ত সে ধর্মঘট বিক্ষুব্ধ হয় গোয়ালন্দ, চাঁদপুর প্রভৃতি ষ্ট্রিমার স্টেশনের মধ্যেও। ফলে রেলও ষ্ট্রিমার চলাচল বন্ধ হয়, এবং ৫-কুলীর দল পদ্মজ্ঞে বাড়ীয়েখো বাড়ী স্রুজ করে। পথে তাদের বৈশ্রাম ও খাওদালাওহার স্ববস্থার জন্য স্থানীয় কংগ্রেসের নেতৃগণ নিসর্ধাধার হাট্টে স্থানে লক্ষ্যবান্দা স্থাপন করে। এক এক স্থানে প্রায় হাজার কুলী জমে যায়, একটা প্রকাণ্ড সমতা দেখা দেয়। স্বতাবতই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে টেলিগ্রাম আসতে থাকে।

সি আর দাশ স্বচক্ষে অবস্থা পরিদর্শনের জন্যে রুতনা হন, এবং গায়ালন্দে পৌঁছে দেখেন ষ্ট্রিমার বন্ধ। স্বর্বার পদ্মা-মেঘনা সমুদ্রের দ্বারক ধারণ করেছে। সেই অবস্থায় তিনি দৌকার পাড়ি দিলেন গায়ালন্দ থেকে চাঁদপুরে—কারো নিষেধ মানলেন না। ধর্মঘটী ও

সাধারণ জনগণের সাহস ও উৎসাহ কতখানি বেড়ে গেল, তা সহজে জুড়িয়ে।

ওদিকে চট্টগ্রামে বতীজ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যারিষ্টারী হয়ে কংগ্রেসের হাল ধরতেছেন। তাঁর দ্বী বিলাতের মেয়ে নেলী সেনগুপ্ত বিলাতী রূপান্তর দেখানো পিকেটিং করে প্রেস্তার হয়েছেন, জেলে গেছেন। ধর্মঘটের দ্বিতেও সেনগুপ্তের প্রায় ৫০ হাজার টাকা ধন্য হয়ে যায়। পরে সেনগুপ্ত ও নেলী কলকাতার চলে আসেন, এক তাঁদের কলকাতার শোক এক বিরাট প্রোমোলান করে অভ্যর্থনা করে। এই সব ঘটনার ফলে আন্দোলনের জোর বেড়েই চলেছিল।

কংগ্রেসের ভাববস্তুর মধ্যে বিপ্লবী বিবেককে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিপ্লবীরা নানা স্থানে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিল—মাকে মাকে উৎসব উপলক্ষে সেখানে বিপ্লবীদের জমাবেল হত,—স্থানীয়তার বিক্ষুব্ধতাও চলতো। আহমদাবাদ কংগ্রেসের পর '২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে কি মার্চে/মার্চের দিনে বোধ হয়, ভারতের হায়বারে কাছে আবদালপুরে গজার কাছই এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, এক সেখানে বসানো হয় রসিক দাসকে, যিনি ৩০ সালে ডালহাউসী ফোর্সার বোমার মামলার স্বীপান্তর নগুলাভ করেন এবং আশ্রমাদ নির্ধারিত হন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন নেতৃত্ব করেন মনোরঞ্জন দা' (মনোরঞ্জন গুপ্ত—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এম-এল-সি)—এক আমার রচিত একখানা গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। গানটি এই :

আজ হোলীর রাজা উৎসবে

উঠলো মেতে রক্ত-পাগল প্রাণ

তোরা আর সবে

ফাগুনের এই রঙীন গানে

জাগলো সাড়া বনে, মনে

তুকনো ডালে ফুটলো রে ফুল

নবীন শোভা সৌরভে।

আনন্দের এই পাগলা কোরা

ভাসিয়ে দিল সকল ধরা

বাঁধন ছিঁড়ে কঁদন ছেড়ে

উল্লাসে আয়, আয় সবে

খুনখারাপীর রক্ত স্রবে

বিষটাতে রাঙিয়ে দে রে

যর ছেড়ে আজ আর বাহিরে

অবোধ পানে চলবি কে।

আবদালপুরে নানা দিক দিয়ে অবস্থা এমন প্রতিকূল ছিল যে, আর কেউ গিয়ে সেখানে থাকতে পারতো না। অর্থাৎ আদামাদে নির্ধারিত হওয়ার আগে রসিক দাসের প্রকৃতপক্ষে বহর সাত-শ্রুটি আবদালপুরে নির্ধারিতের জীবনই বাপন করা হয়ে গিয়েছিল।

আহমদাবাদ কংগ্রেসের পর "জেলে ভর্তি করে দাঁও" হল প্রধান কর্মস্থলী। সর্বত্র সভা এবং ধরপাকড়, পিকেটিং এবং ধরপাকড় অনেক বেড়ে গেল এবং জেলে ভর্তি হতে দেরী লাগলো না। জেলের কর্মচারীরা সভ্যগ্রহীদের ভিড়ে এবং দ্বিভোদে উদ্ভাস হওয়ার জোগাড়। সরকার বাহাদুর খিদিরপুর মেট্রোবুদ্ধকে বড় বড় গুলাম নিয়ে সভ্যগ্রহীদের পুরাত লাগলো। সভার লাঠি চাঁচ করে কতক

লোককে ভাড়ির ভাড়ির বাকি লোকদের ঘরে গিরে দার, এবং জমক ঘরে গিরে গিরে ছেড়ে দেয়। রক্তবীষের কাড় নিমূল হয় না, আবার দেখা দেয়।

এক দিকে এই অবস্থা, আর দিকে খাজনা বন্ধের ফলস্বরূপে সেকে উঠেছে। ইউরোপীয়ান আদ্যোপায়েন এ্যাক্টিভনকোপারেশন প্রোপাগ্যান্ডার জন্তে টাকা চেষ্টাও ফল পাচ্ছে না। পণ্ডিত মরমোহন দাসেরা এটি সময় সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা আপোষ ঘটাবার চেষ্টার মহাকাঙ্ক্ষার কাছে এক হাটুও টেবল ফরকারেলের প্রস্তাব দিয়ে এসেন। কংগ্রেস নেতাদের বিভিন্ন জেল থেকে এক সৌকত আনী জেলে জড়ো করার সরকার রাজী ছিল। নতুন আসা, শুধু করাচীতে এক খিলাফত সভার রাজস্বায়কর হুকুত ও প্রস্তাব পাশ করে কারাগার ভোগ করেছিলেন। মহাকাঙ্ক্ষী হলেন, তাঁদের সভার আনতে হবে। সরকার রাজী ছিল না। আপোষ প্রস্তাব কেঁসে গেল। সি আর দাশ চটলেন।

কংগ্রেসের থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সারা দেশে সর্বত্র সভা করে ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করতে হবে। দাদারীপুরের বিলবীনেতা পূর্ণ দাশ ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করিয়ে তিন বছর কারাগার পেয়েছিলেন। অনেক দাদা কাছটা সমর্থন করেননি। কিন্তু পূর্ণ দাশ বলেন, জেলে অসুখা নতুন নতুন জোরান ছেলের ভিড়—বিক্রমীয়েদের বিরাট ফিল্ড। বাইরে থাকার চেয়ে কাজ বেশীই হবে। তখন দাদার পূর্ণ দাশের “বুধ” আর একবার নতুন করে আপ্রিসিয়েট করলেন। ইতি পূর্বেই পূর্ণ দাশ এক “শান্তি সেনাকল” গঠন করে কংগ্রেসের নামের আড়ালে নিজস্ব এক সংগঠন খাড়া করে ফেলেছিলেন—তারার স্বদেশী গান গেয়ে সারা জেলার গ্রামে গ্রামে স্ট-মার্চ করে ফিরতো।

ঢাকার অম্বুলীন পার্টি প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিলেন প্রাধানত অহিংসার বিপ্লববিরাগী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্তে—তাঁদের কথা ছিল, বৈপ্লবিক প্রগতির মুখে এই গান্ধীবাদ দেশটাকে ক্রীবে পরিত্যক্ত করবে নতুন করে। কিন্তু শুধু এই দৈত্যচাক প্রচারের জোরেই বৈপ্লবিক সংগঠনের বাস্তব কাজ চলে না। সপ্তদ্বী-প্রতিম যুগান্তর দল গান্ধী এবং কংগ্রেসের নামের জোরে সারা দেশে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, ঢাকারও অভাব নেই, কংগ্রেসের স্থানীয় ফাণ্ডও তাদের হাতেই সর্বত্র কংগ্রেস কমিটি করে নিজস্বের লোক বসাজে, ঘরে অথচ নিরবচ্ছিন্নভাবে দলের রিক্রুটিং-এর কাজ চলেছে। এ অবস্থার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। মন তাদের আরো বিকিয়ে উঠতে লাগলো যুগান্তর পার্টির ওপর।

এই অবস্থায় পুলিশ দাসের সঙ্গে এস আর দাশের বন্দোবস্ত হল, তাঁর সঙ্গে (তিনি তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল) ইউরোপীয়ান আদ্যোপায়েনদের বন্দোবস্ত হল, তারা প্রচুর টাকা ছাড়তে লাগলো, সে টাকা এস আর দাশের মারফৎ পুলিশ দাসের হাতে আসতে লাগলো, ভারত-সেবক-সং গঠিত হল, যুগপৎ ‘হক কথা’ সারা দেশে ছড়াবার ব্যবস্থা হল, সর্বত্র ভারত-সেবক-সংয়ের প্রচারকেন্দ্র গড়া হতে লাগলো সর্বত্র স্থানীয় কংগ্রেসের এবং যুগান্তরদলের কর্মীদের সঙ্গেও তাদের চাপা ট্রাকটিকিও চলতে লাগলো। কিন্তু গান্ধী, কংগ্রেস, যুগান্তর দল এবং আন্দোলনের ভাবাবেগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লড়াইয়েই তারা হ’ট বেতে লাগলো। যুগান্তর দলের বিশেষ বিশেষ কর্মী হল তাদের চমুদল।

বাই হোক, ‘২২ সালের গোড়ার দিকেই ১৪৪ ধারা তুল করে সভা করে প্রোডার হওয়া মুজীগজেও, (বিক্রমপুর) চলছিল। একদিন এমনি এক সভার মুজীগজ ভাষাভাষা ছুঁলের প্রথম তিন প্রেমীর ২৭ জন ছাত্র, ৪জন শিক্ষক, এবং শেষ পর্যন্ত “বড়নি” (মুজীগজের সরকারী উকীল উদাচরণ সেনের বড় মেয়ে, বেঁটু সেনের মা) একে একে নিরীক্ষিত সভার বন্ধুতা করে প্রোডার হলে জীবন আদ্যোপায়েন টেলিগ্রাফ করলেন—অবিলম্বে চলে এসো। আমিও অকিলাবেই মুজীগজে চলে গেলুম, সংসার ধর শিকের উঠলো। একটু হাড্ডা বোধ করলুম।

মুজীগজের অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে এক মহাকাঙ্ক্ষার এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বন্ধুত্ব, সেখানকার প্রায় সকল কর্মীই জীবন সে সময় ছিল নিভাঙ্কই রাজনৈতিক জীবন। ২৪ জন বিরাহিত, এবং যে ২৪ জনের পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কটা বেন নিভাঙ্কই পৌণ—একবার দয়া করে ভাত খেয়ে আসা মাত্র। অধিকাংশেরই অবস্থা ভোজনও বহু তর শরনং ইষ্ট-হলিয়ে। দিনরাত ভুতের মত ঝাটুনি।

এক মাইলটাক লবা এবং আদমাইলটাক চণ্ডা মুজীগজ সঙ্ঘ, তার মধ্যে আছে সাব-ডিস্ট্রিক্টাল চেড কোয়ার্টার, আদ্যগত, থানা জেলখানা, পোষ্ট অফিস, উকীল-মোক্তার সরকারী কর্মচারীদের বাসা, একটা বাজার, কালীবাড়ী, মসজিদ,—আর চুটো হাই স্কুল, বেয়েজের স্কুল প্রভৃতি।

আন্দোলনের প্রথমে একটা মাত্র হাই স্কুল ছিল, এবং সেটাই ভেঙ্গে হয়েছিল ভাষাভাষা স্কুল,—পরে আবার হাই স্কুলটো পুনর্গঠিত হয়—হাই স্কুলে ২০০ ছাত্র, ভাষাভাষা স্কুলে ২৫০। এই রকম ভাষাভাষা স্কুল—হাই স্কুল ঠাণ্ডার্ডের—এ এক সাব-ডিস্ট্রিক্টে ১৭টা।

কালীবাড়ীর সামনের প্রকাণ্ড টিনের চালাঘরে হয়েছিল ভাষাভাষা স্কুল, বাজারের পিছনে আর একটা প্রকাণ্ড টিনের ঘরে কয়েকটা তাঁত বসেছে, সেখানে ছেলেরা তাঁত বোনা দেখে,—রাস্তার ঘারে আর একটা ঘরে কংগ্রেস অফিস। কংগ্রেসের ফাণ্ড প্রাধানত মুক্তিভিক্ষা—সকল বাড়ী থেকে নিয়মিতভাবে আদায় হয়। স্কুলের ছাত্রবেতনও নিয়মিত ভাবে আদায় হয়—ক্রি-হাকফি ছাত্রও অনেক আছে। স্কুলের আর যথেষ্ট নয়।

যতীন দত্ত ছেড় মাষ্টার বোধ হয় ৪০টি টাকা পেতেন সর্বোচ্চ বেতন। পক্ষে সেন খন্ডরবাড়ীতেই (উদাচরণ সেনের বাড়ী) থাকতেন এবং স্কুল থেকে পেতেন ৩০টি টাকা। জীবনও টিচার—তাঁর বাড়ীর জন্তে নেওয়া হত ২৫টি টাকা। হারাপ ব্যানাঞ্জি আসে এক জেলাবোর্ডের সেনিটারী ইন্সপেক্টর ছিলেন,—তিনি তাঁর কাঁকা গিরীন্দ্র ব্যানাঞ্জির বাড়ী থাকতেন, স্কুল থেকে নিতেন মাত্র ৮টি টাকা। অজ্ঞাত টিচার এবং এক পণ্ডিত ও এক মোলবী ২০, ১৫, ১২, ১০—এমনি পেতেন। উদাচরণ বাবু এক ছেলে সুরবিন্দু ল পাশ করে বসেছিলেন—তিনি ছিলেন এক অনারারী রিসিডিং টিচার—মাসের মধ্যে ১৫২০ দিন তাঁকে টিচারী করতে হত।

পক্ষে সেন ছিলেন কংগ্রেসের থানা অফিসার—অর্থাৎ মুজীগজ থানা এলাকার যতগুলো লোক্যাল কংগ্রেস কমিটি ছিল, তিনি সেগুলোর ভরির করতেন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। প্রথমে আমাকে সেই পদ দেওয়া হল। জীবনদের প্রায় পঞ্চাশের বতীন দত্তের বাড়ীতে বাইরের ঘরে ছিল গ্রামের কংগ্রেস

আমি। আমি প্রথম মিনস্কতক সেইখানে থাকতুম, বর্তীম দলের
হাট্টাতেই যেতুম। সন্ধ্যা হত কিছুকালের মাঠে।

জীবন হুলাগঞ্জেই বহু অল্প থাকতো—এক একদিন গ্রামে
এমন ভক্তা আমার কাছেই—বর্তীম দলের বাইরের ঘরে। সারারাত
চলতো কলনা-কলনা ও তর্ক-বিতর্ক। সেইখানেই সে সাহিত্যিক
সত্যিকারের খাটমল খিলানোওরাল, অহিংসাপন্থী, বিপ্লব-বিরোধী
মলে আমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছিল। আমি তখনও থাকনাযত্ন
ও খবরের বৈপ্লবিক পরিমতি কল্পনা করে সুখ পেতুম। বসন্ত
“এক বছরে খরাজ” ব্যর্থ হল দেখে দাবারা কংগ্রেসের ভেতরে
থেকেই কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েই
ভাঙে গিয়েছিল।

হাই হোক, কিছুদিন পরেই বঙ্গবাগিনী থেকে ভাষাভাষ
ফুলের সেক্টরী পূর্ণ গুহ, হেডমাষ্টার রমানাথ মিত্র এবং টিচার ও
কংগ্রেসের সেক্টরী ফণী বাবু প্রেস্টার হয়ে হুলাগঞ্জে এসে খবর
দিলেন—সেখানে সেক্টরী হবার মতন লোক পাওয়া যাচ্ছে না,
হুলাগঞ্জ থেকে একজন লোক অবিলম্বে পাঠানো দরকার।

হুলাগঞ্জ ধানার অন্তর্গত প্রাচীন ইতিহাসে বিখ্যাত এক
পণ্ডিত্য এই বঙ্গবাগিনী। তিরসতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্মে যে বাঙ্গালী
পণ্ডিত দীপকর শ্রীজ্ঞান ইতিহাসে বিখ্যাত, তিনি জন্মেছিলেন এই
বঙ্গবাগিনী গ্রামেই। হুলাগঞ্জ থেকে মাইল পাঁচেক দূর—ইতিহাস-
বিখ্যাত রামপাল গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—রামপাল দাঁড়ির
পাশ দূরে। দাঁড়ি এখন মজে জঙ্গল হয়ে গেছে।

সেখানে কংগ্রেস সেক্টরী করে পাঠানো হল আমাকে। বাবার
সময় হুদার রাজনীতি একটু বুদ্ধিতে দেওয়া হল। পর পর কয়েকজন
সেক্টরী প্রেস্টার হয়ে জেলে গেছে। ময়মনসিং-এর কংগ্রেস নেতা
ও উকীল সূর্য সোমের বাড়ী এই বঙ্গবাগিনী গ্রামে, তিনি গ্রামের
কংগ্রেসেরও একটু খবরাখবর করে থাকেন। তাঁর ছেলে শিশির
সোমও সেক্টরী হয়ে জেলে গেছেন। তাঁর পর আর একজন কংগ্রেস
কর্মী কালীজীবন বোম সেক্টরী হয়ে জেলে গেছেন। তাঁর পরে
ভাষাভাষ ফুলের টিচার ফণী বাবু সেক্টরী হয়েছিলেন। ভাষাভাষ
ফুলই এখন কংগ্রেসের প্রধান ঘাঁটী।

ছিল হাই ফুল, সেটাই হল ভাষাভাষ ফুল, ছাত্রসংখ্যা ২০০র
মতন। জমিদার রায়বাহাদুর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রমেশ গুহ ছিলেন
সেক্টরী—তিনি বাধা দেন নি। কিন্তু তাঁর জাতি পূর্ণ গুহের
সঙ্গে ছিল তাঁর বহুকালের মামলা মোকদ্দমা। সেই পূর্ণ গুহ
ভাষাভাষ ফুলের সেক্টরী হয়ে কংগ্রেস কমিটির সাহায্যে রমেশ
গুহকে নানা ভাবে জড় করার চেষ্টা করেন। রমেশ বাবুর হুলাগঞ্জে
আসা বন্ধ হয়েছিল ভুলির শুভাবে, পূর্ণ বাবুর ব্যবস্থার। রমেশ বাবুর
একটা পা একটু ছোট, হুঁড়িয়ে হাঁটেন, হেঁটে হুলাগঞ্জে আসতে
পারেন না। পূর্ণ বাবু তাঁকে বেশ জড়ই করেছেন।

হাটে একটা ঘরে কংগ্রেস অফিস, অফিসের বাইরে একটা
খড় বোর্ডে রাজকার সবারপত্রের খবর, কংগ্রেস সংক্রান্ত খবর
সকলক্ষে হাতে লিখে সেট “দেওয়া হয়—সাধারণ লোক ভিড় করে
পড়ে বার।

আমি গিয়ে কংগ্রেস অফিসে উল্লু, খাওয়ার ব্যবস্থা হল
ভাষাভাষ ফুলের পণ্ডিত মশারের সঙ্গে। তিনি রেঁধে খেতেন।

সর্বকর্মের তলাটিয়ার করা চন্দ্রভূষণ, ডাকনাম সৌর, অসাবজ্জা
শিশির ঘের কালো, সত্যিকারের কর্মী। জোরে বোড়তে বোড়বে
পাঁচ মাইল দূরে মিরকামি হীমার বাট থেকে খবরের কাগজ এনে
বাড়ী বাড়ী বিলি করে, রাগা খাওয়ার ব্যবস্থা করে পণ্ডিত মশারের
সঙ্গেই খায়, এবং সারাদিন কংগ্রেসের তরফ থেকে সর্বপ্রকার লোকের
ধর্মকথামক গিয়ে কংগ্রেসের কাজ করে।

আমি গিয়েই চন্দ্রভূষণের সাহায্যে একথানা একাধি নোটস গি
বোর্ডে সেটে দিলুম—আমি অল্প, হুলাগঞ্জ থেকে বঙ্গবাগিনী
কংগ্রেসের ভাষ নিয়ে এসেছি—আমি শুভলু, কোন কোন কংগ্রেস
কর্মী কংগ্রেস সাগঠনকে তাঁর ব্যক্তিগত বিবাসে হাতিয়ার বলা
ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের উপর অত্যাচার করেছেন। এ দকা
কাজ কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। অত্যাচার এ দক্ষ কোন ঘটন
ঘটলে কংগ্রেস অফিসে জানালে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে।

“লোকটা কোলকাতা থেকে এসেছে” এটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল
এখন তারা ভাবলে “লোকটা জবরদস্ত”—কাজেই সবাই হয়ে গেল
সাধু। রমেশ গুহের বাড়ী নিকটেই—তিনি বিকেলে হাটে এ
নোটস দেখে আমার সঙ্গে আলোচন করলেন এবং চারের নিয়ম
করলেন। গেলুম এবং অনেক কথা শুনলুম ও জানলুম।

কলকাতায় ও সারা দেশে সভা-সমাবেশে স্বদেশী গান গা
বিখ্যাত ছরেন বোমের বাড়ী বঙ্গবাগিনী গ্রামে। তিনি এলেন
আলাপ হল—তাঁর বাড়ী একদিন নিমন্ত্রণ থেলুম।

কংগ্রেসের সব কাগজপত্র পুলিশ নিয়ে গেছে। কাজেই আ
নতুন খাতাপত্র তৈরী করলুম দু সেট—এক সেট থাকবে কং
অফিসে, আর সেট থাকবে গোপন। বিদ্যাবাবু (বোধ হয় মুখার্জি
হলেন গোপন দপ্তর বন্ধক। তাঁর ছেলেরা এখন কলেজ ছোয়া
বই-এর কারবার করছেন।

অজ্ঞান পরেই জীবন প্রেস্টার হল—ভাষাভাষার আইন
তখন পেড়ির ফুলে সাব ডিভিশনাল অফিসার এসেছেন ফণী মুখার্জি—
উত্তরপাড়ার অমরদার পিসতুতো ভাই—আগে আমাদের দলের সব
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হুলাগঞ্জেও তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধুই।

জীবন প্রেস্টার হতেই আমাকে বঙ্গবাগিনী থেকে সরিয়ে এ
জুড়ে দেওয়া হল ফুলে, জীবনের জায়গার। আমি পড়াশুনা ১ম, ২
৩য় শ্রেণীতে বাঙলা, এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভূগোল
তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা “সাধারণ” ক্লাশ—সব ছেলে
এসে বসতে পারতো এবং বার বা খুশী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো—
প্রশ্নের জবাব তাদের বুদ্ধিতে দেওয়া হত।

জীবনের মামলা উঠলো কোর্টে—জীবন বললে, I take a
part in the proceedings—কোন কথার জবাব সেবা না
প্রধান সাক্ষী গ্রামের দফাদার বললে, আমি জানি, জীবন বা
কংগ্রেসের বলটিয়ার। কোর্ট প্রশ্ন করলে, কেমন করে জানলে
দফাদার বললে,—উনি লোকের বাড়ী বাড়ী বিনা পরদায় চরকা দে
কলেরা হলে লোকের সেবা করেন। জীবনকে খালাস দেওয়া হল
কিন্তু জীবন আর ফুলে বোণ দিলে না,—উত্তরপাড়া বিভাগী
চলে “এল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে। বিপ্লবীদের আড্ডা-আগ্র
অন্ততম ছিল উত্তরপাড়া বিভাগী। খরচ বোপাতেন অমরদার।

হুলাগঞ্জেও একটা ছোট পৃথক আড্ডা করা হয়েছিল দাবা

দলের নিজস্ব-মুন্সীপাল প্রায় নামে একটা ছোট্ট থানাধীন লোকাল ছিল সামনের ক্যাম্পোজে—সেখানে বসন্তের জীবনের ভগিনীপতি হীরালাল বাবু, আর পিছনে চলতো আমাদের আড্ডা। দলের ছেলেরা স্থানীয় এবং বাইরেরকার, ওখানে আসতো।

আমি কাজ করতুম আপ খোরাকী। দরকার মত কিছু পরসাকড়ি খরচও করতুম। ফুলে প্রাইজ দেওয়া হবে, কিছু ভাল চালা দিলাম। ফুলের ছেলেরা তৈরী খদ্দেরের গামছা চাদর—সব মোটা ডায়মণ্ড কাটা, পিণ্ডী-পড়া সুরতোর প্রথম ব্যবহার রিজেক্ট মাল—একগালা জমে গেছে কংগ্রেস অফিসে—কেউ কেনে না—আমি কিছু টাকা দিয়ে সেগুলো নিয়ে বাড়ীতে দিলাম—“বা খুসী কর” বলে। একটা মেস করা হল, ভাল আর ভাত—সস্তার মাছও বাদ। আমি মাঝে মাঝে মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে ডজকট করতুম। রসগোল্লা আট আনা সের,—মাঝে মাঝে কিছু খেতুম ও খাওয়াতুম।

মাইল দু-আড়াই দূরে রেকাবীবাজার, বেশ বড় বাজার,—কয়েক শত মুসলমান কলুর বাস,—তাদের ডাকাত বলে ডাকনাম ছিল,—মদীতে কিস্তী মারা যেত আগে—এখন সেখানে হয়েছে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি—একসঙ্গে একঘরে—সেক্রেটারী একজন মুসলমান—সংগঠক ও নেতা আমাদের দলের সুরেন মজুমদার—২৫০ জন কলু ডলিটিয়ার এক কথায় ওঠে বসে,—সব অহিংস। কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা সব জায়গায় চেয়ে বেশী। বরাবরই সমানে বিলাতী কাপড়ের লোকান্দে শিকিট; বিবাদ বিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমার শালিশী বিচার প্রভৃতি সব জায়গায় চেয়ে সফল। লোকানের সামনে খদ্দের হাফ প্যান্ট কুর্তা-টুপী পরিহিত কলু ডলিটিয়ার বসলেই হল, লোকান্দে কেউ যাবে না। শিকিট; ফুলে নেওয়ার ব্যবস্থা হল, বিলাতী কাপড়ের গাঁট বেঁধে কংগ্রেসের ছাপ মেয়ে দেওয়া হবে, সে গাঁট

আর খেলা চলবে না, কংগ্রেস অফিসে কিছু জরিমানা দিতে হবে, আর, যে কদিন শিকিট; করতে হয়েছে, ডলিটিয়ারদের মীথ-শিটু আট আনা হিসাবে প্রোজ দিতে হবে। সুরেন মজুমদারের ম্যান।

শালিশী বিচারেও দু পক্ষই সম্মত হয়ে কংগ্রেস অফিসে কিছু কিছু সেলামী দিয়ে যেত। সব চেয়ে খচ্ছল কংগ্রেস খিলাফত কমিটি।

আমার হাতের টাকা-কড়ি ফুরিয়ে এল; একবার বাড়ী গিয়ে দেখে শুনে আসারও দরকার। ওদিকে জীবনেরও একবার মুন্সীপালে আসা দরকার। বন্দোবস্ত হল, আমি উত্তরপাড়ার বিভাগীঠে গিয়ে জীবনের জায়গায় দিন পনেরো বসবো, জীবন মুন্সীপাল ঘুরে বাবে।

গেলুম উত্তরপাড়া বিভাগীঠে। সেখানে কিছু ছেলে লেখাপড়াও শেখে, জমরদার ছেলেরাও সেখানেই পড়তো, আর নানা জায়গায় বিপ্লবী রিকুট কতকগুলি ছেলে সেখানেই থাকতো। সকালে খবরের কাগজ পড়ার মধ্য দিয়ে তাদের বৈরবিক শিক্ষার কাজ চলতো। তখন সেখানে বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের রাখাল দে প্রভৃতি ছিল, বারা পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দণ্ডিত হয়েছিল।

একবার বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করে এলুম, এবং গোপনে ব্যবস্থা করে বাড়ী ও জমি বন্ধক দিয়ে ৮০০০ টাকা সংগ্রহ করে ফেললুম। সর্গদী মহাজন বা খুসী লিখে নিলে, আমি নিবিবানে সহী করে দিলাম। খুব গোপনে ভায়ীর কাছে টাকাগুলো মেয়ে, কিছু বাগী-টানী দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে মুন্সীপালে ফিরে এলুম। ভায়ের পড়াশুনো বন্ধ হয়েছিল, তাকেও নিয়ে এলুম মুন্সীপালে। জীবনের বাড়ীতে থেকে সে শ্রাশ্রামাল ফুলে পড়তে লাগলো।

দুদিন বাদে শেখ সংগ্রাম আসবেই, কে কোথায় থাকবে বা মরবে কিছুই ঠিক নেই, কিসের বাড়ী? কিসের সঙ্গার? মনটা ঢাঙ্গাই হল।

[ক্রমশঃ]

প্রতীক্ষা

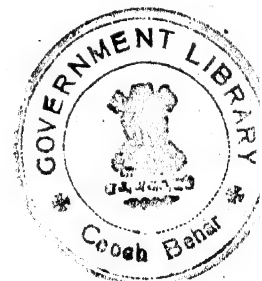
শ্রবণী চট্টোপাধ্যায়

বিমর্ষ বসন্ত কত বিপ্রলক্স-মধুরী-ডানার
আমার আকাশে বসে উৎকর্ষ ইত্যাদ্যাস ভিড়
জমিয়ে তুলেছে দ্রান অবসর সন্ধ্যার কিনারে
কত মরা কোকিলের শবে ভরে আছে মহদয়ার নীড়।

কত মীড় হারিয়েছে, কত গান হয়েছে ক্রন্দন
অনায়াত ফুল খরে শুকতারী কত হলো দ্রান
দ্রাবিড় আকাশে কত দ্রুতকাম অতমু কেঁপে ফেরে
কত দিন নীরব সেতারে ওঠনি কো ভৈরবীর তান।

সেদিন দেখেছি কত বালবৃদ্ধ নব আশা-বাসনা রক্তিম
কত ফুল, আহা, কত সুর—জানি, তুমি এনেছিলে মৃত্যুভরা প্রাণ।

এ শ্রাবণের মরা সীমারে অতীতের দ্বন্দ্বান জাগিরে
শ্রবণী-প্রতীক্ষা যদি করা শিউলির পথে আসে কোন বসন্তের গান।



শ্রীমতী
শ্রীমতী

অমিত্যভুতমঃ স্মৃতম্

১৩

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব হল।

কে ঈশ্বরপুরী ?

পূর্বাঙ্গম কামারহাটি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। অংগ কিছু পরিচয় নেই ? আছে। মহাপ্রেমমণিকতন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

কে মাধবেন্দ্র ?

চেননা তাকে ? মাধবেন্দ্রই তো লৌকিক লীলায় শ্রীগৌরান্দের দীক্ষাগুরু।

ধাকবার স্থায়ী কোনো স্থান নেই, তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ায় মাধবেন্দ্র। অবাচক। অবাচিত ভাবে কল-হুধ গেলে তবে খায়, নচেৎ নিরহু উপবাস।

ব্রজমণ্ডলে এসেছে মাধবেন্দ্র। গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যায় বসেছে গোবিন্দকুণ্ডের ধারে। আপনা-আপনি কিছু জোটেনি, তাই রয়েছে অনাহারে। না জুটুক, বসে বসে নামকীর্তন করি।

কোথা থেকে এক গোপবালক এসে হাজির। বললে, 'আমি এই গ্রামেই থাকি, আমি অবাচকদের খাবার জোটাই। এই নাও, একভাড়া দুধ এনেছি তোমার জন্যে। নাও, খেয়ে ফেল। ভাড়া আমি পরে এসে নিয়ে যাব।'

কি মিষ্টি দুধ। মাধবেন্দ্র খেয়ে নিল এক চুমুকে। কিরে এসে ভাড়া নিয়ে যাবে বালক, তারই প্রতীকার বলে রইল। কীর্তন করতে লাগল।

কিন্তু, কই, বালকের আর দেখা নেই।

শেখরভাতে স্বপ্ন দেখল মাধবেন্দ্র। এসেছে সেই বালক, মাধবেন্দ্রের হাত ধরে—তাকে নিয়ে এসেছে এক কুঞ্জ, বলছে, আমি কে জানো ?

কি !

যমুর হেসে বালক বললে, আমি গোবর্ধনের অধিপতি। আমি গোপাল।

তুমি ? তুমি হয়ে ডাকিয়ে রইল মাধবেন্দ্র।

জানো, আমার সেবক স্নেহের ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে চলে গিয়েছে। আর কিরে আসেনি। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে এখানে।

কষ্ট ? কিসের কষ্ট ?

একা থাকার কষ্ট। রোদ বৃষ্টি শীত দাবানলের কষ্ট।

আমি—আমি কী করতে পারি ?

তুমিই তো পারো, তোমার জন্যেই তো আমি বসে আছি। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ থেকে মুক্ত করো, সেবা-প্রতিষ্ঠা করো আমার।

যুম ভাঙল। ব্রজবাসীদের ডাকল মাধবেন্দ্র। তাদের নিয়ে আঁতিপাঁতি খুঁজতে বেরুল। অনেক সন্ধানের পর দেখা পেল গোপালের।

আর কথা নেই, গোবর্ধনের উপর বসিয়ে তার সেবা-প্রতিষ্ঠা করল।

কিছু দিন পরে স্বপ্নে আবার দেখা দিল গোপাল। মাধবেন্দ্রকে বললে, তুমি আমার অঙ্গের তাপ দূর করার জন্যে অনেক সেবা করেছে, কিন্তু জানো, এখনো আমি শীতল হইনি।

কিসে শীতল হবে বলো ?

মলয়জ চন্দন লেপন করলে বৃষ্টি শীতল হই।

আনবে সে চন্দন ?

সে চন্দন কোথায় ?

নীলাচলে।

তখনি যাত্রা করল মাধবেন্দ্র। প্রথমে এল শান্তিপুরে, অষ্টৈতের ঘরে। পুরীগোবিন্দীর প্রেমাবেশ দেখে অষ্টৈতের আনন্দ আর ধরে না। বলে, আমাকে দীক্ষা দিয়ে যাও।

অষ্টৈতকে দীক্ষা দিয়ে মাধবেন্দ্র যাত্রা করল দক্ষিণে। এল রেণুপায়, বালেশ্বরের এক গ্রামে। রেণুপায় গোপীনাথকে দর্শন করল, কি কি তার ভোগ লাগে জানতে চাইল সবিস্তার। তেমনি ভোগ লাগাব গোপালের। জানতে পেল সন্ধ্যায় যে ভোগ দেওয়া হয় গোপীনাথকে, তার নাম অমৃতকলি। সে আবার কী জিনিস ? সে এক অপূর্ব কীর, গোপীনাথের কীর বলেই সবাই জানে। দ্বাদশ পায়ে তা নিবেদন করা হয়। জাহা, তেমনি একটু কীর যদি পেতাম

আলোকচিত্র

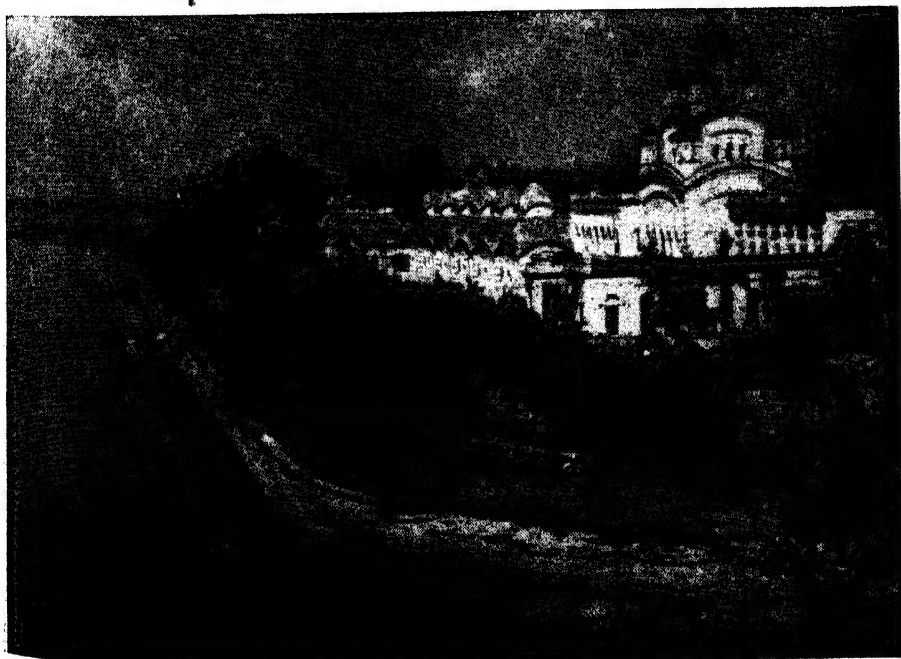
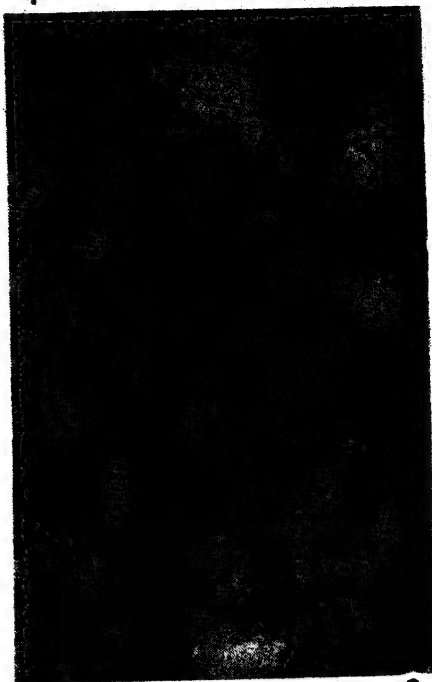
ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না ।]

প্রতীক

—বহু বস্তুপাঠ্য

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—মিহির বস্তুপাঠ্য



বিজ্ঞান-সংগ্রহ



—সংগ্রহ—





বাগ-পাইপ (নেপাল)

—রঞ্জিত মিত্র

যাচিত, দেখতাম খেয়ে কেমন তার স্বাদ-গন্ধ। যদি
লো হত অমনি করে রেখে খাওয়ারাম আমার
পাশাপাশে।

হি, হি, আমি না অবাচক-বৃদ্ধি গ্রহণ করেছি।
বে আমার মনে ক্ষীর পাওয়ার, ক্ষীর খাওয়ার
স্নান কেন? নিজেকে ধিকার দিতে লাগল,
টুকু কিছুর না বলে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে
গল অন্তমনে। গ্রামের শূন্যহাটে বসে কীর্জন করতে
গল।

এদিকে পূজারী গোপীনাথের শয়ন দিয়ে ঘরে গিয়ে
মিয়েছে, স্বপ্ন দেখল। গোপীনাথ বলছে, ওঠ, দরজা
খোল। আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্তে একভাড়া
দর লুকিয়ে রেখেছি। যাও তাকে দিয়ে এস।
দ শূন্য হাটে বসে আছে একা-একা। কোথায় ক্ষীর,
কোথায় লুকিয়ে রেখেছি? পূজারী অবাক মানল।
আমার মায়ার তোমার তা চোখে পড়েনি, সেই ক্ষীর
আমার খড়ার খাঁচলে লুকানো আছে।

পূজারী ছুটে গিয়ে মন্দিরের দ্বার খুলল। কি
মসৃণ, গোপীনাথের বস্ত্রাঙ্কলের নিচে ক্ষীরভাণ্ড।

ক্ষীরের ভাড়া নিয়ে ছুটল পূজারী। কিন্তু কে
মাধবেন্দ্র, এত রাতে কোথায় কোন ভাণ্ডে লুকিয়ে
যাচ্ছে? হাটে ঢুক ডাকতে লাগল চৈচিয়ে, কে
মাধবপুরী, কোথায় আছ, বেরিয়ে এস শিগগির।
তোমার জন্তে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। চুরি
ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে।

সাড়াও নেই শব্দও নেই, কোথায় মাধবেন্দ্র?
গোপীনাথের স্বপ্ন কি তবে মিথ্যে?

গিহ্বলের মত বেরিয়ে এল মাধব। এই যে
মামি, কোথায় আমার গোপালভোগ?

প্রেমশ্রুতিবিগলিতনেত্র মাধবকে দেখে পূজারী
বম্বু হয়ে গেল। প্রশংসা করল দণ্ডবৎ। এমনটি
হলে কি গোপীনাথ নিজে চোর সাজেন! চুরি
ঘরেন ভক্তের জন্তে, ভক্তপরিবশ হন।

মাধবের হাতে ক্ষীরভাণ্ড তুলে দিয়ে চলে গেল
পূজারী। মাধব সেই ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করল। সর্বত্র
মহুতায়িত হয়ে উঠল।

ভাণ্ডটা ভাঙল টুকরো-টুকরো করে, টুকরোগুলো
বঁধে নিল বহির্বাসে, ইচ্ছে একেত টুকরো খাবে
যত্নত। কিন্তু ভয় হল, রাত ভোর হলই ভিড়
মবে হাটে, দিকে-দিকে মুখ্যাতি কীর্জন শুরু হবে।

পূজারী কি ট্যাটার-পিটোতে বাকি রাখবে? সবজের
ভয়, আর কিছু নয়, প্রতিষ্ঠার। ভক্তির শত্রুই হল
খ্যাতি। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করো, কেউ বেন
তোমার না হস্তগা বাড়ার।

রাত্রি প্রত্যাহার আগেরই মাধবেন্দ্র রেমুণা ত্যাগ
করল। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠা চায় না, প্রতিষ্ঠা যে তারই
অমুগামিনী।

অন্তত গোপীনাথের তো প্রতিষ্ঠা হল। তার নাম
হল “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।”

মাধবেন্দ্র নীলাচলে এল, প্রেমবিহ্বল হয়ে দর্শন
করল জগন্নাথ।

পালাবে কোথায়? গোপালের জন্তে চন্দন নিয়ে
যাবে না? চন্দনই তো এখন তোমার বন্ধন হয়ে
দাঁড়াল। উপায় কি, নিজে ঠাণ্ডা না হই, গোপাল
তো ঠাণ্ডা হোক। জগন্নাথের সেবকাদর বললে
স্বপ্নবৃত্তান্ত। তারা রাজার লোকদের গিয়ে ধরলে।
রাজপুরুষদের আনুকূল্যে জোগাড় হল এক মণ চন্দন
আর বিশ তোলা কপূর। বহন করে নিয়ে যাবে
কে? রাজপুরুষরাই হুঁজুন বাহক দিয়ে দিল।
চন্দন আর কপূর নিয়ে মাধবেন্দ্র ফিরে এল
রেমুণায়। যাবার আগে আরেক বার দেখে যাই
গোপীনাথকে।

রাতে আবার স্বপ্ন দেখল মাধব। দেখল গোপাল
এসেছে। মুখে মদিরমধুর হাসি। বলছে, মাধব,
তোমার প্রেমচন্দন কত গাঢ় তা পরীক্ষা করবার জন্তে
তোমাকে বৃক্ষচন্দন আনতে বলেছিলাম। এ বৃক্ষচন্দন
আর তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি এ
চন্দন গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন কর। তাতেই
আমার তাপক্ষয় হবে।

গোপীনাথকে মাথালেই তুমি শীতল হবে?

হব। গোপীনাথের আর আমার একই অঙ্গ।

পূজারীকে ডাকল মাধবেন্দ্র। শোনাল গোপালের
প্রত্যাশ। হুঁজনে চন্দন ঘষতে বসে গেল আর
হুঁজন লাগল গায়ে মাখাতে। প্রত্যহ চলল এমন
ঘর্ষণ-অক্ষণ। যত দিনে না চন্দন শেষ হল মাধবেন্দ্র
থেকে গেল রেমুণায়।

যখন দেহ রাখছে মাধবেন্দ্র, এই বলে কাঁদছে,
পেলাম না, পেলাম না, কৃষ্ণ পেলাম না, মধুবা
পেলাম না, কিছুই পেলাম না। হে দীনবরাহ,
হে করুণাকর্তন, তোমার অলোককাতর হয়ে বুকে

ঝেঁড়াছি পথে-পথে, কবে তোমার দর্শন পাব ? আর
যত দিন তুমি থাকবে অদর্শনে, কি করব আমি,
কোথায় যাব, কেমন করে আমার দিন কাটিবে ?

সেই মাথবেস্তের আশীর্বাদমন্ত ঈশ্বর। সর্বদা
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। একখানা আবার কাব্যগ্রন্থ
লিখেছে, নাম ঐকফলীলায়ত। চাদরের নিচে
সবসময়ে রয়েছে সে পুঁথি। অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র
ঈশ্বরকৃষ্ণপার্শ্ব।

অলঙ্কিত আছে নবদীপে। আর কেউ না
পারুক চিনতে পেরেছে গৌরহরি। অন্তত ভক্ত বলে
চিনতে পেরেছে।

কৃপানুধাসরিং শ্রীগৌরাক। নদীর জল যখন কুল
ছাপিয়ে মাঠে এসে পড়ে তখন কী হয় ? সমস্ত
মাঠ জলে ভেসে যায়, ডুবে যায়। কিন্তু কতকগুলি
দাঁড়ায় জল, কোথায় দাঁড়ায় ? যে সব জায়গা উঁচু বা
সমতল সেখানে দাঁড়ায় না, সেখান থেকে সরে পড়ে
আন্ত-আন্তে। কিন্তু যে জায়গা নিচু, যে জায়গায়
গর্ত বা খোদল সেখানেই জল দাঁড়ায়, সেখানেই জল
জমে।

গৌরকৃপা সর্বত্র সমান ভাবে বণিত হচ্ছে, কিন্তু
অভিমানের ফাঁতি, বা অহমিকার ঔদ্ধত্য তাকে ধরে
রাখতে পারছে না। ধরে রাখতে পারছে কে ? ধরে
রাখতে পারছে শূন্যতা, দীনতা, নিরভিমানতা। এ নয়
যে ভগবান শুধু ভক্তকেই কৃপা করেন। ভগবানের
কৃপা অছিন্নপ্রবাহী, নিরন্তর তার বর্ষণ হচ্ছে সর্বত্র।
ভক্তই একমাত্র পাত্র যার মধ্যে কৃপা থাকতে পারে,
জমতে পারে। যেমন গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল তেমনি
ভক্তির মধ্যে, দৈন্তের মধ্যে, অহঙ্কারশূন্যতার মধ্যে
ভগবানের কৃপা।

পড়িয়ে কিরূপে একদিন নিমাই, পথে ঈশ্বরপুরীর
সঙ্গে দেখা। দ্বিধা-কুণ্ঠা নেই, ঈশ্বরকে প্রণাম করল
নিমাই।

‘তুমি কে ?’ জিগগেস করল ঈশ্বর।

‘আমি নিমাই।’

‘কোন নিমাই ?’

‘পড়ুয়ারের পুঁথি পড়াই, আমি নিমাই পণ্ডিত।’

‘তুমি ?’ কত নাম-ডাক শুনেছে, সেই লোক
চোখের সামনে, ঈশ্বর নিনিমেব তাকিয়ে রইল। তাই
সিদ্ধপুরুষের মত তোমার এমন পরম গম্ভীর শরীর,
এমন প্রেমগরিপূর্ণ চোখ—

‘আপনি ?’

‘আমি এক কৃষ্ণকথক। কৃষ্ণপ্রস্তাবই আমার
একমাত্র প্রসঙ্গ।’

‘তবে আর কথা নেই। চলুন আমাদের ঘরে।
সেখানেই আচ্ছ ভিক্ষা করবেন প্রসাদ।’ সনির্বন্ধ
নিমন্ত্রণ করল নিমাই।

‘তাই চलो। তোমাদের ঘরে গেলে সর্বকণ,
বহুকণ তোমাকে দেখতে পারব চোখ ভরে। তোমার
চোখের দৃষ্টিই তো আমার পরম প্রসাদ।’

প্রহ্লাদকে তার বন্ধুরা জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ,
সুখ কিসে ? প্রহ্লাদ বললে, স্বার্থপর হয়ে যদি শুধু
নিজের সুখ খুঁজে বেড়াও, সুখ নেই, পাবে না সুখ।
কিসে পাখ তব ? প্রহ্লাদ বললে, আমাদের একজন
প্রিয়জন আছে তার নাম আত্মা। সে পূর্ণতৃপ্ত,
নিত্যশুখী, তার কোনো অভাব নেই আকাজকা নেই।
আমাদের কী এমন সেবা আছে না শ্রীতি আছে যে
তাকে আমরা সুখী করব। কিন্তু মজা কী জানে,
যদি আমরা তাকে সুখী করবার জন্তে চেষ্টা করি
তা হলেই আমাদের সুখ হয়। আমাদের সুখ শুধু
সেই আত্মাকে সুখী করবার উত্তমে। আর কোনো
উপায়েই, কোনো রহস্যেই, আমাদের সুখ নেই।

দর্পণ দেখ, দর্পণে দেখ তোমার মুখচ্ছায়া। তোমার
ইচ্ছে হল তিলকচন্দনের ফাঁটা কেটে এ প্রতিবিম্বকে
সুখী করি। দর্পণের পিছনে হাত বাড়িয়ে প্রতিবিম্বকে
ধরতে গেলে, নিফল সেই চেষ্টেচেষ্টা। তখন কী কর।
বিশে অর্থীং নিজস্বোচ্চতলক চন্দন রচনা করো, তাই
তখন ফুটে উঠবে প্রতিবিম্ব। তুমি হাসলেই প্রতিবিম্ব
হাসে, তুমি সুখী হলেই প্রতিবিম্ব সুখী। তোমার
মাধ্যম ছাড়া প্রতিবিম্বকে ধরাছোঁয়া যাবে না, তোমার
মাধ্যম ছাড়া পৌঁছানো যাবে না প্রতিবিম্ব। তাই
আত্মার সুখেই আত্মসুখ। তাই কৃষ্ণসুখে সুখী—এ
ছাড়া আর পথ নেই, কোশল নেই।

সুতরাং বিচিত্র বাসনা স্বীকার করে কৃষ্ণসুখসাধনে
তৎপর হও। যারা গোবিন্দকে ভালোবাসে তারা
বাসনাকে হেয় করে না, নষ্ট-দম্ব করে না, পূর্ণমাত্রায়
বাঁচিয়ে রাখে। তারা কৃষ্ণের জন্তে কুল তোলে, মালা
গাঁখে, চন্দন ঘষে, সে মালাচন্দন কৃষ্ণের গলার হলিরে
দেয়। কৃষ্ণের জন্তে তারা গরু ছুঁয়ে ছুঁ ছালা দিয়ে
কীর তৈরি করে। কৃষ্ণ দেখে খুশি হবে বলে
নয়নে কাজল দেয়, অধরে তাম্বুল লেপে। কটা

আর হাসিকে যুগপৎ উজ্জ্বল করে। লাবণ্যের
কৃতির জন্তে গাত্রমার্জনার তৎপর হয়। অশাসনের
টেউ আনেহাসনে। সকল বাসনা কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্তে
উৎসর্গ করে। কাঁকে তুমি শারীরিক ক্রেশ বলছ,
এ কৃকভোগ, এ কৃকস্থান, এ কৃকস্পর্শ। এই আমার
অনন্দসন্দোহ। শীতে কি করল গোপী? গায়ের
উত্তরায় কৃককে দিয়ে নিজে রইল রিক্তপাণ্ডে—কৃক যদি
উত্তাপ থাকে তাহলে আর আমার শীত কোথায়?
কৃক যদি আরামে থাকে তাহলে আমার আর
ব্যথি কি।

শান্তি শান্তি—শান্তি তো সুখ নয়। আমি স্বস্তি
চাই না, আমি সুখ চাই। শান্তি মানে কি? শান্তি
মানে হুংখনিবৃত্তি, হুংখ পরিহার। হুংখ যাতে না
হুংতে পারে তেমনি একটা হুরক্তিত অবস্থায় আসা
শান্তি। কিন্তু আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য তো
নষ্টক নয়, সঙ্গক। আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য
সুখ। ঘুমিয়ে পড়া নয়, জেগে থাকা।

আর এ সুখ আমার নিত্যসুখ। এ সুখে বয়স
নেই জরা নেই মৃত্যু নেই, নেই দুর্ধ্ব কালপ্রতাপ।
আমার পাঁচ বছরের গোপাল পাঁচ বছরেরই থাকে।
আমার কিশোরকৃক নওলকিশোরই থাকে, নিত্য-
কিশোর, কোনোদিন সে বড়ো হয় না। আর তুমি
যদি তার বোড়শী সখী হও তুমিও থাকবে তেমনি
চিরন্তনই স্থিরদেহী। জাগতিক সুখ গোয়ালার হুখের
মত, জল-মেশানো। স্বার্থদোষ কামদোষের ছোঁরাচ
লাগা। আর ব্রজের সুখ? ব্রজের সুখ খাটি হুখ,
গুরু-গুরু-মধু খাটু, নেই একবিন্দু কামস্বার্থের গন্ধ।
নিঃসুখে তাৎপর্য নেই, রাধাকৃক সুখী হলেই আমার
অনিবার্য সুখ। আমার অনিবার্য জাগতি।

নিমাইয়ের ঘরে আতিথ্য নিল ঈশ্বর।

তারপর কিছুদিন বাসা নিল গোপীনাথ আচার্যের
ঘরে। রোজ সেখানে তার কৃকলীলায়ত পুঁথি পড়িয়ে
শোনায় গদাধরকে। একদিন নিমাই এসে হাজির।
নিমাইকে দেখে ঈশ্বরের ঘেমন কুঠা তেমনি উৎসাহ।
তুমি জগৎখ্যাত পণ্ডিত, তুমি গুনবে আমার পুঁথি?
কেন গুনব না? কৃককথার কি তুচ্ছা মেটে?

‘তাহলে শোনো। কিন্তু এক কথা।’

‘কি কথা?’

‘কোথায় কি দোষ-ত্রুটি হয়েছে বলবে সব
সরল ভাবে।’

‘দোষত্রুটি?’ নিমাই উত্তেজিত হয়ে বললে,
‘ভক্ত কৃষ্ণের কথা লিখছে তাতে আবার দোষত্রুটি কি।
কার সাধ্য কৃককথার দোষ ধরে। ভক্তবাক্যে যে
দোষ দেখে সেই পাপী, সেই দোষী। ভক্তের বেরকমই
হৃন্দ-কবির হোক, কৃষ্ণের অখণ্ড বিনোদ।’

ঈশ্বরপুরী চুপ করে রইল।

‘যে যুথ সে ‘বিকায়’ বলছে আর যে পণ্ডিত সে
ঠিক-ঠিক বলছে ‘বিকাবে’।’ নিমাই বলছে হাসিমুখে,
‘কিন্তু বিষ্ণু কি তারতম্য করছেন? হুই-ই তিনি
সমান ভাবে গ্রহণ করছেন। কেন করবেন না?
তিনি যে ভাবগ্রাহী জনার্দন।’

মুখে বোসে বিকায়, বিকাবে বোসে বীর।

হুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃক বীর।

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।

ভক্তের বর্ণনামাত্র কৃষ্ণের সম্ভাব্য।

আরেক দিন ব্যাকরণের কথা উঠল, আত্মনেপদী
না পরস্মৈপদী। নিমাই বললে, ‘যে ধাতুর কথা
বলছেন সে পরস্মৈপদী।’

বিভারস-বিচারে ঈশ্বরও পশ্চাৎপদ নয়। সে
দেখিয়ে দিল তুল হয়েছে নিমাইয়ের। ধাতু পরস্মৈপদী
নয়, আত্মনেপদী।

হার মানল নিমাই। ভক্তের কাছে ভূত্যের
কাছে হার মানতে তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। কিন্তু
যাই বলো, আত্মপদ, অহঙ্কারের পদ নয়; পরপদ,
পরমপদই নিতুল। পরমপদই স্থিরতম আশ্রয়।

ত্রীকৃক আবার অবতীর্ণ হলেন কেন? তার মুখ্য
বা অন্তরঙ্গ কারণ কি? শুধু প্রেমরসনির্বাসের আশ্বাদন
আর রাগমার্গ ভক্তিপ্রচার।

ভূভারহরণের জন্তে নয়, ভক্তিব্যোগবিধানের জন্তে
তার আসা।

কি রকম ভক্তি? রাগমার্গের ভক্তি। আত্মসুখ
চাই না পরসুখেই পরমসুখ—এই হল প্রেমসার।

[ক্রমশঃ]

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

২

শিশিরকুমারের কথা বলতে গেলেই হুটি জায়গার কথা আমাদের মনে পড়ে—৬নং বঙ্কিম-চ্যাটার্জি স্ট্রীটে গ্রন্থজগতের ঘর আর ২৭৮নং বারাকপুর ট্রাক রোডের বাড়ীতে তাঁর নিজস্ব ঘর। এ ছাড়া শ্রীলক্ষ্মণ রক্ষমণ্ডের বা ওখানে যে ঘরে তিনি থাকতেন, তার কথাও হয়ত বলা চলত, কিন্তু অকারণ কথার জাল বুনে সময় কাটানোর প্রয়োজন কি? তবে প্রথম হুটি ঘরের পরিবেশেই তাঁর কথা আমরা শুনেছি বলে, পরিবেশ বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করছি।

গৌলদাঁধের আশে-পাশে নানা আকর্ষণ পথচারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কাজেই তাদের মধ্যে ৬নং বাড়িটির নজরে পড়বার মত কোন জুই নেই। একেবারে সেকলে প্যাটার্নের দোতলা বাড়ি, বাইরের দিকে কাঠের বারান্দা, তার কাঠগুলোও নড়বড়ে হয়ে গেছে, নীচের ঘরগুলোর সারি সারি বই-এর দোকান—অবশ্য নামকরা কোন কোম্পানী নয়, তাই সাধারণের সঙ্গে পরিচয় এদের অল্প। উপযুক্ত সজ্জা না পাওয়ার দরুনই বোধ হয় বাড়িটা সাধারণের চোখে অপরিচিতই হয়ে গেছে। অথচ বাড়িটার চিন্তাক্ষেত্রে যে সব মনোবীর দান আমরা সগর্বে স্বীকার করি তাঁদের অনেকেই এ বাড়িতে বহু বার এসেছেন।

বাড়ির প্রথম মালিক ডেভিড হেরারের নাম আজকের দিনে কোন বাঙালীকেই বোধ হয় বলতে হবে না। এ বাড়ির প্রতিটি কামরার সেদিন উনবিংশ শতকের নব জাগরণের অগ্রদূতরা এসে যে রীতিমত সোরগোল তুলতেন তা এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও আমরা কল্পনা করতে পারি। হিন্দু কলেজের মাতকররা ছাত্রদের সঙ্গে এসে ডায়-নেটিভ দশা থেকে ি করে মুক্তিলাভ করা যায়, তার উপায় নির্ধারণ করন আর নাই করেন, কুসংস্কারের বাড়ী দেশবাসীদের আলোকের স্রোতে আনার পন্থা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক যে করতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশের সজ্জাবনার প্রথম অমুরোপাম কাঁর কাঁর এ বাড়ীতেই হয়েছিল তার খবর আমাদের জানা নেই; জানলে সে যুগের বহু বিখ্যাত মনোবীর নামই যে নজরে পড়ত তাতে বিম্বমাত্র দ্বিধা নেই আমাদের।

ডেভিড হেরারের যুগ কাটিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে এ বাড়িতে দেখতে পাই আমরা আর একজন বিখ্যাত বাঙালী মনোবীক। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সজীবনী' সে সময়ে বাড়ীনা দেশে রীতিমত আলোড়ন তুলত। 'সজীবনী' পত্রিকার বহু বিখ্যাত রচনাই হয়ত তৎকালীন বিশুদ্ধ জনসমাজের সামনে পড়া হয়েছিল এবং ফরাসের ওপর বসে পান-তামাক খেতে খেতে সে সবকে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভ মতামতও হস্ত দিয়েছিলেন।

মোসামমাঘের কাছে শ্রীঅরবিন্দ বা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এসে অনেক দিন কাটিয়ে গেছেন, আর সেই সময় তাঁদের বন্ধু ও পরিচিত লোকদের সঙ্গে আসলোচনা করে বাড়ীনা দেশে স্বাস্থ্যবাসের জন্মও বোধ হয় এই বাড়ীতেই কোন ঘরে বসে দিয়েছিলেন তাঁরা।

এমনি বহু মনোবীর আনাগোণার একশ' বছরের ওপর মুখ থেকেছে ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িটি। অথচ সেখানেকার বোবা মাটিতে কারো পদচিহ্নই আজ দেখা যায় না। আজ ব্যস্ত-সমস্ত খরিকারের দল লিট্টা মাফিক বই কিনতে দোকান দোকান হানা দিচ্ছে। তাদের প্রয়োজনের গভীর বাইরে নজর দেবার মত অবকাশ তাদের কোথায়? অবশ্য সে অবকাশ থাকলে এই বাড়ির একটি ঘরের বৈশিষ্ট্য তাদের নজরে পড়ত।

দরজা দিয়ে ঢুকে দু'পাশের কাঠ দিয়ে ঘেরা দোকানঘরগুলো পেরিয়ে, ওপরে ওঠার সিঁড়ি বায়ে রেখে, ডাইনের কাদা-প্যাচপেচে উঠানটা পেরিয়ে যে ঘরের সামনে দাঁড়তে হয় তার শাজসজ্জা সাধারণ দোকান-ঘরের মত নয় ঠিক। সামনের দরজার প্যাডেলগুলোতে হুম্বার মাহুরের টুকরো বেত দিয়ে আটকানো। দরজার ঠিক ওপরে চৌকো জেট সোটারের গায়ে শোলার চামরালা, তার নীচেই স্নুড্ড কাপড়ের কালর।

ঘরের ভেতরে ঢুকে একটু এগিয়ে এলেই, কাঠের ওপর বেত দিয়ে আটকানো হুম্বার মোড়া কাউটার। কাউটারের পেছনে গোটা দুই তিন বই ঠাসা আলমারী—এইটুকুতেই দোকানের লক্ষণ। ঘরের বাকী অংশের বেশীর ভাগ ছুড়ে একজোড়া তক্তাপোষের ওপর ফরাস পাতা আর তার চার পাশে কতকগুলো মোড়া পাতা। পশ্চিম দিক ছাড়া বাকী তিন দিকে বুকসম্যান উঁচুতে কাঠের ব্ল্যাক-গ্রানাইট কাজে লাগানো হয়। ঘরের এখানে শুধানে শোলার ময়ূর ও অস্ত্র শোলার কাজ। সবটা মিলিয়ে বৈঠকখানার চেহারাটি ফুটে ওঠে। এখানে প্রায়ই আসতেন শিশিরকুমার। আসতেন রিসার্চাল দিতে, আসতেন নাটক পড়তে, আসতেন আসর জমাতে।

এখানেই হ'ত নব্য বাঙালী নাট্য পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন, সেখানে আসতেন, অপ্রতিরূপী শিল্পী ভোলু চট্টোপাধ্যায়—বার আঁকা 'নিউ জেনারেশন' পশ্চিমের দেওয়ালের মাথখানটা ছুড়ে বুলছে, তার ডাইনে রয়েছে শিশিরকুমারের বসা একটা ছবি আর বায়ে ফরাসী শিল্পী তুলু লোজেকের 'নিজের চেহারা' আর তাঁর জীবনীকার পেয়ের লা যুগের ছবি—রসজ্ঞ পণ্ডিত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী লেখক ও শিল্পী সেবজিত মুখোপাধ্যায়, চিত্র ও নাট্য সমালোচক পঙ্কজকুমার দত্ত, জ্যোতির্বিদ বসু-বাবু, মহুজেন্দ্র ভট্ট, সাহিত্যিক শিবনারায়ণ রায়, কুমারেশ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, অধ্যাপক ভারত গঙ্গোপাধ্যায়, হারাগ চক্রবর্তী, কাউন্সিলার তারাশ্রম মিত্র, কবিরাম বসু, অভিনেতা গৌর চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জামলী চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে রক্তমালায় মধ্যমির মত উজ্জ্বল ভাস্কর হয়ে বিরাজ করতেন শিশিরকুমার।

২৭৮ নং বারাকপুর ট্রাক রোডের বাড়িটার সর্বস্ব বেন মাথানো আছে একটা শালু বিহাদ। সামনের অশখগাছটার ডেবর খোলা হাওয়া বেন সেই বিহাদের স্মরণটাই করে নিলে যায়।

বাড়ির অবস্থা খুব ভাল নয়, সেখানে মনে হত এই ঘুরি আসে। বোলা নর্থবার ওপার বাঁধানো দাঁকোজাতের জিমিরটার দর পাশে ছড়ানো এক রাস পাখরের খোঁয়া। কোন দিন হয়ত গাভী সাধারণ হলে তারই প্রতীক হিসাবে ঢালা হয়েছিল তাদের। কিন্তু প্রতীক চাপে হস্তগত পাখর অবস্থা হলে গুঁঠে পোঁটনীর। কানরকমে পাশ কাটরে বাড়ির সমরে এসে পাঁড়ালে প্রথমেই নজরে পড়ে দু' পাশের ছোটো দোকান।

কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে পাঁড়ালে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক পোঁটী দুই তিন চেয়ার আর রঙটা একটা চৌকো টেবিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের বসার ঘর। এখানে শিশিরকুমারের কোন শাশি আমাদের নজরে পড়নি।

বাইরের ঘর পেরিয়ে দোতলায় উঠার সিঁড়ি—সর সর উঁচু উঁচু ধাপগুলো পোঁটী দুই বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ছোট একটা ছাদে। ছাদে ওপাশেই শিশিরকুমারের ঘর। সে ঘর থেকে বাইরের বড় রাস্তার জীবনের প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। ঘরের মধ্যেও তাই জীবনের স্তব্ধ প্রতীক, ভবিষ্যতের পথনির্দেশের অপেক্ষার।

ঘরের একটা দিক ছুড়ে একটা জোড়া খাট, মাঝখানে একটা সোকা, তার পাশে উপরে খানকতক বই আর অ্যান্ট্রি। অন্য দিকে ছোট একটা খাট—তিনি ঐ খাটেই শোন। ঘরে একখানি মাত্র চেয়ার—কেউ এসে বসতে দেওয়া হয়, লোক বেশী এসে জোড়া খাটে বসে। ঘরের বাকী অংশে শুধু বই—অধিকাংশই নাটক, যক্ষসম্বন্ধীয় বা সমালোচনা, তার মধ্যে সমালোচকের গ্রন্থাবলী আছে, আছে অন্তর্বিদেশী নাট্যকারদের নাটক, নাটক ও যক্ষসম্বন্ধীয় বিভিন্ন যুগের লেখা বই, বহু বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকের রচনা সংগ্রহ, বাঙালি নাটকের প্রায় সব কাঁচি বই আর কিছু সাংস্কৃত কাব্য ও নাটক।

ঘরের তিন দিকের দেওয়ালে তিনটি ছবি—নিউইয়র্কে পৌছানোর পরেই তোলা শিশিরকুমারের ছবি। মাইকেলের রূপসম্ভার শিশিরকুমার—ছবির পাশে বোধ হয় 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি হাতে দেখা আর সমরনারায়ণের সঙ্গে স্বভাষাচন্দ্র।

ঘরের সর্বত্র শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের ছাপ। কিন্তু এ শিশিরকুমার গ্রন্থসম্ভারের আসরের মধ্যমণি শিশিরকুমার নন ইনি, এ অনাদৃত কমল হীরা যার হুতি একদিন দিগন্ত উজ্জ্বলি ছিল কিন্তু যা ইতিমধ্যেই মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে।

৩

প্রথম বৈদ্যের কথা আমাদের খাতার লেখা আছে, দেখা যাক সেটা ১৯৫৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, কয়েক দিন পরেই এটালী কলিকাতার কনকারেন্সে (এর আর এক নাম কলিকাতা সঙ্কলিত সম্মেলন, প্রধান শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। দ্বিতীয় নামটিতেও বিশেষভাবে পরিচিত) উল্লিখিত সাংস্কৃতিক সংস্থাটি) নাট্যাচার্যের অভিনয় করার কথা মাইকেলের ভূমিকার, তাই রিহাস্যাল নিচ্ছেন আর অন্ত্যস্ত সমস্ত চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে পোষাচ্ছেন। কে একজন তাঁর নিজের ভূমিকা বলতে গিয়ে কথাগুলো বলেছে—একটু টেনে বলার নাট্যাচার্য সেটা সংশোধন করে দিয়ে বলেন—প্রত্যেক লোকেরই একটি না একটি যুক্তিদেব থাকে।

আমাদের 'আঁটির একটান আমার মুখে মানার, অন্য লোক কপি করতে গেলে মানাবে কেন? সে, সে চৌধুরি।

অন্ত একজন অভিনেতার কথা উঠলো, মাইকেলে কোনো একটি চরিত্রের জন্য তাঁর নাম করা হ'লো। একটু ভেবে নাট্যাচার্য বলেন—অনেক দিন করেনি, সেই ১৯৪৩এ আর এটা ১৯৫৭ হ'লো বলে।

মাইকেলের মদ খাওয়ার কথা হচ্ছিল। কথার কথার বললেন—Rosy wine কেন বলে? Rosy condition হয় বলে? লাল রঙের এক মদ আছে বটে, কিন্তু সে তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলের মদ ঘরতে শেখানোর জন্যে ব্যবহার হয়।

এই সময় চা এসে পড়লো, শুঁকে দেওয়া হ'লো এক কাপ, একটা চুমুক দিয়েই বললেন—কী দিলে হে, গরম চিনির সরবৎ?

বাস্তব হলো—সে কি! খুব চিনি দিয়েছে ঘুরি?

চিনি তো বেশি দিয়েছেই, তার উপর চা একমুদা দেয়নি।

ইতিমধ্যে মাইকেলের সর্বাঙ্গে কে প্রেরণ করেছেন, তাকে উত্তর দিলেন—মিশ্র ছন্দে প্রথম গ্রন্থে প্রজ্ঞাননা কাব্যে। তার আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতার ছিল আইনমাসিক ছন্দ। এই লোকটাই প্রথম নিগড় ভেঙে ফেললো। বাংলা দেশে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে বেনারসাসের কাদার বলতেই হবে।

চারে চিনি বেশি হয়েছে বলে আমার শুঁকে চা-টি খেতে বাধা করলাম, তাতে বললেন—বাওয়ার দিকে মন দিলে রিহাস্যাল দেওয়া হবে না। তবু কিছুটা চা দিতে বাওয়ার বললেন—আচ্ছা, দাঁও আধ কাপ, এখন আমার স্বাস্থ্যের দিকে তোমাদেরই নজর রাখতে হবে, আমার এখন কেউ নেই I am all alone একটু খেয়ে আমার বলতে শুরু করলেন—আমার যে কর্মকর্তা ছিল, সে এখন mentally as well as physically paralysed যা করতে হবে তোমরা।

নিজেরাই plan করে ঠিক করে নাও। এই সময় টাকা-পরসার কথা উঠল, তাতে বললেন—টাকা-পরসা হলে মানুষ মস্ত বড় একটা ভুল করে। ভাবে, তারা একটা মস্ত বড় কিছু হলো—কিন্তু বোঝে না মানে কেউ তাকে মনেও রাখবে না, সংসারকে কিছু দান করলে তবেই তাকে মানুষ মনে রাখে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠল এবার, বললেন—কোনো বিশ্বাস সত্য নয়। সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক, সত্য grow করছে। কেউ কেউ বলে ভগবানও grow করছে। সবাই মনে মনে একটি ঐক্যজ্ঞেয়। যে যার বিশ্বাস-জীবাণু বের বসে আছে। আর যা হওয়া উচিত নয় তাই হচ্ছে—গৌড়া হচ্ছে।

তারপর অভিনয়ের প্রসঙ্গ গেলেন, বললেন—আমার সত্তার বহুর বয়স হতে চললো। এ তো আর মিথ্যা কথা নয়। সত্তার বহুর সত্য হতে চললো। আমি চাই Playটি ভালো করতে। তোমরা সবাই টিক সময়ে ঢুকলে আর ধেরোলেই হবে। আমি আর পৌরশাস তো ভালোই করেছিলাম, লোকেও মন্য বলেনি।

চা আর দেবো কি না প্রশ্ন করার বললেন—না, আর চা দিয়ে না। আমি অসুস্থ, মনেও সুস্থ নই। তবে লোককে বলতে ভালোবাসি না যে অসুস্থ আমি।

কথা বলতে বলতে হাত থেকে চা-টা চলকে গিয়ে পড়লো, হাসলেন—দেখো, অসুস্থের মতো কেমন গারে এসে পড়লো চা-টা।

‘মাইকেল’ কইটা পাওয়া যায় না। এই অসুস্থতার উত্তরে বললেন—
—হ্যাঁ, কইটা ছাপাতে হবে। তারপর জানতে চাইলেন ক’টা বেছে নেবে,
আটাটা?

কল্যাণ—সাতো ম’টা।

চমকে উঠলেন সমর স্তরে, বললেন—এতো সমর কেটে গেল,
অথচ কই, রিহাস্টিয়াল তো তেমন হলো না। উঠে পড়লেন।

বারার সমর বললেন—আর কিছু গোলমাল না হয় তো আগামী
এপ্রিল মাসে we shall meet under এ ছাউনী। তবে
সইই ভাগ্য।

বাড়িতে বেতে বেতে কলকাতার থিয়েটারের ‘রি-মডেলিং’এর কথা
হচ্ছিল, তাতে উনি বললেন—আচ্ছা তো দেখলাম; কোন একটা
থিয়েটারের বাড়ি তো খুব ভালো করেনি, ঐ রকম হলো রত হবে?
ও যে পারখানার র। ঠিকের কি কিছু Improvement করেছে?
তা যদি না করে থাকে, এতো হেঁচক কেন? ত্রেক হজুগ?

পরের দিন আবার এসে রিহাস্টিয়ে। কে একজন হঠাৎ
হেসে উঠেছিল, শুনে বললেন—১৮১১ সালে আমি তখন আট
ম’বছরের ছেলে। একদিন এক খুঁটির সভার গেছি, সেখানকার
এক পাত্রীর প্রার্থনার সময় তার অচূত সুর শুনে খুঁক করে হেসে
উঠেছিলাম। তোমরা সে রকম অচূত শব্দ কেউ করে না।

মাইকেলের জীবন প্রসঙ্গে এক সময় বললেন—সেবকী বলে কেউ
নেই। ও যে কি করে মাইকেলের জীবনে এসে তা-ও জানি না।
আবার এক সময় একজনের কথা সন্ধান করে বললেন—মেসো অর্থাৎ
মাসির বর। আমি সেকেন্দ্রলোক, সেকেন্দ্র কথাই বলি। তারপর
হুনস্বর বাড়ির কথার বললেন—বাড়িটি তো ঐতিহাসিক বাড়ি।

ঐশ্বর্যবিক আসতেন শুনে বললেন—আসবেনই তো। না এসে
উপায় আছে? কেউ বাবু তো ঠিক মেসো ছিলেন।

আবার একজন রাজনারায়ণের পাট বলতে গিয়ে তুল উচ্চারণ
করেছেন, তাঁকে ব্রহ্মে দিলেন—বস্তুকতা নয়—বস্তুতা। তুমি
মধুর বাবা, হিন্দু-সান্নিধ্য জানো, পান্ডিত্য লোক। অথচ বস্তুতা
উচ্চারণ করতে পারো না। নীচেকার দাঁতের পঙ্কিভুক্ত আঙুল দিয়ে
চেষ্টা ধরো।

ইতিমধ্যে একজন একটু সুর করে কথা বলেছে, তাকে বললেন
সুর টেনে বলাছো কেন?

সুর টেনে বলে বাতায়, কান, সেখানে দুপট নেই। কাজেই
সুর করে না বললে আসত না। ঠেকে স্বাভাবিক সুরে বলা
দরকার।

এবার বললেন—সেখার চোখ সকলের থাকে না। শার্লক
হোমসের ছিল। আর কিছু কিছু লোকের ছিল। আর থাকে
সাহিত্যিকদের।

নিজের পাট বলতে গিয়ে গৌরের জাহ্নবাগ গোঁকুল বললেন।
তুলটি ধরিয়ে দিতে বললেন—কথাটি ঠিক বলেও কতি হয় না।
মধু মাতাল অবস্থায় বলেছে। তারপর স্বীকার করলেন—বলেই হয়েছে
সব কিছু ভুলে যাচ্ছি। বৃত্তিসক্তিও কমে গেছে।

এর পর মধুর সঙ্কত কাব্য আবৃত্তির প্রসঙ্গে বললেন—
সঙ্কতে মজা হচ্ছে যে, কোথার গিরে ক্রিশাশপ শাওরা হারে
ভায় ঠিক নেই।

কথা প্রসঙ্গে অতীতের অভিনেতৃত্বের কথা ওঠার উনি বললেন
—১৮৮১ সালে ভারতস্বকীর সময় সাত বছর। ভারী প্রথম
‘চৈতন্যলীলা’র জ্ঞান ওজার। এখানে বছর বয়েসে প্রবন্ধ নাটক
প্রথম বাবল করে।

দাদী বাবুর সম্বন্ধে বললেন—দাদী বাবুর—বলা। Wonderful
গলা, ও রকম গলা যদি আমার দিতেন। কিন্তু দিলেন না।

এর পর এসে ২রা জাহ্নবাবী। প্রথমে সব লোকজন আসেনি,
কাজেই রিহাস্টিয়াল না দিয়ে নানা রকম কথা হতে লাগল। কি খেতে
ভালো লাগে না লাগে সেই প্রসঙ্গে বললেন—বীথকপি-ভাতে খেতে
বেশ ভালো লাগে। তবে কৈবৎ কীটা থাকে চাই। ফুলকপি
নেহাইই আসত। পাঁতে আর জোর নেই। চারটে পাঁত বীথানো,
তাতে নাকি বেশ শোভা হয়।

অন্ত একটি কথা প্রসঙ্গে বললেন—চোদা বখীর কথার আর
একটি কথা মনে পড়লো। তখনও মনোমোহন থিয়েটারের
Possession ছাড়াইনি, হঠাৎ বার্ষিক দাদী লুপিশরা এক
ভয়লোক হাজির। বললেন থিয়েটারের পোষাক করাচ্ছেন,
আমাকে দেখে দিতে হবে। হাতে কোনো কাজ ছিল না।
রাজী হয়ে গেলুম, ভয়লোক বিশপ ষ্ট্রীটের একটি বাড়িতে নিয়ে
গেলেন। তেতলার ঘর, তখনও মাজানো হয়নি, শলমা
চুমকির কাজ করবার লোকেরা বসে। চারদিকে অনেক ভেলভেট
পড়ে রয়েছে। তখন সবচেয়ে ভালো ভেলভেটের দাম পঞ্চ-প্রতি
এক টাকা চোদা আনার বেশি নয়। সব জিন্দাস করতে একশ,
একশ একশ এইরকম যা গুলি বলে গেল। আমাকে অবাক হতে
দেখে তিনি বললেন—হ্যাঁ, এগুলো সবচেয়ে ভালো পোষাক, পাবলিক
থিয়েটারের পক্ষে অত দাম দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। বললুম—
সম্ভব তো নয়ই। কারণ সবচেয়ে ভালো ভেলভেট এক টাকা
চোদা আনা গজ অত দাম হবে কেন? পর আপনি জানেন না, তা
টাকা আশনার বইই থাকে। কথাটা তাঁর ভালো লাগল না।

এর পর কথার কথার স্বদেশীয়দের কথা উঠল। বললেন—
রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন a Prince among men, ১১০০
সালের কথা National University হবে, পাঁচ লাখ টাক
পাওয়া গেছে। গোলদীঘিতে সতীল মুখ্যো মশার সুবোধ মল্লিকের
টেলিগ্রাম পড়লেন—Another five is to follow.

গান শেখার কথার বললেন—সকতার মুখেই গান গেয়ে নেওর
ভালো। বার লজ্জা নেই তার যদি শেখবার ইচ্ছা থাকে তো তার
ভালো শিখতে পারে।

সংস্কৃতি সম্বলনের কথা উঠলে বললেন—সংস্কৃতি সম্বলন এখন
সার্বজনীন জগৎসংস্কারের মত পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে। ও সব না করে
একটা সংস্কৃতির পত্রিকা রের করো, কাজ হবে। এর পর পত্রিক
প্রসঙ্গে বললেন—বাংলা দেশের এক শ্রেষ্ঠ ইংরাজী মৌনিক
সম্পাদকের ন্যূন করে বললেন, ওকে বলেছিলুম বাধা মাইনে দিও
একজন ভালো ক্রিটিক রাখো।

মদ খাওয়ার কথার বললেন—রাম মদ খেতেন, সীতা মদ খেতেন
কেউই মদ খেতেন; আর ‘রামরাজ্যে’ এঁরা মদ খাওয়া বধ
করতে চাইতেন। গান্ধীজির Sense of humour ছিল না।

এবার রিহাস্টিয়াল শুরু হলো। উনি বললেন—সোফার কথা শু

কথার ওপর কথা বলবে Promptingএর দিকে কান দেবার তত্ব দরকার নেই।

আবার ঠর সঙ্গে দেখা হলো ঠর বাসার—১১শে জানুয়ারী। একজন কবি নাট্যকারের নাটক পড়তে নিয়ে গিয়েছিলেন। কথাদক ধার শিশিরকুমার বললেন—একটা জিনিষ হয়ত ভুলি লক্ষ্য করো, আমি কখনো মেক-আপ করে আয়নার দৃশ্য দেখি না। ইচ্ছা-মিরাকে জিজ্ঞাসা করি—সেখ, সব ঠিক আছে কি না। ব্যস! নিজের হা চেহারা আছে তার থেকে মেক-আপ করে কি রঙ মেখে কী সুন্দর লাগবে! আমার তো মনে হয় তা লাগবে না। অবর অস্ত্র সবাই থেকে থেকে মেক-আপ করা অবস্থার আয়নার সামনে মুখটা একবার দেখে নেয়—কেনন হয়েছে নিজেকে দেখতে।

১২ ফেব্রুয়ারী শিশিরকুমার এলেন গ্রন্থাগারে। তার ক'দিন আগে থেকে তিনি গিরিশ বাবু না অর্ধেনু বাবুর শিষ্য, এই নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছে। তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার বললেন—আমি গিরিশ বাবুকে জীবনে তিন-চার বার মাত্র দেখেছি সামান্যমানি। কথাবার্তাও কলছি। অর্ধেনু বাবুর সঙ্গে কোন দিন দেখাই করিনি।

অভিনেতা হিসেবে অর্ধেনু বাবু গিরিশ বাবুর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু গিরিশ বাবু ছিল realism, ছিল দর্শক-বিতারের ক্ষমতা আরও একটি কথা, গিরিশ বাবুই বাংলা মঞ্চকে লাইক দিয়েছেন, মঞ্চকে বাঁচাবার জন্যে সবরকম compromise করেছেন।

প্রত্যেক বড় অভিনেতাই অভিনয় কালে গুপ্ত ব্যবহার করেন অবশ্য playকে disturb না করে। অর্ধেনু বাবু কিন্তু playকে disturb করতেন।

দক্ষজ্ঞে গিরিশ বাবুকে প্রথম দেখি, কিন্তু তখন নাটক দেখার চোখ আমার কোথায়? তবে তাঁর সেই অদ্ভুত চোখ দুটির কথা আজও মনে আছে।

অর্ধেনু বাবু কিন্তু ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত।

[এর পর এক বছরের ওপর কোনো কিছু লেখা আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না।]

১৯৫৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আবার এলেন গ্রন্থাগারে। সেই সময় শিয়ার্সনের লাইক অফ ডিকেল পড়ছেন। এসেই বললেন—ওহ ডিকেল তো লোক সুবিধের ছিলেন না। তারপর নিজেরই হেসে বললেন—ভাঙাল পড়তে ভালই লাগে।

নাটক পড়ার কথা ওঠার বললেন—এলিজাবেথীয় যুগের নাটকগুলো পোলে ভাল হয়। গ্রীক নাটকও পড়া দরকার। তারপর ইংলেন্ড, ইতালেন্ড এই সব সেনসেশনের বই পড়বে।

এই সময় রিহার্সালের জন্য লোক জন এসে পড়লো। ক'দিন পরেই বেলেঘাটার সংস্কৃতি সম্মেলনে আলমগীর হবে। রিহার্সাল শুরু হবার আগে বললেন যে, নিকোলাই রাষ্ট্রের story of Mughal থেকে থেকে আলমগীরের অনেক কিছু নেওয়া। তারপর ওক হলো রিহার্সাল।

একজনকে পাঠ বলতে গিয়ে বললেন—থাম না কেন? Life of acting হচ্ছে pause। জীবনে বতী থামো, ট্রুকে থামবে তাঁর চেয়ে বেশি। নইলে লোক বুঝবে না। লোককে বোঝাবার জন্যে revive pause.

আবার পুরোনো যুগের কথা উঠলো। বললেন—দক্ষজ্ঞ দেখেছি, জাতি দেখেছি। আবার বললেন—কথা বলতে বলতে আমার মাথার ছবিগুলো ভেসে ওঠে। শব্দে চিত্র হয়। অমৃত সে চিত্র definite হয় না। এক এক রকম চাঁৎকারে এক এক রকম রঙও কুটে ওঠে। খুব চাঁৎকার করলে লাল রঙের effect আসে।

তখন গিরিশ বাবুর কথার বললেন—তিনি তো বাসায় মহাভারত উগরে দিয়েছেন।

আবার আগের কথার ফিরলেন—কথা দিয়েও ছবি ফোটানো যায়। ব্যাঙও তাই ওরার পেইন্টিং।

নিজের কথার বললেন—আমরা বা কিছু করেছি, মর্মে মর্মে অর্থাৎ কল্পনার বা ভেসে এসেছে তাই করেছি। প্রথম open sky ব্যবহার করি সীতাতো। আলোতে shadow পড়াও বন্ধ করি। কেবল নাচের সময় shadow পড়ে।

ইংলণ্ডের অভিনেতাদের সবচেয়ে বললেন—অগিভিয়ার হ্যাঙ্ক সত্যি সত্যি নামকরা ভালো অভিনেতা কেউ নেই। ১৯২২ সালের পর ভালো অভিনেতা আর কেউ হয়নি।

দেখি অভিনেতাদের সবচেয়ে—গিরিশ বাবু, অমৃত বাবু আর দলী বাবু অভিনয় বাঁধা দেখেছেন তাঁরা জানেন কত বড় অভিনেতা ছিলেন তাঁরা। অমৃত বাবুর বই সবচেয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

রসমঞ্চ সবচেয়ে একজনের বিরূপ মন্তব্যের উত্তরে বললেন—রসমঞ্চকে ঘুরার চোখে দেখলে রসমঞ্চ আপনাকে দেবে কি?

তারপর বললেন—অমর দত্তের জীবনী তাঁর ভাইশো লিখেছেন, তার মূল্য আছে। যুগটিকে ভালো করে চেনা যায়, অমৃত বাবু খুব খারাপ নাট্যকার ছিলেন না। গিরিশ বাবুকে তাঁর যুগ দিয়ে বুঝতে হবে। তাঁর যদি ব্যাঙকে উন্নত করবার চেষ্টা করতেন, ইংরেজী নাটকের মোহে চোখ কলসে না যেত তাহলে বাংলা নাটকের চেহারা অন্য রকম হতো।

সিরাজদৌলা প্রসঙ্গে বললেন—গিরিশ বাবুর সিরাজ হিহো নয়। রাণী নিভান্ত ছেলেমাছব।

পরের দিন আবার রিহার্সাল। বইটা তখনও শেষ হয়নি। এসেই বললেন—ডিকেল মাছুটা ভালো ছিলেন না। স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তবু এমিক-ওমিক ছিল। এ যে কে একটি অভিনেত্রী, তার সঙ্গে খুব গভীর প্রেম ছিল।

তারপরেই বললেন—রবীন্দ্রনাথ সখ্যবীর অধুনা প্রকাশিত বই সবচেয়ে—জাল কথা কিছু নেই তবে কণ্ঠিনেটাল নাট্যকার, ইংলেন্ড থেকে শুরু করে আজকালকার আমেরিকান নাট্যকার, আমার আবার নাম মনে থাকে না, পর্যন্ত সবায়ের কোটেশন-কটকিত, অমৃত বাবু-অপটাই ভালো হয়েছে। তবে ছোঁকার ক্ষমতা আছে, অমৃতগুলো বই তো পড়েছে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের কথা উঠল, বললেন—আমাদের সময় ইনস্টিটিউটের কি সিনই ছিল। আমি আর নরেশই ছিলাম best actor আর আবারই সাধারণ রসমঞ্চ বোপ সিমুস।

আমাদের মধ্যে আর একজন ছিল, তার নাম ছিল জানপ্রিয়। আবার কলতার গুঁক। বড় সিলি ব্যবহার ছিল। কখনও দলদলি

হতে দিতে না। তাঁর অপূর্ণ কণ্ঠ ছিল। খুব যে একটা সাধা-গলা ছিল এমন নয়, তবে স্তন্যে ভালো লাগতো। একবার সেক্সপীয়রের নাটকের আগে মঙ্গলাচরণ গেয়েছিল, তাই স্তন্য ও দেশের এক ভক্তলোক বললেন—ও ছোটটি কে? এখানে পড়ে আছে কেন? ও-দেশে গেলে হস্তার একশ' কুড়ি ডলার পাবেই।

রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'র কথা উঠতে বললেন—তপতী কবে আমার কোনো হৃৎ নেই। কবি অভিনয় দেখেন নি তবে নাটক পাঠ করেছেন। সাজ-পোষাক কেমন হবে তা নিয়ে খুড়ো-ভাইপোয় ঝগড়া; কবি বললেন—এই তো ওঁদের জন্তে ঐ রকম পোষাক পরতে হলো। তাতে অবনী বাবু বললেন—ভূমি যা দেখো তাই পরবে বল তো, কি করবে বসো?

দৃশ্যপটের কথা জিজ্ঞেস করতে কবি অবনী বাবুকে দেখিয়ে বললেন—এঁদের অক্ষমতার জন্তেই দৃশ্যপট বাদ দিয়েছি। এঁদের তো ধারণা অজ্ঞতার পর পৃথিবী আর এগোয়নি, তোমরা নিশ্চয়ই দৃশ্যপট করবে, আমি এসে দেখবো।

তা জন্তর এমনই দৃশ্যপট করেছিল যে, কি বলবো। শেষ দৃশ্যের দৃশ্যপট এমনি এঁকেছিল যে স্মিত করতে। আমরা এসে বললে—বড়বাবু আথারোটি পাছ তো দেখিনি, তাই আপেলগাছ এঁকেছি। অথচ দেখো, তাঁর আঁকার দাম কেউ দেখনি এদেশে। তবে 'সীতা'র ভাড়াটোরা দৃশ্যপট দেখেই আমেরিকানবা অবাক হয়েছিল, বিশ্বাসই করতে চায়নি যে কোনো হিন্দুর আঁকা। বলেছিল—এ নিশ্চয় কোনো পশ্চিমী শিল্পীর আঁকা। কিন্তু তারা অত্যন্ত সহজ কথাটি ভুলে গিয়েছিল যে, তাদের দেশে তখন শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর জঙ্গল, আমাদের দেশে তখনও ছবি আঁকা হচ্ছে।

তবে একটা কথা বলবো, ওদের উৎসাহ আছে। সীতার নাচ নাচতে চল্লিশ ডলার নিয়ে অনেকগুলো মেয়ে নাচতে এসেছিল। রাধাচরণ আর—(নামটা বুঝতে পারা যায়নি) শেখাতো। নটীর সময় আমার কথা, নটী বাজতে পাঁচ পর্বস্ত কারো দেখা নেই, আর নটী বাজতে না বাজতে ঝপাঝপ বাথকমে পোষাক খুলে ছোটো পোষাক পরে নাচার জন্তে তৈরী। আবার বলতো—নাচ শিখবো কখন। এঁদের এক একজনের সিগারেট খেতে বিশ মিনিট, বাকি সময় হুঁজনে ঝগড়া করবেন তো শেখাবেন কখন আর আমরা শিখবোই বা কী?

দ্যনগোপাল ভারতীয় অথচ মেলাটে দেখা হতে বললে—আপনার খোঁজ পাইনি বলে দেখা করতে পারিনি। দেশে ফেরার পর অমৃতবাজারে লিখেছে দেখুন—শিশির বাবু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বা পরিচালক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিল বলেই তাঁর নাটক সার্থক হয়নি।

ভারতীয়দের কাছে বিশেষ কোনো সাহায্যই পাইনি আমরা। Crowd sceneএ হারা অভিনয় করেছিল, তাদেরও হুঁ ডলার করে দিতে হয়েছিল, অথচ চীনা অভিনেতা—(নামটা বুঝতে পারিনি) বধন এসেছিল, তখন ওখানকার চীনারা কী সাহায্যই না করেছিল!

ওদের বেশে জাপানীদের তাড়ালেও চীনাদের অবস্থা ভালোই। যে জিনিষ কোথায় মেলে না, তাও China townএ পাওয়া যায়।

কলকাতার China townএরও সেই একই অবস্থা। Canton Hotel ১৯০৮ সালে প্রথম আবিষ্কার করে আমাদের শিবু বড়াল।

এবার আলমগীরের রিহাস্যাল শুরু হ'ল। কীরোরপ্রসাদ সখ্যে বললেন—কীরোর বাবুর লেখার balance বড় ভাল, একটু ছোট হলেই কান লাগে। তিনি লিখতে শিখেছিলেন

তবে ওঁর একটু অনুবিধে হয়েছিল, শরীরে কিছু কীপ ছিলেন ও তাই বীরত্বের কল্পনা কিছু প্রাণের ছিল। একজন লোকের ক্ষমতা পাঁচ লক্ষগুণ না বাড়ালে তাঁর আনন্দ হয় না। রক্তধরের মন্দিরে রক্তধর এক দলকে ঠাণ্ডাশো, তার পর দুজনকে ছ' বগলে ছ' জনকে দুহাতে, আর আর একটাকে পাতে করে ধরে চললো।

তার পর রূপনগরের রাজসভার শ্রামসিংহ বেথানে রামসিংহকে 'কছোয়া' বলে টিককারী সিদ্ধে সেখানটা বোকাতে বললেন—কছোয়ারা আসলে কচ্ছ থেকে এসেছিল, হরত রাজপুতই নয়। তবে রাজপুতরাও mixed জাতি; কালোও আছে, ফরসাও আছে। ওরা বোধ হয় শকদের (Seythian) বংশধর।

২৩ তারিখেও রিহাস্যাল দিতে এলেন। প্রাথমিকই কে একজন ব্যক্তি বলেছে আমাদের গভর্নমেন্টকে দেশের কেউ দেখতে পারেন না।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলেন—কেউই বনি দেখতে পারে না ত গভর্নমেন্ট জেতে কি করে?

আর একজন বললেন—বোধ হয় রাস্তা করেছে বলে গ্রামাঞ্চলের লোকদের স্মরণে হয়েছে, তাই তারা সরকারকে জিতিয়েছে।

সার দিলেন—তাই হবে, স্রেফ রাস্তা করেছে জিতছে ওরা। তার পরেই প্রসঙ্গান্তরে গেলেন Picture-goer বড় ভাল কাগজ ছিল, জবে আজকাল সে ফাঁও নেই, সে জিনিষও নেই। আবার দুখ করে বললেন—আজকাল নিউ মার্কেটে সেক্সপীয়রের বড় বড় প্রডিউসারদের ২১।২২টা দৃশ্যের চবিওয়ালা বই পাওয়াই যায় না।

বাংলায় কোনো ভালো থিয়েটার সম্বন্ধীয় পত্রিকা ছিল কি না প্রশ্ন করতে বললেন—একটি পত্রিকা কিছুদিন বড় ভালো চলেছিল—নাট্যভারতী, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চালিয়েছিলেন। ওতে (হরপ্রসাদ) শাস্ত্রী মশায়ের লেখা ছিল, গিরিশ বাবুর লেখার reprint ছিল।

দুঃখ করে বললেন—আমরা বেশি ইংরেজী শিখে বিপদে পড়েছি! গিরিশ বাবুদের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল; সমালোচনা টমালোচনা পড়েন নি; সেকলে এডিশনে সেক্সপীয়র পড়েছিলেন, কাজেই বুঝে পড়েছিলেন। ম্যাকবেথের অপূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন। তবে শিক্ষিতরা তাঁকে চেপে দিয়েছে। প্রথম চৌধুরী মশায় প্রকৃত বোধে বললেন—এই সব 15th class বই নিয়ে শিশির কেন যে মাতামাতি করছে। রবিবাবুই তাঁকে চেপে দিলেন।

পুরোনো কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দেখেছেন প্রশ্ন করার বললেন—পুরোনো দিনের মধ্যে স্কিনকভার অভিনয় দেখেছি জনার প্রবীর আর সুভদ্রার ভূমিকায়। আর ক্ষেত্রমণি—ইতিহাসে তার নাম নেই, কিন্তু অমন গল্পকা বো—অমন করে 'বু' বলে ধার' বলা এমনটি আর দেখিনি। বিনোদিনীর অভিনয় দেখিনি।

অশ্রবশ বাবুর গলা বড় মিষ্ট ছিল—সুরও ছিল।

আমাদের দেশে convention বড় বেশি চলে। তারামুন্দরীর গলাও সুর ছিল, তবে বয়স হয়েছে মিষ্ট গেল। হাড় বেরিয়ে লাথ্যাও চলে গেল। আমি বলতুম—তারা মা, ও-সব ছাড়া।

তা বলতো—বাবা, আমি সেকলেই থাকবো, (বুজাকি) সাবে যা শিখিয়েছেন তাই বলবো।

আমি বলতুম—সাহেব তো শেখারনি, শিখিয়েছেন গিগিণি বাবু।
তারার সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি। খিরেটোরের বাইরে থাকেই
বচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছি, মরবার সম্বও টাকা দিয়েছি। তবে
যেহা বলবে কিনা জানি না। তারা খুব বুদ্ধিমত্তা ছিল, বাংলা
ই সব পড়েছিল, আর Problem তুললে এমন সব কথা বলতো
যে অস্বাভাবিক করে দিতো।

ইনষ্টিটিউট প্রসঙ্গে বললেন—ইনষ্টিটিউটের ব্যাপারে আগে
পালমাল করলেই কলেজে রিপোর্ট পাঠানো হ'তো, নাম কাটানোর
পক্ষে। আন্ত বাবুকে বললুম,—খিরেটোর, খেলাধুলো করতে আসে
খানেক, তার জন্তে যদি কলেজ থেকে নাম কাটা যায়, তবিয়ে নষ্ট
হয় আর কি মেসবার পাওয়া বাবে?

উনি কলসেন—তবে যে ওরা বললে এতে ভালো হবে?

বাদের বাঁচলুম তারা কিন্তু কোমর বেঁধে আমার বিরুদ্ধাচরণ
করতে লেগে গেল।

শেখানোর কথার বললেন—এখন আর আমার মনের জোর নেই,
যত একদিন অনেককেই ত তৈরী করেছিলাম।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

ডালে-লটুকানো লাল ঘুড়ি

উলার আকাশের অনন্ত নীলিমায় নয়,

ঘনবিক্রান্ত পত্রপুঞ্জের গাঁট স্ত্রীমলিমায় নয়,

দুট্টি ওদের আসক্ত দেওদারের ডালে-লটুকানো এক লাল ঘুড়িতে।

কোনো দর্শন গড়নি ওদের ঐক্যসূত্র আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে,

কোনো কাব্য ঘনিষে তোলেনি ওদের চোখের এই বিভোর দুট্টিকে,

কোনো বিজ্ঞান আনেনি ওদের আকাশের কোনো অম্লসন্ধিস্থা।

ওদের হৃদয় চক্কর—ওদের দুট্টি বিহ্বল

এ দেওদারের ডালে-লটুকানো একটা লাল ঘুড়িতে।

পিতার ক্রোধে আরক্ত নয়নের কোনো ইঙ্গিত নেই ঐ লালের মধ্যে—

মায়ের শাসনের ভক্তিতে উত্তত হাতের লাল শাখার কোনো আভাস

নেই ঐ লালের মধ্যে—

সঙ্গিনীর লাল চুড়ি আর লাল ফিতের কোনো স্মৃতিও নেই

ঐ লালের মধ্যে,—

ও শুধুই লাল ঘুড়ি—দেওদারের উঁচু ডালে আটকে-বাওয়া

চির-অগ্রাণ্য তবু চির-আকাঙ্ক্ষার হৃদয়ভরায় স্থলধর,

ঐ শিশুচৈতন্যের মনোহারিণী ভঙ্গিমায় সলসল—

ঘনবিক্রান্ত দেওদারপত্রের ঘন-আন্দোলনে বিভ্রম,

একটি উথড়ে-আসা কিংবা কেটে-বাওয়া লাল ঘুড়ি

এক হাত লগা আর চওড়া শিশুমনের একটি ক্ষুদ্র স্বর্গ—

যার মাঝা-দেওয়া হৃতোয় বিকিরিত করছে কাচের গুঁড়ো

সন্ধ্যাকালীন রক্তিম আলোকের স্পর্শে।

স্বপ্নাটো নয়—কলাকোলাহলে ব্যস্ত ঐ বালখিলা সন্ধ্যাসীর লল

অর্ধনয়ন—ছিন্ন দেহাবরণ—

ওদের কাঙ্ক্ষার পায়ে নেই জুতো, মাখার রক্ত চুলে নেই সঁাখির

পারিপাট্য,

সীতা কত দিন রিহাস্যাল দিয়েছেন? প্রশ্ন করার বললেন—মাসের
পর মাস। মাঠে রিহাস্যাল দিতে গিয়ে বই চুরি গেল। লোকে বোপেশ
বাবুকে দোষ দেয়, জানে না তো কত অসুবিধের মধ্যে বই লিখেছেন।
পুরোনো কাঠামোর মধ্যে রাখতে হয়েছিল, তবু যা লিখেছিলেন
অপূর্ণ। শাস্ত্রীমশায় বলেছিলেন—সবকে জানা খুবই সুখের হয়েছে।

হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে পড়লেন, বললেন—একটি জাহাঙ্গীর
দাঁও, আর বছর তিনেক বোধ হয় বাঁচবে, পুরোনো সস্তর বছরের
কথা তুলে নতুন উত্তমে কাজ করি।

আবার প্রসঙ্গান্তরে গেলেন—আমি, আজাদ আর জহরলাল
একবয়সী। জহর আমার চেয়ে এক মাস কুড়ি দিনের ছোটো আর
আজাদ ক'মাসের বড়। কান্দারীরা হলো কানুজবাবু আর বিশ্বাসি-
ঘাতকের জাত। হরিশঙ্কর কাউল আর তার ভাই—দেওয়ান হয়ে
নানা রাজ্যের স্বর দিয়েছে। আর হরি সিকে মেয়ো কলেজে কেউ
দেখতে পারতো না। সে ছাত্রদের কথা মাষ্টারদের বলতো, পণ্ডিতের
রাজত্বরঙ্গিনীর অহুবাদ দেখ, বুঝবে আমার কথা ঠিক কি না।

[ক্রমশঃ।

পায়ে নেই বোতাম-পর্যায় জামা—

ওরা কেউ বা ব্যস্ত ঘুড়ির রক্তের গুণপণায়, কেউ বা মাজার—

সেই অর্ধভুক্ত অর্ধনয়ন কৃষ্ণকায় বালখিলা সন্ধ্যাসীর লল—

পৃথই বাদের তপোবন আর ছানিয়ার সমস্ত নর-নারীই পরলা চাওয়ার
মা আর বাপ।

হঠাৎ উঠল হাওয়া—মেঘ এল ঘোরালো হয়ে

বিকেলের সূর্যকে ভূবির দিল সন্ধ্যার অন্ধকারের সমুদ্রে—

শনশনে তাঁর-বেঁধা হাওয়ার কাঁপতে কাঁপতে চিড় খেয়ে গেল ঘুড়ির
লাল কাগজ,

হঠাৎ আঘাতে চিড় ধরে যাওয়া রক্তিম হৃদয়ের মতন।

ওরা পালাল উল্কাধালে বড় বড় বুড়ির কৌটায় নাচতে নাচতে,

ঐ অর্ধভুক্ত অর্ধনয়ন মানব-শিশুর করেকটি রক্ত আকৃতির উপহাস,

বাদের সব আশাই ঐ লাল ঘুড়ির মতন থাকবে অগ্রাণ্যের উঁচু

শাখার আটকানো,

বাদের সমস্ত উত্তমই নষ্ট হবে ছলভকে পাবার পক্ষ বাসনার,

বাদের জীবন হঠাৎ একদিন এক বড়ের রাঙে

সব চেয়ে আগে ছিঁড়ে যাবে ঐ ঘুড়ির কাগজের মতন,

করাত সমাজবন্ধের ছিন্ন হৃদয়স্বপ্নের রক্তিম টুকরোর মতন—

উড়ে যাবে অনির্দিষ্ট পথে—কেউ জানতেও চাইবে না কোথায়।

ঐ তারাই নিবে যাবে সব চেয়ে আগে

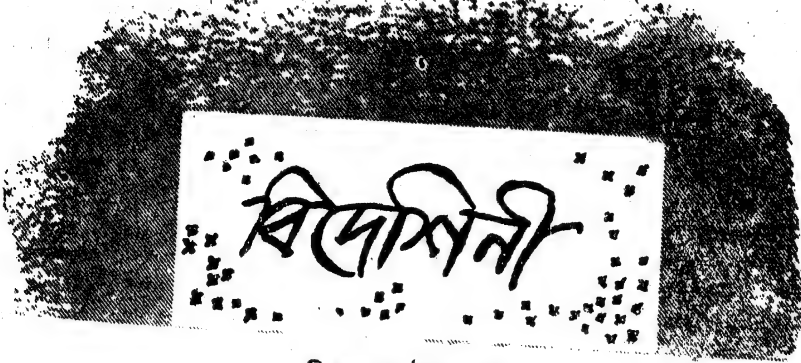
বাদের মন প্রাণশক্তিতে তরঙ্গিত হত—

ঐ দেওদারের ঘনবিক্রান্ত পত্র আন্দোলিত শাখায় মতন,

আর আকাশ ও পৃথিবীর যোগসূত্র বারা রচনা করতে পারত

ঐ বিকিরিত রক্তিম মাঝা হৃতোয় মতন—

ঐ অর্ধনয়ন, অর্ধভুক্ত পূর্ব ঘূর্ণ-কোলাহল বালখিলায় লল।



(সিদ্ধপারের উত্তর পর্ক)

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

[সুশান্ত-সার পৌত্র বিকাশ এসেছে ডাক্তারী পাশ করে, দ্রী হুখ ও শিতপুত্রকে রেখে অভ্যস্তিক পড়াচনা করার জন্ত বিলেতে চলে গেল, আর কিয়ল না—এসব খবর 'নীল শাড়ি' উপন্যাসে লেখা হয়েছে। বিলেতে বিকাশের ছাত্রজীবনের কাহিনী নিয়েই "সিদ্ধপারে" লেখা। তার পরবর্তী জীবনের ঘটনা এই উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু। কোনও বিশেষ কারণে বিকাশ তার বিলেতের জীবনের কাহিনী তার ছোট বোন ব্লাকে চিঠি লিখে বিস্তারিত অল্পপটে দিচ্ছে জানিয়ে।—লেখক]

এক

সেন্ট জন হোটেল

সলিহল।

ওয়ারউইক সারায়

কল্যাণীয়াস

মেসের বোন ব্লা!

এদেশে আমার ছাত্রজীবনের কাহিনী লিখে তোমাকে পাঠিয়েছি। এত দিনে নিকটরই পেরেছ। এইবার পরিশ্রম বরসের কাহিনী আরম্ভ করি। ছাত্রজীবনের কাহিনীটি বড়টা সম্ভব বিস্তারিত করেই লিখেছি। পড়ে জেনেছ—সে জীবনে এ দেশের কাজ শেষ হলে দেশে ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই হয়েছিল, কিন্তু সহসা কি বকম পড়ল বাধা। তার পরেও দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি—কেন, সবই ত জান।

আজ জীবনের অপরাধে ধাঁড়িয়ে সমস্ত জীবনটার দিকে চেয়ে একটা জিনিষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের কোনও কর্তব্যই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। আগেই এক জায়গায় তোমাকে লিখেছিলাম—জীবনশ্রোতের কোন সে অতল গভীরে কী যে তরঙ্গের বাত-প্রতিবাত চলে উপরে ভেসে ভেসে আমরা কিছুই জানি না। কোনও প্রতিরোধ করার শক্তিও নাই আমাদের, অথচ উপরের ভাঙ্গা-পড়া সবই হয় তারই কলে, আমরা শুধু হাবুডুবু খেয়েই মরি। এ কোন শক্তির মহাসীলা! আজও সেই কথাই বলি। আমার সে যুগের জীবনটার দিকে চেয়ে ভেবে দেখ—বেদিন দেশের জন্ত বড়রানা হতে গিয়েও যে আমার বাওয়া হল না, সে কী আমার ইচ্ছাবই হয়েছিল? আমি ত বাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হয়ে টানিয়ে উঠতে বাচ্ছিলাম। ইঠাং পড়ল বাধা। আমি ত হুগেও ভাবিনি—ও ভাবে বাধা আসবে। মার্লিনও যে ভাবন আমার দেশে ফিরে যাওয়াটাই চেয়েছিল সেটা

সে যুগের কাহিনী পড়ে মার্লিনের চরিত্রের দিকে একটু লক্ষ্য করলে সহজে বুঝতে পারবে। মনে আছে ত—শেষ পর্যন্ত আমি বখন মার্লিনকে ছেড়ে দেশে যেতে একান্ত কাতর হয়ে পড়েছিলাম, মার্লিনই আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্ত উৎসাহ দিয়েছিল, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তবে?

হয়ত তুমি বলবে—তুমি মার্লিনের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলে কেন? তুমি ভারতবর্ষের সম্ভান, দেশে তোমার সাক্ষী গুণবতী দ্রী বর্ন্তমান, তা সত্ত্বেও বিলেতে গিয়ে মার্লিনের সঙ্গে প্রেম করার ফল ত তোমাকে পেতেই হবে। কিন্তু ব্লা! আমি তোমাকে কখাটা জায়গাও একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে বলি।

আমায় ছাত্রজীবনের সমস্ত ব্যাপারটাই ভেবে দেখ। ডজিটনে, মার্লিনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল। আমি যে ডজিটনে গিয়েছিলাম সে ত মার্লিনের সঙ্গে দেখা করতে নয়? মার্লিনের অন্তিমই আমি তখন জানতাম না। এবং লগুন ছেড়ে ডজিটনে আমি যে খুব খুশী মনে গিয়েছিলাম—তাও ত নয়। লগুনে কাজ শেষ হলে, আমি প্রায় এক মাস বসে ইংল্যান্ডের নানা হাসপাতালে চাকুরীর দরখাস্ত করেছি—ডাক্তারী পরীক্ষা দেওয়ার আগে ছয় মাস হাসপাতালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্ত। কেন না, ডাক্তারী পরীক্ষা দেওয়ার জন্ত সেটা প্রয়োজন ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল লগুনে কিংবা তার কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে চাকুরী করি। কিন্তু কই—কোথাও ত কিছু জুটল না! শেষ পর্যন্ত হুগের কেরি জসায়ারের গ্রাম ডজিটনে, সেইখানে হাসপাতালে একটা চাকুরী পেলাম। কাজেই চাকুরীটি আমাকে নিজেই হল।

ব্লা! এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হাসপাতালে থাকতে, কোন শক্তির সীলার আমাকে ডজিটনেই যেতে হল—যেখানে ছিল মার্লিন? অল্প কোথাও গেলে ত মার্লিনের সঙ্গে আমার জীবন দেখাই হত না।

তার পর ডজিটনে থাকাকালীন মার্লিনের সঙ্গে আমার দেখা এবং তার সঙ্গে আমার প্রেমের কাহিনী—সবই জান। কিন্তু আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মার্লিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এমি জনসনের সঙ্গে আমার লগুনে দেখা হয়েছিল। এমি জনসনও সুন্দরী ছিল। মিশেছিলামও তার সঙ্গে খুব। কিন্তু কই, তার সঙ্গে ত প্রেম হয়নি? মার্লিনের সঙ্গেই বা প্রেম হল কেন? কোথায় কোন-সে গভীরে কি যোগাযোগ ছিল আমার সঙ্গে মার্লিনের? আমি না হয় দুর্বল চরিত্রের লোক—সহজে অভিভূত হই। কিন্তু মার্লিন? সে ত খুব দুর্বল চরিত্রের মানুষ ছিল না? তার সেই কথাটা মনে আছে ত? আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই সে তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ডরোথীর কাছে একদিন চুপি চুপি বলেছিল—আমি জগতে এমন একটি মানুষ খুঁজে নিতে চাই যে, বিশেষ করে তৈরী হয়েচে আমারই জন্ত। আমিই বা সেই বিশেষ মানুষটি হলাম কেন? বখন মনে মনে সে আমাকে সেই মানুষটি বলে বরণ করে নিয়েছিল তার ত কোনও অপরাধ ছিল না? সে ত জানত না আমি বিবাহিত?

আরও ভেবে দেখ—মার্লিন যেদিন শুনল আমি বিবাহিত, তারপর থেকে সে আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ভাগ্য করেছিল—মনে আছে ত? বতস্বর মনে পড়ে, তারপর দু'মাসের উপর তার সঙ্গে দেখা হয়নি—সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়ওনি। সে সময়ের আমার মনের অবস্থার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার যে আমার সঙ্গে মার্লিনের দেখা হল—সেটা কি আমার ইচ্ছার না মার্লিনের ইচ্ছার? যে ভাবে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সবই জান—এ কোন শক্তির লীলা? যদি ওভাবে দেখা না হত সবই যেত চুকে। আমিও এগিয়ে গিয়ে মার্লিনের সঙ্গে দেখা করতাম না, মার্লিন ত নয়ই।

হয়ত বলবে—মানি, ভগবান কখন ক'কে কি অবস্থায় ফেলেন সেটা তিনিই জানান, তার উপর আমাদের কোনও হাত নেই। কিন্তু বখন যে অবস্থায়ই আমরা পড়ি না কেন, নিজস্বের অজ্ঞানের হাত থেকে বাঁচিয়ে চলা আমাদেরই কর্তব্য। নইলে তার কল ভোগ করতে হবেই। কিন্তু বলা! কোনটা জ্ঞান এবং কোনটা অজ্ঞান এবং 'কি একটা সঠিক মাপকাঠি আছে? অবস্থা-বিশেষে জ্ঞান-অজ্ঞানের রূপ পরিবর্তন হর না কি?

নরহত্যা বোরস্তর অজ্ঞান, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে সেই হত্যাই হয়ে ঠাঁড়ায় শুভু জ্ঞানই নয়—পুণ্য। এর দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই? আরও ভেবে দেখ—মানুষের জ্ঞান অজ্ঞানের মাপকাঠি যুগে যুগে বদলে যায়। স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র যে ভাবে শূন্যকে হত্যা করেছিলেন, আজকের দিনে কি তুমি প্রাণ-মন দিয়ে সেটাকে সমর্থন করতে পার? অথচ সে যুগে সে কাজের ঞ্জকীর্তনই করা হয়েছে। বাক। ওসব যুগের বড় বড় মহাসমস্তার কথা যদি ছেড়েও দিই অবস্থা-বিশেষে জ্ঞান-অজ্ঞানের রূপ বদলে যায় না কি?

মার্লিনের জীবনের দিক দিয়েই প্রশ্নটা করি। জমিদারের ছেলে, স্বকোপ, সুশর্শন, সুশিক্ষিত বোলাও মার্লিনকে বিবাহ করতে চেয়েছিল—মনে আছে ত? মার্লিন তখন আমার প্রেমে ভরপুর মার্লিন তখন জানে—আমি বিবাহিত, আমার সঙ্গে বিবাহের কথা

তখন সে কল্পনাও করে না। তবুও বোলাওকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। মার্লিন ভায় করেছিল না অজ্ঞান? তার যা—সংসারে তখন তার একমাত্র সখল—বর্বারী, বাতে পঙ্কু তার যা—তিনি প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিলেন, এই বিবাহটি হোক, তাহলে তিনি শান্তিতে মরতে পারেন। তবুও মার্লিন বিবাহ করতে রাজী হয়নি। বোলাওকে বলেছিল—অন্ত কোনও পুরুষের বুকে আমার নেওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন। নিজের কাছে সে খাঁটা থাকতে চেয়েছিল, তাই মায়ের মনে শান্তি দিতে পারেনি সে—অজ্ঞান করেছিল?

আমার দিক দিয়েও কথাটা ভেবে দেখ। মার্লিনকে ছেড়ে আমি দেশে বাওয়ার জন্ত তৈরী হয়েছিলাম, তখন তার প্রধান কারণ বাবা দেশে অস্থির, তিনি বেশী দিন না-ও বাঁচতে পারেন, তিনি আমাকে দেখবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছেন—এই রকম চিঠি দাদার কাছ থেকে প্রায়ই পাচ্ছিলাম। দেশে বাওয়াতে কি ভাবে বাবা পড়ল জানই ক? দেশে বাওয়া বন্ধ করে আমি কি অজ্ঞান করেছিলাম? রিউম্যাটিক কিবারের দরুণ মার্লিনের হাটটি বিশেষ সখল ছিল না; সবই ত জান। তবে, উত্তর দাও। আমি অনেক ভেবেছি—এ সব প্রশ্নের কুল-কিনারা পাওয়া যায় না।

আরও ভেবে দেখ—উইসবারীর কাজ শেষ হলে আমার ত দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, কেন বন্ধ হল জানই ত। এখন জ্ঞান—মার্লিনকে ইংলণ্ডের জীবনক্রান্তেও অবস্থায় একলা তাসিয়ে দিয়ে আমার দেশে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হত? আমি কালো, আমি বিবাহিত—আমারই জন্ত সবাই মার্লিনকে ছেড়েছিল, আত্মীয়-বন্ধন বন্ধুবান্ধব, সমাজ। কেউ ছিল না আর তার। তখন আমার কি করা উচিত ছিল—তুমিই বল।

বলা! আজ জীবনের অপরাধে ঠাঁড়িয়ে এইটেই বুঝেছি—জগতে জীবনের দাত-প্রতিদাত, এমন কি আমাদের তথাকথিত কর্তৃ কিছুই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। সবই নির্ভর করে অবস্থাবিশেষের উপরে, আমাদের মনের গঠনের উপরে, বার কোনটায় জ্ঞানই আমরা দারী নই। আমি অবশ্য সাধারণ মানুষের কথাই বলছি—তপতাসিদ্ধ মহামানবদের কথা বলছি না। কেন? আমাদেরই দেশের মহাশক্তি কেনোপনিষৎ-এর গুরুটি জান ত? অগ্নি-বরুণের মত দেবতাদের পর্যন্ত একটি তুণ্যও নড়াবার শক্তি নাই—তার ইচ্ছা ছাড়া। আমি materialist নই। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, মানুষের মনকে অবিশ্বাস করি না। কিন্তু 'মনসো মনো বদ্'—মনের মন যিনি, কর্ত্ত্বের কর্ত্ত্ব যিনি, সেইখানেই লীলা। আমরা নিমিত্ত মাত্র। অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়; আমি অবশ্য এ সব মহাসমস্তার কতটুকুই বা বুঝি? আমার নিজের জীবনের কর্ত্ত্বের সমর্থনে আমি এ সব কথা বলছি না বলা! তা যদি মনে কর আমাকে তুল বুঝবে। আমার ছাত্র-জীবনের কাহিনীর গোড়ায়ই আমি তোমাকে লিখেছিলাম, আমি তোমার কাছে বিচারপ্রার্থী নই। লিখেছিলাম পূজনীয় ব্রহ্মাণ্ড সা মানুষের আশ্রিতে সুবিচার না পেয়ে তাঁরই বড় আদরের পুত্রর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাই লিখেছিলেন 'এত বড় লীল আত্মজীবনী।

কিন্তু আমি তোমাকে লিখেছিলাম, আমার বিচারের ভার রইল ভবিষ্যতের সর্ভে তোলা। আজও সেই কথাই বলি।

হুই

আমার এ দেশে ছাত্র-জীবন শেষ হয়েছে—প্রায় বারো বৎসরেরও বেশী। আমি এখন ম্যানচেষ্টারের সম্মিলিত সহর সেল-এ ডাক্তারী করি। সেলের ওস্ত হল সেনে আমার নিজেরই বাড়ী এবং সেল ফেল্ডেরে ট্রেনের কাছাকাছি আমার বাড়ী থেকে মাইলখানেক দূরে নরসেনডেন রোডে আমার সাক্ষারী।

আমার এখানকার দৈনন্দিন জীবনের মোটামুটি একটা বিবরণ দিই। সকালবেলা নিজের বাড়ীতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এই বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ আমি সাক্ষারীতে বাই। সেখানে আমারই তালিকাভুক্ত রোগীর দলের মধ্যে অনেকে এসে অপেক্ষা করে আমাকে দেখাবার জন্য। একে একে তাদের দেখে ফিরে আসতে আমার বোজাই প্রায় একটা বাজে। বাড়ীতে ফিরে এসে লঞ্চে (মধ্যাহ্ন ভোজন) খাই। তারপর দু'তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করি। বিকালে সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ 'চা' খেয়ে আবার বাই সাক্ষারীতে। ঘণ্টা দুই সাক্ষারীতে থেকে বাড়ীতে আসি ফিরে। বিকালের দিকে সাধারণত রোগীর ভীড় কম হয়। সাক্ষারীতে আমার একজন সেক্রেটারী থাকেন—মিস হলওয়েল। বর্ষাবসী মহিলা কিন্তু বিশেষ কণ্ঠনিপুণ। সাক্ষারীতে একজন লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে—তিনি সেইখানেই থাকেন। মিস হলওয়েলের বাড়ী ম্যানচেষ্টারে। প্রত্যেক শনিবার কালের পরে তিনি বাসে ম্যানচেষ্টার চলে যান এবং সোমবার প্রত্যুষে এসে কাজে যোগ দেন। তাঁর প্রধান কাজ রোগীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলে আমার সঙ্গে দেখা করাবার ব্যবস্থা করা এবং তার হিসাব রাখা। প্রয়োজন মত তিনি সাক্ষারী থেকে বাড়ীতে আমাকে টেলিফোন করে আমার পরামর্শ নেন।

রবিবার দিনটা আমার ছুটি—অর্থাৎ সাক্ষারী বন্ধ থাকে। বিশেষ কোনও জরুরী রোগীর একান্ত প্রয়োজনে হয়ত তাকে বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসি। এছাড়া সপ্তাহে আর এক দিন—বুধবার—বিকেলের দিকেও সাক্ষারী থাকে বন্ধ—মিস হলওয়েলের ছুটি। তিনি মাঝে মাঝে বুধবার দুপুরেও ম্যানচেষ্টার চলে যান। সেল থেকে বাসে ম্যানচেষ্টার যেতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগে।

সেলের ওস্ত হল সেনে আমার বাড়ীখানির একটু পরিচয় দিই। লাল রংয়ের ছোট একটি বিস্তল বাড়ী—ছবির মত দেখতে। বাড়ীর সামনে রাস্তার দিকে একটি বাগান এবং তার পাশ দিয়ে বাড়ীর পিঠা-পেঁথে একটি লাল ঘোরান রাস্তা শেষ হয়েছে রাস্তার দিকে ছুটি ফটকে—গাড়ী ভিতরে এসে বেরিয়ে বাওয়ার জন্ত। এই দুটি ফটকের মধ্যে রাস্তার খেলারের ধারে তিনটি নাভিলীর্ণ লার্ভ গাছ—কতকটা আমাদের দেশের বাউ গাছের মত দেখতে। বাড়ীর ছ'পাশে সারি সারি কয়েকটি স্প্রুস (Spruce) গাছে বাড়ীটির শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাগানে সবুজ ঘাসের উপর ছড়ান নানা ফুলের বিছানা। একটা দাঁলা আছে—সপ্তাহে তিন দিন বাগানের কাজ করে দিয়ে যায়।

বাড়ীটির মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি—এক তলার এক পাশে একটি বড় ঘর, আর এক পাশে ছুটি। বড় ঘরটি লাউজ অর্থাৎ মিসবার ঘর—পুক কার্পেট পাতা এবং খানিকখানেক গদিখোঁটা কোচ দিয়ে সাজান। ওপাশের ছুটি ঘরের মধ্যে একটি

খাবার, এবং অপরিষ্কৃত ভাঁড়ার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ঘরটির সলার রান্নাঘর। সোতলার, একতলার অল্পরূপ—এক পাশে একটি বড় ঘর এবং অল্প দিকে ছুটি। তিনটিই শোবার ঘর বড় ঘরটা আমাদের, এবং ওপাশের দুটি সাধারণতঃ পড়ুই থাকে, কখনও কোনও অতিথি এসে থাকতে দেওয়া হয়।

আমাদের। হ্যাঁ, মার্লিন এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আর প্রায় বারো বৎসর হল আমাদের বিবাহ হয়েছে।

এই বারো বৎসরের কথা মোটামুটি বলি। মার্লিনকে বন বিবাহ করি তখন আমার উইসবীচ হাসপাতালের কাজটি মে হয়েছিল। মনে আছে ত কেশিকশায়ারের ছোট সহর উইসবীচের নর্থ কেমব্রিজশায়ার হাসপাতাল? মার্লিনকে বিবাহ করে চলে গোলাম, ম্যাট্রিসশায়ারের একটি সহর লিডনী—সেখানকার হাসপাতালে একটা চাকুরী নিয়ে। একে ভারতবর্ষের M. B. তার উপর এখানে এসে L. R. C. P. M. R. C. S. পাশ করেছি হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে হয়েছে অনেক। তাই হাসপাতালে চাকুরী পাওয়া আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। লিডনীর চাকুরীটা পাকা ছিল, তাই মার্লিনকে নিয়ে সেখানে প্রায় তিন বৎসর ছিলাম।

সেখান থেকে চলে বাই ম্যানচেষ্টারের একটি বড় হাসপাতালে আরও বেশী মাইনের একটি ভাল চাকুরী নিয়ে। সেখানে বহু তিনেক কাজ করার পরে সেল-এর ডাঃ ম্যাকডোনাল্ডের কাছ থেকে তার ডাক্তারী ব্যবসায়টি কিনে নিয়ে স্বাধীন ভাবে সেল-এ ডাক্তারী করতে শুরু করি।

সেল-এ ব্যবসায় আমার উন্নতিই হতে লাগলো—ডাঃ ম্যাকডোনাল্ডের রোগী ছাড়া অনেক রোগী ক্রমে এসে যোগ দিল আমারই তালিকার এবং সেল-এ বাওয়ার বছর তিনেকের মধ্যে ওস্ত হল সেনের বাড়ীখানি কিনে ফেললাম—মার্লিন তাকে সাজাল মনের মতন করে। সামনের বাগানটি মার্লিনেরই পরিকল্পনার ক্রমে সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ীটি কেনার পর বাড়ীর কি নাম দেওয়া হবে এই নিয়ে মার্লিনের সঙ্গে প্রায় মাসখানেক আমার আলোচনা চলছিল কিন্তু কিছুতেই যেন একমত হতে পারিনি। মার্লিন যেটা বলে আমার সেটা ঠিক মনে লাগে না এবং আমার দেওয়া নামও মার্লিন যেন তেমন উৎসাহের সঙ্গে নিতে পারেন না। আমি অল্প ভারতীয় নাম দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম। ভারতীয় নাম নিয়ে মার্লিনের যে কোনও আপত্তি ছিল তা নয়, কিন্তু কোনটাই যেন তেমন তার মনে লাগেনি। শেষ পর্যন্ত মার্লিন এক দিন শুধু জোয়ার নামটা ঠিক যেন কি বিকো?

বললাম, বিকাশ।

ভাল—বিকাশ কথাটার মানে কি?

একটু ভেবে বললাম, যা আপনা থেকেই নিজেকে প্রকাশ করে। বলল তা বেশ। বাড়ীর নাম দেওয়া যাক—বিকাশ, সে বেশ হবে।

হেসে বললাম, না—না। নামটার মধ্যে না আছে ছন্দ, না

আছে হুর। তার চেয়ে নাম রাখ লীনা। তারি মিষ্ট শোনাবে।

মনে আছে ত মার্লিনকে। আদর করে আমি লীনা বলে ডাকতাম।

তাড়াতাড়ি বলল না—না। ছিঃ! লোকে বলবে কি।

সেদিন কথাবার্তা এই পর্যন্তই হয়ে রইল। পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে মার্লিন বলল, বাড়ীর নাম আমি ঠিক করে ফেলেছি—আর কোনও কথা চলবে না।

শুধালাম, কি?

বলল, বিকোলীনা।

হেসে বললাম, লোকে বলবে কি?

বলল, বলুকগে।

সেই নামই রাখা হল।

* * *

এই বছর বারোর কথা আমার মনের দিক দিয়েও একটু বলি। মার্লিনকে বিবাহ করার পর থেকে মার্লিন যেন সুখা ঢেলে দিল আমার জীবনে। মোটের উপর কি আনন্দ কি শান্তিতে এই কটা বছর কাটিয়েছি, বুলা! আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না এবং এতটুকুও অতিরিক্ত করে বলছি না। ঘর-সংসারের কাজে মার্লিন যে এত স্ননিপুণ—বিবাহের আগে মার্লিনের এ দিকটা আমার একেবারেই জ্ঞানা ছিল না। সসারের প্রত্যেক কাজটি মার্লিনের দৃষ্টির সামনে যেন আপনা থেকে নিখুঁত ভাবে নিশ্চন্দ্রে হয়ে যেত—কোনও দিকে কোনও ত্রুটি ধরার উপায় ছিল না। মার্লিন নিজের হাতেই রান্না করত, কখনও রান্নার জন্ত লোক রাখেনি, যদিও আমি অনেকবার তাকে সে কথা বলেছি। আজও এ কথা জোর করে বলতে পারি—সে যুগে তার হাতের রান্না খেয়ে বিশেষ তৃপ্তি পেতাম—কোনও দিন এতটুকুও অকচি বোধ করিনি। এটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি—যে আমার পছন্দসই খাবারগুলি সে যেন সবই জানত এবং পর পর দু'দিন কখনও সে একই খাবার আমাকে দিত না, কিছু না কিছু পরিবর্তন আনতই।

বসবাসের বাড়ীখানিকে স্মরণ করে সাজিয়ে রাখার দিকে তার দৃষ্টি সব সময়ই ছিল প্রাণর এবং সে দিক দিয়ে তার কৃতিকে আমি সহজেই মনে নিতাম। কখন এ-দিক দিয়ে কিছু বলায় কোনও কারণ ঘটেনি। শুধু তাই নয়, এক একদিন সাম্রাজ্যী থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে অবাক হয়ে দেখতাম—হু হু শোবার ঘরের কিংবা বসবার ঘরের সাজাবার ধরণটিতে সে কিছু পরিবর্তন এনে ফেলেছে; হঠাৎ এই পরিবর্তনটুকু করার কারণ যে কি তা আমি কোনও দিনই বুঝিনি।

গুণ্ড হল সেনের বাড়ীতে একদিন—এই রকম পরিবর্তন সেবে হেসে বললাম লীনা। তোমার মাথার কিংকি গোলামাল আছে।

হু হু হেসে শুভাল কেন?

বসবার ঘরে বসেই আমাদের কথাবার্তা হাছিল। বললাম, বড় কোচটাকে আবার এদিকে এনে কোণাকুণি ভাবে রেখেছ কেন? আগে মন্দ ছিল কি?

বলল, তুমি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ত এই ঘরেই বিশ্রাম কর। আমি দেখেছি—আগনের ধারে ত ছোট কোচটা ছিল—তুমি এটোতে বসে পা দুটিকে লম্বা টেনে দাও আগনের দিকে। কখনও কখনও এ ভাবে একটু ঘুমিয়েও পড়। তাই বড় কোচটাকে আগনের কাছে দিলাম—দরকার হয় পা তুলে দিয়ে ওটার উপর একটু শুয়েও পড়তে পারবে।

শুধালাম আচ্ছা, তা যেন হল, কিন্তু বড় ফুলদানীটাকে আবার ওদিক থেকে এ কোণে এনেছ কেন?

বলল, নইলে কোঁচের পরিবর্তনের সঙ্গে মানায় না যে।

শুধালাম, ফুলদানীর ফুলের রং বদলে গেল কেন? ওটাতে ত বরাবর লাল ফুল রাখ তুমি।

বলল, লাল ফুলটি এ ঘরে অনেক দিন থেকে ছিল ত—বড় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দেওয়ালের রংয়ের সঙ্গে মানাত বলেই এতদিন রেখেছিলাম। আজ বদলে নীল ফুল দিয়ে দেখলাম—কি রকম হয়। কি স্মরণ মনিরেছে বলত—নীচের কার্পেটের সঙ্গে। তার উপর বড় কোচটাতে যদি তুমি শুয়ে পড়—সামনেই দেখতে পাবে থোকা-থোকা নীল রংয়ের ফুল। তোমার চোখ দুটি সহজেই বিশ্রাম পাবে।

হেসে বললাম, লীনা! আমি চলে গেলে তুমি কি খালি এই সবই ভাব?

আমার কোঁচের হাতটির উপর বসে এক হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, বুঝলে না—বাড়ী-ঘর-দোর স্মরণ করে সাজিয়ে রাখলে মনটাও স্মরণ থাকে।

হেসে বললাম—কিন্তু মাঝে মাঝে পরিবর্তন কর কেন?

মুখখানা আমার মাথার উপর রেখে একটু চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল। বলল, তোমার মনটাকে তাজা রাখবার জন্ত—একঘেয়ে না হয়ে যায়।

বললাম, ও! তাই বৃষ্টি তুমি প্রায়ই বেশভূষার পরিবর্তন কর—রোজই সকালে দেখি, পরিধানে কিছু না কিছু নতুনই আছে।

এইবার পরিকার খিল-খিল করে হেসে উঠল—মুখখানি যেন লজ্জায় লুকিয়ে ফেলতে চায় আমার মাথার উপরে। [ক্রমশঃ]

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্যান কপিল সাধ্যাকার
এই বাঙ্গালার মাটিতে গাঁখিল হুন্ডে হীরকহার।
বাঙালী অভীশ লজ্জিল গিরি তুধারে ভরতর
আলিল জ্ঞানের দীপ তিকতে বাঙালী দীপতর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে বনের মুকুট পরি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

মুনিবাবুর নিকট হতে এই তদন্ত সম্পর্কে নাকি-বীণার নামটা আমাদের শুনা ছিল। এই মেয়েটি তার টিকলা নাকের জন্ত এ-পাড়ার বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। নাকি-বীণা ২নং নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের একতলায় দুইখানি ঘরে বাস করে। আমরা দুই জন ঝালবাবুর ভূমিকার অভিনয় করে ঐ বাটাতে প্রবেশ করি। প্রথমে নাকি-বীণার বাড়ীর দুইজন ভৃত্যের সহিত সংলাপ শুরু করে দিলাম। ভৃত্যদ্বয় 'আমরা ইতিপূর্বে তাদের মনিবনী নাকি-বীণার নাম শুনিনি' শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদের হাতে একটি করে টাকা গুঁজে দিলে তারা খাতির করে আমাদের ঐখানকার একটি ঘরে বসিয়ে জানালো যে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তাদের গৃহকর্তার কক্ষে একজন বনী জমিদার তখনও পর্যন্ত আলাপবর্ত আছেন। আমরা এইবার আশঙ্ক হয়ে ভৃত্য করজবনের সহিত আলাপ পরিচয়ে জেনে নিলাম যে সত্যই ঐকম একটি ঘটনা ঐদিন ঐ বাটাতে ঘটেছিল। তাদের বিবৃতির সন্ধিস্ত সারবাস্তা নিয়ে উল্লবৃত করা হলো।

: ৪টা সেন্টেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ৮-৩০ সময় তারা দিদিমণির নির্দেশমত ছাদের উপর রহইকার্য করছিল, এমন সময় একটা বিরাট হাঙ্গা শুনে তারা নীচে নেমে এসেছিল। প্রথমে তারা মনে করেছিল উহা পুলিশের হাঙ্গা, কিন্তু নীচে এসে তারা দেখল তা নয়। প্রায় নয়জন শুভা প্রকৃতির লোক দিদিমণির ঘরে ঢুকে পড়েছে। এদের মধ্যে একজন লোককে তারা ভালো করেই চিনতে। সেই লোকটি হচ্ছে এ-পাড়ার নাম করা তবলতাবাবু, পাগলাদা। তাদের মনিবনীর পা হুটো জড়িয়ে ঘরে কেঁদে উঠে বলছিল, নাকি! 'বদি পাদিস তো বাঁচা আমাকে।' পাগলাবাবুর কথায় দিদিমণি নিশ্চল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি মাত্র কথাও তাঁর মুখ হতে বার হলো না। পাগলা কতো কারাণাটি এবং কতো আছড়া-আছড়ি করলো, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো না। পাগলা নাচার হয়ে ঘরের জানালার একটা বেগিন জড়িয়ে ঘরে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঐ লোকগুলো ছোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চেঁচেনোলা করে তুলে বাইরে এনে একটা ট্যান্ডির ভিতর বসিয়ে দিলে। আমরা মনে করছিলাম এদের ঐ অপকার্যে প্রশংসে আমরা বাধা দেবো। এইজন্য মনিবনীর মুখের দিকে আমরা তাকিয়েও ছিলাম। কিন্তু উনি ইসমারার ঐকম কার্য হতে আমাদের বিরত থাকতে বললেন। এর পর ট্যান্ডিখানা ঐ স্থান ভ্যাগ করে চলে গেলে আমাদের গৃহকর্তা ভাড়াভাড়ি সন্ধ্যা দরজাটা বন্ধ করতে বলে জানালেন যে ওদের সঙ্গে খোকা শুভা নিয়ে ছিল। এইজন্য আমরা তাদের বাধা না গিরে ভালো কাজই করেছি।

রূপেশপত্নীমণি নাকি-বীণা তখনও পর্যন্ত আপনাবর্ণ অর্পণবদ্ধ কক্ষ

পেশারতা ছিল। এই অসময় তাকে আমরা বিরক্ত করবো কিনা ভাবছি, এমন সময় নাকি-বীণা নিজেই তাঁর কক্ষ হতে বার হয়ে এলেন। বলা বাহুল্য যে, পরিশেষে তাঁর উন্নত নাসিকা আরও উন্নত করে তাকে তাঁর ভৃত্যদেরই অল্পরূপ একটি বিবৃতি দিতে হয়েছিল। এ ছাড়াও নাকি-বীণার উপদেশানুযায়ী—আমরা ঐ অঞ্চলে দিদিমণি নামে পরিচিতা অপর আর এক জনৈকা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ঐ বাটার দ্বিতলের একটি কক্ষেও গমন করি। ঐ কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দেওয়ালে ঝুলানমান বিষ্কবি রবীন্দ্রনাথের একটি স্রুহং আলোকচিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এ-ছাড়া ঐ ঘরটি স্রুহং কোচ এবং অস্ত্রাস্ত্র আসবাবপত্র সম্বন্ধিতও ছিল। তথাকথিত দিদিমণি নারী মহিলাটি একজন শিক্ষিতা নারী। ইনি শ্রে ষ্ট্রীটের একটি বাটাতে পুত্র-কন্যাসহ বসবাস করলেও প্রতিদিন এই কক্ষে সন্ধ্যা ছয়টা ইহাতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কালাপহরণ করে থাকেন। বহু বৃষ্টিমন্ত যুবক ঐ সময় এখানে এসে এর সঙ্গে সলালাপ করেন। এই জন্য এ-পাড়ার তাঁর এই কক্ষটি এ-পাড়ার 'গুয়েসিস' নামে পরিচিত।

দিদিমণিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি-বীণা এবং তাঁর ভৃত্যদের বিবৃতির সমর্থনশূচক একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিই। উপরন্তু তাঁর নিকট হতে ঐ সময়ে এখানে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন কৃষ্টিমন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ভ্রমসম্ভানেরও নামধাম সন্ধান করে নিই। দিদিমণি-এর মতে ভ্রমসম্ভান বিধায় লক্ষ্যবশত; তাঁদের পক্ষে এ-পাড়ার কোনও ঘটনা বাহিরের কাউকে জানানো সম্ভব ছিল না। এর পর এইখানে অথবা আর কালহরণ করা আমাদের পক্ষে উচিত মনে হয়নি। কারণ এখানকার অস্ত্রাস্ত্র সাক্ষীদের বিবৃতি পূর্ববর্তীকালে কোনও এক সময় লিপিবদ্ধ করলে কোনপ্রকার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এইজন্য ঐ স্থানে আর একটুমাত্রও অপেক্ষা না করে আমরা মলিনা নারী অপর এক নারীর বাসস্থান অভিযুক্ত রঙনা হল্যাম। সাক্ষী মণীন্দ্রবাবু তাঁর বিবৃতিতে এই মলিনার নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করেছিল।

আমরা এর পর ক্ষতগতিতে ৩২ নং ইমামবজা থানাদার গেলে শ্রীমতী মলিনাশ্রলরী দেবীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল্যাম। আমরা দেখলাম যে, ঐ বাড়ীর বাসিন্দা প্রত্যেকটি নারী তখনও পর্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। এমন কি, খোকাবাবু নামটা পর্যন্ত তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে থাকে। দেখা গেল যে এরা মলিনা দেবীর কক্ষটি পর্যন্ত দেখিয়ে দিতেও ভয় পায়। বেশ বুঝা গেল যে খোকাবাবু এ-পাড়ার সাক্ষার সমরাজ অপেক্ষাও ভয়াবহ। আমাদের অবশ্য মলিনা দেবীর কক্ষটি খুঁজে বার করতে একটুমাত্রও সেরী হয় নি। কারণ আমাদের নিযুক্ত এ-পাড়ারই কয়েকজন ছদ্মবেশী প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রয়োজন মত আমাদের পোপন সর্বাব

দরবারের জন্ত আমাদের আশে-পাশে ঘোরা-কিরা করছিল। তাদের ইসারা পাওয়া মাত্র আমরা সবলে মলিনা দেবীর নির্দিষ্ট কক্ষ চুকে পড়লাম। কিন্তু সেখানে মলিনা দেবীকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। তবে মলিনা দেবীকে না পাওয়া গেলেও সেই কক্ষে তাঁর মাতা সরোজিনী দেবীকে পাওয়া গেল। এই ঘরে তখন মলিনার মাতা সরোজিনী দেবী টাঁক বাঁধা শুড়িয়ে পুঁটলি-পোটলা বেঁধে এই সকল দ্রব্যসহ অল্প কোনও এক স্থানে সরে পড়বার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে আমরা ঠিক সময়ই এই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম, তা না হ'লে আধ ঘণ্টার মধ্যে এই মহিলাটি কোনও এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন আর কি! এইজন্ত দুইহুই মামলা সমূহের তদন্তকার্যে সকলতা লাভ করতে হলে সর্ব্বাঙ্গে স্পিড বা গতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর পর আমরা মলিনাসুন্দরীর মাতা সরোজিনী দেবীকে একটু পীড়াপীড়ি করে নিয়মিতরূপে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই।

প্রঃ—তুমি তা'হলে মলিনার গর্ভধারিণী মা নও? তা' তাড়াতাড়ি এখন চলেছে কোথায়? এই সব পুঁটলি-পোটলা মেয়ের ঘর হতে তুমি চুরি করে পালাচ্ছ? সত্যি সত্যি সব কথা বল জবাব দাও, তা না হলে তোমাকে আমার গ্রেপ্তার করব। তোমার উপর আমাদের ভরানক সন্দেহ হচ্ছে। এই সব দ্রব্য সবিয়ে নিয়ে বাবার অধিকার কে তোমাকে দিলে? তুমি তো দেখছি একজন মহা চোর। মেয়েটা কোথায় বেড়াতে গেছে আর এই সবোশে তুমি তার জিনিসগুলো সবিয়ে ফেলছো, এ্যা?

উঃ—এ্যা! কি বলছেন আপনারা? আমি গর্ভধারিণী না হ'লেও আমি তাই মা, বাবা! এই এতটুকু বেলা থেকে তাকে আমি মালুম করেছি। মা কি মেয়ের জিনিস কখনো চুরি করে, বাবা! আমি মেয়ের কাছেই এই সব নিয়ে চলেছি। সে এখন আমার উত্তরপাড়ার বাড়ীতে কিছুদিন থাকবে কি না। ধকলে ধকলে বাছার শরীরটা পজ কাঁহিল ভয়ে গেছে। তাই গাঁয়ে-ঘরে গিয়ে বাছা একটু বিশ্রাম করবে।

প্রঃ—কি করে বুঝবে যে তুমি সত্যি কথা বলছো? মেয়ের জিনিস তো মেয়েই বাবার সময় নিয়ে যেতে পারত। এ নির্বাং কোনও প্রকারে চাবি সংগ্রহ করে বা ঝুঁটা চাবি তৈরী করিয়ে গুব নকল-মা সজে তুমি এখানে জিনিসপত্র চুরি করতে এসেছ। তোমাকে এই সব জিনিসপত্র স্বহস্তে আমরা এক্ষুণি খানায় নিয়ে যাব। তবে তোমার মেয়ে যদি বলে এ সব জিনিস তোমাকে সে নিয়ে যেতে বলছে, তাহলে অবশ্য তোমাকে আমাদের ছেড়েই দিতে হবে।

উঃ—তা বাবা, এতাই যখন তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে তখন তোমাদের একজন না হয় আমার সঙ্গে চলে। আমি তো এখানে থেকে সোজা উত্তরপাড়ার আমাদের বাড়ীতেই যাবো। ওখানে গিয়ে আমার মেয়েকে না হয় কেউ জিজ্ঞেস করবেই আসুন না—এ সব বা আমি বলছি তা সত্যি কথা, কি না।

উপরে প্রস্তোত্তর হতে বুঝা যাবে, এই জিজ্ঞাসাবাদ ভারতীয় রকীদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছে। এই বিশেষ পদ্ধতিতে সরাসরি মূল ঘটনা সহজে কখনও প্রসন্ন করা হয় না। বরং মালুমের মনকে বাচ্চাতুর্ধ্য সহযোগে কৃত্রিম উপায়ে অল্প বিকল্প করে, পরে প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা

করে তাদের মনের কথা টেনে বাহ করে আনা হয়ে থাকে। এইরূপ বাক্যজাল সাক্ষীদের স্ব-বৃত্তি অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কারণ যে বাক্য-প্রয়োগ স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য, তাহা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। এই ক্ষেত্রে মলিনার মাতা চুরির অভিযোগের কথাই ভাবছিল। এই সময় বুনের কাহিনী তার মনের মধ্যে স্থান পায়নি। তা না হলে এতটা সহজে মলিনার মা আমাদেরিকে মলিনারটিকানা না দিতেও পারত।

উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে মলিনার মা সরোজিনীর মনের প্রতিরোধশক্তির হানি ঘটায় তার স্বাভাবিক মনোক ভেঙে দিয়ে তার নিকট হতে নিয়োক্তরূপ একটি বিবৃতিও আমরা আদায় করে নিই।

: আমি মলিনা দেবীর পালিকা মাতা। কিছুকাল বাবং আমি উত্তরপাড়ায় ঘর বেঁধে বাস করছি। আমার এই মেয়ের রূপের খ্যাতি আছে। সে নাচ-গান ভালো জানে। ছিনেমাতেও সে নাচ করেছে। আজকাল আমার সে ভাল মাসহারা দেয়। তাই এখন উত্তরপাড়ার গাঁয়ে-ঘরে বসে আমি শুধু ভগবানেরই নাম করি। তবে সে ব্যবসার জন্তে কোলকাতাতেই থাকে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকাল সাড়টার সে তার মালুমকে নিয়ে হঠাৎ উত্তরপাড়ার আসে এক বাছোছাছারের জন্ত সেখানে সে কিছু দিন থাকতে চায়। কিন্তু সে তার জিনিসপত্র উত্তরপাড়ায় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। তাই আমাকে তার জিনিসপত্র আনবার জন্তে সে আমাকে তার চাবি দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। না, না বাবা! মনের মালুমকে কার কখন কি করে হয়, তা মা হয়ে আমি জানতে চাইব কেন? আজ্ঞে না, খোকাবাবু নামে কাউকে আমি চিনি না। তবে যে ভুললোক মলিনাকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে তাকে আমি নিশ্চয়ই চিনিয়ে দিতে পারবো। আজ্ঞে হাঁ, সে কথা ঠিকই বলেছেন আপনারা। মলিনা মাস ছয় হ'লো আমার মাসহারা আশাতীতরূপে বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া পত্র দ্বারা সে এও জানিয়েছিল যে এই সময় হতে তার আর ঈশ্বরের কৃপায় তিন চার গুন বেড়ে গিয়েছে।

এর পর আর কালক্ষেপ না করে আমি উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হয়ে বাওয়াই প্রায় মনে করলাম। ইলপেটীর স্থানীয় চক্রায়কে অনুসন্ধান করেও তদন্ত করার জন্ত বেঁধে আমি একাকী মলিনার মা সরোজিনী সমভিব্যাহারে একখানি ট্যান্ডিযোগে উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হলাম। উত্তরপাড়ার বাড়ীর দালানে বসে মলিনা বিষয় মনে কি চিন্তা করছিল। এমন সময় তার মাকে নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রথমে মলিনা খুব সন্দেহে কোনও কথা বলতে চায় নি। কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি করার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নিয়োক্তরূপ একটি বিবৃতি প্রদান করে। তবে তার কখন-ভবি এবং মুখাকুতি হতে বুঝা যায় যে, সে সত্য কথাই বলেছে।

: আজ্ঞে হাঁ! আমি একজন রূপোগজীবিনী নারী। আমার বর্তমান মাসিক আয় এগার বা দ্বাশ শত টাকা। বর্তমানে এই টাকাটা আমার বর্তমান দায়িত্ব খোকাবাবু একাই দিয়ে থাকেন। এছাড়া সিনেমা করে বা আমি পাই—তা আমার কালজু লাভ। খোকাবাবু আসলে কে এবং তিনি থাকেন কোথায় কিংবা বর্তমানে তাঁর পেশা কি, তা আমি জড়নি না এবং কোনও দিন আমি তা জানাবার চেষ্টাও করি না। আমার স্বপ্ন জন্ম দাঁকা নিয়ে সম্পর্ক।

দের টাকা বন্ধ না করলে এসব প্রেরণ আমাদের মনে উঠে না।
কে ভালো আর কে মন্দ আমাদের মনে এসব প্রশ্নের ঠাই
নেই। তবে ঐক্যে ঠিক যে, ভাল লোক আমাদের নিকট
কমই আসেন। ওরফে মাহুদ হু—একজন এলো তাঁর বৈদ্যিক
ডাল থাকতে পারেন না। আজ্ঞে হাঁ, মাত্র ছয় মাস হলো খোকাবাবু
কেবল আমার ঘরেই আসছে। তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রী আছে এই যে
আর কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না। ওর সঙ্গে বারা আমার
ঘরে গান শুনতে আসেন, তাঁরাই ঠেকে 'খোকাবাবু খোকাবাবু' বলে
ডাকেন। এইজন্য আমার কাছেও উনি এ নামে পরিচিত। আজ্ঞে
হাঁ, মাঝে মাঝে আমার ঘরে গানের মহড়া হলে পাগলাবাবু বলে
একজন তবলাটা সেখানে তবলা বাজিয়ে যায়। হাঁ, খোকাবাবুর
জামিনতেও কয়েক বার তিনি আমার ঘরে তবলা বাজিয়ে গেছেন।
হাঁ, এ কথা সত্য যে, খোকাবাবু মধ্যে মধ্যে কয়েক দিন পর্যন্ত উঠাও
হয়ে থাকতেন। এই সময় চেষ্টা করলেও তাঁর কোন খোজ বা খবর
হয়ে থাকতেন না। এইজন্য কয়েক দিন জানাতেন কাজকর্মে তাঁকে
প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। আজ্ঞে হাঁ, চার দিন উঠাও হয়ে থাকার
পর ঠাণ্ডা সেন্টের ভোর ছয়টার সময় তিনি হঠাৎ আমার নিকট
এসে বসলেন যে সেই দিনই তাঁকে বিশেষে যেতে হবে। ফিরতে তাঁর
প্রায় দুই মাস সময় লাগবে। এই জন্য তিনি আমার আমার মার
কাছে রেখে যেতে চাইলেন। বিশেষ লীড়াপীড়ি করার আমি তখন
তাঁর সঙ্গে মার কাছ চলে আসি। পরে খোকাবাবুর উপদেশ মত
মাকে আমার ব্যবহার্য জিনিসপত্র আনতে কোলকাতার পাঠাই।
পাছে খোকাবাবুর অবর্তমানে আমি আর কাজের কামনা
করি, এইজন্যই বোধ হয় তিনি আমাকে আর একটুখনও ওখানে
থাকতে দিলেন না। আমি খোকাবাবুকে ভালবাসি কি না তা
আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে খোকা আমাকে অন্তরের
সহিত ভালবাসে বলে মনে হয়। আজ্ঞে হাঁ, ঠিকই বলেছেন।
আমরা ভালবাসা বিক্রি করে থাকি। তবে কখনও কখনও ওটা দান
যে একবারেই করি না, তাও নয়। না না না, আমাকে আপনারা
মাফ করবেন। এঁছাড়া আর আমি কিছু আপনারদের বলতে
পারব না।

বেশ বুঝা গেল যে মলিনাসুন্দরী প্রকৃত তথ্য গোপন করছে
এক সে ইচ্ছা করেই সত্য কথা বলতে চায় না। এ অবস্থায়
মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা প্রকৃত সত্য তার কাছ হতে
বার করা ভিন্ন উপায়ও ছিল না। পরিশেষে আমরা তাকে
নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। একটা কিছু অঘটন
ঘটার জন্তই যে খোকাবাবু মলিনাকে সহর হতে সরিয়ে দিয়েছে,
এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি মলিনাসুন্দরীর নিশ্চয়ই আছে। এইরূপ
মানসিক অবস্থার মধ্যে পুলিশের উপস্থিতি তাকে যে ভীত ও সম্মত
করে তুলবে তাতে আর বিচিৎ কি? এইজন্য পরামর্শদাতার
অভাবে তার মত একটি নারীর মনোবল যে সহজেই ভেঙ্গে পড়বে
তাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিয়ে উদ্ভূত প্রশ্নোত্তর
হতে আমার আশা যে অমূলক ছিল না তা নিশ্চিতরূপে
বুঝা যাবে।

প্রঃ—খোকাবাবুর দোষের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তবে আমি
জেনার কতই পারি। মলিনাসুন্দরী খোকাবাবু কি করেছে

বা না করেছেন তা তুমি যে একটুও জানো না, তা নয়। তবে
খুনের সঙ্গে তুমি যে সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত নও, তা আমি বিশ্বাস করি।

উঃ—এ্যা খুন? কি বলেছেন আপনি। কে কাকে খুন
করলো? বলুন না বলুন না, কে খুন হয়েছে। আমি খুনের
কথা কিছু জানি না।

প্রঃ—জানো না মানে? খোকাই তো পাগলাকে খুন করেছে।
খোকাকে তুমি কতটুকু ভালবাস তা জানি না। কিন্তু তুমি যে
পাগলাবাবুকে সত্যসত্যই ভালবাসো তা আমার ভালরূপেই জানি।
জানো, আজ তোমার জন্তই পাগলাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে
হলো। তার একমাত্র অপরাধ ছিল, সে তোমাকে ভালবাসতো।
এখনও যদি তুমি মিথ্যা কথা বলো কিংবা সত্য গোপন করো,
তাঁহলে পাগলার কবর-আত্মা তোমাকে ক্ষমা করবে না।

আমরা খুনের কবর সম্পর্কে কেবলমাত্র যা অনুমান করেছিলাম,
তাই কেবল আমি মলিনাকে বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের এই
ব্যথ্যা বারদের ভূপে বেন অগ্নিসংযোগ করে দিলে। হঠাৎ লক্ষ্য
করলাম, মলিনা অঝোরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। লোহ তত্ত্ব
থাকতে থাকতেই তাতে যা দেওয়ার রীতি আছে। তাই আর দেয়ী
না করে আমি মলিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি
লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

ঃ আজ্ঞে, আজ আমি কোনও কথাই আর গোপন করবো না
এ কয় দিন আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, প্রকৃতপক্ষে
কাকে আমি ভালবাসি, নির্ধনী সহায়-সম্বলহীন পাগলাবাবুকে, না
ধনী-সুপুরুষ খোকাবাবুকে? আজ আর স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে
আমি পাগলাকেই বেশী ভালবাসতাম। আমি যদি জানতাম এ
খোকা এই ভাবে তাকে খুন করবে, তাঁহলে কি খোকাকে আমি
আমার ঘরে স্থান দিই? তবে এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপা
ছিল না। খোকাকে আমি স্থান না দিলে পাগলাকে সে এর আগে
আগে খুন করে আসতো। তার পরে কোনও বাধা বা কাঁটা
সে কোনও দিনই ক্ষমা করেনি। এইবার হয়তো সে আমাকে
পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। খোকাবাবু যে কী ভীষণ দুর্দান্ত লোক
তা আমার চেয়ে বেশী আর কেউই জানে না।

আজ্ঞে হাঁ, আমি যা জানি নিশ্চয় বলবো। মাঝে মাঝে খোকা
ভয়ে পাগলা যে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতো এ কথা সত্য
প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টায় আমি গান-বাজনা শিখতে পেরেছি
মাত্র কয়েক দিন আগে খোকা আমার ঘরে পাগলাকে রেখে তা
বাড়ি ধরে বার করে দেয়; আর তামাম সাবধান করে দিয়ে বলে
আমি বেন আর একটা দিনও তাকে আমার ঘরে আসতে না দিই
পাগলা এই দিন একটু মন খেয়েই এসেছিল। অপমানিত হয়ে চলে
যেতে যেতে সেও খোকাকে শাসিয়ে যায় এই বলে—'তুমি যে একজন
জেলখারিজ শুণ্ডা তা আমি জানি। দেখো, কালই আমি তোমাকে
গোয়েন্দা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো।' এর কয় দিন পর একদিন রা
খোকা আমার ঘরে বসেছিল। এখন সময় সারা পোষাকে দুইজন
পুলিশ আমার দরজায় এসে খোকার খোঁজ করতে থাকে। আ
দরজার ফুটো দিয়ে সিপাই দু'জনকে দেখে খোকাকে তাদের আগমন
বাড়ী জানিয়ে দিই। খোকাবাবুও তৎক্ষণাৎ বিজলের জানলার গর
সরিয়ে একলাকে নীচের রাস্তায় উপর নেমে চক্কর পলাকের মধ্যে উঠা

যে যায়। পরে আমি শুনেছি পাগলা পুলিশে ধরবে দেয় নি। সিপাই দু'জন অস্ত্র হাতে সন্ধ্যার শেষে সেখানে এসে গিয়েছিল। কিন্তু খোকাবাবু একজন একমাত্র পাগলাবাবুকেই পুলিশের দাবানলভাঙ্গাপে সন্দেহ করেছিল।

এর পর তেরো সেপ্টেম্বর রাত্রি নয়টার সময় আমার ঘরে বসে মাছি, এমন সময় খোকাবাবুর বন্ধু কালী এসে বললো, 'বৌদি! খোকা এখন তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বললো।' এই বলে কালী বাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে সোনাপাছির উবা নামে একটি মেয়ের বাড়িতে তুললো। এর পর রাত প্রায় দশটার সময় খোকাবাবু তার বন্ধু কেউ বাকুকে সঙ্গে করে উবার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। এই সময় আমি খোকাকার নীল রঙের সার্টির উপরে দু'এক জায়গা লাগ রক্ত রঞ্জিত দেখি। আমি ঐ লাল রঙের দাগ সব্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে খোকা বললো, 'ও, না না, ও কিছু না রে। ও পানের পিচ লেগেছে।' এই কথা বলে খোকাবাবু তার বন্ধু কেউবাবু এবং কালীবাবুকে নিয়ে পুনরায় কোথায় চলে গেল। তার পর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় খোকাবাবু পুনরায় আমাদের নিকট ফিরে আসে। এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে খোকাবাবু চান করে মাথায় গন্ধ তেল দিয়েছে। এঁছাড়া সে তার নীল সার্টি বদলে একটা ছাই রঙের পাঁচভাগা নতুন সার্টি পরে নিয়েছে। এর একটু পরে খোকাকার অপর এক বন্ধু ভূপেনবাবুও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ উবা নামের মেয়েটি ছিল ভূপেনেরই রক্তিতা। এর পর সারা রাত ধরে বসে বসে আমরা সেখানে বিয়ার খাই। এবং সেই সঙ্গে বহু গল্প-গুজবও করি। পরদিন প্রত্যুষে ছয়টার খোকাবাবু আমাকে জানালো যে তার নামে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। এইজন্য কিছুদিনের মত সে বঙ্গভারত বাইরে গিয়ে গা-ঢাকা দেবে। এই বলে সে আমাকে সোজা উত্তরপাড়ার এনে আমার মা'র কাছে রেখে দিয়ে যায়। আমি সময়ের অভাবে আমার বাড়ী হয়ে আসতে পারিনি। এইজন্য আসবাবপত্র আনার জন্য মাকে কোলকাতায় পাঠাতে হয়েছিল। খোকাবাবু এখন কোথায় 'আছেন তা আমি জানি না। তবে আমি আপনাদের সোনাপাছিতে উবার বাড়ীটা দেখিয়ে দিতে পারবো।

এর পর আমি যে ট্যাক্সিতে উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম সেই ট্যাক্সিতেই মলিনাকে নিয়ে কলিকাতায় উবার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হই। এই সময় উবার দয়িত ভূপেনবাবুকেও উবার ঘরে আমি দেখতে পাই। আমাদের দেখামাত্র ভূপেন সবে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পালানোর পূর্বেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলি। তাকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের বেশী বেশী পেতে হয় নি। এইজন্য তাকে একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি বলে আমাদের মনে হলো না। ভূপেনের রক্তিতা উবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে 'মলিনা দেবীর অমুখপই এক বিবৃতি দিয়েছিল। এর অধিক তার পক্ষে এই হত্যা সম্পর্কে যতটা থাকার সম্ভব ছিল না। তবে তার দয়িত ভূপেনের নিকট হতে মন সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া গেলেও যেতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছিল। এইজন্য বিশেষ করে ভূপেনকেই এই হত্যা সম্পর্কীয় একটি বিবৃতি দিবার জন্য আমি লীড়াপীড়ি করতে থাকি। ঐ সম্পর্কে ভূপেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবৃতিটি নিয়ে উক্ত করা হলো:

আমি আমার রক্তিতা উবার সহিত তার ঘরেতেই বাস করি এবং বাজারে পাটের দালানী দ্বারা কীটিকা নির্বাহ করি। খোকাবাবু এবং তার বন্ধু কেউ, গোপী, কালী এবং স্বরূপবাবু মূলতঃ আমার পাড়াতেই আলাপ হয়। আমরা করজন প্রায়ই সন্ধ্যাকালে নিকটস্থ ব্রাকহোয়ারে বসে আলাপ আলোচনা করতাম। কিন্তু এই বন্ধু ব্যক্তি'বে কোথায় থাকে এবং তারা যে কি করে তা তারা কোনও দিনই আমায় বলে নি। তবে মধ্যে মধ্যে তারা আমার রক্তিতা উবার ঘরে এসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। আজ্ঞা হাঁ, তেরো সেপ্টেম্বরও রাত আন্দাজ নয়টার সময় এসেব করজন উবার ঘরে বসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ সময় তারা খোকাকার রক্তিতা মলিনাকে কেন উবার ঘরে এনেছিল তা আমার জানা নেই। এদিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে দেখি খোকা, কালী এবং কেউ আমার ঘরে বসে জটলা করছে। ঐ রাত্রে একটু বেশী মদ খাওয়ার আমি অস্বস্তি হয়ে ব্রাকহোয়ারে মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ি। এই জন্তই বাড়ী ফিরতে আমার অভ্যেতা বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল।

মলিনা দেবীর বিবৃতি অনুযায়ী আমরা তদন্ত করে জানতে পারি যে, কলিকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের গুপ্তা শাখার দুইজন সিপাই কোনও এক সংবাদ অনুযায়ী ঝালা নামে একজন জেলা-বাসিন্দ (Externed) গুপ্তার খোঁজে সত্য সত্যই মলিনার ঘরে ঐ দিন হানা দিয়েছিল। তবে এখানে ঝালার অবস্থান সব্বন্ধে কোনও সংবাদ পাগলাবাবু তাদের দেয়নি। এঁছাড়া এঁও জানা যায় যে, ঐ সময় বরাবর খোকাবাবুর বন্ধু কেউকেও মাতাল অবস্থায় রাজ্য হতে বটলার ধানার জনৈক কনেটবল পাকড়াও করে নিয়ে যায়। কেউকে একটি পেটিকেসে আদালতে সোপার্ক করাও হয়েছিল। আদালতের বিচারে কেউর দশ টাকা জরিমানা হয়। এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাগলাবাবুর সহিত সম্পর্ক রহিত হইলেও খোকাকে যেদিন সে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছিল তার একদিন পরেই সংঘটিত হয়। এইজন্যই বোধ হয় খোকাবাবু এবং তার বন্ধু কেউবাবুর ধারণা হয়েছিল যে 'পাগলাই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের সব্বন্ধে বাধে বাধে পুলিশে সংবাদ দিচ্ছে।

কোনও একটি হত্যার মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমেই প্রমাণ করতে হয় যে, ঐ হত্যাকাণ্ডটি কি 'ডিক্রেডিট' সংঘটিত হয়েছে। ইংরাজীতে একে বলা হয় মোটিভ। এই মোটিভ বা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে না পারলে মূল হত্যাকাণ্ডটিও প্রমাণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত দুইটি বিভিন্ন ঘটনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে পাগলা খোকাবাবুকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে আসার একদিন পরে খোকাকার ঘরে গৌয়েশা পুলিশ হানা দেওয়ার খোকাবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাহলে পাগলাবাবুই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য খোকাবাবুর আশ্রয়না সব্বন্ধে পুলিশকে ধবংস দিয়েছে। এঁছাড়া প্রথম ঘটনার দুই একদিন পরে খোকাকার অকৃত্রিম বন্ধু কেউবাবুকে বটলার পুলিশ অস্ত্র এক কারণে রাজ্য হতে ধরে নিয়ে গেলেও খোকাবাবু ও কেউবাবুর ধারণা হয়েছিল যে কেউবাবুর এই গ্রেপ্তারের পিছনেও পাগলাবাবুই কারসাজী ছিল।

এর পর আমরা সন্দেহক্রমে উবার দয়িত ভূপেনকে গ্রেপ্তার করে ধানায় আনি। কিন্তু বহু চেষ্টা করলেও অস্ত্র কোনও আদালতকে আমরা ঐ রাত্রে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হইনি। এই সময় জালা

বৃত্তে পারি যে এই কালী ভূপেনও এই মৃৎসেহ ইত্যাকারের সহিত সন্নিবিষ্ট আছে। তবে এদের চাইতেও অধিকতর প্রকৃতি, আরো কয়েকজন ব্যক্তি যে এই ইত্যাকারের খোঁকাবাবুর সকারী ছিল, তাও আমরা সহজে বুঝে নিতে পেরেছিলাম।

এই দিন অধিক রাত্রি হয়ে যাওয়ার আমরা মলিনাকে তার কলিকাতার নিজ বাড়ীতে রেখে আমরা আমাদের থানার ফিরে আসি। কিন্তু পাছে মলিনাকে খালা পুনরায় সেখান থেকে সরিয়ে দেয়, এইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ মলিনাসম্বন্ধীয় গৃহে আমরা সালা পোষাকে দুইজন পুলিশ মোতায়েন করতেও তুলিনি। কারণ যে নারীটিকে নিয়ে এই ইত্যাকার সমাধা হয়েছে তাকে খোঁকাবাবু সত্য সত্যই অন্তরের সহিত ভালবাসতো। এই অবস্থায় খোঁকাবাবুর পক্ষে পুলিশের অবর্তমানে তাহার সহিত মিলিত হবার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

এর পরদিন ১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, তারিখে প্রত্যয়ে আমরা য য নির্দিষ্ট কোয়ার্টারস থেকে নেমে থানার অফিসঘরে এসে সমবেত হলাম। বহুতপস্কে ভোর রাতে বাড়ী ফিরলেও আমরা কেহই ঘুমাতো পারিনি। বরং ঘুমের আমেজের ঝাঁকে ঝাঁকে আমরা এই ইত্যাকারটি সন্ধানের চিন্তা করেছি। কিছুকাল আলাপ আলোচনার পর স্থানীলবাবু প্রস্তাব করলেন যে আমাদের এখন উচিত হবে পুনরায় সোনাগাছির বেজাপল্লিতে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়ীতে বাড়ীতে আরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। এইরূপ তদন্ত দ্বারা যে কর্তি বেজানারী কোনও দিন না কোনও দিন পাগলাবাবুর সম্পর্কে এসেছে তাদের খুঁজে বার করার আশা প্রয়োজনও আমাদের ছিল। স্থানীলবাবুর উপদেশ মত আমরা পুনরায় সোনাগাছি অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়ী বাড়ী তদন্ত করে প্রায় বাইশজন কুলটা নারীকে সংগ্রহ করলাম। তদন্ত দ্বারা জানা গেল যে, ওরা সকলেই ভালরূপে পাগলাবাবুকে বহু বার দেখেছে। এদের সহিত আমরা উবা, মলিনা এবং মৃতের অস্ত্র পরিচিত ব্যক্তিদেরও সঙ্গে নিলাম। এদের সকলকে সঙ্গে করে কলিকাতার পুলিশ-মর্সের বরক ঘরে এনে তাদের একে একে পাগলার মৃতদেহটি দেখাতে সক্ষম করলাম। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই মৃতদেহটিকে দেখা পাননি বলে এরা সকলেই সনাক্ত করেছিল। মৃতদেহটিকে দেখে সনাক্ত করা যে খুবই কঠিন তা সর্বদাই স্বীকার্য। কিন্তু নির্যাক্ত কর্তি বিশেষ চিন্তা হতে তাদের পক্ষে এই মৃতদেহটি বিশ্বাসযোগ্যরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

(১) মৃতদেহটির বুক ও পিঠে প্রচুর চুল ছিল। দক্ষণ মাড়াল অবস্থায় তাকে তারা প্রায়ই নগ্ন অবস্থায় পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখতো। এইজন্য এই সব বৈশিষ্ট্য দেখার সুবিধা তাদের হয়েছিল।

(২) মৃতদেহটির বাম হাতে একটি ফুলের কুঁড়ি উল্লি সহযোগে অঙ্কিত ছিল। এছাড়া তার বাম ঠোঁটে একটা গভীর ক্ষতও দেখা যেতো। পাগলাবাবুর দেহের এই সব চিহ্নগুলি এরা প্রায়ই দেখেছে।

(৩) মৃতদেহের বাম পাট কুশ-পা ছিল এবং উহার ডান পায়ে ত্রিশুলের মত একটি দাগ ছিল। এই বকম পা সাধারণত মাদ্রাসের মধ্যে দেখা যায় না।

(৪) মৃতদেহের মাথা, মাকুতি এবং গাত্রবর্ণ হতেও উরা পাগলাবাবুর মৃতদেহ বলে তারা সনাক্ত করতে পেরেছিল। এই পাগলাবাবুকে বারে বার তারা দেখেছে। এইজন্য এই সম্বন্ধে তারা কোনওরূপ ভুল বা ভ্রান্তি করতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত আমরা পাগলার মৃতদেহের ওজন ও মাপও নিয়েছিলাম। কারণ কোনও দক্ষিণের কাছে জামার মাপ দেওয়া কিংবা কোনও স্থানে তার দেহ ওজন করানোও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। উপরন্তু তার পদ-চিহ্ন এবং হস্তাঙ্গুলীর চিহ্নও আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কারণ কোনও থানায় ধরা পড়ার পর জামিনের কাগজে তার পক্ষে চাপ দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু হুভাগ্যের বিষয়, এই কয়েকটি সূত্র অনুযায়ী তদন্ত করে আমরা কোনও ফল পাইনি।

ইতিমধ্যে আমাদের একজন অফিসার পাগলাবাবুর এক ভাইকেও খুঁজে বার করতে পেরেছিল। এই ভ্রাতৃলোক বনগারে ডাক্তারী করতেন। এই দিন ইনিও এসে মৃতদেহটি তাঁর বিগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বলে সনাক্ত করে গেলেন। ভ্রাতৃলোকটির নিকট হতে আমরা জানতে পারি যে, পাগলাবাবুর প্রকৃত নাম প্রতুলবাবু এবং সে সত্যই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু কুলটা নারীদের পানবান্দনা দেখাতে এসে সঙ্গ দোষে ধীরে ধীরে সে অশ্রুপাতের শেষ সীমায় নেমে এসেছে।

একজন আমাদের বিবেচনার বিষয় হলো যে, উপরোক্ত কর্তি মাত্র চিহ্ন হতে ঐ মৃতদেহ পাগলা ওরফে প্রতুলবাবু নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে কি না। এই বিষয়ে শেষ বিচারের ভার জজ ও জুরীদের ধ্যান-ধারণার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে। এইজন্য এই বিষয়টি নিয়ে আর অধিক মাথা ঘামানোর আমরা প্রয়োজন মনে করিনি।

ইতিপূর্বেই আমরা পুলিশ সার্জেন্টের নিকট লাস ডেই-এর বা পোটমোটম পরীকার রিপোর্ট পেয়েছিলাম। রিপোর্টটিতে অস্ত্র বিষয়ের সহিত নির্যাক্তরূপ তথ্যটিও লিপিবদ্ধ ছিল। এই বিশেষ তথ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালীন তদন্ত করবার জন্য ঐ রিপোর্টের এই অংশটি আমরা মনোযোগ সহকারে আর একবার পাঠ করে নিলাম।

আমি পরীক্ষা দ্বারা আরও জেনেছি যে, রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা আশ্রয় সন্ধ্যায় প্রথমে ঐ ব্যক্তিকে ছুরিকা দ্বারা বার বার আঘাত করে মৃতপ্রায় করে তোলা হয়। কিন্তু তখনও ঐ ব্যক্তির প্রাণ বেহ হতে বিচ্যুত হয়নি। এর কিছু পরে তার জীবিত অবস্থায় তার দেহ হতে মৃত্যুটি ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত করা হয়েছিল।

সব দিক বিবেচনা করে আমরা প্রায় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সমর্থ হই যে—কোন ব্যক্তি কোন সময় কার দ্বারা কি কারণে এবং কবে ও কি কি উপায়ে কোথায় নিহত হয়েছিল। বহুতপস্কে এই ভাবে আমরা এই ইত্যাকারহত্যার উপর প্রচুর আলোকপাত করতে পারার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম। এই অবস্থায় আমাদের দলের কোনও কোনও অফিসার মতপ্রকাশ করলেন যে আমাদের মত তদন্ত এইখানেই সমাপ্ত করা বাক। কারণ আমরা সকলে ঐ দুই দিন ব্যবধি খোঁকাবাবুর মৃতদেহটি সনাক্ত করে

পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সেই হতাশা সহ্য করতে পারে তাকে তার বৈশিষ্ট্যের সত্ত্বাতে গেলে তা সহ্যেই প্রবৃত্তি পড়তে পারে। একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, নিজের দেহ ও মনকে সুস্থ না রাখলে কোনও দুরূহ কার্যে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার সহকারী তত্ত্বাবধায়কের সহিত একমত হতে পারিনি। আমার মতে তত্ত্বাবধায়ক সাফল্য একান্তরূপে নির্ভর করে স্পিড বা গতির উপর। অস্ত্রধারণ বহু সাফল্য প্রমাণ ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া বিলম্বের কারণে মূল হত্যাকারী পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গেলে কয়েক বৎসর পর্যন্ত তার পক্ষে ফেরার জীবন অতিবাহিত করা সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে বহু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকেও নানা কারণে আর খুঁজে পাওয়া নাও যেতে পারে। এইজন্য আসামী বহু বৎসর পরে ধরা পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত আর মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এই বিবরণ কয়টি ছাড়া আমার সহকারী অফিসারদের সহিত বিমত হওয়ার অপর আর একটি কারণও ছিল। এই কারণটি হচ্ছে এই যে, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল খোকাবাবু এইধর্ম গভীর রাতে তার বন্ধিতা মলিনাসুন্দরীর কক্ষে নিশ্চয়ই একবার হানা দেবে। এইজন্য আমার সহকারীদের বিশ্রাম করবার সুযোগ দিয়ে আমি একাই কয়েকজন সিপাহীসহ মলিনাসুন্দরীর বাটার নিকট গোপনে অবস্থান করতে মনস্থ করলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাদের অভিজ্ঞ পুরাতন ইন্সপেক্টার সুনীলবাবু আমার মতেই মত দিয়েছিলেন। অগত্যা এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করার ভার বেছাকৃতভাবে আমি নিজের স্বন্ধে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এত যে নিজের জীবন কতদূর বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে, তা তখনও আমি অনুমান পর্যন্ত করতে পারিনি।

আমি কয়েকজন মাত্র সিপাহী সমভিব্যাহারে সাদা শোষাকে মলিনাসুন্দরীর বাটার নিকট যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজতে চলেছে। হঠাৎ আমরা সমস্ত হয়ে লক্ষ্য করলাম, দিক দিকে ঐ অঞ্চলের নিশাচর লোকেরা এবং স্থানীয় দোকানদাররা ভীত-ভ্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। সকলের মুখে সেই একই কথা "খোকা খোকা খোকা।" এই সময় তাদের সমবেত কণ্ঠস্বরকে ধ্বনিয়ে মলিনাসুন্দরীর ঘর থেকে কল্প আর্জিনাদ শোনা গেল,

"ওরে বাবা রে মেরে ফেললে রে। ওগো তোমরা আছো-ও।" এই এসে আমার রক্তা করা গেল। বাটার নীচের ঘরে দুই জন পাহারাদার পাহারার জন্য পূর্ব হতেই মোতায়েন ছিল। ইতিমধ্যে কে বা কাহারো বাহির হতে তাঁর দরজা শিকলের সাহায্যে বন্ধ করে দিয়েছিল। ঐ ঘরের ভিতর হতে তারাও প্রাণপণে চীৎকার করে সাহায্য-ভিক্ষা করছিল। এই সময় বাটলা খানার সেকেন্ড অফিসার আসিফুল হক সাহেব এলাকার রৌদ্র দিতে দিতে ওইখানে এসে পড়েছিলেন। তিনি অকুহলে জমায়েৎ ভীড়ের ওপার থেকে প্রাণপণে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভীত-ভ্রস্ত লোকের চাপে কিছুতেই তিনি এগিয়ে আসতে পারছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, মলিনা দেবীর বাড়ীর দোতলার কার্ণিশ থেকে এক ব্যক্তি শিল্পল হাতে লাফিয়ে রাস্তার পড়ে চতুর্দিকের জনতাকে লক্ষ্য করে উপযুগরি গুলীবর্ষণ শুরু করে দিলে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমারও জামার নীচের পোটকার গুলীতরা একটি শিল্পল ছিল। আমিও তৎক্ষণাৎ উঠা বার করে ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করে উপযুগরি কয়েক বার গুলী ছুঁড়লাম। কিন্তু সমুখের জনতার জীবন পাহাে অকারণে বিপন্ন হয়, সেইজন্য আমাকে শীঘ্রই স্বেচ্ছা হয়ে গুলীবর্ষণ বিরত হতে হলো। এই সুযোগে লোকটি পাশের অপরিসর গলি দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তা জনতার আর সকলের মত আমিও বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বাটলা খানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার স্বতন্ত্র দুখানী বহু সিপাহী-শাস্ত্রীসহ সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। এই খবর জামপুরের খানাতোও পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেইখান হতে ইন্সপেক্টার সুনীল বাবুও তাঁর অভ্যস্ত সহকারীদের সহিত দ্রুত গতিতে অকুহলে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সকলে মিলে দ্রুতগতিতে সারা সোনাগাছি অঞ্চলটি ঘেঁরাও করে ফেলে সেখানকার প্রতিটি বাটার প্রতিটি কক্ষ এবং ভূতস্ব চতুর্দিককার মেঘবগলিও রাজপথ সমূহে তল তল করে ঐ আততায়ীর জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া তো গেলই না; এমন কি কোন পথ দিয়ে যে ঐ ব্যক্তি অস্ত্রধারণ করে গেল, তার সামান্য হদিস পর্যন্ত কেউই আমাদের জানাতে পারলো না।

[ক্রমশঃ]

সকলই কবিতা

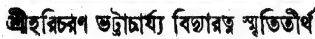
ঐন্দ্রলাল বেরা

এই পৃথিবীতে বা কিছু ঘটিছে সবই কবিতার ছন্দ
ছোট-বড় আর মান-অপমান ভালো হোক কিবা মন্দ।
কবির মানসে জাগে তারি ছবি তুলিয়া বিভল মন্দ।

সুখ তুচ্ছ, কিবা ছোট-বড়ো,
গাঁথিতে তাহার করি সব জড়ো,
একই মূর্খে গাঁথা সে মালা—কেবল নানান ছন্দ।

মিষ্ণো-বোর, প্রেম-ভালোবাসা,
তারো মাঝে আছে কবিতার ভাসা,
কবির বীণায় বাজে তারি স্বর ইমি তাকড়া।





শ্রীশ্রীচরণ ভট্টাচার্য

১৩১৭ সালে ভটশিল্পীর শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীকে দ্ব্যুত্তীর্ণ মহাশয় বিবাহ করেন।

দ্বাদশ বৎসরে উপনয়নের পর হইতে তিনি গণ সাধনার মগ্ন হন। এই পর্বাঙ্ক তিনি উত্তর-ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। নবগ্রহ সাধনার তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

পরিণত বয়সেও তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া যুগভীর আলোচনা ও গবেষণায় নিজেই নিমজ্জিত রাখিয়াছেন দেখিয়া কথঞ্চদম বয়সান ভ্রাঙ্কণ-পণ্ডিতকে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লই।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মূললেখক]

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াও মাতৃভাষা বাঙ্গালার মাধ্যমে লেখায় উল্লুখ হয়েছিলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “ইংরাজীতে লিখে কোন ছাত্রী ছাপ রাখা যায় না বলে আমার ধারণা।” এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদে পবিত্র জীবনধারা লক্ষ্য করিলে উহার স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১১ সালের আশ্বিন মাসে বীরভূম জেলার হাতিয়া গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত শতাব্দীর অন্ততম ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আইনজীবী না হইয়াও আইন শাস্ত্রের নুসান্ধিত্ব জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেন। মাতা ৬/১২১১ সালের দেবীকে পুত্র শ্রীকুমার মাত্র চারি বৎসর বয়সে হারান। স্বগ্রাম বীরভূম জেলার কুশমোর গ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষা বাবার নিকট গ্রহণ করিয়া ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার সি. এম. তারিফ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। মামা আশুতোষ রায়চৌধুরী তখন উহার প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। ১১০৬ সালে তথা হইতে মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেলা স্কুলারশিপ পান। দুই বৎসর পরে হেতুমপুর কলেজ হইতে ত্রয়োদশ স্থানান্তরিত হইয়া এফ. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রাক্তন হন। এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে “দিশান স্কলার” হয়েছেন একমাত্র ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যাচার্য্য সত্যলোকান্ধরিত শিশিরকুমার ভাট্টা মহাশয় তাঁহার অন্ততম সহপাঠী ছিলেন। বর্তমানে তিনি শিশিরকুমার সঙ্কে একটি রচনার ব্যাপ্ত আছেন। ১১১২ সালে তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম. এ. পাশ করেন। উহার ফলাফল বাহির হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি জুরেন্দ্রনাথ ও অধ্যক্ষ জানকী শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে তিনি তিন মাস বিশপ কলেজে অধ্যাপনা করেন। উক্ত বৎসরের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ এচ. আর. জেমস-এর আহ্বানে তিনি উক্ত কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করিয়া ১১৩৫ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১১৩৫-৪০ সাল পর্যন্ত রাজশাহী কলেজে সহাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ হিসাবে কার্য করিয়া পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং ১১৪৬ সালে তথা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১১৪৬-৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে কার্য করেন। “Critical Theories & Poetic Practice in

Lyrical Ballads” এর উপর তিনি ১১

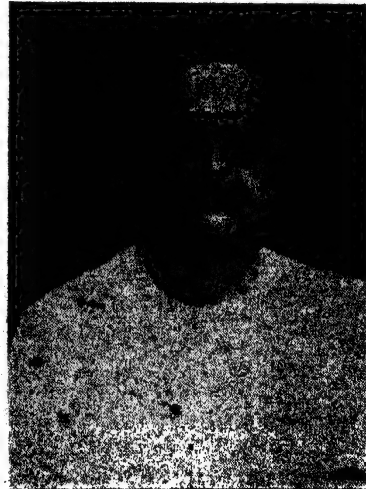
উপাধি পান।

প্রথম জীবনে শ্রীকুমার বাবু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বহু রাবে (বহু ট্রেটের সভাপায়ক) ভাট্টাপুত্র ৬/আশুতোষ রায়ের নিকট নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিলম্বিত লয়ে জেপদ গানে আশুতোষ বাবু অধিতীয় ছিলেন।

১১১১ সালে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর সহিত পরিণয়পুত্রে আবদ্ধ হন।

১৩২১ সালে হাতিয়া গ্রামে এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৬/জলধর সেন, ৬/অপরেশ মুখার্জি প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ উহাতে যোগদান করেন। সেই সভায় শ্রীকুমার বাবু “রূপকথা” নামে একটি ব-লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা উচ্চপ্রশংসিত হওয়ার “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে আই-এর বাঙ্গালী পুস্তকে উহা সন্নিবেশিত আছে। ইহার পর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশঃ বাঙ্গালী রচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে “বঙ্গ সাহিত্যে উপাঙ্গের ধারা” সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে আদৃত। তাঁহার লেখা “উনিষদ শতকের গীতি-কবিতা সম্বলন”-এ আমরা পাই ১৮৫০-১৯০০ সালের ১১১০ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালার বহু জানা-অজানা কবির কবিতা সংগ্রহ। তিনি বহু পুরাতন ও অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা হইতে কবিতাগুলি সংগ্রহ করেন। এছাড়া তাঁহার “সমালোচনা-সংগ্রহ” ও “বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা” পুঙ্খানু পুঙ্খ হুইট পুস্তকের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে।

বাংলাকাল হইতে শ্রীকুমার বাবু খেলাধুলার অনুরক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে কার্য করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কলিকাতার



ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

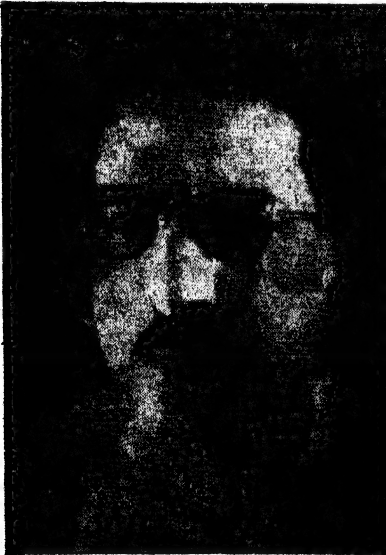
কর্তৃপক্ষ মহাশয়ে নিজস্ব খেলার মাঠ সংগ্রহ করিতে রাষ্ট্র সরকারের খেলাধুলা অনুমোদিত করার উদ্দেশ্যে এক বাসীর উপর তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৫২ সালে তিনি রামপুরহাট কেন্দ্রে ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই সময় তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলসমূহের একীকরণ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। 'রবিবাসর', 'নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন', 'বোর্ড অব ষ্টাডিজ ইন মিউজিক' এর চেয়ারম্যান, আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি এখনও সক্রিয় ভাবে জড়িত আছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী সাহিত্যিক অনেকই আছেন কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শক্তিশালীই নন নিঃসন্দেহে নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

উত্তর প্রদেশের জোনপুরে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৮তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন শহর মুন্সের লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এদের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার বরানগরে। তারপর সেখান থেকে পূর্বীয়া এবং পূর্বীয়া থেকে নিজের কর্মক্ষেত্রে মুন্সেরে চলে আসেন সপরিবারে শরদিন্দুর পিতা। তিনি বিহারের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপত্তি কিছুই অভাব ছিল না। তাই সমৃদ্ধ পারিবারিক পরিবেশে শরদিন্দুর বাল্যকাল কেটেছে। সেখান থেকেই তাঁর ছোটবেলা থেকেই। মা বিজলীপ্রভা দেবীর অলঙ্কার বই পড়ার ঝোঁক। বালক শরদিন্দু মায়ের সংগ্রহ



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

করা বইগুলি পড়তেন। একদিন বঙ্গবন্ধুর আনন্দমঠ পাড়়ে তাঁর মনে অদ্ভুত প্রেরণা এল। তিনি গল্প লিখবেন ঠিক করলেন। এই ভাবে তাঁর সাহিত্যিকের হাতেখড়ি হল। স্থানীয় জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় পড়তে এলেন বিভাগ্যাগর কলেজে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার অনেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তিনি। বিশেষ ফুটবল ও টেনিসে। কলকাতায় কেশব সেন স্ট্রীটের ওয়াই, এম, সি-এতে তিনি থাকতেন। এক সেখানেই বাস্কেট বলের একটি দল গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে এই দলটি একাধিকবার ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্মান অর্জন করে।

কিন্তু এই সবের ঝাঁকও সাহিত্যচর্চা তাঁর সমানে চলছিল। এই সময়েই তিনি নিজের উদ্ভোগে 'বোবনমুখি' নামে একটি ছোট কবিতার বই প্রকাশ করেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় পত্রিকা প্রবাসীতে এর দীর্ঘ সমালোচনাও বেরিয়েছিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মুন্সেরের অন্ততম উকিল শ্রীমলালাল চক্রবর্তীর নাতি। পার্শ্ববাসী দেবী শরদিন্দুর সখ্যক্ষীণী হয়ে আসেন।

কলকাতা থেকে বি-এ পাশ করার পর তিনি পাটনা থেকে ল' পাশ করেন। পিতা বিখ্যাত উকিল, সমস্ত রকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি ওকালতি করেননি। কিছুদিন বার লাইব্রেরীতে ঘোরা-ফেরা করে পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করলেন এসে। কয়েকটি পত্রিকায় তখন তিনি লিখতেন। একদিন বঙ্গবন্ধুতে গল্প (উড়ামেষ) পাঠালেন তিনি। প্রকাশও পেল কিন্তু গল্পের শেষের দিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে। তিনি কিছুটা রাগত ভাবেই সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্র দিলেন। উত্তর এল যথাসময়ে। সুন্দর প্রেরণাময় চিঠি। সম্পাদক জানিয়েছেন, সেখান অদলবদল করা হয়েছে লেখককে ছোট করার জন্তে নয়—রচনাটিকে আরো গতিশীল করার জন্তেই। এর পর বঙ্গবন্ধুতে তিনি প্রচুর লিখেছেন। এমন কি তাঁর বিখ্যাত বোমকেশের প্রথম আত্মপ্রকাশ এখানেই।

১৯৩৮ সালে তাঁর বয়ে বাওহার আহ্বান আসে। বয়ে টকিজের হিমাংশু রায়ের একজন বাঙ্গালী কাহিনীকারের প্রয়োজন ছিল। ওই সঙ্গে তারারাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কেও আহ্বান জানান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে শরদিন্দুই নির্বাচিত হন। সেই থেকে তিনি পশ্চিম-ভারতের মধ্যে নেই। উপস্থিত তিনি আর কনট্রাক্টের বীধাবীধির মধ্যে নেই। স্বাধীন ভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁর বহু কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। তার মধ্যে ভাবী, নবজীবন, দুর্গা, পুনর্মিলন, আজাদ, হুকাফার ইত্যাদি ছবি দর্শকদের চিত্তকর্ষ করেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরদিন্দুর স্থান একক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর ঐতিহাসিক উপভাষাগুলি সাহিত্যের দরবারে যুগান্তর এনেছে। জাতিম্র, বিধকল্যা, কালের মন্দির, গৌড়মল্লার, ভূমি সন্ধার মেঘ ইত্যাদি যে শুধু রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাই নয় বরং ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ডিটেকটিভ কাহিনী রচনায় তিনি ভারতের কোনেও নেই। তাঁর অপর সৃষ্টি বোমকেশের কীর্তিকলাপে পাঠক-সমাজ চমকিত। ব্যক্তিগত জীবনে শরদিন্দু অত্যন্ত

দালাপী ও দলিক। উপস্থিত তিনি পুণ্য মাড়ী করে বসবাস করছেন। তাঁর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগিনী মাহুবানী সুখোপাধ্যায় স্ব স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর তিন পুত্র—সকলেই কৃতিমান। তাঁর মধ্যম পুত্র শাহু বন্দ্যোপাধ্যায় বরের একজন উদীয়মান চিত্রপরিচালক।

প্রকৃতপক্ষে শরমিন্দু সাগর জীবন সাহিত্যই করে চলেছেন। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসেন। গত বছর আনন্দবাজার তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে সর্বাঙ্গিত করেছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

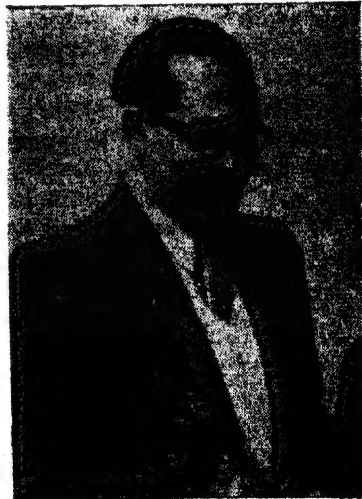
[পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল]

অপূর্ণ কর্মতৎপর, সাহসী ও কর্মদক্ষ এ পুরুষটি। মুখে সর্বদাই হাসি। একে ঠিক পুলিশ অফিসার হিসেবে বহু-বাহুব ও আত্মীয়-স্বজন দেখেন না। সাংবাদিক হিসেবে এই পদস্থ পুণ্ড্র অফিসারটির সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি দীর্ঘকাল। কিন্তু এ দিনও তাঁকে গম্ভীর হতে কিংবা মেজাজ খারাপ করতে দেখিনি। ক্রীড়াবিদ্য সম্পাদনের কার্যে লিপ্ত থাকার কালে দেখেছি তাঁর সান্নাধ্যম্য মুখখানি। কিন্তু এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যখনই যে কাজের আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে, বত কঠিনই হোক না কেন, সন্তুষ্টভাবে ও অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তিনি তা সম্পন্ন করে আসছেন অল্পান্ত্র ভাবে কোন নিশ্বাস বা ক্ষতির অপেক্ষা না করে। যখনই প্রয়োজন হয়েছে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তিনি এগিয়ে গেছেন কর্তব্যের কঠোর আহ্বানে। অসাধারণ সংগঠনী শক্তি নিহিত আছে এর কর্মজীবনের আর তার সাথে রয়েছে বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই মূলধন নিয়েই শ্রী বসু এগিয়ে চলেছেন তাঁর কর্মজীবনে এবং এ কয়টি মূলধনের সহায়তার আজ তিনি পুলিশ বিভাগে এতখানি উচ্চ আসন ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আর একটি মহান আদর্শ রয়েছে শ্রী বসুর জীবনে। তিনি নিজেকে সর্বদাই জনগণের সেবক বলে মনে করেন। শুধু পুলিশ অফিসার হিসেবেই নয়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে। নিজের কর্মময় জীবনধারার তিনি এই আদর্শেরই একনিষ্ঠ পূজারী।

‘পুলিশ বিভাগে চাকরি করতে হবে এ কখনই ভাবিনি। শুধু আমিই নয় আমার পুণ্যপাদ পিতৃদেব কিংবা অল্প কোন আত্মীয়-স্বজন কোন দিন মনে করেন নি। আমার বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে আমি শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাব্রতী হয়ে কাজ করি। আমার পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল অক্সফোর্ড-এর ডিগ্রি নিয়ে এসে শিক্ষা বিভাগে আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু লোকে ভাবে এক, আর হয় এক। ঠিক এমনই দিনেই আমার পিতৃদেবের ঢাকা যে ব্যাচ ছিল, সেই ব্যাচ ফেল হলো। এদিকে আমার পিতৃদেবও তখন বৃদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে আমার কর্মগ্রহণ। নতুবা আজ আমি পুলিশ অফিসার না হয়ে শিক্ষাব্রতী হিসেবেই পরিচিত হতুম।’—এ করেকটি কথা শ্রী বসু আমাকে বললেন স্নানোচনা প্রসঙ্গে।

শ্রী বসুর পৈত্রিক বাসভূমি পূর্ববঙ্গের (বর্তমান পূর্ববঙ্গ) বশোর-জেলায় ঝিনাইদাতে হলেও তিনি কখনও নিজের পৈত্রিক বাসভূমিতে যাননি। ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় বাগবাজারে তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় সনৎকুমার ঘোষের বাড়ীতে শ্রী বসুর জন্ম। পিতা ছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ চূর্ণাপাল বসু। দুই বৎসর বয়সে শ্রী বসু তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে হারান। সেই থেকে তিনি মাতার বাড়ীতে লালিত-পালিত। তার পর তাঁর বাবা, শৈশব ও ছাত্রজীবন কাটে এ কলকাতা মহানগরীতেই। ১৯২৯ সালে সাউথ সুবার্বান হুল (মেন) থেকে তিনি চারটি ‘লটার’ সহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই, এ, পরীক্ষার পঞ্চদশ স্থান অধিকার করে উক্ত কলেজেই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি, এ, পড়তে থাকেন এবং ১৯৩৪ সালে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে ১ম হয়ে সম্মানে বি, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তার পর শ্রী বসু এম, এ, কোর্স ও দুই বৎসর আইনও পড়েন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার এবং ইন্টারন অডিট ও একাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষা প্রদানের জন্য তাঁর এম, এ, ও আইন পরীক্ষা দেওয়া হলো না। হাতের লেখা খারাপের অজুহাতে ৫ নম্বর কাটা যাওয়ার জন্যে শ্রী বসুর শেষ পর্যন্ত অডিট ও একাউন্টস সার্ভিসে যোগ দেওয়া হলো না।

বি, সি, এস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ’য়ে তিনি ডেপুটি সুপার হিসেবে সরকারী কাজে যোগদান করলেন ১৯৩৮ সালে। ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা গ্রহণান্তে প্রথমে নবীয়ার তার পর সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার হিসেবে ২৪ পরগণা জিলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় যোগদান করেন। এর পর শ্রী বসু রাজসাহী, ময়মনসিংহ এক ঢাকায় সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে কাজ করেন। তিনি মেদিনীপুরে পুলিশ সুপার থাকাকালীন ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন



শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

এর সঙ্গে সঙ্গে এই আগষ্ট ভারতের শ্রেষ্ঠ মহানগরী কলিকাতার পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কার্যে যোগদান করেন। এই কাজে তিনি প্রশংসার সঙ্গে ১৯৫২ সাল অবধি কাজ করেন। তারপর অল্প কিছুদিনের জন্তে ২৪ পরগণা জিলার আলিপুরে পুলিশ হুশার হন। ১৯৫৪ সালে শ্রী বহু পুনরায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ডেপুটি কমিশনার হ'য়ে আসেন। ১৯৫৫ সালে কলকাতা পুলিশের সদর কার্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার হন। ১৯৫৬ সালে পুলিশের নন্দীপ বস্ত্রের (জলপাইগুড়ি সদর কার্যালয়) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গৌরেন্দ্রা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে কলকাতার বদলি হন এবং তখন হাতে অস্ত্রাবধি ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের দায়িত্বভার বহন করে চলেছেন নিরলস ভাবে।

পুলিশ বিভাগে কাজ করার সময় শ্রী বহু কয়েকটি দুর্সাহসিক কাজ করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্থানভাবে এখানে মাত্র দু'টি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রথমটি হচ্ছে ১৯৪৭ সালে। শ্রী বহু তখন মেদিনীপুরে। সেই সময় খড়গপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পরে এ দাঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করে। দাঙ্গাকারীরা উত্তর পক্ষেই বন্ধুক, ছোরা, তরবারি, বোমা ও গোলাগুলি ব্যবহার করে।

এই বিধ্বংসী দাঙ্গার মাঝে সহসা কোন লোক যেতে চায় না। শ্রীবহু নিজের জীবন বিপন্ন করে স্বেচ্ছায় দাঙ্গা দমনে এগিয়ে গেলেন এবং আয়েয়াস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ না করেই দাঙ্গা প্রশমিত করেন। শ্রীবহুর উপস্থিতিতেই দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে। তারপর ১৯৪৮ সালে কলকাতার আপার সারকুলার রোডে শ্রীবহুর জীবন বিপন্ন হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাহার অসীম সাহস ও প্রাত্যহপরমতিতে তাহার জীবন রক্ষা পায় ও তিনি বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন এবং দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে। ঘটনাটি ঘটে মহরমের শোভাবাত্রায় সময়। শোভাবাত্রাটি বখন আপার সারকুলার রোডে বিজ্ঞান-কলেজের সম্মুখে উপনীত হয় তখনই ঘটনাটি ঘটে। জনৈক ভদ্রলোক সারকুলার রোডে ফুটপাথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ইতোমধ্যে শোভাবাত্রাকারীরা ভদ্রলোককে আক্রমণ করে এবং ভদ্রলোকের মস্তকে আঘাত করে। ভদ্রলোক রক্তাক্ত অবস্থায় ফুটপাথে পড়িয়া যায়। শ্রীবহু ঘটনাস্থলের অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে দাঙ্গা পোষাক পরিহিত করেকজন মাত্র

কনষ্টেবল ছিল। এই কনষ্টেবল দৃষ্ট দেখিয়া তিনি ছিন্ন থাকিতে পারিলেন না। নিজের জীবনের হারা ভ্যাগ করিয়া তিনি একাকী ক্রুদ্ধ ও নৃশংস জনতার মধ্যে কাঁপাইয়া পড়িলেন ভদ্রলোকটিকে রক্ষার জন্ত। সেদিন শ্রীবহু ঐ ভাবে অকৃৎসন না গেলে ভদ্রলোকের জীবন রক্ষার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীবহু ভদ্রলোকটিকে ধরে ভোলবার সঙ্গেই ক্রোধাক্ত জনতা তাঁকে আক্রমণ করলো। তিনি গভাস্তর না দেখে জীবন রক্ষার জন্তে তাঁর রক্তভার থেকে ১ রাউণ্ড গুলী করেন জনতার পা লক্ষ্য করে। কয়েক জন পায়ে আঘাত লেগে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মুসলমান পলায়ন করে। ক্রমে শ্রীবহু ভীষণ দাঙ্গা প্রশমিত করেন সেদিন। সবাই মনে করেছিলেন, শ্রীবহু বেঁচে আসতে পারবেন না। কিন্তু নিজের কর্তব্যের কাছে কোন শক্তিই সেদিন তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

খুব সম্ভবতঃ একথা অনেকেই জানেন না যে, বাল্যকাল থেকেই শ্রীবহু সাহিত্যচর্চা করে আসছেন। "বঙ্গশ্রী" "বিচিত্রা" ও "শ্রীহর" মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁহার বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অস্ত্রাবধি তিনি সাহিত্যচর্চা অক্লান্ত রেখেছেন। একদিন স্বর্গত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশই শ্রীবহুর গল্পের প্রশংসা করেছেন।

শ্রী বহু ১৯৪১ সালে গৌরী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সহধর্মিণী একজন বিদ্বতী মহিলা ও প্রখ্যাত শিল্পী। তিনটি সন্তানের জননী হয়েও ১৯৫৩ সালে শ্রীমতী বহু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। শ্রী বহুর স্মৃতি পুত্র শ্রীমান অশোককুমার ১৯৫৮ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে। তার সাফল্যের মূলে রয়েছেন শ্রীমানের মাতা গৌরী দেবী ও শ্রীবহু। তাঁরা উভয়েই ছেলের লেখাপড়ার সাহায্য করেছেন সক্রিয় ভাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রী বহু অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করেন। ক্লাব, খেলাধুলো হৈ-ছল্লাও তাঁর ভাল লাগে না। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চা, পড়া ও গানবাক্সনা নিয়েই সময় অতিবাহিত করতে ভালবাসেন। নিরহঙ্কার, সদালাপী, বন্ধুবৎসল প্রকৃতি বহুগুণে তিনি বিভূষিত। জনগণের সেবাই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। আমরা এই গুলী, বিধান ও সং অফিসারটির দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি বহুদিন জীবিত থেকে দেশের ও জনগণের কল্যাণ-সাধন করুন।

রমণী

শ্রীমতী তৃপ্তি সোম

তুমি যে রমণী

তোমার পূর্ণতা নহে রক্ত-কাপনে

রপের দ্রবে তুমি নহে বিজয়িনী।

নারীঘের বাহুঘের অনন্ত সৌন্দর্য
তোমাতে নিহিত : তব অন্তর সৌন্দর্য।

সে সুরভি জর করে সবাকার মন—

মমতা ও সেবা-হস্ত, মিষ্ট আলোচন।

শ্রীমতী-বিক্রান্তিতে দেহ-সকাধিণী
তুমি পূর্ণ তুমি ধর্ম তুমি বিজয়িনী।

হরিদাসের শিখর সৌন্দর্য

দর্শন করনি ভগ্ন। অথচ
তাকেই গিয়ে ধরিয়ে যোঁকরা
ঠাকুরাণী : আমাকে হরিদাসের সিরে
বাঁধি বাবা ?

আমি ?
তুই না নিয়ে গেলে আমার
আর বাওরাই হয় না।

কিন্তু আরও গুরুতর কারণ আছে
ভগ্নের বিশ্রিত হবার। এবার তই
প্রকাশ হয়ে পড়ল তার প্রাণে।

এতদিন বাওরা হরনি কেন,
মাসীমা ? তীর্থ তো কম করনি
তুমি।

আসল কারণটা জানা গেল
যোঁকরা বাট বছর ধরিয়ে কোঠ
পুরে ব্রৈলোক্যনাথের কাছ থেকে।
কবল হরিদাসের কেন, মাঝে সঙ্গে নিয়ে
একেবারে কলারবহরী পর্বত বাবার

একটা ইচ্ছা। অনেক দিন বাবু তিনি মনে মনে পোষণ করে আসছেন
বলে দু'-একবার সুযোগ থাকলেও জননীকে তিনি হরিদাস বেতে
সেননি। কিন্তু বিধি তার উপর বাম বলেই বৃষ্টি চাকরি ছেড়ে অবসর
নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মিছে বাতে একেবারে অচল হয়ে পড়েছেন।
এরকম অবস্থার আর একজনের সঙ্গে এই সময় যোঁকরাকে
পাঠাতে না পারলে এ জীবনে বুড়ার আর হরিদাস দর্শন
হয় না।

আশীর কোঠার পড়েছেন যোঁকরা ঠাকুরাণী। তাঁর জরাজীর্ণ
সেখানির দিকে চেয়ে ভগ্নন বৃহৎ হেসে বললে, তুমি সচল আছ
নাকি মাসীমা ? হরিদাস পাঁহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে উপরে উঠে ঠাকুর
কেনে পারবে তুমি ?

খুব পারব বাবা।

যেন দৃঢ় কর্তব্য বুড়ার। কাতরতা বেঁটু তা কেবল তার
চোখের দৃষ্টিকে। সে দৃষ্ট অচল হয়ে।

তবু সন্ধ্যা দুই হয় না ভগ্ননের ঘন থেকে। কিছুক্ষণ পর সে
আবার জিজ্ঞাসা করল, অত দূরে তুমি কেন যেতে চাও মাসীমা ?
কি সেখানে তুমি হরিদাসের সিরে ?

তৎকাল উত্তর দিলেন যোঁকরা, হরসৌরী দর্শন করব বাবা।

সে তো কান্নাভেঙে দেখেছ তুমি। সেখনি ?

সে তো বিখ্যাত আর অরুণী।

হরসৌরী আলাদা নাকি ?

তা কেন ? তবু—

বলতে বলতে ধোঁমে গেলেন যোঁকরা; কিন্তু এতটু পরেই
তিনি গাঢ়ভাবে আবার বললেন, ছেলেবেলা থেকেই আমার সৌরী
দর্শন করার সাধ। পূজা হত তো আমাদের বাড়ীতে। তখন
আগমনীর পান শুভ্রতা আর মনে হত যে হিমালয়ে সৌরীর বাপের
বাড়ীতে গিয়ে সেই কুমারীকে মাঝে দর্শন করব।

ব্রৈলোক্যনাথ বশ করে ভগ্ননের ডান হাতখানা ঢেলে ধরে



ঐশ্বরীপ্রনারায়ণ দাস

বললেন, তুমি ভগ্নন, কথা বাঁধ জামাদের, মাঝে নিয়ে বাঁও
হরিদাসের। ঘুরে ঘুরে বেড়ানোই তো তোমার খড়াব। আর
হরিদাস তো তোমার বেশ জোঁ জায়গা।

সেই জন্তই তো আপত্তিও আমার বেশী, উত্তর দিল ভগ্নন :
হরিদাস তো বাংলাদেশ নয়, দালা। মাসীমার এ সাধ মিটবে না
সেখানে গিয়ে। মাঝে থেকে আমাদেরই বকনাম বাড়িয়ে। মাসীমা
হয়তো শেষে বলবেন যে আমার মত পার্বত্যের সঙ্গে গিয়েছেন বলেই
সৌরী দর্শন দিলেন না তাকে।

কিন্তু কোন ভজর, কোন আপত্তিই খাটল না ভগ্ননের। শেষ
পর্বত রাজী হতে হল তাকে। তারপর পাঁচি দেখে এক ভত দিনে
কেরান্ন এল্লেশ বোলে হরিদাস বাবা।

ভোর হল লাকসার ঠোঁপে। ভগ্ননের জোঁ পথ, পরিচিত
দৃঢ়। তবু যেন মায়াকাল লেগেছে তার চোখে।

বাঁ দিকে বিচিত্র দৃশ্য সব। কিন্তু অশ্রু হয়েছে। বতবু
চোখ বার লম্বা বার শুধু পর্বতশ্রেণী। অতুলনীর তার রূপ।
নাই বা বলকে উঠল তুমারের মুকুট, নাই বা মেঘ মেঘলোক
ছাড়িয়ে উঠল তার উজ্জ্বল শূন্য। তথাপি সে হিমালয়। শিলাট
তার গঠন, বিপুল সমৃদ্ধি। অরণ্য-সম্পদের আশ্রিত প্রকালও
অপরিমেয়তার ইন্দ্রিত। শেষ বর্ষা প্রকৃতি। স্তিরী প্রাণের
জলা উঠেছে যেন নিস্তাণ পাখাদের কঠিন বক বিপরী করে। জলা
পড়ে গিয়েছে পাঁহাড়ের শিলায় রূপ। পাঁহে গাছ পাঁহে ঠাস
বুননি। ভায় আর সবুজের নিবিড় কোলাহল। ভয়ের পর ভয় এই
ঘন সবুজের লম্বারোহ। উতাল তরঙ্গ-বিদূত সবুজের সমুদ্র যেন
অকস্মাৎ কোন ক্ষোভদেবের দর্শন লাভ করে সমস্ত শিরে নির্বাক
ও নিশ্চল হয়ে গিয়েছে।

ভোর থেকেই মালা জপছিলেন যোঁকরা ঠাকুরাণী। তথাপি
তাকেই সহ্যাবন করে ভগ্নন বললে, দেখ মাসীমা, কি দৃশ্য।

তখন বন্ধুকে কিছুকিণ্ড ভাবেরে দেখেন মোক্ষদা। তারপর বললেন, কি দেখতে বলছিস? এ তো কোণ।

কুণ্ড হল তখন। কিন্তু হেনসেই সে বললে, রাজার বাড়ীকে বলছ কোণ? কোন, সেপাই প্রকটালের কাছে গিয়ে থাকলে হাতে মাথা কেটে নেবে তোমার। এই তো হিমালয় তোমাদের পৌরীর বাগের বাড়ী।

আঁ।—চমকে উঠলেন মোক্ষদা।

তখন বললে, হ্যাঁ মাসীমা, হরিবার এসে গেল আর কি।

তবে ছুই হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করলেন মোক্ষদা, তথাপি বিহ্বল তাঁর ভাব।

গাড়ী তখন গজেন্দ্র গমনে একটি পুলের উপর উঠছে। নীচে খালের মত একটি নদী। তবু তাই দেখেই বৃষ্টি সহযোগী একজন রাজপুত্রানী সবথেকে সঙ্গীতের বন্ধার তুলে জরজরানি দিল : জর জর গলা মাইকী জর।

মোক্ষদা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এই গলা নাকি রে তপু।

তখন উত্তরে বললে, বরং গলা না হলেও তাঁরই কোন বোন হলেন।

কি বলছিস তুই?

তাই বই কি মাসীমা। ইনিও তো শিবের জটা থেকেই নেমে আসছেন।

উত্তর মনঃপূত হল না মোক্ষদার, হবার কথাও নয়। কিন্তু আবার তিনি তাকালেন নীচের সেই নদীর দিকে। গাড়ী পুল পার হয়ে ধানিকটা এগিয়ে বাবার পর তা বন্ধন আর দেখা গেল না, তখন কিরে তপনের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, ভোতাভাতার কথা আগে নয় রে তপু। গাড়ী থেকে নেমেই আমার গঙ্গার বাটে নিয়ে যাবি। কলুশনাশিনী গঙ্গা। সত্যই তো, শিবের জটা থেকে নেমে এই হরিবারেই তিনি প্রথম মর্তের মাটি ছুঁয়েছেন আমার মত পাণী-ভাগীর কল্যাণ ও মুক্তির জন্ত। আগে গঙ্গার ডুব না নিয়ে আর কোন কাজ নয়।

বিজ্ঞা নিয়ে বাহুল ভোলাগিরির আশ্রমের কাছে। বিজ্ঞাওহালা তাজা বালায় মোক্ষদাকে বুঝতে চেষ্টা করল যে নিকটেই যে বর্ষশালা আছে সেখান থেকে তিনি রাত-দিন গঙ্গা সর্পন করতে পারবেন বলেই বিশেষ করে ঐ জায়গাতেই মাদিকীকে নিয়ে এসেছে সে।

ততক্ষণে সর্পন শেষে গিয়েছেন মোক্ষদা। একেবারে কুলে কুলে পরিপূর্ণ বিধা ঘাটের প্রায় সব ক'টি নির্দিষ্ট অতিক্রম করেছে জল—পথে বাড়ীয়েই নীচু দেয়ালের উপর দিয়ে বেশ দেখা যায়। এছাড়া তখন বিশালতা না থাকুক, পরিপূর্ণতার ঝাঁক বা ঝাঁক একেবারেই নেই। ওপারে কনখলের দিকে সমস্ত-যোগিত তল-প্রাণীর নিবিড় ভায়লতার অন্তরালে সিমেন্ট-কঙ্ক্রেটের পাকা গাঁথুনি গোখেই পড়ে না। যাবে তবু জল আর জল। তরল নেই, হুটিল আবর্ত নেই। আছে শুধু গতি—বিপুল, বিশাল জলধারার অবিচল স্রবধার গতি। আর আছে বেন নিখুঁত, তানলরলরহিত অসংখ্য জনতরলের সমাভিহীন ফলালিত একতান সঙ্গীত।

একরকম হুটুই বাটে সেলেন মোক্ষদা। অজানি তরে জল তুলে তুলে নাড়ায়, হুবে শিকন করতে করতে তপনকে ডেকে বললেন,

তোমার মন না তাঁর তো ওখানেই পাঁতা তুই। আমি ছাটি ডুব দিল সকল ঝালা জুড়াই।

তবে কিছু নীতিমত গুরু পেটে গেল তপন। ওটি মাসের বাট হলো কি হবে, প্রোত এত প্রবণ যে তাঁর নিজেরই সাহস না এ বাটে জলে নেমে স্নান করতে। সে ভাড়াভাড়ি এগিয়ে এসে বললে, সে কি মাসীমা, এই গঙ্গার নেমে ডুব নেবে তুমি। মনে নেই ঐরাবতের কি লশা হয়েছিল?

হেসে উত্তর দিলেন মোক্ষদা, ঐরাবতের মনে পাশ ছিল বলেই অমন হুদশা হয়েছিল তাঁর। আমি হলেম গিয়ে মায়ের বেটা। আমি তো গঙ্গার কোলে গিয়ে বসব। আমার জু কিসের?

হঠাৎ বৃষ্টি খেসে গেল তপনের মাথার। সে বললে, তাই বলে তীর্থ করতে এসে এই অস্থানে ডুব নেবে তুমি? এ তো গঙ্গা নয়, নহর—মানে খাল। মাহুবে কেটেছে গঙ্গার জলকে তামের চাষের কাজে লাগাবার জন্ত।

আঁ।—চমকে উঠলেন মোক্ষদা।

হাসি চেপে আরও গভীর স্বরে তপন বললে, হ্যাঁ মাসীমা, এটি খাল। আসল তীর্থ হল গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ড। সেখানে গঙ্গা বাহের স্বয়ং ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে। সেখানেই যদি ডুব না নেবে তবে ঘরে কাছের কলকাতার গঙ্গা ছেড়ে এত দূরে এসে কেন তুমি?

বৃষ্টি থগুন করার চেষ্টা করলেন না মোক্ষদা। কিন্তু বন্ধ করে বললেন, তাহলে সেখানেই চল। মোট কথা, গঙ্গার ডুব না দিয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।

অগত্যা আবার চলতে হল তপনকে; জিনিসপত্র থাকলো বর্ষশালায়।

সময় নয়, কিন্তু বিতক্ত হবার পূর্বের অবস্থা ওখানে গঙ্গার। স্রুতবাৎ আরও বিপুল তার আরতন, প্রবল তার উচ্ছ্বাস, ধরতর তার গতি। কিন্তু সে তো অনেক দূর—হরকি পৌড়ীর প্রশস্ত ও বৃষ্টি বলরবেট্টার অতিক্রম করে অস্ত দূরে দৃষ্টি চলে না মোক্ষদার। সঙ্গীতরতন ব্রহ্মকুণ্ডের বাটে এসে তিনি বেন থ হয়ে গেলেন—এই গঙ্গা নাকি!

ততক্ষণে পাণ্ডা জুটে গিয়েছে। সেই হাত-মুখ নেড়ে বৃষিরে বললে, সন্থ-মহনের অমৃত দেবতাদের ভাণ্ড থেকে ঠিক এই জায়গাতেই উপচে পড়ছিল। এখানে ডুব নিয়ে স্নান করতে পারলে মোক্ষদার স্বর্গলাভ ঠেকার কে।

কিন্তু ডুব দেওয়া কি অত সহজ। সেটি বোপস্বানের দিন না হলেও স্নানের সময় তো বটেই। স্নানার্থীরা ভিড় মূল জমেনি। তাদের সঙ্গে আছে আবার পাণ্ডা, মোকনলার, কেরিওহালা ও জিহাবীর ভিড়। ঠেলে এগুনো যায় না জলের দিকে।

অনেক চেষ্টার পর জল বন্ধন পা কোলা গেল, তখনই আর এক কাসাশ। হস করে মোক্ষদার প্রায় পারের কাছেই ভেসে উঠল পোটা ছুই মাই। অসুট আর্দ্রানদ করে হাত তুলে, পা টেনে নিয়ে দূরে সরে গেলেন তিনি।

হেঁ হেঁ করে উঠল একটি বাতানী বুকের হল। অনেক চার নষ্ট করেও শেষ বর্বার খোলা জলে একতরফ একটি মাহও দেখতে পারিনি তাঁরা। এখন মেখে তামের আনলের আর নীচা মেই।

কিন্তু মিঠাবতী হারানোর বিধবা মোক্ষা। বাড়ীতে বাহু তিনি ল্পর্প করেন না, সেখানেও বোধ করি নিজেকে অন্তি মনে করেন। আর এই হাতীর্ষি হরিয়ারে পক্ষার বাটেই কিনা—

বুঝতে পেরে হেসে ফেলল তপন। সে বললে, এ বাহু অন্তি নয় হাসীয়া! কেউ তো ধার না এ বাহু—বেধ না, বরং খাওয়ার হাতুশেব।

তাই বলে ছুঁয়ে বেবে আবার? আর এই জলে আমি ডুব দেব?

বুঝতে পেরে পাণ্ডাও অজর ছিল মোক্ষাকে; আরও একটু বাড়িয়ে সে বললে, ওরা তো গলাজীর সন্ধান—পরম পবিত্র জীব। এ জীর্বে গলায় সঙ্গে সঙ্গে মহাসিরও পূজা করতে হয়। তুমিও ভোগ লাগাও মাইকী, তুলি কিনে জলে ছিটিয়ে দাও।

আঁটার সঙ্গে হয়তো আরও কি কি মিশিয়ে ছোট ছোট নাড়ুর আকারে তৈরি হয়েছে হাতুশের মিঠার। ও-জিনিস বাহু বেতছিল তাদেরও কয়েকজন ভক্তকণে মোক্ষার কাছে এসে পাকিয়েছে। যেহে তপন যেন মজা পেয়ে গেল। সে বললে, তাই তো হাসীয়া, হরিয়ার-খরীকেন্দ্রে এসে হাতুশের পূজা না করলে কি চলে? এস, আমরা দুজনেই ভোগ লাগাই।

আট আনার নাড়ু কিনে নিয়ে এসে সে; অনেকগুলি ভাজে দিল মোক্ষার হাতে; তার হাত দিয়ে নিজেই সে অনেকগুলি নাড়ু জলে ছিটিয়ে দিল।

এত বড় ভোজের নিমন্ত্রণ বুঝা বাবার নয়। ভেলে উঠল বাহু। দুটি-একটি নয়, এক বাঁক। সিঁড়ি পর্বত ছুটে এল কয়েকটি বাহু—মোক্ষার পায়ের ঠিক নোচেই।

বড় বড় মহাশোল সব। পায়ের রু কাগজে—শেওলাই জমেছে বোধ করি। কিন্তু লেজের নিকটী হলুদবর্ণ। সবটা মিলে ঘোলা জলেও চিক-চিক করছে। পাখনা খেলে, পা তাসিয়ে, নির্ভয়ে নীতার কাটছে ওরা। মাঝে মাঝে ধী করছে। যেন একমল খাবার শিত হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছুড়ে আঁচু-পাঁচু করছে।

আবার হৈ-হৈ করে উঠল সেই বাতালী বুকের দল; তপনও উৎসাহ হয়ে পরিহাস-ভরল কণ্ঠে বললে, তোমার পূজা ওরা গ্রহণ করেছে হাসীয়া; সেধ না, আরও ভোগ চাচ্ছে তোমার কাছে।

ততক্ষণে অনেক বললে সিরেছিলেন মোক্ষা। তাকিয়ে দেখছিলেন হাতুশের খেলা। কিন্তু তপনের কথা শুনে একটু যেন লজ্জা পেলেন তিনি। বললেন, বে বাপু, এখন ওদের সরিয়ে দে খাট থেকে। একটা ডুব দিয়ে শুভ হই আমি।

কিন্তু মান খেব হতেই আর এক গৌ তার—তখনই হরসৌরী নর্পন করবেন তিনি।

অগ্নিতে ইন্ধন দিল পাণ্ডা। সে বললে, চল বুড়ী মারী, বিবেকেশ্বর মন্দিরে গিয়ে বঁধি ভোমাকে; কাছেই সতীকুণ্ড। পরম শিব আর জাগ্রত সৌরী। নর্পন করলে জনম সার্বক হোবে।

বিভীরা গৌ মোক্ষার—তিনি পনরজে মন্দিরে যাবেন।

তখন অমন কাছ পাণ্ডাও শব্দিত হয়ে বললে, অত দূরে পথ কি হেঁটে যাওয়া যায়? আড়ুয়ে নিয়মো নাহি। রেলপাড়ীতে এসে যেমন দেখা হয় না, টাকার চাপলেও ভেদনি।

তবে পনরজে বাবার সাথে মিলে মোক্ষার। মন্দিরে কাছাকাছি এসে টাকা খেয়ে গেল। সারসে হুড়াই, পাড়ী আর বাবে না।

একটি টিলার উপর বিবেকেশ্বরের মন্দির। তেমন পাড়ী বা খুঁ দীর্ঘ পথ না হলেও উপরে উঠা বেশ কষ্টকর। দল দেখার ভক্ত হ'বার খামতে হল মোক্ষাকে। তার হাতের চেয়ে প্রত্যাশাই তার বেশী—বতাবিন্দিত চোখ দুটিও তার জল-জল করছে যেন।

কিন্তু দেখলেন কি। উঁচু পাহাড় ও সবুজের সযারোহ বা জা এই টিলার পিছনে। ততদূর পর্বত দুটি চলে না বুঝায়। যে শিখরে বিবেকেশ্বরের মন্দির সেটি নেড়া পাহাড়। হুঁ-তিনটি মোটে পাহাড়, জাও সাধারসর্ব। ওদের মধ্যে ও মাঝার বিপত বসন্ত মলহানিলের সঞ্জেম চূড়ন কোন শিহরণীই যেন জাগতে পারেনি, বার্ষ হয়েছ ওদের মূলে গভবর্ষার অবিদ্যার বারিসিকল। ঠিক যে পাহাড়ের নীচে মন্দির তার পাভা দেখে বোঝাবার জো নেই যে তা বেলগা না নিদগাহ।

নেড়া-নেড়া দেখার মন্দিরটিও। পাথরের দেয়াল, পাথরের চূড়া, শিলাভূতের উপরেই নাটমন্দির বা বারান্দার ছািব। সব নিম্নেও মনে হয় যেন ছোট একখানি কুঠির। পারিপাট্যহীন গঠন, বিবর্ণ। প্রাচীর মস্তম মোটেই নয়। পাথরের কোণগুলি মাঝে মাঝে বর্ণাকলকের মত উঁচু হয়ে রয়েছে।

বিল্বলের মত চারিদিকে তাকাতো তাকাতো মোক্ষা বললেন, এই মন্দির নাকি?

হ্যাঁ, বুড়ী মারী, পাণ্ডা উত্তরে বললে, মন্দিরে আছেন বিবেকেশ্বর, আর এই হল গিয়ে কাগজভের। একে আগে পূজা করে খুঁটি করতে পারলে তবে মহাভাবের নর্পন মিলবে।

বাড়ীতে কুলুজিতে যেমন বসানো থাকে সাধারণ গৃহস্থের গৃহ-দেবতা তেমনই তৈরবের বিগ্রহ। ফুল-পাতার হুড়াহাড়ি ওর চারিদিকেই, চাপ চাপ সিঁহরের কৌটা ওর সারি পায়ে। পাথরের মূর্তি ভাল করে চোখেই পড়ে না। মোক্ষা অসহায়ের মত বললেন, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি নে বাবা!

বিগ্রহের পায়ের কাছেই ফুলপাতা কিছু কিছু সরিয়ে গিয়ে পূজারী বললে, ভৈরব বড় ভয়ঙ্কর আছে। তুমি এই তার চরণ নর্পন কর, গড় কর, বক্ষিণা দাও। তাহলেই ভৈরবজীর হকুর পেয়ে যাবে তুমি।

নির্দেশ পালন করলেন মোক্ষা। সাক্ষিত অল্পটান শেষ হবার পর একটি সিকি রাখলেন বিগ্রহের পায়ের কাছে; পূজারী ও পাণ্ডাকে মিলে এক একটি হুঁ-আনি।

ভাঙেই খুঁটি ওরা। পূজারী বললে, বাে আপকী ইচ্ছা। যেমন প্রত্ন সেমনি তার ভৈরব। অগ্নেই তুট। লেখনি ধ্যা, ভক্তি চাহিয়ে। কিন গড় করো।

মূল মন্দিরের কাছে গিয়ে আবার বুকের হয়ে উঠল পাণ্ডা: এই বিবেকেশ্বর স্বয়ং শিব। এইখানে সতীর তপস্তার তুট হয়ে তাঁকে নর্পন দিয়েছিলেন তিনি। তুমিও ভক্তি করে পূজা চকাত মারী, তোমারও পরমগতি হোবে। বলতে বলতে বুলন্ত বকীর শিকল টেনে দিল সে। চা চা করে বটা বাজল। প্রতিক্রিয়া বললে—

পারে কাঁটা দিল মোক্ষকার। কিন্তু শিব কোথায় ?

কালো পাখরের বাতায়নহীন মন্দিরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার।

তাকেই বেন পাড়ব করেছে তেমনি কালো পাখরের এক মলমলেটনী। তার মধ্যে লিখলিখ। জীবদ্ভূতি মোক্ষকার চোখে পড়বার কথা নয় তা।

আই অহুমান করে পাণ্ডা মোক্ষকার তানহাওয়াসি নিজেই টানে বিহর শিবলিঙ্গের উপর স্থাপন করে বললে, বাবার খুব কৃপা করেছে তোমার উপর বুড়ী মারী—আগুন ছোঁয়া তোমাকে আগে স্নিগ্ধ চাইতেন। এই তো শিব, দেবতারিণের মহাশয়। এরর টায়ার দিকে চাও, রঙ্গম ভয়।

স্বর্ণপাণ্ডা অহুমানিত। কীপতে কীপতে হাঁটু গেড়ে বসলেন মোক্ষকার, ভায়বর একেবারে সাতাঁব প্রসিদ্ধ। কথালটা ঠক করে পড়ল ঘূর্ণি সৌরীপট্টের উপর। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বসবার পর আবারও তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন, কিন্তু মহাশয় কোথায়, বাবা ? আমি যে হরগৌরী রঙ্গম করব বলে এতদূরে এসেছি।

আমাতলব বেনমার কথার মোক্ষকার কণ্ঠধরে। তাঁর মনের অবস্থা কিছু কিছু অহুমান করে তপস এগিয়ে এনে তাঁকে বললে এই তো মহাশয়, মাসীমা,—এই তো তাঁর নির্বাণ রূপ। কান্ধিতেও তো তাই।

পাণ্ডাও বললে, হা মারী, হর হর মহাশয়ে এই তোমার নামনে। আর গৌরী আছেন নীচে সতীকুণ্ডে। নাও, এখন পূজা শেষ কর।

পূজার অহুমান সঙ্কপ্ত। অটভরা জল শিবলিঙ্গের উপর ঢাললেই হল। কুল-বেলপাতা ইচ্ছা হর দাও, মা দিলেও পূজার অহুমান হবে না। ভোপ বা ভোপসূচ্যও বাজীর সাধ্য বা ইচ্ছাম্বরপ। কোন দিকেই ভেমন দাবী-দাওয়া নেই।

কিন্তু মোক্ষকার পূজা করলেন যন্ত্রাঙ্গিতার মত। মন্দির-পরিষ্কার শেষ করবার পরেও ভূপতির প্রসন্নতা ফুটে উঠল না তাঁর মুখে। হুটি চোখ তাঁর ঢকল হয়ে বেন তখনও তাঁর বাহিত বেরতাকে বুঁজছে।

সৌরী কোথায় বাবা ? আবার পাণ্ডাকে জিজ্ঞাস করলেন তিনি।

নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাণ্ডা বললে, ঐ সতীকুণ্ড।

বেশ ঝঙ্কিটা উত্তরাই ভাঙবার পর ছোট-খাটো একটি উপভ্যকার কেন্দ্রকুলে দ্বিতীয় তীর্থ। তেমন মোড়া আর নয়। চারিদিকেই সবুজ পাহাড়, নীচেও ঝড় বড় গাছ। ওদের কাঁকে কীকে লেপে পড়ে ভাঙা-চোরা ফুটিয়ের মত একটি মন্দির আর সেই মন্দিরেরই প্রাঙ্গণে ছোট একটি পাতকুরোর মত সতীকুণ্ড। পাহাড় আর গাছের ছায়ায় মধ্যাক্ষর কেনন বেন অন্ধকার মনে হয়। পাখীর ডাক নেই, পুণ্ডনার গন্ধ নেই। মন্দিরে পূজারী ও পথে একটি কুলের বোকান থাকলেও কেনন বেন থমথম করছে লায়গাটি।

থমথম করছে মোক্ষকার হুৎখানিও। কিন্তু তাঁর সুই নিবন্ধ ঐ পড়োবাড়ীর মত মন্দিরের গায়েই। সেই দিকেই এগিয়ে চললেন তিনি।

কুলের বোকান থেকে একটি ঘেরে ডেকে বসলে, কুল মিলে, নেহি, কুল ?

মোক্ষকার হয়ে তাঁর পাণ্ডাই যন্ত্রের গামহাওয়ানি প্রসারিত করে ঘেরটির কাছ থেকে কিছু কুল তুলে নিল। প্রায় এক সাতিক কুল দায় পাড়ার দায় যে নিল ছ'পয়সা। তাতেই বেন বুখিতে ভগোয়সো য়েয়েটি। এবার সে তপনের দিকে চেয়ে বসলে, কুল তুলে।

যাথা বেড়ে অধীকার করল তপন, কিন্তু লকেট থেকে একটি ককককে নম নম্বা পরমা বের করে যেটি রে ছুঁতে দিল ঘেরটির দায়ের পাখরের উপর।

হুহুহুহু জল বের বিজ্ঞান চল ঘেরটির দৃষ্টি ; কিন্তু থারকণেই আবার উজ্জল হয়ে উঠল তা। দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ছোট্ট কুল তুলে নিল সে—হুহুহুহুহুহু হুহু হুহু একেবারে হুহুহু হুহুহু।

হাসল তপন, ভায়বর সেও ভায়বর করে উপরে উঠে গেল।

হুহু থেকে জল তুলতে হুহু—পাণ্ডা বখারীতি নির্দেশ দিয়েছিল মোক্ষকারকে। কিন্তু তিনি ভতকণে এগিয়ে দিয়েছেন মন্দিরের কোণের কাছে। তবু এগিয়ে বাঙরা নয়, হাঁটু গেড়ে বসেছেন চৌকাঠের এখানে। কিন্তু সমস্ত মন হুই চোখের দৃষ্টিতে এবার করেও কিছুকণ পর নিরাশ হয়ে তিনি বললেন, কৈ বাবা, গৌরী তো দেখতে পাচ্ছি নে ?

ঐ তো সামনেই, উত্তর দিল পাণ্ডা, কেবল সৌরী কেন, মহাশয়েবকীও আছেন।

হয়তো আছেন। কিন্তু কুলপাড়ার কুল আর চাপ চাপ চলন সিলুরের আবরণের মধ্যে তপনের হুহু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও পরিচিত হরগৌরীর মূর্তি একত্র বা স্বতন্ত্রভাবে বরা পড়ল না। মোক্ষকার অনেককণ চেয়ে থাকবার পর আবার বললেন, ঐ গৌরী নাকি ?

সতীকী, পাণ্ডা নির্বিকার হয়ে উত্তর দিল, যিনি সতী তি—ঐ গৌরী। ঠাঁই এই হুহু—এও বহুহু। উঠ, জল তোল, পূজা কর।

সেই একই অহুমান, তেমনই সঙ্কপ্ত। অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন মোক্ষকার, মন্দির পারিক্রমাও বাদ গেল না। কিন্তু সবই বেন কলের পুতুলের মত। বেশ ব্রহ্মতে পারল তপন যে বাংলা দেশের দেবদেবীর নয়মাত্রিয়ার মূর্তি রঙ্গনে অভ্যস্ত চোখ ছুটি মোক্ষকার মোটেই তৃপ্ত হয়নি। হাসি পেল তপনের ; বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে বললে, রঙ্গন পেলো মাসীমা,—তোমার হরগৌরীর ?

মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ করে মোক্ষকার তখন ফিরতি পথে। পূজা শেষ করেছেন তিনি, ঐ সঙ্গে খোঁজাও শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তরজনার অবসানে এখন ঘূর্ণি অবসাদ। ভারি প্রতিকলন মোক্ষকার মুখে চোখে, গতিতে। মন্দিরের পূর্ব দিকে উঁচু পাহাড়টির পা বেঁধে যে লক পায়ে-চলা পথটি একে-বেকে নীচে নেমে গিয়েছে সেই পথে পাণ্ডার শিঙনে শিঙনে পা টিপে টিপে চলেছেন তিনি। থমথমে গভীর হুহু তাঁর, চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে—আর তো কিছুই দেখবার নেই।

তপনের প্রবেশ উত্তর দিলেন না তিনি। দেখে খোঁচা দেবার প্রবৃত্তি আরও বেন বেড়ে গেল তপনের মনে। আরও ঝানকিটা রেব ওর মধ্যে ঢেলে দিয়ে প্রায়ই মোক্ষকার ঠিক কানের কাছে পুরনামুত্তি করবার উদ্দেশ্যে উপর থেকে বেশ কোর পা চালিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু তখনই ঐ ঘটনাটা ফট গেল।

ঠাই বেন বিদ্রোহের খবরিক—আলোবর, জমিদার বিদ্রোহ।

পরদানী লেও—

বাধীর মত বিহি বিহি হুয়ের সাবর আমরণ তপে চমকে উঠল তপন। চমকে উঠলেন মোক্ষদাও। এরিক-ওরিক তাকাতেই প্রায় একটু সবে হ'লেনই চোখে পড়ল সেই দৃষ্টি।

গাছপালার মোড়া বাধবিকের পাছাড়ে গারে। অনেক উল্লসে তেবর পাড়া আর পাড়া—বেন ঘন সবুজ রংএর একখানি ঠানবনের ছাত্রতপ। নীচে বোপতাক—ছোট ছোট গাছ আর বড় বড় লতার তাকাকি। কিন্তু একঘেরে বড় আর বড়। গাটে গাটে ফুল। সবুজ পাতার কীকে কীকে উঁকি বিশেষ লাল, মীল আর হলুদের খিঁচি সহজি। লম-বায়ে বাপ উল্লসে, ছোট একখানি ছুটীর। তার মীর বেশ বাসিকটা জায়গা হুড়ে এই উপনয় বা উভার। হু য়েতে অনেক পাখর আর অনেক গাছপালার আড়ালে একজন বা চোখে পড়েনি, তাই এখন দেখা গেল। পাড়া আর লতার সবে ফুলি ফোল মর, বেন পুশিতা-লতার কালর-খাঁটা একখানি ছবিও। ফুলের মতই কোমল, ফুলের একখানি হুও তার, বার কর্তে সাবর আমরণ কানের ভিতর দিয়ে বোধ করি বা মোক্ষদার মনেই প্রবেশ করেছে।

পরদানী লেও—

একটি মেরে। বের্টে গড়নের কিশোরী। কবলের মত কালো, মোটা একখানি শাড়িই তার কোমর থেকে কাছ পর্যন্ত বাগরা ও উপরে বুক, পিঠ, বাড় ও গলা জড়িয়ে জড়িয়ে ঢোলিই হয়েছে বেন। নিটোল সুগোল বাহ ছুটি ঢাকা পড়নি তাতে। মাথারও কোন আয়রন নেই। একমাথা ফুল। বেশী নয়। অব্যবহিত, অসম্ভবত বেশবাশি জটার মত বুলছে তার পিঠে, কাঁধের উপর দিয়ে বুকের কাছে; সাপের মত কপা তুলে আছে তার ললাটের উপর। অমার্জিত হুখে বেশ দেখা বার, চাপ চাপ ময়লা। তবু, বোধ করি সেইজন্মই আরও বেশী চোখে পড়ে তার কাঁটা সোনার মত রং, আপেলের মত গাল, কাকাভূহার ঠোঁটের মত ইকটুকে লাল ছুটি ওষ্ঠ, হুজার মত বকবকে ক'টি দাঁত আর বৃত্যচট্টলা পার্বত্য নিরবিরণীর মতই তার হাসি-বলরল চকচকে চোখ ছ'টির চকল দৃষ্টি।

তবু হুখের আমরণই নয়, হাতও বাড়িরেছে মেয়েটি প্রসাদ দেবার জন্ম। বাম হাতে শিহনের গাছটির একটি বুলে-পড়া ডাল লজ্জ হুঠার চেপে ধরে, সামনের দিকে একটু বঁকে, ফুলওছ মাথাটিকে ছলিয়ে ছলিয়ে বলছে, পরদানী লেও।

বিষয়ের প্রথম গাছাটি কেটে বেতেই তপন হুখ কিয়রে ভীক দৃষ্টিতে ডান দিকে, তাকাল যেখানে সত্যিকুণ্ডে বাবার পথে মোক্ষদার হয়ে পাগু পুজার ফুল কিনে নিয়েছিল। দেখলে তপন—প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডখানি এখন নুত, ফুলওয়ালী সেখানে নেই। দেখে সহজ ভাবে নিশ্বাস ফেলল সে।

কিন্তু মোক্ষদার চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। তবু হয়ে পাঁড়িরেছেন তিনি। মেয়েটি তখন গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে কিপ্রসাদে আরও হ'গাপ নীচে নেমে এল। প্রায় মোক্ষদার পথ বোধ করে পাঁড়িরে আবার বললে সে, পরদানী লেও।

একটু থেমে আবার; পুজা কিয়া, পরদানি নেহি লেওগী? লেও—

ততক্ষণে পাগুও তার বজ্রদানের বেদী নেমে কিয়ে এসেছে। এখানে মেয়েটিকে দেখেই মোক্ষদার হুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সে বললে, লেও বড়ী দারী। কোই হরজা নেহি। ওই হৈ মালীতী লড়কী—পারবতিয়া।

মোক্ষদা অসুটবয়ে বললেন, খাঁ।

কিন্তু পরকণ্ঠে আবার তাকালেন তিনি মেয়েটির হুখের দিকে। তার পর খয়ের হারখান্নেই ঐ পারবতিয়ার পায়ের কাছে হাঁটু পেড়ে বসে হুজ কহতল প্রসারিত করে গলগলকটে তিনি বললেন, লিও মা, লিও।

এক বকনের ডালই হরজা হয়ে—তাকিরে বিবর্ণ হয়ে দিচ্ছে। সবে কিছু ফুলের পাশাও কয়েকটি পাড়া। অতলিপুটে গ্রহণ করে ডাক্তারে সে প্রসাদ মাথার ঠোকালেন মোক্ষদা। তারপর কিছু হুখে মিলেন, অবশিষ্ট বাঁধলেন জাঁতলেন খুঁটে।

মেয়েটি ততক্ষণে তপনের কাছে এসেছে। তার হুখের দিকেও তেরনি হাসিহুখে চেয়ে সে বললে, তুমি ডি লেও।

ঠোটে হাসিই কেবল নয়, মেয়েটির চোখে বিদ্রোহ বলকাজে। কয়েকটি ঠোল পড়ছে গালে। কঠখরে কেবল অজনের নয়, একটু বেন বিজ্ঞপেরও আভাস পাগুও বার।

চকিতে মনে পড়ে গেল তপনের যে কিছুক্ষণ পূর্বে পুজার ফুল হাতে নিয়ে মেয়েটি ঠিক ঐ ভাবাতেই সেবেছিল তাকে, কিন্তু তখন ফুল সে নেয় নি। সেই কথা মনে করে বেখেছে বলেই ঐ অভিরিক্ত অভিব্যক্তি নাকি মেয়েটির হুখের ভাবে।

এবার আর অস্বীকার করতে পারল না তপন; হাত পেতে সেও গ্রহণ করল ঐ প্রসাদ। তার পরেই পার্বত্য হরিণীর মত ছুটে বাপে বাপে উপরে উঠে গাছপালার পিছনে অসুত হয়ে গেল মেয়েটি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারও হুখেই কোন কথা নেই। কিন্তু নীচে নেমে আসবার পর তপনের কৌতুক প্রবৃত্তি আবার বেন মাথাচাকা দিয়ে উঠল। হুঠারির হাসি সহজে ঠোঁটের কোণে চেপে রেখে আবার সে মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করল, হরসৌরী কেমন বর্ণন করলে মালীয়া? বলছ না বে!

উত্তর দিলেন মোক্ষদা এবং তাও তপনের হুখের দিকে চেয়েই। বললেন, হি: তপু, ঠাকু-বেবতার কথা নিয়ে কি কালমাসি করতে আছে?

ভৎসনার ভাষা। কিন্তু সবিস্ময়ে লজ্জা করল তপন যে কিছুক্ষণ পূর্বেই নৈরাস্ত্রের যে জ্ঞান হাঠাখানি মোক্ষদার শিরণে কিছু পৌরবর্ণ হুখের উপর তেমে বেঁকাতে দেখেছিল তার চিন্তামাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। বরং এখন বেন তৃপ্তিতে ব্রিড সে হুখখানি।

ভথাপি আরও একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা ছিল তপনের। কিন্তু সে সুবোধ আর পেল না সে।

দ্বিজাতে উঠে বসবার পর তপনের হুখের দিকে চেয়ে মোক্ষদা আবার বললেন, ভাড়াডা মন্দিরে কার কি বর্ণন হল তু। কি বলতে আছে রে। পাশ হুখে বলতে নেই।

গভীর কঠখর, কিন্তু শান্ত। তপনের মনে হল বেন ওষ্ঠপ্রান্তে ললজ্জা হাসির ক'টি রেখা সোপান করবার চেষ্টা করছেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী।



অরুণ সেনগুপ্ত

এই নাম 'বয়লি ডাইট'। বিলাস আর প্রাচুর্যের স্রোতের হাতখানে কোথায় হারিয়েছিল তার বন্ধনের কাছে বা খাওয়া কোন জীবনের স্বপ্ন, নিজস্ব কাগজের বনের অভ্যন্তরেই শিল্পীর আত্মবিশ্বাস।

যুববার প্রাণত্যাগ সেবে বোঝকার নিয়মমত একবার ও বেরিয়েছিল বাইরে। সজিক্ত কাজের পরে ভরতর করে উঠে গেছে চারতলা ছাটবাড়ীটার বিশেষ উপাধ্যায়ের কাছে। তার ছোট স্কেনে বায়লুর ট্রান্সপারেন্সি দেখেছে, আর শিকারের অ্যালবাম। তারপর কাল শ্রমে ঢুকে। এখন এই কলকাতার আবার।

গীটছিল অরুণ, শ্রীমদাসগঙ্গায়ে বেশবোরা মনে হয়। হাওয়ার দেয়াল কেটে ছুটে চলেছে। কোন এক বাজীর মিল'জ অস্ত্রভাণ্ডকে অগ্রাহ করেও যুব ফিরিয়ে নেয়। চোখে পড়ল ধানিক ওদিকে কারা বেশ ব্যারাম করছে।

ছুটপাখের ওপর উঠে গীটতে লাগল অরুণ। এই ন' মাসের মধ্যে ঢাকারী খাতিরে হু' জারগার ঘুরেছে—বোম্বাই, মাদ্রাজ। দানাপুরে থাকে বাওয়ার প্রভাবের বাকী হয়নি, সম্মান আর সম্মানী বেশী পাওয়া গেলেও। কলকাতাতেই স্থায়িতাবে থাকার মত দরখাস্ত দিয়েছে। বিববা মা ও ছোট ভাইবোন ছোটো রয়েছে জামবাজারে। এখানে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।

বেশ গুছিয়ে বসেছে ছোট ছোট শৈশবের দোকানগুলো।



হাটবের জীব এখানে বসে বসে। সকাল পাঁচটার বে প্রাণ ফলে চলে, হাত বাবোটার তার সমাধি। সকালে আবার হয়ে শুরু।

পরন্তু সাধারণ দিন ও কাটিয়ে এসেছে অসীতার হাতীতে। কবে ফুলে পড়েছে, এখনও সে তোলেনি। জানতে পেয়ে জন্মভিত্তিতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। অসীতার হাতাত তাই বিকাল নিকট দিতে চেয়েছিল। ও বাকী হয়নি।

কর্কটীকমের ভাগ্যাকার হাতখানে ওর জীবনের হাবি এখন অচল। বি.এ পাশের পর গল্প, কবিতা পড়বার সময় খুব কম খেয়েছে অরুণ। জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ সেই গানই বন্ধ। তবু হুপখিত নয় সে। মসোবের বন্ধনকে জিইয়ে রাখাটাই আজ ওর প্রধান কর্তব্য। তাই গানের মত অবসর না পেলেও আজ ও কাজে বসে।

আরও একটু ছোটো বাড়াল সে। এক গালা মাসিক সাহিত্য আর সিনেমার পত্রিকা নিয়ে বসেছে একতলা। অরুণ হাতে তুলে নিল মোটা একটা পত্রিকা। জলভরল। অমাবী। কে কেসে এম নন্দ্যাক অভিলেখকে? তবু এক টাকা শান্তিমিত্তেভনী ব্যাগ থেকে বার করে কিমল। রবিবারে অনেক দিন পরে পড়া হবে। আর কিমল কিছু লেখল তাইবোনের মত।

অনেক দিন বাদে নিজের ভগতে ফিরে এল অরুণ। তাইকে রাগানোর শেষ ডিগ্রীতে ওঠার মায়ের কৃত্রিম জন্ম শেল—এতদিন পরে এলি, কোথায় একটু বসবি না—

হুপুয়ে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল বার বার। কিন্তু সকালের কেন। পত্রিকাটা পড়তে হবে আজকেই।

বিদ্যাহং।

ধানিক পরে আশঙ্ক হল অরুণ। কাবোর কোন সাজা না পেয়ে। ওর চেঁচিয়ে ওঠাটা নীচু পর্দায়ই ছিল।

পাঁচ বছরের দুটিটা আর্ন্তনাদ করে উঠল। অখ্যাত পত্রিকা জলতরঙ্গ গল্প বেরিয়েছে বিদ্যাহং সোমের। কোন এক সময়—এক সময় গল্পের হাতখানে খুঁজে পেল অরুণ হারিয়ে বাওয়া বিদ্যাহংকে।

গানের আশের আলাপ। পাটনার তখন অরুণদের বাসা ছিল। চমৎকার পাইত অরুণ। ওর সুরমুর্চ্ছনার চমৎকৃত হয়েছিল সবাই। আবেগ-বিহ্বল সবাই। আবেগ-বিহ্বল করে তুলেছিল ওর কাককাঁধ-করা গলার উপস্থিত সকলকে।

—যেক-যেহু বরবার—

সেই আলাপ অরুণের বাবা প্রোবাবা বুঝে কাছ থেকে সামান্য পরিচয় হয়েই থাকেনি। আত্মিক ভালবাসার তার পরিবর্তন ঘটেছিল বীরে বীরে।

কার্ণেশনের পরিচ্ছন্ন হারানী হারার বিদ্যাহংয়ের করেকটা কথা বড় মধুর মনে হয়েছিল অরুণের।

—সত্যি হারে হারে অবাক হয়ে বাই হাটবের প্রকৃতি দেখে। কি করে তারা নকল আভিজাত্যের বেড়ার নিজেদের নিয়ে চলে বতর ভাবে। কি ভাবে তাদের চোখের হাতখানে চুকতে পার না হাটব।

ধানিকটা নীরবতা। বাতাসে বসে চলেছিল গভীর প্রশান্তি।

—তোমার গলার বেশ জন্ম-জন্মান্তরের ভগভার আশীর্বাদ। একটা স্বপ্নের পুরীত বেশ থাকে তোমার পানের সময়।

লালুক চোখে হেসে থাকিয়েছিল অরুণ।

—আমরাও কালের নামাই করে থেকে বাঁচতে চেষ্টা করব।

—আমরা থেকে আশ্রয়লাভ করব মিত্ররাই।

—খুব দারুনিকের মত কথা বটে। নিওর মত হেসে উঠল বিদ্যা।

—আমাদের কলমে একটা কাগজ আছে। বাবে?

—আমি কেমন করে—

—সেটুকু করত। আমার আছে কলমে।

—বেশ ভাল।

সেও আর একটা দিন। বহু প্রোতার মাঝখানে হৃদয় প্রকৃত ভীও কত আছেন। কিন্তু নিজের নৈশুণ্যের প্রতি সন্দেহ রইল না। প্রথমে একটা মীরার তখন। বহুজনের উচ্চসিত প্রশংসার ভরে সেল ওর সাধনা-বহুল সঙ্গীত-জীবন। তারপর অধ্যক্ষের কথার অনুরোধে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ গান।

চলো সখী, কুজঘামে খেলতে...

গান শেষে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল বিদ্যা। হাতে একটা বাঁধ।

—এই বাঁধের মত চির-পবিত্র আর অমর হয়ে থাকুক তোমার আমার ভালবাসা।

এর চেয়ে আর জানল কি আছে? এ প্রেম স্বীকৃতির কুরালা নয়। রাত্রিশেষেই শুধু হেসে বিদ্যার দেহ না। গভীর ভক্তিতে প্রণাম করেছিল অনুরোধ বিদ্যাকে।

কিন্তু বসন্ত আসেনি। নিগন্ত-কপালে পূর্ণ হেসে আবির্ভূত হয়নি লাজবস্ত্রি আলোরোখা। কমনীর সানাইয়ের পুরে জানক-চন্দ্রে মুখের হয়নি প্রবোধ বাবুর নির্জন নিকেতন 'পথের শেষে'।

অন্যায় জমতিধিতে বিদ্যাতের কাছে পাকা কথাটা বললেন অনুরোধ বাবা। এই ঘন ঠিক ছিল আগে হতে। বাবার গলা তনে মনে হল অনুরোধ, এ বেন হবেই, কোন বাধা নেই।

সকালে খাওয়া হল। দুপুরে ওপুরে নিয়ে গেলেন অনুরোধ বা মাত্র বিদ্যাকে।

—তোমার হাতে অনুরোধকে দেওয়া সৌভাগ্যেরই বিষয়। কথা নয় ঠিক, সন্দেহ নেই। তোমার ইচ্ছাও আমি জানি। কিন্তু আমি না। তোমাকে পেতে না বললেও মায়েরই সমান। তাই

লভ্যের-একটা জেনে রাখা আর প্রকৃতবে একত্রে জানান বই মনে করি। তাইই কল্যাণের মত। কাঠি ইত্যাদি পড়বার সময় অনুরোধ একবার কয়রোগের পুত্রপাত হয়। ডাক্তারের পরামর্শে গান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ও আবার আরম্ভ করেছে। এখন অবশ্য ভালই আছে। যদি তাকে সত্যিই জীবনের সাধী হিসেবে চাও, তবে এখন থাক, আর ক'টা বছর থাক।

বোধ হয় আশাভঙ্গের কাণ্ডটা সেদিন সইতে পারেনি সন্ধ্যার বিদ্যা। খুব সকায়েই এসেছিল ওদের বাড়িতে। একটা নমস্কার করে কোন কথা বলার অবসর না দিয়েই সে আঁচাটি হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রবোধ বাবুর কাছ থেকে।

—বুঝে ইউনিভার্সিটিতে একটা চাপ পেয়েছি। আজই রক্তমাংসা হচ্ছি।

দুপুরবেলা সকল কথা বললেন বা নিজে থেকেই। অনুরোধ জানলার কী দিয়ে ডাকিয়েছিল বুঝে। অশ্রুচোখের কানে আসছিল বাউবনের দীর্ঘবাস। অনুরোধ মনে হল, মাতৃস্বের চরম পরীক্ষা দিয়েছে বা। তার রোগ হওয়াটা ত মিথ্যা নয়।

মাস ছয়কের মধ্যেই খুবসিমে মারা সেলেন মেহমতর বাবা। তারপর মসাবের চাকার টলে সেল পাঁচটি বাস্তব। জীর্ণতা ওর বেহুসরীকে অবশ্য গ্রাস করতে পারেনি। বিদ্যা আর কোন খবর করেনি। তার ঠিকানা অবশ্য ওদের জানা আছে।

একত্রে চিত্রিতা আর অমিত। ঠিক সেই পাটনার বহুকালের ইতিহাস। গল্পটার শেষের দিকে একটা দারুনিক ব্যাথা দেবার প্রয়াস করেছে বিদ্যা, নিপুণ কুটির সমস্ত টানে।

ওই সুর, যে সুর নিবিড়ভাবে বেজেছিল একদিন মনে-প্রাণে, তা বেঁচে থাকবে চিরদিন। তার ভালবাসা সাগরের ঢেউয়ের মতই বড়ার তুলনায় অমিতের বুক। ভাল থাক চিত্রিতা। তার কালো চোখের প্রতীক করবে সে, বত দিন হোক।

অনুরোধ চাপ দিয়ে বিদ্যা ছুটে আসত তাকে গ্রহণ করতে। কিন্তু না—বিদ্যাতের জীবনকে পছন্দ করে দেবার সম্ভাবনা বঁটাতে রাজী নয় অনুরোধ।

চিত্রিতা। দীর্ঘকাল পরে একটা ভাল গল্প পড়ল বলে মনে হল অনুরোধ।

তুমি আছ

প্রীতিমুখা বন্দোপাধ্যায়

তোমার ঠিকানা পেলাম আজকে হঠাৎ
প্রভাতের বোম-ঝড়া আওয়াজে সকালে,
পড়ে দেখি প্রতি ছুঁতে অনেক তবু
আমার নিকট হতে বহু দূরে তুমি তো জগাশে।

গোলাপের বুক দেখি আর ঐ সুই-বলিকার
উড়ে এসে বসে কত মধুসৌভাগ্যে,
তাই দেখে কত লোক নিরাশ ভাবার
ভেঁটে নিয়ে মধুগাণি হাসে কত বো।

তোমার ঠিকানা পেয়ে বাতায় উদ্দেশে
গৃহ ছাড়ি মূলিপথে বাহির হলেম,
চলিলাম বহুদূর তবু অবশেষে
আমারই আবাস-বাগে ফিরিয়া এলেম।

এসে দেখি তুমি আছ ঠিক বধ্যস্থানে
কুয়ে বসি থেকে থাক বহুদূরে আর
তবু তুমি জেনে আছ আমারই তো প্রাণে
তুমি আছ বধ্যস্থানে জ্বলে আমার।

ভাবি এক, হয় আর

আদিলীপুত্রার রায়
পাঁচ

যুবক বিদ্যার নেওয়ার পর পল্লবের মন আরো ধারণ করে গেল। কিরে কিরে মনে হ'তে লাগল ওর একটা কথাই—
হুঁয়ার মতন : ৩য় বখন বাজে তখন তাকে কিরিয়ে দিলে সে আর কিরে আসে না। ভাবতে ভাবতে ওর মনে হ'ল—আর বেশি করা নয়—কী হবে এখানে বাজে গান লিখে? নিজের মনের সঙ্গে হুঁখোহুঁখি হ'য়ে তো লাভ হ'ল সমূহ—এবার বাসিন্দে কেবাই পড়া। আর ততস্তত স্বীয়—কিন্তু কাল এলিওনারায় নিয়ন্ত্রণ স্বীকার ক'রে কেলেনে, কাজেই ওখানে চারের পরেই বাসিন্দা বসে। যোহনলালের জন্তে আর অপেক্ষা করা নয়। ওর নামে একটা চিঠি লিখে লুনা হোটেলের ম্যানেজারের কাছে রেখে বাবে—ও বেন রিতাকে নিয়ে সোজা বাসিন্দেই আসে—সেখানেই দেখা হবে। সেই ভালো। ভাবতেই ওর মন অনেকখানি হালকা হ'য়ে যায়। আইরিশকে কাল সকালেই ডার ক'রে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা কের দেখা সেই কবু হুঁকের সঙ্গে। ওর সঙ্গে আলাপ করা হ'ল না। না হোক। ওর মন আইরিশের জন্তে উঠেছে উন্মুখ হ'য়ে—বাওয়া শেষ ক'রেই নিজের ঘরে গিয়ে বসল যোহনলালকে চিঠি লিখতে :

জাই যোহনলাল,
আমি তোমার জন্তে এখানে দিন দশেক অপেক্ষা ক'রে কিরে রাছি বাসিন্দে কাল রাতের ট্রেনে—

ক্রি—ক্রি—ক্রি—
Avanti ?

পরিচায়িকা ছুটি চিঠি দিয়ে গেল।

ওর বুকের বন্ধ ক্রত বয়—আইরিশের চিঠি—কিন্তু এ কী! এতদিন পরে চিঠি লিখল তাও ছবি পোষ্টকার্ডে!

দুঃ হরে পড়ে—চিঠি কেনেতা থেকে লেখা :
প্রিয় পল,

কাল কাত্তিয়া মাশা ও আমি এখানে এসেছি। আমাদের শরীর ভালো বাছিল না বলে হাওয়া বদলাতে এসেছি। হুইজলও মাসখানেক এখানে ওখানে একটু হুঁখ, তাই তোমাকে ঠিকানা দিতে পারলাম না। তুমি ফ্রাউ জায়াবের ঠিকানার নামকে লিখলে তিনি আমাদের পাঠিয়ে দেবেন—বখন বেখানে বীকি। এখনি যাব লসানে। তাই ইতি কবি। আশা করি ইতালিতে হুঁকের সঙ্গে আনন্দেই আছ।

তোমার আইরিশ।

এ কী! বস দিনের পরে প্রথম চিঠি তাও তুমি পোষ্টকার্ডে, তার উপর এমন তুচ্ছ চিঠি! আইরিশ নিশ্চয় রাগ করেছে। কিন্তু কন? ও আবার পড়ে : আশা করি ইতালিতে হুঁকের সঙ্গে আনন্দেই আছ। এ-সুখ চিন্তে কি তুল হর? অভিমান-হুঁজর অভিমান! তা হাফা আর কী?

কিউ তা হলে কী করবে এখন বাসিন্দে কিরে দিই আইরিশ
বখন সেখানে দেই? ও অত চিঠিটা পড়া যথিত নেবে লিখল :
প্রিয় আইরিশ,

তোমার কেনেতা থেকে লেখা চিঠি প্রথম চিঠি এইমাত্র পেয়েই উত্তর দিছি। পর পাঠ জানাবে কি কবে বাসিন্দে কিরবে?

লিখতে লিখতে ওর মনও হুঁজর অভিমানে ছেয়ে যায়, লিখল :
আশা করি তিন বোনে মিলে সন্ধ্যা হুইজলও আনন্দেই আছ।
ইতি।
তোমার পল।

লিখেই মনে হল—ছি ছি! ওর শরীর ধারণ, এমন তুচ্ছ চিঠি পেলে হয়ত—ভেবেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল, ছিন্ন করল আইরিশ জয়ন শেষ করে বাসিন্দে কিরে তাকে বখন জানাবে তখন তাকে লিখবে, তার আগে না। কেন লিখবে? এই কবু মিলে তুচ্ছ পাঁচ-হুঁখানা চিঠি লেখনি কি? অভিমান তুমি ওই করতে পারবে না কি?

অত চিঠিটা যোহনলালের বাসিন্দা দূরে এসেছে। কিন্তু ওর মনে কই আজ আর কোনো আনন্দ আগে না তো? সেখানে আগবে, না এলেই বা কী? বিমনা হ'য়ে খুলল চিঠি, কিন্তু এ কী!
ভাই পল,

আমাদের আপাতত ইতালি বাওয়া যথিত রাখতে হ'ল। কারণ, কুহুমকে তরত দিন কের পুলিশে ধরেছে। ৩য় বিক্রেত্রে এবার কী অভিযোগ তা ওরা প্রকাশ করেনি, তবে গুজবও না কি বিদেশের বিশ্লবীদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছে। এবার তখনই ওর কোনো প্রকাশ বিচারই হবে না, কেন না ও আজ দেশের হিরো, কোনো কোর্টে ওর প্রকাশ বিচার হ'লে আন্দোলন আরো কীপে উঠবে। বেশবন্ধ বললেন : তিনি খবর পেয়েছেন ওকে না কি এবার বিদেশে পুলিপোলাও চালান দেওয়া হবে—হয় আশ্বামানে, নয় মাদ্রাগারে। তিনি আমাদেরকে অধরোধ করলেন কুহুমের কার্যযুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদেশে না যেতে কয়েকটি কাজের ভারও নিতে হ'ল কুহুমের অন্তর্ভাণে। কাজেই ঠিক এ সময়ে কোন হুঁখ জীব বাস্থারকার জন্তে বিদেশে পাড়ি দিই বলা? একেই আমাদের সবন্ধে নানা লোকে যে সব মন্তব্য করছে সে বাক। কী আর হবে কারুনি গেরে?

তুমি একটা কথা : যদি মাস খানেকের মধ্যেও কুহুমকে না ছাড়ে তবে ভাবছি রিতাকে একাই পাঠাব, তবে হুইজলও নয়—সোজা বাসিন্দে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে সে তবু একটু ভরসা পাবে। তারপর বাবে হুইজলও। কিন্তু সে পরের কথা—এখন তুমি ব'লে রাখলাম জানতে চেরে তুমি আর কত দিন বাসিন্দে থাকবে, আর ওয় একটু দেখাওনা করতে পারবে কি না?

রিতার জন্তে আমার সময়ে সময়ে সতিাই হুঁখ হয় আজকাল। আমি বড় পলা করেই বলতাম একদিন যে আজকের মাহুয়ের গৃহ স্বদেশ নয়—সর্বদেশ। কিন্তু এখন দেখছি এ-জাতীর বুলিতে মন মানলেও প্রাণ মানে না, ঠেকে লিখছি উঠতে বসতে যে, যে-বিধমানব সর্বাঙ্ক-করণে বলতে পারেন যে, তাঁর কাছে স্বদেশের চেয়ে বিধ বড়, আমাদের মনে লাগ কাটতে পারেন হয়ত, কিন্তু প্রাণে ঠাই পারেন না—অন্তত এখানে। হয়ত হুঁখা পাঁচ শো বৎসর পরে বিশ্বমানবতার বাস্তবীকরণের স্বপ্ন হ'য়ে উঠতেও পারে—বলতে পারি না, কিন্তু একথা বলতে পারি খুব জোর ক'রেই যে, এ-সুখের মাহুয়ের কাছে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বাণী হ'ল জাতীয়তা—সর্বদেশেই। আমি বেশবন্ধ বা কুহুমের মতন দু-একজন অসামান্য মাহুয়ের কথা

বলছি না, বান্ধের দেশভক্তি বিশ্বপ্রেমের অন্তরায় না হ'লে সহায় হয় : কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে বা অর্থ সাধারণের কাছে সে পথের হ'লেই থাকবে ; বতরিন না তারা সাধারণ চেতনার চলাকেরা করা ছেড়ে অসাধারণের চেতনার উঠতে শিখবে। না, শিখবে বলি কেন, এ তো বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করার ব্যাপার নয় ভাই। বিকাশ লাভ করে হয়ে ভীতির ব্যাপার আর যে কোন বড় বিকাশ সাধারণের নাগালের বাইরে। যেহেতু সাধারণ মানেই হ'ল অসাধারণের উল্টো। অর্থাৎ অসাধারণের কাছে বা প্রত্যক্ষ, প্রতীকাত সাধারণের কাছে তা অসুখ, না-সুখ। বিশ্ব-মানবতার বাণী হ'ল এই অসাধারণের উপলব্ধি চেতনার আলো। সুতরাং এ আলোকে সাধারণ চেতনার আলো-আঁধারী মন বুঝবে কেমন করে ? তাই রিতাকে খুব অপরাধিনী মনে করতেও বাবে। বিশ্বমানবতার বাণী ওর বুদ্ধি গ্রহণ করলেও ওর হৃদয় আজো বরণ করতে পারেনি, অথবা ভবিষ্যতে পারবে কি না বলা কঠিন। কেন না কোনো মানুষের বিকাশ কখন কোন্ খাতে পথ কেটে চলেবে কেউই জোর করে বলতে পারে না। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে আজকের রিতা ক্রান্ত ছাড়া আর কোন দেশকে স্বদেশ মনে করতে পারেনি বলে ভাবে যে, ভারতবর্ষকে ক্রান্তির মতন ভালোবাসলে সে হবেই হবে বিচারিণী।

তাহাড়া আজকের ভারতবর্ষের—মানে ভারতবাসীর বা অবস্থা তাতে ও যদি আমাদের মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতে না-ই পারে, তবে তার জন্যে ওকে খুব ধোঁব দেওয়া যায় কি ? কিছুদিন আগে মহাপ্রাণ দেশবন্ধু করুণ হেসে কুহুমকে বলেছিলেন (তার এ বক্তব্যটি এখন সারা বাংলার চালু হয়ে গেছে) ; মাত্র এক বৎসর দেশবন্ধু অসহযোগীদের সঙ্গে মিশে ব'ল' হয়ে গেছি বাবা, ঐ হ'য়ে গেছি (ব্যকবর্ধতা ভাবের মধ্যে দেশলায় পতিত বৎসরের ক্রিমিনাল প্রকটনে দুঃখান্বিত মনেও দেখিনি। নিঃসঙ্গ মানুষ দেশভক্তির নাম নিয়ে কী যে করে বেড়াচ্ছে দেখে শুনে সত্যিই হকচকিয়ে যেতে হয়। ভাবতে পারো কি কুহুমের এক বিষয় (?) বন্ধুই পুলিশের গুপ্তচর হ'য়ে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে ? নিলে হয়ত সি-আই-ডি ওকে জোর ধরত না এত ভাড়াভাড়ি।

রিতা এই সব কারণে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। তাহাড়া নিতা চোখে দেখছে আমাদের 'নারীস্বাক্ষরো গুণবানিনাশী', দেখছে আমাদের নোংরানি, তামসিকতা, কাপুরুষতা আরো কত কী। এক আঘাট তিলক, পাকী, দেশবন্ধু, কুহুমে কী হবে ? এ বেন হ' তার খাট জলে মলভূমিকে উর্ধ্ব করার প্রয়াস।

আমি ভারতের আত্মার মহিমা অস্বীকার করি না। কুহুমের যতন আমিও বিবাহ করি যে খবরদের তপস্বিনী এখনো এ-দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু থাকলে হবে কি ?—ভারতের সে গহন আত্মশক্তিকে তো চর্যচক দেখা যায় না ভাই—দেখা যায় কেবল প্রেমের শিবনেত্রে। এইখানেই হয়েছে রিতার মুশকিল—ও আমাদের দেশের বাইরের অবস্থা দেখে এক বা খেয়েছে যে ভারতের অন্তর্লীন সনাতন মহিমার জয়ধ্বনিতে সাদা দিতে পারছে না। এ যক্ষ্ম মনের অবস্থার ও কেনন করে ভারতকে ভালোবাসবে বলা তো ? আর যদি ভালো না বাসে তবে কেনন করে টিকবে

এ দেশে ? ওর শরীর খাণ্ডন হওয়ার মূলে রয়েছে এই মনঃকষ্ট, স্বপ্নজন্ম। ও বক্তৃতা করে এসেছিল যে আমাদের দেশে ও এমন আত্মিক শক্তির দেখা পাবে তার দেখা হুরোপে পায় নি ? সে আশা ওর প্রায় নিমূল হল বৃষ্টি। তাই ও দিন গুণছে—কবে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও ওর স্বদেশে ফিরে গিয়ে একটু ভুজাবে।

এছাড়া আর একটা কারণও রয়েছে যেটা সাময়িক হলেও এত হৃদয় ও জাঘাম্যান যে মনে হয় বৃষ্টি চিরন্তন। সেটা হল আমাদের বিজ্ঞান-বিবেচ। এর জন্যে আমি আমাদের দেশবাসীকে খুব বেশি ধোঁব দিতে পারি না। ইরাকের অভ্যুত্থানে আমরা আজ অধিষ্ঠান, এ অবস্থার বিশ্বমানবতার নোহাই দিয়ে উৎপীড়িতকে বলা বুঝা যে তোমরা উৎপীড়কদের বৃকে তুলে নাও। তাহাড়া এ অসহযোগ আন্দোলন আমাদের রক্ত আক্রোশকে বৃত্ত করে দিয়েছে যার ফলে আমরা সাহেব বা মেয়সাহেব নাম শুনতে না শুনতে আগুন হয়ে উঠি। এ আক্রোশের আঁচ রিতাকে রেহাই দেয় নি একথা বলাই বাহুল্য। তাই ও আরো বুঝে পড়েছে। এক্ষেত্রে ওকে কী করে সুখী করব জেবে পাই নে। আজকাল আমার মনে সময়ে সময়ে সত্যিই গভীর সংশয় জাগে কেউ কাউকে সুখী করতে পারে কি না ?

ওর আর এক কষ্ট—কষ্ট কি ওর একটা ? এখানে ইউরোপীয় অপেরা, সিমফনি, চেম্বারমাসিক প্রভৃতি শুনতে পারি না। হুরোপীয় সঙ্গীত ও কি রকম ভালোবাসে জানোই তো। ওর কাছে সঙ্গীত বিলাস নয়—ভূকার জল, চোখের আলো, বৃকর নিশ্বাস। তাই কালই বলছিল তোমাকে লিখে দিতে—তুমি ঈগণির ফিরে এসো তোমার যুগে শুনে শুবাট, শ্রুমান, শোপায়া, তবুস, ভাইম, রাধমানিক, পুচিনি, তেঁতি প্রভৃতির গান। তুমি এ সব প্রকারের গান নিশ্চয়ই শিখবে ? ও জিজ্ঞাসা করছে। হয়ত দু-চারদিনের মধ্যে ও নিজেই তোমাকে লিখবে ওর শরীর একটু সুস্থ হলে।

আর কী ? চিঠি মন্ত হয়ে গেল—হাতে অনেক কাজ পড়েছে কুহুমের জেলে বাওয়ার দরুন। ভাই এবার আসি।

এ চিঠির উত্তর পারো তো একটু ভাড়াভাড়ি দিও, আর আমাকে না লিখে রিতাকেই লিখো, ও খুব খুশি হবে। কারণ তোমাকে ও আগের মতনই ব্রহ্ম করে। ইতি রেহাখী

মোহনলাল।

ছদ্ম

পল্লবের বৃকর রক্ত বেন জল হ'য়ে গেল। ঠিক এ সময়ে এ কী চিঠি ? চিঠিটা ও হ'বার পড়ল। বড়ই পড়ে ভতই—নে ও চোখে অন্ধকার দেখে। এ অবস্থার আইনিগকে নিয়ে দেশে ফিরতে চাচ্ছে কোন ভদ্রসার—বিশেষ বধন কুহুম জেলে ? নাও কুহুম বাইরে থাকলেই বা এমন কী মন্ত সুখি হ'ত ? হয়ত সে সুখ ফেরাত—কে বলতে পারে ? কে না জানে—যেখানে রাহুয়ের প্রত্যাশা বেশি সেখানে আঘাতও বাজে বেশি ? মোহনলালকে কমা করতেই বধন কুহুমকে এক বেগ পেতে হয়েছিল তখন পল্লবকে কমা করতে—এ চিন্তাকে ও ঠেলে দেয়। না, না, এখানে কমা প্রায় আসে কোথেকে ? কুহুম কি নিজেই লেখেনি নহেশিনীকে বিবাহ করার কথা ?

কিছু সেখানেই বা ভরসা কোথায়? আইরিশ তো অকুণ্ঠেই কবুল করেছে—দেশ বলতে ওর বুকের তার বেজে ওঠে না, ও চায় শিল্পীর জীবন—দেশসেবিকার জীবন নয়। তবে? কী করবে ও? আইরিশকে সব খোলাখুলি জানিয়ে বিনায় নেবে? ক্রমাগতই মনে হয়—এই-ই তো স্রুজিত।

কিন্তু হায় রে স্রুজিত জাঁক। স্রুজিত তো হ'ল মনের নিশারি—প্রাণ তাকে কবে মনে নিয়েছে গুরু বলে? আর প্রাণকে উপবাসী রেখে স্রুজিত আলোজল খেয়ে কে কবে অসাধ্য সাধন করেছে? ওর মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ধনিরে ওঠে, মোহনলালের খেদ ওর স্তম্ভের তায়ে তারে অধ্বনন ভালো: মানুষ কি মানুষকে স্রুখী করতে পারে? অথচ তবু এই স্রুখের অন্তেই আবহমান কাল মানুষ হাত পেতে এসেছে তো মানুষেরই কাছে। শূন্য স্থান আর কার কাছেই বা হাত পাভবে পূর্ণতার বর পেতে? ভগবান? তাঁর কাছে দরবার করতে পারে তারাই যারা শুনেছে তাঁর ডাক। পল্লবের মনে পড়ে ওর কৈশোরের কথা—যখন জিরামকৃৎসনের কথা ওর স্তম্ভে সাড়া দিত। কিন্তু সে-ডাক আজ ওর অন্তরের কানে কই আর তো বেজে ওঠে না তেমন ক'রে? আজ ওর মন-প্রাণ সাড়া দেয় শুধু আইরিশের ডাকে। তাকেই ও আজ চায় সর্বাঙ্গ:করণে—চায় তাকে ভালোবেসে স্রুখী করতে, নিজের কৃতার্থ হ'তে। কিন্তু দেশের যে অবস্থা—তাতে ও কেনম ক'রে আশা করতে পারে যে আইরিশ ভারতবর্ষে গিয়ে স্রুখী হবে?

বৌকের মাথাখ ও বুককে টেলিকোন করে।

কে?

আমি—পল্লব।

পল? কী ব্যাপার?

বুকে পারছি না ভাই। তাই তোমাকে বিরক্ত না ক'রে পায়লাম না।

না না, বিরক্ত কেন? এলিওনোরা শুতে গেছে। আমি আমার ঘরে একটা বই পড়ছিলাম। অথচ অবসর এখন। কিন্তু কী ব্যাপার?

মোহনলালের এক চিঠি পেয়েছি। আইরিশেরও। মন বড় কলাচ হ'রে উঠেছে।

অশান্ত?

শোনো মন দিয়ে—বিরক্ত হবে না তো?

টেলিকোনে বুকফের হাসি বেজে ওঠে। কী পাগল? তোমার বসি-কোনো কাজে আসতে পারি, অন্তত নিজেকে বলার একটু সুযোগ তো পাবো—বা রে আমি।

পল্লবও হাসে: ধস্তবাস্ত প্রিয়দল। তবে শোনো। ব'লে প্রথমে আইরিশের চিঠি প'ড়ে শোনালো, তারপরে মোহনলালের পড়া শেষ হ'লে একটু চুপ ক'রে থেকে পল্লব বলে: কী? কথা ক'ছ না বে?

ভাবছি।

তবু ভাবলে চলবে না। বলতে হবে—কী কববে? এক দিকে আইরিশ রাগ করেছে—

না, আমার মনে হয় এ রাগ নয়।

তবে?

ভেবে কাল বলব।

না। কাল অনেক ঘুরে। তা হাড়া আমি ভাবছিলাম কাল রাতের ট্রেনেই বাগিনে করে বাই।

কিন্তু বাগিনে করে গিয়ে কী করবে তুমি যখন আইরিশ সুইজলগে।

তবু—

তবু না। শোনো। কই বাড়ানো কেন? মানুষ কত কই পায় কাকুর আগার আশায় থাকলে আমি জানি। এখানে অন্তত এক বাঁচোরা, আইরিশের অভ্যর্থনের আশা নেই। অপেক্ষা বহি করতেই হয় এখানেই করা ভালো। আইরিশ বাগিনে কিয়েল তখন কিয়ে বেও সেখানে। এইই হ'ল স্রুজিত কাল।

একটু ভেবে পল্লব বলে হয় তো ঠিক বলেছ। কিন্তু ও কবে বাগিনে কিয়েবে জানাব কী ক'রে? ঘরো যদি ও না জানায়? কী পাগলের মতন কথা বলছ?

পাগল কেন? ঘরো যদি ও ইতিমধ্যে আর কাউকে ভালোবেসে থাকে?

হু পাগল।

তবে চিঠি না-লেখার কারণ কী?

আমি কি অর্ধরামী?

তবু—

না, তবু-টবু নয়। শোনো ভাই। এ ক্ষেত্রে ব্যস্ত হ'ল সুকলের চেয়ে সুকল কলবারই সম্ভাবনা বেশি। একটু খিঁচিয়ে যেতে দাঁও—তুমি নিজেই তো সময় চেয়েছিলে।

চেয়ে তো ভুল করেছিলাম—তোমার মতে।

কিন্তু আমার মত তো আর অজান্ত নয়। তা হাড়া আমি একথাও বলি নি কি যে খিঁচিয়ে প্রত্যেককে পথ খুঁজতে হয় নিজেরি অন্তরের কাছে?

আমার অন্তর যে একবার বলে এ-পথে চলো, একবার বলে ও-পথে।

তাই তো বলছি—খিঁচিয়ে যেতে দাঁও। তখন পাবে ঠিক পথের নির্দেশ। ব'লে একটু খেমে: আমিও ইতিমধ্যে একটু ভেবে দেখি কিছু করা যায় কি না।

পল্লব খুশি হ'রে হেসে বলে: বার বুকু আছে তার সবই আছে।

বুকফের হাসির সাড়া বেজে ওঠে: এই-ই তো চাই, সাধারণ জোয়ান। কিন্তু শোনো এবার একটা কাজের কথা বলি। এলিওনোরা বলছিল তোমার এখানে গাম দেখার ব্যবস্থাও করে সেলেছে। বিনি তোমাকে দেখাবেন তিনি কাল চা-রে আসছেন। তুমি বিরহের দাহনে জ্বলে যেও না কাল আসতে।

ভুলব না। কিন্তু তুমিও জ্বলো না তোমার আশায়। না ভুলব না। কেবল একটু বৈধ ঘরে চুপ করে বসে থাকো এখানে। তুমিই তো একটা কীটন পাও মনে নেই: 'রাই বৈধ রহ বৈধম', রাই এ উপদেশে কান নিয়েছিলেন বলেই না তাঁর কৃষ্ণাঙ্গি হয়েছিল।

পন্নব হেসে বলে : আয়ারও হ'ল ব'লে। মা তৈঃ।
Grazie, amicono mio ! ২

সাত

পন্নবের মন খানিকটা শান্ত হ'য়ে এল। মনে মনে বুহকের সাধুবাদ ক'রে ও ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে দেখল : আইরিশ গাইছে ওই শেখানো গান : "প্রিয়, তোমার কাছে যে-হার মানি..." আনন্দের শিহরণ ব'য়ে যায় ওর দেহে—এত আনন্দ যে ওর ঘুম ভেঙে গেল। এর পরে সাধা রাত আর ঘুম হ'ল না—কেবলই বাজে আইরিশের কণ্ঠে বাংলা গানের মৌড়ী...চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার জলভরা কালো চোখ দুটি : ...

বুহক টেলিফোন করল দুপুরবেলা : "এলিওনোরা তোমাকে টেলিফোন করতে বলল যে ওর মোটর তোমার হোটেলের পৌছবে ঠিক বেলা সাড়ে তিনটের।"

না না! মোটরে কি হবে?

খুব ভালোই হবে, amico sciocco। ও ওর হু"—দুখানা মোটর পাঠাতে চায়—পাঠাক না। বলে না—জো আপসে আয়, উল্কা আনে দে। ৪

পন্নব হেসে বলে : জানি সবই—তবে—

জানো না কিছুই, অন্তত জানো না সিনেমা তারকারের মতিগতি। ওরা চার ওদের ঐষর্ষ একটু জাহির করতে। করতে লাগে না। You must humour the charming, amico intelligente ! ৫

পন্নব হেসে বলে : Concesso, amico insistente।

বধাকালে তারকার রথ এসে হাজির। উর্দুপরা সারথি পন্নবের হাতে দেয় একটি চমৎকার সুগন্ধি লেকাপা। পন্নব খুলে দেখে একটি ফুল-জাঁক কার্ড, উপরে লাল হরকে ছাপা : এলিওনোরা জে নোনি। নীচে লেখা নীল লোহিত কালিতে : Wel Come E leonora.

এলিওনোরার ভিলাটি, রোম থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত একটি মনোরম স্থানের উপরে পোপের বসন্ত নিলয় Castel gondolfar কাছেই। কী সুন্দর ভিলা। মোটর থামলেই চতুর্দিক আপানি গুড়ল এল ছুটে। ও নামতেই তাদের সে কী পুলক। পন্নব একটি কোলে তুলে নিতে না নিতে এলিওনোরার আবির্ভাব।

পন্নব কুহুগটিক মাটিতে বেধে দিতেই এলিওনোরার পরিচারক ইংরাজিতে বলল : আহুন। আপনি কুহুর ভালোবাসেন দেখে কী যে ভালো লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে বুহকের অভ্যাস, বলে ইতালিয়ানে : বহু আয়ার বিখপ্রেমিক—কুহুর বেড়াল কাকাতুরা—ভালো না বাসে কী?

এলিওনোরার মুগ্ধি হেসে ইংরাজিতেই বলে : তাহ'লে আমাদের বনবে ভালো।

বুহক বলে : ও কি? ও ইতালিয়ান জানে।

পন্নব ভাড়াভাড়ি বলে : না, ইতালিয়ানে এখনো বাবুসিধি হয়নি কাঞ্চ চালাতে পারি মাত্র। ইংরাজিতেই কথা চলুক। ব'লে হেসে : বহু আয়ার একজন বিখ্যাত লিখুইট—কাজেই যোবেন না আমাদের মতন নিরীহ মানুষের অবস্থা।

এলিওনোরার হেসে বলে : হ্যাঁ, ও ভাবে—ওর কাছে বা সহজ তা বুঝি সবার কাছেই সহজ। কিন্তু চলুন—ভিতরে।

সিনেমার পূর্ণোদিতা তারকার বাগ্য সাল বটে। এর কাছে

কোথার লাগে ক্রাউ ক্রামারের সেকেন্দা সাল। সোফা, ডিভান, পায়ন্ত-কার্পেট, বড়ান মাছ, বিভিন্ন দীপমালা—কিসের অভাব? ওরা তিনজনে আরাম ক'রে বসল। এলিওনোরার হাতখড়ির দিকে তাকিয়ে বলে : সিনেমা এক দেখি করছে। ব'লেই হেসে : আমরা জরুণ কি মার্কিন নই—সময় আমাদের কাছে টাকা নয়—বরং বিহারের অন্তরীক। তাই কিছু মনে করবেন না মিটার ব্যক্তি।

বুহক বলল : ওকে পলই বোলো। ও তোমার আয়ার চেয়ে অনেক ছোট।

এলিওনোরার কৃত্রিম কোপে বলল : কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি। পাঁচ বৎসর অক্সফোর্ড থেকে ডব্লু শিখল না—*a woman is as old as she looks?*

বুহক হেসে বলে : And a philosopher is as old as he feels। তাহ'লে পল, তুমি মারা পড়লে, কারণ প্রাচীন মর্দনে তুমি সিদ্ধ। কাজেই You are as old as the hills.

এলিওনোরার বলল : সে কি? মিষ্টা—পল তো গায়ক।

বুহক হাসে : ও বহুদঙ্গী। বখন যে-বহুদুই কাছে থাকে, তারই ছোপ গায়ে লাগে।

এলিওনোরার বলে : এটা কি হিরো-ওয়ার্ল্ডেরই দর নয়?

বুহক হেসে গড়িয়ে পড়ে : ওকে এক আঁচড়ে চিনেছ এলিওনোরা।

এলিওনোরার কৃত্রিম কোপে বলে : বহুকে নিয়ে হাসাহাসি? Zola-র তিরস্কার মনে পড়ে : J'accuse ! (বিক, বিক।)

পন্নব প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করতে বলে : আপনি ক'টা ভাষা জানেন সিন্ধাবিনি—

এলিওনোরার ভাষা দিয়ে বলে : আমাকে এলিওনোরাই বুলবেন। আপনি বুহকের বহু, কাজেই আপনার অধিকার আছে। কি জিজ্ঞাসা করছিলেন? আমি ক'টা ভাষা জানি? বেশি না—ব'লে বুহকের দিকে চেয়ে : তবে ওর চোখে ছোট হই কি করে? তাই চার-চারটি-বিশেষী ভাষা শিখতে হয়েছে—করানী, স্প্যানিশ, ইংরাজি আর জরুণ। কিন্তু ও এর উপরেও শিখে নিল আরো হু'রুটো ভাষা। ও সোজা লোক নয়। জানেন তো ওকে?

পন্নব উত্তর দিতে বাবে, এমন লম্বের এক সুদর্শন প্রহুজ প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছুটে এসেই এলিওনোরার হুই গালে চুম্বন।

এলিওনোরার ওর চুম্বনের প্রতিক্রিয়া দিয়ে পন্নবকে বলে : ইনি হলেন আমার মাথা—গিলো বিরাকি। যোমে, একজন বহু গায়ক

২। বহুবাক, পরমবহু।

৩। অবোধ বহু।

৪। বুদ্ধিমত্ত বহু।

৫। মনে নিলাম, নাছোড়বান্দা বহু।

—আমাদের সিনেমার গানের ডিরেক্টর। ব'লেই তাকে : তোমাকে তো বলেছি মিটার বাকটির কথা ?

হ্যাঁ। উনি হিন্দু গান করেন, না ?

হুবুহ হেসে বলে : ঠিক নয়। ও মুসলমানি গানও করে—হিন্দু মুসলমান দুজাতের ওজাদের কাছেই শিখেছে কিনা।

সিন্তোর বিয়াকি বললেন : Scusi, Signori ? ৩

পল্লব ইংরাজিতে বলে : আমাদের দেশে রাগ সঙ্গীতের জন্মভূমি হিন্দু হলেও, তার পালনকর্তা এ-যুগে মুসলমান গায়কেরাও বটে। তাই আমাদের দেশের উচ্চসঙ্গীত শিখতে হলে মুসলমান ওজাদের কাছেও তালিম নিতে হয়।

মাঝা ভাগুনীর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তাতা তাতা ইংরাজিতে বললেন : উচ্চসঙ্গীত ? আপনারা সঙ্গীত তো লোকসঙ্গীত, Primitive—নয় কি ?

পল্লব বিরক্ত হয়ে বলল : সেটা নির্ভর করে যে বিচার করছে তার উপরে। খুঁট বে খুঁট, একদল কারিসী তাঁকেও বলেছিল—তিনি শরতাবের সাহায্যেই শরতাবকে তাতান।

এলিওনোরা ব্যস্ত হয়ে বলে : গিগো কিছু মনে করে বলে নি। আমি হুমদায় ক'রে কথা বলা ওর স্বভাব। তবে কি জানেন ? আমরা তো উনি নি কখনো হিন্দু কি মুসলমানি গান ? এখনো মায়ের মাহুয়ের খবর সত্যি কত কম রাখে জানেন তো ?

সিন্তোর বিয়াকি বললেন : আমার কথাটা একটু—malaccorto ৭ হয়ে গেছি—কিছু মনে করবেন না। ব'লেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : ইংরাজিতে বলে জানেন তো—don't take offence when no offence is meant.

পল্লব হাসিমুখে করপড়ন করে বলে : স্বভাব।

এই সময়ে তিনটি পরিচারিকার ঢা কেক প্রস্তুতি নিয়ে প্রবেশ।

এলিওনোরা ঢা ঢেলে পল্লবকে বললেন : চিনি ?

হুঁ চামচ।

চাপ'বু হুহ হল—একথা সেকথা—সকারণ হাসি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা—কখনো ইংরাজিতে কখনো বা ইতালিয়ানে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। এলিওনোরা আলোর সুইচ টিপতেই ঘর আন্ধার-নাশা, অথচ স্নিগ্ধ আলো, চোখে লাগে না।

পল্লব বলল : চমৎকার সাল! আপনারা সিন্তোরিনা—

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলে : কেন ? বলিনি হুবুকের বজুর—অধিকার আছে আমার নাম ধ'রে ডাকবার।

পল্লব খুশি হয়ে বলে : গ্রাৎসিয়ে, এলিওনোরা। তবে আমি বিশেষ তো—তাই একটু ভরে ভরে থাকতে হয় বৈ কি।

হুবুহ বলল : তোমার হুবুহ এ কী কথা বহু ? তোমার হিরো না নির্ভীকতার অবতার—বালার গায়িকণ্ডি ?

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলল : বাজে কথা অনেক হ'ল, এবার একটু কাজের কথা হোক। ব'লেই সিন্তোর বিয়াকিকে : গিগো।

উনি বালিনে বহুর খানেক জরণ গান শিখেছেন, এখন ভালো ইতালিয়ান গানও কিছু শিখতে চান।

সিন্তোর বিয়াকির হুবু গভীর ক'রে হুহুসিয়ান। মনে বললেন : জরণরা হটিয়েছে—ইতালিয়ান গান শেখা খুব সোজা কিন্তু আমল, জগতের সব গানের মধ্যে ইতালিয়ান গানই সব চেয়ে কঠিন। ইণ্ডিয়ান গানের মতন সাধামাটা নয়।

পল্লবের রক্ত গরম হ'য়ে উঠল : আপনি কি জানেন আমাদের গান—যে এ কথা বলছেন ?

সিন্তোর বিয়াকির চোটে অবজার হাসি ফুটে উঠল : না, তবে নিছক মেলডি তো—তাহাড়া, কিছু মনে করবেন না। মিটার বাকটি, আমাদের কঠসাধনার রীতি এত কঠিন যে বিশেষীর পক্ষে আরম্ভ করা কঠিন।

পল্লবের মেজাজ আরো খারাপ হ'য়ে গেল এ-ইজিতে, বলল : কঠসাধনার কথা যদি বললেন তবে আমাদেরও বলতে হচ্ছে—কিছু মনে করবেন না সিন্তোরে—যে আমাদের কঠসাধনার পদ্ধতি থেকে আপনারাও হয়ত কিছু শেখার থাকতে পারে।

সিন্তোর বিয়াকি হুই ডুক তুলে একটু বাঁধা হেসে বললেন : Patroismo è ammirabile—ma—Signore, ৮ আমাদের স্বরসাধনা এত জটিল যে বিশেষীর পক্ষে—বিশেষ ক'রে ওরিয়েন্টাল গায়কের পক্ষে—স্বরনির্দিষ্ট—তবে আপনি যদি বহুর মশেক আগ্রা সাধনা করেন তবে হয়ত একটু গাইতে পারতেও পারেন। কারণ আমাদের গানে যে-সব ইন্টারভাল নিতে হয় সে অভ্যস্ত কঠিন।

পল্লবের হুবু জ্বল লাল হয়ে উঠল, বলল : ইন্টারভালের বিভীষিকার আমরা ভয় পাই না সিন্তোরে। কারণ, কিছু মনে করবেন না—আমাদের গানের নানা ভাবনাশাশে যে-ধরনের ইন্টারভাল আমাদের সাধতে হয়, সে-ধরনের ইন্টারভাল আপনারা হাজার চেষ্টা করলেও নিতে পারবেন না।

সিন্তোর বিয়াকির হুবু লাল হয়ে উঠল, ব্যস্তভাবে বললেন : কিছু মনে করবেন না। সিন্তোরে, আপনারা গান তো নিছক লোকসঙ্গীত—সহজ মেলোডি—আমাদের গান উঠেছে বিকাশের এমন একটা শিখরে—

হুবুহ বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বলল : আমাদের গানের বিকাশ কোথার উঠেছে, তা তো জানেন না আপনি—বলেই পল্লবকে : তুমি একটা জাঁকালো বাগ শুনিবে দাও না সিন্তোর বিয়াকিকে।

পল্লব তৎক্ষণাৎ উঠে শিরানোর কাছে গিয়ে টুলে বসে বলল : সিন্তোরে, শুধুন তবে আমাদের একটি—বাক্য আপনি বলছেন সহজ মেলডি : এ বাগটির নাম মালকোথ—যদি এর একটুমাত্র তান কি গমক গলায় তুলতে পারেন, তাহ'লেই আমি হার মানব। তবে প্রথমেই বলে রাখি—মেলডি বলতে আপনারা বা বোকেন, আমাদের বাগ তা নয়। বাগ বলতে কি বোকার হু'কবার বো'গানো অন্তর—তবে একটু শুনলে হয়ত টের পাবেন মেলডির বিকাশে কোথার পৌছেছে আমাদের বাগ। ব'লেই শিরানোর পাচটা পর্দা পর পর বাড়িয়ে : শুধুন মন দিয়ে—মাত্র এই পাচটি পর্দার আমি বাগটি গাইছি—সি, ই জ্যাট, এক, এক্যাট আর বিজ্যাট। এ ঠাট

৩। কী বললেন, মহাশয় ?

৭। বেকীশ।

৮। দেশভক্তি চমৎকার—কিন্তু মহাশয়,

আপনারে করনারও অভীত, কিন্তু আমাদের নিখতে হয় প্রথমেই।
ব'লে ঠাট্টা গলায় গেরে : এবার এঠাটে নানা রকম তান শুনুন
—মাত্র এই পাঁচটি পদ্যই, মনে রাখবেন। কোথাও যদি
এর বাইরে একটি পদ্যও লাগাই যমকে দেবেন, আমি হার
মানব। ব'লে উমত হুমত ঘন গরজে ব'লে একটি মালকোবের
অছারীটুকু পেয়েই রকমারি তান ও গমক দেওয়া শুরু করল।
কসরৎ-এর শেষে বলল : এটি গাইলাম আপনারে চতুর্ভাজিক
হুনে। কিন্তু এবার এই রাগেই আর একটি গান গাই শুনুন এমন
একটি তালে বা আশনি ধরতে পারবেন না—মানে হাতে তাল
দিতে পারবেন না পায়নে তো করজোড়ে কমা চাইব বলেই উত্তেজিত
ধরে বাঁপতাল ধরে দিল পঞ্চমাজিক হুনে :

লড়া তরে বন্ধু নহে—প্রেমের ভাকে চাই দরপ,
সিদ্ধু তরি' অকুলে কুল লভিব বরি বাজা চরণ।

বাঁপতাল শেষ করেই তাল ফের দরল সপ্তমাজিক বামারে :
'বেসেছি যদি ভালো, ধার না এ তব্বর প্রতিটি আঁ কন তোমার
পানে—তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, একথা অস্তর
বন্দ জানে।'

গেয়েই থেমে বলে : এ তাল হল বিবমগনী, দেখুন আগের তাল
ছিল ছুই ভিনের হুন্, এ হল তিন দুই দুই কিনা সাতের হুন্—এ
তাল আরম্ভ করতে আপনারে অস্তর দশটি বংসর সাধনা করতে
হবে যদি পুরের সঙ্গে পুরবিহার করতে চান। বলেই উদ্ভীষ্ট কণ্ঠে
গেরে চলে :

'তোমার উচিতর আমার আমি যদি অর্থ সম হয় আপনি নত,
জানি এখন ভব পরশে পঞ্চ কুটবে করুর আমার বত।
ডুবি না তবু কেন সাগরে তব ? চলি আজিও ভেসে ভেসে

কিসের টানে ?

তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, এ কথা অস্তর
বন্দ জানে।'

গান শেষ করে বলে : আমি এই যে সব তান বাঁট দেখালাম,
আমাদের দেশের উদ্ভাবকের কাছে তা ছেলেখেলা। প্ররকে নিয়ে
ঠাড়া যে কাণ্ড করেন শুনে আপনারা ভবিত হবেন। শুনুন
সিজোরে। আপনারা বুঝে কথার কথার আমাদের ওরিয়েন্টাল
বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। আমরা যদি পেট্রিইট হই, তবে
আপনারা লজ্জা তথা আত্মতরী। কিন্তু দার্জিক মাছুষ পার না
সত্যের দেখা, বিনয়ী না হলে চোখের ঝিলি ধসে না। আমি এত
কথা বলতাম না—কিন্তু আমি এসেছিলাম শিখতে। আপনারদের
কাছে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক কিছু শিখবার আছে। কিন্তু
আপনি আমাদের সঙ্গীতকে প্রিথিটিভ বলে ভিশিশ করে দিলেন
তার কিছুই না জেনে।

হুহুহু ঠেঁ ওর কাঁখে হাত রেখে বলে : হয়েছে, হয়েছে—
আর থাক।

এলিওনোরা বলে ওঠে : না না বলুন আপনি। গিঙ্গোর একটু
শিখা হবে—ভালোই হবে।

পল্লব ঈষৎ লজ্জিত হয়ে পুর নামিয়ে নিয়ে বলল : থাক করবেন
সিজোর বিয়াকি। আমি তর্কাতর্কি কি জাঁক করতে সাত সাগর
পেরিয়ে আসি নি। এসেছি সত্যি শিখতে। কিন্তু আমাদের

দেশের 'বহু বিকশিত ঐতিহ্যের কিছুই না জেনে বন্দন তাকে
আপনারা হুকুমত নত্যাং করে দিতে এগিয়ে আসেন, তখন একটু
বিরক্ত হতে হয় বৈ কি। আর একটা কথা : আমাদের দেশের
সঙ্গীতের আমি বেশি জানি না, সামান্যই শিখেছি। ইচ্ছা আছে :
দেশে কিরো ইতিমত্ত শিখব। আপনারাদের গানে কিছু তামিল নিতে
এসেছি আপনারদের সঙ্গীত বুঝব করে এদেশে নাম কিনতে
নয়—আপনারদের সঙ্গীতের বিশেষ করে নানা বিভাস ও উদ্ভাবন
থেকে বতটা পারি গ্রহণ করে আমাদের সঙ্গীতকে আরো সমৃদ্ধ
করতে। কাগর আপনারদের বহুলসঙ্গীত আমি বৃদ্ধ হলেও আপনারদের
কণ্ঠসঙ্গীত আমার ভেতন ভালো লাগে না। কণ্ঠসঙ্গীতে আপনারা
আমাদের কাছেও আসতে পারেন না জানবেন, যেমন অভাবনীর
শ্রবসম্পাতে আমাদের বহুলসঙ্গীত, অর্কেষ্ট্রা, আপনারদের সঙ্গীতের
কাছে আসতে পারে না। তাই দেখছেন পেট্রিইটে আমার উপাধি
নয়, আমার সত্য উপাধি—সত্যাবেশু, জিজ্ঞাসু। সত্যকে জানতে
হলে চাই বিনয়—তাই আমি নম্র ভাবেই আপনারদের সঙ্গীতকারদের
কাছে শিখতে এসেছি। কিন্তু আপনারদেরও ঠিক এমনি নম্র হ'রে
আমাদের সঙ্গীতকারদের কাছে শিখতে বাওয়া দরকার। আর
যদি বান, দেখবেন—আমাদের ভজন, কীর্তন, নাট্যসঙ্গীত, বাগসঙ্গীত,
তাল ও তানের বৈচিত্র্য, অলকারের ঐশ্বর্য এসব থেকে আপনারদের
অনেক কিছুই শিখবার আছে। বলে একটু থেমে : যদি অস্তর
কিছু ব'লে থাকি কমা করবেন এই ভেবে যে গারে-পড়ে আঘাত
দিতে চের আমি আজ এসব কথা বলি নি।

সিজোর বিয়াকি মাথা নিচু করে বললেন : না সিজোরে,
আপনি অস্তর কিছুই বলেন নি, তাই কমা করবার প্রেরণ
ওঠে না। রয় আপনারকে আমার বক্তব্যই দেওয়ার কথা
যে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা অনেক বিষয়ে আপোঁ কী
রকম অজ্ঞ আছি। আপনিই আমাকে কমা করবেন যে আপনারদের
এ আতর্ষ সঙ্গীত সবকিছু কিছু না জেনে চলতি মতামতকেই গ্রামাণ্য
ক'রে বা তা বলেছি।

পল্লব হুহুহু প্রেরণ হ'রে ঈষৎ লজ্জিত ভবিত বলল : সে কি
কথা ? আমিও কি কম বা তা বলেছি না কি ? তাই আপনারাও
কিছু মনে করবেন না, সিজোরে।

সিজোর বিয়াকি বললেন : No, niente signore।
কেবল একটা কথা বলব কি ? যদি বিশ্বাস করেন অবজ্ঞা—

এলিওনোরা মাথা দিয়ে বলে : না করবেন না বিশ্বাস। তুমি
ধামো। বার বার বলি যেখানে সেখানে হুমধাম ক'রে কথা বোলা
না—

পল্লব বলে : না না, সে কি কথা ? আপনি বলুন—ব'লে
হুকুমকে দেখিয়ে : আমার এই অতি বিজ্ঞ বহুটিকে যদি জিজ্ঞাসা
করেন তা হলে খবর পাবেন যে বিশ্বাস না করা আমার স্বভাব
নয়—বরং উল্টো। অস্তর ও ত আমাকে উঠতে বসতে ধমকায়
যে, আমি এখনো সাবালকই হইনি—তাই এক কথার সবাইকেই
বিশ্বাস করে ছা পাই—taking them at their face-value.

এলিওনোরা বলে : আপনি ওর কথা পোনেন কেন ? নিজের

বভাবেই চলবেন। যা ধান তাতে কী? তাছাড়া—বলে একটু খেসে: বিশ্বাস না করে ঠাকার চেয়ে বিশ্বাস কর্তৃত্বকা টের বেশি ভালো।

হুহু আত্মি প্রথম অভিধান করে বলে: একজন জানী বলেছিলেন, হারিয়ে হার: Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pluerer ১০. হুহুকে আমি কান্দ কান্দ, আপনি বলুন সিন্ডারে, আপনার অবিখ্যাত কথা আজ আমিও বিশ্বাস করব, কথা দিচ্ছি।

সিন্ডার বিয়াকি হাসলেন না, পল্লবকে বললেন: কথাটা এই যে, আপনাকে কয়েকটি প্রেট ইতালিয়ান আমি শেখাতে চাই নিজেরি পরজ—আর কেন পরজ তনবেন? কারণ এরকম আশ্চর্য কথ আমি ইতালিতেও বেশি শুনি। তাই তনতে চাই ভালো ইতালিয়ান পান আপনার কথের রকম শোনার।

হুহু এলিগনোরাকে টেনে ধরে ঝাঁড় করিয়ে বলে: বলা হিপ হিপ,—

এলিগনোরা জর্সনার মূরে বলে: শ—শ। How vulgar এ সময়ে শুধু চাই শান্তি পাঠ—মহাকবি দান্তের 'E la sua volontate è nostra pace. ১১

আট

সিন্ডা প্রস্থান করতেই এলিগনোরা পল্লবকে বলে: শুধুন, আপনার কথ তনে কী যে বলব ভেবে পাচ্ছি না।

হুহু হেসে বলে: ওকে কেন এসব বলছ? ও হয়ত কের বিশ্বাস ক'রে বসবে।

এলিগনোরা বলল: তুমি ধামো: ব'লেই পল্লবকে: আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল বলবো?

কী?

সালভিনির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেওয়া। এরকম কথ ভাঁকে না শোনালেই নয়।

পল্লব সতরে বলে: না না, তিনি ইতালির প্রেট পারক—তার হায়েল আমি গাইব কি? পাগল।

এলিগনোরা কবাসি কৈতার কম্প্রিসেন্ট দেয়: পাগল করবার মতনই কথ আপনার—ব'লে হেসে—কিন্তু ভয় নেই—সালভিনি কুমারী—মন—ওক্কা, তার উপরে বৃদ্ধ—তিনি টাল সাইলাতে পারবেন।

পল্লব-মুঠে বলে: কী যে বলেন—

এলিগনোরা হেসে বলল: আমার বলা সহজ—কারণ হুহুকে তো কান্দ ক'রে দিয়েছে যে আমার বস বিপদের কোঠা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ঠাটা না। আপনাকে বলছি আমি—তিনি অস্তত: খুশি হবেন এমন অপরূপ কথ তনে। তাঁর গানও আপনাকে শোনাতো চাই।

পল্লব বলল: আমি শুনেছি তাঁর গান।

কোথার?

বাগিনে।

এলিগনোরার হুহু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে: বটে। কেমন লাগল তাঁর কথ?

পল্লব বলল: অপূর্ণ। যেমন উদাত্ত ভেমনি মধুর। হুহুকে এ পর্যন্ত অমন কথ আমি শুনি।

এলিগনোরা সগর্বে বলল: গলায় ইতালিয়ানদের কাছ কে? আর ভাবুন—এখনো ওই গলা—বাট বৎসর বয়সে। হু-হা-হা-হা লোক তনতে পার।

পল্লব বলল: তা সত্যি। আর কথবয়ের এই বোল, আগুয়াল বার করবার কৌশলটাই আমি ভালো ক'রে শিখতে চাই এদেশে।

তাই তো আরো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াই চাই।

কিন্তু সালভিনি তখন হুহুকে কড়াট-টুরে ডামামাণ। তাই অনেক আলোচনার পরে স্থির হল যে তিনি তাঁর ভ্রমণান্তে যোমে ফিরলেই পল্লব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে এলিগনোরার সঙ্গে।

পল্লবের বিদায় নেবার সময় হ'ল। এলিগনোরা ওকে মোটে তুলে দেবার সময়ে হাসিমুখে বলল: এখন থেকে কিন্তু এখানে মাঝে মাঝে আসতেই হবে। একদিন গান শুনিতেই পালানো চলবে না।

পল্লব খুশি হ'য়ে বলে: এ তো আমার সৌভাগ্য, সিন্ডা—কেয়? তোমাকে পল ব'লে ডাকব আর তুমি আমাকে ডাকবে এলিগনোরা, আর তুল হবে না তো?

না, প্রাংসিয়ে—এলিগনোরা।

এলিগনোরা হাততালি দিয়ে বলে: পাশ।

হুহুকে বলে: এলিগনোরা! তোমার তো আজ সাধারণ সূচী—আমি এই হুহুকে পলের সঙ্গে একটা থিয়েটার দেখে আসি?

কী?

পিরামেন্টোর Sei Personaggi in Cerca d'Autore. ১২

এলিগনোরা পল্লবকে হেসে বলে: হাসতে যদি ভালোবাসো তবে এনাটিকাটি দেখলে খুশি হবেই হবে—আমার আজ সূচী না থাকলে আমিও যেতাম।

হুহুকে বলল হেসে: এখন তো পল তোমার হুঠোর মধ্যে—ওকে নিয়ে বেগ কাপ্তিতে—ওর মন ধারাপ—ঐ যা: তুলে, ব'লেই এলিগনোরার দিকে চেয়ে চোখ মিমিট-মিট ক'রে: মন ধারাপ হলেও দান্তের মতন অবস্থা ওর এখনো হয় নি, তাই বলা না ওকে, লক্ষ্মীটি: 'Tu mi Segui ed io Saro tua guida.' ১৩

[ক্রমশ:]

১০। আমি সব তাতেই হাসি এই ভরে—নৈলে পাছে সব তাতেই কান্দতে হবে।

১১। তাঁর (ভগবানের) ইচ্ছাই আমাদের শক্তির একমাত্র আশ্রয়।

১২। হুটি মধুর প্রকারের খোঁজে।

১৩। এসো আমার সঙ্গে, আমি হব তোমার বিশ্বাসী।



স্পেন্সার স্মৃতি দস্ত

তাই হির হল অবশেষে। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে, বর্তমান জীবনকে ইতিহাসের একটা অধ্যায় করে, নতুন অধ্যায়ের পোড়পত্তন। একশ' সাতবটি টাকা পঁচাত্তর নয়। পয়সা। সওয়াগরী অফিস পুরো একশ' আটবটি দেবে না। কি সরকার এমন কাজে ?

ভাগ্য মেরেছে অশান্তকে। চোখের পাওয়ার—মাইনাস আট। কমপিটিভ পরীক্ষায়ও সুরিষে হবে না। বৈদ্যনন্দন স্ট্রীটে বীয়েশ বাবুর মেসের বোর্ডার হয়ে সে সায়াজীবন কাটাতে পারবে না। না হর ভগবানে মেরেছে—তবু এই তিনশ' ফুড়ির বেড়ালালে ও নিজেকে বেঁচে রাখতে পারবে না। এ জীবন ওর নয়—ওর নয়। তিনতলার ঘরের হু' নব্ব' ঘর। তার দক্ষিণ দিকের বেড়াটা ওর। ঘরের আর ছতন বোর্ডার কেন জানি না ওকে 'খাতির' করে দক্ষিণ দিকের বেড়াটা ছেড়ে দিয়েছে। তবু সন্ধ্যার সময় অশান্ত পশ্চিম দিকের জানলার সামনে এসে ঝাঁড়াবে। নীল আকাশ, ধূসর পৃথিবী। কোলকাতার আকাশে পানকোড়িয়ার সার দিয়ে উড়ে চলে যায় অনেক চুরি। কোথায় যায় ওরা পশ্চিম-আকাশে ? অনেক চুরি ? অনেক চুরি।

পশ্চিম দিকের বেড়াটা অসিত রয়েছে। সে কি করে কোথায় থাকে অশান্ত বোঝ নেয় না, তবে জানা আছে যে সে দশটা-পাঁচটার কেবাবী নয়। অস্ত বেড়ে থাকে অতুল নিয়োগী, সে ভেবেছিল অশান্ত বুঝি মেরে দেখে, পশ্চিমের জানলার একদিন খুব বাড়িয়ে দেখে সারি সারি বস্তীর চালা আর প্যারাঙ্ক। কি দেখে অশান্ত ?

এই পশ্চিম দিকের অনেক চুরি এক বীপ আছে, সে বীপ লং-শাফটিনির বাতাসে মদুর নয়, সন্ধ্যা সেখানে অসংখ্য তারার আলোর উজ্জ্বলিত নয়। সেই বীপের বলরে জাহাজ আসে পণ্য নিয়ে, আর আশা নিয়ে সেই বলরের দ্বন্দ্ব দেখে অশান্ত, কোন বলর ? টিলবারী না-গোলস্পটিন ? ও ঠিক জানে না। ওর পরিচিত কয়েকজন এসেছে নীল রংয়ের air letter এসেছে ওর নামে একাধিক বার। তবে তাদের কেউ নেমেছে টিলবারীতে, কেউ গোলস্পটিনে। মেসের ঠাকুর তখন ওকে প্রেরণ করেছে বাবু বুঝি বিস্মত বাবেন ? আপনায় দেখি রাষ্ট্রীয় হাণ্ডমারা নীল কাপড়ে চিঠি আসে। অশান্ত জবাব দেয় না, অতুল নিয়োগী একদিন

কলতলার পাতন করতে করতে আলোচনা করছিল ওর বিলিভী চিঠির কথা। অশান্ত কিছুই বলে না এদের। ওর আরোজন যদি মিথ্যে হয় ? তবু আরোজন সে এগিয়ে এনেছে অনেকখানিই।

তোমাকে তাহলে একটা কাজ বোগাড় করতে হবে—সন্ধ্যা বলে, নয়তো চলবে কি করে ? তোমার বাবা যদি হঠাৎ সবকারী কাজটা না ছেড়ে দিতেন তাহলে হয়তো কিছু টাকার আশা থাকতো।

না, বাবার কাছে কিছু আশা নেই। বাবার নিজের সঞ্চয় আছে কি না তা-ও জানি না। বাবার মনে বৈরেশ্বরীর রং লেগেছে, আর তা অনেক দিন। মা বাবার পরেই, আমার নিজের সঞ্চয়ের ওপর ভরসা করতে পারি না। যদি বাই তো কাজ বোগাড় করতেই হবে। না গেলে কি হবে অশান্ত ? বিদেশ-বিহীন ? সেখানে তো কেউ চেনা নেই ?

জানি না সন্ধ্যা—তবু আমাকে যেতেই হবে। কাজ কি বোগাড় হবে না ? কত ছাত্র তো সেখানে কাজ করে পড়াভরসা করছে। আমার বোগাতা বেশী না হলও কেমিস্ট্রিতে অনার্স ডিগ্রী তো আছে ? আমারও কি কাজ হবে না ?

আচ্ছা অশান্ত, তুমি যদি বাও তবে হবে কিভাবে ? ক'বছরের জন্ম বাচ্ছ ?

জানি না তো। তিন বছর চার বছর—হয়তো অনেক বছর। অনেক বছর না ? তারপর এই অনেক বছর পরে ঘরে—তোমার আমার আবার দেখা হবে তখন ?

তখন কি ? অশান্ত বলে। তখন সেই ভূমি আর এই ভূমি কি এক থাকবে ? যে পাখে পাখ চলা হয় না—বাসের অংকুর জন্মায় সেখানে, পথের বেধা মুছে যায়, একদিন সূর্যও নিবে বাবে।

বাবে বোধ হয় সন্ধ্যা, তবুও। আচ্ছা অশান্ত, তোমার চোখের পাওয়ার কত ? মাইনাস আট, তাই না ?

হ্যাঁ মাইনাস আট। জান অশান্ত, তোমার চোখের চশমা খুলে নিলে তোমাকে আমার কেমন লাগে ?

কেমন লাগে কি করে বলব, আমি তো কিছুই দেখি না।

আমি দেখি তুমি বক অসহায়, তোমাকে কেউ দেখায় নেই। আমারও লাইস নেই তবু যদি পারতাম।

অশান্ত হুণ করে থাকে, সন্ধ্যা ওর হরিভা নর্য বান্ধবী। লক্ষ্যকে ভাব ভালো লাগে, সন্ধ্যার সঙ্গ সে চার হরতো কিছুকণ বা কিছুদিন, কিন্তু সারাক্ষরনের কথা ও আজও ঠেঁবে দেখেনি। অশান্তের নীরবতা অনেক কথাই বলে। তাই সন্ধ্যা খুব সন্তপণে একটা দীর্ঘবাস ফেলে। অশান্তকে সে ভালবাসে, অশান্ত তাকে ভালবাসে কি না সে জানে না। বোধ হয় না। তবু সে আশা রাখে, আর অশান্ত যদি চলে যায়—তাহলে ওর কোন আশাই থাকে না, সাতাশ বছর বয়স ওর, স্বপ্নের আবরণ তাকিয়ে এসেছে বকুলতলা ছুলে এগারটা-পাঁচটা চাকরী করে, ভালবাসা তার প্রয়োজন—তার জীবনে অপূর্ণতার সমাপ্তি আনবে অশান্তের ভালবাসা—এ তার স্বপ্ন, চুপচাপ ঘরভাষী অশান্ত ওর কাছে এসে মত কথা বলে। একদিন হরতো ও সেই কথাই বলবে বার জন্ত সন্ধ্যা বসে আছে, কবে তুমি বলবে সে কথা অশান্ত ?

অশান্তও বোকে। সাতাশ বছর বয়স তার। ওর মাকে বলে সে ছুলে গেছে অনেক দিন, মা গেছে অনেক দিন—তখন ওর পনের বছর বয়স। মার অনেক ইচ্ছা ছিল—অনেক সাধ ছিল অপূর্ণ—তাই অশান্তের পৃথিবীও অপূর্ণ হইল। কলেজে পড়তে আসার সঙ্গে মেসজীবন শুরু—মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে। তাতে প্রব নেই, আছে সোয়ারকির ফির আসা লাইনে বারে বারে আবৃত্তি, গতি আছে—হুণ নেই। এ জীবনে অভ্যস্ত হতে দেখা হোল না। আবার বৈচিত্র্য আনলো সন্ধ্যার সঙ্গ। আজ সে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিজেকে লোহী মনে করতে লাগলো। এই যে অক্তি-সাধারণ ভায়লা রং-এর মেরে এর সঙ্গে ওর প্রতিটি শনিবার নিয়ম করে দেখা করার নিশ্চয় কোনও মানে আছে—অন্ততঃ সন্ধ্যার মা-বাবার কাছে। আইবুড়ে ছেলেটি প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে তাঁদের বাড়ীতে চায়ের আসরে হাজিরা দেয়—ছেলেটি পাত্র হিসাবে সুশ্রদ্ধি, তার ওপর স্বকৃতি, মেরের বয়স বাঙালী ঘরের হিসাবে কম নয়—আর মেরে স্বরূপাও নয়, অন্তএব বোস-দম্পতির অল্পমোদন অতি বাড়াবিক, অশান্ত এ সুযোগ নিয়েছে—কিন্তু তার অপব্যবহার করেনি। সন্ধ্যাকে ও আজ আবার বুঝতে চায়। কিন্তু সন্তে বোরার আর কি আছে ? সন্ধ্যার সে অবলম্বন ছিল—সন্ধ্যার সে ভবিষ্যৎ ছিল—সন্ধ্যার সে স্বপ্ন।

অনেককণ ওর বসে থাকে—অশান্ত ভরসা পায় না কিছু বলার। দিনের আসে। স্নান হয়ে আসে। সন্ধ্যার শীথ বাজে আশে-পাশের বাড়ীতে। শনিবারের বিকেল ফুরিয়ে যায়, একটু পরে সন্ধ্যা বলে—আজকে আসি।

বীবে বীবে অশান্ত এগার, বাইটাল বিলভি-এর হাংগামা,—বিরাট হাংগামা। প্রথম যেদিন ও পাসপোর্টের বর নিয়ে আসে তা ওর মনে আছে। কি এক বিরাট উত্তেজনা, বিলাত-বাজার প্রথম আরোজন। ওর মাথা থেকে পা অবধি বিদ্যুৎ-নিহরণ খেলে, না ওর মন তেজেছে। আরোজন শুরু হয়েছে। বতদিন না পাসপোর্টের স্বামেলা শেষ হয়েছে ততদিন ওর বড় অস্বস্তি গেছে, ইনকোয়ারী হবে পুলিশ থেকে, লোক আসবে ওর বোজখবর নিতে। তখন তো মেসে জানাজানিই হবে, উপায় কি ? জানাতেই হবে।

আপনার বোঝে পুলিশ-অফিস থেকে একজন এসেছিল। জবুল নিরোয়ী গুকে বলে, কি ব্যাপার—বসন্তী করছেন নাকি ?

ভারপর হেসে বলে, না ভাও বা কি করে হয়, দেশ তো এখন বাবীন। তাহলে কি নোট-জাল-টাল করছেন ?

আপনারে মত ক্রমেট বার, তার কি তাই করা উচিত নয় ? অশান্ত আহত-স্বরে বলে।

চটেন কেন মশাই ? বসিকটাও বোঝেন না ? আপনাকে বোকা সত্তা করিন, মাগ চাইছি। বলুন—কবে বিলতে বাচ্ছেন ?

একটা কথার যেন ভেলকি খেলে। মুহূর্তে অশান্ত সম্পূর্ণ বদলে যায়। ওর মায়ের কথা মনে পড়ে—মাগ মনে রাখিস নে ছোটখোকা, কেউ যদি মাগ চায় তো সব ভুলে বাস। অশান্ত নিজেকে সামলে নেয়। সহজ হয়ে আসে ওর ব্যবহার।

চেষ্টা করছি অতুল বাবু, তবে জানেন তো—বাওয়া বড় কটন, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে, তবে যদি সম্ভব হয়, ভাল কথা, আমার সন্ধ্যাকে কখন লোক এসেছিল পুলিশ-অফিস থেকে ? আবার কবে আসবে—কিছু বলে গেছে ?

হ্যাঁ, লোক এসেছিল কাল সকালে। আবার আসবে দাড় রাখে; আপনাকে জানাতে বলেছে।

শেষ হোল একর পর এক ভট খোলা, সবচেয়ে বড় হাংগামা পাসপোর্ট পাওয়া, তা যেদিন চুকলো সেদিন অশান্তের যেন রাহ-মুক্তি হোল।

কবে বিলতে বাচ্ছেন ? গলির মোড়ের ঠেশনারী দোকানের জগদীশ বাবু জিগেস করে, ছাপোরা জগদীশ সরকার—বাড়ীর সামনের ঘরে ঠেশনারী দোকান, অশান্ত ওর কাছে হাড়ি কামাবার ব্রেন্ড, সাবান-টাবান কেনে, একবার সে সন্ধ্যার প্রসাধনের কি যেন গুগুন্দি এসেছিলও কিনেছিল, কেন জানে না; তবে তা আর সন্ধ্যাকে দেওয়া হয়নি, ওর হাতবাজেই আছে, বিলত বাবার আগে সন্ধ্যাকে তা দিয়ে রাখে—মনে মনে ঠিক করে রেখেছে অশান্ত।

এখনি তারিখ ঠিক হয়নি জগদীশ বাবু। এই পাসপোর্টের হাংগামা সব চুকছে—এখন প্যাসেজের ব্যবস্থা করতে হবে।

বান মশাই চলে, এলেম থাকলে কিস্তি হবে না, আপনাদের মত ইয়ং-মানরা যদি ঘুরে এসে কিছু করে।

অশান্ত বিশেষ কিছু বলে না, শুণু একটু হাসে। কি-ই বা বলার আছে।

কদিন থাকবেন বিলতে ? আবার প্রশ্ন হয়।

বছর তিনেক—অশান্ত বলে।

তা একা কিরবেন তো, না হে—জগদীশ সরকার দত্তপাটি বিকশিত করে ভারপর আবার বলে না না, তাই বা কেমন করে হয় ? আপনার তো ঐ বকুলতলা ছুলের দিমিহিটি বার জন্ত আপনি আমার দোকান থেকে সুরতি পুশমার এসেলে কিনলেন। তা যে-খা করেই যাবেন তো ?

কে বলেছে আপনাকে এসব কথা ?—আশান্তের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

হেঁ হেঁ হেঁ—জগদীশ সরকার আবার কান-সকড়ি হাসি হাসে। আশান্তেরও তো বয়সকাল ছিল অশান্ত বাবু। মেসবাড়ীতে আপনার অল্পবয়সের সময় ওনার বাতাবাতের কথা কে জানে না ? আর আমার ছোট ঘরে টিরা তো ঐ ছুলেই, সেই তো বলে বাবা, সন্ধ্যাদিনিকে দেখলুম বীবেল বাবু মেসবাড়ীতে। এবারে যদি

যেসে ঘেরেছেদেরা থাকবে? তা এ আর এমন কি ব্যাপার যে এই নিয়ে আপনি হাণ্ডাধি কয়েছেন?

না ওরকম আর কি? তবে আপনারা বোধ হয় ওরকম হলে খুবী হতেন—অশান্ত দোকানে আর ঝাড়ার না। হ' বাস আগে ও নৈহাটিতে গিয়েছিল এক বন্ধু বিয়েতে। সেখান থেকে ফেরার পরে ওর পেশটিক ফিটার হয়, আর তখন সন্ধ্যা আসে ওক বেধতে। সন্ধ্যার সেদিন আগাটা ও খুব অহুসোহন করেনি। যেস-বাড়ীতে অনাঙ্গীর পুত্র বন্ধুকে কোনও তরুণীর দেখতে আগার একাধিক বান্দে—নেই। সেই শনিবারের বৈঠকে অশান্ত হাজির হয়নি বলে সন্ধ্যা তার পরের দিনই এসেছিল ওর ঘোঁড়ে।

রবিবারের বিকেল সেদিন, সদর দরজা খোলা থাকা সম্বন্ধে সন্ধ্যা কড়া নাড়, যেসের ঠাকুর রায়ারদের আর ঢাকর ঐহিরি বিমোহিত। একটু অবাক হয়ে ঐহিরি এগোয়, বৈশীন্দন ট্রীটের বীরেশ বাবুর যেসে সুবেশা তরুণী? নিচুদই ফুল হয়েছে অস্ত বাড়ীর।

ক'কে চাই আপনারা? ঐহিরি প্রশ্ন করে।

এটা কি বীরেশ বাবুর যেস? এখানে অশান্ত দ্বিত থাকেন?

হ্যাঁ এখানে অশান্ত বাবু থাকেন তিনতলার হ' নম্বর ঘরে। কিন্তু বাবু তো ঘরে বেহ'শ, অতুল বাবু গেছেন তাকার ডাকতে, আপনি?

কোন রকম উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা ওপরে আসে। হেলোটীর অর তাই সে হাজির হয়নি।

এই অশান্তর ঘর। তিন দিকে তিন চৌকী পাতা, দড়ির আলনার হুঁচি পাভারী এলোমেলা, কয়েকটা বাস্ক-তোরগ ইতস্ততঃ হতান এক কোণে ভূশাকার বই আর খবরের কাগজ। তিনে গায়রা পড়ে আছে আর এক কোণে, চৌকীতে অশান্ত ওয়ে, বোধ হয় বেহ'শ।

হাত দিয়ে সন্ধ্যা ওর কপালের ভাঁপ দেখে, গা ঘরে পুড়ে বাজে। কোনদিন অশান্তর ও কপাল হৌয়নি। এই প্রথম হৌওয়া তার কপাল, আলগোছে সন্ধ্যা ওর মুখে গালে হাত দেয়, হুঁহের একপাশ একটু কোলা কেন ও বোকে না। হু চোখ জরে সন্ধ্যা অশান্তকে দেখে, এমন করে ও কখনও অশান্তকে দেখেনি। একবার ইচ্ছে হয়েছিল অশান্তর কটো চাইতে, কিন্তু কাজলপনারও সীমা আছে, তাই আর চাওয়া হয়নি, হু চোখ সন্ধ্যার জলে কাপসা হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় অশান্তর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকে। উপায় নেই তার, হার অহুই। হাকে সে ভালবাসে তাকে দেখা করবারও ওই অধিকার নেই? চোখ মুছে সন্ধ্যা আবার দেখে। বকুলভদ্রা ফুলের অঁকের টাঁচার সন্ধ্যা বোস, যে হোম-টাসক না আনলে কোন ছাত্রীকে কমা করে না, আজ তার হু চোখ ভরে জগতের কাছে মার্জনা-ভিক্ষা। যদি সে হ'নও অশান্তর মাথা ওর কোলে রাখে—ওকে কি পৃথিবী কমা করবে না?

একটু পরে অতুল নিজেসরী সপে ডাকার আসে। সেপটিক ফিটার। পলার গ্র্যাণ্ডে আর ঝাঁতে সেকোমিত বোগ, সন্ধ্যাকে দীর্ঘ-বিষয়ে দেখে। যেসবাড়ীতে অবিবাহিতা তরুণী। বন্ধুহিতে যেসের ছাত্র। সেই দিন অশান্ত হাসপাতালে বাবার পবে জমসা বলে হুহুপের। কে এই ঘেরটে? আর সন্ধ্যাওন কয়েছিল অশান্ত সরকারের অকালপক ঘেরে টিমা। হুই আর হুইএ

তার হৌল। এই সব ছেলে মশায়, বিবাস হয় না এমন ভালবাসারের মত বেধতে, বিন-বীও জল। অশান্তকে অবত এ নিয়ে অশিত-হার প্রশ্ন করেনি, সে সাথে পাঁচে থাকে না। অন্তের জন্ত তার মাথা বাধা নেই। অতুল নিজেসরী একদিন টিল কেসেছিলেন, আপনারা ভাগ্যবান অশান্ত বাবু, সেপটিক ফিটারেই বাধবী ছুটে আসে, আর আমাদের ঘরে দৌটিশ দিলেও কেউ আসবে না। নিজের স্বভাব অহুয়ারী অশান্ত চুপ করে থাকে।

আজ অশান্ত সরকারের কথা শুনে অশান্ত সন্ধ্যার কথা আবার ভাবে। কবে-কথায় কথায় ও বলেছিল বৈশীন্দন ট্রীটে বীকেল বাবুর যেসে বিখ্যাত। এর নম্বরের দরকার করে না। একটা শনিবার ওর সন্ধ্যাদের বাড়ীর অহুপস্থিতিকে তাকে এত উতলা করেহে যে সে তার পরের দিনই হাজির হয়েহে বীরেশ বাবুর যেসে। সন্ধ্যা কি ওকে ভালবাসে? কিন্তু ওর তো কিছু করার নেই? ভালবাসার জন্ত সময় দরকার, অবসর দরকার, অশান্তর অবসর নেই অনেক ডাড়া, তাছাড়া অনিশ্চিতের পথে ওর বাত্মা। এ বিলাস ওর সাজে না। হয়তো একদিন ওর অবসর আসবে, এ বিলাস সেদিনের জন্ত থাক।

সেজমাসীর বাড়ী বেতে হবে। ছোট বোন লীলা ওকে বড় ভালবাসে। অশান্তর নিজের বোন নেই। লীলা সহোদারর মত। আর ক'দিন পবে তো ও চলে যাবে। 'কারগো' হাফবে বাবুয়া হয়ে গেছে ভিজপাটের থেকে ছাড়বে জুলাই মাসের শেষে। এখন যে মাসের শেষ। বোনটার জন্ত একটা কিছু কিনতে হবে বাবার আসে। কবে কিরবে তার স্থির নেই, হয়তো ততদিনে ও স্বতরবাড়ী চলে যাবে, কি বিনবে অশান্ত? সন্ধ্যার জন্ত আবার কিছু কিনতে হয়, ওকেও দেবে একটা অভিজান—শ্রুতেনীরর, কিছু টাকা খরচ হবে, তা হোক।

আপার সাতু'লার বেতে বাবার বাসে অশান্ত চেপে বসে, সেজ মাসীর বাড়ী বাবার পথে নেমে লীলার জন্ত এক ত'ড় দই আর বাবু নিয়ে বাবে, বেচারী দ্বিষ্ট খেতে বড় ভালবাসে, গত বছরের কথা অশান্তর মনে আছে—পুজোর বোনাস পেরে সেজমাসীর বাড়ীতে গিয়েছিল লীলার জন্ত একবার কড়াপাক সলেশ নিয়ে, যবিরায়ে হুপু—লীলা তখন ঘুমিয়ে ছিল যেহেতে মাহুর পেতে। অশান্ত চুপি চুপি ওর এক পাশে বাস্তা বসিয়ে লিখে রেখেছিল—সাতু'লার জন্তে, ঘুম ভেতে উঠে ওর আনন্দ ভোলায় মর।

বাসে লোকে ওঠা-মাথা ক'রতে বড় সময় নিচ্ছে, অশান্ত বাবে বাবে বড়ি দেখে। পোনে তিনটে, সেজম-হুপু।

দেখাশোমার পালা পড়েহে। আর নেহের খাবার পালা। যে মাস শেষ, জুনও শেষ হ'তে চলেহে, ওর 'কারগো' হাফবে জুলাই-এর মাঝামাঝি, সন্ধ্যাদের বাড়ীতে প্রতি শনিবার হাজিরা দেওয়া বড় হয়েহে অনেকদিন, সময় কখন, অকিস করার পর কত কাজ। কেনা-কাটা আছে—হজীর বাড়ী বাওরা আছে, তারপর বড় টুকিটাকী হাংগাম।

আর আছে কোটালপুকুরে বাওরা বেধানে ওর বড় মাসীয়া আছেন। বড় মাসীয়া আঠার বছর বয়সে থিখা হয়েছেন নিলজান, এখন তাঁর বয়ল প'রাইটি হেব'টি। একরাপ মজিকার মত মায়া

ধবাবে রক্ত, ভাই তাঁর নাম সালা-মাহীরা, কোটালপুকুরের ঠেঁপন কি এখন তৈরী আছে? সেত পেরিয়ে একটু দূরে টিনের ঢালার এনে পাঁচা করে খড় জমান। অশান্ত প্রথম বে বাবু মাহার বাড়ী বাবু এই বাড়ীর পাঁচার সামনে পাড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিজেছিল—নতুন খড়ের গন্ধ। কেমন কেমন বেন? ওর বেশ লাগছিল। বা ওর এগিয়ে গেছে বড়বার সঙ্গে, বাবা আসতেন না কখনও কোটালপুকুরে, অশান্ত পেছিয়ে পড়েছে, ঠেঁপনের পানি-পাড়ে অবাক হয়ে দেখছিল একটা ঘেসে খড়ের পাঁচার সামনে পাড়িয়ে বেন কি করছে, একটু পরে যা আবিষ্কার করলেন হোট খোকা আসেনি। মার ভাকে অশান্ত এসে নতুন বাবের গন্ধ পায়ে মেখে, সালা-মাহীরা বেন বিজয়ী হা। এতো রেহ ও কৈন দিন তুলবে না। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে বিসেক বাবার আগে, আর একবার ওরা সাহেবগঞ্জ বাচ্ছিল লুপ-লাইনে। তারো বাড়ির ঠেঁপনে কে বেন নীল আলো উঠিয়ে বসছিল কোটা-লুপ-কু-ব। সেই ভাকে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এখানে নামবে না হা সালা-মাহীয়ার বাড়িতে? ও থাকে বসেছিল, না হোট খোকা তোমার বাবা বাচ্ছন সাহেবগঞ্জে, এবারে নামা হবে না, জানলার ধূধ বাড়িয়ে অশান্ত দেখে তারের আলো বেন হালাওড়ি দিয়ে আসছে সালাগাছের মাথার ওপরে। সেই টিনের সেত খালি পড়ে আছে—খড় নেই। সালা-মাহীয়ার জন্ত ওর মনটা হ-হ করে উঠছিল, সে তো অনেক দিন হোল? এবারে দেখা না করলে নয়।

সন্ধ্যার মেঘজর ক'রেছে—এবারে সন্ধ্যার যা নিকে বসেছেন অনেক দিন তো লিনী বাওরা থাকে না বিলত গেলে, সামনের শনিবার মাহীয়ার হাতে ছুটি বোল-ভাত খেয়ে বেও। সামনের শনিবার মানে ছুন মাসের উনত্রিশ তারিখ, আজ বাইশে, ওরা সকাল সকালই বসেছে, জাহাজ তো জুলাই-এ।

বোল-গিরী ঠিক জানেন না কতদূর কি ব্যাপার, মেরেকে জিগ্যাস করতেও বাধ-বাধ ঠেকে, একবার ঠায়ে-ঠায়ে মেরেকে বসেছিলেন যে কর্তাকে দিয়ে কথা তুলবেন কি না। কিন্তু মেরে তাতে এত রান করে যে তিনি আর কিছু বলার সাহস পান নি, কে জানে। আজমালকার ঘেসে-মেরে। কি যে ভাল কি যে মল কিছুই বোকা ধার না—তারি ওপর মেরে বাবীরা—নিজের ভাতে আছে। মাস সেসে মসারে পরিত্রাটি টাকা ধরে দেয়, কর্তা প্রথমে বোঝতর আপত্তি করেছিলেন, পরে-তা টেকেনি, তাঁরই বা এমন কি আর? সত্যিয়ার পক্ষিসের কেরাখী, প্রথম দুই মেরের বিয়ের মেনা এখানে শোব চুপনি। জামাই ছুটি মেরের চাকুরে, কোলকাভার বাইরে থাকে, সে মেরে ঝুঁটি হং আর একটু কম। ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার হং প্রায় বাপেরই মত। যদি মেরেটোর একটা হিরে হয়—কর্তা-গিরী ভাবেন, অশান্ত তো পাঁচ হিসাবে সুশাঙ্কই।

মারা দিন ধরে মাহার আয়োজন চল বোলমাহীতে, বোল-গিরী অবাক বসেছিলেন—বোল-ভাত, কিন্তু আয়োজন হোল বোলমাই খানদারী ব্যাপার। অশান্ত খেতে ব'সে অবাক হয়েছিল। এত কেন মাহীরা?

এ তো সামান্য বাছা—বোল-গিরী বলেন।

বাওরা শেষ হ'লে অশান্ত ভিনতলার হোট বরটার ব'সে থাকে। সন্ধ্যার বর, এই ঘরেই চান্দর আসার বসে, আজই হয়তো শেষ

দেখা তোমাদের সঙ্গে সন্ধ্যা—বিসেক বাবার আগে অশান্ত বলে। সুপাহারা না—এর শাকী পরে সন্ধ্যা একটু দূরে পাড়িয়ে থাকে। মেরে কোণে রজনীসন্ধ্যার ওচ্ছ—তার সৌরভে বাতাল জ্বর, সন্ধ্যার কপালে কুমকুমের টিপ, চুল আলগা করে বাঁধা, অশান্ত কথাটুকু বলার পর সন্ধ্যাকে দেখে, এই কি সেই সন্ধ্যা—যাকে সে প্রতি শনিবারে দেখে?

আজ কেন অশান্ত, তোমার তো জাহাজ হাফবে জুলাই-এর শেষে, এখানে তো ভিন সপ্তাহ হাতে, তোমার কি অনেক কাজ। তারিখ বললে গেছে সন্ধ্যা, ২১ তারিখের 'কারগো' হাফবে আসে দেহীতে, ৮ তারিখে একটা 'কারগো' আছে—সেটার বেতে পারি। ইতিমধ্যে টীম সীপকে লিখে নিলাম আট তারিখেই যাব। ওরা ভাতে রাখি আছে। এতে প্যাসেঞ্জার ছিল না।

সন্ধ্যার হু'চোখ জলে ভরে আসে। এ তো তার জানাই ছিল যে অশান্ত চলে যাবে—আজ না হয় কাল, তবু হিসের প্রত্যাশা 'তার? অশান্তকে কি সে বখেই জানে না? যে কথা শোনবার জন্ত সে আকুল আত্মহে প্রতিটি শনিবার বসে থাকে অশান্ত তা কোন দিনও বলবে না, অতচ আজ তার শেষ সুযোগ। আজকে স্বীকৃতি না পেলে ও কোন দিনই পাবে না। শাকীর খাঁচল হিরে সে চোখের জল মোছে।

তোমার চোখে জল কেন সন্ধ্যা?—অশান্ত প্রশ্ন করে।

তুমি কি বোকা না অশান্ত?—অশান্তর হাত ছুটো সন্ধ্যা হু'হাত দিয়ে ধরে, তারপর টেবিলে রাখা রাখে। ওর সারাটা দেহ জলে গুঠে বাঁধে বাঁধে, বেন বুখি সেও থান-থান হয়ে গেছে।

হু'হাত ভরে অশান্ত ওর বুখটা তোল, চোখের জলে কুমকুমের দেখা বুছে গেছে, বুকের খাঁচল পড়েছে বসে। অশান্ত হঠাৎ সন্ধ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে।

এ তুমি কি করলে অশান্ত?—সন্ধ্যা অসুস্থ হয়ে বলে। অশান্ত জবাব দেয় না—মানে হয় সে বুখি তুলই করেছে, কিন্তু তুল কি? কি এমন দোষ। সন্ধ্যার দিকে সে তাকায় আবার। সে চাহনি কিসের, সন্ধ্যা বোঝে না। সময় মরজার দিকে অশান্ত অগ্রসর হয়।

আর একটু বসো অশান্ত, এখানে বেশী রাত হয়নি, আর একটু বসো।

না সন্ধ্যা, আজ রাই। আবার আসবো বাবার আগে। সেদিন না হয় বসবো।

সালামাহীয়ার সঙ্গে আর দেখা করার সময় নেই, জাহাজের তারিখ এগিয়ে আসার কোটালপুকুর বাওরা হোল না। সেলে হু'দিন থাকতেই হবে, অন্ততঃ একদিন। তার আর সময় নেই।

আজ দেখা করতে হবে মাহের সঙ্গে। থাকে অশান্ত বাবা বছর আগে বেখে এসেছে কেওড়াভলার মশানে। হকিম দিকের চিতার, মার সঙ্গে দেখা করতে হবে অশান্তর। অশান ওর ভাল লাগে না—মানে হয় কেমন বেন নোয়া। লোকে বলে অশান পবিত্র, হয়তো হবে।

তবু মাহের কথা মনে বোসেই মনে হয়, হা আছে সেখানে। যেখানে ও একদিন অনেক জনের সঙ্গে থাকে দিয়ে গিয়েছিল হকিমনি মিরে। একটু আভে আভে তোমরা হকিমনি বাও ন

কেন মেজদা—ওর পাশে ওর মেজদা' বাচ্ছিলো, ও তাকে বুল।
এঁদের একটু আঙে চলতে বসো মেজদা'।

বাড়ী থেকে শশান-বাট খুব দূরে নয়, অশান্ত একটুও কীসেনি।
কেন কীভাবে সে? তার বাবার বাড়ীর অনেক পরমা, মা হাঙ্গর
হয়েছিলেন বলে, বিলাসিতার মধ্যে। বাবা বাউতুলে বৈরাগীর মত,
তাই মার কোন আশাই পূর্ণ হয়নি। মামাতো ভাইয়েরা সাহেবী
তুলে গেছে, মার ইচ্ছে ছিল ওরা বার। কিন্তু পরমা কোথায়?
আমিসিয়ার মা মারা গেলেন—অশান্তর মনে হয়, বোধ হয় তাঁর
জান চিকিৎসা হয়নি। তাই অশান্ত সেদিন একটুও কীসেনি,
বুক-কাটা কীলো ওর বড়লা, ওর চেয়ে বারো বছরের বড় সে।

চিটা মাঝাঝিলা কারা, ওর মনে পড়ে না। মার পায়ে মাথা
মেখে ও বসেছিল, আলতা-মাঙা পা। আমিসিয়ার সালা পা। চিতার
তোলার আগে সেই পায়ে চুই খেয়েছিল ও। ওকে সরিয়ে নিয়ে
হাও বান্ধা—মড়ার অত বাঁধনী ভাল নয়। কে বেন বলেছিল,
অশান্ত খুব তুলে দেখে, গেকরা-পর্য এক শশানচারিণী। মেজদা'
ওকে সরিয়ে নিল মার কাছ থেকে। ওঠ হোট খোকা, মা তো
বাড়ী গেছে।—টোটো মেজদার জেতে গেল, মুখটা অভয়িক নিয়ে
বিকৃতভাবে মেজদা' বলেছিল, তুই কি একটুও কীদবিসে হোট খোকা?

কেন কীভাবে অশান্ত? মা যে তাকে কত সাধ-আজ্ঞাদের কথা
বলেছে তা ওই জানে। মার কোন আশাই পূর্ণ হয় নি। তুই বড়
হয়ে বিলেত বাবী ছোটখোকা—দাদার ছেলেরা সাহেব-ই-তুলে বার,
আমার ছোটখোকা বিলেত বাবে, তারপর সে এখন ফিরে আসবে মত
বড় লোক হয়ে তার মার কাছে তখন? তুই কি হবি যে ছোট
খোকা?

দক্ষিণ দিকের চিতার সামনে অশান্ত দাঁড়িয়ে। বারো বছর পর
চিটা বলছে না নেবা। আকাশ ঘনবটা করে এসেছে, ঘরের দুটো
চিটা বলছে, বু বু করে। তোমার কাছে ছুটি নিকে এলুম মা,
অশান্ত অক্ষতভাবে বলে, কাল তোমার ছোট খোকা বিলেত বাবে।
তুমি বলেছিলে ছোট খোকা তুই বিলেত বাবী, দাদার ছেলেরা সাহেব
ই-তুলে বার, আমার ছোট খোকা বিলেত বাবে একদিন। বেগিন
তোমার এখানে রেখে গেছি সেদিন আমি কীদিন, কিন্তু আজ যে মা
পারছি না। হু চোখ বেয়ে নর-নর ধারে জল নেমে এসে, খুব বুক
জেমে গেল। তোমার ছোট খোকা আমার এখন কিসে আসবে তখন
কার কাছে আসবে মা?

শশানবাটে এমন করে একলা দাঁড়িয়ে চোখের জল কেলছিল
বহা। অকস্মাৎ হবে। অশান্ত বাড়ি কিরিয়ে দেখলো সেই
শশানচারিণী বাক-ও বারো বছর আগে দেখেছিল। সেকরাপর
গলায় সজাফ। আশ্চর্য। তার চেহারা একটু পরিবর্তন হয়নি।
চোখের জল বোছে অশান্ত। বাইরে বেরোয়, মজুন বাড়ী আসছে,
পরবাহীর সঙ্গে। এও-এক দুয়ো।

হাওকা ঠেলে পাড়ী ছেড়ে দেবার পরেও অশান্তর উত্তেজনা
আসে না বিলাত বাজার, খুব বেশী লোক আসেনি ওকে তুলে দিতে।
বজা আর বড় বোর্দি এসেছিলেন কোরগর থেকে, বজা সেখানেই
থাকেন। মা বাবার পরে কোলকাতার সলার খান বাস হয়ে বার।
মেজদা' বলপাইওড়ি, সে তা বাগানের চাকুরে, তার আসা হয়নি।

সেজদারীর সঙ্গে লীলা এসেছিল, এক বাজ সিহীনের কড়াপাক মনেন
নিরে। সন্ধ্যা আসেনি। তার আসার কথাও ছিলো না, অশান্ত
অবশ্য তার কথাবত আর একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু
সে বাওরার বিশেষ কোনও মানে ছিল না। সন্ধ্যার সঙ্গে একান্তে
ও দেখা করেনি। সন্ধ্যার মা, মেয়ের সঙ্গে একা থাকার সুযোগ
ওকে দিয়েছিলেন কিন্তু অশান্ত তা গ্রহণ করেনি। ও জানে সন্ধ্যাকে
ও কোন কথাই দিতে পারবে না, ওর নিজের তবির্য অনিশ্চিত,
কেন মিথ্যে আর একটা মেয়েকে এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে
জড়ান? শেষ দিনের ঘটনা যে কেন হ'য়ে গেল ও ঠিক জানে
না, অশান্ত যে তার সঙ্গে একা দেখা করতে চায় না সন্ধ্যা তা
বোঝে, তাই প্রথমে ও জান চোখে তাকিয়ে রইলো অশান্তর
দিকে, এই তার অশান্ত। বাক সে চিরদিন ভালবেসেছে এই
তার স্ত্রীর? তারপর হেসেছে মর্ম-বৈরাগী বিজ্ঞাপন হাসি।

কমমেট অসিত বার অবাক করেছিল। এসেছে হিহি
অশান্ত বাবু।

সে কী মশার, যেসে তো আমাদের ভালই। ছাড়াবেন কেন?
বার-তার সঙ্গে তো থাকা চলে না অশান্ত বাবু। কে
আসবে এ ঘরে কে জানে। তার চেয়ে কোন জায়গায় সীংগল বেতে
চলে বাব—

আর অবাক করেছে টোটকাটা অতুল নিয়োগী, এ
ক'দিন চুপচাপই ছিল, হঠাৎ হাওকা ঠেলে হাছির, হাডে
একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। বেশ কয়েক ভজন হয়ে। আপনি মশার ডাকুক
লোক, সায়েল তুল করে পড়েছেন। এই আপনার উপযোগী।
অশান্ত অভিভূত হ'য়েছিল।

কাঠ' রাসের বাড়ী, জীবনে এই প্রথম কাঠ' রাস-এ বাচ্ছে ও।
সেকেও রাসের বাথ রিজার্ভ করার সময় ছিলো না, সব রিজার্ভ হয়ে
গেছে, তাই বাধ্য হয়ে কাঠ' রাসে আসা, চিরকাল একশ' এগারো
চেড়ে অশান্ত—কথাত বেড়া। রাস বাসে ইনটায়ে। সে তো
ছেলেবেলার কথা। এতগুলো পরমা খরচ করতে হাত কয়কর
করছিল, কী আর করে? বিলেত বাচ্ছে। লীলা ওকে জড়িয়ে
থবে কীলো। আবার কবে আসবে মজুনদা'? কতদিন পূরে—

আসবে যে তাড়াতাড়িই, তাবিসনে।

পাড়ী ছাড়ার কিছু পরেও সহবাত্রী-বাজিরীসের ভাল করে গেছে।
আপার বার্থে এক ভয়লোক—বাতালীই হবে। বরস প্রায় পকান।
চুলের হু তাঘাটে, গোকের হাও তাই, সায়েলের বার্থে এ্যাংলো
ইণ্ডিয়ান-বলপতি,

'কতলু বাওরা হবে আপনার'—আপার বার্থের ভয়লোকটি
আপ্যায়িত করার চেষ্টা করেন।

ওহালটের—অশান্ত বলে।

ওহালটেরে তো আবিও বাছি। তা জেগে সুবি? বেশ তো
মাল নিজেছেন জরি ভাবি। অথচ খেঁজি দেই।

অশান্তর হাসি হোল। গারে পড়ে তার করা, আবার
অবাচিত মতামত বেওয়া। ও মতাব অনুবাহী কবাব বিলো মা।
হাটেকদের পায়ে তখনও জাহাজ কোম্পানীর সেলেন মারেনি
ও, তাই ওপরতলার বাউটী বুললো না ও বিলাতবাড়ী।
একটু মাত হলে বাউটী বোধ হয় জলযোগ করলেন কিছু তার পর

সীটে নেমে এসে ওর সীটের একপ্রান্তে বসে বোতল খুলে খী বেন খোলেন, বোধ হয় মন বেশ করে পাত্র খেয়ে একটা মোটা বর্ষা চুষ্ট ধরালেন। তার পর অশান্তকে বললেন, বসতে পারি একটু? অশান্ত তো অধিক। উল্লসকে তো ওর সীটে বসেই আছেন। আবার জিজ্ঞেস করা কেন এত পরে?

ও বললে, হাঁ নিশ্চয়ই, তা ওয়ালটেরের কোথার উঠবেন, ঠিক করেছেন কিছু? উল্লসকেটি প্রশ্ন করে,

হোটেল বোপাড়া করে নের'খন—অশান্ত বলে।

ও বললে, হোটেল 'য়েল না মশাই এখন ওয়ালটেরের। আমি অনেক বার বাতায়ত করছি—ওয়ালটেরের আমার নকলপণে। আপনি জিমি সাহেবের হোটলে চেরা করতে পারেন। আমার ব্যবস্থা করা আছে। হোটেল ভালই, চার্জ একটু বেশী হবে। উল্লসকের নেশা হয়েচে বলে মনে হয় না। তবে একটু বেচাল হয়তো হবেন। তা মশাই তখন তো বললেন না কি কাজে বাচ্ছেন? আমি? আমি রবার্ট কোম্পানীর সেল-এর লোক। হিরনারায়ণ মিত্তির। আমাকে জো হরমম তেলেরের দেশে বেতে হয়, একলা পথ—কথা দ্বা বলে দ্বন্দ্ব নেই। কই আপনার নাম তো বললেন না?

আমার নাম অশান্ত মিত্তি। অশান্ত বলে।

আরে ভায়া, আপনি মিত্তির? কোথাকার বলুন তো? বি, এন, আর-এ কত বার ওয়ালটেরের গেছি। তা এই প্রশ্ন মিত্তিরের সকে সাফাং। তা ওয়ালটেরের?

আমি তিনগাপটর থেকে বিলেত বাড়ি আট তারিখে, তাই ওয়ালটেরের বাড়ি—

আ—জ্ঞা? তাই এত ফুলের ঘটা। আমি ভাবি বরষাক্রীড়া একা বর—না কবি সখরীনা? বড় খুশী হলাম। তা যদি একটু আগে জানতাম একা ভিত্তি করতাম না। একে ডবল টি মার্কা কয়েত—আর এক ডবল টি মার্কা কয়েতের সঙ্গে দেখা, তার ওপর বিলেত বাড়ী, আপনাকে না হয় এক চুরক।

আজ্ঞে আমার ওলব চলে না—অশান্ত বলে।

বড় ভাগ ভায়া এ জিনিষ, না খেলে বোরা বার না, তবে আমার সড় দেবি, কয়েক টোক বেশী পেটে পড়লে বাজে বকি। আমি কি এখন বাজে বড়ছি? মোটেই না। বুঝলেন ভায়া—আমাদের সনের মধ্যে একটা দরজা আছে, যেটা আমার বক করে রাখি—এই কয়েক পাত্র পেটে পড়লে সে দরজা খুলে যায়—তখন বেলগাড়ী মোটর ইষ্টমার—হেলিকপটার অবধি চলে বার সে দরজা দিয়ে, এই দরজা পেরিয়ে আর একটা দরজা আছে, সে দরজা—খাক ভায়া।

রবার্ট কোম্পানী কি কোম্পানী অশান্তর জানা নেই, তবে নাম শুনে মনে হয় বিলিতি কোম্পানী। উল্লসকে নিচর মোটা মাইনে পান—নরতো কার্ট রাশে বাচ্ছেন, আবার পানসোবও আছে। ওর ঘনের ভেতরের দরজার খবর অশান্ত জানে না, তবে ওর পরিচয়ের লক্ষ বড় হয়েই ও জানে, কোথা থেকে কত কি আসছে, কত আসবে বড় উড়ে বাওয়া পাভা, কোনটা হয়তো বাগানী হয়ে খেয়ে বেদনার, কেউ বা কুকড়ে পেঁজে অকালে। আবার কোন কিনলর প্রাণাধারার উল্লে।

ওর পড়ুন ভায়া, ওপর থেকে মিত্তির মশাই বলেন, অনেক দূরে বেতে হবে। আমিও বার একদিন—অনেক দূরে। বিলেত নয়—বিলেত পেরিয়ে—জল-জ গল মাটা পেরিয়ে অনেক দূরে, অনেক-দূরে। হিরনারায়ণ মিত্তিরের বোধ হয় নেশা হয়ে আসছে, অশান্ত একটু ভয় পায়, তার পর ওর পড়ে।

ওয়ালটেরের হোটেল বোজা সত্যি কামেলা, এক রাতের তো মামলা—তাও মিললো না, জিমি সাহেবের হোটেল বিশেষ বড় নয়, সেখানে মিত্তির মশাইএর ব্যবস্থা ছিল—অশান্তর জায়গা হোল না। জিমি সাহেব কালো কুচকুচে—হাংসীও হার মান বং-এর জোয়ার, মিত্তির মশাই কিন্তু হাল ছাড়লেন না। চলুন মশাই নব্য-বঙ্গে আপনাকে নিয়ে যাই, বাঙালী যেস, হুঁজুনেই ভটা যাবে সেখানে, সাইকেল-রিজা করে দুজনে বড়না হয় নব্য-বংগ যেসে, অশান্তর মাল অনেক, মিত্তির মশাই-এর মাল নেই বলতে গেলে, সবার রাতা পেরিয়ে বিজি বাজার তার পরে সড় গলি, সাইকেল-রিজা চলে না সেখানে। মিত্তির মশাই তেলের ভায়া কি বেন বললেন—সাইকেল-রিজার চালক পাড়ী থেকে নেমে হাতে টেলে চললো। একটু এগিয়েই নব্য-বংগ-য়স।

করোমিন কাঠের ওপরে লাগা হুঁ দিয়ে লেখা, 'নব্য-বংগ-য়েস'। বাঙালীসের জত, প্রো: প্রিন্সিপালকুক সাহা, লোকলার জানলা থেকে একটা হুখ দেখা গেল, তার পর সাদর প্রাণাধার, আদর আদর মিত্তির মশাই, অনেক দিন পরে এ্যা।

ভোমার সৈনিকৃতিকে পাঠিয়ে দাও হে সাহা, ছুটো বেড চাই আজকের রত—আছে তো?

আপনার জত সঙ্গ-সর্বনা অধীনের ব্যবস্থা। দিচ্ছি আমি সৈনিকৃতিকে পাঠিয়ে, সৈনিকৃতী এলো তেলের কি, কুচকুচে কালো রত জিমি সাহেবেরই মতন, জাঁট-সাঁট চেহারা—অজ্ঞেসে মাল কুলে নিয়ে এল।

মুগসী বাড়ী, অশান্ত তো অনেক দিনই যেসে কাটিরয়ে, কোলকাতার, বীরেশ বাবুর মেস—মাহুলী। নব্য-বংগের তুলনার তাকে রাজকীর মনে হোল, অশান্তর বেড ছিল তিনতলার হকিণ খোলা জানলার সামনে, আলো-হাওয়া ছিল, এখানে বেন রাজার অককার বাসা বেঁচেছে—তার ওপরে জুলাই-এর অসম্ভ গরম। মিত্তির মশাই-এর দাক্ষিণ্যে অশান্ত হুঁ হয়েছিল, জিমি সাহেবের হোটেলএর চেয়ে লতাংগে ভাল। ওর জত উল্লসকে কই নিলেন, মিত্তির মশাই একটু পরে এসে বললেন—বান নীচে ইবারার জলে চান করে আদর, একটু আদর পাবেন।

বাড়ীর পেছনে রাজম্বর—তার সাপাও ইলারা। সারান তোয়ালে হাতে অশান্ত সানের জত আসে, কুচকুচলার আবার সৈনিকৃতীর সঙ্গে দেখা। একজন বাবুর সঙ্গে বসকরা হুঁজে তেলের ভায়া, বাবুটিও ব্রাসে এসেছেন।

আজ এসেন বুবি? ভায়া পয়—জকেই তো। কবে কবে লাগবেন? বাবুটি বললেন।

আজ্ঞে আজই সন্ধ্যার ট্রেনে এসেছি, তবে তকে তো কিং হয়নি। অশান্ত বলে।

ও হয়নি, তা ভাববেন না। সুরেশ সবকারের বেকেরওলেন

ওকে কতো স্নেহ কাক পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আপনারও হয়ে থাকে, তেলেও-পটীতে ছুশো বাতাসী আছি মশাই, কিনে নে বাতাসীকে যদি বাতাসী না করে ?

আজ্ঞে আমি কালই চলে যাব—অশান্ত কল্লোলকের কথা শেব হবার আগেই বলে।

সে কী মশাই, এই তো সবে এলেন এখন ছুঁদিন সোঁপাল বাবু মেসের ভাত খান, ওয়ালটেরের শোভা দেখুন তার পর তেলেও মেয়ে—মাইরী কাঠী রান, আপনার ইমিক-সিমিক হয়তো ?

আজ্ঞে আমার এসব miss করবার একটু ইচ্ছে নেই, ফালকের জাহাজেই আমি বিলেত বাছি। 'sorry'

বিলেত ? আরে মশার তাহলে তো কিছু দিতে হবে। থাক চান করা। দেখি মোচলমান পাড়ার দুটো আছে কিনা ?

দুপুরে বাবু তড়িৎ বেগে উঠাও হলেন, রাজে মিষ্টি হোল—সৈবিন্দ্রীর মারা দুগীর বোল তিলতেল দিয়ে মারা। অশান্তর মনে হোল—করোদিন তেলের পঞ্চ। মিষ্টির মশাই বেরিয়েছেন কোথায়, তবে আর ছুঁটার অনেক সঙ্গে আলোপ হোল—তার মধ্যে হিটেন তাহুড়ীকে ওর মনে থাকবে, অন্ন-বহনী দেলে, ভাগা-ভাগা চোখ, তাতে অনেক বধ, অশান্তর সঙ্গে কিছু রজনীগন্ধা ছিল অতুল নিয়োগীর দেওয়া, তাই দেখে ও খুব খুসী।

কতো দিন রজনীগন্ধা দেখেনি অশান্ত বাবু, আহা—কত ভাল এ ফুল।

এটা আমি বাবার আগে আপনাকে দিয়ে যাব—আর আপনাদের পাঁচলনের জন্তে এক বাস কড়াপাক সন্দেশ। আমি মিষ্টির খুব ভক্ত নই, আর এখানে তো ওটা পাওয়া যায় না—আপনারা বোধ হয়—

না না না—তা কি করে হয়, আপনার মিষ্টি—কেউ কেউ প্রতিবাদ করলেন।

নাগকে বেশ হাড়ার আগে আর দুঃখ দিও না, উনি ভালবেসে দিচ্চেন। নিয়েই নাও হে—কেউ কেউ বললেন।

পরদিন দুপুরের দিকে হিটেন হঠাৎ ওর ঘরে এলো। অশান্ত সকালবেলার ওকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ দিয়ে এসেছিল। দুপুরে তার ওকের চাকরীতে বাবার কথা, কিন্তু আজ আর সে কাজে যায় নি।

আপনার কাছে কি শুধু শুধুই রজনীগন্ধা নেব, তার বললে আপনি এই ক্যালেন্ডারটা রাখুন, এতে আমাদের দেশের ছটা বহুং হবি আছে—হুঁ বাস করে এক এক পাঠায়—ও বলে।

থাক আপনার ক্যালেন্ডার হিটেন বাবু, আমি আপনাকে রজনীগন্ধা দিলাম বলছি যে কিছু দিতে হবে তার কোনও মানে নেই, আর তা হাজা ফুল তো আমার ওকিরে এসেছে।

এটা আপনাকে নিজেই হবে, এই দেখুন, এতে আমার মাস

সিখে দিয়েছি, হয়তো তাইলে আমাকে মনে থাকবে, ক্যালেন্ডারের একটা বহু চলে গেছে—দুই, বাকি আছে আরো পাঁচ, বলত সব শেষে, বলত অনেক ভাল হুঁলুটিত হয়, অনেক মনে বাতাসী গাছে পাঁচা সজায়—আবার বলত একদিন আসবেই, সেদিন আমিও বাব আপনারা মত।

নিশ্চয় আপনার বাতাসী হবে, আমার বাতাসী খুব সোজা পথে হয়নি হিটেন বাবু। আপনি বিশ্বাস রাখুন আর ভেটা করুন।

'কারগো' জাহাজ। মাস বোঝাই হবে এ বছরে। খালি হলে অভ বছরে, যে ঘাটে থামবে সে ঘাটে সওয়া হবে, পস্যের অয়ের—অয়ের। কতো রকম সওয়া হয় খুচরো পাইকারী কত রকম দেওয়-নেওয়ার খেলা খেলে বছর, জাহাজ এসে থামলে নাবিকরা মাটি চার, মাটির বাগা চার, মাটির বাগার দ্বার চার, মাছবীর দেখে, মনে, মতে, মতের দ্বারক সে দেখে যায়—মতের দ্বারক সে নিয়েও যায়, সওয়াপার নাবিক তাই কত রকম সওয়া।

সব বামেদা শেষ হয়েছে অশান্তর, কর্তব্য-এর বেতাজাল মেলা পায়মিটার হাঙ্গামা। মাস একে একে উঠছে জাহাজে। এবারে তাইলে সে বাজে। মোতর তোলা হ'লে দেখে, জাহাজের একমাত্র প্যাসেঞ্জার বলে ওর নাম মি: প্যাসেঞ্জার।

অনেক অনেক দিন আগে একজন বধ দেখতো এক বীশের, হারান পল্লব দেবদারু পাইল নাবিকদের হিলোল সেই লেখানে—তারার আবহা। আলোর ইলারা সেই লেখানে, ভু সে বধ, হিটেন তাহুড়ী বোধ হয় আজ তার বধ দেখে, সেই বীশ তো আর বেশী হুঁরে নয় ? তবে কেন তীক্ষ্ণ করে আসছে এরা চোখের সামনে ? সন্ধ্যা বোসের মান-হুঁ আর বিজ্ঞ-মাখান হাসি, তাতে অশমার মাখান, সীলার কল-করা চোখ, অতুল নিয়োগীর হাতোজল দুখ, মিষ্টির মশাই-এর নেপার ছড়ান চাহনি—আর এ্যানিমিয়ার নাদা মার মরা দুখ।

দমকা বাতাস আসছে বঙ্গোপসাগর থেকে, হিটেন তাহুড়ীর ক্যালেন্ডারের পাঁচা উড়ে বাজে—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ; শীত হুঁজর শীত বেখানে—বেখানে অশান্ত বাজে, ওর পাশের, একটা অশান্ত ভিত্তি আর কিছু পাউণ্ড, এই নিয়ে ওকে লড়াই করতে হবে—শীতের সঙ্গে, যে শীত থাকবে, বত দিন না ওর হারা হে—একটা কাক যোগাড় হয়।

আসবে বলত, শীতের পরেই তো তার পালা, এবারও বলত জানবে—কাই-লাত আর ড্যাফোডিল, এবারও সন্ধ্যা রজনী হবে লাভ-ইন-হি-মিষ্টের স্বাভিত্তে কর্ণাওরার পাগড়ীতে, জির মোসের দাকিণ্যে আর হারানবীনের বিলাসে।

মকুন ডারহীর পাঁচা আরত করে অশান্ত, প্রথম লাইন দেখে, আজ সোমবার ৮ই জুলাই, বাতাস হুঁক হয়েছে।

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বন্ধুত্বের উল্লেখ করবেন]



[Osamu Dasa's "THE SETTING SUN"-এর অঙ্কন]

চতুর্থ অধ্যায়

প্রারম্ভ

চিঠি লেখা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। শেষ অবধি আজ সকালে সূর্যের স্তম্ভের বিচক্ষণ ও কণোত্তের স্তম্ভের নিরীহ বীভূত এই বাগী পড়ে যুকে জোর পেলাম, চিঠি লেখাই শেষ করলাম।

নাওজির বোন আমি। আমার কথা যদি তুলে গিয়ে থাকেন, তবে ধরা করে মনে করবার চেষ্টা করবেন।

নাওজির আবার বেরাড়াপা আনতে করেছে এক আপনাকে উদ্ভূত করছে একজন মুখশিল্পী। (বাস্তবিক তার ব্যাপার সেই যুগের আমার পক্ষে আশ্চর্য্যের দায় হয়ে মাথা চাইতে বাঙালি অবহীন)।

আজ নাওজির জন্ম নয়, নিজের জন্ম আপনার কাছে থেকে কিছু জিকা করব। তার মুখে শুনেছি আপনার পুরনো বাড়ী হুজুর সময় নষ্ট হয়ে গেছে বলে আপনারা নতুন ঠিকানার উঠে গেছেন। ভেবেছিলাম সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। বাড়ীটা বেশ হর চৌকির আশে-পাশে কোমলসহরতলাতে; কিন্তু সম্ভাবিত মাসের শরীর ভাল থাকে না, তাঁকে একা কেসে অভ্যস্ত হর বাঙালি চলে না, সেইজন্যই চিঠি লেখা।

আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই। আমার আলোচ্য বিষয়টি যুবকী নারীর সাধারণ শালীনতার পর্দায় তো পড়েই না, বরং উল্টে গুরুতর অপরাধ বলা যেতে পারে কি? আমি, না, আমরা আর এ অবস্থার থাকতে পারি না। সুতরাং যিনি আমার ভাই নাওজির চোখে এ ছনিয়ার শ্রেষ্ঠ মাহু, তাঁর কাছে আমার অনুরোধ, অনুরোধ করে তিনি যেন আমার অত্যন্ত সহজ অনাড়ম্বর অনুভূতির কথা অনুধাবন পূর্বক সুশ্রম দিয়ে বাবিত করেন।

আমার বর্তমান জীবন অসহ। পছন্দ অসহন্যের প্রায় নয়, আমাদের (মা, নাওজির ও আমি) এই ভাবে আর বেঁচে থাকা অসম্ভব।

গত কাল শরীরে অসহ এক বাতনা অনুভব করলাম। তার সঙ্গে জরও ছিল; নিঃশ্বাসের কষ্ট কি করি ভেবে পেলাম না, উপরে খাওয়া-দাওয়ার পর চাবী-মেয়ে ভিজতে ভিজতে এক বোকা ঢাল পিঠে নিয়ে এল। যে কাপড়গুলো তাকে দেব বলছিলাম, দিয়ে দিলাম। খাবার ঘরে আমার সামনে বসে চা খেতে খেতে সোজা হয়ে সে আমার প্রের করল—এভাবে নিজের জিনিষ বেচে আর কদিন চলেবে?

আমি তার জবাবে বললাম—হুঁ-মাস, বড় জোর বছরখানেক। তার পর তানহাতে মুখখানা আড়াল করে বললাম—মুম! মুম আমার হুঁচোখ ভেঙ্গে আসছে।

তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এ তোমার মনের অবসাদ। হয়ত তোমার কথাই ঠিক। চোখে জল আসে-আসে, এই অবস্থায় উঠে পাড়তে, হুটো কথা মনের মধ্যে গুমে উঠল—‘বাস্তব’ এবং ‘কল্পনা’। বাস্তব সবকিছু কোন ধারণাই আমার নেই। সম্ভবত এই কারণেই বেঁচে থাকার আশঙ্কায় আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মা প্রায় অধর্ম—বিছানাতে কাটে তার বেশীর ভাগ সময়।

নাওজির মানসিক অন্তরের কথা আমাদের অজানা নেই। এখানে বতর্কণ থাকে, স্থানীয় এক তাড়িপানার কাটার—আর ছাঁদিন অন্তর আমাদের কাপড়বোটা টাকার কৃতি করতে বার। কিন্তু হুঁচো আমার সেজন্য নয়। আমার ভর হর, পচা পাঁতা যেমন করে না পড়ে, অনেক সময়ে গাছেই হুঁচো থাকে—তেমনি আমিও দৈনন্দিন জীবনের এই ক্লান্তির বোকা টেনে টেনে অনন্তকাল বেঁচে থাকব। এ চিন্তা অসহ এবং এর হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়, আমি আজ যুবকী ভদ্রকন্ডার বাবতীর শালীনতা লক্ষন করতে প্রস্তুত হয়েছি। এখন আপনার উপদেশের অপেক্ষা।

এবার আমি, আমার মা এবং নাওজির কাছে সব কথা হুঁচোই বলতে চাই। কিছুকাল বাবৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খনিষ্ঠা হয়েছে। এখন থেকে আমি তাঁকেই অবলম্বন করে বাঁচতে চাই। তাঁর নামের আভ্যন্তর হুঁচি এম, সি। হুঁচো পেলেই তার কাছে হুঁচি চলে যেতে ইচ্ছা করে এক-তার প্রেমে নিজেকে বিসর্জন দিতে বাসনা জাগে।

আপনার মতই এম, সি'র স্ত্রী ও একটি কন্যা আছে। তাঁকে দেখে মনে হয় আমার চেয়ে যুবকী, বড় কনকীর সম্পর্কে তিনি এসেছেন। তবু মনে হয়, তাঁকে না পেলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আমি দেখিনি, তবে শুনেছি তিনি

এবার কেনবার সময়

শেখরা বিলাস

তৈল

পিলখার-প্রথ ক্যাপ

মুণ্ড দেখে কিতবেত

এম. এল, বঙ্গ যোগ কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-২

চমৎকারী, অসীল। তাঁর কথা চিন্তা করলেই তাঁর তুলনার নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়। আমার বর্তমান জীবন আরও ভয়াবহ। এম, সির কাছে আবেদন আমি করবই। কোন বিবেচনা আমার এ সকলে বাধা দিতে পারবে না। সপের জার বিচক্ষণ ও কপোতের জার সিরীষ আমার এ প্রেম চরিতার্থ হবেই হবে। কিন্তু একটি কথা আমি স্থির জানি যে মা বা নাওজি কেউই আমার সমর্থন করবে না। আপনার মতামত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমার নেই। মোট কথা, নিজের কর্তব্য স্থির করে সেই ভাবে চলা ভিন্ন গত্যন্তর আমার নেই।

একথা ভেবে নিজের মনে কৈদে মরি। জীবনে এই প্রথম নিজেকে বলতে কিছু হবে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক সকলের সমর্থনের অপেক্ষা রেখে এ কাজ করা অসম্ভব। অ্যালেক্সেবরার কঠিনতম সমস্যার সমাধান করতে যে পরিমাণ মানসিক একাগ্রতার প্রয়োজন, আমি আমার মনের সমস্ত শক্তি সক্ষম করে, সেই রকম একাগ্রচিতে আমার প্রেমের উত্তর খুঁজেছি। শেষ অবধি বুকেছি একটি মাত্র জায়গায় সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর দিয়ে এবং ভেবে শান্তি পেয়েছি।

আমার পরমাম্পদ এম, সি কি বলেন? এই একমাত্র ছাত্রবিরোধীক প্রেম। আমাকে আপনি 'স্বপ্নবেরা পত্নী' অথবা 'স্বপ্নবেরা প্রেমিকী' নাম দিতে পারেন। এর পর এম, সি যদি বলেন 'তাঁর পক্ষে আমার বরলাভ করা অসম্ভব তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আপনার কাছে একটি অম্লবোধ আছে। আপনি কি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন? ছয় বৎসর আগে আমার মনে রামধনুর হাতা রং লেগেছিল। তার মধ্যে না ছিল প্রেম, না ছিল কাম। কিন্তু দিনে দিনে তার রঙ গভীরে মিশেছে, গাঢ় হয়েছে। আমার মন থেকে একবারও সে রং মুছে যায়নি। ঝুট হয়ে বাবার পর আকাশে যে রামধনু, সে স্বপ্নায়ু কিন্তু মাছবের অন্তরের রং এত সহজে ধুয়ে যায় না। অনুগ্রহ করে তাকে জিজ্ঞেস করবেন আমার সবচেয়ে তাঁর কি ধারণা? হয়ত তিনি আমার ঝুটবরা আকাশের রামধনু ভেবেছেন, এবং তাকে এই রকমে ধরে মুছে নিশেবে হয়ে গেছে?

উত্তর প্রার্থনা করি।

— 'উয়েহারি জিরের উদ্দেশে (আমার শেখব—এস, সি) লিখিত।

সম্প্রতি আমার ওজন বেড়েছে। নেহাৎ জলোত্তাপ কেটে গিয়ে নিজেকে মাছবের মত লাগে। এই গ্রীষ্মে আমি ডি, এইচ লরেন্স-এর একখানা মাত্র উপভাস পড়েছি।

আপনার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেরে, আমার আমি চিঠি লিখতে বসেছি। আমার আগের দিনের চিঠিখানা অত্যন্ত অজ্ঞার স্ফোটে পরিশূর্ণ ছিল। বোধ হয় আপনি সমস্তই ধরে ফেলেছেন। ঠ্যা—সে কথা সত্যি। চিঠির ছত্রে ছত্রে আমি বুড়ামি নিহিত করেছিলাম। বোধ হয় ভেবেছিলাম, আমার জীবন ধারণের জন্ত আপনার কাছ থেকে অর্থ সংস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য। যাই হোক, রাশ করবেন, আপনাকে জানাতে চাই যে কেবল মুক্তকির-সন্ধানই দি আমার লক্ষ্য হ'ত, তবু বিশেষ করে আপনার কথা মনে আসত না। এটুকু বিবাস আছে যে, টাকাওরলা বহু বৃদ্ধ আমার দ্বারা নিতে অপসিত করবন না। সত্যি বলতে, অল্প কিছুদিন হ'ল আমার কাছে এ ধরনের এক প্রস্তাব আসে। আপনি ভ্রমলোককে

চিনলেও চিনতে পারেন। বরস হাটের ওপর। সম্ভবতঃ শি প্রতীষ্ঠানের সভ্য এই মহাপুরুষ (১) আমাদের পাছাড় বেয়ে এ আমাদের পারিপার্শ্বনা করেন। আমরা নিশিকাতা ষ্ট্রিটের বাড়ীতে থাকতে—ইনি ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। পাড়ার উৎসবদিগে মাঝে মাঝে দেখা হত। মনে পড়ে এক শরৎসন্ধ্যার গাড়ী করে এর বাড়ীর সামনে দিয়ে মা আর আমি আসছিলাম, ভ্রমলোক অসম্ভব হ'য়ে ফটকের কাছে ঠাঁড়িয়েছিলেন। মা গাড়ীর ভেতর থেকে দীর্ঘ মাথা হেলিয়ে নমস্কার করতেই হঠাৎ ভ্রমলোকের ফ্যানের মুখের ওপর কে যেন আবার ছড়িয়ে ছিল।

আমি ঠাট্টা করে বললাম,—মা, বোধ হয় একেই বলে প্রেম। ভ্রমলোক তোমার প্রেমে পড়েছেন।

শান্তস্বরে মা নিজের মনেই উত্তর দিলেন—না, উনি মস্ত লোক। আমার বোধ হয় শরীর প্রাতি লক্ষ্য বস্তুটা আমাদের অস্থিমজ্জাগত।

গুদামামার পরিচিত রাজকুমার, এই চিত্রকর মায়ের কাছে আমার বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তিনি বেশ কিছুকাল বিপণ্ডিত হয়েছেন—এ তথ্যও জানাতে ভোলেন নি। মা বললেন—যা ভাল বোধ, সেই মত সোজা ভ্রমলোককে জানিয়ে দাও। বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই আমি লিখে দিলাম—বর্তমানে আমার আরো বিবাহে ক্ষতি নেই।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম—আমি আপত্তি করলে তোমার ধারণা লাগবে না তো?

এ রকম বোঝাবোণ সম্ভব বলে আমার মনেই হয়নি। জাপানী আল্পস এ শিল্পীর কাছে এই মর্মে চিঠি গেল। আমার চিঠি পাবার আগে—দিনকয়েকের মধ্যে হঠাৎ ভ্রমলোক স্বয়ং এসে উপস্থিত।

তিনি খবর দিলেন 'ইজু' (Izu)তে গরর জলের বন্যার বাবার পথে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান। শিল্পীর বত বয়সই হোক না কেন, এধরনের ছেলোমাছবীতে কখনও হাতি আসে না।

মা'র শরীফটা ভাল বাজছিল না, আমি নিজেই চীনাঘরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। চা ঢালতে ঢালতে বললাম,—এতক্ষণে প্রত্যাখ্যান বহন করে আমার চিঠি আপনার বাসার পৌছে গেছে। আপনার প্রস্তাব সবচেয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে দেখলাম, এ অসম্ভব।

তাই নাকি? ভ্রমলোকের স্বরে অস্বস্তি। ঘাম মুছে বললেন—আশা করি, আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখবেন। হয়ত আমি—কেমন করে বলব জানি না—আপনাকে মানসিক আনন্দ দিতে পারব না। কিন্তু অল্প ভাবে বাস্তব জীবনে আপনাকে যথেষ্ট সুখী করার ক্ষমতা আমার আছে। এ বিষয়ে আমি আপনাকে নিঃসন্দেহ করতে পারি। আশা করি, আমার ভাবা অস্বাস্থ্যকর হয়নি।

আপনি যে সুখের কথা বলছেন তার স্বপ্ন আমার জানা নেই। ঝুটটা মাপ করবেন, একেবারে আমার একটামাত্র উত্তরই জানা আছে—না সম্ভব। নীৎসের (Nietzsche) ভাবার বলতে গেলে আমার সেই জাতীয়া রমণীর পথ্যারে কোলা উচিত, সম্ভানের জননী হওয়াই বাসের একমাত্র কাব্য। আমি সন্ধান চাই, সুখে আমার জরুটি। অর্থে আমার আসক্তি নেই, শুধু সন্ধানকে মাছব করার জ

দেখু প্রয়োজন। হাসিতে বিশ্বাসের ছোঁয়া লাগে। শিল্পী বলেন—
আপনি আমার অবাধ করছেন দেখছি। প্রত্যেকে মনে বা
চিন্তা করে, তা আপনি কেন প্রাঙ্গণ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন।
আপনার সঙ্গে জীবনটাকে বাঁধতে পারলে মজুন করে কাজে উদ্যোগনা
পাওয়া যেতো।

সাজান কথাগুলি আরো বড়োমাপের উক্তি বলে মনে হ'ল না।
হঠাৎ এই ধারণাই হ'ল যে, এত বড় শিল্পীর মনে নতুন অনুপ্রেরণা
জাগার মত আমার মধ্যে কিছু পর্দা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বেঁচে
থাকা সার্থক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে বুদ্ধের বাহুপাশে
আবদ্ধ অবস্থার কল্পনা করতে পারলাম না। মুহূর্তে হেসে জিজ্ঞেস
করলাম—আমার দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রেমের অভাব কি আপনার
সহ হবে?

গভীর ভাবে উত্তর দিলেন ভ্রলোক—তাতে বিশেষ কিছু এসে
যাবে না। নারীর অন্তরের কথা দেবতারও অজানা।

কিন্তু আমার মত নারী প্রেমহীন বিবাহের কল্পনাও করতে পারে
না। পূর্ণ বয়স আমার, আগামী বৎসর ত্রিশ-এ পা দেব।

নিজের কথাই নিজেই চমকে উঠলাম। ত্রিশ! উনত্রিশ বৎসর
বয়স অর্থাৎ নারীদেহে কুমারীস্বভাব কোমলতার কিছু অবশিষ্ট থাকে,
কিন্তু ত্রিশোর্ধ নারীদেহ নিঃশব্দ, রিক্ত। ফরাসী উপন্যাসে পড়া এই
কথাগুলি মরণ করে আমার মন অবসাদে এমন ভারাক্রান্ত হ'ল যে
কোন মতেই তাকে মন থেকে দূর করতে পারলাম না। বাইরে চোখ
কোয়াম। রৌদ্রপ্রভা সমুদ্রের প্রাণের ঠেঙ্কল্যা ভাঙ্গা কাচের টুকরোর
মত ষিকমিক করছিল। মনে পড়ে গেল উপন্যাসে এই ছ'লাইন
পড়তে গিয়ে; সত্যি ভেবে মনে মনে সাঁয় দিয়েছিলাম। যে সময়ে
ত্রিশের কোটায় মেয়েদের ঘোঁরনের সীমা টানতে পারতাম, সেই
দিনগুলির জন্ত বৃকের ভেতর ছ'ল করে উঠল। অবাধ হয়ে ভাবলাম
এই যে আমার নেকলেস, ব্রেসলেট, দামী দামী পোষাকগুলো বেচে
দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘোঁরনের মাধুরী নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে
না তো? হায় যে ভদ্র স্ত্রীর মধ্যবয়সী রমণী! কিন্তু তবু মধ্যবয়সেও
নারীজীবনে একমাত্র তাইই অধিকার নয় কি? সম্প্রতি এই ধারণাই
আমার হয়েছে। উনিশ বছর বয়সে আমার এক ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী
দেখ কোয়ার মুখে আমার সাবধান করে দিয়েছিলেন, কখনও প্রেমের
বাঁধনে নিজেকে জড়িত না। প্রেম তোমার সর্বনাশের মূল হবে।
বাঁধা যদি পড়তেই হয়, অনেক বয়সে, ত্রিশ পেরিয়ে প্রেম করো।

তার কথা নিশ্চয়ই হজম করেছিলাম, মন তা গ্রহণ করেনি।
সে সময়ে আমার পক্ষে ত্রিশোর্ধ জীবনের কল্পনা করাও
কঠিন ছিল।

ভিক্ত স্বরে শিল্পী হঠাৎ বলে উঠলেন তখনলাম আপনাতা
বাড়ীটা বেচে দেবেন? কথাটা সত্যি?

আমি হেসে উঠলাম, মাগু করবেন, আমাদের ডেরী বাগানটার
কথা এইমাত্র মনে হল। আপনি ওটা কিনবেন?

কৃত কক্ষটিতে ওঠপ্রাঙ্গণ কুচিত হ'ল, উত্তর দিলেন না ভ্রলোক।
শিল্পী মায়, আমার কথাই ইঙ্গিত ধরতে কষ্ট হয়নি।

বাড়ীখানা এক রাজকুমারকে বেচে দেবার কথা চলছিল—
একথা সত্যি কিন্তু শেষ অবধি কিছুই করা হয়নি। এরই মধ্যে
শিল্পীর কানে পৌঁছে গেছে ধরমটা জেনে অবাধ হলো।

কিন্তু সেই বৃক্সেন ডাকে ডেরী বাগানের টিকেনার লোচনাখিল
এর সমগোত্রীর মনে করি, অমনি জহলোকের মেজাজ বিগড়ে গেল।
এর পর করেক মিমিট এটা, ভটা খসে উঠে পড়লেন।

এই লোচনাখিল পার্কের পুনরাবৃত্তি হোক; এ অনুঘোষ আপনাকে
আমি করব না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। কিন্তু দ্বারা
করে মধ্যবয়সী রমণীর অন্তরের ব্যাকুলতার কথা কখনও অবধান করুন।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল।
সে সময়ে আপনি আমার ভাই-এর গুরু, শুধু তাই নয়—আমার
এক গুরু, এইমাত্র আপনার সন্ধে আমার ধারণা ছিল। একসময়
আমরা গেলান গেলান মন খেয়েছিলাম; এবং আপনার দিক থেকে
দুঃসাহসের পরিচয় পেয়েছিলাম। উদ্ভাসের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা
ভিন্ন আমার বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। আপনাকে আমার
ভালও লাগেনি, মন্দও লাগেনি—আসলে আমার তখন আবেগের
বালি মোটে ছিল না। পরে ভাইকে খুশি করতে আপনার কয়েকটি
উপন্যাস চেষ্টা নিয়ে পড়েছিলাম, তার মধ্যে কয়েকটি ভালই লেগেছিল,
কয়েকটি লাগেনি। সত্যি বলতে আমি তখন পড়ুয়া নই।

কিন্তু গত ছয় বৎসরের মধ্যে, ঠিক কোন সময় থেকে বলতে পারব না,
আপনার স্মৃতি আমার সমস্ত অন্তর কুরাশছন্ন করে রেখেছে এবং
সেরা একতলা থেকে উঠে আসার সময়ে শিঙিতে যে ঘটনা
ঘটেছিল, পরিবার সব আমার মানসকে প্রতিফলিত হ'ল।

কেনন যেন মনে ভয় হয়, আমার ভাগ্যপটে ঐ ত্রাক্ষর্যুর্ভর রূপ
অভুসনীর। অন্তরের অন্তঃপুরে আপনার অভাব কিরে কিরে
বাজে। জানি না একে প্রেম বলে কিনা এবং তাইই সন্তানবন্তর
নিজেকে এত নিঃসঙ্গ বোধ হয় যে আপন মনে কেঁদে আঁকুল
হই।

হুনিয়ার আর সব পুরুষের চেয়ে আপনি সম্পূর্ণ জিন্ন।
“সাগর-বিল্ব” (The sea gull) উপন্যাসের নারিকা নীলার
মত উপন্যাসিকের মোহ আমার অভিজুত করতে পারেন।

লেখকের প্রতি আমার আকর্ষণ কম। আমাকে বিদ্বতী মহিলা
বা ঐ ধরনের কিছু মনে করলে ভুল হবে। আপনার কাছে
আমার একটি মাত্র ভিক্ষা আছে, আমি সন্তান চাই।

হয়ত বহুকাল আগে, যখন আমরা দুজনেই অবিবাহিত
ছিলাম, তখন সাক্ষাৎ হ'লে আমাদের বিয়ে হ'তে পারত। হয়ত
আমার আজকের এই আন্তরিক যতনাব হাত থেকে মুক্তি পেতে
পারতাম, কিন্তু এ-ও জানি যে আপনার সঙ্গে আমার কোন ফিলিই
বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। আপনার দ্বীপ স্থান দখল করার
চিন্তা মাত্র বর্ধকতা। আমি আপনার রক্ষিতা হ'তে প্রত্যা
আছি। (শব্দটি নিজের কাছেই অসহ। প্রেমিকা লিখতে গিয়ে
মনে হ'ল রক্ষিতা লিখলেই আমার মনের ভাব স্পষ্টই হয়; এবং
ব্যাপার পরিবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়) তখনই রক্ষিতার বরাত মক।

লোকে বলে কাজ ফুরালেই ছিন্ন কছার মত তাকে দূর করে
দেওয়া হয়। পুরুষ মানুষ সে যেমনই হোক বাটের কাছাকাছি
এলেই ঘরঘুণী হয়। আমাদের নিশিকাতা ব্রিটেন-বুড়ো মালীর
সঙ্গে আমার নাসের আলোচনা তখনইলাম একদিন। তাদের
শেষ কথা হ'ল এই যে, মেয়েদের কোনরকমে “রক্ষিতা” হওয়া
উচিত নয়। তারা অবশ্য বারম্বারিতার কথা বদলিল, আমাদের
ব্যাপার সম্পূর্ণ জিন্ন।

আমার বিবাস, আপনাদের কাছে আপনাদের কাজই হুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিষ এবং আমার যদি আপনাদের পছন্দ হয়, খনিষ্ঠতা হ'লে সেদিক দিয়ে জীবিতা বই অস্ত্রবিধা হবে না। আপনাদের দ্বীপ পক্ষেও আমাদের সম্পর্ক মেনে নিতে কষ্ট হবে না। অজুত পোনিঙ্গও আমাদের যুক্তিতে কোন ভুল নেই।

সদন্তা আপনাদের জবাব নিয়ে। আমাকে আপনাদের পছন্দ হয়, কি হয় না? এ বিষয়ে আপনাদের মনের ভাব কি? না জানি কি উত্তর দেবেন, কিন্তু একটা উত্তর যে চাই-ই। আলোর চিঠিতে 'লিখেছিলাম স্বয়ংবরা প্রায়দ্বীপী, এবার লিখলাম স্বয়ংবরা রমণীর অন্তরের ব্যাকুলতার কথা। এখন মনে হচ্ছে আপনাদের জবাব না পেলে এই ব্যাকুলতাও কারণ অভাবে বাপীভূত হ'য়ে শূন্য মিলিয়ে যাবে এবং আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল অভিশপ্ত হয়েই কাটবে। আপনাদের কাছে থেকে জবাব না পেলে আমার জীবন মকছুমিতে পরিণত হবে।

আপনাদের উপস্থাপন শ্রেয়ের অভিযানের বর্ণনা করেন, লোকে আপনাকে হসরহীন আখ্যা দেয়, কিন্তু সম্ভবতঃ সাধারণ বুদ্ধির উপর আপনাদের আস্থা বেশী। ব্যক্তিগত ভাবে সাধারণ বুদ্ধি আমার কাছে অবহীন। আমার মতে আত্মার ইচ্ছা পূরণের দ্বারা জীবনকে সম্পূর্ণ চালনা করা যায়। আপনাদের সম্ভাবনের জননী হওয়াই আমার একমাত্র কামনা। কোন কারণই অল্প কোন ব্যক্তির সম্ভাবন আমার কাম্য নয়। এক্ষণে আপনাদের উপদেশের অপেক্ষা এর উত্তর জানা থাকলে আমার জানিয়ে বাখিত করবেন। অতঃপর করে সেই সঙ্গে আপনাদের মনের টিকানা দেবেন।

বুড়ি খেমে হাওয়া উঠেছে। এখন বেলা তিনটে। আমি আমাদের বরাদ্দ সবচেয়ে ভাল মনের সন্ধান বেরবো। দুখানি শুল্কগর্ত 'রাম'-এর বোতল এবং এই চিঠিখানা পকেটে ভরে দশ মিনিটের মধ্যে ব্রাহ্মের পথে পাড়ি দেব। এই মন আমার ভাই-এর নাগালের বাইরে নিজের জন্ত সরিয়ে রাখব। প্রতি রাতে গেলাসে ঢেলে একটু করে মন আমি খাই। জানেন বোধ হয় 'সাকে' গেলাসে খাওয়াই কেওয়ার।

একবার এখানে আসুন না?

মিষ্টার এম, সিকে লিখিত।

আজ আবার বুড়ি হয়ে গেল। বুয়াশা এবং বুড়ির এক বিশিষ্ট সমীক্ষণ দেখা দিয়েছে। প্রত্যহ আমি আপনাদের উত্তরের প্রত্যাশার থাকি, বাড়ীর বাইরে পা দিতে ভরসা হয়না। কিন্তু অপার্থিত্ব একটারও জবাব এলনা। কি মনে হয় আপনাদের? জানিনা এর আগের চিঠিতে শিল্পীর বিষয় লিখে ভুল করলাম কি না। বোধ হয় ভাবছেন আপনাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব উল্লেখ করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবের কথা লিখে। কিন্তু তারপর থেকে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেছে। এই তো বানিক আগে মা আর আমি এই কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম। 'কিছুদিন হল মা জিজ্ঞাস্য ব্যথার কষ্ট পাচ্ছিলেন কিন্তু নাওজির পোখিন চিকিৎসার কল্যাণে ব্যথার কমেছে এবং সম্প্রতি শরীর একরকম ভালই আছে।

করক মিনিট আগে বারান্দার বাঁড়িরে দেখছিলাম কেমন করে হুজুরার কাপড়ের বুড়িয়ার উড়ে বুনে ময়দে আর সেই সঙ্গে আপনাদের

মনের হাসি পাবার চোঁটা করছিলাম, এমন সময়ে খাবার ঘর থেকে মায়ের ডাক কানে এল—'দুখ ভাল দিয়েছি, এদিকে এস।

মিষ্টার এমন দারুণ ঠাণ্ডা দেখে দুখ একটু বেশীই গরম করলাম। ঘোঁরাঙ্গো দুখে চুচুক দিতে দিতে শিল্পীর প্রশঙ্গ উঠল; আমি বললাম—তার সঙ্গে আমার মিলতেই পারেনা, কি বল মা?

মায়ের শান্ত স্বর—সে কথা সত্যি।

একে তো আমি বেহাড়া মেয়ে। তাছাড়া শিল্পীদের ওপর আমার বখেট আকর্ষণ আছে, এদিকে ভদ্রলোকের রোজগারও ভাল, সু দিক দিয়ে বিচার করলে এ যোগাযোগ নেইহাৎ নিশ্চয়ের নয়। কিন্তু তবু অসম্ভব।

মা হেসে ফেললেন—কাজুকো, তুমি ভাবী দুই মনে। যদি অসম্ভবই জানতে তবে কেন সেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে অত খোঁসার জুড়ে দিলে? তোমার মতিগতি বোঝা দায়।

বাঃ কথা বলতে মজা লাগছিল যে। আরও অনেক কথাই বলা যেত। তুমি তো জান—কথা কওয়ার লোক পেলে আমার জ্ঞান থাকে না।

না কাউকে ছেড়ে কথা বলা তোমার স্বভাব নয়। কাজুকো, তুমি বড় জেদী মেয়ে।

আজ মায়ের মেজাজখানা খুব ভাল আছে। গত কাল আমি মাখার ওপর চুড়া করে চুল বেঁধেছিলাম, সেদিকে চোখ পড়ত বললেন—যাদের চুল কম, তাদের জন্ত এইরকম চুল বাঁধার কারণ। তোমার মাখায় এই চুড়া অসম্ভব জমকালো দেখাচ্ছে। একখানা ছোট সোনার টায়রা হলেই খুলত ভাল। এমন করে না বাঁধলেই পারত।

মা, তুমি আমায় নিরাশ করলে। একবার তুমিই তো বলেছিল যে, আমার এত সুন্দর ঘাড় ঢেকে রাখার কোন মানে হয় না। বলনি?

হ্যাঁ, সেই রকমই যেন মনে পড়ছে। আমায় কেউ প্রশঙ্গ করলে তার একটা কথাও আমি ভুলি না। তোমারও মনে আছে দেখে নিশ্চয় হলাম।

সেদিন সেই ভদ্রলোক নিশ্চয় তোমার প্রশঙ্গা করেছিলেন। হ্যাঁ তা করেছিলেন। সেইজন্মেই তো অত সহজে তাঁকে হাতছাড়া করতে চাইনি। তিনি বলেছিলেন যে, আমি তাঁর পাশে থাকলে তিনি আবার নতুন কাজে উৎসাহ পাবেন। না আর বেশী বলব না। শিল্পী যে পছন্দ করি না তা নয়। তবে হামবড়া ভাব আমার অসহ্য লাগে।

নাওজির মাষ্টার কেমন লোক?

আমার শরীরের ভেতর দিয়ে হিমেল স্রোত নেমে গেল—ঠিক জানি না, তবে নাওজির মাষ্টারের আর দৌড় কত হবে। শুনেছি ভদ্রলোকের পায়ে 'অনাচারী' লেখা তকমা ঝুলছে।

তকমা? মায়ের চোখে কোঁতকের ছায়া খেলে গেল—ভাল মজার কথা তো। তকমাই যদি রইল তবে আর কিসের? এ দেন বেড়ালের গলায় বকটা বাঁধার মতই মিষ্ট। তকমাহীন অনাচারীকেই ডর বেশী।

কি জানি।

আমার সর্বত্র ছড়িয়ে আসনের জোয়ার নামল। মনে হল

সেইটা খোঁজার মত হাফা হয়ে থাকলে উত্তর হচ্ছে বুঝছেন ব্যাপারটা? কিসে আমার আলিফ—এ যদি আপনি না বোঝেন তবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত নিয়ে বোঝাব।

আপনি কি কখনও এখানে আসবেন না? আমি নাওজিকে মলব আপনাকে ধরে আনতে। অবশ্য তাকে বলা আমার পক্ষে অশোভন হবে ঠিকই। সবচেয়ে ভাল হত হঠাৎ যদি আপনি এখানে উপস্থিত হতেন, বেন আপনার একটা খেলার ব্যাপার। নাওজির সঙ্গে এলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তবু নাওজি টোঁকিতে থাকতে থাকতে আপনি একা চলে এলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এখানে থাকলে নাওজি আপনাকে দখল করে বসবে, আপনাকে ওলাফির ওখানে মদ খাওয়াতে নিয়ে যাবে বাস, তাহলেই সব মাটি।

বংশাভ্যুত্থানে আমাদের পরিবারে শিরিপ্রীতি বর্তমান। কিছুটাতে আমাদের আদি বাসার কোরিন (Korin) বহু বৎসর কাটিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি একে গেছেন। সুতরাং আপনি এসে মা খুব খুশি হবেন, আমি জানি। ওপর তলার বিশেষী প্যাটার্নের ঘরটিতে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। মদ্য করে আলো নেবোতে ভুলবেন না। মোমবাতি হাতে আমি জ্বলকারে শিঁড়ি বেয়ে উঠব। পছন্দ হল না? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

অনাচারী মানুষ আমি ভালবাসি, বিশেষতঃ যাদের নামের সঙ্গে কলঙ্ক লড়াইনা আছে। আমি নিজের অনাচারী হতে চাই। আমার বিশ্বাস, এ ছাড়া বাঁচবার আর কোনও রাস্তা আমার নেই। সারা জাপানের মধ্যে আপনি যথেষ্টাচারিতার উদাহরণরূপ।

নাওজির মুখে তখনো, সোকেব ধারণা আপনি অত্যন্ত সোহে, কলঙ্কার, সরাই আপনাকে হুগা করে এবং মাঝে মাঝে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। এই সব শুনে আপনার প্রতি আমার আশঙ্কর বিভ্রান্ত বেড়ে গেছে। আপনার মত ব্যক্তির গুণগ্রাহিত্ব পরিবেশিত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এখন থেকে আপনি তবু আমারই। এ না ভেবে আমার উপায় নেই। আমার সঙ্গে থাকলে কলঙ্ক আপনি নতুন স্বাদ পাবেন। ছেলেবেলা থেকে আমাদের মুখে শুনেছি, আমার সঙ্গে মাইবকে তার মুখে তুলিয়ে দেব। জীবনে কাকুর আদার পাইনি। প্রত্যেকে একমুখে বলেছে ভাল দেবে। এই কারণেই মনে হয় আমার অপছন্দ করার সাধ্য আপনারও নেই।

একবার আপনার দেখা পেলে কি ভালই হত। আর আমার উত্তর বা কোন কিছুই প্রয়োজন নেই। সোজাছবি দেখা করতে চাই। সবচেয়ে ভাল হত যদি টোঁকির বাসার ঘিরে দেখা করতে পারতাম; কিন্তু মায়ের আমি একমাত্র মাস পরিচারিকা—কাজেই তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। পারে পড়ি একবার এখানে আসুন। তবু একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। তখনই আপনি আমার সব কথা বুঝতে পারবেন। অথব প্রান্তে অশ্রুটি রেখাগুলি নজর করে দেখবেন। শতাব্দীর অলিঙ্গাপবাহী বলিরেখাগুলি দেখে যান, ভাবার চেয়ে মুখের ভাবে আমার মানসিক অবস্থা অনেক বেশী বুঝতে পারবেন।

প্রথম চিত্রিতে আমার অন্তর চিত্রিত এক রামধনুর আলস

অমিত লাভগ্যা আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাভগ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতিদিন আপনার সে মাখুরী ঘান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার হকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার হকে মধ্যমলের মত কোমল ও মৃদু কোরে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার হকের সৌন্দর্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক: ডি. বসু এণ্ড কোং, ১৬, বনবিন্দু লেন, কলিকাতা-১

সিঁদুরিলাহ। জামানীর কীপ আসে অথবা জুহুর, সিঁদুরের
মজলদাকি আসে। কলকাতায় সেই সময়ই গঠিত হয়নি। তেমন
কিন্তু অথবা ব্যবধানসাধক হলে আমার এমন ক্ষণ জেদ
করতে হত না একে হইত কালে আপনাকে ফুলেও বেতাম।
জামানীর অস্তরে নিহিত এই রামকু অগ্নিশিখার বহিত। অমৃত্তির
জীবিতা জামানীর হৃদয় দগ্ধ করে। জাফি হুরিয়ে পেলে আকিখোর
দে দাঁড়ানার হটকটরে মরে, তাও বোধ হয় এক অসহ নয়।
জামি নিশ্চিত জানি, এ আমার কুল নয়, আমি কোন জ্ঞান
করছি না কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের হৃদয়ের তাকানার নিজেই
হৃদয়ে উঠে, এ আমি কি অসম্ভব গতিতে নির্বোধের মত এদিকে
হলছি। প্রায় অথাক হয়ে তারি, হৃদয় জামি পাগল হয়ে
সেই। হাই হোক, এখনও দায়ের মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা যেনে কাজের
তথা ভাবতে পারি। মদা করে একবার শুধু এখানে আসুন, যে
কোনও সন্দের এসেই হবে। এখানে আপনায় প্রতীক করে বলে
ধাকব, কোথাও বাস না। মদা করে আমার বিশ্বাস করুন।

আর একবার শুধু দেখুন এবং তারপরেও যদি আমার অপছন্দ
হয় তবে অসন্তোষ হলুন। আপন হাতে ভালো আমার জন্মের
এই বহিঃশিখা আপনি বেজার নিবিয়ে দিতে পারেন। নিসঙ্গ
প্রেক্ষার এ শিখা নির্বাপিত করা অসম্ভব। আমি জানি
আমাদের সাক্ষ্য হলে, শুধুমাত্র সাক্ষ্য হলেই আমি বেঁচে
যাব। হার। দি টেল অফ জেন্জি (The tale of Genji) নামক
উপজ্ঞানের বিনগুলি যদি করে পাওয়া যেত। এর পর আমি যে
কথা বলতে চাই, তার মধ্যে নতুন কিছু নেই। কিন্তু আজ, উঃ।
আপনার পাশে ঠাঁই পাবার, আপনার সন্তানের জননী হবার বাসনা
কি ছুঁইছই না হয়ে উঠেছে। আমার এ চিঠিগুলি পড়ে যদি কেউ
হাসে, তবে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি নারীর বেঁচে থাকবার প্রচণ্ড
প্রয়াসকে, নারীর জীবনকে ব্যর্থ করছে। জাহাজঘাটের চাপা
হাওয়ার আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার মন চায় উন্মুক্ত
সাগরবক্ষে পাল তুলে ভেসে যেতে—কড় আসে আশ্রয়, তাতে ক্ষতি
নেই কিছু। গুটিয়ে-তোলা পাল অপরিহার্য হতে বাধ্য। যারা
আমার উপহাস করে তাদের মন অপরিচ্ছন্ন। তাদের সাধ্য কি
ভাল কিছু করার ?

নারীজীবনের কলহ। কিন্তু এক্ষেত্রে হৃদয়ভোগী শুধু আমি।
'কি বাতনা বিধে, হুবিধে সে কিসে, কতু আশীবিধে লগেনি যারে।'

আলস্য তরে, অপরিহার্য পাল সামান্যের মত বাইরে থেকে আমার
কাজের সমালোচনা করার অপভ্রষ্টা করবীন। আমার চিন্তাধারার
বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব, অপরের হাতে 'তুলে দেবার আসনে' স্পষ্ট
আমার নেই। চিন্তার আমি ধার ধারি না। জীবনে শান্তিলাভ
বা দর্পনের ভিত্তিতে কাজ আমি করিনি।

আমার বিশ্বাস, হুনিয়া বাদের ভাল বলে গ্রহণ করে, তারা সবাই
মিথ্যাবাদী, ভণ্ড। এ হুনিয়ার ওপর আমার আদৌ আস্থা নেই।
আমার একমাত্র হৃদয় স্থগিরিত্তি এক ব্যক্তিত্বী পুরুষ। শুকনাবাদী
ব্যক্তিত্বী। একমাত্র এই দেশের উপর আমি আত্মবিশ্বাস দিতে
প্রস্তুত। দশ হাজার মানুষ আমার সমালোচনা করলেও আমি
তারের দুঃখের ওপর এই ক্রোধ হেড়ে দিতে পারি—পাশের হৃদয়
গোপন রাখা আশও অন্তত বেকী মাদ্যাত্ত নর কি ?

হুয়েলেন কিছু ?

প্রেম অবহীন। আপনাকে হৃদয়সঙ্গত ভাষণ দেখাতে গিরে
যেন বাড়িবাড়ি করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে আমার তাই-এ
হুলি পাখীপড়া আওতে। গাছি এককণ আমার একমাত্র বক্তব্য এই
যে, আমি আপনার পথ চেয়ে রইলাম। আপনাকে আর একবার
দেখতে চাই। ব্যস এ পর্যন্ত।

শুধু অপেক্ষা করে থাক। আমাদের জীবন সুখ দুঃখ, ক্রোধ
আদি বহু আবেগে পরিপূর্ণ কিন্তু জীবনের শতকরা এক ভাগ সময়
যদি এসে নিয়ে কাটে, বাকী নিরানকুই ভাগ আশায় আশার
কেটে যায়। সেই পরম ক্ষণটির অপেক্ষা করে আছি। মনে হয়
ব্যক্তিত্বের পদধ্বনিতে বুকের ভেতরটা দলিত, নিশ্চেষ্ট
হচ্ছে। সব শূন্য। হায়, জীবন কি বিবমর। বুখা জন্ম—এই
চিরন্তন সত্য বাস্তবের ভেতর দিয়ে বার বার প্রমাণিত হয়ে
আসছে।

এই ভাবে প্রত্যাহ সকাল থেকে রাত অবধি পথ চেয়ে চেয়ে
নিরাশ হই। মনে মনে ভাবি এই যে আমি জন্মেছি, বেঁচে আছি,
মানব-জীবন আছে, হুনিয়া আজও টিকে আছে—এ নিয়ে যদি
সুখী হতে পারতাম।

যে মৈত্রিক দায়িত্ববোধ আপনার পক্ষে অন্তরার, তাকে কি
ঝেড়ে ফেলতে পারেন না ?

এম, সি। (মাই শেখত-এর আভ্যন্তর নয়। সাহিত্যিকের
প্রেমে আমি পড়িনি। মাই চাইন্ত)। [ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

পরাজিত

শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

বাস্তব হুনিয়ার

হার—

এই শুধু জানলেন :

জন্মের খিলিরে দিয়ে রাখা শুধু জানলেন।

ভালোবাসা দিয়ে কত

আপন মনের মত

প্রাণের বীশার তাকে আহা স্তব বাঁধলেন।

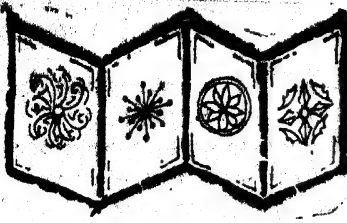
সে তার জো ছিড়ে গেলো, তাই শুধু কাঁদলেন।

প্রেমের প্রদীপখানি

সবতনে আমি আনি

কড়ের হাত থেকে বাঁচতে যে চাইলেন,

নিবে গেলো শুধু শিখা আমি হারলেন।



পত্র

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র-৭

জিয়ালগোড়া পোয়া
জেলা দানকুম, বিহার
১৩ই এপ্রিল, ১৯৩১।

প্রিয় মহাশয়,

জায়াহিলাম ১০ই এপ্রিলের পত্রই আমার শেষ পত্র হইবে কিন্তু তাহা হইবার নয়। আমি খুব সন্মানে উঠিয়াছি। নিজস্বদেবী আমাকে ত্যাগ করার, নিমন্ত্রণ উবার আলো-ঈশ্বারির মধ্যে আমাদের উভয়ের সমতাগুলি সন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তারপর উভয়ের পত্রগুলি পুনরায় আন্তর পড়িয়া দেখিলাম যে, কয়েকটি বিষয়ে আরও বাধ্য আবশ্যক।

৩০শে মার্চের পত্রে আপনি বলিয়াছিলেন যে, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী সেবাগ্রামে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, মূল বিষয়গুলিতে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। আলোপ-আলোচনার সময় আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ আছে কিন্তু এ-বিষয়ে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, সেই মতভেদগুলিকে মূলবিষয়ে মতভেদ বলিয়া স্বীকার করা উচিত কিনা। আপনার পত্রগুলিতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই সে-সময় আপনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। উপাধরপদ্বরূপ দুর্নীতি, হিসাব্যক মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন; স্বরাজ্যলাভের জন্ত চরমপত্র দান এবং জাতীয় সংগ্রাম শুরু সম্পর্কে আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন। আপনার মতে, তখন অহিংস গণ-সংগ্রামের উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদগুলি কি মূলবিষয়ে এবং সেজন্য কি একযোগে কাজ করার সকল আশাই ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত? কর্মসূচী সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, উহা স্থির করার ভার কংগ্রেসের। ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের অভিমত এবং পরিকল্পনা প্রকাশ করিতে পারি কিন্তু তাহা গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা কংগ্রেসেরই। স্বরাজ্যলাভের জন্ত চরমপত্র দানের এবং জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে আমার মূল প্রস্তাবটি ত্রিপুরী কংগ্রেস অগ্রাহ্য করিয়াছিল কিন্তু এজন্য আমরা কোনও অভিযোগ নাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ঐশ্বর্যের বিলম্ব স্বাভাবিক। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, আমি ঠিক কথাই বলিয়াছিলাম এবং কংগ্রেসও একদিন তাহা বুঝিতে পারিবে। আশা করি, তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যাইবে না। এখন যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, উপরিউক্ত বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহা হইলেও একযোগে কাজ করার অক্ষমতার

কারণ কি? এই মতভেদগুলি সহসা আঁকিতে পলাইয়া উঠে নাই। উহা কিছুকাল ব্যক্ত আছে এবং তাহা সন্তোষ আনার পথ-পারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছি। এই মতভেদগুলি বা অনুরণন মতভেদ তবিয়েতেও থাকিবে কিন্তু তাহা সন্তোষ আনানের ঐক্যপই তখন করিতে হইবে (সম-উদ্দেশ্যের জন্ত সহযোগিতা করিতে হইবে)।

অনুগ্রহ করিয়া ময়ন করুন যে, সেবাগ্রামে প্রায় এক বর্ষা ধরিয়া আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম একটি মাত্র বিষয় লইয়া—সর্বদলীয় কনাম একদলীয় কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন। কিন্তু তখন আমরা ঐ বিষয়ে আমাদের মতভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। তিন ঘটাব্যাপী আলোচনার শেষের দিকে আমি বলিয়াছিলাম যে, সর্বদলীয় প্যাটল এবং অজ্ঞাতের সঙ্গে যখন আমি সাক্ষাৎ করিব তখন তাহাদের সহযোগিতা আদায়ের জন্ত শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। সম্ভবতঃ আমি যদি অনুস্থ না হইতাম এবং গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়াকিং কমিটির সভার যদি আমাদের সাক্ষাৎকার হইত, তাহা হইলে একযোগে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিত।

আপনার ৩০শে মার্চের পত্রে আর একটি মন্তব্য আছে বাহার সহিত আমি একমত নই। উহা ভাল করিয়া চোখে পড়ে নাই বলিয়া ইতিমধ্যে সে সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি নাই। আপনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্য যদি আমাদের নীতি সমর্থন করে তাহা হইলে, বাঁহারা আমার নীতিতে বিশ্বাসী, একমাত্র তাহাদের লইয়াই আমার পক্ষে ওয়াকিং কমিটি গঠন করা কর্তব্য। আমাদের পক্ষের পরিচালার অভিমত এই যে, এ, আই, সি, সিতে অধিকাংশ সমস্তের সমর্থন আমরা পাইলেও সর্বদলীয় ওয়াকিং কমিটি বা কর্মপরিসরের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কারণ, উক্ত পরিষদের গঠন যথাসম্ভব কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রতিদ্বন্দ্বি হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন উহার পক্ষেতে থাকা চাই। ভারতের মধ্যে এবং বিশেষে, আজ আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি তাহাতে আমাদের মতে, একদলীয় কর্মপরিসর গঠন নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্র-প্রসারের সময় আসিয়াছে। জাতীয় কর্মপরিসরকে—ওয়াকিং কমিটিকে সর্বাঙ্গ, দলীয় ভিত্তিতে গঠন করিয়া আমরা কি সে কার্য শুরু করিতে পারি?

দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আমরা আপনার সহিত একমত যদিও আমি মনে করি যে, ঐ বিষয়ে আপনার আশঙ্কা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমি জানি না, সমগ্র ভাবে ভারতের কথা বিচার করিলে কেহ বলিতে পারেন কি না যে, দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে বাহা হউক, আমি মনে করি যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইলেও, আমরা এমন অক্ষম

হইয়া পড়ি নাই যে, জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে না। ঘর্নাতির কারণ অসহন্য করিতে গিয়া আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, জাতীয় সংগ্রাম মূলতঃই রাধা এক সরকারী পদাধিকারের দ্বারা ফিলিস্তিনীদের আত্মাধীন এই ঘর্নাতির জন্ত প্রাণদান্য দাবী কি না। আমার পূর্ববর্তী পত্রে যেমন বলিয়াছিলাম এখনও তেমনি বলিতেছি যে, আরও আত্মত্যাগ ও আত্মনির্গতের আহ্বান প্রতিবেদকরূপে কাজ করিবে এবং সমগ্র জাতিকে উত্তমরূপে মৈত্রিক জ্বরে উত্তীর্ণ করিবে।

৩১ এপ্রিল রাজেন বাবু জলুগ্রহণ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লাগরণ ভাবে প্রমিত-সমতা লইয়া আমরা আলোচনা করিবার পর কংগ্রেসের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। এখন আমি আপনার সহিত পত্রালাপ শুরু করি তখন আপা করিয়াছিলাম যে, এই ভাবেই (পত্রালাপের মাধ্যমে) ওয়াকিং কমিটি গঠন সমস্তার সমাধান হইবে এবং বড় বড় সমস্যাগুলি আমাদের উত্তরের পরবর্তী সাক্ষাৎকারের জন্ত রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পত্রালাপ চলিতে থাকাকালে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, উহা কোনওক্ৰমে সমাধানের দিকে আমাদের দিকে লইয়া বাইতেছে না। এখন রাজেন বাবু দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তখন, ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া আপনার সহিত দেখা করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবার কথা ভাবিতেছিলাম। কারণ, আশা ছিল যে, উহার ফলে আমাদের মধ্যে একটি মীমাংসা হইয়া যাইবে। স্ততরাং আমার জলুগ্রহণে সাক্ষাৎকারের জন্ত, রাজেন বাবু আপনাকে বিড়লা হাউসে টেলিফোন করিয়াছিলেন। রাজেন বাবু আমাকে উৎসাহবাক্য কোনও স্বাবল না দেওয়ার আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আর একবার আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব। স্ততরাং বিকালের দিকে আমার ডাক্তার আবার বিড়লা হাউসে টেলিফোন করেন এবং আমিও একটি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠাই। উত্তরের উত্তরে আপনি জানান যে, রাজকোটের ব্যাপারে আপনাকে তৎক্ষণাৎ দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তখন আমার মনে হইয়াছিল এবং এখনও মনে হইতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে জলাঞ্জলি দিয়া সম্ভবতঃ উহার চরম ক্ষতিসাধন করিয়া, রাজকোট সমস্যা লইয়া আপনি মাতিয়া উঠিয়াছেন। আমার ছাত্র লোকের নিকট কংগ্রেসে বিষয়সমূহ—বিশেষ করিয়া এই সঙ্কটমুহূর্তে—রাজকোটের আহ্বান অপেক্ষা সহস্রগুণ মূল্যবান। ইহা আপনার ভাবা উচিত ছিল যে, শ্রাব মরিস গায়ারের রোয়েদাদের পর, একা সর্গার প্যাটেলই রাজকোট পরিস্থিতিতে সাফল্যহিতে পারিতেন, দীর্ঘদিন সেখানে আপনার উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন ছিল না। বাহা হউক এখন আর উহা লইয়া খেদ করিয়া লাভ নাই; কারণ, এ বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে কার্য করিয়াছেন।

১১ এপ্রিলের এক তারবার্তায় আপনি শরৎকে বা অজ্ঞ কোনও প্রতিনিধিকে দ্রুত রাজকোটে লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, উহা কার্যকরী প্রস্তাব নহে। আপনার সহিত সরাসরি পত্রালাপে যদি সম্ভাব্যজনক ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রতিনিধির মাধ্যমে কথাবার্তার কি ফল হইবে—বিশেষ করিয়া সমস্যা যেখানে কঠিন এবং জটিল। না, আমার মনে হয়, রাজকোট প্রতিনিধি

পাঠাইলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। আমাদের উত্তরের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হইলে তাহা সম্ভব হইত।

আপনার দশ তারিখের পত্র এইমাত্র হস্তগত হইয়াছে এবং উহার উপর আমাকে কয়েকটি মন্তব্য করিতে হইবে। যথেষ্ট সহিত বলিতেছি, অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কে আপনার উক্তর আমার দিকট নৈরাশ্যের মনে হইতেছে। আপনার সমগ্র পত্রখানি নিরাশার ভাবে ভরপুর। আমার পক্ষে গ্রহণ মনোভাব সমর্থন করা সম্ভব নয়। স্ফোটে সহিত বলিতেছি, আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। আমাদের দেশেই যে আপনার এই বিশ্বাস বহুতঃ থাকে উচিত যে, জাতীয় সঙ্কট এখন দেখা দিয়াছে তখন এই সকল বিষয় অতিক্রম করিতে আমরা সর্মভ হইব। যদি আমরা কংগ্রেসের মধ্যে একা সম্পাদন করিতে না পারি, তাহা হইলে সারা দেশের মধ্যে বৃহত্তর একা কি করিয়া সম্পাদন করিব?

পূর্বে প্রস্তাব সম্পর্কে আপনি প্রকৃতপক্ষে আমাকে কোনও উপদেশই দেন নাই।

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কেও যদি আপনি নৈরাশ্যের মনোভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে ঐ রাজ্যগুলির জনগণের জন্ত দায়িত্বশীল সরকার এবং পৌরস্বাধীনতা কি করিয়া আদায় করিবেন? মোটের উপর আমাদের একমাত্র অন্ত হইতেছে অহিংস গণ-সংগ্রাম আর তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমাদের দিকের কেবলমাত্র মধ্যপন্থী নীতি গ্রহণ করিতে হইবে অথবা আপনার খাপছাড়া আত্মনির্ভরতার উপর নির্ভর করিতে হইবে। আপনি লিখিয়াছেন যে, যেখানে যেখানে আপনার প্রভাব আছে, সেখানেই সত্যগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি রাজকোটে আপনি উঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর নিজের স্বস্তি সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছিলেন। আপনার জীবনও উহার জন্ত বিপন্ন করিয়াছিলেন। কি আপনার দেশবাসীর পক্ষে, কি রাজকোট রাজ্যের অধিবাসীর পক্ষে এ কাজ কি কল্যাণকর হইয়াছে? আপনার জীবন আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে যে এখন ইচ্ছা আপনি তাহা বিপন্ন করিয়া তুলিবেন। রাজকোট অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের জন্ত দেশবাসী জায়তে দাবী জানানহিতে পারে। রাজকোটবাসীগণ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তাহারা যদি নিজেদের আত্মত্যাগ ও চেষ্টা ব্যতিরেকে একমাত্র আপনার আত্মনির্গতের ফলে স্বরাজ লাভ করে, তাহা হইলে রাজনৈতিক দিক হইতে তাহারা অসম্মতই থাকিয়া যাইবে এবং আপনার দ্বারা লব্ধ স্বরাজ রক্ষা করিতে পারিবে না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এখন আমাদের পক্ষে সংগ্রামক্ষেত্রে অসম্মত সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তখন কত বার আপনি আপনার মূল্যবান জীবন এই ভাবে বিপন্ন করিবেন?

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের উত্তরের সহযোগিতা সম্পর্কে আপনি নিরাশা পোষণ করিতেছেন। আপনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, কারণ আপনি ভারতের জন্ত আমাদের শিল্পায়নের পরিকল্পনা সমর্থন করেন না, যদিও আমরা শিল্পপ্রচারের সহিত উপযুক্ত কুটিরশিল্পের উন্নয়নের কথাও বলিয়া আসিতেছি। রাজনৈতিক মতভেদ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কোন

দ্রুততঃগুলিক আপনি মৌলিক এবং ঐক্যের ও সম্মেলন কার্যের পক্ষে দ্রুততঃমণীর বাধা বলিয়া মনে করিতেছেন। আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, এইরূপ কাৰ্য্য (একযোগে কাৰ্য্য) অসম্ভব, তাহা হইলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ—অন্ততঃপক্ষে অতীত ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতদিন আমি এই আশা পোষণ করিতেছিলাম যে, আপনার মাধ্যমে বিভেদ জোড়া লাগিবে এবং একটা ভীষণ জাতীয় দুর্ভেদ এড়ান সম্ভব হইবে।

আপনি যে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা ভাল, মন্দ বা উদাসীন যাহাই হউক না কেন, উহাদের অস্তিত্ব পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন যদি একযোগে কাজ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোনও কালেই তাহা সম্ভব হইবে না। উহার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্ত নিদারুণ নৈরাশ্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। যৌনোচিত বসিষ্ঠ আশাবাদ এবং ভাষ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনির্বাণ বিশ্বাস লইয়া আমরা কি করিয়া এই পরিস্থিতি স্বীকার করিয়া লইতে পারি?

কয়েকটি পক্ষে আপনি আমাকে সর্বদা নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচী স্থির করিয়া তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমুখে উপস্থাপিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস আমাকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাই আমার বর্তমানের কর্তব্য। ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আমি আমার কর্মসূচী পেশ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত থাকায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট আমার কর্মসূচী পেশ করার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না।

প্রথম পক্ষে আপনি লিখিয়াছিলেন যে, আমরাই হাতে উত্তরাগপর্ণ। তনুসারে, যে সমস্তগুলির সমুখীন আমরা হইয়াছি, তৎসম্পর্কে আমার মতামত এবং আমার সমাধানগুলিও আপনার নিকট পেশ করিয়া আসিতেছি। দেখিতেছি যে, হয় সফল অথবা অবিকাশ প্রস্তাবই আপনি সমর্থন করেন নাই। অতএব এখন আপনারই উত্তরাগী হইবার এবং ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত নির্দোষ সম্পর্কে আপনার অভিলাষ ব্যস্ত করিবার সময় আসিয়াছে। গুরু প্রস্তাবানুসারে ওয়ার্কিং কমিটিকে কেবল যে আপনার ইচ্ছানুসারেই গঠিত হইত তাহা নহে, উহাকে আপনার পূর্বা বিশ্বাসভাজনও হইতে হইবে।

কতকগুলি বিকল্প প্রস্তাব আপনার বিচারের জন্ত উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমি সত্তর জাতীয় সমগ্রায় স্তব্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। উহা করিলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটগুলির মোচন স্বভাবতঃই হইত। এই প্রস্তাবটি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, আমি যদি একদলীয় কর্মপরিসর গঠন করি তাহা হইলে আপনি নেন সমর্থন-আপক ভোট দেন। আপনি লিখিয়াছেন যে, তাহাও সম্ভব নহে।

আমার তৃতীয় প্রস্তাবে জানাইয়াছিলাম, আপনার উচিত আপাইয়া আসিয়া ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা। এই স্বাধীন প্রার্থনা হইলে বহু বাধা দূর হইত এবং বহু বিপত্তির নিরসন হইত। আমার এই প্রস্তাবের কোনও উত্তর আপনি দেন নাই। আপনি যদি ইহাও প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে কার্যারম্ভের দায়িত্ব আমার হাত হইতে আপনার হাতে চলিয়া যাতয়া উচিত। আপনাকে তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

একটি বিষয় পরিহার করিয়া বলিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, একমাত্র আমাদের দলের সদস্যদের লইয়া আপনার পরামর্শ মত একটি একদলীয় কর্মপরিসর, (ওয়ার্কিং কমিটি) আমি গঠন করিতে পারি না। এই পরামর্শ কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধী, কারণ এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি আপনার পূর্বা বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই। অধিকন্তু আমার দৃষ্টমতে, বর্তমান অবস্থায় একদলীয় কর্মপরিসর দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। উহা কংগ্রেসের গণ-প্রকৃতির সত্যকার প্রতিনিধিত্বান্বীত হইবে না এবং বলিতে কি, উহা গঠন করা হইলে রীতিমত মতবিরোধের সৃষ্টি হইবে এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঘটাইবে।

আশা করি, ত্রিপুরী কংগ্রেস আপনার উপর যে দায়িত্ব চাপাইয়াছে তাহা আপনি যথার্থভাবে পালন করিবেন। আপনি যদি তাহাও করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি কি করিব? আমি কি এ, আই, সি-সিকি সমগ্র বিষয়টি জানাইয়া তাহারিগণকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে বলিব? অথবা অস্ত্র কোনও পরামর্শ আমাকে দিবেন?

আশা করি বা (কল্পনা) পূর্বাশেপা ভাল আছেন এবং শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন। আপনার দ্বারা কেমন—বিশেষ করিয়া রক্তের চাপ? আমি ধীরে ধীরে স্বস্থ হইয়া উঠিতেছি। সমস্ত প্রণামান্তে—
আপনার মেসেজ
সুভাষ

পুনশ্চ—

আপনার নিকট আত্মজ্ঞাপক ভোটের অনুরোধের উত্তরে গত ১০ই এপ্রিলের পক্ষে আপনি লিখিয়াছিলেন যে, আমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলে, এ, আই, সি, সি সে সম্পর্কে নিজ বিচারবুদ্ধিমত্ত কাজ করিতে পারেন, আপনার অভিমত বা আপনার আদেশ দ্বারা ভাষ্যক্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আরও ভাল কাজ হইবে যদি তাহারা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে নিজ বিচার-বিশেষনাশক্তির প্রয়োগ করেন। পক্ষপ্রস্তাবের বিরোধী আপনার পরামর্শ অনুসারে যদি কাজ করিতে আমি না পারি এবং আপনি যদি নিজের ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব এ, আই, সি, সি অতি অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। আপনি কি অস্ত্র কোনও সমাধান দিতে পারেন?

দাখিও বল জীবনে

দাখিও মনে আশা

নিখিল এই ভুবনে

দাখিও ভালোবাসা। —ববীন্দ্রনাথ

প্রবাসী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

দক্ষিণ-আফ্রিকা।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবাসীদের অজ্ঞতম পরম আত্মভাজন নেতা ছিলেন গোখল। ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর কাছ থেকে তারবাগে আমি এক জঙ্করি নির্দেশ পেলাম। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমদাসত্ব প্রথার কবলে অসহনীয় অত্যাচারে নিপীড়িত হচ্ছে। এই প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন মহাত্মা গান্ধী। এদের সাহায্য করার জন্যে আমাকে অবিলম্বে দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রা করতে হবে,— এই হোসো গোখলের নির্দেশ।

নাটালের বিভিন্ন বাগিচায় কাজ করার জন্যে ১৮৬১ সাল থেকে ভারতীয় শ্রমিক চালান করা হতো চুক্তি প্রথার মাধ্যমে। দিনে দিনে এই প্রথা অতি বীভৎস রূপ ধারণ করেছিল,—জন্মে উঠেছিল নানা অজ্ঞানের ছুরপনের কলংক। ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্যে পেশাদার আড়কাটি নিযুক্ত করা হতো,—এরা মালিকের কাছ থেকে শ্রমিকের মাথা-পিছু দাম পেত। পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোক চালানোর পারিশ্রমিক ছিল বেশি। আড়কাটির নির্ধিচারে চলবলের আশ্রয় নিত। হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিককে তারা চুক্তিপ্রথার সংগ্রহ করে নাটালে চালান দিয়েছিল। ফলে নাটালে ইউরোপীয়ের চেয়ে ভারতীয় সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে যে প্রাথমিক চুক্তি হয়েছিল তাতে সঠিক ছিল এই যে, ভারতীয় শ্রমিকরা নাটালে পাঁচ বছরের জন্য কাজ করবে। পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার পর ভারতীয় শ্রমিক স্বাধীন ভাবে নাটালে বসবাস করার সুযোগ পাবে। কিন্তু এই চুক্তিকে বানচাল করার উপায় উদ্ভাবনে দেবি, হয়নি। নাটাল গভর্নমেন্ট আইন করল যে পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিককে হয় তিন পাউণ্ড কর দিতে হবে না হয় আবার আর এক পাঁচ বছরের শ্রমচুক্তি করতে হবে। যে করও দেবে না বা নতুন করে শ্রমদাসত্ব মেনেও নেবে না তাকে নাটাল থেকে বিতাড়িত করা হবে।

নাটাল সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অতি সরল। ভারতীয়রা হয় ক্রিয়াকাল বাগিচায় শ্রমদাস হয়ে থাকবে না হয় তাদের দাস্য থেকে

দূর করে দেওয়া হবে। মাথা-পিছু মুক্তিকর দ্রৌ-পুরুষ ও এমন কি পনেরো বছরের উপরের বাসকবালিকাকেও নিতে হবে। এমনি মহার্ঘ মাণ্ডল দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করতে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমিকের ক'জনই বা পারবে?

এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-প্রথা দাসত্বের নামান্তর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সার ডবলু ডবলু হাট্টার বলেছিলেন যে এই প্রথা ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে সীমারেখা টানা দুষ্কর। বাস্তবিক অবস্থা তর তর করে পর্যবেক্ষণ করার পর আমিও দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলাম যে হাট্টারের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। ভারতীয় শ্রমিকরা নিজের পছন্দমত মালিক নির্বাচন করতে তো পারতই না,—যদি বা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাগিচা পরিত্যাগ করত, তাহলে কোঁজদারী অপরাধে শাস্তি পেত।

সরকারী পর্যবেক্ষণের একটা তথ্যাকথিত ব্যবস্থা যে অবশ্য ছিল না তা নয়। কিন্তু তাতে মালিকের নিষ্ঠুরতা বিন্দুমাত্রও লাঘব হতো না। প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস দাসের মনে মোটেও ছিল না। এই প্রথার সব চাইতে বীভৎস রূপ ছিল এই যে, প্রতি একশো জন পুরুষ-শ্রমিকের অমুপাতে চল্লিশ জন করে নারী-শ্রমিক সংগ্রহ করা হতো। বিবাহিত দম্পতি অতি অল্পই ভারতবর্ষ থেকে আসত। অতএব পুরুষ ও নারী-শ্রমিকের সংখ্যার এই বিপজ্জনক ভারতম্যের ফলে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায় দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল।

১৮৩৪ সালে দাসত্বপ্রথা রদ হয়। দাসত্বপ্রথার পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার উদ্ভব হয় এবং এই প্রথা অনুসারে মরিশাস, ট্রিনিডাড, জামাইকা, গ্রেনাডা, ব্রিটিশ গায়ানা প্রভৃতি উপনিবেশের ইকুবাগিচায় দলে দলে ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হয়। প্রাক্তন দাসত্বপ্রথার অধিকাংশ অনাচার এই নতুন প্রথাতেও ফুটে উঠতে থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন প্রথার কলংক পুঙ্কল প্রথার কলংককে ছাড়িয়ে যায়। মালিক যেখানে ভালো হতো, সেখানে ভারতীয় শ্রমিকরাও ভালো ব্যবহার পেত। কিন্তু মালিক যেখানে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী, সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা লাগামেরীণা জন্ম দতো। এমনি অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে কতো হতভাগ্য শ্রমিক যে আত্মহত্যা করে হুজিলাভ করত তার ইয়ত্তা নেই। বাগিচা-স্বাধীনতার দুর্নীতি হুজিগ্যকে আরো গভীরতর করে ঢুকায়।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



রেজোনা সাবান

আপনার ত্বককে
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেজোনা সাবান দিয়ে মুখ
যোবেন—আপনার ত্বক আরও মৃদু, আরও মোলায়েম
সেখাবে। তার কারণ, রেজোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কডেকটি স্টেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাগপকে
মৃদু করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেজোনায়
সবের মত কেণা সাবুন সেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্মে... রেজোনা



রেজোনা সো, লি, অস্ট্রেলিয়ার গবেষণা বিভাগ দ্বারা তৈরি, কর্তৃক আরও প্রমাণ

১৯৬৬-১৯৬৭

কখনো বা পৌছতো নারীহত্যা ও পুরুষের আত্মহত্যার ভাষকের পরিণতিতে। এই সমস্ত হত্যালীলার আশ-কাটা ধারালো ছুরি সাধারণত ব্যবহৃত হতো। সরকারী তথ্য থেকেই জানা যায় যে বিভিন্ন ব্লিশ উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ও আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় শ্রমিককে বাগিচার দাসত্বে শৃঙ্খলিত রাখার জন্তে নাটাল সরকার যে তিন পাউণ্ড মুক্তিকর প্রবর্তন করেছিল এই কর অত্যন্ত ও মানবতাবিরোধী বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই করের প্রধান সমর্থক ছিল ইউরোপীয়ানরা। জেনারাল বোথা বা জেনারাল স্মাটস, ক্ষমতার আসীন থাকার সঙ্গেও উক্তদের কেহই ইউরোপীয়ানদের চাটরে এই কর রদ করবার নির্দেশ দিতে পারেননি। মনে মনে তাঁদের অবস্থা ইচ্ছা ছিল, গোখেল বখন দক্ষিণ-আফ্রিকার যান তখন তাঁরা গোখেলকে মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা বাথতে পারেননি।

এই অস্ত্র করের রদ করবার জন্তে সমস্ত প্রকার আবেদন নিবেদন বখন বার্ষ হোলো তখন মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীরা অহিংস অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। উক্তর নাটালের করলা খনি অঞ্চল থেকে একদিন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে সংযত করে গান্ধীজী তাঁর সত্যগ্রহের বাহিনী গঠন করলেন। ভারতীয়দের দুঃস্থ হৃদশার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত এই বাহিনী নিয়ে তিনি ট্রাঙ্কভাল যাত্রা করলেন। হু'হাজারের অধিক ভারতীয় পুরুষ নারী ও শিশু গান্ধীজীর নেতৃত্ব বরণ করে নিল, তাঁর পিছু পিছু ডাকেন্স বার্ষ পর্বতমালা পার হয়ে ট্রাঙ্কভাল অভিমুখে যাত্রা করল। আরো 'হাজার হাজার ভারতীয় নেতারা পরবর্তী নির্দেশের জন্ত প্রস্তুত হয়ে রইল। করলা খনি পরিত্যাগ করা এবং ট্রাঙ্কভালে প্রবেশ করা দুই কাজই বেস-আইনি, উভয় কারণেই সশ্রম কারাদণ্ডের কঠোর শাস্তি। প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও তাদের অস্ত্র আত্মীয়বন্ধুগণ এই শাস্তির কথা জানত কিন্তু তারা ভয় পেল না। দুর্গম পথযাত্রার কষ্টের সীমা নেই, কিন্তু গান্ধীজীর অমুবাতিগণের একজনও পিছন ফিরল না।

শেষ পর্বন্ত অধিকাংশ সঙ্গিই মহাত্মা গান্ধী কারাবরণ করলেন। আন্দোলনের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেউ বা জেলে কেউ বা হাজতে আবদ্ধ হোলো। নাটাল থেকে আরো ভারতীয় শ্রমিক বাগিচা ছেড়ে আন্দোলনে বোগ দিতে অগ্রসর হলে তাদের উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু হোলো, গুলী চলল নিরস্ত্র অভিযাত্রীদের উপর। ভারতবর্ষে বখন এই সব সবাদ পৌছলো, তখন উত্তেজনা চরমে উঠল। প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী সমর্থন করে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার বখন এই সংকটজনক পরিস্থিতি, গান্ধীজী ও অস্ত্র নেতারা বখন প্রত্যেকে কারাবদ্ধ, তখন গোখেল আমাকে তারমুখে অসহযোগ করলেন অবিলম্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার যাবার জন্তে। বদলে আমিই যা তখন অক্লিম রোগপথ্যার, আমি ইতিমধ্যে তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত দেশে রক্তা হছি। আমার মার জীবনে স্বার্থপরতার লেশ ছিল না। এবার তিনি তাঁর শেষ স্বার্থভাষের নিদর্শন দিলেন—আমাকে বললেন,

তাঁর কাছে না গিয়ে নাটালেই কেন আমি বাই, সেখানে ঞ ভাগ্যহৃত ভারতীয় ভগিনীদের পরম প্রয়োজনের ক্ষণে তাদের যে আমি সেবা করি। মার সঙ্গে আর আমার দেখা হোলো ন আমি দক্ষিণ-আফ্রিকার পৌছবার কিছুদিন পরেই তিনি চিকাগো ফ্রোডে আশ্রয় নিলেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ডাক্তার ফ্রাঙ্কেল পিয়ার্সট পুত্র উইলি পিয়ার্সন নাটাল যাত্রার আমার সাথী হোলো। উইলি মা কোরেকার ছিলেন। দিল্লীতে উইলি আমার বনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তাঁর আত্মব ব্যবহারে সে আমাকে এবার চমৎকৃত করে দিল ভাড়াছড়ো করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিছি,—কেন না দেরি করব সময় নেই, সেদিন মধ্যরাত্রেই দিল্লী থেকে যাত্রা করতে হবে, নইট জাহাজ পাব না। উইলি আমার কাছে এসে বললে,—তোমা বাওয়ার আগে একটি উপহার তোমাকে দিতে চাই। জা প্রশ্ন করলাম,—উপহার ?

উইলি বললে,—এই যে, উপহার তোমার সামনেই উপস্থিত-আমি।

তারপর তার সে কী উল্লাসভরা হাসি !

তার এই কৌতুকভরা আশ্র-উপহার তার উজ্জল চরিত্র-মুখেরে প্রতীক। তার মতো অকপট বন্ধু ও বিশ্বস্ত অনুচর আমি ইতিপূ পাইনি। নাটালে পৌছলো মাত্র সে মুহূর্তে সেখানকার ভারতীয়েরে অন্তর জয় করে নিয়েছিল। তাঁরের আশ্রয় পরিত্যাগ করে বিচি সমুদ্রযাত্রা আমার আরম্ভ হোলো,—এই সব যাত্রার উইলি ছিল আমা প্রধান সহায়। আমার জীবনের গভীরতম আঘাত আমি পা বখন ১৯২৪ সালে ইটালিতে এক চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে উঠি মারা যায়। তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্তেই এই শো অসহনীয় হয়েছিল।

কলকাতা থেকে ডারবান যাত্রার পথে অধিকাংশ দিন আমাদে জাহাজ প্রবল ঝটিকের পিছনে পিছনে চলল। ফলে ডারবান পৌছ আমাদের পাঁচ দিন দেরি হয়ে গেল। তাঁরে পৌছতে পরম বিষয়ে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, জাহাজঘাটে মহাত্মা গান্ধী আমাদের জন্তে অপেক্ষ করছেন। জেনারেল স্মাটস মীমাংসা চান, তাই তিনি বিনা স গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়েছেন। বুঝলাম, অসমর্থনীয় পোলটোরে বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর আপত্তিক উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় নিগ্রহের মূল রহস্ত কী, তা বুঝে আমাদের কিছুমাত্র দেরি হোলো না। মূল কারণ জাতিভেদ আ বর্ণবিষয়ে। ভারতীয়া কৃষ্ণকায় জাতি ;—একমাত্র বাগিচার মালিক হাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্য সমস্ত ইউরোপীয়ানরা চাইত ভারতীয়দে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে দূর করে দিতে। ভারতীয় শ্রমিকদের কেন আমাদানী করা হয়েছিল, এই ছিল তাদের ম্হা হৃদয়। আফ্রিকা অস্ত্র কৃষ্ণকায় জাতিভেদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক হীনতার মধ্যে জীবন কাটাতে হোলো,—ইউরোপীয়ানদের উদ্দেশ্য হোলো ভারতীয়রাও যতোদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার থাকবে, ততোদিন তাদেরও বর্ণমালিক্তের হীনতা মেনে নিয়ে নিকৃষ্ট অবস্থার থাকবে হবে।

দিল্লীতে স্বেচ্ছা ক্রীকসের সঙ্গে শিমলা পাহাড়ে বখন আমি ছিল

তখন খুটান-সম্রাটের মধ্যে জাত্যভিমান ও বর্ণবিষেবের প্রভাব আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিল। জাতির বাধা আর বর্ণের বাধা মানুষ আর মানুষের মধ্যে প্রচীর তুলবে,—আমি ভাবতাম প্রকৃত খুটান হয়ে এই বাধাকে আমি মেনে নেব কেমন করে? এই বাধার ফলে পৃথিবীতে এমনি এক জাতিভেদ প্রথাও সৃষ্টি হবে যা আমার প্রত্ন বীজধূট চাননি। তিনি বলেছিলেন, মানুষে মানুষে ভাই ভাই আর সর্বমানবের পরমপিতা ঈশ্বর। এই জাতিভেদের ফলে খুটীয় বিশ্বসমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ধর্মের ঐক্যকে থান কান করে দেবে জাত্যভিমানের অস্ত্র। সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের মৌলিক দাবীর জন্য তুসে আত্মবিসর্জন করেছিলেন খুট। কিন্তু খুটান হয়েও চুই জাতি পাশাপাশি বসে উপাসনা করতে পারে না। আমি ভাবতাম এ কী আমার করছি, কোন সর্বনাশা পথে আমরা চলছি। খুটান হয়ে খুটের মুখে কলকলেপন করে নৃতন করে কি আবার তাঁকে ক্রুস-বিক্ত করব?

ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেও আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম যে ইহুদীদের জাতীয় ক্রুপাশ্রয়তা যখন প্রাথমিক খুটীয় সমাজকে বিধগ্নিত করতে উজ্জত হয়েছিল, তখন এই বিপদকে প্রতিহত করবার জন্যে খুটশিষ্য পল এমন কি সাধু পিটারেরও মুখোমুখি ঠাঁড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধ সাবধানবাণী পলের পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে।

নিউ টেষ্টামেন্টের অজ্ঞাতম প্রাধান্য ও প্রত্যক শিক্ষা জাতিভেদকে পরিহার করার শিক্ষা। জাতি মিলনের বাণী খুটের দ্ব্যর্থবিহীন সুস্পষ্ট বাণী। সাধু পল লিখেছেন,—“বীজের দৃষ্টিতে ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই, আর নেই—অনার্য নেই,—প্রত্ন নেই, দাস নেই, খুটই সর্বশ্র এবং সকলের মধ্যেই তিনি বর্তমান।”

কিন্তু যখন আমি নাটালে পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে মানুষে মানুষে যে বৈষম্যকে আপ্রাণ প্রতিহত করতে সাধু পল চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক সেই বৈষম্য নাটালের খুটীয় সমাজকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। খুটীয় সমাজের মধ্যে জাতিভেদ যে কেবলমাত্র সরকারী কাজে কর্মে প্রকাশ পুচ্ছে তাই নয়, এই অজ্ঞায়কে আইনের সাহায্যে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে গৃহক পৃথক গির্জা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জাতিতে জাতিতে সামাজিক গণ্ডিবদ্ধতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, জনমতও এই ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে।

এই ভেদবুদ্ধির বীজ উগ্ধ হয়েছিল অতীতে, যখন যুর শাসনের যুগে আইন ছিল যে রাষ্ট্রে বা ধর্মে যেতকার কুরুকারদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই, উভয়কে কিছুতেই সমদৃষ্টিতে দেখা হবে না। সেই অতীত কল্যেকের দায়ভার গ্রহণ করে সেই একই নীতীহীন পন্থা নাটালের খুট আবিবাসীরাও বহন করেছে এবং একই প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা করেছে।

প্রথম যেদিন আমরা ভারবাসে পৌঁছলাম সেই দিনই এই জাতিভেদের কুরুকার আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ল। তারপর অবিলম্বে দিনে দিনে এই সংস্কারের নানা কুসংস্কৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হতে লাগল। এই পাশ বিলাস সঙ্কলনের মতো সুস্থ সমাজসংস্কারের সঙ্গে অনেক ছড়ির পাক। এই

সংকল্প খন্ডিন-আফ্রিকায় অনেক দিন থেকে তরু হয়েছিল এবং এই ব্যাপিকে বোধ করবার চেষ্টাও বলতে গেলে কিছুই হয়নি। খুটীয় লম্বাজের বিভিন্ন শাখার গভীরে এই বিষ বাসা বেঁধেছিল।

এ ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অতি স্পষ্ট,—ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। আমাদের পক্ষে অতি লজ্জার কথা যে খুটীয় ধর্মসমাজ এ পর্যন্ত এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিতান্ত ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মৌখিক ধর্মবাক্যের সঙ্গে ব্যবহারিক আচরণের কোনো সঙ্গ না থাকায় জন্তে এই চর্ণক আত্ম-অবিবাসী প্রতিবাদ কার্যকরী হয়নি।

এক খুটান গির্জার বাজনা করার নিমন্ত্রণ আমি পেরেছিলাম। মহাশয় গান্ধী আমার বাজনা শুনেতে চেয়েছিলেন বলে উইলি পিরার্স তাঁকে গির্জার নিয়ে এসেছিল। পরে আমি জানলাম যে পাকিস্তানী কুরুকার এগিয়াবাসী বলে তাঁকে গির্জার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় আমার লজ্জার পরিসীমা ছিল না। আমার মনে হয়েছিল স্বয়ং বীজধূটকে যেন তাঁর আপন মানিরদ্বার থেকে ওরা দূর করে দিয়েছে। কিন্তু এখনি ঘটনাই দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেতকার খুটানদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

কিছুদিন পরের আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি কেশ টাউনে গিয়েছি। শুনেছিলাম, নাটাল অপেক্ষা কেশ টাউনে বর্ণবিষেবের উন্মাদ অনেক কম। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



এটি পাঁচ
২৫ টি
১৫ আন্সের

- কলমে প্রস্তুত
- সীমে সঁক
- মসিনে প্যাক
- ও ফলি করা

আপনার স্বাস্থ্য, চাপ্তি
ও সর্বস্ব রক্ষা করিতে

আর্য্য বেকরি আর্য্য কম্বফেকশনারী
কলিকাতা - ২০

আমাকে দেখাভাড়া, কববার জন্তে গাঁদীকী তাঁর পুত্র মণিলালকে আমার সঙ্গে নিয়েছিলেন।

মণিলাল যে কী ভাবে আমার সেবা-দত্ত করেছিল তা বলবার নয়। আমিও তাকে পূত্রাদিক স্নেহ করতাম। এক দিন মণিলাল অতি উৎসাহে আমাকে বলল, এক দিন কোনো গির্জার বসে আমার উপদেশ সে শুনেবে এই তার বড়ো সাধ। সহরের উপকণ্ঠে একটি গির্জা ছিল, সেখানকার ধর্মবাজক ছিলেন ভারতীয়দের মুন্সেফ। সেই গির্জার আমি মণিলালকে নিয়ে গেলাম।

এই গির্জার বাজক আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। প্রার্থনা-সভা আরম্ভ হবার আগে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে ও মণিলালকে চা খাওয়ালেন। এ পর্বন্ত ভালোয় ভালোয় কাটল দেখে আমি প্রস্তুত করলাম প্রার্থনাসভার মণিলালকে নিয়ে যাব। ধর্মবাজকের মুখ ভার হোলো এ কথা শুনে। তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আশ্রয় করলে উপাসকমণ্ডলী। শেতকার উপাসকদের পাশাপাশি গির্জার মধ্যে বসে কোনো ভারতীয় বালক বাঙালি প্রবেশ করবে—অসম্ভব এ প্রস্তাব। কিন্তু বেচারী মণিলালের আকাঙ্ক্ষা আমি মিটাই কী করে? শেষ পর্বন্ত একটা আপোষ মীমাংসা হোলো। মণিলাল গির্জার চুকবে না, গির্জার দোরগোড়ায় বসে কান পেতে ধর্মোপদেশ শুনেবে।

একের পর এক এমনিধারা নানা ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হতে লাগল। একটি ঘটনার কথা বলব, কারণ ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

কেপ টাউনের সেন্ট জন গির্জার কোনো বর্ণবিভেদ ছিল না। এক রবিবার প্রত্যুষে আমি সেই গির্জার হোলি কমিউনিয়নে যোগ দিলাম। যুগের পূর্তাবশেষ সমস্ত উপাসক গ্রহণ করেছেন, এবার আমার ধর্মোপদেশ দানের পালা। হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিশীর্ণা বৃদ্ধা নিম্নো মহিলা প্রার্থনাসভার শেষ প্রান্ত থেকে লুপ্ত চরণে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। সমস্ত ইউরোপীয়ান উপাসকরা যতোকণ মা নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসেন ততোকণ এ কুসকারী বৃদ্ধা সকলের পিছনে অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে পূর্তাবশেষ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। গভীরতম ভক্তিতে মাথা নিচু করে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসলেন। সহসা আমার মনে হোলো এই নতজান্না নিম্নো বৃদ্ধার মূর্তি যে সমস্ত আফ্রিকা ব্রহ্মদেশের আত্মার প্রতীক,—যে আত্মা ইউরোপের অগণিত আত্মাদের বেননার মুহম্মান নতশির। বিনয় সহিষ্ণুতার অনন্ত শক্তি দিয়ে শ্রেষ্ঠ জাতির এই অশেষ আত্মাকে আফ্রিকা আপন শিরে গ্রহণ করেছে, এই নির্ধাক নিরুজ শক্তির মতোই নিহিত রয়েছে আফ্রিকার আসল বক্তির শ্রেষ্ঠ অধিকার।

এই গির্জার ধর্মোপদেশ দানের জন্তে এখানকার ভীন আমাকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু চারিদিকে দিনে দিনে যে সব নিষ্ঠুর বৃদ্ধ আমি দেখছি তাতে আমার সমস্ত অন্তর তরঙ্গিত হচ্ছে। আমি বললাম এই আফ্রিকা পরমপিতা একেশ্বরকে ডুবিয়ে, তার বলতে এখানে দুই দেবতার স্থান। এক দেবতার নাম স্বর্ঘ্যদেবতা, আর এক দেবতার নাম বর্ষাঋতু। বর্ষাঋতু নামে কলতে গিয়ে এই উপাসনা-গভীর আমার মনোম সমস্ত পুণ্ড্রিত অজ্ঞানত্ব সেদিন আমি প্রকাশ করে ফেললাম।

পরে আমার সমস্ত মন এক গভীর হতাশায় ডুবে গেল। মনে হোলো, এই উপাসনাসভা, এ বেন এক খেতপাখরের কটন সেয়াল, এই সেয়ালে একটি মাত্র রেখাপাতও আমি করতে পারিনি। তবে একটি লাভ হোলো আমার। বিধান-সভায় সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত জে, এন্ড, মেরিট্যান আমাকে একটি সম্বন্ধ পত্র লিখে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি লিখলেন,—আপনি জেনে রাখুন যে, এই আফ্রিকাতে এখনো দু-একজন আছেন ধীর ঈশ্বরের নামে শরতানের কাছে মাথা পাতেনি। এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন সাধু আছেন, ধীর সঙ্গে আপনায় সাক্ষাৎ হলে আমি খুশী হব। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম।

এই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মালোনাল্যান্ডের আর্থার শার্লি ক্রিপস। অল্পকোণে তাঁর শিক্ষা, তরুণ বয়স, অপূর্ব কাব্য-প্রতিভা অধিকারী। আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে সরল অনাড়ম্বর খৃষ্টীয় জীবন তিনি বাপন করেন। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ও ক্রমে এই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্ব পরিণত হয়।

আফ্রিকার বাটু আদিবাসীদের আমি এই সময় সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে শিখি। তাদের শীর্ণশ্রান্ত মুখে তাদের শতাব্দীপরে বেদনা আমি অনুভব করি। আফ্রিকার মর্মহস্তের প্রখা পরিচয় আমি লাভ করি অলিভ শ্রাইনারের কাছ থেকে তারপর দক্ষিণ-আফ্রিকার আর এক মহিলার কাছে আমি এই শিক্ষা পূর্ণিত হয়। এই মহিলা মিস মণ্টেনো। অলিভ শ্রাইনারের মতো এই মহিলাও শরতানের কাছে আত্মমর্গ করেননি কোনো দিন। দুর্গত ও উল্লীড়িতের হয়ে সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামের চিহ্ন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব চলে, তাঁর মুখের অসংখ্য বলিরেখার।

ভারতীয়দের এক সভায় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি “দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমরা থাকতে চাও আমি জানি। কিন্তু এ জগৎ যদি নির্ধাক্ত বরণে প্রস্তুত না হও তাহলে জননী আফ্রিকা উপযুক্ত সম্ভান বলে দাবী করতে তোমরা পারবে না। নির্ধাক্ত বরণ আমাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার—সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ। আফ্রিকাতে যদি থাকতে চাও, তাহলে এ আফ্রিকাকে মাতৃভূমি বলে মানতে হবে, নির্ধাক্ততা জননীর সন্য বেদনাকে বহন করতে হবে।

ভারতীয়দের কাছে মিস মণ্টেনো তাঁর জীবনের কাহিনী বল লাগলেন। বুয়র সেরে তিনি, বাস করতেন এক নির্জন গোল বাড়িতে। চারিদিকে নিশ্চূর্ণ পর্বতমালা, দামে মায়ে কোণ বহলা, রাত্রির নিসীম অন্ধকারে আকাশভরা অসংখ্য নক্ষত্র আলোক-ইঙ্গিত। মুষ্টিমেয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিল তাঁর বাগা আসা। সেই বৈচিত্র্যহীন দীন পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটাতে এই ছায়াভূমি আফ্রিকার আত্মশক্তির ত্রিধারাকে জি উপলব্ধি করলেন।

একটি শক্তিশালী সঙ্গীত। এই মেঘের আকাশ ও লাভ পূর্ণ ছায়ার অশ্রুদেশে ব্রুটিণ ও ওলন্দাজের করুণ কণ্ঠও কোমল হ বার। হাছকের কণ্ঠ নিরুজ প্রেমসঙ্গীত কেনন ভাবে আফ্রিকা

মানবাত্মকে নাজি দিতে পারে, এমন আর কিছুই পারে না। অন্তরের সমস্ত ভিত্তিকতাকে সত্যিদের প্রাণে হরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় শক্তি বেৎনাবাসী। আফ্রিকা বস্তু নির্ধাতন সহ করেছে পৃথিবীর কোনো দেশ কোনো মহাদেশ তা করেনি। কিন্তু এতো নির্ধাতনেও আফ্রিকার স্বয়ং কঠিন হয়নি, কোমলই হয়েছে। বহু যুগের সহিষ্ণুতার দ্বারা নিবিক্ত তাদের বেৎনা-কল্প ভাষা এক দিন বিধমানবের মর্মে গিয়ে পৌঁছবেই।

তৃতীয় শক্তি আফ্রিকার নারীজাতির নৈতিক শক্তি। অল্প ভবিষ্যতে এই শক্তিরও পূর্ণ প্রকাশ হবে। সারা পৃথিবীতে সর্বত্র নারীজাতিই সর্বত্র বোঝা বহন করে। আফ্রিকার নারীর মতো এতো গুরুভার বোঝা কোনো নারী বহন করে নি। দুর্ব্ব ভার ও দুর্ব্বিহ বেৎনার অগ্নিপরীকার আফ্রিকার নারী-চরিত্র নিকষিত স্বর্ণের পবিত্রতা লাভ করেছে।

মিস মন্টেনো যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন তাঁর বেৎনা-বিধব মুখের দিকে একদৃষ্টে আমি তাকিয়ে ছিলাম। আফ্রিকার ভূমিতলে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমি আবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম যে খুঁটের বাগী সর্বযুগে প্রসারিত, খুঁটের আশীর্বাদ সর্বজাতির অধিকার। আরো উপলব্ধি করেছিলাম যে প্রেমই সর্বশক্তিমান, সন্নিহিত বিকোভের শক্তিও এই শক্তির কাছে নান। এই প্রেমের শক্তি বলেই আফ্রিকার যুগসন্ধিত বন্ধনার অবদান সম্বর।

মিস মন্টেনো বলেছিলেন, আফ্রিকাবাসীর নির্ধাতন বরণ ঈশ্বরদত্ত অধিকার। কয়েক দিন পরে নাটোলে একটি অন্তরঃস্পর্শ ঘটনার মিস মন্টেনোর এই কথার তাৎপর্য আমি প্রত্যাক করেছিলাম।

ভারবানের ভারতীর সমাজ আমার জন্ত একটি বিদার-সভার আয়োজন করেছিলেন। লক্ষ্য করলাম, এই সভায় কয়েক জন ছলু উপস্থিত। এর পূর্বেও অসংখ্য সভায় কিছু কিছু ছলুকে আমি দেখেছি। আমি যখন-বহুতা দিতাম তখন তারা শুভ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের হাবভাবের গভীর মধ্যার প্রকাশ ও মুখমণ্ডলে গভীর বেৎনার ছায়া আমাকে আকৃষ্ট করত।

এই বিদায়সভার অবসানে আমি মিঞা খান নামক এক বৃদ্ধ মুসলমানের লোকানে কিয়ে গেলাম। এইখানেই আমি থাকতাম। মিঞা খানের সঙ্গে চা পান করতে বসেছি এমন সময় হুজুন ছলুমেতা সেখানে এসে উপস্থিত হোলো। আমরা তাদের আমাদের সঙ্গে চা পান করতে নিমন্ত্রণ করলাম। তখন একজন ছলু আমার দিকে নিদেশ করে মিঞা খানকে স্থানীয় ভাষায় বললে, আমরা একে একটা প্রাণ করতে পারি ?

মিঞা খান আমাকে বুঝিয়ে বলতে আমি বললাম, নিশ্চয়ই, আপনি অকপটে বলুন কী আপনার প্রাণ ?

আমার দিকে ফিরে সেই ছলুমেতা তখন বললে, ভারতীয়দের সঙ্গে আপনি যখন কথা বলেন তখন আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমরা বৃদ্ধতে পারি যে তাদের জন্তে প্রাণ দিতে আপনার প্রস্তুত। আমাদের জন্তেও প্রাণ দিতে কি আপনি পারেন ?

আমি এই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন এতো বেৎনা-উল্লীষ যে মোহা! বুকের মধ্যে গিয়ে বেঁচে। এই প্রশ্ন এতো সহজ যে সহজ উত্তর

হাওয়া এর কোনো উত্তর নেই। স্বপ্নের সমস্ত আভবিক্রম নিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর কেমন ভাষায় দেবে, তাই ভাবতে আমার এক মুহূর্ত দেবি হোলো। তারপর দিক্‌তি না করে সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দিলাম। বললাম, হ্যাঁ পারি। সময় বেগিন আসবে সেদিন আপনার জন্তেও প্রাণ দেবার জন্তে আমি প্রস্তুত।

উত্তর দিতে মুহূর্তখান দেবি হয়েছিল আমার। সেই মুহূর্তে চকিত বিদ্রোহ-বিকাশের মতো এই সভা আমার অন্তরে উদ্‌বাচিত হয়েছিল যে, বীতর দেবার জাতিভেদের স্থান নেই, তাঁর দৃষ্টিতে সব বাহুবই সমান। তাঁর অনন্ত প্রেমসমুদ্রে সর্বজাতির সর্বগণা এসে মিশেছে।

আর একজন মহাপ্রাণবতী মহিলার সঙ্গে আমার এখানে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ডবলু ই গ্র্যাডফোর্ডের কন্যা মিসেস ডু। তাঁর জ্ঞাত লর্ড গ্র্যাডফোর্ড ছিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল। ভারতীয় সমাজের এই সংগ্রামে তাঁর আভ্যন্তরিক সমর্থন ছিল এবং তিনি নীরবে তার জ্ঞাতাকে সাহায্য করতেন। দুর্গত মানবাত্মার গভীর বন্ধনকে তিনি সমস্ত অন্তরে দিয়ে অক্লান্ত করেছিলেন,—তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে কল্যাণায় করে পড়ত। মহাশয় গান্ধী ও গান্ধী-পত্নীর প্রতি তাঁর সহস্রভূতিপূর্ণ কথাবার্তার আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতাম।

মহাশয় গান্ধীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এই দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সেই প্রথম লক্ষ্যেই আমাদের উভয় দ্বন্দ্ব এক অদ্বৈত বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়,—সে যখন এ জীবনে কখনো শিথিল হবে না। আমাদের দুজনের স্বপ্নের মাঝখানে যে প্রেম-বন্ধনিকী প্রবাহিত,—সে ভ্রোতে কোনো ভাঁটা নেই।

মহাশয় গান্ধীর বেৎনাক্রিষ্ট কঠোর জীবনের মধ্যে আমি প্রত্যাক করেছি নির্ধাতন-সহিষ্ণুতার সর্বগভীর গুরুশক্তি। গান্ধীজীর স্পর্শে এসে আমি ভরকে জর করতে শিখেছি। অস্বিকৃতির স্পর্শে প্রবীণ যেমন বলে, আমার চরিত্রের বা কিছু নিরুপ্ত ভজবোধ তাঁর চরিত্র-স্পর্শে তেমনি জাগ্রত হয়েছে, উজ্জীবিত হয়েছে আমার প্রেবধ। সামান্ততম প্রাণ বেৎনো নির্ধাতিত,—সেখানেই তাঁর অনন্ত মনকভলা প্রাণ ছুটে গেছে। এমনি ভাবে অবিশ্রাম ছুটে ছুটে তাঁর হৃৎ-সন্ধানী আশা বিরামহীন আবেগে সেই অনির্বচনীয়েই সন্ধান করেছে,—বীর মায় সত্য, বীর অপার নাম ঈশ্বর।

ডাঃ বকুর

অশোক কার্ডিয়াল

কার্ডিও-থ্যাডা, শক্তি ও পৌর্কর্ম বর্ধন করে

ডাক্তার ডিউককর:

ডাঃ বকুর ল্যাবরেটরী লিমিঃ

কলিকাতা-৯

একটি উচ্চ মিনের কথা মনে পড়ে। ঠাকুরভায়ে শ্রুটোরিয়া শহরের কাছে একটি নদীতীরে মহাশয়ার সঙ্গে আমি বসে আছি। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করছিলাম এই বলে, হুইটর উন্নততর প্রাণী, নিম্নতর প্রাণীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, এটা প্রকৃতির নিয়ম,—অতএব মানুষ যে পশুপক্ষী খায়, সেটা নীতিবিরুদ্ধ নয়।

গান্ধিজী আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন,—কিন্তু খুঁটান হয়ে তুমি এই যুক্তি কী করে দাও? তুমি তো বিশ্বাস করো যে পরমপ্রভু মানব-জন্তু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন জীবনকে রক্ষা করবার জন্তে, ধ্বংস করবার জন্তে নয়। তোমাকে আমাকে সকলকে রক্ষা করবার জন্তেই যীশুখৃষ্ট আত্মবলিদানকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তবে? জীবন নেওয়া নয়, জীবন দেওয়া,—এই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য নয়?

তাঁর এই কয়েকটি কথার মধ্যেই গান্ধিজীর জীবনসত্যকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। গান্ধিজীর জীবনের ব্রত শুধু দেওয়া,—কিছু নেওয়া নয়—চরম আত্মদানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম অবিরাম শুধু দেওয়া,—এই দেওয়ার মধ্যেই অনিবার্ণ আনন্দ। প্রথম থেকেই অন্তরের স্ফূর্ত্যমুক্তি দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে গান্ধিজী একজন অশেষ ব্যক্তিকম্পের ধ্বনিতা তো নিশ্চয়ই, ধীর আহ্বানে অসংখ্য নরনারী বিগলিত চিত্তে অসহনীয় দুঃখ-বিপদকে বরণ করে নেন,—কিন্তু এইটুকুই গান্ধিজীর পরিচয় নয়। ঐ আকাশের তারাগুলি যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্বারী পঞ্চমঙ্গল যেমন সত্য, ঐ অবিদ্যমান চিরন্তন সত্যের দূর প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী। সমস্ত বাণ্য-বেদনাকে অতিক্রম করে কে? সমস্ত অন্তরকে হরণ করে কে? সমস্ত শক্তির অধিরাজ পরম শক্তি কী? অনন্ত সহিষ্ণু প্রেম। গান্ধিজীর এই একমাত্র বাণী। এই বাণী পরম সত্যের বাহ্যিক রূপ। মিস মন্টেনাও পতীর স্বদরাক্ষের সঙ্গে এই একই সত্যের প্রতিফলন করতেন। বখন তিনি বলতেন, সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ।

এই সত্যের ব্যবহারিক পরীক্ষা আমি দক্ষিণ-আফ্রিকার সাগ্রামের মধ্যে নিত্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেখানকার নিত্য-নির্ধাতিত ক্ষুদ্রকার ভারতীয় সমাজের অবস্থা দেখে প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টভক্ত-সম্প্রদায়ের কথা আমার মনে পড়ত। সহজ সরল অন্তর মানুষ ভরা সামান্য একটি গোষ্ঠী, তাদের ঘিরে বিবেচ্য ও ভোক্তাদের বিক্ষুব্ধ হলাহলবস্থা।

মহাত্মা গান্ধীর ফিনিজ আশ্রমে গিয়ে প্রথম দিনই এই চিত্র স্পষ্ট প্রতিভাত হোলো। গান্ধী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অঙ্গবর্তীরা এই আশ্রমে তাঁদের ধর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন। শিশুদের মহাত্মা বড়ো ব্রহ্ম করতেন। শ্রীযুক্ত গান্ধী ও তাঁর পুত্ররা তখনো কারাক্ষত। আমি গিয়ে দেখলাম, এই নিরাস্ত্রীয় মানুষদিকে ক্রিয় শিশুর হল ঘিরে

রয়েছে। ভারতের অজুৎ সমাজের একটি শিশুকল্যাণে কোলে নিয়ে তিনি বসে আছেন; আর একটি কণ্ঠ পঙ্কু মুসলমান বালক তাঁর কোলের একটি কোণ দখল করবার চেষ্টা করছে। আমাদের সঙ্গে আহার করবার জন্তে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে একটি জুলু খুঁটান রমণী।

সেদিন সন্ধ্যার অনেক আলোচনা হোলো। ব্রিটিশ ও ব্যুরসের সম্বন্ধেও অনেক কথা হোলো, কিন্তু কোনো কথার হিসাব নেই উদ্ভা নেই, ছালা নেই। দিনান্তের সেই অবসর অন্ধকারে ধর্মগ্রন্থের কয়েকটি কথা কেবলই আমার মনে পড়তে লাগল,—

"যারা বিশ্বাস করে, তাদের এক প্রাণ এক আত্মা; তারা একসঙ্গে আহার করে; প্রভুর নামে দুঃখবরণের জন্তে তারা নির্ধাতিত হয়েছে সেই একই আনন্দে তারা বিভোর হয়।" সরকারী পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও চুক্তিদাস-প্রথার বীভৎস রূপের সঙ্গে পরিচয় সকলেই আমার পরিচয় হোলো। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি বেড়াতে বাঁ'র হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা ইক্ষু-বাগিচার ধারে একটি মূর্তি আমাদের চোখে পড়ল। পথের পাশে গুঁড়ি মেরে রয়েছে একটা লোক। মহাত্মা গান্ধীর কাছে এসে সে তাঁর পদ-ধূলি নিল ও নিজের নয় পিঠটা ধুলে তাঁকে দেখাল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে সমস্ত পিঠটা ক্ষতবিক্ষত। বুঝলাম, অজ্ঞাতারে জর্জরিত হয়ে লোকটা বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছে ও মহাত্মা গান্ধীর আশ্রয় চাইছে। আমি কিছুটা পিছনে ছিলাম, এমন লোকটির পিঠের ক্ষতগুলি পরীক্ষা করবার জন্তে সামনে এগিয়ে এলাম। লোকটি বখনই দেখল আমি ইউরোপীয়ান, তখন সে আতকে কঁকড়ে গেল, এই বৃষ্টি আমার তাকে আমি মারব। আমি শেতকার হলেও তার শত্রু নই, বন্ধু, এ কথা তাকে বৃষ্টিয়ে বলা সহজ হোলো না। আমি বখন প্রথম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তার চোখের সেই ভয়াবহ বিহ্বল দৃষ্টি বহু দিন আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

চারিদিকের এই সব ঘটনা ও দৃষ্টের মাঝখানে দেশ থেকে সেই তারবার্তাটি এসে পৌঁছলো, যেটি আসবে বলে সমানে আমি ভয় করছিলাম। আমার মা আর-ইহজগতে নেই। নিরাস্ত্রীয় বিদেশে বসে এই সংবাদ আমি পেলাম। তখন শ্রীযুক্ত গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় জননী আমাকে মাছুবিরোগ-শোকে সাহ্বনা দিতে এসেন। ভারতীয় জননীরা, প্রেমময়ী সাহ্বনাশ্রিতা তোমরা, বিদেশী সন্তানকে কী পরিচয় ব্রহ্মব্রহ্মদানে তোমরা ভূত করবে। শোকের মর্মান্তিক আঘাতে যে কল্প সাহ্বনাশ্রিতা যে অকপট ভালোবাসায় তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করবে, সে অপরিণোদ্য বণ সারাজীবনে আমি ভুলব না। [ক্রন্দনঃ]

অনুবাদক : নির্দলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল
বহুল বহু

ভুলের হুঁড়ি যেমন খাঁকে নিলান হোয়ে মন্ত আশন পাছে,
তেননি তুমি নীরব কোয়ে গুজরিত তোমার স্বপ্ন-বাণী।

ভুলের 'পরে ভুল কয়েছে তাই ত্রো তোমার পতীর কোরে চাই,
আমায় তুমি কমা কোরে—ভুল কোয়েছি বৃদ্ধতে পারি নাই।

আবার **আশ্চর্য্যজনক** সুস্থবোধ করুন!



ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরিচিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্ত বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বৃকে শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্ত চিকিৎসকেরা অমুমোদন করেন।



এখন হুর্নি-নিরোধক কাশি
এক নূতন লাল লেবেলযুক্ত
বোতলে পাওয়া যায়।

এখনে লাল বোতল কল
করিয়া কেওরা হইরাছে।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন



বঙ্গপুত্রী

হুপিও বিকেল থেকেই আকাশের চোরা তাল ছিল না, কেমন বেন মুখ তার করে গভীর হয়ে বসেছিল, তবু সন্ধ্যা না ই বে এরকম ছড়ছড় করে বৃষ্টি এসে পড়বে তা কমলেশ মোটেই ভাবেনি। ভাবলে অন্তত এই হুধোগের মধ্যে একলা হোট্টেলে ফেরবার চেষ্টা করত না। বিশেষ করে এ অঞ্চলে ও যখন নতুন সোক, পথঘাটও ভাল করে চেনা নেই।

সহর থেকে চার মাইল ঘুরে নতুন গড়ে উঠেছে এক কলোনী। অনেকগুলি পরিবার দ্বারা প্রেমের সজ্জা স্রবন ভাবন ভালবাসে, সহরের মধ্যে বাস করতে তাদের প্রাণ ধাঁপিয়ে ওঠে, তারাই শুধু এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জমি অনেকখানি, তারই মধ্যে ছোট ছোট সব বাড়ী, কম করে পঞ্চাশটি সঙ্গার এখানে থাকে। এখানকার ছেলে বুড়ো সবাই কাজ করে কলোনির জন্তে, বার বেরকম ক্ষমতা। গাঁয়ের ছেলেদের পড়বার সুবিধের জন্তে এই কলোনী থেকেই করা হয়েছে স্কুল, আর তার সঙ্গে লাগোয়া হোটেল। কমলেশ এই হোট্টেলেই থাকে।

কমলেশের বয়স বছর চৌদ্দ। মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করছিল কলকাতার। বাবা কাজ করেন মকদ্দমলে, তার

উপর বাকির চাকরি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। কমলেশেরই মুখের হাত সবচেয়ে বেশী কতবার সে স্কুল পালাটাবে? কলকাতার থেকে তার সেই সুবিধা হয়েছে বেশ কয়েক বছর, একই ছুটে পড়তে পারছে। কিন্তু তা হলে হবে কি, কলকাতার স্কুলে আর বা কিছুই হোক না কেন পড়াশুনাটা হয় না। ছেলেরা সব তৈরী হয়ে থাকে, কোনরকম ছুতো পোনে হয়, তাহলেই ওরা ঠাইক করে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবে। কোরী মাটির মশাইরা "আর কি করবেন, হচ্ছে থাকলেও পড়াবেন কাকে? প্রথম প্রথম কমলেশও অন্তরের সঙ্গে ঠাইক করেছে, হৈ হৈ করে আনন্দ পেয়েছে, ঠাইক করে রাড়ী এসে গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছে। কিন্তু তার মতামত ক্রমশ বদলে গিয়েছিল সদাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে। সদাশঙ্কর বুঝি কোন কলেজে পড়তো কিন্তু তার বুদ্ধি কলেজের সীমা ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো বহু ঘুরে। শুধন থেকেই নিজের মতামত লিখতো, বিভিন্ন কাগজে প্রকাশ করতো। কমলেশের সদাশঙ্করকে খুব বেশী ভাল লাগত। সব জিনিষকে এত সহজ করে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা সে আর অন্য লোকের মধ্যে দেখেনি।

সদাশঙ্করের অনেকগুলো কথা সে আঁকও ভুলতে পারে না, কত সময় মিষ্ট হেসে, বলতেন, স্কুল ঠাইক করে কি লাভ? তোমরা এখন ছাত্র, যদি পড়াশুনা না কর, দেশের কি কাজে লাগবে বলতে পারো?

কমলেশ হয়ত কখনও তর্কের খাতিরে বলেছে, তা বলে অন্যের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব না?

—তা করবে না কেন? কিন্তু ইচ্ছা কি সোচ্চ করল, ঠাইক করে ছেলেরা তো সিনেমার গিয়ে ভীড় করে। তাতে কি লাভ? চল তুমি আমার সঙ্গে একদিন, আমরা যে কলোনীতে থাকি, সেখানে একটা স্কুল খুলেছি, ছেলেরা কি বকম পড়াশুনা করে দেখলে তুমি খুসী হবে। এর নাম দিয়েছি বিদ্যাপীঠ।

কমলেশ সেই প্রথম শুনেছিল বিদ্যাপীঠের কথা। একদিন শঙ্করদা'র সঙ্গে গিয়ে দেখেও এসেছিল। ভাল লেগেছিল। তার কিছু এখানে এসে যে পড়াশুনা করবে তা সে মোটেই ভাবেনি। বার মাকে অস্বস্তি সে উচ্ছ্বাসভরে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, শঙ্করদা'র এই আশ্বাস স্কুলের কথা, কিন্তু কোন জায়গায় লেখেনি সেখানে গিয়ে একলা হোট্টেলে থেকে তার পড়বার ইচ্ছা আছে। বরং তার বাবাই লিখেছিলেন, তোমার শঙ্করদা'র বড় ভাল ছেলে, যদি চাও, তুমি এসব বিদ্যাপীঠে পড়তে পার, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

দিন প্রায়ত ঐ

বঙ্গপুত্রী

বিভাগীয়ে বাবার কথা, তখন না উঠলেও কয়েক মাসের মধ্যেই কমলেশ বিব্রত হয়ে ওঠেন। তার প্রধান কারণ অবশ্য প্রোভান্স আর তার দিদি রেণুকা। কলকাতার এসে খুসে ঢোকায় পর থেকে আর সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশী বন্ধু হয়েছিল, সে প্রোভান্স। ওইই বয়সী ছেলে, কপা, ঝট, টানা-টানা চোখ, কেমন মেন নয়ম হোয়া। পড়াশুনার খুব ভাল না হলেও স্বভাব বড় চমৎকার। কমলেশ কত দিন ওদের বাড়ীতে গেছে। ছোট্ট হুথানা ঘরের বাসা-বাড়ী, অভাবের চিহ্ন চারিদিকে স্পষ্ট। প্রথম বৈদ্য কমলেশ ওদের বাড়ী বার প্রোভান্সের হুখে সে কি হাসি, বলেছিল, আমি জানতাম তুই ঠিক আসবি। ক্রান্তির সকলকেই তুই ভালবাসিস—

নিজের প্রোভান্সের লজ্জা পেয়েছিল কমলেশ, সেখানে আঁকা একটা ছবির দিকে চেয়ে থাকে, বাঃ বড় সুন্দর তো, কেনা বুঝি ?

—কেনা নয়, দিদির আঁকা।

—তোর দিদি আছে ?

—হ্যাঁ, আমার চেয়ে হু-তিন বছরের বড়, ওর এবার ফার্স্ট ক্লাস।

হাতে খাবারের খালা নিয়ে তাদেরই বয়সী একটি মেয়ে ঘরে ঢাকে।

প্রোভান্স জ্বালাপ করিয়ে দেয়, এই আমার দিদি।

রেণুকা সেসে জিজ্ঞেস করে কেন, আমার কথা হচ্ছিল বুঝি ?

—কি সুন্দর আপনি ছবি আঁকেন ?

—আমাকে আর আপনি কেন ভাই, তুমি বল।

সেই ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর কত দিন কমলেশ ওদের বাড়ী গেছে, প্রোভান্সের দিদি সত্যিই ভাল ছবি আঁকে। ভামল বাসায় কত অসুখের ছবি, জীবনের কত দৃশ্য। রেখার কত অমর মুহূর্তকে ধরে রেখেছে। এত ছবি, এত সুন্দর, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কমলেশ। জিজ্ঞেস করে, এগুলো প্রকাশ করা হয় না কেন ?

দিদি উত্তর দেয়, কি করে করব, আমাদের জানা-সুনা তো কেউ নেই ? কমলেশ ভাবে সত্যিই তো, জানা-পোনা না থাকলে এসেলে কিছুই করা যায় না। প্রোভান্সের বাড়ীতে এসেই কমলেশ সত্যিকারের জীবন দেখতে পেয়েছিল, প্রোভান্সরা বই পড়তে চায়, কিন্তু বই পায় না। রেণুকাদি'র ছবি আঁকার সুন্দর হাত, কিন্তু তার সুযোগ কি ? অভাব এদের সব নষ্ট করে দিচ্ছে। এদের বাড়ী বার বার এসে কমলেশের গুণ মনে হয়েছে, এখান মেন 'নেই'-এর একটা মিছিল চলেছে। কাগজ নেই, বই নেই, সুযোগ নেই। কমলেশের কত সময় মনে হয়েছে এদের যদি সে সাহায্য করতে পারত কিন্তু তার শক্তি কতটুকু, কি করতে পারে সে ?

আরও ব্যথা পেত বন্ধন সে দেখত, তারই ক্রান্তির ছেলে সুখান্তের বাড়ী। কি : বিশাল ইমারত, আসবাবের বাহুল্য, অবস্থা ক্লাসের স্টাডেন্ট। সবচেয়ে মজার কথা, সুখান্তও ছবি আঁকে, কিন্তু ছবির তলার লিখে না দিলে বোঝা যায় না, কি সে আঁকতে চেয়েছিল। অথচ এরই মধ্যে তার আঁকবার আলাদা ঘর আছে, সেখানকার মাটির মশাই আছে, কত রু, কত তুলি। সুখান্তের মাইব্রেরীতে প্রচুর বই, সব বই-এর মোকাদ্দম বলা আছে, নতুন ভাল বই বেসে পাড়িয়ে দিতে। কাচগুলোর ওপর বুলো পড়ছে, কেউ এরা নাড়াচাড়া করে বলেও বিবাস হয় না। কমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, তোরা খুব পড়াশুনা করিস ?

সুখান্ত হেসে উত্তর দেয়, আমাদের সময় কোথায় ? মশাইরা মাঝে মাঝে এসে বই নিয়ে যান।

• প্রচুর বই, অথচ পাঠক নেই। আর ওদিকে প্রোভান্স চার পড়তে অথচ বই নেই, কি সুন্দর বিচার।

সদাশঙ্করের সঙ্গে আলোচনা হয় কমলেশের, সে প্রোভান্স বলে তার কিশোর মনের কথা, সে ভেবে পায় না কেন টাকার অভাবে রেণুকাদের প্রতিভার অপমান হয়, আর প্রতিভার অভাবে সুখান্তের টাকার অপমান হয়। কেন হু' দিকেই অভাব ? কেন কেউ সম্পূর্ণ নয় ?

সদাশঙ্কর তাকে বুঝিয়ে বলত, এই যে সমাজের নিয়ম। তুমি আমি কি করতে পারি বল ? তবে চেষ্টা আমাদের করতে হবে, যাতে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে পারি।

প্রায় মাসখানেক বাসের কথা, বলা নেই, কল্পনা নেই হঠাৎ পাঁচ দিনের অনুরোধে ভুলে মারা গেলেন প্রোভান্সের বাবা। ভাল করে চিকিৎসাও করান গেল না। এই হু'টি ছোট্ট কিশোর-কিশোরীর আত্মীয়-স্বজন বারা ছিল এই কিশোরের সময় সবাই দূরে সরে গেল, পাঁচই এদের তার নিতে হয়। সেই সময় কমলেশ দিন-রাত এসেছে এদের বাড়ী, যতরকম ভাবে সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করছে। রেণুকা ওর হাত ধরে বলত, তুই না থাকলে আমাদের কি হ'ত বলত কমল, বাবা যে এভাবে হঠাৎ চলে যাবেন, বেচারী প্রোভান্স, ওকে এই বয়েস থেকেই কাজ করতে হবে। তা না হলে আমাদের চলবে কি করে।

কমলেশ সাহুনা দিয়ে বলেছে, তা হবে না, তোমাদের পড়াশুনা করতে হবে।

কি করে করবে ? এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে তো ? তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকী, পড়ছে। আমিও চেষ্টা করছি, যদি মেয়ে ছবি আঁকা শিখতে চায়—

কমলেশ আর কোন কথা না বলে সোজা গিয়েছিল সদাশঙ্করের বাড়ী। প্রোভান্সের সব কথা খুলে বলে সকল চোখে জিজ্ঞেস করেছিল, কি হবে শঙ্করদা ? এদের ক্ষেত্রে কি কিছুই করতে পারব না ?

শঙ্করদা' সন্তোষে বলেন, বোকা ছেলে, ওদের এ বিপদের কথা আমাকে এত দিন বলনি কেন ?

—কি যে করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

—প্রোভান্স আর রেণুকাকে বসো এখানকার ওদের বা সেনাপত্নীর কাছে, হিসেব করে রাখতে, আমি কাল গিয়ে সব মিটিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে বাব আমাদের বিভাগীয়ে, সেখানেই লেখাপড়া করবে।

শঙ্করদা' যে এত মধ্যে এত বড় সমস্যার সমাধান করে দেবেন, তা কমলেশ ভাবতেই পারেনি। দরোগলায় বলে, ওরা বড় ভালো শঙ্করদা', আপনি দেখলে খুব খুশী হবেন।

সদাশঙ্কর কোন উত্তর দেয়নি, নীরবে কমলেশের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখেছিল, সেই গাঢ় স্পর্শ থেকে কমলেশ বুঝতে পারে তার ওপর শঙ্করদা'র ভালবাসা আর বিশ্বাস কতখানি।

কমলেশ মিছে থেকেই বলে, প্রোভান্সা চলে গেলে, আমিও আর একলা কলকাতার পড় থাকব না। বিভাগীয়েই পড়াশুনা করব।

—সে তো খুব ভালো কথা, তোমার বাবাকে চিঠি লিখ, তিনি যদি মত দেন—

বাবার মত আছে, সে আমি জানি।

এর পরের ইতিহাস হেঁট। ক'দিন বামেই সন্ধ্যার সময় বিজাপুর এসে হাজির হয় কমলেশ, প্রশান্ত আর রেখা। কলকাতা থেকে জাহাঙ্গীর আলী জিন্না মহিল দু'রে, ট্রেন হাইয়ের উপর। বিশাল বসন্তের, চার দিকে শুধু সবুজের ইসারা। সহরের কমলেশ-করা মজাটা এখানে নেই। এখানে প্রকৃতির খেলা, স্বাভাবিক জীবন।

কমলেশ আর প্রশান্ত উঠেই হোটেল। দু'দফা থাকবার ব্যবস্থা, চল্লিশটি ফ্লো থাকে। কিন্তু মেয়েদের হোটেল এখনও ভৈরী হয়নি। তাই রেখা উঠল মণিকান্দিনী বাড়ী। 'মণিকান্দিনী' ফ্লোরের মেয়েদের ছবি আঁকা শেখান আবার অবসর সময় গানও। বড় মিষ্টি স্বভাব মণিকান্দিনী, কত সহজে এদের আপনাতার করে নিসেন। এতটুকু দৃষ্টি দেন নেই।

এই ক'দিনের মধ্যেই বিজাপুরের নাম কাজের ভার নিয়েছে এরা। রেখা মণিকান্দিনীর সঙ্গে সারাদিনই কাটান শিল্পভবনে। এখানকার সবকিছু ভই গুছিয়ে রাখে। মণিকান্দিনী খুশী হয়ে বলেন, ভাগিনা রেখা এসে পড়েছিলো, আমি তো একলা সামলে উঠতে পারছিলাম না।

প্রশান্তের খেলোয়াড় হিসেবে নাম ছিল কলকাতার। স্কুলের টিমের ফুটবল খেলত। এখানে এসে ও খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। সারাদিন স্কুলের পর সোজা চলে যায় খেলার মাঠে, হেঁটেই আনন্দের মধ্যে কোথা দিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে তা সে বুঝতেই পারে না।

কমলেশ তার নিয়েছে লাইব্রেরীর। পোতলার কোণের ঘরে বেশ কিছু বই থাকলেও তা বড় করে এতদিন সাজান হয়নি। সন্ধ্যার সেই ডারটাই দিয়েছে কমলেশের ওপর। একদিন কমলেশ কইঙসো আলদারীতে বিবর জুহাবাঈ গাড়িরে রেখেছে, নতুন সিট তৈরী করেছে, এবার তার বই কেনার পালা। বিজাপুর থেকে চার মাইল দূরে সহর। সেখানেই সোফানপড়া। কমলেশ আর গিয়েছিল সাতখানা নতুন কই-এর অর্ডার দিয়ে আসতে। মনে করেছিল কাজ শেষে বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে। ফিরেও আসত ঠিক যদি না হঠাৎ এক জোরে বৃষ্টি নামত। সহর থেকে বিজাপুরে বাবার অনেকখানি পথই বাস-এ বাজরা যায়। ইচ্ছে করেই কমলেশ বাসে চাপেনি। হেঁটে আসবে বলে। কিন্তু অর্ধেক পথ না আসতেই, কালবৈশাখীর ঝড়ে চারদিক অন্ধকার করে থালা উড়িয়ে বনবন করে বৃষ্টি শুরু হল। কিছুক্ষণের ভয়ে কমলেশ গ্রেবে পের না কোন দিকে যাবে। একটা বড় পাথর তলার ভিত্তিটুকু মেলে বসেছিল কিন্তু বৃষ্টির একোপ কলহাৎ বাড়ছে দেখে তার ভয় হল, এ রাজ্য কিরে সে খুব বেশি হেঁটে বাতারাতে পারেনি। জু মনে পড়ল এই কাছ বরাবর কোথায় যেন নদীর ধারে একটা বিশাল বাড়ী আছে, যা সে বাসে বেড়ে বেড়ে দেখেছে। অন্ধকারের মধ্যে চারদিক ভাঙতে ভাঙতে কমলেশ ফিরে আসে কিছু দূরে যেন একটা আলা শো বাড়ি। এই বাড়ীর ঝড়ে সন্তুষ্ট একটি লোকের পাওয়া যাবে, এই আশার দ্বারা যেন কমলেশ

প্রবেশপন শক্তিতে ছুটল সেই আলো লক্ষ্য করে। হু হু করে সে বাড়ীতে গিয়ে হু হু করে, ভয়ে হু হু করে। বন্ধন কমলেশ। বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছল, তখন তার জামা-কাপড় সবই ভি ছপ-ছপ করছে। কমলেশ জোরে-জোরে দরবার খাড়া দেয়, বর খুলে, দরজা খুলে, কে আছে?

অনেকক্ষণ ভেতর থেকে কোন সড়া পাওয়া যায় না কমলেশ তখনও খাড়া দিয়ে বাজে, হঠাৎ ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল।

কমলেশ একটু বেগেই বলে, কি মশাই, এতদূর আসে গাড়ি আছি তখনও পারেন না? কিন্তু এই পর্যন্ত বলে আর ক'ণেব করতে পারে না। দেখে সামনে এক অতি প্রয়োজনীয় গাড়িরে রয়েছে। ফর্সা রঙ, সাধা চুল, এবং সাধা বাড়ী। সাধা মুখে বয়সের গভীর রেখা পড়েছে প্রয়োজনীয় সোজা হয়ে গাড়িতে পারেন না, বেশ হুঁসে পড়ল সাধা হুতির ওপর একটা সাধা কতুয়া। কমলেশের আগা মন্তক একবার ভাল করে দেখে ঘরের কোণে রাখা একটা ভাট চোয়ারের ওপর গিয়ে বসল।

কমলেশ ভাল করে বরটা চারদিকে তাকিয়ে দেখে। পুরান দা চারদিকে বালি খসে পড়েছে। ঘরের এক কোণে যে লঠন বসে তাতে আলো খুব কম। চিমনির কাচটা কাঁসো হয়ে গেছে। তক্তপোষা বড়ার সামনে রয়েছে তার একটা পায়ো নেই। গা কয়েক ইন্টার একদোরা ওপর গাড়ি কমানো।

বুড়ো জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, এখানে কোথায় থাকো?

গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক। কমলেশ দু'হায়ে বলে বিজাপুরে থাকি।

—ওখানে কি হয়?

—সোফাপড়া, খেলাধুলা, আর কি।

—তোমার নাম?

—কমলেশ বর।

—বুড়ো চুপ করে বার, আর কোন কথা বলে না। কমলেশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাছাড়া শ্রীত করছিলও বেশ, গা গলার জিগ্যাস করে, একটা পামরা দেবেন? গা-হাতটা হু হু করে কমলেশ বুড়ো কিন্তু তখনও গম্ভীর না। ইচ্ছে করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কমলেশ আবার বলে, বড় শ্রীত করছে, একা ওকনো কাপড় যদি দেন, কাঁসে আমি কেমন নিয়ে যাবো।

প্রয়োজনীয় এইবার ফিরে তাকান। চোখ দুটো যেন জল-জল করছে। সোজা উঠে সেলেন দরবার কাঁসে, খুলে দিয়ে কানো এবার বাড়ী হাট, বৃষ্টি কমে গেছে।

কমলেশ আর কথা বলার সুযোগ পায় না। অন্ধকারের মধ্যে আবার বাড়ীর খেঁচিয়ে পড়ে। তখনও অন্ধকার বৃষ্টি পড়েছে। বালি হাতাটুকু জোরে জোরে হেঁটে কমলেশ বন্ধন হোটেল এসে পৌঁছল তখন লাইব্রেরী থেকে গেছে। সবচেয়ে তার ভয়ে হু হু করে বসে গেল মণিকান্দিনী সব কথা শুনে কমলেশ খুব সাবধান কমল, বনবান না ও-বাড়ীতে দেও না।

—কেন মণিকান্দিনী?

—হান না বুধি? ওখাটীর আবার নাম দিয়েছি বন্ধুপূরী। ঐ বুড়াকে দেখেছো, ঐ ওয়া বন্ধুপূরী।

কমলেশ অবিশ্বাসের হাসি হাসে, আপনি ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে, তাই কখনও সত্যি হয়?

মহিকাবির' হেসে বলেন, বেশ তো, থাকে বুধি জিগ্যেস করে। ওখাটীতে যে কারা থাকে, আমরা কেউ দেখিনি। মাঝে মাঝে ওখান থেকে একটা পাড়ী বার হয়, তার চারদিকে পল্লী, পাছে কেউ দেখে বেলে। একমাত্র ঐ বুড়াকে দেখা যায়, সে যে কে, কত তার বয়স, কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা ধরে নিয়েছি ঐ নিচর বন্ধুপূরী। তোমার সঙ্গে তো তবু দু'চারটে কথা বলেছে, লজ্জাকর সঙ্গে কোন কথাই বলে না। চুপ করে বসে থাকে।

সে রাতে খাওয়া-পাওয়ার পর সারাক্ষণই ওই বন্ধুপূরীর কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা হল। কমলেশ কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না মহিকাবির' কি বলতে চাইছে। দুয়োবার সময় প্রশান্তকে ডেকে নিয়ে বলল, কি ব্যাশার বলতো? ওয়া সবাই ওই বড় বাড়ীটার নাম বন্ধুপূরী দিয়েছে কেন? কেনই বা বেতে আমাদের দায়র করছে?

প্রশান্তর ঘুম শেষেছিল, হাই তুলে বলে, অন্ত ভাবনা-চিন্তার দরকার কি? বাগশ করছে এখন, না সেসেই তো হয়।

—আমি কিন্তু আবার বাব।

—কেন? ওখানে কি আছে?

—ওই বুড়ার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। লোকটা অদ্ভুত। কোন বেন কথাবার্তা।

প্রশান্ত তুফ কুঁচকে বলে, তবে আর ওখানে গিয়ে কি লাভ হবে? কমলেশ ভীষণর চোখে বলে, ওই বুড়ার চোখ চুটো আবার বড় ভাল সেগেছে, এখন চুপচাপ বসে থাকে কেমন বেন মিসর একলা চাহনি। নিচর ও কিছু বলতে চায়।

প্রশান্ত হামিয়ে গিয়ে বলে, কি সব আবোল-তাবোল বকছিস? কিন্তু একলা আর হাস না, আমাকে বলিস।

দিন করেক পরের কথা। কমলেশ গিয়েছিল সহরে অজ্ঞের ওয়া বইগুলো নিয়ে আসার জন্যে। বইগুলো হাতে করে কেবলবার সময় একবার বসিও ভেবেছিল বাসে করেই আসবে, কিন্তু কে' বেন তার মন পাশে' ফিলে। কমলেশ হেটেই চলল হোটেলের দিকে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ, নিভেজ হয়ে এসেছে। হাওড়া আছে, তাই টিপতে কই হচ্ছে না। শুভেটি তাখটা সেই। কমলেশ অনেক দূরই ভাবতে ভাবতে আসছিল। তার হাতে পড়া লাইব্রেরীর কথা, বিভাগীর অজ্ঞত কার্যক্রমের কথা, আবার কলকাতার 'গারডে' টুকরো কথাও যে মনে আসছিল না তা নয়। বাব' সকলের ভালকই ব্যাকল একটা টিটি এসেছে। উৎসাহ দিয়ে লেখছেন, যদি তোমার শক্তবাব' আদর্শের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিলে কাজ করতে পার তবে সবসময় খুশি হব আমি।

তাবতে তারমত কখন যে কমলেশ সেই বন্ধুপূরীর সামনে এসে দাঁড়ায় তা তার নিজেরই বোঝানো হয় নি। এ পর্যন্ত এসে তার ১১ নম্বর আপনা' হুইটে ওঠে এসে পেল। সেখান থেকে দূরত্বের দিকে বুড়ার সঙ্গে যে ধর্ম রসে গল্প করছিল, সেটা একটা কনোয়ালের

ঘর। গেটের সঙ্গে প্রাঙ্গণেরা ছোট ঘর। গেট থেকেই বিশাল দরজা তার ওপর কি বিরাট প্রাঙ্গণ। সমস্ত জামাখানা-কল্লা' বসে, দোকান বাস' করে বলে তো মনে হয় না। তখনও সন্ধ্যা' নামেনি। তাই বুকে ভরসা করে কমলেশ গেট শেষের সেই প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে চলল। মহিকাবির' কথাগুলো তার কানে ভাসছে, সেই সঙ্গে প্রশান্তর সতর্কবাণী। একবার মনে করল এখান থেকে ফিরে গেলেই হয়, কিন্তু পারলো না। কে যেন তাকে সামনের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সেই প্রাঙ্গণের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কমলেশ চারদিকটা ভাল করে দেখল। কি ভাবী দরজা। তার ওপর বড় বড় তালি লাগান। মরচে পড়ছে। বোকা যায় অনেক দিন ব্যবহার হয় নি। বাড়ীটা পুরোন, দেখলে মনে হয় মস্ত বড় জমিদারের, এখন আর আসের বোলবোলা নেই। অনেক জায়গার বাগি' খসে পড়ছে, দরজা-জানালাতেও রক্ত পড়নি বই দিন। কমলেশের নজরে পড়ল নদীর দিকে একটা ছোট দরজা খোলা রয়েছে, খিড়কীর দরজা। কোন রকম খিল না করে সে খাড়ীর মধ্যে ঢুকল। কি আশ্চর্য, অবাক হয়ে দেখল কমলেশ বাড়ীর বাইরে ভাড়া-ভাড়া হলোও ভেতরটা মকরক তকতক করছে। আদর্শের মত পরিদায় মার্বেলের মেঝে, বড় বড় খামের ওপর কি নিখুঁত কারুকাজ। বাদামা ধরে বেশ ধানিকটা এগিয়ে যায় কমলেশ। চোখে তার বিষয়ের শেষ নেই। তার মনে হয় মহিকাবির' কথাই বেন সত্যি, গল্পের বই-এ বন্ধুপূরীর বে বর্ণনা পড়ছে তারই সত্যিকারের চোখের দেখছে ঐ বাড়ীর মধ্যে। পাশের একটা হলঘর থেকে অনেকের গলার ঘর ভেসে আসছিল। কমলেশের ইচ্ছে হ'ল তারের সঙ্গে আলাপ করার। কিন্তু সেই দরজার হাত দিতে পারে, পেছন থেকে হঠাৎ কঠোর ভনে সে চমকে উঠল।

—কে তোমাকে এ বাড়ীতে আসতে বলছে?

কমলেশ ফিরে দেখে সেদিনকার সেই বুড়ো বলন্ত দৃষ্টিকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কমলেশ ভর পেতে বলে, দরজা খোলা ছিল, তারলার আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করে বাই।

—খবদার আর এ বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা করবে না। আমি তোমাকে কিছু বলব না। কিন্তু এর পর এসে আর ফিরে বেতে পারবে না।

কমলেশ ভর শিউরে ওঠে। না, না, আমি এখনি চলে যাই। কমলেশ আর কথা না বাড়িয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে মাঠে যেতের আসে। পেছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বুড়ো তার পেছন পেছন আসছে। অজ্ঞকার নামে এসেছে, কমলেশের পা' ছমছম করে। বুড়ো হঠাৎ জিগ্যেস করে, হাতে তুমার ভক্তলো কি?

—গল্পের বই। লাইব্রেরীর ভক্তে কিনে যাইছি।

—কিসের গল্প?

কমলেশ গাধর করে ফিরে তাকিয়ে বলে, ছোট ছোট-হেলেরা কি রকম করে একটা সুন্দর সময় গড়ে তুলছে তাই কাহিনী।

—সে তো আশ্চর্যী গল্প।

কমলেশ জোব ফিরে বলে, আশ্চর্যী নয় সত্যি, বইটা পড়তে পারবে?

—ওসব বাজে জিনিষ আমি পড়ি না।

কমলেশ আর কথা বাড়ায় না, ভাড়াভাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে চলে। ঠিক গেটের ঠিক্ণে সেই এসে পৌছেছে বুড়ো আবার কথা বলে, তোমার একলা এ বাড়ীতে আসতে ভয় করে না ?

—একটু একটু ভয় করে।

—তবে এসেছিলে কেন ?

কমলেশ দুহু করে বলে, আমার মনে হয়েছিল আপনি বোধ হয় আবার কিছু বলতে চান।

বুড়ো এবার হাসে, আচ্ছা পাগল তো তুমি, আর লোক শেলাম না, তোমার সঙ্গে সুখ-দুখের গল্প করব। খবরদার আর গেট পেরুবে না। তাহলেই ঠাণ্ড ভেঙ্গে দেব।

কমলেশ আর কোন কথা না বলে চূপ করে বেরিয়ে আসে। সারা সন্ধ্যার মনে হয় ওই বাড়ীতে না ঢুকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। মনিকাদি'রা ঠিকই বলেছে এ হোল বন্ধপূরী। আর ঐ বুড়ো নিশ্চয়ই বন্ধবুড়ো। [ক্রমশঃ]

বোতামের বাহু কুল

বাহুবলীকর এ, সি, সরকার

প্রাচীনতার প্রারম্ভিক খেলা হিসাবে আসোচ্য 'বোতামের বাহু কুল' অতুলনীয়। আমি বহু বার এই খেলাটি বিভিন্ন বয়সকে দেখিয়ে খুব ভাল কল পেরেছি। বিশেষ করে পশ্চিমের দেশগুলোতে এ খেলাটি লর্দসদের যে আনন্দ দেয় তার তুলনা মেলা ভার।

কিছুটা 'সাক্ষ্য-পোষাক' পরিহিত অবস্থার বাহুবলী প্রবেশ করেন। সকলকে অভিবাদন জানাবার পরে হঠাৎ তার নজর পড়ে তার কোটের 'বটন হোল' বা বোতামের গর্তের দিকে। তাই তো সেখানে কোনও কুল নেই এবং তার কলে তার পোষাক অসম্পূর্ণ। এজ্ঞে দুঃখ প্রকাশ করে বাহুবলী তার বাহুকৌশল প্রদর্শন করলেন। খালি ডান হাতখানা একবার বোতামের গর্তের

উপর দিয়ে বুলিয়ে নিভেই দেখা গেল, সেখানে রয়েছে এক খেত-গোলাপ। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে লর্দসেরা যে কত খুশী হলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্বভাৎকুস্ত হৃৎকম্পিত মনো। কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখানো যায় তাই এবার শোন।

এই খেলা দেখানোর জন্যে চাই কাপড়ের তৈরী একটি সাদা গোলাপ আর এক খণ্ড লক কাসো 'ইলাস্টিক'। এই ইলাস্টিকের এক প্রান্তে বাগানো থাকবে সকল গোলাপ আর অন্য প্রান্তটি কুল দ্বারা বন্ধ দিওঁ

বোতামের গর্তের তৈরী দিয়ে বুক হয়ে কোটের 'ব্যাগ'ের ধারের বোতামে। ইলাস্টিকের দৈর্ঘ্য এমন হবে যেন বাহুবলী অবস্থাতেই এ কুলটিকে বোতামের ধারে ধরে রাখতে পারে। এর পরে কুলটিকে টেনে নিয়ে যদি বা কলে ঢেপে ধরে রাখ তবে ইলাস্টিক আপন ঘরে লম্বা হবে। বগলের চাপ হয় হলে আপন। থেকেই ইলাস্টিক কুলটিকে টেনে এনে বোতামের ধারে বসাবে। এই খেলা দেখানোর সময়ে গারে থাকবে কাসো কোট, কাজেই কাসো ইলাস্টিক এই কাসো কোটের রঙের সঙ্গে সহজেই মিশে থাকবে। বেশ অভ্যাস করে তবেই কিছু দেখাবে এ খেলা। ম্যাজিকে উৎসাহী বারা তারা আমার সঙ্গে জবাবী কার্ড পত্রালাপ করতে পার। A. C. Sorcer. Magician. Post Box 16214, Calcutta 29 টিকানার।

বাহুবলীকর সরকার

বীণাদেবী সেন

আমার ছোটো বহুবলী,

আজ তোমাদের আমি একজনের বিবরণ বলবো বা কাহিনী হলো সত্য। আমি গত বিশ বৎসর ধরে শিক্ষকতা কার্যের মাধ্যমে আমার ছাত্রীদের গল্প শুনিতেছি, যেডিঙতে শ্রীলংকা-বাসের গল্প বলেছি, গল্প লিখেছি মহাপুরুষের বিবরণে বারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আজ কিন্তু এমন একজনের বিবরণ বলবো যিনি বাঙালি এবং কৈশোরে নানারূপ অসুখ অবস্থা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর শক্তিসাহস এবং প্রতিভাবলে স্বীকৃত হয়েছেন, ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছেন দেশের খুব উজ্জল করে। তোমরাই বলতো এ কথা শুনে তোমাদের বুক কুলে লগ হাত হচ্ছে কি না ? তোমরা কবি সত্যেন দত্তের 'আমরা' কবিতা পড়েছো ? সে কবিতাতে লেখা আছে বাঙ্গালীর ধন এবং প্রতিষ্ঠার বিবরণ। আজকে বার বিবরণ বলতে শুরু করেছি তিনি সম্প্রতি আমেরিকাতে সফলভাবে রওনা হলেন। তিনি হচ্ছেন বাহুবলীকর এ, সি, সরকার ডরফে প্রিন্সিপাল চর সরকার। এই অসামান্য খ্যাতিসম্পন্ন বাঙ্গালী তাঁর প্রতিভা দেখিয়ে জগতের নিকট হতে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন, বারংবার বিজয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছেন, তাম্রাঘ্রনীর জনগণমনকে বাহুবলীকর ডেজি দেখিয়ে চমৎকৃত করেছেন। তিনি শুধু যে বাহুবলীকর সুনিয়ন্ত্রিত না নয়, তাঁর সৈন্যবিনীত জীবনের কথারা তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত শব্দবা, তাঁর সজ্জনতা, অসামান্য আদর্শ বার সঙ্গে পরিচিত হতে পাঠ্য অল্পপ্রেরণা পেতে পারো। অল্পপ্রেরণা লাভ করবে এই উৎসব নিয়ে আজ বাহুবলীকর এ, সি, সরকারের বিবরণ লিখছি। তাঁর আধিনিবাস মহম্মদসিহ জিলাতে, টাঙ্গাইল মহকুমায়। তিনি বছরের মধ্যে প্রায় মাস মাস ভারতবর্ষের বাইরে থাকেন, নানারূপ আর্থ-কার্য-দ্রব্য দেশ বিদেশ ঘুরে, তাঁর বাহুবলীকর ডেজি বাজী দেখিয়ে বন্ধন বাংলা দেশে ফিরে আসেন তখন কিন্তু সি, সি, সরকার পুরোভাবে বাঙ্গালী আচরণ, কথাব্যবহার ইত্যাদিতে। ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষাকে তিনি প্রেই মনে করেন এবং পরবোধ করেন তার জন্য। সব মনে তাঁর সেই গর্ব জিনি বাঙ্গাল দেশের ছেলে।



পি, সি, সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, অঙ্ক জ্ঞান নিয়ে বি. এ পড়তে পড়তে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বাহুর হারে চলে আসেন কলিকাতায়। ভারতে প্রথম প্রদর্শনীর পর তিনি প্রথমে বান ডাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ। তারপর থেকে আজ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে চলেছে তাঁর সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি নরনারীর চিত্ত জয়, প্রভা আকর্ষণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথায় তিনি বাননি? সর্বত্র, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাভা, মালয়, জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইত্যাদি। তিনি বছর গিয়েছেন ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকাতে। তিনি স্বীকৃত হলেন বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুরূপে। বিদেশের পত্রিকাতে প্রথম পাতায় বাহুর হিসেবে তাঁর ছবি মুদ্রিত হলো, তিনি আমাদের জাতীয় পতাকা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বাহুর ভারতের জন্য বিজয়মালা নিয়ে এসেন। সর্বসেশের পত্রিকাতে তাঁর প্রচুর প্রশংসা, বিশেষে পি, সি, সরকারকে ভারতের হুজুর আখ্যা দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর কোটি কোটি অনুসারীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র একজন। অঙ্কের প্রধান মন্ত্রী থাকেন হু তাঁকে এশিয়ার গৌরব এই আখ্যা দিয়েছেন। কেনই বা দেবেন না?

১৯৩৬ সালে কলিকাতায়, ১৯৫০ সালে প্যারিসে তার ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর সব চাইতে জনবহুল রাজ্য নিউইয়র্ক টাইমস দ্বারা চোখ ধোঁয়ে সাইকেল চালিয়ে ইনি অসমাপ্ত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লণ্ডন নিউইয়র্ক শিকাগোতে এর প্রদর্শনী টেলিভিশন বোলে দেখানো হয়েছে। শ্রীযুক্ত সরকার ইলেকট্রিক করতে একটি মেয়েকে দুই টুকরো করে যে বাহুর ক্রীড়া দেখিয়েছিলেন তা অতি আশ্চর্যজনক। এই খেলা দেখতে গিয়ে কয়েকজন সজ্জা হারিয়েছিলেন, এমন কি টেলিভিশনের ছবি দেখেও অনেকে অস্ত্রান হতে পড়েছিলেন। অতএব বাহুর রাজত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট পি, সি, সরকারের ভোজবাজী অতুত। পরলোকগত নেপালীরাণীর মতে তাঁর বাহুরপ্রদর্শনী সম্ভারে পূর্ণ। জার্মানী তাঁদের সোনার লরেল দিয়ে তাঁকে স্বীকার করেন—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুরূপে নিউইয়র্ক পি, সি, সরকারকে দুইবার ক্রিঙ্গ পুরস্কার দিয়েছেন, ম্যাজিকে নোবেল প্রাইজরূপে বরগীর এই ক্রিঙ্গ পুরস্কার এবং পৃথিবীর মধ্যে শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকারই একমাত্র বাহুর বিনি দুইবার এই পুরস্কার পেয়েছেন। হল্যাণ্ড একে সিলে ট্রিঙ্গ পদক (১৯৪৮ এবং ১৯৫৪), টোকিও ম্যাজিসিয়ান লাবের ইনি সম্মানিত সভ্য, তাঁরা একে উপহার দিলেন একটি পদক। একজন অজাপানীদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী (১৯০৭)। আমেরিকা আন্তর্জাতিক বাহুর জাহাজ সাহায্য কলিকাতা শাখার নাম—এই নামাঙ্কনে পি, সি, সরকারের মত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, প্যারিস, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলির বড় বড় বাহুরসহায় দ্বারাও ইনি সম্মানিত। আমেরিকা জাতীয় টেলিভিশনে National Broadcasting Company পদ কলয় যে বাহুর শ্রীযুক্ত সরকারের বিবরণীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা যায় জীবন্ত ভঙ্গীকে বিবর্তিত খেলাটি টেলিভিশনে দেখানোর জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করে শ্রীযুক্ত সরকারকে বলল সব নিয়ে বান। সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুরূপে সম্মান দিও

ফ্রেগের সুবর্ণ ম্যাজিক ও ৬ষ্ঠ বাহুরসম্রাটের হাতে পৌঁছানোর জন্য আমেরিকা থেকে বিমানবোলে অস্ট্রেলিয়াতে বান। আমেরিকাতে যখন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাহুরূপের আখ্যার বিতরণ বার ছবিতে হলেন তখন অজ্ঞাত দেশের মত বৃটিশ প্রতিনিধিরা কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। বিশেষে গেল পি, সি, সরকার সেই মহামূল্যবান একটি পোষাক পয়েন—পোষাকটি ভারতের বিভিন্ন দেশের উপকরণ দিয়ে তৈরী। তখনকার দিনে রাজপুত্রের মত দামী পোষাকে, দামী জুতো জোড়া পরে তিনি যখন ট্রেজে পাঁড়ির বাহুরক্রীড়া দেখান সে সব ছবিগুলো দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সুপুরুষ পি, সি, সরকারকে স্মরণ মহামূল্যবান পোষাকে আরও স্মরণ দেখার। বৃটিশ প্রতিনিধি সেই পোষাক লুণ্ঠ করে তাঁকে লুণ্ঠ করার জন্য বলেছিলেন, You have no Royal blood. Then why do you dress like a prince?

বাহুরসম্রাট সম্রাটে উত্তর দিলেন, No I am the prince of Magic.

অপর পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন উঠল না।

বাহুরবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসঙ্গে পি, সি, সরকার বলেন, অপরকর্মের মতে ভারতেই এই মহাবিজ্ঞানের উদ্ভব। তবে আমাদের ছিলো গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান, কাজে কাজেই পূর্বপ্রাচ্যদেশের মহাপ্রাচ্যদের পর এ বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হতে থাকে। তবে এখনও বেলে-বেলেদীর খেলা, ডাহুয়তী খেলা, ভোজবাজী প্রভৃতির খেলাগুলি সেই আদিম ঐতিহ্যের অপস্রবমান চিহ্ন। হিপনোটিজিম এবং মেসমেরিজিম সম্বন্ধে তিনি বলেন, গ্রীসের ঘূমের সেবজ হিপনাসের নামাঙ্কনেই এই বিজ্ঞানের পরিচিতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই বিজ্ঞানের উদ্ভব। বিশেষ ভাবে সন্ধান দিয়েছে, বখাবোগ্য সমাদর জানিয়েছে এক আমাদের দেশ থেকে তাঁকে যে সর্বজন জ্ঞান হযনি তা নয়, কিন্তু বিশেষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। কলিকাতা নাগরিকগণের এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনপত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি অক্ষরের উচ্ছ্বাস পি, সি, সরকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে তা থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃত্য করছি: 'কিবদন্তীখ্যাত ভোজবাজীর সুযোগ্য উত্তরসারক তুমি, অপরকর্মের ও তত্ত্বসার বর্ণিত ইন্দ্রজালকে অলৌকিক অবিখ্যাসী আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মধ্যেও জরযুক্ত করিয়াছ, তোমার মন্ত্রপুত ইন্দ্রজাল নিখিল জগৎকে ভূজিত ও বিমুচ্ত করিয়া জরপত্র লগাটে লইয়া স্বদেশের বক্ষভূমে কিরীয়া আগিয়াছ—তোমার ভারতের তীর্থসলিল (গুরাটার অক্ষ ইতিবা) পানাত্য পৃথিবীর গতাঃগতিক সুদৃষ্ট ম্যাজিককে সকারিত করিয়া ভারতীয় ভোজবাজীর মহিমা অজুত্বীয় করিয়াছ, প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তুমি বারীন নব ভারতের নবীন বাহুরপৌর প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, জবজ্ঞের ভেঁকি ভোজবাজীকে ইন্দ্রজালের ইন্দ্রজ বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছ।' কলিকাতা মহানগরীর পৌর সর্বজন অভিনন্দনপত্রে শ্রীযুক্ত সরকারের অমর অবদানের কথা পাঠাই স্বীকৃত হইয়াছে।

তাহলে বুঝতে পারছো, আজ আমি কেন পি, সি, সরকারের বিবরণে এসব কথা লিখছি। তোমরা সুদীর্ঘ হয়ে তুমি, পরিচিত বোধ করবে। আমি এ কথা বলছি না যে, তোমরা সবাই একদোষ বাহুরূপ হও, তা নয়—তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মান অর্জন কর

বিশেষণের তোমাদের কৃত্রিম বিভিন্নতার বিরুদ্ধে কিংবা এসে থাকুকহি, আমাদের ভারতবর্ষকে চিত্রক সমস্ত দুনিয়া। আমাদের বাংলা দেশের বিষয় মহামাতা সেখানে বলেছিলেন What Bengal thinks to-day India will think to-morrow আবার যেন বিদেশীরা বলতে পারে। What India thinks to-day The World will think to-morrow, একদিন পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ জানসরিদাতে সত্য তার আলোকে দীপ্ত ছিল—বখন পাশ্চাত্য দেশকে কেউ চিন্তিত না—আবার কি আমাদের অতীত ভারতবর্ষকে কিরিত্তে আনতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।

বাহুরক পি. সি. সরকারের প্রতিভার বিষয় তোমাদের বলেছি। এখন বলবে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে তিনি তাঁর কৰ্ম পদ্ধতিকে কি ভাবে পরিচালনা করেন। আমরা একবার তাঁর 'ইন্ডিয়ান' তাঁর পুঙ্খের নাম সেইখানে গিয়ে পরিচালনা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি সহকারীর স্বল্পর শিক্কা দিয়েছেন সর্ববিষয়ে যেমন কার্যকারী বৃক্ষভার সহিত কার্য করা ইত্যাদি। তিন ভাগের একটি বাহুরকদের অধিকার। বহুরকরা চোর, টেকি, আলমারী—তার থেকে এহেন জিনিস নেই যেমন ক্রান্তি বেশি পণ্য, তিনি খ্যাতনামা বাহুরকদের, বিবিধাভ্যাস লোকদের বিরুদ্ধে ক্রোধ রেখেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত কট্টা বিভাগ আছে—ভারতবর্ষ তাঁর প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। এমন ভাবে লক্ষিত করেছেন যে প্রয়োজনীয় পণ্যের দায় হাতের কাছে। তিনি নানা জন্মের সহায়তার মানাশপণ পোষাক সংগ্রহ করেছেন—পোষাক, রৌপ্য তরবারি সবই উপহার। এমন যে ব্যক্তি বাহুরকদের মত তিনি সংগ্রহ করেন বিভিন্ন দেশের ডাক টিকিট, পোষ্ট অফিসের খাম টেলিগ্রাম কৰ্ম, ইন্ডিয়ানের টিকিট, সেলাইএর ছবি, মুদ্রিতকালের মেলা, চাল ডালের প্যাকেট সব জোগাড় করে এক মনে মিউজিয়াম তৈরী করেছেন। কাঁচের ছবি, ভিজিটিং কার্ড, ম্যাজিকের বই, সিন সিনারী কিংবদন্তি যে বই। তাঁর বাহুরক নরেন্দ্র বাঁধা হুট করে। তাঁর সংগ্রহ বিস্তারিত করেছে ধীরা লক্ষ্য তাঁদের কিন্তু সর্বাংশই সব চেয়ে মূল্যবান পি. সি. সরকারের সর্বজনবিদিত, বিনয়পূর্ণ আচরণ। আধুনিক জগতে, উদ্বাসিত আচরণে ইহা চমকিত। তাঁর সংগ্রহ-লেশা ছাড়া অন্য লেশা নাই, হুশপান নর, চা পান নর। তাঁর ম্যাজিক সেখানে এক স্বল্পমতা উভয়ই পরচিহ্নাঙ্কিত। বাহুরক পি. সি. সরকারের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য এই যে, এঁর জীবনব্যাপী অনুপ্রাণিত হয়ে জেনারেলের মত থেকে কয়েকজনও যদি বাহুরকদের সৌন্দর্য হয়ে উঠতে পারে তাহলে আমাদের এ দেশে সার্থক হবে। ধীরা প্রকৃত শুদ্ধি, চাইতে হুজুর অধিকারী এক প্রধান প্রকৃতসত্ত্ব সরকার ওরফে পি. সি. সরকার আমাদের ভারতবর্ষকে যে দেশের সমুদ্রের দ্বীপ দ্বিধায়েন দেশের—হুজুর উদ্ভাবন করে আমাদের সবায় হুজুর উদ্ভাবন করেছেন যে কল্যাণে আমাদের অভ্যন্তর ভাগ্যবাক্য বাহুরক, তিনি যে হুজুর অধিকারী যে হুজুরপ্রাণ তোমাদেরকে জীবনব্যাপী জিজ্ঞাসিত করুক—আমি সত্য মন-প্রাণ দিয়ে তোমাদের সেই জীবনব্যাপী কবাই।

হুই বোন

(রূপকথা)

পুণ্ডল ভট্টাচার্য

জানকি দিন আগে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল না। কিন্তু ছুটি কুন্দের মত দুটো মেয়ে ছিল রাজকুমারী চন্দ্রা আর পদ্মা যা মারা গিয়েছিলেন। তাই রাজাশাশু তাঁর ছোটরাণীকে ডেকে বললেন, তুমি আজ থেকে পদ্মা আর চন্দ্রায়ে নাম রাখ।

ছোটরাণীর নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণ আলস্যপরায়ণ। তার উপর চন্দ্রা আর পদ্মা তাঁর চেয়ে বেশী হুজুর দেখতে ছিল বলে তিনি তাদের হিসেপ করতেন। তাই রাজাশাশুর বাড়ী না থাকলেই তিনি রাজকুমারীদের দিয়ে রাজবাড়ীর বাসন মাজান থেকে নিজের গা-হাত-পা টোপান পণ্য সব কাজই করিয়ে নিতেন।

রাজাশাশুর বখন জিজ্ঞাসা করতেন, চন্দ্রা আর পদ্মা অত বেগা হয়ে বাচ্ছে কেন?

ছোটরাণী তখন কৃত্রিম স্নেহে বলতেন, বা হুই, মেয়েরা আমায়, শাশুদিদি সবাইয়ের সঙ্গে বাগানে বাগানে প্রজাপতিদের পেছনে ছুটে বেড়ায়। সময়ে নাওয়া খাওয়া করে না। তাই তো বেগা হয়ে বাচ্ছে।

রাজাশাশুর একদা মেয়েদের কিছু বলতে গেলেই ছোটরাণী গলার মধু ঢেলে বলতেন, তাই বলে আপনি যেন ওদের বকবেন না। ছেলেমাছবই তো? একটু বড় হলে আপনিই লাভ হবে। ছোটরাণীর কথায় রাজা যেমন নিশ্চিন্ত তেমনি খুশী হতেন। বাক, মেয়েরা তাহলে তাদের ছোট মায়ের স্নেহে বুকেই আছে।

একবার রাজাশাশুর হুই দেশে যুদ্ধে গেলেন। সেই অবসরে ছোটরাণী মেয়েদের উপর এমনই অত্যাচার আরম্ভ করলেন যে তারা আর সহ করতে পারল না।

বড় বোন চন্দ্রা বলল, এ ভাবে না খেয়ে পরিশ্রম করে আর ছোটমার হাতে বোজ বোজ প্রহার সহ করে আমরা বেশী দিন বাঁচব না। তার চেয়ে চল বলে চল বাই, সেখানে বাঘ-ভালুক আমাদের খেয়ে কেলবে সেই ভাল হবে। সে পদ্মার হাত ধরে কীভাবে কীভাবে বলে পাগিয়ে এল।

সেদিন সন্ধ্যার রাত। বনের মধ্যে চারদিকে বাঘ-ভালুক হালুয় হালুয় করে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য। তারা বেন চন্দ্রা আর পদ্মাকে দেখেও দেখছে না। চন্দ্রার মনে পড়ল তার বাইমার কথা—“রাখে কেউ মাকে কে? বাবা সৎ হই স্বয়ং তবান তাদের রক্ষা করেন।”

একথা মনে পড়তেই চন্দ্রার মনে লাগল এল। সে এবার চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে চন্দ্রা। কিছু হুই গিয়ে সে দেখে বনের মধ্যে একটা বড় রাজপ্রাসাদ রয়েছে। সেখান হুই বোনে সেই প্রাসাদে গেল। কিন্তু রাজ্যটা প্রাসাদ থেকে ভাঙা জনপ্রিয়ত দেখা গেল না। একদা বন বনে বাসার পক্ষ, বিদ্রোহ সব কিছুই রয়েছে। কেবল ভক্তরা বাকী একবারে বাসি, এক দলই চলল সেখানে পড়ে গেল।

হুই বোনে রাজপ্রাসাদের এই অবস্থা দেখে খুব অবাক হলেন।
হেথান্নেই থাকবে বলে স্থির করল। কিন্তু খাওয়ার কি করা যাবে ?
চম্। বাবু! করল সকালে পদ্মা আর সত্যার সে নিকটে বসে গিয়ে,
গাছতলা থেকে বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনবে আর বরখা থেকে
কল নিয়ে আসবে।

দিন কতক হুই বোনে সেই রাজপ্রাসাদে বেশ আনন্দেই কাটল।
তারপর একদিন বিকালে চম্। বন থেকে কল আর জল আনতে
গিয়ে আর কিয়ল না।

বিকাল গিয়ে শুভা হল, তারপর অন্ধকার হয়ে এল। তখনও
চম্। কিয়ল না দেখে পদ্মা বেরল তার খোঁজে। সে দিদি, দিদি,
চম্।, চম্। ডেকে ডেকে সমস্ত বন ভোলাপাড় করে বেড়াল সারা
রাত ধরে কিন্তু কোথাও চম্।র সাদা পেল না।

সকাল বেলা খুঁধা উঠলে হঠাৎ পদ্মা তার দিদির গলার
মুক্তোমালার একটা মুক্তো দেখতে পেল। খানিক গিয়ে দেখল আর
একটা মুক্তো পাড়ে রয়েছে। এই ভাবে পর পর তিন-চারটে মুক্তো
পেয়ে পদ্মা বুঝল তার দিদি এই পথেই কোথাও গিয়েছে।

আর খুব সস্তর কেউ তাকে জোর করে নিয়ে নিয়েছে। কারণ
পদ্মাকে না জানিয়ে তার দিদি কখনই কোথাও যাবে না।
তাছাড়া বরখার ধারে দিদির হাতের জলতরা বড়া আর কলের
খুলিটাও ফলতরা পাড়ে ছিল।

পদ্মা তখন সেই মুক্তো কুড়াতে কুড়াতে বনের শেষে এক
নগরের রাজপ্রাসাদের তোরাখাবার সামনে এসে পৌঁছল।
তোরাখের সামনে ঢাল-তলোয়ার হাতে সেপাই-শাঙ্গী দেখে তার
প্রাসাদের ভেতর যেতে সাহস হল না। সে আবার বনের পথে
কিয়ে চলল।

খানিক দূর গিয়ে সে দেখল প্রাসাদের কাছাকাছি একটা বাগানে
একটা ফুঁড়ে-ঘর রয়েছে। সে ঘরে লোকজন কেউ নেই দেখে
পদ্মা সেই ঘরেই ঘরে গেল। এখানে থাকলে ভুবু দিদির কাছাকাছি
থাকা হবে। সেই বাগানে একটা বড় পদ্মফুলও ছিল। পদ্মা
পদ্মফুল বড় ভালবাসত। কিন্তু দিনের বেলায় পদ্ম ফুলে ঘনি
কেউ বকে, এই ভরে সে রোজ ভোর রাতে গিয়ে পুকুরে হান করে
জলের মধ্যেকার সব ঘরে বড় পদ্মগুলি ফুলে আনত।

এই বাগানের খানিক ছিল ঐ রাজ্যের ছোটরাজপুত্র কমলকুমার।
সেও পদ্মফুল খুব ভালবাসত। রোজ পদ্মফুলে হান করে
জলের সেরা পদ্মগুলি ফুলে এনে সে নিয়েই ঘর সাজাত। কিন্তু
কয়েক দিন ধরে সে দেখছিল জলের বেশীর ভাগ টাটকা কোটা বড় পদ্ম
কেউ রাতে ফুলে নিয়ে যায়।

পর পর কয়েক দিন এই ভাবে তার প্রিয় ফুল চুরি যাওয়ার
কমলকুমারের খুব রাগ হল। একদিন রাতে সে বাগান পাহারা
দেবার জন্য পুকুরের কাছে বাঁহের আড়ালে লুকিয়ে বসে
হইল।

পদ্মা এরা আর রাজকুমারের পাহারার কথা জানে না। তাই সে
বন অভয়নের স্বপ্ন হান করে জলের সেরা পদ্মগুলি ফুলে
পুকুরপাড় উত্তরে ট্রিক তখনই কমলকুমার এসে তার হাত চেপে
ধল। কল এক কুড়ি? রোজ রোজ আমার পুকুরের পদ্ম কেন
হুই করে নিয়ে যাও?

পদ্মা ঘলে ঘলে ভুবু পেলো বুঝে মারল করে বলল, কুড়িই
কে? এ পুকুর যে তোমার, তার এখান কি?

কমলকুমার বলল, আমি ঐ রাজ্যের ছোট রাজপুত্র কমলকুমার।
চল তোমাকে ঘরে রাজসভার নিয়ে বাছি। সেখানে পেলোই বুঝবে
এ পুকুর আমার কি না।

পদ্মা বলল, তাই চল। আমিও রাজসভায়কে বললে,
আমি জে কেবল ফুল চুরি করেছি। আর আপনাদা আমার
দিদি চম্।কে চুরি করেছেন। আমাকে যদি শাস্তি দেয় জে
আমার দিদিকে যে চুরি করেছে তাকেও শাস্তি দিতে হবে।

কমলকুমার অবাক হয়ে বলল, তুমিই তাহলে আমার বউদি
চম্।র ছোট বোন পদ্মা? বউদি রাজবাড়ীতে এসে পর্যন্ত মেয়ে
তোমার নাম করছেন। রাজ্যের সেপাই-শাঙ্গীরা যেন যেন তোমাকে
খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পদ্মা রাগ করে বলল, সেপাই-শাঙ্গী আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে
কেন? দিদির মতন আমাকেও জোর করে ঘরে আনবে বলে?

কমলকুমার উত্তর দিলেন তোমার দিদিকে আমরা জোর করে
আনিনি। ঐ যেন একটা রাজস থাকতো। তোমরা যে রাজ্যে
ছিলে তার মালিক ঐ রাজ্যের রাজা; রাষ্ট্র, রাজপুত্রের আর
সব লোকজন খেয়ে শেষ করে সে এসেছিল আমাদের রাজ্যে উপস্থাপ
করতে। তারপর আমার দাদার হাতে তীর খেয়ে সে আবার বনে
পালিয়ে গিয়ে বরখার ধারে তোমার দিদিকে দেখে তাকে ধরে
বলে ঘরে নিয়ে বাছিল। আমার দাদা সে সময় রাজসভায়
তাড়া করে বনে গিয়ে তাকে মেয়ে তোমার দিদিকে অজানি অবস্থায়
রাজবাড়ীতে নিয়ে আসেন।

সকাল বেলায় তোমার দিদির জান হল, তার কাছ থেকে
তোমার কথা শুনে বাবা তখনই তোমাকে আনবার জন্য
বনে লোক পাঠান। কিন্তু সারা বন খুঁজেও লোকেরা
তোমাকে পাননি। তোমরা রাজকুমারী জেনে বাবা তোমার
দিদির সঙ্গে আমার দাদা কমলকুমারের বিয়ে দিয়েছেন। এখন
চল তোমাকে তোমার দিদির কাছে নিয়ে যাই।

তারপর? তারপর তো বুঝতেই পারছ হুই বোনে এক হয়ে
কত সুখী হল। তাদের সেই আনন্দ আরও বেড়ে গেল যখন
কমলকুমারের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে হল টাক ফুফুস ঘুম বাঁহা
বাঁহিমে আর সারা রাজ্যের প্রজাদের তোলা বাঁহি।

কিশোর-সাহিত্যে রোমাঞ্চ

শ্রীমতী হান্না মেথী

সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি প্রধানত দুইরকম উপভোগ্য

নাটক, কবিতা এবং বহু রচনা প্রভৃতি। তন্মধ্যে ভাব
লিখতে পারলে রসোত্তীর্ণ ভ্রমণ কাহিনীও উপভোগ্য সাহিত্যের
পর্যায় পড়ে। কিন্তু রোমাঞ্চের গল্প বলতে আমরা যা বুঝি
তাকে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলতে বোধ করি সব সমালোচকদেরই
আপত্তি আছে। উচ্চশ্রেণীর গল্প ও উপভোগ্যে ভাবিকা ইত্যাদি
কল্পের সমস্ত সত্ত্ব রোমাঞ্চের দলভূমিকে বাক দেওয়া যায়।

এক বিশেষ অজ্ঞানের অজ্ঞাত হয়ে পড়েছে। এবং উদাহরণও আমাদের চোখে প্রতি পড়েই পড়ে।

রোমানকর সাহিত্য বলতে আমরা বা বুঝি তা শুধু ডিটেকটিভ গল্প, কিন্তু ভালো ভাবে বিচার করলে বৈজ্ঞানিক রহস্যের গল্প এবং এ্যাডভেঞ্চারের গল্পকেও স্থান দিতে কারোর বিমত হবে না। এ হিসাবে আমরা ওয়েলসের 'দি কাট মেন ইন দি মুন', 'দি ডোর ইন দি ওয়াল', এম, আর জেমসের 'ক্যাট্টিং দি ফ্লস', আর এল ট্রিভেনসনের 'ট্রেকার আইল্যান্ড', উইলকি কলিনসের, 'উগথ্যান ইন হোয়াইট' এসবকেই রোমানকর সাহিত্যের শ্রেণীতে ফেলতে পারি। শেষোক্ত উপন্যাসটি একটি সফল সামাজিক উপন্যাসও বটে। কারণ যাতে মানবিকতা পূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করেছে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলতে বিধা হয় না।

এবার রোমানকর সাহিত্য সম্পর্কে জনমত কি রকম দেখা যাক। পাঁচাত্তম দশক রহস্য-উপন্যাসের কাঁচটি দাখল। কোনান ডয়েলের চেয়ে শার্লক হোমস অনেক বেশি বিখ্যাত। শার্লক হোমসের নামও দেশের লোক পাগল। কেবল লেখা পড়েই ওদেশের জনসাধারণ এত উন্মাদ হয়ে পড়েছিল যে তারা শার্লক হোমসকে কীবিত দেখতে চেয়েছিল। এ সম্বন্ধে 'এত কৌতুককর গল্প আছে যে, তা রহস্য-উপন্যাসের আধার এবং লেখকের কৃতিত্ব সমভাবে এ দুইয়েরই প্রমাণ করে। অজানা রহস্য সম্বন্ধে কৌতুকল মাছবের চিরদিনের চিরকালের এবং এই উপর ভিত্তি করে মাছবের এত কল্পনা-সজ্জনা। তা ছাড়া ভৌতিক কাহিনীরা একটা ছায়াময় আভিহা আছে, মাছবের জীবনে অন্ততঃ এক বারো একটা অদ্ভুত অশরীরী অস্তিত্বের জড়ত সড়া এসেছে এডলার এ্যাডেন পো এবং জেরোম কে জেরোমের কোন কোন রচনা এই কথাই বীজিত করে।

দুই দশকে অগাস্ট আকাশে, পূর্বদিকের পরপারে, মহা সমুদ্রের অতল গভীরে, 'ফুহিন' হিমমেল-শিখার ব্রোহ্মরু অস্তিত্ব মঙ্গল-সাহায্যর বাস্তুজ্ঞের আর্জনাৎ মাছবের মনে শুধু কাব্যের স্বপ্নাই জাগার নিন 'আগিরেছে আবার কিছু। মাছবের একটা মন নিরন্তর কলকাতাহলে ব্যস্ত থাকতে পারেন তাই একটু কীক পেলেই রহস্যের সন্ধান-পিরাসী মন জাগ্রত হয়ে ওঠে। পক্ষ ইন্ডিয় ছাড়াও মাছবের আর একটা ইন্ডিয় আছে, যেমন হুহুর লোক থেকে অজানা অসৌকিক রহস্য রোমানকর সন্ধান এনে দেয়, এই ইন্ডিয় তারই পথপ্রদর্শক। শিত ও কিশোরদের কল্পনাপিণ্ড মন, অজানাকে একান্ত করে জানার আগ্রহ এ্যাডভেঞ্চারের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সর্ব দেশের সর্ব কালের শিত কিশোরদের এ্যাডভেঞ্চার-পিণ্ড মনকে তাদের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছেন (বহু ক্ষেত্রে বড়দের সাহিত্যেও) বহু ব্যাত অখ্যাত লেখকবৃন্দ। বাঁদের লেখা নিয়ে বলবার বিন আভ এসেছে। অধমিকার বশে পরিত্যাগ না করে সবচেয়ে সে স্বপ্ন রচনার আসোচনা হওয়া উচিত। রচনার নৈপুণ্যে, বিবরণবস্তুর অভিনবত্ব, পঞ্চদশে শিত কিশোরদের মনপ্রাণকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ সর্বিহিতাকর্যও কম প্রচেষ্টা করেননি। কাজেই তাকে তুলে বলে 'অগ্রাহ্য করবার অবজ্ঞা করবার কোন প্রায়সঙ্গত কারণ নাই। কেউ কেউ বলতে পারেন এদেশ আর ওদেশ—অনেক ভঙ্গ। হতে পারে—কিন্তু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব পরিবেশ আছে, সে কথা তুললে কলবে কেন? বাংলা দেশের শিত সাহিত্যিকদের

একটা বিশেষর আদে বা অস্ত দেশের রোমান সাহিত্যে কমই চোখে পড়ে, তা হল এই—আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ, তুচ্ছ পরিবেশ থেকে ক্রমশঃ রহস্য-যন আবিষ্কার জাগিয়ে তোলা।

রহস্য রোমানকের প্রতি আগ্রহ অনাধারদের কথা ছেড়ে দিলেও অসাধারণের আগ্রহও এর প্রতি কম নয়। এ বিষয়ে আমরা বাট্টাও রাসেল, তার অলিভার লুক এবং চার্লস ডিকেন্সের উদাহরণ দিতে পারি। রাসেল বৃদ্ধ বয়সে নৃতন করে ভৌতিক কাহিনী লিখতে শুরু করেছেন। চার্লস ডিকেন্স হুত্মর জন্ত এমন একটি রহস্য-উপন্যাস অসম্পূর্ণ রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বা নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃতি পেতে পারতো। এ ছাড়া আমাদের দেশের সম্বন্ধে অল্পদূর্য্য সেরী হেলক, ক্রীষ্ণবিশ্বের অ্যাবলার্ডের দরজার কথাও বলতে পারি। আমাদের দেশেও রসসাহিত্যের চেয়ে রহস্যগল্পই বেশি কাটে, এ কথা সন্দেহ করলে ভুল হবে না হয়ত।

অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকাদের হাতে যোরে মোহন সিরিজ, বাক মরিস সেবলেকের বার্ষিক অল্পকরণ বললেও যোব নেই। খুবই বিমর্ষ হই একথা ভেবে যে আজকাল রহস্য সাহিত্য বলে আমাদের দেশে বা চলছে তার অধিকাংশই রাস্তার কোলে সেবার মত। কোথায় ওয়েলস আর জুলভার্ন আর কোথায় শশধর সত্য আর স্বপনকুমার। এ পর্যন্ত আমরা শিত ও কিশোরদের জন্ত রহস্য ও রোমান সাহিত্য বলতে বা পেয়েছি তাঁর মূল্য বড় কম নয় কিন্তু এর মান দিনে দিনে আরও উন্নত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে এখনও আমাদের সুসাহিত্যিকের প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক পটভূমিকার রহস্যযন মৌলিক গল্পেরও আজ খুব প্রয়োজন আছে। কারণ তা না হলে আজকের দিন কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করবে না এবং সে গল্প হবে অচল।

অবশ্য আমাদের দেশে কোনান ডয়েল বা এইচ জি, ওয়েলস না থাকলেও একেবারে কিছুই নেই বলা চলে না। বৈদেশিক সাহিত্যে আমরা যেমন প্রতিভার লেখকের সমারোহ দেখতে পাই, এদেশেও তার কিছুটা একেবারে বিরল নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা এইচ জি ওয়েলস এবং প্রেসেন্স মিত্রের তুলনা করতে পারি। অবশ্য প্রেসেন্স মিত্র ওয়েলস হতে পারেননি কিন্তু তিনি যে বাংলা কিশোর-সাহিত্যকে নৃতন কিছু দিয়ে গিয়েছেন একথা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রে উপজীব্য করে সব দেশের পাঠকদের যে কৌতুকল তা বখাসাধ নিবারণ করবার চেষ্টা করেছেন ও দেশের ওয়েলস এবং জুলভার্ন। তাঁদের মত উন্নত সৃষ্টি করা প্রেসেন্স মিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব না হলেও 'পাতালে পাঁচ বছর' 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' এক 'মরণদানবের বীণ' পড়লে মনে হয় তার পিছনে নি ওয়ার অব বি ওয়ার্ডস বি আইল্যান্ড অব ডব্লিউ মোরোর পরিকল্পনা দেখতে পাই। অনেকটা এই বকর ধরনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির পটভূমিকার অভিনব ধরনের নৃতন উপন্যাস 'মুকুত'। ক্রীষ্ণবিশ্বনারায়ণ ভট্টাচার্যের এই উপন্যাসটির নৃতন ধরনের উন্নত মাছবের এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভবিষ্যতে হুত্ম অল্পকরণ অসম্ভব হবে না। এইচ, বি ওয়েলসের 'বি আইল্যান্ড অব ডব্লিউ মোরো'তে যে মরণভয়ের দিয়ে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সৃষ্টি করা হয়েছে, অনেকটা তাইই আভাস দেখতে পাই ক্রীষ্ণবিশ্বনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গিণী পাহাড়ের নীল কুঠি' নামে ছোটগল্পে। তবে ডব্লিউ মোরোতে বৈ মরণভয়ের

মিয়ে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সৃষ্টি করা হয়েছে অনেকটা তাইই আভাস দেবে পাই প্রীতীজ্ঞানারায়ণ ভট্টাচার্যের 'রসিলা পাঁচাত্তর নীল কুঠি' নামে ছোটগল্পে। তবে ভট্টর মোরোর যে যুগান্তবাসী বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল পৃথিবীর মাছধর করার, তার সঙ্গে ভট্টর চিরঞ্জীবের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নামে মানুষদের নরপণ করে তোলার নৃশংসতাকে মিশিয়ে ফেলে তুল হয়ে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং কিতীজ্ঞানারায়ণ ভট্টাচার্যের যুগ প্রচেষ্টা ওয়েলসের প্রতিভা খানিকটা বহন করে এসেছে। ফরাসী সাহিত্যিক জুলভার্ন যে আদর্শ ছাপনা করেছেন, বাংলা ভাষাতে তার স্থানে আমরা হ'ল মাত্র লেখকের নাম করতে পারি, একজন কুলদারজ্ঞান রায় এবং অপরজন রমেশেন্দ্র দাস। এঁদের মধ্যে কুলদারজ্ঞান মৌলিক কাহিনী বিশেষ কিছু লেখেন নি অবশ্য। কিন্তু এঁর অপর অম্বাবাদ পড়তে পড়তে মনে হয় এ রকম সাবলীল স্তম্ভের অম্বাবাদ এবং নানা বিষয়ে প্রগতি পান্ডিত্য অম্বাবাদী মনের সামনে নূতন জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

সাগরিকা, অজ্ঞাতদেশ এবং আশ্চর্য্য ছাপ পড়লে মনে হয় অম্বাবাদকদের প্রাণের সৃষ্টি ও মৌলিক প্রতিভা অম্বাবাদ রচনার সাথে মিশে রয়েছে। ঠিক এই রকম ধরনের প্রাণবন্ত লেখা পাই হরকিস্তর ভট্টাচার্যের রচনায়, যদিও তা অম্বাবাদ নয়, তথাপি ওয়েলসের ক্ষণ প্রভাব আছে মনে হয়, যাক অম্বাবাদ বলা যেতে পারে। "মঙ্গল গ্রহে কারা থাকে" এই রচনাটির বিষয়বস্তুর চমকপ্রদ অভিনবতায় তিনি যে ভগ্নাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই আশ্চর্য্য। হরকিস্তর ভট্টাচার্যের লেখা "কটা পৃথিবী," রীতিমত বিশ্বের এবং কোঁহালের কারণ হয়েছে। বাস্তবিক মহাশূন্যে আমাদের সৌরজগতের বাইরে কত অজানা বিশ্ব লুকিয়ে আছে, তা জানার ইচ্ছে মানুষের চিরন্তন; এই রকম উপাদানে আরো লেখার দরকার। ওদেশে নূতন ধরনের বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় রোমাঞ্চের উপভোগ্য লিখে এঁচি, ফি, ওয়েলস যে চাকল্যের সৃষ্টি করেছিলেন এদেশে ঠিক তেমনি ভাবে সাদা জাগিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং হরকিস্তর ভট্টাচার্যের কোন কোন রচনা। মহাসমুদ্রের অতল গভীরে, ভূগর্ভস্থের অপর পিঠে, গগনচূষী পর্বত-শিখরে এমন কি পৃথিবী ছাড়িয়ে মানুষের মতই কোন বুদ্ধিমান জীব আছে কি না তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার শেষ নেই। বাস্তবধর্মী এ্যাডভেঞ্চারের গল্পে কুলদারজ্ঞান রায় এবং রমেশেন্দ্র দাসের তুলনা নেই। একদা 'রবিনসন ক্রুসো' ও 'হুইট ক্যামিলী রবিনসন' পাঠক মহলে যে ঝড় তুলেছিল, সমাদৃত হয়েছিল বোধ হয় তার চাইতেও জড় স্তম্ভের এদের রচনায় প্রাণসঞ্চার করবার ক্ষমতা। রমেশেন্দ্র দাসের নিজস্ব মৌলিক রচনাগুলিও তাঁর সুনাম বজায় রেখেছে। তাঁর লেখা 'পাজলনগরী', 'লাইট হাউস রহস্য' এবং 'আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে', 'লাইট হাউস রহস্য' বোর্দিও বোপের যে অপর বিষয় পাওয়া যায়, তা সত্যিই চোখের সামনে ওপানকার দৃষ্টপট উন্মুক্ত হয়ে যায়, তবে শেষ দিকের ঘটনাটি সঙ্গিবোধিত না হলেই সর্গীলস্বপ্ন হতো।

বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক রহস্য এবং অভিযানের কথা বার দিলে যাকি থাকে ডিটেকটিভ ও এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। সাধারণ লোকদের

এই ধরনের বই যত শ্রীর ক্লাসিকাল নভেল ঠিক ততটা নয়। বাংলা শিশুসাহিত্যে এই ধরনের বই অনেক বেয়িচ্ছে, কিন্তু উন্নত ধরনের বই বেয়িচ্ছে খুব কম। ধরা এই ধরনের বই লিখেছেন, তাঁদের সীর্গস্থানীয় হচ্ছেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

ওদেশে রহস্যসাহিত্যে অধিতীয় হচ্ছেন টিডেনসন। 'ফ্রেন্সার আইল্যান্ড', 'কিডজাপড' প্রভৃতি এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী লিখে এবং নিউ 'আরাবিয়ান নাইটস' প্রভৃতি রহস্যকাহিনী লিখে তিনি তুলনামূলক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রহস্যকাহিনীর লেখক বলা চলে। এ বিষয়ে বিধার কোনও কারণ নেই, আমাদের দেশের সাহিত্যের মান বিচার কমলে সহজেই হেমেন্দ্রকুমার রায়কে টিডেনসনের আসন দেওয়া যায়।

অবশ্য এর কারণ এই নয় যে, হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে টিডেনসনের লেখনভঙ্গীর কোন সাদৃশ্য আছে। তা নয়—এ তুলনার অর্থ পাঁচাত্তর যেমন টিডেনসন অধিতীয়, ঠিক তেমনি এদেশেও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সমতুল্য কেউ নেই। ১৩২১ সালের মোচাক্ষে বধন হেমেন্দ্রকুমার 'বকের ধন' লিখেছিলেন, তখন সমস্ত বাংলা দেশে রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল, কারণ, এমন রোমাঞ্চের ঘটনাবল্ল উপভোগ্য আর ছিল না। অবশ্য ওর অনেক আগে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় 'লোহার বাঁশ' লিখেছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা এমন ভাবে সমাদর পায়নি। বকের ধন এবং তার নায়ক বিমল ও কুমার সম্পূর্ণ ভাবে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়ালে। তাদের আগ্রহ চরমে উঠলে বধন 'মেঘদূতের মস্তিষ্ক আগমন' এবং 'মহানামতীর মাদ্যাকানন' লিখে তিনি আরো উন্নত ধরনের প্রতিভার পরিচয় দিলেন। যদি বুদ্ধদেব বহু বৎসনে যে এসব লেখার পেছনে বিদেশী ইচ্ছাক্রমে রয়েছে—তবে সর্দিনয়ে বলা চলে যে—অম্বাবাদ-সাহিত্য কি প্রতি দেশের সব সাহিত্যেরই একটা বৃহৎ অংশ ছুড়ে নেই? আমরা কি তবে বার্ষিক শব্দের লেখা ছেড়ে আমাদের দেশের হিরণ বস্তুর লেখা পড়বো?

তাছাড়া হেমন বাবুর লেখাকে শুধু মাত্র অম্বাবাদ বললে সত্যের অপলাপ হবে সুনিশ্চিত। হেমেন্দ্রকুমার প্রথম তিনখানা উপভোগ্য লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও এর মধ্যে কাঁচা হাতের ছাপ অস্পষ্ট নয়। কিন্তু আবার 'বকের ধন' থেকে তাঁর হাতের রচনা একেবারে পাকা। আবার বকের ধন পড়তে পড়তে আমরা উৎকণ্ঠিত হলেও আফ্রিকার ষাণদসকুল অরণ্যের পরিচয় পাই। তাঁর লেখা সূর্যনগরীর গুপ্তধন, যক্ষপতির রত্নপুরী, হিমালয়ের ভরদ্বার এই নৈপুণ্যকে ব্যাপক করা ছাড়া কমাতে পারে নি।

তাঁর রচিত ডিটেকটিভ কাহিনীও অনবদ্য। "জেরিনার রক্তহারা" ও "জগজ্ঞের কণ্ঠি" পড়তে পড়তে মনে হয় এ দেশ ডিমা-মাইটারের আরেক আশ। "ভাগ্যের দুঃখ" বইটিতে তিনি আমাদের মনকে রহস্যে ঘেরা পরিবেশের ভেতর দিয়ে চীনা, তাও বর্ধ সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রাণবন্ত ভাব—নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের সমারোহ আছে। তাঁর রচনা পাঠকদের মনকে আকর্ষিতকরীল ও সর্বল করে তোলে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ডিটেকটিভের জরাজ ও মাহিক নিঃসঙ্গেই পাঠকদের হৃদয় জর করেছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু-উপভোগ্য মাদ্যাকার

হৃদয়ে! এমন সকল রোমাঞ্চের ইজিডি বাংলা দেশে খুব বেশি নেই।

রোমাঞ্চের সাহিত্যে ইজিডি আরো অনেকই স্থিতি করেছেন। শ্রীযুক্তলাল রায়ের 'অভিশপ্ত' একটি অদ্ভুত রোমাঞ্চের করণ উপজাতি। কেবল এই একটি উপজাতিই রবীন্দ্রলাল রায়কে কিশোর-সাহিত্যে চিরস্বয়ংরূপ করে রাখবে। উপজাতিটির প্রথম দিক—তাইবোনের যে উৎসাহপূর্ণ অভিধান শূন্য পথে এরোপ্লেন নিয়ে,—তা বিশেষ করে পাঠিকাদের মনে সাদা জাগিয়ে তোলে। ইরার সাহস, ধৈর্য এবং আত্ম উৎসাহ এবং বর্ণিতের ভগিনীস্নেহ, এবং অজয়ের আন্তরিক বন্ধুপ্রীতি মনকে আকর্ষণ করে। প্রথম দিকের একটি দিক এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, শোকাক্ত পিতামাতা যখন সন্তানদের সংবাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন সে সময়ও তাঁরা যে অদ্ভুত সংযম ও তত্ত্বতা ও সুরবিলেচনা দেখিয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে বাস্তব ক্ষেত্রে তা অমূল্যবোধ্য। উপজাতিটির শেষ দুই পরিচ্ছেদে কল্লনাভীত বিষয়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়,—অদ্ভুত একটা ভীতি-বিহ্বলতা মনকে আশ্রয় করে। এই রকম বিষয়বস্তু নিয়ে গোধ হর আর কোন উপজাতি বার হয়নি। মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর এই নামে ধারাবাহিক ভাবে উপজাতিটি 'রামকল'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রীযুক্তলাল রায়ের আবিসিনিয়া ক্রুসে, প্রায়ের পথিক, আঁধার রাতে আর্ডানাদ, কামাদের মধ্যে নানকিউ প্রভৃতি অপূর্ণ ইজিডি। রোমাঞ্চের বীরত্ববাক্য বিরোগাঙ্ক উপজাতি লেখাই শ্রীযুক্ত রায়ের বৈশিষ্ট্য। বাঙালী যে কোথাও পিছিয়ে নেই জলে, স্থলে, বর্ণক্ষেত্রে সে যে অসীম বীরত্ব এগিয়ে যেতে পারে বিশ্বমাত্রাই তার মূল মন্ত্র। আমরা প্রেরণা পাই তাঁর লেখা থেকে। তবে ভারতবর্ষ, চীন দেশ এবং বুটেনকেই মিত্রতার পুরোভাগে ধাঁড় করিয়েছেন এবং অনেকক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি ভেদে কালো তুলিকার ছাপ না দিয়ে কেবল দেশভেদেই দিয়েছেন। ঈশ্বর প্রচারধর্মীর গন্ধ না থাকলে তাঁর উপজাতিগুলির কয়েকটি ভুলনাবিহীন বলা যেতো।

ধারা অভিযোগ করেন এ্যাডভেঙ্কার উপজাতি লিখতে গেলেই নায়কদের আফ্রিকাতে নিয়ে যাওয়া লেখকদের প্রধান দোষ। তাহলে তাঁদের বলবো, এর দুটো কারণ প্রথমতঃ বই পড়ার বিষয়ে তাঁদের অহুসকারী মনের একান্ত অভাব, ভালো বই খুঁজে দেখবার অবসর তাঁদের নেই, দৈন্য হাতের কাছে পেলেন তো পড়লেন এবং তার থেকেই উৎকৃষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিচার হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভুলে যান সমগ্র ভারতবর্ষে উপযুক্ত পটভূমিকার অভাব নেই, যার জন্য সব সময় অল্প দেশের পটভূমিকাকে ধার করতে হবে। বাংলা দেশের স্তম্ভ বন, আসামের জঙ্গল পাহাড়, পর্বত, নাগপুর ও ছোট নাগপুরের জঙ্গল, হিমালয়ের পালভূমি উপত্যকা ও অধিকাংশগুলি, সমগ্র ভারতবর্ষে ছোট বড় অসংখ্য স্থান ছড়িয়ে আছে পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, জলাভূমি, বিতর্পী প্রান্তর, তরু মরুভূমি কোন কিছুই অভাব নেই।

তাই এই ধরনের সমালোচকদের উচিত দেশীয় পটভূমিকার লিখিত উপজাতি ও গল্পগুলি পড়া, হেমচন্দ্রমার যার রচিত অমাবস্তার রাত। 'ক' নামে ছোট গল্পটি, প্রশান্তের অরিলীলা, শ্রীকান্তলাল রায়ের ককর জলসে, পৌরীসমোহন মুখোপাধ্যায়ের

লাল কুঠি, হিরমন্তার মন্দির, বতীন সাহার সোনার বক্স, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ডাকাডের হাতে ইত্যাদি। দেশী পটভূমিকার লিখিত বই যে কত সুন্দর হতে পারে এই সব বইগুলিই তার প্রমাণ, অহুসকারী করলে এই রকম রচনা আরও পাওয়া যাবে। তাছাড়া ভালো রচনার জন্য পাঠকদের দাবী জানানো উচিত। তাঁদের আগ্রহ উৎসাহ পেলে সার্থক রচনা স্থিতিতে মনোবাগী হওয়া উচিত।

অত্যন্ত নীচুদের সন্তার মারপ্যাচে পাঠকদের ভোলাবার চেষ্টা করেন এক শ্রেণীর লেখক, কিশোর-পাঠ্যর নামে কত যে অপাঠ্য চলে যায়। এবার ডিটেকটিভ প্রসঙ্গে আসা যাক; এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বহু লিখেছেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের প্রশংসনীয় ছকা-কাশি সত্ত্বেও বাংলা ভাষার এখনও সত্যিকার ডিটেকটিভ গল্প হতে পারলো না। শুধু তার বিকৃতি চরমে উঠলো শিশু-সাহিত্যের কুপখাশালার। হৃদয়ের বিবরণ এ বিকৃতি আমরা দেখতে পাই বুদ্ধদেব বহুর নিজের রচনাতেই, কিশোর-সাহিত্যে রোমাঞ্চ আনার ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেননি। রহস্য ও রোমাঞ্চের নামে অসার বস্ততে পাড়া ভরেছেন, একঘেয়েমীর চূড়ান্ত। এ ছাড়া আর ধারা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে স্বপনকুমার, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং রাধারমণ দাস ইত্যাদির রচনা নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। আগাছার মত বহু রচনার অভাব বাংলা দেশে নেই, কিন্তু তার কোন সার্থকতা আমরা খুঁজে পাই না। ভারতীয় মেয়েদের রহস্য-রোমাঞ্চ বা গোয়েন্দা কাহিনীর মাঝে অসার্থক ভাবে আনার কোন মানে হয় না। কেন না আজকালকার দিনের মেয়েরা এ্যাডভেঙ্কার বা গোয়েন্দাগিরিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অসমর্থ একথা বলতে চাইনা কিন্তু তাদের নিয়ে লিখতে গেলে যে কলাকৌশল সহজ সুন্দর রচনা করা দরকার, সে ক্ষমতা এদের লেখনীতে নেই। কিশোর সাহিত্যে রহস্য ও রোমাঞ্চের পরিবেশে মেয়েদের এগিয়ে আনা বড় সহজসাধ্য নয়। এ বিষয়ে প্রকৃতই আগ্রহ ও কৌতুক জাগিয়ে রাখার মত শ্রেষ্ঠ রচনা প্রবোধচন্দ্র ঘোষের 'আজও তারা ডাকে', পড়ার পড়ও সহজে ভুলতে না পারার মতো রচনা সার্থক হইবে। সুমিতা ও চন্দ্রার চরিত্র যেভাবে রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে আনা হয়েছে তাতে লেখকের যে রকম নিপুণতা প্রকাশ পায় তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর একটি দারী চরিত্র মিসেস ডিক্কা, অদ্ভুত রহস্যময়ী মহিলা মিসেস ডিক্কা পাঠক-পাঠিকাদের অরণ্য থাকবে, 'বাইরের বাড়-জলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে উঠলেন মিসেস ডিক্কা' পড়লে মনে থাকবে। যদিও এটা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি 'রং মশালে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আশা করা যায় রচনাটি বই হিসাবে বার হ'লে জনপ্রিয়ও সমাদৃত হবে।

শ্রীনিহাররঞ্জন গুপ্ত একজন লক্ষ্যপ্রার্থী সাহিত্যিক, রহস্য উপজাতিসিক। কিন্তু সত্য বলতে কি, একমাত্র কালো ভ্রমরই তাঁর সার্থক স্থিতি। এই রকম কিশোরপাঠ্য উপজাতি আর তাঁর বহু কমই আছে। 'নাগপান' অপর একটি ভালো রচনা, সত্ত্বেও অসুবাদ, তবুও রসোত্তীর্ণ। এই রকম আর দু-একটা ছাড়া আর সবই কিশোরদের অপাঠ্য। তাঁর অধিকাংশ উপজাতিই সৌভাগ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কিশোরপাঠ্য (কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবও) রহস্য-উপজাতিসিক বলে মানতে বিধা হয়।

তার লেখার কিরীটি গোয়েন্দাকে নাইট হ্রাবের গোয়েন্দার বাসিন্দা
কলসে বোধ হয় অত্যাশ্চর্য্য হইবে না।

বালা দেশের ছেসেমেদেরের হাতে প্রকৃত ভালো উপজাতি তুলে
দিয়েছেন স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিগণ রচনা
একবার তাঁরই হাত দিয়ে বার হয়েছে। মনোরঞ্জন যে কি স্বক
স্বিক ছিলেন তা তাঁর অবিমর্ষণীয় গোয়েন্দা ছক-কাশির নাম ওনসেই
লোকা যায়। কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস ও মনোরঞ্জনের
মূলগত সুরস্কৃ এক। সেইজন্য কোন কোন পাঠক তাঁর "বোম
সৌরীর হরি" উপজাতিটির সঙ্গে কোনান ডয়েলের "সিঙ্গ নেপোলিয়নের"
টেকনিক সাধুত আছে মনে করছিলেন। কিন্তু এ রচনা ছাট
পাঠক মাত্রই জানেন, এ সন্দেহ আসলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
জতি সন্দেহ মাধুর্য্যপূর্ণ সহজ ভাষার লেখা তাঁর প্রত্যেকটি রচনা।
জাজগুবি, গাঁজাবুড়ী খুল-জ্বাম, গোয়েন্দার অত্যাশ্চর্য্য অর্নোকিক
কমতাসম্পন্ন অবিদ্যাত ঘটনা অথবা গভীর সমুদ্রের মাঝে পড়ে
গিয়েও নায়ক বেঁচে যায়, উড়ন্ত প্লেন থেকেও নায়ক অক্ষত দেখেই
নেমে আসে, গায়ে পুর পর সাতটা গুলী লাগলেও নায়ক গোয়েন্দার
কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, এ রকম সোমহর্ষক ঘটনা—অর্থাৎ
সত্তার মাদর্প্যাট নেই কোথাও, কিন্তু তবুও কি রকম পরিচ্ছন্ন
কৌতুকোদ্দীপক তাঁর প্রত্যেকটি রচনা!

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অদ্ভুত বুদ্ধি-
চাতুর্য্য এবং কখন-কোশল। তাঁর প্রথম উপজাতি "পদ্মরাগ" এই
উপজাতিতে কে যে প্রকৃত অপরাধী তা কল্পনা করা প্রায় হুসাধ্য।
অথচ শেষ পর্যন্ত পাঠকমনকে সমান আগ্রহে এগিয়ে নিয়ে চলে।
তাঁর রচনার নূতনত্ব জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে—এটা যে
কত বড় সমস্যা! তা এক কথায় বলা যায় না। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপজাতি
"সোনার হরিণের" অপরাধী যে মিঃ বাসু তা বলে না দিলে ধরা
প্রায় অসাধ্য। পাঠকমনকে যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে মস্তিষ্ক
চালনার সুযোগ দিয়েছেন লেখক। কিন্তু মনোরঞ্জন যে ততটা
জনপ্রিয় হতে পারেননি তার কারণ তাঁর লেখা নিয়ে আন্দোলন
করার মত প্রকৃত সমালোচকের অভাব। অতি অল্পবয়সে তিনি যা
দিয়ে গেছেন তাঁর স্থান পূরণ করবার মত খুব কম শিশুসাহিত্যিক
আজ আছেন। বীরা তাঁর রচনা পড়ছেন তাঁরাই তাঁর শ্রেষ্ঠ
সম্পর্কে অবগত।

এর পরে আরো কয়েকজন কুশলী লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার
নাম উল্লেখ করতে চাই, সেগুলি উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা কাহিনী,
কিশোরদের হাতে তুলে দেবার মতই। বিশেষ করে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
চট্টোপাধ্যায়ের জঙ্গ-পরাজয়, বিজয় অভিযান, রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার;
হেমেন্দ্রকুমারের বিতরণের জাগরণ, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, স্বককারের বহু,
সুহৃদ্যর দে-সরকারের হানাবাড়ী এবং মনটা ছ হ করে, একটা প্রশাসার
পক্ষে সুহৃদ্যর দে-সরকারের-লেখা মনটা ছ হ করে, একটা প্রশাসার
যোগ্য আকর্ষণীয় লেখা, তাঁর রচনা পড়লে অসুখের সন্দেহ থাকেনা
কিশোর-সাহিত্যে লেখক একজন শক্তিমান রহস্তোপজাতি লেখক।
এখানে বলতে ভুলে গিয়েছি, ছোটদের জন্য কাকনজন্মা সিরিজ,
জলকন্যা সিরিজ এবং প্রহেলিকা সিরিজে অনেক নূতন ধরণের
গোয়েন্দা কাহিনী এবং রোমাঞ্চ কাহিনী বেরিয়েছিল; বলা বাহুল্য
এ এন্টো প্রশাসার। কারণ প্রথমোক্ত সিরিজ ছাট থেকে

অনেকগুলি এবং শেষোক্ত সিরিজ থেকে হু-স্তিরে ভাল বই পাওয়া
যায় বা প্রশাসার যোগ্য।

অতি উত্তম না হলেও কিশোরপাঠ্য রহস্য ও রোমাঞ্চকর যে
কয়েকখানি ভালো বই আমরা পাই এই সিরিজে তিনটির থেকে তার
মধ্যে কয়েকখানি হয়ত অসুখের, কিন্তু তবুও তা প্রশাসার যোগ্য।
এর মধ্যে আমরা হেমেন্দ্রকুমারের সুন্দরবনের রক্তপাগল, কুমারের
বাঘা গোয়েন্দা, রক্তপূরের স্বাধীনতা, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের সকলের হিমালয়,
জুবোদ্ধকুমার দাশগুপ্ত জীবনের মেয়াদ, শেষ নিশ্বাস ইত্যাদি।
এই সিরিজ ছাড়াও আরো কয়েকখানি সুখপাঠ্য বই-এর নাম করা
যেতে পারে। সুহৃদ্যর দে-সরকারের হলুদকুটি, নিশাচর,
খগেন্দ্রনাথ বিশ্বের আফ্রিকার জঙ্গল, হেমেন্দ্রলাল রায়ের দুর্গম পথের
স্বাধীনতা, সুবোধেন্দ্র মজুমদারের পাতালপুরী ইত্যাদি। ছোটদের মনকে
আকর্ষণ করার মতই লেখা এগুলি। ছোটদের জন্য লিখতে গেলে
কল্পনার মাত্রা সহজ স্বপ্নের স্বাভাবিক হওয়া চাই।

আমরা ছোটদের রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কাহিনীকে তিন ভাগে
বিভক্ত করতে পারি যথা—বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় কোন বৈচিত্র্যময়
অভিযান বা রহস্যজনক আবিষ্কার। নানারকমের অভিন্ন
পদ্ধতির গোয়েন্দা কাহিনী, তৃতীয়তঃ প্রেতাত্ত্বের উপর ভিত্তি করে
নানা রকম ভৌতিক কাহিনী। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে যাই
লেখা হোক, আন্তরিকতার স্পর্শ না থাকলে সবই অসল। উপযুক্ত
ছোটদের কাহিনী বড়দের মনকেও আকর্ষণ করে। যথার্থ
রসোদ্ভাবী ভৌতিক কাহিনীগুলির আদর বড়দের কাছেও কম নয়।
নানা রকম বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় লেখা গল্প এবং গোয়েন্দা
কাহিনী ছাড়াও কিশোর-সাহিত্যে আর একটা বিশেষ স্থান অধিকার
আছে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর ভৌতিক কাহিনী। অস্বাভাবিক ভৌতিক
কাহিনী লিখে ওদেশে ডায়ামন্টকার যদিও ততটা খ্যাতি পাননি
তবুও তাঁর ডাকুলা যে সারা বিশ্বে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছে
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই উপজাতিটির চিত্ররূপ প্রদর্শিত
হয়েছে, নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন লন চ্যানী। অবশ্য
ডাকুলা উপজাতি ও তার চিত্ররূপের মধ্যে পার্থক্য আছে
যথেষ্ট। আজ পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যে যতগুলি ভৌতিক কাহিনী
রচিত হয়েছে, তার মধ্যে ভীষণতম উপজাতি এই ডাকুলা।
একে শ্রেষ্ঠতম বললেও বোধ হয় অত্যাশ্চর্য্য হইবে না।

বালা ভাষার মূল ভৌতিক কাহিনী বলতে আমরা ভূত, পেট্রী,
শাকচুরী দেড়ে মামলে এবং ব্রহ্মলতা বা ব্রহ্মলতার কথাই, এছাড়া
আর কিছুই পাই না। কিন্তু ভৌতিক কাহিনী অতি চমকপ্রদ ভাবের
বর্ণিত হলে মনকে তা কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখবেই। বালা দেশের
শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই ভৌতিক রসের নামে হাত্তরসের
সৃষ্টি করেছেন। ভৌতিক কাহিনীর মধ্যেও এমন একটা বাস্তব অথচ
ভয়ানক আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার যাতে পরিবেশটা বিশ্বাসযোগ্য
হয়ে পড়ায়। প্রেতাত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এদেশে ও ওদেশে
অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে, সেগুলি রহস্যময় পটভূমিকায় বাস্তব
অসুখতির ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, সেইগুলি যথার্থ সার্থক
হয়েছে, সত্য হোক মিথ্যা হোক ভৌতিক কাহিনীর যে একটা
বিশেষ মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। মাহবুব মুহাম্মদ
পরেও যে কিছু আছে এ নিয়ে গবেষণার জন্ত নেই, এক দিকে

যেমন পুনর্জন্মবাদ—আধ্যাত্মিক জন্মের কথি হয়েছে, অপর দিকে ঠিক তেমনি প্রেতজন্মবাদ—অপরীণী প্রেতাত্মা এমন কি শরীরী প্রেতেরও কথি হয়েছে।

যে দ্বিবা অমৃত্যুত্বি মানুষকে ভগবানের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়, সেই অমৃত্যুত্বিই মানুষকে জাগিয়ে দেয় জন্মান্বয়ের চার পাশে অমৃত্যু অলৌকিক রহস্যময় কিছু আছে। মানুষ মরে গেলেও তার ইচ্ছাশক্তির রাজ্য ক্ষয়, কোন কোন মানুষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে, বুঝাওত বিপদের জাগরণ তাহা বুঝতে পারে, মানুষ না থাকলেও তার হারামের স্তম্ভের ঠাঁক স্তম্ভ, অকৃত্রিম হাসনা কামনা হরত তা জাতি ভ্রমাদক, কেউ কেউ জ্ঞান চরিতার্থ করত চার অঙ্গনের ওপর নিজেকে আরাধন করে। রচনা কবন বিবরণকে অবলম্বন করে যে সমস্ত ভৌতিক কাহিনী রচিত হয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত হেমেন্দ্রকুমার দাসের রচিত লেখাগুলিই প্রোত্বেয়। যদিও তাঁর কয়েকটি বই ডাক্তারাল খণ্ডাংশের অল্পবাদ তবুও তার মধ্যে মৌলিকতার অভাব নেই, মিথ্যাই প্রাণবান আত্মই অল্পবাদ নয়। তাঁর কিশোরপাঠ্য রচনাগুলির মধ্যে যে লিপি-কুশলতা আছে তা অতি অল্পত। তাঁর লেখা বিশালগড়ের দুশাসন, মোহনপুরের খাদ্যন, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ এবং ঐকজালিক পড়লে চমৎকৃত হই। অল্পবাদ হলেও ডাক্তারাল সঙ্গে বিশালগড়ের দুশাসনের পার্থক্য আছে যথেষ্ট, মিলিয়ে পড়লেই সে কথা বুঝতে অল্পবিধে হর না।

‘বিশালগড়ের দুশাসন’র তাবা এবং ঘটনা-বিজ্ঞাস পাঠকে বিমিত্ত করবার মত। বিনয় যখন বিশালগড় অভিমুখে রওনা হচ্ছিল, সেইখানটা অথবা রাজ্য প্রতাপকল্পের ঘরে গিয়ে বিনয় বা দেখলো অথবা অবিশ্বাস বাবু যখন বিনয়কে প্রায় মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় গণ্ডির ভেতরে টেনে আনলেন তখন, তখন পাঠককেও ভীত, বিমিত্ত এবং চমকিত করে। হেমেন্দ্রকুমার দাস কৃত প্রোত্বেয় উপজ্ঞাস বলা চলে ‘মানুষ-পিশাচ’কে। কারণ ‘মানুষ-পিশাচ’র কাহিনীর বিজ্ঞাস, অত্যাশ্চর্য্য ভাবার খেলা এবং ভৌতিক অংশ সমস্তই অতুলনীয়। এরকম অল্পত লিপিচাতুর্য্য সাধারণতঃ কোন ভৌতিক কাহিনী রচনায় দেখা যায় না। ভয়াবহ অপরাধী নবাব ও তার ছয়জন প্রোত্বেয় অল্পচরের কথা যে একবার পড়েছে, সে কখনোই ভুলে যাবে না। ‘মানুষ-পিশাচ’র কাহিনীর মধ্যে ‘ডাক্তারাল’র একটা অল্পত আভাস আমরা অল্পভব করি। যদিও কাহিনীর জোর ‘বিশালগড়ের দুশাসন’রই বেশি। তবুও রচনা-স্বকতার জন্ত প্রথম স্থান ‘মানুষ-পিশাচ’র।

এ ছাড়া হেমেন্দ্র বাবুর আরও তিনখানি বই ‘সঙ্গার পদে সাবধান’, ‘রাতে বারা ভয় দেখায়’ ও ‘বাদের নামে সবাই ভয় পায়’ ছোট ছোট ভৌতিক কাহিনীতে পূর্ণ। এগুলির মধ্যে ‘বাজলে বাঁকি কাছে আনি’ ও ‘মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী’ রিশের ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে শেষোক্তটি ‘ডাক্তারাল’র খণ্ডাংশের অল্পবাদ। হেমেন্দ্র বাবুর ভৌতিক কাহিনীর প্রোত্বেয়টি উল্লেখযোগ্য। ‘প্রেতাত্মার প্রতিশোধ’ অল্পত রচনা। এরকম ভৌতিক কল্প রচনা প্রায় দুর্লভ। যে কোন কারণেই হোক মানুষ খুন করে বারা প্রেত-পাহাড়ের উপত্যকায় বাস করে তার একা কল্মষের আর কোন কারণেই রেহাই নেই। পড়ার পরেও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে এই রচনাটি। আমরা একটা বিবরণ লক্ষ্য করেছি যে, দুর্ভাগ্য অথবা অদৃষ্টতঃ ‘ডাক্তারাল’

প্রোত্বেয় নিয়ে বহু বেশি ভয়াবহ রচনাভীর্ণ গল্প লেখা সম্ভব হয়েছে আর কোনোটিই তত নয়। এই জন্তই আমরা রায়মটৌকারকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।

ডাক্তারাল প্রায় ছব্ব অল্পবাদ ঐকনীনন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিশেষী আত্মা’। ‘কিশালগড়ের দুশাসন’ এবং ‘বিশেষী আত্মা’ মিলিয়ে পড়লেই ‘বিশেষী আত্মা’কে অনেক উচ্চতর স্থান দিতে হয়। অনেক বেশি ভয়াবহ চিত্তাকর্ষক ঘটনা ‘বিশেষী আত্মা’তে পাই। ‘বিশেষী আত্মা’র চতুর্ভুজিতা, রাজ্য কৃত্যত বারম্ভ অল্পত ভৌতিক বিজ্ঞান প্রায় ভিত্তি করে দেয়। এই শেষোক্ত লিপিচাতুর্য্য কতটা প্রাণবান না হলেও নিম্নলিখিত প্রায় ‘বিশেষী আত্মা’র কোন ভৌতিক উপজ্ঞাসের চেয়ে প্রোত্বেয় বলা চলে কাহিনীর রিক থেকে। ‘বিশেষী আত্মা’ পড়লে মনে হয়, কাহিনীর প্রায় অত্যাশ্চর্য্য বেশি বিশেষী বইটি যথার্থ প্রাণবান যোগ্য হয়েছে। চুখের বিবরণ এই অল্পত সোমহর্ষণ উপজ্ঞাসটি এখনও পুস্তকাগারে প্রকাশিত হয়নি ‘রায়মটৌ’তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই লেখাই প্রাণবান করে দেয়, লেখক ইচ্ছা করলে বিশেষী সাহিত্য থেকে অতি উচ্চতর ভৌতিক কাহিনী কিশোরদের জন্ত উপহার দিতে পারেন এবং এতেই কৃতকার্য হবেন।

এ ছাড়া ছোটদের জন্ত আরো কয়েকখানি উচ্চতর বই-এর নাম করা চলে, যথা—শৈলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘অসম্ভব’, এই বইয়ের গল্পগুলিতে যথার্থই লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় আছে। ছোটদের জন্ত ইনি বা লিখেছেন, তা প্রকৃতই স্কন্দর রচনা। কিন্তু ঠোকারে প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে উন্নত ধরনের অতি স্কন্দর সাবলী ভাবায় রচিত ঐকনীনন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ভৌতিক কাহিনীগুলি। তাঁর রচিত কাশী কবিরাজের বিপদ, ‘হুট মস্তব’ প্রোত্বেয় গল্পগুলি বাল্য সাহিত্যে নিশ্চয়ই স্মারিক। কিছুতিভূষণের প্রোত্বেয়টি পাতায় যে অপরীণী পবন রয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। ‘আরক’ গল্পের বাস্তবিক তুলনা নেই। গভীর রাতে চাঁদের আলোর আকাশপরিবাহী যখন জল খেতে নেমে আসে, তখন সে দৃশ্য যে দেখে সে আর আপনাকে ধরে রাখতে পারে না! এমন উন্নত ধরনের ছোট গল্প খুব বেশি পড়া যায় না। কিছুতিভূষণের ভৌতিক গল্পে কেমন একটা স্কন্দর ভাব দেখা যায়, মৃত আত্মা সেও গিয়েও এপারকে ভুলতে পারে না তাই সে নিয়ত মানুষকে ওপারের ডাক দেয়। ঐকনীনন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘মর্ঘর’ এমনই একটি ‘স্কন্দর রহস্যময় গল্প, ‘আরক’ ও মর্ঘরের পেছনে ‘কুখিত পাখানের’ প্রভাব আছে মনে হয়।

বড়দের সাহিত্যে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর রচনা লিখে বারা বাল্য সাহিত্যকে প্রকৃতই উন্নত করেছেন, তাদের মধ্যে ঐকনীনন্দ্রকুমার দাস, শরদিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কিশোর-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে বসে বড়দের সাহিত্যে রোমাঞ্চ ও রহস্য নিয়ে আলোচনা ভালো দেখায় না। পরে স্বতন্ত্র ভাবে করবার ইচ্ছা রইল। যদিও ঐকনীনন্দ্রকুমারের অনেক রচনা এবং শরদিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন রচনা কিশোরপাঠ্য হিসাবেও অতি উচ্চতর। কিন্তু এরা কেবল যাত্রা বড়দের জন্ত লিখেছেন বলেই সে সব রচনার নাম এখানে উল্লেখ করলাম না।



পিয়াজ

...**झुन्झरी**

নারীদের

ঐতিহ্য



“গিয়ার” নামকী সারা শ্রাবণের
মুকরী নারীরের কাছে অতুলনীর শুণালীর
প্রতীক — যোগায়েব এক ভাল গিয়ারে
ভায়েব সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপন্ন।
সেইকল্পই তাঁরা গিয়ার” নামানের সাহায্যে
ভায়েব লাবণ্যের বহু বেন — গিয়ার” আসল
মিলায়িণ বহু সৌন্দর্য যাবান।
এটি স্পর্কভিত্তর স্বকর বহু এক বিতর এক জীব।
শিতনের গকে সেইকল্পই এটি ব্যাপ্য যাবান।
বহুনের বহু যোগায়েব গিয়ার” ভিতর
পাতিভার অসুখ হুদহ হুদাও ব্যাধ
সেই একই শুণালী এক বিতর।

ଆମର ଶୈଳୀ
ଉଚ୍ଚାର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ
କ୍ଷମା ଦେବ

চন্দ্রা তার নাম

। বারাবারিক উপন্যাস ।

মহাশেতা ভট্টাচার্য

তিম্মার নং বেজিনেট ইঞ্জিনারার ইভাল। দীর্ঘ দেহ। একহারা গড়ন। পঁচিশ বছর বয়সের তুলনায় যেন একটু বালক ভাব আছে চেহারার। বিশেষতঃ দুই চোখের দৃষ্টিতে আছে একটা বিশ্বাসের ভাব। যেন বুঝতে চেষ্টাও বুঝতে পারছে না কিছু মানুষটি। ঈর্ষা বিজ্ঞত ভাব, স্থিতিত একটা মিনতির ব্যঙ্গনা এখনও ইভালের মধ্যে দেখা যায়, যা দেখে অজ্ঞাত সাংঘবরা বিজ্ঞপ করেন। তাঁদের মনে হয় মানুষটা দুর্বল চরিত্রের। দুর্বল হোক না হোক, সে যে কিছুটা স্বল্পভাবী ও স্বল্পদর্শী তাতে সন্দেহ নেই। আর এখনও তার এ দেশ সম্পর্কে অনেক কৌতুহল অনেক জিজ্ঞাসা আছে মনে। সেটাও তাঁদের কাছে কম আশ্চর্য বোধ হয় না। আকগান ও পাঞ্জাব ফেরং পাকা জঙ্গী বুড়োরা ইভালকে বোঝাতে ছাড়েন না—ওহে স্বল্পদর্শী, এ দেশটার মাটিতে সোনা-রূপো ছাড়িয়ে নেই, আর কলকাতার পথে ঘাটে বাঘ সাপ যোগী সাধু কিলবিল করছে না। এ নেহাই-ই একটা জায়গা। বুদ্ধি থাকলে পেট আর ট্যাংক দুই-ই তোমার ভরবে। আর নেটিঙুলোকে দুইশো হাত তফাৎ রেখে চলবে। ওদের অসভ্য পোষাক, বাঁহুরে ভাষা আর আমাদের সম্পর্কে উত্তম আজগুবি সব বারণা—সবগুলোই দূরে রেখে চলা উচিত। কি ছিলো এ দেশে বল? সবই তো আমরা এসে শেখালাম। ভিখারী, নেহাই ভিখারী এরা। এদের সঙ্গে মিশেছ কি মরেছ।

কিন্তু বুঝেও বোঝে না ইভাল। হাজারটা শেখানো কথাও তার মনে থাকে না। আর একটা কথা সে কারকে বোঝাতে পারে না। নিজের সম্পর্কে তার নিজেরই খানিকটা বিভ্রান্তি রয়েছে। জান থেকে তার বস্তুত্ব মনে পড়ে, সে যেন সর্বত্রই বেখানো। নিজে কেন্দ্রে সেই প্রবাসবাস্যের চোঁকো পেরেক, যে কোনও গোল গুল্লিই খাঁপ খায় না। আরো কি, সমস্ত দোষগুণ আর অসঙ্গতি ক্রমা করে তাকে গ্রহণ করবে এ রকম কোনও মনের মানুষ দূরে থাক, কোন বন্ধুও সে পায়নি। ঐ রকমই ঈড়িয়ে গিয়েছে তার চরিত্রের আলল।

জন্মে বিহুরের প্রাঙ্গণে এক পৌরালী সন্ধ্যায় চন্দ্রাকে দেখে ভালো লাগেছিল তার। জন্মলো সে মেয়ে কানপুরে থাকে। মেয়েটাকে দেখে ভাল লাগলো তার। আর মনটা যেন ঈর্ষা উত্তপ্ত হলো। টমশন ও ফ্রেডরিক প্রায়ত বন্ধুর অবশ্য উপদেশ বা দিলো তা বন্ধুজনেই মতো। বললো—এ সব কাজ করে এমন বুড়ো মেয়েছেলে পাবে অনেক। পাঠিয়ে দাও একটাকে কটা টাকা বা গয়না দিয়ে।

জন্মে যেতেও পারে। তবে আমি বলি বন্ধু, ঐ আলগা আলগা বাঙালী-আসাই ভালো। বেশী জড়তে গেলে ব্রাইটের না কেসে যেতে হবে।

আর একজন বললো—ব্রাইট হলো হাকনেটিত। আর ব বলো ব্রাইট পুরুষ বাচ্চা। মেয়েটাকে শারেকা করে বেখে ফৈজাবাদের কালেক্টর কি ক্যাপ্টেন নজের মতো একেবারে সব বিকিয়ে দেয়নি।

মাতৃভূমি আর এই দেশের মধ্যে যেমন সাত সাগরের তথ্য নোণাজলের ঢেউ খেয়ে খেয়ে আইন-কাহুনও পালাটে গিয়েছে এ কাছে। স্বদেশে এবং এখানে খেতাদারীদের সম্মান রাখবার ও আজও জানকবুল আর মানকবুল রাখতে প্রস্তুত আছে টম ফ্রেডরিক, ইভালরা। কিন্তু এ দেশের মেয়েদের দরকার হলো ও বন্ধ করে বাংলা ঘরে চাবুক দুই-এক ঘা মারতে দোষ নেই। ও দিলেই এরা মাথাখ চড়ে বসবে।

সে বিবরে মতবিরোধ হয় না। তবু টাটকা আমদানী ইট চট করে অন্তর্ধান অধিকার জাহির করবার কথা ভাবতে পারে। এই দুনিয়াতে তার অবাধ অধিকার থাকতে পারে কোন বিখর কথা ইভাল ভাবতে পারে না।

খিওড়ার এক ইভাল পঁচিশ বছর আগে কোথায়, কোন পরিব কোন মায়ের কোলে জন্মেছিলো, তার মনে নেই। তার চেয়ে বড়দর যায়, মনে পড়ে একটা উঁচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলটা তার শিশুমনকে শৈশবে কয়েক করে রেখেছিলো। আর আ সে কথা মনে করতে গেলেই মনটা গুটিয়ে যায়। থেমে যায়। হয় থাক। ঐ পাঁচিলটার ওপারে স্যাংস্টোতে একতলা ঘরে লো খাটে বসে একটা রোগা ছোট্ট ছেলের কথা মনে করে কাজ নে তবু মনে হয়। মনে হয় সে ছোট্ট ছেলেটার বহন হবে নয় কি ন স্থপারের চড়ের দাগ গালো লাল হয়ে ফুটে রয়েছে। আর চো জল চিকচিক করছে। মনে পড়ে ছেলেটাকে শান্তি দি জনাখাশ্রমের স্থপার সে দিনকার মতো উপাসী রেখেছেন। ও ওপারে ঈড়িয়ে স্থপারের প্রিয়পাত্র একটা নিষ্ঠুর ছেলে, বহন। তের কি চোদ, চেহারো বেশ বলিষ্ঠ—পা ঝাঁক করে ঈড়িয়ে তাি তারিরে একটা আপেল কামড়াচ্ছে। রোগা শান্তি পাওয়া ছেে মুখ তুলেও দেখছে না। তনিয়ার অবিচার আর অজাচারে তার তোর ভোঁতা হয়ে গেছে। মনটা দিয়ে সহস্র খুঁটারে পড়ছে।

শেষের দার বাপ মা মরে গিয়েছে, আর জন্ম থেকেই যে আনাথ্রমে মানুষ, সেই বাচ্চা খিঙডোর তখন শুধু একটা কথাই ভাবতো। ভাবতো, যে এমন কি কেউ নেই যে তাকে এই মরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে? এই পাঁচিলঘেরা বাড়ী, সুপারের থেকে স্কুল করে প্রত্যেকের হাতে মার খাওয়া, জলের মতো সুপ আর শক্ত কাশো কুটি খেয়েই কি তার দিন কেটে যাবে? মনে হতো কিছু ছেলেকে তার আত্মীয় স্বজন এসে নিয়ে গিয়েছেন। কেউ রাইরে পালিয়ে গিয়ে রুজি-রোজগার করছে। মনে হতো এর চেয়ে করবার খনিতে কাজ করা বা চিমনী সাফ করাও ঝি ভাল।

এই ছিলো জীবন। আর প্রত্যেক দিন দুমোবার আগে এই জীবনের জন্তেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হতো। বলতে হতো Hallowed be thy name.

হে ঈশ্বর, তোমার নাম জয়দীপ্ত হোক। জয়দীপ্ত হোক হে রুশাময় ঈশ্বর এই স্যাং-স্যাং মরে শীতে ঠাণ্ডা বিছানা আর পাতলা সস্তা গরম শার্টের জন্ত, ঝর ও কাশিতে মরে যাওয়া ছোট ছোট কফিনে শায়িত বালকদের জন্ত, কবর চরিত্রের বর্কর চাকরদের হাতে বিবিধ নিত্য-মুতন অন্যাচারের জন্ত। জয়দীপ্ত হও তুমি।

হঠাৎ সম্ভব হলো স্বপ্ন। মুক্তি এসে। খিঙডোরের জীবনে। খিঙডোরের মা সঙ্গতিপন্ন এক কাপড়ের ব্যঙ্গারীর মেয়ে হয়েও পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিলেন তার বাবাকে। বাবা নেহাংই মরতাইন। এক জমি কেনাবেচা দালালের সহকারী ছিলেন তিনি।

তার মায়ের পিসীমার ছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কিছু

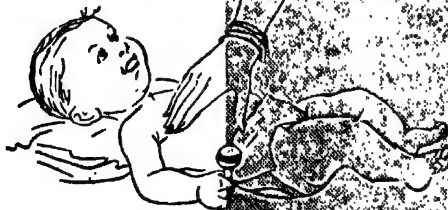
শেয়ার। খিঙডোরের এগারো বছর বয়সে একদিন সেই মহিলার তরফ থেকে খোজ এসে। তাঁর মোটরী পাবলিকের তরফ থেকে। ভায়োলেটের ছেলের জন্ত কিছু করতে চান তিনি। শিক্ষাদীকার খরচ বহন করতে চান।

আনাথ্রম থেকে লণ্ডনের উপকণ্ঠে এক স্কুল। ভ্রমহিলার ধারণা ছিলো, ইঞ্জিনীয়ার করবেন খিঙডোরকে। তাঁর আশঙ্করূপ হয়ে উঠতে খিঙডোর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তিনি ছিলেন বাতিকগ্রস্ত এবং খুঁৎখুঁতে। আহা! পরিচ্ছন্ন বা শিক্ষাদীকার তিনি কাঁপাণ্য করতেন না। যদিচ বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। তবে অল্পত অল্পত বিষয়ে তাঁর জেদ দেখা যেতো। চেয়ারের সোফার ডিলি শালা ঢাকনী দিয়ে রাখতেন। হেলান দিয়ে বসলে তিনি চটে যেতেন। শিঠসোজা করে বসে থাকতে পারেননি, বা হেলান দিয়ে বসেছেন, এই সব কারণে ঝি ও রাঁধুনীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হতো। তা ছাড়া আনাথ্রমের জন্তে উলের মোজা বোনা তাঁর অজান্তর বাতিক ছিল। বছরে দুবার করে তিনি একশো জোড়া মোজা দান করতেন আনাথ্রমে। আর সেই উলের কাঁটার মরচে পড়লে বা হারিয়ে গেলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। তিনি কুকুর পুষতেন না। বেড়ালের গুপের ছিল তাঁর টান। এবং বেড়ালকে তিনি কুকুরের মতো ঢেলে বেঁধে বেড়াতে বেরতেন। তাঁর বিবিধ বাতিক সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করলে তিনি রেগে যেতেন।

পুরুষজাতি সম্পর্কে তাঁর অবিবাস এত প্রবল ছিল, যে বাড়ীতে বেড়াল বা পাখীও পুষবার সময়ে তিনি সময় দেখে কিনতেন।

বুকে সর্দি বসেছে?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায় ভেপোলীন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলীন ঝকের মধ্য দিয়ে এক নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরায়, বাথা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, লন্ড এণ্ড কোং
২৬, কলিকাতা সেন - কলিকাতা-১

বোরোল্যান্ড প্রস্তুত কার্ভকর সামগ্রী

খিওডোরকে কেনন কর্তৃক বেন একটু সেই কঠোর বেসেছিলেন।
লীডস-এ পাঠ্যবনে ইঞ্জিনীয়ারদের মুলে পড়তে সব ঠিক করেছেন।
সুখা আধিকার করলেন খিওডোর কবিতা পড়ে ও লেখে।

সঙ্গে সঙ্গে খিওডোরের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি।
ভাড়াভাড়া পাঠ্যবনে তাকে লীডস-এ।

ছুই বছর বাদে যখন ফিরলো সে, তখন সে লম্বা হয়েছে অনেক।
বেশ বাড়ীখাপটা চোহারা।

মহিলার মনে হলো, বাড়ীতে এই একজন পুরুষের নিয়ন্ত্রণ
উপস্থিতি তাঁর পক্ষে নেহাৎ অসহ্য। খোজ করে তাকে পাঠ্যবনে
কমলাখনিতে চাকরী দিয়ে।

কিন্তু নিজেকে মানাতে পারল না ইভাল। ইঞ্জিনীয়ার সে
নামেই। আসলে মালিক চায় যে সে জবরদস্ত হোক। কাজ
আদার করুক। যে অবস্থার, যে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ
করে শ্রমিকরা, দেখে তার মন প্রথমে ক্রুদ্ধ হলো, তারপর ভেঙে
গেল। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্ত কিছু করতেই নারাজ কর্তৃপক্ষ।
ইতিমধ্যেই খনিতে দুর্ঘটনা হলো। ইভালকে দোষী খাড়া
করলেন কর্তৃপক্ষ। মিটিং-য়ে ইভাল বার বার বললো, যে সে
শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্ত ঝাই বলেছে, সেটাই উপেক্ষা করা হয়েছে।
এমন কি জল সেচে কেলবার ব্যবস্থার করেন নি তাঁর সময় মতো।
এমন পরিস্থিতিতে কাজ করেছে শ্রমিকরা, যে মুহূর্ত অনিবার্য, ঠেকানো
সম্ভব নয়।

ইভালের দৃষ্টান্তর চটে গেলেন কর্তৃপক্ষ। সেখান থেকে চলে
এলো ইভাল। বললো—সম্ভব হলো না।

সম্ভব হলো না কি? চটলেন সে মহিলাও। বললেন—
অনিদিষ্টকাল ধরে আমি তোমার পুত্রের পায়ব না।

সে কাজ থেকে তাকে সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন এক কাচের
কারখানায়। সেখানে বিশেষ সুরিখে তরতে পারল না ইভাল।
তার অসাবধানতার দ্রুতি হয়ে গেল মালিকের। আবার হাতকিরতি
হয়ে গিয়ে এল সে।

সম্পর্কিত ঠাকুরা আর কি করতে পারেন? অগত্যা লেখালেখি
করে ইভালকে ভারতবর্ষে পাঠানোই স্থির হলো। বিদায় বাক্যের
দিনে ভয়মহিলার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বললেন—
আমি তো তোমাকে সেই বর্ষ অল্পবয়সে দেশটার পাঠাতে চাইনি।
কে না জানে যত রাজ্যের নোংরা মিস্ত্রী আর অসুখবিসুখ
সেখানে? হয়তো সাপ-ই কামড়াবে তোমাকে, বা জন্ত কিছু
বিলম্বে পড়বে, বা আমার ধারণার অতীত।

তার পর নশ্টি ট্রেন স্টেশন-এ গিয়ে তিনি নিজেকে সামলে
নিলেন। সোনার চেনে গীথা একখানি হুস্তাখতি ছোট ক্রশ তিনি
দিলেন ইভালকে। বললেন—আর কিছু দিতে পারলাম না।
সর্বস্ব সঙ্গে রেখে। এটা তোমার মাকে দেবো বলে মনে ইচ্ছে
ছিলো। তা তো আর হলো না।

তা ছাড়াও বিলেন বেশ পাউণ্ড। পরম হুঁশিয়ার ও বিজ্ঞত হয়ে
ইভাল বার বার বলতে লাগলো—না, না। কি দরকার। কি
দরকার।

ভারতবর্ষে আসবার পরে অবশ্য ইভাল তাঁর চিঠি পেয়েছিলেন।
সেও লিখেছিলেন। ব্যস, তার পরে আর চিঠিপত্র নেই।

এখানে ইভাল এলো হুইলারের রেজিমেন্টে ইঞ্জিনীয়ার হা
আর এই হুইলিং উপনিবেশে খেতানদের সমাজজীবন
শিখারি হয়ে গেল। এত অবসর, এত স্বচ্ছলতা, এত সুখ
খাওয়াপানীয় দাস-দাসী।

এই জীবনের নেশা সবে আমেজ ধরাচ্ছে তার চোখে, তা
মুখে চম্পার সঙ্গে দেখা। আর তারপর রেজিমেন্ট-এর এক সু-
জলসার ভাড়াহুড়া লাগলো।

চামড়ার জিনপোষ ও জুতার কারবারী, ধনী ব্যবসারী পুরুষ-
বাগানবাড়ীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলো ক'জন। ভোর রাত যে
বেলা অবধি বসে চাকরদের কাঁধে মাছের বেতের খোলা আর হু
ইত্যাদি দিয়ে ফিরতে ফিরতে ট্রাইট ইভালকে চোখ টিপে বললো
কালো আঙন দেখেছ? আসবে এই জলসার।

—কে?

—চম্পা। চম্পা তার নাম।

তখন ইভালের মেজাজ খুসী হয়ে গেল। ট্রাইটও কেন জা
খুসী-খুসী ভাব। চারি পাশে তাকিয়ে শুঁকে বললো,—মনে হ
এবার জবরদস্ত গরম পড়বে। শুকিয়ে বাবে খালবিল। আর জ
জন্তে হস্তে হয়ে বাঁকে কাঁকে পাখী এসে পড়বে। আ, কি মজাই
হবে। গরমকালে বসে শীতকালের মতো পাখী শিকার কর
পারবে।

—ট্রাইট, তুমি নাকি শিকার বিষয়ে অনেক জান?

মরণ করত আশ্চর্যসাদে ট্রাইটের মুখ হাসিতে ভরে গেল
বললো।—শিখিয়েছিল একটা বরমাইস। জন্মও করেছিলাম তাকে
তবে বুড়ো ম্যাকমোহানের জন্তে লোকটা বেঁচে গেল। বেরলী আ
নৈনীর পথে ট্রানজিট একটা সাফাখানার কীপার আছে লোকটা
পাচ্চা শিকারী। বলতেই হবে। দেখলে মনে করবে ব্রি
গিয়েছে। কিন্তু হাড়ে হাড়ে শক্তি। আর নজর কি! বাস
মতো তাঁক।

রেজিমেন্টের জলসা। সিভিলিয়ান ফতো সাহেব, ব্যবসা
খাতিরে বারা আছে সে সব সাহেব, তা ছাড়া রেজিমেন্টের ক
অফিসাররা সমবেত হয়েছেন। মার্চ মাস শেষ হয়েছে। এখন
লগ্নে আছে শীতের আমেজ। আর এমন এক জলসার আরোজ
হয়েছে, যা নাকি কানপুরের মাছুষ অনেক দিন মনে রাখবে
গালিচা নাকি এমন সুকোমল এমন সুন্দর যে ইটতে গেলে পা
এক অপূর্ণ সুখাধুভুতি হবে। খাস পারশ থেকে আমদানি
কারিগররা বারা দিল্লীতে রসত করেছে দুইশো বছর ধরে তাকে
কোমল ও পাতলা আঙুল এই গালিচা বুনেছে কত দিন ধরে
এর বেশম ও পশম রং করেছে লক্ষ্যে ও কৈদাবাদের সুবিখ্য
রয়েজীরা। তাদেরও আঙুলের স্পর্শ মিলবে এতে।

এই গালিচার কত মনুষ, কত বাগিচা কত নম্রা কুটে উঠেছে
এর বুকে ইটতে গেলে এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।
অনেক ভারতীয় কারিগরদের অনেক পুণীভূত স্বপ্ন ও প্রা
প্যের তলে এমন কোমল হয়ে বুক পেতে গিয়েছে।

মাথার ওপরে ঝলছে হুইলিং বাড়। অপরাধ তার কাঙ্ক্ষার
অনুভূত এক স্বপ্নলোকের আলোকিত সমারোহ যেন পীপামান

হাসে জীতি শিতনের ও রূপায় ফুলদানিতে জরপূরের কারিগরদের তের কাজ। বৃকে তার গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ্মীরী ও শাহরাণপূরের লাগল।

পাতলা কাচের গেলসে টলমল টলমল সোনালী খেতাব ও বহু নীর। হুঁড় হুঁড় সেই কয়ালী ও বিলেতী পানীর। অনেক মূল্য তার। দ্রি পূর বৃহৎ যে সব বেরা তার। সতর্পণে ববে আনছে ট্রেণ্ডিল। মেসদাহেবরা বসেছেন স্বামীদের পাশে। তাঁদের বেশভূষায়ও লজ্জাকঙ্কমক। এসে এসে কোন খেতাব ললনার সাধ যায়নি দা, সোনা, মুক্তা পরতে? তাঁরাও কিছু কিছু গহনা পরেছেন। রানী সিংহের পোষাকে আলো বলমল করছে।

অপর দিকে বসেছেন কতিপয় ভারতীয় রিয়ালো ও ইনফ্যান্টির ফিয়ার। আর সাহেবদের সঙ্গে সহজে কথাবার্তা চালাতে ভাত্ত বাঙালী বাবুদেরও দেখা যাচ্ছে।

ক্লাবঘরে সাহেবদের নাচ ও ব্যাণ্ডের আয়োজন আলাদা। ধামে তাঁরা বসে কিছুক্ষণের জন্য এই 'নেটিভ নাচগাল'দের নাচ ধছেন। তারপরে তাঁরা উঠে যাবেন, আর এই রক্তভূমি ছেড়ে যেন ভারতীয়দের ছাতে।

লক্ষ্য থেকে এসেছে এক নর্তকী। আভ্যমীরে দরগা শরীফ নি করতে গিয়েছিল সেই পুণ্যাধিনী। প্রত্যাভর্নের পথে বিশ্রাম রত করতে এবং আনন্দ বিস্তরণ করতে করতে চলেছে সে। সারের একপ্রান্তে বসে সেই বিগতবোবনা ফুরীওয়ারালী বিতুক দৃষ্টিপাত র এদিকে ওদিকে। এই সব আসরে বসে কি গাইবে সে! গান বুঝে এখানে? কদর করবে কে? পিছনে বসে জালীবাগা কথাবার্তা কইছেন তার কানে আসে। একজন আর জনকে বলছেন।

—এসে পড়েছিলে ভাই, তাই কান আর চোখ সার্থক করে র। লক্ষ্য-এর নবাব ঘরের সব তওয়ারেফ! পড়ে থাকতে ই বাঁধবেড় আর ভয়েশ্বরে, জয়ে সুযোগ হতো না!

জর্দ ও তামাকে কালো টোট হুঁচকে গারিকা পিক্কেলে পায় শিকলানীতে। তাকিয়া এসে দিয়ে আঙুলের সাত আটটা টিট দিকে চেয়ে থাকে। তারপর সারেকীওয়ারালেকে বলে।

—লক্ষ্য-এর তওয়ারেফ! অমনি সন্তা তারা! এই পয়সাতে র এমনি আসরে তারা আসবে কি না! এদের কপালে আমাদের তা সো-মেশাল, ভাঁড়াবরণার মাহুঘই জুটবে।

সারেকীওয়ারা খিসখিসে গলায় বলে—বেসমবাই! যে হুঁ দনগাছ দেখিনি সে পিলল গাছের ছায়াতে বসেই নিজেকে ভাগ্যবান বো।

ঈং নিমীলিত চোখে মনোহুখে বেশমবাই দীর্ঘনিশ্বাস সে। মনে হয় লক্ষ্য-এর মাহুঘের গানের ঘরণা চিরকালের তা ভেঙে গেল, আর সে সুবুৎ হুঁখের কথা রসিকহৃদয় ছাড়া কে র বুঝবে? নির্বাসনে গিয়েছেন সঙ্গীতরসিক সুরের দরদী নবাব মজিব আলি শাহ, আর গানও গিয়েছে বেইজুত হয়ে। কে হবে এই হুঁ? সনিশ্বাসে ঘন ঘন আলোলিত হয় এক মাহুলী রীওয়ারালী বৃক সাঁকা শিল্পাভুতিতে। মনে হয় ঐ যে আর জন এসেছে, ঐ মজারী চম্পা—বার বোবন ছাড়া অজ্ঞ কোনও জি নেই—ঐ রক্ত মাহুঘই ভালো এই সব আসরে।

তারপর বড় সাহেব আসেন। পাকা সাহেব। শিকারী বেড়ালের মতো ঝোলা পাকা গৌক। তাঁর অমমতিতে শুরু হয় আসর। নানাভাবে আঙুলের মুদ্রার ভঙ্গিমা জাহির করে বেশমবাই এক মাহুলী গজল গায়। সুনতে সুনতে মেসদাহেবরা গহনার খিলিক দেখেন ও তার দাম সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করেন। সাহেবরা একটু স্তম্ভেই নিজেরদের মধ্যে গল্পগুজব করেন। যে হিন্দুস্থানী মুন্সী একে এনেছিলেন তিনি নিচু গলায় সঙ্গীকে জানান পাকা বনমায়ের মেয়েটা। মোটেই দিল লাগিয়ে গাইছে না আজ। আমার মুখটাই হাসলো সাহেবদের কাছে।

দর্শকজন একবারে খুসী হয় না। সে বিরক্তি যে স্পর্শ করে না বেশমকে তা নয়! তবে শ্রোতার বৃথতে পারে না, যে নানাকথা মনে হয়ে ঐ গায়িকার মনটি আজ ভেঙে গিয়েছে। তারা বোঝেন, ঐ বোবনের ফুলকির মতো চম্পাকে দেখে বেশম অহুভব করেছে যে সে চিরতরে যৌবন হারিয়েছে। সেই হুঁখেও যে আজ বেশম বার বার সুরের টিকানা হারিয়ে ফেলেছে, সে কথা কেউ বোঝে না।

দরদী মনপ্রাণ সব কোথায় গেল? বোঝে শুধু চম্পা। বোঝে আজ ঐ বেশমের মনে কোন হুঁখ আছে। বুঝে যে সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

তারপর সে যখন দাঁড়ায় আসরে, তখন মাপ চেয়ে বেরিয়ে যান বেশম। চম্পাকে সেখান থেকেই খুসী হয়ে উঠে ভারতবাসীরা। এদিকে ওদিকে চেয়ে থাকে যেন খোঁজে চম্পা। নজরটা তবুও তার আটকে যায় সামনে।

সেই সাহেব! যে তাকে বিদূষ-প্রাসাদে তারিক করেছিলেন,

**JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING**



**OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA.**

আর এই কানপুর, ফতেগড় ও ভগবানপুরে বার বার বার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সেই সাহেব ঢেরে আছে। ব্রিজহুসারী তবে একই হয়ে দৌড়া করতে এসেছিলো? হাসি পায় চম্পার। দেখে সাহেবের চোখে অকুণ্ঠ অমুহুরিত।

দেখে যে গুটিয়ে বাবে, সে মেয়ে-ই নয় চম্পা। ইচ্ছা করে গুড়না আঁজিয়া থেকে আর একটু নামিয়ে নিলাজ হয় সে। ইবৎ ভাড়া মিঠি গলার সে ভীষণ পদার্য ধরে, 'না মাঝে না মাঝে সৈরা'—
প্রথম লাইনটি বেশ খেলিয়ে গেছে মের। তারপর ঠমক দিয়ে নেচে উঠে বলে—‘প্রীত কে পিচকারী’

চম্পার গান যেন গান নয়, কোলাহল। তার দেহ, চরণ, সুর, স্রোত, চুল ও গুড়নী—সব মিলে যেন কোলাহল সুর হয় একটা।

এই হেঁচকি করে আসর মাঝাতে পারে বলে-ই চম্পা সকলের জির। এবার আসর মেতে উঠে। চম্পা বেপারোয়া হয়েই বুড়ো বুড়ো নজরের পিচকারী ছুড়ে মাঝে আসরের সর্বত্র।

হাত বারোটার আসর শেষ করে বরফিরতি চম্পার আগে-পেছনে চার জন সিপাহী চলে। তাদের কান্নর হাতে বড়-বজোড়া দিয়ে, আর কান্নর হাতে নাচের পোষাক দিয়ে তাদের ধাক্কা করেছে চম্পা। গল্প করছে চম্পা, যেন একটা স্বর্ণা-ই চলেছে কলকল করে। তারা বলছে—‘চম্পা বাউ, তুমি পালকী ফিরিয়ে দিলে কেন?’

—আমার ইচ্ছে।

বলে হাসছে চম্পা। আসলে তাকে কানে কানে একটা খবর দিয়ে গিয়েছে ব্রিজহুসারী। খুব কৌতুক বোধ হচ্ছে চম্পার।

চম্পার কুঠি কিছু কম রাস্তা নয়। পথে জৈবরাম চৈবরাম ছুইডারের কুঠিবাড়ী। কুঠিবাড়ী ঘিরে বাগান। তার পিছন দিয়ে সহজে বাওয়া চলে। যেতে যেতে একজন সিপাহী বলে—

—তাহলে চম্পা বাউ, কান্নকে দিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসব আঁজি।

তুমি হাইটের বিধিকে দিয়ে আঁজি পাশ করিয়ে দিও। তিন গাল ঘরে বাইনি। কুসেই গিয়েছি দেশবরের চেহারা।

—এ বার এত ভাড়া কেন?

সিপাহীটি বলে—বলেছি তো? বড় ঘামলা লাগিয়েছে আমার চাকরা ভাই। একটা সেবুগাছের মালিকানা নিয়ে। আমি না সেলে আমার বুড়ো বাপ কিছু করতে পারবে না। তার কোন জানই নেই।

—একটা সেবুগাছ?

অজানতি সিপাহীটির গলার উন্নয়ন সুর লাগে। সে বলে—
হী। তুমি বুঝবে না। সে গাছের সেবু কি বড়, আর তেমনি মিঠি। বাবা চারা এনেছিল চৌধুরীদের বাগান থেকে। গরমকালে সেবুর সবুজ খেয়ে শরীর জড়িয়ে বার—আর বখন ফুল কোটে, ভখন তার কি পঙ্ক। চাই কি সময়কালে কটা সেবু বিক্রীও করতে পারবে আমার মা, শেঠদের বাড়ীতে দিয়ে কর সেবু ছাত্তুও আনতে পারবে। তুমি বলছ কি চম্পা বাউ? একটা সেবুগাছ অমনি ছেড়ে দেওয়া বার?

এবার চোখে পড়ে চম্পার। জোৎস্নাতে চিনতে কুল হয় না। নিচু গলার সিপাহীদের বলে—তোমরা চলে বাও। আমার সঙ্গে কথা আছে এ সাহেবের। বুড়াকে বলে যে আমি আসছি। যেন জিজ্ঞাসা না করে।

এগিয়ে বার চম্পা। আশ্চর্য হয়ে ইভাল ভাড়া হিন্দুস্তানীতে বলে—তোমার সঙ্গীরা?

—এগিয়ে গেছে।

—তুমি?

—একা বাব।

—ভয় করবে না?

চম্পা জোৎস্নায় ঝিলিক দিয়ে হাসে। বলে—সাহেব, তুমি ভয় রয়েছ।

ইভাল এই হুসাহনী কথা শুনে অধর দংশন করে। তারপর বলে—আমাকে ভয় কর না তুমি?

—না সাহেব! তুমি ভাল।

—কে বললো?

—আমি শুনেছি।

হিন্দুস্তানী শিকার কথা ইভালের ততখানিই, যাতে ‘কৌতু’ অর্থের ‘পড়া’ চলে। আর যে হিন্দুস্তানী তাকে পড়ে পাশ করতে হয়। তাতে আর বাই হোক, এই সব কথা ঠিক ঠিক জোগায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইভাল বলে পুঁথির ভাষায়, থেমে থেমে—

—তুমি কি বিশ্রাম করবে। তুমি কি ক্লাস্ত হয়েছ? তুমি কি ঐ কুঠির প্রাচীরে সামান্য বসতি চাও?

চম্পা আবার হাসে। বলে সাহেব, আমার সঙ্গে অমন করে বসে গল্প করলে তোমার অপমান হবে।

—কেন?

—কে-ও করে না।

—কে-ও করুক বা না-ই করুক। চম্পা, তুমি সে কথা আমাকে বলো না।

—হা হুজুম।

পাঁড়ির থাকে ইভাল। আর চম্পাও পাঁড়ির থাকে। এবার ইবৎ নিচু হয়ে ইভাল আঁজুরের আগা দিয়ে চম্পার কপাল ও চুল আগতো করে ছোঁয়। অকুণ্ঠ বলে, হুমকি। হুমকি তুমি চম্পা। কোড়াকের স্পর্শ চলে গিয়ে চম্পা এবার শঙ্কিত হয়। মনে হয় কুল করেছে সে। সেখ থেকে এনেছে বিপদ।

ইভাল তার চোখে, চুলে, কপালে আঁজুল বুলিয়ে এবার আরো সহজ ও অকৃত্রিম আত্মরিক্ততার যেন চকল হয়ে ওঠে। মুক্ত বালকের মতো পুনর্বার বলে—বড় হুমকি তুমি। আমার বড় হুমকি সেগোছে তোমাকে।

চম্পা বলে—সাহেব। আমি বাই।

—নিশ্চয় বাবে। আমি তোমাকে এগিয়ে দেখ।

—তুমি? না সাহেব, তা হয় না।

—কেন চম্পা?

চম্পা এবার আত্মনির্ভর খুঁজে পায়। সে অসঙ্কোচে ইভালের দিকে চায়, বলে—সাহেব, এখানে আমাকে সবাই জানে। কেউ আমার অন্তিৎ করবে না। তুমি কিবে বাও।

তবু ইভাল শোনে না। বলে—অন্তত তোমার বাড়ী দেখা যায় তত দূর চলে।

—না। শোন, আমি ছুটে চলে বাব।

—ব্রিজ চম্পা, আমি যে ভয়বান নই।

চম্পা কাছে আসে। বলে—তুমি হুলারীবিবিকে খবর দিও।
মে আমাকে জানাবে।

এবার আসো—আঁখারির পথ ধরে ছুটে চলে বার চম্পা।
ঘরে আসতে সম্পূর্ণ প্রেরণ করবার আগেই চম্পা জিজ্ঞাসা করে—
বুঢ়া, কেও আমার খোঁজ করে নি?

—কে, চম্পা?

—কোনো চন্দন?

—না। কোন চন্দন, চম্পা?

—তুমি তাকে কেন? সে ঐ ডাক্তার বাবুর সহকারী।

—না চম্পা।

—ও!

ঘর থেকে গোঁবাঁক বদলে ফিরে আসে চম্পা। সম্পূর্ণকে বলে—
বুঢ়া, কথা আছে।

—কি কথা?

—নতুন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ভাব করতে চায় আমার সঙ্গে।
অনেক দিন ধরে আমার পিছু নিয়েছে বুঢ়া!

—সত্যি?

—সত্যি।

—তুমি কি করবে?

—বল, কি করব।

—বলব চম্পা?

—বল।

সম্পূর্ণ বলে—তবে শোন চম্পা। বলি তোকে।

—বল, বুঢ়া।

সম্পূর্ণ বলে চলে। বলে—তুই যখন ওখানে ছিলি, আজ
এখানে এসেছিল রিসালার শোভালাল, পহেলা রিসালদার কুন্দন
সাহেব, আরো অনেককে তুই চিনিবি, চিনিবিও না। এ কথা নিশ্চয়
জানবি চম্পা, যেখানে সাহেব আছে, তারা বসে আছে বাকুদের
গোলায় ওপর। একটু এম্বিক-ওমিক হবে, কি কাটিবে গোলা। ধর
নেই, জাত নেই, ইজ্জত নেই, কটি নেই—আর মানবে না
সিপাহীরা। লঙ্কা, বেরলী, দিল্লী, কৈজাবাদ, এলাহাবাদ সব
জায়গায় এক কথা চলছে। তোকে নিশ্চয় বলি চম্পা, তুই এই
কানপুর সহরের আলো-পাশে সব জায়গায় একেবারে একা চলতে
ফিরতে পারিস। তোকে সম্পূর্ণের লোক জানে সবাই। জানে,
তোকে কেউ কিছু বলবে না।

—সবাই কি তাদের লোক বুঢ়া?

—না বেটি! তবে সহরের হিন্দু মুসলমান সবাই তো কেন্দ্রে আছে
কি না! কম লোক না।

—এ কথা তো আগেও বলেছিল বুঢ়া!

—তো আবার বলছি। কথা যদি কথার মতো হয়, তাহলে
লশ বার বলতেই বা কি! আর লশ বার সুনতেই বা কি, বেটি! বলে,
আর অল্প অল্প হাসে সম্পূর্ণ। বলে—আমি অঘোষায় কিরাণ চম্পা!
তুই জানিস না—তার বুঢ়া অনেক দেখেছে এই তিন হুড়ি বছর
ধরে। দেখেছে তার দেশঘরের জোরদান হেলে রাকট হয়ে চলে যায়।

উজ্জ্বল প্রাশন

কে. হোডের

মালোবন প্রেসারী



কে. হোড ২৩ কোং . কলিকাতা-১৪

আর তার পর কি জীবন হয় তাদের। আমি অনেক দেখেছি চম্পা। আমার বাপ মরেছিল সেই পানজাবের লাঠাইয়ে। দাদাকে আমার জন্ম করে মেরেছিল সেই সময়। সেই বাউজনের একজন আমার দাদা। যারা সিদ্ধ পেরবে না বলে বলওয়া লাগিয়ে ছিলো। তুই খানিস না, আমার মা আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে নিয়েছিলো। বৈদেহিনী—ভিখ মেজে খাবি, ডাকাতি করে খাবি—তবু টাকার লোভে ফোঁজে নাম লেখাবি না।

সম্পূরণকে মনে হয় অল্প মাহুৰ। সিংহের মতো মস্তমাথাটা সে অল্প-অল্প নাড়ে। বলে—চম্পা, বেইমানী করবি তো মাথাটা কেটে রেখে দাও। খুন করতে ভয় পায় না সম্পূরণ।

—বুঢ়া, মৌতির ভয় দেখাস না।

—তো, শোন চম্পা। সাংঘের সঙ্গে ভাব কর। ওদের খবরাখবর জান। তুই পারবি। পারবি না চম্পা?

এ বেন চম্পার গলা নয়। অল্প কারু গলা। চম্পা না চন্দনের সঙ্গে কত প্রেম, কত যুগল জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। সে কথা ভুলে বিশেষের কথাতেই কেন সাড়া দেয় তার মন। চম্পা বলে—পারব।

—আমি জানতাম।

—কি?

—বে তুই পারবি।

—বুঢ়া, চূপ কর। কেন আমি বললাম, তা তুই বুঝবি না।

—বুঝব না?

—না বুঢ়া, তোর জওয়ানী নেই।

—জরুর।

এবার আর অস্বীকার করে না সম্পূরণ। তার পর কি ব মনে করে সে বলে—চম্পা, চন্দন কে তোর?

—চন্দন আমার গ্রামের মাহুৰ। আমার কৈলবের সহল।

—বুঝলাম।

—কিছু বুঝি না বুঢ়া! আমি তার থেকে দূরে দাও ব এখানে এসেছি। তবু সে তো বোকে না। চন্দন বড় নির্বোধ, বুঢ়া

—তো সে নির্বোধের জন্ত তুই কেন হুং পাগ চম্পা?

—বুঢ়া, তুই বুঝবি না। আর চন্দনের মা—

—কি?

—চন্দনের মা বড় পুণ্যবতী। সে বলেছিল চম্পা, তুই রমজান হবি। দেখ, আমি কোন গায়ের মেয়ে—চলে এলাম শহরে। হলো রমজানী।

—বুঝলাম।

—চন্দনের মা-ও বড় নির্বোধ, বুঢ়া! দেখে এসেছি সে দুখিয়ানী হুং মেরে যাচ্ছে।

—চম্পা, এসব কথা তুই বলিস না কেন?

যৌবনযুগলিত দেহ ঈষৎ খুঁকিয়ে কাছে আসে চম্পা। হেসে বলে—বুঢ়া, তুমি এত জান, আর একথা জান না, যে হুংয়ের ভাগ কারুক সেওয়া যায় না? হুংয়ের ভাগ আছে, হুংয়ের ভাগ নেই। বুঢ়া, তুমি সে কথা জান না?

—না। সে কথা জানে না সম্পূরণ। যৌবনের কাছে বাধা এমনি করেই পরাজিত হয়—কি হুং, কি হুং। একটা বাড়িও জিততে পারে না সম্পূরণ। [ক্রমশঃ]



বোটানিকাল গার্ডেন-এ

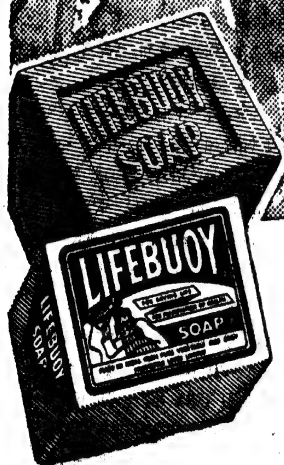
অশোক ভট্টাচার্য

উর্দে আলোর বজার জেসে দার
মেখে-মেখে ঐ পুঁপিত নতলোক,
নিম্নে কোমল সবুজ ফলের 'পরে
বসেছি আমরা পোছার নিকটে পৌছা।

পাশে বরে চলে বৈরাগী নদী তার
দুপুর অঙ্গে কত মাহুদের আশা,
নিঃশেষে নীন—অগান-কুড়ানো ছাঁট
কত না চলেছে সাগরের সন্ধান।

অবুঝে হঠাৎ শালবীষিকার গুনি
বুঝে-বুঝী কলকোলাহলে মাত্রে,
তবু হার কই, তোমার আমার প্রাণে
জাপে না তো সেই হৃৎকৃত ভাসোমাগ।

দায়ব। হৃৎকনে বেন এ কাজের ছই
নট আর হঠাৎ ব'সে আছি পাশাপাশি,
হৃৎকর 'পরে মেখে পাঠ ফুল করে
দায় মেখেছি এ গ্রাস-প্রাণের দায়।



লাইফবয় জীবন দিয়ে

**করলে পাবেন জেই
পরিষ্কার ও স্বরকারে আঘোজ।**

विद्युत्वाय विद्युत् विद्युत् विद्युत् विद्युत् ।

44-38861-100

অন্ধন ও প্রাক্ষণ



মাহ চূচাক বেগম শিবানী বোব

ভাঙ্গার কারাগারে বন্দি অবস্থায় হুঁপিয়ে চলেছে একটি পকলশরীরা কিশোরী। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। এভাবে আর ক'দিন তাকে রাখা হবে। তার মনে পড়ছে দিন কয়েক আগেও সে চক্কা হরিণীর মত ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে কান্দাহারের পাহাড়ে পর্বতে। এই ঘরে বেড়ানোর ব্যাপারে তার মায়ের কিছুটা আশঙ্কি থাকলেও তার পিতার দেওয়া ছিল অবাধ স্বাধীনতা; এই রকম পিতা খুব কম জনের ভাগ্যেই জোটে। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর রাজনীতির দাখাখেলার তাকে চিরকালের মত বিদায় নিতে হল এই পৃথিবী থেকে।

ওড়নাগুলো চোখ মোছে মাহ চূচাক। তার মনে পড়ছে সেই দিনটা। সেদিন বাবর বাঘাশাহ কান্দাহার আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন দেশটা। প্রতি ঘরে ঘরে সেদিন উঠল ককল আর্তনাদ। মাহ চূচাক তখনও বুঝতে পারেনি কি বিপদ ঘনিরে এসেছে তাদের গুপ। সেদিনও সে ছিন্ন করেছিল ছুটোছুটি করে বেড়াতে কান্দাহারের পাহাড়ে পর্বতে। কিন্তু হঠাৎ কতকগুলো লোক বেগে প্রাসাদে প্রবেশ করে বেঁচে ফেলল তাদের সকলকে। তারপর তাদের উত্তর পিঠে উঠিয়ে নিয়ে চলে এল কাবুলের এই কারাগারে। তখনই মাহ চূচাক প্রথম জানলো আরবান জাতি পরাজিত হয়েছে মোগলের হাতে। শুধু পরাজিতই নয়, তার পিতা মিলি মোহাম্মদ সাকির নিহত হয়েছেন আততায়ীর হাতে।

এই কথাটা শোনে মত এসে থিমেছিল মাহ চূচাকের জ্ঞান। সে পিতার প্রথম বাক্য শুধু মনে মনে কত হেসেছে কেমনে, সেই

শিতা আর নেই। এখনও সে বিশ্বাস করতে পারে না তিনি নেই। মনে হয় কান্দাহারে ফিরে গেলেই সে তাঁকে দেখতে পাবে। কিন্তু এখান থেকে সে বাবে কেমন করে? তার মা এবং অন্তঃসত্ত্বা আত্মীয়রা নাকি সব হুক্তি শেষে গেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই এত দিনে দেশে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু একমাত্র তাঁকে এখনও এভাবে আটক রাখা হল কেন?

—এই পোষাকগুলো পরে নিন কুমারী।

মাহ চূচাক ঢের দেখে তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মোগল রাজপ্রাসাদের এক দাসী। তার হাতে কতকগুলি বিবাহের বস্ত্র। বিমিত্তা হয়ে সে প্রশ্ন করে, এ পোষাক কি হবে?

দাসীটি মুহূর্তে বসে—দাঁজ যে আপনার বিয়ে।

—বিয়ে! এ কি আমাকে ঠাটা করা হচ্ছে?

—না কুমারী, ঠাটা আপনাকে কেউ করেনি। স্বয়ং মোগল সম্রাট বাবর আপনার বিবাহ স্থির করেছেন কাসিম গোকুলতাস নামক তাঁর এক প্রতিভাসম্পন্ন কর্মচারীর সাথে। কাজেই এগুলো পরে নিয়ে উপস্থিত আপনি কারাগারের বাইরে চলুন।

দাসীটির কথা শুনে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে মাহ চূচাক বসে, কি। কি বললে? কাসিম গোকুলতাসের সাথে হবে আমার বিয়ে? এতে আমাদের বংশের মর্যাদাহানি হবে না?

দাসীটি পুনরায় মুহূর্তে বসে, মিথ্যে ব্যাখ্যাভিমান আঁকড়ে ধরে থেকে আর লাভ নেই কুমারী। হরিণী স্বধন বাবের কবল পড়ে তখন তার সব সৌরভ্য তাকে মেনে নিতে হয়। এখন যদি আপনি আমার কথা অবহেলা করেন তবে সম্রাটের কোন পুত্র কর্মচারী এসে আপনাকে বলপূর্বক এই শোষক পরিধান করিয়ে নিয়ে বাবে বাইরে। নারীর পক্ষে সেটা কি চরম অপমান হবে না কুমারী!

মাহ চূচাক হুঁপিয়ে উঠে বলে—ওগো তোমরা কি নিষ্ঠুর!

দাসীটি বলে—আমাকে এই দলের মধ্যে টানবেন না কুমারী। আমি যথার্থই আপনার মঙ্গল চাই।

ক্রান্তিকণ্ঠে মাহ চূচাক বলে—ওগো, তাই যদি চাও তবে তুমি আমাকে উদ্ধার করে দাও এই পাহাণপুরী থেকে।

দাসীটি বলে—সে ক্ষমতা আমার নেই কুমারী, থাকলে নিশ্চয়ই স্বরতাম। উপস্থিত আমি বা পারি তা নারীর মর্যাদা রক্ষা করা। এর বিনিময়ে উপস্থিত আপনাকে ছাড়তে হবে জাত্যভিমান। আর বাস্তবিকই কাসিম গোকুলতাসের বংশমর্যাদা খুব বেশী না থাকতে পারে কিন্তু তাঁর মত নিতীক বিচক্ষণ এবং উদার পুরুষ এই পৃথিবীতে কমই আছেন। তাঁকে স্বামিভূষণ পাওয়া যে কোন নারীর পক্ষেই ভাগ্যের কথা।

মাহ চূচাক সম্রাটের হুঁপিয়ে উঠে বলে—ওগো তুমিও না, আর তুমিও না ও-সব কথা। আমাকে নিয়ে তুমি যা করতে এসেছে করো। আমি আর একটা কথাও সহ করতে পারছি না।

দাসীটি আর কোন কথা মা বলে এগিয়ে আসে কুমারীর কাছে। তারপর তাকে একটি একটি করে পরিয়ে দিতে থাকে বিবাহের বস্ত্র এবং অলঙ্কার।

মাহ চূচাকের বিবহা মাতা বিবি জারিকা খাতুন প্রাসাদে আপন নিযুক্ত ককে বসে শুধু চিন্তা করেন মেয়ের কথা। তাঁরা ঝুঁক শোনে সর্বসেসেই। কিন্তু বাবর বাঘাশাহ এই কটি মেয়েটাকে কেন যে ঘরে রাখলেন তা বুঝতে পারা যায় না। এক এক সময় ভর

হয় ওর পবিত্র সেহীতাকে নিয়ে তিনি আপন বিলাস চরিতার্থ করেন না তো? কথটা মনে উদয় হতেই শিউরে ওঠে বিবি জারিফার সর্বাঙ্গ। তিনি নানা উপায়ে জানাবার চেষ্টা করেন মেয়ের কথা। কিন্তু কার্যকরী হয় না কোনটাই। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে যখন তিনি মেয়ের স্বপ্নান পেলেন তখন জানলেন, তার বিবাহ হয়ে গেছে এক বংশমর্যাদাহীন পুরুষের সাথে। শুধু তাই নয়, তার ঔরসে মাহ চুচাকের কোলে এসেছে একটি কন্যাসন্তান।

জনে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় জারিফা খাতুনকে। তাঁর এক মাত্র কন্যার এমন দুর্ভাগ্য হয়েছে? দেশে কি এমন লোক নেই যে এর প্রতিকার করে? তাকে কি করে কান্দাহারে ফিরিয়ে আনা যায় তাই তিনি ভাবেন সারাদিন। তাঁর ঘরের তুলসী কি কাঁটেই না দিন কাটাচ্ছে। একে শত্রুপুত্রী, তার ওপর এক বংশমর্যাদাহীন পুরুষ তার স্বামী! এ তো সমগ্র আরবান জাতির পক্ষেই অপমানজনক। জারিফা বিবি সময়ে অসময়ে কান্দেন আর ভাবেন, কবে শিউরি থেকে ফিরে আসবেন তাঁর ভাস্কর শাহ বেগ। আজ আর জীবিত নেই তাঁর স্বামী। কাজেই ভাস্করের সহায়তার উদ্ধার করতে হবে মেয়েটিকে।

শিউরি রাজ্যের বিভিন্ন গোলযোগ মিটিয়ে কান্দাহারে ফিরতে বেশ কিছু বিলম্ব হয়ে গেল শাহ বেগের। দীর্ঘ অস্থিরতার পর দেশে ফেরা তখন চতুর্দিকে চলল আমোদ-প্রমোদ। কিন্তু সেই আমোদ তখন বিব টেলে দেয় জারিফা বিবির অন্তরে। এই কি প্রমোদ করবার সময়? তাঁর কন্যার উদ্ধারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি দেবাস্যকে এই স্মৃতি করতে কিছুতেই সেনেন না। তিনি এই কথা ভাস্করকে জানাবার উদ্দেশ্যে অশ্বপুত্রের দরজার পাশে ঠাঁড়িয়ে থাকেন নিশ্চল হয়ে। সেই পথ দিয়ে শাহ বেগ অন্ধর মহলে বাবার সময়ই জারিফা খাতুন হুঁপিয়ে উঠে ছুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদতলে। প্রথমটা হতভম্বিত হয়ে পড়েন শাহ বেগ। তখন তাঁকে মেয়ের সব কথা জানালেন জারিফা বিবি। তাঁর কথা শুনে অন্তরে আঘাত পেলেন শাহ বেগ। বিশেষ করে কোন মোগলের সাথে আরবান জাতির মেয়ের বিবাহ হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক। কিন্তু কি ভাবে মাহ চুচাককে বারবারে নাগপাশ ছিন্ন করে কাবুল থেকে কান্দাহারে নিয়ে আনা যায় তা তাঁর মাথার আসে না। বা হোক, এর ব্যবস্থা শীঘ্রই করবেন, বেগমকে এই আশ্বাস দিয়ে আপন কক্ষে চলে গেলেন শাহ বেগ।

অবশেষে স্থির হল একটা মতলব। বিভিন্ন বেগমরা এই মত পোষণ করলেন যে তাঁদের এক দাসী ছদ্মবেশে কাবুলে গিয়ে সাক্ষাৎ করুক মাহ চুচাকের সাথে। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে আসবে হাজারা দেশে। সেখান থেকে উঠের শিঠি চড়ে কান্দাহারে ফিরে আসতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। কিন্তু কথা হল, সেখানে যাবে কে? তখন দৌলত কিতা নাম্নী মির্জা মোকিমের এক দাসী রাজী হল তাঁর প্রভুকন্যাকে উদ্ধার করতে। সে সেই দিন ছদ্মবেশে বওনা হয়ে গেল কাবুলের পথে।

কাবুল রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে মাহ চুচাক বেগম মুখ ভার করে বস রয়েছে এক পাশে। অন্ধুর বিছানার তরং কঁপে চলেছে তার শিশু-কন্যা নাহিলা, কাঁচক বস্ত্র পায়ে কাঁচক। ঐ মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তার আদর করতে এতটুকু ইচ্ছে হয় না। তার মনে পড়ছে গত দু

বছরের কথা। সেই যে বাবরের সেনানীর হাতে বন্দি হয়ে এল এই কাবুলে তারপর আর একটা শব্দের জন্তও সে বেতে পারনি কান্দাহারে। একবারও তার সাক্ষাৎ হয়নি মা কিংবা অজ্ঞাত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে। উঃ, এরা কি নির্ভীক শয়তান! তাকে জোর করে বিয়ে দিল এক হীনকবীরের সাথে। তারপর তার ঔরসে এল ঐ মেয়েটা।

—এ কি নাহিদ কাঁচছে বে? ঘরে এসে খুকীকে কাঁচতে যেতে বললেন কাসিম পোকুলভাস।

—কাঁচছে তা আমি কি করতে পারি? শিকার দিয়ে কথটা বলে মাহ চুচাক।

তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে কাসিম দাসীকে ডাক দেন, খানিজা!

হৃদয়ের বাটী হাতে ছুটে আসে খানিজা। সে তাড়াতাড়ি তাঁর কোল থেকে নাহিদকে নিয়ে আদর করে বলে—দুই, শোনা, এরই মধ্যে গম হয়ে গেল? চল দুধ খাবে চল। বসেই খানিজা তাকে নিয়ে চলে যায় পাশের ঘরে।

কাসিম তখন এসে বসেন তাঁর সহধর্মিণীর সামনে। মাহ চুচাক বিবস্ত্রের সাথে যুখটা ফিরিয়ে রাখে অঙ্গ দিকে। তিনি তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেন—চুচাক, মেয়েকে কোন দিনই কি আপন বলে গ্রহণ করবে না?

এর কোন জবাব দেয় না মাহ চুচাক। কাসিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আজ তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আজ আমাকে সম্রাটের সাথে বেতে ইচ্ছে উজ্জবেকনের বিক্রমে লাড়াই করতে। এই যুদ্ধে আজ কি হবে কিছুই বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে এই আমাদের শেষ দেখা। এতে অবশ্য তুমি খুশী হবে। কারণ আমি তোমার জীবনে খানিকটা সুখ এবং বোঝা ছাড়া আর কিছুই নই। কাজেই এ থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু চুচাক, আমার একটা অনুরোধ—ঐ নাবালিকা শিশুটিকে অন্তত তুমি একটু দেখো।

তবু নিরুত্তর হয়ে বসে থাকে মাহ চুচাক। কাসিম বলেন—বলো প্রিয়া, এর পূর্বও কি তুমি নাহিদকে টেনে নেবে না বুকের কাছে?

—না। পছন্দী হয়ে জবাব দেয় বেগমসাহেবা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন কাসিম পোকুলভাস। তারপর বুকের সাঙ্গপোষাকে সম্মিলিত হয়ে তখনই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে।

স্বামী চলে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তি পায় মাহ চুচাক। আজ তাকে বেশ খানিকটা আঘাত দেওয়া গেছে। যুদ্ধ যাবে, মরবে, তাতে তার কি? সে তো তাই চায়। আর তার সাথে ঐ মেয়েটাও যদি শেষ হয়ে যায় তবেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

—শাহজাদা?

—কে? কে তুমি? চমকে ওঠে মাহ চুচাক। এ কে এসে দাঁড়াল তার সামনে?

আগন্তুক মুখে আঙুল দিয়ে ইসারা করে—চুপ। তারপর চারদিক দেখে সে সরিয়ে দিল যুদ্ধের আবরণটা। মাহ চুচাক তখন বিম্বিত হয়ে বলে—এ কি দৌলত কিতা, তুই কেমন করে এখানে এলি?

দৌলত কিতা চাপাগলার জানিয়ে দিল যে কেমন করে প্রবেশ করেছে এই রাজপ্রাসাদে এবং তার আসার উদ্দেশ্যটাই বা কি।

তার কথা শুনে আনন্দে নেচে ওঠে মাহ চুচাকের অন্তর। এইবার সে নিশ্চিন্ত পাবে এই নাগপাশ থেকে। এইবার সে আবার দেখতে পাবে কান্দাহারের পাহাড়-পর্বত। এইবার সে চরম প্রতিশোধ নিতে পারবে তার স্বামী কাসিম গোকুলতাসের ওপর। কিন্তু এই জনশূন্য রাজপুরী হতে সে বাইরে যাবে কেমন করে?

সে-মতলবও দিল দৌলত কিতা। বললে—বিকলে প্রাধিনার পুরে পথে-ঘাটে বধন জমে উঠবে স্নানার্থীদের ভিড় তখন আপনিও আপনার জাকরাণী রঙের বোরখাটা পরে বেরিয়ে পড়বেন স্নানের উদ্দেশ্যে। সে-সময়টা আর কেউই লক্ষ্য রাখবে না আপনাকে। তখন আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে নিয়ে যাব নিরাপদ জায়গায়।

মাহ চুচাক বলে—তা না হয় হল, কিন্তু এখন তুই থাকবি কোথায়?

দৌলত কিতা বলে—আমার জন্মে ভাববেন না শাহজাদী! এখন আমি চলি। সময় হলে দেখা করবো। বলে মুখের আবরণটা টেনে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বিকলের দিকে মাহ চুচাক একাকিনী পায়চারী করছে আপন কক্ষে। খামিজা মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে বিছানায়। অকাতরে সে ঘুমোচ্ছে কচি হাত দুটো মুঠো করে। এইবারেই বেরিয়ে পড়তে হবে স্নান করতে যাওয়ার ছলনা করে। মাহ চুচাক জাকরাণী রঙের বোরখাটা চড়িয়ে দিল সেজে। এইবার আঁ তাকে রাখে কে! কিন্তু এ কি! যাবার সময় ঘুমন্ত মেয়েটা তাকে এমন আকর্ষণ করছে কেন? সে একবার চেয়ে দেখল নাহিদের মুখের পানে। কি চমৎকার মুখ! এত ভাল করে মাহ চুচাক কোনদিন দেখেনি মেয়েকে। মুখের আলল কতকটা তার পিতারই মত। কিন্তু না না, আর সহ্য নষ্ট করলে চলবে না। এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে। নড়ে ধরা পড়ে যাবার লজ্জাবনা আছে। ঘুমন্ত মেয়েটাকে কেলে রেখে মাহ চুচাক একাকিনী দ্রুত বেরিয়ে পড়ে দর থেকে।

পথে বেরিয়ে সহজেই দেখা হল দৌলত কিতার সাথে এবং তার জহাযতর হাজারা দেশে আসতে তাদের অস্থবিধে হল না কিছুমাত্র। তারপর সেখান থেকে উঠের পিঠে চড়ে কান্দাহারে ফিরে আসে মাহ চুচাক। মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে বিবি জারিকা খাতুন ছুটে আসেন তার কাছে। চতুর্দিকে তখন বেজে ওঠে আনন্দমুচক বাজনা।

কিন্তু এ কি! এখন ঐ বাজনা শুনতে মাহ চুচাকের তো আর ভাল লাগছে না! কাবুল থেকে কান্দাহারে এসে সে যা আনন্দ পাবে মনে করেছিল তা তো পাচ্ছে না! বরং মনে হচ্ছে যে কেন তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছে কাবুলের দিকেই।

মেয়ের বিব্রত মুখের পানে তাকিয়ে জারিকা খাতুন বলেন—আহা, মেয়ে আমার হৃদয়স্তায় কত যোগা হয়ে গেছে। তুই কিছু ভাবিস না চুচাক, তোকে ওরা জোর করে যে বিয়ে দিয়েছে সে আমি কিছুতেই মানবো না। আমি আবার নতুন করে তোর বিয়ে দিয়ে ঘরমসার পেতে দেবো। আর সেই সঙ্গে অভিশাপ দিই যেন ঐ কাসিম আর তার মেয়েটার মৃত্যু হয়।

—মা। হঠাৎ শিউরে ওঠে মাহ চুচাক।

—কি? কি হল চুচাক?

—না মা কিছু নয়। এতক্ষণে মাহ চুচাক বুঝতে পারে কাবুল থেকে কে তাকে হাতছানি দিচ্ছে। সেই যে ছোট্ট মেয়েটিকে একলা ঘরে ফেলে রেখে সে চলে এল এ তারই আকর্ষণ। তার বেশের মত কৌকড়া চুল, কচি হাত দুখানি, কৌশানি কান্না এগুলি যেন অত্যন্ত বেশী করে মনে পড়ে মাহ চুচাকের। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্মে আকুলি-বিকুলি করে ওঠে প্রাণ। সে ভুকের কেনে ওঠে—মা!

জারিকা খাতুন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—কি হল মা! চল ঘরে যাই। আমি বুঝতে পারছি পথক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তোার শরীর।

মেয়েকে নিয়ে ঘরে গেলেন জারিকা বিবি। মাহ চুচাক কিছু কিছুতেই শান্তি পায় না মনে। এইবার তার মনে পড়ছে স্বামীর। তাঁর শেষের কথাগুলো বড় বেশী করে বাজছে বুকের মধ্যে। উজ্জবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উনি চলে গেলেন। সত্যি যদি সেখানে তার মৃত্যু হয়? উঃ, না না না, এ যেন আর সে ভাবতে পারছে না। অন্য সময় সে কত বার তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু এখন সেকথা ভাবলেই চোখে জল এসে পড়ছে।

ক্রমশঃ নেমে আসে রাত্রি। সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায়। শুধু ঘুম আসে না মাহ চুচাকের চোখে। কান্দাহারে এই প্রাসাদ যেন আজ হল ফোটাচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। কাবুলে ফিরে যেতে আনন্দান করছে প্রাণ। মনে হচ্ছে নাহিদ যেন আচমকা দর থেকে উঠে কান্দাচ্ছে। তাকে দেখবার জন্মে খামিজা পর্যন্ত সেখানে নেই। তার ওপর তার স্বামী যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন কি না কে জানে। এখনি যে তাঁর খবর নেওয়া দরকার। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে মাহ চুচাক। আর একবার সে চেয়ে দেখে কক্ষের সকলেই নিদ্রাভিভূত। তখন সে ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে বেরিয়ে যায় বাইরে।

নাহিদকে কোলে নিয়ে একাকিনী পলচারণা করছে খামিজা। মনে মনে সে বলছে হায়, কি কুমারতার গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল খুকী! বুকের দুধ দিয়ে মাহুব করা তো দুবের কথা, আপন মেয়ে বলে কোনদিন কোলে পর্যন্ত নিল না। তারপর তাকে একলা ফেলে রেখে সে চলে গেল আপন আন্তানার। শুধু তাই নয়, পিতার যেটুকু বা শ্রদ্ধে ছিল তাও আজ শেষ হয়ে গেল জন্মের মত। হায় গোড়া কপালী, পিতৃমাতৃহীন হয়ে এবার মাহুব হবি কার কাছে? বাদী খাদিজার কাছে? হায় রে রাজনন্দিনী!

—খাদিজা!

—কে? বেগমসাহেবা?

—হ্যাঁ খাদিজা, আমার নাহিদ কই?

—নাহিদ তো এই আমার কোলে।

—কই দে দে আমার কোলে দে। মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোলে নিয়ে চোখে-মুখে চুষন করে মাহ চুচাক। এই মেয়ের আকর্ষণে সে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ছুটে এসেছে এখানে। এর কাছে সে যে বহরিনের স্বামী! শুধু এম কাছেরই নয় আর একজনের স্বপণ্ড আর

তাকে শোধ করতে হবে। মাই চুচাক খাদিজার পানে তাকিয়ে
জিজ্ঞেস করে—তিনি কোথায়?

বিম্বিতা হয়ে খাদিজা বলে—কায় কথা জিজ্ঞেস করছেন
বেগমসাহেবা?

—তোমার প্রভু, মানে আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাদিজা বলে—তায় কথা আর না-ই বা
শুনতে চাইলেন বেগমসাহেবা!

ব্যস্ত হয়ে মাই চুচাক বলে—ওরে না না, আমাকে শীগগির
বল তিনি কোথায়?

খাদিজা বলে—তিনি উজ্জবেগদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আর
কোনো নি। সেখানে সম্রাট বাবরকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

—এ্যা! সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে মাই চুচাকের। মৃত্যু ঘটেছে
তাঁর স্বামীর! উঃ, জেনে শুনেও কেন সে তাঁকে মানা করেনি যুদ্ধে
যেতে! কেন সে তাঁকে জোর করে ঠেলে দিল মৃত্যুর পথে?
যাবার সময় উনি যে অনুরোধ করেছিলেন তা, সে অবজ্ঞা করে কেন
কষ্ট দিল! হায় নাহিদ, কেন আমি তোদের আগে বুঝতে পারিনি!
বলে অঝোরে কঁাদতে থাকে মাই চুচাক।

দেখে অবাক হয়ে যায় খাদিজা। মনিব-ঠাকরুণের এই

পরিবর্তন দেখে তার চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সে তাঁর পাশে
এসে বলে—আগনি শান্ত হোন বেগমসাহেবা!

শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা

ও নারীত্বের মূল্যায়ন

অরুণিমা মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় লেখক তাঁর
সমসাময়িক কালে তো নয়ই, তাঁর পরেও বোধ হয় জন্মাননি।

তাঁর এ বিপুল জনপ্রিয়তা কালের বিবর্তনবাদকে অব্যবহার করে
অটুট থাকতে পারবে কি না, সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলা শক্ত।
তবে একথা অনস্বীকার্য, শরৎ-সাহিত্যের ভক্ত পাঠকের সখ্যা-বৈপুল্য
বোধ হয় আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই মনোহারিতা স্তরের পিছনে
যে যুক্তিটি প্রধান বলে মনে হয় সেটি হচ্ছে সমরোপযোগিতা।
শরৎচন্দ্র আমাদের কৃষ্ণস্বারাচ্ছন্ন সমাজ-জীবনের 'নির্লজ্জ অবিচার
ভণ্ডামির দৌরাত্ম্যে দুঃসহ মাহুঘের মননশীলতার কাছে প্রকট করে
তুলে ধরেছেন সে সমাজের সাহিত্য-বস-মণ্ডিত স্বরূপটি। করেছেন
সমাজের তথাকথিত অসার নীতি-আদর্শের উপর স-বিস্ময়

মনের কথা

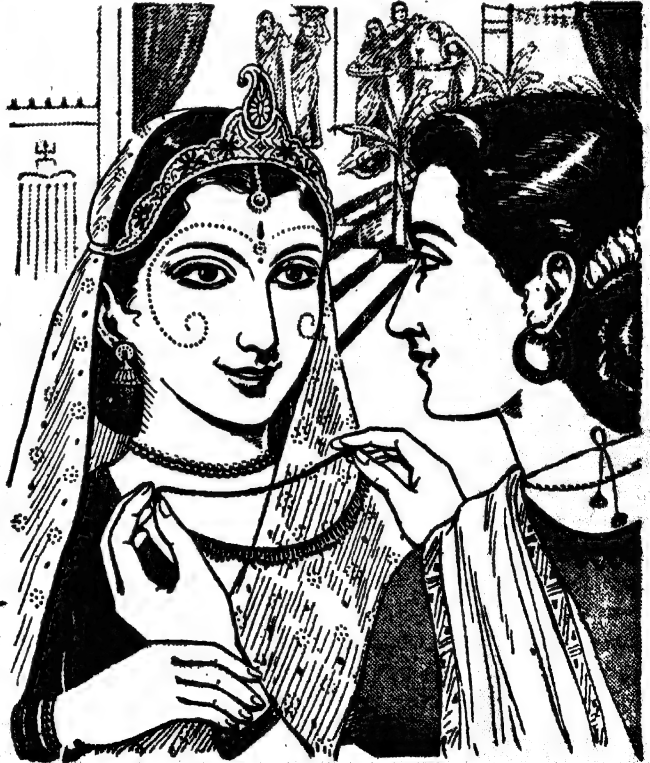
"এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?"

"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স
দিরাছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই,
মনের যত হয়েছে—এসেও পৌছেছে
ঠিক সময়। এঁদের কৃতিত্বান, সত্ততা ও
পারিষদ্যে আমরা সবাই খুশী হয়েছি।"

**মুখার্জী
জুয়েলার্স**

শ্রীমতী সোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-ভাণ্ডার
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



কটাক্ষপাত। অবশ্য আশ্চর্যের বিষয়, এই স্বাধীন নীতি-আদর্শ শেখাবার পরিকল্পিত স্বতন্ত্র প্রয়াস নেই সেখানে আর তার সংগে পার্থক্যমূলের রুচির বিরোধ ছিল না,—ছিল আনুকূল্য। জন-মানস যৌক ছিল বিপ্লবধর্মতার দিকে। শরৎচন্দ্র হাওয়া বুকে পাল খাটানেন। যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনকে হুটিয়ে তুললেন তাঁর সাহিত্যে।

এই অর্থে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে 'রিভলিউশনার আর্টিষ্ট'—বিপ্লবী সাহিত্যকার। সাহিত্যে প্রধানত নীতি-আদর্শের নাম-সংকীর্ণনের মধ্যে তিনি আনলেন নতুন সুর, নতুন বাণী। অভিনব দৃষ্টির আলোকে তিনি রাঙিয়ে তুললেন অন্তরপ্রকৃতিকে। মানবতা পেলে তাঁর হাতে নতুন মান। ছাত্রহীন সমাজের অন্ধ-কারায় নিপীড়িত মানব-সত্তাকে তিনি দেখালেন তাঁর অন্তরতম ছাত্রের সহানুভূতির শাস্ত-মিষ্ট প্রদীপ-শিখা। 'এক এ অভিনবত্বটুকু প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন নারীসত্তাকে তাঁর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে। অবশ্য রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের অনেকেরই এ অভিনব স্বপ্নকে নীতি ও নীলতার প্রস্র তোলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তেমন রক্ষণশীল বিচার-বুদ্ধির উর্দে।

প্রাক-শরৎ-সাহিত্যের বঙ্কিমী নীতি-আদর্শের প্রাধান্যের যুগে শরৎ-সাহিত্য এক প্রশংসারী দুঃসাহসিক প্রয়াস সন্দেহ নেই এবং শরৎচন্দ্র বাংলার যে সমাজ-জীবন থেকে তাঁর সাহিত্যের উপাদান নিয়েছেন তাঁর সাহিত্য সেই আচার-সর্বধর্ম নির্মম সামাজিকতার এক অনিবার্য, বিপ্লবাত্মক প্রতিচ্ছবি। প্রধানতঃ শরৎচন্দ্র এ 'রিভল্ট' আনলেন তাঁর সাহিত্যে নারীদের বিশ্লেষণে। অবশ্য প্রথম রিভল্ট হলো তথাকথিত সমাজের অন্ধ কুসংস্কার, কু-প্রথা অজ্ঞার অবিচার সম্পর্কে একটা বিরোধমূলক ভাব-বস্তু বয়ে চলেছিল বাংলার বুকে, বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে অস্পষ্টতার চোরাবালি সরিয়ে কুলগ্রামী, বিবোধী বিপ্লবী এই ফলস্ত ধারাটিকে আবিষ্কার করেছেন। প্রকাশ করেছেন মানবতার কাছে মানুষেরই অবমাননা—দুঃখ তাচ্ছিল্য অ-সহানুভূতি। রসাত্মক ভাবে। শরৎচন্দ্রের নিজের কথাতেই বলি :—'রিভল্ট আমি আনিনি, তবে তা এসেছে যুগের প্রবাহে এবং আমি শুধু তা প্রকাশ করেছি। আর এ-প্রকাশ, সামাজিক কুসংস্কার, অনাচারের নিশ্চল শিলাভূপের ওপর আঘাত হেনেছে। সমাজের গণ-মানসে আলোড়ন তুলেছে।'

কুসংস্কারজর হিন্দু-সমাজ চিরকাল নারীকে নৈতিকতা দিয়ে গভীর করে রেখেছিল। সেখানে শুধু নীতি-স্বীকৃত ছিল না, তা সমগ্র নারীদের নৈতিকতা। সেখানে সতীত্ব ও নারীত্ব কোন প্রভেদ নেই। সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীত্বের বিকাশ অসম্ভব। শরৎচন্দ্র এই প্রচলিত সামাজিক ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন। নারীত্ব এমন একচেঁখা বিশ্লেষণের অস্বাভাবিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, অনেকদিন ধরে কোন ধারণা বা বস্তু চলে আসছে বজাই যে তা ঠিক তা নয়। কোন কিছুই চিত্তকালের জন্ত সমান ভাবে ঠিক নয়। শরৎচন্দ্রের অভিনব হল : তিনি নারীত্ব থেকে সতীত্বকে পৃথক করে দেখেছেন। সতীত্ব ও নারীত্ব নারীচরিত্রের দুইটি সত্তা—এক বৃহত্তর দুটি অঙ্গ—তাহার পরিপূর্ণ মহাযাত্রা। সে মহাযাত্রা এ দুয়ের প্রত্যেকটি থেকে বড়। তাই পরিপূর্ণ মহাযাত্রার সতীত্ব একটা অঙ্গ বই তো নয়। কাজেই মহাযাত্রকে সে ছাপিয়ে উঠতে হবে

তা তো হতে পারে না! শরৎচন্দ্রের মতে নারীচরিত্রের বিকাশ শুধু মাত্র সতীত্ব নয়, বা একমাত্র সতীত্বই সমগ্র নারীসত্তা বিচারের মানদণ্ড নয়।

সতীত্ব বাদ দিয়েও নারীত্বের মহিমা গ্রাহ্য হতে পারে। যে নারীর জীবনে তথাকথিত সতীত্ব নেই, বা তেমন সতীত্ব বিকাশের সুযোগ নেই, সে কি নারীচরিত্রের অঙ্গ গুণে মহিমময়ী হয়ে উঠতে পারে না? তাই বলে সংসারে সতীত্বের প্রয়োজন নেই একথা ঠিক নয়। আবার একমাত্র সতীত্বের গুণ দিয়েও নারীত্ব পূর্ণতা পেতে পারে না। এমন কি, সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীত্বের বিকাশ (যদিও পরিপূর্ণ নয়) সম্ভব, কিন্তু আমাদের বিচারের নারীত্ব-স্নেহ-মমতা সেবা ধর্ম-দয়-আত্মত্যাগ প্রভৃতি নারীর কোমল স্বপ্নবৃত্তিসমূহকে বাদ দিয়ে, শুধু সতীত্ব নিয়ে নারীসত্তার বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ—নারীত্ব সে মহাযাত্রার সংগে অচ্ছেদ্য ভাবে, প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, আর সতীত্ব নিহিত থাকে জীবনের একটা বিশেষ পর্যায়ে গড়ে ওঠা আত্মগত্যা ও পরিতৃপ্ত মনোধর্মিতার মধ্যে। মহাযাত্রার সাথে তার যোগসূত্র কিছু দূরের—পেরাঙ্ক। অবশ্য সংস্কারাঙ্ক হিন্দু নারীর লোকদেখানো পোষাকী সতীত্বের মধ্যে মহাযাত্রার কোন মহৎ বৃত্তি নেই। সে এক ধরনের অন্ধতা, আত্ম-প্রতারণা—বাক্যে তথাকথিত হিন্দু সমাজ দিয়েছে প্রচুর মূল্য।

জীবনে চলার পিছল পথে কোন নারীর দৈবাৎ পদস্থলন হল—তুল করে ফেললো—সতীত্ব হারালো, কিন্তু তাই বলে কি সে সমগ্র নারীত্বকে হারিয়ে ফেললো? হয়তো তার মধ্যে এক মহাপ্রাণ লুকিয়ে আছে—যে পরের ব্যথায় কাঁদে, পরের এতটুকু ভাল করার জন্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরের জন্ত এই যে কাঁদা, এই যে ব্যাকুলতা তাই তো নারীমনের কোমল বৃত্তি, নারীত্ব, বা ছাড়া নারীচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব!

সতীত্ব নারীর গুণ সন্দেহ নেই, তাই বলে ক্ষণিকের ভুলের জন্তে সে যদি সতীত্ব না রাখতে পারতো তার জন্তে কি সে সমাজ থেকে চিরতরে বহিস্কৃত হবে? নারীত্ব ঐশ্বর্যবতী হওয়া সত্ত্বেও? শরৎচন্দ্র কত দুঃখ করে বলেছেন : 'একটি যুবতী মেয়ে যদি বোঁবনে একবার একটা ভুল করে ফেলে তাহলে তার আর রেহাই নেই। তার চরম দুর্গতি করিয়ে তবে লোক ছাড়বে। কেন? তার ভাল হবার পথ, সমাজের একজন হয়ে কিসে আসবার পথ কেন খোলা থাকবে না? তার কি প্রাণ নেই? আমি তো জানি তাদের মধ্যে এত বড় প্রাণ আছে যা অনেক গৃহস্থের সতী মেয়ের মধ্যে নেই। সতীত্ব না রাখতে পারাটা অপরাধ ঠিকই, তাই বলে পতিতের উপরে উঠবার সুযোগ করে দেওয়াটা অজ্ঞারের প্রশ্রয় নয়।' শরৎচন্দ্র মানুষের এই দৈহিক পতনের দৃষ্টান্তে সংবেদনশীল হয়ে উঠছেন। স্বভাবত্বর্ল নীতিচ্যুত মানুষকেই তিনি কোনদিনই পাপী বলে হীন চক্ষে দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। আদর্শবাদী বহিমচন্দ্র আদর্শ-জাতিভ্রমকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি সতীত্ব ও নারীত্বকে এক করে দেখেছেন সতীত্বহীন নারীত্ব নেই। সে পাপীয়সীর সামাজিক কর্তব্য। তাই কন্দনদ্বীপী রোহিণীর শাস্তি হল ঐ একই কারাগার। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি তাচ্ছিল্য শরৎচন্দ্র ভাবতেও পারেন নি।

তার চন্দ্রবুধী পতিতা অন্তী পাণীরসী হয়েও পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করলো কোনও গুণে? তার সত্যবোধ জাগাবার জন্তে? না তার নারীত্বের মনোহর বিকাশের জন্তে? শুধু মাত্র সত্যই হলে তা সম্ভব হত না। কেননা নারীত্বকে বাদ দিয়ে সত্যই কি করে হৃদয় হবে? সত্যই একক ভাবে হৃদয় হয়ে উঠতে পারে না। নারীর কোমল চিত্তবৃত্তি সত্যত্বকে মহিমা দিয়ে হৃদয় করে তোলে। তা না হলে অমন সত্যত্বের অর্থ কি? তাই শরৎচন্দ্রের দরদী মনের প্রশ্ন : 'দৈহিক স্ত্রীতাই কি এতবড় গুণ, যে মেয়েমাছুষ স্বামী জেলে যায় দেখেও তাকে বাঁচাবার জন্তে গহনা টাকা বের করে দেয় না—সেও সত্য! সেরূপ সত্যত্বের যে কি মূল্য জানিনে।'

হিন্দুসমাজ তবুও হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ নারীত্বকে বাদ দিয়ে পোষাকী ফরমাসী সত্যত্বকে সমগ্র নারীসত্তা বিচারের মাপকাঠি করেছে। কোন নারী চিরাচরিত সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হয়ে শরৎচন্দ্রের মতো মানবদরদীর সমর্থন পেতে পারে যদি সে সমাজ ভৈরব ভট্টাচার্য্যি বেণী ঘোবালের সমাজ হয়—যে সমাজ প্রকৃত তথ্যকে উপেক্ষা করে কেবল এক নিরর্থক কংকালকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। মানবতাকে অবমাননা করেছে। রমায়ণের মত সমাজের প্রকৃত মংগলাকাঙ্ক্ষীর সমস্ত সমিচ্ছাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। তাই শরৎচন্দ্রের কত সহানুভূতি মাছুষের উদ্দেশ্যে : 'আমার কথা হচ্ছে, আমি যেন কোন দিন মাছুষের আত্মাকে আমার লেখার মধ্যে অপমান না করি। মেয়ে মাছুষই হোক আর পুরুষ মাছুষই হোক তার গুণের জন্ত পথ যেন একটা খোলা থাকে। হিন্দু সমাজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তার তুলনায় মুসলমান সমাজ অনেক ভাল। বাইরের জিনিষ দেখে আমরা অনেক ভুল করছি। কিন্তু বাহিরটাই তো সব নয়। অন্তরই যে বড়। তাকে তো সত্য অস্বীকার করা যায় না।' কোমল-শুভ্র নারী-হৃদয়ের ভালবাসা কোমল বৃত্তির পরম উৎস—পরম ধন। সে পাপড়টিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দলিত করে দিতে চায় নিষ্ঠুর সমাজ-শাসন। সমাজ-নিয়ম তার মূল্যায়ন কোন দিন করতে শেখেনি। তার মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে শেখেনি। বোঝেনি—ভালবাসা কত বড় শক্তির উৎস—নারীকে কত বড় ত্যাগের কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিত করে। শরৎচন্দ্র বলেছেন আরও বড় কথা : 'ভালবাসা যে কত বড় জিনিষ তা বলে বোঝান যায় না। সব দৌষ-ক্রটি এতে ঢেকে যায়। ভালবাসার মত আত্মত্যাগের শিক্ষা দিতে আর তো কিছু পারেনা। প্রণয়-পাত্রীকে জ্বর করবার জন্তে যুবকের যে বিপুল চেষ্টা, যে আত্মিক সাধনা, এত মাধুর্য্য তা আমি অজ্ঞ দেখে দেখে ভুলতে পারিনি। এই যে পাবার মধ্যে কত সেকরিকাফাইস, কত চেষ্টা, কত সাধনা, এতে মাছুষকে অনেকখানি নোবল, অনেকখানি গ্রেট করে দেয়।'

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা অল্প রকম। রকমটা অবশ্য একান্তভাবে অসমর্থনীয়—অন্ধতায় পটু। অপব্যবস্থায় কটকময়। এ সমাজ যুবক-যুবতীর বিয়ে ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে বাবা-মায়ের ইচ্ছাবীন ছিল। কয় যুগ আগেও হিন্দু ঘরের কোন মেয়ে ভাবতেও ভয় পেত—সে কখনো কোন যুবককে ভালবেসে বিয়ে করবে। এমন কি ভারী খাদীর কদনাও বৃষি তার কাছে ভয়ের। এই ভয় করতে শিখিয়েছে

তার পবিত্রবোধ—বাবা-মায়ের শাসন ও সমাজের দৃঢ় অঙ্গশাসন। সে জানে বাবা-মা তাকে বার হাতে তুলে দিয়েছে, সেখানে তাকে বাঁধা পড়ে থাকতে। দাম্পত্য-জীবনে অজ্ঞপ্তি থাকলেও সামাজিক মন্ত্রাচার্য্য আয় বজ্জের পোঁয়ায় যে জীবন একবার বাঁধা পড়েছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে কি করে? সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হবে কি করে? বিদ্রোহের ধাতুটি তার রক্তে নেই—সে সঙ্কীর্ত্ত। সমাজ-শাসনের দাস। শৃংখলিত। শরৎচন্দ্রের অভিযোগ এ ধরনের অন্ধতার বিরুদ্ধে। সমাজের কুশাসনের বিরুদ্ধে। যে সমাজ নারীর কোমল হৃদয়ের কোন গোপন কোণ ঘেঁষে ফুটতে যাওয়া একটি যুগ্ম-হৃদয় প্রণয়-কুলকে কঠোর শাসনের রক্তভেজ অকালে বালুসে দেয়, শরৎচন্দ্রের মতবোধ সে হৃদয়হীন সমাজের সংগে। যে সমাজ অন্ধত্বের চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করে চরম অন্ধতায় একান্ত অসত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে, মানবতায় দৃঢ়বিশ্বাসী মাছুষ সে সমাজের নিয়ম-শাসনকে কোন দিনই সমর্থনের দৃষ্টি ফেলে দেখবে না। নারী-হৃদয়ের সেই সত্যানুভূতির প্রতি তথাকথিত সমাজের মনোভাব সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন : আমাদের এখানে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। জয়ের যে একটা আনন্দ, জীবনের গুণর তার যে একটা মহৎ প্রভাব, তা থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত থাকে। জয়ের জন্ত কত ব্যগ্রতা, কত ব্যাকুলতাই না দেখেছি। তারা শক্তি সঞ্চয় করে, নিজেকে তারা ব্যোগ্য করে তোলে, দরকার হলে 'ভুলে' লড়ে। তারা ভালবাসার মর্য্যাদা বোঝে, ভালবাসার সন্ধান তারা রাখতে জানে। এখানকার সমাজ ধরে-বোঁধে কতকগুলো মন্ত্র পড়ে হুঁচুনকে এক করে দিল, কিন্তু তারা ভালবাসার একটা জীবন্ত আনন্দ কখনো পায় না।'

শরৎচন্দ্রের এই মতবাদ রক্ষণশীল সমাজের চোখে বিদ্রোহাত্মক সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের সমর্থিত সে 'ভালবাসা' সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধ মতবাদ হচ্ছে : 'প্রণয় পাত্র-পাত্রীকে জয়ের জন্তে যে ব্যাকুলতা তা কণিকের—তার স্থায়িত্ব চিরদিনের নয়।' শরৎচন্দ্রের উত্তর হল : 'যে আনন্দ তাতে আছে, তা হুল্লভ। হতে পারে কণিকের, কিন্তু হুঁ-দশ দিনের যে আনন্দ, তার তুলনা নেই। সে আনন্দ জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্টকে ছাপিয়ে বড় হয়ে থাকে। তার ইনস্টিমেন্ট খুবই কার্য্যকরী। কন্ট্রোলের আনন্দ—সে কি কম? 'সেলফ-মেড' মাছুষ যেমন বড়, যারা হৃদয় কঙ্কার করে তারাও তেমন বড়।'।

নারীকে মূল্যায়ন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এ ধরনের সম্বন্ধ-চেতনা তথাকথিত সামাজিক রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রশ্নের উদ্ভেদ করবে। তারা তুলবে শরৎ-সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন। কিন্তু সে অন্ধরা তুল বুঝেছে। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র দুর্নীতি প্রচার করেননি। নীতি-বর্জিত তিনি মোটেই ছিলেন না, ছিলেন উদারনীতিবাদী। মানবদরদী। তিনিই স্বীকার করেছেন : 'নীতি আমি মানিনে, এমন কথা আমি বলিনে। শুধু দৌন্দর্য্যটাই করব, কোনও নীতি-কৃতি মানবো না—এতো আর সত্য সত্যি চলাতে পারে না। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, সাহিত্যের ভেতর নীতি-টিতি নেই, কৃতি আছে। আমি কিন্তু তা বলিনি, আমি বলি, নীতিও আছে।'

শরৎ-সাহিত্যে নীতিকথা যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু সেখানে কড়িক পুরিকল্পিত ভাবে নীতি শিক্ষাদানের প্রয়াস নেই—যে প্রয়াসটুকু খুঁজে পাওয়া যায় কবিতা-সাহিত্যের অনেক জায়গায়। সেখানে নায়ক-নারিকার কথাবার্ত্তার যে নীতিজ্ঞান প্রকাশ পেরেছে তা

সামাজিক মানবের সমাজের সাথে মিলে যাওয়া স্বভাববিশিষ্ট নীতিবোধের প্রকাশ। একান্ত সাহিত্যোচিত দ্ব্যর্থবোধী পন্থায়।

নারীকে মূল্যায়ন পন্থায় শব্দচম্পের অভিন্ন সমাজ-বর্ণনের ছায়া পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে প্রচুর রয়েছে। তা শুধু অনুকরণ নয়। 'সিদ্ধান্ত'র উত্তরাধিকার। বৈধ বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। আরও এগিয়ে তৃতীয় ধাপে—অর্থাৎ সর্বাধুনিক যুগে সেই অভিন্ন সমাজ-বর্ণনের দৃষ্টি সাহিত্যে আরও উল্লসিত হয়েছে। তাই শব্দচম্প বাংলায় যে বিপ্লবাত্মক নতুন পথের পথিকৃত শরভাস্তর বাংলা-সাহিত্যে প্রধানতই সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে পথেই এগিয়ে চলেছে, আরও বৃদ্ধি চলেবে বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে পা ফেলে।

রক্তগোলাপ

গীতা চক্রবর্তী

মিতা,

লক্ষ্য থেকে তোমার যে চিঠি নিয়েছি আশা করি তা পেয়েছে। এখন যে চিঠি তুমি পাবে তা যাচ্ছে আগ্রা থেকে। মিতা, ৪ঠা তারিখে আমরা এসে আগ্রার পৌঁছেছি। সেদিন বিকেলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রেমিক সাজাহানের 'মর্ষর স্বপ্ন' তাজমহল দেখতে। আমরা যখন মতি মসজিদের সামনে পঁড়িলাম, তখন অন্তর্গামী সূর্যের রক্তিম আভা এসে পড়েছে মসজিদের উপর। দেখলাম ঘুরে ঘুরে সব। দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো, মনে হোলো এই মহাকাল, যে কালের কবলিত হয় সব প্রতীপত্তি, মান, সম্মান। আস্তে আস্তে সূর্য মতি মসজিদের পিছনে বিলীন হয়ে গেলো। আমার মনে হোলো ঠিক এমন করেই অন্ত গেছে মোঘল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূচ্য। সাইপ্রাস বনভূমির মধ্যে দিয়ে বৈকালিন বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পাতার মধ্যে আসতে আসতে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তা যেন বনভূমির দীর্ঘশ্বাস। আমরা সেইখানে ঘাসের উপর বসে আমাদের জলযোগ সায়লাম। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, ভাগ্যক্রমে সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। একটু একটু করে জ্যোৎস্না তার রূপালী ফাগ ছড়াচ্ছে তাজমহলের উপর। চমৎকৃত হলাম। যে বেনারস গুরুতর এককণ বুকটা চেপে ছিল এককণ তা যেন নেমে গেল। অবাক হয়ে গেলাম যে তাজমহল এতদিন শুধু গল্পে পড়া রূপকথার রাজ্য ছিল, আজ তা প্রত্যক্ষ করছি। তা এত সুন্দর।

অপূর্ণ। অপূর্ণ সাজাহানের শিল্পদৃষ্টি। তাঁর প্রেম। তাজমহলের প্রতিটি পাথর যেন মমতাজ আর সাজাহানের প্রেমস্বভাষা-সিক্ত। আর সেই পাথর দিয়েই তৈরী তাদের প্রণয়ের মর্ষর মুক্তি। আমার মনে হোলো মনের গহনে কোন কবি বলে উঠেন—

তাজমহলের পাথর দেখেই দেখেছি কি তার প্রাণ?

অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরে সাজাহান।

মিতা। আজ বড়ো তোমার কথা মনে হচ্ছে। মুর্শিয়ারাম বেনন ছদ্মনে সিরাজদৌলার কবরে প্রছাভলি অর্পণ করেছিলেন, তেমনি এই দুই প্রণয়ী যারা আজও হুটি কবরে পাশপাশি শুয়ে করছে তাদের প্রেমোপার্জন যুগ যুগ ধরে, তাদের কর্তব্য আমাদের প্রাণ-নিবেদন।

মিতা, অনেক বলে এই তাজমহল নাকি মমতাজের মৃত্যুর পর হয়নি। হয়েছিলো তাঁর জীবিতাবস্থায়। তবে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে

শেষ হয়নি। সাজাহানের ছিল 'রক্তমহল' মমতাজের 'তাজমহল'। কোন একটি বিশেষ দিন যখন বিশেষ বাতি জ্বলেবে রক্তমহলে তখন মমতাজ আসবে নৌকা করে যখনা অতিক্রম করে রক্তমহলে। আর যখন বিশেষ বাতি জ্বলেবে তাজমহলে তখন সাজাহান আসবে যখনা বেয়ে তাজমহলে। কিন্তু বিধাতার অভিশাপ, কল্পনা তাঁদের কল্পনাই রইলো। মিষ্টুর নিয়তি ছিনিয়ে নিলো মমতাজকে। তাই প্রেমিকার অভিসার রজনী শেষ হলো। রচিত হলো বাসরশয্যা কবরের কঠিন মাটিতে তাজমহলের বুকে। মিতা! তবু তারা সুখী—

একজন আগে গিয়ে অপেক্ষা করছে আর একজনের জন্তে তারপর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পেরেছে তবু দয়িতকে।

দীর্ঘদিন আদ্যোধ্য যে বিরহ-বনুনার সৃষ্টি হয়েছে কবে তা পার হোয়ে তোমার দেখা পাব? মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে, আর বেশি দেবী করব না। এবার কিছু গ্রাম ঘুরে মাসখানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরব। এর মধ্যে চিঠি নাও পেতে পার, লক্ষ্যটি রাগ করো না। আমার যাওয়ার দিন আমাদের বাড়ী তোমার থাকা চাই। ইতি তোমারই অসীম।

চিঠিটা পেয়ে খুশিতে ভরে যায় সুমিতার মন। অসীম আগ্রা গেছে, দেখেছে তাজমহল। তারও বড় তাজমহল দেখার সখ। ঠিক আছে বিয়ের পর তারা যাবে। সে শুনেছে তাজমহল দেখতে যায় 'কৌক-মিথুন'। ভাবতেই লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে যায়। চিঠিটাকে বার বার পড়ে। ইঠাৎ অসীমের বোন জননীর গলা পাওয়া যায়—

বৌদি ভাই! ও বৌদি ভাই—

ছুটে যায় সুমিতা—এই নন্দা কি করছিস?

—কেন কি করেছি?

—তুই বৌদি ভাই বৌদি ভাই বলে চেঁচামিচি করছিস কেন?

মা শুনেছে কি ভাববেন বল তো?

—ও মা, এতে আবার ভাববার কি আছে! কাল যা হবে আশ' তা বলছি, আর তা ছাড়া ত মাসিমা জানেনই।

—জানলেই বা।

আচ্ছা বাবা, অজ্ঞায় হয়েছে। এবার থেকে মিতাদি' বলবো। বাক দাদার চিঠি পেয়েছে? অবশ্য এ'জিজ্ঞাসা করা অজ্ঞায়, তবু করছি। মিতা চিঠিটা দেখায়।

—ও বাবা! তোমার চিঠিটা কত বড় আমারটা মাত্র এক পৃষ্ঠা, পঁড়াও না কেনম বগড়া করি গুর সঙ্গে।

সুমিতা বলে থাক, আসলে ত বগড়া করবি আপাততঃ, একটু চুপ কর। আর চা খাবি আর।

কানপুর এসেছে অসীম আর তার বন্ধুরা। আশ্রয় নিয়েছে এক বাঙ্গালী পরিবারে। অত্যন্ত যত্ন তারা একে একে আপন করে নিয়েছে। অসীমের অপূর্ণ দুই বছর কয়েক দিন পর তাদের আত্মীয়ের বাড়ী চলে গেছে। অসীমকে বাধ্য হয়ে এখানেই থাকতে হলো।

প্রতিদিন অসীম তোরে উঠে ক্যামেরা হাতে স্ট্রিট বেরিয়ে পড়ে, দুপুর বোদে পড়ে তবে ফিরে আসে। কানপুরে বড় বড় ধান-একডর

যা দিয়ে যখন সে আসে মনে ভাবে, বিয়ের পর 'সে' আর 'মিতা' নামে। খেলবে লুকাচুদি ধানক্ষেতের মধ্যে।

অসীম অবাক হয়ে যায়, প্রতিদিন তার ঘর কে যেন গুছিয়ে রেখে যায়। ময়লা, জামা-কাপড় পরদিন খোঁয়া অবস্থায় ভাঁজকরা থাকে টেবিলে। যাক, সে নিয়ে মাথা বাঁমাঝার খুব বেশী অবসর থাকে না অসীমের। বাড়ীর কর্তা, গিন্নী, অত্যন্ত ভাল। আপন লোকের মতো যত্ন করে তাকে।

অসীমের কানপুর দেখা হয়ে গেছে, এবার বাড়ী যাবার জন্ত হস্তির হয়ে ওঠে। আরোজন করে যাত্রার। বাড়ীর কর্তা বলেন— বাবা, আমার একটি মেয়ে আছে বোধ হয় জান। সামনের এই তারিখে তার বিয়ে। এই দিনটি তোমার থেকে বেতে হবে। প্রক বোধ হয় তুমি দেখনি বড় লাছুক, তবে ও তোমায় বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে।

অসীম বলে, তাই বুঝি? আমি ত আপনার মেয়ে আছে জানতাম না!

জানবেই বা কি করে, বাইরে বাইরেই ত থাক চকিষ ছটা—যাক লীলা একিকে আয় তো মা!

অসীম ভাবে এই তবে তার ঘর গুছায়, পরে বলে—আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ না খেয়ে কিন্তু যাচ্ছি না, লজ্জায় লীলা পালিয়ে যার বাবার সামনে থেকে।

বিয়ের দিন, রাত্রিবেলা বর বিয়ে করতে বসেছে, হঠাৎ একটা গগুণাল শোনা গেলো। বরপক্ষ বর তুলে নিয়ে যাবে, এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। কারণ অহুসন্ধানের পূর্বেই বর পক্ষ বর নিয়ে চলে গেলো। শোনা গেল ছেলে পক্ষ মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান আর তার জন্ত অসীমই দায়ী। অবাক হয়ে যান মেয়ের বাবা ছুপন বাবু। ছিঃ ছিঃ অমন দেবতুল্য চরিত্রের ছেলের নামে এ অপবাদ! কি বলবেন তিনি অসীমকে, অসীম তো চলেই যেত শুধু তাঁর অমুরোধ রক্ষা করে এই কলঙ্কের সম্মুখীন হতে হলো। মাথার হাত দিয়ে বসলেন ছুপন বাবু। স্ত্রী এসে মিনতি করে বলেন, ওগো তুমি একবার অসীমের হাতে-পায়ে ধরে মিনতি করো ও ছাড়া কে রক্ষা করবে আমাদের। মান-সন্মান সবই যার, ওগো ফলধর সবই যার। যাও তুমি একবার।

এরই মধ্যে সব ঘটনা গিয়ে পৌঁছেছে অসীমের কানে। শুদ্ধ হয়ে বসে থাকে সে। ছিঃ ছিঃ একি কথা, এমন এদের অবস্থা! আর এ কথা মনে করতাই যার কথা মনে হয় সে একটি শাস্ত স্ত্রণর লাছুক মেয়ে। হায় রে! এই মেয়েরও ভাগ্যবিড়ম্বনা। ভাবতে থাকে অসীম, ঘরমর ঘুরে আর অস্থির ভাবে পারাচারি করে।

হঠাৎ ছুপন বাবু হস্তবস্ত হয়ে অসীমের ঘরে ঢুক কেঁদে ফেল। বাবা অসীম, তুমি বাঁচাও আমাদের, নইলে আমার মান সন্ধান সব যায়। শব্দ হাসছে, তুমি আমাদের স্রজাতি আর লীলা আমার দেখতে খারাপ নয় বাবা, ধর রাখো। আমি এখনি তোমায় বাঁচাতে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। আমারই সব অপরাধ আমি স্বীকার করব।

—না না, একি কি বলছেন আপনি, এ কি করে সম্ভব হবে?

বাবা তোমার পায়ে ধখছি, তোমরা যুবক ছেলে, তোমরা না বাঁচালে আমাদের উপায় কি বাবা? তুমি যদি স্বামী না হও আমি

একুশি মেয়েকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হবো। তবু আমি শত্রুর মুখ হাসাব না, কুল রাখব।

• নিরুপায় অসীম, সবায় উপরে একখানি মুখ বার বার মনে হয়, যে এখনও তার অপেক্ষার দিন গুণছে, সে হোলো স্মৃতি। তাই হঠাৎ নিরুপায়ের মতো বলে উঠে, না না, ব্যাপার হয়েছে কি আমি বিবাহিত।

বিবাহিত! হুহুতেরে জন্ত ধমকে যান ছুপন বাবু। পরে অসহায়ের মতো বলে ওঠে বাবা, তাতে কি হয়েছে তোমার স্ত্রীর ত দাসীর প্রয়োজন—লীলাকে তার দাসী করে নাও বাবা। তুমি যদি না নিতে চাও তবে শুধু একটু শাস্ত্রমতে সিঁদুর দিয়ে দাও। তারপর আমরাই রাখবো। এটুকু দয়া আমার করো বাবা, ১১টাই শেষ লগ্ন, এর পর আর ওর বিয়ে হবে না। আর বেশী সময় নেই।

অসীম ভাবে—মিতা, আমার তুমি কথা করো, আমি নিরুপায়। তার পরে বলে, ঠিক আছে, আপনারা বিয়ের আরোজন করুন।

বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু হলো না কোনো আনন্দোৎসব। যেন বিরাট একটা অমঙ্গল কোন রকমে নির্বিঘ্নে কাটান হলো।

খবর পৌঁছাল বাড়ীতে। আশ্চর্য হয়ে গেলো সবাই, এ কি! মা বড় আশা করেছিলেন যে স্মৃতি হাবে এ-বাড়ীর বহ্নমাতা। সব আরোজনই সম্পূর্ণ, শুধু মাত্র অসীমের কথার অপেক্ষা, কি বলবেন তিনি স্মৃতির মাকে?

খবর পেয়ে অসীমের বাবা চলে যান কানপুর, বউ দেখে তার বেশ পছন্দই হয়। তাছাড়া ছুপন বাবু দিয়েছেন অনেক। তাতেই তাঁর তৃপ্তি। ছেলেমেয়ের মনের খবর তিনি রাখেন না বা তাঁর মূল্যও তিনি দিতে চান না। তাই বাড়ীতে খবর সেন বোভান্তের সব বন্দোবস্ত করতে। তিনি হু'এক দিনের মধ্যেই ছেলে-বো নিয়ে বাড়ী ফিরছেন। সুনন্দা স্মৃতিদের বাড়ী যায় অপরাধীর মতো, কি বলবে সে মিতাদিকে। দেখে খাটের বাজু ধরে চুপচাপ ঝাঁড়িয়ে আছে মিতা। সুনন্দাকে দেখে মিতা বিছানার উপর পড়ে ফুল ফুলে কঁদতে থাকে। কি দেখে সান্দনা তাকে, সুনন্দা নিজেই কঁদতে থাকে। আসেন স্মৃতির মা, স্ত্রী সৌম্য একটি লেবী-মুষ্টি। যেন আরো বেশী মাত্রায় শাস্ত হয়েছেন। সুনন্দা কিছু বলতে পারে না। তিনিও কিছু বলেন না, এসে কিছুক্ষণ ঝাঁড়িয়ে নীরবে আবার চলে যান।

এসে গেছে অসীম আর লীলা। বাড়ীতে ফুলসজ্জার আরোজনের কোন ক্রটি নেই। অসীম বার বার বায়ন করেছে এসব আয়োজন করতে কিন্তু তার বাবা ললিত বাবু তার কথা রাখেন নি। স্ত্রী যখন বলতে এসেছে তিনি বলছেন, কেন? এটা কি আমার শ্রান্ত না কি যে চুপ করে কাজ সারতে হবে? আমার একটি ছেলের বোভান্ত, আর তাছাড়া আমার মান জাত কুল সবই বজায় আছে। প্রকাশ করার মতো সম্বন্ধ হয়েছে আনন্দ করব না কেন? ছ'দিন আগে থেকে সানাই আসবে। তোমার অন্ত্রবিধা হলো অস্ত্র বাড়ী গিয়ে কল ধেকো।

কি বলবেন অসীমের মা, চুপ করেই থাকেন। স্বানন্দদের ফুলসজ্জার দিন এসে পড়ে। সকাল থেকে লোকজনের আগমন বিরাম নেই। কিন্তু সুনন্দার যন অস্থির হয়ে উঠেছে। রাতক গিয়ে বলে—মা মিতাদি আসবে না মা? বা বলেন কি করে আনবে মা সে? আর আমিই বা কোন-রূপে তাকে আনতে বলবো?

হঠাৎ কার গলার স্বর শুনে চমকে বার মা, মেয়ে—নন্দা এই নন্দা কোথায় গেলি বলতো, তোর কি কাজের দিনেও ঘুম কমালে চলে না—আর এই ত আমি ভাবছি কোথায় বসে বসে ঘুমাচ্ছি—
আয় আর, এখনও বৌদিকে সাজাও নি, সন্ধ্যা হয়ে গেলো, লোকজন আসতে শুরু হয়েছে। তোর বুদ্ধি কোন জগে হবে না। আর মাসিমাও বেশ ওর সঙ্গে এখনও পাড়িয়ে কথা বলছেন। কি বলবেন না অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। কি অপূর্বই না লাগছে আজ মিতাকে। বড় স্নন্দর লাগছে মিতাকে—
বেন যেতবন্য সারস্বতী পরেছে একখানা শাদা বেনারসী। গারে শাদা ব্লাউজ, গলার সাদা মুক্তার মালা হাতে সাদা রজনীগন্ধার চুড়ি, বৌশার রজনীগন্ধার মালা, কপালে খেত চন্দনের টিপ। শুধু মাত্র একটি রক্তগোলাপ বুকে। স্নন্দা বুঝতে পারেন না তার সাজের অর্থ। স্নন্দা জানে মিতাদি'র কোন কাজই অর্থহীন নয়। অবাক হয়ে বলে মিতাদি'র অর্থ?

—কিসের?

—তোমার সাজের?

কিছু না, শোন, বাইরে আমাদের চাকরের হাতে বা আছে নিয়ে আর বৌদিকে সাজাব। সাজার মিতা বৌদিকে লাল বেনারসী লাল ব্লাউজ, বৌশার রক্তগোলাপের মালা, কপালে শিখর, পায়ে আলতা। পরায় চন্দন অশুর্ভ ভঙ্গিতে। বেন আপন মনের সমস্তটুকু রস নিয়ে রঞ্জিত করেছে সে লীলাকে।

নন্দা বা না ভাই, অসীমকে সাজিয়ে দে। বাড়ীতে লোকজন আসবে, বর সে, তাকেও একটু সাজাতে হবে। যদি না সাজতে চায় বলিস মিতা বলছে। আমি বাই ওদের খাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসি। চুই বৌদিকে একটু পরে নিয়ে আসিস।

মিতা কর-কনের খাট ফুলে স্নন্দর করে সাজিয়েছে। খাটের দু' পাশে শিরের দু' পাশে দিয়েছে তার নিজের হাতে গড়া দু'টি মাটির প্রাণী, নিজের হাতে আঁকা একখানা হরপার্বতীর মিলন মূর্তি তার ফুলার দেখা রয়েছে তোমাদের শুভমিলনের দিনে মহামিলনের প্রতীক। আর বড় একটা ফুলদানিতে এক ঝাড় রক্তগোলাপ। বে এসেছে বৌ এক ফুল-সজ্জার ঘর দেখে সকলেই প্রশংসা করে গেছে। সত্যি যে সাজিয়েছে সাজাবার ক্ষমতা আছে। শিল্পজন্মোচিত দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

হাত্ত একে একে সব অতিথি চলে গেছে, আত্মীয়-স্বজন বারা আছে তারা বৌকে নিয়ে খেতে গেছে—কেউ নেই ঘরে। আন্তে আন্তে ঘরে ঢোকে মিতা। দেখে অসীম চোখ বুজে শুয়ে আছে, বুঝে একটা স্নান অবসাদের ভাব। স্নমিতা ভাবে ঘুমিয়েছে অসীম। তাই শেখবাবের মতো চুপি চুপি তাকিয়ে থাকে ঐ ঘুমন্ত বুকের দিকে, তারপর? তারপর আন্তে আন্তে চোবের মত বেরিয়ে আসার সময় জেগে বার অসীম, ডাকে—মিতা—। পাড়িয়ে পড়ে স্নমিতা, এই ডাককে উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই স্নমিতার।

এসিয়ে আসে অসীম, মিতা তুমি তো জানো যে আমি নিরুপায়। আমার পার তো কমা করে কিছু মিতা, সবইতো তুমি একজনকে দিয়ে গেলো, আমার—আমার কি দিলে মিতা। আমি কি নিয়ে থাকবো? স্নমিতা কিছু না বলে আন্তে আন্তে বুক থেকে রক্তগোলাপটা খুলে দেয় অসীমকে।

—আমার বেটুকু ছিল সবটুকু দিয়ে বাকে দাঁড়িয়ে দিয়ে সেলাম

দেখো তার বেন কোন অনাগর না হয়। বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে য়র থেকে। না খেয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে বার বাড়ী।

পরের বছর। আজ-কাল কেমন যেন হয়ে গেছে স্নমিতা, সময় একটা অন্তরনয় ভাব। দশ বার ডাকলে একবার উঠ দেয়। একটুতে বেগে যায়। আজ কাল তারা আমার বাড়ী কাছে এসে বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকে। নিজেকে বড়ী ভা দিয়ে দিয়েছে। কারণ তাদের নিজস্বের বাড়ী অসীমের বাড়ী পাশে। সেদিনটা ছিল অসীমের ফুলসজ্জার দিন। গত বছর এমন দিনে অসীমের ফুলসজ্জা হয়েছিল। স্নমিতা মাকে ক অভ্যস্ত ফুল আনিয়ছে। আনিয়ছে রক্তগোলাপ, আনিয়ছে দু' বড়ো বড় খুঁইয়ের মালা। স্নন্দর করে সাজিয়েছে তার শোনা খাট। যেমন করে সাজিয়েছিল অসীমের ফুলসজ্জার দিন, তারপ সজেছে নিজে তেমনি করে। আজ কিন্তু সাদা নয় আজ সব লাল যেমন সাজিয়েছিল সেদিন লীলাকে।

বেখেছে অসীমের দেওয়া অসীমের ফটোটা বিছানার উপর পরিয়েছে তাকে মালা। সাজিয়েছে তাকে চন্দন দিয়ে। মা ঘা চুকে এই ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে যায়। দেখেন স্নমিতা অসীম ফটোটাকে মালা পরিয়েছে, পরেছে নিজে মালা। তারপর বুকে অভ্যস্ত কাছে নিয়ে বলছে—

তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার বৌকে হিসে করবো। দেখে ত এতটুকুও হিসে করিনি। নিজেকে রিক্ত করে সমস্তটুকু রক্ত নিয়ে রাখিয়েছি আমার প্রতিবন্দীকে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না! কি আজ আমি রিক্ত নর আজ আমি পূর্ণ। দেখছো তাই আজ আমি লাল। আমি যাচ্ছি আমার মহলে মমতাজের মতো। আমিও অপেক্ষা করবো। তোমার কাজ সেরে যেদিন আসবে সেদিনের জন্ত। তখন আর কেউ থাকবে না থাকবে না কোন প্রতিবন্দী। শুধু তুমি আর আমি। বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। তার ফটোটাকে বুকের অভ্যস্ত কাছে নিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মা এই অবস্থা দেখে চোখে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর মিতার কোন সাদা না পেয়ে মা মেয়ে সার এসে দেখেন খাটের উপর ফুলের উপর চলে পড়েছে বেন কুসুম-কণা আর বিড় বিড় করে বলছে—

আমার সকল কাঁটা ধস্ত করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।

আমার সকল ব্যথা রক্তন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

কিন্তু মুখের অবস্থাটা বেন কেমন। পায়ের কাছে খাটের উপর নিজে পড়ে আছে অসীমের ফটোটা টুকরো টুকরো অবস্থায়। এগিয়ে আসেন মা—হঠাৎ দেখেন মিতার হাতে তার আক্ষিমের কোঁটা। তিনি তাঁর বাতের জন্ত প্রতি সন্ধ্যার একটু একটু আক্ষিম বান, সেই আক্ষিমের কোঁটা খালি।

চাঁকর করে উঠেন মিতার মা—মিঠু—মা, আমার কি সর্কান করলি তুই, ওরে, এই জন্ত তোর এত সাজ। আমি একটু বুখি। কি করলি মা—

মহলে রান্না অভিসারিণী মিতা ভজিত কীণ কণ্ঠ বলে, মা—বা অন্ত চোঁমেটি করছ কেন, কাল সারা রাত বাসর জেগেছি, আজ একটু ঘুতে দাও।



ছুটি রীনা মিত্র

এখন সময় আর আমার মাঝখানে
দুস্তর মরুর ব্যবধান।
ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে,
ঘটীর সব বন্ধারে,
হরিণ-পায়ে ছোটাবে না আমার।
মিলের আকাশ-হোঁয়া নলের পাশে,
রক্তরাঙা সূর্য্যের প্রকাশে,
সময় বললে—‘পাঁচটা দশ’।
তাকে জগতের সবাই ধারে
পাঠিয়ে দিয়ে,
পরম নিশ্চিন্ততার কুহেলী-ঘেরা স্বপ্নটাকে
আবার জড়িয়ে ধরলুম।

এখন আকাশ-জোড়া ছুটির রবে
নীল রঙে ভরা দিনগুলি।
বাতাসও বেশ মধুর,
মা'র কোলের কাছে ঘন হয়ে বসা
নিশ্চিন্ততার মতো।

এখন সময় নেই, ‘গ্রামার’ নেই,
ছুলের টেবিলের সবুজ খাতাটা নেই,
এখন সময় আর আমার মাঝখানে
দুস্তর মরুর ব্যবধান।
ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে,
ঘটীর সব বন্ধারে,
হরিণ-পায়ে ছোটাবে না আমার।

মৃত্যুর পরে বিশাখা ঘোষ-রায়

আমাকে ক'র না দাছ, বন্ধ বেথো না কবনের আধারে।
উলান আকাশ-ছায়ার, মৃত্তিকার কণায় কণায়,
আমার দেহের প্রতি জুড়ে জুড়ে—মিশিয়ে দাও।
সেনাটাকের প্রয়োজন মিটে গেছে;
(কারণ গুটা লোকদেখানো আর জমির অপচর মাত্র)।
তুমু একটি ফুলের গাঁছ, পুরোনো বিশ্বাসী ভূত্যের মত,
উলার সাথে সাথে অজস্র ফুল ঝরিয়ে দেবে
আমার সমাধির ওপর।
আর কবরের মাটিতে, চির-নিদ্রায় শায়িত থেকেও
আমি দেখব, ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রণয়লীলা।
এবং শতবর্ষ পরে
তখনকার সেই কৃষকের মুখে কলহান্ত কুটে উঠবে।
জমিতে প্রচুর লাভ;
দুতলোহের শায়।

একফালি রোদুর্ ব্রজা গুপ্তা

একফালি কাঁচা রোদুর্
আবির মাঝিয়ে দিলে কত গুল মনে।
ছোট একফালি রোদুর্,
ও-বাড়ীর কাশিণি বেঁসে যে এসেছিল
এ-বাড়ীর ছোট উঠানে।
সে এনেছিল মিনের খবর, আর—
জীবনের একটুকু হাসি।
সে এনেছিল এ-বাড়ীর খোঁরা অন্ধকারের রাজ্যে
আনন্দে-ভরা ফুল এক রাশি।
তাই—এ-বাড়ীর ছেলের মাঝে,
কাঁড়াকাড়ি পড়ে গেল মহা ধুমধামে।
তার পর ছোট রোদুর্ চলে গেল হঠাৎই,
বেঁকে গেল ও-বাড়ীর খামে।

অব্যক্ত প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

এ মনের প্রান্তদেশে জুড়ে
ভুধু এক নিসৌম রিক্ততা জাগে।
আকাশ উজাড় করে বখন অবিশ্রান্ত ঝুট ঝরে,
ছায়ের শঙ্কহীন কালার মতো।
অস্তরের পৃষ্ঠীভূত ব্যথার সঙ্কল্প রাগিণী বাজে,
বখন প্রভাতের আবছা কুয়াশা-ঘেরা মাঠে
বাসে আসে বিনু বিনু শিশিরের ‘পরে’;
ভোরের প্রথম আলো চিক্-চিক্ করে
গোপন অঙ্গুর বেদনাবিহীন প্রকাশের মতো।
ছায়ের অতলান্ত দেশে সগ
খেলা শেষের চির-বিদায়ের ধনি গুঠে,
বখন ছায়ামান গোঁধুরি নামে পৃথিবীর ‘পরে’,
অন্ধকার রাত্রি আসে আকাশের পটে ক্রত পদসঞ্চারে;
বর্ণহীন, রক্তহীন, হিমনীল মৃত্যুর মতো।

দিন-রাত্রির কাব্য সত্ত্বমিত্রা রায়

কবির কথা আর বেদনার, ওমরে মরে দুঃখের কাব্যখানি
হাসি-কালার মাঝে বিজ্ঞপের কুটিল অকুটি।
জীবনের বাকী কটা দিন বিদায়ের শেষও জানায়,
এ জীবন ‘স্বকুড়েই জানি।
তবু হাসি রান হয়ে অন্নান কিছু কাটি ছাঁটি সাধনা সেখার
আমার মাছের বত কথা জান, সুখ ও শান্তির বত বাগী
এ সবেই অচেনা রাগিণী অজানার বেড়ালালে দুঃখের সেই কাব্যখানি,
বাস্তবতা রূপ অতি যন্ত্রণাদায়ক।
জীবন-সংগ্রাম করি পেটে জ্বলে কঠোর যন্ত্রণা
লজ্জা পেয়ে কাব্য মানি আরজিম মুখটি লুকার,
কবি লিখেছে তবু সে কাব্যের সেই কি নায়ক?

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

ব্যাংক ব্যালান্স দশ লক্ষ টাকা আর এই লালকুঠি ছাড়া কলকাতায় আরো দুখানি বাড়ী এই হোল তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি। শাস্ত্র মুহুর্তে বলছিলেন সোমনাথ হুমিতাকে—আজ তার একটা সুব্যবস্থা করবার জন্ত আমি এসেছি। হলে আপেক্ষা করছেন কয়েকজন সাক্ষী এ্যাটর্নি আর রেজিস্ট্রার—একটু হেসে আবার বললেন তিনি—তুমিই এ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এর জন্ত কোনো উইল বা লানপত্রের প্রয়োজন নেই। তবে আমি বেঁচে থাকাকালীন সেটার পূর্ণ অধিকার তোমরা পেতে পারো না, সে জন্ত আমাকে আইনতঃ তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তবে—নীরব হলেন তিনি।

—তবে কি বাবা? মুহুর্তে শুধালো হুমিতা।

কম্বলের ওপর পদ্মাসনে বসে চোখ বুঁজে কি যেন চিন্তা করছিলেন সোমনাথ। কপালে ফুটেছে কয়েকটি রেখা, চাপা বেদনার দ্বন্দ্ব দ্বারা যেন আজ উঁকি মারছে তাঁর প্রশান্ত সোম্য বদনে। কস্তার প্রস্থের জবাব দিলেন না তিনি, কোন গভীর সমস্তার নিবিড় অরণ্যে যেন পথ অন্বেষণ করছেন।

লাইব্রেরীকক্ষে তখন আর কারুর প্রবেশ নিবিদ্ধ ছিলো।

কয়েক মিনিট পরে চোখ খুললেন সোমনাথ। চাইলেন কস্তার দিকে। কোন অসৌকর্য্য দিয়া বিভা ঝলমল করছে ওঁর দুটি চোখে, তার তীব্রজ্বলি সহিতে পাখা ঘায় না।

—মিছু!

চমকে উঠলো হুমিতা পিঠার ডাক শুনে।

ও কণ্ঠস্বর যেন এ পৃথিবীর নয়, কোন দূর-দূরান্তের দিব্যলোক থেকে ভেসে আসছে ও ডাক।

অত্যন্ত কুণ্ডার সঙ্গে কণ্ঠে বললো সে আমার,—আমায় কিছু বলবেন বাবা?

না। গুরুঁর মত সুগভীর কণ্ঠে বললেন সোমনাথ। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে—নিসংকোচে বলতে পারো। কথার শেষে কস্তার আধার হাত রেখে নীরবে আশীর্বাদ করলেন যেন।

—বাবা! কেঁপে উঠছে হুমিতার গলার স্বর।

—বলো মা! সজোরে কোরো না।

বাবা! এ সম্পত্তির দুর্ভিক্ষ বোঝাটা আমার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। আমি এ বোঝা বহিতে পারবো না বাবা! আগনি কোনো সংকাজে এসব লান করে দিয়ে এর সম্ভাব্য করুন বাবা! ও আর—কথা খামিয়ে মাটির দিকে চোখ নামালো হুমিতা।

বলে বাও, থেকো না!

দামীরাকে সর্ব্বথ্য ঠাকি দিয়েছেন ওঁর কাকা। যাবনা, বাড়ী কিছু নাকি ভাড়া নেই বাবা! কাদার ভাবে কেঁপে উঠলো হুমিতার

কণ্ঠস্বর। হুঁচোখে আঁচল চেপে ধরে বাঁধভাঙা অজ্ঞবন্তাকে মোহন করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো হুমিতা।

সব জানি মিছু! পূর্ব মেহন্ডের ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে কান্নে লাগলেন সোমনাথ। আমার মা-ঠাকুমার পবিত্র রক্তধারার সম্মান তুমি আজ রক্ষা করেছে। মহা পরীকার উত্তীর্ণা হলে আজ তুমি। সামনের অন্ধকার দেখে-ভর শেরো না মা! এর পরে আছে অন্য জীবন, অনির্ব্বাণ আলো। সে আলোর পথে চলবার অধিকার লাভ আজ করেছে তুমি।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁর দুটি পায়ে ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলো হুমিতা।

ওকে হুঁহাতে তুলে ধরে প্রগাঢ় মেহে নিজের বুকে টেনে নিয়ে ওঁর মাথার ওপর হাত রেখে অর্ধনিম্নীলিত নেত্রে অশ্রুটস্বরে কি আশীর্বাদবাণী উচ্চারণ করলেন সোমনাথ। কোন এক ঐশ্বরিক মনশ্রুতি দিব্যচেতন যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে হুমিতার সঙ্কটিত অন্তরে। জাগতিক সত্তা ভূবে বাজে মহাতাবাগরের অন্তর গভীরে।

হুমিতার সর্বাঙ্গে জেগেছে এক পুলক-কম্পন, সে কম্পনে আছে কি এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ! হৃদয়নে ঝরছে দরদর ধারার আনন্দাঞ্জন।

কেটে গেলো কয়েকটি হৃৎস্পন্দ মুহুর্ত।

কস্তাকে সঙ্গে করে হলঘরে এলেন সোমনাথ। একটু পৃথকভাবে বসলেন কথলাগনে।

আর সকাল বসেছিলেন সোফায়, চেয়ারে।

—সোমনাথকে নীচে বসতে দেখে সকলে উঠে দাঁড়ালেন সমস্তে।

আপনারা এখানেই বহুন,—এক কাজের সূত্র করুন, বললেন সোমনাথ।

অসীমও উপস্থিত ছিলো সেখানে, তির্যক দৃষ্টিতে চাইলো হুমিতার দিকে। ক্রোধ আর বিরক্তিতে থমথম করছে ওঁর মুখখানা।

অপমানের জ্বালায় সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। ওকে বাধ দিয়ে মেয়েকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করার মানে হচ্ছে সকলকার সামনে ওকে অপদস্থ করা। আজ্ঞা, এর প্রতিশোধ কি ভাবে দিতে হয়, সেটাও দেখবে আজকের দর্শকরা। আগে সম্পত্তিটা হাতে আনুক।

করবী আর অনিলও বসেছিলো সেখানে সোমনাথের আদেশ। মায়া দেবী আনাগোনা করছিলেন, আগজ্ঞকদের চা-জলখাবার ঠিকমত দেওয়া হল কি না তার তদারক্য ব্যস্ত হয়ে যোরাধুরি করছেন।

—এলার লিখুন আপনারা—বল্লভচন্দ্রীর স্বরে আদেশ করলেন সোমনাথ।

—আমি প্রস্তুত। জবাব দিলেন অ্যাটর্নি।

—আমার এত নথ্যের ওস্তাদ বাগিগঞ্জের পৈত্রিক বসতবাড়ী লালকুঠি ও এক লক্ষ নগদ টাকা আমি দান করলাম আমার কস্তা হুমিতা হালদারকে।

অ্যাটর্নি বিব্রতভাবে একবার চাইলেন সোমনাথের দিকে আর আড়চোখে দেখলেন অসীমের মুখখানা, তারপর লিখতে শুরু করলেন।

—করেছে? এবারে লিখুন—আমার অর্ধেক নথ্য এলগিন রোডের বাড়ী ও নগদ এক লক্ষ টাকা আমি দান করলাম—আমার স্বর্গীয় বন্ধু মহিম হালদারের একমাত্র পুত্র জীবান হুমায় হালদারকে।

জু-জু মেঘ গর্জনের সাথে সাথে, বাশি রাশি আঙনের সাপ বিলম্বিলে উঠলো আকাশে, বরষার সকলে একবার মড়ে চড়ে বসলো। পরম্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়া করলো। অসীমের দুই তখন খন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিবন্ধ। হৃৎ করে বইছে এসোমেসো কোড়া হাওয়া, জ্বালাপ মাস। শীতের স্রবতেই চঠাৎ এমন ঝড়-বুড়ি জালিয়ে মারলে, তাই বোধ কর ততো খাওয়ার বিকৃতি ওর চোখে-মুখে স্থপাট।

—২। লিখন, বললেন সোমনাথ—আমার এক নম্বরের খিয়েটার বোডের বাড়ী আর সাত লক্ষ টাকা আমি দান করলাম একটি হাসপাতালের জন্য। এই হাসপাতালে আমার দেশের দুঃস্থ জনগণের চিকিৎসা ও সেবা হবে বিনা পয়সায়। আর এই হাসপাতাল গঠন ও চর্চাব্যয়নের ভার দিলাম জিন্নাম খুসাম হালদারের ওপর। বাকি এক লক্ষ টাকার ভেতর থেকে আমি কুড়ি হাজার টাকা দান করলাম আমার কনিষ্ঠা জালিকা জিন্নমতী করবী চ্যাটার্জিকে। দশ হাজার টাকা দিলাম আমাদের বৃদ্ধ মাসী রামভরন সিকে, আর হুড়ি হাজার টাকা দিলাম বৃন্দাবনে জীওর গোপী মহারাজের বোগাঙ্গমে।

বাকী পঞ্চাশ হাজার ব্যাঙ্ক থাকবে আমার নামে, আমার মৃত্যুর পর ঐ টাকা বোগাঙ্গকে দেওয়া হবে।

নীচ হলেন সোমনাথ। বাইরে তখন প্রবল বেগে বর্ষা শুরু

হয়েছে। দুবড় বাতাসের ঝাপটা লেগে চলে উঠছে দেওয়ালে বিলম্বিত ধীর্ঘাচার অরল শোড়ি ছবিগুলো। মনে হচ্ছে যেন পূর্ণ-পুরুষের ছবিগুলোই মাঝে অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটছে, তারা মল বেধে দেখতে এসেছেন সুযোগ্য বংশধরের কীর্তিকাশ। অভিশপ্ত সম্পত্তির সার্বভার বিপুল আনন্দোজাস ভাবে চলে উঠছেন ওরা। ওদের প্রতিভাশীল নরন থেকে করে পড়ছে নীরব আশীর্বাদ। শান্ত দুই মেসে, ছবিগুলোর দিকে চেয়েছিলো সুমিতা। দিবা প্রকাশিত শান্ত আলোর ফলমণ করছিলো ওর ককল মুখখানি।

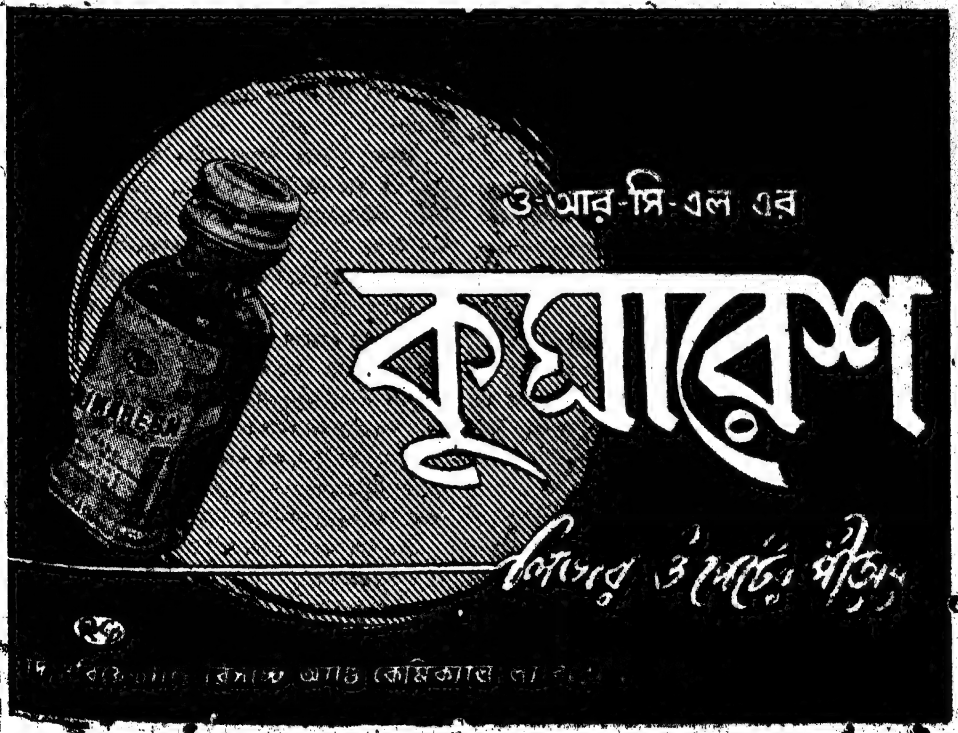
অনতিদূরে কোথায় কড়কড় শব্দে বাজ পড়লো, খব-খব করে কেঁপে উঠলো লাসকুটি। চারিদিক থেকে শীথ বাজতে লাগলো, সহ্যের লীলা সংবরণ করার মিনতি জানিয়ে।

—আমার কিছু বলবার আছে।

চমকে উঠলো সুমিতা। অসীমের কঠোর বেন বঙ্গভঙ্গের আওয়ার।

—ওর দিকে চোখ ফেরালেন সোমনাথ, বীর কণ্ঠ বললেন, বসো।

—আপনার কথা মানে আমার স্ত্রী সুমিতাকে বেঁচে রাখ করতে চাইছেন, সেটা ওর প্রয়োজন হবে না, বরং ওটা আপনাকে আজম-টাঙ্গমে দান করলে বাইরে আপনার পুনাম হবে।



উ-আর-সি-এল এর

কুশারেশ

লিঙ্গের উদ্দেশ্যে পীড়িত

১০ বর্ষের জন্য বিশেষ আওত কোমিকাতা

এক ঠেতী করে পেতেই গাছের কাছ, কিন্তু সে কাছ গাছ কোনোদিন
তোপ করে না, সমর হলোই কল জল ঢলে বার যেমন তার জননীর কাছ
থেকে, মাহুকের কাছেরে ভাই হয়, পুত্রের বহুতই এই। মাতা, শিলা,
পুত্র, কন্যা, সবাইই প্রয়োজন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, তারপর
কালের স্রোতে কে কোথায় হারিয়ে যায়, তার জন্য শোক কল্প যুগ।
কিন্তু মহাকালের মহাসমুদ্রে প্রতি দুইদুই ভেসে উঠেছে অমৃত জীব-
বুদ্ব, হুতার লণ্ড লীলাধোয়ার তরঙ্গে ভেসে আবার মিশে বাচ্ছে
মহাসাগরের বৃক্ক। কিন্তু কেন এই আসা-যাওয়া? এই মহা
মিজাদার জটাই বোঝা-বঝিা কঠোর তপস্বী করেছেন। তারপর সব
কেনেছেন, পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন পঞ্চদ্বন্দ্ব মাহুকে। একটু খেমে
আবার বলছেন সোমনাথ—শোক, দুঃখ, হতাশার জর্জরিত মানব-
সন্ধানের এঁরাই গুনিয়েছেন আশার বাণী, অমৃত বাণী অমৃতের
সন্ধান তুমি, যুগ্ম তোমার নেই। ধনী, দরিদ্র, ব্রহ্মপুত্র, কুলপ, পণ্ডিত,
দুর্ভ, দুঃখী, দুঃখী, এসব তোমার কলজের খোলস মাত্র। এক মুঠো
হলো এর স্বরূপ। আসল তুমি কি? আর কে? তারই অল্পসন্ধান
করা, নিজেকে জানো, সব জানার শেষ হয়ে। অমৃত কামনার যে
কলজ খিঁচা নিভা নহন করছে তোমাকে, সাধনার অমৃতধারার বটবে
তার চিরনির্বাণ।

নীরব হলেন সোমনাথ। অসৌক্যিক জ্যোতির্পূর্ণ ছিন্ন নুড়ী তাঁর
মহাপুত্র নিবন্ধ। নির্বিশ্রি চিত্তে মারা দেবী স্তনছিলেন সোমনাথের
কথাগুলো। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—

—স্বাছা, তোমার কথা শুনে বুটী কেন জুড়িয়ে গেলো বাবা!
এমন জামের কথা আর কেউ শোনায়নি, কখনও। এখন মনে হচ্ছে
জোকটাকে বাজে খরচ করেছি বাবা। তুমি ঠিকই বলেছো, সব বাঁটি
কথা, কেউ কাকুর নয়। ভাই এখন ইচ্ছে করে এসব ছাই-ভস্ম ফেলে
গিন কতক তাঁরবাস করি ধর্ম-কর্মো করি; জানি না বাবা,
এ কপালে গুসব হবে কি না। সবকিছু কপালে হাত বিদেন তিনি।

—প্রবল ইচ্ছা থাকলে অকতই হবে। বীর কঠে জবাব দিলেন
সোমনাথ।

সব কিছু কেন আজ নতুন ঠেকছে সুমিতার কাছে। বেলায় এ
হোলন দিয়ে পাড়িয়ে সে স্তনছিলেন তবের
কথাগুলো। বিহ্বল নুড়ী সেসে দেখছিলেন,
কল পাখা গিরিকন্দর থেকে কেমন করে
হঠাৎ পড় ধারে করে পড়ছে যুদ্ধাঙ্গিনীর
বিধবার! মিতভাবী, উদাসীন, অটল
গাউন্টের বর্ষে ঢাকা শিতার যে কঠোর
কপটি একদিন লক্ষ্যকে করে সযিহে
দেখছিলেন, আজ সে ফলের এ কি
খালকা বিকর্জন! কোথায় লুকিয়েছিলো
এই ত্রেহীভাব? আর সেই কলজাবী,
একল ব্যক্তিকল্পার অভিলক্ষিকা দিগ্বা!
আজ যেন তেজকল্যাবরী বহুভাবী
মহতার বিলম্বিত।

হায়! আজ কোথায় ছিলো এ
ফলত ক? বায় জামার ওর স্তন-
কোমল পরিপূর্ণ আনন্দের আলোর

বল মেলো, কুটে উঠতে পারিনি? সজো-বহুলিকার সে গেলো
বিশীর্ণ হয়ে।

—না, না, বাবার কথাই ঠিক। যখন বা জামার, তখনই
ভাই হয়, আসেও নয়, পকেও নয়। বা তার পাওনা ছিলো ভাই
সেয়েছে সে।

খপ খপ করে ঢেকিচাটা কালো কলজটা গানে জড়িয়ে বারান্দার
এসে পাড়ালো দ্ব্যভঙ্গর দি। চাঁদের আলোর দিতাকে পাড়িয়ে
থাকতে দেখে হঠাৎ বিদম চমকে উঠে ছিন্ন হয়ে পাড়ালো। তারপর
হাতজোড় করে বললো, উদাবে কেন মারী? বাঁকলছায়া। এ যুগের
শিরমে পাড়াও ম। হা-হা করে কঁপে, উপুড় হয়ে দুই থেকে
সাঁঠায়ে প্রণাম করলো দ্ব্যভঙ্গর দি।

—অবাক সুমিতা—কুটে এসে হ-হাতে বুড়াকে তুলে বসে
বললো—একি একি! ভজনবা, কি হল জোয়ার?

সোমনাথও বিম্বিত ভাবে জেরে বইলেন ভয় দিকে।

হ-হাতে চোখ মুছে কাঁশা-কাঁশা করে বললো বুড়ী—ভীষণবী
ধরেছে দিমি ও কিছু না।

জরাজরে ঘুরেপড়া জামার কল, কোন একদিকে দিয়ে
সোমনাথের কাছে গিয়ে কল জামার লাগলো কলজের। সুমিতাও
বললো ওর পাশে, ওর পিঠে হাত বুলায়ে মেহকোমল কঠে বললেন
সোমনাথ—এতটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে কেন ভজন দি?
মিতুকে দেখে হঠাৎ অমন চমকেই বা উঠলে কেন, বলে কোলো
ব্যাপারটা কি?

—কলবা? আচ্ছা কলজা কল। কুটকুটে আলোর মনে
হল, না, না মনে হল না, এতকাল সেই কেন দেখলাম পাড়িয়ে
আছেন বহুবাণী কমলা দেবী।

সেই রক্ত কাল আসে—বাক্য তুমি এখন এতকাল এই বহু
খানেকের ছিলে, তখন সেবার রাত এখানেই পাড়িয়ে থাকতে
দেখেছি বহুবাণীকে। একদিন হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকলেন
আমার, আমি এমনি করে এসেছিলাম এইখানে। বেশ
কুটকুটে চাঁদের আলো মেখে পাড়িয়ে আসেন তিনি, আলো





রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি বধন আঁধার নতুন তৈরী করা
ত্রুট্টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছলিত
হয়ে উঠলো। ত্রুট্টাও আমি অনেক
বয়স করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধবধবে
জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড়
দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে
মুন্নি আঁধার সামনে গেলো।
যুয়ে ফিরে চারিদিক থেকে
মুন্নি তার ত্রুট্টা দেখলো তার-

পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা,

তবুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পারে।

আমি চৌকিরে জাকলাব ওকে, “মুন্নি, মুন্নি নতুন
ত্রুট্টা ফুলে ঝ—ওটা স্বপ্না হয়ে বাবে যে ওটা পরে

বিয়ের নেবুয়ে ধরবিনা?” মুন্নি ততকণে বাড়ীর থেকে
বন্ধুদের। নতুন ত্রুট্টা পরে মুন্নির দেখে বলে হলো

আঁধার যেন কোন এক পরীর মেশের রাজকন্যা, ওকে
সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল।

একবার তাফলাম ডাকি ওকে কারণ ত্রুট্টা ওকে পরতে
দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয়! কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে

জামা ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেরে
আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আঁধার খেয়ালই ছিলো।

আঁধার হাঁ ল বধন রাঁধার গলা তনুলাস দরজার সামনে। সন্ধ্যার নিয়ে আঁধার বন্ধুতো—” তার মাথা খায়াপ
১৯৮৫-১৯৮৬



রাখাকে মেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে বধন বগাট
ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজার দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আঙণ—ত্রুট্টা একদম নোংরা
করে কেলেছে—বিয়েতে বাওনার সময় পরবেই বা কি?

“ত্রুট্টার কি ছিরিই করেছে। এখন পরবে কি বিকালে”
বলে আমি ওকে হারতে বাজিলাম এখন সময় রাঁধা মুন্নির

সন্ধ্যার নিয়ে আঁধার বন্ধুতো—” তার মাথা খায়াপ



হল নাকি? ঐতুই বীচাকে মারছিল। “মুনি বীচলো আর
ক্রকট গুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।”

ক্রকট নিরে আমি কলতায় পরিকার করতে এলাম এবং
ধবন ক্রকটকে আহুড়াতে বাছি, রাখা বললো “যেহের
তলার রাগটো কি ক্রকটের ওপর ফলাবি।”

“এটা না কালো ও পরবেটা কি? অত ভাল জামা যে
আর নেই” আমি বললাম। রাখা বললো, “কিন্তু ওটা
আহুড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।”

“আমি কলার “না-আহুড়ালেই বা কালো কি করে?”

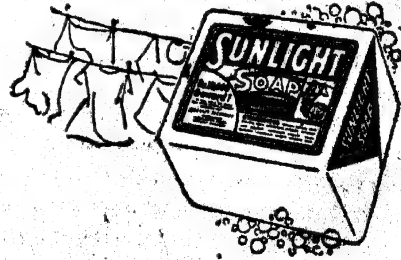
“আহুড়াবার কি রকম—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই
হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।” “কিন্তু সানলাইট

কি সত্যিই এত ভাল সাবান?” “সত্যিই সানলাইটে জামা-

কাপড় সাধা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিকট যে
এতে কাপড়ের কিছু কতি হয় না।”

“কিন্তু সানলাইটে বরুণা বেশী পড়েনা?” রাখা জে হেসেই
আছিল—“নে কিবে, জেবে তখ্ একটু ব্যবসেই সানলাইটে
এত কেনা হয় যে এক গাধা জামাকাপড় কাটা চলে আর
সময়েই সাধা ব্যবসে করে। এছাড়া গিটে আহুড়ে কাপড়ের
সর্বনাশও হয়না, নিজেও
জামেলা বাঁচে কতো—এর
পরেও তুই কলি থকো বেশী।”

তখন আমি একটা সানলাইট
সাবান আনলাম এবং কাটা
তরু করতেই ক্রকট
কেনার তুপে তরে গেলো
আর দেখতে দেখতে
সাধা ব্যবসে হলো।
সকলবেলা নতুন কাটা
ক্রকট। পরে মুমিকে
সত্যিই পরীক্ষের
গল্পের রাজকুমারীর
হাত লাগছিলো। আমি
মুমিকে কপালে কাপড়ের টীপ, পরিচয় দিলাম।



হুখবান কি হুখজরা, আমি শুধোলাম, আমার কেন ডাকলেন বহরানি !

—একবার নাচবার গিটে খবর নাও না তখন সি, কুমার সারের জেন্না আহমেদ ? কাঁধ থেকে ভার হয়েচে, কত বাধ করলুম তখনো না, নিচে চলে গেলেন, আঁচলে চোখ দুহুতে লাগলেন বহরানি ! তারপর বললেন, জত হৈ-ঠে করছে বহুবাহুবরা ককক, একটু আঙুলে ডেকে ওদের আমার নাম করে বোলো, কুমার সারেরের বেয়ার আছে, মম বেন ঠেকে কেউ না বাওয়ার ডাকারের নিষেধ আছে ।

না লক্ষ্যকে প্রায়ই দেখতাম এখানে তর দিগে হুখ নিচু করে পাড়িয়ে থাকতে, ঐ কোণ থেকে নিচের হল কারবারটা নজরে পড়ে কি না তাই । একটু থেমে, মম নিরে আবার বললো রামভজন ।

—আজ হঠাৎ মিতা দিগিকে যেন হয়েছিলো একেবারে অবিকল বহরানি ! আহা যেন আমার জনম-হুখিনী সীতামাই !

হুখী কাঁপড়ের বুট দু-হাতে তুলে চোখ দুহুতো রামভজন সি ।

—তুল দেখোনি ভজন সি, ধরালার বললেন সোমনাথ, আমার বাই কেই পাণ্টে এসেছেন মেয়ে হয়ে । তাঁর স্বামীর পাশ, এ কলের পাশের কালি হয়ে হুহু এ কলকে লাগলুত করবার জন্তে যে পাকভেই হবে তাঁকে । বার বার জাঁকপান করে সমস্ত অপহাসের খণ শোধ না করা পর্যন্ত নিভুতি যে তাঁর নেই ভজনসি ! তাঁর সম্মানেরও নেই ।

বহুবাহুবর দিকে উল্লাস আঁখি মেলে নীরব হলেন সোমনাথ ।

পঞ্চ দিম্বরে দেখলো হুমিতা, টানের আলোর তাঁর জলেডরা চোখ দুটা যেন চক-চক করছে ।

—অমর অনুব্রুণে কথা বোলা না বাবা ! কবে কি হয়ে গেছে, সে সব কথা বাক, এখন আশীর্বাদ করো মেয়েটা তোমার যেন সুখী হয় ! বললেন ধারা দেবী ।

জবাব দিলেন না সোমনাথ, কি এক গভীর চিন্তার যেন মগ্ন কইলেন ।

—একটা কথা শুধাতে যে এসেছিলাম বাবা ! বললো রামভজন হুহুত করলে ।

—বলো ! যেন হুখ থেকে ভেলে আসা সোমনাথের কণ্ঠস্বর ।

—এই এতগুলো টাকা দিলে কেন বাবা বাটের মড়াটাকে ?

—কতদিন বাঁচবে বলা তো আর না রামভজন ! না হয় দেখে কিছু বাত, আমার করে হু-তারদিন ধরকা গে, তারপর ভালো কাজে টাকাটা দান করে দিও !

—অনেক, অনেক আশ্রয় করেছি বাবা, অনেক ডাঙো-বল করেছি, জোয়ারের কাছ ! তেমন আমার আত্মকালিকার হাল লাগলেন বহু লোকেরা কেউ কখনো ক্রোধও দেখেনি !

—বিবিস্যার দিকে একবার আঙুলোয় তাকিয়ে—আবার বললো বৃক্ষ—এই আত্মকালিকী না হয় বৃক্ষ মালী হয়েছি বাবা—কিন্তু জোয়ার বাবার আমলো তাঁর ইয়ারবান্নির সঙ্গে একসঙ্গে বাঙালিরা করিয়েছেন আত্মকালিকীর বাবা ! আর বাই হোক অমর করাক দিল কোথাও কেউ হুহু পাতে না বাবা, এ আমি বলে দিলাম ! আর যেন হুহুত সবে আমার এই লাগলুট ! সেই কতকাল এসেছি

এখানে, সারা জীবনটা তো কাটালাম, আর কটা দিন ! কিছু দিগিকে হুহুকে যে আমার কোথেকে যেকোনো চার না বাবা !

—তাই নাকি ? হেসে বললো করবী, আমাদের তাহলে হুখি একটুও ভালোবাসো না ?

—আরে না, না কবি গিগি ! তা নয়, তা নয়, এই বহুবাহুবর ঐ একটা দৈনিক কি না তাই বলছিলাম ঐ কথা, ভালো আমি সবাইকেই বাসি ।

হাসে হুখ হাঁড়ি করে বলেছিলেন বিবিয়া । উঠে পাড়িয়ে বললেন—বাই বাবা, নটী-বৌ হুহুতো বেড়িয়ে কিরনের এখুনি, রাঙ্গাবাহার কি করছে বাহুবনী সেবে আসি । একটা হলুত বুট রামভজনের দিকে হুহু গিয়ে অহুতকণ্ঠে বিহু-বিহু করে বললেন, বুড়ো ডাঙুকটা আবার এখানেও লাগতে এসেছে, আ-মোলো বা । বাটের মড়া ! হুম হুম করে পা কলে চলে গেলেন তিনি ।

করবী মায়ের দিকে চেয়ে জ্ব কোঁচকালো । হুহু হেসে বললেন সোমনাথ—আ ভালো বোঝো কোরো ভজনসি ! আমি তো কালই হুওরা হবো । হুলাখনে থাকলো মাল হুহুকে, তারপর মানস সর্বোপর বাজা করলো ।

—কতদিন পরে আপনি আবার কিরবেন বাবা ? কাতরবনে শুধোলো হুমিতা ।

—এখানে তো আর কিরবো না মা ! এ বাড়ীতো এখন আর আমার নয় । গাঁও ঘরে বললেন সোমনাথ, তবে সময় হলেই আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে ।

নিষেধ আকাশের গারে ভেসে এসো একখানি ঘন কালো চল্ল মেঘ, ঢেকে দিলো আলোররা চাঁদকে । চাঁপা, বহুলের গছে হাতাল হুহুত উত্তরে বাতাস সকলকার সঙ্গে দিগে গেলো হিমশীতল পবন । টি টি শব্দে ককণ আর্দ্রনাদ করে গাছের স্তম্ভ-থেকে উড়ে গেলো একটা রাতজাঙ্গা পাখী ।

—বাবা ! কালার ভারে কেঁপে উঠলো হুমিতার কণ্ঠস্বর ।

—বলো, মা ! ওর শিঠি হাত রাখলেন সোমনাথ ।

—আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে তো ?

—কিছু বিলম্ব হবে মা ! একটা চাঁপা লীলবাসের সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি ।

—কি যেন একটা ভয় আমার মনটাকে পেরে বড়ো বাবা !

কিছুই বুঝতে পারি না । লম্বাটা চলে গেলো, আপনি চলে গেলেন, ঠিক তারপর থেকে কেমন জ্বরের ছায়া যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর যাত হলে আমি হুহুকে ঘোরে প্রায়ই দেখি কি ভূমিক কালো সন্ধ্যা হু শো-শো করে গর্জন করছে আর আমি ভুবে বাছি তার ভেতর ! ঠিক ঐ বাজিয়ার ছকটার মতো একটা কালো কালো হুহু, আমি প্রাণপণ জোর এগিয়ে যেতে চাই তার কাছে, কিন্তু বাবা, সে সরে যায় ! উঃ, তখন কি যে কতটা ভেতর হুহুত জ্বরে আর শরীর যন সব কেমন অস্থির হয়ে ওঠে ! তাই যেন হয় বাবা, আপনি কাছে থাকলে বোধ হয় ঐ ভূমিক, হুহুতা আর কেতে হবে না, সব জ্বরের ছায়াগুলো আর আমার সঙ্গে হুহুত না, তখন জাবাব আমি হুহু হয়ে উঠলো ঘোর হয় ।

করক বিমিষ্ট চোখ বুজ বীরব হইলেন সোমনাথ । হুহুত উঠে শিঠি গিগে বার বার চোখ দুহুছিলো বৃক্ষ ভজন সি । করবীও

হুই বিকিয়েছে ভক্ত দিকে, জেথের সঙ্গে জেলে বাজে তাঁর দাঁল হুটো।
 জে চাইলেন সোমনাথ। সুমিতার বাথার হাত বুড়ির পাচকরে
 হলেন—আমি সৌন্দর্য পিতা হার। তোমারি 'ঐ' করকল
 মহাগায়ের কবালি গ্রাস থেকে রক্ষা করে সকল শত্রুহুট করতে পারেন
 একবার জগৎপিতা। তুমি মনে-প্রাণে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করো
 না। এই মহা অন্ধকার হুটক সাগর পেরিয়ে সেই অনির্বাক্য জ্যোতিকে
 ভবতই লাভ করবে। অনন্তকালের মহাসাগরে জল-অবসাররূপ
 ডেউর ডেউরে ভেসে চলেছি আমরা তাঁরই দিকে। বাসনা কামনার
 বড়-বড়া, সদস্য করের বিভীষিকা চারিদিকে। ভয় পেয়ো না, লক্ষ্যভ্রষ্ট
 হোয়ো না, আলোর সন্ধানে এগিয়ে বাও তাঁকে সন্ধান করে। ভয়

সেই, কোনো ভয় নেই জেথের, আলোর তাঁর বাবার শক্তি আর
 অধিকার লাভ করেছে তুমি। নীরব হলেন সোমনাথ। তবু তাঁর
 হাতবাঁনি ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে লাগলো কভার বাথার,
 পিঠের ওপর। আত্মোক্তিক শক্তি যেন সঞ্চারিত করছেন কভার
 সেজে-মলে।

আবার সেই অনাবরণিত রোমাক জাগলো সুমিতার সর্বাঙ্গে।
 কোন দ্বিভাবের মূহ কল্পনে কেঁপে উঠলো সে-মন। দর-বর করে
 হু' চোখে নেমেছে গুলক-বেশনার অঙ্গধারা। অবনত হয়ে পিঠের
 চরণে মাথা রাখলো সুমিতা। উল্কারার শিক্ত হতে লাগলো তাঁর
 চরণ-বৃগল। [ক্রকাক]

শ্রেষ্ঠ উপদেশ

ঐরকিন দাশগুপ্ত

ক্রোড়েরা বিজয়লালী পণ্ডিতের নাম আজ দেশ-বিশেষে সুপরিচিত।
 বর্গত মতিলাল নেহেরুর কড়া অথবা অস্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিনী
 হিসাবেই তিনি খ্যাতি লাভ করেননি, নিজের কৌতিকেও তিনি
 ইতিহাসে স্মরণীয় হবার বোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভারতের বাবুনতা-
 মাদ্রাসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তিনি একাধিক বার কারাবরণ
 করেছেন ও স্বাধীনতার পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ বোগ্যতার সঙ্গে পূর্ণ
 করে হাকিমুর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। ১৯০৩-০৪ সালে তিনি
 ইউনাইটেড নেশনস-এর সভাপতি নির্বাচিত হন, তার পর বৎসরে
 আমেরিকা ও বাপিরাতে চারি বৎসর ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।
 বর্তমানে তিনি বিলাতে ভারতের হাই-কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত
 আছেন।

করেক বৎসর আগে তিনি একটা বিলাতী পত্রিকাতে প্রবন্ধ
 লিখেছিলেন "আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ।" সে প্রবন্ধটার কিয়দংশের
 তাম্রণ্য নীচে দেওয়া হোল।

"দেশ স্বাধীন হবার করেক বৎসর পূর্বে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়।
 সে সময় তাঁর স্ত্রী আতা ঈহুত অভয়লাল নেহেরু কারাগারে ও
 তাঁর কভার আমেরিকার শিকারত। শোকে হুহুমানা হয়ে তিনি
 শক্তির অভাবে ছিন্ন করলেন দেশের বাইরে চলে যেতে। স্বামীর
 মিন-কল টিক করে তিনি এলেন গান্ধীজির কাছে বিদায় নিজে।
 কভারে গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্বামীর আত্মীয়দের
 সঙ্গে গভীর স্বাণের কতই হু?'

বৈধব-লোক-ছাড়াও নানান পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর মন
 সখন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বৈধবিক কারণে স্বামীর আত্মীয়দের উপর
 তিনি সত্যত অসন্তোষ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তখনও দেখা করেন
 নি ও পারেন-দেখা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বেশ স্পষ্ট ভাবে
 গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'যারা আমার কতি করতে চেষ্টা করছে
 তাঁদের সঙ্গে আমি কিছুতেই দেখা করব না। বাপু, তুমি বললেও
 না।'

গান্ধীজি যেন হু এক স্পষ্ট উত্তর আশা করেন নি। পারিবারিক
 কদালা দিয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকিয়ে হইলেন। তাঁরপর
 নিজস্বতা ভুল করে সত্যের প্রত্যাহত হু করলেন 'তোমার উচিত

স্বাধীন আসে তাদের সঙ্গে দেখা করে বাওরা। এসেছে আমরা
 এখনও এ সব শোভতে বিশ্বাস করি। তুমি অস্বামী, তাই তুমি
 দেশের বাইরে বাহু শক্তির অবস্থানে। কিন্তু অস্তর হুই তোমার
 স্বহু না থাকে তবে তুমি স্রি দেশের বাইরে গিয়ে শক্তি পাও?
 তুমি 'অতি প্রিয়জনকে' হুইয়েছ। এ গভীর স্তত ভুলতে হলে
 নিজেকে দুঃ কর। সব, অভিমান বিসর্জন দাও। নিজের স্বত্ব
 পরিহার কর। তা না হলে তোমার আহুত মন তবু আরও আঘাত
 পাবে। কেউ তোমার কতি করতে পারে না, যদি না তুমি নিজে
 তোমার কতি কর। (Nobody can harm you except
 yourself)."

তাঁর মন বড়ই বিরোধ করক না কেন, গান্ধীজির কথাগুলি
 তিনি কিছুতেই মন থেকে সেড়ে কেলেতে পারলেন না। মনের সঙ্গে
 অনেক সংগ্রাম করে শেষে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হোল। সব
 অভিমান বিসর্জন দিয়ে তিনি সেলেন তাঁর পরলোকগত স্বামীর
 আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে। অল্পকল কথাবার্তা বতই বুরতে
 পারলেন যে তিনি তাঁদের ভুল বুঝেছিলেন। তিনি উপবাচক হয়ে
 দেখা করতে বাওরার সন্ত আকাঙাক্ষাটাই বললে গেল। সকলকেই
 মন হালকা হয়ে গেল। তিনি বুরতে পারলেন গান্ধীজির উপদেশটি
 কত মূল্যবান। মত একটা বোকা মন থেকে হু করে তিনি বজরানা
 হলেন গভীর স্বান আমেরিকার।

সংসারের ব্যত-প্রতিঘাতে বা অথবা বিপদেই কীবল এক-একটা
 সময় আসে যখন আমরা নিজস্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি ও শত্রু
 জগতের অস্ত্রের মনে করি সকলেই আমাদের শত্রু, আমাদের অনিষ্ট
 করতে চেষ্টা করছে। বিবেচনাপূর্ণ অস্ত্রে আমরা মনে করি বৃষ্টি বিবেচ
 যির বিবেচকে জর করা যায়—কলে বিবেচের বহিঃকেই চলে আর
 সে বহিঃতে নিজেরাই সব ক্ষয়ে বেশী মরি মল-পুত। আমরা ভুলে
 বাই 'লজর থেকে বিবেচ হু না করতে পারলে শক্তি বিশেষ না।

বিজয়লালী পণ্ডিতকে দেওয়া গান্ধীজির উপদেশ—"Nobody
 can harm you except yourself" সর্ব দেশের সর্ব লোকের
 হতেই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। আকাশের কবজতার মতন সকলের স্বত্বের
 সর্ব সময়ে লক্ষ্যবান রাখা উচিত।

২৭। ভল্লর ছটিকে নিয়ে আরও করে দিলেন ভোজন।
ভগবান্ধরীও তখন বলরাম ও কুবের লবাসের ভেঁকে পাঠিয়ে দিলেন।
ভেল মাগিরে মান করিরে কাপাৎ পরিষে দিলেন। তাঁরা গয়া
যের তাঁর নিজের পেটের ছেলের। কুবের সঙ্গে তাঁদেরও খেতে বসিলে
দিলেন। ভোজন-পর্যন্ত খেতে বসে তাঁদের বাড়ী কেবাব গরম প্রজাপি
বললেন—বেশ, অত্যন্ত করে খেতে বেশীটা ভাল নয়। আরো
ভোজ্য অত্যন্ত চকল, খেলা পেলেন সব কুলে বাত দিত কোর।



জেনারেল পোস্টাক্সিস
—মাননীয় বঙ্গোপাধ্যায়



সেব-প্রয়াগ
—ঐশ্বর্যিক মুখোপাধ্যায়





গেছোমেয়ে

—সত্য পাল



তুই ছেলে

—সাবন রায়

প্রতিচ্ছবি



याजी ह'ल कुन

—प्रायिक (कलपुन)

মিষ্টি হরের নাচের ভালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



হৃৎসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

জমনটি হোসো না। খানিকক্ষণ খেলবে, তারপরে হয় আন্দের বাড়ী নয় নিজেদের বাড়ী চলে যাবে। দেখি তখন ও ছেলে কেমন করে একলা খেলে। এই বলে ভজরাণী যে বার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন ছেলেদের।

২৮। এর পর আর একদিনের কথা।

মাথায় খুড়ি নিয়ে ফল বিক্রী করতে বেরিয়েছে এক চৌধুরী ফলওয়ালী। 'কে কিনবে গো ফল, কে কিনবে'—হাঁকতে হাঁকতে হনহনিয়ে হাঙ্গির হয়ে গেল ভজরাজের প্রাসাদ-ঘরে।

আওরাজি কানে পৌঁছল নন্দহুলালের।

বুকে হুলাছে মোতির মালা, থল-কমলের মত পা দু'খানি থুপথুপ করে কেতে কেতে, মুখাল-ফুলের মত দু'হাতের আঁজলায় এক মুঠো ধান ভরে নিয়ে, বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন নন্দহুলাল। সোনার কাঁকী বুধর-বুধর নাচাতে নাচাতে বতকশে তিনি ফলবিক্রয়ীরা কাছে এসে পৌঁছলেন ততকশে তাঁর হাতের ধান সব ঝরে পড়ে গেছে মাটিতে, দু'তিনটি ধান মাত্র বাকি।

নন্দহুলালকে দেখে, একরুতি নীল মেঘের মত সেই মূর্তিনন্দকনকে দেখে, কেমন বেন বিহবল হয়ে গেল ফলওয়ালী, ঘোর লাগল তার ফুলের। বা ছিল মনের মধ্যে, মনে তা স্মার হইল না। কী করি কী করি, ভাবতে ভাবতে নন্দহুলালের অঞ্জলি ভরে সে বিলিয়ে দিল তার সব ফল। তারপরে খুড়ি উঠিয়ে যখন ফলওয়ালী চলে গেল তখন পথের লোকেরা দেখতে পেল, বড়িতে ফল নেই, রয়েছে স্র।

২৯। তারপরে একদিন অন্তঃকরণের মধ্যে যেন সেই অস্ত্রবীড়িই প্রেমা অমৃতব করেই, স্রুতচরণে ভজরাজসমীপে উপস্থিত হয়ে গেলেন উপনন্দ সন্ন্যাস প্রভুটি আভীরমুখের। ভজরাজ তখন সমাসীন ছিলেন আহ্বান-মণ্ডপে। চুপ্ত-বিশ্বাসে সন্ন্যাসন হয়ে তাঁরা তাঁকে বললেন,—

ভজরাজ, আপনার সম্পদেই আমাদের সম্পদ। আপনার সমুদয় বিপুলতম সৌভাগ্যমালী মানব অমৃতপুর্ণ। আপনিই সভাই মহাশয় ব্যক্তি। কেন না, আপনার পুত্রটি নিতান্তই বিশ্বাসীরা দুঃখহতা। স্তুতিকাগুহ হতে আরম্ভ করে এত প্রকারের ভক্তভক্ত ঘটনা ঘটতে সংসারে আর পঞ্চাশ কোথাও আমরা দেখিনি।

৩০। প্রথমে এক নিশাচরী নিয়ে এল... যনযোয় প্রেলদের মত অবস্থা। তারপরে ঘটল এক দৈত্য নিপাত—সর্বজনের বেন মনোনিপাত। তারপরে উঠল কুণ্ডাবস্তের ঝড়। কী অনিষ্টই না ঘটল সেই দানব ঝড়ের ঘূর্ণী। সপ্রতি ঘটছে ঐ দ্বীপ অন্ধন পাছের ভীষণতম। মহান অন্তর্য সব ঘটেছে।

৩১। এ ক্ষেত্রে নিদান কি? কুমারের জন্মকালে ততটুকুও তো কোথাও দেখ নেই? সব গ্রন্থগুলিই তাঁর শুভগ্রহ। আপনার অমৃত যে লোকোত্তর তা প্রত্যক্ষ। তা না হলে কেমন করেই বা আপনি অকস্মাৎ লাভ করবেন এ-হেন দেবহুল্ল অপভারত, বিনি জগৎপতি মারায়নের অংশকলিত এবং বীর অসীম কৃপার অকস্মাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে-বার ভীষণ সব অনর্থ?

৩২। অতএব আমরা অনুমান করছি, এই হুলাটেই কিছু সোব লেগেছে, এবং সেইহেতু মহারাজ, এই হুলাট পরিণ্যাপ করে কলসরকালের মধ্যেই আমরা বৃন্দাবনে যেতে চাই। সে বন সর্বদাই

সুখ, বড়কতুর সমস্ত সনকই সেখানে বর্তমান, ভামল কুপের অবধি নেই সেখানে। বৃন্দাবনে বারা বাস করেন তাঁরাও বলেন, বৃন্দাবনের তুলনার ত্রিসোক-সৌন্দর্য্য ভূষণ। সেখান চিত্র-নিবাস লক্ষ্মীদেবী, সকলেই সেবা করেন তাঁর; এবং সেখানে রয়েছেন গিরি গোবর্ধন। আমাদের গোণদের জীবিতের পক্ষে সে হল অমূল্য। জ্ঞানিগণ মহারাজের যদি অভিমত হয়, তাহলে বৃন্দাবন-বাড়া আমাদের সম্বোধে কারণ হয়ে উঠবে।

৩৩। আভীরমুখ্যদের ভাষণ শ্রবণ করে সর্বকি বিবেচনা করে দেখলেন যোযাধীশ। বিচারগুস্তীর প্রস্তাব আত্মকুল্যে নিজের চিন্তা-ধারাকে পোষিত করে নিয়ে শেষে বললেন—

এই বৃহত্তর উত্তর আমার যে মমত্ব-বোধ রয়েছে, আপনাবাই তার নিমিত্ত। এখন আপনাবাই যদি এই হুলাটকে সোবস্কুল বলে মনে করেন তাহলে মাছবে কেমন করেই বা এখানে থাকবে? অতএব, আমার মনে হয়, স্রুতা ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে বৃন্দাবনের পথেই যাত্রা করা অধুনা বিধেয়।

ভজরাজের অমুমতি লাভ করে উপনন্দাদি আভীরমুখ্যেরা সপরিজন স্রষ্ট হয়ে উঠলেন।

প্রথমেই তাঁদের আশঙ্কা হল, শকটগুলি স্রুদ্র হয়ে গেছে কি না। কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন শকটগুলি নির্ভরযোগ্য তখন দ্রুত হয়ে উঠল তাঁদের চিন্তবল।

৩৪। অনন্তর বা ঘটল সে এক বৃহৎ ব্যাপার। শকটে বসীর্ষক সযোজিত হয়েছে সকলেই দেখে থাকবেন, কিন্তু কেউ কি কখনও দেখেছেন শুভ্রবর্ণ নব লক্ষ বসীর্ষকের সংযোজন? চার-পাঁচি বসীর্ষকের প্রত্যেকটিই কি ইন্দ্রসেবের শালা হাতীর উপমাগুল? যৌনব্রতী বৌগীদের মত স্থির পাড়িয়ে রয়েছে সহস্র সহস্র নবদস্তী বসীর্ষকের দল। লক্ষ লক্ষ সোনারীধানো শিঙ। বেন স্রুতকর শিখরগুলো চমকছে। লক্ষ লক্ষ ধূয়ের সে কী প্রাণের লীলা। বেন ধরধরে নৃত্য শোখছেন সঙ্গীতাচার্য্যেরা। চার পায়ে বসীর্ষকেরা নাচছে বটে কিন্তু আতর্ষ সেই চারিটি পায়ের কি নেচে উঠছেন চতুশ্রী আসিদ্ধল।

যথা, জীনারী বৃগী সমালিকা ইন্দ্রবজ্র। লক্ষ লক্ষ লতার মত হুলে উঠছে চামরপুঞ্জ। লক্ষ লক্ষ গলায়, বাজছে অমৃত-নিধু কিল্লিগী। কিন্তু শকটে সকলকেই যখন জোতা হল, তখন নাকে মস্ত মস্ত ফুটোর সকলকেই কি দড়ি।

শকটগুলিও দ্রষ্টব্য। প্রতি শকটের মাথায় সটান চারমণ্ডল ঘেরা টোপের কাপড়ের রত্ন শালা, সবুজ, লাল, হলুদ, কমলা, ধূসর চারদিকে বহু মূল্য পটবস্ত্রের বৃত্তি। চারমণ্ডলের চূড়ায় চূড়ায় কনক কলসের শোভা। পত-পত করে বাতাসে কাঁপছে অজস্র পতাকা যেন তারা কলা-পাণ্ডিত্য দেখিয়ে রসনা বিস্তার করে, অমর-বিমানের পরিহাস করে, বায়বায় স্লেহন করে নিজে চাইছে দিনকরের কিরণজাল এদের প্রসঙ্গগুলি নির্দোষ, সাধুদের প্রতি আসক্তির মত; এদের অঙ্গগুলি স্রন্দর, হরিতকদের ইন্দ্রিয়ের মত; এদের চক্ষুগুলি শোভ চক্রবাক-শাস্ত্রিত তড়াগের মত; এবং এদের উজ্জ্বল যুগলগুলি যর-জানে অলকাপূরী নলকুবেরের সান্ধ্য।

এই মনোহর শকটগুলিতে ভজরাজীরা প্রথমে ধীরে ধীরে আরোহ করিয়ে দিলেন আপন আপন পরিবারবর্গকে। তাঁরপরে তাঁরা যথ অভ্যস্ত শকটগুলিতে বোকাই করতে লাগলেন স্বর্ণ-রৌপ্য-পিত্তল-তা

৬ ফাংশনমিত্ত উত্তমসঙ্গত, তখন বিষয়ে বিকসিত নেত্র হয়ে গেলেন সত্যজন।

তারপরে উঠল চমক প্রের। গাভীসজ্জকে পুরাবত্তী করে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব হবে? স্থির হল শেহরাই আগে বাবে, তারপরে যাত্রা করবে শকট-শোভা। কিন্তু গাভীসজ্জের প্রাচুর্য বিধার ক্রম রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়িল। শেষে পাক্ষিকের বিজ্ঞান দিয়ে যুগপৎ যাত্রা করল শেহু ও শকটের সমারোহ। কী বিপুল সেই শোভাযাত্রা, গম্যস্থানে পৌছলেও তার পা পড়ে রইল ত্যক্তনীর স্থানে।

৩৫। বৃহৎনের মধ্যস্থল থেকে আরম্ভ করে বৃন্দাবনের সীমা পর্যন্ত অবিস্তার ভাবে চলেছে শেহু-পাক্ষিক। বয়নার তীর ধরে বখন চলেছে তখন জনতার মনে হল, নাঈ এরা বৃষ্টি চলেছে না। বিতর্কান্তরের আশ্পদ হয়ে পড়িল শেহুপাক্ষিক।

৩৬। বয়নার সঙ্গে রহস্যচাপের অভিশ্রায়ে তবে কি এখানে এসে মিলিত হয়েছেন স্তরধুনীর ধারা?

বৃন্দাবনের রেণু সংগ্রহের লোভে তবে কি একের পর এক ধরে আসছে কীরসাগরের অক্ষর ডে?

কীরসাশায়ী নারায়ণের শরনভার পরিত্যাগ করে তবে কি লোভ পড়েই বৃন্দাবন দেখতে গতিয়ে বেড়েছে অনন্তনাগের দ্রাবীড়সী ধরা?

না, না, এটি ধরিত্রীর মুক্তাবলী মালা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই শেহুপাক্ষিকের মত ঐ শকট-পাক্ষিকটিও সাধারণ মানুষের চোখে বিশ্বাসের বন্ধ হয়ে পড়িল। সকলেরই ধারণা হল, নিশ্চয় তাদের চোখ

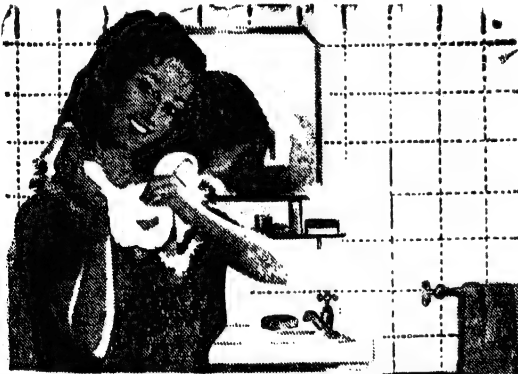
বিরাট একটা কিছু ভুল দেখছে। সত্যিই এটি কি একটি শকটপাক্ষিক না, কনককলস-বিলসিত পতাকা-নিকর করহিত ললিতাট-গোপন্য খটখটিত একটি অসুখ স্বন্দর দুর্গপ্রাচীরের কল্পনা?

এও তো হতে পারে... এটি পর্কতরাজ হ্রদেক হিমালয়র কৈলাস প্রভৃতির শিশু কুমারদের পাক্ষিক, বয়নার তীরে খেলতে নেমেছেন, করুণা করে ইন্দ্র তাঁদের ডানাতলিক আর কাটেন নি?

ধীরে ধীরে চলছে শকটের সমারোহ ও শেহুর সমারোহ, আর শ্রেণীর পর শ্রেণী রচনা করে আকাশে উঠছে ব্রহ্মধূলির সমারোহ। শূন্যে বেস ফলিত হয়ে যাচ্ছে নিরালম্ব এক মাত্তিক দুর্গের কল্পচিত্র।

এও তো হতে পারে এই ধূলির সমারোহই ধরিত্রীসেবীর নব-প্রতিমা? পূর্বাকালে একদিন দৈত্য-কান নিমেন্দ-ব্যাপসে ধরনীসেবীকে ত্রালোকে যেতে হয়েছিল দীনহীন গো-রূপ ধাক্ক করে। তিনিই কি আজ তবে কৃষ্ণাদিপঙ্কজ-সঙ্গমস্থল নিবেদনের অধীর লাসসায় উদ্ধপবনবিকস্পিত ধূলিশ্রেণী পরম্পরায় ত্রালোকে পুনর্বার ছুটেছেন স্বরূপে?

৩৭। ক্রমে ভ্রাতাপথে মাসল হয়ে উঠল কোলাহল। সহস্র হুহু সহস্র কথা। এস এস, বাও বাও, আনো, নাও চলো, বোখো চালাও। একীভবনখ থাকা সম্বন্ধে ক্রমশঃ বহুতরঙ্গের মিলিত ব্যাহতিতে সর্বাঙ্গে বহুতরঙ্গ ঘটল প্রত্যেকটি শব্দের। তারপরে অকস্মাৎ অবশেষেরে তুর্বিভাব হয়ে উঠল কে বক্তা, কি বক্তব্য। বাক্যের সমস্ত ব্যবহার কেবল সম্পন্ন হতে লাগল হস্ত-সংজ্ঞার।



জীবাণুনাশক নিমাতল থেকে চৈরী, বৃশক্তি মাগো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাধন। মাগো সোপের প্রচুর ধরন কেনা রোমকুপের গভীরে প্রবেশ করে ত্বকের লবনকর দামিত্ত তুন্ন করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের লক্ষ বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাধন ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিভার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

৩

পরিবারের
সকলের পক্ষেই
ভালো



মাগো সোপ

পরিবারের সকলেই প্রিয় সাধন

বি ক্যালকাটা ডেবিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৩

৩৩৩

একদিন যা ঘটেছিল..... তাদের মায়ে ছেলের ছোট
সংসার। মাধুরী এসেছে নতুন বোঁ হয়ে। বাস
কোলকাতার মেয়ে মাধুরী। মাধবপুরের মতো গ্রামে ঠিক
সে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। রাত্রি হলে
এখনও তার ভুতের ভয় করে। শেরালের ডাকে ঘরে দোর
দেয়। হুতুম প্যাচার ডাকে তার নিশিথ রাতেও ঘুম ভাঙে।
ঝিঁ ঝিঁ পোকাকার শব্দেও নাকি মাধুরীর ভীষন ভয়। গাঁয়ের

তারাপদ মাষ্টার

বৌ-রা সহরে মাধুরীকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মাধবপুরের
মতো অ-জ গ্রামদেশে এসে কোলকাতার লোকও সত্যিই
তবে বোকা বনে যায়!..... তবু মাধুরীর গ্রামকে কিন্তু
ভাললাগে। ভালবেসে কেলে মাধুরী ও গাঁয়ের মাটি আর
মাধবপুরলোকে—আগ্রান চেষ্টা করে ওদের আপন করে
নিতে।.....

বুড়ো খাত্তী সরলাবালার বয় নিতে মাধুরী কখনও ভুল
করে না। তাইতো তিনি মাধুরীকে এত ভালবাসেন।
কায়করমাস মতো তাঁকে মাধুরী ভালটা মন্দটা রোঁধে
খাওয়ায়। আর কত দিনইবা বাঁচবেন—এই ভেবে মাধুরী
বুড়ার সব অহুরোধই মেনে চলতে চেষ্টা করে। ওদের
ছোট সংসারে মাধুরীকে পেয়ে বোধহয় সব চাইতে বেশী
খুশী হয়েছেন তার খাত্তী।..... কত অহুনের পর
তারাপদ ব্রিজে করতে রাজী হয়েছে। বেচারী তারাপদ
এই বিয়ের কথা নিয়ে মা'র কাছে কতই না কথা শুনেছে।
মাধুরী এসে অবধি তাকে আর সকাল সাঝে মা'র
মোকাবেলার যেতে হয়না।

এম. এ. পাশ করে গাঁয়ের কুলের মাষ্টারীর কাজ নিয়েছে
তারাপদ। ভাল চাকুরীর আশায় সে গ্রাম ছেড়ে সহরে
চলে যায় নি। গ্রামকে সে ভালবাসে। এ গাঁয়ের ছেলে
বুড়ো সবায় সে আপনাকজন—তারাপদ মাষ্টার। এদের
নিয়েই তারাপদের দিন কেটেছে।..... মাধুরী আজ তার
খারীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ
দিতে—মাধবপুরকে আদর্শ গ্রাম করে গড়ে তুলতে।.....
ইতিমধ্যে মাধুরী সবায় প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলাইয়ে রান্নায়
মাধুরী পাড়া জোড়া নাম। আনাড়ী তাবলেও আজকাল
কালের ফাঁকে গাঁয়ের বৌ-রাই এসে মাধুরীর কাছে ভীড়
জমায়। বুড়ীদের আগরে সরলাদেবী বৌ-মার যা প্রশংসা করে
বেড়ান, তাতে সব খাত্তীই চায় বৌ-রা তাদের মাধুরী-
বৌ-র মতো কাজকর্ম শিখুক।.....





১৬২-১৯৩৩ ২৩

গায়ের বোনের বন্ধু নিয়ে তারা শেখায়—মাধুরী। কতক
হয়ে তারা দেখে মাধুরীর রান্নার নতুন ঢা। মাধুরী তার
সব রান্নাতেই 'ডালডা' ব্যবহার করে। ওদের কাছে, আজক
লাগে। কালু হুদীর দোকান সাঝানো খেজুর গাছ বাকী
'ডালডার' টিন তারা অনেকই দেখেছে। বো-রা জানে
'ডালডা' দিয়ে যেঠাই-মণ্ডা ভাজাডুকি হয়—সব রকম
রান্নার কাজও যে 'ডালডা'র হয় এ কথা তারা জ্বতন্ত
পারে না। তাই মাধুরীকে 'ডালডা' দিয়ে সব রান্না রাখতে
দেখে ওদের অত আশ্চর্য লাগে। কোঁকল বাড়—তু
মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জা পায় লজ্জার মাঝ
থেকে 'বেহু-বো' জিজ্ঞেস করে বসে। মাধুরী কিন্তু ওর
কথায় হাসে না, বুঝিয়ে বলে ওকে 'ডালডার' কাহিনী।
'বেহু-বো, পায় তার প্রেমের জবাব, কেন মাধুরী সব রান্নাতেই
'ডালডা' ব্যবহার করে।.....

"খাঁটি ভেরজ তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী। আর প্রতি
"আউল" 'ডালডা'তেই আছে ভিটামিন 'এ'র ১০০ 'ইটার
জ্ঞানানালইউনিট' এবং 'ডি'র ৫৬ 'ইটার জ্ঞানানাল ইউ-
নিট"—আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান।
কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ রান্নার কাজেই 'ডালডা' ব্যবহার
হয় না, 'ডালডা' দিয়ে আমরা সব রকম রান্নাই করতে
পারি। আর 'ডালডা' সবসময় সীল করা টিনে প্যাকিং
হয় বলে গুলোময়লা পড়বার বা ভেজালের কোন ভয়
থাকে না। 'ডালডা' চেনবার সহজ উপায় হোল—সীল
করা টিনের গায়ের 'খেজুরগাছ' বাকী ছাপ"—মাধুরী
তার 'ডালডা'র বিশ্লেষণ পর্ক শেষ করে। গায়ের বো-রা
থরে ফেলে।.....

দিন কতক পরের কথা। বাইরে গলেশ ব্যাপারীর কল্যা
শুনে মাধুরী দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে গলেশ ব্যাপারীর
হাতে 'ডালডা'র একটা ছোট টিন। আজই হস্ত গলেশ
কিনেছে। সত্যতা জেনে নিতে মাঠারের কাছে ছুটে আসে।
কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এ সব বেহু-বো-র পরামর্শে। নইলে
গলেশ আবার 'ডালডা' কিনতে বাবে কেন।.....
খানীর চোখে চোখ পড়ায় মাধুরী ভেতরে ঢলে আসে।
ভেতর থেকে কান পেতে শোনে খানীর কথা "ষ্টা গলেশ,
একেবারে খাঁটি জিনিষ 'ডালডা' জুতে আর বলায় কি
আছে। ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবে..... হেলে মাধুরী
কাজে চলে যায়।

বিশুদ্ধায় নিজের দিগন্তে বোঝাই।

হৃদয়ের আরাধে, আতীরদের প্রাণে, শব্দটির 'নিবেদে',
যেহেতু উদ্দেশ্যে বসিও নষ্ট হয়ে গেল অল্প সময় শব্দ, তবুও
কিন্তু অর্থাৎ শব্দ সেই শব্দভৈরবকেই যেন আলিঙ্গন করে বসল
মহাযোগের সময় গুণ।

৩৮। এদিকে জীবশোলা ও জীবোহিনী একত্রে আরোহণ
করলেন শব্দ-সত্ত্ব। শব্দটো তো নয়, সেটি যেন একটি ক্রীড়ামল্লের
মণিকূহর। নিজের নিজের কুমারটিকে কোলে নিয়ে তাঁরা
বসলেন। এর আসো পড়ল গিয়ে ওঁর গায়ে। তাঁরা দুটিতে
যেন একজোড়া সুকৃতিস্বরপা সিদ্ধোবাধি লতিকার জীব, আর
তাঁদের উৎসব দুটিকে যেন সফল করে রেখেছে জগৎকলসেরও মঙ্গল
কল। 'কৃষ্ণগুণীতির কলসেরে ভাষার হয়ে উঠল শব্দটরঙ্গ।

৩৯। শোভাবাত্রার সমুখে পাশে পঁচাত্তে ইতস্ততঃ চলতে
লাগলেন শব্দ শব্দ শব্দধারী শব্দটি আরোহণ করে, চললেন অনেকে,
পদব্রজে চললেন অনেকে। বিপুল পদক্ষেপে যখন অগ্রসর হল
জগৎবাহিনী তখন মনে হল মহাবন—রাজধানীর লক্ষ্মীদেবীই যেন
দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে গতিবেগে যেন গগন লেহন করতে করতেই, নিজেই
প্রাণে ছুটে চলেছেন গন্তব্যস্থলটিকে অলঙ্কৃত করতে; সেখানে
কেবল কেসে রেখে বাচ্ছেন জমি।

৪০। সর্বাঙ্গে ধীরা বাত্রা করেছিলেন গন্তব্যস্থলের সীমানায়
পৌঁছে তাঁরা ফিরে পাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন অমৃত্যুদীপের
গতিবিধি। আসছেই তো তারা আসছে, বাড়ছেই তো তারা
বাড়ছে। কুলের কেমন যেন সন্ধান রাখা হল দায়। অতএব তাঁরা
স্থির করলেন, যখন পাঁরা হওয়া অসম্ভব, এ পারেই নিশি বাস বিধেয়।
সকলেই শেপকালজ। ব্রহ্মাজের আভার অপেক্ষা না করেই
তাঁরা বিভ্রত করলেন পটমণ্ডপ। ব্যবহার সে কী পারিপাট্য!
যেহেতু যখন হল পুণঃপ্রস্থিতা রাজধানী লক্ষ্মীদেবীই যেন স্বয়ং ঘটনা
করে কেসেছেন ভগ্নবিধেয়।

সঙ্গিবেশের মধ্যস্থলে গড়ে উঠল হাজার হাজার দীর্ঘপ্রসার
পট-গুহ। চতুর্দিকে বিতানের পর বিতানের শ্রেণী। আকাশ
অদ্ভুত করে চৌদিকে উঠল বিরাট বিরাট পট-প্রাচীর। চতুর্দিকের
মোহানার মোহানার ক্রমাগতের স্রষ্টা হয়ে গেল বনিকমণ্ডলীর
সুস্বাদু ও সুশ্রেণী বিপাশ।

এখমেই সে স্থানটিতে সমবেত হয়েছিল কয়েকটি দল, দেখতে
দেখতে সেই স্থানটিতেই ভিড় জমে উঠল বহু গো-সহতির। যে
স্থলটিকে প্রথম দেখতে হয়েছিল এক টুকরো জ্যোৎস্নার মত একটু
পরেই সেটি হয়ে পাঁড়াল হুসারের, তারপরেই একেবারে
কী-সমুদ্র।

৪১। দেখতে দেখতে পটগুহগুলি বাসোপযোগী হয়ে উঠল।
প্রথমস্তম্ভ পল্লবের সঙ্গে নিয়ে জীনল, সন্ধান ও উপনলপ্রবুধ
ধুকধুকরো অশ্রুপ্রবেশ করলেন তাঁদের বহানির্দিষ্ট পটগুহে। বিজ্ঞান
করলেন। তারপরে এলেন অজ্ঞাত আতীরমুখগণ। তাঁদের
প্রাপ্যদানদেবীর বহু পরে মূল-বিছিন্ন হয়ে এল যেহেতু পট-
পটিকা।

৪২। দেখতে দেখতে সহস্র সহস্র শব্দ থেকে নেমে পড়লেন
গোপ এবং গোপিতা। শব্দ থেকে তাঁরা শব্দে শব্দে নামিয়ে
কেনলেন অকাল-ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় প্রত্য-পারী। বলাবল্লেখটিকে

শব্দটুকু করিয়ে অবিকারীরা ওঁরপর হয়ে উঠলেন আহার-দান
ব্যবহার। ক্রম-বিক্রমের লিপ্ত হয়ে পড়ল পরিচায়কবর্গ। তারপরে
এলেন স্থল-পরিচায়করা, পাঁড়িয়ে থেকে তাঁরা ব্যবহার করে দিলেন
রক্তনামির। ভগবান মধুমালাকেও দেখা গেল, বাম-চতুর্দ-গম
গমনপথ অতিক্রম করে যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, এবং অধুন
অভিলাষী হয়ে উঠেছেন পশ্চিম-দিক-নাগরীর আন্তরিক্যে।

৪৩। দেখতে দেখতে কলধরনি তুলে আকাশ ছেয়ে উড়ে চলে
গেল কুলায়মুখী পাখীর দল। উঁচু-উঁচু ডাল দেখে গাছে চড়ে বসল
মধুর-মধুরী, সর্বদিকে মুখ রেখে মণ্ডলরচনা করে ওঁদের পাড়ে রোমহ
মধুর মুগন্ধময়। পদ্মের ঘরে ঘরে ধীরা ঘুরে বেড়ান, হঠাৎ বন্ধী হয়ে
গেলেন সেই সব মধুরের দল। আর এই নিম্নধূরা তিমিরনাক
অবগুণ্ঠনের মহিমায় তাঁরা ধারণ করলেন অভিসারিকাদের ভাবালুতা।
একদিকে যেমন হাতমুখী হয়ে উঠল কুমুদিনীর দল, ওরে এসেছে
এবার যেন ওদের মনের মত স্বপ্নের সময়টুকু এসেছে। অত্মিক
তেমনি এপার থেকে ওপারে ডাকাডাকি করতে লাগল বিরহ-বিধুর
চক্রবাক-মিথুন। হায় যে ওদের বৃষ্টি এবারে দুঃখের বাতাসধানি
বয়েছে। আহা! কী কল্প ওদের আহ্বান, চোখে দেখা যায় না। এই
দেখ চক্রবাক-মিথুনের কাণ্ড। মৃণালের টুকরো দিয়ে এখনও দুটিতে
বাঁছে এ ওর টোটা। রোজাবাদনের মালিন্দে আকাশে অশ্রুট ফুটে
উঠল দু-চারাট নক্ষত্র। বিজাতীয় হলেও অতি প্রকট হয়ে দিলে
যেতে লাগল মায়ুষ ও পদ্মের দীর্ঘ দীর্ঘন্তর ছায়া। তারপরে যখন
প্রত্যেক পটগুহের অভ্যন্তরে একটি একটি করে আলিয়ে দেওয়া হল
দীপ, এবং বাইরের দীপগুলিকেও দেখতে হল সহস্রর ব্যতির ছায়ার
প্রকাশের মত; এবং প্রত্যেক সর্বগিতে সর্বগিতে পাহারার বসে গেল
প্রহরির দল, তখন মনে হল, জীভগবানকে তাঁর উপাসিত-দেবী
নিবেদন করবার অভিপ্রায়ে প্রোদ্যোতনীর বৃষ্টি শুভাগমন হল।

৪৪। দেখতে দেখতে জগৎমতি হল স-স্বাধা যুদ্ধমতি।
তাদের আহার তৈরি, কোনো আকুলতা নেই, তবু হয়ে
তারা বিবাহ করতে লাগল আনন্দে। ক্রমে যুদ্ধমতীর
মাঝখান থেকে ভেসে উঠতে লাগল সন্ন্যাসমহনধরনের মত বিপুল
হুদ্ধদোহন বব, এবং দোহনপাত্রের গর্ভ থেকে উদ্ভাসিত হতে
লাগল মুক্ত-মধুর আরও একটি গুহীর ধরনি। সে ধরনি অতি
ভালো লাগল জীভকর। শব্দরস রসত হল তাঁরা। রসপ্রিয়তা
আরো বেড়ে উঠল যখন তিনি দেখলেন ও জনসেন, নাম
ঘরে ঘরে গাভীসের ডাক দিয়েছে ব্রজের গোয়ালারা। মুখ থেকে
টুপ টুপ করে টপকিয়ে বেরোচ্ছে নাম, আর মণ্ডল থেকে
বিছিন্ন হয়ে ছাড়াধরনি তুলে, কোরা-করা দিয়ে ছুটে আসছে গাভী।
উত্তমা গাভীটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গোয়ালার সে দী
আবার করার বটা। কী নবরকসি সব গাই।

দেখতে দেখতে ব্রজনগরের নরনারীদের সুখসম্পন্ন হয়ে
পানাহার-বিহার। নিজস্বের জাগরণ কোণাল প্রকাশ করে
এবারে প্রহরির দল চাঁকান করতে লাগল 'জাগতে রহো', নিম্ন
নিম্ন হয়ে গেল বিপুল ঠাট।

রাজ্যেশ্বরের আর বধন এক প্রহর বান্ধি
পাত্রোপধান করলেন পৌললক্ষ্মী। হৃদয়
হয়ে পটগুহের দীপিত দীপ প্রাতি-অনিলে সব

গরপরে মনন করলেন দিবি। দধিমহুনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঠ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল ভগবান বাসুক্যের কর্ণরমা গগন। কীর্তনের সহচর হল যবির কর্ণ বলয়ের ও মঞ্জুসরীরের জা। গর্গরীকুহরে সঙ্করমান সেই মন্থন জনির গভীরতা, স্নেহর গীতধ্বনির সেই অনাবিল সুরলালিতা, দিগ্ভ্রমণের দুর্ধে সেই সুরলালিতার পেশল অম্লরঞ্জন, কেন সম্মুখে নিম্নল রে দিল ভাগতিক সমস্ত অম্লজল। আর সেইক্ষে অমর-পতিদের লয়ে সঘর জেগে উঠে বসলেন অমরসীমন্তিনীরা। সত্যিই তো, তর কি এখন ঘুমিয়ে থাকে চলে। একান্ত ভাবে তাঁরা সানন্দে নি পেতে শুনে লাগলেন ঘোষ-বন্যণীর সেই দধিমহুন-নির্ঘোষ।

৪৬। দেখতে দেখতে যখন উদয়চলের শিখরে সমুপস্থিত জন ভগবান ঐকিরমণালী, তখন কিরণমণি-দুহিতা স্রীমতী নাদেবীর অপর পারে অধুনা কেমন করে পৌঁছনো বাবে তারই পূল সমুজোগে ব্যস্ত হয়ে উঠল ব্রজবাসীদের বিশাল ঠাট। ব্রজ প্রথমেই আদেশ দিলেন—

“অধিকারীরা এবার যে ধীর ক্ষেত্রবল পারে নিন।” আরস্ত য় গেল খেম্বুসের পারাপার। সে এক অভূতপূর্বে দৃষ্ট!

লক্ষ লক্ষ খেম্বু সীতরে পার হয়ে বাচ্ছে যখন। হু-পাশ দিগে জের ঠলে নিয়ে চলেছে প্রোত। নিঃশ্বাসের বাতাসে ফুলে ফুলে ঠছে তাদের নাসা; দেহের পুরোভাগ ভেসে চলেছে জলের পরে। তাদের চালাচ্ছে ভীমের মত বলিষ্ঠবপু গোপ, নমন রব তুলছে—স্বীঃ হীঃ; আর হাওয়াধনি তুলছে লক্ষ লক্ষ হ্রঃ—যেন প্রত্যন্তরে জানাচ্ছে “আমরাও বাজি হ্যা হ্যা।”

লক্ষ লক্ষ বাহুর তারাও সীতরে পার হচ্ছে যখন। শিঙ জায়িন, তাই বোধ হয় জলের উপরে জানন্দে নাচিয়ে চলেছে আ-হা-হা হুতু। হোঁট হোঁট দেহ হলে হবে কি, যেনে তারা কিয়র ঝাঁপিরে জল ভাঙতে ভাঙতে চলেছে। জলে ডিকে বী হয়ে গেছে ল্যাজ, উঁচিয়ে আর কেমন করে লোটার? জের নিজের মায়ের সামনে গা ভাসিয়ে সীতরাত্তে সীতরাত্তে তারা চলে গেল ওপারে—কুশলে।

চোখের সামনে দিগে ছবির মত সীতরে চলে গেল হাজার হাজার লক্ষ সীতার। এক হাত খেলিয়ে তারা সীতারাল। অস্ত তে তারা বৃকর কাছে চেপে ধরে রইল কচি কচি চারটে ঠ্যাঙ। ডের উপর লজিরে রয়েছে সজপ্রস্থত বাহুর। আর তাদের পিছনে ঘন হাওয়া নিয়ে সীতরের আসছে মায়ের হল। সেই বাহুর নিয়ে হুনা পার হয়ে গেল তারা।

তারপরে সীতরে চললেন বুধপর্বতরা। তাঁদের পবিত্র বিরাট কূসের আঘাতে জর্জরিত হতে লাগল বহুনার জলস্তম্ভ মনের স্তর কী তাঁদের উরা। ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাঁরা শূন্যঘাত করতে গেলেন তরঙ্গের দেহে, আর আন্দর্ঘা, প্রোতের বেগ অতো সী হলেই বা হবে কি, নিঃশ্বাসের রক্তবেগে তাঁরা জল ঝাঁপাতে পাতে, মাথা উঁচু করে একটানা সোজা পার হয়ে গেলেন যখন।

৪৭। নদী পার হয়ে ওপারের কণ-বুগিষক বাসুক্যের যখন মৈত্রিকী পাভীসের বিরাট প্রান্তঃসহিত প্রেরীকর হয়ে বাঁড়াল তখন মনে হল বিচ্যুতি তুলে। সিরে একত্রিভিরে বাসনার জাহবী বুরি মিলিতা হয়েছেন কালিদার সঙ্গ।

৪৮। চকল সমুদ্রণে এই ভাবে যখন পার হয়ে গেল লোবর। তারপরে নদীতে হঠাৎ আবর্জিত হু বহুবিহ্র, অকথা তরপি। এত আকস্মিক তাদের আবর্জিত যে মনে হল, নার্সনাগরীদের মণিষ্টলের লীলাক্রোশিগুলি হঠাৎ বুরি পাতাল ভেদ করে উপরে উঠে এল; বুরি বা ব্রজরাজ সমাজের আনন্দবিধানের উদ্দেশে সুরশিল্পী বিশ্বকর্ষা নিজেই গগন-গঙ্গার প্রবাহ থেকে তুলে নিয়ে নাটকরী বহুনার কাছে হঠাৎ পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এই বিজ্ঞান মূর্তিগুলিকে। বুরিবা এই তরপিগুলিই কোনো বহুপাশকিত বিচিত্র জলজন্তুবিপেষের কুলকুল মল।

৪৯। এই তরপিগুলির মধ্যস্থলে ছিল একখানি অতিসরীটল তরপি। এখ তারও ঠিক মধ্যস্থলাটিতে ছিল একটি চিত্র-ভবনের পরিকল্পনা। তরপির ললিত পতাকার মুখ পর্বনের কম্পন। নিজের নিজের তরপিটকে কোলে নিয়ে সেই ভবনে একত্রে প্রবেশ করলেন স-পরিত্যক্তা স্রীব্রজরাজ-রাজমহিষী ও স্রীব্রজদেব-রমণী। বহুনার মাঝখান দিয়ে যখন তরপিখানি চলেছে তখন বাসুক্য ঈক্ষ ঈক্ষ ঝাঁকিয়ে দেখতে পেলেন, আহা কী সুন্দর জল, হোঁট হোঁট জেঁ দিয়েছে জলে, আর জলের রঙও কি ঠিক নিজের পারের রঙের মত। আর বায় কোথা? মায়ের আঁচল ছেড়ে বাসুক্য তখনি গুটি-গুটি পৌঁড়লেন তরপির প্রান্তে। কী যেন এক নিবি দেখেছেন তিনি। তরপি তখন চলছে। কৃষ্ণমণ্ড টালল করছে পা। কিন্তু ডান হাতখানি প্রসারিত করে যেই স্রীকৃষ্ণ নিজের করকমল দিগে আলোড়ন করতে যাবেন জল, অরনি তাঁকে ধরে কোলেন তাঁর মা বশোদা; মা রোহিণীও তাঁকে ধরে কোলেন। অব্যুত আভাসে তাঁরা বেন অস্থির। কিন্তু কখনো কি হবে বাধন মানে কি ছেলে? অনিষ্টের আশঙ্কার ব্রজরাজও তখন দ্রুত উঠলেন সেই তরপিতে। হাসতে হাসতে এক ঘটকার কুককে উঠিয়ে নিলেন কোলে। তার পর সাবধান হয়ে বসে রইলেন তরপিতে। তরপি-বাহীরা বেয়ে চলল তরপি।

অজ্ঞাত ব্রজবাসীরা সপরিজন নিজেদের সুখসুবিধামত আয়োজন করলেন অতি স্নগত অথচ সমান প্রতিমাংশবিশিষ্ট অজ্ঞাত তরপিজে। আরামে তাঁরা সমকালেই পার হয়ে গেলেন যখন।

৫০। তাঁদের পায়ে পৌঁছিয়ে দিগে সেই তরপিগুলি নিজেই আব'র ফিরে এলেন নাবিকেরা। নিটোল কাঠের সিঁড়ি তাঁরা পাতলেন। তার উপর দিগে তাঁরা তরপিগুলিতে তুলে নিলেন ব্রজশকটের সেই বিরাট ঠাট। পার করে দিলেন যখন। ব্রজরাজ পারিতোষিক দিলেন নাবিকদের। সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন সকলে।

ইতি বনলাজুনভঙ্গা নাম বটভবকঃ। [কম্বনঃ]

এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি উৎসাহ শিখায়
হুটিয়েছিল নিরিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়—
—সত্যোজ্জনাধ নত।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মূলধা দাশগুপ্ত

দিন দশক পরের কথা ।

অক শিরিগড়ে ককি-হাউসে কাপ কাপ ককি গামনে করে বলে মজুদা সব বর্তমান বছরের নোবেল পুরস্কার পাওয়া বইখানা নিয়ে তর্কের তুফান বইয়ে দিছিল। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। নিছক সাহিত্য আলোচনার সাধারণত হাওয়াটা এতোটা উত্তপ্ত হয়ে হয়তো গুঠে না, কিন্তু বর্তমানে সাহিত্য পুরস্কারের পেছনে সাহিত্যের মান বিচারের চাইতেও বেশী থাকে রাজনীতি। আর জর্যদেব রাজনীতি সেখানেই আর না রইল ব্যক্তি, না রইল ব্যক্তির বিদগ্ধ মনের নিজস্ব মত। রইল কেবল দল আর দলীয় মত। হোক সাহিত্য হোক শিল্প, যে কোন আলোচনার চেহারাটাই গিয়ে পাড়ার তখন তার দলীয় লড়াই-এর মতো। ককি হাউসের টেবিলের চারপাশ দিয়ে বলে মজুদের মধ্যেও বা চলছিল তাকে সাহিত্য আলোচনা বলে না—বড়সের এই পোষ্টমডের লড়াই-এরই একটা ছোট সংস্করণের জোর মহলা চালাছিল ওরা। এমন সময় জটিল একটা নিত্যকাল অপরিচিত হেসেলে হস্তমত ভাবে উপস্থিত হয়ে এসে একবারে ওদের টেবিলের পাশে পাঁড়তে দেখে তর্কের তৌড় বন্ধ হয়ে গেল ওদের। একসঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো হেসেলের ব্যস্ত-মজুদে হুখের উপর।

—মজুদি—

অপরিচিতকে ওর দিকে তাকিয়ে ওকেই সন্ধান করে মজুদি বলে উঠতে ভনে বিস্মিত ভাবে বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখালো মজু—আমাকে বলছেন ?

মাথা নাড়লো সে—হী আপনাকে বলছি। ঐগ'গির উঠে আসুন। ভীষণ জরুরি খবর আছে।

—ভীষণ জরুরি খবর আছে আমার কাছে ? বলতে বলতে হেসেলের হুখের উপর কেসে-রাখা ওর না-চেনা না-বোঝা দুটো সন্নিবেশে এসে খুঁজি-হাতে বই খাড়া ব্যাগ শুঁকিয়ে চেয়ার টেলে উঠে পাঁড়লো মজু। বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবতে লাগল, কে হেসেলটি ? কে পাঠিয়েছে তাকে ওর কাছে ? প্রথমে হুখটা বড়টা অদেখা মনে হয়েছিল, এখন যেন ততটা অদেখা মনে হচ্ছে না। ওদের পাড়ার ছেলে ? আসতে-যেতে দেখে কিন্তু চেনে না ? কথাটা মনে হতেই হাত-পায়ের জোড়াগুলো যেন সব আলগা হয়ে আসতে চাইল মজুদে—কোন ছুটনি বটেছে বাড়ীতে। বাবা-বাবা বাড়ী নেই। আকস্মিক তুফানবাদের ধবন নিয়ে পাড়ার ছেলে ছুটে এসেছে ওকে নিয়ে যেতে ?

কি হয়েছে না শুনে আর চলতে পারছে না মজু। ককি-হাউসের দরজা আর সিঁড়ির স্বল্পশব্দের জটিলগাটার পা দিয়ে খেমে পড়লো সে। ভেতর থেকে গলার স্বরটা টেনে বের করে এনে জিজ্ঞাসা করলো—কি জরুরি খবর ? কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমার কাছে ?

সিঁড়ির দিকেই মোড় ঘুরতে যাচ্ছিল হেসেলটি। মজু পাড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলে পাড়িয়ে পড়লো সে-ও। মজুদে দিকে ফিরে বললো—জরুরি'র মা পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার কাছে। আর পাঠানোর কারণটা বলতে গিয়ে হেসেলটি খেমে পড়ে যে মুহূর্ত সমরটুকু নিল, তারই মধ্যে মজুদে মনের ভেতর থেকে গেল—হী, ঠিক। জর্যদেব বাড়ীর উন্টোদিকের পানের দোকানটার যে ছেলগুলো সকাল সন্ধ্যা দুপুর কেবল পাড়িয়ে পাড়িয়ে বিড়ি টানে, পান খায়। বাদেব এতো বাজ্ঞে লাসে ওর যে পাছে ওদের উপর দিয়ে চোখ পড়ে এই জন্ত পানের দোকানটা পার হয় মজু ঘাড়টা একেবারে উন্টো দিকে ফিরিয়ে, তাদেরই ভেতর একে ও দেখেছে—না তাকানোর ভেতরও যে তাকানোটুকু হয়ে যার তারই মধ্যে দেখেছে।

সম্ভবত এই থমকানো মুহূর্তটা নিল হেসেলটি কথাটা এখানে পাড়িয়েই মজুকে বলবে না গাড়ীতে গিয়ে বলবে, এটাই ঠিক করে নিতে, তারপর বললো, জর্যদি' আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। সিরিয়াস অবস্থা—

আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল জর্য ! সিরিয়াস অবস্থা তার ! বিমূর্ততার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল মজু—ঐগ'গির, ঐগ'গির গিয়ে আগে একটা ট্যান্ডি ধরুন আপনি। ও, সঙ্গে আছে ট্যান্ডি। এবার একেবারে হেসেলটিকে পেছনে ফেলে দৌড়ে নেমে চললো সে। এই গাড়ীটা তো। পাড়িয়ে থাকা গাড়ীটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—জেনে নিয়েই উঠে বসল গাড়ীতে। না, না ওখানে নয় আপনি ভেতরে আসুন। হেসেলটি সামনের আসনে বসতে গেলে ডেকে এনে তাকে বসালো পেছনের আসনে। গাড়ী ছুটে চললে অস্থির কর্তে জিজ্ঞাসা করলো—

—এ্যা, কি ভাবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল জর্য ? বিব খেয়ে ? কোথায় পেলো সে বিব ? কে দিলে তাকে বিব বোগাড় করে এনে ? কখন করলে সে এ কাণ্ড ? এ্যা, বিব খায়নি ! তবে ? হাতের কব্জির শিরা সাংঘাতিক ভাবে কেটে দিয়েছে ব্রোড দিয়ে ? হেসেলটি তার হাতের কব্জির উপর আঙুল টেনে জর্যকে কি গভীর ভাবে হাতের শিরা উপনিরা ব্রোড টেনে কেটে দিয়েছে দেখালে, 'মা গো' বলে হু' হাতে চোখ ঢাকল মজু যেন হোস পাইপের জলের তোড়ের মতো জর্যর ছিন্ন শিরার হুখ দিয়ে রক্তের তোড় ছুটে এসে ছিটকে পড়েছে ওর গায়ের উপর। ধানিক বাদে বাদে ভেজা হাত দুটো নয়তো যেন রক্তভেজা হাত দুটো নামলো মজুদে হুখ থেকে—কখন একাণ্ড করলে জর্য ?

তারপর হেসেলটির হুখ থেকে মজু যে বিবরণ শুনে চললো তা হলো এই, দুপুরের নির্জন অবসরে কখন যে জর্য এ কাণ্ড করেছে টের পাননি জর্যর মা। ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। ছেলের ভীতি-বিহবল কাঠের ডাকে জেগে উঠে দেখেন অজ্ঞান জর্য পড়ে আছে বিছানার উপর। তার কাটা হাতটা বেখানটার পড়ে আছে সেখানকার চান্দ্র ভিত্তে উঠে রক্তের বোঁটা নাচে গড়িয়ে পড়ে পা একটা রক্তের ধারা বহুই করে বলে চলছে বর থেকে বাই



মায়ের
মমতা
ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটা কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ গুরু শ্রেয়সী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিল্ক খাওয়ান। অষ্টারমিল্ক বিশুদ্ধ চূড়ান্ত খাদ্য এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিল্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আণবিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্পন্ন। ডাকঘরেরে জন্ত ৫০ নম্বারের ডাক টিকিট পাঠান— এই ঠিকানায়— "অষ্টারমিল্ক" P. O. Box No. 202 বোম্বাই ১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারের শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। দুধ দেহগঠনের জন্য চার থেকে পাঁচ মাস বয়স থেকে দুধের সঙ্গে কারের খাওয়ানও প্রয়োজন। কারের পুষ্টিগুণ শব্দাত খাদ্য-রাসায়নিক হওয়া—ওগু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চাষতে করে খাওয়ায়।



দিকে। দেখে তিনি আত্মকারার যে চিহ্নকার করে গঠন সে কার।
সর্বপ্রথম গুলতে পায় সে। সেই গিরে ভাস্কর ডেকে আনে।
ভাস্কর জয়ার হাঁর সেওয়া ঠিকানা নের মজুর খোজে। প্রথমে
বাঁহী বাড়ীতে। সেখানে শোনে সে কলসে। আসে কলসে।
কিন্তু কলসেও না পেরে কি যে সে করবে এই ভেবে না পাওয়া মুহুর্তে
একটি ছেলে হবিস দেয় তাকে এই ককি-হাউসের। বলে, একবার
খুঁজে দেখুন। অধ-শিরিড চলছে, হয়তো সেখানেই পাবেন।
ভাস্কর আসে সে এখানে।

—ভাস্করকে কি বলতে শুনে এসেছে সে ?

সে শুনে এসেছে ভাস্কর বলছেন, একটুও সময় নষ্ট না করে—
একটি হাসপাতালে রিড করে রক্ত সেওয়ার ব্যবস্থা করতে। নইলে
বাঁচানো দুষ্কর হবে। ক্রমেই সব রক্ত নিঃশেষে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর
থেকে জরাদির।

—ডাইভার জলদি—খব জলদি—মঞ্জু ডাইভারের আসনের ওপর
ছুই হাত রেখে সামনে এগিয়ে এসে কখনোশাসে তার অপর হিন্দিতে
বোঝাতে চাইলে; তার এই ভাড়াভাড়ি পৌঁছে সেওয়ার ওপর যে
একটা জীবনের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে সেই কথা।

কিছুই দরকার ছিল না। ডাইভার বাংলা মথেষ্ট বোকে। সে
সব শুনেছে এক বুকেছে। হর্শের উপর হর্শ বাজিয়ে যেন নিজের
গুরুতর জরার কথা স্নেহেতে বলতে বলতে এবং একটু পথ ছেড়ে দেবার
অনুরোধ করতে করতে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চললো সে।

কিন্তু মাল্লবের ভেতরটা বখন বরা করার উৎসেগে ছুটতে থাকে,
তখন তার সেই মনের ছোটার সঙ্গে যন্ত্রের ছোটা তাল বেথে চলতে
পারে না। তখন মনে হতে থাকে, রাস্তায় নেমে পড়ে নিজে ছুটে
চলতে পারলেই বৃষ্টি বেশী ভাড়াভাড়ি হয়। মোড়ের মাথার লাল
বাতি, চৌমাথার ট্রেনিক পুলিশের হাত, মোটরের ভিড় বখন তারও
উপর কেবলই সে চলাকেও বার বার দিতে থাকে ধামিয়ে, তখন যে
মাল্লব গাড়ী থেকে নেমে পড়ে সতি নিজে ছোটে না, সেটুকুই বৃষ্টি
পাগলের সঙ্গে বৃষ্টি ব্যক্তির তফাৎ। আর শুধু এই বিশেষ অবস্থার
বিশেষ ক্ষেত্রেই নয়—ইচ্ছে করলেই সব করা যায় না, ইচ্ছে করছে
বলেই করতে গেলে যে পাগলামী হয়, এই বোঝার গুলনটুকু নিয়েই
তো সর্বক্ষেত্রে মাল্লব পাগলের সঙ্গে নিজের তফাৎটুকু বাঁচিয়ে চলে।

বসে থাকতেই হলো মঞ্জুকে, স্থির হয়েই বসে থাকতে হলো
তাকে। শরীফা গিরির উপর নামমাত্র রেখে সমুখের আসনের পিঠটা
ধরে শুক হয়েই বসে রইলো মঞ্জু, বতসন না গাড়ী জরাদের বাড়ীর
গলিতে প্রবেশ করলে। আশেপাশের কোন বাড়ীতে যে দুঃস্থ রকমের
কোন ছুটিটা ঘটে গেছে, তার পরিচর গাড়ীটা গলিতে ঢোকান পর
থেকেই মিলতে লাগলো তার মোড়ের মাথার গভীর জটলার, জরাদের
বাড়ীর সমুখের রাস্তার এখানে-ওখানে ঠাণ্ডিয়ে থাকা ছোট ছোট ভিড়ে,
মাল্লবগুলো ঠাণ্ডানোর লগ্ন ভক্তিতে আর মুখের কাকণ্যে। মুহূর্ত্তের
নিম্ন-উপারি প্রতিবেশী মুখগুলো যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে মায়া-মমতার
উৎসেগে-উৎসাহে পর্দাবসিত হয়ে উঠেছে পরমাশ্রমে মুখে।

না থাক কেনা, না থাক জানা, না থাক পরিচর, তবু তারা তো
কেউ কার অপরিচিত নয়। সব কথা না জাহ্নক অনেক কথাই
ভারা জানে পরশর পরশপরের সবকে। স্থানের সোকানের গামনে
বাড়ার মেয়েটিকে পৌঁছে যে ছোটো নিত্যদিন বিলার নিয়ে যায়, তার

বহন বাড়ীর লোক না জাহ্নক, জানে প্রতিবেশী। সোকাম ধা
বাড়ী ভাড়া বাকী, পত্রিকার বিল, গৌরিলার কপের খবর না জানে
পারে আত্মীয়গোষ্ঠী, কিন্তু জানে প্রতিবেশী। পর পর দুদিন কুণ্ড
পাকানো ঘোঁরা এসে লম বন্ধ করে না তুললে প্রতিবেশী দৃষ্টি তারে
নিজের অজ্ঞাতেই গিরে ধাক্কা দেয় উপবাসী জানালার উপর
তার কেউ কাউকে চেনে না কিন্তু জানে সবাইর কথা সবাই
জানো জরার সবকেও। তারা দেখেছে, এক দিন এক বিল
সন্ধ্যায় এক বিষমুখী মেয়েকে এসে এই বিশ টাকা ভাড়া
ঘরের দরজায় রিস্তা থেকে নেমে পাঁড়তে, মা-ভাই-এর হাত
ধরে সমস্ত নামাতে, ঠেলাওলার মজুরি মিটির দিয়ে মলিন
ভাল্লচোরা মালপত্রগুলোকে মা আর ছোট ভাইটির সাহায্যে
টেনে টেনে ঘরে তুলতে। তারপর দেখেছে মোটা ছিট কাপড়ের
ডরা খলিতে কি সব নিয়ে তাকে হাওয়া-আসা করতে, তার
চোখের তলার কালীকে গড়িয়ে গড়িয়ে গালের উঁচু হাড় বেয়ে
নেমে আসতে, তার কফী রূকে দিনে দিনে রোদে পুড়
কালো হয়ে চোখের তলার কালীর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে।
তারা দেখেছে দু'পা ভেতরে ঢুকলে যেখানে আর কিছু না হোক
অন্ততঃ ঘরের আড়ালের বিশ্রামটুকু মেলে, সেখানে নিজের বাড়ীর
খোলা রাস্তারই রকের চিলতেটুকুর উপরই বসে পড়ে তাকে বিশ্রাম
করতে, অঁচল দিয়ে মুখ মুছতে। তারপরের দ্রুত পটপরিবর্তনও
অসম্ভব নেই কাল। হঠাৎ হঠাৎ করে দেখতে দেখতে প্রায়
সবাইর দেখা হয়ে গেছে তার রাতের বেরুনো আর প্রাতের ঘোরা।
আর ইদানীং রাস্তার উপর সে যে কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করতো,
তাকে নিয়ে যে টানা-পেঁচা রাস্তার উপরই চলতো তা আর দেখতে
বাকি ছিল কার? কুংসা চলেছে গুকে নিয়ে। শিশু দিয়েছে
পানের সোকানের বিড়িটানা ছেলেগুলো। কিন্তু সেই সব নিষ্ঠুর
নিষ্করণ মুখগুলোই আজ মমতায় কি আশ্রয় নরম—কি আশ্রয়
করণ।

হায়! মাল্লবের বুক এই মমতাবোহটুকু জাগতে যদি এতো
কিছুর দরকার না হতো। যদি 'আহা' শব্দটা যতটুকু হাওয়া নিয়ে
ভাদের বুক থেকে বেরিয়ে আসে তাতেই স্থির হয়ে না যেতো।

এতোদিন জরাকে তারা বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন
ভাবে দেখেছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করেছে। রায় দিয়েছে।
দাওয়ার বসে পড়তে দেখে সহানুভূতির সঙ্গে বলেছে, চোরা মেয়েটা।
এই দুদিনের সঙ্গার কি এভাবে টেনে চালাতে পারবে? মরবে।
আবার গাল দিয়েছে, উঠেছে রাত বিচরণ করা জরাকে নির্দয় ভাবে।
গেছে একেবারেই জাহ্নকমে গেছে মেয়েটা। যেমন প্রবৃত্তি তেমনি
পথ বেছে নিয়েছে। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ করবার সময়
কোথার তাদের। কিন্তু আজ প্রথম তারা প্রথম দিনের সেই
বিষমুখী মেয়েটির মা-ভাই-এর হাত ধরে এসে দরজার ঠাণ্ডানোর
দিনটি থেকে আরম্ভ করে তার থলি কাঁধে এ-পাড়ার ও-পাড়ার
এর দরজার তার দরজার ঘোরা থেকে, তার প্রতিদিনে এক গ্রাম
আজের জন্ত সঙ্গায় তার পাগলামো, তার উদ্ভুল হাসি, তার
আত্মকের মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হয়ে এসে শয্যার শোনা পশত প্রতি
দ্বিহ ঘটনাকে এক সঙ্গে গাঁথলো। প্রবৃত্তির পথে চলে নর চর

অগ্রসরিত চলা চলতে গিয়ে আজ সে সেই চক্কা খামিরে দেবার জন্য রাহুতরী কেটে ফেলছে আপন হাতে। কাঁদছিল ঘরে প্রমাণ করেছিল ঘরে নাই। এ ঘরে প্রমাণ করছে চাইছে সে ঘরেছিল। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ করে আজ তাদের ঘর থেকে যে দীর্ঘনিশ্বাসগুলো বের হয়ে আসতে লাগল তা কি ভুলি জয়ার জন্ত? না। জ্বাংরেই বা কি এমন রমণীয় সবুজ ছায়ন। সেই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের স্মৃতিত বঞ্চিত ছায়নগুলোও এসে ফিলে গিয়ে নিশ্বাসকে টেনে দীর্ঘ করলো।

চোখের কোণে কোণে তাদের যে আলোর কণিকা অঙ্গে উঠতে লাগল যদিও তা জোনাকির আলো ব্যতীত কিছুই নয়। তাশ নেই, বিদ্যুৎ নেই, আগুন নেই। অঙ্গে উঠতে পায়ে না আলিয়ে দিতে পার না—হৃত। তবু সেই হৃত আলোগুলো যখন মোড়ের মাথার চটলার দাঁড়ার সন্ধ্যের ছোট ছোট ভিড়, একতলা সোতলার ঘাটলার দরজার জানালার পাড়িরে থাকা চোখে চোখে বলে উঠতে লাগল তখন সেই কিছু কিছু হৃত আলোর কণাগুলোর তেজের এক বিকিরে প্রাণ ভরে দেওয়ার জন্য ভগবানের দরজার মাথা কুটতে ইচ্ছে করতে লাগলো মঞ্জুর।

এতকাল মঞ্জু গাড়ীতে বসে বসে কেবল এখানে এসে পৌঁছানোর তাগিদে ছুটকট করেছে। এখন এসে গিয়ে নিজেকে ভারি নিরবলম্ব মনে হতে লাগলো ওর। কি করে কি করতে হবে, কি করে হাসপাতালে যেতে হবে—কোন হাসপাতালেই বা নিয়ে যাবে। যে অনবধানতার কথা কাগজে পড়ে, তাদের গাফলতি আর উদাসীনতার দৃশ্য প্রাণহানির যে কলঙ্কজনক সব ঘটনার কথা শুনে পাঠ—যদি সেখানে গিয়েও সঙ্কটকালের তরিক ব্যবস্থা না মেলে। তবু চোখে অন্ধকার যে মঞ্জু দেখছিল না তা সে কোন ব্যাপারেই চোখে অন্ধকার দেখে না বলেই। কিন্তু ছেলটিকে সঙ্গে রাখতে হবে। তার নাম জানতে চাইলো মন—আচ্ছা, আপনার নামটা কি?

—অমল।

—আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। আমি যে কি ভাবে কি করবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে। আপনি থাকলে তবু আমি জোর পাবো।

যেন কৃতার্থ করল মঞ্জু তাকে, এমন ভাবে বাড় কাত করে শয়তি জানালো ছেলটো।

কিন্তু এখানে নামা হলো না ওদের। গাড়ী থেকে নামবার মুখেই একটি ছেলে ছুটে এসে বাধা দিলো। বললো, একেবারে এঁকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে চলে যা অমল। মিঃ চৌধুরী—মাথা লোকে বোধ হয় জয়ার নামটা মনে করে নিল সে—জয়ারদিকে নিয়ে সেখানে রক্তা হয়ে গেছে। তাদের আসামাত্র সেখানে চলে বেতে বসে গেছেন ওরা।

কেন বন্ধ গলি থেকে গাড়ী পেছু চলতে লাগল। মঞ্জু দেখল, যদিও মস্ত একটা তালো ঝুলছে জয়ারদির দরজার কিন্ত খোলা। হয় শিশুহারা জয়ার মা তালার মুখটা টিপতে ভুলে গেছেন নয়তো হাতে তার এমন জোর এখন নেই যে তার হাতের টিপে তালার মুখ বন্ধ হয়। নেমে বন্ধ করে আসবে? না। মূল্যবান জিনিষ খোঁরা গেলেও এখন সময় নেওয়া যায় না—আর এতো নেই-ই কিছু। যার বাবে। রক্তের সেওয়া টাকার বা হাতে আছে জয়ার দ্য'র একা সে

টাকা ক'টা এখন বর্তমান মুহুর্তে ওর একমাত্র ভরসা সে টাকা জে জয়ার মা সঙ্গেই নিয়ে গেছেন।

কতই বা বুঝ, গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে সাবপেটাইন লেন থেকে মেডিকেল কলেজ। দু' মিনিটে পৌঁছে দিলো ওদের ডাইভার মেডিকেল কলেজের প্রশস্ত সিঁড়ির চক্রে। মঞ্জু ট্যাক্সি-মিটারটার দিক একবার তাকালোও না। সে বিলম্ব জানে, যে অন্ধই মিটারে উঠে থাক ওর ব্যাগের সাধ্য নেই তা মিটারে দেবার। এ ছাড়িও দরকারও হতে পারে ট্যাক্সির। এমন অবস্থায় একটা ট্যাক্সি হাতের কাছে থাকা ভালো। ডাইভারকে ওয়েটি চাকের সঙ্গে বকসিস কল করে নেমে পড়ল মঞ্জু। কিন্তু তার পর? কোথায় এখন ওরা খুঁজবে ওদের, ক'বে ফিঙ্গার্স করবে জয়ারের কথা?

কি করা যায় ফিঙ্গার্স নিয়ে হুজনে হুজনের দিকে তাকালো।

—চলুন ইমার্জেন্সি কেস কোথায় নিয়ে যাব খোঁজ করি। অমল বলতেই মঞ্জু 'চলুন' বলে হাঁটা দিল তার সঙ্গে। কিন্তু খোঁজ করার জন্যও কোন দিকে যেতে হবে সেটা জেনে নেওয়া দরকার। ও মশাই শুভন, বলসেই অমল টেবিলে উঠল এঁতো ওরা মিঃ চৌধুরী পাড়িয়ে। মিঃ চৌধুরীদেরও অমলের দিকে চোখ পড়ে গেল। ডেকে উঠলেন তাঁরা। একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে হুজনে উঠে এলো চক্রে সিঁড়ি পার হয়ে উপরে।

না, কিছুই করে উঠতে পারছে না তারা। তবু হট্টো কুলী এসে জয়কে ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে ইমার্জেন্সি রুমের টেবিলে শুইয়ে রেখে গেছে। বাস! কোথায় ডাক্তার! কোথায় নার্স! ডাক্তার নাকি আর একটি ইমার্জেন্সি রোগীকে অপেক্ষন করছেন।

—চলুন।

মঞ্জুকে নিয়ে এলো তারা ইমার্জেন্সি রুমে। জয়ার মা কখনো কান্দছিলেন, কখনো ঘর-বার করছিলেন। কখনো মেয়ের কাছে গিয়ে তার হিম্মতল হাত-পা হাতে নিয়ে বসছিলেন গরম করে তুলবার জন্য। কখনো নাকের কাছে হাত ধরে দেখছিলেন খাস বইছে কি না। মঞ্জুকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মুখে আঙ্গুল চেপে থামতে ইসারা করে মঞ্জু এক মুহুর্তের জন্য রক্তশূন্য সাদা কাগজের মতো মুখটার দিকে তাকালো। তাকালো জয়ার ব্যাণ্ডেজবাধা রক্তভেজা হাতটার দিকে। রক্ত যে কেবল বেরিয়েই গেছে সব তাই নয়। যেটুকু অবশিষ্ট আছে অধীর্ঘ যে রক্ত ক'বিস্তর জন্য এখনও নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে জয়ার, তাও নিশ্বাসে বেরিয়ে চলেছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কোমরে অঁচল ও'ল মঞ্জু।

বারান্দার বেরিয়েই যে অকিস-শিরনটার সঙ্গে দেখা হলো তার কাছেই পাড়িয়ে পড়লো মঞ্জু। তোমাদের ডাক্তার বাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?

—কোন ডাক্তার বাবুর কথা বলছে সে? ডাক্তার বাবু তো একজন নয়?

এক-বোকা ও'বুধ ব্যাণ্ডেজ হাতে হনন করে ছুটে চলে গেল একজন নার্স তাদের পাশ দিয়ে। আর ছুটে চলা নার্সের

শেষের বাতাসটা বেন মজুর করে কানে ধরল করিয়ে নিয়ে গেল তুমি মমতায় খোঁজ করছ না কেন? সে যে যেডিকেল কলেজের ঠাক নার্স একজন—হানে নেই তোমার? মিস সেন, মিস সেনকে চেন তুমি? নার্স মিস সেন—মমতা সেন? বেন লোকটা মিস মমতা সেনকে চেন বলে তবেই সব খুশিকি আনানি হইবে যাবে তার।
চেনা? আবারও করে তার কাছে একটু নিয়ে চুলা না।
কল্প মিনতি করল মজুর।

আর আবেদন শেখকাতরতা কোন অজুকাই আর এসে রনে গায় জানাই না। চলতে চলতে জরাব ছিল সেন—সে জরারি জাগল নিয়ে চললো। তার পাঞ্জ নিয়ে হাওয়া সস্তর হয়ে না। কাশ নার্স—কোরাটার এখন থেকে লক্ষ পনরো মিনিটের পায়। খাটা খালেত হবে ডিউটি শেষ করে সে দিবিয়নি তার কোরাটারে চলে পৌছবে।

—পলপলরো মিনিটের পথ। আসতে যেতে আধ খটা।
কোন—কোন করা বার না একটা? লক্ষ লক্ষ চলতে চলতে কিজাসা করলো মজুর।

—যার কিন্তু সেখানে কোন করতে হলে সুপারিটেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়ে আগে অজুমতি নিতে হবে।

—কোথায় সুপারিটেণ্ডেণ্টের ঘর?

আজুল দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দিয়ে চলে বাড়িল সে। মিনতি করলো মজুর—তুমি আমাকে দর্য করে অন্ততঃ অকিসবরটার শৌছে দেও। আমি তোমাকে বখশিশ দেবো।

এবার কাজ হলো।

অতি বিনয়ের সহিত, সঙ্গে করে নিয়ে এসে সে শৌছে গিল মজুরে সুপারিটেণ্ডেণ্টের ঘরের দরজায়। মজুর বাগ থেকে ওর কলেজের বাতায়ত খরচার টাকাটা বের করে পিয়নের হাতে তুলে দিয়ে গিয়ে অকিসবরকে ঢুকল। সামনের চেয়ারটার বিনি বসেছিলেন মজুর জানে না তিনিই সুপারিটেণ্ডেণ্ট কিনা, তবু সে তাঁরই কাছে আবেদন জানালো—তাকে নার্স—কোরাটারে একটা কোন করবার অজুমতি দেবার জন্য। মজুর জানে না নার্সদের কোন করার এই অজুমতির নিয়মের কতটা কড়াকড়ি তার মুখের অস্থিরতায়, তার গলায় স্বরের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেই এতো অনায়াসে অজুমতি মিলে গেল কি না। জরালোকটি নিজে উঠে ডায়েরি ঘুরাতে ঘুরাতে কিজাসা করলেন, কাকৈ চান আপনি?

—মমতা সেনকে।

একবারে মমতা সেনকে ডেকে ওর হাতে কোন তুলে দিয়ে জরালোক গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

—হলো কে? কে আপনি? একটা মিটি গলা ভেসে হলো মজুর কানে।

—আপনি—আপনি কি মমতা সেন?

—হী। বলুন।

—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন কি না বুঝে উঠতে পারছিলেন। আমার নাম মজুর। আপনাদের বাড়ীতে আমি গিয়েছি। একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছিল কিন্তু পরিচয় হবার পৌঁজাঘ্য হয়নি।

এক বলক নিচু মিটি হাসির সঙ্গে জবাব এলো—আমি

খুব চিনতে পারছি আপনারকে। আপনার কথা আমি পাশা মুখে ভুলেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

—আমার এক বন্ধুকে অত্যন্ত সন্তোষের অবস্থায় আপনাদের যেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তার হাত কেটে গিয়ে অতিরিক্ত রক্ত পড়ে গেছে। কিন্তু এক ঘণ্টার উপর হয়ে চল আপনাদের ইয়ারজেলি রুমের টেবিলের উপর সে পড়ে আছে অজ্ঞান অবস্থায়—কি যে করবো—

—তাই। আমি একদমি আসছি। আপনি ইয়ারজেলি রুম চলে যান। যোন বাথার শব্দ হলো ঠক করে।

যদিও মিনিটের কাঁটাটা মজুর প্রতীকমান চোখের উপর ফিরে বার পাঁচ লাভের বেশী ঘুরে আসতে পেলো না। পোনরো মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে চলে এসে যাবে ঢুকল মমতা। ভোর ছাটা থেকে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত একটানা ডিউটি দিয়ে—কোরাটারে ঘিরে গিয়ে সে সব জান-খাওয়া সেরে একটু বিছানায় শরীর এলিয়েছিল। মজুর কোন পোরে যেতাবো ছিল সে জাবেই চলে এসেছে শুধু তির্যক চুলের রাশি হাতে জড়িয়ে করেখটা কাঁটা গুঁজে। এক খটা পরে না দিগে আগেই কোন খবরটা মজুর ওকে দিল না—মজুরকে একখাটাই বলতে বলতে চলে গেল সে একেবারে জয়ার টেবিলের কাছে। প্রথমই সে জয়ার ডান হাতটা হাতে নিয়ে নাড়া দেখলো। তারপর দেখলো কালো হয়ে আসা তার আঙ্গুলের ডগাগুলো। এক নজর তাকালো তার নীল হয়ে আসা চোঁট ছুটোর দিকে। তারপর এমন অবস্থায় করণীয়টা আগে করে নিলো সে; জয়ার হাতের রক্তজো ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে আটারি ফরসেপ নিয়ে এসে মুখটা আটকে দিয়ে নিল রক্ত পড়ার পথ বন্ধ করে। নিতান্তই হাতের স্পন্দ শিরা উপশিরা। কিছুক্ষণ রক্ত বেরুনার পর রক্ত জমে গিয়ে নিজ থেকেই থাকে, কিছু সময়ের জগ বন্ধ হয়ে ফের রক্ত জমে জমে চাপ সৃষ্টি হয়ে রক্ত ক্ষরণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। আর এই ভাবে কিছুক্ষণ পড়া আর কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার ভেতর চলছিল বসেই জয়ার এই নিঃশ্বাসটুকু এখনও বইছিল। নইলে কখন সব চলা যেতে যেত তার। কিন্তু আর সময় নেই। একটা গুরুকোজ সেলাইন এখন—এই মুহূর্তে দেওয়া দরকার—যদি মেয়েটিকে বাঁচাতে হয়। কিন্তু গুরুকোজ সেলাইন দেওয়া নার্সদের—বিশের জুনিয়ার ট্রেনিং নার্সদের পক্ষে একেবারেই আইন-বিরুদ্ধ! তবে তারা যে এ কাজ না করে বা কোন রকম আইনবিরুদ্ধ কাজ না করে তা মাত্রও নয়। নিজের হাতেই গুরুকোজ সেলাইনও সে দিয়েছে। ডাক্তার উপস্থিত থাকতন এই মাত্র। কিন্তু এখন লোকচক্ষুর উপর সে কিছুতেই একাক্র করতে পারে না। কিন্তু যার অবসর আছে, যে সময় দিতে পারে নিজের কাজ ছেড়ে আসবার এমন একজন ডাক্তার খুঁজে পেতে আনতে আর খটা সময় পার হয়ে যাবে—বে আধ খটা সময় রোগীর বিপদের কথা ভাবলে কিছুতেই দেওয়া যায় না। ফের জয়ার নাড়া দেখল মমতা তার ডান হাতটা তুলে নিয়ে। তার পর দাঁত দিয়ে পাতলা চোঁটটা কামড়ে ধরে দ্রুত হাতে জগুরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করে চলল রোগীকে গুরুকোজ সেলাইন দেওয়ার। হী সেই জরাকে সেলাইন দেবে। তারপর বখন এই আইনবিরুদ্ধ কাজের জবাব তার কাছে চাওয়া হবে, তখন তার জবাবের কথা ভাবা যাবে। [ক্রমশঃ]

আপনারও -চিত্রতারকাদের মত উজ্জ্বল লাবন্য হতে পারে

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত "লাক্স টয়লেট সাবান"
আমাদের ত্বকে লাবণ্য সর্বদাই প্রদান ও সুরক্ষা
প্রদান করে। লাক্সের সর্বোত্তম সৌন্দর্য আমাদের ত্বকে
প্রদান করে — এর ফলে পৌরুষ আমাদের সর্বদাই
প্রদান করে লাক্সের সৌন্দর্য।"
আপনিও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত লাবণ্যময়ী হতে
পারেন। লাক্স টয়লেট সাবান আপনার ত্বকে
সৌন্দর্য চর্চার সঙ্গী হোক। মনে রাখবেন
লাক্স প্রদানের সময় সত্যিই আনন্দপ্রসূক।

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ
লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান





ভাবানী মুখোপাধ্যায়

উনত্রিশ

বার্ণার্ড শ'কে প্রশংসা করা হল, Saint Joan নাটক লেখার পরিকল্পনা কি ভাবে আপনার মনে এল ?

বার্ণার্ড শ' উত্তরে বললেন—আমি অবস্থার দাস, যদি আমাকে নাটক লিখতে বলা হয় আর মাথায় যদি আইডিয়া থাকে, তাহলে সেই অনুরোধ আমি রাখবো কিন্তু সেখা যায় ঠিক সেই জাতীয় নাটক কেউ চায়নি। Saint Joan শুরু করার আগেও এই অবস্থা, যাহা কিছু লিখতে চাই কিন্তু মাথায় কোনো আইডিয়া নেই। আমার দ্বী বললেন—Joan of Arc চরিত্র নিয়ে একটা নাটক লেখ না কেন ? আমি তাঁর কথা রেখেছি। আমি জেনের বিচার এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিবরণ পড়েছিলাম, তখনই মনে হয়েছিল এর মধ্যে নাটক আছে, শুধু বিজ্ঞানের প্রয়োজন ঠেকের উপযুক্ত করে। আমার কাছে এ ছেলেখেলা। প্রাচীন জোন সম্পর্কিত নাটক এবং ইতিহাস রোমান্সের ফাল্গুস আমি সমসাময়িক বিবরণ পড়েছিলাম, কিন্তু সমালোচনা বা জীবনী পড়েছি নাটক রচনা শেষ করে। প্রথম প্রোটেষ্টান্ট হিসাবে জেনের ভূমিকা আমাকে আকর্ষণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গের লাক্তনা আমি বুঝি। আমি পরিশেষে জেনের মৃত্যুর পর কি হল তা বলায় চেষ্টা করেছি, বাকী অংশ সমগ্র ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণী। প্রথমে নাটকটা অনেক দীর্ঘ হয়েছিল, পরে কেটেফুটে কঙ্কালটুকু রেখেছি মাত্র। তবু অনেকে মনে করেন সাড়ে তিন ঘণ্টার অর্ধ—কঙ্কালের অনেকটা অংশ।

বার্ণার্ড শ'র Back to Methuselah নাটকের পর সকলে মনে করেছিল তিনি নিঃশেষিত, বিশেষ কিছুই আর দেওয়ার নেই। তাঁর নিঃশেষণে ধারণা এই তাঁর সর্বোত্তম রচনা। তাঁর অনুরাগী পাঠকের অনেকেই বলেন, না Man and Supermanই শ্রেষ্ঠ, এবং Saint Joan যে শ্রেষ্ঠ নাটক এই অভিমত পোষণ করেন ধীরে ধীরে সংখ্যার কম নন। এই নাটক অতি জনপ্রিয়। বার্নার্ড শ' এই নাটক রচনার অভিজ্ঞত হয়ে পড়েছিলেন, তাই যেখানে যাতক বর্ষ ত্বকের শেষে বলেন—You have heard last of her তখন

ওয়ার্ডটাইক সহান্তে বললেন—The last of her ? Him ! wonder

এইখানেই নাটকের শেষ হলো তা সঙ্গত হত। সমালোচকের এই মত, কিন্তু লেখকের মত বিভিন্ন, তাই তিনি Epilogue বা পরিশিষ্ট ছুড়ে দিয়েছেন, তার কারণও বললেন।

পুরোহিত আর রাজনৈতিকের কাছে যদি জোন মতি স্বীকার করে, তাহলে তার প্রাণ বাঁচে, কিন্তু জোন আপোহ-বিরোধী। বা অজ্ঞার মনে করে তার কাছে মতি স্বীকার তার চরিত্র-বিরুদ্ধ। সে তার বিশ্বাসে অচঞ্চল। সে বলে—কোথার থাকতে আজ তোমরা, যদি আমি তোমাদের কথাই মেনে নিতাম ? তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য, কোনো উপদেশ আমি পাইনি। হ্যাঁ, আমি এই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ। চিরদিনই এমন একা। আমার হাধা আমার ডায়েরের হৃদয় দিয়েছিলেন আমাকে জলে ডুবিয়ে দিতে, যদি আমি তাঁর ভেড়াগুলো না দেখি, ওদিকে তখন জ্বালে হৃদয় তাণ্ডব চলেছে। আমাদের ভেড়াগুলো হত নিরাপন্ন হত, কিন্তু জ্বাল ধ্বংস হয়ে যেত। আমি ভেবেছিলাম করাসী সম্রাটের রাজসভার জ্বালের মিত্র আছে, কিন্তু দেখলাম, জ্বালের ছিন্ন মৃতদেহটা নিয়ে নেকড়েদের লুণ্ঠ হানাহানি। ভেবেছিলাম ঈশ্বরের সর্গদ্রই মিত্র আছে, কারণ তিনি সকলের বন্ধু, আর সরল মনে ভেবেছিলাম আজ আপনারা ধীরে আমাকে এখন এই ভাবে অপসারণ করছেন, তাঁরা আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, আপনারাই আমার শক্তিস্থান হৃগ্তোত্তরণ। কিন্তু এখন আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত।

বার্নার্ড শ' এই নাটকে স্বদীর্ঘ উক্তি দিয়েছেন, ছাপার অক্ষরে তা অনেকাংশে আড়াই পাতার বেশী এবং উচ্চারণ করতে সাত-আট মিনিট লাগে, তবু এই স্বদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রোতার মন দিয়ে শুনছে। বিশেষতঃ জেনের উক্তিগুলি এত সুন্দর কাব্যাত্মক ভঙ্গিতে রচিত যে, অভিনয় না দেখে এই নাটক পাঠ করলেও আনন্দ পাওয়া যায়।

জোন যেখানে বলে—You promised me my life ; but you lied. You think that life is nothing but not being stone dead. It is not the bread and water I fear—I can live on bread : when have I asked for more ?.. Bread has no sorrow for me and water affliction.....

তার পর উত্তেজিত পুরোহিতগোষ্ঠী উদ্ভা ও ক্রোধে জোনকে ডাইনী ঘোষণা করে প্রাকৃতিক বাজারে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারে। এমন নাটকীয় বিষয়বস্তু আর বার্নার্ড শ'র বিভিন্ন রচনা-কৌশল দর্শককে আকুল করে তোলে।

কঠিন-স্বল্প সমালোচকও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন Saint Joan বার্নার্ড শ'র শ্রেষ্ঠতম রচনা।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটক রচনাকালে বার বার নানা ছোটোখাটো অনুরোধে বার্নার্ড শ'কে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, এখন আর কোনো কিছু নয় I must get my Joan of Arc play through the press and on to the stage—for the moment, spare me. I will make good later.

জ্বাল ছারিসের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব, তিনি বার্নার্ড শ'র একটি জীবনী লিখেছেন। নিছক ভালোবাসার থাকিতে নয়, অর্থের প্রয়োজনে। এই জীবনীর পরিশেষে The Saint Joan Row

নামে একটি পরিচ্ছেদে, Saint Joan নাটক সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র মত তাঁর কি পজালাপ হয়েছিল এবং কোথায় বিরোধ তা বর্ণিত হয়েছে। বার্নার্ড শ'র অপর একজন জীবনীকার আর্কিবাল্ড হেনডারসন বলেছেন—Saint Joan is the greatest play in english since Shakespeare—ফ্রান্স হারিস বলেছেন, এই কথাতেই বার্নার্ড শ'র মাথা ঘুরে গেছে। এই নাটক ফ্রান্স হারিসের মতে ঐতিহাসিক ক্রুটি, সাধারণ ভুল ভ্রান্তি এবং নাটকীয় দুর্বলতায় পরিপূর্ণ। বার্নার্ড শ' বলেছেন, most other writers made Joan an operative heroine—a grand opera stunt. What she really was did not interest them—

এর পটভূমিকার আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, ফ্রান্স হারিসও জোনের জীবন নিয়ে লিখেছিলেন Joan La Romee—বার্নার্ড শ' এই গ্রন্থ নির্বোধের রচনা বলেছিলেন। পশ্চিমের মানুষেরা কিঞ্চিৎ শাষ্টবানী, তাই ফ্রান্স এ কথাও স্বীকার করেছেন—Shaw did not like my play and that, you may be sure, quite obviously influences my judgment of his Saint Joan.

বার্নার্ড শ' তাঁর Men and Superman নাটক তাঁর বন্ধু এ. বি. ওয়াক্লির নামে উৎসর্গ করেছেন। Saint Joan প্রকাশিত হওয়ার পর Times পত্রিকায় ওয়াক্লি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন, তিনি এই প্রবন্ধে স্বীকার করলেন, তিনি নাটকটি পাঠ করেননি এবং চোখেও দেখেননি, তবু তাঁর মতে বার্নার্ড শ'র মত মানুষের এমন একটি গভীর এবং মহৎ বিষয়বস্তুকে রূপদানের চেষ্টা হাশ্বকর। সমালোচনা-সাহিত্যে এমন অভূতপূর্ব উত্তির আর নজীর নেই। যাই হোক, পরে কিন্তু ওয়াক্লি নিজের ক্রুটি বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছিলেন।

পৃথিবীর সব দেশেই বন্ধুরাই বন্ধুকে আক্রমণ করে অশোভন ভঙ্গিতে।

ঐতিহাসিকরাও বার্নার্ড শ'র রচনার তথ্যগত ক্রুটি সম্পর্কে বলেছেন। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অগ্রণী পণ্ডিত ডাঃ জি. জি. কুলটন নাটকটিকে উচ্চ প্রশংসা করেছেন কিন্তু ভূমিকাটির তাঁর নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—

মিঃ শ'র Saint Joan নাটক হিসাবে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে, তাঁর পরিকল্পিত জোন চরিত্র ইতিহাসের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণভাবে গঠিত; তবে তাঁর সুদীর্ঘ ভূমিকাটুকু বালকোচিত বিবেচনা করা যেতে পারে। তবু স্বীকার করতে হবে এই নাটক বার্নার্ড শ'র সার্থক রচনা।

হাইয়ের গ্যারিক থিয়েটারে ১৯২৩-এর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে Saint Joan প্রথম অভিনীত হয়। অভিনেত্রী উইনিফ্রেড সেনিহান জোন চরিত্রটিতে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। এই নাটকটি অতি ক্রুত মার্কিন দর্শকের মনে লাগল, তাঁরা বুঝলেন যে একটি মহৎ নাটকের প্রথম প্রদর্শন দেখার সুযোগ তাঁদের মিলেছে। কিন্তু সংবাদপত্র ও সমালোচকরা বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করলেন না, বরং কিঞ্চিৎ বিতর্ক মনোভাবই প্রদর্শন করলেন।

প্রথম রজনীতে এমন দর্শকের ভীড় হল যে পরদিন অল্প রক্তকে অভিনয়ের ব্যৱস্থা করতে হয়। The Shaw Bulletin নামক শ' সোসাইটির মুখপাত্র ডাঃ এলিস গ্রিফিন এই প্রথম রজনীর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হাইয়ের নাট্য-সমালোচকরা যদি এরূপের মতো শক্তিম্যান হতেন তাহলে হয়ত হাইয়ের Saint Joan এর এত সাফল্য সম্ভব হত না। আলেকজান্ডার উলকট অবগত বলেছিলেন—beautiful engrossing and at times, exalting. আর হাইয়ের তদানীন্তন বিখ্যাত সমালোচক মিঃ ওয়ালটার প্রিচার্ড ইটন কিন্তু অপর উক্তি করেছিলেন—Shaw is not only one of the keenest minds in the world to-day, he is one of the most religious men—Saint Joan is the work of a religious soul!

সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতালীয়ান লেখক ও নাট্যকার লুইজী পিরান্দেলো এই সময় হাইয়ের ছিলেন। তিনিও উদ্ধৃতিত প্রশংসা করেন।

নাটক লেখার অনেক আগেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী ঠিক কার বেখেছিলেন বার্নার্ড শ'। অনেক আগেই সিবিল অর্গডাইক ক্যানডিডা ভূমিকা চেয়েছিলেন, শ' তখন বলেছিলেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে ঘরকন্নার কাজ করো, চারটে ছুটা ছেলে হোক, তারপর এসে ক্যানডিডায় অভিনয় করো। এট উপদেশ পালাল



ফোন ৩৪-৩২৩০

পি.সি.আড

জুয়েলার

১২৫ বি বহুবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-১২

করে ফিরে এসে ক্যানডিডা অভিনয় করেন। যুদ্ধের পর তাঁর স্বামী লুইস কাসন ও তিনি কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক মঞ্চ করেন।

সেই নাটকগুলি কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে তেমন সাফল্য লাভ করেনি। ঋণভাঁটিক দশপতি স্থির করলেন The Cenci নাটকের ম্যাটিনী প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করতেন। সবাই বলেছিল এই নাটক ধোঁরো না, একেবারে জমবে না, বন্ধুবা বললেন তোমরা সর্বনাশ ডেকে আনছো। কিন্তু তাঁদের তখন অবস্থা মরি আর বাঁচি এই নাটকই ধরা থাক। The Cenciর জন্ম গেল, এমন কি আগেকার জনপ্রিয় নাটকগুলির ক্ষতিপূরণ হল এই নাটকের সাফল্যে। আর এই নাটকের জন্মই ঋণভাঁটিক পেলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা, বিচারমুখে সিবিল ঋণভাঁটিকের অভিনয় দেখে শ' মুগ্ধ হলেন। তাকেই 'জোনের ভূমিকা দেবেন স্থির করলেন।

সিবিল ঋণভাঁটিক আর তাঁর স্বামী লুইস কাসনকে বার্লিড শ' আহ্বান করলেন গ্রায়াট সেট লরেঞ্জের বাসভবনে। সেদিন বার্লিড শ' তাঁদের কাছে Saint Joan পাঠ করে শোনালেন। এই দিনটি সিবিলের জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল।

সিবিল বলেছেন—কি অপূর্ণ তাঁর আবৃত্তি, যেন এক আশ্চর্য সুরকারের কণ্ঠ এক মধুর সঙ্গীত শুনিছি, তিনি জানেন কোথায় কি সুর, প্রতিটি লাইন যেন এক অপূর্ণ সঙ্গীত। প্রতিটি চরিত্র অর্কেস্ট্রায় বিভিন্ন যন্ত্রের মত সুর সৃষ্টি করছে। আর যাদুকর বার্লিড শ' জানেন কখন কি সুর বাজাতে হবে। সেই সুরভরঙ্গ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

এই নাটক বার্লিড শ'র কণ্ঠে বার বার তিন বার শুনেছেন সিবিল ঋণভাঁটিক, আর নাট্যকারের কাছ থেকে নিজস্ব ভূমিকাটি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। আর কোনও অভিনেত্রীর জীবনে এই সুযোগ আসেনি এক বার্লিড শ'র মতে এমন সার্থকভাবে কোনো চরিত্র কেউ এভাবে অভিনয় করেনি।

লণ্ডনের নিউ থিয়েটারে ২৬শে মার্চ ১৯২৪ এই নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট উভয় দলই এই নাটককে সমান মর্যাদা দান করেছেন, নাটকভিত্তিক দেখে খুসী হয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, আপনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন নাকি? জবাবে বার্লিড শ' বলেছেন—“রোমান ক্যাথলিক চার্চে ত 'আর দুজন পোপের স্থান হবে না, তাহলে হরত তাই হতাম।” লুইজকে উইনিগেড সেনিহান আর লণ্ডনে সিবিল ঋণভাঁটিক (পরে ডেম সিবিল ঋণভাঁটিক), দুজনেই সমান খ্যাতি অর্জন করেছেন জোনের ভূমিকার অভিনয় করে। এই অভিনয়ের ফলে পুরুষের পক্ষে যেমন 'হামলেট' নাটকে হামলেটের ভূমিকা তেমনই মেয়েদের পক্ষে Saint Joan নাটকের জোন চরিত্র। ১৯৩১-এ লণ্ডনে এই নাটক বরন নতুন করে মঞ্চস্থ হল তখন আবার অনেক সন্তোহ চলছিল।

রিহার্সেলের সময় বার্লিড শ' সিবিল ঋণভাঁটিককে প্রশ্ন করলেন—
জোন সম্পর্কে কোনো বই পড়েছ নাকি?

সিবিল বললেন—হ্যাঁ, যা সংগ্রহ করতে পেরেছি সবই পড়ে
কলেছি।

উত্তরে শ' বললেন—তাহলে, সব কুলে বাও, আমি মূল দলিলকে
মাটিকারিত করেছি।

সবাই জোনকে দিয়ে এতদিন রোমান সৃষ্টি করেছে, আমি ঠিক
যেমনটি খুঁজেছি তাই বলেছি। আমার মনে হয় যা নাটক এতখান
লিখেছি এই নাটক সবচেয়ে সহজ। আমি তথ্য সমাবেশ করেছি,
জোনকে ঠোঁড়ের উপযুক্ত করে পরিবেশন করেছি। বিচার মূহ
আসল বিচার মুক্তেরই রিপোর্ট। আমি জোনের প্রতিটি কথাই
ব্যবহার করেছি, যেমনটি বলেছে, যেমন করেছে।

বার্লিড শ'কে আমেরিকার থিয়েটার গিলড, অল্পরোধ করেছিলেন
Saint Joanকে কিঞ্চি কাটছাঁট করে ছোটো করতে, কারণ
অভিনয় শেষ হতে মধ্যরাত্রি হয়ে যায়। বার্লিড শ' জবাবে বলেছিলেন,
হয় একটু আগে অভিনয় শুরু করো, নয় রাতের শেষ ট্রেনের সময়
কিঞ্চি পিছিয়ে নাও।

বলা বাহুল্য, দর্শকের অভাব ঘটেছিল। কি লুইজকে কি লণ্ডনে
সাধারণ দর্শক Saint Joan অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছিল।
লুইজী পিরানেল্লো এই নাটকের অভিনয় দেখে তাই বলেছিলেন—
ইতালীয় রঙ্গমঞ্চে যদি Saint Joan এর চতুর্থ অঙ্কের মতো বসিষ্ট
অংশ অভিনীত হত তাহলে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী উঠে দাঁড়াত এবং
যবনিকা পতনের পূর্বেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উদ্‌যত্তের মতো
করতালি দিয়ে উঠত।

তিন বার এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, তিন বারই তার সাফল্য
ঘটেছে অসামান্য। Pygmalion নাটকের সাফল্য এই নাটকের
কাছে দূর হয়ে গেছে।

এখন থেকে বার্লিড শ' Saint Joan নাটকের নাট্যকার
হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হলেন। যখন কেউ প্রশ্ন করতো আপনি জোনের
জন্ম এত দূর গেলেন কেন? শ' জবাবে বলেছেন—কারো জন্ম বা
কোনো কারণ আমি কখনো কিছু করিনি। আমি কবি, চূর্ণকারের
বেপারি নই (I am a poet and not a soot and white
wash merchant), যা জোনের প্রাণ্য তাকে দিয়েছি
আর যা অপরের তা দিয়েছি তাদের। নাট্যমঞ্চকে এতদিনে
তাঁর আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এইবার সুপ্রতিষ্ঠ
হল। জর্জ বার্লিড শ' এখন মনীষী, মহাপুরুষ, মহাজ্ঞান। তাঁর
পাকারাদি, অসংখ্য উচ্ছল-নীল চোখ এবং স্বচ্ছ স্তন্যদেহ যেন
যুদ্ধের আকৃতি চিরযোদ্ধার প্রতীক। ভ্রমাত্মক বলেছেন—
'Sages, once acclaimed, retired into solitude to
become sapless with ennui—' বার্লিড শ' এই উক্তি
ব্যক্তিগত। তাঁর সমগ্র স্বর্গ সাহিত্য-জীবনের চরম পরিণতির
কাল ১৯২৪। তাঁর মর্যাদার সীমা নেই। যা তিনি বলেন তা
লোকে সজ্ঞ চিন্তে শোনে, সঙ্গমভরে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য
করে। যা কিছু তাঁর উক্তি সবই সারা পৃথিবীতে তারবাণে
প্রচারিত হয়, বিশ্ববাসী তা উপভোগ করে, গ্রহণ করে। তাঁর
রসিকতা, তাঁর অদ্ভুত বক্তোক্তি, বিশ্বমানবের মনে জ্ঞানসাধকের
বহু চিন্তা ও সাধনা লঙ্ঘন বাধী হিসাবে গ্রহণ করে।

বিত্তীয় মহাযুদ্ধের কালে সমর-দপ্তর (ওয়ার অফিস) তাঁকে
অল্পরোধ জানায় আপনায় তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচন করে দিল,

স্বল্পের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বার্লিট শ' সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর নাট্যকালীর বিচার শুরু করলেন। কিন্তু মন স্থির করা কঠিন। তিনি বললেন, এর কারণ, আমি ত' আর খুলমাঠার নই যে পরীক্ষার খাতার নম্বর দেখ। বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন ক্রম ভালো লাগে। তাদের পিছনে আছে ভাবাবেগমিশ্রিত ইতিহাস। Mrs. Warren's profession ও The snewing up of Blanco posnet—নাটক দুটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। Candida এবং Man and Superman নাটকে প্রাপ্তিল বার্গারের অভিনয়ের দৃষ্টি বিজড়িত। Arms and the Man নাটকে প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বসিকতা করেছেন, আর Back to Methuselah নাটকে বার্লিট শ' তাঁর সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন, 'কঠিন সেবার হবিধা বিধেয়?' 'কারে রাখি, কারে দেখি কে বেশী সুখের?' বার্লিট শ'র মনে হল এর চেয়ে মনঃপশুর বহিঃস্বার্থে কবিতা নতুন নাটক লেখার, কাজটা অনেক সহজ হত। তাঁর মতো স্ত্রোযোগ্য ভাবে কে আর সে কাজ পারবে!

অশেষে নির্ধাতিত হল, Androcles and the Lion। Pygmalion আর Saint Joan। এর কারণ এই তিনটি নাটকই আছে করণ আবেদন। এই নিদারুণ হৃদয়ময় এই নাটকের আবেদনই সর্বাধিক। তিনি শুধু একটি মাত্র অস্বার্থে জানালেন এই সব নাটকের 'ভূমিকার' অংশটুকুই বাদ দেওয়া চলেবে না। ভূমিকাগুলি বিচিন্ন। Androcles and the Lion নাটকের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে—

I am ready to admit that after contemplating the world and human nature for nearly sixty years, I see no way out of the world's misery but the way which would have been found by Christ's will if he had undertaken the work of a modern practical statesman.

আর শেষ গ্রন্থ Saint Joan নাটকের শেষ কথা সেট জ্ঞানের কর্তৃ আবুল প্রার্থনা না আর্দনা—?

O god that madest this beautiful earth, when it will be ready to receive thy Saints? How long O Lord, how long?

সেই চিরন্তন প্রশ্ন হে ঈশ্বর! কত দিন? আর কত কাল?

Saint Joan এর কলে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠলেন কর্তৃ বার্লিট শ'। এই ১৯২৪-এ তিনি বহুবিশেষে জনিত নিদারুণ আঘাত পেলেন। আজীবন সহযোগী বন্ধু উইলিয়াম আর্চার, বিপক্ষে, সম্পদে বিনি বার্লিট শ'কে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হঠাৎ ১৯২৪-এর ১৭ই ডিসেম্বর নার্সিং হোম বাতায় প্রাক্কালে বার্লিট শ'কে লিখলেন—

—তোমাকে চিঠি লেখার পর জানা গেল, ক'দিনের ভেতর একটা অপারেশন করানো প্রয়োজন। কাল নার্সিং-হোমে যাচ্ছি। অপারেশন হয়ত তুমি গুরুতর নয়, আমার শরীরও বেশ ভালো। সুতরাং সেবে উঠবে আশা রাখি। তবু বিপদের কথা বলা যায় না, তাই এই হৃদে দু-একটা কথা বলার স্ত্রোযোগ্য নিছি, তুমি ত জানো যে

মাঝে মাঝে তোমার হিঠেবা সংশোধক হিসাবে কিছু বললেও তোমার প্রতি আমার প্রভা বা ভালোবাসা কখনও ক্রুর হয়নি। কখনো এ কথা ছাড়া আর কিছু ভাবিনি যে অষ্ট্রেলিয়া তোমার মত একজন সমসাময়িক বন্ধু লাভ করেছি। শ্রুতী চল্লিশ বছরের বন্ধুদের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি তোমার

ডর, এ—

কিন্তু আর্চার হাই ভাবুন, সে যাত্রা তিনি যুগ্ম পেলেন না, ২৭শে ডিসেম্বর নার্সিং-হোমেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বার্লিট শ' সে সময় বিদেশে বেড়াতে গেছেন। এমন এক বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে ক্ষিপ্ত হলেন বার্লিট শ', তিনি বললেন, আর্চারকে হত্যা করা হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অনেক, মতের অমিল অনেকখানি, তবু উভয়ে বন্ধু। গভীর ভালোবাসার চূড়ানের জীবনমুহুরে বাঁধা, তাই লগুনে ফিরে এসে বার্লিট শ' বলেছিলেন—আর্চারইনি লগুনে ফিরে এসে মনে হচ্ছে এ যেন এক মৃত্যু যুগ্ম এসেছি, এই পরিবেশে আমি প্রয়োজনাত্মিক উদ্ভূত যাত্র। এবদও মনে হয়, আর্চার আমার জীবনের একটা বড় অংশ সজ্জা নিয়ে গেছে।

উইলিয়াম আর্চারের বিয়োগবেদনা বার্লিট শ'র হৃদয়ে যে আঘাত করেছিল, ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বিয়োগেও তিলি ভেদন বিচলিত হননি। চল্লিশ বছরের বন্ধুদের মধ্যে কত মান-অভিমান, কত

বাসবী বন্ধুর

বন্ধনহীন গ্রন্থি

দাম হু' টাকা মাত্র।

'বন্ধনহীন গ্রন্থি' একখানি বহু পৃষ্ঠার উপভাস। কিন্তু এই উপভাস-খানির মধ্যে লেখিকা এমন একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন যাঁর মধ্যে এতটুকু শিথিলতা ও শালীনতার অভাব প্রকাশ পেলে বন্ধনহীন সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পর্ববসিত হ'ত। সাহিত্যক্ষেত্রে একজন নব্যগতা লেখিকার পাশে আন্দর্য প্রেমের লিখন শক্তির পরিচয় পাঠকমাত্রকেই হুঁত করবে। যে কাহিনীর তিনি অবতারণা করেছেন, সত্যিই এমন কাহিনী বিবল সংস্কার নেই, কিন্তু তা অব্যবহৃতও যে নয়, লেখার মাধুর্য দিয়ে, সমগ্রা দিয়ে আর বক্তব্যের সূত্র দিয়ে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন তিনি। এই প্রেমারের শাস্ত্র নায়ক নায়িকা অজর ও কদিকার চরিত্র দু'টি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নিজেরের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই অজর ও কদিকা বামী-জী। দীর্ঘদিনে শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবন বাপনের পর দু'টি সন্তানের মা কদিকা একদিন বামী অজরের কাছে প্রকাশ না করে পারে না, বিবাহ-পূর্ব-কালে তার অনিচ্ছাসিদ্ধ পদখলনের কথা; শুধু পদখলন নয়, তার এক মেয়েবিশ্বাসিত উৎসাহিত জীবিত এক বক্তার কথা। অকস্মাৎ সমাজিক এই কথা ডাক্তার বামী অজরকে কিভাবে যে আঘাত করে তা সহজেই অনুমের। জী কদিকাও যে অসহায় মধ্যে দু'টি সন্তানের পর্ববাসিত হয়েও প্রাণপ্রিয় বামীর কাছে এই বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয় তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনামূলক, তেমনি দৃষ্টান্তপূর্ণ।—বন্ধনহীন ১৮.১.৬০ প্রকাশক: বলাকা প্রকাশনী, ২৭শি, আমহারি ট্রাট, কলিঙ্গ-২

ছোটোখাটো কথ-কথ, কত খসি ইতিহাস বিজড়িত তা বার্ণার্ড শ' বুঝেছিলেন বলেই এক কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

উইলিয়াম মরিসের মৃত্যুর পর শ' লিখেছিলেন—*You can lose a man like that by your own death, but not by his* উইলিয়াম আর্চারের মৃত্যুতে এই শোক আরো গভীরভাবে বেজেছে, তার আর একটি কারণ তত দিনে বার্ণার্ড শ'র বয়স অনেক বেড়ে গেছে, অনেক আত্মীয় ও বন্ধুজনের বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁকে বার বার আঘাত করেছে, আর সব চেয়ে বেশী কারণ হয়ত আর্চারের সর্বশেষ চিঠিখানি। মৃত্যুর পূর্বে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাঁর আত্মীয় মৃত্যুর আশঙ্কা বৃদ্ধিতে পালে।

জিহ্না

পুট্‌ডিস আকাসেমির নোবেল কমিটিতে চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্য বার্ণার্ড শ'কে নোবেল পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করে লিখলেন—

জর্জ বার্ণার্ড শ' তাঁর তরুণ বয়সে লিখিত উপন্যাসে পৃথিবী ও তার সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সেই ধারণায় তিনি আজও অব্যাহত আছেন। তিনি গণতন্ত্রের রাজদরবারে পেশাদারী দরবার, এই দুইটি অভিব্যঙ্গনের বিরুদ্ধে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাঁর উজ্জ্বল শানিত সমস্যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তিনি বা বলেন তা সবই বসিকতা করে 'সিঁদাই' হেসে উড়িয়ে দেয়। বার্ণার্ড শ'র এই নিশ্চয় ভঙ্গীই তাঁর বিচিত্র বনাকোশল, মানুষকে হাসিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করেন বা তাঁর আসল বক্তব্য তা সহজে ধরতে পান না।

এই সত্তর পুষ্টির কালে বার্ণার্ড শ'র জীবনে অনেক সম্মান এসেছে। প্রায় বর্ষিত হওয়ার উপক্রম হল। সরকারী জগতের কাছে সমস্ত বছরই বোধকরি বিচারের পক্ষে কথাবোধ্য। সাহিত্যের স্বীকৃতিতে প্রদত্ত নোবেল প্রাইজ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। ৯০ লেবর পার্টি গঠনে একসা তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেই লেবর পার্টি ক্ষমতার আসীন হয়ে তাঁকে পীরদর দান করতে চাইলেন, লর্ড বার্ণার্ড শ' তাঁর পছন্দ নয়, তিনি জবাবে বললেন তোমরা আমাকে ন্যূনতম হুত ডিকর দিতে পারো, কিন্তু আমার পোষাবে না, সুইবে না। তখন তাঁরা বললেন, তাহলে Order of merit নাও। বার্ণার্ড শ' উত্তরে জানালেন, I have already conferred it on myself। তাঁর বন্ধু কিছু ভীষণ আহত হলেন এই উক্তিতে।

হুনিভারসিটির অনারারি ডিগ্রীও বার্ণার্ড শ' নিতে চাইলেন না, বললেন যে সব মানুষ উপাধি ও ডিগ্রীর জন্য আগ্রহ খেটেছেন তাঁদের অপমান করা হবে, কারণ বিনা পরিজ্ঞানই নিছক সম্মানের

বাতির অপরে বিদ্যুৎ ও বিনা বাতলে উপাধি পাবে, এ কোম কথা।

বার্ণার্ড শ' অনেক বয়সে, দক্ষিণ ইংল্যান্ডের প্রান্তে এসে ব্রহ্মণ করলেন Freedom of Dublin, এই তাঁর জন্মস্থানের সম্মান। অথচ আত্মীয় তিনি এই জায়গাটা অশুভ করতেন। যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই মরো সেট প্যানক্রাস তাঁকে সম্মানিত করল Freedom of the borough of St. Pancras উপাধিতে, এই মরোতেই তিনি একবার কাউন্সিলর হয়েছিলেন। আরো ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন ব্রহ্মণ করলেন Freeman of the city of London। লন্ডন করার বিবরণ এর সবগুলিই নাসরিক সম্মান, তার জন্মভূমি, বাসস্থান এবং বিচরণ কেন্দ্রের প্রদত্ত সম্মান।

নোবেল প্রাইজ গ্রহণে আপত্তির কারণ যে কোনো উপাধি বা পুরস্কার নিতেই বিতর্ক। এখন তাঁর যথেষ্ট সম্পত্তি, লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। ৬,৫০০ পাউণ্ডের চেক ফেরৎ দেওয়ার সময় বললেন, আমার পাঠক এক নাটকের সমর্থকরাই আমার ভরণ শোষণের ভার নিয়েছে, এই চেক ঘেন তাঁরে উত্তীর্ণ দাঁতাককে লাইফবেল্ট ছুঁড়ে দেওয়া (a life-belt thrown to a swimmer who has already reached the shore in safety.)

৬,৫০০ পাউণ্ড, দুই ডিস ফ্রোনারে ১৯৮.১০৫। বার্ণার্ড শ'কে বহু প্রার্থী এই টাকার জন্য লিখতে লাগল, সবাই বলে, তুমি না নাও, নিয়ে আমাদের দাঁও, আমাদের এত অভাব, এত সংকট করার আছে ইত্যাদি। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে ঘর বোঝাই হয়ে গেল। বার্ণার্ড শ' বললেন—ডিনামাইট আবিষ্কারকের অধিরা আমাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পর প্রায় পকাশ হাজার লোক আমাকে চিঠি লিখে বলেছে—টাকাটা নিয়ে আমি বেন তাগের নিয়ে দিই। অথচ আমি দাতাদের টাকাটা ফেরৎ দিলাম। তখন সবাই লিখল ফেরৎই যদি দিলাম, তবে ১৫০০ পাউণ্ড হিসাবে তিন বছর ধরে কর্তৃক দিলাম না কেন?

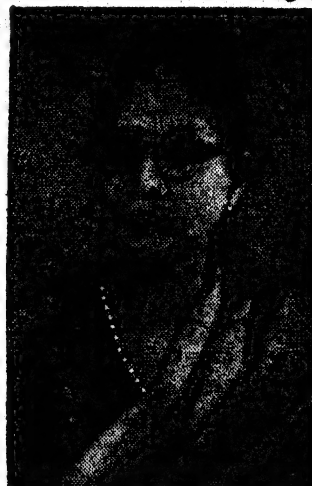
বাই হোক বার্ণার্ড শ' দুই ডিস-সাহিত্যের প্রচারের জন্য Anglo-Swedish Literary Foundation স্থাপন করলেন, দুই ডিস ফ্রোনারি ব্রিগল তার পুঁটপোষক। ১৯২১ এ আগস্ট ১১তমবার্গের চারখানি নাটকের জর্জমা প্রকাশ করলেন এই কাউন্সিলর; ১৯০১-এ আরো সাতখানি গ্রন্থ অঙ্গদিত হল, তার মধ্যে তিনটি গ্রন্থবার্গের নাটক। বৃদ্ধিতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আরো করেকটি গ্রন্থ অনুলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—*I can forgive Alfred Nobel for having invented dynamite. But only friend in human form could have invented the Nobel prize!* [ক্রমশঃ]

... এ সমস্ত প্রচুরপট ...

এই সমস্ত গ্রন্থের পাঠ্যতা পাঠ্যকার আলোকচিত্র হুক্তি ইইয়াছে।
আলোকচিত্রশিল্পী বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

প্রতিভা বহুর নতুন উপন্যাস

প্রতিভা বহু বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কোনো একতার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়, মরনারীর চিরন্তন প্রেমসত্তাই তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু; জীবনের উজ্জ্বল স্তম্ভসমূহের আনন্দকণিকা আহরণেই তাঁর অকুরন্ত আগ্রহ। আধুনিক প্রেমের পরিভাষায় প্রতিভা বহুর 'মনের মদুর' 'মাধবীর জন্ম' 'বিবাহিতা স্ত্রী' 'ভিন্ন তরঙ্গ' 'যেথের পরে যেথ' ইত্যাদি গ্রন্থের সরস ও বজ্জ্বল কাহিনীগুলিতে নারী-হৃদয়ের, বিশেষ করে বাঙালী নারী-হৃদয়ের যে কোমল নিখর রূপাঙ্কিত হয়েছে সমকালীন সাহিত্যে তার তুলনা বিয়ল।



..স মু দ্র-হৃ দ য়..

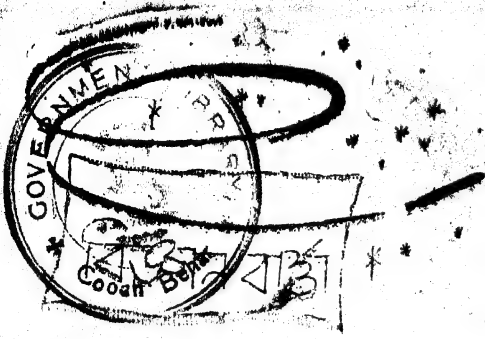
..স মু দ্র-হৃ দ য়..

'স মু দ্র-হৃ দ য়' প্রতিভা বহুর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের আরেরগিরি থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব শুলতান আমাদের ভালো লাগার আলো কি করে ভালোবাসার আলোনে আবহিত হ'লো আর নবাবের সবুজবহলে বন্দিনী তেজবিনী শুলেখা ভালুকদারের চিরসঞ্চিত অন্ধ আক্রোশ অবশেষে কোন অভ্যাস যমতার আকুল উবেল, 'সমুদ্র-হৃদয়'-এর নিরতি-নির্ভীত পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিধুর রেখাধী আঁকা পড়েছে ॥ রাম : চার টাকা ॥

নাভানা

॥ নাভানা প্রিন্ট ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ ॥

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১০



বৈজ্ঞানিক পাত্তর

আজ জোহানের কাছে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাত্তরের সবচেয়ে
হ'—একটি কথা বলছি। পাত্তরের নাম জোহান। অনেকের
জেনেছে। বড় হ'লে তাঁর সবচেয়ে অনেক কথা জানতে পায়বে।
বিজ্ঞানের পূর্বের পাত্তরের নাম স্বর্ণাকরে লেখা হয়েছে।

পাত্তরের পুরো নাম হলো লুই পাত্তর। ফ্রান্সের ডোলে নামক
স্থানে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক লুই পাত্তর জন্মগ্রহণ করেন। তখন
কি জানতো এই ক্ষুদ্র শিশুটি! একদিন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক
হিসাবে পরিগণিত হবেন! লুই পাত্তরের বাবা ছিলেন একজন
সামান্য লোক। তিনি ছিলেন চর্ম-ব্যবসারী। এই ব্যবসা করে তিনি
সম্ভার নির্বাহ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই লুই পাত্তরের লেখাপড়ার
দিকে ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর পিতা দেখতেন, ছেলের তো
পাত্তরনার ডায়েরী মনে। তিনি মনে মনে উপলব্ধি করতেন যে,
ছেলে নিশ্চয়ই একদিন বড় হ'লে উঠবে—তাঁর মুখ উজ্জ্বল করবে।
ইরাজিতে একটা কথা আছে—“Childhood shows the man.”
কথাটির আসল অর্থ হচ্ছে যে, কোন্ লোক ভবিষ্যতে কি ধরনের
হবে, এটা তাঁর বাচ্চকালের স্বরূপ দেখলেই বুঝতে পারা যায়।
উপরের কথাটি লুই পাত্তরের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
শৈশবেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় সকলেই পেয়েছিল। লুই পাত্তর যে
একদিন বিখ্যাত লোক হবেন, এটা তাঁর বাবার মনে একেবারে
বন্ধুল হয়েছিল। তিনি লুই পাত্তরকে ফ্রান্সের সবচেয়ে ভাল
বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। বিদ্যালয়টির নাম হচ্ছে—
“ইকোল নর্মাল”। লুই পাত্তর এখানে খুব ভালভাবে পড়াশুনা শেষ
করে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাটসবার্গে বসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত
হলেন। বসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁর খোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকেই।
পরে তিনি বসায়নবিজ্ঞান গবেষণা করে “ডক্টরেট” উপাধি পেলেন।
পিতার আশা পূর্ণ হ'লো। বৈজ্ঞানিক লুই পাত্তরের নাম ফ্রান্সে
ছড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সের অজ্ঞাতম বৈজ্ঞানিক হিসাবে গণ্য হলেন
তিনি। পিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। হবারই তো
কথা। পুত্রের এতদূর উন্নতিতে কোন্ পিতা আনন্দিত না হয়ে
থাকতে পারেন?

লুই পাত্তর তাঁর জীবনে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন।
তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। যে আবিষ্কারের
জন্ম লুই পাত্তর সারা পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করেছেন, সেই
আবিষ্কারের কথা এখানে বলছি। লুই পাত্তর জ্বলন্তক রোগনিরাক

নাম ভয়ে ধাক্কা দে। ইরাজিতে এই রোগটিকে বলা হয়—
“Hydrophobia”.

পাণ্ডা কুকুরের বা শিল্পের বিবে জ্বলন্তক রোগ হয়। জুঁতি
তাই! এই রোগে বড় অনিবার্য। ভাখো, কী ভীষণ এই রোগ।
লুই পাত্তরের আগে এই রোগের কোন ঔষধ বের হয়নি। কাজেই
জ্বলন্তক লোক এই রোগে মারা গেছে। লুই পাত্তর এতদূর রোগের
প্রতিরোধক ইনজেকশন বের করলেন। পাণ্ডা কুকুরের দ্বারা
আক্রান্ত একটি ছেলের উল্লস তিনি এই ইনজেকশন প্রয়োগ করলেন।
খুব ভাল ভাল পেলেন তিনি। ছেলেটি স্বস্থ হয়ে উঠলো, ছেলের
জ্বলন্তক রোগ হ'লো না। ছেলেটি বাঁচল, লুই পাত্তরের নাম
চাষাফিলে ছড়িয়ে পড়লো। বেশ-বিশেষ থেকে বড় লোক আসতে
লাগল তাঁর কাছে। সারা পৃথিবীতে লুই পাত্তর এক যুগান্তরের
হলি করলেন। লুই পাত্তর সারা পৃথিবীর লোকদের বাঁচালেন একটি
ভীষণ রোগের হাত থেকে, সত্যি তিনি মহৎ।

আজ লুই পাত্তর নেই। তাঁর সেই পৃথিবীতে নেই যত্ন—কি
তিনি অদূর হোরে আছেন বিজ্ঞানের পূর্বের। তাই তাঁর মৃত্যু নেই।
—জীবনদশনাথ মৈত্র।

কৃত্রিম উপগ্রহ

গত ৬ই অক্টোবর তারিখে পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রের
শিরোনামের বোধ করি একই সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছিল, আর এ
সংবাদটি হইতেছে—সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সর্বপ্রথম কৃত্রিম
উপগ্রহ স্থাপিত। রাশিয়ার এই সাফল্য বিশ্বের কোন সংবাদপত্র মন্তব্য
করিল—“Russia wins space race.” কেহ বা লিখিল—
“East has beaten West in putting first man made
moon.” আমেরিকার New York Herald Tribune
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিল—“A grave defeat for America...
The Soviet satellite meant that the U. S. had
lost its supremacy in scientific research and
development.”

মন্ডো বেতার থেকে সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপিত কথা
ঘোষণা করা হয়। সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান Tass-এর
এক খবরে বলা হয় যে, গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ন
সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন সাফল্য লাভ করিয়াছে। উপগ্রহটি
এখন পৃথিবীর ৫০০ মাইল উপর দিয়া ঘণ্টার ১৭০০০ মাইল বেগে
মাত্র ১৫ মিনিটে পৃথিবীকে “ডিম্বাকার কক্ষপথ” (Elliptical orbit)
একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। সংবাদ আরও প্রকাশিত হয়
যে, কৃত্রিম উপগ্রহটি গোলাকার, ব্যাস ২’ ইঞ্চি, ওজন ১৮০ পাউন্ড
এক উচ্চ বিদ্যুৎবলীয় সহিত ৬৫ কোশ করিয়া ঘূরিতেছে। Tass-এর
এই সংবাদ যে সত্য তাহা অচিরেই প্রমাণিত হইয়াছে কেন না,
কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে প্রেরিত বেতার সংকেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত
বহু রাষ্ট্রই পাইয়াছে একে এখনও পাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা মহাশূন্য পরিভ্রমণ (Space Travel)
বিষয়ে পিছাইয়া আছে, এ কথা তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সাফল্য সমগ্র বিশ্ব আজ স্তম্ভিত।
মাত্রাতিরিক্ত প্রচেষ্টা, সাধনা ও তাত্ত্বিক কল্পনার ফলশ্রুতি হইতে পারে,
বোধ করি ইহাই তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। বিবাতার স্তম্ভ শ্রেষ্ঠ জীব
জন্ম সমগ্র জীবের সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান সম্রাটের পর দিন যে অপ্রতিরোধ্য

পড়িতে সত্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে, অসম্ভবক সম্ভব করিয়া চলিতেছে, অসম্ভবক বাস্তবে রূপান্তরিত করিতেছে—তাহাতে সত্যই বিশ্বের হতবাক হইতে হয়। ক্রমে মানুষই সেদিন লজ্জার করিয়াছে। হুলজ্বল সিরিয়ার হিমালয়কে। মানুষের হাতেই তৈয়ারী Radio, Television, Aeroplane আর প্রচণ্ড শক্তিশালী Hydrogen বম্ব। পরমাণু বোমা! আজকে আবার সেই মানুষই সৃষ্টি করিল ক্রান্ত চলমান এই ছোট্ট চান্দটিকে, বাহ্যিক বিপত্তির পাশে অতি সাধারণ কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই উষ্ম অথবা মন্ড্যাকালে (অর্থাৎ যখন আমরা পৃথিবীর দ্বারা থাকিতেছি, অথচ উপগ্রহটি তখনও সূর্য্যাস্রোকে উদ্ভাসিত থাকিতেছে) উজ্জ্বল একটি বিশুব মতন দেখা বাইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই কৃত্রিম উপগ্রহ কখন আন্তর্জাতিক জ্যোতিষিক বৎসরের (International Geographical year from 1st. July '57 to 31st. Dec. '58) কর্তৃত্বের অন্তর্গত। এই সময়ে, পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশের বৈজ্ঞানিকেরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবী সর্বত্র অবিকারিত তথ্য সংগ্রহ ও মহাশূন্যে পরিচর্যা প্রযুক্তির বিষয়ে গবেষণা করিতে যন্থ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক জ্যোতিষিক বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক এক কোটি ডলার ব্যয়ে ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবে বলিয়া শুনা বাইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন অপরদিকে Artic (Franz Joseph Land) হইতে ২৫টি দেশের মধ্যাঞ্চল হইতে ৭০টি এবং Antarctic (Miruyr নিকটে) হইতে ৩০টি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ক্রান্ত আন্তর্জাতিক জ্যোতিষিক বৎসরে ১৫০০ মিলিয়ন রু। (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি টাকা) খরচ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি কিন্তু একদিনেই সম্ভবপর হয় নাই। বরন্তঃ ইহার পিছনে রহিয়াছে দীর্ঘকালের নিরলস প্রচেষ্টা। বহুদিনের গবেষণা ও অল্পশীলন আজ মানুষকে সাক্ষ্যদান করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন অনেক দিন হইতেই রকেট পরিচালনা দ্বারা শূন্যপথে গমনাগমনের বিষয়ে অহুমস্কান চালাইতেছিল। অতি আধুনিক কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন এক বিশেষ ধরনের রকেটকে কাজে লাগাইয়াছে। এই সকল রকেটগুলিতে বিশেষ এক ব্যবহার্য ছোট ধাতুপাত্রকে (Metallic cylinder,—দৈর্ঘ্য ১ মি: এবং ব্যাস ৪০ সে:) উর্দ্ধে নিক্ষেপ করে। Cylinderগুলির মধ্যে নানা যন্ত্রপাতি থাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আর থাকে কাচের পাত্র, বাহ্য উর্দ্ধে অবস্থানকালে ভরজ্য বায়ু সংগ্রহ করিয়া আনে। রকেটটি ১০—১২ কিলোমিটার উপরে উঠিলেই Cylinder সংলগ্ন প্যারাসুট আপনা আপনি খুলিয়া গিয়া রকেটের যথাস্থিত সাক্ষ্যসংগ্রহগুলিকে ধীরে ধীরে মাটিতে নামাইয়া আনে। মাটিতে নামিবার সময়ে বাজা লাগিয়া যন্ত্রপাতি বাহাতে নষ্ট না হয় তাহারও বন্দোবস্ত থাকে। কাচপাত্রে সংগৃহীত বায়ু হইতে ভরজ্য ঘনত্ব (Density) এবং উপাদান সর্বত্র সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। রকেটের মাথায় আবার কতকগুলি যন্ত্রপাতি থাকে যেগুলি প্যারাসুটে করিয়া নীচে নামে না, সেগুলি বেতার দ্বারা যক্ষণে পৃথিবীতে সন্বাদ সর্ববরাহ করে, এই সকল রকেট তৈয়ারী যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই পরীক্ষার জানা গিয়াছে যে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতার পরিবর্তন ঘটে। ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার উর্দ্ধে

তাপমাত্রা কমিতে থাকে, পরিমাণ হয় সাধারণতঃ—৫৫০ থেকে ৬০০ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, অত্যন্ত অধিক উচ্চতার তাপমাত্রা না কমিয়া বরং বাড়িতে আরম্ভ করে। ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার উচ্চতার পারদপীনা ১° সে অধিকতর করে। কখন কখন তাপমাত্রা বাড়িতে ৩০°—৩৫° সে পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু ৭৫—৮০ কিলোমিটার উর্দ্ধে তাপমাত্রা আবার কমিয়া গিয়া পঁড়ায়—১০° সে।

গত ডিসেম্বর মাসে Paris-এ অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক রকেট ও স্পেসপ্লান কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়ে, তাহাতে সোভিয়েট এতিমি Mr. A. Pokrovsky এক চমকপ্রদ পরীক্ষাকার্যের কথা বিবৃত করেন। বিভিন্ন উচ্চতার ক্রান্ত চলমান যানের যথাস্থিত জীবের দেহের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাব লক্ষ্য করিবার জন্য কয়েকটি কুকুরকে রকেটের মাথায় রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জির জির উচ্চতার তাপ ও চাপের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলির পারিপার্শ্বিক উত্তাপ, শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া ও মাতার পতি নির্ধারণ করিবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হয়। একটি চলচ্চিত্রের 'ক্যামেরাকে' রকেটের মধ্যে এমন ভাবে সংস্থাপিত করা হয় বাহাতে জির জির অবস্থার ও উচ্চতার কুকুরগুলির আচরণ কটোর সাহায্যে পরে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ১১০০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত রকেটটি উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। গতিবেগ হইরাছিল ঘণ্টায় ৪০০০ কিলোমিটার। এর পর কুকুরগুলি যে কক্ষে ছিল, সেটিকে রকেট হইতে উৎক্ষিপ্ত করা হয়, বাহা পরে প্যারাসুটের সাহায্যে মাটিতে নামিয়া আসে।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিশ্রুত
‘শঙ্খ ও পদ্ম’
মার্ক গেঞ্জী
ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিটেম ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২১১৫

এই ভাবে বাহ্যিক বিশ্বের পথ দিগ্গন্তে পরিভ্রমণে বিবর্তিত হইলে সৌরজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। সূর্য ও তারার মতই গ্রহকে লইয়া আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। এই গ্রহগুলি সূর্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে থাকিয়া বিভিন্ন সময় বয়রা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের পরিক্রমণকাল বিভিন্ন (different) হইলেও কিছু নির্দিষ্ট (fixed)। পরিক্রমণকালে সূর্যের সহিত এই নির্দিষ্ট ব্যবধানকে লক্ষন করিবার ক্ষমতা গ্রহগুলির নাই। ইহার কারণ, সূর্য বিপুল আকর্ষণবলে গ্রহগুলিকে নিজের দিকে টানিতেছে। ফলে গ্রহগুলি কক্ষপথে হইতে পারিতেছে না। সৌরজগতের গ্রহগুলির অধিকাংশেরই আকার এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। উপগ্রহগুলি আবার গ্রহের আকর্ষণে গ্রহেরই চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর উপগ্রহ একটি চন্দ্র।

বহুসংখ্যক উপগ্রহের সংখ্যা দুইটি—ভূমি ও কোবাস। বহুসংখ্যক উপগ্রহের সহিত গ্রহের সব ক্ষেত্রে, গ্রহের সহিত উপগ্রহের সম্পর্কে অনেকটা অনুরূপ। তবে সূর্যেরই একমাত্র আলাকিকালের ক্ষমতা আছে, অপরাধকে গ্রহগুলি সূর্যলোককেই আলোকিত, ইহাদের নিজস্ব কোন আলোক নাই। বায়ুহীন ভৈরবী কৃত্রিম উপগ্রহের সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ও আয়তন

সাধারণতঃ ইহার ব্যাস হইতে ১৪" ২০" ইঞ্চির মধ্যে (সোভিয়েট নির্মিত উপগ্রহটির ব্যাস ২৬" ইঞ্চি) ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে প্রয়োজনীয় বস্তুপাতি লইয়া বাওয়া সম্ভবপর হইবে না। আধিক্য ক্ষুদ্রতর আয়তনের জন্ত ইহাকে বেশিতে পাওয়াও দুঃসাধ্য হইয়া উঠবে। আবার ইহার আয়তন খুব বড় হইলেও চলিবে না, কেন না, সেক্ষেত্রে রকেট বহন কষ্টকর হইবে এবং আলানীয় খরচ খুব বেশী হইবে। এক্ষেত্রে জানিয়া রাখা দরকার যে, প্রতি কিলোগ্রাম ওজননের জন্য আবশ্যক হয় ১০০ কিলোগ্রাম আলানীয়। নির্দিষ্ট উচ্চতার নির্দিষ্ট পতিবেগে ঘূর্ণায়মান রকেটের একটি উদ্ভূত ভারবহন ক্ষমতা আছে। এই ভারবহন ক্ষমতা হইতে আলানীসম্মত রকেটটির ওজন বাহ্যিক সর্বোচ্চ ওজননের কৃত্রিম উপগ্রহের পরিমাণ পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২১১ পাউণ্ড ওজননের কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবার মনস্থ করিয়াছেন, অপর পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে উপগ্রহটি সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ওজন ১৮০ পাউণ্ড।

কৃত্রিম উপগ্রহের আকার গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন না, তাহা হইলে ইহা গমনকালে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ইহার আকারের কোন পরিবর্তন হইবে না—সর্বসামান্যই একাকার থাকিবে। আর যে কোন আকারের হইলে কিছু তাহা সম্ভবপর হইত না। বস্তুতঃ কৃত্রিম উপগ্রহের আকারের বিষয়টি যান্ত্রিকভাবে নিষ্পত্ত করা দরকারী নয়। কেন না, কৃত্রিম উপগ্রহের উপর বায়ুর আকর্ষণের পরিমাণ অনুসারে তাহার অতি উদ্ভূতবেগে বায়ুর ঘনত্ব Density সম্বন্ধে সঠিক সূত্র পাওয়াইবে। উপগ্রহের আকার

সকল অবস্থায় সমান না হইলে গোলাকার হইবার সম্ভাবনা আছে। কৃত্রিম উপগ্রহের আকার আবার "মুক্ত রকেট" প্রাতিদোষ দ্বারাও উপরও নির্ভর করে।

বহিরাবরণের উপাদান

বহিরাবরণ পাউশা অথচ দৃঢ় হইবে। এ্যান্টিমিরনের ব্যবহার এ বিষয়ে প্রাপ্ত। তবে ম্যাগনেশিয়ামের উপর ক্রমাগত তামা, দস্তা, নিকেল, রূপা ও পরিণেবে সোনার পাউশা আবরণ দিয়া বহিরাবরণ নির্মাণ করিলে, ইহা একদিকে সূর্যের উত্তাপ ও অপরিণেবে অত্যধিক শৈত্যের প্রভাব হইতে (যখন উপগ্রহটি ও সূর্যের মধ্যে পৃথিবী থাকিবে) রক্ষা করিবে। তবে এ্যান্টিমিরন অথবা কোন ষাছু বহিরাবরণ হিচাবে ব্যবহার করিলে একটি অন্তর্বিধা হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্ণনের অন্ততম একটি উদ্দেশ্য হইতেছে পৃথিবীর বায়ুস্তরের উপরিতাগে Ionosphere-এর মধ্যে এক উহার উর্ধ্ব প্রবহমান তড়িৎপ্রবাহের অনুসন্ধান করা (ইহার সম্বন্ধে পরে বলা হইয়াছে)। ইহা সাধারণতঃ Magnetometer দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উপগ্রহের বহিরাবরণ হইতে হইবে চুম্বকশক্তিবিহীন এক তড়িৎপ্রবাহে ক্ষম্য। এইজন্য বিদ্যমান হইয়াছে যে, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রেও প্রাটিকের বহিরাবরণ ব্যবহৃত হইবে।

বহিরাবরণের রং হইবে হৃৎস্পন্দ মতন লাল, কারণ তাহা হইলে উল্লস সূর্যালোককে প্রতিফলিত করিয়া এক ছাড়িয়া দিয়া (scattering) অধিকতর স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? ইহা কি মাধ্যমে নিচুক খেলায় আর প্রকৃতির উপর নিজের আধিপত্য দেখান না অন্য কিছু? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পৃথিবীর বহু বহুস্তর কার্যকারণ আশ্রয় আমাদের জানি না। শুনিতে হইত অশ্রুত লাগিবে যে আমরা ২৮ লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত চন্দ্র সম্বন্ধে কত ধরার ধারণা জানি, পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিছু তাহাপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ কি ভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে? আয়তনে ইহার অতিশয় ক্ষুদ্র এক ইহার মধ্যে মাথুর বাতায় প্রায়ই উঠে না। তবে কি ইহার বহির্বিষে কিছুদিন ঘুরিয়া সঙ্গীত তথ্য সরবরাহ করিতে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে? না তাহাও নয়। কেন না ইহার গতিবেগ যখন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া পুনরায় মাধ্যাকর্ষণের বল মণ্ডলের মাটিতে নামিতে থাকিবে তখন চারিদিকের ঘন বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষ লাগিয়া উষ্ণাপিণ্ডের মতন জ্বলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তবে উদ্ভাসকের সূত্র সংগ্রহ কি ভাবে সম্ভবপর? সম্ভবপর হইবে যেতার-তরঙ্গের সহায়তায়। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেট-সংস্থা (signal corps) সর্বপ্রথম চন্দ্র হইতে যেতার প্রতিফলিত সঙ্কেত পান (Radio echo) তাহার আবিষ্কার করেন যে যেতার-তরঙ্গ মহাসূক্তেও বহ্যারীত স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করিতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক বস্তুপাতি বা সাজসজ্জা থাকিবে তাহালাগিকে একটি স্বয়ংক্রিয় যেতার-প্রেরক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ନାମିକ ବିକ୍ରୟ - ୩୫୦



ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାସିକ



ପିରିଡାଲ୍‌ ଜୁয়েଲାରୀ ଡିଜାଇନ୍‌

ଏମ୍.ବି.ମରକାର
ଏଓ ମନ୍ତ୍ର
 ମ୍ୟାନ୍‌ୟୁଆଲ୍‌ ଡିଜାଇନ୍‌

ସେଲ୍‌-୩୫-୨୫୦୫ ୧୬୧/ମି ୧୬୧/ମି/୨ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହାଉସ୍‌ କଲିକତା-୨୧ ଗ୍ରାମ-ପିନ୍‌କୋଡ୍‌
 ଗ୍ରୀଷ୍ମ-ହାଲ୍‌ ମଞ୍ଚ-୨୦୦/ମି ଗ୍ରୀଷ୍ମାପିନ୍‌କୋଡ୍‌ କଲିକତା-୨୧ ଗୋଲ୍‌-୫୫-୫୫୦୫
 କୋରାପୁଟ୍‌ ପୁରୀ-୨୧୫/୨, କଲିକତା-୨୧, କଲିକତା-୨୧
 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗିରିପାଟ୍ଟା ଗୋଲା ଘାଟ୍‌
 ବ୍ରାହ୍ମ-ଜାମସେଦପୁର କଲ୍‌-ଜାମସେଦପୁର- ନିତି-୨୧୧୧-୧

B.B.

এই বেতার প্রেরক বস্তু হইতে প্রেরিত শক্তি অথবা জল কোন সাংকেতিক জিন্সের ব্যবহাযোগে অর্ধ পৃথিবীতে বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে (যাহারা পূর্বেও সাংকেতিক প্রক্রিয়ার সূত্র অর্ধ করিতে অক্ষম), আমরা বহির্বিষয়ের খবরাখবর পাইতে পারিব। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কূ-প্রাকৃতিক বৎসরে (I. G. Y.) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ২৫টি বেতার-গ্রাহক কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষে নৈনিতালে মার্কিন সহায়তার অঙ্কুরপ একটি গ্রাহক-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে, যংগুহীত তথ্য সমূহ পৃথিবীর সকল জাতিই জানিতে পারিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেতারে এইরূপ ভাবে সংবাদ প্রেরণের নাম Telemetering. এখন কথা হইতেছে যে, স্বয়ংক্রিয় বেতার-প্রেরক বস্তু এক অজ্ঞাত যন্ত্রপাতি চালনের জন্য প্রয়োজন শক্তিসংগ্রহ-পায়নের (Htg) ব্যাটারীর ব্যবহার এ বিষয়ে উদ্বেগব্যাগ, কেননা, তাহারো ওজনের তুলনার সর্বাধিক শক্তি (energy) সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু উপগ্রহের মধ্যে ধুব বড় ব্যাটারী লইয়া বাওয়া সম্ভবপর নয়। সর্বাঙ্গের বৃহদায়তনের যে ব্যাটারী লইয়া বাওয়া সম্ভব, তাহাতে একদিন সর্বকণ ধরিয়া বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে চালু রাখিবার মতন শক্তি সরবরাহ সম্ভব। কিন্তু এক দিনেই সকল তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই জন্ত স্থির করা হইয়াছে, যখন উপগ্রহটি ইহার কক্ষপথে সর্বাঙ্গেরা সুবিধাজনক স্থানে থাকিয়া তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সক্ষম থাকিবে, কেবল তখনই ইহার যন্ত্রপাতিগুলিকে পৃথিবী হইতে বেতার সংকেত দ্বারা কিছুকালের জন্য চালু রাখা হইবে। উপগ্রহটির মধ্যে তাই বেতার পরিচালিত সংগ্রাহকের (Radio command Receiver) স্থাপন করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাত্র ৫ ওয়াট শক্তি ব্যয়ে ইহার মর্ন্তভূমি হইতে প্রেরিত সংকেত অল্পদূরে

যন্ত্রপাতিগুলিকে চালু অথবা বন্ধ করিরা দিতে পারিবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ১০ মিনিটের কক্ষপথে গিয়ে ১০ বার ঘুরিমান ৩০ পাউন্ড ওজনের উপগ্রহটির যন্ত্রপাতিতে যদি ১০ বারের প্রতিরোধ সুবিধাযন্ত্রারী মাত্র ৫ মিনিট করিয়া চালু রাখা যায়, তাহা হইলে তড়িৎকোষাবলীর (Battery) শক্তি সরবরাহ ক্ষমতা ১৫ দিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে। ৩০০ মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত সেকেন্ডে ৪৫ মাইল গতিতে চলমান কৃত্রিম উপগ্রহের স্বাভাবিক সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার ইহাই উর্দ্ধতম সময়। তবে একথা ঠিক যে, ইহার পর যদিও উপগ্রহটি তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেতার মাধ্যমে তাহা সরবরাহ করিতে অক্ষম থাকিবে, তথাপি ইহার নিজ কক্ষপথে এক বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিবে থাকিতে পারে।

বর্তমানে সূর্য হইতে শক্তি সংগ্রহের কথা চিন্তা করা হইতেছে। নিউইয়র্কের 'বেল টেলিফোনে ল্যাবরেটরী' সৌর তড়িৎকোষাবলীর (Solar Battery) আবিষ্কার করিয়া শূন্য গমন গবেষণা বিষয়ে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছে। Solar Batteryর গঠন প্রাণী হইতেছে কতকগুলি পাতলা অগ্নিশক্তির (Silicon) ডিসকে স্বর পরিমাণ Boron এর আবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। যখন ঐ ডিসগুলির উপর সূর্যালোক পড়ে, তখনই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয়। যেহেতু সূর্যালোক চারিদিকেই বর্তমান, সেই জন্য তড়িৎকোষাবলীর জীবনীশক্তিও অবিনশ্বর। এই ব্যবস্থা চালু হইলে কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে প্রেরিত তথ্য বছরদিন ব্যাপ্য পাওয়া যাইবে। তবে এ ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহটির এক অংশকে বরাবরই সূর্যের দিকে মুখ করিয়া থাকিতে হইবে।

[আগামী সংখ্যার সমাপ্য।

— শ্রীভানুলকুমার রায়

অথচ

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভেঁকেছিলো ঘুম সকালের বেদ-হৃৎকানো আবারে,
প্রভাত ঘোষণে বেবেছি আকাশ পানীবের ভাঁজে,
বিস্তারিত শূন্যঃ স্বপ্নের উৎসাহ কখন।
অথচ জীবন কাঠ-কোরোসিনে প্রাত্যহিকের
চিন্তার জালে হুনিরীক্য; চতুর্দিকের
বজ্রপীড়নে কীক নেই, বাঁধা অশান্ত মন
হাথা ঠেকে শুধু টেবিলে; বটা টেলিফোন কানে
হাফ হাফ—সামনে-পেছনে হাথা ধরে টানে।

কি যন্ত্রা যে কীপে স্বপ্নের রক্তে রক্তে।
লিখত করে হাফালা নুতন; হাটির নিধিরে
জেনেছি জীবন সোণালোর জোরে নতুন ভবে।
শৈশব এই—হাফ-পা হুঁকি জনতার কীক
হাফা স্বপ্ন নাচে জামিলার শানাকে ঘিরে
পানীর বেঁচেছে স্বপ্ন-বেতাল কীতলাসে।

কাশির
মূলকারণ দূর
করুন



সিরোলিন
খান



সিরোলিন কেবল যে কাশি
'বামিয়ে দেয়' তা নয়—
কাশির মূলকারণ ছুটে-
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

একমাত্র পরিবেশক : ডক্টার্স লিমিটেড



মোহনবাগানের লীগবিজয়

আই, এক, এ, শীতে ৩টি দল

বহু ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলা তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় দল মোহনবাগান নিত্য প্রত্যাশিত ভাবেই এ বছরের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগবিজয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে তারা মোট আটবার লীগ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ এই বছরগুলোর জয়ের ইতিহাসে তারা কোনবারই অপরাধিত আখ্যা নিয়ে এই সম্মান লাভ করতে পারেনি। বহু-আকাঙ্ক্ষিত এই আখ্যাদানের সুযোগ মোহনবাগানের প্রায় সামনে এসেও হাজির হয়েছিল। কিন্তু 'বিবি বাম'। লীগ খেলার প্রায় সমাপ্তি পর্যায়ে তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গলের কাছে হেরে গিয়ে ভাগ্যের নিরাকরণ পরিহাসকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবারের লীগ মরশুমে মোহনবাগানের এইটি হোল একমাত্র পরাজয়ের 'ছাপ'। অবিশিষ্ট ৩টি অমীমাংসিত খেলার তারা ৩ পয়েন্ট হারিয়েছে। এতে পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে কিন্তু সম্মান নষ্ট হয়নি। প্রথম পরাজয়ের আঘাত তীব্র না হলেও সামলে উঠতে মোহনবাগানের বেশ সময় লাগলো। চরম লক্ষ্য সবচেয়ে তারা হতোত্তম হয়নি। সত্য কিন্তু লীগের সূচনার তারা যে বিক্রমে দাড়া হয়েছিলেন শেষ পর্যায়ে তাদের পদক্ষেপ সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এতে দলবিশেষের কোন মহলে হরত কিছুটা সংশয়েরও লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু মোহনবাগানের লীগজয়ের পথ অবলম্ব ছিল না। বাকী পঞ্চটুকু পাড়ি দিয়ে তারা লীগ পরিক্রমা সার্থক করলো ও সফল করলো। অগণিত দর্শক ও সমর্থকবৃন্দ জনপ্রিয় মোহনবাগানের সাক্ষ্যে উল্লসিত হয়ে উঠলো। মোহনবাগান যে জনচিহ্নিত কতখানি জারগা জুড়ে বসে আছে তার জাফল্য প্রমাণ পাওয়া গেল বিশ্বিরপূর দলের সঙ্গে তাদের লীগের শেষ খেলায়। খেলা হিসেবে এ খেলাটি নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় ছিল না। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে এ আশাও করা হয়নি। তবে খেলাটার ফলাফলের উপর কিছুটা ভরসা ছিল। এ খেলার মোহনবাগান এক পয়েন্ট পেলেও লীগবিজয়ী হতো। কিন্তু লীগবিজয়ের চরম অঙ্গটি চাক্ষুষ করে নিজেদের মন ভরতে বিপুল দর্শকশ্রেণী এই দিন 'মার্চে' উপস্থিত থাকে। বিশ্বিরপূরের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয়লাভের ফলে লীগ-বিজয়ের মীমাংসা হয়ে বাওয়ার এই জনসমষ্টি বাঁধভাঙ্গা বজার শ্রোতের ব্রত জানন্দে ও উল্লাসে মেতে ওঠে। প্রাণচাঞ্চল্যের বে নজীর সেহিন পাওয়া গেছে, তা সাম্প্রতিককালের খেলাগুলোর ইতিহাসে বিরল। এই সন্কেই কলকাতা মরশুমে লীগ মরশুম সাদা হলো। সামনে পাতা হয়েছে আই, এক, এ, শীতের আসর। নতুন উৎসাহে, নতুন উদ্দীপনার খেলবার আগ্রহে দিকে দিকে সাজ

*সাজ দব।

এবারে আই, এক, এ, শীত ফুটবল প্রতিযোগিতার মোট ৪ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে ১৫টি দল মোট বাংলাদেশের বাইরের। বাইরের খ্যাতনামা দলগুলোর মধ্যে হায়দ্রাবাদ স্পোর্টস্, ই, এম, ই, (সেকেন্দ্রাবাদ), বিজয় ক্যান্টনমেন্ট (সেহাঙ্গন), ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (বোম্বাই), হিন্দুস্তান এয়ারলাইন্স (বাক্সলোর) দলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের বিরুদ্ধে কলকাতার প্রখ্যাতনামা দলের খেলা নিশ্চয়ই আকর্ষণ ও উৎসাহের কারণ। লীগ ও শীত প্রতিযোগিতার চেহারা চট্টো আলদা ধরনের। লীগ বেন লম্বা সড়ক বেয়ে দূর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার একটা প্রয়াসমাত্র। এ পথে চলতে গিয়ে সাময়িক ভাবে পিছিয়ে পড়লেও একেবারে মিলিয়ে বাবার বা নিশ্চিহ্ন হবার ভয় নেই। বাধা-বিশুদ্ধিক্রে ঠেলে যে আগে গিয়ে চরম লক্ষ্যে পৌঁছবে, জয়ের মাল তায়ই গলে ফুলবে। কোন উজ্জ্বল পূর্বস্মৃতিই আরাহণ করাই নে শীতে সাক্ষ্যলাভের সামিল। চড়াই-উৎরাই বেয়ে উঠতে চলতেই হবে—পেছনে ফেরবার অবকাশ নেই। পেছনে ফিরলেই বিপর। এমনকর দুর্ভাগ্য মনোভাব নিয়ে বোগদানকারী দলগুলো এবারের শীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং তার নমুনা দেখিয়ে দর্শকমণ্ডল হুসাহসিক অভিযানের প্রেরণা জোগালে তাতে ভাল ছাড়া মন হয় না, আশা করা যায়।

[ভারত আবার জগৎসভায় প্রবেশ আসন লবে]

রোমে আগামী বিশ্ব অলিম্পিকে ভারত হকি প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিজয়ী আখ্যা অক্ষর রাখতে পারবে বলেই মনে হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের গর্ব করার একটি জিনিষই আছে, সেটা হোল হকি।

১৯২৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারত হকি প্রতিযোগিতায় তাদের বিশ্ব-জয়ের পতাকা উঁচুতে ধরে রেখেছে। বিজয়-বৈজয়ন্তী অক্ষর থাক—এটা ভারতবাসী মাত্রেই কাম্য।

টোকিওতে অর্জিত গত এশীয় ক্রীড়ার ভারত হকিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করার অনেকেই আগামী-বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের সাক্ষ্য সবচেয়ে কিছুটা নিজেদের ভাব হরত বা পোষণ করে থাকেন। এশীয় ক্রীড়ার ভারত পরাজিত হয়নি। গোলদাখার হিসেবে তালিকার ক্রমিক অবস্থান নির্ধারিত হয়েছিল। সেই হিসেবেই পাকিস্তান তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এর ফলে ভারতের হকি খেলার স্থান নিম্নগামী হয়েছে বা ভারতীয় দলের শক্তি আগের থেকে দুর্বল হয়েছে, একথা মনে করলে চরম ভুল করা হবে। দুই আশা কথা যে, আসন্ন অলিম্পিকের জন্ত ভারতীয় দলের

বিশেষ শক্তিশালী করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভারতে হকি খেলায় নিয়ামক-সংস্থা নিখিল ভারত হকি ফেডারেশন এ বিষয়ে যোগ্য দৃষ্টি দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও শুরু করে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় হকি দল পূর্ব-আফ্রিকা সফর করে গঠন মাসে দেশে ফিরেছে। বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক 'বাবু' (কে, ডি, সি) ছিলেন পূর্ব-আফ্রিকা সফরে ভারতীয় দলের 'কোচ' এবং ম্যানেজার। তিনি বিশেষ করে ৬ জন খেলোয়াড় সম্বন্ধে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেছেন এবং ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য এই ছয় জনের নাম সুপারিশ করেছেন। "বাবু" নির্বাচনী কমিটিরও অন্ততম সদস্য। সুতরাং তাঁর সুপারিশ যৌক্তিকতা এবং যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহ্য হবে বলেই মনে হয়। অবিস্তি ভারতীয় অলিম্পিক 'হকি দল গঠনে এখনও দেরী আছে। জাঙ্গীয়ার মিউনিকে হকি প্রতিযোগিতার এবং বিশেষের আরও কয়েকটি জয়গায় খেলার পর দল গঠন করা হবে। এ সমস্ত খেলাগুলো হবে বিশ্ব অলিম্পিকের জন্য ভারতের প্রস্তুতি-পর্ব।

এ ছাড়াও খেলোয়াড়দের বিশেষ শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। হকির বাড়কর খানটান, বাবু এবং হাবুল মুখার্জী শিক্ষাদান করবেন।

এবারের অলিম্পিকে ভারতীয় দলকে আগের তুলনায় অনেকখানি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে হয়। কেন না, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড ও জার্মানী ইতিমধ্যেই হকি খেলায় বৃহৎ উন্নতি প্রদর্শন করেছে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের অনমনীয় দৃঢ়তা, প্রশংসনীয় ক্রীড়াধারা এবং সর্বোপরি জাতীয়তা ভাব প্রকাশ ভারতের জাতীয় সুনাম এবং ঐতিহ্য অক্ষুর থাকবে এবং গণ্য বিশেষত্বের বিজয় পতাকা চির-উজ্জ্বল থাকবে। জগৎসভায় তাঁর শ্রেষ্ঠ আসন নেবেন।

কলকাতায় ট্রেডিয়াম

আবার কলকাতার "ফুলবল ট্রেডিয়াম" প্রসঙ্গ। ট্রেডিয়াম সম্পর্কে কোন মুখরোচক খবর হলেই কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের কৌতুহলের শেষ থাকে না। ট্রেডিয়াম নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তেগ-আয়োজনের শেষ নেই! কিন্তু সেই একই প্রশ্ন—কবে ট্রেডিয়াম নির্মাণ আরম্ভ হবে? সম্প্রতি সরকারী দপ্তর থেকে ট্রেডিয়াম সম্পর্কে কিছুটা আশার আলো নিক্ষেপ করা হয়েছে। এখন নাকি "এসলবরা কোর্সে" (কেলা সলার প্রান্তরে) ট্রেডিয়াম গঠনের জন্য জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

"এসলবরা কোর্সে" ভারত সরকার তৈরী একর জমি ট্রেডিয়ামের জন্য সেবে বলে ঠিক করেছে। একে নাকি সু'ভাগে বিভক্ত করা হবে। সাড়ে ছয় একর অর্থাৎ হুড়ি বিরা জমির ওপর ট্রেডিয়াম নির্মিত হবে এবং বাকি সাড়ে ছয় একর জমির ওপর সুইমিং পুল, জলদল, কবডি, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি খেলায়লার মাঠ প্রস্তুত হবে বলে ঠিক হচ্ছে।

বর্ষাব্যয়ে মহারাজা, মহারাজের মহারাজা, ত্রায় বি, এম,

মুখার্জী ও ত্রিশিবত্র বানার্জীকে নিয়ে ট্রেডিয়াম গঠনের জন্য একটা "অফিসগুদী"ও গঠন করা হয়েছে। ত্রিশিবত্র বানার্জী হিন্দুস্থান কল্টারাকসন কোম্পানীর কর্তাধার। তাঁরই ওপর ট্রেডিয়াম গঠনের ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি রোমে গেছেন। রোমে এবং লণ্ডনের নানা স্থানে ট্রেডিয়াম গঠনের তথ্য সংগ্রহ করে তিনি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলকাতার ফিরবেন। "কলকাতার ট্রেডিয়াম" এবারকার প্রসঙ্গ যে বেশ কিছুটা মুখরোচক, তা বলাই বাহুল্য। দেখা যাক ট্রেডিয়াম নিয়ে আর কতকাল টালবাহানা চলে।

কলকাতায় আমেরিকান সম্ভরণ-শিক্ষক

আমেরিকার খ্যাতনামা স্নাতক-শিক্ষক জন মিলারের শিক্ষাবীনে কলকাতার তত্ত্ব ও উদীয়মান স্নাতকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। মিলার একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক। ১৯৫৬ সালে বোম্বাই রাজ্য সুইমিং এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে তিনি ভারতে এসেছিলেন। এবার তাঁর আসার ব্যবস্থা করেছেন ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তবে এখানকার শিক্ষাদানের সকল উদ্দেশ্য আয়োজন করবে বেঙ্গল এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে। মিলার কলকাতায় অবস্থান কালে স্নাতকাল সুইমিং ক্লাবে "রক্ত-প্রবর্তী" উৎসবে যোগদান করবেন। কলকাতার লোক ইন্সটিটিউট সোসাইটির সুইমিং পুলে তিনি শিক্ষাদান করবেন। কলকাতার পর তিনি দিল্লী ও বোম্বাই যাবেন। সেখানেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

কাট বোলিং তীতিরোধের চেষ্টা

ভারতের ক্রিকেট-অমুরাগী মাঝেই জেনে থুশী হয়েছেন যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খ্যাতনামা "কাট বোলার" রর গিলক্রিস্টকে ভারতে এই বৎসরের শেষাংশে "কাট" হিসাবে আনার প্রচেষ্টা চলছে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের "কাট বোলিং" তীতির কথা সুবিদিত। ভারতীয় খেলোয়াড়দের গিলক্রিস্ট কিছুটা সহায়ক হোল, এটাই সকলে কামনা করেন।

দ্বীরোগ, ধবল ও

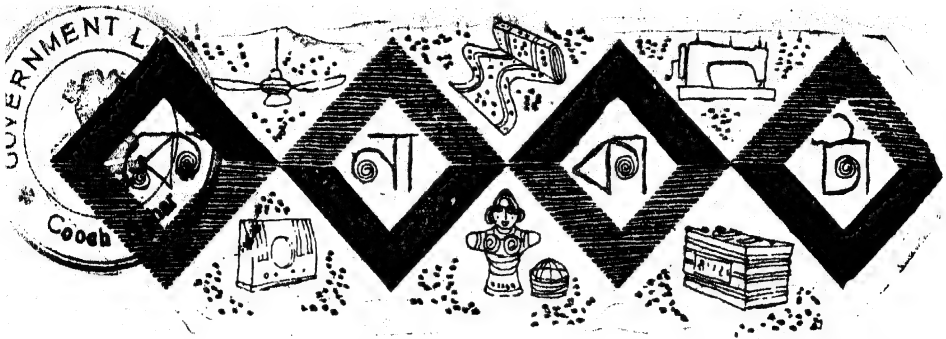
বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের খাবতীর রোগ ও দ্বীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করঙ্গ।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশনমূল কিংবদন্তী

৩৩, একতালিরা রোড, কলিকাতা-১১

লক্ষ্য ৩১-৮১। কোম নং ৪৬-১৩৫৮



গবেষণা ও শিল্প-সমৃদ্ধি

মা'রূষ যেনদিন থেকে এসেছে এই মাটির পৃথিবীতে, সাথে সাথে হাজির হয়েছে তার করুণাও। প্রথমটায় করুণার পরিচিতি ছিল নিত্যন্ত সীমিত, কিন্তু যুগে যুগে তা বিস্তার লাভ করে চলে। এই দুবস্ত করুণা ও স্বপ্নকে আশ্রয় করেই একদিন বিজ্ঞানী মানুষের হয় জন্ম—সেই থেকে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবধি নেই।

একথা আজ আর বলবার অপেক্ষা রাখে না, সভ্যতার জন্মিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অপরিমেয়। বিজ্ঞান-লব্ধীর আশীর্বাদেই মানুষ পেয়েছে বিচিত্র ধরণের সুখ-স্বাস্থ্য—ব্যবহার উপযোগী রকমারী শিল্প-সম্পদ বা শিল্প-ঐর্ঘ্য। এমন দাঁড়িয়েছে—আজকের দিনে কোন লোকের পক্ষেই বিজ্ঞানকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্তব্ধ কিছু না কিছু ভোগ করছে প্রত্যেকেই।

যেমানকার অধিবাসী এই মানুষ, সেই পৃথিবী সম্পর্কেও জন্ম-করুণা ও গবেষণার অন্ত ছিল কি? কত রকম বিচিত্র ধারণাই না করা হয়েছে পৃথিবীর আকার ও অবস্থান সম্বন্ধে। প্রাচীন গ্রীসের অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক থেলসের বিশ্বাস ছিল—পৃথিবীটা দেখতে রেকারীর মতো—আর সমুদ্রের জলে এটি স্থির ভাসমান। হুই হাজার বছরেরও ওপর এই নিরে চিন্তা-আলোচনা করলেন ভাবুক-মহল। গবেষণা শেষে আজকের মানুষ পৃথিবীর আকার ও রহস্য সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণার আসতে পেয়েছে—যুগে নিরেছে সত্যি কতো সব মৌলিক উপাদান ও রাসায়নিক পদার্থ মিলেমিশে এটি গড়া।

পর পর আবিষ্কৃত এই বহুমূল্য পদার্থগুলো নিয়ে গবেষকরা শিল্প-গবেষণাপারসমূহ গবেষণা চালিয়েছেন, সে-ও বহুদিন। এব ভেতর হাজার হাজার নতুন জিনিস তৈরী হয়েছে—দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো অনেক প্রয়োজনে আসছে আমাদের। একদিকে গবেষণা, অপর দিকে শিল্প-সমৃদ্ধি—এই নিয়ম এক্ষণে প্রায় বাঁধবরা, নিয়মানুযায়ী কাজেরও বিরতি নেই বলা যায়।

শিল্পোন্নত হবার জন্যে আজ ছোট-বড় সকল দেশেই উদ্ভব চলেছে নানানভাবে। অগ্রসর রাষ্ট্রগুলিও চায় আরও শিল্প-সমৃদ্ধি, আরও শিল্প-সম্প্রসারণ। তাই দেখা যায়—বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অবিরাম গতিতে চলেছে সেই সঙ্গে সর্বত্র। বলতে কি, গ্রিণ কি চলিশ বছর আগেও শিল্প-গবেষণার গতিবেগে এতখানি তীব্র ছিল না। রাসায়নিক ও পদার্থ বিদ্যক বিজ্ঞানের অগ্রগতি সে পরিমাণে হয় নি তখন অবধি। আজকের মানুষ সেই তুলনার এগিরে পেরে বহু যোজন

পথ—শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহায়তার চমক সৃষ্টি করেছে এঁা যুগুর্ভে।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলতে হয়—বৈজ্ঞানিক গবেষণার শিল্পে যেমন প্রসার হচ্ছে অবিরাম, শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রায় তেমনি। প্রধানতঃ দুইটি দিকে নজর রেখে শিল্প গবেষক বা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে থাকেন। এক—যে অভিন্ন পণ্য বা শিল্প-সামগ্রী সৃষ্টি হলো, কি ভাবে তার চরম উৎকর্ষ সাধির হতে পারে; দুই—গবেষণা করে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের আর কি জিনি বের করা যায়। কয়েকটি শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানী প্রথমটির ওপর জোর দিয়ে থাকেন, আবার অপর কতকগুলোর বেলায় জোর থাকে দ্বিতীয় দফা ব্যবস্থার ওপর।

আরও একটি কথা বলতে হবে—শিল্প-সমৃদ্ধি ও শিল্প-গবেষণা জন্ত সর্বোপরি থাকা চাই সরকারী তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা। বেসরকারী উদ্ভবের সাথে সরকারী উদ্ভবের ঐক্য ঘটলে খু তাড়াতাড়ি সুফল পাবার স্বভাবই সম্ভাবনা থাকে। অপর দিকে শিল্প-সমৃদ্ধি চাইলে শিল্প-গবেষণা চালাতেই হবে, আর বর্ধারীতি গবেষণা চালালে নতুন শিল্পও আবিষ্কৃত না হয়ে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় কিবা হওয়া বিচিত্র নয় যে, একটি বিশেষ শিল্প-সৃষ্টি করতে গিয়ে, অপর কোন শিল্প (উপজাত) সৃষ্টি হয়ে গেলে, আর সেটিও মূল্যবান। পরমাণু বা আণবিক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার গবেষণা মারকত শিল্প-সমৃদ্ধি ও শিল্প-সম্প্রসারণের পথ আজ বর্ধে প্রশস্ত হয়েছে। শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের নিরলস সংগ্রাম ও দুর্দয় অভিযান আরও কতো অভাবনীয় সাফল্য বহন করে আনবে, সে প্রতীক্ষা আস্তে অবাস্তব বা বাড়াবাড়ি নয়।

শ্রম-জীবন—কয়েকটি কথা

বাঁচবার জন্য নিয়মিত শ্রম করতে হবে, খেয়ে-পারে নি কাটাতে কাজ করতেই হবে কোন না কোন—সাধারণ লোকের কাছে এ নতুন কিছু নয়। শুধু প্রশ্ন কে কি ধরণের শ্রম করবে, কিস পক্ষে কতকগুলি স্বহু ভাবে খেতে বাওয়া সম্ভবপর। শ্রম-জীবন বর্ধি সবদিক থেকে বিবর্তিতকর হলো, কাজ করে সামান্য আয়ম বা আনন্দের খোরাকও যদি না পাওয়া গেলে, তা হলেই সোলামাল।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি দেশে কর্ম-সংস্থান বেড়ে যায়। আর কর্ম-সংস্থান বাড়তি হওয়ার অর্থ শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি। শিল্প-অমিকদের অবস্থা-ব্যবস্থা স্বভাবতই তখন আলোচনা-গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে। এই থেকেই ক্রমে অবশ্য নানা শিল্প-বাইন বা অমিক কালুন তৈরী হয়।

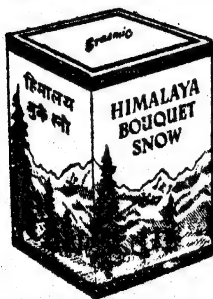


সৌন্দর্যের জন্য...

হিমালয় বোকে

প্রেম

প্রসাধন



শ্রীক এবং হৃদয় হিমালয় বোকে সৌন্দর্যের
স্বককে মনন এবং মোলায়েম রাখে। মননময় মত হিমালয় বোকে টয়লেট
পাউডার আপনার লাভণ্যর স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে
বাড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার



একটু পৈশৈনের দিকে তাকালেই দেখা বাবে—শিল্পগত মনস্তত্ত্ব বলতে বা বুঝার, তার সূচনা হয় চলিত শব্দের গোড়ার দিকে। সূচনার হুইট ভাঙ্গ ধারণা মূল বিষয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, প্রথম ধারণাটি ছিল—মানুষের সেই হচ্ছে নিছক একটি স্বভাব, একে খুশিমস্তো কাজে লাগালেই কাজ হাসিল হয়ে বাবে। দ্বিতীয় ধারণা—প্রমিককে বেখানে কাজ করতে হবে, সেই ধারণাটি যদি উপযুক্ত আলো ও তাপ সমন্বিত হয় এবং কাছাকাছি কোন ঠাই-ঠে না থাকে, তা হলেই সব ঠিক-ঠাক।

প্রমিকবাদের ক্ষেত্রে যেটি বড় কথা, পর্যায়োচকদের কাছে সেইট ধরা পড়ে নি প্রথমটায়। কাজ করে প্রমিক আসলে কি চার অর্থাৎ তার মনোর মূল চাছিলো কি, এই দিকে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি পড়ে যত্নমিত্তি বাবে। প্রমিক প্রচার উপযুক্ত মূল্য চায়, বাঁচবার অধিকার চায় সেও মানুষের মতো, এটি সর্বোপরি সত্য। এ সত্য আজও বেখানে স্বীকৃতি পায় নি, প্রমিককে বেখানে মাত্র স্ব স্ব হিসাবে ব্যবহার করতে চাওয়া হচ্ছে, সেখানেই দেখা বাবে অসন্তোষ ও অশান্তি।

শিল্প-প্রমিক সম্পর্কে গোড়াকার দিনগুলোতে যে যে ধারণা পোষণ করা হতো, সে যে ভুল, তা প্রমাণিত হয়েছে বাস্তব পরীক্ষাতেই। একটি দৃষ্টান্ত—বহুর ত্রিশেক আগে চিকাগোর একটি বিদ্যুৎ কারখানার কতকগুলো সমস্তার উত্তর হয়। সেখানে প্রমিকদের ভেতর অসন্তোষ বেড়ে চলে এবং কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। অতঃপর কারখানার আলো-বাতাসের অভাব ছিল না, বাইরে থেকে দেখতে কাজের উপবোধী পরিবেশ সেখানে ছিল না।

পলর কোথায় রোষবার জন্মে ডেকে আনা হলো অষ্ট্রেলীয় অধ্যাপক এলিটম মেরোকে। তিনি সে সময় অল্প শিল্প-গবেষণার কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। চিকাগোর কারখানাটিতে এসে পরীক্ষা চালানেন তিনি নানা ভাবে। প্রথমেই চিরাচরিত ব্যবস্থা মতে আলোর বহর বাড়িয়ে দেওয়া হলো, যে কোন কারণেই হোক—উৎপাদনও বাড়লো তখন কিছুটা। স্বভাবই ঘরে নেওয়া হলো এর পর আলোকসজ্জাই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। অধ্যাপক মেরো আবার উল্টো দিক থেকে অবস্থাটি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এবারে কমিরে দেওয়া হলো কারখানার সব কর্ণাট আলো। চাদের আলোর পরিমিত আলোতে এসে বহন লাড়ালো, বিষয় যে, তখনও বজায় থাকলো উৎপাদনের। উদ্ভগতি। বহর উৎপাদনের মাত্রা এমনটি কখনও সে কারখানায় দেখাই যায় নি।

তা হলে ব্যাপারটি আসলে কি? অধ্যাপক এলিটম বহন পরীক্ষাটি চালাতে থাকেন, তখন কিন্তু প্রমিকবাদের কাজের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ কর্তৃপক্ষের কিছুটা চোঁটা চলে। প্রমিকরা এইটি বুঝতে পারা মাত্র সোৎসাহে কাজে যোগ দেয় এবং এরই পরিশ্রুতিতে উৎপাদন ক্ষমতা এগিরি বার অনেক দূর। গবেষণা করে অগ্রগতির এই মূল সূত্রটি ধরতে পারেন অধ্যাপক এলিটমও। তাঁর চোখে শব্দ ধরা পড়লো—কাজ করতে যেহে কর্মীর মনে কিসে সৃষ্টি আসে, সেইটি বড় কথা।

প্রমিকবীণী ও প্রম-জীবন সম্পর্কে পর্যায়োচনা করতে যেহে আরও একটি কথা কলা চলে—সাধারণ মানুষ-মোটাই প্রমকাত্তর নয়। কাজে লাগি দিয়ে পরমা লুভ্যার মূল্যব গড়পড়তা প্রমিকদের মাঝে নেই। শব্দ কলা চলে প্রমিকবীণী মাঝেই সাধারণতঃ সন্তোষজনক অবস্থার থেকে কাজ করতে চায়। বস্তুতঃ যে-কাজটি যে করছে, বোল আনা মনে ও সৃষ্টি দিয়ে সেটি করার ব্যবস্থা যদি থাকে, সব দিক থেকে মঙ্গল।

আর—ব্যয়—সঞ্চয়

মৈনলিন জীবনে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলো নিয়ম কাছের মেনে চলবার প্রয়োজন রয়েছে। আর যুগে ব্যয় করা আর তারই কীকে কিছু কিছু সঞ্চয়—এই বিধিটি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—সীমাবদ্ধ আরবিশিষ্ট সঙ্গারী স্নোকেব বেলার তো বটেই।

বুকে-সুন্দর ব্যয় করার বিধি ব্যবস্থার কথা উঠলেই একটি উপবিধি পাঁড়ার—ধরনের বাজেট ঠিক রাখতে হবে আগে থেকেই। সরকারী ক্ষেত্রে যেমন বাজেট করার রীতি আছে সর্বত্র, তেমনি কোন না কোন ধরনের বাজেট (বতই ক্ষুদ্র হোক) চাই পরিবারিক ক্ষেত্রেও। ধরনের একটি মোটামুটি ধারণা চোখের সামনে না থাকলে অনেক সময়ই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হবার আশঙ্কা থাকে। আর সে অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের সুযোগটি সহসা মিলতে পারে না।

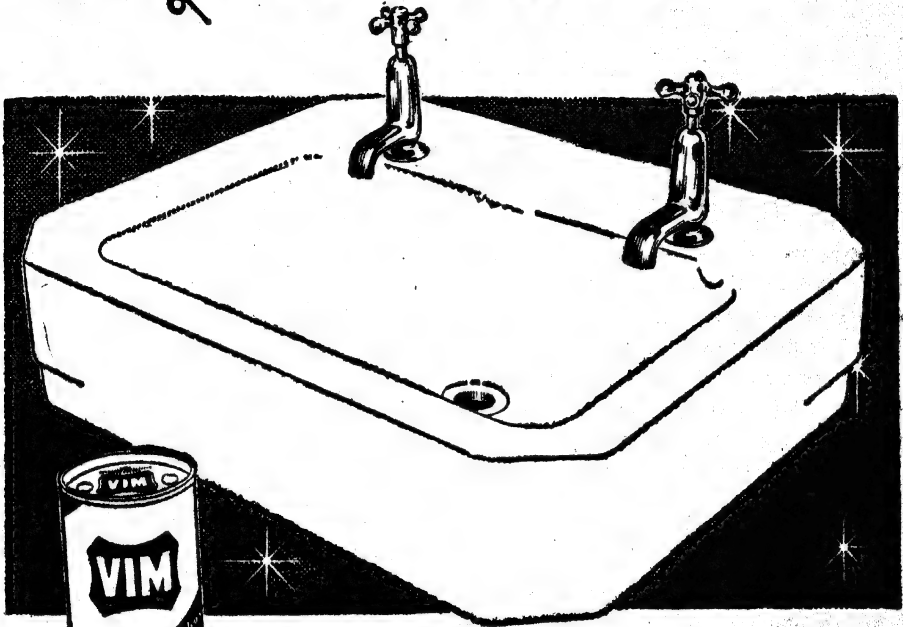
এমন অনেক দেখা যায়—বারী আয়ের দিকে না তাকিয়ে বেশরোমা ধরত করে চলেন, ভবিষ্যতে বাই-বুটু না কেন, তার জন্তে এতটুকু তৈরীকরা রাখেন না। ‘ক্লপ করেও বি খাওয়ার কথা’ এই প্রেমীর স্নোকেবাই ভাবতে পারেন। নিয়ম আর বিশিষ্ট সঙ্গারী মানুষের পক্ষে এই পথ অস্বপ্নরূপ করতে বাওয়া বিশ্রুজনক। বলতে কি, বাস্তব দুনিয়ায় এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত জটিল পদক্ষেপ—এ গার্হস্থ্য অর্থনীতির বিরোধী।

আয়ের অল্পপাতে ব্যয় করার যে বিধান, সেইটি অর্থাৎ মিতব্যয়ী হওয়া সকল অবস্থাতেই প্রোঃ। বিলাস-বাসনে অবধা অর্থব্যয় করে পথে লাড়ালো কিংবা খেয়ে-পরেই সব টাকা পরমা অসন্তোষে উড়িয়ে দেওয়া—এই যদি হলো, বুঝতে হবে পদে পদে বিশ্রুতি। আয়ের সীমারেখা ছাড়িয়ে অপরিহার্য কারণ ভিন্ন ব্যয় কোন মতেই চালাতে পারে না। বর্তমান সমাজ কাঠামোতে প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের সামনে অনিশ্রুততা রয়েছে বলেই সঞ্চয়ের কথা বড় হয়ে দেখা দেয়।

ধরনের মাত্রা বতসূর সন্তব কমাতে হবে আর সব ধরনেই হওয়া চাই আয়ের ভেতর, এই নিয়ে প্রায় তোলা নিরর্থক। কিন্তু তাই বলে পর্যায় টাকা-পরমা থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ দেখানো কিংবা খাওয়ার-পারায় অহেতুক কষ্টভোগ সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সোজামুজি বলতে গেলে—অমিতব্যয়ী হওয়া যেমন ভালো নয় কিছুতেই, অতিসঞ্চয়ী হবার নীতিটিও তেমনি ক্রটিপূর্ণ ও অর্থোজিক।

প্রসঙ্গত, আর একটি কথা বলতে হয়—একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় বেখানে আয়ের সীমা নিয়মিতভাবে ছেড়ে বাবে, সেক্ষেত্রে আর বাড়ানোর সক্রিয় চোঁটা হাড়া উপায় নেই। মোটের উপর, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের প্রেরণা খুব বহু সঞ্চয়কে ডাকতে হবে সাধারণ বৈধরিক বাস্তবকে—তারপর মাকামাখি একটা সূত্র স্থির করে তবেই কার্যক্ষেত্রে পা বাড়াতে হবে। আয়ের সীমাবদ্ধতা অল্প ধরনের নিত্য মাত্রাবিকা, এমনটি যাতে না হয়ে পড়ে, তার লক্ষ বতসূর সন্তব সন্তর্ক না থাকলেই নয়। সঞ্চয়ের প্রায় ছেড়ে বিলোও (কারণ, গড়পড়তা পরিবারে সেটি হওয়া স্বভাবই কঠিন), আর ও ব্যয়—এ হ’—এর ভেতর একটি ভারসাম্য বলা করে চলাই একান্ত সর্বাটিল, শিষ্টমর্মেই বলতে পারা যায়।

ভিম ব্যবহার করলে পরে -দেখুন কেমন ঝলমল করে



ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষেরই চেহারা বদলে যায়। কাচের ও চামের বাসন, রান্নার জিনিষ, খালা বাটা ও ডেক্‌স্টী ইত্যাদি থেকে ঘরের মেঝে—সবই এক নতুন রূপ নেবে। আর ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে জিনিসপত্রে কোন রকম আঁচড় লাগে না। আর কত সোজা ও কম খাটুনীতে হয় ভেবে দেখুন। ডেকা ল্যাকড়ার একটু ভিম কেলে, আঙো আঙো ঘষুন আর আপনার চোখের সামনে জিনিষ গুলোর রূপ বদলে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়

হিন্দুস্থান লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

V. ১০-৫২২ ৪৫



যাত্রাগানের ইতিকথা

“গান জনতে বাব”—গানের লোক বলে, যাত্রা দেখতে বাবার ইচ্ছা ভক্তের কাছে প্রকাশ করে। যাত্রাপালা, যাত্রাপান বা শুধু যাত্রা—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যাত্রা যে নাটকের দৈর্ঘ্যের লৌকিক রূপ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই যাত্রার উদ্ভব কি ভাবে হোল, বিকাশ কি ভাবে হোল, এর স্বার্থ ইতিকথা কী—বিভিন্ন আলোচকের বিভিন্ন মন্তব্যে এক দুর্ভেদ্য যাত্রাবরণের মাঝে এসব প্রশ্ন আত্মগোপন করেছে। এসব প্রশ্নের একটা সুস্পষ্ট সমাধান লাভের আশার এই আলোচনার অবতারণা করছি।

অনেকে বলেন, নৃৎ ধাতু হতে নাটক কথাটির উৎপত্তি। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, নৃৎ ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে নৃত্ত ও নৃত্য কথা দুটি। নৃত্ত শব্দটির অর্থ তাললয়াদি সহযোগে অভিব্যক্তি আর নৃত্য শব্দের অর্থ হাবভাববৃত্ত বিবিধ অভিব্যক্তির সাহায্যে নৃৎ অভিনয়।^(১) নৃত্য হতে ভারতীয় নাটকের জন্ম। কীথ বলেছেন—“the origin of the drama in the sacred dance, of course, accompanied by gesture of pantomime character, combined with song and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama.” (Sanskrit Drama)। এ যত স্বীকার করলেও, সংস্কৃত নাটক কালক্রমে সুশ্লিষ্ট রূপ লাভ করেছিল মুছকটিক বা হুয়াবাক্স ইত্যাদির মত নাটকে। সংস্কৃত নাটকের বিকাশ ও আবেশন অতি সূক্ষ্ম সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শেষের ও শেষের দ্বন্দ্বের সঙ্গে এর কোনো সচল যোগাযোগ ছিল না। ম্যাকডোনেল বা মন্টজিয়াস প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ঐ বৈদিক আদিম সীতিনাট্যের অঙ্কুরিত রূপ জনসমাজে ধারাবাহিক ভাবে এসে যাত্রার পদ্ধতি লাভ করেছে, অরসেবের সীতপাণ্ডিত্যে তারই প্রকাশ। কিন্তু

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, বৈদিক ঐতিহ্যে কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি।

অধ্যাপক আন্তোভাভ ভট্টাচার্য বলেছেন, ওরাওঁদের ‘জৈবাত্মা’ বা লক্ষিপাতের ‘হারীহরাত্মা’ বা সাগুতাস-ভূইঞাদের ‘যাত্রাপরব’ প্রভৃতির মাঝে যাত্রা কথাটি একটি উৎসবাত্মক প্রচলিত দেখা বাচ্ছে। তা ছাড়া, যাত্রার মূলে আদিম সমাজে গ্রহ-নক্ষত্রাবির কক্ষীয় গমনাপনকে যে sympathetic magic জাতীয় অমুঠান হোত তার অনুমানও করেছেন।^(২) যে নরী তার দীর্ঘ গতিপথ অতিক্রম করে সমুদ্রে মিশে, তার উৎপত্তি বিশেষ একটি ধারা থেকে নয়, ছোট ছোট বিভিন্ন ধারা মিলে মিশে একটি নরীকে গড়ে তুলে; তেমনি যাত্রার উদ্ভবমূলে একটি বিশেষ ধারাই ক্রিয়াশীল, বিভিন্ন ধারা মিলে মিশে তাকে সম্ভব করে তুলেছে। ভট্টাচার্য মহাশয় কথিত ধারাটি ভাই যাত্রার উদ্ভবমূলে ক্রিয়াশীল হতে পারে, কিন্তু এই ধারাটিই যাত্রার একান্ত উদ্ভবমূল নয়।

অতীতে কোন দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করে নাচ-পানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করত। একে যাত্রা বলত। কেউ কেউ বলেন, সৌরোগ্রহ সবচেয়ে আদি-উৎসব। আন্তোভাভ ভট্টাচার্য ও এ কথা বলেছেন। মধ্যযুগের বহু বলেছেন, ‘স্বর্গের যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বহিরা নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে।’ (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ) স্বর্গদেবতা পরে শিবতীর্থের সঙ্গে মিলে যান। শিবপুরাণ, ধর্মসাহিত্য প্রভৃতি নানা পুরাণে নৃত্য-সীতাদিগে শিবজির উৎসবের কথা বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক অমিতকুমার ঘোষ গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, যে ডায়োনিসাসের উৎসব থেকে গ্রীক ট্রাজেডি ও কমেডির উৎপত্তি। এবং অনেকের সঙ্গে তিনিও দেখিয়েছেন, শিবোৎসবমূলক নৃত্য-সীত ও হাতকোঁড়কপূর্ণ বর্তমান গজদার বা গাঁজন উৎসবের মধ্যে যাত্রার আদি উপাদান দেখা যায়। কিন্তু তিনি পরিশেষে বলেছেন, পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব। তিনি বলেছেন, প্রথমে পাঁচালীর একজন মাত্র মূল গায়ক গান করত। কালক্রমে পাঁচালীর পহার ও পালাগানের দীর্ঘতার ফলে একজনের মূলে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আমদানী হতে লাগল। এই ভাবে পাঁচালীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং কালক্রমে পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল। এই মতটি মনোহারী, কিন্তু সত্যধারী নয়। সচল শিবোৎসবের নাচগান আমোদ কৌতুকের ধারা আর একটি আসরে স্থির পাঁচালী গানের ধারাকে তিনি মিলাতে পারেন নি।^(৩)

ডাঃ হুজুমার সেন বলেছেন,^(৪) যাত্রা কথাটি চলে এসেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে, এর অর্থ ছিল—‘গিছন গিছন বাওয়া, দল বেঁধে বা মিছিল করে বাওয়া।’ যাত্রা ছিল হৃৎরকম—আমোদ-প্রমোদের জন্য ‘বিহার যাত্রা’ বার থেকে বর্তমান জেলা অর্ধে ‘জাত’ কথাটি এসেছে; আর ধর্মকর্মের জন্য ধর্মযাত্রা, নাট্যসীতবোধক তৎসম শব্দটিতে এই ধর্মযাত্রার ইঙ্গিত। নাচগান করে ধর্মযাত্রা বা বিহারযাত্রার উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। হরিবংশে

২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৪। বিভিন্ন সাহিত্য ১ম খণ্ড।

যদি এক উল্লেখ পাই। সেখানে সম্ভবতঃ করে কুজলীলা বিষয় মঙ্গলদায়ক উল্লেখ আছে, তাতে নাট্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া যাবে। তাই তিনি মনে করেন, একটি অবিস্মৃত হতে থেকে মঙ্গলদায়ক বা পাঁচালীর দ্বারা নাট্যশিল্পের দ্বারা চলে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন, নেপালের কোন কোন ভাষা নাটকে নাট্যপালা পাঁচালীর বর্ণনায় অবিস্মৃত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বলেছেন, যার সঙ্গে পাঁচালীর এইমাত্র পার্থক্য ছিল যে, পাঁচালীতে মূল গায়ন বা পাত্র একটি মাত্র, যাত্রার একাধিক—সাধারণত তিনটি। বাজালী সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড—২য় সঃ : ১৫১ পৃঃ) এ সেনের মতটি নিশ্চিত বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মতের প্রমাণ হিসেবে (শ্রীযুক্ত ননোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত) নশালে ভাষানটিকগুলি অবলম্বিত হয়েছে। মনে প্রশ্ন না জেগে পারে না, কেন ঐ ভাষা-নাটিকগুলি বাংলার ভূমিতে স্থান পেল না নশালে গিয়ে আশ্রয় নিল? নাটক এমন একটা সাহিত্যিক রূপ যেখানে সমগ্র জাতিসত্ত্বের মহত্ত্ব ভাব আন্দোলন রূপ পায়, তা জাতির স্বপ্নের সামগ্রী, জাতির প্রাণের কাছেই তার ঠাই। তাহলে ওগুলি জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত নয় কি? মনে হয় ওগুলি নিত্য শৈল্পিক প্রচেষ্টা। আর আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে লোকসমাজে যাত্রার যে দ্বারা পাচ্ছি তার পূর্বসূরী হিসেবে এই জনাত্মিক ধাক্কা নাট্যশিল্পগুলি ইতিহাসের অবিস্মৃত দ্বারা আলোকপাত করতে ততটা পারছে কই?

যাত্রার পূর্বইতিহাস অধ্যয়নে এত গোলবোল দেখে ভাঃ হুইল সে বলেছেন, the old yatra seem to be of indigenous growth, peculiar to itself. তাই বাংলাদেশে যাত্রা বা যাত্রার অল্পরূপ কি কি প্রকরণ পাওয়া যাবে, দেখা যাক।

চর্চাপক্ষেই বাংলার নাট্যরচনার রূপ ও স্বরূপের আভাস পাচ্ছি—
নাট্যজি বাজিল গাখড়ি সেই।

বৃন্দনাটক বিস্মা হোই ॥

বৃন্দনাটক অভিনীত হচ্ছে। কেমন ভাবে? বজ্রগত নাট্যরচনা ও সেবী পাইয়েন—এর উল্টোভাবে, অর্থাৎ বজ্রগত গান ও সেবী নচেন—এভাবে সেই প্রাচীন নাটকের অভিনয় চলে। এর পর স্তম্ভগোবিন্দ পাচ্ছি। জয়দেব পাইয়েন, পদ্মাবতী নাচতেন, পরামহাষি জির বন্ধু মোহারের মত তাঁকে সাহায্য করতেন। স্তম্ভগোবিন্দ নাটকের চেয়ে স্তম্ভের প্রাধান্য। এর পর পাওয়া যাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যাত্রাপালায় রূপটি বেন হুশাট আকার পালা করে দেখা দিয়েছে।

চৈতন্য আলে নাট্য স্তম্ভাভিনয়ের উল্লেখ পাচ্ছি—বরা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিবর্ক কল্কর। চৈতন্য বলেছেন, “আজি নৃত্য কবিবাণ্য করব বদান।” তিনি অভিনয়ের যে চূড়ান্ত পার্থক্যতা—অভিনয়ের বিরুদ্ধত পত্রিপাত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস—তার বৃদ্ধি হাঙ্গন করেছেন। (৫) এমন কি তাঁর অভিনয়ে সাজপোষাকের উল্লেখও আছে। “চৈতন্যভাসবতে” “কৃষ্ণবাত্রা” কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬)

৫। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, কুমিকা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। “কৃষ্ণবাত্রা” অথবা “কৃষ্ণ-পত্রিকা”।

ইহার উল্লেখো নাহি জানে কোন জন ॥”

কিন্তু বাংলার অভিনয় গ্রন্থের কোনো নিবন্ধন পাওয়া যায় না একালে। কেবল কয়েকটি সম্ভবত অভিনয় গ্রন্থ পাচ্ছি—শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ, ‘ললিতমাধব’ ও ‘বিশ্বদামাধব’, রামানন্দ রায়ের ‘কর্ণদামাধব’, কবি কর্ণপুত্রের ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ ইত্যাদি। চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালী জাতির মধ্যে যে একটা ভাব-আন্দোলন জেগেছিল তারই ফল এগুলি। এর পর আর হ’ল ‘বহর বাংলা সাহিত্যে’ যাত্রার কোন নিবন্ধন পাচ্ছি না। এই মধ্যযুগীয়কালের গুপ্ত-প্রচেষ্টা হিসেবে ভাষা-নাটকগুলিকে ধরা যেতে পারে।

এর পর আঠার শতকের দ্বাদশাব্দ থেকে যাত্রাপালায় উল্লেখ পাচ্ছি। কুজলীলা বিষয়ক ‘কালীয়দমন’ পালায় তখন বিশেষ প্রচলন। তার সবচেয়ে পুরনো কবির নাম শিত্তরাম অধিকারী। শিত্তরামের নিবাস ছিল কৌতিল্যগ্রামে। তাঁর শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীও নাম করেছিলেন। পরমানন্দের পর শ্রীধর-সুন্দারের যাত্রা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। গোচন অধিকারীর ‘অন্ধক-দেবদাস’ ও ‘নিমাইসম্রাট’ও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এরপর কৃষ্ণকমল গোবিন্দী, গোবিন্দ অধিকারী ও তাঁর শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়; তারপর ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় ইত্যাদি বাজাপালায় নাম উল্লেখযোগ্য। এদের যাত্রাগুলি বিবেচনা করলে তিনটি ভর হুশাট হয়ে ওঠে। প্রথম ভরে পড়ে কৃষ্ণকমল গোবিন্দীর যাত্রাপালাগুলি। এর ভিতর গত আছে কয়েক ছন্দ মাত্র, এটি মুখ্যত কীর্তন পালায়ই নাট্যরূপ। দ্বিতীয় ভরে পড়ে গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পালাগুলি; এদের মধ্যে গান ও কথা আর সমান সমান

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আছে

মনে আলে ডোয়াকিনের



কথা, এটা
বুঝে যাভা-
বিক, কেনার
সবাই জানেন
ডোয়াকিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভাজিকার
জ্ঞত লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

পো-কর :- ৮/২, এল্ড্র্যাংমেড ইস্ট, কলিকাতা - ১

অংশ গ্রহণ করেছে। কৃত্তীর স্তরে ব্রজমোহন, মতিলাল রায় ইত্যে আরম্ভ করে আধুনিক সখের বাজাওয়ালাদের রচনায় (প্রায় বাট কংসর হইতে চলিল, এই সখের বাজা প্রথম আরম্ভ হয়। বঙ্গবর্নন কান্ডন, ১২৮১) উচ্ছাসপূর্ণ নীর্থ গন্ত সলাপের প্রাধান্য আর প্রত্যেক সলাপের সঙ্গে একটি করে গান আছে। আবার এই স্তরের রচনায় অসংখ্যক ভাঁড়ানি বা তরল হাস্যরস স্তম্ভির প্রচেষ্টা দেখা যায়। কুককমল বা গোবিন্দ অধিকারীর ভক্তিরসও সেই এখানে। এর থেকে বৈভবনাথ ঈল মনে করেন, (৭) গীতগোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বারায় সঙ্গীতাত্মক নাট্যগীতের এক ধারা এসে আঠার শতকের শেষ থেকে পরিশীলিত করেছে। আততোষ ভট্টাচার্য্যও বলেছেন, “বাংলার শোকনাট্যের এই দুই প্রান্তবর্তী দুইটি নির্দেশের উপর লক্ষ্য রাখিরাই ইহার মহাবর্তী স্তরের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।” আর সেসব নাট্যশালায় বিঘরবস্ত ছিল “বৈকুণ্ঠবর্ষ সম্পর্কিত এবং কুল্লীলা বিঘরক”। বৈভবনাথ ঈল দেখিয়েছেন, কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও ভাবের পারস্পর্য্য রক্ষা করে পদের পর পদ সজিয়ে নিবন্ধ কীর্তনের যে সব পালা বোল শতকের শেষ দিকে রচিত হতে লাগল, পরে কবিগণ এই সংগ্রহগ্রন্থের আদর্শে নিজেরা স্বতন্ত্র পালা রচনা করতে লাগলেন। দীন চন্দ্রদাসের যে পালাগ্রন্থ মণীন্দ্রমোহন বহু আধিকার করেছিলেন, তা হোল এই ধরনের নির্দর্শন। পরে পালাকীর্তনে নানা দুহুই দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কথকতা অল্পপ্রবেশ করতে লাগল। কীর্তন ও বাজার মহাবর্তী স্তরে চপকীর্তন। চপের মধ্যে বাজার প্রায় সমস্ত লুকপই লুপ্ত হয়। একক অভিনয় না বেখে তাকে ডেঙে বন্ধ পাড়াপাড়ার দ্বারা অভিনয় করালেই বাজা হয়। চপে সলাপের আধিক্য দেখা যায়। মোট কথা, সলাপ ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে যে বাজার উৎপত্তি, চপকীর্তন তাইই অন্ততম রূপ (পূর্ববর্তী রূপ)। আর এই চপকীর্তন যে নতুন পাটালীর উদ্ভব, সে কথা ডাঃ হুজুমার সেন মহাশয় বলেছেন। (৮) তাই পাটালীর সঙ্গে বাজার সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। আমার মনে হয়, সতের শতকে বাজার মহাভারতের বিভিন্ন খণ্ড ৭৩ পালা রচনার আধিক্য বা বাজার পালা রচনা যে মনোভীতিপ্রযুক্ত সেই একই মনোভীতি থেকে বাজাপালা রচনার সূত্রপাত। কীর্তনগানকে নতুন ভোলে উপভোগ করবার প্রয়াস থেকেই বাজাপালায় প্রবর্তন। আঠার শতকের শেষদিক থেকেই বিভাসরস পালা রচনার উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। এ বিঘের বহাভরসর ঠাকুরদাস দুখোপাধ্যায়, বেলতলার প্যারীমোহন, ভাঘবাচার্যের নবীনচন্দ্র বস্ত্র, গোপাল উড়ে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙালী সংস্কৃতিতে ও বাংলাসাহিত্যে বাজার উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করা গেল। এবং তাতে দেখা গেল, নাট্যগীতের এক বিশেষ ধারা গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বারা দিয়ে বৈকুণ্ঠ আবেগাত্মক ভাবাকুলতা ও সঙ্গীতক পালাসংকীর্তনের রূপে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বাংলা বাজার উদ্ভব হয়েছিল। তার মূল্য বৈকিক নাট্যগীতের দ্বারা প্রবাহিত হয়নি। আর ডাঃ সেন কথিত প্রাচীন নাট্যগীতের দ্বারা থাকতে পারে। কিন্তু তাই বাজাপালায় সল

প্রবাহকে প্রবর্তিত করে নি। প্রাচীন গৌরবাজার উদ্ভবই শিবোৎসবের সলাপা ও নাট্যসমের দ্বারাও কিছু পরিমাণে থাকতে পারে, এসব প্রাচীন সংস্কাররূপে মিলেমিশে বাজারপকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে; কিন্তু বাজা বাংলাসাহিত্যে indigenous growth, peculiar to itself—এর মূলে বাজারের আদি নাট্যাকৃতি সক্রিয়, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রাক্ আধ্যাত্মের লক্ষণ-সমৃদ্ধিত ব্রতকথার মাঝে তার সূত্র দেখিয়েছেন। অনেকে মঙ্গলকাব্যের মাঝে বা অন্ত কোথাও নাট্যরসের স্রবিক সূত্র দেখিয়ে বলেন, বাজার দ্বারা এদের মাঝ দিয়েও এসেছে। আসল কিন্তু তা এই নাট্যাকৃতির স্বাভাবিক সূত্র। এদের মাঝ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা, বাজার পূর্বসূরী বা পটভূমি হিসেবে তা বিবেচ্য নয়, কেননা dramatic element কেবল play-drama-opera-ই একান্ত উপকরণ নয়। বাংলার অধিবাসীর ছিল স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চিত, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা থেকে দূরীভূত, তাই মুক্তিকামারী স্বয়ং সরলভাবে সংগঠিত, বাহ্যিক বাস্তব, নৃত্যের স্রুততার, সঙ্গীতের ব্যবহার ধর্ম তার গ্রাম্য নাট্যপ্রয়াস বিলম্বিত হয়েছিল, আর ধর্মমোহে তার দুটি আত্মর থাকায় বাস্তব সংঘাত বস্তুবোধ হয়ে উঠেনি। এজ্যেই বাজার আড়ষ্ট ও বিলম্বিত বিকাশ ও প্রকাশ।

—দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫৫)

শ্রীমতী রাধাকান্তী দেবী

শিল্পীজীবনের চরম উৎসবতার উঠিয়া আজও যিনি নিজেকে শিকাবীনা মনে করেন—অন্ততঃম ষষ্ঠ-পার্বিকা হওয়া সত্ত্বেও অহংকারকে যিনি ঘৃণে রাখেন—বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন গানকে নিজ অধিবাজার সাথে যিনি মিশাইয়াছেন—সেই শ্রীমতী রাধাকান্তী দেবী ব্যক্ত করলেন :

আমি বহর পাঁচ কংসরের শিশু, তখন থেকে পাড়ার বাজা ও কীর্তনের আসরে যসে যে গানগুলি শুনতাম—তা বহুতরু মনে পড়ত ততটুকু বাড়িতে গাইতাম। আমাদের জিরাগরের লোক ছিলেন জেলা-খ্যাত কীর্তনীয়া হরিমান দাস। তাঁর গান প্রায়ই ততবার চুপটি করে যসে। তাঁরই জিলাসার একদিন তাঁরই গায়ক হুঁ-চার লাইন কীর্তন গাই। তারপরে তিনিই হলেন আমার প্রথম সঙ্গীতগুরু। সাত কংসর বয়স থেকেই তিনি আমার নানা আসরে নিয়ে যেতেন এবং তাঁরই কোলে যসে গান গাইতাম। এই বয়সে এসে আসরে ছিলেন হুঁদারাবাদের জেলা-শাসক বাজালাজারী ও প্রায় বৈকুণ্ঠ ইয়ারাজ এডি (Eddie) সাহেব। তিনিও হারিনাম কীর্তনে যোগ দিতেন। আমার গান শুনে নিয়ে থেকে একটা প্রপঞ্চাসর ছিলেন—আজও তা রেখেছি বহু করে। পল্লী অঞ্চলে অনেক বৈকুণ্ঠ কীর্তনীয়া, অনেক সত্যকারের বাউল জানতেন। গৃহস্থ হজেন বহু তাঁদের গান শুনে—আর তাঁরাও যন-প্রাণ উজাড় করে কীর্তন গাইতেন। সাধারণ ‘সিমে’ নিয়ে অনেক জিনিষ নিখেছি এই স নামহীন জাতিমান কীর্তনীয়া আর বাউলদের কাছ থেকে। তাঁরাও আমার গুরু—আমার প্রবক্তা। তাঁদের পাঁচগা দেহতত্ত্বের গান কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার মনে, হয় পান শেখার নয়

৭। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা।

৮। বাঙালী সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—২য় স্ক—১৫৮ পাতা।

কান জৈয়ারী করতে হবে। অর্থাৎ কানের ভিতর যে কান আছে তাকে সজাগ রাখতে হবে। নতুন জীবনে নূর আসে না—গলায় নূর আসে না—গলার নূর ঠিক বাজে না। সাধারণ লেখাপড়ার গরুর করতে পারি না—হেসেবেলা থেকে হারিয়েতার সঙ্গে লড়াই করে দুসংযোগ বার বার ভেঙ্গে চলেছে—কিন্তু যেটুকু শিখেছি তার জন্যে কানি আছে এই কান গেতে রাখার অভ্যাস।

কলিকাতার এসে শেখাবারী কীর্তন গায়কদের সঙ্গে পরিচয় হয়। জাত-বৈকল্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের গান গাওয়ার তুল থাকত। তখন উঠা বসিকমল থেকে নির্বাসিত হয়ে প্রাচ্যবাড়ীতে “সোলা” খুঁজে বেড়াত। তবুও তাঁরা দুইখের দিনে, অনাদরের দিনে কীর্তনগানের ধারাকে শুকিয়ে যেতে সেন নি। তাঁদের অনেকের প্রতি শেয়ে গুণ হয়েছি। বড় হয়ে বুঝলাম যে কীর্তন গানের অনেক কিছুই শেখা হয়নি। তাই আতুল আগ্রহে খুঁজেছি সেই শিক্ষককে—বিনি নতুন করে আমার পাঠ পড়াবেন। সৌভাগ্যবশতঃ কীর্তনশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীহরিদাস করের সঙ্গে পরিচয় হল—কিন্তু শারীরিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। তার পর শ্রীপকান উড়াচার্যের শিষ্য গ্রহণ করে গুণা হয়।

কলিকাতার জীবিকাভরনের জন্ত আসবার আগে মধু সাহেবের শিষ্য গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। এত বড় সঙ্গীতশিল্পীর মধুর কণ্ঠ স্রীর নূর কাক ও বাচ্ছল্য আলংকারিতা প্রতিটি শ্রোতাকে সম্বোধিত করত। কাজী নজরুল ইসলাম ও আরও অনেকে তাঁর শাস্ত্র শিষ্য ছিলেন। এত বড় সঙ্গীতশিল্পীর শেখ পরিণতি হয়েছিল—হু হুঁচো আয়ের অভাবে কণ্ঠ হয়ে বার কীপ আর মাদিকতলার এক জঘন্য বস্তীর এক ভালা ঘরে পথ্যহীন, উষ্মহীন সখ্যহীন হয়ে শেখ নিঃশাস ভাগ করেন। হুতুর কিছুদিন আগে প্রচণ্ড জ্বর গায়ে এক বিলায় চেপে আমার বাড়ী এসেন। সর্বদা তাঁর কাঁপছে—চোখ দিয়ে জল বরছে—জড়ানো গলার আমার তানপুরা নিতে বসলেন। এই অবস্থায় ওস্তাদজী গান ধরলেন। হুঁ হুঁ হুঁ অশ্রু প্রতিভার। তাঁর ধারণা হয়েছিল তিনি ঠিকমত শেখাতে পারেন না। তাই লোকে তাঁকে ভাগ করেছে। হিন্দী ও উর্দু গান শেখাবার আগে আমার তিনি প্রথম শেখান ঠিকমত উচ্চারণভঙ্গী ও ভাষা। অনেক বাঙ্গালী শিল্পী তুল উচ্চারণের জন্ত অনেক আসরে হাতাশূন্য হন। মধু সাহেবের শিক্ষার গুণে আমি দিল্লী, লখনৌ, নাগপুর, পাটনা প্রভৃতি বেতার কেন্দ্র থেকে বাৎসরিক আমন্ত্রণ পেয়েছি। শ্রীমতের চৌধুরীও আমাকে হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারে বহু সাহায্য করেন। এই ভাষা হুটি ঠিকমত আরম্ভ না করলে, নতুন আন্তঃপ্রাদেশিক সংস্কৃতি-গোষ্ঠীতে বাঙ্গালী শিল্পী অনাবৃত্ত হতে পারে।

কলিকাতার এসে তদানীন্তন বেতার কেন্দ্রে শিল্পী হিসাবে যোগ দিই এবং আজও আমি উহার শিল্পী। এখনকার প্রধান প্রোগ্রাম পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় মধুমহারের অশ্রু রেহমর ব্যক্তিগত আমার শিল্পীজীবনকে গড়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করেছিল। রাইটস বডল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট, বাণীকুমার, পঙ্কজ-মল্লিক, বীরেন্দ্র সেনের সহিত শিল্প সম্মেলিতার কথা বার বার মনে পড়ে। এই সময় বেতারের সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক ছিলেন শ্রীমুখের চক্রবর্তী।

তিনি আমার উচ্চ সঙ্গীতের তালিম দেন। এছাড়া বাণীকুমারের বেতার বিজ্ঞানায় আমার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবর্তিত ‘মহালার উঠা অল্পটানে আমি প্রায় বারো বৎসর যোগদান করি। আদর্শ ব্রাহ্মণের মতন তাঁহার সূচিতা আমাদের উদ্দীপিত করত। ইহাকে সার্থক করে তুলেছিলেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।

সেই সময় কলকাতা প্রোসোফোন কোম্পানীতে যোগদান করিয়া প্রথম গান করি উর্দু গজল ‘না কিসিকি জাঁখ কা নূর হ’। এর পর বহুরকম গানের রেকর্ড করিয়েছি সেখান থেকে। গৃহ প্রবেশের বিখ্যাত গান হুটি ‘অগ্নিশিখা এসো এসো’, ও ‘এই মননের সাগর পার’ে শ্রীঅনাদি দত্তদ্বারের সুরে আমি গাই। তাছাড়া, নেপালী মাড়োয়ারী ও নাগপুরী ভাষায় রেকর্ড করাই এখন থেকে। মধু বোসের হিন্দী আলিবাবার রেকর্ডাভিনয়ে আমি ‘মজিনার’ ও বড়ুয়া সাহেবের ‘জবাব’ (হিন্দী) রেকর্ডাভিনয়ে নায়িকার অংশে অভিনয় করি। দুইখের বিবয়, গত কয়েক বৎসর আমার কোন রেকর্ড সেখান থেকে হয়নি।

সিনেমায় যোগদানের পর কৃষ্ণ-সুদামা, কণ্ঠহার, মানমরী গার্গস তুল, রাভার্বো, রামাহুত ও চাপচাতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছি। চাপকার প্রয়োগকর্তা ছিলেন নাট্যাচার্য সত্য-লোকান্তরিত শিখিরকুমার। ইহার আউটডোর স্টুডিও-এর সময় শ্রীমতী ককাবতী প্রচণ্ড জ্বরে সংক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় একমাত্র আয়িই তাঁর কাছে ছিলাম। শত চেষ্টাভ্রমেও তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে নাই। প্রয়োজক হিসাবে বড়ুয়া সাহেব, নারায়ণ বসু, লেবকী বসু ও মধু বসুকে আমি খুব সজ্ঞা করি। এদের উত্তর হইব কিছু কিছু গান আমি রেকর্ড করি। পঙ্কজকুমার ও আমার বৈত-সঙ্গীত কোন লগনে জনম আমার খুবই জনপ্রিয় হয়। এখনকার মতন সেদিনের



শ্রীমতী বাণারসী দেবী

নেপথ্য-পায়কদের টাইটলে নাম থাকত না বা এত সম্মান ছিল না। সিনেমার নাম করতে হলে প্রযোজকের শুভকামি পাওয়া চাই শিল্পীর—ইহাই আমার ধারণা।

পেশাদারী রকমকে বখন যোগ দিই, তখন বাংলা রকমকের ভয়প্রায় অবস্থা। অভিনয় শেখার জন্য স্বর্গত শিশিরকুমারের মতন আচার্য্য পাওয়া সৌভাগ্যের টুকু। দু'একদিন মহলা দিয়ে তাঁর সঙ্গে পিয়ারা, ছায়া, সিতারা, সেবকী প্রভৃতি ফুমিকায় আমার অবতরণ করতে হয়েছে। কালিকায় মীরাবাই নাটকে নামফুমিকায় ও নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে সারির ফুমিকায় আমি তুণ্ড হয়েছি। শোশাঙ্ক স্থানে শ্রীপ্রবোধ গুহ ও শ্রীমতী নীহারবালায় সঙ্গে আমার খুব পরিচয় হয়। নীহারবালা ফিল্ম থেকে বিদায় নিয়ে পতিচাঁরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে স্থান পান ও সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহার মল্লো ছিল একটি শিল্পপ্রাণ। সারা বার্ণার্ডের বা ইসাভেরা ডানকানের জীবনী হয় 'কিন্ধ

খ্যাভনামা লেখক ও সাংবাদিকদের সহিত শ্রীমতী নীহারবালায় এত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাঁহার শিল্পজীবনী কেহই এ পর্যন্ত লেখেন নি।

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল আমার—কিন্তু শেখার সুযোগ পাই নি। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৈভালিক' দলে আমার নেন ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের অঙ্কশিল্প আরম্ভ করান। ভর ভেঙ্গে গেলে মহানন্দে অন্তরে অল্পভব করতে লাগলাম শিল্পজীবনের চরম সার্থকতা—রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে। এর জন্তে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আমি বিশেষ স্বামী।

কিছুকাল আগে কীর্ত্তন গানের একটি ছোট বিভাগের খুনি—আর তার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন সত্যিকারের সঙ্গীতরসিক ভূপতিদা' অর্থাৎ রাজা সরকারের অন্ততম মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার। আমার পরিচালনা শক্তির অভাবে সে বিভাগের চলনি—কিন্তু ভূপতিদার সঙ্গীতশ্রীতিতে মুগ্ধ হয়েছি।



অজয় নদীর চর

ঐআইতি রাহা

ছেটি একটি গ্রাম ঐ সেখা বায়
অজয় নদীর চর,
বেধায় মোরা বেঁধেছিছ মোদের
সামের কুঁড়ের।
নদীর বুকেতে বঁরে বেত তরী
উড়ায়ে তাদের পাল,
কালের হাওয়ার হায় সেখায়
নেমে এল মহাকাল।
কত কুঁড়ের সমাধি হয়েছে
চাল উড়ে গেছে বয়ে,
তাদের সেখিয়া নয়নের জলে
কত কথা মনে পড়ে।
কিছু ঘুর গেলে চোখে এসে পড়ে
বায়েরের ভাঙ্গা বাড়ী,
বেতে হয় সেখা মোদের বাড়ীও
বট পাছ পথে ছাড়ি।
পুকুরের পাড়ে চোখে পড়ে কত
অতীতের ভাঙ্গা বাড়ী,
সকালে বিকালে বসে বেত বেধা
“বউঠাকুরাণীর হাট”।
হোসেনের বেধা সমাধি দিয়েছে
অজয় বাকের তীরে,

আজিও সেখায় পৃথিক চলিতে
চেরে দেখে কিংব কিংব।
শরৎের দিনে আগমনী গানে
উঠিত গো আবাহন,
সঙ্গীত সবুজ হাসিতে ভরিত
পথ-প্রান্তর-বন।
সোনার বরণ ধানের ক্ষেতেতে
বাইত মল্লর বহিরা,
ঐবগুণি সব চলিয়া পড়িত
কতই না কথা কহিয়া।
গ্রামবাসী মোরা সবল প্রকৃতি
হুখেতে মধুর হাসি,
হুখে হুখে মোরা ঝাঁড়াভায় লগা
লগার পাশেতে আসি।
ভোলাভেল নাহি জানিতাম মোরা
কিন্তু-হুসলায়ন,
আকাশে বাতাসে ভরিয় উঠিত
হাস-হাসিমের ধান।
অভাব কাহারো ছিল নাই বেধা
কেহ পাণ্ডেনিক' কব;
নদীর মাঝেতে জেসে আছে আজো
অজয় নদীর চর।

সেকেন্সে

খাবার না নিয়ে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ

নষ্ট করবেন না ?



সেকেন্সে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যবহার সীমিত
ভালভাবে জীবন উপভোগ করার এবং আধুনিক
জগতের সুবাসিত জীবনে সফলতার পথে সঠিক
বাধ্য হয়ে উঠতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত, কোনো কোনো লোককে বলতে
শুনা যায়, "আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না।
শুনেছি, বাছুর পক্ষে জিনিসটা ভাল নয়।" এ হল
একবারেই সেকেন্সে সংস্কার ... কারণ স্নেহভাজী
পদার্থ যে বাছুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান
তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে
পুষ্টিকর ও উপকারী স্নেহপদার্থের সমন্বিত
বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

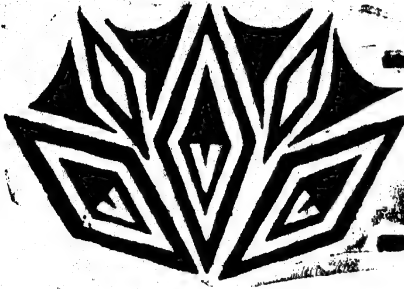
অত্যাবশ্যক ভিত্তিমািনে সমৃদ্ধ
বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে বাছুর ও শক্তি করার
সাধনায় জন্মে প্রত্যেক বাছুরের দৈনন্দিন পুষ্টি
পক্ষে দু' আউন্স করে স্নেহপদার্থ বাগড়া প্রকার।
স্নেহপদার্থ আমাদের অল্প খাদ্য হ্রাস করতে ও
তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া,
রোগ ও অবসাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আমাদের
হৃৎ ও সর্বল থাকতেও সাহায্য করে।

বনস্পতি কিন্তু উদ্ভিদই হেঁ—চিঁচিঁবাবাদের ও
তিনের তেল পরিপাক্য করে বিশেষ প্রয়োজনে
ভৈরী। এর তেতের স্নেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত
হয়ে আছে বলে বনস্পতি শুধু যে দামে মূল্য ও
অল্পেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ... আরো
ব্যাপ্য প্রকারের জন্মে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয়
ভিটামিনও এতে বেশানো হয়। বনস্পতির প্রতিটি
আউন্স এ-ভিটামিনের ১০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে
সমৃদ্ধ—বা তেতের ও ছকের বাছুরকার, শরীরের
করপূরণ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক।

ভাল, খাদ্য আপনাকে ভাল বাছুর উপভোগ
করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য
করে ... এবং বিপুল, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে
মূলত বনস্পতির ব্যাপ্যে ভাল খাদ্য বাগড়া সহজ
হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে
হয় করা উচিত নয় ?

বনস্পতি
— হাড়ের গিল্লির বন্ধ

বনস্পতি বাছুরকৃত্যাদি প্রস্তুতকরণ এবং বিক্রয় কর্তৃক প্রচারিত



সাহিত্য পরিচয়

বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

বাঙলা সাহিত্যের দীর্ঘকালব্যাপী গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আলোচনা এ পর্যন্ত বহু স্রবীই করেছেন, এই আলোচনা-গ্রন্থগুলি বলা বাহুল্য, দেশের ও দেশের প্রভুত মঙ্গল সাধন করেছে। লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা শিক্ষারতী ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন—তবে এক জিন্নত! আনন্দ অবলম্বন করে, সাহিত্যের ইতিহাসই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য; তবে আলোচনার তলী একটি পৃথক ধরনের। আর এর কলে গ্রন্থটি যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্য বিধুবৃত্ত হয়েছে। ঠিক কতকগুলি তথ্যগরীর সংকলন বা সাহিত্যবিশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর পর্ষায় এই গ্রন্থটিকে কেলা বার না, এর আলোচনার ভিত্তি আরও গভীর। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পরিবেশে সাহিত্যের যে নিত্য নবরূপায়ণ ঘটেছে তার মূল পটভূমিকার প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন, যে মূল ধারাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শতাব্দী ব্যাপক বাঙলা সাহিত্যের উপর দিয়ে যে বৈচিত্র্যের বজ্রাঘাত করে চলেছে তার উৎস-পঙ্কানে লেখক যাপূত। নব নব ত্রুতনা ও নব নব চিন্তাধারার সমিক্ষণে সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে তালে ভাল রেখে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে যে সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, পুষ্ট হয়েছে, বিকাশ ঘটেছে, সে সবকিছু লেখকের মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থটিকে যথোচিত স্তম্ভপূর্ণ তাৎপর্যবান ও অভিনব করে তুলেছে। গ্রন্থটির গঠনকার্যে লেখকের প্রচুর পরিশ্রম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হয়েছে। আমরা আশা রাখি যে দেশবাসী এর বধ্যবহ মূল্যবান কাঁপাণ্য প্রকাশ করবেন না। এই গ্রন্থ পাঠক-সমাজে ও ছাত্রসমাজে সমান সম্মানলাভ করবে বলে আশা করা যেতে পারে, এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার বড় অধিক হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থের পেচাণে বাঙলা সাহিত্যের একটি কালাহুত্বকমিক এবং সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি স্রবীর তারিখের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা মুদ্র করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কন অপরূপ হয়েছে, শিল্পীকে অভিনন্দন জানাই। (বঙ্গিও সমুখ প্রচ্ছদে গ্রন্থের লেখকের নাম লিখিত নেই এবং প্রচ্ছদশিল্পীর নামও গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না) প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ১ ভাষাচরণ মে ট্রিট। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সত্যতা ও আঁপনিক মুদ্র

আজকের দিনে কনসের অভিমুখে সারা জগতের ক্রমাগতসরণ শান্তিকারী মানুষকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলেছে। কল্লীর দিবিদিকে আজ যে ব্যাপক ভাবে বিসর্জিত হয়েছের চোরে ছোরে

মধ্যে পৃষ্ঠের পূজারী মানুষদের পক্ষে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা এক বিরাট প্রচেষ্টার তথা সমস্তার রূপ নিয়েছে। বর্তমান কালে আন্তর্জাতিক স্রবী সমাজে বাট্টাও রাসলে একটি বিরাট প্রচেষ্টার আসনের অধিকারী, মনীষার দরবারে এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান অনন্তসাধারণ বিশ্ববন্দিত। এই বর্ষায়ান চিন্তানায়ক ও দার্শনিকের অভিমতে মূল্যও অপরিসীম। জগতের এই কনসেরখীনতা স্রবীরবের মানবপ্রেমিক মনকে ব্যথিত করে তুলেছে, ব্যাকুল করে তুলেছে, বিহ্বল করে তুলেছে। চতুর্দিকে হিলা, হানাহানির বড়বড়, কুটিলতা, পদচীকাতরতা ও কন্ডা-সোলুপতার ভরাবহ মিছিল তাঁর মনকে পীড়িত করে, তাঁর মতে এ পথ বাঁচার পথ নয়, প্রকৃত পথ নয়, কল্যাণের পথ নয়, এ পথ পরিহার করে শান্তির, মৈত্রীর, শ্রীতির পথে পদাৰ্পণ করলে কল্যাণের মিত্র আলোর সারা জগত জ্বরে উঠবে, নিশাচর বিশবর্ষ থেকে পাওয়া বাবে রক্ষা—মিলবে জীবনসেবতার রুচী রুচী আশীর্বাদ। উপরোক্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত এবং স্রবীসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত। আনন্দিক হৃদয়ের মারাত্মক পরিণতির সিকে মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রাসলে ক্ষান্ত হন নি, শান্তির পথে পদক্ষেপণের এক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীও সেই সঙ্গে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবনসাধকের এই হুমহান প্রচেষ্টা সকল হোক, এই কামনাই করি। পথদ্রান্ত মানুষকে পথ খুঁজে নিতে আঁপ রাসলের সৃষ্টিমিত নির্দেশ প্রভুত সহায়তা করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। গ্রন্থটির বধ্যবহান করেছেন শ্রীমতী কল্লনা দায়। ইতিপূর্বে একাধিক বিদেশী সাহিত্য বাঙলায় অনুবাদ করে প্রভুত বণ ও খ্যাতির অধিকারিনী হয়েছেন শ্রীমতী দায়, মাসিক বহুমতীতে বর্তমানে তাঁর অনুবাদ-উপভাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। রাসলের গ্রন্থানুবাদেও অনুবাদিকা যথেষ্ট শক্তির পরিচর দিয়েছেন এবং আপন সুনাম অক্ষর রেখেছেন, তাঁর অনুবাদকর্ম নিসন্দেহে আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। প্রকাশক—আর্ট হ্যাণ্ড সেটার্স পাবলিশার্স। জবাহরম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন দ্ব্যতিনিউ। দাম—ছ' টাকা পঞ্চাশ নয়। পরলা মাত্র।

মধুমালা

বাঙলা সাহিত্যের হুমপ্রভাসের মধ্যে কাজী মজল ইসলামের দাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বধ্যবহানীর প্রবাদমন্ত্র সেবকসের মধ্যে এই সৈনিকটির আসনও পুরোভাসে। বাঙলা কবিভার ইতিহাসে নজরুলের নাম চিত্রকালের মত চোখ আঁকবে অকল্পিত স্বর্গাকরে। আলোকেই জানেন যে, বধ্যবহানীর কৃপাও নজরুলের উপর কম পরিমাণে ব্যয়িত হয় না। স্বরকার ও শীতিকার হিসেবেও নজরুল অকল্পিত

এক জনে সমালীন, সুবন্ধন ও গীতিকার হিসেবে তাঁর অবদান যেহেঁয়ালপক ভেদনই বিরাট। গীতিনাট্য রচনাতেও তাঁর কবিতা সীমাবদ্ধ নয়, সম্ভ্রান্ত উপরোক্ত শিরোনামের তাঁর একটি গীতিনাট্য দীর্ঘকাল পরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই গীতিনাট্যটি এককালে সর্গ্যরবে নাট্যভারতীয় অভিনীত হয়েছিল এবং এই নাটকটির দ্বারা নট্যভারতীয় বাহ্যিক ভুক্ত। গীতিনাট্য রচনার নকসুলের কুলসভার হৃদয় পাঠ্যর পাঠ্যর ফুটে ওঠে, গানগুলি অভ্যন্তরীণ স্বকল্পিত এবং কল্পনাময়। এই নাটকের কাহিনীর মূল বস্তুটিও খেটে স্বয়ংসম্পর্ক। প্রচ্ছদচিত্র একেই প্রদর্শন করছে। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—২ টাকা মাত্র।

রক্তের বদলে রক্ত—ও মানুষ নামক জন্তু

রূপ-রস-বর্ণ-বৈচিত্র্য সমন্বিত জীবনের মহিমামণ্ডিত রূপ ধরা পড়ে ধীরে ধীরে, জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা প্রত্যক্ষ করতে পারেন, জীবন-রহস্যের উৎস-গন্ধানে তৎপর যে সব সন্ধানীর দল, সেই সার্বকনামা জীবনশিল্পীদের মধ্যে মনোজ বসুও একজন। উপরোক্ত উপভাস হুটিকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অন্ততম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। উপভাস হুটির নামকরণের মধ্যে এদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক মতান্তর থেকে জাত লালা-হাঙ্গামার আগুনের লেলিহান শিখা মানব-জীবনে যে কতখানি বিপর্যয় আনয়ন করে আনল, হিংসা-হানাদানির মারপ্যাট কত শান্তির নীড়কে ধ্বংস করে দিল, জগতের মানুষের মিছিল থেকে কতজন যে কোথায় ছিটকে পড়ে চিরকালের জন্তে হারিয়ে গেল, মানুষের জীবন যে কতখানি ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, মানুষের হাসি-আনন্দ-গান কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল। প্রাণ নিয়ে কি জীবন ছিনমিনি খেলা চলতে পারে, এখন উপভাসটিতে সেই বীজঙ্গল বৃন্দসভার রূপ প্রতিচ্ছবিই দেখতে ফুটে উঠেছে। মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে জন্তুও লুকিয়ে থাকতে পারে, বহুসময়ের তাঁর পাশব প্রবৃত্তির বিকাশের কলে কয়েকটি নিষাপ সরল জীবনের উপর দিয়ে সর্বসাধারণের বিক্ষণী ব্যাধার হয়ে বার। পাশব প্রবৃত্তির বিকাশে হুহু সমাজ কেমন কণ্ঠে বিধিরে ওঠে! বিতীর্ণ উপভাসটিতে মানব-জীবনের ব্যাধার, বেন্দ্যার, বন্ধনার বিকটির এক সম্যক চিত্র দেখকের দেখনীর কলাশে প্রকৃতিত হয়েছে। আত্মকের দুষ্টিয়া যে কতখানি মেকিতে ছেয়ে গেছে দেখক-দেখিক সাধাভবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। জীবনের নৃত্যভার সেরাযিহুর হুকি কেবল তাঁর দেখনী আঁকনি, আশার হা ভেঙে রাইও তাঁর দেখনী উদিয়েছে। অন্ধকার রাত্রির ভীষণ ভরাল রূপের প্রতিচ্ছবিটি ফুটে ফরই দেখক কাঁদে হন নি, উজ্জল প্রভাতের সৌভাগ্য আলোকের কলনও তাঁর দেখনীর দ্বাধ্যমে প্রকাশ পায়। পাঠক-পাঠিকা তথা মানুষের বরবারে দেখক কেবলমাত্র দুঃখবাদের প্রচার করেই থেমে যান নি—সেই আনন্দলোকের সিংহদ্বারের দিক নির্দেশও তিনি দিয়েছেন, ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্রচিত্রণে, সলাপ বর্ণিত অনন্তসাধারণ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন শক্তিশালী কথাসিল্পী শ্রীমদাচরণ বসু। স্বরনার, বর্ণনার, বিভাসে অতুলনীর পতির পরিচয় দিয়েছেন দেখকের দেখনী। মনোজ বসুর হুহু অন্তর্ভুক্তি তাঁর উপস্থিতি ও তাঁর অতুলনীর স্পর্শপ্রভাবে এই হুট সার্বিক

হয়ে উঠেছে। উক্ত প্রবন্ধে প্রচ্ছদচিত্রাকলে আশাভরণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শিল্পী আও বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত প্রবন্ধই প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—প্রথমটির হুটাকা পঞ্চাশ নয়া পরলা মাত্র এবং বিতীর্ণটির তিন টাকা মাত্র।

নতুন বাঁকে

বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্প ও উপভাসের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে স্বরগীর নামগুলির মধ্যে 'বনফুল' নামটি অন্ততম। বহু সার্বকনামা ছোট গল্প ও উপভাসের তিনি শ্রেষ্ঠা, আশা করি, এ কথাও কারো অজানা নয় যে, কবি হিসাবে বনফুল কম বশবী নন, বাঙলা কবিতার পুষ্টি সাধনে বনফুলের অবদানও অল্প নয়, বাঙলা কাব্য দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দ্বারা সেবিত হয়ে আসছে। বর্তমানে তাঁর কতকগুলি কবিতার একটি সংকলন এই প্রকাশিত হয়েছে। এই তিরিশটি কবিতা স্থানলাভ করেছে। কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ, স্বয়ংসম্পর্ক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতাগুলির ভাব অপূর্ণ, হৃদয় মনোরম, ভাষা সাবলীল। কবিতাগুলির আবেদন পাঠকচিত্তে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র কবিতাগুলির মধ্যে প্রশস্তিবাচক কবিতাগুলি বহা শাক্যিসিহ, পচিলে বৈশাখ, শ্রীশ্রীয়া সারলা দেবী, দাদামশাই, (রসসম্রাট কোদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), স্বরীন্দ্রনাথ (মৃত্যুবিবসে), প্রজ্ঞেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় কবি বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিতাগুলি এক অনবদ্য আভরিকতার স্পর্শে ভরপুর। প্রচ্ছদচিত্রাকলনের প্রশংসা দেখিয়েছেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান হ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩ পাক্স রোড। দাম—২ টাকা পঞ্চাশ নয়া পরলা মাত্র।

অশেষ গল্প

উত্তর হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতাটি সুবিস্তৃত, বশবী শিক্ষাধি ও শিক্ষাপ্রচারক হিসেবেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু ছোট গল্প রচনাতেও তাঁর দেখনী যে সমান পটু, এই বিষয়টি অনেকের কাছেই এখনও অজানা হয়ে গেছে। তাঁর কয়েকটি ছোট-গল্পের সংকলন এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমরা এটুকু জানা অজানাসে করতে পারি যে ছোট গল্পলেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদের আসনও নিম্নসক্ষেই প্রথম সারিতে। এই লাভটি গল্প স্থান পেয়েছে। হরপ্রসাদের গল্পরচনাকেও তাঁর কবিতার খেটে প্রভাবাবিত করেছে। গল্পগুলির সৌন্দর্যের প্রথম অঙ্গী অল্পবয়সের ও এক গভীর অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দেখকের এক প্রবীণ স্বরসাহিত্যের পরিচয় মেলে। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই এক বিশেষ আবেদন বহন করে। ঘটনার সংস্থাপনে, চরিত্রস্বভাব, বর্ণনাভঙ্গীতে দেখক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি সমগ্র গ্রন্থটিতে দেখকের এক উপার দরবী ও শ্রিত মনের আলেখ্য প্রকৃতিত হুহু উঠেছে। প্রকাশক—ইই এও কোম্পানী, ৩১ নেতাভী হতাব হ্যাভিনিউ স্ট্রামপুর্, প্রান্তিহান—ইই এও কোম্পানী, ৫২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট। দাম—২ টাকা মাত্র।

অপার্থ্য

পাঠক-পাঠিকাকে অজ্ঞানোষ যে, উপরের শিরোনামটি বেন তাঁরা আমাদের মন্তব্য বলে মনে না করেন—আমাদের মন্তব্য বরং এর বিপরীতই। রম্যরচনার মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি বাঁদের দ্বারা হয়ে চলেছে, নীলকণ্ঠ তাঁদেরই একজন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির তুলনায় রম্যরচনার লেখকসংখ্যাও অল্প, সেই বিরল সংখ্যকদের মধ্যে নীলকণ্ঠ নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। শ্রুতি উক্তি, তীক্ষ্ণ মন্তব্য এবং সভ্যতাভাব এই ত্রিধারা মিলিত হয়েই নীলকণ্ঠের সাহিত্যে এবং তার কলে তাঁর রচনা প্রথম প্রাণের সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, এই গুণগুলির স্বাভাব্য প্রকাশ আসোটা গ্রন্থটি থেকেও অল্পপাছিত নয়। যে দুর্নীতির বিববাস আজকের সমাজকে বিবাক্ত করে তুলেছে তার বিরুদ্ধে লেখক এক 'সম্প্রদায়ের চাবুক' ব্যবহার করে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রচনাগুলির মধ্যে লেখকের জীবন, মানব ও সমাজ-সচেতন মনের যে পরিচর কুটে উঠেছে তা 'পাঠক' সাধারণের অন্তর-স্পর্শ করবে বলে আশা করা যায়। হুটি খোলা চিঠি (একটি নির্দ্বার্ক রায়কে অপরাধি বাটা প্রতিষ্ঠানকে) এবং হুটি ছবির (পঞ্চের পাঁচালী ও কাবুলিওহালা) সমরোপযোগী বর্ণিত ও ততোধিক নির্ভীক সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পার্শ্বপ্রদ্রোহ এবং পঞ্চাঙ্গপ্রদ্রোহ লেখা গ্রন্থটির সক্ষিপ্ত পরিচিতি রচনা-কৌশলে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ভাষানাল পাবলিশার্স, ২০০ কর্ণওয়ালিস ট্রাট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

নাট্যগুচ্ছ

সাম্প্রতিক কালে বাঙলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সেবা করে যে তরুণ বঙ্গী-উপাসকের দল দু'নাম অর্জন করেছেন শ্রীতরুণ দায় ওয়কে ধনজর বৈরাগীর স্থান তাঁদেরই মধ্যে। সার্থক নাটকের স্রষ্টাকর্মী তাঁর প্রচেষ্টা সাক্ষ্যলাভ করেছে, একথা বললে ভুল হয় না। নাট্যশাস্ত্রের কল্যাণকর তাঁর আশ্বিনিরোগের বিরোধ সুবিস্তৃত। বাঙলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসও অসামান্য গৌরবের আসার উজ্জল, তার অভিবান বেগিন থেকে শুরু হয়েছে তার পর আজ একটি শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। এই কিবিরবিক একটি শতাব্দীর সাক্ষ্যের বাঙলার নাট্যগুচ্ছ রয়েছে পরিমার্ণেই সমৃদ্ধ হয়েছে। সাধারণতঃ নাটকের মাধ্যমে বঙ্গের সমকালীন ছবি, তার প্রাণ, তার স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা নাট্যকারের প্রধান দায়িত্ব। নাটকের প্রধান ধর্ম বলতে বা বোঝা যায় তা হচ্ছে মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলা। এই প্রধান দায়িত্বকে কেন্দ্র করে বিচার করলে দেখা যায় যে, তরুণ দায়ের নাটকগুলি আত্মস্রষ্টার দায়িত্ব। পাঠক বা লক্ষকের দাবী মোতাবেক সক্ষম, আজকের সমাজের বিভিন্ন রূপের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি বর্ণনাচিত্র নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছে পাঠক তথা লক্ষক-সাধারণের সামনে। লেখকের সন্ধানী মনের পরিচরও গ্রন্থের নানাস্থানে পাওয়া যায়। নাটকগুলি বাস্তববর্ষী হলেও তাদের মধ্যে রূপ-বর্ণ-বর্নময় বিচিত্র বর্ণনার এক আকর্ষ অল্পভূতি অদৃষ্ট নয়। গ্রন্থে সবসময়ে নটি নাটিকা স্থানলাভ করেছে, এসের মধ্যে অবিকারই আকাশবাণী এবং অন্যান্য স্থানী সমারোহে অভিনীত।

দৃষ্টান্ত হবে বলে আশা দায়ি। শ্রীতরুণদায় দায়ের প্রথম রচনা প্রকাশ্যে। প্রকাশক—বাটী দ্যাও সেটার পাবলিশার্স, ব্রহ্মকুরন হার্টস ৩৪ ডিসেম্বর দ্যাডিনিউ। দাম—হুটাকা যখন নয়-পয়সা মাত্র।

বৃত্তমতার ইতিহাস

আজকের দিনে বিশ্বপ্রসঙ্গে বাবীন ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনীয় যে ক'টি দেশের নাম উল্লেখ করা চলে, মাঝি বৃত্তমতার তাদের মধ্যে অন্যতম। অগতের মহাদেশগুলির মধ্যে অ্যামেরিকাই বরং সবচেয়ে তরুণ। পোনে পাঁচ শ' বছর আগেরও সারা পৃথিবীতে এই মহাদেশের অভিব্য পর্বত ছিল না। আর একটি কারণে বাঙালীর কাছে মাঝি বৃত্তমকের গুরুত্ব রয়েছে, বহির্ভারতে বৃত্তমতার বাস্তবত্বের প্রচারে পুণ্যকল লাভ করে সর্বপ্রথম গুচ্ছ হয়েছে এই দ্যাডমেরিকা। আজকের এই মানবসভ্যতার ব্যাপক জরবাজার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই দ্যাডমের মনের গতিবিবেগও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তার মন ক্রমশঃই ক্ষীত থেকে ক্ষীততর হয়ে চলেছে। মানবমনের প্রাণও আজ হতে চলেছে অনন্ত থেকে অনন্ততর। সত্যপিতার সীমারেখা অতিক্রম করে প্রাণেরতার আহ্বান দ্যাডমকে আকর্ষণ করছে। বৃত্তমতার প্রাচীর ভেদ করে বিশালতার, প্রাঙ্গণে পা ফেলতে মানবচিত্র উদ্বুদ্ধ। জানার ইচ্ছা নয় আজ জানার কুখা দ্যাডমের মন অধিকার করে আছে। আজ দ্যাডম পরিণত হতে চলেছে এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীতে, দ্যাডম অপরের সঙ্গে আজ বিশলভাবে জানতে চায়, পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই এই জানা সম্ভবপর হবে, দেশের ইতিহাসই নিয়মন করবে এই জানার কোঁতুল।—শ্রী আর, বি, নাই ও শ্রী মে, ই, মোরপারগোর লেখা বৃত্তমতার ইতিহাসে বৃত্তমতার সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্যে ভরপুর এবং এ দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা বিবরণ-গুরু। দ্যাডমেরিকার বিশাল ইতিহাস রয়েছে কৃত্তিমের সঙ্গে মিলিবদ্ধ করেছে লেখকদায়। বাঙলার গ্রন্থটির প্রশংসারী অজ্ঞান করছেন শ্রীবীরবর্ষ সরকার, শ্রীলীলতরুণ বেব ও শ্রীমতী শীপালি মুখোপাধ্যায়। অজ্ঞান কর রয়েছে উজ্জ্বলের হয়েছে এবং নিপুণতার স্বাক্ষর বহন করেছে। শেখোক্তদের প্রথম সফল হয়েছে এ কথা অনায়াসে বলা যায়। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এঃ ১৩২-১৩৩ কলেজ ট্রাট মার্কেট। দাম—বর্ণ টাকা মাত্র।

আমিকারের গল্প

আজকের দিনে বেকীর ভাগ ক্ষেত্রই বিজ্ঞানকে পরিচালিত করা হচ্ছে ধ্বংস করে, বৈজ্ঞানিক শক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বিপ্লী প্রচেষ্টার, বিজ্ঞানের ধ্বংস করার শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে পূর্ণমাত্রায়, কতকগুলি আত্মস্রষ্টার, কমতাসোতী, ব্রহ্মবীরদের হাতে পড়ে বিজ্ঞান আজ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে বিধাতার অভিশাপরূপে অথচ এ কথাও কোনরূপেই অস্বীকার করা চলে না যে, বিজ্ঞান বিধাতার আশীর্বাদের এক বলন্ত স্বাক্ষর। সাহিত্যের মত বিজ্ঞানও সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। বিজ্ঞান ব্যতিক্রমে সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণ। সভ্যতার উৎকর্ষবর্ষী বিজ্ঞানের অবদান যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সীমাবর্ষী। সেই অসত্য, বস্ত, বর্ষা জীবন বাপন করেছে যে দ্যাডম—তার পর বহু শতাব্দী ধরে যে অসত্য দায়নায় সে

କୃତ୍ତବର୍ଣ୍ଣେନ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ

সম্প্রদায় বাম্পালের মধ্যে হারিশচন্দ্র কৃষ্ণকর্ণের উপস্থিতি
ত পোলে কংসামাত্র, খুব অল্প জল ছুড়ে থাকলেও
মধ্যেই মধ্যে কৃষ্ণকর্ণ যে একটি বিশেষ লক্ষণ
প চরিত্র, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে
কৃষ্ণকর্ণের নিরীড়াভাবের আঁচটুকু অবলম্বন করে হোটেলের
বাগী একটি তিনটি দৃশ্যসমিতি নাটক রচনা করেছেন খ্যাতিমান
ক প্রশান্ত চৌধুরী। শারী নাটকের মধ্যে কৌতুকবস্তু হুক কন্ডম
কটি বেশ উপযোগ্য হয়ে উঠেছে। নাটকটি অভিনীতও হয়েছে
হয়ে। নাটকটির মধ্যে কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র বৃত্ত করে
কটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। নাটকটি হোটেলের
পায়ে পায়ে গৃহীত এবং বসে শামরা আশা রাধি। নাটকটি
মিত্র ও সুনির্মিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কলাগোষ্ঠন কল্যাণ
প্রাচীণ, চরিত্রগুলিও অস্বাভাবিক নয়। প্রচ্ছদ এবং প্রবেশ অভিজ্ঞ
গুলি অঙ্কন করেছেন লেখক বর। প্রকাশক—বলাকা প্রকাশনী
শি আমহার্ট ট্রাট। দাম এক টাকা পণ্ডিত নরী পরমা মাত্র।

ভালোবাসা

जयसि नाम उवा

আমার চিত্তা তোমার বুক বহুক বহুক,
আমার বুদ্ধি তোমার চোখে বহুক বহুক,
হাসিখেলের নিকি কখন
পল্লভাঙের হাজরান নদে
আমার দুখে সন্ধ্যার বীণ
বাহুক বলে বাহুক বলে ।

প্রাৰণ, ১৩৬৬ (জুলাই-আগষ্ট '৫১)

অন্তর্দেশীয়—

১শা প্রাৰণ (১৮ই জুলাই): কেৱলে কমুনিষ্ট মন্ত্ৰিসভাৰ উচ্ছেদৰ দাবীতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ (ডা: ৰাজেন্দ্ৰপ্ৰসাদ) নিকট কেৱল বিমোচন সমৰ সমিতিৰ নেতা ঐশ্বৰনাথ ও কেৱল প্ৰজা-সমাজতান্ত্ৰী নেতা ঐশ্বৰু পিল্লাই-এৰ দৰবাৰ।

২য়া প্রাৰণ (১১শে জুলাই): শিক্ষা-প্ৰতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্ৰভৃতি জনকল্যাণ সংস্থাৰ ধৰ্ম্মত বদ্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সৰকাৰ প্ৰস্তাৱিত আইন-ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিৰোধকৰে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কৰ্ত্তক পাঁচ দফা আন্দোলনবহী গ্ৰহণ।

৩য়া প্রাৰণ (২০শে জুলাই): ৰাজসিং-এৰ সৰকাৰী ভাৰ্য্য হইতে দশ হাজাৰ টাকাৰ চাউল পাচাৰেয় সংবাদ।

কেৱলে অধিবেশ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ব্যবস্থাকৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিকট কেৱল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ স্মাৰকলিপি পেশ।

৪ঠা প্রাৰণ (২১শে জুলাই): জম্মু ও কাশ্মীৰেৰ ভয়াবহ বস্ত্ৰাৱ ১৩১ জনেৰ প্ৰাণহানি—১০ কোটি টাকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট।

কেৱলেৰ সৰ্বশেষ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে ত্ৰিবাৰ্ম্মায়ে ৰাজ্যপাল ডা: বি, ৰামকৃষ্ণ ৰাও-এৰ সহিত কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী জিই, এম, এল, নাথুৰিগিয়েৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা।

৫ই প্রাৰণ (২২শে জুলাই): ভাৰত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি প্ৰসঙ্গে নয়াদিল্লীতে সেক্টৰাৰী পৰ্য্যায় উভয় ৰাষ্ট্ৰেৰ সম্মেলন।

৬ই প্রাৰণ (২৩শে জুলাই): পাক সৈন্যদল কৰ্ত্তক আসামেৰ জয়ন্তিয়া পাহাড়-সীমান্তে আৱণ্ড হুইট ভাৰতীয় গ্ৰাম (বাকুৰিলা ও বাশা) অধিকাৰ।

১১৬১ সালেৰ এপ্ৰিল মাসেৰ মধ্যে পূৰ্ব ৰেলওয়েৰ পিৰালং-ৰাণাঘাট একে সময়-বনগী সেকশন দুইটিৰ বৈদ্যুতিককৰণ—গলিষ্ট ৰেলওয়েৰ জেনাৰেল ম্যানেজাৰ ঐক্ৰপাল সিং-এৰ ঘোষণা।

৭ই প্রাৰণ (২৪শে জুলাই): কলিকাতা পৌৰসভাৰ অধিবেশনে পৌৰকৰ্ম্মীয়েৰ বেতনেৰ হাৰ পৰিবৰ্ত্তনেৰ প্ৰশ্ন আলোচনাকালে সভাকৰ্ম্মেৰ ভিতৰে ও বাহিৰে তুৰুল হটগোল।

৮ই প্রাৰণ (২৫শে জুলাই): কেৱল পৰিস্থিতি প্ৰসঙ্গে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সহিত প্ৰধান মন্ত্ৰী জিনেহু ও কংগ্ৰেছ-সভানেত্ৰী জীমতী ইলিৱা গান্ধীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক।

৯ই প্রাৰণ (২৬শে জুলাই): নয়াদিল্লীতে কেৱলেৰ প্ৰসঙ্গে প্ৰধান মন্ত্ৰী জিনেহু ও কেন্দ্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পণ্ডেৰ জৰুৰী আলোচনা।

১০ই প্রাৰণ (২৭শে জুলাই): পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য উপদেষ্টা বোৰ্ডেৰ সভাৰ মুখ্য মন্ত্ৰী ডা: বিৰানচন্দ্ৰ ৰায় ও খাদ্যসচিব ঐশ্বৰুচন্দ্ৰ সেনেৰ সহিত বিৰোধী বলভুজ সমন্তেৰেৰ তীব্ৰ বাগাছবাৰ এক সৰকাৰী কাৰ্য্য-ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিবাদে বিৰোধী সমন্তেৰেৰ সভা-কক্ষ তাগ।

১১ই প্রাৰণ (২৮শে জুলাই): কেৱল সৰকাৰেৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিকট উপস্থাপিত প্ৰশ্নেৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সকল অভিযোগ সম্পূৰ্ণ

উত্তৰীণ—দিল্লী ও ত্ৰিবাৰ্ম্মায়ে প্ৰকাশিত কেৱল সৰকাৰেৰ (কমুনিষ্ট) অৰাৰে স্পষ্ট ঘোষণা।

১২ই প্রাৰণ (২৯শে জুলাই): কমুনিষ্ট পাৰ্টিৰ পশ্চিমবঙ্গ শাখাৰ থক হইতে কলিকাতাৰ ৰাজ্যপাল জীমতী পদ্মজা নাইডুৰ নিকট এক দিল্লীতে ৰাষ্ট্ৰপতি ডা: ৰাজেন্দ্ৰপ্ৰসাদেৰ নিকট ৰাজ্যেৰ কংগ্ৰেী মন্ত্ৰিসভাৰ বিৰুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগ সম্বলিত স্মাৰক-লিপি পেশ।

১৩ই প্রাৰণ (৩০শে জুলাই): পশ্চিমবঙ্গ সৰকাৰেৰ জনস্বাৰ্থ-বিৰোধী খাদ্যনীতিৰ প্ৰতিবাদে মুখ্য মন্ত্ৰী ডা: বিৰানচন্দ্ৰ ৰায়েৰ বাসভবনেৰ সম্মুখে তিনি সহস্ৰাধিক নৱ-নাৰীৰ বিক্ষোভ।

১৪ই প্রাৰণ (৩১শে জুলাই): কেৱলে ২৮ মাসবাণী কমুনিষ্ট শাসনেৰ অবসান—ভাৰতীয় সাংবিধানৰ ৩৫৬ ধাৰা অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতি কৰ্ত্তক পাসনভাৰ গ্ৰহণ।

প্ৰথম ডিভিচান কুটবল লীগ প্ৰতিযোগিতাৰ মেইনবাগান দলেৰ (কলিকাতা) চ্যাম্পিয়ান শিপ (এ বাব ৮ বাৰ) লাভ।

১৫ই প্রাৰণ (১শা আগষ্ট): অস্ত্ৰসংৰণ চুক্তি ভঙ্গ কৰিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ৰে ডাঙকি অকলে পাক-সৈন্যদেৰ পুনৰায় স্তম্ভাবৰ্ণ।

১৬ই প্রাৰণ (২য়া আগষ্ট): কেৱলে কেন্দ্ৰীয় হস্তক্ষেপ ব্যত্যয়েকে গতান্তৰ ছিল না—নয়াদিল্লীতে কংগ্ৰেছ পাৰ্লামেণ্টাৰী দলেৰ সভাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী জিনেহুৰ উক্তি।

১৭ই প্রাৰণ (৩য়া আগষ্ট): লোকসভাৰ বৰ্ধাকালীন অধিবেশনেৰ প্ৰথম দিনে কমুনিষ্ট সদন্তগণ কৰ্ত্তক কেৱলে কেন্দ্ৰীয় হস্তক্ষেপেৰ প্ৰতিবাদে একযোগে সভাকক্ষ তাগ।

১৮ই প্রাৰণ (৪ঠা আগষ্ট): বিনিয়ন্ত্ৰণেৰ পৰ পশ্চিমবঙ্গেৰ সৰ্ব্ব চড়িলেৰ মূল্য বৃদ্ধি—লোকসভাৰ প্ৰশ্নবাণে জৰ্জৰিত কেন্দ্ৰীয় খাদ্যমন্ত্ৰী ঐশ্বৰজিতপ্ৰসাদ জৈনেৰ বাকৃতি।

১৯শে প্রাৰণ (৫ই আগষ্ট): লোকসভাৰ স্পীকাৰ জীমন্ত-পৰনম আয়েলাৰ কৰ্ত্তক কেৱল (কেন্দ্ৰীয় হস্তক্ষেপ) সম্পৰ্কে কমুনিষ্ট বুলভুৰী প্ৰজাৰ অগ্ৰাহ—পৰিণতিতে লোকসভাৰ তুৰুল হটগোল।

২০শে প্রাৰণ (৬ই আগষ্ট): লোকসভাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী জিনেহুৰ বিবৃতি—ভিন্নত্ব চীনা কৰ্ত্তকপ্ৰেৰ এক আদেশবলে তিব্বতে ভাৰতীয় ও তিব্বতী মুক্তা বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে।

২১শে প্রাৰণ (৭ই আগষ্ট): ভাৰতে অনিৰ্দ্ধিষ্ট কালেৰ জন্ত ইংৰেী ভাৰা চালু থাকিয়ে—লোকসভাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী জিনেহুৰ ঘোষণা।

২২শে প্রাৰণ (৮ই আগষ্ট): পশ্চিমবঙ্গ সৰকাৰেৰ জনস্বাৰ্থ-বিৰোধী খাদ্যনীতিৰ বিৰুদ্ধে ২০শে আগষ্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গেৰ সৰ্ব্বত্ৰ আইন অমাত্ৰ আন্দোলন—মূল্যবৃদ্ধি ও হাড়িক প্ৰতিৰোধ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত।

২৩শে প্রাৰণ (৯ই আগষ্ট): নয়াদিল্লীতে ৰাজ্য শিক্ষামন্ত্ৰী সম্মেলনেৰ সিদ্ধান্ত—১৯৫৫-৬৬ সালেৰ মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসৰ পৰ্য্যন্ত সকল বালক-বালিকাৰ অৰ্বেতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানেৰ ব্যবস্থা কৰা হইবে।

২৪শে প্রাৰণ (১০ই আগষ্ট): ৰাজ্যসভাৰ কেৱলেৰ ৰাজ্যপালেৰ কেৱল সৰ্বকাল মিশোৰ্ট দাখিলেৰ দাবী প্ৰত্যাহ্বান হওৱাৰ প্ৰতিবাদেৰূপে কমুনিষ্ট সদন্তেৰে সভাকক্ষ তাগ।

২৫শে প্রাৰণ (১১ই আগষ্ট): ভিন্নত্ব ভাৰতীয়নেৰ বপেনেৰ আনয়ন ব্যাপাৰে ভাৰত সৰকাৰেৰ অনুৰোধ গণচীন কৰ্ত্তক অগ্ৰাহ—লোকসভাৰ জীমতী লক্ষী মেননেৰ (কেন্দ্ৰীয় পৰরাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰেৰেৰ সহকাৰী মন্ত্ৰী) উক্তি।

নরসিংদীতে দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত ও আফগানিস্তানের
শ্রী নতন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত।

২৬শে প্রাবণ (১২ই আগষ্ট) : সীমানা (পাক-ভারত) নির্ধারণ
পারে থাশিরা জরজিরা পাহাড় (আসাম) ও ত্রিপুরার ডেপুটি
মিশনারদের বৈঠক ব্যর্থতার পর্যাবসিত।

২৭শে প্রাবণ (১৩ই আগষ্ট) : চীনের সরকারী পত্রিকার ভারত
ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার—সোচ্ছন্দ্যের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর
বাণী।

২৮শে প্রাবণ (১৪ই আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যাগুলি
তদন্তবিধিতির সঙ্কট নিরসনের নতন প্রচেষ্টার অপ্রত্যাশিতভাবে
জ্যেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের রাজ্য প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের
তা'ত্বে প্রকল্পের ঘোষের বোধ বিবৃতি প্রচার।

২৯শে প্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) : দেশের সর্বত্র রাহুলি পদ্ধতিতে
বীনতার দ্বন্দ্ব বাহিনী উৎপাদন। বহু স্থানে সভা-সমিতিতে
গণতান্ত্রিক কংগ্রেসী সরকারের তীব্র সমালোচনা।

মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাসক প্রতিরোধ কমিটি ২০শে আগষ্ট হইতে
জাভাঙ্গী (পশ্চিমবঙ্গ) আইন অমাত্র আলোচনের সিদ্ধান্ত
রণ করার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক বিবৃতি যারকত
লোচ্য কমিটিকে সতর্কীকরণ।

৩০শে প্রাবণ (১৬ই আগষ্ট) : হুগলি কোর্ট ও ভারতীয়
মিশনের এক্সিক্যুটর সম্প্রদায়ের জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন
রা হইবে—কান্দীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের ঘোষণা।

৩১শে প্রাবণ (১৭ আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও হ্রাসক
প্রতিরোধ কমিটির প্রস্তাবিত আইন অমাত্র আলোচন (রাজ্যব্যাপী)
মনে ১৬ জন এম, এল, এ সহ প্রায় দুই শত বায়পন্থী নেতা ও
মন্ত্রী প্রেরণ।

হির্দেশীয়—

১লা প্রাবণ (১৮ই জুলাই) : পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক
দৃষ্টান্তের আদেশ অনুযায়ী ১৯৫১ সালের ৭ই মে তারিখের
গণতান্ত্রিক বহুভূমতীর সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত।

পেশোয়ারে মার্কিন বাঁটি স্থাপনে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি
স্বাক্ষরিত হওয়ার সুবাদ।

৩রা প্রাবণ (২০শে জুলাই) : সমগ্র জাতিগত সমস্যার রীমাংসা-
রে হুগল চতুষ্পতি (কশিরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ক্রাণ)
রিরাষ্ট্র সচিব সম্মেলনকে আধা স্থায়ী সম্মেলন পরিণত করার পশ্চিমী
মন্ত্রণা সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

৪ঠা প্রাবণ (২১শে জুলাই) : ইরাকের তৈল সহরে কিরকু-এ
ব্রিটিশদের সহিত ইরাকী বাহিনীর সংঘর্ষ অব্যাহত।

৫ই প্রাবণ (২২শে জুলাই) : জাভাঙ্গী এসসে জেনেভার
ফুসজি পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচনার অচলাবস্থা দুরীকরণের চেষ্টা
ওড়তার পর্যাবসিত।

৭ই প্রাবণ (২৪শে জুলাই) : আলজিরিয়ার বিদ্রোহ বন্দনে
লগ্নী সরকারের বৃহত্তম সামরিক অভিযান আরম্ভ।

মধ্যের ক্রেমলিনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের
সহিত মার্কিন জাইন-প্রেসিডেন্ট মিঃ দিওর্ড নিকসনের সাক্ষাৎকার।

১১ই প্রাবণ (২৬শে জুলাই) : আন্তর্জাতিক আইন-বিশেষজ্ঞ
কমিশন কর্তৃক তিরহেতের ঘটনাবলী তদন্তের জন্য কমিটি গঠন—
ডোবরম্যান : শ্রীপুরুষোত্তম ত্রিকমদাস (ভারত)।

১১ই প্রাবণ (২৬শে জুলাই) : রুশ কুর্নিম উপগ্রহ নির্মাণ
পরিদর্শনার প্রধান অধ্যাপক এডোনিম ব্রান্সনরাজতের ঘোষণা—
কশিরা ঐক্যই সৌরজগতের অজ্ঞাত গ্রহে পবেষণার বহুশক্তি সম্মিলিত
রকেট প্রেরণ করিবে।

১২ই প্রাবণ (২৭শে জুলাই) : হুগলিতির দ্বারে পূর্ব-পাকিস্তানের
তিন জন প্রাক্তন মন্ত্রী (আওয়ামী লীগ—কংগ্রেস কোরালিগান
সরকারভুক্ত) প্রেরণ।

১৩ই প্রাবণ (২৮শে জুলাই) : বিশ্ব সমতাবলী সমাধানের
উপায় বিবেচনার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ কর্তৃক
ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব।

১৪ই প্রাবণ (২৯শে জুলাই) : লাওস-এ সরকারী বাহিনী ও
প্যাথেন্ট-লাও বাহিনীর (বিদ্রোহী) মধ্যে পুনরায় লড়াই হওয়ার সুবাদ।

১৭ই প্রাবণ (৩রা আগষ্ট) : পারম্পরিক আমন্ত্রণ অনুযায়ী
রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক সেপ্টেম্বরের (১৯৫১) মাক্যামারি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার (মার্কিন) কর্তৃক
শরৎকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৮ই প্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট) : বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর
সহিত রাজকীয় লাও বাহিনীর সংঘর্ষের পর লাওসের পাঁচটি প্রদেশে
জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

১৯শে প্রাবণ (৫ই আগষ্ট) : প্রায় আড়াই মাস অবিলম্বন
চলার পর বিনা সিদ্ধান্তে জেনেভার জাতিগতী সম্পর্কে হুগল চতুষ্পতি
পররাষ্ট্র সচিবগণের সম্মেলনের পরিসমাপ্তি।

২২শে প্রাবণ (৮ই আগষ্ট) : কান্দীরের পাক-অধিকৃত
এলাকায় মঙ্গলাবীধ নির্মাণ ব্যাপারে ভারত কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘ নিষাপজ্ঞ
পরিষদে তৃতীয় দফা প্রতিবাদ পেশ।

২৪শে প্রাবণ (১০ই আগষ্ট) : লিভুনের জল বিভাগ সম্পর্কে
১৯৬০ সালের প্রথমার্ধে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি সম্পাদিত হইবে—
লগ্ননে সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের সহ-সভাপতি মিঃ উইলিয়ম
ইলিকের ঘোষণা।

২৬শে প্রাবণ (১২ই আগষ্ট) : চীন কর্তৃক লাওস হইতে
মার্কিন সামরিক কর্মচারীদের প্রত্যাহার দাবী। লাওসে ক্রাণ ও
আমেরিকার জেনেভা চুক্তি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উত্তর
ভিয়েতনাম সরকারের অভিযোগ।

উর্দ্ধতন চীনা কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বের শিকি-এর বাহিরে কোন স্থানে
এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার সুবাদ।

২৮শে প্রাবণ (১৪ই আগষ্ট) : জাপানে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষভায়া
প্রায় ৭ শত লোক হতাহত—১ লক্ষাধিক গৃহ বিক্ষত ও ৪২ বালি
হাহায়া জাহাজ জলে নিমজ্জিত।

৩০শে প্রাবণ (১৬ই আগষ্ট) : 'সম্মিলিত আরব' প্রজাতন্ত্র ও
জর্ডেনের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং জর্ডেন-সিঙ্গা
লীমাত্ত উদ্ধৃত করার ব্যবস্থা।

৩১শে প্রাবণ (১৭ই আগষ্ট) : তিরহেত নতন বিদ্রোহের সন্ধান—
পাকের লামার উপর চীন সরকারের আস্থা লোপ পাওয়ার সুবাদ।



[দৃশ-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

উল্লিখ

চৌর্যের ঘেরি ঠিক কদালীর উপরে নয়। কদালী থেকে খাল
 বেরিয়েছে, ঘেরির বাঁধ আর তার সমন্বয়ে এসেছে। একটা
 জায়গায় এসে খাল থেকে এক ডাল বেরিয়ে সেই ডাল গোলা হুকে
 পড়েছে বেরির ভিতর। বাঁধ দিয়ে দুখ আটকানো। বাঁধন
 সেয়ে ও বনকাটের আশ্রয় এই দিকটা। চোত-বোলশে নদীতে বাঁধ
 কখনো বাঁধের ওখানটা কেটে দেয়। বাঁধ কেটে ইচ্ছা মতো
 ঘেরির খোলে নোনা জল তোলে। জলের সঙ্গে মাছের ডিম
 ও ডাঙো-মাছ উঠে আসে। তারাই বড় হয় ঘেরির ভিতর। মাছের
 পোনা কেন্দ্রীয় জল এক আকোশে বরাট নেই এ তর্রাটে। বর্ষাকালে
 ডেড়ি জলে ভরতরতি হয়ে যায়। জল ছাপিয়ে উঠে বাইরের
 সঙ্গে একাকার হওয়ার উপক্রম, মাছ ঠেকানো যায়।
 তখন আবার ময়নাকোটালে বাঁধ কেটে দিয়ে খালের পথে জল
 বের করে দেয়। ধুব পতক হয়ে এই কাজ করতে হয়, জলের
 সঙ্গে মাছ বেরিয়ে না যেতে পারে। বাঁধের পলায় পাটা বোনা
 থাকে, বাঁধের কাটা জায়গায় সেইগুলো শক্ত করে বসিয়ে দেয়।
 জেয়ার জায়গায় আগেই ভাঙাভাঙি মাটি বেলে বাঁধ বেগারত
 করে রেখেত হবে। নয়তো খালের জল ভিতরে হুকে জল কীসে
 যাবে আবার। অনেক হাজারি। এবং একদিন একবার করেই
 হল না। সাত্ত বর্ষাকাল ঘরে মজর রাখতে হয়, অনেক বার
 এমনি কটিলপটির প্রয়োজন পড়ত।
 বাঁধের ঠিক নিচে সেই জল একটা ঢালা বানিয়ে রেখেছে।
 বাঁধ-কাটা সোকেরা কুটীবালায় মধ্যে সোমো জায়গায় দেয়,
 জেদাল রেখে সোমাকটাধাক যায়। হাঙ্গিরেলা পড়তে থাকল
 বা এক একদিন। বর্ষার সময়টা ভিড় খুব, মাছবের গভীরত
 সলিল সলসল, পারে পারে জলজের ভিতর পথ পড়ে যায়।
 সল সল উকি দেবে তাকায় না কেউ ওখিকে। জল
 এটে গিয়ে, পাতালভার মধ্যে ঢালায় একবারে অদৃশ হয়ে যায়।
 পলক-হাসির আলার উরধাককে সেদিন বড় খাতির করল। পলক-
 আলার খিটে গেছে, ভরপেট এসেছে। পেলেরদম, অনু হেঁটে চলে
 না। নাহোফালা চাক বলছে, সে হেঁটে যা গেলু বসার।
 বড়ই একজো, হুটী চাক কুটীরে সেবা করে বেতে হবে এখান
 ১৮৩৮

থেকে। ভিটেবাড়ি পবিত্র হবে, গোমিষ্ট কেটে যাবে।
 ছাড়বে না, আমি কি করব? ঐ দেখেন, উত্তর ঘরতে
 গেছে এর মধ্যে।

চাকবালা মেয়েটা হাসে বড় হাসা, আর আবার
 আবারের পেকিঙলের মতন নয়। ছাড়বে না বখন, কী উ
 আসবার সময় জলদালীকে বিলায় দিয়ে এসেছেন। রায়ে আজ ও
 গরজ নেই, ওদের ওখানে জলটল ষাওয়াবে, তাতেই ঢের হয়ে ব
 কিছু শুকতর বকমের জলযোগের উপরে আবার এই ভাত
 খাচ্ছে। হোক তবে তাই, মা-লক্ষীকে না বলতে নেই।

ভরপেট ষাওয়াবাওয়ার পর গড়াতে ইচ্ছে যায়। কি
 অনেক রাত হয়েছে, ঘেরি করা চলবে না আর একটুও। গো
 ভরষাক ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে লোক দিতে চাচ্ছে গ
 ভরষাক বাড় নাড়েন : নাঃ, কী দরকার! এই তো, এ
 গোলাম বলে।

চাকবালা বলে, শালতিও নিয়ে এসেন না। পারে হেঁটে এ
 যাবেন এক রং।

ভরষাক বলেন, শালতি আর চাপিনে এখন। কতটুকু বা রা
 কুলতলা থেকে নতুন এসেছি তখন, ছুতো পরে পরে তুলতুলে
 মাটির উপর বড় লাগত। এখন কড়া পড়ে গেছে।
 মায়লো পারে সাড় হবে না। আরও ঐ জলদালীকে দেখেই হয়ে
 দেখ না, সাঁইতলা থেকে সে কেমন দোজ হু-বেলা ফুড়-ফুড়
 বাওয়া-আসা করে। সে আমায় লজ্জা দিয়েছে। মেয়েমা
 পারে তো আমি লক্ষণই মর পাঁচব না কি জড়ে?

গরপ হতে বলেন, খুব খেয়েদেয়ে গোলাম। পুজোলা
 চাপিনে কি জল বকম দায়ে-বোদের বখনই দরকার হবে, আ
 ডেকে। আসব। সাতাই তো, তাকাল বলতে একলা
 জলটির মধ্যে—মান চাপিনে বসে থাকলে হবে কেন, আমি
 একটা কর্তী আছে বইকি। ডেকে তোমরা, কোন বকম গ
 কোয়ো না।

হরহর করে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ভরষাক বর
 একবারে নিভতি হয়ে গেছে বৈ। বাবাভনের দিক থেকে জ
 একটা আঁজার উল, এক বকম হাঙ্গির পাখি ডাক ঐ র
 ১৮৩৮

সর্বস্ব কেঁপে ওঠে। কিন্তু এসে ভরখাষ বসলেন, ধাক্কির করতে চাচ্ছে। তা বেশ, আলো ধরে একজন কেউ চৌধুরিগঞ্জের বাঁধে তুলে দিয়ে, আশ্রয়। এলাকার বাঁধে উঠলেই হল, আমাদের জালা অবধি বেজে হবে না। কে বাচ্চ, চলে এসো। বড় রাত হয়ে গেছে।

পচা ধাক্কে অজ্ঞ কে বাবে? পচা বুঝে কেনা-গোলাম। তাই বা কেন, কাজের নামে গা বাড়া দিয়ে আপনি উঠে পড়ে, কিছু বলতে হয় না—কেনা-গোলামে এত কুর করে না। ভরখাষের জাগে জাগে আলো ধরে পচা চলল। চৌধুরিগঞ্জের বাঁধের উপর উঠে গেছে, লুপ্তের আলো। ভরখাষ বসলেন, চলে বা এবার তুই। আর কই করতে হবে না। সোজা পথ—জলকান্দা—নেই, সিঁচি চলে বাব এইটুকু পথ।

তবু পচা ধাক্কির করে বলে, কী দরকার! আমায়ই কোন পথটুকু এগিয়ে দিলে পায়ে ব্যথা ধরবে।

ভরখাষ চটে উঠলেন: আচ্ছা নেই-চুড়ে তুই তো কেটা। বলছি যেতে হবে না, জোর করে বাঁধি নাকি? চৌধুরি-জালায় গিয়ে বাঁচবেই বন্ধ আসবার মতলব? চরবৃত্তি করবার?

এত বড় অভিব্যঙ্গের পর পচা আর এগায় না। রাগে গজগজর করতে করতে ফিরে চলল।

ভরখাষও এগলেন না জারি আলার দিকে। চুপচাপ পাঁড়ালেন। পচা নজরের বাইরে যেতে ফিরে চললেন আবার। ভাইনে ঘুরে রাখ ধরে হনহন করে চলছেন। বাজের ঘুংগু, জলসের দিকে।

কাছাকাছি এসে বাঁধ থেকে নেমে পড়লেন। হাত-আঁককার, ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালা। বাঁধের উঁচু সোজা সড়ক ছেড়ে জলসের আঁকাবাঁকা পথে যেতে গা-ছমছম করে। উঁ, সাহস বলিহারি অন্নদাসীরা। অনেক দিন টালবাহানার পর সেখান এই জায়গার কথা বলে মিয়েছে। পরিত্যক্ত ঐ ঢালাঘর। স্বজের মধ্যে অপেক্ষা করছে সে। জায়গাটা বেছেছে অল্প ভালই—বহু বদরাজেরও খুঁজে পাবার কথা নয়।

ভরখাষকে দেখতে পেয়ে ঢালাঘরের ভিতরে নয়—বাইরে কোথাও গিয়ে এসেছে অন্নদাসী। হাঁ, অন্নদাসী বই কি—মাহুব ঠিক কেনা যায় না, কাপড়-চোপড়-জড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। নিঃশব্দে হবার, ভরখাষ গুরুক মিলেন, কে?

অন্নদাসী হেসে বলে গলে পড়ছে: আমি শো—আমি—এক পেরী। এত কথাবার্তা—মনের হাল্ছ পোড়ারহুয়া সন্তত বিস্ময় হয়ে যেছি?

মাহিকপীরের পান হারে গেছে মস্তিষ্কটি গঠিপার বয়সোপকার। গুরু বড় বুককের রোগপীড়া হল। কিংবা গুরু নিষেধ হল। মাহিক পীরের নামে সিনি হামে, পীড়ার অহিমা প্রচারের পানিক ফের দুবিধা হল। এত কল গুরু নিয়ে স্বপ্ন কোন বাসনা হয় না, মাহিক পীরের স্তবক কুই থাকে গুরু উপর। পীরের ধার থেকে বাসনা নামধারের প্রক্তি প্রেরণা উক্তি অল্পকল্পে অন্নদাসী হামে এইবে বেধে গিয়েছে। বলে, পীরিজ্ঞক বাহুর একবারে বিস্ময় হয়ে গেছে গো। তাবছে পেরী আছে পাঁড়িরে।

ভরখাষ বুজল, পেরী হাজি কী আর কুই? মাহুব হামে অর্ধাৎ আশ্রিত ভরখাষ। কল হাতে দেখে সে—পুণ্যবাহু

হামে বুককের মধ্যে জানার বড়ান-বড়ান করাই। একবার মেয়েদাহু এলি তুই কেমন করে বল দিকিনি।

একাকেনা-আসনি—

ভরখাষ বলে, জাফি নিসে আবার কল জেটতে পেলি? এত কল জাফি, এমন থাকুড়ি নিসে গুরু হামর—

অন্নদাসী-বলছে, অহিহিসার একা একা জো—জা বয়স কেমনে টের পেয়েছে। গুরু-মাহিক কি না—শিছু নিয়েছে কখন থেকে।

খোঁড়া হামে জো-বহুরে অহা পড়ে পড়ে কোঁকায়, চৌধুরিগঞ্জ থেকে আপনার হাড়ির ভাত এনে-বাঁচতে হয়। হঠাৎ একবার শিহন ফিরে দেখি, খোঁড়া শা মিলি, জাল হামে গেছে। বাজারের আলো ছুটছে। মলি, অজ ফিলে, কিসের তলি? আপনার নরায়ণ-জল শুষ্কিত পেটে থেয়ে বাঁচছি—কোন দরকারে একই জলসে ঢেকেছেন, তা নিয়ে ছুটোছুটি অজ কিসের তলি?

বাহেজামে হঠাৎ কথা বলে ওঠে। কোঁকায় সাড়াসে ছিল, উদর হল মেনে মাহা বলে। বলে, এসছি, তাতে কি দোর হল? বায়ে পড়ে আসতে হয়। একা তুই আসিস কি করে? জলসের মধ্যে ধর কোন অজ জানোয়ার বেয়িরে পড়ল।

বাহেজামের পাশে আবার জা। কিছুকি, কবে হাসছে। জগা বলে, আমি মানা করেছিলাম: হল বেধে গিয়ে কাজ নেই তুইর যা। মেয়েদাহুব তুমিই বা কি কল হামে—আমরা কেউ গিয়ে দরকারটা তল আসিয়ে। তা নায়েব, মশায়, মশাখানার উপর দেখলাম টান খুব। ছেলে অজ বাড়ি রেখে মাহিরকো হোচট খেতে খেতে চলে এসেছে।

Amico's GREEN LINIMENT

আপনি নিচের লৈখিক ব্যাখ্যা হওয়া পাচ্ছেন—কোথায়?
কোথায়, হাঁটুতে, কিংবা কোন লিহিবানে?
তবে খুশী হবেন—

পারীষিক, হুক বা শিঠের পাঁচদার,
বাড়ের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাধি

এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট

(বহু, মদিসি)
যান্ত্রিক নিভরযোগ্য।

মূল্য: ১/৬ গিলি—২.০০ মার্কেট
হোট গিলি—১.০০ মার্কেট

আমিকো গ্রীন লিনিমেন্ট (এস) লিঃ
১০০০ সেন্টার স্ট্রিট, কলিকাতা



রাধেশ্বর বলে, টান বলে টান। চৌধুরী-আলা থেকে ফিরতে এসিকে বিকল, ওসিকে রাত হুপুহ।

অন্নানী কিন্তু হাসে। রাধেশ্বরের মুখের নিশ্চেষ্ট পায়ে মাখে না। হাসতে হাসতে বলে, তা কথাবার্তা কি আছে, বলে সেন নারের মশার। এতখানি পথ আবার তো কিরে বেতে হবে।

জগা হঠাৎ হুকার দিয়ে উঠল : এই রাধে, মারখোর দিবি নে—ধবরদার। মালী লোক—কুলতলা সদরের নারের মশার। গারে হাত না পাড়ে। সঙ্গে চাকু এনেছি—আপট বর, কাচ-কাচ করে কান হুটো কেটে নিরে ছেড়ে দিই।

ভরদ্বাজ আকুল হয়ে কঁদে বলেন, ওরে বাবা। ধবদ্বাপ তোরা আমার। অন্ন আমার মা। নাক মলছি, কান মলছি—বারমিগর আর এমন কাজ হবে না।

জগা নয়ম হয়ে বলে, আচ্ছা, বাক্স মাছের এমন করে বলছেন—মাঝামাঝি একটা বন্ধ করে নেওয়া দাক। হুটো কানের দরকার নেই। একটা কেটে নিরে বাই, একটা ঠাকুর মশারের ধাক্কাকো।

কান কাটা শেষ অবধি রত হয়ে গেল অবত। চাটোলা করে ভরদ্বাজকে আবার সামনে পুকের ধারে দড়ায় করে এসে ফেলল। ফেলে দিয়ে জগা আর রাধেশ্বর সরে পড়ল। ভরদ্বাজ সেখানে থেকে কাতবাজেন : ওরে, কারা আছিল—তুলে নিরে বা আমার এখান থেকে। হাটবার জো নেই।

দোকানন এসে দিবে পাড়াল। কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

হয়েছে কি নারের মশার ?

বলো কেন। পুজো করতে গিয়ে এই লশা। ঠাঁহর করতে পারিনি, বাঁধ থেকে গড়িয়ে একেবারে পগারের মধ্যে। গা-গতর আর আঁত নেই।

হুই জোয়ান মরদ বগলের নিচে হাত দিয়ে একরকম ঝুপিয়ে ভরদ্বাজকে আবার নিরে চলল। আবার গিরে একটা চৌপারার গড়িয়ে পড়লেন। কীলকটে জিজ্ঞাসা করেন, মাহের খোড়া সব উঠ গেছে ? নৌকো ছাড়বার দেরি কত রে ?

এই তো, ভাটা ধরে গিরে জল ধমধমা খেয়ে গেছে। উল্টো টান ধরলেই ছেড়ে দেবে।

ধরে নিরে আমার নৌকার চালির উপর তুলে যে বাপসকল। কুলতলার গিরে চিকিছেপত্তোর হুইপে।

নৌকার তুলে দিবে বাক্সের পায়ের ধূলা নিয়ে কালোসোনা জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে আসা হবে ঠাকুর মশার ?

আমি আসি কিবা অল্প বেকেউ আশ্রক। পাশের ওই ছুঁড়োর পত্তন নিকেশ না করে কাজ নেই। পৈতে ছুঁরে এই দিবি করে বাছি।

কুড়ি

কুমিরদারি থেকে সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে। কিন্তু তা বলে হুলাস কিছু নেই—বলাইকে পাওয়া রাখে না। সকাল হোক আর সেবি হোক; ডিঙি থেকে মটিতে পা গিরেই চলে রাখে সে গরন বাসের আলায়। আলা আর-কি জন্তে বলা, আলায় এখন পুরোপুরি। আলায় কাকবর দিবে আভামছব সেখানে। অন্নর আদেদ-হুড়ি হে-জগা—আর জগা দেখ কথাই দেরি পায়ে না একলা বনের মধ্যে।

পায়ে পায়ে সে রাধেশ্বরের বাড়ি গেল।

আছ কেমন রাধে ?

আলার দিক থেকে একটু বৃষ্টি খোলসে আওলাক আসছিল, রাধেশ্বর উৎকর্ষ হয়ে ছিল সোমকে। জগদ্বাধের গলা তনে চকিতে ফিরে তাকিয়ে আঃ-ওঃ করতে লাগল। তারই মধ্যে টেনে টেনে বলে, ভাল নয় গো বিশ্বাস ভাই। সেই একদিন ছুটোছুটি করে রাগের বশে বাক্স নির্ধাতন করে পায়ের দরদ বড় বেড়ে গেল। তার উপরে বউ জ্বরদন্তি করে হুটো দিন আবার জাল খাড়ে দিবে পাঠাল।

বাক্স না কাঁচকলা। পৈতের বায়ন হয় না। একটা শত্রু নিপাত হল, আর একটা বাড়ের উপর চেষ্টে রয়েছে। এরা কবে বিধায় হবে, কালীতলার ঢাক-ঢোলো পুজো দিবে মানত শেষ করে আসব।

রাধেশ্বর বাড় নাড়ে : না বিশ্বাস ভাই, মিছামিছি রাগ তোমার চাকবালার উপর। সকলে বার, তুমি তো একদিন গেলো না। গিরে আসে নিজের চোখে দেখ—

জগা বলে, বা তনছি তাতেই আক্কেল-গুড়ুম হয়ে বার। সেখবার আর সাধ থাকে না। খুতু ফেলবার উপায় নেই, খুতু নাকি গিলে ফেলতে হবে। বিড়ি খেয়ে গোড়াটুকু হাতের মুঠোর ধরে বলে থাক, নয় তো উঠে ফেলে দিয়ে এস সেই বাঁধের ধারে। জোরে হাসবে না, কথাবার্তা হিসেব করে বলতে হবে। পাড়ার বত মরদ সব ভেড়া হয়ে গেছে। ছুঁড়ি কামখার বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাসন করে যেমনটা বলবে ঠিক তেমনি করতে হবে।

রাধেশ্বর হেসে উঠে বলে, পরের মুখে ঝাল খেয়েছ তুমি। চোখে দেখে তারপরে বা বলবার বোলো। পচা-মাছের গন্ধে ভরা সে পুরানো জায়গা আর নেই, একবারে ভোল পালটেছে। শুখা আরগা কেন, মাছবগুলাও। বড়না অবধি বেন আলাদা এক মাছ। ধবধবে গেলি গারে, পান খেয়ে মুখ রাঙা, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বড়না। অভোস সকলের ভাল হয়ে বাচ্ছে। আমি বলছি, গিরে দেখ একদিন। হাতে ধরে বলছি বিশ্বাস ভাই।

জগা বলে, ধাব বই কি। গিরে পাড়ে বাবুইয়ের বাসা জেতে দিবে আসব।

বলতে বলতে বিবম উত্তেজিত হয়ে ওঠে : আমার ডানহাত বাঁহাত হল বলাই আর পচা—হাত দুখানা মুচড়ে ভেঙে বোলআনা নিজের করে নিয়েছে। বনের মধ্যে একটা কথা বলার সোদর পাইনে। ও ছুঁড়িকে সহজে ছাড়ব ? কুলো বাজিয়ে বিনের করে দেব—আমাদের বাবা অকল থেকে।

গজরাছে কেউটেসাপের মতো। রাগের কান্দি হয় না। বলে, তুমি এক সৈত্য মাছব—নিজের বউ শিটিয়ে তুলো-খোনা কর—ও মেয়ের কাছে গিরে কৈচো। হাত ধরে তুমি ওর ওকালতি করছ। ধবর কোনটা রাধিনে ? পা ভেঙে পড়েছিল সেই খোড়া পায়ে গড়াতে গড়াতে ওদের ওখানে গিরে উঠতে। তোমার বউ তাই নিরে ক্যারক্যার করে, খেউড় গাধা—বনের চালে কাক বলতে দেই না।

রাধেশ্বরও চটেছে : ক্যারক্যার করে বৃষ্টি সেইজতে ? না—বেসেজতে তুমি এক একখানা স্বচন বেড়ে বোলো। হুই দিন

গিরে দু-গুণা কুটো-চিংড়িও আনতে পারিনি, সেইজন্তে চোঁয়ার।
লোভী মেয়েমাছ। কুকুরের মুখে মাংস ছুঁড়ে দিলে খেউ-খেউ বন্ধ,
এদের সামনেও তেমনি পয়সা ছুঁড়ে দিলে চোঁচানি খামে। সেটা
পেরে উঠিলে—অনেকদিন শুয়ে বসে থেকে অভ্যাস ছেড়ে গেছে।
গভরও নেই। চৌরস বাঁধের উপরেই এক পা হাঁটতে চিড়িক মেয়ে
ওঠে, বাঁতবাঁত বুধে ভেড়ীতে জুত করে জাল ফেলি কেমন করে?
মাগি তা বুঝে না, আজ্ঞে বাজ্ঞে নানান কথা তুলে ঝগড়া করে মারে।
জগা এমিক-ওমিক ভাকিয়ে বলে, বাড়ি যে একেবারে চুপচাপ।
বউ কোথায় গেল তোমার?

গেছে ঐ নতুন আলার। ছেলে ঘুম পাড়িয়ে আমার পাহারার
বেশে সে গিয়ে মছবে বসেছে।

কী সর্বনাশ! অ্যাঁ, অন্নগাসী অবধি ভক্ত হয়ে গেল?

রাখেস্তাম বেজার হুধে বলে, ভক্ত না আরো-কিছু! হিংসে—
বুঝতে পারলে না? আমি কখনো কখনো গিয়ে বসতাম, সেইটে আর
হুতে দেবে না। আগে থেকে ষাঁটি করে বসে আছে। কেউকথার
মন বসাবে হাড়বজ্ঞাত ঐ মেয়েমাছ? তবে একটা ভাল—
সমস্তা দিনের পর বাড়ি এইবারে ঠাণ্ডা। দিবা শান্তিতে আছি
একলা মাহুব।

জগা বলে, তুমি তো জালে বাছ না বাধে। জালগাছটা দাও
দিকি।

রাখেস্তাম অবাক হয়ে বলে, জালে তোমার গরজ কি জগা?

বাইব, কী আবার! পারিয়ে ভাবছ? দুনিয়ার হেন কর্ম
নেই, তোমাদের জগা বিশ্বাস বা পারে না। মাছ-মারার কাজ কত
করেছি। বতই হোক, কাজটা চুরি-ছাঁচডামি তো। এখন
তাই আর ইচ্ছে করে না।

কৌস করে নিখাস ফেলে রাখেস্তাম বলে, জগা তুমি ভট্টাভি
হচ্ছে। পেটে জুত থাকলে সবাই হয় গুরুকর্ম। মাগি এদিন চাট
চাট ভাত এনে সিত আলা থেকে—আমিও খুব সাজা হয়ে ছিলাম।
এখন ভাত নেই—সেই জন্তে ভোল পালটাবার দরকার। কিন্তু পেয়ে
উঠছি নে। পা-খানা খারাপ। পা যদিই বা ভাল হয়ে যায়, অভ্যাস
খারাপ হয়ে গেছে। জাল ফেলতে গা ছমছম করে। সামলে উঠতে
বেশ ধানিকটা সময় লাগবে।

জগা সেমাক করে বলে, আমার তো
ভডাইই মোটে নেই। তবু কিছু না কিছু
হবে। জাল তো নিয়ে বাড়ি, দেখো।

গৌরাতুমি যেখানে সেখানে জাল
ফেলাই হল না। সমস্ত পুরের জায়গা—এ
লোকের ভেড়ি নয় তো ওলোকের ভেড়ি।
কোথায় ফেলেবে, পাহারা কোন দিকে
কমজোরি—আগের থাকতে সমস্ত জেনে
বুধে নিতে হবে। দিনমানে 'ভালমাছ
হয়ে যোগাধারি করতে হয়। গতিক বুধে
নিতে কুটো-চিংড়ি পিন লোগে যায় অন্তত।
আর তুমি তো কোন দিন গুখো' হও নি,
পয়সা দিনেই জালগাছটা আঙুলসোমামি
দিয়ে শু-হাতে আসবে।

জগা হাস করে বলে, জাল কেড়ে নেব তো জরিমানার পয়সা
খিয়ে খালাস করে এনে দেব। ছিঁড়ে বার তো নিছ খরচার মোরামত
করে দেব। বাছ সমস্ত বড়লার খাতায় উঠবে, তার অর্ধেক বখরা
হিসেব করে পরসাকড়ি নিজের হাতে গণে গণে নিয়ে আসবে। এই
চুক্তি। এর উপরেও মনে সন্ম থাকলে কাজ নেই। ধানাই-পানাই
না করে সোজাখুশি বল। অস্ত কোথাও চোঁচা দেখি গে।

এত সুবিধা আর কোথায়? রাখেস্তাম জাল দিয়ে দিল।
অন্নগাসী গভর বতদিন আছে, হুকোলা দু-পাখর যেমন করে হোক
জোটাবেই। তার উপরে হাতে-গীটে কিছু যদি নগন মেলে, সেটা
রাখেস্তাম অন্তভাবে ধরত করবে।

বলে, জাল নিয়ে বাও জগা। একটা কথা, বখরা আমি নিজে
আনতে যাব না। তোমার উপর ধর্মভার, চোবোগোস্তা তুমি এসে
দিয়ে যাবে। মাগি হল স্লিলের রেহন্দ। টের পার তো ছোঁ মেয়ে
সমস্ত নিয়ে নেবে। আমার ভোগে হবে না।

জাল নিয়ে বেয়িরে এসে তখন খুব বড় ভাবনা ঐ বে ভর
ধরিয়ে দিয়েছে রাখেস্তাম—বেকুব হবার ভয়, ধরা পড়ে আত্মায়ক বনে
বাওনার ভয়। জাল ফেলতে জানে সে ঠিকই। অনেক বছর জাল
ফেলে নি, তা হলেও ভরসা আছে, সূতোর আর কাঠিতে জড়িয়ে
গিয়ে আনাক্ষির হাতে যেমন লাঠির মতন সোজা হয়ে জাল পড়ে
সে অবস্থা হবে না। জায়গা খিরে গোল হয়েই পড়বে। কিন্তু
ফেলে কোন জায়গায়? যেখানে সেখানে ফেলেই মাছ পড়ে না।
কোন খেরিতে কি রকম পাহারা, তারও কিছু আশঙ্ক নেই। রাখেস্তাম
যে ভর করেছে—হয়তো বা ধরাই পড়ে পেল। জগরাধ বিশ্বাসকে
ধরে ফেলেছে, বাসা অকলে এর চেয়ে বড় খবর কি? জব্বলের মধ্যে
এত কাল চরে বেড়াচ্ছে—সরকার বাহাদুর এত নৌকো মোটরলক
মাছবন্ধন পিটেল-পুলিশ নিয়েও তার গারে হাত ঠেকাতে পারে নি।
আর এখানে কীকা যেবির এলাকার পাঁচ-দশটা মাহুব পাঁচচারি করে
বেড়াচ্ছে—তার ঘরলে তো মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

জাল কাঁধে নিয়ে জগা হন হন করে চলেছে রাজা ধরে। কুমিরমারি
থেকে নতুন যে রাজা আসছে। নতুন মাটি ফেলেছে—আর ঐ চাক
মেয়েটার অত্যাচারে কিছু অন্তমনস্কও বটে জগা—হাঁচটে লাগে বারবার।

পেটের যন্ত্রণা কি সারাদিক তা ডাক্তারগোঁরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা তিরুদিনের মত দূর করতে গারে একমাত্র

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ-লক্ষ
গোণী আয়োগ্য
লাভ করছেন

তারত গভা: রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্মশূল, পিত্তশূল, অম্মপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, তেজুর ওঠা, বমিডাও, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা,
আহায়ে অরুচি, মন্দপনিয়া ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তারাও
আমাদের সের্বন করলে সবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বকোষে স্থান্য ফেরাৎ।
৩২ ডোলায় প্রাপ্তি কোটা ৩ টাকায়, এককো ৩ কোটা - ৮-১১। আদামা: ডর, মার ও গাইকরীদর পুথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-আলিগঞ্জ (দুর্গ পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ-১৯২১, অম্মা গাঙ্গা কলকাতা, বাকলা-১

তা সৈক, রাজ্য ভবু সহকারি জরিপী। হাতে তুলে জাল নাচিয়ে শকলভা করে রাজ্য বসে বসে বসি হাও, কাগজ কিছু বলবার এজিয়ার নৈ। বড় বড় বেছোবেদি ভাইসে বাসে, বাসে আজ জোর হাওরা গিরেছে, ছাছল করে জল এসে লাসে দাঁড়ায় নতুন মাটির গারে। আবাতে আবাতে কেনা উঠছে জলে। জলের উপর চেউ-লাগা সাদা কিনা আঁখি। জীবনে বেশ নজরে আসে। জল জগতীয়—জলের মধ্যে মাছ। অনেকবার খোঁজ হয়েছে, কোন এক দিকে রাজ্য থেকে নেমে গিয়ে দেখে এক খেওন। কিন্তু খেওনের জাল জল থেকে টেনে টেনে তুলছে—বসি সেই সময় পাহারাব মাহুব সৈয়্যাবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে থপ করে জালের ঘুরটা চেপে ধরে। বসন্ত অপমান।

এসিগুই বাছে। বসন্ত সন্তব চেনা-জানার চৌহদি বাবে ছাড়িয়ে। সন্তব মাসে জল—হালি হয় মি এখনো। হরভে করবেই না হালি, ইচ্ছে করে দেখে গিরেছে। বানকরের চেয়ে জলকরে বোজগার বেশি—বসি অবত ঠিক মতো মাছ ঢালানের ব্যবস্থা করা যায়। বনকর জাল তাল। বোজগারে জলকরের মতন না হোক—একটা হুঝি, পুয়া খরচ করে বাধ বীথতে হয় না। বাধ বেধে কখন ভাঙে কখন ভাঙে করে শক্তিত থাকতে হয় না—আহবই। কেউ জানে চালা লাগানো কিবা ঘেরিতে চালা—মাছ তোলাই বাধে পুয়া খরচ করতে হয় না। কখনো জলকর কখনো বা বনকর হু-শাখ ফেসে জগা নিশিরায়ে মতুন রাজ্য হয়ে চলেছে।

বাববির খাল—পুল এখনো বানানো হয় নি। ইট এনে ফেলছে, পুল গাঁবা তুল হয়ে বাবে বুঁব শিগগির। এমন আরও তিন-চারটে পুল বাকি, বাসের সীকা বানিয়ে পারাপারের কাজ চলেছে। ঐকান্তিক এসে জগায় খেয়াল হল অনেকটা বুঝ এসে পড়ছে। খাল পাঁচ হয়ে গিয়েছে, মনে পড়ছে, মেছোবেদি একটা। বা হবার সৈক, ঐ বেছিতে কমাল ফুঁকে দেখা বাবে। গতিই তো, সারা রাত্তির ধরে হাটবে নাকি? হাটতে হাটতে চলে বাবে সেই কুমিরঝারি অবধি?

সীকোর উঠবে, বাসের পাড়ে পোলকনের ভিতর কি নড়ে উঠল। কুমির—কুমির নাকি? বাসের উপর হাবামারি জায়গার দ্রুত চলে এসেছে। গাড়িয়ে পড়ল হুচাপা সেখানে। বাঁশ মচমচ না করে। অপেক্ষা করছে কোন জন্ত বেরিয়ে আসে কীকার। তাকাল সীকে পাঁচ হয়ে দুটে পালক, অবধা এগিয়ে দিবে হাটির চিল ও বনকটা গরানের ছিটে নিয়ে রূপ একত্ব হবে—সে বিবেচনা ত্বরকর।

বেঙ্গল জন্তটা পোলবনের জিকর প্রেঙ্ক। কুমির—কুমির—কুমির নর, কুমির নর, এমন কি মেছো-পুল নর—মাহুব একজন। সন্তব তালু কেনে-কু সাইজের বাছের খাবুই। বাছুর ইচ্ছা করে নেয় মি। কীকো উপর লাটি গিরে তারই ওদিকে শিগগির গারে বোলানো। বোকা রামছ তব তো চাও, হাড়ে ভরতি-ভরতি খাবুই। ভরতি একত্ব বে হাটে খুলিয়ে নিজে পাব মি, কীকের উপর প্রেঙ্কা দিক নিজে হাছে।

বাসের উপর হাছহাটা, জলজল জেরে সোয়া খাবুই। জলজল জল পায় হুয়া। ফল না, কিরে এসে খাড়ায়ে-খাড়ায়ে দিক

টিপি এগোচ্ছে মাহুবটার দিকে। একটা কোপ পাওয়া গেল, বাপটি মেরে আছে সেখানে। যেই মাহু মাহুটা রাজ্যের পা দিয়েছে, জগা নাকি হয়ে বলে, টাউট মাহু গৈ—

মাছের উপর সকলের সোভ। বনকরের বাবু, খেরিওয়াল, নৌকোর মাঝি, ডাকপিনে, ডাক্তারবাবু, গুরুশাখ—মাছের নামে সবাই হাত পাতে। মাহুব ছাড়া এমন কি বাসাবনের ভুত-দানো ওরাও। সেইজন্ত রাজ্যে মাহু হাতে নিয়ে মাহুব পারত পক্ষে একলা বাতায়ত করে না।

মাছ গৈ জীমার—বাব।

চমক খেয়ে মাহুটা কোপের দিকে তাকাল। হো-হো করে আকাশ কাটিয়ে হেসে জগাখ তার হাত চেপে ধরে।

আমরা মাহু-মাহারা সেই কোন সন্ধ্যা থেকে জাল নিয়ে চক্কোর দিছি—কোন ঘেরিতে কখন খেওন পেওয়া বার। তুমি বাবা ওস্তাদ সিঙ্গেল—টুক করে কার তৈরি কটি কয়তা দিয়ে এসে বল তো?

মাহুটা চটে গুটে : ওসব বল কেন? তোমরাই বা কোন সাধু-মোহান্ত তুমি? তুমি বা, আমিও সেই। হুজনেই মাছের ধান্যর ঘুরছি।

জগা বলে, না সাঙাত, বিনয় কোরো না। এক খেওন জাল ফেলনি, জালই নেই তোমার হাতে, গারে কু-সেওয়া কাজকর্ম। মাছের ডারে পিঠি কুজা হয়ে চলেছে। আর আমাদের দেখ, কালবাম ছুটিয়ে জাল ফেসে ফেসে বুনাবার বেলা অষ্টরজা। বলছ কিনা, তুমি বা জীমারও তাই। অনেক উপর দিয়ে বাও তুমি আমাদের।

মাহুটা সোমক করে; গারে কু-সেওয়া কাজ হলে সবাই বুকত এই দিকে। কষ্ট করে জাল ফেলতে বেত না কেউ। বুকব বল চাই রে লাশ, যেমন তেমন লোকের কর্ম নয়। ঠের পেলে গাঙের মধ্যে ধরে চুবানি দেবে। গলা টিপে মেরে ফেসে ভাসিয়েও দিতে পারে জোয়ারের জলে; টানের সঙ্গে ভেসে ভেসে লাস চলে বাবে কীহা কীহা মুদুক। তক্তে তক্তে থাকতে হয় সেই জন্তে। পাড়ের জলসের মধ্যে বসে মশার কামড় খাও, আর নজর পেতে রাখ। নৌকো কাছি করল এইবারে। বেউট-জাল নাশাল জলে। রাজা খাচ্ছে হাত-কিরতি করে—এ-হাত থেকে ও-হাত, ও-হাত থেকে সে-হাত। পাঁচবার সাতবার চলল এইরকম। অহম্বর শুয়ে শুল। শুয়ে শুয়ে গরু চলল, শেবটা বিম হয়ে থাকে। তৈরি হও এবারে—জলে নেমে খাচ্ছে খাচ্ছে সীতার কেটে এগোও। জল এতটুকু তোলাপাড় নেই—তঁটার টানে যেমন একটানা মেয়ে বাছে তেমন। জালের মাথা উঠু করে লাবলানে তুলে ধর, খালুই পাতে ঠিক তার নিচে, বাসাল ছুরি দিয়ে পাঁচ লাগাত জলে এইবার। বলবল করে মাছ এসে পড়বে খালুইতে, কমালে থাকে তো ভরে গিরে ছাপিয়ে পড়বে। তিলেক আর দেখি নয়—কেনা, ঠিক যেমন কায়দার এসেছিল। কীকার বাবে না, জললে গা ঢাকা দিবে একত্ব। হাতের নাগালে পেলে বন-কাটা হোসো-পা দিবে কীকের উপরে বুণখানা নামিয়ে নেবে। সড়কির হাঙ্গামে পেলে একেবারে ও-ফোড় ও-ফোড় করবে। এক কষ্টের কাছ—আর তুমি বল-মাহু-কু-দিক বেড়ানো।

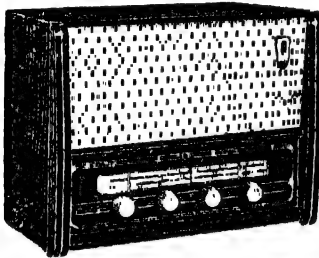
জগা—কেন, মাছ কি কখনো পেলে সে নিজে খাওয়া? মহাজন কে তোমার, কেন খাওয়ার দিকে প্রেঙ্ক?

স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে মুন্দর জিনিস

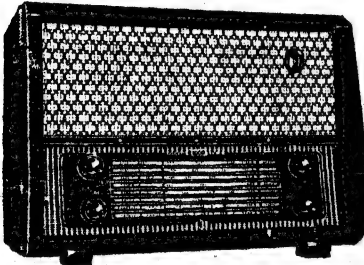
কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় বলে
জাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লীয়ারটোন
সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক
রকমের পাওয়া যায় যে আপনি মনের
মতো জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন!

জাশনাল-একো

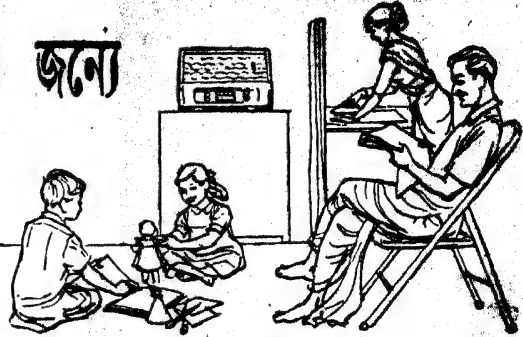
রেডিও



জাশনাল-একো-মডেল এ-৭২২ : এলি।
৩ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, কাজে চমৎকার, এই খেপীর রেডিওর
মধ্যে সেরা, 'মন্দহাইজড'। দাম ৩৩৫, নীট



জাশনাল-একো মডেল এ-৭৩১ : এলি।
'নিউ প্রম্ব' ৭ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড। এর শব্দগ্রহণশক্তি
অসামান্য। বরনিয়ন্ত্রিত আর-এক-স্টেজ যন্ত্রক,
এছাড়া এর টেনশন স্ট্রীকার ও গ্রামোফোন
পিক-আপের কলোবস্ত আছে। 'মন্দহাইজড'
দাম ৬২৫, নীট



Klartone

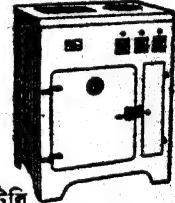
ক্লীয়ারটোন
বাতি ও সরঞ্জাম

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সম্মত
গরম বা কুটন্ত জল পাওয়া যায়। সাইজ : ৩.৫
৩ ৮ গ্যালন। এসিতে চলে।



ক্লীয়ারটোন
ঘরোয়া ইলেক্ট্রিক
ওজন ৭ পাউন্ড, ২০০ ভোল্ট,
৪০০ ওয়াট, এলি/ডিসি।
বাক্সপাইপের হাতল।

ক্লীয়ারটোন কুইং রেক
হুটে হুটে ও উত্তম আবে—প্রত্যেকের
আলাদা কন্ট্রোল। সর্বোচ্চ সোড
৫,৫০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন
বৈদ্যুতিক কেটলি
৩ পাইট জল ধরে, ফ্রোজিং কলাই করা।
২০০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এলি/ডিসি।

ক্লীয়ারটোন টুইন্ হট প্লেট
রান্নার জন্তে। প্রতি প্লেটের আলাদা
কন্ট্রোল। ২০০ ভোল্ট—এলি/ডিসি।
সর্বোচ্চ সোড ৫,৫০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং
টীল চেয়ার ও টেবিল
মানুষের পাওয়া যায়।
আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী।
পরিমিতো কিংবা পরি
ছাড়া পাওয়া যায়।



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩, ম্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১১৮, মজিট
রোড, মাদ্রাস-২ • ফ্রেন্স রোড, পাটনা • ৩৬৭৯, সিলভার জুবিলী পার্ক রোড,
বামঙ্গলোর • বোসবিহার কলোনি, টাটনি চক, দিল্লী • রাইশি রোড, শেখপুরাবাদ

GRA 9022/11



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ণপ্রকাশিতের পর]
সাধনা বসু

কুড়ি বছরের সীমানা পেরিয়ে আসার পরে আজও, রাজনর্তকীর কথা মনে পড়লে মনের মধ্যে জেগে ওঠে বিরাট বিষয়। পূর্ণ লৈক্য ছবি রাজনর্তকী। তিনটি ভাষায় তোলা হয়েছিল, বাঙলায়, হিন্দিতে ও ইংরিজীতে, ইংরিজী ভাষায় তোলা ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল The Court Dancer. হিন্দিতে তোলা ছবিটির অবশ্য নতুন কোন নাম দেওয়া হয় নি, অবাক হওয়ার কারণ—এই



সাধনা বসু

পূর্ণ লৈক্য ত্রিভাবী ছবিটির নির্মাণকার্য শেষ হতে এত অল্প সময় লেগেছিল বা কল্পনা করা যায় না। যথেষ্ট নিশ্চয়তার সঙ্গে এ কথা আমি বলতে পারি যে আপনাবাও সময়ের পরিমাণ শুনে তার আশাতীত অল্পতা সম্বন্ধে কম বিস্মিত হবেন না। বিশ্বাস করুন—যাত্র ছুটি মাস লেগেছিল এই পূর্ণ লৈক্য ত্রিভাবী ছবিটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হতে। এক বছর নয়, দশ মাস নয়, আট মাস নয় যাত্র ছুটি মাস, একটি গুরো বছরের অধীশ। বলুন, ভাবা যায় কি কিন্তু তবু এই অসম্ভবও সম্ভবপর হয়েছে। অবশ্য আরও গভীরভাবে চিন্তার সমুদ্রে অবগাহন করলে দেখা যায় যে হবে নাই বা কেন, প্রতিটি কর্মীর অস্বাস্থ্য পরিশ্রম, অক্লান্তি সহায়ত, আন্তরিক সহযোগিতা কি কোন মূল্যই বহন করে না? নিশ্চয়ই করে—তা যে মূল্যহীন নয় তার জাফল্য প্রমাণ রাজনর্তকী। এ বিষয় নিয়ে আমরা এখানে যথেষ্ট গর্ব করতে পারি যে বাসের সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিচালনার ভার ধীরে উপর স্তম্ভ ছিল, ছবির নির্মাণ-কার্যে বাসের পরিশ্রমের চিহ্ন জড়িয়ে আছে তাঁদের কাছ থেকে আমরা সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে সহায়ত ও সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছবির নির্মাণকার্য সমাপনের এই-ই হচ্ছে মুখ্য কারণ, প্রকৃত রহস্য আসল চাবিকাঠি।

ছবির নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এটি এক নৃত্যপ্রধান চিত্র, স্বভাবতই আমার করণীয় অংশ ছিল অনেক বেশী এবং ছবিতে সর্বাঙ্গী আমার করণীয় কর্মের পরিমাণও যথেষ্ট। কেবল কলামগুলায় (Poet Vallathole's School of Dancing in South India) থেকে জয়শঙ্করকে এ ক্ষেত্রে গুরুরূপে আহ্বান জানানো হল, সেনারিক রাজকুমারও গুরুত্বপূর্ণই এলেন মণিপুর থেকে। মণিপুরেরই এক রাজনর্তকীকে কেন্দ্র করে গল্পনা রচিত অধীশ কাহিনীর পটভূমিকা মণিপুর, সেই কারণেই সাজসজ্জা সমস্তই সরাসরি মণিপুর (ইম্ফল) থেকে আনাও হ'ল। রাজনর্তকী বধন নির্মারমান, সে সময় আমার নিখাস ফেলার অবকাশ ছিল না। সাজসজ্জার পরিকল্পনার, ব্যালের শিক্ষালানে, নিজের অভিনীতব্য ভূমিকায় মহড়া দেওয়ার মধ্যে দিয়েই সময় এগিয়ে যেত জলস্রোতের মত, কোথা দিয়ে কখন যে একটি একটি করে দিন এগিয়ে যেত তা ভাবতে পারা তো দুইয়ের কথা, সে কথা চিন্তা করার মতও সময় মিলত না। তবে এ কথা সত্য যে, এই ব্যস্ততার মধ্যে ছিল এক বিরাট আনন্দ। এই পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দের অংশও তো কম ছিল না, প্রাপ্যপাত পরিশ্রম করে চলেছি ঠিকই, নাওয়া-খাওয়ারও সময় পাইনি, নিয়মের জীবন তো প্রারম্ভাতের ব্যাপার হয়ে ঠাড়িয়েছিল, "অবসর" বা "বিরতি"—এই জাতীয় শব্দগুলি বলতে গেলে আমাদের মন থেকে তখন একেবারে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু তবু সেই সময়ে সব কিছু ভুলে আমাদের মিন, আমাদের রাত, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, উত্তম, শক্তি আমরা পুরোপুরি মিশিয়ে দিয়েছি ছবির কাজে—তার প্রাধান্য কারণ তখন আমাদের চোখের সামনে ছিল বুকভরা আশা, অনন্ত স্বপ্ন, অপরিমিত কল্পনা—এই আশার, এই স্বপ্নের, এই কল্পনার প্রাচীরই আমাদের জুগিয়েছে দুটো দুটো প্রেরণা, অদম্য কর্মশক্তি, এগিয়ে বাওয়ার মা ঠেক বাধী।

আমার অভিনয়ের সিক্রেট কম ছিল না, অহীন্স জৌহী এবং পৃথীরাঙ্গ কাপুরের মত নৃত্যকর্মী অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে আমার

অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তাঁদের সন্ধান, তাঁদের মধ্যল, তাঁদের প্রতিভার গগনম্পর্শী। অভিনয়কালে এ বিধের আমার নিজেকে সম্পূর্ণ সচেতন রাখতে হয়েছিল। বাঙলা এবং হিন্দী রাজনৈতিকভাবে অস্বাভাবিক চৌধুরী প্রধান পুরোহিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দি কোর্ট ডালায়ে ঐ ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল মিঃ জাল খাখাটাকে। হিন্দী রাজনৈতিক এবং কোর্ট ডালায়ের নায়কের চরিত্রে দেখা দিয়েছিলেন পৃথিবী রাজ কাপুর, বাঙলা রাজনৈতিকভাবে ঐ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রকাশ, সেনাপতির ভূমিকায় নবাসত ক্যাপ্টেন কে, এল, থাপানও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। থাপান ছ' ফুটেরও বেশী লম্বা ছিলেন, হিন্দী ছবিতে সেই তাঁর প্রথম অবতারণ। থাপানের দৈহিক আকৃতির এই অসাধারণ উচ্চতায় আমাকে কি রকম মুগ্ধ করে গঠিত হয়েছিল সে স্বাক্ষর বেশ একটি মজার গল্প মনে পড়ছে। হস্তরসের দিক দিয়ে এই গল্পের আবেশন অল্প বলে মনে হয় না। ছবিতে আমি থাপানকে চড় মাথছি এই রকম একটি দৃশ্য আছে, কিন্তু মুগ্ধ হলে অত উঁচুতে আমার হাত পৌঁছায় না। শেষে আমাকে একটি টুলের উপর দাঁড় করিয়ে ঐ দৃশ্যটা গ্রহণ করা হল। ছবির মধ্যে সেই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল—কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ও রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের চিত্রায়ণ টুডিওর মধ্যে রীতিমত এক হস্তকৌতুকময় পরিবেশ গড়ে তুলল। থাপানের দৈহিক উচ্চতার মাত্রাতিরিক্ততাই এর জন্তে দায়ী নয় কি?

অজান্ত শিল্পীদের মধ্যেও কয়েকজনের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী নিশ্চয়ই রাখে। হিন্দী রাজনৈতিক এবং কোর্ট ডালায়ে রাজার চরিত্র রূপায়ণের ভার গ্রহণ করেছিলেন মিঃ নিয়ামপালী (Nyampally), লেখক শ্রীমন্ত রায় স্বয়ং রাজার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাঙলা রাজনৈতিকভাবে। শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তও উচ্চাঙ্গের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। কোর্ট ডালায়ের এবং হিন্দী রাজনৈতিকের সংলাপ রচনার ভার গ্রহণ করেছিলেন বাক্সম বিখ্যাত লেখক জ্রিডি, এক, কারাকা এবং বর্তমানকালের বিশিষ্ট প্রযোজক মিঃ ডব্লিউ, জেড, আমের কোর্ট ডালায়ের আন্তর্জাতিক পরিবেশন স্বয়ং নিয়েছিলেন কোলাসিয়া পিকচার্স, এবং রাজনৈতিক (বাংলা ও হিন্দীর) পরিবেশন স্বয়ং নিয়েছিলেন সঙ্গতি পরলোকগত এম, বি, বিলিমোরিয়া।

[কম্পাঃ]

অনুবাদক—কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন আজিকে মিনার্ভার পুনরুদ্বোধন

মিনার্ভা থিয়েটারের পুনরুদ্বোধনের বারতায় নাট্যমোহীদের সঙ্গে আমরাও যথেষ্ট আনন্দবোধ করছি। দীর্ঘকাল পরে লিটল থিয়েটার কলের স্থপতিচালনার মিনার্ভা থিয়েটার দর্শক-সাধারণকে অভিবাদন জানাচ্ছেন ও ছায়াশ্রমকে কেন্দ্র করে। অভিনয়-নিপুণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীগণের পুরোভাগে আছেন উৎপল দত্ত এবং শ্রীমতী শোভা সেন। মিনার্ভা থিয়েটার বাঙলার গৌরব! গত শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অসংখ্য নাটক উপহার দিয়ে এসেছে এই রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন বহু দিকপাল দিলী, বাঁদের কল্যাণ বাঙলার অভিনয়-জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বহু গুণ। বাঙলাদেশের নাট্যাভিনয়ের উন্নতিকল্পে সাংবাদিক ও

সপ্তম বিশ্ব যুব-উৎসবে পুরস্কৃত
একমাত্র ভারতীয় ছবি!



আট এণ্ড কানচার
পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড
নির্বাহিত ও পরিবেশিত

যজ্ঞনা ব্যানার্জি
অভিনীত

অস্ট্রিমস্তকা



পরিচালনা সুশীল মল্লিকমদার
সহকারী কানোভদ্বয়
কাহিনী শান্তি দাসগুপ্তা

অজান্ত চরিত্রে : ছবি বিধান, কালী ব্যানার্জী, নির্বলকুমার, নৃপতি চাট্টাজি, বনানী চৌধুরী, মণি শ্রীমালী ও কমলা মুখার্জি।

দর্পণা ও প্রিয়ায় আগতপ্রায়!

শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের পূর্বদ্বী এসক্কুমার ঠাকুরের অবদান এক নাটকাত্মিকতার প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। মাতামহের নাট্যোদ্ধারগে দৌহিত্রের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। এসক্কুমারের দৌহিত্র বাগেশ্বরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকলার প্রতি অস্বস্তি হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন মিনার্ভা থিয়েটার। তার পর বহু জনের অধিকারে এসেছে মিনার্ভার মালিকানা। কিন্তু মিনার্ভার সৃষ্টির এই হ'ল আদি ইতিহাস। বর্তমান পরিচালকগোষ্ঠীর এই নতুন প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই কামনাই আমরা সর্বতোভাবে করি। নাটকের প্রতি এঁদের অমুগমের কথাও অবগিত নয়, আজকের দিনে যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে তালে তালে রেখে মিনার্ভাও এগিয়ে বেতে থাকুক, তার জয়যাত্রা হোক অপ্রতিরোধ্য, তার নাট্যলভ্যতার আবেদন মানুষের মনে বেধোপাত করুক, তার অজীভের গরিমাকে চোখের সামনে আদর্শরূপ রেখে ভবিষ্যতের জন্যে নব নব সৃষ্টির উদ্দানার মেতে উঠুক। আজকের জাতীয় জীবনে নাটকের আবেদন অপরিমিত, নাটক সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ, জাতীয় চরিত্র গঠনে নাটকের সহায়তাও অপরিহার্য। বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে, যুগোপযোগী নাট্যোপহার জাতি নিশ্চয়ই লাভেরে গ্রহণ করবে—এ বিশ্বাস রাখি।

বর্তমান পরিচালকবর্গ মিনার্ভার নব নামকরণ করতে চেয়েছেন, মটক শিশিরকুমারের নামানুসারে। তাঁদের এই মহৎ, সঙ্কল্পের জন্যে আমরা অভিনন্দন জানাই। পরিশেষে উৎসব দপ্তর এবং লিটল থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্তর্ভুক্তদের—তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টার আত্মনিয়োগের জন্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি তাঁদের প্রচেষ্টার সর্বজনীন সাফল্য।

চলতি ছবির বিবরণী

কলকাতার প্রধান প্রধান চিত্রগ্রহণগুলিতে যে ছবিগুলি সমারোহে প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে ছবি, কিছুকণ, আত্মপালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছবির কাহিনী সবেশে পাঠকসমাজকে নতুন করে বলার কিছু নেই। এর কাহিনীর স্রষ্টা বাঙালার অপরাধের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। ছবির গল্পাংশ মানবীয়তার আবেদনে ভরপুর, এর পটভূমি বর্ষা, বর্ষার মাহুত, বর্ষার সমাজ, বর্ষার জীবনযাত্রার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই গল্পে বৃত্ত হয়ে উঠেছে। এই মর্মস্পর্শী গল্পটি ছায়াচিত্রায়িত হল নীলেন নাহিড়ীর পরিচালনায়। প্রধান ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছেন আশীষকুমার ও মালা সিনহা, অস্ফুট বিশেষ ভূমিকার দেখা দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায় এবং অস্ফুট খ্যাতিমান শিল্পিবৃন্দ।

কিছুকণেরও গল্পাংশও জন্ম নিয়েছে বাঙালার একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিকের লেখনী থেকে, ছোটগল্প হিসেবে বনকুলের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। কিছুকণ ছোট গল্পটি বয়ঃ কবিত্ব রবীন্দ্রনাথকেও বখেটে আনন্দ দিয়েছে। জীবনের হাসি-কান্না, গান, আনন্দ, কৈনজুরা বৈচিত্র্যময় রূপ বনকুলের দক্ষ লেখনীর মাধ্যমে সুসম্পূর্ণতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। পরিচালনা করেছেন লেখকের অল্প, অরবিন্দ

মুখোপাধ্যায়। পরিচালক তাঁর পরিচালন-প্রতিভার স্বাধীন পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালক ছবিটিকে সব দিক দিয়েই পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্য ও চিত্রাকর্ষক করে তুলেছেন। বলিষ্ঠ আবেদন সমৃদ্ধ এই কাহিনীর নায়ক-নারিকার ভূমিকার দেখা দিয়েছেন অসীমকুমার ও অরুণমতী মুখোপাধ্যায়, জীবন বসু, গঙ্গাপদ বসু, শিশির বট্টাচার্য, শোভা প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রে রূপ দিয়েছেন।

বৌদ্ধযুগের এক নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আত্মপালীর কাহিনী। আত্মপালী তৎকালীন সমাজের বিম্বর, এই দুঃখের নারী রূপেও যেমন অসামান্য, নৃত্য প্রভৃতি গুণেও তার বখেটে অধিকার। তাকে পাওয়ার জন্যে বৈশাখীর ধনী শ্রেণীসমূহ মধ্যে তুলল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিশেষে তথাগত বুদ্ধের কল্যাণার্থার মধ্যে জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির চাবিকাঠি খুঁজে পায় আত্মপালী। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন জীতারামদাস। নামভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছেন জীমতী সন্দ্রিয়া চৌধুরী, অস্ফুট ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অনিত্যবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, মণি জীমতী, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি। অনিল বাগচীর সঙ্গীত পরিচালনা দর্শকচক্ষে বখেটে পরিমাণ আনন্দ দেয়, গানগুলি উপভোগ্য এবং সুগীত।

নকল 'আকাশ পাতাল', জাল 'খোয়ায়'

বাঙলা সাহিত্যের মহামূল্য কোবাগারে আকাশ-পাতাল একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আকাশ-পাতাল বাংলাদেশে অতি প্রিয় বহল গঠিত এবং স্বনামধন্য একখানি অনবদ্য সাহিত্যসম্রাট। প্রভাত মুখোপাধ্যায় 'নামধারী চলচ্চিত্র-স্রষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি বর্তমানে একটি ছবি পরিচালনা করছেন, যার নাম দিয়েছেন আকাশ পাতাল, এ কথা বলাই বাহুল্য যে আকাশ পাতাল উপন্যাসের খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা এত বিরাট যে ঐ নাম শুনে যে কোন ব্যক্তিই প্রাণতোষা ঘটকের আকাশ পাতাল বলেই মনে কবন। এই ধারণা যে আমাদের মিথ্যা নয় তার প্রমাণ বহু ব্যক্তি বা মহিলা পত্রে বা বচনে লেখককে আকাশ পাতাল চিত্রায়িত হচ্ছে জেনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এ ধারণাও আমরা করতে পারি যে ঐ ছবি মুক্তিলাভ করলে বহু জনে তা দেখতে যাবেন পূর্বোক্ত ধারণার বশীভূত হয়েই। বলতে গেলে, প্রাণতোষা বাবুর বিখ্যাত উপন্যাসের নাম ভাবিয়ে তার 'আকাশচূরী' খ্যাতির স্ববোণ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বইয়ের নামটির প্রাণতোষা ঘটককে বিমূঢ়ও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, কিন্তু ছবি মুক্তিলাভের পর দর্শক জানবেন যে ছবির আকাশ পাতালের সঙ্গে এক 'নামটুকু' ছাড়া মূল আকাশ পাতালের কোন মিল নেই অর্থাৎ ব্যবধানটাও 'আকাশ পাতাল'। এই লেখকের জ্ঞান একটি উপন্যাস 'খোয়ায়'ও অস্বস্তম। প্রবোজক সরোজ দেন্ডুও পলাক অমুসরণ করেছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের। এমন প্রচেষ্টা সত্যিই নিশ্চল।

॥ মাসিক বঙ্গবন্ধু বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥



মেজোপলিটন পিকচার্সের

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

প্রযোজনা. বি.এল.থোমস



শ্রী বিশ্বজিৎ পিকচার্স প্রিলিড.



এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে এক বিরাট হানি শুধু একরকম
হানি। জীবনের মত সুখ ও বেদনা, হাসি-কান্না ও হতাশা কে
হাসির ভূমানে উড়িয়ে দিতে পারলেই
আজকের দিনে চরম বাহাদুরি!

কোভাংগে

ছবি বিশ্বাস. ভানু বাল্ল্যা:
বাসুদেবী বাল্ল্যা: (ভানু বাল্ল্যার কন্যা)
প্রেমশাস্ত্রী. তুলসী চক্র:
তপসী. কেতকী

কাহিনী. অবধূত
পরিচালনা. নির্মল দে
সঙ্গীত. নটিকেশ্বর ঘোষ

শুভমুক্তি শুক্রবার ২৮শে আগস্ট !

শ্রী . প্রাচী . ইন্দিরা

এবং শহরতলীর অগ্ন্যাগ্নি চিত্রগ্রহে।

মানসিক প্রসঙ্গ

ভাকরার ভবিষ্যৎ

“কুৎসার না কিরিডেই ভাকরা বাঁধে কাট ধরিয়াছে। আপাততঃ (অবশ্য সরকারী হিসাবে) প্রাণহানি দশ জনের (কেহই মন্ত্রী নহেন) আর আর্থিক ক্ষতি ৫০ লক্ষ টাকার (এক কোটিও নহে)। এখন ভবনের পালা। সে-মন্ত্রী মিষ্টার হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম তলস্ত কবিরীর জন্ত—Bade his messengers ride forth, East west and south and north, To summon his array. নল, নীল, গর, পবাক সকলেই তলব হইয়াছে। এই ১৭০ কোটি টাকার পরিকল্পনার কর্তা আমেরিকান। তিনি এখন আমেরিকার ভাঁহাকে আসিতে তার করা হইয়াছে। আর আসিয়েন করজন কালা বিশেষজ্ঞ। ইংলিসের মধ্যে একজন বাঙ্গালীও আছেন—মিষ্টার এ. সি. মিত্র। এই অল্পসংখ্য কার্যে কর লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহার রিপোর্ট কি লাগি হইবে—সিমেণ্টের পরিকল্পনা গন্ধারুতিকা (অবশ্য নেপালচন্দ্র রায়ের নহে) ব্যবহার করিলে অবন হইয়াই থাকে?” —দৈনিক বহুমতী।

সমের বিচার

“সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুঃ ও দুর্নীতি দমন কেন্দ্রীয় সরকার ব নিষ্ক্রিয় বা উল্লাসীন নহেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ত মাঝে মাঝেই দুর্নীতি দমন চেষ্টার বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক খবরে জানা গিয়াছে যে, দিল্লী প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে গত মাসে ১৩ জন সরকারী কর্মচারী দণ্ডিত হইয়াছে। একজন আদালতের বিচারে শাস্তি পাইয়াছে, বারো জনকে বিভাগীয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। উচ্চ-নিম্ন সরকারী প্রায় সকল মহলেই যে দুর্নীতির প্রভাব পরিব্যাপ্ত, তাহা দুঃ করা খুচরা চেষ্টার কর্ম নহে। এখানেও অসতর্ক ব্যক্তিরাই বেশী ধরা পড়ে, কোর্শলীদের বহু কোশল কয়রান্ত। তাহাদের ধরাও যেমন কঠিন, শাস্তি সেওটা আরও শক্ত। তবু এইটুকুই সাক্ষ্য যে, কেন্দ্রীয় কর্তারা এই ব্যাপারে ‘তেজস্ক্রিয়’ না হইলেও একেবারে উদাসীন নহেন।” —যুগান্তর।

বাণ্ড ও সরকার

“কথা হইল যে, জিজেন কেবল খাজনার পদ ত্যাগ করেন নাই, তিনি প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার-অনুসৃত খাজনার্ত্তি প্রতি অনাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নব-নিযুক্ত খাজনামন্ত্রী খাজনার্ত্তির পুনর্বিচার করিতে উদ্যোগী হইবেন কিনা, তাহাই জানিবার বিষয়। খাজনাত্ত সঙ্গ্রহ এবং বটনের সর্বস্তরে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার হুস্যাধ্য চেষ্টার অগ্রসর হইলে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবেন, বর্তমান সঙ্কট তাহার সুনিশ্চিত আভাস দিয়াছে। জিজেনও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, খাজনাত্ত সঙ্গ্রহ ও বটনের সর্বস্তরে কর্তার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করিবার সরকারী নীতি

অবাস্তব এবং অদৃবল্য প্রমাণিত হইয়াছে। কুতাব কেন্দ্রীয় খাজনাত্তের ভার নুতন মন্ত্রীর উপরে অর্পিত হইলেই মুশকিল আসান হইতে পারে না। নীতিগত ব্যর্থতার ফলে যে কুৎসার কল পর্ষৎপ্রমাণ হইয়া খাজনাত্ত-পরিস্থিতিতে স্থায়ী সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বাড়িয়া ফেলিতে না পারিলে নেহরু সরকার জয়সাধারণকে শঙ্কায়ুক্ত করিতে পারিবেন না। দেশজোড়া দুর্গতির প্রতিকারের উপার কেবল মন্ত্রী-বদল নয়, বাস্তবনিষ্ঠ নীতি নির্ণয়।” —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভারত-চীন সম্পর্ক

“আমাদের দেশে এই চীনাবিবোধী কুৎসা যে-পরিমাণে রচিত পাইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে মার্কিন-বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পুষ্টি লাভ করিতেছে। চীনকে ভারতের শত্রু প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুদ্ধ-জোটটিকে এবং উহাতে সমবেত সরকারগুলিকে ভারতের মিত্ররূপে জাহির করিবার কাজ বেশ সহজ হইয়া আসে। চীনকে ভৌগোল্যে চিত্রিত করা গেলে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বায় বার যে মার্কিন-বুটিশ যুদ্ধ জোট দুইটিকে ভারতের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে উত্তত বিশপ হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন সেই জোটকে এবং উহার সরকারগুলিকে পরম সুন্দররূপে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা একটু সহজ হয়। চীনকে হের প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, সমাজতন্ত্রের প্রতি, চীনের বিপুল সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলির প্রতি ভারতের মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং সেই পথে চলিবার চর্যার অমুপ্রেরণা অন্ততঃ ক্ষুর করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাহাদের ক্রৌড়নেকেরা সেই উদ্দেশ্যেই চীনাবিবোধী কুৎসা ও প্রবোচনার জাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। জানিয়া উঠক, অগোচরে হটক ঐ কীদে বিনিই পা দিবেন তিনিই ভারত-চীন মৈত্রী ক্ষুর করিয়া যেমন এশিয়ার এবং সারা-পৃথিবীর শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারা হইয়া পড়িবেন, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তেরও হাতিয়ার হইবেন।” —স্বাধীনতা।

ভাকরা বাঁধ

“ভাকরা বাঁধে বিশদ্যর ঘটনাছে। উহার জন্ত তলস্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই বাঁধটি বাহাদের প্রত্যাক তত্ত্বাবধানে পঠিত হইয়াছিল, তাহাদেরই দুই কর্তাকে তলস্ত কমিটির প্রধান পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শুধু ভাকরা বাঁধ নয়, দুর্গাপুরেও সেদিন ভিত্তিতে ফাটল ধরা পড়িয়াছে। উহার জোয়ারেল ম্যানোজারকে ইহার পর বখারীতি খাতির দেখানো হইয়াছে। এই যে দেশে নিরম, যে সব অপদার্যের কোষে কোটি কোটি টাকার প্রজেক্টে ফাটল বাহির হইলেও তাহাদের দেখানে শান্তির বদলে পুখরার হয়, সে দেশে সব কয়টা প্রজেক্টে সবক্কে লোকের-সক্কে গভীরতর হইতে বাধ। ভিসাই প্রজেক্টের ভায় নিরাছে রাশিয়ান দল। তাহারা প্রতিটি ছটাক সিমেন্ট, বালি প্রভৃতি নিজেদের ল্যাবরেটরীতে নিজেরা পরীক্ষা না করিয়া কাজে লাগাইতে দেয় না। ডাঃ মেঘনার সাহা একবার ঐ রাশিয়ান দলের নেতাকে এত সতর্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরলোক জবাব দিয়াছেন—আমাদের কাজে গলদ বাহির হইলে আমাদের সর্বসম্পদে কি করিবে জানেন? দেওয়ানের



অত্যাশ্চৰ্য্য
কমলড় কাচাৰ
পাউডাৰ



মূল্যঃ
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন.প.
সামান্য সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কৰ ছাড়া)

নীল
সার্ফ

অপূৰ্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চৰ্য্য কমলড় কাচা পাউডাৰ সার্ফ কাচা জামা-কাপড়ৰ অপূৰ্ব শুভ্ৰতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে...

আপনি কখনও কাটেনলি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে সাগা, এত হালকা উজ্জ্বল করে। নাট, চমর, পাড়ী, তোঙ্গালে—সবকিছু কাচায় করতেই এটি অ্যাবর্ণ!

আপনি কখনও, দেখেননি এত ফোঁ—ঠাঙা বা গরম

জলে, ফোঁটাৰ পক্ষে অতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফোঁটাৰ এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কমলড় কাচা যায়। বেশী পরিচয় নেই এতে! হাক্ জামাকাপড় কাচা মানে ৩টি সহজ ক্লিক্স: ভেজানো, চেণা এক যোগসা মানেই আপনাব জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনাব গরমাব মলা এত মন্থ-কারভাবে কিয়ে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা বলেনে দেখেন! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচাব পক্ষেই অ্যাবর্ণ!

আপনি নিজেই পৰ্য্যবাস কৰিব দেখুন

সার্ফে জামাকাপড় অপূৰ্ব সাদা করে কাচা যায়!

সামনে পাঁচ কবরীয়া সোজা ওলী করিবে। খোসলা, কুনওয়ার সাই, কলকাতেন সেন প্রভৃতির কাণ্ডের উপযুক্ত তাস্ত এবং প্রমাণিত অপরাধের কঠোর শাস্তি হইলে অন্ততঃ ভবিষ্যতের প্রজন্মটোলা রক্ষা পাইবে।”

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

উদ্ধৃত পুনর্বাসন প্রসঙ্গ

“ভারত সরকার পুনর্বাসনের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেছেন ইহা সত্য; কিন্তু ৭৮ বৎসর পূর্বে উদ্ধৃতদের যে দুঃখবস্থা ছিল, আজও তাহার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা শোচনীয়তর হইয়াছে। এমিকে সরকার চাহিতেছেন যে, ১৯৬১ সালের মধ্যে পুনর্বাসন দপ্তর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, কারণ সরকারের মতে পুনর্বাসনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পুনর্বাসন অফিসগুলির কাজ বিগড় এক বৎসর বাধে প্রায় বন্ধ আছে বলা চলে, কারণ মাঠে মাঠে যে লোক দেখা হইত, তাহাও এখন আর তেমন দেখা হইতেছে না। শুনা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে সামান্য টাকা ধন হিসাবে দিবার জন্য এতদপদের পুনর্বাসন অফিসগুলিতে দিয়াছিলেন তাহাও সব বটন না করিয়া ৩১শে মার্চকে কেবল দেওয়া হইয়াছে। অথচ শত শত উদ্ধৃত দিগের পর দিন অপের জন্য ধরা দিয়াছেন ও দিতেছেন। এই কাছাড় জেলাতেই সরকার অবাস্তব ও অর্থেজ্ঞানিক ভীম করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা অশচর করিয়াছেন। আইটি-এ ফীম এবং সি. টি. ও ইত্যাদির কোলকাতারী সকলেরই জানা আছে। জনসাধারণের অর্থ বাহারা এই ভাবে নষ্ট করিয়াছে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইবে কি? দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা মরণ বাধিয়া লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্ধৃত নবন্যারীর স্মৃতি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার অবিলম্বে করুন—ইহাই আজ ভারত রাষ্ট্রের কর্তব্যগণের নিকট আমাদের একান্তিক অনুরোধ।”

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

ঝাড়গ্রামের জনবাহ্য

“চিকিৎসার জন্য সরকারী ব্যবস্থা বহিয়াছে ২০টি বেডসমিতি একটি সদর হাসপাতাল ও একটি ডাঙার। আউটডোরের রোগী ও হাসপাতালের রোগী দেখা ছাড়া তাঁহার উপর রহিয়াছে জেলখানার ভার ও পোষ্টমেন্টের দায়িত্ব। তাহা ছাড়া পুলিশের সাক্ষীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম। স্বাস্থ্যকেন্দ্র বহিয়াছে ১৩টি, মোবাইল ইউনিট বহিয়াছে ৬টি, কুষ্ঠ ক্লিনিক বহিয়াছে ২টি, মহকুমার এক্সরের ব্যবস্থা নাই, অস্ত্রজেনের ব্যবস্থা প্রায় থাকে না, রক্ত, মল, খুঁত পরীক্ষার সরকারী কোন ব্যবস্থা নাই। কোনরূপ মস্তব্য না করিয়া আমরা সংক্ষেপে কেবল তথ্যগুলি প্রকাশ করিলাম। ব্যাতনামা প্রাণ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাদের ইচ্ছামন্ত্রী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের শেষ হইতেছে। সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রদায় ইত্যাদি উন্নয়ন চলিতেছে। কাজেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে আমাদের বলিবার আর কিছু নাই, কেবল এই কথাই বলা চলে, ‘মহন্তের মরি নাকো মোরা মারি নিরে ঘর করি।’ কাজেই আমাদের বাস্তব লাইয়া সরকারের মাথা বামাইবার প্রয়োজন নাই। তবু অন্ধ জনগণ নাচায়। তাই কৃপাচুরী আকর্ষণের চোঁটা করে।”

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

বখাটে ছেলের উৎপাত

“সম্প্রতি বার্ষিকের এক শ্রেণীর বখাটে ছেলের উৎপাতে স্থানীয় ভ্রমব্যক্তিগণ উত্তির ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। একশা যে কতিপয় যুবক, অধিকাংশই অবাধালী, মূল-কলেজগামী মেয়েদের বাতায়নের পথে, গাছের উপর ইত্যাদি স্থানে ওৎ পাতিয়া থাকে এবং মেয়েরা বাস্তা পায় হইবার সময় ছোট ছোট ঢিল, কাগজের টুকরো ছুঁড়িয়া, শিস দিয়া অশ্লীল মন্তব্য নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিব্রত করিয়া তুলে। ইহারা স্বচ্ছল গৃহস্থের সন্তান, বাপের হোটেলের অন্ন ধসে করিয়া বেপারোয়া উচ্ছললতা করিয়া বেড়ায়। যুবকদের চরিত্র-ভ্রংশতার যে কুৎসিত চিত্র ইহাতে উদ্ঘাটিত হয়, তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। এখন ইহার প্রতিবিধান না করিলে সমাজজীবনকে ইহা কলুষিত করিয়া তুলিবে। কলিকাতার ব্যাড কণ্ডাক্টের জন্য যে শাস্তিমূলক আইন প্রচলিত আছে তাহা এখানেও অবিলম্বে প্রযুক্ত হওয়া দরকার। আশা করি সার্জিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হইবেন।”

—মালিক (আদানসোল)।

চালের চাল

“সদর মহকুমার আংশিক বরাদ্দ ব্যবস্থার যে চাউল বরাদ্দ আছে তাহার দশ জানা অংশ সহরের এক লক্ষ লোকের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাকী ছয় জানা অংশ পল্লী অঞ্চলের অর্ধাংশ ছয় লক্ষ লোকের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, সহরের লোকের ক্রয়ক্ষমতা অধিক। তদুপরি বহুলোক আছেন ধাঁধার খোলাবাজার হইতে অধিক মূল্য দিয়া চাল খরচ করিলে কোন অনুরোধ ভোগ করিবেন না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের কথা নিশ্চয়ই বসন্ত। তাহাদের পক্ষে খোলাবাজার হইতে চাউল সংগ্রহ করা একান্ত কষ্টকর। এই অসম ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মহকুমা শাসক এমিকে দৃষ্টি দিলে এবং পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিলে প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে। ইহার উপর আর একটি কথা বলিবার আছে। পল্লী-অঞ্চলে কেবলমাত্র ‘ক’ শ্রেণীর লোকেরা এই বরাদ্দ ব্যবস্থার সুযোগ পাইতেছে অথচ সহরাকলে কোন ব্যতিক্রম নাই। পল্লী-অঞ্চলের সকলেই বাহাতে চাল পায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক প্রয়োজন।”

—বর্দ্ধমানবাণী।

খাতকথা অমৃত সমান

“ভবিষ্যৎ বংশধর বধন ইতিহাসের পাতায় দেখিবে যে সামান্য কিছু সাংখ্যিক ব্যবসায়ীদের হাতে সরকারী অভিনাদের চরম পতন হইয়াছে—এই সরকার সমাজের নাম কি তাহার উল্লেখ করিবে তাহা কে বুঝিতেছেন? গত সপ্তাহ হইতে ৩৫ মণ দরের চাউল কয়েক টাকা হ্রাস পাইতেছে। সরকারী মহলের ধারণা, আউল ধাত্তর আমদানীর কলে চাউলের দাম হ্রাস পাইয়াছে। এই ধারণার সবটুকু সত্য নহে। চলিত সমস্তই বৃষ্টিপাত ও আমন ধাত্তর চাব আবার পূর্ণপরিপাক বৎসর হইতে ভাল হইয়াছে এবং প্রকৃতির অস্বাভাবিক বিপর্যয় না ঘটিলে আগামী অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধানে বেশ ভরিয়া যাইবে। নতুন ধান উঠিলে বাজারের দাম হ্রাস পাইবে। মহাজন ব্যবসায়ীদের গুণ্ড ভাত্তরে যে চাউল সঞ্চিত আছে বহি ইত্যদয়ে

সম্পূর্ণ বিক্রয় করিতে পারে তবে তাহাদের বড় বিপদ ঘটিবে। এই বিপদের আশঙ্কায় ধান চাউলের ব্যবসারীরা এখন বাধ্য হইয়া বাজারের দাম কমাইয়া গুপ্ত সঞ্চিত চাউল খালাস করিতেছে। কিন্তু যদি এই ধান চাউলের হাটের মহাজন ব্যবসারীদের হোলদ খাবলা হইতে আগামী মরশুমের ধান চাউল রক্ষা করা না যায় তবে প্রকৃতির অশেষ করুণা নিশ্চয়ই বার্ষিক পর্ষদবাসিত হইবে। আমরা কয়েক বৎসর পূর্বে হইতে পশ্চিমবঙ্গের ধান চাউল ব্যবসায় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার কথা বলিয়া আসিতেছি এবং জাতির স্বার্থে নিরুপায় অসহায় দুঃখী দেশবাসীর দুই কোর দুই মুঠি অন্নের স্বার্থে ধান ও চাউল ব্যবসারীদের প্রতি মুদ্রাশর চক্রান্ত দমন করিতে সরকারকে আবেদন জানাইতেছি।”

—বারাসত বার্তা।

নেহরু অবতারণা

“কর্তৃত্বজ্ঞার দেশে সবই সম্ভব। বোম্বাই বিধান সভার মুখ্যমন্ত্রী এক প্রস্তাবের প্রকাশ করিয়াছেন, গুজরাটের দোদোদা নাম গ্রামে একদল লোক “ক্রীজওহর শক্তি মণ্ডল” নামক এক সন্থা গঠন করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী ক্রীজওহরলাল নেহরুকে দশম অবতার বলিয়া ঘোষণা ও ক্রওহরলালের পূজা শুরু করিয়া দিয়াছে। এক দিন এই ক্রজওহর গান্ধী-পূজা শুরু হইয়াছিল, তখন শাসন-ক্ষমতা হাতে আসে নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর গাভীতে আসীন ব্যক্তিকে দশম অবতার বানাইবার প্রচেষ্টা গুজরাটের মাটিতে গজাইয়াছে। কর্তৃত্বজ্ঞা দেশের পুরাতন শ্রোগান ছিল দিল্লীখো বা জগদীশখো বা। এই স্তুতি-গানে বাদশার দিলখোশ হইত। শাসিত বিভ্রান্ত হইত। কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস এখনও এদেশের মজাগত, তাই ব্যক্তি পূজার সাড়শর মহড়া প্রতিদিন চলিতেছে। ক্রীজওহর শক্তি মণ্ডল সাধনা ও প্রচারণা যেন একটু বেশী আগে শুরু করিয়া বসিয়াছেন। আগামী নির্বাচনের অল্প দিন পূর্বে এটা শুরু হইলে বেশী কাজে লাগিত। সাধু সমাজ গঠন করিয়া রাষ্ট্র-নেতাদের স্তবজ্ঞতি করার জন্ত জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর অভাব যেদেশে হয় না, সেদেশে ক্রীজওহর শক্তি মণ্ডলের স্তায় সংগঠনের লোকের অভাব হইবে কেন? কোথাও মা মনসার দেওয়ানীর “ভব” কাহারো বা স্বপ্নদেশ, এমনি করিয়া পাজন জমিয়া উঠে।”

—বীরভূমবাণী।

বাংলার হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ

“ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের বাংলা শাখার উদ্ভোগে ৬ জন বিশিষ্ট প্রবীণ চিকিৎসক লইয়া স্পেশাল কমিটি কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের প্রশাসনিক নানা গলদ ও শৃঙ্খলাহীনতার বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপক তদন্ত করিয়া এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কার্যকলাপের অধ্যয়ন করিয়া সকল অভিযোগের জন্ত মুখ্যত দায়ী—এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। হাসপাতালগুলির উন্নয়নকল্পে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং একটি কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়াছিলেন। সরকার সকল সুপারিশ ও দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সরকারের এইরূপ প্রত্যাখ্যান গণতন্ত্র-বিরোধী কি না দেশবাসী ইহার উত্তর দিবে।”

—বাঙালীসভা (কলিকাতা)।

সাক্ষর পর্ষদ

“লজ্জার কথা রাজ্যের মহকুমাগুলির সহিত সংবাদীকারী বার মাস চলাচলোপযোগী সড়ক আজ বার বৎসরেও নির্মাণ করা যায় নাই। আরও লজ্জার কথা, যে আসাম-আগরতলা সড়ক নির্মাণে সরকার অসমেধ বজ্র পূর্ব সম্পন্ন করিয়াছেন; সেই সড়কটি দিয়াও রীতিমত মোটর বানবাহন চলিতে পারে না। ছয় দিবসে সাত ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে ইহাই ত্রিপুরার পক্ষে যথেষ্ট, ধর্ম্মনগর হইতে সাক্ষর পর্ষদ বানবাহন চলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দশটি মহকুমার মধ্যে সাতটি মহকুমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বানবাহনের অভাবে শত শত যাত্রী আটক পড়িয়াই থাকে নাই, ঐ সমস্ত সাতটি মহকুমার জনসাধারণ ডাকের চিঠি, সংবাদপত্র পাইতেছে না, দুনিয়ার কি ঘটনা, কি ঘটবে তাহার কিছুই জানিবার কোন ব্যবস্থা নাই। আগরতলা-আসাম সড়ক বাহাকে ত্রিপুরার লাইক লাইন বলা হয় তাহা ইতিমধ্যেই বানবাহন চলার পক্ষে সম্পূর্ণ অসুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সড়কের অনেক স্থানেই পিচ উঠিয়া গভীর গর্তের আবির্ভাব হইয়াছে। কাপডাট নির্মাণে বিলম্বের ফলে ডাইভার্সন রোডগুলি বিপজ্জনক হইয়াছে। তিন টনের বেশী মাল নিয়া ঐ সড়কে ট্রাক চলিতে দেওয়া হয় না। মোটর উপর সড়কটির অবস্থা এক সঙ্কট জনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সড়কটি নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এর মধ্যেই ইহার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ আমরা পাইতেছি তাহা উৎসাহজনক ত বটেই, নানা প্রকার সন্দেহেরও উদ্ভব করিতেছে।”

—সেবক (আগরতলা)।

ভয়াবহ

“পশ্চিম বাংলার বেকারের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর হইতে বাংলা দেশের জীবনে যে অর্থনৈতিক সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত! দিনের পর দিন এই অর্থনৈতিক সংকট জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। বাংলা দেশের এই সমস্তা স্বল্পদুরতার সহিত কেহ চিন্তা। বয়ঃ দেখেন কিনা তাহা আমরা জানি না। দেশে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা আসিতেছে এবং তাহার ফলে দেশের কিছু সংখ্যক যুবকগণ যে চাকুরী পাইতেছে না তাহা নহে কিন্তু তাহাতে সমস্তার কিছুমাত্র সমাধান হইতেছে না। পশ্চিম বাংলার অবস্থা ও সমস্তা বিচিত্র।



ক্যালকুলাস অপটিক্যাল স্টো (প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৩৫-১১৭১, সড়কপত্র: ডাঃ লালু চন্দ্র সেন-৮।
৫৫ নং ব্রাহ্মচরী স্ট্রীট কলিকাতা ৬।

আমরা বহুবীর বহুভাবে তাহা আলোচনা করিয়াছি। স্বাধীন দেশে কর্মকর্ম প্রভৃতি ব্যক্তি দেশ গঠনের জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছেন এই স্বপ্ন বাহারা একদিন দেখিয়াছিলেন তাহারা আজ রক্ত বাস্তবের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া বিমিত না হইয়া পাবেন না। সমবেদনা ও সহায়ত্ব হইয়া সমগ্র সমস্রাতি দেখিলে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও দুর্গতি লাঘব করা সম্ভব হইত বলিয়া আমরা মনে করি। আজ সমবেদনা ও সহায়ত্বের অভাব সর্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ মানুষ যে আয় করে তাহার দ্বারা কোন মতেই ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছে না। ইহারই ফলে সামাজিক নানা পাপ মাঠের সমাজ-জীবনে দেখা দিয়াছে। দেশের যুবকগণই স্বাধীন দেশের একমাত্র আশা-ভরসা ছিল। আর্থিক অনটন ও বেকার অবস্থার ফলে দেশের যুবকগণ কোন পথে চলিত হইতেছে, তাহা বর্তমান অবস্থা দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

—ত্রিশ্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শোক-সংবাদ

বামাচরণ ভায়াচার্য্য

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৬) ইং-১৪৮৫৯ তারিখে বুধবার ইহার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার আমতলী গ্রামে ১২১৬ বঙ্গাব্দে ১০ই আশ্বিন বুধবার উক্ত বামাচরণ ভায়াচার্য্যের জন্ম হয়। পিতা প্রবীণ স্মার্ত্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ ও মাতা ৬বামাসুন্দরী দেবীর ইনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। দেশেই তিনি ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া ইদিলপুরের মূলগ্রামবাসী পণ্ডিত ৭নবীনচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ভায়াশাস্ত্রের কতক অংশ অধ্যয়ন

করেন, পরে ২১ বৎসর বয়সে ৮কাশীধামে বাইরা সেখানকার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ভারত-বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৮ বামাচরণ ভায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল ভায়াশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা দেশের “তর্কতীর্থ” এবং কাশীধামের “ভায়াচার্য্য” পরীক্ষায় প্রথম স্থানধিকারী হইয়া উত্তীর্ণ হন। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচারদক্ষতা শুধু কাশীস্থ পণ্ডিতসমাজে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তারপর ক্রমে কাশীস্থ বিত্তদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে টিকমানি সংস্কৃত কলেজে, রাজস্থান সংস্কৃত কলেজে ও গোয়েন্দা সংস্কৃত কলেজে ভায়াশাস্ত্রের অধ্যাপনার দ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি এমন বিস্তৃতিলাভ করে—বাহার কলে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভায়াশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সেখানে তিনি “রীডার” পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও অধ্যাপনা-খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের নানাদেশীয় বহু ছাত্র তাঁহার নিকট আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক উত্তম অধ্যাপক হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কাশী বিদ্বৎ পরিষদের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে “ভায়ারণ্যকেশরী” উপাধি দিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত মহাশয় ভায়াশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করিয়া বিদ্যার্থীদের বশের উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল এবং শেষ পর্যন্তও বুকের ভায়া কর্মশক্তি বর্তমান ছিল। স্মরণীয়কাল বাৎ কাশীধামে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের যে প্রশঙ্গ সৌরবধারা প্রবাহিত ছিল, সম্ভ্রুতি এই বামাচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের তিরোহানে সেই ধারা লুপ্ত হইল। ইহা পণ্ডিত-সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি। হার ভাগ্যবতী পত্নী মাত্র দুই বৎসর পূর্বে কাশীধামেই স্নেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পাঁচ পুত্র, চার কন্যা ও কতিপয় পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী বিজ্ঞমান। করুণাময় বিশ্বনাথ এই শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গের শান্তিবিধান করুন।

উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যভূষণ

বাংলাদেশের সুপ্রব শিক্কাবতী সিট কলেজের ভূতপূর্ব সহাধ্যক বিশিষ্ট স্ত্রী উপেন্দ্রনাথ সাংখ্যভূষণ গত ৪ঠা শ্রাবণ ১২ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ ইনি সিট কলেজের সহাধ্যকরূপে অতিবাহিত করেছেন। একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের ইনি প্রণেতা। বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে ইনি এক বিশেষ আসনের অধিকারী। শিক্ষাজগতে এঁর অক্লান্ত সেবা একে অরণীয় করে রাখবে। ইনি রাজা শশিভূষণ রায়ের পুত্র।

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সার্বকনামা বঙ্গজননীর আরও একজন সুপ্রবীণ সন্তানের জীবনাবসান ঘটল। চন্দননগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩ বছর বয়সে গত ২রা শ্রাবণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এঁর সুনাম সর্বজনবিদিত। সুলেখক এবং সুপণ্ডিত হিসেবেও ইনি প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৩৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রট, “বহুদলী রোটারী বেলিনে” প্রচারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

“বৌদ্ধ পঞ্চালী”

বিগত সংখ্যার পত্রদ্বারা ও লেখকের মতে, ‘ঐতিহাসিকগণ বৈদিক যুগের বয়ঃক্রম নির্ণয় করেছেন খৃঃ পূঃ ১৫০০ হতে খৃঃ পূঃ ৫০০ শতক।’ এটি হ’ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়দের ভুলপাঠ। কোন কোন পুস্তকের উচ্ছিন্ন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডাঃ সুনীতিকুমা চট্টোপাধ্যায়ের মতে বৈদিক যুগ খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১২০০ বৎসর। ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের মতে ঋগ্বেদ-সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর এবং অজ্ঞাত সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসর ধরা হ’য়েছে। প্রখ্যাত মনীষী স্বর্গত রায় যোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানিষি মহাশয় তাঁর ‘বেদের দেবতা ও কৃষ্ণিকাল’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, খৃঃ পূঃ ৮০০০ (আট) হাজার অব্দে বৈদিক ঋষিদের অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টাব্দে বর্ণিত শতকে বৈদিক কাল ও আয়গণের ভারত আগমন ভুলপাঠ। পুস্তকের অসার উপকথা মাত্র। তা পরম প্রবন্ধের স্বামী অন্বেষণে তাঁর বহু মূল্যবান পুস্তক ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’তে প্রমাণ করেছেন। তথাকথিত ‘Aryans’ এর বৈদিক আর্থ এক নয়। Aryans-রা ‘মহা’ অসভ্য ও বর্বর জগৎ ভারতে প্রবেশ করে। এদের দ্বারা বেদও রচিত হয়নি। পরে এই Aryans-রা ভারতীয় আর্থ জাতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যেমন Sir John Marshall ও অমূল্য মত অনুমান করেছেন। বৈদিক কাল গণনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে মতেজোন্ডো ও হারাল্ডা এক উচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত। স্বর্গত রায় বাহাদুর বমাপ্রসাদ চন্দ বলেন, মতেজোন্ডো ‘পণি’দের নগরী। Rev. Father Heras বলেন, এই নগরী দ্রাবিড়দের। অবশ্য তিনি স্মেরিয়ানদের নগরী বলেও অনুমান করেছেন। ‘পণি’ ও ‘দ্রাবিড়’ যাই হোক ‘পণিরা’ বৈদিক বৈদ্য সমাজের লোক। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে’ দ্রাবিড়দের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘দ্রব দিভুম্-সাম’ ধারা গান করতেন তাঁরাই কালক্রমে ‘দ্রাবিড়’ হয়েছেন। এ ছাড়া যে সকল গৌরীপতি সংযুক্ত শিবলিঙ্গ, গুপ্ত, শবসমাধির বিবরণ উদ্ধার করা হয়েছে ঐগুলি যে বৈদিক ঋষিদের অনুকৃতি এবং দ্রাবিড়ের বৈদিক আর্থীদেরই যে একটি শাখা তা স্বামিজী ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’তে বিশদ আলোচনা করেছেন। অতএব সিদ্ধান্তভারতীয় বয়ঃক্রম কাল যদি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০০ হতে ৫০০০ বৎসরও ধরা যায়, তা হলে বৈদিক আর্থীদের প্রাচীনত্বের পরিধি আরও বিস্তৃত লাভ করল।

লেখকের মতে—‘বেদে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মিত্র বা স্বর্গের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি, পূজা-যজ্ঞ ও বলিদানের নির্দেশ।’ বেদের ধারণা বোধ হয় লেখকের এই পর্যন্ত। কিন্তু এ যে কত বড় অজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি তা সমালোচনা করতে যাওয়া দুরূহ। বলে মনে করা যেতে পারে। লেখক অল্পগ্রহণ করে আর্থ-সমাজের পূজাপাদ স্বামী শ্রীমানন্দ সরস্বতী বিরচিত ‘সত্যার্থ প্রকাশ ও ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা’ নামক গ্রন্থের পাঠ করুন, তা হলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বেদের কথা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন। অল্পগ্রহণ আলোচনা করলে দেখা যায়, লেখক যে সকল দেবতার নাম করেছেন ওগুলি

অল্পগ্রহণবাচক বা অল্পগ্রহণ উপাধিবাচক শব্দ বা জড়বাদীদের প্রজ্ঞানশূন্য মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। ধরা ‘যাক ইন্দ্র শব্দের দৃষ্টান্তটি। “শাস্ত্রদৃষ্টা তুপদেশো বামদেববৎ ॥” ১।১।৩০ ॥ অক্ষহুত্র ॥ এই শ্লোকের তাৎপৰ্য—ইন্দ্র ব’লছেন—‘আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞা, আমাকেই জান।’ একথা তিনি বামদেব ঋষির দ্বারা ‘শাস্ত্রদৃষ্টা তু উপদেশঃ’ অনুসারে ব’লছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষ্যংকারের পর ‘ইন্দ্র’ ব’লেতে স্বতন্ত্র পদার্থ আর থাকে না। ইন্দ্র তখন ‘প্রজ্ঞা’। লেখক আরও জেনে রাখুন—বেদের ভাষাই বেদান্ত ও উপনিষদ। আবার বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের ভাষা বলা যেতে পারে শ্রীমদ্ভাগবতকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাছন্ন মনে বেদার্থের সত্য-জ্ঞান বা উপলব্ধির স্থান নেই। প্রজ্ঞানের আলো ব্যতিরেকে এ সকল ঋতি-স্মৃতি গ্রন্থের অর্থ অনুধাবন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

‘স্বপ্নর অভীতে কালক-পঞ্চলী মন্ত্র’ (বহুমতী, আখড়, পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য।) লেখকের এই নাটকোচিত বানতদ্বী বেশ বর্ণনা এবং প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। লেখক ইতিহাসমুগ ব্যক্তি। অতি বুদ্ধিমান লেখকের হাতে এ বিষয়ের তথাকথিত ইতিহাসের নজির আছে। তবে দুঃখের বিষয়, তথাকথিত ইতিহাস যে নিরপেক্ষ অভ্যন্তরিত সত্যদ্রষ্টা যথি এই অপবাদ ইতিহাসের কোন ছাত্রই তাকে দিতে পারবে না। নির্ভেজাল চিত্রে লেখক একটি কথা জেনে রাখুন—তদানন্তর কালে উত্তর-ভারতের স্থানে স্থানে যদি হিন্দুধর্মের কিছুটা বিকৃতি সাধন ঘটে থাকে তদ্বারা, অল্পগ্রহণ ভাষ্যের অবলম্বিত ঘটন যে বিশেষ অভিসন্ধিসূচক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতএব ভারত যে তখন কতটা ‘ভূষিত’ চাতক হ’য়ে উঠেছিল একথা বলা সুকঠিন।

এখন দেখা যাক ‘যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধ প্রসঙ্গ।’ অমরকোষে ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ ‘বুদ্ধঃ—সর্বজ্ঞঃ। অধ্বয়বাদী।’ কিন্তু ঐতিহাসিক বুদ্ধ অধ্বয়বাদী নন শূন্যবাদী। যোগবাশিষ্ঠের ও শ্রীমদ্ভাগবতের বুদ্ধ হ’লেন সুরাচার্য বৃহস্পতি। তিনি ‘একদা ঋতি-বহির্ভূত হেতুবাদ-সম্বন্ধিত শাস্ত্র রচনা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র নামে তখন তা খ্যাত হয়। “জিন ধর্মঃ সমাধ্যায়-বেদবাহান পরিজ্ঞায় হেতুবাদসম্বিতান ॥”—মাৎস্ত, ২৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যোগবাশিষ্ঠ—বৈরাগ্য প্রকরণ, ১৫৬—১০ শ্লোকের তাৎপৰ্য—‘আমি বুদ্ধদেবের দ্বারা শাস্ত্রভাবে সর্বভূতেই আত্মবৎ ব্যবহার (বা সর্বভূতে আত্মজ্ঞানের সাধনা) করিতে ইচ্ছা করি। ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্ম ‘আত্মজ্ঞানের’ সাধনা নেই। আছে নির্বাণস্বপ্নের সাধনা। —“We have seen that Buddha said that there was no atman (soul)”—A History of Indian Philosophy—Dr. S. N. Dasgupta.—দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবত ব’লেন—‘বুদ্ধকৃত নিরাশ্রয়শাস্ত্রম। তং সর্গৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ খণ্ডিতঃ অস্বীয়ম।’ ফলতঃ বৃহস্পতি নামধের, বুদ্ধের শাস্ত্র ছাড়া ঐতিহাসিক বুদ্ধের নিরাশ্রয়বাদ ‘সর্গৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ খণ্ডিতম’ হতে যায়নি। যদিও ভারতভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম উচ্ছদের জন্ত প্রধানতঃ শঙ্করাচার্যকেই

সারী করা হয়—ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়।...It will be wrong to say that he (Sankara) routed the Buddhists by his philosophical arguments.—The cultural heritage of India.—Prof. H. Bhattacharjee, M. A. B. L. বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদের জন্য আর আছে কুমারিল ভট্টের উল্লেখ। অতএব এর দ্বারা 'সর্বৈক্য শাস্ত্রকারিঃ' 'ঐতিহাসিক' মত হ'তে পারে না।

আমাদের প্রাচীন মহর্ষিদের 'জগৎকাল' সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয়ানদের কাছে পাঠ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মনে করি না। তবে 'বুদ্ধ মহর্ষি পতঞ্জলির কাছে যে ঋণী' একথা আর উল্লেখ করার প্রবন্ধে নেই। উহা লেখকের দৃকপোশককল্পিত দিবাক্ত। 'বৌদ্ধ' ও বিরাটসংস্কৃতি বলতে লেখক কি বুঝেন? শুধু নাটকোচিত আবেগে স্বচ্ছন্দ লেখকের 'বিক্ষোভ' বাস্তব ইতিহাস নয়। বাস্তব ইতিহাসের চরমা এঁতে লেখক এবার দৃষ্টিপাত করুন—সব 'Ism' তা ধর্মীয় আর political হোক মতপার্থক্য থাকলেও তার ভিতরের সত্যের ঐ সব Ism এর follower দেব হাতে প'ড়ে পরবর্তী কালে অপমৃত্যু ঘটে। শঙ্করাচার্য বা কুমারিল ভট্ট নয়। নির্বাণমুক্তির নামে পরবর্তী কালের যখন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ ব্যাভিচারের স্রোতে গ'ড়াসিয়ে দিল এবং সম্রাট অশোক ও হর্ষবর্ধনের পরে ভারতের জাগ্রত ক্ষাত্রাজ্ঞা (শুণ্ড বংশ প্রভৃতি) নির্বাণমুক্তি জাতীয় জীবনের অগ্রগণ্য বলে গ্রহণ করল ও বাস্তববাদী মুসলমানদের যখন ভারতে আগমন ঘটল, তখন ভারত থেকে অবলুপ্তি ঘটল বৌদ্ধধর্মের। বড়ই দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমান জগতের মানচিত্র থেকেও বৌদ্ধজগত নবজাগ্রত কাল-ধর্মের হাতে অবলুপ্ত হ'তে চলেছে। চীন ও তিব্বত তার দৃষ্টান্তস্বরূপ। বৌদ্ধ বাণী, সিংহল, থাইল্যান্ড (শ্রাম), কাম্বোডিয়া ইত্যাদি রাজ্যে অধিঃস পঞ্চশতাব্দী সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। খ্রীষ্টানদের সংস্কৃতির বিরাট আনন্দিক বিক্ষোভ এখন শূন্য বিলীন হ'তে চলেছে। এই হিসাই আজ জগতকে ক্রমশঃ পৃথক এগিয়ে নিয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। আজ জগত চায় না ধর্ম। চায় মহাবুদ্ধকার খণ্ডপানীয়। এই দুর্দিনে অতীতের বস্ত্র নিয়ে খ্রীষ্টানদের বা বজ্রানন্দদের মধ্য-যুগ-স্বপ্নের বাক-বৃন্দে কোন সত্য নির্ণীত হবে না। অতএব আমাদের 'পঞ্চশতাব্দী' সাধনার এখানেই সমাপ্তি ঘটুক।—কেম সমাজদার।

আনন্দবুদ্ধাবান চন্দ্র

"মাসিক বসুমতীতে" মাসে মাসে প্রকাশিত কবিকর্পণের "আনন্দবুদ্ধাবান চন্দ্র" গ্রন্থের সুললিত অম্বুবাদ পাঠ করিয়া অভিনন্দন জানন্দলাভ করিতেছি। আপনাদেব বঙ্গভাষায় ত আদৌ অম্বুবাদ বলিয়া মনে হয় না। নূতন মৌলিক কাব্য বলিয়াই মনে হয়। যেমন মধুর কৃষ্ণলীলা কাহিনী চিরকালই স্নেহমধুর, তেমনি আপনাদেব অম্বুবাদের ভাষা মধুর হইতেও মধুর; এ ভাষার মল্লিকানী-ধারা তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া পাঠককে অমৃতরসে অভিষিক্ত করে। কবি কর্ণপুরের নাতিপ্রাঞ্জল সত্ত্বতের প্রতিটি ভাব ও ব্যঞ্জনা আপনাদেব অম্বুবাদ-ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অম্বুবাদের এই ভাষা ঠাকুরবাড়ী, বৈষ্ণবী বজার রাখিয়াছে।

কিন্তু এই সম্পর্কে আমার একটি নিবেদন আছে। কবি কর্ণপুর গোখামী প্রণীত "আনন্দবুদ্ধাবান চন্দ্র" মূল সত্ত্বত গ্রন্থ বাজারে দাঁড় পাওয়া যায় না। আপনি এই গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশের

সময় যদি এই অম্বুবাদের সঙ্গে মূল সত্ত্বত চন্দ্রকাব্যটি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সোনার সোহাগা হয়, কবির কাব্যরস আনন্দনের তথা আপনাদেব রূত অম্বুবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই সুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবগ্রন্থকে বৈষ্ণব-সমাজে পুনরায় উপস্থাপিত করা হয়। আমার এই নিবেদন, আপনাদেব প্রণীত সকল অম্বুবাদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য জানিবেন। আশা করি আমার নিবেদন কাণ্ডারী করিবেন। খ্রীঃখ্রীঃবিহারী দাস, গড়বেতা, মেদিনীপুর।

পত্রিকা সমালোচনা

আমি মাসিক বসুমতীর এক জন নিয়মিত পাঠিকা, এই মাসিক বসুমতী গ্রন্থটি আমার খুবই ভাল লাগে, অতীতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখক-লেখিকাদের উপস্থান পড়ে খুব খুসী হয়েছি। বিশেষ করে আন্তোভা মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চতপার কথা উল্লেখযোগ্য। সাততের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা। আন্তোভা মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপস্থান আবার মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখতে চাই। সম্প্রতি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত সুলেখা দাশগুপ্তার 'বর্ণালী' ও সাতারি 'অনিবেদিত' খুবই ভাল লাগছে। হিমালীশ গোখামীর ভ্রমণ কাহিনী পড়েও দেশ সম্বন্ধে নোতুন করে অনেক কিছু জানতে পারলাম। বর্ণালী শ'র জাবনী পড়ে খুবই খুসী হচ্ছি। ভবিষ্যতে এই বকম পৃথিবী-বিখ্যাত লেখকদের জাবনী মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখতে পেলে আনন্দিত হবো। বাতিঘরের চতুর্দশ পর্ব আবার কবে বের হবে? তবে একটি বিষয়ে আমার অভিযোগ আছে। সেটা হচ্ছে আন্তোভা মুখোপাধ্যায়ের বিবরণে। এই বিভাগটি উঠিয়ে দিলেন কেন? এর পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করুন।—অঞ্জলি সেনগুপ্ত, ২৪৫, বঙ্গ রোড; কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please receive the annual subscription for another year. Kindly send the magazine regularly.—Head Master, Govt. High School, Haflong.

Herewith Rs 15/- being the subscription for Masik Basumati for one year. Please send it from the Jaistha number.—Manager, New Chunta T. Estate, Darjeeling.

আগামী ৬ মাসের জন্য টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া রাখিবেন।—Mrs. Bani Chakravorty, Ahmedabad.

Remitting herewith Rs. 15/- as my annual subscription for the ensuing season,—Ambujaksha Mahanty, Purulia.

মাসিক বসুমতীর আবার ৬৬ সংখ্যা থেকে মার্চ '৬৬ পর্যন্ত টাকা বাবদ ১০০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।—খ্রীঃখ্রীঃ টাণ্ডারীয়া মণ্ডল—মেদিনীপুর।

Payment of annual subscription for Masik Basumati—Vani Sen Gupta.—Bombay.



মাসিক বসন্তমতী

॥ তারিখ, ১৩৪৬ ॥

(জলরঙ)

রঙ-বাহার

—অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী অঙ্কিত



৩৮শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৬]

৥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যেহেতু যত প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা—ধর্ম কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে ধর্ম নিত্যন্ত অপরিণত ও সমাজ সশব্দ উন্নত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্মুখী। পাশ্চাত্য দেশ ধর্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিত্তর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিস্বাভাব করিতে হইলে তাহা ধর্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই কারণে আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোযোগ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রামাণ্যিক' বিশ্বাসের জন্ত যে সাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া বান নাই। ঈশ্বরোচ্ছার আমি এই সমস্তের মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি বলি, বিশ্ণুসমাজের উন্নতির জন্ত ধর্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচারসম্বন্ধিত প্রকৃতি সম্বন্ধে

করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, কিন্তু ধর্মকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেভাবে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।

একটি কাঠখণ্ডকে উহার আঁশের অনুকূলে যেমন সহজে চিরিয়া ফেলা যায়, হিন্দুধর্মকেও তেমনি হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়াই সংস্কার করিতে হইবে; নব্যাত্মিক মতবাদের মধ্য দিয়া নহে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারগণকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের সংস্কৃতিধারাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে।

খাঁটি চরিত্র, সত্যকার জীবন, বাহ্য শক্তির কেন্দ্র এবং দেব-মানবের মিলনভূমি—তাহাই পথ দেখাইবে। ইহাদ্বিতিকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদানসমূহ সঞ্চারিত হইবে এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সমস্ত অপবিত্রতা ধুইয়া দিবে।

এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অন্যায়ের ছাঁটিয়া ফেল—যেহেতু ধর্মই জগতের সর্বোচ্চ ধর্ম। আমার কথা কি যুক্তিযুক্ত? ধর্মই লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পারি? তাহা যে বিশ্বাস ইহা কারো পরিণত ভ্রম। খুব সত্য, আর ইহা ইহা হইবে।

বঙ্গালী কেরাণীর যুদ্ধ পরিচালনা

তিনপন্থাধা ভট্টাচার্য

বঙ্গালী ভীক, যুদ্ধবিযুখ, ভেতো বাঙ্গালী, বাঙ্গালী শুধু
বঙ্গালীই জানে, বাঙ্গালী সামরিক জাতি নয় ইত্যাদি অশ্রু
মিথ্যা কথা। এই বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের নামে পুঞ্জীভূত
হয়ে আছে। কিন্তু বাঙ্গালী যে ভীক নয়, সমরবিযুখ নয়, সূর্য
অতীতের মহাভারতের যুগ থেকে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগ পর্যন্ত
বাঙ্গালার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। বাঙ্গালার মুক্তাভ্যুদয়-লেশহীন বিপ্লবী
যুদ্ধকলই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বৃটিশ আমলের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে
পাই, বাঙ্গালীর এই মিথ্যা অশ্বাবাদের মূলে রয়েছে ইংরেজ। ইতিহাসে
বাঁদের কিছুমান দখল আছে তাঁরাই জানেন একদা ভারতই ইংরেজ
রাজত্ব প্রসারের প্রধান সহায়ক হয়েছিল এই অসামরিক বলে উপেক্ষিত
বাঙ্গালী ও মারাঠী সিপাহীরাই। বৃটিশ আমলের গোড়ার দিকে
একদিন এই ইংরেজরাই বাঙ্গালীর সমরকুশলতার প্রশংসা করেছেন।
কে এবং ম্যালিসন প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিক তৎকালীন অনেক যুদ্ধে
ইংরেজগণ যে শুধু বাঙ্গালী ও মারাঠী সিপাহীর বীরকেই জয়লাভ
করেছেন একথা যুক্ত বটে স্বীকার করে গেছেন। সে যুগে ইষ্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানী কর্তৃক অনেক বাঙ্গালী বোম্বার্ডের বীরদের জন্ত যে 'ইংলিশ'
নামক জমদারীর প্রদত্ত হয়েছে তারও ঐতিহাসিক নজির আছে। কিন্তু
পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত এই ইংরেজই আবার
বাঙ্গালীকে সমর বিভাগ থেকে সরিয়ে একেবারে কেরাণীতে পরিণত
করেছে।

বৃটিশ আমলে অল্প সব প্রদেশ থেকে শিকারীরা এবং শিক্ত-
কুলভায় বাঙ্গালীই ছিল অগ্রণী। বাঙ্গালীর দেশপ্রেম, স্বাধীনতা
লাভের পূহা এবং বিপ্লবী মনোভাবই হল ইংরেজের ভয় ও আশঙ্কার
কারণ। নিরক্ষর, ও অনগ্রসর রাজনৈতিক চেতনহীন ভিন্ন
প্রদেশবাসীকে বাঙ্গালী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার জুই ইংরেজ তাই
সুকৌশলে তাদের সরিয়ে দিলে সমর বিভাগ থেকে। শুধু সরিয়ে
দিয়েই ক্ষান্ত হল না, বাঙ্গালী প্রভাব খর্ব করবার সর্বপ্রকার কূট
কৌশলও অবলম্বিত হল। কার্জন করলেন বাংলার অঙ্গচ্ছেদ, হার্ডিঞ্জ
বাংলা থেকে সরিয়ে নিলেন রাজধানী, সর্বশেষে ম্যাকডোনাল্ড কায়ম
করলেন কয়িটাল এওয়ার্ড। সিপাহী বিদ্রোহের পর সৈন্যদলে লোক
নির্বাচনের কড়াফিটা আরো বেড়ে গেল। ফলে সিপাহী যুদ্ধে তারা
যোগ দেয়নি এমন অঞ্চলের লোক ছাড়া সমর বিভাগে অস্ত্র সশস্ত্রই
হয়ে পড়ল অবাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ কেবল মাত্র সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব,
নেপাল প্রভৃতি রাজনৈতিক চেতনশূন্য করেকটি প্রদেশের অধিবাসী
ছাড়া অস্ত্র সব প্রদেশবাসীকেই বাঙ্গালীর মত সরিয়ে দেওয়া হল
অসামরিক পর্যায়ে। স্তবরাং সেনা বিভাগে সামরিক বা অসামরিক
জাতি এই কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টির উদ্ভাবক যে ইংরেজ এবং তার
রাজনৈতিক মস্তিষ্ক একথা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলা নিম্নরোজন।

বাঙ্গালী যে অসামরিক জাতি নয় এবং কোন কালেই সমরবিযুখ
নয়, ইংরেজের অতীত ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে শুধু নবাবী আমলের
শেষ ও বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করলেও তার
খবর নজির পাওয়া যায়। তখনো বাংলার ঘরে ঘরে ছিল শক্তিকর্ষ

বাংলার লাঠিরাঙ্গের প্রাধান্য সে যুগে লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত।
বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি, বাংলার কোন ইতিহাস নেই। তাই আজ
নিছক আত্মপ্রাণ ও আত্মবিবরণ-সর্বস্ব মুসলমান বা ইউরোপীয়
ঐতিহাসিকদের বর্ণনাই বাঙ্গালার ইতিহাস সংকলনের একমাত্র
অবলম্বন। এ সব বর্ণনার মধ্যে কচাচ কথানো প্রসঙ্গ ক্রমে
বাঙ্গালী হিন্দুর যে ভিটে-কোটা আলোচনাটুকু পাওয়া যায় তাই হয়েছে
এখন আমাদের ইতিহাস রচনার অকিঞ্চিৎকর পাথের।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনার পলাশীর যুদ্ধের সময়ে সিরাজ-
সেনাপতি মোহনলালের জায় আরো তিন জন বাঙ্গালী বোম্বার নাম
পাওয়া যায় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁদের কণশপাঠিত বা কীর্তিকলাপের
বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানা যায় না। এ তিন জনই ছিলেন আলীবর্দীর
জামাতা পুর্ণিয়ার নবাব সইদ আহম্মদের সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ
কর্মচারী। গোলন্দাজ বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন লালু হাজারী
এবং বেতন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন জামসুদদার নামে জটনক বাঙ্গালী
কায়স্থ। এ ছাড়া নবাবের দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন
একজন বাঙ্গালী বোম্বা, তাঁর নাম মিতনলাল। সইদ আহম্মদের
অপদার্থ ও আহম্মক পুত্র সওকৎ জঙ্গ অতি তুচ্ছ কারণে প্রবীণ
সেনাধ্যক্ষ লালু হাজারীকে বরখাস্ত করলে লালু হাজারী মুর্শিদাবাদ
দরবারে গিয়ে নবাব সওকৎ জঙ্গের দুর্নীতি ও খামখেয়ালীর কথা জ্ঞাপন
করেন। মুর্শিদাবাদ ও পুর্ণিয়া দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি মাঝেই এই
প্রবীণ তোপাধ্যক্ষের পদচ্যুতিতে মর্দ্যাহত হন এবং সওকতের
আহম্মকী এবং অদ্বন্দ্বশিতার নিন্দা করেন। লালু হাজারী বা
মিতনলাল সশঙ্কে মুসলমান ইতিহাসে এর বেশি আর কিছুই জানা
যায় না। তবে কতখানি বিশ্বস্ততা ও সামরিক যোগ্যতা থাকলে সেই
মুসলমান প্রভুত্বের যুগে কোন বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে নবাবের দেহরক্ষী
বাহিনী বা গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কদের মত সামরিক উচ্চপদ
লাভ সম্ভব ছিল তা সহজেই সম্বোধ্য।

সে যুগে দেশবাসীর মধ্যে শরীরচর্চা, অবচালনা বা বাহিনী
পরিচালনা শিকার একটা স্বাভাবিক রেওয়াজ ছিল। কেন না, মোটামুটি
এসব গুণ আয়ত্ত নবা ব থাকলে নবাব সরকারের অসামরিক বিভাগেও
রাস্তারান্তি উন্নতি লাভের সুযোগ ঘটত না। এ জন্ত নবাবী আমলে
দেওয়ান জহাঙ্গীরার প্রভুতি অসামরিক সরকারী কর্মচারীদিগকেও সময়
সময় দক্ষ সেনাপতির মত বাহিনী পরিচালনা করতে দেখা যায়।
দুর্ভাগ্যবশত দেওয়ান দয়ারাম, জানকীরাম, রাজা রাজবল্লভ, রাজা
জঙ্গ ভরাম, মহারাজ নলকুমার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এরা
সব অসামরিক কর্মচারী হলেও অনেক সময় দক্ষ সেনাপতির মত সৈন্য
পরিচালনাও করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা পুর্ণিয়া সরকারের
গোলন্দাজ বিভাগের কেরাণী জামসুদদারের যুদ্ধ পরিচালনার কাহিনী
উল্লেখ করব।

নবাব আলিবর্দীর তিন কস্তার মধ্যে বড় দাসটি বেগম ছিলেন
নিঃসন্তান। মেজ আমিনার ছই পুত্র সিরাজ ও একমকদোলা এবং
ছোট মেয়ের পুত্র হলেন সওকৎ জঙ্গ। পিতা সইদ আহম্মদের মৃত্যুর
পর সওকৎ পুর্ণিয়ার নবাবী তক্তে বসলেন। সওকৎ-এর মত তিন

আহামক, আকতি মুখ্য আরি দেশাধার নবাব ফুলশান ইতিহাসে বর কমই দেখা যায়। সওকৎ নিজের নাম স্বাক্ষর করতে গলম্বুয় হয়ে পড়তেন। এক এক সময় দলীল দস্তাবেজ বা ফারমানের স্বাক্ষর করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে কলম ছুড়ে ফেলে সিহাসন থেকে সরে বসতেন। সকল রকম কুজিরা আর পাণাচায়ে সিরাজের সমগোত্রীয় হলও সিরাজের যে বুদ্ধি বা বিবেচনাসক্তি ছিল, সওকতের মধ্যে তার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

আসিবদীর মৃত্যুর পর মীরজাকর, বায় হুদুভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি বিরোধীদল সিরাজকে সরিয়ে এই সওকতকে মুর্শিদাবাদের সিহাসনে বসাবার জন্য একটি যড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললেন এবং এই মধ্যে সওকতের নিকট একটি গোপন পত্রও প্রেরিত হল। মনে হয়, সিরাজের বিরোধীদল তখনো সওকতের স্বপ্নটা ঠিক জানতেন না, জানলে তাঁরা এমন নির্বুদ্ধিতা করতেন বলে মনে হয় না।

এদিকে মুর্শিদাবাদের আমীর ওমরাহগণ তাঁকে বাংলার মসনদে বসাতে চায়, একথা জেনে সওকতের মাথা ঘুরে গেল। চারদিক থেকে ইয়ার চাটুকারের দল উদ্ভাসি গিয়ে আহামক নবাবকে আয়ো রূপিয়ে তুললে। সওকৎ গৌকে চাড়া দিয়ে ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে তাঁর খোদাবী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করতে লাগলেন—বাংলা জয় করাই তিনি অব্যাহার নবাব ও বাদশাহের উজ্জীর্ণ গাজীউদ্দিনকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করবেন। তারপর দিল্লীর উক্ত একজন পছন্দসই লোককে বসিয়ে লাহোর এবং কাবুল পার হয়ে একেবারে হুদর খোদাশানে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করে বসবাস করতে লাগলেন। কেননা, বাংলার জলবায়ু নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর। এরম অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাঁর মৃত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকের বসবাস অসম্ভব। দেশভক্ত লোক আহমক নবাবের এসব প্রলাপোক্তি শুনে হেসে অস্থির হল।

সঙ্গে বাংলার নবাবী তক্তা লাভের জন্য সওকৎ ইতিমধ্যে বহু লক্ষ টাকা উপাচুকন দিয়ে দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে হুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী পদের একটি কারমান জোগাড়ও করেছিলেন, যদিও এ কারমানের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না, কেন না কারমানের নিচে স্বাক্ষর ছিল উজীরের। বাদশাহের কোন স্বাক্ষর ছিল না। কারমানে সিরাজকোঁলার সমস্ত সম্পত্তি এবং বার্ষিক এক কোটি টাকা রাজস্ব দিবার সর্ব সওকৎ সমগ্র বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা দখল করে নিবেন এরূপ আদেশ ছিল।

এদিকে মুর্শিদাবাদ দরবারের যড়যন্ত্রকারী আমীর ওমরাহদের গোপনপত্র আর একদিকে বাদশাহী কান্ডান, এর ওপর আবার চাটুকার ইয়ার বন্ধুদের উদ্ভাসি। মুখ সওকৎ একেবারে আত্মায়ে আটখানা। পূর্ণিয়ার দরবারে বসেই তিনি নিজেকে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করলেন। তারপর মুর্শিদাবাদে সিরাজকে লিখে পাঠালেন—বাদশাহী কারমান বলে এখন আমিই বাংলার আসল নবাব। তুমি ভাল চাও তো সিহাসন ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এখন চলে যাও। কিন্তু হুসিয়ায়, বাওরার পূর্বে আমার কর্মচারীদের রাজকোষের অর্থ ও মূল্যবান হীরা জহরৎ বুদ্ধির দিয়ে বাবে। আমি ইচ্ছে করলে তোমার মাথাটা এখনি ক্যাচাৎ করে কেটে ফেলাতে পারি কিন্তু তুমি আমার মালমুহুরে ভাই, নেহাৎ

আত্মীয়; তাই এ নৃশংস কাজটা আর করবু না। মুর্শিদাবাদের মত মসনদ ছেড়ে যদি ঢাকা চলে যাও, তোমার জন্য ভাল মাসোদারার যত্ন করব। অবিলম্বে এ পত্রের জবাব চাই, আমি ঘোড়ার বেগেই পা তুলেই আছি, জবাবে বিলম্ব হলেই মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করব।

মুর্শিদাবাদ দরবারে এ পত্র পৌঁছলে সেখানে প্রথমে একটা হাসির বুন পড়ে গেল। দরবারের প্রধানগণ ইতিপূর্বেই পছন্দ্যত প্রবীণ গোলন্দাজ সেনানায়ক লালু হাজারী মারকৎ সওকৎ জঙ্গের আসল পরিচয় পেয়েছিলেন, এক্ষণে সিরাজের কাছে লিখিত পত্রের বয়ান দেখে সওকতের চরিত্র ও আহামকী সত্যতা তাঁদের আর কোন সন্দেহ হইল না। সকলেই সওকতের ধূর্ততার উপস্থিত জবাব দেওয়ার জন্য দৃঢ়সম্মত জানালেন। বিরাট দুই দল কোঁজ মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্ণিয়ার পথে রওনা হল। একদলের পরিচালক স্বয়ং নবাব, মীরজাকর খাঁ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীরজাজের খাঁ, দিলীর খাঁ, আসাদি খাঁ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ অপর দল পরিচালনা করলেন রাজা মোহনলাল এবং তার বীর অনুগামিগণ। নবাবের আদেশে পাটনা থেকে দলবলে অগ্রসর হলেন। পাটনার নাইবে নাইব রাজা রামনারায়ণ। পূর্ণিয়ার প্রবীণ সেনানায়কগণের পরামর্শানুসারে সওকৎ জঙ্গ ও নবাবগঙ্গ ও মণিহারীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রান্তিক পরিধায় জায় চারদিক কর্মদাজ বিলে পারিকৌত একটি উঁচু জায়গায় সেনাসমাবেশ করেছিলেন। এই সেনাব্যূহে মাকখানে স্থাপিত হল সওকৎ জঙ্গের শিবির। একত্রিংশ সর্কার পথ ছাড়া এই সুরক্ষিত স্থানে গমনাগমনের জন্য কোন উপায় ছিল না। এই সর্কার পথমুখে মুর্শিমের সৈন্তসমাবেশ ঘাইই অনায়াসে সিরাজের বিপুল বাহিনীর গতিবোধ করা যাবে তেবে পূর্ণিয়ার প্রবীণ সেনানায়কগণ স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু এমন অল্পকূল পরিবেশ বৃহৎ রচিত হওয়া সত্ত্বেও মুখ নবাবের ভীকতা ও বুদ্ধির দোষে সমস্তই বানচাল হয়ে গেল।

রাজা মোহনলাল ভাগীরথী পর হয়ে পূর্ণিয়ার পথে সিরাজের অগ্রগামী বাহিনীসহ আবার ও মণিহারী মধ্যস্থ হুসিয়ারী নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সেটা ১৭৫৬ সালের নভেম্বর মাস। গন্ধীর পাহাড়ের ওপর সেনা-সমাবেশ করে মোহনলাল দেখলেন, সেখান থেকে সওকতের শিবিরের ব্যবধান মাত্র দুই কোঁশ। সওকতের শিবিরের সুরক্ষিত অবস্থান এবং পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীর সর্কার মুর্শিমের মুখে জলাভূমি মধ্যস্থ সর্কার পথ দিয়ে অব্যাহারী বাহিনী চালনা বিশৃঙ্খলক বৃহৎ মোহনলাল শক্রবাহিনীকে বিপদ্যস্ত করার জন্য সেখান থেকেই শক্রব্যূহের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের আদেশ দিলেন।

সওকৎ জঙ্গের শিবিরে তখন নাচ-গানের মহড়া চলছিল। অকস্মাৎ গোলাবর্ষণের ফলে সেখানে হলুদুল পড়ে গেল। যে খেলিক পায়ে ছুটে পালাবার উত্তোগ করল। শত্রুকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে যে বার মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত। একটি গোলা এসে একেবারেই সওকতের শিবির-প্রান্তে পড়ল। আর বার কোথায়? তবে বিহ্বল সওকৎ তাঁর মাহী পতাকা নামিয়ে ফেলবার আদেশ দিলেন, অল্পদূরের তাঁর শিবিরের আসে-খাসে ভিড় না করে ঘুরে সরে যাওয়ার জন্য বার বার বদক দিতে লাগলেন। কারণ তাঁর বারখা হল যে মাহী পতাকা এবং লোকজনের ভিড়ের জন্যই শত্রুপক্ষের

শিবিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সওকতের সেনানায়করাও দূরে দূরে সবুজিন্চেট, কেউ কোন ছকুম মিছে না। কোন আদেশ না পেয়ে পুঁরয়ার গোলন্দাজ বাহিনীও স্থায়ী মত নিশ্চল। সওকত শিবিরের বিবৃদ্ধি ও ভীতিবিস্ময়তার সুযোগ বুঝে বিচক্ষণ মোহনলাল এই সময়ে বীর বীরে অতি সতর্কণে তাঁর অঝারোহী বাহিনীকে সেই জলাপথ মধ্যবর্তী সর্কারী পথ দিয়ে পরিচালিত করলেন। মোহনলালের অঝারোহী বাহিনী জলাপথ পার হয়ে একবার এ পারে এসে পড়লে যে সওকতের সমগ্র বাহিনী বিপন্ন হয়ে পড়বে, কারো পালাবাণও উপায় থাকবে না, একথা তখন কেউ ভাবছে না, শত্রুকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে সবাই তখন শত্রুগোলাবর্ষ হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই ব্যস্ত। রণক্ষেত্রের এই ঘোরালো ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে পুঁরয়ার গোলন্দাজ বাহিনীর বেতনান্যাক বাঙ্গালী শ্রামস্রমের আর স্থির থাকতে পারলেন না। অবিলম্বে মোহনলালের অগ্রগামী অঝারোহী বাহিনীর পঙ্কিরোধ না করলে সমুদ্র বিপদ বুঝে তিনি কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করেই কয়েকটি কামান ও গোলন্দাজ সৈন্য সহ ষাঁটি ছেড়ে এক মাইল এগিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলেন। এই আক্রমণের ফলে মোহনলালের অঝারোহী বাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হল এবং সমস্ত পুঁরয়া বাহিনীর মধ্যেও কিছুটা মনোবল বিধে হল। এর পর উভয়পক্ষের মধ্যেই কিছুক্ষণ চলাচল প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ, উভয়পক্ষেই বহু লোক হতাহত হতে লাগল। ভীক আহায়ক এবং যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ সওকত এ সময়ে আর এক দাক্ষিণ তুল করে বসলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি কারগুজার থাকে এ সময়ে সেই সর্কারী পথে অঝারোহী বাহিনী সহ শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাবার আদেশ পাঠালেন। কারগুজার এবং অভিজ্ঞ সেনানায়কগণ বলে পাঠালেন যে, উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণের মধ্যে এ সর্কারী পথে অঝারোহী বাহিনী চালনা করলে সমগ্র বাহিনীই ধ্বংস হবে, পুঁরয়ার শ্রেষ্ঠ সৈনিকগণ বেযোরে প্রাণ হারাবে। কিন্তু যুদ্ধ সওকত সেনাপতি এবং সেনানায়কগণের সতর্কবাণীতে ক্রোড়প না করে বেগে আশ্রয় নিয়ে বসে পাঠালেন— সামান্য একজন হিন্দু কেরাণী শ্রামস্রমের অসম সাহসে কামান চালিয়ে আমাদের ইচ্ছা বন্ধা করছে আর তোমরা বরদক মুসলমান বীর হয়ে এ সময়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রয়েছে? ধিক তোমাদের বীরত্ব! কারগুজার ঋ এবং তাঁর সহকারী সেনানায়কগণের কাছে নবাবের এ বরদক অপমান-সূচক বাক্য অসহ্য বোধ হল, তাঁরা আর বিস্মৃতি না করে নিশ্চিত ধ্বংস জেনেও নেই সর্কারী পথের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে অঝারোহী বাহিনী পরিচালনা করলেন। মূর্খ সওকত তাঁর জ্ঞানেশ পালিত হয়েছে দেখে মনের আনন্দে নিজের শিবিরে এসে নাচ-গানে মগন হনেন এবং উত্তপ্ত মস্তিষ্কে শীতল করবার জন্য প্রচুর মাদক ও ভাজ সেবন করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেহুঁস হয়ে পড়লেন।

এদিকে জলাভূমি-মধ্যস্থ সর্কারী পথে ধাবমান কারগুজারের অঝারোহী বাহিনী বিপক্ষের গোলাবর্ষণে আঘাতে কাতারে কাতারে ধরাশায়ী হতে লাগল। অনেক সৈনিক অশ্বহীন হুঁসিকের বিধে মহাপ্রাণে পড়ে প্রাণ হারালো। হতাবশিষ্ট সেনাদল মীরজাকার ও মীরকাজেমের প্রচণ্ড আক্রমণে একেবারে বিকল হয়ে গেল। সইদ আহায়কের বহু যুদ্ধকরীণ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন স্বয়ং এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং অপর কয়েকজন সেনানায়ক ইত্যন্ততঃ পলায়মান ছত্রভঙ্গ পুঁরয়া বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনবার শেষ চেষ্টা হিসেবে সওকত জঙ্গের সমস্তাশুভ দেহটাকে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়ে এ সময়ে রণক্ষেত্রে নিয়ে এলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সহসা শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গোলাবর্ষণে সওকতের প্রাণহীন দেহ হস্তিপৃষ্ঠের হাঁওদার মধ্যে গুটিয়ে পড়ল। রণক্ষেত্রের সমুখভাগে অসীম বীরত্বের সঙ্গে কামান চালাতে চালাতে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণে শ্রামস্রমেরও এ সময়ে প্রাণ হারালেন। সিরাজ ও সওকতের এই সঙ্গ্রাম ইতিহাসে মণিহারীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। নিজের বুদ্ধির দোষে আহায়ক এবং অদূরদর্শী সওকত এই যুদ্ধে কারগুজার ও শ্রামস্রমের দ্বারা বিকল সেনানায়ক সহ পুঁরয়ার বীর-বাহিনীর ধ্বংস সাধন তো করলেনই, নিজের রাজ্য ও প্রাণও হারালেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন স্মরকিত গোলন্দাজ ষাঁটি ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে শ্রামস্রমের এই কামান চালনাকে ইচ্ছাক্রিতা বলে কটাক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু নবাব সওকতের যুদ্ধের প্রশংসা-বাক্য থেকেই বুঝা যায় যে, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কায়স্থ শ্রামস্রমের যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার দ্বারা শুধু শত্রুর অগ্রগতিই প্রতিরুদ্ধ হয়নি, নবাব এবং তাঁর শিবিরপার্শ্বস্থ বিশুদ্ধল সেনাদলের মনোবল ফিরিয়ে আনাও সম্ভবপর হয়েছিল। রণক্ষেত্রের সেই সঙ্কট মুহূর্তে ভবিষ্যৎ বিচার করে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার পরিণাম শুভ কি অশুভ হত, তা নির্ণয় করা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তা ছাড়া শ্রামস্রমের মত একজন নগণ্য গোলন্দাজ বিভাগীর কেরাণীর কাছ থেকে একজন সমরদক্ষ সেনানায়কের স্বৈর্য্য, প্রতিভা বা রণনৈতিক দূরদর্শিতা আশা করা সমীচীনও নয়। বিপক্ষদলের ভয়াবহ গোলাবর্ষণের মধ্যেও বিশ্বস্ত ও নির্ভীক সৈনিকের দ্বারা আয়ত্বা সঙ্গ্রাম চালিয়ে শ্রামস্রমের যে শত্রুবাহিনীর গতিরোধ করেছিলেন, শুধু তারই জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।

বাঙ্গালী হিন্দুর ইতিহাস নেই, তাই বাঙ্গালী কেরাণী শ্রামস্রমেরও এই অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা আজ কেউ জানে না। কেউ রাখে না তাঁর বংশপরিত্রা বা জীবনোত্তিহাসের সন্ধান! আত্মবিস্মৃত বাংলা এবং বাঙ্গালী জাতির এই হল পরম হৃদ্যাগ্য আর চরম অভিশাপ।

“যুদ্ধের খুঁট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মনুষ্য এবং বৌদ্ধধর্ম যুদ্ধ ব্যতীত ভিত্তিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না।”

—বাবী বিবেকানন্দ

বঙ্গরমণীর মৌন বিক্রম

অনির্বচনীয় চৌধুরী

ভ্রম করেক দিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সপ্তম উত্তান হইতে ভারতের প্রথম বুটিশ গভর্নর জেনারেল (১৮৩৩-৩৫) লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিশ বেকিংহামের প্রতিমূর্তি অপসারিত হইয়াছে। ইহা সেইসাং সংবাদপত্রে বেশ কিছু আলোড়নও হইয়া গিয়াছে এবং বেকিংহামের মূর্তি অপসারণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ, বেকিংহাম ছিলেন উড়ার মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সংস্কারকামী, জনদরদী শাসক। ভারতীয়দিগের সহিত তাঁহার সখামূলক মনোভাবের জন্য তিনি তৎকালীন ইংরেজদের কাছে “স্লিপিং ডাচম্যান” (তিনি ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়াম বেকিংহাম সংস্কারমূলক বহু জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে সতীদাহ নিবারণ-মূলক আইন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। নবভারতের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির আবেদন ও আন্দোলনের ফলেই যে এই সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত এবং যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে একপা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তবুও সহমরণের মাধুর্য়টুকুও এই সঙ্গে স্মরণীয়। একথা সত্য যে, হিন্দুসমাজেও সকল সময়ে যেচ্ছার অগ্রপ্রবেশ করিতেন না; কারণ জীবনের প্রতি মমতা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম। একথাও সত্য যে, কালক্রমে সহমরণ প্রথাও ভিতর স্বাধীন, ঘেব, অনাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া প্রাথমিক কুসিত এবং বীভৎস করিয়া ফুলিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্যও বঙ্গ-নারীগণ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেচ্ছার সহমৃত্যু হইতেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জনৈক বুরোয়ী মহিলা লিখিয়া গিয়াছেন যে, “এমন অনেক নারী আছেন, বাঁহারা মৃত স্বামীর শবের সহিত সহমৃত্যু হইয়া অকৃত সাহসের পরিচয় দেন। সেই সাহস অন্ততঃ পরিচালিত হইলে নারীস্বাভিক গৌরবান্বিত করিতে পারিতেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, তাঁহাদের (সহমৃত্যু হইতে) কৃষ্টিত হওয়ার কথা শুনা যায়। কিন্তু সেরূপ ঘটনা অত্যন্ত বিরল” (১)। বঙ্গরমণীর সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেমের কথা লিখিতে বাইদা শত বৎসর পূর্বে হটন সাহেব লিখিয়াছিলেন, “তাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মতাগ ও প্রাণ সমর্পণ জলন্ত চিতার শিখাকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছে” (২)।

সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথা কোন বিদ্যুত অতীত হইতে বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা আর এখন সঠিক জানা যায় না। তবে, অনেকের মতে সতীদাহ প্রথা পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৃহদ্রথপুরাণে (২।৮।৩০) মৃত স্বামীর সহিত পুত্রিয়া মহিবার জন্য সমাজনায়কেরা বিভনারীসের পুণ্যসোভে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। ইহার চেয়ে

বীরব নাকি তাঁহাদের আর কিছু নাই (৩)। পটিনা মিউজিয়ামে রক্ষিত মানভূষ, পুর্নসিয়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ‘সতীদাহক’ জড়গুলি এই প্রাচীন অহুতানের পুণ্যসুতি বহন করিতেছে।

ইতিহাসে জানা যায়, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে ৪০০টি সহমরণ অহুতীত হইয়াছিল। ১৮১৫ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বার বৎসরে ৭১৫টি রমণীর সহমৃত্যু হইবার সংবাদ ম্যাগিষ্ট্রেটসিগের নিকট পৌছে। ১৮১৮ সালের সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল, এই তিন বৎসরে ২,৩৬৫ জন বিধবা সহমরণে যায়। এর মধ্যে ১,৫২৮ জন কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলের। ১৮১১ সালের কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠের সতীদাহের একটা ফর্ম পাওয়া গিয়াছে। এক বৎসরে ৪টি ধানীর ৫২টি সহমরণের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক সতীর নাম, জাতি, স্বামীর নাম, সংস্কারের তারিখ, ধানীর নাম ও কয়টি ছেলেমেয়ে ছিল তার একটা দীর্ঘ ফর্ম আছে। এই ৫২টি সতীর মধ্যে ২০ জন ব্রাহ্মণ, ১০ জন কার্বার, ২ জন বৈজ্ঞ, ২ জন সঙ্গোপ, ৫ জন কৈবর্ত, ৩ জন বৃগী, ২ জন শুভ্রী, ২ জন ময়রা, ১ জন কাঁসারী, ১ জন ছুতার, ১ জন গোয়াল, ১ জন তেওয়ারী, ২ জন অন্তর্জাত। বয়সের গড় ৫২ বৎসর ১০ মাস, ৭ বা তার চেয়ে বেশী ১৩ জনের বয়স ছিল। ২০ বৎসর বা তার চেয়ে কম বয়সের চারটি নাম পাওয়া যায়। একসঙ্গে দুই সতী হওয়ার একটামাত্র উদাহরণ আছে। দেখা যায়, উচ্চ-নীচ ভেদে সব জাতির মধ্যেই সতীদাহ প্রচলিত ছিল; হয়তো উচ্চবর্ষের মধ্যে প্রচলন কিছু বেশী ছিল। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ৫২টি সতীর মধ্যে ৪০ বৎসরের কম মাত্র দশটি নাম পাওয়া যায়। ১৮১৮ সালে বাংলা দেশে ৮০০টি সতীদাহ হইয়াছিল (৪)। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জেলাকার ৩০১ জন বিধবা সহমরণে যায় (৫)। সমসাময়িক সংবাদপত্রে হইতে অবগত হওয়া যায় যে বাঙ্গালাদেশে বহু অধিক সহমরণ হয়, পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না, এবং বাঙ্গালার মধ্যেও কলিকাতার ফোর্ট আলীলের অধীন জিলাতে অধিক হয়। আরো হিন্দুস্থানে বহু সহমরণ হয় তাহার সাত আশের একাংশ কেবল হুগলী জেলাতে হয় (৬)। এবিষয়ে বিলাতের গুয়েস্ট মিনিষ্টার সেক্রেট ১১৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব ছোটলাট স্ত্রী চার্লস ইলিয়ট (১৮১০-১৫) লিখিয়াছিলেন—সম্প্রতি যেসকল ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার সকলগুলিতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, আইনের নিষেধ ও সতীদাহের স্বপক্ষে জনমতের পরিপোষকতার অভাব সত্ত্বেও নারীগণ প্রত্যেকেই এই ভাবে আত্মবলিদানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—নারায়ণরাম রায়, আদিপর্ক—৪১১ পৃঃ

৪। ইতিহাস—১৩৫৭—ভাগ, ১১ পৃঃ

৫। বাঙ্গালীর নারী আন্দোলন—হবি রায়—১১ পৃঃ

৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—জগদীশচন্দ্র বসু—আশাশুয়ার

১ম খণ্ড—২৮১ পৃঃ

সকল কেহেই ইহা অনুমোদন করিয়াছেন—বাধ্য করেন নাই” (৭)।

কলিকাতার বন্দীর বিধান সভার উত্তরে টাউনহলের দিকে যুগ করিয়া দণ্ডায়মান লর্ড বেটিকের প্রতিমূর্ত্তি অপসারণের বৈকথ্য উপরে লিখিত হইয়াছে, উহার পাদপীঠে সভাপতির বিদ্য অবলম্বন করিয়া হোজে ঢালা চমৎকার একটি চিত্র আছে। এই চিত্রটি বাস্তবিকই অতি সুন্দর। পাদপীঠের আকার অনুসারে গোলাকারে গঠিত তিন দিক হইতে তিনখানি ছবি লইয়া উহা প্রদর্শিত হইল। মধ্যচিত্রটির প্রধান পাত্রী—সহমরণের জন্ত প্রস্তুত জটিল তরঙ্গী বিধবা দণ্ডায়মানা; বিধবার মস্তকের উর্ধ্বে সু-উচ্চ চিতার উপরে শায়িত তাহার মৃতপতির বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ দেখা বাইতেছে। বিধবার সমস্ত তরঙ্গীতে একটা অপার্থিব আশ্চর্যভোলা ভাব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিধবার বামপার্শ্বে গভীর বিবাহ ও সহমৃত্যুর ভাবে স্বাক্ষরিত বর্ণে একজন বয়সান অল্পবয়সী পুত্র পাড়াইয়া—সম্ভবতঃ বিধবার পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি যেন মেরোটিকে সহগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত যুগ্ধভাবার অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন। সম্মুখে একজন আত্মীয় বিধবার হুটি পুত্রকে লইয়া—কালের শিঙি মায়ের কাছে বাঁপাইয়া বাইতে বার, কিন্তু মাতার সেমিকে লক্ষ্যই নাই। আর একটি শিশু সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ও মায়ের গুহ উদ্ভাসিনীবৎ ভাব দেখিয়া সন্তের পিসী বা মামীর কাছে আশ্রয় লইতেছে—সন্তানের প্রতি মায়ের আর স্নেহ মমতা বা কোনও আকর্ষণ নাই। চিত্রটির দক্ষিণ ভাগে একজন অল্পবয়সী পুত্র পুঁথি হাতে ভ্রাতৃদের কাঁধে হাত রাখিয়া তাহাকে যেন উৎকণ্ঠিত ও কাতর ভাবে কি প্রার্থনা জানাইতেছেন।—শিরী ওয়েষ্টমেন্ট বিশেষ দরদ দিয়া, এমন কি যে জাতির মধ্যে বিজ্ঞান এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটির চিত্র তিনি আঁকিতেছেন তাহার সম্বন্ধে একটা প্রত্নভাবও লইয়া এবং পুরা গ্রীক ও রোমান দৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভাব্যটি গঠিত করিয়াছেন (৬)।

বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামে অজ্ঞাপি সহমরণের দ্বিতীয়াপক মঠ ইত্যাদি বিজ্ঞান আছে। তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রামের “সত্যীকরণের মঠটি” বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং বিখ্যাত। সে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের কথা, বিক্রমপুরস্থ বৈজ্ঞানিক গ্রামে এই সভাপতি অঙ্কিত হইয়াছিল। যে পরিবারের পুত্রবধূ তাঁহার মৃতপতির সহগামিনী হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিক্রমপুরের একটি অসিদ্ধ বংশ, মুন্সী-পরিবার বসিয়া পরিচিত। ইহারা নীলকণ্ঠ যুগোপাধ্যায়ের বংশধর, ভবদ্বাজগোত্র, ফুলিয়া মেল। এই বংশের কানীনাথ যুগোপাধ্যায় রত্নাবহার বিদেশ হইতে বাড়ি আসিলে সকলে রত্ন কানীনাথকে ধরাধরি করিয়া তলীর পত্নীর শয়নগৃহে লইয়া গেলেন।

পত্নী মহামায়া প্রাণপণে পতির সেবা ওস্তাধা প্রবৃত্ত হইলেন। রত্ন পতির শারীরিক ও মানসিক শান্তি ও সুখের জন্ত দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার-নিদ্রার প্রতি ভেমন লক্ষ্য নাই। সর্বদা

স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিয়া সেবা ওস্তাধা করিতে লাগিলেন। শিশুপুত্র ও কস্তার প্রতিও কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু এত সেবা ওস্তাধা-সঙ্গেও কানীনাথের জীবন রক্ষা হইল না, কানীনাথের মৃত্যু হইল। সকলে শোকমগ্ন, কিন্তু কানীনাথ পত্নী মহামায়া দেবী হান্তময়ী। নয়নে অশ্রু নাই, বদনমণ্ডলে বিবাদের কোন চিহ্নও দেখা যায় না। অতি প্রত্যুবে স্নান করিয়া সেই বিবাহের সোহিত পটবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, ওষ্ঠ দুইখানি রক্তকমলের ভ্রায় শোভা পাইতেছে। লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, অনবগুণ্ঠিতা সাক্ষী আজ মৃত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে খণ্ডর, ভাস্বর সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। শব প্রশ্রানে নীত হইল। সান্নী মহামায়া দেবীও চিত্তারোহণের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। সকলে নিবেদন করিলেন। আত্মীয়-স্বজনরা শিশুপুত্র ও কস্তা হুটিকে দেখাইয়া কত প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মতেই মহামায়া দেবী তলীর সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। আত্মীয়-স্বজনরা বিফল, মনোরথ হইয়া থানার সংবাস দিলেন। দারোগা আসিলেন এবং মহামায়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি যেচ্ছার মৃত স্বামীর সহগামিনী হইতেছেন কি না?” মহামায়া দেবী বলিলেন—“হাঁ। তবে পরীক্ষা হউক।” মহামায়া দেবী তৎক্ষণাৎ অগ্নিমধ্যে হস্ত প্রদান পূর্বক হাসিমুখে বাক্যলাপ করিতে লাগিলেন, দারোগা বিম্বিতচিত্তে চিত্তারোহণের অনুমতি দিলেন। চতুর্দিকে এই সংবাদ খড়ের মত ছড়াইয়া পড়িল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে শত শত বরনারী সহমরণের দৃষ্ট দর্শন করিবার জন্ত আসিতে লাগিলেন। হস্তমুখী মহামায়া ধীর মন্থর গতিতে উপস্থিত জনসাধারণকে আশীর্বাদ করিয়া চিত্তা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সধবা মহিলারা তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিল। তৎপরে মহামায়া দেবী চিত্তারোহণ করিয়া মৃতপতির শবদেহের বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিত্তা জ্বলিল। সমবেত জন্মগুণী চারিদিকে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আর্তনাদ করা হুবে থাকুক। বিন্দুমাত্রও তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে কেহ দেখিল না। দেখিতে দেখিতে দম্পতির পঞ্চভৌতিক দেহচিত্তা ভয়ে পরিণত হইল (৯)।

গদাধামে জটিল বাক্যলীর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পত্নী সহমরণে উত্তীর্ণ হইলে গরার জজ মিঃ ক্রুটোকার স্থিৎ গিয়া তাহাকে অনেক নিবেদন করিলেন। তাহাতে সে ভ্রাতৃস্বী আপন অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেখাইলে জজ সাহেব আত্মা দিলেন। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল (১০)। আর একস্থানে সহমরণের বিধ তৎকালীন সংবালপত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

সাহেবরা আসিয়া দেখিলেন যে, ঐ স্ত্রী হরিদ্রা মাথিরা আত্মশাখা হস্তে করিয়া ঘরের পিড়ার বসিয়া আছে। সাহেব গিয়া বিনয়পূর্বক তাহাকে বলিলেন যে, তুমি দগ্ধ হইয়া মরিলে আত্মহতিনী হইবা। অতএব দগ্ধ হইয়া মরণে কাত হও। তোমার বাপেরা তোমাকে আনন্দ করিবে ইহা চিন্তা করিও না। আমি তোমার স্বতন্ত্র বর করিয়া দিব ও বাস্তুজীবন তোমার ভ্রাতৃ পরিচ্ছদ দিব। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী স্থিররূপে সবিনয়ে কহিল যে, হে কোম্পানী, আমি বাহাতে

১। প্রবাসী—১৩০৭-৪৭২ পৃঃ

২। প্রবাসী—সত্যীকরণের মঠটি—১৩৪০,

ভাঙ্গ—১৩১ পৃঃ

৩। প্রবাসী—১৩৪৭, ভাঙ্গ—৩২-২২ পৃঃ

৪। সংবালপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড—২৮৫ পৃঃ

মতে মুখ পাই সেগল অমুখতি কর। আমি তিন জন এই স্বামীব
গৃহিত সহগমন করিয়াছি। এরূপ কাশ্যে কখন হইতে বুঝা
হইলে তখন জন সাহেব কহিলেন—এখন কি করিবা। তাহাতে
সে স্ত্রী কহিলেন যে, অজ্ঞ রাতি হইল অজ্ঞ হইবে না, কল্যাণ
হইলে সহগমন করিব। অনন্তর রাতি প্রভাত হইলে তাহার
বকুলোৎকরা সহমরণোত্তাপ করিতে লাগিল ও এক খটা আনিয়া
তাহাতে ঐ শব রাখিল এবং ঐ স্ত্রী সে খাটে শব সন্নিহিত বসিল।
পরে আত্মীয়-স্বজনরা ঐ খটা হস্তে করিয়া দ্রুতগতি লইয়া গেল।
সেখানে আর কোন ব্রাহ্মণ ছিল না। কেবল চতুর্দশ বয়স্ক এক
ব্রাহ্মণ বালক ছিল, সেই ব্রাহ্মণ পাঠ করাইল। পরে ঐ স্ত্রী
হরিনাম করিয়া স্থির ভাবে চিত্তারোহণ করিল। তখনও দ্বিতীয়
সাহেব তাতাকে টাকা, ঘর ও পাখী দিতে চাহিলেন। তাহাতে
সে স্ত্রী উত্তর করিল, এই আমি পাখীতে আরোহণ করিলাম। ইহা
কহিয়া ঐ মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া চিত্তাভেদ শয়ন করিল। কেহ
ধরিল না, বাড়িল না। চতুর্দিকে অগ্নি প্রজলিত হইল, তাহাতে
তাহার অঙ্গ স্পন্দন হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল (১১)।

বগুর জেলার তুতভাণ্ডারের জমিদার-বংশের কয়েকজন কুলবধু
সহমরণে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐ বংশের জয়দুর্গা
দেবীও যথারীতি সংসারধর্ম প্রতীপালন করিয়া বীর স্বামীর সহিত
সম্মুতা হন। তৎকালে তুতভাণ্ডার নিবাসী হিসাবিয়ারা তুত-
ভাণ্ডারের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা জয়দুর্গা দেবীকে
সম্মুতা হইতে নিবেদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহা
শুনিলেন না। তাঁহারা গোপনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ
দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তুতভাণ্ডারে আসিয়া জয়দুর্গা দেবীকে
অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে
পারিলেন না। জয়দুর্গা দেবী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, 'আমি
সত্য স্বামীর পদপুঙ্খই আমার জীবনের ব্রত, স্তব্রগা তাঁহার মৃত্যুর
পর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমি স্বামীর সহিত
নিশ্চয়ই সম্মুতা হইয়া তাহাতে আমার একটুও কষ্ট হইবে না।'
তাহার প্রমাণরূপ তিনি প্রজলিত অনলে হস্ত প্রবেশ করাইয়া
দিলেন। 'হস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কষ্টভুল করিলেন
না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই অস্বাভাবিক দৃষ্ট দেখিয়া বিস্মিত
হইলেন এবং তাঁহাকে সম্মুতা হইতে আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।
জয়দুর্গা দেবী হাসিতে হাসিতে চিত্তা আরোহণ করিলেন (১২)।

১৮২ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গার রাজা রামশঙ্কর দেব-বায় দেহভাগ
করিলে তাঁহার সাক্ষী পত্নী রাধামণি দেবী পতির অঙ্গগামিনী হইয়া
'সত্য' হইয়াছিলেন। যে সময়ে রাজা রামশঙ্করের প্রাণপকী
সেইপক্ষ ছাড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময় রাণী রাধামণি শোকহৃত
কোনপ্রকার ধনি করেন নাই। তিনি স্বেচ্ছাপ্রতিজ্ঞার দ্বারা
নিশ্চল ভাবে বসিয়াছিলেন এবং কেবলব্রত বসিয়াছিলেন
আমার স্বামী ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন,—আমি তাঁহারই সঙ্গে
পরলোক বাইব।—অনেকে রাণীকে বুঝাইলেন। 'সত্য' হইয়া
পতির চিত্তার বেহ বিস্ময়নের সঙ্গ হইতে নিঃসংশয় হইয়া অনেক

রাণীকে কত কথাই কহিলেন কিন্তু রাণীর সঙ্গ হইল না। অনেকে
রাণীকে অগ্নিশিখার নহ হইয়া মরিবার বিভীষিকাও দেখাইলেন; তখন
রাণী একটি প্রাণী আনিয়া তাহার শিখায় তাঁহার তরুণী বসিলেন,
অগ্নিশিখার অঙ্গুলি চটপট শব্দে পুড়িতে লাগিল। কিন্তু রাণীর মুখে
কোন প্রকার বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বয়স আনন্দের
চিহ্নট প্রকট হইতে লাগিল। অঙ্গুলি তরুণ হইয়া গেল;
তথাপি সত্যের কোন দিকে দ্রুতগতি নাই। সকলে রাণীকে লইয়া
কালিকাতলার দহের নিকটবর্তী স্থানে গেলেন, রাণী রাধামণি
তাঁহার বাবতীর হস্তের হস্তের অলঙ্কার, হস্তের বস্ত্র পরিধান করিলেন,
মস্তকে সিন্দূর লেপন করিলেন, তথায় সমস্ত লোকসিককে টাকা,
পয়সা, ও চাউল মুক্ত হস্তে বিতরণ করিলেন এবং শেষে দৃঢ় পদক্ষেপে
প্রভুর বদনে সাত বার চিত্তা প্রবেশ করিলেন।—রাণী একবার
রাধার মুখের দিকে চাহিলেন, আর হাত মুখে রাখার পাখেই সেই
চিত্তাশযায় শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্রই তাঁহার সজ্জা লোপ হইল।
সকলে আসিয়া দেখিল, সেহ প্রাণ নাই; রাজার প্রাণের সহিত রাণীর
মহাপ্রাণ অনন্তে উড়িয়া গিয়াছেন (১৩)।

বিবৃত বঙ্গের নানা স্থানে এইরূপ সহমরণের অনেক দৃষ্টান্ত
পাওয়া যায়; আতি আধুনিক কালেও সংবাদপত্রে আকর্ষক ভাসে
সহমরণের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায় (১৪)। এইরূপ
স্বচ্ছন্দে আত্মদান করিবার মধ্যে যে শক্তি, দৃঢ়তা ও পলাতনভীর
পরিচর পাওয়া যায় তাহার মাহুর্ঘ্য অস্বাভাবিক করিবার উপায়
নাই। যখন পূত্র কন্যা ভ্রাতা সকলেই চারিদিক বেঁটন করিয়া
বহিয়াছে, যখন সংসারে পুত্রপৌত্র বাহা কাম্য সে সকলই বহিয়াছে, নাই
কেবল তাঁহার পরম প্রিয়তম স্বামী; তখন তাহারই সঙ্গেই প্রেম স্বরূপে
ধারণ করিয়া, তাঁহারই চরণ ধ্যান করিতে আনন্দে অগ্নি প্রবেশ করিতে
যে বিক্রম প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন দেশেই দেখা
যায় না। বঙ্গনারী সেই অল্পশ্রম মৌন বিক্রমে গর্ভিতা বঙ্গালী হইলেই
তাঁহার সন্তান লাভিত, তাঁহারই স্নেহছায়ায় বর্ধিত, তাঁহারই আশ্রয়ভাগে
মস্ত্র নীক্ষিত—তাঁহারই পদধ্বনি পার্শ্বে বলবর্ধিত। নোয়াখালীর বীভৎস
অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের সময় বঙ্গবমণীর অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক সত্যের
রক্ষার কাহিনী তদানীন্তন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৫)।
রাজপুত্র মহিলার 'জহর ব্রত' সাহিত্যের দ্বারা সম্পদ; কিন্তু
নোয়াখালীর বীর বঙ্গবালার আত্মত্যাগ সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

বাঙ্গালার প্রথম ছোটলাট শ্রী ফ্রেডারিক হালিডে একদিন
স্বচক্ষে বঙ্গবমণীর এই মৌন বিক্রম দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—১৮২১
খৃষ্টাব্দে রাজবিধি সত্যদাহ বন্ধ করিয়াছে। সেই সময় আমি হুগলীর
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম আমার কুঠি হইতে কারেব
মাইল দূরেই সত্যদাহ হইবে। গলাতীরে সর্বদাই একগা বটনা ঝড়িত
—আমার সহচরবর্ষ বমণীকে নানারূপ বুঝাইয়া নিরস্ত করিয়া
ঠেঁট করিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী জানিতেন না বলিয়া আমি

১৩। বঙ্গপরিচর—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—১ম খণ্ড—২২৬-৩০

১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই ভাদ্র, ১৩২১।

১৫। "women jump into fire! Take poison an-
hang to save honour"—Hindustan Standard—
23rd october, 1946.

১১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড—২৮৩ পৃ.

১২। বঙ্গপরিচর—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—২য় খণ্ড—৩৫১-৫২ পৃ.

ঐহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি গভীরভাবে একমনে সমস্ত কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আমি যখন দেখিলাম কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যায় না, তখন তাঁহাকে চিতার পাশে বাইতে অহুমতি দিলাম।

পূর্বাহিত আমাকে বলিলেন—একবার জিজ্ঞাসা করুন অরিতে তাঁহার যে যন্ত্রা হইবে তাহা কি তিনি জ্ঞাতিতছেন?

রমণী আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহার ভীষণবৃত্তিব্যক্তক মুখখানি তুলিয়া যুগান্তের কহিলেন—একটা প্রাণী আমায়। প্রাণী প্রজাতিত কবিতা তাঁহার সমুখে রাখা হইল। ভীষণবৃত্তিতে আমার দিকে তাকাইয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্ত তুমিতে সঙ্কল্পনপূর্বক অগ্নিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেন। অঙ্গুলিটি বলাসাইয়া গেল—উহাতে কোসকা উঠিল, উহা শেষে কালো হইয়া গেল। একটি হৃৎস্পন্দে আঙুন ধরিলে উহা বেরূপ বক্র হইয়া যায়, অঙ্গুলিটিও সেইরূপ বক্র হইয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। রমণী একটি বারও হাত সরাইলেন না—একটুও কাতর শব্দ করিলেন না, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। তিনি কহিলেন, এখন আপনার সঙ্গে দূর হইয়াছে কি? আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম হাঁ, হইয়াছে। তখন ধীরে ধীরে অগ্নি হইতে অঙ্গুলি অপস্থত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি আমি বাইতে পারি? আমি অহুমতি দিলাম। তিনি অবসর্পিত নকীতীর বাহিয়া ধীরে ধীরে চিতার নিকটে গিয়া চিতার আরোহণ করিলেন।

আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই চিতার নিকটেই ছিলাম, শেষে অগ্নির উত্তাপে সরিয়া আসিলাম—তখনো তাঁহার কণ্ঠ হইতে শব্দমাত্র শুনিতে পাই নাই, চিতার মধ্যে কিছু যে নড়িতেছে এমন পর্যন্ত দেখি নাই। কেবল দেখিলাম তাঁহার দেহের উপস্থিত কাঠগুলি একবার অতি ধীরে একটু নড়িয়া উঠিল তার পর সব স্থির। (১৬)

১৬. "I stood near enough to touch the

ইহাই বঙ্গরমণীর অসাধারণ মৌন-বিক্রমের স্রোত ও পবিত্র ইতিহাস। ইহারই কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শিখিরাছেন—“বাংলার সেই প্রাণ-বিস্ময়-পরাধনা পিতামহকে আমরা আজ প্রশংসা করি। তিনি যে জাতিকে জ্ঞান দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাঁহাকে বিন্মত হইবেন না। যে আর্ঘ্যে, তুমি তোমার সম্ভানসিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জ্ঞান নাই যে তোমার আত্মবিন্মত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীর পুরুষসিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিব্যবদনে সংসারের সকল কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পাশে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যজীবনের অবসান দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমন সহজে বধুবশে সীমন্তে মঙ্গল সিন্দুর পরিয়া পতির চিতার আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি স্মরণ করিয়াছ, ভয় করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি শব্দার ভায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই জীবনাত্মতির দ্বারা পুত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব; কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অকর অমর স্মরণ নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে তোমার সেই অন্তিম বিবাহের জ্যোতিঃসুত্রের অনন্ত পট-বসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রশংসা করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উত্তর বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জল, কত উন্নত, যে চির নীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক!”

pile, but I heard no sound and saw no motion, except one gentle upheaving of the brushwood over the body, after which all was still;—Bengal under the Hr. Governors—Buckland—vol—1—p 160—62.

কোন একজনকে

জীবনকুমার বিশ্বাস

তুমি বলো—কি স্বপ্নের সজ্জাছে আকাশ
একবার চেরে দেখে ভাই।
আরো বলো কি যে গন্ধ মেখেছে বাতাস।
আমি শুনে চোখ চুটো বেদনার আগুনে জ্বালাই।
ভেঙার হানে শুয়ে অলস সন্ধ্যার
উজ্জল আকাশে তুমি মেলে দাও মনের ঠিকানা।
কত সাদা মেঘ উড়ে যায়,
তারি সাথে মেঘ হয়ে পাড়ি দাও কত পথ বন্ধুর অজানা।

আমি শুধু চুপে দেখি, ভাবি
বহুবর্ণের গিয়ে আবার কেমন করে কিয়ে আসে।
পৃথিবীর এই যুগে—তুমি সিদ্ধ নও বিশ্বদ্রাবী,
তবুও চোখে-এর ভানে সেতার বাজিয়ে ছুটি হাসো;

কত দূরে চলে দাও—আমি শুধু এ কুলে পাড়িয়ে
পাই কিছু অল্পভব, কল্পনার ভরে নিই তারে।
তোমারি বৃক্কের নীল, আমি বাতে বহুবার গিরেছি হারিয়ে,
রূপকথা লেখে কত আকাশের আলোর সম্মানে।

আমিও অবাক হই নদনদী নগরীর রূপে,
তোমার মনের মাঝে তারা তোলে চেউ;
আমার মনের মাঝে সাদা তার জাগে চুপে চুপে,
তোমারি তরঙ্গে স্থির থাকে নাক' কেউ।
তাদের আনন্দ-কি তোমার মনের মাঝে জন্ম নিয়েছিল
যেমন নদীর জন্ম নির্বাসনের অশান্ত নর্তনে?
শিশু আর জীবনেরা তোমার মনের মাঝে বাসে
প্রেরণার আবৃত বা—একটি ভীষণ সুখের স্নান

কী হয়েছে নিমাইয়ের ?

কী জানি কী হল ?

কখনো হাসছে কখনো কঁদছে কখনো ধূলোয় ডুগড়ি যাচ্ছে। কখনো মালসাট মেরে ছতার-পর্জন দরছে। কখনো বা সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকার হয়ে যাচ্ছে। গী ভয় পেয়ে লোক ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন। প্রগো দেখে যাও, আমার নিমাইয়ের এ কী হল ? এই দেখ, বাকে কাছে পাঁচে মারছে, নিজের ঘরদোর তখন করছে। এ কী, মাটিতে যে পড়ল মুহিত হয়ে। শিগগির যাও, বড়ি ডাকো।

ছুটে এল লোকজন। সবাই বললে, বায়ুরোগ হয়েছে। মাথায় বিষুতেল দাও।

আমি সব ব্যবস্থা করছি। বললে বুদ্ধিমন্ত খান। নবদ্বীপের টাকাওয়ালা লোক, নিমাইয়ের প্রতি পক্ষপাতী। ধরে আনিল কবরেজ। কবরেজ তেল চাপাল।

তেলে ঠাণ্ডা হলনা নিমাই। আচমিতে অলৌকিক শব্দ করে উঠেছে : 'আমিই সেই, আমাকে কেউ চিনতে পারলনা।' বলে ছুটল রাস্তা দিয়ে। 'বিশ্ব ধরে আছি বলেই তো আমি বিশ্বস্তর।'

ধরো, ধরো, নিশ্চয়ই গুর ওপরে দানবের অধিষ্ঠান হয়েছে। কেউ বা বললে, ভর করেছে ডাকিনী। নারায়ণতৈল লাগবে। আর এ তেল শুধু মাথায় নয়, মাথাতে হবে সর্বাস্থে।

তৈলাক্ত ঝলঝলে খলখল করে হাসছে নিমাই।

হাহাকার করছেন শটী, আর সকলেও ভ্রিয়মাণ, মহাবল বায়ু কী ভীষণ কাণ্ড করে ফেলল, আমাদের সে সোনার নিমাই আর নেই—চারদিকে এমন যখন বিধান আর নৈরাশ্র—হঠাৎ স্বভাবের আলো ঝলমল করে উঠল। এ কী, কই সেই মেঘবিকার, এ যে দেখি নীলের নির্মল খালায় রূপালি মেঘের স্রীর। নিমাই আবার আগের মতন হয়েছে। বায়ু নেই, আগুন নেই, নেই আর আকালন। ফিরে এসেছে স্বরূপানন্দে। হাসছে মুহু-মুহু।

সবাই হরিধ্বনি করে উঠল।

কেউ এল উপদেশ দিতে। বললে, 'তুমি এত বুদ্ধি ধরো, তবু তুমি কৃষ্ণভরন করো না কেন ?'

'যার কৃষ্ণকথাকৃতি সেই ভাগ্যবান।' প্রহ্লাদ মিত্রকে বললেন মহাপ্রভু।

নীলাচলবাণী ব্রাহ্মণ, প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ কাছে এসে

প্রভু হরিশ্চন্দ্র
শ্রীমদ্রামানন্দ
অচিন্ত্যকৃষ্ণ প্রভু

বললে, 'প্রভু, আমি দীনাধম গৃহস্থ। আমার কৃষ্ণকথা শোনবার খুব ইচ্ছে। তুমি দয়া করে শোনাবে আমাকে কৃষ্ণকথা ?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'আমি কৃষ্ণকথার কী জানি ? জানে শুধু রামানন্দ। তার কাছে থেকেই শুনি আমি কৃষ্ণকথা। তুমিও তার কাছেই যাও। সেই তোমাকে শোনাবে।'

প্রহ্লাদ মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে রইল নিনিমেঘে। কী অনবদ্য দৈন্ত, পাণ্ডিত্যের এক তত্ত্ব অভিমান নেই, না বা কোল গুর। আর ভক্তের গুণগরিমা প্রকাশ করতে কী উচ্ছ্বসিত আগ্রহ।

'মিশ্র, তোমার যে কৃষ্ণকথা শুনে মন হয়েছে, তোমার এ মহাভাগ্য।' বললেন আবার মহাপ্রভু।

যদি হরিকথাতে রাত না হয় তা হলে ধর্মকর্ম পরিজ্ঞানের সামিল। যার ভগবানের প্রতি টান আছে তার আর টানাপোড়েন নেই, নেই কোনো টানাটানি। তোমার যখন কৃষ্ণকথায় লালসা তখন তোমার ধর্মাস্ত্রাণও অর্ধাঙ্গিত।

প্রহ্লাদ গেল রামানন্দের বাড়ি। রামানন্দ বাড়ি নেই। চাকর বললে, আপনি বসুন। শিগগিরই ফিরবেন।

'কোথায় তিনি ?'

'তার বাগানে আছেন।'

'বাগানে ? সেখানে কী ?'

'অভিনয় দেখাচ্ছেন।'

'কাকে ?'

'ছটি পরমানন্দরী কিশোরী দেবদাসীকে।'

'আর কেউ আছে সেখানে উপস্থিত ?'

‘না, আর কেউ নেই।’

ভৃত্য আরো বিষদ হল। রামানন্দ রায় নাটক লিখেছেন, নাম জীর্ণগঙ্গাবল্লভ। আকাক্ষক, স্বয়ং জগন্নাথের সামনে দেই নাটকের অভিনয় হবে। তারই জন্তে এত চেষ্টা-যত্ন-আয়াস-রেশ চলছে।

জগন্নাথবল্লভ নাটকে পাত্র-পাত্রী তো অনেক। নায়ক কৃষ্ণ ও তার সখা মধুমঙ্গল এই দুই পাত্র আর পাত্রী সাত জন। নায়িকা রাধিকা, তার সখী মাধবিকা, মদনিকা, শশীমুখী, অশোকমঞ্জরী আর মদনমঞ্জরী আর বনদেবী বৃন্দা। এত জনের মধ্যে শুধু দুটিকে বেছে অভিনয় শেখাচ্ছেন কেন? তাও নির্জন বাগানে?

শুধু অভিনয় শেখাচ্ছেন? নিজের হাতে তাদের গায়ে তেল-হলুদ মাখাচ্ছেন, তারপর স্নান করিয়ে পা মেজে দিচ্ছেন। স্নানান্তে সর্বাঙ্গ মগুন বসন পরাচ্ছেন। কোন্ অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার শোভা পাবে তাই দিয়ে সাজাচ্ছেন বেছে-বেছে। সাজাচ্ছেন মালাগুলেপনে।

বলো কি?

উপায় কী তাছাড়া। অভিনয় নিখুঁত করা চাই। যে ছজনকে শেখাচ্ছেন তাদের একজন হয়তো কৃষ্ণ আরেকজন রাধিকা। কৃষ্ণ-রাধিকার নিগূঢ়-হৃগম ভাব রামানন্দ ছাড়া আর কে শেখাবে? অভিনেত্রীদের অঙ্গসৌষ্ঠব কমনীয় না হলে অভিনয় মধুর হবে কি করে? আর এই মাধুর্য সম্পাদনের জন্তে যত লৌকিক উপায় ও উপাদান আছে সব কিছুই সহ্য করেছে রামানন্দ। ব্রজলীলায় যারা অভিনয় করবে তাদের দেহ স্নিগ্ধলাবণ্যে কাস্তোজ্জ্বল হতে হবে তাই রামানন্দের নিজ হাতে কালন-মার্জন, নিজ হাতে মর্দন-মগুন। আমি নিজ হাতে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে-গুছিয়ে না দিলে আমার তৃপ্তি নেই। আমার পূজা রাগাঙ্গণা। আমি রাধারাগীর দাসী। দেবদাসীঘরের সেবার সময়েও আমার সেই আরোপ, সেই ভাব।

অত কথা কে বোঝে! গুম হারে বসে রইল প্রহর।

মহড়া শেষ হবার পর দেবদাসীদের প্রসাদ খাইয়ে তাদের নিজ-নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে রামানন্দ ঘরে ফিরল।

ভৃত্য খবর দিল প্রহর মিশ্র বসে আছে।

সন্মুখী রামানন্দ মিশ্রের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, ‘আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, কমা করবেন। আপনার পায়ের ধুলোর আমার ঘর পবিত্র হল। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্তে।’

বেলা অনেক হরে গিচেছে, মিশ্র উঠে পড়ল। বললে, ‘আমার অস্ত্র কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছিলাম। দর্শন পেলাম, তাতেই আমি কৃতকৃতার্থ।’

ফিরে গেল প্রহর।

পরদিন সকালে মহাপ্রভুর কাছে যেতেই মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি, রামানন্দের কাছে গুনলে কৃষ্ণকথা?’

প্রহর রামানন্দের কীর্তিকথা ব্যক্ত করল বিরক্ত হয়ে।

এ হৃগম মহিমা! উত্তানের বিরলে বসে পূর্ণ-যৌবনা দেবদাসীদের অভিনয় শিখা দিচ্ছেন। ভাব-বিজ্ঞানের আধার নৃত্যগীতের উচ্ছাস যে সব রমণী, তাদের। শুধু দেখছেন, স্পর্শ করছে। অঙ্গভঙ্গি শেখাতে যেটুকু দরকার শুধু ততটুকু নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অস্তরঙ্গ। নিজহাতে তেল মাখাচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, পাত্রমার্জনা করে দিচ্ছে, রচনা করছে বেশভূষা। কী পরিমাণ চিত্তচাক্ষু্য হবার কথা সহজেই অনুমেয়। তার কাছে কৃষ্ণকথা গুনব কি। বরং কলঙ্ককথা শুনি?

মহাপ্রভু বললেন, ‘তুমি রামানন্দের কাছেই যাও। সেই সত্যিকার কৃষ্ণকথার অধিকারী।’

এ যে আশ্চর্য কথা, প্রহর বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

‘হ্যাঁ, রামানন্দের কথা আশ্চর্য কথা।’ বললেন মহাপ্রভু, ‘সুন্দরী যুবতী মেয়ে যদি একটুকরো কাঠ বা পাথরকে স্পর্শ করে তা হলে কাঠ বা পাথরের কী হয়? কিছু হয়না। কোনো বিকারই তাতে হয়না। রামানন্দও তেমনি কাঠ-প্রস্তরের মতই নিবিকার।’

‘আপনি বলছেন?’

‘হ্যাঁ, আমিই বলছি। গুহা অঙ্গের দর্শনে স্পর্শনেও তার ভাবান্তর নেই। তার যে দাসীভাবে আরাধনা। তার ইঞ্জিরের প্রাকৃতিক নেই। তুমি ফিরে যাও তার কাছে। খোলো আমি পাঠিয়েছি। প্রাণ ভরে কৃষ্ণকথা শুনে এস।’

প্রহর ছুটে ছুটে চলে এস রামানন্দের কাছে। সাতাঁল প্রণাম করে বললে, ‘প্রভু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে।’

‘কেন বলুন তো?’ প্রভুর নাম শুনে প্রেমাবিষ্ট হল রামানন্দ।

‘কৃষ্ণকথা শোনবার জন্তে।’

প্রভুর কপায় কৃষ্ণকথা অন্তরে স্ক্রুজিত হোক।
প্রাণের উন্মাদে রামানন্দ বলতে লাগল। আর
প্রহারা ? ওছায় নাচতে লাগল কৃষ্ণপ্রবেশ।

দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে তবে না বন্ধা, না জ্যোতা
করুই আশ্রয়তি নেই।

নিমাই চলল তার শিষ্যদের সঙ্গে লীলা করতে।
বললে, ‘চলো বাজারে যাই। কত দিন কিছু
আসেনি সংসারে।’

‘চলুন।’ বললে পড়ুয়ারা। ‘কিন্তু কেনবার
কড়ি কোথায় ? নিয়েছেন সঙ্গে করে ?’

‘কোথায় পাব ? দেখি মিষ্টি কথায় পাই কিনা।’
নিমাই হাসল : ‘দেখি মধুরের বাজারদর কত ?’

বাজারে ঢুকতেই প্রথমে ডাকল তন্তুবায়।
‘ও ঠাকুর, আমার দোকানে আসুন, দেখুন না
কেমন সুন্দর আর মজবুত ধুতি—’

‘কই দেখি।’
একখানা ধুতি বাছল নিমাই।

‘খুব ভালো, কেমন মিহি অথচ টেকসই।’
ক্রেতার পছন্দকে তারিফ করল দোকানি।

‘দাম কত ? আর দাম জিগপেস করেই বা লাভ
কী। দেব কোথেকে ? একটা কাশাকড়িও হাতে নেই।’

দোকানি কাঁপরে পড়ল। বললে, ‘তা দামের
জন্তে ভাবনা কি। দাম না হয় কদিন পরে দেবেন।’

‘না বাবা, ঋণ করতে পারব না।’ নিমাই কিয়ে
চলল। ‘কোনোদিন ঋণ করিনি। যদি নির্দিষ্ট
দিনের মধ্যে শোধ করতে না পারি।’

‘না পারেন তো মেয়াদ বাড়িয়ে নেবেন।’
দোকানি দোনামনা করতে লাগল।

‘না বাবা, সেই মেয়াদও বজায় থাকে কিনা ভাব
ঠিক কি।’ নিমাই পা বাড়াল রাস্তায়। ‘একে ঋণ
তায় আবার কথার খেলাপ—অন্ত পোষাবেনা। অদৃষ্টে
যখন নেই তখন আর কী করব।’

রাস্তায় নেমে পড়েছে নিমাই, পিছন থেকে ডাকল
দোকানি। ‘ও ঠাকুর, ধুতিখানা তুমি অমনি নিয়ে
যাও। তোমার ইচ্ছে হয়েছে তাই আমি কুপা
হয়েছে বলে মনে করছি। তুমি যদি নাও মনে হচ্ছে
তাইতেই আমার মঙ্গল।’

নিমাই নিল হাত বাড়িয়ে।
‘ও ঠাকুর, পান খেয়ে যাও।’ জব্বলি ডাকল।

হনহন করে চলে যাচ্ছে নিমাই, বললে, ‘পান
খাবার কড়ি নেই।’

‘আহা, নাই বা থাকল, এক খিলি পান
তোমাকে খাওয়াতে পারি না ?’ পানওয়ালা বললে
ব্যগ্র হয়ে।

নিমাই খামল। বললে, ‘তুমি খাওয়াতে চাইলে
আমিই বা বিনা কড়িতে খাব কেন ?’

‘না খাও তো, তুমি হাতে নিয়ে কেলে দাও
রাস্তায়—’

‘তা তোমার জিনিস আমি অমনি-অমনি নেবই বা
কেন, ফেলবই বা কেন ?’ নিমাই মুখ কেরাল ; ‘বখন
স্বচ্ছল হব তখন কিনে খাব।’

‘না, তুমি যদি আমার হাতের পান না খাও আমি
প্রাণ দেব। তোমাকে বিনা দামে পান খাওয়াব এই
আমার প্রাণের অভিলাষ।’ পানওয়ালা নিমাইয়ের
হাত ধরল।

নিমাই হাসতে হাসতে বললে, ‘তোমার প্রাণ
বাওয়ার চাইতে আমার পান খাওয়ার বঞ্চিত কম।
দাও তাহলে এক খিলি।’

পর্ণে-চূর্ণে-খদিরে-কপূরে পান সাজতে লাগল
তামুলি।

বাজার থেকে নিমাই চলল এবার গোয়ালার ঘরে।
বললে, ‘দই-করু কী আছে আনো দেখি।’

গোয়ালারা আনতে লাগল ভাঁড়ে ভাঁড়ে। যা
পারো খাও নয়তো পাঠিয়ে দিই বাড়িতে। দাম ?
দাম কিসের ? তুমি খাবে এই তার দাম।

‘ভালো দেখে গন্ধ আনো।’ গন্ধবণিকের ঘরে
গিয়ে হাঁক দিল।

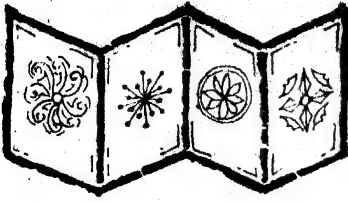
নিয়ে এল দিবা গন্ধ। দাম কত নেবে ? আমার
গন্ধ যদি তোমার গায়ে লাগে, তোমার গায়ে থাকে
তাই আমার দাম।

মালাকরের ঘরে গিয়ে নিমাই বললে, ‘মালা
দাও। দাম দিতে পারব না কিন্তু।’

তোমার গলায় যদি আমার মালা দোলে, সেই
আমার দাম।

ভারপর শম্ভবণিকের ঘরে গিয়ে শম্ভ চাইল নিমাই।
শম্ভবণিক নিমাইয়ের দক্ষিণ হাতে তুলে দিল শম্ভ।
দাম ?

তুমি যদি এই শম্ভে একটি ধনি ভোলো, বললে
শীখারি, তবে সেই আমার জরখনি। [ক্রমশঃ।



পত্র

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৮

ভিলাগোড়া পোঃ
জেলা মানভূম, বিহার,
১৫ই এপ্রিল, ১৯৩১

প্রিয় মহাশয়,

এক তারবার্তার আশ্রম আমি আপনাকে জানাইয়াছি যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের সময়ে কলিকাতায় আপনার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। ইহা এতই আবশ্যক যে, আপনার সুবিধার জন্য, প্রয়োজন হইলে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত। অল্পগ্রহ করিয়া জানান কোন তারিখে আপনার পক্ষে কলিকাতায় আসা সম্ভব হইবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী কয়েকজন বন্ধু আমাকে জানাইয়াছেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। এ-বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত এতই দৃঢ় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি পূর্বাভাসে গঠিত না হইলে, এ, আই, সি, সির অধিবেশন জটিল। কোনও লাভ হইবে না। তাঁহারা আরও মনে করেন, আমাদের উভয়ের পত্রালাপের মাধ্যমে কোনও মীমাংসা না হইলে, ব্যক্তিগত (উভয়ের) আলোচনার মাধ্যমে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদের মতে, আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হইলে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি অধিবেশন স্থগিত রাখিতে সাহস করি না, (কারণ আমার বিরুদ্ধে দীর্ঘত্বতার অভিযোগ আসিতে পারে), যদি না আপনি পূর্বেই প্রস্তাব সহর্ষন করেন। কিন্তু আমারও যুদ্ধ অভিমত এই যে, পত্রবিনিময়ে যদি সফল না ফলে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন এবং তাহা এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বেই হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত আলোচনা-আলোচনাতেও যদি কোনও মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে এইটুকু অন্ততঃ আত্মপ্রদান লাভ হইবে যে, বধাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

বর্তমান পরিস্থিতি সন্দেহে বলিতেছি। একদলীয় কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনার উপদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না; কেন্দ্র আমি চুপ্‌চাপ। (কি জন্য তাহা পারিলাম না তাহা পূর্বেই পত্রালাপে জানাইয়াছি। এখন তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না।) অতএব, পত্র-প্রস্তাব পাশ হওয়ার কালে আপনার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সোজা কথা, ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতির নামের জালিকা আপনাকে ঘোষণা করিতে হইবে। আপনি যদি তাহা করেন,

তাহা হইলে অচলাবস্থার অবগান হইবে, ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিবে এবং তাহার পর বসিবে এ, আই, সি, সির অধিবেশন। এই আশা করা বাইতে পারে যে, তাহার পর সব ঠিক হইয়া যাইবে, আর কোনওরূপ সঙ্কট দেখা দিবে না।

যদি কোনও কারণে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে আপনি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের গোলকণ্ঠাধার ঘুরিতে হইবে। তখন বিষয়টি (ওয়ার্কিং কমিটি গঠন) এ, আই, সি, সির সমুখে অনিশ্চিত অবস্থার উপস্থাপিত হইবে। আমার মনে হয়, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। কারণ, তাহা হইলে ত্রিপুরার জায় এ, আই, সি, সির অধিবেশন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবে না।

জানি না, এখন আপনি কিরূপ চিন্তা করিতেছেন কিন্তু আমি এই আশা করি যে, আপনি ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতির নাম ঘোষণা করিবেন এবং অচলাবস্থার অবগান ঘটাইবেন। আপনার অভিমত যদি অন্তরূপ হয় তাহা হইলে আমার অনুরোধ এই যে, আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন, ওয়ার্কিং কমিটি গঠন পূর্বাভাসে না করিয়া কলিকাতায় এ, আই, সি, সির অধিবেশন বসিলে কি চূরিকপাকে তাহা পর্যাবসিত হইবে। যদি ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় (আপনি অন্তরূপ অভিমত পোষণ করেন) তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন এবং তাহার জন্য প্রয়োজনবোধে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখাও উচিত।

একটি বিষয়ে সম্প্রতি আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি। একদলীয় ক্যাবিনেট সম্পর্কে আমরা বহু আলোচনা করিতেছি—কিন্তু একদলীয় ক্যাবিনেট বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি কি? উদাহরণস্বরূপ বলা বাইতে পারে—লক্ষৌ, কৈলেশপুর, হরিপুরা কংগ্রেসের পর যে সকল ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপনি একদলীয় ক্যাবিনেট বলিবেন না অন্ত নামে অভিহিত করিবেন? যদি ঐগুলিকে আপনি একদলীয় বসেন তাহা হইলে একদলীয় বনাম সর্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠন লইয়া বিবাদ-বিসংবাদে প্রয়োজন নাই। আপনি যদি ঐগুলিকে সর্বদলীয় বলেন, তাহা হইলে, তিন বৎসর সাক্ষ্যের সহিত কাজ চালাইবার পর, এই বৎসরই বা সর্বদলীয় ক্যাবিনেট কার্যকরী হইবে না কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদলীয় বনাম সর্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠন সম্পর্কে পুথিগত আলোচনা যদি আমরা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতির যেটা নামের একটা জালিকা কাটা করিতে পারিবে বাহা, সাময়িক ভাবে এ, আই,

সি, সির এক কংগ্রেসের সাধারণ সভাপনের আত্মজ্ঞান হইবে। সমস্ত এই বিকটি দূর্য্য করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।

দুর্নীতি, হিসা ইত্যাদি সমস্ত লইয়াও আপনি বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত। সম্ভবতঃ এই প্রকৃতিকে আপনি মূলগত বলিয়া মনে করেন। বর্তমানে কতখানি দুর্নীতি আছে, কতখানি হিসার ভাব বিস্তারিত—এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে কি আমরা একমত নই যে দুর্নীতির এক হিসার অবদান হওয়া উচিত এবং সেজন্য ব্যবসায়গ্য পদ্ম অবলম্বন করা উচিত? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আপনি কেন আলোচনা করিতেছেন যে, কাজের সময় আমরা একযোগে কাজ করিব না বা জরুরী বিষয়ে আমরা একমত হইব না?

প্রত্যেক আর দীর্ঘ করিব না। মনের কথা খুলিয়া আপনাকে জানাইয়াছি। আমি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, ক্যাবিনেটের রূপ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ থাকিলেও, ব্যক্তিগত আলোচনা-আলোচনার পর আমরা দেখিতে পাইব যে, আসল নামগুলি সম্পর্কে আমরা একমত হইতে পারিয়াছি এবং জরুরী বিষয় সম্পর্কে আদর্শগত মতই বিরোধ থাকুক না কেন, কাজের সময় উপস্থিত হইলে, একযোগে কাজ করিতে আমরা পারিবই।

আশা করি, কস্তুরবা ক্রান্ত উন্নতি লাভ করিতেছেন এবং অত্যধিক কাজের চাপ সত্ত্বেও আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্ভাব্যজনক। আমি ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছি।

সম্রাট প্রণামান্ত—

আপনার রেহের

হুভাব

[ইহার পর মোহনদাস করমচাঁদ গভীর সহিত নেতাজীর তারবার্তা-বিনিময় হয়। নেতাজী তিনটি এবং গান্ধীজি তিনটি তার-বিনিময় করেন। গান্ধীজি নেতাজীর সাত নম্বর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র দেন নাই। গান্ধীজির ১১/৪/৩৬ তারিখের তারবার্তার পর নেতাজী দুইটি তার পাঠান এবং তাঁহার ৮নং পত্র লেখেন। উহাই তাঁহার শেষ পত্র। পত্রালাপ-পর্বের এইখানেই শেষ। এই শেষ পত্রের পর নেতাজী ২খানি তার পাঠান এবং শেষ তাকে গান্ধীজি জানান যে, পত্রগুলি প্রকাশ করা বাইতে পারে।]

নেতাজীর পত্র—৮নং

জিলালগোড়া পোঃ,

জে. মানকুমার, বিহার,

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৬।

প্রিয় মহাশয়,

অন্ত আপনাকে নিম্নোক্ত তারবার্তাটি পাঠাইয়াছি:—“মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট। আপনার জ্বরের জন্ত চিন্তিত। সমস্ত আয়োগ্য কামনা করি। জগদ্বল্লালজীর এবং আমার আন্তরিক আশা এই যে, আমাদের উত্তরের (আপনার এবং আমার) সাক্ষাৎকারের ফলে সকল কলির এবং একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সকল কংগ্রেসদেবীর মধ্যে সহযোগিতা বন্ধন করিবে। কলিকাতার

আমাদের উত্তরের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনার, ঐ সাক্ষাৎকারের পূর্বে, পত্রগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অনাবশ্যক এবং অর্থাত্মিক। প্রণাম। হুভাব।”

পত্র তিন সপ্তাহ ধরিতা আমাদের উত্তরের মধ্যে দীর্ঘ পত্রালাপ হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে এই পত্রালাপ কোনও ফল প্রসব করে নাই। বাহা হউক উহা একবিষয়ের সহায়ক হইয়াছে—আমাদের পারস্পরিক বুঝাপড়ার মনের ভাব পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়া উহা সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু জরুরী সমস্ত সমাধান এখনই করিতে হইবে, কারণ, আমরা আর অধিক দিন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কাজটি কেলিয়া রাখিতে পারি না। দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনাই যে, এখনই কংগ্রেসদেবীদের পক্ষে বিরোধ তুলিয়া একাবদ্ধ হইয়া পীড়িত প্রয়োজন। আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রতিদিন অবনতির দিকে বাইতেছে। বৃটিশ লোকসভার যে সংশোধনী বিল পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বুদ্ধজনি জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে বৃটিশ সরকার, ভারতীয় প্রদেশগুলিতে বেটু বারন্তাসনের ক্ষমতা আছে, তাহাও কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা হইতেছে। সকল দিক বিচার করিয়া উহা নিশ্চয়ই উপলব্ধ হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা একটা লক্ষ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছি যদি এখনই আমরা বিভেদ দূর করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমরা সেই বিপর্যয়ের সহিত যুদ্ধিতে পারিব।

আপনি যদি আগাইয়া আসিয়া নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন, তবেই এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমরা সবাই আপনার অঙ্গগমন করিতে এবং আপনার সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আপনি আরও দেখিতে পাইবেন যে, দুর্নীতি দূরীকরণ এবং হিসাবসম্বন্ধ প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আমাদের দুই দলের মধ্যে একটা ঐক্যমত আছে, যদিও দুর্নীতির পরিমাণ এবং বর্তমানে দেশে হিসাবসম্বন্ধ মনোভাব ঠিক কতখানি আছে সে সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কার্যক্রম সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, কংগ্রেস অবশ্য এ, আই, সি, সিকেই উহা স্থির করিতে হইবে যদিও প্রত্যেক সম্ভাব্য ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ অভিমত উক্ত সংস্থাকল্পিত সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারে। কার্যক্রম সম্পর্কে আমার এই কথা মনে হইতেছে যে, যে সঙ্কট আমাদের সম্মুখে আসিতেছে তাহাই উহা স্থির করিতে সাহায্য করিবে এবং তখন ঐ বিষয়ে আর মতভেদের অবকাশ থাকিবে না।

এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বে কলিকাতার অবস্থা কলিকাতার নিকটে আপনার সহিত সাক্ষাৎের জন্ত বিশেষ উৎসাহ হইয়া রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং অজান্তে প্রদেশে এই মতই কম্পন ঘূর্ণ হইতেছে যে, আদর্শগত বিরোধ এবং কলিত মতভেদ বা মনকষাকবি সত্ত্বেও পারস্পরিক বীজবিন বন্ধনে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্ত সমাধান করা উচিত। পরে প্রকাশ অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব আপনার। ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমরা আপনার সহিত বরাদ্দে পরোপিতা করিতেছি।

ভোরাই

ঐগম্যনিকান্ত দাস

আমি কি তোমার গান গাই ?
তুমি আজ কোথা আছ, মরেছ অথবা বাঁচো
আমার তো কিছু জানা নাই ।
তুলে গেছি বেন কবে প্রভাতের সে উৎসবে
তুমি দিয়েছিলে আল্পনা ;
ধূয়ে মুছে গেছে সব, আছে কি না অজুতব
নাই—কিছু করি না কল্পনা ।
আমি কি তোমার গান গাই ?
জীবনের বিপ্রহরে প্রচণ্ড সে সূর্যকরে
পুড়ে গেছে ভোরের সানাই ।

সুনীল আকাশে চেয়ে চেয়ে
কত রং কত ছবি দেখে যে সন্ধ্যার কবি ;
তোমার সে কচি মুখ, মেয়ে,
তার মাঝে পায় ঠাই ? আমার তো মনে নাই,
জীবনের প্রথম রাগিণী
কবে কোথা কে বাজাল, আঁধারে অন্ধ আলো
কে বলাল—রাখিনি তো চিনি ।
সুনীল আকাশে চেয়ে চেয়ে,
হাজারো সুরের ভিড়ে ভোরের সে সুরটিরে
ভুলে গেছি, আন গান গেরে ।

নিয়ো না, নিয়ো না অপরাধ ।
অনেক বাড়ির ঘর, মনুষ্যের পায়-পায়
মুছে বার মুকুলের গাথ ।
চলার নেশার বদি পায় হয়ে পিরিনদী
ভুলে বাই প্রিয় প্রাথম্যনি,
বার বার আঁধি এসে পথিকে তুলার শেষে
ভারে কি দুঃখিবে, দোষী মানি ?
নিয়ো না, নিয়ো না অপরাধ—
আমি খাটি সোনা নই তব সোহাগায় কই
কাটে না তো জীবনের খাথ ?

পাখী তো নিজের গান গায় ।
নিশান্তে তরুণ আলো চোখে তার লাগে ভালো
সে তো ঘূষে উড়ে যেতে চায় ।
প্রহরে প্রহরে তার গান ওঠে অনিবার—
কতু রোর, কতু সমীরণ,
কতু ফুল কতু ফল, কতু আকাশের জল,
গান তার কিসের কারণ ?
পাখী তো নিজের গান গায়—
সে গান তাহারি বুক হুমাইয়া থাকে সুরে
আপনা আপনি উছলায় ॥

ভেবে থাকো বদি, আনমনে
গেয়েছি তোমার গান— তটিনীর কলতান
নয় সে তো উৎসব স্রবণে ।
যে ভট নিকটে তাকে ভালবাসে, ঘিরে থাকে,
তাহারি আঁধারে ওঠে সুর ;
ভারে ভাঙে তারে পড়ে তবেই না পান ঝরে—
পিরি-পথ সে তো বহু দূর ।
ভেবে থাকো বদি, আনমনে
গেয়েছি তোমারে সুরে, কমা তুমি কবে মোখে,
ভুলে বেরো ভোরাই স্বপনে ।

জওহর এখানে গতকাল আসিয়াছিল । বর্তমান পরিস্থিতি সন্দেহে
তাহার সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হয় । আমাদের উভয়ের
একমত দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি ।
আমাদের মনে হয়, আপনার আসিবার সময় কলিকাতার
নিকটে কোনও ঠোনে নামিয়া পড়িলে ভাল হয়, তাহা হইলে
পাশ্চাত্যবিশেষে আলোচনা হইতে পারিবে । আপনি যদি নাপপুর
হইয়া আসেন তাহা হইলে মেদিনীপুরেই (বড় পপুন্ডের নিকটে) সর্বোত্তম
স্থান হইবে । আপনি যদি চুঁকি হইয়া আসেন, তাহা হইলে, বর্তমানের
নিকটে কোনও এক স্থানের কথা ভাবিতে হইবে । এ বিষয়ে আপনাকে
কিছু তার পাঠাইয়া উভয়ের অপেক্ষার আছি । তাহা সম্ভব না

হইলে, কলিকাতাতেই আমাদের সাক্ষাৎকার হইবে । আমি জওহরকে
আলোচনার যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছি এবং সে সানন্দে সম্মতি
দিয়াছে ।

আপনার অবের জন্ত চিন্তাভিত আছি । প্রার্থনা করিতেছি,
উচ্চা বেন শীঘ্র হুব হয় ।

সম্ভব প্রণামান্ত—

আপনার মেসের
সুভাষ

[ইহার পর নেতাজী দুইটি এক পাছাভি একটি তারবার্তা
বিস্তার করেন এবং পত্রালাপ-পত্রের অবসান হয় ।]

শি শি র=সানি থ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

Prompting সন্ধে কথা হচ্ছিল, বললেন—মণিমোহন বড় ভালো prompter ছিলো, অভিনেতা তৈরী করতে পারতো। অথচ কি পোশাক? কী কণ্ঠ মরসো, কি রকম বাড়ির কী রকম করে! তার আশ্রয় তাকে দেখলে না, অথচ থিয়েটারে প্রথম নাববার সময় মণিমোহনের পেছনে পেছনে ঘুরেছে। কথাগুলো বলেই কি রকম বেন অন্তরমনক হয়ে পড়লেন।

উনি বখল চুষ করে বসে আছেন আমরা ক'জন একপাশে বসে তখন ফিসফাস করে কথা কইছিলাম, তারই একটি কথা কানে যেতে চমক ভাঙলো ওঁর, প্রশ্ন করলেন—মিত্রা ত্রীকান্তে কমল করছে? তারপর নিজেই বলে চললেন—মেয়েটা অভিনয় তো ভালোই করে, তবে বাপ স্বাকার করবে কি না জানিনে। ওর একটি মাত্র দোষ, অভিনয় হৃদয় থেকে করে না, মুখস্থ বলে। approachটা বড় মেকানিক্যাল, দেখো, জীবন রক্তে নিজার ভূমিকা করেছিলো বন্দনা, বড় ভালো করেছিলো। জীবন সন্ধে বিশেষ করে হৃদয় সন্ধে জ্ঞান যে খুব বেশি। বাইরের 'মেয়ে'র জীবন সন্ধে জানে ভালো। কর্ণেল ক্রফোর্ড বলতেন, লেখাপড়া না জেনে অভিনয় করে কি করে। তাতে বলেছিলুম, They have drank from the fountain of life and not through conduit pipe.

ওঁর পুরোনো বলের কথাই বলেছিলেন—আমাদের টু বড় ভালো হতো। দলটা ভালোই গড়ে উঠেছিলো, মুহূর্ত আর অজান্তে কারণে ভেঙে গেলো।

এর পর হলো কিশোরী নাট্যকারদের সন্ধে আলোচনা। উনি বললেন—বার্ষিক ব্রেক্ট অনেক কিছু করেছেন, মায় বিনা ট্রেনে অভিনয় করানো পর্বত। আমাদের কিন্তু ওটা ট্রাডিশন—বিনা ট্রেনে, বিনা সিনে অভিনয় আমরা চিরকালই করেছি। তারপরই ওঁর প্রশ্ন করে বললেন—বাড়ি পেলুম না, experimentation করতে পেলুম কই। বত্নকে জাতে তুলে থিয়েটারকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু exit-entrance হবে কি করে? বত্নায় আসবে বলে পড়তো, কিন্তু সকলের মাঝখানে বসে বাধা হ'কো থাকছে চোখে লাগতো।

হঠাৎ বিনয়দাকৈই জিজ্ঞাসা করার ভক্তিতে বললেন—গ্রীক নাটকের রূপ কেমন ছিলো? কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বলে চললেন—বত্নায় শীচগুলো এক ধরনের আর লম্বা লম্বা হতো। এই দুর্লভতার জন্যই অ্যাগিল করলো না। নীতান্তে গিরিশবাৰু তো নীতা বিলম্বনের পর গান ধরলেন। বত্না ধরনের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বই হলো পাণ্ডুরোগীর harmonious বই।

গিরিশ এসেছেই বলে চললেন—গিরিশবাৰু নাটক লিখবেন কখনো ভাবেননি, কিন্তু বত্নায় আর বীনবন্ধু দিয়ে চললো না, তাই লিখলেন। তবে গান ভালোই বাঁকল।

আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরলেন—চারদিক খোলা হয়তো চলবে না। তবে তিন দিক খোলা রেখে একদম হর পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেখে কী। উঁচুটাকে দিকেরই নাবাজা বার, অতো উঁচু বারায় বরকার কি?

ট্রেনের কথাই বললেন—একটা নতুন বই হ'চ্ছে না। বা' ট্রেন আছে তারও তো উন্নতি করা যায়। এই তো অভিনেত্রীকে ইতিভাষা নিয়ন্ত্রিত করলো, অথচ ভেতরে আর্চ দিয়ে ট্রেনকে ছোট্টো ক'রে দিলে।

আমি বা কিছু innovation করেছি লোক নিল না, আর অন্তরের চেয়ে সবাই নেয়। একবার রেল লাইনের ধারে একজনকে হুড়ি সাঝাতে দেখেছিলুম, বলেছিলো, শোভা ক'রছি। এরাও শোভা করছে।

গ্রীষ্ম ওপেনিং আর ডেপথ সবচেয়ে বেশি। দিগ্বিজয়ীর মতো বই কী আর হবে?

কোনো বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকের কথা উঠতে বললাম—They are hardly educated.

তার পর নির্মলচন্দ্রের কথা বললেন—নির্মলের frustration বাদের জন্তে এতো ক'রলো, কংগ্রেসের জন্তে এতো করলো অথচ তারা সবাই তাকে বেড়ে ফেলতো। সেনার দারে মাথাপাঙ্গল। বাদের মাল্লব করলে ভাড়া ডাকলে আসবে কি না এ সন্ধেই ছিলো তার। ওর মতো অমন হৃদয়ের বিস্তার আরই দেখেছি। আসে খুব শার্ট ছিলো, কিন্তু বড় ছেলে মারা যেতেই সোঁতামি আর আলবোলা নিয়ে প'ড়লো। অতো দিন কাউজিলে ছিলো, ইকুনমিক্স আর পলিটিক্যাল ইকুনমিতে অতো বড় পণ্ডিত কিন্তু কখনো বকুল দেখনি। বিজয় ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো, এসে আবার থিয়েটার দেখতে পারতো না, ভারতো আমিই নির্মলকে ডুবিয়েছি।

আমাদের দেশে কেনো কিছু মন-প্রাণ দিয়ে করতে গেলে পেছনে লোক পাওয়া যায় না। গিরিশবাৰু তাই ছেলেকে বলেছিলেন—প্রাইমারিটর হ'সেন। ছেলের কথা ভেবে সিরাজে বড় বড় বকুল ঢোকালেন। দানীবাবুর অনেক দোষ ছিলো, কিন্তু কসেটি তারো ক'রতেন, বোধগম্য হ'লেই ভালো ক'রতেন, তবে তত্ত্বের জেঁদাধেঁদা ডুবলেন।

—রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করেছিলুম—বাংলা দেশের নাটক বাঙালীর মতো ক'রতে গেলে কেমন কর হবে? তাতে বলেছিলেন, তোমরা সেবে, নয়তো এসেছো কেনো? নিজে কিন্তু এলিফ্যান্টের ট্রাকে কলো করলেন, তাঁর সাংকেতিক নাটক মেতাসাংকেতিক প্রকৃতির অনুসরণ করে।

—বার্ষিক ব্রেক্টের নাটক অপরূপ—Exception and the rule কি হৃদয়। আকাল তো আর মেয়েহেলে নিয়ে বাজা নেই, তাই একটা একটা বাড়ি আর কিছু এনজায়েন্টস—বাতে সবই কিছু পায়।

সিনেমা ভালো কি খিঁচোটার ভালো, জানতে চাওয়ার বললেন—
গত পঞ্চাশ বছরে সিনেমার কটা ভালো বই হয়েছে। বছরে
লাখ লাখ নায়ক-নায়িকা হচ্ছে অথচ তিনকড়ি আর তারেক
সকলে মনে রাখবে। প্রভাব মতো অভিনেত্রী আর হয়নি।

—দানীয়াবুর সঙ্গে প্রকৃত বত বার করেছি Understanding
ছিলো যে উনি যখন অভিনয় করবেন আমি কিছু করবো না, কারণ
নরেশ একবার ভুঁড়িতে হাত বুলিয়েছিলো। (নরেশ কাভ্যান
হলেই চাপকাক্যে মারবার ভাল করে।) দানীয়াবুর গলা ছিলো
অসুস্থ। উলার-মুদার-তালা—তিনি এসেই গলা চলতো : তাঁর
ব্যক্তিগত ছিলো প্রথম আর তার জেরেই চলতো। বিলোতে হ'লে
মিলে পড়তেন, তবে গলার জন্তে হয়তো ও-কোশেও দায় পেতেন।

কখনো কে বেনে চললেন—গিরিবাবু আর অমৃত বোসের
হ'ল না হ'লে হয়তো ভালো হতো। তখন নিয়োগী, অর্ধশু
বাবু, অমৃতলাল তো ছিলেনই, কিন্তু সবার ওপরে ছিলেন গিরিবাবু।
গিরিবাবু ছাড়া খিঁচোটার তো কেউ রাখতে পারেন না। বোল
হাজার টাকা দিলেন (আজকালকার এক লাখ বাট হাজার টাকার
মতো) অথচ পার্টনার না করে তাড়িয়ে দিলে। খিঁচোটার থেকে
পেয়েছে কি? মাসে একশ' টাকা মাইনে আর দৈনিক চার পয়সার
ভারাক—থ্রেন Dramatic director। বোজ বোজ সেই
বোল হাজার টাকা দেবার কথা বলতেন, তাই তাড়িয়ে দিলে।

—খিঁচোটার মলাট চিরকাল। ক্ষেত্রমণিকে ভালো পার্ট না
দিয়ে Starve করিয়ে করিয়ে নষ্ট করে দিলে। মলাটটিতে
থাকতেন না অর্ধশুবাবু। খুব ভালো লোক ছিলেন তিনি। সব
মলেই মিশতেন। খুব মজা দিলেও ছিলো ওঁর। অমন লোক
আর হবে না।

তাঁর খিঁচোটারের পুরোনো খাতাপত্র কিছু আছে কিনা জানতে
চাওয়ার একটু বেন বিরক্ত হলেন, বললেন—খাতাও কী আমি
রাখবো? বিবেচনায় বসিনি ছিলো ততদিনে করছে। অশিক্ষিত
লোক, বতটুকু পেয়েছে ততটুকু করেছে। সে মারা যেতে
হীরলালবাবুকে বললুম, আপনি খাতা রাখুন। তা'তে বললেন—
ওই নিয়ে অমন দস্তর সঙ্গে ব্যবহারি হয়েছিলো। বললুম, আমার
সঙ্গে হবে না। তবু বললেন—ও তার আর আমার ওপর
চাপাবেন না।

পরের দিন চরিত্রে ক্ষেত্রমণী আবার এলেন। তখনও ডিকেলের
কথাই ঘুরছে খাখার। ঢুকতে ঢুকতে বললেন—ডিকেল বড় ভালো
লোক ছিলেন হে! তবে পরিচিত আত্মীয়দের সবাইকেই লোথার
হুকিয়েছেন। আর কি অসুস্থ গলা! খুব ভালো অভিনয় করতে
পারতেন, নিঃশব্দ লেখা পড়ে প্রচুর পরশা পেয়েছেন, বিশেষ করে
আমেরিকার। আমাদের দেশে স্বাভাবিকের পরশাও ওই বকম ছিলো,
উনিও ইচ্ছে করলে ওই ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

—ডিকেলের বতাবতরিত খুব ভালো ছিলো না। লিটল
আন্ডারস রকে খুব ভাল ছিলো, বইও পড়তেন খুব। লিটল
আন্ডারস হুজুর পর বইই হয়েছিলো একবার সন্ধ্যা পড়তে পড়তেই
কোথ গেলো।

—ক্ষেত্রমণীর লেখা জীবনীটা বেশ ভালোই লাগছে।
ওঁকে ক. literary illusion আছে। সিনেমার ইতিহাসেও

আছে। আর-কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে সেন্সিটিভ কোর্ট করে
বেকুব বসে সেলুম। হামসেট পড়েন তা বীকার করতে রাজী নয়
অথচ বা বোকাডুম তা কিছু বুঝতো ব'লে তো মনে হয় না।

কোনো এক অভিনেতা সম্বন্ধে বললেন—ওর বা দাম তা কী
পেলো? বড় লাগায় বে! শৈলেন্দেবও ওই দোব ছিলো,
হু'পরশা পেলোই ছুটতো। অথচ একটু ভেবেচিন্তে অভিনয় করলে
ওই-তোমাদের কি কুমার—তার চেয়ে অনেক বেশি বোজগার করতে
পারতো। অথচ মরবার সময় কী আর রেখে যেতে পেরেছে? ওর
একটা কিন্তু মস্ত বড় কবিতা ছিলো—সমস্ত চরিত্রের সলাপ মুখ
থাকতো। ও কবিতা রবিরও ছিলো, আর একটা মজার ব্যাপার
ছিল, সকলের আগে এসে মেক-আপ নিতে ব'সতো অথচ কখনো
মেক-আপ নিয়ে খুশি হ'তো না।

এর পর রিহার্সাল শুরু হ'লো। বললেন—আগের দিন মোটাই
রিহার্সাল হয়নি, আজ আর কোনো কথা বলবো না।

পঁচিশে ক্ষেত্রমণী বোধ হয় রবিবার ছিলো, সেদিনটা বার দিয়ে
ছাফিশে এলেন। ডিকেলের জীবনী পড়ার বেশ তখনও কাটেনি,
তাই সেদিনও চুকেই প্রথম বললেন—ডিকেল মস্ত বড় অভিনেতা
ছিলেন, ছিঁচুতার রান্নিতে বিশ হাজার টাকা বোজগার করেছেন।

এই সময় সম্ভবতঃ বিনয়দাস সঙ্গেই কথা উঠলো, নাটক কথার
দাম কি? উনি বললেন—নাটকে কথা দরকার বই কি। ভালো
নিবে পর। উঠলো, সবাইয়ের মনেই যখন ঔৎসুক্য তখন প্রথম
কথাটার দাম কতখানি বলোতো? প্রথমে ঢুকে বাজে কথা
বললে কী ভালো হতো? তবে আমাদের দেশে নাটকে কথা একটু
বেশি। বার্গিট শ'র লেখাতোও এই দোব আছে। আসলে তিনি
ভালো নাট্যকার নন, his characters are so many pegs to
hang his ideas on! তবে গল্পটা সব সময়ই বলেছেন।
যে যে বইতে গল্প সব চেয়ে ভালোভাবে বলেছেন সেই সেই বইই
মাছুব ভালোভাবে নিয়েছে।

নির্বাচন ছবিতে কথা না বললেও তো গল্প বলতে পারা যায়।
যেখানে সেইভাবে বলেছে সেখানে sub title ছাড়াও বুঝতে অসুবিধে
হয় না।

এই সময় পাণ্ডিত্য সাহেবের কথা উঠলো, বহুস্বভাব মতো
কারা তাঁর কাছে পড়তেন, তিনি কেমন পড়াতেন ইত্যাদি
প্রশ্নের জবাবে বললেন—পাণ্ডিত্য সাহেবের কাছে তো আমরাও
পড়ছি, তাঁর কাছে পড়ছে এমন বহু লোক আজও আছে।
তাঁর লেখা বইপত্রের সমস্ত প্রকল্পবাবু নিয়েছিলেন, ওঁর জালায়
পাণ্ডিত্য সাহেবের ওপর রাগ ধরে যেতো আমাদের।

—প্রকল্পবাবু খেটেখুটে পড়া তৈরী করে নিয়ে আসতেন, তবে
প্রথম দিকে খুব ভালো হিসাপসন পাননি ব'লে ছেড়ে দিয়েছিলেন,
পরে পাণ্ডিত্য সাহেব আবার ওঁকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন, খেটে
পড়াতেন তিনি, কিন্তু তা' তো আর ভালো পড়ানো নয়।
পড়াতেন ভালো এম, যোব। তাঁর পড়ানো শুনেল জানরাজোর
যার খুলে যেতো, পড়ানোনা যে ভালো জিনিষ তা' বোঝা যেতো।

এবার রিহার্সাল শুরু করলেন। উনিপূরায় তাঁর থেকে
কল্পমণীকে মেবার শিকিবে পৌছে মেবার জন্তে কামবন্ধ যখন রাম
সিঁড়ির সঙ্গে কথা বলছে তখন রাম সিঁড়ির যে কথা আছে 'তর

দরবারী অস্ত্রে নয়, ভয় দৃষ্টিতে, আগের দিন সেটা রাম সিন্ধের হুমিকান্ডিনতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে বুঝতে পারেনি। থুমেই সেই কথা বললেন—কথাটা ও না বুঝেই বলছে। থোটার ভেতরের অর্থ হ'লো Traitor has now turned upon himself, একটা মেয়ের জন্তে সমস্ত দেশ আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত, অথচ এত বড় গৌরবের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার কোনো থিকারই নেই তার। সেই দুঃখের আভাসই তো ফুটেবে কথার। শাকটার মাথায় কিন্তু তা ঢোকে না।

গান নাটকে থাকা ঠিক কিনা জানতে চাওয়ায় বললেন—বাংলা টিকে গান থাকা দরকার, এ বিষয়ে আমি রবিবাবুর সঙ্গে একমত। নি যদি নাটকের moodকে অনুসরণ করে, তবে আপত্তি কিসের? ছাড়া আলমগীরে বাগীবাবু অপরূপ সুন্দর দিয়েছেন। 'অতিথি এসেছে'র প্রথমে দরবারী কানাড়া লাগিয়েছিলেন, বললুম, ভালো গেলো না। শুনে তো চটেই আশুন! শেষ পর্যন্ত বোঝাতে গেলেন—কি রস? বললুম, বিরস!

আবার রিহাস্তাল শুরু করলেন, তবে হঠাৎই থেমে গিয়ে বলেন—একটা নতুন বই করে। এই বই রিহাস্তাল দিতে ইনস্টান গেলার মতো লাগছে।

রিহাস্তাল বন্ধ করে ডিক্লেসর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হলেন আবার, বললেন—হেস্তেথ পিয়ার্সন ডিক্লেসর জীবনের পাণ্ডাল বাদ দিয়ে indomitable spiritটাই দেখিয়েছেন। একদল কাগজ চালিয়েছেন, সিরিয়াল লিখেছেন, আবার নাটকও প্রাডিজ করছেন। ম্যাকারডি খুব বন্ধু ছিলেন, ডিক্লেসর গলা দিয়ে পিলে চমকে গিয়েছিল তাঁর, বলেছিলেন—আমার কাজ বাবে।

কাব্যনাট্য সম্বন্ধে কথা হ'লো, বললেন—নাটক কবিতার না হয়ে গেলে কিছু হবে না। অথচ মজা দেখো, কবিতা কেউ পড়তেই বৈ না। ছুতো ধারি পড়ে, তারা মাইনে বেশি দেয় অথচ নেট ডা চলে না। বাড়িতে অভিজান কিনিয় বিপদে পড়েছি। হেলো দেখে না, আমার কাছেই পড়ে থাকে।

—নেট আমিও লিখেছি কোর্স ইয়ারে পড়তে পড়তে। জিতেনের পাকানের ধার শোধ দিতে চার-পাঁচজন মিলে কথা-পেছু দশ-পনেরো কা নিয়ে লিখে দিয়েছি।

—আমাদের দেশে পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে প্রিন্সিপালের টিকিটের ওপর ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

—আগেকার দিনে মাঠের মশায়রা ভালো ছেলেরকে নিজের দ্বিষ্ট নিয়ে গিয়ে পড়াতে। আজকাল তাঁদের প্রাইভেট টিউটরি রেই দিন কাটছে; ভালো ছেলের পড়াবেন কখন?

২৭ তারিখেও এলেন। সেদিন গোড়াতেই রিহাস্তাল শুরু হ'লো। দয়াল শাহ'র সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলবে, বোঝাতে গিয়ে বলেন—দয়াল শাহ'কে একটা খাতির দেখানো দরকার। ঐকালকার মন্ত্রীদের যেমন খাতির করা হয়, পাতিয়ালা ইত্যাদি জাদের কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি মন্ত্রীদের খাতির করতে হতো। জিনবাবরের অবস্থা খুব দরবারের মতোই ছিলো, সবাই খুব মাথা রাখতো। সেওয়ানের ক্ষমতা কতো ছিলো, ইচ্ছে করলেই রাজাকে জাহাচ্য করতে পারতো। অথচ সামনে কি বিনত, কথায় কথায় রীত পুরোজার, অমরাজ্য বলেই চলেছে।

দোল এসে পড়েছে, সেদিন আবার দুপুর পর্যন্ত ট্রান্স-বাস করে তাই নিয়ে কথা গুণায় বললেন—দোলের একটি barbarous ভাব আছে, বড়বাজারে দোল খেলা বন্ধ করা উচিত। গান বা গায়, সে ছোটদের শোনবার অযোগ্য; মনে একটা ধারণা ইম্প্রেশন হয়। কনষ্টেবলরা কিন্তু খুব ভয়ভাবের দোল পালন করে। দোলে অসুস্থ আর লাল রঙ দেওয়াতেও ধারণা কিছু নেই। তবে আলকাতরা বাতুরে রঙ, ছাপ এগুলো বিকৃত রূচির পরিচায়ক।

থিয়েটারের সাজ-পোষাক প্রসঙ্গে বললেন—পোষাক ঠিক রুচি মাসিক হয় না! লোকে পোষাকের দোকান করে না কেন? তাতে তো লাভ হয়। থিয়েটারে এমনিতে সবাইকেই এক রকম সাজিয়ে দেয়। আমরা ঠাণ্ডে খুব চোঁটা করে উন্নতি করেছিলাম, রাখাল বাই (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) নিজে এসে সবাইকার আলোচনা আমায় রকম পাগড়ী বেঁধে দিতেন, অবন বাবুও হরদম 'আলজের'। তখনকার দিনে পশুতরা সংস্কৃতিবানরা প্রায়ই থিয়েটারে আসতেন।

ইংরেজের সার্টফিকেট ছাড়া আমাদের এখনও চলে না, আমি দর্শন-তর্কণ বুঝি না, থিয়েটার বুঝি। আমাদের দেশে বাজা ছিলো এখনও আছে। আর আমাদের ভরত মূনির সময়কার নাটক আর ইংরেজদের নাটকে অনেক মিল ছিলো।

—নাটককে যাত্রাইজড করতে হবে, তার জন্তে দরকার লেখক। যোগেশ বাবু থাকলে পারা যেতো। তবে এখনও লেখক পাওয়া যেতে পারে। আসলে চাই কিছু আগ্রহশীল যুবক-যুবতী, বলবার জায়গা, সতরঞ্চি, তামাক খাবার জায়গা আর কিছু অর্থ। বাংলা কথা বলতে বলতেও বই রিহাস্তাল হয়।

আমেরিকান ভাইস দেশে খুবই আসছে, আমেরিকান হারি দেখে হয় আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আসে।

Sacrilege করতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের দেশে যাত্রার দর্শন, Aesthetics ইত্যাদি সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করা হতো যে সাধারণ লোকে বুঝতে পারতো এক কিছু ধার্মিক convention ছাড়া এর দল ভালোই হয়েছিলো।

আমার মনে হয়, একজন মহাপুরুষ আসা দরকার, যিনি আমাদের মনের অন্ধকার তাড়িয়ে দিতে পারবেন।

এর আগে নাটক নিয়ে experimentation করেননি কেন জানতে চাওয়ায় বললেন—experimentation করার জন্তে martyr to the cause হবার রাস্তা পেলাম কোথায়, বাপের অর্থ না থাকলে কিছু করার উপায় নেই। I am not man enough to do it (i. e. to change the trend), ভয়ে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

নাটক আজকাল প্রগতিশীল হচ্ছে মন্তব্য করার বললেন—আজকালকার দিনের নাটকে পথ দেখাবার মতো কিছু আছে কি? প্রগতিশীল তো বলছে, কিন্তু কোন্ দিকে প্রগতিশীল? অর্থ না বুঝেই কথা বলা কেনো? রেডিও অভিনয়ধারা এমন কি পাই করা পর্যন্ত খুব ক্ষতি করছে, পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হচ্ছে তাই গড়গড় করে বলটা অভ্যাস হয়ে বাচ্ছে।

গান বুঝতে হলে সুরজ্ঞান থাকার কি দরকার জানতে চাওয়ায় বললেন—আমার নিজের মনে হয় সুরজ্ঞান না থাকলেও বেশকিছু গান

জনতে কান্না লাগে। আমারও ঐ জ্ঞান নেই, অথচ বেশভূষা গান শুনে চকল হই একথা অত লোক বলেছে।

হুবি কে কেমন আঁকে কার ছবি ভালো দেখায়, কেন এই নিয়ে কথা শুরু হলো, তখন বললেন—ছবি সবচেয়ে কেউ কোনো উৎসাহ করেনি আমাদের। অথচ ইউরোপে বা আমেরিকার ছোটো ছোটো সহস্রও আর্ট গ্যালারী থাকে। ছোটোরা তা দেখতে যায়, ছবি আঁকতে শেখে, পারিশ্রমিকের গুণে ছবি সবচেয়ে জ্ঞান জন্মায়। আর আমরা এসব বিষয়ে বিশেষরূপে অজ্ঞ।

আমার মনে হয়, জাত হিসেবে আমরা ছোটো, তবে আশা করি ভলবান আমাদের হুবহু খোঁচাবেন।

আর্টসে কেন্দ্রকারী আর পরলো মার্চ; দু'দিনই এলেন। প্রথম দিন থেকে কী পরিবর্তন করা দরকার এই নিয়ে কথা উঠলো, বললেন—আমার মনে হয় বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রোসেনিয়াম পুস্তকালয় উচিত। এসব কথা তোমাদেরই তো ভেবে দেখা দরকার, তবে আর কিছু করার আগে কাজ শুরু করা দরকার। তিন-চার হাজার টাকা হ'লেই তো শুরু করা যায়। তারপর বললেন—কেন্দ্রের লোকের রুচি কি রকম খারাপ হ'য়ে বাচ্ছে তা বলবার নয়। আর্টসে অ্যাগ্রিসিয়েশন হয় না আজকাল, হয় ক্যাম্পন, পলনো নবর পার্ক স্ট্রীটে দল বেঁধে সবাই ভিড় করে বাচ্ছে কিন্তু বোকে ক'জন? তাছাড়া বোঝাবার লোকও তো নেই, লোক বুঝবে কী ক'রে?

—আমার হৃৎ হয় বেঁচে আছি অথচ শক্তি নেই, গুণফিলিং অর্থাৎ সবাই মিলে গড়ে তুলবো, এই ইচ্ছেটা তো দরকার। দেশে কোন Organisation-টা কাজের? কাজের Organisation অত্যন্ত rare। আসলে willing young man দরকার।

একজন প্রশ্ন করলো গান শেখেননি কেন উনি, উত্তরে বললেন—গান শিখলে বোধ হয় ভালোই হ'তো। সুরের হতো ভবিষ্যৎ। তবে গাইয়েদের জীবনও খুব একটা সুরের কিছু নয়। অনেক বড় গাইয়ের কথা জানি যাদের জীবন বড় হুয়ের। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত হ'চারণনা বাইকী। তাদের ভাবটা don't care, লোকের সঙ্গে বাঁতা ব্যবহার করে অথচ সবাই হাত জোড় করে বলে থাকে।

আমাদের মধ্যে কথা ছিল কোলকাতার সংস্কৃতি-সম্মেলনের বিষয়ে, একজন বললো যে হায়ে কোলকাতায় বেড়ে চলেছে সম্মেলন, একমাত্র শুধু বেলেঘাটাতেই দেখুন না, কতগুলো আবির্ভাব ঘটেছে! এতে যে সংস্কৃতি বাবে। শুনে হাসলেন, বললেন—সংস্কৃতি বাবে। হায়ে কেনো? বেলেঘাটা তো ভালো জায়গা, আমি প্রথম ওদিকে বাই উলিশ' তেতালাশি সাপে। সেই সময়েই নন্দরদাবুদের সঙ্গে পরিচয় হয়। হেয় বাবু মাদ্রাস বেশ ভালো neutral লোক। ঠুকে পরিচিতি আসেন দাশ মশার, তিনি যে সি, আর, দাশ আর অল্প পুঙ্খ বা তা একথা কখনও ভাবেননি। তাঁর বুকাটা যেমন দরাজ ছিলো, মনটাও ছিলো তেমনি, তবে মাদ্রাসটাই বিশেষ চিন্তেন না। দরজার বাবু কিন্তু মাদ্রাস চিন্তেন প্রসঙ্গ, বার বা দাম তাকে ছাই দিচ্ছে। তবে একটা তুল জেনি করেছিলেন, (অবশ্য বিদ্যাবীরের কেউ কেউ বলতে পারেন, তুমি শিশির ভাড়াড়ি দেশের জন্ত-কি করেছ যে, স্বাধীনতার জন্তে বাঁধা জীবন-পণ করেছ)

তাঁদের কাজের তুল ধরো।) কর্পোরেশনে ঢুকে তাঁরা যেভাবে কনট্রাক্টদের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন তাতে ভবিষ্যতে তাঁদের শিখার যে অপব্যবহার করবে এই কথাটাই ভেবে দেখেননি।

—বিদ্যাবীরের টাকা উঠেছিলো ডাকতি ক'রে। টাকার লোক খুলনার, খুলনার লোক ঢাকার ডাকতি ক'রতো। তার পর সেই টাকা দিয়ে দল ক'রতো। তার ফলে কতো নিরীহ লোক যে কষ্ট পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিদ্যাবীরের মত ছিলো endjustifies means, সেই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে কতো ভালো ছেলেও immoral কাজ করেছে।

একাদশী প্রসঙ্গে বললেন—সরকার একটি তুল তুললেন, কিন্তু কী হয় সেখানে? বিশেষতঃ একাডেমি আছে, বার্গার্ড শ'র সব টাকা পাচ্ছে খুব কাজ ক'রছে। একজন ডিরেক্টর আছে বছরে আড়াই হাজার পাউণ্ড মাইনে পায়। কেনেথ ব্ল্যাক বুড়ো হয়েছেন বলে রিটায়ার করেছেন। অত একজন আছেন, লিভারপুল ম্যাগেট্টের অনেক কাল অভিনয় করিয়েছেন।

—আমাদের দেশে নাটক পড়তেই বা পারে কে? গিগিসবাবুর শতবারিকী হ'লো অথচ ক'জন তাঁর ক'টা বই পড়ছে আর প'ড়ে মানে বুঝছে। তাঁর নাটক তো খুব খারাপ কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের ঘোটে দু'খানি সফল নাটক আছে। তপতী আমাদের আগে কেউ বোঝবারই চেষ্টা করেনি, কারণ রবীন্দ্রনাথ বইটা পড়তও পারেননি। রাজা-কণীতে যে সংঘাতের ইংগিত ছিলো তপতীতে তাই পূর্ণতা পেয়েছে।

—তুলে দু' বছরে বোল লঙ্ক টাকা খরচ হলো অথচ হ'লো না কিছু। জনসংযোগ বিভাগও তো কতো খরচ হচ্ছে, সবায়েরই কিছু না কিছু হচ্ছে আর আমি ঘোটে দু'লাখ টাকা পেলে একটা কিছু করতে পারতুম।

পরের দিন যখন এসে দেখলাম বেশ সুক, কিছুদিন আগে কোথায় পুরোনো কি একটা বই অভিনয় করেছিলেন, লোকে তার দুর্নীতি করেছে। তত্ত্বপোষে বসে বললেন—বুড়ো বায়েসে জীত খোয়ালুম। ও সব পুরোনো বই কোনো মতেই করা উচিত হয়নি। পরিচিত একজন তো বললো, 'ও সমস্ত পুরোনো বই ছাড়ুন, দেখছেন তো পুতুলখেলা করে বহুধরুণী কতো নাম করেছে। আপনি তো আবার কাগজ দেখেন না', তা' দেখো, নাম তো কতলোকেই ক'লে আবার কতো লোকই গেলো, ছত্রিশ বছরে অনেক তো দেখলুম! পাখর ওপরে উঠলেও শেষ পর্যন্ত মাটিতে নেবে আসে।

অভিনেতাদের মধ্যে কার গলা ভালো, এই প্রশঙ্গে বললেন—গলা আমার খুব খারাপ নয়; আজকালকার দিনে আমার মতো গলাও তো দেখি না কারোই। কিন্তু দানীবাবু, অনুত মিত্র কি গিরিশচন্দ্রের মতো গলা আমারও নয়।

আবার বললেন—অনেকে বলেন চিরকুমার সভা একটি ভয়ানক নাটক, কেন যে অভিনয় হচ্ছে না। চিরকুমার সভা যদি নাটক হয়, তবে আমার এতদিন বুঝই নাটক করেছে।

Prostitution প্রশঙ্গে বললেন—আমাদের দেশে prostitution আছে বলে আমরা ছোটো জাত। লগুন দেখিনি, তবে জেনেছি, সন্ধ্যার পর Picadillyতে বাপ-ছেলে একসঙ্গে পথ চলতে পারে না। নিউইয়র্ক মেয়েরা কেমন ক'রে পুঙ্খবদের pester

করতে পারে তার প্রমাণ পোষেছি। ওদের মেয়েদের মেয়েরা কিছু নিলজ্জ। দু'চার হাজার পাউন্ড আপিসে কাজ করে, কি নতুন কমানিয়ান বা এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে থাকিয়ে দাঁড়িয়ে ভাব করা যায়।

—আমাদের দেশের বেজারদের মধ্যেও একটি ত্রুটি আছে। তারা রাত হজোড় করে সকালবেলা গজানান সেরে ঠাকুরপ্রণাম করবার সময় লেখ নিয়ে জল পিঁড়িছে দেখা যায়। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও ঠিক ওই ভাবটি দেখা যায়।

—আমাদের দেশে moral যে ভাঙতে তার poverty is the cause কিন্তু only cause নয়, কেবেরা যদি নিজেরা বোঝপার করে তো এ অবস্থার বদল হয়।

বিদেশী নাট্যকার ও নাটকে দলের প্রসঙ্গ বললেন—জিয়ে! লেখে ভালো, কিন্তু বড় বস্তুতাত্ত্বিক। বিদেশী দলদের ভালো হচ্ছে drilling। নিউইয়র্কে ভালো লেগেছে নিগ্রো বই Green Pastures। নাটক ঠাঁড় করাতে হ'লে দরকার প্রাণ। নিগ্রোদেরই

প্রাণ আছে। আর কি গান! এমন পাতের পল্ল এসেছে নেই।

—ও'নীদের Desire under the Elms এ আছে—বীভ এসো, নয়তো দেখটা গেল। ওদের মেয়েদের আত্মীয়তা বহুব বয়স পার হ'লেই কাজকে যদি খুব ভালোবাসে তো বলে, come on, my honey, I will manage.

—বিয়ের আর সার্বজনীন উৎসবে আমাদের যে রকম waste হয়, তা দেখে মনে হয় এ জাতের কিছু হবে না।

আবার (পুতুল খেলার কথায়) বললেন—নোরা আমাদেরও করতে বলেছিলো, তার উত্তরে আমি বলি, ইবসনের আটোরা না আটবিট সালের, এখন নোরা পুরোনো হয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক শক্তিমতী নারী এখন রপক্ষেত্র এসেছে।

—ইবসনের নাটক Dated হ'য়ে গেছে। সেক্সপীরের সঙ্গে তার তফাৎও সেইখানেই। সমাজ একটু বদলালেই problems বদলে যায়।

[কলকাতা]

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

রেড রোডের শুকনো পাতা

উড়তে লাগল কয়েকটি শুকনো বরা পাতা
ছুটে-চলা মোটরের সামনে হাওয়ার হাওয়ার—
বাসমি, হলদে, লালচে আর নারঙ শুকনো পাতা
নানা আকারের—হয়তো বা নানান বয়সের।
ওরা যেন কয়েকটি ক্ষণ—ছিল স্বপ্ন হ'য়ে
বিশ্বস্তির মোলায়েম পুরু ধুলোর শরায়—
আর এই মুহূর্তে জেগে উঠল তড়িত-তাড়িত হ'য়ে
ছুটন্ত গাড়ীর উন্নত আবেগের অগ্নি-গর্ভ স্পর্শে।
ওরা যেন কয়েকটি প্রজাপতি—
ঘুমিয়েছিল ফুটে-ওঠা নানা রঙের মুহূর্তের
ফুলমধু পান করে
সন্ধ্যার বাজা বোদের ছায়া ছায়া আসরে,
রেড রোডের দু'ধারের গাছের আড়াল-ওঁড়ায় বাসরে।

কত উন্নতিত হৃদয়ের মধু বনে-বাওয়া মুহূর্তের বল
কত অক্ষ বনে-বাওয়া কেশামির উনপকাশে হাওয়া
কত স্বপ্নের দিশাহারা চপলতা
ওই মুহূর্তগুলি—ওই পাতাগুলি—
ওই প্রজাপতিদের শুকনো ম'রে-বাওয়া

রঙিন জানাগুলি,

পাতা হ'য়ে বরা আবার উড়তে লাগল
ছুটন্ত গাড়ীর প্রমত্ত আবেগের সম্মুখে
অগাধে ডুবে বাওয়ার সূঁখে—
ঘুম ভেঙে বাওয়া শ্রুতি-সচকিত পরীদের মত

কীপতে কীপতে

রক্তিম আলোর বিহ্বল বাতাসে আসর

অন্ধকারের রহস্তে।

জানলাম—

একদিন এই মুহূর্তও মিশবে ঐ পাতার দলে
ঘুমিয়ে পড়বে হাজার হাজার মুহূর্ত চিরন্তন স্বপ্নে
বিভোর হ'য়ে

তুমি আবার জেগে উঠতে—কেনে উঠতে
কোনো এক ছুটন্ত গাড়ীর প্রমত্ত হাওয়ার সম্মুখে
অগাধে ডুবে বাবার সূঁখে।

কালীদেবী ও কালীপূজার ইতিহাস

ত্রিশিষ্মণ দাশগুপ্ত

পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ জগতিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিতআদিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীয়া ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাঙলা দেশের শক্তি-সাক্ষার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত-সর্বধরা হইয়া উঠিয়া দেবীর অঙ্গসব রূপ লব্ধকথানি পিছনে ফেলিয়াছেন। বাঙলা দেশের শক্তিসাধনা এবং শক্তি সাহিত্যকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে সেই জন্ত এই কালী বা কালিকার ধারাটির প্রাচীন ইতিহাস একটু অল্পসন্ধান করা প্রয়োজন। কি করিয়া এই দেবী মহাদেবীর সঙ্গে মিলিয়া সেসের তাহার ইতিহাস বহু পুরাণের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আবিষ্কার করিবার আমাদের প্রবৃত্তি। বেদের রাজিসূক্তকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে এক রাজিদেবীর ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে কাঁহারও কাঁহারও বিশ্বাস সেই রাজিদেবীই পরবর্তী কালে কালিকা রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমাদের এই কৃষ্ণ-ভরদ্বারী দেবীর প্রসঙ্গে বৈদিক কৃষ্ণ-ভরদ্বারী নিষ্পত্তি দেবীর কথাও কেহ কেহ মরণ করাইয়া দিয়াছেন। (১) 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' নিষ্পত্তি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' দেবীকে কৃষ্ণা (কৃষ্ণা হি তত্তম আসীদথ কৃষ্ণা বৈ নিষ্পত্তিঃ, ৭।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নিষ্পত্তিঃ, ৭।২।১১) বলা হইয়াছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৪।১।৭) নিষ্পত্তি দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে এবং নিষ্পত্তি দেবীর হস্তস্থিত এই পাশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্ত প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই নিষ্পত্তি দেবীর পরবর্তী কালে আর কোনও ইতিহাস দেখি না। সুতরাং বর্ণনার সামান্য একটু কোথাও মিল দেখিয়াই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত মনে হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, লঙ্কাকারকপিণী রাজিদেবীকেও কালীর সহিত যুক্ত করা হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্গীত 'সহজিকর্ণমৃত' নামক সঙ্কত সংগ্রহগ্রন্থে কবি ভাস্কর্যের নামে বৃত্ত একটি শ্লোকে দেখি কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'সুংস্কারা ইকাণ্ডেচী চিরমবতুতরাং ভৈরবী কালরাহিঃ'।

বৈদিক সাহিত্যে কালী এই নামটি আমরা প্রথম দেখিতে পাই 'বৃহত উপনিষদে'; সেখানে কালী বজ্রাঘ্নির সপ্ত জিহবার একটি সিক্তা।

১। তার জন উজ্জ-কৃত Shakti And Shakta গ্রন্থের প্রকাশনা মুখোপাধ্যায় লিখিত দ্বিতীয় পরিশিষ্টে প্রাপ্য।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা বা চ স্তম্ভধরী।
ক্ষুদ্রলীলী বিশ্বকটী চ দেবী
লোমায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥

এখানে 'কালী' আছত্তি-গ্রহণকারিণী অগ্নিজিহ্বা মাত্রই; মাতৃ-দেবীষের এখানে কোনও আভাসই নাই। শুধু বিশ্বকটীর ক্ষেত্রে দীপ্যমান। অর্থে দেবী কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাই। 'মহাভারত'ও বজ্রাঘ্নির এই সপ্তজিহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাই (আদি, ২৩২।৭)। দার্শনিক মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিকে অগ্নির সপ্তজিহ্বা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থলে 'কালী'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পৌরাণিক কালীদেবীর সহিত মহাভারতের এই সকল স্থলে বর্ণিত কালীদেবীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌপ্তিক পর্বে দেখিতে পাই, দ্রোণের মৃত্যুর পরে দ্রোণপুত্র অশ্বপামা বধন রাজিতে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিমিত্ত বীরগণকে হত্যা করিতেছিলেন তখন সেই হস্তমান বীরগণ ভরদ্বারী কালীদেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কালীদেবী রক্তাশ্রনয়না, রক্তমালাচ্ছলেপনা, পাশহস্তা এবং ভরদ্বারী। কালীর ভীষণ স্বরূপ মহাভারতের প্রতীক; কালরাজিকপিণী এই দেবী বিগ্রহবতী সহায়।

মহাভারতে কালীদেবীর এই উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজনা হইতে পারে। পরবর্তী কালের যোজনা না হইলেও এই সব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবীষের আভাস নাই; কালী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভরদ্বারী ছায়াসূচিত দর্শনের দ্বার। কবি কালিদাসের সময়েও কালী কোনও প্রাণনা দেবী বলিয়া গৃহীত হন নাই। 'কুমারসম্ভবে' উমার সহিত মহাদেবের বিবাহ-প্রসঙ্গে বর-যাত্রার বর্ণনার দেখিতে পাই, কৈকাস পর্বতের মাতৃকাগণ বিবাহযাত্রার মহাদেবের অঙ্গগমন করিয়াছিলেন; আর—

তাস্যাক পঞ্চাং কনকপ্রভাণা

কালী কপালাভরণা চকাশে।

বলাকিনী নীলপদ্মোদরাজী

দুঃখ পুষ্কলিপুতত্বদেব ॥ (৭।৩১)

কনকপ্রভা তাঁহাদের (সেই মাতৃকাগণের) পশ্চাতে কপালাভরণা কালী অগ্রে বিদ্যুৎপ্রসারকারিণী বলাকা-সমমিতা নীলমেঘরাজির দ্বার পোতা পাইতেছিলেন। মাতৃকাগণের পঞ্চাঙ্গামিনী এই কালীদেবী কালিদাসের যুগেও একজন অপ্রাণনা দেবী বলিয়া বনে হয়। 'মহাভারত' মধ্যে একটি উপন্যাসেও এই কালী বা কালিকা দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই। রাম-লঙ্কণের জ্যান্মন তনয়

ভরসী তাড়কা দাক্ষী স্বৰ্ণন আভ্যুৎকণ কবিল তখন সেই কুক্ক
গ্রতির দ্বার কুক্কর্ণী তাড়কাকে মনে হইতেছিল চকলকপালকুণ্ডলা
কলাকায়ুস্তা কালিকার মত।

জানিনাদমথ গৃহতী তরো:

প্রাচুর্যাস বহলাকপাঙ্কজি:

তাড়কা চকলকপালকুণ্ডলা

কালিকের নিষিদ্ধা বলাকিনী ॥ (১১১৫)

মহিনাথ 'কালিকা' শব্দের অর্থ কালিকাদেবী করেন নাই, 'কালিকা' শব্দের এক অর্থ 'বনাবলী', সেই অর্থ ধরিয়া এবং 'বলাকিনী' কথার সহিত যুক্ত করিয়া 'বনাবলী' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু 'চকলকপালকুণ্ডলা' কথাটি তাড়কা বসন্তে প্রযুক্ত হইলেও ইহা কালিকা দেবীর কথাই মরণ করাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কবি কালিদাসের 'কালিদাস' নামটির ব্যুৎপত্তি কি? 'কালীর দাস' এই অর্থ কি কালিদাস? 'ঈ' এখানে বিকল্পে হ্রস্ব হইয়াছে, 'কালীদাস' পাণ্ড বিকল্পে সিদ্ধ। কালিদাসের লেখার মধ্যে কালী ভেদন কোনও প্রসিদ্ধ দেবীর লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু কালিদাস নামের ব্যুৎপত্তিতে মনে হয়, কালীর দেবীর তখন বহু সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে এক বক্তৃতাশ্লোপা ভরস্করী দেবীর উল্লেখ পাই। যে নামেই দেবীকে পাই না কেন, মনে হয় এই সকল দেবী তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। আমরা 'বিল হরিবংশে' মত্তমাসপ্তমিরা দেবীকে শবর, বর্ষর, পুলিনঙ্গণ কক্কৃক পূজিত হইবার কথা পাইয়াছি। যুবকর (যষ্ট শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) 'বাসবদত্তার' আমরা কুমুদপুরের গঙ্গাতীরে ভগবতী বা কাভ্যায়নীর বাসের কথা জানিতে পারি। এই দেবী 'তত্ত-নিতত্ত-মহাবন-দাবালা', 'মহিমহাশ্বর-গিরিবজ্রদারদারা' এবং 'প্রণয়প্রণতগঙ্গাধরজটাজুট-খলিত-জাহ্নবী-জলদারামেতপাদপদ্মা' বটেন, কিন্তু 'বেতালাভিধান'। এই 'বেতালা' অভিধানটিই এখানে ভালভল করে। বাণভট্ট রচিত (সপ্তম শতক?) 'বায়ধরী'তে আমরা শবরগণ কক্কৃক বনমন্ডে যে ভাবে কৃষিকের প্রাধান দিয়া 'চণ্ডার' পূজার বর্ণনা পাই, বিশেষতঃ চণ্ডী-পূজক বৃদ্ধ শবরের যে ছুঃখিত বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা কবির শবরপূজিতা, বক্তৃতাশ্লোপা ভরস্করী চণ্ডীদেবীর প্রতি অল্পদ্বারই ভোতনা করে। বাসুপতিবাজ (অষ্টম শতক) তাঁহার 'গড়ভবহো' প্রাকৃত কাব্যে শবরপূজিতা 'পূর্ণ' বা পদ্মপরিহিতা 'পূর্ণশবরী'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভবকৃষ্ণের রচিত (সপ্তম শতক) 'মালভীমায়ব' নাটকের পঞ্চমকে আমরা নরমাস-বলিদানে পূজিতা ভরস্করী 'কাদা' দেবীর বর্ণনা পাই। এই দেবীই ভরস্করী চানুত; বনপ্রদেশে সন্নিহিত শশানঘাটের নিকটে ইহার মন্দির। ইনি কুক্কর্ণী উগ্রা দেবী।

কুক্কর্ণী শোণিতশ্লোপা ভরস্করী চানুত দেবীকে আমরা কালী বা কালিকাদেবীর সহিত পরবর্তী কালে অভিন্না দেখিতে পাই। কিন্তু মনে হয়, ইহার মূলে দুই দেবী ছিলেন; আকার সাঙুতে এবং সাধন্যে ইহারা পরবর্তী কালে এক হইয়া গিয়াছেন।

এই কুক্কর্ণী ভরস্করী কালিকা ও চানুত দেবী এক পন্থেবরী মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কণ্ডের 'চণ্ডীতে

এই মিলনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। উপাখ্যানটির সাহায্যে পুরাণকারেরা এই-জাতীর মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ইন্দ্রাকি স্বেপন তত্তনিতত্ত বয়ের জন্ত হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে আর এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন, এবং এই দেবী স্নেহেতু পার্ণভীর শরীরকোষ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন সেই জন্ত সেই দেবী 'কৌশিকী' নামে লোকে পরিগীত হইলেন। (১) কৌশিকী দেবী এইরূপে দেখ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্ণভী নিজেই কুক্কর্ণী হইয়া গেলেন, এই জন্ত তিনি হিমালয়বাসিনী 'কালিকা' নামে সমাখ্যাতা হইলেন। (২) মনে হয় এই যুগে কালিকা দেবী কিশিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেও বাসিনীকী পুণীক হইয়াছিলেন, সেই জন্ত হিমালয়বাসিনী দেবীর সহিত এইভাবে তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে 'কালিকা'র আবির্ভাব-রহস্য এইরূপ দেখিলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই শিরা আবার অজ্ঞান দেখিতে পাই। তত্ত-নিতত্তের অল্পচর চণ্ড-বুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্ত্যস্ত অন্তরগণ দেবীর নিকটবর্তী হইলেন—

ততঃ কোপ চকারোচ্চরখিকা তানবীন প্রতি।

কোপেন চাত্তা বদন মসীর্ণমভূৎ তদা।

জুট্টীকুটীলাং তত্ৰা ললটকলকাকুট্রত।

কালী কদালবদনা বিনিব্রজাসিগাশিদিনী। (১১৫-৬)

'তখন অবিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত কোপ করিলেন; তখন কোপের দ্বারা তাঁহার বদন মসীর্ণ হইল। তাঁহার জুট্টীকুটীল ললটকলক হইতে ত্রুত অসিপাশধারিণী কদালবদনা কালী বিনিব্রজা হইলেন।' এই কালী দেবী—

২। এই কৌশিকী দেবী অভিশর বৃন্দরী ছিলেন; তাঁহার রূপেই তত্ত-নিতত্ত বৃদ্ধ হইয়াছিল। এই 'কৌশিকী' দেবী মূলে (উক্তর ভাগ্যকরের মতে) কুশিক জাতির (tribe) দেবী ছিলেন। দেখিতেছি, এই কৌশিকীরূপেই দেবী তত্ত-নিতত্ত বৎ করিয়াছিলেন। কুশিক-জাতির এই কৌশিকী দেবীই কি তত্ত-নিতত্ত অন্তর নিধনের উপাখ্যানাদি লইয়া হিমালয়-বাসিনী পার্ণভীর মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া হিমালয়-বাসিনী দেবীকেই তত্ত-নিতত্তবাভিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন? শিব-পুরাণ-সাহিত্যের কৌশিকীর তত্ত-নিতত্ত হ্রদয়ের বিশেষ কারণ দেওয়া হইয়াছে। মার্কণ্ডের চণ্ডীতে দেখিতে পাইতেছি, দেবীর দেহ হইতে গৌরবর্ণা অনিন্দ্যহ্রদরী যে দেবী বাহির হইলেন তিনিই কৌশিকী; কিন্তু পদ্মপুরাণে অল্পকথা দেখিতে পাই, দেবীর দেহ হইতে কুক্কর্ণী যে রাত্রি দেবী বাহির হইয়া আসিলেন তিনিই কৌশিকী—এই কৌশিকী দেবীকে ব্রহ্ম বিদ্যাচলে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিলেন। কালিকা-পুরাণেও দেখি, কৌশিকী রূপে পার্ণভীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া কুক্কর্ণী ধারণ করিয়া বালিকা রূপ গ্রহণ করিলেন। সেই দেবীই কালরাত্রি (৫২৩২-৩)। পদ্মপুর বিদ্যারী উপাখ্যানগুলি দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, কৌশিকী নামে যে পৃথক দেবী ছিলেন তাঁহাকে মহাদেবীর সহিত মিশাইয়া লইবার এই সব পৌরাণিক চেষ্টা।

৩। তত্ৰা বিনির্গতায়াত্র কুক্কর্ণ সাপি পার্ণভী।

কালিকৈ সমাখ্যাতা হিমালকুভায়া ॥ (৫১৮)

বিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর্য নরমালাবিকৃষণ।
 বাণিচর্যপরিধা না তুম্বাসাতিভেরবা।
 অতিবিস্তারবননা জিহ্বাললনভীষণ।
 নিমগ্নায়কনরনা নালাপূরিতদিগ্ধুখা ॥ (৭১৮)

‘বিচ্ছিন্নরককাল-বারিগী, নরমালা-বিকৃষণ, ব্যাচর্যপরিহিতা, তুম্বাসা (মাংসহীন অচ্ছিন্নময় দেহ), অতিভেরবা, অতিবিস্তার-বননা, লোলজিহ্বা হেতু ভীষণ, কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষুবিধিটা,— তাঁহার নামে দিগ্ধুখা আশ্রিত।’

দেবী হইতে বিনিষ্কৃত হইয়াই সেই কালীদেবী বেগে দেবশ্রেষ্ঠ অম্বরগণের সৈন্সমধ্যে অভিপত্তিতা হইয়া সেখানে মহা-অম্বরগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের সৈন্সবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দেবী পৃষ্ঠ-রক্ষক, অঙ্গ-প্রাঙ্গক, বোঁকা ও গলগঢ়াদিসহ হস্তাঙুলিকে হস্তে লইয়া মুণ্ডে গ্রাস করিতে লাগিলেন। শুষ্ক হস্তাঙুলিকে নষ্ট, বোঁকার সহিত বোঁদাকে, সারথির সহিত রথকে মুখে ফেলিয়া দিয়া দম্ভধারা অতিভীষণ ভাবে চৰ্ণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও চুল ধরিলেন, আবার কাহাকেও ঘ্রীষ্য ধরিলেন; কাহাকেও পায়ের দ্বারা আক্রমণ করিয়া অস্ত্রকে বন্ধের দ্বারা মর্ষিত করিলেন। সেই অম্বরগণ কর্তৃক নিশ্চিন্ত শত্রুগুলিকে এক মহাশত্রুগুলিকে তিনি মুখে গ্রহণ করিলেন এবং যোবে দম্ভধারাই মথিত (চূর্ণ) করিলেন। অম্বরগণের কতগুলিকে তিনি মর্ষণ করিলেন, কতগুলিকে ভক্ষণ করিলেন, কতগুলিকে বিতাড়িত করিলেন। অম্বরগণ কেহ কেহ অসিধারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাড়িত হইল, কেহ কেহ দম্ভাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কলকাল মধ্যে সমস্ত অম্বরগণের নিশ্চিন্ত দেখিয়া চণ্ড সেই অতিভীষণ কালীর দিকে ধাবিত হইল। সেই মহাসুর চণ্ড মহাভীম শরবর্ষণের দ্বারা এক মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা সেই ভীষণনয়নকে ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু কালমেঘের উদয়ে যেমন অসংখ্য সূর্যবিধ শোভা পায় সেইরূপ চক্রসমূহ তাঁহার মুখগহবরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইল। অতঃপর ভৈরবনাদিনি কালী অতিরোবে ভীষণ ভাবে অটহাস করিলেন— তাঁহার কয়লা বস্তুর অন্তঃপাতি ভীষণদর্শন দশনগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পরে মহাখড়্গ উত্তোলন পূর্বক দেবী হৃদয়নাশে (হৃদ লক্ষ্যে) চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং তাহার চুলে ধরিয়া সেই খড়্গের দ্বারা তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন। চণ্ডকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া মুণ্ড দেবীর প্রতি ধাবিত হইল; দেবী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গের দ্বারা আহত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। হতশেষ অম্বরসৈন্যগণ চণ্ডমুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। চণ্ডমুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে গ্রহণ করিয়া কালী চণ্ডিকার নিকটে গিয়া প্রচণ্ড অটহাসের সঙ্গে বলিলেন,—‘এই বৃদ্ধকে আমি এই চণ্ড-মুণ্ডে হই মহাপণ্ডে তোমাকে উপহার দিলাম, তুমি স্বয়ং শুভ-নিশ্চয়কে ফলন করিবে। দেবী চণ্ডিকা বধন কালীকে বলিলেন,—

বয়স চণ্ডক মুণ্ডক গৃহীয়া যমুপাগতা।

চামুণ্ডিত ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি ॥ (৭২৭)

‘যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে (তাহাদের ছিন্ন শির) লইয়া আসিয়াছ, সেই কারণে তুমি লোকে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে।’

চণ্ড শব্দ হইতে বা মুণ্ড শব্দ হইতে চামুণ্ডা শব্দ হয় না; চণ্ডের ও মুণ্ডের মুণ্ড লইয়া তাহার পরে অকারেণ চৈতে দীর্ঘ করিয়া এবং স্ত্রীলিঙ্গে ‘আ’-প্রত্যয় করিয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে হয়। একাত্তর ব্যুৎপত্তিগুলি দেখাই গোষ্ঠামলের জন্য পুরাণকারগণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার তৎকালের প্রচলিত কালীদেবীকে এবং তৎসদৃশা চামুণ্ডা দেবীকে মহাদেবীর সহিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রয়োজনবোধ করিয়াছিলেন; সুতরাং দেবীকে ‘কালী’ করিয়া এবং চণ্ড-মুণ্ড-হস্তী চামুণ্ডা করিয়া সেই কাৰ্য সাধন করিলেন।

রক্তবীজ-বধের সময়ও কালীদেবী চণ্ডিকাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রাহত রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তধারা ভূমিতে পড়িবামাত্রই সেই রক্ত হইতে রক্তবীজের দ্বারা অসংখ্য অম্বর বোঁকা উদ্ভিত হইতেছিল; তখন দেবী চণ্ডিকা—

উবাচ কালী চামুণ্ডে বিস্তর বদনং কুরু ॥

দেবী কালীকে বদন বিস্তার করিয়া রক্তবীজের দেহ হইতে নির্গত রক্তবিলু সকল যুগ্মবাদনের দ্বারা গ্রহণ করিতে বলিলেন—এবং সেই রক্তনির্গত অম্বরগণকেও ভক্ষণ করিতে বলিলেন। দেবী এই বলিয়া শূলের দ্বারা রক্তবীজকে আহত করিলেন, কালীও মুখের দ্বারা তাহার রক্ত লেহন করিলেন। সেই কালী-চামুণ্ডার মুখে পতিত শোণিত হইতে বহু সকল অম্বর সমুদ্রগত হইয়াছিল তাহাগুলিকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ করিলেন। চামুণ্ডার এইরূপ শোণিত পানের ফলে রক্তবীজ নিরস্ত হইয়া গেল এবং দেবী তখন অতি সহজেই তাহাকে হনন করিলেন। কালী-চামুণ্ডার রক্তলোলুপ এই ভাবে ‘চণ্ডী’তে নূতন রূপে প্রকাশ পাইল।

রক্তলোলুপা কালীর এখানে যে ভয়ঙ্কর বর্ণোদ্ভাসিনী রূপ দেখিতে পাইলাম অস্ত্রাশ্র পুরাণে এই জাতীয় বহু বর্ণনা দেখিতে পাই। উপপুরাণগুলিতে ইহার আর কিছু কিছু বিস্তারও দেখিতে পাই। পরবর্তী কালের পুরাণতন্ত্রাদিতে আমরা কালী ও চামুণ্ডাকে এক করিয়াও পাই, পৃথক করিয়াও পাই। উভয় দেবীর ধ্যানেও পার্থক্য আছে। চামুণ্ডা চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা; আললিত-কুস্তলা নন, ‘শিঙ্গলযুগ্মজা’ (জটাধারিণী?); উল্লঙ্গিনী নন, শাঙ্কলম্বারুতা (কোন কোন পুরাণে গজচর্ম্মাধা) সর্ব্বলয়ের বর্ণনাতেই দেখি, চামুণ্ডাদেবী নির্মালা এক কুশোদরী, তাঁহার চক্ষু কোটরাগত। কোন ফলেই কালিকার এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই না। সাক্ত-সকলন গ্রন্থগুলিতে কালিকার বর্ণনার মাঝে মাঝে দেখিতে পাই যে কালিকা অজিনায়ুতা। ৪ ‘সমুজ্জিকর্ণায়ুতে’ বৃত্ত উমাপতি ধরের একটি শ্লোকেও কালীকে অজিনায়ুতাই দেখিতে পাই। ইহা পরবর্তী কালের মিশ্রণের ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি। চামুণ্ডার বর্ণনার একটি জিনিস প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করি, চামুণ্ডা অতি কুশোদরী। কবিগণ কর্তৃক কালীর বর্ণনারও হানে হানে কালীকে কুশোদরীশে দেখি। ভাস্যক কবি কালীকে ‘কুংকমা’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুভাবিতরত্নভাণ্ডাগারে কালীর বর্ণনায় দেখি—

নীলকুণ্ডলবোণাধরনহলহল্লবজিহ্বাশ্রী-
 ত্রাণাকোজবিলুপ্রবলতরুভবকজারি কুলিঙ্গায়।

কালী কঙ্কালশেখামূলগলজলনুগুণমালাকালী-
গুণসংবাহিনেত্রামজিননিবলনাঃ সৌমি পাশাবিহঙ্গম্ ॥ ৫

পূরণ, উপপূরণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার
যে বিস্তার ও বিবর্তন দেখিতে পাই, সে বিষয়ে আমরা লীর্ণ
আলোচনা করিতে চাহি না। এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাশেকা
লক্ষ্য বস্ত্র হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। শিব কালীর পদে স্থিত,
কালীর এক পদ শিবের বৃকে স্থিত। সাধকের দিক হইতে এই
তন্ত্রকে নানাভাবে গভীরার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৬ কিন্তু
কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবাক্ষর্য্য দেবীর বিবর্তন সাহায্য
করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ সাংখ্যের নিষ্ঠুর পুরুষ ও
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রের 'বিশরীতরতাতুরা'
তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ নিষ্কির দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিনী
শক্তিদেবীর প্রাধান্য এবং প্রতীক। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাশেকা প্রধান
কারণ—বাহ্য মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনার কালিকা
শিবাক্ষর্য্য নন, শবাক্ষর্য্য; অস্তুরনিধন করিয়া অস্তুরগণের শব তিনি
শবদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবাক্ষর্য্য বলিয়া বর্ণিত।
দক্ষিণাকালীর প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও দেখিতে পাই—

শবরূপ-মহাদেব-জদয়োগপরি-সাহিত্যম্ ॥

... ..

মহাকালেন চ সমঃ বিপরীতরতাতুরাম্ ॥

পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তার শক্তি বিহনে শিবেরই শবতা-
প্রাপ্তির তত্ত্ব খুব প্রশসিত হইয়া গঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই
পূর্ববর্তী কালে বর্ণিত শবের স্থান গ্রহণ করেন—শবাক্ষর্য্য দেবীও
তাই শিবাক্ষর্য্য হইয়া ওঠেন। অস্তুরের শবাক্ষর্য্য বলিয়াই যে দেবী
শিবাক্ষর্য্য বলিয়া কীৰ্ত্তিতা বাঙলা দেশের শাক্ত-পন্থাবলীর মধ্যে এই
সভ্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই। সাধক রামপ্রসাদের
নামে প্রচলিত একটি গানে দেখিতে পাই—

শিব নয় মায়ের পদতলে ॥

ভটা মিথ্যা লোকে বলে ॥

দৈত্য বোটা ভূমে পাড়ে,

মা পাঁড়ায় তার উপরে,

মায়ের পাদম্পর্শে দানবদেহ

শিবরূপ হয় বর্ণস্থলে ॥ ৭

মায়ের পাদম্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা প্রাপ্তির, আসল অর্থ
হইল, শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরমলয় অস্তুরের শবই তত্ত্ব-
দৃষ্টিতে শিব রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক কালে যচিৎ মৈথিল
কবিসিৎ ঠাকুরের দেবী-বর্ণনাতোও দেখি—'শিবশবরূপ-উরসি তুচ্ছ

৫। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই দুখণ্ডী কালীমূর্ত্তিকে
অবলম্বন করিয়া একটি অপূর্ণ আধুনিক কবিতা রচনা করিয়াছেন
তাহার 'ত্রিঘাটা' কাব্যগ্রন্থের 'পশাবিনী' কবিতায়।

৬। ঋতব্য—'শিবের বৃক জামা কেন?'—বিজয়কৃষ্ণ
সেবশর্মা।

৭। ভাবতন্ত্র ও রামপ্রসাদ, উক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,
৩৯ পৃ।

পদবৃণ, গলা বাস সমনানে ॥ ৮ তন্ত্রাদিতে শিবের বৃকে কালীর প্রতীক
বিষয়ে বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা লেখিতে পাই। যেমন মহানির্বাণ
তন্ত্রে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল তিনি সর্বপ্রাণকে কলন অর্থাৎ
গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে
কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আত্ম পরম 'কালিকা'।
কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আশ্রি,
সকলের কালধরুণা এবং আশীষভূতা, এই নিমিত্তই লোকে দেবীকে
আত্মকালী বলিয়া কীর্ত্তন করে।—

কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

মহাকালস্ত কলনাং যমাতা কালিকা পরা ॥

কালসংগ্রহণাং কালী সর্ববোধানিরূপিনী ॥

কালবাদ্যাদিকৃত্যাদাতা কালীতি গীয়েস ॥

বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্রাদির ভিতরে 'কালীতন্ত্র' হতে কালীর বর্ণনাই
কালীর ধ্যানরূপে কৃৎয়ানন্দের তন্ত্রসারে গৃহীত হইয়াছে এবং কালীর
এইরূপই এখন সাধারণ ভাবে বাঙলা দেশের মাতৃগুণার গৃহীত।
দেবী কবালবধনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিঘা,
মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বামহস্তে বৃগলের অধোহস্তে সর্ভশস্ত্র শিব,
আর উর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, উর্ধ্বহস্তে বর।
দেবী মহামেঘের বর্ণের স্তায় স্ত্রীম বর্ণা (এই জন্তই কালী দেবী স্ত্রীমা
নামে খ্যাতা) এবং দিগবরী; তাহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত
ক্ষরিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত; আর দুইটি শবশিত তাহার কর্ণভূষণ।
তিনি ঘোররক্তা, কবালান্তা, পীনোন্নতপরোধর; শবসমূহের করদ্বার
নির্মিত কাঁকী পরিহিতা হইয়া দেবী হসমুখী। ওষ্ঠের প্রান্তস্থ
হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিম্বুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদিনী,
মহারৌদ্রী—আশ্রয়গৃহবাসিনী। বান্দবদ্যমণ্ডলের স্তায় দেবীর ব্রিনত্র;
তিনি উন্নতহস্তা, তাহার কেশধাম দক্ষিণব্যাপী ও আললুসিত।
তিনি শবরূপ মহামেঘের জদয়োগপরি সজ্জিতা; তিনি চতুর্দিকে
ঘোররবকারী শিবাক্ষর্য্যের দ্বারা সমধিতা। তিনি মহাকালের সহিত
'বিশরীতরতাতুরা'-স্বখপ্রসন্নবদনা এবং 'স্নেহাননসরোজা'। (১)

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালীর বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়।
'সহস্রিকর্ণামৃত'ে অজ্ঞাতনামা কবির একটি চমৎকার কালীবর্ণনা
পাওয়া যায়।—

শিখণ্ডে খণ্ডেলুঃ শশিনিনকরো কর্ণবৃগলে

গলে তারাহারজ্বরকলমুজ্জক্রে চ কূচরোঃ ॥

তড়িংকাঁকী সন্ধ্যাসিচরচিচা কালি তসয়

তবাকলঃ কল্যুপারমভেদো বিজয়তে ॥

শিখণ্ডিনী দেবীর মূহুপুঙ্খ-চূড়াতেই খণ্ড-ইন্দু; কর্ণবৃগলে ছই
কুণ্ডল হইল চক্ষু স্বর্ষ; গলায় তারার হার, কূচবৃগলে উড ডক্ক
(চক্ষুপথকক); তড়িংই কাঁকী; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন।

'মহানির্বাণ-তন্ত্র'র মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার
একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সেখানে দেখি পার্বতী দেবী
মহেশ্বরকে প্রের করিতেছেন যে, মহাদেবানি-বরুণা আদিশক্তিধরুপিনী
মহাভূতি-সম্পন্ন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতা যিনি, মহাকালী তাহার আবার

৮। গীতমালা, শ্রীউমানন্দ স্বা সংলিভ। ১৪। ৩১-৩২।

৯। কবালবধনা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা—ইত্যাদি।

শক্তিনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সপাশিব বলিতেছেন—‘হে ত্রিপুরে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্যের নিমিত্ত গুণকিয়া অমৃতসারে দেবীর রূপ প্রকল্পিত হইয়া থাকে। শ্বेतগীতাদি বর্ষ যেমন ক্রমে বিলীন হয়, হে শৈলজ্যে, সর্বভূতসমূহ তেমনই কালীতে প্রবেশ করে। এইজন্যই বৌগিগণের হিতের জন্ত সেই নিগুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ষ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অমৃততত্ত্বের হেতুই এই নিত্য কালরূপা অব্যয়া কল্যাণরূপিণীর মলাটে চন্দ্রচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শশি স্বৰ্ণ আয়ি ধারা তিনি এই কালকৃত জগৎ সম্যক দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার তিনটি নয়ন কল্পিত হইয়াছে। সর্গশ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদণ্ডের দ্বারা চৰ্ণ করেন বলিয়া তাহারের রক্তসমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিশদ হইতে জীবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর বর ও অভয় বলিয়া ভাবিত। রজাশুগজনিভ বিশ্বসমূহকে তিনি ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন এই জনাই, হে ভগ্নে, তিনি রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কথিত হন। মোহময়ী সুরা পান করিয়া সেই সর্বসাক্ষিবিশিষ্টা দেবী কালসমুদ্র ত্রীড়াময় স্তম্ভকে দর্শন করেন। এইভাবে অমরবৃদ্ধি ভক্তগণের হিতের জন্ত গুণাহুসারে দেবীর বিবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। (১০)

‘ব্রহ্মবাসনে’ আত্মাত্মায়ে যেখানে আত্মা দেবী কোন দেশে কি মূর্তিতে পূজিতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে সেখানে দেখিতে পাই, ‘কালিকা বঙ্গদেশে চ’, বঙ্গদেশে দেবী কালিকারূপে পূজিত। উক্তটিকে আমি ইতিহাসের দিক হইতে গভীরার্থবাক্য বলিয়া মনে করি। দেশ হিসাবে বাংলাদেশই শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার দিক হইতে বিচার করিলে বাংলাদেশে কালীপূজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসবের রূপে এখন পর্যন্তও দুর্গাপূজারই অধিক ব্যাপিকতা, জমজব্বততা এবং জাঁক-জমক। কিন্তু বাঙ্গালী যে বিশেষ করিয়া শাক্ত তাহাত শুধু তাহার ধর্মোৎসব রূপে শক্তি-পূজার জন্ত নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্ত; সেই সাধনার দিক হইতে বিচার করিলে দেখিব, ঈষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত শক্তি-সাধনার কেন্দ্রে কালী; তারকোও আমরা কালীহীন্য করিয়াই লইরাছি; দশমহাবিভার ভিতরকার অজ্ঞাত মহাশক্তিগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গা-পূজা ঠিক কখন হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত সে কথা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; তবে ঈষ্টীয় চতুর্দশ শতদশ ও বোড়শ শতকে রচিত কতগুলি দুর্গা-পূজাবিধান পাইতেছি। এই বিধানগুলি মুখ্যতঃ দেবীপূরণ, দেবীভাগবত, কালিকা-পূরণ, ভবিষ্যপূরণ, বৃহদ্রসিকেশ্বর-পূরণ জাতীয় কয়েকখানি উপপূরণ হইতে সম্বলিত।

বিভাগপতির ‘দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী’তে দেখিতে পাই, ‘কালী-বিলাস জন্ত’ কলিকাগণেশ, জয়া-বিজয়া (সম্মতি-সম্বর্তী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমার শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পূরণ আদির মধ্যে অষ্টপূরণের ১৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গৌরীপ্রতিষ্ঠা ও গৌরীপূজার বিধান আছে। ঐ পূরণের ৩২৬ অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত উমা-পূজার বিধিও দৃষ্ট হয়। গজদুর্গপূরণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দেবীপূজা-বিধানকালগণের পরিচয় অনেকেই মিয়াছেন, আমি জগদীশবানন্দ তাঁহার ‘ঐচ্ছিকতা’র ভূমিকার ইহারের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ মিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। “ঐচ্ছিকতাব্যবহার সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী শ্রুতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ (বোড়শ?) শতকে আবিষ্কৃত হন। রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) ‘তিথিতত্ত্ব’ গ্রন্থে ‘দুর্গোৎসবতত্ত্ব’ নামক একটি প্রাকরণ আছে এবং তাঁহার ‘দুর্গাপূজাতত্ত্ব’ নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কালিকাপূরণ, বৃহদ্রসিকেশ্বরপূরণ ও ভবিষ্য-পূরণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তৎপরেবর্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণের রচিত নিবন্ধের নাম ‘দুর্গাচিন্তাকৌমুদী’। মিথিলার প্রসিদ্ধ দ্ব্যর্থপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫—১৪৮০) তাঁহার ‘কিয়াচিন্তামণি’ এবং বাসন্তীপূজাপ্রাকরণ গ্রন্থদ্বয়ে দুর্গাদেবীর মূময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি বিভাগপতি (১৩৭৫—১৪৫০) তাঁহার ‘দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী’ গ্রন্থে ১৪৭১ ঈঃ মূময়ী দেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গুরু জীনাথের ‘দুর্গোৎসববিবেক’ গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) ‘দুর্গোৎসববিবেক’ ও ‘বাসন্তী-বিবেক’ এবং ‘দুর্গোৎসব-প্রয়োগ’ নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমুতবাহন তাঁহার ‘দুর্গোৎসব-নির্ণয়’ গ্রন্থে মূময়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই জ্ঞান পণ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবিষ্কৃত হন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী শ্রুতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকর বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীনতম শ্রুতিনিবন্ধকার ভবেন্দ্র ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন ও জীকরের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবেন্দ্র ভট্ট ছিলেন একাংশ শতকের রাজা হরিরামদেবের প্রধান মন্ত্রী।”

উপরিউক্ত তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক হইতে দুর্গাপূজা বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। পূজাবিধি রচিত হইবার পূর্ব হইতেই পূজা প্রচলিত থাকে। কিছুদিন পূজা প্রচলিত থাকিলেই পরে বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়—ধর্মের ইতিহাসে এইজন্যই সাধারণতঃ দেখিতে পাই। বিভাগপতি যে ‘দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী’ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবতঃ মিথিলার সিংহরাজ্যগণের মধ্যে সময়বিজয়ী বীরসিংহের আমলে (মহাস্তবে বীরসিংহের শিষ্ঠা নবসিংহদেবের আমলে) ১১; আমলে পাইয়াই বিভাগপতি পূজাবিধি লিখিতে আরম্ভ করিলেন কিরূপে? ‘দৃষ্ট! নিবন্ধহিত্তি’—এ বিষয়ে পূর্ববর্তী যে নিবন্ধ সকল ছিল তৎহা দেখিয়া। প্রথমে হয়ত পূজাবিধি সংক্ষিপ্ত ছিল; বাংলা ও তৎস্থানীয় ব্যক্তিগণের পূজার উৎসব-অনুষ্ঠান জাঁক-জমকও যত বাড়িয়া যাইতে লাগিল, পূজাবিধানও সম্ভবতঃ ততই বর্ধিত-কলেবর হইতে লাগিল।

১১। ইশানচন্দ্র শর্মা কর্তৃক অনুদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থের সমাপ্তিতে আছে,—বীরসিংহদেবশাসনানুযায়ী সময়বিজয়ীরা কৃত্তী দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী পরিপূর্ণ।

বর্তমানে আমরা বাঙলা দেশে যেভাবে দুর্গাপূজা করি, তাহা সম্ভবতঃ বোড়শ শতকে প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিবরণ এই, আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহিতার বক্তব্যেই এটি প্রচলিত হইয়াছিল। কলিকাতার কলিকট উদ্ভিদ পুত্র রাজা কলসনারায়ণ নর লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমার দুর্গাপূজা করেন। কথিত হয়, কলিকট উদ্ভিদ পিতা উদয়নারায়ণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুত্রোচিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ শাস্ত্রী তাঁহাকে দুর্গাপূজা করিবার উপদেশ দেন এবং নিজের একখানি দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন। অত্যন্ত জাঁক-জমক সজ্জায় সেই পূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পৌত্র রাজা কলসনারায়ণ।

বাংলা দেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কুব্জানন্দ আগমবাসীশ সঙ্কলিত 'অপ্রসিদ্ধ তন্ত্রসার' গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা দেশে 'কালী' নাম প্রচারের আশ্রয়ে; 'তন্ত্রসারে' আমরা বিবিধ প্রকারের কালীর সাধনার পদ্ধতি দেখিতে পাই। প্রচলিত মতে কুব্জানন্দ আগমবাসীশকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করিয়া বোড়শ শতকের লোক বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহার কুব্জানন্দের 'তন্ত্রসার' নামক তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলন গ্রন্থকে পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'তন্ত্রসারের' মধ্যে কালী বা কামাপূজার বিধি ব্যতীত তারার, বোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধন-বিধিও সঙ্কলিত হইয়াছে। কুব্জানন্দ ব্যতীত তাত্ত্বিক সাধনা ক্রিয়াকলাপবিধি সম্বন্ধে গ্রন্থচরিত্ররূপে ব্রহ্মানন্দ ও সর্বাদিন্দ্রের প্রসিদ্ধি সমধিক। (১২) ব্রহ্মানন্দ পূর্ণিন্দ্রের গুরু ছিলেন এবং আত্মমায়িক শ্রীশ্রী বোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার রচিত 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনীতে' শাক্তদিগের আচার অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ভারতবর্ষে' তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণিন্দ্র পরবর্ত্তন বোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত 'ভারতবর্ষে' কালীর উপাসকের আচার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। অপর একজন গ্রন্থকার (সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমচার্য) 'গৌড়ীয় শঙ্কর' নামে অভিহিত হন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার 'ভারতবর্ষে' গ্রন্থে তারার উপাসকের আচারাদি বিবৃত হইয়াছে।

বর্তমানকালে যেসব স্থানে নিত্য কালী পূজার প্রথা রহিয়াছে বা বিশেষ কোনও উপলক্ষে 'মনসিক'-করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংসদিক কালীপূজার বিধি হইল নীপালি-উৎসবের দিনে। নীপালি-উৎসবের দিনে এই কালীপূজা বা কামাপূজার বিধি সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালী-সংবাদ' গ্রন্থে। (১৩) কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে

যেভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা এখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে অস্বীকৃত ছিল না। কালীপূজা বিষয়ে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এই যে, নবাবশের ক্ষয়াজী কলিকটের এই পূজার প্রবর্তন করেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বাহারা কালীপূজা করিতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রতি বৎসর দশ সহস্র করিয়া কালীমূর্তি পুজিত হইতে লাগিল। কথিত আছে, কলিকটের পৌত্র ঈশানচন্দ্র সহস্র সহস্র মণ নৈবেদ্য এবং সহস্র সহস্র খণ্ড বস্ত্র এবং সমপরিমাণ অস্ত্রাস্ত্র উপঢোরে কালী-দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। রচয়িতা চতুর্দশীর ব্যক্তিতে (মাঘের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে) কালীপূজার কথা 'স্বতন্ত্রসূচক' গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, বৃহস্পতি রায়মুকুট এবং কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (১৪)

এই দেবীপূজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তন্ত্র-সাধনা, এই তন্ত্র-সাধনা মুখ্যভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল কালী-সাধনা এবং দশ-মহাবিদ্যার সাধনার সঙ্গে, এবং শ্রীশ্রী বোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অস্ত্রাস্ত্র দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি-সাধকগণের কথা জানিতে পারি। আমরা পূর্বে কালীপূজার বিধান রচয়িতারূপে কুব্জানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণিন্দ্র প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি; ইহার সাধকও ছিলেন। অস্ত্রাস্ত্র সাধকগণের মধ্যে বোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অভিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জিন্মুখা জেলার মেহার গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি শব্দশ্রী ভূতা পূর্ণিন্দ্রের দ্বারা উপরে বসিয়া সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার সাধনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাত্ত্বিক সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার কলমের তাত্ত্বিক সাধকগণ 'সর্ববিজ্ঞ'র বেশ বলিয়া খ্যাত। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে 'অর্থকালী'রও প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার সমীপবর্তী পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে দ্বিজদেব নামক সাধকের গৃহে ইনি কল্পরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার নাম ছিল জয়দুর্গা, তিনি স্বয়ং মহেশ্বরী বলিয়া প্রবাদ। তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধেক গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার অর্ধকালী নাম হইয়াছিল। (১৫) গৌসাই ভট্টাচার্য নামে খ্যাত রত্নগর্ভ নামক সাধক ঢাকা জেলার মাইরসারের দিগম্বরী-কলাস বারাদারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত হয়, ইনি প্রসিদ্ধ 'বার ভূঞা'র মধ্যে চাঁদ রায়, কোদার রায়ের এক ছিলেন। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠের একটি ঠাটলাগ্রামে সাধক বামদেবপার জন্ম হয়; তারাপীঠ তাঁহার মন্দির ও সিদ্ধির স্থান।

১২। এ-বিষয়ে অধ্যাপক জীতিহার্ষ চক্রবর্তী লিখিত The Cultural Heritage of India, চতুর্থ খণ্ডে Sakta Worship and The Sakta Saints প্রবন্ধ ও তৎসংলগ্ন 'অন্তর্যাক্ষ' (বিশ্ব-বিজ্ঞান-গ্রন্থ) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

১৩। অধ্যাপক জীতু চিত্তাবরণ চক্রবর্তী Sakta Festivals

Bengal and their Antiquity (Indian Historical Quarterly, September, 1915) 'কলকাতা দৈনিক'।

১৪। ঐ।

১৫। তন্ত্রকথা—জীতিহার্ষ চক্রবর্তী।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া শক্তিসাধনারূপে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন । বাঙালী শাস্ত্র-পারাবলীর তিনিই প্রবর্তক । তাঁহার পরে সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাধক শাস্ত্র গান রচনা করিয়াছেন । ১৬ দক্ষিণেশ্বরের স্বা. 'ভবভারতী'র মন্দিরের পূজারী জীৱামকুন্দদেব বাঙালার এই শক্তি-সাধনাকে বিশ্ব-বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন । বোগিপ্রথর জীৱবিন্দ বাঙালার শক্তি-সাধনার অন্তর্গত রহস্যকে তাঁহার অণু মহাব্যোমের সহিত যুক্ত করিয়া নৃত্য এবং ব্যাপক দার্শনিক রূপ দান করিয়াছেন ।

আমরা উপরে অতি সংক্ষেপে বাঙাল দেশে মাতৃপূজার যে ইতিহাস আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে, স্বাভাবিক ভাবেই দুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালে এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে । শুধু তাহাই নয়, আমরা একথা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূজাকে অবলম্বন করিয়া ধর্মেতৎসবের ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অন্ত্যাবধি বাঙালীর সর্বপ্রধান পূজা । এখনও আমরা সাধারণ ভাবে

১৬। অধ্যাপক জীৱাবীকুমার চক্রবর্তী, এম, এ রচিত 'শক্তি পূর্ববর্তী ও শক্তি সাধনা' গ্রন্থখানির কবি-প্রসঙ্গ স্বীৰ্বক আলোচনা কর্তব্য ।

'পূজা' বলিতে শারবীরা দুর্গাপূজাকেই মন করি; 'পূজা' আসিডেছে, এবারে পূজা কোন্‌ মাসে' প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'পূজা' কথাই লক্ষ্য কি, তথাই কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না । কিন্তু 'দুর্গাপূজা' আমাদের সাংস্করিক উৎসব-বিশেষ হইবে । সাংস্করিক পূজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নিতাপূজার প্রচলন তেমন কোনও অঞ্চলে দেখিতে পাই না । ১৭ রোগে, শোকে, দৈব-দুর্বিপাকে সঙ্করপূর্বক 'চণ্ডীপাঠ' বা দুর্গানাম জপের ব্যবস্থা শাস্ত্র-বস্তুত্বের অনুরূপে দেখা যায় । কিন্তু এই সব ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন কোনও প্রাধান্য দেখিতে পাই না । শারবীরা দুর্গাপূজার পর হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকাল পর্যন্ত দেবীকে আমরা নানারূপে পূজা করিয়া থাকি । লক্ষীপূজা, কালীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা—সর্বশেষে বসন্তকালে দেবীর বাসন্তী মূর্তির পূজা—ইহার মধ্যে এক কালীপূজা ব্যতীত আর সবই সাংস্করিক পূজা । শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন সাধারণভাবে কালী—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশমহাবিক্রার অন্ত কোনও রূপ ।

১৭। কোনও কোনও মন্দিরে অবত হর-পৌরী বা হর-পার্বতীর নিজপূজা প্রচলিত আছে ।

রঙহরিণ

জয়ন্তী সেন

আমি জানি সেই রঙের বলক—রঙহরিণ,
ছুটেছে আকাশে ছুটেছে বাতাসে ফুলের গন্ধ
চলার ফলে ছুটেছে বন্ধ রাত্রি-দিন ।
উদ্ভত তার ছুরত বেগে
উদ্ভত ধূলা রঙের আবেগে
করালে স্বপ্ন জাগরি জীবনে স্নান্তিহীন
সোনালী-স্বপ্ন-সুখা-নিব্ব রঙহরিণ ।
দিশন্ত পথ চোখের পলকে হয়েছে পার,
নদী নির্জন শুটবালিরেখা কন কিনার
চলেছে—চলেছে কাছের ঘরের ;
সীমানার জোরে অন্ত পায়ের
ইসারায় টানে দুর্গম পানে লুপ্ত তারার আভাস ক্ষীণ ;
নিব্ব গহনে আশাস-দানা রঙহরিণ ।
আমি জানি সেই রঙিন স্বপ্ন—রঙহরিণ
উধাও বজ্র জীবন-নদীতে—নৌলিমা লীন ।
আশার শিপাচা আকণ্ঠে নিয়ে পিছনে ধাই
তবু পলকের অঙ্গ পলক—কণিকে নাই ;
সে যে কল্পনা-ঘনে আল্পনা ময়-দিন—
হারাদো রঙের নিব্বরথানা রঙহরিণ ।

তৃতীয় নয়ন

দেবব্রত চক্রবর্তী

ভাষণের উঠে এলো নারী ।

কীকা ধব :

সন্ধ্যার আলো-ঐধারিতে বেরা ছোটো কোণে

একটি মাটির প্রদীপ্ত খেলো দিলে

লক্ষীর পটের কাছে মাথা বেখে

কী যেন বলেছে

অনেকক্ষণ ।

ভাষণের কাছা যেমন উঠে আসে মনের গভীর থেকে
তেমনি সে উঠে এলো ।

হে নারী,

তোমার স্তন্যকে প্রদীপের মতো জ্বলে ধরে

কোন স্বপ্ন দেখো ?

একলা ঘরের আলো-ঐধারিতে

কার কাছে বসো তুমি মনের সব কথা ?

জানি, আর একটু পরেই হরজো-নিবে ধানে

এই ক্ষীণ শিখাটুকু,

রুছে বাবে পাঁচালীর ঘরে ডুবা এই ঘর,

আর তুমিও বাসে হারিয়ে ।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক এবং সাহিত্য-সমালোচক

শ্রীসরোজ আচার্য জীবন শুরু করেছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হিসাবে, কিন্তু জীবনের স্রোত আজ তাঁকে রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নদীয়ার এক কৃষি ক্ষমিদার-পরিবারের সন্তান শ্রী আচার্যের জন্ম কুষ্টিয়া শহরে (বর্তমানে পাকিস্তান) ১৯০৬ সালে। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কলকাতায় আসেন আই-এ পড়তে। পাশ করে আবার কিয়ৎকাল নদীয়ায় এবং ১৯২৭ সালে ইংরাজি অনার্স নিয়ে কলকাতার কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে পান 'মোহিনীবোহন রায়-পুরস্কার'। ছাত্র-জীবনে অধ্যয়নের চেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল বেশী। ১৯২১ সালে স্কুলে পড়বার সময় অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি এক বছরের জন্ত পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি কুষ্টিয়া মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং নদীয়া জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে বেহুলাবাজার বোমার মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন, কিন্তু কয়েক দিন বাদে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় সরোজ বাবুর পরিবার অত্যন্ত অর্থ-সঙ্কটে পড়েন এবং তিনি তখন মালদায় গিয়ে স্থল-মাষ্টারের চাকরী নেন। সেখানে বে-আইনী লবণ বিক্রয় এবং বিলাসী বস্ত্রের বহুৎসবে নেতৃত্ব করার তাঁর উপর পুলিশের নজর পড়ে এবং ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েক দিন বাদে বেঙ্গল অভিজ্ঞতা অস্ত্রধারী তাঁকে ডেটিং করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন বন্দী-শিবিরেই কেটেছে তাঁর জীবন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন (প্রথম স্থান পেয়েছিলেন শ্রীমতী সুজাতা রায়) এবং প্রবন্ধের পেপারে সব চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে রেজিনা গুহ স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। মুক্তি লাভের পর ডাঃ ভানুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রদূত হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কেরানীয় পদ লাভ করেন। চার বছর সেই চাকরী করবার পর উইরেল কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পান। ঐ সময় মাস্টার্স দর্শন নিয়ে বিখ্যাত দার্শনিক বর্গের ডাঃ সুরেন দাসগুপ্ত এবং ডাঃ বটরুদ্র ঘোষের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে শ্রী আচার্য সুখী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৪৪ সালে 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের অমর্যাদা আসে। এ বাৎসর্য সেই পদেই বহাল ছিলেন। সম্মতি 'বানন্দবাজার পত্রিকা'র শনিবার সহকারী সম্পাদক দায়িত্ব হয়েছেন। ইংরাজি এবং বাঙলা—দুই ভাষাতেই তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে কলম

চালাতে পারেন। বর্তমানে ডোভার লেনের বাসিন্দা, শ্রী আচার্য লিখতে শুরু করেন চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। 'জাগরণ' নামে বাবার একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। তাতে তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। কলকাতার কলেজে পড়বার সময় সহপাঠি ডাঃ প্রমোদ ঘোষাল তাঁকে মাস্টার্সদের প্রতি আকৃষ্ট করেন। বন্দী অবস্থার ব্যাপক ভাবে তিনি মাস্টার্স চর্চার সুযোগ পান এবং মাস্টার্সকেই আত্মদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। সাহিত্যের ছাত্র হলেও, দর্শনেই তাঁর প্রিয় বিষয় এবং প্রকৃত পক্ষে 'মাস্টার্স দর্শন' লিখেই তিনি সর্বপ্রথম সুখী সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পড়াশোনায় শ্রী আচার্যের কোন বাদবিচার নেই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ডাক্তারী, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, চিত্রকলা, শিকার, খেলাধুলো—সব বিষয়েই তিনি অধ্যয়ন করে থাকেন। ১৯২৭ সালে তিনি 'কৃষিধার রক্ত-বিপ্লব' এবং 'বিল্লবী অনন্তধরি' নামে দুখানা বই লেখেন। অস্তিত্ব বইয়ের মধ্যে 'মাস্টার্স যুক্তি বিজ্ঞান', 'বই পড়া' এবং 'সাহিত্য রুচি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুই পুত্রের জনক, শ্রী আচার্যের স্ত্রী শ্রীমতী যশ্চী সাহিত্যিক শ্রীপরিমল গোস্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী। বিয়ের ব্যাপার একটা মজার গল্প। পরিমল বাবুর সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল।

তিনি জানতেন যে পরিমল বাবুর বিবাহ-যোগ্য একটি বোন আছেন কিন্তু ভ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ১৯৩৯ সালে যখন বাড়ী থেকে বিয়ের চাপ আসতে লাগল, তখন তিনি একদিন পরিমল বাবুর বাগায় গিয়ে বললেন, 'জামি আপনার বোনকে বিয়ে করতে চাই।' শ্রীমতী যশ্চী তখন কলেজের ছাত্রী। পরিমল



বাবু তৎক্ষণাৎ বোনকে লেফটেনেন্ট ডেকের বসলেন, “ওহে—এই ডক্টরকে তোমায় বিয়ে করতে চান। এতুনি বলে যা হয় ঠিক করে ফেল।” পরিণাম বাবুর সামনে টেবিলে মুখোমুখি বসে দশ মিনিটের মধ্যে তাঁরা নিজেদের বিয়ে স্থির করে ফেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-টি শ্রীমতী আচার্য সদাশাস্ত্রময়ী হজুগপ্রিয় মহিলা। আট বছরের ছেলে জয়ন্তকে নিয়ে তিনি একা একা বিলেত গিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাডুয়েট সার্টিফিকেট-অফ-এডুকেশন নিয়ে এসেছেন। আগে রাজ্য সরকারের শিক্ষণে শিক্ষা-বিভাগে চাকরী করতেন। এখন চাকরী ছেড়ে গৃহস্থালী নিয়ে আছেন। চেইন স্মোকায় সরোজ বাবু এখনও ধূমপানের ব্যাপারে গৃহিণীর রক্ত চক্ষুকে নরম করতে পারেন নি। সরোজ বাবু তিন ভাই, এক বোন। যা এখনও ভাবিত।

ডাক্তার শ্রীঅরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট দন্ত-চিকিৎসক]

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বাবে না—একটি চমকি কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু রোগী নিজে মর্যাদা না দিলেও, দন্ত-চিকিৎসক উভার পূর্বে গৌরব কির্যাইয়া আনার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করে থাকেন। বিশিষ্ট দন্ত-চিকিৎসক ও আর-জি কর, মেডিক্যাল কলেজের ডেন্টাল-সার্জারীর ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ অরুণ গাঙ্গুলী তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বিক্রমপুর (ঢাকা) বেগের সুগরিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ বংশের অন্তর্ভুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের বিশিষ্ট সন্তান বেঙ্গল লিভেল সার্ভিসের শ্রীমতীলা কান্ত গাঙ্গুলীর ও শ্রীমতী প্রকল্প দেবীর পুত্র অরুণ ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরিয়া হওয়ায় পিতার সঙ্গে পুত্রকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে লেখা পড়া করিতে হয় এবং

১৯২৮ সালে প্রবেশিকা ও ১৯৩০ সালে রাজসাহী শিক্ষায়তন হইতে আই, এল, সি পাশ করেন। দাঁত সঞ্চর্কে বাল্যকাল হইতে আগ্রহ থাকায় উক্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি ১৯৩২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন—যদিও সেই সময় ভাল চাকরী পাওয়া ও পুত্র পোষকতার জন্য ভারতীয় ছাত্রীরা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে

সাধারণতঃ ভর্তি হইতেন। ১৯৩৩ সালে তথ্য হইতে Z.D.S., D.S. ডিগ্রী লইয়া স্থানীয় জেনারেল হাসপাতালে oral-surgeon নিযুক্ত হন। পরে স্নেলে কিছুদিন থাকিয়া বার্লিন মিউনিখপাল ও বিশ্ব-বিদ্যালয় হাসপাতালদ্বয়ে একই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই সময় তিনি যুরোপের বিভিন্ন দন্ত-চিকিৎসালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া প্রভূত জ্ঞানলাভ করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে ফিরিয়া আর, জি, কর হাসপাতালে ডিজিটিং সার্জেন হিসাবে যোগদান করেন ও ব্যক্তিগত চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

১৯৪৫ সালে গোয়ালিয়রের মহারাজা সিদ্ধিয়ার আমন্ত্রণে এক বৎসরের মধ্যে রাজ্যের দন্ত-চিকিৎসা বিভাগকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (চিকিৎসা বিজ্ঞান) সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লেখা “An aspect of Industrial Absenteeism and its method of control” সরকারী ও বেসরকারী মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্প-মন্ত্রী সি, এইচ, ভাবা ও বঙ্গের অর্থমন্ত্রী মনলিনীরঞ্জন সরকার ইহাঃ তুমিকা লেখেন ও ডাঃ রামমোহন লোহিয়া মন্তব্য করেন “Dr. Arun Ganguli has done his part in producing such a book-let and it will be for the trade-unionists to carry its contents to the workers on a mass scale.”

ডাঃ গাঙ্গুলী জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি হিসাবে বঙ্গী-উন্নয়ন ও আর্থ-আত্মরদের আওগার্থ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রাতিষ্ঠানটিকে তিনি রাজনৈতিক আবর্জনা হইতে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। কলিকাতা অঞ্চলের গভর্ণর হিসাবে তিনি যুক্ত আছেন।

কিছুকাল পূর্বে প্রথম জগদ্বিতীয় দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় ডাঃ গাঙ্গুলীকে আমন্ত্রণ করা হয়। তথাকার চারিশত বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে তিনি বিখ্যাত মহো Stomatological Instituteএ তাঁহার সর্বশেষ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মানলাভ করেন। ফেরার পথে যুরোপের প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া দন্ত-বিজ্ঞান সঞ্চর্কে সম্প্রতিকার উন্নতিমূলক কার্যধারা অমুদ্রাবন করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ডাঃ গাঙ্গুলীর বেশ কিছু অবদান আছে। সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তিনি যুক্ত আছেন। চারি বৎসর যাবৎ তিনি “নিরীক্ষা” নামে একটি পাবলিক পত্র সম্পাদনা করিতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে উচ্চর মতাদর্শ কিছুটা ছাপ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। বিশ্ববৈজ্ঞানিক পক্ষে মানব-সংস্কৃতিকে সার্থক করে তুলবে বলিয়া তিনি মনে করেন।



ডাঃ শ্রীঅরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

বই পড়া তাঁহার অবসর বিমোদনের উপায় এবং কয়েকটি রুপায় তাহা আরম্ভ করিয়াছেন। নবী সমস্তার অল্পতম বিশেষজ্ঞ ও ই, বি, রেলওয়ের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার কুমুদভূষণ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা অশিমা দেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন।

শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়

[শ্রীতীবন রাজনৈতিক কর্মী ও বিহার আইন-সভার সদস্য]

তুর্জা ও আত্মস্থরের দিকে না তাকিয়ে আজীবন দেশের নিরলস ভাবে সেবা করার মহান ব্রত পালন করে আসছেন, এমন অল্প সংখ্যকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিহার আইন-সভার সদস্য শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়।

১২৯১ সালের (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) ২৯শে আশ্বিন বর্ধমান জেলার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা নৈনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতার ব্যবসায়ী ছিলেন। পুত্রের ডাঙরার সুবিধার্থে তিনি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং বঙ্গবাসী-স্কুলে ভর্তি করে দেন। লেখাপড়ার খুবই যত্নবী ছিলেন শ্রী মুখোপাধ্যায়, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি লের পেরা ছাত্র বলে পরিগণিত হন। এই সময়েই বন্য মেঘে বজ্রাঘাতের মত পর পর তাঁর মাতা ও পিতার ত্যাগ হইল। চারিধারে অন্ধকার দেখলেও অকুল ভাসলেন তিনি, তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় চেষ্টে তাঁর সমস্ত দারিদ্র্য গ্রহণ করলেন। তিনিও কৃতি-কৃষ ছিলেন। ভারত ও বর্ধার পোষ্টাল ইউনিয়নের পদ পূরণ করেছিলেন তিনিই।

বাংলায় তখন বৈপ্লবিক বৃগ। তরুণ শ্রী মুখোপাধ্যায়ও দেশের ডাকে সাড়া দিলেন। সুবিখ্যাত অম্মশিল্প-সমিতিতে যোগ দিলেন তিনি। বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের এটি ছিল একটি বুল কেন্দ্র। অবশ্য ভবানীপুরের সমাজবাদী দলেই তার রাজনৈতিক হাতে-খড়ি হয়। পরে তিনি ফ্রেণ্ডস উনিয়ন নামে একটি দল গঠন করেন। বাঘা যতীন ই দলের সদস্য ছিলেন। তিনি তখন সরকারী, অফিসের নো। গোয়েন্দা-বিভাগের ইন্সপেক্টর শশধর গোস্বামী ই সময়ে পরিচয় গোপন করে তাঁদের দলে যোগ দি-লেন। তিনি বাঘা যতীনের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি থেছিলেন। কিন্তু দৈবাৎ একদিন সব জানাজানি হয়ে ল।

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘোর ঘনঘটা। বঙ্গ-ভঙ্গ আলোলন। শ্রী মুখোপাধ্যায় এতে সক্রিয় গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর পড়া-বার বিরাম ছিল না। তিনি বঙ্গবাসী-কলেজ থেকে ল' করেন (তখন বঙ্গবাসী-কলেজ ল' পড়ান হত) ১৯১০ সালে ভাগলপুর যারে যোগ দেন। এর বছর চক আগেই তিনি ঋষি বসুসহ চট্টোপাধ্যায়ের

সম্প্রদায়-প্রভা রাই বাহাদুর শাহজা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী রাণী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ভাগলপুর থেকে অল্পদিনের মধ্যেই মুন্সের কোর্টে চলে আসেন এবং অচিরেই সেখানে শ্রেষ্ঠ উকিল হিসেবে পরিচিত হন। পরে তাঁকে পাব্লিক-প্রসিকিউটরের পদ গ্রহণ করতে হয়। এই সময়েই তিনি এখানে নানা রাজনৈতিক কর্মে রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বনিষ্ঠ হয়ে উঠেন।

এক বর্ষ-প্রান্ত সফালে শ্রী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বয়স ৭৫ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও চেহারায়া কত দৃষ্ট ভাব।

দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই যোরালা হয়ে উঠছিল। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। আইন-অমাত্যের দরুণ দৃষ্ট হলেন এবং হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হল। এর কিছুদিন পরে তিনি গান্ধী-আব্বাইন প্যাট্র অফিসারে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ১৯৩১ সালে ডিস্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন। ১৯৩২ সালে আবার জেলে যেতে হল তাঁকে। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে ছাড়া পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বিহারের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প হল (১৯৩৪ জানুয়ারী)। বিহার সেন্ট্রাল রিডিক কমিটির উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকম্প-বিধ্বস্তদের সেবার আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে এই কাজে আর কখন বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি হলেন বিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ ও শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯৩৬ সালে বিহার আইন-সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯৪১ সালে বিহার কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্যে তাঁহাকে আবার জেলে যেতে হয়। ১৯৪৬ সালে আবার আইন-সভার সদস্য হন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালে তিনি পাল্লারমেন্টারী সেক্রেটারী মনোনীত হন। তাঁর অধীনে আইন, জার, কারা ও জাপ দপ্তরগুলি ছিল। ১৯৫২ সালে স্বাভাৱ্য শাসন ও পুনর্বাসন দপ্তরের উপ-মন্ত্রী পদ তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে আবার তিনি আইন-সভার আসেন। উপস্থিত বিহার পুলিশ-কমিশনের তিনি সদস্য।

আমাদের দুজনের প্রশ্ন ও উত্তরের বিনিময়ের মাঝে তিনি জানান, ছাত্র-জীবনে বহু-কোষিান অধ্যাপকের বনিষ্ঠ সাহচর্যে তিনি এসেছেন। যেমন, রেভারেন্ড ডি-এন হুইলার, ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জি-সি বসু ইত্যাদি। তিনি কলকাতার সুবিখ্যাত ওল্ড ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন সুবক্তা। কলকাতার দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোডটি তাঁরই উদ্যোগেই-এর নামাঙ্কিত।

শ্রীমতী কল্পনা ঘোষী

[বিপ্লবী বাঙ্গালী মহিলা]

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা। বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী ভীত আন্দোলন। পছবিষয়নে মতভেদ দেখা দিচ্ছে। একদল অহিংসার পথে চলেছেন—আর অল্পদল সশস্ত্র বিপ্লবের পরীক্ষা-সিরীক্ষা করছেন। শেষেরটির প্রাণকেন্দ্র ছিল অবিভক্ত বাঙ্গালা। কীর্ণদেহ বাঙ্গালী সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে প্রবল নাড়া দিচ্ছে—সংগ্রামী মনোভাব ও রণমুগ্ধিতে। আবিষ্কৃত হল যে শুধু তরুণ ও যুবক বিপ্লবীরা নহে—বাঙ্গালী কিশোরী এবং যুবতীও সশস্ত্র সংগ্রামে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে চট্টল-কল্পা শ্রীমতী কল্পনা ঘোষী (দত্ত) অন্ততমা।

১৯১০ সালের ২৭শে জুলাই চট্টগ্রাম জিলার শ্রীপুর গ্রামে ৬বিনোদবিহারী দত্ত ও বর্ভনামে পাকিস্তান-নিবাসিনী শ্রীমতী শোভনাবালা দেবীর কল্পা শ্রীমতী কল্পনা দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। দেশপ্রিয় বৃত্তিজ্যোহন ছিলেন বাবা। স্থানীয় ভাঃ খান্দেরী বালিকা বিদ্যালয় হইতে ১৯২২ সালে তিনি ভালভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর পরে কলিকাতা বেথুন কলেজ হইতে নন-কলিজিয়েট ছাত্রী হিসাবে এ.ই, এস, সি পাশ করেন। পরে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে বি, এস, সি পড়েন কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ায় পড়াশুনা বন্ধ থাকে।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজি চট্টগ্রামে আসিলে লাভ বৎসরের কল্পনা তাঁহার বক্তৃতা শোনার পর হাতের মোনার চূড়া গান্ধীজিকে দিলে তিনি উচ্চ কেরং দেন। তখন থেকে দেশের স্বাধীনতা, স্বর্গ ও অনাথ-আতুরদের দুঃখকষ্ট দূর করার চিন্তা এলোমেলো-ভাবে বালিকার মনে উঠত। কিন্তু দিশাহারা হয়ে পড়ত ক্ষুদ্র জন। বাড়ীতে দুই কাকা চুপি চুপি “দেশের কাজ” করতেন আর প্রাতঃসূতী তাঁদের আকৃত “দেশের ডাক” “পথের দাবী” প্রভৃতি পুস্তকগুলি পড়ত। সেই সময় মেজ কাকা ৬কুম্ভবন্ধু দত্ত সরকারী চাকুরী ত্যাগ করার বাড়ীতে চাকশ্যের সৃষ্টি হয়। ঠাকুরদা ক্রুদ্ধ হলেন, কারণ সরকারী মহলে তাঁহার সম্মান ছিল যথেষ্ট। বালিকা যেন ক্রমশঃ হুঁকে পড়ল স্বদেশীয়মানের নিকে, শব্দ পরা আরম্ভ হল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা কিশোরীকে আকর্ষিত করল—বজান চর্চার উৎসাহ হল মন। ১৯২৮ সালের কলিকাতার নিখিলভারত কংগ্রেস সম্মেলনে বোগদান করা সম্ভব হল না। কিন্তু পরের বৎসর বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দত্তবাবুর উৎসাহে চট্টগ্রামে অজড়িত ছাত্র-সম্মেলনের অন্ততম উদ্যোক্তা হলেন কল্পনা দত্ত। এই সম্মেলন ছিল সুভাষচন্দ্রের অগ্রসারীদের। “মাউন্ট এ্যাট” পক্ষে তাঁর মন বিকল হল। কলিকাতার পড়ার সময় লিখা ব্যাঙ্গ্যর লিখিত “পদবিহার্য”

কাছে ছোরা, লাঠিবেল, আর লৌকাচালনা শিখলে কলিকাতার দুই কাকার মাধ্যমে তিনি কার্যকর জন বিশ্রব পাই সম্পর্কে আসেন। কিন্তু তাঁদের কর্মধারা প্রথমে টি অমুখাবন করতে সক্ষম হন নি। সহসা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল বৈকালে তিনি সংবাদপত্রে পড়লেন স্বর্ঘ্যে (মাষ্টারদা) ও তাঁহার সহকর্মীদের আক্রমণে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগা দখলের বীরকাহিনী। ব্রিটিশ সিংহকে অপমান ও ব্রিটি সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের চেষ্টায় চট্টগ্রামের বালকদের উৎসাহিসকণ চট্টলকুমারীর মনে এনে দিল এক গভীর প্রেরণা—যদি তিনি তখনও বিপ্লবীদলভুক্তা ছিলেন না। কলেজে গ্রীষ্মাবকাশে তিনি নিজ জেলায় ফিরলেন। মাষ্টারদা অল্পদের সহিত সাক্ষাত পরিচয় হল। কর্মমূলা দিয়ে কল্পা দত্তকে explosives তৈয়ারী ও সংগ্রহীত আয়োজ্য তাঁর বাড়ীতে রাখার ভার দেওয়া হল। চট্টগ্রাম কলেজে বদলী চেষ্টা চলল। সুবিধা না হওয়ায় সেখানে থেকে দলে কাজ করিতে লাগিলেন। নভেম্বরে কলিকাতার চেষ্টে পরীক্ষ দিয়ে ফিরলেন স্বহানে। সেই সময় বন্ধু ও রাইফে চালনার মনোনিবেশ করেন। মাষ্টারদার সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ হত আর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসাবীদের সহিত নৃকি জেলে প্রত্যহ দেখা করতেন। কলিকাতা হইতে প্রয়োজনী জিনিবপত্র কেনার ভার তাঁহার উপর স্তম্ব হল। ইহার প চট্টগ্রাম সহরে ডিনামাইট পুঁতিয়া সমস্ত সরকারী ভব উড়াইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা শ্রীমতী ঘোষীর দক্ষতার চালি হয়—কিন্তু দলের একটি ছেলে ৫রা পড়ার কল্পনা দেবীর কণ পুলিশ জানিতে পারে। তাঁহার পরিবারের ও গৃহের উপ পুলিশী হামলা আরম্ভ হল—আর তাঁহাকে পক্ষকাল অন্ত থানার হাজিরা দিতে হত। সতর্ক পুলিশ পাহারা ভেদ করে তিনি বিপ্লবী-কার্যধারা চালিয়ে যান। ডিনামাইট বস্তু মাঝমা প্রমাণভাবে বন্ধ হয়ে গেল। পূর্ণপরিত্যাগ গ্রীষ্ম ওয়াবেলারকে তিনি মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাৎ করান দুইজনে পুলিশের সাথে বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন পুলিশ কল্পনা দেবীর উপর খুব লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করল ১৭ই সেপ্টেম্বর ৩২ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় আর ২৪ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে চলে শাসক বনাম তরু বিপ্লবীদের এক অল্পতরুর সংগ্রাম। যদিও তিনি এখ কারাগারালে, তবুও তিনি যে ইহার অন্ততম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন—তাঁহা বলার প্রয়োজন নাই। ইহার পর ব্যাপ পুলিশী অভিযাচার চলে। সর্বসম্মত ১০৮ জনকে বিচারী চালান দেওয়া হয়। ২৩শে নভেম্বর তাঁহাকে জামিনে থালা করা হল। দলের নির্দেশে ২৩শে ডিসেম্বর তিনি গৃহত্যা করেন। কলে বাবার সরকারী চাকুরী গেল—বাড়ীর জিনি নীলাম হল—তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্ম করেক হাজার টা পুরস্কার শোভিত হল। সেই সময় তিনি ৩ বাঁটারা গৈরা গ্রামে আশ্রয়শোণ করেন। বানের গোলায় দুখিরে থাকতে

কৃত্ত বাড়ীর কৰ্ত্তা একদিন তাঁহঁর বায় করে দিলেন। পুলিশ
নতুতাড়া করল—রাষ্ট্রদাৰা বরা পড়েন কিছু কন্ননদেবী
মাস্ত্র পেলেন গৈহিয়া গ্রাণে পূৰ্ণ তালুকদারের বাড়ীতে।
পুলিশ সন্ধান পেল—সমস্ত বাড়ী ঘিরে গুলী চালাতে লাগল,
পূৰ্ণ তালুকদার গুলীতে মারা গেলেন—আর ১২৩০এর ১২শে
ম শ্রীমতী যোশী বৃত্ত হলেন। পচিশ মাইল পায়ে হাঁটিয়ে
নিরে এল পুলিশ তাঁকে চট্টগ্রাম সহরে। আত্মগোপনের
নয় মাষ্টারদাকে জেল থেকে সবিয়ে নিরে আগার ব্যবস্থা
চলোছিল আর স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দারা বিপ্লবীদের সৰ্ক-
প্রকারে সাহায্য করতেন—সে কথার উল্লেখ করেন
কন্ননদেবী। কিন্তু নেত্র সেন ধরিয়ে দিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধের
মাষ্টারদার বিরুদ্ধে বড়বন্ধ-মামলা চলল—বিচারে মাষ্টারদার ও
তারকেশ্বর সেনগুপ্তের কালীর ও শ্রীমতী যোশীর যাবজ্জীবন
দীপান্তর বাসের আদেশ হয়। কবিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের
জীবনাব্দে মেয়ে রাহনৈতিক বন্দিনীদের (শান্তি, সুনীতি,
উজ্জ্বা, পাকল, বীণা বাস ও কন্ননা দত্ত) আশ্রয়ানে প্রেরণ
করা হয় নাই—তব্ধে বিভিন্ন জেলে থাকিতে হয়।
চুখের সঙ্গে জানহিচ্ছ, শ্রীমতী যোশী যে—Terrorist

History' ও 'Details of explosives manufacture'
নামে তথ্যবহুল হস্তলিখিত পুস্তক দুটি পুলিশ নষ্ট করিয়া
দেয়।

• ১২৩৯ সালের মে মাসে মুক্তি পাওয়ার পর কন্ননা দেবী
চট্টগ্রামে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১২৪০
সালে প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে তিনি বি, এ, পরীক্ষার পাশ
করিয়৷ কালিদাস বিজ্ঞান কলেজে এম, এল, সি পড়িতে
থাকেন। সেই সময় বিদ্যাপীঠ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিতে
জড়িত থাকায় পুনরায় তাঁহাকে গৃহে অন্তরীণ করা হয়।
কলে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। ১২৪২ সালে মুক্ত হওয়ার
পর তিনি চট্টগ্রামে ছাত্রিক ও বোমাবিক্ষপ্ত এলাকার
সমাজসেবার কাজ করেন। উক্ত বৎসর তিনি ভারতীয়
কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। ১২৪০ সালের মে মাসে
তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্টপার্টির ভূতপূৰ্ব সাধারণ সম্পাদক
শ্রীপূর্ণচাঁদ যোশীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১২৪৮
সালের অক্টোবর মাসে তিনি চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায়
চলিয়া আসেন। বর্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান ট্যাক্সটাইল
ইনস্টিটিউটে চাকুরীহইতে বৃত্ত রহিয়াছেন।

পুরীর ঝাউবনে

অমলেন্দু দত্ত

এই ঝাউবনে

এসেছি এখানে এসেছি কখন
এখানের এই আদরে পলানো
সোহাগে জড়ানো ঝাঁত হারায়,
বাদামি বালুর সোনালি বোদের
মোহিনী মায়ায়...

এসেছি এখানে এসেছি কখন
এখানে আসতে চেয়েছি কি মন ?
দিক-জানহীর অবোধ সাগর
ডেউয়ে-ডেউয়ে ভাঙে মনের আগড়,
কত ঘন নীল কত ফিক ফেন
একটু সবুজ মেশানো—এ কেন ?

সাগরিন কাল কত রত কোরা
দেখেছি, দেখেছি অবোধ ডেউয়েরা
সারারাত আর সারাদিন ধরে
ভেঙে লুটে পড়ে, লুটে ভেঙে পড়ে
আবার পায়ের ফাটল কী যে বোঝে
বুঝি হেঁয়-হেঁয়... এই হাট হুঁতো যে
ভিজে কলু পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে
বিছুর কুড়িরে কিছুক হারিয়ে
এসে গেছি কোল এখানে কখন
এখানে আদর নীলের সাগরে

নীল চুঁয়ে পড়ে পাড়ার কাঁসরে
ঝাঁড়ের হাতের শিশিরের মত
কিংবা ভোবের কুহাশা কেনন ॥
কেন গুলী কেন হাওয়ার আড়ালে
কাউয়ের সেতাবে হর তুলে তুলে
দিগন্তলী বহির সাগরে
শোনাবেই সে যে শোনাবেই অকারণ !
এসেছি কে জানে কখন ধোঁয়া
বালিরাড়ি ভেঙে, লকাল কোনার
সোপালি বোদের ডাকে সাড়া দিয়ে
সাগরের নীল ইসারা ডিঙিয়ে ।
এখানে এসেই বুঝেছি : এমন
এখানে আসার জন্তে উত্তল
হয়েছিল বুঝি কতকাল কেন
কত যুগ ধরে...

আশা আর সাথে বাহিত সেই
চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া নীলের শেরালা
ধরে লেবে বসে ;

আমি শুধু বসে
থাকবো এখানে—এখানে ভোঁয়ার
ঝাউবন বীধি হারায় হারায়
বসবো ঝাঁটলে, বসবো জোয়ার
স্থানী জীয়ে...

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

ঐশ্বরীন্দ্রকুমার ঘোষ

(২)

মৃতদর সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে জানতে পারা যায় মুদ্রিত বাঙলা শব্দের অভিধানের গোড়াপত্তন কবে যান এক পতুগীজ মিশনারী।

১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী অভিধানিকদের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে কিন্তু তারপর থেকে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তকে অভিধান-ক্ষেত্রের অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় পাদে পাদ্রে ফ্রে মানোএল দা আসম্পকাও (Padre Frey Manoel da Assumpcao) নামে এক পতুগীজ অভিধানিকের আবির্ভাব।

পতুগীজদের বাঙলা দেশে আসার একটা ইতিহাস আছে।

১৪৮৮ খৃঃ ২০-এ মে পতুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা মলবরের রাজধানী কালিকটে পদার্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে আসেন পেদ্রো দে কোবিলহাম (Pedro de Covilham)। ১৫০০ সালে এই ভ্রমলোক ভারতে খ্রীষ্টান মিশনের সূত্রপাত করেন। এই বছরেই পেড্রো আলভারেজ কাস্তালের সঙ্গে আট জন বাঙক আর আট জন ক্রানসিসকান আসেন। মুসলমানেরা কিছু এদের তিনজনকে হত্যা করে। তাতে দমে না গিয়ে তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনের কাজে হাত দেন। ১৫০৩ সালে ডমিলিক্যানরা ভারতে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। ফলে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আর গোয়ার ১৫১০ খৃঃ মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। পতুগীজরা ১৫১০ সালেই গোয়া নগরী অধিকার করে। তারপর সেখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের জন্ত তারা চেষ্টা করে। ধর্ম-প্রচারের জন্ত তারা কতকগুলি বই ছেপেছিল। ছাপাখানারও ব্যবস্থা বহেছিল আর সেই সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যও চালাত। যখন পতুগীজদের বাণিজ্য বেশ চলছে তখন নুনো দা কুনহা (Nuno da Cunha, ১৫২১—৬৮) তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাঙলা দেশের সঙ্গে ব্যবসায় চালাতে শুরু করেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে পতুগীজরা বাঙলার এসে বালেশ্বর থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আর হুগলী থেকে ঢাকা পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার জগ্রে বাস করতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তাদের আর একটা কাজ ছিল জলদস্যুতা আর লুণ্ঠহাজ। এতে তারা খুব নৃশংসতার পরিচয় দিলত। বেশ কিছুদিন কাটবার পর পতুগীজ মিশনারীরা লিসবন হয়ে গোয়ার পথে বাঙলার আসে। ধর্মপ্রচার আর ব্যবসার জগ্রে তাদের বাঙলা ভাষা শিখতে হয়। তাঁরা যেখানে থাকত সেখানকার কথা ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করত। বাঙলা ভাষা শেখবার উপযোগী তারা এক বাঙলা ব্যাকরণ আর প্রচলিত শব্দ নিয়ে অভিধান তৈরী করার, আর সেই সঙ্গে খৃষ্ট-ধর্মের প্রার্থনা-বই বাংলা ভাষায় ছাপানোর প্রয়োজন মনে করে।

পাদ্রে ফ্রে মানোএল দা আসম্পকাও (Padre Frey Manoel da Assumpcao) একজন পতুগীজ অগষ্টিয়ান সন্ন্যাস-সুত মিশনারী। তিনি পতুগালের এভেরা-নিগাসী

ছিলেন। তিনি ১৭৩৪ সাল থেকে ১৭৫৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেল ভাণ্ডারের ভক্তগত সেট নিখোলাস টলেটিনো মিশনে (Missio des Nicholas Tolentino) অধ্যক্ষ (recto) ছিলেন। তিনিই একাত্তরের ভার নিলেন। কর্তার পরিচয় বাঙলা ভাষা শিখলেন—তাতে দেখলেন অপরকে শেখাতে গো বাংলা শব্দের প্রতিশব্দ পতুগীজ আর পতুগীজ শব্দ প্রতিশব্দ বাঙলার অভিধান খাকা প্রয়োজন—তাই সহকর্মীকে কাজের সুবিধার জন্ত তিনি এহটা ব্যাকরণ ও একটা শব্দকে তৈরী করেন। শব্দকোষটির নাম—“Vocabulario em idioma Bengalla Portuguesa”। বইখানি ১৭৪৩ খৃঃ পতুগালে রাজধানী লিসবনে ছাপা হয়। বইখানির আখ্যাপত্র এরূপ—“Vocabulario em Idioma Bengalla e Portugue dividido em duos Partes dedicado as Exceler e Rever. Senhor. D. F. Miguel-de Tavor Arcebispo de Evora do Concelho de Su Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Sant Agostinho da Congregacao da India Orienta Lisboa 1743. তখন বাংলা অক্ষরের ব্যবহার ছিল না। বইখানি সমস্তটা রোমান অক্ষরে ছাপা। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে এভেরার আর্চবিশপ Senhor D. F. Miguel de Tavor কে। ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের কোথাও বইখানির সন্ধান বা পাননি। গ্রীষ্মবসন সাহেব তাঁর Linguistic Survey-

১ম খণ্ড ১ম ভাগ ১৩ পৃঃ) এই বইখানির একটা সাক্ষিত্ত পরিচয় দিয়েছেন। বইখানির তিনটি ভাগ আছে—১ম ভাগে ১ থেকে ৪ পাতা পর্যন্ত ব্যাকরণ। ২য় ভাগে ৪১ থেকে ৩০৬ পাতা পর্যন্ত বাঙা-পতুগীজ অভিধান, আর ৩য় ভাগে ৩০৭—৫৭৭ পাতা পর্যন্ত পতুগীজ-বাঙলা অভিধান। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে বাঙলা হরফে ১টি শব্দকে পেয়েছেন। এই বই সবক্ষে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া বাবে—Hist. of the Beng. Language and Litt., (১৯১১), Beng. Past and Present, ১৯১৪; J. A. S. B. (১৯১৩) কেশবনাথ মজুমদারের বাঙলা সাময়িক সাহিত্য, ১৯১৭, ডক্টর সুনীতিকুমার দেব Bengali Litt. in the 19th Century, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২৩; অম্বলচরণ বিজাভরণ (ভারতী, ১৩২৯ প্রবাসী, ১৩৩৭), ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পা মানোএল দা আসম্পকাওরচিত বাঙলা ব্যাকরণ (কলি বিশ্ববিদ্যালয়), ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ‘ব্রাহ্মণ-রোম ক্যাথলিক সংবাদ’, প্রজ্ঞাবনা (কলি. বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭) ক্রীষ্ণনীকান্ত দাস (সাপ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪র্থ সং. প্রভৃষ্টব্য)।

এর পর অগষ্টিন আসাঁ (Augustin Aussant) প্রণীত ‘করাসী-বাঙলা’ অভিধানখানির (১৭৮১৮৩) উল্লেখ করে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of Bengali Literature, ১ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা এটি মুদ্রিত হয়নি, পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে, ইহা তিনি উল্লেখ করেছেন।

কলিকাতা গেজেটের (১৭৮১ খৃঃ ২৩এ এপ্রিল) এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায় বাঙালী পণ্ডিতমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হচ্ছে একখানি ভাল বাঙালি ব্যাকরণ এবং অভিধান রচনা করার জন্যে। (সাপ-পত্রিকা, ৪৩ খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ)।

তারপরে পাওয়া গেল একখানি ডিক্সনারী 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিয়ারি' নামে। এর প্রকাশকাল ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। স্ক্রিমসনিকাস্ট দাস মহাশয় এই বইখানির আবিষ্কর্তা (সাপ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪র্থ সংখ্যা)। এই বই-এর লেখকের নাম জানা যায়নি। মুদ্রাকরেরও নাম নেই—কেবল আছে 'ক্রনিক্যাল প্রেস' থেকে ছাপা। স্ক্রিমসনিকাস্ট দাসের আপজন্ম (A. Apjohn) নামে না থাকায় তিনি অভিধানখানিকে আপজন্ম সাহেবের অভিধান বলে অভিহিত করেছেন। বইখানির 'আখ্যাপদ্য এইঃপ—(সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় স্ক্রিমসনিকাস্ট প্রবন্ধ ইহাতে উদ্ধৃত)—'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিয়ারি'।

An Extensive Vocabulary, Bengalee and English, very useful To Teach the Natives English, and To Assist Beginners in Learning The Bengali Language. Calcutta, Printed at the Chronicle Press. MDCCXCIII।

'ক্যালকাটা ক্রনিকল' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (মঙ্গলবার, মার্চ ২০, ১৭৯২) A. Apjohn সাহেব এক বিজ্ঞাপন দেন ইংরেজি ও বাঙালিতে। বাঙালি বিজ্ঞাপন এরূপ—

"ইংরাজ ও বাঙ্গালি লোকের। সিখিবার কারন এক বহি অতি। সিন্ন ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে। ক সাহেব লোকে বাংলা কথা। সিখিবক এবং বাঙ্গালি লোকে। ইংরাজি কথা সিখিবক অতএ। ব সকল লোকের কেকাএত। কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা। ইতেছে জে ২ লোকে চাহে তা। হারা মেং আবজান সাহেবের। ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক। ইতি সং ১৭৯২ ইংরাজী। তারিখ ১৯ মার্চ মন ১১৯৮। বাঙ্গালা তারিখ ১ চৈত্র।"

স্ক্রিমসনিকাস্ট আপজন্মের অভিধানের একটি পাতারও প্রতিলিপি উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তার শব্দ-বিজ্ঞান কিরূপ ছিল—তার কয়েকটা কথা এখানে উল্লিখিত হল—

| | |
|-------------|-------------------------------|
| কাঁটালিকলা | a plantain of an angular kind |
| কাটাইতে | to cause to cut |
| কাটার | a poignard, dagger |
| কাটোবি | a crooked broad knife |
| কাটিতে | to cut, to hew |
| কাটিতে আঁখর | to blot a letter |
| কাটরা | a fence of boards |
| কাটুরা | a wood-cleaver |

ইত্যাদি।

তারপর যে অভিধানখানির কথা উল্লেখ করছি—সেখানিই আপজন্মের অভিধান আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত আদি অভিধান বলেই কীতিত ছিল। এই অভিধানখানির রচয়িতা হেনরি পিটস ফরস্টার (Henry Pitts Forster)। ফরস্টারের জন্ম

১৭৬৬ খৃঃ আর মৃত্যু হয় ১৮১৫ খৃঃ। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তরফে চিহ্নিত কর্মচারী হয়ে ভারতে আসেন। ১৭৯৩ সালে কালেক্টারের পদে আর ১৭৯৪ সালে ২৪-পবগমার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। আদালতে বাঙালি ভাষা প্রচারের জন্ত তিনি বাঙলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় একখানি অভিধান সংকলন করেন। অভিধানখানির নাম—'A Vocabulary, in two parts, English and Bengalee and Vice Versa', Calcutta 1799. কলকাতা ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে পি. ফেরিস কর্তৃক প্রকাশিত। বইখানির ১ম খণ্ড প্রকাশ হয় ১৭৯৯ সালে (মূল পৃষ্ঠা ৪২১), ২য় খণ্ড ১৮০২ সাল (মূল পৃষ্ঠা ৪৪৩)। ইহাতে প্রায় ১৮০০০ বাঙালি শব্দ আছে। সে সময় যে সব ইংরেজ বাঙলায় আসতো—তার বাঙলা বুঝত না—কাজের অসুবিধা হত। এবং আদালতের কাজেও বাঙলা না জানার অসুবিধা ফরস্টার সাহেব অনুভব করতেন। সেই অসুবিধা দূর করার জন্ত তিনি কঠোরভাবে বাঙলা ভাষা শেখেন এবং অভিধান সংকলনে হাত দেন। আরও একটা কারণ জানা যায় তাঁর বাঙলা ভাষার প্রতি প্রীতির। এই দেশে অবস্থান কালে তিনি এক জাঠ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই জাঠ রমণী বাঙলা ভাষা জানতেন, আর ঐ ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেই কারণেও ফরস্টার সাহেবেরও বাঙলা ভাষার প্রতি এত সমাদর সম্ভব হয়।

অভিধানের শব্দ সংকলনের সময় তিনি সাধু ও প্রচলিত উভয় শব্দই যথা সম্ভব উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিধানখানির শব্দবিজ্ঞান এইরূপ—

আগ্রে Ogr—above all, before, already ইত্যাদি।

আগ্রে Age—above all, before, already

প্রথমতঃ Prothomotho—above all, before

আচমক } Sudden

আচম্বিতে } Suddenly

হঠাৎ Sudden, perchance

পতিত—Waste

"ই" তালিকায়—ইতস্ততঃ পতিত Scattered (সাধু)

"উ" " উলচল Hurly burly (গ্রাম্য)

"স" " সাং Evening, twilight (সাধু)

"সাঁজবেলা " (গ্রাম্য)

"আ" " আকর্ষণ To drag (সাধু)

"হ" " হেচকান " (গ্রাম্য)

"প" " পরিশ্রম Labour (সাধু)

"থ" " থাটনী " (গ্রাম্য)

"ম" " মজুরী " (গ্রাম্য)

"চ" " চন্দ্রাতপ Tent (সাধু)

চাঁদোয়া " (গ্রাম্য) ইত্যাদি..

(বঙ্গভাষার আদি অভিধান ও ফরস্টার সাহেব-অন্যায়চরণ বিজ্ঞান, বঙ্গভাষা, ১৩১৪, ১৫ পৃষ্ঠা)।

১৮০৭ সালে কোলকাতা সাহেব অমরকোষের সম্পাদন করে এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। কোলকাতা সাহেবের কথা।

গত বারই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি অমরকোষকে এক নতুন ধারায় ইংরেজি অর্থ সমেত সম্পাদন করেন। বইখানির মুখবন্ধে তিনি বলেছেন যে, তিনি অমরকোষের মূল গ্রন্থের সঙ্গে বহু প্রাচীন-কালের বিভিন্ন দেশের পৃথিবী পুরীক্ষা করেন। গ্রিহতীয় অক্ষরে এক প্রাচীন পৃথিবী নকল করেন। দেবনাগরী অক্ষরেও নকল করেন। দেশগুণের উইলিয়ম জেনস বেশ ভাল করে পরীক্ষা করেন—জেনস সাহেব শব্দগুলির বহুলাংশে ইংরেজি প্রতিশব্দ লিখে দেন, তাতে তাঁর কাজের খুব সুবিধা হয়। বহুদীয় অক্ষরের পৃথিবী নকল টাকা ও বাখ্যা সমেত দেবনাগরী ভাষায় রূপান্তরিত করেন—দেশগুলির মধ্যে অনেকাংশ অপর প্রচলিত গ্রন্থে না থাকায় দেশগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও টাকা সমেত একখানি গ্রন্থ পান, তার অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করেন। এই সব গ্রন্থ তিনি এবং অপর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা বিচক্ষণতার সহিত বিচার করে তবে তিনি অমরকোষ সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করতে তাঁর পাঁচ বছরেরও অধিক সময় লাগে। এই বইখানি শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। গ্রন্থখানিতে তিনি সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ইংরেজিতে দিয়েছেন—তারপর ধারাবাহিক মন্তব্য, শ্লোকের সারাংশ এবং পাদটীকায় শব্দগুলির ইংরেজি অর্থ এবং পরিশিষ্টে অকারাদিক্রম শব্দসূচী দেন। পরিশিষ্টে বর্ণাহুক্তম-পদ্ধতি পরবর্তী কালের আভিধানিকগণ গ্রহণ করেন। কোলকাতা সহস্রাব্দে যে কত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—তা তাঁর (১৮১৪ খৃঃ) ভারত ত্যাগের পর ২৩ বছর পরে যখন তাঁর মৃত্যু হয় (১৮৩৭ খৃঃ ১০ই মার্চ), তখন সেই মৃত্যু সংবাদ ভারতে এসে পৌঁছুলে তদানীন্তন সংবাদপত্র ‘সমাচার দর্পণে’ নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানতে পারা যায়—

“আমরা অতি খেদ পূর্ব্ব জ্ঞাপন করিতেছি যে ইংলণ্ড হইতে যে শেষ সংবাদ পৌঁছিয়াছে তদ্বারা অবগম হইল যে কোলকাতা সাহেব লোকান্তর গত হইয়াছেন।এ সাহেব কতক বঙ্গবাসিদের দেওয়ানী আদালতে প্রধান জজ ছিলেন পরে কোর্জেস ডক্টর হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিজ্ঞা ও পণ্ডিত লোকদের প্রতিপোষকতা করণের উপরই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য সংস্কৃত বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না জোস সাহেবও নহেন এবং সর্বসাধারণ লোকই স্বীকার করেন যে তিনি সর্ব বিষয়েই স্বদেশীয় সর্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগত হইলে পূর্ব তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিজ্ঞার চর্চাতে বিরত হন নাই।.....” (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮০)

কোলকাতা সম্পাদিত অমরকোষের ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খৃঃ শ্রীরামপুরের ছাপাখানায়। দাম ১২ টাকা।

১৮০১ সালে জন লীডন (John Leydon) সাহেব বাংলায় এক অভিধান রচনা করেন। লীডন সাহেব (১৭৭৫-১৮১১) চিকিৎসক হিসাবে ভারতে এসে মাদ্রাজ, মাদ্রাস, পেনাড প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। তারপর কলকাতায় আসেন ১৮০৬ সালে তিনি কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্তানী ভাষার অধ্যাপক হন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকাকালীন

পণ্ডিতদের কাছে বাঙলা শেখেন। সে বাঙলা কিন্তু পুরো পণ্ডিতী বাঙলা অর্থাৎ পণ্ডিতদের কাছে শেখার দক্ষ সংস্কৃত-বহুল বাঙলা। তাই তাঁর অভিধানটিও সংস্কৃত শব্দের অভিধান হয়ে দাঁড়ায়।

পাদরী উইলিয়াম কেরী সাহেবের (১৭৭২-১৮৩৪) নাম বাঙলা দেশে শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তাঁর জীবনের ইতিহাস তাঁদের কাছে অজানাও নয়। তিনি ১৫ বছর পরিশ্রম করে এক বাঙলা-ইংরেজি অভিধান সম্বলন করেন। আর ৫ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য আরম্ভ করেন ১৮১৫ সালে। ১ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ মুদ্রণের পর বেথা গেল বড় অক্ষরে ছেপে বইখানির আবৃত্তি অত্যন্ত বৃহৎ হয়েছে এবং সম্পূর্ণ হতে যে আকার ধারণ করবে তা সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী হবে না। তাই তিনি বইখানি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করলে ছোট অক্ষর তৈরি করিয়ে সঙ্ক্ষিপ্ত ভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপেন। এই ভাবে ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ বের হয় ১৮১৮ সালের ১৭ই এপ্রিল। তার আখ্যাপত্র এইরূপ—

A | Dictionary | Of the | Bengali Language | in Which | The Words | Are Traced to their Origin | And | Their Various Meanings Given. | Vol. I | By W. Carey, D. D. | Professor of the Sanskrit, And Bengalee Languages, In the | College of Fort William | Second Edition, with corrections and Additions, | Serampore, | Printed at the Mission Press, | 1818. |

২য় খণ্ডের ২য় ভাগ প্রকাশ হয় ১৮২৫ খৃঃ ৭ই জুন।

১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৬ আর ২য় খণ্ডের দু’ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৪৪। এই অভিধানটিতে ৮০,০০০ শব্দ আছে (জি, যিথের কেরীর জীবনী, ১৮৮৭; বিস্তৃত বিবরণ, গুরুদ্বারিত্যের ভূমিকা, সা-প-পত্রিকা, ৪৬খণ্ড, ৩য় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ)

বইখানি ১৮২৫ সালে প্রকাশিত হবার পর সমাচারদর্পণে (১১ জুন ১৮২৫) নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল—
“বাঙলা ডেক্সিয়ানরি।—আমরা অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীমূর্ত্ত ডাক্তার কেরী সাহেব পোনের বঙ্গের পর্য্যন্ত পরিভ্রম করিয়া যে বাঙলা ও ইংরেজী ডেক্সিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্র সংখ্যা কাটো পেজের অর্ধাৎ বড় পৃষ্ঠার ২৬০ ছোট পৃষ্ঠার ১০০ হইয়াছে এবং অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইও সমেত ১১০ একশত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বহু শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় এই অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেবকৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদিক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।.....” (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ৭৭পৃঃ)।

[ক্রমঃ]



[পৃথ-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

লোকটা হেসে বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা—মহাজন লাগে না আমার। জাল কাটার জগা বাবো আমার এক ছুরি মস্তোর মূল্যধন। যেখানে খুশি মাল ছাড়তে পারি। কুমিরমারি চলে যাওয়াই ভাল। দেড় পহরের ভিতর পৌঁছে যাব। বাজার পুরোপুরি ঘরা যাবে।

কেন ভাই, কাছেপিঠে গগন দাসের খাতা—তোমাদের জগাই খাতা বসানো। কুমিরমারি অবধি কেন কষ্ট করবে ?

পাতায় কি আর কুমিরমারির দর দেবে। খাতার ব্যাপারিরা কুমিরমারি নিয়ে কেচে—মাঝখানে লাভ চাই তো খানিকটা। আর তোমাদের খাতা বসবে সেই ভোর-রাত্রে। হাত-পা কোলে করে তরফে বসে না থেকে কত দূর চলে যাব পায়ে পায়ে।

জগা বলে, মাল নামাও, কোনখানে যেতে হবে না। যাবে তো অর্দ্ধাঙ্গ বন কেটে এত কাণ্ড করেছি কেন ? কি মাছ এগুলো—পারবে ? আচ্ছা রাহুসে পারলে ছুটয়েছ ভাই।

মাছের আয়তন দেখে উল্লাসের অবধি নেই। এক একটা বেব করে জগা, পরম আদরে হাত বুলায়, আর বাহসল্যের চোখে চেয়ে থাকে : আহা-হা, রাজপুত্র ! পাঁচটা ছ'টার সেরের ধাক্কা। এজিনিষ পেটে খাবার নয়—সদরে নিয়ে দেখালে সরকারি পুরস্কার দেবে। আমি ছাড়ছি না, কুমিরমারির দর দিয়েই কিনে নেব। আরও বেশি চাও, তাই দেব। কষ্ট করে তোমায় একবার সাঁইতলা অবধি যেতে হবে। পরসাকড়ি সদাসর্বদা লোকে গাঁটে করে যোরে না।

কুমিরমারি চলে শাঙ্খিল, সেই লোক সাঁইতলার এইটুকু পথ যাবে, এ আর কত বড় কথা ! কালীতলার গৈয়ো-বনে ভাণ্ডার আছে। ভাণ্ডার বৃন্দে টাকা বের করে দাম দিতে হবে লোকটাকে।

সাঁইতলায় নিয়ে গিয়ে তাকে চালাঘরের ভিতর বসাল। প্রশ্ন মুখে জগা বলে, ঢেলে ফেল সমস্ত মাছ এইবারে। নেড়েচেড়ে দেখে আশ্চর্য করে দাম বল।

লোকটা দাম বলে, পাঁচসিকে।

উঁহ, দেড় টাকা। দেড় টাকায় খুশি হলে কিদা বল। কুমিরমারিতেও তুমি এই দর পেতে না ভাই। বসে বসে তোমাক খেতে লাগ, টাকা নিয়ে আসি।

তোমাক সাজছে জগা। লোকটা প্রশ্ন করে, তুমিই বা এত দর দিচ্ছ কেন ? পোষাতে পারবে ?

তাই বোঝ। না পোষালে দিচ্ছি কেমন করে ?

লোকটা হি-হি করে হাসে : বুঝতে পেরেছি।

কি বুঝলে ?

মাছের মনে কত কি মতলব থাকে। কত রকম ডেবে কাজ করতে হয়। খাতা জমাচ্ছ বুঝি এই কায়দায় ? বাবু বা বেমন করে হাট জমায়। হাটে যে মাল অবিকি থাকে, বান্দুদের তরফ থেকে সমস্ত কিনে নেবে। এমনি করে করে ব্যাপারি জমে। ব্যাপারির মাল আমদানি হতে লাগলে খন্দেও এসে ছুটেবে। হাট জমে গেল। তারপরে কসে তোলা আদায় করে বাও। ভাল দর দিয়ে তোমরাও তেমনি খাতা জমাচ্ছ—যত মাছ-মারা তোমাদের ওখানে বাতে জোটে। কেউ কুমিরমারি বাবে না, এদিক-ওদিক হাতে কেটে বেচতে যাবে না। খাতায় এসে নিরঙ্কুশে পাইকারি ছেড়ে দিয়ে যাবে।

জগা বিষমমুখে বলে, বন কেটে যেদি বানালাম ভাই, খাতার বুদ্ধিটাও আমার। কিন্তু আমি আর কেউ নই এখন। আমি তো আমি—খোদ মালিক গগন দাসের দশা গিয়ে দেখ একবার। আমি যাইনে—কিন্তু যা শুনতে পাই পাষণ কেটে জল বেরিয়ে যায়। ডাঙা অঞ্চলের ভান্ডাররা এসে চেপে পড়েছে। সে আছে জেলখানার কয়েদির মতো হয়ে।

লোকটা ছিলিমে গোটা দুই টান দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল : মতলব এবারে ধরতে পেরেছি। বলব ? জাল নিয়ে বেরিয়েছ—জালে তো একেবারে ফকা। আমার মাছ দেখিয়ে বউয়ের কাছে পশার বাঁচাবে তুমি।

জগাও হাসে : বউই নেই। এই হল বসন্ত-ঘর। বউ থাকলে মজা করে এমনি হাত-পা মেলে থাকতে দিত ? ঘরের চেহারা দেখে বল তুমি।

একুশ

ভোরবাত্রে আর দশটা মাছ-মারার সঙ্গে জগা গিয়ে নতুন জালার উঠল। বসেছে মাছ-মারাদের মধ্যে। জালে জড়িয়ে মাছ এনেছে, জাল খুলে মাছ পাতিয়ে দিল। জগার এই নবমুহুর্তে অবাক

হয়েছে সকলে। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলে না। কাশ্মীর ভিতর গোয়ার মানুষকে ঘাঁটাতে গিয়ে কোন বিপত্তি ঘটে না জানি!

আলায় এসেছে জগা অনেকদিন পরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চতুর্দিক। হায় হায়, কী চেহারা করে ফেলেছে তাদের মাথের আলার। বাগেদার বাড়িয়ে বলেন। আলা কে বলবে, বোলআনা গৃহস্থবাড়ি। দরজা উঠান পড়ে ছিল—আগাছার জঙ্গল, আর হ্রদ ফুটে-ওঠা সাদামাটি জায়গায় জায়গায়। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সারা উঠান ভরে লাউ-কুমড়ার চায়া পুতেছে, নটে-পালশাক-মুলায় বীজ ছড়িয়েছে। নথর লকলকে শাকে মাটি দেখা যায় না। সামনের দিকে গোয়ালঘর বাঁধা হচ্ছে। উত্তাগী ময়দ মাছবের তো অভাব নেই। খুঁটি পোতা হয়ে চাল উঠে গেছে এর মধ্যে। গোয়ালঘর শেষ হতে মাস দুয়ের বেশি দেরি হবে না। শেষ হয়ে গেলে গরু আসবে, ছাগল আসবে। আর এখনই এই ভোর হবার মুখে হাঁস ঝটপট করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় একটুকু খোশের ভিতরে। হাঁস তবে তো এসেই গেছে এর ভিতরে। মাস দুই পরে যে কী কাণ্ড হবে, ভাবতে শিরশঃ লাগছে। গোয়াল, তরিতরকারির ক্ষেত, উঠান জুড়ে লাউ-মাটা। মাচার তল দিয়ে মাথা নিচু করে দাওয়ায় এসে উঠতে হবে। সাগরের কূলে চর পড়ে ডাঙা বেঙ্গল, ডাঙায় জঙ্গল জমল আপনা আপনি। জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার চরে বেড়ায়। সকলের শেষে এলো মানুষ। শুধু মাত্র চরে গেয়ে ও-জীবের স্রুং হয় না। জমিজিরেত নিজস্ব করে ঘিরে নেবে, চিরস্থায়ী ঘরবাড়ি বানাবে—সকল জীবের মধ্যে এই মানুষই কেবল যেন অনড় হয়ে এসেছে দুনিয়ার উপর।

সব চেয়ে কষ্ট হয় বড়দার জঙ্গে। কথা বলা চুলোয় থাক, নিদারুণ লজ্জায় মুখ তুলে সে জগার দিকে চাইল না এককণের মধ্যে। সেন কে না কে এসেছে। পুরো-হাতা কানিজ এক পুরো দশতাত্তি কাপড় পরিয়ে খাতা-কলম আর হাতবাক্স সামনে দিয়ে মাচার উপর গগনকে ভয়লোক করে বসিয়ে দিয়েছে। বসে বসে হিসাব কর, আর লিখে যাও। লেখাপড়া শেখার এই বড় কাল। ফটিন্ট ঠাঁটা-তামাসা হাসিগলা করছে—তা দেখ, ভালক নগেনশলী খোঁড়তে খোঁড়তে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে সামনের উপর। এক কামরার দরজার আড়াল থেকেও দোর-ওপ্ততাপ বোন আর বউ নিশ্চয় একগুণা চোখ তাকিয়ে পাহারায় রয়েছে। মানুষটাকে নড়ে বসতে দেবে না। তোমার এই কেনাবেচার সময়, কাজের সময় বসেই নয়—দিনরাত অষ্টপ্রহর নজর রয়েছে। তার উপর সন্ধ্যার পর গান-বাঁজনা আর কড়ের আড্ডা ছিল, আড্ডা এখনো আছে। কিন্তু রসের গান গাও দিকি একখানা—‘পরলা দ্বি লো, বড় ময়লা তোরা প্রাণ’—গাও দিকি কত বড় সাহস! জিথোলার সঙ্গে নামগান করে এখন বড়দা বোন-বউ-জালকের সামনে বারাজি হয়ে বসে। হরিবরনি করে হরিব লুই ছড়ায়, বাঁধ-শখ বাজায় হয়তো বা লক্ষীপূজার সময়। জেলের কয়েদি হয়ে আছে, সেটা কিছু মিথ্যে বলেনি জগা।

গগন গদিয়ান হয়ে বসে। আর নগেনশলী মাতবরির চালে চরকির মতো ঘুরছে। অকাজের ঘোষাঘোরা নয়—খাবার মাছ বলে এক এক জাঁজিলা মাছ তুলে নিচ্ছে মাছমারাদের ঝুড়ি গালুই ও জাল থেকে। জগা বলেও খাব দিল না, নিয়ে নিল তার কাছ থেকে গোটাটকতক। জগা কিছু বলবে না, সে তো পুরোপুরি মাছ-মারা হয়েই এসেছে। এমনি ভাবে খাতার নিজস্ব খড়িও প্রায় ভরতি। তার অন্নকিছু খাবার জন্ত

রান্নাঘরে পাঠিয়ে বাকিটা বিক্রি করে দেবে। সেটা সকলে শেষে। নগেনশলী এসে এই একখানা বৃষ্টি বের করেছে—রোজগাকে নতুন পুষা। ফল্গিকিরের অন্ত নেই লোকটার মাথায়। মাছ মারার মাছ নিয়ে বসে আছে—নগেনশলী ঘুরে ঘুরে এক এক জনে কাছে যায়, হাত দিয়ে মাছ উল্টেপাল্টে ব্যাপারিদের দেখায়, হু-হায়ে তুলে ধরল বা একটু উচুতে। বলে, উং, পাইডের সমান ওজন একটা জালে জেড়ির বাবতীয় মাছ তুলে এনেছি গো! কত বড়! ঘড়ুই মশায়? হর ঘড়ুই কিছু বলবার আগে নিজেই মন-গড়া দর বলে বার আনা? ঝড়ু ব্যাপারি এ দেখ এক আঙুল দেখিয়ে পুরোপুরি টাকা বলে বসে আছে। এর উপরে কে কত উঠতে পার? এক-দুই—উঁহ আটার আনা নয়, পাঁচ সিকে—তিন। পাঁচ সিকোয় গেল মাছ ঢেলে নাও ব্যাপারি।

এমনি কারদায় মাছের দর তোলে নগেনশলী। দর উঠলে বৃষ্টি বেশি আদায় হয়, খাতার মুনাকা বেশি। যা গতিক, খাতা তো দাঁপা করে এবারে সনে উঠবে নগেনশলীর ব্যবসার ক্রমে।

সকাল হয়েছে। কিন্তু আজ বড় কুয়াশা—মনে হচ্ছে, রাত্রি আছে এখনো। বেচাকেনা শেষ। মাছের ডিভি ছেড়ে দিয়েছে অনেককণ, পচা আর-বলাই বেয়ে নিয়ে চলে গেল। জগা ভাবছে, হু-জনেই ওরা সমান ওস্তাদ—এই কুয়াশায় পথ ভুল করে কাণ্ড ঘটাবসে। আবার ভাবছে, তাই কর না-কালী, জগা কী দেরি নেয়ে না হাড়ে-হাড়ে বুকে তব্বে সকলে। মাছ-মারাদের হিসাব খাতায় উঠে গেছে, এইবার পরস্যা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরস্যা গরগেথে নিয়ে চলে যাচ্ছে একে একে।

বিনোদিনী গিয়ে হাঁসের খোশের কাঁপ সতিয়ে দিল। পাক-পাক আওরাজ তুলে ছুটোছুটি করে হাঁসের পাল বাধের দ্বারে ডোবার গিয়ে পড়ে। বাদাবনে শিয়াল নেই, এই বড় সুরিধা। কোমরে জাঁচল কেবততা দিয়ে নিয়ে চাকুবালা ঘর বাঁট দিচ্ছে। বলে, বেঁটেল পড়ছে। সবে যাও গো ব্যাপারি মশাহেরা। সবেও মাছ-মারা মশায়—

সব মাছ-মারার হয়ে গেছে, সর্বশেষ জগার পরস্যা গণা হচ্ছে। সেই বাকি আছে শুধুমাত্র। ইচ্ছে করেছে যেন চাকুবালা তার দিকে চেয়ে মাছ-মারা বলে ডেকে মুগের স্রুং করে নিল। হর ঘড়ুই আর জগার কথাবারী চলেছে তখন। ঘড়ুই তারিফ করে: ওস্তাদ বটে তুমি জগা! সর্বকমে দড়। একদিন জাল নিয়ে পড়লে, তাও একেবারে সকলের সেরা মাছ তুলে নিয়ে এসেছ।

ঝাঁট দিতে দিতে চাকুবালা স্বগতোক্তি মতো বলে, ওস্তাদ বলে ওস্তাদ! মাছ মেরে আনা হয়, তা জালে জলের ছিটে লাগে না! একেবারে শুকনো জাল।

হর ঘড়ুই তাকিয়ে দেখে, ব্যাপারি তাই বটে! আচ্ছা! তাদোই মেয়ে তো, অতদূর থেকে ঠিক নজর করে দেখেছ।

জগা কিন্তু হয়ে বলে, বড়দা বাণ কর। ময়দ মনিবের কথা মেয়েলোকে কেন কোড়ন কাটবে?

জগা যত রাগে ততই চাকুবালা খিল-খিল করে হাসে: কাণ্ডখানা বুঝে ঘড়ুই মশায়? এর-তার কাছ থেকে মাছ জোগাড় করে নিয়ে মানুষটা আলায় এসেছে।

ঘড়ুই বলে, তার গরজটা কি ছিল? বার যখন ইচ্ছে, চলে আসে চলে যায়। বাধা কিছু নেই।

চাক বলে, মনে পাণ খাকলে ছতো খুঁজতে হয়। সকলকে হানা করে, আলায় যাতে না আসে। মাছ-মারা সঙ্গে নিজে তারপর চরবুড়ি আসে।

বাটার তলে হঠাৎ পোকামাকড় পড়েছে বুঝি! মরীয়া হয়ে ঘোঁর উপর বাড়ির পর বাড়ি দিচ্ছে। জগা কোন দিকে না তাকিয়ে পয়সা গাটে নিয়ে হুমহুম করে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল।

চালাঘরে জগা একা। সোয়াস্তি নেই। সাপের মতন কঁঁস-কঁঁস করছে। ঘরে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ, বেরিয়ে পড়ে। লোকের সামনে এমন হেনস্থা আজ অবধি কেউ করেনি তাকে। চাকবাবা থাকতে ভুলেও কোনদিন আর নতুন আলায় যাবে না। বাদাবন থেকে তাকে তাড়িয়ে অপমানের বোল আনা শোধ নিয়ে তবে যাবে। ভরদ্বাজকে তাড়িয়েছে—তারও চেয়ে বড় শত্রু মেয়েটা। ভরদ্বাজ ছিল ভিন্ন এলাকায় চৌধুরীদের মাইনে-খাওয়া গোলাম—নিজের ইচ্ছেয় কিছু করত না। চাকবাবা বৃকের উপর পড়ে থেকে শক্রতা সাধবে। বলাই আর পচা, তার ডান-হাত বা-হাত কেটে নিয়েছে সকলের আগে।

আপাতত একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। চৌধুরি-আলায় চলে যাবে। সেখানে পুরানা সাঙারো আছে—অনিরুদ্ধ, কালোসেনা একা আরও সব। গগন দাসকে নিয়ে প্রথম যেখানে এসে উঠল, বাদাবনের ছাদ পাইয়ে দিল গগনকে। অতিথি এসে সেই গৃহস্থ তাড়ানোর ফিকির। গোপাল ভরদ্বাজ বিদায় হয়েছে, এখন আবার সেখানে ভাব জমিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না। চৌধুরিগণের মাছ মাছ আমশানি করে চালাঘরের ভিতরেই আড্ডা জমাবে। নতুন আলায় পাশাপাশি ওদের চেয়ে ঢের ঢের জবর আড্ডা।

এমন সব আনাগোনা করতে করতে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশা—সন্ধ্যাসার মুছে গিয়েছে সেন একেবারে। দু-হাত দুয়ের গাছটাও নজরে আসে না। স্থিতিাকুর বনের এই নতুন বসতির পথ ভুলে গেছেন বুঝি আজ।

থমকে দাঁড়াল। শিস দিচ্ছে কে কোথায়। শিস দিয়ে ডাকছে বন কাঁকে। মন্দ মাছের কাণ্ডবাত্ত নাকি? ঐ ভরদ্বাজের যে বাপা—ব্রাহ্মণ-সন্তান শিটুনি খেয়ে গেল অসংকমে গিয়ে। আর মজা এমনি, কাউকে কিছুই বলবার জো নেই—কিল খেয়ে কিল চুরি করা। কান কেটে নেওয়ার কথা হয়েছিল সেদিন—সেটা হলে কি করত? খোঁড়া পায়ের অজুহাত আছে—পগারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। কোলা মুখের কৈফিয়ৎ—মোমাছি কামড়ে দিয়েছে। পিঠে লাঠির বাড়ির দাগ—তা হয়তো গায়ের ফতুয়াই খুলল না দাগ বসে না বাওয়া অবধি, তেল মাখবার সময়ও না। কিন্তু কাটা কামের কি কৈফিয়ৎ? হেন ক্ষেত্রে কান ঢেকে পাগড়ি পরে থাকত হয়তো বার-মাস তিরিশ দিন। রাত্রিবেলা মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে পাগড়ি খুলত। শয়তান মাছ মাছ বাগে পেলে এবার আর ছেড়ে কথা কইবে না—কানই নেবে কেটে।

শিসটা বড় ঘন ঘন আসছে গো। জোর-জোর এখন। মাছঘটা বেপরোয়া—পিরীতের মাছ মাছ সাড়া দিচ্ছে না, বেশি রকম উত্তলা

হয়েছে তাই। নদী-খাল-বন-জঙ্গল কুয়াশায় অন্ধকার। রাত্রি-জাগরণ রাত্রি মাছমারার বেতন হয় বৃষ্টি; বউরা পয়সা নিয়ে কেনাকাটা বেরিয়ে গেছে। দিন-রাত্রির মধ্যে সব ঢেরে নিঃশা এই সকালবেলাটা। সময় বুঝে বাসিলার জোগাড় বেরিয়ে পড়েছে কেউ।

জগন্নাথ বাঁধ থেকে নেমে পড়ল। আওয়াজের আন্দাজ করে যাচ্ছে। কোনখানে কার কাছ গিয়ে পড়বে, কিছুই জানে না। মাছঘটা যে-ই হোক—সেই একদিন গোপাল ভরদ্বাজকে নিয়ে যেমন হয়েছিল,—আজকেও হাতের সুখ হবে তেমনি ধারা। বেতে বেতে অনেক নাবালে একেবারে খালের উপর এসে পড়ল যে! ঠিক ওপারে বাদাবন। আওয়াজের অনেক কাছ এসেছে। অত্যন্ত টিপিটিপি এগুতে হচ্ছে—কাদার মধ্যে পায়ের ওঠানামায় শব্দ না হয়। সতর্ক হয়ে যাবে তা হলে মাছঘটা।

একেবারে পিছনটিতে এসেছে, তখন চিনল। চাকবাবা। চাক, তোমার এবই কাণ্ড? দিগন্তজোড়া কুয়াশা পেয়ে আলা থেকে এত দূর এসে প্রেমিকপুঙ্খ ডাকাডাকি করছ? জগা হাতের মুঠি পাকাল। উঁহ, এখন কিছু নয়—এসে পড়ুক সেই রসিক নাগর, দৌড় কত দূর দেখা যাক। কাদার মধ্যে একেবারে জলের কিনারে হৈতালের ডাল ধরে আছে চাক। শিস দিচ্ছে, প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে তাই ফিরে। আবার করছে অবনি। হাত করে কয়েক পিছনে নিঃসোড়ে ঝাঁড়িয়ে দেখছে জগা। এসে পড়ল যে হয়! বাঘের মতন কাঁপিয়ে পড়ে তার টুটি চেপে ধরবে। বাঘের গায়ে জোর কটকটু—তার ছনো জোর তখন জগার হাতে মুঠিতে।

শিস দেওয়া ছেড়ে এবারে আর এক রকম—কু দিচ্ছে চাকবাবা। কু-কু-কু-উ-উ—কোকিলের রবের মতো কঠ ডেউ খেলে যায়। নোনাজল-ওঁ কুয়াশাময় বাদাবনের ভিতর থেকে পাটা দেখি কোকিল জেঁকে উঠল। ভারি মজা চলেছে নির্জন খালের এপারে আর ওপারে। মেয়ে এবার স্পষ্টাঙ্গ কথাবার্তা শুক করল বনের সঙ্গে : ও বন, শোন—আমার কথা শোন। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি আসছে : শোন—। অতি স্পষ্ট—চাকবাবার চেয়েও স্পষ্টতর গলা। বাড়ি ছলিয়ে চাকবাবা আরও চেঁচিয়ে বলে, না, শুনব না। তুমি আমার কথা শোন আগে, বা বলি শোন। শোন, শোন—দূর-দূরান্তে ধ্বনিত হয়। চাক বলে, শোন; বনও বলে, শোন। দু-জনে পাঁজাপাঁজি। মাঝখানে খাল না থাকলে বোধকরি চুলোচুলি বেধে যেত ছই পক্ষে।

এতক্ষণে জগা বুঝতে পেরেছে। মাথা খায়াপ মেয়েটার। রকমশকম দেখে অনেক আগেই সেটা বোকা উচিত ছিল। ছৎকম্প হচ্ছে জগন্নাথের। বনরাজ্যে একটা খাল এমন-কিছু হস্তর বাধা নয়—ভাটা সরে গিয়ে সেই খাল এখন আরও সর হয়ে গেছে। চুলোচুলির ভাবনা ভাবছে না, বাঘ আসতে পারে খাল পার হয়ে। মাছঘের গলা পেয়ে দুয়ের কোম-ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে হয়তো শাব হয়ে এসে উঠছে—সেখান থেকে টিপিটিপি পা ফেলে ঘাড়ের উপর হাত নাপিয়ে পড়বে। এমন কত হয়ে থাকে! গালের জায়গা মানসেনায়। বাদাবনে যারা আসবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচার-বিবেচনা করে প্রতি পায় সতর্ক হয়ে চলতে হবে তাদের। মানসেনার নদে বাদায় এসে সন্নিবি পাচ্ছে না, বনের সঙ্গে তাই ডেকে ডেকে বলতে এসেছে।

গালিগোলাজ করা উচিত। কিন্তু খানিক আগে যা কথার খোঁজা খেয়ে এসেছে, চাককে নাড়তে জগন্নাথের আর সাহসে কুলাব না। শুধু কথাই বা কেন, মাটিতে ঐ যে অভাবড় বাঁটা ঝুলক তাই বা তাকে উদ্দেশ্য করে কি না কে বলবে? বাবে যদি মুখে করে নিয়ে যায়, ভালই তো—ভরসাজ গেছে, শেষ শত্রু আপোষে থতম 'হয়ে যাক তাদের সাঁইতলা থেকে।

কুয়াসা কেটে হঠাৎ আলো ফুটে উঠল। সূর্য দেখা দিয়েছে। বনের মাথায় বোদের ঝিলিমিলি, কী সর্পনাশ, চাকবালার একেবারে পিছনটিতে জগা—দেখলে যে ক্ষেপে উঠবে দজ্জাল মেয়ে! পা টিপে টিপে পিছিয়ে সে বাঁধে গিয়ে উঠল। খানিকটা বাঁচোয়া এবার। বাঁধের উপর দিয়ে হন হন করে চলেছে করালীর দিকে। চাকবালার দৃষ্টিতে না পড়ে যায়। কিন্তু হয়ে গেল তাই। ভাড়াভাড়ি করতে পা পিছলাল। পড়ে যাচ্ছিল, একটা ডাল ধরে সামলে নিল। মুখ ঘোরাল চাকবালার। এক পলক। ঘুরিয়ে নিল মুখ লজ্জা সঙ্গে। চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থ বোন দেখে ফেলেছে—এমনি অবস্থা এখন জগার। সম্রাসী চোর নয়, বোঁচকার ঘটায়। কিন্তু কে বুঝবে, বাবেই বা কে বোঝাতে? বলি, বাঁধের পথ তো কারো কেনা জায়গা নয়—গরজ পড়েছে, তাই এসেছি এখানে। যা ইচ্ছে ভাব গে, বয়ে গেল।

নতুন আলার একেবারে পা বেসে বাঁধ চলে গেছে, সেইখানটা এসে

পড়েছে। বাঁধের মাটি তুলে ভিতর দিকে ডোবা মতন হয়েছে। মতলব করে একটা জায়গা থেকেই মাটি তোলে। ক'বছর পরে এই ডোবা পুঙ্খর হয়ে পঁড়াবে। কলমির দামে এরই মধ্যে জলের আধাআধি ঢেকে গেছে, কলমিকুল ফুটে আছে। হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে তার ভিতরেই। কতগুলো হাঁস যে বাবা! ডোবাটা আলার এলাকার ভিতরেই, কিনারা দিয়ে পথ। পিটলি-গোলায়—লক্ষ্মীর পা এঁকেছিল, খানিকটা তার চিহ্ন রয়েছে। সাপা পায়েব দাগ ফেলে ঐ পথ ধরে লক্ষ্মীঠাকরুন আলার ঘরে উঠে বসেছেন—আগন্তবালাই তাদের দূর করে দিয়ে লক্ষ্মীর বসত। এবাং সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীমন্তদের আনাগোনা সেই জায়গায়।

খান দুই-তিন গুঁড়ি ফেলে ডোবার একদিকে ষাট বানিয়েছে! বিনি-বউ ধুচনি করে চাল ধুতে এল। বেড়ে আছে বড়ল, বাঁধা ভাত খাচ্ছে। রকমারি খাবার মাছ রেখে দেয় রোজ, হাঁসে ভ্রিম পাড়ে, তার উপরে এটা-ওটা ফাইকসমাস করে পচা-বলাইকে—কুমিরমারি থেকে তারা কেনাকাটা করে আনে। ভাত বেড়ে অষ্টবাজন চতুর্দিকে সাজিয়ে পিড়ি পেতে গগনকে ডাক দেয়, ভাত গেতে এস গো। সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও—বলে, দাঁত খোঁচাবার লজ্জা খড়কে-কাঠি এনে দেয় আঁচাবার সময়। বউ-বোন-শালায় সন্সার পাতিয়ে দিবার মজায় আছে নতুন যেদি ও খাতার মালিক ক্রিয়াক্ত বাবু গগনচন্দ্র দাস। [ক্রমশঃ]

মন

বীরেশ্বর বসু

“How fleet is the glance of the mind
Compared with that of wind.”

বাসে যেতে যেতে মনে হয়—
আমি যদি পাখি হোতাম,
উড়ে যেতাম বহুদূরে বিদিশার দেশে
অথবা নীল শান্ত কোনো সমুদ্রের পারে
কিবা উর্ধ্বে অতি উর্ধ্বে মহাপুঙ্খ 'পরে
যেখানে পাখিরা গুড়ে,
মহানন্দে গায়, মেঘে মেঘে বাতাসে হারায়!

এর মাঝে কখন যে বাস—
এসে গেছে বহুদূর,
পেরিয়ে গড়ের মাঠ, আলিপুর, বাস, মাটি, চূপ—
পাখিরা পিছনে সর;
আমি গেছি আরো দূরে অনন্ত নিখিলে
সেখানের খোঁজ কিন্তু পাখিরা জানে না,
জানি আমি, অর্থাৎ এ-মন।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এর পর আমরা সকলে মিলে খোকাবাবুর রক্তিতা মলিনাসুন্দরীর কক্ষে এসে দেখলাম, মলিনাসুন্দরী আপন বক্ষে বসে ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছে। তার পাশে পড়ে রয়েছে একটা দস্তা মোটা দড়ী ও একটি ক্রোরোফর্ম-ভর্তি শিশি। এই ঘটনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়েছিল। তার সেই বিবৃতির একটি সারমর্ম নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

“এই রাতে আমি নিশ্চিন্ত হয়েই আপন কক্ষে নিদ্রিত ছিলাম। কারণ, আমি জানতাম যে নীচের ঘরে দুইজন সিপাই আমাকে রক্তার জন্ত উপস্থিত আছে। সহসা জানালা ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে একটা ঝুপ করে আওয়াজ হলো। এইরূপ একটা আওয়াজ শুনা মাত্র আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আমি উঠে বসবার পূর্বেই দেখি, আমার ঘরের বিজলী বাতিটি জ্বলে দিয়ে খোকাবাবু আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি লাক্ষ্যে পড়িয়ে উঠা মাত্র খোকাবাবু আমাকে চূপ করে থাকবার জন্ত নির্দেশ দিলেন। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ছিন্ন আমার উপায়ও ছিল না। খোকাবাবু এর উপর প্রস্তাব করলেন যে তিনি আজই আমাকে বাংলাদেশের বাইরে এক স্থানে নিয়ে যাবেন। আমি সন্তোষে তাঁকে জানলাম যে এতে তাঁর বিশেষ বিপদ ঘটতে পারে। কারণ নীচে ঘরার কাছে দুই জন পুলিশের লোক আমাকে রক্ষা করার জন্ত মোতায়েন করা আছে। ইতিমধ্যে খোকার বন্ধু কেঁটাবাবুও ঐ একই পথে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন যে, ঐ সিপাহিরদের ঘর বাহির হতে অতর্কিতে তিনি শিকল ভূমে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঠিক এই সময় নীচকার সিপাহিরও বাহিরের ব্যাশার উপলব্ধি করে চাঁচকার শুরু করে দিলে। তাদের চোচানিতে বিরক্ত হয়ে খোকাবাবু তার সাক্ষরদ কেঁটাবাবুকে জানান, ‘এই তুই শীঘ্রি নেমে রাস্তার গিয়ে পঁড়া। মলিনা সহজে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি একে ক্রোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করে ওর দেহটা ভেঙে দিয়ে বেঁধে নীচে গলিটার নামিয়ে দেব, আর নীচে থেকে তুই ওকে ধরে ফেলে বাঁধনটা তাড়াহুড়ি খুলে দিয়ে ওকে কাঁধে করে নিয়ে চলে যাবি। ঐ গলির অপর মুখে গ্রন্থক শুল্ক নিচরই মট্টরের ট্যান্ডিখানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।’ খোকার আদেশ পাওয়া মাত্র কেঁটাবাবু জানালা পঁলে দেওয়ার পর খাঁড়া বঁয়ে নীচে নেমে গেলো। কিন্তু আমি এই সব ডাকাতদের কথামত কাজ করতে আরপেই তৈয়াস পেশাম না। আমি খোকাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে তাদের সঙ্গে আমি কোথাও যাব না এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের লোকের সাহায্যের জন্ত চাঁচকার করতে শুরু করে দিলাম—‘গোকে কোথায় আছে আমাকে রক্ষা করো। খোকাবাবু এসে আমাকে খুন করে ফেললো গো। শীঘ্রি তোমার ধানার খবর পাও গো, ইত্যাদি’ কথা বলে। আমাকে এই ভাবে চিঠিরে উঠতে

দেখে খোকাবাবুও ‘খোং’ বঁলে কেঁটের মত খাঁড়া বঁয়ে নীচে নেমে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনেতে পেশাম, বাইরে বন্ধু হোঁড়ার দস্তাদম আওয়াজ হচ্ছে। এই জন্ত তখন থেকে ভয়ে ঘরের মধ্যেই আমি বসেছিলাম।”

আমরা অকুস্থল হতে দড়ী, কাপড়, ক্রোরোফর্মের শিশি প্রভৃতি প্রদর্শনী দ্রব্য কয়টি সাবধানে সংগ্রহ করে নিজেকে হেপাজতীতে গ্রহণ করলাম। ঐ গৃহঘের শিশিটা গ্রহণের সময় আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। কারণ তাতে খোকাবাবুর অঙ্গুলির টিপ-চিহ্ন সন্নিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এঁছাড়া নেমে এসে আমরা পাশের গলিতে এবং বাটার দেওয়ালের গায়ে অপরাধীদের পদচিহ্নের সন্ধানও করেছিলাম। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারিনি।

সাক্ষিনী মলিনাসুন্দরীর উপরোক্ত বিবৃতিতে আমরা কেঁট এবং সুবল নামে আরও দুই ব্যক্তির নাম জানতে পারি। খোকাবাবু বলে যে বহু ব্যক্তি সংযুক্ত আছে তা ইতিপূর্বেই আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম। এই জন্ত মলিনাসুন্দরীকে এই সম্পর্কে জেরা করে এদের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এঁছাড়া আরও একটি বিশেষ তথ্য তার কাছ হতে অবগত হওয়া আমাদের দরকার হয়েছিল। এই তথ্যটি হচ্ছে এই যে, মলিনাসুন্দরী খোকার সহিত বহুদিন রক্তিতারূপে বাস করা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে অজ্ঞাত যেতে চাইছিল না কেন? এই সকল দুরূহ মামলার তদন্তে পুলিশের কর্তব্য শুধু সাক্ষ্য সংগ্রহ করা নয়। মামলার শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এই সাক্ষীকে নিজেকে তাঁবে রাখাও তাদের অপর আর এক বিশেষ কর্তব্যরূপে বর্তিয়ে থাকে। এই জন্ত সাক্ষীদের মধ্যে কোনও বিসদৃশ ব্যবহার পরিলক্ষ্য করা মাত্র আমাদের কর্তব্য হচ্ছে উহাদের এইরূপ ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া। এই জন্ত এই সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা মলিনাসুন্দরীর নিকট হতে আমরা অবগত হতে থাকি। নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নোত্তর হতে বক্তব্য বিষয়টি বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

প্রঃ—আচ্ছা! তুমি তো কিছুকাল খোকাবাবুর রক্তিতারূপে বাস করেছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি খোকার সঙ্গে অজ্ঞাত যেতে রাজী হলে না কেন? খুব বেঁচে গেছ কিন্তু তুমি। হয়তো তোমাকেই এইদিন সে খুন করে বসতো।

উঃ—আজ্ঞে, যেভাবে আমরা জীবনযাপন করি তাতে যে কোনও দিন আমরা খুন হয়ে যেতে পারি। বাড়ীতে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে অনেক কম। এইজন্ত সাধারণতঃ এমনি চেনা লোকের সঙ্গে তাদের কথামত অজ্ঞাত কোথাও আমরা বাই না। এক্ষণে এই হত্যাকাণ্ডের পর ঐ ভয়ঙ্কর লোকটার সঙ্গে অজ্ঞাত কোথাও যাওয়া আমি নিরাপদ মনে করিনি। এঁছাড়া নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে

অল্প একজনের হেপাজতে আমি ঘাইদাই বা কেন? আমাদের এই, অল্পজ্ঞ জীবনের একমাত্র সুবিধা হচ্ছে এই স্বাধীনতা। যেহেতু এই স্বাধীনতা হারাতে আমরা সাধারণতঃ রাজী হই না। অজ্ঞাত কারণের মধ্যে তাঁকে প্রত্যর্থ্যমান করার এটাই ছিল অজ্ঞাতম কারণ। পোকাবাবু এই বিশেষ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি আমার সম্মতির জন্ত অপেক্ষা না করে আমাকে জোর করে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রঃ—হ্যাঁ। আমরাও এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু একটি কথা আজ আমাদের কাছে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। আপনি উপরোক্ত কারণ ছাড়া পোকাবাবুকে প্রত্যর্থ্যমানের অজ্ঞাত কারণের কথাও বলেছেন। আমরা কি ঘরে নিতে পারি যে এই অজ্ঞাত কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল পোকাবাবুর প্রতি আপনার সাম্প্রতিক ক্রোধ? পোকাবাবু পাগলামীকে অকাণ্ড হত্যা করার জন্য তাঁর উপর আপনার এক দারুণ বিরুদ্ধা এসেছিল। আসলে আপনি পাগলামীকেও পোকাবাবুর মতই ক্রীতির চক্রে দেখতেন।

উঃ—কেন আপনারা এই সব অবাস্তব কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে মিছামিছি কষ্ট দিচ্ছেন। পোকাবাবু আমাকে প্রচুর অর্থ প্রতি মাসে দিয়ে এসেছেন। তাঁর মত দুর্দান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অজ্ঞাত গেলে আমাকে তাঁর একান্তরূপে ভাবে থাকতে হতো। আমার প্রাণ্য অর্থের কথা তুললে হয়তো তিনি আমাকে একাকী পেয়ে অকথা নির্ধাতন করতেন। খুনে ডাকাত প্রভৃতিদের ভালবাসার কোন স্থিরতা আছে বলে আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। কিন্তু পাগলামীর কাছে আমি কোনও দিনই একটি কপদকও নিই নি। বরং সে আমাকে গানবাজনা শোণাতো বলে প্রথম প্রথম আমিই তাকে বহু অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দিয়ে এসেছি। তবে ইদানীং রাগে সে অতিরিক্ত মত্তপান শুরু করেছিল। এই দুর্বিপাক হচ্ছে তাকে বন্ধ করার জন্তই আমি কিছুদিন তাকে অধিক অর্থপ্রদানে বিরত ছিলাম। তবে ভালবাসা শব্দটি আমাদের কাছে আপনারা আর দয়া করে তুলবেন না। আমরা মানুষকে গুলি করতে শিখেছি, কিন্তু তাদের আমরা ভালবাসতে শিখিনি। তবে—থাক সে সব কথা।—আজ্ঞে হ্যাঁ। একথা সত্য পাগলামীর নিহত হওয়ার আমরা সকলেই খুব ব্যথা পেয়েছি, বাবু। প্রকৃতপক্ষে এখনও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে তাঁর মত নিরীহ মানুষকে নিহত করতে পারে এমন নিষ্ঠুর মানুষও পৃথিবীতে বিচরণ করছিল।

প্রঃ—আচ্ছা, এইবার বলো এই কেঁদেবাবু এবং সুরেলবাবু লোক দুইটা কারা? পোকাবাবু যে একটা খুনের দলের সন্ধান এখন তুমি তা তো ভাল করেই বুঝেছ। এইবার তা'হলে তুমি মনে করে করে বল, তাঁর দলে আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি তোমার ধারণা মত সংযুক্ত ছিল?

উঃ—আজ্ঞে, আমি এই কেঁদেবাবু, সুরেলবাবু, কালাবাবু এবং গোপীবাবু নামে কয়টি লোককে পোকাবাবুর বন্ধুরূপে চিনি। এরা সকলে ঋণ্য মধ্যে পোকাবাবুর সঙ্গে আমার ঘরে এসে আমার গান শুনে গিয়েছে। কিন্তু এরা আমার সঙ্গে কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করতে কোনও দ্বিধাই সাহসী হয় নি। তবে আমি এও লক্ষ্য করেছি যে, যারা পোকাবাবুকে সব সময়ই ভয় ও সেই সঙ্গে ভক্তি করে চলত এবং এদের উপর পোকাবাবুর প্রতাপ ও সেই সঙ্গে বিশ্বাসও ছিল অসীম।

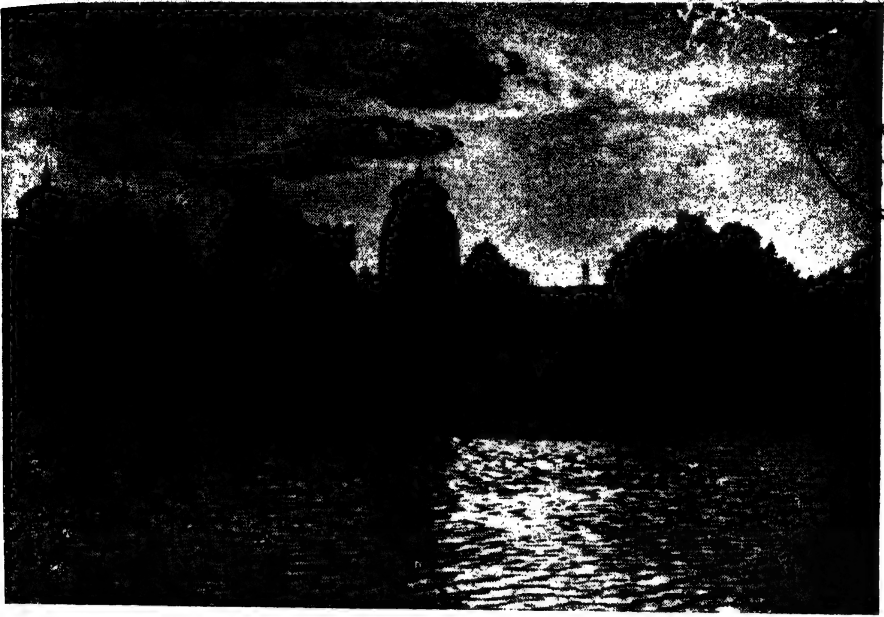
উপরোক্ত প্রস্তাবের হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই প্রধান সাক্ষিনী মলিনাস্থলীর সহিত পোকাবাবুর আর

সাক্ষাৎকার না ঘটলে তাকে বিচারের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের তাঁকে রাখা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। তবে মলিনাস্থলীর হাবভাব হতে আমরা একথাও বুঝেছিলাম যে তাকে বন্ধ করার অজুহাতে তাকে নজরবন্দী করে রাখারও প্রয়োজন আছে। মধ্যে মধ্যে তাকে পাগলামীরূপে নিহত হওয়ার কল্পনা কাহিনী শুনিতে তাকে থোকাবাবুর প্রতি বিরূপ করে রাখা আমাদের উচিত হবে।

পরের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ প্রত্যয়ে ছয়টার সময় আমরা সকলেই যথারীতি অফিসঘরে নেমে এলাম। গত দিবস অধিকরাতি পর্যন্ত কার্যে রত থাকার আমাদের কাহারও ভালো করে ঘুম হয় নি। এতদিনে আমরা ভালরূপেই বুঝতে পেরেছি যে এই খুনের কিনারা করতে হলে আমাদের মূড়াপণ করে এগিয়ে যেতে হবে। এমন কি, আমাদের মধ্যে যে কেহ যে কোনও মুহূর্তে নিহতও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জাখাশ আর্মি এবং বৃটিশ নেতীর ভায় কলিকাতা পুলিশেরও একটা ঐতিহ্য ছিল। এই বিশেষ ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণরূপে আমরা অর্জন করেছিলাম। এতদিনের এত বড় ঐতিহ্য আমাদের পক্ষে হেলায় হারিয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। আমরা যে কোনও দুর্বিপাক মাথা পেতে নেবার জন্ত প্রস্তুত ছিলাম। এখন আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো প্রবর্তী তদন্ত এখন কোন দিকে পরিচালিত করা উচিত হবে, তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি যে, এই হত্যাকাণ্ডটি পোকাবাবু এবং তাঁর দলের লোকদের দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই পোকাবাবুটির প্রকৃত পরিচয় কি? তিনি কে এবং থাকেনই বা তিনি কোথায়? অভিজ্ঞ ইনস্পেক্টার সুনীলবাবু মত প্রশ্ন করলেন যে এখনো পর্যন্ত এইরূপ এক দুর্দান্ত ব্যক্তি কোনও না কোনও নুড়ে কলিকাতা পুলিশের নজরে আসেনি তা কখনও হতে পারে না। আমাদের পরামর্শসভায় তিনি দৃঢ় চিত্তে যোগ্যতা করলেন যে নিশ্চয় শোকটা কলিকাতা পুলিশের নিকট অল্প কোনও নামে পরিচিত আছে।

এই সময় সহসা আমার স্মৃতিপথে উদয় হলো প্রায় বৎসরাধিক পূর্বেরকার একটি ঘটনা। এই ঘটনাটি 'শিউরণ হত্যাকাণ্ড' নামে ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এই শিউরণ গুরুত্বপূর্ণ শিউরণিয়া ছিল একজন পুরাতন পানী। তবে শেষের দিকে আর চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত না থেকে সে চোরদের ধরতে এবং চোরাই মাল উদ্ধার করতে আমাকে প্রায়ই সাহায্য করত। একজন আমি তাকে প্রতিটি মামলা বাবদ প্রচুর অর্থও প্রদান করেছি। একদিন সে আমাকে জানাল যে, বাঁধা নামক একজন জিলাধিকারী গুণ্ডা গুণ্ডা-আইন অমান্য করে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। এই বাঁধাগুণ্ডার নাম পূর্বে থেকেই আমাদের জ্ঞান ছিল। দুই বৎসর পূর্বে দেওয়ানত তেওয়ারী নামক জনৈক জমাদার তাকে ধরতে গেলে সে তাকে ছুরী মেরে পলাবার চেষ্টা করে। এই মামলাটি আমিই তদন্ত করেছিলাম। আমার রিপোর্ট অমুযায়ী পুলিশের এই জমাদারটি বীরহের জন্ত ভারতীয় পুলিশ পদকও প্রাপ্ত হয়েছিল। আমার অধুরোধে আমার এই ইনকরমার শিউরণ কৃপাবাদ লেনের একটি বাড়ী দূর হতে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় বাঁধাগুণ্ডা তাঁর বাড়ী থেকে বার হয়ে আমাদের উত্তরকে সেখানে একত্রে দেখে ফেলল। আমি তৎক্ষণাৎ পথের উপর দিয়ে পাড়তে তাকে ধরতেও পেরেছিলাম। কিন্তু বাঁধাগুণ্ডার সঙ্গে একটি সাইকেল থাকার সে তাকে চড়ে সড়কেই অদৃষ্ট হয়ে যেতে পেরেছিল। [ক্রমশঃ]



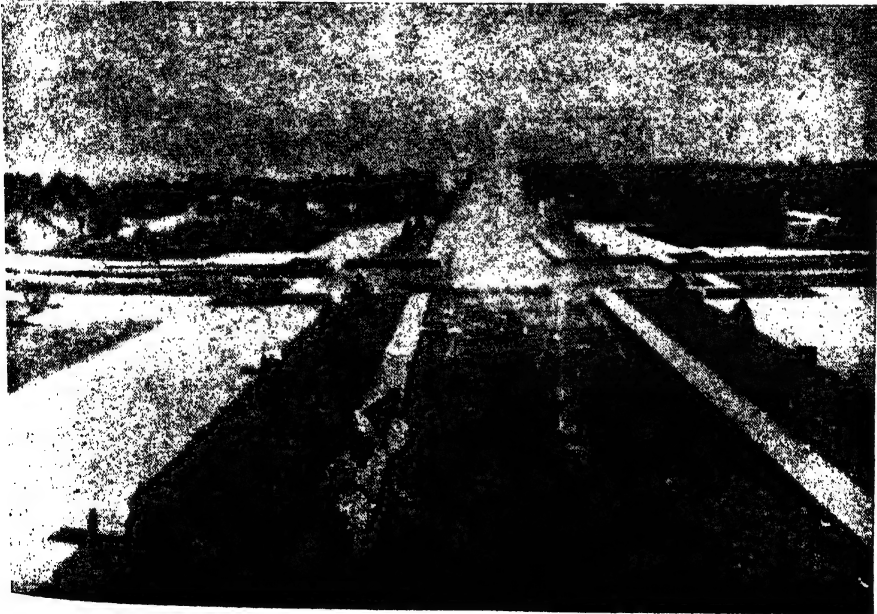
সাঁঝের বেলা

—কমল

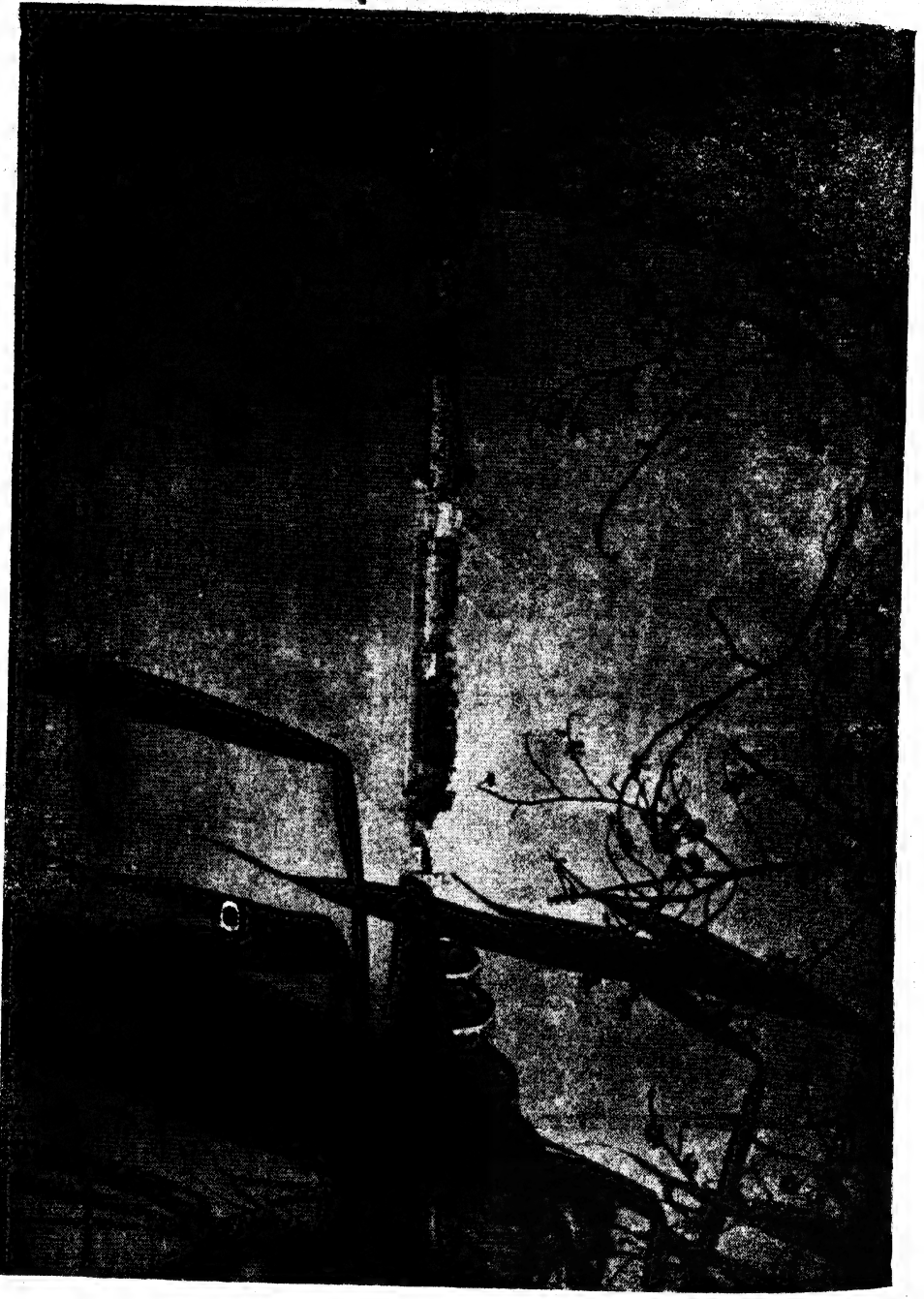
॥ আলোকচিত্র ॥

ছুবিলা পার্ক (টাটা)

—অসিতরঞ্জন ঘোষ-দস্তিদার



কালীমন্দির (ধাকপেয়ার)





অমরনাথের গুহা



মেঘপালক

—চিত্রকরন মণ্ডল

এবার কেনবার অম্ময়

শেখ মুহাম্মদ বিলোয়া

ইতল

পিলখার-প্রথম ক্যাপ যুক্ত দেখে কিলবেন

এম. এল, বঙ্গ য়াও কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলদরজা দাশগুপ্ত

তবে এই বাতাসে বছরের মধ্যেই একটা আঘাত পেয়েছিলাম, মনে আছে—এক সে কথাটাও তোমাকে এইখানেই বলে রাখি। আঘাতটা এল—সুখার মৃত্যু-খবর।

বাবার মৃত্যু-খবরে মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা ত জানই। তার মধ্যে বেদনা ছিল ঘনীভূত—সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিলাম মনে আছে ত? কিন্তু এবার সুখার মৃত্যু-খবর বেদনায়ন হয়ে আমাকে ঠিক অভিভূত করেনি। সুধাকে হারালাম, আর তাকে কোনও দিনই দেখতে পাব না—এদিক দিয়ে মনটা আমার মোটেই কাতর হয়নি। কিন্তু সুখার মুখখানা মনে করে মনের গহন তল থেকে একটা যেন জ্বালা থেকে থেকে সমস্ত মনটাকে বিধিরে দিচ্ছিল—বোচাৰী! বিনা অপরাধে, আমারই জন্ত প্রাণটা দিল। অসুশোচনা? কি জানি, জোর করে ঠিক তাও বলতে পারি না, নিজের কাছে ত নিজেকে কোনও দিনই অপরাধী মনে করিনি।

কিন্তু ক্রমে দেখলাম—ঘনীভূত বেদনা চোখের জলে মেঘের মতন সময়ে নিশেষ হয়ে যায় কিন্তু এই জ্বালাটা ঠিক একেবারে মুছে যায় না। তীব্রতা অবশু কমে গিয়েছিল—সময়ে কমে যায়। কিন্তু তবুও অকারণে হঠাৎ কখনও সমস্ত মনটা টনটন করে উঠত। বুঝিয়ে দিত—অন্তরতম অন্তরে বিধের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হয়নি, কোনও দিনই বোধ হয় হবে না।

মার্লিনকে বন্ধন খবরটা দিলাম—তখন আমরা ম্যানচেষ্টারে। মার্লিন কথাটা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেল—এদিক দিয়ে তার মনের কথা আমি আজও জানি না। কলে, শুধু এইটুকু বলে রাখি, প্রায় ১৫১২ দিন আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যেন খুব কমে গেল, প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া দু-জনে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাবার্তা বলিনি। বলা! ভুল বুলো না, এ সময় কোনও বিরোধের সৃষ্টি হয়নি আমাদের মধ্যে।

আমি বোধ হয় সে সময়টা চুপচাপ থাকতেই চেয়েছিলাম এবং মার্লিনও যেন তা সহজেই মেনে নিয়েছিল। এগিয়ে এসে কথাবার্তা বা ব্যবহারে কোনও সহানুভূতিও আমাকে দেখায়নি কিংবা কোনও দিক দিয়ে কোনও বিক্ষোভেরও সৃষ্টি করেনি কোলও দিন।

কলে, ক্রমে বন্ধন সময়ের সঙ্গে মার্লিন এবং আমার পরস্পর প্রতি ব্যবহার আবার সহজ হয়ে গেল, সুখার বিষয় কিন্তু কোথাও আভাসেই জিগে পর্গস্ত কোনও দিন হয়নি আমাদের মধ্যে দু-জনেই যেন এড়িয়ে চলেছি।

তবে, এই সময় প্রায় বছর থানেকের জগা আমার মনে জ্ব একটা প্রবৃত্তি জেগে উঠল—সেটা একান্ত আমারই মনের নিহ গোপন কথা আর কেউ জানে না। মাঝে মাঝে মনে মনে আ সুখার সঙ্গে মার্লিনের তুলনা করতাম। মার্লিনের সঙ্গারকত স্ত্রীপুণতার দিক দিয়ে সুধাকে বাচাই করে দেখতাম—সুধ কি এতটা দক্ষতা ছিল? বলতে লজ্জা করব না—মার্লিনে প্রেম নিবেদনের নব নব রূপের মধ্যে মাঝে মাঝে সুধাকে বাচ করে দেখেছি, এত মধু কি ছিল তার প্রাণে? আমার সেবায়ে দিক দিয়েও সুখার কথা ভেবে দেখেছি—মার্লিনের মতন এমন ক কি সে প্রাণখানা বিছিয়ে দিতে পেরেছিল আমার চলার পথে বলা! ভয় পেও না। এই তুলনায় সুধাকে আমি কখনও পরাজিত হতে দিই নাই আমার মনে—নানা যুক্তি দিয়ে তার গৌরব মনে মনে বজায় রেখেই চলেছি। রূপের দিক দিয়ে অবশু কোন দিনই মার্লিনের সঙ্গে সুখার তুলনা করিনি, কেননা সেদিক দি সুখার নিশ্চিত পরাজয়ের কথা ত আমার অজানা ছিল না এ সেদিক দিয়ে সুধাকে অপমান করতে আমার মন একেবারে চায়নি।

আমার মনের আর একটা দিকের কথাও তোমাকে এইখানে বলে রাখি মনে রাখ। দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশের সঙ্গে প্র সমস্ত সম্পর্কই ক্রমে দিয়েছি চুকিয়ে, তবুও সেই দেশের দিক দি মাঝে মাঝে এক একটা প্রবৃত্তি কেন যে আমার মনে কিছুদিনে জন্ত প্রবল হয়ে উঠত—আমি জানি না। ইরাজীতে থাকে বা Complex, সেই রকম এক একটা Complex যেন আমার পেয়ে বসত কিছুদিন।

বলা! মনে আছে ত, বাবার মৃত্যুর পরে, দেশে আমাদের ক বড় বংশগৌরব, আমাদের বংশগৌরব এ দেশের লর্ডবয়ে

সমুদ্র—এ ধরনের কথা প্রায়ই কিছুদিন জাহির করেছি মার্লিনদের কাছে, এতটুকুও বিধা করিনি। শুধু তাই নয়,—শিতামর্ষ, স্রশাস্ত সার, ভাইকে খুন করার অপরাধে জেল হয়েছিল, একথা ত তখন আমার অজানা ছিল না। সে কথাটি সকলের কাছে থেকে চেপে রেখে, আমাদের বংশগৌরবে কোনও দিন কোনও কলঙ্ক পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি—মার্লিনদের কাছে একথা জাহির করতেও এতটুকু লজ্জা বোধ করিনি। এ সব খবর আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতে বহুত বহুত তোমাকে জানিয়েছি। এ প্রবৃত্তি অবশ্য ক্রমে গেল কেটে, তবে স্রশাস্ত সার জেল হওয়ার খবরটি গোপনই রেখেছি—মার্লিনকেও কিছু বলিনি।

আজ ভাবি—কেন বলিনি? মার্লিন ত এখন আমার বিবাহিতা ছা। তার সঙ্গে মনের সমস্ত অমুভূতির নিবিড় আদান-প্রদান এই বারোটা বছরের মধ্যে কোনও দিন কোন বিরোধের ত সৃষ্টি হয়নি বরং একটা অপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছি। নিজের সমস্ত প্রাণখানা বিছিয়ে আমার প্রাণ-মন তার উপর তুলে নিয়ে তাকে ভালবাসার একটা ক্ষুদ্র যাত্রা যেন সে জানত—সহজেই আমার মন একটা নিশ্চিন্ত বিধামে ঘুমিয়ে পড়ত সেখানে, অন্যদিকেই কেটে যেত বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্লাস্তি। তবুও বলিনি। কেন? লজ্জা পেলাম কি? অত বড় ব্যশের ছেলে বোলাঙ্কে আমারই ভ্রাতৃবিরাহ না করে সে শেষ পর্যন্ত আমাকে বিবাহ করেছিল—তাই কি আমার ব্যশের কলঙ্কের কথাটা তার কাছে থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম? জানি না। হায় রে! তখনও আমি মার্লিনকে কি ঠিক চিনিনি? বোধ হয় তাই। আজ এই কথাটা নিয়ে প্রায়ই ভাবি, কিন্তু কোনও সম্ভাব্যজনক জবাব খুঁজে পাই না। বহু পূর্বে ছাত্রজীবনে মনোবাদের কথাটা মনে পড়ে। সত্যিই কি তেলে-জলে মিশ যায় না?

অনেক পরে তোমার পাঠান পূজনীয় স্রশাস্ত সার আত্মজীবনী গাত এল। কিন্তু তখন—

* * * * *

হাই হোক, দেখতে দেখতে বারোটা বছর জীবনের কেটে গেল। এইবার আমি যেন একটা ক্লাস্ত বোধ করতে লাগলাম—মনের দিক দিয়ে একবারেই নয়, শরীরের দিক দিয়ে। সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে যেন আর ইচ্ছে করে না, বিকালে সাঙ্ঘারীতে যেতে যেন আর ভাল লাগে না, আগুনের কাছে কোঁচে ভয়ে পড়েই সমস্তা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে—এই ধরনের একটা ভাব। এত যে আমি গল্গল খেলতে ভালবাসি, প্রত্যেক রবিবার দিনটা পুরো পরিবার থাকলেই সকালবেলা ব্রেফাষ্ট খেয়ে মার্লিনকে নিয়ে চলে হাই ক্লাব এবং সমস্ত দিন সেইখানেই কাটিয়ে, সেইখানেই লাঞ্চ খেয়ে, খেলে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে আসি, এবং শুধু তাই নয়, শীতকাল কেটে গেলে বুধবারেও বিকালের দিকে মাঝে মাঝে হাই সোফান, ক্লাবে যাওয়ার এত বোকামি আমার—ইলানী তাও যেন আর ইচ্ছে করে না। গল্গল পুরো আঠারো হোল অন্যদিকে খেলি আমি কিন্তু ইলানী নয় হোল খেলতে না খেলতেই একটু যেন ক্লাস্ত বোধ করি। ডাক্তারীর দিক দিয়ে শরীরটাকে আমি পরীক্ষা করেও দেখেছি—কিন্তু কোনও পোষ কোথাও পাইনি।

আমার শরীরের এই দিকটা মার্লিনকে অবশ্য কিছুই জানাইনি।

কেননা—ভেবেছিলাম—যদি বলি মার্লিন অথবা ভেবে মরবে। যখন এই রকমটা হল তখন শীতকাল। এসময়ের শীতকাল যে কি তাও তুমি জান—আগেই বলেছি। পাছে পাছে পাতা থাকে না, সূর্যের মুখ দেখা যায় না, একটা শব্দনে হাওয়া ও প্রায়ই বিরিয়ে বৃষ্টিতে সমস্ত দেশটা যেন খালি শিউরে শিউরে উঠছে। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া লোকজন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেই না—কোনওরকমে ছুটে পালিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে সার্সি এঁটে বাইরটাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আগুনের কাছে এগিয়ে গিয়ে যেন বাঁচে। তাই ভেবেছিলাম—শীতকালটা কেটে গেলে, আমার এ ভাবটাও যাবে কেটে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, মার্লিনের চোখ এড়ায়নি। তখন ফেব্রুয়ারী মাস—বাইরের বরফ পড়টা কিছুদিন বন্ধ হয়েছে কিন্তু শীতের প্রকোপটা চলেছে খুব। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে শেষ করে বসবার ঘরে আগুনের কাছে বসেছি—আমি বসেছি কোঁচে এবং মার্লিন মেঝের কার্পেটের উপর পা ছাড়িয়ে বসেছে, আমারই পাশ ঘেঁষে, আমারই কোঁচে হেলান দিয়ে, মাঝে মাঝে একটা লোহা মিলে খুঁচিয়ে আগুনটাকে দিচ্ছে একটু জোর করে।

সহসা মার্লিন বলল, বিকো, অনেক দিন ত ছুটি নাগনি—কাজই করছ। এইবার কিছুদিনের ছুটি নাগনি না। চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

বললাম, সে ত এখন সুবিধা হবেনা—শীতকালে আর কোথায় যাব?

বলল, শীতকালটা ত আর মাস দুই পরেই কেটে যাবে—তারপর। তখন ছুটি নিতে হলে ত তোমাকে এখন থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কথাটা মনে লাগল। সত্যি—শীতকালটা কেটে গেলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে হয়। কিছু টাকা রং লোকসান হবে—তা হলই বা, যথেষ্ট ত রোজগার করছি।

বললাম, তা মন্দ বলিনি।

বলল, হ্যাঁ তাই কর, এখন থেকেই সব ব্যবস্থা কর—এপ্রিলের শেষোংশেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

মুগলাম, কোথায় যেতে চাও?

বলল, কোনও একটা ভাল জায়গায় গিয়ে চুপচাপ নিবিবিলি থাকব দুজনে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, চল, না হয় ইংল্যান্ড ছেড়ে, দক্ষিণ ফ্রান্সে রিভিয়ারায় কোথাও থেকে আসি—দাঁস কি শাউকালো।

জেনেছি খুব স্বাস্থ্যকর সে সব জায়গা।

বললাম, ও বাবা।

বলল, তা হলই বা। টাকা ত অনেক রোজগার করছ—আমাদের কি দরকার এত টাকার। শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবেত।

একটা হাই তুলে বললাম, তা বা বলেছ—শরীরটা ইলানী একটু ক্লাস্ত বোধ করি।

বলল, তা আমি জানি বিকো।

মুগলাম, কি জান?

বলল, তোমার ক্লাস্তির খবর।

মুগলাম, কি করে জানলে? আমি ত তোমাকে কিছু বলিনি।

বুহ হেসে বলল, আমার কি চোখ নেই—তোমার মুখে যে ক্রান্তির হাস পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত বাওয়া ঠিক হল—দক্ষিণ ক্রান্তে নর, ইংল্যান্ডেরই কর্ণওয়াল সমুদ্রতীরে—লু'তে। বৃশা! লু'র কথা আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতে বিস্তারিত করে লিখেছিলাম, মনে আছে ত? অল্পবয়সের পরে মার্লিন স্কুলে হাওয়া বদলাতে লু'তে গিয়েছিল—ছিল তার মাসীর হোটেল, রোজ এণ্ড ক্রাউনে। আমিও গিয়েছিলাম, তবে ছিলাম ভিন্ন হোটেল—তখন ত আমাদের বিবাহ হয়নি। এবার ঠিক হল—আমারই মোটর গাড়ীতে দুজনে বেরিয়ে পড়ব এক ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি মুঠার, ডেভন্ কর্ণওয়ালের মধ্য দিয়ে ঘুরে লু'তে গিয়ে বিশ্রাম করব দুজনে। সেই হেডল্যাণ্ড হোটেল, যেখানে সেবার আমি ছিলাম—সেখানে চিঠিও লিখে দিলাম—সোভালয় সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্ট একটি ঘর রাখতে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মার্লিন বলেছিল সে বেশ হবে—যে ঘরটার ভূমি ছিল, সেই ঘরটা যদি পাওয়া যায়। ঘরে বসেই দিনরাত সমুদ্র দেখতে পাব জানালা দিয়ে।

বললাম, সে ঘরটা হয়ত ঠিক পাওয়া যাবে না। তবে সেইরকম ঘরই পাশাপাশি আরও আছে।

একটু আবহাওয়ার সুরে বলল না—সেই ঘরটা।

হেসে শুভালাম, বিশেষ করে সেই ঘরটা কেন বলত?

বুহ হেসে বলল, সেবার ত সে ঘরে তুমি আমাকে ঠাই দাওনি—

বললাম বা রে—সে বুঝি আমার অপরাধ? আমি ত প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিলাম—

আমার গলা জড়িয়ে ছুটি আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট দুটি চেপে বলল, চূপ! চূপ! ওকথা বলে না।

ভিন্ন

একিংশ মাস শেষ হয়ে গেছে—সে মাসের স্মৃতি। সেল ছেড়ে আমাদের বেরিয়ে পড়বার সবই ঠিকঠাক—আর মাত্র সাত-আট দিন বাকী। মার্লিন ক'দিন ঘরে খুব শুষ্কিয়েছে—তার গোছান বেন শেষ হয় না, রোজই কিছু না কিছু করে। আমার গাড়ীখানি ভালই—ভাল হল—বহুখরাদেক আগেই কেনা, আমি নিজেরই চালাই। এদেশে গাড়ীর ড্রাইভার খুব কম লোকেই রাখতে পারে—অসম্ভব ধরনের ব্যাপার—আমাদের মতন ভাল প্র্যাকটিক ওয়ালে ডাক্তারদেরও সাধারণ বাইরে। তাই আমিই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাব—এই রকমই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এদিক দিয়ে মার্লিনের মনে একটু ঝিগা ছিল।

একদিন বলল, দেখ তুমি গাড়ী চালিয়ে এতটা সুরবে—আমার মন এতে ঠিক সার দিচ্ছে না।

শুভালাম, কেন?

তুমি ক্রান্ত হয়ে পড়বে—তোমার শরীরের দিক দিয়ে সেটা ঠিক ভাল হবে না।

বললাম, গাড়ী চালাতে আমার কোনও ক্রান্তি হয় না—দাঁনই ত। আর তাছাড়া, বেশীদূর এক সঙ্গে চালাতেও ত হবে না।

মারে মারে প্রায়ই ত নানা হোটেলের বিশ্রাম করব—এদেশের ম্যাপ দেখে সেই ভাবেই ত সব ঠিক করা হয়েছে।

মার্লিন বলল, তা ত জানি—কিন্তু তবুও—

বললাম, আর তাছাড়া শেষ পর্যন্ত লু'তে গিয়ে লবা বিশ্রাম ত নেবই—এক মাস চূপচাপ থাকব সেই হোটেল।

মার্লিন শুভাল, ট্রেনে লু'তে যাওয়া যায় না?

বললাম, তাহলে ত ডেভন কর্ণওয়ালের কিছুই দেখা হবে না। আর ট্রেনে এতদূর যাওয়াও ত কম ক্রান্তিকর ব্যাপার নয়! বোধ হয় অনেক তদল-বদল আছে।

মার্লিন চূপ করে গেল। একটু পরে বলল, বেক্সবার আসে গাড়ীটা কিন্ত ভাল করে দেখিয়ে ঠিকঠাক করে নিও।
বললাম—তা ত বটেই। সে সব ব্যবস্থা আমি করছি।

যাই হোক, সামনের শনিবার লাঞ্চ খেয়ে রওয়ানা হব—আর রবিবার। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি আমার বসবার ঘরে আগুনের ধারে কোঁচটির উপর পা ছড়িয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। মার্লিন একবার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আগুন জালিয়ে দেবে কি না। বলেছিলাম—আপাততঃ দরকার হচ্ছে না।

নিজের মনে খবরের কাগজ পড়ছি—মার্লিন ঘরে ছিল না, বোধ হয় রান্না-তাঁড়ার নিয়ে ছিল ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে মার্লিন হঠাৎ ঘরে ঢুকল—কোলে তার বছর তিনেকের একটি পুতুলের মতন মেয়ে—নাম পিপা। মার্লিনের কোলে পিপাকে দেখে একটু অবাক হলাম—কারণটুকু বলি। পিপাটি আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে। আমাদের বাড়ীর পূর্বের দিকে আমাদের সীমানা সল্লয় বাগানওয়ারা আর একটি বাড়ীতে পিপা থাকে, তার বাপ-মার সঙ্গে। পিপার বাপ মিঃ হোমিস, কি করেন আমি জানি না এবং আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে টুপী তোলা ব্যতীত আর কোনও পরিচয় নাই। তবে শুনেছি, পিপার মার সঙ্গে মার্লিনের পরিচয় হয় পরস্পরে বাগানে বেড়ার হুপাশে ঝাঁড়িয়ে এবং এই ভাবে মাকে মাকে আলাপ হত দুজনার। ক্রমে মার্লিন পিপার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মিসেস হোমসের আমন্ত্রণে মাকে মাকে যেতে শুরু করল পিপাদের বাড়ীতে। মিসেস হোমসও মাকে মাকে পিপাকে নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়ীতে কিন্তু আমার সঙ্গে কখনও তাঁর দেখা হয়নি। তবে মার্লিনের কাছে শুনেছি, মহিলাটি নাকি খুব ভাল। পিপাকে আমি অবশ্য এর আগে হু-চার বার দেখেছি—মার্লিনই কোলে করে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। পিপাকে আদর করে চুমো খেয়ে বলছে এক টুকরো মিষ্টি—না বিকো?

প্রায় বারো বছর হল আমাদের বিবাহ হয়েছে—কিন্তু আমাদের কোন ছেলেকেই হয়নি। সেদিক দিয়ে আমার মনে যে কোনও দুঃখ ছিল এমন কথা বলতে পারি না। কেন না, সেদিক দিয়ে কোনও অভাব বোধ আমি কোনও দিনই করিনি এবং সেদিক দিয়ে মার্লিনের মনে যে কোনও দুঃখ থাকতে পারে—তাও কখনও জেবে দেখিনি বা খেয়ালও হয়নি। দুজনে বেন দুজনকে নিয়ে পরিদূর হয়েছিলাম।

কিন্তু ক্রমে মার্লিনের পিপার প্রতি এই আকর্ষণে হঠাৎ একদিন কথাতার খেয়াল হল—আমার মনের অবস্থা বাই হোক, মার্লিনের মনে

নিশ্চয়ই ঐদিক দিগে একটা হুংখ আছে। কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন
চাবলাম—হুংখ ত হওয়ারই কথা, সব মেয়েই ত 'মা' হতে চায়, এ যে
তাদের অন্তরতম অন্তরের একান্ত নিছৃত কামনা। অনেকদিন ত
হয়ে গেল—হলই বা না কেন?

সেই দিন রাত্রে খাওয়া বাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে মালিনের
কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—লীনা! পিপার মতন তোমার
একটি মেয়ে হলে কি স্থল্লর হত বলত?

মালিন যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিল সেটুকু বুঝতে আমার
দেয়ী হয়নি। একটু চাপা হাসি হেসে বলল, নাই বা হল।
আমাদের কিসের অভাব।

কিন্তু ফলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম; যেদিন রাত্রে মালিনের
সঙ্গে এই কথা হল, তারপর থেকে মালিন আর পিপাকে কোলে করে
আমার সামনে আসত না। আড়ালে পিপাকে আদর করে, আমার
লজনা ছিল না। কিন্তু আমার সামনে—সেদিন রাত্রের কথা'র পরে
একটা লজ্জা এসেছিল কি তার মনে? হয়ত তাই।

তাই বোধ হয় আজ অনেক দিন পরে হঠাৎ পিপাকে কোলে করে
আমার সামনে এসে দাঁড়াতে একটু অবাক হয়েছিলাম।

মালিন হেসে বলল, দুটোটা কি বলে জান?

তথালাম, কি?

বলল, বলে—uncle বাবে বাক কিন্তু তুমি যেও না।

হেসে পিপার দিকে চেয়ে বললাম, হ্যা' পিপা—তুমি আমাকে
'ভালবাস' না?

অল্প দিকে মুখ ফিরিয়ে মালিনের গলা জড়িয়ে আদরমাখান সুরে
বলল, না আশ্চি বাবে না।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটি ছিল ঘরের বাইরে
সিঁড়ির পাশে। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম, তথালাম কে?

উত্তর এল, আমি লালকাকা।

বললাম, আরে, মি: লালকাকা! কি খবর আপনার? অনেক
দিন দেখা হয় নি—ক্লাবে আর আসেন না কেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, শুনলাম আপনারা ডেভেল,
কর্ণগুহাল বেড়াতে যাচ্ছেন ঐগ'গিরই। তার পূর্বে আপনাদের সঙ্গে
একটু কথা ছিল। কখন গেলে আপনার সুবিধা হয়?

বললাম, আজই আসুন না। আজ সকালটা ত বাড়ীতেই আছি।
একটু ইতস্তত করে বলল, আজ—আজ একটু অসুবিধা হচ্ছে।
কাল ডিনারের পরে রাত্রে যদি যাই?

একটু ভেবে নিলাম। কাল ডিনারের পরেও কোথাও বাওয়ার
কথা নাই।

বললাম, বেশ তাই আসবেন—আমি বাড়ীতেই থাকব আপনার
জন্ত।

'অনেক ধন্যবাদ' বলে টেলিফোন কেটে গেল।

[কমল:]

জলছবি

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

হাওয়ার হরিণ ঘুরছে কিয়ছে ঘুরছে,
জ্যোৎস্নার জরি নজ্জা আঁকছে আকাশে
সময়ের সুর থেকে থেকে পাতা মুড়ছে!

খুশির হাওয়ারা কী কথা বলছে কানে
মনের ময়ূর বল না কী জানে কী জানে—
আয়নার মতো সাগরের মনে মনে
শ্রোতের সোহাগে কি পায়ন এনে পুয়ছে।

(প্রেমিক হৃদয় তার, মৌমাছি উড়ছে ও উড়ছে;
ছ'চোখে নীরব ভাষা, কালো চুলে হাওয়ার চিক্কী
ধানব্রত ভবিষ্যৎ মৌনলীল বার্তা সজোপনে—
অরণ্যে রেখেছে ঢেকে, সবুজের মঞ্চে পাকলনি।)

তবুও হাওয়ার হরিণ ঘুরছে কিয়ছে;
নীলমাতানো সুরে আমাকেই কিয়ছে,
কথার পাশড়ি জলভরঙ্গ ছি ডুছে!
জ্যোৎস্নার জরি নজ্জা আঁকছে আকাশে,
ছুরে জোনাকি সুই হয়ে ফোটে—
ফি বা সেবু আসে, সে আসে।

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশেতা ভট্টাচার্য

১০

ব্রাইটকে যারা চেনে তারা তার মুখে হাসি দেখলে শঙ্কিত হয়। জলসার রাতে ব্রাইটের মেজাজ বড় শরীফ বোধ হয়েছিলো। দেখে গ্যেটকেল ও টড বলাবলি করেছিলো—নিশ্চয় কোন মৎসব এঁটেছে। কি ব্রাইট, হাসছ কেন ?

—আবার কি ভাবছ ?

সব সময় রাগে না ব্রাইট। সে তার অধিকারের পালা জানে। তার বিবিধ কীর্তির কথা কানপুরে সবাই জানে। সবাই জানে টাকাপয়সার ব্যাপারে ব্রাইট একেবারে উদার। আড়ালে সাহেবরা বলে—ভাগ্যে মরে গিয়েছে ম্যাকমোহনের বোন। বেঁচে থাকলে দরকার পড়লে ব্রাইট-ই তাকে খুন করতো।

আর খুন ব্রাইট অনেক করেছে। যেখানে যেখানেই সে ঘুরেছে, সেখানে অদ্ভুত সব দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে বোকা নয় সে। ভুলেও কখনো যেতাম্ন মারেনি। নেটিভ! এ দেশে এত কালোকালো মানুষ কিলবিল করে, আর আইনের নামে তাদের গায়ে এমন অর আসে, যে ছুটো-একটা কমে যাওয়াতে কেউ অভিযোগ করেনি। কেউ নাশিশও করেনি সাহেবের নামে।

সাহেবরা ব্রাইটের বাপের দিক থেকে ভেজাল রক্তের ব্যাপারটা জানেন। তাঁরা ব্রাইটের আচার-ব্যবহার দেখে তাকে পরিহার করে চলে। রক্তের যে কৌলীন্ত দাবী করে ব্রাইট ভারতীয়দের উপর চাবুক চালায়, সেই কৌলীন্তের দাবীতেই সাহেবরা ব্রাইটকে পরিহার করে চলে।

ব্রাইট এখন হাসলো। নির্মালিত চোখে বললো—কাল জ্বরদন্ত মজা হবে। দেখতে এসো। মজা পাবে।

সে রাতে ব্রাইটের স্বভাব-বহির্ভূত হাসিমুখ দেখে ব্রিজহুলারীর চোখ থেকে হুম চলে গেল চট করে। উঠে বসল সে। ব্রাইট ছোটবেলা থেকে স্বভাব অল্পস্বাভাবী লাইনজুরি-গার্ড আর সহিসদের সঙ্গে মিশেছে বেশী। তাদের পিঠে ছপটি চাঙ্গে মজা দেখেছে কাজের সময়। অবশ্যই সে সব ক্রীড়াকৌতুক ম্যাকমোহনের চোখের আড়ালে হতো। তবে ব্রাইট হিন্দী বলতে শিখেছে মাহুভাষার মতোই। সহিসের বাচ্চার হাত বুড়ে দিয়ে বলেছে—যাও আপনা পাপাকো পাশ যাও !

রেজিমেন্ট সাহেবদের হিন্দী পরীক্ষা দিতে হয়। ব্রাইটও বাইরে বলে সে পরীক্ষা দিয়েই শিখেছে হিন্দী। বলে, আর খতরা চোখ টিপে বলে—ব্রাইট, হিন্দী সবাই শেখে কিন্তু এমন চমৎকার কেউ বলে না।

ব্রাইট সে কথা শুনে মনে বোঝে, এটা হলো তার বাপের প্রতি কটাক্ষপাত। কে না জানে যে, বুঢ়া ম্যাকমোহনের বোন বিয়ে করেছিলো একটা ফিরঙ্গীকে ?

বুকে ব্রাইট সমঝে গিয়েছে। পারতপক্ষে অল্প সাহেবদের সামনে প্রয়োজনেও হিন্দী বলতে চায় না।

ব্রিজহুলারীর কাছে এসে তার মুখ খোলে। ব্রিজহুলারীর সঙ্গে সে কথা বলে সেই হিন্দীতে, যা সহর বা গ্রামের মানুষ ভুগাব চোখে দেখে। যা শুনে পণ্ডিত ও মুন্সীরা হুখে করে বলেন—ভাষাতে জারজ দোর ঢুকলো। কলঙ্কিত হলো ভাষা।

অর্থাৎ নিরন্তর রেজিমেন্টের সঙ্গে ঘোরে যারা, সামান্য দেড় টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা বাপের মাসিক রোজগার, রুক্ষ ও শ্রুকের বাদেই জীবন, সেই সব সহিস, লাইনগার্ড, ভিক্তি, মেথর—তাদের ভাষা থেকে গ্রামের মানুষের সমৃদ্ধি সরলতা যাবে পড়ে সহজেই। গালাগালি ও রুক্ষ হুকুম শোনে তারা, আর ভাষাও হয়ে ওঠে অশালীন, রুক্ষ।

এমনি করেই ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

ব্রাইট তাকে সেই ইতর ভাষাতেই কথা বলে। ব্রিজহুলারীকে রাতে গালাগালি করে বলে—এক একটা দেশী মেয়ে বেন আগুন! তোমার মতো নিকল্লাপ, ঠাণ্ডা কেউ নয়। যেন মরামাছুব।

এরকম প্রত্যেকটা নিশীথে অবমানিত হয় তার নারী। মুত্থা-কাসনা করে ব্রিজহুলারী। এই বর্বর মাছুষটা কেন যে তাকে ছাড়ে না, তাড়িয়ে দেয় না, তাতেও সে বিস্মিত।

আজ রাতে, এই জলসার রাতে কিন্তু ব্রিজহুলারীকে সে রকম কোন অভিযোগ করলো না ব্রাইট। বরঞ্চ বললো—খুব ভারী একটা সোনার গহনা দেব তোমার কোমরে। খবর দেব লক্ষ্মীচাঁদকে।

—কি দরকার ?

—কেন, তুমি পরবে ?

—আমি আর গহনা চাই না।

—সেটা তুমি পরবে।

—কেন, দেখিয়ে দিতে চাই আমি সবাইকে। এত গহনা কার ঘরে আছে ?

ব্রাইট শুয়ে শীঘ্র দেয়, ভাবে, এ ছাড়া তিনশো টাকা আটকে ফেলবার কোন রাস্তা নেই। আর তিনশো টাকা মনে করতেই তার মনে হয় একটা পঁচিশ ছাল্লিশ বছরের আছেরিয়া ছেলের ভীত মুখ। পিট-পিট করে পড়ছে চোখের পাতা জ্বরে। মনে করছেই এমন

এদ হর তার, যে দুনিয়াটা ভাল হয়ে বার তার কাছে।
হুলাসী বলে—কি হয়েছে? তুমি শীঘ্র দিচ্ছ কেন?

—মন ভাল আছে।

—কেন?

পাশ ফিরে গড়িয়ে ব্রিজহুলাসীর নরম শরীরটা একটা শক্ত হাতে
কে ধরে টাইট বলে—এমনি।

হতভাগ। আর এ-ই হলো টাইটের মজা। বতকণ না
ধার অন্তর্নিহন করে মুক্তি চাইবে ব্রিজহুলাসী, ততকণ সে
ডুবে না।

ব্রিজহুলাসীর নিষ্পেষিত, নিঃশেষ নারীসত্তা কাঁতে চোঁট চেপে
কে। চোখ দিয়ে জল পড়ে। তবু মুখে বহুধার শব্দ করে সে
ইটকে ব্রিজহুলাসীর আনন্দ উপভোগ করতে দেয় না।

সে বাত গায়েন জেগে থাকে একটা পচিশ বছরের ভীক সিপাহী।
সে গায়েনের বাইরে দাঁড়িয়ে সে পাহারা দেয়, সেই সিপাহী-ও জেগে
রে। গায়েনের ভেতরে বসে সিপাহীটা থেকে থেকে শুধু জিজ্ঞাসা
রে—সকাল হলো?

—না, ভাই—যা হবে, তা হবে—তুমি ভের না।

—না, ভাবছি না আমি।

আকাশের জাঁধার ঘন পাতলা হয়ে আসে। পাহারাদার সিপাহী
সে—একটু চুপ, পাশ্চি ডলে দেব? খাবে?

—না

তরপাষ হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে—হাঁ ভাই, এ্যাড্‌জুটেন্ট
হিরে খোঁচ নেই?

না। না, তুমি ভের না ভাই!

—না, আমি ভাবছি না।

এই কয়েকটা সিপাহীর মাথায় কোন দিন-ও চট করে ঢোকেনা
খা। মতজ বৃথতে পারেনা সে। বড় জটিল তার কাছে প্রক্রিয়াটা।
যত বড় সময় মের সে। যখন আকাশ দেখে সে বোঝে যে সকাল
তে আর খুব দেরী নেই, তখন সে উঠে হয়ে বসে মাথার হৃদিকে
ত দেখে বুখতে চেষ্টা করে কি করে কি হলো।

হাঁ, সে নানু মুখিয়া, 53rd-এ যে একজন সিপাহী। যাকে
কি গ্রামে কি শস্তরবাড়ীতে, কি এখানে সকলে জানে মুখ বলে, সে
দাব করেছে। সে চুপি করেছে।

তার কাণে হলো সকলে তাকে চিরদিন বলেছে বোকা। অল্প
হলেদের সঙ্গে সে লালার গল্প-ছাপল চরাতে গিয়েছে। অল্প ছেলেরা
গাীর বাগান ভেঙে আম পেয়ারা নিয়ে বেচে এসেছে জরীপ
গায়েনের ভাঁড়তে। নিয়ে এসেছে তেয়্যা পয়সা। সে ভয় পেয়েছে।
বা বোন বলেছে—মুখ তুই নানু। তুই বোকা।

শুধর এক বিধে জমি দিয়েছে, আর বৌ বলেছে—বোকা তুমি।
তোমাকে পাখুরে জমি দিয়ে ঠাকালো আমার বাপ। আরে, নালার
ধার যে জাঁ, সেটা দেখে বেছে নিলো আমার বোনের বর। সে জমি
থেকে যে তিন বার ফসল তুলবে। তোমার এ জমি থেকে কি পাবে?
বড় বোকা তুমি। বড় মুখ।

হঠাৎ কেন সাহেবদের মনে হলো যে নতুন নতুন সিপাহী সওয়ার
দরকার হবে রেজিমেন্টে। কথাবার্তা চলছিলো। আর বোড়া

কিনছিলো রেজিমেন্ট। সে টাইটের কুটি পাহারা দিচ্ছিল, তাতেই না
জানতে পারলো? জানতে পারলো, যে বরাহ রেজিমেন্টে বোড়া
সরবরাহ নিয়ে বেবারেই ছিলো তোলাবাম আর শিরাজি বাইজুর
মধ্যে। তোলাবামের চার পুরুষ ধরে দিল্লী আগ্রা, এখন কানপুর
লক্ষ্মী-এ বোড়া সরবরাহ করছে। তার মন্ত ব্যবসা। শিরাজি বাইজুর
কোনদিন স্ত্রীযোগই পায়নি। জানলো যে এবার কোন অজ্ঞাত
কারণে সাহেবদের বোড়া দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তোলাবাম।
আর শিরাজি বাইজুর দর দিয়ে পাঠালো।

টাইট আর বাই হোক বোড়া চেনে। তাই এসব লেনদেনের
সময়ে কেমন করে যে সে জড়িয়ে পড়ে কেউ বুঝতেও পারে না।
তিনশো টাকায় এক একটা বোড়া, এই হিসেবে ত্রিশটা বোড়া কেনা
হলো। নর হাজার টাকা পেলো শিরাজির ছেলে। কোম্পানীতে
কাঁচা কাজ হয় না—সব হাতে-কলমে।

কিন্তু সেখানেই টাইট টেকা দেব অপবকে, আর সেখানেই তার
কুতিহ।

শুধু মুখের কথায় এক একটা বোড়া-পিছু বিশ টাকা করে কমিশন
লইলো টাইট। সব কথা ঠিকঠাক। টাকা আনবে নানু। তার
বতো মুখ কে আছে? শিরাজির ছেলে সামান্য নানুকে বললো,
এই বোড়া পৌছিয়ে দিবি সাহেবকে।

টাইটের হিন্দুস্থানী বিবি আছে। অনেক দেশীলোক সদাসর্বদা
বাওয়া-আসা করে সেখানে। সুবজের হাত দিয়ে একটা ছোট
তেজারতি কারবারও খুলে দিয়েছিলো টাইট। সেজন্তেও আসে
কেউ-কেউ। টাকাপয়সার দরকারে।

তেমনি করেই এল নানু। আর তোড়া নিয়ে গুপতি তিনশো
টাকা দেখে চটে গেল টাইট।

আসলে সামান্য তাকে টেকা দিয়েছে। নানুকে দিয়েছে পাঁচটা
টাকা। আর টাইটকে ডাছা ঠকিয়েছে। সামান্য শিরাজি নয়।
শিরাজি পুরনো বিবাসের লোক। সে কথা দিয়ে কথা কথা বাখে।
মুখের কথায় আর বিবাসেই টাকা-কড়ির লেনদেন চলে। খুব একটা
প্রবন্ধনা হয় না।

কি বুঝলো টাইট কি জানে! নানুর ডিউটি বদল হয়েছিলো।
নানুর মনে হয়েছিলো সে হাতে স্বর্গ পেয়েছে। বুক ফুলিয়ে সে
একে-তাকে বলেছিলো—আমি যদি ডাছা মুখই হবো, তবে পাঁচটা
টাকা কেমন করে কামালাম?

আবার দিখা দিয়ে বলেছিলো—কালকে বলো না এ
কথা।

আসলে খুব কুতি হয়েছিলো তার। আর এখন ভারতীয়
অফিসাররাও গরম হয়ে আছেন। এমনতেই জাঁকজমকে সাহেবদের
সঙ্গে টেকা দিয়ে চলেন তাঁরা। এখন যেন বেশ বেপারো। নানুকে
ডেকে জিজ্ঞাসা কইরেছিলেন। বলেছিলেন—তুই কি মিথ্যে কথা
বলছিস? তোর জিত টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারি, তা জানিস?
এ বকম আলগা কথা বলিস কেন? আবার শুনিছ তুইও পেয়েছিস
পচিশ টাকা?

হাবিলদার সাহেবের কথা শুনে ভয়ে নানু কঁকড়ে গিয়েছিলো।
পুরনো ভয়টা পেয়ে বসেছিলো তাকে। বলেছিল—হুজুর পাঁচ টাকা।
পচিশ নয়।

তখন সুবেদার চোখ চোখে হেসেছিলেন হাবিলদারের সঙ্গে।
পত্নীর ঘরে বসেছিলেন—সিপাহী, তুই সত্যি কথা বল।

সব বলেছিলো নান্নু। বলেছিলো—রাইজু সাহেব আমাকে
টাকা দেন। আমি সাহেবকে হিঁই। আমি কিছু জানি না।

তারপর এ নিয়ে আরো কথা হয়েছিলো। ভারতীয় অবিসার
থেকে সিপাহী পর্যন্ত ইনক্যািটু ও রিসালার লোকেরা সকলে একটি
কথাই ভেবেছিলো, কত দিন, আর কত দিন সহ করতে হবে এই
অত্যাচার? আর বেন পাঁচা হার না। মুখ বন্ধ করে কিল খেয়ে
কিল চুরি করে আর কত দিন চলবে? এর কি শেষ নেই?

তারপর স্বভাই একথা ছুঁয়েছিলেন। ওদিকে সামাদ শহরে
বসে চৈত্রায় জৈত্রায় ব্যাকরনের দুহরীকে শুনিতে বলেছিলো—
মল্লিকের কল ব্যবসা পোটাতে। হিন্দুস্থান ছেড়ে বাচ্ছে সাহেবরা
আর সোনাকুশো সব নিয়ে কীক করে মিয়েছে রিসাসত। আর
বেচারীদের হাল কি? লপ-কিশ টাকা মেয়ে নিচ্ছে? আহা হা!

সব্বতঃ প্রেরণ ছিলো আকাশ-বাতাসে বাজার গরম গুজবে।
তাই দেখে-ঢেকে বসেনি সামাদ। বলেছিলো বাজারে আগুন লেগেছে
কেবল না?

সত্যি কথা। রেজিমেন্টের চাহিনা মেটাতে মেটাতে বাজার
কতুর। বি টাকার আড়াই সের আর আটার দাম টাকার ত্রিশ সের।
বৈতে কোন সুখটা রইলো। এর চেয়ে কাঁচাপয়সা খেলেই তো হয়।

তারপর কথাটা মুখে-মুখে ডালপালা মেলে ছড়ালো। আইটকে
গোলাঘুনি মলব করে কিছু বললেন না সাহেব। কিন্তু কথাগুলো পরোকে
বললেন। বললেন—সমর ভাল নয়। এমন কোন আচরণ করা না, বাতে
নোটভরা দশটা কথা বলবার সুযোগ পায়। কি টাকা-পয়সা,
এটাসোটা।

বুকেলো আইট। বুকে হাতের মধ্যে বাকে পেলো সেই
বোকাসিপাহী নান্নুকে জব্ব করবার মতলব করলো।

হঠাৎ মার্কিভিটিতে কীক দিবে জুয়া খেলতে গিয়েছিল নান্নু,
এই অপরাধে সে অপরাধী হলো।

গায়সে বসে ভাবে নান্নু। ভাবে হঠাৎ সাহেবের মুখোমুখী
হয়ে ভরে তার পা কেমন কঁপে গিয়েছিল। আবার এ কথার
মান্যদানে সেই পাঁচটা টাকার কথাও উঠছিল। সে কেমন ভরে
ভরে কবুল গিয়েছিল। আসেই তাকে সতর্ক করতে চেরেছিলেন
হাবিলদার। পায়নি। সুযোগ মেলেনি। তবে ঐটুই
বলেছিলেন—সিপাহী তোকে জেরা করলে তুই বা সত্য, সবই
বলিস।

কি বলবে সে? জেরা তো সেবিক দিয়ে গেল না। জেরাটা
গেল শুধু তাকে আর তার পাঁচটা টাকার কাছ থেকে। সেই
খিয়েই কবুল বলে সে। কবুল না খেয়ে নিজার কি? ভক্তবশে
কাঁট টাকা মাইনের সিপাহী নান্নু সেই পাঁচটা কুশোর টাকার
তপর জো এসেছে। কে জানতো এত কামেলা হবে?

জামশর বিটরে। তারপর বিশ বা বেত। এক মাসের মাইনে
জরিয়ানা।

রাত পোহানোবিশ বা বেত থাকে সে। সেই ভাবনাটাই মরে
মরেছে নান্নু। দেখেছে যে চামড়া হিঁফে বন্ধ পড়ল। দেখেছে
সে একজোড়া বেত থাকে চামড়ার মোড়ানো। শুনেছে তার

রেজিমেন্টে কেউ কবুল বাচ্ছে না বেত মারতে। শুনেছে মার
হয়তো কোন গোরা, চাই কি জন্ত কেউ। শুনেছে এ্যাডজুটেন্ট
সাহেব আপত্তি করেননি। দিনকাল ধারাপ। বেশ কড়া হাতে
এই সব ছোট ছোট ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তাই সে এ
নোটিভ সিপাহীগুলো শিখা পাবে।

অবত এমন কথাও বলা হয়েছে যে, এই বেকার্যাত দেখে
অসন্তুষ্ট হতে পারে সিপাহীরা।

—তা কখনো হয়? আর কে করে শুনেছে যে এরা সন্ত
রইলো?

—তাদের মনে পরোকে বিস্কোভের ভাব জাগতে পারে।

—এই একটা সামান্য সিপাহীর ব্যাপার? এ সিপাহী নান্নু
এখনি একটার জায়গায় দশটা রকট মিলবে। এ সিপাহী নান্নু
এত নগণ্য এই মানুষ, যে এ সব ঘটনা কোন দিনও খাতা
পাতার উঠবে না।

কয়েদী সিপাহী নান্নুকে পাহারা আর বদল পাহারার সিপাহী
বলে গিয়েছে—নান্নু। তুই ভাবিস না, সুবেদার সাহেব বন্দোব
করেছেন কি বেত মারবে তোকে শোভারাম।

—শোভারাম?

—হাঁ। আর নরম নরম মারবে।

—তবু তো লাগবে।

—জাগবে। তবে কম। ঐ কোন ফিরিকী বা অস্ত রেজিমেন্টে
মানুষ তো দয়া মারা করে মারবে না।

—আমি ভয় পাই।

আইট এই কয়েদী সিপাহীর কথা ভেবেই উৎফুল্ল। সকাল হয়
লাফিরে ওঠে সে।

কয়েদে বা'ও বা মনে হচ্ছিল, বাইরে আনতে দেখা যায় নান্নু
চোরা খুবই ছেলেমানুষের মতো। নির্বোধ মানুষের যেমন চোরা
বয়সের ছাপ সহজে পড়ে না, এর চোরাভাজেও তেমনই নির্বে
সরলতা। বর্তমান ভীকু ভাট্টা প্রবল। হুর্ল চিবুকা ধরা
করে কাঁপে তার। ছোট জাদিরা পরে আরো অসহায় দেখায়
হুখ ও ক্রোখে অস্ত্র সিপাহী জমাশররা ধুখ ফেলে মাটিতে।

আইটকে খুব উৎফুল্ল দেখায়। যে সিপাহী অস্ত্র সমর কুস্তি
মাটি মেখে কুস্তি দেখায়, সেই নিয়েছে চাবুক। সে নান্নুকে ধ্য
ইসারা করে চোখে চোখে চেরে—নান্নু দেখে না। সে শুধু বলে—
হা রাম! জো রাম! হা রাম।

ভবানীশঙ্কর ও চন্দনকে পাঁড়ির থাকতে দেখা যায়। ভবানীশঙ্ক
রয়েছেন ডাক্তার হিসেবে। আর চন্দন তাঁরই সহকারী
ভবানীশঙ্করের হুখ বেনে একটু শালা। চোখ ছোট। যে সব মাদ
নরম খজাবের, আর নির্ভরতা বারা দেখতে পারে না, ভবানী তাদের
একজন। উত্তেজনা ও বিতুলার দুর্বল বোধ হয় তাঁর।

চন্দনের হাত হুইথানা বাঘতে থাকে। আজব কোঁকী-কীক
আর আজব তার আইন-কাছন। এই জীবনের জরিয়ানাই কু
তার দাদা চন্দন। এ কোন বিবেচনার কথা। যে একটা মানুষ
এমন করে বেঁধে মারবে? বেঁধে রাখেনি লোকটাকে, তবু থি
দেখেছে কোঁ? পেটাই বা কয় কি? আদ কি, চন্দন ভাল করে

বোরে, বাতাসটা ইতিমধ্যেই শব্দ আর ভারী হয়ে উঠেছে। ভারী হয়েই সমবেত ভারতীয়দের মানসিক বিকোভের চাপে।

এত কোভ কেন? চন্দন ভাল করে মনে জানে। যে অস্ত্রার করে বা বিনা অপরাধে একজন সিপাহী বেত খাবে করেক যা, তা নিয়ে সিপাহীরা মোটেই মাথা খামতো না ক-মাল আগও। কিন্তু এখন তারা বড় বেশী সচেতন হয়েছে। বড় বেশী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, কোথায় কোথায় তাদের অধিকার খর্ব হলো। কোথায় কোথায় তাদের ছোট করা হলো। দেখছে আর মনে মনে জমা করে রাখছে সেই সব অভিযোগ। এই যে ঠাঁড়িয়ে রয়েছে আইট দু'রে। দুই পা ঝাঁক করে। দুই-পা মাটিতে পুঁতে রয়েছে। পা নয়, বেন শক্ত দুই খুঁটি। এই খুঁটি বেন অনড়, অচল। চন্দন আশ্চর্য্য হয়, এই সাহেব টের পাচ্ছে না, চারিপাশের বাতাসে পুঞ্জ পুঞ্জ বিকোভ আর প্রতিবাদ?

এখানে ওখানে কতরকম গুজবের ফুলকি। জমায়েতে জমায়েতে গাটে বাজারে শোনা কতরকম কথা। সাহেবদের কত অত্যাচারের কথা। কতদিন ধরে কত অত্যাচারের কথা! এখন চন্দন বুঝতে পারে বেন কিছু কিছু। বুঝতে পারে সাহেবমেমদের দেখলে তার গ্রামের মানুষ ভাবতো। তার দালা-পরদা! ভাবতো সাহেবরা-ই এই পৃথিবীর রাজা। তাদের উপরে আর কেউ নেই। সাহেবরা যা বলতো তা-ই করতো তারা। করতো কি? এখানে করে। এই নিয়ে গল বাংলায় লুকো। রাজমহলে গুলী চালিয়ে খুন করে এল কালোকালো সাঁওতালদের। আবার যারা বরায়, আখ্যানিন্তানে

নেপালে গিরেছিল, ভারত ভে কতজন যে সব দেশেই মরে ফুট হয়ে গিয়েছে। এখন চন্দন বুঝতে পারে, যে তখনো অনেক অত্যাচার অবিচার ছিল, যা তারা স্বাভাবিক মনে করতো। বুঝতে পারে। যে সে সব আচরণের মধ্যে তাদের উপর একটা ঘৃণার ভাব চিরদিন-ই ছিল।

এবার চারি দিক স্তব্ধ। বাতাসে সাপের মতো শীব নিয়ে লকলকিয়ে ওঠে কালো চাবুক। পাকা বেতের সঙ্গে চামড়ার দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে এখন তাকে এক নাগিনীর মতোই দেখাচ্ছে।

আন্দোলিত সেই চাবুক শীব দিয়ে নেমে আসে নার, সিপাহীর নয় পিঠে। খুব হিসাব করেই মেরেছে সিপাহী, তবু নারের গলা চিরে যায় আর্তনাদে।

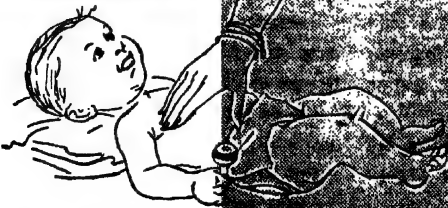
এক-দুই-তিন-চার—মাছুর কেমন জ্বল হয়ে বেতে পারে তাই দেখে ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে চন্দন। তার জোহান শরীরে পেশী ফুলে উঠেছে। তার হৃৎ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে আর তার মতো অস্ত্রাঙ্গ সকলে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। বন বন নিশ্বাস ফেলেছে তারা। তারাও জানোয়ার। জানোয়ারের মতোই ভয়ে চূপ করে রয়েছে।

যে মার খাচ্ছে সেও জ্বল। গলাকাটা এই আর্তনাদ কি মাছুর করতে পারে। আর এই যে সাহেব ঠাঁড়িয়ে রয়েছে? সেও এক জ্বল। জানোয়ার নইলে এমন উল্লাস কে অপরের হৃৎপা দেখে!

চন্দনের হাত হুঁখান ভাবানীর চেয়ারের পিঠটা মোড়ানায় মনে পড়ে বিদ্রোহ স্বপ্নের মতো ছবির পর ছবি। মনে পড়ে

বুকে সর্দি বাসেছে?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায় ভেপোলীন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলীন স্বকের মধ্য দিয়ে এক নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরায়, বাথা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৯, কলিকতা - ১

বায়োলীন প্রস্তুতকারক স্যামুয়েল

এলাহাবাদের উপকণ্ঠে পালামো-এ এক শিকারের দৃষ্ট। সাহেব
দেখকে নিশানা দেখেছে। তারপর সাহেবের গুলিতে ঐ ঘুরে
আনেক ঘুরে পড়লো পাখী দুইতে দুইতে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।
সাহেব এক পুঙ্খানুপুঙ্খ বালককে বলে—বা! এনে দে ঐ হাঁস!
নগদ এক আনা পাবি।

ছুটেতে ছুটেতে যায় সেই বাগাল বালক। সেই আঁধারে, বাস,
জল জলে নিয়ে আসে হাঁস। এসে পাঁড়ায় যখন, কচি বুকটা
হাঁসের মতো উঠছে নামছে। পরসার আলোর খুঁটা জল-জল
করছে।

মেমসাহেব হাতে নেয় একটা আনি। সমস্ত দিনের শিকার এবং
মহাভক্ত্য তার মাথার নেশার মতো ঢুকছে। মুখ লাল। বেকী
হাসি। বেকী কথা। মেমসাহেব হঠাৎ সেই আনিটা ঘুরে ছুঁড়ে
থেকে। বলে—খুঁড়ে নিতে বলা।

ছেলোটা তখনও চেয়ে থাকে। তারপর চলে যায়। চন্দনের
মনে পড়ে তারা চলে আসছে। আর আঁধারিতে কোপকাড় দিয়ে
একটা গরীব আখা-নেটা ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা আনি।

মনে পড়ে তার দাঁটার কথা। মনে পড়ে এই ব্রাইট-ই তার
দাঁটার জীবনটা পঙ্ক করে দিয়েছে। আবার মনে পড়ে সেই
সাক্ষাৎকার বাংলাতে এসেছে দুই সাহেব। সে আর তার দাদা
চলেছে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে। সাহেবদের পৌঁছে দিতে হবে
রামপুরের বাগানসাহেবের শিকার পার্টিতে। মনে পড়ে সাহেবরা
জয় লাভকে উল্লেখ করে বলেছে—শূয়োটা শিকারের মাস খেয়ে
খেরে ছোরা বাগিয়েছে বেশ।

—দেখ না পছন্দ দিকটা? টিপ করে ছরমা মেয়ে দেখলে
হয়।

—লাকিরে উঠবে।

—আর ছোকরাটা বেন জোয়ান গাধা একটা।

জনছে আর চন্দনের বাড়টা লাল হয়ে বাচ্ছে। অপমান ও
বিজ্ঞানিতে তার দাঁটার খুঁটা খর-খর করে কাঁপছে। দুজনে
দুজনের দিকে চাইছে না।

মনে পড়ে পোরা কট্টারিকের দেখে এসেছে এলাহাবাদ আর
কান্টার মারে বেলপথ বেরামতের সময়ে চাবুক নিয়ে মেয়ে পুরুষ
কুলীকে একই সঙ্গে তাড়না করতে। মনে পড়ে বাচ্চা পিঠে বেঁধে
মা-ও ভয়ে জম্ব হয়ে চমকে চমকে কাজ করছে। দু'হাতে চটপট
ভুলছে পাখর। ভরছে খুঁড়ি।

কুঁড়ি কি তার? সমবেত সকলেরই বুঝি মনের নজরে এমনি
সব ছবি খেলো যায়। মনে পড়ে। তবু হুখের ভাবে কিছু বোঝা
যায় না। তারা প্রতিজ্ঞা এক সত্যকার জন্ত। অন্ততঃ মনোভাব
প্রকাশ করবে না কোন নির্বোধ।

কিন্ যা বেত নয়, চোখ যা পড়তে না পড়তে অজান হয়ে
ছিলোহে মল্ল। পদেপদে যা তাই সিপাহী নামিয়ে নিয়েছে।
জান ত শরীর খামি তিরে গিয়েছে।

—বেরাইল হো গিয়া, বেরাইল হো গিয়া—বুখে বুখে ভজন
কলি। এগিরে আসে ব্রাইট। কেন, খেয়ে সেল কেন? বলে—
বরদাসী। জল দাও।

—জা। জা-হর না।

—কি বললে?

বিস্মিত ব্রাইট ঘুরে পাঁড়ায় ডুবানীর দিকে। ডুবানীর চোখ-বুখও
লাল। তিনি বলেন, আমি উপস্থিত থাকতে অজান এই
মাছবটার ওপর বেত চলতে পারে না।

—তুমি কাজে বাধা দিচ্ছ?

—বেত করতীর উপর বেত তুমি চালাতে পারো না সাহেব।

ডুবানীর দিকে চেয়ে আর নাম্নর দিকে চেয়ে সম্ভবতঃ বুঝতে
পারে ব্রাইট। বলে, বহৎ আচ্ছ। তোমাকে আমি দেখব।

দুজন সিপাহী নিয়ে যায় নাম্নর দিকে। উপড় করে শোয়ার তাকে
খাটিয়ার। উফ জলে আরোড়িন দিয়ে দ্রুতহান ঘুরে কোলতে
কোলেতে ডুবানী বুঝতে পারেন জ্ঞান ফিরে আসছে নাম্নর। তার
উফ আর হুই হাত খাটিয়ার সঙ্গে ধরে ছজন সিপাহী।

সে বোঝাখাত সামান্য। কিন্তু এ অবস্থার সামান্য নয়।
দ্রীঘের প্রথর তাশে যখন তাকিয়ে ইন্দন হয়ে গিয়েছে অরণ্য, তখন
একটা চকমকি কি সামান্য? তাতেই কি আগুন জ্বলতে
পারে না?

কথা হয় সে দ্বিপ্রহরে ব্যারাকে। কথা হয় সাহেবদের আড়ালে,
কান বাঁচিয়ে। প্যারেড বা ডিউটি বাসের নেই, সেই সব সিপাহীরা
আজ আর রামায়ণ পাঠ করে না বা কুস্তি খেলে না। এমন কি
লুকিয়ে জুয়া খেলাতেও আগ্রহ দেখা যায় না আজ। কথা হয়
যেখানে তিনজন চারজন একত্র। 2nd Cavalry বা 53rd
Infantry-র বিস্তৃত সিপাহী সওয়াররা কথা কর। তাদের জ্বর
বিজ্ঞান। তারা কিছু বুঝতে পারছে না। চাপাটি ও পথের
নিশানা দেখিয়ে যে সব ককির সন্ধানী কথা করে গেছে জম্বারিতে
তারা কি মিথ্যা বললো? কোথায়? কোথা থেকে আসবে
লড়াইয়ের নিশানা? দিল্লী? লক্ণৌ? মারাট?

তারা কথা কর। কথাগুলি জ্ঞানীর আগুন কুলকির মতো গুড়ে।

—বিনা কপরাধে এই অত্যাচার আর কত দিন? কত দিন
চলবে?

—আজ নাম্নর? কাল কার সময় আসবে?

—আবারের বেলা বিচার নেই, আর ওদের বেলা সাতখুন মাপ!

—কে বলেছে ওরা নির্দোষ? আর বত পোব আমাদের? কথা
হয় হাটে বাজারে দোকানে।

—এই পাচা আটা, দুর্গন্ধ গম। এতে কিসের ভেজাল আছে?

—কেমন করে জানব জ্ঞাত মারছে না ইন্দ্রজ?

—মিননারী সাহেবরা বলেছে বিধবাদের বিয়ে দোষ, ঠাণ্ড
দেবতা কেসে দোষ। সাহাবাধপুরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখার
দিয়ে জল খাওয়াচ্ছে ওরা।

—কত দিন সহ করব? রেললাইন কেন জানিছে? কেন
একদ করে জিনিসের দাম চড়িয়ে দিল? কেন এখন করে সব
জাহাঙ্গীর আমাদের পারের তলা থেকে জমি সরে সরে বাচ্ছে?

কথা হয় রেজিমেন্টের বিদ্যাসী ব্যাকার জৈনাম চৈত্রাসের
কুস্তিতে। সেখানে সবচেয়ে হর শহরের নানীসোফদের কথা।
কথা হয়।

—কে বলেছে ওরা সর্বশক্তিমান? তবে সিবাভোপোলে
হাটছে কেন?

—বিদ্যুৎ, অযোধ্যা, সাত্তার, নাপদুব একটার পর একটা রাজ্য এখন কার নিজে কেন ওয়া ?

—আগেককার বড়ো সাক্ষেবলের তাড়িরে হোকায় হোকায়। সাহেবদের এনে বসেছে কেন ? তারা সম্মান করে চলতে পারে না ?

—ওরা এক ঘুরো মাহুদ। নিজেরের মাথা চামড়া নিয়ে চলে থাক না কেন ? আমরা ওদের চাই না।

—ওরা চলে থাক ! হিন্দুস্থান যে কলঙ্কে ভরে গেল ! আমাদের ছায়াটুকু পর্বন্ত ওরা এড়িয়ে চলে। এমন করলে এক জমিতে এক আকাশের নিচে বাস করবে কি করে ?

সকলেই এক কথা বলে। আর সহ হয় না। আর কত দিন ? আর কত দিন এ কলঙ্ক ? এ অপমান ?

আসন্ন এক ছোট সর্ব্বের প্রাক্টলে এক আশ্চর্য পরিবেশে কথা বলেন ভবানী। বলেন ব্রিজহুলারীর সঙ্গে। আইটের আচরণে মনে মনে জলে ব্রিজহুলারীর ওপরে বিষ ঢেলে দিয়েছে চম্পা। আর চম্পাকে বিস্মিত করে ব্রিজহুলারী ভবানীর সঙ্গে একটি সাফাংকার ভিক্ষা চেয়েছে।

চম্পার কুঠিতে নিচের ঘরে এক প্রদীপ জ্বলছে। ঠাঁড়িয়ে আছে ব্রিজহুলারী আর ভবানী। প্রদীপের রাঙা আলো দু-জনের পায়ের কাছটুকু শুধু আলো করেছে। মুখ আলোর আভার বেটুকু দেখা যায়, তাতে ব্রিজহুলারীর মুখে অনেক রঙ দেখা যায়। গালে জলের আভাস দেখা যায়। মাথার কাপড় খসে পড়ে গিয়েছে। গহনার সে গুরুভার দেখা যায় না। বুক ঘন ঘন হুলছে। নিশ্বাস এখনো সহজ হয়নি। সে বলে, জানি, তোমাকে আর দেখব না, তুমি বলে বাও আমি কি করব ?

—আমি কি বলব ব্রিজহুলারী ?

—বল। একবার ডেকেছিলে, আমি তীক আমি পারিনি। তুমি বোধ না, যে আমি মনে মনে মরে গিয়েছি ?

—এখন আর হয় না।

—জানি। এ কথা ভুলি না যে তোমার কত দয়া। ভুলি না যে সেই রক্তের মৈনপূরীতে, বান্দ্যার তুমি না থাকলে আমি মরে যেতাম। তুমি বাঁচিয়েছিলে, বলেছিলে আত্মহত্যা পাশ। বলেছিলে নিজেকে হত ছোট ভাবছ ততই দুঃখ পাব। বলেছিলে তুমি আমার কলঙ্ক দেখ না।

—সে কথা আজ কেন ?

তিরস্কার করেন না ভবানী। দুঃখ করেন না। শাস্ত এক বিষয়তা শুধু ফোটে তার গলায়। তিনি বলেন—তুমি জান ব্রিজহুলারী, সেদিন যদি তুমি একবার রাজী হতে তবে আজ তুমি কোথায় আমি কোথায় থাকতাম। বলিনি যে আমার সাহস আছে ? কই তুমি ত পারোনি !

—বলেছিলে ! আমি ত বলেছি সে কথা। আজ আর সে কথা বলে কই নাও কেন ডাক্তার সাহেব।

হুজনে হুজনের বিকে চেয়ে থাক। একলা এই ছোট নরনারী পথপাশে জ্ঞানতো। ভাগ্য প্রতিকূল না হলে তাদের সে পরিচর অন্তরঙ্গতা হয়ে উঠতো এতদিনে। কিন্তু হুজনের ভাগ্য হুজনে হসিকে নিয়ে গিয়েছিলো। তিন বছর আগেই। আজ তাই সাদানাসমনি এত কাছে ঠাঁড়িয়েও হাকখানের সে বিচ্ছেদের সত্ত্ব

তারা পেরিয়ে আসতে পারে না। সর্ব্বশ্রম গোথে চেয়ে থাকে ব্রিজহুলারী। যে পরিচর কোন পরিণতি পায়নি, যে প্রেম বহুদূরে বিনষ্ট হয়েছিল, তারই দুঃখস্বস্তি যেন কুয়াশার ওপারে প্রাসের বাতিগুলির মতোই স্তব্ধ হয়ে মনকে আকর্ষণ করে।

সে ছিলো একদিন, বেদিন পিতৃহীন, বিমাতা-পরিভ্রান্ত ভবানীশঙ্কর জেহুইট ফাদারদের সঙ্গে নিয়ে ক্রীড়ান হতে উৎসাহী হয়েছিলেন। মনে হয়েছিলো বৃষ্টি বা তাতে বৃষ্টির আশ্রয় পাবেন। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হবার পরামর্শ দিলেন তাঁকে ব্যারাকপুর চার্চের ফাদার। আর ডাক্তারী তিন বছর পড়ে পাশ না করেই চলে এসেন ভবানী চাকরী নিয়ে।

১৮৫৪-৫৫ সালে মিলিটারী জীবনে তাঁর বিশেষ ও সমাজের বাঙালীর অভাব ছিল না। কিন্তু ভবানী কেমন যেন তাঁদের সঙ্গে মিলতে পারেন না। রুচি এবং মানসিক সংগঠনে বাধলো। একদিনের Humanity আর Ethics-এর ছাত্র ভবানীশঙ্কর ঠিক এ জীবনেও মিশে গেলেন না। আর যা যা ভেবেছিলেন—বাহুবীর সঙ্গে মেলামেশা, অন্ত দেশের মাহুকে জানা, আহত ও আত্মের সেবাস্রত—এর কোনটাই গেলেন না। এক আশ্চর্য জীবন, বাহুবীর সমাজ ও সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত, মিলিটারীর জীবনে—ফৌজী ডাক্তার হয়ে তিনি মহাবাহুকে অবমানিতই হতে দেখলেন। তিনি নেতিভ ডাক্তার। নেতিভ সিপাহী সহরারদের। তাঁর লজ্জ অপরিহার্য তাঁর, অগ্রচুর ঔষধ এবং কর্তৃপক্ষের অপরিমীম অবহেলা।

তাঁর দোষের প্রাণ আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সল ও সমাজবিমুখ মন তাঁর। ফৌজীজীবনে এই সুবিপুল স্বর্গবন্দ্য এবং মাহুবের অবমাননা দেখে তিনি দুঃখিত হলেন, যেমন সাধুসন্ন্যাসী দুঃখিত হয়। এই অভিশাপের কারণ খুঁজে তুলিয়ে দেখে বা বিচার না করেই তিনি অজ্ঞানিকে মানসিক ভাণ্ডার্য খুঁজতে গেলেন। প্রকৃতি-প্রেমিক হলেন ভবানী। মাহুবের চেয়ে প্রকৃতির রাজ্যকে অনেক শান্ত, উদার ও কথাময় বোধ হলো। গাছ, নদী, আকাশ, পাহাড়, ফুল ও জীবরাষ্ট্রো তিনি ঈশ্বরের অপার করণা অনুভব করলেন।

কিন্তু মাহুবের দিকেই কি বিমুগ্ন হতে পারলেন ? তখন তিনি বেওরাতে। আইটের ইনফ্যান্ট্রি wing-এর ডাক্তার ব্রহ্মেন সর্ব্বের ; আইট সেই সময়ই সংগ্রহ করেছেন ব্রিজহুলারীকে। ভবানী জ্ঞেছিলেন সে মেয়ের অপূর্ণ রূপের কথা।

আইটও ভেবেছিলো ব্রিজহুলারীকে তার উপযুক্ত করে দেবে। অন্ততঃ সামান্য উচ্চ ফার্সী জানা দরকার তার। সেই প্রসঙ্গেই সে ভবানীকে ডাকে। বলেছিলো—সামান্য শিখরে নাও। ঠাকাল দেখ আমি।

সেই হলো আলাপ। বিস্মিত ভবানীশঙ্কর দেখলেন, যে মেয়েটি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিলো না তাঁর সম্পর্কেই তাঁর মনে জেগেছে করুণা।

আইটের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা প্রচলিত ছিল মুখে মুখে। তার অনেক আচরণ সম্পর্কে সাহেবরাই লজ্জা পেতো। ভবানী মেয়েটিকে করুণা করলেন। তাঁর মনে আত্মবিশ্বাসে আশ্রয় চাইলেন এবং সহসা একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর অনেকখানি মনই একখানি স্তম্ভর, বিগ্ন মুখের পাণ্ডুর ছবিতে ভরে উঠেছে।

ত্রিভুজারীর অবশেষিত জীবনে ভবানী হলেন প্রথম পুত্র, যিনি তাকে প্রভা করেছিলেন। তার আশ্চর্য জীবন তাকে তার দেশসমাজের সর্গীর্ণ পণ্ডী ছিঁড়ে বাইরে এনেছিলো, আর কোন পথের দিশা না দিয়ে অন্ধকারে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলো। ভবানী তাকে শোখালেন—ভয় পেরো না। ভয়-ই তোমাকে দুর্বল করেছে। তুমি সাহসী হও।

কোন দিন বললেন—নিজেকে মূল্যহীন মনে করো না। নিজেকে বিশ্বাস করো।

সেই সময়-ই ত্রিভুজারীর জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। সে যেন প্রথম এক আলোর নিশানা দেখতে পেয়েছিলো, আর মনে ভেবেছিলো যদি ভবানীশঙ্কর তার হাতখানা ধরে রাখেন, তবে হয়তো বা সে এই জীবনের নিগড় বন্ধন ভেঙে চলে যেতে সাহস পাবে।

সেদিন ভবানী সাহস হারাননি। তিনি রাজী হয়েছিলেন। ডেবেছিলেন নিয়ে চলে যেতে পারবেন তাকে। কাজের অভাব কি? কাজ পাবেন কোথাও না কোথাও। বিয়ে করবেন ত্রিভুজারীকে। তাকে মাহুত করবেন। উন্নত করবেন।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ত্রিভুজারী-ই সাহস হারালো। মেয়েদের বৃষ্টি বা এমনি হয়।

সে কথা বাইরে কেউ জানলো কি না বড় কথা নয়। ভবানী মনে বড় খা খেলেন। আর এমনই পরিস্থিতি, যে মুখ বুঁজে সইতে হলো আঘাত। এ-ও তিনি বুঝলেন, যে এর পরে আর ত্রিভুজারীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। সে মন তাঁর নেই। মন ভেঙেছুরে অস্ত রকম হয়ে গিয়েছে। অসুস্থতার ছুটি নিয়ে বদলী হলেন ভবানী। কিছুদিন রইলেন কুমায়ূন প্রদেশে এক সাফাখানায়। অপরূপ আরব্য পরিবেশ। অপরিণীত সারথী সেখানকার মাহুতদের মধ্যে। সেখানে গিয়ে যেন আবার উপলব্ধি করলেন ভবানী, ঈশ্বর, বা আশীর্বাদ, বা সৌভাগ্য, সে বা-ই হোক—ত্রিভুজারী-ই সব কিছু বয়ে নিয়ে এসেছিলো। তাঁর জীবন সেই একজনকে ধরেই মধুময় হতে পারতো। আর সে বিহনে সত্যিই তাঁর জীবনটা শূন্য হয়ে গেল। মান হারিয়ে গেল। জীবনটা অনেক বেশী অর্থপূর্ণ হতে পারতো। কল্পনা ও স্নেহের পথ ধরে প্রেম আসতো। একটা মাহুতকে নিজের মধ্যে পুনর্বাণীকৃত করার সার্থক কাজ নিয়ে তিনিও সার্থক হয়ে উঠতে পারতেন।

ভবানীশঙ্কর বুঝতে পারলেন চলতে চলতে একটা জায়গায় হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছে, আর সে হিসেব কোনদিনও মিলবে না। বহু দিন যাবে তাঁর জমার খরে শুধু লালকালিতে ঢারাই পড়বে। কিছুই পাবেন না তিনি।

আজ সেই সব বিবলতা আর নিরাশার কথা মনে পড়ে হুজুনেই হুংব পান।

ত্রিভুজারী আবার বলে, কিস-কিস করে—বল, আমি কি করি—এরকম করো আর কতদিন বাঁচবে? সবাই আমাকে খোঁজা করে। আমার সঙ্গে কেউ মিলে না। ঈশ্বর জানেন আমার কি হুংব।

সে নিচুপা আরো নামিয়ে বলে—মনে হয় মরে বাই, কিন্তু সে সাহস-ও হয় না। আমি একেবারে ছেঁদে পেরা।

ভবানীর চোখে ভৎসনা নেই। দিকার নেই। সে দিকে চেয়ে ত্রিভুজারী কোনো অসম্ভব দুরাশায় বলে।

—আর একবার নিয়ে যেতে পার না?

ফর্সগিলার নীলশিরাটা দশদশ করে তার। ভবানী মাথা নাড়েন।

তারপর আর কোন কথাই প্রয়োজন থাকে না। নির্বাক এই সময়টার ভার যেন অসহ হয়ে ওঠে। ত্রিভুজারী বলে,—আমি বাই।

আর বাবার কালে ভবানীর চোখে পড়ে অপস্বয়মান এক নীল শাড়ীর আঁচল। যেন চেনা মনে হয়। তারপর মনে পড়ে একদিন যেন তিনি বলেছিলেন,—হুসার এই নীল রং। বড় বিন্দু। আমার দেশে এই রঙের আকাশ দেখা যায়।

তারপর-ই প্রফুট তারার মতো ছোট ছোট শাদা লাল ফেশনের বুটী তোলা এই নীল শাড়ীখানি বার বার পরতো ত্রিভুজারী।

তিনি বলেছিলেন,—এই অলংকার, এ যেন বোকা! কেন পরো তুমি?

আজ সেই পরিচিত নীল শাড়ী পরে নিরাভরণে, যে এসেছিলো ত্রিভুজারী, সে তাঁরই স্বৃতিক সম্মান করে। মনে হলো ভুলেছেন রেজিমেন্টের বাঙালীদের কাছে, আর অন্তঃ-ও।

—ব্রাইট কম চালাক নয়। কাঁচা টাকা হাতে রাখেনা সে। সবই এ মেয়েটাকে গহনা গড়িয়ে দেয়। ওব অনেক টাকার গহনা আছে।

পোষ্টঅফিসের বাবু তাঁর কাঁচা চন্দ্রমোহন বহু লিখেছিলেন—বড়সাহেবের বিবিকে কাশী ও ইরাজী সামান্য শিখাইয়া আমি সোনার খড়ি জেবচেন ও উত্তন চাঁদির ডিবা পারিতোষিক লইয়াছিলাম। তুমি জান, তোমার খুড়ীমাতা করুণ অলংকারপ্রিয়। তোমার জন্ত না হোক, তাঁহার কথা মরণ করিয়া একজোড়া উত্তম বালা, বা সোনার নাসদান, অবশ্য লইও। তোমার সৌভাগ্য যে—

দেশীর অফিসাররা বলেছেন—ডাক্তার সাহেব, ওই মেয়েটা আমাদের কলঙ্ক। তাতে ও বেরকম গহনার বাহার দিয়ে বেড়ায়। এইজন্য টাকার এক দরকার হয় ব্রাইটের, জানলেন; আর একদরকম পোলমাল হয়।

ভবানীর মনে হলো সত্যিই ত্রিভুজারী হুঁতাপিনী। আর এখন চম্পার খর থেকে বিদায় নিয়ে চন্দনের সঙ্গে চলতে চলতে মনে হলো, যে বকম শোনা যাচ্ছে, যদি কোন বিশদ হয়, তবে রেজিমেন্টের লোক ব্রাইটকে তো নয়ই, ত্রিভুজারীকেও ছেড়ে দেবে না। সহসা চন্দন প্রায় করলো।

—ডাক্তার সাহেব, আপনি ব্রাইটের বিবিকে জানলেন কি করে? কি দরকার ছিলো তার? এমন করে কথা বলবার মতো?

—আমি তাকে অনেক দিন জানি চন্দন!

—ও।

এবার ভবানী কোঁতুল ও ঈর্ষ কোঁতুকে প্রায় করেন।

—চন্দন চম্পাকে তুমি কত দিন জান?

—কেন?

চন্দন যে হাসছে তা যেন ভবানী বুঝতে পারেন। ভবানী সন্দেহাবেই হলেন।

—চম্পাকে সকলেই চেনে। তার সঙ্গে সকলেই মিশতে চায়

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



**রেক্সোনা
সাবান**

**আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে**

যতদূরই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ
ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মৃদু, আরও মোলায়েম
দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনার থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি জেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাগপকে
হাল্কা করে এবং আপনার ত্বকে প্রস্তুত রাখে। রেক্সোনার
সবের মত বেগা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও হাল্কা হয়ে উঠবে।
আপনার সৌন্দর্যের জন্তে... রেক্সোনা।

Rexona
BLENDED WITH CADYL

রেক্সোনা কো., লিম., অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে বিক্রয় করিবার লিম., কর্তৃক প্রস্তুত ও বিক্রয়

R.P. 144-388 ৩৮৭

সকলেরই তার সম্পর্কে কৌতুহল। তবে চম্পা তো কারকে আর দেয় না। দূরে রেখে চলে। তবে ?

—তবে কি ডাক্তার সাহেব ?

—তুনি ইঞ্জিনীয়ার ইভাল সাহেবের সঙ্গে বড় ভাব হয়েছে তার।

চন্দন বলে—ও কথা বলোনা ডাক্তার সাহেব !

—কেন, চন্দন ?

—চম্পা কোন বে-আদব করবে না।

কৌতুক ছাড়া চন্দন কথা কয় না। সব কথাতেই সে হাসে। চন্দনের পিছার এখন কোন পরিহাস নেই। ভাবানী বলেন।

—আমি কিছু জানিনা চন্দন, এমনই বলেছি।

—এমনই চম্পার সম্পর্কে কোন কথা বলো না ডাক্তার সাহেব। জবান বড় খারাপ জিনিস। একটা ছুট কথা বে-আদাব ত্বয়ের মতো ছুটে গেলে আর কিরিয়ে আনতে পারো না আর কে না জানে একটা কথা থেকে লড়াইও লেগে যায় ? এমন কথা বলো না, হাতে ধাক্কাশোধ লাগে মনে।

তারপর আবার হাসতে থাকে। লঘু হয় কণ্ঠ। বলে—ডাক্তার সাহেব, আজ কি বলছিলেন তোমাকে ঐ সাহেব ডাক্তার ? ক্লাবে বেতে বেতে ?

—বলছিলেন কি, যে পাগলা কোন ফকির না কি ভগ্নবানপুর, উনাও আর কতগড় দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে চাপাটি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর কি বলছে।

—চাপাটি ?

—মাথুলী জোরার বাজার-র ছাতুর চাপাটি। সেই তো হাসির কথা।

—হাসির কথা তো ভাবছে কেন সাহেবরা ?

—কোথায় ভাবছে। পাগলা সেই ফকিরকে তো জেরা করে ছেড়ে দিয়েছে।

আর কোন কথা হয় না। চূপচাপ চলেন দু'জনে পাশাপাশি। সহসা চন্দন গান গাইতে শুরু করে। বলে—কিছু জ্ঞান নিও না, বড় কুঠি হচ্ছে।

সে রাতে চৈতন্যম জৈবরামদেবের পরিত্যক্ত সে বাগান বাড়ীর চত্বরে বসে কথা কয় ইভাল ও চম্পা। এ নির্জন জায়গার নির্বাচনে শুধু চম্পার জেদে। প্রেমের প্রাথমিক পর্ব শেষ। অতৃপ্ত ইভাল। বলে আয়ার ভাললাগে না।

ছোট একটা ফুল গাছের নিচু তাল ঘরে ঝাঁড়িয়ে চম্পা সব কথাই বলে কৌতুকের স্বরে। বলে—সাহেব, তুমি ব্যারাক ছেড়ে নিয়ে কুঠি নাও, নয় তো আমার ইচ্ছা থাকবে না যেখানে সেখানে আমি বেতে পারব না। আচ্ছা, তুমি না কি চলে যাবে ?

—No, my princess. No, my pretty.

—সাহেব, ইংরাজী বলো না।

—তোমার কিচির-মিচির ভাষা আমি বেশী কলতে পারি না।

—তবে, তুমি যাবে না ?

—না। বড় সাহেব নিষেধ করেছে।

—কেন ?

এবার চম্পা ফুল এসে তার সামনে বসে। ইভালের মনে হু এই ফুলের গেলজল হরিণের মতো গতি ভঙ্গী, এ বৃক্ষি প্রাচীর মেরেই নিজেই। বলে—চম্পা, বড় ফুলের তুমি। তুমি মনোহর !

—বল, কেন মানা করেছে সাহেব ?

—কি চিন্তা চুকেছে মাথায়, হঠাৎ না কি সকল সাহেব মেয়াদে নিরাপদে থাকবার দরকার হবে। আমার উপর হুকুম এসেছে, বহু সময়ে নিরাপদে থাকবার বন্দোবস্ত কি ভাবে করবে আমি যেন ভাবি।

—কি করবে তুমি, কোলা বানাবে ?

চম্পা হেসে গড়িয়ে যায়। ইভাল বলে—না। আমি এক টাওয়ার বানাব, তার উপরে তোমাকে কয়েদ করে রাখব। শুধু আমি ছাড়া কেউ তোমার কাছ আসবে না।

—তুমি আসবে কি করে ?

—চম্পা, তুমি কণ্ঠকথা জান না। তুমি চুল নামিয়ে দেবে, আমি উঠে আগবো সেই টাওয়ারে।

—সাহেব, তুমি বড় ভাল। এ দেশে নতুন এসেছ কি না !

—কেন, চম্পা ? আমি শ্রীজী ফুলের কুঠি নেব। সেখানে তোমাকে কালো কালো দাঁস দাঁসী, তামাক আর পানের সরঞ্জাম বা তোমরা ভালবাস, সব তোমাকে দেব।

—সব ?

—সব।

—এখানেই থাকবে তুমি ? আর দেশে যাবে না ?

—না। এ দেশও তো আমাদেরই।

—নিশ্চয়। তোমার ভাষা আমাকে শেখাবে না ?

—না চম্পা। তুমি চিরদিন এ বকম অজ্ঞত পাখীর মতো কল কল কথা বলো। আমার স্তন্যতে ভালো লাগবে। তুমি এই বাগানে বুলবুল। কেন তোমাকে বিসাতের পাখীর গান শিখাব ?

—সাহেব, তবে তুমি যাবে না ?

—না চম্পা, আমি এখানেই থাকব। খুশী হলে ?

—খুশী হলাম।

ঘরে ফিরে সম্পূর্ণকে চম্পা বলে—বুঢ়া, তোমরা ভাব সাহেবরা খবর রাখে না ? বুঢ়া, তুমি জেনো, যে সাহেবরা বিপদ আশঙ্কা করে। তারা মিল্লার ইন্তাহার, কি মীরটিরে বাজারের হাজার খবর রাখে কি না, জানি না। তবে তারা সাবধান হবার কথা ভাবছে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তাই বললো। বড় সাহেব বলেছে তাকে গড় বাঁসতে ! কি অজ্ঞ কোন কিছু বানাতো।

—চম্পা, একথা আমরাও জানি। তবে তোর হৃদে ঝাচাই হয়ে গেল সত্যি মিথ্যা।

—তারপর ?

—আব দেবী বোধ হয় নেই চম্পা। মনে হয় তাই। বুঝি না।

চন্দনের আসল সন্ধ্যার প্রান্তালে বিদায় জানাতে আসে চম্পা। পরিত্যক্ত মস্তির শিখরে ফকিরদরবার বাগানে ঝাঁড়িয়ে কথা হয়। চন্দন বার বার বলে—চম্পা, তুই সাবধানে থাকবি। তোর জন্ম বড় চিন্তা নিয়ে গেলোয়।

—চন্দন, তুমি ভেবে না। আমি একা নই।

—চন্দ্রা, বিপদের সময় আমি সকলের কথা ভাবতে পারি না।

মনে জানি এ আমার একার দায়িত্ব।

—ভয় করে কেন?

—ভয় করি কেন?

চন্দ্রার বাড়ি ধরে রেগেই স্বাকি দেয় চন্দন। বলে—কতি হলে দায় হবে? আমার? না সকলের?

চন্দ্রা হাসতে চায়। তারপর হাসি থেমে যায়। বলে—আমি ভাল থাকব। কিন্তু তুমি? তুমি কবে আসবে চন্দন?

—দেয়ী করবো না।

চন্দন হেঁট হয়ে চামড়ার দড়ি বিনিয়ে বিনিয়ে বাঁধা ভারী চন্দ্রাটো বেঁধে নিতে চায়। চন্দ্রা নিচু হয়ে বেঁধে দেয়। তারপর বলে—কি রকম সময়ে বাছ। মনটা আমার ব্যস্ত হয়ে ইটলো।

চন্দন ঈষৎ ভুরু কুঁচকে চন্দ্রার মুখ দেখে। বলে—বড় তোমার স্নান চন্দ্রা, বড় ভাল বলে জোমাকে সাধাই। কিন্তু তাতে আমার গর্ব নেই।

—কেন?

—মনে হয় তোমার নিষেধ শুনে ভুল করলাম। কিছু কথা না মেনে যদি ধরে নিয়ে যেতাম ঐ খোঁড়া পণ্ডিতজীর কাছে, আর তাকে পুস্তক রেখে বিয়ে করে নিতাম, সব হাল্কাটা মিটে যেতো। তোমার জন্ত হলো না!

—আবার সেই কথা?

—একশোবার। আর কোন কথা থাকে? শোনো চন্দ্রা, আমার ডাকগাড়ী ছেড়ে বাবে, চলে বাব এখনি। বলে বাই—

তুমি হুঁশিয়ারে থেকে। সাহেবকে বেশী খেলিও না। ওরা যেন। যত খেলতে পারে? আর,—

—আর কি চন্দন?

—তোমার মাসিক তুমি নয় চন্দ্রা, তোমার মাসিক আমি? এই খেয়াল রেখে খুব ভাল থাকবে? যখন ফিরে আসব, বেন না দেখি আমার চন্দ্রা হোদে আসে গিয়েছে কি মলিন হয়ে গিয়েছে? জানলে?

—জানলাম।

—আচ্ছা। তবে চলি।

—এসো চন্দন। মঙ্গলময়ের কুপায় ভাল করে ঘুয়ে এসো। আমি কিন্তু পথ চেয়ে থাকব।

—এ কি ডেরাপুরের পথ, পাগলী।

—হী চন্দন, আমার কাছে সেই একই পথ। ঐ পথটা তোমাকে বার বার নিয়ে যায়।

—আবার কিরিয়েও দেয়।

—তা দেয়।

কিছুক্ষণ কাটে এমনই। এ ওর দিকে চায়। চন্দ্রা বেন এখন আত্মবিশ্বাস স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নারী। আর সে অপরিপক্ব তরুণী নয়। আর চন্দন তেমনই বেশবোরা এক নির্ভীক যুবক। আত্মবিশ্বাসে সেও প্রোচ্ছল।

শেহনে সাক্ষাৎ রাগে আকাশ। স্বদয়ে প্রেম। তবু বেন প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা।

জোর করেই চন্দ্রার মুখ থেকে চোখ ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে চন্দন।

চন্দনের হাতে হাত রেখে চলে চন্দ্রা। স্বদয়ে অনেক কথা। তাই মুখে কোন কথা হয় না। [ক্রমশঃ]

স্বাধীনতা

(পি. বি. শেলী)

বহুমান পূর্ণভেরা দেয় একে অস্ত্রের উত্তর;
বজ্রনাশে তাহাদের প্রতীধ্বনি জাগে দিকে দিকে;
অজ্ঞানত্ব নিহুদল জাগাইয়া রাখে পম্পর,
এবং হিমশৈলচর চূর্ণ হয় শীতেরই সমুখে,
ঝড়ের বিবাহ হবে বাজ্রিণী ওঠে এ বিশ্বলোকে।

এক খণ্ড মেঘ হ'তে খ'সে বাওয়া বিদ্রোহ-কলক
বাণশ্রু হ'য়ে চারিভিতে সহস্র বীশের আলো হয়,
ভূমিকম্প করে যায় লীলা তার অতি-ধ্বনিস্বক—
নগরী পোড়ায়, শত লক্ষ বীশে ত্রাস সঞ্চার;
ভূমির গর্ভেও তার বীতার বর্ষের স্রুত হয়।

তথাপি তোমার দুই তীরতর বিদ্রোহ-কলক,
ভূ-কম্প থেকেও স্রুত পদক্ষেপ কর স্বাধীনতা;
ভূবাহিনী দাঁও তুমি বারিষির ভীমগর্জনেও;
আনে তব দুইপাশে অগ্নি-বর্ষা পূর্বতে রান্নাও;
আলোরার আলো নহ, তুমি এক সৌর ভাষয়তা!

ভূমি হ'তে, গিরি হ'তে, বাস্প-আবরণ হ'তে আর
বন-বিশিষ্ট ছুটে যায় কুন্ডলি ও শবন জেদিয়া;
আত্মা হ'তে আত্মাভরে, জাতি হ'তে অশর জাতিতে,
সর্বগ্রাম জনপদে যায় তব আলো বিস্তারিয়া—
ভূ-স্বামী ও ভূমিদাস ত্রিযামার ভিমির সন্ধান
প্রভাত আলোকে তব কৈশে কৈশে যায় মিলাইয়া।

অনুবাদ : জীবনকৃষ্ণ দাশ।





[Osamu Dazai's 'THE SETTING SUN'-এর অনুবাদ]

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমহিলা

এই গ্রীষ্মে আমি তাঁকে তিনখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। সে সময়ে মনে হয়েছিল, এছাড়া আমার আর উপায় নেই এবং আমার হৃদয় উজাড় করে চিঠিগুলিতে ঢেলে দিয়েছিলাম। নিস্তরঙ্গ অন্তরীপ ছেড়ে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত দোহুলামান অবস্থার চিঠিগুলি ডাকে দিই, কিন্তু বহুকাল অপেক্ষা করেও কোন জবাব শেলাম না।

একবার এমন নাওজিকে জিজ্ঞেস করলাম—ভ্রমলোক কেনম আছেন। নাওজী জবাব দিল যেমন থাকেন তেমনি আছেন। প্রতি রাতে মদ ও আলুবাঙ্গি হৈ-হুয়ার মধ্যে কাটে; তাঁর সাহিত্য ক্রান্তগতিতে নীতি-বিশিষ্ট খাতে বয়ে চলেছে। সভ্য সমাজ তাকে ঝুগা করে, অবজ্ঞা করে। উপরন্তু তিনি নাওজিকে এক পৃথক প্রকাশনী স্থাপন করতে বলেছেন এবং সে-ও সেই প্রস্তাব দাঙে উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করেছে। গোড়াপত্তন হিসাবে নাওজি, এই ভ্রমলোক ছাড়া আরও দুইজন ঔপন্যাসিককে বলে করে তাদের কর্তব্যরী কাক বোণাড় করেছে। এখন মূলধন জোঁপাবার মত কাউকে ধরা যায় কিনা, এই হ'ল সমস্যা। নাওজির কথা শুনেও তবুও পরিকার বুঝলাম যে আমার হৃদয় এক কণা হরভিত্ত

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভেসে করে আমার প্রেমাপসের কাছে পৌঁছানি। এর অন্তর বত না লক্ষ্য শেলাম, তার চেয়েও বেশী করে বুঝলাম যে, বাস্তব জগৎ আমার কল্পনার দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থে গঠিত। আমার স্বব অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে ভয়াবহ এক নিঃসঙ্গ বোধ আমার খিয়ে কেঁদল, মনে হ'ল সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিজ্ঞান এক শারীরীয় প্রান্তরে আমি নির্বাসিত। এখান থেকে আমার ব্যাকুল আঁহবানে সাড়া দেবে না কেউ। অবাক হয়ে ভাবি, একেই চলতি ভাবার হতাশ-প্রেমিক বলে? সূর্যাসেব সম্পূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে সরে যাবার পর, একাকী বিজ্ঞান প্রান্তরে নিষ্ঠুর শিশিরাবাতে মৃত্যুই কি আমার কপালের লিখন? কল্পকায়ার আগে আমার স্বকল্পেণ, বন্ধনুল আলোড়িত হল।

অতঃপর টোকিওতে গিয়ে মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে দেখা করা ভিন্ন গত্যন্তর রইল না—খরচ যা হয় হবে। পাল উড়িয়ে জাহাজ খাট ছেড়ে আমার তরী অকুল সাগরে ভাসল। আর অপেক্ষা করা যায় না। যেখানে যাবার সেখানে আমার যেতেই হবে। টোকিও ব্যক্তির গোপন আয়োজন করার সময়ে এই কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ঘোরাকেরা করতে লাগল। ইতিমধ্যে হঠাৎ-ই মায়ের অবস্থা মোড় নিল।

এক রাতে মা দারুণ কাশতে শুরু করলেন। শরীরের তাপ নিয়ে দেখলাম ১০২° ডিগ্রি জ্বর। কাশির ধমকের ঝাঁকে মা বললেন—খুব সম্ভব আজকের এই প্রচণ্ড শীতটা সহ হ'ল না। কাল আমি ঝেড়ে উঠব। যাই হোক, শুধু কাশি বলে আমার মনে হল না এবং নিশ্চিন্ত হবার জন্য পরদিন সকালে ডাক্তার ডাকব স্থির করলাম।

পরদিন শরীরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে কাশিও কমল। যাই হোক, আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে মা'কে একবার দেখে যেতে অনুরোধ করলাম এবং সেই সঙ্গে সম্প্রতি মায়ের হৃৎকলতার কথা, গত রাতের জ্বরের কথা এবং কাশির পেছনে ঠাণ্ডা ছাড়াও আরও কোন কারণ আছে, আমার এই অনুমানের কথা সব তাঁকে জানালাম।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছলাম—বলে ডাক্তার আমার ভরসা দিলেন, তারপর বললেন, তোমার জন্যে একটা জিনিষ আছে। বাইরের ঘরের তাকের ওপর থেকে তিনখানা ক্রাসপাতি এনে আমার দিলেন। পরিপাটি পোষাক পরে বেলা তিনটের খানিক পরে তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন। প্রতিবারের মত এবারও দীর্ঘ সময় নিয়ে মা'কে পরীক্ষা করলেন। বুক, পিঠ ঠুকে ঠুকে কান পেতে শব্দ শুনে শেষে আমার দিকে ফিরে বললেন—ভর পাবার কিছু নেই। আমার ওষুধ খেলে ভাল হবে উঠবেন বলেই মনে হয়।

ভ্রমলোকের ভাবভঙ্গী দেখে হাসি চেপে রাখা দায়। কোন মতে জিজ্ঞেস করলাম—ইনজেকশন দেবেন না? ডাক্তার বাবু গভীর ভাবে উত্তর দিলেন—তার কোন দরকার নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে, তোমার মা যদি চুপচাপ শুয়ে থাকেন তবে শীঘ্রির মধ্যে উঠবেন।

কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেল, মায়ের অবস্থা ভাল না। কাশি কমল বটে, কিন্তু জ্বর সকালে ১১° এবং রাতে ১০২° ডিগ্রির মধ্যে ঘোঁরাঁমা করে। ঠিক এই সময়ে পের্টের গোলমাল হয়ে ডাক্তার লুয়া মিলেন। আমি তাঁর বাড়ীতে ওষুধ আনতে গিয়ে নাসের কাছে মায়ের অবস্থার কথা বললাম, সে গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিল। তাঁর

দাঁছ থেকে জবাব এল—সামান্য সর্দি, কাশির ব্যাপারে ঘাবড়াবার কি আছে? এক শিশি মিস্কার আর একটা পাউডার নিয়ে বাড়ী করে এলাম।

নাওজি টোকিতেই আছে। প্রায় দশ দিন হ'ল সে গেছে। একাকী ভয়ঙ্কর হয়ে আমি ওরাদা মামাকে মায়ের কথা জানিয়ে চিঠি লখলাম।

বিন কয়েক পাত্রে আমাদের গ্রামের ডাক্তার এসে জানালেন, শেষ রবী তাঁর পেট সেরে গেছে।

খুব মন দিয়ে মায়ের বুক পরীক্ষা করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—না, এতক্ষেণে বোঝা গেল। এইবার ধরেছি। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—অবের কারণ ধরা পড়ে গেছে। বা দিকের সফুসটা জখম হয়েছে। যাই হোক, উল্লেখের কোন কারণ নেই। ব এখন কিছুকাল চলবে, কিন্তু তোমার মা যদি চূপ করে পড়ে কেন, তবে ভয়ের সত্যি কোন কারণ নেই।

কে জানে—মনে মনে ভাবলাম, কিন্তু তবু ডুবন্ত মাহুস যেমন ডুকুটো নিয়ে ভাসতে চায়, তেমনি ডাক্তারের পরীক্ষার ফল থেকে টুকু আশ্বাস পাওয়া যায়—এই আর কি!

ডাক্তারকে বিষয় দিয়ে এসে খুশির ভাগ করলাম—মা, এতদিনে শিশু হওয়া গেল, কি বল? কেবল ছোট একটা ছাঁদা, এ তো শীর ভাগ লোকেরই থাকে। মনটাকে যদি তুমি শক্ত করতে পার মা, তবে জ্ঞাপ জ্ঞাপ করে সেরে উঠবে। গ্রীষ্মকালটা আমার চোখের বিষ, গরমের ফুলগুলো তাই।

চোখ বন্ধ করেই মা হাসলেন—লোকে বলে যারা গ্রীষ্মের ফুল ভালবাসে, তারা গরমেই মারা যায়। আমি এই গ্রীষ্মেই শেষ নিশ্বাস ফেলব আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন নাওজি ফিরে এসেছে বলে শরৎকাল পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারব।

নাওজির মত এমন অপরাধই আজ মায়ের চোখ বড় হয়ে দাঁড়াল ভেবে মনে ব্যথা পেলাম।

বেশ, সেই গ্রীষ্মই যখন পেরিয়ে এলে, তবে তোমার কাঁড়াও বোঝ হয় কেটে গেল—না মা! বাগানে লবঙ্গ ফুল ফুটেছে মা! তাছাড়া ভালেরিডান, বার্নেট, বেল লাহার টিমোথি সবাই মিলে বাগানে শরতের বান ডেকে এনেছে। আমার মন বলছে অক্টোবর পড়তেই তোমার ঘর ছেড়ে যাবে।

প্রাণপণে ভগবানকে ডাকি, হে ভগবান! তাই যেন হয়। সেপ্টেম্বরের চটচটে একঘেয়ে দিনগুলো গেলে বাঁচি। তার পর যখন ক্রিসান্থিমাম ফুটে, ভারতীয় গ্রীষ্মের মত একটার পর একটা ঝলমলে দিন আসবে তখন মা ভাল হয়ে উঠবেন। একটু জোর পেলেই আমি বাব অভিসারে। হয়ত মস্ত এক ক্রিসান্থিমামের মত আমার আশা পরিপূর্ণ বিকাশের স্ববোগ পাবে। হায়! অক্টোবর মাসটা যদি এগিয়ে আসত আর সেই সঙ্গে মা'ও সেরে উঠতেন।

এক সপ্তাহ পড়ে আমি মামাকে চিঠি লিখতে এককালীন রাজবৈজ্ঞানিক প্রবোধ ডাক্তার মিয়াকে (Miyake) কে টোকিও থেকে এনে মাকে দেখবার ব্যবস্থা করলেন।

ডাক্তার মিয়াকে বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁকে দেখে মা খুশি হলেন



‘নিম’এর তুলনা নেই

২০০ বছর ধরিয়া ইহার উপকারী গুণগুলি স্বপ্রতিষ্ঠিত

দাঁত স্ফূট করে মাটীও
স্বস্থ রাখে

নিম টুথ পেস্ট

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ
এবং আধুনিক টুথ পেস্টগুলিতে ব্যবহৃত
ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেস্ট



পত্র লিখিলে নিমের উপকারিতা
স্বকীয় পত্রিকা পাঠান হয়।

..... দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২৩

MT-185-NP-3

বোঝা গেল। তাঁর অমার্জিত ভাষা আর কক ভাষা মায়ের মন গলিয়ে দিল। পোষাকী পরীকার আরোজন না করে ভ্রমলোক মায়ের সঙ্গে অগ্নি পরচর্য্যে নেতে গেলেন। পুজি রান্না শেষ করে এসে দেখি মাকে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। ভ্রমলোক বেতের চেয়ারে বসে আছেন, তার কণ্ঠ থেকে কণ্ঠহারের মত ঐতিহাসিকোপটী ঝলছে।

আমার মত লোক রাস্তার ধায়ে এঁদো হোটেলের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুড়লু খেয়ে লাঞ্চ-পূর্ব্ব সারে। তোমরা কখনও সে রকম অপূর্ব্ব সব খাত, অর্থাৎ বাজে জিনিষ একবারে খাও না।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে এই কথা কানে এল। আর এই ছিল তাঁদের আলোচনার ধরণ, মা একমনে তাঁর কথা শুনছিলেন।

মনে মনে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম, তাইলে মায়ের অন্তরখটা বোঝ হয় বিশেষ কিছু নয়। হঠাৎ মনের মধ্যে জোর পেয়ে প্রশ্ন করলাম—মা কেমন আছেন—গ্রামের ডাক্তার বলে গেল বা দিকের ফুসফুসে ছাঁদা হয়েছে। আপনি কি বলেন?

নিরীকার মুখে ডাক্তার বাবু জবাব দিলেন—সে আবার কি? তোমার মা'র কিছু হয়নি।

আঃ! বাঁচা গেল বৃকের ওপর থেকে পূর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা নেমে গেল। আমি খুশি হয়ে বলে উঠলাম—তুনেছ মা, উনি বললেন—তোমার কিছু হয়নি।

এর পর ডাক্তার মিয়াকে চেয়ার ছেড়ে চান্দাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিশ্চর আমার কিছু বলতে চান। তাঁর পেছন পেছন পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলাম।

দেয়াল-ঢাকা পর্দা অবধি গিয়ে উনি থামলেন—অজুত শব্দ পাচ্ছি বুকে।

ফুসফুসের ছাঁদা নয়?

না।

ব্রকাইটিস? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চোখে জল এল।

না।

টি, বি'র কথা আমি জোর করে মন থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। নিউমোনিয়া বা ব্রকাইটিস বা ঐ জাতীয় রোগ হ'লে মা'কে আমি এ বাড়ী টেনে তুলতে পারব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এ যে রাজরোগ, তাছাড়া হয়ত অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। মনে হ'ল পা'ছুটোর দাঁড়াবার মত জোর নেই—

আপনি যে আঙুরাজের কথা বললেন, সেটা কি খুব খাওয়া? তখন আমি অসহায় ভাবে কাঁদছি।

ডান, বা দু-দিকের সবটুকু ছেয়ে গেছে।

কিন্তু মাকে তো এখনও দিবা স্নান দেখায়? কেমন তৃপ্ত করে খান?

কোন উপায় নেই মা।

এ সত্য নয়, এ হতেই পারে না। মা'কে যদি প্রচুর পরিমাণে মাখন, ডিম, দুধ খাওয়াই তবে নিশ্চয়ই সেবে উঠবেন—তাই না? যে পর্য্যন্ত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আছে, তত দিনে তাঁর জ্বর ছেড়ে যেতে বাধ্য;—কি বলেন?

তাঁর বা প্রশ্ন চার ঠাই প্রচুর পরিমাণে খেতে দেখে।

আমি তো তাই বলছি এতক্ষণ। দিনে মা পাঁচখানা করে টম্যাটো খান।

টম্যাটো ভাল জিনিষ।

তবে ভাবনার কি আছে? মা তো সেহেই উঠবেন।

এ রোগ মারাত্মক দাঁড়াতে পারে। তোমার আগে থেকে জানাই ভাল।

জীবনে আজ প্রথম জানলাম যে, দুনিয়াতে কতগুলি জিনিষ আছে। বাদে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার এমন এক চুলজা নিরাশার প্রচীর তৈরী হয়, যার সামনে মানুষের সকল শক্তি ব্যর্থ।

হু'বছর? তিন বছর? কাঁপালায় ফিন-ফিন করে জিজ্ঞেস করলাম।

বলা যায় না। মোট কথা এর কোন রাস্তা নেই।

নাগাওকা গরম জলের ব্যবহার জায়গায় সেদিন কি যেন কাজেব কথা আছে, সেই সব বিড়বিড় করতে করতে ডাক্তার মিয়াকে চলে গেলেন। আমি ফটক অবধি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর আজকের মত মায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়লাম। যেন কিছুই হয়নি, মুখে এমন এক হাসি টেনে আনলাম, কিন্তু মা জিজ্ঞেস করলেন—ডাক্তার কি বলে গেলেন?

তাঁর মত তোমার জরটা ছেড়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৃকের কথা কি বললেন?

বোঝ হয় বিশেষ কিছু নয়। তুমি এর আগে একবার কেমন ভুগেছিলে, তেমনি কিছু একটা হবে। আমি জানি ঠাণ্ডাটা একবার পড়ে গেলে তুমি কেড়ে উঠবে।

নিজের মিথ্যা কথাগুলি যেন নিজের কাছে সত্যি হয়ে দাঁড়াল। ঐ ভয়ানক মারাত্মক শব্দটা ভুলে থাকতে চাইলাম। মনে হ'ল মা মারা গেলে আমার শরীর থেকে সব মাংস গলে পড়ে বেরিয়ে যাবে। দৃঢ় সরল করলাম, এখন থেকে মায়ের জন্ত সব রকম সুস্বাদু খাবার তৈরী করাই হবে আমার সাধনা।

চান্দাঘর থেকে আঁগামচেয়ার বারান্দায় টেনে এমন জায়গায় পাঠলাম, যেখান থেকে মাকে স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁর মুখে চোখে অসুস্থতার লেশমাড়া নেই। চোখ দুটি উজ্জ্বল, গায়েব ঝক সতেজ মন্থণ। অরটা আসে ঠিক বিকেলের মুখে।

মনে মনে ভাবলাম, মাকে কি স্নান দেখায়? আমি ঠিক জানি মা আবার ভাল হয়ে উঠবেন। মন থেকে ডাক্তার মিয়াকে'র রোগ বিলম্বের কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেললাম।

কল্ললোকে অষ্টাবরের ছবি, পূর্ণ প্রকৃতিত ক্রিসান্থিমামের ছবি এঁকে গেলাম। অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমের ঘোরে কখন যে এক পটভূমিতে নেমে এসেছি—টের পাইনি। স্বপ্নে আমার এ জায়গার সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু বাস্তবিক কখনও এমন জায়গায় যাইনি। যেন আমি অনেক মধ্য এক হলের ধারে পৌঁছে পরিচিত ছান দেখে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এক জাপানী ছেলের পাশে পাশে নিশ্চেষ্ট চলেছি। সাধা দৃষ্টান্ত সর্ব্ব কৃশাশায় ঢাকা, পলকা এক সাধা পুল জলের তলায় ডুবে আছে।

ছেলেটি বলছে—পুলটা ডুবে গেছে। আজ আর আমাদের কোথাও বাওয়া চলে না। এস এখানে হোটলে গিয়ে উঠ। নিশ্চয়ই একখানা খালিঘর পাওয়া যাবে।

হৃদের প্রাণ্ডে এক হোটেল। তার পাখরের দেওয়ালগুলো সর্ব্ব কৃশাশায়। পাখরের কটকের গায়ে সোনার জল-কিরে দেখা

রয়েছে—হোটেল হাইজারগাও। এম, ডব্লিউ, আই অববি পড়ে ছাঁৎ মায়ের কথা মনে হল। না জানি কেমন আছেন এখন? মনের মধ্যে অস্বস্তি, এই হোটেলেরি আছেন কি না কে জানে! সেই ঘুরকের সঙ্গে ফটক পেরিয়ে সামনের বাগানে ঢুক পড়লাম। হাইড্রেনজিয়ার মত মস্ত মস্ত লাল ফুল ধোঁয়াটে বাগান আলো করে আছে। ছেলেকেলার আমার বিছনার চারপাশে ওপর টুকটুকে লাল ঝং-এর সূতো দিয়ে হাইড্রেনজিয়ার প্যাটার্ন তোলা ছিল। সেগুলো দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু এখন মনে হল বোধ হয় হাইড্রেনজিয়া ফুল লালও হয়।

তোমার শীত করছে না তো?

সামান্য, আমার কান দুটো কুরাশায় ভিজ়ে উঠছে আর শরীরের ভেতরটা জমে যাচ্ছে।

তবে উঠি ওকে প্রহ্ন করলাম, মা কেমন আছেন কে জানে!

হেলোটর গ্রান হাসির মধ্যে বিবাদ ও সত্যভূতির ছায়া। তিনি তাঁর কবর স্থান লাভ করেছেন।

আমি আর্ন্তর্জন করে উঠলাম। তবে ঠিকই হয়েছে। মা আর আমারের মধ্যে নেই। শ্রান্ত-শান্তি চুকে গেছে। মায়ের মৃত্যুর এই দুঃস্বপ্নে অবর্ণনীয় নিঃসঙ্গতায়, আমার সারা দেহে ঝাঁকুনি সেগে চোখ ঘুমে গেল।

এতক্ষণ গোখুরির আলো বারান্দার নামে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে।

প্রতিটি জিনিষে স্বপ্নে দেখা সরজের ছোঁয়া।

মা—ডাক দিলাম আমি।

বডাল-শান্ত কণ্ঠে মা জবাব দিলেন—কি করছ ওখানে?

লাফিয়ে উঠে পৌড়ে মার পাশে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মা!

আমি এতক্ষণ ভেবে মরছি না জানি তুমি কি কাজে ব্যস্ত। টানা ম দিয়ে নিলে—কি বল? আমার অবস্থা দেখে মা কৌতুক বোধ করেন।

মায়ের রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম তিনি যে বেঁচে আছেন আজও, এর জন্ত কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এল।

চুই-মি করে জিজ্ঞেস করলাম সান্ধ্যভোজের জন্ত কি আদেশ পাঁগীরা?

কিছু দরকার নেই। আজ আর কিছু খাব না, ঘর ১০° ডিগ্রি ঠাণ্ডা ছিল।

আনন্দের ভেতর থেকে কে যেন আমার অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেল দিল। কি করব কোন দিশা না পেয়ে ঘরের আঁখি অন্ধকারে তুদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। আর আমি বাচতে চাই না।

তা কেন হবে? ১০° ডিগ্রি?

ও কিছু নয়। জ্বর আসার মুখে একটা কঠি হয়। মাথা ব্যথা হয়, শীত-শীত ভাব হয়—তার পরেই ঘরটা নামে।

বাতের এতক্ষণ আঁধার নেমেছে। বৃষ্টি ধরে গেছে, কিন্তু পাতা রয়েছে।

আলো ছেলে খাবার ঘরে খাবার মুখে মায়ের ডাক কানে এস—মালটা বড় চোখে লাগছে। নিবিয়ে দাঁও তো মা!

কিন্তু এই অন্ধকারে কি করে শুয়ে থাকবে? স্নাইচের কাছে গড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম।

তাতে কিছু এসে-যায় না। ঘুমোলে চোখ তো বন্ধই থাকে, অন্ধকারে একটুও খারাপ লাগে না। এর পর থেকে এবার আর আলো ছেলোনা—কেমন?

মায়ের কথায় মনের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। দ্বিতীয় কথা না বলে বাতি নিবিয়ে দিলাম। পাশের ঘরে একটা বাতি ছেলে। নিঃসঙ্গতার অসহ্য ভারে জরুরিত হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলাম। সেখানে ঠাণ্ডা ভাতের সঙ্গে টিনের সামন মাছ খেতে বসে চোখ দিয়ে বড় বড় কঁোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল।

বাত বাড়ার সাথে সাথে বাতাসের জোর বেড়ে গেল এবং রাত নয়টা আশ্রয় প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে আঝের বৃষ্টি নামল। বারান্দার জানালার পাখিগুলো দিন দুই আগে আমি গুটিয়ে তুলেছিলাম, এখন সেগুলো বাতাসে ঝুন্ঝু করে উঠল। মায়ের পাশের ঘরের অদ্ভুত এক উত্তেজনা নিয়ে রোজা লাক্সেমবার্গের অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা Introduction to Economics পড়তে বসলাম। নাগজির ঘর থেকে এ বইখানা ধার করে গ্রন্থিছি। (সে অবশ্য একথা জানে না) তাছাড়া লেনিনের শ্রেষ্ঠ রচনা (Selected works of Lenin) এবং কৃষ্টিকার সামাজিক বিপ্লবের (Social Revolution) সঙ্গে ছিল। আমার ডেস্কের ওপর সব জড়ো করা ছিল। একদিন সকালে এই ডেস্কের পাশ দিয়ে কলঘরে যাবার সময়ে মা একখানা বই তুলে নিয়ে ভেতরের চোখ বুলিয়ে বিষয়টা দেখে নিলেন। তারপর করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বইটা আমার বখাছানে রেখে দিলেন। তাঁর চোখে বিবাদের ছায়া উলমল করছে। কিন্তু সে মুষ্টিই ভেতর নিষেধ ছিল না বা দরদের লেশমাত্র অভাব ছিল না। মায়ের জ্বর বইগুলি ছিল হিউগোর রচনা, 'ফুমার' 'পেয়ের এল ফিল' (Pe're el fils) মুখে এক লোদে, কিন্তু আমি জানতাম এই সব মধুর প্রেমের উপভাসগুলিতেও বিদ্রোহের গন্ধ ছিল।

মায়ের মত ধারা 'ভগবান দত্ত শিকা' নিয়ে জন্মেছেন জানি আমার কথা তাঁদের কাছে অদ্ভুত ঠেকেবে। তাঁরা বিদ্রোহে অজান্তে সহজ মনে, সাধারণ ব্যাপার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এমন কি রোজা লাক্সেমবার্গ-এর বই এর মধ্যেও আমি আপাত্তর উক্তি পেয়েছি। কিন্তু তা সবেও আমার মত লোকের মনে বইখানি যথেষ্ট কৌতুহল উদ্রেক করেছে। তাঁর বই-এর বিষয়বস্তু অর্থনীতি এবং সেই দিক থেকে বইখানি বাস্তবিক নীরস। এর ভেতর লেখক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। হতে পারে অর্থনীতি আমি বুঝি না। এ সবকে আমার আগ্রহও কিছু নেই। 'মানব মাঝেই সোভিট এবং কোন দিনই-লোভমুগ্ধ হ'তে পারে না'—এই অমুমানের উপর যে বিজ্ঞান ভর করে আছে, নির্দেশিত মানুষের কাছে সে বিজ্ঞান অর্থহীন। কিন্তু তবু এ বই পড়তে পড়তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আমার উত্তেজনার সীমা থাকে না। কারণটা হ'ল এই—যে, চিত্রাচারিত বিষাদের মূলে বিনা বিধায় কুঠারাঘাত করার মত মংসাহন লেখিকার আছে। নীতির বিরুদ্ধে মনে বতই বিদ্রোহ থাক না কেন, নিশ্চিন্ত নীড়ে ফেরা পাখীর মত আমার প্রেমাপ্সদের সেই মমতাময়ী জীবনসঙ্গিনীর ছবিও তো চোখের ওপর থেকে মুখে ফেলাতে পারি না। অতঃপর আমার মনে ধ্বংসের নেপা লাগে। ধ্বংসলীলা যেমন করুণ, বিধাবময়, তেমনি উপভোগ্য। ধ্বংস, নৃতনের স্রষ্টা পরিপূর্ণতার স্বপ্ন! হয়ত বিনাক্ষর পর নতুন



রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা
ফ্রকটা পরলো তখন আনন্দে উজ্জ্বলিত
হয়ে উঠলো। ফ্রকটাও আমি অনেক
বস্ত্র করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধবধবে
আমার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড়
দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে
মুন্নি আয়নার সামনে গেলো।
যুঁরে ফিরে চারিদিক থেকে
মুন্নি তার ফ্রকটা দেখলো তার-

পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা,
তখন বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে।
আমি চোঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, “মুন্নি, মুন্নি নতুন
ফ্রকটা খুলে যা—ওটা স্নয়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে
দিয়ের নেকস্কে বসিনা?” মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে
বহুদূরে। নতুন ফ্রকটা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো
আমায় যেন কোন এক প্রচীর দেশের রাজকন্যা, ওকে
সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল।
একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রকটা ওকে পরতে
দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্ত। ইতিমধ্যে
স্নায় অরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে
আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা।
আমার হাঁস হল যখন রাখার গলা শুনলাম দরজার সামনে।

৪৮.১৬-১৯৩৩



রাখাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন হগাঙ
ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।
ওকে দেখেই আমি যেনে আশুপ—ফ্রকটা একদম নোয়া
করে ফেলেছি—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি?
“ফ্রকটার কি ছিরিই করেছে। এখন পরবে কি বিকালে”
বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এখন সময় রাখা মুন্নিকে
সন্নিয়ে নিয়ে আমার ঘৃণালো—” তোর মাথা খাখাপ



কল নাকি' এতটুকু বাচ্চাকে মারছিল। "মুন্নি বাঁচলো আর
ক্রকট পুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।"
ক্রকট নিয়ে আমি কলতলার পরিষ্কার করতে এলাম এবং
বখন ক্রকটকে আছড়াতে বাচ্চি, রাখা বললো "মেয়ের
ওপর রাখটা কি ক্রকের ওপর কলাবি।"
"এটা না কাচলে ও পরবটা কি? অগ্র ভাল জামা যে
আর নেই" আমি বললাম। রাখা বললো, "কিন্তু ওটা
আছড়ালে ছিঁড়ে বাবে যে।"
আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে?"
"আছড়াবার কি ব্যবহার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই
হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট
কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামা-

কাগড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিতর্ক যে
এতে কাগড়ের কিছু ক্ষতি হয় না।"

"কিন্তু সানলাইটে বরফা বেশী পড়েনা?" রাখা তো হেসেই
আকুল—"সে কিরে, ভেবে শুধু একটু ঘষলেই সানলাইটে
এত ফেনা হয় যে এক গাদা জামাকাপড় কাটা চলে আর
সময়েই সাদা ধবধবে করে। এছাড়া পিটে আছড়ে কাগড়ের
সর্বনাশও হয়না, নিজেরও

ঝামেলা বাঁচে কতো—এর
পরেও তুই বলবি বরফা বেশী।"
তখন আমি একটা সানলাইট
সাবান আনালাম এবং কাটা
তর করতেই ক্রকট
ফেনার তুণে ভরে গেলো
আর দেখতে দেখতে
সাদা ধবধবে হলো।
সন্ধ্যেকো নতুন কাটা
ক্রকট পরে মুন্নিকে
সত্যিই পরীক্ষের
পক্ষে রাখা হুমারীর
হত লাগছিলো। আমি

মুন্নিকে কথাসে কাগড়ের টালু পড়িয়ে দিচ্ছি।



বিশ্বনাথ গিতার লিঃ বোয়াল

করে স্তম্ভিত করার দিন না-ও ফিরে আসতে পারে। তবু প্রেমের উদ্ভাসনার ধ্বংস আমার করতেই হবে। বিদ্রোহের সূচনা করতে হবে। দুঃখের বিরূপ রোজা (Rosa) তার অভিন্ন হৃদয়ের প্রেম মার্জাবাদে সমর্পণ করে বসে আছে।

যারো বৎসর আগের এক শীতকাল। সারাসিনা ডায়রীর (Sarashian Diary) মেরুদণ্ডহীন মেয়েটির মত তুমি কখনও মুখ খোল না। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ভার।

এই বলে আমার বন্ধুটি এগিয়ে গেল। এইমাত্র আমি তাকে লেনিনের একখানা বই না পড়েই ফেরৎ দিলাম।

বইটা পড়লে ?

অত্যন্ত দুঃখিত, পড়িনি।

একটা পুলের কাছ থেকে টোকিও রাশিয়ান অর্থোডক্স ক্যাথিড্রাল (Tokyo Russian Orthodox Cathedral) দেখা যায়, ভারি ধারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কেন কি হল ?

বন্ধুটি আমার মাথার ওপর এক ইঞ্চি লম্বা ছিল আর অনেক দেশের ভাষা জানত। লাল টুপিটা তাকে চমৎকার মানিয়েছিল। মেয়েটি ছিল অপূর্ণ সুন্দরী! মোনালিসার মত অপূর্ণ চেহারা বলে তার নাম-ডাক ছিল।

মলাটের রঙটা আমার বিকী লাগল।

অবাক করলে যে। আসলে ওটা কোন কারণ নয়। তুমি আমার সঙ্গেই করতে শুরু করছে, তাই না ?

না সঙ্গেই আমার নেই, মলাটের রঙটা আমার সহ্য হল না তাই।

তাই নাকি ? সংক্ষেপে বলে উঠল মেয়েটি এবং এর পরই আমার সারাসিনা ডায়রীর মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে। আমার সঙ্গে কথা বল কোন লাভ নেই, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। হৃদয়ে দাশিক চূপ করে শীতের নদীর দিকে চেয়ে রইলাম।

বিদায়, যদি এই হয় আমাদের শেষ দেখা! বিদায়, বন্ধু বিদায়। বারবরণ; নিজের মনে গুনগুনিবো বারবরণের কবিতার পদগুলি আবৃত্তি করে গেল। তারপর আমার আলগোছে আলিঙ্গন করল।

নিজের প্রতি বিদ্রোহে মন ভরে গেল : ফিসফিস করে একটা কি অজুহাত দিয়ে ঠেগনের দিকে রওনা হলাম। একবার পেছন ফিরে দেখি বন্ধুটি তখনও সেখানে সেই ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমরা দু'জনে দুই ফুলে পড়লেও একই বিশেষ টিচারের কাছে ভাষা শিখতে যেতাম।

তারপর বারো বছর কেটে গেছে। সারাসিনা ডায়রীর অবস্থা পরিচয় আমার আরও এক পা অগ্রসর হতে হয়েছে। এতকাল ধরে আমি কি করলাম তবে? বিদ্রোহের প্রতি আমার আসক্তি নেই, নেই ভালবাসার দিকে ঝোঁক। দুনিয়ার বিচক্ষণ শক্তিতর্য চিরদিন বিদ্রোহ ও প্রেমই এই দুটি অজুহাতকে মানব-মনের হীনতম প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের আগে, এমন কি যুদ্ধের সময়ই আমরা সেকথা বুঝছি।

পরাজয়ের পর থেকে প্রাণী বিজয়ের ওপর আস্থা আমরা হারিয়েছি। এবং তাঁরা যা বলেন তার বিপরীতটাকেই মূল্য দিতে

শিখেছি। বাস্তবিক বিদ্রোহ ও প্রেমের মধ্যেই দুনিয়ার সেরা আনন্দের বাসা। সেই সঙ্গে একথাও বুঝছি যে ঠিক এই কারণেই, জানী বুদ্ধেরা হিসাব-পরিচয় করে তিক্ত ত্রাণাক্ষরের মত মিথ্যা দিয়ে আমাদের প্রতারণা করতে চেয়েছেন। আমি চোখ বুজে এই কথাই বিশ্বাস করতে চাই যে, প্রেম ও বিদ্রোহের জুড়িই মানুষের জগৎ।

হঠাৎ দরজার কঁাকে মায়ের হাসিমুখ দেখা গেল। ঘুমওনি এখনও ? ঘুম আসছে না—না ? ডেস্কের ওপর বাড়ির দিকে চেয়ে দেখি বারোটা বেজে গেছে। না আমার একটুও ঘুম আগছে না ; সমাজতন্ত্রের ওপর একখানা বই পড়ে মাথা গরম হয়ে আছে।

ও! আচ্ছা বাড়ীতে কোনরকম ঝিক নেই—না ? এরকম অবস্থায় শোবার আগে এক গেলাস কিছু পেয়ে নিলে ভাল হয়।

সুন্দর ঘুম আসে। মায়ের গলার স্বরে, কথার ঢা-এ কেমন যেন মন-গলানো ভাব।

শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোত্তর এল কিন্তু আকাশ-বাতাসে তেমন করে হঠাৎ সোনার রং লাগলো না। বরং বর্ষাকালের মত এক এক করে অনেকগুলি স্যাঁতস্যাঁতে দিন পেরিয়ে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় মায়ের স্বর একশ'র কিছু ওপরে সেগে রইল।

এক সকালে হঠাৎ একটা জিনিষ লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেলাম। মায়ের হাতখানা ফুল উঠছে। তাছাড়া সকালের খাবারটুকু মা চিরদিনই বন্ধ করে খান, কিন্তু ইলানিং সকালের দিকে নামে মাত্র ভাতের কাথ মুখে দেন। কড়া গন্ধযুক্ত কোন খাবার খেতে পাতেন না। সেদিন সুপের ভেতর ব্যাঙের ছাতার গন্ধ পর্যন্ত সহ্যে পারলেন না।

সুপটা মুখে তুলে, না চেখেই ট্রের ওপর মারিয়ে রাখলেন। সেই সময়ে আমার নজর পড়ল মার ডান হাতখানা কোলা।

মা, তোমার হাতে কি হল ?

মুখখানাও কেমন যেন সাদাটে ফোলা-কোলা লাগল—ও কিছু নয়, এটুকু কোলায় কিছু এসে যাবে না।

ক'দিন হল এমন হয়েছে ?

মা কোন উত্তর দিলেন না, মুখে চোখে কেমন আচ্ছন্ন ভাব। আমার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল—ও হাতখানা কিছুতেই আমার মায়ের নয়। মার হাতটি কত সুন্দর, ছোট। চিরপরিচিত, স্বকোমল সে হাত যে আমার পুরম আদরের ধন। আমি অবাক হয়ে ভাবি মায়ের সে হাতখানা কি চিরদিনের মত অজুহিত হল ? বা হাতখানা এখনও অবিকৃতই আছে। কিন্তু আর যে আমি মায়ের দিকে চেয়ে থাকতে পারি না! চোখ ফিরিয়ে ঘরের কোণে রাখা ফুলের বুড়িটার দিকে তাকাই।

টের পাচ্ছি চোখের জল ঝুততে পাবো না। অসহ্য হওয়ার হঠাৎই রান্নাঘরের দিকে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, নাওজি একখানা নরম সেক্স ডিম খাচ্ছে। কচিং কখনও বাড়ীতে এসে, বাতটা ও মাসীর ওখানে মদ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। সকালে বাড়ী এসে রান্নাঘরে ঢুকে গোমড়া মুখ করে বলে নরম সেক্স ডিম খায়। এই একমাত্র খাবার বা সে বিশ্বাস করে খায়। তারপর সোতলার নিজের ঘরে গিয়ে সারাটা দিন বিছানায় শুয়ে, বলে কাটিয়ে দেয়।

মাটির দিকে চোখ নাখিয়ে বললাম,—মায়ের হাতখানা ফুলে

উঠছে। আর বলতে পারলাম না, কান্নার সারাংশে কেঁপে উঠছে, নাওজি কোন উত্তর দিল না।

এবার আমি মুখ তুলে চাইলাম,—সব শেষ হয়ে এক। তুমি লক্ষ্য করনি? ওরকম ফুলতে শুরু হলে, আর কোন আশা থাকে না। টেবিলের শাস্ত্র শক্ত যুগের ধরে ঠাঁড়িয়েছিলাম কোন মতে। নাওজির মুখে যেখ থেকে এসে—আর দেবী নেই। একি হল! কি মুহুর্ত!

মাকে আমি বাঁচাতে চাই। যেমন করে হোক মাকে ফিরে পেতেই হবে। নিজেই নিজের হাত দুটি নিশ্চেষ্ট করে বললাম। হঠাৎ নাওজি কান্নার ভেঙ্গে পড়ল—সেখান না মা, এখন আমাদের হাতের বাইরে। কিছু করার মাধ্য কি? জোরে জোরে হাতের মুঠি দিয়ে চোখ কলোতে লাগল। সেদিন নাওজি টোকিততে ওয়ালা মামাকে খবর দিতে এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থার নির্দেশ নিতে চলে গেল। মায়ের পাশে থেকে যে সময়টুকু উঠে আসতে হ'চ্ছিল, তার প্রতিটি মুহুর্ত আমার কেঁদে কেটেছে। সকালের কুয়াশা ভেদ করে দুখ আনতে বাবার সময়ে, আয়নার সামনে ঠাঁড়িয়ে চুল বাঁধার সময়ে, প্রসাধন করার সময়ে সারাক্ষণ শুধুই কেঁদেছি। মায়ের সঙ্গে আমার আনন্দের দিনগুলি, বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনা চোখের ওপর দিয়ে ছবির মত ভেসে গেল। কান্নার কোন সীমা, কোন সার্থকতা ছিল না তখন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বারান্দার চান্দাঘরের সামনে বসে সমানে কেঁদেছি। শরৎ-আকাশে তারার শোভা, পারের কাছে না জানি কার এক বেড়াল চুপ করে গুটিয়ে পড়ে আছে।

পরদিন মায়ের হাতের ফোলা আরও বেড়ে গেল। থাংগ সময়ে মোটে কিছুই খেলেন না। কমলার রস পর্যন্ত গলার ব্যথার গিলতে পারলেন না।

মা, নাওজির ব্যবস্থা মন্ত সেই মুখ ঢাকা আবার কিছুদিন পরে দেখবে? হাসি দিয়ে কথাগুলো ভেজাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনের উদ্বেগ চাপা হইল না।

শান্তরবে মা বললেন—দৈনিক কাজের ভাৱে তোমার শরীরপাত হজে। আমার জন্তে নার্সের ব্যবস্থা কর। বুঝলাম তাঁর নিজের চেয়েও আমার চিন্তা বেশী এবং এতে আরও বেশী করে মন খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরের খানিক পরে নাওজি ডাক্তার মিয়াকে এবং এক নার্স সঙ্গে নিয়ে এল। বৃদ্ধ ডাক্তার সাধারণতঃ হাসিঠাট্টা করতে ভালবাসেন, কিন্তু এখন রিতায় বাক্যব্যয় না করে সোজা রোগীর ঘকে ঢুকে পরীক্ষা শুরু করলেন। কাজ শেষ করে নিজের মনেই বললেন, বেশ কাহিল হয়েছেন। বলে একটা কপূরের ইনজেকশন দিলেন।

প্রলাপের ঘোরে মা প্রশ্ন করলেন—ডাক্তারবাবু! আপনার থাকবার জায়গা আছে?

নাগাওকাতে ঘেতে হবে আমার জন্তে চিন্তা করবেন না। আপাততঃ পরের কথা ছেড়ে নিজের বিষয় একটু ভাবুন, যা ভাল

লাগে বেশী বেশী করে থান। পুষ্কির খাবার খেলে সেয়ে গুটা শক্ত হবে না। আমার নাম রেখে গেলাম, প্রয়োজন মত এর সেবা নিতে থিখা করবেন না।

মায়ের বিহানার উদ্বেগে জোরে জোরে কথাগুলি বলে ইশারায় নাওজিকে কাছে ডাকলেন। নাওজি নিজেই কটক পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেল। যখন সে ফিরে এসে, তার মুখ দেখে বুঝলাম, সে কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা নিশ্চেষ্টে খাবার খর ছেড়ে বোগীর ঘরে এলাম।

আর কি কোন আশাই নেই, উনি কি বললেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে বিকৃত হাসিতে নাওজির ঠোঁট কেঁপে উঠল—এ আর সহ হয় না; আগের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবুর মত আর হু-একদিনের বেশী নয়। বলতে বলতে ওর চোখ দু'টি জলে ভরে এল।

আমি বললাম,—সবাইকে টেলিগ্রাম করা দরকার বোধ হয়। আশ্চর্য্য। কেমন করে যেন নিজের ওপর দখল ফিরে এসেছে।

ওয়াদামামার সঙ্গে কথা হল, উনি বললেন—মামাদের বর্তমান অবস্থার এতবড় আয়োজন করা সম্ভব নয়। ধর যদি মাহুত্বজন এসে উপস্থিত হয়—আমাদের এটুকু বাড়িতে তাঁদের টাই দেবে কোথায়? এছাড়া ভাল হোটেলপত্তর কিছুই নেই এখানে। তাঁর কথার ভাবে বুঝলাম আমাদের পরিবারের মহামহারখীদের নিমন্ত্রণ, করার কথা আমাদের ভাবা উচিত নয়। ওয়াদামামা শীগগিরই আসছেন। কিন্তু উনি চিরকালই এত কুণশ যে ওঁর কাছে কোন সাহায্য আশা করা যায় না। গত রাতের মত অমন দুঃসময়েও উনি মারের অন্তরের কথা তুলে গিয়ে আমার মর্মান্তিক এক বক্তৃতা শোনালেন। হুনিয়ার ইতিহাসে এমন দুর্ভাগ্য কোথাও নেই, যেখানে রূপের বক্তৃতার অজ্ঞান আলোর সন্ধান পেয়েছে। এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ, মার কথা তো ছেড়েই দিলাম। শুঁকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন থেকে আমার যদি না-ও হয়, তোমার তো তাঁর ওপরই ভরসা করতে হবে।



ককণা না, বয় ভিক্কে করে খাব। বোনটি আমার, তোমাকেই
ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে।

আমি—তোমার জল ভরে এল—আমার হাবার জায়গা আছে।

বিরে করবে? ঠিক হয়ে গেছে?

না।

স্বাধীন জেনানা? চাকরী করবে? হাসিও না বাপু!

না, চাকরী নয়, বিবাহ করব।

কী? অদ্ভুত চোখে নাওজি আমার দিকে তাকাল। ঠিক
এই সময়ে নাসের গলা পেলাম—আপনাকে মা ডাকছেন।

ছুটে গিয়ে মায়ের পাশে বসলাম। মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস
করলাম—কি হয়েছে মা? মা চুপ করেই রইলেন—কিন্তু আমি
বুঝলাম কি যেন বলার চেষ্টা করছেন।

জল?

ঈশং মাথা নেড়ে মা বললেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেরই খুব আস্তে
বললেন—স্বপ্ন দেখছিলাম।

কেমন স্বপ্ন?

সাপের বিবর।

শিউরে উঠলাম আমি।

আমার বিশ্বাস, সামনে গাড়ীবারান্দার সিঁড়িতে লাল ডোরাকাটা
সাপিনী এসেছে। দেখতো গিয়ে। উঠে পাঁড়াতে গিয়ে টের পেলাম
আমার সারা দেহ হিম হয়ে গেছে। বারান্দা অবধি গিয়ে কাচের
দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকালাম। সিঁড়ির ওপর নিশ্চিন্ত দেহ
এলিয়ে শরতের সূর্য্যকে উপভোগ করছে এক সাপিনী। আমার
মাথা কিম্বিকিম করে উঠল।

তোমার আমি চিনি। শেষ তোমার বা দেখেছি, তার চেয়ে
তুমি বড় হয়েছ, বড়ো হয়েছ, কিন্তু তুমি সেই ডিম্বের মা, বাবের
আমি একদিন পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিলাম। তোমার প্রতিশোধ তো
আমার উপর দিয়ে নিলে, এবার তুমি দুঃ হও।

সাপিনীর ওপর দৃষ্টিবদ্ধ করে আমি মনে মনে এই প্রার্থনা
করলাম, কিন্তু তার এতটুকু চাকল্য দেখা গেল না। কেন জানি না,
নাসের চোখে পড়ে এটা আমার ইচ্ছে ছিল না। সেইজন্য অনাবৃত্তক
জোরে মাটিতে পা ঠুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেঁচিয়ে বললাম—মা,
মা এখানে তো কোন সাপ দেখছি না। ও তোমার ভুল স্বপ্ন। আবার
সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণে নড়েচড়ে সাপটা চলে যাচ্ছে।

আর কোন আশা নেই, কোন আশাই না। সাপটা নজরে
পড়ার পর থেকে আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। আমি
জানতাম বাবার মৃত্যুর সময় একটা কালসাপ বিছানার পাশে
দেখা গিয়েছিল, আমি নিজেরই বাগানের সমস্ত গাছে সাপ জড়িয়ে
থাকতে দেখেছি।

মনে হল মা বিছানার উঠে বসার শক্তিকুঁড়ু হারিয়ে ফেলেছেন
এক সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন। আমি নাসকে মায়ের
সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। খাবার তাঁর গলা দিয়ে প্রায় নাসকে
না। সাপটা চোখে দেখার পর সমস্ত উত্তেজনা কেমন যেন
গলে গিয়ে স্বস্তি বোধ হ'ল। মুখের অন্ধকার গহবরে তলিয়ে
গিয়ে শান্তি পেলাম। আমার একমাত্র কাজ, এখন মায়ের পাশে
বসে বসে সবর কাটানো।

পরদিন সারাক্ষণ মায়ের পাশে বোনা নিয়ে বসে রইলাম।
দেলাই বা বোনায় আমার বেষীর ভাগ লোকের চেয়ে ভাড়াভাড়া
হাত চলে, কিন্তু খুব ভাল কিছু একটা করতে পারি না।
মা আমার সর্ব্বস্বই বোনার মধ্যে কাঁচা-কাজের জায়গাগুলি দেখিয়ে
দিতেন। সেদিন বোনটা আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু
সারাদিন এভাবে মায়ের পাশে বসে কাটানোর তাঁর মনে কোন সন্দেহ
না হয়; সেই জন্য উলের বাস্তব নিয়ে আড় হয়ে বসে বুনতে লাগলাম।
যেন দুনিয়ায় এ ছাড়া আমার কোন চিন্তাই নেই।

মা আমার হাতের দিকে চেয়ে রইলেন—তোমার নিজের মোকা
—না? মনে রেখো লম্বার দিকে আটটা করে না বাড়ালে পরায়
সময়ে আঁট লাগবে।

ছেলেবেলায় মা হাজার সাহায্য করলেও কিছুতেই আমি ঠিক
বুনতে পারতাম না। আজও সেই বকম বোনা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি,
কিন্তু এর পর আর কোন দিনও মা আমার ভুল ধরিয়ে দেবেন না
মনে হ'তেই বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। চোখের জলে
বোনা দায় হ'ল। মা'কে এভাবে তেরে থাকতে দেখে মনেই হচ্ছিল
না যে, তাঁর শরীরে কোন কষ্ট আছে। সকাল থেকে কিছুই খাননি
আজ, সারা দিন থেকে থেকে শুধু গজ (Gauze) কাপড় চায়ে ভুবিয়ে
তাঁর গোট দুটি ভিজিয়ে দিচ্ছিলাম। বাই হোক, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিল
এবং মাঝে মাঝে শান্ত গলার কথা বলছিলেন, খবর কাগজে সন্ধানের
একটা ছবি দেখেছিলাম, আর একবার দেখি ছবিখানা।

কাগজের ঐ আংলটা মায়ের মুখের ওপর তুলে দরলাম।

বুড়ো হয়ে গেছেন।

না, ছবিটা ভাল ওঠেনি। সেদিন অল্প একখানা ছবিতে দেখলাম,
দ্রিবি হাসিখুশি তরুণ চেহারা। বোধ হয় আজকাল আগের তুলনায়
ভালই আছেন।

কেন?

তিনি তো এখন যুক্ত, স্বাধীন।

করণ হেসে মা বললেন—কীদমে চাইলেও আজকাল আমার কাঁচা
আসে না।

হঠাৎ মনে হ'ল এখন মায়ের খুশি হবার পালা এসেছে।
শোকের প্রভাবে নিমজ্জিত মুখের অস্পষ্ট সোনালী ঝিলমিলির মত
এই মুখের অসুখভূতি। সকল মুখের বন্ধন অতিক্রম করে এই যে
ক্ষীণ আলোর আভাস, এই তো সুখ। আমাদের সন্ধান, আমাদের
মা জননী, এমন কি আমি নিজে পর্য্যন্ত এই মুখের পরশ
পেয়ে বস।

শরতের প্রভাত শান্ত, স্থির। সূর্যালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শে
মনোরম উদ্ভাস শোভা। বোনা নাবিরে রেখে দূরে উজ্জল সন্ধ্যার
দিকে চোখ রেখে বললাম—মা, এতদিন আমি সঙ্গারের বিষয় কিছুই
জানতাম না। আরও অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঘরের
কোণে নাস একটা 'ডেন ইনজেকশন' তৈরী করছিল, পাছে তার
কানে যায় এই ভেবে লজ্জার কথার মাঝে চুপ করে গেলাম। আমার
কথার খেঁই ধরে স্মিতহাস্তে মা বললেন—তুমি যে বললে 'এতদিন',
তার মানে এখন তুমি লসারকে চিনেছ?

আমার মুখখানা অসন্তব লাল হয়ে উঠল। আমি কিন্তু আজও
চিনি না—বলে মা অন্তরিক্তে মুখ কেমালেন।

আমিও বুঝি না, জানি না কে বোঝে? সময়ের মনে সময় বয়ে যায়, আশ্রয় ছেলেমানুষ থেকে যাই। কিছুই বুঝি না আমরা।

বাঁচতে আমার হবেই, বলতে পারেন ছেলেমানুষী, তবু সত্য প্রাণে একে মেনে নেওয়াও শক্ত। এখন থেকে দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হবে। মনে হ'ল বীরা সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে, শোকের ভিতর দিয়ে কান্নার সঙ্গে বিবাদ না করে, কাউকে বুঝা না করে, প্রস্তাৱনা না করে জীবন বাপন করে গেছেন—মা তাদেরই শেষ নিদর্শন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এমন লোকের ঠাই হবে না। মৃত্যুপথবাহিনী সুলক্ষণের প্রতীক, কিন্তু বেঁচে থাকা, টিকে থাকা এ ব্যাপারগুলো ক্রমশঃ দূরত্ব হ'য়ে উঠছে। মনে পড়ে গেল গর্ভবর্তী সপ্তাহীকে একবার মাটিতে গর্ভ খুঁড়তে দেখেছিলাম। আমি মাটিতে শুয়ে সেইভাবে শরীরটাকে গুটিয়ে নিলাম। কিন্তু এমন কিছু আছে যার কাছে আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব। বলতে পারি আমি নীচাশয় তবুও আমার বাঁচতেই হবে, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য দুনিয়াতে টিকে থাকতেই হবে। এখন যখন স্পষ্ট বুললাম, মায়ের আঁখি ফুরিয়েছে, আমার মন থেকে প্রেম, ভাবপ্রবর্তা বাস্পের মত উবে গেল, মনে হল দিন দিন আমি স্বার্থপর, অন্যায় হয়ে উঠছি।

দুপুরের পরে আমি মায়ের চোঁট ভিজিয়ে দিছি, এমন সময় ফটকের কাছে একটা গাড়ীর শব্দ পেলাম। ওরাদামামা ও মামীমা এসেছেন টোকিও থেকে। মামা সোজা রোগীর ঘরে ঢুকে রোগীর পাশে বসলেন। মা রুমাল দিয়ে মুখের নীচের দিকটা ঢেকে মায়ের মুখের ওপর চোখ রেখে কীভাবে লাগলেন কিন্তু চোখে এক কঁোটা জলও এল না। মাকে দেখে আমার পুতুল বলে মনে হল।

নাওজি কোথায়? কিছুক্ষণ পরে আমার জিজ্ঞেস করলেন। আমি দোতলায় গিয়ে দেখি নাওজি সোফায় শুয়ে বই পড়ছে।

মা তোমার ডাকছেন,—বললাম আমি।

কিন্তু? আবার সেই ভয়াবহ শোকের দৃশ্য! হে বীরহৃদয়া, ক্রীণ অমৃত্তিসম্পন্ন নারী, ধৈর্য ধরে তোমার কর্তব্য পালন করে, আমাদের মত তাপিত ব্যক্তি বাদের প্রশ্ন চার, চকু না চার তাদের পক্ষে মায়ের পাশে বসে থাকা অসম্ভব। জামা গায়ে দিয়ে আমার সঙ্গে নীচে নেমে এল।

হুই ভাই বোনে গিয়ে মায়ের হুপাশে বসলাম। হঠাৎ চান্বরের নীচ থেকে হাত বের করে প্রথমে নাওজি, পরে আমার দিকে নির্দেশ করে অম্লরোধের ভরীতে জোড়হাতে মামার দিকে তাকালেন।

উদার ভাবে বাড় নেড়ে মামা সাধনা দিলেন—হ্যাঁ, বুকেছি, আমি বুকেছি।

এই শেষ কথাটি বলে পরম নিশ্চিন্তভাবে হাত ছুটি চান্বরের ভেতর টেনে নিয়ে চোখ বুঁজলেন। আমি কঁাদছিলাম, নাওজিও

চোখ নিচু করে কঁোপাচ্ছিল। ডাক্তার মিয়াকে এসেই একটা ইনজেকশন দিলেন। মামাকে দেখে মা ধরই নিলেন, তাঁর আর দেবী করে লাভ নেই। মুখে বললেন ডাক্তার বাবু, দয়া করে আমার ভবভ্রমণা ঈগুগির শেষ করুন। ডাক্তারের সঙ্গে মামার একবার চোখাচোখি হ'ল—দুজনের মধ্যে কান্নার চোখই শুকনো ছিল না।

খাবার ঘরে গিয়ে বা হোক একটু খাবার ব্যবস্থা করলাম। টোকিও থেকে মামা কিছু শ্রাণ্ডউইচ এনেছিলেন—মা'কে দেখিয়ে বাসিশের পাশে রেখে দিলাম—বিড়বিড় করে মা বললেন—তোমার ওপর দিয়ে যা বন্ধি চলেছে।

চীনাঘরে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। মামা-মামীর টোকিওতে কি যেন কাজ ছিল, তাঁদের কির বেতেই হল। মামা আমার হাতে খামে করে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। স্থির হ'ল তাঁরা ডাক্তারের সঙ্গেই ফিরবেন। ডাক্তার মিয়াকে ইতিমধ্যে নার্সকে পরবর্তী চিকিৎসার কথা বুঝিয়ে গিচ্ছিলেন। ঘরে নেওয়া গেল ইনজেকশনের গুণে মা আরও চার পাঁচদিন বেঁচে থাকবেন। এখন পর্যন্ত তাঁর পুরো জ্ঞান ছিল, হাটটাও বিশেষ জখম হয়নি।

সবাইকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মায়ের পাশে কির এলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে মায়ের মুখে সর্কলাই কেমন যেন দরদ ফুটে উঠত—তোমার ওপর দিয়ে খুব বড় কাপটি চলেছে। ফিসফিস করে আমার বললেন। মুখখানা উত্তেজনার বলমল করছে। মনে করলাম মামাকে দেখে খুশি হয়েছেন বুঝি!

এর পর মা আর কথা কননি। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শান্ত শরতের গোহুলি লগ্নে নার্স তাঁর নাড়ী দেখল; নাওজি, আমি, মায়ের হুই সন্তান আমরাও দেখলাম। জাপানের শেষ সম্রাট মহিলা আমাদের হৃদয়ী মা শেষ নিশ্বাস ভাগ করলেন।

তাঁর অপরূপ মুখখানা মৃত্যুর করাল স্পর্শ বিকৃত করতে সাহস করেনি। বাবার মৃত্যুর পর দেখেছিলাম মৃত্যুর পর হঠাৎই তাঁর মুখখানা অন্তরকম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মায়ের মুখখানা জীবিত কালের মতই সুলক্ষণ রয়ে গেল। কেবল তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হ'ল, কিন্তু তাও এত শান্ত ভাবে গেল যে, আমরা টেরই পেলাম না। আগের দিনই মুখের ফোলাটা নেমে গিয়েছিল, এখন তাঁর গাল দুটি মোমের মত মৃদু দেখাচ্ছে।

চোঁট দুটি যেন ঈষৎ হাসিতে স্ফূর্তিত হয়ে আছে। জীবিত কালের চরেও এখন অনেক বেশী লাভ্যময়ী দেখাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল জননী মেরীর সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

শান্ত্রাশাসন রইল মাথার তর্কে মিছে নাইকো কল
বলরে ঐ ঠাঙিয়ে জাহাজ বেরিয়ে পড় বহুদল।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাণজলি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

বীণুখুট ও জাতিভেদ

মাতৃবিয়োগের ব্যক্তিগত বেদনা যখন আমি শৈশব, তখন আমার চারিদিক ঘিরে দুঃখ বেদনার অন্ত নেই। সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ছুড়ে নিগৃহীত ভারতীয়ের বেদনা। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আবার আরম্ভ হবে বলে মনে হচ্ছে। সেই শোক দুঃখ ক্ষণে খুটরাজ্য সম্বন্ধে এক নতুন ভাবনার আমার চিত্ত আচ্ছন্ন হোলো, মনে হোলো খুটের মূর্তি স্পষ্টতর ভাবে আমার চেতনের সামনে কেন ফুটে উঠেছে। আমি পিতৃদেবকে লিখলাম যে এখানকার সংগ্রাম শেষ হলেই আমি ইংলণ্ড হয়ে ফিরব। আমার এই কাজকে তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে সমর্থন করেছিলেন, তাঁর ও আমার মধ্যে মনের এমন নিবিড় সংযোগ বহু বৎসরের মধ্যে হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি জিনিষ আমার কাছে স্পষ্ট হোলো। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুচরবৃন্দের প্রচেষ্টার মধ্যে আমি খুটের আদর্শকে প্রত্যক্ষ করলাম, অন্ত্যায়কে তাঁরা পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে বরণ করছেন, অন্ততকে তাঁরা জয় করছেন শুভ দিয়ে। বীণুখুট প্রচার করেছিলেন বিখ্যেয় আর প্রাচীন ভারতে বৃদ্ধ চনিয়েছিলেন অনন্ত করুণার বাণী। আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে এই দুই মহামানবের শিক্ষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই চেতনার একই আদর্শে একই ধারায় এই দুই শিক্ষা মানবসাধনা ও মানবভাগ্যের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সাধু জেমসের পত্রের সেই মহান বাক্যটি বারে বারে আমার মনে বাজতে লাগল,—

প্রতিটি শুভপ্রদায় প্রতিটি মঙ্গলদান তাঁর কাছ থেকে প্রেরিত যিনি আলোকের পিতা। সকলকে যিনি সমভাবে আলো দেন, কোথাও আলো আর কোথাও ছায়া,—এ নয়।

দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুচরদের এই খুটাদর্শ প্রদোষিত আত্মদানের পাশাপাশি বৃষ্টির সমাজের এক আদর্শবিরাগী অজ্ঞার কাছাকাছি আমি প্রত্যক্ষ করলাম! প্রভু খুট বলেছেন সুনীতির পরিচয় কথায় নয়, কাজে। বুঝা বাক্যে নয়, প্রকৃত কর্মের মধ্য দিয়েই চরিত্রের প্রকাশ। আমি ভাবলাম,—এই বারী অত্যাচারিত অখুটান আর বারী অত্যাচারী খুটান,—আমার প্রভু খুট কোন্ দলে? ধর্মের পরীক্ষা কর্মের মধ্যে। যে ধর্ম শুধু বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বাক্য হতো প্রাচীনই হোক,—সেই ধর্ম বুঝা,—সেই বুঝা ধর্মকে খুট

রূচাভাষ্য অবজ্ঞা করে গেছেন। এই অন্তঃসারশূন্য ধর্মকথা-সর্বস্ব হুলাচাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়,—এই খুটের বিচার!

জেনারেল স্মিটসের সঙ্গে আলোচনার জন্তে মহাত্মা গান্ধী বৎ প্রিটোরিয়াতে অবস্থান করছিলেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম তখন গ্রীষ্মকাল,—উষ্মক আকাশের নিচে আমরা রাত্রে বিশ্রা করতাম। অনেক রাত্রে আমার প্রথম দিকে ঘুম আসত না,—অন্যে তারকাখচিত বিপুল রহস্যমণ্ডিত সীমাহীন কৃষ্ণ আকাশের দিকে স্তব্ধ-বিশ্ময়ে আমি তাকিয়ে থাকতাম। অনেক দিন আবার সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে ঘুম ভেঙে যেত। সমস্ত জগৎ তখন নিদ্রামগ্ন প্রভাত-পূর্বের সেই অচঞ্চল অন্ধকারে ঘটার পর ঘটা আঁ একলা চুপ করে বসে থাকতাম। মনে মনে ভাবতাম, কি বিরাট এই সৌরজগৎ, তার অন্ততম গ্রহ এই পৃথিবীও কতো বিরাট এই বিরাট বিশ্ব-মাঝে এই অনন্ত কালসমূহে মানুষের জীবন কতো সামান্য, কতো ক্ষণিক। যেন অন্তহীন অন্ধকারে মুহূর্তস্থান একটি শিখা। নিঃশীর্ণ জড়সমূহে চৈতন্য-তরঙ্গের পলকস্থান স্পন্দন। মানুষের জীবন সামান্য বলেই এতো মহাব্য, ত্রুণ বসে! এতো মূল্যবান! সেই জগৎই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে ঈশ্বরের কাজে ব্যস্তিত করতে হবে এবং সেই কাজের নির্ণেও প্রেরণা দেবেন পরমপ্রভু খুট।

চুক্তিদাসের যুক্তি আলোচনের উত্তেজনা চরম থেকে চরমত হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর সহায়তায় আমি প্রত্যক্ষভাবে নিজেই নিয়োজিত করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের নিভৃততর স্ব থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীর অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিত্বের রহস্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি। গান্ধীজি সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু অথচ তিনি পর খুটান। খুটধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী তাঁর চরিত্রে প্রকট, খুটের আদর্শ সমাপিত তাঁর জীবন। এই বিষয়ে আমি অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলাম। আমার বন্ধু জীহুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই পত্রাবলী মজার রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মানুষ বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু মানবাত্মা এক। বিভিন্ন ধর্মমতে বাহ্যিক পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত আপাত পার্থক্যের প্রাণ এক গুণ গভীর ঐক্য। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ইতিহাসে আদিম ঐক্য শুধু এ নয়, এই ঐক্যবোধ অন্তরুণী উপলব্ধির সকল মানুষেরই এক পরম পিতা, তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানকে সমানভাবে স্নেহ করেন, প্রতি সন্তানকে প্রেমের আকর্ষণে পরিশেষে

প্রতি ও তাঁর নিজের প্রতি টানেন। এই উপলব্ধি যদি সত্য হয়, মানুষে মানুষে ভাইএ ভাইএ ভেদভেদের স্থান কোথায়?

ঈশ্বরের ও ঈশ্বর-প্রতিভূ বীণার এই সর্বপ্রাণী কঙ্কণার সঙ্গে আমি কোনো প্রকারের সর্কারী ধর্মোদ্ভাসনাকে একমুহুর্তে গাঁথতে পারিনি। আখানাসিরাসের ঘোষণা সর্বদা আমার মুখে এসে বেধে গেছে। বারং বার খুঁটান নয়, তাদের মুক্তি নেই, অনন্ত নরকে তাদের স্থান, এই ঘোষণাকে আমি কখনো মেনে নিতে পারিনি, মেনে নিতে পারিনি যে ভারত ও চীনের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বিধর্মী বলে বর্বর, বিধর্মী বলে অন্ধকার তাদের জীবন, জীবনের অবসানে অন্ধ নরকে তাদের গতি।

খুঁটানদের এই ধরনের সর্কারী বিশ্বাসকে খুঁটানদের অমুপবৃত্ত বলে বহুদিন আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। এখন গান্ধীজিকে আমার আত্মার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে গ্রহণ করলাম, তাঁকে অকপটে ধুলে বললাম আমার সমস্তার কথা। যে ঘোষণা অখুঁটানকে নরকবাদী করে, সেই ঘোষণা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিনি, অথচ খুঁটানবাদকে হিসেবে উপাসনাক্ষেত্রে সেই ঘোষণাকে আমাকে উচ্চারণ করতে হয়, এই হৃদয় থেকে মুক্তি পাব কেমন করে? মহাত্মা গান্ধী আমার এই সমস্তার কথা অতি নিরিখভাবে ভনলেন, আমার দুর্বল অন্তরঙ্গের জন্ম তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, বরং তিনি ধৈর্য ধরবার উপদেশই দিলেন। বললেন,—এমন দিন আসবে যেদিন খুঁটসেবার উদারতর ক্ষেত্রে আপনিই আমার আহ্বান আসবে, সেদিন ধর্মীর অমুশাসনের জীর্ণ গণ্ডী আপনিই আমি অতিক্রম করতে পারব। লজনে

প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে শ্রীযুক্ত গোথেলের সঙ্গে এই একই বিষয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম, তিনিও আমাকে ঐ একই উপদেশ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমুগ্রহে আমি মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলাম। সে কাহিনী আমি পরে বিবৃত করব।

বাহিরে ঘটনার আবর্ত,—সেই সঙ্গে মনের মধ্যেও চিন্তার আবর্ত। গভীরতর অভিনিবেশের সঙ্গে আমি আমার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলাম,—ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্ন হতে লাগল আমার অন্তর্দৃষ্টি, বীণাধ্বনির স্বচ্ছ সরল স্পষ্ট বাণী আমার প্রাণে এসে বাজতে লাগল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্তাবলীর সম্মুখীন হয়ে আমার আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে আমি যেন নূতন আলোক দেখতে পেলাম। সে জাতিবিভেদ সর্কারী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বয়ং বীণা তাঁর স্পষ্ট অন্তরের কঠিন বিস্তার উচ্চারণ করেছেন, সেই জাতিভেদ ও সেই কুসংস্কার তাদের কুংসিত কুটিল প্রলম্ব নিয়ে পদে পদে আমার সম্মুখবর্তী হতে লাগল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ধর্মভীরু ফরীশীর উদাহরণস্বরূপ দৃশ্য সামারিটানকে কেন বীণা গ্রহণ করেছিলেন, কেন তিনি ফরীশীদের মনে প্রবলতর আঘাত দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে মন্তব্যবসারী ও পাণ্ডুরাও তাদের পূর্বে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে।

এই সমস্ত চিন্তা জাতিভিমান ও জাতিবৈরিতার বিরুদ্ধে আমার মনকে দৃঢ়তর করে তুলল। আমি বুঝলাম, এই অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাকে ঝাঁড়াতে হবে। এ জন্তে হয়তো আমাকে

উৎসর্গে ত্যাগ

কে. হোডের

মোদারন প্রসাধনী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১০



আমার স্বাভাবিক বিকৃতিচরণ করতে হবে, খুঁটানদের বিপক্ষে যেতে হবে, তবু পিছপাও হলে চলবে না। খুঁটের নামে বিশ্বের দরবারে আমি সভা সাক্ষ্য দেন, আগুন জনের বিমুখতার ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসার আমার উপায় নেই। খুঁটান কাকে বলে? আমি খুঁটান-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, খুঁটান-সমাজের স্বযোগে সুবিধা লাভ করে বড়ো হয়েছি, খুঁটান-গির্জায় প্রবেশের অধিকার পেয়েছি, অতএব আমি খুঁটান? খুঁটপ্রেমের একটি মাত্র পরীক্ষা। সমাজ সংসারের সমস্ত স্বার্থ নির্দেশে নির্বিণেবে অকুতোভয়ে বিবেকের নির্দেশকে যে অনুসরণ করে সেই খুঁটান। মাদ্রাসের নির্দেশকে অতিক্রম করে ঈশ্বর নির্দেশকে মাজ্জা করাই খুঁটানের এক মাত্র পরীক্ষা। এই নির্দিষ্ট পথে যে যাত্রা করে সে সমাজ বন্ধন মানেন না, সে জাতিস্বার্থ মানেন না। আত্মীয়ের আহ্বানেও সে কান পাতে না। সে চলে পরম পিতার নির্দেশে, সে শুধু তার পরমাত্মীর পরম পিতাকেই জানে। খুঁটের আপন জননী ও জাতারা খনন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন,—

‘কে আমার মাতা? কেই বা আমার ভ্রাতা? ঈশ্বরের আজ্ঞা যে পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, সেই আমার ভগিনী, সেই আমার জননী।’

আজ আমার চারি দিকে যেমন জাতিগত কুসংস্কার সেই কুসংস্কার বীতর প্রথম শিষ্যদের মনেও ছিল। তাঁরা তাঁদের স্মারাহুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বীতর ঐকী প্রেরণা একের পর একে এই সমস্ত কুসংস্কারের বাধাকে বিদূর্ণ করে এগিয়ে চলেছে। তাঁরাও তাঁদের মন থেকে এই সমস্ত কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে খুঁটের অমুবর্তী হয়েছিলেন। খুঁটই তাঁদের দেখিয়েছিলেন ভেদ-বাধাবিহীন ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথ। যারা সমাজচ্যুত, যারা অবজ্ঞাত, মন্দিরে যাদের স্থান নেই, বীত তাদের কাছ থেকে ডেকেছিলেন, কোলে স্থান দিয়েছিলেন। এই মহান দৃষ্টান্তকে মেলে দেখেছিলেন প্রভুর প্রথম অমুবর্তীরা দল। সর্ব স্বযোগ থেকে বঞ্চিত করে সমাজ বাসের দূরে পরিহার করেছে প্রভু তাদেরই ভালোবাসতেন অধিক,—এই দৃষ্টান্ত শিষ্যরা খুঁটের প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মৃত জাতিভিম্বানকে জীবী বস্তুর মতো পরিহার করার শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন, সমাজ বাসের ঘৃণা করেন, খুঁট তাদেরই প্রেম করেন, সমাজ বাসের পরিত্যাগ করে, খুঁট দেন তাদেরই আশ্রয়।

খুঁটের জীবনের মধ্য থেকে ভক্তগণ ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দেশ প্রত্যক্ষ করেন। দূরকে করো আপন, পরকে করো ভাই,—ঈশ্বরের এই মহামন্ত্রে লীক্ষিত হলেন শিষ্যগণ। এই শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা গৃহবন্ধন পরিহার করলেন, স্তম্ভ করলেন ঈশ্বর প্রেরিতের অভিধান। সমাজ তাঁদের পরিত্যাগ করল, সমাজের পক্ষী তাঁরা অতিক্রম করলেন নির্ভর আনন্দে।

পদে পদে তাঁদের কতো আতঙ্ক, কতো বিপত্তি। প্রাচীন ইহুদী শিখী মহাশয় সমাজকে ইহুদী ও যে ইহুদী নয়, অর্থাৎ ‘জৈটিল’ এই দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। সেই গণ্ডী পার হয়ে দূর দূরান্তরে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। প্রাচীন জাতিগত ও ধর্মগত কুসংস্কারকে পদে পদে তাঁরা ভাঙতে ভাঙতে চললেন। যতো তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন ততো তাঁদের আশ্রয় খুঁট সমুজ্জল হতে লাগল,

ঈশ্বরকে যে রূপে পূর্বে কখনো কল্পনা করেন নি, সেই অনিশ্চয়তার রূপ তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল,—খুঁটবাহীর যে উদার মহৎ অর্থ পূর্বে তাঁরা বুঝতে পারেনি, সেই অর্থ প্রতিভাত হোলো তাঁদের মনে। খুঁট বলেছিলেন, ‘ঈশ্বরই করুণা’। এই বাক্য শুধু আমার নিরুদ্ব উপাসনাগৃহের কঠিন দেয়ালে লিখে রাখার নয়—এই বাক্যের অমোঘ মন্ত্রে বিশ্বচরাচর মন্ত্রিত হচ্ছে, সেই মহাধ্বনির প্রতিধ্বনি তাঁদের স্বদয়ে এসে বাজতে লাগল। এই মন্ত্র প্রাচীন বিশ্বাসের বন্ধ দ্বার উন্মোচন করে দেয়, অভূতপূর্ব অকল্পনীয় সাধনার পথে মানবমনকে আহ্বান করে নিয়ে যায়।

প্রেমসাধনার এই যাত্রাপথে দু-একবার থমকে গাঁড়ালেন শিষ্যগণ, প্রতিনিবৃত্ত হলেন দু-একবার। উত্তেজনা ও চিত্ত-দৌর্বল্যের বশে পিটার একবার খুঁটভক্ত ‘জৈটিল’দের সঙ্গে আহার করতে আপত্তি করলেন। সেই পরাজয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন পল। কিন্তু পিছু তাঁরা শেষ পর্যন্ত হটলেন না, আশ্চর্য তাঁদের সাহস, আশ্চর্য তাঁদের নিষ্ঠা। তাঁদের সামনে নিত্য-সমুজ্জল খুঁটমূর্তি,—নিত্য-নূতন দ্বার খুলে নিত্য-নূতন পথ সন্ধান দিচ্ছেন প্রভু, বলিষ্ঠ হাতে ভেঙে দিচ্ছেন যুগযুগে কঠিন শৃংখল, মোচন করছেন যুগ-সঞ্চিত আবর্জনা। খুঁটের প্রেম পরমপিতার আশীর্বাদ, গোষ্ঠীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানবসমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

খুঁট সভ্যতার প্রাথমিক অভিধানের সাক্ষিপুত্র পরিচয় হোলো এই। এই অভিধান মানব-ইতিহাসের এক মহৎ প্রগতি। এই অভিধান ও সংস্কারের বিস্তৃতি এই সংগ্রাম মানবাত্মাকে এক উদার মুক্তির ঐশ্বর্য দান করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে দেখলাম, উদার সর্বমানবিক খুঁটীয় সভ্যতা জাতিভেদের আঘাতে থানু থানু হতে চলেছে। খুঁটের আদি শিষ্যদের সমস্তা ও অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি যেন উপলব্ধি করলাম। আমি বুঝলাম, আমাকেও পিছিয়ে পড়লে চলবে না, শংকা নিয়ে কুঠা নিয়ে দূরে সরে থাকলে চলবে না। খুঁটের সেই আদি শিষ্যদের মতো নির্ভর বলিষ্ঠ হতে হবে আমাকে। যুদ্ধ করতে হবে আমাকে। খুঁটের উদার আহ্বানকে যারা জাতিভেদের সংকীর্ণ কোলাহলে লুপ্ত করতে চায়, সাধু পালের মতো তাদের মুখোমুখি গাঁড়াতে হবে আমাকে।

এও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, যারা নিজেদের খুঁটান বলে না, তাদেরও অন্তরে খুঁট আছেন। তাদেরই দলে আমাকে যোগ দিতে হবে,—জাতির নামে ধর্মের নামে যারা মাদ্রাসকে বাহুরের কাছ থেকে পৃথক করে রাখে তাদের দলে আমার থাকলে চলবে না। আমি জানি আমার পক্ষেই ঈশ্বর আছেন,—যে ঈশ্বর ব্যক্তির গর্বে প্রেরণ দেননা, যে ঈশ্বর সমভাবে করুণা করেন সর্বমানবকে।

এমনি পণ যে কেবল আমি একাই করেছিলাম তা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আরো অনেক সহস্রদণ্ড ও ধর্মপ্রাণ শ্বেতকার খুঁটান আমার মতো একমত ছিলেন। মহাশা গাঙ্গী ও তাঁর পক্ষীর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগব্রত লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছিলেন,—‘এই সাধুসম্প্রতি প্রকৃত খুঁটান, আমাদের চেয়ে অনেক মহৎ খুঁটান এঁরা।’ একথা শুধু কথার কথা নয়, এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সভ্যকে তাঁরা

স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গান্ধীর অনুগামী ভারতীয় অহিংস সত্যগ্রহীদের হিন্দু বা মুসলমান ধরে ভয় হলেও তাঁদের খৃষ্টীয় জীবনাদর্শ যে কোনো খৃষ্টানের চেয়ে অনেক বড়ো। নতুন করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে করতে ও খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে এই কথা কেবলই আমার মনে বাজতে লাগল।

আমার মনের মধ্যে এক বিপ্লব আবর্তিত হতে লাগল অবিরাম। স্বদেশে 'রবিন হুড বে'-র কাছে একদিন বিশপ ওয়েষ্টকটের সঙ্গে ভ্রমণকালীন তাঁর কয়েকটি কথা বারে বারে আমার মনে পড়তে লাগল। দুজনে পাশাপাশি আমরা বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি শুরু হয়ে পাঁড়ালেন লাঠির মাধ্যম দু-হাতের ভর দিয়ে। তারপর বলে উঠলেন, মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যদি খৃষ্টকে অবলোকন করতে পারো, তবেই প্রকৃত তীকে অন্তরের মধ্যে দেখতে পাবে। তা যদি না পারো তাহলে তাঁর সর্ব-অন্তিমব্যাপী অখণ্ড অন্ত্রিয়কে স্বীকার করতে পারলে না, বুঝতে পারলে না মানবপুত্র কেন তাঁর নাম।

এই কথা ক'টি বলার পর বিশপ ওয়েষ্টকট কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে শুরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, অনুভূতির উদ্বেলনে তাঁর হৃদয় হুট চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ তাঁর পক্ষে বিরল ছিল। তাঁর সেদিনকার অশ্রু তাঁর গভীর অন্তরের অমৃতধারা।

সমস্ত ধর্মমত ও সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের উন্মেষ সত্যের স্থান। অভিজ্ঞতার অসংখ্য উন্মুক্ত দ্বারপথে সত্যের আলো এসে আমার দৃষ্টিকে অভিবিস্তৃত করতে লাগল। আমার হাইচার্চ ধ্যানধারণায় যেটুকু পরিবর্তন এ পর্যন্ত হয়েছিল, তা এই সত্যদৃষ্টির কাছে নিতান্ত সামান্যমাত্র। কিন্তু এখন থেকে সত্যের আলোকে আমার স্বাভাৱ্য। এই যাত্রাপথে কুসংস্কারের অন্ধকারের কোনো স্থান নেই। প্রত্যক্ষ বাস্তবের আঘাতে যে বিশ্বাস অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে আঁকড়ে রাখা সম্ভব নয়, সেই বিশ্বাস বহু-অভ্যন্তরীণ ধর্মবিশ্বাস হলেও।

ধর্মসংস্কারের নিগড়ে যারা আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়, তাদের মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। সংস্কারের একটা নির্দিষ্ট ও নিরাপদ গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীর মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখায় কোনো বজ্রাট নেই—নিতান্ত নিরুপদ্রব এই ব্যবস্থা। আমারও মন সহজে এই গণ্ডী পায় হতে পারেনি,—এই গণ্ডীর আকর্ষণই আমাকে হাই চার্চের অবলম্বন থেকে যুক্ত হতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু যে মন মুক্তি চায়, কোন অমুশাসন তাকে বাধা দেবে? সমাজচ্যুতির কোন ধমক তাকে ডরাবে?

বাইবেলে এক কল্পা রমণীর কাহিনী আছে, সে বিশ্বাস করেছিল যে যীশুর বজ্রাঙ্কল স্পর্শ করলেই রোগমুক্ত হবে। যীশু তাকে ড'সনা করেননি, কল্পনা করেছিলেন। যীশুর বজ্রাঙ্কল স্পর্শ সে করেছিল, আপন বিশ্বাসে রোগমুক্ত হয়েছিল। তার এই দৃঢ়বিশ্বাসের মধ্যেও ভীকার দীনতা ছিল। এই দীনতা তার বিশ্বাসকে পাণ্ডিবে সঙ্গারের সঙ্গে আবদ্ধ রেখেছিল। রোমক সেট রিয়নের অন্তরে যে বিশ্বাস ছিল তার সমকক্ষ হতে পারেনি। সে বলেছিল,—“প্রভু, ছুঁনি তুমি বসো, তোমার বাণীতেই আমার ভৃত্য হইব হব।” যীশুর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এই মহাবিশ্বাসী জন্তু লাভ করেছিল। তিনি বলেছিলেন,—“সত্যই, এমন বিশ্বাস আমি ইসরাইলে কোথাও দেখিনি।”

উন্নত করে তোমার হৃদয়—এই মহাবিশ্বাসী অর্থ কী? আমার

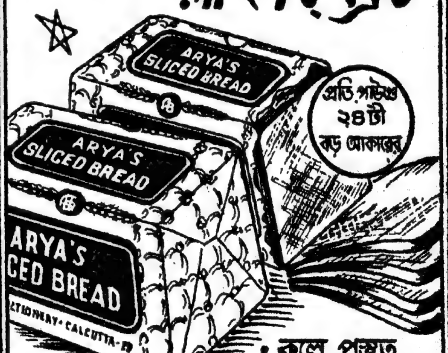
আন্তরিক দৃষ্টিকে শুধু যে স্বর্গরাজ্যের দিকে তুলতে হবে তাই নয়,—পূরমাখ্যার প্রসঙ্গ নীরবে কেমন করে সর্বমানবের অন্তরকে নিখিত করে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতি মানবাত্মাকে কল্যাণ ও শুভকর্ষের পথে পরিচালিত করে, তা লক্ষ্য করতে হবে, তবেই হবে অন্তরের উন্নয়ন।

মহাত্মা গান্ধী ও জেনারেল মার্স সক্রান্ত এই সমাচার একটি কাহিনী অতি অপরূপ! অল্প বিবরণ অবতারণা করার পূর্বে সেই কাহিনীটি এখন বলতে চাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কারাবাসে ভারতীয় নারীদের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন খ্রীযুক্তা গান্ধী। নাটালে পৌছানো মাত্র আমি জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি তখন এত অসুস্থ যে তাঁর সঙ্গে সাফল্য করা সম্ভব হয় না। যতদিন আমরা প্রিটোরিয়ার ছিলাম, কারাবাসীদের অন্তরালে তাঁর অসুস্থতায় দুশ্চিন্তা সর্বক্ষণ আমাদের মনে লেগেছিল। সরকারের সঙ্গে আলোচনা আলোচনা স্বখন শুভপথে এগিয়ে চলল, তখন অল্প বন্দীদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীযুক্তা গান্ধীও মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দিনে দিনে তাঁর সেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল।

এটিকে অবিলম্বে প্রিটোরিয়া পরিত্যাগ করা তখন আমাদের

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



• কলে প্রস্তুত
• ফ্রীজে স্টোকা
• মেসিনে প্যাক
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সফল বস্তু করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী
কলিকতা - ২৯

পক্ষে সম্ভব নয়। বিরোধের সম্পূর্ণ মীমাংসা তখনো হয়নি,—কয়েকটি প্রশ্ন তখনো রয়ে গেছে,—যে কোনো যুদ্ধের সংকট সব ব্যবস্থা ভেঙে পড়া বিচ্ছিন্ন নয়। ধীরে ধীরে সব প্রশ্নের মীমাংসা হোলো, বাকি রইল শুধু চুক্তিপত্রের জেনারাল মাটসের একটি স্বাক্ষর। এদিকে জেনারেল মাটস তখন দেশের এক আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে ভ্রাম্যক বাস্তব। তাঁর এই স্বাক্ষরটি আদায় করা গাফীরা কাছে তারবার্তা এল,—তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যা। আমি গাফীরাজিকে অমরোষ করলাম,—কালবিলম্ব না করে তিনি স্ত্রীর কাছে চলে বান, চুক্তিপত্রে সই আমি যথাসময়ে করিয়ে নেব। কিন্তু আমার কথায় তিনি কর্পপাত করলেন না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জাতীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবার মানুষ তিনি নন। কর্তব্যনিষ্ঠার তিনি প্রকৃতির মতো অটল, তাঁকে টলানো অসাধ্য। আমার পক্ষে, তাঁর তখনকার বিপুল মর্যাদা আমি আমার নিজের মনে অনুভব করতে পেরেছিলাম, এইটুকু মাত্র।

দৈনিক রাত্রি কিছুতেই আমার চোখে ঘুম আসছিল না। মধ্যরাত্রি বখন পার হয়ে গেল তখন হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এল। আগামী কাল প্রত্যুষে উঠেই জেনারাল মাটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সইটা আদায় করার চেষ্টা করি না কেন? আগামী দিনের প্রথম কর্তব্য মনে মনে স্থির করে নিয়ে আমি শান্তিতে চোখ বুজলাম।

পরদিন প্রভাতে ঠিক ছ'টা নাগাদ আমি ইউনিয়ন বিজিন্সে পৌঁছলাম। আমি জানতাম যে এই ধর্মঘট আন্দোলন দমনের জন্ত জেনারাল মাটস প্রতিদিন অতি ভোরে পরিভ্রমণে বার হয়ে বান। ঠিক সাতটার সময় তিনি উপস্থিত হলেন এবং আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে মর্মাহত হলেন। যুদ্ধে তাঁর গভীর মানবতাবোধ জাগ্রত হোলো। আমার কাছ থেকে চুক্তিপত্রটি তিনি দেখতে চাইলেন। চুক্তিপত্রের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্ত পরবর্তীগুলো ঠিক ঠিক আছে তো এর মধ্যে?

আমি বললাম—হ্যাঁ, আছে।

তৎক্ষণাৎ চুক্তিপত্রটি তিনি সই করে দিলেন। পরম আনন্দিত মনে আমি মহাশয় গাফীরা কাছে ফিরে চললাম। সেই দিনই আমরা ভারবান যাত্রা করলাম। ট্রেনে যেতে যেতে পশ্চিমঘোঁই সুস্বাদ পেলাম যে শ্রীযুক্ত গাফীরা অবস্থা একটু ভালো দিকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সবচেয়ে আমার এই রচনার পাঠকগণ মনে রাখবেন যে, এসব ঘটনা প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বকার কথা। তার পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার খৃষ্টীয় সমাজের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য নব জাগরণ ঘটেছে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ, উভয় জাতির উৎসাহী নরনারীর দল ঘনিষ্ঠতার ভাবে খৃষ্টীয়সরণে ব্রতী হয়েছেন। খৃষ্টশিষ্যদের প্রকৃত কর্তব্যবোধের আনন্দে বিভিন্ন খৃষ্টানগোষ্ঠী উদ্ভূত হচ্ছেন। অজ্ঞার্থী গ্রুপ আন্দোলন তরুণ দ্বয়ের নব উদ্গাদনার সঞ্চার করছে। এই সমস্ত দেখে মনে হয় যে, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের পাগলগণী বোধ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ধীরে ধীরে বিদূরিত হবে। খৃষ্টীয়দের আনন্দিত আনন্দে আবার ধর্মবিশ্বাসীর মনের কালো অশ্রুত হবে, সেখানে বিরাজ করবে খৃষ্টীয়দের প্রেম-প্রভ।

ভারতীয় সমতার মীমাংসার পর আমি ইলগে যাত্রা করলাম। গৌখেল তখন স্বয়ং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল আমার। তাছাড়া উদ্দেশ্য ছিল পিতৃদর্শন। আমার মাতৃবিরোধের পর আমার বাবা অত্যন্ত দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন,—এই শেষ বয়সে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন গুণছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে, আমার মা-ও তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কার্যকলাপের খবর রেখেছেন ও আমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। আমাদের মধ্যে রেহমতী জননী আর নেই,—এতো দিন পরে বাড়ি ফিরে এই শোকের মধ্যেও আত্মীয়-মিলনের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এর পর আমি ভারতবর্ষে ফিরে এলাম,—মনে মনে এই স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে কেমব্রিজ মিশনের স্থানীয় গণ্ডী আমাকে অতিক্রম করতেই হবে এবার,—নইলে উদারতর পৃথিবীর পথে কেমন করে পা বাড়াব?

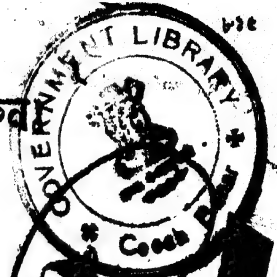
বহু বৎসর ধরে আমি এই পদক্ষেপের বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করছিলাম এবং ঈশ্বরের পথ-নির্দেশের প্রতীক্ষা করছিলাম। এই সঙ্গে এই কথা সর্বদা আমার মনে জাগত যে, ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে সংযুক্ত করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে বিদেশী সংস্থাপনের উপর নির্ভরশীলতা। জনগণের প্রয়োজনে নবতর কর্তব্যের আহ্বানের জন্তে নিজেকে স্বাধীন করতে হবে। পৃথিবীর অজ্ঞাত স্থানে যেখানে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা রয়েছে, সে সমস্ত স্থানে আমাকে যেতে হবে ও ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে,—এ সবচেয়ে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম। অতএব মিশনের বন্ধন আর আমার ভবিষ্যৎকে বেঁধে রাখতে পারবে না। যদি যীশুর পথে একান্ত ভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারি তাহলে নোঙরের বন্ধন তাগ করে হস্তর সমুদ্রে ভাঙতে হবে জীবনতরী।

কেবলমাত্র ভাড়াবাড়ি ও তাঁদের পরিচালক অ্যালানট ন্যাটাই বুঝছিলেন যে ঈশ্বর নবকর্মপথে আমাকে আহ্বান করেছেন। অতএব এই ভাড়াবাড়ি থেকে আমি বখন বার হয়ে এলাম তখন তাঁদের সঙ্গে সম্প্রীতিচ্যুতির কোনো কারণ ঘটল না। এর পূর্বে আমি অর্ধে উৎসাহে সঙ্গে এমন অনেক কাজ করেছি যাতে বিশপ ও অ্যালানট নিতান্ত বিরক্ত হয়েছেন। আমার অনেক ব্যবহার তাঁদের পক্ষে সহ্য করা শক্ত হয়েছে, তবু আমার প্রতি অন্তরের অকুপণ দাক্ষিণ্যের কখনো হ্রাস হয়নি, গভীর প্রেমামৃত্তি দিয়ে তাঁরা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষের নাড়ীতে তখন নবীন জীবন-স্পন্দন, প্রাচীন সমাজে জেগেছে বন্ধন-মোচনের সাড়া। খৃষ্টীয় বিশ্বাসেরও নতুন পরীক্ষার প্রয়োজন তখন সমাগত, খৃষ্টীয় সমাজের নতুন পথে যাত্রা করার দিন। আমার পক্ষে আর বিলম্ব করার উপায় ছিল না, বিলম্বের কল মর্মান্তিক হোতো আমার পক্ষে।

সুশীল স্নেহের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াই হোলো আমার পক্ষে সব চেয়ে শক্ত। তিনি ছিলেন আমার সহোদর ভ্রাতার অধিক। তাঁর দেখে তখন এক মর্মান্তিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, যে ব্যাধি দিনে দিনে তাঁর জীবনীশক্তিকে গ্রাস করছে। তাঁর এই ব্যাধির কথা

আবার আশ্চর্য্যজনক স্বস্থ্যবোধ করুন



ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ
টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তির নিয়মিত এটি
নিজের ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।
ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর
উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের
সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্ম বাড়তি
শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও
বৃক্ লেপ্তা থামায়। রোগমুক্তির পর হতস্বাস্থ্য দ্রুত
পুনরুদ্ধারের জন্ম চিকিৎসকেরা অমুমোদন করেন।



এখন চুরি-নিরোধক কাপ
এবং নুতন লাল সেবেলমুক্ত
বোতলে পাওয়া যায়।

একচে লাল মোড়ক বন্ধ
করিয়া বেওয়া হইয়াছে।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

করুন কত নিজে স্বস্থ্য হন

অবশ্য তখন আমি জানতাম না। তিনি নিজেকে জানতেন এই কালরোগের কথা, কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অপরিণীত ছিল তাঁর বিবাহাৰ্থতা। তাঁর নিজের প্রয়োজনে একদিনের জন্তেও তাঁর কাছে আমাকে ধরে রাখতে তিনি চাননি।

আমার জীবনের এই পরম পরিবর্তন কী ভাবে এল তা বোঝাতে এখানে কিছুনের একটি ঘটনা বিবৃত করা দরকার।

ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে আমার দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্ত শিখার মতো নিতাই উজ্জ্বল হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ভারতীয় সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। মহৎ তাঁর রচনাবলী তেমনি মহান তাঁর জীবন। দিল্লীতে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে চাকুস পরিচয়ের সুযোগ আমি পাইনি, কেন না দিল্লী থেকে কলিকাতা অনেক দূর। দূর থেকে তাঁর কথা আমি উইলি শিয়ার্সনের মুখে অনেক শুনেছিলাম। উইলি আগে বঙ্গ প্রবেশে ছিল ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এসেছিল। গভীর জ্ঞান ও শ্রেয় সহকারে উইলি আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা বলত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার উৎসাহী বাসনা আমার ছিল। সেই বাসনা চরিতার্থ হোলো ভারতবর্ষে নয়,—লণ্ডনে।

১৯১২ সালের একটি চমৎকার গ্রীষ্মসন্ধ্যা। হ্যাম্পট্রেড হীথের কাছে তাঁর গৃহে রসেনষ্টাইন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন লণ্ডনে। তিনি রসেনষ্টাইনের গৃহে আসছেন। ডবলু বিয়েটস-ও আসবেন। 'গীতাঞ্জলি' নামক রবীন্দ্রনাথের এক নূতন পাণ্ডুলিপি কবিতাবলী পাঠ করা হবে।

সেদিন কবিকে আমি প্রথম দেখলাম, তাঁর কাব্যসুখ পাণ করলাম ভারতের অন্তর-গভীরে যে মহান বিশ্বাসভূতি নিহিত, সেই সংস্কৃতির হৃদয় নিবিড় মাধুর্যের পরিচয় আমি আমার স্তব্ধ অন্তরের মধ্যে অনুভব করলাম। কবি তখনো লণ্ডনে অপরিচিত, তাছাড়া তিনি তখন অসুস্থ। র্যেটস যখন গীতাঞ্জলি আবৃত্তি করছিলেন কবি তখন তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় ও অপরিচিতের ভীড়া নিয়ে প্রায় সকলের দৃষ্টির অন্তরালে এক কোণে সরে বসেছিলেন। আমি যখন শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম, তখন আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আমার সে মনোভাব কথা দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যের জন্ত মৌখিক ধ্বনিবাদ জ্ঞাপন আমার পক্ষে সম্ভব হোলো না। কবিও বৃষ্টি আপন অল্পভূতি দিয়ে আমার অন্তরের অল্পভূতি উপলব্ধি করলেন।

সেদিন রাতে হ্যাম্পট্রেড হীথে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুরে বেড়ালাম, শুধু ভাবতে লাগলাম, আজ সন্ধ্যায় একা আমি দেখলাম, একা একা আমি শুনেলাম,—এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক কী? বাহিরে রাত্রির অন্ধকার,—কিন্তু আমার অন্তর আকাশ যেন এক আশ্চর্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

সেই দিনই রাতে শয্যা গ্রহণের আগে একটি বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হলাম। কবি যদি অমৃত্যু সেন তাহলে তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে হীন নেব। দিল্লীর বিদেশী হলে তাঁর ভারতবর্ষে কিছুতেই আমি চিনতে পারব না। সেই কালের পটভূমিকা এই বিচিত্র মহাদেশ নিবিড় ভাবে আমার

একটা কথা শুনে আমার আনন্দের শেষ রইল না যে উইলি শিয়ার্সনও এই একই বাসনা কবির কাছে নিবেদন করেছেন এবং কবি তাঁতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু আমার পক্ষে অবিলম্বে এমনি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না; কেন না তখনো আমি মিশনের কর্তব্য থেকে মুক্ত হইনি। কিন্তু মনে আশা রইল। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দিনগুলির বেদনা এই আশার আনন্দে লাঘব হোলো।

ভারত-আশ্রায় অন্তর্মিহিত সৌন্দর্যরূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে কেবলই আমি চাইছিলাম। এই অথবা রূপকে কখনো বা বৃষ্টি দৃষ্টির বন্ধনে আমি বেঁধেছি, আবার চকিতে তা আমাকে এড়িয়ে গেছে। কখনো রা আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত ভারতবর্ষকে প্রত্যাক্ষ করেছি পথের মাথুরের মুখে,—সেই মুখ আবার হারিয়েছি মুহূর্ত পরে। দিল্লীতে বসে ভারতবর্ষকে পুরোপুরি চিনতে আমি পারিনি। এখানে থাকতে শুধু বিদ্রোহ করে করেই আমার দিন কেটেছে,—সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার সর্কোপতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিদেশী মিশনারীর কর্মধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদেশী মিশনারী আমি হতে চাইনি, আমি চেয়েছি ভারতের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে আমার জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলতে। এই ভারতভূমিতে বসে যদি আমার পরমপ্রভু বীতকে প্রকৃত মানবপুত্র রূপে অন্তরে পেতে চাই, তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গে এক ণীপ এক আত্মা আমাকে হতে হবে,—বিদেশী বলে দূর থাকলে চলবে না।

দিন যতোই যেতে লাগল ততোই পুরাতন ধারার প্রতি বিদ্রোহভাব আমার মনে গভীর হতে লাগল। কেন না, আমি দিনে দিনে লক্ষ্য করতে লাগলাম যে পুরাতন ধারার দিন ফুরিয়ে আসছে। অহংকার আর আভিজাত্যের প্রাচীরে আর্দ্রেপৃষ্ঠে ফাটল ধরেছে। রক্ত ছারে বাজছে নবযুগের বলিষ্ঠ আঘাত। বাতাসে নব-জীবনের উড়। বন্দী বিহঙ্গ মাটিতে ডানা ঝাপটাতো আর চায় না,—উন্মুক্ত উদার নীলাকাশে সে মুক্তপাখি বিস্তার করছে চায়। ভারতের নবযুগের এই আন্দোলনে আমারও স্থংপিও স্পন্দিত হচ্ছে, আমারও রেহমান ছুটে বার হতে চাইছে। দিল্লীতে বসে বসে অনেক শিক্ষানবিশী করেছি,—এবার আমি মুক্তি চাই। আর কোনো বন্ধনে আমি বাঁধা পড়ব না।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্ত গোথেলের সহসা অপ্রত্যাশিত নির্দেশ যদি না আসত তাহলে আমি আরো আগেই শান্তিনিকেতনে যোগ দিতাম। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিনা আদ্যাসে কেম্ব্রিজ মিশন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হোলো। ১৯১৪ সালে ইষ্টারের সময় আমি দিল্লী পরিত্যাগ করলাম।

কবি তাঁর উদার রূপের মহত্ত্ব দিয়ে আমাকে তাঁর আশ্রমে গ্রহণ করলেন। আমার ষ্টুডেন্ট ধর্মবাজকবৃত্তির কোনো প্রতিবন্ধক আশ্রম থেকে আমি পেলাম না। আমি আমার বিশপকে জ্ঞানলাম যে, শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে আমি প্রতি রবিবার বর্জমানের এক গির্জায় গিয়ে বাজনা করব। সুশীল যখন বালক ছিলেন, তখন সুশীল পিতা শিয়ারীমোহন রায় বর্জমানের এই গির্জায় ধর্মবাজক ছিলেন।

ট্রিনিটির রবিবার এল। প্রভাতী প্রার্থনা সভায় আধ্যাত্মসিয়ান

ক্রীড় আমাকেই পড়তে হবে। কেন না, এ গির্জার আমিই একমাত্র ধর্মবাহক। বার্য খুঁটান নয়, তাদের অনন্ত নরকের অভিসম্পাত বাণী নিজস্বাথে উচ্চারণ করতে হবে আমাকে। আমি তখন 'সবোমাত্র শান্তিনিকেতনে এসেছি, এখানকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ও অখুঁটান বন্ধুজনের অক্লপণ প্রেমে আমার মন বিভোর হয়ে রয়েছে। আজকের আন্তর্জাতিক ধর্মবাহকের পরীক্ষায় কেমন করে উত্তরী হব? কোন মুখে অভিসম্পাত দেব অখুঁটান মানবপুত্রদের? আমি শেষ পর্যন্ত যাক্সনার ঐ অংশটি সম্পূর্ণ বার দিলাম। কিন্তু এতেও আমার বিবেক প্রবোধ মানস না। মনে হোলো, আমি চুরি করেছি, নিতান্ত কাপুরুষের মতো স্তম্ভে আত্ম-হুলনা করেছি মাত্র।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে যখনই কবির নিষাপ মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, তখনই উপলব্ধি করলাম যে আমার জীবন অসহের বন্ধনে জড়িত হয়ে রয়েছে, এ বন্ধন থেকে আত্ম মুক্তি চাই, কবি আমার চোখের দিকে উজ্জ্বল স্বচ্ছদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি যেন মহাবিচারের দিনে বীজবৃষ্টির দৃষ্টি। তাঁর সেই পবিত্র দৃষ্টির প্রতি আমি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে পারলাম না, চোখ নিচু করে অকপটে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বললাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, সত্যের সঙ্গে আর প্রবঞ্চনা করব না, এই মুহূর্ত থেকে সত্যের পথ থেকে মুহূর্তের জন্তেও ভ্রষ্ট হব না।

কবি প্রথমটা খুবই চিন্তিত ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজনার কোনো কিছু যেন না করে বসি, সেই উপদেশই তিনি আমাকে দিলেন। কিন্তু মিথ্যার শেষ সীমান্তে এসে আমি পৌঁছেছি। এই সীমান্ত রেখার উপর ঝাঁড়িয়ে বহু বৎসর আমি যুদ্ধ করেছি, যুদ্ধ করেছি নিজের সঙ্গে, আপন মনের ষিধা-সংশয়ের সঙ্গে। এইবার আর যুদ্ধ নয়। শুধু শেষ পরিক্ষেপট ফেলতে হবে, পার হতে হবে গভী। আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি এইবার।

হুঁখানি চিঠি লেখা দরকার, সেদিনই লিখে পাঠিয়ে দিলাম। একটি চিঠি লিখলাম বিশপকে, তাঁকে জানালাম কেন আমার পক্ষে

আর বর্তমান গির্জার ধর্মবাহকবৃত্তি করা সম্ভব নয়। অপর চিঠিট জামার পিতাকে।

ভয় ছিল, আমার চিঠি পড়ে পিতৃদেব যে আঘাত-পাবেন তা তাঁর দুর্বল হৃদয় সহ করতে পারবে কি না। চিন্তিত মনে তাঁর উত্তরের প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু স্তবের বিবর, আমার সবচেয়ে কোনো প্রকার হুশিঙ্কা তিনি প্রকাশ করলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে বা কিছু আমি করি, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।

এর পর থেকে কোনো বিশপের অধীনে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মবাহক-বৃত্তি আর আমি কখনো গ্রহণ করিনি। তবে দেশে বিদেশে যেখানেই আমি গিয়েছি, সর্বদা অ্যাংলিকান খুঁটান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমি সংযোগ রেখেছি। খুঁটান সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে আমি কোনো কোনো গির্জায় ধর্মালোচনা করেছি ও ধর্ম-আচরণে বোপ দিয়েছি। এই কাজে আমি খুঁটান সমাজের কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর গণ্ডীকে স্বীকার করিনি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাস আমার মনে আছে যে ঈশ্বর যে কাজের জগৎ আমাকে প্রস্তুত করেছেন ও যে কাজ আমার প্রতি নির্দিষ্ট করেছেন, সে কাজ পুরোহিতের নয়, পরিব্রাজক ও প্রচারকের। অনেক বৃথা ভ্রমণের পর তিনি আমাকে সত্য পথে টেনে এনেছেন, এই শেষহীন পথের নিরুদ্ধে যাত্রার আমার পথিক আজ্ঞাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

প্রচলিত ধর্মের অজ্ঞাত নিয়মকানুন সবচেয়ে আমার সংশয় ছিল, সে সব আলোচনা বন্ধন-মোচনের পর অবাস্তব। এর পর বতো দিন কেটেছে, আমার স্বত্বিবোধও ততো বেড়েছে। মুহূর্তের জন্তেও পুরানো অবস্থা ও গণ্ডির মধ্যে ফিরে যাবার বাসনা আমার মনে জাগেনি। যে জীবন আমি বাপন করেছি তা অসম্ভব হতো, যে কর্তব্যপথে আমি চলেছি সেই পথ কখনো আমি খুঁজে পেতাম না, যদি না গোষ্ঠীর গণ্ডী থেকে আমি মুক্তি পেতাম। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

হুলনা

(চীনা কবি Ho Chi Fang-এর কবিতার অনুবাদ)

হুলনা!

হলনা, "আবার আসিবে তো?"

সোনালি ঝং-এর আবহাওয়া কুয়াশার জাল ছিঁড়ে?"

সেই তো বিকেল বেলায়

বখন মুখোমুখি বসেছিলাম

আমার চোখে ছিল নীল মস্ততা

আর ওর চোখে ছিল বনবিড়ালের মায়াতা ভিজাসা;

আন্দামানের দ্বীপ জগতে

আমরা পাখা মেলে ডাসছিলাম

তখনই তুমি প্রেতিনী মায়ামিনীর মত

বলখলিরে হেসে উঠেছিলে।

হলনা হলনা!

"আবার আসিবে তো?"

অনুবাদক : শ্রীঅমর বসু।



কৃত্রিম উপগ্রহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে সংগৃহীত তথ্য কি ভাবে পৃথিবীতে সরবরাহ করা হইবে তাহার আলোচনা করিলাম। এখন সাধারণ ভাবে কি কি তথ্য কৃত্রিম উপগ্রহ মারকং সংগ্রহ করা হইবে তাহা দেখিতে হইবে।

(১) Cosmic Rays (মহাজাগতিক রশ্মি)—পৃথিবীর চারিদিকে রহিয়াছে বায়ুসমুদ্র। মাধ্যাকর্ষণ বলে পৃথিবী এই বায়ুসমুদ্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে এবং ঐ অবস্থাতেই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য আর বায়ুবেষ্টিত পৃথিবীর মধ্যে বস্তুতপক্ষে বিরাজ করিতেছে এক মহাশূন্য। কিন্তু ‘শূন্য’ কথাটি ব্যবহার করা বোধ করি ঠিক হইল না। কারণ সূর্য দ্বিতীকাল বস্তুর ভায়ে কেবল আলো আর উত্তাপ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের মধ্যে ঘটিতেছে নানা অকৃত ঘটনা। একটি পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া আর একটি পরমাণুতে রূপান্তরিত হইতেছে, আর সেই রূপান্তরের সময় যে বিপুল শক্তি উৎসারিত হইতেছে, তাহাই সূর্যকে তাহার সৌরজগতের অধিবাসীদের তাপ ও আলোক দিবার ক্ষমতা যোগাইতেছে। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইতে পারে যে, পরমাণুর রূপান্তরকালীন যে বিপুল শক্তি উৎসারিত হয়, তাহাকে কাজে লাগাইয়াই বর্তমানকালে নিখিত হইয়াছে, পরমাণু তথা হাইড্রোজেন বোমা) পরমাণু রূপান্তরের সময়ে নানা রশ্মিকণা সূর্য হইতে নির্গত হয়। এই সকল রশ্মির কোন কোনটি পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে সূর্য ও সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহগুলির মধ্য দিয়া অতি দ্রুত গতিবেগে সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রশ্মিকণা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি আবার পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর বৃক্ক আদিয়া পৌঁছিতেছে। ইহাদেরই নাম ‘মহাজাগতিক রশ্মি’ বা Cosmic Rays. মহাজাগতিক রশ্মি হইতেছে বস্তুতপক্ষে ‘প্রোটন’ Proton (পরমাণু-কেন্দ্রকের Nucleus, প্রধানতম অংশ) ইহারা + (ve) শক্তি-বিশিষ্ট) হইতে নিঃসৃত অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রশ্মিকণা। কণাগুলির মধ্যে যেগুলি অধিকতর শক্তিশালী, কেবল তাহাবাই পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিতে সক্ষম হয়। এই রশ্মিকণাগুলির গুণাগুণ এবং শক্তির পরিমাণ সঠিক নির্ধারণ করা পৃথিবীর বৃক্ক অপেক্ষা ভূপৃষ্ঠের উর্দ্ধদেশেই অধিকতর সহজ ও সম্ভবপর। কাজেই কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি দ্বারা মহাজাগতিক রশ্মি সর্বক্ষে অধিকতর তথ্যাদ্য়সন্ধান, ইহাদের সৃষ্টি

আধিক্য এবং মানবদেহের উপর প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষে অধিক পরিমাণে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইবে।

(২) Ultraviolet Rays ও Ionosphere—সূর্য যে কেবল আলো আর উত্তাপ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সূর্য হইতে কম্পনবিশিষ্ট (High frequency) অদৃশ্য X-ray এবং Ultraviolet rays প্রকৃতি বিকিরিত হয়। এই সকল High frequency waveগুলি পৃথিবীতে পৌঁছাইবার পূর্বেই পৃথিবীর বায়ুগুণল কব্জক শোষিত (absorbed) হয়। Ultraviolet Rays এর বায়ুগুণলে এই শোষণ নানা অকৃত অকৃত ঘটনা ঘটায়, বাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Ultraviolet রশ্মি বায়ুকণাগুলিকে ইলেকট্রন ও আয়নে বিভক্ত করে। ভূপৃষ্ঠের ৩০ মাইল উর্দ্ধ হইতে আরম্ভ হয় বায়ুগুণলের এই Ionosphere কেখান থেকে কেবল ইলেকট্রন (Electron) আর আয়ন (Ion), বায়ুগুণলের এই Ionosphere পৃথিবীর উপর দিয়া বোতাম-তরঙ্গ চলাচলের বিশেষ সহায়তা করে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কাজ হইবে সূর্যালোকের মধ্যস্থ Ultraviolet বা অতিবেগুনী রশ্মি সর্বক্ষে অধিকতর জ্ঞান লাভ করা—ইহাদের আক্রমণ হইতে কি ভাবে নিজেদেরকে বাঁচান যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। U. V. রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার সর্বক্ষেও অধিক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হইবে। Ultraviolet রশ্মির গবেষণা জন্ম যে রশ্মি কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহার করা হইবে, তাহার নাম photon counters, Ionosphere এ তড়িৎ-প্রবাহের অনুসন্ধান করাও কৃত্রিম উপগ্রহের অন্যতম একটি কাজ। ইহার জন্ম Proton precession Magnetometer অথবা Nuclear Resonance Magnetometer এর ব্যবহার করা হইবে।

Proton precession Magnetometer এর গঠন প্রণালী সংক্ষেপে এইরূপ—“একটি জলপূর্ণ ছোট প্রান্তিকের পাতের মধ্যে তামার তার ডুবান থাকে। ইহার সহিত সংযুক্ত থাকে একটি programmer বাহাকে পৃথিবী হইতে প্রেরিত সংকেত অনুসারে পরিচালিত করিলে তামার তারটিকে প্রতি সেকেন্ডে পর্যায়ক্রমে একবার শক্তিসম্পন্ন ও পর ব্রহ্মর্ষে শক্তিবহীন করিয়া দেয়। যখন তারটি শক্তিসম্পন্ন অবস্থায় থাকে, তখন জল মধ্যস্থ হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকগুলি (Hydrogen nucleus অর্থাৎ Protons) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের মতন সারিবদ্ধ ভাবে ঠাঁড়ায়। শক্তিবহীন হইলে সারিবদ্ধ কেন্দ্রকগুলি স্থান পরিবর্তন করিয়া পৃথিবী চুম্বকক্ষেত্রের দিকে (Earth's magnetic field) ঢুলিতে থাকে। কেন্দ্রকের এই দোলন তামার তারের মধ্যে স্বল্পপরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহকে আরও বৃহৎ আকারে দেখাইয়া (Amplify) সাংকেতিক পরিভাষায় পৃথিবীতে যেতার যোগে প্রেরণ করা সম্ভবপর। এই সকল সংকেতবলীর দ্বারা সৃষ্টিত তথ্যবাহিনী সহিত ভূপৃষ্ঠের উপনিভাগে Magnetometer দ্বারা সংগৃহীত খবরাখবরের তুলনা করিয়া বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর চুম্বকশক্তির মাত্রা নির্ধারণ করিতেও সক্ষম হইবেন।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি হইলে এই ভাবে পৃথিবী হইতে বিভিন্ন দূর্যে অবস্থিত বস্তু উপর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি মাত্রা সর্বক্ষে জ্ঞানলাভ করা হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সঠিক তথ্য সংগ্রহ। এমন অনেক বিষয় আছে বাহা আমরা সাধারণভাবে জানিলেও সঙ্গতভাবে জানি না। যেমন আমরা Magnetic Poles, North Pole ও South Pole-এর সঠিক অবস্থান জানি না। বিভিন্ন দেশের দূরত্ব সযত্নে মেরিট্রান্সিট দ্বারা থাকিলেও উহাদের সঠিক দূরত্ব (exact distance) আমরা জানি না। কারণ পৃথিবীর বক্র উপরিভাগের Curved Surface উপর দিয়া সঠিকভাবে দূরত্ব নির্ণয় সম্ভবপর নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট গতিতে ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিবিধি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দেখিয়া ঐ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দূরত্ব জ্যামিতির সাহায্যে (Triangular measure) সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি হইলে আরও বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে। যেমন পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত হইব। পৃথিবী ও গ্রহ ও উপগ্রহের 'কন্টা' বৈশাখ মারক (Radio Photo) আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব। শুনা বাইতেছে যে, সোভিয়েট নিশ্চিত উপগ্রহটি নাকি Radio Photo সম্প্রতি উদ্দেশ্য হইতে পৃথিবীতে পাঠাইতেছে। মেরুজ্যোতি বা Aurora Borealis কার্যকারণ আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আশা করা যায় যে, কৃত্রিম উপগ্রহ এই বিষয়ে আলোকপাত করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিবে। সূর্যালোক সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য ও মধ্যাকর্ষণের তারতম্যের কারণ জানা হইবে। বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া না আসিলেও সূর্যালোক মানবসংস্কার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিত তাহাও জানা বাইবে।

বাসায়নিকেরা কাচের গবেষণা করিতে গিয়া পাইয়াছিলেন Pyrex এর সন্ধান, প্রাক্টিকের গঠন প্রণালীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আবিষ্কার করিলেন Nylonক, সেই বস্তু হরত বা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করতে গিয়া আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করিয়া বসিব বাহা দ্বাদশাভীত ভাবে সৌভাগ্যদায়ী হইবে। আর সব চাইতে বড় কথা যে কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টির দ্বারা মহাশক্তির পথ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি ভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি সম্ভব? পৃথিবী হইতে বাহিরে বাইবার প্রধান বাধা হইল মাধ্যাকর্ষণ। আমরা জানি, পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে ভূপৃষ্ঠের উপরের এক নিকটের বাবতীর বস্তুর বিপুলবেগে আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর এই মহাকর্ষণের নামই মাধ্যাকর্ষণ। এইজন্যই কোন বস্তুকে উপরে ছুঁড়িয়া দিলেও মাধ্যাকর্ষণের জন্ত পুনরায় উহা মাটির বুকে নামিয়া আসে। দেখা গিয়াছে, কোন বস্তু যদি ১০০ মাইল উপর থেকে মাটিতে পড়ে, তবে উহার পতনকালীন গতিবেগ হয় সেকেন্ডে এক মাইল (বায়ু প্রতিবন্ধকতার দ্রুত অবস্থা কিছু পরিমাণ গতি হ্রাস হইতে পারে)। বিপরীতক্রমে যদি কোন বস্তুকে সেকেন্ডে এক মাইল প্রাথমিক গতিতে উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করা যায়, তবে উহা ঠিক ১০০ মাইলই উপরে উঠিতে সক্ষম হইবে। V-2 রকেট দিয়া এ ব্যাপারটা পরীক্ষা করা গিয়াছে। এই হিসাবে কোন রকেট যদি সেকেন্ডে ৫ মাইল প্রাথমিক গতিতে উপরে উঠে তবে উহা ৪০০০ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠিতে পারিবে। কিন্তু প্রাথমিক গতির পরিমাণ যদি সেকেন্ডে ৭ মাইল করা যায়, তবে উহা মাধ্যাকর্ষণের জন্ত আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না। কেন না, পৃথিবীর

মাধ্যাকর্ষণ কোন অবস্থাতেই সেকেন্ডে ৭ মাইল অথবা তাহার অধিক কোন গতি উৎপাদনে অক্ষম। অর্থাৎ লক্ষ মাইল অথবা তদধিক উচ্চতর কোন স্থান হইতে কোন বস্তুকে পৃথিবীর উপর ফেলিলেও, উক্ত বস্তুর পতনকালীন গতিবেগ কোন অবস্থাতেই সেকেন্ডে ৭ মাইলের অধিক হয় না।

এতকালে আমরা জানিতে পারিলাম যে, প্রাথমিক গতি যদি সেকেন্ডে ৭ মাইল (অর্থাৎ ঘণ্টায় $৬০ \times ৬০ \times ৭ = ২৫২০০$ মাইল) হয়, তবে উহা মাধ্যাকর্ষণের জন্ত আর ফিরিয়া আসিবে না, পৃথিবীর মাথা কাটাইয়া চিরকালের জন্ত মহাশূন্যে চলিয়া যাইবে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবার সময়ে রকেটের গতিবেগ (প্রাথমিক) সেকেন্ডে ৭ মাইল হওয়ার প্রয়োজন নাই, কেননা, এরূপ গতিবেগে সাতার হইলে উহা আর পৃথিবীর চারিদিকে না ঘুরিয়া বহির্বিষে চলিয়া যাইতে। এতদ্ব্যতীত এরূপ প্রচণ্ড প্রাথমিক গতি উৎপাদনও একপ্রকার অসম্ভব। কেননা, প্রাথমিক গতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে, সমস্ত আলানীকে মহর্ভূমধ্যে পুড়াইয়া এক প্রচণ্ড ধাক্কা সৃষ্টির প্রয়োজন, বাহা রকেটকে একেবারে নির্দিষ্ট উচ্চতার লইয়া বাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ বিক্ষোভ তথা ধাক্কা ঘটানো এক কল্পার অসম্ভব এবং সম্ভবপর হইলেও রকেটের পক্ষে তাহা সহ করা সাধ্যাতীত। এরই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা সৃষ্টি করিলেন Three stage Rocket, বাহাতে ধাক্কাটা একেবারে না দিয়া বাত বাত, পর্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

মাধ্যাকর্ষণ ও কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন সম্বন্ধে সাধারণ একটি উদাহরণ দিতেছি। আশা করি, বিষয়টা এবার বোধগম্য হইবে। একটি ঢিলকে সূতা বাঁধিয়া উপরে ছুঁড়িয়া দিলে মাধ্যাকর্ষণ কেহু উহা পুনরায় মাটিতে পড়ে,—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু ঐ ঢিলটিকেই যখন সূতার এক প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইয়া থাকি, তখন উহা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, নীচে আর পড়ে না। কারণ জানিতে গেলে উভয়ের অবস্থার তারতম্য বৃদ্ধিতে হইবে। পূর্বের সহিত পরের অবস্থার প্রধান পার্থক্য হইল যে, বিপরীতবাহার ঢিলটি গতিতে পেরে হইয়াছে এবং উক্ত গতিই ঢিলটিকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছে। সূতা ঘুরাইবার সময় দুইটি শক্তি কার্যকরী হইতেছে—একটি কেন্দ্রাভিমুখী Centripetal অপরটি কেন্দ্রবিমুখী Centrifugal। প্রথমটির কাজ হইতেছে ঢিলটিকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখা, দ্বিতীয়টি বস্তুটিকে কেন্দ্র হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া বাঁধার চেষ্টা করিতেছে। এখন এই শক্তি দুইটি উভয়ে যদি পরস্পর সমান হয়, তবে বস্তুটি কেন্দ্রের দিকে অথবা কেন্দ্রের বিপরীত কোন দিকেই না গিয়া, কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করিয়া কেন্দ্রেরই চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।

বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মামুসারেই সূর্য পৃথিবীকে ও পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছে (All bodies attract each other) আর এই আকর্ষণকেই বলা হইতে পারে Centripetal Force. এক্ষতপক্ষে সূর্যাবাধা ঢিল যে কারণে কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরে ঠিক সেই কারণেই পৃথিবীও ও চন্দ্র বধাক্রমে সূর্য এবং পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। তবে একটা কথা, গতিবেগ ও আকর্ষণের মধ্যে থাকা চাই সামঞ্জস্য। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরে, কেননা সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর গতিবেগের মধ্যে

সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলেও চাই মাধ্যাকর্ষণ ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া।

কৃত্রিম উপগ্রহ তৈয়ারী করিবার সময় সাধারণতঃ তিনটি নিয়ম পালন করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইহার গতিবেগ হওয়া চাই সেকেন্ডে ৪২ মাইল (সোলিডেট উপগ্রহের গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় ৬ মাইল।) দ্বিতীয়তঃ ইহাকে পৃথিবীর ঘন বায়ুমন্ডলের উপরে থাকিতে হইবে। কারণ গতিবেগ বায়ুমন্ডর দ্বারা ব্যাহত হইলে ইহা ক্রমশঃ গতিহীন হইয়া নীচে পৃথিবীর দিকে পড়িবে এবং পতনকালে পৃথিবীর ঘন বায়ুমন্ডলের সহিত সংঘর্ষে উদ্ভাপিণ্ডের মতন জলিয়া উঠিবে। তৃতীয় এবং শেষ সর্ব হইতেছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহটিকে তথাকথিত যে কোন একটি Great Circle বা 'বৃহৎ বৃত্তে' ঘুরিতে হইবে। Great Circle কথাটির অর্থ হয়ত অনেকের কাছে বোধগম্য না হইতেও পারে। মনে করা যাক, একটি ময়রার গোলাকার বল। এখন যদি ইহাকে ছুরি দিয়া লম্বা অথবা আড়াআড়ি, যেভাবেই হউক না কেন খণ্ড খণ্ড করা যায়, তবে ঐ খণ্ডগুলির প্রত্যেকটির আকারই বৃত্তাকার হইবে। এখন ঐ বৃত্তাকার খণ্ডগুলির মধ্যে যে খণ্ডটি পূর্বোক্ত বলের মধ্য অর্ধাংশ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কাটা হইবে, তাহাই সর্বাঙ্গীকৃত বৃত্তাকার হইবে। এই বৃত্তের খণ্ডটির যে কোন অংশকেই Great Circle বলা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ স্থলন করিবার সময়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহা যেন Great Circle অর্ধাংশ পৃথিবীর কেন্দ্রের উপর দিয়া পরিকল্পিত বৃহৎ বৃত্তে ঘূরে। এই ঘূর্ণন পূর্ব-পশ্চিম অথবা উত্তর-দক্ষিণ যে কোন দিকেই সম্ভব। তবে পূর্ব-পশ্চিমই কৃত্রিম উপগ্রহ স্থলন অধিকতর সুবিধাজনক, কেননা পৃথিবীর আক্ষিকগতি পশ্চিম হইতে পূর্বে। কাজেই পৃথিবীর গতির তালে তাল রাখিয়া ঘুরিলে জ্বালানী খরচের পরিমাণটা কিছু কম হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থলনের সর্ব অর্ধাংশ Conditionsগুলির কথা একদল আলোচনা করিলাম। এখন দেখিতে হইবে, কি ভাবে উপরোক্ত সর্বগুলি পালন করা সম্ভব। সাধারণতঃ এ ব্যাপারটি সম্ভবপর হয় রকেটের সহায়তায়। রকেটের মূল কথা বৃত্তিতে হইলে হাউই বাজীর দৃষ্টান্ত দিতে হয়। হাউই বাজীতে যখন আগুন দেওয়া হয়, তখন উহার নিম্নদিক হইতে নির্গত গ্যাস যে বিপুল উদ্ভটচাপের সৃষ্টি করে তাহাই হাউই বাজীকে উর্ধ্বে উঠিতে সহায়তা করে। রকেটের পটনপ্রাণী মূলগতভাবে অস্বল্প। তবে পার্থক্য এই যে, রকেট বড় আর হাউই বাজী ছোট। সাধারণ রকেটের সঙ্গে, কৃত্রিম উপগ্রহ স্থলন করিবার জন্য যে রকেট ব্যবহার করা হয় তাহার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তুত, ইহাকে একটি রকেট না বলিয়া "রকেট সমষ্টি" বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজীতে ইহাদের নাম 'Three Stage Rocket'.

এই বিশেষ ধরনের রকেটের মধ্যে থাকিবে তিনটি স্বতন্ত্র অংশ, মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ। বাহ্যিক প্রত্যেকটিই এক একটি স্বল্পসম্পূর্ণ রকেট। কৃত্রিম উপগ্রহটি থাকিবে মস্তক-রকেটে। সমুদ্রতীর হইতে বাজা করাই সুবিধাজনক, কেন না পরে যখন রকেটের লেজ ও দেহকাণ্ড একে একে খসিয়া পড়িবে, তখন জলের উপর পড়িলেই জ্বল হয়। রকেট যখন ছাড়া হয়, তখন বর্ণকোষা বিদ্যায় চমকের মতন আলোর কলকণি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না।

কারণ কিছু কৃষ্ণবায়ু পূর্বেই সেকেন্ডে ৭০০০ ফুট গতিতে উহা উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহাদের গতিবেগ খুব একটা বেশী না হইলেও গতিবেগ ক্রমশঃ সেকেন্ডে ৫০ ফুট করিয়া বাড়িতে থাকে। ২০ সেকেন্ড পরে রকেটকে দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতন। এক মিনিট পরে ইহা ১২০০০ ফুট উঠিতে সক্ষম হয়। এই সময় কিন্তু রকেট আর খাড়াভাবে (straight) উঠিতে সক্ষম হইবে না, একটু আড়ভাবে উঠিবে। ১মি: ১৫ সেকেন্ড পরে রকেটের লেজের অংশ খসিয়া পড়িবে। খসিয়া পড়া অংশ ইহার সহিত পূর্বে হইতে সংলগ্ন সোহার প্যারাবলোয়েট করিয়া রকেট ছুঁড়িবার স্থান হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে পৃথিবীর বৃক বীরে বীরে নামিয়া আসিবে। তবে 'বেগবল' বা Momentum এর জন্য খসিয়া পড়া অংশ প্রথম প্রথম কিছুটা উপরে উঠিবে (চলন্ত বাস হইতে নামিবার সময় আমরা যেমন বাসের গতিবেগের সঙ্গে সমতা রাখবার জন্য খানিকটা এগিয়ে যাই) লেজ খসিয়া পড়িবার পর রকেটের দেহভার শতকরা ৭৫ভাগ কমিয়া যায়। দ্বিতীয় রকেটের কাজ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়। গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়া হয় সেকেন্ডে ৩ মাইল। আরও এক মিনিট পনেরো সেকেন্ড পরে প্রায় ৪৫ মাইল উর্ধ্বে থাকাকালীন দেহকাণ্ডও খসিয়া পড়িয়া যায় এবং রকেট ছুঁড়িবার স্থান হইতে আনুমানিক ১০০ মাইল দূরে আসিয়া পড়ে। লেজ ও দেহকাণ্ডের গুরুভার হইতে মুক্ত হইয়া মস্তক-রকেট, বাহ্যিক জ্বালানী তখনও পর্যন্ত একবিন্দুও খরচ হয় নাই, অসম্ভব দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতে থাকে, মাটি হইতে বাজা করিবার প্রায় ৪ মিনিট পরে তৃতীয় রকেটের জ্বালানীর দহনক্রিয়া (Fuel consumption) বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় উহা প্রক্ষেপকের (Projectile) মতন ছুটয়া বাইবে। গতিবেগ ইতিমধ্যেই সেকেন্ডে ৪২ মাইল হইয়াছে। এইবার কৃত্রিম উপগ্রহ সমেত মস্তক-রকেটটি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমকেন্দ্রিক কক্ষপথে অর্ধাংশ Great circle এ আসিয়া পৌঁছায়। আনুমানিক ৪৫ মিনিট পরে যখন উহা পৃথিবীকে প্রায় অর্ধ প্রদক্ষিণ করিয়াছে তখন উহার গতিপথ পুরাপুরি 'বৃহৎ বৃত্তের' বা Great circle অন্তর্গত হয়। এর পর থেকেই ইহা ঘুরিতে থাকে পৃথিবীর চারিদিকে ঠিক একটি ছোট চাঁদের মতন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। কৃত্রিম উপগ্রহটি যে বৃত্তাকার কক্ষপথেই ঘুরিবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতগত ইহার ডিবাঁকার কক্ষপথে (Elliptical Orbit) গমন করাই অধিকতর স্বাভাবিক। তবে এক্ষেত্রেও কক্ষপথটি পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়া পরিকল্পিত সমতলের (Plane passing through the centre) উপর দিয়া বাইবে। কক্ষপথের আকার দ্ব্যুতঃ নির্ভর করে ব্রহ্মকের রকেট কর্তৃক উপগ্রহটিকে নিক্ষেপনের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর।

রশ্মিরা যে উপগ্রহটিকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ডিবাঁকার কক্ষপথে বিশ্বব্রহ্মার সহিত ৬৬° কোণ করিয়া ঘুরিতেছে। ৬৬° কোণ করার সুবিধা হইতেছে যে একদিকে মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সকল অংশ হইতেই কোন না কোন সময়ে উপগ্রহটিকে দেখা সম্ভবপর হইবে। কারণ কক্ষপথটি বরাবর একই সমতলে থাকিবে (in the same plane), না। পৃথিবীর অক্ষের অক্ষের সহিত বিশ্বব্রহ্মার

অক্ষের মাধ্যাকর্ষণের ভারত্বের দ্বারা কক্ষপথটি পশ্চিম হইতে পূর্বে সরিয়া আসিতেছে (Precessional Motion)। কক্ষপথটির এই ভাবে সরিয়া আসার দরুণই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে উপগ্রহটিকে দেখা সম্ভবপর হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষপথ ডিম্বাকৃতি হইলেও ক্রমে ক্রমে ইহা বৃত্তাকারে রূপান্তরিত হইতেছে। ইহার কারণ এই—কৃত্রিম উপগ্রহটি ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘূরিবার সময়ে একবার পৃথিবীর সর্বাংশে নিকটে (Perigee) ও একবার সর্বাংশে দূরে (Apogee) চলিয়া যাইতেছে। যখন সবচেয়ে কাছে থাকে তখন পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ সর্বাধিক এবং দূরে চলিয়া গেলে আকর্ষণের মাত্রা হ্রাস পায়। অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের Uniformity বা সমতা থাকে না। পৃথিবীর নিকটে থাকিবার সময়ে উপগ্রহটির শক্তি কিছু পরিমাণ ক্ষয় হইতেছে। এই ভাবে কক্ষপথটি ক্রমে বৃত্তাকার হইয়া ছোট হইয়া (shrink) যাইবে।

একটা মজার কথা এই যে, একটি উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে গিয়া আমরা দুইটি সৃষ্টি করিয়া বলিব। বস্তুতপক্ষে রাশিয়া যে কৃত্রিম উপগ্রহটি ছাড়িয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারটাই ঘটয়াছে। কেন?

আগেই বলিয়াছি যে, কেবল মস্তক-রকেটের মধ্যেই থাকিবে কৃত্রিম উপগ্রহটি। মস্তক-রকেটটি যখন যথানির্দিষ্ট গতিবেগ ও গতিপথে আসিয়া পড়িবে, তখন ব্যতিক্রম কক্ষকুলতায় কৃত্রিম উপগ্রহটি মস্তক-রকেট হইতে নিষ্কৃতি হইবে। কিন্তু মস্তক-রকেটটির অবস্থা কি হইবে? উহা নিশ্চয়ই আর নীচে পড়িবে না। কেননা কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মস্তক-রকেটের অবস্থাগত কোন পার্থক্য নাই। কাজেই দুইটিই অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহটি একটু আগে ও মস্তক-রকেটটি তাহার পিছু পিছু পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।

রাশিয়া যে কৃত্রিম উপগ্রহটি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধ সাধারণের কৌতূহল হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, ইহা কি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে, না অনন্তকাল ধরিয়া চাঁদের মতন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে? কৃত্রিম উপগ্রহটির যে পৃথিবীতে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই—এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে যে, উপগ্রহটির দ্রুত পৃথিবী হইতে সব সময়ে সমান নয়। যখন পৃথিবী হইতে সর্বাংশে দূরে থাকিতেছে, তখনকার দ্রুত ৫৬০ মাইল, আর সর্বাংশে নিকটে থাকাকালীন দ্রুতের পরিমাণ মাত্র ১৫০ মাইল। দূরে থাকিবার সময়ে পৃথিবীর উদ্ভবিত বায়ুস্তর তথা মাধ্যাকর্ষণ, কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিবেগ ও

গতিপথের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও, নিকটে থাকিবার সময়ে উহার প্রভাব উপেক্ষীয় নয়। বায়ুস্তরের সহিত অল্পবিস্তর সর্ঘর্ষ friction এবং মাধ্যাকর্ষণের অর্জন আচরণ, কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিবেগ ধীরে ধীরে হ্রাস করিতে থাকিবে। উহার ডিম্বাকার কক্ষপথটি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইয়া বৃত্তাকারে পরিবর্তিত হইবে। কক্ষপথটি ক্ষুদ্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহটিকে অধিকতর ঘন বায়ুস্তরের সর্ঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে। আর সেই সর্ঘর্ষের দ্বারা সৃষ্টি হইবে উত্তাপের, যে উত্তাপ কৃত্রিম উপগ্রহটি উদ্ভাপিণ্ডের মতন জলিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

এ ব্যাপারটা কবে ঘটিবে, তাহা সঠিকভাবে বর্তমানে বলা সম্ভব নয়। কেহ বলিতেছেন, ইহার আবৃদ্ধাল এক মাস, আবার কাহারও মতে ইহা ২০ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে। বস্তুতপক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহটির আবৃদ্ধাল নির্ভর করিতেছে অজ্ঞাত বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এবং কৃত্রিম উপগ্রহটির উপর মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণের উপর। কাজেই উহা কত দিন বাৎসরিক ঘুরিতে থাকিবে—তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। আর একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহটির বেতার-সংকেত-প্রেরণ-ক্ষমতা কতকাল থাকিবে? এ বিষয়েও আগে কিছু বলিয়াছি। যদি কৃত্রিম উপগ্রহের বেতার চালানের শক্তি ব্যাটারী হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তবে ইহা ১৫ দিন, কি খুব বেশী এক মাস অবধি বেতার সংকেত পাঠাইতে সক্ষম হইবে, আর যদি শূন্য হইতে শক্তি আহরণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে উহার বেতার-সংকেত-প্রেরণ-ক্ষমতা বহুকাল বর্তমান থাকিবে। তবে একথাও ঠিক যে, সংকেত প্রেরণ-ক্ষমতা না থাকিলেও, কৃত্রিম উপগ্রহটি অনেক দিন ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকিতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়ন আনিয়াছে। মানুষ এখন দেখিতেছে, গত দিনেও বাহা ছিল স্বপ্ন, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। বাহা ছিল অসম্ভব, তাহা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকের মানুষ তাই চম্পসোকে তথা মঙ্গলগ্রহে বাইবার কথা ভাবিতেছে। এ বাগ্ম্যকে আজ আর অবিদ্বান বলিয়া মনে হইতেছে না। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক M. Khlebztzevitch-এর মতে মানুষ আগামী ৫ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যেই চাঁদে পৌঁছাইতে পারিবে। তখনকার দিনের মাইকেল অঙ্গভব বঙ্গভাষ্যের Simile খুঁজিতে নিশ্চয়ই “বায়ন হইয়া কে চাহে ঘরিতে চাঁদে?”—এই দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইবেন না।

—জীতেন্দ্রনাথ দাস।

তুমি এসো

কুমারী সুনীতা মিত্র

আমার মনের নিভৃত ভোমার, যে পাই,
যাকে বিনি-বিনি তপ-বৃক্ষ ভনি কখন—
ভীবন আমার হল যে হৃৎকর, অলঙ্কার
চাঁদা-শাওলা দিয়ে ঢলেছে বন মোর প্রাণে।

কীভাবে আমার তুমি এসে হেসে বাও রসে,
আমি কীবি আর কথা-কুল সঁচো মাল্য রাখি
ভগ্নো জীব, এসো, অদৃষ্টের বাকী বাও বনে,
সর্বক হোক না-কোটা কলী-গুণটি।

ভাবি এক, হয় আর

ঐদিলীপকুমার রায়

নয়

যুগ্মক মোটারে চড়েই পল্লবকে জড়িয়ে ধরল। বলল : না পল !
আজ কী খুশি যে হয়েছে—জানো না।

কেন ?

আর কেন। ঐ গিদো—গার ভালো—কিন্তু কী যে দান্তিক।
ধরাকে সরা জান করে। ওকে যে খ করে দিয়েছে—সাবাস !
ব্রাভো ! Ausgezeichnet ! Vive le grand chanteur !
Grazie a Dio !

পল্লব হেসে বলে : বাকি চারটে ভাবার জরখনিগুলি আর বাকি
থাকে কেন ?

যুগ্মক হেসে বলল : সত্যি এত আনন্দ আমি অনেক দিন
পাইনি। আর কী গানই গাইলে দাদা ! কাটির দিলে তানে
গমকে পর্জনে ছড়ারে ! ধন্ত যে চারখ-আবাসাডর ! আমাদের
বেশ যদি দৈবাৎ স্বাধীন হয়—মানে আমাদের জীবদশার, তবে
তোমাকে পাঠাতেই হবে আবাসাডর করে দেশের পর দেশে।

পল্লব প্রসঙ্গান্তর আনতে বলে : কিন্তু সালভিনির কাছে
এলিওনোর। আমাকে নিয়ে বাবার জন্তে এখন উঠে পড়ে লেগেছে
কেন বলতে পারো ?

পারি না ? আমি কী না পারি শুনি ? সালভিনি এলিওনোরার
প্রেমে অর্ধ-জলে।

পল্লব চমকে ওঠে : বলা কি হে ? বাট বছরের বুড়ো !

যুগ্মক বলল : এলিওনোরোও এমন কিছু কচি খুকি নয়।
চল্লিশের কিনারার।

তবু—

তবুর কী আছে এতে ? রোমান্সের আবু এদেশে আমাদের
ঢের ঢের বেশি। পঁচাত্তর বৎসরের পিতা এদেশে এখনো পঞ্চাশ
বৎসরের নববধূর পাণিগ্রহণ করতে উঠে পড়ে লেগে থাকেন এবং
প্রায়ই করে থাকেন।

পল্লব সজ্জিত হয়ে ধমকায় : কী যে কথার ছাঁদ !

যুগ্মক বলল : কিন্তু—থাক এ সব অল্লীস মধুবাক্য। তোমাকে
আমার একটা অঙ্গুরোধ আছে ভাই ! তুমি সালভিনির সঙ্গে দেখা না
করে বাঙ্গিনে কিরো না।

বাঙ্গিনে কিরব আমি—কে বললে ?

মানে—যদি কেনো।

পল্লবের মনে বিবাদ ছেয়ে আসে। একটু উল্লাসের বিস্তৃত্তর
পরেই ছেয়ে আসে বেদনার অন্ধকার।

দশ

সিঙ্গের কাছে পল্লব ইতালিয়ান গান শেখা শুরু করে দিল।
লুখাতে শেখাতে উল্লাস বেড়েই চলল। শেষে একদিন বলল :
এলিওনোরার কথা তুমি ঠেলো না ! সালভিনি মালখানেকের মধ্যে
রাসে কিরবেন—স্টাক এ গানগুলি তোমাকে শোনাতেই হবে।

পল্লব সাক্ষাৎ সিঙ্গের কাছে তিনসাহ পরে ডেবেটিভে ফির
কল্ল—বাসে সালভিনির কাছে। এর পরে হাফে হাফেই এলিওনোরার
ওকে নিয়ন্ত্রণ করত। পল্লবের সত্যিই ভালো লেগে গেল এলিওনোরার
ব্যবহার। শেষে একদিন কোঁকের মাথার আইরিনকে লিখবে না
লিখবে না করেও লিখে দিল সব কথা : কী ভাবে ওর জীবন কাটছে
রোমের আবহাওয়ায়। কোনো উত্তর এল না। ওর 'সপটিলমান'
মন আবার খাণাপ হয়ে যায়—কের ইচ্ছা হয় দেশে ফিরতে। কী হবে
মিথো ইতালিয়ান গান শিখে ? কী হবে সালভিনির সঙ্গে দেখা
করে ? ওর মনের মধ্যে কেবলই খচখচ করতে থাকে : কুহু
জলে আর সে কি না এখন অবাস্তর বিয়াকি সালভিনি এলিওনোরার
কথা ভাবছে ? গান তো ইল্লির-বিলাস নুহু বিলাস হ'তে পারে,
কিন্তু বিলাস ছাড়া আর কী ? অথচ মজা এই যে, এ-বিলাসে এখন
কই আর উল্লাসের ছিটে-কোটাও তো নেই ! একদিকে আইরিনের
কোনো খবরই নেই, অতদিকে কুহু ওকে ডাকছে দেশে ফিরতে,
অথচ ঠিক এই সময়েই কি না ও আটক পড়ল কোথাকার-কে
সালভিনির জন্তে ? বিড়ম্বনা বলে আর ক'কে ?

এমন সময়ে লসান থেকে এল আইরিনের আর এক ছবিবার্ড।
শুধু লেখা : আমরা খুব ঘরে বেড়াছি—কবে যে কোথায় থাকি
নিজেরাই জানি না। পরে লিখব। আইরিন।

কিন্তু আইরিনের হু-হুটি কাউই এই একই আশাস—পরে
লিখবে। এর মানে কী ? আইরিন কি ওকে ঘরে রাখতেই চেষ্টা
করছে ? কিবা ভুলে যেতে ? কে জানে ? স্মিয়ারচরিত্র—
আওড়ার মনকোভে। তারপরই আসে অল্পশোচনা। ছি ছি !
আইরিন তো যেমন তেমন মেয়ে নয় !

একদিন আর থাকতে না পারে যুগ্মককে বলল। যুগ্মক শুনে
ভাবিত হ'য়ে তাই তো ব'লেই চুপ।

এর সাত আট দিন বাদে আইরিনের আর এক ছবিবার্ড এল
জারমাট থেকে। এখানে চমৎকার তুঘারের দৃশ্য—ব্যস।

পল্লবের মন হুখে অভিমানে কালো হ'য়ে আসে। কুখে উঠে
ও আরো মন দিল ইতালিয়ান গান শিখতে—যাকে বলে প্রতীহিসার
সহিত।

এমন সময়ে একদিন বিকেলে হঠাৎ যুগ্মক মুখ অন্ধকার ক'রে
বলল : ভাই, মেয়াদ ফুরুল, আজই বাঙ্গিনে ফিরতে হবে।

পল্লব ওর মুখ দেখেই চমকে গেল : কী হয়েছে ?

যুগ্মক জান হেসে বলল : সে আমি বলতে পারব না।

জলায়—ঘটোখানেক বাদেই ট্রেন।

সে কি ? এত তাড়া কিসে ?

যুগ্মক হেসে বলে : আর কিসের ? আকাশের তারার জ্যোতি
পাকিয়ে তাড়ালো। আমি জ্যোতির্গর পুরুষকে না মেনেও মাঝে
মাঝে জ্যোতির্গর না মেনে পারি না।

পল্লব হঠাৎ বলল : চলো, আমিও যাই। আমার এখানে
একটুও ভালো লাগবে না তুমি চলে গেলে।

যুগ্মক বলল : না, সেটা ভালো হবে না। এলিওনোরার
তোমাকে সত্যিই নিজের ছোটভাইয়ের মতন মনে করে। তোমার
সবচে ও যে-ভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনো তোমার গৌরব কর্ণদল
লোহিত—কিন্তু সে বাই। ও তোমার সবচে অনেক কিছুই
সালভিনির লিখেছে, তিনি আর দিন পনেরর মধ্যেই আসবেন—

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি সুরের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

তোমার সম্বন্ধে উৎস্রুকাও প্রকাশ করছেন। এ-সময়ে you must not let her down বলেই একটু খেমে : তাছাড়া শ্রীমতীই যখন অজ্ঞানিতা তখন বাগিনে ফিরে শ্রীমান্ত কী করবেন তিনি ? কৃপ-কর্তন ? কিরন্তেও তো পারে।

উঃ হঃ। ও যদি সত্যিই তোমাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা থাকে তবে এ সময়ে কিছুতেই বাগিনে ফিরবে না। বলেই হেসে : ভাই, ওঁরা যখন ঘর সেন তখন কাছে আসেন যেন পোষা পায়রা। কিন্তু পরে আবার যখন উঠাও হন তখন ঈগল পাখীর মতন কোন ছায়াপথে যে বিচরণ করেন—দূরবীণ দিয়েও পাঁতা পাওয়া যায় না। বলে ওর শির্ষে হাত রেখে : কিন্তু তুমি ভেবে না—আমি ইতিমধ্যে ক্রাউ ক্রামারকে লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে ঘর-ছোঁরা সেন নি। সে বাই হোক, বাগিনে ফিরে যে কবেই হোক এরহস্ত ভেদ করব।

আর তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে—কথা দাও ?

হুহুহু হেসে বলল : জানাব বৈ কি। কেবল তার করলেই তুমি উড়ে এসে—কেমন ? মানে, যদি শ্রীমতীকে প্রেমস্থার করতে চাও।

বলে ওর স্বভাবসিদ্ধ মধুর হেসে বিদায় নিল। কেবল আজ সে হাসির উপরে একটা বিবাদের ছায়া মতন।

পল্লব ভাবে আর ভাবে : কী হ'ল ওর হঠাৎ !

এখন সময়ে এলিওনোরার মোটর এসে হাজির। সেই উর্দিশপরা সারথি ওর হাতে দিল কার্ড : পল। একবার একশি আসতে পারো কি ? এখানেই ডিনার খেও ও খাওয়ার পর রাজে খেকে বেও। লম্বীটি।

এগারো

এলিওনোরার মোটরে হুহু ক'রে চলতে চলতে পল্লবের মনে রাজ্যের দুর্ভাবনা ভিড় ক'রে আসে। এলিওনোরার সঙ্গে সম্প্রতি গানের সুখে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেও এভাবে সে ওকে ডেকে পাঠাবে এ ও ভাবতেই পারে নি। হুহুহু ওকে ভরসা দিয়েছে বটে যে পল্লবকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন ভালোবাসে—তবু—মনে হয় ফের কুহুমের কথা। কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর মনে পড়ে হুহুকের রান হাসি ও পল্লবের প্রেমের উত্তরে মাথা-নাড়া : সে আমি বলতে পারব না।

এলিওনোরা ওকে সত্যি আপন মনে করে বলেই ডেকেছে ভাবতে ভালোও লাগে—অথচ একটা কেমন যেন সঙ্কোচও আসে। কুহুমের একটি প্রায়োক্তি ওর কিরে কিরে মনে হয় : আমাদের এখানে আসা যেয়েদের মনস্তত্ত্ব জানবার জন্তে নয়—নিজেকেই তৈরি করতে—বাহুব হ'তে। বিধান অপ্রতিবন্ধ—অথচ—তবু এলিওনোরার মত মনোরমার রেহ এত সহজে পেয়ে ওর মন বুশি হ'রে ওঠে—কুহুম এসেই জীবনের কতটুকুই বা জানল ? অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে : কিন্তু জানার এমনই বা কী দরকার ?

উত্তর খুঁজে পায় না। হস্ত পেত—যদি মনের মধ্যে ওর বিবাদের ছায়া ঘনিয়ে না আসত।

এলিওনোরার স্মরণ জিয়ার মোটর এসে ঠাঁড়াতেই ওর কামেরিসেরা ১ অভিযান ক'রে ওকে নিয়ে পেল সোজা এলিওনোরার শয়নকক্ষে।

পল্লব মেডেক বৃহৎবে ফিঙ্গালা করলে : কী ব্যাপার ?

মেড ফিশ-ফিশ ক'রে বলে : Signora e ammata, ২

পল্লব এলিওনোরার ঘরে চুকেই চমকে গেল। কমনারি মুখের উপর কালো ছায়া, চোখের কোসে কালি—তাছাড়া প্রসাধন নেই ব'লে আরো যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে। শরন অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে পল্লবের হাত চেপে ধ'রে বলে : বোসো ভাই !

বিছানার পাশেই একটি কুশনওয়ালা চেয়ার ছিল, পল্লব বসল। এলিওনোরা এবার ওর দু'টি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখে চোখ বোজে।

মিনিট দুই পরে এলিওনোরা চোখ খুলে পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাসে—নামমাত্র হাসি—

ব্যাপার কি এলিওনোরা ? তোমার কামেরিসেরা বলল—অমুখ।

হ্যাঁ, এ আমার কালব্যাহি—মাথা-মোরা। একটু বোসো ভাই ! বলছি। বলতেই ডেকেছি। উঃ। ব'লে ফের চোখ বোজে।

এলিওনোরা ঘুমিয়ে পড়েছে। পল্লব পা টিপে টিপে বাইরে যায়—বাগানে। আকাশ মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়ার ওর দেহ জুড়িয়ে যায়। কেবল চিন্তার তাপ বেড়েই চলে : কী ব্যাপার ?

কামেরিসারার পুনরাবিত্তি : Favorisca Signora.... ৩

বারো

এলিওনোরা বিছানায় অর্ধশায়িতা অবস্থায় ওর হাত ধ'রে টেনে জোর ক'রে ওকে বিছানার উপরেই বসিয়ে বলে : তুমি কত কী ভাবছ হস্ত—কিন্তু আমি তোমাকে না ডেকে পারলাম না। মনের ভার একলা বইতে পারি না আর। হস্ত অস্ত্রার করলাম—হুহুহু কি সাথে আমাদের অবজ্ঞা করে—

না না, সে কি কথা ? আমি—

এলিওনোরা রান হেসে ওকে ধামিয়ে বলে : শোনো পল ! আমি তোমাকে বা বলতে ডেকেছি শুনলে তুমি এতই অবাক হবে, যে হস্ত ভাববে আমি বাড়িয়ে বলছি।

না না—

শোনো আগে, তবে 'না না' কোরো। আমি আজ এত দুর্বল বোধ করছি—যে কথা বলতেও কঠ—

তবে এখন থাক না—আমার কোনো কাজই তো নেই, একটু পরে হবে।

না পল। না ব'লে আমি আর থাকতে পারছি না—নৈলে ভাবো কি তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে জোর ক'রে বলতে চাইতাম বা—বা—এক হুহুহু ছাড়া আর কেউ জানে না ? ব'লেই ফের চোখ বোজে।

পল্লব চুপ ক'রে ওর দিকে দিকে চেয়ে ওর একটা হাতে হাত বুলায়।

এলিওনোরা একটু পরে চোখ চেয়ে বলে : হুহুহু তোমাকে মারিবার সম্বন্ধে বলেছে নিশ্চয়ই ?

কিছু বলেছে—তবে আমাকে ও মনে করে—নাশালক, তাই বলি বলেনি।

এলিওনোরা হান হাঙ্গো : না, তোমাকে ও মুখে থা বলে মনে তা ভাবে না। ও তোমাকে বেশি বলেনি কেন তখন ?

পল্লব ওর দিকে প্রব্রোহনক নেত্রে তাকায়।

এলিওনোরার হাসি আরো হান হ'রে আসে, বলে : ও তোমাকে খুব সাবধান হ'য়েই বলেছে এই জন্তে যে, বেশি বললে আমার কথাও বলতে হয়—আর সেটা ও পারে না আমার অনুমতি দনা। কিন্তু শোনো—সব কথা তুলে বুলতে পারবে—কিন্তু—ক জানে—হয়ত তুল বুলবে ? হয়ত এখনই তাবছ আবাক হ'য়ে—দনো—তারকাও কি না এমন সেটিমেটাল !

পল্লব ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে : না এলিওনোরা, ঘুমের পেশা যে তার স্বভাবকে বদলে দিতে পারে না এটুকু আমার মতন সাবালক আমি হয়েছি বিশ্বাস কোরো। কারণ—গরণ যা আমিও খেয়েছি হয়ত সুস্থক তোমাকে কিছু ব'লে থাকবে ?

আভাবে কিছু বলেছে। তবে ও ভাবি চাপা মানুষ—কাউকেই কিছু বলে না, যা ভাবে তা গোপন ক'রে এমন ভাব দেখায় যাতে লোকে ওকে তাই ভাবে যা ও নয়। তবে আমাকে ও আইরিনের দখা বেশি না বললেও রিতার কথা বলেছে বেশ ঘটা ক'রেই যার—সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—যে এক কথার সব ছেড়ে চ'লে 'বেতে পারল তি, রিতাকে আমি হিংসে করি।

হিংসে ?

হ্যাঁ, কারণ সে পেরেছিল যা আমি পারিনি—পারিনি—কারণ—কিন্তু না, বলি আগে—ভূমিকা দেখে। কেবল একটি ভঙ্গী চাই—ভূমি শুভেতে রাঙ্গি আছ তো ?

সে কি কথা এলিওনোরা ? আমার একটি দিমির সাব ছিল অনেক দিন থেকে। বুল্লক আমাকে ব'লে গেছে যে ভূমি আমাকে ছোট ভাই ব'লেই বরণ ক'রে নিয়েছে—আমি না চাইতেই—

এলিওনোরা মুহূ হাসে : দিমির একটি কথার আমার আপত্তি আছে। তিনি বলেছিলেন—যে চায় সে পায়ই। আমি বলি—যে প্রেমের ক্ষেত্রে সেই পায় না যে চায়—পায় সেই যে পেতে না চেয়ে দিতেই ছোট। ভূমি এত লোকের স্নেহ পাও এই জন্তেই—তোমার ভাষায়—ভূমি দেবার সময়ে প্রতিদানের কথা ভাবে না ব'লে। আর তাই হয়ত দিতে পারো এত সহজে। কিন্তু শোনো—কথার কথার কথা বেড়ে যাচ্ছে। গিলো কোন করেছে, সে ডিনারে আসবে। তার আসার আগেই যা বলার ব'লে শেষ করতে হবে।—তোমার হাত দাও, যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে—

পল্লব আদ্র হ'য়ে ওর ছোটো হাতই নিয়ে হাতের মধ্যে নিয়ে বলে : ভাই—বোন পাতিয়েও এমন কথা বলে ?

এলিওনোরার মুখে ফের সেই ককণ হাসি ফুটে ওঠে : এত মিষ্ট কথা কত দিন শুনিনি—মারিয়া বাবার পর। ব'লে হাত ছাড়িয়ে চোখের জল মুছে সুরু করে : শোনো তবে। মারিয়ার সব্বক বুল্লক তোমাকে হয়ত বলেছে—সে সম্পর্কে আমার বোন হ'য়েও স্বভাবে ছিল ঠিক আমার উল্টো। তার সত্যি বিশ্বাস ছিল বাইবেলে। আমি

ক্যালকেমিকোর
ক্যাম্‌টরল
মনোরম একযুক্ত ক্যাম্‌টর অয়েল
ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে
সহায়তা করে

বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি:
কলিকাতা-২২

ক্যাথলিক মাত্র নামে, সে ছিল মনে-প্রাণে। ভার্জিন মেরীর মূর্তি, এই যে দেখেছ—বসে ঘরের কোনো কাছের খোদাটোপ-পরা একটি মূর্তির মেরী-মূর্তি দেখিয়ে—এই বিব্রহটীর সামনে সে রোজ ধূপ-লীপ জ্বালাত, ভব করত নতকায় হ'য়ে সাক্ষাৎকালে।

তাই যুগ্মক বধন তাকে বলল যে, সে কোরাণ মনে মূল্যমান না হ'লে ওদের বিবাহ হ'তেই পারে না, তখন সে ভেঙে পড়ল। আমি যুগ্মকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু সে-সময়ে যুগ্মক ছিল দারুণ—বাকে বলে গৌড়া—‘বা নেই কোরাণে, তা নেই ভুবনে’ গোছের মনোভাব জানাই তো। ওদিকে মারিয়ার ঠিক তেমনি গৌড়া ক্যাথলিক, রকম হবে কোথেকে? অথচ দেখে বিবাহতার দুর্বোধ্য লীলা : এই ছুটি মাহুর বর্ষের পায়ে মনকে বলি দিলেও প্রাণকে বাগ মানাতে পারল না। কবি বলেছেন না—প্রেমের পথ মস্তন নয়? কিন্তু যাক, কথার কথার কথা বেড়ে যাচ্ছে।

যুগ্মক চলে গেল অজ্ঞানফোর্ডে দর্শন পড়তে। মারিয়া কেঁদে বলল—যাবে কনভেন্টে। আমি শুকে অনেক বৃষ্টি-সুষ্টি-ওর মন ভালো করতে ভ্রমণে বেরুলাম। আমরা যখন প্যাংলোষ্টাইনে, তখন একটি ধনী ইছবি ওর প্রেমে পড়ে পাগলের মতন হ'য়ে যায়। মারিয়া তাকে ভাগিয়ে দিল, বলল সে ক্যাথলিক। গাব্রিয়েল বলল সে খৃষ্টান হবে। মারিয়া তখন তাকে বলতে বাধ্য হ'ল, সে আর একজনকে ভালোবাসে। গাব্রিয়েল বলল : সে অপেক্ষা করবে—

তার পর সে অনেক গুঁটা-পড়া, আঙ-পিছু—শেখটা মারিয়ার মন জিকল—ওকে বিয়ে করল।

কিন্তু বিয়ে করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর ভুল ভাঙল। কেমন ক'রে—সে-সব বলার আজ সময় নেই, সে অনেক কাণ্ড—তা নিয়ে একটা বীভিষ্মত নাটক লেখা যায়। শেষে মারিয়া মনঃকণ্ঠে আত্মহত্যা করল। সে মনঃকণ্ঠে প্রবান কারণ এ নয় যে, গাব্রিয়েল লস্ট—এখান কারণ—ওর হ'ল আত্মহত্যা নিশে ও বিচারিণী হয়েচে।

চোখের জল বেশ মুছে এলিনোরার ব'লে চলল : যুগ্মক এ খবর পেয়েই ছুটে এল রোমে। ওকে সেই একবারই কানতে দেখেছি। বাক্।

তারপর ও উলাস হ'য়ে শান্তির আশার সারা যুরোপ ঘুর বেড়ালে। হ'সাত বৎসর ধ'রে। শেষে গেল রুব দেশে। সেখানে ১১১৭ সালের নভেম্বর বিন্দবের সময়ে ওর প্রাণ নিয়ে টানটানি—কারণ ও কোথায় ব'লে কেসেছিল যে কলশেভিকরা মাহুর নয়—মানব। লেনিনকে টিপ ক'রে বেসেছিলটি স্ত্রী ছুড়েছিল সে যুগ্মকে চিন্তা। কাজেই ঢেক পুলিশ ওর পিছু দেয়। ও অতিকণ্ঠে হুম্ববেলে কোনো মতে পালিয়ে আসে—একবারে কলহার ও নিঃশ্বাস। আমি ওকে আশ্রয় দিই এই জিলাতেই। বলতে ভুলেছি—আমি ইতিমধ্যে সিনেমার চুকে নার করি। যুগ্মক আবার এখানে এসে লক্ষ অল্পখ পড়ে—নিউমেনিয়া। বহু ওল্লভার ওকে আমি সারিয়ে তুলি।

ওর মনে কৃতজ্ঞতা বেশে ওর আত্মহত্যাভীর প্রতি। তাছাড়া মারিয়ার বিধি আসি। ও আমাকে *Sorella* ব'লেই ডাকত।

কিন্তু স্বপ্নর চলে তার নিজের খেদাসে—ভালো-দমকে পিছে একাকার করে। কলে বহু ধানকের মধ্যে—বুকেই পারছ—

আমরা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলাম। তারপর আবার সে কত কাণ্ড—কত গুঁটা-পড়া!—সব বলার দরকার নেই—কেল পরিণামটুকু বলি : আর মারিয়ার জন্তেই পরস্পরের কাছে এসে পল্ল সঙ্গেও মারিয়ারকেই ভুলে গেলাম ওর প্রতি হুমিবার টানে।

কিন্তু ও ভুলেও ভুলাত পারেনি। কলে ওর এল চিন্তাশ্রম। সে আর এক নাটকীয় কাণ্ড—বাক্। ও বলল : না এ হতেই পারে না—এরি নাম পাণ্ড—মারিয়ার দিকিকে আমি কিছুতেই সে-চোখে দেখতে পারি না যে-চোখে মারিয়ারকে দেখেছিলাম। আমার মাথার আকাশ ভেঙে পড়ল। তখন যুগ্মক আমাকে বোঝানো শুরু করল। আমার প্রাণ সার না দিলেও শেষে মন সার দিল—পাণ্ডের ভয়েই বলব। ক্যাথলিক সংস্কার তো। আমরা ঠিক করলাম—পরস্পরের সঙ্গে আর দেখা করব না, মারিয়ার মান রাখতে অন্তত : আরো কিছুদিন অপেক্ষা করব।

এই সময়ে সালভিনি দার্ন নংসিয়োর এক মেসো ডামার আমার অভিনয় দেখে ‘আমার জন্তে পাগল হয়ে উঠলেন। দিনের পর দিন আমাকে ফুল পাঠানো, গান শোনানো—আরো কত কী। আমি তাকে বললাম যে আমি আর একজনকে ভালোবাসি। তিনি জানতেন—ক'কে। সিনেমা-তারকারের তো ঘোরা ব'লে কিছু থাকে না—বাই করি আমরা, বটে যায় হাজার লোকের মুখে। সালভিনি বললেন : আমি একজন ভারতীয়কে বিবাহ করব এ হতেই পারে না। তাছাড়া ভয় দেখালেন—যুগ্মকে বিবাহ করলে সে আমাকে আর সিনেমায় অভিনয় করতে দেবে না। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল, কারণ যুগ্মক থিয়েটারের উপরে না হলেও—টকির উপরে ছিল হাড়ে চটা। বালিনে এক টকিতে কাজ ক'রে ওর বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়।

ওদিকে আমাদের সিনেমার ডিরেক্টর ছিলেন সালভিনির বন্ধু। তিনিও আমাকে ধরলেন এসে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মামা গিদোও একদিন আমাকে খুব ঘমকালো : সালভিনি শুধু ধনী নন—ইতালির শ্রেষ্ঠ গায়ক—বিশ্ববিখ্যাত—তা ছাড়া যুগ্মক বধন আমার মারিয়ার ওজর ভুলে সময় চেরেছে, তখন তার যুগ্ম চেরে ব'লে থাকা আমার সাজে না—আমার কি আত্মলয়ান জ্ঞান নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি—বলতে বলতে ক্রমে উঠে আমাকে দুখ পাগল কাণ্ডাকাটজ্ঞানহীন—আরো কত কী উপাখিই বে দিল—বাক্।

আমার প্রাণে খুবই রাগ হয়েছিল বৈ কি—কিন্তু রাগ পড়ে যেতে মনে হল—সত্যিই তো। তা ছাড়া যুগ্মকের সময়-চাওয়ার জন্তে আমি নিজেও খুবই যা খেয়েছিলাম—গিদো আমার সেই কাটাঘারে দিল মুনোর হিটে। আমি রোখের মাথার সালভিনির প্রস্তাবে রাজি হয়ে যুগ্মকে তার ক'রে দিলাম যে সামনের মাসে আমাদের বিয়ে।

তার পেয়েই যুগ্মক ছুটে এল—তোমাকে সঙ্গে ক'রে। বলল : করছ কী? কাকে ভালোবাসো না তাকে—আমার লক্ষ রাগ হ'ল, বললাম : আমি ক'কে ভালোবাসি না বাসি তাতে যে আমাকে ভালোবাসি তার কী? যুগ্মক হুম্বিত হ'য়ে বলল : আমি তোমাকে ভালোবাসি—কিন্তু আমার বিবাহ কারণ কি তুমি জানো না? আমি কতকণ্ঠে বললাম : সে তো আর কি হবে না? তুমি কখন কখন লম্বাইকে সে-টিউন-বলে মিজল করো—কিন্তু এ জোয়ার কী হুম্বিত বলা তো? ও তখন বীকায় করল যে আমাকে



আপনার জন্যে চিত্রতারকার মত অপূর্ব লাবণ্য

মালা সিংহা সত্যিই অপরূপ দেহলীংগের
অধিকারী। কি করে তিনি লাবণ্য এত
মোলায়েম ও হৃদয় রাখেন ?
"বিশুদ্ধ, শুভ্র লায় টয়লেট সাবানের
সাহায্যে", মালা সিংহা আপনাকে
বলছেন। চিত্রতারকারের মির এই মোলায়েম
ও হৃদয় সৌন্দর্য সাধনটির সাহায্যে।
আপনারও হৃদয় ফুটুক। যেন আপনি,
জানের সময় লায় সত্যিই আশ্চর্য্যবোধ।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকারের পৌনঃপুন্য।



দিশু হান, লিঙ্গার নিষিদ্ধ, বন্ধক প্রভৃতি।

যে ও কতখানি ভালোবাসেই নিজেই ভালো। ক'রে বুঝতে পারিনি, সে অনেক কথা।—শেষে বলল : বিবাহ সবচেয়ে আমার মতামত তুমি জানো। আমি বিশ্বাস করি বিবাহ—যদি তার প্রতিষ্ঠা হয়, প্রেমের ও প্রদ্বার ভিত্তিতে। তোমাকে আমি শুধু ভালোবাসিনি,—প্রদ্বার করতে পেরেছি। তাই আমার মন ব্যথিয়ে উঠেছে ভাবতে যে, তুমি বিবাহ করবে কারুর নামের জন্তে বা নিজের সুবিধের জন্তে। না, বার কাছে আমি এত স্বাধীন, থাকে শেষে অনিচ্ছা। সন্তোষ তোমো না যেসে পারি নি—সে হীন হ'লে যাবে আর আমি বসে দেখব? আমি বরবর ক'রে কৈদে ফেললাম, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল : এলিগনোয়া, মনগড়া নীতির আইন-কানুন মেনে তুল করেছি বার বার, কিন্তু এখন থেকে মানব না আর মনের মানা, চলব স্বপ্নের নির্দেশেই। তোমাকে আমি বিবাহ করব—হাতের লম্বী আর পায়ে ঠেলব না বৃদ্ধির বিবিবিধান মেনে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—বা গেছে, আর ফিরতে পারে না তাকে জপ ক'রে তাগাই বাড়ি, ভালো মেনে না—অতীত চারপাশ নিয়ে যে বেঁচে থাকে তার উপাধি জীবনমুখই বটে।

আমি আনন্দে অবির হ'লে সালভিনিকে একটা চিঠিতে সব কথা জানিয়ে শেষে লিখলাম : তোমার সঙ্গে আমি আর দেখা পর্বন্ত করব না—সব ক'রে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোনো না।

যা খেয়ে সালভিনি বেক্সেনে ভ্রমণে—বিশেষ ক'রে আমাকে ডুকতে। একটা চিঠিতে আমাকে শুধু লিখে পাঠালেন : তুমি রোমে আর একজনকে বিবাহ করবে এ আমি রোমে ব'সে দেখতে পারব না। মনে আমার দুঃখ হ'ল বৈ কি। কিন্তু উপায় কী? দুঃখ কিবে এসেছে—দুঃখ আমার হবে—আমি তার—এই আনন্দে আমি উজিরে উঠলাম, সালভিনির জন্তে দুঃখ এ-উজ্জ্বলতার জোয়ারে ধুয়ে মুছে ভেসে গেল।

কিন্তু বাধা এল এবার এক অচিন পথে। দুঃখ ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে বদলে গিয়েছিল। আর কেমন ক'রে ওনবে? তোমার সম্পর্কে।

পদ্মব চমকে উঠল : আমার ?

হ্যাঁ তোমার। তোমার কাছে বার্লিনে ও দিনের পর দিন স্তনত কুহুমের কথা। মুখেও তাকে হেসে উড়িয়ে দিত—শেষধর, সবুজ এই সব ব'লে। কিন্তু—এ বিবাতার আর এক বিচিত্রলীলা—মুখে ও দেশভক্তির আদর্শকে বহুই বিক্রম করে ওর মনে ততই বদিয়ে ওঠে আত্মত্যাগ—দেখতে দেখতে ও জেসে উঠল যেন এক নতুন চেতনার—নতুন বিবেকে—হয়ে উঠল অশান্ত। ওর মনে হ'ল—যে কথা পরে বলেছিল আমাকে—যে, পুরুষবাহ্য প্রমকে বরফ ক'রে সার্বক হ'তে পারে না, তার চাই একটা কবের ক্ষমতা, কিছু গ'ড়ে তোলার সুযোগ।—সম্মান দেখ : যে-আদর্শকে ও সবুজবনের পোটিয়েটালিটি ব'লে বরাবর ব্যঙ্গ-বিক্রম ক'রে এসেছে হঠাৎ সেই যেন কিবে এসে শোধ তুলল ওর বাড়ি রূপে—ওর মনে হ'ল, নিম্নক ব্যক্তিগত আনন্দ সার্বিকতার পথ দেখাতে পারে না—আত্মবিশ্বাস গুটি কাটতে না পারলে আত্ম-ব জরে মায়ুব হয়ে পড়েই পড়ে—এক পয়ম ব্যর্থতার।

বলেছি—এক কথা ও আমাকে বলে গিয়ে। কয়েকই তখন আমি জালভার না ওর অন্তর্ভবের কথা। আমি শুধু সেরভাস, ও

প্রায়ই অন্তরনয় হ'লে পড়ে। হাঙ্গেরি বটোমানাই, কিন্তু সে-হাসিতে আর বেজে ওঠে না ওর স্বভাবগত বিজ্ঞতার স্বর, শেষে আমি একদিন গুকে হ'লে পড়লাম। ও তখন বলল যে, ওর মনে একটা খিতিয়ে না গেলে কিছু বলবে না।—একদিন হঠাৎ কথার কথার বলল কুহুমের বার বার জেসে বাওয়ার কথা। পরে একদিন বলল—সে অন্তর হ'লে জেস থেকে বেরতে না বেরতে ফের জেসে গেছে। আমি ভয় পেলাম—কিন্তু সে-ভয়ের নাম সেওয়া ভায়। তাবলাম—যাক, কাজ কি পাড়াপীড়ি ক'রে—ও বলবে পরে কী ভাবছে—বলবেই—যখন কথা দিয়েছে—কারণ স্বভাবে ও সত্যবাদী।

হঠাৎ পরন্ত রাতে ও আমাকে বলল : এলিগনোয়া। জানি—তুমি কত কী ভবে দুঃখ পাচ্ছ—কিন্তু—আর একটা বৈধ ধরো—আমার মানে—যতক্ষণ আমার মন না স্থির হচ্ছে ততক্ষণ কী ক'রে বলি যা তোমাকে বলতে চাই ?

আমার মনে ফের সেই নাম-না-জানা ভয়ে ছেয়ে গেল, কিন্তু বললাম শান্ত সুরেই : আমি জানি—তোমার মন ভালো নেই। কিন্তু কী হয়েছে একটা অন্তত জাভাস দাও ? কোনো খারাপ খবর ?

ও এড়িয়ে গেল, বলল : এখনো আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি কাল সকালে তোমাকে বলব। আজ রাতে আমি আমার মনের সঙ্গে একবারে একলা মুখোমুখি হ'তে চাই। ব'লেই বেরিয়ে গেল।

এ রকম ও কখনো করে নি এর আগে। সারা রাত ফিরল না। আমার ঘুম হল না। কী হল আবার? আমাদের বিবাহ হবে মাস দুই পরে সব ঠিক—এ সময়ে আমার মাথা ঘুরে উঠল।

পরদিন সকালে ও ফিরেই বলল : আমার মন স্থির হয়েছে—আমি এদেশে আর টিকতে পারছি না—এবার দেশে ফিরতেই হবে। সময় এসেছে।

আমি চোখে জলকার দেখলাম, বললাম : সে কি ? কথা ছিল—তুমি এসেলেই থাকবে—আমাদের বিবাহ সামনে—

ও রান হেসে বলল : মায়ুব বা ভাবে তাই কি পারে ? আমি ভেবেছিলাম প্রেমের জন্তে সব পারা যায়। কিন্তু আমার চোখ খুলে গেছে। আমি দেখতে পেরেছি যে যুরোপের সভ্যতার আছে শুধু বাইরের ঢেকনাই, সে বহুই আদর্শ আদর্শ কল্পক, সত্যি বিশ্বাস করে শুধু ভোগকে। বিজ্ঞান তাকে এনে দিয়েছে এই ভোগের উপকরণ—শাস্ত্রহীন অন্তরহীন ভোগ, ভোগ, ভোগ। তাই আজ সে বিজ্ঞানের উপাসক। কিন্তু ভায়তবর্ষের বাণী এ নয়, কারণ তার বাইরের চটক না থাকলেও অন্তরে আছে এমন এক সম্পদ যা যুরোপের চোখবাঁধানো ধুমধামে নেই। তাই আমাদের দেশে এ যুগেও জন্মায় গান্ধী, শেখবকু, তিলক, অবিনাশ, কুহুমের মতন বাহুব। এরা ভোগের মোহ জয় করেছে এমন কোনো সত্যের যোগে বার দেখা গেতে যুরোপের এখন অনেক দেখি। বলতে বলতে এলিগনোয়ার কঠোর গাঠ হয়ে এল ও বলল : তাই তো কুহুম অর্থ, সেহস্ব, বিলাস, সাংসারিক প্রতিপত্তি, বড় চাকরির মোহ সব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এত সহজে। সে কোর জেনে গেছে ইয়ত তার বীণাভর হবে। এ-কেন দুঃখের সঙ্গে বদন আমি নিজের তুলনা করি তখন আমার আত্মকল্পে মন খিঁচিয়ে জ্বরে ওঠে। তাই আমি স্থির করেছি দেশে ফিরব ও দেশের কাজে যোগ দেব।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, বললাম : আর আমি ? ও
লেল : তুমি বাবে আমার সঙ্গে ভাববর্বো। আর কি ?

আমি ভুক্তিত হয়ে পানিকরণ চূর্ণ করে বইলাম, তাহপদ
বললাম : তোমার সঙ্গে বাব ভাববর্বো বরাবরের জন্তে ? ও বলল :
নয় কেন ? আমাকেও কি তুমি এ দেশে বরাবরের জন্তেই ধরে
রাখতে চাও নি ? আমার কাছে যে দাবি করতে তোমার বাধেনি
তোমার কাছে সে দাবি করতে আমার বাধবে কেন ? ব'লেই
হেসে : ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে—What is sauce for
the gander should be sauce for the goose.

আমার মাথায় কে যেন হাতুড়ি মারল। আমি বললাম :
আমাকে একটু সময় দাও ভাবতে।

এলিগনোরার চোখে জল ধ'রে এল, নিজেকে সামলে ব'লে চলল :
সেদিন—মানে কাল সারারাত ঘুমতে পারলাম না, সব ছেড়ে বেতে হবে
অচিন দেশে ! মন আমার উঠল রুখে। ওদিকে যুদ্ধকে হারাবার
কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে ওঠে টন টন ক'রে। বাক। পরদিন
মানে আজ সকালে উঠে যুদ্ধকে বললাম : তুমি দেশে ফিরে স্বদেশী
আন্দোলনে যোগ দেবে বলছ, কিন্তু আমার সেখানে টাই কোথায় ?
ও অগ্নান বদলে বলল : আমার পাশে আর কোথায় ? আমি বললাম
কিন্তু তোমার দেশবাসী ? তারা কি আমাকে সাহায্যে বরণ ক'রে
নেবে ? ও বলল ব্যঙ্গ হেসে : আদরের স্বামি তো পেয়েছে অঙ্গে,
এবার না হয় একটু মুখই বদলালে আমাদের আমারে ও ব'লে দাস্তের
কাব্য পড়তে পড়তে এত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, না হয় তার জন্তে
একটু অনাদরই সইলে। আমি বললাম : শুধু অনাদরই তো নয়
তোমারি মুখে তো শুনেছি সেদিন রিতার অবস্থা। ও বলল : তার
কী অবস্থা এত দূর থেকে কী ক'রে জানব ? কিন্তু সে ওদেশে গিয়ে
অশ্রুধী হয়েছেন যদি ধ'রেই নিই তা হ'লেও তুমিও যে অশ্রুধী হবে
এমন সিদ্ধান্ত করা চলে কি ? তা ছাড়া আমি যোগ দেব মহাস্বাক্ষর
গ্রাম-সংগঠনের কাজে, লহরে থাকব না। তুমি হবে আমার প্রধান
সহায়। আমি শিউরে উঠে বললাম : গ্রামে গ্রামে ঘুরব আমি ?
ও বলল মন্দ কি ? ছবির জন্তে কি এমন অনেক গ্রামে যাওনি যেখানে
ছবির জন্তে না হ'লে বাবার কথা ভাবতেও পারতেন না ? এবার না
হয় প্রেমের জন্তেই কিছুদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরবে, তা ছাড়া এত আঙ
পিছু ভাবলে কি কেউ ঝাঁপ দিতে পারে ?

আমার মন বিরামে কালো হ'য়ে গেল, বললাম : যুদ্ধ, তুমি
জানো না তুমি কী বলছ ! ভাবছ শুধু তোমারি কথা। কিন্তু
আমার দিকের কথাটা কি এতই তুচ্ছ যে এক কথার সব
ডিমিশন ক'রে দিতে চাও ঝাঁপ দেবার কথা ব'লে ? আমার একটা
প্রতিষ্ঠা হয়েছে এদেশে। আমি ভালোবেসেছি আমার প্রতিপক্ষকে,
সাক্ষ্যকে, শিল্পে সৃষ্টি করবার আনন্দকে। তুমি প্রেমের জন্তে
আমাকে বলছ এ সবই ছাড়তে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তা হ'লে
তুমিই বা কেন প্রেমের খাতিরে আমার কাছে থাকতে পারবে না ?
ও বলল : থাকতে পারতাম যদি এখানে কোনো কাজের মতন কাজ
থাকত কিন্তু এখানে আমি কী করব বসো ? আমি বললাম : কেন ?
আমাদের সহযোগী হবে। আমার ঈশ্বরীয় ভাববর্বো সবচেয়ে একটা

হবি করব। ও ব্যঙ্গ হেসে বলল : আমি। এককর হবি এদেশে
কয়েকটি বেরিয়েছে। ভারতীয় রাজা, সাপুড়ে, যোপ-টিক এবং
মহাত্মা গান্ধীকেও হয়ত নামতে হবে কৌশল পূর্বে আর সঁদাই নিউনে
উঠবে ভেবে—এই অধনয় কবির যে দেশের নেতা সে দেশের না
জানি কী অবস্থা ? আমি যদি থাকি এদেশে, তবে তোমাদের ধরে
মুক্তি ; কেন না আমি কিছুতেই এই মাহুকের মতন মাহুয়টিকে
তোমাদের ছবিতে অবতীর্ণ হ'তে দেব না। আমার রাগ চড়ে গেল,
বললাম : কেন ? তোমাদের দেশে নানা ছবিতে কি তিনি আসেননি
এরি মধ্যে ? ভবিষ্যতে আরো আসবেন দেখে নিও। ও বলল :
আসতে পারেন যদি তোমাদের ক্যান্টিনালিটার জাল ফেলেন। কাউকে
জীরা সাব্বানে সরোজিনী নাইছ, কাউকে মহাত্মা গান্ধী, দেখাবেন
তু জনে চরকা কাটছেন তাকমহলের সামনে, টাকার জন্তে ছবিবন্ধন
কী না করতে পারেন ? আমি রেগে বললাম : শুধুই টাকার জন্তে ?
শিল্পের আদর্শ ব'লে কি কিছুই নেই ? রূপ সৃষ্টি—ও বাবা দিয়ে বলল
রাখো রাখো। আমি আজ তিন বৎসর বালিনে একটি সিনেমাত্তেই
কাজ করছি। আদর্শ ? সিনেমার আদর্শকে যদি আদর্শ নাম দিতে
হয় তবে তেলোপোকোরো নাম দিতে হয় পারি। ছবিবন্ধনের
একমাত্র লক্ষ্য টাকা, আর তার উপায় হ'ল স্কন্দরদের নর মূর্তি,
হাব ভাব, ছলাকলা। এ দিয়ে বা সৃষ্টি করা হয় তার নাম রূপ সৃষ্টি
নয়, তার নাম কী, নাম তুমি খুব ভালো ক'রেই জানো। আমি
টেচিয়ে বললাম : এই-ই যদি তোমার ধারণা তবে আমাকে কাছে
যে'তে দিলে কেন ? ও বলল : শোনা এলিগনোরা, রাগ করো না।
আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই বলিনি, কিন্তু সিনেমার
আদর্শ আছে ব'লে এখন এই মাত্র তুমি জাঁক করলে তখন তার
নিজমূর্তির সখকে কিছু না বলে কী ক'রে চূর্ণ করে থাকি বলে—
যখন জানি যে খুব সস্তা বোন উত্তেজকরাই তার উপজীব্য—বাক
বাদ দিয়ে তোমাদের দল সিনেমার লক্ষ্য রুমহল ধ'রে পড়বেই
পড়বে ?

রাগে ক্ষোভে আমি কেঁদে ফেললাম। ও আমার কাছে এসে
অন্ততঃ হয়ে আমার হাত ধরতেই আমি ওর হাত ঠেস দিয়ে বললাম,
আর তোমাদের রাজনীতির আদর্শ—যাতে তুমি যোগ দিতে বাছ ?
তার নিজমূর্তি কী আমরা কি কেউ জানি না কি ? কুরাশে
কি তাকে আমরা চাক্ষু্য করিনি বার বার ? জাহিরিশনা, মিথ্যাচার,
কনসেনসেশন ক্যাম্প, ঘূব, গুপ্তচরবৃত্তি, নিহৃত্য, ঘূনধারাপি—
কোনটাতে বাহে আজকের সেরা রাজনীতিকদেরও ? তুমি কি নিজেই
বলশেভিকদের দানব উপাধি দাও নি ? দেখনি কি বিপ্লবী রাজনীতির
স্বর্গীয় পাল তুলে রূপ শক্তিমান্তরা চলেছেন কোন্ নরকের বন্ধরে ?
এক আখটা মহাপ্রাণ দেশভক্তের মহত্ব দেশজোড়া মিথ্যাচার ও
ঘাতকবৃত্তির গ্রানিকে মুছে দিতে পারেন না। না যুদ্ধ, হবার নয়
—আমার পথ আলো, তোমার পথ আলো।

এলিগনোরা খেমে গাঢ় কণ্ঠে বলে চলে : একথা শুনে ও চমকে
উঠল। যুধ ঢেকে পানিক চূর্ণ করে বইল। তারপরে যুধ তুলে
শাঙ্ককণ্ঠে বলল : তুমি ঠিকই বলেছ এলিগনোরা ! আর এখন
তোমাকে বলি—তোমাকে ভালোবেসেও যে তোমাকে কীর
টানতে চাইনি তার প্রধান কারণ—এই-ই, মনে জেনেছিলেন
কাজে আমার অভাবে সাহা দেই। তোমার প্রতিজ্ঞা আমি

নিজেকে অনেক ক'রে খোঁকাবার চেষ্টা করছি যে 'হুত' সিনেমার মতিগতি বললোনা যেতে পারে। কিন্তু বুধা চোঁটা! আমি তো জ্ঞান নই, তাই কেমন ক'রে অস্বীকার করব যে সিনেমার প্রধান পাশা যে-প্রবৃত্তি—বাক্য খোঁরাক দিয়ে তোমরা আজ টাকার গতিতে গমিহান—সে-প্রবৃত্তিকে বাদ দিলে সিনেমার অতিকার মতি হুতিনে আনাহায়ে শুকিয়ে হুইই হুবে অস্থিচর্মসার। লক্ষ লক্ষ লোকের সাড়াতেই তোমরা ক্রোড়পতি—আর তারা সাড়া দেয় কিসে ও কেন—বলেছি। এ অবস্থায় সিনেমার সংস্কার অসম্ভব—কেন না জল্পিল বোন উত্তরজনা বাদ দিয়ে এগুণে সিনেমার রূপস্বই হয় না, হ'তে পারে না। তাই তোমার কথাই আমি মনে নিলাম! কেবল একটি কথা বলব। তুমি যে বলেছ যে আজকের জগতে রাজনীতির অবস্থা শোচনীয়, একথা কে না স্বীকার করবে? কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে: সেটা এই যে, ভারতবর্ষে আজ সর্বপ্রথম নেমেছেন কয়েক জন সত্যিকারের মহাত্মা ধীরা রাজনীতিকে চেলে সাফেতে চাইছেন। এরা সফল হবেন কি না জানি না। তবে একথা তুমিও নিশ্চয় মানবে যে তিলক ও মহাত্মাজী রাজনীতির আদ্যাকারের মূলেই আঘাত করেছেন—সত্যকে পুরোপুরি না হ'লেও অনেকখানি মেলে। এ রকম ত্যাগী ও মহৎ আরো কয়েকজন একাজে বোঝ দিয়েছেন, যেমন দেশবন্ধু কুরুম ও আরো অনেক অজ্ঞাতনামা তরুণ মহাপ্রাণ যুবক। এদের আদর্শেই আমার মন সাড়া দিয়েছে আজ—বিশেষ ক'রে পরবের সঙ্গে সম্পর্কে এসে তার মাধ্যমে আমাদের দেশের এগুণের আদর্শবাদের মতিগতি আলা দ্বয়ের লব্ধে একটু ভিতরকার খবর পেরে। কলে আমার একটা লক্ষ্য লাভ হয়েছে এই যে, আমার চোখের ঝুলি খ'লে গেছে—আমি আমি দেখতে পেয়েছি দেশের কাজ একটা সত্যিকার আদর্শ, যেখানে সিনেমা হ'ল শুধু ইন্ড্রিবিলাস নয়, অতি নিকটত্তরে ইন্ড্রিবিলাস—অসার আমোদ-প্রমোদের লোভে পথের পাথের খোঁয়ানো। ভালোই হ'ল—এ হুত্রে তোমার সঙ্গে এবিষয়ে খোঁলাখুলি আলোচনা হ'রে। শেষে আর একটি কথা বলব: তোমার ভালোবাসাকে ভালোবাসা নাম দেওয়া চল না! এ হ'ল একটা সুবিধার ভোগের ব্যবস্থা: তুমি চাও একটি পুঙ্খ যে তোমার মন টানে অথচ তোমার তাঁবে থাকতে নারাজ নয়। তাকে তুমি সুখের বিলাসের হুই প্রচুর দেবে বৈ কি, নৈলে সে থাকবে কিসের সোভে? কিন্তু এখবরের সুখ সুবিধা যে চার তার নাম না-মরদ, ভেড়ুয়া। আমি আর হাই হই না কেন—স্বর্গের ভেড়ুয়া নই—পুঙ্খ। তাই এবার বিদায় দাও আমাকে—কেবল কোঁচ না বেখে, আর যদি পারো তো আমাকে ক্ষমা কোরো এই ভেবে যে, আমি তোমার মনে হুঃখ দিতে চেয়ে যদি নি যে সব কথা আত্মবলসাম: বলেছি—না বলে উপায় ছিল না ব'লেই—ভেলে ললে যে মিশ খায় না সে-দোষ ভেলেয়ো নয়, লসেয়ো নয়—সে দোষ—

এলিওনোরা কুখাটা শেষ করবার আগেই ভেঙে পড়ল: বালিশে হুই ভ'লে সে কী হুশিবে হুশিবে কারা।

পল্লবের হুইর অস্থি-পার আত্ম হ'লে ওঠে—ও শিঠি হাত বেখে জর্কে: এলিওনোরা—গোনা—আমি—হুইককে—

কিন্তু এর পরে হুইককে কী-ই বা বলবে?

খানিক বাদে হুই কুলে এলিওনোরা বলে: আমার সবচেয়ে হুইখ কী জানো পল? বিচ্ছেদ নয়। বিচ্ছেদ হুইখের জানি—কিন্তু প্রেম যেখানে লতা সেখানে গভীর বিচ্ছেদেরও ক্ষতিপূরণ মেলে অস্ত্রের এক অচিন উৎস থেকে। কিন্তু হুইখ বাজে সবচেয়ে—বখশ দেখি যে সত্যি তেমন ভালোবাসতে পারিনি, যদিও মনকে বুরিয়েছি উট্টো কথা।

হুইককে সত্যি ভালোবাসোনি?

এলিওনোরা কল্প ভাবে মাথা নাড়ে: এখ পরেও কেমন ক'রে তার নাম দেব—সত্যি ভালোবাসা? যদি সত্যি ভালোবাসতাম তবে কি এত আশুশিছু ভাবনা এসে আমার পথ আগলে ধাঁড়াতে পারত—না, পরে কী হবে ভাবতে চোখে জ্ঞানকার দেখতাম? সত্যি যে ভালোবাসে সে সব আগে ছাড়ি পশ্চিম চিন্তা—এমন কি নিজে সার্থকতার চিন্তাও বিসর্জন দেয়। তার শুধু এক চিন্তা, এক সাধনা—কিসে তাকে অস্বী করবে বার কাছে নিজের বা কিছু সব দিকেই আমান। কিছু রাখতে গেলেই চিন্তান্নানি। বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: হুইক আমাকে চোখে আমাকে চোখে আজুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমার ভালোবাসার কোথার খাদ। নিলে কি আমি ছাই সিনেমার কথা ভাবি—প্রের তুলি ভারতবর্ষে গিয়ে যদি অস্থবী হই?

পল্লব ওর হাতে হাত বুলাতে বলল: এ আশুশিকার কেন এলিওনোরা? হুইকই কি পারল তোমার জন্তে দেশছাড়া হতে?

এলিওনোরা হান হেসে বলল: ও বুধা সাধনা পল। হুইক পুঙ্খ মাছব। ওরা প্রেমে দেয় নিজের সবটা নয়—চার আনা মাত্র। আমরা, মেয়েরা, দিই বারো আনা—কর্তব্য ভেবে নয়, না দিয়ে পারি না বলে, এইই আমাদের প্রকৃতি ব'লে। তাই হার মানতে হয়েছে এখানে আমাকেই। বলতে বলতে ওর চোখ ফের ললে ভরে ওঠে: না ভাই না। আমার কোনো সাফাইই নেই। বলে না: Many are called but few are chosen? প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। আমি ভাক শুনেছিলার সব ছাড়বার, কিন্তু পারলাম না সব ছাড়তে। কারণ আমি আতুত হ'রেও বাহাল হ'তে চাইলাম না। তাই নিয়তি হেসে আমাকে পাশ কাটির সেলেন ছুরো নিরে: 'পেরেছিলি তুই মজ্ঞ সুযোগ কিন্তু পারলি না ঝাঁপ দিতে।' ব'লে একটু থেমে: অথচ হুতিন আসলেও আমার প্রেম নিরে কত পৌঁছাই না করেছি মনে মনে—বখন বিখ্যাত সালভিনিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ভাক দিলাম এক অজ্ঞাতকুলশীলকে। কিন্তু ঝাঁক দিয়ে ঝাঁক ভয়ে না ভাই। তাই না মাসিক হুড়িরে পেয়েও কাজে এল না—পারলাম না রাখতে। অথচ উপায় কী বলো? বেনারী সাগরের ভাক ভনেছে তুধু সেই চলতে পারে তুধু মোহনাকে জপ ক'রে। খাল বিল হুই হাজার বড় হোক না কেন আপনাকে নিয়েই থাকে, তাই বা হিল তাই থাকে—আজ্ঞা বড় হ'তে পারে না কোনো দিনও।

কাসেরিয়ার এসে কল: "সিভের বিরাকি।"

[কলস:]

[মাসিক বহুবলতাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নর্ভরযোগ্য]

পুরনো অন্ধ-সংস্কার নিষে

আপনার
উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ
নষ্ট করছেন কি ?



এমন অনেক লোক আছেন যারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না মনে ক'রে নিজেদের আধুনিক বলে গর্ব বোধ করেন। কিন্তু আসলে তাঁরাই অন্ধ-সংস্কার আর সেকলে ধারণা আঁকড়ে থেকে নিজেদের সুযোগ নষ্ট করেন।

দৃষ্টান্তরূপে, রায়ার জন্তে স্নেহজাতীয় জিনিসের কথাই ধরুন। অনেকেই বলেন “বনস্পতি দিয়ে বাঁধা খাবার আমি কখনো খাই না। এটা একটা কৃত্রিম স্নেহ। কাজেই প্রাকৃতিক স্নেহপদার্থের মত ভাল হতেই পায়ে না।” অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র ভৈরী করতে মাছের অঙ্গাধারণ যত ছাড়া এর ভেতর কৃত্রিম বলে কিছুই নেই।

আগাগোড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ বনস্পতি চিনাবাদান ও তিলের তেলে তৈরী একটি বিশুদ্ধ উত্তম স্নেহপদার্থ। কঠোর নিয়ন্ত্রণাবধানে

পরিচালিত আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়। এই বিশুদ্ধ স্নেহপদার্থ সহজেই হজম হয় ও সবরকম রায়ার পক্ষেই উৎকৃষ্ট—কারণ বনস্পতি দিয়ে বাঁধা খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। বনস্পতি কেনার ও ব্যবহারে খরচ কম... কারণ এর প্রতিটি আউন্সই খাঁটি ও পুষ্টিকর।

ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বাঁচার জন্তে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহজাতীয় পদার্থ খাওয়া দরকার। বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্য বনস্পতি অল্প খরচে আপনাকে এই সুযোগ দিচ্ছে। ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্তে বনস্পতির ব্যবহার শুরু করুন আপনার উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিরীর বন্ধু

বি বনস্পতি বাহ্যাকাচার্য্য এমপিএল এল এমবি এমবি এমবি

১৯৩৩

কবি কণ্ঠপুর-বিরচিত আনন্দ-স্বন্দাবন

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অম্মবাদক—ঐপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১। একদিকে গিরি গোবর্ধন, অত্রদিকে জীনবীষর যবুনার
তীর ধরে অর্চচক্রাকারে, তাৎকালিক নিবাস হল শকটকুণ্ডলীর।

পূর্বভূমিত যে (নবীশ্বর-বর্তিনী) রাজধানীটি এককাল অগ্রকট
ছিল সেই রাজধানীটিই যেন নিমন্তব্যমাহাত্ম্যের অনন্যভাৱে অধুনা
প্রাকটীকায়িত করে বসল।

ঐহরির লীলাধামের সব কটিরই নিভাধা যথিও খ্যাতি বা প্রমোদের
কোন্না অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ সু-সিদ্ধ, তবুও একটির মধ্যে
অপরটির এই মিলনবন্ধ সংঘটিত হওয়াতে এই ধামটির কোথাও দুঃমান
হল না অনিত্যতা। তেজ যেমন তেজের মধ্যে, জল যেমন জলের
মধ্যে লীন হয়ে যায়, পরিত্যক্তনীরতা তার আর থাকে না, তেমনি
হল বৃহৎনাথপ্রতি পুরলক্ষ্যের দশা; তিনি আবিষ্ট হয়ে গেছেন
ঐগোবর্ধন ও কালির হৃদয়ের অন্তর্গতিনী এই শকটাকর্ষ নামক
রাজধানীটির পূর্বজীতে।

২। এক হয়ে গেছেন উভয় পুরজী। এবং ঐক্যাবান তখন
সর্বভাভাবে উপভোগ করতে লাগলেন তাঁদের উভয়ের আশ্রয়জী।
বর্ণনার অতীত হয়ে ষাড়াল তাঁর রামবীরক-সম্পত্তি।

গোপেশ্বর এমন কি গোপীরাও আনন্দে উদ্গাসিত হয়ে বাক্যহারা
হয়ে গেলেন ঐক্যাবানকে দর্শন করে।

এই কি সেই বৃন্দাবন্য। নানাচ্চিত্র-পতত্রিহারি বৃন্দাবন্য। কত
হরিশ, কত-সুগের কত সমাবেশ। কত গাছ, কত নিকুঞ্জ,
গুহ-লতা, বীণা, সায়র, পুষ্করিণী। বকবক করছে কালিন্দীর
কত পুঙ্খ। আর তার মধ্যে গিরি গোবর্ধনের ঐ অদ্ভুত প্রসন্নতা।

ঐক্যাবানের ব্রজরাজপুরীতে প্রবেশ করলেন ব্রজরাজ।
সম্মত-আদি বৃন্দা বোঝেরা প্রবেশ করলেন স্ব স্ব প্রাসাদে। কারও
হানাজাব হল না এতটুকুও। গোশালায় গোশালায় গাভী; বিপণির
বীথিতে বীথিতে বণিক; চতুর্দিকে লোকান খুলে বসল মাল্যকর,
তাম্বুলিক।

৩। তবু সমস্তই কেমন যেন এককট হয়েও অগ্রকটের মত
লাগছে—এই ভাবনাটি দূরত্ব করতে লাগল সামাজিক মনে। কেউ
ভুলতে পারলেন না এই ভাবটি। এই ভাবেই ভাবিত হয়ে
নারদবাণীয়া নির্বিশ্রি হয়ে গেলেন আপন আপন গৃহস্থে। পুলিশরাও
বার পড়লো না। অভিনব তৃপ্তাবাদনে উজ্জীত হয়ে উঠল গোবর্ধনের
প্রমোদ। এই বৃন্দাবনেই না জানি কতকাল যেন তারা রয়েছে;
তারা যেন বিবৃত হয়ে গেল তাদের পূর্ববাস। সেখানে বিতরণ করতে
লাগলেন শূন্যপঙ্কজি নব নিধি। হাটোব পরিচর্যক্ষীলা হয়ে উঠলেন
অনিমা লম্বিমা প্রাকটীকায়িত অঙ্গিগি। আর যিনি ঐক্যাবান তিনি
নিজেই মনোবর্ষ গোপন করে রাখলেও মাঝে মাঝে প্রকাশ করে
কেনো লাগলেন নিঃস্বার্থ; হয়ে উঠলেন লীলাবালক, প্রকাশনের
দায়ক হল—তাঁর নিরর্থক জীবনরাজ।

৪। বৃন্দাবনে এসেই কিছু দিনের মধ্যে বালকুকের মধ্যে
আবির্ভূত হল বৎসপালন-কর্মজা। এই কাজের জন্ম যথিও অভাব
ছিল না উপযুক্ত দাস-কুমারের, তবুও বোধ হয় ঐক্যাবান তাঁর
তথ্যবির লীলাকোষক প্রকটনের উদ্দেশ্যেই ব্রজরাজের অন্তঃকরণে
প্রেরণ করেছিলেন একটি অভিসিদ্ধি। হঠাৎ ব্রজরাজের বিচারবুদ্ধি
ভট্ঠ হয়ে বলে উঠল—অত্যন্ত সুকুমার হলেও পরম দুঃস্থ হয়ে উঠেছে
কুক, ওকে এখন বৎসপালন করে নিখুঁত রাখাই কর্তব্য।

ব্যবস্থা শুনে মা যশোদা, যিনি বৎসপালনের শেষ সীমানা,—
তিনি শক্তিত হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটি বড় উপভোগ্য হবে না
বুঝতে পেরে, তিনি বাধা মিলেন, ব্রজরাজকে বললেন, হৃৎকের ছেলেকে
নিরে হঠাৎ এ কী তোমার কাণ্ড! এখন থেকেই কষ্ট দিতে চাও?
কিন্তু লীলাবালক অবাক করে মিলেন সকলকে। অগ্নান স্বপ্নের
মোহন ভালে লীলা ভরে চলে উঠল ভাঙা-ভাঙা চুলগুলি, বললেন—
মা, মাম কথ্য বুধে আনিস নি মা! সত্যি মা, বাছুরগুলোকে
আমি বড় ভালবাসি। ওদের আমি পূর্ব, চোখে চোখে রাখব।
যদি মা তুই না করিস, আমার দরকার নেই তোর ভালবাসায়।
ও মা, তুই বল, খেলার সাথীদের নিয়ে এবার থেকে বাছুর চরাব।
আমি বাছুর চরাচ্ছি দেখলে পৃথিবীর সকাই কী হুঁটাই না হবে!

ছোট ছেলের হৃৎকের বুলি—এতও মিষ্ট হয়! তার মিষ্ট আঘাতে
শিথিল হয়ে যায় সমস্ত সংকল্প, সমস্ত অভিমান। মা যশোদারও
বন্ধ হয়ে গেল মুখ। অনন্ত কৌতুক বোধ করলেন ব্রজরাজ,
আজ্ঞাসে দ্বার সমাচ্ছুর হয়ে গেল।

তারপরে একটি শুভদিন বেধে ব্রজরাজ স্বয়ং উপস্থিত হলেন
আত্মিনার। কুকের সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন বলভয় ও বালাসহচররা।
কয়েকটি বাছুরকে নিয়ে আসা হল তাঁর সমুখে। ব্রজরাজ পুত্রের
হাতে স্বয়ং ধরিয়ে মিলেন লালরঙের পাঁচবাড়ি। ছড়ি হাতে
লীলাবালক চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন বৎসদের, আর ব্রজরাজ
পাছু পাছু চললেন লীলাবালকের।

৫। বাছুর হাঁকাতে হাঁকাতে ঘাড় ফিরিয়ে কুক দেখলেন—
পাছু পাছু পিতাও আসছেন, মাতাও আসছেন।

চাঁকর দিয়ে উঠলেন—

বাড়ী কিং হাও তোমরা। আমরা যে এখন কাজ করছি।
অত ভয় করিস নি বা!

ব্রজরাজ ব্রজবীর বলে উঠলেন—বেশ বেশ, কিন্তু দুই বাসনি
যেন। এইখানেই আজ চরা। আর দেবী করিসনি যেন।
ঐগুণির করে যার কিং আসিস কিন্তু।

পিতামাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সাধীদের সঙ্গে নিয়ে লাকিরে
লাকিরে স-বলরাম নন্দমহালাসের সে কী বাছুর-চরানো কর্মকাণ্ড!
যেন কতদিনকার এই সন্ধ্যাস।

প্রথম দিন কেটে যায় বৎসপালনের।

৬। তারপর প্রতিদিন বাছুর চরান ঐক্যক। একটি একটি
করে দিন যায় আর একটু একটু করে বেড়ে ওঠে তাঁর বিক্রম;
সেখার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে থাকে মানসিক উদ্গাস। আর ঐ
উদ্গাস-ভরা বৎসচারণ-লীলার প্রকাশ দেখতে দেখতে আনন্দে মুগ্ধ।
বেতে থাকেন আকাশ-পখের অমর পখিকেরা। তাঁরা অয়তন
করেন এক অদ্ভুত আশোদের প্রবর্তনা। ব্রজবাসীরা, সহচররা
এমন কি বলভয়ও অল্পতন করেন সেই হর্ষ-প্রাচুর্যের বৈজিৎ। স্বীত

হয়ে ওঠে জনকজ্ঞানীর আনন্দ। আর আশ্রমের ঐ নন্দহুলাল, গিরি নদীর ঘনঘটাির মত তাঁর শ্রীজ্ঞানের অমলভামিসিয়ার ব্রহ্মজ্ঞিক জীর্ণ কর গিয়ে খেলতে থাকেন বাছুর-ভরসা খেলা, তিনি এমন লোলাকুলী হয়ে ওঠেন যে, গোষ্ঠের সমস্ত বাছুরই পশুপুত্রক হয়ে ওঠে, তারা সবাই হয়ে তিনিই তাদের চরায়। সানন্দে তারা চরতে থাকে নাল টুকটুক একটি পাঁচবাড়ির শালনে।

৭। এমনি করে দিন যায়। আর প্রতিদিন সূর্য ওঠবার আগেই শয়ন ছেড়ে উঠে পড়েন মা বশোলা। ত্রিভুবনের যিনি জন-পারন-জননী সেই ব্রহ্মজননী, দ্বার শরীর তাঁর; উপান সেন দুলালকে। নিজের হাতে সব কিছুই যে তাঁর করা চাই। যুগ যোগানো, ভেল মাখানো, রান করানো, চন্দন মাখানো, গরনা পরানো সবই করেন নিজের হাতে। তিনি ছাড়া আর কে-ই বা পারবে বল? অমন দামাল ছেলেকে সাহায্যো কি যাব-তার কাছ? কত যে কোশল করতে হয় মাকে!

তারপরে খেয়ে-দেয়ে একটু ভিরিয়ে নন্দহুলাল গোষ্ঠে বান। মা তাঁর সঙ্গে চলেন অর্ধেক পথ। আর ছেলের মুখ থেকে মৃতমুখ্যে বেগতে থাকে নিবেদন—কিরে যা মা, ও মা তুই কিরে যা।

সেই মধুর মধুর অতিমধুর বুলি শুনে শেষে ভগবানে যারে যির আসেন মা। আর লাল বলবাদের সঙ্গে নাচতে নাচতে চমতে থাকেন নন্দহুলাল, ললিত বৃকে নাচতে থাকে বিনোদ-কুলের মাল। শরল সুলম চলেন তাঁদের সঙ্গে। পৌছে বান গোষ্ঠে। গোষ্ঠে গিয়ে বাছুরেরা কচি কচি লপাটের ছিঁড়ে আশ্রম পায় নতুন রসের চরতে থাকে আনন্দে। আর মজার মজার খেলায় মেতে ওঠেন বাসগোপালের দল। কষ্টতে থাকে স্তনময়।

তারপরে ঠিক সন্ধ্যাবে। ব্রহ্মপুত্রপরমেশ্বরীর কাছ থেকে অষ্টপ-পরিজনের হাতে গোষ্ঠে এসে পৌছল মাধ্যমিক ভোগ।

সে ভোগ—স্বকবির কাব্যের মত সন্ধ্যা, পুষ্কার্ণনাথের মত সর্গা চতুর্বিধ, পুষ্কার্ণ সাধনের মত অশীতল-প্রাণ, এক বিশ্বের মত প্রভূত অন্নময়। নন্দহুলাল সহচরদের নিয়ে মিলে-মিশে গোল হয়ে খেতে বসেন সেই ভোগ। হাসি-পরিহাসের ছন্দোড় বয়ে যায় ভোজনকালে। ভোজনশেষে দীনোদ্ধার জীকৃক আবার চরতে থাকেন বাছুর, কাননে কাননে উঠতে থাকে কিক্বীর বংবংকার, কোমল চরণভঙ্গের কমল-শর্শ পেয়ে ছুড়িয়ে যায় ধরীদেবীর ছবয়ের আলা।

৮। তারপরে কুরিরে বার বেলা। বাছুরদের গুণে-গোঁথে যেরে পানে কিরতে থাকেন নন্দহুলাল। ব্রজভিতিক-বরভা শ্রীযোগদা পথের পানে নরন মেজে বলা থাকেন, কান পেতে শোনেন কেরা-গোষ্ঠের অন্নলপন। যেন বৎসদের যার কুলতে আগে বাড়িয়ে ছুটে চলে বার বাৎসর্যদের একখানি উৎকর্ষ।

৯। হুলাল বখন কিরে আসেন যেরে, তখন অতো দাস-দাসী থাকা সবও নিজের হাতেই মা বশোলা আগের মতই তাঁর হাত-পা বুইয়ে দেন, পরিপাটি করে তাঁকে ঝাইয়ে দেন সায়ভোগ; তারপরে, সন্ধ্যা পার করে দিবে তাঁকে শয়নে দেন পরাধি দুলাস পাশে।

১০। বৎসপালনশীলার মাত্র কয়েকটি দিন কেটেছে, এমন সময় একদা, বাছুর চরতে চরতে জীকৃক হঠাৎ দেখতে পেলেন, ঠা

একটিবার মাত্র দেখেই বুঝতে পারলেন, কঠিনক কলোভূতর বাছুরের আকৃতি ধরে জ্বকের বাছুরদের মধ্যে সবাব অলকো বুঝে বেড়াচ্ছে। তিনি যেন একটি বৈকবকেশবীর মহাশক্তির ছবি; যেন পরবর্ত-লিপার আভিকতার চিহ্ন উচিত্রে উপস্থিত হয়েছেন বোধ চারিক; যেন সর্ষধ হংগের সোতে মিত্র সোজে ছুঁয়ারে এসেছেন চোর।

সর্গজ চক্রচুড়ামণি জীকৃক বিপাককে চিনতে পেয়েই অঙ্গক বলরামকে বললেন—

দামা, ওটি কি আমাদের জ্বকের বাছুর না বাছুরের নকল?

সচকিত নয়নে যতকণে শ্রীহরাম সন্দলবলে সোটিক দেখছেন, ততকণে তাঁদের স্বরূপ নির্ণয়ের পূর্বেরি, জীকৃক তাঁর পদ্যের পাণ্ডিত্য মত বামকরতল দিয়ে ধরে কেলেছেন বাছুরটার পিছনের জোড়া ঠাণ, আর মাথার উপর অলাতচক্রের মত বোরাতে বোরাতে তাকে আছড়ে মেরেছেন কপিখগাছের কাণ্ডে। বখন প্রাণ বেকসে, তখন সে ধারণ করল তার নিজের বিকৃত আকার। বয়-সগনে পাঠিয়ে দিলেন তাকে জীকৃক।

১১। জীকৃকের এই শত্রুবধ প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠল স্তবগভীর। প্রশংসার যুগের হয়ে উঠলেন শিব-ব্রহ্মা, যদিও যিনি দুর্ঘট-ঘটনপটীয়ার, যিনি দুষ্ক-কর্মকর তাঁর পক্ষে এমন কিছুই অদ্বুত নয় এই শত্রুবধের নগণ্যতা।

১২। কিন্তু সেই সময়ে অদ্বুত হয়ে উঠেছিল জীকৃকের আকৃতি। সাবানের মধ্যে যিনি লীলারদের মনোরম আলতে ছিলেন ময়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন রমজন্মন, এবং তাকে উচ্চাসিত করেছিল মহাপিঙ্গলি একটি ভ্যোতির্ময়তা (লালস)।

তারপরে গণনাগনের শেষসীমায় বখন উপনীত হলেন অদ্বারি, এবং সন্ধিমালিন্তের অমুশোচনায় বখন দান হয়ে এল তামরল, তখন ব্রহ্মচর বাছুরদের অমুসরণ করে সবাদের সঙ্গে নিয়ে রাজপুত্রীতে কিরে এলেন জীকৃক।

১৩। বাড়ী চুকেই ছেলের কী কলরব। মায়েরা এসেছেন, যে ধীর ছেলে নিয়ে যাবে কিরবেন, কিন্তু কে শোনে তাঁদের কথা? তারা প্রথমেই একপৌড়ে পৌছে গেলেন ব্রহ্মপুত্রপরমেশ্বরীর কাছে এবং তারপরেই চাঁৎকার করে বলতে লাগলেন—

উঃ, কী অগম্যচরিত আপনার ছেলে। আর লানবটারই বা কী অদ্বুত শরীর। ঠিক কি একবারে একটি নবর চোখজুড়ানো বাছুর! বিনামুখে তাকে তুলে আছড়ে মারলেন আমাদের কৃক।

১৪। ভগবান জীকৃকও তখন জনকজননী পবিত্র হয়ে ধর আলা করে বসে পড়লেন। তাঁকে যেন আরতি করতে লাগল পৌরজনের আনন্দ। তারপর অতদিনের মতই সায়জন বানামুলেপন সাঙ্গ করে ব্রহ্মজ্ঞের সঙ্গে একত্রে সাক্ষা-ভোজন করলেন সমাধি। অম্বস্তুরির মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলেন রজনী।

১৫। তার পরের দিন, আকাশে তখনও লেখা দেবনি সূর্যদেব, জীকৃক আহারশেষে বুকের উপর হার নাচাতে নাচাতে সহচরদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। শ্রীহরামও এসেন। বাছুরগুলিকে যথারীতি সংগ্রহ করে চলে গেলেন বনান্তরে। সেখানে গিয়ে দেখেন নতুন বাস গজিয়েছে, বনভল ছেয়ে আছে, জলাশয়ের ধারে ধারে নবাহুত দ্বীপ মেঘর সমারোহ। বাছুরগুলিকে চরতে দিলেন সেখানে।

১৬। অনন্তরসিক নবীন কংসপাল এখন সেখানে রাখার, রাখা হয়ে বিরাজমান, তখন তিনি অদ্বিতীয় থেকে দৃষ্টিগোচর হলেন এক দানবের। দানবটি আর কেউ নয়, তিনি পুতুমার সহোদর, কংস-সম্মত মহাবীর। অত্যাশ্চর্য বক পক্ষীর মত তাঁর শরীর। দানব-সংহতি বন্দা কংসের তাঁর নীতি। তিনিও তগবানের অমুসন্ধান ছিলেন—দৈবজ্ঞপ্ৰেস্তার মত। দৈবগতিক আজ তিনি বুঝতে পারলেন, 'ইনিই তিনি'। বোঝাও যেই অমনি সেই বকদানব, —যেন পৃথিবীটাকে উপরিয়ে উঠে তুলতে তুলতে নীচের চকুটিকে বকীপুত্র এবং বকীটাকে নীচের দিকে টেনে নামাতে নামাতে উপরের চকুটিকে আকাশপুত্র সঙ্গ কর দিলেন যুগপৎ। প্রচণ্ড ভয়ে ভয়ে ভয়ে হল কংস-সহচরদের হৃদয়। আতঙ্ক-পাণিল নয়নে তাঁরা দেখতে লাগলেন দানবপক্ষীকে; যেন তাঁদের সামনে বিরাট কাশপুত্র, সে-বহুজ-মহুজারি সর্বজীবের জীবনাকর্ষণের বাসনায় বিশাল তাঁর সীড়ানীটিকে বিফারিত করে রয়েছেন ঝাঁড়িয়ে।

১৭। তাঁরা সত্যের বলে উঠলেন—

সখা, এটি পক্ষী নয়। এ দানব। আমাদের সকলকে গিলে ধাবার জ্যেষ্ঠ রয়েছে। বিপুল দ্বন্দ্ব রূপ ধারণ করেছে বক-পক্ষীর। এ কেনে আমাদের পক্ষে পলায়নই পথ্য। কিন্তু পাখার কোথায়? কৈলাস পাহাড়ের চূড়ার চেয়েও যে প্রকাণ্ড ওর দেহ, তার চেয়েও যে দীর্ঘ দীর্ঘতর ওর চকুপুট।

সমস্তা ও হীমাদ্রাঙ্গর মধ্যপথেই যুদ্ধ-মল হাত করলেন লীলাবালক। বাস্তব হুহা স্বরিয়ে বললেন—

কোমর আমার প্রাণের সমান। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অতো ভয় কিংবা? না ভয়।

কণ্ঠে বলতে ঐক্য—বিনি অধ্যয় অকৃতোভর, বিনি অখিল সৌন্দর্য পতঙ্গলাতা, বিনি ভূবনৈকবদ্ধ, বিনি অমুপনি-নিরবধি-করকবলিত, তিনি হেলাভয়ে ধাবিত হলেন পক্ষীদানবের অভিমুখে। কিন্তু ঐক্যের অধ্যয়ত মহাপ্রভাব থাকিলেও হবে কি, দেবদ্রোহী এই অমরসাহসিক পামর জংগল্য তাই অতি করাল তুণ বিভার করে লাঞ্ছিত গিলে ফেলল ঐক্যকে। ফাল-ফাল করে তাকিয়ে হইলেন দ্রাক্ষ্যাকের দেবতারা।

১৮। কী বোর সঙ্কট! নিরুপায় হয়ে হায় হায় ধনি তুলে চাঁকায় গিরে উঠলেন বলরাম। 'অহো কষ্টম, অহো কষ্টম' কণ্ঠে কণ্ঠে লজ্জার মান ধুইয়ে, মন-বেদনায় চেতনা হারিয়ে, কল। হাবার উপক্রম হল বর্গের দেবতাদের। কিন্তু ইত্যাবকাশে ঘটে গেল এক অভ্যাকর্ষ ব্যাপার।

লোকের ভীতিপ্রদ জলন্ত এক খণ্ড অনলের মত ঐক্যকে জ্বলি দিয়ে গ্রহণ করতই যেন পাউ পাউ করে জলে গেল বকাস্রবের জাল। নতুন আমের পরব গিললে যে দশা হয় উটের, সেই দশা হল দানবের। গলায় নলীটিকে একবার কৌটকার তে একবার সেলায়। কী কাতর সজ্ঞান, কী স্থাভুল বিদ্যার। আর তার সঙ্গে দুটো প্রচণ্ড-ভানার সে কী অসম্ভব প্রকল্পন। শেষে গলা আর চোঁট কীক করে বকাস্রব এক দমকে উদ্ধার করে বিপুলবেগে বহিয়ে ছুঁকে ফেল দিল ঐক্যকে, —যেন তার নিজেরই বেরিয়ে-বাঙার প্রাণ।

২১। রাহুর গ্রাস থেকে চত্বের মত বিস্তারিত হলেন

লীলা-বালক। যমতর যমখটার কোটর থেকে বেরিয়ে এসেন যেন কিরণমালা। হিমালয়ের গুহা-রহর থেকে বিনিজ্জ্বাল হল যেন সিংহশাবক। নির্বিড় তমসাহার সঙ্গার-কূপ থেকে যেন যুক্ত হলেন ভক্তজন।

বকাস্রবের কঠোর বসন-কুণ্ডল সিক্ত হয়ে গেলেও সে কী অপূর্ণ গোভা তখন ঐক্যের! বেরিয়ে এসেই তিনি বললেন—তর কোরো না।

সপ্রাণর মধুরতর সেই কলসর সখাদের সেহে নিয়ে এল মুহুরি বিরতি। কিন্তু এক মুহুরি। তারপরেই সেই দানবপক্ষী পুনরায় চকুপুট বিঘটন করতে করতে ঠুকে খেতে এল ঐক্যকে এগিয়ে। আগাগোই অমনি ঐক্যক-... তাঁর বাম করকমল-কুইমল দিয়ে তার উর্ধ্ব চকু এক দক্ষিণ করকমলকোণ দিয়ে তার অধরচকুটিকে ধারণ করে,—সহচর বালকদের হৃৎশব্দকোমলকৃতির সঙ্গে সঙ্গে, সজ্ঞাপ্রভাবনত অমরদের আত্মবিক্রাস-জননের সঙ্গে সঙ্গে, হৃৎসঙ্গ দম্বজলৈতে-পরিবরের হর্ষোৎপাতনের সঙ্গে সঙ্গে,—নিজের মুখকমলটিকে সহসা হাসিতে ফুটিয়ে দিয়ে, বীরণ-ভূতের মত হেলাভয়ে বিদীর্ণ করে ফেললেন বকাস্রবকে। গলগল করে অনর্গল হয়ে পড়তে লাগল অস্রবের রক্তধারা, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল নাড়ীনাগ, খসে পড়তে লাগল খোঁগো খোঁগো চর্ম। বিধতিত হয়ে পড়ল হল বকাস্রবের, যেন ধসে পড়ে গেল দু'-হুটো শৈলশিখর।

২০। বকাস্রবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে আনন্দমগ্নে প্রমুগিত হয়ে উঠলেন দেবতারা। সন্ধ্যা বর্ষণ করতে লাগলেন নন্দনকাননের গন্ধকুল। দেবক্রম গিরে শুভনে মেতে উঠল দিবা ভ্রমবেরা; যেন তারা স্বর-নারিকাদের পুলকিত নয়নের সজ্জল জলবিন্দু। আনন্দিত বিষয়ে দলে দলে নৃত্য করে উঠল গন্ধর্ব-কিরণ-বুঝতার দল। দিকে দিকে বেজে উঠল অভর হুন্ডি। এবং যুগিগণ, বীদর আহ্বান করেছিলেন বৈরত মহ তাঁরাও উপলব্ধি করলেন পরমার্থ্য লীলার বিলাস, স্তবগান গেয়ে উঠল তাঁদের হৃদয়।

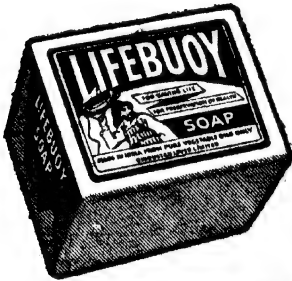
২১। আর এখানে কুসলহচররা? প্রমোদের চাপে বৃষ্টি ভাঙে-ভাঙে তাঁদের হৃদয়। জনার জনায় তাঁরা বৃকে জড়াতে লাগলেন তাঁদের কুসলপ্রাপকে, তাঁদের হৃদয়খিনিথকে, এই বকারিকে। আর তাঁদের মধ্যে হেলে-তুলে ঐক্য বিচরণ করতে লাগলেন, যেন জনৈক করিপুংসব।

তারপরে যখন বেলা পড়ে এল, তখন আর আর দিনের মতই সকলে সঙ্গ্রে করলেন বাহুরয়ে। তারপর তাঁদের লীলাময়টিকে ঘণিঘানে নিয়ে,—তাঁর করকমলে তখন ললিত-ললিত করকমলের নাচে পেল্লার,—সেই তাঁদের সেই সকল সৌভাগ্যবান ভগবানটিকে নিয়ে, তাঁরা পৌছে গেলেন বংশাব-ভবনে। পৌছেই আর ঘর সর না। পৌছে গেলেন ব্রহ্মপুর-পরমেশ্বরীর কাছে। উৎকর্ষ সাধারণ করছে তাঁদের কঠোর অষ্ট পঞ্চদশ ভেরে আগছে তাঁদের ভাষা। উভারণে তাই মাথুরের ভক্তি জুড়ে দিয়ে তাঁরা আত্মপাত বলে পেলেন বহুহন-কথা। সব শেষে বললেন—

২২। হা জননি, এর পরে—এর চেয়ে আর অসম্ভব কিছু হয় না। এরকম কাণ্ড কাহ না চোখ কপালে তোলে। হালদাট-মেয়ে আজ বা সখা সেনিবেছেন, ঠা, তাকেই বলে পরজিব।

যাঁৱা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁৱা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান কৰিব।

খেলাধূলোই বহুদূৰ বা কাজকৰ্মই
বহুদূৰ আমৰা কখনই ধূলোময়লৰ থেকে
নিৰাপাদ নহয়। আৰু ময়লা বহন
কৰে ৰোগেৰ-বীজাণু যা সবসময়
আপনাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ক্ষতি-
কৰ। লাইফবয় সাবান এই
বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ কৰে
দেয় এবং আপনাৰ স্বাস্থ্য
সুৰক্ষিত ৰাখে।
অত্যন্তদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
কৰে আপনাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত ৰাখুন—
এটি আপনাকে এত কৰিবৰে কৰে তোলে।



পর্বতের মত পানী দা, পর্বতের মত পানী। অহঙ্কারের পাল-পাখি। সন্ধ্যাকে ঘিরতে এল। কিন্তু চোখের পলক পড়তে মা পড়তেই আনন্দলোপ। তোমার ঐ ফুলের মত হুলে হু হাতের পলক নাড়িয়ে—কি বলব মা—হেলাডের হস্ত পাখকের মত বকটাকে উড়, কী তার ধারালো চোঁট, কী জোয়ালো তার বঁকে বঁকে চলা—গুণের জোয় জোয়ার রা জননি—এক নিমিষে কেঁড়ে ফেললেন অস্তুরটাকে—রেন সে বেটা একশাছি বেগান্দার।

২৩। বাছুর চরাতে যায় যে সব বালকেরা তাদের যুগের দাঁড়িয়ে কর্কটাত্মক কৃৎস হল বটে ভজরাগীর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খড়ায় ভুজা বাজল তাঁর হৃদয়ে। একদিকে কৌতুক অভ্যাসিক শব্দ। এ এক বিশ্বকর হাত্যাবীপক পরিবেশ হয়ে পাড়াল। তাই ভজরাগীর পুষ্করীর নিকট চরে মহাশা বলে উঠলেন—

কী কপাল আমার। যে ডের আমি ত্যাগ করলুম 'মহাশা'র অবস্থান। হায়, এখানেও কি সেই ডের। সমস্ত কিছুই যেন উপড়ে কেলেতে চার দৈত্যদের ডহডহ উপস্থাব। ত্যাগিস আমার পরমচকল হেলোটর অসীম সাহস, তাই নকে। এখন কোথায় বাই, কী করি। সোঁকা বিধাতার যে কী ইচ্ছে তা কেমন করে জানি ?

২৪। কপাল দিষ্ট। বহুসেন ভজরাগীর। ভাষণর অভ্যাসের মতই যে বায় বাতীতে পাঠের দিলেন কুলকলহবধের। সমযোজিত অত্যন্ত উৎকর্ষানি সমাপন করালেন তনয়ের। ভালবাসাই মায়ের ব্যবসা। সন্ধ্যার ছেলেকে খাইয়ে বীরে বীরে বললেন—

এবার থেকে তোকে যবেই থাকতে হবে, যবে-বনান্তরে বাছুর চরিয়ে বুয়ে বেড়ানো আর চলবে না। এ উৎসবে ফেমা সে বাবা। বাছুর পাহারা দেবার জন্যে লোক রয়েছে। আর তোকে অতো কষ্ট করতে হবে না।

জননীর যুগে ঐ জননীভিকর বচন শুনে, 'ও মা, তোমার এতটুকুও ডেরে কিছু নেই মা, এরা সবাই মিছে কথা বলেছে মা। তেনে মিছে ভাবিস মা—'

বলতে বলতে লীলাবালক অভিনয় করতে লেগে গেলেন নিস্তার। তগবতী জননী তখন আর কী করেন। অতিপার্বত্য শয়নতলে ছেলেকে তইয়ে দিয়ে তাকে আদর করতে করতে হুম পাড়িয়ে দিলেন।

[ক্রমশঃ]

অপারগ

মান্না যুগোপাধ্যায়

বিষ-ছুড়ে শ্রেণীবৃত্ত, আত্মস্তরী মাহবের মন
লানবের বাসভূমি। এক দল বিকৃত প্রাণের
অশ্রুতী আর্জনাতে কঁপে ওঠে কোমল শিশুর।

বহুজরী যুগের নিশানা

উড়ছে বিরাট শূড়ে—

[তৃতীয় (বিষ) যুগের এরা কি স্থচনা ?]

অসংলগ্ন ভাবনার মেঘ

উড়ে উড়ে চলাছেই।

উপগত সমস্তার ভিড়ে

হারিয়েছি সেদিনের নীপাত্ত আকাশ।

শূত চারের কাপে নিখিল চুয়ুত

পল্লী ভেলাবার এক অদ্য টেঁকর,

শেব নেই এর শুধু ক্লান্তির কাপটে

নড়েচড়ে উঠে বসি।

অপারগ আমি, নরাধুগ বিকল বধির

পতঙ্গ হাসল সেহে অজ্ঞ শুধু চেরে চেরে দেখি।

শুভির বুকবীণ দিয়ে।

বাঁচবার ত্যাগিচ্ছেই যেন

বেঁচে আছি দীপ্তিত হুতাকে ছেড়ে।

বেশ লাগে

বকুল বসু

বেশ লাগে

দীর্ঘ হৃদয়ে দুজনে

পাতা-কথা বাগানে

জবরের কল্লভব

বোসে বোসে ভাবতে।

বেশ লাগে

দোনা-কথা সন্ধ্যার

চাঁদোরা আলোর

বাসন্তা পার্শ্বতে

হাসতে হাসি দিয়ে বোসতে।

বেশ লাগে

চুপি চুপি নিঃশব্দে

হাসি-হাসি বোসে, এলে

জ্বালায় হাসি-কথা হুগতি

কুব দিয়ে বোসতে।

বেশ লাগে

নিরিরিচি কল্লভে

ভূমি মাঝে থাকবে

আর দিশি-দিশি কাগজে

তবু আবার ভালবাসতে।

ডু স্ব র্গ প'রি ক্র মা

শ্রীশিবপ্রসাদ নাস



GOVERNMENT

Cooch Behar

কুম্ভস্থগিয়াস বলেছিলেন—‘পৃথিবীর সর্বত্রই সৌন্দর্য আছে, কিন্তু তা দেখবার মত চোখ কই?’ জাতিগত ভাবে দৃষ্টি হলেও বাঙ্গালীর কিছুটা চোখ আছে। যুগে যুগে এ-জাতির জীবন বছবার বিড়খিত হয়েছে আভ্যন্তরীণ বন্দ-কলহে, বৈদেশিক আক্রমণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তার ওপরে বৈ-অভিশাপ নেমে এসেছে, তেমনটি বোধ হয় আর কখনও হয়নি। তবু এ-জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভাটা পড়েনি। হয়ত এই প্রাণশক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে তার দলবোরে, তার সৌন্দর্য-পূজায়। তাই মূল্যবোধের আকর্ষণে সে ছুটে যায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সামান্ত অবসর পেলেই। আর কান্দীর? বাঙ্গালীর নাড়ীর সঙ্গে তার যেন একটা অচ্ছেদ্য বোগা আছে। বাঙ্গার সমস্তল থেকে সেড় হাজার মাইল দূরে পর্বতবেষ্টিত কুম্ভস্থগিয়াস কান্দীর তাই বাঙ্গালীর কাছে হ্র নয়—‘যো বত স্বজ্ঞ ন হি তন্ত হ্রদম্’। সত্যিই তো, হ্রদের বোপ থাকলে আবার দূর কি?

আগেকার দিনে মধ্যবিন্দু বাঙ্গালীর পক্ষে কান্দীর বেড়াতে বাঁওয়াটা কতকাটা স্বপ্নের সামিল ছিল। এখন পথ বাট ভাল হওয়ায়, ট্রেনে কনসেদান পাওয়া যায়, চৌর-ডাকাতের ভয় নেই আর দল জুটিয়ে বাঁওয়াও সহজ। স্বতরাং গত পূজার ছুটিতে বহু বাঙ্গালী কান্দীর গিয়েছিলেন—কেউ বিমানে, কেউ মোটরে, বেশীর ভাগই ট্রেনে বাসে। সেপ্টেম্বরে অক্টোবরে দেবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙালী গিয়েছিলেন—তার মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাস্করেরও বেশী বাঙ্গালী। আমরাও অবশ্য এই অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

দলে আমাদের এগারো জন—মহিলাই মেজবিরি। লেডিস ক্লাব নীতি অনুসারে নয়, নিছক-লক্ষ্যতার জন্মেই নদের নৈকীর স্থান অধিকার করেছিলেন চন্দনমগরের শেকালী—‘মন্ডী—আমাদের শেকালী দি’। ব্যবস্থাপনার ভার এঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা পুরুষরা রীতিমত নিশ্চিন্তই ছিলাম। স্বতঃ বাঁচিরে ডান হাতের ভালো ব্যবস্থা করা, নানা খুঁটিনাটি হিসেব রাখা আবার নরকার মত রূপসায়েরে ডুব দেওয়া, একি আর আমাদের মত সাধারণ পুরুষের কাজ? সিকিউরিটি কনট্রোল থেকে পাশপোর্ট বোগাড়া করা, রেলের কনসেদানের জন্ত থানা দেওয়া, কামরা রিজার্ভ করা এ সবই করেছিলেন সক্রিয়রা।

ভূবাগশাপ দেখবার ইচ্ছে ছিল বলে আমরা অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে, বেশ একটু বিলম্বেই, কান্দীর রওনা হই। মেলপথে কান্দীর হটা পথে বাঁওয়া বার; একটা হচ্ছে বিল্লী হ্রদ আর একটা অমৃতসর দিয়ে। আমরা দ্বিঃ কবি, সিন্ধী হয়েই বাঁওয়া করব। কামরা রিজার্ভ কনাই ছিল, স্বতরাং বেশ শান্তিতেই বাঁওয়ার হোল। পরদিন দুপুরে

আমরা আগ্রা কোর্টে নেমে বাই। অবশ্য এর কয়েকখানক বিল্ড হয়েছিল। রিজার্ভ কামরা আর মেদেনি। কৃত্রিম তিন হ্রদে কুম্ভস্থগিয়াস মেল হয়ে কয়েকটে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ পূর্বাতন বিল্লীতে পৌঁছলার। বাঁওয়াপথে রাজধানী দেখলাম দূর থেকে, আলোর আলোকিত। সাড়ে এগারো বর্গ-মাইল জুড়ে ২৫ কোটি টাকার ‘ভারত ১৯৫৩’ প্রদর্শনী চলছিল। রাজধানীর চেয়ে কান্দীরের আকর্ষণই ছিল বেশী। তাই রাত্রি ১টার কান্দীর মেল ধরলাম। তারের মোহে একদিন আবার কাটানোর রিজার্ভেদান ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনটিতে পাঠান আর পাঞ্জাবীয় ভিড়—পুরু ছাগলের মতই গালাগাদি। মহাসমতায় পড়লাম আমরা পর্বতপ্রমাণ লটবহর নিয়ে। কুম্ভস্থগিয়াস হ্রদের জয় সর্বত্র। মেয়েরা বেয়ে ট্রেন-মাঠারকে পাকড়াও করে একটি রিজার্ভ মেয়েদের কামরা নিজেদের জন্তে গুছিয়ে নিলেন। আমরা কয়েকজন আউট, অফ হাউস। কোন রকমে তেঁরাধা অবস্থায় হাতটা অস্ত্রায় কামরাগ কাটয়ে নিলাম।

পরদিন সকাল আটটার মেল পৌঁছল পাঠানকোটে। জেল-লাইনের এইখানই শেষ। এদিকে পাঠানকোটই পূর্ব-পাঞ্জাবের শেষ সীমা। হাওড়া থেকে টিকিট করার সময় বাসের ব্যবস্থাও করতে হয়। আমাদের বাসের নম্বর আগে থেকেই জানান ছিল। নেমে দেখলাম বাস অপেক্ষা করছে। বিল-সেক্সানে চলবার উপযোগী মজবুত, আরামী বাস। সিট-নম্বর অনুসারে বসতে হয়। ২২/২৪টির বেশী আসন থাকে না। হুঁলে যাওয়া বেশ-আইনী। ১টার বাস ছাড়ল।

পাঠানকোট থেকে গ্রীনগর ২৬৭ মাইল, বিমান-পথে মাত্র ৪৫ মাইল। বাস-ভাড়া রিটার্ন ২৭ টাকা। হুঁসিদের সন্ধ্যা ছুটা দিনের জেলখানা ভোগ করতে হবে ভেবে আমরা কিছুটা অনস্থিত বোধ করছিলাম। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই আমাদের জ্বল জ্বল গেল। বেনয়নভিরাম ভূজ দেখতে দেখতে চললার, তার কুলনা মেলে-না। হাওড়াই জাহাজে উড়ে গেলে পথের কষ্ট কম হয় সত্যি কিন্তু সে ‘অভাবনীয়ের কটিং ক্রিয়ে’ ফল বীজ হয়ে ওঠে না। পথে মাঝে মাঝে ১০-১৫ মিনিটের জন্তে বাস থামে, বাঁওয়া প্রয়োজনমত চা পান করেন, গা-এলিয়ে হুয়ে লেকান।

বাঁও নদী পেরিয়ে তিন মাইল আসবার পর আবার কুম্ভস্থগিয়াস প্রথম স্রব লক্ষণপূর্ণ পৌঁছলাম। এখানে একে প্রাচীরে গেল। ভারতীয় সামরিক অফিসারেরা আমাদের বাঁওয়াপথে একে একে পরীক্ষা করলেন, কামর মালপত্র সিটেপো প্রদর্শনীর ভাবপত্র অনুসরণ। পাঁচি আবার চলল। ৩৭ মাইল পরতলুদ্বি

ভবর সির ভাবার পর আমরা এসে পৌছলাম জন্ম নগরীতে। ভবন হুগুর। এখানে এক বড় বিহার। একই মধ্যে ভ্রাম-ভোজন সেয়ে নিতে হল। জন্মে বাজীদের খাওয়া-পাওয়ার অধিক কিছু নেই। সোকাপাট প্রচুর। কিন্তু ভবনের অভাব। বিখ্যাত রত্নার জীউর মন্দির বাস-ভাণ্ডার সামনেই। বিরাট ভবনের মধ্যে ফুকেই বা দিকে প্রথমে নজরে পড়ে বোড়হস্তে কতাবদান ভক্তবীর, কহুদারজীর স্থিতির উপর। বিরাট স্থিতি পাথরে খোদাই। হস্তিরের মধ্যে রামচন্দ্র, সীতাদেবী আর লক্ষ্মণ অধিষ্ঠান করছেন। রামচন্দ্রের বর্ণ 'নব-ব্রহ্মলক্ষ্মণ' নয়, কালো। নববস্ত্র কালের ধোপে রাম আর কৃষ্ণ এক হয়ে গেছেন। এখানের চারদিকের ছোটখাট দ্বিধাগুলিতে এক লক্ষ শালগ্রামশিলা আছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সংগ্রাহকের ধৈর্য্যের প্রশংসা করতে হয়।

জন্ম সহ্যটি মোটের উপর পরিভার-পরিছর। হাফটি কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্তভাবে শাসিত হয়। কাশ্মীরের জঙ্গল রাজাদের জন্ম হচ্ছে শ্রীতের রাজধানী। এ-রাজ্যের শতকরা ১০-এর বেশী কিন্তু। হাফেজাবাদী আর পাঞ্জাবী ব্যবসারী সর্বত্রই চোখে পড়ে। শ্রীতকালে জন্ম সহরে কনকনে ঠাণ্ডা পড়লেও জ্বালাপাত হয় না, তবে সহর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে পাহাড়ে জ্বালাপাত হয়। এই পাহাড়ে বিখ্যাত এক বিদ্যুৎশিল্প আছে।

কোলা প্রায় আড়াইটার সময় আমাদের বাস সড়ক হোল। মাইল খানেক বেতে না বেতেই চোখে পড়ল পর্বত-বিন্যাস। একটার পর একটা পাহাড় ঢেউ খেলছে চলে গেছে। এই পাহাড় কেটে কেটেই স্বল্পর পিচের রাস্তা করা হয়েছে। রাস্তাগুলি বিশালগতিতে একে-বেঁকে পাহাড় কেটে ঘুরে ঘুরে উঠছে আর নেমেছে। এই পর্বতশ্রেণীর নাম পীরপঞ্জাল। ভারত বা জন্ম থেকে এই পাহাড়গুলি কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিস্তারিত কল্পনায়—প্রায় হু'শো মাইল। কাশ্মীর সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যদি ভাবা যায় যে, উত্তরদিকে তিনটে সমান্তরাল রেখা পর পর পড়ে আছে। এর প্রথমটি হচ্ছে পীরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, তার পরেরটি কাশ্মীর উপত্যকা আর শেষেরটি হচ্ছে কাশ্মীরের উত্তরে থাকে থাকে সাজান পাহাড়ের সারি, বাদ্য পরম রেখে সমগ্র উপত্যকাটিকে ঘিরে বন্ধা করছে।

মোটর বাস পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠে আবার ঘুরে ঘুরে নেমে এগিয়ে চলে। কোনও কোনও পাহাড়ের উচ্চতা ন' হাজার ফিট। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে হিমেল হাওয়া পর্যন্ত শৈত্যের কয়েক ডিগ্রী অন্তর্য করলাম চড়াই আর উৎসাহের সময়। এই পার্শ্বতাপ অধিকাংশ হানেই সর্পি, একটামাত্র বাস চলার মত; তবে প্রতি বোড়ের মাথার দৃষ্টি বাসের পথ কয়ে নেওয়ার মত রাখা আছে। হু তিন মিনিট পর পর এক একটা মোড় আসে আর হুঁ বাজিরা বাস মোড় ঘোরে। অন্ত্যন্ত সতর্ক হয়ে মোড় ঘুরতে হয় কারণ বিপরীত দিকের গাড়ীর সঙ্গে সামান্য হাল্কা লাগলেই কয়েক হাজার ফিট নীচে পড়ে কবল দিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তবে চালকের অন্ত্যন্ত দক্ষ, হুটনার সংবাদ এ অবশ্য প্রায় শোনাই যায় না। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কল্যাণ পদ্ধতি দিনরাত তদারক করা হচ্ছে। সতর্কতা বিশেষ

থাকলেও শঙ্কা নেই। বলবানদের পথে বেতে বাসবাহীরা আর ডাইভারের ভাবনাদের মায় দরপ করেন। বাসের পেছনে লেখা থাকে—'ভগবান, তুমিই একমাত্র সনাতন'। নেপালের ডিমপেরি থেকে কাঠমন্ডু পর্যন্ত রাস্তাটাও এরকমই বিপদমূল। কিন্তু ততটা বিপদের ভর এখানের পার্শ্বতাপে নেই। সামরিক গাড়ী আর দ্বাল-বোমাই ট্রাক সারাদিন ছুটে চলেছে। তবুও ডাইভারদের রীতিমত বাজিরে নেওয়া হয়। বাছ চালক হাড়া এখানে মোটর চালিয়ে হাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ঘন ঘন মোড় ঘোরা, ন' হাজার ফিট উঁচু ঘিরে হাওয়া—ব্যাখাটা আটপোরে আসে নয়। কেউ কেউ ভয়ে কাঁদতে শুরু করে পড়েন। ওনলার পাঞ্জাবী বীরপুরুষদের মধ্যে একজন এমনই ভয় পেয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি হুঁ হান, তারপর জান কিরে পেয়েও জীনগর পর্যন্ত আর চোখ খোলেন নি। বিমানে কিরে গিয়েছিলেন। অবশ্য ভেতো বাজালী হলেও আমাদের দলের কাকুর দ্বাং তত দুর্বল ছিল না। তবে ঘন ঘন মোড় ঘোরার জন্যে মাথা ধরেছিল অনেকেরই, আর কেউ কেউ হুঁ ঘিরে চলেও ফেলছিলেন। কেরবার সময় একজন মহাবহাদুরী পাঞ্জাবী সৈনিককেও ঐ কর্তব্য করতে দেখছি।

জন্ম যে সকলেই কিছুটা পোরে থাকেন, তার পরিসর মিলে বাসের ভেতর থেকেই। কেউ কোনও কথা না বলে চুপচাপ বলে আছেন, পাছে মোটর-চালকের মনের ওপর রেখাপাত হয়, তার হাত নড়ে চড়ে যায়। আমরা কয়েকজন বেশরো। মরলে অন্ততঃ খাটরায় চেপে মাঝুলি নিমন্তলার যেতে হবে না ত! রীতিমত রক্তাঙনের খেলা দেখিয়ে পীরপঞ্জালে শেহ-পঞ্জরকে রাখতে পারব! চাই কি, পীরের দরায় বেহস্ত-বাসেরও ব্যবস্থা হতে পারে।

অবাক-বিস্ময়ে দেখছিলাম পাহাড়-কাটা জাঁকাবাকা বিভিন্ন পথগুলো। মাঝবের পায়ে-চলা পুরাতন, পরিত্যক্ত পথগুলোও নজরে এল। হয়ত এই পথ ধরেই লতিতানিত্যের সৈন্ত বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল, আবার হয়ত ঐ পথ ধরেই রাজপুত্র গুণবরণ দক্ষিণ ভারতে এসে জাহাজে চড়ে বহুদীপ আর চান্দে গিয়ে তথাগন্তের বাণী ছড়িয়েছিলেন।

দেখলাম দেশলাইয়ের বাস চলেছে নীচের পথগুলো ধরে। মিলিটারি ট্রাক আর বাজিবাহী বাসকে তাই মনে হচ্ছিল। ঘুরে অগণ্য তুবারমস্তিত পর্বতের চূড়া, হুয়ার সোনালী আলো পড়ার কি তাবের জী! হাফাপথে পার্শ্বতাপ খণ্ডাও চোখে পড়ল, পাশ কাটিয়ে কয়েকটার চলেও গেলাম। নিস্তক, ভ্রামল পর্বতগুলির এক একটা ভেদ ক'রে সালা সালা প্রাথমিক প্রোত নীচে ঘুরে পড়ছে। বন-খাট, বেবলাক আর পাঞ্জাবের ভ্রামলিমাথ মধ্যে এই বেতাগিনীদের আবির্ভাব যনের পছন্দে গভীর সংবেদন জাগিয়ে তোলে। ভূমর্শের উপস্থিতি পরিবেশই বটে।

বিকেল নাগাদ আমরা এসে পৌছলাম কু-এ। অশূর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্তে স্থানটির প্রসিদ্ধি আছে। এখানে বলাই আছেন কাশ্মীরের 'শেহ' শেখ আকবর। সোকাপাট এখানে ভালই। পনের মিনিট বিজ্ঞানের মধ্যে সবাই চা পান করলেন। চা-ওলা আবার সজিনীদের এক গুচ্ছ হল এসে দিলেন। নামটা নাকি নার্স। আসল নামই ঐ, না এখানেও চিত্র-ভাস্কর্য্য আসর জাঁকিয়ে বসেছেন কে জানে। কি হুনির কার্ণাভার তারকাদের। এ-খুঁজে জন্ম

নতুনের অভিযান...



দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
 শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
 সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
 দিবে, কর্ম দিবে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
 কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শান্তিময়,
 ক্ষান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
 বৈচিত্র্য আর অভিব্যক্ত জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
 কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
 জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেরেছে সে নতুনের আশ্বাসন.....

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজীব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে
 পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
 আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে
 চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই
 প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীর পথেও...দেশের সেবায় হিন্দুস্তান লিডার্স

PR 2-X52 80

নিউটন হরত ওঁদের নিয়েই প্রিন্সিপিয়া লিখতেন। ফুটি খিঁচ ভারী ভাঁসে লাগল। প্রতিটি ফুল তরুই ডিগ্গি কোণ করে আছে। সলা তার রং, মূখের কাছটা ঈষৎ হলুদে। যুগ্মযুগ্ম গন্ধ। অজ কোথাও একটু আমায়ের নীলগন্ধ পড়ল, এমন কি গ্রীনগরের মোগল উভান-গুলিতেও নয়।

সন্ধ্যায় আসে বানিহালে পৌছান সম্ভব হ'ল না—বাটোটে পৌছলাম। সন্ধ্যায় পর অন্ধকারে গাড়ী বাধে মা; রাত্রির বিপদের ঝুঁকি নেবে কো?

পাঠানকেই থেকে গ্রীনগর পর্যন্ত পথে মধ্যে মধ্যে সরকারী ডাকবাংলো আছে লক্ষ্মী, উদামপুর, কুল, বাটোটে, রামবাণ, বানিহাল, কাতিগুন্ডা-এ। বাটোটে ডাকবাংলোটি বেশ বড়। রাস্তা থেকে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে হয়। তাড়াতাড়ি যেয়ে একটা বড় ঘর আমর ভাড়া নিলাম। ভাড়া মাথা-শিছু আট আনা আর খাটিয়া-শিছু এক টাকা। মালপত্র বাস থেকে নামিয়ে বালোয় এনে বহাল-হাবিহত হওয়া গেল। চাঁদনি রাত। ডাকবাংলোর চাঁদ পাশে মস্তমস্তী ফুলের সমাধিতে। সামনের পাহাড়গুলোতে দীর্ঘদেহ লেহমাক আর পাইনের সারি আর তার ওপর একটা হাফা কুয়াশা। রীতিমত ইটলিক, একটা জীবন্ত কাব্য। স্বর্গের 'মর্দারতুর'-এর দৈবী ভুলোয়ার এককালিবার ভলে ফেলার দিন এমন রূপময় চাঁদনি রাত ছিল কিনা জানি না। ছলিছলকে প্রেম নিবেদনের সময় রামিও বলেছিলেন, 'এ হেন রাতে।' কিন্তু সে-রাতে কি এমনি ছিল?

বাটোটে কয়েকটি হোটেল আছে, নিতান্ত মামুলি হোটেল। মালিকদের অধিকাংশই শিখ। আগ্রা থেকে দেখে আসছি মোটর গাড়ীর আর হোটেল-রেস্তোরাঁর ব্যবসাসে এরা কেমন একচেটিয়া করে ফেলেছে। দেশ-ভাগের ফলে ওয়াও, আমাদের মতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পথের ভিখির হয়েছিল, কিন্তু সাহস, উত্তম, ঐক্যগেহ ওঁদের আজ আবার মাযুব করে তুলেছে। একটা শিখকে ভিক্সা করতে কোথাও দেখলাম না। আর আমরা? এত গুণ থাকা সত্ত্বেও এমন লম্বাছাড়া জাত আর আছে কোথায়? আত্মসম্মানবোধটা বোধ হয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

বাটোটের হোটেলের স্ট্রিট, ভাত, মাংস পাওয়া যায়; ভাতের স্বাদ আর স্বাদ চমৎকার! জম্মুর বাসমতী চালের মতই সুগন্ধ। বাংলা দেশেও এ-চাল উৎপন্ন হয়, তবে কান্দীর ও জম্মুর মত এতো নয়। মাংসে স্ট্রিট এল না—বোটকা গন্ধে ভরা। প্রথমে রান্নার লোব বলে মনে হয়েছিল, পরে জানতে পেরেছিলাম সারা কান্দীরে পাঁটা আর হুবার মাংসের গন্ধ ঐ বন্ধই। এককালীর খাই নাকি ঐ গন্ধের জন্ত দাঠ। হুংগীর মাংস খুইই সুস্বাদু। বানিহাল থেকে আরম্ভ করে গ্রীনগর পর্যন্ত সর্বত্র আমরা এই 'নিবিড় মাংস' ভুজি পেরেছি।

রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। সকাল সাতটার বাস ছাড়বার কথা। একত্রে পাঁচটার উঠতে হোল। মেয়েরা ঠোঁট ঝেলে চা করে বেসলেন, টোটে ভৈরী হল। এক কান্দীরী জাল-বন্দুতি এখানে আমাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিলেন। তাঁরা কিছুই খেলেন না। পাশে ফল ছাড়া আর সব তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য।

সকাল সাতটার বাস ছাড়লো। শীতে আমরা ঠুঁকুঁক করে ঝাঁপছি। ভারী কোঠির ভিতরেও হাত পা কঁকনিয়ে উঠছে।

একটা হাফা কুয়াশা জমনও চারদিক ছেঁয়ে আছে। হুং পাহাড়ের উচ্চতর, হুংয়ের সোহাগিী আভা দেখে বুঝলাম—তিমিরবিহারের অন্তরায় হয়েছি।

বহুবর মনোজ মুখার্জি চন্দননগরের পৌর-পিতাদের অন্তরায়। অকৃতদার, বামপন্থী, আধা-দার্শনিক। হঠাৎ হকুম করলেন—গান লাগাও 'আমাদের যাত্রা হল সুখ।' হেমপ্রভা, পুষ্প আর ততাদির গলা বাসা। তাঁরাই শুরু করলেন। সেই কুয়াশাভরা হিম-নিম্ন প্রভাতে কান্দীরের পাশে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সন্ধ্যা-সুগন্ধ। কবিগুরু সাধনা যে বিশ্বজনীন তা সেদিন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলাম। বাসের মধ্যে যে ৬০৬ এন অবাকাসী ছিলেন তাঁরাও নিশ্চক্ষে সে-সুখা পান করছিলেন। বাংলা দেশ থেকে সেড হাজার মাইল দূরে আছি, একথা আমরা তুলেই গিয়েছিলাম। দূরের পর্বতরাজির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম—যাত্রা ত শুরু হোল, কিন্তু চলেছি কোথায়? আত্মবিমুত হয়ে ভাবছিলাম—এই ত সেই কান্দীর! কথাসিংহগার রচয়িতা কবি শোমদেব, দ্বিতীয় চাচুকা বংশের রাজা বিক্রমাদেবের সভাকবি বিজলন, যব-শেখ বৌদ্ধগুণ প্রচারক রাজপুত্র গুণবর্ধনের শেখের মাটির উপর দিয়ে চলেছি। মনে পড়ল 'ঐক্যমৌরিক মহামাত্য চম্পক প্রতাপুত্র বহনকৃত' রাজতরঙ্গিনীর কথা—ভূবর্গের জয়কথা থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু রাজাদের কাহিনী। প্রথম কল্লহর থেকে ছটি মহুর কাল পর্যন্ত হিমালয়ের কুম্ভিরেশের নিকটবর্তী ভূভাগ জলপূর্ণ ছিল। নাম ছিল তার সতীসর। তারপর বৈবরত মন্বন্তরের সময়ে প্রজাপতি কাজল-শ্রদ্ধা, বিষ্ণু, কুরু প্রভৃতি দেবতাকে সেখানে এনে প্রস্তাবগুলির নিরোধ করলেন। ভূমিতে পরিণত হোল সর্বাব্য এনে। জন্ম হোল 'কান্দীর' প্রদেশের। তারপর কত অমিতবিক্রম রাজা রাজত্ব করলেন, গড়লেন কত পাথরের প্রাসাদ, কত মন্দির। মহাভারতের যুগের কথা। জরাগন্ধের বহু কান্দীররাজ গোনন্দ ঐক্যের মন্থাপনীর অবরোধ করলেন। বহুকাল পরে খেতহুনপতি, 'দুর্ধতি' মিহিরকুল কান্দীররাজের অনুরোধে কুরু রাজ্যের অধিপতি হলেন। তারপর বিবাহযাতকতা করে করলেন কান্দীর আক্রমণ ও জয়। দুর্ধতি হলেও তিনি গ্রীনগরিতে প্রতিষ্ঠা করলেন মিহিরেশ্বর শিবের। তারপর রাজা সন্ধিমতি, মহাধাখিক চন্দ্রপীড়, ভাটুনিবনকারী ভাগপীড়, ললিতাদিত্য, জয়পীড় অবজীবদা, মেঘবাহনদেব, তুল আরো কত রাজা রাজত্ব করলেন। ললিতাদিত্য কান্দীর থেকে পূবে প্রাগজ্যোতিষপুর, বরদেশ জয় করলেন। দ্বীরাভা বা মণিপুর জয় করতে যেয়ে দ্বী-সেনাদের নয় বাক্যে দেশ দেখে তাঁর সেনারা প্রায় খায়েল হয়েছিল। এই ললিতাদিত্যই চুয়াঙ্গী হাজার তোলা সোনা দিয়ে নির্দাণ করেছিলেন মুকাকেশ্বর ব্রহ্মহ। তারপর নেপালরাজ অয়নুজির সঙ্গে কান্দীররাজ জয়পীড়ের যুদ্ধ ও পরাজয়। বিধবা রাণী বিদ্যার কান্দীর শাসন—রাজা তুজের সময়ে 'তুরঙ্গগণের' প্রথম আক্রমণ। মনে পড়ল প্রাতঃসরগীর রাজপুত্র গুণবর্ধনের কথা। সিংহাসনের প্রোলোভন ভাগ করে মহাভাবের আকর্ষণে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমুদ্রপথে তিনি চীনও গিয়েছিলেন। কে জানে কোথা থেকে তিনি ফেরেছিলেন সেদিনের অর্ধরপোতে—হরত বাংলার ডায়ালিগ থেকে, হরত রক্তিম ভারতের কেনও বন্দর থেকে। এই কান্দীরী রাজপুত্রই চীন এক নুতন শিরদাঁড়ি

প্রবর্তন করেছিলেন। এই সেট প্রাচীন কান্দীর বার রাজকতাকে বিবাহ করেছিলেন। সপ্তম শতকের প্রথম পালে তিব্বতের রাজা শ্রাবিট সন্ন্যাসী। ইনিই ত কান্দীরের এক পণ্ডিতকে পাঠিয়ে কান্দীরী লিপি তিব্বতে নিয়ে এসে সামগ্রিক অঙ্গলবলন করে, তিব্বতের জন্তে তা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর পদ্মসম্ভব? চ্রিয়ালের বিখ্যাত সন্ন্যাসী তিনি। অষ্টম শতকে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন আর সেখানে তেঁরা বছর কাটিয়ে লামা ধর্মের প্রবর্তন করেন। তারপর ১০০০ খৃষ্টাব্দের কথা। তিব্বতী স্থপতিগণ, সংস্কারক, সন্ন্যাসী বিন্ সেন, বজান-পো দেশে মন্দির নির্মাণ, ভাস্কর্য আর চিত্র তৈরীর জন্তে কান্দীর, নেপাল আর বাংলা থেকে শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে বিক্রেত নিয়ে আসেন।

মন্দির রূপালি পূর্বীর একটার পর একটা ছবি ভেসে আসছিল। একটা মুহুর্থাৎ আশ্চর্য হলাম। হাজার বছরের যবনিকা আবার নেমে এল। গান কখন খেমে গিয়েছে। সঙ্গিনী পুষ্প বন্দে—
কি ভাবছিলেন তময় হ'য়ে?

বললাম—না, কিছু না। দূরের পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।

পথের ছোট্ট একটা ঘননা। বাসের দোলায় আমাদের জলের কুঁজোর খুঁটা ভেঙ্গে গেল। সন্ধ্যা অন্ধার বাঙ্গালী যাত্রীরা বললেন—
ফেলে দিন মশাই, কুঁজোটা। ভাস্ক কুঁজো অপসার।

দলের অবিমাত্র ক্রমে উঠল—না, আমরা ভাস্কাই নিয়ে যাব। যত সব কুলস্কার!

অপর পক্ষ বললেন—বাসটায় শুধু আপনাবাই যাচ্ছেন না, আমরাও যাচ্ছি। পথে বিপদ হ'লে কে তাব জন্তে দায়ী হবে? ফেলে দিন।

বাঁহা বললেন তাঁরা সবাই পুরুষ, বীতিমত ভ্রম-হরম, বাঙ্গালী। অবাকালীরা মাইনিরটি। তাঁরা চুপ করেই ছিলেন। অস্ত্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্তে কুঁজোটা ফেলেই দিলাম। ভ্রমলোকদের দোষ দিই না। এসব পার্শ্বতাপকে মাছুবের সংস্কার আপনাই সজাগ হয়ে ওঠে। যে ভগবান আর ভূত মালোকপ্রাপ্ত নাগরিকের কাছে আউট অফ বাউণ্ড, তাঁরাও ন'হাজার কিউ উপরে পার্শ্বতাপে বেশ কড়ে পান।

বেলা ম'টা নাগাল আমরা বানিহালে পৌঁছলাম। স্থানটা নানা কারণে প্রসিদ্ধ। সামরিক গুরুত্ব আছে। এখানে চার মাইল হুড়ঙ্গপথ জাঞ্চাল এতিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে তৈরী চলছে। এই চার মাইলের জন্তে দু'শো মাইল পার্শ্বতাপের ৪০ মাইল কমে যাবে। হুড়ঙ্গপথ আসলে দুটি—একটি পূবে আর একটি পশ্চিমে। পশ্চিমেরটি প্রথম তৈরী হয় হাক্কা ধরনের মোটরের জন্তে ১৯৫৬ সালে। সেটি মাঝে বন্ধ করে দিয়ে নতুন করে তৈরী হয়। সম্প্রতি এটি গত ২১শে ডিসেম্বর খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন সব রকমের গাড়ী আর মাছুব এই টানেল দিয়ে যেতে পারবে। ১৮ মাইল পথ কমে গেল এই হুড়ঙ্গটির জন্তে। এর নাম দেওয়া হয়েছে “জহর টানেল”। প্রধান মন্ত্রী নেহরু কয়েক মাস আগে এর উদ্বোধন করেছেন। পূর্বের টানেলটি খোলা হবে ১৯৬০ সালে। কাজ এখনও চলছে। হুড়ঙ্গগুলির জন্তে মোট ব্যয়-বরাদ্দ চার কোটি টাকা।

বানিহালের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। পার্শ্বভানবী নীচে গিয়ে

বয়ে রয়েছে—চারদিকে ভ্রামশোভা, বিভিন্ন রং-বাহার। এখানকার স্থানবাসীদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই ফুলের বাগান। প্রকৃতির যে কতখানি ক্ষমতা মাছুবের মনে রং-বাহার তা এখানে এসে বেশ বোকা যায়। বানিহালে বাস থামে যাবার সময় আধ ঘণ্টা, অসম্ভব সময় এক ঘণ্টা। বিশ্রামান্তে আবার চলা শুরু হোল। গত দিনের অবসাদ, মাথাধরা ইত্যাদি দলের কান্ধর আর ছিল না। চড়াই আর উৎসাহ-এর জন্তে ভাবনাও মিলিয়ে গিয়েছিল। “শরীরের নাম মহাশয়, যা সহ্যও তাই সর।”

পথে পড়ে ভেরীনাগ, শ্রীনগর থেকে ৬০ মাইল দূরে। শ্রীনগর যাবার পথে একটা মোড় ঘুরে ভিন্ন একটা পথ চলে গিয়েছে ভেরীনাগের দিকে। চার মাইল এই পথে ঝাঁরা যেতে চান, তাঁদের মাথা-শিঁটু কিছু দক্ষিণ বাসওয়ালকে দিতে হয়। ভেরীনাগে ঘেরে বেঁধেই আমরা দেখলাম, তার তুলনা সারা কান্দীরে নেই বসেই শুনলাম, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়েনি। সবচেয়ে বিভিন্ন আকর্ষণ হচ্ছে গভীর লাল রং-এর চীনার গাছগুলি। সারা কান্দীর উপত্যকার চীনারের প্রাচুর্য কিন্তু এমন মনমোহনো লাল রং আর কোথাও দেখিনি। চারদিকের সবুজের মধ্যে প্রকৃতির এই কাণ্ডা, হুম্মর কেয়ারী-করা রং-বেরংয়ের ফুলের বাগান, প্রবলমান ঝিলমের ধারা, অসূর দৃষ্টমান তুবারকিরীট পীরপঙ্কালের স্বর্বাঙ্গি—সে দৃশ্য ভোলা যায় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তা দেখলে পাগল হয়ে যেতেন। চীনার গাছ জমুতে হু-চারটে দেখছি—বর্ষাকাল, বিবর্ষ। একমাত্র কান্দীর উপত্যকাতেই এদের লালিমার বিকাশ। ষোড়শ শতকে সম্রাট আকবর পারস্ত দেশ থেকে কয়েকটি চীনার গাছ এনে কান্দীরের মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারাই বংশব্রতি করে সারা কান্দীরকে আরও সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। শ্রীনগরের এস, পি কলেজের অধ্যক্ষ জিলানী সাহেব আমাকে বলেছিলেন যে, পারস্তেও চীনার গাছ এত বড়, এত হুম্মর হয় না। কান্দীরীদের কাছে চীনার হচ্ছে জাতীয় ফুল। শালের ওপর চীনার পাতার ডিজাইন, আখরোট কাঠের চীনার পাতা, চীনার পাতা-ট্রে, পেপার-মাসির উপর চীনারের চিত্র—চীনার-প্রীতিরই বাহ্যপ্রকাশ। বৈভব দিনে চীনারের পাতা দরিত্রের কুটিরকে গরম করে রাখে। অজান্তে পাতার চেয়ে এর অয়িদেবকে সহ্য করার ক্ষমতা বেশী। চীনার

স্ত্রীরোগ, ধবল ও

বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের ব্যবহার
রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার
পত্রালাপ বা সাফাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্রাশন্যাল কিংস সেক্টর

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

সন্ধ্যা ৩।—৮।।। কোম নং ৪৬-১০৪৮

পাড়ার সঙ্গে গোবর মিশিরে কাকীরাবা যে ঘুঁটে তৈরী করে, তার তাপ-বিকিরণের ক্রমতা অপেক্ষাকৃত বেশী আমাদের দেশের ঘুঁটের চেয়ে।

ভেরীনাগ হচ্ছে বিলার নদীর উৎস। মুন্সেবে যেমন সীতাকুণ্ড আছে, এই উৎসটিও তেমনি একটি কুণ্ড। ঠাণ্ডা, নীল তার জল। গভীরতা ৫৪ ফিট। উৎস বলে মনেই হয় না—এক শুষ্ক, নিখর এর জল। ট্রাউট মাছেরা শতে শতে খেলা করে বেড়াচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কুসেক পরিমিত জল নাচে থেকে ওপরে উঠছে। এটা বোঝা যায় কুণ্ডের বাইরে বেয়ে, যেখান দিয়ে পাথরে বাঁধান অগভীর খাদ বেয়ে অলস্রোত ভীষণ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডের চারপাশে পাথরের তৈরী ঘর আছে। পাথর দিয়ে বাঁধানোর কাজ জাহাজীর ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করেন আর শাহজাহান ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে তা শেষ করেন। হিন্দু-আমলে ভেরীনাগের নাম ছিল নীলনাগ। নীলনাগ হচ্ছেন সর্পদেবতা। বহুমানের ‘রাক্ষসবিনিনী’তে আছে—নাগগণের আদেশে নীল নামক নাগ বিত্তা নদীর প্রস্রবণকে আতপত্রস্থানীর করে সর্পরা কাকীরাবকে রক্ষা করেছেন। ভেরীনাগ, কোকরনাগ, অনন্তনাগ, শেবনাগ ইত্যাদিতে নাগের ছড়াছড়ি দেখে মনে হয়, শ্রদ্ধাকালে অনু-আর্য নাগপূজা এখানে বেশ চলত। অবশ্য সেই নাগ এখন রূপান্তরিত হয়েছেন দেবদেবির মহাদেবে। ভেরীনাগে দেবপূজা এখন আর হয় না।

ভেরীনাগ দেখে আবার চার মাইল পিছু হটে জীনগরগামী পথে এসে পৌঁছলাম। ক্রমশঃ সমতল ভূমিতে এসে পড়লাম—পার্বত্য-পাথর শেষ হোল। বোলা তখন একটা—জীনগরে পৌঁছলাম। বাগ এসে সহরের হাকখানে টুরিষ্ট রিসপসান সেটারে বিস্তৃত চব্বরের মধ্যে প্রবেশ ক’লে। এই কেন্দ্রটি একটি এল-আকৃতির বড় দোতলা বাড়ীতে স্থাপন করা হয়েছে সম্প্রতি। নতুন বাড়ী—ককমকে তক্তকতে; সামনে, আশে-পাশে ফুলগাছের সারি। কয়েক শ’ গজ দূরেই পার্বত্যমালায় উন্নত বিস্তার। সারা জন্ম আর কাকীরাবের জন্ম সঞ্চার্ত অধিকর্তার অফিস এখানে। বাকীরাবের সুখসুবিধার দিকে তাঁর কড়া নজর। কাকীরাবের শতকরা ২০ জন অধিবাসী ভ্রমণকারীদের উপর জীবিকার জন্ত নির্ভর করে, সরকারেরও প্রচুর আর হয়। সুতরাং খাতকদের সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর রাখতেই হয়। এই কেন্দ্রে বহিরাগতদের থাকবার জন্তে অনেকগুলি কাছারা আছে। আকার হিসেবে তাদের ভাড়া। সাধারণতঃ একদিন মাত্র এখানে থাকতে দেওয়া হয়; তা’পর বার বেরিয়ে খুঁদী—হোটেলের বা হাউসবোটে চলে যান। অধিকর্তার নিজের অফিস দোতলায়। একতলায় বড় হলঘরটায় নানা বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার আর বিভিন্ন স্থানে বাবার জন্ত বাসের টিকিটের কাউন্টার আছে। অফিসাররা সবাই ভদ্র আর সাহায্য করবার জন্তে সলাই উত্থু। একতলার আর দোতলার সিঁড়ি কাঠের তৈরী—কাকীরাবী নক্সা করা। এখানে একটি ডাকঘরও আছে।

দৈনিক পনের টাকা ভাড়া কল করে একটা বড় ঘরে আমরা উল্লাম। কাছারাটি অবশ্য তিন জনের থাকবার মত অর্থাৎ তিনটি মাত্র পাট আছে। কিন্তু ঢালাও পালিটার উপর প্রচুর যারণা—সবুজের শোবার ব্যবস্থা করা যায়। রাজা-মহারাজা-জমিদার

নই, নিতান্তই সম্মানিত আমরা। তিনজননের কামরাতেই এগারো জনের ব্যবস্থা করা হোল। এখানের পরিবেশটা এতই মনোময় যে, সহজে ছেড়ে বাবার ইচ্ছে কার্য দিল না।

টুরিষ্ট রিসপসান সেটারে চারের জন্ত একটি ভালো থেক্টার আছে। ভাত রুটি বাইরে খেয়ে আসতে হয়। বার্ষিক পরিবেশ সে বারিটার আমাদের ভালই নিশ্চয় হোল। পবনিন গুলমার্গ আর খেলনমার্গ যাওয়া স্থির হয়েছিল; টিকিট কাটা ছিল। সকাল সাড়ে ন’টার বাস ছেড়ে যায়। ভাড়া টনমার্গ পর্যন্ত যাতায়াত ২’২৫ টাকা। জীনগর থেকে টনমার্গের দূরত্ব ৩৪ মাইল। ওখান থেকে ঘোড়ার চেপে চার মাইল গেলে গুলমার্গ আর সেখান থেকে তিন মাইল দূর খেলনমার্গ। টনমার্গ থেকে ক্রমশঃ পাহাড়ের উপরে উঠতে হয় তার উপর ঘোড়ার চড়া। ঘোড়া মানে ওয়েলার নয়, পাহাড়ী টাট।

খুঁটি আর শাড়ী পরে ঘোড়ার চড়ে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হলেও উচিত নয়—বিপদের ঝুঁকি আছে। তাই আমরা, ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত হয়েই গিয়েছিলাম। মেয়েটাও চোস্ত, বা পাখলুন পরে, কেউ বা মারাঠি কাঁদায় শাড়ী পেঁচিয়ে নিলেন। পাহাড়ের উপরে কনকনে ঠাণ্ডা বলে আকুল ঢাকবার জন্তে দ্বাভু, গলার জন্ত পশমের মাফলার, পুরুষদের টুপি আর মেয়েদের হেড-স্কার্ফ নিয়ে যাওয়া দরকার। ওভারকোট অত্যাবশ্যক। গ্রীষ্মকালে অবশ্য এসবের প্রয়োজন হয় না।

জীনগর সমুদ্রের স্কেলে থেকে ৫২০০ ফিট উঁচু, গুলমার্গ ১৫০০ ফিট আর খেলনমার্গ ১১৫০০ ফিট। সুতরাং পূজার ছুটিতে গেলে কনকনে ঠাণ্ডার জন্তে প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। টনমার্গে পৌঁছতেই ঘোড়াওয়ারালা ঘোড়া নিয়ে ভিড় ক’রে পাড়ায়। হুজাতের ঘোড়া আছে। একটু মোটাসোটা, চিকণ-চাব্বের নাম কাঠ’ রাস। রোট টনমার্গ থেকে গুলমার্গ হ’য়ে খেলনমার্গ পর্যন্ত ১৪ মাইল যাতায়াত বাবদ সাড়ে ছ’ টাকা। একটু পাখীরা জ গোছের ঘোড়ার রোট সাড়ে পাঁচ টাকা। এর নাম সেকেন্ড রাস। কলকাতার গুলমার্গ-ফেরত বন্ধুর সাহায্য করে দিয়েছিলেন—ঘোড়াগুলোর স্বভাবই নাকি শাদের ধার বেঁচে যাওয়া, হাজার লাগাম ধ’রে টান মারলেও খাদ বেঁচে যাবেই। সুতরাং পৈতৃক প্রাণটা রাখবার ইচ্ছায় আমরা পাখীরা জেই চড়া স্থির করলাম। অন্ততঃ ধীরে ধীরে ত বাবে।

প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে সহিস থাকে। সহোদরের সুখ-সুবিধের দিকে তার কড়া নজর। কারণ টাকটা সিকিটা বকশিশের সে প্রত্যাশা করে। তাকে হেঁটে হেঁটেই চড়াইরে উঠতে হয়। মুক্তারাম বাবু ট্রাউটের বন্ধুর ভবনী আড্ডা সজ্জা গিয়েছিলেন। তাঁর গৃহিণী একটা সাদা ঘোড়ার চেপে সবাই আগে আগে চলেন—সহিসের সাহায্যও নিলেন না। মহিলাদের বীরবেশ দেখে মনে হোল—এরা বাঙ্গলার ঘরকুশো মেয়ে, না প্রদীপার দল? অবস্থা বিশেষে মাহুঘ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বাঙ্গী বাঙ্গান-ওয়ারা বাঙ্গালীঃঃ অগ্নি ধরতে বেগ পেতে হয় না। সেই নিম্মন পার্বত্যপথে, দেবদাক আর পাইন-অরসোর মধ্যে সর্দারী চড়াইরে আমরা ছিলাম সেদিন সবাই বজবাসী। বাঁরা আগে গিয়ে ফিরছিলেন তাঁরাও। মনে হ’চ্ছিল আমরা যেন বাঙ্গলার নাকিলি—এই আছি।



পিয়াস

সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!

পিয়াস সাবান—বিশুদ্ধ মিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য সাবান—আপনার
হকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপদ।
হৃগন্ধ পিয়াস সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার নিত্য সঙ্গী হোক।
শিশুদের কোমল হকের পক্ষেও পিয়াস আদর্শ।
পিয়াস ট্যালকাম, এত মধুমলের মত মোলায়েম, এত অপূর্ণ হৃগন্ধ—
আপনাকে সারাদিন সতেজ, হৃদয় রাখে। হৃদয় হৃদয় হৃদয়—সবুজ—
সোনালী চেনে পিয়াস ট্যালকাম কিম্বদ।



ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগল। বুরলাম, বন্ধু! খাঁস সবক্কে নিতান্তই কলমার্গের জল খেতেছিলেন। ঠিকভাবে বলতে পারলে বোড়া নিরবধতই আর আর খাঁসও তেমন গভীর নয়। গভীরতা কোথাও এক-কোমর, কোথাও এক-গলা। পড়ে গেলেও মরবার ভয় নেই, হাড়গোড় একটু-আটটু ভাঙতে পারে মাত্র। তবে বোড়ারা সবাই ওস্তাদ। এ-পথ তারা ভালভাবেই চেনে। জল দেখলে, পথে কাদা দেখলে পথ শুঁকে শুঁকে আন্তে আন্তে চলে। তার পর সহিস তো আছেই। ভয় হচ্ছে উইরাই-এর সময়। তখন যদি ভাড়াভাড়ি নামবার লোভ শবরণ করতে পারা যায়—ভয় কিছুই নেই। পায়ে হেটে ওপরে ওঠা যে কষ্টকর তা মালুম হোল সহিসদের মধ্যে। ওরা এ-পথের ঘু হ'লেও বীভূত হ'ইপাচ্ছিল।

কথা হচ্ছিল আমাদের সহিসের সঙ্গে—ভাদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে। মাইনে পাঁচ ওরা মাসিক ১৫৮ থেকে ২৫৮ টাকা। এই সমস্ত আদে চলে না—জমিজমাও কাকর নেই। যাত্রীরা দয়া করে বা বকশিশ দেয়, তাতে কিছুটা সুখই হয়, তবে দুঃখ ঘোচে না। প্রতিদিনের আর বোড়ার মালিকের। অবশ্য আর অল্পসারে তাঁকেও সন্মানে করে দিতে হয়। কিন্তু তিনি মাত্র বোড়ার মালিক হয়ে, না খেটে জ্বল থেকে অস্তাব-নভের পর্যন্ত ভালো আয়ই করেন। আর বোরাই সহি? এদের কথা কেউ ভাবে না। সহিস বললে—ভারত স্থান স্থান স্থানে গুলমার্গে ছিল যেতকায়েদের একটি বড় আন্তান। হাজারে হাজারে তারা আসত, উৎসবও হোত। সহিসদের মধ্যে তখন হাসি লেগে থাকত। আজও অনেক সাহেবের কাঠের বাড়ী অবশ্য পড়ে আছে। গুলমার্গে দেখলাম, কাঠের বাড়ীর চাল ছাণের ওপর শিশির জমে আছে। রোদে ক্রমশঃ গলে টুপটুপ করে পড়ছে। সহিস বললে—আপনাদের ভাগ্য ভালো, আকাশ এখন পরিষ্কার। এখানে ২৪ দিন ছাড়া জল হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে, নভেরে কখনও কখনও তুষারপাতও হয়। অন্ততপক্ষে ঠাণ্ডাটা তখন অসহ্য হয়ে পড়ে।

অবশেষে সাড়ে ন'হাজার ফিট উঠতে গুলমার্গে পৌঁছলাম। ওপরটার বেশ ঝুঁকি সন্মতভূমি আছে। এখানে কিছুকণ বিজ্ঞান আর দুপুরের আঁহা সেরে চড়াই অভিবান। ছোট-বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ এখানে অনেক। বোর্ডিং-এরও অভাব নেই। বারটি বড় বড় বোর্ডিং-হাউস আছে। এদের মধ্যে বাগলাহী মেজাজের হোটেল হচ্ছে 'নেহরু হোটেল'। দৈনিক খরচ ১৮ টাকা থেকে ৪০ টাকা। দৈনিক ৫৮ টাকার নীচে কোনও হোটেল এখানে নেই। কাশ্মীরের মহারাজার একটি প্রাসাদ আর ভারত সরকারের প্রতিনিধির বাসবার জন্তে রেসিডেন্সিও আছে। এক সময়ে গুলমার্গের সমস্তভূমিতে ইউরোপীয়রা গল্ফ খেলতেন। এখনও গ্রীষ্মের আর গুলমার্গে সরকারী গল্ফ ক্লাব আছে।

কিছুকণ বিশ্রামের পর আবার চলা শুরু হোল। গুলমার্গে ওঠবার তিন মাইল পথ এক এক বাগলাহী বেশ সজীর্বা। সন্ধ্যার ঘু'পাশে বিশাল, উন্নত সেবাদার আর পাইনেরা কেন সব সজীর্বা প্রহরী। বহুদূর থেকে এখান অল্পচর নদীর মত ঘুবে সজীর্বা রেখে যেন বলছে—'হু'পা! ভয়ঙ্কর এই সজীর্বা। সত্যিই হিমালয়ের এই সব সজীর্বা মাছের মনে একটা বিরাট অদ্ভুত জাগার, ভাবা তখন শুধু হয়ে আসে। বড়ই উপরে উঠছিলাম, ততই নিখোশ নেওয়ার একটু যেন কষ্টবোধ

হচ্ছিল। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের বেয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র নন্দাদেবীর পথহলে কেন মুচ্ছিত হয়ে পড়ছিলেন, তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল ওপরে উঠতে। ওপরে অশূন্য দৃশ্য! সত্যিকার ভূবায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হোল। পাঁছের নীচে, কাঁকা বায়গার, পাখরের ওপরে পের্ণা-পের্ণা তুলোর মত পড়ে আছে। আমরা শিশুর মত হয়ে গেলাম। সমস্তভূমিবাসী বাঙ্গালীর তা'না হ'য়ে উপায় নেই। সেই পের্ণা-তুলো হাতে নিয়ে এ ওর গারে একটু ছড়িয়ে দেওয়া গেল। ওপর থেকে চারিদিকের পাহাড়ের আর সমস্তভূমির বিচিত্র দর্শন মেলে। আমাদের গাইড বললে—এ দূরে দেখুন, নালা পর্বত—২৬,৬২০ ফিট। গুললাম কাশ্মীরের অল্প এক স্থান থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বত কে—২ বা গডউইন অর্ডেন (২৮,২৭৮ ফিট) দেখা যায়।

গুলমার্গের ওপরে একটি চায়ের দোকান আছে। মালিক একজন শিখ। বাত্রীদের বসবার জন্তে কয়েকখানি চেয়ার-টবিলের ব্যবস্থাও ইনি করে রেখেছিলেন সমস্তভূমিটুকুতে। ১৫ই নভেম্বরের পর আর থাকা চলে না, তাঁকে নেমে যেতে হয়। তখন তুষারপাত শুরু হবার সময়।

গুলমার্গ, গুলমার্গ আর সোনামার্গে বোড়াই সবচেয়ে ভাল বাহন। পায়ে হেটেও কেউ কেউ ওঠেন। তবে পাইনের বরা-পাতার পাঁচিলে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। বোড়াই এ-পথে নিশ্চিন্ত বাহন। ধীরে বিশেষ সুলভুতি, তাঁদের পক্ষে ভাঙা ছাড়া গতি নেই। খরচ কিছু বেশী পড়ে অবশ্য।

গুলমার্গ থেকে নামবার সময় দেখা হোল একদল ভারতীয় সৈন্তের সঙ্গে। টহলদারী দল। ত্রেণগান, মেনিগান, রাইফেল, তাঁবু ইত্যাদি নিয়ে এরা উঠে এলেন। জিন্সালা করে জানলাম, তারা ২৫ মাইল দূরে পাক-ভারত-সীমান্ত থেকে টহল দিয়ে ফিরছেন। বললাম—এতটা পথ এই ভাবে ভারী বোকা নিয়ে হেঁটে হেঁটে এলেন?

উত্তর মিলেন একজন—এ আর কি! দেশরক্ষার জন্তে এঁরু কষ্ট করতে হবে বৈ কি!

ভারী ভালো লাগলো যুগের দুগু ভঙ্গীটি। ভাঙ্গলাম সব ঠিক আছে। দেশরক্ষার জন্তে জোয়ানদের উৎসাহের, আন্তরিকতার অভাব নেই। শুধু কর্তব্যের হেড-এ কিছু গোলমাল, এই বা।

নামবার সময় ঠিক হোল, গুলমার্গ থেকে বাকী চার মাইল হেঁটে নামা হবে, বোড়াগুলাকে নুরো ভাড়া কবুল করেও। চোখ খুলে দৃশ্য দেখা। ত বটেই, উইরাই-এর কঠোর অভিজ্ঞতাও হবে। মুচ্ছিত হল শুধু একজনকে নিয়ে—গুভার্নিকে। প্রায়ে তিনি আমাদের চেয়ে বেশী। অধিমা ঠাটা করে বললে, গুভার্নি, সাবান কি? মাংস ইনটু ভেলগিটির ব্যাপার। দেখে-শুনে পা ফেলবেন। না হলে একেবারে বুলডার হয়ে গড়াবেন।

গুভার্নি রসিকতার চটেন না। মুচকি হেসে সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন।

বহু ইউরোপীয় পর্যটক কাশ্মীরকে 'প্রকৃতির কার্পেট' বলেছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। সর্বত্রই আমরা প্রাকৃতিক স্ন-বাহার লক্ষ্য করেছি। কিন্তু গুলমার্গ থেকে টুনমার্গ পর্যন্ত হেঁটে নামবার সময় আমরা যা দেখলাম, বাস থেকে বা বোড়ার চড়ে তা দেখা সম্ভব নয়।

শাল, সবুজ আর হলদে রঙের খেলা। সবুজের সঙ্গে মিশেছে উপত্যকার শাল চীনাবের রং আর মাঝে মাঝে প্যাটার্ণ কুনছে পাহাড়ের ওপরে হলদে পাতাওরলা গাছ। থাকে থাকে বেন, এক একটি কাপেট রচনা করেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে প্রবহমান পার্কভ্যানের রূপও অদূর দেখায়।

শ্রীনগরে কেবলবার পর ঘোড়ার চড়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হোল। শরীরের সর্বত্র ব্যথা, পা বেন আর চলে না। দিন হুয়েক এই টনটনানি থাকে। ব্যথার চোটে মেয়েরা বললেন—সোনামার্গে আর নয়। অবশ্য পরে এই সিদ্ধান্ত বলাতে হয়েছিল।

পাতভাড়ি গুটির পরদিন বাত্মা করলাম পহলগাঁও। দেশী নাম পহলগাম। শ্রীনগর থেকে সোজা-পথে ৭২ মাইল। কোকরনাগ, অছাবল হয়ে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখে গেলে ১৫৫ মাইল। টুরিষ্টরা এই দ্বিতীয় পথটি বেছে নেন, কাশ, কোকরনাগ, অছাবল দেখবার মত। প্রথম পথের ভাড়া রিটার্ণ ৫১০ টাকা আর দ্বিতীয়টির ৬১০ টাকা। সরকারী টুরিষ্ট বাসে ২২২৪টি আসন থাকে, মোটঘাট বার মাথার উপরে। একদিন আগে থেকে টুরিষ্ট রিসেপশান সেটায়ের টিকিট করে রাখলে আসন সবক্কে নিশ্চিত থাকে বার।

পহলগামের পথে সবচেয়ে বা চমক লাগায় তা হচ্ছে পশলার-এভেন্যু। সোজা, খাড়াই গাছগুলি। অনেকটা বৈজ্ঞানিক ধুটির মত। ওপরের নিকে ছোট ছোট কয়েকটা ডাল-পালা। বড় হলে গুড়ির রং হয়ে যায় সালা। কান্দীরের অশ্রুও এই রকম পশলার এভেন্যু করবার চেষ্টা করা হচ্ছে—চারা গাছ লাগান হয়েছে।

কোকরনাগে এসে বাস প্রথম থামল। এখানে তিনটি উৎস আছে। পাথর ভেদ করে বেরিয়েছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ চারদিক বীধিয়ে দিয়েছিলেন। চারদিকে পাথরের দেওয়াল আর তার মধ্যে বাগান। সর্বত্রই চীনাবের দর্শন মেলে। অছাবলে উৎস ছাড়া স্বন্দর বাগান আর ট্রাউট মাছের সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

হুপরে পহলগাম পৌঁছলাম। পাহাড়ের মাঝখানে স্বন্দর, ছোট এই গল্পী। পথগুলি পিচ্ দিয়ে বীধান। কয়েকটি ভূবিষালের, মণিহারির আর সবুজের দোকান আছে। শাল-কাপেটের দোকানগুলিরই এখানে আভিজাত্য। কাপেট, গাফা আর শাল এখানেও ভৈরী হয়। কম-নামী কাপেট আর গাফা কিনতে হলে শ্রীনগরের চেয়ে এ বারগাই ভালো। একটি ডাকঘর আছে—মরতমে চালু থাকে। ১৫ই নভেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। টুরিষ্টদের আহার ও বাসস্থানের জন্তে কয়েকটি ভালো হোটেল এখানে আছে। বাড়িগুলি মূলতঃ কার্টের, কারণ, ও অরণ্য-সম্পদ এখানে প্রচুর। মালিকদের অধিকাংশই শিখ। পাঁচটি ভাল হোটেলের মধ্যে আমরা এসে উঠলাম পহলগাম হোটেলে। এ-হোটেলগুলির থাকা-খাওয়ার ব্যয় জন-প্রতি দৈনিক ১—১২।০ টাকা আর শুধু থাকার ব্যয় জন-প্রতি ৫—১০ টাকা। অবশ্য এ হিসেব মরতমের। বে-মরতমে অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গেলে অপেক্ষাকৃত কম। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেই বাত্মীরা হোটেল ছেড়ে চলে যান, দোকানগুলিও বন্ধ হতে শুরু করে। ভূষাধিপত্য সাধারণতঃ ১৫ই নভেম্বর থেকে শুরু হয় কিন্তু তার আগে থেকেই আহাওয়া কনকনে হয়ে ওঠে।

আমরা বখন পহলগামে এসে পৌঁছলাম, তখন চাদের হাট ভেঙে

গিয়েছিল। অর্ধেক দোকান বন্ধ। পাঁচ মাসের জন্তে পাকপাকি ভাবে দয়জার উপর কার্টের প্যানেল দিয়ে পেরেক বুকে বন্ধ। হোটেলও বন্ধি নেই। আমরা আর এক পাড়াবী পরিবার। মাসখানেক আগে এই আধা—নিজ্ঞনধুরী ছিল গুলজার। হোটেল ত ভিলধারের স্থান ছিল না, মাঠের মাঝখানে তাঁবুতে বাস করতে হয়েছিল। হোটেলের দুখানা কামরা জুটেছিল সস্তা-ভাই। সন্নিবাসের কল্যাণে স্বপাক ভোজনও চলেছিল। তিন আনা সের আলু আর সওয়া পাঁচ টাকা সের খাটি বি। দুতরফা একটু খাটখাটনি করলে এখানে খাওয়া ভালই জোটে।

শ্রীনগরের অনেকই বারণ করেছিলেন ও সময়ে পহলগামে থাকতে। জমে বাবার নাকি সভাবনা। দেখলাম কনকনে ঠাণ্ডা ঠিকই, তবে জমে বাবার মত নয়। ওখানের সকল লোককেই দেখেছি লম্বা পা-পূর্ণাঙ্গ ঢিলে আলখান্না চাপিয়েছে জামার ওপর। প্রাত্যহিকের কাছে এক একটি আঙ্গোটি। বেত দিয়ে একটা তাঁড়ের মত তৈরী করা হয়, ভেতরে থাকে একটা শোড়। মাটির পাত্র আর তাতে জলজ্ব অঙ্গার। একটা হাতল আছে। তাই ধবে আলখান্নার ভেতরে বৃকের কাছে আঙনটা রাখে। শ্রীনগরেও এই রীতি। তবে ডিসেম্বর থেকে এটা সার্বজনীন। সন্ধ্যার আগেই হোটেল ফিরতে হত। তার পরে আর বাইরের ঠাণ্ডা সহ্য করা যায় না। দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে লেপ-কম্পন হুড়ি দিয়ে তোকা রাত কেটে গেছে। নভেম্বরের বাত্মীরা



ফোন ৩৪-৩২৩৩

প্রি, প্রি, আড্য

১২৫-বি বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

এসেছেন শ্রীনগর থেকে। দিনের বেলা এসে দেখে-শুনে সন্ধ্যার আগে ফিরে গেছেন। আমরা কিন্তু পহলগামের দীতকে, দ্বারগত জানিয়েছিলাম।

এখানে তুবারপাত হয় আগেই। সাধারণতঃ ১৫ই নভেম্বরের পর থেকে আরম্ভ হয়। শ্রীনগরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। কিন্তু আজকাল নাকি ইতরবিশেষ হচ্ছে। একজন কান্দারী অধ্যাপক রহস্য করে বলেছিলেন, বোধ হয় রাশিয়ার আর্থিক বিক্ষোভের জন্মেই ঋতু-পরিবর্তন এই ব্যতিক্রম। পহলগামে তুবারপাত আট ফিট পর্যন্ত হয় আর শ্রীনগরে দু'ফিট। পাহাড়ের ওপর নাকি পঁচিশ ফিট তুবার জন্মে। এবার তুবার পড়েছে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আটটাল্লিশ ঘণ্টা একটানা বৃষ্টিপাতের পর। তুবারপাত নাকি এবার এতই বেশী যে, ভারের চোটে বড় বড় গাছ পড়ে গেছে। মার্চের প্রথম দিকে এই তুবার কান্দারীর সর্বত্র গলতে থাকে, মায়া মাস ধরে চলে এই গলানির কাজ। তখন পার্বত্য নদী আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বর্ষায় আর একবার উচ্ছ্বাস। মে-জুন মাস থেকে তু-শর্গ আবার জ্বালিমায় ঢাকা হতে শুরু করে, ফুলের বাগানগুলি আবার জ্বলে ওঠে, ভাল হ্রদে পদ্মের অরণ্যে আসে প্রাণ-তরঙ্গ।

পহলগামই আখরোট উৎসবের প্রধান কেন্দ্র। বারো আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত শ'। একশো প্রায় সত্তর। কলকাতার তার দাম প্রায় পাঁচ গুণ। আপেলও দশ-বারো আনা দেয়। শ্রীনগরেও তাই। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নাকি আপেল চার আনা দেয় ছিল। আখরোট গাছ এখানে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর। বড় বড় গাছ—আমাদের আম-জামগাছের মত। এর কাঠ থেকেই নানা কাঠের খেলনা তৈরী হয়। বানামও প্রচুর পাওয়া যায়। ছাড়াও বানামের দাম সাড়ে তিন টাকা দেয়, কলকাতায় আট টাকা।

আমাদের হোটেলের সামনে দিয়েই প্রবাহিত শেবনাগ নদী বা নীলগঙ্গা। জলস্রোত প্রবাহ কিন্তু হেটে পেরিয়ে যাওয়া যায় যদি সাহস থাকে। রাত্রিতে চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে নীলগঙ্গার গুরুগম্ভীর ধ্বনি দূরগত সমুদ্রের গর্জনকে মরণ করিয়ে দেয়। অমরনাথের পাখে কিছুটা এগিয়ে গেলে পহলগামের শুক সৌন্দর্য অভিভূত করে ফেলে। এখানকার জলহাওয়া অত্যন্ত স্বাদুকার,



পহলগাম : অমরনাথের পাখে।

শ্রীনগরের চেয়ে ভালো। ধারা নাগরিক জীবনের জঞ্জাল থেকে কণিক মুক্তির জন্যে কান্দারী আসেন, তাঁদের এখানে কয়েক দিন কাটিয়ে যাওয়া দরকার। এমন নাউটনিক খুব কমই আছে।

আশে-পাশের গ্রামে আমরা গিয়েছি, কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনাও হয়েছে। আমাদের দেশের চাষীদের তুলনায় এরা আরও দরিদ্র। এদের ছেলেমেয়েরা বাড়ী দেখেই হাত পাতে। স্বল্পর কচিকচি মুখগুলিকে হাত পাতে দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়। বাংলায় দারিদ্র্যের চির-অধিষ্ঠান। মানুষকে ডাউবিন থেকে ফুকুরের সঙ্গে আহার খুঁজতে আমরা দেখেছি। আমাদেরই দেশে পকাশের মনস্তত্ত্বের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। তবু এদের দারিদ্র্য প্রাণে আঘাত দেয়। প্রকৃতি যেখানে ক্ষুধার্ত রচনা করেছেন অরুপণ হাতে, যে-দেশের মানুষকে এত রূপও তিনি দিয়েছেন, সে-দেশে মনস্তত্ত্বের আবাস মনকে ভারাক্রান্ত না করে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলাম এক কৃষককে—এত লোক তুবারপাতের ভয়ে চলে যাচ্ছে, তোমরা যাবে না ?

উত্তর এলো—কোথায় যাব বাবু ? যাদের পয়সা আছে, বাবার জায়গা আছে, তারাই এখান থেকে অনন্তনাগ বা শ্রীনগরের দিকে চলে যায়। আমাদের নড়বার উপায় নেই।

বললাম—তুমি এখান থেকে আট ফিট বরফ জমে যায় ? তাহলে তোমরা টিকে থাকো কি করে ? খাও কি ?

উত্তর দেয়—প্রতিদিন দরকারমতো তুবার কেটে সরিয়ে দিই। দিন-রাত আগুন জ্বলে রাখতে হয় ঘরের ভেতর। তার জ্বল আগ-ভাগেই কাঠ জোড়াড় করে রাখি, জ্বল থেকে কেটে এনে। ৪৫ মাসের জ্বলে চাল আর ভুট্টাও জোড়াড় করি। তাই বসে বসে খাই। কোনো রকমে বেঁচে থাকি। সরে গেছে।

এদের ঘরগুলি শ্রীহীন, বেকীর ভাগই আধ-ভাড়া। পল্লীর পথগুলিও পরিচ্ছন্ন নয়। কিনা পয়সার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, সে-সুযোগ নিতে পারে না। ছেলেমেয়েকে স্থলে পাঠিয়ে করবে কি ? মার্চের কাজে সাহায্য করবে কে ? শের-ই-কান্দারী এদের জন্তে কিছুই করেননি। গোলাম মহম্মদ এখনও কিছু করে উঠতে পারেননি। তবে চার আনা দেয় দরে কন্ট্রোল চালের ব্যবস্থা করে কিছুটা সুস্থতা করা হয়েছে। শ্রীনগরে দেখেছি এক ছোট্টা চাল ঘাটে চোরাকারবারীর খপ্পরে না পড়ে তার জন্তে প্রতি বসি জোর খোঁজাই হয়। কান্দারী পুলিশ আর ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে দিয়েই এই কাজ করানো হয়। আর পশ্চিম বাংলায় ? জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তাশার সুরে বলেন, এমনই আইনের ঝাঁক যে, চোরাদের চালানো কারবার চোখের সামনে চলতে দেখেও ঠাট্টা জগন্নায় হ'রে তাঁদের কসে থাকতে হয়। স্তমভার চাকের দাম বাল্যের ত ভিবিলা টাকা মণ হবেই।

পহলগাম হয়ে দুই মাইল দূরে বড় রাস্তা চলে গেছে—একটা গেছে আফ-সিদেরওরাত, হয়ে কোলাহর গ্রেসিয়ারের দিকে হুড়ি মাইল দূরে। আর একটা গিয়েছে চন্দনওরারী-শেখরামনাগ-ওরাকান-পাকতনী হয়ে অমরনাথের গুহার ২৮ মাইল দূরে। যেড়ার চড়ে চন্দনওরারী পর্যন্ত যাওয়া চলে, ভাবশর পায়ে হাঁটা ছাড়া পথ নেই। কোলাহর গ্রেসিয়ারও হাঁটা-পথের শেষে। মোন্টবরের পরে আর ঐ দুটো বাসনার বাওয়া অসম্ভব না হলেও নিরাপত্তা নয়। স্তমভার আশেপাশে ভাগ্যে দুটো কানটাই হয়নি। [ক্রমশঃ]



বোকা চাকর- বুদ্ধিমতী গিল্লী



— মা আপনি যে 'ডালডা' চাইছেন তা আমি কেমন করে খুঁজে পাব ?

— ঠিক। নাম তো তুই পড়তে পারবিনা কিন্তু—
'ডালডা' টিনের ওপর থাকে খেজুর গাছের ছবি।

— ও এখন মনে পড়েছে ! আচ্ছা মা, বাটি করে
আনব না বড় কিছু একটা নিয়ে যাব ?

— ছুর সবজাস্তা ! 'ডালডা' কখনও খোলা বিক্রী হয়
না। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা টিনে।

— যাতে কেউ চুরী না করতে পারে ?

— হ্যাঁ, তাছাড়া শীলকরা টিনে মাছি ময়লা বসতে
পারেনা, ভেজালের ভয় থাকে না। স্বাস্থ্য খারাপ
হওয়ারও ভয় নেই।

— ও সেই জন্যেই সব বাড়ীতে 'ডালডা' দেখা যায় !

— হ্যাঁ, কিন্তু কত ওজনের টিন আনবি বল তো ?

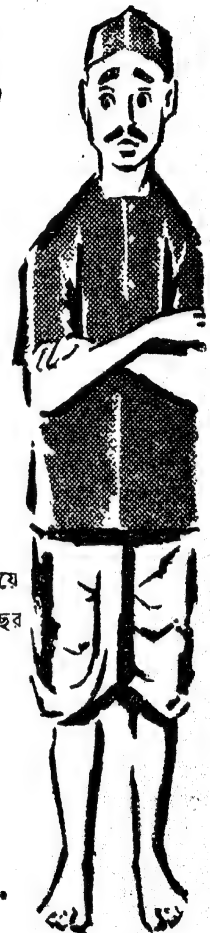
— যেটা পাওয়া যায়।

— 'ডালডা' পাওয়া যায় ½, ১, ২, ৫ আর
১০ পাউন্ডের টিনে। তুই একটা ৫ পাউন্ডের
টিন আনবি।

— ঠিক আছে মা ! আমি একটা ৫ পাউন্ডের
শীলকরা ডালডা মার্কা বনস্পতির টিন নিয়ে
আসব—যে টিনের ওপর খেজুর গাছের

ছবি আছে—ঠিক তো ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন তাড়াতাড়ি কর।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন

হিন্দুস্তান লিকার লিমিটেড, কোচবিহার



২

আবার সেই বৃড়ো

কমলেশ যে আবার সেই বৃড়োর কাছেই গিয়েছিল একথা কান্ডকে জানায়নি, পাছে এই নিয়ে সবাই হাসি ঠাট্টা করে। বিভাগীর নানা কাজের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ভুলতে চরেছে সেই বন্ধুবান্ধব কথার, সেই বৃড়োর কথা।

সারাদিনে তাদের কত রকম কাজ। সকালবেলা উঠে প্রভাত-করিতে যোগ দিতে হয়। এই নতুন গড়ে-উঠা কলোনীর সব ছেলে মেরাই ভোরবেলা গান করতে করতে চারদিকটা ঘুরে আসে।

প্রথম দিন অবশ্য কমলেশ আর প্রশান্ত অবাক হয়েছিল খুব। প্রভাতকরির কথা তারা জানতো না। ভোরবেলা ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনো চারদিকে অন্ধকার, কাকেরা সব ডাকতে শুরু করেছে। গভীর আগরতায় তাদের মন নেচে উঠে। কিসের ধ্বনি।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে গান করতে করতে ছেলেমেদের দল এগিয়ে আসছে। শব্দরঙ্গ তাদের মধ্যে রয়েছে, সামনের দিকে। কমলেশদের দেখে হাত সেড়ে ডাকে, আরে তোরা আমাদের সঙ্গে যোগ দে।

—এ কি শব্দরঙ্গ?

—প্রভাতকরি।

—কিন্তু আরি তো গান করতে পারি না।

—তাতে কি হয়েছে গেয়ে দেখ ঠিক পারবি।

কমলেশ আর প্রশান্ত ওদের দলের সঙ্গে মিশে যায়। সব মিলিয়ে গুয়ে উঠে—

বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে

ভারত আবার জগত সভার শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

ভোরের আলো ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে। চারদিক ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠে—চারপাশে একটা ঠাণ্ডা আমেজ। অদ্ভুত অম্লভূতি। ফুলের গন্ধে বাতাস ঘেন মাতাল। গাছের পাখীরা কত রকম শব্দ করে উড়ে চলে যায়। বড় বড় ফুলগুলো তাদের অভ্যর্থনা করে।

প্রত্যেকটা বাংলার সামনে দিয়ে তারা এগিয়ে চলে। কত ছেলে মেয়ে সব বেরিয়ে আসে। হাত জোড় করে গান করতে করতে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

সমস্ত কলোনীটা কমলেশরা দেখতে পার। একদিকে গুরু গোয়াল, অনেকগুলি গরু, নধর দেহ, চকচকে রঙ, বিশাল চোখে তাদের দিকে চেয়ে আছে। খানিকদূরে ঝাঁস-মুরগীর আন্তান, পালে পালে ঘর থেকে বেরিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। কত ধানের গোঁলা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটা মাঝারি পুকুর—সেখানে ছাড়া আছে মাছ। কত ছোট বড় বাড়ী—স্থল, ডাক্তারখানা, থিয়েটারের মঞ্চ, সব তাদের চোখে পড়ে। কী সুন্দর সারবন্দি।

পাক দিয়ে গানের দল ক্রিতে শুরু করে। ঘুরে ঘুরে ওঠে। টকটকে লাল বিশাল—চারদিকে তার কোমল প্রভা। সহরের ছেলে, যারা এ দৃশ্য কখনো দেখেনি, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দল ভাঙতে থাকে। যে বাঁচ বাড়ীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। এখনি তারা তৈরী হয়ে কাজে যাবে। সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে, চারদিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভোরের মাধুর্য কেটে যায়।

প্রথমদিন প্রভাত ফেরির পর বেণুদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কমলেশের একটা বাগানের মধ্যে। কমলেশ উদ্ভূত গলায় জিজ্ঞাস করে—জায়গাটা কী সুন্দর, না দিদি?

—সত্যিই বড় ভালো, এই রকম একটা জায়গাই আমি খুঁজছিলাম। আজ কি ইচ্ছে করছে জানিস? ইচ্ছে করছে সারাদিন বসে ছবি আঁকি এই রূপকথা রচনার। আমি এখনও ভাবতে পারছি না, একি সত্যি না স্বপ্ন?

—না দিদি, এইতো সত্যি, এইতো সত্যিকারের মাধুরের বাগ।

সেদিন চুপ করে দুই ভাইবোন তাকিয়ে ছিল অসীম কাকার দিকে। বাগানখন বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

দিন প্রান্তর

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বেণুকা বা বলেছিল তা সত্যি কথা—এ বেন রূপকথারই রাজত্ব। দুদিন এখানে থেকে, এখানকার নিয়ম কাহ্নন দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছিল। এ কলোনীর সকলেই কেন একটা বিবাহিত যৌথ পরিবারের মতিন্দ। নিজেদের পৃথক সভ্যকে তারা বিসর্জন দিয়েছে। সকলেই ওরা কাজ করে, যার যে রকম ক্ষমতা। অনেকখানি জমি নিয়ে চাষ হয়। সেই কদল থেকেই এতগুলি পরিবারের খাওয়া চলে। উদ্বৃত্ত হলে বাজারি বিক্রী করা হয়।

বড়রা এখানে চাষের কাজ করে। অনেকে মাছের তদারক করে। সেও তো আরেক রকম চাষ। আবার যারা পশুপালী হালবাসে, তারা দেখে গরুগুলোকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ দ্বারা যার বিক্রী হতে, এখানকার খাটি দুধের চাহিদা ওখানে থব। খাটি দুধের মতোই, সবচেয়ে পোষা যুবগীর ডিমও বাজারে পড়তে পার না। অনেকে তো না জানলে সন্দেহ প্রকাশ করে ঈসের ডিম চুরি।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক কলোনীর বৃদ্ধা জোয়ান কতজনই চাষ আবাদে ব্যস্ত থাকে, কী ভাবে আবার তারা উদ্ভূতি করবে সেই চিন্তাতেই বিভোর।

এখানকার নিয়ম-কাহ্ননের কথা জানতে নতুন ছেলেদের বেশ কতদিন সময় লেগে যায়। প্রথম প্রথম কমলেশ আর প্রশান্ত নজরের মধ্যেই কথাবার্তা বলত। চূপচাপ থাকত, কিন্তু থব খাণ্ডির আলাপ হয়ে গেল, ওদেরই বয়েদী একটি ছেলের সঙ্গে, নাম হল অমিতাভ। এখানে দু'বছর আছে। পড়ে সেকণ্ড ক্লাস।

এও সঙ্গে আলাপ চলি খাবারঘরে। সব ছেলেদের একদিকে খাবার ব্যবস্থা। কাঠের পিড়ি, সামনের কলাপাতায় অন্ন-বাগান।

দুধের গেলাসটা দেখিয়ে কমলেশ প্রশান্তকে বলে, দেগছিস্ পানকার গরুর দুধ, কি রকম গাঁত?

প্রশান্ত হেসে বলে, হজম হলে হয়, আমাদের তো আর খাটি দুধ খাওয়া অভ্যাস নেই। এখানকার গরুগুলো একবারে বাসা, দুধ জল মেশাতে জানে না।

ওদের কথা শুনে পাশ থেকে একটি ছেলে হেসে ওঠে, সেই অমিতাভ—গরুলা কোথায়? আমরাই তো গরুলা।

—তার মানে?

—প্রভাতফেরীর পর আমরাই দুধ দুয়ে নিয়ে আসি। তবে প্রত্যেকদিন সকলকে যেতে হয় না। ভাগ করা আছে, সপ্তাহে কদিন। আমার পালা সোমবার।

—বা: বেশ সুন্দর ব্যবস্থা।

অমিতাভ নিজের থেকেই বলে, তোমরা নতুন ছেলেতো চল, ব জারগাগুলো দেখিয়ে দি।

খাওয়া দাওয়ার পর অমিতাভ তাদের নিয়ে এসে একটা বাড়ীর মিনি, এই হচ্ছে মায়েরের কার্গ্যালর।

ভেতরে ঢুকে যার তারা। সত্যিই তাই। কমলেশ মনে তারই মায় মত মায়ের দল। কয়েকজন চরকার স্ত্রীতো টিছেন, কয়েকজন সেই স্ত্রীতো নিয়ে কাপড়ের জমি তৈরী করছেন। আবার অনেকে কলে সেলাই করে জাৱা-কাপড় তৈরী করছেন।

অমিতাভ বুঝিয়ে দেয়, এইখানেই সব জামা-কাপড় তৈরী হয়, এ কলোনীর সকলেই প্রায় একই রকম জিনিষ পরে।

একটা বারান্দা পেরিয়ে দুটো বড় ঘর। প্রথমটার কোটা হয় তক্তাকার, অনেকে বসে তৈরী করে রান্নার সরঞ্জাম। আর তার পাশের ঘরে হয় রান্না। সেখানেও মায়ের দল কাজে ব্যস্ত। এতগুলো ছেলেমেয়ের দায়িত্ব তাদের ওপর।

অমিতাভ বলে, সকালে এরা এই সব কাজ করেন। দুপুরে কয়েকজন স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ান। কয়েকজন রান্না সেলাই, গৃহস্থালীর কাজ শেখান। যেসব মেয়েরা এই স্কুলে পড়ে, তাদের এ সব কাজ শিখতেই হয়।

কমলেশ আর প্রশান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। অমিতাভ ওদের নিয়ে যায় আর একটি বাড়ীতে। বলে, এখানে গান শেখানো হয়।

কমলেশরা দেখে, কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে আছে। আর এক ভদ্রলোক তাদের গান শেখাচ্ছেন। অমিতাভ আলাপ করিয়ে দেয়, এই আমাদের শশাঙ্কদা, এর কাছে আমরা সকলে গান শিখি।

প্রশান্তরা ঠুকে আগেই দেখেছে। প্রভাতফেরীর সময় উনিই তো সকলের আগে গান করছিলেন।

সুন্দর চেহারা শশাঙ্কদা'র। ফরসা বঙ, চোখে-মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বলেন তোমরা বুঝি নতুন ছেলে?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের কথা শব্দর বলছিল বাট, সময় করে এসে আমাদের কাছে। প্রভাতফেরীর সুরগুলো সব তুলিয়ে দেব। তাহলে গাইবার সুবিধে হবে।

—বেশ আমরা বিকেলের দিকে আসব।

অমিতাভ তাড়াতাড়ি বলে, বিকেলে তো আমাদের ড্রিল হয়। বরং স্কুলের টিকিনের সময় এস। আমাদের আধ ঘটাখানেক ছুটি থাকে।

শশাঙ্কদা'র আবার ছেলেদের গান শেখাতে থাকেন। অমিতাভ ওদের পাশের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে কমলেশরা দেখে চারদিকের কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে, চমৎকার সাজান ঘর! নান্যখানে একটি ভদ্রমহিলা বসে একটি মেয়েকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছে। অমিতাভ আলাপ করিয়ে দেয়, ইনি মণিকাদি, আমাদের ছবি আঁকা শেখান।

মণিকাদি' হেসে ওদের অভ্যর্থনা করেন। রাজি এসে ভাই, এখানে ছবি আঁকা শিখবে।

প্রশান্ত উত্তর দেয়। আমরা তো ছবি আঁকতে জানি না?

—তাতে কি হয়েছে, শিখতে দোষ কি?

—কি মিষ্ট কথা, ভারী নরম স্বভাব, মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। বলেন, এই দেখ না আমার একটি নতুন ছাত্রী কি সুন্দর ছবি আঁকছে!

প্রশান্তরা নতুন ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে দেখে, সে আর কেউ নয়, বেণুকা। এত মন দিয়ে সে ছবি আঁকছে যে একটা কথাও তার কানে যায়নি।

কমলেশ ডাকে, দিদি।

বেণুকা এবার মুখ তুলে তাকায়, হেসে জিজ্ঞাস করে, কি রে তোরা এখানে?

মণিকাদি' বলেন, কি তোমরা বুঝি ভাই-বোন? দিদি যখন এত ভালো ছবি আঁকে, ভাইবাও নিশ্চয়—

কমলেশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, না মণিকাদি'। দিদি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো—

রেণুকা জলভরা চোখে তাকায়, ওদের কথা শুনবেন না মণিকাদি', ওরা আমার পাগল ভাই।

কলাভবন থেকে বেরিয়ে ওরা এগিয়ে চলে ডাক্তারখানার দিকে। সোনালী রোদে সবুজ ক্ষেত ঝলমল করছে। কমলেশ প্রশ্ন করে, এই যে ফসল, এ-ও কি সব তোমাদের চেষ্টায়?

—হ্যাঁ ভাই! জমি ঠিক করা, লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল কাটা সবই আমাদের করত হয়।

—তোমরা শিখলে কি করে?

—লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজও যে আমাদের শেখানো হয়।

তারের কথা শেষ হয় না, সদাশঙ্কর এসে পড়ে।

—কি কমল, কি রকম লাগছে তোমাদের এখানে?

—খুব ভাল শঙ্করদা', এ যেন স্বর্গরাজ্য।

—অমিতাভ বুঝি তোমাদের গাইড হয়েছে। এখন কোন দিকে যাবে?

—ডাক্তারখানায়।

—চল। আমি ওদিকেই যাবি।

ওরা এগিয়ে চলে। সামনে পুকুর পেরিয়ে আরও গানিকটা গেলে তবে ডাক্তারখানা। কমলেশ নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করে, এখানে বোগের দৌরাহা কি রকম শঙ্করদা'?

—হ্যাঁ, তা একটু আছে। তবে অল্প গাঁয়ের চেয়ে অনেক কম। এই কলোনীর ডাক্তার আমার বন্ধু মিহির। খুব যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করে।

অমিতাভ বলে, সত্যি মিহিরদা' বেন চিকিৎসার বাহু জানে। এত সহজে শক্ত রোগ সারায় যে দেখলে অবাক হতে হয়। আচ্ছা মিহিরদা' বুঝি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন?

সদাশঙ্কর হেসে কেলসেন, সে কথা আর বোল না। ওর মত ছুই ছেলে আর ছুটি মেলে না, বাপু'র বাপু, মাষ্টারদের চিরকাল পাগল করে মেলেছে। ক্লাসের ফ্যান, জানালার শাশী ভাঙ্গা ওর ছিল কল্টানবীণা কাজ। স্কুলের বোর্ডে সরষের তেল মাখিয়ে ও রাখতাই। অঘট ফাইন দেবার নাখও করত না। হেড-মাষ্টার ভয় দেখালে একেবারে পায়ের গিয়ে পড়ত।

কমলেশ অমিতাভ আর প্রশান্ত হো-হো করে হেসে উঠে। সদাশঙ্কর দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, কেল-আসা দিনের কথা ভাবতে ভাবতে বলে, সেই মিহির যখন ডাক্তার হয়ে বেক্সল আমি তো অবাক! তবে তখন এই কলোনী গড়ে উঠেছে। একদিন ওর কাছে গিয়ে হাজির, যদি কিছু সাহায্য করে, দেখলাম সেই একই রকম ফাজিল, হেসে বললে, কি রে তুই নাকি আশ্রম খুলে লাখু-টাকু হয়ে বসেছিস, তা চলছে কি রকম?

—কললাম তোর কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে।

—কিসের সাহায্য?

—নতুন ভাবে ইচ্ছল গড়ছি, সত্যিকারের মানুষ তৈরী করার ইচ্ছল। শুনলাম তোর প্র্যাকটিস বেশ জমে উঠেছে।

মিহির কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেয়, দূর দূর একেবারে ভুল শুনছিল, টাকা কোথায় আমার, টাকা দিয়ে সাহায্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

রেগে বললাম, টাকাই যদি না দিবি, তাহলে আর কি করে সাহায্য করবি?

মিহির ঠিক আগের মত হেসে বললে, আমাকে যদি কোন কাজ লাগতে পারিস তাহলে যেতে রাজী আছি।

—তার মানে?

—মানে তুই চাইলি টাকা, দিতে-পারলাম না—তাই নিজেকেই না হয় দিলাম।

আমার চোখে জল ভরে এল। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যি যাবি মিহির, এখানকার পশার টাকাকড়ি নাম-শাম ছেড়ে সেই পাড়াগায়ে পাঁচ জনের সেবা করে একেবারে সাধারণ জীবন বাপন করতে?

ঠিক আগের মত হেসে ও বললে, আমাকে বিশ্বাস করা একটু শক্ত ২ই কি, সহজে কেউ করতে চায় না। তবে ভয় নেই, জামাদের সব কথাই আমার ফাজলামী নয়, অন্ততঃ এটা নয়। যার মতন বলেছি, আজই যাব।

কথাগুলো বলতে বলতে সদাশঙ্কর-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেদিনের কথা ভাবলেও আমি জানতাম আশ্চর্য্য হয়ে যাই। সেই দুই মিহির, যার কাছে একটা কানাকড়ি সাহায্য পাব বলে আশা করিনি, সে কোথায় নিজেকে বিলিয়ে দিলে দেশ আর দেশের মাঝে! আর যারা তখন দেশ দেশ বলে চাংকার করে বেড়াত তাদের মধ্যে কতজনই আজ কালো-বাজারী ব্যবসাদার, কি বিচিত্র সংসার!

আবার একটু থেমে সদাশঙ্কর বলে, মনে পড়ে স্কুলে বাগদার মাষ্টার মশাই বিরক্ত হয়ে মিহিরকে বলতেন, তুমি লেখাপড়া ছেড়ে গোটারেণে যাও। তাঁর কথাই আজ ফলস্বে, ও গোটারেণেই এসেছি। কিন্তু সেদিনকার সেই সেয়া ছেলের চাইতে ও অনেক ভাল কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তারখানায় এসে পড়ায় সদাশঙ্কর সামনের দিকে এগিয়ে যায়, কমলেশার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কল্লীর সারি গাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাক্তার এক একজনকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে, লম্বা, গ্রামসে চোঁহায়া। চোখে লম্বা। সারা মুখে সেয়ানা হাসির ঝিলিক।

একটি ছেলেকে পরীক্ষা করে বলেন, কি রে পল্টু, পেট কামড়াচ্ছে?

—হ্যাঁ মিহিরদা'। কাল বিকেল থেকে—

—কামড়বে না! কাল যা আগুন দম খাচ্ছিল, যত সব টিপিণ খাওয়া ছেলে।

ডাক্তার টিপিণ কথার ওপর এমন একটা জোর দেয় যে সকলে হেসে ওঠে। কমলেশদের ওপর চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করেন, এরা বেন জিন্ গাঁয়ের লোক মনে হচ্ছে। কি রে অজিত, তোর আমদানী না কি?

অমিতাভর কথা কলার আগেই মিহির কমলেশের কাছে এগিয়ে

যায়। তা বাপু তোমার বেদনাটা কোথায়? শিঠি না পেটে, না ছ'ভায়গারই।

কমলেশ হেসে ফেলে। মিহির তড়বড় করে বলে, ছেলে! আবার হাস দেখে, এ যে দেখনহাসি। বলি কিছু কামড়চ্ছে না কি, পেট কি পা?

অমিতাভ উত্তর দেয়। এদের কোন অসুখ করেনি, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

—সে কথা আগে বলতে হয়? আমি তো এখন এক শিশি কাঠের ওয়েল খাইয়ে দিচ্ছিলাম আর কি। মিহির নিজের মনেই হেসে বলে, এখন তো ভাই ব্যস্ত আছি। পরে সময় মত বুকে সুখে আলাপটা সেরে নেওয়া হবে।

মিহির ডাক্তারের সঙ্গে প্রথম আলাপেই ওরা খুসী হয়।

বিকলে ছুটির পর 'ডিলের আয়োজন। সবাই এসে জড় হয় স্থলের সামনের কাঁকা মাঠে। স্ন্যাপ-পো-স্ত্রের ওপর উড়িয়ে দেয় হিনরঙা পতাকা, তারই নীচে পাঁড়ির সকলে এক সাথে গান করে।

তারপর হয় খেলা শুরু। একদল বল নিয়ে চলে যায় ফুটবল খেলতে। একদল খেলে ভুলী। আবার অনেক করে কুচ্কাওয়াজ। সমান তালে পা ফেলে হাত নেড়ে এগিয়ে চলে। বীরের মত বুক ফুলিয়ে বলে,

আমরা নবীন তেজপ্রস্রীণ বীর তরুণ
বিপদ বাধাব কষ্ট ছি'ড়িয়া শুবিব খুন।

আমরা ফসাব ফুল ফসল,
অগ্র পথিক রে যুবদল।

জোর কদম চল রে চল।

কথায় ছন্দে পা ফেলে তারা এগিয়ে যায়। মেয়েরা আর একদিকে খেলা করে। এক দল খেলে ব্যাডমিটন। এক দল কপাটি। আবার হয়ত একদল একসঙ্গে হাত তোলে, নামায়। ওঠে, বসে। সুন্দর সারবন্দী ভাবে জিল করে।

এদের মধ্যে কমলেশ বের্বাককে দেখতে পায়, একসঙ্গে হাত তুলে, মাথা নেড়ে দলের সমভাষা রাখার চেষ্টা করছে। প্রশান্ত চলে গেছে ফুটবল খেলতে। কমলেশ একলা পাঁড়িরে ছিল।

—কি হে, তুমি কিছু করছ না?

কমলেশ পেছু ফিরে তাকায়, দেখে, মিহিরদা' পাঁড়িরে পাঁড়িরে হাসছে।

—মিহিরদা, আপনি?

—আলাপ করবে বলেছিলে, তাই দুপুরে হাজির দিলাম। কিন্তু তুমি জিল করছ না কেন? খুব পালোয়ান বৃষ্টি? কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। দেখে বাক্যের চেয়ে তোমার চুলের স্বাস্থ্য বেশ পরিপাটি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

কমলেশ লজ্জিত হয়ে বলে, না তা নয়, আজ নতুন কি না তাই কিছু করছি না। কাল থেকে—

মিহির কথা ধামিয়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ক'দিন জিরিয়ে নাও। এই তো জিরোবার ব্যয়স, শেষ কালে বুড়ো হলে তো আর জিরোবার সময়ই পাবে না, তখন কাজ আর কাজ। কি বল?

মিহিরদা'র কথার ধরনই ঐ বকম, সারাক্ষণ সবাইকে হাসিয়ে মাঠে।

এ সবই কিন্তু কমলেশের প্রাথমিক দিকের কথা। এ কালোনির সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতেও তো সময় লাগে। ক্রমে এরা এখন সকলের মাঝে মিলে গেছে। হৈ হৈ আনন্দে ভরা দিন কেটে যায়। লেখাপড়া কাজকর্ম, খেলাধুলোর প্রোতে ওরাও অন্তরের মত গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

এ জায়গা যে কমলেশের কতখানি ভালো লেগেছে, তা ওর চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। বাবাকে মাকে সে বার বার করে লেখে, "তোমরা একবারটি এখানটা ঘুরে বাও। দেখবে আমরা কি আনন্দে আছি। কলকাতায় দেখতাম, ছাত্ররা শুধু ভাঙতে চায়, দেখে দেখে বড় দমে যেতাম। নিরুপায় মন ভরে যেত। এখানে এসে মনে আশা জাগছে। আমরা শুধু লেখাপড়া করছি না, কাজ করছি, কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। গড়ার যে কি আনন্দ তা এতদিন আমরা বুঝতে পারিনি। এই বিদ্যালীষ্ট আমাদের তাই বুঝিয়েছে।"

সেদিন শনিবার। কমলেশ গিয়েছিল ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে। খুব জরুর খেলা হল। শত্রু থেকে একদল ছেলে এসেছিল খেলতে বিদ্যালীষ্টের সঙ্গে। কোন শকই জিততে পারিনি। ড্র হয়ে গেল। প্রশান্ত সত্যিই ভাল খেলেছে, প্রশ্রাপণ চেষ্টা করেছে গোল দিতে, তবে সফল হয়নি।

খেলা শেষ হয়ে গেলে শত্রুর দল ফিরে গেল শহরে, কমলেশরাও রাস্তা শরীরে ফিরছিল হোষ্টেলের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পাখীরা ফিরছে বাসায়, ফুরফুরে বাতাস-এর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়লে দূরে গাছতলায় কি বেন একটা জিনিষ পড়ে রয়েছে।

কমলেশ জিজ্ঞাস করে, ওখানে কি গুটা সাদা মত মনে হচ্ছে? প্রশান্ত এড়িয়ে যায়, কাপড়চোপড় কিছু হবে।

—একবার দেখে গেলে হয় না?

—না না চল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হোষ্টলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

তবু কমলেশ কথা শোনে না, কি বকম মনে তার সন্দেহ হয় —তারা পাঁড়া, আমি আসছি, বলে কমলেশ ছুঁতে ছুঁতে গাছের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে হয় না, খানিকটা গিয়েই বুঝতে পারে গুটা শুধু কাপড় নয়, কোন লোক উণ্ডু হয়ে পড়ে রয়েছে। এখান থেকেই চেঁচিয়ে ওঠে, তোরা শীগ'গিরি এদিকে আর, কেউ বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ছেলেরা ব্যস্ত ভাবে ছুটে আসে, সবাই মিলে আন্তে আন্তে সেই গাছের দিকে এগিয়ে যায়। দেখে, কমলেশ বা বলেছিল তাই সত্যি, জলকানার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে এক ভদ্রলোক পড়ে রয়েছে। প্রথমটা ভয় পেলেও ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে তারা কাছ গিয়ে বসে, লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবু ব্যয়স বেশ বেশী হয়েছে বলেই মনে হয়। তিন-চার জনে ধরে আন্তে আন্তে ভদ্রলোককে তুলে ধরে, এতক্ষণে তার মুখটা দেখা যায়, কমলেশ চমকে ওঠে, এ সেই বুড়ো।

সকলে জিজ্ঞাস করে, তুমি ওকে চিনিস না কি?

—হ্যাঁ, এ সেই বুড়ো বন্ধুরীতে থাকে।

সবাই চিন্তিত হয়, তাহলে এখন কি করণ হবে?

কমলেশ ভেবে নিয়ে বলে, চল, সবাই মিলে ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—এ যক্ষপুত্রীতে ?

—ভয়ের কি আছে ? বুড়ো বিপদে পড়েছে, ওকে সাহায্য করা আমাদের উচিত।

মনে মনে খুশী না হলেও মুখে কেউ আপত্তি করল না। বলল, চল, তবে ভেতরে আমরা ঢুকব না। দোরগোড়ার 'নামিয়ে রেখেই' চল আসব।

কমলেশ কোন কথাই উত্তর দেয় না। একদৃষ্টে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে হাঁটতে থাকে, কিছুতেই সে ভেবে পায় না এখানে এসে বুড়ো অজ্ঞান হয়ে পড়ল কেন ? আবার যদি জ্ঞান ফিরে উঠলে এদেরই বকাঝকা করে। যক্ষপুত্রীতেই বা ওই বুড়োকে দেখানোনার লোকজন কে আছে ?

কোন প্রণয়েরই সহস্তর সে নিজের মনে খুঁজে পায় না। আর সকলের সঙ্গে খমখমে অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞান বুড়োকে নিয়ে এগিয়ে যায় সেই ভয়াবহ যক্ষপুত্রীর দিকে।

[ক্রমশঃ]

কমাল আর পেন্সিলের ভেঙ্কী

যাহ্নরত্নাকর এ, সি, সরকার

কাকে এতোদূর ক্যাশিয়ার মাদমসেল জিলে ছিলেন আমার ম্যাজিকের বিশেষ ভক্ত। পারিসে থাকা কালে মাঝে মাঝেই যেতাম 'কাকে এন্তোয়াল'এ কফি খেতে। সর্বপ্রথম যেদিন ওখানে গাই সেদিন ঘটছিল এক মজার ব্যাপার! বাইরে পড়ছিল ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি। গা থেকে রেনকোটটা খুলে দোরের পাশে বসিয়ে দিয়ে কাকের এক কোণে একটি খালি চেয়ারে বসলাম গিয়ে। আগের দিন ফরাসী টেলিভিশন 'টেলিভিসিও ফ্রান্স'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে আমার বাহুর খেলা। কাজেই ছোট্টোলে অপেক্ষমান থাকেব থেকে শুরু করে পরিচায়ক পরিচায়িকা পর্যন্ত প্রধান দর্শনেই চিনে ফললেন আমাকে। টেবিল টেবিলে উঠল মুহুগুন। একটু বিব্রত বাধ করলাম। এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করে যিনি কাকের ভেতর দিককার এক কেবিনে নিয়ে আমাকে বসিয়ে দেখানোই আমাকে খাবার ও কফি সরবরাহ করলেন, তিনিই মাদমসেল জিলে।



তার অহুদোথে সেদিন একটি ম্যাজিক দেখাতে হয়েছিল সবার সামনে; বা নাকি খুব সমান লাভ করেছিল সবার কাছে। টেবিলের উপরে পড়েছিল একটা লেড পেন্সিল। ডান হাতে এই পেন্সিলটাকে উঁচু করে ধরে জনৈক বন্ধরের এক কমাল দিয়ে ঢেকে গিলাম এই পেন্সিল শুদ্ধ হাত। কমালচাপা অবস্থাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এই উদ্ধত পেন্সিলটি। এর পরে ওহান—টু—থি—বলে কমালটা তুলে নিতে দেখা গেল পেন্সিল অদৃশ্য! কমালের মালিক কমাল পকেটস্থ করলেন আর আমি ফিরে গেলাম কেবিনে।

কেমন ক'রে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা করেছিলাম তাই শোন। পেন্সিল-শুদ্ধ হাতটাকে কমালচাপা দিয়ে যখন কমালের ধার টেনে টেনে কমালটাকে ঠিক ভাবে হাতের উপরে রাখছিলাম, সেই সময়ে এক কীকে পেন্সিলটাকে দিয়েছিলাম ছেড়ে আর তা আপনা থেকেই চুকেছিল আঙ্গিনের ভেতরে। উদ্ধত তর্জনী নিয়েছিল পেন্সিলের স্থান। কমালে ঢাকা অবস্থায় তর্জনী আর পেন্সিলের পার্থক্য বোঝা যায় নি কোন মতে। বাকী অংশ খুবই সহজ—কমাল টেনে নেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে তর্জনী গুটিয়ে নেওয়া। ভাল ভাবে অভ্যাস করে দেখাতে পারলে এ দিয়ে সহজেই দর্শকদের অবাক করতে পারবে। যারা যাহ্নবিদ্যায় উৎসাহী তারা আমার সঙ্গে A. C. SORCER, Magician, Post Box 16214, Calcutta—29 এই ঠিকানায় জবাবী পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখতে পার।

ছোট গিন্নী

বুদ্ধদেব বাগটী

ছোট খুকি বেড়ায় ভুলে বোঝে না কিছুই,
ছোট একটা নিদ্রির দেওয়া কাপড় পরে।
মাথাব উপর ঘোমটাটা ডাব বেশ তুলে দেয়,
মাথের মতই আলতো করে চরণ বেলে।
কোলের উপর ছোট পুতুল ঘেঁষে নাকি ওয়?
দুধ খাওয়াতে বায়ে বায়েই হয় নাকো তুল,
শান্ত ছেলে তাকে আবার বুম পাড়িয়ে,
যায়ের মতই দুধের হিসাব দেয় বুঝিয়ে।
গোয়াদা তার পুটলি বাঁধা ছোঁড়া কাপড়,
বাগতিটাই বড় হ'য়ে বাঘার কাপড়।
বা হোক ওসব মেয়ের বিয়ে আসছে মাসে,
টুকটুক বর বেনারসী পাচ্ছে না বে।
দিদি বলেছে বিয়ের আগে দেবেই দেবে,
ওও বে বিয়ে হয়েছে এই সেদিনই।
জামাই নাকি বিলেত কেবং টাকা অনেক,
কলকাতাতে হু'দান বাড়ী ভর নিয়েই।
হঠাৎ গিন্নী পড়ে গেলেন কাপড় বেবে,
হাতের চুড়ি ভেঙে বাগড়ার উল কেঁদে।
আগরাজি তার হুড়িয়ে পরে আসে-পাশে,
ভুলে গেল ঘেঁষে বিয়ে আসছে মাসে।

চেকোলোভাকিয়ার রূপকথা

শ্রীমূলতা কর

[ভূমিকা—দেশ-বিদেশের কত শ্রমের রূপকথা আছে। এই সব দেশ-বিদেশের রূপকথার সঙ্গে পরিচয় হলে ছোটদের মন খুশীতে ভরে ওঠে, তাদের জ্ঞানের সীমা বেড়ে যায়। এখানে একটি চেকোলোভাকিয়া দেশের রূপকথা লিখলাম।—লেখিকা]

মেঘে-ঢাকা সূর্য। বর্ষাকাল। আকাশ ঘোর কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। আর দিনরাত বৃষ্টি পড়ছে। তিন দিন ধরে পৃথিবীতে এক বলক বোনের দেখা পাওয়া যায় না, একটু কড়া আলো দেখা যায় না।

ছোট ছোট মুরগীছানারা গজগজ করে মাকে বলতে লাগল—মা, মুরগীমামা আকাশ ছেড়ে কোথায় পালাল? তাকে টেনে আকাশে নিয়ে আসতে হবে। এক কৌটা রোদ নেই। শীতে আনরা কাঁপছি, এ কি অজ্ঞার বলত?

মোটামোটা শীঘ্রই দোলাতে দোলাতে মুরগী-মা বলল—সে ত বুঝি বাছা! কিন্তু মুরগীমামার বাড়ীটা যে কোথায় তা ত জানি না, সেইখানেই হয়েছে মুশ্বিল।

মুরগীর ছানারা বলল—ওসব তোমায় ভাবতে হবে না মা! মুরগীমামার বাড়ীর ঠিকানা আমরা ঠিক খুঁজে বার করব। এত আমাদের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তারা কেউ না কেউ নিশ্চয় ঠিকানা জানে। চল বে ভাই-বোনেরা, সবাই মিলে একটু খুঁজে দেখি। এই বলে কৌকর কৌ, কৌকর কৌ, করে ডাকতে ডাকতে মুরগীছানারা মাকে ফেলে রেখে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

মুরগীছানারা একটু এগিয়ে একটা ছোট বাগানে ঢুকল। বাগানের সামনে একটা কপিক্তেত। সেখানে মস্ত বড় একটা কপির তলায় এক শামুক বসে বসে হাই তুলছে। মুরগীছানারা শামুককে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল—শামুক দাদা, মুরগী ঠাকুরের বাড়ীর ঠিকানাটা বলতে পার? বিষ্টিতে ভিজ মরে গেলাম। মুরগী ঠাকুরকে ঘরে থেকে টেনে বার করতে হবে। তাই আমরা তাব বাসা যাচ্ছি।

শামুক হাই তুলতে তুলতে বলল—ঠিকানা ত আমি জানি না। তবে একটু দূরে গিয়েই ওই কোপের ভিতর মস্ত বড় এক পায়রা দেখবে। সে হয়ত ঠিকানা তোমাদের বলতে পারবে। এই কথা বলেই শামুক খোলার ভিতর ঢুকে ঘূমতে আরম্ভ করল।

মুরগীছানারা খোপের দিকে এগোতে লাগল। দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে পায়রা ভাড়াভাড়ি ঘোপ থেকে উড়ে বেরিয়ে এল। মনের আনন্দে ভাবতে লাগল—বাঁচলাম বাবা, মুরগীর ছানাদের সঙ্গে খানিকটা বন্ধুত্ব করতে পারব।

মুরগীছানারা কাছে এসে নমস্কার করল। পায়রা বলল—কি খবর? কি খবর ভাই? ছুঁচাচটে খবর বল। প্রাণটা ছুঁড়োক। বহা বহা দিনে কারো মুখ দেখবার উপায় নেই, হুটো কথা বলতে পাই না, ধাপিয়ে উঠলাম।

মুরগীছানারা বলল—পায়রামাসী? সে জন্তই ত তোমার কাছে এসেছি। এমন বর্ষায় কি কারো প্রাণ বাঁচে? মুরগীমামাকে খব

থেকে টেনে বার করব বলে আমরা তাব বাড়ী যাচ্ছি। এ মুরগীমামার বাড়ীর ঠিকানাটা তুমি আমাদের বলে দাও।

পায়রা বন্ধু বন্ধু করে অনেক কথা বলে গেল। তারপর বলল—আমি ত ভাই ঠিকানা জানি না? তবে আমার বন্ধু খরগোস নিশ্চয় জানে।

চল তবে খরগোসের কাছে যাই। বলে মুরগীছানারা চলতে আরম্ভ করল। পায়রাও তাদের সঙ্গে উড়ে চলল।

খরগোস দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে ভাড়াভাড়ি গায়ের লোম রেড়ে ফিটকাট হয়ে নিল। তারপর তার বাড়ীর দরজা খুলে বলতে লাগল—এস এস। আমার ঘরে এসে বস। এই বর্ষায় দিনে একটু চা খাও।

কিন্তু মুরগীছানারা তার ঘরে ঢুকল না, দরজার সামনে ঝাড়িয়ে বলল—নমস্কার, খরগোস মামা! বড় বড় আমরা, এখন বলতে পারব না। মুরগীমামাকে ঘর থেকে টেনে বার করতে যাচ্ছি তুমি শুধু মুরগীমামার বাড়ীর ঠিকানাটা বল।

খরগোস ধতমত খেয়ে বলল—মুরগীমামার ঠিকানা ত বলতে পারব না! তা আমি না পারলেও আমার বন্ধু পাতিহাঁস ঠিক জানে। চল তার কাছে তোমাদের নিয়ে যাই। ওই যে সামনে নদী রয়েছে, ওপাড়ে যে নলখাগড়ার বনে, সেইখানেই পাতিহাঁসের বাড়ী। নদীতে ওই যে একটা নৌকা রয়েছে, চল ওইতে চড়েই যাবো যাক।

খরগোসের কথামত সবাই সেই নৌকায় চেপে বসল। তেলে তুলে নৌকা চলতে লাগল। একটু পরেই নলখাগড়ার বনে এসে আটকাল। সবাই মিলে নেমে পাতিহাঁসের বাড়ীর দরজায় এল। খরগোস দরজার দাঁকা দিয়ে ডাকতে লাগল—ও ভাই পাতিহাঁস, আমি তোমার বন্ধু খরগোস। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দরজাটা একটু খোল। আমার সঙ্গে অনেক সব অতিথিরাও এসেছেন।

ভিজ ডানা বটপট করে নাড়তে নাড়তে পাতিহাঁস দরজা খুলে বলল—ওঃ বিষ্টির জ্বালায় মরে গেলাম। তিন দিন ধরে ডানা শুকতে পাইনি। কি কষ্টই না হচ্ছে!

পাতিহাঁসের কথা শুনে মুরগীছানারা বলল—ঠিক বলেছ হাদমাসী! হুটু মুরগীমামা, নিজের ঘরে শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশে ওঁবাব নাম নেই, তাই আমাদের এত কষ্ট। এখন আমরা সবাই সূর্যের বাড়ী চলেছি। তাকে টেনে ঘর থেকে বের করে আকাশে নিয়ে আসব। কিন্তু মুশ্বিল হয়েছে সূর্যের বাড়ীর ঠিকানা আমরা কেউ জানি না। তুমি মাসী, ঠিকানাটা বলে দাও।

পাতিহাঁস বলল—আমি ত বাগ, সূর্যের বাড়ীর ঠিকানা জানি না। তবে আমার বন্ধু সজ্জাক খুব পণ্ডিত লোক। সে জানে না এমন জিনিষই নেই। নদীর অঙ্গ পাড়ে ওই যে প্রকাণ্ড গাছ দেখা যাচ্ছে ওইই একটা কোটের সে থাকে। চল সবাই মিলে নৌকায় চেপে সজ্জাক-বন্ধুর বাড়ী যাই।

তাই চল—বলে সেই প্রকাণ্ড দল নৌকায় চড়ে সজ্জাকের বাড়ী গেল। গাছের কোটের গরম বাতাসে শুয়ে বাদলার দিনে সজ্জাক দিবা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। সবাইয়ের ডাকাডাকিতে সজ্জাক ঘুম ভাঙল।

বাগা থেকে বেরিয়ে এসে অতিথিদের নমস্কার করে বলল—আহ্নন আহ্নন। আমার গরম ঘরে বসে বিজ্ঞান করুন।

পাতিহীন বল—না বন্ধু সজ্জা, আমরা আর বসব না। একটা শক্ত কাজ করতে হবে, সেজ্ঞ এই ঝড়-বালস মাথায় নিয়ে সবাই মিলে ছুটে চলেছি। তুমি হলে আমাদের সবায়ের চেয়ে পণ্ডিত। তুমি না সাহায্য করলে আমাদের কাজ সফল হবে না। কষ্ট করেও কোন ফল হবে না।

সজ্জা নিজের প্রাণা শুনে খুবী হয়ে বলল—তা যা বলেছ ডাই পাতিহীন। সব জীব-জন্তুরাই বলে বটে আমি পণ্ডিত লোক। কোন কাজে তোমরা যাহ্ন বন? নিশ্চয়ই যা পারি সাহায্য করব। তোমরা সবাই আমার বন্ধু।

সজ্জার কথা শুনে মুরগীর ছানারা বলল—সজ্জা দাদা, তিন দিন ধরে স্থিয়ামা মা নিজের ঘরে শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশেও গুঠ না, রোদও ছড়ায় না। আমরা সবাই বিষ্ট-বামলে ভিজে মরে গেলাম। সেজ্ঞ আমরা স্থিয়ামার বাড়ী চলেছি। তাকে টেনে ঘর থেকে বার করে আকাশে বসিয়ে দেব। তবেই আমাদের প্রাণগুলো বাঁচবে। কিন্তু মুস্তিল হয়েছে। কেউ আমরা স্থিয়ামার বাড়ীর ঠিকানা জানি না। তুমি সজ্জা দাদা, ঠিকানা বলে দাও।

সজ্জা পণ্ডীর ভাবে বলল—যে কথা কেউ জানে না সে কথা বলতে কেবল আমিই পারি। পণ্ডিত বলে একটা সুনাম আছে, সেটা ত আর মিথ্যে নয়। স্থ্যের বাড়ীর ঠিকানা আমি জানি। তারপর তাহ্মিমের ঘরে সজ্জা বলতে লাগল—দুর্গায় বাড়ী এমন কিছু দূর নয়। এই আমার বাড়ী থেকে কতটুকুই বা রাস্তা। ওই যে সামনে প্রকাণ্ড পাহাড় দেখছ, তার মাথায় একটা প্রাণও কালো কুচকুচে মেঘ ঝুলছে। সেই কালো মেঘের চূড়ার ওপর রূপালী চাঁদ আটকান আছে। তোমাদের প্রাণে সেই চাঁদের দেশে যেতে হবে। তারপর চাঁদের দেশ পার হয়ে যেই এক পা এগোবে অমন স্থিয়ামার বাড়ী পেরে যাবে। চল আমি সঙ্গে গিয়ে পথ দেখিয়ে দি। এই বলে মাথায় একটা নতুন টুপি পরে হাতে একটা লাঠি নিয়ে সজ্জা পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল। তার পিছনে পিছনে মুরগীর ছানারা, পাররা, খরগোশ, পাতিহীন চলল।

সজ্জা যেমন রাস্তা চলেছিল ঠিক তেমন রাস্তা ধরে চলে তারা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মাথায় উঠল, কুচকুচে কালো মেঘের ভিতর দিয়ে চল গেল। তারপর চাঁদের দেশে পৌঁছল। তাদের দেখে চাঁদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খাতির করে সবাইকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে স্থ্যের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এল।

স্থ্যের বাড়ীর ধারে এসে তারা সবাই দেখে চারদিকে কি বোর অন্ধকার, কিছুই চোখে দেখা যায় না। তবু তারা মনে সাহস এনে স্থিয়ামার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখে, ঘোর অন্ধকার ঘরে প্রকাণ্ড এক কালো মেঘের কবলে অসংখ্য মুড়ি দিয়ে স্থিয়ামা লোক ভাকিয়ে অগাধে ঘুমাচ্ছেন।

আদের পায়ের কত শব্দ হল কিন্তু স্থিয়ামার ঘুম ভাঙল না। তখন সজ্জা মিলে স্থিয়ামার ঘুম ভাঙাবার জন্যে বিকট গীংকার করতে আরম্ভ করল।

মুরগীছানারা কৌকর কৌ, কৌকর কৌ করে ডাকতে লাগল, পাররা 'বন্ধু বন্ধু' 'বন্ধু বন্ধু' করে ডাকতে লাগল, পাতিহীন প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকতে লাগল, খরগোশ ঝপ ঝপ করে কারকাপটা দিতে লাগল, সজ্জা তার লাঠিটা নিয়ে হুহু হুম হুম করে ঠুকতে লাগল।

একসঙ্গে সবাই চীংকার করতে লাগল—স্থিয়ামা ঘুম ভেঙ্গে ওঠ, স্থিয়ামা ঘুম ভেঙ্গে ওঠ। আকাশে চল, রোদূর দাও।

সবায়ের এক চীংকারে স্থ্যের ঘুম ভাঙল। ঘুম বেগে উঠে মেঘের কবলটা একটুখানি মুখের কাছ থেকে সরিয়ে, সিঁহানার শুয়ে ওঠিয়ে উঠল—কে রে, চোমোমি করে অসময়ে আমার ঘুম ভাঙাছিল?

স্থ্যের রাগ দেখে তারা কেউ ভর শেল না, উল্টে আরও চীংকার করতে লাগল। ক্রমে লাগল—দেখ স্থিয়ামা, অনেক কালো হয়েছে। ভাল চাও ত আকাশে উঠে পড়, আর নয়ত তোমাকে টেনে তুলব।

স্থ্য দেখল, এদের হাত থেকে কিছুতেই ছাড়া পাবে না। তখন সে বলল—কেমন করে উঠি বল? তিন দিন ধরে ভারী ভারী কালো মেঘ আমার সারা শরীর আর মুখ চেপে ধরেছে, তাদের ঠেলে সরাতে পারছি না। দেখ না কালো মেঘেরা আমার মুখটা কি রকম কালো করে দিয়েছে। স্থ্যের কথা শুনে খরগোশ ছুটে বাইরে গিয়ে একটা বড় কলসী-ভরা ঠাণ্ডা জল টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এল। পাতিহীন সেই কলসীপুঙ্ক জল টোট দিয়ে টেনে টেনে স্থ্যের মুখের উপর উণ্ড করে ঢেলে দিল। পাররা একথানা প্রকাণ্ড সাপা তোরালো নিয়ে সেই জল দিয়ে স্থ্যের মুখ ঘলে দিতে আরম্ভ করল, আর সজ্জা কাঁটা দিয়ে বড় বড় করে টেনে স্থ্যের মুখের ওপরের কালো মেঘগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেপতে লাগল। মুরগীর ছানারা সেই সব মেঘের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে ফেলতে লাগল।

দেখতে দেখতে স্থ্যের মুখের ওপর থেকে সব কালো মেঘ মোছা হয়ে গেল। স্থিয়ামা এদের হাতে পড়ে ঝুঁকুকে হয়ে উঠল। তখন আর কি করে, অগত্যা ঘর ছেড়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে আকাশে উঠল। তখন স্থ্যের এমন তেজ হল, তা দেখে সবায়ের চোখ বলসে গেল।

সমস্ত পৃথিবী প্রচণ্ড রোদে ভরে গেল। বড়, বিষ্ট, মেঘ ভরে কাঁপতে কাঁপতে কোথায় যে ছুটে পালাল তার ঠিক নেই।

তখন মুরগীছানারা, পাররা, পাতিহীন, খরগোশ, সজ্জা মনের আনন্দে রোদ পোহাতে পোহাতে আর পান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে চলল।

পশু ও পাখী

ঐরগজিৎকুমার দত্ত

সবুজ পাখী টিয়ে, ডাকে না শিব দিয়ে
সাদা পাখী বক, নরকো জেনো ঠগ
কালো পাখী কাক, করুণাতার ডাক
এবং লাল পাখী কি, মুরগী ও মুরগী।

ডাকে যাওর-খাও, তারাই কোলাব্যাও
দেখতে নয় খারাপ, জিরাফ তারা জিরাফ
পথে যায় না ঝুট, মকর রাজা উট
লবা ডোরা বাগ,—হিংসে পণ্ড বাবা।

জলেতে বার বাস, সে হিপোপটেমাস
চামড়া মোটা বার, গুতার নাম তার—
কেশর কার চিহ্ন, শতরাজ সিংহ
সব দিকে কার হাশ,—মাঘু, সে মাঘু।



মায়ের মমতা ও

অস্টারমিন্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ গুর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অস্টারমিন্কে খাওয়ান। অস্টারমিন্কে বিশুদ্ধ দুগ্ধভাত খাদ্য এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অস্টারমিন্কে তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অস্টারমিন্কে পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাকখরচের জন্য ৫০ মহাপ্রদসার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অস্টারমিন্কে” P. O. Box No. 202 বোম্বাই ১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারেন্স লিগুয়ের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। হৃদয় দেহপুষ্টির জন্য চার থেকে পাঁচ মাস বয়স থেকে দুধের সঙ্গে কারেন্স খাওয়ানও প্রয়োজন। কারেন্স পুষ্টিগুণে শরীরকে খাদ্য-রাসায়নিক করে তৈরী করে—গুণু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পৃথ-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ সালেই ভারতের নানা স্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষ নানা ভাবে প্রকাশ হচ্ছিল—সরকারী হিসাব অনুসারে '২১ সালে ৪০০ খরবট হয়েছিল, এবং ৫ লক্ষ শ্রমিক তাতে সমিষ্ট ছিল। দেশের মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিকরা সামিল হতে চাচ্ছিল নিম্নেরদের বিশিষ্ট সংগ্রাম পদ্ধতির মারফৎ—কিন্তু মহাস্বাক্ষী সেটা পছন্দ করছিলেন না, এবং শ্রমিকনেতাদের তদনুসারে নিরুৎসাহিত করছিলেন। কৃষকরাও নানা স্থানে তাদের দুঃস্বস্থার প্রতিকারের জন্তে বিপুলভাবে বিকোভ প্রদর্শন করছিল, এবং স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহের দিক ঝুঁকছিল। এপ্রিল মাসে মুল্লানতে কৃষকরা সত্যাগ্রহ শুরু করতে বাচ্ছিল,—জমির মালিক টাটাগোষ্ঠী—মহাস্বাক্ষী তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন 'উপর্যুক্ত' ব্যবস্থা করতে। হায়দরাবাবীতে বিরাট কৃষক বিকোভের পর কৃষকনেতাদের গ্রেপ্তার করা হলে কৃষকরা বিদ্রোহমুখী হয়ে ওঠে এবং সরকার গুলী চালিয়ে ৭ জন কৃষককে হত্যা, এং বহুসংখ্যক আহত কর। ফলে দেখানকার ৭০ হাজার কৃষক কংগ্রেসে যোগ দেয়। শিখদের তীর্থস্থান ও মন্দিরাদিতে ছিল দুর্ভবিত্র মোহান্তদের রাজত্ব—সরকার ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক—তাদের হাত থেকে পাবলিক কমিটির হাতে কড়ী আনবার জন্তে শিখেরা চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় নানকানা-সাহেব-এর মোহান্ত ১০০ শিখ তীর্থযাত্রীকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করে, এবং পেট্রোল দিয়ে মৃতদেহগুলো জালিয়ে দেয়। ফলে শিখকৃষকরাও দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দেয়। মহাস্বাক্ষীর এক বছরে স্বরাজের ভরসায় নির্ভর করে এইভাবে কৃষকরাও তাদের দুঃস্বস্থার অবসানের আশা নিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করছিল। মহাস্বাক্ষীও প্রাণপণে তাদের অসন্তোষকে অহিংসার পথে টেনে রাখার চেষ্টা করছিলেন।

মালাবারের সমুদ্রোপকূলের চিরনির্ধাতিত দরিত্র মোপলা কৃষকরা কিন্তু এক রীতিমত সশস্ত্র বিদ্রোহ করে এক খিলাফতরাজ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল।

এর আগে তারা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল, এবং সরকার রক্তের বন্যায় সে সব বিদ্রোহ ভূবিদ্যে দিয়েছিল—একদল বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ একে-একদল সৈন্য সুখানো স্থায়ীভাবে মোতায়েন করেছিল। '২১ সালের কংগ্রেস-খিলাফত আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে তারা স্বাস্থ্য পুলিশ, সৈন্য, জমিদার, মহাজন, সবাইকে আক্রমণ করেছিল, এবং অবশ্য হিন্দুদেরও—যাদের তাঁরা বরাবরই শত্রুশিবিরের সমিলই

দেখে এসেছে। তাছাড়া তারা ইউরোপীয়দের হত্যা করেছে সরকারী-ভবন লুণ্ঠ করেছে, রেল, টেলিগ্রাফ বিধ্বস্ত করেছে।

হাওয়া বুঝে মহাস্বাক্ষী মোপলা বিদ্রোহকে দীক্ষার না দিয়ে বললেন, তারা সাহসী ও উৎসাহিত,—এবং বললেন সরকার তাদের অসহ্য উৎপীড়ন করেছে, এবং তাদের অপকর্মের সরকারী ক্ষিপ্রতা অতিরঞ্জিত। তিনি এবং মৌলানা মহম্মদ আলী মালাবারি যোগে পথে ওয়ালটেরারে গ্রেপ্তার হলেন, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পরেই করাচীতে রাজদ্রোহকর বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ করে মৌলানা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের জেল হয়।

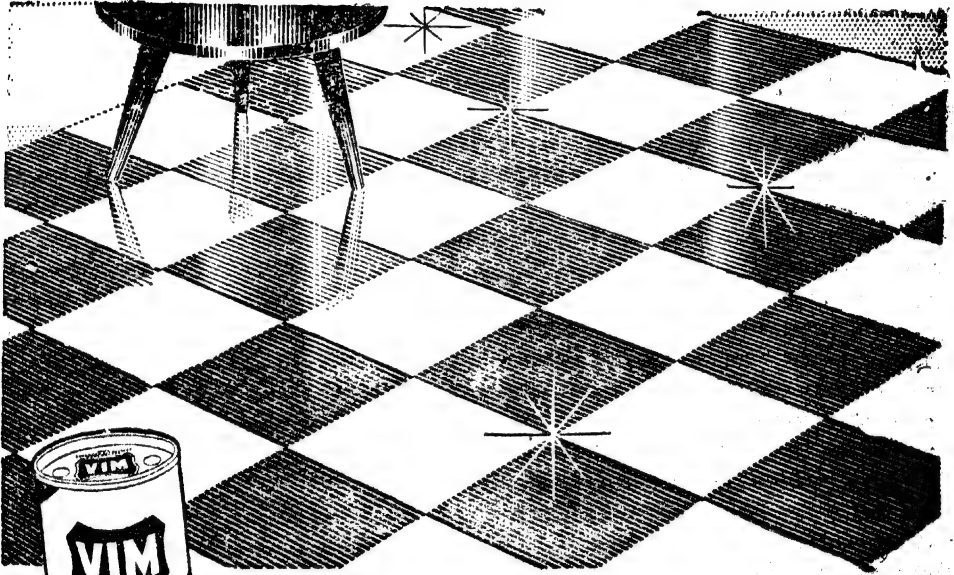
যেটি কথা '২১ সালের শেষেই আইন অমান্ত ও শেষ পর্যন্ত খাজনা বন্ধ আন্দোলনের কথায় লোকের সর্বত্র উৎসাহ-উত্তেজনার সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অনেকে আশা করেছিল, আহমদাবাদ কংগ্রেসেই খাজনা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু তা হল না। জেল ভাঙি করার নির্দেশে বে-আইনী-ভালাটিয়ার দলে নাম লিখিয়ে, বে-আইনী সভা করে দলে দলে লোক জেলে যেতে লাগলো। '২২ সালের গোড়োটেই জেলে ৩০,০০০ লোক জন্মে গেছে। মহাস্বাক্ষী ছাড়া বড় বড় নেহারও জেলে গেছেন।

দেশের লোক কিন্তু খাজনা বন্ধের জন্তে উদ্বল হয়ে উঠেছে। অনেক স্থান থেকে মহাস্বাক্ষীর কাছে আবেদন আসছে, খাজনা বন্ধ শুরু করার অহুমতির জন্তে—মহাস্বাক্ষী অহুমতি দিচ্ছেন না। অন্ধের ৩০ টি জেলা খাজনা বন্ধ শুরু করে দিয়েছিল,—১৫ লাখের মধ্যে মাত্র ৪ লাখ টাকার বেশী সরকার আদায় করতে পারেনি,—এই অবস্থায় মহাস্বাক্ষী তাদের নিন্দা করে সব খাজনা চুকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। লোক হতভম্ব হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রকারী মাসে তিনি বড়লটকে নোটিশ দিলেন, সরকার যদি নির্ধাতন বন্ধ করে বন্দীদের মুক্তি না দেয়, তিনি খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি সকলকে বলে দিয়েছিলেন, সরকারী নির্ধাতন ও প্ররোচনার মুখে কেমনভাবে সম্পূর্ণ অহিংস থাকতে হয়, তা তিনি নিজে আগে দেখিয়ে দেবেন, তার পরে অস্ত্র খাজনা বন্ধ শুরু করা যাবে। তিনি এজন্তে বারদোলাী তালুক খাজনা বন্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন। ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে নতুন শাসন সংস্কার অনুযায়ী ইউনিয়নবোর্ড সংগঠনে বাধা দিয়ে একটি নতুন



ভিম ব্যবহার করলে পরে —দেখুন কেমন ঝালমল করে



ভিম অস্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষের চেহারা বদলে যায়। মেঝে, বাথরুমের বেসিন ও সিঙ্ক, থেক, রান্নার হাঁড়ী, ডেক্‌চী, হাসর-কোসন, কাঁচের ও চায়ের বাসন—সবই এক মতল রূপ নেবে। ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে জিঁবিশপত্রে কোন রকম আচড় লাগে না। আর কত সোজা ও কম শাটুনিতে হয় ভেবে দেখুন। ভেজা ব্যকড়ার একটু ভিম দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষুন—দেখবেন যত মরলা আর দাগ নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়

সকলের আইন অমান্ত হুজুর হয়ে গিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত নব্বও হয়েছিল, সরকার ইউনিয়ন বোর্ড সংগঠন করতে পারেনি।

বাই হোক, বাঙ্গালীতে খাজনা বন্ধ হুজুর হওয়ার আগেই চৌরীচৌরার বিদ্রোহ ঘটনা ঘটে গেল। বিদ্রোহ কৃষকদের ওপর পুলিশ গুলী চালিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা ধান আক্রমণ করে আলিয়ে দিয়েছিল এবং ২২ জন পুলিশকে হত্যা করেছিল। ঘটনা প্রকলমাত্র মহাত্মা গান্ধী তীব্র অপমান বোধে জর্জরিত হয়ে আন্দোলন বাড়িল করে দিলেন এবং বললেন, তিনি তাঁর হিমালয় প্রমাণ ভ্রাতা বিচারের জন্তে ঈশ্বর ও মানুষের চোখে বেইজ্ঞ হয়েছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সভা করে নির্দেশ দিলে, অতঃপর আইন অমান্ত স্থগিত থাকবে, এবং কংগ্রেসকর্মীদের সর্বত্র চরকা অশ্লীলতা নিবারণ, মাদকবর্জন ও শিক্ষাকার্য নিয়ে থাকতে হবে।

সংগ্রামী উৎসাহ-উত্তেজনার উল্লস্ক তরঙ্গ শুরু হয়ে গেল,— কর্মীরা ক্ষুদ্র হয়েও নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে তথাকথিত গঠনমূলক কাজেই মনঃসংযোগ করলে। আমরা চরকা-খন্দর এবং চাশাভাল স্থল নিয়েই খাটতুম—সবটুকু সময় ও শক্তি তাতেই নিয়োজিত ছিল—আমরা তাই নিয়েই থাকলুম। কংগ্রেসের স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, একাঙা ও এখন গিয়ে পড়লো “বিশ বাঁও জলে”—সুতরাং আমাদের নিজস্বের আদর্শ কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই এখন আমাদের করতে হবে,—এটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এরিক চট্টগ্রামে প্রাদেশিক কনকাবেল এসে পড়লো—গেলুম দেখানে। সত্যেন্দ্রী বাসন্তী দেবীর বক্তৃতায় আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র কাউন্সিলের ভিতর পর্যন্ত প্রসারিত করার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আমরা উৎসাহিত হলাম, কিন্তু গোড়া গান্ধীবাদীরা তার ক্ষেত্র যি আর লামের ব্যারিট্রেক্টরী হুঁসীতির গন্ধ পেলো।

হুসীপঞ্জ সাবডিভিশন, এবং ঢাকা সহরের অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানা নিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুর (সাবডিভিশনাল) কংগ্রেস কমিটি ৬টা থানা—ভার মধ্যে দেহায় এবং নবাবগঞ্জ ছিল প্রাক্কুর ঘোষ প্রাক্কুর গোড়া গান্ধীবাদীদের আড্ডা—বাকি ৪টে থানা—হুসীপঞ্জ, রাজাবাড়ী, টলীবাড়ী এবং জীনগর আমাদের আড্ডা। এর মধ্যে বানরী বিভাগ্রমের ধীরেন দাশগুপ্ত এবং পূর্ণানন্দ সেন, এবং সৌহজকে জিতেন কুশারী গোড়া গান্ধীবাদী। খন্দরই ছিল এদের প্রধান অবলম্বন,—কিন্তু আধিরাও তাতে নেহাৎ পিছিয়ে ছিলুম না—“২২সালে শুণ্ড পঞ্চদশ কয়েই গোঁশে চুপো চরকা চলেছিল। সকল বাড়ীতে তুলোর বীজ বিতরণ করে আমরা তুলোর গাছও করেছিলুম অনেক। ভাশাভাল স্থলের তীতে ভাল খন্দরের বৃত্তিশাড়ীও তৈরী হচ্ছিল। আমরা প্রান অনুসারে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কিছু কাঠ সংগ্রহ করা হত, এবং কারো বা একটা বড় আমগাছের মোটা সোজা একটা ভাল চালা আঁদার করা হত। ডালের টুকরো দিয়ে চরকার হুঁপো বা “ডিম”, তৈরী হত, এবং অজ্ঞাত কাঠ গিয়ে অজ্ঞাত অংশ তৈরী হত। বাসের বাড়ী থেকে কাঠ আনা হত,—ভাসের একটা চরকা বিনামূল্যে দেওয়া হত,—বাড়তি চরকা অজ্ঞাতকক্ষে দু টাকা হার বিক্রী করা হত, তাতে টাকু ও ছুতারের মজুরীর খরচ চলতো।

দাশ মহাশয় জেল থেকে বেরিরে স্বরাজপাটি গঠনের পরিকল্পনা প্রচার করলেন। সার্ভেট ও আনন্দবাজার গোড়া গান্ধীবাদীদের

কাগজ দাশ মহাশয়কে এতাহ গালি দিয়ে কুত ভাগাতে লাগলো। দাদাসেব সজে দাশ মহাশয়ের বন্দোবস্ত হল, যুগান্তরপাটি স্বরাজপাটিকে সমর্থন করবে, এবং কাজ করবে। বস্তাবস্তই কংগ্রেসের কেন্দ্রগুলো হুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল Nochanger গান্ধীবাদীদের কেন্দ্র, এবং Prochanger স্বরাজপাটির সমর্থকদের কেন্দ্র। বিক্রমপুরে প্রাক্কুর ঘোষদের সঙ্গে লাগলো আমাদের ঠাকাতুকি।

কলকাতায় দাদারাই প্রথমে আত্মশক্তি কাগজখানা বার করেছিলেন এবং উপেনদাকে সম্পাদক করেছিলেন। বোঁবাজের চেরী প্রেস এসেছিল অমরদার হাতে। শেষ পর্যন্ত চেরী প্রেসে আত্মশক্তি উঠে গেল,—কাগজটা চালাতে লাগলেন উপেনদা’ এবং অমরদা’ই, এবং এই একখানি ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকাই হল দাশ মহাশয়ের সমর্থক, স্বরাজপাটির কর্মপন্থার প্রচারক। সুতরাং সেখানে এসে জমলেন ভূপতি মজুমদার, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি স্বরাজপাটির প্রাথমিক সমর্থকদের কর্মীরা। চেরীপ্রেস হল স্বরাজপাটির প্রধান কর্মকেন্দ্র।

হুসীপঞ্জ ভাশানাল স্থল থেকে আমরাও একটা হাতে লেখা মাসিক পত্র বার করেছিলুম,—প্রথমে জীঘনের নাম ছিল সম্পাদক—কিন্তু জীঘন কলকাতায় পাটির কাজ এবং স্বরাজ পাটির কাজেও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং পরে সম্পাদক হলাম আমি। সেই কাগজেই আমি আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের মুখকল্প “নন-কোম্পারেশন ও স্বরাজ” নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলুম, বার বার পূর্বোক্ত উদ্বৃতিগুলো—গান্ধী, হজরত মোহানী প্রভৃতির কথাগুলো লিখেছিলুম। কাগজটার প্রকৃতি বোঝা যাবে একটা সর্বদা উদ্বৃত্ত করলে—“আনন্দ রাজারের দেশেবা—(এটা গরা কংগ্রেসের পদের কথা)—“পত ২২শে বৈশাখ আনন্দবাজারের সম্পাদকীর ভূতে দেখা হয়েছো :

যখন দেশের সকল হস্তের সকল সম্প্রদায়ের একযোগে কংগ্রেসের পতাকাভ্রম সমবেত হইয়া কার্য করিবার প্রয়োজন আসর হইয়া উঠিয়াছে,—সেই মুহুর্তে বৃহৎ নেতৃত্ব পরিচালিত স্বরাজ্য দল প্রতিস্থল সমালোচনার কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লাঘব এবং কাউন্সিলের মহিমা কীর্তন করিবার জন্ত দেশের সমুখে উপস্থিত হইলেন।

ঐ কাগজেই দেশবন্ধুর মির্জাপুর পার্কার বক্তৃতা বেরিয়েছে—তাতে কাউন্সিল সবক্ষে দেশবন্ধু বলেছেন :

“কাউন্সিল যে অসার তা তিনি বিশ্বাস করেন এবং অসহযোগ নীতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে তিনি অন্ততঃ কংগ্রেসেও একথা বলিয়াছিলেন। কাউন্সিল দ্বারা আমাদের কোন উপকার হইবে না সত্য, কিন্তু দেশদ্রোহীদের সাহায্যে কাউন্সিল দেশের অনেক ক্ষতি করিতে পারে।”

আমাদের কাগজে আমরা এইরকম ভাবে প্রচার করতুম। গরা কংগ্রেসে দেশবন্ধু বললেন,—কাউন্সিল বরকট করার ফলে আমরা গভর্ণমেন্টের একটা মন্ত সুবিধে করে দিয়েছি,—কতকগুলো ঘো-ছকুমের দল দেশের লোকের প্রতিনিধি সেজে সেখানে বসে গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করছে—আইনতঃ গভর্ণমেন্ট দেশবাসীর সমর্থনেই নির্ধারিত চালাচ্ছে। আমরা কাউন্সিলের ঐ আদর্শগুলো দখল করে সরকারের দুইদিককে পদে পদে বাধা দিই, যাতে তারা

দেশবাসীর নামেই দেশের সর্বনাশ না করতে পারে। কংগ্রেসের তাতে জোরই বাড়বে,—বাইরের আন্দোলন কাউন্সিলের জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত হবে, জোরদার হবে।

গয়া কংগ্রেসের পর এই কাউন্সিল-প্রবেশের প্রচার নিয়ে নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ ছই দলের গুঁতোও তি বেড়ে চললো। ইতিমধ্যে আডভোকেট-জেনারেল এস. আর. দাশ এক দিন কাউন্সিলে বক্তৃতায় মধ্যে একটি কথা বলে সকলের তাক লাগিয়ে দিলেন—“বিপ্লবীরা কংগ্রেস ঢুকে সারা দেশে কংগ্রেসের আড়ালে নিজেদের দল পড়ছে, এবং তাদের নামের লিপি আমার পকেটেই আছে।”

জীবন ও আমি গয়া কংগ্রেসে গিয়েছিলাম। এম, এন, দাসের একখানা ম্যানিফেস্টো দেখানে বিলি হয়েছিল,—যাতে বলা হয়েছিল চাষা-মজুরদের ব্যক্তিগত ভাবে কংগ্রেস-সদস্য না করে, তাদের সংগঠনগুলোকে কংগ্রেসের affiliation দেওয়া চোক। সেটা অবশ্য গ্রাহ্য হয়নি। এম, এন, দাস তখন কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল ভারতের প্রতিনিধি এবং কৃষিরা থেকে কমিউনিষ্ট সাহিত্য এবং প্রচারপত্র ভ্যানগার্ড পাঠাতেন, জীবন কলকাতায় সেগুলো পেতো এবং মাঝে মাঝে মুল্লীগঞ্জও পাঠাতো। ডাঙ্গ্রে তখন তরুণ এবং প্রথম বই লিখেছেন “Gandhi Vs Lenin”—জীবন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসে, আমিও সঙ্গে ছিলাম।

এই গয়া কংগ্রেসে অমূল্যলনের চারজন নেতার নামে এক ম্যানিফেস্টো বিলি হয়—

ভারত-সেবক-সংঘ

সাধারণের অবগতির জন্য আমরা জানাইতেছি যে, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের বর্তমান কার্যকলাপের সহিত আমাদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্ট নাই এবং ভারত-সেবক-সংঘ নামক যে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন সেন

” প্রভুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

” রমেশচন্দ্র আচার্য

” রমেশচন্দ্র চৌধুরী

এই ম্যানিফেস্টোটা কলিকাতার আত্মশক্তি কাগজেও ছাপা হয়েছিল, এবং আমরা আমাদের কাগজে (উদ্যত) তা থেকে উদ্ধৃত করেছিলাম।

বহুতটা পরে শুনলাম। এস আর দাসের পকেটে বিপ্লবীদের নামের তালিকা গেল কেমন করে? অমূল্যলনপাটির কর্মীরা বিভিন্ন কংগ্রেস কেন্দ্রে ভারত-সেবক-সংঘের নামে “হক কথা” প্রচার করতো, কিন্তু যুগান্তর পাটির কর্মীদের দ্বারা তাদের প্রচার বানচাল হত। তাদের ব্যর্থতার কৈফিয়তে তারা এস, আর, দাসের কাছে (পুলিন দাসের মাধ্যমে) লিখতো, যুগান্তর দলের অল্প কর্মীরা জন্মে আমাদের প্রচার ব্যাহত হচ্ছে, সে এখানে কংগ্রেস কমিটি দখল করে বসে জেলোদের বিপ্লবের মন্ত্র নিয়ে দল গড়ছে। এরনি করে নানা জায়গা থেকে যুগান্তর দলের দাশদের নাম এস, আর, দাসের

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্মান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতির্বিদ, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত কলিত ও গণিত সম্ভার সম্ভাপতি এবং কাশ্মীর রাগাণ্ডী পণ্ডিত মহাত্মার দ্বারী সম্ভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোম্পি বিচার ও প্রকৃত এবং অন্তত ও দৃষ্ট ইহাদির প্রতিকারকরণে শাস্তি-বস্ত্রাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়া ও প্রত্যক্ষ কলত্রের কতাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ভাঙার কবিরাজ পরিতোষ কলি রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, লিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনোবীজ দ্বারা অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবারো শীকার করিয়াছেন। এলাসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ, হাইনেস মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস মাননীয়া বটমাতা মহারাজী ত্রিপুরা স্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ভারত সরকার যুগোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর হার মদননাথ রাই চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রাই, বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীকৃষ্ণদেব রায়চক, কেউনরড হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মি: এস. এম. দাস, আশাদের মাননীয় রাজাপাল হার ফল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরী মি: কে. কপল।

প্রত্যেক কলত্রের বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধর্ম্ম কবচ—ধারণে বঙ্গদেশে প্রভুত ধনলাভ, মাননিক শাস্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তত্ত্বোক্ত)। সাধারণ—১১/০, পলিশাঙ্গী ২৫/০—২১/০, মহাপলিশাঙ্গী ও সত্ত্ব কলত্রক—২২/০। (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের রূপ লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও যক্ষ্মার অস্ত্র ধারণ কবচ)। লক্ষ্মী কবচ—অর্থশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় প্রফল ১১/০, ২৫/০—৩১/০। মোহিনী (বন্দীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত ধনী ও পুত্র বন্দীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১/০, ২৫/০—৩১/০, মহাপলিশাঙ্গী ৩৭/০। বঙ্গলক্ষ্মী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিহ মনবিক সন্ততি ও সর্বপ্রকার মাংসলায় জরলাভ এবং প্রবল ক্ষমতা ২০/০, ২৫/০—৩১/০, মহাপলিশাঙ্গী—১৮/০। (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাঙার সম্ভাবনা নাই হইয়াছেন)।

(হাঙ্গিডাক ১৯০৭ ধঃ) অল ইন্ডিয়া এন্টোনমিক্যাল সোসাইটি (রেজিঃ)

হেড অফিস ৪০—২ (খ), বর্তমান স্ট্রীট “জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন” (এবেশ পথ ওয়েলেসলী স্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৬৬।

সদর—কোলকাতা হাইডে ৭৮। ব্রাক অফিস ১০৬, প্রে স্ট্রীট, “বসন্ত বিলাস”, কলিকাতা—৫, ফোন ১১—৩৬৭৫। সদর প্রান্তে ১৮ হাইডে ১১৮।

কটজমা হয়েছে। তিনি নিবোধের মতন সেটা নিয়ে “বড়াই করার যুগান্তরের দাশাসের আরম্ভবৃত্তে কিছু বাকি নেই। তাই এই কেসেদারী থেকে অম্মশীলন পাটিকে বার করে আনার জন্তে এই ম্যানিফেস্টো প্রচার করা হয়েছে। দোষটা সবই পুলিশ দাসের বাড়ি চাপিয়ে অম্মশীলনের নেতারা সরে এসেছেন। পরবর্তীকালে পুলিশ দাস বাপারটার উল্লেখ করে বলতেন,—“বেইমানের দল, আরে ভরাই তো সব খাইচেন—আমি একটা পরসা খাইচি?”

এর পরই অম্মশীলন দল যুগান্তরের সঙ্গে মিথালী করে কংগ্রেসে যোগ দেয়। এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বই (বিপ্লবের পদচিহ্ন) থেকে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন :

ধরা পড়ার কিছুদিন আগে থেকে (‘২৩ সাল) প্রতুল বাবু ও রমেশ বাবু আমার কাছে যাওয়া-আসা করছিলেন। তখন এরা ভারত-সেবক-সংঘ করার দরুণ বাংলা রাজনীতিক্রেত্রে অপাক্ষেপ্য। প্রতুল বাবু একদিন আমার বলেন, “ও যা করতে গিয়েছিলাম, দেশের ভাল হবে বলেই তো করতে গিয়েছিলাম।”

কিন্তু দেশের ভাল হবে বলে ওরা এই সময়ে মিলতে এসেছিলেন, এ কথাটা যে কত অসার, সেটা বৃষ্টি ১৯২৮ সালে খালাসের পর। এসেছিলেন তখন স্বরাজ্যপাটি গঠিত হচ্ছে বলে—(১২৪ পৃষ্ঠা)

“বাই হোক, স্বরাজ্যপাল গঠনের ভার কিন্তু প্রায় সবটাই পড়লো আমাদেরই উপর। এবং তাই স্বাভাবিক। প্রতুল বাবুদের এই সময় আমাদের সঙ্গে মিলন কামনাও তেমনি স্বাভাবিক।”

—(২১৭ পৃষ্ঠা)

কিন্তু, এম, আর, দাসের গকেটের তালিকার স্বভাবতই অম্মশীলনের নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীদের নামও উঠলো। কিন্তু I B তো সেই তালিকার উপরই নির্ভর করে না—তাদের খাতার দ্বারা বড় তালিকা গড়ে তোলার ব্যবস্থা তারা আগে থেকেই করেছিল। দাদার এক বছরের জন্তে অফিস অসহযোগ কর্মসূচীকে একনিষ্ঠ ভাবে চাল দিয়ে, তারপর নিজস্বের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু সেটা এই কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনার ছন্দেটা মাত্র, এবং তার জন্তে স্বাভাবিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভাবে বাধ দিয়ে চলার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন, যাতে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে তাদের দল গড়ার কাজ I B বানচাল করে দিতে না পারে, বরঞ্চও প্রেরণার করার কোন সুযোগ না পায়।

তার পর যখন কাউন্সিল-প্রবেশের প্রোগ্রেস নো-ডেজ প্রোডেজ হ’ল ভাগ হয়ে গেল, তখন প্রকৃত পক্ষে গান্ধীবাদী, বিপ্লব-বিরোধী, অহিংসোপহরী হ’ল নো-ডেজার, আর বিপ্লবীরাই হল প্রো-ডেজার। I B-র চার্জে আরো পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছু স্বাভাবিক কার্যকলাপ দেখে চালু করার ব্যবস্থা তারা আগে থেকেই শুরু করেছিল। একেট প্রোডোকেটের লাগিয়ে ছুটো-ছুটো। বিপ্লবী প্রেরণক প্রথম ভরুণদের দিয়ে স্বাভাবিক কার্যকলাপের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই রকম একজন একেট ছিল শিশির ঘোষ। সে-মির্জাপুর স্ট্রীট এক থানবের দোকান করে বসে কাজ চালাতো। আর একজন ছিল, ভূপেন বাবু। ঠাঁয় বইয়ে তার ছদ্মনাম দিয়েছেন হুইটল। শিশির ঘোষ খেলাতো সন্তোষ মিত্রকে, এবং টুইটল

ছিল হাওড়ার ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেকির শিছনে। শিশির এবং টুইটল মধ্যে আবার পাল্লা এবং বেবোবোধিও চলতো।

বিশ্বিনন্দ’র চেলা হিসাবে সন্তোষ মিত্র তাঁর কাছ থেকে (বা শিশিরের কাছ থেকে?) বিডলভাষ বোগাড় করে ভাই দেবিরে ছেলে রিক্রুট করতো, এবং নেতা বলে বিশ্বিনন্দ’রই নাম করতো। বিশ্বিনন্দ’ কংগ্রেসে দাদাদের সঙ্গে যোগ দিয়েও এ ব্যাপ্তর বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। শিশিরের বন্দোবস্তেই সন্তোষ মিত্রের দল শাখারীটোল পোষ্ট অফিসে ডাকাতি করতে গিয়ে পোষ্ট মাষ্টারকে হত্যা করে। বরেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে এবং পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে। মামলার জার বিল্ডে সাক্ষী দেয় যারা, তার মধ্যেও শিশিরের লোক ছিল। বরেনের প্রথমে প্রাণবশু, ও পরে Mercy petition করার যাবজ্জীবন কারাবশু হয়। তারপর সন্তোষ মিত্রের দল কোণা (হাওড়া) ডাকাতি করে, ডাকাতি ব্যর্থ হয়। তারপর সন্তোষ মিত্র, ধীরেন বাগচি এবং সুবোধ লাহিড়ীকে রেগুলেশন থিতে রাজবন্দী করা হয়, এবং সেবন বে (খোকা) গা ঢাকা দেয়।

পরে মির্জাপুর স্ট্রীট শিশির ঘোষের ধন্দরের দোকানে বোমা পড়ে, শিশির পাগিয়ে বেঁচে যায় এবং তার কর্মচারী প্রকাশ বদিক বোমার আঘাতে মারা পড়ে। এই সম্পর্কে ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেকি পরে ধরা পড়ে, এবং মামলার জার কাঁসি হয়। শিশিরের দোকানে বোমা মারা কাজটা নাকি টুইটল সেনের আক্কা-আকচির কল। শিশির তার পর I B-র চাকরী নিয়ে ইউ পিজে চল যায়। পরবর্তী কালে গোপী শার শিছনে থেকে টুইটল সেনই নাকি তাকে দিয়ে ডে সাহেবকে খুন করিয়ে টেগাটকে বাঁচিয়েছিল। গোপী টেগাটকে হারার জন্তে ব্যর্থ ছিল।

এই সব স্বাভাবিক কাণ্ড শুরু হওয়ার সময় থেকেই দাদারা মনে মনে বিপ্লব গণছিলেন, দিন বৃদ্ধি ঘনিয়ে এল। ওদিকে আর একরকমের কাণ্ডও চলছিল। দাদারা মোজাকফর আইমদের দ্বারা এম এন রায়ে’র সঙ্গে বোগাযোগ স্থাপন করে ভারতীয় বিপ্লবে কল সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করেছিলেন, কিন্তু এম এন রায়ে’র চাচা-মজুরের বিপ্লবের প্রাণ গ্রহণ করতে সম্মত হননি। ২১ জন দাদা, যেমন ভূপতি মজুমদার, কিন্তু প্রায় কটর কমিউনিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ২১ সাল থেকেই কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে মেতেছিলেন এবং মোজাকফরের আড্ডায় (মুম্বাই অফিস) আন্তানো গেড়েছিলেন। উপনন্দ’ও আত্মশক্তি কাগজে এম এন রায়ে’র জ্যানগার্ড প্রভৃতি থেকে চাচা-মজুরের বিপ্লবের আদর্শ সম্পূর্ণ প্রচার করতেন। দাদাদের মধ্যে ‘মনোরঞ্জননা’ ছিলেন এসব কাণ্ডের সব চেয়ে উগ্র বিরোধী।

কিন্তু একদিকে গান্ধী, আর এক দিকে বলশেভিজম দাদাদের মধ্যে রীতিমত ভাব-বিরোধের সৃষ্টি করছিল। বিপ্লবী দলের জিতেন কুমারী হয়েছিলেন পরিপূর্ণ গান্ধীবাদী এবং নো-ডেজার দলভুক্ত—তিনি দাদাদের কাছে গোপন রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, জীবন ছেলের জ্যানগার্ড পড়তে হচ্ছে। মনোরঞ্জননা হয়েছিলেন বারো আনা গান্ধীবাদী এবং নো-ডেজার—তিনি জীবন এবং ভূপতি’কে ভাল চোখে দেখতেন না—কারণ এরা দুজনেই হলেন প্রো-ডেজার দাদাদের সামিল, স্বরাজ্যপাটির উদ্বাসী কর্মী এবং কমিউনিষ্টিক কুশক্তি। কমিউনিষ্টদের

খোলা বর্জন করেছিলেন এবং '২৩ সালে তাঁকে বি-পি-সি-সির সেক্রেটারী করে নিয়ে দাদারা তাঁর কমিউনিজমপ্রম সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিলেন। জীবন কিন্তু দাদাদের সঙ্গে বরাহপাট ও করে এবং ডানপাটও এঁচার করে। দাদাদের সঙ্গে যোজ্ঞাকর আহমদের বোণাযোগ বন্ধার জন্তে দাদারা জীবনকেই নিযুক্ত করেছিলেন।

অতুল' পলাতক জীবন শেষ করে বেরিয়ে আসার পর ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন,—দাদাদের সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেননি—কলেছিলেন অহিসাঁপন। আমার হজম হবে না। অনেক তখন তাঁর ওপর চটেছিলেন, কিন্তু তাঁরই বছরের পর বছর তাঁর কাছ থেকে নানা প্রকারের সবচেয়ে বেশী অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতেন।

সতীশদা' বেরিয়েছিলেন সকলে বেরোবার প্রায় এক বছর পরে। তিনি ও পীচুদা' সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে পৃথক হয়ে পড়েছিলেন,—জানতেই পাবেন নি যে সরকারের সঙ্গে আপোষ হয়েছে,—সকলেই কিংবে এসেছেন! তাই তাঁর নামে বিজ্ঞপ্তিতে দাদাদের বিজ্ঞাপন অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। তার ফলে তাঁরা চন্দননগর মন্ডলাল রায়ের কাছে এসে গুটেন, এবং সতীশদা' তাঁর নামে যেটা টাকার সরকারী খোঁজা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাতিল হওয়ার পর আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২১ সালের শেষে। তিনি তার পরেও গাঢ়া দিয়ে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন, ভবিষ্যতের কাজের সুবিধার জন্তে,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদাদের সঙ্গে কংগ্রেসে ভিড়ে গিয়ে খুলনায় গিয়ে বসেন, যেমন প্রায় সব দাদাই নিজ নিজ জেলায় বসে ছিলেন।

যাই হোক, গয়া কংগ্রেসের পর আমি ও জীবন কয়েক দিন একটু মধুপুর, নেওঘর, জামসেদপুর ঘুরে গেলাম লক্ষ্মীসরাইয়ে। সেখানে জীবনের একটু ছোট্ট জমিদারী ছিল। বৎসরান্তে কিছু খাজনা আদায় হত—জীবন সেটুকু শিক্তি করার বন্দোবস্ত করে এল। এসিকে মুন্সীগঞ্জে বটে গেল জীবনবাবু মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে চলে গেছেন, এবং তার ফল হল, গ্রামাঞ্চাল স্থল প্রার উঠে বাওয়ার বোগাড়—ছেলেরা স্থলে আসা বন্ধ করতে শুরু করলে। ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে জীবনের প্রভাব, তার প্রতি বিশ্বাস কতখানি, তা দেখা গেল। আমরা মুন্সীগঞ্জে এসে যখন এই অবস্থা দেখলাম,—তখন জীবন উদ্দাদের মতন বাড়ী বাড়ী ছুটোছুটি করতে লাগলো। তখন চৌরীচৌরার মামলায় ১৭২ জনের কীসার হুকুম হয়েছে—মহাত্মা গান্ধীকেও সরকার গ্রেপ্তার করেছে এবং ৬ বছর জেল দিয়েছে—আদালতের ভাঁটার মুখে সরকার নির্ভয়ে তাঁর উপর চরম আঘাত হানার বন্দোবস্ত করেছিল।

জীবন চৌরীচৌরার আগামী ১৭২ জন কৃষকের কীসার হুকুমের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করলে। প্রকাণ্ড সভা হল, আমি উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলাম "দেশ দেশ নন্দিত করি যজ্ঞিত তব ভেরী—আসিল যত বীরবৃন্দ" ইত্যাদি। সভাপতি বোধ হয় শৈলেশ মিত্রের বাবা সিনিয়র উকীল জ্ঞান মিত্র। জীবনের বক্তৃতায় এমন এক ৯তুন উৎসাহ উদ্ভবনা সৃষ্টি হল যে আবার গ্রামাঞ্চাল স্থল জরজরাত হতে উঠলো।

খরচ সবুজানের অল্পবিধা বরাবরই ছিল। যতীন দত্ত, পদ্মেশ দেন প্রকৃতি দাঁটার দশায়রা জেলে গিয়ে জাঁতার গম পোষা শিখে এসেছিলেন—কখনো জাঁতা কেন্দ্র হল, এবং টিচারদের

ডিউটি ফুল এক ঘণ্টা করে গম পোষা। অনেকের বাড়ী থেকেই গম আসতো, এবং আক্ষরা চার পয়সা পের হারে গম পিঁয়ে দিতুম।

প্রাইজ দেওয়ার সময় আসছে টাকার দরকা—জগদ্ধাত্রী খোলায় মেবারপতন অভিনয় হল, কিছু টাকা উঠলো। আমি গানের সুর গঠিয়ে দিলাম। আমাদের পাড়ায়, টালায়, একবার মেবারপতন প্লে করেছিল পাড়ার দল। বিখ্যাত নাট্যশিল্পী ও সুরশিল্পী রাধাচরণ ভট্টাচার্য—করালীর পিসতুতো ভাই, টালায় লোক! তিনি নৃত্যশিল্পী এবং সর্বপ্রকারের যন্ত্রসঙ্গীতেও ছিলেন ওস্তাদ। তিনি গানের সুর রপ্ত করে দিয়েছিলেন,—এক আমি তখন তখন ঘেরে দিয়েছিলুম। জগদ্ধাত্রী নাট্য সমাজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সাবডিভিশনাল অফিসার পূর্বোক্ত ফণী মুখার্জি। ঢাকায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কেউ আবেদন করেছিল প্লে বন্ধ করার জন্তে—সাম্প্রদায়িক বিরোধ সত্তাবনায় অজুহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধ করার আদেশও জারি করেছিলেন,—কিন্তু ফণী বাবু নিজে লিখে সে আদেশ বাতিল করিয়ে নিজে সারাক্ষণ বলে থেকে প্লে করিয়েছিলেন।

এইখানে একটা মনোবিজ্ঞানের প্যাচের কথা বলে নিই। বারা কোন আদর্শ নিয়ে খাটে, করণস্থা সঠিক হোক বা না হোক, তাঁরা নিজেরা কবে খাটে বলেই মনে করে, কাজের কাজ অবশ্যই কিছু হচ্ছে। আমাদের অবস্থাও ছিল কতকটা এই রকমের। সাধারিন ভূতের মতন খেটে বার লাইব্রেরী গরালেবইন জানালা টপকে চুকে লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেওয়া, এই হয়ে পাড়িয়েছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। পঞ্চসারের এক কাম

**JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING**



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

বুধ থাকতেন বার লাইব্রেরীর স্নানের পাছায়া, তাতেই আমাদের এই সুযোগ হয়েছিল।

খিচুটোর শেষ করে বেরোতে রাত তিনটে বাজলো—পরদিন পাইকপাড় (আবদুল্লাপুর) বাওয়ার প্রোগ্রাম আছে, মিটিং করতে হবে—শেষ বাজুই না ঘুমিয়ে কয়েকজনে হাট্টা দিলুম—মাইল পাঁচেক হেটে সকালেই সেখানে পৌঁছে গেলুম। '২২ সালেও কংগ্রেসের মেম্বার করা কঠিন হয়নি, কিন্তু '২৩ সালে সেটা কঠিনই হয়ে উঠেছিল, বিশেষতঃ ঐ কেন্দ্রে প্রধানত চাষীদের বাস, তারা গ্রেফ কংগ্রেসে আসতে চায় না। স্থানীয় কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

বিকালে আবদুল্লাহপুরের মাঠে সভা হল, আমি প্রধান বক্তা—“কলকাতার বক্তা”! এক মৌলবী সাহেবকে করা হল সভাপতি আর পাইকপাড়ার (পার্বতী গ্রাম) শ্রীশ্রীশ্রী শুলের কর্মীরা কংগ্রেসের রসিদ বই নিয়ে সভার মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেন। আমি বক্তৃতা দিলুম, প্রায় ক্রমিউনিজম—কংগ্রেসে শুধু বাবুদের ভিড়, তারাই কর্তা, সুতরাং কংগ্রেস শুধু তাদের স্বার্থ সাধনের কল হয়ে উঠছে, আর যদি স্বরাজ হয়, তাহলে সেটা হবে বাবুদের স্বরাজ—তাতে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হবে না, কারণ কৃষকদের স্বার্থ আর বাবুদের স্বার্থ এক নয়। সুতরাং কৃষকদের দলে দল কংগ্রেসে প্রবেশ করা দরকার,—তারাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী, তারা যদি কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়, তাহলে তাদের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না।”

মৌলবী সাহেব যখন আমাকে সাধুবাদ দিয়ে বক্তৃতা করছেন, জনন ভণিক ১০ জায়গায় কংগ্রেসের সম্মত করে রসিদ কাটা চলছে। সভাভেদে বেশ কিছু সদস্য সংগৃহীত হল, এবং তার পর সেখানে কংগ্রেস কমিটিও হয়ে গেল।

এ ঠিকে কংগ্রেসের এডুকেশন বোর্ডের যে ২য় সভা,—সভায় শাসনিক শুলে ছেলেরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার চিন্তিত হলাম।

Education may wait, but Swaraj cannot—এ দোমান স্বরাজের সম্ভবনা ঘুরে সরে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঁঙা হয়ে গেছে। সুতরাং আমার ঘনস্থির করে লেখালেখি করে স্বদেশী যুগের National Council of Education-এর অন্তর্ভুক্ত হলাম, যাতে আন্তঃপরীক্ষার পর ছেলেরা Bengal Technical Institute-এ সহজে ভর্তি হতে পারে। সেটা হয়েছিলও—আমাদের কয়েকজন ছাত্র বেঙ্গল টেকনিক্যালি ভর্তি হয়ে পাশ করে চাকরী বাকরী পেরেছিল।

চাকর্য সম্বন্ধী লাইব্রেরীর এক ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছিল, আমাদের দলের লোক তরুণ ব্রহ্মচারী কালী মহারাজ বোধ হয় চার্জে ছিলেন। একজন ভাল কর্মীর প্রয়োজন হল গ্রামে গ্রামে ঘুরে সম্বন্ধী লাইব্রেরীর প্রকাশিত জাতীয় সাহিত্য প্রচারের জন্তে—আমি কলকাতা থেকে সাদরা ব্যানার্জিকে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিলুম। প্রভাস মল্লিককেও মুন্সীগঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলুম, সে ছিল সকল কাজেই General assistant—এক সর্বজনপ্রিয় কর্তব্যবাহী ছিল। সেই সময়ে সম্বন্ধী লাইব্রেরী নরেশনার (চৌধুরী) একখানা ছোট বই প্রকাশ করেছিল—কোরিয়ার বিপ্লব আন্দোলন ও জাপানী বর্ধনতার বিবরণ—কোরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা সীম্যান বী টান থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন। নরেশ চৌধুরী যুগান্তর দলের লোক, আর তাঁর দাদা রমেশ চৌধুরী ছিলেন অমূল্য দলের।

'১৭/১৮ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে ৪৪ ডিগ্রীতে বহুকাল নির্জন কারাবাসে থেকে জোয়ান বয়সেই নরেশনার চেহারা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা হয়েছিল বৃদ্ধদের মতন। '২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে তাঁর সঙ্গে ছিলুম। তিনি আমাকে খুব ব্রহ্ম করতেন। '২৮ সালে জেল থেকে বেরোবার পর কিছুদিন রোগভোগ করে তিনি মারা গেলেন।

যাই হোক,—২৩ সালের মাঝামাঝি স্বরাজ্যাদেশের ঘাঁটি দেবী প্রেসে যখন সুভাষ বাবু আজ্ঞা গাড়েন, তখন উপেনন্দা তাঁর ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেন, এবং দাদাদের মতিগতি দেখে সুভাষবাবুকে করায়ত্ত করে গোপনে অমূল্যলীন পাটিকে নিয়ে কাজ করার প্রায়ন করেন। অমূল্যলীন পাটি চাইছিলো জনপ্রিয় সুভাষচন্দ্রকে যুগান্তর দলের প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নিতে এবং তার জন্তে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্ব মেনে নিতে,—যাতে কংগ্রেস এক পাবলিক ফিল্ডে তাদের কাজের সুবিধা হয়। সুভাষবাবুর মনেও একটা রোমাঞ্চকর মোহ দেখা দিয়েছিল, উপেনন্দার মতন মন্ত্রী এবং একদল অভিজ্ঞ বিপ্লবী কর্মীর অনুগত্য পেলে তিনি হতে পারেন স্বরাজ সংগ্রামের একটা deciding factor.

এই সময়ে দেশবন্ধু বেলুসেন পূর্ববঙ্গ সফরে—সঙ্গে ছিলেন সুভাষচন্দ্র, কিরীটচন্দ্র এবং উপেনন্দা'কে। জীবনও সুযোগ বুঝে বেকারীবাঞ্ছার (স্বয়ং মজুমদারের সাহায্যে) বিক্রমপুর রাজনৈতিক সম্মেলনের বঙ্গোবস্তু করে তাঁদের নিমন্ত্রণ করলে। তাঁরা মুন্সীগঞ্জ এলেন। কমলা ঘাট থেকে মুন্সীগঞ্জ সহরের মাঝখানের খাল থেকে নৌকায় সহরে আসাই সুবিধা। দেশবন্ধু আসছেন বলে লোকের যে উৎসাহ, ততোধিক উৎসাহ সুভাষবাবু আসছেন বলে। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ মতি সিং-এর। বঙ্গবাগিনীর চন্দ্রভূষণ ওরফে গৌরীর মতন সে হচ্ছে মুন্সীগঞ্জ কংগ্রেসের পাঞ্জরার হাড়—সনাতন ভলা টায়ার। তথাৎ এই যে, মতি ভাত চেয়ে কাশো—তার হাতের তেলোটাও কাশো। কিন্তু ওপরটা ভাত কাশো, তেলোটা তত সাধা—আর সাধা তার হৃদয় পাঁতের পাটি, যাকে বলে milk white, সাধা মনের পরিচয় তার নির্মল হাসিতে, আর সে হাসির অন্তও নেই বিরামও নেই—তাকে ধরে মারলেও সে হাসে। বোধ হয় তার শেট কামড়ালেও সে হাসে, আর সে হাসিতে বেন মুক্তা করে।

নেতাদের নৌকা ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে উজ্জল গৌরবর্ণ সুভাষচন্দ্রকে দেখে তার আনন্দ আর উৎসাহ যেন লাফিয়ে উঠলো—সে এক লাফে নৌকায় উঠে পড়ে সুভাষবাবুর একখানা হাত ধরে টেনে তার পাশে নিজের কুচকুচে কাশো জাতখানা রেখে সেখান থেকে একেবারে লুটোপুটি। সদাগরী স্বভাববাবুর মুখেও হাসি ফুটে উঠলো, সুভাষবাবু তাকে বুকে টেনে নিলেন—এক মুহূর্তে সে সুভাষবাবুকে আপনায় করে নিলে।

মতি Matriculation Examination-এর আগেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, পরে আন্তঃপাশ করে, এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতার এসে কণ্ঠাধ্বননের শুলের টিচার হয়েছিল।

যাই হোক, কলকাতার অধিবেশন চলার মধ্যেই রমেশ উপেনন্দা' প্রভু বাবুকে খবর দিয়ে আনিতে সুভাষবাবুকে নিয়ে এক পুরুষের 'ঘাটলার' নৌকায় বসে কিছু শোপন পরামর্শ করলেন। ণিকই কলকাতার কাউন্সিল প্রবেশ নিয়ে নো-ডেয়ার প্রোডেচার ওভারভিউ চললো। নো-ডেয়ার নেতা উত্তর প্রভু বোধ কলকাতা নিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি জীবনকে লক্ষ্য করে সভায় বললেন,—যারা অহিংসার বিশ্বাস করে না, তাদের কংগ্রেসে থাকার কোন অধিকার নেই। তার জবাবে জীবন মহাত্মা গান্ধীর স্বহস্তলিখিত পত্র বার করে পড়ে শুনিতে প্রফুল্ল বাবুদের আহ্বান করলে স্বচক্ষে পত্রখানি দেখে হাওয়ার জন্তে। ওঁরা চুপ করে থাকলেন,—খোঁড়া মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। স্বরাজ্যপাটির সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

জাশান্তাল ঘুলে বাংলা পাঠাপুস্তক ১ম শ্রেণীর জন্তে নির্গাচিত হয়েছিল,—সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের বিসজ্জন,—কাব্য—নবীন সেনের ঐক্যবাক্য, এবং প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব বা অমূল্যলীলন। দেশপ্রেম, বীরত্ব, সশস্ত্র সংগ্রাম, রাজনীতি, বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই সব নিয়েই হত আলোচনা। ফুটবল ক্লাবের কার্ট বয় ছিল একটি মূল্যমান ছেলে, নীরব ও নিরীহ প্রকৃতির। সে হঠাৎ একদিন আমাকে পোপনে তার লেখা এক প্রবন্ধ দেখালে—তার প্রতিপাদ্য, ধর্মমুঠান এবং ধর্মের প্রচলিত বচনগুলো, ঈশ্বর-আলার কুরং—এসবই বৃজ্জকী,—সাধারণ সরল লোকদের ধোঁকা দিয়ে ঠিকিয়ে খাওয়ার জন্তে মোহো পুঙ্খভদের কৌশলমাত্র। প্রকাণ্ড প্রবন্ধ, প্রত্যেকটি কথার সমর্থনে প্রচুর উদাহরণ ও যুক্তি—দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ—আমার মাষ্টারীর সন্দেহাতীত সাক্ষ্য, আশাতীত ফল! এখন সে কোথায় আছে, কি করে জানিনা,—মনে পড়লে জানতে ইচ্ছে করে,—মনে মনে ব্রী, যেখানেই থাক,—সকলীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ভেবে আনন্দ পাই।

বিক্রমপুরের মতন মানিকগঞ্জেও সাবভিভিসগ্রাল কনফারেন্স

হল—সেখানকার নেতা ছিলেন নরেন বোস। বিক্রমপুর সাবভিভিসগ্রাল কংগ্রেস ছিল আমাদের হাতে। নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা কয়েকজনে গেলুম। সকলে ঠিকার থেকে মানিকগঞ্জে নেমে একজন ডলফিন্টার গাইডের সঙ্গে ১২ মাইল হটন দিয়ে গেলুম ভেওতা গ্রামে—কিরণশঙ্কর রাইয়ের বাড়ী। ঐ ১২ মাইল পথের মধ্যে একটা জিরোবার জায়গা নেই, খাবার জলের পর্যন্ত বন্দোবস্ত নেই। কিরণবাবু কিছু চাঙ্গা নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু তা ছাড়া তাঁর সংস্পর্শের কোন পরিচয়ই ছিলনা।

২৩ সালের শেষে ইলেকশন এল,—ঢাকার স্বরাজ্যদলের প্রার্থী হলেন কিরণশঙ্কর। ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি তখন অস্থায়ীলয় পাটির হাতে। প্রতুলবাবুর ভগিনীপতি উকীল মনোরঞ্জন বানার্জির সঙ্গে কিরণশঙ্কর ব্যবস্থা করলেন, তাঁরাই নির্বাচনী প্রচারণা করবেন, এবং সারা জেলার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একেটা পাঠাবেন,—তাঁদের কর্মী আছে সর্বত্র। বলা বাহুল্য,—নির্বাচনের ব্যয়ের একটা মোটা অংশ এই প্রচারণা-এজেন্টের নামে তাঁরা পেলেন। জীবন কলকাতার তাঁকে আগেই নিশ্চিত করে দিয়েছিল, আমাদের কেন্দ্রগুলো সবুজ। মনোরঞ্জন বাবুর কোন লোকই আমাদের সঙ্গে বোণাযোগ না করায় আমরা একটু চিন্তিত হয়েছিলাম। শেষে ইলেকশনের আগের দিন আমরা চারিদিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়লুম,—কার্য স্বরাজ্যদলের সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের, অনারারীদের, সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব—কার্য যুগান্তর দলের হাতেই স্বরাজ্যপাটির সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব ছিল।

আমি গিয়েছিলাম বোলঘরে। হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন

উজ্জ্বল দিবসের উজ্জ্বল চিত্রা



বোরোলীন

পত্রম প্রসাধন

পরিষ্কার স্বকৃৎকে আকাশ,
রূপালী-মেঘ কাশফুলের নাচন,
আর শিউলির গন্ধে উৎসবের
লাড়া জেগেছে দিকে দিকে।
আকাশে-বাতাসে এক খুশির
আবেগ আছে জড়িয়ে। এই
স্বকৃৎকে পরিবেশে নিজেকে
উজ্জ্বল করে তোলাবার ইচ্ছে
সকলেরই সেজন্তে আপনার চাই
বোরোলীন ফেস ক্রীমের মত এক
অতুলনীয় উপকরণ। বোরোলীনের
যন্ত্রে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলুন।
সুস্বভিত বোরোলীনের মিষ্টি গন্ধে
আপনার মন খুশিতে ভরে উঠবে।



পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোম্পানী

১৬, বনফিল্ড লেন। কলিকাতা-১



একজন দরদী, তাঁর বাড়ীতে রাতে থাকলুম incognito, সকালে পোলিং বুথ গিয়ে বসলুম, লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন করে লোক আসতে শুরু করলো, দেখলুম একটু কথা কয়ে, সকলেই স্বরাজ্যদলের ভক্ত। দুপুর বেলা মনোরঞ্জন বাবু একজন ছোকরা নিয়ে এসেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে কলসেন, 'এই যে, এই থাকবে এখানে।'

ইলেকশন হয়ে গেল, কিরণস্বরূপই নির্বাচিত হলেন। বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছিল, মনে নেই, বোধ হয় ভাগ্যকূলের জমিদারদের কেউ। বিক্রমপুর থেকে বি-পি-সি-সি-র ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আমিও তখন বি-পি-সি-সি-র মেম্বর হয়েছি।

ইতিমধ্যে '২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়ে গেছে। নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ নিয়ে কংগ্রেস প্রায় বিধ্বস্ত হওয়ার যোগাড় হয়েছিল বলে' একদল সেটার গুণ রূপও গজিয়ে উঠেছিল, বাংলায় তার একজন পাণ্ডা ছিলেন বাঁকুড়ার অদ্বৈতবাগী প্রোফেসর অনিলবরণ রায়। একদিকে গান্ধীভক্তি, আর একদিকে যুগান্তর দলের দাঙ্গাধর্ম প্রো-চেঞ্জ কর্মকাণ্ড, এই সেটানায় পড়ে মনোরঞ্জন দাঁর (গুপ্ত) অবস্থাও হয়েছিল কতকটা মধ্যপন্থী। অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে তাঁর বাতির এবং ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। 'সরস্বতী প্রেস' থেকে মনোরঞ্জনদা' এক সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ করেছিলেন 'সারথি' এবং অনিলবরণকে সম্পাদক করে আরো নিকট বন্ধ করে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, এই সেটার গুণের চেষ্টায় দিল্লীতে আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়—মোলানা মহম্মদ আলী হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। বাংলা থেকে দেশবন্ধু তাঁর ডেলিগেটের দলবল নিয়ে দিল্লী চললেন, মুন্সীগঞ্জ থেকে আমহাও ককেকজন দিল্লী গেলুম—যতীন দত্ত, পরেশ সেন প্রভৃতি—জীবন কলকাতা থেকেই গিয়েছিল।

বৈধ গণতান্ত্রিক স্বাক্ষরিত স্বাক্ষর ছিলেন দেশবন্ধু—বেপরোয় জাঁদরেল। তখন ডেলিগেটের নির্বাচনও হত না, প্রাদেশিক সম্পাদক ডেলিগেটের চালা নিয়ে certificate ও card issue করলেই যত খুশী ডেলিগেট হতে পারতো, সংখ্যা বাঁধা ছিল না।

দেশবন্ধুর একটা বৈধ গণতান্ত্রিক কাগজ দেখা গেল অপরূপ। সারা ভারতের নো-চেঞ্জার ডেলিগেটদের চেয়ে বেশী সংখ্যক প্রো-চেঞ্জার ডেলিগেট জমা করে নো-চেঞ্জারদের out vote করে দেওয়ার অবস্থা করতে না পারলে তারা আপোষ মীমাংসায় বাগ মানবে না, স্বতঃস্ফূর্ত ভুক্তি ডেলিগেট নিয়ে যেতে হবে। বাংলায় লোকের অভাব নেই, কিন্তু দিল্লী বাওয়া-আসা খরচ জোপাতে জিভ বেরিয়ে বাবে।

স্বতঃস্ফূর্ত ককেকজন লোক পাঠানো হল কালীতে, এবং প্রায় সমগ্র বাঙ্গালীটোলাটোকেই বন্দরে সাজিয়ে তুলে নিয়ে বাওয়া হল দিল্লীতে, বেশল ডেলিগেট। কংগ্রেসে দেশবন্ধু বললেন, যদি আগনারা চান, আমি ভোটাভূতীতে রাজি আছি, কিন্তু আমি চাই না, কংগ্রেস স্তম্ভে ছুঁখানা হয়ে থাক। আমি মিসিত, সহস্ত কংগ্রেসই চাই। ইত্যাদি—

ডেলিগেটের বন্ধ দেখে out vote হওয়ার ভয়েই নো-চেঞ্জার বাগ মানলেন। ঠিক হল, দুইদলই কংগ্রেসের ভিতরে থেকে ছুটো বিভাগের মতন কাজ করবে, একদল প্রধানত কাউন্সিলের কাজ নিয়ে থাকবে, আর একদল গঠনমূলক কাজ নিয়েই থাকবে।

জীবন দিল্লী থেকে বসে বাওয়া স্থির করে বসনা হয়েছিল। আমরা ফিরে এলুম। কিন্তু ইতিমধ্যেই ১৭ জন নেতার নামে রেগুলেশন খুব ওয়ায়েট বেরুলো, আর অনেকেই ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁরা হচ্ছেন—মমরদা' (চাটার্জি), উপেনন্দা', বাহাদা', মনোরঞ্জনদা' (গুপ্ত), ভূপতিদা', ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রো: জ্যোতিষ বোষ (মাঠার মশায়), মনোমোহন ভট্টাচার্য, স্ববীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ চৌধুরী, অমৃত সরকার, সতীশ নকড়াই এবং বোধ হয় প্রভাস দে। জীবন পাখে খবর পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়ার পর গ্রেপ্তার হল, হঠাৎ একদিন রাত্তার মধ্যে। পূর্ণ দাশ এবং প্রভুল গাঙ্গুলীও গা ঢাকা দিয়েছিলেন, এব পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

কিছু দেখে আমি খুলে নোটিশ দিলুম,—ভিসিবরের পর আমি আব থাকবো না, কলকাতায় ফিরে যাবো। ভিসিবরে হল কোকনর কংগ্রেস সাধারণ অধিবেশন। আমি কোকনর কংগ্রেস থেকে কিব কলকাতায় চলে এলুম। সারদাও পরে চলে এল,—প্রভাস মুন্সীগঞ্জই থেকে গেল, অম্মার ভায়েও।

২৪ সালের জাম্বুদ্বীপে হঠাৎ একদিন গোলা শা টেগার্ট ডমে অর্গেষ্ঠ ডেনিমক এক সাহেবকে গুলী করে হত্যা করে পালাবার পাখে ধরা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আর পীতজন নেতাকে গ্রেপ্তার করলে রেগুলেশন খিতে। তাঁরা হলেন, অতুলদা' (বোষ), সতীশদা' (চক্রবর্তী খলনা), কিরণদা' (মুখার্জি), গোপেনন্দা' (খাবনা) এবং অরুণ গুহ। সরস্বতী প্রেস ও লাইব্রেরী একটা বিরাট ধাক্কা খেলো।

কংগ্রেসকে বিপ্লবের পাখে টেনে আনার প্রায় স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনে আপাততঃ পর্ববসিত হয়েছিল,—সেই স্বরাজ্য পার্টিও একটা ধাক্কা খেলো। স্বরাজ্য পার্টির ইংরাজী দৈনিক ফরওয়ার্ড প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছিল ২৩ সালের সেপ্টেম্বরের আগে। উপেনন্দা' থাকবেন সম্পাদকীয় বোর্ডে,—মনোমোহন ভট্টাচার্যের স্বীকৃতিজারির আশা ছিল, তিনি খুব খাটিছিলেন। যখন প্রথম দাদারী ধরা পড়লেন, তখন লালবাজারে (বা ইলিসিয়মহরোই) মনোমোহন বাবুকে দেখে রবি সেন তাঁর কাছে চুপি চুপি খবর বলছিলেন, যাতে ফরওয়ার্ডের প্রথম সংখ্যার খবরগুলো বেরোয়। মনোমোহন বাবু চুপ করে গুনছিলেন। এমন সময়, হরি, হরি। রবিবাবুর সঙ্গে মনোমোহন বাবুকেও কালো গাড়ীতে বোকাই করলো। তখন এক চোট হাসাহাসি লেগে গেল—যেন মরণপীড়া।

যেন বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্ব শেষ হল। হরিনা (চক্রবর্তী), স্বরেন্দ্রনা (বোষ), নরেন্দ্রনা' প্রভৃতি যারা থাকলেন, তাঁরা আবার ভাঙ্গাবার পোছাতে শুরু করলেন। আমরাও থাকলুম শিচ্ছেন।

[ক্রমশঃ]

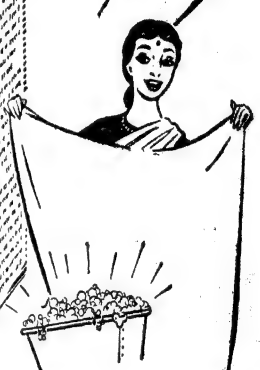
"হিন্দুধর্ম দুখিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে এবং সমুদয় ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুরু এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলী জানিতে হইবে।"

—হামী বিবেকানন্দ

মাসিক বহুমতী—ভা.৩



অত্যন্ত
কাল্প কাচার
পাউডার



মূল্যঃ
বড় সাইজ ২ টাক ১২ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাক ১২ ন.প.
(দুনিয় কর ছাড়া)

সারফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যন্ত কাপড় কাচা পাউডার সারফ কাচা জামা-
কাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে
যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মনেতেই
হবে যে...
আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে সাদা,
এত হালকা উজ্জল করে। সাট, চামর, শাড়ি, তোলালে—সবকিছু
কাচার জন্তেই এটি আদর্শ!
আপনি কখনও দেখেননি এত ফেগা—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, ফেগার পক্ষে প্রতিদুল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন
ফেগার এক সমুদ্র!
আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড়
কাচা যায়। বেশী পরিচর্য নেই এতে! সারফ জামাকাপড় কাচা
মানে কষ্ট সহন অক্লান্ত ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই
আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে দেয়।
আপনি কখনও পাননি আপনার পরনার মূল্য এত চমক-
কারভাবে ফিরে। একবার সারফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা
মেনে নেবেন! সারফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ।

আপনি নিজেই পরখ করি দেখুন...

সারফে জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

হিন্দুস্থান লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

BU. 25-X12 BQ

অক্ষন ও প্রাক্ষণ



কল্যাণী
অপরাজিতা ঘোষ

বহু বাক্যে ধরে মানসকল্প কল্যাণীতে আসবার আমন্ত্রণ আসছিল। সময় আর হয়ে উঠছিল না, তাই এই বাব শিপ গির, এই সামনের ছুটিতে বাব বলে ওকে কিছুটা শাস্ত করছিলাম আমার দিক থেকে। প্রত্যেক চিঠিতেই 'কবে আসছে' এই কথাটুকু বিশেষ করে লেখা থাকত।

এবার বেলাদির একখানা খুব বড় চিঠি এল। খুব অভিমান করে লিখেছে। বেশ বৃথতে পারলাম, বেলাদিকে চিঠি দিয়ে আর শাস্ত করা বাবে না। যেতেই হবে কল্যাণীতে। মাস খানেকের ছুটি নিয়ে দুর্গা নাম জপে জপতে ট্রেনে চলে বসলাম।

ট্রেন একটার পর একটা ট্রেনে পেরিয়ে যেতে লাগল—কোনটার খামে, কোনটার খামে না। বেশীভাগই খামে না। এসব দিকে বিশেষ খেয়ালও ছিল না। কেবল মনের মধ্যে করেকটা আত্মজিজ্ঞাসা ঘুরে ফিরে আসা বাওয়া করছিল। কেমন জায়গা কল্যাণী, শুনেছি ত খুব ভালো জায়গা, যিহি সহরের নোংরাই এখানে নেই, পথ চলতে গেলে ট্র্যাফিক পুলিশের দরকার হয় না, ডাঠ বিনের গন্ধে অরপ্রাণের ভাত উঠে আসে না।

হ্যাঁ, বাস্তব। ত বেলাদি চিঠিতে ভালো করে বুঝিয়ে গিয়েছিল। তবুও চিঠিটা এনেছি সঙ্গে করে, কি জানি আবার যদি বাড়ী চিনতে না পেরে ফিরে যেতে হয়! বেলাদির চেঁচাটা ড্রাস ড্রাস মনে আসছিল, কিজানি এখন বেঙ্কন দেখতে হয়েছে। দশ বছরের পুরোশা চেঁচাবার সঙ্গে মিল আছে কি না। আমাকে

চিনতে পারবে ত বেলাদি? দীর্ঘ দশ বছর পরে দেখা হবে—সোজা কথা? এইসব এলোমেলো কথা মনের মধ্যে ঝঁকি ঝঁকি মারছিল।

হঠাৎ মনে হ'ল কতদূর চলে এসেছি। পাশের উল্লোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এই সামনের ট্রেনটা কাঁচড়াপাড়া। ওঃ তাইতো, ভাগ্যিস মনে হল, নইলে কোথায় চলে যেতাম! কান্ড গাড়ীখানা একবার দম নেবার জন্য থামল। নেমে পড়লাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ বড় ট্রেন, লোক গিসগিস করছে। বেলাদি লিখেছিল কল্যাণী ট্রেনে না নেমে কাঁচড়াপাড়া হয়ে এলে নাকি অনেক সুবিধে হয়। কি জানি, হয় যে হয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, বেলাদির সেই ডিরেক্সন দেওয়া চিঠিখানা আছে, কি না। ট্রেনের বাইরে এসে পানিকটা ঠেটে গিয়ে বাস ধরতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে বাস্তার দুপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মনটা বিধিরে উঠল। নোংরা-বস্তী বললেও অত্যুক্তি হয় না। নোংরা বাস্তা আর দুপাশে সারি সারি দোকান—মুদির দোকান থেকে বইএব দোকান পর্যন্ত। পাশে একটা বাজার।

কণ্ডাল্লার 'বাগমোড়' বলে একটা জায়গার নামিয়ে দিল। জোরাস্তার মোড়। সোজা দক্ষিণ দিকে যে বাস্তাটা চলে গিয়েছে, ওটা নাকি কলকাতার পথ। মোড়ের পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, উত্তর দিকে যেতে হবে। আরো জানলাম, কল্যাণীর বাস নাকি এখনি আসবে। প্রায় আধঘণ্টা বৈশাখ মাসের দুপুর দুটোর সময়ে ছাতিফাটা রোদে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাসের জন্য। বাস আর এল না। সামনে একটা রিক্সা পেরে উঠে বসলাম। রিক্সা চলতে লাগল বেলাদির বাড়ীর দিকে।

—কতদূর, জিজ্ঞেস করলাম।

—এই মাইলখানেক বাবু, পশ্চিমা দিক্সাওয়ালা জবাব দিল।

দুপাশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা পিচঢালা পথ সোজা চল গিয়েছে। মাঝে মাঝে ছ'একটা বাড়ীও চোখে পড়ল। ওকে ঠিক বাড়ী বলা যায় না; জীর্ণ লোনা লাগা, ইট ধসে বাওয়া দেওয়াল সব। খাঁপড়া ভাবে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ বোকা যার, এগুলো এককালে সব বড় বড় বাড়ী ছিল। আজ সে সব কিছুই নেই। বাড়ীর লোকগুলোও সব কোথায় চলে গিয়েছে জানি না, বাকশে কেউ আছে কিনা তাও বলতে পারব না। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দেওয়ালগুলোকে জিজ্ঞেস করে আসি,—বলতে পার এরা সব কোথায়? হাদের দেখেছো তোমাদেরই পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে, হয়ত তোমাদেরই গারে ট্রেনে গিয়ে তারা কত গল্প শুভব করেছে প্রিয়জনদের সঙ্গে। তোমরা ত সবই জান, বলতে পার এরা সব এখন কোথায়? হায়রে, ওহা যে কথা বলতে পার্কে না, নির্ঝাঁক। শুধু ছ' করে দাঁড়িয়ে দেখছে এই আশ্চর্য জগৎটাকে।

চোখে পড়ল কবি ঈশ্বর শুস্তের গ্রন্থাগার। শুনলাম ওর পাশেই নাকি ঈশ্বর শুস্তের বাড়ী ছিল। অজ্ঞান সে মিলিয়ে যার নি কালের কম্পাতলে, ভগপ্রায় অবহায় তার অজ্ঞানকে দীবার করবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—আর কতদূর, জিজ্ঞেস করলাম।

—এই যে এসে গেছি বাবু।

সত্যি এখন মনে হচ্ছে যেন এসে গেছি। রিক্সাটা একটা গোল : ত পার্কে ডাইনে রেখে এগোচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, পার্কটা বেশ রঙ এবং সুন্দরও। দেখলাম পার্কের এক কোণে পাঁচটা বড়গাছ পা। “যে’বারে’র করে পাঁড়িয়ে আছে। পুকুরটার খানিকটা ভাব এনে দিচ্ছিল। তাদের তলার আধো আলোর আধো জাঁধারে একটি পাখরের ধ্যানগভীর মুক্তি দেখলাম—বেশ বড়। মনে হ’ল বুদ্ধদেবের মুক্তি। বাস্তবিকই মুক্তি ভাবি সুন্দর। অজ্ঞাত চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুক্তি যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি।

রিক্সা চলছে বেশ মন্থর গতিতে। দূরে দেখা যাচ্ছে হলদে রংয়ের ছোট ছোট বাড়ী সার সার ভাবে পাঁড়িয়ে রয়েছে।

রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলো কিগো?

বলল, এই ত বাবু কল্যাণী। আমরা এসে গেছি।

দুপুরের সমস্ত স্নান যেন কোন বাতস্পর্শে যুছে গেল। আনন্দে ভরে উঠল মনটা। বাক, তাহলে বেলানির অভিমান ভাঙ্গাতে পারলাম।

রিক্সা হঠাৎ থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলাম ওকে, থামলে কেন? গলায় জড়ানো গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল রিক্সাওয়ালা, নাহুন, এসে গেছি কল্যাণী।

হ্যা তাইত। বাড়ী ঘর সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওকে বললাম, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। কিছু চিনি না, জানি না, কোথায় বাব?

—বাবু আর বাবে না রিক্সা। এই পর্যন্তই আপনার সঙ্গে ভাড়া ঠিক হয়েছে।

—আজ্ঞা বেশ ত, আমি না হয় তোমাকে বেশী ভাড়া দিচ্ছি। নিয়ে চল।

—না বাবু আর যেতে পারবো না।

—কেন?

কিছুতেই বলল না ও, কেন আর নিয়ে যেতে পারবে না আমাকে। কতবার জিজ্ঞেস করলাম। ‘ঘাড়টা নেড়ে একটু হাসল শুধু।

ওর মনের কথা ওর কাছেই থাক। আর যাঁটালাম না। যখন কল্যাণীতে আসতে পেরেছি তখন নিশ্চয়ই বাড়ী চিনে নিতে পারব। কষ্ট একটু হবে এই আর কি।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বাঁদিকে চোখে পড়ল আধুনিক টাইলের বিরাট সোলাপী রংয়ের পোতালা বাড়ী। পরে তখনইলাম, এই বাড়ীটাই নাকি কল্যাণীর এডমিনিস্ট্রেটিভ বিডিং। আর ডান দিকে বঙ্গুর চোখ যায় কেবল বাড়ী আর বাড়ী—একই রকমের দেখতে, একই রংয়ের। হু একটা বড় পোতালা বাড়ীও চোখে পড়ল। চোখে পড়ল কাছেই একটা বড় পার্ক। চারিপাশের রাস্তাগুলোর মাঝে পাঁড়িয়ে আছে। পার্কটার ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা বিরাট টাওয়ার। আর তার চারপাশ দিয়ে গজিয়ে উঠছে সুন্দর বাগান—ফুলে গাছ ভর্তি। এত সুন্দর পার্ক খুব কমই দেখেছি। এখানে ফুল ফোটে, আবার আপনিই তাকিয়ে যায়, কেউ ওদের স্পর্শ করে না। প্রকৃতি-সুখিতাই বটে ওরা। ওখানে

থাকতে প্রায়ই বেড়াতে আসতাম এই পার্কে বিকেলের দিকে। বসতাম, গল্প করতাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রকৃতির কান্ডকার্য দেখতাম। এই পার্কের নাম সেন্ট্রাল পার্ক। এখানকার মধ্যে সব থেকে বড়, সব থেকে ভালো পার্ক। এই যে পার্কের মাঝখানে টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে, তখনইলাম ওর মধ্যে জল সঞ্চিত থাকে, পরে ছড়িয়ে দেয় কল্যাণী উপনগরীতে। শুধু এই একটাই টাওয়ার মোটা-কল্যাণীকে জল যোগাচ্ছে না, এইরকম আরও টাওয়ার আছে।

হু, রিক্সাওয়ালা আমাকে হিন্সি দিয়েছিল নেহেরু-পার্ক বাবার। এই সেন্ট্রাল পার্কের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, এই রাস্তা ঘরে বরাবর গেলেই নাকি নেহেরু-পার্ক চোখে পড়বে।

কিছু রাস্তা ত আর একটা নয়, গোট্টা ছয়ক হবে। সব রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখি সবই ত সেন্ট্রাল পার্কের সামনে। তাহলে? চূপচাপ পাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কানে এল দূর থেকে কে যেন বলছে—বাবু, ওধার না। এই রাস্তা দিয়ে বান। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, সেই রিক্সাওয়ালা। এডমিনিস্ট্রেটিভ বিডিং-এর পাশে পাঁড়িয়ে আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আসল রাস্তাটা। অস্ত রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না, আবার এই চড়া বোদে হেঁটে ওর কাছে গেলাম।

এবার বুঝতে পারলাম। আবার ওকে অত্যাচার করলাম, বেশী পরস দেব, বাড়ী পৌঁছে দাও। এবারও ও একটু হাসল। ওর হাসি দেখেই বুঝতে পারলাম, ও যেতে চাইছে না। আজও বুঝতে পারি না, কেন ও গেল না এই সীমানাটুকুর বাইরে। কি জন্ত?

হাঁটতে লাগলাম ওর নির্দেশ দেওয়া রাস্তা দিয়ে। ভারি সুন্দর রাস্তাটা। এই বলন্ত রোদের মধ্যেও বেশ কত সুন্দর লাগছিল। হু’পাশ দিয়ে সার সার বাড়ী চলে গেছে একরকমের, এক রংয়ের। আবার রাস্তার দুপাশে লাইন করে গাছ লাগানো হয়েছে। মাঝারি গোছের গাছগুলো প্রত্যেকটা ইট দিয়ে বেরা গোল জায়গার মধ্যে। এটাও যেন কত সুন্দর।

চলেছি ত চলেছিই, কোথায় নেহেরু পার্ক। জানতাম না যে, এই রাস্তা ঘরে সোজা গেলে কোনদিনও নেহেরু পার্কের দর্শন লাভ হবে না। এই রাস্তার ডান দিক দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে গেলে দুটো বড় বড় বাড়ী চোখে পড়বে। তার সামনে দেখা যাবে একটা ছিম ছাম মাঝারি গোছের পার্ক। ওরই নাম নেহেরু পার্ক। আর বাড়ী দুটো নেহেরু বিডিং। কয়েক উল্লসে নাকি এই বাড়ী দুটো একটাতে নেহেরু আর একটাতে বিজয়লক্ষ্মী শান্তি ছিলেন।

কোনদিকে গেলে নেহেরু পার্ক পাওয়া বাবে আমি ত ভা জানতাম না, তাই সোজা চলে গিয়েছিলাম। একটা বোড় পেলাম, চারটে রাস্তা এসে মিলেছে চারদিক থেকে। মোড়ের একপাশে পাঁড়িয়ে আছে বিরাট কমপাউন্ডে বেরা কল্যাণীর হাই ইন্সুল। বেলানির কাছে পরে তখনইলাম, ওখানে হেলসেমের একসঙ্গে পড়ে। বেলানি এই ইন্সুলেই টিচার। কোন হৈ চৈ নেই, শান্ত। আবু একটা পাশে পাঁড়িয়ে আছে কল্যাণীর ডাকঘর। একটা বাড়ীকে সরকারি ডাকঘর বানিয়েছে। মাঝে মাঝে আসতাম খান-পোষ্টকার্ট কিনতে,

চিঠি ডাকে দিতে। দেখতাম পোষ্টমাষ্টার আর একটি পিয়ন নিয়ে। এখানকার কারবার। পোষ্টমাষ্টারই সব, তিনিই সব কাজ করেন। খাম-পোষ্টকার্ড, ডাকটিকিট বিক্রী করেন, আবার মনিঅর্ডারের কাজও করেন। ভয়লোককে দেখে রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটা মনে পড়ে যেত। সেই গল্পের পোষ্টমাষ্টারই বেন ফিরে এসেছেন এখানে।

ইত্বল আর ডাকঘরের পাশ দিয়ে উত্তর মুখো যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে বা দিকের রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে দেখা যাবে একটা বেশ বড় বাড়ী। এই বাড়ীটা কল্যাণীর বাসভাষ। এখন অল্প বিস্তর সব জিনিষই পাওয়া যায় বাজারে। বহুখানেক আগেও নাকি পাওয়া যেত না তরিতরকারি বাছ-মাস। সরকার আধুনিক ক্রটিদ্রব্যত ভাবেই বাজারটা তৈরী করেছেন।

বাঁদিকে না ঘুরে ঐ রুকচুড়া, অ্যামগাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর সোজা গেলে দেখা যাবে একটা বড় বিল। ঐ বিলটাই নাকি এককালে হ্রদ বা লেক হবে। সেইজন্যই বোধহয় ঐ বিলটার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, ওর নাম—লেক রোড। কয়েকদিন গিয়েছিলাম বেলাদির সঙ্গে আগামী লেকের ধারে বেড়াতে। বেড়াবার জায়গা অবশ্য এখনও হয় নি, দেখে এসেছিলাম শুধু।

বাক্, কথার কথার অনেক কথা বলে ফেললাম। ইত্বলের মোড়ে এসে একটু সন্দেহ হ'ল মনে। অনেকদূর ত চলে এসাম সেন্টাল পার্ক থেকে। রিক্সাওয়ালা ত অন্তরুর আসতে বলে নি। কাকেই বা জিজ্ঞেস করব এখন? একটু লোকও ত দেখছি না। ডাকঘরের ঢুকলাম, বসি কিছু উপায় হয় ভেবে। ভাবাই সার হ'ল। ডাকঘর বন্ধ। এমিক ওমিক তাকান্ধি, কাউকেই ত দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ দেখি, ডাকঘরের পাশের খালি বাড়ীটা থেকে সন্ত হুম ভাঙা একটা লোক আমার কাছে এগিয়ে এল জিজ্ঞাস করছে। দেখে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, আমি একজন নবাসত।

তাকে বাড়ীর নম্বরটা বললাম, ঠিক বুঝতে পারল না। নেহেঙ্ক পার্কের কথা বলতে অবশ্য সেখিয়ে দিল। কাছেই।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, কি শেপের বাড়ী।

বললাম, তা ত জানি না। চিঠিতে নম্বরটা লেখা রয়েছে, এর বেশী আর একটুও জানি না। ঠেপন থেকে কল্যাণী আসবার ডিরেক্সান দেওয়া আছে। লিখেছে নেহেঙ্কপার্কের পাশেই ওদের বাড়ী। আর ত কিছু লেখেনি।

লোকটি নিজে থেকেই ওর পরিচয় দিল। এখানকার দ্বারওয়ান সে। ওকে বেলাদির বাবা অবনীবাবুর নামটা বললাম। তাঁর চেহারা বর্ণনা দিলাম।

এবার ও ঠিক চিনতে পারল। বাস্তবিকই ভয়লোকের একটা বিশেষত্ব আছে। চেহারা, গুণ, সব কিছুতেই। চেনে না এখানে তাঁকে এমন একজনও নেই। শুধু এখানে কেন কলকাতার যখন ছিলেন, তখনও না চিনত এমন কেউ পাড়াতো ছিল না। অমায়িক ব্যবহার আর অত্যন্ত রসিক। পরক্ আপন করতে তাঁর এক মিনিটও লাগে না। তাঁকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে, তার বছর আগে তিনি গেজেটেড অফিসার ছিলেন। কার সঙ্গে তাঁর

আলাপ নেই তাই ভাবি। এখানকার ঢাক ইঞ্জিনিয়ারও তাঁর বন্ধু আগার এই অখাত দ্বারওয়ানটাও তাঁর অত্যন্ত পরিচিত।

দ্বারওয়ান আমাকে অবনীবাবুর বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। বেলাদির সেই মলিন হয়ে হাওয়া চিঠিখানা খুলে মিকিয়ে নিলাম ঠিকানাটা। ঠা, নম্বরটা ত একেবারে অকরে অকরে মিলে যাচ্ছে, সামনেই ত নেহেঙ্কপার্ক।

এক নজরে দেখে নিলাম সার সার ভাবে ঈড়ানো বাড়ীগুলোকে। প্রত্যেকটা বাড়ীর চারিপাশে খোলা খানিকটা করে জায়গা, সামনে পাঁচিল দিয়ে, পাশে তারের বেড়া দিয়ে সীমানা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সামনেই লোহার গেট, তারপর গেটটা পেরিয়ে পাঁচ কদম খেটেই সিঁড়ি, ঘরে উঠবার। আর হু'পাশে খোলা জায়গায় নানা রকমের ফুলের গাছ; অজস্র ফুলে ছেয়ে আছে। হুপরে সব স্নাস্ত, ঝিমিয়ে পড়েছে। শুধু ঐ ফুলগুলো নয়, গোটা সহরটাও ঝিমচ্ছে। একটু শব্দ নেই কোথাও, শুধু সামনের নেহেঙ্ক পার্কের হাওয়া লাগা কাউ গাছের শব্দ শব্দ শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে।

গেটের বাইরে ঈড়িয়ে ডাকলাম, বেলাদি—বেলাদি।

খুঁট করে দরজা খোলার একটা শব্দ হ'ল। একটা মেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে বছর কুড়ি বয়স হবে। জিজ্ঞেস করল আমাকে,—কাকে চাই।

বললাম, বেলাদি আছে, বেলাদি—

ভেতরে চলে গেল মেয়েটি। একটু পরে সেই মেয়েটি আর একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। এই মেয়েটিকে একটু বয়স্ক বলে মনে হ'ল। চোখে চশমা, মুখে গাভীরের ছাপ।

ওদেরকে আবার বললাম, বেলাদি আছে? একটু ডেকে দিন ত? বয়স্ক মেয়েটি উত্তর দিল,—আমার নামই বেলা ব্যানাজি। আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারলাম না। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

আমার চিনতে একটুও দেবী হ'ল না বেলাদিকে। কত বদলিয়ে গিয়েছে সেই দশ বছর আগের পরিচিতা মেয়েটি!

বেলাদি কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু হেসে বললাম—কি, চিনতে পারছ না?

মুখের কোন ভাবান্তর হ'ল না বেলাদির।

এবার সেই চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললাম,—দেখত?

চিঠিখানার দিকে একটুখানি তাকিয়ে একগাল হেসে বলে উঠল,—আরে তুমি স্বদেশ। এইরকম দেখতে হয়ে গেছে তা চিনতে পারি কি করে বল? রোদে ঈড়িয়ে কেন? এস এস, বলে গেটটা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

বেলাদির মাকে প্রণাম করলাম। একগাল হেসে নানা কথার ভীড় জমািলেন। বললেন একটু অভিমানের সুরে, সেই দশ বছর আগে যে বেশা করে গেলে তারপর আর এলেও না, একটা খবরও নিলে না। আরো কত প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোনটাও জবাব দিলাম, কোনটাও দিলাম না। অবনীবাবু ছিলেন না তখন, সফার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল।

দশ বছর আগে যে রকম দেখেছিলাম, সে রকম আর নেই কেউই।

বেলাদির মারও শরীরে এবং মনে বার্ষিকের ছাপ এসে গিয়েছে। তবে সেই হাসিই আজও লেগে আছে মুখে। বেলাদিকে ত আর চিনতেই পারা যায় না, একেবারে অল্প বকমের হয়ে গিয়েছে। কথার, চেহারাও, সব কিছুতেই। অবনীবাণুও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু মনটো এখনও তাঁর সেইরকমই সতেজ আছে। সেইরকম স্বভাব, সেইরকম বসিকতা করে কথা বলা, সব একই রকমের আছে। আশ্চর্য্য, একটুও পরিবর্তন হয় নি একমাত্র চেহারাটা ছাড়া।

বেলাদির মা পরিচয় করিয়ে দিলেন পাশে বসে থাকা মেয়েটির সঙ্গে, এই বাড়িতে প্রথম বার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এর নাম নমিতা, এবার আট, এ, পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে এসেছে এখানে। নমিতা আমার ভাইএব মেয়ে। আলাপ হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে, বেশ মেয়েটি।

আবার যেন কিরে পেলাম সেই দশ বছর শিছিয়ে যাওয়া জীবন। বেলাদিকে আবার যেন কিরে পেলাম সেই অনাস' ক্লাসের মেয়ে। এই ক্লাসের পরিবেশে হাসি গল্পে কেটে যেতে লাগল দিনগুলো। কোন আপনজনের সঙ্গে বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হলে তাকে যেমন কবে আপ্যায়ন করে লোকে, আমার বেলাতেও ঠিক সেইরকমই হয়েছিল বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়।

কলাগীর দৈনন্দিন জীবনটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

খুব সকালে সাইকেলে করে দুধ নিয়ে যেত পোয়ালা। একটু পরেই আসত খবরের কাগজ। ঐ কাগজটা নিয়ে সকালটা কেটে যেত। চাকরটার সঙ্গে দু'একদিন বাজারেও গিয়েছিলাম। যেন হ'ল অজ্ঞান্যগার থেকে সব জিনিষের দাম একটু বেশী।

বা গরম, সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে দিতাম একটু বেলা হলেই। দুপুরগুলো ঘুম আর গল্পে কেটে যেত।

দুপুরটা শান্ত, স্তব্ধ। পাশে একটিও জনপ্রাণী নেই। গিটের বাস্তাগুলো বোনের তাল সজ্জ করতে না পেরে ধারে এসে জমা হচ্ছিল। বাইরে বেরোলে শুধু শোনা যাবে, সামনে নেইক পার্কের ঝাউগাছগুলোর হাওয়া-লাগা শব্দ শুন শব্দ আর থেকে থেকে ডেকে ওঠা দু একটা কাকের কা কা রব। সে রবও যেন কত ক্লান্ত।

ঘরের ভেতরেরও সেই অবস্থা। শুধু জেগে আছে একটা জিনিষ। ঐ টেবিলের ওপর রাখা চতুস্ত বাস্কাটা। রেডিওটা গান দিয়ে, কথা দিয়ে, আমাদের কিম্বদন্তি পড়া ভাবটাকে কাটিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বিকলে রোদ পড়লে আমাদের নিয়ে বেলাদি বেড়াতে যাব হ'ত। সঙ্গে যেত নমিতা। কোনদিন শুধু বাস্তা নিয়ে হেঁটেই কতদূর চলে যেতাম, ইত্থল পেরিয়ে, বাজার পেরিয়ে কতদূর। কোন কোন দিন ডবিষাডের লেকের ধারে বেড়াতে যেতাম। বেশীর ভাগ দিন সেন্ট্রাল পার্কে গিয়ে বসতাম। ঐ পার্কে আরো অনেক ছেলে মেয়ে বেড়াতে আসত।

আপনার সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসাধন সামগ্রীর রাণী

“মহীশূরের শোভা স্নো”

ব্যবহার করুন।



ইহা ফুলের রেণুর মত স্নিগ্ধ ও চন্দন গন্ধযুক্ত।

নিয়মিত শোভা স্নো ব্যবহারে ত্বককে মসৃণ, মোলায়েম এবং মনকে সতেজ রাখে। ইহা দেহে মাখিলে রৌদ্র ও ধূলা দেহের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ত্রণ বা ফুসকুড়ির উপর শোভা স্নো ব্যবহারে অনেক উপকার হয়। একমাত্র শোভা স্নো ব্যবহারের ফলে বগলের ঘর্মের দুর্গন্ধের অবসান হয়।

প্রস্তুতকারক : শোভা কসমেটিকস্
মহীশূর

পরিবেশক : হানামিন ইণ্ডাস্ট্রিজ

৩৭, জেকেরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-৭



একদিন বেলাদিকে কথার কথার জিজ্ঞেস ক'বেছিলাম, 'আচ্ছা বেলাদি, এখানে গরীবের স্থান নেই, না ?

একটু হেসে বেলাদি বলেছিল, তোমার বুদ্ধিটা দেখছি এখনও হেলোমাহুই হয়ে গেছে। একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখত, গরীব বলে কাউকে মনে হয় ? এখানে বাঁরা থাকেন সব সোটা ব্যাক ব্যালাল হোস্টার। বেশীর ভাগই ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, প্রফেসর বা কোন অফিসের বড়বাবু, রিটারার করেছেন প্রায় ত্রিশ হাজার ক্যাপ নিয়ে। জানো, এখানকার বাড়ীগুলোর কত নাম ? এই নামে অল্প জায়গায় পছন্দমত ভালো বাড়ী তৈরী করা যায়। আমার একদম ভালো লাগে না এখানে, বাবা যে কেন বৌকের মাথায় এখানে বাড়ী কিনলেন, বুঝতে পারি না। এখানকার সবাই নিজের চাল নিয়ে ব্যস্ত, হাবভাবে ব্যুরিয়ে দেন আমাদের এত টাকা আছে, এত ফণিচার আছে। এঁদের মধ্যে আত্মরিকতা নেই, আছে বাহিক আবরণ। জানি না বোধ হয়, এখানকার ইচ্ছুল-মাঠারদের সঙ্গে কেউ বড় একটা মেশেন না, তাঁদের ত আর এঁদের মত এত টাকা নেই, তাঁরা যে গরীব। একদম ভালো লাগে না আমার এখানে, অল্প কোন জায়গায় চাকরী পেলে চলে বাব।

বললাম, কেন, কাগজে দেখি, লোকের যুখে শুনি, কত সুলভ জায়গা কল্যাণী। নগরের কোন কোলাহল এখানে ঢুকতে পারে না। কাঁকা কাঁকা সব বাড়ী। বাড়ী করতে হলে একমাত্র কল্যাণীতেই বাড়ী করতে হয়। আলো বাতাস প্রচুর। প্রশস্ত দাশপথ, সুন্দর পার্ক, কলের জল, আলো-পাখা, বাজার বিজাল সবই এখানে আছে। সব কিছু মিলে নগর-জীবনযাত্রার নতুন রূপ কল্যাণীতে বেন ফুটে উঠেছে। তার ওপর সরকারের বড় বড় প্র্যান্ডও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে, বড় বড় অফিসগুলো এখানে উঠে আসবে, আরো কত কি।

আমার কথা বলার ধরণ শুনে বেলাদি, নমিতা, দুজনাই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল বেলাদি, এতকণ ধরে বা বসিয়ে বসিয়ে বললে তা সবই আছে এখানে। আমি ত তা অস্বীকার করছি না। আমি বা বলতে চাইছিলাম, তুমি সেটা ঠিক ধরতে পারলে না। আমি বলছিলাম, এখানে মাহুভের মনের নাগাল মেলা ভার। এদের সমাজের সঙ্গে একটু মেশ, হু'একজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বল, নিজেই সব বুঝতে পারবে। তোমার হয়ত খুব ভালোও লাগতে পারে। মাহুভের মন ত একরকম না।

একটু থেমে আবার বলল, শুধু এখানে কেন, আজ সব জায়গাতেই তাই। সবাই আজ নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।

বললাম, এখানকার মাহুভের মনের খবর আমার থেকে তুমি বেশী জান, কারণ, তুমি এখানে বাস করছো। তবে এই ক'দিনে আমার এইটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে কল্যাণী সবকে যে, এত সুন্দর নগর খুব কমই দেখা যায়। কল্যাণীর প্র্যান্ড বিপুল, এককালে নিশ্চয়ই এ একটি পার্বক নগরী হয়ে উঠবে। এখন ত সে একটা ছোট মেয়ে। এই ছোট মেয়েটি একদিন পূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠবে, জোয়ার আসবে তার দেহে, আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে সে সকলের কাছে।

সজ্জা লপটা-পাট্টার জীবন থেকে, ধীরে ধীরে একটু হস্তির

নিখাস কেলেতে হলে সোজা চলে আসতে হয় কল্যাণীতে। প্রকৃতিকে বাঁরা উপভোগ করতে পারে না, শহরের আবহাওয়া বাবা হাঁশিয়ে উঠেছে, এখানে তারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেরের পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে পারবে অল্পতঃ দিন করেকের জন্য।

হয়ত এখানে ট্রাম বাস মটরের কনসার্ট নেই, সিনেমা নেই, আকাশ ছোঁয়া বাড়ী নেই, চোখ বাঁধানো চৌরঙ্গীর মোড় নেই, তবুও এখানে আছে শান্তি। হ্যাঁ, শান্তি। বার জন্ম আজ সবাই পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

[আগামী সংখ্যার সমাপ্য]

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম

শ্রীমতী শান্তি ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক কালে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম লইয়া বিভিন্ন মহলে বাগ্মন্যবাদ চলিতেছে। কেহ মাতৃভাবকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করিতে মত প্রকাশ করেন, আবার কেহ বা ইংরেজীকেই উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রাখার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সমস্তার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত হইয়া উঠিতেছে না।

স্বাধীন ভারতে সমস্তার অন্ত নাই। খাত ও শিক্ষা সমস্তাই বেশী প্রেকট। শিক্ষা সমস্তার মধ্যে ভাষা সমস্তা অঙ্গতম। দীর্ঘদিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতবাসী উপকৃত কি অপকৃত হইয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে।

যুগের প্রয়োজনে, বিদেশী শাসকবর্গের শাসন-পরিচালনার সুবিধার্থে, রাজ্য ও বর্ষে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, বুদ্ধি ও নীতির দিক দিয়া ইংরেজ, এমন এক দল লোকের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই ১৮৩৫খঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক মেকলের প্রস্তাব বা "মিনিট" অল্পমোদন করিয়াছিলেন। এ থাককাল ধরিয়া সেই প্রস্তাবই সরকারী নীতি রূপে চলিয়া আসিতেছে।

যুগের প্রয়োজন বলার তাৎপর্য এই যে, তখন কোন একটি ভারতীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য ভাবে সমৃদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করার মত লক্ষ-ভাণ্ডার ছিল না এবং বাহ্য ছিল তাহাও আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য ছিল। এই কারণেই এক পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব চর্চার দ্বারা জাতির লুপ্ত চেতনা পুনরুদ্ধারের আশাই রাম মোহন রায় প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক ব্যক্তিগণ এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথপাতি ছিলেন।

কিন্তু কাল-প্রবাহে আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন যদিও আজও রহিয়াছে, কিন্তু ইহাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রাখিবার দেশের অজ্ঞাত ভাবার উন্নতিকে বাধা দেওয়া গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা নয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সব ক্ষেত্রেই স্বজনী মনোবৃত্তি লইয়া আগাইয়া আসিতেছে। কাজেই আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সাধন করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করাও আজ সরকারের একান্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত।

কোন জাতিকে শিক্ষিত করিয়া গড়িতে হইলে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমও মাতৃভাষা হওয়া প্রয়োজন। নূত বন্ধিয়ারের উপর কোন

ইমারত যেমন শক্তিশালী হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে শিক্ষার স্বাধীন দৃঢ় হয়—অকালে ভাঙ্গিয়া বাওয়ায় ভয় থাকে না। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশ মাতৃভাষার সহৃদয় সাধনে তৎপর হয় সেই কারণে।

বিভক্তবাঙ্গিগণ একটি প্রশ্ন করিবেন—আঞ্চলিক ভাষার পরিভাষা বাধায়? অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমগ্র আঞ্চলিক ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নত হয় নাই। যেমন তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি। কিন্তু উত্তর হইবে এই যে, সহস্রাব্দীতি ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সরকার যদি পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে অত্যন্ত-কালের মধ্যে, তাহা নিশ্চয়ই উন্নতি করিতে পারিবে।

বাংলা ভাষার আসন সমগ্র বিশ্বে আজ সর্বোপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকের প্রতিভার স্পর্শে তাহা সজীবিত হইয়াছে। ইংরেজীর সংস্পর্শে আসিতে পারিয়া বাংলা ভাষা জীবন্ত হইয়াছে। যে কোন প্রকার ভাব প্রকাশের পক্ষে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইংরেজী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা যদি উপযুক্ত শব্দ না পাওয়া যায়, ইংরেজী হিসাবেই তাকে ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি? যেমন ব্যবহার আছে ট্রেণ, প্রটেক্ট, ঢোকার, টিকট ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার হৃদয়গা এই যে, উন্নত সাহিত্য হইয়াও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা সে পাইল না—তার কারণ হিন্দীভাষীর সংখ্যা এবং আরতন বেশী। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছে হিন্দীভাষা। যদিও ভাষা হিসাবে সমৃদ্ধ নয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সরকার যদি শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা লইয়া অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দান করা অল্প ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।

খোলা মন লইয়া, জাতির অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য জাতীয় সরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফেল করার কারণও এই বিদেশী ভাষা। বিদেশী ভাষা জ্ঞার করিয়া চাপানির ফল যে কিরূপ সমগ্র, শক্তি এবং অর্থের অপচয়, তাহা পরীক্ষার ফেল করার সংখ্যা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে এইরূপ অপচয় রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

অতি উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইংরেজীতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর উপর হইতে বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করিতে হইবে। ভাষা হিসাবে ইংরেজী সমৃদ্ধ সম্ভব নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পথে তাহা বাধা বরূপ হইবে কেন? আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা যে কোন মতঃ এবং বৃত্তঃ কাজ করা সম্ভব। নবী বখন প্রবল যোগে ধাবিত হয়, কোন বাধাই তার গতি রোধ করিতে পারে না। জাতির প্রয়োজনে জাতীয় সরকার যদি আন্তরিক সহায়ত্বের সহিত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার জন্য অগ্রণী হন, তাহা হইলে শিক্ষার প্রসার অতি দ্রুত হইবে, জাতির অন্তরে শিক্ষার আগ্রহ বাড়িয়া যাইবে ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে নব যুগের প্রবর্তন হইবে। গণতান্ত্রিক সমাজে হুঁইরে পড়ার নীতি

কখনই ফলপ্রসূ হইবে না। তাই দুইমের শিক্ষিত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত হাত হইতে জনগণকে মুক্তি দিতে সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

কবিতা ও তার জনপ্রীতি

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

আমি কবি নই; কোন কবিতা ভাল কোন কবিতা মন্দ অথবা কোন ভাল, কোন মন্দ, এ বিচার করার দ্রুত পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি কিবা যুগল আমার নেই।

আমি কবিতা ভালবাসি—আর কবিতার জনপ্রিয়তা কয়ে বাড়ে, এ সত্যও উপলব্ধি করি, কেন কয়ে সে সখ্যকেও ভেবে থাকি।

কবিতা-পাঠ্যগার প্রতিষ্ঠা করলে কবিতার জনপ্রীতি বাড়বে অনেক বলেন। নানা মনীষী আরও নানা কথাই বলেছেন।

কবিতার ছন্দ, পদলালিত্য, ভাববস্ত, রসাত্মক সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য সখ্যকেও অনেক আলোচনা হ'য়েছে। পাণ্ডিত্যের পরি-প্রেক্ষিতে কবিতা সখ্যে কিছু লিখতে গেলে আমার মত একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার স্পর্ধাই প্রকাশ পাবে। আমি শুধু সাধারণবুদ্ধিতে কবিতা ভাল লাগার বস্তু অথচ তার জনপ্রিয়তা কেন কয়ে বাড়ে, সে কথা বলবারই চেষ্টা করব।

আমার যুক্তি সাধারণ পাঠক-পাঠিকারই যুক্তি বলে বুঝে বিদগ্ধসমাজ হাতসংবরণ করবেন, এই প্রার্থনা করি।

আমরা কবিতা ভাল না বেসে পারি না। কবিতা আমাদের সত্তা বললেও চলে। ভাল, মন্দ, অন্তরীক, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ছন্দ আছে, স্বতঃকূর্ত হিলোল আছে, সেই চন্দর, সেই হিলোলার, নৃত্যপার ভাবের ললিতকাকারে প্রসবিত বহিঃপ্রকাশই কবিতা। ছন্দ হিলোল আমাদের তত্ত্বতে তত্ত্বতে, মনের পরতে পংক্ত অঙ্গারীভাবে জড়িয়ে আছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যেতে হয় সেই জীবের প্রথম উপপত্তির যুগে, অর্থাৎ সেই আদিম Palaeozoic যুগে, কোন জজাত কারণে, কোন স্তম্ভভূর্তে যখন পৃথিবীতে প্রাণ সম্ভব হয়েছিল।

অগভীর সমুদ্রের উপকূলসন্নীপে জলজ উদ্ভিদের ওপর প্রাণাচ্ছাদনের জন্য নির্ভরশীল প্রাণীরাই জীবের আদি জনক-জননী। অগভীর জলে গা ভাসিয়ে থাকতো তারা আর পরম আরামে নিশ্চর, ডেউএর দোলায় বিভোর হ'ত—অগভীর জলের নৃত্য তরঙ্গগুলি কখনও কখনও বায়ু-হিলোলে অথবা জোয়ারের আবেগে সৈকতে এসে যুগ যুগ আঘাত করত—যা যেমন শিশুকে চাপড়াতো থাকেন আসরে সোহাগে। অবস্থিত প্রাণীগুলিও সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গের দোলনায় হুলতো।

জল ছেড়ে স্থলে যখন প্রাণ সম্ভব হ'ল, সেই বহুযুগের আনন্দের যুতি প্রাণী বহন ক'রে নিয়ে এল তত্ত্বীতে তত্ত্বীতে। স্থলের পারিপার্শ্বিকের ছন্দ, হিলোল এখন ধ্বনিত হ'তে থাকল কর্পটরে, শব্দবাহী বায়ুতত্ত্বী নিয়ে বেতে থাকল হেড অফিস মন্ডিকে।

ছন্দহিলোলে গা ভাসিয়ে পরমানন্দ আবাসনের অধুনা তাই আদিম, শাশ্বত। আমাদের মন, আমাদের দেহ হৃদয়ের ডায়াল, আমাদের

তাই নাচ গান কবিতা কার্যকলাপ, সকলের মধ্যেই ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াসী আমরা, ছন্দের পূজারী, ছন্দের অমুখিল-প্রবণ।

মানব ইতিহাসের প্রথম দিকে এই ছন্দপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাণের আবেগে নৃত্য, করতালি, পদত্যাগ প্রভৃতির উদ্ভাবিত আভিভাষিত।

পরে ভাষার উদ্ভব হওয়ার পর থেকে তীব্র অমুখ্যতিকে প্রকাশ করা হ'তে থাকল ভাষার মাধ্যমে—যে ভাষায় ছিল হিলোল ওঠা-নামার নুপুর-নিঙ্কণ।

ভাষার ছন্দোহিলোল অথবা প্রাণের লীলায়িত আবেগ যখন স্বয়ং সম্পূর্ণ না হ'ত তখন ব্যবহার করা হ'ত নানারূপ বাস্তবজ্ঞান, বহু প্রাচীন যুগের যে সমস্ত অবশেষ পাওয়া যায়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিগলিখিক যুগের ধর্ম ক্রমবিবর্তনে নানারূপ তারবস্ত্রের উদ্ভব ঘটায়—এছাড়া ঢাক, ঢোল, তবুরা জাতীয় বাস্তবজ্ঞানের অভাব ছিল না।

আমরা যতই সভ্য হই, যতই আধুনিক হই, যত মার্জিত, সংস্কৃত, সংযত হই—চক্কর পূজার ঢাকে কাঠি পড়ল অথবা কীর্তনের মূল্যে বোল উঠলে আক-ও কি আমরা সেই কোন কোটি কল্প যুগের পূর্বপুরুষদের স্বপ্নের স্পন্দন আমাদের শিক্ষা, নীতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আধুনিকতা-অধুষিত স্বপ্নের অমুভব ক'রে তালে তালে নেচে উঠি না?

প্রত্যেকের মনে আছে লুকিয়ে একটি ছন্দপাগল বাউল, আনন্দলহরী থানি হাতে নিয়ে যে রসসাগরের অনবীকার্য দোলনায় ছলছেই, ছলছেই, খড়ির পেতুলার মত।

কিন্তু স্বাধুত রস প্রকাশ ক'রে অল্প পাঁচজনের মনকে ভাসিয়ে দিতে পারে খুব কম লোকেই—আর সহজাত ছন্দোহিলোল গুণ্য-প্রোক্তভাবে দেখলে জড়িয়ে থাকলেও তা অমুভব ক'রে রসাস্বাদন করতে পারেও কম লোকে। তাই প্রয়োজন করি—যিনি নিজের উপলব্ধি রসে তার বেধে পরিবেশন করতে পারবেন অল্পকে—আর রসচেননা সহজে মুগ্ধ মনের তারগুলিতে ঝংকার ফুলতে পারবেন অনাধারিতের আশ্বাসদায়ক ক'রে।

উপহার উৎকর্ষ, অর্থশৌর্যের বৈশিষ্ট্য ও পদলালিত্যের স্বপ্নময় জোতনা কবিতার প্রাণ। অর্থাৎ কালিদাস, ভারবি ও নৈমিষের রস একত্রে জাল বেওয়া মাঘের রসকন্দ।

মুজাব্বের প্রচলন বতর্গিন না হ'য়েছে, ততদিন মাঘের রসকন্দা তৃপ্ত করেছেন চারণ ও কথক কবিরা সুরের মাধ্যমে গানের উপলব্ধ অমুখ্যত্ব প্রচার ক'রে; উল্লেখ্য করে—মাঘের মনের বহু দুঃখ-রস কপাট খুলেছেন, অমুখ্যত্ব রসের আবহব্রহ্মেতে ছোয়ার এনেছেন। মনোরাচক, ক্রতিরাচক, প্রাণের স্পন্দন ও একান্ত চাওদাকে সুরে ছন্দে যে দোলারিত করতে পেরেছে, সেই হ'য়েছে চিরন্তন, সেই হয়েছে চিরকামা, চির আদৃত।

সেই রামায়ণ কৃত যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে—সেই আগমনী 'এলি যদি খের ফিরে আর মা উমা কৈলে আর।' চিরন্তন জননীর অন্তর-র কথা। সেই বাউল-ভাটিয়ালী—'মন মাঝি তোর বৈঠা নেদুরে।' সেই 'নিতাই এনেছে নাম হরিবোল, হরিবোল।' পাগল ক'রে রেখেছে আজও বাঙালীকে চির অন্তরের উৎস হ'য়ে।

সেই মনশা-মনসের লখাইধর করুণা ছলছল কাহিনী—'পানির

বেউলে, বার বেগের যি।' তোরে পাইল কালনিদ্রে, মোরে খাইল কি।' তারপর রামপ্রসাদ, 'মনেরে কুবি কাজ জাননা', মস্ত প্রমত্ত উম্মত ক'রে দেয় নাকি মনকে আজও? পূর্ববঙ্গে একটুকু চন্দ্রাবতী প্রভৃতির কবিতা নাকি এখনও প্রচলিত আছে। তাছাড়া মুখে মুখে রচিত ছড়াগান, পালা গান আজও বাঙালীর প্রাণের জিনিষ হ'য়ে আছে। ষিজনবংশী কেনারামের মত পাষণ্ডেও অমৃত-প্রস্রবণ ছুটিয়ে ছিলেন। রসিক বাঙালী জাতি ধান কাটতে, নৌকা বাইতে সুরের হিলোল তোলে। বিয়ে, পৈতে, পালা পার্বণে, ব্রত অমুঠানে ছড়া কাটে। ঘুম-পাড়ানি ছড়া কেটে খোকার চোখে আনে ঘুম, ভোলায় অবশ্ব খোকাকে। এসব ছড়ার সঙ্গে কেই বা নয় পরিচিত তাই বাহুল্য বোধে আর উল্লেখ করলাম না সেগুলি।

যে চিত্র একশত তুলে ধরা হোল তা সবই প্রাক-ব্রিটিশ যুগের। এর পরেই মুজাব্বের উদ্ভব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব মাঘের আনন্দ উপভোগ করার ধারা ও রীতির মধ্যে আনন্দ এক বিরাট পরিবর্তন। একখানি বই কিনে বীরে সন্তোষ প'ড়ে মাঘের তার মনের তৃপ্ত মিটাতে আরম্ভ করল এবং গানের মাধ্যমে ধারা রসসৃষ্টি করতেন, তাঁরা ক্রমে ক্রমে নিজস্বের বৃত্তির জনপ্রিয়তা হ্রাস হ'তে দেখলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত মন শুধু কর্ণ ও স্বপ্নকে পরিভ্রমণ করে শাস্ত থাকতে পাগল না—বৃত্তির খোঁজ চাইল। তখন মুক্তিবন্দ, বুদ্ধিগ্রাহ, বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করার মালমশলায়ুক্ত কাব্য রচিত হ'তে লাগল। এমন ক'রে মূল শিকড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে গেল কবিতা—টবের ফুলের মত হ'ল তার অবস্থা—মাটির অতলাস্তে পায়ল না শিকড় ঢালাতে!

সাধারণত্বের আবালবৃদ্ধবনিতার স্বদরবাজ্য থেকে নির্বাসিত হ'লেন কাব্যলক্ষী;—শিক্ষিত, বুদ্ধিবীরের সংখ্যা কত? কবিতার জনপ্রীতি তাই কমে যেতে বাধ্য হ'ল।

একমাত্র শিক্ষিত অন্তঃকরণ ছাড়া অন্তঃকরণ ও স্বপ্নের স্পন্দন জাগ'তে পারে, এমন কবিতা আর রচিত হ'ল না। রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ—তাঁর কবিতাই বা সাধারণ কটা লোকে পড়েছে? তাঁর গভীর ভাবের কবিতাগুলি কজন বোঝেন বা বোঝবার যোগ্যতা রাখেন? ঐ ভাষা ভাষা পড়া, ভাষা ভাষা জ্ঞান। অল্প কবিরের কথা ছেড়েই দিলাম। সিনেমার দৌলতে অবলম্বিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান লোকের মুখে মুখে ফেরে—তবে হিন্দীগান, অথবা তাঁকে ভাঙির রচিত চটুল, হাফা গানেরইতো স্বাক্ষর।

Glamour আর অনবসরের যুগ এসেছে। ষাঁচবার কঠোর সংগ্রাম নিয়ে এসেছে অর্থচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, এমন আরও কত চিন্তার পাছাড়। আনন্দ উপভোগের সময় কোথায়? সময় নেই, সময় নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সেই চণ্ডীর গান, কথকতা শোনবার নিশ্চিন্ত জীবন কোথায়? ইউরোপে তাই one act drama হ'য়েছে—সংক্ষিপ্তকরণ—সবচেয়ে—এলাম, দেখলাম, চলে গেলাম—অভিনিয়ে দেবার, মনঃসংযোগ করার সময় কোথায়? মাঝর বুরছে রাজ্যের চিহ্ন। বিক্ষিপ্ত মন, কিছুই যখন মন দিবে করতে পারা বাচ্ছেনা তখন সখানি মন দিবে কবিতা পড়বারই বা সময় বা মন কোথায়?

বাউলসেই ক'রে সিনেমার তারকাশ্রিত বই-এর পাঠ্য সেলাম উলটিয়ে। বড়লোকের একখানা ডিটেবুটিত গল্প অথবা হাফা ধরসে

কম পাতার উপভাস হ'ল শব্দে পড়লাম—আর কবিতার বই ?

হাতে কি বই রে ? ওঃ বাবা : কোথায়! এই হ'ল বেকীর ভাগ লোকের অভিযুক্তি।

Ready made সৌন্দর্য সাজানো থাকবে আমার বিনা অয়াসে একটুও মন খচকা ক'রে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চানচুরের মত মচমচিয়ে খেয়ে বলব, বাঃ! তবেই না।

মেকলে অবশ্য বলেছিলেন—As civilisation advances, Poetry declines, তা বোধ হয় সত্যি হ'তে চলেছে—আমরা সভ্য হয়েছি না ?

এমন সব কবিতা লেখা হয় আজকাল যার অনেকগুলি পাড়ে প্রবৃত্তি ও জনবৃত্তি হওয়াতো দূরের কথা, দস্তখুট করবার উপায়

নেই—এপর্যন্ত একজনকেও এ সকল কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বোধগম্য করতে সক্ষম দেখলাম না। আমরা সাধারণ পাঠক, আমাদেরই স্বাধাধিক্য—তাই মনে হয় কবিতা পড়বার সময় কবি এসে যদি অহুগ্রহ ক'রে অর্ধটি বুলিয়ে দেন তবেই বসাস্বাদন করতে সক্ষম হওয়া যেতে পারে। নয়তো আর কোনই উপায় নেই। মিল্টনের অমর মহাকাব্য Paradise Lost পড়বার সময় অধ্যাপক আনন্দে গগগর হন, কিন্তু জনসাধারণের কাছে তা অবহেলিত।

তাই মনে হয়, পাঠাগার স্থাপনাই করা হোক : কবিতা পড়ো, কবিতা পড়ো ব'লে গগন বিনোদ ক'রে দেওয়াই হোক ; কোন ফলই হবেনা—বর্তমানে না কবিরা নিজেকে খোঁজাখুঁজী মার্কিক কবিতা সৃষ্টি করা বন্ধ রাখবেন, জনসাধারণের স্বপ্নে স্পন্দন জাগাবার মূলমন্ত্রটি ধরবেন, ততদিন কবিতার জনপ্রিয়তা আসতে পারবেন না।

শুন্তে পাই কবিতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই মশগুল আধুনিক কবিরা—সে তাঁদের ব্যাপার, অথবা মুষ্টিমেয় কাব্যজ্ঞান-বৃদ্ধির—কিন্তু সাধারণ কাব্যপিপাসু জন আকৃষ্ণির পর আকৃষ্ণি লাগিয়ে তাঁদের নাগাল পাচ্ছে না।

আমাদের তৃষ্ণা আকর্ষণ—কিন্তু সে তৃষ্ণা মিটাবে কে ?

আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার সুযোগ নিয়ে, শব্দের চটকে, ভাবের কাঙ্ক্ষার্থে, উপমার অস্বাভাবিকতায় ও অভিনবতায় বিভ্রান্ত ক'রে অনেক অনধিকার-প্রবেশও ঘটেছে কবিতা-ক্ষেত্রে, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অনেক আধুনিক কবিতা বোধগম্য করাও

যেমন, মনে রাখাও তেমনি কষ্টকর, উদ্ধৃত করাও—কলে ব্যবহৃত, কথিত বা লিখিত ভাষার তা নিজস্ব সম্পদ হ'য়ে যেতে পারে না।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, কাব্যবিচার করা বা নবতর কবিদের বিম্বরকর সৃষ্টির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেননা তার যোগ্যতাও আমার নেই। আমার প্রিয় কাব্যলক্ষী যাতে সকলের স্বপ্নের বেলোতে অধিষ্ঠিতা হয়ে শ্রান্ত, তাপিত, ঝিলি, পীড়িত মনকে আনন্দের অমিয়-নিখ'রে সিক্ত, তৃপ্ত করতে পারেন, তাই তাঁর প্রসাদ প্রাপ্ত গুণী জনকে আমার ভাবনা, আমার আকুলতা জানালাম।

তাঁরা এমন সৃষ্টি করুন যাতে আমাদের ভয়কে আশার রিজোল জাগবে, কাব্যবিম্বিতা বিপরীত থাকে প্রবাহিত হয়ে, রসসিকারে শুদ্ধ জীবন ডুবু ডুবু হয়ে ভেসেই যাবে আর—

'সৌভজন বাহে আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি।'

শাহরদিয়
অভিনন্দন

মুখার্জী জুয়েলার্স
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা

ফোন :
৩৪৪১৩০

মুখার্জীর গহনা
শ্রীক্ষ ও মুদ্র

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

তারপর কেটে গেছে আরো সুদীর্ঘ তিনটি বছর! জগৎ জুড়ে চলেছে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা।

মানব জীবনের উত্থান, পতন, স্রুৎ, দৃংখ, হাসি কান্নার নিত্য রচিত হচ্ছে পৃথিবীর অলিখিত ইতিহাস।

দীর্ঘ পাঁচবছর পরে স্বদেশের মাটিতে পা দিয়েছে সুদাম, M. R. C. P.—F. R. C. S.—M. R. C. O. G.

ডিম্বির মালা গলার পরে। প্রথমে কাকার নির্দেশ মতই সোজা চলে এসেছিলো সে তার মামার বাড়ীতে। কেরা হয়নি আর সেখানে, যেখান থেকে জনক-জননীর পদধূলি মাখায় নিয়ে, মঙ্গলঘটকে প্রণাম করে হাত্যা শুরু করেছিলো। সে বাড়ী এখন কাকার সম্পত্তি, সেটি তিনি ভাড়া দিয়ে, নিজে বাস করছেন লাঞ্ছনিত, সুদামের মা গেছেন তাঁর পিতালয়ে। মামার বাড়ীতে অবশ্য বেশীদিন আর থাকতে হয়নি ওকে, সোমনাথের দানপত্র আর এ্যাটর্নি মারক্‌স একথানি দিলমোহর-করা তাঁর লেখা চিঠি পাবার পর প্রথমে বিহ্বল ভাবে এসে মাকে বলেছিলো সুদাম—

—কি করবো মা?..কাকাবাবুর দেওয়া এ বাড়ী আর টাকা, কেন্দ্র অধিকারে গ্রহণ করবো আমি!

—তাকে ভুল বুঝানো দামী! সুদৃশ্যের বলেছিলেন যমুনা দেবী।—তাঁর স্নেহের দানকে উপেক্ষা করে তাঁকে কঠোর আঘাত করতেই কি পারবে তুমি?

—যুৎ নিচু করেছিলো সুদাম মায়ের জবাব শুনে। ছুচোখের কুল ছাপিয়ে দর দর করে নেমে এসেছিলো জলের ধারা।

অনেক দিনের সঞ্চিত বেদনার জমাট তুষার আজ অকস্মাৎ গলতে শুরু করেছে।

মায়ের গলাটা দুহাততে জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধে মাথা রেখে, ফুল ফুলে কেঁদেছিলো সুদাম, সেই ছোটবেলার মতো।

তারপর মাকে নিয়ে চলে এসেছিলো এলগিন রোডের বাড়ীতে।

যিয়েটার রোডের বাড়ী হবে কমলা-সেবাসদন। কাকাবাবুর দেওয়া এ মহান কার্যভার সম্বন্ধিত্তে মাখায় তুলে নিয়েছে সুদাম। আরো কয়েকজন নির্দোষ সেবাসার্থী ডাক্তার আর কয়েকজন ধনী বাড়ালী, অবাঙালীর সহায়তা লাভ করেছে সে। সেবা-ভবনের কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। নাড়বা-খাওয়ার সময় মেলেনা ভায়। ঠান্ডাহীন এই কর্তব্যোপেক্ষের মাঝে আত্মনিয়ম রূপটি তার বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছে তার সহকর্মীদের মনে। সেদিন গুর হুখের স্নেহের ভাব দেখে বিখ্যাত লঙ্ঘনবিরূ প্রবীণ ডাক্তার সর্বাধিকারী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—

—শরীর অসুস্থ নাকি হালদার? দেখি, বেশি। ওর হাতটা ফুলে বিয়ে নাকী টিপ-কোডের সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ। বেশ অসুস্থতা

দেখছি। বাও, বাও, শিশুগির বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম নাওগে শরীরটা গাড়ীর ঢাকা নয় হে, যে তাকে বেশরোয়ি ভাবে ঢালাবে;—যে রকম অনিয়ম, অত্যাচার দেখছি তোমার, মিষ্টার ড্রিবলী সেবাস্রমে প্রথমেই তোমাকেই না ভস্মি করতে হয়।

—লজ্জিতভাবে হাসলো সুদাম—যুৎ নিচু করে বললো,—তেমন কিছু নয়। হতটা পরিশ্রম করা উচিত—ততটা আ-পারি কৈ? হস্পিটালের ডিউটি সেয়ে, বাকি সময়টা এ কাজে জ্ঞত যথেষ্ট নয়। তবুও আপনাদের যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছি, তাই তাঁর পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

—কি আর করতে পারছি হে! পাঁচজনের উপকার হয়ে আমাদের কিছু পুণ্য সঞ্চয় হবে,—এই আর কি! হা, হা, কয়ে প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন ডাক্তার সর্বাধিকারী, আমার গাড়ী তোমার পৌছে দিয়ে আশ্রুক হালদার, বড় চড়া রোদ্।

—না, না, আমি ট্রামেই যেতে পারবো, তেমন কিছু হয়নি আমার। বিনীত নমস্কার জানিয়ে দীর পায়ে বেরিয়ে গেলো সুদাম।

—ওর গমনপথের দিকে চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বললেন ডাক্তার—Poor Soul.

সোমনাথের বালায়ন্ধু, গৃহচিকিৎসক তিনি। দানপত্রের গ্রন্থান সাক্ষী। শালকটীর ইতিহাস তাঁর অজানা নয়।

ট্রামে উঠবার পর মাথাটা কেমন টলো, টলো মনে হতে লাগলো সুদামের। চোখ দুটো যেন বড় ছালা করছে। অতিকষ্টে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লো সিটে, মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো সে।

পাণের সিটেই বসেছিলো করবী!—সুদামের দিকে নজর ফেরালো কিছু পরে।

যেন ভারি চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না? বার বার দেখলো করবী ওর মুখখানা!

মনের গহন বনে চললো ব্যাকুল অমুগ্ধান—কে? কে? চমকে উঠল যরণ বিদ্রাৎ!—তার আলোতে চিনলো করবী ওকে—পরম বিশ্বয় ভরে অকুট স্বরে উচ্চারণ করলো—সু—দাম!!!

—কে? চমকে উঠে চোখ মেলে চাইলো সুদাম।—চিনতে পারছো না সুদাম? আমি করবী।

কিরলো করবী?—হোটমাসী? ওর দিকে চেয়ে হাসলো সুদাম।

—তা প্রায় বছরখানেক হয়ে গেলো ফিরেছি। কথা বলতে বলতে কেমন ধাঁধাতে লাগলো সে। চোখ দুটো লাল, লাল!

তোমার কি শরীর অসুস্থ সুদাম? ব্যস্তভাবে জবাব করবী।—হ্যাঁ হোটমাসী! বাড়ীতে বোধ হয় স্ট্রেট যেতে পারবো না।

—কোথার নামবে?—এলগিন রোডের মোড়ে—

—ঠিক আছে! আমি বাবো তোমার সঙ্গে সুদাম? বাড়ীটা চিনে আসবো!—এখন আর কথা নয় পরে কলবো, আর তখনবো সব!

ট্রাম ধামলো। সুদামের হাতটা শেপ করে ওকে সাবধানে নামালো করবী।—উঃ, কি ভীষণ পদম তোমার পা?—বাপরে!

এবে সড়ক দুর্ঘটনা দেখছি। এই নিয়ে বেরিয়েছো? মিথ্যা শুনে—

নিজের জিব ধাঁত দিয়ে চোপে গলল করবী।—মজা অপ্রকৃত ভাবে

কুটপাথে ঝাড়িয়ে চেয়ে দেখলো সুদামের মুখপানে ।-বুকেটা যেন ফেটে গেলো ওর সুদামের চোঁটের কোণে কল্পন স্নান হাসি দেখে । একটা চলন্ত ট্যান্ডি বাচ্ছিলো,—তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো করবী !

দিন সাতেক বাদে অরটা ছাড়লেও, ডাক্তার সর্বাধিকারীর কড়াশাসনে সুদামকে আরো একসপ্তাহ শাস্তিছেলের মত বাড়ীতে থাকতেই হলো ।

করবী রোজ এসেছে, যমুনাদেবীর সঙ্গে সুদামের শুশ্রুষায় বোগ দিয়েছে !

—জরের মাঝেই একদিন সুদাম বলেছিলো, ছোটমাসী ! তুমি যে এত সেবা করতে পারো, তা'তো জ্ঞানতাম না আগে !

—সেই আগেকার ছোটমাসী আমি আর নেই গো !

নাসিং শিখ'ছি যে ! মানে খোলস পাশ্টেছি । কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে উঠতো যমুনাদেবীর চোখ দুটো ! বলতেন—

—এমন বিপদের দিনে ভগবানই তোমাকে এনে দিয়েছেন বোনটি—তা, না হলে একা যে কি করতুম !

স্মিতার কথা ওঠে না ! ওরা সকলেই যেন—পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে মিতার তথ্যটি বেদনার আড়াল দিয়ে গোপন রাখতে চায় !

পথ্য পাবার দিন তুয়েক পরের সন্ধ্যায় খাটের ওপর বাগিশে হেলান দিয়ে বসে একটা বই নাড়া চাড়া করছিলো সুদাম । ঘরে এলো করবী, সঙ্গে তার অনিরুদ্ধ !

—কাকে এনেছি দেখতো সুদাম, চিনতে পারো কি—না ! সকৌতুকে বললো করবী !

একটু বিস্মিত ভাবে চাইলো সুদাম অনিরুদ্ধ'র দিকে !

—অনিরুদ্ধ এগিয়ে এসে খাটের পাশের চেয়ারটি দখল করে বললো—দুর্বল মস্তিষ্কটাকে অনর্থক খাটিয়ে আর কাজ কি ?—আমার নাম অনিরুদ্ধ বহু, বিলেতে থাকতে কয়েকদিনের পরিচয় আপনার সঙ্গে !

—ও হো, হো ! মনে পড়েছে ! যুক্তকরে ওকে প্রণাম জানিয়ে হেসে বললো সুদাম—অপরাধ নেবেন না, মস্তিষ্কটির ধারটা আমার দিন দিন কেমন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে ! অনেকদিন বাদে আপনাকে দেখে ভারি ভালো লাগছে আমার !

—হ্যা ! আমারও ! বললো অনিরুদ্ধ ! করবী দেবীর কাছে আপনার খবর পেয়ে নিজেই এলাম, অবশ্য পূর্ব পরিচয়ের দ্বাবী নিয়ে এবারের আশা নয় ; আমার এবারের পরিচয় মিতার দালা আমি ! নামে একমাত্র দালা !

—তাই নাকি ? হাসলো সুদাম ! তা আপনার ভরির খবর ভালো তো ?

১১

ও-আর-সি-এল-এর

কুহ্মারেশ

সিওন ও সেন্ট্রাল পীতু

২৭

দি ওবিয়েট্যাল বিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

—বর ? মাথা চুলকালো অনিচ্ছা !

বিত্রস্ত দৃষ্টিতে চাইলো করবার যথের দিকে !

—ওর অশ্রুস্ত ভাবখানা দেখে হাসলো করবী—তারপর বললো—কি আশা করো তার সম্বন্ধে সুদাম ?

তোমার কাঁচকে চিন্তে পেরেছো বোধ হয় ; তার সজিনী হয়ে মিথার অবস্থাটা কি হতে পারে বলনা করে নাও,—বেচারী অত বড় বাড়ী খানার একেবারে একলা থাকে ! কোথাও বেবায় না ; থাকে বলে নির্কাসন দণ্ড ; তাই ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তার কথা—কি আর বলবো বলে ! গলায় স্বর কেঁপে উঠলো করবীর—চোখ দুটি ভরে এলো জলে !

—সোজা হয়ে উঠে বসলো সুদাম ! বেদনা-ছলো-ছলো, চোখ দুটি তুলে চাইলো করবীর দিকে—

—একলা ? একলা থাকে কেনো মিতা ?

তুমি, দিদিমা, ছোট মামা ! সকলেই তো আছে !

—না সুদাম, আমরা প্রায় বহর চারেক অজ্ঞাত আছি !

—সে কি ? জানতাম না তো ?

—জানাবার আর সময় পেলাম কই ? স্বর নিয়ে তো প্রথম দেখা। এবারে সবই বলছি শোনো ! কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে নিজে থেকে প্রস্তুত করে নিলো করবী !

—আপনার হাতে কি বই ওখানি ? শুধালো অনিচ্ছা !

—বালুচর ! বললো সুদাম ! একখানি কবিতার বই !

—বালুচর ? ইছামতীর লেখা ? —কেমন লাগছে ?

—অপূর্ব ! প্রত্যেক কবিতাটি রসোত্তীর্ণ ! তবে রসটি, বেদনার রস আর কি ! সেই জন্তেই বোধ হয় এত মর্মস্পর্শী হয়েছে ! একটা ছোট নিঃখাসের সঙ্গে বললো সুদাম !

—ঠিক বলেছেন ! স্তনৈতি, লেখিকার প্রথম রচনা এই বইখানি। আশ্চর্য্য হলাম বইখানি পোড়ে—প্রথম রচনা যে এত অনোরম হতে পারে !

—আরো আশ্চর্য্য হবেন শুনে যে, বইখানি ডাকে কেঁবে আমাদের পাঠিয়েছেন জানি না। এমন একজন অখ্যাত নীন হীনকে এমন কার্য্যগ্রহের উপযুক্ত সমঝদার কে যে ঠাওরালেন, ব্যর্থলাম না ! বোধ হয় পরিহাস করেছেন কেউ, সেই কথামালায় দেয়াল আর ককের গল্পের মত !

—না, না, তাইবা ভাবছেন কেন ? হয়তো আপনার পরিচিত বা জ্ঞাত প্রিয়জন, আপনার জন, কেউ পাঠিয়েছেন—পাঠিয়ে হয়তো তিনি নিজেই তৃপ্তি পেয়েছেন,—আর এমনো তো, হতে পারে, ছদ্মনামের অবগুণ্ঠন সরিয়ে একদিন তিনি উদয় হতে পারেন আপনার সামনে ! অসম্ভব নয় কিছু !—সেদিন এ অভাজনকে মরণ করবেন কিন্তু ! কারণ এই ইছামতীটি যে কে, বাস্তবে কি তার পরিচয় জানবার যথেষ্ট কৌতূহল আছে আমার, প্রকাশকের কোরে ধরা দিয়েও এ বহস্তের পুরে কিছু মেলেনি !—এই বাজারে বইখানার চড়, চড় করে তিনটে সংস্করণ কেটে গেলো, একবছরের মধ্যেই !

—তিনটে কেন, ছ'টা সংস্করণ কেটেছে তবলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই ; কারণ বর্ষা ভালো জিনিষ সমাদর পাবেই !—হ্যাঁ ! ছোটমাসী কি যেন বলবে বলছিলো না ? করবীর দিকে চাইলো সুদাম !

—তাইতো ভাবছি, বললো করবী—অগ্রিয় ঘটনাগুলো তোমাকে জানিবে—

—জানলে মনে আঘাত পাবো এইতো ? মান হেসে বললো সুদাম, সব কিছুকে সহজভাবে মনে নেওয়ার শিক্ষা করছি ছোটমাসী, জানি, বা ঘটবার—তা অবশ্যই ঘটবে, এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের চলতে হবে। শত চেষ্টাতেও ঘটনাস্রোতকে বন্ধন ফেরাবার আমাদের ক্ষমতা নেই, তখন শাস্তিচিত্তে তাকে বাঁতে মনে নিতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাদের করা উচিত—এই আমার মনে হয় !

—আপনার মূল্যবান অভিমতটিকে জীবনে কার্য্যকরী করতে পারলে মনে হয় জীবনের উত্তম সমস্তাগুলোর সমাধানের প্ত্র কিছুটা মিলতে পারে ! বললো অনিচ্ছা !

—আপনি নয়—তুমি ! হেসে বললো সুদাম, মিতার দাদার ওপর আমিও ভাগ বসলাম, আমারও যে দাদা-দিদির একাত্তই অভাব !

—অবশ্যই ! আজ থেকে দাদার কড়া শাসনটিকেও কিন্তু মনে চলতে হবে—হা, হা শব্দে উচ্চরোলো হেসে জবাব দিল অনিচ্ছা !

—ভরসা পেলো এতকালে !—মুহূর্তেই বললো করবী ;—বহর চারেক আগে জামাইবাবুর দানপত্রে, তাঁর সম্পত্তির বা ব্যবস্থা হয়েছে, তা'তো তুমি জানোই ! এর কয়েকদিন পরেই অসীম এসে মাকে সোজা-স্বজিই বললো,—

—এত বড় বাড়ীটা আমি অমনি কেলে রাখতে চাইনা, আরে ব্যবস্থা করবো,—মানে আপনারা যদি চান তো একতলায় থাকবেন ভাড়া দিয়ে ! দোতলার আমি নিজে থেকে আমার বাড়ী ভাড়া দেব !

একটু খেমে,—আবার আরম্ভ করলো করবী—

—মাকে তো জানোই সুদাম,—তিনি দেইদিনই আমার হাত ধরে হস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। ছোড়ল আর আমি কত বোঝালুম যে, একটা স্নায়ু খুঁজে নিয়ে তবে যাবো,—কিন্তু মা কোনো কথাতেই কান দিলেন না !

মা ছোড়লকেও বললেন সঙ্গে আসতে,—তারও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার নতুন বিয়ে করা বৌ একেবারে চোখ কপালে তুলে বললো—

—স্নায়ুতো আর বিনাভাড়ার ছুটবেনা ;—তার চেয়ে ভাড়ি দিয়ে এখানেই থাকবো ! এমন চমৎকার মার্কেলের স্বর, এমন লন, ফুল ছেড়ে আমি একপাও নড়চিনে,—যেতে হয় তুমি বাও মায়ের আঁচল ধরে !

আহা কত আরাধনা করে পাওয়া বো !

ছোড়ল মায়ের আঁচলের বদলে বৌএর আঁচলই ধরলো !

—ছোটমাসী বিয়ে করেছেন নাকি ? শুধালো সুদাম কৌতূহলী হয়ে !

—হ্যাঁ,—সে তো অনেকদিন ! মিতার বিয়ের মাস হয় সাত পয়েই ! বৌ তোমার অচেনা নয়,—তোমার কাঁচার বান্ধবী—

—কোন শুকতার ? সেই অভিনেত্রী শুকতার ? কাকা সঙ্গে একবার গিয়েছিলেন কোন্ একটা নাচ গানের ক্লাব না ক্লা

জানি না, সেখানে দেখেছিলাম ঠর নাচ। সেখানকার—পরিচালিকা যিনি। মাসীমা বলতেন তাঁকে কাঁকা—ভদ্রমহিলা, কি রকম যেন, আমি তখন বেশ বড় হয়েছি—আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এমন ছেলেরা হুয়ে মত আদর করতে লাগলেন, ভীষণ লজ্জা করছিলো আমার। বাক্সে ওকথা—তাবশর রাস্তায় নেমে—

—ও! অলকাপুরীর মাসীমাকেও তুমি চেনো দেখছি! চোখ বড় করে চেয়ে বললো করবী—ছেলে, মেয়ে খবার জেলেনি তিনি। ঐ অলকাপুরীটি তাঁর একখানি মোক্ষম জাল। আর ঐ জালে ধরেই মিতাব গলায় কাঁস লাগিয়েছেন তিনি। জানতাম না,—সুদাম, আগে এসব জানতে পারিনি,—যখন জানলাম, তখন করবার আর কিছু নেই।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলো করবী।

—জানবার কোনো উপায়ই ছিলো না,—যদি না পুলিশের হাঙ্গামা হতো। বললো অনিচ্ছা।

—পুলিশের হাঙ্গামা? সে কি? চমকে উঠলো সুদাম।

—মানে, টাকা বোজ্জগারের নানারকম কৌশল বিস্তার করছিলেন ভদ্রমহিলা। নাচ গানটা বাইরের শো মাত্র। ঘনী সন্তানদের নিয়ে জুয়োখেলা, ছেলে মেয়েদের অর্ধে ব্যাপার,—ইত্যাদিতে প্রচুর টাকা লাভ করতেন। ঠর দলে অবশ্য ছিলেন কলকাতার আদ্যো সস্তান্ত নামকরা লোকেরা।—বাঙালী অবাঙালী সব রকমই নিয়ে তৈরী করেছিলেন তিনি ঐ অর্ধে ব্যবসায়ের ঘাঁটিটি।

আমিও দিনকতক গুধানকার মেথার হয়েছিলাম কি—না, তাই জেনেছিলাম ব্যাপারগুলো। প্রথম প্রথম বেশ মজাই লাগতো,—তারপর আস্তে আস্তে—এলো সন্দেহ, বিতৃষ্ণা! ছেড়ে দিলাম অলকাপুরী।

এর পরেই কাগজে দেখলাম ভ্যানক খবর।

মল বল সহ শ্রেণ্ডার হয়েছেন মাসীমা! ঐ ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক কয়েকজন সব জানতে পেরে পুলিশের কাছে সব কাঁস করে দিয়েছিলেন আর কি।

মামলা অবশ্য চললো না। টাকা চাললো রতনলাল ফেরি। মাসীমা খালি পেলেন বটে, তবে বিশ্বকীর্তিটো খোঁদা গেলো। অলকাপুরীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেলো।

রতনলাল ফেরির উপকারের প্রতিদান দিতে কিন্তু তিনি ভোলেননি;—পাঁচপিয়া সাপ্তকে নিয়ে বোম্বাই পালানোর মূল তাঁর স্বেচ্ছা কৌশল দানের কথা রতনলাল কোনো দিন ভুলবে না আশাকরি। খালি দুঃখ হয় যেটাটি বুড়ো। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে দেখে—

মা-মরা নাতনীটিকে—হারিয়ে কেমন যেন হয়ে গেছেন। রতনলালের কাছে—বিস্তর দেনাও ছিলো তাঁর,—আর অর্থবল, মেয়ের বন্ধ কিছুই আর এখন নেই... তাই...দ'য়ে পড়া হাতীর মতই চামচিকের লাথীকে শিরোধার্য করছেন তিনি!..

• একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলো অনিচ্ছা।

করবী একবার চোখ তুলে চাইলো ওর হৃৎকের দিকে—চাপা বেদনার স্নান ছায়া ভাসছে যেন ওর চোখ দুটিতে।

বিনু বিনু ঘাম জমেছে হৃদ্যামের কপালে, বিন্দুর ফুটেছে... চোখের দুটি তারায়।

উঃ কি ভয়ানক!।।...এই ভয়াবহ অলকাপুরীতে নাচ গান শিখতো মিতা? কে নিয়ে গেলো সেখানে তাকে ছোটমাসী? সে তো...সব চিনতো না...তার প্রকৃতি যে শিশি বড় কোমল, ভারি ভীত!—উৎসেগ-আকুল কণ্ঠে—বললো সুদাম।

কে নিয়ে গিয়েছিলো? এখ জবাব তো তোমার অজানা নয় সুদাম। তোমার কাঁকা,—অসীম হালদারের কাঁড়ি এটা। অলকাপুরীর নামকরা পাণ্ডা ছিলেন তিনি, তাতো জানতেই! প্রথম প্রথম আমরা কেই কিছু সন্দেহ করিনি—কিন্তু তারপর..

ও প্রদল—আজ থাক ছোটমাসী! আঁড়কণ্ঠে বললো সুদাম।

ওহো! এ আমি...কি করছি! ওর দুর্বল মাথায় দুঃসহ বোকাটা চাপাতে চাইছি? মনে মনে নিজেকে দিক্কার দিলো করবী।

সকল লজ্জার হাত থেকে ওকে বাঁচলেন যমুনা দেবী! দুটি খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন,—শেষে, দুকাপ চা নিয়ে এলো বাজ্জা চাকর—রত্নল।

—একি? কঙ্গীর ঘরে এসব কেন দিদি? কাঁড়িয়ে উঠে শশব্যস্ত যমুনা দেবীর হাত থেকে প্লেট দুটো নিয়ে টেবিলে রাখতে, রাখতে, বললো করবী—আমার ডাকনেনি কেন? আমিও বোণাড় দিতাম আপনাদের সঙ্গে,—তাতে আমার লেখাও হতো!

—কি-ই বা করেছি? মাছ মাংসের পাট তো বাড়ীতে নেই, শুধু চা ধরে দিতে যনটা যে কেমন করে ভাই, তাই সামান্য দুখানা নিম্বকি ভেজে নিয়ে এলাম। স্কীরের পুলি আগেই করা ছিলো!..

—বেশ করেছেন মাসীমা—খাবারের ভিনু টেনে নিয়ে বললো অনিচ্ছা। মা মাসীমা খাওয়াবেন না তো খাওয়াবে কে? ওসব অকতো ভদ্রতা আমার নেই।

বাড়ীতে ঢুকে প্রথমেই যমুনাদেবীর সঙ্গে করবী অনিচ্ছার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। ভারী ভালো লেগেছিলো ওকে

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! মে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারো একমাত্র

বাব্বলা

ব্যবহারে সর্বজনীন
প্রাণী আরোগ্য
লাভ করেছেন

জরুর গভা: রেজি: নং ১৬৮৩৪৪

অম্বশূল, পিত্তশূল, অম্বপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেঁকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, সন্দাশি, বুকজ্বালা, আহায়ে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হতাপি হয়েছেন, উন্মাদ ও আত্মহত্যা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। শিশুকে মৃত্যু ঘেঁষিয়ে ৩২ ডালার প্রতি কোটা ৩ টাকার একমাত্র ও কোটা—৮-১১ আলা। ডাঃ, মাঃ ও পাইলটের মত সুখক।

দি বাব্বলা ঔষধালয়। হেড অফিস—আবুল্লাখান (পূর্ব পাکیস্তান) ব্রাঞ্চ—১৪২২, হুদায়া গাঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৭

—বুকের ভাব যেন অনেকটা স্লামের মত ! বমজ ভাই যেন ওর !

—একি আর খাওয়া বাবা ? ভালো করে দামীর সঙ্গে বসে পরে খেও । বললেন তিনি !

—সে কথা আর আপনাকে বলতে হবে না মাসীমা, ক্ষীরের পুলি খেতে খেতে বললো অনিচ্ছ—এখন আর আপনার একটি ছেলে নয়, এ ছেলেটাও এসে দৌরাখ্য করবে মাঝে মাঝে । আর যে রকম লোভনীয় খাবার দেখছি আপনার হাতের, এর কাছে কোথায় লাগে বিলিতি হোটেলের মোগ্লাই রান্না !

—খাবার তৈরী করতে তো প্রায় তুলেই গেছি বাবা, ক্ষুধা স্নান হচ্ছে বললেন যমুনাবী—খাবার লোক কোথায় ? আগেকার দিনে,—নিতি নতুন ধরণের খাবার তৈরী করে সকলকে খাইয়ে কত আনন্দ তৃপ্তি পেতাম, তখন ঠাকুরপো কত ভালো বাসতো আমার হাতের রান্না খেতে, আর এখন—

অবস্থার বদলার চাপে কষ্টক্লম হয়ে গেল ওর । নিজেকে সংযত করে নিয়ে আবার বললেন তিনি—

—স্বা রে দামী ! সেই তো এসে একবার গিয়েছিল । ঠাকুরপোর সঙ্গে তো দেখা হয়নি বলি, আর হাসনি দেখা'নে ? মিতুর সঙ্গেও দেখা করুলি না একবার ?—আহা, মেয়েটার জন্তে বড় প্রাণটা কেমন করে রে ।

—হ্যাঁ মা গিয়েছিলাম আরেকদিন ; তোমাকে বলতে তুলে গিয়েছি । হেসে জবাব দিলো স্লাম । কাকা নীচেই ছিলেন, দেখানই বসে ছুটারটে কথা বললেন আমার সঙ্গে ;—আরো বললেন মিতার শরীফা ভালো নেই ; অজনি দেখা করো ।

—ও, তাই বুঝি ! নিঃশ্বাস চাপলেন যমুনা দেবী । অনেকক্ষণ কিছু খাসনি দামু ! ছুটা আনি । রান্না পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি ।

—তারপর ছোটমাসী ! এখন নিবাস কোথায় তোমাদের ? ছোট মামাতো লালকুঠিতে আছেন জানলাম, অবশ্য আমার সঙ্গে দুদিনই দেখা হয়নি । নীচের ঐ কোণের দিকের যে ঘরটা সর্বদা বন্ধ থাকতো—মানে মিতার দাঁত খুন হয়েছিলেন শুনেছি যে ঘরটায়, সেই ঘরটা এখন খোলা, আর পার্শ্ব সরানো ছিলো, বেশ সুসজ্জিত মনে হলো । একজন মহিলা বার দুয়েক এসে কাকাকে ভেঁকে নিয়ে গেলেন, তখন চিনতে পারিনি, এখন মনে হচ্ছে তিনিই ছোটমামার স্ত্রী বোধ হয় ।

—বুকেছো ঠিকই ; অল্প হেসে বললো করবী । লালকুঠি থেকে চলে আসবার পর আমি মাকে লুকিয়ে দু'তিন দিন মিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম ঐটি ওদের শোবার ঘর হয়েছে ।

নিবাস ?—প্রথমে পথে নেমেই মা'র মনে হল কোথায় বাওয়া যায় ! নিজের বাড়ীতো ভাড়া দেওয়া । অলকাপুরীতে বাবেন স্থির করলেন কেশব্রীর পার্কে বসে । কিন্তু আমার মন চাইলো না সেখানে যেতে—গেছা থেকেই কেমন আমার ভালো লাগেনি ও জায়গাটা । আমি বললাম চলো যাই আলিপুরে অনিচ্ছ বাবুর বাড়ীতে । তার মায়ের সঙ্গে তো তোমার বেশ আলাপ আছে, আর তিনি বড় ভালো । রাজী হলেন মা । সেখানে গিয়ে একেবারে

ঠাকুর-আমের কাটলো কয়েকদিন, তারপর ওদের চেষ্টাতেই বাড়ী একটা মিললো চেংলায় । টিউলানী করি, চলে যায় কোনরকমে দুজনের । জামাইবাবু প্রচুর টাকাও গিয়ে গেছেন । আর কোনো কষ্ট নেই, খালি মিতুর জন্তে মাঝে মাঝে বড় মনটা কাঁদে ।

বিমর্ষ দৃষ্টি মেলে, চুপ করলো করবী ।

—এত সব ব্যাপার ঘটে গেছে ? আমি এর কিছুই জানি না । ক্ষুধা চুলগুলো, হাতের মুঠোয় চেপে ধরে টানতে টানতে বিষণ্ণকণ্ঠে বললো স্লাম ; তা মাঝে মাঝে শুধানে গেলেই তো পারো ছোটমাসী ! মিতা আসে না তোমাদের কাছে ?

—না । সে আজ চার বছর নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে নিজেকে । কোথাও যায় না ! কাকুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি । আমি প্রথম প্রথম যেতাম ওর কাছে,—কিন্তু যাওয়া বন্ধ করতে হলো ।

—কেন ? কেন ছোটমাসী ?—ব্যাকুল কণ্ঠের স্লামের ।

—ওর সিকে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে চাইলো করবী, তারপর উঠে গিয়ে স্লামের একখানি হাত চেপে ধরে আর্দ্রকণ্ঠে বললো সে—

—জানো স্লাম ! আমাকে জড়িয়ে ধরে মিতুর সেদিন কি কান্না !—তুমি এখানে আর এসোনা ! এলে হয়তো তোমার সম্মান আর থাকবে না ।—

আর কিছু বলতে পারিনি সে স্লাম ! তবুও আমি বুঝতে পেরেছিলাম সব ! ওর কত বিকৃত...মনটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেরেছিলাম সেদিন । আঁচলে চোখ মুছলো করবী !

‘বালুচর’ বইখানিকে অন্তরমনক ভাবে হাতে তুলে নিয়ে ‘নাড়া’ চাড়া করতে লাগলো স্লাম ।

বাগানে সন্ধ্যোটা ল্যাতেওয়ার চাঁপার গন্ধ মুঠো মুঠো চুরি করে, ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে, শব্দ শব্দ করে, খোলা জানলা-পাথে বেরিয়ে গেলো আশিনের উদাসী বাতাস ।

বড় চেনা, বড় ভালোলাগা গন্ধটি যেন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলো স্লামকে ! কোন্ এক হারিয়ে-বাওয়া মধুর রাগিণীর বিবাদ ভরা স্বর কেঁদে ফিরতে লাগল ওর অন্তরের গভীর অন্তলে !

লালকুঠির...নীচের তলায় বারান্দায় অস্থির ভাবে পাইটারী করছিলেন অনিল ।

আলা, বৃকভরা শুধুই আলা ! এখালা আর সূচ হয়না ! বিক্ষিপ্ত মনটা তার বার বার প্রশ্ন জানাচ্ছে ওর কাছে—

কি পেরেছো ? কি পেরেছো তুমি ? কি রকম ? কিসের—
লোভে...মা বোনকে ত্যাগ করেছিলে ?

মিতুর সর্বনাশের বিনিময়ে কি লাভ করলে তুমি ? এতদিনের দিবা রাত্রির পরিভ্রমের অর্থে কার ভোগ-বিশ্রামিতার উপকরণ জুগিয়েছো ? নিঃস্বের মনুষ্যত্বকে বলি দিয়েছো কার পায়ে ? কে ? সে ? সে আলোয়া ! ওর সবটাই মিথ্যা হলনা মাত্র ।

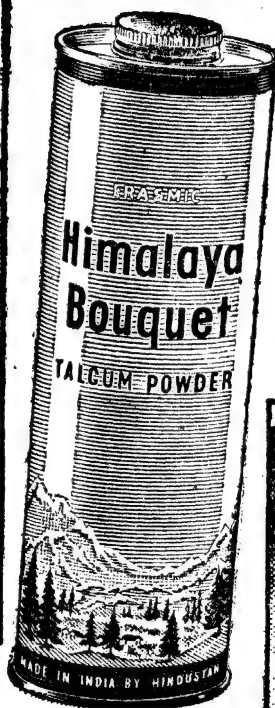
পেরেছে বৈকি কিছু তার কাছে ! পেরেছে বন্ধনা, অবহেলা, চাতুরী, আর নিদারুণ হতাশা !

জ জ জ করে রাগি বারোটা বেজে গেলো, এখনও বাড়ী ফেরেনি শুকতারাম !

কোথায় গেছে ?..



ব্যবহার করুন
হিমালয় বোকে
ট্যালকাম পাউডার



সারাদিন
সতেজ
থাকার জন্যে



- এত সুগন্ধ
- এত কম খরচ
- সারা পরিবারের
পক্ষেই আদর্শ

একমাত্র লকসে পাতে হিন্দুস্তান লি. কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

BBT 15-3532 BO



বাউল পদ্মলোচন

বাউল-কবির মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন শালন ফকির। শালন কবিরের মতো অট্টা প্রসিদ্ধ না হইলেও, পদ্মলোচন বা 'পোদো' একজন সুকবি বাউল ছিলেন।

অধিকাংশ বাউলগানের গানের মধ্যে তত্ত্বকথা, স্মর-সৌন্দর্য, গীতি-সঙ্গতি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইলেও, অশিক্ষিত বাউল-কবিরের বহু গানই কাব্যশৈলি নিকট। ইহার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমতঃ, বাউল সাধকরা জনসমাজ হইতে আত্মগোপন করিয়া দূরে থাকিত, তাহার ফলে তাহাদের গানগুলি রসিক সমাজে প্রচারিত হয় নাই। কলে, তাহাদের বহু গানেরই ভাষাভঙ্গী প্রাচীন ধারার পরিচ্ছিন্ন, সময়সংগতের ধারা পরীক্ষিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিবার অবসর পায় নাই।

ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন,—“বাউল গান আমার বাহা পাইতেছি, তাহা হইতে ভাষা সম্বন্ধে কোন প্রাচীনত্বের অনুমান করা যায় না। খুব বেশি হইলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহাদের রচনাকাল। শালনের গানের রচনা যদি ষোড়শশতাব্দী হইতে আরম্ভ হয়, তবে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে তাঁহার রচনা আরম্ভ হইয়াছে—এইরূপ সঙ্গত অনুমান করিতে পারি। বড় জোর, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান গানগুলির রচনাকালের শেষ সীমা ধরা বাইতে পারে।”

দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত অশিক্ষিত বাউল কবিরের বিজ্ঞাবুদ্ধি অল্পব্যাপী গানগুলি রচিত। তাহার প্রচলিত ভাষার কোন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছে। উচ্চতর রচনাভঙ্গীর সঙ্গে তাহাদের পরিচয়ই ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ, লোক-মুখে-মুখে একক গানের নানাভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গায়করা নিজের মনোমত শব্দের বোঝা করিয়াছে, অর্থ-বিভিন্ন রূপান্তর করিয়াছে। তাহার ফলে গানগুলির বিকৃতি ঘটয়াছে।

তবে, রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ‘বালা কাব্য পরিচয়’ যে সকল বাউল গান আছে, সেগুলি কবির-রসে সমৃদ্ধ। কিন্তু ঐ শ্রেণীর বাউল গান ঐ করণ ছাড়া আর সংগৃহীত হয় নাই বলিলেই চলে।

পদ্মলোচনের যে বাউল গানটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে আছে, সেটির কাব্যসৌন্দর্য ও স্মরণীয় হই-ই অন্তর্ভুক্ত—

আমার ভুবল নয়ন রসের ভিমিরে,
কমল যে তার গুটাল দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোর ধনুনাতে রসের লহরী,
(কালোর ঢালা ধনুনাতে রসের লহরী)
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাশরি,
শুধু কৈঁসে মরি—ভাসাই কুন্ত রসের নীরে।

কীর্তনের ভায় বাউল-ও আঁধারের বাহর হইত। এই সকল আঁধার গায়করা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত না। গাহিবার সময়েই তাহাদের কণ্ঠ হইতে আবেগভরে উচ্চারিত হইত। পদ্মলোচনের গানে এইরূপ আঁধার থাকিত।

পদ্মলোচন বাউল অঞ্চলের বাউল, তাঁহার অনেক গান বর্ধমান অঞ্চলেই গীত হয়। গোসাঁই হরি ছিলেন তাঁহার গুরু, প্রায় সৎল গানেই তিনি গুরু নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎসিঁতে তিনি নানাভাবে আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়া নিজের অকিঞ্চনতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

‘গোসাঁই হরি বলে, ও পোদো নজ্জার,
মূলে চুরি করলি রে গোয়াত,
ও তোর মস্তকে দংশেছে কণি
আমার তাগা বাঁধা হ’ল সার’।

এই-ধরণের উক্তি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রাচীন। চর্চাপদে, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ঠিক এই শ্রেণীর স্মরণ ব্যবহৃত হইয়াছে। চর্চা এই সকল উক্তি সে আমলে জনপ্রবাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর হইতে এগুলি, সমানে চলিয়া আসিতেছে।

বাউল গানে অল্পপ্রাস, শ্লেষ, ধর্মকের সাহায্যে পদবিজ্ঞানের সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সুপ্রাচীন প্রথা। এই শ্রেণীর বাক্চাতুর্ষ্য কবি-গানের আসরে খুবই প্রাবল্য লাভ করে। গানের মধ্যে এইরূপ বাক্চাতুর্ষ্য ও কথায় কথায় উপমাধি ব্যবহার করা পদ্মলোচনের রচনারও বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর বাউলগান বেশ অভিনয় সহকারে রসাইয়া রসাইয়া গাওয়া হইতঃ—

গোল চেড়ে মাল লও বেছে।
গোলমালে মাল মিশান আছে।
গোলমাল বলতে পারে যে,
গোলের ভিতর মাল থাকলেও চিনতে পারে সে।

ওমে পোদো হ’ল কাণা বেড়াল, দই বলে কাপাস থাকে।

‘পোদো’ কবির আসরী নাম; এটি শ্রেণীর খাত্তা-করা নামের মাধ্যমে বাউল-কবির জনসমাজের অন্তরঙ্গ হইতে চাহিতেন।

বাউলদের আদর্শ হইলেন রূপ-সনাতন। পূরম প্রেমের আহ্বান গ্রহণ করা মাত্র তাঁহার ব্যক্তি-প্রতিপত্তি, পদার্থবাদ, ধন-মান সবই ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া চলিয়া যান। পদ্মলোচনের নিম্নলিখিত বাউল গানটিতে তাঁহার আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে।

॥ আলোকচিত্র ॥

... এ সন্দের প্রহুদপট ...

এই স্থাথ্যার প্রহুদে একজন বাঙালী মেয়ের আলোকচিত্র
মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রটি ত্রিস্তা পাল গৃহীত।



পাহাড়িয়া

—মণ্ট মল্লিক



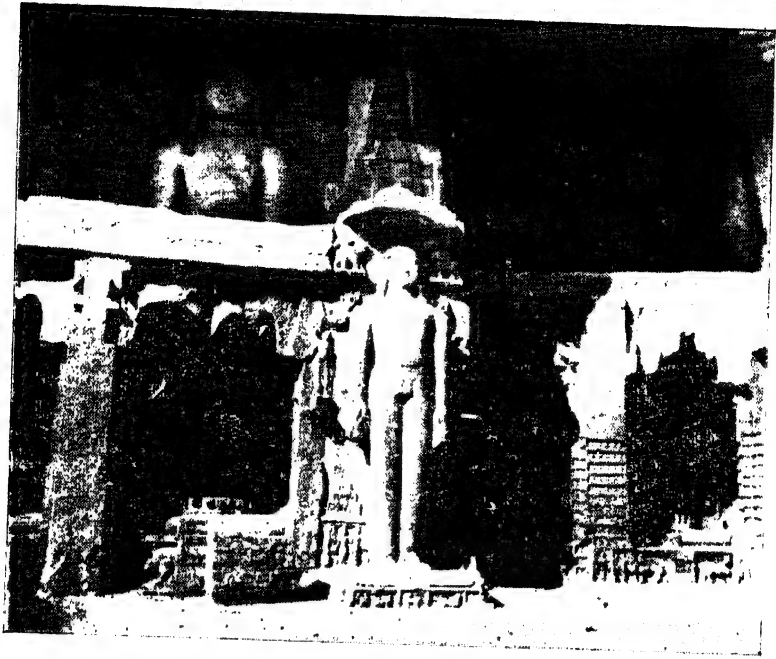
জয়পুররাজ সমাধি

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

চাষীভাই

—প্রব্রত বাগচী





উদয়গিরি (ভুবনেশ্বর)

বিজ্ঞান

—হস্ত মুখোপাধ্যায়

—নিমাইরতন গুপ্ত





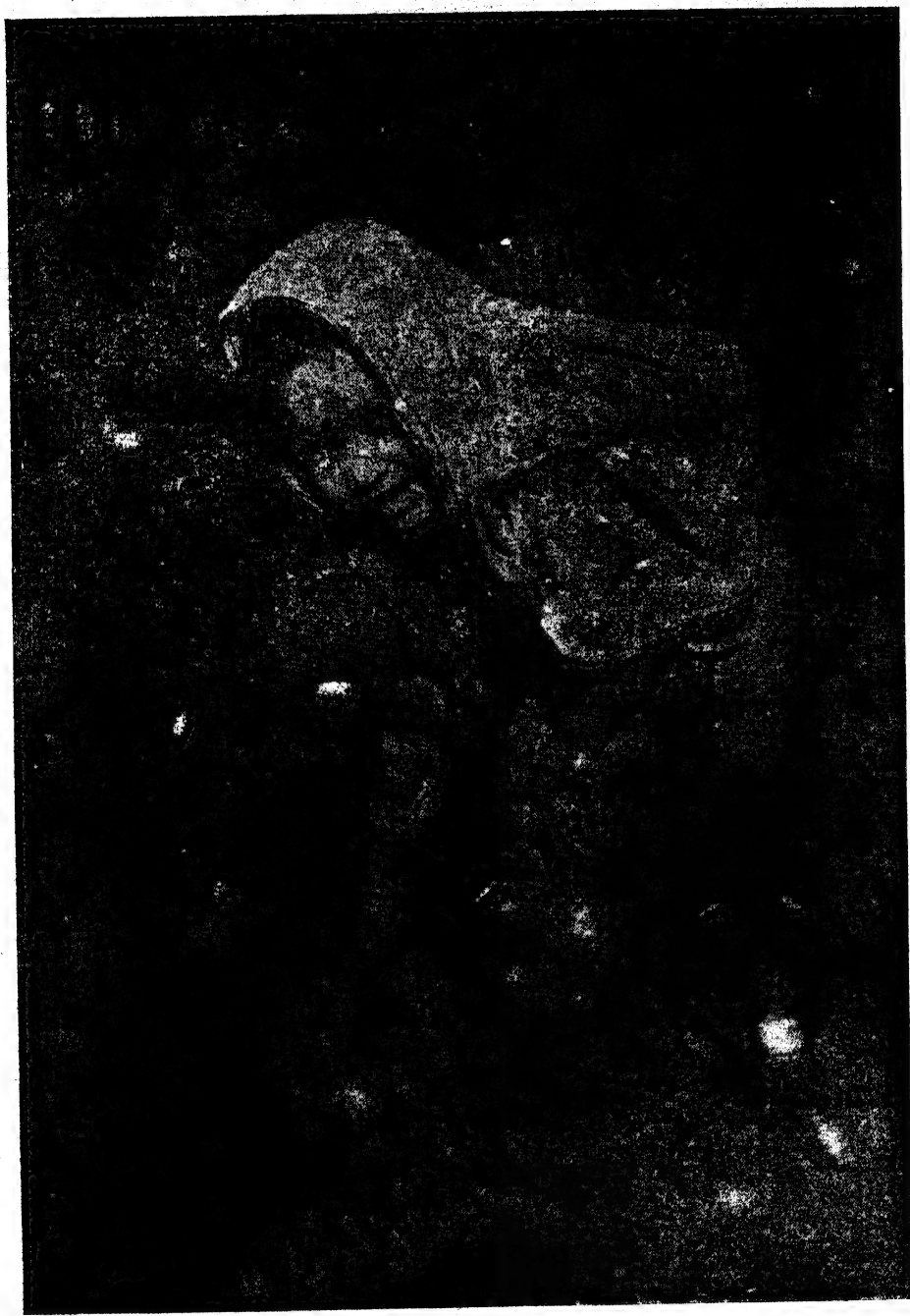
অজ্ঞতা

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

খেলা

—অনিলকুমার বোষ





পাগরী ভরশে

—সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গানটিতে সুভাবিত প্রবচনগুলি লক্ষ্যীয়—

‘রাগের করণ যজ্ঞ গেছে গোঁসাঁই ত্রীকূপ-সনাতন।
প্রেমশিখিত করবি যদি ধর গে সাধুর ত্রীচরন।
কথায় কথা সবাই তো কয়, বোঝা নয় তো জগৎজন,
ছেড়া চ্যাটারি শুয়ে থাকে, দেখে লাখ টাকার স্বপন।
গাভীতে হয় গোবোচনা, সে জানে না তার মরম,
দেখ, সাপের মাথায় মাখিক থাকে, তবু করে
ডেক ভোজন।’

গুণকবির নামে প্রচলিত “দিনকপূরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো
গার” নামক বিখ্যাত গানটি পদ্মলোচনের রচিত বলিয়া অনেকে মত
প্রকাশ করেন। তাহা হয়ত সত্যও হইতে পারে, গুণকবি দেশের
প্রাচীন কবিরের রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই বাউল
বিবর রচিত স্থলর গানটি তাহার নামেই চলিয়া গিয়াছে। গানটি
বশ উচ্চাঙ্গের সুরে-তালে রচিত; হস্তারসের গান বলিয়া বাহাতে সহজে
নে না হয় তাহার স্তম্ভ গাহিবার সময়ে সাধমত গাভীধর্মপুত্র বাগিনী
মলধন করা হইত। গানের শেষে পদ্মলোচন বলিতেছেন—

‘গোঁসাঁই পোদোয় কয় ভেবে এবার, কথা শুনেতে চমৎকার,
সাধক বিনে বুকতে পারে এমন সাধা কার?
কথা বে বুঝেছে, সেই মন্ডেছে, গিয়েছে সে বেদের পার।’
বঙ্গরসের গানে তবে এই শ্রেণীর ভাবিতা উপযুক্ত হয় নাই।
হাতে অতীন্দ্রিয়তা স্বপ্নের বার্ষ প্রয়াস হইয়াছে মাত্র।

বাউল গানের মধ্যে ঠারের আকার ইঙ্গিতে গুঢ় গভীর ব্যঞ্জনা
ধাক্কিত, বাউল গানের ‘রনের মাছুষ—রসের মাছুষ’ পরমপুরুষের
রূপভেদ—

রসের মাছুষ খেলা করে বিরজাপারে।
তার করণ উর্দা, স্বরূপ রূপের ছটা,
আছে করণ জাঁটা, অতি নিবিচারে।
আটে আটে চৌবাঁট কুঁচুরি ভিতরে,
রসের মাছুষ সেখা নিত্য লীলা করে,
তিন ঘারে কবট মেরে প্রভু বান তো বাহিরে,
কড়ু সিংহধারে, কড়ু সিঁদু নীরে।

পল্লী-গৃহস্থদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন, বাগ্‌ধারা, টুংরা
টুকরা রসের কথা পদ্মলোচনের গানগুলিকে বঙ্গ ফুলের মত সুস্বভিত
কথিয়া রাখিয়াছে—

(ওরে তুই) রইল বেলা পাছে ব’সে
ছুমুর গিলবি কোন সাহসে?
ও তোর ঝাঝার এই কি করণ, শোনরে পদ্মলোচন,
পিপীলিকার পাখা ওঠে কেবল মরিবার তরে।

শ্রীজয়দেব রায়

নতুন রেকর্ড গীতি

হিজ মাষ্টার ভয়েস

N 82834—জামল মিত্রের কর্তৃক হু’খানি আধুনিক গান
তো সেদিন” ও “ভালবাসো তুমি শুনেছি অনেক বার।”

N 82835—হু’খানি কর্তন গান “সখি, কহিও নিষ্ঠুর আগে”
‘কেন গোলাম যমুনার জলে’ গেয়েছেন শ্রীমতী সুরপ্রীতি বোব।

N 82836—“ঐ দূর নীলাকাশ” ও “চম্পক বনে” বানবেঙ্গ
মুখোপাধ্যায়ের কর্তৃক অনবদ্য ছ’টি আধুনিক গান।

N 82837—নবাবগতা শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের কর্তৃক
“বিন্দু জাঁখির” ও “একটি গানের একটি কলি” সবাইকে মুগ্ধ
করবে।

N 76088, N 76089, 76090 এবং 76091—রেকর্ড
গুলিতে “মাহত বন্ধুরে” বাগীচিরের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলক্সিয়া

GE 24961—পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের জীব মধুর কর্তৃক জাফা
সঙ্গীত “কালো বলা হয়নি বলা” ও “মা বলে মা ডাকতে তোয়।”

GE 24961—কুমারী বনানী বোবের অভিনয় আধুনিক গান
—“আম জাঁটির ভেপু” ও “না জানি ঐ কাজল কালো”।

GE 24962—মেঘ রাত্তানো অন্ত আকাশ” ও “হলকে পড়ে”
বৈশিষ্ট্যময় আধুনিক গান—গেয়েছেন শ্রীমতী প্রতিমা বসোপাধ্যায়।

GE 24963—অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা কর্তৃক দুন্দর
গান “দেখ শুকতার” ও “চাঁদের থেকে অনেক দূরে”।

GE 30427—শ্রীমতী আশা ভোঁসলে ও মায়ী দে’র কর্তৃক
“গলি থেকে রাজপথ” বাগীচিরের গান।

GE 30428, GE 30429 এবং GE 30430 রেকর্ড
গুলিতে “রাতের অন্ধকারে” বাগীচিরের গানগুলি গেয়েছেন—শ্রীমতী
আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ইলা বসু।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জতার কলে

তাদের প্রতিষ্ঠা যন্ত্র নির্মিত রূপ পেয়েছে।

কোন বহুর প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার
অন্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :- ৮/২, এলগ্যান্ডন ইন্স, কলিকাতা - ১

আমার কথা (৫৬)

সঙ্গীত-শিল্পী পরেশ দেব

বাংলার পল্লীগীতি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এই পল্লীগীতির মধ্যেই বাংলার গ্রামীন সমাজের সাহিত্য ও সঙ্গীত সহজ ভাবে বিকাশ লাভ করেছে। তাই, এ বাংলার তথা বাঙালী সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান।

সরল পল্লীজীবনের আশা-নিরাশা, প্রেম-বিরহ, সাধন-ভজন, দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক ভাবাবেগের অতি সহজ অভিব্যক্তি দেখি পল্লীগীতির ছন্দে ছন্দে। নিত্য-ব্যবহার্য কথায় সাধারণ অলঙ্কার-উপহার-এ-এক অনায়াস অনাড়ম্বর সু-ধুর সাহিত্য-সৃষ্টি; পল্লী-কাননে প্রকৃতির আপন খেলালে প্রস্তুত বিচিত্র ফলের সস্তার, বিচিত্র মাধুর্য-ভরা। কবে অজানা কোন গ্রাম্য কবি আপন খেলালে রচনা করেছেন এই স্থললিত পদ্যবাজি, হৃদয়ের গমীর আবেগ ও দরদ-ভরা সুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন পল্লীবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে। বৈরাগী-বাউলের ভজন, নদীতে নৌকা-চালনার রত মাঝি, খেতখামারে কর্মরত কৃষকের গানে পল্লী-পরিবেশ কি অপূর্ণ মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে উঠে। আধুনিক যুগে নাগরিক সভ্যতার এই জয়যাত্রার মাঝে শহুরে উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক সঙ্গীতের পার্শ্বে পল্লী-সঙ্গীত তাড়ায় যথাব্যোগ্য আসন করে নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গীতিকার ও সুরকার ত্রিপুরেশ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। পল্লীর গায়কদের নিজস্বভঙ্গি আক্ষর্যভাবে রূপ পেয়েছে পরেশ বাবুর কণ্ঠে। এক্ষেত্রে ইনি ত্রিশটান দেব বর্ণণের উত্তর সাধক। সে আজ অনেক দিনের কথা। তরুণ শিল্পী পরেশ দেবের কণ্ঠে 'আমার ভাঙ্গা ঘরে চাদের আলো', 'তুমি কি আমার বন্ধুরে, আমি কি তোমার বন্ধু' ইত্যাদি গানগুলি কোন এক সরলা পল্লীবালায় প্রেম ও বিরহে আমাদের মন ব্যাকুল করে তুলেছিল। পরেশবাবু একান্তই পল্লীবাংলার মানুষ, তাঁর কণ্ঠে গ্রাম্য গীতিকারের মনের সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবটি অনায়াস-দক্ষতার ধরা দিয়েছে।

ত্রিপুরা জেলার 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' শহরে ১৯১১ সালে পরেশ দেবের জন্ম। সঙ্গীতের ঐতিহ্য তাঁতার পরিবারে ছিল না। তাই তাঁর আবালা সঙ্গীতাহ্বারাগ কোন অহঙ্কল পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারেনি। তবে মাতামহ অনন্ত কুমার দেব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের শিক্ষক হরেন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁর সাক্ষ্যের সহায়ক হয়। হরেন্দ্রবাবু নিজে সঙ্গীতাহ্বারাগী ছিলেন, এবং ছাত্রের সঙ্গীত-চর্চায় তিনি ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। তাঁর সম্বন্ধে সাহচর্যে সাধনার পথে পরেশবাবুর বাত্মা শুক হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সারা ত্রিপুরা জেলার সুবর্ধ বনে পরিচিতি লাভ করেন। এই সময়ে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে আসামের এক চা-বাগানের সাহেবকে গান শুনিতে তিনি চাকুরী লাভ করেন। কিন্তু এই চাকুরীজীবন বেশি দিন তাঁর ভাল লাগেনি। সঙ্গীত-সাধনার উগ্র বাসনার আবার তিনি ফিরে এলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

সঙ্গীতাহ্বারাগী মাঝেই জানেন, তখনকার পূর্ববাংলার এই ক্ষুদ্র

শহরটি সঙ্গীত-চর্চায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল। এখানেই জয়প্রহরণ কবনে ওজাদ্দ আলোউদ্দীন খাঁ-সাহেব, স্বর্গত: কামিনী কুমার ভট্টাচার্য, স্বর্গত: অজয় ভট্টাচার্য, স্বর্গত: সুহৃদাগর হিমালয় দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পী ও গীতিকার। বাংলা সঙ্গীতে সমগ্র ত্রিপুরা জেলার অবদানও কম নহে।

কামিনীবাবু ও ওজাদ্দ আলোউদ্দীন খাঁর নিকট পরেশ দেব ছই বৎসরকাল সঙ্গীত-সাধনার সুযোগ পান। পরে ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় এসে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী জ্ঞান দত্ত, বাণীকণ্ঠ ও অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সুরশিল্পী শৈলেন দত্তজ্যেষ্ঠের কাছ তিনি নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই সময় মেগাফোন কোম্পানী তাঁর 'ভাঙ্গা ঘরে চাদের আলো' গানখানি রেকর্ড করে এবং কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রেও তিনি গান গাইবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পরেশবাবু মেগাফোনে সঙ্গীত-শিক্ষকের কাজ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালে কালী ফিল্মের একখানি ছবিতে তিনি 'প্রেমব্যাক' গান করেন। ভায়দেব চট্টোপাধ্যায় উক্ত ছবিখানির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন।

১৯৪০ সালের পর তিনি ঢাকা বেতারে যোগদান করে নিয়মিত পল্লীগীতি, ভজন ও ঝুমুর গানের প্রচার করেন। সঙ্গীতের সুর চণ্ড পল্লীগীতিতে রাগ-প্রধানের সম্বন্ধে পরেশ দেব শটান দেব বর্ণণেরই অম্বুসত্তী। তাঁহার 'ভ্রমরা যাওরে মধুবনে মধু নাই', 'ওরে শ্রামের বিহনে মধু-বুন্দাবনে গোঠের খেদু নাহি তৃণ খায়', 'কৌন রক্সীলা নাইয়া ডিঙ্গা বাইয়া যাওরে' প্রভৃতি গানগুলি শুনে শটানদেবের বিখ্যাত গানগুলি মনে পড়ে। ১৯৪০ সালে 'রাজকুমারের নির্দাসন' ছবির প্রেক্ষাগৃহে গাইবার জন্তে সঙ্গীত-পরিচালক শটানদেব বর্ণণ পরেশ বাবুকে মনোনীত করেন।

মেগাফোনে কাজ করার সময় নজরুল ইসলাম পরেশবাবুর পল্লীগীতির প্রতি অম্বুরাগে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে গাইবার জন্তে গানও লিখে দেন। ১৯৩৯ সালে স্বর্গত ইস্ত্রিসারিও হরেন্দ্র খোবের 'সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে তাঁর ইউরোপ যাত্রার কথা হয়। কিন্তু যুদ্ধাজন্তে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪৭ সাল হ'তে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা কোম্পানীর সঙ্গীত-শিক্ষক (ট্রেনার) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে কয়েক বৎসর মেদিনীপুরের বাসজীপুর টেটের টেট-মিউজিশিয়ান ছিলেন।

পরেশ দেব বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনে যোগদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর অভিনন্দন লাভ করেছেন। ১৯৪৭ সালে তিনি তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলনের বিভাগীয় বিচারক পদে নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। 'এটালি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' সঙ্গীতের একটি বিভাগের পরিচালনা-ভারও পড়ে পরেশ বাবুর উপর। রাজভবনে সোভিয়েট অতিথিবৃন্দের সম্বর্ধনা উপলক্ষে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে তিনিও আমন্ত্রণ লাভ করেন। পরেশবাবু কয়েকখানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সঙ্গীত-সাধনার পরেশবাবু জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বর্তমান বৈধে থাকবেন, সঙ্গীতের সাধনাই করে যাবেন।

I do not consider myself a good painter at all.
I am a genius.

—Salvador Dali



এ দেশের অলঙ্কার-শিল্প

বাংলা তথা ভারতে গহনা বা অলঙ্কারের প্রচলন চলে আসছে অপর্যায়িত কাল থেকে। আজকের দিনে সেটা অল্প বহু গুণ বেড়েছে, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য। বাঙালী সাধারণ ভাবে রূপ ও সৌন্দর্যের পূজারী—তাই নারীদের যে-দরপেরই হোক, অল্প-বিস্তর অলঙ্কার তাই চাই।

এ কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নয়—বাংলার অলঙ্কার-শিল্প বাংলার একটি পরম ঐতিহ্য। সমগ্র ভারতে তো বটেই, বর্তমানেরও এর সুনাম ও খ্যাতি ছুড়িয়ে আছে। বাঙালী স্বর্ণশিল্পী ও মণিকারগণ যেমন সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাজ করতে সক্ষম, অক্লান্ত তেমনটি আজও বিবস।

গহনাশিল্পে বাংলা যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, তা একদিনে হয় নি, সহজেই অসম্ভব কঠোর। এর পিছনে এদেশের স্বর্ণ-বণিক সমাজের অবদান রয়েছে অপরিমিত। গোড়া থেকেই এ তাঁদের ক্ষাতীয় ব্যবসা ছিল—এখনও এই উন্নত শ্রেণীর ব্যবসা বা শিল্পে তাঁরাই রয়েছেন অধিক সংখ্যায়। আজকাল অল্প সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোকও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং শিল্পের মান ও ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এটি লক্ষ্য করবার।

প্রথমাবস্থায় গ্রামে-ঘরে সাধারণ বণিক বা শ্রমিকের হাতে ছিল এই শিল্পের মানদণ্ড। সামান্য মূল্যবস্তুর উপর নির্ভর করে সেদিন তাদের কাজ-কারবার চলতো। যারা গহনা তৈরী করতেন, প্রয়োজনীয় সোনা বা রূপো সরবরাহ করতেন তাঁরাই। শিল্পী মনোমত গহনা তৈরী করে দিয়ে হাতে তুলে নিতেন শুধু তাঁর প্রাপ্য সামান্য মজুরী বা বাণী।

সহস্রাব্দে গড়ে উঠে থাকলে সেখানেও এই ব্যবসা চালু হয়ে চলে ক্রমিক ধারায়। রকমারী অলঙ্কারের চাহিদা যুগে যুগ বৃদ্ধি হয়ে চলে দেশের সর্বত্র। শুভ বিবাহ কিংবা অপর কোন মঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যৌতুক দানের প্রদত্ত উত্তরেই গহনার কথা বড় হয়ে দেখা দিতে থাকে। বিগত দশাব্দীতেও দেখা গেছে—রূপোর গহনা বা অলঙ্কারের সমাহারই বেশি—এমন কি, ধনিক ও মধ্যস্তর লোকের গৃহেও ছিল এরই সমধিক প্রচলন। ক্রমে সেই কটির রূপান্তর ঘটতে দেখা গেলো—তখন থেকেই রূপোর চেয়ে সোনার গহনার চাহিদা বেড়ে যায়।

গ্রামের পরিবেশে যে শিল্প এক কালে আবদ্ধ ছিল, সহরের বৃহত্তর আওতায় এসে উহা উন্নতির প্রচুর সুযোগ পায়। অলঙ্কারের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে, দেখা যায় যে-সাংস্কৃতিক ধরণের ব্যবসা-কাঠামোতে এ আর চল না। মাল যত্ন করে

রাখবার প্রয়োজন দেখা দেয় এইভাবে আর সেটি সম্ভবপর করে তোলাবার জন্য মূলধন বিনিয়োগ অপরিস্রাব্য হয়ে ওঠে। বিস্তারিত পোন্ধরগুণ প্রচুর অর্থ নিয়ে এদিকে এদিয়ে আসতে থাকেন। তাঁদের নিরলস উত্তম ও ব্যবসা-প্রীতি—শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের ফলেই আজ এটি এক বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে।

অলঙ্কার শিল্পে বাংলার ভেতর রাজধানী কলকাতার স্থান সকলের শীর্ষে, এ কারও অজানা নয়। গ্রামে ও ছোট সহরে এখনও কুশলী শিল্পী বা পেশাদার শ্রমিকরাগণ সোনা-রূপোর কাজ-কারবার করছেন বটে, কিন্তু নতুন নতুন নমুনা বা ডিজাইনের জন্য কলকাতার দিকে তাঁদের দৃষ্টি না রাখলে চলে না। দেশ-বিভাগের আগে ঢাকাতেও (বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী) এই শিল্পের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। সে অঞ্চলের অলঙ্কার-শিল্পী ও স্বর্ণকারগণ একটা বৈশিষ্ট্যের দাবী রেখে এসেছেন বরাবর।

কলকাতার বাজারে আজ স্বর্ণলঙ্কারের দোকান বা ব্যবসা-কেন্দ্রের অভাব নেই। নগরীর সর্বত্র—এমনকি, অকতি গলিতে—এই শিল্পসত্তা ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় অবশ্য বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রীট বা পূর্বতন বহুবাজার স্ট্রীটে। তাৎপর্যই বোধ হয় রাসবিহারী এডিনিউ—গড়িয়াহাটা, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর-কালীঘাট প্রভৃতি এলাকার নাম করা যায়। যতদূর খবর নেওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, কলকাতা ও হাওড়াতেই বড় রাস্তায় শো-কেস সাজিয়ে কাজ-কারবার চলছে, এমন দোকানের সংখ্যা দুই হাজারের কম হবে না। অপর দিকে হাজার হাজার লোক এই সকল দোকানে কর্ম-নিযুক্ত রয়েছেন, এ সহজেই অসম্ভব।

পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও কিন্তু এত অধিক সংখ্যক গহনার দোকান মহানগরী ও সহরতলী অঞ্চলে ছিল না। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা এলাকার অত্যধিক লোকবৃদ্ধি হয় আর জুয়েলারী ফার্মে সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়ে চলে ধাপে ধাপে। বহু স্বর্ণকার তথা সূক্ষ্ম শিল্পী ও কারিগর পূর্ববঙ্গ থেকে এদিকে চলে এসেছেন এক ছোট বড় দোকান খুলে তাঁরা বসেছেন নানা ধারণায়। আধুনিক গহনাপদ্ধতি বহু ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর চোখে পড়ে।

আর একটি জিনিস এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার যে, পূর্বে এই মহানগরীতে এই শিল্প বা ব্যবসার রূপ এখনকার চেয়ে পৃথক ধরণের ছিল। একটু আগেই বলা হলো—তখন দোকানের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। আজকের দিনে কলকাতার এমন কোন রাজপথ প্রায় পাওয়া যাবে না, যেখানে দুই চারটি জুয়েলারী দপ

নেই। কত সহস্র স্যাকার ও স্বর্ণকারের দোকান (খোঁকেস বিলীন) রয়েছে নগরীর অলিতে গলিতে—মহানার মহানাদ। বিগত দিনগুলোতে স্বর্ণশিল্পের বাজারে তেজারতী বা বর্ষকী, কাজ-কারবারই ছিল বেশি। আর সেই সঙ্গে অবশ্য নিয়মিত ব্যবস্থায় চলতো সোনা-রূপোর বোকা-কেনার কাজ। গহনাপত্র অর্ডার পেয়ে তবেই সরবরাহ করার রীতি ছিল সেদিনে জনৈকটা চলতি। তখনকার দিনে আজকার মতো দোকান-পাট এমন সজ্জিত ছিল না—জুয়েলারী কার্খা সমূহে শো-কেশের প্রচলন আরম্ভেই বলা যায়। এখন বেশিরভাগ দোকানেই তৈরী (রেডি-মেড) জিনিষ বিক্রি হয়—গহনার অসংখ্য নমুনা শো-কেসে সব সময় মজুত থাকে। ক্রেতাদের পক্ষে অর্ডার দিয়ে পছন্দসই জিনিষ পেতে আগের চেয়ে সুবিধা এখন বেড়েছে বই কমেনি।

এ দেশের গহনা ও গহনা-শিল্প আজ সত্যি বিশেষ গর্বের ব্যাপার। অতীত দিনের তুলনায় এ এগিয়ে গেছে সকল দিক থেকেই, বলতে বিধা নেই। শিল্প-কাজ এখন অনেক শৃঙ্খল ও বিতৃষ্ণতায় পরিণত হয়েছে—নিত্য নতুন নক্সা ও ডিজাইনের সর্বত্র ছড়াছড়ি।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গহনা যারা পরবে, সেই নারী সমাজের কৃতিও বেশী পালাটিয়েছে, তা নয়। আগেকার দিনের মেরেদের পছন্দ ছিল ভারী অলঙ্কারের ওপর; নক্সা বা ডিজাইন নিয়ে এতটা মারামারি ছিল না এখনকার মতো। এ যুগে মেরেরা গহনা কিনতে এসে সাধারণতঃ হালকা জিনিষেই সন্তুষ্ট হন, শুধু তাঁরা দেখেন কাজটি শৃঙ্খল কি না। এখনও সাবিক ধারণের ঝুমকো পাশা, চিক, তাগা (অনন্ত), বালা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় বটে, তবে পূর্বকার তুলনায় নিশ্চয়ই হালকা ওজনের। অর্থনৈতিক কারণ এর পিছনে বিশেষভাবে রয়েছে, সে-ও অবশ্য অস্বীকার করা যায় না।

শৃঙ্খলবাহী মণিকার ও স্বর্ণশিল্পীদের প্রযুক্তি ও উদ্ভমে অলঙ্কার-শিল্প ক্রমেই উন্নতির দিকে বাবে। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতা বতই বাড়বে, এ শিল্পের অগ্রগতির পথও হবে তত প্রশস্ত। বৌদ্ধের প্রদত্ত বাস দিলে, বিপদের দিনের সবল হিসাবেই বহুক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে সোনার গহনা কেনা হয়। কিছুদিন হয় সরকার এই শিল্পের ওপর বিক্রয় কর ধার্য্য করেছেন। এই কর ব্যবস্থা এমনি করা হয়েছে যে, গ্রাহক বা খরিদাদের নিজের সোনার গহনা তৈরীর বেলাতেও উহা প্রযুক্ত হয়। বিক্রয় করের প্রকৃতি নিয়ে তাই একটা অসন্তোষ রয়েছে, সেই থেকেই। যা হোক, বালায় অলঙ্কার-শিল্প নিজের স্থান ও ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে চলুক, সকলেই এই দাবী রাখতে পারে।

মধুর ব্যবসা ও পশ্চিম-বঙ্গ

কি নামে, কি কাজে, সকল দিক থেকেই মধু সত্যি মধুর। এর স্বাদ ও মিষ্টত্বের যেমন তুলনা হয় না, তেমনি এর উপকারিতাও অপরিমিত। মাতৃগর্ভ থেকে ভ্রূমিষ্ট হওয়ার পর, শিশুর মুখে মধু দেওয়ার রীতি বহুদিনকার। বার্ষিকের দিনগুলোতেও মাতৃহৃৎ ক্রম ভক্তি যোগায় না এই মধু। পূজা-পার্বণে বা উৎসব-অনুষ্ঠানে মধুর প্রয়োজন হয়, এ-ও একটি চিরাচরিত রীতি। অনেক যোগের

ক্ষেত্রেই এইটি মূল্যবান ঔষধের কাজ করে থাকে। সর্বোপরি এ যতই সহজসাধ্য, ততই বৃষ্টিপূহিক।

বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ একটি ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। এখানকার বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর মধুর চাহিদা নিতান্ত কম হবার কথা নয়। সে দিক থেকে মধুক কেন্দ্র করে আধুনিক ধারায় সুন্দর ব্যবসা বা শিল্প গড়ে উঠতে পারে এই দেশে। এর ক্ষেত্রে একদিকে চাই কতকগুলি উত্তমশীল ও ব্যবসা-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ, অপর দিকে যথাসম্ভব সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা।

ব্যবসার কথা উঠলেই, মধুর উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সেইটির উপর লক্ষ্য রাখা দরকার আগেভাগে। ভোজ্যাহীন ভালা জিনিষ বাজারে সরবরাহ করতে পারলে, কাটতি সম্পর্কে ভাবতে যাওয়া (অন্ততঃ মধুর বিষয়ে) নিশ্চয়োজন। রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) সরকারের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে মধু সংগৃহীত হয়, তার একটা স্থায়ী বাজার নিশ্চয়ই রয়েছে।

মধুর উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে বিজ্ঞান-সম্মত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা সব সময়েই সমীচীন হবে। মধু আহরণের পুরানো রীতি প্রয়োজন হলে পরিহার করা ছাড়া উপায় নেই। অনেক সময় পরীক্ষার দেখা যায়, মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হলেও, সে মধু নির্ভরযোগ্য হয় না। এর কারণ, অবৈজ্ঞানিক সংগ্রহ-পদ্ধতি—যাতে করে মৌচাকের কত লো দূষিত পদার্থ হয়তো মধুতে মিশে যায়। সুতরাং মৌমাছি পালন থেকে মৌ বা মধু আহরণ অবধি সবটা কাজই হওয়া দরকার বিতৃষ্ণভাবে আর নিতান্ত মনঃসহকারে।

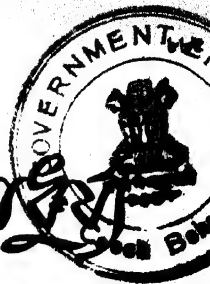
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগের নির্দ্বিধিত পারমিট নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে মধু সংগৃহীত হচ্ছে, প্রসঙ্গতঃ তার একটি হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ১৯৫৭-৫৮ সালে যে মধু সংগৃহীত হয়, উহার পরিমাণ ছিল ৩,৬০.১ মণ। ১৯৫৮-৫৯ সালে অর্থাৎ বিগত বর্ষে ২,৬৮.১ মণ মধু সংগৃহীত হয়েছিল এক আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হয়েছে ৩,৬০.০ মণ। সরকার এই (মধু) খাতে বেশ কিছু টাকা রাজস্ব স্বরূপ পেয়ে থাকেন, আর সেটি প্রতি বছরই।

অনুসন্ধানে জানা গেছে—পশ্চিমবঙ্গের বিপুল চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে এখনও মধু আমদানীর প্রয়োজন হয়। আমদানীকৃত মধুর বেশিটাই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ও সিংহলদেশের। যেখান একটু চেষ্টা থাকলেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া যায়, সেখানে বাইরে থেকে আমদানী করতে যাওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়, এ 'সমস্ত-সকল' রাজ্যের বহু পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতে পারে এই থেকেই।

মধুর ব্যবসার কথা বলতে গেলে উহার সঙ্গে জড়িত আর একটি জিনিষের কথাও বলার প্রয়োজন হয়। মৌচাকে যে মোম পাওয়া যায়, সেইটি কেন্দ্র করেও ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য হতে পারে। মোম থেকে বহু রক্তমারী প্রসাধন সামগ্রী তৈরী হয়—বাজারে যার বেশ চাহিদা ও দাম রয়েছে। যদি দেখা গেলে মোম তৈরী অপেক্ষা মোমজাত পণ্য উৎপাদন লাভজনক হবে, তা হলে সেদিকেই বৌক খাচা উচিত। মোটের উপর, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাইরে শুধু মধুই নয়, মধুর সজ্জিষ্ট মোমজাত দ্রব্যের রপ্তানীও কি উপায়ে বাড়ানো যায়, সেদিকে লক্ষ্য না রাখলে নয়।



জোদর্যে মাসিক



গিনি চান্স জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

এম.বি.সরকার এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৩১ ১৬৭/সি ১৬৭/সি/২ বহুতলার টাই কলিকতা-২ গ্রাম-পুশিয়াকৈর
 গ্রাফ-বালি গজ-২০৭/সি রাসবিহারী এডিনিউ কলিকতা-২ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
 মোকামের পুরাতন টিগায়া ১২৪, ১২৪/১, বহুতলার টাই, কলিকতা-২
 কেবলমাত্র গুণিয়ার খোলা থাকে
 ব্রাহ্ম-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮৭



আব্দুল আজিজ আল-আমান

সোলেমানপুর বালিকা-বিভাগীঠে দুটির কটা পড়লো।

চারটির ঘণ্টা। বাঁধাভাড়া বস্তার জলের মত খিলখিল হাসিতে মুখের হ'য়ে সুরকী-বাঁধানো লাল সড়কে নামলো ছাত্রীর দল। নীল আকাশে ডানা মেলে হাওয়ার উড়ে চলেছে। ক্রকের গোল বেড় ঘুরিয়ে, রঙিন ক্ষিতের বাঁধা বাড়ি ছোঁয়া কেশ ছুলিয়ে, রাস্তায় যেন মাতামাতি শুরু করেছে ছোট মেয়ের দল। তরুণীরা চলেছে বৌ ছুলিয়ে বুক বই চোপে মস্তুর পদক্ষেপে। কিছুক্ষণের মধ্যে কোলাহল জ্বিমিত হয়ে এল। সহরতলার জনবিরল সড়কে আবার নিশ্চলতা নেমে এল।

বিভাগীঠের পেট পেরিয়ে এবার পথে নামল দিদিমণিরা। হাতে বেঁটে ছাতা। কাঁধে ঝোলান রঙিন ব্যাগ। অনুস্রা, গৌরী, রাবেয়া—।

খানিকটা পথ এগিয়ে এসে অনুস্রা—গৌরী বাক ঘুরে বাড়ীর পথে মিলিয়ে গেল। নিকটেই বাসা। রাবেয়াকে আরো খানিকটা পথ যেতে হবে। লাল সড়ক বেয়ে বকুলতলা হয়ে জনপ্রিয় লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে খানিকটা এগুতে হবে। তারপর শেখ পাড়া। প্রায় মিনিট দশকের পথ।

মাথা থেকে ছাতাটা সরিয়ে একবার সূর্যটোর দিকে তাকাল রাবেয়া। রাস্তা সূর্য বটাগছটার আড়ালে হয়ে পড়েছে। তারপর আবার ছাতার মাথা ঢেকে মুহু তালে পা চালিয়ে দিল। শরীরটা অত্যন্ত রাস্তা মনে হচ্ছে। সারা দিনটা একটানা বকতে হয়েছে রাস্তা রাসে। কীকি সে দেয় না। দিতে পারে না। অন্তরে বটায় অঙ্ক করতে বলে দিয়ে দিবি বসে থাক। বার, কিন্তু না, কীকি দেয় না রাবেয়া। ছাত্রী মহলে তাই তো তার এত নাম। বটায় প্রথম থেকে শেখ পর্যন্ত এতটুকু বিক্রাম করে না সে। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সমগ্র প্রাণ-মন যেন ঢেলে দেয় রাবেয়া। অবাক হয়ে শোনে মেয়েরা। পাড়া ভনতে ভনতে তারাও ভাবে মনে মনে—তারাও যদি এমন করে পড়তে পারত।

বকুল তলায় এসে যেন মুক্তির নিশাস ফেলে রাবেয়া। ছাতাটা বন্ধ করে পাড়ায়। রোজ-ই পাড়ায় এখানে। কোন কোন দিন ভুলেবল বসে থাকে সবুজ ঘাসের উপর। আজও বসল। বৃহল হাওয়ার বকুলের মিষ্ট গন্ধ। ভরাট এক-বুক নিশাস টেনে নিল রাবেয়া। রাস্তা নেহটা যেন পদম শান্তিতে ভুবে গেল। সামনে

সবুজ ঘাসের উপর একটা চড়ুই বসে লালালাকি তই করেছে আশপ মনে। একটা কাঠবিড়ালী লেজ ফুলিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে দিকে। বড় ভাল লাগে রাবেয়ার। একটা ঢিল নিয়ে কোলা লেজে মারতে গিয়ে থেমে গেল। কি ফল হবে এই রোমাটিক দুশাটা নষ্ট করে? সেও মুহু বিস্ফারিত হুই চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। অনেক্ষণ।

হঠাৎ মনে হলো এক সাইকেল-আরোহী ব্রেক কসে নেমে পড়েছে রাস্তায়। মাঝে মাঝে এমন উপজব শুরু হয়। রুমহল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বড় ছেলে মুসা এমন আকস্মিক ভাবে এসে মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। সতর্ক হয়ে তাকায় রাবেয়া। না, মুসা নয়—আহসান। রবিউদ্দিন চাচার ছোট ছেলে। রাবেয়া শুধার কোথার বাচ্চিসের আহসান?

সাইকেলটা একহাতে ধরে আহসান জবাব দেয়, কুমুদমিষ্টান্ন ভাণ্ডারে—কিছু মিষ্ট আনতে। একটু থেমে বলে, জান আপা—আজ আড়াইটার মেলে আবিদ ভাই বাড়ী এসেছে।

আবেগে উজ্জ্বলে হঠাৎ যেন ফুল গুঠে রাবেয়া। এ্যা—আবিদ বাড়ী এসেছে, আবিদ! পান্টা শুধার, সতি?

মিষ্ট আনতে তো বাচ্চি সে জন্তে। সাইকেল চড়ে সড়ক বেয়ে দূর পথে মিলিয়ে যায় আহসান।

রাবেয়ার সারা দেহটা যেন কেঁপে ওঠে। হঠাৎ আলোর বলকানির মত খুশির আমেজে রাস্তা জড়িমা যেন ছিটকে পালিয়ে গেছে দেহ থেকে। হঠাৎ—হ্যাঁ একান্ত হঠাৎ-ই এক গুচ্ছ গুচ্ছ কেশকীর মত হালকা হয়ে গেছে দেহটা। বহু বছর পর কুমারী-জীবনের সেই প্রথম প্রেম-জ্ঞাপা প্রজাতের ছুনিবার শিহরণের মত অভিবব আবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে সারাট দেহের অনুপমরাশি। একি—এমন করে কাঁপছে কেন রাবেয়া? সুরীর্থ তিন বছর পর প্রেমের শাস্ত পরিবেশে ফিরেছে আবিদ। বলিষ্ঠ স্ত্রীময় যুবক। কমঠ, স্নুদ্র অভিমতে অচকল। কিন্তু তার জন্তে রাবেয়া কাঁপছে কেন এমন করে?

বকুলতলার সেই শান্তশীতল নির্জন ছায়াতলে সবুজ ঘাসের ওপর বসে চারিদিক সন্তর্পণে একবার দেখে নিল রাবেয়া; না—কেউ নেই কোথাও। তারপর ছুনিবার আবেগে লুটিয়ে পড়ল কোমল ঘাসের বুক। চোখ বন্ধ করে স্বপ্নের ঘোরে যেন বলে ফেললো,—তুমি—তুমি-ই এসেছ আবিদ!

উঃ সেই ছোট বেলা থেকে আর এই সেদিন পর্যন্ত কত হাসি, কত গল্প আর কত গান। একই পাড়ায় ঘর। একই সাথে ফুলে বাওয়া। একই সাথে খেলা, আর একই সাথে খাওয়া।

বিকেলের অলস বেলায় মা কাঁধা সেলাই করতে বসেছে রোয়াকে। হুটিতে কোথায় ছিল—হঠাৎ এসে হাজির। তারপর আর কি। হুজেনেই লুটিয়ে পড়লো কাঁধার ওপর, তারপর গড়াগড়ি। কাঁধা সেলাই করে আর সাধ্য কার? মা যদি কখনো বলতো—ওরে সুরী ফুটে বাবে—ওঠ, তাহলে গড়াগড়ির আরো জোর লাগতো হুজনার। শেষে সুরী ছেড়ে দিয়ে মা বলে উঠতো—মর তোরা কখনো।

খানিক চুপচাপ শুয়ে থেকে হুজনার কি ইশারা হয়ে যেত।

তারপর কাঁথা ছেড়ে ছুটে চলে যেত হুজুর্নাই। নতুন পরিকল্পনার তখন তারা উদ্ভাবন। বীর পদক্ষেপে অতি সতর্কতায় হুজুর্নাই এসে হাজির গালাব ধারে। হুজুর্নাই হাতেই ইট। আদিব আগো। পিছনে রাবেয়া। একটা কুকুর শুয়ে আছে গোলাব তলায়। খুব কাছে এসে থান ইট ছুটো সজোরে নিক্ষেপ করে একই সাথে চোঁচিয়ে ওঠে হুজুর্নাই—সুবগীর পিলে খাবে আর ?

কুকুরটা তখন লম্বা অর্ধনাদ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে ছুটে পালাচ্ছে।

পুকুরে মাতামাতির কথাগুলো আজো স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু থাক সে সব কথা। কলেজ-ভাবনের কথা যে আগে স্পষ্ট। একই স্থল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বারাসাত কলেজে ভর্তি হলো হুজুর্নাই। সোলেমানপুর থেকে মাত্র দুটি ট্রেন দূরে বারাসাত। কতদিন কলেজ কীকি দিয়ে ছুটিতে চলে এসে বাইরে বেড়িয়েছে এখানে ওখানে। গল্প করেছে কবির মত। নীল আকাশে ডানা মেলে কপোতকপোতীর মত হাওয়ার ভর করে ছুটিতে উড়ে গিয়েছে সূর্য দিগন্তের কোলে—যেখানে মিলেছে অসীম আকাশ আর সবুজ পৃথিবী, অসীম-সসীম যেখানে চুমোচুমি করেছে ব্যগ্র হয়ে, হয়ে পড়ে। ও, সে কত স্বপ্ন, কত সাধ!

বারাসাত কলেজ থেকেই এক সাথে বি. এ পাশ করলো হুজুর্নাই। তারপর আদিব চলে গেল কলকাতায়—এম-এ পড়তে, আর সোলেমানপুর বিজ্ঞাপীঠে শিক্ষারতীর পদ নিল রাবেয়া। তারপর থেকে এই তিন বছর; আদিব এম-এ পাশ করেছে সম্মানে। তারপর একটা ভাল চাকরিও পেয়েছে আজকাল।

ছাড়া ঢাকা বকুলতলার নির্জন প্রান্তে পলকে সবল কথা মনে পড়ে রাবেয়ার। কিন্তু এভাবে আর বসে থাকার সময় কতক্ষণ। হ্যাঁ, বাড়ী যাওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধ আকা হয়তো চায়ের জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠছেন এতক্ষণ। তা ছাড়া—একুনি গিয়ে একবার দেখা করে আসতে হবে। মনের উপলব্ধি শুধু যেন আনন্দ-বস্তার প্রবল জলকজ্জালে ডুবে গেছে। নতুন রং পেয়েছে দেহ-মন-প্রাণে। হ্যাঁ এখনি গিয়ে একবার দেখা করে আসতে হবে বৈকি! আদিব, আগো! স্বপ্নের আদিব!

রাবেয়া যখন বাসার কিবল তখন কমলা রংয়ের নরম বাদ বিকলের শান্ত আকাশ খিঁচি বিছিয়ে পাড়ছে। মাথার ওপর পাখী পাখীদের ডানার ঝাপটা শোনা যায়। কানে দেখা আলোর মনোরম পরিবেশে দলক কিছুই মনোরম হয়ে উঠেছে। রাবেয়ার চোখে আজ সব কিছুই স্বন্দর। অপূর্ণ মনে হয় পশুপাখীকে। কি হয়েছে আজ রাবেয়ার ?

হাত মুখ ধুয়ে ডেসি টেবিলের সামনে গিয়ে পাঁড়াল রাবেয়া। রংয়ের শাড়ীটা পালটে নিল। ইন্ডিরী করা বকরকে আকাশ-নীল শাড়ীটা সে পরে নিয়েছে। কোন বিশেষ উপলক্ষ না হলে সে পরে না এ শাড়ীটা। কিন্তু আজ হঠাৎ ট্রাক থেকে শাড়ীটা বের করে নিয়েছে। ভাল ব্রাউজটাও। শাড়ীর সাথে শোভন করে নিটোল লাবণ্য-নীল সজ্জিত জড়িয়ে নিয়েছে হ্যাঁ। অপূর্ণ লাগছে নিজেকে। আয়নার দিকে তাকিয়ে যিক হয়ে হেসে ফেলল আপন মনে। ইচ্ছে করেই। হ্যাঁ, গালে টাল পাড়ছে। ঝিকঝিক করে উঠছে পীতলো। হ্যাঁ, এমন মট করেই হাসতে হবে আজ। হ্যাঁ, ঠিক এখনি করেই।

কি করছে আদিব! হয়তো চা খেতে বসেছে—হয়তো গল্প জুড়েছে সকলের সাথে। রে-মাথা কোমল গণ্ডে পাউন্ডারের গন্ধটা, একবার বুলিয়ে নিল। হ্যাঁ ঠিক হয়ে ছ। রঙিন ব্যাগটাও নিল কাঁখে ঝুলিয়ে। তারপর খানিক ভেবে নিল আপন মনে। আবেল ভাবোল। তাইতো কি বলা বাবে গিয়ে? হ্যাঁ হয়েছে—বলবে, বেশ মিষ্টি হেসেই বলবে—স্থল থেকে কেবলবার পথেই তোমার আসার সংবাদ শেলুম আহসানের মুখে; বাড়ী না গিয়ে একেবারে সোজা চলে আসছি। তারপর মিষ্টি টোল-বাওয়া হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে কুশল সংবাদ বিজ্ঞাপনা করবে, কেমন আছ আদিব ভাই?

শেষবারের মত আয়নার মুখটা দেখে পা তোলে রাবেয়া। ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে রিটার্ডার্ড বুদ্ধ আকার গলা ভেসে আসে, একটু চা তৈরি করে দেমা রাবু।

দরজার কাছে এসে থমকে পাঁড়ায় রাবেয়া। সব আশা সব আনন্দ যেন অকস্মাৎ উবে গেছে। তাইতো এই ভাবে সেজেগুজে যাওয়াটা কি তার শোভন হবে? কি হবে গিয়ে! কত কাজ বাকী পাড়ে রয়েছে সংসারে। সন্ধ্যা হয়ে এল বলে। পাখীপাখালীরা বাসার কোরা শুরু করেছে। ডানার ঝাপটা শোনা যাচ্ছে। পাশের বাঁকা বনটা নীড়কেরা পাখীদের কাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে। আকাই বা কি বলবেন দেখে।

অভিষারের নিখুঁত বেশে দরজার কাছে শুক হয়ে পাড়িয়ে রইলো রাবেয়া। নির্বাণ, নিশ্চল।

অকস্মাৎ ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বেডের উপর। শাড়ীটা



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
‘শ্রী ডি. এন্ড সন্স’

মার্ক গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিটেল ভিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৫-২২২৫

পাণ্টে নিল। ব্লাউজটাও ডাঁজ ভাঙা শাড়ী ব্লাউজ পড়ে বইলো অবিশ্রান্ত হয়ে। কি হবে গিয়ে? একটু দেখা—না, দরকার নেই। ভুলেই কেঁদে উঠতে চাইছে। নিজের, নিশ্চয় গৃহ কোণে দাঁড়িয়ে আজ স্পষ্ট অনুভব করে বাবেয়া, মনের উপলে শুক বালুস্তর তৈরি করে হৃদয়বোধে লবণাক্ত জলোচ্ছ্বাস বার হয়ে আসতে চাইছে। অবশ্য স্নানন্ত দেহে অবিশ্রান্ত শাড়ীর ওপর লুটিয়ে পড়লো বাবেয়া।

পাশের ঘর থেকে বুদ্ধ আবার আবার বলে উঠেন,—রাবু, একটু চা তৈরি কর মা।

বাস্তব হয়ে উঠে পড়লো বাবেয়া। বললে, গ্যা হাট। কথাটা কেমন বেন ভাঙা ভাঙা শোনাল।

পাশের বাড়ীর ছাত্রীটিকে পড়িয়ে যখন বাসায় ফিরলো বাবেয়া, তখন রাত নটা। ফিরতেই আঁকা বললেন, আবিদ এসেছিলো রাবু—এই মাত্র চলে গেলো। বেশ ছেলেরা—অনেকদুশ ঘরে কত গল্পই করলো। কাল একবার দেখা করে আসিস মা। একটা সমিতি নাকি গঠন করতে চায়—তোব সাথে অনেক কথা আছে।

অবাক চোখমেলে কথাগুলো শুনলো বাবেয়া। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। খুশীতে ডগমগ। আবিদ এসেছিলো তা'লে? এ্যা আবিদ!

দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই বেন চমকে ওঠে বাবেয়া। আয়নার বাঁধানো তার ফটাটা টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। ইস—ফটাটা যদি আজ আঁকার ঘরে থাকতো! এক অক্ষুট কান্তর ধ্বনি বয়ে ওঠে। বাবেয়া। বেন অপূর্ণ দোনালী স্বপ্ন অবস্থায় যা খেয়ে টুকরে টুকরে হয়ে ভেঙে গেল।

গ্যা, কাল সকালেই ফটাটা আঁকার ঘরে টাঙিয়ে দিতে হবে। আবিদ এসে যে ওঘরই বসে।

দোহমানপুর বালিকা বিজ্ঞাপীঠ থেকে ফেরার পথে সেদিনও আহসানের সাথে যে দেখা হল বাবেয়ার। ঠিক বকুল তলাতেই। আহসানের মুখে স্তনলো আবিদের ফিরে যাওয়ার সবাদ। অফিসের হড় সাহেব নাকি একটা জরুরী কাজের জন্ত টেলিগ্রাফ করেছে। আজ দুপুরেই এসেছে টেলিগ্রামটা। ভোর পাঁচটার মেলে চলে যাবে কলকাতায়।

বকুলের ডালপালা ছলিয়ে মিষ্টি হাওয়া বইছে। ঝিরঝিরে পাতাগুলো মাতালের মত ছলছে। একটা হলুদ রঙের পাখী মাথার উপর ডালটায় বসে গান ধরেছে আপন মনে। বাবেয়া একটু তাকালে ওদিকে—তারপর বসে বইল নিশ্চয় হয়ে।

স্নানন্ত বিকালের আকাশ ঘিরে পোঁজা তুলার মত রাশ রাশ মেঘ জমে উঠেছে। চোখের জর মত দীঘল জানা মেলে নায়না জানা কয়েকটা পাখী উড় চলেছে মেঘের দেশে। বকুলের ঘন-সন্নিবিষ্ট পত্রপল্লব তৈরি করে একগুচ্ছ ফলকের মত ঠিক সামনের সবুজ বাধের বুক লুটিয়ে পড়েছে অবশ্য সূর্যের আলো-মাখা রোদ। না, এমন কিছুই ভাল লাগে না বাবেয়ার। সকল নীরবতার মাঝে সকল চিন্তার মাঝে সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ে, আজ ভোরে চলে যাবে আবিদ? দেখা হবেনা শেষবারের মত? মাত্র একটিবার? একটি ললক?

বাড়ী যখন ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আঁকারে চা দিয়ে একদালি বারান্দায় ইজিচেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিল

বাবেয়া। তখনও ঠিক ঐ চিন্তাই তার মনের অলিতে গলিতে ঝিরছে। রূপ সন্দের এই পৃথিবীর সাল কিছুই বেন একান্ত বিষয় হয়ে উঠেছে। দক্ষিণের হিমেল ব'তাসটা বাবেয়ার হৃদ-ভেজা দেহটাকে শীতল করে থাকে। হঠাৎ এক সময় বেন একটু আশার আলো দেখতে পেলো বাবেয়া। না—যাওয়ার আগে একবার আসবে বৈকি আবিদ। সেতো জানে মেয়েদের অনেক বাধা আছে। যাওয়া হয়ে ওঠে না ইচ্ছামত। তা ছাড়া সে যে আজ ভোরেই চলে যাবে, এ সংবদটুকু বাবেয়া নাও জানতে পারে। অন্ততঃ এটা খেয়াল করে আবিদের একবার আসা উচিত। গ্যা—আজ রাতেই আসবে আবিদ, নিশ্চয় আসবে।

ঘরের ভিতরটা বেশ আঁধার আঁধার মনে হচ্ছে। আলোটা আলিয়ে নিল বাবেয়া। আঁকার ঘরের আলোটাও আলিয়ে দিল। ছড়িটা নিয়ে আঁকা বেড়তে গেছেন—এখনই ফিরবেন। তারপর টুকিটাকি সাংসারিক ছ'একটা কাজ শেষে নিয়ে কাপড়চোপড় পাণ্টে নতুন সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত হয়ে উঠল বাবেয়া। হঠাৎ কখন এসে পড়বে আবিদ কে জানে। আকাশ-নীল ধংর সেই কাপড়, সেই ব্লাউজটাই পরে নিল। তারপর অশ্রুমনস্তার ভাণ করে বারান্দায় সেই ইজি চেয়ারটার বসে বাকুলভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সময় গড়িয়ে চলে। ঘড়ির কাঁটাও। রাত গভীর হয়।

ঘরের আশপাশ হতে রাতভাণা পোকামাকড়ের গীতালীর ধ্বনি ভেসে আসে। পত্রপল্লবে আছাড় খেয়ে মগ্নিত হয়ে ওঠে উদাসী সমীর। চাঁদের আলোয় চিকচিক করে ওঠে কলাগাছের মাঙ্গপাতা। ক্রমে ক্রমে নিশ্চয় হয়ে ওঠে ছায়া-ঢাকা পল্লীর কলমুখর গৃহ-প্রাঙ্গণ। এই একান্ত নিশ্চয়তার মধ্যে বসে মাকেমারে সচকিত হয়ে ওঠে বাবেয়া, আবিদ—আবিদ কই? এখানে কি আসবার সময় হলো না? সেই আগের মত চুপসিঁড়ে নিশ্চয় পদক্ষেপে এসে পিছন হতে চোখ ধরবে নাকি আজ। সামান্য শব্দই বাস্তবের আগমন সংকেতে গহন বনান্তরালগামী হঠাৎ থামা হরিণীর মত উৎকর্ষ হয়ে ওঠে বাবেয়া। না—আবিদ নয়, বাতাস।

থায়-দাঁড়ায় পাট চুকিয়ে ও বারান্দায় অপেক্ষা করে। আঁকা ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত কত? আলোটা জোর করে সুগোল হাতটা তুলে সময় দেখে নিল বাবেয়া। একটু চমকে উঠেই টেনে টেনে উচ্চারণ করলো, বারো—ওটা। এত রাত হয়ে গেছে।

হৃদয় অভিমানে বুকটা ফুলে ওঠে বাবেয়ার। অভিমান-বিফারিত কণ্ঠে বলে, নিইর—একবার এলে না। একটিবার আগার সময় হলো না তোমার!

বেন পাগল হয়ে ওঠে বাবেয়া। সমগ্র দেহমন হৃদয় অভিমানে দোল খায়। বাইশটা বসন্ত অতিক্রান্ত বাবেয়ার জীবনে এমন দেহমন যাতন পাগল করা আবেগ-ব্যাকুল মুহূর্ত খুব কমই এসেছে। না—যেহা একবার করতেই হবে। সুগ-সুগাতনের বন্দীশালা হতে আদিশ নারায় বেন ছনিবার ব্যাকুলভায় মাথা গাড়া দিয়ে উঠেছে।

রাতের ঘন কানো আবহণ ভেদ করে সন্তর্পণে পথে নামল বাবেয়া। মাথার উপর এক আকাশ তারা। মিটে মিটে করে অলছে। একাদশীর চাঁদ তখন নিম্ন পাছটার ওপাশে হয়ে পড়েছে।

দোহমানপুরের অলিগলি সব বাবেয়ার নখ-কর্পণে। একান্ত

জামা-চেনা পথেই সে আজ দ্রুত অভিমান-সুন্দর অভিনয়িকা। ওয়েল পেশের কলমবাগানের ধারে এসে একটু থমকে দাঁড়ায় রাবেয়া। চারদিকটা দেখে মিল ভাল করে। না—কেউ নেই কোথাও। জনবিরল পল্লীপথ গভীর নিশীথে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। রাতজাগা পাখী-পাখালীর ডানার বাশটায় মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে ওঠে নিজের পখ-বাট। দূর গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসে দীর্ঘ লয়ে।

আবিসের বাড়ীর কাছাকাছি এসে বুকভরা অভিমান যেন থরে গেল রাবেয়ার দেহ থেকে। নব আবাড়ের সজল মেঘমালার নীচের শুভ্র কেশতী ফুলের মত নব বধূ অপরিসীম লজ্জার কৈশে কৈশে ওঠে সেহটা। বিরাট বাড়ীটার দিকে বিক্ষারিত দৃষ্টি মেলে তাকাল একবার। হ্যাঁ—ঐতো আলো জ্বলছে। আবিসের ঘরেই। কি করছে এত রাত জেগে? হয়তো ঘুমিয়ে গেছে ক্লান্ত দেহে, ফুলে গেছে আলো নেভাতে।

জানাসার রড ধরে শঙ্কিত মুখে সম্বর্ণণে একবার উঁকি মিল রাবেয়া। একি, এখানে লিখছে আবিস! টেবিলে হারিকেন জ্বলছে। নত হয়ে একমনে লিখে চলেছে লাবণ্যদীপ্ত যলিষ্ঠ যুগল। কি লিখছে এত? গল্প? উপস্থাপন? চিঠি?

রাস্ব্যার বলতে ইচ্ছা করে,—ওগো পাখাংস্বয়—আমি এসছি। যুগযুগান্তর ধরে আমি যে তোমার প্রতীক্ষা করছি।

আবাড়ের সজল মেঘমালার আমি তোমারই ছায়া দেখছি। শরতের সোনাপলা বিকলে আমি তোমারই ধ্যান করছি।

বসন্তের ভোরে সুরভী সমীরণে কোকিলের কণ্ঠে আমি যে তোমারই কণ্ঠ শুনেছি। ওগো পাখাং, ওগো দেবতা—।

অকস্মাৎ শিঠি যেন চাবুক পড়ে রাবেয়ার। একি করেছে সে? একি পাগলামি তার? কেউ যদি দেখে ফেলে। অপরের কথা দূরে থাক, আবিস-ই বা কি মনে করবে তাকে দেখে? এই নিজের গভীর রাত? এই অবস্থায়?

জানালার ধার থেকে সরে এসে পথে নামল রাবেয়া। ঘান যার ভাঙলো না—কি হবে তার ঘান ভাঙিয়ে? দ্রবন্ত অভিমনে আবার বিক্ষারিত হয়ে ওঠে রাবেয়ার বুক। কান্নার কণ্ঠ যেন অবশ্ব হয়ে গেছে। দ্রুতবেগে সড়ক বেয়ে, আরাগান শেড়ির ঘরে এসে পৌছাল রাবেয়া। দরজার খিল দিয়ে বিছানার লুটিরে হৃদয় কান্নায় ভেঙে পড়লো। ওগো পাখাং তুমি লুখে থাক। কি হবে তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে? বিশাল হৃদয়ের নিরাশ্রয় আলয়ে একটু স্থান চেয়ে কি হবে? হয়তো দেবে না। হয়তো প্রত্যাখ্যান করবে। তার থেকে আমার এই ভালো। কৈদে কৈদে কাটুক সায়টা জীবন। নর্মভেলী চোখের জল সায়নার উল হয়ে থাক। কপালের গভীর নিশীথে হঠাৎ জেগে আমি চোখের জলেই সংস্কার পাব। ওগো আমার সেই ভাল—ওগো পাখাং, ওগো—।

হুনিংর অভিমনে এবার অক্ষুট কণ্ঠে কুকুরের কৈদে উঠলো রাবেয়া। এ কান্নার শেষ নাই।

একদম্পীর চাপ তখন ডুবে গিয়েছে।

বহুরূপী

তরলতা ঘোষ

মহাকাল-জলধির একটি বৃন্দ যেন চেতনার চকিত ঝলক—

মুক্তিকার রসমঞ্চে গুরই মাঝে কত অভিনয়। একটি পলক

মাত্র বুদ্ধি আয়ু তার অনন্তের কালের বিচারে।

তারই মাঝে দেখে যেতে হবে ঘটনার পারস্পর্কে, সত্যেরে মিছারে।

অক্ষয়ের, অজ্ঞানের, অর্থহীন ক্রন্দনের আর্থ আবেদনে

বতটুকু দাবী ছিল, বিন্দুটি কুহেলি ঘেরা কামনায় প্রথম বাগনে,

বহুভণে-বহুরূপে মূল্য তার হোয়ে গেছে পাওয়া,

এখন জীবন যপ্নে তারই রোমহন, তারই গান গাওয়া,

সেই শুধু একবার ধরণীর ধূলি চুমি স্বর্গ নেমেছিল,

কুটীরের দ্বারপ্রান্তে অনাহৃত দেবতার সমুদ্রত রথ খেমেছিল।

অবকল গন্ধ সম তখনও তো চেতনার সুস্বপ্ন বিকাশ,

তারপর ঘটনার গতিপথে কতই রংর খেলা, কত বেশবাস।

নূতন ছন্দে তালে জাঁকা-বাক, উঁচু-নীচ, সমস্তল ভূমি,

বাত্রীর কঠোর করে, মন্থন-শিচ্ছিল কত পলতল চুমি।

লুজ্জগত বৃন্দের ক্ষণিক জীবনে যত অনিশ্চিত রংর বাহার,

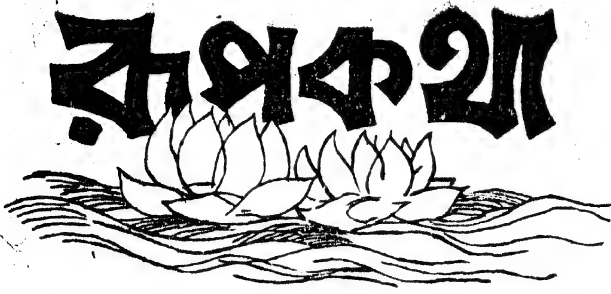
অহংকারে কাপে তত। আমিদের বোকাটুকু অবশেষ সবল তাহার।

তবে একি অর্থহীন, জীবনের ঘটনায় বিচিত্র রংর ফুলে মালা গেঁথে যাওয়া,

রসমঞ্চে নাটকের এত অভিনয়, এত হাসি, এত অজ্ঞ, এত গান গাওয়া?

সে বিচারে কিবা কাজ? বহুরূপী চেতনায় যত পার রং কর লুট,

যেদিন হবার হবে সকলি ফ্যাকাশে, ফেটে যাওয়া বৃন্দের সব মন ছুট।



Zola র The Fairy amoereuse গল্পের স্বচছন্দ অনুবাদ

শ্রীমতী তুমার স স্থান।

এমন বাসল-ঝর-ঝর সন্ধ্যা আগে কখনও দেখেছি তুলা ?
বাইরে জানালার শাখিতে আছড়ে পড়া বৃষ্টিবিন্দুর একঘেয়ে আওয়াজ
আর বাধন-ছেঁড়া বাতাসের দুঃস্বপ্ন দাপাদাপি ; এমন দুঃস্বপ্নের
সন্ধ্যায়ই দিগ-বৃক্ষের অন্তরে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অশ্রুধারা উজ্জ্বলিত
হয়ে উঠে ধিক্কির বৃক ভাসিয়ে দেয়, আর মানুষকে প্রিয়সঙ্গ-কামনার
আকুল করে তোলে।

আজকের এ সন্ধ্যার রূপ কি, তা জানো ? জানো না,
তোমার জানার কথাও নয়, তোমার মাথার উপরে একটা আচ্ছাদন
আছে কিনা ? খোলা জানালা দিয়ে একবার তাকাও ঐ অন্ধরের
বড় বাড়িটির পানে ; চেয়ে দেখো ঐ তোরণ-দুয়ার ! কনকনে
ঠাণ্ডার বাসের হাতে-পায় খিল ধরে, তারা মিলতিভরা চোখে ঐ
রুদ্ধ দুয়ারটির উপর মাথা ঝুঁড়ে একটু আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু
দুয়ারের আগল তা মুক্ত স্থান নয় ; তিতরের উচ্চ পরিবেশে যারা
হাসি-গান-গল্পের বান ডাকিয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসে প্রবৃত্ত,
তাদের ভিতরে আশ্রয় দিলে সে চেঁচায় ছন্দ পতন ঘটবে যে !

কাজ নেই, তুলা ওরিকে তাকিয়ে—তুমি ব্যথা পাবে। তার
চেয়ে এস, এখানটিতে আমার পাশে এসে বস—খুলে ফেল তোমার
জমকালো বেশভূষা, পর তোমার সেই নীলাবরী—যার কঁকে কঁকে
ফুটে উঠবে তোমার নিরাভরণ দেহের অরূপ শ্রী, অসীমের ছোঁয়া
লাগুক তোমার শুক্লতায়, আর তারই এককথা ঠিকরে পড়ে রাড়িয়ে
দিক আমার অন্তরলোক।

ওকি, তবুও মুখ নীচ কেন তুলা ? বাসল-ঝরা এ সন্ধ্যায়
তোমার মুখ তার সইতে পারিলে। তোল মুখ লক্ষ্মীটি, আর এস
এখানে জলন্ত শিখার পাশে আমার কাছ ঘেঁষে বসবে এগো।
অগ্নিশিখার বক্ষিম আভায় তোমার গালে গুটি কুচুড়া ফুটে উঠুক।
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর তোমার একটি রূপকথা বলে শোনাই।

দূরে—বন্ধ দূরে—বনের কিনারার পাহাড়ের উপর কালো কালো
পাখির দিয়ে গড়া এক দুর্গ-প্রাসাদে বাস করতেন এক বিশাল-
বলু সৈন্য। প্রাসাদের রুদ্ধ ভয়ানক রপটি যেন প্রাসাদ-অধিকারীর
নির্মম কর্তার মনেই একটা প্রতিচ্ছবি !

এই প্রাসাদের এক কক্ষে বাস করতো বসিনী নন্দিনী ! বৃদ্ধের
শুভ নীরস মনে কোথাও বৃষ্টি বা এই নন্দিনীর জন্ত এক কথা নেই
সঙ্গোপনে সঞ্চিত ছিল। নন্দিনীর শিতাকে যুদ্ধে হত্যা করে তাকে
ধরে এনে এই প্রাসাদে বসিনী করে রেখেছেন। সে তখন ছোট
এক কঁটা মেয়ে ছিল। আজ সে প্রথম বৌবনের সিঁহদ্বারে

উপনীত। বসন্ত-প্রভাতের নৃতন অক্লেশে বর্ণিত
চোখ মেলে চাওয়া পায়ের সঙ্গেই শুধু নন্দিনীর
রূপের তুলনা করা চলে !

নন্দিনীর মনে স্থখ ছিল না, অজানা
ব্যথায় তার মন সারাক্ষণ টনটন করতো ;
অশ্রু যেন তার বাধা মানতো না, যত্নে যত্নে
তার বৃক ভাসিয়ে দিত। বৃদ্ধের পানে সে
চাইতে পারতো না ; কেমন যেন একটা
উ কট ভয়ে সারা দেহ ঝড়ে নড়া পাতার
মতই কঁপে কঁপে উঠতে !

খোলা জানালার ধারে সে খেত-পাথরে

গড়া মূর্তির মত বসে থাকতো। আকাশের স্বচ্ছ নীলিমা আর গ্রাম
বনানীর বিপুল সম্পদের পানে উল্লাস দৃষ্টি মেলে অজ্ঞাতে হয়তো বা
উৎসারিত হতো এক ব্যাকুল প্রার্থনা। কত রাতে নিদ্রাহীন আঁখি
মেলে সে চেয়ে থাকত আকাশের ঐ তারকাপুঞ্জের পানে—চোখে তার
অব্যক্ত মৌন জিজ্ঞাসা, কিসের এই ব্যথা, কি তার অন্তরের কামনা ?
তার অবচেতন মনে বৃষ্টি লেগেছে প্রেমের ছোঁয়াত, অন্তরে চোখে তার
বৃষ্টি নৃতন জাগা প্রেমের দৃষ্টি। কে তার মনের এই ক্ষুধা মেটাবে,
কে তাকে দেবে এককথা প্রীতি, যার জন্তে সারা দেহ উন্মুখ প্রতীক্ষায়
নিশিদিন ছলে ছলে উঠেছে। প্রেম আর সৌন্দর্য্য বিলিয়ে যে ভূপতি,
সে তৃপ্তি সে পাবে কোথায় ? শুভ কাঠের মত নীরস ঐ বৃদ্ধ তার
ব্যথা বুঝবে কেন ?

একদিন বাতায়নে তার নির্দিষ্ট কোণটিতে বসে নন্দিনী বাইরের
পানে তাকিয়ে একজোড়া ক্রৌঞ্চমুখনের প্রেমালোচন দেখাছিল,
এমন সময় তার কানে ভেসে এলো দুর্গগত বাঁশীর সুরের মত মিষ্টি
একটি কোমল স্বর। নীচে তাকিয়ে নন্দিনী দেখলো কণ্ঠে অপূর্ণ
সুরের বস্তার তুলে এক স্তম্ভর্শন তরুণ যুব প্রাসাদের তোরণের দিকে
এগিয়ে আসছে। যুবকের কণ্ঠ-নিঃসৃত সে অপূর্ণ সুরে নীরস পাহাণর
বৃক চিরে আনন্দের ধারা যেন উথলে পড়ছে। যুবকের কথা
শুনবার জন্ত নন্দিনী যেন উন্মুখ হয়ে উঠলো। এমন মধুরা দরদী
কণ্ঠস্বর সে আগে কখনও শোনেনি। নন্দিনীর দুঃখ ছাপিয়ে
নেবে এলো অশ্রুর বজা, তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাধনা—
সে অশ্রুতে সিক্ত হল তার হস্তবৃত্ত নীল-শাড়টি।

প্রাসাদের রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত হলো না, দ্বারীর রুদ্ধ বঠ গজ্জ্বল উঠলো
—“দূরে বস—তুমি সৈনিক নও, সৈনিক ভিন্ন অপর কাকুর এ
প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ।”

নন্দিনী যেমন তাকিয়ে ছিল তেমনি বইলো। অশ্রুসিক্ত নীল
কমলটি সে নীচে ফেলে দিল ! পয়সাটি পড়ল তরুণের পায়ের
কাছটিতে। তরুণ চোখ তুলে চাইল, ফুটি তুলে নিয়ে তার নয়ন
পাপড়িতে এঁকে দিল ছোট একটি চুমো, তারপর এক-পা এক-পা
করে বনের দিকে চলে গেল।

অনাবাদিতপূর্ব্ব এই সুরের আবেশে নন্দিনীর চোখ দু’টি বুঁজে
এলো, অজানা বাহুদণ্ডের পরশে তার মনের রুদ্ধ কণাট খুলে
গেল বৃষ্টি।

সে রাতে নন্দিনী স্বদ্র দেখলো, তরুণের পায়ের কাছে ফেলে
দেওয়া তার সেই নীল-শাড়টিক। আর দেখলো—কি দেখলো জান
তুলা ? দেখলো সেই ঐক্য কম্পমান পাঁপড়িগুলির মধ্যে থেকে

আবিষ্কৃত হইল। এক নারীমূর্তি, তিশোভমার মত যার রূপ, গৌরী তরুণতা আশ্রিত। চেনি দিয়ে ঢাকা। মাথার ফুলের মুকুট, দেহে বহু সযুক্ত আভরণ আর কটনটে বর্ণ মেখলা।

নারীমূর্তিটি ঘরে ঘরে এগিয়ে এলো; নন্দিনীর ললাটে একখানি হাত রেখে বললো—নন্দিনী চেয়ে দেখ, আমি এসেছি। আমিই আজ ভোরে পাঠিয়েছিলাম তরুণকে—কণ্ঠে যার স্বধ-স্বরা স্তব। তোমার অঙ্গ আমি মুছিয়ে দেব নন্দিনী।

মেহনীর জীবনের ভার বয়ে বয়ে যাবার নির্যাস ফেলে, তাদের সন্ধানে আমি বিশ্বময় ঘুরে বেড়াই। তাদের ভাঙা বুক জোড়া লাগাই। রাজার প্রাশন, নীনের পর্জুটার—বিশ্বের সর্বত্র আমার গতি অব্যবহিত। প্রয়োজন মত রাজা-প্রজার ব্যবধান চুড়িয়ে আমি তাদের মধ্যে মিলন ঘটাই। আমার পক্ষপূট-ছায়ায় যারা একবার আশ্রয় পায়, কেউ তাদের অকল্যাণ করতে পারে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, দেহের সঙ্গে দেহ বেঁধে দিই আমি প্রেমের অন্তরতম বন্ধন। হিয়ায় হিয়ায় আমি ডাকাই পুলকের উজ্জ্বল। বসন্ত-প্রভাতে বনানীর ক্রাম-ছায়ে আর শীতের হিমেল রাতে প্রিয়তম-প্রিয়তমার নিবিড় মিলনেই আমার আনন্দ। প্রেমের নিভৃত কুণ্ডলনাট আমায় নিত্যকার কাজ। তোমার ব্যথা দূর করবো বলেই আমি তোমার কাছে এসেছি।

এই না বলে নারীমূর্তিটি অন্তর্ধান করলো, পদ্মের দলগুলি বুঁজে গিয়ে আবার কুণ্ডিতে পরিণত হল।

তুমি জান তুলা, স্বপ্নে নন্দিনী যে নারীমূর্তি দেখেছিলো, তিনি চায়াময়ী নন। এই গৃহকোণে চেয়ে দেখ, আজকের এই সন্ধ্যায় তার নৃত্যগার রূপ তুমিও দেখতে পাবে।

পর দিন ঘুম ভেঙে নন্দিনী দেখলো নূতন রবির সোনারঙ্গী হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার ঘরে, পাখীর কাকলিতে বনাকুল মুখর হয়ে উঠেছে আর ঘুম ভাঙা ফুলের চুখন-স্বরভিত ভোরে বাতাস তার কালো চুলের রাশির সাথে ঘন লুকাচুরি খেলছে। নন্দিনীর মনে আজ হৃৎকের লেশমাত্র নেই; সারা দিনমান তার শরতের মেঘের মত হালকা হালকা মনে হল। পাছাড়ের রক্ত সৌন্দর্যও আজ ঘন আর ততটা রক্ত নয়। মাঝে মাঝে ছোট শিশুর মতই হাততালি দিয়ে সে অকারণে হেসে উঠেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় গোজকাব মত নন্দিনীর ডাক পড়লো দৈত্যের কাছে, তার বিগত বৌবনের দ্ব্যসাহসিক কথা ও কাহিনী শোনবার জন্য। নন্দিনী এসে তার নির্দিষ্ট আসনটিতে বসলো। বাইরে গিল্লির অশ্রান্ত একঘেয়ে আওয়াজ। খোলা বাতায়নের পাখে বাইরের পানে দৃষ্টি মেলে নন্দিনী বুঝি সেই আওয়াজই শুনছিল।

একটু বামে দৈত্যের পানে চাইতেই সে কি দেখলো, দৈত্যের পাশে বসে আছে এক তরুণ, হাতে তার নন্দিনীর কলে দেওয়া সিকাল বেসাকার সেই পদ্ম।

তার লাজ-রাঙা মুখখানি দৈত্যের দৃষ্টি হতে লুকোবার উদ্দেশ্যে সে আবার বাইরের পানে তাকালো।

তরুণ মুহু মুহু হাসছিলো, আর মধ্যে মধ্যে মাথা নেড়ে দৈত্যের কাহিনীর তারিক করছিল।

বাতায়নের নীচে পদ্ম-নীষির জল একটু নেড়ে উঠল না? দেখতে না দেখতেই আবিষ্কৃত হইলেন স্বপ্নে দেখা সেই হাসি মুখ আর ম্রিটি গাহনি। স্বপ্ন যে এত শীঘ্র সত্য হবে, নন্দিনী তা ভাবতেই পারেনি।

যার পাশকোণে বিদেহিনী ঘরে প্রবেশ করলেন দৈত্যের নিকট অবস্থ করে। দৈত্য তার কাহিনীতে থিড়ায়। চাপা স্বরে বিদেহিনী নন্দিনী আর তরুণকে বললেন—“বড়ো তার অতীত জীবনের কাহিনী বহুক! তোমাদের তো বড়োর গল্প শোনবার সময় নয়, ভাল-বাসবার সময়, ভালবাসা ছাড়া তরুণ-তরুণীর আর কোন কাজ নেই। তোমাদের প্রেম গভীর হোক; এত গভীর যে ভাষা-হারা। ইনিতে, চাইনিতে, চুখনে ব্যক্ত হোক তোমাদের প্রেম।”

পুলকের গ্রাবন সে ভীক হিয়া বইতে পারবে কেন? কল্পবন্ধ নন্দিনী অসহ্য আবেশে ঘন হয়ে পড়ল।

এর পর কি হল জান তুলা? বিদেহিনী তার ক্রাম অকল দিয়ে একটি স্বপ্ন—নন্দিনী আর তরুণের মিলন-বাসর—রচনা করলো। এই বাসরে দৈত্যের অলঙ্কার তরুণ নন্দিনীর গুণ্ডে একে মিল প্রেমের পরিচয়ের লেখা। দৈত্যের কাহিনী শেষ হল। তরুণ নন্দিনীর উদ্দেশ্যে একটি বিদায়-চুখন জানিয়ে দৈত্যের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল। নন্দিনীর স্বপ্নের আর অবধি নেই।

পরদিন ভোরে নন্দিনী ফুল-বাগিচার রঙীন পাখনা মেলে প্রকাশপতি যেমন উড়ে উড়ে ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায় তেমনি করে বেড়াছিল কুণ্ড হতে কুণ্ডে। তেমনি একটি কুণ্ডের পাশে শান্ত্রীর হৃদবেশে তরুণ তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল—হাতে তার বস্ত-পদ্ম।

তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে পাছাড়ের কোলে বেথানটি বরগার বৃকের মধু করে পড়ে সেখানে গিয়ে বসল। দিনের আলোর দুজনে দুজনকে দেখে কি খুসিই হলো। সে দিন বনানীর পাখির কত কথাই না শুনেছিল।

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যাধায় যত্নপা পাচ্ছেন- কোথায় ?
কোথায়, হাঁটতে, কিংবা কোন সন্ধিরানে ?
তবে খুশি হবেন—

শারীরিক, হৃক বা পিঠের পীড়ারার,
বাড়ের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাধায়

এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট
(সবুজ মালিশ)
শারীরিক নিষ্ঠুরযোগ্য।

মূল্য : বড় শিশি—২.৭৫ নং পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পঃ
“নাস্তুল” পতন্ত্র

ব্যাধ্যপাশে ঘনো নিবৃত্ত—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সন্ধ্যার আবহাওয়ার ঠৈতোর বিশাল বসু
উঁকি দিয়ে কি? তার পক্ষমনি শোনা যাচ্ছে। ভূ-চকিতা
হৃদয়ের মত নন্দিনীর সারা দেহ খেঁক খেঁক খব খব করে
কঁপতে লাগল। ঠৈতর দেখতে গেলে আর রক্তা নেই।

স্বপ্নার স্বীকৃতি হঠাৎ ইন্দ্রধনু রঙে রঙিন করে বিদেহিনীর
অবির্ভাব হলো। হঠাৎ আলো-ছায়ে সে নন্দিনী আর তরুণকে
অন্তরাল করে রাখলো। বুড়ো ঠৈতোর কানে দূরগত বীণীর সুরের
একটা মিষ্টি আভ্যাস ভেসে এলো, কিন্তু দুইজনার তার চোখে কোন
স্বপ্নবৃত্তি ধরা পড়লো না।

তরুণ আর নন্দিনীর গালে দুটি রেখা-চিহ্ন একে বিদেহিনী
ফেললো—“প্রেমের দেউলার দোবের অস্ত্র প্রহরী আমি।

“বাবা ভালবাসে না, তাদের চোখের দুটি আমি হরণ করে নিই ;
দেউল তাদের প্রবেশ দিয়ে। অস্ত্র রবির এই মাঝা-মাঝের, তোমরা
দুজনে দুজনায় বুকে রহস্তময় আবেশ রচনা করে নির্ভয়ে। কেউ কোন
অস্ত্র করতে পারবে না। আমার পক্ষপট হারে তোমরা বতরুণ আহ।
প্রেমের ছোঁয়া লাগিয়ে তরুণ-তরুণীর রক্ত হিয়ার কপাট খুলে দেওয়াই
আমার কাজ। প্রেমের মশাকিনী-ধারায় বার্য অবগাহনে অক্ষম,
তাদের কলুব দুটিতে তোমাদের স্রবে হের পড়বে না।”

এই না বলে নন্দিনী আর তরুণকে মিরে বিদেহিনী অস্ত্রহিত
হলো।

তারপর তরুণ আর নন্দিনীর কি হলো জানতে তোমার খুব
সাধ হচ্ছে, না তুলা?

ওকি! টোট তোমার ফুলে ফুলে উঠছে কেন? হুটু মেয়ে! আর
হুখ ভার করে না! বলছি বলছি—তরুণ ও নন্দিনীকে বুকে করে
বিদেহিনী কত পাছাড়, কত প্রোত্তর, কত নর, কত নরী পেরিয়ে গল
তার ঠিক ঠিকানা নেই। অবশেষে বিদায়ের রূপ এলো, কিন্তু তরুণ
নন্দিনী কেউ কাউকে হাঙতে বালী নয়। বিদেহিনী তখন ভি
করলো জান তুলা? তার হাতের বাহুল্যটি ওদের কপালে একটু
হুলিয়ে ফিল—অমনি—ওকি তুলা—তোমার চোখ দুটি অত বড়
হয়ে উঠল কেন?

চোখের পলক ফলতে না ফলতে তরুণ আর নন্দিনী, নন্দিনী
আর তরুণ—দুটি আশ্রয় স্থান রক্তকমলের মৃণালে পরিণত হলো। এত
কাছাকাছি যে, তাদের পাতাগুলি বেন পরস্পরকে মিথিড় আলিঙ্গনে
আবদ্ধ করে রেখেছে। সেই মৃণাল দুটিতে ফুটলো দুটি রক্তকমল।

এবার এখন আমরা—তুমি আর আমি—বেড়াতে বেরবো, তখন
এই রক্তকমল দুটি আর তাদের অধিবরী খোঁজ করবো, কি বল

মৃত্যুর অখণ্ড প্রেম

জয়ন্তী রায় (লাহিড়ী)

মৃত্যুর অখণ্ড প্রেম নেয় যদি মোরে কাছে টেনে,
অমৃতের পাত্রখানি দেয় মোরে এনে,
হয়তো বা তবে এই আঁধারের রাত্রি হবে শেষ,
আলোকের জয়ধ্বজে দেখা দেবে স্রব্বের নিমেষ।
এ জীবনে যেন মোর বেননার নাই অবসান,
বুধা মোর স্রব্ব খোঁজা বুধা তারে আকুল আহ্বান।
হুঃখ মোরে ভালবাসে,
তাই সে জড়াতে আসে তার বাহুপাশে,
গভীর বিষের রঙে রাঙাতে এ প্রাণ,
এ জীবনে বেননার নাই অবসান।
আঁধারের ফুল যে গো, ফুটেছে যে চির অন্ধকারে,
কে দেখাবে আলো তারে,
কবেকার কোন্ স্থখ তার লাগি হ'য়েছে আকুল,
সে যে চির আঁধারের ফুল।
সমস্ত প্রহর ধরে বত তার আলোর সাধনা,
রক্তের চন্দনে মাখা বত আরাধনা,
মিথো সে কুহুমে বীধা মালার প্রয়াস,
এ জীবনে স্রব্ব পরিত্যাস।
তাইতো আঁধার পথে চলেছিলাম আমি একা একা,
বসন্তের কুহু নয়—শ্রাবণের কেকা,
আকণ্ঠ বেননা ভরি ছিল মোর সাথী।
আমার আকাশ ছিল মেঘ-ছায়া পাতি,
উত্তপ্ত আলার মাঝে বৃষ্টির সান্না—
স্মার্য জীবনে ব্যর্থ আলোর সাধনা।

জীন খির করতে বেহাল সময় দিলে না মমতা, তেমনি ফিরে
করেও সময় নষ্ট করলে না। প্রাথমিক পরীক্ষার পর
যোগীকে তেতলায় তুলে নিয়ে বাওয়াটা পৰ্ব্বত বাদ দিলে। এখানেই
সেলাইন সার্চ করবে সে। এ্যানিমিকের যোগী, তাতে বন্ধ চল
গেছে অচির—আর ঘেরী করা নয়। ঠাঁটা দিলো সে ডক্টরস
কমের দিকে—অস্থগুপ্ত বস্ত্রপাতির ঘরের দিকে।

তেমন এয়োজনে এই টেবিলে সেলাইন দেওয়াটা আইনবিরুদ্ধ
কাজ নয়। কিন্তু কোন ডাক্তারের উপস্থিতি ছাড়া নাসের পক্ষে—
মিলেব করে কুশীরার ট্রেণ নাসের পক্ষে যোগীকে সেলাইন দেওয়াটা
যে হাসপাতাল-আইন-বিরুদ্ধ কাজ, এটা মজুর জানার কথা নয়,
জানেনও না। যুকি এবং মনের জোর নিয়েই যে মমতা একা
প্রবৃত্ত হলো সেটাও সে বুঝল না। সে শুধু দেখল, এই যে এঘর
থেকে ও ঘরের দিকে ঠাঁটা দিল মমতা সে ঠাঁটার সঙ্গে তার কিছুকণ
পূর্বের ঠাঁটার কণামাত্র মিল নেই। নাসের চলার যে বিশেষ
ধরণের একটা শরীর টান করা আর টান-চলার তড়িৎ তন্ত্রির গতি
আছে, এখানের চলার মমতার শরীরে সেই টান ভাব, পায়ে সেই
তড়িৎ গতি এসে গেছে।

‘এখন যা করার মমতা করবে।’ নিলাকণ উৎকর্ষার ভেতরও
এ নিশ্চয়তা কম নয়। যা একটু শাস্ত হয়ে মেরের পায় হাত
বুলোতে লাগলেন। প্রতিবেশী ক’জন আর অমল তিন-তিনটে
বস্ত্রমাথা সেই এনে কুশীরার যেখানে নামালো হু’ পা এগুলো
সেদিকে। মজুর জয়ার বরফের মতো ঠাণ্ডা কপালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে
রইল। আহত দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলে, এই লোকগুলোও
আবার কতক্ষণ এ ভাবে পড় থাকবে কে জানে!

মমতা যেমন গেল প্রায় তেমনি ফিরে এসে হাতের ট্রে শিশি-
বোতল নামিয়ে রাখল একটা টেবিলে। একটা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক
জয়ার টেবিলের পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল একটা লম্বা ঠাণ্ড।

মমতা ট্রে থেকে টলটলে জল ভর্য একটা বোতল তুলে নিয়ে
ঝুলিয়ে দিলে সেই ঠ্যাণ্ডের হুকে। তারপর দক্ষ পরিচ্ছন্ন হাতে
মিনিট পোনেদোর ভেতর জয়ার শরীরে সেলাইন সঞ্চরণ করে
চটপট হাতে এক টুকরো কার্ডবোর্ডের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল
জয়ার হাতটা। কোঁটার কোঁটার টলটলে লবণ জল রবাদের নল
বেরে নেবে এসে সূচের মুখ দিয়ে বেরে চল জয়ার ধমনীর ভেতর।

এ হাতে সেলাই, ও হাতের কব্জিতে আটটি ফরশেপ—হাতের
মাঝখানের নাড়ীতে তিনটি আঙ্গুল রেখে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে
নাড়ীর স্পন্দন শুনলো মমতা অনেকটা সময়। তারপর মজুরকে
বললো—এবার আমি একটু একজন ডাক্তারের খোঁজে বাছি—

—হাতটা ধরে রাখবো আমি, বাতে নাড়াচাড়া করতে না
পারে? জানতে চাইলে মজুর।

—দরকার নেই। ব্যাণ্ডেজ এমন ভাবে বাঁধা আছে ও
নাড়াতে পারবে না। আচ্ছা, আমি আসছি।

মমতার ডিউটির সময় ছিল না এটা। ঢিলেঢালা পোষাকটা
বোধ হয় সে অস্থগুপ্ত আনবার আগেই অঁচলে জড়িয়ে প্রায়
কোমর-বন্ধনীর মতোই শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছিল। আর
মাথার উড়ন্ত চুল গুলোকে বেঁধে নিয়েছিল একটা রুমাল দিয়ে।
তার দিকে তাকিয়ে মজুর মনে হলো, মমতা সুন্দর কিন্তু সেটাই
তার সব নয়। তার সেই সৌন্দর্য যেমন তার গুণের কাছে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্থলেখা দাশগুপ্তা

কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে আছে—আর মমতার সব রূপ যেন
সেইখানে।

হ্যালো, ব্যাপার কি? পরিচিত কেস নাকি? ডক্টরস
কমের দিকে এগুতে গিন্বে একেবারে মমতার মুখোমুখি পড়ে গিয়ে
থেকে পড়লেন এক ডাক্তার।

ডাক্তারকে দেখে যেন বর্তে গেল মমতা। সাগ্রহ বলে উঠল—
বাঃ এই তো কেমন আপনাকে পেয়ে গেলাম। মিঃ সেন একটু
এদিকে আসুন।

চিনল মজুর। একেই সে সেদিন মমতারের বাড়ীতে দেখেছিল।
মমতার মুখ থেকে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত এই আগ্রহাষিত
অ’হুহান ডাঃ সেন কিন্তু এর পূর্বে আর কোন দিনও শোনেননি।
মমতার দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে শান্তি জয়ার দিকে
তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। —কি হয়েছে?

জয়ার কাটা হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তারের দিকে
বাড়িয়ে ধরল মমতা নীরবে।

মজুর তাকে জয়ার আত্মহত্যা করতে বাওয়ার কথা বলেনি বা
বলবার সময় পায়নি। কিন্তু মমতা ব্রেডে কাটার চেঁচাটা
দেখেই যেমন বুকে নিয়েছিল এটা স্ট্রাইট, কেস, ডাঃ সেনও
তেমনি কাটা দেখেই সেটা বুকে নিলেন। জয়ার হাতের মাঝখানের
শিরার ওপর ঠিক মমতারই মতো করে তিনটি আঙ্গুল ছুঁইয়ে
তারই মতো ঘড়ির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাক্তার
অনেকটা সময়। কালো হয়ে আসা আঙ্গুলের ডগা নখ গোটা ছুঁই
তিন তুলে তুলে সেখানেন টিপেটিপে; তারপর টেবিলের কাছ থেকে
সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন,—ব্রাড ট্রান্সফিকুশনের
ব্যবস্থা করে ফেল। ডাঃ সিনহা কোথায়?

—ডাঃ সিনহা হেড ইনজুরী কেস নিয়ে চলে গেছেন ওটিতে।
তাইতো—

—একে সেলাইন দিলে কে? ডাঃ দাস?

আমি। বিনোদ কণ্ঠে বলল মমতা।

—তুমি? ক্র কুচকে তাকালেন ডাক্তার জয়ার দিকে।

—উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হয়েছে।

সবিনয় কণ্ঠে বললো সে।

সংসারের পরিচয় দিয়েছে মমতা—এমনভাবে প্রশংসার দৃষ্টি
ফেললেন ডাক্তার মমতার মুখের উপর।

সবাই-ই বুকল আইন-বিকল্প ভাবে মমতা নিজ গারিখে সব করেছে। মজুদের সবার দৃষ্টিতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে ফুটে উঠল।

—এ কেসটা আপনি একটু দেখুন ডাঃ সেন। এখন কাউকে পাওয়া বাবে না—এই মেয়েটি আমার বিশেষ বন্ধু। কিছুটা বন্ধুত্বের দাবী, কিছুটা প্রীতির সুর—যেন মিশিয়ে দিল মমতা তার আবেগনের সুরে।

অত্যন্ত দুঃস্থ একটা ডেলিভারিং-কেস নিয়ে ডাক্তার সেনকে আজ গলদ ঘর হতে হয়েছে সমস্ত দিন। তারপরও স্বাভাবিক ডেলিভারি সম্ভব হয়নি। মেয়েটির স্বাস্থ্যের অবস্থা, হার্টের কন্ডিশন দেখে অপারেশনটা এড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্জিক্যাল অপারেশন থিয়েটারে-নিয়ে মৃত শিশু বের করতে হয়েছে ডাক্তারকে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। এই মাত্র রোগীকে বেডে পাঠিয়ে পীড়িয়ে থেকে ব্লাড সেলাইন সার্ট করে বাড়ী ফেরবার মুখে একটু দরকারে এখানে এসেছিলেন ডাক্তার। একে সমস্ত প্রায় ব্যর্থ করে শিশু হয়েছে মৃত, তাতে মার অবস্থা আশঙ্কাজনক—মিনটা-ই ব্যর্থ মনে হচ্ছিল ডাক্তারের। পরিশ্রান্ত পিঠটা হাত পা মেলে তবু পড়তে চাইছিল কোথাও। কিন্তু মমতার মনস্তত্ত্ব মোষ্টা বুধা গেল না। তার গলার সেই প্রীতির সুর—আবার এক নজর তার দিকে তাকাতে বাধ্য করলো ডাক্তারকে। সার্টির শুটোনো হাতা অভ্যাস বশেই ঠেলে তুলে দিতে দিতে জয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে ঠাঁড়ালো ডাক্তার। ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে আসা নাড়ীর গতিটা দেখল আবার। দেখল বুকের স্পন্দন। তারপর বললো—কোয়ামিন।

মমতা ছুটলো কোয়ামিন আনতে।

—হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার। বাইরে বাওরা-আসা কথাবাড়ী সরগরম। গ্র্যাণ্ডলেন খামার শব্দ হয়। দুপ, দাপ, শব্দ তুলে কতকগুলো পা ছুটে আসতে থাকে এসিকে। ষ্ট্রেচার এনে নামায় কুলীরা। টেবিল হলো ভর্তি হয়ে হয়ে শেষে শুধু সিমেন্টের ওপর শরীরগুলো নামিয়ে রেখে খালি ষ্ট্রেচার নিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে কুলীরা।

কি হয়েছে?

আহা, বিধ খেয়েছে।

ই-৭, রাজমিস্ত্রী, কাজ করতে করতে আচম্ভা তিনতলার ছাদ থেকে ছিটকে পড়ে গেছে!

মাগো, গাছ চড়ে খেলা দেখতে গিয়ে গাছ উপড়ে পড়ে চাপা পড়েছে ওপরের লোক নীচের লোক।

এ্যা, গাড়ীর তলার চাপা পড়েছে?

মদ খেয়ে মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে!

কেউ কাতরাচ্ছে। কেউ গোড়াচ্ছে। কেউ পড়ে আছে নিখর হয়ে। জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না। বাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে করে ঘটনা জানতে আর নোট নিতে চেষ্টা করছে। বারা অজ্ঞান তাদের আর এই জিজ্ঞাসাবাদটুকুও সম্ভব হচ্ছে না। নেড়ে চেড়ে নাসরা একটু প্রাথমিক এটা ভটা দেখে তুলে দিচ্ছে ষ্ট্রেচারে। ডেটল, লাইজল, ইথার, ক্রোরোফর্মের-মিশ্রিত যে হালকা পঙ্কট হাসপাতালের গেটে ঢোকায় পরই নাকে আসে, তারই উগ্র গন্ধে ভাবি হয়ে উঠেছে চারিদিকের বাতাস।

জয়াকে উপরে তুলে নিয়ে বাওরার জন্ত যখন ষ্ট্রেচার আনা হলো—তখন যেন এখান থেকে বেরুতে পেরে বাঁচল মজু।

সব ছোট প্যাসেজটা গিজগিজ করছে লোকে। শেষ হয়ে গেছে ভিজিটিং আওয়ার। রোগীদের আত্মীয় বন্ধু সব বেরিয়ে যাচ্ছে। কার হাতে খালি টিকিন-কেরিয়ার। কার হাতে খালি কোটো। আর এখন হাসপাতালের ভেতর থাকা চলবে না বাইরের লোকের। জয়ার মাকে নিয়ে ওদেরও বাইরে চলে আসতে হলো। এক মজুকে নিয়ে নিল মমতা সঙ্গে ভেলে। জয়াকে নিয়ে লিক্‌টে এলো হলো। ওরা চলল সিঁড়ি ভেঙ্গে। এতক্ষণে বুঝলো মজু ইয়ারজেকী কমটা কিছুটা কাজ করে যেন একটানা তেতলায় তুলে নেবার আগেই নিরীক্ষণ-কেন্দ্রে হিসাবে। তেমন গুরুতর ক্ষেত্রে সেখানে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে, যেমন মমতাকে জয়ার সেলাই সার্ট করে দিয়েছিল—নইলে তেতলার রুকেই নিয়ে আদতে হয় সবাইকে।

কিন্তু মজু বে ভেবেছিল ঐ ঘরটা ছেড়ে সে বাঁচলো—তা একেবারেই মিথ্যে। উপরে উঠে দেখল এটা—আরো ভীষণ। কার হাত কেটে ফেলা হয়েছে। কার পা। কার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখ একেবারে গলা পর্যন্ত ঢাকা। কার পা উপর দিকে টানা। কার হাত। কার নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢে কানো। কার কাছ থেকে অস্ত্রের সিলেণ্ডার। সারি সারি ষ্ট্র্যাণ্ডে ঝুলছে রক্ত, লবণ-জল। প্যাসেজ থেকে শুরু হয়েছে রোগীদের খাটিয়া পাগ। তাতেও কুলোচ্ছে না। মাটিতে মেরুতে এখানে ওখানে পড়ে আছে সব। নোরা, অপরিচ্ছন্ন বেশাবাস পরিবেশ বিছানা-পত্র আবহাওয়া। এই হাসপাতাল? মানুষের আরোগ্যনিকেন?

করিডোরের বেড়গুলোর পাশ দিয়ে কুলীরা ষ্ট্রেচার ডান দিকে ঘুরালো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো মজুও। এখানেই মেয়েদের ওয়ার্ড। সেই এক অবস্থা—এক চেহারা। জয়ারও খাটিয়া মিলল না। নামিয়ে রাখা হলো তাকে নীচের একটা শুটোনো নোরা তোদক টান করে।

কোন উপায় নেই।

পেই ওয়ার্ডের কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল মমতা। নেমে গেলেন ডাক্তার। অবস্থা বুঝতে কতক্ষণ লাগে?

সেই মেয়ের বিছানায়ই ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিলেন ডাক্তার। দিলেন মরফিন। করলেন কাটা হাত সেলাই। তারপর বেরিয়ে এসে ঠাঁড়ালেন করিডোরে।—তুমি থাকবে এখন এই মেয়েটির কাছে?

—খাকা দরকার হলে থাকবো।

—দরকার মানে, ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার সেন—এখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নটা নাগাদ আমার চেয়ারে একটা রি করে তুমি এর অবস্থাটা জানাবে আমাকে। তখন আমি বলে দেবো, আজই আর একবার ব্লাড দেওয়া দরকার, না কাল সকালে দিলেই চলবে। আর তুমি যদি না থাকো তবে ওয়ার্ডনাসকে বৃত্তি করে বলে বাবে—খামলেন ডাক্তার। আজ্ঞা, আমিই বলে যাচ্ছি। তোমার কথায় তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারে।

—আমিই থাকবো। নটার পর আপনাকে অবস্থা জানাবো আমি।

একটু চিন্তা করলেন ডাক্তার—আজ সমস্ত দিন ডিউটি দিয়েছেন, কাল সকালে আবার তোমার ডিউটি রয়েছে—

একটু হাসল মমতা—এটাও ডিউটিই। ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত থাকতে আমার কিছু কষ্ট হবে না। আমি আপনাকে ঠিক ন'টায় ফোন করবো।

ডাক্তার ব্যালেন,—তিনি যে আরো কিছু সময় বোগীর কাছে এ্যাটেনডেন্স দরকার মনে করছেন, মমতা তার কথায় সেটা বুঝেছে।

—আই উইন্স ইউর সাকসেস। বলে জুতোর শব্দ তুলে করিডোর পার হয়ে গেলেন ডাক্তার।

সে দিনের জরায়ের বাড়িতে দেখা ডাক্তার আর এই ব্যক্তি কি একই লোক? মজুর মনে হতে লাগল যেন এক নয়। তা ভিন্ন লোক বৈকী। এখানে সে ডাক্তার।

মমতার সঙ্গে থেকে যেতে চাইলো মজুর। কিন্তু মমতা মিলে না। তুমি, তা তোমাকে একদম আপনি বলছিলাম কিন্তু বলতে একটুও ভালো লাগছিল না। ছোট ভো। তুমিই বলি, কি বলা? তোমার থাকার কোন দরকার নেই। দরকার থাকলে কি আমি কখনোই যেতে দিতাম তোমাকে? ভয়ের কারণ কেটে গেছে। আমার থাকার প্রয়োজন হলো,—অবস্থা দেখছ তো হাসপাতালে। কি করবে ডাক্তার, কিই বা করবে বেচারী নার্স অর্থাৎ আমরা। হাসল মমতা। একেবারে হিমশিম খাট আমরা। সামনের গুরুতর কেস পেছনের গুরুতর বোগীর কথা ভুলিয়ে দেয় জানি তো। তাই রয়ে গেলাম। দেহ রাঙা দিতে হয় তো, দেওয়া হয়ে গেলেই চল বাবো আর না দিতে হলে তো কথাই নেই। তুমি শুধু শুধু কেন রাত করবে? তারপর তোমাকে রাখাটাও একেবারে নিয়ম-বিফল্ড যে—

—কাল সকালে ক'টার সময় আসবো।

সেটাও যেন নাই করতে বাচ্ছিল মমতা। বলতে বাচ্ছিল একেবারে হাসপাতালের ভিজিটিং সময়ে এলেই চলবে। কিন্তু খেমে গেল। রক্ত আনতে হয়েছে রাউন্ড-ব্যাক থেকে, আবারও হয়েছে আনতে হবে। অস্থির এসেছে। ইনজেকশন এসেছে। জরায় মার আঁচলের টাকায় তার অনেক কিছুই মূল্য দেওয়াই বাকী থেকে গেছে। নিজ দায়িত্বে আনিয়েছে মমতা। কাল টাকাদিতে হবে। বললো—তা তোমার সময় মতো এসো। কাল আমার ডিউটি সকালে। সেবার-করে থাকবো। বোজ করলেই ডেকে দেবে।

মজুর যখন হাসপাতালের দালান থেকে বাইরে এলো তখন ওর মুখের বাও এই ইমারজেন্সী-ওয়ার্ডের দ্বারে, বাইরে, প্যাসেজ, টেবিলে, মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলোর মুখের মতোই কালো চটচটে ঘামে ভেজা। শরীরের অবস্থা এই লোকগুলোর মতোই বুঝি অর্থহীন। ইমারজেন্সী ওয়ার্ড নয় তো যেন রমের কড়াই থেকে হাত পা গুলো সহ্য ছিল বলে ও ছিটকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

জরায় মা সমস্ত পথ গুলন করে বত কথা বলে গেলেন, তা সবই মমতার প্রশংসা। এমন রূপ, এমন গুণ, একত্র হয় না কখনো, যদি না সৌন্দর্য হয়। মমতা নিশ্চয়ই শাপ-জ্ঞানী সৌন্দর্য। আহা, কি ভালো মেয়ে।

—হী, নিঃশব্দে ভালো মেয়ে। আর এই শুধু ভালো বলার

যেন কিছুই বলা হয় না মমতার সম্বন্ধে। ওর আর জানতে ইচ্ছে করে—কেনই বা মমতা বড়ার কাকাকে বিয়ে করতে বলার একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কেনই বা সে আর একদিন ওর ছোড়নাকে বিয়ে করতে মত দিয়েছিল। গালে একটু হাসির টোলই যেন খেলে গেল—মজুর। এবার ছোড়ন এলে সে তাকে বলবে—ছোড়ন, তুমি কি হারাইয়াছ তাহা তুমি জানো না।

পাশের বাড়ীর মিঃ চৌধুরী—যিনি উদযোগী হয়ে জন্মকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার বাড়ীর মেয়েরা জন্মকে নিয়ে তাদের কাছে রেখেছিলেন। এখন জরায় মাকেও চৌধুরী তার বাড়ীতেই নামিয়ে দিয়ে যেতে চাইলে নিশ্চিন্তবোধ করলো মজুর। এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? ওরা নেবে গেলে এবার কত গলায় ডাইভার জানতে চাইলো—সে কোথায় যাবে।

সেই বেলা তিনটে থেকে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এই খামা ওয়েটিং চার্জের চাইতে চলার তাদের দ্বিগুণ লাভ। কিন্তু মজুরকে সে খুঁজে বের করতে পারে নি। আর খুঁজবেই বা কোথায়—এরিক ওরিক তাকানো ছাড়া। অমলয়া বেরিয়ে এসে তাদের ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু ওরা দেবে কোথা থেকে? বাধ্য হয়ে গজগজ করতে করতে থেকে যেতে হয়েছিল তাকে।

বুঝল মজুর সবই। না ভেবে-চিন্তেই সে বলে ফেলল—গ্র্যাণ্ডে চলো।

—গ্র্যাণ্ড হোটেল? মজুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানতে চাইলো সে। একটু অবাক হওয়া ভাব তার জিজ্ঞাসায়। যেন—বেশবাস আদব-কায়দা কিছুই তো মজুর গ্র্যাণ্ডে বাওরার সান্দ্রা দেয় না; ওকে ঐ সমাজের কেউ বলে বলে না।

জবাব দিল মজুর—হী, গ্র্যাণ্ডে।

বহুৎ আচ্ছা।

গাড়ী ছুটে চলল।

যদিও মজুর ভাবলো সে না ভেবে-চিন্তেই গ্র্যাণ্ডের কথা বলেছে, কিন্তু—তা কি কখনো হয়? মন প্রস্তুত না হয়ে কোথাও এক পা বাড়তে চায় না, বাড়ায় না! জোর করে টেনে নিয়ে বাওরা অবশ্য যায় কিন্তু তার পেছনে জোর থাকে, বল প্রয়োগ থাকে, জুলুম থাকে। হঠাৎ করে কিছু করে বললেই যে আমরা ভাবি, না ভেবে-চিন্তে করেছি—এটা ভুল। হঠাৎ করা কাজের পেছনে মনের প্রস্তুতি থাকে সব চাইতে বেশী।

ওর এখন এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে সাত রকম প্রশ্ন করে ওকে কেউ বিরক্ত করবে না, কোন দৃষ্টিচ্যুততা নিয়ে ওর দিকে কেউ তাকাবে না।

যদি সে কথা বলতে না চায়, একটা কথাও না বলে, বসে বসে নীরবে সিগারেট টেনে চলবে।

মুখ দেখে ওর দৃষ্টি দিখের কথা বুঝতে পেরে থাকার এনে কাঁটায় গেঁথে হাতে তুলে দেবে।

ডাইভারের কবুল করা বকশিশ, ট্যানি মিটারের অঙ্ক, কালকের বেশীটার প্রয়োজন, যেন কিছুই জড়ই ওকে আর ভাবতে হবে না—এর কোন কথাটা মনের জ্ঞানো?

তবে কোথায় যেতে হবে সে জানিবে না কেন ?

শ্রান্ত হয়েই বা তবে থাকবে না কেন ?

গ্র্যাণ্ড ছাড়া যে মজুর আর কোথায় এখন যাওয়া হতে পারে না, এটা মন জানতো। শ্রান্ত হয়েও ছিল সে। আর কোথাও নিতে হলেই তাকে—জোর করে নিয়ে যেতে হতো।

চোটেলের দরজায় গাড়ী এসে থামলে মজুর নেমে পড়লো।

নেমে পড়লো ডাইভারও। জানালো আর সে এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবে না। তার টাকা মিটিয়ে দিক মজুর।

ডাইভারের বলার ভঙ্গিতে, মুখের চেহারায় কোন সন্দেহ ছিল না।

শঙ্কিত হলো মজুর।

এমনি সময় রজতের গাড়ী এসে থামল মজুর ট্যান্সির পেছনে।

মজুরকে দেখে নেমে এসে সমুদ্রে সেলাম জানালো, রজতের ডাইভার।

এতো বড় গাড়ী থেকে এমন জাসো দশা অবস্থাকে বোতাম খঁটো, সাদাশোখা পুরা ডাইভারকে নেবে এসে মজুরকে সেলাম জানাতে দেখে যেন গুটিয়ে গেল ট্যান্সি-চালক। হাত কচল জানালো, মজুর যেন মেহেরবাণী করে টাকটা এন্টনি তার পাঠিয়ে দেয়।

হাঁফ ছেড়ে গ্র্যাণ্ডের পরিচিত পথে হাটা দিলে মজুর।

তেমনি জোড়ায় জোড়ায় দেশী-বিদেশী নারী-পুরুষ চলেছে করিডোর দিয়ে। খোলা হাওয়ায় রেষ্ঠিবেটে তেমনি বাজছে অব্যবস্থা। তেমনি একটি মেয়ে মাইকের মুখ কিউটেক্স রঞ্জিত আল্লে আলতো হাতে ধরে গান গাইছে। তার মুক্তোর মতো পাঁচ রাসা টোন্টের কাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। বয় বৃহৎ ঠোঁট হাতে। সব কিছু পাশ কেটে সোজা চলে গিয়ে লিফটে উঠল মজুর। কিন্তু রজতের ঘরের দরজার বাইরে সন্ধ্যার কংক্রিটের বৈশা টেবিলটা পেরিয়ে ধাবার জন্ত পা বাড়িয়েও থেমে পড়ে সরে দাঁড়াতে হলো তাকে। জন তিন চার নারী পুরুষের একটা ছোট দল ঠেঁহ ঠেঁহ করে বেরিয়ে এলো রজতের ঘর থেকে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রজতের ঘরের উদ্দেশ্যে বলল—নাইট ইজ টিল ইয়ং—ওহো, রজত নিবেদন জারি করেছে তো নিজেরদের ভেতর ইংরেজী বলায়। বুঝলে রজত, স্নাত্তি এখনও নবীন—আবার আসছি আমরা।

জবাব এলো ভেতর থেকে—ও, সিওর।

—সিওর নয়, বলো নিশ্চয়। সকৌতুকে পাল্লাটা ঠেলে ঘরের ভেতর ডাক দিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে, 'সরি' বলে মাথা টেনে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হাসির রোল তুলে চলে গেল সবাই লিফটের দিকে।

ওরা লিফটে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল মজুর অপেক্ষা করে। এখানে ওরই বিশ্রামের জন্ত ওরা ঘরটা কিছুক্ষণের জন্ত খালি করে দিয়ে গেল। ভাগ্যটাকে একটা ধন্যবাদই দিয়ে কেবল মজুর।

কিন্তু কোথায় যে সত্যিকারের ভাগ্য, তা যদি মানুষ বুঝতে

পারতো তবে তো, কথাই ছিল না। মজুর লোকটির রজতের ঘরে ভেতর মাথা ঢুকিয়েই 'সরি' বলে মাথা বের করে এনে হো হো করে হেসে ভটার কারগটা ধরে উঠতে পারেনি। নিম্নায়োজন বোধে তা টোকাটোকা না দিয়েই দরজার ভারী নিঃশব্দ পাল্লাটা ঠেলে একেবারে ঘরে ঢুক পড়লো সে। কিন্তু ঢুকেই ইকটকিয়ে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো মজুরকে।

রজতের ডবল শ্রীংএর খাটের ডানলোপী গদীর ভেতর শরী তুলিয়ে দিয়ে অবশ্যাসিত ভাবে বসে আছে একটি মেয়ে। তার সিগারেট ধরা অলস হাতটা শিথিল ভাবে পড়ে আছে খাটের বাইরে। বোধ হয় রজতের শরীরে বাতে না লেগে যায় সে জটাই হাতটা ঘুরে বেগেছে মেয়েটি। রজতের দুহাত বেঁটন করে আছে মেয়েটির খালি কোমর। মুখটা মেয়েটির মুখের উপর।

কি করে বেরিয়ে যাবে ঠিক করে উঠবার আগেই মেয়েটির চোখ পড়ে গেল মজুর দিকে। রজতের মুখটা হাত দিয়ে সাব্ব ঠেলে দিয়ে, নেশাগ্রস্ত শরীর এলিয়ে দিল সে—বিছানায়।

বললো,—রজত, সাম ওয়ান ছাজ কাম। কাক আগটা মেয়েটির মতোই গ্রাহ করলে না রজত। যেমন ছিল প্রায় তেমনি ভাবে বসে থেকে—শুধু মাথাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে স্মৃতির সঙ্গে টেঁচিয়ে উঠলো সে—হালো, কে ?

বেরিয়ে যাওয়া হলো না মজুর। থাকতে হলো দাঁড়িয়েই।

—মজুর! মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো—রজত বিছানা ছেড়ে। বিমূঢ় মজুর দিকে তার মাতাল চোখ দুটোও কিছু সময় তাকিয়ে রইল বিমূঢ় হয়ে। তারপর পা টলা পাথ এগিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল মজুর দিকে—আঃ মজুর, তুমি—তুমি এখন এখানে এসেছ কেন ? এখন—এখন তোমাকে আমি কোথায় বসাবো, কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলবো ? না—না। তুমি এখন চলে যাবে মজুর। কথাগুলোর—আদ্যেক বোঝা গেল। আদ্যেক চাপা পড়ল তার ভারী জিহ্বার তলার।

চলো, তোমার এগিয়ে দিয়ে আসি। চলতে গিয়ে কোঁচের পিঠ ধরে টাল সামলালো। তারপর বললো—চলো।

হঠাৎ সোজা হলো মজুর।

—চলো।

—না।

লাল চোখ দুটো তুলে বিমিত্র ভাবে মজুর দিকে তাকালো রজত—বাব না বলছ ?

মজুর মাথা নেড়ে জানালো। ইঁ। সে তাই বলছে।

বিহ্বল কণ্ঠে রজত বললো—কি করবে ?

মজুর মুখের বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে এখন যেন সেখানে বিহ্বল খেলছে। বললো—বসবো।

[ক্রমশঃ]

A bad book is as much of a labour to write as a good one—it comes as sincerely from the author's soul.

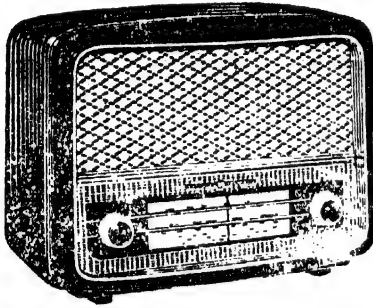
—Aldous Huxley



মুণের মতো কাজ পাও হ'লে

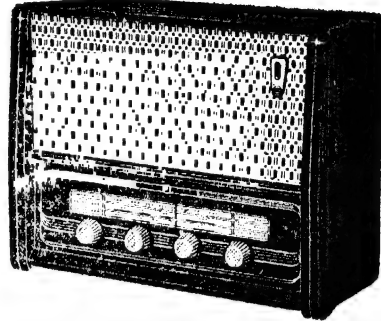
কাজে সেরা ও দামে সুরিখে ব'লেই ক্রাশনাল-একো রেডিও এবং ক্রিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

ন্যাশনাল একো



ক্রাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ক্রাশনাল-একো-র বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনহুনাইজড ২০০ টাকা

রেডিও



ক্রাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি অথবা এসি/ডিসি; ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড; খুব ভাল কাজ দেয়; এই ধরনের রেডিওর মধ্যে সেরা।
মনহুনাইজড ৩০০ টাকা

Kleertone ক্রিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম

ক্রিয়ারটোন
বৈদ্যুতিক

ওয়াটার হীটার—

কল ঘুরালেই গরম জল
পাওয়া যায়; ৫ থেকে
১৮ প্যালন জল ধরে



ক্রিয়ারটোন
সিংক্রোনাস
বৈদ্যুতিক

দেওয়াল ঘড়ি—

অসাধারণ নির্ভরযোগ্য।
৭ রকম সাইজে এবং হুন্দর
হুন্দর রঙে পাওয়া যায়



ক্রিয়ারটোন

হুকিং রেন্ন—

ছোটো পেট দেওয়া

উহুন, প্রত্যেকটির

আলাদা নিয়ন্ত্রণ

ব্যবস্থা আছে।

শক্তি ৪,৫০০ ওয়াট পর্যন্ত



ক্রিয়ারটোন

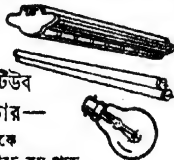
বাতি,

ফ্লুরোসেন্ট টিউব

এবং ফিল্ম চার—

পরিষ্কার স্বকণ্ঠকে

আলো অথচ খরচ কম পড়ে



ক্রিয়ারটোন

ঘরোয়া ইন্সট্রি—

ওজন ৭ পাউণ্ড;

২৩০ ভোল্ট—

৪৫০ ওয়াট; খুব

পুরু ক্রোমিয়াম

কলাই করা



ক্রিয়ারটোন

বৈদ্যুতিক

কেটলি—

ক্রোমিয়াম কলাই করা;

৩ পাউন্ড জল ধরে;

২৩০ ভোল্ট—৪৫০ ওয়াট



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩, মাদান স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১/১৮, মাইল
রোড, মাদ্রাজ-২ • ফ্রেজার রোড, পটনা • ৩৬/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড
বাক্সালোর • যোগেশ্বর কলোনি, চাঁদনী চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ



ভাবনী মুখোপাধ্যায়

একত্রিশ

বার্ণার্ড শ' দারুণ ইনসপনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। কেউ

বলেন—আকাশে উড়ে বেড়িয়ে আমি আনন্দে আছি, ভূমিও তাই করে। আকাশে ওড়া তখন নতুন চালু হয়েছে। আরো অনেক প্রস্তাব এসে। টি, ই লয়েল (লয়েল অব এ্যাংগলিয়া) বার্নার্ড শ'র স্ত্রীকে বললেন, যে আরব বেশে আকৃতি পরিচয় বহুলাতে হয়েছিল গোলমালের পূত্রপাতে, তার ফলে অনিশ্চয় সন্দেহ পোড়ে।

বার্নার্ড শ' একথা শুনে বললেন—তাহলে তোমাদের কি ইচ্ছা যে আমি লাড়ি কামিয়ে হাত্যার হাতুড়ারের কণ্ঠা গ্রহণ করি? সে কাজে আমার সন্ধান যোগ্যতাও নেই।

প্রোফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন একটা নতুন প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন—চিন্তা করা এক না করার মধ্যে দীর্ঘ বিরতি থাকা প্রয়োজন। সোজা থাকা হয়ে পীড়ানোটা যেমন অস্বাভাবিক চিন্তাও তাই। তাইত মানুষ চিন্তা করতে চায় না। আইনস্টাইন বললেন—প্রচুর পরিভ্রমণ করুন। শরীরিক পরিভ্রমণ প্রয়োজন। কাঠ জোলা করুন করতে দিয়ে, মেঝে পরিষ্কার করুন, কিংবা বাগানের মালীর কাজ শুরু করুন।

বার্নার্ড শ' প্রস্তাবটি ভেবে দেখলেন। তাঁর মনে হল আইনস্টাইনের কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। তবে আইনস্টাইন এ কথা হঠাৎ ভেবে দেখেন নি লাসী-চাকর বা মালী হরত কর্তৃক পরিবর্তন বাজী হবেন। এই কারণেই ধনীদের জন্ত নানাবিধ খেলাধুলা ব্যবস্থা।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সত্যজিৎ হোটেলের স্বর্ণখানা ভোজে বার্নার্ড শ'কে আইনস্টাইনের স্বাস্থ্য প্রস্তাব করার অসুযোগে জানানো হল। বার্নার্ড শ' সানন্দে এই কর্মজার গ্রহণ করেছিলেন। দার্শনিক শিল্পী (Artist Philosopher) গাণিতিক শিল্পীকে (Artist Mathematician) সন্মান প্রদর্শন করবেন। বার্নার্ড শ'র দাম্পত্য ছিল বীজদ্বাপাবে যে সব বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন,

কবি ও কলাবিদরা তাদের চেতন অগ্রসারী। ধর্ম নিরতই অস্ত্রান্ত আর বিজ্ঞানকে সব সময়েই ভুল প্রমাণ করা যায়।

বার্নার্ড শ' ভাবলেন, Back to Methuselah নাটকে যেখানে তিনি বলেছেন—When a man is mentally incapable of abstract thought he takes to metaphysics; and they make him a professor, when he is incapable of conceiving quantity in the abstract he takes to mathematics; and they make him a professor.

এই স্বর্ণখানাসভার সভাপতি ছিলেন লর্ড রথসচাইল্ড, তিনি বললেন—আচ্ছা মিঃ শ', আপনি আর আমি আমাদের যথাসর্বস্ব যদি দরিদ্রদের দিয়ে দিই তাহলে সকলের জীবনযাত্রা সহনীয় হয়ে উঠবে?

বার্নার্ড শ' বললেন—জানেন, আমার কোথায় আপত্তি! আমার আপত্তি দরিদ্র তার যথাসর্বস্ব ধনীর হাতে ভুলে দেওয়ায়। য' অর্থনীতি হিসাবে ক্রটিপূর্ণ, ধর্ম হিসাবেও তার ক্রটি থাকবে।

—মিঃ শ', আপনার ধর্ম কি? ঠিক বা বলুন?

—আপনারও বা আমারও তাই। আমিও বাইবেল পড়ে মহামানবের আবির্ভাবের আশায় বসে আছি।

লর্ড রথসচাইল্ড চোখ ছোট করে বললেন—আপনার হিসাবে তিনি ত' এসেই গেছেন।

শ' সেসিনকার সম্মানিত অতিথির দিকে ফিরে বললেন—সেধন প্রোফেসর আইনস্টাইন, আমার এই প্রেরণা আমি বহু বৈজ্ঞানিককেই করেছি, যদি দেখেন আপনারদের থিয়োরীর সঙ্গে আসল ঘটনার পার্থক্য অনেক তাহলে কি করেন? প্রশ্ন করার সঙ্গে নিজেই উত্তর দেন—আসল ঘটনা যদি থাপ থাইয়ে নিতে না পারে তাকে বাদ দেওয়াই ভালো।

আইনস্টাইন হেসে বললেন—বন্ধু! চুপেথের বিবর আপনার ধর্মধর্মী ব্যক্তিটি বা বিজ্ঞানী বা কলাবিদ কেউই তর্ক করার অবসর পাবে না। তাছাড়া তারা সবাই হরত একই ব্যক্তি।

—তাহলে তাদের জন্ত আপেক্ষা করবো, শুধু সেই কারণেই নয়, উপযুক্ত কথা রক্ত আপেক্ষা করবো। মানুষকে তাদের চিন্তা সম্পর্কে সচেতন করার দত্তবাহন লিথিংস্টোনও আমি নিজের খাড়েই নিয়েছি।

আইনস্টাইন আবার হাসলেন, বললেন—দে কর্ম আপনি ভালোভাবেই করেছেন—তাতে তারা এমনভাবে কথা বলে, মান হয় তার পৃথিবীতে সর্বশ্রু চিন্তানায়ক।

সকলে অটোহাস্ত করে উঠলেন। বার্নার্ড শ' এই সময় যে নাটকটি লিখছিলেন টি, ই, লয়েলের চরিত্র সেই নাটকে রূপায়িত করেছিলেন। বার্নার্ড শ' তাঁর সব পরিচিত চরিত্রকেই এই ভাবে অমর করেছেন, তবে রক্ত চড়িয়েছেন অনেক বেশী। এই নাটক কিন্তু সম্পূর্ণ হল না, তার আগেই রাশিয়া বাওয়ার একটা স্তবধোগ ঘটল।

লর্ড লেখিয়ান ও লেডী গ্র্যাটর প্রভৃতি রাশিয়া যাচ্ছিলেন, তাঁরা বার্নার্ড শ'কে আমন্ত্রণ জানানলেন। তাঁরা জানতেন, শ' রাশিয়া গেছে খুশী হবেন। তেমনই রাশিয়াও খুশী হবে বার্নার্ড শ'কে চরিত্র দেখে। বার্নার্ড শ' যেন কাল মার্কস ও লেনিনদের সংযুক্ত সংস্করণ। এর ফলে বার্নার্ড শ'র সঙ্গীতাও কিংবা প্রতিফলিত দর্পণা লাভ করবেন, হরত ট্যালিনের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

সার্লেট এলেন না এই তীর্থযাত্রার তবুে বার্বার্ড শ'কে বার বার বললেন—সেলিনের বিধবা স্ত্রী ক্রপস্কায়ায় সঙ্গে বেন দেখা করা হয়।

এাষ্টেরা সঙ্গে প্রচুর টিনের খাবারের বসদ সংগ্রহ করলেন, বেন, দুর্ভিক্ষের দেশে চলেছেন। বার্বার্ড শ' কিন্তু নিজের পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিলেন না, তিনি ইংলণ্ডে অনেক রাশিয়ান দেখেছেন, তাদের খানা খেয়েছেন, আর কালো রুটিও তিনি পছন্দ করতেন, ছোটবেলায় আইরিশ বাদামী রুটিও তাঁর অপছন্দ ছিল না।

আশ্চর্য কাণ্ড, বার্বার্ড শ'র সহচরবৃন্দ মস্কো শহরের হোটেল দেখে তাক্তব। তাদের হুঁরাপীয় খানা আরো তাক্তব! মস্কো শহরের সেই সেই হোটেল তখন মার্কিন ভ্রমণকারীতে বোঝাই।

আমাদের পূর্বে শুধু বার্বার্ড শ'র কথাটাই রাশিয়ান সন্বাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বার্বার্ড শ' বেন 'মানবীয় বিদ্যাব্যবস্থা' তাঁকে বলা 'হুমান, Human Dynamo'। রুশ দেশের মাপকাঠিতে এই সর্বোচ্চ সম্মান। যে শ্রেষ্ঠ উৎপাদক এবং আরো উৎপাদনে সক্ষম তাঁকেই আদর করে এই কথা বলা হয়। বার্বার্ড শ' এই সব লক্ষ্য করে থাকতেন।

বার্বার্ড শ'কে প্রকাশ 'হুমান অব নোবেলস'এ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। তাঁকে ওপেরা, ব্যাল, বকৃত্য ও ভোজনভাষা আশ্রয়িত করা হল।

বার্বার্ড শ'র সঙ্গে মঃ লিটভিনকের দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনিই সর্বত্র ভোবাদীর কাজ করলেন।

বার্বার্ড শ' বলতেন—সারভাইভাল অব দি ফিটেট বা যোগ্যতমের জয় হিসাবেই ষ্ট্যালিন তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতাসীল করেছেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যপূর্ণ মুহূর্ত ও সংকটময় কালের মধ্যে তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, নবীন সভ্যতার প্রসব বেদনার সমস্ত অন্তঃবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাই ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত বলে স্বীকার করেছেন।

বার্বার্ড শ'র ভুক্তিবাদ অত্যন্ত সমর্থদার প্রোক্তার মত হাতমুখে তুললেন জোসেফ ষ্ট্যালিন।

বার্বার্ড শ' অতি ভীষণলায় বললেন—যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই, আমি বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার আপনাদের রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন সমর্থন কবি। এই সব ঘটনা এখনই ছেড়ে দেওয়া চলে না।

ষ্ট্যালিন অটোহাস্ত করে বললেন—এটা কি শুধু আমারই নীতি? আপনাদের নয়?

শ' বললেন—আমাদের কি ক্রীড় বা নীতি তাতে কি এসে যায়? আমি একজন লেখক মাত্র, নব্য সভ্যতার জনক নই। আমি এক কীর্ণচরিত্র,—কীর্ণ মোমের পুতুল মাত্র।

এর জবাবে ষ্ট্যালিন বললেন—কাল' মার্কসও এমনই একজন সামান্য লেখক মাত্র। অথচ কাল' মার্কস না থাকলে আমরা প্রতিপদেই হয় ত ভুল করতাম। আমরা লেখক চাই, আমাদের মতবাব প্রচারের সহায়তায় প্রয়োজন লেখকদের। ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের হস্তস্বাক্ষর জমা হয় ত আমরা প্রস্তুত নই, তবে আপনার একদিন হয় ত হাসতে শিখব।

শ' বললেন—আমাদের দেশে এখন কোনো সমস্তার মুখোমুখি

হতে ভয় পাই তখন আমরা তা হেসেই কাটিয়ে দিই। এখানের মানুষ জীবনের সমস্তার মুখোমুখি এসে কাঁড়িয়েছে, তাই তাদের জীবনে এখন হাসির অবসর নেই। আমাদের কবি-বন্ধু টমাস হার্ডি একটি চমৎকার পেনটিং নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তাতে তাঁর হাতময় অবস্থা রূপায়িত করা হয়েছিল।

ষ্ট্যালিন বললেন—আমাদের জীবনে তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক আমরা পেয়েছি—লিও টলষ্টয়, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ বার্বার্ড শ'। টলষ্টয় ধর্মের চাপে পড়েছিলেন এবং পরাভূত হয়েছিলেন। ডিকেন্সের ক্রটি তাঁর সেনটিমেন্টালিজম আর আপনি—এখনও আপনি যথেষ্ট নবীন, কিসের চাপে পড়ে যে আপনি স্ববন্দিত হবেন তা আমার এখন বলা সাজে না।

ছোট ছেলে যেমন পুরাতন হেডমাষ্টারকে স্নেহে প্রহার বিগলিত হয়ে পড়ে, যাকে সে এতদিন মনে মনে ঈশ্বর দান করেছে তার মানবিক রূপ দেখে বিস্মিত হয়, ষ্ট্যালিনেরও সেই স্বকথা। যে বার্বার্ড শ'কে মনে মনে 'এতদিন পূজা করেছেন, তার ঋণছড়ানো মৃতি দেখে একটু বেন আনমনা হলেন।

রাশিয়া সম্পর্কে বার্বার্ড শ'র মনোভঙ্গী কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল, তিনি যা কিছু দেখেন তাই তাঁর কাছে বিশ্বাস ও চমৎকার! 'তালো ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখেন নি। কারখানা লোকান প্রভৃতি সর্বত্রই তিনি সম্মানিত হয়েছেন। সর্বত্র রাশিয়ার মানুষ তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে বরণ করেছে, অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করেছে। তার মধ্যে ছিল যথেষ্ট অনাড়ম্বর আন্তরিকতা।

যে সমালোচক এতদিন সব কিছুই উপহাস করে কাটিয়েছেন তাঁকে এখন নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে হয়, যে শক্তি প্রশংসা ও প্রশস্তির।

অনুবিধা হল সেলিনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সময়। বার্বার্ড শ' অনুবিধাটা বেণী করে অনুভব করলেন। ক্রপস্কায়া তখনছিলেন যে বার্বার্ড শ' অতি দুর্ভাবিত প্রতিক্রিয়াশীল (illmannered reactionary) মানুষের পরিবর্তিত হয়েছেন। একদা সেলিন ঠিকে বলেছিলেন—A good man fallen among Fabious

ডাঃ বঙ্গুর

মেসোকর্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

সেই ব্যক্তি সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে সেই ব্যক্তি A' bad man fallen among Tories হয়ে গেছেন।

সেলিনের স্ত্রীর এই ধারণা আরও দৃঢ় হবার কারণ বার্নার্ড শ'র এই নতুন রাশিয়ার তথ্যবাজার সঙ্গীরা সবাই সোশালিজমের বিরোধী, এক হিসাবে শত্রু বলা চলে।

অবশেষে ক্রপসকায়া তাঁর কুটারে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে চা পানো রাজী হলেন। এই দিন বার্নার্ড শ' অতিশয় বিমিত্ত হলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এক কুদর্শনা স্ত্রীলোককে তিনি দেখবেন এবং তাঁর সঙ্গে অবাস্তর তর্ক করতে হবে। যথাস্থানে পৌঁছে দেখলেন, ক্রপসকায়া অতি মধুর চরিত্রের মনোমায়ী মানুষ। ক্রপসকায়া এক সময় বার্নার্ড শ'কে বললেন—এই পরিহাস-সরসতা-বর্জিত দেশে এই দীর্ঘ নির্বাসনে আপনি কি করে এমন হাসিখুসী বজায় রেখেছেন? বার্নার্ড শ' বললেন—এখানে আনন্দের খোরাক প্রচুর।

মার্লেট রাশিয়া যাত্রার সময় ষাট ষাট বলেছিলেন, যেন সেলিনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা হয়। সামাজিক রীতি অনুসারেই বার্নার্ড শ' তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন। সহবাসীরা অবশ্য স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্তই উদ্গ্রীব।

ক্রপসকায়ার দিক থেকে কোন আগন্তি না হলেও, একটা না একটা ছল-ছুতায় এই সাক্ষাৎকার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বার্নার্ড শ' অবশেষে বুঝলেন না দেখা করাই চেষ্টায় এই সব আয়োজন।

কখনো কখনো ক্রপসকায়া অতিশয় অস্বস্তি, কঠিন সর্গিতে ভুগছেন। তাঁর বয়স হয়েছে, নির্জনবাস পছন্দ করেন। এই সময় বিশ্রাম করা উচিত হবে না। তা ছাড়া তিনি মনোমুগ্ধ হয়ে বাস করেন না। গ্রামে অরপ্য অকলে আছেন। মোটের সেইখানেই বাঙালি ব্যর্থতা করলেন শ', আজ শোনা গেল তিনি মস্তকোত্তে আছেন।

অবশেষে বার্নার্ড শ' গৌ ধরে বললেন আমি ষাটই। দেখা না হয় না হবে, একখানি বই তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার কথা, বইটি আর আমার নামের কার্ড দরজায় রেখে চলে আসব। সেই দরজা যেখানেই হোক।

সেই এষ্টর শুনলেন, স্ট্যালিনের সঙ্গে ক্রপসকায়ার দাঙ্গা বন্ধকিনাথ, লিঙ্গা ব্যবস্থা নিয়ে। সেই বিরোধ এমন জায়গায়

পৌঁছেছে যে স্ট্যালিন নাকি বলেছেন—অজ্ঞ কাজকে সেলিনের স্ত্রী সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেই হবে সেলিনের সমকামী স্ত্রী। এমন মুখরোচক সর্বস্ব পোষে সেডী এষ্টর বললেন—সেলিনের বিধবা ক্রপসকায়াকে না দেখে আমি মনো থেকে এক পা নড়ছি না।

সহসা সব কিছু গুজর-আপত্তি কোথায় অদৃষ্ট হল! সিন সিন হল এবং সেলিনের স্ত্রীর কুটারে একদিন সমলবলে যাত্রা করলেন।

কুটার ময় একেবারে প্রাসাদ। ক্রপসকায়া তাঁদের এমন অভ্যর্থনা জানালেন যে একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হল যে তিনি নির্জনতা পছন্দ করেন, নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী। ক্রপসকায়া প্রাসাদের সহচর সহচরীর সংখ্যা অনেক। হৃদমন্ডীয় বার্নার্ড শ'কে স্বচক্ষে দেখে তিনি অতিশয় প্রীত হলেন বোকা পেজ। স্ট্যালিন সম্পর্কে একটুও কথা হল না।

আসল কথা, ক্রপসকায়াই এতদিন আগন্তি করছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছিল বার্নার্ড শ' একজন দুর্দান্ত, অভব্য, অসামাজিক মানুষ। বার্নার্ড শ' ক্রপসকায়ার অপূর্ণ লাভণ্যময়ী মূর্তি দেখে বিমিত্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—একঘর ছেলেমেয়ের মধ্যে যদি ক্রপসকায়াকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তারা সবাই এই গণেশজন্মীকে ঘিরে ধরবে। এমনই জননীমূলত মনোময় আকৃতি ক্রপসকায়া।

বার্নার্ড শ' রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সবাইকে বললেন—রাশিয়ার মানুষ অতিশয় সচেতন এবং সজীব। নতুন আদর্শ গ্রহণ করতে তাঁরা মন উন্মুক্ত রেখেছেন—ফেব্রিন আইডিয়া তাঁরা পছন্দ করেন।

বার্নার্ড শ'র কথা শুনে ওয়েবসম্পত্তি উৎসাহিত হয়ে রাশিয়ার ছুটলেন স্বচক্ষে সব দেখার জন্ত। তাঁরা ফিরে এসে লিখলেন Soviet Communism, A New Civilization.

বার্নার্ড শ' বলেছেন—রাশিয়ান বিপ্লবের জনক এক হিসাবে আমি। সর্বদাই আমি তাই মনে করি। আমি ১৯১৪—১৮ র যুদ্ধের সময় বলেছিলাম—সৈন্যদের পক্ষে সবচেয়ে সংকর্ম হবে তাদের অফিসারদের গুলী করে মেরে বাড়ি ফিরে যাওয়া। রাশিয়ানরাই একমাত্র সৈনিক ধারা আমার সেই সঙ্গদেশে গিয়েছিল।

বার্নার্ড শ' তাই রাশিয়া, এণ্ডের সব পেয়েছির দেশ দেখে আনন্দে, আবেগে, উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই কালেই বলেছেন—“রাশিয়ায় না এসে আমার এ জীবনের তথ্যবাজার অসম্পূর্ণ থেকে যেত।” [ক্রমশঃ]

আখিনের ভোর

পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

এখন এখানে শুধু কাঁচা রোদ করিতেছে ভিড়
অনেক বর্ণ-শেয়ে উঁকি দেছে সোনালী সিন।
প্রভাতের একতারা বাজাতো জৈনবীর মীড়
এ ক্লান্ত প্রাণের ভীরে তরী নিয়ে এসেছে আখিন।

আমার যমজ চুলে কাশফুল বুলতেছে পাখা
সবুজ ঘাসের জাগ প্রাণভরে নেয় রাজহাঁস।
শিশিরের জমা অঞ্জলি মুছে কেলে জিরলের শাখা
এ আখিন নিয়ে আসে জীবনের গভীর আশা।

শিউলিফুলের আঁজ পথিকের জানায় স্বাগত
কুমারী সৌখিন মত ঘুলাভরা পথের হৃদয়ে।
কচি কচি ধানচারা হাওয়া সেগে হয় অবনত
সবুজের ছোঁয়া লাগে আকাশের বৃকে বারে বারে।

এখন নদীর তীরে শাহুকরা করিতেছে খেলা
কড়িডেরা খুশীমনে হেথা-হেথা ইতি-উতি বোয়ে।
প্রথম রোদের 'পরে শালিকেরা জমায়েছে মেলা
পথিবীর হত ক্রম হুড়ে গেল আখিনের জোয়ে।



শীল্ড ফাইনাল অনিদিষ্ট কালের জন্ম স্থগিত

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ. শীল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলা নিয়ে এবারও অটল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বর্তমানে অনিদিষ্ট কালের জন্ম শীল্ডের ফাইনাল খেলা স্থগিত রাখা হয়েছে। আই এফ এ বাঙ্গলা তথা ভারতের প্রাচীন ক্রীড়া-সংস্থা। কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থা তাদের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে বললে বোধ হয় অস্বাভাবিক হবে না। এর সত্তাও বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। এখন তাদের বড় বড় ক্লাবদের মজির উপর নির্ভর করে চলতে হয়। আই, এফ, এ'র পরিচালনা পদ্ধতিতে বুন ধরতে আরম্ভ করায় শীল্ডের আকর্ষণ বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একদিন শীল্ডে যোগদান বাইরের নামকরা দলের কাছে একটা বড় আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এখন ঠাঁড়িয়েছে ঠিক অঙ্গরূপ। এখন বাইরের কোন নামকরা দল যোগদান করতে রাজি হয় না। কেন দিন দিন শীল্ডের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে? এ নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে—পরিচালক-সংস্থা আই, এফ, এ'র পরিচালক-মণ্ডলীর ফ্রাট-বিচ্যুতি। ক্রীড়া-সূচী তৈরী করার সময় তাদের কারসাজি কারও অজানা নয়। কোন কোন বিশেষ দলকে সুবিধে দেওয়াটা তাদের রেওয়াজ হয়ে পড়েছে। তাদের কেবল কোন দলকে কয়েকটা চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা করার দিকে সোলুশন দৃষ্টি। সব সময়ই কোন দলকে দুটো জনপ্রিয় দলকে ফাইনালে তুলে হ'পদসা যোগ্য করার ফন্দি। এদিকে বেফারীর কারসাজি তো আছেই। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলাটা ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠেছে।

শীল্ডের খেলা এত বেশী পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে বাইরের নামকরা দলের পক্ষে যোগদান করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। যারা যোগদান করলে তাদের অবস্থা তো একেবারে সজ্ঞান। পাচা ব্যাংর জন্ম এখানকার হার্টের অবস্থা যেমন শোচনীয় হয়ে পড়েছে তাতে করে প্রথম শ্রেণীর খেলা মোটেই চলে না। তাই বাইরের নামকরা দলেরও বাতাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয় না। তাদের অভিযোগ যে শীল্ডের খেলার সময় পরিবর্তন হওয়া দরকার।

এবারকার যোগদানকারী বাইরের দলের মধ্যে গুর্বা ব্রিগেডের খেলা সকলের বেশী আনন্দ দিয়েছে। এই দলের সব খেলোয়াড়ই সুবাহ্যের অধিকারী। কঠিন পরিশ্রম করার মতন এদের মজবুত গড়ন। খেলা দেখলেই বেশ বোকা যায় যে এদের খেলার পেছনে শিকার আছে, কঠিন অর্থশীলনও আছে। গুর্বা দল ভিন ব্যাক অথায় খেলতে অভ্যস্ত। এই দলের সকলের খেলাতেই কিছু না কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অলিম্পিক দলে নির্বাচিত দলর লাইফীরা খেলা দর্শকদের বেশী করে আনন্দ দিয়েছে।

বাইরের অজ্ঞাত দলের মধ্যে মীরাট থেকে আগত এ, এস, সি, সেন্টার, পাটনা এথলেটিক এসোসিয়েশন, কটক সম্মিলিত দলের খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার দলের মধ্যে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত এরিয়াল ও জঙ্ক টেলিগ্রাফের খেলা প্রশংসার দাবী রাখে। খ্যাতিনামা দলের মধ্যে মহম্মেদান স্পোর্টিং সেমি-ফাইনালের খেলায় সকলকে নিরাশ করেছে। বিশেষ করে তারা ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তবে এই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল উন্নত ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে। মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে এরিয়ালের বিপক্ষে মোটেই তাদের খ্যাতি অমুঘারী খেলতে পারেনি। তাদের এই খেলা দেখে সকলেই হতাশ হয়েছেন।

এশীয় দলে ভারতের নয়জনের স্থানলাভ

আগামী জাহুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে এশীয় ফুটবল কনফেডারেশনের আমন্ত্রণে পেরু দল ভারত সমেত প্রায়ের নানান অঞ্চলে মোট আঠারোটা ম্যাচ খেলবে। এই দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্ম এশীয় দল গঠনে জোর তোড়জোড় হচ্ছে। নভেম্বর মাসে কেরালায় এশীয় কাপের পশ্চিমাঞ্চলের খেলার শেষে এশীয় দল চূড়ান্তভাবে গঠন করা হবে। সাময়িকভাবে যে তেরিশজন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে তাদের মধ্যে ভারতের নয়জন খেলোয়াড়—থঙ্গরাজ, লজিক, কেম্পায়া, রামবাহাদুর, প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, দামোদরন, নেলিস ডি'লুজা ও বলরাম আছেন। অজ্ঞাত বাছাই খেলোয়াড়দের দলে হংকং জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়ে প্রতিনিধি আছেন। তবে ইসরাইল, পাকিস্তান ও ইরানের তরফ থেকে এ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড়ের নাম পাঠান হয়নি।

একুশজন খেলোয়াড়কে প্রাথমিক ভাবে মনোনীত করে কুয়ালালামপুর অথবা ম্যানিলায় ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ডাঃ বিমল চন্দ্রের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

সাবাস ডাঃ বিমল চন্দ্র! তোমার সাফল্য বাঙ্গলা গুণ্য ভারতের সকলেই গৌরব অমুঘব করছে। কলকাতার নামকরা সীতার ডাঃ বিমল চন্দ্র ফ্রান্সের উপকূলবর্তী কেপ ব্রিজ লেন থেকে ডোভার পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। ডাঃ বিমল চন্দ্রকে নিয়ে আজ পর্যন্ত দু'জন ভারতীয় এবং তিনজন বাঙ্গালী চ্যানেল অতিক্রমে সমর্থ হয়েছেন। সর্বপ্রথম ভারতীয় ও বাঙ্গালী সীতার মিতির সেন চ্যানেল অতিক্রম করেন। ডাঃ চন্দ্রের সাফল্যে ভারতের অজ্ঞাত সীতার ডাঃ চ্যানেল অতিক্রমে উৎসাহিত হোক এটাই সকলে কামনা করে।

ব্রজেন দাসের পুনরায় চ্যানেল অতিক্রম

পাকিস্তানের খ্যাতিমান সাঁতারু ব্রজেন দাস পুনরায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে সমুদ্রের অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি একই মাসের মধ্যে উভয় দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ইহার পূর্বে ১৯৫১ সালে স্কটল্যান্ডের উইলিয়াম ডালি অসুস্থরূপে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ব্রজেন দাস ডোভার থেকে সমুদ্রের আরম্ভ করে ১৪ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে কেশ গ্রিজনেজে উপনীত হন। এবার নিয়ে ব্রজেন দাস তিনবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল উভয় দিক থেকে অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পূর্বে গ্রেট ব্রিটেনের এডওয়ার্ড টমি, গ্রেট ব্রিটেনের ফিলিপ মিকম্যান, আমেরিকান মহিলা সাঁতারু মিস ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক, মিশরের হাসান আব্দেল রহিম, ব্রিটেনের টমাস ব্লোয়ার, ইটালীর গিয়ামী গাথি, স্কটল্যান্ডের উইলিয়াম বার্নি, আমেরিকার বাট টমাস প্রভৃতি উভয় দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুবই দুর্বল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক সম্প্রতি ইংলও থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি ভারতীয় দল সম্পর্কে বলেন—ফিল্ডিং খুবই দুর্বল হয়েছে। কিন্তু খেলোয়াড়রা ফিল্ডিংয়ে অসুস্থলানে গাফিলতি করেছেন বলে যে অভিযোগ হয়েছে তা সমীচীন নয়। খেলায় সফরে সরকারী দলকে সপ্তাহে ছয় দিন খেলতে হয়। এটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর। বিশেষ করে ভারতীয় খেলোয়াড়রা গাধারণত সপ্তাহে দুই দিনের বেশী খেলতে অনন্ত্যন্ত নন বলে। সপ্তাহে ছয় দিন খেলার তাঁদের অনেক বেশী বকল ভোগ করতে হয়েছে এবং ইহা ছাড়া ভারতীয় দলের একাধিক খেলোয়াড় হারত হারে পড়ার তাদের অন্তর্বিধা হয়। কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে যে

এই সব অন্তর্বিধা বুঝেই তো ভারতীয় দলের ক্রীড়া-স্বচা ১৫ হয়েছিলো। ভারতে বা কেন বেশী দিন খেলার ব্যবস্থা হয় না ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং-এর উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না এটাই সকলের প্রশ্ন।

অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফর

অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে আসছে। তারা ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে দিল্লীতে পৌঁছাবে। পাঁচটা টেস্ট ম্যাচ ও দু'টি প্রদর্শনী খেলার যোগদান করে ২৯শে জানুয়ারী স্বদেশ যাত্রা করবে তারা দিল্লীতে (প্রথম), কানপুরে (দ্বিতীয়), বোম্বাইতে (তৃতীয়) মাত্রাজে (চতুর্থ) ও কলকাতায় (পঞ্চম) টেস্ট ম্যাচ খেলবে ১৯৬০-৬১ সালের শীতের মরসুমে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে।

খ্যাতিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় শিখের মৃত্যু

ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ও'নীল গর্ডন শিখের কোলি শিখ হাসপাতালে মারা যান। সম্প্রতি তিনি এক মোটা দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে গারফিল্ড সোবার্স, টম ডিউডগেও আহত হন। ষ্ট্যাকোর্ডশায়ারের কাছে রাষ্ট্রার তাঁদের মোটরের সঙ্গে ১০ টনের এক মালগাড়ী সংঘর্ষ হয়। তিনজনে চারিটা খেলার পর এক মোটরে বাচ্ছিলেন। কোলি শিখ একজন উদীয়মান চোখ ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁর অভাব ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে বিশেষভাবে অনুভব করতে হবে।

শিখ মোট ২৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। তাতে মোট রাণ সংখ্যা পাঁচায় ১৩৩১ রাণ ও গড়পড়তা পাঁচায় ৩১'৬১ রাণ। এ ছাড়া বোলিং করেও ৪৮টি উইকেট পান।

ভয়

(অর্থান করি Peter Baum-এর কবিতা Horror অবলম্বনে)

মাঝে মাঝে এই কথাটাই হয় মনে,
তোমার আঁখি, তোমার বেন কেশ
অনিচ্ছে দ্রুত ক্ষয় মনে।
শঙ্কিত হই, কল্পিত হয় হাত !
বেন আসে রাত,
ওঠে কোটে তিস্ত গ্রানি
চূর্ণ ভাবাবেশ !
সাঁঝের পাখি—বয়জ পাখি
পালিয়ে গেল রে,
পালিত কি পালিত পাখা
জালিয়ে গেল রে !
কান্না আসে চক্ষু ছেয়ে !
ঝিলার বাতা বেশ।

অনুবাদ : মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

নীল আকাশ

লক্‌শ্মী কথালিপি অচিত্তাকুমার সেনগুপ্তের অবদান বাড়লা কবিতার ক্ষেত্রেও সামান্য নয়। তাঁর নীল আকাশ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর বিপুল সমাবেশে বিভূষিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর তামনে ঐ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। এই গ্রন্থে অচিত্তাকুমারের ত্রিশটি কবিতার রস আত্মমনে পাঠক সাধারণ সমর্থ করেন। অচিত্তাকুমারের কবিতাগুলি যেমনই বৈশিষ্ট্যবান, তেমনই বৈচিত্র্যময়। কবিতাগুলির মধ্যে কবির বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর অমূল্য ও অপূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় মেলে। কবিতাগুলির আবেদন অন্তরকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। সত্য-শিব-সুন্দরের বর্ণনায় কবির মন-প্রাণ নিরোক্তিত, কপটতা, জড়তা ও যান্ত্রিকতা তাঁর অসহ্য, কবিতাগুলি যেমনই জোবাসো, তেমনই স্পষ্ট, যেমনই বেগবান, তেমনই আয়বগমণিত, যেমনই স্বরসম্পন্ন, তেমনই প্রকৃতিবাসী। বীজনাথের এবং শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লেখা স্বাক্ষরিত ডিউটি ও দুটি দীর্ঘ পাঁচটি কবিতা এই গ্রন্থের মধ্যে যুক্ত হয়ে সমগ্র গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান হ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ১৩ গান্ধী রোড। দাম—২ টাকা মাত্র।

ধীরপ্রবাহিনী ডন

জগতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থগুলির মধ্যে “কোথা-এটো হোস মি ডন” অন্যতম। এর শ্রদ্ধা মিখাইল শলোখভ-এর সৃজনী প্রতিভার ছাপ দে পাঠ্য পাঠ্য ফুটে ওঠে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশ্রষ্টাদের যাবত শলোখভ-এর ক্ষেত্রেও যে একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট এ বিষয়ে যমত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। উপন্যাসখানি চার খণ্ডে বিভক্ত। লেখকের চোদ বছরের সাধনার ফল। ডন মনের তাঁরে তাঁরে ধর্ম কশাকসের কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। তাঁকের বিভিন্ন প্রাণ-গল্প, চর্যাম জীবনবেগ এবং বিপ্লবের পর সর্বদা গৃহযুদ্ধের পর সেই জীবনের এক বিরাট কণাক্তরই উপন্যাসটির মুখ্য উপজীব্য। গল্পের এই গ্রন্থটির অনুবাদ করেন বশরী সাহিত্যলিপি অবন্তী গাঙ্গুল। কবি অবন্তী গাঙ্গুল আভ্যন্তরীণ লেখক নন। বাড়লা গাঙ্গুলের সেবা ইনি করে চলেছেন যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতার সঙ্গেই। বিকাল সাহিত্যসেবার কল ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই অনুবাদকর্তব্যে ইনি প্রকৃত সাফল্যলাভ করেছেন—এ কথা তুলনায় ৫ বিদেশী সাহিত্যের যে পরিমাণ অনুবাদ বাড়লা ভাষায় হয়ে থাকে নবতরঙ্গের অন্ত কোন ভাষায় তা হয় না। তবে বাড়লা ভাষার এখন

অনুবাদ-সাহিত্যের আখ্যা নিয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তাদের অধিকাংশকেই অনুবাদ তো বুঝে কথা, গ্রন্থও বলা চলে কি না। এমন কি, গ্রন্থটি শেষ করারও বৈধ পাঠকের থাকে না। এর কারণ অনুবাদকর্তব্যে ব্যর্থতা। বাড়লাদেশে সত্যিকারের অনুবাদকের সংখ্যা তো বিরল বললেই চলে। তবে আশার কথা, অবন্তী গাঙ্গুলের অনুবাদ যথেষ্ট বলিষ্ঠ, সার্থক ও উন্নত। বহুকাল পরে একটি সর্বজনস্বাক্ষর অনুবাদগ্রন্থ চোখে পড়ল। দীর্ঘায়তন উপন্যাসটির প্রতিটি পৃষ্ঠা গাঙ্গুলের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছে। প্রচ্ছদচিত্রটি একেছেন গাঙ্গুলের চৌরী। প্রকাশক—গ্রাফানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১২ বক্স চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—২ টাকা মাত্র।

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্বনির্বাচিত গল্প

বলবাহীর একনিষ্ঠ সারকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বর্ণগত সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের নাম। আজ প্রায় আড়াই বছর আগে তাঁর দেহান্তর ঘটেছে, তার অল্পকাল পূর্বেও তাঁর লেখনী সচল ছিল। বর্তমানে তাঁর ছোট গল্পের একটি স্বনির্বাচিত সংকলন আত্মপ্রকাশ করেছে। জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বহন করে। সার্থকনামা লেখক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। চরিত্রস্বষ্টিতে, সংলাপ বোঝানার ঘটনাবিন্যাসে অক্ষুণ্ণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে গেছেন স্বর্ণগত লেখক। মনকে আকৃষ্ট করার যথেষ্ট ক্ষমতা গল্পগুলি রাখে। জীবনকে, সমাজকে এবং জগতকেও নানান দিক দিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখেছেন—এই উজ্জ্বল সত্যতা তাঁর গল্পগুলি প্রমাণিত করে। মানুষের মনের অব্যক্ত অন্তর্ভবনের সম্যক প্রকাশ ঘটেছে গল্পগুলির মধ্যে। কৃত্রিমতাহীন, সহজ সরল জীবনকেই তিনি ছুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান হ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ গান্ধী রোড। দাম চার টাকা মাত্র।

গ্রন্থাগার প্রচার

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির মর্যাদা অত্যন্ত দেশের কুলনার কম তো নয়ই বরং বেশী। এ দেশের গ্রন্থাগারে এমন বহুল ভান্ডার সচল রয়েছে রক্ষিত বা সারা জগতের বহুল উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে। সাহিত্যাহুশীলনের ক্ষেত্রে তথা মানসিক চেতনার ক্রম জাগরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান অসামান্য। বর্তমান যুগের বিধান অনুযায়ী কোন কিছুই শুধু বসন্ত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ

ক্ষেত্রে প্রচারের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গতান্তর নেই। স্বভাবতই গ্রন্থাগারেরও প্রচারের প্রয়োজন। এই বক্তব্যকেই মুক্তি, বিপ্লব এবং নানাবিধ আলোচনার সাহায্যে উপায়ে গ্রহণে প্রতীতিত করেছেন শ্রীরাষ্ট্রকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রস্তুত জ্ঞানের তিনি অধিকারী। গ্রন্থাগারের প্রচারের সম্পর্কে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মূল্যবান। প্রাচীরপত্র, পত্রিকা, সিনেমা, বেতার, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রচার কেমন ধরণে করা যায়, কি ধরণের হওয়া উচিত, প্রচারকর্ম কি ভাবে সম্পাদন করা যায়, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের চিন্তাশীল মনের পরিচয় গ্রন্থে প্রফুট, তাঁর বক্তব্য ব্যেপ্ট সারবান। প্রচার সম্বন্ধেও তাঁর দক্ষতা বা জ্ঞান অসীম, গ্রন্থটি এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করে। প্রকাশক—গ্রন্থভবন, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—দুই টাকা মাত্র।

প্রণয়ী পঞ্চক।

কাহিনী-কাব্য কাব্য-সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এতাবৎকাল অসংখ্য কবি এই কাহিনী-কাব্যের মাধ্যমে আপন আপন স্বজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সাহিত্য সেবা করেছেন। তবুও এ দেশে বর্তমানকালে কাহিনী-কাব্য রচয়িতার সংখ্যা যে অনুপাতে হওয়া উচিত ছিল সে অনুপাতে যে হয়নি—আশা করি এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অথচ সে যুগে মধুসূদন, রসলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ প্রান্তঃস্বরণীয় কবিগণ এই কাহিনীকাব্যের মাধ্যমে দেশীয় কাব্যকে সমৃদ্ধির আশ্রয় উদ্ভাসিত করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি স্মৃতিতে রাখি ও সাহিত্যশিল্পী শ্রীলীল রায়ের কাহিনী-কাব্যের একটি সংকলন-গ্রন্থ। তাঁর পাঁচটি কাহিনী-কাব্য এর মধ্যে স্থান পেয়েছে—মহাভারত থেকে রম্যোন্মেষিত পাঁচটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে পাঁচটি কাহিনী তিনি কবিতায় রচনা করেছেন। এই পাঁচটি নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনা হতাশা-খাতনা তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে, পাঁচটির মধ্যে চারটির মূল সুর এক, কেবল তৃতীয়টি ভিন্নমর্মী। অন্তঃকলিতে নারীর দয়িতা রূপকেই লেখক হৃদয়ে তুলেছেন কিন্তু তৃতীয়টিতে নারীর দয়িতারূপের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্বপ্নের বৃত্তাকাণ্ডেও কবি অসামান্য দক্ষতা সহকারে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। কাহিনী-কাব্যগুলি সাবলীল, মনোময় এবং লালিত্যপূর্ণ, বর্ণনভঙ্গী, ঘটনা বিশ্লেষণ এবং বিভ্রাস-কুশলতা মনকে আকৃষ্ট করে। নারীচরিত্রের বিভিন্ন বৃত্তি, নারীর জীবন-লিঙ্গাস নারী জীবনের চাওয়া-পাওয়ার প্রধান প্রায় সম্পর্কে কবি পূর্ণসচেতন, তাঁর বিশ্লেষণী, শক্তির তার পরিচায়ক। ব্যঙ্গনায়, শিল্পকর্মে অভিনবত্ব সকল দিক দিয়েই গ্রন্থটি শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—নতুন প্রকাশক, ১০/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা মাত্র।

এক মুঠো আকাশ (নাটক)

মাসিক বঙ্গমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিখ্যাত উপজ্ঞাস এক মুঠো আকাশ সম্বন্ধে আজ নতুন করে আর করার কিছু নেই। বাঙালার নাট্যজগতে এই সার্থক উপজ্ঞাসটিকে স্বাভাবিক সন্মান প্রদর্শন করেছেন। লেখক কর্তৃক উপজ্ঞাসটি নাটকে রূপান্তরিত হয়ে কলকাতার রঙ্গালয়ে আজ সন্মারোহে অভিনীত হচ্ছে।

সম্প্রতি এই নাট্যরূপ গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। নাট্য-রূপাদানে ধনঞ্জয় বৈরাগী যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ কথা কবির অভিনয় নয়, সাহিত্য সৃষ্টির তুলনায় নাট্য সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা বিচুত্রাক্ষ কম নয়। নাটকের ধর্ম অল্পবাহী মূল উপজ্ঞাস থেকে অনেক রকম অদলবদল করা হয়েছে এবং কাহিনীর মূলরস তাকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। আত্মতন্মের দিক থেকে স্বভাবতই উপজ্ঞাসটির তুলনায় নাটকটি অনেক ক্ষুদ্র। যে সকল গুণাবলীর জগ্রে উপজ্ঞাসটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—সেই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নাটকটিও সমান জনপ্রিয় হয়ে ওঠার দক্ষতা রাখে। উপজ্ঞাসটির সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। নাটকটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর সন্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে, নাট্যজগতে এক বহু-আকাঙ্ক্ষিত নতুনত্বের সন্ধান দেবে এবং বাঙালার নাট্যসাহিত্যের এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—দুই টাকা মাত্র।

স্বপ্নতোক্তি

সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায় অধিকার করে আছে নাটক। জাতীয় চরিত্রের বিকাশে নাট্যজগতে সহায়তা করে বৈথে। এই নাট্যজগতের ইতিহাসও যেমনই গৌরবময়, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালার সাধারণ নাট্যজগতের বিশদ ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কিছুকাল আগেও ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বঙ্গমতীতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত উপজ্ঞাসটি রচনা করে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন শক্তিমান সাহিত্যিক প্রশান্ত চৌধুরী। উপজ্ঞাস হলেও এই গ্রন্থটিকে বাঙাল দেশের রঙ্গজগতের প্রামাণ্য ইতিহাস বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু ইতিহাসও নয়, সাহিত্যও তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, লেখনীর নিপুণতায়, গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। শুধু বাঙালার রঙ্গালয়েকে তুলে ধরেই লেখক খোদে যাননি ভারতের প্রথম নাটক, কি পরিবেশ, কেমন করে জন্মাল সে সম্বন্ধেই যথেষ্ট চিত্তহারী একটি ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য নাটক, অসংখ্য শিল্পীর সমন্বয়ে য় বিরাট নাট্যজগত গড়ে উঠেছে সেই জগতের হসিনী-কারা আনন্দ-বেদনা-রহস্য-বৈচিত্র্য অপরিমিত নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক হৃদয়ে তুলেছেন। রঙ্গমঞ্চের শ্রমী বা প্রধান শিল্পী ধারা লেখকের আলোচনা কেবল তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই জগতের সঙ্গে অভিজ্ঞ প্রবেশ দর্শক হিসেবে, শুভাভিযাত্রী হিসেবে এবং অন্তরালের নেপথ্যকর্মী হিসেবে ধারা যুক্ত এ গ্রন্থে তাঁরা কেউই অবহেলিত নন, বরং লেখক তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করেছেন। সামান্য কর্মী ধারা—রঙ্গসজ্জাকর, ভাণ্ডারী, বাদক, বারবান্দী এমন কি জুপের দড়ি টানে ধারা ভারী প্রত্যেকেই লেখকের কাছে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পায়। উপজ্ঞাসটিতে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য জগতে দৈনন্দিন বিভিন্ন ঘটনা কাহিনী, পরিবেশ লেখনীর কলাপে সার্থক ভাবে চিত্রিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় বহু তথ্যের আকর এই উপজ্ঞাসটি তাঁর প্রাপ্য সম্মানের লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। প্রকাশক ইন্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাই লিম্., ১৩ গান্ধী রোড। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা মাত্র।

মায়াপুরী

বাঙাল দেশের খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীঅখিল নিয়োগী (বপনবুড়া) অন্যতম। সুবীকাল ধরে বাঙালার

দ্রুত-গতিতে সেবা করে এসে শিশুসহনে নির্ভর আসন ইনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানকালে শিশুদের উপযোগী নৃত্যনাট্যের অভাব কম নয় যা আছে তাও স্বল্পসংখ্যক। শ্রীনিয়াগীর উপরোক্ত গ্রন্থটি সেই অভাব অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থটি সর্বোচ্চ গ্রন্থকারের দক্ষতার পরিচয় বহন করে, এর কাহিনীর অভিনব শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, বর্ণনভঙ্গী, সংলাপ কহিনের গতি সকল নিকেই সার্থকতার স্পর্শে ভরপুর হয়ে উঠেছে। শিশুসহল গ্রন্থটি যথার্থ সমাপ্তিরে বিভূষিত হোক—এট কামনাই আমরা করি। প্রকাশক—সাহিত্যচরনিকা ৫১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শেষনাপ

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে দীক্ষিত রাজকুমার নবগত নন, একাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। সিন এগিয়ে চলেছে যখনিয়মে, ভগবতের গায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই লাগছে পরিভ্রমের ছোঁয়ায়, জীবনের ধারা কত বদলে চলেছে তাই টিক-ঠিকানা নেই। একটি অঙ্কলের কথাই দ্যা নাক, আগে যে অঙ্কল ছিল রীতিমত অসম্মত, বোপ-বাড়-পরিপূর্ণ, দস্তা-মাপারোদের রাজত্ব, যে অঙ্কল সামন্ততন্ত্রের ছিল বিরাট প্রভাব, আবার যে অঙ্কলে প্রকৃতি উজ্জ্বল করে গেলে নিয়েছিল তাই যা কিছু সপল, সেই অঙ্কল কেমন করে ধীরে ধীরে তিলে তিলে পরিবর্তন হ'ল রীতিমত উন্নত, আলোকপ্রাপ্ত এক শিল্পপূর্ণী—তারই বর্ণাঙ্কল বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে। কল্প ও মানব পিতাপুত্রের চরিত্র দুটির মাধ্যমে নীতি ও আদর্শগত সংঘাতের একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে। লেখকের বচনা বসন্তাধী, চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসনীয়, বচনার বলিষ্ঠতা মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থের নামকরণটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—আশানাম পাণ্ডালিঙ্গার, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

দুই পকেট হাসি

বর্তমান যুগে রসসাহিত্যিকরূপে সাহিত্যের দরবারে যাদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে প্রবুদ্ধের নাম বিশেষ উল্লেখনীয়। শিরোনাম দেখেই আশা করি পাঠক-পাঠিকারা ব্যস্ততার পারছেন যে আলোচ্য গ্রন্থটিও হাস্যরসসমৃদ্ধ। টুকরো টুকরো অসংখ্য হাসির চুটকি গল্পে দুই শতাধিক পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি পূর্ণ। কাটুনও যুক্ত করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। চুটকি গল্পগুলির বিষয়বস্তুও একের মধ্যে গীমাবদ্ধ নয়, বহুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। গ্রন্থকারের মন বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে অতীব সচেতন। লেখকের চিন্তাধারা, কল্পনাসক্তি ও প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রসসৃষ্টির কঁকে কঁকে লেখক যায় দরদী, সংস্কৃতিবীল ও রসস্বন মনের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

চুটকি গল্পগুলি পরিবেশ উপভোগ্য, এবং লেখকের রসবচনা পাঠককে প্রভূত পরিমাণে আনন্দদায়ক করে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন শ্রীমন্তের গুণ। কাটুনও ও বাঙলার বিখ্যাত কাটুনিসের তুলিকাজাত। প্রকাশক—বঙ্গা প্রকাশনী, ২৭-সি আমহার্ট স্ট্রীট। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

কয়েকটি সাম্প্রতিক কালীন কাব্যগ্রন্থ

সাম্প্রতিক কালে যে ক'টি আধুনিক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মনোমোহনে সহায়তা করেছে, তাদের মধ্যে আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের মধুর দিনের গল্প, দেবতায় ঘটকের অকৃত্রিম, কুশল মিত্রের চৈতন্যের পলাশ ও মাহাবতী মেঘ এবং বিমল চক্রবর্তীর নন্দনের আলোয়—এই চারখানি বইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কবিতাগুলি উচ্চাঙ্গের, স্তব্ধক গভীর ভাবে স্পর্শ করে এক নতুনধর সন্ধান দেয়। কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের রস-রস অকৃত্রিমসম্পন্ন শিল্পমনের একটি সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। কবিত্বের প্রত্যেকের কতকগুলি কবিতা এক কথায় অনবদ্য। ভাবের দিক দিয়ে ছন্দের দিক দিয়ে ব্যঙ্গনার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থগুলি সর্বতোভাবে কবিত্বের প্রতিভার স্পর্শ বহন করেছে। গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। কেবল দেবতায় ঘটকের গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন কবি স্বয়ং। গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রকাশক গ্রন্থগণ্য, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। মূল্য—এক টাকা মাত্র (কেবল কুশল মিত্রের গ্রন্থের মূল্য—দুই টাকা মাত্র)।

নিঃসঙ্গ

উপরোক্ত গ্রন্থটি এক বিপ্লবীর আত্মকাহিনী। লেখক শ্রীসত্যেন্দ্র দে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে একদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও যথেষ্ট নিৰ্যাতনও ভোগ করতে বাধ্য হন। অতীতের সেই দ্রুতি, দেশের স্বাধীনতার মহান তপস্যার গৌরবোজ্জ্বল বিবরণী, শোষকের বিরুদ্ধে মুক্তিকামদের মুক্তি অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সকল সময়েই সমান মর্যাদাই পেয়ে আসে। কালের ব্যবধানে তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। কারাকাহিনী বর্ণনার লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসগন্ধী এই গ্রন্থে লেখকের সাহিত্যিক দক্ষতারও পরিচয় মেলে, তখনকার দিনের তরুণ সম্প্রদায়ের দেশের জন্তে সকল প্রকার স্বার্থত্যাগের এক হলধর প্রতিচ্ছবি লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। লেখকের ভ্রম সফল হোক। জীবনরসনা মন্তের প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনও প্রশংসনীয়। প্রকাশক—চক্রবর্তী চ্যাটার্জী ব্যাংক কোম্পানী লিমিটেড, ১৫ কলেজ রোড। দাম, তিন টাকা মাত্র।

Happiness is like coke—something you get as a by-product in the process of making something else.
—Aldous Huxley



জেনিফার জোনস

খুব বেশী দিনের কথা নয়, হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিস জেনিফার জোনস বোম-এ বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে রচিত 'এ ফোর ওয়েল টু আর্থ' এর স্রষ্টা সেরে তাঁর স্বামী প্রযোজক পরিচালক মি: ডেভিড ও. সেলজনিক সহ ভারতবর্ষে পাঁচ সপ্তাহের ভ্রমণ অবকাশ ঘাপন করতে এসেছিলেন। এ খবর শোষ করি আমাদের দেশের চিত্রাঙ্গাদীদের কাছে অজানা নেই। বর্তমানে হলিউডে কে কয় জন প্রথম জেনারী অভিনেত্রী আছেন মিস জোনস তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও অন্যতম। অবশ্য এই প্রথম জেনীতে মিস মেরিলিন হুন্সো, জেন মেলাফিল্ড ও অনিতা একবার্গের কোন স্থান নেই। কারণ তাঁর ভিন্ন স্তরের ও ভিন্ন রুচির অভিনেত্রী।

মিস জোনস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেটের টুলসা-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইসলম ষ্টক কোম্পানী নামে এক জায়গার বিয়েটার পাটের মালিক, পরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন। এই বিয়েটার পাট আমেরিকার বিভিন্ন সহরে তাঁর খাটরে অভিনয় করে ফেঁদাভেন। এঁদের অভিনীত "দি ওড হোমস্টেড", "ইষ্ট লীন" প্রভৃতি নাটকগুলি তখনকার দিনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে বিজ্ঞানের মহিমায় নিকর ছবি সবাক ছবিতে রূপান্তরিত হওয়ার ইসলে ষ্টক কোম্পানী উঠে যায় এবং জেনিফার-এর বাবা ফেরেটি সিনেমা-গৃহ তৈরী করে সেখানে সবাক ছায়াছবি দেখাতে শুরু করেন।

ছোটবেলা থেকেই নাট্য পরিবেশের মাঝে মগ্ন হইয়েছেন মিস জোনস। প্রতিদিন গভীর আগ্রহে তিনি বিয়েটার দেখতেন। সময়কের বৃক অভিনেতা অভিনেত্রীদের সুখ দুঃখ, আশা হতাশাকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। মাত্র চার বৎসর বয়সে জেনিফার ডান্স-এর উয়ল্লাইন একাডেমীতে ভর্তি হন। এই স্কুলের ছাত্রী থাকা কালে তিনি আবৃত্তি ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এখানকার শিক্ষাগ্রহণ শেষ হলে তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভের আশায় ওকলাহোমা সিটিতে চলে আসেন এবং স্টিকার্সিনোয় পড়াওনা শেষ করে আমেরিকার মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের একটি বিখ্যাত বিয়েটার কোম্পানীতে যোগদান করেন। প্রায় ছ'বৎসর তিনি এই বিয়েটার কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন। ছ'বাবা: বিয়েটারের প্রতি জেনিফারের গভীর আগ্রহ দেখে তাঁকে

নিউইয়র্কের আমেরিকান একাডেমী অব ড্রামাটিক আর্টস-এ ভর্তি করে দেন। কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর ইচ্ছা ছিল অন্তরঙ্গ। এ সময়ে মিস জোনস নিজেই বলেছেন—বাবা চেয়েছিলেন আমি আইন পড়ি। কিন্তু আমার বাক ছিল নাটকের প্রতি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি আমার মতেই মত দিলেন।

কিছুদিন পরে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সহপাঠী মি: রবার্ট ওয়াকার-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল জেনিফারের প্রথম পুত্র রবার্ট ওয়াকার জুনিয়ার ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ দ্বিতীয় পুত্র মাইকেল-এর জন্ম হয়। চার বৎসর পরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এই সময়ে তাঁর মনে হলিউডের চিত্রাঙ্গাদে 'তারকা' রূপে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বিশেষ ভাবে বলবতী হয়ে ওঠে। কিন্তু চিত্রঙ্গগতের কারো সাথে তাঁর পরিচয় না থাকায় তিনি প্রত্যাখ্যাত হন ও আবার রঙ্গমঞ্চেই অভিনয় শুরু করেন।

ছ'বৎসর পরের কথা। একদিন তিনি অভিনয়ের শেষে গ্রীষ্মকমে বসে মেকআপ, তুললেন। এমন সময় জেনিফা স্ববেণা তরঙ্গী সেখানে এসে বিনীত ভাবে তাঁর সাথে আলাপের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একটু বিবস্ত্র হয়েই জেনিফার তাঁকে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে তরঙ্গী তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন—আমি হলিউডের প্রযোজক পরিচালক ডেভিড ও. সেলজনিকের নিউইয়র্কস্থিত প্রতিনিধি মিস ক্যাথরিন ব্রাউন।

তাই নাকি?—খুশীতে স্তম্ভময়িবে উঠল জেনিফারের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অমার্জিত ব্যবহারের জগা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মিস ব্রাউন জেনিফারকে চলচ্চিত্রে যোগদানের জগা উৎসাহিত করলেন এবং প্রযোজক-পরিচালক মি: সেলজনিকের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মি: সেলজনিক জেনিফারের অভিনয়-প্রতিভায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিম্নোক্ত ছবি 'সঙ্গ অব বার্গায়েং'-এর নামভূমিকায় অভিনয়ের জগা মনোনীত করলেন। অবশ্য এই মনোনয়নের পূর্বে জেনিফারকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল।

নামভূমিকায় অভিনয়ের জগা ছয় জন অভিনেত্রীর নাম ঘোষণা করা হলেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় মিস জোনসই সঙ্গমানে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল দৈবলীলা (Vision) দর্শনের পর বার্গায়েং-এর মানসিক পরিবর্তন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিস জোনসের অভিব্যক্তি এত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত হয়েছিল সে পরিচালক মশায় নিজে পর্যাপ্ত এতটা আশা করেন নি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মিস জোনস বার্গায়েং-এর ভূমিকায় অভিনয় করে অন্তর পূর্বস্বার লাভ করেন।

বর্তমানে মিস জোনস পারিবারিক জীবনে প্রযোজক পরিচালক ডেভিড ও সেলজনিক-এর পত্নী। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তাঁদের একমাত্র কন্যা মেরি জেনিফারের জন্ম হয়। মিস জোনস মধুরভাষিণী ও সঙ্গীতপী। খ্যাতির হিমালয়-শীর্ষে আরোহণ করেও তাঁর মনে বিষমূর্ত অহংকার নেই। হলিউডের তথাকথিত চিত্রাঙ্গিনীদের মত পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তিনি নেগলিগ ও বিকিনি-মার্কা হুস্তা-বস্ত্রতা পছন্দ করেন না। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে সর্বদাই রুচি ও সঙ্গমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মিস জোনসের স্তম্ভ অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আবগপ্রবণ। তাই জাবাবেগপূর্ণ নাটকীয় দৃষ্টান্ত রূপেণ তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি 'সঙ্গ অব বার্গায়েং', 'দি ব্যারোট', অব উইম্পোল গীট', 'উই ওয়ায় ট্রেন্সফর্ম', 'ডুয়েল ইন দি সান', 'ম্যাগাম বোভারি'

‘লাও ইজ এ মেনিফেস্টার্ট থিং,’ ‘বট দি ডেজিল,’ ‘ইন্ডিক্রিশন্স অব আন আমেরিকান ওয়াইক,’ ‘গুড মরনিং,’ ‘মিস’ ডাড’ প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। এ যাবৎ আঠারোখানি চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন।

প্রতিদিন দেশ-বিদেশের অমুখ্যগী তত্ত্ববৃন্দের কাছ থেকে তিনি হাজার হাজার চিঠি পান। নানা আকারে ভরা সে সব চিঠি। যতদূর সাধ্য মিস্ জোনস্ তাঁর তত্ত্ববৃন্দের আশ্বাস পূরণের চেষ্টা করে থাকেন। সেক্রেটারী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে হাতে লিখে (টাইপ করে নয়) ফান্ মেলের উত্তর দিতে ভালোবাসেন। কারণটি সহজেই অস্বমেয়। প্রচুর খ্যাতি ও অর্থের মোহে আজো তিনি বিভ্রান্ত হননি। এ সবকিছু তাঁর অভিমত হল—আমার অভিনয় যদি কারো জীবনের ক্ষণিক অবসর মুহূর্তটুকু আনন্দ ভরে দিয়ে থাকে অথবা কোন সন্ধ্যায় তাঁর চুখভারাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথা—যেমনাকি লাঘব করতে বিনুমাঙ্গ সাহায্য করে থাকে তবে অভিনেত্রী হিসাবে সেইটাই হল আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা শিল্পী মাত্রেই কাম্য। কারণ শিল্পীর মূল্যায়ন তাঁরাই করে থাকেন।

সম্প্রতি বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্-এ অনুষ্ঠিত চিত্রমেলায় মিস্ জোনস্ বছরের সেরা (১৯৫৮) অভিনেত্রীরূপে সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন। আশা করি, জেনিফার অমুখ্যগীরা এ সুবাদে আনন্দিত হবেন।

—ঐদেবব্রত ঘোষ

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কলকাতার এক বোম্বাইয়ের মেট্রো সিনেমায় একযোগে কোর্ট ডালার মুক্তিলাভ করল ১৯৫১ সালে। এর পূর্বে মেট্রো সিনেমায় কোন ভারতীয় ছবি মুক্তিলাভ করে নি। অর্থাৎ ভারতীয় ছবির মধ্যে কোর্ট ডালারই প্রথম ছবি, যে মেট্রো সিনেমার মাধ্যমে সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করল। এবং বলা বাহুল্য, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রসজ্ঞ দর্শকসাধারণ এবং অভিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দের আত্মকৃত্যে, প্রশংসায় এবং সমর্থন ছবিটি সর্বোচ্চভাবে পূর্ণতা পেল। বোম্বাইতে তখন আমরা উপস্থিত থাকতে পারি নি, কারণ ঠিক সেই সময় নিউ থিয়েটার্সের হয়ে জিতাবী ‘মোনাকী’ ছবিটির গঠনকর্মে আমরা ভাষণ বাস্তব, স্টেজটাই ইত্যাদিগুরুত্ব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বোম্বাইতে কোর্ট ডালারের মুক্তিকালে উপস্থিত থাকা কিছুতেই আর আমাদের পক্ষে শেষ অবধি সম্ভবপর হয়ে উঠল না। বাই হোক, বোম্বাইতে যেতে পারি নি, তবে কলকাতায় কোর্ট ডালারের মুক্তি তো প্রত্যক্ষ করেছি আর তার আলোকোজ্জ্বল স্মৃতিও তো মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়।

এই ছবির কাছে মুক্তকণ্ঠে প্রকৃষ্ট স্বীকার করছি, আমাদের ব্যক্তিগত ধারণাও সীমা-পারিসীমা নেই। কারণ সম্পূর্ণরূপে ভারতে নির্মিত প্রথম আন্তর্জাতিক ছায়াছবির তারকারূপে অভিহিত হওয়ার পৌজ্য অর্জনে আমি সমর্থ হতে পেরেছি—এই ছবিই হলো।

১৯৪১ সালের কথা মনে পড়তেই বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় একজনর কথা। হরেনদাস’ কথা। আমাদের বহুকালের পারিবারিক

স্বন্ধু বাহাদুর অধিতীর প্রয়োজক বর্ণনায় ফলস্বরূপ কখনও ‘এক’ এবং ‘একমাত্র’ (one and only) আখ্যাটি বাহু-একমে ব্যবহার করলে বিনুমাঙ্গ কুল হয় না। শেষের নৃত্যশিল্পের ইতিহাসের একটি অধ্যায় পড়ে উঠেছে হরেনদাস’র অবিস্মরণীয় অবদানে। দানবর যেনকা, উদয়শঙ্কর প্রমুখ বহু দিগ্বিজয়ী নৃত্যশিল্পীদের ভারতীয় দর্শকের সামনে প্রথম উপস্থিত করার গৌরব হরেনদাস’রই। এই বছর (১৯৪১) দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের একটি আয়োজন করছিলেন হরেনদাস’। তাঁদের দল আমিও যেন বাই, এই ইচ্ছা হরেনদাস’ প্রকাশ করলেন—এ সম্পর্কে অস্ববোধে তিনি জানালেন মধুর কাহ্নে। অস্বস্তি আসনি মধুর পক্ষ থেকে—ঠিক সেই সময় বাহাদুর চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরব ও ইতিহাসপ্রসঙ্গ জীবনোন্মেষনাথ সরকারের নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে মোনাকী ছবির নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিল মধু। তাই তার নিজের পক্ষে আমাদের সঙ্গে বাওয়া শেষ অবধি সম্ভবপর হয়ে উঠল না।

আমরা, তারপর কোন একটি দিনে অকুরত আনন্দ সঙ্গে নিয়ে প্রচুর কৌতুহল মনের মধ্যে জমিয়ে যেখে বাজা শুরু করলুম দক্ষিণ-ভারত অভিমুখে। বিরাট একটি দল হল পুরো শিরিসজ্জায়, হরেনদাস’, সঙ্গীত পরিচালক তিমিরবরণ, মাধব বেদন প্রভৃতি। শেখোজ জন কোচিনে নৃত্যশিল্পী হিসেবে বসেই খ্যাতির অধিকারী। আমার নৃত্যসঙ্গী হিসেবে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটি জন্মের ইনিও যোগ দিতেছিলেন। রাজনর্তকী চরিতেও আমার নৃত্যসঙ্গীর ভূমিকার আপনারা (বীরা রাজনর্তকী দেখেছেন) একেই দেখতে পেয়েছেন।

দক্ষিণ-ভারত আমরা মহা আনন্দে বেড়ালাম, যেখানে গিয়েছি সেইখানেই পেয়েছি আশার অতীত সমাদর, আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা, পেয়েছি আন্তরিকতাপূর্ণ দরদী ব্যবহার, পেয়েছি সহস্রমতায় বহু পরশ।

আমাদের শিল্পোপহারে সেখানকার দর্শকদের মধ্যে যে কতখানি সাদা জাগিয়ে তুলেছিল তার একটি প্রমাণ আপনাদের সামনে কুলে ধরছি। একটি হলও এই প্রমাণ অনেকের তুলনায় কম নয়। যেখানে যেখানে আমাদের অস্থান সম্পন্ন হয়েছে, দর্শকদের অসীম আগ্রহে নির্ধারিত দিনেই অস্থানের সমাপ্তি ঘোষণা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমাদের পরিচালিত শেষ অস্থানটিকেও দেখা গেছে দর্শক সমায়ে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি—আমাদের স্মিত বাড়াতে হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করেও দর্শকদের ইচ্ছায় আরও ক’টা দিন যুক্ত করতে তার সঙ্গে, অস্থান-রজনীর সম্ভব করতে হয়েছে বহু।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছি সাংবাদিকদের কাছ থেকে। কৃতঃকৃষ্ট অভিনয়কে আমাদের ডবিরে তুলেছেন জনতার প্রতিনিধি সাংবাদিকদের দল। আমাদের অস্থান সম্পর্কে জনতার অল্পকুল মতামত রূপ পেল তাঁদের বলিষ্ঠ ও দরদী লেখনীর মাধ্যমে। সেদিনকার দক্ষিণ-ভারতীয় সাংবাদিকদের কয়েকটি অভিমতের অংশবিশেষ আজকের বঙ্গদেশের পাঠক-সাধারণের সামনে কুলে ধরছি—একটা কথা তার আগে বলে নিয়ে বিবরণী পরিষ্কার করে নেওয়াই ভালো। আত্মপ্রশংসার সুবিধিত প্রচারের স্বপক্ষে আমরা কোনভাবেই প্রত্ন নেই। স্বতন্ত্রাং সেট চরিত্রের মিত্র এই অভিমতগুলি

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনাথ ছোট গল্পের মধ্যে “হেড মাষ্টার” অষ্টমতম। সেই ছোট গল্পই বর্তমান পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিটির বক্তব্য দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে। এই হৃদয়গ্রন্থী ছবিটির কাহিনী এক শিক্ষাব্রতীর জীবনের বাস্তব-প্রতিবাস্তব বিশদায়ক কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সহস্র বাধা দুর্বোধ্যকে উপেক্ষা করে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নিজের সারা জীবনের আশর্ককে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে সেই বিষয়ে এক স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এর কাহিনীর মাধ্যমে। হেড মাষ্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন চরিত্রটি লেখকের এক ‘কুপূর্ণ সৃষ্টি’—আর এই সার্থক সৃষ্টি চলচ্চিত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ছবি বিখ্যাসের অনবদ্য অভিনয়ে। ছবি বিখ্যাস অভিনীত সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণপ্রসন্ন চরিত্রটিকে অষ্টমতম শ্রেষ্ঠ বলে অনারাসে অভিহিত করা যায়। মানবিক আবেদনে ছবিটি ভরপুর। হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই এর আবেদন বঙ্গা না দিয়ে পারবেন না। ছবিতে বৃষ্ণ গান্ধি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাপুত্রের লেখনীজাত। স্বরাষ্ট্রের কবলেই দুইজন লালগুপ্ত। অগ্রগামী পরজাতিত ছবিটিতে ছবি বিখ্যাস ছাড়া বিভিন্ন কৃষিকার রূপ দিয়েছেন নবগোত জামাল খোয়াল, শিশির বটগাল, গুণাগণ বব্ব, মণি শ্রীমানী, শোভা সেন, ককরা বক্যোপাধ্যায় ও নবগোত স্বকনা বক্যোপাধ্যায় (দক্ষিণী বৃষ্ণজয় বক্যোপাধ্যায়ের ককা)।

'হুতোরই তাল ভালে' হাবিট কাহিনীকার পরিচালক স্বরীন্দ্রনাথ বর্ষভার বাকর বহন করছে। সর্বতোভাবে হাবিট অসাক্ষ্য বরণ করে নিচ্ছে। চর্লস কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপায়নের মধ্যেও আপা বা সভাবনা আশঙ্কাক্ষণ করা না। এক সভাবনাতীয়তার আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে বাস্তবায়ন বৈশিষ্ট্য, স্বাভাব্য ও নিম্নবতার মূল্য কঠোরভাবে করা হয়েছে। হাবির মধুর গতি দর্শককে বিশেষভাবে পীড়া দেয়। চিত্রনাট্যও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। হাবিটির মধ্যে বরীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জহুলপ্রসাদ প্রভৃতির গানগুলি যুক্ত করে হাবির অনেক ঘোঁর ঢেকে দেওয়া হয়েছে। গানগুলি এবং হুতোরই হাবিটির একমাত্র আকর্ষণ বললেই হয়, তাঁর কলেই হাবিটির অসংখ্য জটিল অনেকাংশ চাপা পড়ে গেছে। হাবির তিনটি প্রধান কৃমিকারও তিনজন অবাঙালী—সোণীকুমার, হাগিগিও সুকুমারী। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে হাবিটিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাজাল, অসিতবরণ, ইন্দ্রনাথ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শতপতি হুতু, পদ্মা দেবী, সন্ধ্যা দাস, ভারতী দাস, মিতা চট্টোপাধ্যায়, হাজলক্ষী প্রভৃতি। শান্তির বোম্ব, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতির কণ্ঠস্বরও হাবিটির এক বিশেষ আকর্ষণ।

আজকের দিনের বহুধাবিকৃত সমাজের প্রধানতম দুটো স্তরই চোখে পড়ে। "HAVE"দের জ্বর আর "HAVE NOT"দের জ্বর, একদল উপরের মহলে বাস করে, হাওয়ার ওড়ে, নীচের মহলের বাসিন্দাদের মায়ূষ বলে গণ্যই করে না। সুখের পায়দার দল এরা, আর একদল নীচের মহলে বাস করে, উপরের মহলের উপেক্ষাই যেন এর প্রাপ্য। বাস্তব জগৎ এদের সামনে দেখা দেয় কষ্টের সূত্রিতে, এদের বিচ্যেত হয় বৃদ্ধ করে, জীবনযুদ্ধ। এই যে দুটো স্তর এদের পরস্পরকে বিভক্ত করেছে কানুনকৌলীনা। তবে স্তরগত প্রেমের বহু উর্ধ্বে প্রতিভার অবস্থিতি, পরিবেশ যত প্রতিকূলই হোক না প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ একদিন না একদিন ঘটবেই। তার প্রাপ্য সমাদর মিলবেই, এই গটকমিকা অবলম্বন করে "অরিসম্ভব"র গল্পাঙ্গের সৃষ্টি। লেখিকা শান্তি দাশগুপ্তের লেখনীর স্বকলীশক্তির প্রকৃত পরিচায়ক বলে গল্পটিকে অভিহিত করা যায়। এর চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। এই রক্তচক্রের দ্বারা আজকের সমাজে যে অসাম্য দেখা দিয়েছে তার কল সমাজের পক্ষেই যে কতখানি ভয়াবহ, সেমিকেও হাবিটির মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি মুগোপযোগী বলিষ্ঠ ও সারবান কাহিনী পরিবেশিত করলে পরিচালক সুশীল মজুমদার। হাবিটির জোরালো বক্তব্য দর্শকমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। হাবির সুরসৃষ্টি করেছেন কালোবরণ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অমর মল্লিক, ভুবন চৌধুরী, তরুণকুমার, প্রোমো বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান তিলক, শ্রীমান দেবানন্দ, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, কুমারী শিবানী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

ইন্ড্রজাল

জগতের দরবারে বাস্তবায়ন গৌরব বর্ধনে বীরা সহায়তা করেছেন, বিখ্যাত বাহুশিল্পী প্রতুলচন্দ্র সরকার বা পি. সি. সরকার তাঁদের অজ্ঞত। বাহুর হিসেবে তাঁর প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত এবং সে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক করে কিছু বলারও নেই। জগতের

শ্রেষ্ঠ বাহুশিল্পীদের দরবারে একটি বিশিষ্ট আসন তাঁর। জগৎ সংরক্ষিত। কলকাতার তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনীও জনগণের প্রচুর সমাদরে সর্বাঙ্গসম্মত হয়ে উঠেছে। তাঁর বর্তমান প্রদর্শনীর বিশেষ এই যে, এ বছর নতুন ধরণের কয়েকটি বাহুরকৌড়া তাঁর অমুঠানসূচীর তালিকা বৃদ্ধি করেছে। তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রদর্শনীটি সর্বতোভাবে নৈপুণ্য, মৃদুতা ও চমৎকারিত্বের বাকর বহন করে—কয়েকটি ক্ষেত্রে বাহুরসূচী অবিদ্যমানীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কৌড়াগুলির প্রত্যেকটি অভিনয় এবং অতুলনীয়। সমগ্র অমুঠানটি আবালবৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন। প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই বাহুর প্রদর্শনীটি কেবলমাত্র কয়েকটি কৌশলপ্রধান কৌড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে সঙ্গ সমানভাবে তাল বেঁধে গিনোয়া, থিয়েটার, হাউসের অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন বাহুরসূচী শ্রী সরকার। দক্ষসজা আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বাঙ্গের তাঁর অভিজ্ঞ সহকারীদের কর্মমুগো "ইন্ড্রজাল" পুরম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, ইন্ড্রজাল দর্শকের মনে যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই অমুঠানটির মধ্যে একাধিক ভাব্য, গণিতে ও চিত্রশিল্পে শ্রী সরকারের ব্যুৎপত্তির প্রমাণ মেলে। মনোমুগ্ধকর বহু বাহুরকৌশল প্রদর্শন করে সমগ্র অমুঠানটির মধ্যে তিনি যে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

রক্তপট প্রসঙ্গে

তরুণ পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনার স্বরীর হাজহার "কোন এক দিন" কাহিনীটির চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে। রূপায়ণে দেখা যাবে কমল মিত্র, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, শোভা সেন, তপসী ঘোষ, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গকে। প্রখ্যাত চিত্রকর বিপ্লব চক্রবর্তীর পরিচালনার বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী "অবাক পৃথিবী"র চিত্ররূপ গৃহীত হচ্ছে। রূপালী পদ্মার দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, জহর দাস, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান লাহা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, সবিতা গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পিবর্গকে। হেমন্তাহুজ শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে দেখা যাবে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনার "সখের চোর" হাবিটিতে অভিনয়শাশে অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সাজাল, কমল মিত্র, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, ভাষ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বাসবী নন্দী প্রভৃতি শিল্পিবর্গ। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জ্যোতিষ্ময় দাস। বাসবিতারী লালের দেখা "সোনার হরিণ"-এর চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে মঞ্জল চক্রবর্তীর পরিচালনায়। অভিনয়শাশে দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, বিপিন গুপ্ত, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, অপ্রিয়া চৌধুরী, নমিতা সিংহ, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের। সুর-যোজনায় দারিৎ গ্রন্থ কবেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় মিনারিহান ছবি "চলতি পাথের প্রহি" হাবিতে অভিনয় করেছেন বলে বীদেব নাম জানা গেছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, পূর্ণক মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বরান দাস (বাঘা বতীন খাত), এবং দীপ্তি দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

● দেশে-বিদেশে ●

ভাঙ্গ, ১৩৬৬ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ভাঙ্গ (১৮ই আগষ্ট) : পণ্ডিতেরা বিধান সভায় অস্ত্রস্বত্ব মিস্কান্সনে কংগ্রেস দলের জয়লাভ—মোট ৩৯টি আসনের মধ্যে ২১টি আমিন অধিকার।

২রা ভাঙ্গ (১১শে আগষ্ট) : কলিকাতার হুই দিবসব্যাপী পাক-ভারত বৈঠক সম্পন্ন—টুকরগ্রাম ও পাখারিয়া বনাকলের (আসাম) সীমারেখা সন্ধাক্ত রিপোর্টের অধীনাংসিত আলোচনা ;

৩রা ভাঙ্গ (২০শে আগষ্ট) : সরকারী খাজনাত্তির প্রতিবাদে ও সত্তা দবে খাজনাপ্রবাসী চাউলের দাবীতে মূল্য বৃদ্ধি ও ত্তিক প্রতিবাদ কমিটির উক্তোণ কলিকাতা ও সারা পশ্চিমবঙ্গে গণ-সংগ্রাম ও আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ।

কেবল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির বোষণা (কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ) লোকসভায় ২৭.০.৩৮ ভোটে অনুমোদিত—প্রতিবাদে কম্যুনিষ্ট সমস্তদের সত্যাক ভাগ।

৪ঠা ভাঙ্গ (২১শে আগষ্ট) : প্রধানমন্ত্রী জিনেহরর নিকট কেন্দ্রীয় খাজ ও কৃষি সচিব জীঅজিতপ্রসাদ জৈনের পরত্যাগপত্র পেশ।

৫ই ভাঙ্গ (২২শে আগষ্ট) : শিকং-এ আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ হক্কাল আলির (৭৩) পরলোকগমন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলিকাতা ও সহরতলীর প্রায় ৩০ হাজার কর্মচারীর বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পূরণের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাস ভবনের সম্মুখে বিকোভ।

৬ই ভাঙ্গ (২৩শে আগষ্ট) : মুসৌয়ীতে দালাই লামার বিবৃতি— ত্তিকতের সংগ্রামে এ বাকং ৮০ হাজার লোক নিহত।

৭ই ভাঙ্গ (২৪শে আগষ্ট) : পে-কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ—অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ বৎসরের হলে ৫৮ বৎসর পর্য্যন্তের সুপারিশ।

দক্ষিণ আফ্রিকা বসবাসকারী ভারতীয়দের দায়িত্ব দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী জিনেহরর বোষণা।

৮ই ভাঙ্গ (২৫শে আগষ্ট) : খাজ-আন্দোলনের ৬ষ্ঠ দিবসে হাওড়া, আমতা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খাজ-আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের লাঠি চালনা।

৯ই ভাঙ্গ (২৬শে আগষ্ট) : চীনা সৈন্তবাহিনী কর্তৃক ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন ও নেফায় (উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী) বাম্পাদেশের সহিত তুমুল সংঘর্ষের সবাদ।

১০ই ভাঙ্গ (২৭শে আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গের খাজবিহা-খর্যাসোলনার জন্ত ১২ জন কংগ্রেসী পালামেটোরী সমস্তের কলিকাতা। উপস্থিতি এবং রাইটাস বিজিংস-এ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাজমন্ত্রী জীপ্রকৃষ্ণচন্দ্র সেনের সহিত আলোচনা।

১১ই ভাঙ্গ (২৮শে আগষ্ট) : লোকসভায় জিনেহরর বোষণা— ভারতের নেফা অঞ্চলে দকী খাঁটিতে চীনা ফৌজের হামলা ও প্রবল জর্জর—লাডকে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া চীনাদের খাঁটি স্থাপন।

মিখর্ভনমুলক আটক আইনে কাউন্সিলার প্রেক্ষাপ্রের প্রতিবাদে ইউ, সি, সি, কাউন্সিলারদের একযোগে কার্যকরেশন সত্তা জ্ঞাপ।

১২ই ভাঙ্গ (২৯শে আগষ্ট) : ভারতসত্তা (কলিকাতা) হলে অনুষ্ঠিত রাইনকীবী ও শিকাবিন্দের সভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমননীতি ও জনস্বার্থ-বিবোধী খাজনাত্তির প্রতিবাদ—সভায় সুস্পষ্ট অভিযত বে, ভায়া দাবীর জন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার আইনসম্বন্ধে সংবিধানসম্বন্ধ।

১৩ই ভাঙ্গ (৩০শে আগষ্ট) : ত্তিকতের প্রের রাষ্ট্রসম্মে উপাধানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দিল্লীতে দালাই লামার বোষণা।

১৪ই ভাঙ্গ (৩১শে আগষ্ট) : খাজের দাবীতে রাইটাস বিজিংস অভিধানকারী গণ-মিছিলের উপর পুলিশের বেশবোরা লাঠিচার্জ ও কাঁহলে গ্যাস প্রয়োগ—পাঁচ শতাধিক লোক আহত ও ৭০ জন প্রেক্ষায়।

১৫ই ভাঙ্গ (১লা সেপ্টেম্বর) : খাজ আন্দোলন প্রসঙ্গে কলিকাতার পুলিশের গুলীবর্ষণে ৭ জন নিহত ও ৬৫ জন আহত।

পারম্পরিক আলোচনা মারকত পাক-ভারত অধীনাংসিত প্রক্সসমূহের মীমাংসা প্রস্তাবে মতৈক্য—প্রধান মন্ত্রী জিনেহর (ভারত) ও জেনারেল আবুয খানের (পাকিস্তান) বৈঠকান্তে যুক্ত ইস্তাহার।

১৬ই ভাঙ্গ (২০শে সেপ্টেম্বর) : খাজ আন্দোলনের জেম— পুলিশের গুলীবর্ষণে কলিকাতায় পুনরায় ৪০ জন আহত—কয়েকটি খানা আক্রান্ত।

প্রধান মন্ত্রী জিনেহরর অনুযোখে ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল বিমারায় উপস্থাপিত পরত্যাগপত্র প্রত্যাহার।

১৭ই ভাঙ্গ (৩রা সেপ্টেম্বর) : পুলিশের সহিত বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষে কলিকাতা ও হাওড়ায় ১৫ ব্যক্তি নিহত—হাওড়ায় হাঙ্গা (খাজ আন্দোলন সংক্রান্ত) দমনে মিলিটারী তলব।

মূল্যবৃদ্ধি ও ত্তিক প্রতিবাদে কমিটির আহবানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অগণতান্ত্রিক খাজনীতি ও পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ-বরূপ কলিকাতা-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণ হরতাল পালিত।

দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী জিনেহর ও দেশরক্ষা সচিব জীকৃষ্ণ মেননের সহিত দালাইলামার (ত্তিকত) দীর্ঘ বৈঠক।

১৮ই ভাঙ্গ (৪ঠা সেপ্টেম্বর) : ৪ দিন হাঙ্গামা ও বিপর্য্যত অবস্থা চলার পর কলিকাতা মহানগরীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চাল।

১৯শে ভাঙ্গ (৫ই সেপ্টেম্বর) : ভারত-চীন সীমান্তে পুনরায় সংঘর্ষ—৭জন চীনা ও একজন ভারতীয় নিহত হওয়ার সবাদ।

২০শে ভাঙ্গ (৬ই সেপ্টেম্বর) : ত্তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন—কংগ্রেস পরিকল্পনা সাব-কমিটির চারদফা সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ।

২১শে ভাঙ্গ (৭ই সেপ্টেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী জিনেহর কর্তৃক চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে পালামেটে ১২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী বেতপত্র পেশ।

২২শে ভাঙ্গ (৮ই সেপ্টেম্বর) : নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী জিনেহরর সহিত লাওসের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বামপাল যুক্তের সাক্ষাৎকার ও লাওস পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

খাজ আন্দোলন ব্যাপারে আপোষের চেষ্টার পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত জীকৃষ্ণে ও জীজিবিব দৌরী

দাঁত ও ঠাণ্ডা ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে
দাঁত ও ঠাণ্ডা সহজ করে তোলে।



দাঁত ও ঠাণ্ডার সমস্যা? মাড়ীর ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার
আঙ্গুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙুলটা ডুবিয়ে
দিন তারপর আঙুলে আঙুলে শিশুর মাড়ীতে মালিশ করে দিন
এবং ভাড়াভাড়া ব্যথা কমে যাবে আর এর নিষ্টি ও সুবাস
শিশুর প্রিয়। এটা বিস্তৃত এবং গৃহকক্ষে, ওষুধ হিসাবে, প্রসঙ্গেন
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুপনটি করে নীচের ঠিকানার পাঠান :
হিন্দুস্থান লিটারি লিমিটেড, পোষ্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে অনুরোধ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকক্ষে ব্যবহার
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

B.M.C

ডিস্ট্রিবিউটারস : আই. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লি: কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

ও শ্রীঅবিনব ঘোষাল—এই তিনজন বামপন্থী পার্লামেন্ট সদস্যের বৈঠক।

২৩শে ভাদ্র (১ই সেপ্টেম্বর): জাতীয় আয়বুদ্ধির দিক হইতে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিকতার পর্যাবসিত—ভারতীয় বিজ্ঞান ব্যাক্তের রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ।

২৪শে ভাদ্র (১ই সেপ্টেম্বর): ম্যাকমোহন লাইনই চীন-ভারত সীমারেখা—এই দাবীর ভিত্তিতে চীনের নিকট ভারতের আর এক দফা কড়া নোট প্রেরণ।

কলিকাতা ও পাণ্ডুৱতী অঞ্চল হইতে খাজ আন্দোলন এসঙ্গে ফলস্ব ১৪৪ ধারা প্রজ্ঞাপন।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বর্ষের অভিজিত খালসতের চাহিলা কেন্দ্র খুল করা যাবে—নব নিযুক্ত কেন্দ্রীয় খাজ সচিব শ্রী এস কে পাতিলের ঘোষণা।

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): খাজ আন্দোলন এসঙ্গে কলিকাতা ও হাওড়ার বৃত্ত বন্দীদের মধ্যে মূল্যবুদ্ধি ও হৃতিক প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার বসু প্রমুখ ৫৭ জনের (১৩ জন বিধান সভা সদস্য) মুক্তিলাভ।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): খাজ আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মূল্য বুদ্ধি ও হৃতিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কলিকাতায় বিরাট মৌন শোক-মিছিল।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): ক্রমাগত সন্তোষকর প্রবল বর্ষণের ফলে বৃহত্তর কলিকাতার ২৫ বর্গমাইল অঞ্চল (বহু উদ্বাস্ত কলোনি) জলময় ও জনগণের অপরিমিত দুঃখ দুর্দশা।

৩০শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): মূল্য বুদ্ধি ও হৃতিক প্রতিরোধ কমিটির খাজ আন্দোলনের সময় হাওড়ার পুলিশের সাম্প্রতিক জব্দবর্ষণ সম্পর্কে শাসন বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা রাষ্ট্রপতির নিকট যে অভিযোগ পেশ করে, রাজ্য সরকার কর্তৃক উহার জবাব দান। জবাবে কম্যুনিষ্টদের সকল অভিযোগ অস্বীকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে পান্টা অভিযোগ।

বহির্দেশীয়:—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট): আণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রসঙ্গ রাষ্ট্রসংঘে আলোচনার্থ রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল দাগ হ্যামারফ-জোন্সের নিকট ভারতের প্রস্তাব।

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): জেনেভা ত্রিশক্তি আণবিক সম্মেলনে রুশিয়ার ঘোষণা—গোপন অস্ত্র পরীক্ষা সম্পর্কে সম্মেলনক স্থান পর্যবেক্ষণ চালানার পশ্চিমী প্রস্তাব নীতিগতভাবে মানিয়া লইতে সে প্রস্তাব।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের স্বাক্ষর ক্রমে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম জন্মজ্যো পূর্ণিত।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট): লাওসের রাজধানী লুয়াংপ্রাবাং-এর ৫০ মাইল মধ্যে বিদ্রোহীদের সমস্ত অভিধান।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট): ইউরোপীয় রাজধানীগুলি সরকার প্রথম পর্যায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বন (পশ্চিম জার্মানী) উপস্থিতি।

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট): ছই জাধানীর মধ্যে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠানের ব্যাকুলতায় পশ্চিম জার্মানি চান্সেলার ডাঃ কেরনার 'আমেরিকার নিকট রূপ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুস্কেভের পত্র।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়া—বাকিংহামসারারে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হারল্ড ম্যাকমিলন ও পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সেলুইন লসেভের মধ্যে জল্পনী আলোচনা।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট): লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ হারল্ড ম্যাকমিলানের (বৃটেন) সহিত সম্বন্ধকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার।

১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর): চীনভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘন করে মাই—চীনা পররাষ্ট্র সচিব মার্শাল চেন ইয়াং-ই ঘোষণা।

ঢাকা হইতে পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খানের ঘোষণা—পাকিস্তানে নতুন ধাঁচের গণতন্ত্র প্রবর্তনের আয়োজন করা হইয়াছে।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার—পার্লমেন্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

অবিলম্বে লাওসে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী প্রেরণের জন্য লাও সরকারের অনুমোদন—উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): লাওস পরিব্রাজিত এসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের জল্পনী অবিরোধন শুরু।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): লাওসের পরিব্রাজিত সম্পর্কে তদন্তের জন্য রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক জাপান, ইতালী, তিউনিসিয়া ও আর্জেন্টিনা—এই চার সদস্য লইয়া কমিটি গঠন।

২৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): শ্রীনেহরুর নিকট চৌ এন্ লাই-এর (চীন প্রধানমন্ত্রী) পত্র—বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করা হউক।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): তিস্তা প্রদেশে আগ হস্তক্ষেপের জন্য হালাইলামা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন পেশ।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): চীনা পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর ঘোষণা—পঞ্চশীলের (সহ-অবস্থানমূলক) ভিত্তিতে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হইবে।

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সাক্ষরিত সহিত চম্ভাভিষে মহাজাগতিক রকেট (লুনিচ-২) উৎক্ষেপণ।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): রূপ রকেট লুনিচ-২ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষেপিত হওয়ার ৩৪ ঘণ্টা পরই চম্ভাভিষে উপনীত—সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ঘোষণা।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) চারদিকব্যাপী আকপানিস্থান সফর শুরু।

২৯শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): আমেরিকার ১৩দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক সফর রূপ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিটা ক্রুস্কেভের ওয়াশিংটন উপস্থিতি।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত প্রাথমিক বৈঠকান্তে এক সরকারী ভোক্তাভার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুস্কেভের ঘোষণা—'ঠাণ্ডা লড়াই-এর দুয়ারপূর্ণ' ভিত্তিতে শুরু করিয়াছে।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত
এরূপ সহস্রবারে উৎসর মত কোথাও প্রোৎসারিত হয় নাই।
যেন স্তম্ভের ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন স্রবের মিশ্রণ
যার কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাক্যলার সব সীতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ,
কবির বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু কবি
বি বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

বিবির জীবনী, সুবিদিত সমালোচনা সহ স্রবহং গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা।

বঙ্গবতীর প্রের্ত অবদান শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

প্রখ্যাত কথামিশ্রী
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মুনির্বাচিত এই ৭খানি গ্রন্থের মণিমাণিক্য
১। শরজোতা, ২। সার-চৌধুরা, ৩। ছায়াছবি,
৪। সত্যের কাঁটা বা গঙ্গা-বনুনা, ৫। অক্লণোদয়,
৬। ধ্বংসপথের যাত্রী এরা এবং ৭। কয়লা কুটি।
মূল্য ৮ পেন্সী, ৩২৮ পৃষ্ঠার বহুং গ্রন্থ।

মূল্য মাত্র তিন টাকা।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের বাহুর গীতেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

ইহাতে আছে ৫ খানি স্রবহং ভিত্তিক উপন্যাস
১। রঞ্জিত, ২। কয়েদীর গুপ্তকথা, ৩। কুতান্দের
৪। টাকের উপর টেকা, ৫। স্রবের ঢেঁকী।

মূল্য ৩।।০ টাকা।

উপন্যাস-সাহিত্যের বাহুর সরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী

দুই বাগলী, রক্তের টান, পিপাসা, প্রথম প্রতিমা,
মিথ্যের ঠাকুর (বোঝাপড়া), বন্ধন, মাছুষ প্রভৃতি।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

জনতার দরদী নিপুণ কথামিশ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মানিক গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং পঁচিশটি মুনির্বাচিত
গল্পমিশ্র। মূল্য দুই টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি সুখ্যাতি উপন্যাস এবং বহুপ্রশংসিত
চৌদ্দটি গল্প। মূল্য দুই টাকা।

প্রখ্যাত কথামিশ্রী শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপদ গ্রন্থাবলী

—মিশ্র গ্রন্থগুলি দলিবিষ্ট—

- ১। শাশত পিপাসা, ২। প্রেম ও পৃথিবী,
- ৩। মায়াজাল, ৪। স্তম্ভের স্রব, ৫। সংশোধন,
- ৬। কত, ৭। প্রতিবিম্ব, ৮। জোরার ভাটা,
- ৯। মৃত্যু জগতে ও ১০। ভয়।

মূল্য ৮ পেন্সী ৩২২ পৃষ্ঠার বহুং গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা।

কথা ও কাহিনীর বাহুর প্রেমোন্মত্ত মিত্রের

প্রেমোন্মত্ত-গ্রন্থাবলী

—গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত—

মিছিল, প্রতিশোধ, পরোপকার, একটি কথা
টোটে, নিরুদ্দেশ, পাছখালা, মহানগর, অরণ্যপথ
হল জন্ম, নতুন বাসা, বৃষ্টি, নির্জলবাস, ছোট গল্প
রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), অজিয়ান কবিতা (প্রবন্ধ)।

মূল্য আড়াই টাকা।

বলিষ্ঠ কথামিশ্রী শ্রীজগদীশ গুপ্তের

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

লক্ষ্য (উপন্যাস), রতি ও বিরতি (উপন্যাস),
অসামু সিদ্ধার্থ (উপন্যাস), রোমন্থন (উপন্যাস),
হুলালের দোলা (উপন্যাস), লক্ষা ও কৃষ্ণা (উপন্যাস),
গতিহারী জাহাঙ্গীর (উপন্যাস), বধ্যভূমে (উপন্যাস),
বয়স্ক মল্লিক ও মল্লিকা, স্মৃতিলা, শরৎচন্দ্রের
শেষের পরিচয়।

মূল্য তিন টাকা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশপ্রেম

“কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস আন্দোলনের মূল ভিত্তি বরাবরই জাতীয়তাবাদ এবং এই লক্ষ্য হইতে কোনদিনই কংগ্রেস বিচ্যুত হইতে পারে না। শ্রীমতী ইন্দিরার এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া আর কিছু না হউক তাঁহার দুঃসাহসের প্রশংসা করিতেই হয়। ইতিহাস বিস্মৃত করিতে হইলে সাহসের চেয়ে দুঃসাহসের প্রয়োজন বেশি। কংগ্রেস সভানেত্রীর সেই দুঃসাহস ইদানীং খুবই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অথও ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ছুই ছুই করা করিবা। পরও নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে যে কংগ্রেস সভানেত্রী সাহস করিয়াছেন—ইহাও কম কথা নয়। কিন্তু দুঃসাহস দেখাইয়াও কি দেশের লোকের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। কংগ্রেসের আশ্বাসের মধ্যে আর বাহাই থাক, জাতীয়তাবাদ কোনদিন ছিল না—ছিল মুসলিম লীগের জায় চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে তোষণ করার আদি এবং অকৃত্রিম চেষ্টা। সেই প্রচেষ্টার ফলেই যে শেষ অবধি ভারত বিভক্ত হইয়াছে, একথা স্বয়ং মোলানা আব্বাস ও ‘আম্ভজীবনী’তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইদানীং কংগ্রেস নেতার্য্য অস্ত্রাচ্ছ বিরোধী মনসের দেশপ্রেমের প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য দাবী জানাইয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু বাহার প্রারম্ভিক ভারতবর্ষ ক্ষমতার সোভে বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, সেই কংগ্রেস নায়কদের দেশপ্রেমিকতার প্রমাণ কি সর্ব-প্রথম পাওয়া লক্ষ্যকার নয়?”

—দৈনিক বহুমতী।

ভারত-চীন

“ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ লইয়া আলাপ-আলোচনার যে প্রস্তাব উঠিয়াছে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকিবার প্রয়োজন আছে। আপাতত চীন সরকার ভারতভূমিতে সাময়িক অভিযান চালানো হইতে বিরত থাকিতে পারেন। পিকিং হইতে লাসা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে এবং লাসা হইতে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত সৈন্যচালনের উপযুক্ত সড়ক তৈয়ারী করিতে চীন সরকারের আরও দুই-এক বৎসর সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের উত্তর সীমান্ত অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হাড়া টানা সৈন্যবাহিনী ভারতভূমির যে সমস্ত জায়গা অজ্ঞাতভাবে দখল করিয়াছে সেগুলি পুনরুদ্ধার করা না গেলে পিকিং সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা নিরর্থক প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ভিত্তি পড়ে শ্রীমতী এন লাই জনাইয়াছিলেন, আলাপ-আলোচনার সময় ‘হিটাবহা’ বজায় রাখা সম্ভব। ইহার অর্থ মোটেই স্পষ্ট নয়। ভারতভূমির যে সকল জায়গা বলপূর্বক দখল করা হইয়াছে সেগুলি হইতে চীনা সৈন্যগণ বিদায় না লইলে ‘হিটাবহা’র সমানজনক ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা স্ক্র হইতে পারে না।

নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি-গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় এলাকার চীনের অধিকার প্রবেশ অবশ্য প্রতিরোধ করিতে হইবে (must be resisted) ইহা ভাল কথা। কিন্তু যে জায়গাগুলি চীন সরকার দখল করিয়াছেন সেগুলি উদ্ধারের জন্য কী ব্যবস্থা হইতেছে? নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীনেহরু কিছুটা স্তব্র চড়াইয়া বলিয়াছেন, “দরকার হইলে, সাগ্রাম করিতেই হইবে।” অতঃপর প্রধানমন্ত্রী নেহরু কবে কখন এবং কী অবস্থায় দরকারটা দেখাচিত দৃঢ়তার সহিত উপলব্ধি করিবেন তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী উৎসুক রহিল।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা

“দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২০টির বেশী ক্ষুদ্রশিল্প সমিতির প্রতিনিধিগণ দিল্লীতে সমবেত হইয়া সর্ব ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প সন্থ গঠন করিয়াছেন। ইহার ফলে ছোট ছোট শিল্পের সাংগঠনিক দুর্বলতাজনিত জটিল উপসর্গের প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে। এখন সাংগঠনিক যুগ, কথায় বলে নশের লাঠি একের বোঝা। ছোট ছোট শিল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত; যন্ত্রসজ্জায় ও অর্থসঙ্গতিতে নিত্য দুর্বল, যথাসম্ভব সস্তা দরে কাঁচামাল ক্রয়ের, তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিয়া শ্রাব্যদের পাওয়ার এবং প্রয়োজন অমূল্যে দান বা ঋণ জোগাড় করার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আকাশে এবং ঐশ্বর্য়ে নগণ্য বলিয়া সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়া জাধ্য ব্যবহারও ইহার অনেক সময় পায় না। সরকারের পক্ষেও অবশ্য হাজার হাজার ছোট ছোট শিল্পকারবাবের বক্তব্য আলাপাভাবে বিবেচনা করা অসুবিধাজনক। এই কারণেই সমস্বার্থবান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমিতি বা সন্থ গঠন করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ, শ্রেণীস্বার্থসংশ্লিষ্ট সাংখ্যিক সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ অপেক্ষা সর্গাধ শ্রেণীস্বার্থ প্রদানের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকে। আলোচ্য ক্ষুদ্র শিল্পসমাজের সভাগণ মধ্যবিত্ত পর্যায়ভুক্ত। তাঁহাদের নিকট দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতিক্রম আশা করিতেছি। জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্যপদ্ধতি ও দাবী-মাওয়া স্থির করিলে তাঁহারা সব মহলেরই সহায়কৃতি ও সমর্থনলাভ করিতে পারিবেন।”

—যুগান্তর।

বিধানসভায় জুতা

“পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কালাপাশ বুখাঞ্জির প্রতি জুতা নিক্ষেপ হইয়াছে, তিনিও সেই জুতা ছুঁড়িয়া কেহ দিয়াছেন। ইহার পর আরও কিছু জুতা উড়র পক্ষে নিক্ষেপ হইয়াছে। ডাঃ রায় বাবুর ভায় আগেই পলায়ন করিয়াছিলেন। এই জুতা ছোঁড়ার ব্যাপারে সকলেই হি হি করিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। কিন্তু

আমরা আবারও বলিব—একশ ঘটনা ঘটতেছে কেন এবং তাহা জ্ঞাত দায়ী কে? আজ জুতা নিষ্কিন্ত হইয়াছে, কাল বোমা নিষ্কণ্ণ হইবে না ইহার গ্যারাণ্টি কোথায়? আমরা দিবা চক্রে দেখিতেছি বিধান সরকার বাঙ্গলাদেশকে সেই পথেই চলিয়া নিয়া চলিয়াছেন। খাত সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অভিযোগ অত্যন্ত সঙ্গত এবং অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। শাস্ত্র এবং ভদ্র উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতেছে না, প্রতিকারের সম্ভাবনাও দেখা যায়ইতেছে না। লোকে যখন খাওয়ার কষ্ট পায় এবং অপমানিত হয় তখন তাহার মরিয়া হইয়া ওঠে। খাজের দাবী উপেক্ষিত হইয়া যখন তার উপর অপমান ও লাঞ্ছনা আসে তখন এই অবস্থা ঘটতে বাধ্য। ফরাসী এবং জাপানী পালিমেটে এর চেয়ে বেশী খারাপ অবস্থা হইয়াছে। ডাঃ বাবু তাঁর ঘরে বসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিতেছিলেন। তিনি যদি তখনই সভাকক্ষে আসিতেন এবং বলিতেন—‘আমি এর জ্ঞাত দায়ী এস, জুতা মারিতে হয় আমাকে মারো, তাহা হইলেও মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া হইত। সমস্ত দুষ্কার্যের প্রকৃত নায়ক তিনি, তাঁর উপযুক্ত সাক্ষরেন জুটিয়াছে দুইটি—প্রফুল্ল সেন আর কালীপদ মুখার্জি। দুষ্কার্যের সব আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার সাহস নাই—ইহা দেখাইয়া বিধান রায় সেদিন প্রমাণ করিয়াছেন তিনি চূড়ান্ত কাপুরুষ।’

—যুগবাণী।

ভারত-চীন মৈত্রী

“মহাচীন স্বাধীন ভারতকে আক্রমণ করিতে পারে না—এই দৃষ্টিভঙ্গি সার্বভৌমবাদবিরোধী স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি মাহুষের থাকা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের বৈদেশিক নীতির চিরসঙ্গগুণই ভারত-চীন মৈত্রীর বিরুদ্ধে সর্বাধিক উগ্র প্রত্যায়ক। সাধারণ মাহুষের জীবন জীবিকার প্রশ্ন হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি সরাইয়া গইবার উদ্দেশ্যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়ানীল শক্তিশূলই সুপ্রচলিত ভাবে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। এই যুদ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টির বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেতৃকণ্ঠও সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। চীনের জাতীয় বিবসে আমাদের লক্ষ্য হইবে—সীমান্ত বিরোধের সমস্ত শাস্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুমৌল্যাসিত হওয়া চাই। ভারত-চীন মৈত্রী আমরা দুর্বল করিতে দিব না। সার্বভৌমবাদী চকাত চূর্ণ করিয়া ভারত-চীন মৈত্রী সম্পর্কে অসুচ কবিতার জ্ঞাত প্রাণপণ সপ্রাণ করিতে হইবে। ভারত ও চীন উভয় দেশের স্বার্থেই ইহা প্রয়োজন। ভারতের শান্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ মাহুষের জীবন-জীবিকা ও গণতন্ত্রের জন্মই ইহার প্রয়োজনীয়তা। ভারত ও চীনের অবিস্তৃত সৌহার্দ্য দীর্ঘজীবী হোক।”

—স্বাধীনতা।

নূতন ট্যাক্স ও পঞ্চায়ত কর্মকর্তা

“বিনপূর থানার পঞ্চায়ত নির্বাচনের মারকতা ও তাণ্ডবতা থানিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসী এক নির্বাকচিত্ত কর্কশস্তার অঙ্কুর দেখিতেছেন। পঞ্চায়ত আইনে যেভাবে ট্যাক্সের চাপ আসিতেছে, তাহাতে সকলে আতঙ্কিত। জমির কসলের উপর কিভাবে আর বার্ষিক হইবে—জমির হিসাব, এবং জমির আয়ের হিসাব কে করিবে? গ্রাম্য পদালির প্রকাশে নিবীহ গ্রামবাসীদের খাড়ে যে অজ্ঞার ট্যাক্স

প্রাণতোষ ঘটকের লেখা

বাঙলা সাহিত্যে বিশ্বয়! কয়েক মাসের মধ্যেই
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত!

* মুঠো মুঠো কুয়াশা *

মূল্য মাত্র আড়াই টাকা

ভারতী লাইব্রেরী

৬, বঙ্কিম চাটাজি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

“মুক্তাভঙ্গ” ‘আকাশ পাতাল’ প্রভৃতি বিশেষ ধরনের খানকর্যের উপস্থাপনা লিখে প্রাণতোষ ঘটক সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু ছোটগল্পও যে তাঁর হাত মিলে, তার প্রমাণ এই গল্পের বই। বাসি ফুল, স্বর্গদ্বার, মুঠো মুঠো কুয়াশা, আলো আঁধারি, মেঘমল্লার আর আশার আলো, এ ছ’টি গল্প। প্রতিটি গল্পে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ এবং তার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র। পরিবেশ আর চরিত্রের হৃদয় সঙ্গতি সত্যিই উপভোগ্য। আবার প্রতিটি গল্পে বাস্তব ও কল্পনার সম্ভাব্য বেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে, বিশেষ করে ‘বাসি ফুল’, ‘স্বর্গদ্বার’ এই দুটি গল্পে। আলো আঁধারিতে যে নির্ভূত পর্যবেক্ষণ ও বাস্তববোধ, তা তীক্ষ্ণ ও হৃদয় হয়ে ট্রাজেডির রূপ নিয়েছে ‘আশার আলো’ নামক শেষ গল্পে। আবার ‘মেঘমল্লারে’ যে স্বপ্নভঙ্গ ও মোহমুক্তি, ‘মুঠো মুঠো কুয়াশা’ তারই বিপরীত অর্থাৎ একটি অনবদ্য স্বপ্নরচনা। প্রাণতোষ ঘটক এই সেরা গল্পটিতে শুধুই এক চমৎকার আলোকের বর্ণ-কৌশলের পরিচয় দেননি, কুয়াশাকে মিথিয়ার করে একটি নতুন জগৎ গঠা মানব বিজ্ঞার ও সংঘাত দেখিয়েছেন, খুব গভীরভাবে। পড়তে পড়তে মন এক মূর্তি-বিস্মৃতি বাস্তব-অবাস্তবের ছায়ারাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। স্বপ্নকাননের সৌন্দর্যতা হিম্মত কুয়াশার ভারি শেলব, হৃদয় এবং নিটোল এই ছোট গল্পটি শেষের চার পাঁচ লাইনেই এর শির-পরিচয়। এখানেই এক অস্পষ্ট মনোজগতের আসল চাবি ‘মুঠো মুঠো কুয়াশা’র মধ্য দিয়ে হাতের মুঠোর এসে ধরা দিয়েছে।” —দেব

—॥ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥—

আকাশ-পাতাল—(দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম পাঁচ টাকা। ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। মুক্তাভঙ্গ—পাঁচ টাকা। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। কলকাতার পথ-ঘাট—তিন টাকা। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। রত্নমালা (সম্পাদিত)—আড়াই টাকা। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। বাসকসঞ্জিকা—চার টাকা। মিত্র ও শো, কলিকাতা-১২। খেলাঘর—চার টাকা। সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৭।

ধাৰ্য্য হইবে তাহার প্রতিকার কে করিবে? গন্ধর গাড়ীর উপরেই বা কত টাক্স বসিবে? ইহা হইল গ্রামবাসীদের আতঙ্ক। কৰ্ম-কর্তার ভাবিতোহেন আইন মানিয়া এই সমস্ত টাক্স স্বাধীনভাবে ধাৰ্য্য করিলেও অক্ষলের প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের পৰ্য্যন্ত গ্রামে বাস করা কষ্টকর। বাহাই হউক নূতন পঞ্চায়েতের টাক্সের হারও কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে, সেই সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর প্রচারের প্রয়োজন। আমাদের মহকুমায় সাধারণ গ্রামবাসীদের যা অবস্থা তাতে যে কোন উন্নয়নের জন্তই হউক নূতন টাক্সের বেশী বোঝা তাহারা বহিতে পারিবে না। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের কৰ্মকর্তার সজ্ঞান থাকিলে ভাল হয়।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

বিনা মূল্যে চিকিৎসা-প্রহসন।

"বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার নামে ভারতে যে প্রহসন চলিয়াছে তাহা কোন স্বাধীন দেশের জনসাধারণই সমর্থন করিতে পারে না। সরকারী কৰ্মচাৰী ও জনসাধারণ দুইটি শ্রেণী হইলেও জনকল্যাণ বাস্তবের কার্যে সরকারী বিমুখী নীতি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সরকারী কৰ্মচারীর বেলায় দামী ও ভাল ঔষধ পত্রের (যাহা হাসপাতাল হইতে সরবরাহ করা হয় না) ব্যয় সরকার বহন করিবেন আর জনসাধারণের বেলায় এই সুযোগ থাকিবে না ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সরকার স্বধন এক শ্রেণীর রোগীর ঔষধপত্রের মূল্য বহন

করেন তাহা হইলে বৃষ্টিতে হইবে রোগ নিরাময়ের তাগিদে সরকারী অর্থ ব্যয়ে ঔষধপত্র খরচ করা সরকারের নীতি বহির্ভূত নয়। তবে কেন জনসাধারণ এই সুযোগ পায় না? 'বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ' এই নীতিটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ না করা জনকল্যাণ বিরাধী বলিয়া আমরা মনে করি। পুনরীক্ষার উল্লেখ করিতেছি হাসপাতালের আউটডোর ও ডিসপেন্সারীতে সর্বপ্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হইলেই 'বিনা মূল্যে চিকিৎসা' নীতিটি স্বাধীনরূপে পালন করা হইবে। আমরা ত্রিপুরা প্রশাসনকে এই ব্যাপারটি নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আলোচনা করিতে পরামর্শ দিতেছি।"

—সেবক (আগরতলা)

'দর বাঁধা' না পরিহাস !!

"বীৰভূমে তথা দেশে চিনি 'কন্ট্রোল' ইহা আছে অর্থাৎ ঠিক কন্ট্রোল নয় তবে দর বাঁধা ইহা আছে। সব দোকানেই দোকানদারের মুখের ভাবে ইহা গোপন থাকিতেছে না যে চিনি নাই কথারি ভাঙতা কারণ সব দোকানেই চিনি আছে, তাহারা সরকারী দর বাঁধাকে অপমান কবিবার বা তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গু দেখাইবার জন্তই ইহা করিতেছে। এদিকে অনেকে আবার খরিদারকে রাখে আসিতে বলিতেছেন। ইহা শুধু বিশ্বাসঘাতক নহে; উপরন্তু ইহা আইন ও রাষ্ট্রনীতিকে কেয়ার না করার দৃষ্টিসাহস। এই দৃষ্টিসাহস দেখাইবার স্পষ্ট আজ এইসব সমাজের কলঙ্কগণ পাইতেছে কোথায়? ইহাই ক্ষিপ্রাঙ্গ। ইহা ছাড়া, জনসাধারণের মধ্যে অনেকে এখনও বলিতেছেন যে বেশ ১০/০ আনা সের যত খুসী পাওয়া যাইতেছিল অনর্থক ১০ পয়সা বাঁচাইবার অর্থহীন প্রেরণাবোধে মানুষকে একে নাজেহাল করা হইতেছে। এখন সিভিলসাপ্লাই অফিসে আবার পারমিট এইসব বাবেলা পোহাইতে হইবে। অর্থাৎ জনগণ এই দর বাঁধাকে সাপ্লাই অফিসে ধর্না দেবার পুনঃস্বপ্ন বা বলিয়া মনে করিতেছে। বাই হোক এখনই এ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা দরকার—সম্মুখে পুজা, এখন যদি চিনির বিভ্রাট শুরু হয় তা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চয়ই সারস সতর্কতা জ্ঞানাইবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটু এ বিষয়ে নজর দিন—আইজার মর্যাদা যাতে সত্য সত্য রক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।"

—বীরভূম বাৰ্তা।

বাসবী বন্ধুর

বন্ধনহীন গ্রন্থি

ফাম দু' টাকা মাত্র।

'বন্ধনহীন গ্রন্থি' একখানি বর পুটার উপভাস। কিন্তু এই উপভাস-খানির মধ্যে লেখিকা এমন একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন যার মধ্যে এতটুকু শিথিলতা ও শালীনতার অভাব প্রকাশ পেলে বন্ধনহীন সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হ'ত। সাহিত্যক্ষেত্রে একজন নবাবসত্য লেখিকার পক্ষে আশ্চর্য্য স্তম্ভের লিখন সজ্জির পরিচয় পাঠকমাত্রকেই হুঁত করবে। যে কাহিনীর তিনি অবতারণা করেছেন, সংসারে এমন কাহিনী বিরল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অব্যক্তবও যে নয়, লেখার বাধুরী দিয়ে, মহত্তা দিয়ে আর বক্তব্যের দৃঢ়তা দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। এই প্রমাণের সাক্ষ্য নায়ক নাসিকা অজয় ও কণিকা চরিত্র দু'টি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া করেছে। এই অজয় ও কণিকা স্বামী-স্ত্রী। নীচবর্গের শাস্তিপর্য্য বিবাহিত জীবন বাপনের বর দু'টি সম্মানের দ্বা কণিকা একদিন স্বামী অজয়ের কাছে প্রকাশ না করে পারে না, বিবাহ-পূর্ব-কালে তার অনিচ্ছাকৃত পক্ষপনের কথা; শুধু পক্ষপন নয়, তার এক মেসোমহাশয়ের উল্লেখ্য জীবিত এক কস্তার কথা। অকস্মৎ মর্মান্তিক এই কথা তাজুর স্বামী অজয়কে কি ভাবে যে আঘাত করে তা সহজেই অনুমিত। স্বামী কণিকাও যে অবস্থার মধ্যে দু'টি সম্মানের পক্ষপানি হয়েও প্রাণপ্রিয় স্বামীর কাছে এই বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয় তা যেমন ভয়ানক ও উত্তেজনামূলক, তেমনি জরুরপূর্ণ। —বন্ধুভাষ্য ১৮.১.৫৯

প্রকাশক: বলাকা প্রকাশনী, ২৭শি, আমবাড়ী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৩

বস্ত্রার তাণ্ডব

"উপযুগ্মির করেকমিনের ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে সহরের কয়েকটি অঞ্চল, বামনাড়া, ধাত্রীগ্রাম, অষ্টবরিয়া, শিখিরা, নাল্দি এই প্রভৃতি ইউনিয়নগুলির কতকগুলি গ্রাম প্রাণিত হইয়াছে। জলে মাঠ, মাঠ সব একাকার হইয়াছে। পরিশুদ্ধ অবস্থায় আউস ধান, আমন ধানের চারপাছগুলি জলের তলে পটিতেছে। এবারে মাঠ ভাঙি ফল হইয়াছিল, ফলও ছিল খুব সম্ভাবজনক। চাবীর মন আনলে নাচিয়া উঠিয়াছিল। চাউলের দর প্রায় তিন চার টাকা পর্য্যন্ত নাকিয়াছিল। কিন্তু অকস্মৎ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে সব কিছু গুণ হইয়া গেল। হুপে চাবীরা এখন কুক চাপড়াইতেছে, দুহুয়ারা নীচিতেছে, জনসাধারণের চক্রে এখন হতলা ও নৈরাশের ছায়া। আমরা (পত

২৫শে শ্রাবণ) সম্পাদকীয় নিবন্ধে বস্তার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। এখন উপায় কি? কর্তব্য কি? অভিজুষ্টি হইলেই যদি বস্তা হয়, তাহা হইলে ডি. ভি. সি. পরিকল্পনার একটি মুখ্য বিষয় দেশে বস্তা শিক্ষণ বর্ষভিত্তি পূর্ববসিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এক গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে জনসাধারণের মনে সশয় জাগিতেছে যে সমস্ত অঙ্গুলি কদাপি প্রাবিষ্ট হইত না এখন যুষ্টির প্রকোপ একটু বেশী হইলে সে অঙ্গুলি কেন প্রাবিষ্ট হইতেছে? প্রাবনের পর বিলিক দান ও নানাবিধ খরচাতি সাহায্য দানে মূল যোগের উপশম হইবে না। উহা সাময়িক সাহায্য দিতে সক্ষম।

—ভাগীরথী (কালনা)।

দুর্গাপুর ও স্থানীয় বেকার

“দেশের সম্ভান, এই অঞ্চলের বাস্তুচ্যুত বাসিন্দার কাজ জোটে না। অজুহাত বহু। যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে অজুহাত সৃষ্টিতে বাণ জন্মে না। তাই এই শিল্পনগরিতে লোক নিয়োগ কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া বর্দ্ধমান জেলায় অনন্তোষ ধুমারিত হইয়া উঠিতেছে। রক্তকেন্দ্রার রূপ লইবে কি না জানি না তবে এখন হইতে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে এ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যদিও তাহা আর্দ্রো কাম্য নহে। প্রথম জাগিয়ে ইহার জ্ঞাত মূলতঃ দারী কে। অবশ্যই বহুলাংশে সরকারই দারী। দুর্গাপুরে নিয়োগ সংস্থা খোলা হইয়াছে। নিত্য শত শত বাল্যলী যুবক নাম লেখাইতেছে। সরকার আইন করিয়া নিয়োগ-সংস্থাকে সংবার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিল্পপতি ও ঠিকাদারদের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে স্থানীয় লোক অধিক সংখ্যায় বাহাতে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহাই কি কর্তব্য শেষ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়? বাধ্য করিবার ধারা কোথায়—স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিবার গ্যারান্টি কোথায়। পূর্বে বলিয়াছি অজুহাতের অভাব হয় না। দক্ষতার প্রথম তুলিয়া অভিজ্ঞতার ধূয়া তুলিয়া স্থানীয় যুবকদের নিরাশ করা হইতেছে। কেন্দ্র হইতে প্রাদেশিক সরকারী মুখপাত্রদের অনুন্নয়ন বিনয়, মানবতা ইত্যাদির আবেদন জানাইরা কোন ফল হয় নাই। অবশ্য অকেবাবে হয় নাই বলিলে ভুল হইবে। তবে নিয়োগের হার উল্লেখ করিতে যুগপৎ লক্ষ্য ও দৃষ্টি হয়। দুর্গাপুরে স্থানীয় বেকার নিয়োগের চিত্র এইরূপ।”

—বর্দ্ধমান বাণী।

মামলা আছে, হাকিম নাই

“লালবাগ, ২৩শে সেপ্টেম্বর—গত ১১শে সেপ্টেম্বর শনিবার লালবাগ কোর্টমারী আদালতে কোন নতুন নালিশ দায়ের করা সম্ভব হয় নাই এবং জেনারেল কাইলও হয় নাই। কারণ নালিশ করার লোকের অভাব নর হাকিমের অভাব। উক্ত বিবসে সেকেন্ড অফিসার সরকারী কাজে অস্ত্র গিয়াছিলেন এবং মহকুমা শাসকও তাহার জরুরী সরকারী কার্যের তাগিদে সেইদিন আদালতের

কার্য ছাড়িয়া অস্ত্র গিয়াছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র থার্ড অফিসার। কিন্তু তাহার কগনিজেন্সী নেবার কোন ক্ষমতা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পেশাল পারমিশন দিয়ে থাকেন। সেইদিন থার্ড অফিসারকেও সেইভাবে কগনিজেন্সী দেবার অনুমতি দিয়ে আদালতের কার্য চালু রাখা বাইত। এই অব্যবস্থার জ্ঞাত বহু লোকের নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল।—নিজঃ

—জনমত (সুপ্রসাদ)।

শোক-সংবাদ

কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

খ্যাতনামা কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গত ৮ই ভাদ্র ১৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কবি হিসেবে ইনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন এবং স্বদীর্ঘকাল যাবৎ কৃতিত্বের সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে এসেছেন। ছন্দা, বাঙালার বাঁশী, পদ্মরাপ, নির্মালা এবং সত্ত প্রকাশিত বাঁশীর আগুন প্রমুখ গ্রন্থসমূহ তাঁর স্বজনীপ্রতিভার পরিচায়ক।

শিল্পপতি সুধীরকুমার সেন

সেনর্যালে ইণ্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ভারতবর্ষে সাইকেল শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীসুধীরকুমার সেন পশ্চিম জার্মানিতে কর্মোপলক্ষে অবস্থিতকালীন গত ১১ই ভাদ্র ১২ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায় এর অগ্রজা। বাইসাইকেল শিল্পের প্রতি ইনি প্রথম জীবনেই অগ্ররক্ত হন এবং ভারতবর্ষে ঐ শিল্পের প্রসার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তরকালে ভারতীয় বাইসাইকেল শিল্পের প্রধানপুরুষ রূপে জগতের শিল্পমহলে এক বিশেষ আসন অধিকারভুক্ত করেন। বর্তমানকালে বাইসাইকেল শিল্পে ভারতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি স্বর্গত সেনের কর্মদক্ষতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। স্বর্গীয় ডাঃ সার নীলরতন সরকার মহাশয়ের অন্ততমা কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী এর সহধর্মিণী।

ডাঃ গণপতি পাঁজা

বাঙালার স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং ভারতের প্রখ্যাত চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা গত ২১শে ভাদ্র ৬৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। চর্মরোগ সংক্রান্ত প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং জ্ঞান চিকিৎসকমহলে একে একটি প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত করছে সমর্থ হয়। উক্ত বিষয়ে প্রচুত অধ্যাপকের কল সাহা ভারতবর্ষে খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ায় বাঙালার গৌরব বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে অস্ট্রি ভাষাভাষী বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল ও ডেন্টারি শাখার সভাপতির আসন স্বর্গত ডাঃ পাঁজা অলঙ্কৃত করেন।

সম্পাদক—প্রবোধচন্দ্র বসু

বঙ্গিকাতা ১৩৬৬ নং বিশিষ্টবাহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, “বঙ্গভূমি মোটরী বেনিফে” প্রিন্টার্স-মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



কাব্যে অনাদৃত

গত বৎসর কাব্যিক সন্ধ্যার প্রকাশিত পূর্বী চক্রবর্তী লিখিত "কাব্যে অনাদৃত" প্রবন্ধটির সবচেয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখিকার রচনাকৌশল ও বাগবিদ্যাস প্রশংসনীয়। কিন্তু বিষয়বস্তুটি তিনি কিছু তুল ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় শিরোনামটিও যথাযথ হয় নাই। প্রথমতঃ, দেববানীর প্রতি সহানুভূতির উচ্চাঙ্গে তিনি কচ ও যশতির প্রতি অজ্ঞার সোবারোপ করিয়াছেন। কচ গুরুসকাশে বিভাগধিকারে মাত্র আসেন নাই। আসিয়াছিলেন দেবকুলের জীবন মান রক্ষাকারী মন্ত্রাহরণের জন্য। গুরুসহবাস কালে গুরুকর্তা দেববানীর স্নেহের মর্যাদা তিনি অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা দান করেন। অতঃপর সন্তানবীক্ষণ লাভান্তে কচ স্বর্গে প্রয়াণের পূর্বে দেববানীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসেন। কিন্তু যুদ্ধা, কচকে চিরতরে স্বর্গে হইতে দূরে, আপন অঞ্চলছায়া বাঁধিতে চায়। নববোঁদনা প্রবাসসঙ্গিনীর এই মধুর আবেগন অস্বীকার করা, তাহার স্নেহময় যুবকের পক্ষে যে কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। জাতির স্বার্থের জন্য আত্মত্যাগ বিন্দান, স্নেহের জন্য প্রেরণে তাগ, শুধু স্বকটিন নয় স্নয়হান! সত্যই ইহা দুর্লভদেহবৎ। কিন্তু লেখিকা এত বড় ভাগের মর্যাদা না দিয়া কচকে স্বার্থপর কুচক্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গুরুকৃপা লাভের জন্য কচ দেববানীর স্বয়ং হরণ করিয়াছেন, এরূপ সোবারোপ করিয়াছেন। কিন্তু, কার্যতঃ দেখা যায়, দেববানী স্নেহের স্বয়ংদান করিয়াছিল আর কচ সে প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন স্বর্গস্বখলোভে নয় স্বজাতির রক্ষার জন্য। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর এই স্বজাতিপ্রীতির? অনার্যসেই তিনি, গুরুচার্যের জাতিভাৱূপে সম্মানে অস্বপ্নপূরে দেববানীর সঙ্গস্বখে স্বপ্নবির দিনবাণন করিতে পারিতেন। লেখিকার মতে, কচ দেববানীর জীবনে প্রথম পুরুষ। দেববানী কি কচের জীবনে প্রথম নারী নয়? তবে, দেববানীর যুগের বেদনা অপেক্ষা কচের নীরববেদনা কোন অংশে কম? লেখিকার মতে কচের অভিলাষ তাহার "অলঙ্ক পৌরুষের" বিকৃত পরিচয়। কিন্তু, প্রথমই কৃতবিত্ত ব্রাহ্মণের প্রতি দীর্ঘ সাধনার বিস্তার বিফলতার অভিলাষ, দেববানীর উন্নয়ন হিসার পরিচর নয়?

লেখিকা যার, পূণ্যবান যশতি প্রাণ থাকিতে কচকে বিনুণ করিয়া না, এরূপ সত্যবদ্ধ হওয়ার শাস্তির পূজ প্রার্থনা পূর্ণ করেন; যাহুৎ নারীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। তাই, লেখিকার লেখ্যসারে "দৌবদ্বালার" নয়, পুত্রলাভের জন্য শাস্তি পুত্রদান প্রার্থনা করে। সত্যবদ্ধ হইলেও যশতি গুরুর নিষেধ স্মরণে দাবীকৃত হয়। কিন্তু শাস্তি বলে দেববানী তাহার ঈশ্বরী, তিনি

দেববানীর ঈশ্বর। সত্যবদ্ধ যশতি: তাহারও স্বামী। অতএব যশতি বন্দীকৃত নহেন। কিন্তু লেখিকা তাঁহাকে অজ্ঞায়ভাবে "দুর্বলচিত্ত" ও "রূপমুগ্ধ" বলিয়াছেন।

অতঃপর দেববানী যখন পিতার নিকট পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তখনও দেখি, লেখিকার তাহার প্রতি সমান সহানুভূতি। সত্যী সাবিত্রীর শাশ্বতাদর্শের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। "ভাগে স্বখ ভোগে দুঃখ" যাহার তাহাই প্রেম। কিন্তু ভোগলোভুণা দেববানী পট্টমহাদেবী হইয়াও বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকার স্বামীর জন্য করিতে পারে নাই। কুমারী-জীবনেও দয়িতকে না পাইয়া নিষ্ঠুর অভিলাষে তাঁহাকে জর্জরিত করিয়াছে। এখান, শাস্তি পিতার রাজ্য-পরিজনের জন্য বাবজীবনের স্বখ বিলম্বিত দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তার পরে, দেববানীর পুনরায় পরাজয় হয় শাস্তির কাছে মাতৃস্নেহের পটভূমিকায়। কারণ, গুরুশাপে জরাগ্রস্ত যশতি যখন পুত্রদের যৌবনদানের জন্য আহ্বান করিলেন, তখন শাস্তিঠানন্দন পুত্র পিতার জন্য গ্রহণ করিল। কিন্তু অসহিষ্ণু মাতা দেববানীর অসহিষ্ণু পুত্রস্বয় তাহা অস্বীকার করিল। পুত্রের মাঝেই মাতার চরিত্রের সম্যক বিকাশ হয়। শাস্তির মহান ত্যাগ পুত্র পুষ্ককেও তারগে মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। কিন্তু দেববানী পারে নাই। এর পর, লেখিকার মতে, যশতিকের স্বপ্না ব্যতীত দেববানীর সেবার কিছুই থাকিল না। নিশ্চয় তাহার কারণ, যশতির উপর চিরতরে দেববানীর একাধিপত্য ক্রম হওয়া। এখানেও তাহার ত্যাগের অভাব পরিস্ফুট। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দেববানীর যুগে স্বভাব তাহাকে মোহিনী করিয়াছে সত্য। কিন্তু গৃহিণী ও জননীরূপে মহিমময়ী করিতে পারে নাই।

লেখিকার মতে, তাহার এ বিভ্রমনার জন্য দায়ী তাহার স্নেহাঙ্ক পিতা, কিন্তু এই অভিযোগ অমূলক, একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। গুরুচার্য্য বাহা করিয়াছিলেন তাহার চেয়ে বেশী ভাল কোন পিতাই পাবেন না। সমাজের বিরুদ্ধেও তিনি কতক, স্বখ-সৌভাগ্যের জন্য, রাজস্বায়াজ যশতির হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু দেববানী "পট্টমহাদেবী" হইয়াও কর্মলোভে রাজপ্রিয়া ও রাজমাতা হইতে পারিল না। সে ইহার জন্য স্বয়ং দায়ী তাহার পিতা নহেন। তৃতীয়তঃ, আমার মতে প্রবন্ধটির শিরোনামাও যথাযথ হয় নাই। হওয়া উচিত ছিল "ভাগ্যবিধিতা কাব্যনাটিকা" অনাদৃত। কারণ, অনাদৃত অর্থ উপেক্ষিত। কিন্তু মহাকবি ব্যাস দেববানীকে আসৌ উপেক্ষা করেন নাই। উপরন্তু বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। যে বর্ণনা যুগান্ত পরেও বর্তমান লেখিকাও অসম্যাক জনের এমন কি কবীজ রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে ও করিতেছে। "অনাদৃত" তাকেই বলা চলে

যে সকল সৌকুমার্য সত্ত্বও পাঠকের ও শ্রীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার “কাব্য উপেক্ষিতা” প্রবন্ধে “রামায়ণের লক্ষণপ্রিয়া উদ্ভিলা” এবং “কাদম্বরী” পত্রলেখা” সম্বন্ধে সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। “উদ্ভিলা” নবোচ্য বোধে দেখা দিয়াই আমাদের মৃতি হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইল। সীতার দুঃখের প্রোতে আরও দুঃখিনী “উদ্ভিলা” ভাসিয়া গেল। আর “পত্রলেখা” পরমসৌকুমার্যময়ী হইয়াও “কাদম্বরী” ও “মহাশ্বেতার” পাশে চিরনিপুত হইয়া রহিল! রাজকুমার “চন্দ্রগীড়ের” সহিত তাঁহার অসম্ভব সখ্য, কিন্তু কোন আকর্ষণ ছিল না। “চন্দ্রগীড়” তাহাকে পুষ্পবান্ধব “পুণ্ডরীক” অপেক্ষা বড়ত্ব মনে করিতেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে তাহার নারীত্বের প্রতি বচসিতার ইহা চরম উপেক্ষা।—কিন্তু দেববানীর একদম কোন সমতা নাই। স্তবরাং সে “অনাদৃতা” বা “উপেক্ষিতা” নহে। অর্জুন দেবী। গুরুধাম। কলিকাতা—২।

বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত শ্রাবণ সংখ্যায় ‘বৌদ্ধ পঞ্চশীল’ শীর্ষক সমালোচনার বেদের বয়স নির্ণয়ে শ্রীমত সমাজদ্বার মহাশয় যুরোপীয় ভারততত্ত্ববিৎগণের মত কুজ্ঞ করে প্রদ্ব্যে আচার্য শ্রীমতীতিলুকার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হতে পারেন নি। প্রদ্ব্যে স্বামী অভেলানন্দজীর উক্তিকেও তিনি অবলম্বন করেছেন। প্রদ্ব্যে স্বামীজী যে ঐতিহাসিক ছিলেন না তা লেখক উদ্ভেজনার মধ্য ভুলে গেছেন। খৃঃপূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্বে বেদ রচিত হয়েছিল বলে কোন ঐতিহাসিক বলেন নি। লেখক যেভাবে পাশ্চাত্য মনীষিগণকে অবজ্ঞা করেছেন, তা লেখকের ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত বিবোধগার মাত্র। তদন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁদের অক্ষয় কীর্তি এতটুকু মান হতে পারে না। মহাযুগীয় কুসংস্কারের বনিকা উত্তোলন করে তাঁরাই আমাদের উজ্জ্বল সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতীয় মনীষিগণ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক পরিপক্ব গবেষণারীতি প্রবর্তন করেছেন। স্তবরাং মেক্সমলর প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণের সমৃদ্ধ চিন্তাধারা দীর্ঘকাল একেত্রে পথনির্দেশ করবে। বেদের অর্থ যুরোপীয় পণ্ডিতগণের কাছে দূরবিগম্য—লেখকের এ অভিমত নিতান্ত হাতাশার। বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুধু স্বামী দয়ানন্দজীর ‘চার্য প্রকাশে কেন, শ্রীহর্গদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অনুবাদেও রয়েছে। বেদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সে যুগের ভাবধারা ও পরিবেশ অনুভব করার শক্তি থাকা চাই। তা হলেই অনাচ্ছন্ন মনে বেদাধ্যয়ন সম্ভব হবে।

বুঝাবিভাবের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঐতিহাসিক সত্য। একে বাধা চাপা দেবার লেখকের অপচেষ্টা করুণানীপক। শ্রীমদভাগবতের ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণের বৃহৎ প্রসঙ্গে নিহক কালনিক ব্যাখ্যাপ্রবানের অপকৌশলও তেমনি করুণানীপক। ‘আত্ম’ শব্দের উল্লেখ করে বৃহৎ উড়িয়ে দেবার দরুন যুক্তি অত্যন্ত কৌতুকাবহ। বৃহৎ পরিনির্বাণ শব্দার শুভেও শিবাদের উপদেশ প্রসঙ্গে বসেছেন—অন্তরীপা ভিক্ষাবে বিহবৎ,

অন্তরীপা, অনঙ্গসরণা... ‘অন্তরান উপমা’ কথা ন হনব্য ন ঘাতয়ে’ অর্থাৎ আত্মোপমায় কাকেও হত্যা করবে না আশাভ করবে না। ইত্যাদি উক্তিগুলি লেখককে অনুধাবন করতে অনুবোধ করি। শুদ্ধ অনন্তবাদ বা অনাস্বাদ্যদের মর্ধারণ পল্লবপ্রাহিত্যর বোধগম্য নহে। শুধু অনাস্বাদ্যদের উল্লেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে লাভ নেই। এই প্রসঙ্গে লেখকের বৃহৎশক্তি বৃদ্ধের কষ্টকরনা দেখে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ কৌতুক অনুভব করবেন।

বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে যদি লেখকের ধারণা অশ্পষ্ট হয়, তবে ভারতের ইতিহাস অনাচ্ছন্ন মনে অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। শ্রীসমাজদ্বার মহাশয় উদ্ভেজনার বোধে আলোচ্যবিষয় অতিক্রম করে শ্রীশ্রীশ্রীদ্বারচাঁচ ও কুমারিল ভট্টকে টেনে এনে বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেও ক্ষান্ত হননি। তার পরও তিনি এশিয়ার মানচিত্র থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের স্বপ্নে বিভার হয়ে আমাদের চীন ব্রিগে ত্রিকতে নিয়ে এসেছেন। অবশেষে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইলেও প্রভৃতি দেশে অহিংস বৌদ্ধধর্মের সহিংস রূপ দেখে তিনি পরম কুপ্তি লাভ করেছেন।

লেখকের শালীনতাবোধের অভাব ও ভাবার অসংযত ব্যবহার দেখে আমরা বিস্ময়াবিত্ত হইনি। বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না, দস্তোস্তি ও শালীনতার সীমাতিক্রম মার্জিত মনের পরিচায়ক নয়। —শ্রীলানন্দ ব্রহ্মচারী।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

৬ মাসের গ্রাহক মূল্য বাবদ ৭.৫০ নং পং. পাঠাইলাম। আগামী আঘাট হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি নিয়মিত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।—শ্রীমতী মিনতি বসু—সম্বলপুর।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়, পাটনা।

Remitting herewith my subscription for M. Basumati from Ashar to Agrahayana.—Leela Ghose, Meerut. (U. P.)

I am sending herewith Rs 15/- for Masik Basumati.—Secy. Hasimara I. Club.

Remitting herewith our subscription for one year with effect from Asar for your Monthly Basumati.—Head Master, Nasigram High School, Burdwan.

Subscription for Monthly ‘Basumati.—Supdt. C & Z Mission, Howrah.

Please receive Rs. 15/- as my subscription for Basumati—Bancee Roy, New Delhi.

১৫, টাকা বার্ষিক টালা মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠাইলাম—
রেণুকা মিত্র, ভাগলপুর।

আমার অনেক দিন হইতে বসুমতী পত্রিকা পড়বার যে আগ্রহ
তাঁহা প্রকাশ করবার আর অবকাশ পাই নাই। অল্পগ্রহসূর্যক
মাসিক পত্রিকা V. P. যোগে পাঠাইবেন—Sree Charan
Pathak—Chakradharpur, Singhbhum.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক গ্রাহিকা হইবার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে
বার্ষিক টালা ১৫, টাকা পাঠাইলাম।—Geeta Das Guptoo,
Bina, M. P.

বসুমতী মাসিক সংখ্যার জন্য বাৎসরিক ১৫, পাঠাইলাম।
দয়া করিয়া আদ্যতঃ সংখ্যা বসুমতী পাঠাইবেন।—Aloka
Sadhukhan—Calcutta.

Herewith sending Rs 9/- as an advance
for half-yearly subscription for your Monthly
Basumati.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য বাবদ ১৫, পাঠাইলাম।—শ্রীমতী
মীরা বসু, জামসেদপুর।

I send herewith Rs. 15/- for the subscription
of Masik Basumati for one year.—H. N. Bailung,
Secy., Baghjan Indian Club, Assam.

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর টালা বাবদ ১৫, টাকা
পাঠাইলাম। বৎসরীতি প্রাপ্ত সংখ্যা হইতে পাঠাইতে থাকিবেন।
—Malati Rani Ganguly, Bombay.

I am remitting Rs. 15/- towards the annual
subscription for continuing supply of
“M. Basumati” from Sravana issue.—Mrs. Maya
Barat, Bombay.

I send herewith Rs. 15/- as yearly subscription
for your Monthly Basumati.—N. Khatun, Cachar,
Assam.

আদ্যতঃ মাস হইতে ৬ মাসের মাসিক বসুমতীর টালা পাঠানো
হইল।—Sm. Senti Lahiri, Kanpur, U. P.

Herewith Rs. 15/- for one year's subscription.
Please continue to send your Magazine as usual.
—Sri R. Barthakur, Assam.

আগামী ৬ মাসের টালা পাঠাইলাম। প্রাপ্ত মাস থেকে নিয়মিত
বসুমতী পাঠাবেন।—Mrs. Indira Mukherjee, Shahdol,
M. P.

গ্রাহিকমূল্য এক বৎসরের জন্য ১৫, টাকা পাঠাইলাম। ‘মাসিক
বসুমতী’ প্রাপ্ত সংখ্যা হইতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—
Mrs. Bela Bagchi, Allahabad.

One year's subscription for Monthly Basumati
from the issue of “Aswin.”—Mrs. Sudhira
Ghosal, Varanashi.

Please accept subscription for “Monthly
Basumati” for the period Aswin to Chaitra 1366.
—Ava Rani Debi, Kanpur.

Please receive our yearly subscription towards
your Monthly Journal.—Welfare Library,
Wellington Mill, Hooghly.

১৫, বার্ষিক টালা পাঠাইলাম। এক বৎসরের জন্য গ্রাহক
করিয়া ৬ বর্তমান মাস হইতে ‘মাসিক বসুমতী’ পাঠাইয়া বাধিত
করিবেন। আপনাদের পত্রিকা প্রবাসী বাঙালীদের সম্পদ-বিশেষ।
—Hansara Union Club, Doom Dooma, Assam.

I am sending herewith Rs. 15/- for Monthly
Basumati for one year only.—Sm. Manoka
Sundari Devi, Lalpur, Ranchi.

Herewith please find Rs. 15/- being the
annual subscription for Masik Basumati—Railway
Institute, Masiani, Shibsagar, Assam.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টালা বাবদ ১৫, টাকা পাঠাইলাম।
নিয়মিত বই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রভা দে,
দিল্লী।

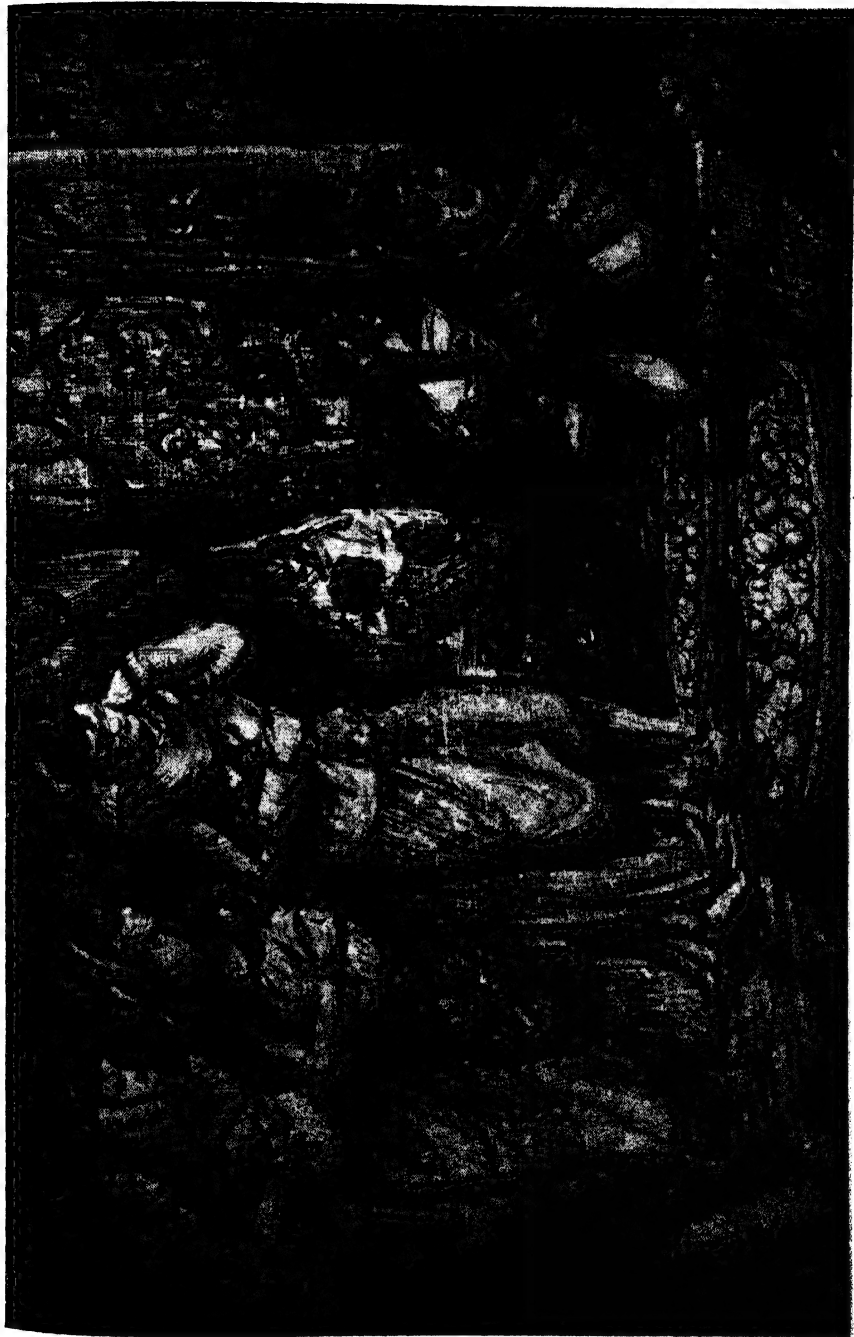
Please send my copy for another year.
—Mamata Sen, Burdwan.

Renewal subscription for Masik Basumati for
one year till Ashar 1367.—Burdwan Raj College,
Burdwan.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক টালা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া
আমাকে গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী বেণী
বল্লভাশঙ্কর, পুণা।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫, অগ্রিম পাঠাইলাম।
—শ্রীমতী অমিতা মল্লিক, বোম্বাই।

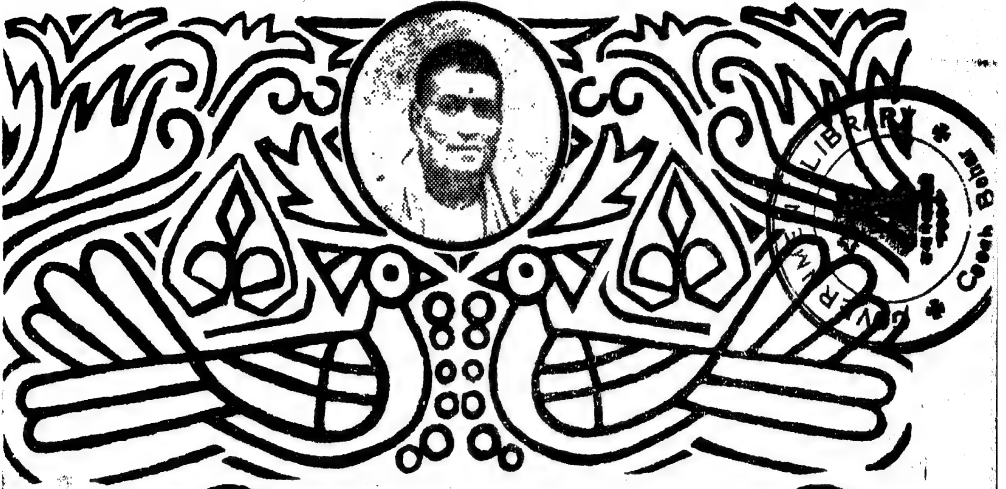
বর্তমান বৎসরের বৈশাখ হইতে ‘মাসিক বসুমতীর’ গ্রাহিকা
হইবার জন্য ১৫, টাকা মনিষ্যকর্তা করিলাম।—Kamala
Brahmachari, Dehra Dun.



মাসিক বহুস্বামী
॥ আশ্বিন, ১৩৩৩ ॥

(শেষ)

হাট-বাজার
—স্বীকৃতবিশ্ব দত্ত অঙ্কিত



সামিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—আখিন, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

সর্বনা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য
যেহেতু মনঃ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তদ্রূপ নহে। আমি
পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য
যেহেতু মনঃ, অস্ত্র কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ
অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতাসাধন ও
আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরা ভাল বলিতে হইবে।
অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর।

তোমরা আর্ষ, অনাৰ্ঘ, স্ববি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ
জাতি—বাহাই হও, ভারতভূমিনিবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের
পূর্ণপূজ্যগণের এক মহান আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের
প্রতিই এই এক আদেশ, সে আদেশ এই—‘চূপ করিয়া বলিয়া
থাকিলে চলিবে না—ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে।
উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পৰ্বন্ত সকলকেই
আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।’ বেনোন্তের এই আদেশ
ও যু যে ভারতেরই প্রাচীনে, তাহা নহে—সমগ্র জগৎকে এই

আদর্শায়ুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের
জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য বীরে বীরে সমগ্র মানব-
জাতি বাহাতে আদর্শ ধার্মিক—অর্থাৎ কমা, দ্রুতি, শৌচ, শান্তি,
উপাসনা ও ধ্যানপরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই
মানবজাতি ক্রমশঃ উন্নতশাস্ত্র লাভ করিতে পারে।

অবিগণের মত চালাইতে হইবে; মনঃ, বাজবক্য প্রভৃতি স্ববিরে
মন্ত্রে সের্শটাকে দীক্ষিত করিতে হইবে। তবে সমরোপবোধি
কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে। এই দেখ না, ভারতের
কোথাও আর চাতুর্ধর্ষ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ,
কৃত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি জাতিতে দেশের লোকজনকে ভাগ
করিতে হইবে। সমস্ত ব্রাহ্মণ এক করিয়া একটি ব্রাহ্মণজাতি
গড়িতে হইবে। এইরূপ সমস্ত কৃত্রিয়, সমস্ত বৈশ্য, সমস্ত শূদ্রের
নিয়া অস্ত্র তিনটি জাতি করিয়া সকল জাতিতে বৈশ্বিক প্রাণীভেদ
জানিতে হইবে। নতুবা শুধু ‘তোমরা হোঁচ না’ বলিলেই কি দেশের
কল্যাণ হইবে? কখন নয়। —বানী বিবেকানন্দের বানী।

বাঙলা শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী

ত্রিশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বিবিধ মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাঙলা সাহিত্যে শাক্তির যে বিভিন্ন রূপ ও চরিত্র কৃষ্টিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা সাধারণ পরিচয় আমরা জানি। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয় (ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইহার জন্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইতে পারে)। রামপ্রসাদও বিভাসুন্দরের কাহিনীকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'কালিকা-মঙ্গলে' রামপ্রসাদ আরাধিত কালিকারও স্বার্থ পরিচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধকবিরূপে যে প্রতিভা তাহারও কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় নাই। কিন্তু বাঙলার শাক্তধর্মে ও শাক্ত-সাহিত্যের একটি নতুন দিক খুলিয়া দিলেন এই সাধক কবি; ইহা হইল শাক্তসঙ্গীতের দিক। বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং তাহাকে নিজের একটি বিশেষ সুর সংযুক্ত করিয়া (যাহা আজকাল 'প্রসাদী' সুর নামে খ্যাত) তিনি একদিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ করিলেন—অষ্টদিকে মায়ের জন্ত সম্ভাবনের আঁতকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা পূর্ববর্তী কোনও সাহিত্যেই আর দেখি নাই। এই আঁতি যেন বাঙালী-মনে সঞ্চিত হইয়া রুদ্ধ হইয়াছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে যখন তাহার প্রকাশ খটিল তখন বাঙলাদেশের এখানে সেখানে ছোট বড় বহু সাধকবির মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। আমরা ঊনবিংশ শতকে বহুসংখ্যক শাক্তসঙ্গীতি পাইলাম। ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া শাক্ত পদাবলী নামে খ্যাত।

বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয় বলিয়া শাক্ত গানগুলির শাক্ত পদাবলী নাম দেওয়া হইলেও বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কতগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অব্যাহার করিতে পারি না। শাক্ত সঙ্গীতের প্রথম কবি রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গীত রচনার মধ্যে একটা স্বতঃ উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। স্বতঃ রামপ্রসাদের শাক্ত সঙ্গীত রচনার পশ্চাতে বৈষ্ণব পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল একথা বলিতে পারি না। রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন পরিবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে—ভাবেয় দিক হইতেও, প্রকাশভঙ্গির দিক হইতেও। ঊনবিংশ শতক হইতেই বাঙলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসার বলিতে পারি। ঊনবিংশ শতক

পর্যন্ত সহস্র সহস্র বৈষ্ণব পদ রচনার ভিতর দিয়া সে ধারা প্রায় অবিকল্পিত ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপে বহু শতকে প্রবাহিত সাহিত্যের একটি অতি সমৃদ্ধ ধারা একটি বিশেষ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সাময়িক ও পরবর্তী শাক্ত কবিগণের সঙ্গীতগুলির উপরে এই পরিবেশের প্রভাব অতি স্বাভাবিক ভাবেই পড়িয়াছিল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পার্থক্যের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। প্রথমে আমরা মিলের কথাটাই আলোচনা করিতেছি।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতিষ্ঠা মধুর রসে। জীবনের মাধুর্য প্রেমে; সেই প্রেমেই বৈষ্ণব কবিগণের প্রধান নহে—একমাত্র অবলম্বন। এই মধুর প্রেমের স্পর্শে দেহও মধুর—গেহও মধুর। বৈষ্ণব কবিগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধুর্যের প্রভাব পড়িয়াছে বাঙলা দেশের শক্তিদেবীর উপরেও। সর্ব সৌন্দর্য মাধুর্যের ঘনীভূত প্রতিমা রাগার প্রভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিতা দেবীগণও যে অনুরূপ মাধুর্যমণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু দেবীগণের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় এই যে রাগ-সৌন্দর্যের প্রভাব ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য করি এই শাক্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে যখন দেখি যে শুধু বাহিরের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনার নয়, দেবীর মূল পরিকল্পনাতেই দেবী মধুর রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা স্বয়ম্বে আমরা দেখিতে পাই—তিনি প্রথমাবধিই মধুররসাস্রিতা; তাই উমাকে অবলম্বন করিয়া যখন মধুর রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই—বা উমাকে যখন মধুর রসেই প্রতিষ্ঠিতা দেখিতে পাই তখন আমরা সচকিত হই না; কিন্তু অত্যন্ত ভাবে সচকিত হইয়া উঠি যখন দেখি, শুধু অনুরনশিনী ছুর্গা-দেবী নহেন—ভয়ঙ্করীঘের চরম নিদর্শন যে কালীর মধ্যে তিনিও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধুর রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া উঠিতেছেন।

দেখা যাইতেছে, বাঙালী কবিগণ বৈষ্ণবই হোন আর শাক্তই হোন, মূলে সকলেই মধুর রসের উপাসক। আমরা দেখিতে পাই মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্শ্বী উমার একটি বিশিষ্ট ধারা, অনুরনশিনী দেবীর আর একটি পৃথক ধারা। পৌরাণিক যুগেই এই দুই ধারা একত্রে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কবিগণ ঐতিহ্যবাহী মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, জল ও হৃদয়ের মিশ্রণের ভিতর হইতে হসে যেমন হৃদয়েই পান করিবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কবিনোহোলেও তেমনই ভাবে মায়ের মধুররসপীণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির

মিশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে মধুররূপিনীকেই বাছিয়া আবাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাকে লইয়া বাঙলা দেশের জনমনেই যেন এই মধুর রসের দিকে ঝোক। তাই দেখি, বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিতমহলে বা উচ্চকোটি মহলে মতই মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'র সহিত যুক্ত করিয়া অস্বরনাশিনী দেবীর পূজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অস্বরনাশিনী মূর্তিতে দেখেন— কিন্তু ঐ পঞ্চমুখী, তাহার পরে তাঁহারা স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন— আসলে আর কিছুই নয়—মায়ের স্বামিগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কলারূপে পূত্র-কন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিন দিনের বাপের বাড়ির উৎসব-আনন্দ—তাঁহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই ত আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া' সঙ্গীতের উদ্ভব। এই সঙ্গীতগুলিতে লক্ষ্য করিতে পারিব, গিরিরাজ বখন কন্যা উমাকে লইয়া গিরিপূরে কিরিয়া আসিলেন তখন গিরিরাজী কন্যাকে বৃকে লইতে এলোকেশে ধাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু দশরথি রায় তাঁহার পাচালীতে বলিলেন, মেনকা দশভুজা বরণস্বর্ণী দেবীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেই চাহিলেন না, মা স্পষ্টই বলিলেন,—

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!

সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো বরণস্বর্ণী?

এই বরণস্বর্ণীকে মেনকা—এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কবিমণ্ড— শুধু যে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না তাহা নহে—তাঁহাকে উমা বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না; মা স্পষ্টই বলিলেন,—

দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কঙ্কে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।

তখন আর উপায় নাই। বাঙালী কবিও মনস্তত্ত্ব করিবার জ্ঞান দশভুজা বরণস্বর্ণী মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল।—

মায়ের প্রতি মহামায়া তাজিলেন মায়া।

যনের অর্পূর্ণ রূপ পূর্ণের তনয়া ॥

দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।

নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী ॥

হুই কঙ্কে হুই শিশু আন্ততোষদারা।

উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা ॥ ১

বসিকচন্দ্র রায়ের গানে দেখি, তাঁহার মেনকাও অভিনব এই নারীকে চিনিতে পারেন নাই অর্থাৎ চিনিতে চাহেন নাই।

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপূরে?

এ জো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে।

মুখে মুখ হাসি, স্বধারামি হে, আমার উরাশস্বরী;

এ যে মেদিনী কীপায় হুঙ্কারে বহুবারে।

হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে,

এ নারীকে কেবা চিনতে পারে। ২

শুধু যে ভয়ঙ্করী মূর্তি চাই না তাহা নয়, ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিও চাই না—শুধু মাদ্রুধময়ী মূর্তি চাই।—

বলে গেলে হে গিরি, বাই—

আনি গে গিরিজার,

সে মেয়ে বেখে এলে কোথায়?

শশী ভান্নু আসি উদয় পদে পদে

উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাহে; ৩

অপর কবি বলিতেছেন—

গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলো করে কার মেয়ে?

সর্বদেব-তেজ দেহ, জটাজুট শিরোমুখ,

আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে।

কনক-চম্পকদামা, অতলী-কুম্ভমোপমা,

এই নাকি সেই উমা, সশয় আমার ৪

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, কবি এই গানটিতে উমার যে সব বর্ণনা করিতেছে তাহা চণ্ডীর পৌরাণিক বর্ণনা; সেই অস্বরনাশিনী চণ্ডীকেই যেন কবিগণের একান্তভাবে 'স্নেহের ফুলালী' উমার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইতে আপত্তি। পূর্বের শেষে করিয়া একটা আপোস-বফা করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিতে মোটাই কষ্ট হয় না যে এ আপোস-বফার চেষ্টা তাঁহাদের তত্ত্ববুদ্ধিতে—কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য দিকে।

পূর্বেই বলিয়াছি যুগে যুগে সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপায়িত মধুররূপিনী উমাকে অস্বরনাশিনী চণ্ডীর সহিত মিলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন ব্যাঘাত আপত্তি স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কবিগণ এই আপত্তি জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা অস্বরনাশিনী ভয়ঙ্করী কালী মূর্তিকে নিজস্বের হৃদয়-পন্থে স্থাপিত করিয়া যে রূপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কালীকে এইভাবে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী কবিগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের মৈথিলী কবি বিভূপতির 'অম্বর-ভয়াউনী' 'পশুপতি-ভামিনী' ভৈরবী কালীর বর্ণনা করিতেছেন—

বাসর রৈনি

সবাসন সোভিত

চরণ, চন্দ্রমনি চূড়া।

কতওক দৈত্য

মারি হুই মেলল,

কতও উপিল কৈল কুড়া ॥

৩। ঐ, ঠাকুরদাস দত্ত।

৪। ঐ, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আরও তুলনীয়—
কে রণ-রঙ্গিনী।

কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।

অঙ্গণে পাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণকুমারী।

দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা,

বিবিধ আয়ুধ-ধরা, ময়ূজ-দলনী হেরি।

নহে মম কণ্ঠে এ যে, এ সময়-সাজে সাজে,

মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিরি।

(ঐ, ব্রজমোহন রায়)

সামর বরণ, নয়ন অমরজিত

জলদ-জাগ কুল কোকা ।

কট কট বিকট গুঠপুটে পাড়রি

লিধু-কেন উঠ কোকা ॥ ৫

‘দিন-রজনী, তোমার চরণ শবাসন শোভিত, তোমার চূড়ায় শোভে চম্পকি ; কত নৈত্যকে মারিয়া যুগে কেলিলে, বস্ত্র না উপদীপণ করিয়া জড় করিয়াছে । শ্রামল তোমার বর্ণ, তাহাতে রক্তিম নয়ন, বেন কালো দেখে লাল পদ্ম ; তোমার পাটল গুঠপুটে বিকট ধ্বনি, রুধিরের কেনার বুধু উঠিতেছে ।’

এই বিকট মূর্তির মধ্যেই শ্রামর শ্রাম বর্ণের মধ্যে রক্তিম নয়নের শোভা কবির মনে আনিরাছে শ্রাম জলদের গারে বরুণস্নেহের শোভার কথা । রামপ্রসাদের কালীমূর্তির একটি অম্বরূপ বর্ণনার দেখিতেছি—

চলিয়ে চলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,

বামা রণে ক্রতগতি চলে, ললে দানবদলে,

ধরি করতলে গজগয়াসে ॥

কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে,

কালিন্দীর জলে কিংকত ভাসে ।

কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল,

অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥

কে রে নীলকান্ত মণি নিভান্ত,

নগর-নিকর তিমির নাশে ;

কে রে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়,

ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥ ৬

পদটির পশ্চাতে যে কবি-মানস রহিয়াছে তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে পদটির একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার । কালী আসব-আবেশে—অর্থাৎ সুরাপানে বিহ্বলা হইয়া এলোকেসে চলিয়া চলিয়া রণক্ষেত্রে আসিতেছেন ; কিন্তু চলিয়া চলিয়াও দানব-বলনে তাহার চরণের ক্ষিপ্ৰগতি—এবং রণক্ষেত্রে তিনি দানবপক্ষের গজগুলিকে করে ধরিয়া প্রাস করিতেছেন, রণোদ্গাদিনী দেবীর সর্বাসে রুধিরচিহ্ন । এই পর্বস্ত কালীর পৌরানিক রূপ ; কিন্তু সাধকের মনের মাধুরীর স্পর্শে এইরূপও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে না ; কালীর কালো দেখে রুধিরের ছটা বেন কালিন্দীর কালো জলে ভাসিয়া যাওয়া কিংকতের ছটা । আবার মনে হইতেছে, মায়ের মুখখানি বেন নীলকমল—চূড়ার অর্ধচন্দ্র এই নীলকমলের উপরেই অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে । নীলচরণের নখরগুলি হইতে বেন নীলকান্তমণির ছাতি বিচ্ছুরিত হইয়া অন্ধকার নাশ করিতেছে ; নীলবর্ণের উপরে রূপের ছটায় বেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—দেবী যে ঘোর রবে রণ লক্ষ দিতেছেন—তাহাতে মনে হয় আকাশে গর্জনকারী নীলনবী মেঘে বেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে ।

এই বর্ণনাটি কাব্যের দিক হইতে নিখুঁত না হইতে পারে—

৫। বিভাপতি, শ্রীমঙ্গলনাথ মিত্র ও উত্তর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭৬৬ সংখ্যক পদ ।

৬। শা, প, (ক, বি) (শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ।

অত্যধিক দোষে দুষ্ট হইতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, পৌরানিক ভয়ঙ্করী দেবীর কোনও লক্ষ্যকে বাদ না দিয়া তাহাকেই স্বয়ংমধ্যে কতখানি মধুর করিয়া লওয়া হইতে পারে তাহার কি একটি ব্যাকুল প্রয়াস রহিয়াছে কবির সবটুকু বর্ণনার মধ্যে ।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি অপরূপ বর্ণনার দেখি—

তুবার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী ।

হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্রামা মা জননী ।

রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি’

উজলিছে জিহুবন জিনি সৌদামিনী ॥ ৭

তুবার-ধবল মহাদেব—তাহার হৃদয়োপর নীলবর্ণী শ্রামা যেন তুবার-ধবল হ্রদে প্রস্ফুটিত। একটি ‘নীলিম নলিনী’ তিমিররাশি দিয়াই সে রূপ গড়া—কিন্তু রূপের বিদ্বৎ-বিভার দশদিক্ আলো করাই হইল তাহার কাজ । কোনও কোনও কবি আবার মায়ের পদনখে রবি-শশীর বিভা আনিয়াই ক্ষান্ত হন নবই ; উদ্গাদিনী রণরঙ্গিনী মায়ের চরণে নুপুরও বাঁধিয়া ছাড়িয়াছেন । ৮ কেহ আবার চরণে নুপুরের সহিত কটিতে ঘূরুঘূরু করিয়াছেন । ৯ কোনও কবি আবার সর্বত্র শুধু ‘অমিয়া’ রূপই লক্ষ্য করিয়াছেন ।—

অমিয়া জিনি মুখ শোভা তার, অমিয়া সব শ্রমজল তার,

অমিয়া সম শিকভাষে গায়, অমিয়া রূপে সুধাকর ॥ ১০

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের—

নীলকমলী, নবীনা রমণী,

নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী ।

নীল নলিনী জিনি জিনরনী,

নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী ॥ ১১

প্রভৃতি বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্ হইতে নয়, মধুর ভাবের দিক্ হইতেও বৈকব কবিতাকে স্বরণ করাইয়া দিবে ॥ ১২

রামপ্রসাদেরও এই বৈকব ভাবা ভজিতে কালীর বর্ণনা দেখিতে পাই—

৭। শা, প, (ক, বি,) ।

৮। কে ও বিহরে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী ।

চমকে অক্ষর রবি শশী বেন, নখরে প্রথরে আপনি ॥

শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপনে সম্পদদায়িনী ।

চমকে নুপুর, আলো করে পুর, মণিময় পূর্ববাসিনী ॥

কালী মর্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) শা, প, (ক, বি) ॥

৯। নব জলধর কায় ।

কালো রূপ হেয়িলে অধীষ জুড়ায় ॥

কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘূরু, রতন নুপুর পায় ।

হাসিতে হাসিতে কত দানব দলিছে, কবির লোগেছে পায় ॥

ইত্যাদি ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ; শা, প, (ক, বি) ॥

১০। গৌরমোহন রায়, শা, প, (ক, বি,) ।

১১। শা, প, (ক, বি,) ।

১২। মঙ্গল-কাব্যগুলির ভিতরে পার্বতীর মনোহর মূর্তির বর্ণনার আশ্রয় বৈকব-সাহিত্যের রাধার রূপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা গুণে উল্লেখ

নব নীল নীরব তরুণটি কে ?

ঐ মনোমোহিনী রে ।

ভিমির শশধর, বাল সিনকর,

সমধন চরণে প্রকাশ ।

কোটিচন্দ্র বালকত, স্রীমুখমণ্ডল,

নিশি অধোমুতভাব ॥ ১৩

অথবা—

এলোকেশে, ক্রম শব্দে, এলো রে বামা ।

নখর নিকর হিমকরবর,

রঞ্জিত ঘন তরু মুখ হিমধামা ॥

নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিণী,

হাসত ভাবত নাচত বামা ।

কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দম্ভক দলে,

ধরাতলে হতরিপু সমা ॥ ১৪

অথবা—

শব্দর পদতলে, মগনা রিপুদলে,

বিগলিত কুন্তলজাল ।

বিষল বিষুবর, স্রীমুখ হৃদয়,

তরুণটি বিজিত তরুণ তরাল ॥ ১৫

হাতে বে ডরাল করবাল লইয়া কালী অশ্বর বিনাশ
করিতেছেন তাহাকেও বাঙালী মন রূপান্তরিত করিয়া লইবার চেষ্টা
করিয়াছে ।

করিয়া আসিয়াছি । দেবীর রূপ-বর্ণনাতে আমরা শাক্ত-পণ্ডাবলীতেও
মাকে মাকে এই ভঙ্গির অনুসরণ দেখিতে পাই । যেমন—

অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তাধ্বজাসনা,

কিঙ্কণি মণি রচিত, মুকুট শিরোভূষণ ।

কুটিল কুন্তল জাল, আবৃত মুখমণ্ডল,

গুঠ জিত বিষকল, প্রক্লম পঙ্কজানন ।

ধনু সদৃশ ক্রসতা, জিনয়ন-সুশোভিতা,

সহস্র বদনাভিতা, মধু মধুর বচন । ইত্যাদি

মহাতাব চাঁদ, শা. প. (ক. বি.)

১৩। উত্তর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ'
গ্রন্থে পৃষ্ঠ পদ (১৩৭ স.) ।

১৪। ঐ. (১৪৮ স.) । তুলনায়—

কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,

অকুলি দংশন করিছে অলি,

মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ

করত পূর্ণ শশধর বলি ।

জমর চকোরেতে লাগিল বিবাল,

এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,

পৌছে পৌছে করতলি নাগ,

চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধনি । ইত্যাদি ।

রামপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থে পৃষ্ঠ (১৩৮ স.) ।

১৫। ঐ. (১৫৩ স.) । এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪৯, ১৫০,

১৫১, ১৫২ পদগুলি দ্রষ্টব্য ।

তুবন ভূলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী ।

বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌদামিনী ॥১৬

ভক্ত-স্বরূপে এই কালী-রূপের আকৃতি রসধনরূপ লাভ করিয়াছে
কমলাকান্তের একটি গানে—'মজিল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-
নীলকমলে ।' রামপ্রসাদের দুই একটি গানে এই রূপকে লইয়া
ভক্ত-স্বরূপের রীতিমত একটি উল্লাস জাগিয়া উঠিয়াছে । যেমন—

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অধরে ।

নৃত্যতি মানস-শিখী কোঁকুকে বিহরে ॥১৭

অথবা—

সজল জলধর, কান্তি সুরধর,

কৃষির কিবা শোভা ও বরণে ।

প্রসাদ প্রবদতি, মন মানস নৃত্যতি,

রূপ কি ধরে নয়নে ॥১৮

কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপাচর্য্য' সহসা খুব স্বাভাবিক
বলিয়া মনে হয় না । এক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী
ধরিয়া বাঙলা দেশে শত শত বৈকব কবি রূপাচর্য্যের সাধনা
করিয়াছেন ; সেই সাধনা বাঙলার কবিমানসে 'রূপাচর্য্য'র
একটা বাসনাকেই প্রবল করিয়া রাখিয়াছিল ; সেই বাসনাই
অষ্টাদশ শতকে কালীমুখিকের নূতন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছে । নূতন
দৃষ্টি বলিতেছি, কারণ কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপাচর্য্য'র
আভাস কোনও পুরাণে নাই—তন্ত্রেও নাই ।

তবে এই 'রূপাচর্য্য'র পশ্চাতে মধুবন-প্রীতি ব্যতীত শাক্ত
সাধক-বিগণের একটি গভীর অনুভূতির প্রেরণ ছিল । এই সাধক
কবিগণ বহুছানে কালীর কালো-রূপে স্বরূপ আলো করিবার কথা
কলিয়াছেন । ইহার ভিতরে একটি গভীর সাধক-বহুস্তর কথাও
নিহিত আছে, তাহার আলোচনা আমরা এই সাধক কবিগণের
সাধনার কথা বিবৃত করিবার সময়েই আলোচনা করিব ।

আমরা উপরে লক্ষ্য করিলাম, দেবীর রূপ বর্ণনার কতকগুলি
শব্দে ভাষা ও ভঙ্গিতে বৈকব সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখা
দিয়াছে । বর্ণনার এই প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে
ভক্ত কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' নামক সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থে ।
কমলাকান্ত এসব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য মুক্তির বর্ণনা করেন
নাই, দেবী এখানে 'কুল-কুণ্ডলিনী' শক্তি—বাল ভাঁহার বটচক্রের
ভিতরকার সর্বনিম্ন মূলধার্য্যচক্রে । তিনি কখনও বালিকা, কখনও
কিশোরী, কখনও নবীনা যুবতী । তাঁহার দ্বিতীয় শিবের অবস্থিতি
ক্রমধার্য্য অজ্ঞাতক্ষে । মূলধার্য্য হইতে আজ্ঞাচক্রে চলে এই 'নবীনা
যুবতী'র অভিসার বাজা । এই আজ্ঞাচক্র-রূপ দ্বিতীয়ক্ষে আসিয়া—
মিলিয়াছে গঙ্গা, যবুনা ও সরস্বতীর (ইন্ডা, পিন্ধা ও সুর্য্যা নদীর)
ধারা—এখানে আসিয়াছে ত্রিবেণী-সঙ্গম । 'সাধক-রঞ্জন'র এই
নবীনা যুবতীকে সাধক-কবি গ্রহণ করিয়াছেন ব্রহ্ম-অভিগায়িত্রী
রাধার প্রতিচ্ছবিতে ; সমস্ত বটচক্র-সাধনাই এখানে বৈকববর্ণিত লীলার

১৬। মহারাজ হরেন্দ্রনাথায় রায়, শ. প. (ক. বি.)

১৭। উত্তর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখিত 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ'
গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রামপ্রসাদের পদাবলী (১৪৪ স.) ।

১৮। ঐ. (১৩৪ স.) ।

অবলম্বে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু বৈষ্ণব-লীলার স্ফুৰকই নয়—তাহা ও হৃদয় ও গৃহীত সম্পূর্ণভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে। কিছু কিছু নমুনা দিতেছি। রজনীর শেষে প্রভাতে (অজান-অন্ধকারের বিনাশে জ্ঞানালোক দেখমন উদ্ভাসিত হইলে) এই ‘রমণী’ (শিবসঙ্গে রমণের অভিলাষিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি) জাগ্রত হইলেন; তিনি তখন ত্রিকোণী তরঙ্গিণীতে স্থানে চলিলেন।

ত্রিগুণা ত্রিবেণী তরঙ্গিণী ধায়।
কেনি করে কুলকানিনী তায়।
বিহরই রঙ্গিণী সখীগণ সঙ্গে।
বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে।
হেরি হেরি স্নানরী চকিত নয়ন।
তড়িত স্তম্ভকল করি অমুমান।
সমবর সঙ্গিনী নব অম্বরগণে।

কিসলয় পরশে কুন্তমধু জাগে ১১১

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্থানকেনি; সেই কেনি সমাপন হইলে আবার ধীরে ধীরে তিনি চলেন আপন নিবাসে (মূলাধারে)। এই আপনার ঘরে ফিরিবার বর্ণনা দেখি—

গজপতিনিমিত্ত গতি অবিলম্বে।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে ॥
চাক্র চরণগতি অভরণবন্দে।
নখরমুকুরকর হিমকর নিম্বে ॥
উরসি সরসীকহ বামা।
করিকর শিখর নিতম্বিনী রামা ॥
মুগ্ধপতি দূর শিখরমুখ চার।
কটিতট কীর্ণ স্তম্ভকল বায় ॥ ইত্যাদি।

এই দেবীকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিভাবে কিছু কিছু বর্ণনাও দেখি। ইহার বালাভাবে বর্ণনায় দেখি—

কিরে ধনী পেখলু হেরি হেরি ভল্ল
বেরি বেরি মন ধায়।
ইহ তলু অবস দিবস রজনী
রমণী পুন আঁখি ভূলায় ॥
মন এ স্নানরী বধি কহে বাণী।
বচন পরামৃত মুক্ত তলু মুক্তবে
এ তলু সকল করি মানি ॥ ইত্যাদি।

তাহার পরে মধ্যভাবে—

কদম কুন্তম জহু সতত সিংহরে ভল্ল
বদবধি নিরবিলাস তারে।
যদি পাসকিতে চাই আপনা পাসরে আই
এনা দুখ কহিব কাহারে ॥
সেই সে জীবন আর বসিকের মনোচোর
রমণী রসের শিরোমণি।
পরিহরি লোকলাজে রাখিব স্তম্বর মাঝে
না ছাড়িব দিবস রজনী ॥

অধিক উল্লেখিত প্রয়োজন নাই; উল্লেখিত দিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানিই ভুলিয়া দিতে হয়। যেটুকু উল্লেখিত নিলাম তাহা দ্বারা শাক্ত সাধকগণও যে নিজেদের সাধনভঙ্গ বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষ্ণব দ্বারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহারই একটি বিশেষ নমুনা দিবার চেষ্টা করিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙালার প্রতিবেলী মৈথিলী সাহিত্যেও দেবীর বর্ণনায় বাঙালী সাহিত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেবীর বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একটি দুইটি ছন্দে দেবীর কমলীয় মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে আমরা মৈথিল কবি বিভূষণের একটি দেবী-বন্দনার পদ দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম। পরবর্তী কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মৈথিল কবিগণের দেবী-বর্ণনার মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করি। মহারাজ মহেশ ঠাকুরের ‘তার’ বর্ণনার ভিতরে দেখি—

জয় জয় জয় ভয়ভঞ্জনি ভগবতি
আদি শক্তি তুমি মায়া।
জন নব সজল জলদ তুমি তরুণতি
পদকটি পঙ্কজ ছায়া ॥২০
মহারাজ মহিনাথ ঠাকুরের কাব্য-বর্ণনায় প্রথম ছন্দ—
বদন ভয়াল কান শব কুণ্ডল
বিকট দশন ঘন পাঁতা।

কিন্তু দ্বিতীয় ছন্দেই দেখি—

ফুলল কেশ বেশ তুমি কে কহ
জন নব জলধর কীতি ॥২১

কবি ব্রজেন্দ্রের দুর্গা-বর্ণনায় দেখি,—

সিংহ চড়লি মাতা অশ্বর-নিকসিনি,
মেদিনী ডোল গতিমাগে।
আযুধ উগ্র শোভে আর্চ্য কর,
জাহি ডরে অরি উর কাণে।

কিন্তু ঠিক পরের বর্ণনাই হইল—

দুর্গাল সন কাঙ্ক্ষি মনোহর,
শিরে শোভ চান কলাগে ॥২২

আধুনিক কবি বিদ্যনাথ বা ভগবতীর স্নেহে বলিয়াছেন—

জয় জয় সকল অশ্বরকুলনাশিনি, আদি সনাতনি মায়া।
গিরিবর বাসিনি, শঙ্করভাষিনি, নিজ জন পর কহ দায়া ॥
শামল রুচির বদন তুমি রাজকিত, ভড়িতবিনন্দক নয়নে।
বয়ছাল পরিহর, কটি অতি শোভিত, কণিকুণ্ডল যুগ কালে ॥২৩
বাঙালী বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত বাঙালী শাক্ত পদাবলীর আর একটি গভীর মিল লক্ষ্য করিতে পারি উভয় জাতীয় পদাবলীতে বাংসল্য-রসের বর্ণনায়। এই বাংসল্য রসের প্রাচল্যে বাঙালী কবিমণ্ডল বৃন্দাবন ও গিরিপুত্রের মধ্যে ব্যবধান ও ভেদচিহ্ন অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে মুছিয়াও গিয়াছে। এইরূপ হইবারই ত কথা, কারণ বাঙালী কবিমণ্ডল বৃন্দাবনও উভয়

প্রদেশে অবস্থিত নয়, গিরিপুত্র হিমালয়ের কোনও কন্ডরে স্থিত নয় ; উভয়ের অবস্থিতিই বাংলাদেশের মাট-ঘাট-জোড়া ভ্রামল অঞ্চলে । সুতরাং ভাবপ্রাবল্যে আন্তে আন্তে স্বাভাবিক ভাবেই ভেদচিহ্নে বিভূতি । একই চিত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণীরও আপোষে ভাব বিনিময় হইয়া গিয়াছে ; ইহার মাঝখানে একস্থলে কাঁড়াইয়া 'স্নেহের দুলালী উমা' অপরস্থলে 'স্নেহের দুলাল গোপাল' । বাংলাদেশের বৈষয় কবিতায় গোপালের বালালীলাকে অবলম্বন করিয়া বৃকের সমস্ত স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন যে বাউলী মা, বাংলাদেশের শাস্ত্র কবিতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন করিয়াও তেমনই ভাবে স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন একই মা । অবশ্য লীলার এবং লীলাক্ষেত্রের কিছু পার্থক্য আছে । একজনের বালা-লীলা মুখ্যতঃ গোষ্ঠী অবলম্বনে—অপরের বালা-লীলা অষ্টমবর্ষেই স্বামীর ঘর করণে । কিন্তু পুত্রকে অবলম্বন করিয়াই হোক আর কন্যাকে অবলম্বন করিয়াই হোক, মা যশোদা রূপেই হোন আর মা মেনকা রূপেই হোন—সেই একই 'মাকে চিনিয়া লইতে কোনও অস্ববিধা হয় না । রামপ্রসাদের গিরিরাণী মেনকা যেখানে গিরিরাজ হিমালয়কে ডাকিয়া বলিতেছেন—

গিরিবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ।

উমা কৈদে করে অভিমান, নাহি করে স্তম্ভগান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥

সেখানে চিত্রটিকে সামান্য একটু পরিবর্তিত করিয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং মেনকা স্থলে যশোদা এবং গিরিরাজের স্থলে ব্রজরাজের কথা গ্রহণ করিতে আমাদের কোনই অস্ববিধা হয় না । গোপালের গোষ্ঠে যাওয়া লইয়া কবিওয়ারার গান দেখি—

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর

নীলমণি ধনে ;

কপাল মন্দ তাহিতে সন্দ,

বলাই হচ্ছে রে মনে ।

কুস্থপন দেখেছি ভারি,

যেন হায়ায়েছি হরি,

বলাই রে তোরা করে ধরি,

মন মানে ত নয়ন না মানে ।

আজকের মতন হারে তোরা,

ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,

পালকেতে হইরে হারা

নয়নভায়া দিয়ে বনে ॥২৪

ইহারই ঠিক পাশে রাখিয়া দিতে পারি আমরা শাস্ত্র সঙ্গীত—

গিরি, কি সুখাণ্ড হে সঙ্গচর ?

বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন,

খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার ।

নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন,

অনেক আয়াসে মুখেছি নয়ন,

অমনি স্বপনে করি দরশন—

শিরয়ে বসিয়া যেন মা আমার ।

বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,

হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ;

হেরে তার আকার চিনে উঠা ভায়,

সে উমা আমার উমা নাই হে আর ॥২৫

লীলা-ক্ষেত্রের সকল পার্থক্য স্নেহেও হৃদয়-মনের ঐক্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই ।

বৈকুণ্ঠ পদাবলীতে আমরা দেখিতে পাই, গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় দিয়া নন্দরাণী সারাদিন উদ্বেগ-আশঙ্কায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং গোষ্ঠী হইতে গোপাল ফিরিয়া আসিলে ক্ষীর-সর-ননী লইয়া আগাইয়া বাহিতেন ।

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে ।

বামে বসাইয়া ভ্রাম

দক্ষিণে বসাইয়া রাম

চুষ সেই মুখ-সুধাকরে ॥

ক্ষীর ননী ছেনা সর

আনিয়া সে ঘরে ঘর

আগে দেই রামের বদনে ।

পাছে কানাইয়ের মুখে

দেয় রাণী মনোহুখে-

নিরঞ্জে চাদ মুখপানে ॥২৬

শাস্ত্র পদাবলীতেও অমূহুপভাবে দেখিতে পাই, উমা কৈলাস হইতে ফিরিয়া আসিলে মা মেনকা আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন—

পথ-প্রশ্নে বেদে সিন্ধু কলেবর,

কুধায় মলিন হয়েছে অধর,

বহু ক্ষীর সর রেখেছি, মাধব,

দিব বদন-কমলে ॥২৭

কানু সন্ধ্যায় গোষ্ঠী হইতে ফিরিয়া আসিলে—

গোপণ সবত

গোষ্ঠে পরবেশল

মন্দিরে চলু নন্দলাল ।

আকুল পঙ্খ

বশোমতি আওল

মোহন ভণিত রসাল ॥২৮

এবং তাহার পরে—

পঞ্চদশে নিরমল্লন কেল ।

কত শত চুষ বয়নপর দেল ॥২৯

আগমনী সঙ্গীতও দেখি কৈলাস হইতে ফিরিয়া উমা আসিলে গিরিরাণী মেনকা—

অমনি উঠিয়ে পুঙ্কিত হৈহরে, ধাইল যেন পাগলিনী ।

চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরনী ॥

আগ্নিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, ক্রুত কোলে নিল রাণী ।

অমিয় বরষি উমা-বুধ-শশী চুষয়ে যেন চকোরিণী ॥৩০

২৫। শা, প, (ক, বি,)।

২৬। বলরাম দাস, পদকল্পতরু ।

২৭। মহেন্দ্রলাল খান (রাজা), শ, প, (ক, বি,)

২৮। পদকল্পতরু ।

২৯। মোহন, পদকল্পতরু ।

৩০। কমলাকান্ত, শা, প, (ক, বি,)

২৪। মহুলাল মিশ্র ; ত্রিনিয়ঙ্কন চক্রবর্তী লিখিত 'উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ারা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত ।

কৃষ্ণের মধুরাগমনের বিচ্ছেদ ব্যথা এবং উমার কৈশাসগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথাও বহুলাংশে কবিগণের মনে খানিকটা সমজাতীয় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কৃষ্ণের মধুরাগমনে যেমন দেখিতে পাই—

কুসুম তেজিয়া অলি কিত্তিতলে লুঠাই
তরুণ মলিন সমান।

শারী শুক শিক মন্থরী না নাচত
কোকিল না করতহি গান ৷৩১

তেনমই উমার কৈশাস গমনেও দেখিতে পাই—

রাগি গো, স্নুধু তোমারি বেকনা ব'লে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুবে, পল্লপক্ষী আদি ক'রে,
উমার লাগিয়া বুবে, সব নিরানন্দময় ৷৩২

কৃষ্ণ মধুরায় চলিয়া বাইবার পর রাজিতে কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখিয়া বন্দরানী যশোলা কাদিয়া উঠিতেন। এই জাতীয় চমৎকার একটি পদ দেখিতে পাই কৃষ্ণকমল গোস্বামীর ‘স্বপ্ন-বিলাস’ পালার মধ্যে। স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়াছে—সকাল বেলা ব্রজরাজী কাদিয়া কাদিয়া সেই কথা ব্রজরাজ নন্দকে বলিতেছেন।

শোন ব্রজরাজ, স্বপ্ননেতে আজ,
দেখা দিলে গোপাল কোথা লুকালে।
বেন সে অঙ্কল চাঁদে অঙ্কল ধ'রে কাদে,
“জননী, দে ননী দে ননী” বলে।

নীল কলেবর ধূলার ধূসর,
বিধুমুখে বেন কতই মধুস্বর
সকায়রে তাকে “মা” বলে।
হত কাদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর সর,
বললেম নাহি অবসর, কেবা দিলে সর,
অমনি সর সর বলি কেলিলে ঢেলে ॥ ইত্যাদি।

সমজাতীয় বহু গান দেখিতে পাই আমাদের আগমনী সঙ্গীতের মধ্যে। এখানে উমার স্বপ্ন দেখিয়া গিরিরাজী মেনকা গিরিরাজকে বলিতেছেন—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতন কত না ঘুমাও হে।

এই এখন শিরে ছিল, গৌরী আমার কোথায় গেল হে,
আধ আধ মা বলিরে বিধু-ঘরনে!

মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অন্তরাপি স্থললিত বচনে।

অচেতনে পেয়ে নিখি, তেমনে হারিলাম গিরি হে!
ধৈর্য না করে মম জীবনে ৷৩৩

আবার—

কাল স্বপ্নে শতরী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার ॥

বসিরে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার,
জাগিরে না হেরি তারে, প্রশ্ন রাখা ভার ৷ ৩৪

দাশরথি বায়ের প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে—

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা দিলে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালে ॥

কহিছে শিখরী, কি কহি, অচল,
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,

চকলার মত জীবন চকল,—

অকলের নিধি পেয়ে হারালো ॥

কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-কবিতায় বাৎসল্য-রসের শুধু একটানা প্রোত্তই দেখিতে পাই—মাতৃ-স্নহের বিগলিত স্নেহধারার সন্তানের উপরে—অবিরল বর্ষণ। বাৎসল্য-রসের অপর একটি প্রোত্ত আছে—উহা মাতৃ-পাগল সন্তানের মাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ—যে আকর্ষণ তাহাকে সংসারের অস্ত্র সকল আশঙ্কিত বন্ধন হইতে একেবারে মুক্তি দিয়াছে। মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষণ বাৎসল্য নামে বহুখ্যাত বলিয়া মায়ের প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রতিবাৎসল্য নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাৎসল্য-রূপ সন্তানের এই সর্ববিধায়ক আকৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই—শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, অস্ত্র কেনও সাহিত্যেই—এমন করিয়া নাই যেমন আছে বাঙলা দেশের এই শাক্ত সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক—রামপ্রসাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি। স্বপ্নে ঘুমুখে, আশায় নৈরাশ্যে পাওয়ার না পাওয়ার, হাসিতে অশ্রুতে মিলাইয়া এই ‘মা’ ডাক। সর্বব্যাপিনী সর্বৈশ্বর্যময়ী আনন্দরূপিণী মাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া রস-বিফারিত নেত্রে কল্পগাত্র কণ্ঠে যেমন মা নাম, তেনমই আবার ‘ভবের গাছে ছুড়ে নেওয়া’ চোখে তুলি বাঁধা বলসের মত বানির গাছে ঘুরিতে ঘুরিতেই শ্রান্ত কণ্ঠে মায়ের নাম, (৩৫)—না-জানা অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে ভুগিতে ভুগিতেই মায়ের নাম, (৩৬) আবার ডাকিতে ডাকিতে শ্রান্ত না পাইয়া অভিমানের অবিরল অশ্রুতে অথবা অভিমানের কঠিন রোবেও সেই একই মায়ের নাম। এই সাধন-শক্তিতে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে বলিয়াছিলেন—

এমন ছাপাম ছাপাইব খোঁজে খোঁজে নাহি পাব।

বস্ত্র পাছে গাভী যেমন তেনমি পাছে পাছে ধাব।

স্নহের সমস্ত আর্তি আকৃতি উত্তরহীন নৈশকোয়ার কঠিন শিলাতে মাথা কুটিয়া কুটিয়া একদিন হরত কুঁসিয়া উঠিয়া বলিয়াছে—

মা বলে আর ডাকিস, না-রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।

থাকলে আসি সিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই ৷ ৩৭

৩৪। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা, প, (ক, বি,)।

৩৫। ‘মা আমার ঘুরাবি কত’ প্রভৃতি, রামপ্রসাদ।

৩৬। ‘তারা কোন অপরাধে, এ-দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল’। নীলাদর হুখোপাধ্যায়, শা, প,

৩৭। নরায়ণ দাস; শা, প,

৩১। গোবিন্দ দাস। ৩২। রম্যপতি বন্দ্যোপাধ্যায়; শা, প, (ক, বি,)

৩৩। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা, প, (ক, বি,)।

অভিমনে হৃদয়কে কঠোর কথিয়া সজ্ঞান বলিয়াছে—

যে ভাল কহেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই।

ভালর ভালর বিদায় দে মা, আলোর আলোর চলে যাই ॥৩৮

পূজীভূত অভিমন্যুর জ্বালায় রামপ্রসাদও একদিন মায়ের সহিত
সব হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

মা মা বলে আর ডাকব না।

ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যত্ননা ॥

ছিলেম গৃহবাসী, কবিরি সন্ন্যাসী,

আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,

ঘরে ঘরে ঘাব, ভিকা : যগে ঘাব,

মা বলে আর কোলে বাব না ॥

ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,

মা কি রয়েছিস চক্ষুর্কর্ণ খেয়ে,

মা বিজ্ঞমানে এ হুংখ সন্তানে,

মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥

কিন্তু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এই সব সঙ্গীতকারগণ। এই অভিমন্যুর
চোখের জলেই হয়ত তাঁহারা বুকিতে পারিলেন, মা যে স্বাশানবাসিনী,
অজর মায়ের আগমন নাই। তখন চলিল একটু একটু করিয়া
নিজের হৃদয়কে স্বাশানে পরিণত করিয়া মায়ের লীলা-ক্ষেত্র রচনা
করিবার সধনা। কামনা-বাসনা-আসক্তিকে নিঃশেষে জ্বালাইয়া
পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে স্বাশান করিতে হয়; দক্ষ কামনা-
বাসনার চিত্তাভ্যাসের উপরেই স্থাপন করেন সর্বশাস্তিদায়িনী
মা তাঁহার দুই চরণ। সেই মাতৃ-সাধনার রত রাবলাল দাস
দন্তের গান—

স্বাশান ভালবাসিস ব'লে স্বাশান করেছি হৃদি।

স্বাশানবাসিনী শ্রামা নাচবি ব'লে নিরবধি ॥

আমরা বাঙলা বৈষ্ণব পরবালী ও শাক্ত পদাবলীর ভিতরকার
মিলের কথাই আলোচনা করিতেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে
উভয়-জাতীয় পরবালীতে বর্ণিত বাৎসল্য-রসের কথা বলেতেছিলাম।
এই মিলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে
পারি। বাঙলা দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঘন্থের কথা সুপ্রসিদ্ধ।
নবরাগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দস্তপূর্বক
বিহহার পূজা, মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মত্তমাসে দিয়া
বাহুলী পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই পটভূমির উপরে
বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ, ফলে শাক্ত-ধর্মের সহিত ঘন্থ-কলহ অনিবার্য।
নবরাগে এই ঘন্থ-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছে, তাহার চিহ্ন
আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব
বাসমাত্রার পূর্ণিমা রাত্রিতে নবরাগের প্রধান প্রধান রাত্তাগুলির
তোমাথা-চোমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসমারোহে
পূজিতা হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমরা এই শাক্ত-বৈষ্ণব ঘন্থের
একটা জনশ্রিত সম্বন্ধের প্রবণতা দেখিতে পাই। ধর্মের ভেদ
সমজভাবে অবলুপ্ত হইয়া যার দুইজাতীয় হৃদয়ে, এক বর্ধাধ সাধক-
রসে, দ্বিতীয় কবি-হৃদয়ে। যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কবি-
হৃদয়ের যোগ ঘটরাছে সেখানে ত আর কথাই নাই। সাধারণভাবে

লেখা যায়, সমাজের জনসাধারণও ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী; সুতরাং
কথিণেব প্রচারিত সমন্বয়বাদ জনসাধারণ সাদরেই গ্রহণ করিয়া
থাকে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে আমাদের যে সকল যাত্রা-পাঁচালী
প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটা শাক্ত-বৈষ্ণবের সমন্বয়ের
স্বর দেখিতে পাই। এই সব যাত্রা-পাঁচালীতে দেখিতে পাই, রাধার
স্বামী আদ্যন খোব ছিলেন শক্তি-উপাসক—কালী উপাসক। রাধা
লুকাইয়া লুকাইয়া করিতেন কৃষ্ণের পূজা! নন্দিনী কুটীলা গিয়া
ভ্রাতা আদ্যনের কাছে অভিশাপ করিল, বধু রাধা! লুকাইয়া কৃষ্ণের
পূজা করে। আদ্যন ভগিনীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দেখিতে
আসিলেন—আসিয়া দেখেন—

কৃষ্ণকাননে কাগী,

তাছে বাঁশী বনমালী,

করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।

শ্রাম শ্রাম ভেদ কেন করবে জীব ভাস্ত ॥

পীতাম্বর পরিহরি,

হরি হলেন দিগবরী,

মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।

কি বা কাল শশী,

লোলজিহবা এলোকেশী,

ভালে শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত ॥

যে গোবিন্দ পদধরে

সুগন্ধি তুলসী দিয়ে

স্বর নরে সাপে সারা দিনান্ত।

দিয়ে সে চরণে বাঙ্গা জুবা রঙ্গিণী রাই করে সেধ

কে পাঁবে শ্রাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত ॥৩৯

বাঙলা দেশ চলিত কৃষ্ণ-যাত্রার এই পালাটি দর্শকবৃন্দের সোহাগ
সমর্থন লাভ করে—এসত্য আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ
করিয়াছি। রামপ্রসাদের গানও এই কৃষ্ণ-কালীর উল্লেখ আছে। ৪০

ইহার অপর পিঠ দেখিতে পাই শাক্ত পদাবলীতে। সেখানে
কৃষ্ণ-কালী বিষয়ে কবিওয়ালা লালু নন্দালের বিস্তৃত বর্ণনা
'প্রাচীন কবিওয়ালা গান' (শ্রীকৃষ্ণকুমার পাল সংকলিত) গ্রন্থের
৪২—৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

সমন্বয় দেখা দিয়াছে শুধুমাত্র জনপ্রিয় কবিত্বের মারফতে নয়, সেই
সমন্বয়ের গভীর রূপ দেখা দিয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যাহুত্বের
মধ্যে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম অনুভূতির মধ্যে তিনি লাভ
করিয়াছিলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরম-আনন্দ তাহার মধ্যে
শ্রাম ও শ্রামার তিনি কোথাও কোন ভেদ দেখিতে পান নাই।
তাই তিনি অতি সহজ ভাবেই গাহিতে পারিলেন—

কালী হলি মা রাসবিহারী

নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।

নিজ-তত্ত্ব আধা গুণবতী রাধা, আপনি পূর্বক, আপনি নারী।

ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি এলোচুল চূড়া বশীধারী।

সাধকের নিকটে রূপ ত কেবল ভিতরে কতগুলি ভাব উদ্ভূত
করিয়া লইবার জন্ত এবং লীলার আশ্বাস করিবার জন্ত।

৩৯। দামধি রায়ে পাঁচালী।

৪০। কালবরণ ভ্রমের জীবন, ব্রজানন্দের মন উদাসী।

হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী, বাঁশী তাজ করে অসি ॥

রামপ্রসাদ প্রথমতঃ কালীকে অবলম্বন করিয়াই নিজের ভিতরকার ভাবমালার উদ্ভূত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন,—আমাদের যে একই সত্য-অনুশীলন-অভ্যর্থনের লালসা চলিয়াছে তাহাই আশ্বাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়া যে এক পরমসত্যের কাপীরূপে লালসা তাহাওই কৃষ্ণ লাল কোনও সময়ে আশ্বাদন করিতে সাধকের কিছুই বাধা নাই । তাই লাল-বৈচিত্র্য-প্রয়োগ রামপ্রসাদেরই গানে দেখি—

বশোলা নাট্য গো মা ব'লে নীলমণি,

সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ?

গভাব অধ্যাত্মভূতির সহিত সরল কবিপ্রাণ যুক্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে যে সত্য প্রতিভাত হইল তাহাই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাঠ অগাধ কবিগণের মধ্যেও । সাধক কমলাকান্তও কালার 'পরম কারণ' বলিয়াই অল্পভব করিতে পারিয়াছিলেন । এই 'পরম কারণের' নারাকপে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, তেমনই পুরুষরূপে প্রকাশিত হইতেও কেন বাধা নাই ।

জানি না কি মনঃ পরম কারণ, কালী কেবল ময়ে নয় ।

মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পূজ্য হয় ।

হ'য়ে এলোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দম্ভজ-তনয়ে করে গড়য় ।

কত ব্রহ্মপুত্রের অসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ৷১১

এ সম্বন্ধে আত্ম চমৎকার একটি গান দেখিতে পাই নবাই ময়রার । ই'হার কবি মরমিয়া সহস্রপদ্যের মলের । হৃদয়ের যে মন্দিরে অসি-মুগ্ধধারিণী কালীমায়ের প্রতিষ্ঠা সেই মন্দিরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধুর-লীলা-আশ্বাদন করিবার অভিলাস ।—

হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা দ্বিভঙ্গ হয়ে ।

একবার হ'য়ে বাঁকা, দেমা দেখা,

ঐ বাধারে বামে ল'য়ে ।

নয় কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,

মাধায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ খুঁয়ে !

১১ শা. প. (ক. বি.) ; তুলনীয়—

অভেদে ভাব যে মন কালা আর কালী ।

মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুগ্ধমালী ।

কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয়ে না কোন কালে,

কালের কত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী ॥

রামলাল দাস দত্ত, ঐ ।

ভাজি নয়-শিরমালা, পদ গলে বনমালা,

একবার কালী ছেড়ে হও মা কালী,

ওগো ও পাখানের মেয়ে ।

হৃৎ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে ভালবাসি,

একবার তাজে আসি ধর মা বাঁশী,

ভক্তবাহু পুরাইয়ে ॥ (৪২)

একটু প্রেমিধান করিলেই বোঝা বাইবে, শাক্ত পদাবলীতে এই-জাতীয় গান কোনও তরঙ্গ প্রভাবজনিত নয় ; এখানে প্রভাব একেবারেই কিছু নাই এমন কথা বলিতে পারি না ; তবে প্রভাব অপেক্ষা এখানে অল্পভূতির ব্যাপকতাকেও মর্যাদা দিতে হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবও শাক্ত সাহিত্যে কিছু কিছু পড়ে নাই এমন কথা বলিতে পারি না । গোবিন্দ আধিকারীর রচিত রাধা কৃষ্ণকে লইয়া শুক-সারীর দ্বন্দ্ব একটি প্রসিদ্ধ গান । (৪৩) ইহারই অমুকরণে পত্রিতাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি 'নন্দী ঘরার দ্বন্দ্ব' দেখিতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া ।

নন্দী বলে, আমার শঙ্কু বেন রক্তশিখরি,

জয়া বলে, গৌরী আমার সুবর্ণ বহুরী,

রূপে জগৎ আলে ।

নন্দী বলে, আমার প্রভু শিরে বাল কণী,

জয়া বলে, মা'র নুপুড়ে কণীর মাথার মণি,

শোভা বলব কত !

নন্দী বলে, আমার শিবের ভষ্ম গায়ে মাখা,

জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মাঠের দেশা,

ভোলা তাই উদাসী ।

নন্দী বলে, শোভা পঞ্চ বদনমণ্ডলে,

জয়া বলে, হুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে,

পাগল পকানন । ইত্যাদি ৷৪৪

৪২। শা. প. (ক. বি.)

৪৩। শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন ।

সারী বলে, আমার রাধা বামে বস্ত্রক্ষণ,

নৈলে শুধুই মদন ।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল ।

সারী বলে, আমার রাধা শাক্ত সঙ্কায়িল,

নৈলে পারবে কেন ? ইত্যাদি ।

৪৪। শা. প. (ক. বি.) ।



মিঃ লোমেন হত্যার নায়ক বিনয় বসু

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

এ যে দ্বিরীক-শব্দ গো-বেচারী ধরণের ছেলে, ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, কোন দলদলিলিতে থাকে কোন দিন দেখা যায় নাই—সেই বিনয় বসু যে বিপ্লব যুগের প্রলয়-বহিরূপে কোন দিন প্রকাশ পাইবে তাহা মিঃ লোমেন হত্যার পূর্বে কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে? সত্যই এটা একটা অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা।

ঢাকা নগরীতে (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) আমাদের বাসার নিকটে একটি ছাত্রাবাসে থাকিয়া বিনয় বসু ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়িত। সে খুব সুন্দর বাঁশী বাজাইত, উঠাই যেন ছিল তার একমাত্র আনন্দ। আমাদের বাসা হইতে উঠাদের ছাত্রাবাসটি দেখা যাইত। ঐ ছাত্রাবাসের ছাদে বসিয়া উঠাকে কত দিনই না বাঁশী বাজাইতে দেখিয়াছি। বহুকাল পূর্বের ঘটনা হইলেও সমস্ত বাণীবাদী আজও চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসিতেছে। মনে হয় উঠা যেন অঙ্গকাব ঘটনা।

আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে—এই স্বাধীনতা লাভ করিতে কত চেষ্টাই না তাদের অমূল্য জীবন অকাল মৃত্যুর যুগকাষ্ঠে আহুতি দিয়া অমর লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বহুকালব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ভারত আজ স্বাধীনতার আলোকে উজ্জ্বল এবং মুক্তির আনন্দে উচ্ছল।

বীরা স্বাধীনতার সার্থক রূপ দেখিবার পূর্বেই অবিরাগ সংগ্রাম করিয়া চিরবিরাগ লইয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে জানাই সম্ভব কৃতজ্ঞতা। অরণ কর তাঁদের—বীরা শক্তি দিয়া শাসন দিয়া কঠোর সাধনা দিয়া উন্নীতদের অভাবনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ করিয়া অকুণ্ঠ চিন্তে সকল পার্থিব স্তব্ধ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকের জীবন এক একখানি ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আজ অরণ কর তাঁদের, বীরা দেশকে—‘মা’ মনে করিয়া পরাধীনতার অবমাননা। হইতে তাঁকে উদ্ধার করিতে হাসিমুখে নিজেদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র বিধাবোধ করেন নাই করি ভাষায়—‘জীবন-মৃত্যু পায়েব ভৃত্য চিত্ত ভাবনা ইন।’ এই সকল বরণা ও চিরস্মরণীয় বিপ্লবী—ও স্বাধীনতার অগ্রদূতরূপে বীরা প্রণাম্য—বিনয় বসু যে তাঁহাদের অঙ্গতম ইচ্ছা কে না স্বীকার করিবে?

তাঁদের চিন্তাগারার সাথে, তাঁদের হিংসাত্মক কাজের আদর্শের সাথে আমাদের বিন্দুমাত্র মিল না থাকিলেও তাঁদের জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা, শাসকদের দুঃখ-কষ্টের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ করা ও শেখাভূক্তার পদতলে জীবন বিসর্জনের চরম ত্যাগকে চিরকাল কৃতজ্ঞ-চিন্তে অরণ করিয়া নিজেবাই ধ্বংস হইব। তাঁরা যে ভারতের স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক।

আজ আমি পাঠকদের নিকটে মিঃ লোমেন হত্যার কাহিনী ও সেই সাথে উঠার নায়ক বিনয় বসুর কথা বাহা নিজ চোখে দেখিয়াছি—বলিব। বিনয় বসুর নাম কেন বঙ্গালী না জানেন? বিনি জানেন না, তাঁহাকে বঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে বড়ভাঙাই সঙ্কট হয়।

১৯৩০ সনে জুলাই মাসে এই ঘটনা ঢাকায় এটিকোর্ড হাসপাতালে প্রাতে অনুমান দশ ঘটিকায় ঘটে।

মিঃ লোমেন ছিলেন সেই সময়ে পুলিশের তর্জী কর্তা বিধাতা অর্থাৎ I. G. P. এবং মিঃ হডসন ছিলেন ঢাকার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট। হিন্দুর প্রতি বিশেষতঃ ছাত্রদের ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের প্রতি—তাঁহাদের অগ্নায় ও অস্বা অত্যাচারের জঙ্ক সকল হিন্দু অধিবাসীর নিকটে কুখ্যাত ছিলেন।

ঢাকা নগরীতে ও উঠার সংলগ্ন ও অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে ঐ সময়ে প্রবল বেগে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল এবং সেই আন্দোলনে কত দ্বী-পুরুষই না যোগদান করিয়া হাসিমুখে অজ্ঞান অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা যেমন গণনাতীত—তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের কাহিনীও তেমনি বর্ণনাতীত।

ঐ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে মদের দোকান, আবগারী দোকানগুলিতে সর্বদা পিকেটিং চলিত। সেজ্ঞা সরকারের আয়ের পথে যথেষ্ট সিয়ের সৃষ্টি হইত। সেই সাথে প্রায়শঃ সবতালের জঙ্ক ঢাকার পুলিশ প্রভুরা খবত চকল ও রক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংসদ কাজের জঙ্ক তাহারা ছাত্রদের—বিশেষতঃ মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের দায়ে কলিচ। ফলে প্রায়ই নিশাপ ও নিবাহ ছাত্ররা অকাবশে নিষ্ঠুর ভাবে প্ররক্ত হইত। গভীর রাত্রিতেই তাহাদের এই পৈশাচিক কার্য চলিত। অনেক রাত্রিতে এই সকল ছাত্রের করুণ কান্না শুনিয়াছি।

আমার দুর্ভাগ্য—এইরূপ অত্যাচারের ফলে অনেক নিবীহ ছাত্র অবশেষে বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখাইয়াছে। প্রতিশোধ-মন্ত্র হইয়া এই সকল তরুণ যুবক যে চকল হইবে ইচ্ছা আর আশঙ্কা কি? এইবার সেই বল ঘটনার হাট। ১৯৩০ সনের ১লা জুলাই প্রাতে অনুমান দশ ঘটিকায় মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন এক সাথ হাসপাতালে তাহাদের এক বন্ধকে দেখিতে আসেন—বন্ধুটি River S. P.—তিনি পুরুষ লিঙ্গসাহেবের বাড়ীতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও তাঁহাকে হাসপাতালে চিকিৎসাার্থ পাঠান হয়।

সেই দিন হাসপাতালে ও রাস্তাঘাট পূর্ণ হইতেই পুলিস ভরা ছিল। কারণ সেই দিন প্রাতে সাত্বে দশ ঘটিকায় তদানীন্তন লিটসাভেবের পক্ষ হইয়া তাহারা কল্লার হাসপাতালে পারদর্শনের কথা। মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন উভয়ের হাতেই প্রকাণ্ড পিস্তল ছিল। তাহারা, তাঁদের পূর্বোক্ত বন্ধকে দেখিয়া হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবের সাথে ঈড়িয়া কথা বলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বিনয় বসু ও তাহার এক সাথী যাহার নাম বা কোন পরিচয় আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই এবং সে কি ভাবে যে বহু পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়া পলাইবার সুযোগ পাইল, তাহাও আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। হঠাৎ মিঃ লোমেনদের নিকটে আসিয়া ঈড়িল। বিনয় বসু উঠাদের প্রায় ১০ হাত দূরে আসিয়া মিঃ লোমেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল “ওউ মর্নিং মিঃ লোমেন।” মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন বেই কিরিয়া ঈড়াইলেন অননি বিনয় বসু তার হাতে থাকা রিভলবার দ্বারা মিঃ লোমেনকে উপস্থাপিত ওলী করিল ও

বিনয় বস্তুর সঙ্গীতি সাধে সাধে মিঃ হডসনকে গুলী করিয়া শিশুসহ পলাইল।

মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন উভয়ের হাতের শিশু হাতেই বহিয়া গেল। ব্যবহারের সুরোপ হওয়ার পূর্বেই আততায়ীদের গুলীতে বিদ্ধ হইয়া উভয়েই রক্তাক্ত দেখে হাসপাতালের সিঁড়িতে পড়িয়া গেলেন। হাসপাতালে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হইল। ঐ সুরোপে বিনয় বস্তুর সঙ্গীতি যে কোন পথে পলাইয়া গেল কেহই সঠিক বলিতে পারে না।

বিনয় বস্তুর হাতের রিভলবার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ও পারের চাঁচী ছুতা সেখানে রাখিয়া তার মেসের দিকে সদর রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া চলিল। হাসপাতাল হইতে তাহার মেস অল্পমান দুই হাজার হাত হইবে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য এবং কেবল চাকার চুনিতোছি “পাকড়াও”—“পাকড়াও”। এত লোকের ভিড় দিয়া নির্ঝরে বিনয় বস্তুর তাহার মেসে চলিয়া গেল। এত লোকের মধ্যে কেন যে কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইল না ভাবিলে সত্যই আশ্চর্য হইতে হয়।

এই ঘটনার প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট পরে বিনয় বস্তুর তার মেস হইতে একটি সাইকেলে নিশ্চিন্ত মনে পলাইয়া গেল। তখন রাস্তাঘাটে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল,—কিন্তু কেহই বিনয় বস্তুরকে ধরবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না।

প্রায় আশ ঘটনা পরে অল্প পুলিশের দল হাসপাতাল ও নিকটবর্তী রাস্তা-ঘাট ছাইয়া ফেলিল ও গতানুগতিক ভাবে তাদের কার্যক্ষমতা দেখাইতে ক্রটি করিল না। যেখানে বাহাকে পাইতেছে বানাতুল্লাসী করিয়া যতখানি সম্ভব বিরক্ত করিতে ক্রটি করিল না। বহু নিরস্ত্র যুবক তাদের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া জেলখানায় প্রেরিত হইল। পুলিশ বাহিনী বিনয় বস্তুরকে ধরিতে পারিল না :— তবে তাহার পরিত্যক্ত রিভলবার ও চাঁচী ছুতা লইয়া সজ্জ হইল।

অনেকেই হয়ত জানেন যে, এই ঘটনার কিছুকাল পরে বিনয় বস্তুর কলিকাতায় অল্প একটি বিপ্লবী ঘটনায় মারা যান।

অল্প পুলিশের চোখে ধুলি দিয়া বিনয় বস্তুরকে কি ভাবে ঢাকা ভাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তাহা আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই—কোন দিন যে জানা যাইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখি না। বাহা ইউক, মিঃ লোমেন আহত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়া ছিলেন—পরে মারা যান। তাঁহার জ্ঞান আর কিরিয়া আসে নাই।

মিঃ হডসন যত্নের চুরায় হইতে কিরিয়া আসিলেন। যদিও তিনি প্রাণে রক্ষা পাইলেন কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হইল। তিনি অকালে অতি যুব হইয়া পড়েন। আচার-ব্যবহারেও পরবর্তী কালে তিনি খুবই সংকট হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় বিনয় বস্তুর জীবন বিসর্জন দেওয়ার পূর্বে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকার উচ্চপদস্থ পুলিশ বাহিনীর দাবণ ছিল যে, বিনয় বস্তুর ঢাকাতেই আছে, ঢাকাতেই ধরা পড়িবে এবং ঢাকাতেই বিচারে কাসীর মতো শুলিবে এবং পুলিশ বাহিনীর অঙ্গ-অঙ্গরকার হইবে। কিন্তু তাহাদেরই সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

যে রিভলবার দ্বারা বিনয় বস্তুর মিঃ লোমেনকে হত্যা করে তাহার একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস উদ্ধারে কৃত্রিম রায় সাহেব

জিভেন্স ধর, সি-আই-ডি বিভাগের পুলিশ ইন্সপেক্টর মহাশয়ের। বহু বার মনে পড়ে, এই ঘটনার তদন্তের ভার তাঁকে দেওয়া হইয়াছিল।

মিঃ হাচিল নামে একটি খাস বিলাতী সাহেবের শাক দ্বীটে সোনা রূপা জহরতের খুব বড় দোকান ছিল। দোকান ও আশ্রয়কার জন্ত তিনি এই রিভলবারটি লুকন হইতে ক্রয় করেন। মিঃ হাচিল ও মিঃ লোমেনের মধ্যে বহুই বন্ধু ছিল। ১৯১১ সনের শেষভাগে মিঃ হাচিল কিছুদিনের জন্ত হাঞ্চিং-এ বেড়াইতে যান এবং তিনি যে হোটলে জায়গা নেন, মিঃ লোমেনও সরকারী কাজে সেই স্থানে গাই নেন। হাঞ্চিং-এ এই রিভলবারটি লুকন হইতে মিঃ হাচিলের নামে ভিঃ পিঃতে আসে। এই রিভলবারটি দেখিতে খুবই স্বন্দর ছিল। উহা দেখিয়া মিঃ লোমেন পরহাস্য করিয়া বলেন যে, এমন একটি রিভলবার যদি কেহ আমাকে উপহার দিত, তাহা হইলে আমি নিজেকে মোগল বাদশা মনে করিতাম আর উপহারদাতাকে এক শত একটা মোগল বাদশাহী-মোহর উপহার দিতাম। তখন মিঃ হাচিল হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, তুমি এখন পুলিশের Inspector General হইবে, তখন এটি তোমাকে উপহার দিব। ইহা মিঃ হাচিলের মুখে নিজে শুনিয়াছি।

মিঃ লোমেন তখন তরুণ যুবক এবং Asst. Police Suptd. রূপে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কে জানিত যে সেই রিভলবারই যত্নের দৃষ্টরূপে মিঃ লোমেনের প্রতীকার ছিল।

মিঃ হাচিলের অলঙ্কারের দোকানের সিন্ধুক হইতে ১৯১৪ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর এই রিভলবারটি চুরি যায়। সমস্ত ও একপ্ত সাধারণ রক্ষিত রিভলবারটি বিনয় বস্তুর হাতে কবে ও কি ভাবে আসিল তাহা আজ পর্যন্ত প্রকাশ পায় নাই।

বিপ্লবীদের কাহিনী ও বিপ্লবের পূর্ণ ইতিহাস যদি কখনও কোন ঐতিহাসিক অসীম পরিভ্রমের দায়িত্ব লইয়া রচনায় প্রবৃত্ত হন, এই কাহিনী হয়ত তাঁহাদের আরও কাজের সহায়ক হইতে পারে।

১৯১৪ সনের চুরি বাওয়া রিভলবারটি, যেটি দেখিয়া মিঃ লোমেন এক যুগ হইয়াছিলেন, তাহাই পুনঃ ১৯৬০ সনে তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু সে ইতিহাস আনন্দের নয়—বেদনার করুণ-কাহিনী।

মিঃ হাচিল এই ঘটনায় খুবই ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তার চুরি বাওয়া রিভলবারটি দেখিয়া বহন বলিলেন যে আমি মিঃ লোমেনকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম যে তুমি এখন Inspector General of Police হইবে তখন, এটি তোমাকে উপহার দিব। বোধ হয় আমার পূর্বে প্রতিক্রান্ত রকার জন্মই রিভলবারটি এ ভাবে দেখা দিল। এই প্রকাশ চিরকাল আমাকে আঘাত দিবে। এই ভাবে দেখা না দিয়া যদি চিরকাল রিভলবারটি অপ্রকাশ থাকিত তাহা হইলেই আমি সব চেয়ে বেশী খুশী হইতাম। এই কথাগুলি বলিবার সময়ে লক্ষ্য করিলাম যে তাঁর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

এইরূপ হত্যার পূর্বে রিভলবারটি অল্প কোন ঘটনায় লিপ্ত ছিল কি না তাহা জানা যায় নাই।

জীবনরক্ষার জন্ত যেটির প্রয়োজন মনে হইয়াছে তাহাই কি না যত্নের বাহনরূপে নিষ্ঠুর ঘটনায় এই ভাবে দেখা দিল।

ইহাকেই বলে দিয়তি! অতৃপ্তের নির্দম পরিহাস!!

জীবন গীতা

শ্রীগোতম সেন

[গীতাকে আমরা ধর্ম-গ্রন্থ বলেই জানি। নিত্য পাঠ করি, পূজা করি। কিন্তু এর ভেতরে কি আছে—তা অনেকেই জানি না। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজে জড়িয়ে আছে এই গীতা। নিয়মিত আচরণ করলে জীবনকে শুভ্র ভাবে রক্ষা করা যায়—এ প্রত্যক্ষ সত্য। তাই এর নাম দিয়েছি জীবন-গীতা। গীতার ভাষ্য করেছেন অনেকেই। তা আরও দুর্ভাগ্য। আমি নতুন কিছুই লিখিনি। তাঁদেরই কথা ভেঙে ভেঙে সাধারণকে বোঝাবার জন্যে সহজ করে বলেছি মাত্র।—লেখক]

কুরুক্ষেত্রের সূচনা

অন্ধ রাজা দ্রুতরাষ্ট্র পরাভব অনিবার্য জেনেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলেন না। স্নেহাক পিতা, পুত্র দুর্ধোধনের দুর্বনীত ব্যবহার অসহায়ের মতো সহ্য করছেন। জ্ঞানি বন্ধু আশ্বায়-বজ্রন সকলেই চান তার অপরাধের শাস্তি হোক, শাস্তি আসেও তার বজ্র-কঠিন হাত নিয়ে এগিয়ে, কিন্তু দুর্ধোধনের মুখের দিকে চেয়ে সে লৌহ-কঠিন হাত শিথিল হয়ে যায়। শিতামহ ভীষ্ম, অর্চাধি শ্রোণ, মহামতি বিহুর সকলেই দেন উপদেশ। কিন্তু সকল উপদেশকে অগ্রাহ্য করে মদমত্ত দুর্ধোধন পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মহাজ্ঞানী দ্রুতরাষ্ট্রের কাছে এ যুদ্ধের পরিণাম অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর স্বনাশা পুরুষের। পুত্র দুর্ধোধন এই দুর্বলতার প্রয়োগকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগালেন। কৌশলে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত করেও রাজা দুর্ধোধন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না—গোপন বড়রত্নে তাঁদের বধের ব্যবস্থাও করলেন। সম্ভানে একটি পরিবারকে ভার আঁধারের দিক দিয়েই শুধু নয়, তার ঐতিহ্য, তার বংশ:খ্যাতি প্রভাব-প্রতিপত্তি—এক কথায়, জগৎ-ইতিহাসের পাতা থেকে পাণ্ডবের নাম মুছে কেলে দেবার সংকল্প নিয়ে রাজা দুর্ধোধন কূট রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

পুরুষসল রাজা দ্রুতরাষ্ট্রের কাছে পুত্রের কীর্তি ও অকীর্তি বধন সমান উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তখন গান্ধারী এসেন আবেদন নিয়ে—পুত্রকে ত্যাগ করবার আবেদন নিয়ে। রাজাকে তিনি তিরস্কার করেন, কটুক্তি করেন—পাপ-পুণ্যের কথা বলেন, দ্রুতরাষ্ট্র চিন্তিত হন, শাসন করবার প্রতিক্রিয়াও দেন, কিন্তু ঐন্দ্রজালিক দুর্ধোধন তাঁর বাকচাতুর্যে দ্রুতরাষ্ট্রকে বার বার সন্মোহিত করেন।

এমনি সন্মোহিত হয়েছিলেন তিনি যখন তাঁকেই সম্মুখে রেখে রাজকুলবধু দ্রৌপদীকে তারা লালিত করলো। সত্যি সেই কল্পন কণ্ঠের আবেদন তিনিও স্বকর্ণে শুনেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কিন্তু শ্রবণশক্তি তিনি হারান নি। তিনি স্বকর্ণে শুনেছিলেন, যখন ভগবানের আশ্বাসবাণী। বে-আশ্বাসবাণী পাণ্ডবদের সমুদ্র করেছিল। গান্ধারী বললেন, এত বড় পাপ গীহেব না মহারাজ!

মহারাজ বললেন, ধর্মই তাকে শাসন করবে, বে-ধর্মকে সে লঙ্ঘন করেছে।

কিন্তু মহারাজ পাণ্ডী-পুত্র বিধাতারও ভ্রাতা।

তাইতো তাকে ত্যাগ করতে পারি না মহারানি, আমি যে তার একমাত্র।

গান্ধারী বললেন, আপনি তো শুধু পিতা ন'ন—আপনি যে অগণিত অল্পবয়সের রাজা।

আমাকে শুধু পিতা হয়ে থাকতে দাও মহারানি।

গান্ধারী তখন অশ্রুপূর্ণ লোচন বললেন, হায় অন্ধরাজা, দুর্ভাগ্য আমার, তোমাকেও আজ উপদেশ দিতে হচ্ছে! নইলে একথা আজ কেন ভুলে গেলে মহারাজ, দেহের একটি অঙ্গে পচ, ধরলে সে-অঙ্গ ত্যাগ করাই ধর্ম?

কিন্তু দুর্বল পিতা, নিরুপায় পিতা অসহায়ের মতো সেই পচা-অঙ্গকেই মমতা দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন।

বনবাসের পর পাণ্ডবদের কিরে আসবার সময় বধন আসন্ন হয়েছে, তখন এলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য-প্রত্যর্পণের প্রস্তাব নিয়ে। দুর্ধোধন সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ভায়া রাজ্য চায় না, চায় বাস করবার একখণ্ড ভূমি। দান্তিক দুর্ধোধন জানালেন, বিনা যুদ্ধে সূত্রগ্র প্রমাণ ভূমিও তিনি দেবেন না।

এই ঘোষণার সকলেই বিচলিত হলেন। দ্রুতরাষ্ট্র তিরস্কার করলেন, ভীষ্ম শ্রোণ কৃপাচার্য সকলেই এই পাপযুদ্ধ থেকে বিরত হতে বললেন। কিন্তু দুর্ধোধনের পরাক্ষেপে তখন ধর্মী কম্পিত হচ্ছে। বললেন, যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাকেন—বয়স হয়েছে অবসর গ্রহণ করুন।

ভগবান কিরে গেলেন শূন্যহাতে। অজ্ঞ-পুরুষ বলে গান্ধারী প্রত্যাক করলেন, ‘আগামী-কালের কুরুক্ষেত্র-প্রাণ্ডর।’

অর্জুনের প্রথম প্রস্তাব

যুদ্ধ-আয়োজন সম্পূর্ণ করে অর্জুন বধন দ্বন্দ্ব হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, এত যে আয়োজন, এ কার জন্যে? আর কেনই বা এ আয়োজন? কুহু রাজ্য সে আমাকে কি দেবে?

যুদ্ধ দেবে জগৎকে শান্তি। পাণ্ডব উচ্ছেদ হবে। রাষ্ট্রবের কল্যাণে এই যুদ্ধের আয়োজন আছে বহু। যুদ্ধ যেখানে আত্মহতু, সেখানে সে পাপ। ভূমি বাবে দুইতের বিনাশের জন্যে—ধর্ম করবে অধর্মকে জাঘাত।

অর্জুন বললেন, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম সে তুমিই জানো কৃষ্ণ, কিন্তু আমি জানি, যুদ্ধ হত্যারই জিন্ন নাম।

কৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, এ শুধু আমি তোমাকে পরে বলবো। কিন্তু তুমি কত্রিয়, জগতে কোনো কত্রিয় যুদ্ধকে পরিহার করবার জন্যে যুক্তি-আলো বিস্তার করে না। কৌরব আজ তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে—তুমি কত্রিয়, তুমি তোমার স্বধর্ম পালন করো।

যুদ্ধের বললে যুদ্ধই কি তবে ক্ষমিকার একমাত্র স্বৰ্ণ কৃষ্ণ ?

তোমার ধর্ম আর ব্রাহ্মণের ধর্ম এক নয় অর্জুন !

বেশ বেশ কৃষ্ণ, অর্জুন হাসতে হাসতে বললেন, আমি কিছু জানি না, ভূমি যা করাবে তাই করবো। এ-যুদ্ধে আমি হবে। রথী, ভূমি হবে সারথি।

নিজেকে এমন সমর্পণ যদি করতে পারে অর্জুন, জয় আমি তোমাকে এনে দেবো।

অর্জুনের অন্তত্যাগ

পাণ্ডব এবং কৌরব। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের সংঘাত। আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে আছে দানবের সঙ্গে দেবতা। পাণ্ডবের সঙ্গে পুণ্য। 'সন্তাবামি যুগে যুগে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই অধর্মকে নাশ করতে আমিই এসেছি বারে বারে, হে পার্ব, তাইতো আমার প্রয়োজন তোমাকে।

অর্জুন যুদ্ধসজ্জার সজ্জিত হয়ে এসে দাঁড়ালেন শত্রু-সৈন্যের মুখোমুখি। বললেন, শত্রু কে ? এরা যে আমার আত্মীয়, কার সঙ্গে করবো অন্ত্যাত্যাত ? সে-অস্ত্র যে আমারই বৃকে কিংবে এসে লাগবে। কে শত্রু, কে মিত্র জানি না—আমি দেখছি, তাঁদেরই মধ্যে রয়েছেন আমার পিতামহ, আমার পিতৃব্য, আমার আচার্য—ওঁদেরই মধ্যে রয়েছে আমার বংশের ধারা পুত্র-পৌত্রাদি—আমার সখা, বন্ধু আত্মীয় আত্মীয়—হে কেশব, থামাও তোমার সর্বনাশা যুদ্ধ, আমার শরীর অবসর হয়ে আসছে। তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধনঃ খ্যাতি। আর কার ক্ষত্রেই বা এ সব ? কে ভোগ করবে সে-সম্পদ ? আমার বলতে যারা, তাদের বিনাশ করে কি পরম-ঐশ্বর্য ভোগ করবো আমি ? আর যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে বলো কৃষ্ণ, আমিই সে-সুত্বা বরণ কার। নইলে সজ্জানে আমি আমার স্বজন-সঙ্গ কখনো অন্ত্যাত্যাত করতে পারবো না।

যুদ্ধ স্বজন-নিধন সন্তাননা দেখে অর্জুন অমুতাপ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, কার ক্ষত্রে তোমার এ শোক ? জগতে কেউ কি মরে ? মরে না। তোমার আমার মতো ওরাও—যারা এই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সমবেত হয়েছে, তারা কেউই মরবে না। আমরা সকলেই ছিলাম, আছি এবং থাকবো—থাকবো জীবন-ধ্বংসের পরেও। 'বাসাংসি জার্ণানি যথা বিহার্য' জার্ণ বস্ত্রের মতো দেখকে পরিত্যাগ করে আমরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবো।

‘এক কাপড় কাঁদা চলে ?

তেমনি দেহ জার্ণ হলে

সেটা ছেড়ে নুতন দেহ পরি।’

তবে দুঃখ কিসের ? দুঃখ ভোগ করে কে ? সে তো আমি ? কিন্তু আমি কে ? ‘আমিই আত্মা। আমিই ভোগ করি, আমিই দুঃখ পাই। কিন্তু এ কোন্ আমি ? আমার দেহটাই কি আমি ? কিন্তু দেহের অল্পভব-শক্তি তো তত্ত্বজনই, বতকণ থাকে দেহে প্রাণ। কিন্তু বধন প্রাণ থাকে না, তখন ভোগ করে কে ? দেহ, না দেহাতীত আর কিছু ? বল, অপমান পায়ে এসে লাগে। মিছে কথা। পায়ে লাগে না। পায়ে লাগলে দেহের বিকৃতি হ’তো। দেহের কেহো পরিবর্তনই হয় না, তবু দুঃখ পাই। তবে এ-দুঃখ পায় কে ? যে পায়, সে দেহ নয়—সে স্বতন্ত্র। লই আমি।

দেহ নয়, দেহাতীত আত্মা। আত্মাকে চোখে দেখা যায় না। চোখে কি সব কিছু দেখা যায় ? কিছু দেখা যায়, কিছু অসুমান করে নিতে হয়। এই যে ইন্দ্রিয়গোচর নয়, অথচ স্রষ্টা-জগৎপের ভোগকর্তা—সেই আত্মা।

আত্মা সকলেরই আছে। তোমারও আছে, আমারও আছে—পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যেই আছে। ভিন্ন আধার বলে আত্মা ভিন্ন নয়। একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন আধারকে আশ্রয় করে আছে মাত্র। যেমন আকাশ আছে সকল পাত্র। পাত্র ভেঙে গেলে, সেই একই আকাশ—বসু আকাশ, বৃহৎ আকাশে বিলীন হয়ে বাচ্ছে। আত্মাও সেই বসু থেকে বৃহতে জগদাত্মায় এসে মিশছে। এই জগদাত্মাই হলো পরমাত্মা। আকাশের বমন বিনাশ নেই, এই পরমাত্মারও তেমনই ক্ষয় নেই।

ক্ষয় নেই আত্মার, কিন্তু দেহের তো আছে ? অর্জুন এই দেহের কথা চিন্তা করেই চকল হয়ে উঠলেন : দেহই তো রাহুঘের সব। দেহই যদি থাকলো না, তবে থাকলো কি ? দয়দ তো এঁ দেহকেই নিয়ে। কারণ, দেহ আর তখন দেহ নয়—বিশেষ একজন হয়ে আমার নয়ন-মন অধিকার করে বসে আছে। কত বস্ত্র, কত আরম, কত সাজ-সজ্জা। সেই দেহকে ভোলা কি সহজ কথা ? দেহ তো শুধু তখন পূর্বাতন বস্ত্র নয়—‘প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।’ এই দেহান্তরে সেই বিশেষ-মাহুঘটিকে পাচ্ছি কোথায় ? সে তো আর তখন সে নয়। প্রাণ কাঁদে তো সেই তাইই জন্মে।

অর্জুনকে বিহ্বল হতে দেখে ভগবান হাসলেন। বললেন, কে কাঁদে ? কাঁদে মানুষ। দুঃখ পেলে কাঁদে। কিন্তু দুঃখ তো তত্ত্বজন, বতকণ বস্ত্রের সঙ্গে থাকে ইন্দ্রিয়ের যোগ। এই সংযোগ বতকণ থাকে, তত্ত্বজনই দুঃখ। বোদে গা পোড়ে—বোদের সঙ্গে গাত্র-চর্চের সংযোগ পর্যন্তই। যেই সংযোগের অভাব হয়, তখন আর সে অমুভূতি থাকে না। তবে যা থাকে না, যা অনিত্য ? তাকে সহ্য করাই ভাল। যে-দুঃখ সহ্য করলেই ফুরিয়ে যাবে, তার জন্ত আমার কষ্ট কি ? বৃহ্মকেও তেমনি সহ্য করতে শেখো। তাহলে ভয় আর থাকবে না। দেহ তো অনিত্য। দেহের বললে দেহ, রূপের বললে রূপ। এটো একই নিয়মে জগতের সকল বস্তুর রূপান্তর হচ্ছে। দেহীর মৃত্যু অবজ্ঞাতব্য, কেউ বোধ করতে পারে না। যুদ্ধে হোক, ক্ষয়ে হোক, বোগে শোকে—মৃত্যু তার হবেই। তাই তপস্বান বলছেন, হে অর্জুন, মিথ্যা শোক ভূমি পরিহার করে। শোক ত্যাগ করে স্বধর্ম পালন করো। স্বধর্ম অর্থাৎ আপন ধর্মের আচরণ করো। কারণ সকলের ধর্ম এক নয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আচরণ করবে না, ক্ষত্রিয়ও করবে না শূত্রের আচরণ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যেমন যুদ্ধ—সে করবে শত্রুকে আঘাত, ব্রাহ্মণের ধর্ম তেমনি ক্ষমা, শূত্রের ধর্ম সেবা। কর্ম বত ধর্ম তত্ত্ব। আপন আপন কর্মই তার ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ হলোও, অকারণ যুদ্ধ সে করে না। শত্রুকে বিনাশ করতে অধর্মকে আঘাত করতে সে করে অস্ত্র-ধারণ। স্বধর্ম হলোও সে করে না অপরাধকে প্রবোচিত। তবে যুদ্ধ বেধানে অপরিহার্য, সেখানে সে কৌরবের মতো নিশেষ্ঠও থাকে না।

যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত মহাপ্রাণী কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে পাড়িয়ে যুদ্ধের জবাব পরিণামকে লক্ষ্য করলেন। মহাক্ষত্রিয় মহাপ্রাণী মহাকালের মহাক্রিয়াজ্ঞা !

অজুন বললেন, এ-কৃষক শেষ কোথায়? এক অর্থহীন নশ করতে সহস্র পাণে পূর্ণ হলো ধরণী। কুল গেলো, কুলধর গেলো, মানুষের সমাজ-বন্ধনে পড়লো এতও আঘাত। মানুষ ভুলে গেলো কোনটা ধর্ম, কোনটা অর্থ। ভয়হীন, কৃষ্ণাঙ্গ, নিলজ্ঞ বাউচারে পারিবারিক জীবন ভেঙে গেলো। পাণ আজ আর পাণ নয়—তাই ভয় নেয় নিষ্কলুষ ধরিত্রীর বৃক লক্ষ লক্ষ জীবন্ত সন্তান। বুকের পরিণাম যদি এই হয়, তবে কাজ নেই বৃক, আমার সে-বৃক। অজুন ধূরূপাণ ত্যাগ করে বনের পাশে বসে পড়লেন।

ভগবানের প্রথম উত্তর

অজুনকে ধূরূপাণ ত্যাগ করতে দেখে অপেক্ষমান শত্রু-সৈন্য মহা উল্লাসে শব্দধ্বনি করতে লাগলো। অজুনের ক্রিয়-বন্ধ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু বৃদ্ধ তাকে শান্ত করে। বৃদ্ধিহীন পত বিচার করতে জানে না, সামান্ততম উত্তেজনাতেই সে খাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু মানুষ তা পারে না—সে বৃদ্ধির অস্বাভাবিক।

অজুন বিচার ক'রে দেখতে চান, বৃদ্ধির পরিমাণে যাচাই করে নিতে চান, এ বৃদ্ধি কতটুকু তাঁর ক্ষতি আর কি-ই বা তাঁর লাভ। আমি জয় করি, অথবা তারাই আমাকে জয় করুক—এর মধ্যে কোনটি জয়ের, বৃদ্ধি দিয়ে তা বিচার করতে পারলেন না।

উত্তর দিলেন ভগবান: তুমি কে? তুমিই কি সব করো? এই আমার অস্বাভাবিক তোমার সকল বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আছে। তুমি তোমার কাজ করে যাও, কর্মের জগুই তুমি এসেছো। কর্মেই তোমার অধিকার—“কর্মদোষাধিকারস্তে মা ফলমু কদাচন” ফলের দিকে চেও না। এই যে নিরাসক্ত কর্ম, অর্থাৎ সফলতা, নিফলতা বিষয়ে সমান ভাব রাখা সেই তো যোগ। সমতা তো মুখের কথা নয়, থাকে পেতে হয়—অজ্ঞান দ্বারা ভয় করতে হয়।

“যোগস্তু: কুরুকর্মাণি সন্ত: তাক্ষ্য ধনশ্রয়

সিদ্ধিসিদ্ধ্যাঃ সমোভূষা সমঃ যোগ উচ্যতে।”

যোগ হচ্ছে সঙ্গ ভাগ ক'রে কর্ম করতে হবে। যোগ কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান। সঙ্গ কি? কর্তৃবাভিনিবেশ। আমি কর্তা নই, কর্তা তুমি, ভগবান। কর্মযোগের এই হলো বড় কথা। কর্ম তো সংগ্রহ করে—পশু-পক্ষী জীবমাত্রই। কিন্তু তারা করে নিজের জন্তে, নিজের বা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্তে। কিন্তু মানুষের কর্ম-জীবন তাদের উর্ধ্বে—চেষ্টা ক'রে তাকে সকলের উপরে উঠতে হয়েছে। জন্মের পর থেকেই সে খাড়া হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টার ফলেই হাতকে সে অস্ত্র কাজে লাগিয়েছে—বা অস্ত্র জন্ত-জানোয়ারে পারেনি। দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন উল্লসিত হয়ে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডবিরি থেকে বিশ্ব-ভূমির দিকে, নিজের জানা-শোনাকও তেমনই স্বাভাবিক হয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতির থেকে। এই যে আপন প্রেতাকে প্রকাশ করবার জন্তে প্রকৃত প্রয়াস, এ একমাত্র মানুষেরই আছে। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অনুভব করেছে তারি দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচর দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, হৃদিতে, ঘরে, ব্যবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তিগত মানুষের প্রেরণাকে প্রকাশ করতে চায়নি, বিশ্বগত মানুষের আদর্শকে স্থায়ীভাবে দেবার জন্তে তার হুঁসখ সাধনা। এই সাধনার পাশেই সে উল্লসিত হয়ে উল্লসিত

উল্লসিত চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওপরে উঠতে গেলে নীচের ধাপটাকে অস্বীকার করা চলে না—তাকে প্রত্যেকটি ধাপ উত্তীর্ণ হতে হবে, তবেই ওপরে ওঠা যাবে।

ভগবান সেই ওপরে উঠবার কৌশলটিই দেখিয়ে দিলেন। বললেন, কর্ম করো। পশু-পক্ষীর কর্ম নয়, জীব-প্রাণী মানুষের কর্ম। ফলাভাবের প্রত্যাশায় কর্ম নয়, ফল-অফল সমান জ্ঞান রেখে যে কর্ম, সেই কর্ম তোমাকে করতে হবে।

অজুন বললেন, কর্ম তো ক্রিয়া। বা করা যায় ভাই কর্ম। ভগবান হাসলেন, বললেন—এ যে বললাম, কর্মে অনাসক্তি। কর্ম মানেই স্বধর্ম। তোমার স্বাধর্ম সেই অনুযায়ী কর্ম করো। পরধর্ম কখনো গ্রহণ করবে না। কর্ম স্বধর্মচরণের বাহু মূল ক্রিয়া।

অজুন বুঝতে পারলেন না। ভগবান বললেন, কর্মের সঙ্গে মনোমিলন হওয়া চাই। এই মনের সহযোগ হলোই কর্ম তখন বিকর্ম হয়ে যায়। বাইরের কর্ম সাধারণ কর্ম। আর আন্তরিক কর্মই হলো বিশেষ কর্ম। আবার এই বিশেষ কর্ম নিজ নিজ মানসিক প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই বিশেষ কর্মের, এই মানসিক সংগতির সংযোগ-সাধন—করলেই নিষ্কামতার জ্যোতি ফুটেবে। কর্মের সঙ্গে আন্তরিক ভাবের যখন মিলন হয় তখন সে আব-কিছু হয়ে যায়।

অজুন প্রশ্ন করেন, সে কি বকম?

উত্তরে ভগবান বললেন, তেল-পলিকার সংযোগেই কি আলোর উৎপত্তি হয়? হয় না। আলোর উৎপত্তি হয়, তার সঙ্গে জ্যোতির মিলন হলে। কর্মের সঙ্গে বিকর্মের মিলন হলে তবে না নিষ্কামতা আসে। এই কর্মে বিকর্ম ঢাললে তবেই কর্ম দিয়া হয়। তবুও সঙ্গে মন্ত্র থাকে চাই। যেমন বাহু তবুও কোনো মূল্য নেই তেমন কর্মহীন মন্ত্রেরও মূল্য নেই। হাত দিয়ে যেমন, হৃদয় দিয়েও তেমন সেবা করা চাই। সন্তানের কাছে মায়ের সেবা যেমন। কর্মের সঙ্গে বিকর্মের সংযোগ হলোই শক্তির ক্ষুদ্র হয়। আর তা থেকেই আসে অকর্ম।

সে আবার কি? কার্টা পুড়ে ছাই হয়। প্রথমে কত বড় কার্টা ছিল, কিন্তু পুড়ে নিস্তেজ ছাই হয়ে গেল। যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করে। কর্মে বিকর্মের জ্যোতি স্পর্শ হলোই অকর্ম হয়। কোথায় কার্টা, আর কোথায় ছাই! ওদের গুণধর্ম এখন কোনো সমতাই নেই। কিন্তু সে যে ঐ কার্টারই ছাই এতে তো আর ভুল নেই।

তথাপি অজুন প্রশ্ন করলেন: কর্মে বিকর্মের সংযোগ হল অকর্ম হয়—এর অর্থ কি?

এর অর্থ হলো—কর্ম যে করছি তা মনেই হয় না—অর্থাৎ কর্মের যোগ অনুভব হয় না—কর্ম করেও অকর্তা। কর্মকে নির্মল করার জন্যে যখন অবিচল চেষ্টা শুরু হয়, তখন আপনা থেকেই কর্ম নির্মল হতে থাকে। নির্বিকার কর্ম যখন সহজভাবে পর পর হচ্ছে থাকে তখন কর্ম কখন যে হয়ে গিয়েছে তা টের পাওয়া যায় না। কর্ম সহজ হয়েছে মনে, কর্ম অকর্ম হয়েছে। ছেলে হাঁটতে শেখে—প্রথমে কত কষ্টই না হয়—পরে সে কর্ম ভার সহজ হয়ে যায়। কর্মকে অকর্ম করাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্তে স্বধর্মচরণ লক্ষ্য কর্ম করতে হবে। কর্ম করতে করতেই লোভ ধরা পড়বে, তখন বিকর্মের আশ্রয় নিতে হবে। এই চেষ্টার ফলে মন এমন অজান্ত হয়ে যায় যে কর্মে আর তখন কষ্টবোধ থাকে না। হাতে ইচ্ছার কর্ম

চলতে থাকে কিন্তু মন থাকে শুষ্ক, শান্ত। বড় বড় কঠিন অর্থহীন আর তখন কঠিন মনে হয় না।

অর্জুন ভুবু বৃষতে পারেন না, বলেন, কর্ণ বিকর্ণ অকর্ণের কথা ভাল ক'রে বলো। ভগবান বললেন, কর্ণ বিকর্ণ অকর্ণ মিলে সকল সাধনা পূর্ণ হয়। কর্ণ হলো মূল বস্তু। যে স্বধর্ম-কর্ম আমরা করি তাতে আমাদের মনের সহযোগ থাকা চাই। কর্ণ ও বিকর্ণ দুইই দরকার। এই দুইয়ের আচরণ করতে করতে অকর্ণের ভূমিকা প্রকট হয়। এই কর্ণের সহায়তার জন্মেই বিকর্ণ নিরন্তর দরকার। অর্থাৎ কর্ম মানেই হলো স্বধর্মের আচরণ করা। স্বধর্ম কি? স্বধর্ম—মিজের ধর্ম। চাষা বে, চাষই তার ধর্ম। লব্ধ ধর্মের আচরণ তার বিকল্প কর্ম। এই স্বধর্মচরণের বাহ্য কর্ম চলতে থাকে কালে তার সহায়তার জন্মে মানসিক যে কর্ম করা হয় তাই বিকর্ণ। এই কর্ম ও বিকর্ণ এক হয়ে যখন চিত্ত পূর্ণ-শুদ্ধ হয়—সকল ময়লা ধূয়ে যায়, বাসনা ক্ষীণ হয়, বিকার শান্ত হয়, ভেম-ভাব মিটে যায়—সেই অবস্থাকেই তখন অকর্ণ বলা হয়। এই অকর্ণ দু'রকমেই করা যায়। এক, দিন-রাত কাজ ক'রেও কিছুমাত্র কাজ করছি না এরূপ বোধ—আর কিছু না ক'রেও অস্বাভাবিক কর্ম করা।

সে আবার কি রকম? অর্জুন বললেন।

যেমন পূর্বের কর্ম। পূর্বের আলো—নানই হ'লো তার সহজ-ধর্ম। তার আলো দেওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। আলো যে সে দিচ্ছে—সে নিজেরও জানে না। তার অস্তিত্বই আলো। আলো-দেওয়া-রূপ-ক্রিয়ার কষ্ট তার নেই। তাইতো চলিশ বকী কর্ম করেও পূর্ণ লেশমাত্র কর্ম করে না। সাধুদের অবস্থাও তাই। পূর্বের আলোক দানের মতোই তাঁদের কর্ম স্বাভাবিক। সে কর্ম করেও করে না—এ হলো সন্ন্যাসের একটিক, আবার অপবদিক হলো—সে নিজের কোনো কর্মই করে না, অথচ সারা বিশ্বকে কর্মে প্রবৃত্ত করছে। অকর্ণের বিশেষত্বই হলো এই। তাতে অনন্ত কর্মের উপযোগী শক্তি ভরা থাকে। যেমন বাশ্প—অনন্ত শক্তি রয়েছে তার মধ্যে। না-বলারও ক্রেতের এক রূপ। ভাতেরও কর্ম হয়। কর্ম না-করার পরিণাম, প্রত্যক্ষ-কর্ম-করার পরিণাম থেকে অনেক বেশী প্রচণ্ড হয়ে থাকে। ঐ অ-বলার যে কাজ হয়, সহস্র বলাতেও সে-কাজ হয় না। পিতার উপস্থিতিই পুত্রের শাস্তির পক্ষে বাধ্য। জ্ঞানী পুরুষের তাই হয়। তার অকর্ণ, তার শাস্ত ভাব প্রচণ্ড কর্ম ক'রে থাকে। অকর্মী থেকেও সে এত কর্ম করে বা নানা ক্রিয়া দ্বারাও করা যায় না।

ভগবান বললেন, কামনাশূন্য হয়ে কাজ করলে কলও আনন্দ হয় না, আবার ক্ষতিতেও হয় না দুঃখ। সুখ-দুঃখের সমাহুত্বই সমস্ত জ্ঞান। বীর আত্মা সমতাবাপন্ন তিনি দুঃখভোগ করেন বটে, কিন্তু বুঝা করেন না—দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাতে উত্তসিত হোন না। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা। ওদের বীকার করতে হবে, ওদের উপেক্ষা ক'রে জয় করতে হবে। অভ্যাগ্ন করলেই মাহুয তা পারে। অভ্যাসই তো বোপ। অভ্যাসে মাহুয কাম-ক্রোধকেও জয় করতে পারে। এর নাম তিষ্ঠিকা—সহ্য করবার সক্ষম ও শক্তি।

অর্জুন কলসেন, সবকিছু সহ্য করবার জন্মেই যদি মাহুয এসে

থাকে এই পৃথিবীতে, তবে কি প্রয়োজন ছিলো এই সৃষ্টি? জগতে ভোগের সমস্ত উপকরণ সমুদ্রে বেধে মাহুয ভোগ করবে না এই বা কি কথা! তাই যদি, তবে ভগবান ভোগের স্পৃহা দিলেন কেন? কামনাই বা দিলেন কেন? পিপাসার্তের মুখের কাছে জল বেধে তাকে বঞ্চিত করাই বা কি অর্থ?

ভগবান বললেন, ও-কথার অর্থ তা নয়। ভোগে আনন্দ আছে, কিন্তু দুঃখও তো আছে। ভোগের শেষ নেই—বত সেবে, তত থাকে। এই দেওয়ার ইচ্ছাকেই তোমার সখ্যত করতে বলা হয়েছে। তার মানে, কামনা ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। দুঃখে কাতর হলেই মাহুয দুঃখ পায়। কিন্তু দুঃখ থাকে স্পর্শ করে না, তার দুঃখ কোথায়? দুঃখকে তো সে ভয় করেছে। আবার স্তবে বার স্পর্শ, সেও দুঃখী, স্পৃহাই হলো পাণ। তব, ক্রোধ অহুসারগ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুতে অহুসারগ, এও দুঃখের কারণ। সুখে স্পৃহা-শূন্য ব্যক্তিকে পাণে সুখকে ভোগ করতে।

অর্জুন বললেন, কিন্তু এ কামনা তাগ করা কি সহজ কথা? দশ ইন্দ্রিয় দশ দিক থেকে বাধা দিচ্ছে। ভগবান উত্তর দিলেন: ঐ ইন্দ্রিয়কেই তো ভয় করতে হবে—ইন্দ্রিয়-সংরম্ভই হলো জীবন-বেদের প্রথম কথা।

মন মুখ এক করো। মনই তো হলো বত নষ্টের গোড়া। ভোগ গেলেও মন থাকে। মনের বাসনা কিছুতেই যেতে চায় না। তাই ভগবান বললেন, কল্পপের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিতে শোখো, তাহলে দুঃখ থাকবে না। শক্ত ক'রে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকো—দুট্টু ঘোড়াকে বশে রাখতে হলে, রাশ টেনে রাখা চাই। যে সকল বিষয়ে রাশ টানতে জানে, সে দুঃখ পায় না। তাই বলে মাহুযের কি বিপু থাকবে না? বিপু আছে, তার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু যেতে হবে বলে কেউ অতি ভোজন করে না। তার দুঃখ আছেই। এখানেই আসছে সংযমের কথা। এই সংযমের মধ্যেই আছে আনন্দ। যিনি বিষয়ান্ধা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, তিনি রাগদ্বৈষবিযুক্ত-ইন্দ্রিয়ের উপভোগে আনন্দলাভ করেন।

রাগদ্বৈষবিযুক্তেন্দ্রিয় বিষয়ান্দ্রিয়ৈরশ্রবণ

আত্মবর্ত্তৈর্বিষয়ান্ধা প্রসাদমবিগচ্ছতি।

রাগদ্বৈষবিযুক্ত-ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ বার ইন্দ্রিয়-আচরণে অহুসারগও নেই, বিদ্বৈষও নেই।

অর্জুন হেসে বললেন, সে আবার কি কথা? ভগবান বললেন, কেমন জানো? রোগী বা মেহ মনে যে অসহ্য তার কি ভোগে কৃতি থাকে? ভোগে কৃতি হ'ল মাহুযের, তার বিদ্বৈষ নেই। আসক্তি তো আসে বিষয়ের চিন্তা থেকেই। আবার আসক্তি থাকলেই মনে কামনা জাগে। সে কামনার আর শেষ নেই। তখন না পেলে মাহুয রাগ করে। এই রাগ থেকেই অনর্থের সৃষ্টি। সেই জন্মেই ভগবান উপদেশ দিলেন, রাগ এবং যে বঞ্চিত হয়ে ভোগ করে, চিত্তের প্রসন্নতা আসবে। চিত্তের প্রসন্নতাই বৃত্তিকে হ্রাস করে। বার সম্বন্ধ নেই তার বিবেক নেই, ভক্তিও নেই। ভক্তি থাকলেই শাস্তি, আর শাস্তি থাকলেই সুখ। 'অপূর্বমানমাল প্রভির্ভূত' কত নদীর জল এসে পড়ছে—স্রাবণে, স্রব্ধে কিন্তু সে জলে উত্তলিত হয় না। সে স্থির, অচঞ্চল—সে সকলের জলকে আদ্রব ক'রে স্থির। কামনাকেও করতে হবে অসদ্বি করে আদ্রব। [ক্রমশঃ]

ভেরা ফিগনার

অমল সেন

ভেরা ফিগনার রূপ-বিপ্লবের একজন নায়িকা।

অত্যাচারিত রুশিয়ার বৃকে নিহিলিষ্ট সংঘের তখন নব-অভ্যুত্থান। এই সংঘের সভা সংখ্যা দ্বী-পুরুষে মিলে চল্লিশের বেশী ছিল না, কিন্তু এসেই আত্মকে সমগ্র রুশিয়া কঁপে উঠলো। সব বধন প্রথম গড়ে ওঠে তখন সংঘের সভা সংখ্যা ছিল মাত্র আট, কিন্তু তবুও তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংঘকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

ভেরা ফিগনার এই দুঃশাসনেরই একজন। আমাদের দেশের মতো শাস্তিশিষ্ট লক্ষ্যমস্ত মেয়েদের সংখ্যা কোনো দেশেই কম নয়। এইসব লক্ষ্যমস্ত মেয়েরা শাস্তিশিষ্ট জীবন বাপন করে, গুরুজনদের উপদেশ পালন করে, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ শৃংখলার সাথে সুন্দর পরিপাটিরূপে সম্পন্ন করে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে সুলভ বশ কুড়িয়ে বেড়ায়—এরা হ'ল এক টাইপের মেয়ে।

কিন্তু ভেরা হ'ল নতুন টাইপের মেয়ে। তার পণ হ'ল—অজ্ঞায় অত্যাচার আর অবিচার সহ্যে না, কান্নার পরে অজ্ঞায় অত্যাচার আর অবিচার করবে না। যখনই দেখবে কান্নার উপরে অজ্ঞায় অত্যাচার আর অবিচার হচ্ছে বৃক দিয়ে তাকে বন্ধা করবে।

এই প্রতিজ্ঞা বন্ধা করতে গিয়েই ভেরার প্রথম চোখে পড়লো তার ছুঁনিচো জননী জন্মভূমি রুশিয়া এই অত্যাচারে জর্জরিত। তার প্রথম পণ হল এই অজ্ঞায় অত্যাচারের হাত থেকে, এই পরায়নীতা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে হবে। এই প্রতিজ্ঞাই ভেরাকে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিল।

খুব অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ভেরা ফিগনার নিহিলিষ্টদের দলে বোঁগ দিল।

কিন্তু বিপ্লবের পথে পা বাড়ানোর আগে ভেরার মনও সশয়ে শোঁস খেতো, ষিখায়ুক্ত দ্বন্দ্বের সে ভাবতো—এই গুপ্তহত্যা—মায়াবক অস্তরিতে খুন করা—এ কি বড় সহজ?

না!

এ অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অত্যন্ত করুণ—যে খুন করে এমনি ভাবে, তারও মনে বেদনা জ্বলে অজ্ঞাতে। এ নিষ্ঠুর কার্য হচ্ছে করে কেউ করে না, করা উচিতও নয়। কিন্তু তবু কেন করতে হয় এ কার্য? কে দারী এর জন্ত?

ভেরা ভেবে দেখলো, দারী রুশসরকার। অজ্ঞার অত্যাচারে অস্তিত্ব হয়ে উঠে মায়াবক বিচার চাইতে গেছে বাবে বাবে। পেয়েছে কি? চতুর্গুণ অজ্ঞার, চতুর্গুণ অত্যাচার।

লজ্যাকরে অত্যাচারে কণ্ঠক, হস্ত অসাড়! সমগ্র রুশিয়ার

সাধারণ মানুষের এই অব্যক্ত বেদনা ভেরা ফিগনার আপনার অন্তর দিয়ে অনুভব করলো।

জারকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে ধরা পড়ে ভেরার এক বছর কীসী হল!

ভেরা খবরটা শুনে অত্যন্ত চকস হয়ে উঠলো। কীসি? কেন? জারকে সে খুন করেনি। এর চাইতে কম শাস্তি দিলে চলতো না কি? কিন্তু রুশ-সরকার তা দেয় না। তারা কথায় কথায় কীসি দেয়, কথায় কথায় গুলী চালায়, মাছবের প্রাণের কোন দাম নেই যেন!

রুশ সরকার অনর্থক হত্যা করবে দলে দলে মানুষ—তা হবে আইন! আর যে-আইনী ভাবে হত্যাকারী সেই জলাসদের—বারা গুলী চালাবার জন্ম দায়ী—তাদের হত্যা করা হবে—অপরাধ?

কেন?

কেন না, রুশ-সরকার যা করবে তাই আইন।

ভেরার মন থেকে গুপ্তহত্যার প্রতি যে একটা ভীষণ ঘৃণা ছিল, তা ধীরে ধীরে চলে গেল।

রুশ-সরকার বলবান—খোলাখুলি হত্যা করছে—শত সহস্র। তারা তো খোলাখুলি পারে না, কাজেই গুপ্তভাবে যে ক-জনকে পারে। এই দুট সাক্ষ্য হ'ল ভেরার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে এক গ্রামে বাস করছিল ভেরা আর তার বোন।

পুলিশ এসেছিল গ্রামে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর যোর সন্দেহ। এ গ্রাম আর মোটেই নিরাপন্ন নয়—এখনি চলে যেতে হবে—বিদ্যার আয়োজন শুরু হল। গ্রামবাসী ছেলে-বুড়ো দ্বী-পুরুষ সবাই জো কঁপে আকুল। শ্রম প্রিয়জনকে কে যেন তাদের বৃক থেকে জ্বিনিয়ে নিয়ে বাজছে। যেতে দিতে ইচ্ছা নাহি, তবু হায় যেতে দিতে হয়।

সেই ঘৃণা। ছেলে-মেয়ে, সকল ছাত্রছাত্রীর মুখ আজ আবার জলভরা মেঘের মতো। আজ শেষ পাঠ!

ভেরার বোন ইভজিনিয়া পড়ানো সাংগ করে বললো, আরহা বাচ্চি, বিদ্যার—আর কিছু সে বলতে পারলো না, কণ্ঠকণ্ঠ।

কোথায় বাজছে দিদিমণি?

অনেক দূরে।

আর আসবে না?

তা কি করে বলবে ভাই?

কেন বাজছে?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে? সেই সূখের স্মরণ হতে তার

বেরিয়ে পড়লো। গ্রামবাসীদের অশ্রু-অর্থের মুক্তি বহন করে। রাজধানী পেট্রোগ্রাডে এসে পৌঁছালো। ভেরা ফিগনার আর তার বোন ইভজিনিয়া।

নির্দিষ্ট দিনে কীসি হ'ল ভেরার বন্ধুর, কীসীর মধ্যে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন তিনি।

ভেরাকে সে আঘাত সইতে হ'ল। অস্ত্রায় অবিচার তাকে ক্রমাগত হিষ্ণু করে তুললো। এ জার-তন্ত্রে ধ্বংস করা চাই।

এর কিছুদিন পরে ভেরেনিজে একটা সভা হ'ল বিপ্লবীদের। ভেরা ফিগনার এই সভার অগ্নি-গর্ভ ভাষায় প্রচার ক'রলো, বিপ্লবীদের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হবে জারকে হত্যা করা। যেমন ক'রে হোক জারকে হত্যা করার আয়োজন করুন আপনারা।

অনেকেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। আয়োজন চ'ললো। ডিনামাইটের ভার প'ড়লো ফিবালশির উপর।

ফিবালশি জেল-কেন্দ্র, ১৮৭৮ সালে ছাড়া পেয়েছে। সেই থেকে বাড়িতে ব'সে গোপনে ডিনামাইট তৈরি ক'রে আসছে।

প্রচুর ডিনামাইট জমা—

জার ক্রিমরা গেছে। তার ফেরার পথে বাঁটিতে বাঁটিতে বোমা নিয়ে গুং পেতে থাকে চাই।

জার ফিরছে শীর্ণশিরই, কাজেই অটপট তৈরি হওয়া চাই বোমা-নিষ্ক্ষেপ-কারীদের।

কিন্তু তৈরি হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিপ্লবীদের মধ্যে তখন উপদ্রব সৃষ্টি হয়েছে। একদল,—তারা বলে, জারের উপর বোমা ছাড়ার জন্য এখনও তারা প্রস্তুত হয়নি।

গরম দল তাতে ক্ষেপে গেল। ফলে, দু'ভাগ হ'য়ে গেল বিপ্লবীরা।

‘মুজুজারী দল’—এরা বলে, একটু দেরী করো।

‘প্রজার দাবী’ দল—এরা চায়, একুশি জারকে নিপাত ক'রবে। এদের সংগ্রামও ছিল ভালো। ভেরা ফিগনার এই গরম দলের সভা হ'ল।

এই দলই হ'ল শক্তিশালী—এরা প্রজার দাবী প্রতিষ্ঠা করার মহান ত্রুত নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল।

কশিরার প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান স্থানে এর শাখা-সমিতি গঠিত হ'ল—সকল সমিতিগুলির কাজ এক সুরে বাঁধার জন্য একটি কার্ধ্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হ'ল। নেতৃস্থানীয় বারা, তারাই এই কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির সভ্য।

এই কার্ধ্যনির্বাহক সমিতিই এই বিপ্লবীদের প্রাণ।

ভেরা ফিগনারের মতো তেজস্বিনী নারী এই কার্ধ্যনির্বাহক সমিতিতে আরো শক্তিশালী ক'রে তুললো।

এবার বোমা নিষ্ক্ষেপের আয়োজন শুরু হ'ল।

ক্লশ সন্ধ্যা জার যে যে পথ দিয়ে ফিরতে পারেন সেই সেই পথের পাশে তিন জায়গায় বোমা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষার ব'সে থাকতে হবে—

গুডেনা—খার্কভ—মস্কো।

লোক ঠিক করা হ'ল—কারা যাবে, কোন্‌ স্থলে, কি চাকুরী নিয়ে যাবে।

ভেরা একটা স্থির হ'য়ে নিয়েছিল, জারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে।

সকালে তার আগ্রহই বখন সবচেয়ে বেশী তখন তাকে এ তিনের এক জায়গায় পাঠানো হবেই।

কার্যকালে দেখা গেল, তার নাম নেই কোথাও।

বেশ একটু উচ্চ হ'য়ে লোক-নির্বাচনকারী কমিশনারদের কাছে গিয়ে ব'ললো—আমার নাম সেন নি কেন?

দ্বিইনি, যোগ্যতার লোক পেয়েছি ব'লে।

আমাকে আপনারা অযোগ্য মনে ক'রলেন কিসে?

অযোগ্য মনে করিনি। ও ছাড়া আরো অনেক কাজ আছে এখানে, যা আপনি ব্যতীত কেউ আর ক'রতে পারবে না।

আমি সে সব কথা শুনে চাই না। আপনারা জানেন, জারের হত্যার জন্য আমিই প্রধানতঃ আপনাদের উত্তেজিত ক'রে তুলেছি, কাজেই আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে এ কাজে। আমার নাম ভ'রে দিন।

গুডেনায় বোমা নিয়ে হাওয়ার ভার প'ড়লো ভেরার উপর।

ভেরা ব্যস্তার উত্তোগ ক'রতে লাগলো। কাজের বদলি দিয়ে যেতে হবে। বোন জিনিয়া গরমের ছুটিতে রিয়াজান গিয়েছিল সম্প্রতি ফিরে এসেছে। ভেরা তাকে ঠিক ক'রল।

ভেরা গুডেনায় চ'লে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখে, ফিবালশি হাজির। একথানা ঘর ভাড়া করা হ'ল। কী ক'রে বোমা ফাটানো হবে তারই নানা রকম পরীক্ষা চ'লতে লাগলো সেই ঘরে। ফিবালশি দেখাতে লাগলো, কি ভাবে বিদ্যুতের তার বেগ ক'রে দূর থেকে বোমা ফাটানো হবে।

বিপ্লবীরা সবাই কার্যদাটা শিখে নিল—কোলোকা, কলোদকিভিল, নেবেডেভা।

এখন সমস্যা—রেললাইনের তলার গর্ত খুঁড়ে বোমাগুলি বসানো। বহু আলোচনার পর ঠিক হ'ল, রেলের গার্ডের চাকুরী জোগার ক'রে ফেলতে হবে।

কোলোকা গার্ড হ'য়ে ঢুকবে—গার্ডের কামরা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট স্থানেই থাকে, কাজেই বোমা বসানো সহজ হবে খুবই। আর, তাকে যাতে কেউ কোন সন্দেহ না করে, সেজন্য নেবেডেভাকে তার বউর পাট ক'রতে হবে।

চমৎকার প্র্যান!

কিন্তু চাকুরী জোগার করে কে? প্র্যান তো দিয়েছে ভেরা ফিগনার।

ভেরা ব'ললো, চাকুরীও আমিই জোগার ক'রে দিছি।

ভেরা রেলওয়ে অফিসে গেল।

কোন রেল-গার্ডের পর খালি নেই।

তাই তো—আচ্ছা, দেখা যাক।

গুডেনায় শাসনকর্তা কাউন্ট টটলেবনের ভাবী জারাই ব্যাণ সেনবার্স ভেরার পরিচিত। তার সঙ্গে দেখা। ভেরার কনফারেন্স ক'রে সে ব'ললো, আপনি এখানে? এমন বেশে? ভেরা গম্ভীর হ'য়ে ব'ললো, হ্যাঁ, ভারি বিপদে প'ড়ে এসেছি।

কি বিপদ বলুন তো!

ভেরা বললো, আমার একটা বন্ধুর পত্নী ক্ষয়রোগে ভুগছে—তার খোলা জায়গায় ঝাকা দরকার, তা যদি হয় তবে তাঁর বাঁচবার কিছু আশা থাকে। জা আর পাচ্ছি কই? যদি একটা রেলের গার্ডের

চাকুরী ভুটতো—হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনার তো খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে বেলগেয়েতে। আপনি পারেন না সাহায্য করতে ?

ব্যারণ বললেন, ও চাকুরী তো আমার হাতে নয়! সেকশন মাপ্টারের হাতে। আর ও সব পদ খালি আছে বলেও মনে হয় না।

ভেরা বললো, তা হ'লে অল্পগ্রহ করে সেকশন মাপ্টারের কাছে এক লাইন লিখে দেন কি ?

ব্যারণ নেহাৎ চকুলজ্জার খাতিরে লিখে দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন।

ভেরা একটু হাসলো মনে মনে।

অভিজাত বাপের মেয়ে ভেরা—তার পোষাক হবে বলমলে—হাবভাব হবে রাগীর মতো, তা না হ'লে নোজরা পোষাক পরে সে পথে পথে চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই ভেবেই ব্যারণের মাথা হেঁট হচ্ছিল তা বুঝতে বাকী রইলো না তার।

আজ্ঞা, ময়ূরের মতো। পঞ্চম ধ'রে পঞ্চলা বহনিন চর ছেড়েছে সে, 'পলিসি', হিসাবে আবার আজ সাজতে হবে তাকে।

ব্যারণ এ পোষাক দেখে লজ্জিত হয়েছেন সেকশন মাপ্টারও নিশ্চয় কথা কইবেন না। সব মাটা হবে তা হ'লে, অন্তএ—যে দ্বেবতা যাতে ভোলে।

ভেরা পোষাক ব'লসে ফেললো। স্বভাবতই সে সন্দরী! আজ যেন সে সৌন্দর্য-সাগরে বানু জেঁকেছে!

বেচার সেকশন মাপ্টার ভাততে ভেসে গেল কিনা জানি না, তবে প্রার্থিত চাকুরীর নিয়োগ পত্র লিখে দিতে মোটেই ইতস্তত করলো না।

ভেরা নিয়োগ-পত্র নিয়ে ছুটে এলো। ঘরের সবাই অশাক।

এক বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি ভেরার। ভেরা ময়ূরের পঞ্চম খুলে ফেল ফ্রোলেংকোকে নিয়োগ-পত্র দিল। লিমেই এই ছদ্মনাম নিয়ে সে কর্মস্থানে চ'লে গেল, লেভেডভাও তার সংগে গেল।

মেইন ট্রেন থেকে সাত-আট মাইল দূরে সে স্থান। বোমা এক কাঁকে নিয়ে গিরে পু'ত্ততে হবে। সব ঠিক—

এমন সময় পোল্ডেনবার্গ ওডেসার গিরে হাজির।

খবর কি ?

বোমা চাই—মস্তা লাইনের জন্ত যথেষ্ট বোমা নেই।

সে কি ! বোমা দিলে এখানকার কাঙ্ক্ষ কি করে হবে ?

জোর গুজব এ লাইন দিয়ে জার কিংবদন্তি না।

ভেরা খবর শুনে মুগ্ধ হ'ল। এতো উত্তাপ আয়োজন সব বুধা ?

পোল্ডেনবার্গ চ'লে গেলো বোমা নিয়ে, কিন্তু পৌঁছুতে পারলো না গন্তব্য স্থানে। পথে ধরা পড়লো।

সঠিক খবরও এসে পড়লো, জার ওডেসার পথে আসবেন না। খার্কভ জার মস্তা লাইন দিয়ে বাবেন।

কাজেই, ফ্রোলেংকো, লেবেডভ—ওরাও চ'লে গেল ওডেসা থেকে। ভেরা ব'লে গেল সেখানে আরো কিছুদিনের জন্ত।

জার কিংবদন্তি আসছেন কিমিয়া থেকে হু'খানা গাড়ী, সামনের খানায় তার কর্মচারীবর্গ।

বিদ্রোহ গতিতে ছুটে চ'লেছে গাড়ী।

খার্কভের মধ্যে দিয়ে যাবে—বিপ্রবী দল—ঝিগ্যাবড, ইয়াকি-মোভা, ওকালংকি—বোমা পেতে ওং পেতে আছে।

দূরে ট্রেনের শব্দ শোনা গেল—ঝিগ্যাবড, ইয়াকিমোভা একদৃষ্টে চেয়ে আছে দূরে—

ওকালংকি চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে ব্যাটারির কাছে এলো—সংগীদ্যকে অস্ত্র দিকে নিবন্ধ চক্ষু দেখে ব্যাটারিটা খুলে তার ভিতরের বশোবস্ততা আগাগো ও অচল করে আবার যেমনটি ছিল তেমন রেখে দিল। এক মিনিটের কাজ। তার পরেই আবার সংগীদ্যের কাছে এসে কাঁড়ালো।

ইঞ্জিনের বাতি দেখা গেল।

ওকালংকি বললো, আমি সিগনাল দিচ্ছি—তোমরা ব্যাটারিতে তার সংযোগ কর।

সংগীদ্য ব্যাটারির কাছে গিয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে রইলো।

বর্ধন হয়ে ট্রেন এসে প'ড়লো।

ওকালংকি সিগনাল দিল। সংগীদ্য তৎক্ষণাৎ তার সংযুক্ত করলো। কিন্তু নিশ্চল সে সংযোগ—গাড়ী যেন তাদের উপহাস করে চ'লে গেল।

ওকালংকি বাধা হ'য়ে বললে, তোমরা নেহাৎ অপদার্ব, তারটা যোগ করতে পার না।

সংগীদ্য হতাশ হ'য়ে বললো,—তাইতো, কিছুক্ষণ আগেও দেখলুম ঠিক আছে, এর মধ্যে ব্যাটারি খারাপ হ'য়ে গেল। আঁা, বলো কি ? ব্যাটারি খারাপ ! ওকালংকি আকাশ থেকে প'ড়লো।

লোকটা ওজাদ গুপ্তের ক্রশ-সরকারের।

মস্তা লাইনের কাছেও বোমা নিয়ে বসে আছে একদল বিপ্রবী।

এ দলে যিনি সিগনাল দেন, তিনি একজন মহীয়সী নারী—শোফিয়া লুভনা পেরোভস্কায়া, রুশিয়ার এক জাদুঘরে শাসনকর্তার মেয়ে। ভেরা কিংনারের মতই অভিজাত বাপের মেয়ে। পিতা ছিলেন একটি মুস্তম্ব শয়তান, দ্বিতীয় জার! শোফিয়ার মা—দেবীর মতো ছিলেন যিনি—তার উপর অকথ্য অত্যাচার হ'ত। ছোট ছেলে—পিতা তাকে বাধ্য করতো মাকে স্বাস্তে, গাল দিতে।

শোফিয়া সইতে পারলো না এ অত্যাচার অত্যাচার।

সোচ্ছাব্রজি বাপের কাছে গিয়ে বললো, তুমি, এ বাড়ী বাসের অযোগ্য করে তুলেছ। আমি বিদায় নিলুম।

পিতা ভয় দেখালেন, বটে। কোথায় যাবে তুমি ? যেখানে যাবে পুলিশ পাঠিয়ে ধ'রে আনবে না।

পুলিশের ভয় ! কোনোদিনই করেনি শোফিয়া।

গোপনে পিতৃবৃহ ত্যাগ করে সে এসে আশ্রয় নিল সহপাঠিনী কোন বন্ধুর বাড়ী, সেখানে থেকে ডাক্তারি পাশ করে পল্লীসেবায় বেরিয়ে পড়লো ঠিক ভেরারই মতন। বিপ্রবী মস্তা দীক্ষিত সে বহু জাগেই হয়েছিল। সেই ১১৩ বিচারের সেও অজ্ঞতম আসামী।

শোফিয়ার প্রাণ ছিল অত্যন্ত কোমল লোকের হৃৎকণ্ঠ দেখলে কেঁদে ফেলতো। অশচ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন লড়তো তখন এই নারীই হ'য়ে উঠতো ভীষণা, ভৈরবী, অতি নিষ্ঠুরা—

এর উপর প'ড়লো সিগনাল দেওয়ার ভার। রেললাইনের পাশে একখানা ঘর ভাড়া করে বিপ্লবী স্বেচ্ছায় দ্বীপ পার্ট নিয়ে এই দিনটির জন্য তৈরি হচ্ছিল সে। তারের গাড়ী কাছে এসে শোঁকিয়া সম্মুখতো সিগনাল মিল—কিন্তু ব্যাটারির তার যোগ করতে একটু দেরি হ'য়ে গেল।

প্রথম গাড়ীটা বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় গাড়ীটা শব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে হ'য়ে গেল।

ষট্টিশতক জার বেঁচে গেল। প্রাণ গেল তার কর্মচারীদের।

জার মারা না গেলেও এ বোমা-কাটা বুধা হ'ল না। সমগ্র কশিরা সত্ত্ব ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো যেন, বিপ্লবীদের কেরামতিতে সারা দেশ ভোলাপাড় হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু জার-বতোমাকে রহু হ'য়ে বাঁচতে হবে না, অন্তত ভীষণতর আয়োজন আগে থেকেই করা হয়েছে।

সব্বাটের শীতাবাস। অনেক কর্মচারী কাজ করে। নানারকম কাজ—দাঁড়ির কাজ, মুটির কাজ, রিজার কাজ।

ষ্ট্রিকেন ব'লে একটা লোক বাসো তৈরী করে। রক্ষীদের সঙ্গে তার গলাগলি ভাব। কেউ দোস্ত, কেউ চাচা।

কাজে আসার সময় ষ্ট্রিকেন রোজই মোড়কে ক'রে কী নিয়ে আসে—সকীরা যখন আসতর্ক থাকে, তখন প্রাসাদের ভিত্তের তলার একটা গম্বরে লুকানো একটা বাসো তা ফেল রাখে।

এমনি ক'রে সে জিনিষটা খানিকটা জ'মলো সেই প্রাসাদের তলার বাসে।

সকীরা ফাঁকরেও কিছু জানলো না।

তারপর একদিন—

কিন্তু তার আগে ভোরের বোন ইভজিনিয়ার খবর ব'লে নিই। পোবরোজকারা নাম নিয়ে সে থাকে—তারই সংগে বিপ্লবী বহু ভিয়ারকোভস্কি থাকেন।

কসেজে থাকতে বোগো নামে একট মেয়ে ইভজিনিয়ার কাছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেয়। মেয়েটির প্রণয়ী ছিল একজন পুলিশের গুপ্তদর। একদিন বোগোকে এসে পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রলো। আদালতে বোগো পোবরোজকারার কথা ব'লে ফেললো।

পুলিশও ঠিক পোবরোজকারার অর্থাৎ ইভজিনিয়ার ঘর ঘেরাও ক'রলো।

ঘরে ঢুকে ইভজিনিয়ারকে প্রথমে বন্দী ক'রলো। তারপর তার বুক বন্ধুকেও ধ'রলো।

ভিয়ার টপ ক'রে পকেট থেকে একটুকুরা কাগজ বের ক'রে চিবিয়ে ঘরের এক কোণে ফেলে দিল।

পুলিশ সে কাগজ হুড়িয়ে নিয়ে গেল। একটা বাড়ীর নক্সা—কিন্তু কোন্ বাড়ী? তদন্ত চলতে লাগলো খুব জোর।

সব্বাটের শীতাবাসে। তারপরে একদিন জার সপরিবারে ভোজ-কক্ষে চুকছেন। হঠাৎ একটা প্রেলর শব্দ। ডিনামাইট।

নীচের ঘরটা নষ্ট হ'ল পঞ্চাশজন বডিগার্ডের প্রাণ গেল।

ভোজ-কক্ষ দোতালার, কাজেই জার এবারও বেঁচে গেলেন।

যশেট পরিমাণে ডিনামাইট দিলে সে ঘরটাও নির্বাং উড় যেতো। তা হ'ল না। শুধু দেয়ালের ছবি, টেবিলের বাসন-কোবশই স্বনয়ন লক্ষে প'ড় চূর্ণ হ'য়ে গেল।

সেই নক্সা।

এবার তার রহস্ত ভেদ হ'ল। এই শীতাবাসেরই নক্সা। নক্সার এক কার্যগার একটা X চিহ্ন—সেইখানে ডিনামাইট রাখা হয়—ঠিক ভোজনকক্ষের তলার।

স্বতরাং পোবরোজকারা আর ভিয়ার নিশ্চরই অপরাধী!

ভিয়ারের কীসি হ'ল—

আর ইভজিনিয়ার সাইবেরিয়ার নির্বাসন।

ভেরা দূর থেকে শুনলো সবই। তবুও ওডেলা থেকে আসতে পারলো না। সেখানে সে আর একটা কাজ হাতে নিয়েছে।

কাউন্ট টরলবেন ওডেলার শাসনকর্তা।

শাসন, অর্থাৎ শীড়নকার্ধের সুবিধার জন্য একজন “নিরো”কে তিনি আমদানি ক'রেছেন। নাম তার পানুয়টিন।

পানুয়টিনই যেন সেখানকার রাজা—তার অত্যাচারে লোক ধরহরি কম্পমান।

একবার ২৮ জনকে গ্রেপ্তার ক'রে বিপ্লবী ব'লে বিচার করা হয়, পাঁচজনেরই প্রাণদণ্ড।

এতেও তৃপ্তি নেই পানুয়টিনের।

মুহুরূকে যতো তেজস্বী লোক ছিল তাদের সকলকে রেটিয়ে গ্রেপ্তার করা হ'ল। শিক্ষক-ছাত্র-গ্রন্থকার-শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী—কাককে বাদ দিল না। শহরে একটা সংঘ ছিল,—তা বে-আইনী ব'লে ঘোষণা ক'রে তার প্রায় সব সভ্যকেই গ্রেপ্তার করা হ'ল।

তারপর—বিচার নয়, বিচারের প্রহসন। স্বৈচ্ছান্ত্রের চরম বিকাশ।

সাইবেরিয়ার নির্বাসন, আজীবন কারাবন্দ—এ ছাড়া ক'থাই নেই।

দণ্ডিতের আত্মীয়রা এসে এমন ছদ্মহীন শিশাচের মতো ব্যবহার ক'রতো সে।

বাগ-মা ছেলেকে—একমাত্র ছেলেকে দেখতে আসতেন, ভগিনী ভাই-এর সংগে দেখা ক'রতে আসতো, দ্বী এসে কেঁদে প'ড়তো—স্বামিকে দেখাবো।

স্বয়ংহীন পণ্ড এদের সংগে বা-তা ব্যবহার ক'রতো। গর্ভবতী একটা রমণী এসেছেন স্বামীর সংগে দেখা ক'রতে। স্বামী শৃংখলাবদ্ধ অমূলক অপরাধে চিরদিনের মতো চ'লেছেন নির্বাসনে চোখে জল কত আশা ছিল, কত রত্নীন স্বপ্ন তরুণী বধুর ফুলের তোড়ার মতো শিশু দেখবেন—জীবনের সকল সাধ অপুর রেখে চ'লে যেতে হ'চ্ছে আজ একান্ত অসহায়।

তার চোখের জলে যেন স্পষ্ট হ'য়ে এ কথাগুলি ফুটে উঠলো।

দ্বী আর সহ ক'রতে পারলো না কেঁদে কেলো।

পানুয়টিন মুখ বিচিরে ব'ললো, কী জালা। বাইরে গিয়ে টোচাও বত পারো। তুমি কি এইখানেই ঐ বেজন্মটার জন্য মিতে চাও না কি?

এই পানুয়টিনের পরলোকসাত্রার পথ প্রস্তুত করার ভার নিল ভেরা।

দলের একটি বুকেয় সংগে মিলে ভেরা পানুয়টিনের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

লোকটা বোজাই একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেড়াতে বেরোয়—
একজন বন্ধী সংগেই থাকে, আর একজন পিছনে অনতিদূরে
সুরক্ষণ কর্তৃত্ব থাকে।

একজনের উপর তার দেওয়া হ'ল—সে পান্থটিকে ছোরা
দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সিকে ছুটে বাবে, সেখানে একটা খোঁড়া থাকবে
তার পলায়নের সাহায্যের জন্য।

ভেরা সব বন্দোবস্ত এমনি ভাবে বন্ধন ঠিক করেছিল, তখন
রাখা পড়েন।

হেভু কোয়ার্টার থেকে শোফিয়া এবং শ্বেলিন এসে হাজির।
খবর পাওয়া গেছে, জার শীঘ্রই ক্রিমিয়ায় গ্রীষ্মকাল আসছেন।
এই শহর দিয়েই যাওয়ার কথা। রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে জাহাজ-
ঘাট পর্যন্ত। এর মধ্যে কোথাও একটা বাঁটি পেতে মাইন তৈরি
করে রাখা চাই।

মাইন হচ্ছে ভূ-প্রাণিত ডিনামাইটের স্তূপ। লোক চক্ষুর
অগোচর থাকে,—কাজেই ধ্বংসের সুন্দর অস্ত্র।

সেই রাস্তার পাশে দুটো ঘর ভাড়া করা হ'ল।

মনোহারী দোকান।

দিনে দোকান,—দোকানদার সেবলিন, দোকানদারনী শোফিয়া।

রাত্রি—টানেল খোঁড়া ডিল দিচ্ছে। দোকানের জিনিষপত্র
তখন সরিয়ে নেওয়া হ'ত। কাদা-মাটি, ডিল ভালো চলে না।
দাঙ্গা পরিষ্কার, কেন্দ্র থেকে মাইন-পাতায় ওস্তাদ ইয়াকিমোভ এবং
গ্রিগরি এসে বেগ দিচ্ছে।

রাত্রি টানেল খুঁড়ে যা মাটি ওঠে, তা ভোরের বেলায় নানা রকম
কায়দা করে—মোড়কে, ঠোঙায়, পাকেটে ভর্তি করে ভেরার ঘরে
এনে জড়ো করা হয়।

এমনি করে বহুদূর পর্যন্ত দীর্ঘ টানেল তৈরি হ'ল।

ডিনামাইট ঠিক করে সাজাতে গিয়ে গ্রিগরির তিনটে আঙুল
উড়ে গেল। খানিকটা ডিনামাইট ফেটেছে। শব্দও কম হ'ল না,
তবে কেউ কিছু স্থির কর্তৃত্ব পারলো না।

কিন্তু দোকানে আর কিছু জমা করে রাখা সমীচীন নয়।
ডিনামাইট, মার্কানি-ফালমিলেট, তার ইত্যাদি ব্যবহার্য সরঞ্জাম ভেরা
ফিগনার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। গ্রিগরি এখন অক্ষর্য। তবুও
ক্রম ক্রমে অগ্রসর হ'তে লাগলো। জার মে-মাসে আসবেন। সবাই
তার আসার দিনটির অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রইলো। কিন্তু
সম্রাট এলেন না সে শহরে। তাইতো, এত আয়োজন একেবারেই
ব্যর্থ হবে? আচ্ছা, অস্ত্রাচারী শাসনকর্তা টলেবেনকে মারলে
হয় না এ দিয়ে?

কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে হুকুম চরে পাঠানো হ'ল।

জবাব এলো, না,—ও-সময়ান জ্বরের জন্যই তোলা থাক,
টলেবেনকে মারতে চাও অস্ত্র উপায়ে মারো।

অস্ত্র উপায়ে মধ্যে বোমার্টাই প্রধান। ভেরা ফিগনার বন্ধুদের
নিয়ে আবার লেগে গেল টলেবেনের পশ্চাদ্ধসরণে। শত
শত বৃক্কের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসার জন্য ব্যস্ত। এর যন্ত্রে তাদের
তপণ করা চাই।

একদিন তাদের কান্ধি দিয়ে টলেবেন সে স্থান ত্যাগ করে
চলে গেল।

কাজেই পাতাভি তটরে ভেরা এবং অজান্তে বিপ্লব নায়করা
শেফেরাশে চলে এলো।

ভেরা বন্ধন রাজধানীতে গেলে তখন সেখানে আর একটা
উত্তম চলেছে জারকে মারার।

গোরকডায়া ব'লে একটা রাস্তা দিয়ে জার যাবেন। রাস্তাটার
গায়েই একটা পাথরের সেতু। নীচে, জলের তলায় লুকানো
থাকবে ডিনামাইট, ডাঙায়, দূর আড়াল থেকে, ব্যাটারির সাহায্যে
তা ফাটানো হবে।

জার এ কীদেও ধরা পড়লেন না। নির্দিষ্ট দিনের আগের দিনই
তিনি ক্রিমিয়ায় চলে গেলেন—সে-পথে বেড়াতে এলেন না। জারকে
মারার কাজও ব্যর্থ হ'য়ে স্থগিত রাখতে হ'ল কিছুদিনের জন্য।

বিপ্লবীল আর একটা জরুরী কাজে মন দিল। সৈন্ত-সংগ্রহ এবং
সৈন্ত-সংগঠন।

দেশবাসীর যে অসচ্ছন্দ-ভাব তা ক্রমেই বেড়ে বাচ্ছিল। সৈন্ত-
বিভাগেও তা প্রবেশ করেছে। অনেক সামরিক কর্মচারীকে
ব'লতে শোনা যেতো,—কশটসমুদ্রা বিদেশের মুক্তি-যুদ্ধে সাহায্য
করার পর্ব করে, কিন্তু তাদের নিজের দেশ যে আজও বন্দনস্থিতি
তাই দেখে না।

নৌ-বিভাগ এবং গোলন্দাজ সৈন্তদের মধ্যেও অসচ্ছন্দকে আরো
উসকিয়ে তুললো।

লেকটেনেন্ট সুখানভ নৌ-বিশাগীয় কর্মচারী, ইনিই বোধহয় প্রথম
বিপ্লবীদের দলে এসে যোগ দিলেন। এরই মধ্যে দিয়ে নৌ-বিভাগে
প্রচার-কার্য চলতে লাগলো।

গোলন্দাজ বিভাগে—ডিগারোভ। ক্রোনষ্টাট দুর্গে কাজ করতেন
আগে, রাষ্ট্রনৈতিক স্বতন্ত্রের জন্য কর্মচ্যুত হ'য়ে বিপ্লবীদলে যোগ দেন।

রোগাভেভ, পখিমোভোভ, পেপিন, নিকোলায়েভ—এরাও
যোগ দিলেন ক্রমে ক্রমে। স্থির হল,—সৈন্ত-বিভাগ 'প্রজার দাবী'
দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির অধীনে থাকবে। সাধারণ বিভাগের
সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কার্য-নির্বাহক সমিতি বন্ধন
হুকুম দেবেন—এখন সমস্ত বিদ্রোহের সময় এসেছে, তখন বাঁশিরে
পড়বে তারা অস্ত্র নিয়ে।

এ ছাড়া, বিদেশে 'প্রজার দাবী' দলের পক্ষে লোকসম্মত গঠন
করার জন্য প্রচার-কার্যও চলছিল। বহু নির্বাসিত বৃক্কের উপর
এ-ভার চাপ হ'ল। তাদের মধ্যে হার্টম্যান এবং ল্যান্ডরভ প্রধান।

সভা-সমিতিতে বহুতা করে, আলোচনা হয়, বই ছাপিয়ে
এবং বিপ্লব-বল সম্বন্ধে সঠিক খবর প্রচার করা হ'ত। হার্টম্যান
ফ্রান্স-আমেরিকা-জার্মানী—দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের নায়কদের কাছে
উপস্থিত হ'য়েছেন বিপ্লবীদের কার্যপদ্ধতি নিয়ে। সবাই প্রতিশ্রুত
হ'য়েছেন, যার যেভাবে বড়টুকু শক্তি সাহায্য করবেন।

সমাজতন্ত্রবাদের জরুরীতা মনোবী কার্ল মার্কস কার্য-নির্বাহক
সমিতি তাঁর কাছে চিঠি দিলেন, যাতে তিনি হার্টম্যানকে সহায়তা
করেন প্রচার-কার্যে।

মার্কস অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন। জবাবে তিনি জানালেন,
আপনাদের কোন রকম সেবা করতে পারলে আমি নিজে
স্বীয়বাসিত্ব মনে করবো।

জবাবের সঙ্গে মার্কস নিজের একখানা কোটোও পাঠিয়েছিলেন। মার্কসের এ আনন্দ অকৃত্রিম। রুশবিপ্লবীদের চিঠিখানা তাঁর কাছে মহামূল্য বস্তু—বন্ধুদের তিনি সর্বদা সেটা দেখিয়ে বেড়াতেন।

এমনি অক্লান্ত চেষ্টার ফলে রুশের দিকে ছুনিয়ার নজর পড়িলো। খবরের কাগজ খুলে সবাই প্রথমই দেখতো, রুশের খবর কি?

তারা যাতে সঠিক খবর পায়, বিপ্লবীদল তারও বদোষ ক'রলো। নিঃশব্দভাবে বিপ্লব-সমিতি থেকে রিপোর্ট আসতো, আর তাই ছাপা হ'ত খবরের কাগজে। কাজেই রুশবিপ্লবীদের সম্বন্ধে সবাই বেশ সহস্রভুতি ভাব জমালো।

রুশ সরকার তো হার্টম্যানের উপর রোগে অস্থির। দূত পাঠালো ক্রালে—হার্টম্যানকে যাতে রুশ সরকারের হাতে দেয়। কিন্তু দূতকে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসতে হল। ক্রালে—বার বাই বৈপ্লবিক মতবাদ থাকে না কেন, আশ্রয় পাবে।

কিন্তু রুশ থেকে—বিশেষে এ-খবর চালান দেয় কে? রুশ পুলিশ তার গুঁত পেতে রইলো। কিন্তু কিছুতেই তাকে বের ক'রতে পারলো না।

কী ক'রে পারবে?

এ হচ্ছে ভেরা কিপনার,—পুলিশ বার বাই শুনেই পাগল, চোখে দেখাবার সৌভাগ্য হয়নি।

পুলিশ বিপ্লবীদের খ'রে খ'রে কান দেয়।

কত হুগল জীবন-কুসুম অকালে ঝ'রে যায়—কে তার খোঁজ রাখে?

এমন অনেক বিপ্লবী আছে, অসীম শক্তি—বিচিত্র জীবন বাসের, নেপোলিয়নের মতো। প্রবল হ'তে পারতো বারা বিপ্লবের পথে না গেলে—তারাও ক্রমে বিশ্বাসের সাগরে লীন হ'তে যায়। তারা যে বিপ্লবী তাদের জীবন-কথা বতাই বিচিত্র হ'ক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার অধিকার নেই কারো। তা স্বাক্ষর হ'ক।

এই বিশ্বাসের হাত থেকে এমন অমূল্য জীবন-কথা রক্ষা করার ভার ভেরার উপর। সেই বিপ্লবীদের ছবিহা বিশেষ বিবরণ বিশেষে প্রকাশের জন্য পাঠাতো। বিপ্লবীদের মধ্যে ভেরার চেয়ে বোগান্তর ব্যক্তি ছিল না কেউ।

রাজধানীতে একটা জারগা আছে—মিখায়লোভি-ফেনিভ।

জার প্রতি রবিবার সেখানে বেড়াতে বান। কিন্তু রোজই এক রাজা মিলে নয়, এক এক দিন এক এক রাজা। বিপ্লবীরা এবার তাইই একটা রাজার মাইন পাতেই ঠিক ক'রলো।

মল্ল-শব্দেভর ব'লে রাজাটার উপর দুখানা খালিঘর ছিল, জারই একখানা পছন্দ ক'রে পনিরের দোকান খোলা হ'ল। দোকানদার কে হবে?

ভেরা কিপনার ব'ললে, আবার মনে হয় 'হুবি' একাজের বোগ্য ব্যক্তি। কমিটি দেখলো, সত্যই সত্যই। হুবির বোগ্যতা সম্বন্ধে জো কথাই নেই, চেহারাও তার দোকানদারীর মাকি। কাজেই ভেরাই এ-পদে বাহাল করা হ'ল—জার হুদরাম দেওয়া হ'ল কবোজেভ।

ইয়াকিমোভ ক'রবে বড়র পার্ট নে। হুদরাম বাসকা।

কবোজেভ-বাসকার পনিরের দোকান।

অন্তত পনির ব্যবসারীরা প্রথমটা ইধাবিত হ'ল আর একটা

নতুন পনিরের দোকান দেখে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাদের শংকা দূর হ'ল। এরা তেমন অভিজ্ঞ ওস্তাদ দোকানদার নয়।

মাত্র তিনশো রুবল জোগার ক'রে পনিরের দোকান খোলা হ'য়েছে। মালের ঠিক খুবই কম।

কবোজেভ অতি কৌশলী—কারও বাইরে থেকে বোকার মো ছিল না, দোকানে জিনিষ এতো কম বা এরা জাল লোকানী।

দোকান থেকে রাস্তার দিকে টানেল খোঁটা চলতে লাগলো। খুঁড়ে মাটি বা ওঠে তাতে বাসকে বাসো ভতি ক'রে দেবেল এঁটে দেওয়া হয় 'পনির'। ক্রেতার ভাবে, গুঃ, এদের কত মাল আমদানি।

এমনি ক'রে বহুদিন কেটে গেল।

টানেল তৈরি শেষ।

দোকানের এক কোণে মাটির ভূপ, কর্ছা আর খড় দিয়ে মাটি ঢাকা। তার উপরে একটা মাহুর বিছানো।

এখন মাইন-পাতা বাকী।

১৪ই ফেব্রুয়ারী জার সেই পথ দিয়েই চলে গেলেন। মাইন পাশা হয়নি তখনও, কাজেই কিছু করা গেল না তার।

বিপ্লবীদল রাসে অস্থির।

গুঃ, এমন সুযোগ। আর কতদিনে জার এ পথে আবার আসেন তার ঠিক কি। বাকু, মাইন পেতে তৈরি হ'য়ে থাকা বাক।

ডিনামাইট ইত্যাদি জমা ছিল অল্পত এক ঘরে। পুলিশ যেন কী একটা সন্দেহ ক'রে খুব খানাতারাস শুরু করে দিল। কাজেই সে ঘর থেকে ডিনামাইট সরানো হ'ল।

ভেরার তীক্ষ্ণ জ্ঞান। একদিন দেখে, দলের একজন লোকের শিছু নিয়েছে একটা পুলিশের গুলুটর।

ব্যাপার কী? মাইনের সম্বন্ধে কোন খবর পেয়েই নাকি? তাই-ই হবে।

ভেরা তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্তন ক'রে নিয়ে দোকানের দিকে গেল।

ক্রেতার বেজার ভিড়—বাসকা দিয়ে দিয়ে আর কুলোতে পারছে না। হঠাৎ নতুন এই ক্রেতাটিকে দেখে সে বেশ সচকিত হ'য়ে উঠলো।

খুব ভালো পনির দিতে পারেন?

হী, আশ্রয় না, ভিতরে এসে দেখুন। নতুন ক্রেতা ভিতরে গেল।

এ হচ্ছে ভেরা কিপনার। ভেরা পনির দেখার ছলে ব'লে গেল, পুলিশের সাড়া-টাড়া পাছ কিছু?

না তো। তুমি পেরেছ নাকি?

হী। খুব সাবধানে থেকে তোমরা।

বাসকা-কবোজেভ বেশ সতর্ক হ'য়ে চলতে লাগলো।

২৭শে ফেব্রুয়ারী।

পুলিশ সম্বন্ধকমে ত্রিগোনি ব'লে একটি কর্মীর ঘর অবরোধ করলো। ত্রিগোনি বৃত্ত হ'ল (ঘরাটা চলাকী, কেন না ত্রিগোনি পুলিশের চর) কিছু পরে কিল্যাবত এসেছে ত্রিগোনীর কাছে, তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার।

কোথাও ডিনামাইটের লীলা-খেলা চলছে, এটা বোম্ব হয় পুলিশ টেন পেরেছে, কিন্তু বের করতে পারছিল না, কোথায়।

ঠিক পাওয়া খুবই শক্ত, এমন বিপ্লবীদের বন্দোবস্ত। যাদের উপর কাজের ভার দেওয়া হ'ত, তারা ছাড়া অন্য কেউ জানতো না কাথায় কখন কেমন ক'রে ডিনাইট্রাইট কাটানো হবে।

কাজেই পুলিশ অন্ধ কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে রাস্তাতে লাগলো।

পুলিশের এ উদ্ভাস বিপ্লবীরা টের পেয়েছে।

একদিন দলের কয়েকটি লোক পথ চ'লছে। হঠাৎ শুনেতে পেলো, রাস্তায়ে কারা হু'জুন কথা কইছে।

ও কারা ?

একজন পুলিশ, আর একজন দরওয়ান।

দরওয়ান বলছে, এ বাড়ীতে খানাতল্লাস ক'রবেন ? সে কি ? কন ?

পুলিশ বললে, কর্তাদের মরজি।

খবর শুনে ভেয়া বুকলে, পুলিশ অনেকটা কাছাকাছি এসে ঝেঁড়ে ঠিক জায়গার।

বিপ্লবীরাও পুলিশের চোখে ধুলি দিতে ওস্তাদ।

কবোজেন্দ-বাসকা দোকানে বসে পানির বিক্রী করছে, এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজির।

কি চাই আপনার ?

আমি বাহা-বিভাগীয় ডাক্তার। এ দোকান পরিদর্শন ক'রবো। ককুন।

লোকটি ডাক্তার নয়, ডাক্তারবেশী পুলিশ। ঘরে গিয়ে চুকলো।

উঁচু জায়গাটার গিরে হাতুড়টা তুলে দেখে, কয়লা আর খড়। আর কোথাও কিছু নেই। অপ্রতিভ হ'য়ে চ'লে গেল।

দোকানদাররা একটু মুচকি হাসলো।

আর একদিন আর একজন পুলিশ। মাটি-ভর্তি বাজ্ঞপ্তার গা দিয়ে জল ঝরছিল, তা দেখে পুলিশটা জিজ্ঞাসা ক'রলো, ওতে কি ?

কবোজেন্দ হাত-মুখের অপূর্ব ভঙ্গী করে বললো আর বলবেন না ছজুর। লোকসানের একশেষ। সন্তান দশ অবস্থা।

ও কি সন্তান কিনেছিলে ?

হী, নইলে কি বাজ্ঞা-কে-বাজ্ঞা পচা বেবোয় ?

পুলিশটা বুকতেই পারলো না—এর পরেও সন্দেহের কিছু থাকতে পারে। এতএব সে চ'লে গেল।

পুলিশরা কিছুতেই বের করতে পারলো না কোথায় চক্রান্তের আঙন ধুমায়িত হ'চ্ছে। [ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

শো-কেসে একটি হাতঘড়ি

শো-কেসে দেখলাম একটি হাতঘড়ি।

ড্যালাহাউসি ঘোরারের এক হিম-ঝরানো ঘরের বাতাসে

বহু কীচের সাজানো বাজ

তবে আছে স্বন্দরী—সহাকালের প্রাণহীন।

তার কালো মণিবন্ধনীর উপরে সোনার ছটি স্বল্পবেধা—

অবশ হরে পড়ে আছে স্থির প্রতীকার।

তার চতুর্কোণ স্বপ্নপিণ্ডের দুল ডঙ্কতি টিক্-টিক্ শব্দে

প্রাণের প্রত্যাশা ধ্বনিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

কালো বেশের মণিবন্ধনী বেন রাত্রির নীল অন্ধকার

তাইতে নিলীন হ'য়ে আছে একটি সুবর্ণ-কমল।

কোন লীলামহীর হাতে লীলাকমল হ'য়ে উঠবে সে ?

কোন আধুনিকা বরবারিনীর গৌর মণিবন্ধ বাঁধা পড়ে

সখীর মত সে জানিয়ে দেবে প্রিয়-মিলনের সমর-সংকেত ?

কিন্তু এ আঠার শ' টাকা দামের দুহু'লা হাতঘড়ি

এখনও বহুকাল থাকবে শায়িতা—

অপেক্ষাক্রান্ত বয়স্কা রূপসী কুলীন কন্ঠার মত

তু'ং এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর দোমশ শিরাবহুল হাতে

পড়বার জন্ত।

হায় রে—হিম-ঝরানো ঘরের শীতল বাতাস—

জনায়শ্য জনবিরল নিরালা !

হায় রে—রাত্রির রহস্তময় নীল অন্ধকার—

বেন দুইপ্রাঙ্ক নীল বেশের মত।

হায় রে—নিগুন আলোর নীল আভা ছড়ানো জ্যোতির্ময় হলনা—

তিমিরগভিরায়ের আশায় আতুর—

হায় রে—কাচাধারের স্বচ্ছ কবরে শায়িতা—

সহাকালের বিরহিনী নীলবসনা সুবর্ণছবি মুছিতা রূপসী প্রাণহীন !

শি শি র=সানি ধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

১৪১

কুড়ি পঁচিশদিন পরে আবার আসবেন বলে গেলেন। মাঝে কথা ছিলো 'চন্দ্রকান্ত'তে চাকর্য্য করতে যাবেন বর্ধমান। বর্ধমান হাবার পথে হাওড়া ট্রেনে পড়ে গিয়ে ডান হাতটি ভাঙলেন এক তার ফলে হুঁতিন মাস তাঁকে শয্যাশাশী হ'য়ে থাকতে হ'লো। এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও কথা হয়নি কিছুই।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যার আমরা কয়েকজন বসে গল্পগুজন করছিলাম এমন সময় বিনয়দা এসে হাজির। বিনয়দার আসাটি অত্যন্ত আকস্মিক বলে রীতিমত অবাক হ'লাম। প্রশ্ন করতে হ'লো না, উনি নিজেই বললেন—ভাড়াটি মশার আঁজ ডেকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে একটি দল খোলা, যেখানে পুরোনো নাটক পড়া, আলোচনা করা নাটকের বিষয়ে, নতুন আর পুরোনো নাটক রিহাস্যাল দেওয়া, অভিনয় করার ব্যবস্থা থাকবে। তা তোমরা যদি দায়িত্ব নাও তো এ কাজ করা সম্ভব।

চোর চোর ভাড়া বেড়া! এমনিতেই খিরেটারের সুযোগ পেলে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে এক পায়ে খাড়া, আর অন্য গিরিশকুমারের নেতৃত্বাধীনে অভিনয় শেখবার আর অভিনয় করার সুযোগ পাবো নতুন বই হবে, এতো অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য। চটপট রাজি হ'য়ে পেলো। আমাদের হুঁজুকে যুগ্ম সম্পাদক করা হ'লো। সভাপতি ও সহ-সভাপতি হ'লেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ বোর ও কুমারেশ ঘোষ। ভোলাদা দলের নামকরণ করলেন—নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ। স্থির হ'লো আপাততঃ প্রাচীন বৃহস্পতিবার নাটক পাঠ হবে, পরে সুযোগ সুবিধে হতো পুরোনো বা নতুন নাটক (যখন যেমন পাওয়া যাবে) রিহাস্যাল দিয়ে অভিনয় করা হবে।

সেই অক্টোবরী ২৪শে জুলাই তিনি প্রথম এলেন ও তারপর থেকে মাঝে এক আধ হপ্তা বাদ দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবারে এলেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন, নাটক পড়লেন। নভেম্বরের শেষে যখন ডিসেম্বরের নাট্যাংগসব করার কথা স্থির হ'লো তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এসেছেন। দৈনিক ওঁর বাসা থেকে ওঁকে নিয়ে এসেছি এক পৌছে দিয়ে এসেছি আমরা, আসা বাওরার পথেও অনেক কথা হয়েছে ওঁর সঙ্গে।

পরবর্তী পাঁচাশোতে সেই সময়কার কথাই লিপিবদ্ধ করছি। ২৪শে জুলাই এলেন কি নাটক পড়বেন, কিভাবে কি করা হবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। প্রথমে বললেন—বাজার চলন হয়েছে আমাদের দেশে ১৫-৮৫ শতাব্দী থেকে। তখনকার নাটককে বাজা বলত, বাজাটি চারদিক খোলা জায়গায় হবে না ভিন দিক খোলা জায়গায় হবে সে কথাটি ভাবতে হবে। চারদিক খোলা জায়গায় অন্তর্নিবেদন হবে এই যে, ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হবে। মাইক ব্যবহার করলে অন্তর্নিবেদন হবে।

এ কাজ করতে হলে রাষ্ট্র বা কর্পোরেশনের সাহায্য নিতে হবে

এ কথা ঠিকই, কিন্তু অভিনয় করবে কারা? আজকালকার অভিনেতারা ত অভিনয় করতেই জ্ঞানে না, সিনেমার অভিনয় করতে গেলে অনেক নাবিয়ে অভিনয় করতে হয় কারণ সিনেমার মুখটি 'ড্রশ' গুণ বাড়িয়ে কাজেই নৃত্য ভঙ্গীও অত্যন্ত বিকৃত লাগে।

আমাদের দেশে অভিনেতার মূল্য নেই, তাই গিরিশবাবুও কোথাও যেতেন না; অল্প অভিনেতাদের সমকাক্তে—রঙ মেখে সামনে দিয়ে বেহুবি কেন? তাঁর বলার কারণ এ রকম করলে অভিনয়ের মায়টি ক্ষুণ্ণ হয়।

এবার কি নাটক পড়বেন প্রশ্ন করা হলো, একজন বললেন—ইংরেজি নাটক পড়ুন, উত্তরে বললেন—ইংরেজি নাটক পড়তে হলে সেক্সপীয়র পড়তে হয়, কিন্তু তাতে অন্তর্বিধে অনেক, তাঁর চেয়ে দ্বিতীয় বই পড়াই ভাল, মাইকেলের রুকুমারী খুব ভাল বই, টডের সাহায্য নিলেও অনেক কিছু বললেছেন, বিদেশী এলিজাবেথীয় নাটকের ওপর নির্ভর করেই পদ্মাবতী নাটকটি লিখেছেন অথচ সংস্কৃতেরও কত সাহায্য নিয়েছেন।

গিরিশবাবুর বেশির ভাগ বইই হয়ত অপাঠ্য কিন্তু যে কটি ভাল বই আছে তা এতই ভাল যে বাংলা ভাষার এমন নাটক প্রায় দেখাই যায় না।

প্রাচীনিকতার প্রশ্ন উঠলে তখন বললেন—জাতীয়তাকে এর জন্তে রবীন্দ্রনাথ দোষ দিয়েছেন, কিন্তু জাতীয়তার দোষ কী? এত জুল ধরনের জাতীয়তা!

আমাদের দিনে লোকে তীর্থভ্রমণে বেরোলে দেশের কোথাও কোনো রকম বিপদে পড়তে হতো না, অথচ তখন হয়ত এই দুই দেশে রাজার রাজার যুদ্ধ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কথা বলা যায়, এ কথাটা প্রথম আমাদের বুঝিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পাবলিসিটি খুব ভাল ছিল, ঠাকুরবাড়ির অজ্ঞানের অত ছিল না। বিজ্ঞাননাথের কোথার ছিল? দায়কানাথ একজন মহৎ লোক ছিলেন।

অভিনয়ের প্রসঙ্গে বললেন—বিজ্ঞানলাল বার বাংলা দেশের মকে প্রথম অভিনয় ঢোকালেন। (বোধ হয় বলতে চাইছেন বাস্তবায়ণ অভিনয়।) দানীয়া চাকর্য্য আর আগরকাজেব না করলে দেশে অভিনয় আসত না, নয়ত দানীয়া বা অমর দত্ত ভালভাবে অভিনয়ই করলেনই বা কোথা? শুধু 'এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল'।

গিরিশ বাবু পরমহংসদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন কিন্তু পরার্থপর হলেন কই? ছেলের কথা আর নিজের নাটক ছাড়া অল্প সব বিষয়ে careless ছিলেন। তবে অনেক পড়াশোনা ছিল। কত যে পড়েছিলেন তা কেউ জানে না। সে সময় সামগ্রিক চিন্তা আর drill-এর বড় অভাব ছিল, ব্যক্তিগত জিনিয়াসই ছিল একল।

গিরিশ প্রসঙ্গ থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠল, বললেন—বিশেষ

ব্রহ্মনাথ খুই সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছেন বারীজি।

সমসাময়িক (অর্থাৎ আত্মকালকার) মক্কে সবে তঁার মতামত জানতে চাইলে বললেন—সমসাময়িক মক্কে সবে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত।

বাংলা দেশের মাসিক পত্রের কথা উঠল, বললেন—একটা ভাল মাসিকের জায়গা এখনও বাংলা দেশে আছে। ভাল বলতে পুরোপুরি প্রবাসী আর ভারতীয় মত। প্রবন্ধ প্রথমতঃ লেখাতে হয়। লিখতে লিখতে কাঁচা লেখা পাকে। সে চেষ্টা যে করবে সে খাবে কি?

বঙ্কিমবাবুর লোকের ক্ষমতা বিকাশ করানোর অপূর্ণ দক্ষতা ছিল, কিন্তু বাংলা দেশের চর্যাপা যে মাত্র শক্তির বহুর বয়সে তিনি মারা গেলেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী অতুলনীয়, বিবিধ প্রবন্ধের মূল্য দেয়ই বা কে?—জানাই বা কে?

—সব মানুষের মনোবৃত্তি এক; কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা এলানো ভাব আছে। আমাদের খিয়েটার শুরু হ'তেই হুঁতাপ হলো। একটা হ'লে বা মহৎ হ'তে পারত তা' স্বগড়াখাটির মধ্যে হুঁতাপ হ'য়ে কিছুই হলো না।

কথা শেষ হবার পর কি বই পড়বেন সবাইকে প্রস্তাব করলেন, অনেক তর্ক-বিতর্ক করার পর ঠিক হ'লো গিরিশচন্দ্রের জন্য পড়া হবে। বাংলা মাসিকের নটক গিরিশচন্দ্রের নটক দিয়ে নবা বাংলা নাট্য পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হওয়া যে আমাদের কথা তা সবাই স্বীকার করলেন।

৩১শে জুলাই উনি এলেন, পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই খবর ঘটে গেছে যে, শিশিরকুমার পুরানো সব নাটক পাঠ করবেন। কাজেই ঘরের মধ্যে ছোটখাট জনতা এসে তক্তাপোষের ওপর বসলেন, পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করলেন। হুঁ একজন তখনও আসেননি বলে বই পড়া কিছুকালের জন্যে স্থগিত রেখে অল্প সময় আলোচনা শুরু করলেন।

প্রথমেই বললেন নাট্য সমালোচক কেমন হবে সেই কথা—প্রকৃত নাট্য সমালোচনা হয় না কারণ সমালোচক হ'তে গেলে নাটকের সঙ্গে নাট্যের যোগ থাকতে হয়, নয়ত ভালবাসতে হয় নাটকে। বাংলা নাটক ভাল করে পড়া থাকা দরকার তা ছাড়া নিয়মিতভাবে রিহার্সিয়াল আর অভিনয় দেখতে হয়। নয়ত leader দেখার মত লেখা লিখিয়ে ত সহজেই কাগজওয়ালারা নাম করিয়ে দিতে পারে। মৃতব্যক্তিদের মধ্যে অমর দত্ত আর দানীবাবু এক সময়ে অভিনয় করতেন। কিন্তু অমর দত্ত কাগজকে কাজে লাগিয়ে খুব পণ্ডার হয়ে উঠেছিলেন, দানীবাবু কিন্তু অল্প পণ্ডার ছিলেন না, অমর দত্তের মত অজ্ঞানত কন্ঠী বাংলা নাট্যশালায় খুব কম ছিলো, কিন্তু অভিনেতা—সে কথা না বলাই ভালো।

—দানীবাবুকেও ঠাঁড় করলেন গিরিশবাবু। অভিনেতাদের একটি ডোল বা conventional mode of acting ঠিক করে সিদ্ধান্তদোলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি সেই অমরদারী লিখে ছেলের হাথিবে করে দিলেন।

—আমাদের দেশে আগে খিয়েটারের দাম ছিলো, ভয়ত কালীদাসের আগেই লেখা হয়েছিল আর রাক্ষসের বস্তুর রামায়ণের

অমরদারের উনিশ পাঠার লেখা আছে যে, অমরদার অলিতে গলিতে খিয়েটার ছিলো।

—ইতিহাসে bias একটু থাকবেই, কিন্তু তা establish করা চাই।

কালিদাসের ভৌগলিক জ্ঞান খুবই ভালো ছিল; শাস্ত্রীশাখার জিনিষটা ভালো করেই শিখিয়েছিলেন, শাস্ত্রীশাখার লেখা সব এক করে বার করা উচিত। উনি বড় গৌরো ছিলেন, জোর করে লেখাতে হ'তো। তবে তাঁর সঙ্গে কথা বললেই কত জ্ঞান বোঝা যেত।

—গিরিশবাবুকে আমার প্রেমলিলা মনে হয়। এগিকে পরমহংসদের শিষ্য অথচ কখনও ঠিকেননি। মিথো মোক্ষদমাত্তেও ভিত্তেছেন। গাড়ীতে চড়বার সময় বলছেন—আজ অনেকগুলো মিথো কথা বলব, লোকটি বড় ভালিয়েছে। তবে খিয়েটার উনি না হ'লে চলত না। ভুবন নিরোগী, অমৃতলাল আর অর্ধেন্দু যুক্তি কি খিয়েটার চালাতে পারতেন নাকি?

—অর্ধেন্দুবাবুর কথা ছেড়ে দাও, মরবার সময় বলেছিলেন, সর্বস্ব দেনী মল ঢেলে তবে বেন পোড়ানো হয়। মানুষ বড় ভালো ছিলেন, রিহার্সিয়াল আমরাই মতো কোঁক ছিলো, দশ-বিশ-পঁচিশবার বলতে কষ্ট পেতেন না। রিহার্সিয়াল আরম্ভ করলে আর শেষ করতে চাইতেন না, তা লোকের মরক আর তরক।

মানুষটি খুব দুঃসাহসী ছিলেন। 'দস্তাবেজ' পৌরীন্দ্রমোহনের নকল করে তাঁর বাড়ি থেকে বিত্যাড়িত হলেন। তবে কালীকেই ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। লিখিয়েছেন কিন্তু পাত্র-অপাত্র ভেব না করে।

—গিরিশবাবু কিন্তু কাউকে শোখাতেন না। রিহার্সিয়ালে বসতেন এক ডাবা পান, আর ব্যাপ্তি বা হুইচির বোতল নিয়ে চাকর সোড়ার বোতল নিয়ে তৈরী থাকত। হুঁতিনবার বলত বলতেন—ঠিক হ'য়েছে, তোমার বদলে অমন আমি পারতুম না, এগিয়ে গিয়ে চেষ্টায়ে বল তাহলেই হবে।

—তিনকড়িই একমাত্র অভিনেত্রী থাকে—গিরিশবাবু খাতিব করে চলতেন। একবার মহেন্দ্র মিত্রকে বা বলেছিল, তা (সধবার একাদশী) নাটকেই লেখা আছে। মীরকাশিমে তারায় ভূমিকায় অভিনয় করছে, কে বুঝিয়েছে, অল্প চ'জন হুইলা আর তারায়, খুব ভাল শোবাক পরছে আর তোমার বেলা শুধু গেকরা। তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে ঝাঁপাল, ভাল শোবাক ছাড়া নাহবে না।

—গিরিশবাবু বললেন তিনকড়িকে কোন অভ্যর্থনা করতে পারবেন না। কে যায় 'বোখাতে শেষ পর্যন্ত চারখানি মালিক মহেন্দ্র মিত্র সাহস করে বোখাতে গেলেন। তিনকড়ি সাক্ষ্যে ওপর বলে দিলে—ভূমি আর টকখাই-টকখাই করে না বাপু, বাও আর ওকালতি করতে হবে না। তোমার মত উকিলের হামলার আমি হ'কোর জল ঢেলে দি।

মহেন্দ্রবাবু পালিরে বাচলেন, শেষ পর্যন্ত একজন হুইবার লোক (ডোলালা বলেন—সমস্তটাই রসিকতা আর তা মিটনাট করান অর্ধেন্দুবাবু) গিয়ে বোকায়ে—আরে, তোমার কি এমনি গেকরা পরাব, পরাব একেবারে খাটি সিঁড়ের গেকরা, তখন ঠাণ্ডা হলো তিনকড়ি।

ডাঃ অধিকারী মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে কথা বার করত চাইতেন।

বললেন—তারার কিন্তু খুব দস্ত ছিলো। বললেন—খাকবে না কেন, এক সময় থিয়েটারের মাসিক পুঁজি ছিলেন। অপরেখমন্ডারু তার থিয়েটার ঠিকিয়ে আট থিয়েটারকে বেচে দিলেন আর তার টাকায় ভালুক পাড়ার দু'খানা বাড়ি কিনলেন, পরে আবার সে বাড়ি বেচে দিয়ে টাকাটা ভোগ করলেন। উনি ছিলেন আওবলজ্জের। প্রথমে আমাকেও খুব দাবাতে চেয়েছিলেন।

—পাণ্ডব গৌরব দুবার করেছি, কিন্তু ওর ওপর আমার কোন sympathy নেই।

এই দিন জনার আধাখাবি পড়ে শোনালেন।

৭ই আগষ্ট এলেন। প্রথম কথা হল—সেদিন আমি তুল করেছিলাম, মাইকেলের শমিষ্ঠার আছে সন্তুত নাটকের প্রভাব আর গ্রীক নাটকের প্রভাব আছে পদ্মাবতীতে। তার পর বললেন—একজন অভিনেত্রী অনেককাল অভিনয় করছে, মহতী আকাঙ্ক্ষা মানে জানে না। বলে—যুধ হবে আর কি? তখন আমি বললাম—কথাটার মানে হ'লো পৃথিবীর হবার ইচ্ছা। বিজয়ীরা মানে জানে না।

পূর্বানো দিনের অভিনেতাদের সবকে বললেন—গিরিশবাবু একটা ডোল করলেন, ছেলেকে বড় করবার জন্তে কতকগুলো বড় বড় পাট লিখে গেলেন, দানীয়াবু অবশ্য লেখাপড়া জানতেন না। তবে তখন তাঁরা স্বীকার করতেন যে, লেখাপড়া জানেন না। কুসুম বড় ভাল বলেছিল। একটি ছেলে না মেরেকে শেখাচ্ছি, পাটটা বোঝানোর জন্তে গোটাকতক ইংরেজি sentence বলেছি তা দেখি সে 'ধা' করে ঠাড়িয়ে আছে। কুসুম বললো—ওত খুবই বুঝেছে। যে ভাবার বললেন, ও ভাবার যে ও পণ্ডিত।

রামকৃষ্ণের কাছে গিরিশবাবু গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। পরমহংসদেবের শিষ্যতা খুব সাহায্য করেছিলেন। স্বামীজি ছিলেন শেহুদে। স্বামীজির অপূর্ব জনপ্রিয়তা ছিলো। পশ্চিমেও স্বামীজির বা জনপ্রিয়তা ছিলো, রবীন্দ্রনাথের তা ছিলো না। কিন্তু এসেলে স্বামীজির নাম হ'লো আমেরিকা থেকে নাম করে এসে।

—ওদের দেশে কতকগুলো গরীব লোক থিয়েটার খুললেন, তারপর দিল হুমিমান টাকা দিতে ঠাড়িয়ে গেল। আমাদের দেশেও গরীব লোকেরাই থিয়েটার খুলেছিলেন। গিরিশবাবু ছাড়া কারো কিছু ছিলো না। অর্ডেলুগু'র ছিলেন অরহাস। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে থাকতেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বহুআজি করতেন, পকাশ টাকার বেশি কখনও একসঙ্গে চোখে দেখেননি। শ্রীতকালে ওভারকোট আর পরমকালে ড্রেসিং গাউন পরে কাটিয়েছেন। খাবার মধ্যে খেতেন দিলী মদ। দিলী ছেড়ে বিকিতিতে কখনও উঠতে পারেননি। দিলী মদ বোধ হয় তখন চোদ খানা বোতল ছিল।

এবার এলেন জনার প্রসঙ্গে, বললেন—জনা বলা হয় লেডি ম্যাকবের্থের বাবা অশুভ্রাণিত কিন্তু পড়লে ত তা মনে হয় না। কাব্য হিসেবে খুবই ভাল বই। ওর আর একটা ভাল বই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। বিখ্যাতদের পাঠ্য হওয়া উচিত। নাটকটির দুটি ক্ষেত্র—কীটকবর আর উত্তর গো-সুহৃদু। অবশ্য এরকম দুটো ক্ষেত্র জমাজেও কিছুটা আছে। প্রবীণের মৃত্যুর পরের অংশটাও নতুন। ওর নাটক গ্রীক বা সেরাণীয়রের নাটকের ছকে নয়; একবারে নিজস্ব। সম্পূর্ণ নিজস্ব। মাচেস্ট অব জেনিসে শাইলকের ব্যাপার

চোকার খবর সেরাণীয়র যদি পোর্টিয়া আর তার যি নিয়ে একটা বাড়তি অংক লিখতে পারেন ত গিরিশবাবুই বা পারেন না কেন।

—আইন হয় পরে। আরিষ্টটল এথিষ্টোকেনিস আর এসকিউলাসের কত পরে আইন বাধলেন। তাছাড়া বিখ্যাত লেখকরা আইন পুরো মাত্রায় কখনই মানেন না। জেন অর্ডেনের লেখার সঙ্গে ডিকেন্সের লেখার যেমন অনেক তফাত।

ইংরেজি লেখকদের কথার বললেন—আন'ড বেনেট ত ভাল লিখতেন। আমা অব ফাইভ টাউন্স খুব ভাল বই। ওও ওয়াইভস টেলসও বেশ ভাল লেখা। ওয়েলসও ভাল লিখতেন। যি: পলি পড়েছি।

কথার কথার 'মহাপ্রস্থান' নাটকের কথা উঠল। বললেন—মহাপ্রস্থান দুটি লোক লিখতে পারতেন—কীরোর পণ্ডিত আর গিরিশবাবু। গিরিশবাবু লিখলে ভীষণ ট্রাজিক হ'তো। অবশ্য এ চয়ে ট্রাজিক আর কি হতে পরতো! তবে উনি বোধহয় মহাপ্রস্থান পর্যন্ত যেতেন না। অর্জুন যেখানে গাণীর তুলতে পারলেন না সেখানেই শেষ করতেন। কীরোর বাবুকে বলতে উনি লাক্ষিরে উঠলেন, কিন্তু একদিন ভেবে এসে বললেন—ভায়া, এখানো বাট বছর হয়নি, এখি মধ্যে পূর্ণব্রজ নারায়ণের মৃত্যু দেখালে কি আর বাঁচবে।

জনার কথা তুললেন আবার, বললেন—জনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কি? ভাল করে পড়ানো দরকার, শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ানো দরকার, এতে নাটকীয়তাও আছে, কাব্যগুণও আছে, বীরা পড়ান তাঁরা ভাগ করে পড়ান না। কিছু ভাগ ভাগ সমালোচনা থাকলেও তাতে এমন অনেক জায়গা আছে না পড়লে বোঝা যায়, তাঁরা বইটা ভাগ করে পড়েননি। তা ছাড়া শ্রদ্ধা না থাকলে কী করে বুঝবেন।

মাইকেলের প্রতি গিরিশ বাবুর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। আমার যখন সত্যেরো বছর বয়স, তখন প্রথম গিরিশ বাবুর কাছে বই ইনস্টিটিউটে রেসিটেশন কম্পিটিশনে, কি ভাবে রেসিটেশন করণা শিখতে। মাইকেলের লেখার যে অংশটি নির্দিষ্ট ছিল সেটা পড়ে হুগে করে বলেছিলেন এটাও মাইকেলের লেখার ভালো অংশ নয়, এর চয়ে অনেক ভালো লেখা আছে তাঁর, এই বলে 'নীলক্ষজের প্রতি জনা' পড়ে শোনালেন।

তিনি যে নিজে নাটক লিখবেন, একথা কখনও ভাবেননি। কিন্তু খুব ভালো অভিনেতা ছিলেন। ইউনিভারসিটির উচিত গিরিশ বাবু সবকিছু খোঁজ খবর নেওয়া। তাঁর নাটকের Genesis সবকিছুও খোঁজ নেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ আমার বলেছিলেন—গিরিশ বাবুর লেখা পড়িনি আর এ বুড়ো বয়সে পড়তে বলা না। তবে তিনি খুব বড় অভিনেতা ছিলেন।

—দানী বাবুকে যে দেখতে পারতেন না তার কারণ তিনি 'ত' কেবল ভোগে চলতেন, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর খায়াপ অবস্থার সূত্র হয়। এক সেক্সান্দেরীতে বিজির খা হয়ে চটিয়েছিলেন কিছুদিন' তবে পরশা পাননি।

আজকের দিনে যে হাই কলক, Publicity Conscious সবাই, আমাকে দু'বছর কেউ mention করেনি।

এক বিখ্যাত ইংরাজী বৈনিকের সম্প্রদায়ের নাম করে বললেন তাকে উল্লিখ' সাভান-আশি' সালে বলেছিলেন, সমালোচনা

তে একটি ভাল ছেলেকে তিন-চারশ' টাকা মাইনে দিয়ে
খো, আমরা তাকে সাহায্য করবো, তাতে বললে, এমনিতই
তলোকে লেখা দিতে চাইছে। আর একটি পত্রিকা পোষ্টার
রিচালকের নাম করে বললেন—সে বললে, কেউ ত কিছু জানে না।
লেখবার আপনি বরং লিখে দেবেন, কাগজে ছাপিয়ে দেবো।
মি তাতে রাজি হইনি।

বাবার সময় ঠিক হলো পণের দিন পড়বেন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।
আবার এলেন চোদ্দই আগষ্ট। ইতিমধ্যে বার্মাপুরে অভিনয়
রত গিয়েছিলেন, সে সময়েই প্রথমে বললেন—বার্মাপুরে মেকের
নামের পি চৌধুরীর বাড়িতে ছিলুম। ভদ্রলাক ex—
. M. S.। ঠিক দ্বায়ে আমার বড় ভালো লেগেছে। কোনো
কম রং চা মাথা নয়, একেবারে সাধারণ। বাঙালী-ঘরের বউ।
যে ধারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন সবাই রমাখা।
আর কী বড়। খাইয়েছেও খুব ভালো। তাইত বললুম, I am
feeling quite at home,

—চৌধুরী সাহেব আই, এন, এ.এসও ছিলেন, জীবনে অনেক
গ্যাডভেঙ্কার আছে।

—অভিনয় খুব ভালো হয়নি। (একজন অভিনেতার নাম
দেয়)—এর অবস্থা খুব স্বাভাবিক ছিল না। একবার ঢুকে আর
খন ঢুকলো না তখনই বঙ্গলুম কিছু গোলমাল হয়েছে। বাঁধা
ততালি পাঁচর জায়গার না পেলে এক কথা তিনবার করে বলেছে।

—ষ্ট্রট খুব ভাল, গভীরতা চল্লিশ ফুট, তবে মাঝখানে
কটা বাধা আছে (সম্ভবতঃ শিলার) নীচে ছশ পঞ্চাশজন
লাক ধরে। ষ্টারও ধরত না। জিজ্ঞাসা করলুম—সবই ত তোমাদের
গলো, কিন্তু মাঝখানে ওটা কেন? ষ্টারের নকল, তা উত্তর
দিলে—না, আগে ওই পর্যন্তই ট্রেজ ছিলো, এখন বাড়ানো হয়েছে।
মি বললুম—ওটা সবিয়ে দিয়ে। আর একটু জিজ্ঞাসা বার করে।
যতিনয় করতে পরসা নিই বটে কিন্তু এসব কথা জানতে চাইলে ত'
দার পরসা নেবোনা।

এবার কতকগুলো সাধারণ কথা বললেন—আমাদের দেশে
গভীরতা বোধ এসেছে পরে। আধারা যে বাইরে থেকে এসেছিল
কথা হয়ত সত্য নয়, নয়ত এসেদের লোকেরাই নিজেরদের
ধর্ম বলে চালিয়ে দেয়। মুসলমানরা যখন এসেছে আসে
মামাদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস এসঙ্গে বললেন—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
লগা হয় আটারশ' বিরাশি সালে। তার আগের বছর লেখা হয়
মাখ বধ। প্রথম দিনে উত্তরা কে করেছিল তার নাম পাণ্ডুরা বার
না। অমৃতলাল মিত্র করেছিলেন ভীম ছাড়া আরো দুটো পাট।

গিরিশবাবু করেছিলেন কীচক আর দুর্ধোষন। গিরিশবাবু কীচক
খুব ভাল করতেন, কিন্তু প্রথম রাত্রির পর ছেড়ে দিয়েছিলেন।
তখন করতেন মতিলাল মুর। তাই নিয়ে তুমুল হৈ চৈ। শেষ
পঞ্চম বাধা হয়ে আবার ধরলেন। অমৃতবাবু ছিলেন লগা চণ্ডা
দশাশই পুরুষ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের দুটি কেন্দ্র, এক কীচক বধ আর এক
উত্তর গো গৃহ যুদ্ধ। দুটিকে জুড়েছে উত্তরা-অভিমত্যা বিবাহ আর
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ইঙ্গিত।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে বিদ্রোহী কোনো ছোঁওয়া নেই। এর মূল
হালো পুরো কাশীরাম দাস। এর গড়নটাও সম্পূর্ণ গিরিশবাবুর
নিজস্ব।

সেঙ্গপীরের খুব ভক্ত ছিলেন গিরিশবাবু। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব
সম্পন্ন লোক ছিলেন উনি। যত কাল ছিলেন, নতুন কোনো ধারাকে
চুকতে সেননি।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু
পড়াবে কে? সেঙ্গপীরের বোধ হয় জীকুমার পড়াতে পারে,
পার্সিভাল সাহেবের সব নোট ওর মূখস্থ। প্রফুল্লবাবুও ভাল পড়াতেন
শুনেছি। তবে আমাদের ধা পড়িয়েছিলেন—ফাইলোলজি—
তা ভাল পড়াননি। ফাইলোলজি জানে সুনীতি, একেবারে
সব মূখস্থ।

প্রফুল্লবাবুকে পড়ানোর লাইনে আনলেন পার্সিভাল সাহেব।
ধমকে বললেন—ডেপুটিগিরি করবে তো আমার কাছে এতদিন
পড়লে কেন?

প্রফুল্লবাবু আগেও এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের ভালোতলে
পালিয়ে বাচলেন। পার্সিভাল সাহেব ঠেকে খুব ভাল বাসতেন।
নিজের সব নোট লেখা বই দিয়ে যান।

ও'র সময় পার্সিভাল আর এম, ঘোষ ভাল পড়াতেন। আর
একজন ভাল পড়াতেন—বিনয় সেন। উনি ফিলসফি, হিন্দি আর
ইকনমিকসের প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু কোনো দিকে যেতেন না
তাই আগাবা পছন্দ করতেন না। তবে দলে টানতে চেয়েছিলেন।
বিনয়বাবুকে এক কথায় ইলপেটের অব কলেজের করেছিলেন।
তিনি খুব রাসভায়া লোক ছিলেন। তাঁকে সবাই নাম ধরে ডাকতে
পারতেন না, বাবু বলতে হ'তো।

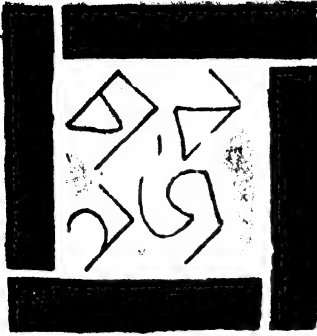
অমৃতবাবু মাঝে মাঝে গুরুত্ব ঠিকে ভুল হ'তো। গুরুত্ব
বাবু সঙ্গেও একবার হয়েছিল। ঠিক ছেলে হাবাসের চাকরী করে
ও'র কাছে ভোট চান। তাতে গুরুত্ববাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

ঐ সময়ে পণ্ডিতরা তাঁদের জ্ঞান দেখাতেন না, নিতান্তই খোঁচা
দিয়ে জানতে হ'তো।

[কমশ:]

এ সময়ে প্রচলিত

এই সময়ে প্রচলিত সাঁওতালী বঙ্গ-ললনা দুই বোনের আলোকচিত্র
প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র শ্রীমাকিয়ার সিংহ কর্তৃক গৃহীত।



রাজেন্দ্রলাল আচার্য

“খাঁয়ন, বক্সিমচন্দ্রের মুহূর্ত উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোকসভায় আমরা বক্সিমের গড়ে তোলা বাংলা ভাষাতেই সকল কথা শুনেছি, ইংরাজিতে নয়।” বালকের কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি উঠল। সভাপতি সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। সাহিত্যসম্রাট বক্সিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে সাহিত্যসম্রাটের মূর্তিপূজার জন্ম শোকসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন রাজসাহীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট লোকেন্দ্রনাথ পালিত। সভাপতির অভিভাষণে তিনি ইংরাজিতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে বক্সিমচন্দ্রের রচনাবলী তিনি লগুনে যিদিয়াও পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি বক্সিমচন্দ্রের একজন অমূল্য ভক্ত। তবুও ইংরাজি ভিন্ন অন্য ভাষার বক্তৃতা করিতে পারেন না এমনকি তিনি ইংরাজিতেই বক্সিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাহা কিছু বলিবেন। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হইয়া সভাপতির অভিভাষণ শুনিতেছিল। সহসা সভার এক প্রান্ত হইতে বালকের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিয়া উঠিল। বক্সিমচন্দ্রের মূর্তিপূজার বক্সিমের গড়ে তোলা বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার বক্তৃতা করা চলিবে না। এই বালক রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের উন্নয়মান ছাত্র রাজেন্দ্রলাল আচার্য। বালকের প্রতিবাদের সারবত্তা অনুভব করিয়া সভাপতি মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়েন এবং সমুদয় সভার হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বাংলা ভাষার বক্তৃতা করিয়া সাহিত্য সম্রাটের মূর্তি প্রতিভা নিবেদন করেন এবং সভার কার্যও সমাপ্ত হয়।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য

বঙ্গ ভাষার প্রতি এই অস্বাভাব্য অধরাপ এবং বঙ্গীয় জাতীয়তার প্রতি অকৃত্রিম প্রবাহ

রাজেন্দ্রলাল আচার্য মহাশয়ের জীবনের মূল স্রব। কয়েক দশকব্যপী বিরাগভাজন হইয়াও তিনি তাঁহার ‘বিপ্লবী বাংলা’ নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন ভারতবর্ষের কর্তমান স্বাধীনতা গান্ধীবাদের দ্বারা আসে নাই—আসিয়াছে অপরাধ কারণের সহিত আত্মা হিন্দু ফৌজের সর্বাধিনায়ক বাঙ্গালী বীর সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার এবং আত্মত্যাগে। তাইতে বঙ্গজননী আর একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বর্গতঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ‘বিপ্লবী বাংলা’ পাঠ করিয়া আচার্য মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন “এই গ্রন্থে আপনি সত্যকায়ের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। আপনায় প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।”

ঐযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য রাজসাহী জেলার এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার কেদারের আচার্য এম, বি উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তবুও চিকিৎসক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজসাহীর প্রতিটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যথা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, পাবলিক লাইব্রেরী, হরিসভা, কলেজ, স্কুল প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সহিতই তিনি অপ্রার্থন্যপূর্ণ যুক্ত ছিলেন। আজিও রাজসাহীর আপামর জনসাধারণের নিকট ‘কেদার ডাক্তার গরীবের মা বাপ ছিলেন’ বলিয়াই পরিচিত। এই বিখ্যাত পিতার ছোটপুত্র রূপে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঐযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্যের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়; কিন্তু বিয়াতা স্নেহস্রোতের বহিত হইলেও তিনি মায়ের অভাব কোনদিন অনুভব করেন নাই।

রাজেন্দ্রলাল বাল্যকালে রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং প্রথম হইতেই একজন মেধাবী এবং কৃতি ছাত্র হিসাবে পরিচিত হন। তবু তাহাই নহে; খেলাধুলা, গান-বাজনা, সমস্তর প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বধাকালের দুঃস্বপ্ন পদ্মা নদীও তিনি একাধিকবার সাতরাইয়া পার হইয়াছেন। ছাত্র জীবনে রাজসাহীর বেখানে যে সহৃদয়তামূলক আন্দোলন হইয়াছে তাহাতেই তিনি একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কয়েকটি অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

স্কুলের ছাত্র জীবন হইতেই রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য চর্চা শুরু হয় এবং রাজসাহীর ‘হিন্দুস্তানিকা পত্রিকায়’ এক ‘লিঙ্ক’ নামক আর একখানি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে লিখিতে থাকেন। রাজসাহী হইতে এন্ট্রাল পাশ করিয়া তৎকালীন ছাত্র জীবন সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার পড়িতে আসেন এবং রিপণ কলেজে (আধুনিক সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন। রিপণ কলেজ হইতে রাজেন্দ্রলাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করেন। রিপণ কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি তার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন এবং তাঁহার কথা মত “Bengali” পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। রাজেন্দ্রলাল সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রও ছিলেন।

অক্টোবর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল সরকারী চাকুরী সার ভেটুগীর পদে নিযুক্ত হন এবং যোগ্যতার সহিত কার্য সম্পাদন করিতে থাকেন। কিন্তু স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্ম তিনি প্রতিপদে ইংরাজ শাসকশ্রেণীর বিরোধভাজন হন। তাঁহার প্রথম চাকুরী জীবনে মেদিনীপুরে বঙ্গভাষা কাণ্ডে অকৃত্রিম দুর্দমনী কর্মণ করেন।

ঐ সময় তিনি Famine Rules সম্বন্ধে যে নিবন্ধ লেখেন, তাহাতে ইরাকের প্রচলিত নীতিবো (যে সমালোচনা করেন, তাহা শাসক মহলে আন্দোলন আনয়ন করিয়াছিল এবং উহা তীহার পরবর্তী জীবনের উন্নতির প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি বগুড়ায় সাব ডেপুটি থানা কালে ইংরাজ শাসকগণ কর্তৃক 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আবার দেশ' শীর্ষক গানটি নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিচলিত না হইয়া বগুড়ার—'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার' রাজেন্দ্রলালের পরামর্শক্রমে ঐ গানটি প্রতিবার বিবর্তিত সময় কনসার্টে বাজাইবার ব্যবস্থা করেন। শুনিতে পাওয়া যায় রাজসাহী বিভাগের তলানীজান কমিশনার রিড সাহেব (পরবর্তীকালে আসামের গভর্নর) রাজেন্দ্রলালকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করিবার জন্য সুশীল করিলেও বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিবার অপরাধে ফুলার সাহেব তীহার মনোনয়ন অগ্রাহ্য করেন।

রাজেন্দ্রলালের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বাংলার প্রতাপ' তাহার পরে তিনি 'রাণী ভবানী', 'বীর কাহিনী', 'মরাঠির কথা', 'ছত্রপতি শিবাজি', 'নিষিদ্ধে বাঙালী', 'বাঙ্গালীর বল', 'বাঙ্গালার ধর্মগুরু' (দুই খণ্ড), 'বিদ্রোহী বাংলা', 'বৃদ্ধার পরপাণে' (দুই খণ্ড), 'স্বামী অভেনানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং জুলাই মাসের '৮' দিনে ডু প্রেন্সিপ, 'চন্দ্রসেকো বাজা', 'পাভাসে', 'বেলুন পাচ সপ্তাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ অম্ববাদ করেন। টলস্টয়ের Ressurrection ভিত্তির হগোর Hunch Back of Notterdum, আনাতোল ফ্রান্সের Red Lily-র মধ্যস্থবাদ 'পুনর্জন্ম', 'সেব সেউল' ও 'বঙ্কমল' নামে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'মিকালোকাণ্টির' ভারত বৃত্তান্ত তিনি 'শেখ হিন্দু সাম্রাজ্য' নাম দিয়া অম্ববাদ করিয়া 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'কিরিকী বাগকের' মত রাজেন্দ্রলালের 'কিরিকির বাগিক' এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত বঙ্গ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন রাজেন্দ্রলাল হিরাভরের মন্তব্যের উপর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। 'মহম্মদ' উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার মহম্মদ অপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য হইয়াছে কিন্তু ভর হয় উহা ছাপিতে গিয়া বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে না হয়।' প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চাট্টোপাধ্যায় একবার জেটগ্রন্থ করিয়াছিলেন—তাহাতে রাজেন্দ্রলালের 'বাঙ্গালীর বল' বাংলা সাহিত্যের একমুখনি তাল বইয়ের অঙ্গতম বলিয়া নির্বাচিত হয়। ইহাই রাজেন্দ্রলালের রচনার শ্রেষ্ঠত্বের অঙ্গতম নিদর্শন। কবিতা ও প্রবন্ধে যে তিনি কত লিখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নাটক রচনা ও অভিনয়েও রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব দেখা যায়। পূর্বে রাজসাহীর আচার্যপরিবারে হর্সেংসবের সময় নাটক অভিনীত হইত। উক্ত অভিনয়ের জন্য রাজেন্দ্রলাল প্রতিবৎসরই নূতন নূতন নাটক রচনা করিয়া দিতেন এবং উহারই অভিনয় হইত রাজেন্দ্রলালের লিখিত এবং প্রকাশিত নাটকের মধ্যে উহা এবং প্রারম্ভিক উল্লেখযোগ্য।

তথ্য সাহিত্যিক হিসাবেই রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব মনে—গঠনকারী কর্মী হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। রাজসাহী বরেন্দ্র অন্নসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল ব্যক্তি স্বর্গীয়

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পাশে সমবেত হইয়াছিলেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাহাদের অঙ্গতম। পরবর্তী কালে রাজসাহী ত্যাগ করিয়া বারাকপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেও তাহার দেশ হিতৈষণা লোপ পায় নাই। বারাকপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং বারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজেরও তিনি অঙ্গতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক সমিতির সভ্য। বারাকপুর জীবনমুকু সমিতি ও বট প্রতীষ্ঠাও তাহার অঙ্গতম কীর্তি। স্বামী অভেনানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিনি স্বামীজি মহারাজের বিশেষ স্নেহ ও কৃপাভাজন হইয়াছিলেন এবং স্বামীজির অনেকগুলি ইংরাজি রচনায় বাংলা অম্ববাদ করেন। স্বামী অভেনানন্দ মহারাজের একখানি জীবনীও তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বয়ং বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে যুদ্ধে যাইতে থাকেন, রাজেন্দ্রলাল তাহাদের একজন উৎসাহী সমর্থক এবং প্রচারক ছিলেন। ১৯ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিস্ট্রারের জন্য তিনি কয়েকটি জাতীয়সঙ্গীতও রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; যথা—

১। বঙ্গবীরের বংশ আমরা কত না শত্রু করিব ভয়।

অর্থাৎ আনব দেশের তরে অগ্রতি ক্রিষ্ট করিয়া জয়, ইত্যাদি।

২। কোথা গোবর্গ কোথায় কোথায় কোথা রাম সেতু কোথা পাণ্ডার বনছন্দার ধানিল বাহার জলধি হইতে জলধি শেব। ইত্যাদি।

রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য রচনার যুদ্ধ হইয়া ১৩২৬ সালে 'বঙ্গ সাহিত্য সারস্বত মণ্ডল' তাঁহাকে 'পুরাতত্ত্ব' এবং নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'বিভাভূষণ' ও 'সাহিত্য সারস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে ইংরাজ সরকারও তাহার সাহিত্য সাধনার জন্য রাজেন্দ্রলালকে বার সাহেব উপাধি দান করেন। ইহাব্যতীত বহু পদক ও পুরস্কারও তিনি সাহিত্য রচনার জন্য পাইয়াছেন।

পাখনা জেলার ভারেন্দ্রা গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী জমিদার বংশের ৮যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যমা ভগ্নী শ্রীমতী হেমললিতা দেবীর সহিত রাজেন্দ্রলাল আচার্যের বিবাহ হয়। তাহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিশয় সুখ। কিন্তু কয়েকটি পুত্রের পর পর মৃত্যু হওয়ার তাহার শেষ জীবন কতকটা শোকাবহ হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাহার দুইটি পুত্র রজনলাল ও বিহরলাল স্বয়ং যুদ্ধে গমন করেন তাহাতে স্বামী-স্ত্রী পৌরবই অম্বভব করিয়াছিলেন এবং উভয়ে একত্র যাইয়া সন্তানস্বরকে কোট উইলিয়ামে পৌছিয়া দিয়া আসেন। "কেত যুদ্ধে যাইতেছে?" জিজ্ঞাসিত হইয়া রজনলাল বলিয়াছিলেন—"দেশে জঙ্গ—বর্দি করিয়া আসি, তবে আমাদের সময়-কৌশল শিক্ষা দ্বারী ভারতের সেবার নিয়োজিত হইবে। আর যদি না কিরি, তত যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু 'বাঙ্গালীর বলের' লেখকের উপযুক্তই হইবে। রজনলাল সত্যই আর কিরেন নাই। ব্রহ্মদেশের মিটকিনীর সময় ক্ষেত্রে জীবন দিয়া নিজ পিতার 'বাঙ্গালীর বল' রচনায় বাধ্যবাধী প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতেই রাজেন্দ্রলাল পরলোকগত সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন এবং পরলোকগত সম্বন্ধে তাহার 'বৃদ্ধ পরপাণে' ১ম ও ২য় খণ্ড অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

প্রায় অশ্রুতিবর্ষ বয়সে রাজেন্দ্রলাল এখনও অটুট যত্নাবল লই সাহিত্য সাধনা করিতেছেন। বোগ তাঁহাকে শীর্ণ করিয়াছে। পো তাঁহাকে জীর্ণ করিয়াছে, তবুও অবিকলিতচিত্তে তিনি সাহিত্য সাধ

কমিয়া চলিয়াছেন, বাহার মূল সুরাই হইল বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা ও প্রেত্ব। এই সঙ্গে অল্পান্ত ভাবে তিনি কবিয়া চলিয়াছেন সুশিক্ষিতাৎ বলজ ও জীবাশ্মকুমার সমিতি ও মঠের মাধ্যমে সমাজসেবা। রাজেন্দ্রলাল শীলই অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিবেন;—তিনি শতায়ু হইল।

শ্রীচরুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক]

আপুর্ন কব্ধ নষ্টা, বিজ্ঞান সাধনা ও সাহিত্যচর্চা এঁর জীবনের মূল মন্ত্র। বহুগুণে বিভূষিত হলেও এই তিনটি বিষয়ের তিনি একনিষ্ট পুজারা। তাই এই সাহিত্যের বহু বয়সও তিনি নিঃশব্দ ভাবে সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন। বঙ্গ জননীর অমৃত ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন আজও।

বর্তমান কালে যে কয়েকজন শক্তিমান লেখক বিজ্ঞানালোচনায় অগ্রণী হয়েছেন তন্মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রীচরুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে—পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র চারুচন্দ্র আধুনিক যুগের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্যিক। সরস বর্ণনাত্মক এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁর রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। চারুচন্দ্রের রচনায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্টই প্রত্যক্ষমান হয়।

এই জানা, গুণী নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সম্পর্কে এসে বিশ্বভারতী প্রকাশনার সমৃদ্ধ করেন নানাভাবে ও নানাদিকে। বাংলা দেশে যে পাঁচ জন বৈজ্ঞানিক রয়াল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হয় বিবেচ্য বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্যে তন্মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, যেশনাথ সাহা, প্রশান্ত মহলানাবিশ, শিশির মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ব্যতীত অপর চার জন হচ্ছেন চারুচন্দ্রের ছাত্র। এঁরা ছাড়াও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক স্বর্গতঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ছাত্র। এঁর জীবনের আরো দেখতে পাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমিশ্রণ—জ্ঞানী জীবনের অপূর্ণ সংযোগ।

১৮৮৩ সালের ২১শে জুন ২৪ পরগণা জিলার হরিনাতি গ্রামের এক ধর্মাবলম্বিত পরিবারে শ্রীভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গতঃ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভট্টাচার্য্যের বাংলা ও কলেজ জীবন সম্বন্ধে শ্রীভট্টাচার্য্যের নিজের মুখের কথাই এখানে উদ্ধৃত করছি—

বাংলাকালে একটি নতুন স্কুলে ৩ বছর পড়ে ১০ বছর বয়সে কলকাতায় আসি। কলকাতা মেট্রোপলিটান স্কুলে (বউবাজার থানা) এসে ভর্তি হওয়ার দুই মাস পরে একদিন শুনে যে সেলু সাহিত্য সমিতি বক্তৃতাচর্চা উপাধায় মহাপ্রয়াণ করেছেন। এত কাছে থেকে তাঁকে দেখা হলো না। এক্ষেত্রে মনে কোঁড় বসে গেল। আমাদের স্পষ্ট বয়স আছে সেদিন আমাদের স্কুল হ'লো না। ১৮৯১ সালে মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ

হই এবং মেট্রোপলিটান (বর্তমান বিভাগসাগর) কলেজে এক, এ পাড়। সে সময়ে আমাদের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন স্বর্গতঃ এন, এন, ঘোষ, জ্ঞান বানার্জী, মোহিতচন্দ্র সেন এবং ক্ষেত্রগোপাল ঘোষ প্রমুখ। ১৯০১ সালে এক, এ পরীক্ষায় কৃতকাংক্ষাভাবের পর প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ (বি কোর্স) ক্লাসে ভর্তি হলাম। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের অধ্যাপক ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক মিঃ পার্শাডেল প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত অধ্যাপকগণ। আমি যখন ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন ডক্টর পি, কে, রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদলাভ করেন। কিছুদিনের জন্যে। ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে পদার্থ বিজ্ঞান এম, এ, পড়ি এবং ১৯০৪ সালে পদার্থ বিজ্ঞান সনমানে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এম, এ পড়বার সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণা আরম্ভ করি এবং এম, এ পাশ করার পরও আচার্য্য বসুর অধীনে গবেষণা কার্যে রত থাকি। তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান লেকচারার হয়ে যোগ দিই। সন তারিখ মাস আর মনে নাই। তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজেই পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যাপক হই এবং বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপনা করতে থাকি।

ছাত্রাবস্থায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সান্নিধ্য লাভ করি এবং তাঁর দৃষ্টান্তনি পথান্ত আচার্য্যদেরই সঙ্গ লাভ করি।

দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যাপকের পদ থেকে শ্রীভট্টাচার্য্য অবসর গ্রহণ করেন। অতাবধি তিনি বিশ্বভারতী ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে বর্তমানে তিনি রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি, রবীন্দ্র ভারতীর সহ-সভাপতি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ সভাপতি, অবনীন্দ্র পরিষদের সভাপতি, ভারত সভার সহ-সভাপতি প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীভট্টাচার্য্যের দীর্ঘ কথনয় জীবনে অপর একটি দিক হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা। ১৯১৭ সালে বিশ্বভারতী সন্মিলনী প্রাতিষ্ঠিত হ'লো। সে সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে রচনা ও কবিতা পাঠ করতেন। শ্রীভট্টাচার্য্য তাতে বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি উক্ত সন্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বভারতী যখন স্থাপিত হ'লো তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রকাশনী বিভাগটির পরিচালনা তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন। শ্রীভট্টাচার্য্যের যুগের কথাই বলি, ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় উপর অর্পণ করেছিলেন সে দায়িত্ব ভার বহন করেছিলাম। আজ দু'বছর হ'ল সে ভার হ'তে অব্যাহতি নিয়েছি। বিশ্বভারতীর কার্য নির্বাহক পরিষদ ও তার অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে গোড়া থেকেই আমি যুক্ত ছিলাম।

বর্তমানে 'বন্ধুধারা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার আমার উপরেই পড়েছে। রবীন্দ্র ভারতী ও বিশ্বভারতীর পুস্তক প্রকাশন বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে এখনও আমি সক্রিয় আছি।

শ্রীভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানের সাধনার রত থেকেও পদম পদা ও নির্ভীর সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে চলেছেন আজও। প্রাক্ল ও শিল্প রচনাবলী এঁর অপর বৈশিষ্ট্য। এঁর রচিত প্রবন্ধগুলি পাঠক সমাজ

মঞ্চের সমালোচনা করেছেন। এঁর প্রচেষ্টার বাংলা বিজ্ঞান সচিবতা করেই সম্বন্ধিত দিকে এগিয়ে বাচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্য্য এঁর বাস ২৪ খানার উপর পুস্তক প্রেরণ করেছেন তদানন্তর নব্য বিজ্ঞান (১৩২৫); বাঙ্গালীর বাস্তব (১৩২৬), বিশ্বের উপাদান (১৩৫০), তত্ত্বিতের অভ্যুত্থান (১৩৫৫), আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৯৩৮), জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৩৫০), ব্যাধির পরাজয় (১৩৫৬) পদার্থ বিজ্ঞানের নবদৃষ্টি। ঐজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমরা এই জ্ঞান তপস্বী, বঙ্গ ভাষার একনিষ্ঠ পূজারী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের দীর্ঘজীবন কাহিনী কবি এবং আশা রাখি তিনি আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে বঙ্গজনের তথ্য ভাষার ও বিশ্ববাসীর জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবেন।

অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়কুমার সেন

[প্রখ্যাত জ্ঞান-তপস্বী]

গণ্য গৃহস্থ ঘরের ছেলে বক কষ্টের মধ্যে জীবন চালিয়েছি। সন্তানের অভাব অনটন স্বতন্ত্র বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা কিংবদন্তি হয় আমার ভাল ভাবে জানা আছে—জানাতেন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ছাত্র দরদী অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়কুমার সেন। কথাগুলো বলার সময় তাঁহার চোখের সজল ভাব আমার নজর এড়িয়ে যায় না।

কলিকাতা সিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরলোকগত অন্নদাচরণ সেন ও ৬বঙ্গকুমারী দেবীর প্রথম সন্তান অমিয়কুমার ১৮৯৭ সালের ৭ই আগষ্ট বরিশাল সহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম ছিল বরিশাল জেলার গুটুরা গ্রাম। মনোবঞ্জন গুণ্ডাচরণের দীক্ষার ব্রাহ্মণ্য গ্রহণ করার অন্তরালে নিজ পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া কলিকাতা সিটি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং শিশু পুত্র সন্তকে লইয়া কলিকাতার চলিয়া আসেন। সাত বৎসর পরে উনুবেড়িয়া মহকুমার বানীবন-গ্রামে তাঁহার পরিবারবর্গের বসতি স্থাপনা করেন। অমিয়কুমার স্থানীয় বাসিকা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সিটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তথা হইতে দশ টাকা বৃত্তি সহ ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা, সিটি কলেজ হইতে ১৯১৫ সালে আই-এতে বিত্তীয় ও ১৯১৭ সালে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানধিকারীরূপে গ্রাজুয়েট হন এবং ১৯১৯ সালে উক্ত বিশ্বের প্রথম শ্রেণীতে বিত্তীয় ছাত্র হিসাবে এম. এ পাশ করেন। ১৯২০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হইয়া বার্ষিক যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের সমসাময়িক ও সত্যবাদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রিয়বন্ধন সেন, কিশোর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অধ্যক্ষ সেনের সহধর্মিণী হলেন এককন্ডি সিংহাসের কন্যা শ্রীমতী সুরমা সেন, তৃতীয় ভ্রাতা কলিকাতা কনোয়েশনের টিফ ইন্সটিটুটের শ্রী অমূল্য সেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্যারিসের অরুণ সেন হলেন সিটি কলেজের কমার্স বিভাগের অধ্যক্ষ।

শ্রীসেন বিগত চার বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সহিত জড়িত, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক সভাপতি

ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি, বঙ্গদেশীয় কৃষিকর্মী সমিতির ট্রাষ্টী ও সভাপতি, ব্রাহ্ম বাসিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন।

আমরা বিজ্ঞানায় অত্যন্ত প্রীণ-শিক্ষাবিদ ও ছাত্র সমাজের কল্যাণকামী হিসাবে তাঁহার অভিমত জানাশ্রী—

১। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বল বাঙ্গালী নিরুপায়িত পরিবার মেধারী ছাত্র পাঠ্য যার সে স্থান চলে। কিন্তু হুঁইয়ে কথা যে আজ ওই পরিবারগুলি আর্থিক ও অর্থনৈতিক চাপে এবং শিক্ষার বিরূপ আবহাওয়ার ধ্বংসে পথে। এরা কখনও অমিয়বৃত্ত হতে পারেনা।

২। উচ্চশিক্ষার সমাপ্তিতে ছাত্ররা স্বদেশ, বিদেশ, জ্ঞান পৃথিবীর চারিপ্রান্তের সঙ্গে সুপরিচিত হবেন—তখনই ভালো। যে কোন আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। তার আগে তাহারা শাস্ত্রী বিশ্বের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে—রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে—আর কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের হবে নিজের ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা।

৩। শিক্ষায় বিশ্ব হবে—হিউম্যানিটিজ ও বিজ্ঞান। কিন্তু বিদেশে পাঠ্য করা হয়েছে—সামাজিকবিজ্ঞান, কলাবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। তিনটি ক্ষেত্রই প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠাতার পড়ান প্রয়োজন—শিক্ষার উচ্চতর যে কোন একটি গ্রন্থ করিলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে পূর্ণতা আসবে। পরিণত মননশীলতা হবে বিশ্বের শিক্ষার উর্ধ্ব ক্ষেত্র।

৪। স্কুল পরিবেশ ও সুপরিচালনার তিন বৎসরের জিজ্ঞাস্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার বিষয়ে।

৫। সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ-চিহ্ন থাকা বর্তমান ভাবতে বাঞ্ছনীয় নয়।

৬। আর কলেজ-শিক্ষা ক সম্বন্ধে দুই উন্নত করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দ্বারা পৃথক 'আর্থাৎ-গ্রাজুয়েট' উপসভা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন—বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও কলেজ প্রতিনিধিদের নিয়ে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে এই বোর্ড। ইহার প্রধান কাজ হবে বেসরকারী-শিক্ষাকে সুদৃঢ়ভাবে কলেজ উপযোগী করে পুনর্গঠিত করা।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাউন্ড কমিশন অধ্যাপকদের বেতনবৃদ্ধি স্বতন্ত্র মনোযোগী হয়েছে—ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহার আরও তৎপর হওয়া বিবেক। প্রয়োজন হলে দেশে শিক্ষাকর্মীর দারিদ্র্য করা যেতে পারে—প্রতিটি স্বাধীন দেশে ইহা চালু আছে।

শেষে তিনি ব্যক্তি চিত্রে বলেন যে, প্রকৃত জীবনদর্শন যদি আমরা স্থাপনা করি, তবে দেশ থেকে দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচারকে

চিহ্নিত করি



অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়কুমার সেন

বায়ু। আর অল্পমাত্রায় করলেই বায়ুজৈবিক কলগুলিকে—যেহেতু বায়ু ও বায়ুজৈবিক কলগুলির ভবিষ্যতের জন্য হঠাৎ সম্প্রদায়কে রাজনীতির আবর্ত হতে দূরে রাখা হয়।

ডক্টর ফিজেন্সবিনোদ সিংহ রায়

[কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক]

আমার বহুল ধারণা যে প্রত্যেক প্রত্যেকের নির্ধারিত কাজ যদি ঠিকমত করে তবে বৈদ্যমান সমস্তর অনেকটা লাভবান হতে পারে। আজ দেখা যায় যে সর্বত্রই পরিপ্রভাববিশিষ্টতা বায়ু ও বায়ুজৈবিক কলগুলির দ্বারা বৃদ্ধির কারণ। তাই সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বায়ু ও বায়ুজৈবিক কলগুলিকে উৎসাহিত করে নিয়ে যেতে হবে—বিজ্ঞানের প্রীতিসম্পন্নতার পর আমার জানালেন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডক্টর ফিজেন্সবিনোদ সিংহ রায়।

হর্যাই ও চার বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান ফিজেন্সবিনোদ ১৯১২ সনের জুলাই মাসে ঋষার চাঁদপুর বাবুঘাটে (আজিকার দিনে) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ৩০ বারিনীমোহন সিংহর কুমিল্লা কোর্টে মুহুরী হিসাবে বখেষ্ট উপাধীন করেন এবং প্রতিটি ছেলেমেয়েকে সুশিক্ষিত করার জন্য ব্যবস্থা করেন। চাঁদপুর ও কুমিল্লায় সুশিক্ষিত, সুশিক্ষিত উচ্চশ্রেণী বামিনী বাবুকে হারালেন তাঁহার পড়ুয়া সন্তানরা। ফলে সংসারে দেখা দিল আর্থিক অভাব। তখন ফিজেন্সবিনোদ কলিকাতা বিভাগের কলেজে বি. এস-সি-র ছাত্র। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে বাবুঘাট উচ্চ বিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা ও কুমিল্লা কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে তিনি আই, এস-সি পাশ করেন। ফিজেন্সবিনোদ সহ গ্রাজুয়েট-ই-ই ১৯৩৫ সালে তিনি Applied Physics-এ প্রথম শ্রেণীর তৃতীয় হিসাবে এম. এস-সি ডিগ্রী লইয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করিতে থাকেন। ইহার পর ১৯৩৭ সালে তিনি আন্তর্জাতিক কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ১৯৪৪ সালে বিজ্ঞান কলেজে আংশিক সমগ্রের জন্য লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫০ এর এপ্রিল



ডক্টর ফিজেন্সবিনোদ সিংহ রায়

মাসে (দীর্ঘ তের বছর আন্তর্জাতিক কলেজে থাকার পর) তিনি বিজ্ঞান কলেজে পাঠ্যপাঠ্য ভাবে যুক্ত হন।

যেহেতু ট্রান্সিলি ফেলোশিপ লইয়া খ্রীস্টাব্দে ১৯৫২ সনে টেজিটন জাতীয় গবেষণাগারের ফিজিক্স বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫৩র জানুয়ারী হইতে তিনি লণ্ডন ইন্সটিটিউট কলেজে গবেষণা কার্যে লিপ্ত হন এবং A study of the Mechanism of Nuclear Boiling নামক প্রবন্ধ লিখিয়া ফিজিক্স বিভাগের Ph. D. লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ফ্যাকালটি অব ইনজিনিয়ারিং এর D. I. C. হন। Specialized in Heat Transfer তাঁহার গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল। এই সময়ে তাঁর গবেষণা ফিজিক্যাল সোসাইটি ও লণ্ডন ইন: অব ফিজিক্স এর সমস্ত করা হয়। টেজিটন ও লণ্ডনে তিনি অধ্যাপক ই গ্রিকিংস এক, আর, এস এক অধ্যাপক ডি. এম. নিউইট এক, আর, এস, র অধীনে কার্য করেন। বিলাতে থাকার সময় ছুটিতে তিনি পশ্চিম জার্মানীর কয়লা, ইস্পাত ও অক্সিজেন শিল্পাঞ্চলসমূহ, ব্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি যুদ্ধোত্তর দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জার্মান ও ব্রিটিশ Physical Society'র যুগ্ম সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ডাঃ সিংহরায় যোগদান করেন। আমস্টারডাম Van-Der-Wal ও ইংল্যান্ডের Cavendish Laboratory পরিদর্শন ও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সালের মে মাসে ভারতে ফেরার পর বৎসর এপ্রিলে তিনি বিজ্ঞান কলেজের রীডার নিযুক্ত হন। মধ্যে বাবুঘাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স এর এসো: প্রফেসর নিযুক্ত হন কিন্তু ডাঃ সিংহরায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধ্যাপনা জীবনের প্রথমে পরলোকগত ডাঃ জামাশ্রমের অকৃত্য দরদ ও বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের পর অধ্যাপক পি, এন, যোহ এবং অধ্যাপক পি, সি, হুজার স্বাধীন সহযোগিতা ফিজেন্সবিনোদবাহু কৃতজ্ঞচিত্তে মরণ করেন।

হাজরাবাহু তিনি বিভাগের কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইউনিয়নের সম্পাদক, বিজ্ঞান পরিষদের (কি: কলেজ) প্রথম সম্পাদক, ভারতীয় ফিজিক্যাল সোসাইটির বর্তমান কর্তৃপক্ষ। সিনেটের সমস্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি জড়িত ছিলেন বা আছেন।

১৯৪১ সাল হইতে এই পর্যন্ত তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং ভারতীয়, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত বই হিসাবে সেগুলি চলিতেছে। ১৯৪১ সালে তিনি ক্রিয়াদপ্তের জীৱতাপক্ষে চৌধুরীর তনয়া জীৱতী কবিতা সেবীকে বিবাহ করেন। ছবি তোলা তাঁহার 'হবি'। ছাত্রজীবনে 'লীপ অব মেশন' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পুণ্ডার পান। যুরোপে থাকার সময় তিনি মহাকাবি গ্যোটে ও সেলসিয়াসের গৃহে প্রায়ই বাইতেন।

শেষে তিনি বলেন যে, বিজ্ঞান কলেজে এখন কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক রহিয়াছেন—যাদের সহায়তায় রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বক্তাবিত্ত্ব: নদানিগ্রহণ, স্বাভাবিক পরিকল্পনা প্রভৃতি সমাজহিতকর কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে পারেন। কারণ এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকগণ বায়ু ও বায়ুজৈবিক কলগুলির সমাধান আশ্রয়ল আর তাঁহার বরাবর রাজনৈতিক কলগুলির বাহিরে থাকিয়া নিজেদের পূর্ণতা কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন।



ত্রয়ী

—রামকিঙ্কর সিংহ

॥ আলোকচিত্র ॥

শ্রীকেশী

—তপতী আচার্য

অবগুপ্তিতা

—মহির বন্দ্যোপাধ্যায়





হিমালয়

—ঐপথিক যুথোপাধ্যায়

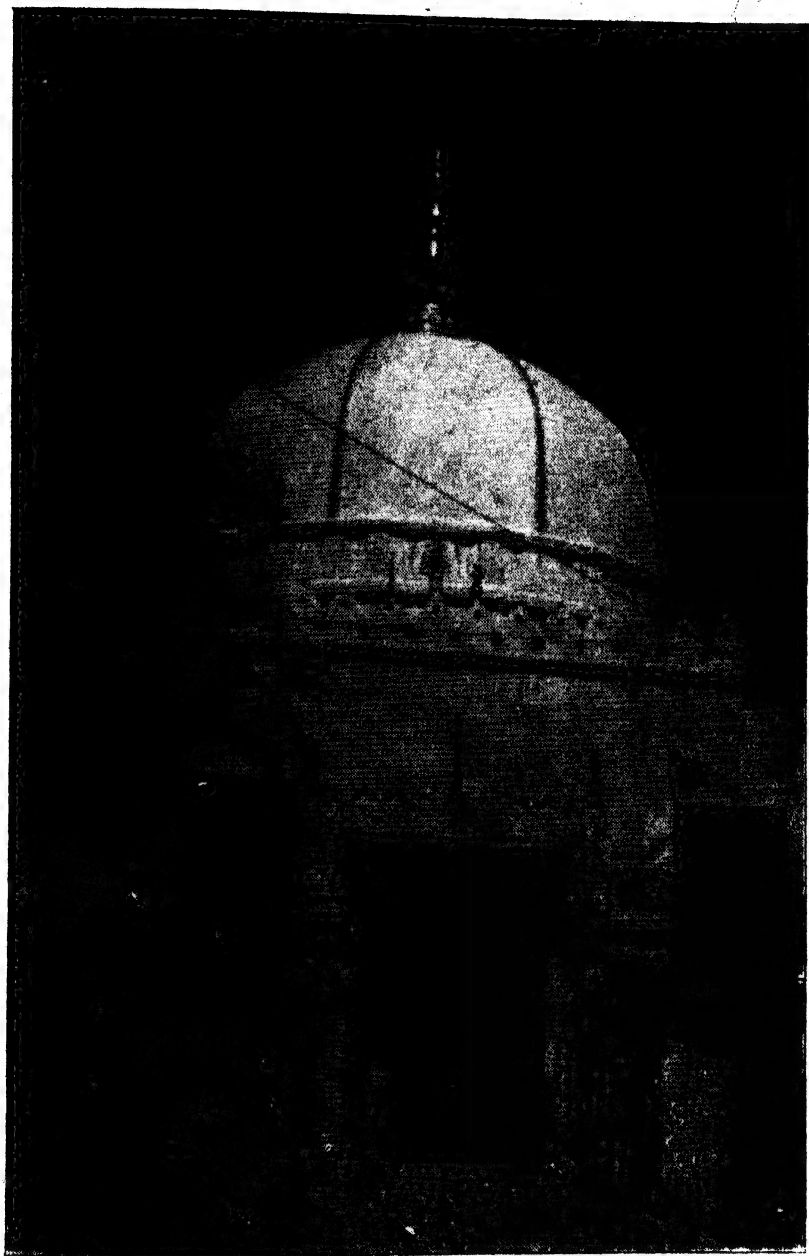
খেয়ালী শিশু

—ডাঃ আব্দুলক্বার খোদা



—মন্ট গৌর





আজমীর শরিফ

—সাধনা সোম



ভূমিমালা

চলো শ্রীধরের ওখানে যাই এবার। নিমাই বললে পড়ুয়াদের। যদি সেখানে জিততে পারি তবেই আমার জয়কার।

শ্রীধর বাজারে কলার খোলা বেচে, বেচে খোর মোচা। সামান্য আয়ের মানুষ, তা থেকে যদি বা কিছু উদ্ধৃত থাকে কৃষ্ণসেবায় ব্যয় করে। যদি উদ্ধৃত না থাকে তাতেও ছুঁখ নেই, মুখের নাম কে হরণ করবে? দিবানিশি উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ বলে। এত জোরে চৈচায় পাশের বাড়ির লোক ঘুমুতে পারে না।

‘এই উপহাসের মানে কী?’ নিমাই প্রায় তেড়ে আসে।

নিমাইকে ভীষণ ভয় করে শ্রীধর। বলে, ‘বেশ এবার থেকে আস্তে আস্তে নাম করব।’

‘কী দরকার এত হাঁক ডাক? এতকাল তো হরি-হরি করলে কিন্তু হল কী?’ নিমাই রুখে থাকে তেমনি। ‘অল্পবস্ত্রের অভাব ঘুচল?’

‘কই আমার অভাব কই? আমি তো উপাস করে থাকিনা, আর ছোট হোক বড় হোক কাপড়ও তো পরি। রাজা রত্নঘরে থাকুক কিন্তু পাখিও তো আছে রক্ষাশে। রত্ন নেই বলে পাখির ছুঁখ নেই। তেমনি তো তার আকাশ আছে।’

‘তোমার যখন এত সুখ তখন বিনাদামে জিনিস দাও।’ শ্রীধরের সওদাপাতিতে হাত দিল নিমাই।

মুঠো চেপে ধরে বাধা দিল শ্রীধর। বললে, ‘জিনিস নেবে তো দাম দিয়ে নেবে, কেড়ে নেবে কেন?’

‘তোমার তো অনেক আছে। তবে দেবে না কেন?’

‘আমি পরীষ, আমার আবার কি থাকবে?’

‘তুমি আসলে কৃপণ, দান করতে চাও না।’ নিমাই গাখ পাকাল।

‘যাই হুই, পণ্যের দাম ছাড়তে পারব না। তুমি র অশ্রু দোকানির কাছে যাও।’

‘তুমি বললেই হবে? আমার জোগানদার তুমি, আমাকে তোমার কাছ থেকেই নিতে হবে।’ নিবিচল ড়িয়ে রইল নিমাই।

‘ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি। আমার সঙ্গে দণ্ড করো না।’ করজোড়ে মিনতি করল শ্রীধর।

‘না, দণ্ড কিসের? নিজের জিনিস নিজে নেব গতে কার কী মাথাব্যথা? একথাবলা তরকারি তুলে বল নিমাই।’

‘তোমার পায়ে পড়ি। পরীক্ষা তুমি কতি করো

অশ্রু দোকান
শ্রীধর
অশ্রু দোকান

না। অশ্রু দোকানে গিয়ে দৌরাশ্রু করো।’ হাতের থেকে প্রায় আঙ্গেক জিনিস কেড়ে নিল শ্রীধর।

নিমাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, ‘তুমি আমার হাতের জিনিস কেড়ে নিছ?’

‘সবটা নিতে পারলাম কই? ওগো, বাকিটাও ফিরিয়ে দাও।’

নিমাই তবু নরম হল না, বললে, ‘এই দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেওয়াটা কি ভালো হল?’

‘বা, আমি তোমাকে দিলাম কখন? তুমিই তো জোর করে তুলে নিয়েছ।’

‘জানো আমি কে?’

‘তা কে না জানে? তুমি টোলের পণ্ডিত, ঠাকুরের অবতার।’

‘আজ্ঞে না। তুমি গঙ্গাকে চেন তো? যে গঙ্গার প্রতিদিন নৈবেদ্য দাও? কি, চেন?’

‘বা, পারকর্ত্রী ভগভাগ্যবতী গঙ্গাকে চিনি না? সর্বজ্ঞমহরা সর্বদুঃখ প্রশমনী। শুকস্রোতা, ভেজোজ্জলা, মধুরঙ্গবা। হরিকৃষ্ণা পরমার্থী-পূরাতনী।’

‘বা চিনি বৈকি।’

‘সেই গঙ্গার বাপ আমি।’

‘ছি-ছি-ছি।’ হু হাত দিয়ে কান ঢাকল শ্রীধর। বিষ্ণু-বিষ্ণু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। ‘বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ধীর হয়, ভদ্র হয়, তুমি একেবারে বিপরীত। যতই তোমার বয়স বাড়ছে ততই তুমি হুবিনীত হচ্ছে। তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নেই?’

‘আমার কাউকেই ভয় নেই। তুমি যদি তোমার দেবতাকে, গঙ্গাকে, বিনাদামে রোজ নৈবেদ্য দিতে পারো, আমাকে বিনাদামে না হোক কিছু কম দামেও

তো দিতে পারো। মেয়ে অমনি অমনি পাবে তার বাপ দাম কিছু ধরে দিলেও পাবেনা খানিকটা ?’

‘বেশ, তোমাকেও অমনি দেব। দাম কমাতে পারবনা।’ হাত ছেড়ে দিল শ্রীধর।

‘দেবে ?’ উজ্জল চোখে হাসতে লাগল নিমাই। ‘যা বিনিদামে পাওয়া যায় তার মূল্যই অসীম। হোক সে সামান্য, দেওয়ার গুণেই অপরূপ। কিন্তু দেবে কী শুনি ?’

‘রোজ একটুকরো খোর আর খোলার পাত্র দেব তোমাকে আজীবন।’

‘দেবে ?’

‘দেব। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আর দ্বন্দ্ব কোরো না।’

‘না, দ্বন্দ্ব কোথায় ? তোমার খোলায় আমি খাব। তোমার খোর মোচাই শ্রীব্যঞ্জন হয়ে উঠবে।’

প্রভু, আমি মৃত, অকুর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করছে : স্বপ্নভূল্য দেহ পুত্র গৃহ দারা অর্থ ও স্বজনকে সত্য ভেবে ধুরে মরছি। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে অনিত্যে ও অনায়ে বিপরীত বুদ্ধি করছি, দ্বন্দ্ব ক্রোড়া করছি সর্বক্ষণ। যা আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই আত্মাকেই জানছি না। তৃণাচ্ছন্ন শ্লিষ্ট জল ছেড়ে মৃগতৃষ্ণার দিকে ছুটছি। তোমাকে ত্যাগ করে ছুটছি দেহাভিমুখে। আমি বিষয়-বাসনায় বিভ্রান্ত, কামে ও কমে দ্বুভিত, উদ্ভাদী। মনকে সংযত করতে অসমর্থ। প্রভু, মানুষের সংসারের সমাপ্তি যখন কাছে আসে তখনই সাধুসেবায় তোমার প্রাপ্তি তার মমতা হয়। কিন্তু তোমার রূপা না হলে কে বা করে সাধুসেবা, কার সাধ্য তোমাতে মতি আনে। তুমিই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারণ-আকর। তুমিই পরিপূর্ণ। তুমিই সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিষ্ঠাতা। তোমারই পদপরবশ হলাম, আমাকে পরিত্যাগ করো।

১৫

‘মা, আমি কিছু দিন প্রবাস করে আসি।’

শচী চমকে উঠল। ‘কোথায় ?’

‘পদ্মায়ণ। পূর্ববঙ্গে।’

শচী চাইল নিবৃত্ত করতে কিন্তু নিমাই টলল না।

লক্ষ্মীকে বললে, মাকে দেখো। মাকে বললে, দেখো লক্ষ্মীকে :

অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত এসেছে, দলে দলে লোক আসছে দিক-দিকস্থর থেকে। পড়ুয়ারা

বললে, ভেবেছিলাম নবদ্বীপ যাব, মূর্তিমন্ত বৃহস্পতি দ্বারে এসে দাঁড়াল। তোমার টিঙ্কনী মিলিয়ে ব্যাকরণ অভ্যাস করি আমরা, এবার সাক্ষাৎ শিষ্য করো আমাদের। তোমার মুখের অমৃতবচন শুনি।

অমৃতবচনই শোনাতে এসেছি তোমাদের কাছে। প্রথমে নবদ্বীপে না হয়ে এই পদ্মাপুত্র পূর্বাঞ্চলে। সে বচন পাখিব বিছা নয়, অমর্ত বিছা।

সে বিছার নাম কি ?

সে বিছার নাম হরিনাম। পরিণামে হরিনাম।

এ কী আশ্চর্য কথা !

যে নিমাই উদ্ধতের শিরোমণি, চক্কলের জয়োত্তম, দিবানিশি যে পুঁথি-পাতি নিয়ে বিতোর, বৈষ্ণবে যার প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা, সে কি না এখন হরিনাম বলছে। শুধু বলছে না ফুটকণ্ঠে কীর্তন লাগিয়েছে। শুধু পথে-পথে নয়, নদীতে, নোকোয়, ওপারে-ওপারে। সজ্জন-ভজ্জন আচারী-বিতারী অক্ষম-অধম, পতিত-পীড়িত—সবাইকে এক নোকোর সোয়ারী করে এক বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে। এক আনন্দের বন্দরে।

নিমাইয়ের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে দাঁড়াল এক ব্রাহ্মণ। শুচিভাষার মূর্তি।

‘কে ?’

‘আমি তপন মিশ্র।’

‘কী চাই ?’ দৃষ্টি আয়ত করল নিমাই।

‘সাধ্য-সাধন বুদ্ধিতে চাই। বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিন্তের বিভ্রম ঘটেছে।’ দুই হাত মুক্ত করল তপন। তাই আপনার কাছে এসেছি।’

‘আমি সাধ্য-সাধনের কী জানি ?’

‘প্রভু, আপনি জানেন না তো আর কে জানে ? কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি, এক ব্রাহ্মণ এসে আমাকে বলছে, তপন, নিমাই পণ্ডিত এসেছে, যদি সাধ্যসাধন জানতে চাও তো তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো। জানবে সেই নরনারায়ণ, সেই পূর্ণব্রহ্ম। তার কাছ থেকে জেনে নাও রহস্য। আর এ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা কোথাও যেন আর প্রকাশ কোরো না।’

‘শুন শুন ওহে দ্বিজ পরমসুধীর।

চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির ॥

নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।

তিহৌ কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন ॥

মনুষ্য নহেন ভিহৌ—নরনারায়ণ।

নররূপে লীলা তাঁর ভগবত-কারণ ॥

বেদপোষ্য এসকল না করিবে কারে।

কহিলে পাইবে হুংখ জন্মজন্মান্তরে ॥

যা পাবার জন্তে লোকে ভজনা করে তার নাম সাধ্য। আর সাধ্যবস্তুরে পাবার জন্তে যে অমুষ্ঠান বা আচরণ তার নাম সাধন।

তোমার সাধ্য যদি স্বর্গপ্রাপ্তি, তাহলে সাধন তোমার বেদবিহিত কর্মের উদ্বাদপন। তোমার সাধ্য যদি পরমাত্মায় মিলন, তাহলে সাধন তোমার যোগ। তোমার সাধ্য যদি ব্রহ্মসায়ুজ্য তাহলে সাধন তোমার জ্ঞান। তোমার সাধ্য যদি ভগবৎসেবা, তাহলে সাধন তোমার ভক্তি, ভক্তি-অঙ্গের অমুষ্ঠান।

এখন বলো সাধ্য-সাধনের শ্রেষ্ঠ কী? কর্মযোগ, জ্ঞান, ভক্তি—কোনটা? তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি না বললে আর কে বলবে?

‘না, এসব কথা বলবে না। জীবে ভগবৎবুদ্ধি মহা পাণ।’ নিমাই পাশ কাটাতে চাইল।

‘এসব কথা শুনিছ না। তুমি যদি গোবিন্দ না হবে, মাধব না হবে, তবে এই অখ্যাত দেশে আসবে কেন? কেন দেখা দেবে এই অবজ্ঞাতকে?’

‘তুমি কী ভাপ্যবান।’ বললে নিমাই, ‘কৃষ্ণভজনে তোমার রতি হয়েছে।’

‘কৃষ্ণভজন?’

‘হ্যাঁ, কৃষ্ণই সাধ্য, ভজনই সাধন।’

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই সাধ্য, একমাত্র কাম্যবস্তু। আর, সাধন এককথায় নামকীর্তন। মধুরমধুরমেতম্বজ্ঞান মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসংফলং তিস্বরূপম্। ভগবানের নাম সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগমলতার সংফল এবং অপ্রাকৃত চৈতন্যস্বরূপ।

শিষ্য গুরুকে বললে, আপনি সাধনের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমার পক্ষে অশক্য। যদি শরীরের দ্বারা নিষ্পাণ্ড কোনো সাধন থাকে তাই আমাকে বলুন। মনের দ্বারা নিষ্পাণ্ড কোনো কিছুই করতে পারব না, কেন না মন বড় চঞ্চল।

গুরু বললে, বেশ, তোমাকে একটি স্বর সাধনের কথা বলছি। তা আর কিছু নয়, গোবিন্দকীর্তন। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ঘুমতে যাবার আগে ঘুম থেকে চোখমলে এমন কি পতনকালেও গোবিন্দ-গোবিন্দ বলবে। নামকীর্তন চিন্তাচাক্ষ্যেরও অপেক্ষা রাখে না। চিন্তাচাক্ষ্যেও চলে নামকীর্তন।

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।

হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন ॥

ভজ কৃষ্ণ স্বর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।

কৃষ্ণ হউ সবার জীবনধন প্রাণ ॥

‘কী ভাবে ভজন হবে?’ জিগ্গেস করল তপন।

‘শুধু কেশবের নাম করবে। কলির যুগধর্মই নামকীর্তন।’ বললে নিমাই। ‘সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা আর কলিতে শুধু হরিকীর্তন।’

‘শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।’

যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ পিয়া।

কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥’

‘শুধুই নাম?’

‘হ্যাঁ, শুধুই নাম।’

‘এই সাধ্য-সাধন?’

‘হ্যাঁ, এই সাধ্যসাধন। সমস্ত তত্ত্ব এই হরিনাম-সঙ্কীর্তনে।’

‘কিন্তু মন্ত্র কী?’

‘মন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।’ নিমাই তদগত-তন্ময় হয়ে বললে, ‘কলিকল্যাণনাশক তারকত্রয় নাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ কলিতে অশেষ দোষ, তবু তার একটি মাত্র গুণ আছে। সে হচ্ছে কৃষ্ণ-কীর্তনের আরাম। একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনের ফলেই সংসারাসক্তি থেকে মুক্তি ঘটে। যাওয়া যায় পরমধামে।’

আদিপুরুষ নারায়ণের নামেই কলির সর্বদোষের নিবারণ। কলিদোষাপহারক কৃষ্ণনাম। সর্বচিন্তাহর বলে হরি, সর্বচিন্তাকর্ষক বলে কৃষ্ণ, সর্বচিন্তাভিরাম বলে রাম।

‘তন্মাম কিমিতি।’ নারদের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মাকে। সেই নামটি কী?

সেই নাম ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। ব্রহ্মা বললে, সমস্ত বেদে এর চেয়ে পরতর আর কিছু নেই।

সেই নাম কীর্তনের বিধি কী?

এর কোনো বিধি নেই। আসন নেই বাসন নেই, রীতি নেই নীতি নেই, নেইবা সংখ্যাপূরণের দায়িত্ব। গোপন-গোচর নেই। সজন বিজন নেই। শুনতে হলে লোকে শুধুক, না শুনলেও বা কী এসে পেল। সর্বত্র পূতি, সর্বত্র স্মৃতি, সর্বত্র স্মৃত্ত্ব।

প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা সন্তে জপ গিয়া করিয়া নিবন্ধ ॥

ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইব সভার।

সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর ॥

দেশ পাঁচ মিলি নিজ ছয়ারে বসিয়া।

কীর্জন করিহ সন্তে হাতে তালি দিয়া ॥

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।

তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

সমস্ত মস্তের শ্রেষ্ঠ হরিনাম। আর কিছু নয়, শুধু
নামৈকশরণ হয়ে থাকো।

‘কিন্তু মনের মধ্যে যে অনেক মল, অনেক
কুটিলতা।’ করুণ নেত্রে তাকাল মিশ্র।

‘নাম করতে করতে দেখবে মন স্থির হয়েছে, স্বচ্ছ
হয়েছে, স্বাচ্ছ হয়েছে। জানো তো, যার পিস্ত বেশি
তার মিছরিও তিক্ত লাগে। ঐ তিক্ততার ওষুধই
অম্বার মিছরি।’ নিমাই বললে, ‘মিছরি আপে তিক্ততা
কাটাতে পরে প্রতিষ্ঠিত করবে তার মিষ্টত্ব। তাই নাম
আপে চিক্তকে শুদ্ধ করবে পরে জাগবে কৃষ্ণরতির মাধুর্য।
অভ্যাস থেকে চলে আসবে অনুরাগে। আর তখনই
বুঝবে কোন্ সাধ্যের জন্তে কী সাধন। কৃষ্ণ প্রেম
পাবার জন্তেই কৃষ্ণ কীর্তন। সাধিতে সাধিতে যবে
প্রেমাকুর হবে। সাধ্য সাধন তব্ব জানিবা সে তবে।’

বারে বারে প্রণাম করতে লাগল তপন। বললে,
‘যদি অন্তরমতি করেন তো আপনার সঙ্গে যাই নবদ্বীপ।’

নিমাই উঠে দাঁড়াল। আলিঙ্গন করল তপনকে।
বললে, ‘না নবদ্বীপ নয়, তুমি কাশী চলে যাও।’

‘কাশী? আপনার সঙ্গে ছেড়ে কাশী।’ প্রেম-
পুলকিত অঙ্গে বিভোর তপন মিশ্র।

‘হ্যাঁ, আমিও শিগগির যাচ্ছি সেখানে। মায়াবাদী
সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করতে হবে। সেখানে তোমার সঙ্গে
আমি মিলব, সেখানে তুমি আমার সহচর।’

প্রভুর অতর্ক্য লীলা নির্ণয় করি কী করে? যাত্রার
উচ্চোগ করতে লাগল তপন।

কয়েক মাস পরে বহু ধন-জন নিয়ে নিমাই বাড়ি
ফিরল। কিন্তু বাড়িতে আনন্দ নেই কেন? মা এসে
দাঁড়ালে, কিন্তু মুখে হাসি কই?

‘এ কি মা, কী হয়েছে?’

অবোধে বেঁদে ফেললেন শচী দেবী। ‘ঘর লক্ষ্মী
শূন্য। লক্ষ্মী চলে গেছে বৈকুণ্ঠে।’

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নিমাই। কান্না ভরা
চোখে জিগপেস করল, ‘কী হয়েছিল?’

নিজের মনে শাস্তি নেই, স্বাস্থ্য মেই, তব নিরবধি

শাশুড়ির সেবা করে চলেছে। নাম মাত্র খায় আর
একলা ঈশ্বরবিরহে সমস্ত রাত কাঁদে। ভোর হলে
বিষাদের প্রতিমার মত সংসারসীমায় এসে দাঁড়ায়।
প্রভুর বিরহই বুঝি একদিন সাপ হয়ে দেখা দিল ঘরের
মধ্যে। লক্ষ্মীর পায়ে এসে দংশন করল। কত ওষুধ
ডাকলেন শচী, কত বিষবৈজ্ঞ, কিছুতেই কিছু হল না।
প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে নিয়ে লক্ষ্মী চোখ বুজল।

প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।

বিরহসর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥

তারপর?

তুলসীদামে সাজিয়ে তাকে আনা হল গঙ্গাতীরে।
উঠল হরিনাম কীর্তনের তূফান। ধ্বনিত হল লক্ষ্মীর
বিজয়-যাত্রার রথধ্বনি।

শচী শোকে একেবারে ভেঙে পড়লেন।

লোকালুপকরণ দুঃখ নিমাইকেও পেয়ে বসল ক্ষণকাল।
পরে আত্মস্থ হয়ে বললে, ‘মা, কার কে পতি? কার কে
পুত্র? শুধু মোহই পতি পুত্র প্রতীতির কারণ। সমস্ত
সংসার ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরের অনুবর্তী। যত সংযোগ
বিরোগ সব ঈশ্বর ইচ্ছায়। সুতরাং যা ঈশ্বর ইচ্ছায়
ঘটছে তার জন্তে দুঃখ কিসের?’

চোখ মুছলেও জল থেকে যায় শচীর চোখে।

নিমাই বললে, ‘তার কত বড় স্মৃতি বনো তো।
সে স্বামীর আপে গিয়েছে, স্ত্রীর এর চেয়ে আর বড় কী
আকাজক্ষার থাকতে পারে? স্বামীর অগ্রেতে গলা পায়
যে স্মৃতি। তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী?
মৃত্যু কোথায়? সমস্ত শোকের পরপারে আনন্দস্বরূপের
অবস্থান। তাকে দেখ’

একলে ঈশ্বর তত্ত্ব—চৈতন্য ঈশ্বর।

ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্বুত স্বভাব।

আপনা আশ্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥

অন্যনিরপেক্ষ ভগবান ভক্তভাব ধরেছেন অভাববশে
নয় স্বভাব বশে। রসিকশেখর কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার
করে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণ নিজের বিগ্রহ
বা শরীরের চেয়েও ভক্তকে প্রিয়তর বলে মানে। ভক্ত
শুধু কৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদন করে না কৃষ্ণমাধুর্য চর্চণ করে।

তুমি আমার প্রিয়তম। উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ।
তুমি যত প্রিয় আত্মযোনি ব্রহ্মা তত নয়, নয় শঙ্কর,
নয়বা সঙ্কর্যণ। অগ্রে কা কথা লক্ষ্মীও তত প্রিয় নয়।
তোমাকে বলব কি উদ্ধব, আমি নিজেকে আমার কাছে
তত প্রিয় নই।

‘কৈরবাসী।’



পূর্ণপ্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

বাইশ

চলে গেল জগা চৌধুরিগঞ্জের আলায়। অনিরুদ্ধ কালোসানো
এক আরও কত পুরানো সাঙাৎ—হী করে তাগা তাকিয়ে
থাকে। চোখে দেখেও যেন চিনতে পারছে না। এমন আচমকা এসে
পড়া—কোন মতলব নিয়ে এসেছে কে জানে? বসতে বলে না
তাকে কেউ। অনিরুদ্ধ তামাক খাচ্ছিল, হাতের কলকেটা এগিয়ে
দিল না। অর্থাৎ সেই যে জাতক্রোধ নৌকা সরানো থেকে, এত
দিনেও সেটা কিছুমাত্র নবম হয় নি।

জগাই তখন কৈকিরতের মতো ছোটো চারটে কথা খাড়া করে:
চলে যাচ্ছি তোমাদের তল্লাটে ছেড়ে। তাই ভাবলাম, কে কেমন
বাহু একবার খবরটা নিয়ে বাই।

কাঁকা কথা বলেই বোধহয় কানে নিচ্ছে না। আরও তাই বিশদ
করে বলতে হল। উদাসী মন নিয়ে এসেছে, কোনরকম বদ মতলব
নেই—ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে ওদের নিশ্চিন্ত করে। বলে,
বহারখোলা বাচ্ছি, আর আসব না। গগন দাস তো কালকের
মাছ, বাছাবনে এই সেদিন এল। যাবার আগে, বলাচ্ছিলাম কি,
আমাদের পুরানো আড্ডা জমানো থাক কয়েকটা দিন। সেই
আমাদের পুরানো সবাইকে নিয়ে।

এতক্ষণে অনিরুদ্ধর মুখ খুলল। জগার দিকে চেয়ে সত্যক
ভাবে প্রশ্ন করে, বহারখোলা কেন?

বাজার দল খুলছে ওরা। খুব ধুমধাড়ানো।

কালোসানো বলে, পাঠশালা খোলে তো ওরা বছর বছর।
এবারে বাজার বোঁক উঠল!

কলন যে ছুনো-তেছুনো এবারে। মা-লক্ষ্মী বাঁগি উপড় করে
ঢেলেছেন। মনে বজ্র হুখ। তাই বলছে, পাঠশালা শুধু ছেলেরদের
নিয়ে। বাজা হলো ছেলে-বুড়ো সবাই গিয়ে বসতে পারবে।
বিবেক পাচ্ছে না, আমার ঘরে—তাই টানাটানি। আর সাতাই
তো—গাঙে-খালে বার মাস মেছো-নৌকো বেয়ে বেড়াবার মাছ
কি আমি? গলাখান তো শুনেছ—বল তোমরা সব। লখ
হয়েছিল, ছোটো-ডিনটে বছর এই সব করা গেল। এ মূলুকে
যাচ্ছে খাড়া ছিল না, গড়ে পিটে দিয়ে গেলাম একটা।

পরসা-কড়ি আসছে—রক্তের গন্ধে হিনেজের মতো
গা-ঘর থেকে কিলবিল করে সব এসে পড়েছে। করে থাক সগোষ্ঠি
মিলে। আমি আর ওর মধ্যে নেই দালা। ইন্ডকা দিয়ে ঘেরিয়ে
পড়েছি। বাজার মাছর আমরা হলাম বসন্তের কোকিল। যে বাড়ি
মুছব সেইখানে ডাক আমাদের। নেচে গেয়ে আমোদস্ততি কয়ে
ঘুরব।

কালোসানো অবীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, বাছ কবে এখান
থেকে?

পা বাড়িয়ে বসে আছি। গেলেই হল। কিন্তু যে জন্তে এসেছি
শোন। যাবার আগে কটা দিন গলাখান মেজেশবে শান দিয়ে
নিই। গানবাঁজনা তো একলা মাছের ব্যাপার নয়। সন্ধ্যার
সময় যে যে পার চলে যেও আমার বাড়ি—আমার চালাঘরে।
পথ তো এইটুকু। আলায় মাছ উঠবার সময় হলেই আবার
চলে আসবে।

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা যাব তোমার ওখানে?

জগা ভ্রমুর করে বলে, পুরানো রাগ মনে পুবে রেখ না।
জায়-অজায় যা কিছু করেছে, সে তো গগন দাসের জন্ত।
তোমরাও যেমন চৌধুরি বাবুদের জন্ত করে থাক। লখ করে
কি করি কিছু আমরা? কাজের গম্বন্ধে করতে হয়, আমাদের
হাত ধরে করিয়ে নেয়। নিজেরদের মধ্যে কি জন্তে তবে পরম
হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে থাকি?

বুঝিয়ে বুঝিয়ে একরকম মিটমিট করে জগা ফিরে এসে। সে
যেন আপন-বালাই—বিদায় হয়ে গেলেই তল্লাটের মাছব বাঁচে।
লোক-সেখানো ভাবে মুখেও ওরা কেউ বলতে পারত, একেবারে চলে
যাবে কি জন্তে, এনা ফিরে আবার। তা কেউ বলল না—বাওয়ার
ব্যবস্থা পাছে সে বাতিল করে দেয় এই একটু অমরোদের অজুহাত
শেয়ে। চৌধুরিগঞ্জ লক্ষণক, তাদের কথা থাক—কিন্তু নতুন আলায়
গগনের দলবলই বা কী। কাজকর্ম দিখি চালু হইবে গেছে,
বলাই-পটা মেছো নৌকো নিয়ে নির্গোলে কুমিরমারি বাচ্ছে আর
জগাকে কার কোন দরকার? সেই একটা মাছব চালাঘরে একলা
পড়ে গজরায়, সে কথা মনে রাখার গরজ নেই এখন কারও।

সেইটাই বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার বাহ্য। চালাঘরের মধ্যে ভিন্ন একটা দল হয়ে ঢোল পিটির গান গেয়ে জানান দেওয়া যে আমরাও আছি অনেক জন—তোমরা সমস্ত নও। তোমাদের বড় বাইন হয়েছে বলাই, আর বড় গায়ের বোধ করি গগন দাস—ওই এক মজাদার গান হয়ে থাকে, আর গান শুনে আজকে আমাদের।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে করালী পার হয়ে একবার বরাণোতার দিকে যেতে হল। মানুষজন এসে জুটবে, পান-সুপারি তো চাই। তামাক বড়-তামাক ছোটাই ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর কিছু ছাঁচ-বাতাসা আনলেও মন্দ হয় না, আড্ডা ভাঙার পর হরির লুটের নামে আরও কিছু ছত্রোড় করা যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। জগা ফিরে আসছে বরাণোতা থেকে। খালের ঘাটে ডিঙি। ফিরেছে তবে পচা-বলাই। গাঙে গোন গেয়েছে, পিঠেন বাতাস—তাই এত সকাল সকাল ফিরল। আলায় ঢুক মালিক গগন দাসের সঙ্গে হিসাবপত্র মেটাচ্ছে। ফিরে এসে নৌকো ধোবে এখনই। ভাল হয়েছে, পচা বলাই আলা থেকে বেরোক, ধরবে তাদের। ধরে সোজাশুজি বলবে, আঁধারের আড্ডা নতুন আলায় নয়, সাঁইতলার পাড়র মধ্যে—নিজেরের চালাঘরে। গাওনা-বাজনা সেখানে আজ। চৌধুরিগঞ্জ থেকে ওরা সব আসছে—ঘরের মানুষ তোমরা থাকবে না, সেটা কোন মতে হতে পারে না।

বাঁধের ধারে কোশের একটু আড়াল হয়ে সে পাঁড়াল। আচমকা ঘেরিয়ে অবাক করে দেবে। আলায় কাজ সেবে পচা-বলাই বাঁধে এসে পড়ল। হু-হাতে দুটা কলসি ত্রুতি জনের। কলসি নিয়ে চলল কোথা এখন এই অবসার ?

খালে নেমে যাচ্ছে। জগা ডাকল, বলাই—

বলাই থমকে পাঁড়াল।

নৌকায় আবার বেরোবি নাকি ? এই তো ফিরে এলি।

মুখ কাচুমাচু করে বলাই বলে, আলায় মিঠে জল ফুরিয়ে গেছে। একেবারে ফুরিয়েছে। বাস্তিরে খাবার মতোও নেই। না এনে দিলে নয়। ঘুরে আসি বরাণোতার পার থেকে। কতক্ষণ আর লাগবে।

আবার বলে, কুমিরমারি থেকে খালি ডিঙি বেয়ে নিয়ে এসাম। সকালে যদি বলে দিড, টিউকলের জল ধরে আনতাম ওখান থেকে। যত কলসি খুশি। এই ভোগ ভুগতে হ'ত না।

জগা বলে, চার চারটে কলসি নিয়ে চললি—এত জল কে খাবে ? সন্নিপাতের তেঁঠা কার পেল রে ?

পচা বলে, খাবে, রান্নাবান্না করবে—

চানও করবে নাকি ? বাদ্যবনে এত নবাবি কার—চারি ঠাক্কনের ?

বলাই বলে, কলসি-মাণা জল—চান করে আর কেমন করে ? চান-চান সেবে এঁরে কলসির জলে গামছা ভিজিয়ে তার পরে গা-ভাঙ-শা মুছে নেব, গায়ে ঢালে এক খটি দু-খটি। নয় তো নোনা জলে গু-গা চটট করে।

জগা কিন্তু হয়ে বলে, মরেছিল তোরা হতভাগা। একেবারে সোজায়ে গেছিল—

বলাই বলে, আজ্ঞাস নেই, কি করবে ? গায়ে নাকি কি সর

উঠেছে হুনে জরে গিয়ে। আজ্ঞাস হয়ে যাবে, তখন আর মিঠে জল লাগবে না।

মরদ হয়ে মেয়েমানুষের নাওয়ার জল বয়ে বেড়াস, মুখ দেখাচ্ছিল কেমন করে তোরা ?

বলাই মুগড়ে যায়, মুখ নিচু করে। পচা কিন্তু কিছুমাত্র লজ্জা পায় না। গালি শুনে দাঁত মেলে হাসে। কী যেন মইৎ করছে, পরমানন্দে তার বশোভীর্জন শুনছে।

বলাইকে ধরে ফেলল গিয়ে জগা। কঠিন মুহুর্তে হাত চেপে ধরেছে। বলে, কলসি রাখ। মানুষজন আসছে আজ বাড়িতে। চৌধুরির আলা থেকেও আসছে। স্তোর এখন কোথাও যাওয়া হবে না। যায় পচা একলা চলে যাক।

বলাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে—খানা কিছু বা কাড়ে না। জগন্নাথ গর্জন করে বলে, ফেলে দে কলসি। ভালর তরে বলছি।

একটা কলসি কেড়ে নিয়ে বাগের বশে সত্যি সত্যি ছুঁড়ে দিল। চুবমার হয়ে গেল। পচা চেঁচিয়ে ওঠে, আচ্ছা মানুষ তো। কলসি ভেঙে দিলে, কদুর থেকে জোগাড় করে আনতে হয় জান ?

হাত ছেড়ে দিয়ে জগা বলাইকে বলে, আসবি নে ?

পচা ইতিমধ্যে ডিঙিতে উঠে পড়েছে। পিছন ফিরে বলাই একবার তার দিকে তাকাল।

জগা বলে, জবাব দে।

বলাই বলে, ফিরে এসে তার পবে যাও। একুশি ফিরব, যদি দেরি হবে না।

মরণ য—

নাগালের মধ্যে পেলে জগা গলাধাক্ক দিত হয়তো। কিন্তু বলাই শুধন নৌকায় উঠে পড়েছে।

কাউকে দরবার নেই। তারি তো কাজ ! এবাড়ি ওবাড়ি থেকে একটা দুটো হোগলার পাটি কিছা মানুষ চেয়ে এনে পেতে দেওয়া। না দিলেও ক্ষতি নেই, মাটিতে সব বসে পড়বে।

চৌধুরির আলা থেকে অনিরুদ্ধ এল তিন চার জনকে সঙ্গে নিয়ে। পাঁড়ার ভিতর জগার ঘরে ভ্রমায়ত—সাঁইতলা ও আশপাশের মাছ-মাঝরা সব এলো। রাত গভীর হলে এইখান থেকে জালের কাজ বেরাবে। ছোট চালাঘরে জায়গা দিতে পারে না। খুব চলল। এখানে বসে যা মুখে আসে বলতে পারে, যে গান খুশি গাইতে পার। শাসন-বানন নেই—উচ্ছ্বল, বেপারোয়া। আড্ডার মাঝখানে উঠে একবার জগা চুপ চুপ বাঁধের উপরে ঘুরে দেখে এলো। নতুন আলায় সাড়াশব্দ নেই, মিটমিট করে আলো জ্বলছে একটা। খালের ঘাটে ডিঙি—পচা-বলাই অতএব ফিরে এসেছে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নাম-কীর্তন নয়, ভক্ত কটিকে নিয়ে গগন দাস আজকে বোধ হয় খ্যানে বসে গেছে।

আসর ভাঙার মুখে জাঁকিয়ে হরিষ্মনি। একবার দু-বার নয়, বাববার শ্রাশনে মড়া নিয়ে বাবার সময় করিবোল দিতে দিতে বাত, এই চিংকার তারও চেয়ে ভয়ানক। তার সঙ্গে চপাচপ ঢোলের বেতালা শিটুনি। জগাই বাজাচ্ছে। ছাউনির চামড়া না ছেঁড়ে শিটুনির ঠেলায়। সমস্ত মিলিয়ে জলসের প্রান্তে একটা ভোলপাড় কাও। লোকজন বিদায় করে জগন্নাথ অনেক দিন পরে আশ্রয় ঘরে মুখে আখের বসে দুখাল।

জগা পাবের দিন অনেক বেলায় উঠল। নতুন আলায় আসর ফাল একেবারে বন্ধ গেছে—বুম থেকে জেগে উঠেও সেই আনন্দ। সকালবেলা ওদিককার গতিকটা কি দেখবার জন্য বাঁধে এসেছে। নিতান্তই প্রাণতর্জয় করে বেড়াচ্ছে, এমনি একটা ভাব। কোটালের কুলদ্বারা জোয়ার। খাল ছাপিয়ে পাবের গাছগাছালি ভূমির দিয়ে বাঁধের গায়ে জল ছলাং-ছলাং করছে।

কাত হয়ে-পড়া একটা বড় বানগাছের গুঁড়ি জলে ডুবে গেছে। চার পাঁচটা ডাল বেরিয়েছে চতুর্দিকে। ডালেরও গোড়ার দিকটায় জল। জগার নজর পড়ল সেখানে। কে মানুষটা দিবা ডাল চোমান দিয়ে বসে আছে কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে? আবার কে—নবাবান্দিনীর চানে আসা হয়েছে। আলায় ডোবার কাদা-পচা জল—সে জল ক্রীমকে লাগানো চলে না। কেন যে এসব শোখিন মানুষ বাদাবনে আসে? দালান-কোঠার বাবুবাঁকি হয়ে থাকলেই পাবে, গায়ের চামড়ায় মরচে ধরার হাতে শস্তা নেই।

চাকবালার পছন্দের জায়গা। জল ভেঙে এসে গাছের ডালে চড়ে বসেছে। হাতে ঘটি। শ্রোতের জলে ঘটি ভরে ভরে গায়ে ঢালছে। ঘটি কখনো বা ডালের কাঁকে গুঁজে রেখে গামছা ভরে ভরে গায়ে দিচ্ছে। ডালপাতার অন্তর্বালে লোকের তথাং চোখ পড়ে না—জ্বাক রেখে স্নান হয়। বলাইয়ের আনা কলসি-ভরা মিঠে জল—বাড়ি ফিরে সেই জলে গায়েব মোনা ধুয়ে ফেলবে।

জল বাড়ছে, কল-কল বেগে শ্রোত এসে ঢুকছে। কোমর পর্যন্ত জলতলে ছিল, দেখতে দেখতে বুক অবধি ডুবে গেল। স্বর্গী চাকবালার বেড়ে যাচ্ছে তন্তুই। ডাল ধরে পা দাঁপাচ্ছে। গায়ের পুকুরে যে সাঁতার কাটত। স্বর্গী শ্রোতের মধ্যে ততখানি আর সাহস হয় না, দাঁপাদাঁপি করে সাঁতারের সুখ করে নিচ্ছে গানিকটা। গুন গুন করে গানও ধরেছে বৃষ্টি।

আপন মনে ছিল মেয়ে। বাঁধের দিক দিয়ে ছায়া বাঘ সাঁপ দিয়ে পড়ল বৃষ্টি। এসে কামড়ে ধরে উল্টো এক লাফ। এক লাফে ডাঙার উপর। শুখন ঠাঠর করে দেখে—কামড়ে ধরেনি, ছই বাছ দিয়ে ধরেছে জাপটে। বাঘ তো নয়, জগা। ছি-ছি, কী লজ্জা। চান করার মধ্যে কী অবস্থায় আনল শো টেনে। টেনে এনে বাঁধের উপর ফেলল। চাক কিল দিচ্ছে নমাদম জগার বুকুর উপর, বৃষ্টি মায়ছে পাগলের মতো হয়ে। জগাও কি ছাড়বার পাত্র—সেজোরে চাকর খুঁচ বৃষ্টিয়ে ধরল যে ডালে বসে চান করছিল সেই দিকে : নয়ন তুলে দেখ একবার স্রীমতী, কী কাণ্ড হয়ে যেত এতক্ষণে।

শ্রোতের উপর ভয়াস আবার তুলে কুমীর ভেসে উঠেছে ডালের ভিতরে।

দেখ? এটা হল বানাবন। মেরমানবের সুখ করার ঘর-কমার জায়গা এটা নয়। শিকার তাক করে অনেক দূর থেকে কুমির ডুব দেয়। জলের নিচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে এসে ডেসে উঠবে ঠিক তার সেই তাক-করা জায়গায়। আমি দেখেছিলাম তাই। এতক্ষণে, নয়তো, কুমীরের মুখে কাঁধা-কাঁধা ইঙ্গুক চলে যেতে।

প্রাণ বাঁচিয়ে দিল, তবু চাকবালার কবর করে ওঠে। তা মরজাম আমি—করে যেতাম। তোমার কি? ভূমি কেন জলকে ভয়?

থাকবে? যেমিকে বাই, তুমি ঘুরঘুর করতে থাক। কানা বৃষ্টি আমি—দেখতে পাইনে?

জগা বলে, তুল হরহে আমায়। বাঁধে টেনে না এনে ধাক্কা মেয়ে জলে ফেল দিলে ঠিক হত। আপদের শান্তি হত, সাঁইতলা জুড়োত, বাদার মায়ের মনের সুখে কাজকর্মে লাগতে পারত।

গজর গজর করতে করতে যাচ্ছে জগা। নিমকচাঁরাম মেয়ে-মায়ের। কলিকাল কিনা—জল করলে মন্দ হয়, গোসাই পুজলে কুড়ি হয়। বাগে পেলো আলটপকা দায় মুতুটা কাঁধের উপর থেকে ছিড়ে নেবে, সেই মায়ের পিছন পিছন ঘোরে নাকি জগা। পচা-বলাই শুনেতে পেলো কত না হাসাহাসি করবে এই কলকের কথা নিয়ে।

আশ্চর্য বাপার, উঠানের উপর বড়লা। প্রথমটা মনে হয়েছিল গুণময়ী ভগিনী কিছু নাগানি-জাগানি করেছে, ভেড়ে এসেছে ঝগড়া কববার কল। জগা তৈরি আছে বোল আনার উপর আঁঠার আনা। অনেক দিন ধরে জমে জমে মনের আকোশ বিবের মতাক ফেনিয়ে কঠ ছাপিয়ে উঠছে। লাওরা থেকে উঁকি মেয়ে দেখে জগা শান্তির করে ডাক : এসো এসো—কী ভাগিা, নতুন যেটির খোদ মালিক গগনবাবু আজ বাড়ির উপর এসেছেন!

পরিচয় গগন কানে নেয় না। চাকবালার বাপাবও কিছু নয়। বলে, নৌকোর কাজ একেবারে ছাড়লে জগদাথ? ঘর থেকে তো নড়ে বোসো না।

জগা বলে, কাজ তো তা বলে আটকে নেই। অন্যের কাজ শিখে গেছে! কুমিরমারির গন্ধে মায়ের ঝোড়া নাড়িয়ে দিয়ে রমারম টাকা নিয়ে আসে, টাকা বাজিরে তুমি হাতবান্নে তোল। কাজকর্ম তো দিবা চলেছে।

গগন বলে, সে ঘটি চোক, তিনটে চারটে দিন তোমার ঠেকিয়ে দিতে হবে জগা। কাল সকালে নৌকা নিয়ে যাবে।

কেন, পচা-বলাই গেল কোথা? ময়ে গেছে?

বলাই আছে। পচা আর আমার শালা নগেনশশী বরাপোতার হাটুরে নৌকোর রঙো গেল গাইগর কিনতে। গোয়াল হল, গজ তো চাই এবারে। পচা হাটুরে নিয়ে আনবে গজ, কবে কবে ঠিকঠিকানা নেই।

জগা এক কথার কেটে দেয় : আমি পাবর না। অন্ত মায়ের দেখ।

গগন বলে, মায়ের একজন তো হালই হল না। কোটালের টান—জলে কুটোগাছটা ফেললে ভেড়ে ছই খণ্ড হয়ে যায়। যে সে মায়ের পাবর টান কাটিয়ে নৌকা ঠিক মতো নিয়ে যেতে?

অনুন্নর করে আবার বলে, তোমার পাওনগণ্ডা পুথিরে দেব জগা। একেবারে হাত-পা কোলে করে বসলে হবে কেন? মিথ্যা দিন না পার, দায়ে বেদায়ে দেখতে হবে তো। না দেখলে বাই, কার কাছে? ঘর, তোমার উদ্যোগেই তো এসমস্ত।

জগা হেসে ওঠে : গজ কিনতে চলে গেছে, সে গজর দুখ খেতে গেবে আমার এক হটাক?

হাসতে হাসতে বলছিল। বলতে বলতে ঘর কটল হল :

উদ্ভাসের কথা তুললে—বখন ছিল, তখন ছিল। পুরানো সেসব মনে রাখ তুমি বড়না ?

হাঁসি নে ?

না। ছাড়াছাড়ি পুরোপুরি হয়ে গেছে। আজকে কেবল দ্বারে গুড় তোমার আসতে হয়েছে।

বলে জগা কথার মধ্যেই প্রসন্ন করে, কাল গান শুনে কেমন বড়না ? দুই দল হয়ে গেল আমাদের। আমার একটা, তোমার একটা।

গগন বলে, দল দুটো হোকগে, কিন্তু আমার কোন দল নয়। আমি তোমার দলে জগা।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে গগন মনের কথা ব্যক্ত করে : তোমাদের পাড়া বলে কেন, কোনখানেই তো হাই নে। দেখেছ কোনদিন আলার বাইরে ? আমি মরে আছি জগরাখ। বেরতে পারিনি ঐ নগেন শালার জন্তে। হ্যাঁ, সম্পর্ক না থাকলেও শালা ডেকে বলতাম। বিবস খচর। দ্বিবারাত্রি চোখ ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খোঁড়া মাছ নিজে বেশি নৌড়রাপ করতে পারে না, অস্ত্রে করলে হিসে হয়। কি জানি, তোমায় তো একেবারে পরলা নখরের শত্রু ঠিক করে বসে আছে। নগনা নেই বলেই আজ তোমার কাছে আসতে পারলাম।

জগা বলে, সে জানি। শত্রু সকলের তো আমি। তোমার বোনটাও বড় কম যায় না। তাই তো ভাবি বড়না, কত কষ্টের জমানো আড্ডা—সে দিকে এখন চোখ তুলে তাকাবার উপায় নেই। এ জায়গার পোকা ধরে গেছে—থাকব না এখানে। ঠিক করে কেসেছি। তোমরা থাক পরসাকড়ি আর সংসারধর্ম নিয়ে।

গগন বলে, তা আমার দুঃখ কি জন্তে ? জামি কি আনতে গিয়েছিলাম ? জান তো সবই। আসবার ভ্রাগে মুখের কথাটা শুক্নু জিহ্বাসে করেছিল আমার ?

কিন্তু তোমায় তো তেল চুকচুক বেধাচ্ছে দ্বিবি। মুখের বচনের সঙ্গে চেহারা মিলছে না। খুব যে হুখের পাখার ভাসছে হোঁরা দেখে কিন্তু মনে হয় না বড়না।

গগন বলে, বেটা তো মার খেতে পায়ে—আরে, ধরে মারে তবে উপায়টা কি ? শুধু নগনা কেন, নগনার বোনটাও তো চোখে তুলে নাচায়। চানের আগে আচ্ছা করে তেল রগড়াতে হবে, নয়তো ছাড়ে না। খাওয়ার সময় সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও করবে। খাওয়া না হতে তামাক সেজে নিয়ে আসবে চাৰি। খেয়ে তার পরেই বিছানায় গড়ানো। শোওয়ার পরে দেখে দেখে হার ঠিকমতো ঘুমাচ্ছি কিনা। দেখে তেল না চুইয়ে বায় কোথায় বল ?

জগাও এমন ভাবছে। নগনার বোনকে সে ভাল জানে না, কিন্তু গগনের বোনকে জেনে বুঝে কেসেছে। গাই-বকনা কিনে এনে নতুন গোয়ালে ঢোকাবে। বাসাবাজারে দুর্দান্ত মাছবজলোকে মেয়েটা ইঁটমতোই জাবনা খাইয়ে শিষ্টশাস্ত করে গলায় দড়ি পরিয়ে টান জুড়ে দিয়েছে।

বেলা ছুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার হয়েছে। কথা বলতে বলতে গগন আর জগা বাঁধের উপরে এলো। ভাঁটা এখন। কলকল স্বনে উজ্জল আবার্তে জলধারা ধুব সমুদ্রে ধেয়ে চলেছে। তার-ভরা আকাশ, তারার আলো চিকচিক করছে জলে। মাটিতে নেমে-আসা মেঘের মতো ওপারের ঘন কালো বাহাবন। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে জগার মনটা পিছনের কালে ঘুরে বেড়ায়। এই বেখানটার ঘুরছে, এখানেও তো বন ছিল আগে। আস্তে আস্তে বসতির পত্তন হচ্ছে—জনালায় একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে বনরাজ্য মুঠির মধ্যে চেপে ধরছে। এখানকার লীলাখেলার ইতি। নতুন চালা বাঁধতে হবে ভাঁটি ধরে আবার কোন নতুন জায়গা খুঁজে পেতে নিয়ে। কঁাকা বাবার মধ্যে হৈ-হল্লার কিছুদিন কাটাতে সেখানে, ঘরগৃহস্থালীর বিদ-নজর বতকণ সেই স্রাবধি না গিয়ে পড়ছে। [ক্রমশঃ।]

অভ্রাণের রং

রথীন্দ্রনাথ সেন

তাইলে আবার আমি হেমন্তের ক্লাস্ত মেঘে মেঘে নিবিড় ধানের গাঙ্গে অভ্রাণের আন্দধ আচ্ছাদনে, আবার জীবন খুঁজি শব্দরাগ স্বপ্নের আবাসে, নরম রোদের রঙে মুগ্ধ চোখ শিশুরের জ্ঞানে।
তাইলে আবার আমি লাইলাকে রূপ বাউচরে—
পাইনের বনে বনে উদ্ভাস্ত হাওয়ার শরীরে,
নিভৃত হিমের স্পর্শে শিম শিম হারণ-প্রসরে,
প্রাণের আবাস খুঁজি স্বপ্নবিশ্ব আত্মার সন্ধারে।
রাজিব নির্জন মেঘে জ্বরবাদের রীশ আনন্দে—
জলে গেলে, জীবনের স্বপ্নাঙ্গি আদ্যের বন্য
খুলে দেখি।
আহিগন্ত আজ শুধু আদ্যের চন্দ্রে
ধরে ধরে আন্দর্ভ জ্ঞান আর অজ্ঞানের রং।

[সি, এক, অ্যাণ্ড লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

আমার অনেক স্বপ্ন চূর্ণ-শিচি করে দিল। স্বপ্ন খুঁট বে-দিনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—আমার মনে হোলো সেই দিন বেন ঘনিষে এসেছে,—মহাবিচারের দিন। মানবপুত্রের নব-অভ্যুপানের দিন।

ইসলামে আমার বৃদ্ধ পিতা ভাবলেন তাঁর এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ এবার বৃষ্টি সফল হতে চলেছে। অশীতিপর তাঁর বয়স, সেহ অত্যন্ত দুর্বল। আমার ভগিনীদের কাছ থেকে আমি বেদনা-করুণ চিঠি পেতাম, তারা লিখত আমার মা বর্তমান থাকতে আমাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা যেমন ছিল, পিতা সবকিছু ঠিক সেইমত রাখতে চাইলেন। মার অবর্তমানে কোনো পরিবর্তন তিনি সম্ব করতে পারতেন না। আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবের ধারণা হোলো যে এইবার প্রভুর পুনরাবির্ভাবের সময় সমাগত, তিনি এসেন বলে। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা দীর্ঘ পত্রে তিনি আমাকে জানালেন। মুক্তহৃদে লেখা একটি স্বরচিত কবিতাও পিতৃদেব এই সময়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতা ও তাঁর শেষ জীবনের পত্রগুলি অতি মহার্ঘ সম্পদ বলে আমি সবচেয়ে রক্ষা করে এসেছি। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই আমার পিতৃদেব দেহরক্ষা করেন।

মহাযুদ্ধ এখন পূর্ণভাবে ঘোষিত হোলো এবং এই যুদ্ধে আমার স্বপ্নে জড়িত হয়ে পড়ল, তখন আমার মনের অবস্থা হোলো অতি অদ্ভুত। আমার মনে জাগল নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা,—সন্দেহ আর অস্থিরতার মুহূর্তে মুহূর্তে বিপরীতমুখী চিন্তার টানাটনি। আমি অবত বৃষতে পারছিলাম এমনি শিথিল অস্থিরতা বিপজ্জনক,—অবিলম্বে যদি কঠিন মনে সত্য সিদ্ধান্ত করতে না পারি, তাহলে নিছক আবেগের বস্তার ভেঙ্গে যেতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধকে আমার অত্যন্ত সাধু ও মহান বলে মনে হয়েছিল। আমি দেখছিলাম বিলুপ্ত প্রতিবাদ না করে প্রতি দেশের তরুণ সশস্ত্রায় যুঝার পক্ষে অগ্রসর হচ্ছে,—যে উদ্দেশ্যকে জার ও সত্য বলে মনে করেছে, সেই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্তে জীবন ও জীবনের চেয়েও মহার্ঘতর সব কিছুকে বিসর্জন দিতে মুহূর্তের জন্ত বিধা করছে না।

এই মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানব সমাজের যে বিপুল নৈতিক পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল, সেই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অঙ্গুষ্ঠিত অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই বংশেরের গোড়ার নিক থেকে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মানবাত্মার বেদনার্ত অঙ্গকার,—যে বেদনার কোনো তল নেই, যে অঙ্গকারের কোনো সীমা নেই,—সেই বেদনার মণ্ডিত হচ্ছিল কবির মন, সেই অঙ্গকার গ্রাস করছিল তাঁর স্বপ্ন,—সর্বনা তিনি ভাবতেন সারা পৃথিবীর মহা সর্বনাশ বৃষ্টি দিনে দিনে ঘনিষে আসছে। শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধ বখন বাধল, পরম আশায় তিনি বুক বাঁধলেন এই ভেবে যে প্রাচীন পৃথিবীর ধ্বংসকৃত ভূপতিতির উপরে এক নবীনতর মহত্তর পৃথিবীর জন্ম হবে।

পৃথিবীর এই গভীরতম বেদনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বপ্রথম আশার একটি আশাস বেজেছিল। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের স্বত্বপক উপলব্ধি করতে তাঁর সেরি হয়নি। এই যুদ্ধ সত্যের নিষ্ফল। মানবতার নিকট। মিথ্যা ও কলহকাণ্ডের যে মহাভয়

এই যুদ্ধ উৎক্লিষ্ট করল, অমাব্যবিক নিরুৎসাহ ও পাশব বর্বরতা যে নিলজ্ঞাতকে দিকে দিকে প্রকাশ করল, তাতে কবি বেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যুদ্ধের সমস্ত আঘাত বেন তাঁর একলা অন্তরের গভীরে গিয়ে বাজল। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করলেন। বহুরের পর বহুর ধরে যুদ্ধ চলতে লাগল, যুদ্ধের প্রতি তাঁর ঘৃণাও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল।

মহাযুদ্ধের সূচনাকালে আমার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল সেই দ্বিধা আমার নৈতিক পরাজয়। উদ্ভেজনার সক্রিয় ব্যাধিতে সমস্ত পৃথিবী আক্রান্ত, রণোদ্ভাস তখন বস্তার মতো সর্বদেশের মানব সমাজকে গ্রাস করছে। এই বিপুল তরঙ্গের প্রতিহত করবার মতো শক্তি আমার ছিল না। যুদ্ধে উদ্ভাটনা আমার মনের মধ্যে মাথা উঠু করেছিল, তাতে সযত করতে আমি পারি নি। যুদ্ধের প্রত্যেকটি সবাদ আমি তখন উদগ্রীব উৎসাহ নিয়ে অনুধাবন করতাম, কেন না হিসার বীর আমার মনে তখন উদ্ভূত হয়েছে। এই বীজ বখন তাঁর ঘৃণা দানবীর্য নিয়ে অবচেতন থেকে চেতনার স্তরে এসে পৌঁছলো,—তখন আমা চমক ভাঙল। নিজেকে ঘৃণা করলাম,—নিজের মনের সঙ্গে লড়াই শুরু হোলো আমার। কেন না বখনই আমি উদ্ভেজনাবিরী শাস্ত্র মুহূর্তে চিন্তা করেছি, মনের শুভবোধ সর্বদা স্বীকার করে যে খুঁটানি যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। এ ছাড়া শীঘ্রই আমি বৃষে পারলাম যে কুলিঙ্গের সঙ্গে বাতাস দিয়ে দিয়ে যেমন সেই কুলিঙ্গ লেলিহান অগ্নিশিখার পরিণত করা হয়, তেমনি শত্রুর প্রাণ ঘৃণাকে লেলিহান ধ্বংসশিখার পরিণত করা হচ্ছে মিথ্যার খটকা সাহায্যে। সেই মিথ্যাকে চিনতে পেরে সাবধান হলাম আমি।

ক্রমে আমার আঙ্গুর চোখের মিথ্যা দৃষ্টি খসে পড়ল। মনের যে কাটল। শাস্ত্র অথচ আশংকাতর মন নিয়ে আমি আমার ধর্মগ্রন্থ আশ্রয় গ্রহণ করলাম,—আরো সততনে ও আরো নিষ্ঠিতভাবে পড়ু লাগলাম প্রভুর বাণী। প্রভু খুঁট আমাকে শপথ দেখালেন, আঁ বুলায় যে ধর্ম ও যুদ্ধ এই দুই-এর মাঝে কোনো সন্ধি নেই। ঈশ ও বন্ধ—এই দুই প্রভুর উপাসনা একসঙ্গে করা যায় না। বীণা সুস্পষ্ট ভাবার ঘোষণা করেছেন—

“তোমার শত্রুকে তুমি প্রেম করো; বারো তোমাকে অবর করে তাদের তুমি মরণ করো, বারো তোমার প্রতি ঘৃণাযুক্ত ব্যবহ করে, তাদের জন্তে তুমি প্রার্থনা করো। তবেই তুমি তোমা পরমপিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে।”

যুদ্ধের এই ঘোষণার কোনো দ্ব্যর্থ নেই, কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। আমি বুলায়, সন্তান সমস্তা আমার সমুখে। ঈশ্বরের মহিমা নুতন করে উপলব্ধি করতে হবে আমাকে। ক’কে আমি পূজা করব কে আমার ঈশ্বর? ওভ টেট্রামেটের গোষ্ঠীদেবতা যিনি তিনিই আমার ঈশ্বর? নিউ টেট্রামেটের অন্তরদেবতা যিনি, বীর মহিমা খুঁট বিশ্বমানবের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনিই কি আম ঈশ্বর? আমি দেখলাম, রণোদ্ভাটনাকে মনের মধ্যে বাসা দিয়ে আ আমার পরম প্রভু যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসহতা হয়েছি। কিন্তু এ আমাকে রক্ষা করেছেন, তিনি তাঁর নিত্যবাণীর সমার্কনীবাতে আম স্নিগ্ধ মানসকে পরিচ্ছন্ন করেছেন, আমার আমাকে কিরিরে এনে

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে আমি নিবিড়তম সাহায্য পাই করেছিলাম। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রেম দিনে দিনে তীব্র থেকে গভীরতর হয়েছিল। তিনি তাঁর শান্ত বুদ্ধি দিয়ে আমার সংশয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা আমি অকণ্টে নিবেদন করতে পেরেছিলাম তাঁর কাছে। অশুষ্ঠান হলেও রবীন্দ্রনাথ 'সার্নন অন দি মাউন্ট' পাঠ করেছিলেন ও ই উপদেশাবলীর গভীর তাৎপর্য হৃদয়কম করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন,—'তোমরা খৃষ্টান হয়ে একী করছ? স্পষ্টতম নৈতিক নির্দেশ রয়েছে তোমাদের ধর্মে,—সেই নির্দেশ তোমরা পালন রেখা কেন?'

অপর এক তৃতীয় স্তর থেকেও আমি সাক্ষ্য লাভ করি। ই স্তর গান্ধীজির জীবনবোধ। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মহাত্মা গান্ধীর গৃহচর্চা আমি দেখেছিলাম 'সার্নন অন দি মাউন্ট'-এর উপদেশাবলীর সহিত অর্থ কর্মের মাধ্যমে কী ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের তিনি লক্ষ্য দিয়েছেন,—তাঁর উদাহরণ আমার চিত্তপটে বিষ্ময়কর। সত্যই তাঁর শক্তি, তাঁর 'সত্যগ্রহ' খৃষ্টোপম চরিত্রপ্রদ। এই যুদ্ধ সত্যগ্রহের বিপরীত,—খৃষ্টকে যে অহুসরণ করে যুদ্ধ তাঁর অমিত্র।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও আমার ধর্মগ্রন্থ—এই তিন প্রভাব একটি অচ্যুত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাকে পৌঁছে দিল। সংশয়ছায়াহীন সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে সত্যের আলোকে আমি দেখলাম যে, এই যুদ্ধ খৃষ্ট-নির্দেশের পরিপন্থী। আমি স্টুনিশ্চয় ছিলাম যে, এই যুদ্ধ আমার নয়। যুদ্ধের কাজে বোংগালানের জন্ত যখন নির্দেশ এল, তখন আমি নির্ভীকচিত্তে অস্বীকার করলাম। এই অস্বীকারের অর্থ কাগবরণ। তার জন্তেও আমি সোৎসাহে প্রস্তুত ছিলাম। যদিও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-পরিপন্থী বলে আমাকে শাস্তিভোগ করতে হইল, তবুও দশগ্রন্থ মহাযুদ্ধ কালে মুহুর্তের জন্তেও আর কখনো আমার মনে দ্বিধালাভ আসেনি। বিশ্বাসই মুক্তি। এই বিশ্বাস আমাকে মহামুক্তি দিল। এই বিশ্বাসের জন্তেও ভবিষ্যতে কখনো অহুতাপ করিনি।

এই মহাযুদ্ধ আমার জীবনে এক মহা পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্যে অবর্ণনীয় মানসিক বজ্রপাত আমার চিত্ত বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু এই বজ্রপাতের মধ্যে আমার প্রত্ন খৃষ্টের প্রসঙ্গ আমি লাভ করেছি—নব নব স্বপ্ন অগোচর রূপে তিনি আমার মনশ্চকুর সমুখে আপনাকে প্রতিভাত করেছেন। ঠুটি প্রতিজ্ঞা আমি করতে পেরেছিলাম,—প্রথম প্রতিজ্ঞা যে খৃষ্টান-গোষ্ঠীর মত গভীর মধ্যে আর কখনো থাকব না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধকে সমর্থন করব না। এই উভয় প্রতিজ্ঞাই আমার জীবনে সার্থক হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা ধারণের পর আমার জীবনে বীণের নৃত্তিকে আমি গভীরতর ভাবে লাভ করেছি, তাঁর প্রসঙ্গের মূর্তি উদ্ঘাটিত হয়েছে আমার দৃষ্টির সমুখে।

এই সময়ে স্বপ্নীল কব্জের পুত্র সুধীর আমার কাছে এসেছিল। কিছুদিন আমার কাছে থাকার পর জ্যাযুলেঙ্গের কাজ নিয়ে সে ফালে যায়। সুধীর আমাকে বলেছিল, 'সাক্ষ্য এখানে এই শান্তিনিকেতনে আপনি আছেন কী করে? এখানে তো 'হোলি কমিউনিয়ন' নেই?'

আমি বলেছিলাম,—এই সব শিশুর দল, বাকের আমি শিক্ষা দিচ্ছি, একই আমার 'হোলি কমিউনিয়ন'। আমি বলেছিলাম, ঈশ্বরের নীচে শরণাগত তুল্যতরক এক পাত্র জলানাই একুত হোলি কমিউনিয়ন, তাই নয়?

আমার এই কথা সুধীর চিরদিন মনে রেখেছিল। ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে যখন তার পিতার শেষ রোগশয্যা পাশে, আমিও তখন তার সঙ্গে ছিলাম। সুধীর তখন আমাকে বলেছিল, 'শান্তিনিকেতনের সেই সকালটিতে যে কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন সে কথা ফ্রান্সে থাকতে আমাকে বাবে বাবে সাহায্য করেছে। ফ্রান্সে বিভিন্ন হাসপাতালে দৈনিকদের যখন আমি শুশ্রূষা করতাম, তখন বুকেছিলাম আপনার কথা কতো সত্য। এই সব রোগীদের দিকে তাকিয়ে আমিও বলতাম, এই আমার হোলি কমিউনিয়ন।' খুঁট বলেছিলেন, 'আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করেছিলে।' খুঁটবাণীর নিগূঢ় তাৎপর্য আপনার কথাতো আমি উপলব্ধি করেছি।

খৃষ্টের এই পরম বাণী আমার দৈনন্দিন জীবনে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য করেছে, প্রেরণা দিয়েছে, শাস্তি দিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে। কেন না, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আবদ্ধ শুধু মাত্র একটি নৈতিক মহা আদর্শ বলে আমি খৃষ্টকে দেখি। তাঁকে আমি জীবন্ত মানুষ বলে উপলব্ধি করেছি, বীর পরমাত্মার সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমি সর্বদা অনুভব করেছি। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যে নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁর প্রত্যক্ষ বাণীর প্রসঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমি সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। প্রভুর সেই বাণীর মধ্যে তাঁর অন্তরের গভীরতর বেদনা ও পরমতম আশ্বাসকে আমি অনুভব করেছিলাম। আমি যেন স্বকর্ণে শুনেছিলাম যে ধ্বংসের উত্তম শোভাবাহার বোংগালানের বিরুদ্ধে তিনি আমাকে সাবধান করে বলেছেন, আমার পশ্চাতে যে আগতে চায় সে যেন আপন সত্যকে পাহার করে আপন স্বক্ষে ক্রসকে গ্রহণ করে একান্ত ভাবে শুধু আমা-কই অহুসরণ করে।

এমনি সময়ে একটি নূতন চিন্তা আমার মনকে অধিকার করতে লাগল। যুদ্ধের আগ আমি আফ্রিকার গিয়ে আফ্রিকাবাসীদের প্রতি বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছিলাম,—সেখানকার ভারতীয় চুক্তিদাসদেরও আমি দেখেছিলাম। তখন এই বলিষ্ঠ প্রত্যয় আমার চিত্তে সম্পূর্ণ হয়েছিল যে মানুষের এই অবমাননার বেদনা মানবপুত্র বীণাই অন্তর বেদনা। এবার এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ দেখে আমি হিরিশ্চর হলাম যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও শোষণনীতি পাশ এই যুদ্ধের মূল কারণ, এবং পৃথিবীর অজুয়ত জাতিরাই এই পাশের প্রধান বলি। যারা অজুয়ত, যারা দুর্বল, খুঁট তাদেরই দলে। ভাগ্য বাদের কল্পণ, তাদেরই দিকে তাঁর অনন্ত করুণা ধাবিত, তাদেরই তিনি আহ্বান করে বলেছেন,—'এসো তোমরা,—যারা শান্ত বাগী গুরুভার—আমার কাছে তোমরা এস,—আমি তোমাদের নব বিজ্ঞান।'

আমার মনের এই সব প্রবল চিন্তা আমি কবির কাছে ব্যক্ত করলাম। আমার ভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল দেখে আমার বড়ো আনন্দ হোলো। বর্ণ-বিরোধ বা জাতীয় অধমিকার সাম্রাজ্যত্ব কালিমা তাঁর মনকে কখনো স্পর্শ করেনি। অপরদিকে আবার

বৈজ্ঞানিক প্রগতির জন্ত পাশ্চাত্য জগতের প্রতি তাঁর গভীর অজ্ঞান ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের প্রতি অভিযোগও তাঁর মনে ছিল প্রবল। যে স্বাধীনতাগর্ব ও বাণিজ্যিক লালসার বলে পাশ্চাত্য জগত সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে চলেছে, তাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—‘অনেক কিছু গ্রাস করেছে ওরা, এবার এসেছে মৃত্যুর বিধিগ্রাস।’

আমি কবিকে বলেছিলাম যে আমার মনে হয় হয়তো এ মহাযুদ্ধ মানুষের বহু মালিন্য মোচনের মুক্তিস্থান। আমার এ কথার কবির মুখে যে বেদনার প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—

‘তোমার কথা সত্য হোক চাণি, এতে তোমাদেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। কিন্তু এই পাণের মূলে রয়েছে লোভ। মনের গভীর কন্মর থেকে এই লোভের শিকড়কে যদি নিমূল করা না যায়, তাহলে এই মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হবে অর্থনৈতিক ক্ষতিকে পূর্ণ করবার, দরিদ্র জঘন্যতাকে শোষণ করবার। এই লোভ আর এই শোষণ—হাই হোলো আসল ব্যাধি, এই কালব্যাধি যদি না সারে, তাহলে ব্যাধির বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা করে লাভ কি?’

‘এসো তোমরা, ধারা শ্রান্ত ধারা গুরুভার, আমার কাছে তোমরা এসো’—থুটের এই কথাগুলি এ সময় নিরন্তর আমার মনে প্রতিধ্বনিত হতো। তারপর ধীরে ধীরে আমার মনে এক পরম চৈতন্যে জ্বলপ্রদীপিত হয়ে উঠল, আমার অন্তর আমার প্রভুর কাছ থেকে এক পরম নির্দেশ লাভ করল। তিনি আমাকে আহ্বান করলেন এক যুদ্ধে, ইউরোপের বিভিন্ন রণক্ষেত্র জুড়ে যে মহাযুদ্ধ চলেছে, তার ঘেরে মহন্তর যুদ্ধের সম্মুখীন হতে তিনি আমাকে ডাক দিলেন। এ যুদ্ধ থুটের নিজের যুদ্ধ, সমস্ত পৃথিবীর পদানত নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে অভ্যাচারের বিরুদ্ধে হিংসার বিরুদ্ধে ঘৃণার বিরুদ্ধে তাঁর নিত্যকালের যুদ্ধে তিনি আমাকে তাঁর সৈনিক করে নিলেন। সৈনিক আমি হব না, সামরিক কাজ আমি কিছুতে গ্রহণ করব না, তাতে যে বিশদই আশ্রয় এই ছিল এতদিন আমার দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু এই সংকল্প ছিল নতুর্ধক। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্তব্যের আহ্বানে প্রভুর নির্দেশে আমি সৈনিক হতে পারলাম এবার, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিরাটতম ধর্মযুদ্ধে আত্মনিবেদনের নিঃসন্দেহ আশ্বাস আমার মনে জাগল।

এই আশ্বাসের কথা আজ এখানে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ। সেদিন কিন্তু এই আশ্বাসকে একনিষ্ঠ আস্থার সঙ্গে আঁকড়ে রাখা মোটেও সহজ ছিল না। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে মহাযুদ্ধ চলেছে, পূর্বে ও পশ্চিমে প্রতিদিনের জয় পরাজয়ের সবাদে উত্তেজনার তরঙ্গে মন সর্বদা আলোড়িত। এই নিত্য আলোড়নের হাত থেকে পরিদ্রাঘস্বরূপ কোনো প্রত্যক্ষ কর্তব্যের সন্ধান করা তখন সহজ ছিল না আমার পক্ষে। পৃথিবীর অজ্ঞাত বর্ণ ও জাতির প্রতি ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের ব্যবহার সম্পর্কে তখনো এ আশাও আমার মনে ছিল, যে ইংরেজ জাতি সাধারণের ব্যতিক্রম, ইংরেজ জাতির ব্যবহার মঙ্গল। এই জাতি যে আমারই জাতি, এই জাতির আদর্শ যে আমারই গৌরব। স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বত্বকে আমার শিড়ার মনে

যে অসন্ত বিবাস ছিল, সেই বিবাস আমারও রক্তে পোষিত হয়েছিল। বিশেষে এসে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ সত্ত্বেও আমার মনের গভীর অন্তস্তল থেকে সে বিবাসকে আমি মুছে ফেলতে পারিনি।

যে সময়ে দাম্ভপ্রথা রদ হয় ও বিখ্যাত রিকর্ড আইনগুলি পাশ হয়, ঠিক সেই সময়ে আমার পিতৃদেবের জন্ম হয়। স্বাধীনতার প্রতি স্পৃহা আস্থা ও সমর্থ মানবতাবোধের ঐতিহ্য তিনি লাভ করেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। স্বাধীনতা ও মানব কল্যাণের আদর্শ আমাদের ষ্ট্রট অ্যাংলিক্যান রক্তের ধারায় প্রবাহিত। এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বযুগের চিন্তাধারায় গভীর সংযোগ। বৃটিশ ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ একটি স্মরণীয় কাল। ক্রাফটন, উইলবারফোর্স, লিভিংস্টোন, হাফটস্‌বেরি, ফোরেল, নাইটিংগেল, জোসেফিন বাটলার প্রভৃতি মানবরক্ত যে দেশের সন্তান, মানবকল্যাণ ত্রুতের ইতিহাসে সে দেশের অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়।

কিন্তু ১৮৮০ সাল নাগাদ আমার স্বজাতির ধ্যানধারণার এক বিচিত্র পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আফ্রিকা ভূখণ্ডে ও অন্তর ইউরোপীয় জাতিদের সাম্রাজ্যলোলুপতার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তনের শুরু। এই সঙ্গে খৃষ্টীয় নির্দেশের পরিপন্থী বর্ণবিষেব ও জাতি-অহমিকা সারা পৃথিবীতে প্রকটতর হয়ে উঠল। ‘শ্বেতকায়’ মানুষ সপক্ষে ঘোষণা করল যে সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, তার জাতিই উচ্চতম জাতি। অল্প মানুষ অল্প জাতির সংস্পর্শ থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে লাগল। শুরু হলো মানুষের প্রতি মানুষের তিক্ত বিষেব। বিদেশে ভ্রমণ করার ফলে আমি যে-সব দৃশ্য দেখেছি আমার পিতৃদেব তা দেখেন নি, আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। এই ঘৃণা বর্ণবিষেব বিশেষ করে পৃথিবীর উচ্চ অঙ্গলে কী লজ্জাকর বীভৎস তার সঙ্গে প্রকট হয়েছে জাতিভিমানের নামে নিলজ্জ কুঠাীনতার সঙ্গে কতো সাংঘাতিক অপকর্ম অমূল্য হারেছে, আমি তা জানি। এও আমি জানি যে আমার প্রতিদিনের কর্ম ও চিন্তায় সত্য যদি থুটের দৃষ্টি না থাকত তাহলে হয়তো স্বার্থপরতা ও বিজাতির প্রতি ঘৃণায় আমি অনেক শ্বেতকায়কেই ছাড়িয়ে যেতাম। আমি জানি, এই পাণের বীজ আমার মনের মাথোঁ ছিল,—প্রভু বীট আমাকে রক্ষা করেছেন।

এই সময়কার সমস্ত অন্তর্দাহের নিবৃত্তি হলো অতর্কিতে। ১৯১৫ সালের মে মাস। আজম্যে ধীরে ছুটি হলো। হাট ও শিক্কেরা যে ঘর বাড়ি কিরল। কয়েকটা দরকারী কাগজ সংগ্রহের জন্ত কলকাতা থেকে আবার শান্তিনিকেতনে যেতে হলো আমাকে। হঠাৎ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। অবিলম্বে প্রকট হলো যে এশিয়াটিক কলেজের সাংঘাতিক কাল ব্যাধি আমাকে ধরেছে। কাছাকাছি কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক নেই। হাকে সে রাস্তার মাথোঁ জানা বার। সমস্ত রাত কাটল নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায়—তবু আমার আত্মর চৈতন্যে মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল বীভৎস বেদনাহত কল্পনাধন মূর্তি।

কলকাতা থেকে কবি দুটো এসেন শান্তিনিকেতনে। আমার

রোগের সংবাদ পেয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব তিনি করেন নি। পরদিন প্রভাতে কবির মুখ দেখে আমি যেন নবজীবন লাভ করলাম। তাঁকে যে আমি কতো ভালোবাসি তা আমি সেই মুহূর্তেই যেন সত্যক উপলব্ধি করলাম। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আমার ছিল কিন্তু এই ভালোবাসা শ্রদ্ধার চেয়ে অনেক গভীর, অনেক আন্তরিক।

কলেরা রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। কবি এবং আমার অজ্ঞাত মুহুরা বাদে নিরন্তর সেবার আমি পুনর্জীবন লাভ করেছিলাম, তাঁরা নিজেরাই যে কোনো মুহূর্তে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারতেন। আপন প্রাণের মমতা না করে তাঁরা আমার তত্ত্বাবধা করেছিলেন,—গভীর স্নেহভরে আমাকে নৃত্যমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বেশ কিছুদিন পরে আমাকে কলকাতায় এক নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হলো। তারপর হৃৎযন্ত্রাঙ্গাভের আশায় আমি গোলাম সিমলায়।

ফিজি দ্বীপ

সিমলা পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করে দিনের পর দিন উষ্ণ রৌদ্রের নিচে এক দীর্ঘ বারান্দার আমি শুয়ে থাকতাম। শরীর এতো দুর্বল যে, কিছু পড়তে পর্যন্ত সক্ষম আসত। সেই সময় চুক্তিদাসস্বয়ংক ভারতীয় শ্রমিকদের স্বয়ংক একটি সরকারী বিবরণী আমার হাতে এল। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার পরে এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু স্বয়ংক আমার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। বইটির পাঠা উলটিয়ে দেখতে লাগলাম। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় শ্রমিকদের আত্মহত্যার সংখ্যা ও বিবরণ দেখে আমি চমকে উঠলাম।

ফিজি দ্বীপ বহুদূরে,—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। সেখানেও বহু ভারতীয় শ্রমিকের বাস, বাগিচায় চুক্তিদাসস্বয়ংক তাদের জীবিকা। রিপোর্ট পড়ে দেখলাম ভারতবর্ষে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা যতো, তার বহুগুণ বেশি এই ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় বাগিচা-শ্রমিকদের মধ্যে। এর কারণ গৃহগতপ্রাণ প্রবাসীদের দুঃসহ জীবনযাত্রা।

নাটাল ও অন্তর ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পাশাপাশি ফিজির ভারতীয়দের জীবনযাত্রার বিবরণ তুলনামূলক ভাবে এই প্রক্ষেপে লিপিবদ্ধ ছিল। ফিজির বিবরণ এতোই করুণ যে, আমি তা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। নাটালের চুক্তিদাসস্বয়ংক প্রথা আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। ফিজি দ্বীপের ভারতীয় শ্রমদাসদের জীবনযাত্রা যে কতো বীভৎসতর তা আমার মানস চক্ষে স্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি বইটি বন্ধ করলাম। বেশি পড়ার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু যেটুকু পড়েছি তার চিন্তা হৃৎস্পন্দনের মতো মনে জেগে রইল।

কয়েকদিন পরের কথা। দুপুর বেলা আমি চোখ বুঁজ বারান্দার শুয়ে আছি। হঠাৎ আমার বহুদূরের সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য যেন ভেসে উঠল। নাটালের সেই দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকটিকে আমি যেন দেখলাম, যেতকার মালিকের বেরদণ্ডের আঘাতে আঘাতে হার সমস্ত শিষ্ট ক্ষতবিক্ষত। সে যেন উল্লেখ্য করণ দৃষ্টি যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের দিক তাকিয়ে মুখে আমারও বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। একটু পরেই আমার মানস চক্কর সামনে তার মুখটি বললে গেল, আমি দেখলাম মানবপালক পরমপ্রভু বীতর মুখ, যে মুখকে শিতকাল থেকে আমি চিনেছি ও একান্ত করে ভালোবেসেছি। এই মুহূর্তেই আমার মনমুগ্ধে এমনই স্থপতি হয়ে ফুটে উঠল যে আমি

আত্মহারা হয়ে গেলাম, সমস্ত প্রাণ আমি যেন ঈশ দিলাম কুণ্ঠিত আত্মনিবেদনে। ক্রমে দৃষ্টিটি মিলিয়ে গেল। আমি ভব হয়ে পড়ে বইলাম সেই নিঃশব্দ বারান্দায়। বহুক্ষণ পরে বুঝলাম আমি যা দেখেছিলাম তা জাগ্রত স্বপ্ন, মাহুতের বেদনা-বঞ্চনার গভীর আবেগের ফলে আমার মগ্ন চৈতন্য এই স্বপ্নের সৃষ্টি করেছে।

আমার বিশ্বাস, সেদিন আমার প্রভু প্রকৃতই আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রির দিয়ে প্রত্যেক উপলব্ধি করা আর অন্তর দিয়ে অনুভব করা,—দুইই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা। মুখে যতো আলোচনা বলি নো কেন, এই দুইয়ের মধ্যে অতি সংকীর্ণ সীমারেখা, অনেক সময় এই রেখা কোথায় তা বুঝেই পাওয়া যায় না।

সেই উষ্ণ দ্বিপ্তরয়ের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের মতো এই কথাটি আমার মনে উদ্ভাসিত হয়ে গেল যে ঐশ্বর্য আমাকে আহ্বান করছেন ঐ স্বপ্ন সমুদ্রপারের ফিজি দ্বীপপুঞ্জে,—তাঁর আহ্বান ব্যর্থ হবেনা আমার জীবনে। কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো বিধা নেই,—ঐশ্বর্য নির্দিষ্ট কর্তব্য আমাকে পালন করছেই হবে। ফিজি দ্বীপে যাত্রার চিন্তায় আবদ্ধ হয়ে উঠল আমার মন। কোন্ পথে যাব, যেতে কতোদিন লাগবে,—এই সব বোজ খবর আমি নিতে শুরু করলাম। আমার জীবনের এক নতুন অর্থ নতুন আশা আমি বুঝে পেলাম, সেই সঙ্গে নববাহ্যের স্পর্শ লাগল আমার দুর্বল স্নেহে। একটু স্থল হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির কাছে আমার উদ্বেগ নিবেদন করলাম। কবি সানন্দে তাঁর আশ্রমের কাজ থেকে আমাকে ছুটি দিলেন। পরমবন্ধু উইলি পিয়ার্সন আমার সহযাত্রী হলো, এতে অপরিণীত আনন্দ হলো আমার। কবির উদার হৃদয়ের প্রশংসা আশীর্বাদ নিয়ে আমার ভারতবর্ষ থেকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করলাম।

ফিজিতে পৌঁছিয়ে আমরা দেখলাম সেখানকার অবস্থা বই-এ যা পড়েছিলাম তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ। শ্রমদাসদের নিগড়বদ্ধ ভারতীয় নারীদের অবস্থা এতো দুঃসহ যে ভা বর্ণনা করা যায় না। নাটালে কুলি লাইনে যে নৈতিক অবনতির কুৎসিত চিত্র দেখেছি এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। বরং ফিজির ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে নৈতিক কলংক গাঢ়তর। এমন শ্রমচুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে হাজার হাজার দরিদ্র ভারতীয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে,—ফিজি, মরিশাস, নাটাল ও বৃটিশ গায়নার অতিবাহিত করছে বর্ণনাভীত দুঃখের জীবন। তাছাড়া ভারতবর্ষ থেকে আড়কাটির প্রতি বৎসর ঝাঁক ঝাঁক ভারতীয় শ্রমিককে দূর-দূরান্তে বেটরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দৃঢ়নিশ্চয় হলাম যে এমন শ্রমিক-শগুণকে পুরোপুরি রদ করা ছাড়া অন্য কোনো মধ্য পথ নেই।

উপনিবেশের কৃষি-মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী যে বলভাবে এ আশা করা কথা। কিন্তু ভারতবর্ষের জনমত এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই চুক্তিদাসপ্রথার অবশানকে ভারতবাসীর প্রধান রাজনৈতিক দাবী বলে ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ তাঁদের সাগর পারের হুত্বিনী ভগিনীদের বেদনাকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমার প্রত্যেক অভিজ্ঞতার বিবরণ বড়লার্ট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পেশ করা হলো। তিনি এই বিবরণীর বাধ্যবাধ্য হাঁকার করলেন, কল চুক্তিদাসপ্রথার অবশান বর্ণিয়ে এল।

ফিজি থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আমারা যে রিপোর্ট দিলাম

তার অব্যবহিত পরেই চুক্তিদাসপ্রথা রদ আইন পাশ হোলো।
কিঞ্জির বিভিন্ন বাগিচার দুর্নীতি ও অন্যচাচরের যে সব তথ্য আমরা
সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা এমনি প্রত্যাক ও স্বয়ংস্পর্শী যে, ভাইসরয়
সঙ্গ সঙ্গে ইংলণ্ডের ভারত-সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কিছুমাত্র
বিলম্ব করলেন না। চুক্তিদাসপ্রথা রদ করার আইন বাতে বড়ো
শীঘ্র সম্ভব পাশ হয় তার জন্তে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক দপ্তরের অমুরোধে এই আইনে এমন
একটি বিপত্তিকর বাক্য জুড়ে দেওয়া হোলো যাতে আমাদের অনেক
আশায় বাদ সাধল। আইনের একটি ধারায় বলা হোলো যে
এই প্রথার প্রয়োজনীয় রদবদলের জন্তে কিছু বিলম্ব ঘটবে।

চুক্তিদাসপ্রথা রদ হোলো, এই আনন্দের উজ্জ্বল আলো আমাদের
একটি ধারা সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হইনি। কিন্তু এই ধারার ফলে
সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হয়ে উঠল যে এক বৎসর যেতে না যেতে
আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে হোলো। আমরা অল্পসঙ্কান
করে জানলাম যে এই বিলম্বকর ধারার সুযোগ নিয়ে লগুনে এক
চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যাতে আরো পাঁচ বছর ধরে শ্রমিক সংগ্রহ
করা চলবে এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যে এক নতুন প্রথার প্রমুখতার
দাসপ্রথাকে এক নতুন রূপে চালু করা হবে। এই প্রথার
কলংক গর্জনবাহিত হয়েছে, এখন নতুন চাকুরীর মাধ্যমে এই
প্রথাকেই পুনর্জীবন দান করা হবে এ করুনা করাও অসম্ভব।
অন্তঃপ্রকার নতুন করে শুরু হোলো আমাদের সংগ্রাম।

ফিজি দীপে প্রথম বার্তা আমার এক অবিস্মরণীয় আনন্দ-অভিধান।
আমার ভাগ্যবিধাতা প্রভু আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিয়ে
গিয়েছিলেন, এই নির্দেশের জন্তে তাঁর প্রতি আমার অনন্ত ধন্যবাদ।
আমার সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছিলাম এই
ফিজি দীপে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন যুগে শতাব্দী ও বোজন পারের
দূর-দূরান্তে খুঁটিবিশালী, নরনারীর মত খুঁটির সেবার আদর্শে কী
স্বর্গীয় আবেগে বারো বারো অল্পপ্রানিত হয় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমি
এখানে লক্ষ্য করেছিলাম, লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছিল আমার জীবন।

সেখানে একজন মিশনারী সাধুর সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম।
তার নাম মিটার লেলীন। ফিজিবাসীদের তিনি সমস্ত মন
প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। ফিজিবাসী খুঁটানী তরুণদের এক
'হোলি কমিউনিয়ন' উৎসবে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন। এই
উৎসব খুঁটানীদের মধ্যে অনেকে কয়েক দিনের মধ্যেই সেলাম ও
নিউ হেব্রাইডেস দীপপুঞ্জের বিভিন্ন দীপে বার্তা করবেন, সেখানকার
অসত্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করবেন খুঁটির আদর্শ। খুঁটির
প্রথম শিব্যার যেমন একত্র ভোজনের অমুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে
খুঁটির প্রেরণাকে আপন আপন অন্তরে ভরে নিয়েছিলেন,
তেমনি অমুপ্রেরণাকে আমরাও বরণ করে নিলাম এই ধর্মোষ্ঠানে।
একজন ফিজিয়ান খুঁটানী একটি ধর্মগাথা রচনা করেছিলেন।
হানীহ-স্বদেশীতের সঙ্গে সেই গানটি সমাবেশে কণ্ঠে গাওয়া হোলো।
পানির প্রবাহ কলিটি নিয়ন্ত্রণ :

স্বপ্ন সমুদ্রপার থেকে

কার কণ্ঠ ভেসে ভেসে আসে ?

কে তাকে নিয়ন্ত্রণ ?

সে ডাক বাজে আমার কানে,

সে ডাক বাজে তোমার প্রাণে,—

এসো, এসো সমুদ্র পার হয়ে এসো,—

তোমার হাত মিলাও আমার হাতে।”

ফিজিবাসী খুঁটভক্তদের কণ্ঠে এই সঙ্গীতের অনির্বচনীয় কারুণ্য
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফিজিবাসী কতো খুঁটান প্রচারক
স্বদেশ ছেড়ে সমুদ্রপারের দূর দীপে গেছে, এই অভিবাসীদের মধ্যে
কতোজন প্রাণ বিসর্জন করেছে দুর্গম প্রদেশে। তাদের মৃত্যু
নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এই সঙ্গীতের মধ্যে। এই সঙ্গীতের বেদনা যে সব
হানীহ খুঁটান অধিবাসীদের কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে, তাদেরই
নিকটতম পূর্বপুরুষ ছিল অসত্য বর্বর। আজ তারা বর্বরতার বিরুদ্ধে
খুঁটির অভিযানে জীবনোৎসর্গ করতে চলেছে। তাদের কানে তাদের
প্রাণে দূর-দূরান্তের ডাক এসে পৌঁছেছে। যে ডাক মানুষের প্রতি
মানুষের ডাক,—সাহায্য করো, সেবা করো, হাতে হাত মিলাও।

ধর্মোষ্ঠান সমাপ্ত হোলো। আমি এক দোভাষীর সাহায্য নিয়ে
এই সব তরুণ ফিজিয়ান খুঁটান প্রচারকদের প্রতি আমার পরিপূর্ণ
অন্তরের প্রেম-ও শুভকামনা জ্ঞাপন করলাম। বিদেশী তরুণ বন্ধুরা
আমার কাছে ঘিরে এল, হাতের মুঠির মধ্যে ভরে নিল আমার হাত।

এমনি আশ্চর্য মুহূর্তে আমার জীবনে আরো এসেছি। এমনি
মুহূর্তে প্রতিবার এই কথাই আমার মনে বেজেছে খুঁটির সর্বমানবিক
প্রেমের প্রাণর আলোক আশাভে ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ-গড়া
সমস্ত বাধা নিষেধের যবনিকা দূর হয়ে যায়। আমি যখন
নিজে হাই চার্চের অন্তর্গত ছিলাম তখন আমি নিজেও বিশ্বাস
করতাম যে আলোকান খুঁটানগোষ্ঠী ও অন্যান্য খুঁটান সম্প্রদায়ের মধ্যে
যে বিভেদ তা ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু এই বিশ্বাস যে অসত্য তার
কতো সহজ প্রমাণ খুঁটাই দিয়ে গিয়েছেন। রবিবার দিন যে
'স্রাবাথের' দিন, এও তো ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু খুঁটাই
আবার সমস্ত বিধান থেকে মানব-মনকে মুক্তি দিয়ে
গেছেন, যখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানুষই রবিবারের
বিশ্রামকে সৃষ্টি করেছে, রবিবার মানুষকে সৃষ্টি করেনি,—মঙ্গলকর্ম
যদি করতে হয় তার জন্তে রবিবারই বা কি, আর অমুবারই বা কি !
একজন ইংরেজ বিশপ একদা বলেছিলেন, সমস্ত বিধানের উপরে
মঙ্গল বিধান। খুঁটির বাণীই তিনি প্রতিরনিত করেছিলেন।

আমি আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের প্রেম
আরো ব্যাপক আরো উদার। বীতখুঁটির বাণী যদি সত্য হয়, এবং
ঈশ্বর যদি প্রকৃত আমাদের সকলের পিতা হন, তাহলে জাতি ধর্ম বর্ণ
সম্প্রদায় নির্ধিংশে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আমার ভাই, কেন না
প্রতিটি মানুষ আমার পরমপিতারই সন্তান। খুঁটীবালাবীরূপে
আমাদের কর্তব্য, সর্ব দেশের সর্ব জাতির মানবকে আপন বলে গ্রহণ
করা, ঈশ্বরের অখণ্ড প্রেমের শক্তিতে আপন অন্তরের প্রেমকে সর্ব-
মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করা। বীতখুঁট আমাদের সম্ভারের বন্ধন
ধাওনে নি। বিশ্বাসের উজ্জ্বল আকাশে তিনি আমাদের মহামুক্তির
আশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছেন। জাতি ধর্মের জোড়াজোড় বণি কর্তন
করে সারা বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করতে পারি, তবেই প্রভুর সেই
মুক্তির আশীর্বাদকে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারব। এক সেই
সঙ্গে এক মহা মহৎ অভিজ্ঞতাও আমরা লাভ করব। খুঁটান নামে

অভিহিত নয় এমন অনেক মানুষের স্বপ্নের খুঁটির আশ্রয়ের ক্ষমতার সঙ্গ আমরা পরিচিত হব। তারপর শেষ বিচারের দিন যখন আসবে সেদিন লক্ষ্য করব যে সেই সব অশুভীনরাই ঈশ্বর-চরণে স্থান পেয়েছে, যারা মুখে খুঁটির নাম নিয়ে অথচ জীবনে খুঁড়ি-আশ্রমকে সম্মান দেয়নি, ঈশ্বর তাদের ঠিকই চিনেছেন, আপন পাদপ্রান্ত থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাদের।

ভারতীয় শ্রমিকদের চুক্তিদাঙ্গপ্রথার সম্পূর্ণ অবসানের জন্তে শেষ আন্দোলনের কাহিনী সক্ষেপে এই পরিকল্পনের শেষ বিবৃত করা যাক।

পূর্ববর্তী বলাই যে একই কু-প্রথাকে নতুন নামের সজ্জা পরিচয়ে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। ভারতীয় নেতারা আমাকে অস্বস্তি করেছিলেন কিন্তু রীপে যেতে। সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকতার ডাবে আমাকে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে হবে। যে অভিশাপ অবর্ণনীয় নৈতিক কলঙ্কের সৃষ্টি করেছে এবং যার ফলে ভারত ও বুটনের মধ্যে প্রচুর তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে সেই অভিশাপ যেন আমার নতুন করে মাথা তুলতে না পারে, তার দায়িত্ব নিয়ে আমি আমার সমুদ্রযাত্রা করলাম।

প্রথমবার আমার সঙ্গে উইলি গিয়ার্ডান ছিল। এই দ্বিতীয়বারের ফিজিয়ানরা আমি সম্পূর্ণ একা। এবার প্রায় এক বৎসর আমি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ছিলাম। এইবারে প্রায়ই শারীরিক অসুস্থতার কষ্ট যেমন ভোগ করি তেমনি ভোগ করি স্থানীয় স্বার্থ-শত্রুতার অধিকতার আঘাত। প্রথমবার ফিজিতে গিয়ে যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম তার কণামাত্রও এবার পাইনি। নিসঙ্গতা আর অবসাদে সর্বদা আমার অন্তর ভরে ছিল। তবে প্রথমবারের চেয়ে এবার আমি কাজ করতে পেরেছিলাম অনেক বেশী। এবার আমি যা তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা যেমনই ব্যাপক ও যেমনই গভীর যে এই প্রমাণসংগ্রহের স্বপক্ষে কোনো যুক্তির আর স্থান ছিল না।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ আমার এই দ্বিতীয় যাত্রার শুভমুখি আছে বৈ কি। ফিজি ভারতীয় শ্রমিক নারীদের পক্ষ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ বেতাবে ঠাঁড়িয়েছিলেন তা তুলবার নয়। আমি সেবার অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে গিয়ে বিভিন্ন মহিলা-সভায় শ্রমচুক্তিবদ্ধ ভারতীয় নারীদের দুঃখ দৈন্তের কথা শুনিতেছিলাম—কেমন মিথ্যা। ছলচাতুরীর সুযোগে তাদের ভুলিয়ে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানকার বাগিচায় কী রীতিমত দুঃখ জীবন-বাপনে তাদের বাধ্য করা হয়। আমি শুনিতেছিলাম কী ভয়ানক দুর্নীতির পক্ষে এই ভাগ্যহারা শ্রমিকনারীদের জীবন নিমজ্জিত, তার ফলে কতো খুদোখুনি, কতো আত্মহত্যা, সুস্থ ভঙ্গ সসারবাজার কী ভয়ঙ্কর পরিণাম!

আমার কথা প্রথম প্রথম অস্ট্রেলিয়ানরা বিশ্বাসই করেন নি। তাঁদের নিজের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্তে তাঁরা মিসেস্ গার্নহাম নাম্নী এক মহিলাকে ফিজিতে প্রেরণ করলেন। মিসেস্ গার্নহাম যে রিপোর্ট আনলেন তার চিত্র আমার স্বপ্ননার চেয়ে অনেক ভয়াবহ। অস্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ এই রিপোর্ট পেয়ে তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন, তাঁরা সম্বন্ধেই দাবী করলেন যে এমনভাবে বিদেশী শ্রমিক সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। মিস্ গ্রিট ও মিস্ ডিক্সন

নামে দুই অস্ট্রেলিয়ার মহিলা তৎক্ষণাৎ ফিজি যাত্রা করলেন। এই দুই মহিলা থিয়োজিক্যাল সোসাইটির সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা ফিজিতে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিক নারীদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের সেবার নিজস্বের উৎসর্গ করলেন। ভারতবর্ষে শ্রীমতী জয়ন্তী পেটিটের নেতৃত্বে একদল মহিলা বঙ্গলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে, অবিলম্বে শ্রমচুক্তি প্রথা বদল করার জন্তে যা কিছু করা দরকার তা করা হবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে এই দুবিত প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হলো। ভারতীয় পুরুষ ও নারী বারা সেদিন পর্যন্ত শ্রমচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল সেদিন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল তারা। সমস্ত উপনিবেশে এই দিনটি মুক্তিবিরল নামে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এই দিনটির অঙ্গান আনন্দ-ভাতি।

সম্প্রতি ফিজি-প্রভাণ্ড গঠনকল্পের সঙ্গে আমার লগনে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের কথা শুনে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, সত্যই অল্প সময়ের মধ্যে ফিজিতে অনেক স্তব্ধ কলহে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, নৈতিক ও শিক্ষামূলক কল্যাণক্ষেত্রেও। শ্রমিকদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ কলহরূপ পুরাতন কুলি লাইনের দুর্নীতিমূলক জীবনযাত্রার অবসান হয়েছে, সামাজিক জীবনে সুস্থতার ও আনন্দকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, নব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবস্বাস্থ্যসুস্থ ভারতীয় কর্মীর নতুন সালার।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ আমার এই শেষ যাত্রার আমার প্রধান পাথর ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি ও প্রেরণা। নিসঙ্গতার ছায়ায়, শত্রুতার পাকে ও হতাশার অন্ধকারে যখনই আমার মন ডুবে গেছে, তখনই আমার মনস চক্রে আমি শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত পরিবেশকে কল্পনা করছি, যেখানে প্রতিদিন প্রত্যুৎ-জাতার বহু পূর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন স্তব্ধতার উপবেশন করে আছেন। আমার উত্থান অবসর মনে এই স্মৃতিচিত্র থেকে অশেষ সাহায্য লাভ করত। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী থেকেও আমি গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করতাম। সমুদ্রপারের সেই সুদূর দ্বীপে তাঁর একটি চিঠি যেদিন আসত, সেই দিনটিকে জীবনের আশীর্বাদরূপে আমি গ্রহণ করতাম।

ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহে এই পৃথিবীর স্ফল্লেখ্য জীবনে এমনি ভাবে মানুষের কাছ থেকে যে প্রেম যে স্নেহ আমি লাভ করেছি, তুলনাতীত তার ঐশ্বর্য। আমি এ-ও জানি, মানুষের ভালোবাসাকে অতিক্রম করে মানুষের ভালোবাসাকে আপন মজল কোড়ে স্থান দিয়ে আমার সমগ্র জীবনকে যিরে রয়েছে ঈশ্বরের ভালোবাসা, আমার পরমপিতার পরম প্রেম। সেই প্রেম তার নিত্য অঙ্গুলি-নির্দেশ আমাকে সেই চিরন্তন অনন্ত সত্যের পথে পরিচালিত করে চলছে। এই সত্যের ভালোকে সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভাসিত, সর্ব অন্ধকারের নিবৃত্তি। শান্তম্ শিবম্ অষ্টৈভম্—এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথও এই অনন্ত অখণ্ড সত্যের পথে আমাকে আকর্ষিত করেছেন। আমার মরণ্যু এই পঃম সত্যকে বীণখুঁটির পরমরূপের মর্মে পঃম করে ধরা হয়েছে।

[কমপঃ]

অনুবাদ—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

এই লালকার একটু পরিচর দেওয়া দরকার।

মি: লালকালা সেলেই থাকেন—ঠিক সেলে নয়, সেলেরই অর্ধাংশে পরিচিত পল্লী ক্রকলীনে, আমাদের বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে। নরদেনডেন রোডে ত আমার সাক্ষাৎ, নরদেনডেন রোড পোকা দক্ষিণমুখে গিয়ে মিশেছে আর একটি বড় রাস্তায়—নাম মাসল্যাও রোড। এই মাসল্যাও রোডটিও কোণাকূণি ডাঁবে চলে গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ এবং যেখানে নরদেনডেন রোড এসে মিশেছে তারই কাছাকাছি পূর্বমুখে চলে গিয়েছে আমাদের গুহ্র হল লেন। এবং এই মাসল্যাও রোডে উত্তরমুখে আর মাইলখানেক গেলেই মি: লালকার বাড়ী পাওয়া যায়। এ পরীটির নামই ক্রকলীন।

মাসল্যাও রোডের বাড়ীখানি মি: লালকার নিজেরই। বেশ ভাল বাড়ী। মাসল্যাও রোডের এ দিকটার অনেক দোকান পসার আছে, তাই এখানকার বাড়ীগুলি কোনটাই বাগানযেবা নয়, রাস্তার ফুটপাথের উপর থেকেই উঠেছে। মি: লালকারও তাই। শুনেছিলাম—মি: লালকার ভাল ব্যবসা আছে এদেশে, এবং তার বাড়ীর একতলায়ই তাঁর নিজস্ব বেশ বড় দোকান—কয়েক রকম জিনিষের—নাম গ্রেস ট্রেন্স। বার নামে এই দোকানটি, অর্থাৎ গ্রেস, মি: লালকারই স্ত্রী—এদেশী মহিলা। এই মহিলাটিকে অনেকবার দেখেছি—সুন্দরী ঠিক বলা চলে না, তবে সুন্দরী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কথার বাস্তব, ধরলে ধরলে একটা স্বাভাবিক মাধুর্য্য সবসময়ই চোখে পড়ে। ছোটখাট মাথা, ছিমছাম গড়ন, সুখখানিও মন্দ নয়—সব সময়ই যেন একটি হাসি লাগান আছে মুখে। বয়স বহু চৌকি-পরিণত হবে।

মি: লালকার বয়স কিছু বেশী—দেখলে পঞ্চাশের উপর বলে মনে হয়। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথার মাঝখানটিতে পরিচর টাক এবং মাথার হুঁপাশের চুলে পাক ধরেছে। অসাধারণ গভীর প্রকৃতির বস্তু—কথা প্রায় বলেনই না তবে তাঁর সহনশীলতার পরিচর সহজেই পাওয়া যায়।

এই লালকার-দম্পতির সঙ্গে আমাদের আসাপ হয়েছিল—বিনহুদ গালক, রাবে। বিনহুদ গালক রাবটি, যেখানে

নরদেনডেন রোড মাসল্যাও রোডে মিশেছে, সেখান থেকে মাসল্যাও রোড ধরে আরও মাইল দুই দক্ষিণে গিয়ে মাঝী নদীর ধারে। ধূ-ধূ করছে সবুজ তরঙ্গারিত মাঠের মধ্যে ঠিক নদীর কিনারায়ই রাবের ঘরখানি—যেমন এদেশে হয়, চারিদিকে বড় বড় জানালার সারিখানি একটা বড় চারচালা বাসো।

ভিতরে কোনও অলঙ্কারেরই ফ্রেট নাই—রাষ্ট্রাব্যয় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ত আছেই, তাছাড়া নদীর ধারের বড় হলটি দামী দামী কেঁচ সোকা ও কার্পেট দিয়ে সাজান এবং চার কোণে চারটি ছোট তাল খেলার টেবিল ও তৎসংলগ্ন চেয়ার। এই হলটিরই একপাশে একটি কাঠের পর্দার আড়ালে খাওয়ার টেবিল ও চেয়ারগুলি সাজান—একবারে বায়োজন বসে খাওয়া যায়। এ ছাড়া হলটির সন্ধ্যা পাশে পাশে অনেক ছোট ছোট ঘর আছে গুরুবদের কাপড় ছাড়ার, মেয়েদের কাপড় ছাড়ার, গলক খেলার জিনিষপত্র রাখার ইত্যাদি। নদীটির অপর দিকে বাসোটির উত্তরে ঘনসবুজ গলক খেলার মাঠ—সমতল মোটেই নয়, নানাদিকে ঢেউ খেলানো। আমাদের বেশে নদী বলতে বা বোঝ, এ নদীটি মোটেই সেবকম নয়—ছোট একটি বোশঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। বোধ হয় লাকিরে পার হওয়া যায়। তার উপরে, রাবঘরের কাছেই ছোট একটি সেতুও আছে।

বাসোটির সন্ধ্যা পূর্বের দিকে আর একটি ছোট বাসো আছে—মি: ও মিসেস শেজ থাকেন একটি বছর পঁচিশেকের আবিবাহিত মেয়ে নিয়ে। বৃদ্ধ মি: শেজ ও মিসেস শেজের উপরেই এই রাবটি বসাবথ ডাঁবে চালাবার তার দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন মত রাষ্ট্রাব্যয় ব্যবস্থা এরাই করেন—শুধু সকালে টেলিকোন করে বলে দিতে হয় ক'জন যাবে বা ক'জন থাকবে। বৃদ্ধা মিসেস শেজের শরীর তত ভাল ছিল না, তিনি বেশী ভাগই এক কোণে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে কাঁচ কাঁচ প্রয়োজন লক্ষ্য করতেন। কিন্তু মি: শেজ এবং বিশেষ করে মেয়েটি সর্বদা দূরে বোকা—সকলের প্রয়োজন অস্বাভাবিক পরিবেশন করার জন্য। রাবে 'বার' অর্থাৎ মদ খাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল—তারও চাহিদা যতন এরাই সবসময় করতেন।

বুলা। তোমাকে আগেই বলেছি, ক্লাবে যাওয়ার আমার খুব রৌক ছিল। দিনটি পরিষ্কার থাকলে প্রায় প্রত্যেক দুপুরেই সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি ও মার্লিন পাড়ী হাঁকিয়ে চলে যেতাম ক্লাবে। সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা আসতাম ফিরে—লাক ও রিকেলের 'চা' সেইখানেই খেয়ে নিয়ে। আমি অল্প দিনের বেশী ভাগই কাটিয়ে দিতাম গলফ খেলে। মার্লিনও যে গলফ একেবারে খেলত না এমন নয়, তবে বেশী খেলতে পারত না। বাকী সময়টা ক্লাবে গল্পগুজব করে কিংবা তাস খেলে কাটিয়ে দিত।

এই ক্লাবেই লালকাকাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এবং ক্রমে ওদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল আমাদের। তার প্রধান কারণ বোধ হয়—আমি ও লালকাকা দুজনেই ছিলাম ভারতবাসী—অল্প কেনও ভারতবাসী ক্লাবের সভ্য ছিল না। লালকাকা ছিল ভারতের বহু অঞ্চলের লোক—পার্সী। কিন্তু বিশেষভাবে ভাবটা জমল মার্লিনের সঙ্গে গ্রেসের। তারও কারণ—যতদূর আমার মনে হয়েছে—দুজনেরই স্বামী ভারতবাসী এবং সেই দিক দিয়ে অল্প সব মেয়েদের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক ছিল দুজনের। যদিও এইখানেই বলে রাখি—ক্লাবের সভ্যদের কাছ থেকে কোনও দিন এই স্বাভাবিকের দরুণ অভাবে ইজিতে পর্যন্ত ব্যবহারের কোনও তারতম্য লক্ষ্য করিনি।

লালকাকার সঙ্গে আমার ভাবটা একটা সম্ভবতঃ তার বন্ধনে নিশ্চয়ই দৃঢ় ছিল কিন্তু আমাদের মধ্যে মেলামেশা যে খুব বেশী ছিল, এমন কথা বলতে পারি না। তার কারণ, লালকাকা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং তাঁর স্বভাবও ছিল একটু অন্তরূপ—ঠিক আমার সঙ্গে মেলেনি। আগেই বলেছি—লোকটি কথাবার্তা খুবই কম বলতেন এবং ক্লাবে এসে মদের গ্লাস নিয়ে এক কোণে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন—কোনও খেলাধুলার মধ্যে যেতেন না। সকলের সঙ্গেই দেখা হুল, সৌজন্যের অভিবাদন জানাতে ক্রটি করতেন না কিন্তু এ পর্যন্ত। তার পরে চুপ হয়ে যেতেন—নিজের স্ত্রীর মধ্যে মসৃল হয়ে।

স্ট্রীটের অর্ধাং গ্রেসের চরিত্র ছিল ঠিক বিপরীত। অসাধারণ প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল সে—সকথা আজও জোর করে বলতে পারি। সকলের সঙ্গে মেলামেশার প্রাণ দিত চলে এবং বিশেষ করে মার্লিনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে তার বেন রাস্তা ছিল না। প্রাণের উৎসাহে গলফ খেলা শিখত এবং তাস খেলার টেবিলেও তার উৎসাহের অভাব ছিল না। প্রথম প্রথম লক্ষ্য করতাম—স্বামীকে সব জিনিষের মধ্যে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেন হাল ছেড়ে দিয়েছিল। স্বামীরও ভাবটা ছিল—আমাকে নিবিবিচি চুপচাপ থাকতে দাও, তুমি জীবনটাকে যেমন খুশী উপভোগ কর, আমার আপত্তি নেই।

এ নিয়ে একদিন মার্লিনের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল—মনে আছে। কথায় কথায় মার্লিন বলেছিল—বাই বল, গ্রেস মেয়ে খুব ভাল।

বললাম, আমি তা ত অস্বীকার করছি না? কিন্তু লালকাকাও লোক খারাপ নয়।

মার্লিন বলল, তা হতে পারে, কিন্তু প্রেমের প্রতি একটু উদাসীন।

গুথালাম, তা কেন বলছ—লালকাকার স্বভাবই ঐ রকম।

বলল, স্বভাব যাট হোক, গ্রেসের সঙ্গে জীবনে স্তর মিলিয়ে 'চলে না—চলতে চায়ও না।

গুথালাম, গ্রেস কিছু বলেছে নাকি তোমাকে?

বলল, না না। গ্রেসের মনে নয়। তবে বোঝা ত কঠিন নয়।

বললাম, বাইরে থেকে দেখলে তুমি যা বলছ তাই মনে হয় বটে, কিন্তু হয়ত তোমার ভুল। অন্তরের নিবিড়ে হয়ত দুজনেই একই স্তরে বাঁধা।

মাথা নেড়ে মার্লিন বলল, না না। গ্রেসের ওরিক দিয়ে একটা গভীর দুঃখ আছে, কথাবার্তার স্ট্রুত আমার লক্ষ্য এড়ায় নি।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, দেখ, একটা জিনিস ভুলনা—ওদের বয়সের অনেক পার্থক্য। লালকাকা যৌবনের সীমানা ছাড়িয়েছে, তাই শরীর এবং মনের দিক দিয়ে সে চার বিশ্রাম। গ্রেসের এখন ভরা যৌবন—তাই সে চার উপভোগ। একটু গরমিল ত সেদিক দিয়ে হবেই।

মার্লিন বলল, তা কেন? বয়সের ওরকম পার্থক্য ত আরও অনেক স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আছে—কৈ তাদের ত ঠিক ওরকম হয়নি?

মনে মনে ভাবলাম—কি জানি, হয়ত এখানেই ভারতবর্ষের মনের সঙ্গে এদেশের মনের তফাৎ! একটু বয়স হলই, ভারতবর্ষের মন হয়ত এলিয়ে পড়ে, এদেশের দ্রুত চলার তালে ঠিক চলতে পারে না। মার্লিনকে কিন্তু সে কথাটি না বলে বললাম, হয়ত লালকাকার মনে কোনও একটা নিবিড় দুঃখ আছে—তাই সে নিজেকে ওরকম গুটিয়ে রাখে।

মার্লিন বলল, কিন্তু সেটা গ্রেসকে বলে পরিষ্কার করে নিজেই হয়। গ্রেস ত অবুঝ নয়।

মুহূ হেসে বললাম, হয়ত সে কথা গ্রেসকে ঠিক বলার নয়।

মার্লিন একটু বেন গভীর হয়ে গেল। শুধু বলল, হবে বা।

যাই হোক, এখন থেকে মাস আটেক পরের কথা। হঠাৎ একদিন সুনলাম—গ্রেস লালকাকাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে—লালকাকারই দোকানের একটা যুবক কর্মচারী—নাম নাইট—তার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, একটা মাত্র সন্তান বছর আট-নয়ের একটি বালক—তাকেও বেছে গেছে। শুনে আমি ও মার্লিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম—আজ্ঞাও মনে আছে। মার্লিন শুধু একবার বলেছিল, গ্রেসকে কি ভুলসি বুঝেছিলাম—ভাল মেয়ে বলেই ত জানতাম।

* * * *

পরের দিন সন্ধ্যার পরে লালকাকা এলেন আমাদের বাড়ীতে। আমরা ডিনার খেয়ে বসবার ঘরে তাঁর জুড়েই অপেক্ষা করছিলাম।

গ্রেস চলে যাওয়ার পর প্রায় আট মাস লালকাকাকে দেখিনি। লালকাকা যখন এলেন তাঁর চেহারা দেখে সভ্যই অবাক হলাম। এ কি চেহারা হয়েছে মিঃ লালকাকার! মাথার হুপাশের চুলগুলি একেবারে সাদা হয়ে গেছে এই ক'মাসের মধ্যেই। মুখের ভাঁজনে বার্দ্ধিক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটু বেন কুঁজোও হয়ে গেছেন।

সাদর অভ্যর্থনার লালকাকাকে বসালাম। জানি—লালকাকা

মন খেতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাই এক পেগ হুইকি সোড়া মিশিয়ে দিলাম তাঁর সামনে। আমিও একটা শেরী নিয়ে বসলাম।

বুলা! এইখানেই বলে রাখি—আমাদের বাড়ীতে এসবের কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। অবাক হইনো,—এদেশে ভদ্রলোক মাত্রেয়ই বাড়ীতে সুরাপানের বন্দোবস্ত থাকে—নিজেরা না খেলেও অতিথি-অভাগতদের অভ্যর্থনার জন্য রাখতেই হয়। আমি অবশ্য নিয়মিত ভাবে কোনও দিনই সুরাপান করিনি, তবে ঠাণ্ডার দেশে মাঝে মাঝে একটু খেতেই হয়, এবং বখনই খেয়েছি—হুইকি আমার কোনদিনই ভাল লাগেনি; হয় শেরী না হয় পেট এটরকম একটা কিছু। মার্লিন সুরাপান একেবারেই পছন্দ করত না।

আমি, লালকা—হুজনে বসেছি ঘরে। মার্লিন একপাশে ঠাঁড়িয়ে লালকাবার দিকে চেয়ে শুধাল, বৎ ভাল আছে ত ?

বৎ, লালকাবার ছেলের ডাক-নাম।

বললেন, হ্যাঁ। ধন্যবাদ। তাকে ত বাড়ি-স্থলে দিয়েছি—ভালই আছে সেখানে।

মার্লিন বলল, আপনারা বসে কথাবার্তা বলুন। আমার যদি মাপ করেন, আমি বাই, আমার একটু কাজ আছে। লালকা কা বিষয় চোখ দুটি তুলে মার্লিনের দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি থাকবেন না? আমার কথা আপনার সামনে বলতে পারলে আমি খুশী হতাম।

মার্লিন বলল, বেশ যদি অনুমতি দেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই মার্লিন ঘরে এসে বসল আমাদের হুজনার থেকেই একটু দূরে।

লালকা কা একজন কোনও কথাই বলেন নি। মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিলেন—মাঝে মাঝে সুরার গ্রাসে দিচ্ছিলেন চুম্বক।

আমরা হুজনেও চুপ করে বসে আছি—কি আর বলব। কিছুক্ষণ পরে লালকা কা চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে শুধালেন, আপনারা বখন ডেভন, কর্ণওয়ালের দিকে যাচ্ছেন, টকীতে যাবেন নিশ্চয়ই?

বললাম, অবশ্য। টকী না দেখলে ত ইংল্যান্ডের সমুদ্রতীর দেখাই হল না। যাওয়ার পথে টকীতে ছ'তিন দিন থেকে 'লু'তে গিয়ে বাস করব—এই ত হচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, একটা কাজের ভার আপনারদের দিতে পারি কি?

বললাম, বলুন?

বললেন, টকীর পাশেই সমুদ্রের ধারে বেবাকোষ বলে একটি গ্রাম আছে—টকী থেকে মাইল দুই-তিন দূরে। সেইখানে এসটন্ লজ বলে একটি বাড়ি-হাউস—

হঠাৎ চুপ করে গেলেন। হুইকির গ্রাসে আর এক চুম্বক দিয়ে একটু পরে মাথা নীচু করে বললেন, এসটন্ লজে গ্রেস থাকে?

আমি ও মার্লিন পরস্পরে চোখ চাওয়াচারি করলাম।

আবার বললেন, গ্রেসকে টকী দিয়ে যাওয়ার সময়ে যদি কিছু টাকা দিয়ে যান।

পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে সামনে টেবিলের উপর রাখলেন।

বললেন, হুশো পাউণ্ড।

আমরা হুজনেই অবাক হয়ে লালকাবার মুখের দিকে তাকালাম। কেউ কিছু বললাম না।

একটু পরে লালকা কাই বলে যেতে লাগলেন, গ্রেসের বড় দুর্দশা—আমি খবর পেয়েছি। শরীরও অসুস্থ, টাকা-পয়সাও হাতে একেবারেই নেই—একলাই আছে।

বুখলাম—যার সঙ্গে গিয়েছিল সেই লোকটি গ্রেসকে ফেলে পাঠিয়েছে।

শুধালাম, গ্রেস আপনাকে চিঠি লিখেছে বুঝি?

তাড়াহাড়ি বললেন, না—না। সে বড় অভিমানী মেয়ে, মরে গেলেও আমাকে চিঠি লিখবে না। তবে আমি খবর পেয়েছি।

ইচ্ছা হল শুধাই—তাহলে কোথায় আছে, কি ভাবে আছে আপনি জানলেন কি করে, প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়েছিলেন নাকি? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম না।

মার্লিন শুধাল, গ্রেসের নিজের হাতে ত অনেক টাকা কাড়ি ছিল!

লালকা কা বললেন, সে টাকা ঠিকই আছে। গ্রেস ত এক পয়সাও নিয়ে যায়নি। এমন কি, তার চেকবইখানাও রেখে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, সত্যিই আপনি খুব উদার। না—না বলে একচুম্বক হুইকির গ্রাসটি শেষ করলেন।

উঠে ঠাঁড়িয়ে বললাম, আপনাকে আর এক পেগ হুইকি দি?

সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। আর এক পেগ হুইকি ও সোড়া দিলাম মিঃ লালকা কাকে। এক চুম্বক হুইকির গ্রাসের তিন ভাগের একভাগ খেয়ে নিয়ে হঠাৎ যেন কথা বলার অনুপ্রেরণা এল। বললেন, মিসেস চৌধুরী! আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমি উদার একেবারেই নই। গ্রেস যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—সে ত আমারই অপরাধ।

গ্রেসের ব্যাধবৎ মূল্য আমি তাকে দিতে পারিনি। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ভাল থাকে আমি বাসি—খুবই বাসি। কিন্তু সে ভালবাসা জানিয়ে নিবেদন করার শক্তি আমার ছিল না। তাই সে আমাকে ভুল বুঝল। অভিমান করে গেল চলে। সে ত তার অপরাধ নয়।

মার্লিন শুধাল, কিন্তু গ্রেস ত বোকা ছিল না? সে কি সেরূপ বুঝতে পারেনি?

মিঃ লালকা কা বললেন, ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী—মেয়েদের স্নেহ না বোঝা নির্ভর করে প্রাণের অনুভূতির উপর, বুদ্ধির বিচারের উপর নয়। তার সেই অনুভূতিতে যে কোনও সাড়া জাগতে পারিনি আমি।

বললাম, ভা আপনি ত তাকে অনেক টাকা কাড়ি দিয়েছিলেন তদেহিলাম—খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে দেখেছিলেন তাকে—

বৃহৎ হেসে লালকা কা বললেন, টাকা কাড়ি পেলেই খুশী হওয়ার মেয়েরা অল্প জ্ঞাতব্য—গ্রেস ঠিক সে জাতের নয়।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। পরে মিঃ লালকা কা বললেন, মিসেস চৌধুরী! বিশ্বাস করুন—সেও আমাকে ভালবাসে। আমার বিশ্বাস—আজও ভালবাসে। তাই ত চলে গেল। ভাল না বাসলে গ্রেসের মতন মেয়ে চলে যাবে কেন? আজ তার এই বকম হুবহু—

আমি তাকে টাকা না পাঠিয়ে পারি?

কথাগুলি বলে কি বকম করণ ভাবে চাইলেন মার্লিনের মুখের দিকে। সকলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ঠাং মালিন প্রশ্ন করল, মি: লালকা! সে যদি আপনার কাছে ফির আসতে চায় আপনি তাকে নেবেন?

মি: লালকা! একটু হাসলেন। বললেন, সে ফিরে আসবে না—মিসেস চৌধুরী! অসম্ভব অভিমতিনি সে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে তার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন—আমার দরজা চিরদিনই তার জন্য খোলা।

মালিন বলল, আপনারই যোগ্য কথা মি: লালকা!

শুধালাম, টাকাটা সোজা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন না কেন?

বললেন, সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু তাহলে টাকাটা সে নিত না। তাই আপনারদের কাছে ছুটে এলাম। এক মিসেস চৌধুরী যদি তাকে বুঝিয়ে টাকাটা নেওয়াতে পারেন। পারলে উনিই পারবেন।

কিন্তু টাকাটা নিয়ে গ্রেসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে আমার মম একেবারেই সার দিচ্ছিল না। মনে হল—স্বামিত্ত্বীয় এসব ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভাল। বাচ্ছি আনন্দ করে বেড়াতে—মালিনকে আবার এসব স্বামেলার মধ্যে জড়ান কেন? ভয়ভয়ে কি বলে লালকা! আর অরোধ প্রত্যাখ্যান করা যায়। ভেবে বললাম দেখুন মি: লালকা! এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কি আমাদের উচিত—গ্রেস কি সেটা পছন্দ করবে? সে হয়ত—

ঠাং মালিন উঠে পড়াল। লালকা! আমার সামনে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে টাকাটা নিল তুলে।

বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মি: লালকা! আমি আমার যথাযথ করব। গ্রেস আপনার এ উদারতার মধ্যাদা দিতে জানে বলে আমার বিশ্বাস।

মি: লালকা! যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৃতজ্ঞতা ভরে চাইলেন মালিনের দিকে।

মি: লালকা! চলে গেলে মালিনকে বললাম, শেষ পর্যন্ত তুমি এ দায়িত্ব নিলে?

মালিন শুধু বলল, গ্রেসের প্রতি এটা আমার একটা বড় কর্তব্য বলে মনে করি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রেস ভালবাসতে জানে বলে মনে হচ্ছে।

শুধালাম, কি বকুম?

বলল, লালকা! কথা শুনে মনে হল—গ্রেস হয়ত বা সত্যিই লালকা!কে ভালবাসে।

হেসে বললাম, তুমি বড় ছেলেমানুষ লীনা—লালকা!র কথায় অভিভূত হয়েছ। ভালবাসলে কেউ কখনও স্বামীকে ছেড়ে পালায়?

মালিন বলল, পালাই বা কেন? লালকা!র একটা কথা শুন্য করলে না—ভাল না বাসলে চলে যাবে কেন? সত্যিই ত। লালকা! ত গ্রেসের জীবনে কোনও কাজে কোনও দিন কোনও বাধার সৃষ্টি করেননি—সেটা লালকা!র স্বভাবই নয়। গ্রেস ত লালকা!র চোখের আড়ালে নিজের প্রেমের লীলা অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারত সব দিক বজায় রেখে, পালাবার কি দরকার?

টাকা!কড়ি. মান সম্মান এমন কি নিজের ছেলটিক পর্যন্ত ছেড়ে, এমন করে অন্ধকারে খাঁপ দেওয়া—

মালিন চুপ করে গেল। শুধালাম, তাতে করে লালকা!র প্রতি ভালবাসা প্রমাণ হল কি করে? বড় ছোব এইটুকু মানতে রাজী আছি—গ্রেস হয়ত আসলে মেয়ে তত খারাপ না, একটা মিথ্যা লুকাচুরির জীবন ঠিক সইতে পারেনি।

মালিন ইতস্তত করে বলল, তা হতে পারে। কিন্তু গ্রেসের কাজে একটা যেন অন্ধ অভিমানের আভাষ পাচ্ছি, যেন দিক-বিরিক জ্ঞান হারিয়েছিল।

হেসে বললাম, লীনা—একটা কথা ভুলনা। স্বামীকে ভালবাসলে কেউ অন্ধ প্রেমিক হোটাঁয় না।

মুহু হেসে মালিন আমার মুখের দিকে চাইল। বলল, সেইখানেই ত ঠিক বৃষ্টিতে পারছি না। তাই ত আমি একবার গ্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শুধালাম, দেখা করেই বা কি বুঝবে? গ্রেস কি এ অবস্থায় সরলভাবে কিছু বলবে তোমাকে?

নিজের মনেই বলল, দেখা হোক। তবে একটা কথা বলে রাখি।

শুধালাম, কি?

বলল, যদি বুঝি গ্রেস সত্যিই লালকা!কে ভালবাসে, তবে তাকে আমি ফিরিয়ে দেব লালকা!র কাছে—তোমাকে বলে রাখছি।

চার

গ্রীষ্ম ডেভন কর্ণওয়াল প্রকৃতি ঘুরে দু'তিন জায়গার হোটেলের রাত্রিবাস করে এলাম টর্কিতে। উঠলাম—এবিলন হোটেল। সমুদ্রের ধার দিয়ে পঞ্চমী কি বঞ্জীর চাদের মতন ঘুরে গিয়েছে টর্কি সহরটি—ক্রমে উঠে গিয়েছে উচ্চতর ভূমিতে। সমুদ্রের পারে রাস্তাটির ধারে বড় বড় সব বাড়ী—ভার মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল হোটেল—এবং বাড়ীগুলির নীচে বেশীর ভাগই নানারকমের দোকান পণ্য ইত্যাদি সুন্দর সাজান। তা'ছাড়া সমুদ্রের ধারের রাস্তাটির পাশে-পাশে কয়েকটি পার্কও আছে—সংবেগের অবলাবাহারে রাস্তাে যেন একটা মায়ারাজের সৃষ্টি হয় সেখানে।

এবিলন হোটেলটি ঠিক সমুদ্রের ধারের বড় রাস্তাটির উপরে নয়। তবে সমুদ্র থেকে খুব বেশী দূরে নয়—একটি ছোট রাস্তার উপরে। এবং এবিলন হোটেলটির শিঁছনে একটি বাগান—যে বসে তার কাঁকে ঝাঁক দূরে সমুদ্র দেখাও যায়। হোটেলটির সামনেও ছোটখাট একটি বাগান।

বখন টর্কিতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রথম সমুদ্রের ধারের দু'একটা হোটেলের স্থান পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু পাইনি, সবই ভর্তি ছিল। আরও অনেক হোটেল ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এবিলন হোটেলের স্থান পেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম। সামনের বাগানটিতে সারি সারি অনেক গাছী ছিল—সেইখানেই রেখে দিলাম আমার গাড়ী।

পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেবাকোশ বাব—এই বকমই ঠিক ছিল এবং সেইভাবেই তৈরী হয়ে ভোজনাপায়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম—আমি ও মালিন। খাবার খরটি বেশ বড় এবং

চারিদিকে ছোট ছোট খাবার টেবিল ও চেয়ার দিয়ে সাজান—কোনটার বা দুজন বসে খাবার এক কোনটার বা চার পাঁচজন। সব টেবিলই ধবধবে সাদা চাকরে ঢাকা এবং প্রত্যেকটির উপর একটি ফুলদানিতে নানা রংয়ের ফুল সাজান। আমরা খাবার ঘরে ঢাকা মাত্র একটি পরিচারিকা এল আমাদের কাছে—তার পোষাকের উপর একটি ধবধবে সাদা এপ্রনে গলা থেকে প্রায় পা পর্যন্ত ঢাকা। এসে বৃহৎ হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, সুপ্রভাত! আপনাদের ঘরের নম্বরটি কত?

বললাম, সতেরো।

‘এই দিকে আসুন’ বলে আমাদের নিয়ে গেল একটি ছ’জন বসে খাবার মতন টেবিলে এবং দেবলাম, তার উপর আমাদের ঘরের সতেরো নম্বরটি আলগা পিতলের হরকে বসান। বুললাম—এইটাই আমাদের টেবিল, আগে থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ত্রেকফাষ্ট খাচ্ছি—সেই পরিচারিকাটিই খাবার এনে এনে দিচ্ছে আমাদের টেবিলে। ঘরের আশে-পাশে আরও টেবিলে ছ’চার জন বসে ত্রেকফাষ্ট খাচ্ছে—অনেক টেবিল খালি, হয়ত তারা খেয়ে গেছে কিংবা হয়ত এখনও আসেনি। ঘড়িতে তখনও দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকী—এ হোটেলের নিয়ম অল্পসরে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ত্রেকফাষ্ট।

আমরা যে টেবিলে বসে খাচ্ছি তার অনতিদূরে একটি টেবিলে একটি স্বরশর্ন ইংরেজ যুবক বসে খাচ্ছিল—পরিধানে বেশ দামী শোবারক, সেটা সহজেই চোখে পড়ে। যুবকটি খেতে খেতে লজ্জাহীনের মতন অনবরত মালিনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল—সেটুকু শুধু আমি নয়, মালিনও লক্ষ্য করবেছিল। মালিন ত সুন্দরী—বুলা! তা ত জানই। সে কথার আভাস ইতিপূর্বে আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতেই দিয়েছি। এখন একটু পরিণত বয়সে সে রূপ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাজেই মালিন যুবকটির মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এ আবার বিচিত্র কি? মনে মনে এই রকম কিছু ভাবে বোধ হয় একটু কৌতূহলও অল্পভব করছিলাম। মালিনের দিকে যেন নতুন করে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ভাকে! দিনটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাই বোধ হয় একটা গাঢ় সবুজ রংয়ের পোষাক ছিল তার পরিধানে। কালো চুল এবং সেই অভঙ্গপাশী কালো চুটি চোখের মধ্য দিয়ে শুধু সুপের লাগনটুকুই নয়, পরিধানের পারিশাটো তার দেহের বোঁদনশ্রীও যেন চারিদিকে ঠিকরে পড়ছিল, তার বসার ভঙ্গিমার মধ্যে। আমিও যেন একটা নতুন গর্বের মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম—মালিনের দিকে। একটু পরে চাপাগলায় বললাম—জীনা। স্নোকটি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, চোখ ফেরাতে পারছে না।

মালিনও যেন একটু বিরক্তি করে চাপাগলায় বলল, স্নোকটি অসভ্য—এদিকে তাকিও না।

বেবাকোষে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। মি: লালকাকা ঠিকই বলেছিলেন—টর্কি থেকে মোটরে বেবাকোষ বেতে ব্রিনিট দশ-পনেরার বেই লাগে না। বেবাকোষ মোটেই টর্কির মতন নয়—সমুদ্রতীরের একটি গ্রাম বললেও চলে। টর্কি থেকে একটি পাহাড় ক্রমে উঠতে গিয়ে উঠেছে এবং তারই মাথার

উপরে বেবাকোষ গ্রামবাণী—সমুদ্র অনেক নীচে পাহাড়ের তলায়। পাহাড়ের উপর সমুদ্রের ধার দিয়ে একটি রাস্তা এবং তার পাশে গুটিকয়েক ভাগ ভাগ বাড়ীও আছে—তার মধ্যে তিন চারটিই হোটেল। কিন্তু পিছনের বাড়ীগুলি বেশীর ভাগ মোটেই বড় নয়, চারিদিকে ছড়ান সাধারণ ছোট ছোট বাংলা-কুটার বলাও চলে। সমুদ্রের ধারের রাস্তাটি বাঁধ দিয়ে পিছন দিকে একটি মাত্র রাস্তা। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একেবারে নেমে গিয়েছে টর্কির দিকে। এই রাস্তাটির আশে-পাশে সরু সরু সিমেন্টবীধান ছুঁচরাটি পথ হয়ত উপরের দিকে উঠেছে না হয় নেমে গিয়েছে নিচের দিকে—এই পথগুলির ধারে ধারে সব বাংলা।

এসটন লজ এই রকমই একটি বাংলা—খুঁজে নিতে আমাদের দেয়ী হল না। টর্কির রাস্তা থেকে নিচে নেমে হ্যাওয়া একটি বীধান পথের সর্বশেষের বাড়ী।

রাস্তায় পাড়ী রেখে এই পথ দিয়ে নেমে একটি লোহার গेट খুলে ঢুকলাম এসটন লজে। তখন যে মাস, সবুজের গাঢ় অভিধান শুরু হয়েছে। আজ মেঘলা দিনে চারিদিকে পাহাড়ের ঘন সবুজ বেন চোখ জড়িয়ে গেল। এসটন লজের বাইরের প্রাঙ্গণে সমস্তরকিত বাগানটির ফুলের বাগারেও মুগ্ধ হলাম। সদর দরজার গিয়ে কড়া নাড়লাম। একটি বৃদ্ধা এসে দরজাটি খুলে প্রশংসূচক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে হঠাৎ আমাদের মনে বিধা এল। কি বলি? মিসেস লালকাকা বলা কি চলবে? হয়ত অজ্ঞানমে আছে এখানে। মালিন কণা কইল।

শুধাল, গ্রেস বলে কোনও মহিলা থাকে এখানে?

বৃদ্ধাটি একটু ইতস্তত করে শুধাল, গ্রেস? গ্রেস লালকাকা?

আপনারা কি তাকেই চাইছেন?

মালিন বলল হ্যাঁ—ধন্যবাদ!

বৃদ্ধাটি বলল, তিনি ত অসুস্থ। বাই হোক, আপনারা ভিতরে আসুন।

দুজনে ভিতরে ঢুকলাম। সামনেই একটা ঘেরা সারিসাঁটা বারান্দা—কাপেটপাতা কয়েকটি কোঁচ দোকা দিয়ে সাজান। বুললাম—এইটাই লাউজ। বসিও রংয়ে ঢাকা, তবুও বাড়ীটির দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বহু পুরাতন বাড়ীর স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সহজেই বোঝা যায়। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যেও যে একটা দৈর্ঘ্য আছে—সেটাও চোখে পড়তে দেয়ী হয় না। জানালার পর্দাগুলি গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে আলো আসার জন্য।

বৃদ্ধাটি বলল, বহুন—দেখি খবর নিয়ে। কি নাম বলব?

মালিন বলল, বলুন—ডাঃ ও মিসেস চৌধুরী—সেল থেকে।

বললাম। বৃদ্ধাটি ভিতরে চলে গেলেন উঁকি মেরে দেখলাম—বারান্দাটির পাশের ভিতরের ঘরটিই খাবার ঘর। একটু পরে বৃদ্ধাটি ফিরে এল।

বললেন, তিনি ত শোবার ঘরেই বিশ্রাম করছেন। তবে—

মালিনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি আসুন।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে।

মালিন তুমি একটু বস বলে বৃদ্ধাটির সঙ্গে ভিতরে চলে গেল।

আমি বসার উপর কেটে গেল। আমি যেন আঁধার হয়ে উঠলাম।

ধানিকটা ঘরের মধ্যে পাঁয়চারী করি, খানিকটা বসে আজকের পড়া খবরের কাগজটি আবার হুত পড়ি, খানিকটা জানালায় ধারে ঝাড়িয়ে বাইরের শোভা দেখি—এই ভাবে সময়টি কাটতে লাগল। হঠাৎ ঘরের পর্দা সরিয়ে মার্লিন চুকল, সঙ্গে গ্রেস। গ্রেসের দিকে চেয়ে সত্যিই চমকে উঠলাম—এ কি চেহারা হয়েছে তার! অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা, চোখের কোলে কালি দিয়েছে ঢেলে, মুখখানি এত রুগ্ন হয়েছে যে গাল দুটি ভেসে চোয়ালের হাড় দুটি বেন এগিয়ে এসেছে। আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ মুহু হেসে বলল, দয়া করে আমার খবর নিতে এসেছেন, সেজন্য সত্যিই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এতক্ষণ আপনাকে একলা অপেক্ষা করতে হয়েছে—সে জগ্ন মাপ চাইছি। বসুন!

গ্রেস ও মার্লিন ঢোকামাত্র আমি উঠে ঝাড়িয়েছিলাম। তিন জনই বসলাম। বললাম, না—না। তার জগ্ন আর কি হয়েছে। তবে আপনাকে দেখে অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ। সন্ধ্যার দিকে রোজই একটু জ্বর হয়। তাই দুর্বল হয়ে যাছি।

শুধালাম, তা চিকিৎসার কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে? একটু চুপ করে থেকে বলল, এখানকার একজন ডাক্তার এসে দেখে বান—ওষুধ দিচ্ছেন।

মার্লিন উঠে ঝাড়াল। আমার দিকে চেয়ে বলল, চল, আজ আমরা যাই। গ্রেসের*এখন একটু বিশ্রামে থাকা দরকার।

উঠে ঝাড়িয়ে বললাম, চল।

গ্রেসও উঠে ঝাড়াল। আমাকে বলল, আবার আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মার্লিন আমাকে বলল, ও শুভেই ছিল। আমি শুকে উঠতে বাধ্য করেছিলাম। শুনল না। নিজের মুখে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জগ্ন বেরিয়ে এস।

বললাম, ওর বিশেষ কক্ষণ!

গ্রেসকে দু'জনে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মার্লিন গ্রেসকে বলল, তাহলে ঐ কথাই রইল। কাল ব্রেকফাস্ট খেয়ে আবার আসব।

গ্রেস বলল, হ্যাঁ।

গাড়ীতে এসে মার্লিনকে বললাম, আবার কাল আসতে হবে—আজ শেষ হল না?

মার্লিন বলল, না। দু'-তিন দিন বোধ হয় আরও আগতে হবে।

টকিতে বিন দুইয়ের বেশী থাকবনা—এই রকমই কথা ছিল।

বললাম, তাহলে ত টকিতেই অনেক দেবী হয়ে যাবে।

হেসে মার্লিন বলল, তার আর উপায় কি বল? গ্রেসের যা অবস্থা দেখলাম—ওর একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার—নইলে ও বাঁচবে না।

শুধালাম, কি কথা হল আজ?

মার্লিন বলল, চল—সমুদ্রের ধারে কোথাও গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাই। সমুদ্রের ধারে বসে বসে কথা হবে।

মার্লিনের কথা মত গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে সমুদ্রের ধারের রাস্তায় সমুদ্রের গা ঘেঁষে রাখলাম।

আবার শুধালাম, আজ কি হল?

মার্লিন বলল, আমি ওর ঘরে গিয়ে দেখি—ও বিছানার ওপরে আছে। ঘরে গিয়ে ঘরের দৈর্ঘ্য দেখে মনটা ধারণ হল—পিছনের দিকে হোট একখানি ঘর, একটি মাত্র সজ্জা জানালা, আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। আমি ওর বিছানার গিঁড়েই বসলাম। বীয়ে ওর একখানি হাত তুলে নিলাম হাতে।

মার্লিন একটু চুপ করল। শুধালাম, কি কথা হল?

বলল, খানিকক্ষণ কিছু বলিনি—আমার দিকে একবার চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে চুপ করেছিলাম। আমিও কথা কইলাম।

শুধালাম, কি বললে?

বলল, প্রথমেই বললাম—গ্রেস বৎ, ভাল আছে—বোজিছুসে ভাল ভাবেই মানুষ হচ্ছে—সেইটাই যে ওর মনে সবচেয়ে বড় কথা, সেটা বুঝতে আমার সেরা হয়নি। লক্ষ্য করলাম—চোখ দিয়ে দু'-চার কোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

শুধালাম, লালকাকার কথা কিছু হলনা?

বলল, হল বৈ কি। কিছুক্ষণ পরে শুধাল, আমার ঠিকানা তোমরা পেলে কি করে?

তখন বললাম, মিঃ লালকাকা তোমার জগ্ন বিশেষ অস্থির হয়ে আছেন। তোমার বিষয় তিনি সবই জানেন। তিনিই ত তোমার ঠিকানা দিয়ে আমাদের বিশেষ করে অল্পবোধ করলেন দেখা করে তোমার খবর নিতে। তারপর গ্রেসকে শুনিয়ে নিজের মনেই যেন বললাম—কি আশ্চর্য উদার লোক লালকাকা! কি দরদী প্রাণ!

কথাগুলি বলে মার্লিন মুহু হেসে আমার দিকে তাকাল।

হেসে বললাম, বুঝছি। যাই হোক, কি বলল ওকথা শুনে?

বলল, কিছু না। চুপ করেই রইল।

শুধালাম, টাকার কথা কিছু বলনি?

বলল, না—আজ অতটা নয়।

শুধালাম, তারপর?

বলল, তারপর আর কি? তারপর ওর শরীরের কথাবার্তা কিছু হল। শেষ পর্যন্ত উঠে বসল—বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে।

বললাম, তা আজকেই টাকাটা দিয়ে দিলে পারত। যে দু'বন্ধুর আছে—টাকা নিতে বিধা করত বলে আমার মনে হয় না।

বলল, কুমি গ্রেসকে এখনও ঠিক চেননি। লক্ষ্য করলাম—ও, ওদিককার বিষয় একটি প্রশ্ন করেনি, এমন কি ববের নিক দিয়েও নয়, বা বলবার আমিই বলেছি।

বললাম, সেটা স্বাভাবিক লজ্জা।

বললে, তবে সেই লজ্জা কাটিয়ে আজই কি টাকা নিতে পারে? আর তা ছাড়া—

শুধালাম, কি?

বলল, শুধু টাকা দিলেই ত আবার হল না। আমি গ্রেসকে লালকাকার কাছে কিরিয়ে দিতে চাই।

[ক্রমশঃ]

Learning to love oneself is the beginning of a life-long romance.

—Oscar Wilde

ভাবি এক, হয় আর

ত্রিদিলাপকুমার রায়
ভেরো

লুনা হোটেলের ফিরে এসে পল্লবের মন বিবাদের কাণ্ডে হয়ে এল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিশ্বাসেরও অবধি বইল না : যুহুফ দেশের কাজ করবে, মহাশয় গান্ধীর ডাকে সাড়া দেবে কি ভাবা যায় ? ওর দেখে-মনে একটা পুলক ছেয়ে গেল ভাবতে যে, যুহুফ বাইরে সচরাচর অগলভতা করে চললেও জীবন নিয়ে এত গভীর ভাবে ভেবে দেখেছে। যুহুফকে ও ভালোবাসত বরাবরই, কিন্তু আজ সেই সঙ্গে জেগে উঠল ওর প্রতি শ্রদ্ধা : রাজার টানাছেড়া ওঠাপড়া সম্বন্ধে ওর মেকদুও দুর্বল হয়ে যায়নি তো !—যেখানে হাত বাড়ালেই পেত সুন্দরী নারী ও সেই সঙ্গে আধুনিক বিলাসের অজস্র উপকরণ, সেখানে কেমন করে ও মোহ কাটাতে—আরামের লোভেও চাইল না তো বাঁধা পড়তে ?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মন আরো অতিষ্ঠ হয়ে উঠল : এবার দেশে ফেরাই চাই। যুহুফ-যে-যুহুফ সেও যখন দেশে ফিরে যাচ্ছে তখন ও কেন আর মিথ্যে সময় নষ্ট করে বিদেশী গান শিখে ?

কেবল এলিওনোরার কথা ভেবেই ও ফের পড়ে গেল সপ্নায়ের লোভায়। দেশে যখন ফিরবেই এবার—তখন কেন আর ওর মনে দুঃখ দিয়ে যাওয়া ? আশ্চর্য ! মানুষের সুখ দেওয়ার ক্ষমতা কত কম, অথচ চলতে ফিরতে সে অপূরণকৃত দুঃখই না দিতে পারে ! না, ও সালভিনির সঙ্গে দেখা করেছে ফিরবে—বিশেষ যখন এলিওনোরাকে কথা দিয়েছে।—যে ওকে সত্যি এত স্নেহ দিয়েছে তার স্নেহের মান রাখতেই হবে : মন ওর কারাগারে ভিজে ওঠে।

কিন্তু যুহুফিক হ'ল—সময় যে আর কাটতে চায় না। এলিওনোরার ওখানে মাঝে মাঝে যার বটে, কিন্তু ঠিক এই সময়ই তাকে সকাল থেকে রাত আটটা ন'টা অবধি ঈডিয়োতে কাটাতে হ'ত একটা নতুন ছবির জন্তে। তাই ব্লাস্ত এলিওনোরার সঙ্গে ডিনারের পর বড় বেশী কথালাপের সময় থাকত না। ও মাঝে মাঝেই সূর্যাস্তের সময়ে যেত টাইবারের তীরে বেড়াতে—রাঙা আলোয় বিখ্যাত সান পিয়েরো গির্জার অপূরণ উদাস শোভা উপভোগ করত। কখনো বা যেত ভ্যাটিকানে মাইকেল এঞ্জেলোর স্কোপো দেখতে, বা চূপ করে চেয়ে থাকত রাফেলের অপূরণ La Transfigurazione ছবির দিকে : আকাশপথে ঈশা উঠছেন স্বর্গলোকে। ছবি ওর মনকে কখনো এমন করে স্পর্শ করেনি তো এর আগে—ভাবে ও আশ্চর্য হ'লে ! মনে পড়ে—কোথার পড়েছিল একটি কবিতা : "তোমার বাথার দানে আমার উঠল যে প্রাণ জেগে !"

কিন্তু তবু ব্যথা ব্যথাই। এক দিকে সে ভ'রে দেয় বটে, কিন্তু অল্প দিকে বেন বিজ্ঞ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ওর মনে ভয় জেগে ওঠে : মারিয়ারে এত ভালোবাসা সম্বন্ধে তো যুহুফ পরে তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে নাগাল পেতে চাইল এলিওনোরার ! তবে ? তবে প্রেম স্বামী—এমন ভরসা পথ কোথায় ? কে জানে—হয়ত আইরিনও আজ পেয়ে গেছে এমন কোনো নতুন

মনের মাহুফকে যে ওকে সর্বাঙ্গ-করণে ঠেলে দেবে শিরীর জীবনের দিকেই ? কে বলতে পারে ? আর যদি আইরিনের মন ওকে পাশ কাটিয়ে খুঁকে থাকে আর কাজের দিকে, তবে তাকে দোষ দেবেই বা কেমন করে ? সে তো ওকে শেষ দিন খোঁজাখুঁজি বসেছিল—কোনো জন্মভূমিই ওর কাছে সর্বাঙ্গসাহিত্য নয়—সে চার সপ্তাহে সৃষ্টি করতে সুরের পরমানন্দ, দেশ ওর কাছে জড়—মাটি—নিষ্কাশ।

চোদ্দ

এলিওনোরার সঙ্গে চার-পাঁচ দিন দেখা হয়নি। সেদিন বিকলেও Via Appia-র বেড়িয়ে এসে হোটেলের টেবিলে সন্ধ্যা-ভোজনে ব'সে ভাবছে কী করা যায়, এমন সময়ে হোটেলের মানোজার ওকে এসে বললেন সোৎসাহে যে রুখ দেশ থেকে একটি থিয়েটারি দল এক সপ্তাহের জন্তে বোমে এসেছে। অভিনয় করবে চেকভের "চেরি বাগান" আর ডন্তেরভস্কির "ত্রাদাস" কারামাজভ।

পল্লব উৎসাহ বোধ করল না—যদিও মাস কয়েক আগে হ'লে আরম্ভ ও রাখতে পারত না। ও শুধু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : "ত্রাদাস" কারামাজভ হবে কবে ?

Domani Signore ! Bellissima dramma !

যদি যেতে চেনে তবে এখনি টেলিফোন করি—নৈলে কাল টিকিট পাবেন না।

পল্লব পাশ কাটিয়ে যেতে বলল : যেতে ইচ্ছা তো হয়, কিন্তু রুখভাবার একটি কথাও জ্বনি না যে ! মন ওর বিবাদের ভ'রে গেল। এ বইটি আইরিনের আভি প্রিয় বই—যদি এত সে থাকত তবে কী আনন্দেই না হ'লেন মিলে নাটকটি দেখতে যেত !

পাশের টেবিলে সেই রুখ যুবকটি রোজকার মতন একলাই থাকছিল, হঠাৎ অভিযান করে পরিচার্য ফরাসী ভাবায় বলল : আমি রুখ। যদি যেতে চান তো আহ্বান না। আমি হুঁটি টিকিট পেরেছি।

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে বলল : যতবাদ, কিন্তু অল্প টিকিটটা—

যার আসার কথা ছিল তিনি হঠাৎ অসুস্থে পড়েছেন। আমি আপনাকে প্রতি দৃষ্টই বৃত্তিয়ে দিতে পারব। এ-নাটকটি আমি পাঁচ ছ' বর এখোছি মন্থোতে। ব'লে ঈবৎ গর্ভ করেই বলল : দেখবার মতন অভিনয়—স্বয়ং ক্যান্সান্সাভিচি নাটকটির প্রডিউসার। আর অভিনয়ে রুখা অগতের সবার সেরা, জরনন হয়ত ?

পল্লব প্রীতিকণ্ঠে বলল : বহু ধন্যবাদ ! ঠা, ফরাসী অপূরণ অভিনয় করে শুনেছি আমার এক বন্ধুর কাছে। কিন্তু টিকিটের দাম কত ?

যুবকটি উঠে পল্লবের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল : টিকিটের দাম আমার লাগেনি। আমি প্রতিদিন হুঁটি করে ক্রী পাস পাই। ব'লে পল্লবের সামনের চেয়ারটি দেখিয়ে বলল : Vous permettez ? ২

১। কাল, সিগোরে ! অতি চমৎকার নাটক !

২। বলতে পারি কি ?

পল্লব সাগ্রহে বলল : বিলক্ষণ! আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকে। কী পান করবেন?

ধন্তবাদ, আমি মদ খাই না।

পরিচয়ের উপক্রমদিক। সূত্র হ'ল। পল্লব নিজের পরিচয় দিল বর্ষাবিধি। আগন্তুকও দিনে নিজের পরিচয়, যদিও সংক্ষেপে : এখানে কাজ করেন একটি কন্যা-আফিসে। মা নেই। বাপ কন্য, দুইভেদে থাকেন—কঁকালধর ডাক্তার—হনী। মা ওর পনের বৎসর বয়সেই সঙ্গারের হিসেবে নিকেশ সাজ করে পাড়ি দেন পরপারে। ও সেই থেকে মস্তোভেই মাছুর ওর এক কাকার কাছে। ওর বাপ-মা ক্যাথলিক। কিন্তু ও পনের বৎসর বয়স থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছে। নাম শাপিরা।

পনের

শাপিরোর সঙ্গে আলাপ হ'তেই ওর মন গান গেয়ে ওঠে। মনের বিবাদ কটিল না অবজ্ঞা, কিন্তু আঁধার কেটে গেল। ওর একটি প্রিয় গানের একটি চরণ ফিরে ফিরে বাজে ওর প্রাণের তারে :

আয় মা এখন তারারূপে শিতহৃৎ শুভবাসে,

নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।

কী অপকণ উপমা! যেমন সত্য তেমনি আলোভরা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় ভগবানের কথা, অনেক দিন পরে। তিনি এক হাতে মনো আঁর এক হাতে রাখেন। এক হাতে জীবনের পেয়ালা শূন্য করেন আশাভঙ্গে, শোকে, বিচ্ছেদে, বিরহে—কিন্তু যেই মন ভরে আর বইতে পারবে না, ভেঙে পড়বে, অমনি আসে তাঁর স্বর্ণা, রক্ত-পাত ফের ভরে ওঠে সুধায়। হঠাৎ মনে হ'ল আইরিনের অভাবের জ্ঞান যে-দুঃখ ওর কাছে এত দিন মনে হয়েছে বন্ধা—হয়ত সেই অভাবের, সেই বিরহেরই ওর দরকার ছিল। এ পর্যন্ত ও একটানা পেয়েই এসেছে। ওর পিতার মৃত্যুর পরে কোনো বড় দুঃখ কি শোক পায়নি। আইরিন আনন্দের হয়ে ওর জীবনে হানা দিয়ে প্রথম ওকে গভীর আঘাত দিল—কাছে থেকেই দূরে ঠেলে। সে বেদনার মহানে মনে হ'ল ওর—চিন্তা যেন ওর অজ্ঞাতে উঠেছে উর্ধ্ব, গ্রহিষ্ণু হয়ে। বেদনার করুণের পর বীজ পড়তে না পড়তে নব আশা অরুণোদয় হ'ল যেন। সাঁঝ রাত ওর মন এক আশ্চর্য আনন্দে ছেয়ে গেল। লুনা হোটেলের লাইব্রেরি থেকে উঠেয়েভির 'ব্রাদার্স' কারামাজভের পাঠা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ এসে পড়ল একটি জায়গায় : আইরিনের সঙ্গে ঠিক এই অধ্যায়টিই ও একদিন পড়েছিল সে কী আনন্দে। সেই হারানো আনন্দ যেন স্মৃতির মর্মকূলের ফের বেজে উঠল আরো নবীন হ'য়ে, আরো গভীর হ'য়ে। কী সুন্দর, পবিত্র, ওজস্বী! মনে পড়ে গেল উপনিষদের একটি বিশেষণ—'ভগবৎ করুণা শুণু শুভ্রা'ই নয়, বলদাও বটে।' মনে ওর কৃতজ্ঞতা জেগে ওঠে : প্রভু, কত তো পাই দিলে দিলে, তবু ভুলে যাই কেন যখন কিছু পেয়ে হারা'ই? বসি কেন তখন কুকৃ চিত্তে তুমি নিষ্ঠুর? মনে করি কেন যে বা আমি পেয়েছি তা আমার প্রাণ? এই যে আলিয়াশাও বলাছে ঐ কথা—যেন ওর মনের কথা টেনে :

আলিয়াশা পাড়িয়ে একটুই তাকিয়ে থাকে, তারপরে হঠাৎ সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—ছেবে পায় না কেন সে মাটিকে চূষন করছে

দরবিগলিত অস্ত্রধারে! কী আনন্দ, আকাশের ঐ তারাদের দিকে চাইতে ওর চোখের পাঠা ভিক্রে ওঠে কিন্তু কই, মনে হয় না তো—এ মিথো উজ্জ্বল, কৃষ্ণা আসে না তো কী করছি ভেবে? মনে হয়—যেন ভগবানের অগণ্য জগত থেকে আলোর রাণী এসে ওর আত্মাকে বেঁধে দিচ্ছে সব-কিছুর সঙ্গে। ওর গায়ে কাঁটা দেয়—সাধ জাগে সবাইকে ক্ষমা করতে, সব-কিছুকে ক্ষমা করতে—সবার উপর ক্ষমা চাইতে—শুধু নিজের জন্তে নয়, সকলের জন্তে। মনে হয় এমনি আয়ো কত আত্মা আমার জন্তে প্রার্থনা করছে!

পড়তে পড়তে পল্লবের চোখেও জল আসে। মনে পড়ে যায় কুজুমের একটি কথা : হামিজী বলতেন—'ভূহায় ব'সেও যদি মহৎ চিন্তা করো, জেনো সে-চিন্তা বার্থ হবে না, ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে।' হঠাৎ ওর বুক ভরে যায়—সাধু-সন্তের চিন্তার ও প্রার্থনার টেউ হয়ত এমনি অলক্ষ্যে এসেই লাগে কত-শত দুর্ভাগীর প্রাণের তটে—অদৃশ্য মহাশুদ্ধার বিরকল্যাণ কামনার স্পন্দন হয়ত এমনি প্রত্যক্ষ ভাবেই স্তম্ভমর্মে বেজে ওঠে কত-শত স্বপ্নবীর অস্তরে! পবিত্রতা, অমরকল্যাণ, সহিষ্ণুতা—আরো কত কী ভাগবত বরাভয় মাছুরের তন্তু মনকে করে তোলে স্নিক, বিপদে জাগায় নির্ভর, কোভের অন্ধকারে ক্ষমার কিরণ, দুর্ভবের নিরাশার সাহসের জাগরণী!

সব ছাপিয়ে ওর গোমে রোমে জেগে ওঠে এক নাম-না-জানা আশার ওজস্বিনী : অবিধাসীর নাস্তিবাদ ধুয়ে মুছে ভেসে যায় যুগ-যুগান্তের বিশ্বাসীর অস্তিবাদের কলকল্লালে। আনন্দে ও ঘুমতে পারে না। একটি আয়ামকোদারা টেনে নিয়ে জানলার কাছে এসে ব'সে চেয়ে থাকে উদার আকাশের পানে, কান পেতে শোনে অজ্ঞান নক্ষত্রদীপালির বরাভয় কংকার।

আছে আছে আছে আছে—কিছুই জীবনে বার্থ হয় না, হ'তে পারে না।

যোল

পরদিন হুজনে মিলে 'ব্রাদার্স' কারামাজভ অভিনয় দেখতে গেল। কী প্রাণলিপ্সা অভিনয় করে এই আশ্চর্য কন্যজাতি! মনে পড়ে ওর মানবপ্রেমিক প্রিন্স রুপটকিনের একটি কথা যে, কন্য জাতির মধ্যে আছে একদিকে যেমন নটকীয় নিষ্ঠুরতা তেমনি অন্ধদিকে—অগাধ ঔপাৎ। প্রতিভার অবস্থার উত্তেজিত 'ব্রাদার্স' কারামাজভে দেখিয়েছেন রাশিয়ানদের এই দুটি প্রবৃত্তির স্বত্ববিরোধ। একদিকে অপকণ সন্ন্যাসী—পবিত্রতার প্রতিমূর্তি—যুবক আলিয়াশা, অন্ধদিকে জঘন্য বৈরিনী গুণেশকা। লম্পট ডিমিট্রির মধ্যেও কী মহত্ত্ব! বেকরপসী কুমারীকে সে চেয়েছিল কাম-চরিতার্থ করতে সে-কিশোরী যখন এল তার পিতাকে বাঁচাতে তখন ডিমিট্রি বলল : যে টাকা চাইছ, বরদা, যদি রাতের জন্তে আমার হ'ল। কুমারী বেদনায় দিশাহারা হ'য়ে শেষে রাজি হ'ল, ওল ওর কাছে গভীর রাত, নইলে তার পিতার সর্বনাশ! ডিমিট্রি তাকে টাকা দিয়ে বলল : তোমার মহবে আমি অভিজ্ঞত হয়েছি—ফিরে যাও অনাহত দেখে—এই টাকা নাও। ব'লে কুমারীকে লম্পট না করে তার হাতে দিল অসীকৃত বর্ণযুজার খলি। ওর মনে হ'ল—কে বেশি মহৎ? কুমারী, না লম্পট? প্রশ্নাম করল সেই মহান ব্রষ্টাকে যে নরকের রাজ্যে বাস করেও উদ্ধারণ করেছিল বর্ষের

সামগ্র্য : I believe in the eternal harmony in which, they say, we shall one day be blended.

শাপিরো ওকে চাণা স্তরে বুকিয়ে দিচ্ছিল, যখনই কোনো চরিত্রের মুখে ফুটে উঠছিল এই ধারণার কোনো অবিস্মরণীয় বাণী। পল্লব কেবলই ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এসব কথা যখনই ও বলে, ওর চোখে স্নেহে ওঠে সে কী এক অপূর্ণ দৃষ্টি! ওর আর সন্দেহ রইল না যে শাপিরো মনে-প্রাণে স্বপ্নী, আদর্শবাদী। লুনা হোটেল ওকে প্রথম দিন দেখেই গভীর ভাবে আকৃষ্ট হবার সে আজ কারণ তথা সমর্থন খুঁজে পেল।

অথচ এর পরেই শাপিরোর তন্ত্র রূপ। রাজ্য যায় সকালে ওর কাজে, ফিরে আসে লাঞ্চে—পরে ফের বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে সন্ধ্যায় ক্লাস্ত হারে। পল্লবের সঙ্গে দেখা হয় বটে, ভূপূরে ও সন্ধ্যায় খেতে খেতে কথাবার্তাও হয় বৈ কি, কিন্তু পল্লবই কথা বলে চলে দিনের পর দিন। শাপিরো নিজের কথা কিছুই বলে না—মস্তব্য হিসেবে কচিং এক-আখটা কথা ছাড়া।

একদিন হঠাৎ পল্লবের মনে কেমন বেন ঈষৎ অভিন্ন মতন এল। ও শাপিরোকে কাছে পেতে না পেতে ওর জীবনের কত কথাই না বলে ফেলেছে—এমন কি আইরিনের কথাও বলেছে—কিন্তু শাপিরো তো প্রতিদানে কিছুই বলে নি—এমন কি রোমে ও কী কাজ নিয়ে আছে সে-সম্বন্ধেও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি! ভাল ওকে আর বলবে না নিজের মনের কথা। এর নাম কি বন্ধু? একতরফা অন্তরঙ্গতা হয় কখনো?

সতেরো

সেদিন রবিবার—পূর্ণিমা। এলিওনোরা পল্লবকে ওর মোটর পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যা ছুটির, লিখল : আজ সন্ধ্যায় ছুটি নিয়েছি, চাঁদের আলোর তুঙ্গে নৌকাবিহার করা যাবে। রাতে যদি আমার এখানে থেকে বাঙ তবে সুখী হব।

পল্লব শাপিরোর সঙ্গে একটি ছোট চিঠি রেখে গেল যে আজ সন্ধ্যায় ও এলিওনোরার ওখানে যাবে, রাতে হয়ত না ফিরতেও পারে। এলিওনোরার কথাও ও শাপিরোকে বলেছিল, কিন্তু শাপিরো শুধু এটুকু মস্তব্য করেছিল : ওমা বিলাসিনীর দল পল! ওদের সঙ্গে বিশেষ তোমার স্তন মাছব তৃপ্তি পেতে পারে না।

পল্লব একটু যা খেয়েছিল বলেই আরো শাপিরোকে জানিয়ে দিল যে এলিওনোরার সম্পর্ক ওর কাছে শাপিরোর চেয়েও কাম্য। কথাটা সত্য নয়, কিন্তু চিঠিতে তবুও ঈষৎ খোঁচা না দিয়ে পারল না : এলিওনোরা বন্ধু নয়—ভ্রম ওর মন। অথচ বিচারকের দল ওকে না জেনে কতই না বিচার করে!

মোটর চড়ে ওর মন বুঁধে বুঁধে করে : গায়ে পড়ে এসব কথা শাপিরোকে কেন বলতে গেল? কিন্তু যোথ চেপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে : কেন বলব না—ও যখন এলিওনোরাকে প্রশ্ন দিয়ে কথা বলতে পারল—তার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে?

হুদ থেকে পোশের বসন্তিলর কী স্মরণ দেখায়। চারিদিকে গাছপালা। হঠাৎ এক বুলবুল তান ধরে দেয়।

পল্লব বলে : কী স্মরণ! হাল ওর হাতে।

এলিওনোরা পাঁড় টানতে টানতে বলে : সত্যি। এমন ভান নিজে পারে না আর কোনো পাখি।

পল্লব টোকে : তা বলতে পারি না। আমায়ের দেশে বসতে কোকিল যখন প্রথম ভেঁকে ওঠে আমি কিছুতেই কোনো কথা করতে পারি না, শুধু একধনে শুনি আর শুনি।

এলিওনোরা মুহূর্তে বলে : কারো মিরো! আমি বুলবুলকে বড় করিনি তোমাদের কোকিলকে ছোট করতে। তুমি বড় ছেলেমানুষ।

পল্লব ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলে : আমিও কিছু জেবে বলি নি ওকথা। আমি দেশভক্ত বটে, ছেলেমানুষও হ'তে পারি, কিন্তু এটুকু বুঝবার বয়স আমার হয়েছে যে দেশ বড় হ'লেও সবচেয়ে বড় মানুষ।

এলিওনোরা চুপ ক'রে থাকে।

পল্লব বলে : কী হয়েছে? ফের বেকাঁশ কিছু বলে ফেলেছি না কি?

এলিওনোরা গান হেসে বলে : না পল! কেবল—থাক গে—কী হবে বলে—যখন এর কোনো চারা নেই?

পল্লব উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে : কী হয়েছে এলিওনোরা?

না থাক। নিজের দুঃখ নিয়ে বগুয়াই ভালো। সালভিনি লিখেছেন তিনি এসেন বলে—দিন দশেকের মধ্যেই।

সালভিনি থাক। বলো কী হয়েছে?

কী বলব ভাই? সেই একই কথা তো ঘুরে ফিরে—

না। আবার কিছু একটা হয়েছে। যুগ্ম লিখেছে না কি কিছু?

এলিওনোরা মুখ নিচু ক'রে হঠাৎ ব্লাউসের হাতার চোখ মােছে।

কী লিখেছে? বলবে না তো?

এলিওনোরা চুপ ক'রে থেকে বলে গাঢ়কণ্ঠে : কী আর লিখবে? ঠিকই লিখেছে। শেষে রাগ হয়েছিল। কিন্তু সত্য অপ্রিয় হ'লেই তো মিথ্যা হয় না সব সময়ে?

কী প্রশ্নের সত্য ও বলল ফের?

এলিওনোরা একটু চুপ করে থেকে বলে : আমাদের একটা প্রবচন আছে : 'Dal dire al fare, c'e di mezzo il mare'—শুনছ কি?

না। কী বললে?

এর মানে—বলার আর করার মাঝখানে পাঁড়িয়ে আছে অতল সমুদ্র। এটা বুঝছি হাড়ে হাড়ে সেদিন। যুগ্মকে কয়েক মাস আগেও বলেছিলাম—ভালোবাসার জন্তে মেরেরা কী না করতে পারে? বিধাতা নিশ্চয় সেদিন অলঙ্ঘ্য মুঠকি হেসেছিলেন।

পল্লব চুপ করে থাকে। এলিওনোরা বলে চলে : তবে আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়, যে কথা সেদিন তোমাকে বলেছিলাম : যে, কাল আমাদের দিনে দিনে জ্ঞান দান করতে পারে, কিন্তু শক্তি হরণ করে—বিশেষ ক'রে আত্মজ্ঞানের শক্তি। বলে পল্লবের দিকে চেয়ে : আর একথা কত সত্যি বুঝতে পারি—তোমাদের দেখে।

আমাদের?

তোমাকে, মোহনলালকে, বিতাকে। সব চেয়ে বেশি মনে হয় মাল বিতার কথা : এক কথায় সে সব ছেড়ে চলে যেতে পারল তো। হ'লে একটু খেমে : যতই কেনে না বিজ্ঞতার গুণগান করি পল, চিরদিন যৌবনই হ'রে এসেছে জীবনের রাজা—খাকবুও জীবনের রাজা—কেন না, কেবল যৌবনই এক কথায় ছাড়তে পারে পরিণাম-চিত্ত। আশ্রয়—বিজ্ঞা—পারি শুধু বড় বড় কথা বলতে। অথচ তবু গুণ কত আমাদের—বে আমাদের জানি। কিন্তু কেনে কী হয়? পারাই সব।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে : কিন্তু এর মূল কারণ কি যৌবন, না স্বভাব?

মানে?

মানে বারা পারে তারা যৌবন পেরিয়েও পারে। ব'লে একটু খেমে : আর বারা পারে না যৌবন তাদের উজ্জল করতে পারে, কিন্তু বল দিতে পারে কি?

এলিওনোরা হঠাৎ বলল : তুল বুঝে অবিচার কোরো না পল। আইরিন তা নয়—বা তুমি ভাবছ।

পল্লব চমকে ওঠে : কে বলল? যুযুৎসু কি কিছু লিখেছে?

এলিওনোরা ইতস্তত করে : মা ঠিক আইরিনের কথা লেখেনি, তবে—কিন্তু খাক ও কথা, আমাকে ও বলতে বারণ করেছে।

পল্লব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : কী এমন কথা যা তোমাকে লিখতে পারল অথচ আমাকে বলা মানা? ব'লে—বলতেই হবে তোমাকে। আইরিনের সঙ্গে কি গুর দেখা হয়েছে? না, এও বলা মানা?

না। আইরিন এখনো বাগিনে ফেরেনি—কবে ফিরবে কেউ জানে না। এখনো সে হুইজল'গে। শরীর না কি তার ভালো নয়—লিখেছে তার দিগিকে।

পল্লবের মনে অজ্ঞান ফুলে ওঠে, বলে : এই কথাটা জানাতে এত নিবেশ? এলিওনোর উত্তর না পেয়ে : ব'লে, বলতেই হবে—আরো আছে নিশ্চয়?

এলিওনোরা বলল : কী বলব ভাই? যুযুৎসু কয়েকটা জল্পনা-কল্পনা করেছে মাত্র। আইরিন যে ঠিক কী ভাবছে তা কেউ জানে না—কারণ সে কাউকেই কিছু লেখেনি।

তবু—

তুমি বড় নাছোড়বান্দা। তবে শোনো। যুযুৎসু লিখেছে যে আইরিনের দিগি মনে করে না আইরিণ তোমাকে বিবাহ করলে তার ফল ভালো হবে।

কিন্তু আইরিন কেন দেখে না সে কথা বলে?

এলিওনোরা বিস্মিত স্বরে বলে : কুক হোরো না ভাই।

আইরিন ভালো মেয়ে—আমি বলছি তোমাকে।

কেন এড়িয়ে বাঙরো?

কী বিপদ? আমি কী বলব ব'লে দেখি—যখন আমার কেউই জানি না? আমি কেবল বলতে পারি একটি কথা : যে বাইরের ঘটনার যোগাযোগে মানুষের যে ছবি ফুটে ওঠে অনেক সময়েই সে ছবি তার স্বরূপের দিশা দেয় না। একথা আমি জানি নিজেকে দিয়ে। আমি বিলাসে থাকি—কিন্তু তাই বলে সত্যিই বিলাসিনী আমি নই। ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : একথা বললে কে বিশ্বাস করবে ব'লে? শেষের কথাগুলি বলে ও ধরাগলায়।

পল্লবের দৃষ্টি কাক্ষণ্যে ভরে ওঠে, বলে : তুমি যে বিলাসিনী নও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কেবল তুমি হয়ত—

কী?

একটু কম উচ্চাশিনী হ'লে ভালো হ'ত। তবে হয়ত এখানেও আমি তোমাকে তুল বুঝছি। যদি তাই হয় তবে এই ভেবে আমাকে ক্ষমা কোরো যে, মানুষ মানুষকে ঠিক বুঝতে চাইলেও প্রায়ই পারে না। বোধ হয় সেই জেতেই যিও বলেছিলেন কাউকে বিচার না করতে।

এলিওনোরা সায় দিয়ে শান্ত স্বরে বলে : ঠিক সেই জেতেই আমিও বলি তোমাকে, আইরিনকে বিচার না করতে। ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে আহা, ওকে একটু সময় লিখেই বা। ওর মনে অনেক কুঠা সংশয় অশান্তি হয়ত টগবগিয়ে উঠছে। একটু থিড়িয়ে যেতে দাও না।

পল্লব একটু ভেবে বলে, ঠিক বলেছে এলিওনোরা! তাহাড়া—যদি ওকে সত্যি ভালোবেসে থাকি তবে ওর চিঠিই বা চাইব কেন? তুমি বড় সময়ে কথাটা বলেছ। বওয়া যখন তার হয় তখনো যে সইতে পারে অজ্ঞবোধ অজ্ঞবোধ না ক'রে, সেই না জেতে।

এলিওনোরা হঠাৎ বলে, জেতে? শুধু স'য়ে? আমার জে ভাই মনে হয়।

এলিওনোরা উদ্বাস কণ্ঠে বলে, তুল পল, তুল। জেতে শুধু সেই যে সব ছাড়তে পারে। আর এ-সব-ছাড়ার শক্তি পায় ও শুধু সেই যে চলে দৃষ্টির হুকুম মেনে, মনের মানাকে আমল দিয়ে নয়। কিন্তু চলো—ফিরি। মেঘরা জড়ো হ'চ্ছ।

চাঁদ ঢেকে গেছে, ওরা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি। হাওয়া উঠল। ওরা ফিরল।

[ক্রমশঃ।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অস্তিত্বের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধুবান্ধবীর কাছে সামাজিকতা বন্ধা করা বেশ এক হুমকির বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মৈত্রী, প্রেম, শ্রীতি, যেহে আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কাবও শুভ-বিবাহ কিংবা বিবাহ বাধিকোত্তে, নয়তো কারও কোন কৃতকাব্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন—অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর হ'বে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ম হৃদ্য আবেশের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালস। প্রথম ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভাব আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে বুঝি হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উন্নয়নের বৃত্তি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জাতব্যের জন্ম লিখুন—প্রচার বিভাগ মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



[Osamu Dazai's 'THE SETTING SUN'-এর অঙ্কন]

মর্ত্য আধ্যাত্ম

বিশ্রোহের সূচনা

চিরদিন শোকসাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় বেঁচে থাকা অসম্ভব।

কোন একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে, বার জন্ম আমার যুঁহু বোধ করাতে হবে। নূতন শাস্ত্র—ভগ্নমীর রূপান্তর যাত্রা। প্রেম, সেও ভাই। অধনীতির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যেমন যোজা লাক্ষ্মণবর্গকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছিল, টিম তেজনি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রেমকে জাঁকড়ে থাকতেই হবে। সমসাময়িক আইনবিশারদ আচার্যনিষ্ঠ অধ্যক্ষিক, প্রতাপসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভগ্নমীর মুখোশ খুলে দিয়ে। নির্ভরে ঈশ্বরের পায়ে আত্মবিসর্জনের সেওয়ার যে বাস্তবী যৌত তার বারো জন শিষ্যের মুখে দিয়েছিলেন,—আমার বর্তমান অবস্থার তা বিশেষ অগ্রযোজ্য হবে না।

গোনা, রূপো, তামা দিয়ে খুলি বোকাই করা না। কাজাপনের বিবরণ, ছ'খানা কোট, ছুতো কিংবা ছড়ি কিছুই সঙ্গে মিও না, হলে দেখো তোমাদের আমি নেকড়ে-বুকের 'ভেতর মেঘশাবকের মত পট্টাবিষ্টি, ছতরাং সর্পের ভায় চতুর ও কপোতের ভায় নিরীহ হ'তে হবে।

হাথা নেহকে আঘাত দিলে আত্মার কতি করতে পারে না, তাদের ভয় পেও না, বং যে ব্যক্তি দেখে, মন উত্তরেরই জ্বলন করতে পারে, তার কাছ থেকে ঘুরে থেকো।

তোমরা ভাবো, ধরায় শান্তি জানাই বুঝি আমার উদ্দেশ্য। শান্তি নয়, ভরবারি বল এনেছি আমি।

কারণ আমি শিতার বিরুদ্ধে পুরকে, মাতার বিরুদ্ধে কস্তাকে, শাওড়ীর বিরুদ্ধে পুত্রবধূকে উত্তেজিত করতে এসেছি এবং আপন পথিবারের মধ্যেই শত্রু বিভীষণের দেখা পাবে।

যে আমার চেয়েও তার বাবা-মাকে বেশী ভালবাসে—সে আমার বোণা নয় এবং যে আমার চেয়েও তার পুত্রকস্তাকে বেশী ভালবাসে, সেও আমার বোণা নয়।

যে জগৎলাভ করেছে, সে মরবেই, আর যে আমার জন্ত জীবন দেবে, তার মরণ নেই।

বিশ্রোহের সূচনা।

যদি প্রেমের কারণে আমি যৌতর এই বাস্তবী পুখামুপুখ অমুসরণ করি, তবে তিনি আমার অপরাধী করবেন কি? দেহজ প্রেমের তুলনায় আধ্যাত্মিক প্রেমকে কেনই বা উচ্চতর আসন দেব? এ আমার বোধগম্য নয়। আমার ধারণা দুই-ই এক। যে নারী প্রেমের জন্ত, অভ্যাস এক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্ত কিংবা আত্মবধিক দুঃখের কারণে, দেহ-মন নয়কে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, আমি সেই নারী। এই আমার গর্ভ।

ইজুতে সমাধি দিয়ে, টোকিওতে অকুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করলেন মামাবাবু। অতঃপর নাগজি এবং আমি, দুজনের বোঁধ সঙ্গার এমন বিজী মোড় মিলে যে, মুখামুখি পড়ে গেলেও পরস্পরের মধ্যে কথা হয় না। মাসের সমস্ত গহনা বিক্রি করে নাগজি পুস্তক প্রকাশনার মূলধন সংগ্রহ করল। টোকিওতে নেশার চূড়ান্ত করে ও বখন টলতে টলতে বাড়ী ফিরত, তখন তার মড়ার মত সাদা মুখখানা দেখে দুঃস্থ ব্যাধিগ্রস্ত বৌগীর শেষ অবস্থা বলে মনে হত।

একদিন বিকেলে নর্তকীশ্রেণীর এক মেয়েকে নিয়ে সে বাড়ী ফিরল। এর পর আর এক দণ্ডও তিঁতনো যায় না দেখে বললাম—আমি ক'টা দিন টোকিওতে ঘুরে আসতে চাই। আমার এক পুয়নো বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় নাই,—তার ওখানে দুটে-তিনটে রাত থেকে আসব। তুমি একটা দিন সঙ্গার দেখো—কেমন? তোমার বাক্যবী রাস্তা করে দেবে'খন।

নাগজির দুর্ভলতার সুযোগ নিতে এক দণ্ডও ইতস্তত করলাম না। স্ত্রতরাং একেত্রে সাপের ধুঁটামি প্রয়োগ করে ব্যাগের ভেতর প্রসাধনের টুকিটাকি আর কিছু খাবার নিয়ে টোকিওতে অভিসারে বেরুলাম।

এক সময়ে কথাগুলো নাগজির কাছ থেকে জেলে নিলাম যে, টোকিওর ছোট লাইনে ওগিকাবু ষ্টেশনের উত্তর কাটক থেকে মিটার উয়েহারা বাড়ী স্নাত্ত কুড়ি মিনিটের দাঙা। সেদিন এলোমেলো বেলে শরতের হাওয়া উঠছিল। ওগিকাবু ষ্টেশনে রামতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এক পথচারীকে মিটার উয়েহারা বাড়ীর টিকানা জিজ্ঞেস করলাম। সঠিক নির্দেশ পাবার পরেও প্রায় বটখানেক অন্ধকার গলিতে উদ্ভেদবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালাম। একা ঐ অবস্থায় চোখে জল এল। হঠাৎ একটা পাথরে হেঁটাই খেয়ে চটির ট্র্যাপ আলুগা হয়ে এল। অসহায় হ'রে ভাবছি কি করা যায়, এমন সময় আমার ডানহাতি বাড়ীর সারিরদ্বীপে একটায় গারে গৃহকর্তার নাম চোখে পড়ল, অন্ধকারে এক ঘাবড়া লাগা। এমনি কেমন বের

এবার কেনবার সময়

শেহস্মা বিলোদ

ইতল

পিলখার-প্রথ ক্যাপ

মুক্ত দেখে কিতবেল

এম. এল, বঙ্গু য়াণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

মনে হ'ল, এ নিশ্চয় মিটার উয়েহারার মাম। এক পাশে চটি পরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরকা পর্যন্ত এগোলাম। নামের ওপর হুমুড়ি খেয়ে দেখলাম বাস্তবিক তাই। উয়েহারার জিরো। কিন্তু ভেতরটা যে একেবারে অন্ধকার!

মিটিট খানেক চুপ করে ভাবলাম, কি করা বার। শেষ পর্যন্ত রবিয়া হয়ে দরকার গায়ে বেহ এলিয়ে দিলাম—মনে হ'ল এখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে বাব।

জানিয়ার সান্ধিতে হু'হাতের আনুল ঘিরে টোকা ঘেরে কিস'মির ভবু বলায়—মাণ করবেন মিটার উয়েহারার।

সাতা মিলল বটে কিন্তু বায়কটে। তেতর থেকে দরকা খুলে গিয়ে জামার চেয়ে তিন চার বছরের বড়, সেকেনে গন্ধবাখা জীপারী এক মহিলাকে অন্ধকার ঘরের মাঝে দেখা গেল। দুই হেসে জিজ্ঞেস করলেন—কে গো? গলার ঘরে মা আছে বাগ, মা-আছে তব।

মাণ করবেন, আমি—নাহ বলায় অবসর হ'ল না, আমার প্রেয় ওর চোখে চুপা রূপ নিতে পারে, এই আপড়ার সন্নিহন প্রেয় করলাম—মিটার উয়েহারার বাড়ী আছেন কি?

মা। আমার প্রতি দৃষ্টিতে তাঁর কল্পনা হুয়া কিন্তু সাধারণকত: তিনি যেখানে বান—

এখান থেকে অনেক দূর?

না। মনে হ'ল আমার কথার তিনি কোঁকুক বোধ করছেন। ওগিকারুতে। ঠেগনের সামনে শিরাইশি খাবারের সোকান খোঁজ নিলে, তারা বলতে পারে।

উয়েহারার নাচতে ইচ্ছে হল।

ও কি? আপনার চটির এ অবস্থা কি করে হল? আমার তেতরে থেকে নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় বেকের ওপর বলতে, মিটার উয়েহারার আমার একখানা চামড়ার ট্রাপ দিলেন। আমি যখন চটি মেরামতে ব্যস্ত, তখন তিনি একখানা মোমবাতি জেলে আনলেন। অত্যন্ত লজ্জিত, আমাদের হু'খানা বাসই পড়ে গেছে। আমার স্বামী বাড়ী থাকলে একখানা আনিয় নিতাম। কিন্তু হু'রাত হ'ল তিনি ফেরেননি এবং মেয়ে নিয়ে আমি সকাল সকাল শুতে পড়ি। পকেটে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই।

তিনি অত্যন্ত সরল, সহজ হাসিমুখে কথাগুলি বললেন। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে বছর বারো-তেরোর একটি শীর্ষ-মেয়ে বড় বড় চোখে আমায় লক্ষ্য করছিল। মনে হল একেবারেই মিতকে নয়। এসের আমি কিছুতেই আমার শত্রু মনে করতে পারিলাম না, কিন্তু এতটুকু অস্বস্তি করা কঠিন ছিল না যে, একদিন এরা আমায় কি রকম উপায় চোখে দেখবে। এই চিন্তা মনে আসতে আমার সমস্ত প্রেমের তাপ নিবে হিম হয়ে গেল। চটি মেরামত করে দাঁড়িয়ে উঠে হু'হাত দিয়ে হাতের ধূলা ঝেড়ে নিলাম। সেই মুহুর্তে অজানা হুখে, আপড়ার আমার মন ভারী হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল বৈঠকখানায় ঐ অন্ধকারে দৌড়ে গিয়ে মিসেস উয়েহারার হাত হু'খানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিই। তাঁর সঙ্গে গলা জড়িয়ে কেঁদে মনটা হাতা করে নিই। এ চিন্তায় আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার আচরণের মধ্যে কি পরিমাণ ভগ্নাচার ও কল্যাণ প্রদানিত হবে, সে কথা মনে করে এ সমস্ত ত্যাগ করলাম।

আমার আত্মবিকৃত কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আত্মমিত নত হয়ে প্রণাম করে ছুটে বাইরে পাশিয়ে এলাম। বড়ো হাওয়া আমার সারা দেহ ছিন্নত্বির করে দেবে মনে হল। মনে মনে বিব্রোহ ঘোষণা করলাম। আমি তাঁকে ভালবাসি, তাঁর জন্ত আমার অস্তবাস্তা কেঁদে মরে, তাঁকে আমার চাই-ই। তাঁর প্রতি ভালবাসার বেশ বোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-ও আমি জানি যে, তাঁর স্ত্রীর মত মধুর স্বভাব মহিলা কঠিন চোখে পড়ে। তাঁর মেয়েটিও স্নানবী, কিন্তু আমি টীকবের আলাহুতে আসাদীর কাঠসড়ার দাঁড়িয়ে আছি; মনে আমার অগভীরের ট্রানির বেধামাত নেই। প্রেম ও বিব্রোহের কারণে প্রাণবের জন্ত। আমার শান্তি বেধার কোন ক্ষমতা অজ্ঞাত টীকবের হাতে নেই। আমি অসতী নই। আমি তাঁকে বখাওই ভালবাসি এবং তাঁর স্নানবাতের জন্ত হেসে কান নেই, বা আমার অসাধ্য। প্রবোধন হ'লে হু'তিন রাত আমি মাঠে-বাঠে শুতে কাটতে সিতে পারি। হ্যা, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে।

ঠেগনের সামনে শিরাইশি খাবার সোকান খুঁজে নিতে অস্বস্তি হল না, সেখানে তাঁকে পেলাম না। তবে নিশ্চয়ই আসাদগোয়াতে আছেন। সম্ভবত: আসাদগোয়া ঠেগনের উত্তর কাটক থেকে সোকা পেড়' গজ এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে এক লোহার মিত্রীর সোকান পেরিয়ে আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে উইলো নামে ছোট্ট হোটেল। তারই এক পরিচারিকাকে নিয়ে বর্তমানে মিটার উয়েহারার যেতে আছেন, সেইখানেই সাতটা দিন পড়ে থাকেন। আপাতত তাঁর কারবার ঐখানেই সীমাবদ্ধ।

ঠেগনে টিকিট কেটে টোকিওর ট্রেন ধরলাম। আসাদগোয়াতে নেমে নির্দেশ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত উইলোতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম কিন্তু সেই হোটেল তখন খাঁ-খাঁ করছে, কেউ নেই।

একদল লোকের সঙ্গে এইমার বেরিয়ে গেলেন। এখান থেকে তারা নিশিওগির 'চিজেবির'তে রাতভর মাতলানী করতে গেল— এই পরিচারিকার বয়স আমার চেয়ে কমই হবে, বীর, হির মাজিত বজোই মনে হ'ল। জানি না, এই মেয়েই তাঁর বর্তমান প্রাণিনী কি না।

চিজেবির:—নিশিওগির কোন ভায়গায় হ'তে পারে? হতাশায় চোখে জল আসার জোগাড়। হঠাৎ সঙ্গেই হ'ল আমার মাথাটা কেমন গোলামাল হ'য়ে গেল না তো?

ঠিক জানি না, তবে মনে হয় ঠেগনের দক্ষিণে হবে। বাই হোক, পুলিশবন্ধে খোঁজ নিলে নিশ্চয় তারা বলে দেবে। কিন্তু ঠিক এক ভায়গায় আটকে থাকার মত মাহু'ব তিনি নন। পথের মাঝে আর কোথাও না জড়িয়ে পড়েন।

আমি চিজেবিরেই আগে খোঁজ করব।—কল্লবাদ! আরার ট্রেনে উঠলাম—এবার একেবারে উটো দিকে। নিশিওগিতে নেমে ঝড় মাথার নিয়ে পুলিশবন্ধের সন্ধান পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। সেখান থেকে চিজেবির ঠিকানা জোগাড় করে অন্ধকার পথে প্রায় ছুটে চললাম। চিজেবির নীল বাড়ি চিনে সোজা গিয়ে দরকা ঠেলে হুকলাম। দশ-বন্ধ-করা খোঁয়ায় ডরা ছোট্ট ঘরে দশ-বারো জন মাতাল একটা মস্ত টেবিল জুড়ে হৈ-হৈ করে মদ খাচ্ছে। তার মধ্যে তিন জন মেয়ে। আমার চেয়েও ছেলোমাছব পুরুষের সঙ্গে সমান ভালো সিগ্রেট টানছে আর হাউলানী করছে।

ঘরের এক পাশে সরে গিরে চারি দিকে কোথ বুলিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করলাম। মনে হল স্বপ্ন দেখছি বুলি। এ বেন ভিন্ন, বাহুর। দ্বারের ছাঁটা বন্ধের গোটা মানুষটাই পাশে গেছে।

এই কি আমার রামধন্থ এম, সি, যিনি আমার জীবনের একমাত্র আরাধ্য-দেবতা? হুঁ বরন! আগের মতই অবিস্মৃত কেন্দ্রীয়—বর্তমানে বিবর্ত ও বিরল হয়ে এসেছে। স্থখানা ফীত ও নিষ্কৃত, চোখের কোল বেঁবে রক্ত লালিয়া। সামনে কটা দাঁত পড়ে গেছে এবং ক্রমাগত কি বেন বিড়-বিড় করে চলেছেন। সেখে মনে হ'ল ঘরের কোণে একটা বুড়ো বাঁধ শিউঁড়ির বসে আছে।

আমার সেখে একটি ঘরে মিষ্টার উয়েহারাকে কোথ টিপে ইশারা করল। জহ্নলোক বসে বসেই গলা বাড়িয়ে আমার দেখলেন এবং নির্ভীকার ভাবে খুঁতনি রেখে আমার ভেতরে ডাকলেন। দলের আর সকলে বেন আমার দেখতে পায়নি, এই ভাবে সমানে চৈ-চৈ করতে লাগল, কিন্তু ওইই মধ্যে নিজেরা একটু সরে ব'লে মিষ্টার উয়েহারার পাশে আমার জায়গা করে দিল।

আমি কোন কথা না ব'লে চুপ করে বসে বইলাম। মিষ্টার উয়েহারার গেলান জ্বরে খেনোমদ ঢেলে দিলেন। তারপর নিজের গেলানটিও ভরে নিয়ে হেঁড়গলার বললেন—থেকে নাও।

আমাদের গেলান দু'টি কোন মতে পরস্পরের স্পর্শ করে মুহু কলশ টা শব্দ তুলল।

কে বেন চিকিৎসা করে উঠল—গিলোটিন, গিলোটিন, হু, হু, সজে সজে আর একজন বুয়ো ধরল, গিলোটিন, গিলোটিন, হু, হু, হু। তারা পরস্পর গেলান ঠেকিয়ে মনে চুহু হিল। মনে দলে তারা ঐ ভাবে অর্থহীন কথাগুলি স্থর করে বলে আর গেলান টেকে মদ খায়। বেন ঐ পাগলের প্রলাপ তাদের মদ খাবার প্রেরণা বোগাচ্ছে। বেই একজন কোন অজুহাতে বেরিয়ে যাচ্ছে, সজে সজে নতুন অস্তিত্ব ঘরে চুকে মিষ্টার উয়েহারাকে মাথা নেড়ে অভিমান করে দলের মধ্যে ভিড়ে যাচ্ছে।

মিষ্টার উয়েহারার, আপনি জানেন একটা জায়গার নাম? আহা! আচ্ছা বলুন তো, কথাটার সঠিক উচ্চারণ কি হ'তে পারে? আঃ-আঃ-আঃ। না আহাঃ-আঃ? যে লোকটি সামনে খুঁকে এই প্রশ্ন করল আমি তাকে ঠেজে অভিনয় করতে দেখছি, আমার পরিচায়ক মনে আছে, এর নাম ফুজিটা, কথাটা আহাঃ-আঃ। ধর তুমি বললে, আহাঃ-আঃ; চিজেরির মদ সস্তা নয়।

একটি ঘেয়ে বলে উঠল—আপনি একটি মাত্র বিষয়ে কথা বলতে জানেন, সেটি হ'ল টাকা।

এক ছোঁকা জহ্নলোক—এক কাফি-এ দু-ডোক, দামী হ'ল, না সস্তা হ'ল?

আর এক জহ্নলোক—বাইবেলে বলে তোমার শেব ফাল্টি পর্বাত গিরে বেতে হবে। একজনের পাটটি গুণ আছে, আর একজনের আছে ছাঁটা, আরও একজন একটি মাত্র গুণের অধিকারী—বায়াঃ, লবা কিরিস্তি। বীতর হিসেবের বজ্র কড়াঙড়ি ছিল।

আর একজন বললেন—আরে, তার চেয়েও বড় কথা হ'ল, তিনি নিজে মদ খেতেন। বাইবেল ভণ্ডি মদের গল্প। যে সব লোক মদ ভালবাসে তাদের নিয়ে অনেক আলোচনা পাবে, কিন্তু বাবা মদ খায়, তাদের লব্ধে উচ্চাচা নেই। তবু

ভালবাসলেই পাপ; এতে প্রমাণ হয় বীত নিজে নিশ্চয়ই মদ খেতেন। আমি বাকি বেখে বলতে পারি, উনি এক নাগাড়ে ছই কোয়ার্টার-মদ টানতে পারতেন।

হয়েছে, হয়েছে, বখেট হয়েছে। আমাদের মধ্যে বধুভীক বাবা, তারাই বীতকে নিয়ে টানটানি করে। ও-সব বেখে মদ চালিয়ে যাও। গিলোটিন, গিলোটিন, হু হু হু।

মিষ্টার উয়েহারার দলের মধ্যে সবচেয়ে স্তম্ভী তত্ত্বাবধি গেলানের সঙ্গে সজোরে নিজের গেলান টুকে মনে চুহু হিলেন। টোটার কল বেয়ে গড়িয়ে-পড়া তরল পলায়নটুকু অসত্যের মত হাতের চেঁচাতে মুছে দিলেন। পর মুহুর্তে পাঁচ-ছয়বার এতও হাঁচি দিলেন।

আমি নিশ্চয়ক উঠে পাশের ঘরে গেলাম। ফ্যাকাশে, কণ্ঠ চেহারার হোটেলকর্তাকে জিজ্ঞেস করে কলস-বর পথটা তেমনে নিলাম। ঘরে চুকে দলে পৌছবার পথে সেখি 'চী'—সেই স্তম্ভী হেলোমাদ্রব ঘেয়েটি আমার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

মধুর হেসে আমার প্রশ্ন করল—কিসে পায়নি তোমার?

না, সঙ্গে কটা আছে।

চুর্কল চেহারার পূর্বোক্ত মহিলাটি হিটারের ওপর হাজতাবে খুঁকে পড়ে বললেন,—দেবার মত বিশেষ কিছু নেই আমাদের; সামান্য যা আছে ছুটি হুখে দেবে এস। এই মাতালদের পাল্লার পড়লে সারা রাত পেটে কিছু পড়বে সে ভরসা নেই। এদিকে চী-এর পাশে বসে পড়।

এই কিছু—এদিকে মদ ফুরিয়েছে। পাশের ঘর থেকে এক জহ্নলোকের সঙ্গে গেলাম। কিছু যি 'বাই' বলে দশ বোতল খেনো মদ একটা ট্রয় ওপর বসিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এস।

হোটেলকর্তা তাকে মারপথে ধামালেন—এক মিনিট দাঁড়াও, আমাদের এখানে হ'বাক্তল বেখে যাও। পরে মুহু হেসে বোগ দিলেন—তোমার কিন্তু একটু কষ্ট দেব। সজুইয়ার কাছ থেকে দু'বাটি ছুড়ল নিয়ে এস। বাবে আর আসবে।

আমি চী-এর পাশে বসে পড়ে হিটারে হাত শেকতে লাগলাম। আয়াস করে বসো, এই নাও কুশন, দিবা ঠাণ্ডা পড়ছে—না? মদ খাও না তুমি? মাদাম, প্রথমে বোতল থেকে মদ ঢেলে নিজের পেরোলা ভণ্ডি করলেন, পরে আমাদের হ'জনের পেরোলাও ভরে দিলেন। আমরা তিনজনে নীরবে পান করতে লাগলাম। আশ্চর্য অন্তরঙ্গ হয়ে মাদাম বললেন—তোমরা দুজনেই কল খেতে অভ্যস্ত দেখছি!

সামনের দরজা খোলার শব্দে চেয়ে দেখি, এক তরুণ যুবা বলাছে—মিষ্টার উয়েহারার, মাসিক এমন কিপটে বে, কিছুতেই বিশ হাজার ছাড়তে রাখী হল না, শেব অবধি কোন বকমে দশ হাজার বাগিয়ে এনেছি।

ডেক? মিষ্টার রক্ত গলার হজ্জার দিলেন।

না, মাপ করবেন। নগদ।

ঠিক আছে, আমি একখানা বসিদ দিয়ে দেব'খন। দলের আর পাঁচজন একটানা গিলোটিন, গিলোটিন, হু-হু-হু পেরে চলল। এমন অবস্থা বে, কথাবার্তার যাবেও থামে নই।

মাদাম বখেট চিন্তিত ভাবে সীকে জিজ্ঞেস করলেন,—নাওজি কেমন আছে?

টী-এর গালে লাসের হোশ লাগল—ইতস্তত করে জবাব দিল—
কি করে জানব বল ? আমি তোমার পার্শ্ববর্তী নই।

আলৌ বিচলিত না হয়ে মাদাম্ আবার বললেন—মনে হয়
সম্প্রতি মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে তার কোন গুণগোল হয়েছে, নইলে
হুজুনে তো ব্যবহার একসঙ্গে থাকেন।

তুনেহি আত্কালা সে নাট শিখছে, সম্ভবতঃ কোন নাটওয়ালীর
পাল্লার পড়েছে।

নাওজি বড় বেহিসেবী, মদের ওপর আবার মেরেমাছুব !

মিষ্টার উয়েহারা এই রকমই বন্দোবস্ত করেছেন।

একবারে গোলায় বাবে ছেলোট, এখন ওর মত নষ্ট ছেলে একবার
এ হাজার পা বাড়িয়েছে—

হুহ হেসে আমি বাগা দিতে বাধ্য হলাম। চুপ করে শোনা
উচিত হবে না মনে করে বললাম—মাপ করবেন, নাওজি আ
জাই।

মাদাম্ অপ্রস্তুত হ'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। টী
কিন্তু সহজ গলায় বলল—তোমাদের চেহারাও কিন্তু খুব সাদৃশ্য আছে।
তোমার বাইরে কাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি এক মিনিটের জন্যে চমকে
উঠেছিলাম, মনে হয়েছিল সেই বৃষ্টি।

মাদামের গলায় স্বরে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল।

হ্যাঁ তাই তো। তাহ'লে তুমি এই নরকে এলে কেন ? মিষ্টার
উয়েহারার সঙ্গে আলাপ ছিল বৃষ্টি ?

হ্যাঁ বছর ছয়েক আগে আমি ঠিকে একবার দেখেছিলাম—আমার
গলা-বুকে এল, চোখ নীচু করলাম।

হুডল হাতে কি দেখা দিল, এত দেবী হয়ে গেল, ভারী লজ্জার
পড়ল।

মাদাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ঠাণ্ডা হবার আগে
খেয়ে নাও।

ধন্যবাদ, বলে হুডল-এর ধোঁয়ার মধ্যে মুখ শুঁজে দিয়ে চটপট
খেতে শুরু করলাম। বেঁচে থাকার অসীম হুজু আমি বেন
জীবনে এই প্রথম এমন গভীর ভাবে অনুভব করলাম।

অকুট কাঠে গিলোটিন, গিলোটিন, স্ত্র, স্ত্র, স্ত্র, গুন্‌গুন্‌ করতে
করতে মিষ্টার উয়েহারা ঘরে ঢুকলেন। আমার পাশে ধপ করে ব'সে
পড়ে নীরবে একখানা মস্ত খাম মাদামের হাতে তুলে দিলেন।

খামে কি আছে না দেখেই মাদাম সেটিকে দেয়ালে চালান
করলেন। হাসিমুখেই বললেন—ভেরো না এতেই তুমি পার পাবে।
আমাকে কীকি দিয়ে পালাতে পথ পাবে না।

হবে, হবে, সামনে বছর সব শোধ করে দেব।

এও কি বিশ্বাস করতে বল ?

দশ হাজার ইয়েন্—কত অল্পস্র বালব কেনা যায় ঐ দামে।
ঐ টাকার আমার মত মানুষ একটা বছর হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে
পারে।

এই শোকস্তোর মাথার ছিট আছে, কিন্তু বোধ হয় ঠিক আমার
যে দশা, এদেরও তাই। এমনি করে বাঁচতে না পারলে এরা মরে
যাবে। একথা যদি সত্যি হয় যে, এ পৃথিবীতে জন্ম নিলে মানুষকে
বা হোক করে জীবন কাটিয়ে যেতেই হবে, তাহ'লে তার বেঁচে
থাকার প্রয়াস, হোক না। কদর্য—নিজের চেহারা মত বিকৃত,

তবু তাকে বোধ হয় বুণা করা উচিত নয়। শুধু বেঁচে থাকা, শুধু
প্রাণ ধরনের দ্বানি এ এক পর্যন্তপ্রমাণ দায়িত্ব—বার সামনে
মানুষ বোকার মত ক্যাল-ক্যাল করে শুধু চেয়েই থাকতে পারে।

বাই হোক—পাশের ঘরে এক ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—
এখন থেকে টেকিকির মানুষ যদি মৌখিক ভদ্রতামাত্র বজায় রেখে,
অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করতে না পারে, তবে
শিক্ষিত মহলের সর্বনাশ ঘনি়ের আসবে। আজকের দিনে সমান,
বিবাস আদি গুণাবলি লোকের কাছে আশা করা হুঁশ'তা। এ বেন
কীসিকার্টে বোলানো মানুষকে ঠার ঘরে টান মারা। শ্রদ্ধা ?
সত্যতা। বাজু কথা। এরা তোমার যদি আর্থে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে,
তবে তোমার আর রক্ষা নেই। আজ জীবনসমূহের ওপর দিয়ে
আলগোহে গা ভাসাতে না পারলে তিনখানি মাত্র রাজা খোলা
থাকে—গ্রামে ফিরে চাবাস করা, আত্মহত্যা করা, অথবা বেস্তাবুতি।

আর একজন বললেন—যে হতভাগা এ তিন হাজার একটাও
নিতে পারে না, তার জন্যে শেষ রাজা খোলা আছে—উয়েহারার
কাছে ধার করে পাঁচ মাতাল হ'রে পড়ে থাকা।

গিলোটিন, গিলোটিন। স্ত্র, স্ত্র, স্ত্র।

আধচাপা গলায় মিষ্টার উয়েহারা জিজ্ঞেস করলেন—এখানে
তোমার রাত কাটাবার কোন ব্যবস্থা নেই বোধ হয়। আছে ?

আমি ? মনে হ'ল একটা সাপ নিজেকে ছোঁবল সেবার জন্য
মাথা খাড়া করে উঠেছে। বিরোধ। বিজাতীয় বুণার আবার
সারা শরীর শক্ত হ'রে উঠল।

আমার এই বিতৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন
করলেন—আমাদের সকলের সঙ্গে একঘরে শুতে পারবে ? বাইরে
বা দাক্ষণ নীচ।

মাদাম বাগা দিয়ে বললেন—না, অসম্ভব। তোমার ছদয় বলে
কোন পদার্থ আছে ?

মিষ্টার উয়েহারার দাঁতের গোড়ায় জিভ ঠেকিয়ে বিরক্তি সূচক শব্দ
করলেন—তাহলে ওর এখানে আসাই উচিত হয়নি।

আমি চুপ করেই রইলাম। তাঁর গলায় স্বর আমার সেই
বুহুর্ভে বৃষ্টিয়ে দিল যে, আমার সব চিঠিই উনি পড়েছেন এবং
সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, আমার প্রীতি ভদ্রলোকের তুর্কলতার
অন্ত নেই।

তিনি বললেন—উপায় কি এখন ? ফুঁকির ওখানে একখানা
বিছানায় ব্যবস্থা হ'তে পারে। টী, এঁকে সেখানে নিয়ে যাও—
কেমন ? না, হুটি মেয়ের পক্ষে এত রাতে পথে বেরুনা ঠিক হবে
না। কী ভালো ! আমার নিজেকেই বেতে হল দেখছি।

পথে বেরিয়ে বেশ বোকা গেল রাত প্রায় মারবরার পৌছেছে।
বাভাসের বেশ কমেছে, তারারা আকাশ জাঁকিয়ে সভা ভেঙেছে।
আমরা পাশাপাশি হেঁটে চললাম।

আমি বললাম—অন্তদের সঙ্গে বেশ শুতে পারতাম। মিষ্টার
উয়েহারার দুহুচোখে বোঁৎ-বোঁৎ করে উঠলেন। হুহু হেসে আমিই
আবার বললাম—আপনি ইচ্ছে করেই আমার সঙ্গে এলেন—
তাই না ?

বিরক্ত হাসিতে মুখ বিকৃত করে জবাব দিলেন—সেই তো হয়েছে
হুহু-হালা।

সবেশে অল্পতব করলাম, তবলোক আমার প্রেমে পড়েছেন।
আগনি দেখছি দারুণ ধন ধান। এই কি যোজ্য যাতব্য ব্যবস্থা?

প্রত্যেক দিন। ভোর থেকে শুরু হয়।

মদ এত ভাল লাগে?

বিল্লী গক!

গলার বরে এমন কিছু ছিল, যা শুনে আমি শিউরে উঠলাম।
আপনার কাজ কেমন চলছে?

খুব খারাপ। এখন বাই লিখতে বসি, তাই বোকার মত
হিঁচকিগুনে হয়ে পড়ায়। জীবনে সন্ধ্যা, শিল্পজগতে সন্ধ্যা,
মানবজাতির সন্ধ্যা। কি চরম অধঃপতন!

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—ইউট্রেলো।

হ্যা ইউট্রেলো। লোকে বলে তবলোক আজও জীবিত আছেন—
কিন্তু মদ এখন তাঁকে খাচ্ছে। কক্সলসার দেখ। গত দশ বৎসর
যাবৎ তাঁর ছবি অবিস্মৃত রকম অল্লীল এবং ততোধিক জঘন্য ছবি
আঁকছেন তবলোক।

শুধু ইউট্রেলোই নন—বৈশীরা ভাগ প্রতিভাবান লোকেরই আজ
এই দশা—না?

হ্যা—তাঁদের স্বজনশীর্ণকিতে ভাটা পড়ছে। কিন্তু নতুন বার্য,
তাদের ঐ একই অবস্থা, কুড়িতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। তুঘারঘাত!
যেন অকালে তুঘারঘাত হয়ে শারা ছুনিয়াটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

হাঙ্কা হাতে আমার কাঁধ বেঁধে করে আছেন। এ যেন তাঁর
গরম আচ্ছাদনের অন্তরালে আমার রক্ষা করার প্রয়াস। একে
প্রত্যাখ্যান করার শক্তি আমার কই? হাঁটতে হাঁটতে তার
আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ঘনীভূত করে আনলাম।

পথের পাশে বৃক্ষশাখার দল, পত্রমাত্র-বিবর্জিত অবস্থায় তার
দল বেঁধে রাস্তার আকাশ ভেদ করে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। তার
হৃদয় ডালগুলি—না? নিজের মনেই বললাম।

কেমন যেন না-বোঝা স্তরে প্রশ্ন করলেন—তুমি বলতে চাও—
এই কালো-কালো ডালগুলির সঙ্গে ফুলের মিতালির কথা,—
তাই না?

না। ফুল, পাতা, কুড়ি কোনটাই না। আমি ভালবাসি
গাছের ডাল। সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থাতেও তারা সম্পূর্ণ প্রাণরসে সিক্ত।
মরা ডালের সঙ্গে এদের কত তফাৎ!

অর্থাৎ একমাত্র প্রেক্ষিতের প্রাণরসের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ
আছে এই তো? বলতে গিয়ে তবলোক কয়েকটা প্রচণ্ড হাঁচি
লিগলেন।

আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে?

না, তা নয়। আমাদের মদের নেশা যখন চরমে ওঠে তখন
এমনি হাঁচি। এ যেন আমার নেশার পরিমাপ যন্ত্র।

আর প্রেম?

কি?

তেনম কেউ আছে কি? এমন কেউ যে আপনায় অল্পবয়সের
শিখরে উঠেছে?

ঠাটা করে না আমার নিয়ে। মেয়েরা সব সমান। এমন
কটিল তাদের মনোভাব। গিলোটিন, গিলোটিন সু-সু-সু।
যান্ত্রিকই একজন আছে; না ঠিক একজন নয়, আধ জন আছে।

টিটিওলো পড়েছিলেন!

সব।

আপনার কাছ থেকে কি রকম উত্তর আশা করতে পারি?

আসলে বমেদি চালে আমার অকচি। সব ব্যাপারেই তাদের
কেমন যেন উদ্ধত, নাক-উঁচু ভাব। সেদিক থেকে তোমার ভাই
নাওজি যথেষ্ট উৎসে গেছে, কিন্তু সে-ও মাঝে মাঝে এমন জমিদারী
মেজাজ করে যে, আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে।

এই রকম ছোট নদীর পাশ দিয়ে গেলেই ছেলোবেলার গাঁয়ের
নদীতে জাল বেলে মাছ ধরার কথা মনে পড়ে, বুকের ভেতরটা
হালাকাব করে ওঠে।

অন্ধকারে অস্পষ্ট শব্দ করে বয়ে চলেছে এক ছোট নদী, আমদা
তার পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম।

তোমরা বড়লোকেরা শুধু যে আমাদের দৃষ্ট বোঝ না তাই না,
উপরন্তু বুগা কর।

তাহলে তুর্গেনিডকে কি বলতে চান?

সে-ও তো তোমাদেরই দলে—ওর প্রতি আমার যথেষ্ট বিতৃষ্ণা
আছে।

তার স্পোর্টস ম্যান্স কেচেস?

হ্যা, ওর ঐ একমাত্র বই মন্দ হয়নি বলা যায়।

গ্রাম্যজীবনের বেনমায় ভয়া বইখানি।

বেশ, মানসাম তিনি গ্রাম্য অভিজ্ঞতা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এই
বার হ'ল তো?

আমিও গ্রামের মেয়ে। জমি চাষ করি, একেবারে গরীব চাষী
মেয়ে।

তুমি কি এখনও আমার ভালবাস? এবার তাঁর গলা ক্লক হয়ে
এল, এখনও কি তুমি সন্তান কামনা কর?

এও উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

পাহাড়ে যেমন ধন্য নামে, তেমনি হঠাৎ তাঁর মুখখানি আমার
মুখের ওপর মেখে এল। সশব্দে আমার চূষন করলেন। সেই
চূষনের ভেতর দিয়ে তীব্র কামনার আভাব পেলাম। গ্রহণ করতে
গিয়ে আমার চোখে জল এল। গভীর লজ্জায় আত্মগোপনিত সে কারা।

স্ত্রীরোগ, ধবল ও

বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয়
রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার

পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর রায়শম্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

সন্ধ্যা ৩।—৮।টা। কোন নং ৪৫-১৩৫৮

আমার অন্তরের অন্তর্ভুক্ত ভেঁসে করে চোখের ভেঁসের দিগে বস্তুর মত নেমে এসে।

পাশাপাশি চলতে গিয়ে তিনি বললেন—একটা কাঁচই করে ফেললাম। বুড়ো বয়সে তোমার প্রেমে মজ্জা গেলাম। নিজের মনেই হেসে উঠলেন ভ্রমলোক।

আমার কিছ একটুও হাসি পেল না। জু কুণ্ঠিত, অধর কুণ্ঠিত, আমার সে সময়ের মনোভাব ভাবার ব্যস্ত করলে এই পাঁড়ার—অগত্যা।

আমি যেন অন্ধকারে একা চলছি।

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—ভ্রমলোক বললেন, কি বল মহলা চলবে?

থাক, আর অভিনয় করতে হবে না। শরতান। মিষ্টার উয়েহারার বুদ্ধিবৃত্ত হাত আমার স্বকলমে নেমে এসে। আবার এক বৈরাট হাঁচি।

মিষ্টার ফুকির বাড়ীতে সবাই শুয়ে পড়েছে মনে হ'ল। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম! মিষ্টার ফুকি টেলিগ্রাম এসেছে। মিষ্টার উয়েহারার চোঁচামেচি করে দরজার দাঁড়া দিতে লাগলেন। কে? উয়েহারার ছুমি? পুকবকে সাড়া পেলাম। হ্যাঁ আমি। রাজপুত্র রাজকন্তা এসেছে এক রাতের আশ্রয়ের আশায়। বাইরে এত শীত যে হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। প্রেমের অভিসারের এ কি হাতকর পরিণতি!

সদর দরজা খুলে গেল। টাক মাথা, গরগারে রং-এর পাঞ্জামাশরা এক পঞ্চাশ বছরের বুড়ো—কেমন যেন সলজ্জ হাসি হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। মিষ্টার উয়েহারার ঘরে ঢুকে কোট না খুঁলেই অভিযোগ করলেন—কিছু মনে করে না, তোমার ইন্ডিওঘরখানা বড় ঠাণ্ডা, বোতলার খর আমার চাই। চল এস। বলে আমার হাত ধরে হলঘরের প্রান্তে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চললেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমার একখানা অন্ধকার ঘর পেলাম, মিষ্টার উয়েহারার স্নাইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

আমি বললাম, এ যেন হোটেলের নিভৃত খাবার ঘর—তাই না?

নতুন বড়লোকের রুচি আর কতই বা ভাল হবে? তবু ফুকির মত বাজে মার্কা আটিন্টের পক্ষে এও বাড়াবাড়ি। ভাগ্য যখন তোমার খুঁজে বেড়ায়, তখন আর পাঁচজনের মত পতনের ভয় থাকে না। এই সব লোকদের খাড় ভাঙ্গাই উচিত। বাই হোক শুয়ে পড়, এখন শুয়েই পড়।

এ যেন ঠাণ্ডা নিজের ঘর-বাড়ী, এমনি ভাবে আলমারি থেকে বিছানাপাত্র টেনে-টুনে বের করলেন। ছুমি এখানে ঘুমোও—আমি তবে আসি। কাল সকালে এসে তোমার নিরে খাব। নীচে নেমে ডানহাতি কলঘর পাবে।—সিঁড়ি দিয়ে এমন প্রচণ্ড শব্দ করে নেমে গেলেন, যে মনে হ'ল, গড়িয়ে পড়েই গেলেন বুকি! ব্যস এই পর্যন্ত। এর পর চারিদিক নিস্তক, নিস্ততি।

আলো নিবিয়ে—বাবার বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন ভেলজেন্টের কোটখানা খুলে কিমনো পরেই বিছানার চুকে গড়লাম। বেশশী কোমরবন্ধটা শুণু ঢিলে করে নিলাম। ক্লান্তির মুখে মদ খেয়ে

শরীরটা তার হয়েছিল, সহজেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কোম সময়ে ঠিক মনে দেই চোখ খুলে দেখি, ভ্রমলোক আমার পাশে শুয়ে। আর ঘণ্টাখানেক নীরবে-খুঁজ করে, শেষ অবধি ওর জন্ত মায়া হ'ল, আত্মসমর্পণ করলাম।

আপনার জীবনে এই কি একমাত্র গাধনা?

ঠিক তাই।

কিছ এতে আপনার শরীর খারাপ হয় মী? আমার ধারণা আপনার কাশির সঙ্গে যুক্ত উঠেছে।

কি করে বুঝলে? সত্যি সেদিন সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছি—অবশ্য একথা কেউ জানে না।

মাগের মৃত্যুর আগে এই বকম গল্প পেয়েছিলাম।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে মদ খাই। দুর্ভিক্ষ, অন্ধকারময় এ জীবন বুখা। দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, জড়তা দ্বন্দ্বের বিদীর্ণ করে। তোমার চার পাশের দেওয়াল থেকে যে হাহাকার ওঠে, তা থেকে ধরে নিতে পার। এ ছুনিয়ায় তোমার জন্ত কোন সুখ আর অবশিষ্ট নেই। সব শেষ। মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে ছুনিয়াতে বেঁচে থেকে কোন সুখ বা স্বপ্নের মুখ দেখতে পাবে না, তখন তার কি অবস্থা হয় বলতে পার? এ কি প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রাম! এ শুণু ক্ষুধার্ত প্রাণির মূখে আগের বোগান দেওয়ার পণ্ডপ্রম। অসংখ্য মানুষের এই যে বেদনা, এ-ও কি অভিনয়?

না।

একমাত্র প্রেমই অমূল্য,—ঠিক যেমনটি তুমি চিঠিতে লিখেছ।

হ্যাঁ।

আমার প্রেমের বাতি ফুৎকারে নিবে গেল।

যদি যখন সম্প্রতি আলো হ'ল, দেখলাম সেই ঘুমন্ত মানুষের চেহারা। দেখলাম মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে চরম ক্লান্তির ছায়া। এ বুধ বলির পতন: এক অমূল্য বলিগান। আমার প্রেমোপ্পাদ। আমার রামধনু। আমার সন্তান। ঘুণা পুস্তক। ব্যভিচারী পুরুষ।

কেন হ'ল এই অপূর্ণ মুখখানার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই। পুনর্জীবিত প্রেমের উত্তেজনার আমার অন্তরাঙ্গা কেঁপে উঠল। চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি তাঁকে চুম্বন করলাম।

প্রেমের কি মধ্যান্তিক প্রহসন।

মিষ্টার উয়েহারার চোখ বন্ধ রেখেই আমার বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। ভুল, আবার ভুল করলাম। চাবার ছেলের কাছে এর বেশী কী-ই বা আশা করা যায়!

এর পর শুঁকে ছেড়ে বাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

এতদিনের সুখের সন্ধান পেয়েছি। যদি চার পাশের দেওয়াল ভেদ করে হাহাকার ওঠেও, তবু আমার সুখের মাত্রা চরমেই থাকবে। আনন্দে আমার হাঁচতে ইচ্ছে করছে।

মিষ্টার উয়েহারার হেসে উঠলেন,—কিছ বড় বেশী দেরী হ'য়ে গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

সবে ভোর হ'ল।

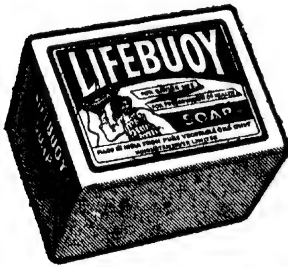
সেই দিন সকালে আমার ভাই নাগজি আত্মহত্যা করে। [ক্রন্দন]

অনুবাদ: কল্পনা রায়।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।

খেলাধুলোই বলুন বা কার্জকর্মী
বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে
নিরাপদ নয় । আর ময়লা বহন
করে রোগের বীজানু বা সবসময়
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-
কর । লাইফবয় সাবান এই
বীজানুগুলি ধুয়ে সাক করে
দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য
সুরক্ষিত রাখে ।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
এটি আপনাকে এত বরবারে করে তোলে ।



হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত ।

L.P. 2-X58 BQ

সাপমুক্তি



ঐতর্য্যেস্তম্ভে শম্মাচার্য্য

এঃ, সত্য কি তারা এসেছে ?

হ্যাঁ, তারা এসে গেছে। তাদেরই পায়ের শব্দ পাচ্ছে শীলা। ফিস-ফিস কথার আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। ভয়ে বুকা বেন কুঁকড়ে যায়, তাইত মৃত্যুভেরা তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। জাঙ্গলে বা গুনেছে, বইতে যা পড়েছে, তা সত্যি ? পরলোক আছে— প্রেতলোক আছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা নিয়ে যেতে আসে। মৃত্যুভেরা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে ?—জাতকে গুঁঠে শীলা।

দরশের অশর পারটা তার মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। কই ? শীলা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। চোখ মেলে তাকাতে চায়, কিন্তু পাবে না। দেহটা বেন অসাড় হয়ে গেছে। নড়বার চড়বারও শক্তি হারিয়েছে শীলা। শশর ও আভঙ্কে শীলা চক্কল হয়ে গুঁঠে। সত্যি কি জন্মের মত এ জগৎটাকে সে ছেড়ে চলে যাবে ? সত্যি তার মৃত্যু হয়েছে ?

না, না, না। তাহলে এ কি হল ? ভাবতে গিয়ে সবই গোলমাল হয়ে যায়। সত্যি কি সে গটাসিয়ার সারেনাইড খেয়েছিল ? না, সে তা পায়নি। শুধু তারই উদ্ভোগ করছিল শীলা। অনেক কষ্টে অনেক ছলনার বৈজ্ঞানিক বামীর গবেষণার থেকে তা চুনি করে এসেছিল।

শীলাই মনে পড়ছে, সে ত টেবিলের বায়ে বসে চিঠি লিখছিল।

সেই মারাত্মক শেষ চিঠি। কিন্তু চিঠি লেখা তার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা ঘুরে গেল। টেবিলের ডয়ারেই সেই সাংঘাতিক জিনিসটা ঘেঁষে দিয়ে চিঠি লিখতে বসেছিল শীলা।

চিঠির শেষের কথ—“মৃত্যু আমার মুক্তি দেবে কি না জানি না : কিন্তু তোমার ক্ষমা পোলেই আমি মুক্তি পাব।”

চিঠি শেষ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল শীলা। তমনি উয়া-উয়া-উয়া,—পাশের কোন্ এক বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল সজ্ঞাজাত শিশুর কাণ্ড। আর তার সঙ্গে শাঁখের আওয়াজ আকাশ-বাতাসে নব জীবনের বার্তা বোষণা করছিল। দুপুরের শুষ্ক বাতাসও বেন মৃদু হিল্লোলে স্বাগত জানাচ্ছিল সেই নবাগত মানব-শিশুকে।

তার নিজের বুক চিরেও বেন উয়া-উয়া কাণ্ডের শ্রোত বের হয়ে এক ‘মুক্তিমান’ শিশুর রূপ ধরে শীলার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। ফুটন্ত কমলকলির মত সে মুখখানি। সেই মুখে চুমা খেতে গিয়ে সব ভুলে গেল শীলা। সেই শিশুর বাহুবন্ধনে শীলার দম বন্ধ হয়ে গেল। কিছুতেই তাকে ছাড়তে পারলে না শীলা। আর ত কিছুই তার মনে পড়ে না।

মরতে চেয়েছিল শীলা। কিন্তু এ কি হয়েছিল তার ? সে কি মনের দুর্বলতায় এসব বিভীষিকা দেখেছে ? তাহলে কি এ অবস্থায় জন্মের থেকে বের করে সেই সাংঘাতিক জিনিসটা সে মুখে ঘিরেছিল ? এরকম কিছুই তার মনে পড়ে না।

তবু মনে শশর জাগে,—সত্যি কি সে মুক্তি পেয়ে গেছে ? মাটির পৃথিবী থেকে সত্যি কি সে চিরবিলায় নিয়ে চলে যাবে ? হ্যাঁ, তার সে চিঠি পড়ে প্রশান্তির মনে কি হল, তা জানতে চায় শীলা। নিশ্চয়ই যুগায় প্রশান্ত তাকে আভিলাপ দেবে। না, না, প্রশান্ত তাকে ক্ষমা করবে।

ফিস-ফিস কথার আওয়াজ শীলার কানে ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই মৃত্যুভেরা কথা কইছে। কই, কোথায় তারা ? কিছুই দেখতে পাচ্ছে না শীলা। সবই বেন অন্ধকার ! মনে মনে ভাবে,— সে নিজেও অশরীরা হয়ে গেছে। তবু কেন দিতে অবদান এসেছ ! তার মনে হল,—দেহের মধ্যেই সে এখনও হটকট করছে। তাহলে আত্মাটা দেহ ছেড়ে এখনও যেতে পারে নি !

কিন্তু এ কি হল ? সে যে বিচ্ছিন্নায় শুয়ে আছে। নরম বিছানায় বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে শীলা। কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে ! এ ঘরেও বিছানা ছিল না ! আর প্রশান্তর এখনো ফেরবার সময় হয় নি।

দুপুরবেলা প্রশান্ত কলকে চলে গেছে। দরজা ত্রেজির দিয়ে নিরিবিলিতে চিঠি লিখছিল শীলা :—শেষ বিপারের চিঠি। প্রশান্তর কাছে তার অভিশপ্ত জীবনের স্বীকৃতির কথা জানিয়ে মার্জনা চেয়েছিল শীলা।

আত্মহত্যা ছাড়া যে আর কোম উপায় ছিল না। আত্মভোলা বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্ত। এমন হুল্লর ময়ূর স্বভাব বামীকে সে স্বীকৃতি করতে পারল না। প্রশান্তকে হতলা করে নিজের পাশের বোকা বাড়িতে চামুনি শীলা।

অতীতের সব কথা মনে পড়ায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শীলা। সোমার বয়ে বিতোর হয়ে সে হস্ত বড় ভুল করেছিল। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে আজ করছে। এ ছাড়া যে কোম উপায়ই ছিল না।

সমীর তার সর্বনাশ করেছে। শুধর অত-শত বৃথতে পারেনি
শীলা। সমীর তার দেখে-মনে কি এক উদ্ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছিল।
শীলা সে উদ্ভাবনায় আত্মসমর্পণ করেছিল। সমীরকে বিশ্বাস করেই
মিজের সর্বনাশ সে নিজেই ডেকে এনেছে। সমীর আশ্বাস দিয়েছিল;
সেই সমীরই করেছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

বে সমীর জাত মানে না, ধর্ম মানে না, সমাজ মানে না।
সেই সমীরই বাপ-মায়ের দোছাই দিয়ে দূরে দূরে গেল। জাম্বের
মেয়েকে তার বাপ-মা ঘরে তুলবেন না; বরং সমীরকে ত্যাগপত্র
করবেন।

সমীরের বুক মাথা বেধে শীলা কত কৈশেছে। এমন কি
তার পা ছুঁতে জড়িয়ে ধরে তাকে উদ্ধার করতে বলেছিল।
সমীরের সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল শীলা। মিথ্যা আশ্বাসও
দিয়েছিল সমীর। কিন্তু শেষ কালে সমীর গাটাকা দিয়েছিল।

অধ্যাপক শিবনাথের একমাত্র বন্ধা শীলা। আপনভোলা
খবিতুল্য অধ্যাপকের ছাত্রেরা তাঁর অধ্যাপনায় মুগ্ধ। কথায়-বাতায়,
উঁসাই উদ্ভাপনায় তিনি ছেলেরের মাতিয়ে তুলতেন। শীলার অস্ত
জাইবোনও ছিল না। সমীর কলেজে উপরের ক্লাশে পড়ত। কলেজেই
তার সঙ্গে শীলার আলাপ হয়। শিবনাথের ছাত্র বলে শীলাদের
বাসগৃহেও তার সেই স্ত্রে বাতায়াত সুর হয়ে যায়। বছর কয়েক
আগে শীলা তার মাকেও হারিয়েছে। প্রায় এই নিঃসঙ্গ জীবনে সমীর
এক আনন্দের ঈচ্ছা নিয়ে ছাঙ্কির হল। তাদের দুজনের যোগাযোগ
শিবনাথ খুশীই হতেন বলে মনে হয়েছিল।

উত্তির ঘোঁরনে সমীর দ্বারা-মহাচিকার মত শীলার চোখ ধাঁধিয়ে
ছিল। আত্মভোলা অধ্যাপক সে খবর রাখেন নি। সমীর ভাল
ছেলে। তার উপর শহরের নামজাদা এডভোকেট হাবিল মুখোব্বার
একবার ছেলে সে। হরত প্রজ্ঞুর কোন আপত্তি মনে মনে
পোষণ করতেন শিবনাথ।

অজ্ঞানী অধ্যাপক শিবনাথের কল্যকে জ্ঞান চরিত্র মুখোব্বার
ঘরে তুলতে পারেন, এমন চুরাশাও হরত শিবনাথ করেছিলেন।
আজকাল ত এ রকম প্রায়ই ঘটে থাকে। আর শীলা অত-শত
চিন্তাও করেনি। সমীরই শেষ মুহুর্তে তাকে শেষ আঘাত দিয়ে
তা জানিয়ে দিলে।

নিজের অপরাধের বোঝা পড়ের বাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সমীর
সরে পড়ল। শীলা কোন উপায়টি দেখতে পার না। এমন সময়
নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। হাব, মা যদি বেঁচে থাকতেন!

বিজ্ঞানী অধ্যাপক কি ভাবলেন বুঝা গেল না। সমীর দ্বারা
আসে না। তিনি হরত ভাবলেন,—শীলা সমীরকে প্রচণ্ড কষ্ট
পায়বে না। কিন্তু মেয়ের মনের কোন খবরই তিনি রাখতেন
না। রাখবার কোন উপায়ও ছিল না। এমন সময় এল প্রশান্ত।
বিজ্ঞানের ছাত্র প্রশান্ত; নূতন অধ্যাপক হয়ে সে কলেজে এসেছে।
শিবনাথেরই প্রাক্তন ছাত্র প্রশান্ত। শিবনাথের গবেষণায় সচরোগী
হল। শিবনাথের গৃহে প্রশান্তের আনাগোনা চলল। শীলার সঙ্গে
তার পরিচয়ও হল।

শীলার মনোজগতে তখন ভয়ানক তোলপাড় চলছে। নিজেকে

বুকে সর্দি বসেছে ?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায়
ভেপোলীন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।
কারণ ভেপোলীন হকের মধ্য দিয়ে এক নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের
ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে
মাথাধরা ও গলাধরায়, ব্যথা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য
মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৬, কলিকতা-১

বোরোলীন প্রস্তুত কারকের সামগ্রী

দুখিরে দাঁখতে চার শীলা। অতঃপ্রশান্তর আকর্ষণ সে এড়িয়ে থাকতে পারে না। নিজের নিষ্কৃতির উপায় খুঁজতে শীলা; এর দ্বারা প্রোশান্ত এসে পাড়িয়ে সবই তুলু করে দিলে।

হঠাৎ একদিন শিবনাথ তরানক অনুরূপ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার। বলে গেছে,—এই হলো হাটের আটাক। খুব সাবধান থাকতে হবে।

এই অনুরূপ জরতীর শীলার অভ্যে বেলী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শিবনাথ। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে লাগলেন শিবনাথ,—জানি ত চলার; কিন্তু তোম কি উপায় হয়ে যা?

ঠিক সেই সময়ে প্রোশান্ত এসে হাজির হল। শিবনাথের কথা তার কানে গিয়েছিল। প্রোশান্ত বললে,—শীলার জন্ত আপনি যত্ন করেন না মা। আপনি আগে সেয়ে উঠুন।

হঠাৎ মাটীর ভাঙিতে এক কচটমীর ব্যাপার ঘটলেন শিবনাথ। তিনি শীলার হুটি হাত প্রোশান্তর হাতে দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন,—তুমিই এর তার নাও প্রোশান্ত। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা সুখী হবে।

শীলা বাধা দিতে পারেনি। তবে কোন কথা বলতে পারেনি শীলা। পরের দিনই বিবিসম্বত ভাবে শীলার সঙ্গে প্রোশান্তর বিবাহ হয়ে গেল। শীলা অনেক ভেবেছে। প্রোশান্তকে সব কথা লিখে জানিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। দুমুখ পিতার মুখের দিকে চেয়ে সে সাকল্য তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

শিবনাথ যে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসলেন, শীলা তা ভাবতেও পারেনি। সেদিন রাঙেই আত্মহত্যা করত শীলা। এ কি করলেন তার বাবা? সমাজ, বন্ধুবান্ধব এমন কি প্রোশান্ত পর্যন্ত তার কাছে সেদিন হুঁশিয়ারি বিতরিকা হয়ে উঠল।

উপায় চিন্তা করতে লাগল শীলা। না, না, তাকে বাঁচতে হবে, হলনার অভিনয়ে নামল শীলা। এ প্রোশান্তকে আঁকড়ে ধরেই তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে তার দুমুখ পিতাকে; হলনার অভিনয় ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই।

প্রোশান্তর হাত ধরে নৃতন জীবন শুরু করল শীলা। অদ্ভুত এ মাহুটি! সলা হাসিমুখ। একান্ত শীলার উপরই তার নির্ভর। প্রোশান্তর আশ্রয়নে আর তার মাথুখে শীলা মুগ্ধ হয়ে গেল। নিজের কপট হলনার কথা ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝে জাঁকে ওঠে শীলা। মনে মনে ভয়,—বদি এ হলনা ধরা পড়ে? এ মাহুটিকেও কি শীলা আঘাত দেবে? প্রোশান্ত কি তাকে কমা করতে পারবে? এ কি কোন মাহুতের পক্ষে,—কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব?

না, না, না। প্রোশান্তকে সে আঘাত দিতে পারবে না। প্রোশান্তকে শীলা ভালবাসে। অতীতের ভুল-একটা হেসেখেলা মাত্র। তা কি শোধন বার না? যেহেতু জন্মানে কি একই অপরাধ? কি করে? সে অপরাধী হয়েও নির্দোষ। সমাজে উচ্চ আদর্শ পাবে সমীর। গ্রী-পুত্র নিয়ে সে সুখী হবে। আর তাইই পাণের বোকা শীলাকে গিয়ে মারবে।

শীলা অতীতকে ভুলে বেতে চার। কিন্তু অতীতের সাক্ষ্য সে বহন করেছে। এ যে জীবন্ত সাক্ষ্য। এ সাক্ষ্য যে ঘুরে-ঘুরে শীলায় নাই। তারই দোষে তার বাবা আর তার পিতা। তারও পাড়াবার টাই থাকবে

না। ঘরে-বাইরে কোথাও পাড়াবার টাই নাই শীলার, মনে করলেও পা শিঙিয়ে ওঠে। এই ত আমাদের সমাজ। কেন, জন্ত দেশে ত এমন হয়।

একপ অভ্যর্থনের মধ্যেও টিকে থাকে শীলা। দুমুখ শিবনাথের মেবার তার হৃদয়েই এখন ব্যস্ত। কখন যে কি হয় বলা যায় না। মামবানেকের মধ্যেই তার সমাপ্তি ঘটল। শিবনাথ মারা গেলেন। এবার অস্থির হয়ে উঠল শীলা। না, আর ত কোন বাণী হইল না। নিজের অপরাধের বোঝার আরেকজন সিবরী লোককে বিব্রত করা তার উচিত হবে না। হলনার হুণেণ যে তার আপনা-আপনি বলে পড়বে। এরকম অভ্যর্থনে আরো মামবানেক কেটে গেল।

প্রোশান্তকে ছেড়ে বেতে তার কষ্ট হচ্ছে। তাকে পেয়ে নিজেকে অনেকখানি সামলে দিয়েছিল শীলা। এ মাহুটিকে হলনা কলতেও তার কষ্ট লাগে। ভেবেছিল, খোলাখুলি সব কথা বলে কমা চাইবে; কিন্তু সাহস হয় নি। তত্ব হলনা ছিল, প্রোশান্ত তাকে কমা করবে।

এক দিন সবই হলনার ঢেকে যেতেছিল শীলা। কিন্তু সেইসকল লক্ষণগুলি ত ঢাকবার নয়। শীলার চেহে সব লক্ষণই একপ পেতে শুরু হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য। প্রোশান্ত সহজভাবেই তা নিয়েছে। খুশির চাকল্য প্রোশান্ত উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রোশান্ত জানে না যে শীলা সর্জনশেষে বোঝাই বইছে।

প্রোশান্ত আপন খেয়ালেই বিভোর। মরমেরভার তার মন। প্রোশান্ত বলে, এ অবস্থার তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্ত লোকের হরকার। এখন থেকেই ডাক্তারের পরামর্শ মত চলা উচিত। কি বল? শীলা বাধা দেয়। ডাক্তারের নাম শুনেই ভয়ে আঁতকে ওঠে শীলা। প্রোশান্তর বন্ধু ডাক্তার শ্রীমন্ত দু-একদিন এসেছিল। কিন্তু তার কাছেই শীলা বায়নি। তাকে এড়িয়ে চলত শীলা।

এ লুকোচুরি আর ভাল লাগে না। তাই ত শেষ পর্শা সে করেছে। এই ত কিস-কিস আওহাজ হচ্ছে। নিশ্চয়ই তারা এসেছে। কান শ্রুতে থাকে শীলা। না, মিছামিছি এ জগতের কথা ভেবে আর কি হবে? সে যে পরলোকের পথে পা বাড়িয়েছে। যেহেতু থেকে তার আত্মা হুজির শেষে গেছে। এখনই দূরে পাড়িয়ে শ্রুতে ভেসে ভেসে সবই সে দেখতে পাবে। তার অপরাধী আত্মা তারপর মহাপুণ্ডে মিলিয়ে বাবে। হুক্তির নিঃশ্বাস কেলে শীলা। কিন্তু প্রেতলোকের চিন্তা তাকে বিচলিত করে ভুলে।

কি জানি অজানা সে প্রেতলোকের কার কাছে পাঁজাবে শীলা? তত্ব মনকে শক্ত করে নেয়। তার বাবা-মা পরলোকে রয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই তার জন্ত অপেক্ষা করছেন। মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়বে শীলা। তার মা নিশ্চয়ই তাকে কমা করবেন।

কোথার মুহূর্তহুতরা? এ যে পরিচিত কঠর। ভালো এরাও একপক্ষ এসে গেছে। চোখ মেলেতে চার শীলা, কিন্তু পাবে না, মনে সশর জাঙ্গে। সত্যি কি-সে হুক্তি পেয়ে গেছে? এ যে শীলা শ্রুতি ভ্রমতে পাচ্ছে,—না ডাক্তার। শীলকে বাঁচাতে হবে।

প্রোশান্তর কঠর। কি ব্যাকুলতা এককঠর। শীলার চিত্তবানো টেবিলের উপরই পড়েছিল। প্রোশান্ত নিশ্চয়ই একক্ষণে সে চিঠি পড়ে ফেলবে। কি লক্ষ্য? কি ভাবে প্রোশান্ত? শীলার কলঙ্কের কথা কেনেও শীলাকে বাঁচাতে চাইবে।

মনে মনে ভাবে শীলা—আমি ত বেঁচে নাই। ওদের নিশা-প্রকাশ্য বাটরে চলে গেছি। ওরা বৃকতে পারছে না যে আর কোন ডাক্তারই আমাকে আর ফেরাতে পারবে না।

হাসতে চায় শীলা। কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটল কি না সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ কেমন যেন ভয় হয়। তবে কি এমনও 'তার আত্মা' দেখে ছেড়ে যায় নি?

এবার শীলা ডাক্তারের উত্তর ভনতে পার,—মেটাল শব্দ। এ অবস্থায় বোগী উল্লসে হয়ে বেতে পারে প্রশান্ত। এর জ্ঞান ফিরে আসতে তিন-চার ঘণ্টা লাগতে পারে।

কি সর্বাঙ্গ। এ যে প্রশান্তর বন্ধু সেই গাইনোকোলজিষ্ট ডাক্তার জীমসনর গলা। কি বলতে চাইছে জীমস ডাক্তার?

শীলার মন উৎকর্ষার ভরে গুঁটে।

ডাক্তার বলতে থাকে—আমার মনে হয়, ঠিক বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই প্রশান্ত। তোমারও নয়, তাঁরও নয়।

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—বাঁচতে হবে ডাক্তার। শীলাকে বাঁচাতে হবে।

ডাক্তার বলে,—তারই চেষ্টা করছি প্রশান্ত! কিন্তু ভেবে দেখো, মাত্র দু'মাস তোমাদের কিয়ে হয়েছে; কিন্তু এ যে পাঁচ মাসের কেস! এ তার, এ বোকা বইতে পারবে তুমি?

প্রশান্ত শাস্তকণ্ঠে উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই পারব ডাক্তার! শীলার সমস্ত দায়িত্ব এ এক দিন শপথ করে আমি নিয়েছি। তাকে তুমি ভাল করে তোলা।

ডাক্তার বলে,—হ্যাঁ, তারই চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু আমার কথা হয়ত তুমি বুঝতেই পারনি প্রশান্ত!

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—সবই বুঝতে পেরেছি আমি। বুঝতে পেরেছি বলেই অস্ত্র কাটকে না ডেকে তোমাকেই ডেকেছি।

ডাক্তার বলে,—তার কলঙ্ক তোমাকে বইতে হবে প্রশান্ত! জোঁরার মনের সে জোর আছে?

প্রশান্ত বলে হাসিমুখে উত্তর দেয়,—কলঙ্ক নয় ডাক্তার! এটা আমাদের সমাজেরই গলদ। বোঁবনের উগ্রাঙ্গমায় মাছুষ সহজেই এ রকম ভুল করে থাকে। ছেলেরের বেলা কোন দোষ হয় না; তারা নির্বিকার ভাবে সরে পড়ে। মেয়েরাই আমাদের অপরাধের বোকা হয়ে বেড়ায়। হয় তাদের আত্মহত্যা করতে হয়, না হয় সমাজের বাইরে চলে যেতে হয়। এ রকম আর চলতে পারে না ডাক্তার।

ডাক্তার বলে,—কি করবে তুমি?

প্রশান্ত বলে,—সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করছি ডাক্তার। সহজ ভাবেই তার সঙ্গে চলব। শীলার কোন গৌরব আমি দেখতে পাইনি। তার ভালবাসাই তাকে জরী করবে।

ডাক্তার বলে,—কোন দোষ নেই?

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—না, শীলার কোন দোষ নেই। শীলা তার মূল গুণের নিমিত্তে। শীলাকে বাঁচিয়ে সমস্ত পুরুষজাতির হয়ে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ডাক্তার!

ডাক্তার বিষমভঙ্গ্য কণ্ঠে উত্তর দেয়,—প্রায়শ্চিত্ত?

প্রশান্ত বলে,—হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত। আমার ভালবাসা দিয়ে তার অভিশাপ থেকে সমাজকে বাঁচাতে হবে ডাক্তার।

ডাক্তার বলে,—অদ্বুত মানুষ তুমি প্রশান্ত! সেই হেলেনকে থেকেই দেখছি,—সত্যি তুমি অদ্বুত!

প্রশান্ত বলে,—আমি না, তবে এরূপ অভিশাপ থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত হবে ডাক্তার! জানি না তবে আমরা লাগন্তু কি? প্রশান্তর কথাগুলি শুনে শীলার দেহে-মনে কি এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইনি মাছুষ না ফেবকা? না, না, আমি যাব না। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শীলা।

হুটে আসে প্রশান্ত। আর হুটে আসে ডাক্তার।

প্রশান্ত শীলার হাত হুঁখানি নিজের কোলে টেনে নেয়। শীলার মাথার পরর ঘেঁষে হাত হুঁপিয়ে দেয় প্রশান্ত।

আবেগে উদ্ভাসিত প্রশান্তর কণ্ঠস্বর,—শীলা! শীলা!—তবু সেই! তুমি কাঁদতে কেন? এই যে আমি রয়েছি।

জীমস নাড়ী পরীক্ষা করে বলে,—ষ্ট্রাঞ্জ। আর নিশ্চয় কোন ভয় নেই। তবু সাবধান প্রশান্ত! কোন উত্তেজনার কারণে মন না ঘটে। এই ওষুটাই চলবে। আমি আমার আসব।

ডাক্তার বেরিয়ে যায়।

প্রশান্তর কোলে মাথা রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শীলা। তার হৃৎস্পন্দে ধারা বয়ে যায়।

প্রশান্ত বলে,—ছিঃ, কি পাগলামি করতে গেছে শীলা! আর ওরকম করে না।

উত্তর দিতে পারে না শীলা। আজ আর কোন লজ্জা নেই, সন্ধ্যা নেই; সমস্ত ভয়, সমস্ত আতঙ্ক তার যেন মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কি দুঃসহ যাতনা সে পাঁচটি মাস বৃকে করে নিয়ে আছে; আজ আর কোন যাতনা নেই। নির্ভর হয়েছে শীলা।

প্রশান্ত বলে, সব ওলট-পালট হয়ে গেল ত? বা হবার হয়ে গেছে; তার জন্তু পাগলামি করে না।

প্রশান্তর মুখে প্রসন্ন হাসি।

শীলার মুখে উত্তর নেই। প্রশান্তর বৃকে মুখ লুকিয়ে অজ্ঞানারায় তাকে ভাগিয়ে দেয়।

কর লাগন্তু? সমাজের না শীলার? প্রশান্তর স্পর্শে আজ শীলার পুনরুৎসাহ ঘটেছে। প্রেতলোক থেকে ফিরে এসেছে শীলা। আর যে তার কোন ভয় নেই।



দ্রষ্টব্য: পুনরুৎসাহের জন্য
ও প্রাথমিক ধর্মের জন্য
আমুন

ক্যানকটা অপটিক্যাল স্টোং প্রাইভেট লিঃ
ফোন-৩৫-১১৭৭, পোস্টবক্স: ডাঃ কাজী হুদা কাম সার
১৯৫-ক্যানকটা, ৪৫ নং প্রাইমারি স্ট্রীট, কলিকতা ১.



হুমায়ূন

নিহুই তবে এসেছেন এ-পাড়ার। এর আগে কোনো দিন দেখিনি। কিন্তু এখন রোজ হুঁসেলাই দেখছি এই রাস্তা দিয়ে বাতাস তরল।

পারে ময়লা কেড়ু ছুতো, গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি। চলনেও বিশেষ আটপাট ভাব নেই। জীবনটাকে যেন ধরে রাখার জন্তে আর ব্যর্থ নন; কিন্তু জীবনটা যেন নাছোড়, ঠুকে ছাড়তে চায় না কিছুতে।

ক'দিন বাদে ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে পারলাম। নাম দীপঙ্কর সেন; বর্ষার বেলে চাকরি করতেন, রিটারির করে দেশে ফিরে এসেছেন। নালন্দা বাবুর বাড়ির নীচতলার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন। বিপত্নীক। কিন্তু সন্তোষক।

ধবরটা জানার জন্তে অবশ্য কোনো আগ্রহ ছিল না। কানে এসে গেল, তাই শুনে রাখা গেল।

কখনো-কখনো দেখি পাশের ঘরের দোকানে গাড়িয়ে আছেন। তার পর একটা সিগারেট মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের মনে হেঁটে চলেছেন।

আশ্চর্য লাগে! এত হেঁটে চলে বেড়াবার কি দরকার ঠিক? তাঁর হাঁটার ভঙ্গি দেখে অবস্থাই লাগে। শরীর যেন চল না। যদি না-ই চলে, তবে শরীরটাকে ওভাবে টেনে টেনে বয়ে বেড়াবার দরকার কি?

অবশেষে আলাপ হল একদিন। বললেন, উদ্দেশ্যহীন হস্ত ঘুরি বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য একটা থাকে।

কী সেই উদ্দেশ্য—এ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে বাধল। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম, বিকারও নেই, বিকৃতও নেই, আবেগও নেই, উদ্বেগও নেই। এরনি নিষ্পৃহ তাঁর দৃষ্টি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে আছেন এখানে? একা বসি?

সংক্ষেপ জবাব দিলেন তিনি। বললেন, প্রায় তাই।

এভাবে তাঁর জবাব দেবার অভিজ্ঞতা বৃত্তে পারলাম না। বললাম, বর্ষায় ছিলেন কনলায়। দেশটা কেমন?

ভালো।

ক'বছর ওদেশে কাটালেন?

দীপঙ্কর সেন আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, অনেক বছর। সারাটা জীবন।

কথার স্বরে মনে হল কী রকম যেন একটা আক্ষেপ আছে ওই কথায়।

সেদিন কথা এই পর্যন্তই হল। দীপঙ্কর সেন বারান্দা থেকে নেমে বাঁ দিকের ঘরের দোকানে গিয়ে গাড়ালেন। একটা সিগারেট কিনলেন, তার পর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের আমার বারান্দার সম্মুখ দিয়ে চলে গেলেন। আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। মনে হল, আমার ওই সব গায়ে-পড়া প্রায় শুনে ভদ্রলোক সন্তুষ্ট; আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

এই জন্তে এই রাস্তা দিয়ে তাঁকে যেতে দেখলেও তাঁর সঙ্গে কয়েক দিন আর কথা বলিনি। কিন্তু

লোকটার চলন দেখে ওর উপর কেমন যেন মায়ার ভাব জেগেছে।

একদিন বলে ফেললাম, কোথায় চললেন?

এই—বলে সামনের রাস্তার দিক দেখিয়ে দিয়ে সোজা সেই পথে ঘীরে ঘীরে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক বিপত্নীক। তা হোন। কিন্তু উনি নাকি সন্তোষক। তবে সেই কস্তাটি কী? তাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখিনে কেন? তাকে দেখে যে বস্ত্র হয়ে বাব—এমন না হলেও মেয়েটিকে দেখার জন্তে কৌতুহল হতে লাগল।

কোথায় চললেন?

দীপঙ্কর সেন আমার দিকে আলগোছে চেয়ে বললেন, এই—এদিকে। একটু ব্যস্ত আছি।

ব্যস্ততার কথা জানা গেল কেবল তাঁর কথায়। চলার ধরণ দেখে ব্যস্ততার কোনো লক্ষণই বোঝা গেল না।

দিন কয়েক বাদে ভদ্রলোকটি একটু ঠাণ্ডা হয়ে গাড়ালেন আমার বারান্দার সামনে। বললেন, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল মশাই! ওই সব দেখে আমার সর্বত্র গিয়েছিল হিম হয়ে।

কিসের কথা বললেন?

আমার মেয়ে। বিশেষ কোনো অগ্রহ নেই। কিন্তু কেমন ফিট হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে যায় হাত-পা।

চোখে-মুখে চিন্তার ভাব আনার চেষ্টা ক'রে, গলায় সহায়হুতির স্বর আনার চেষ্টা করে বললাম, এখন কেমন?

ভালো। অনেকটা সুস্থ।

দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে বনিষ্টতা হয়ে উঠল ক্রমশ। ভদ্রলোকের বয়স এখন তেরো তখন নাকি তিনি পলাতক হন দেশ থেকে। চলে যান আকিরাব, সেখান থেকে বেসিন, তারপর রেঙ্গুন। পুরো পঞ্চাশ বছর তিনি কাটিয়েছেন ওই দেশে। এখন তাঁর বয়স চৌষাট। খুঁটিনাটি হিসেব দিলেন তিনি। পথে-ঘাটে যে সময় খরচ হয়েছে, আর এ দেশেও এসেছেন মাস ছয় হল—এই সব খুঁটিনাটি কয়েকটা মাস একত্র কংসে করতো একটা পুরো বছরই গাড়ির

না, না!
এ 'ডালডা' নয়!
'ডালডা' কখনও খোলা
অবস্থায় বিক্রী হয় না!

আম্বে হ্যা, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা
টিনেই কিনতে পাবেন। এই জন্যেই এতে কোনও ধুলো
ময়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা
হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা'
কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য
ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও
½ পা: টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।



হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা'!
এর হলদে টিনের ওপোর
খেজুর গাছের ছবি দেখলে
সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম।
আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা
বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষযুক্ত
হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে
স্বাদে নেই সব খাবারের
প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

ধাবে। তাহলে বিদেশে তাঁর কেটেছে ঠিক একটা অর্থ-শতাব্দী। এই কথা জানানোর মধ্যে দীপঙ্কর সেনের আক্ষেপ আর অস্বস্তির বেন মেশানো বলে বোধ হল।

হয় মাস হল এসেছেন, কিন্তু আপনাকে খুব বেশি দিন হল তো দেখছি নে।

আপনাদের এমিকে এসেছি মাত্র কয়েক দিন হল। যেদিন এসেছি সেই দিন আর আড়কের দিন হিসেবে ধরলে মোট আটশ দিন হল। তা, দেখতে দেখতে অনেক কটা দিনই হয়ে গেল বলতে হবে।

মুখে বললাম, তা বটে!

কিন্তু মনে-মনে বলতে লাগলাম অল্প কথা। এতগুলো দিন কেটে গেল কিন্তু ওকে একা ছাড়া আর কাউকে এ-পাশও দেখা গেল না কেন?

এ কেনের উত্তরের জন্তে অবশ্য কোনো প্রণয় করলাম না।

দীপঙ্কর সেন মাঝে মাঝে আসেন। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি নাকি পুরো বম্বাই হয়ে গিয়েছেন। বিয়ে করেছেন ওই দেশে। মোট তিনটি নাকি বিয়ে গুর। তিনটিই বম্বাই বটে। তাঁর এই মেয়েটি মেজো বউ-এর। কিন্তু সব কেমন নেন—দীপঙ্কর স্বাকার করেন—তাঁর নিজের স্বভাবেই নিশ্চয় কোনো পলল আছে, নইলে বউগুলো টেকসই হইল না কেন?

সবাই মাঝে লেছেন বুঝি?

উঁহ। তাদের কী ইচ্ছে কে জানে—তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে অল্প সংসার পেতে বসেছে। আর, শুনেছি বেশ সুখেই নাকি আছে।

একটু ডাবলেন দীপঙ্কর সেন। বললেন, একটা চোখ বাঙালী ছেলে খুঁজছি। মেয়েটাকে গছাই।

ভদ্রলোকের ভাষা শুনে অস্বস্তি হল, বললাম, বিয়ের বয়স হয়েছে আপনার মেয়ের?

কি জানি। এ দেশে কোন বয়সে বিয়ে হয় জানিনে। বয়স হল তার বাইশ; গত মার্চে বাইশ পূর্ণ হয়েছে।

বললাম, কিন্তু ওকে আপনার সঙ্গে দেখিয়ে কেন? খুব লাভুক বুঝি, খুব বুদ্ধি পূর্ণ নারী?

ছোটো একটাও না। দীপঙ্কর সেন হাসলেন, বললেন, আগা এজ্ঞাক ও ফিটর, রাস্তার বের হতে দিতে ভয় পাই। কখন কোথায় বেঁধে ফেলে পড়ে ঠিক কি।

নলিনী বাবুর বাড়ির একতলায় বাসিলে এই বুদ্ধিট এ-পাড়া মাত করে রেখেছেন।

নলিনী বাবুর ছাি একজন বিবাহিনীক। কিন্তু শুনলাম, তিনি নাকি দীপঙ্কর সেনের মেয়েটির প্রণয়সার পক্ষমুখ। বাপের উপর মেয়েটির বা মমতা—কোনো ধাঁটি বাঙালী মেয়েরও নাকি তেমন দেখা যায় না। শুধু এইচ এর থেকে একটু করতে পারা গেল। রূপ দেখিনি, কিন্তু শুনলাম—রূপও নাকি সে তেমনি।

এই সব শুধু শুনে সারা পাড়া চকল হয়ে উঠেছে। ছেলে-ছোকরাদের কথা না হয় ধরা নাই হল, বুড়াদের চোখে-মুখেও বেশ চাকল্য দেখা গিয়েছে।

নলিনী বাবুর ছাি নাকি মেয়েটির গুণকীর্তন করে বেড়াচ্ছেন।

এমন সেবা আর এমন বক্তৃতা তিনি নাকি কখনো শোবেননি। দেখা পূর্বের কথা; তিনি নাকি কল্লনাও করতে পারেননি।

ভাড়া-ভাড়া বাংলা নাকি বলতে পারি মেয়েটা। নলিনী বাবুর ছাির সঙ্গে নাকি খুব ভাব হয়েছে। অজ্ঞানের কথাও নাকি অকপটে বলে সে নলিনী বাবুর ছাির কাছে।

পাড়ার গুরুবরা এই সব গল্প শুনে যেমন পুলকিত, মেয়েরা নাকি তার বিপরীত—তারা নাকি সব খুব তার করে আছে; তাদের সব গুণকে ধামা-চাপা দিয়ে বিদেশিনী ওই মেয়েটা সবার উপরে টেকী দেবে—এ নাকি বরদাস্ত করা কঠিন।

তার বাপকে ছেড়ে গেছে তার মা। এইজন্তে মায়ের উপরে সে নাকি খুশি নয়। বাপের এই অধর্ম অবস্থা দেখে সে তাই নাকি তার সমস্তটুকু রেহ আর মমতা বাপের উপর ঢালছে।

মেয়ের মেহমমতা পেয়ে ধস্তাধরছেন দীপঙ্কর সেন। আর, আমরা এই তত্বাতে বলে এক বিদেশিনী ললনার স্নায়ুর পরিচর পেয়ে মনে মনে হহুতো নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করছি; হয়তো নিজেরা যে মেহমমতার মধ্যে লালিত হচ্ছি, তা অকিঞ্চিৎকর বলে অবজ্ঞা করছি। এবং দীপঙ্কর সেনের মত ধস্তাধরছে বাবার জন্তে মনের মধ্যে ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলছি।

কিন্তু হঠাৎ ধস্তাধরছে সেলাম একদিন। তৈরী ছিলাম না। আচমকা বিহৃতাের একটা কলক এসে লাগল যেন চোখে।

সত্যি, চোখ আছে নলিনী বাবুর ছাির। বম্বাই নারীর শারীরিক কোমলতা এবং বদনারীর দৈহিক লাবণ্য একসঙ্গে মিশে এক অবর্ণনীয় শোভার সৃষ্টি হয়েছে।

চলমান সেই সৌন্দর্যের নিৰীশ সঙ্গে নিয়ে হেঁটে চলেছেন দীপঙ্কর সেন।

বাক্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না—কোথায় চলেছেন?

কিন্তু দীপঙ্কর সেন নিজে থেকেই বললেন, একটু লোকের দিকে চলেছি বেড়াতে। বন্ধুবান্ধব কিছু জোগাড় হয়েছে ওদিকে; বাই। গল্পওজব করে আসি।

বললাম, আচ্ছা।

দীপে দীপের গুঁরা চলে গেলেন। মনে হল, সারা পথে লাবণ্যের বজ্রা ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল যেন এক মায়াবিনী। বাতাসে দুগন্ধের প্রাবন সৃষ্টি হল যেন ঐ অজের স্ববাসে।

এই সৌন্দর্য দেখে খুশিতে উথলে ওঠাই উচিত, কিন্তু, অকপটে স্বাকার ঠিকরি, আধার সমস্ত মন একটা চাপা বেরনার তেন যেন ভারী হয়ে উঠল। নিজেকে বড়ই ভাগ্যহীন বলে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এই রমণীর ঐ রমণীয় সৌন্দর্য কেন ভাগ্যবান মাসাকরের উত্তার স্থানোতিত করবে কে জানে!

সকাল আর বিকাল এই রাস্তা ধরে তিনি ধাতাঘাত করেন। জায়গাই তাঁর কতটুকু সঙ্গে নিয়েও যান। এই জন্তে রাস্তাটার ধরাধরাই বেড়ে গেল আমার কাছে। যে পথের দিকে তাকাভান কদাচিৎ, সেই পথটার দিকে চেয়ে থাকার একটা রোমাঞ্চকর আভাস বোধ করি।

সকালের দিকে তিনি একা যান, বিকালের দিকে যান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

সেদিন সকালে তিনি চলেছেন এই পথ ধরে, তাঁকে একা পেয়ে
কিছুক্ষণ করলাম, খোঁজ কিছু পেলেন?

কিসের?

কোনো চোন্ত বাঙালী ছেলের?

আবার প্রশ্ন তখন এটাই হেঁদে তিনি বললেন, অত নীপুণের
কি পাওয়া যায়? খোঁজ চলছে। পেতেই হবে।

বললাম, সেদিন অত বন্ধুবান্ধবদের কথা বলছিলেন?

বললেন, হ্যাঁ। লেকে ছাওয়া খেতে আসেন সবাই। রিটারার-
করা ভদ্রলোকেরা। বেশ হাসি-খুশি। বেশ মিশুক।

পরমর্শ দেবার মত করে বললাম, ঠান্ডেরই কারো একটা যোগা
ছেলেকে খোঁজ করুন না।

হাসলেন দীপঙ্কর সেন। বললেন, সেই মতলবেই আছি।

বাধ-বাধ ঠেকছিল, কিন্তু শেষে বেশ কিছুক্ষণ করেই বললাম,
মেয়ে জানে আপনার এই প্রানের কথা?

বুঝি তো আছে। নিশ্চয় কিছু বোঝে।

বিকেলের দিকে যখন তিনি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যান তখন
তার সঙ্গে অল্প একটা কথা বললেন।

বহুদিন বাদে দেখি, দীপঙ্করের বন্ধুবান্ধব সত্যিই জোগাড়
হয়েছে। তাঁরাও দীপঙ্করের সঙ্গে আসতে আরম্ভ করেছেন। এবং
অন্যদের মধ্যে তাঁর ঘরে বুড়োদের বেশ-একটা মজলিস বসতে
আরম্ভ হয়েছে।

লিলি বাবুর স্ত্রী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। বুড়োদের

উপর সত্যিই মেয়েটার কি আন্তরিক দরদ! এমন না হলে আর
মেয়ে। মেয়েদের মন হবে তুলোর মত নরম আর মাথনের মত
মোলায়েম—তবেই না সে মেয়ে মেয়ে। তুলোর হাতা পসিতে
যেমন সজপশে রাখতে হয় আঁতুর, বুড়োদের ভেতর সাবধানে
জাইয়ে রাখার জন্যে সে নাকি বাগ। তার বাশের সহায়তীন
অবস্থা দেখেই সন্তোষ: তার মনে এই ধারণা নেই জমা হয়েছে।

অনেকে আসেন দীপঙ্করের কাছে। এদের মধ্যে জনকয়েককে
আমি চিনি। পুণীশ গুপ্ত, হিমাদ্রি পাকড়াশি, বিপিন চাকী,
বেবতী চক্রবর্তী—সকলেই রিটারার করেছেন। এদের মধ্যে
হিমাদ্রি বাবু একটু ছিমছাম।

ছিমছাম দুই সিক থেকে—ধরধর ফর্সা রং, মাথা-ভর্তি পরিচ্ছন্ন
চকচকে টাক, পরনে কিনাকিনে খোয়া খুঁটি-পাঞ্জাবি। তিন ছেলে
দুই মেয়ে হিমাদ্রি বাবুর। সকলেই বাইরে থাকে, অর্থাৎ বাংলা
দেশের বাইরে। ছেলেরদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে, একটা-মেয়ে বাকি
ছিল, তারও বিয়ে হয়েছে মাস কয়েক হল। আরও একটা সিক
অবস্থা আছে—হিমাদ্রি বাবু বিপন্ন। তাঁর মস্ত বাড়িতে তিনি
একা।

হিমাদ্রি বাবুর সঙ্গে দীপঙ্কর সেনের ভাব আবার নাকি একটু
বেশি। দুই জনেই বিপন্ন—একজনের স্ত্রী জীবিত থেকেও নেই,
আর এক জনের স্ত্রী লোকান্তরিত। কিন্তু দু'জনের মিল এই—দু'জনেই
স্ত্রীহীন। সুতরাং তাঁদের অন্তরঙ্গতা একটা গাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের এই দিকটা একটু যেন তেজত উঠেছে; আর, সেই সঙ্গে



‘নিম’এর তুলনা নেই

২০০০ বছর ধরিয়া ইহার উপকারী গুণগুলি অপ্রতিষ্ঠিত

দাঁত স্ফূট করে মাটিও
সুস্থ রাখে

নিম টুথ পেস্ট

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ
এবং আধুনিক টুথ পেস্টগুলিতে ব্যবহৃত
ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেস্ট



পত্র লিখিলে নিমের উপকারিতা
সহজায় প্রতীক। পাঠান হয়।

..... দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২২
MT-186.NP

একটু বেন মেতেই উঠেছে। ভিন দেশ থেকে এক অজানা 'মাহু' এসে আমাদের এই অঞ্চলটাকে উচ্ছ্বিত করে তুলেছে।

যে রাজা দিয়ে একা-একা ক্রান্ত পদক্ষেপে চণ্ডভেদে দীপঙ্কর সেন, সেই রাজা এখন একটু সরঞ্জামই হয়ে উঠেছে। এখন দীপঙ্করের সববয়সীরা আসেন। দল বেঁধে গল্প করতে করতে। তার পর, অনেককণ বাসে তাঁরা আবার দল বেঁধে গল্প করতে করতেই ফিরে যান। জমিটা আড়া জমে দীপঙ্করের ঘরে।

নলিনী বাবুর স্ত্রী নাকি পাড়ার সকলের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন। বিশ্বেশ্বর তিন, কিন্তু তাঁর বাড়ির ভাড়াটেরদের ঘরে এই আড়া বসে। তিন কেন বিরক্ত না হয়ে ঐ মেয়েটার প্রশংসায় এখনো পক্ষপাতি—এইটেই হচ্ছে সকলের প্রবল আগ্রহ।

কিন্তু নলিনী বাবুর স্ত্রীর বলায় কথা আছে। অমন একটি ফুটফুটে মেয়ে যদি বাঙালীর ঘরে হত, তাহলে দেশকে মাটিতে তার পা নিশ্চয় পড়ত না। কিন্তু এই মেয়েটি অতগুলো বুদ্ধের তদারককে আর তবিরে নিজেকে কেমন ব্যস্ত রাখে, আর, সকলের সঙ্গে কি রকম প্রাণপাত পরিশ্রম করে। অত খাটুনি খাটে, কিন্তু মুখের হাসিটা কেমন অল-অল করতে থাকে সারাক্ষণ।

দুপুরের দিকে একবার আসেন হিমাত্রি পাকড়াশি। সাঝা দুপুর বসে বসে গল্প হয়। তারপর একসঙ্গে তিনজন—দীপঙ্কর, দীপঙ্করের কণা ও হিমাত্রি—সাক্ষাৎসাক্ষ্যে বের হন।

নলিনী বাবুর স্ত্রী এবার নাকি চটেছেন। তাঁর ভাড়াটে নাকি উঠে বাচ্ছে।

এই খবরে পাড়ার সকলের মনে বুকি আনন্দের বান ডাকল। ছেলেমেয়েলো হয়তো একটু বিবাদের ছাড়া পড়ল, কিন্তু মেয়েমহলের মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি সে ছাড়াটুকু উই করে দিল।

সত্যিই। একদিন উঠে গেলেন দীপঙ্কর সেন।

কোথার গেলেন, সে-খবর জানার আগ্রহ আর কারো রইল না।

নলিনী বাবুর স্ত্রী কিন্তু খোঁজ করে সেটা বার করলেন। ওরা হিমাত্রি পাকড়াশির বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। মস্ত বাড়ি—অনেক জায়গা। অনেক আরামে থাকতে পারবে ওখানে।

এ-খবরটা অবশ্য কিছু না। আমি এই রকম আলাপই করেছিলাম। হিমাত্রি বাবুকে আমি চিনি বলেই খবরটা আমার

কাছে হয়তো কিছু না। কিন্তু যারা তাকে চেনে না, তাদের কাছে খবরটা অবশ্য একটা খবরই।

ঘরে ঘরে এমিকের সমস্ত চকলতা জ্বলিত হয়ে এল। যে বার নিজের কাজে এবার বসতে পারল মনোযোগ দিয়ে। অথচ নিখার শান্তি কিন্তু সেই কারোই মনে। একটা মস্ত বেণী মনের একটি নিভৃত কোণায় চিমটি কেটে বসে রইল। অন্তত আমার কথা যদি বলেন, আমার অবস্থাটা এই রকমই হল।

দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। তাঁর কথা ভোলা কষ্ট, অথচ প্রায় ভুলতেই বুকি বসেছিলাম।

এমনি এমনি হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন তিনি। তাঁর এই হঠাৎ আবির্ভাবে একসঙ্গে পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কি খবর বলুন? কেমন আছেন?

ভালোই আছি। চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মেয়ের খবর কি? আপনার মনের মত পাড় জোগাড় করতে পারলেন?

দীপঙ্কর বাবু বললেন, বড় ভালো মেয়ে। যেমন মায়া তেমনি মমতা। আমাকে দেখে-দেখে দর বুকি হয়েছে ওই দশা—অসহায় মাহুয়ের উপর ওর বড় টান।

বললাম, এ তো ভালো বস্তু। এর সঙ্গে আপনার গর্বিত হওয়ার কথা।

উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয়। গর্ব আমার আছে।

আর কিছু না বলেই তিনি উঠে চলে বাচ্ছিলেন, বাবালা পূর্ণ গিয়ে ফিরে এসে বললেন, ভেরি প্রাইভেট কিন্তু। কাউকে বলবেন না। হিমাত্রি পাকড়াশিকে বিয়ে করেছে আমার মেয়ে।

হেঁচমকে উঠলাম, বললাম, বলেন কি?

হ্যাঁ। বড় অসহায় মাহু'র ওই হিমাত্রি।

হুঁ-চোখ ছলছল করে উঠল দীপঙ্কর সেনের। সেটা তো দেখা গেল।

কিন্তু আর কার বুকির ভিতরটা হুঃসহ বেবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, সেটা কারো চোখে পড়ার কথা নয়।

বললাম, সুখী হোক ওরা।

দীপঙ্কর সেন বললেন, আমিও ওই আশীর্বাদই করছি। বলেই তিনি নেমে গেলেন বাবালা থেকে।

জ্ঞান দৃশ্য নয়

শিবশঙ্কু পাল

বিষয়টা সম্ভবতঃ সঙ্গ, জীর্ণ শরীরের জ্ঞান দৃশ্য নয়।

বোধের প্রত্যক্ষ নেমে রক্তের সন্ধান মন আবিষ্কারকের সমগ্র জগৎ, মন পরিভ্রমে অকাতর, দুট ইচ্ছার তাকনা তারে দিক থেকে নিগন্তবে কত না হাঁটার কেন না সে সুস্থলত রক্তের ছটায় যত বিধা অপগত করে বাসে, এই তার সাক্ষ্য মনে।
দৃষ্টি তার দীপ্তজ্যোতি, কোঁড়ল সৌরকরোজল।

এক বোধের নীচে যতদূর চোখ বাসে—শূন্য, কিছু নেই।

সেই সব বিধাগুলি তমিপ্রাই চিরকাল থাকে
বেখানে হাজার সব আশ্বাসন, সুপলতা, অমর কবিতা।

অশেষণে ব্যর্থ, তবু বোধের গভীরে স্নানহীন

পৃথিবীরা দৃশ্যমান শরীরের বহিরঙ্গে শুধু

মাহু'র উজ্জলতা, দুর্বলতা মহিমার আভাসিত রাখে।

হুঁ চোখে প্রেমের আলো; সম্ভবতঃ তার পাশে থেকে যেতে পারে
পরিজ্ঞাত মানসের ভায়ে স্নান কতগুলি রেখা।

অত্যাশ্চর্য
কানড় কাচার
পাউডার



মূল্যঃ
বড় সাইজ ২ টাকা ১২ ন. প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন. প.
(হাস্য কর ছাড়া)

নীল
সারফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য কানড় কাচা পাউডার সারফ কাচা জামাকাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে...

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত ঝকঝকে সাদা, এত সুন্দর উজ্জ্বল করে। সার্ট, চাবর, শাড়ী, তোরাণে—সবকিছু কাচার জন্তেই এটি আদর্শ।

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোঁপা—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, ফোঁপার পক্ষে প্রতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফোঁপার এক সমুদ্র।

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কানড় কাচা যায়। বেশী পরিশ্রম নেই এতে! সারফ জামাকাপড় কাচা মানে ৩টি সহজ গ্রন্থিঃ ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনার পরদার মূল্য এত চমৎকারভাবে দির। একবার সারফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মেনে নেবেন! সারফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ।

আপনি নিজেই পরখ করে দেখুন...

সারফ জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

বিস্ময়ান লিটার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

BU. 24-X52 BO



রাগু ভোমিক

বেদনাবিহীন অন্তরে শয্যা ত্যাগ করে নীচে গাঁড়ালো গুল্লা।

বেদনাহীন চোখে তারার পরিত্যক্ত শব্দায় দিকে। জান
হয়ে ওঠে ছুটি চোখ—বিকল মনের বিকল বেদনার।

শয্যা কি শুধু শরনের উপকরণ? না, এ যে বিদেহী মনের
অস্থূপম ভাবে আশ্রয়। এয় আছে রূপ, বং, শ্রোণ। সময়বিশেষে,
ব্যক্তিবিশেষে এ হয় পরিবর্তিত, কখন বাসকসজ্জিতা, আসঙ্গ-ঈশিতা,
আত্মজনশিরাঙ্গী। কখন বা এক ব্যাকুল বেদনা, মৃত্যুধ্বংস
বস্ত্রা।

এত দিন এই শয্যা খিরেই গুল্লার প্রতীকিত কুমারী-জীবনের
অভিলাষ, আশা, আকাংক্ষা মুকলিত হয়েছে। কত বিনিমিত রজনী,
কত দীর্ঘ দিবস ধরে এই অস্থূপম মুহূর্তটিকে ঘিরে কল্পনার জাল রচনা
করেছে সে। আজ সেই প্রান্তহীন, প্রান্তহীন, বিরামহীন প্রতীক।
সার্বিক।

চারিদিকে নিবিড় আঁধার। রজনীর তিমির-মন্দিরে কোন
কৃষ্ণকার পুরোহিত গভীর তপস্ভারত। তাঁর তপঃধূমে দিগন্ত
মলিন। আঁধারের বন্ধ চিরে চিরে তাঁর আহ্বানবাণী আহ্বান
করছে আলোককে। গুল্লারই অন্তর-উৎস উৎসারিত এই আহ্বান।
বেদনারীর্ণ স্বরে সে তপস্বী করছে এতটুকু মহাহৃদিতর জঙ্ঘ।

কিন্তু নেই। কেউ নেই। কে বুঝবে তার অন্তর-বেদনা?
কে দেখাবে পথ?

কি ভেবে যে ওর মা ওর নাম গুল্লা রেখেছিলেন তা আজ আর
জানার উপায় নেই। গুল্লতা কিছুই তো ছিল না তার! তার
মন কালো, রঙে নেই ছিটকোঁটা সালা। এমন কি তার চোখের
মণির চারিপাশের সালা অংশও বেন রংয়ের হাস পড়ে হয়ে উঠেছে
কালচে-নীল, তবু তার নাম গুল্লা। ইদানীং গুল্লার মনে হোত,
তার নামের সঙ্গে বেন মিল আছে তার জীবনের। সন্ত গুল্লপক
হয়ে চেষ্টা নিজেই কর করে প্রস্তুত হয় অমানিশার অন্ত। তেমনি
ভাবেই সমগ্র জীবনভোর নিজেকে বিলুপ্ত কর করে সে

তিমির-তমসার প্রতীকিতা, সেই প্রতীকিত
আজ হয়েছে অবসান। অভিসারে আমন্ত্রিতা
হয়ে আজ সে গতা। কিন্তু—

ব্যারাকপুর ঠাঁর মোড় ধরে এগিয়ে
গেলে বেশ খানিকটা দূরে একটি বাড়ী
ডানদিকে পড়ে—সেই বাড়ীটিই দেবানন্দ
রায়ের। রাত্রির আঁধারে বাড়ীটা চোখে
পড়ে না কিন্তু দিনের আলোর পাঁচিলের
বাড়ীটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
অনেকটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—
মার্বাধানে মার্বারী আকারের দালান।
বাড়ীর চারিপাশের বিস্তৃত জায়গায় শুধু
ঘাস। এত জায়গা পড়ে আছে কিন্তু
কোথাও একটা ফুলগাছ নেই! অথচ
কোন বুনে ফুলও ফোটে না!

বাড়ীর মালিককে যে জানে সে এত
মোটাই আশ্চর্য হবে না। বরঞ্চ বাগান
দেখলেই বিস্মিত হবে। সে জানে, পথে
ফুলগাছ পড়লে দেবানন্দের গাড়ী তাকে

দলিত করে চলে যাবে, হাতের সামনে কোন ফুল পেলে
দেবানন্দ নিজে তাকে নিষেধিত করবে। ঐ যে হাতে একটু
ক্লোস্ত আঁঠর মত লেগে থাকে, এই তার উপভোগ রীতি।
সে বলে, দূর থেকে নাক টেনে টেনে গন্ধ নেব, মাথা বেকিয়ে
বেকিয়ে রূপ দেখব—ও সব ছাফা-ছাতা অলস কাব্য-বিলাস
আমার নেই। ও সব হচ্ছে তাদেরই—বারা শক্তিশীন, ব্যক্তিশীন,
নপুংসক। তারাই একটি মেয়ের পায়ে তলার পড়ে গঙ্গদ ধরে
বলবে—তুহু মম জীবন। আমি সমস্ত জীবন তোমাকে চেয়েছি,
আজ তোমাকে পরে থকা হয়ে গেলো আমি।

কথাটা সত্য। দেব বলে, কারণ তারা অক্ষয়। তারা জানে বহু
পরিশ্রমে, শ্রোপণে অধ্যবসারে আজ তারা যাকে পেয়েছে তাকে
হারালে আর কোন গতি নেই। তাই এর মাঝে অতীন্দ্রিয়তা
আরোপ করে, বড় বড় তুঁ-চার কথা বলে, স্বর্গের ডার টানটান করে
বিশিষ্ট করে তুলতে চায় সেই সামান্য ভাব কিন্তু গোড়ায় আমি
যা বলেছি তাই চরম কথা। তাদের পৌরুষ নেই, বিবাহীন সাপের
মত তাই তাদের মুখে একনিষ্ঠতার অহিংসামন্ত্র, প্রেমের হরিণাম।

—এ তোমার অন্তর কথা—কোন কোন বন্ধু প্রতীবাদ
করতো—তুমি বলতে চাও প্রেম নেই জগতে?

—না। প্রেম চলতি অর্থহীন এঁক শব্দ। প্রেমের দোহাই
শক্তিশীনের সফল। সফলহীন পুরুষ প্রেমের বাণী জপতে জপতে
নারীর কাছে যায়। পশ্যন্তু নারীকে খোঁজবে ব্যবহার করি আমি
ঠিক সেই ভাবেই সেই প্রেমিক ব্যবহার করে প্রেমন্তু নারীকে।
ঠিক তেমনি আকাংক্ষা-পূরণ—ঠিক তেমনি প্রাপ্তির তৃপ্তি। আবার
যে সব নারীর প্রেমিক জোটে না তারাই আঁঠর মত লেগে থাকে
একজনের প্রতি। বুঝে বলে প্রেম পড়েছি।

—নরনারীর সম্পর্ক কি শুধু হেয়? প্রশ্ন করতো কেউ।

—শুধু দেহ। তাঁর বিজ্ঞপে বলতো দেবানন্দ, দেহ জির আর
কি আছে নারীর? বিজ্ঞা? বুদ্ধি? তোমরা তোমাদের এই

মোহনিয়া মন নিয়েও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, বিজ্ঞান গরিমার, বুদ্ধির নীতিতে পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তবে? তবে কেন পুরুষ রমণীর নিকট যার? রমণী বুদ্ধিজীবিনী নয়, রূপরসিনী। সে নরকের দ্বার নয়, স্বর্গের চাবীও নয়—ভোগের সামগ্রী, পুরুষের পরিপূরক। সে কামবনের কোমল কামলতিকা, রসপূর্ণা রসবতী।

বন্ধুদের বিষয়াবিশিষ্ট নীরব দৃষ্টি সম্মুখে ঠাড়িয়ে গভীর গবিত হ্রদে বলে—আমার ক্ষমতা ক্ষয়হীন, আমার বর্ষ অন্তহীন। আমি কি লজ্জা চোরের মত চুপিসাড়ে উঁকি দিয়ে এসে সেই চিন্তার কণ্ডুয়ন করবো? মনকে চোখ ঠেরে কি লাভ? বিদেশী প্রেম আমার নয়। দেখেই আমি কামনা করি, উপভোগ করি এবং সেই দেখকে অধিকার কিংবা আহরণ করবার ক্ষমতা আছে আমার।

দস্তোভস্কি দেবানন্দ রায়ের মুখে সাজে। সত্যই, কিছুইই অন্তর নেই তার। অপকণ্ঠ বুলার দেহ—অপরিমিত ঐশ্বর্য।

এই দেবানন্দ রায়কে ভালবাসলো কি না গুল্লা মিত্র! গুল্লা মিত্র—যার রূপ নেই, যৌবন নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। উদর মলকে ভালবেসেছে স্বীণকায়ী নির্ধরধারা।

গুল্লা যখন খুব ছোট তখনই ওর মা স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দ্রনাথের গৃহে চলে আসেন। গুল্লার মার হাতে অর্ধ ছিল, কাজেই কোন অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে তাঁকে পড়তে হয়নি। ইন্দ্রনাথ তাঁর দূরদর্শকের আদ্যায়। নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে না

থেকে এর সঙ্গে থাকায় কিছু কিছু বক্তোক্তি এবং কুটিল কটাক্ষ নে না হয়েছিল তা নয়। তবে এরা কেউ তা গ্রাহ্য করেননি। কেন যে তিনি এখানে এসেছিলেন তা কেউ জানে না। হয়তো ইন্দ্রনাথই জোর করে আনিয়েছিলেন। তাঁর গৃহে পরিজনদের আধিক্য ছিল না, কাজেই আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে স্থখী হতেন।

ওদের আগমনে সব চেয়ে স্থখী হয়েছিল দেবু। ইন্দ্রনাথ তাকে বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে দিড়েন না। কাজেই আত্মীয়-স্বজনহীন বিরাট গৃহে বালক দেবু ছিল নিতান্ত একাকী। সে যেন শুধু মাতৃহীন নয়, পৃথিবী-পরিভ্রাজ্য এক আদিম শিশু।

গুল্লাকে শেষে ও যেন বেঁচে গেল। প্রকাণ্ড মার্চে দু'টি সমবয়সী শিশু খেলা করতো। একজন যেমন স্কলার অপার জন ঠিক তেমনি কুৎসিত না হলেও যথেষ্ট কুৎসিত। সকলেই তা লক্ষ্য করতেন শুধু ওরা দু'জন ছাড়া।

কৈশোরের স্পর্শ থলে দেয় ওদের মনের ওজার ক্ষত কপাট। ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে ব্যক্তিস্বাভা, কচিবোধ, দেহ ও মনের পরিবর্তনের ধুপছায়ায় সমস্ত পৃথিবী ভিন্ন রূপ ধারণ করে। অন্তর-গুহা হতে নিমন্ত্রিত হয় আদিম আত্মা।

বয়ঃসন্ধিতে সেই আত্মা বেহিয়ে আসে। তার উপর পড়ে পৃথিবীর প্রলেপ। তাতে প্রতিফলিত হয় গগনের গরিমা, বিশ্বের মহিমা, অরণ্যের অকণিমা, সাগরের কলকলোল, সবুজ শস্তের



ও-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

নিজের ও দোস্তের পীড়না



দি ওবিয়োট্যাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

তারুণ্য, কালো কয়লায় করুণতা, ইটকাঠ-পাথরের কাঠি। আজকের মানবতা শুধু প্রকৃতির সৃষ্টি নয়—সে মানব-সৃষ্টি সত্যতারও বাইরে-প্রোডাক্ট। উভয়ের মিলিত সত্তা।

বিশ্বস্তার আলয়ে এবং মানবের সত্যতারে গড়া দেবু এই মন্থন জগতে বেশ দ্রুতই গড়িয়ে যেতে লাগলো। প্রায়ই তাকে বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যেত না। কখন আসতো, কখন যেত, কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, ইন্দ্রনাথ অস্থিত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলে ক্লাব, হুগল, পার্টি, জলশা ইত্যাদি নানা রকম কথা বলে দিত।

এদিকে বড় হবার উপক্রমণিকাতেই গুল্লাকে আটকে রাখা হয়েছিল, বাইরে বাওয়া বারণ—হেলেনের সঙ্গে মেশা নিষেধ।

হেলেন বলতে তো এ বাড়ীতে আদি এবং অকৃত্রিম এক দেবু। তা-ও সে কাঁদে বাইরে এত ব্যস্ত থাকে যে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তবু বাসসঙ্গীর সবচেয়ে এই সতর্কবাণী ওর মনে গভীর পরিবর্তন এনে দিল। আর সঙ্গে এত দিন খেলাধুলো, ঝগড়া, খাওয়া ওঠা-বসা সবই চলছে আজ তার সম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা কেন? নীরব সঙ্গী প্রেমধারা রুদ্ধ আবেগে হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত।

কবি লিখেছেন—সকালবেলা কাটিয়া গেল, বিকাল নাহি বয়—কিন্তু গুল্লার সকাল-বিকাল কিছুই কাটতে চায় না। কি করে কাটবে? মহানগরীর উপকণ্ঠের অধিবাসিনী সে। প্রকৃতির সঙ্গ থেকে একান্ত বঞ্চিত। এখানে প্রভাত প্রতিদিন পৃথক পোষাকে আসে না, মহানগরের ব্রোডমার্কে রিক্সা, ঘর ডাকে, কবুতরের স্রবস স্পন্দনে হয়ে ওঠে না রমণীয়। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া সমগ্র জগতের দুখে দৈনন্দিন মালিককে আঁচলে চাপা দিয়ে মানব-মনে স্নিগ্ধ, কল্পনাম্পূর্ণ বুলিয়ে দেয় না। শুধু—

শুধু রাত্রি এখানে ঐশ্বর্যময়ী। কালোর নিবিড়তার মাঝে কুকুরের পিচের রাস্তার দ্রুত সঙ্করমাস আলোর বিন্দুগুলিকে দেখে একটু শিউরে ওঠে শিশুগাছগুলি। বহররা মাথা নেড়ে কি বেন বলে বিভ্রিড়িয়ে।

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ঐ প্রান্তীরঘেরা প্রকাণ্ড গুহের এক কক্ষে বাস করে কুমারী গুল্লা। সঙ্গী শুধু বই। তার নিজস্ব ঘরের কোণে কোণে বইয়ের ভূঁপ। মনের কোণও কি ভাই?

এই বইয়ের জগৎ সম্পূর্ণ মাস-জগৎ। আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, মোহ, মাহাত্ম্যতা, প্রতিহিংসা, পাপ-পুণ্য, জীবন-মরণ সবই সেখানে আছে। আছে ভরল মনের খোরাক। কিন্তু সবই বাস্তবতাহীন এক অমুণ্ডম আরাগোমতিগত। অপরূপ স্বপ্নময়।

গুল্লার স্বপ্নজগতের নায়ক দেবানন্দ। অবশ্য, শুধু গুল্লার কেন, অনেকেই সে চিন্তাচোর। তবে, গুল্লার কথা আলাদা। তার বোনের প্রারম্ভে সে শুধু একটি পুত্রকেই দেখেছে—যে তার শৈশবের সান্নিধ্য। পরিচিতের গভীরে এই যে অপরিচিত যুবক, এই কি তার খেলাধুলোর মায়ক দেবু? এর হাসি অজানা, কথা অজানা, জালা ভাব সবই অজানা। তবু মনে হয়, একে চিনি। একে জানি। বাইরের অপরিচিতভিত্তি মধুরতর করে তোলে মনের পরিচিতটিকে।

কোন অলস অবসরে অমুণ্ড পথে প্রেম গুল্লার স্বপ্নের স্থায়ী আসন পেতে বসেছিল। অসীমের স্বর শুনেছিল সে। যখন সে

চমকে দেদিকে দৃষ্টিপাত করলো তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে প্রত্যাবর্তনের পথ। সেই রুদ্ধ কক্ষে স্বপ্নের রসে জারিত, প্রাণের উত্তাপে প্রতপ্ত হয়ে প্রেম এক অমুণ্ডম অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করলো। কল্পনার বাকি শ্রম মনে হয়েছিল, এখন সে হল দেবতা।

এদিকে গুল্লার মা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি চারিদিকে পাত্র খোঁজ করতে থাকেন। হেলেন ডাল পাওয়া যায় তো কুল ডাল নয়। বৎস ভাগ তো পাত্র অমুণ্ডমুক্ত। আবার দুই-ই যদি ঠিকমত জুটলো তবে হয়তো গুল্লাকেই তাদের পছন্দ নয়। একটা না একটা ঝগড়া লেগেই আছে। বোজাই পাত্রী দেখা চলতে থাকে।

ওদিকে দেবানন্দ রায়ও রোজ পাত্রী দেখছে। তবে তা তার নিজস্ব রীতিতে। বন্ধুগন্ধব নিয়ে হলা করতে করতে এক জায়গায় ঢুকে পড়া—পছন্দ হলো তো সেখানেই বইলো নীলে চল অস্ত্র জায়গায়। মধুসন্দানী মন্ত মধুকর।

অল্প দিনের তফাতে গুল্লার মা ও দেবানন্দের বাবা দুজনেই মারা গেলেন। দেবানন্দের মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং হ'জন বেন অকস্মৎ একান্ত স্বাধীন হয়ে ওঠে।

গুল্লার নিকট এ স্বাধীনতা কিছু নয়—শুধু সন্তার পাড়ের নিকট নিজেদের বার বার দেখানোর হাত থেকে মুক্ত পাওয়া মাত্র। কিন্তু দেবানন্দ গৃহকর্তা হয়ে গৃহকেই পরিবর্তিত করে ফেলে। বাইরের আকর্ষকে সে ঘরে টেনে আনলো। সমস্ত দিন বন্ধুদের বাতায়নে অঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হতে না হতে আনন্দ-মত্ততা উল্লাসে পূহ মুখর হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়ে। শুধু একটি ঘরে আলো জ্বলে—আর ঘর থেকে একটি নারীর স্রবস-অঙ্গল এ ঘরের চারিদিক ঘিরে জলতে থাকে।

গভীর রাত্রিতে সবাই বখন ঘুমিয়ে পড়ে, বিনিদ্রা গুল্লা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পা টিপে টিপে ও এগিয়ে যায় ঐ আলোছায়া ঘরের দিকে।

মুহু আলোক-উজ্জ্বল ঘর। সাপা চানরের উপর শুয়ে আছে দেবানন্দ আর কোন অপরিচিতা। মুহু হাসি—প্রণয়োদ্ভাস-পরিহাস।

এই যে নারী আজ দেবানন্দ রায়ের শবার অংশভাগিনী হয়ে রয়েছেন, এ যে শুধু গুল্লার অপরিচিতা তাই নয়; হয়তো দেবু নিজেও একে চেনে না। তবু এ গুল্লার কাম্য স্বর্গে বিচরণ করছে আর প্রতিদ্বন্দ্বের পরিচিতা গুল্লা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে দীর্ঘবাস ফেলছে।

প্রতি রজনীতেই দেবানন্দের নর্স-উইংস স্বধাধ স্বর ও সমাপ্ত হতো। কিন্তু সে এসেও জানতো না যে এক পোশাক গুচাঘিণী নারী তার সমস্ত ব্যক্তিগতের নীরব সাক্ষী।

এই ঘটনার দুশুভলি গুল্লার চিন্তাধারার মোড় কিরিয়ে দেয়। আগে তার প্রেমে এক শান্ত হিব সৌন্দর্যমহিমা ছিল। প্রিয়তমকে পাবার আকাঙ্ক্ষার হৃৎ, লাহ, বেদনা ছিল, উগ্রতা ছিল না। প্রেমোপাসের দৈহিক সৃষ্টির বিস্ময়ী রূপ কল্পনা করতো সে। কামহীন, কলুষহীন, শুভ্র নিরুণ ছিল তার প্রেম। কিন্তু, এখন তার চারিদিকে রুদ্ধ দাহ। আগুনের হৃদ। ও এখন পেতে চায়—দিতে চায়। সে ঘরে যে কাবনাগুলি, ইন্দ্রিয়ের যে ধারগুলি সে এত দিন অতীতের ভাব দিয়ে রুদ্ধ করে রেখেছে—আজ তাই সবাই আকুল হয়ে উদ্ভাস হয়ে উঠছে। বত মেরে এখানে আসে

তারের প্রতিটি মেয়েকে সে অভিশাপ দেয়। যা তার একান্ত নিম্ন তাকে কোন রবাহুত ভোগ করছে।

এই ভাবেই চলছিল। তারপর আজ—

আজ সকাল থেকেই টুকরো টুকরো মেখে ছেয়েছিল আকাশ। দুপুরের দিকে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। বিকেলে ঝড় কমে গেল বটে কিন্তু বৃষ্টি কমে না। বৃষ্টির একটানা শব্দ, ভিজ্জে-ভিজ্জে হাওয়া মনে কি বেন ভাব আনে। কোন এক নাম-না-জানা অমুভূতি আদিম সসীস্থের মত জড়িয়ে ধরে মন। শেষে ফেলে, উত্তপ্ত হাড় নিঃশ্বাসে আঁছির করে তোলে।

দেবানন্দ আজ সমস্ত দিন বেহুতে পারেনি। বজ্রাও কেউ আসে নি। কি করে আসবে? বাস্তব জল ঝড়িয়ে গেছে। গাভী চলছে না।

দুপুর থেকেই দেবু পান করতে শুরু করেছে, রক্তের ধারার মত লাল পানীয়। উরু মদিরা তার রক্তকে করে তুলেছে উত্তপ্ত। বারি বখন আর বারটা সেতার খাম চাকরকে ডেকে বলে—গুলাকে একবার এখানে আসতে বল।

অবাক হয়ে স্থাবর মত ঝড়িয়ে থাকে ভূত, জীবনে ক্ষয়তো এই প্রথম আদেশ পাওয়া মাত্র তামিল করে। গুলাদিকে ডাকবে। এইখানে। সে কি আসবে!

দেবু ভালভাবেই জানে গুলা আসবে। সে জানে তাব ভূমিত নারীদ্বয় এত দিন এত মাস ধরে শুধু এই প্রতীকার প্রতীক্ষিত। বার বার তার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে হাতের ভঙ্গিতে, পায়ের গতিতে, হাসির রেখায়, কথার স্রাবে, হৃৎসঙ্গলতায়। এতদিন তাকে দেবুর প্রয়োজন ছিল না, কাজেই সে ইচ্ছে করেই এদিকে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু, আজ যখন আর কোন উপায় নেই তখন ওকে থকা করাই ভাল, মনে মনে ডাকতে থাকে—ওর ডাক শুনে কি রকম মুগ্ধতা হবে গুলা? কি অপরূপ ভূমির হাসি ফুটে উঠবে সেই পিপাসার্ত অধরে? একটু হাসে দেবু।

গুলা জেগেই ছিল। আকুলি-বিকুলি হাওয়া, বৃষ্টির মাতাল পল্লবনি তার অশান্ত হৃদয়কে আরও উত্তেজ করে তুলেছে। ধ্বংস! ধ্বংস হয়ে যাক পৃথিবী—এমন সময় চাকর এসে খবর দিল।

প্রথমে বেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না গুলা। দেবু তাকে ডেকেছে! ধ্বংসের কালো গহবরের অতলে সে ছুটে বাচ্ছিল তখন তাকে কে ফেরাল? প্রেম। এতদিনে অভিসারিকার অপেক্ষা কি শেষ হলো?

কিন্তু, দেবুর ঘরে ঢুকে, সেই শব্দা স্পর্শ মাত্রই এক অদ্ভুত অমুভূতিতে সমস্ত মন বিধিরে গুট। সেই ঘর—সেই শব্দা।

তার তপস্তার সিদ্ধি নয়, দেবুর বাসনা পবিত্রতার জন্তই তাকে এখানে আনা হয়েছে। প্রেম নয়, ধ্বংসই বড়িয়েছে হাত।

সাদা চাদরে ঢাকা নিজীব শব্দা। নিজীব কি? ওর দিকে তাকাতে ওর প্রতি কথা বেন কথা করে ওঠে—আবরণের প্রতি সূত্রে বেন কামনার রোদাক্ত ইতিহাস—বিবাক্ত ব্যাধির নির্মম উলঙ্গ প্রকাশ। গুলার স্বপ্নকে দেখা বিভিন্ন নারীর একই রূপ বিকৃত ও বিকৃত অভিব্যক্তি ঐশ্বর্য বিকৃষ্ণ, কলুষ হাসি বেন ওকে সহস্র বাহু দিয়ে ঘিরে ধরে। গুলার মনের সেই নিঃশ্রিত অমুভূতিগুলি বেন জাগ্রতি হয়ে তাকে মুহূর্তগতরে ঠেলে দেবার জ্ঞান মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রেমের অন্ততত্ত্ব নয় যুত্বার নারকীয় গহবর। এই কামনার অধিভূতর সামনে ঝড়িয়ে গুলার মনের সমস্ত বিধা-বন্ধ গুড়ে ছাই

হয়ে গেল। দেহভোগ স্রব, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উর্ধ্বে, ত্যাগ ও বিস্মৃতির কোমল আসনে যে অলৌকিক চিরন্তন প্রেম এতদিন বৃদ্ধিত হয়ে পড়ে ছিল, আজ এই মুহূর্তে সে নবজীবনের অনন্ত পরশে অনাবশ্যক, বিশাল নয়নে তাকালো। দেবুকে সে বেন আরও ভালবাসলো। ক্ষুদ্র, সামান্ত প্রবৃত্তিগুলি গুড়ে যেতে থাকে আর তারই কালেতে দীপ্ত দেখালো অনন্তর প্রেমের প্রদীপ।

দেবু ঘরে ঢোকে। ওর দিকে সহজে হাত বাড়িয়ে বলে—এস। এখানে বোস।

—না! সামান্য একাক্ষর শব্দ কিন্তু তাই বেন অসামান্য হয়ে বার বার দেবুর তীক্ষ্ণ নাসায়, গবিত গুণ্ঠাধরে, দৃঢ় চিবুকে আঘাত করতে থাকে। না—কিন্তু কেন?—কেন?

—কোন উত্তর দেয় না গুলা।

ওর দিকে তাকায় দেবু। এই মৌনা নারীর নয়নে অজ্ঞানতা নেই। তবু বেন তার আপাত শুদ্ধতার পেছনে কোন অজ্ঞানির প্রকট। কিন্তু কেন গুলা তাকে এই অনাবশ্যক অপমানে অপমানিত করছে? নিজেও ভোগ করছে চরম স্বপ্ন?

—তুমি তো আমাকে ভালবাস। দেবু না বলে পারে না।

—সে কথাই কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তোমার কাছে।

—না নেই। স্বীকার করে দেবু—কিন্তু তোমার—তোমার কাছে নিশ্চয়ই তা প্রয়োজনীয়।

—আমারও নেই—মুহূর্ত হেসে বলে গুলা।

—হঠাৎ এ রকম নিস্পৃহতার কারণ জানতে পারি কি? বহু কষ্টে নিজেকে সংবৃত করে শান্তভাবে বলে দেবু।

—কোন দিনই বা স্পর্শ-স্পৃহনীয়তা দেখেছিলে? ঠিক সমান ভাবে উত্তর দেয় গুলা। তারপর একটু ভিন্ন সুরে বলে—দেবুনা, আমি তোমার যোগ্য না।

যোগ্য যে নও সে কথা খুবই সত্য—কিন্তু তাই বলে অযোগ্যতার অহঙ্কারে আমাকে অপমান করবে? দেবানন্দ রায়ের মুখের উপর বলবে—না? কিন্তু কি করে জবাব দাও এই স্পৃহিতা নারীকে?

—কি চাও তুমি?

—কি চাই আমি? ক্রটি একটু বেঁকে উঠেই আবার প্রশান্ত হয়ে উঠলো—আমি কিছু চাই না কিংবা যা চাই তা দেবার সাধ্য তোমার নেই।—আমার সাধ্য নেই? দেবানন্দ রায়ের অমিত অহঙ্কার বেন বিকৃত মুখে বীজন্ত চীৎকার করে ওঠে।

একটু পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত বিক্রমে বলে—দেবানন্দ রায়ের সাধ্য নেই গুলা মিত্রের প্রার্থনা পূরণের?

মুহূর্ত হেসে গুলা। আর সেই শান্ত গুড় হাসির দিকে তাকিয়ে এই প্রথম বেন নিজের অক্ষমতা পলঙ্ক করে দেবানন্দ রায়। রূপ যা দিতে পারে না, রূপ বা কিনতে পারে না, তেমনি দুর্লভ বনের অধিকারিণী এই শান্ত শ্রীহীনা মেয়েটি। সমস্ত রজনীর নীরব বেদনার পূজীভূত শুভ্রতার সমগ্র পৃথিবীর ব্যথিত হৃদয়ে মনুসৌরভে যে রজনীগন্ধা ফুটে উঠেছে, তার কাছে বস্তুরাডা গোলাপও হার মেনে যায়। এই তপস্কলিত তরুণীর দিকে তাকিয়ে দেবানন্দ রায় মাথা নত করলো। তার মন বেন কোন এক পরশমণির প্রভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। মল্লম বুকে জেগে ওঠে এক কল্প কল্পন, দেহাতীতকে পারাবার অদম্য অনুরণীর কায়না।



প্রকল্প রায়

ঠিক এই মরসুমে অর্থাৎ দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে একটা জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে এসে নোঙ্গর ফেলে। মাল-টানা জাহাজ; নাবিকী পরিভাষায় থাকে বলে কার্গো শিপ। নাম এস, এস, ক্যামেরুণ।

জাহাজটার খোল, হাট, লোয়ার ডেক কার্গোতে ঠাসা। কার্গো খালাস হতে পুরো দু'টি মাস লাগবে।

দু' মাস পর নোনা জল থেকে জঙ্গ-ধরা নোঙর উঠবে। তারপর বছরের মধ্যম ঋতুতে হঠাৎ একদিন আকাশের দিকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া ছুড়ে, তাঁর আকস্মিক একটা ভেঁ বাজিয়ে আস্তে আস্তে ক্যামেরুণ জাহাজ চাটগাঁ বন্দর ছেড়ে চলে যাবে।

দশ বছর ধরে জাহাজটা সমানে চাটগাঁ বন্দরে আসছে। এবারও এল।

ঘড়-ঘড়, কর্কশ শব্দ করে ভারী ভারী শিকলগুলোর সঙ্গে চারটে নোঙর জলে নামল। মাল্লা আর রসিমানরা জেটের ক্যাপষ্টানে মোটা মোটা কাছি পেঁচিয়ে জাহাজটাকে বেঁধে ফেলল। গ্যাংগে লাগাল।

গ্যাংগে বেয়ে পরলা বে জেটতে নামল, রিয়াজুদ্দিনের গলির বাসিন্দারা তাকে বলে সাত দরিয়ার কুতুম। আসলে তার অগ্র একটা নাম আছে। নাম তার হবীব। ক্যামেরুণ জাহাজের ছোট সাহেব সে।

কোন দিকে তাকাল না হবীব। জেটটা পিছনে ফেলে, বন্দরটা ভাইনে রেখে সোজা রিয়াজুদ্দিনের গলিতে গিয়ে ঢুকল।

দ্বিতীয় ঋতুর দিনটা একটু আগে মরেছে। আকাশটা আবছা আবছা, ছায়া-ছায়া। ভূবা কালির বঃ ধরেছে সেখানে।

সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। এর মধ্যেই রিয়াজুদ্দিনের গলির থুপবিশে থুপবিশে কেরোসিনের ডিবে বলে উঠেছে। বিকিকিনির হাট বসে গিয়েছে।

কার্পড় না, মরিচ না, চাল না, ডাল না—এখানে বা বিকিকিনি হয়, তা হল মাস। ঠিক মাছবের ময়, মেয়েমাছবের ভাঁটো শরীরের ঝাঁজ, ভল্লা মাস।

দালাল-আড়কাঠিরা শিকার ধরে ধরে আনছে। দরাদরি কষাকষি চলছে।

যারা শিকার পায় নি, এমন একদল মেয়ে গলির মুখে দলা পাকিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যামেরুণ মত জুল-জুল করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমন সময় হবীব এল।

রিয়াজুদ্দিনের গলিতে সোরগোল পড়ে গেল। এখানকার বাসিন্দারা সবাই চেনে হবীবকে।

একটি মেয়ে নাক টেনে টেনে বলল, আইল সো, দশ মাস পর সাত দরিয়ার কুতুম আইল। তোরা সবগলে জোকার (উলু) দে।

কল-কল করে এক ঝাঁক উলু পড়ল।

কেতনোঁমাখা লালাচে মুর হবীবের। একটি মেয়ে মুরসমেত থুতুনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, এ্যাটদিনে আমাগোর মনে পড়ল লাগর?

ভীক ধারাল শব্দ করে হেসে হেসে ঢলে ঢলে পড়তে লাগল চার পাশের মেয়েগুলো।

কমুই দিরে সবাইকে ঠেলে গুঁত্বিয়ে একটা বেঁটে মাংস মেয়ে সামনে এল। বলল, এইবার ঢলানি খাশা সো মাগীরা! সাত দরিয়ার কুতুমে নিয়া তোরাই বে মজলি! উইদিকে আসমানের বুকখান টুটাকাটা হইয়া বাইতে আছে। এইবার কুতুমে ছাউড়া দে। হবীব কিছু বলে না। মেহেরী-মাথা চোখা হয়ে হাত বুলাতে বুলাতে মিট-মিট করে হাসে।

রিয়াজুদ্দিনের গলির বাসিন্দাদের কাক নে চেনে সে? এক আধ দিন না, দশ বছর ধরে সে এখানে আসছে।

দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে ক্যামেরুণ জাহাজ বেই মাত্র চাটগাঁ বন্দরে এসে লাগে, গ্যাংগে বেয়ে পরলা বে বামুঘাট নামে, সে হ'ল হবীব। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এট গলিতে এসে ঢোকে সে।

বেঁটে মেয়েটা বলে, খাউইয়া খাউইয়া ভাব কী? বেতুব ময়দ। হাও, আসমানের কাছে বাও কুতুম।

এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল আসমান। অসহ এক স্ত্রীর কাঁপুনি তার বকের ভিতর খরখর করছিল। পা কাঁপছিল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আসমানের সামনে এসে দাঁড়াল হবীব।

গলির মুখটা ছায়া-ছায়া; কিকে অন্ধকারে জড়িয়ে রয়েছে। এখন মুখের চেহারা দেখা যায়, কিন্তু তার ভাবা পড়া যায় না; বা বোকা বায় না।

কিস-কিস করে আসমান বলল, আইলা মিয়া?

আইলাম।

চল।

আগে আগে চলেছে আসমান। পিছনে হবীব।

চলতে চলতে তারা রিয়াজুদ্দিনের গলির শেষ মাথায় এসে পৌঁছাল। এখানেই আসমানের থুপরি।

থুপিতে ঢুক ভিতর থেকে কাঁপ এঁটে দিল আসমান।

বাঁশের মাটানে পা স্থলিরে বলল হবীব।

ঠিক মাথামানে একটা কেরোসিনের ডিবে জলছে। ভিবেটা থেকে বত আলা পাওয়া যায়, ভায় ঢেে বেশি মেলে খোঁয়া।



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটা কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ ওর মেহময়ী মা ওকে নিরমিত অষ্টারমিল্ক খাওয়ান। অষ্টারমিল্ক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিল্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যা সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাকঘরের জন্ত ৫০ নম্বরপত্রের ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিল্ক” P. O. Box No. 202 বোম্বাই ১।

...মায়ের দুধেরই মতন

ক্যারের শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। দুধ সেহগর্ভনের জন্ত চার পেকে পাঁচ মাস বয়স থেকে দুধের সঙ্গে করেন খাওয়ানও প্রয়োজন। কারেজ পুষ্টির শযাজাত খাদ্য-রাস্না করতে হয়না—শুধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



আজ বেশ শাকগোছ করেছে আসমান। চোখে ধূধার টান মেরেছে। ঘোর লাল কাঁচুলি পরেছে। চোকো চোকো খোপ-কাটা একটা শাড়ি পরেছে। হাতের পাতার মেহেন্দী রস মেখেছে। নাকে বেশ গঁথেছে। লম্বা লম্বা চুল খোঁপায় বেঁধে লাল টুকটুক মান্দারকুল গুঁজে দিয়েছে।

চকচকে, শাশানো চোখে আসমানকে দেখেছে হবীব। এই তো মাত্র দশ মাস আগে তাকে ছেড়ে গিয়েছে। এই দশ মাসে আসমান আরো খুব সুস্থত্ব হয়েছে। তার শরীরটা ধারালো রেখে কুটিরে আরো বেশ ভরে উঠেছে। টান-করা তামাটে চামড়ার আরো জেরা কুটেছে।

নীচে, দুই হাঁটুর কীকে খুঁতনি গুঁজে একদুষ্টে চেয়ে আছে আসমান।

এক সময় আসমান বলল, আজ বুঝি জাহাজ আইল ?

হ।

প্র্যাত কিনে আমারে মনে পড়ল ?

তুমারে গলগ সময় মনে পড়ে। কিছক কী ককম ? জাহাজের কাপ। ইরাণ-ভুলগ, পুট (শোট) ইডেন, মুহাসা, পুট ইসনাইলা, পুট শিবাব পুল—হুনিয়ার পানি তুলকাড় কইরা বেড়াই। হুনিয়ার এক মাথা খিকা আর এক মাথায় চলে বাই। দিল তো তুমার লেইগা পাখ মেলেই আছে। কিছ ইচ্ছা থাকলেই কী আসা যায় ?

একটু থেমে হবীব আবাব শুরু করে, ঘাউক উই সগল। পুট ইডেনে মুখতার মিয়ার লগে দেখা। তার কাছে খপার দিয়া দিহিলাম। পাইছ ?

পাইছ।

যর ভাড়া কইরা রাখছ ?

রাখছি।

ভবে চল।

আজ না কাল সকালে যায়।

আচ্ছ।

পরের দিন সকালে রিয়াজুদ্দিনের গলির মুখে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি এসে পীড়াল। একটা টিনের বাস বিছানা, টুকটাকি ছ'চারটে বোতাকা নিয়ে হবীব আর আসমান গাড়িতে উঠল। তারা পাহাড়তলীর দিকে যাবে। সেখানে যর ভাড়া করেছে আসমান।

গলির মুখে এ পাহাড়ার বাসিন্দারা দল শাকিয়ে পীড়িয়ে আছে।

খিদ-খিদ করে তাদের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, আসমান মাস্কি কত রঙ্গই জানে। মাগী বেবুজা, দুই মাসের সোমোর পাততে গেল।

ঘোড়ার গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

রিয়াজুদ্দিনের গলি একটা দুঃস্বপ্নের মত শিছনে পড়ে রইল। বলর রোড পেরিয়ে, অনেক চড়াই-উত্তরাই ঘুরে পাহাড়তলী কাছে এসে পড়ছে গাড়িটা।

হবীব আর আসমান—হু-জনের মধ্যে অজুত একটা সম্পর্ক। ঠিক সম্পর্ক না, দ্বিটি জীবন একটি সর্ভে, একটি বিচিত্র বোঝাপড়ায় জোড়া লেগেছে।

এক-আধ দিন না। দশ বছর আগে এই সর্ভ আর এই বোঝাপড়া শুরু হয়েছিল।

দশ বছর আগে দ্বিতীয় শত্রুর পরলা দিনটিতে ক্যামেরগ জাহা চাটগী বলরে প্রথম নোঙর ফেলেছিল।

জেটিতে নেমে শহরে গিয়ে চুকেছিল হবীব। কসবীপাড় খুঁজছিল।

চাটগীর তাদের জাহাজ সেই প্রথম এসেছে। এখানকার কিছুই চেনে না হবীব। ঘুরতে ঘুরতে সে আড়কাটির কীদে পড়ে গিয়েছিল। আড়কাঠিই তাকে রিয়াজুদ্দিনের গলিতে নিয়ে এসেছিল।

গলির মুখে চোখে-মুখে রং মেখে মেয়েগুলো কামঠের মত ঘুরছিল। শিকার অর্থাৎ হবীবকে দেখে তারা থমকে পীড়িয়ে পড়ল।

এক কাণ্ডই করেছিল হবীব।

বাহুল না, বিচার করল না, বাজালো না; দরাসরি, কবাকবি করল না। এমন কী ভালো করে দেখল না পর্যন্ত। হাতের সামনে বাকে শেল, ছেঁ। মেরে তাকে তুলে নিল। এক হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। বলল, তুমার ঘর কুনটা ?

উই গলির জায় মাথায়।

ঘরে চুকে নিজেই ফাঁপ আঁটল হবীব। টিমিয়ে টিমিয়ে একটা কুপী জলছিল। হুঁ দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে দিল।

যার ঘরে চুকেছিল, সেই মেয়েটা এতক্ষণ এক পশে চুপচাপ মুখ বুঁজে পীড়িয়েছিল। কুপীটা নিববার পর তাকে দেখা যাচ্ছিল না। গাঢ় অন্ধকারে সে হারিয়ে গিয়েছিল।

হাতড়ে হাতড়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলল হবীব। তিন ডুড়ি মেরে পাতলা একটা শোলার মত তাকে বৃকের উপর তুলে নিল। তার নরম মাংস শরীরটাকে ইচ্ছামত ডলে, পিষে, ছেনে, আঁচে, কামড়ে, ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

সমস্ত রাত অন্ধকার খুপরিটা অন্ধ, আদিম এবং বর্বর হয়ে রইল। সকালে উঠে মেয়েটার মুখে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়েছিল হবীব। বলেছিল, আজ রাত্রে আবাব আহম।

মেয়েটা জবাব দেয় নি। জবাব দেবার মত অবস্থানও তার নয়। কাল রাত্রির বর্বর ঝড়টা তার উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছে।

শাড়ি আর কাঁচুলি ফালা-ফালা হয়ে গিয়েছে। নখ আর পীন্তের ছা খেয়ে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত জমে আছে। শরীরটা ডেলা পাকিয়ে রয়েছে।

হবীব যখন চলে যায়, প্রায় বেহুশ, ঘোর ঘোর চোখ মেলে একবার তাকিয়েছিল মেয়েটা। তারপরই চোখ বুঁজে ফেলেছিল।

সেই রাত্রেও এল হবীব। তার পরের রাত্রেও। তার পর থেকে রোজ রোজ আসতে লাগল। রিয়াজুদ্দিনের গলিতে সেই মেয়েটার খুপরিতে আসা একটা নিয়মে পীড়িয়ে গেল।

সমস্ত রাত আঁচে, কামড়ে ছিঁড়ে সকালে মেয়েটাকে, না, মেয়েটাকে নয়, মাংসবের আকৃতি পাওয়া এক ডেলা নিজীব মাংসকে খুপরিটার ভিতর ফেলে রেখে যায় হবীব।

দিন দশেক আসার পরও হবীব একটা কথা বলেনি। শরীরগী মেয়েটার দেহ ছাড়া কোন ব্যাপারে তার কোনোই নেই।

এমন আজব মেহমান রিয়াজুদ্দিনের গলিতে কোন দিন আসে নি।

দন পনের পর মেয়েটিই প্রথম জিগোস করেছিল, 'তুমার নাম কী ?

হবীব।

তুমি কী চাটগাঁও মাহুব ?

না। আমি জাহাজী, সাত দরিয়ার মাহুব। আমার নাম হবীব।

একটু থেমে হবীব বলেছিল, এই পয়লা আমাগো জাহাজ চাটগাঁ পুটে আসছে। দুই মাস আমরা এইখানে থাকুম। তুমার কাছে আমি কল আসব।

আইসো।

কথার শির্ষে কথা আসে। হবীব বলে, নাম কী তুমার ?

আসমান।

বাহারের নাম। তুমি যেমন খুবসরত, তুমার নামখানও তেমন খুবসরত।

আসমান জবাব দেয় না। নীচের নরম টোটে ধারাল চোখা ঠাঁত বসিয়ে হাসে। তার হাসিতে ধার আছে, শব্দ নেই। কথার কথার হাত বাড়তে। অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে।

চঠাং এক'লময় আসমান বলে, মেহমান, তুমারে একখান কথা জিগামু ?

কী কথা ?

তুমি আমাদের অমুন কুতার সাখান কামড়াও কান ? অমুন ডল কান ? ছানো কান ? সকালে শরীলখান দরদে জরজর হইয়া থাকে।

হবীব হাসে। বলে, আমি হইলাম জাহাজী, সাত দরিয়ার মাহুব। কালা পানির তুকান গুণে আমার জন্ম কাটে। ইউগান উসেন, পিসিকি উসেন, রেড সী, হুইজ খাল—সারা হনিয়ার পানি মাপতে মাপতেই জন্ম গেল। পানিতে যখন থাকি, বাটার আশা থাকে না। কুনো দিন যে ডান্ডার দেখা পামু, এমুন ভরসা থাকে না।

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, পানি দেখতে দেখতে আমরা কুতা হইয়া যাউ। পুটে নেমেই তুমাগো কাছে আসি। জানি, পানিতে তো এক কল মরুমই। ডাল খিকা, মেয়েমানুষের শরীল খিকা বতটুকু ফুটি বতটুকু সুখ আনায় করে নিতে পারি ! নিজেরে বাগ মানাইতে পারি না আসমান ! তুমাগো কামড়াইয়া খামচাইয়া ফুটি করি।

হবীবের গলাটা কেমন বেন গাঢ় শোনায়। আসমান কিছু বলে না। একদুট্টে সাত দরিয়ার জাহাজ মাহুবটার নিকে তাকিয়ে তাক্সব হয়ে তার কথা শোনে। বুঝি বা হবীবের জন্ত একটু হুংখই হয়।

প্রথম বার এসে কামেক্ষণ জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে মাস দেড়েক রইল। ঠিক হ'ল প্রত্যেক বছর দ্বিতীয় শতুর শুরতে হনিয়ার নানা বন্দর থেকে কর্গো নিয়ে জাহাজটা এখানে আসবে।

জাহাজ মেদিন ছাড়বে, তার আগের রাত্রিতে আসমানের খুপরিতে এসেছিল হবীব। বলেছিল, কাল জাহাজ ছাড়ব আসমান !

আসমান চমকে উঠেছিল, কই, আগে তো আমাদের কও নাই ? আগে তো জাহাজ ছাড়নের ঠিক আছিল না। গলাটা কেমন বেন ধরে গিয়েছিল হবীবের।

জাহাজী মাহুব সে। সাত দরিয়ার তুকান গুণে তার দিন কাটে, রাত ফুরায়। দিন-রাত, মাস-বছরের হিসেব নেই। দিনের পর দিন কালো, নোনা, অফুরন্ত সমুদ্র দেখতে দেখতে জীবন সম্বন্ধে হবীবের দৃষ্টিভঙ্গিটা হয়ে গিয়েছে একদোখা, বেগবোরা। দুনিয়ার কোন কিছু সম্পর্কে তার মোহ নেই।

ইরাণ-তুরাণ, পোট এডেন, পোট মোম্বাসা—যে বন্দরেই জাহাজ ভিড়ুক, হবীব আগে ছোট্ট কসবীপাড়ায়।

দরিয়ার জীবন নারীসঙ্গরান, নিরুৎসব। সেখানে আশা নেই, নিরাপত্তা নেই, ভরসা নেই, বেঁচে থাকটা সেখানে একঘেরে, বিষাদ, অসহ।

জাহাজ থেকে ডাঙায় নেমেই হবীব হজ্ব হয়ে ওঠে। কসবীপাড়ায় মেয়েদের দেহ আঁচড়ে-কামড়ে বতটুকু ফুটি আনায়/করা যায়। ডাঙার সঙ্গে মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ এটুকুই।

কিন্তু সে বার যেন কী হয়ে গিয়েছিল। দেড় মাসের প্রয়োজটা রাত আসমানের খুপরিতে কাটিয়ে দেহ বিকিকিনির তৈরী সম্পর্কটা ছাপিয়ে দুজনের মধ্যে একটা স্বপ্ন, গুঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ব্যাপারটা আগে বুঝতে পারেনি হবীব। জাহাজ ছাড়ার আগের রাত্রি টেব গেল।

সাত দরিয়ার বেগবোরা মাহুবটার গলা ধরে গেল, আবার

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যার "স্লাইসড ব্রেড"



মতি পাইয়ে
২৪ টি
বুড্ড আকর

- কল প্রস্তুত
- স্ট্রো-সেকা
- মেসিন প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

আর্য্য বেকারি অ্যান্ড কন্সল্টেশনারী
কলিকতা - ২৯

আরম্ভ; কিন্তু বহুরে জাহাজ এখন চাটগাঁর আলব, তুমার কাছে আরম্ভ।

কাঁপাঙ্গলার আসমান বলেছিল, আইসো কিন্তুক। মাথার কিসে (দ্বিবি)।

বহুরের বিতীর খড় বেই শুক হয়, ক্যামেরা জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে আসে। জেটিতে গ্যাংয়ে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে হবীর নেমে পড়ে। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা আসমানের খুণিকতে চলে আসে।

ক্যামেরা জাহাজ পুরো ‘হু’ মাস চাটগাঁ বন্দরে থাকে। এ ‘হু’ মাসের একেজকটা রাত আসমানের খুণিকতে কাটার হবীর। সে ‘হু’ মাসে বিতীরে পড়ত। ময়মুখী মেহমান।

বিহাজুদ্দিনের গলির বাসিন্দারা সবাই চিনে ফেলেন হবীরকে। তারা তাকে বলে, বর্ষার জড়িবি, সাত দরিয়ার হুটুম।

হবীর চাকের আসমান পর হবীর একদিন বলল, এখুন করে তো আর চলে না।

আসমান বলে, কেন্নে করে?

এই যে বহুরের দশখানা মাস আমার দরিয়ার দরিয়ার ককট, আর বেবুতাপাড়ার আন্ধারে তুমি শুইজা থাক। এখুন করে চলে না।

বহুরের একটা নির্দিষ্ট মরতমে আসমানের ঘরে করেকটা দিন কাটিয়ে যায় হবীর। আসমানের ঘরে জীবনের অভ একটা খাদ পায় সে। যে খাদটা দরিয়ার উদ্দান তুমানে নেই, যে খাদ ইরান তুমার মোহালা বন্দরের ভিতর নেই। এ খাদটা হল মাটির খাদ, ভাতার খাদ, জীবনে নোভর ফেলার খাদ।

এই খাদটার টানে বহুরে বহুরে আসমানের কাছে আসে হবীর।

সাত দরিয়ার হামুঘটা করেক দিনের জন্ত ঘরের আশ্রয় পায়।

এই ঘরই তাকে একদিন অস্থির, আছন্ন করে ফেলল।

হবীর বল, ভাবতে আছি, দরিয়ার কাম আমি ছেড়ে দিযু।

তুমারে এই বেবুতাপাড়া থিকা নিয়া বাযু। তুমারে সাদি করে সোমার ককম।

কিস-কিস করে আসমান বলে, সত্যি?

সত্যি।

আসমান আর কিছু বলে না। অকৃত্ত এক শ্বের শিহরণে তার বুকে তির-তির করে কাঁপতে থাকে।

সত্যিই একদিন জাহাজের কাজ ছেড়ে দিল হবীর। পাছাড়তলাতে একটা ঘর ভাড়া নিল। তারপর বিহাজুদ্দিনের গলি থেকে আসমানকে নিয়ে গেল।

সে বার ক্যামেরা জাহাজ হবীরকে রেখেই চাটগাঁ বন্দর ছেড়ে চলে গেল। তিন-চারটে মাস খড়ের মত উড়ে গেল।

আসমান আর হবীর পরস্পরকে তারা উদ্দান মোহালা জড়িয়ে রাখল। কিন্তু তারপর? তারপর কোথায় বেন তাল কটল।

উলস চোখে এক একদিন আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকত হবীর।

আসমান বলত, কী হইল?

কিস-কিস করে হবীর বলত, কিছু না।

আমার মনে হয়, নিশ্চয়ত কিছু হইছে।

কী আবার হইব?

হইছে হইছে। আমি বুঝি।

অজ একটু হাসি হবীর। নির্ভীক, বিষন্ন হাসি। ভোঁতা খানখানে আঙুর হয়। সে বলে, কী বোঝ আসমান?

হবীর কানে খুঁজ করে আসমান বলে, সকল বুঝি আমি সকল খপর রাখি। দরিয়ার লেইগা তুমার পরাণ থির নাই।

বুকের ভিতরটা খক করে উঠল হবীরের। আসমান কেন্নে করে তার সিলের কথাটা জানল? বিমুত চোখে তার শ্বের দিকে তাকিয়ে রইল হবীর।

আসমান বলে, তাক্সর হইয়া গেলা, তাই না?

ডাইনে এবা বাঁয়ে মাথা কীকায় হবীর। হাঁ হাঁ, কী যে বোঝাতে চায়, সে-ই জানে।

আসমান থাকে না, তুমি কক্স জাহাজের খোঁজ নিতে যাও। তুমি হইলা দরিয়ার মাছব, ঘরে তুমার মন বশ খায় না।

ঠিক—

আন্তে আন্তে মাথা নাড়তে থাকে হবীর। গাঢ়, মধুর একটা হাস ফেলে।

যার রক্তে দরিয়া মিশে রয়েছে, যার কত দিন তার মন বসে?

তালটা আগেই কেটেছিল। এবার ‘হু’ জ্বনের মাখখানে চিড় ধরল। চিড়টা একটু একটু করে বাড়তে লাগল।

যে মেয়েমাছবের রক্তে কলবীপাড়ার বীজ রয়েছে, সংসার-ঘর সাজতে কত দিন তার ভাল লাগে?

একদিন হবীরের চোখে পড়ল। রাত্রির অন্ধকারে পাছাড়তলীর সেই বাড়িটার চারপাশে কতকগুলো লোক নেশার চুরচুরে হয়ে হলা করছে।

হবীর গর্জে উঠল, উই কামঠগুলো এখানে আসছে ক্যান?

আসমান জবাব দেয় না। সেই হাসিটা হাসে, যাতে ধার আছে, শব্দ নেই।

আসমানের রকম-সকম দেখে স্বেপে উঠল হবীর। খানিকটা কুটক্স রক্ত তার মাথার চড়ে বসল, ‘হু’ হাতে তার গলা টিপে ধরল হবীর। বলল, মাগী বেবুতা, এই দিকে সোমার করে, উই দিকে কুতা এনে চুকাই ঘরে।

গলায় জোরে জোরে চাপ দেয় হবীর। আসমানের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে। খাসটা আটকে আসছে।

মরিয়া হয়ে হবীরের তলপেটে লাগি ছুড়ল আসমান। টাল সামলাতে না পেয়ে ছিটকে পড়ল হবীর।

জখমী জনোয়ারের মত ছুটো মাছব একই ঘরের দুই কোণ পাড়িয়ে হুঁসতে থাকে।

পরস্পরের ভালবাসা, বিশ্বাস এবং নির্ভরতার নৃত্রে দু’টি জীবন জোড়া লেগেছিল। কিন্তু এই মুহুর্তে তাদের সম্পর্কটা অবিশ্বাস, সন্দেহ আর শত্রুতার সম্পর্ক।

হবীর খোঁকা, মাগী কুস্তী, কামঠগুলো ঘরে এনে চুকাই।

ক্যান চুকাই না? ভুই বাবি দরিয়ার। আমার চলব কেন্নে? ব্যবসা চালু না রাখলে খায় কী?

ব্যবসাই চালু রাখ মাসী, তোরে নিয়া আমার চলব না। হাঁপাতে
পাতে হবীব বলে, আমি দরিয়ায় চলে যাবু।

সেই ভাল। তুয়ে নিয়া আমার চলব না। যার মতি খির
দুই-চার ফজর করতে না করতে যে দরিয়ায় বাইতে
তা'র উপর আমার ভরসা নাই। আমি পাড়াতেই চলে
হু।

দরিয়ার মানুষ একদিন দরিয়াতেই চলে গেল। আর রিষাফুদ্দিনের
লগ্নে এসে ঢুকল আসমান।

আসমানকে দেখে গলির বাসিন্দারা ফিসফিসিয়ে হাসে। বলে,
সো আসমান, হব-সোংসার খইরা আবার এই সোজখে (নরকে)
ইলি যে?

সখ হইছিল; দুই-চার দিন সোংসার করলাম। কিন্তু সখটা
দু'দিন বইল বা। রক্তে রইছে বেবুতাপাড়ার বিব। কয় দিন
সার ভাল লাগে?

বলতে বলতে নিজের পুরনো খুপরিতে গিয়ে ঢুকল আসমান।

তারপরের বছরও ক্যামেরাণ জাহাজ এল চাটগাঁয়।

হবীব এল আসমানের খুপরিতে। আসমান খুশীই হল।
যক মাস একসঙ্গে সোংসার করে হবীবের উপর কেমন একটা
ম বসে গিয়েছে।

আসমান বলল, আছ কেমন?

ভালই।

আসমানের উপর অদ্ভুত এক আকোশ নিয়ে দরিয়ায় চলে
য়েছিল হবীব। দরিয়ায় দরিয়ায় ঘুরে সেই আকোশটা উবে
য়েছে।

হবীব বলল, শ্রাখ আসমান, তুমি কসবীপাড়ার মানুষ, আমি

দরিয়ার মানুষ। তুমি এই পাড়া ছাড়তে পারনা না, আমিও দরিয়া
ছাড়তে পারক না।

ঠিক।

আসমান সার দেয়।

দরিয়া আর কসবীপাড়া ছেড়ে যে আমার সারা জনম সোংসার
করক, তার উপায় নাই।

ঠিক।

এক কাম করলে কেমন হয়?

কী কাম?

বছরে দুই মাস আমাগো জাহাজ চাটগাঁয় থাকে। এই দুই মাস
তুমি আমি সোংসার পাতলে কেমন হয়? পুটে পুটে ঘুরি। কত
মাগীর কাছেই তো বাই। কিন্তু সোংসারের ঘরের দ্বার তো পাঠি-না!
আসমান বলে, সারা জনম হারা মাস তো এই সোজখেই
কাটা। দুই মাস যদি সোংসার পাততে পারি, সখও মিটে,
শান্তিও পাই।

হু' জনের মধ্যে সর্ভ হল।

বছরের রিটারি শ্রুতে ক্যামেরাণ জাহাজ যখন আসবে তখন
আসমানকে নিয়ে এই শহরের কোথাও চলে বাবে হবীব। একটা
ঘর ভাড়া করে থাকবে।

হু'-মাস জাহাজটা চাটগাঁ বন্দরে থাকবে। এই হু' মাসের মেয়াদে
তার মরশুমী সোংসার পাতবে। এই সর্ভে, এই চুক্তিতে দুটি জীবন
জোড়া লাগল।

রাত গাঢ় হচ্ছে, ঘন হচ্ছে। গাড়টাকে টেনে টেনে বোড়া
চুটো পাহাড়তলীর সেই ঘরটার কাছে এসে দাঁড়াল, যেটা আসমান
ভাড়া করে রেখেছে। যেখানে তাদের হু' মাসের মরশুমী সোংসার
পাতা হবে।

এক মুঠো ভিক্ষে পাবো মা!

শ্রীযোজন বসু

নিরীহ জীবন-বন্দে
মরণের অদ্বৈত মহড়া
নিঃস্ব রসে পূর্ণ করে
নিভাকার ভরা।
নিমগ্ন রাতের পাখা
খুলে দেয় স্তব্ধ বাতায়ন,
বিশ্রামের পরমায়ু
রাতভর করে আপ্যায়ন।

ভোর হ'লে,
স্বপ্ন হলে অভিমান :
অনিবার্য ভদ্রার্ঘ্য ভিড়ে
যাত্রাপথ অসঙ্লান।
মুক্ত দ্বারপথে
এক মুঠো দানা পোলে,

মধ্যাহ্ন অবশ হাতে
ছিন্ন বস্ত্রখানা মেলে
কুড়াই শব্দক।
দূর প্রান্ত হতে কহু
স্বপ্নের ফাটল পাহারা দেখে
থেনে বাই অনিমেধ।

চারি পাশে
নেকে আসে
অস্পষ্ট গোঁধূলি :
নিজের হারহুই আমি নিজে।
মরণের কক্ষ নিয়ে
তবু কেন বেঁচে আছি আমি ?
বহুদূর অন্ধর শীঘ্র
দারিদ্র্যের বীজে।

ডু স্ব র্গ প রি ক্র মা

শিবপ্রসাদ নাস



পূর্ণসূর্যের মত পহলগামেও সকালে দেখেছি একটা সাদা আঁকুরণ দিয়ে বাড়ীর ছাদ, মাঠ আর উপলব্ধ ঢাকা। শিশির জমে বরফ হয়। এইভাবে সকালে শেবাগ নদীর ধারে উপলব্ধের উপর দিয়ে বেড়াবার সময় সাবধানে চলা উচিত। পিছলে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এখানে এক কুকুর নিয়ে বেশ মজা হয়েছিল। সারা কান্দীরের কুকুরগুলো বেশ গ্রাম-কেডু গোছের। বেশীর ভাগই পথের বাসিন্দা। কিন্তু কি তাদের পুষ্টি রূপ! বাংলাদেশের যেসব কুকুর একটাও চোখে পড়েনি। শ্রীনগর থেকে পহলগাম আর ওপাশে উলরি—মানসবল অববি সব পথের কুকুরই রীতিমত ভয়-দুঃস্থ। হয়ত আবহাওয়ারই এর জন্ত দায়ী। নেপালে দেখেছি মাহুগুলা—বিশেষ করে পাহাড়ীরা রীতিমত গায়ে-গতরে। কিন্তু পথের কুকুরের এমন নৈকব কৌলীল চোখে পড়েনি। এমনি এক কুকুরকে রাস্তার বিকট খেতে দিলাম। বাস, অমনি বন্ধু হয়ে গেল। হোটেল ফেরবার সময় দেখি পিছু নিয়েছে। তারপর সোজা দোতলায় আমাদের কামর এসে হাজির। তখন সন্ধ্যা হয়েছে—বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। আমি বিদায় করতেই বাজিলাম। এগিয়ে এল পুষ্প। বললে—আহা, এত ঠাণ্ডার বাইরে থাকবে? থাকুক না আঁকুরের রাস্তা ঘরের ভেতরে?

বললাম—কতি কিছু নেই। কুকুর ত দূরের কথা, বাঘা-বাঘা খাঁপদের সঙ্গেও থাকতে রাজী আছি। 'মহন্তরেও মরিনি মোরা, মারি নিয়ে ঘর করি।' কত মারি-গান্ধা, কত রাখব-বোয়াল, কত নেকড়ে-হায়েনা নিয়ে আমরা বাঙ্গালীরা ঘর করছি! এ তো নিতান্তই নিরামিষ সে তুলনার।

বাঘা দিয়ে হেমপ্রভা বললে—বাঘুন, ধামুন। আপনাদের সব তাইতেই রসিকতা! কুকুরটা বাইরেই থাকবে।

তথ্য। বাইরেই থাকা সাবাস্ত হোল। পুষ্প তাকে খাইয়ে এল। সারা রাতটা সে বাইরেই কাটিয়ে দিলে। সকালে দরজা খুলে আমি তাকে ভেতরে টেনে আনতে গেলাম—কি আশ্চর্য্য, সে আসবে না। রাতে আসতে দিইনি। তাই অভিমান! অভিমান ত আর শুধু বাঙ্গালীই একচেটে নয়! সারা দিন খেয়ে দেখে আমাদের সঙ্গে সন্কেই রইল, সন্ধ্যা হতে আবার ওপরে এল। এবারে সন্ধ্যানে, সাগরে অন্ধর মহলে প্রবেশ করতে বললাম। কিন্তু ডুবসে কুকুর—বালায় নেভী কুত্তা নয়। অভিমানটা নিতান্তই উচ্চগ্রামের। সে এলো না। পুষ্প হাত থেকেই খেলো। কিছুক্ষণ পর বাড়ীর দরোয়ান এসে লাঠি মেয়ে তাকে তাড়িয়ে

দিলে। সকালে যথারীতি তার সঙ্গে দেখা হোল—তবে বাড়ীর বাইরের ঘাটে। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও ওপরে ওঠা ত দূরে কথা—বাড়ীর চৌকাঠে মাড়াল না। বাপু,স। কি অভিমান! সব অপমানগুলিই স্বয়ং করে রেখেছে। কান্দীরের কুকুরই যখন এই, তখন না জানি ওদেশের অলদাদের মনটি কতই 'শর্পকাতর'।

মনোজ বাবু গভীর মুখে বললেন—দাদা, এমন ছিমছাম দেশের পুরুষেরা দেখিপদপদেবের চর্চা করবেন আর তার ফলে—ঐ ওদিকের ওরা ক্রমশঃ পায়ালারি হয়ে অভিমানত্বরত হবেন—এ আর বিচিত্র কি! বৈকল্যবাক্যের অভিমান চর্চার দায়গাই ত এই!

বললাম—কিন্তু ভায়া, ও-বাঁপারের চরম ত হয়ে গেছে মথুরা-বন্দাবনে। নিতান্তই ধূলোমাটির পরিবেশ! এখানকার আয়রণ কাটেনের ওপাশে ঝাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে ত পরিচয় হল না? স্ততরাং কুকুরের অভিমানটা যে এদেশের মাটির ফসল, তা তো বলা যায় না?

কল্যাণী রান্নাঘর থেকে বললে—অভিমানের বিলাস খুব হয়েছে! ও সব আপনারা বুঝবেন না, খাবেন আশ্রম।

এর পরে আর কাব্যদর্শন চলে না। স্ততরাং উঠতে হোল।

ফেরবার পথে আমরা সোজাপথেই চললাম—৭২ মাইলের পথ। এ-পথে প্রথম দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে মাওনু। বর্ণা আর প্রাকৃতিক দৃশ্যবলী। এর পর অনন্তনাগ। এটি একটি ছোট সহর। চারিদিকে বহু বর্ণা আছে। তারপর অবন্তীপুর। শ্রীনগর থেকে ১৮ মাইল দূরে। বাস এখানে কিছুক্ষণ ধামে। দ্রষ্টব্য হচ্ছে একটি পুরাতন মন্দিরের ক্ষয়সাংশেব। মন্দির, বড় বড় ধামওহালা বারান্দা, চম্বর—সবই পাথরের। এককালে জমকালো মন্দির ছিল। সরকারী এক বিজ্ঞাপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ৮৬৫ থেকে ৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবন্তীবর্ণধ ছিলেন কান্দীরের অধিপতি। ইনিই এই বিষ্ণুমন্দিরটি নির্মাণ করেন। স্ততরাং মন্দিরটি নবম শতকের। "রাজতরঙ্গিনী"তে আছে—অবন্তীবর্ণধার রাজত্বকালে সুপণ্ডিত মুক্তাকর্ণ, শিবস্বামী, কবি আনন্দবর্দ্ধন ও স্তাকর বিজ্ঞার জন্তে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। মন্ত্রী শ্রবর্ণাকে দিয়ে উমামাধ-মহেশ্বরের মন্দিরটি (বিষ্ণুমন্দির?) নির্মাণ করান। কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, ওটা মন্দিরই নয়, একটা রাজবাড়ী। পরকপাণ্ডব এখানে নাকি সন্ন্যাসী বাস করেছিলেন। আমাদের অবন্তী ত মনে হোল না। সরকারী আর্টস কলেজের পাশকরা, শিল্পনিপুণা হেমপ্রভা চারিদিক

আপনার জন্য

চিএতারকার মত মধুর লাগে

কনিস্ আমিরোহীর
টেকনিকালার “পাকিস্তান”
চিত্রের সুন্দরী তারকা



সুখিই প্রসন্ন লাগেই মেয়েদের সৌন্দর্যের আনন্দ কারন হতে
পারে। মনাকুমারী বলেন “আমি লাক্স টোইলেট সাবানের
সাথ্যেই আমার লাগেই চমক কবি। মনোহর সরের মত
হোলায়েম ফেনা আমার চককে নিখিল রাখে।” এটা আপনিও
দেখতে পারেন কেমন করে লাগে ফেনা আপনার লাগে
একটা মধুর উজ্জলতা এনে দেয়। লাক্স আপনার লাগেই
সৌন্দর্যের জন্ত ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ শুদ্ধ **লাক্স টোইলেট সাবান**

চিত্রতারকার সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্থান লিটার লি, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS/12-X52 BG

পরীক্ষা করে বললে যে, সরকারী ভাষাই ঠিক। অষ্টম শতকের মুক্কাপীড় ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত কান্দীরের বিখ্যাত মার্ভণ্ড-মন্দিরের সঙ্গে এর খ্রীষ্টও গ্র্যানের একটা মিল আছে। পেছনের দিকের বড় বড় খামওয়ালা কলোনেড বা হলগুলো খ্রীষ্টীয়ত্বের তৈরী। মার্ভণ্ড-মন্দিরে তা সুস্পষ্ট। গান্ধারশিল্পের প্রভাব এখানে আছে হয়ত।

চুঁচুড়ার হুই ভাই-বোন—অনিমা ও কলাগীল যখন ফুটে নিতে বাস্তু, ধ্বংসভূপের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তখন ভাবছিলাম—একে ধ্বংস করল কে? পাঠান সিকান্দার লোলী না মোগলরা? কালাপাহাড়ী ঐতিহ্যে ত ওদের ইতিহাস ভরা। ইসলামাবাদ থেকে ৫ মাইল দূরে একলা-বিখ্যাত মার্ভণ্ড-মন্দিরকে ত সিকান্দার লোলীই ধ্বংস করেছেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে! আজও সেই বিখ্যাত মন্দিরের নীলাভ-ধূসর রঙের পাথরগুলো পড়ে রয়েছে। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির গুজরাটে দেখেছি। মামুদের পৈশাচিক হাতে তার কবচরূপ মনকে পীড়া দিয়েছে। তাঁরই সভার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অল্ বেকরী দস্ত করে বলেছিলেন—“মামুর ভারতকে ধ্বংস করে আশ্চর্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অধিকৃত স্থান থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদায় নিয়ে কান্দীর, বেনারস প্রভৃতি যে-সব স্থানে মামুদের হাত পৌঁছাতে পারেনি, সেই সব দেশে পালিয়েছে।”

অল্ বেকরীর বহুভাষ্যেরই প্রকাশ, মামুদের সময়ে কান্দীরে, বারানসীতে শক্তিমান হিন্দু রাজা ছিলেন। তখনও হিন্দু-সংস্কৃতি কান্দীরে কবচরূপ প্রাপ্ত হয়নি। সেদিনের আর তার আগের কান্দীরের হিন্দু রাজাদের শক্তির কথা মনে পড়ল। গুর্জররাজ রামভদ্রের পুত্র ভোজ উত্তর-ভারতে পালদের পরাজিত করে ভারতের অধিকাংশ অংশ জয় করেন। কিন্তু কান্দীর, বাংলা, সিন্ধু আর মগধ জয় করতে পারেননি। মনে পড়ল অষ্টম শতকের মুক্কাপীড় ললিতাদিত্যের কথা, দ্বাদশ শতকের রাজতরঙ্গিনীর লেখক কল্লান ধীর কীর্তি অমর করে রেখে গেছেন। কান্দীরের কোর্ট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ইনি। এরই সময় হিউয়েন-সাং কান্দীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। মগধ, বঙ্গদেশ কামরূপ, উড়িষ্যা, মালব আর গুজরাটেও ইনি প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কালকুঞ্জের বংশোদ্ভূতের মত ইনিও, বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, বাঙ্গালদেশ আক্রমণ করেছিলেন। পাহাড়-পর্বত ডিকিয়ে বেঙ্গ হাজার মাইল হেঁটে আসা সোজা কাজ নয়। এই খাতানামা ললিতাদিত্যই সেদিন এক বাঙ্গালী রাজাকে তুলিয়ে কান্দীরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে কৃষ্ঠাবোধ করেন নি। অবশ্য তাঁর সেই জঘন্য কাজের প্রতিশোধও নিয়েছিল আর এক বাঙ্গালী রাজপুত্র; কান্দীরে গিয়ে আর এক রাজার বৃকে ছুরি বসিয়ে ললিতাদিত্যের আগে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে আর এক মহামুভব সম্রাট কান্দীরকে গরীবানু করেছিলেন। কুহাণ কণিক কান্দীর শুধু জয় করেন নি, চতুর্থ বৌদ্ধ সম্রাতিও (মহাস্তমের জলকরে) সেখানে করেছিলেন।

ভাবছিলাম, একটাও বৌদ্ধমন্দির শ্রীনগরে বা তার আশে-পাশে নেই কেন? লাডাক্ হাড়া আর কোথাও বৌদ্ধ-মন্দির আছে কিনা জানি না। গাইডবুকেও কোনও উল্লেখ নেই।

বাস ছাড়লো। আমরা ক্রমে পামপুরে এসে পৌঁছলাম। দু'পাশে কিকে বেঙনী রঙের জাকরাগন্ধে দেখা বাচ্ছে। সমগ্র

কান্দীর জম্বু বধো এই পামপুর হাড়া জাকরাগন্ধ কোথাও জমে না। অল্প জাকরাগন্ধ জাকরাগন্ধ চাষের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, সাক্ষ্য 'আসেনি। মাটির বিশেষ গুণের জন্তেই এ অঞ্চল হাড়া আর কোথাও জাকরাগন্ধ জন্মায় না। পামপুরের জাকরাগন্ধে শুধু যে কান্দীরকে রাজস্বের একটা অংশ এনে দেয় তাই নয়, এর সৌন্দর্য্যও দেশ-বিশেষের মানুষকে মুগ্ধ করেছে। সিংহাসনলাভের চৌদ্দ বছর পরে জাহাঙ্গীর শাহ যখন কান্দীর ভ্রমণে যান চার শত বেগম বাদী আর চার শত পালতোলা জাহাজ নিয়ে, তখন পামপুরের এই জাকরাগন্ধে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আত্মজীবনীতে এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

জাকরাগন্ধলগ্নি চমৎকার দেখতে! মাঠে যখন ফুটে থাকে তখন রং হালকা-বেঙনী। কিন্তু তুলবার পর নীলাভ-বেঙনী হয়ে যায়। এই ফুলের হলুদ পরাগের সঙ্গে খয়েরী রঙের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়া আছে, তাই জাকরাগন্ধ। স্তবরাং এক তোলা জাকরাগন্ধের জন্তে কত ফুল সংগ্রহ করতে হয়, সহজেই অমুম্যে। ইংরেজী অভিধানে এই ফুলকে গাট হলুদ রঙের বলা হয়েছে। কিন্তু কান্দীরে সে রং দেখিনি। ওল, কচু ইত্যাদি গাছের মত এরও মূল থেকে গাছ হয়। সরকারী এম্পোরিয়ামে শ্রীনগরে খাঁটি জাকরাগন্ধ পাওয়া যায়। তোলা ১২-৩০ টাকা। হাউসবোটে অনেক সময় কাড়াই টাকা তিন টাকা তোলা পাওয়া যায়। আমাদের বোটের বিক্রতা এসেছিল কিন্তু ডেকালের বাঁপারটা জানা ছিল বলে আমরা সাবানন হয়েছিলাম। অধিকাংশ সস্তার জাকরাগন্ধই সং-করা কাগজকাটা মাত্র।

সন্ধ্যার আগেই আমরা শ্রীনগরে ফিরলাম। টুরিষ্ট রিসেপশন সেটরে হাজির হতেই বোটওয়ালারা টানটানি আরম্ভ করল। বে-মরশুম কি না! চিন্তা হোল—ঝিলানে না ডাল-এ, কোথায় থাকি যাবে, কোন্ জায়গার পরিবেশ রমণীয়? অবশেষে ডাল-এই স্থির হোল—নেহের পার্কের কাছে।

হাউসবোট চার রকমের আছে। স্পেশাল, এ, বি, সি। মধ্যবিত্তের উপযোগী হচ্ছে বি আর সি শ্রেণীর বোট। চার কামরাওয়ালা বি শ্রেণীর মাসিক ভাড়া ৩৫০ টাকা আর সি শ্রেণীর ২৫০ টাকা। চার কামরার হু'জন সহজেই থাকতে পারেন। ডুইংক্রম আর খাবার খাবের গালিচার উপর বিছানা শেতে শুতে আপত্তি না থাকলে, দশ-বার জনেরও যায়গা হয়। বি শ্রেণীর প্রতিদিনের জন-প্রতি রেন্ট ৮ টাকা, অন্ততঃপক্ষে পাঁচ জন থাকলে। সি শ্রেণীর জন-প্রতি দৈনিক রেন্ট ৬ টাকা; অন্ততঃ পাঁচ জন থাকতে হয়। গাইডবুকে হাউসবোট, সিকারা, টকা, বাস ইত্যাদির সব রেন্ট বেঁধে দেওয়া আছে। তার বেশী কেউ নিলে ডিরেক্টর তার প্রতিবিধান করে থাকেন। কিন্তু বে-মরশুমে, যখন বোটের বোট "টু-লেট" ঝুলতে থাকে—তখন বাঁধা-বরাদ্দ রেন্ট চলে না। তখন নিছক ডিমাও আর সাগ্নাইয়ের নীতি। তখন গরম বোটওয়ালায়। যে আর নভেম্বর হচ্ছে বে-মরশুম। এই সময় দর রীতিমত কমানো যায়। আমরাও এই সুযোগটার সন্ধ্যাবহার করেছিলাম।

বোটের রেন্ট শুধু বোটভাড়া নয়—খাবা, খাওয়া, বৈজ্ঞানিক আলো, চাকর ইত্যাদি থাকতে সব খরচ ধরে। সকালে বেডটী, তারপরে প্রাতঃরাশ, দুপুরে ভাত বা রুটি, বিকেলে চা-টোষ্ট আর

রায়ে রুটি বা ভাত। ষ্ট্রাইট মাছ বা ডিম ছুবেলাই দেয়। মাংস মধ্যে মধ্যে। বাজীর ইচ্ছানুসারে খাতের মেছু বদলায়। বাজীদের মধ্যে এবার শতকরা নকুই ভাগই ছিলেন বাঙ্গালী। সুতরাং বাঙ্গালী-খানার জন্তে আমরা পীড়াপীড়ি করেছিলাম। ওস্তাদ রাধিরে শেফালী দি' ওদের রান্নাঘরে গিয়ে নির্দেশ দিয়ে বাঙ্গালী-খানা তৈরী করাতেন।

বোট গিয়ে ওঠবার আগে একটা চুক্তিপত্রে সই করতে হয়। সই করবার সময় সিকারা সমেত চুক্তি করা দরকার। পারাপারের জন্তে এর প্রয়োজন। বোটের সঙ্গে সিকারা না থাকলে, বোটওয়ালার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় পারাপারের জন্তে। চুক্তির মধ্যে সিকারা ধরা না থাকলে, অন্তরিক্ত ভাড়া দিয়ে সিকারা নিতে হয়। ডাল হুদে বা খিশামে বেড়ার জন্তে অবশ্য আলাদা করে সিকারা ভাড়া করতে হয়। বোটওয়ালাই তার ব্যবস্থা করে দেয়। তখন ভাড়া দিতে হয় ঘটী হিসেবে।

বাঙ্গালীদের জলে হাউসবোটে বাস করার একটা মোহ আছে। আমাদের কিছু হাউসবোটের জীবন খুব ভালো লাগেনি। তবে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, বাব মূল্য কম নয়। সম্ভবতঃ ডাল হুদের জলেই রান্না হয়। হয়ত এইজন্তেই বড় বাজীর প্রথম করে দিন পেরে অবস্থা ভাল থাকে না। খাবার জলটা অবশ্য ভালই। গ্রীনগরের এবং আশে-পাশের সব দর্শনীয় স্থান দেখাশোনা আর কেনাকাটা হয়ে বাবার পর, দু'তিন দিন হাউসবোটে কাটানি ভালো ব্যবস্থা বলে মনে হয়।

গ্রীনগরের আরম্ভন মাত্র এগারো বর্গমাইল। উত্তর দিকের বড় পাহাড়টার চূড়ায় আছে "হরিপর্কত দুর্গ" আর পূর্বদিকের পাহাড়ের উপরে আছে একটি সুন্দর পাথরের মন্দির—"তখ ত-ই-মলহান" বা "সোলেমনের সিহান"। ডাল হুদ এই দুটি পাহাড়েরই পা ধুয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ দিকে আছে শব্দর পর্বত আর তার ওপরে শব্দরনাথের মন্দির। পাহাড়টা হাজার ফিট উঁচু আর মন্দিরটিও হাজার বছরের পুরাতন। নেছক পার্কের দক্ষিণে, রাস্তার ডান দিকে আছে শব্দর পার্ক। তার ভেতর দিয়ে শব্দরনাথের মন্দিরে বাবার পাহাড়ী পথ উঠে গেছে। এই পথে সময় বেশী লাগে—তিনটি পাহাড় ডিলিয়ে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। সোজা পথ হচ্ছে—টুনিট সেটারের কাছ থেকে। মন্দিরটিতে বাহাহুরী কিছু নেই কিন্তু শিবলিঙ্গটি বিশাল। পরিবেশ প্রচুর উষ্ণকরে। সরকার পাহাড়ের ওপর পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছেন। রাত্রিতে সমগ্র গ্রীনগর লহরটার ওপর মন্দিরটি বেন কর্তৃক করছে বলে মনে হয়। ডাল হুদ থেকেও রাত্রিতে আলোকোজ্জ্বল শব্দর পর্বতের দৃশ্য মনোরম।

হাউসবোটের মালিকেরা বিধাঙ্গী। ঝাড়ুদারের কাজ ছাড়া আর সব কাজই পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে করা করে। হাউসবোটের সঙ্গেই একটা ছোট বোট থাকে। পরিবারের মেয়েরা তাতে বাজীদের জন্তে রান্নার কাজটা করে। বাজীরা জিনিষপত্র সবই এদের জিহ্মায় ফেলে রেখে ঘুরে বেড়ান—চুরি হয় না। ব্যবসা এরা জানে, সুতরাং খাতকের ক্ষতি করে না। আমাদের হাউসবোটের মালিক আলি ওলানী অত্যন্ত ভক্তলোক। সাত দিনের চুক্তি করে পাঁচ দিন থাকার জন্তে কিছুটা উদ্বা প্রকাশ প্রথমে করেছিলেন কিন্তু

নিজেই আবার কমা চেয়ে নেন। করেকটা জিনিষ আমরা ফেলে এসেছিলাম। ফিলামের তীরে আমাদের হোটেল খুঁজে বের করে, ছেলেকে দিয়ে সেগুলি পাঠিয়ে তবে স্বস্তি পান।

একদিন একে বলেছিলাম—গুসানীজ, আপনার নাম শুনে আমাদের দেশের গোঁসানীদের কথা মনে হচ্ছে।

উত্তরে বলেছিলেন—বাবুজি, আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলাম। মুসলমানরা এদেশ জয় করে জোর করে আমাদের মুসলমান করেছিল। আসলে কিছু আমরা ব্রাহ্মণ।

কথাগুলো বলবার সময় তাঁর চোখে-মুখে একটা প্রবীণ ভাব ফুটে উঠেছিল।

বোটের মালিকেরা দরিদ্র নয়। আমাদের অনেককে সাত বায় কিনতে পারে। এক একটা হাউসবোট তৈরী করতে খরচ পড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তারও বেশী—অবশ্য কার্পেট, সোফা, কোচ ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর খরচ ধরে। শীতের সময় অর্ধাং ডিসেম্বর থেকে মে পর্য্যন্ত এরা শাল, কার্পেট ইত্যাদি নিয়ে নেমে আসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। তাতেও ভালো রোজগার হয়। কোনও কোনও হাউসবোটে একাবিক ব্যক্তির পার্টনারশিপ আছে।

সকাল থেকেই হাউসবোটে নানা পশারী সিকারা নিয়ে আসে—ফুল, ফল, মনাহারী জিনিষ, ফিল্ম, পেপারমাসি, শাল, জাকরণ আরও কত কি সওয়ার ভরে। বাজার দর জানা থাকলে এদের কাছ থেকে কেনা চলে। নবাগতদের না কেনাই ভালো, কারণ এরা বাজার দর অপেক্ষা বেশী নেয়। জাকরণ এদের কাছ থেকে কিনলে ঠিকবার সম্ভাবনাও বেশী।

সেদিন বোট প্রথম প্রভাত। সোনালি রোদে চারিধিক ঝলমল করলেও ঠাণ্ডা ভয়ে ডইংকমে বসে আমরা আড্ডা জমিয়েছি। এমন সময় মনোজ বাবু বাইরে থেকে ডাকলেন—দাদা, মহারাজ এসে গেছেন, দর্শন করে বান।

আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। তাবলাম কান্দীরের রা কোন্ দেশের মহারাজ বুঝি যাচ্ছেন। দেখি—একটা কার্পেট পাড়া সিকারায় সুরেশ মাথায় পাগড়ী এক স্বদর্শন প্রৌঢ় বসে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—মহারাজ কে? কোথায় তিনি?

চোখের ইসারায় মনোজ বাবু বললেন—এ যে উনি।

—ব্যাপার কি?

—উনি নাপিত মহারাজ, কামাবেন কি?

মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। ভাবানী বাবুর সখ হাচ্ছিল মহারাজের কাছে কামিয়ে দেখেন, কি বকম সাধু কামান হয়। হয়ত ওর মধ্যেও কিছু চাক্কলার সন্ধান পাওয়া যাবে। জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ি বনানেকা ভাও কিতনা?

—জি, আট আনা। উত্তর এল গভীর মহারাজের কাছ থেকে।

ভাবানী বাবুর গৃহিণী স্মৃতি বললেন—থাক থাক, আর মহারাজে কাজ নেই! সেক্ট রেজার আছে না?

বেচারি মহারাজ বঙ্গবাসীদের ভাবগতিক দেখে গভীর চালে সরে পড়ল।

সিকারায় ডাল ও খিশামে বেড়ার কাহিনী মনে থাকবে। আরবা আট ঘটীর চুক্তি করেছিলাম হুটে সিকারায় জন্তে দৃশ্য

টাকার। মরগুম অবশ্য আরও বেশী লাগে। ডাল, ছদ সাড়ে পাঁচ মাইল দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থ আড়াই মাইল। এর লাগাও আছে, নাগিন্ হু। এ ছাড়া ছাড়া দুই দুই আরও এগারোটি ছদ কাশ্মীরে আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে উলার, মানসবল, শেব রামনাগ। কুম্ভসায়র আর গঙ্গাবল।

এক্ষেপে ফুলের রাজত্ব ছুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সে-সময় পৌলোপ আর পদ্ম সারা দেশটাকে মাতিয়ে তোলে। আরও যে কত স্বকমের ফুল ফোটে তার ইয়ত্তা নেই। রাজত্বজিগীর মতে গ্রীষ্মই কাশ্মীরের প্রেষ্ঠ ঋতু।

ল চাতিরমা: কাশ্মীরে গ্রীষ্মজিগীরভূতঃ।

হিমলিকার্জনৈ: প্রায়াদ বনাজ্জ্ব কৃতার্থিতাম্ ॥

অর্থাৎ কাশ্মীরের গ্রীষ্ম অতি রম্য, স্বর্গেও তা দুর্লভ। সেই সময়ে (রাজা) সন্ধিপতি) বনমধ্যে হিমলিক্সের (অমরনাথের) পূজা করে কৃতার্থ বোধ করতেন।

সিকারার যেতে যেতে দেখলাম, পদ্মপাতার সমারোহ—ফুল কিচ্ছ একটিও নেই। হিন্দু আমলে ডাল-কে পদ্মসরোবর কেন বলা হত তা বুঝলাম। আফশায় হোল, আরও আগে এলাম না কেন। পদ্মের গোলাপী অরণ্যের মধ্য দিয়ে ভূর্যের স্বম্বা অতুল্য করার সৌভাগ্য হল না। পদ্মের আফশায় মেটালেন দলের গায়ক-গায়িকারা। ভবানী বাবু, মনোজ বাবু, হেমপ্রভা, পুষ্প আর শুভান্দি গান দিয়ে ডাল-এর ওপর ছড়িয়ে দিলেন মোহ-মদুরতা।

একটা ঘাটে এসে শিকার লাগল। মাঝিরা জানাল হজরতবাল। মুলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। আমরা এগিয়ে গিয়ে এক বড় হুসিন দেখলাম। নির্ধাতা শাজাহান—১৬৪২ খৃষ্টাব্দে। এখানে হজরত মোহাম্মদের মাথার বারটি চুল সমস্ত রক্ষা করা হচ্ছে। বছরের মধ্যে একদিন তা সব জাতের মানুষকেই দেখতে দেওয়া হয়। মসজিদটির পরিচালকেরা অত্যন্ত ভক্ত। অফিস টেলিফোন আছে, কে-কেউ বিনা পয়সায় ব্যবহার করতে পারেন। কাশ্মীরে পাবলিক টেলিফোনে দাম দিতে হয় না। অফিস-সালার একটি ধনুশালাও আছে। যে কেউ থাকতে পারেন, জাতিভেদ নেই। পরিবেশটি আমাদের খুবই ভাল লাগল।

সিকারার করে মোগল উত্তানগুলিতে বেড়ান যার। ফেরবার পথে আমরা হাসনাবাদ হয়ে আসি। ওখানে পেয়ারমাসি বা কাগজের মণ্ড জমাট করে নানা আকৃতির টরসেট সেট, ফুলদানি, ঐ ইত্যাদি তৈরী হয়। ওখানেই সারা কাশ্মীরের সেরা পেয়ারমাসি প্রস্তুতকারক জাফর আলির কারখানা আছে। আমরা কারখানা আর শো-রুম দেখলাম। কাগজের মণ্ডকে জমিয়ে তা দিয়ে কি সুন্দর যে একটা কুটিরশিল্প গড় তোলা যায়, তা এখানে না এসে বিশ্বাস করা যেত না, জামর আলি মাসিক হলও নিজেই আর্টিষ্ট, এখনও নিজে পরিশ্রম করেন। তাঁর কারখানায় পঞ্চাশ জন লোক কাজ করে বসলেন। শো-রুম যে সব কাজ আমরা দেখলাম, যেমন কাশ্মীরী নক্সা সরকারী আর্ট এক্সপারিয়মেও দেখিনি। তবে জিনিষ অল্পপাতে দামও খুব। রাজার অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ বেশী। জাফর আলি একটি উর্দু পত্রিকা নিয়ে এসে, স্বর্ণত ভ্রাম্যপ্রসাদ আর তাঁর নিজের ছবি দেখালেন। বললেন—ভ্রাম্যপ্রসাদ বাবু, তাঁর কারখানাকে এতই ভালবাসতেন যে, কাশ্মীরে এসে তাঁর কারখানায় ঘটায় পর ঘটায় কাটিয়ে দিতেন।

শ্রী নেহেরু, পণ্ডিত পঙ্ক ইত্যাদি ব্যক্তিরাও তাঁর কারখানায় এসেছেন। সব চেয়ে ভালো লাগল পেয়ারমাসির টের ওপর ওমর খৈয়াম, তাঁর সাকী আর সুয়ার চিত্রটি। কি নির্ভূত আর জীবন্ত ছবি! এঁদের তৈরী আধ ঘোট কাঠের জিনিষগুলিও পছন্দ নব্বের।

বিক্রয়ের দিকে সিকারার করে বিলামে বেড়াই। আগেই বলেছি গ্রীনগরে বিলাম সঙ্গীর্ণ—অধিকাংশ স্থানে বাগবাজারে খালের মত। এক এক বায়গার দু'পাশে বাড়ীর মাঝখান দিয়ে বিলাম চলেছে। তখন মনে হয়েছে ডেনিসে গাঙোলায় করে চলেছি।

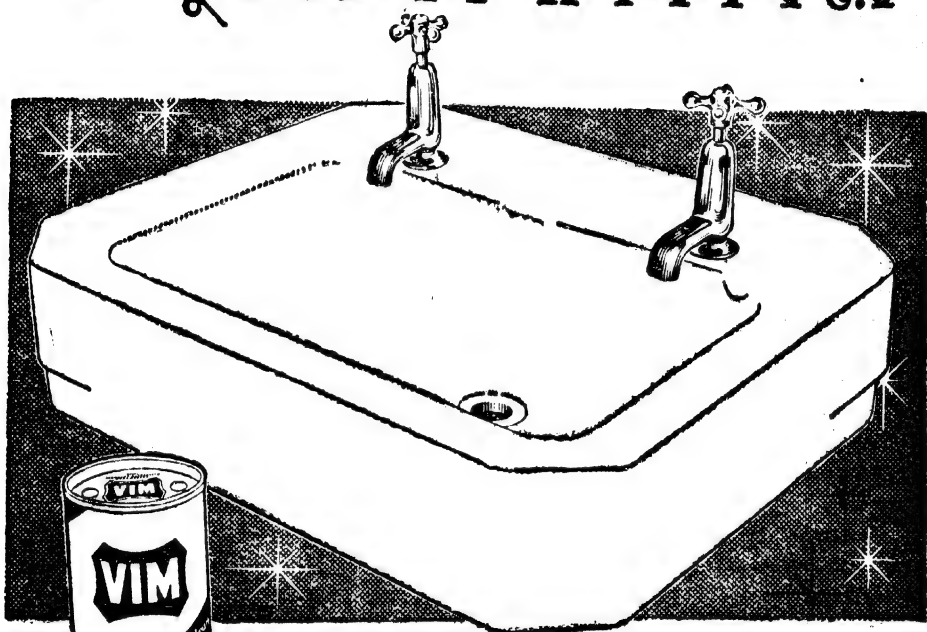
হাউসবার্টে থাকাকালীন একদিন আমরা মোগল উত্তানগুলি দেখতে গেলাম। টুইন্ট রিসপ্যান সেটার থেকে বাস করে যেতে হয়। কেউ কেউ ডাল বা বিলাম থেকে সিকারাতোও যান। বাস-ভাড়া ১'৭৫ টাকা বাতায়ত। দু'বার বাস ছাড়ে—সকাল সাড়ে আটটার আর বেলা দুটোর। বাসের প্রথম বিশ্রাম হারওয়ার্ড-এ। এখানে জলের রিজার্ভার আর নানা পণ্ডপাখীর ক্ষুদ্র উপনিবেশ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাণ্ডও চলেছে দেখলাম। হারওয়ার্ড-এ চীনার গাছের এলুমিয়াট দেখবার মত। এর পরের বিরতি—শালিমার উত্তানে। শালিমার কথাটির অর্থ—“প্রেমনিলায়।” বাস এখানে এক ঘণ্টা থাকে। সুতরাং ভাল করে দেখবার অবসর পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর শাহ এটির নির্ধাতা। উত্তানটির দৈর্ঘ্য ১৭৭৭ ফিট আর প্রস্থ ৮-১ ফিট। তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। জাহাঙ্গীর বাদশাহ কাশ্মীরে এক মাসের সফরে আসবার আগেই সম্ভবতঃ উত্তানটি তৈরী করানো হয়েছিল। নির্ধাতাও সম্ভবতঃ খোজা ওয়েসী। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আছে—তিনি খোজা ওয়েসীকে দিয়ে লাহোরের কাছে শীর্ষ হিল-এ উত্তান রচনা করিয়েছিলেন।

মিসেস ষ্টার্টের মতে, উত্তানটি চোসরোজ, নামক এক পারসিক কার্পেটের ডিজাইনের অনুকৃতি। বার নাম থেকে কার্পেটের নাম, সেই ইরানীর সম্রাট প্রথম চোসরোজ, শাহানীর বংশীয় ছিলেন এবং ৫৩১ থেকে ৫৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করত। প্রতিটি উত্তানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে এক একটি স্বর্ণ-খাল। এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে নাচতে নাচতে নেমে আসছে আর জমা হচ্ছে এক একটা বড় কুণ্ড। কুণ্ডগুলিতে আছে ফোয়ারা। জল বখন বেশী থাকে তখন ফোটারগুলি খুলে দেওয়া হয়। আমরা ফোয়ারার খেলা দেখতে পাইনি, কারণ জল তখন ছিল না বললেই হয়। বর্ষান্তেই এর সৌন্দর্য খোলে। খালের কেবলগুলি কোথাও বা মার্বেল পাথর কোথাও বা পুরাতন চূর্ণাপাথর দিয়ে তৈরী। মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আলোর ব্যবস্থা আছে। রাতে জলের ওপর আলোর খেলা চমৎকার। উৎসবমুখর রজনীতে এই সব আলো জ্বালা হয়। ক্রুশেড-বুগসানি যখন কাশ্মীর জমশে গিয়েছিলেন, তখন খুবই সমারোহ হয়েছিল। ভি, আই, পিসের আগমন ছাড়া আলো আর ফোয়ারার বৈত খেলা সাধারণতঃ দেখানো হয় না। তা তো হবেই—নীচের তলার মাছুর সৌন্দর্যের বোকেই বা কি আর তাদের জীবন “প্রেমনিলায়” মহাভাব উপলব্ধির অবসরই বা কোথায়? জাহাঙ্গীর-শাজাহানের মত প্রেমের সমঝদারই বা ক'জন? বুঝে গেলে উল্লস চরিত্রদের দিলে কি হবে, একটা বিশাল শাজাহাদর টাকার জোরে নানা



ভিম ব্যবহার করলে পরে

—দেখুন কেমন ঝলমল করে



ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষেরই চেহারা বদলে যায়। কাচের ও চায়ের বাগন, রান্নার জিনিষ, থালা বাটা ও ডেক্টী হাড়ী থেকে ঘরের মেঝে—সবই এক নতুন রূপ নেবে। আর ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে জিনিষপত্রে কোন রকম আঁচড় লাগে না আর কত সোজা ও কম খাটুনিতে হয় ভেবে দেখুন। ভেজা ন্যাকড়ায় একটু ভিম ফেলে, আঙুলে আঙুলে ঘষুন আর আপনার চোখের সামনে জিনিষ গুলোর রূপ বদলে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়

বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে নিশ্চিত, কর্তব্য প্রবর্তক।

V. M. X32 83

কীর্তির মাধ্যমে, তাঁদের প্রেমকে “কালের কপোলতলে গুঁড় সমুজ্জল” করে রেখে গেছেন! মহাকাব্যকেও ঘুম দেওয়া যায়।

এর পর বাস ধামসো নিশাতবাগে। কথাটির অর্থ “গার্ডেন ক্লব সোসাইটি” বা “প্রমোদোত্তান”। এর নির্মাতা শাজাহানের খন্ডর আসফ খান, আগ্রার বহুনাগারের “ইতমদৌলা” বীর বিখ্যাত সন্ন্যাসি-মন্দির। উত্তানটি তৈরী হয় ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে। দৈর্ঘ্যে ৫১৫ ফিট আর প্রস্থে ৩৬১ ফিট। উত্তানটি বারটি ছানে বিভক্ত। ডাল হ্রদের তীর থেকে শুরু হয়েছে। ক্রমশঃ এক একটি ছানে বিভক্ত হয়ে গাহাড়ের কোল পর্যন্ত উঠে গেছে। প্রতি ছানে ওটার জন্তে করেকটা পাথরের সিঁড়ি আছে। সমস্তাঙ্গের মাত্রা ধাপে ধাপেই বাড়ে। ধাপে ধাপে বাদশাহী খুশু বাড়িয়ে একেবারে ব্যোমমার্গে পৌঁছে দেওয়াই বোধ হয় আসফ খানের উদ্দেশ্য ছিল। বারটি ছানে ওঠবার পর এত নীতৈও কিন্তু আমাদের ঘাম এসে গিয়েছিল। যোগলাই আর বাঙ্গলাই-এ তফাৎ ত হবেই!

যোগল উত্তানগুলির মধ্যে সেরা এই নিশাতবাগ। পরিকল্পনাটি চমৎকার। ডাল হ্রদে বখন পদ্ম ফোটে আর ফুলের সময়ে বখন গোলাপ, ধুই ইত্যাদি নানা ফুলে নিশাত রূপসী হয়ে ওঠে, তখন ডাল-এর জলরাশি থেকে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত একটু বিশাল, বিচিত্র, অপূরণ্য কার্ণেটি রচিত হয়। ডাল-এর ওপারে কুড়ি মাইল দূরে পীরপঞ্জাল তখন রচনা করে বসিবেই যবনিকা।

নীতকালে এখানে নানা জাতের গালা, মল্লিকা, ডালিয়া, ক্রিসেনমিয়াম, বাটনহোল ইত্যাদি ফুল ফোটে। গাঁগার চেহারা আর দৃশ্য দেখবার মত। নাগপুর, আমেরাবাদ এমন কি বাংলা দেশের দূর বড় বড় মল্লিকা এখানে দেখি’ন। তবে হলদে আর সালা-বেঙনী ছোট ছোট মল্লিকাকে এমন অল্পস্রু ভ্রুতেও আর কোথাও দেখিনি। এখানের হলদে রঙটা বাঙ্গলা দেশের হলদে রঙের চেয়েও গভীর আর মনোহারা। হু’পালের কয়েকটি গাছ ছাতার মত ছাঁটা হয়েছে। তাতে সৌন্দর্য বেড়েছে।

কাগো, কাগো—কাগো দেখুন—বলে উঠল অগ্নিমা।

সে আবার কি?

ঐ যে—কি স্মরণ মিষ্ট! আগুয়াল!

ও ত কাক মনে হচ্ছে—কাগো আবার তোমার কোথায়?

হাঃ! কাক বলে ওদের অপমান করবেন? নিতান্ত অভিমানের সুরেই বললে অগ্নিমা।

তোমার কথাই শিরোধার্য। ওরা কাগোই—অমন ছোট ছোট কালো চেহারা আর অমন মিষ্টি সুর—কাকই বা বলি কি করে?

মনোজ বাবু বললেন—অগ্নিমা বোধ হয় কাকের সঙ্গে ওগো যোগ করে কাগো করেছে। তা ঠিকই করেছে। এই স্মরণ পরিবেশে একা একা কি ভালো লাগে—পাশে ‘ওগো’ না থাকলে? ওর একটা জগোর সন্ধান করতে হয়—

শেখালীদি’ থাকিয়ে উঠলেন—বলিহারি তোমাদের কল্পনাশক্তির। কোথা থেকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারো তোমরা—

কান্দীর কাক বা কাগো-প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। বাসের হর্ণ বেজে চলেছে—সময় উত্তীর্ণ। তাড়াতাড়ি সদলে উঠে পড়লাম।

নিশাত-এর পরে পড়ে চলমাসাহী। চলম শব্দের অর্থ বর্ণা। জাহাঙ্গীর এর পরিকল্পনা রচনা করেন আর শাজাহান ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে

তা কাজে পরিণত করেন। এখানের বিখ্যাত বর্ণার জলের হজম করাবার শক্তি ভারত-বিস্তৃত। শোনা গেল, প্রধান মন্ত্রী নেহরুর জন্তে নাকি এখান থেকে জল বিমানে করে প্রায়ই মিলী যায়। নিশাতের মত এখানেও ছাদের উপর উত্তান আছে। তিনটি মাত্র ছাদ। উত্তানও তেমন সবুজরচিত নয়। হয়ত বাদশাহী আমলে এর চেহারা অজরূপ ছিল।

নসীমবাগের খ্যাতি এককালে খুবই ছিল। কিন্তু ডালহুসের তীর বরাবর এর বিস্তৃতি নয়, এটি সহরের মধ্যে। নসীমবাগের অর্থ “নীতুল বায়ুর উত্তান।” চীনার গাছের খ্যাতি এককালে এই উত্তানে খুবই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এটিকে কান্দীর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছেন। শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে শুনলাম, বাড়ী তৈরীর কাজ এই বছর শুরু হবে আর ৬২ সালের মধ্যে সম্ভবতঃ শেষ হয়ে যাবে। আমরা যেয়ে দেখলাম, উত্তানও আর কিছু নেই। গাছপালা কেটে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন নির্মাণের উত্তোগপর্ক চলেছে। তবে নতুন করে উত্তানও রচনা করা হবে।

একদিন উলার হ্রদ দেখতে যাওয়া হোল। এটি এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ। রাজতরঙ্গিনীর আমলে এর নাম ছিল মহাপদ্মহ্রদ। টুরিট রিসেপশন সেন্টার থেকে বাস ছেড়ে যায় বেলা ন’টায়। ডাড়া যাত্রায় ৪’৫০ টাকা।

প্রথম বিশ্রাম গন্ধরবলে। এখান থেকে কিছু উপত্যকার দৃশ্য দেখা যায়। লাডাক বৌদ্ধধর্মের দেশ। গন্ধরবল থেকে সাত দিন পদব্রজে যাত্রা করবার পর ১১৬০০ ফিট উঁচু জোঞ্জিলা গিরিবন্ধ অতিক্রম করে রাজধানী লে অকলের দিকে যাওয়া যায়। কান্দীরের অন্তর্গত একটি প্রদেশ হচ্ছে লাডাক। এই লাডাকের বিখ্যাত লামা কুশক বাকুলা এখন কান্দীর সরকারে এক মন্ত্রী। জলমার্গ, গহলগাম, সোনামার্গ, কোকরনাগ আর ইউসমাগের মত গন্ধরবলও একটা স্বাস্থ্যনিবাস।

এর পর কিছুদূর গেলে উলার হ্রদ চোখে পড়ে। কিন্তু বাস উলার-তীরে অনেক পরে থামে। পথিমধ্যে পড়ে ক্ষীরভবানী। একদল শীতের অন্তর্গত ক্ষীরভবানী মন্দির হিন্দুমানব্রেরই পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে নাকি সতীর কণ্ঠ পড়েছিল। পাথরে বিধান একটা বিস্তৃত চব্বরের মধ্যে এই মন্দির। চরিত্রিকে বিশালকার চীনারের সমারোহ। এমন মোটা ওড়িওয়ালা চীনার গাছ খুব কমই দেখা যায়। ভবানীসেবীর মন্দিরটির তিন দিকেই ক্ষীর বা জলের বেড়া দেওয়া আছে বলেই ঐ নাম। শোনা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন এবং দৈবদেশেও নাকি পেরেছিলেন। পাণ্ডারা আছেন কিন্তু অজ্ঞাত অনেক তীর্থস্থানের মত গলাকটারি জন্ত ব্যস্ত নন। স্বল্পেই তাঁরা সন্ধ্যা। চারিদিকের পরিবেশের মধ্যে একটা পবিত্রতা আছে। দেখলাম, অনেক বাত্মীই গুজো করছেন। হেব্রপ্রভা ফুল নিয়ে প্রদানত হয়ে গুজোর বসে গেল। হলের কেউ ‘কেউ মনে মনে প্রার্থনা জানালেন। ভবানী দেতাজীর উপাস্তা দেবী। শিখাজীও এর সাধনা করতেন। মনে মনে বললাম—মা বাংলা দেশ থেকে লারেলারা দূর কর; আর মেঘ করে রেখ না।

হাসনবল-এ এসে বাস ধামসো। উলার-এর সলার একটি ফুল। হুজাবলী চমৎকার। বাত্মীরে কিল্লারের জন্তে এখানে

একটি নূন ঘর তৈরী করা হয়েছে। সমুখের পাহাড়ের বর্ণাঙ্কিত লেদাশাহার মতই স্বাভাৱি আছে। এর পরের দর্শনার স্থান হচ্ছে বাতলাব। এখানে বাস সেড় বর্ষা থামে। উলার এখান থেকে ভালভাবেই দেখা যায়। যতক্ষণ উলার দেখিনি ততক্ষণ মনে মনে এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ সম্বন্ধে একটা বন্ধন বন্ধনা ছিল—অবস্থাটা ঠিক ওয়ার্ডল ওয়ার্ণের “ইয়েহো আনভিক্টিটেড্”—এর বা মোনালিসার হাসির পুরাতন কাব্যিক ব্যাখ্যার মত। কিন্তু যখন সেরূপ দেখলাম তখন বলতে পারলাম না—

নয়ন ন তিরপিত ভেল।

বড় বড় চড়া পড়ে, চড়ার ওপর আগাছা জমে ডাল লেকের মতই ওকে নিত্যন্ত “ডাল” করে দিয়েছে। তবে বিস্তার বেশ আছে। উলারও বোট করে বেড়ান যায়, তবে সহজ নয়। তনলাম সাত-আট দিন থাকবার চুক্তি করলে তবে বোটওয়ালারা বাত্ৰী নেয়, খরচও অনেক পড়ে। আমরা কোনও বাত্ৰীকে উলারে বেড়াতে দেখিনি।

এই উলারের উপরেই বন্দীপুর নামে একটি বাহগা আছে। সেখান থেকে ট্রাগবল্ হরে বাজিল আর কামরা গিরিবন্ধ্যা অতিক্রম করে গিল্গিটে আর পৃথিবীর ছাদ পামীরে হাওয়া যায়। এখন ৬-৭শ বন্ধ। গিল্গিট পাকিস্তানের অধীনে আর পামীর রাশিয়ায়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে জপার।

শোপুর আর বারামুলায় বাস থামে ফেরবার পথে। বারামুলাতে শহীদ শেরওয়ানীর একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ১৯৪৮-এ পাকিস্তানের উদ্বাসিতে উপজাতিরা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন তারা জীনগরের উপকণ্ঠে এই বারামুলায় এসেছিল। এক যুদ্ধের পর ভারতীয় সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। সীমান্ত রক্ষার বাপারে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একে কাশ্মীরের দ্বারও অনেকে বলে থাকেন।

উলারের পথে মানসবল্ হরে “লোলা উপত্যকা” আছে। গাইডবুকে এর কোনও উল্লেখ নেই। কাশ্মীর ত্যাগ করবার পর এক কাশ্মীরী যুবক সংবাদটা দেন। তাঁর মতে, সমগ্র বাগ্মারে নাকি তত সুন্দর উপত্যকা আর নেই। ঐ উপত্যকায় বেতে হলে মানসবল্-এ নেমে বেসরকারী বাসে ৩৫ মাইল বেতে হয়। তারপর কিছুটা পদযাত্রা। উপত্যকার মাঝামাঝি একটা হ্রদ আছে; নীল, ফটক স্বচ্ছ নাকি তার জল। এক পাহাড়ের মধ্যে এক গুহা আছে। তার এক প্রান্ত নাকি হাজির হয়েছে রাশিয়ায়। তাই নাম “কারাকশ” বা “কুশের মাথা”। ভ্রমলোকের কাছে গর তনলাম—বয়েকজন ইউরোপীয় ব্রুটিশ আমলে ১২০০ লোক নিয়ে ঐ হ্রদের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। আর কিসে আসেনি। অবশ্য ওপাশে যদি সত্যিই রাশিয়া থেকে থাকে তাহলে ফেরবার কথা নয়। একটা কিছু রহস্য স্থানটাকে ঘিরে আছে তা না হলে সরকারী গাইডবুক-এ তার উল্লেখ নেই কেন? আমাদের আকশোষ হল যে, এমন আশ্চর্য্য বায়গাটা দেখতে পেলাম না?

সোনামার্গ-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রেসিয়ার বা হিমাবাহ। পাচাধ্য জগদীশচন্দ্র ভগীরথীর উৎস-সন্ধানে যেয়ে যে-হিমবাহ দেখেছিলেন, তার স্বরূপ কিছুটা বোঝা যায় সোনামার্গে হিমবাহ দেখে।

জীনগরের টুরিষ্ট সেন্টার থেকে সপ্তাহে মাত্র দুদিন বাস ছাড়ে। ছত্তাশ দিন সামরিক প্রয়োজনে প্রায়ই শব্দ বন্ধ থাকে। গুলমার্গ বা খেলনমার্গের মত এখানেও ঘোড়ার চড়ে যেতে হয়। দৃশ্যবলী অপূর্ণ! হিমবাহ যেখান থেকে বেরিয়ে আসছে তার চেহারা অনেকটা বৃহদাকার মাছের খোলা মুখের মতন।

হাউসবোটের স্থবির জীবন কারো কারো খুবই ভালো লাগে। আমাদের কিন্তু করেক দিনেই মোহ কেটে গিয়েছিল। যাদের মধ্যে সেই আদিম বেহুইন জেগে ওঠে, তাদের পক্ষে একই পরিবেশে শান্ত, সমাহিত জীবন কাটানো যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের রক্তে বোধ হয় তার আহ্বান পৌঁছেছিল। তাই আমরা ‘ফর পাশ্চাস নিউ’—নূতন পরিবেশের সন্ধানে চলে এলাম ঝিলামের তীরে এক হোটেল। মোগল আমলের সাতটা সেতু আছে এই ঝিলামের উপর। অবশ্য এখন সেগুলোর চেহারা কিছুটা আধুনিক করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আছে, কাশ্মীরে আসবার সময় তিনি বহু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন জলপথে আর সৈন্যরা সমান্তরাল ভাবে স্থলপথে। তাদের বাত্মাশ স্বগম করে জাহাঙ্গীর নুউদ্দিন কুলি বেগকে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন জঙ্গল পরিষ্কার আর নদীর উপর সেতু তৈরীর জন্তে। সেই সময়েই সেতুগুলি নিহিত হয়। একটা সিকারী নিয়ে ঝিলামের সপ্ত সেতু সহজেই দেখা যায়।

জীনগরের শিক্ষা-বাবস্থা দেখবার ইচ্ছা ছিল। শুনেছিলাম, জম্মু কাশ্মীরে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত বিনা বেতনে দেওয়া হয় আর সমূহ অর্থের বোকাটা ভারত সরকারই বহন করে থাকেন। সুতরাং শুধু চীনার, পপুলার আর তুবার নিয়ে সম্ভ্রষ্ট হতে আমরা পারিনি। তাই একদিন কল্যাণিকের নিয়ে রেসিডেন্সী রোডে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে গেলাম। রিপ্, পাঠ্যবই ডিরেক্টর হুস্তার আহমেদ নিজে এসে খুবই খাতির করলেন। সহকারী ডিরেক্টরের অফিসে মিয়ে গিয়ে বললেন—প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র যেন আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়।

সহকারী ডিরেক্টর শামলাল রায়না কাশ্মীরী হিন্দু। যথেষ্ট খাতির করে বাসিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন। কক্ষে উপস্থিত ছিলেন

ডাঃ বঙ্গুর

অশোক কার্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বঙ্গুর স্যাবলরেটরী লিঃ

কলিকাতা-৯

জন্ম ও কান্দীরের শিক্ষা-বিভাগের শারীর শিক্ষার অধিকর্তা জীযুত মালহোত্র আর জর্নেক জীবন্তের অধ্যাপক।

ভামলাল রায়না বললেন—কেমন লাগছে আপনাদের কান্দীর ?

বললাম—‘ইয়েরো রিভিজিটের’ মত নয়। বন্ধনার আর বাস্তবের কান্দীরকে একই রকম মনে হচ্ছে। বীরা ভূষণ বলেছিলেন, তাঁরা মিথ্যা বলেন নি।

বললেন—তা ঠিক। প্রকৃতি এ দেশে মুক্তহস্তে সৌন্দর্য ছড়িয়েছেন কিন্তু একটা জিনিসের খুবই অভাব—অর্থের। দেশটা বড়ই দরিদ্র।

বললাম—আমিও সে কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। আমরা বাঙ্গালীরা দারিদ্র্যের সঙ্গে চির-পরিচিত। কিন্তু এখানের দরিদ্রদের দেখে সত্যিই বেদনাবোধ করেছি। আপনাদের দেশে মধ্যবিত্ত প্রায় নেই। অবশ্য থাকলে ভাল হত কিনা বলতে পারছি না। কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রাণ উপরের তলার আর নীচের তলার দুই বাতায় চাপে পিবে ফেলা হচ্ছে। আমাদের দেশে মধ্যবিত্তেরাই সহস্র কষ্ট সহ করে সভ্যতার আলোকবর্তিকা তুলে ধরে রেখেছিল। ইংরেজ বৎসর বিনষ্ট করতে সাহস করেনি, দিল্লীর মনলওয়ালারা তাদের জীবনকে নরকে পরিণত করছে। এসব নীতি টেনে ওঠানো নয়—টেনে নামানো। তবুও আমার মনে হয়, মধ্যবিত্ত থাকলে কান্দীরে সৌন্দর্যের সঙ্গে লক্ষ্যী আসতো। তারাই নিতানুতন কল্যাণ চেষ্টার স্বপ্ন ক্ষিতে পারত।

কথাগুলো বোধ হয় জোরালো হয়েছিল আর আমার শ্রোতারও ছিলেন উচুতলার মানুষ। স্ততরাং কথার মোড় ফেরালেন শারীর শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মালহোত্র। বললেন—দেখুন, আমার মনে হয়, বাঙ্গালীদের সঙ্গে কান্দীরীদের একটা নান্দীর যোগ আছে। নানা ভাবেই তার প্রমাণ পেয়েছি—

মনে মনে খুশি হলেও বললাম—তা হয়ত সত্য। তবে আমি দৃষ্টান্তিক নই। তাই জোর দিয়ে স্বীকৃতি জানাতে অক্ষম। তবে মনে হয়, কোনও একটা বন্ধন নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে সেড় হাজার মাইল দূর থেকে বাঙ্গালীরা ছুটে আসবেই বা কেন ? প্রতি বছরই ত আমাদের দেশ থেকেই বেশী লোক এখানে আসে। এ-বছরের কথাই ধরুন না। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত লীনগর নাকি ফলকাতা হয়ে গিয়েছিল। আগামী বছর হয়ত আরও বেশী বাঙ্গালী বেড়াতে আসবেন। স্ততরাং দৈহিক না থাকলেও আত্মিক সম্পর্ক একটা আছেই।

জীযুত রায়না বললেন—বাঙ্গালীদের আমরা শ্রদ্ধা করি। এদেশে উচ্চশিক্ষার নৃত্যপাত করেছেন তাঁরাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাটা কি অর্ধেকজনিক ? অগ্রগতি কেমন হচ্ছে ? বাজেট কত ?

বললেন—এদেশে বিনা বেতনেই প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। গত পাঁচ বছরে আমরা তিন গুণ এগিয়ে গিয়েছি। অগ্রগতির হার ত্রুটিই বলতে হয়। আগে বাজেট ছিল ৪০ লক্ষ, এখন আড়াই কোটি টাকা। কিন্তু এ তো সমুদ্রে পাড়-অর্থ। টাকা পেলে দেখির দিভাম আমরা কি করতে পারি।

শারীরশিক্ষার অধিকর্তা বললেন—টাকাটাই বড় কথা নয়। বিজ্ঞান-সম্মত পরিকল্পনা চাই। তা না হ’লে টাকা কোন্ অতলে তলিয়ে ধাবে।

বললাম—অতি সত্য কথা। ছুটোরই দরকার। এ-ছুটার ঠিক ঠিক কো-অর্ডিনেশন না হলে কি ছুববছ। হয়, তা পঞ্চাব্দিকার কল্যাণে বেশ বুঝতে পারছি।

জীযুত রায়না বললেন—এগারো বছরের কোর্স পশ্চিম-বাংলায় কি রকম চালু হয়েছে ? তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সেরই বা ভবিষ্যৎ কি ?

বললাম—পশ্চিম-বাংলার ১৬৮-টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ২৮-টিতে এগারো বছরের কোর্স চালু করা হয়েছে। সবগুলি অবশ্য সর্বাধিকারক নয়। সরকারী টাকায় স্কুলের বড় বড় বাড়িও তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে কিনা, এখনও তা বলা যাচ্ছে না। দু-পাঁচ বছর পরে সমাপ্ত পরীক্ষার ফল দেখে হয়ত বলা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষক-ছাত্র দু’জনেই হুসি পড়েছেন। পশ্চিম-বাংলার কলেজগুলির কর্তৃপক্ষরা দীর্ঘকাল তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের বিরোধিতা করেছিলেন। তার ফলে গ্রাউন্ড কমিশনের টাকা তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি। সম্প্রতি তাঁরা নয়া তালিম মেনে নিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে শীগগির তিন বছরের কোর্স চালু হবে।

কল্যাণী করণ চোখে আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ এই—নীরস আলোচনা বেখে চটপট উঠে পড়ুন। বাইরে যেয়ে পাকাড়ি খেলে কাজ দেখবে। আমিও চোখের ইন্ধিতে জানাশাম—এই উঠলাম বলে। আবার আলোচনার ডুব গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার এ-বিষয়ে কি করেছেন ?

জীযুত রায়না বললেন—জন্ম আর কান্দীরের মাত্র ছুটি স্কুলে আমরা এগারো বছরের কোর্স চালু করেছি। কলেজে তিন বছরের কোর্স এখনও চালু হয়নি। ক্ষেত্র করা হবে স্থির হয়েছে।

বললাম—আপনার কি মনে হয়, নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে ? সর্বাধিকারক বিভাগগুলির কানা-ছেলে পয়সালাচন হবে না ? পরিচালনার আর আর্থিক ব্যবস্থার দিক থেকে এগুলো একটা বিপর্যয় ডেকে আনবে না কি ? ইংলও ১৯৩৮ সালের স্পেশাল রিপোর্টে সর্বাধিকারক স্কুলগুলোকে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল—এত আপগনি জানেন। বটগ সরকার তারপর মালটিকিটোরেল্ বিভাগের গড়তে আর এগোন নি। আমাদের মত দরিদ্র দেশের এতো হুসাহস কেন বৃদ্ধি না। আমেরিকার টাকা আছে। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। আমাদের তা করা কি তোগলকী পাগলামি নয় ? উদ্বেগ ভাল হলেই কি কাজ ভাল হয়, না বাস্তব বৃদ্ধির দরকার ?

জীযুত রায়না বললেন—আপনার বুদ্ধির মূল্য আছে। আমরাও নয়া ব্যবস্থা সবচেয়ে এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি—এখনও আমরা ভাবছি।

এর পর তিনি কয়েকটি সাক্ষীর টাইপ করিয়ে আমাদের হাতে দিলেন—বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে দেখা। আমরা আত্মরিক খড়বাব দিয়ে বিদায় নিলাম। [ক্রন্দন]

বিপ্লবের সম্মানে

[পূর্ণ-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৪ সালের প্রথমেই যখন আমি কলকাতায় চলে এলাম—
যটনাচক্রের সঙ্গে জীবনযাত্রাও যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল।
জীবন যেখানেই থাক, বাইরে ছিল—যেন পাশেই ছিল। এখন
সে জেসে—কতদিন থাকবে কিছুই ঠিক নেই—বুকের পাশটা যেন
খালি হয়ে গেছে। গত কয়েকটা বছর ধরে সে ছিল আমার বন্ধু,
পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক। আমিও তার ডেপুটি হয়ে উঠিলাম।
বহুত জীবন না থাকলে আমার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ হয়ত
অল্প দ্বারা চলতো,—আর সেটা হত একটা ছবিপাকের নামাস্তর।

আমি “জীবনবানু” লিখি না, কারণ তা লিখতে কেমন যেন
বাধে। ১৯২০ সালের আগে পূর্ণাঙ্গের “আগনি” বলেই কথা
বলতাম। একদিন জীবন বললে, “আগনি-আজ্ঞে” ভুলে আঁব ভাল
সেখার না, ওগুলো বার দেওয়া থাক,—“তুমি” সম্পর্কই ভাল—কি
বলুন? আমি বললাম, “বেশ।” তারপর, কে আগে “তুমি” বলবে,
তাই নিয়ে আর ভেঁটাছুটি। হসিকেই সমান ভেঁটা—কাজেই
ফরসালা হওয়া হুঁসিল। তারপর জীবন দত্ত বিকশিত করে বললে,
“তুমি আগে বলুন।” তারপর একচোট হাসাহাসি হয়ে ফরসালা
হয়ে গেল। সে ফরসালা আজও বলবৎ আছে,—যেমন শত
যত্নের পর মধ্যে মূল আর্শে মিল বরাবরই আছে।

কলকাতার প্রথমেই প্রয়োজন হল একটা রোজগারের ঠাঁট—
Ostensible means of livelihood—বাংলার বাড়ীতে
থেকে ভারীজামাই বা ব্যবসা চালাচ্ছিলেন—ভাড়ার কাজ—সেটার
হয়েছিল আভিমন্যু। তাকে খাড়া করতে গেল, আর সব ছেড়ে
সমসেই জড়তে হয়। তখনও কিছু টাকা হাতে ছিল,—তাই
নিয়ে কলকাতায় জিলাপাল মল্লিক লেনে এক ঘর ভাড়া করে
সাবানকে (ব্যানাঙ্কি) এলালুম—হল এক কার্ণিটারের ব্যবসা—
নিম্নম থেকে কার্ণিটার কিনে বিক্রী। খরচ চলে প্রায় পকেট
থেকেই। কিছুদিন পরে ময়মনসিং এর আন্দ মজুমদার—সুরেনদার
এক বৃদ্ধ সহকর্মী—কলেজ হোটেলে এক বোর্ডিং করলেন,—বোর্ডিং
সবই পল্লের লোক—সুরেনদার আজ্ঞা। আমি সেখানেই নীচের
তলায় একখানা ঘর নিয়ে উঠে গেলুম। ২৪ সালের মধ্যে বোঁ সেই
বাড়ী থেকেই সুরেনদার প্রভৃতির সঙ্গে রেগেশ্যন থিওর বরা পড়ি।

বাই হোক,—যখন outdoor work করার নামে বাইরে
যোবাকের রীতিমত চললো। সেইরকম কাজের পর আইন অমান

আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন ঘোঁড়াই বাধ
হল বলেই লোকের ধরে নিয়েছিল,—এক তারপর মহাশয়
গ্রেপ্তার ও জেল হওয়াতে আন্দোলনের ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল।
কতকগুলো জারগার খবর উৎপাদন হেস্ত, আর কতকগুলো জারগার
একমাত্র সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্বাধীন পাটির প্রচার প্রেরণ—
এই ছিল কংগ্রেসের মোট শক্তি। শতকরা ১০ জন উকীল এবং
চারে ছোট-কলেজ ফিরে গিয়েছিল,—এক বছর তাপাতেই স্থানীয়
কংগ্রেস কমিটিও উঠে গিয়েছিল—টাল, বরানগর, আলমবারাওকে।

কিন্তু স্বাধীন পাটির গণভিত্তি বন্ধাব জন্তে স্থানীয় কংগ্রেস
কমিটির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। আমি টালার আবার এক
কংগ্রেস কমিটি গঠন করলুম—আলোগরের উকীল জিহামচন্দ্র মিত্র
(অমূল্য সিংহের মাতুল) প্রেসিডেন্ট,—আর আমি সেক্রেটারী।
বরানগরে কয়েকজনকে নেড়েচেড়ে নেখে ভাল ছেড়ে দিলাম।
আলমবারাজের তুলসী ঘোষ ও বীরেন চট্টোপাধ্যায় আবার কংগ্রেস
কমিটি করে কাজ করতে রাজী হলেন—সেখানে এক কমিটি
হল। ভটিপাড়াতে আমাদের একজন পুরাতন সহকর্মী—
নগেন দাস, অস্বরণ থেকে মুক্ত হয়ে এক লোকান করে বসেছিলেন,
—আর ছিলেন কালী ভট্টাচার্য—আগে তিনি বিপিনদাস সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং পরে হয়েছিলেন এবংজন প্রসিদ্ধ নেতা।
যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী বলে আমাদের একটি ছেলেও ছিল (এখন একজন
ইনকাম ট্যাক্স অফিসার)—এঁদের নিয়ে ভটিপাড়াতেও এক
কংগ্রেস কমিটি করা হল।

কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনা ছিল আমাদের লক্ষ্য—
আমাদের সংগ্রামীল চেতনার “রূপের” সখ বোলে মোটোনার” জন্তে
আমরা ধরেছিলাম স্বাধীন পাটির সংগ্রামী কর্মপন্থাকে। কিন্তু
জনগণের সংগ্রামী চেতনা অল্প দুই দ্বারা প্রবাহিত হতে সক্ষম
করেছিল।—এক দ্বারা হচ্ছে প্রমিক ও কুবক আন্দোলন,—আর
তার মধ্যে বীরে বীরে বলপূর্ণিকরানের অগ্রপ্রবেশ,—এক আর
এক দ্বারা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক চেতনা ও হান্ধা। এই সাম্প্রদায়িক
চেতনা এবং হান্ধাটাটা সব চেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠছিল,—এক
হিন্দু-মুসলমান মিলন যেহেতু কংগ্রেসের কর্মপন্থার একটা কড়
অঙ্গ, সুতরাং কংগ্রেস নেতারা,—কি হিন্দু, কি মুসলমান,—সকলেই
সব চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানেরা মশাধি নেমা

পড়ছে,—এমন সময় এক হরিনাম সংকীৰ্তনের দল এক শবযাত্রা করে যাচ্ছে। মসজিদ থেকে মুসলমানেরা বেরিয়ে বললে—এখন নমাজ হচ্ছে,—তোমরা সংকীৰ্তন একটু বন্ধ করে যাও। হিন্দুরা রাজী হল না,—মুসলমানেরা ইট-পাটকেল ছুড়ে শবযাত্রার মিছিল ভেঙ্গে দিলে। এই ভাবে একজায়গায় গোলমাল সুরু হতেই সব জায়গায় সেটা ছড়িয়ে পড়লো অনেক বড় হয়ে। মুসলমানেরা দাবী করলো, নমাজের সময় হোক বা নাই হোক,—মসজিদের সন্মুখ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া কোন সময়েই চলবে না। হিন্দুদেরও জেদ চড়লো, তারা মসজিদের সন্মুখ দিয়ে সংকীৰ্তন করে যাবেই—গান-বাজনা থামাবে না। ইট-পাটকেল গিয়ে লাঠালাঠি লাঠিবাছিতে। নিত্য নতুন জায়গা থেকে লাঠালাঠির ধবর আসে।

অসহযোগ আন্দোলন বার্থ হয়েছিল,—স্বরাজ এক বছরে দুবে থাক, কত বছরে হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অসহযোগের ফলে কিছু মুসলমান ছাত্রেরও লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিল,—এখন সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা বলতে সুরু করলে—হিন্দুরা লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে আছে,—তাদের চেয়ে মুসলমানদের ক্ষতি হল বেশী।

খিলাফত আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে। মুস্তাফা কামাল পাশা সেকার্দ সন্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ভারতের খিলাফত কমিটি উৎসাহিত হয়ে চাঁপা তুলে একখানা এরোগেন কিনে তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সেই কামাল পাশা যখন নতুন তুর্কী রাষ্ট্র গঠন করলেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি খিলাফতই ভেঙ্গে দিলেন। তুরস্কের সুলতান ছিলেন সমগ্র মুসলমান জগতের ধর্মগুরু। তারই নাম খিলাফত। প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা মুসলমান জগতের সঙ্গে তুরস্ককে জড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা তুলে দিলেন এবং তুরস্ককে করলেন একটা মডার্ন স্টেট। ভারতের খিলাফত আন্দোলনের স্বভাবতই নসারি হয়ে গেল।

ভারতের মুসলমানেরা, বারা খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলনেও বেগ দিয়েছিলেন, এবং বুটিং সরকারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম করছিলেন, দুই দিক থেকে বার্থ হয়ে, তাঁদের মনের বিব সাম্প্রদায়িকতার চোরা গলিতে প্রবাহিত হল। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারের মুখে দিল্লীতে আর্থ সমাজের নেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মুসলমানেরা জুয়া মসজিদে বন্ধুতা দিতে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হাজারা সুরু হওয়ার পর হিন্দুরা যেমন হিন্দুগড়ার সংগঠন সুরু করেছিল, তেমনি ব্রহ্মানন্দ তত্ত্বি আন্দোলনও সুরু করেছিলেন,—মুসলমানদের “তত্ত্বি” করে হিন্দু করে নিতে সুরু করেছিলেন। আবার হিন্দুদের এই তত্ত্বি ও সংগঠনের পাণ্টা ব্যবস্থা সুরু করেছিলেন কংগ্রেস নেতা উত্তর সৈয়দানি কিল্লু (এ যুগে যিনি শান্তি সংসদের প্রেসিডেন্ট রূপে ঐলিন প্রাইজ পেয়েছেন) কিল্লুর আন্দোলনের নাম তবলীগ ও তাজিম আন্দোলন—মুসলমান সহতির আন্দোলন। এই সব সংগঠনের মুখে—বোধ হয় ২০ সালের শেষে—দিল্লীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন এক মুসলমান আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হলেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো বেড়ে গেল। প্রকাশ্যে হানে গোহত্যা, এবং তা নিয়ে লাগাও হল।

এই সব ব্যাপারের পাশাপাশি আর এক রকমের আর একটা

আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে সুরু হয়েছিল—সে মুসলমানদের কাউন্সিলে সদস্য সংখ্যা এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সংখ্যার অসুপাত বৃদ্ধির আন্দোলন। বাংলার এ আন্দোলন বেশ জোর পেয়েছিল,—কারও এখানে মুসলমানের সংখ্যা বত বেশী, পদাধিকার ছিল তার তুলনায় অনেক কম। কাজেই বেশবড় মুসলমানদের অসন্তোষ নিবারণের জন্ত বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছিলেন, যাতে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শান্ত হয়। তাঁর নেতৃত্বে এক হিন্দু-মুসলমান প্যাঞ্জি বা চুক্তি হয়েছিল,—যাতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী এবং কিছু বেশী কাউন্সিলের সদস্য পদ এবং চাকুরী স্বীকৃত হয়েছিল,—এবং স্থির হয়েছিল,—হিন্দুরা মসজিদের কাছ দিয়ে সংকীৰ্তনাদি নিয়ে যাওয়ার সময় মসজিদের কিছু আগে থেকে কিছু পবে পৰ্শস্ত গান বাজনা বন্ধ করে যাবে,—আর হিন্দুদের ধর্মভাবে যাতে আঘাত লাগে, মুসলমানেরা এমনভাবে গোহত্যা করবে না।

স্বভাবতই মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই চুক্তিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছিল,—এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের শান্তি-কামনাও করা হয়েছিল। এমন কি এই, চুক্তির পরে ২৪ সালের প্রথমে (বা ২৩ সালের শেষে?) ঈদের সময়, কলকাতার—ইতিহাসে এই একটা মাত্র বৎসর গো-কোথাগী হয়নি—বড় মসজিদে কোথাগী হয়েছিল একটা উট—মজাজ জেড়া। সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত “সারথি” পত্রিকার আমি এই চুক্তি সমর্থন করে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম (২৪ সাল)—যার জন্ত—হরেনদা বলেছিলেন—ময়মনসিংগ সারথির কিছু মুসলমান গ্রাহক বেড়েছিল। চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের তরফ থেকে প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল। বিশেষত নো-চেঞ্জার কংগ্রেসীদের তরফ থেকে প্রো-চেঞ্জ নেতার বিরুদ্ধে বিবোকাগারের যেন একটা মহাসংযোগ জুটে গিয়েছিল। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুস্তান-বর্ষা একটা দল গড়ে ওঠার সুযোগ হয়েছিল,—যে দল পরবর্তী কালে হিন্দুমহাসভার রীতিমত বিপক্ষে পরিণত হয়েছিল। পরে যখন কলকাতার কংগ্রেসে বেশবড় তাঁর হিন্দু মুসলমান-চুক্তি মঞ্জুরী জন্তে উপস্থাপিত করলেন, তখন সে মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যাত হল। মোলানা মক্কাহ আলী বিরক্ত হয়ে বললেন, আজান আর সংকীৰ্তনই যদি হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেয়ে বড় ধর্ম হয়, তাহলে আমাদের এ ছুস্টোটা স্বাগ করাই ভাল।

জেলে মহাত্মাজী অ্যাপোণ্ডিসাইটস হয়েছিল, এবং তাঁকে বারবেলা জেল থেকে পুণার সন্তান হাসপাতালে এনে অপারেশন করা হয়েছিল,—এবং তিনি আরোগ্য হওয়ার পর গভর্নমেন্ট তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁর মুক্তির পরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোহাটে এক প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয়, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের হাতে হিন্দুরা বহু সংখ্যার হতাহত হয়। মহাত্মাজী আশ্বত্থর জন্তে ২১ দিন অনশন করেন। অনশনের সময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে সকল সম্প্রদায়ের নেতারা উপস্থিত হয়েছিলেন।

বাই হোক, এদিকে স্বরাজ্য পাণ্টি কাউন্সিলের সাধারণ সিট প্রায় সবগুলো দখল করেছিল, এবং কলকাতা কর্পোরেশনেরও সব সিট দখল করেছিল। কাউন্সিলের নির্বাচনে দুটো কেন্দ্র হয়েছিল সবচেয়ে বড় নয়। বামাকপুরে স্বরেন্দ্রনাথ পরাজিত হয়েছিলেন বিধান রায়ের কাছে, এবং বড়বাজারে এস, আর, দাশ, পরাজিত হয়েছিলেন

সাহসিকপতি বাঘের কাছে।* এস, আর, দাশের তখনকার দিনে, ৬০ হাজার টাকা খরচ হবে গিয়েছিল। তিনি দেশবন্ধুকে বলেছিলেন,—তোমাদের স্বাধীন যেদিন হবে, সেদিন আমি বিলেতে পালাবো।

বিধান সায়কে নির্বাচনে নামিয়েছিলেন দেশবন্ধু স্বয়ং। তিনি প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কংগ্রেসের সদস্য (চাব আনার) হয়ে বাও আমরা তোমাকে ইলেকশনে দাঁড় করাই। বিধান বাবু কংগ্রেস সদস্য হতে রাজী হননি—ইলেকশনেও দাঁড়াতে চাননি। তারপর দেশবন্ধু বলেন,—বেশ, কংগ্রেসের সদস্য নাই হও,—ইণ্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী হয়ে ইলেকশনে দাঁড়াও, আমরা তোমাকে সমর্থন করবো। তাই শেষ পর্যন্ত হল, বিধান বাবু জিতলেন,—এবং তার পরে কংগ্রেসের সদস্য হলেন।

ময়মনসিং-এ নলিনীরঞ্জন সরকারকেও ইলেকশনে নামিয়েছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু,—এবং তিনি পরাজিত করেছিলেন এস, এম, বোসকে, যিনি পরবর্তী কালে বোধ হয় অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। বিপ্লবীরা, বিশেষত যুগান্তর পাটি,—এবং তার তখনকার নেতা সুরেন দা এই সব নির্বাচনে দেশবন্ধু স্বয়ং হাতিয়ার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

অহুশীলন পাটি কংগ্রেসে বোম্ব দেওয়ার পর থেকেই দুই পাটির মিলনের চরম পর্যবসিত হয়েছিল দুই পাটির প্রতিযোগিতায়, এবং সে প্রতিযোগিতা ক্রমে বস্তাবন্ধি পর্যন্ত উঠেছিল। ঢাকা ছিল অহুশীলনের দুর্গ,—ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি তাদের দখল করা চাই।—খরচ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন শ্রীণ চ্যাটার্জি, যিনি অহুশীলনের লোক নন, এবং দুটো বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বীর যুগান্তরের দাদাদের সঙ্গে, এবং বিশেষভাবে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। অহুশীলনের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী তাঁর ভগিনীপতি উকীল মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকে শ্রীণ বাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দখল করতে খাড়া করেছিলেন। সে প্রতিযোগিতার মধ্যে একদিন শ্রীণ বাবুকে খুন করার ভয় দেখাতে এক ছোকরাকে রিডলবার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল,—কিন্তু ঘটনা গড়ানো অল্প দিকে। ছোকরাকে রিডলবার সমেত ধরে শ্রীণ বাবু পুলিশের হাতে দিলেন।

খবরটা বখন কলকাতায় এল, তখন দেশবন্ধু অহুশীলন পাটির ওপর চটে আশুন হয়ে গেলেন,—এবং যুগান্তরের দাদাদের তরফ থেকে জীবনকে পাঠানো হল ঢাকায়, এক দিকে শ্রীণ বাবুকে অভয় দেওয়ার জগে,—আর একদিকে প্রতুলবাবুকে জানিয়ে দেওয়ার জগে যে, শ্রীণ বাবুর ওপর আর কোন আক্রমণের চেষ্টা হলে যুগান্তর পাটি টোকে নিজেদের ওপর আক্রমণ বলেই মনে করবে। তার পরে আর শ্রীণ বাবুর ওপর আক্রমণ হয়নি।

আর একদিক বিকুটিয়ের টানা-হেঁচা। আগে বিকুটিয়ের প্রসঙ্গতো ছিল এক একটা ফেরের পিনে হাঁস হরে লেগে থেকে তাদের ভারত মাতার মুখে কান্ডর হতে শেখানো,—এবং কিছু বোমা পিণ্ড বোমাগাড় করে ভবিষ্যতে একদিন ইংরেজগুলোকে মেয়ে ত্যাগতে পারলেই যে ভারতমাতার শৃঙ্খল বন বন করে ভেঙ্গে যাবে, পরাধীনতার বেদনার টনটানি আর থাকবে না, এবং স্বাধীনতার পতাকা পুষ্প করে উড়বে,—এই কথা কটা মুখস্ত করানো। কি

করে কতদিকে কি হবে, সেটা দাদারা জেনেন, ছেলেদের কাজ শুধু দাদাদের ইচ্ছিতে চলা,—কারণ, তাড়াতাড়ি বিপ্লবের সেপাই মাত্র!

বোম্ব-বন্দুকের কাজকর্ম বখন সামান্য কিছুই নেই,—তখন হুঁ গ্যাবিবতীরা সহজেই কথা কটা শিখে ফেলতে এবং আঙড়াতে শুরু করে দিত। এই সহজ বিকুটিয়ের স্থলে এক নতুন প্রসঙ্গ দেখা দিল,—ছেলেগুলোর দুই কাণ দিয়ে দুই দলের নিম্নে ঢুকতে শুরু করলো। অহুশীলন পরে আসরে নেমেছে, সুতরাং আগে তারা শুরু করে দিতেই প্রসঙ্গটা দুপক থেকেই পাকা হবে গেল—সুতরাং ছেলেগুলো “তেওঁটে মারতে” শুরু করলো। কিছু দিন টানাটানির মধ্যে দুই দলেরই সত্য-মিথ্যা সত্যাব্য-অসত্যাব্য নিশ্চিন্তলো শিখে ফেলে শেষ পর্যন্ত একটা দলে ভিড় গিয়ে ছেলেটা আর এক দলের নিশ্চিন্ত প্রচার করে—এই দাঁড়ালো এ যুগের অনেক ভাল ভাল ছেলেরও পরিণতি। যাদের হাত দসকে যায়, তারা বলে, ছেলেটা পয়মাল।

ঢাকায় সারা জেলা থেকে ছেলেরা কলেজে পড়তে আসে,—গরার পাণ্ডুর মত দুই দলের এজেন্ট ট্রেনে হাজির থাকে তাদের ধরবার জগে,—যে যাকে পারে ধরে নিয়ে যায় নিজদের মেস-বোডিং বা ছাত্রনায়—এই হয়ে দাঁড়ানো বেওয়াজ। শেষ পর্যন্ত টানা-টানি থেকে ছুরিনারা পর্যন্ত শুরু হল। হাত ফসানো ছেলেকে পর্যন্ত ছুরি মারা হয়েছে। ঢাকার অহুশীলনের ইতিহাসে এই ছুরি-বাজীর বাগাছুরী একটা রেকর্ড। এসব কথা বাইরের লোক জানেনা,—কিন্তু জানার প্রয়োজন আছে, পরবর্তী কালের ইতিহাস বোধবার জগে।

প্রায় এই রকম টানাটানি সত্যাবাবুকে নিয়েও চলেছিল। তবে তিনি যেহেতু স্থল পালানো স্থলবন্দু নন, সুতরাং তাঁকে ভারত উদ্ধারের গুপ্তপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে যাওয়া চলে না,—আর কানে কানে অপারদলের নিম্নেও চলে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে পদাঘাত,—I C S চাকুরীর মোহের মস্তকে পদাঘাত,—ছাত্র ও তরুণদের কানে প্রচুর জনপ্রিয়তা,—অর্থাৎ বোম্ব-বন্দুক-খুন ডাকাতির সম্পর্ক ছাড় সঙ্গল বিষয়েই নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন। সুতরাং তাঁকে বিকুটি করার একমাত্র কায়দা হল গুণহীন ডক্তরের মতন “কোলানো” কথা বলা। তাঁকে নিয়ে দুই বিপ্লবী দলে তারই প্রতিযোগিতা চলেছিল। কিন্তু সে পরবর্তীকালের কথা—পরে হবে।

২৪ সালে তিনি ছিলেন নেতৃত্ব-লোভহীন বিনয়ী নীরব কর্মী। তাঁকে নেতা করে অহুশীলন পাটিকে নিয়ে কাজ করার যে প্ল্যান উপেনদা করেছিলেন,—সেটা কৈসে গিয়েছিল,—এবং তার একমাত্র দল হয়েছিল,—যুগান্তরের দাদারা বুঝলেন উপেনদাকে কন্ট্রোল করা যাবে না,—সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন দাদাকে কোপঠাসা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অমরদাকেও তাঁরা খরচের খাতায় লিখলেন, কারণ তিনি উপেনদার পরামর্শেই চলেন, এবং চলেছেন।

এদিকে গোপী শার কালীর পর একদল ছাত্র তার মৃতদেহ নিয়ে সংকার করবে বলে দাবী করল—সত্যাবাবু তাদের নেতৃত্ব নিয়ে জেল গেটে গিয়ে হাজির হলেন। খবরাখব পাটি উপলক্ষে তাঁর যে বিপ্লবী দাদাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা I.C.S. অজানা নয়। তারপর এই ঘটনার তাঁর নাম I.C.S. খাতার পাকা হয়ে গেল।

গোপী শর্মা'র সখ্যে মহানাজী বলছিলেন, তার পার্টিট্রয়টিক ঘোড়ি থাকতে পারে,—কিন্তু সে কাজটা করেছে অত্যন্ত গতিত। দেশবন্ধু বলছিলেন, তার কাজটা ঠিক হয়নি বটে, কিন্তু তার দেশভেমের তুলনা নেই। এই দুঃকর্মের কথা নিয়ে অ্যালবার্ট হলের এক সভার নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ দুই দলে প্রায় মারামারি হওয়ার ভোগাড় হয়েছিল।

যুগান্তরের দাদারা সম্বন্ধী লাইব্রেরীর সুবাদে গোপীকে নিজের দলের ছেলে বলে দাবী করেন,—কিন্তু তার উপর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রোঃ জ্যোতিষ ঘোষ (মাঠাব মশাই)—যিনি সম্ভাব্য মিত্রেরও সমর্থক ছিলেন। যুগান্তরের দাদারা যে তখন সম্মানবাহী কার্যকলাপের বিরোধী, এটা ভুললে লেবে না।

বাই হোক, স্বরাষ্ট্রদল কর্পোরেশন দখল করার পর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ নিয়ে এক গুণগোল সৃষ্টি হল। বীরেন্দ্রনাথ শাসনাল মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের বিক্ষেপে সত্যাপ্রহ আন্দোলন করে জরী হয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছেন,—তিনি চাম, তাঁর কর্তৃপক্ষ প্রমাণ করার বৃহত্তর ক্ষেত্র কর্পোরেশনের কর্মকর্তৃৎ। দেশবন্ধু স্থির করলেন, তাঁকেই সে পদে বসাবেন।

কিন্তু যে স্বরাষ্ট্র প্যাটির সাফল্যের জগে যুগান্তরের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, সেই স্বরাষ্ট্রদলের হাতে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব আবার পরেও সেই যুগান্তর দলের অর্থসম্ভার কোন সুরাহা হবে না,—এ কেমন কথা? যখন শাসনালের গায়ে দাঁত বসানো অসম্ভব—সুতরাং সুরেন না ঠিক করলেন কর্পোরেশনের কর্মবর্তা নয়তে হবে সুরাহা বাবুকে। তাতে প্রভাব বাবু সঙ্গতও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে, আর কতকগুলো ছেলের চাকরী-বাকরী এবং কিছু অর্থের সহানুও হবে। তিনি সুরাহা বাবুকে বললেন। সুরাহা বাবু বললেন, তা কেমন করে হবে?—দেশবন্ধু যে শাসনালকেই বসাতে চান।

তখন নাকি সুরেন না বাসন্তীদেবীকে গিয়ে ধরলেন, এবং তাঁকে দিয়ে দেশবন্ধুকে বাগ মানিয়ে শাসনালের বদলে সুরাহা বাবুকে কর্পোরেশনের গদীতে বসাবার ব্যবস্থা করলেন। শাসনাল বিপ্লবী দাদাদের ওপর এমন ক্ষেপে গেলেন যে, ২৫ সাঙ্গে (কুকনগর)—প্রাদেশিক কনফারেন্সে বিপ্লবীদের সখ্যে বললেন, এরা দেশের জগে ডাক্তারিত স্রু করে' শেষ পর্যন্ত পেশাদার চোর ডাকাতেরে পরিণত হয়!

ঘটনা সব দেখে থাকিলুম। খাটছিলুম আর চিন্তা করছিলাম। ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল,—অনেক জিনিষই নতুন ভাবে দেখতে স্রু করছিলাম। হিন্দু-মুসলমান মিলন যে ধর্মের গোহাই দিয়ে হবার নয়,—ধর্মের—দার্শনিক বা নৈতিক কাঠামোর যে অনগণ পরোয়া করে না,—ধর্মের আত্মচৈতন্যিক বহিঃস্থ নিয়েই যে তাদের কাববার, সুতরাং ধর্মের গোহাই দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলন কোন দিনই হবে না,—বরং দেশের শতকরা ১১ জন মানুষই শ্রমজীবী কৃষক-শ্রমিক বলে তাদের জীবনের বাস্তব আর্থনৈতিক আর্থের ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের মধ্য দিয়েই দেশের শতকরা ১১ জন হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব,—এই সব কথা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে শিকড় গাড়ছিল।

আর বিপ্লব? শতকরা ১১ জন শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী সংগঠন,—সেটাই কি বিপ্লবের সব চেয়ে বড় আয়োজন নয়?

শোষণের অবসানের চেয়ে বিপ্লবের আর কি মহত্তর উদ্দেশ্যই থাকতে পারে? এ সব কথাও ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার অজ্ঞান বাধা এবং বিপরীত যুক্তিও তখনও মনের মধ্যে একটা বিরাট অস্পষ্ট ছিঁকিবিজির মত ঘূর্ণপাক খাচ্ছিল।

জীবনের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্তে মনটা ছুটুটু করছিল, কিন্তু তার তো উপায় নেই—সুতরাং ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম,—বাইরে থেকে রাজবন্দীদের যখন জিনিসপত্র পাঠানো যায়,—জেল গেটে দিয়ে এলে রাজবন্দীরা পায়,—সেই রকম কিছু চেষ্টা করতে হবে। তদুপহারে শেষপর্যন্ত একদিন একখাঁড়ি বাগবাজারের রসগোল্লা নিয়ে (বোধ হয় দশসের) মেদিনীপুরে রওনা হলুম—এবং বুদ্ধ উকীল ক্রীষ্টল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হলুম। রাজে তাঁর বাড়ীতে থেকে সকালে জেল গেটে উপস্থিত হলুম খাঁড়ি নিয়ে। আমার নামটা এবং রসগোল্লার খাঁড়িটা পৌছে গেল নিবিবাহে,—কিন্তু দেখাটা কিছুতেই সম্ভব হল না। বাই হোক, রসগোল্লা পেয়ে এটুকুতো অন্তত বুঝবে যে, খবর সব ভাল! আমি যে কলকাতায়, এটাও বুঝবে।

কর্পোরেশনের ষাঠি ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার করা হয়েছিল নোয়াখালীর উকীল হাজি আবদুর রসিদ খাঁকে। নোয়াখালীর সত্যেন্দ্র মিত্র, আমাদের সত্যেন্দ্রা ছিলেন স্বরাষ্ট্র প্যাটির সেক্রেটারী। উপেনদা, সহকর্মী আশ্বামান কেবং ভূতি সরকারও একটা চাকুরী পেয়েছিলেন,—চ্যাম কালেকটিং সরকার! বহুকাল সেই চাকরী-করতে করতেই তিনি মাথা গেছে।

এক নেতার এক "বাহন" ছিল—সোকে তাকে বাহনই বলতে, এবং কেউ কারো কাছে অম্বকের বাহন বললেই লোকে তাকে চিনতেও পারতো। সে হয়ে গেল এক লাইসেন্স ইনস্পেক্টর। ঐ নেতাটি কিন্তু জেলে যাবনি। যখন একে একে সব নেতা জেলে যাচ্ছেন, তখন তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন।

বাই হোক, চাকরী বটনের এই সব বিশেষ বিশেষ নমুনা ছাড়াও, এমন একটা নমুনা ছিল, যার তুলনা হয় না। বিপ্লব বাদে লক্ষ্য, তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় একা একা কানেকানে কথা বলতে। সকলে সব কথা জানতে পায় না,—ভাষাজ্ঞি নেই। এ অবস্থায় পাকা জুরাচোরের সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেই সফল হতে পারে। এই রকম এক জুরাচোর মাঝে থেকে একটা বেশ বড় চাকরী বাগিয়ে নিয়েছিল। উপেনদা বলতেন, বেঁটে লোকগুলো হয় ত্যাগোড়,—আর ত্যাগগুলো হাঁদা। ঘুং, শয়তান, ধুরকর অর্থেই উপেনদা "ত্যাগোড়" কথাটা বলতেন। উদাহরণও দিতেন কিংবদন্তি এবং অমরদাকে (চাটুজ্যে) দেখিয়ে। তিনি নিজে বেঁটে ছিলেন, একথা তাঁকে বললে বলতেন,—বেশ, মিলিয়ে নাও।

কর্পোরেশনের ঐ জুরাচোরটা ছিল অতি-বঁটে। তাঁর কায়দাটা ছিল চমৎকার। একটা গরীব জুরাচোরের সত্যিকারের দৃষ্টি দিলেই কায়দাটা বুঝতে পারবেন।

এক বাবুসারী গুলাম থেকে দোকানে এক গাড়ী (গল্পের গাড়ী) মাল নিতে এসেছেন, সঙ্গে আর লোক নেই। রাস্তা থেকে একটা গাড়ী ডাকলেন,—গাড়োয়ান গাড়ীটা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে,—আর গাড়ীর পিছনটা ধরে একটা খোটা হেঁটে আসছে। গুলামের সামনে এসে মালিক বললেন, গাড়ী ঘুরাও। খোঁটাটাও বললে ঘুরাও।

গাড়ায়ান মাল বোঝাই করে নিলে, খোটাটা তাকে সাহায্য করলে। মাল নিয়ে গাড়ী চললো দোকানের ঠিকানা লেখা "পুধা" নিয়ে,—খোটাটাও চললো।

গাড়ী দোকানে পৌঁছালো,—খোটাটা সঙ্গে নেই। ভাড়া দেওয়া হল, গাড়োয়ান বললে, আউর দশ আনা? মালিক বললেন, কয়ে? গাড়োয়ান বললে আপকা আদমী আপকা ওয়াস্তে মাজ লিয়া। মালিক অবাক।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, খোটাটা জুয়াচোর। সে এমন বেপরোয়া ভাবে মালিক ও গাড়োয়ানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল যে, গাড়োয়ান বরাবর তাকে মালিকের লোক মনে করেছে, আর মালিক মনে করেছেন, ও গাড়োয়ানের লোক। গাড়ী গুলাম ছেড়ে কিছু দূর আসতেই সে গাড়োয়ানকে বলেছে, তুমার পাশ রুপয়া হায়?—একটো দেওতো,—বাবুকা পাশ খুচরা রুপয়া নেই হায়,—তুইকানমে হাকৈ ভাড়া। সাথে দিয়া যায়গা। গাড়োয়ান বলেছে, রুপয়া নেই হায়, দশ আনা পরয়া হায়। সে বলেছে, আজ্ঞা ওহি দেও। বলে দে দশ আনা পরয়া নিয়ে সরে পড়েছে।

এ জুয়াচোরটাও ঠিক ঠিকভাবে সুভাবাবু ও সুরেনদার মাঝখানে ঢুকে পড়েছিল। কখনো বা সুরেনদার দেখেন সে সুভাবাবুর সঙ্গে গভীরভাবে কথা কইচে একা,—তিনি বোঝেন, ও সুভাবাবুর বন্ধুস্বাক্ষর,—আবার কখনও বা সুভাবাবু দেখেন সুরেনদার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ ভাব,—তিনি মনে করেন সেও একজন বিশ্বাসী, সুরেনদার দলের লোক। অথচ সে কোন কালেই না ছিল সুভাবাবু, না ছিল সুরেনদার দলের।

যাই হোক, ছোটবড় চাকরী অনেকেরই পেয়েছিল। চাকরী পাওয়ার আগে এক চাকরী পাওয়ার পরে মাঝে একরকম থাকতে পারে না,—যেমন এডওয়ার্ডস টনির বা সুরবরী কথায় খাওয়ার আগে আর পরে মাঝে একরকম থাকতে পারে না। বড় চাকরী বটন মারফৎ দলের কিছু অর্থসাহায্যের আশা স্বাভাবিক,—কিন্তু চাকরী বটনের পরে দেখা যায়, অসুগত অসুগত বিপ্লবের বহু—“কালেক্শনে” কিছু চান। এক মাঝে মাঝে কিছু চা-সিগাড়া ছাড়া বিপ্লবের জন্তে আর কিছু ছাড়তে নারাজ। সবই দেখলুম এবং জানলাভ করলুম। কিন্তু তখনও মুখ ফুটতে দেয়ী ছিল।

তারপর,—১৯২১-২২ সালে যুগান্তর অমূল্যন চুই দলেরই কিছু অর্থের সাহায্য ছিল, এফ দলের সাহায্য কংগ্রেস থেকে,—আর এক দলের ভারত সেবক সংঘ থেকে। ২২ সালের পর দুই দলেরই আর্থের সাহায্য ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু যুগান্তর দল পেয়েছে দেশবন্ধু ও স্বরাজ্যলকে,—অমূল্যন তা পায়নি। কাজেই তারা মাঝে মাঝে এক-আধটা জায়গায় শুভ মেথড চালিয়ে বাজিল। ২৪ সালে যুগান্তর দল পোশো কর্পোরেশনের স্বরোধ।

কিন্তু স্বরাজ্যলদেরও টাকার প্রয়োজন বেড়ে চলছিল। অর্থায়নের নতুন স্বারী পথ খুঁজে পাওয়া বাড়িল না। দেশ অনেক মঠ মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, যেগুলো লুটে খায় জুয়াচোর সেবাইং-মোহান্তের দল। সেগুলোকে প্রাথমিক ম্যানেজ-মেন্টের হাতে আনতে পারলে, এবং সেখানে নিজেরা বসতে পারলে, অতিথিগোষ্ঠাও নিয়মিত, হতে পারে,—প্রজাদের জন্তে নানাবিধ

কল্যাণকার্যেরও ব্যবস্থা হতে পারে,—আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ সঙ্গ্রামের কিছু স্বারী অর্থসাহায্যও হতে পারে।

হাটের কাছে ছিল তারকেশ্বর মন্দির—বিরাট আয়, অথচ মোহান্ত একটা দুশ্চরিত্র জমিদার ছাড়া আর কিছুই নয়। মোহান্তকে গদীচ্যুত করে ম্যানেজমেন্ট দখল করতে পারলে ঐ বিরাট আয় দেশের ও দেশের কাজে লাগানো যায়। স্বতঃস্বে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেসীরা প্রজাদের তরফ থেকে আন্দোলন শুরু করলে। ইতিপূর্বেই অসহযোগ আন্দোলনের এক “বেওয়ারিশ” নেতা স্বামী বিশ্বানন্দ এক “ইঠাং স্বামী” সচ্চিদানন্দ (দুজনই খোটা) স্বানীয় লোকদের সাহায্যে মন্দিরটা দখল করে বসেছিলেন—স্বানীয় লোকেরা মন্দিরের আশেপাশের বাস্তু জোড়া করে দিনরাত পালা করে বসে থাকত, মোহান্তের লোকেরা মন্দিরে ঢুকতেই পারে না। মন্দিরের দৈনন্দিন আয়টা স্বামীদের হস্তগত হয়েছে,—মোহান্তের লোকদের সঙ্গে স্বানীয় লোকের ঝগড়াও চলছে,—এবং যথাস্থি দুই “স্বামী”তেও ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে। বিশ্বানন্দ হটে গেছেন, সচ্চিদানন্দ মন্দিরের পাশেই আস্তানা পেড়েছেন প্রায় পাঁচাপাশত ভাবে।

কিন্তু আইনগত সমস্যা হচ্ছে মোহান্তকে গদীচ্যুত করে দেবোত্তর—এবং বেনামী জমিদারী দখল করা। আবার আইনগত সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে ব্রাহ্মণ সভা (ভটিপাড়া)।—তারা তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার এক বংশধর খুঁজে বার করে তাকে দিয়ে আদালতে নালিশ করিয়েছে—দুশ্চরিত্র মোহান্তকে গদীচ্যুত করে মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজমেন্টের ভার ব্রাহ্মণসভার হাতে দেওয়া হোক।

দেশবন্ধু সে মামলারও বাদী, মোহান্তরও বাদী—একটা ত্রিভুজাকার যামলা চলে। এ দিকে মোহান্তর বাড়ী দখলটা মন্দির দখলের পরবর্তী সমস্যা—তার জন্তে শুরু হল সত্যাগ্রহ। প্রথম দিন মিটিং করে বহু লোক জড়ো করে—বাইরে থেকে, কলকাতা থেকেও অনেক লোক এসেছিল—শেষ বড় একদল ভলাটিয়ার মোহান্তর বাড়ীতে হানা দিলে। গেটে পুলিশ পাহারাও বাড়ানো হয়েছিল। ভলাটিয়ারা গ্রেপ্তার হল,—খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। নানা স্থান থেকে ভলাটিয়ার আসতে লাগলো। একটা ক্যাম্প তৈরী হল ভলাটিয়ারদের থাকা-খাওয়ার জন্তে। ক্রমে শেওড়াস্থীতেও দ্বিতীয় একটা ক্যাম্প হল! তারকেশ্বর ক্যাম্পের চার্জে সুরেনদা ময়মনসিং থেকে “নিজস্ব লোক” এক সতীশ চক্রবর্তীকে বসালেন, আর শেওড়াস্থীর ক্যাম্পে থাকলেন পাঁচ দা’ (স্বানাজি)। পরে এই সতীশ চক্রবর্তী কর্পোরেশনে একটা বড় চাকরী পেয়েছিলেন।

প্রথম উত্তেজনা যথাস্থি মিথিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভলাটিয়ারও কমতে লাগলো। প্রত্যাহ ৪ জন করে ভলাটিয়ার মোহান্তর গেটে নিকিষ্ট সময়ে গেলার হয়, তার পর দিনরাত চল ভাবেও ভাড়া। নতুন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্তে প্রায় হল, স্বামী সচ্চিদানন্দকে সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়াতে হবে—তাতে এক চিলে দুই-পাখী মরবে—সচ্চিদানন্দকে মন্দির থেকে হঠানো হবে। কিন্তু সে কিছুতেই নড়তে চায় না,—নানা অজুহাতে প্রস্তাব প্রস্তাধান করে। অবশেষে এক দিন স্বরাজ্যল গুলেন তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে। দেশবন্ধু আসছেন শুনে বিরাট ভিড় হল মন্দিরের কাছে, দেশবন্ধু সেই ভিড়ের সামনে সচ্চিদানন্দের পায়ে বোঁচ সাঁটতে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন—লোকেরা ধাক্কা ধাক্কা করতে লাগলো।

তারপর যত্নে ভেতরে সচিদানন্দকে ডেকে নিয়ে দেশবন্ধু রক্তমুখি ধরে বললেন, মোহান্ত হবার সখ হয়েছে?—কাল যদি সত্যাগ্রহ করে জেলে না যাও, তা হলে—ইত্যাদি—

সঙ্গে সঙ্গে কাগজে খবর বেগিয়ে গেল, স্বয়ং স্বামী সচিদানন্দ কাল সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করবেন। এই স্মৃতিকাভরণ চিকিৎসার ফলে আবার কিছু ভলাকিয়ার এল,—কিছু সে যেন নিদানের ওষুধ,—প্রদীপ নিভবার আগে একবার ফলে ভটার মতন। স্বতরাং তখন দেশের নানা দিকে “দলের” লোক পাঠিয়ে ভলাকিয়ার সংগ্রহ করে আনার প্রান হল। আমাকে পাঠানো হল বিক্রমপুরে—আমি সেখানে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে জন ২০ ভলাকিয়ার সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। স্বরেন্দ্রের প্রধান দায় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ—তিনি কোন রকমে কাজ চালান।

এই হুড়-হাঙ্গামার মধ্যে মধ্যে কর্পোরেশনের কাজ আছে,—আর তার ওপরে আছে কাউন্সিলের কাজ। নতুন শাসন-সংস্কারে ব্যবস্থা হয়েছিল, মন্ত্রীদের বেতন কাউন্সিলের ভোটে পাশ করতে হবে। বৈধ বিধিব্যবস্থার এইখানে একটু কঁাক, একটু দুর্বলতা আবিষ্কার করে দেশবন্ধু এইখানেই আঘাত তানায় ব্যবস্থা করছিলেন। মন্ত্রীদের বেতন বছরে ৬৪০০০ টাকা নির্ধারণ করে সরকার কাউন্সিলে এক বিল উপস্থাপিত করলেন। স্বরাজ পাটি তার এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন,—মন্ত্রীদের বেতন বছরে এক টাকা।

সাধারণ ছাড়াও যেসব বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী ছিল, তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে দেশবন্ধুর খাতিরে এবং অমুরোধে স্বরাজ্যদলের বিকে ভোট দিলেন—স্বরাজ্যদলের সংশোধন প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। ব্যাপারটাকে মন্ত্রীদের প্রতি কাউন্সিলের অনাস্থার সাক্ষি বলে গণ্য করা হল,—মন্ত্রীর পদত্যাগ করলেন। স্বরাজ পাটির জয়জয়কারে দেশ উৎসব হয়ে উঠলো।

এদিকে মহাস্বাক্ষরী অবস্থা বুঝে ঘোষণা করলেন—বর্তমান অবস্থায় স্বরাজ পাটির কর্মসূচীই কংগ্রেসের কর্মসূচী বলে গৃহীত হওয়া কর্তব্য। তিনি নিজে তখনকার মত কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বরাজ পাটির হাতে দিয়ে সরে গিয়ে অল ইণ্ডিয়া স্পিনাস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে তাঁর ভক্তবাহিনী নিয়ে চরকা-বন্দরের কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন।

ওদিকে শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল গান্ধী-কংগ্রেসের মোহ কাটিয়ে নিষ্কেষর বিশেষ পক্ষে, এবং তার মধ্যে ভঙ্গীকার এবং বলশেভিকবাদের প্রচার বেড়ে চলেছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (কমিউনিষ্ট—মস্কো) স্পেসিডিয়ামের সভায় এম, এন, রায়ের যোগাযোগে বাংলায় মোজাফফর আহমদ প্রভৃতি কমশ ধীরে ধীরে বলশেভিকবাদের আদর্শ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন—যেমন বহুতে ডাঙ্গা, মাদ্রাজে শিলাবাড়ল প্রভৃতি—

২০ সালের আগে শ্রমিক আন্দোলন ছিল প্রাথমিক শ্রমিকদের মধ্যে জনকল্যাণের কাজ—সংবদ্ধ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল নাম মাত্র। ২০ সালে লালার লাজপত রায়কে সভাপতি করে প্রথম এক সভায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের চেষ্টা হয়। তার পর অসহযোগ আন্দোলনের ছড়েছড়ি ধামলে ২২ সালে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে প্রথম সাধা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইউনিয়নের লক্ষ্যও নিত্য কম, এবং অতি অল্প-

শ্রমিকই তাতে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু আন্দোলন তাড়াহাড়ি বেড়ে চলেছিল,—এবং সরকারের নির্বোধ নির্বাকতন নীতির ফল বিপরীত হয়ে শ্রমিক সংঘগুলো ক্রমে সংস্কৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিশ্বের গিরনি কামগর ইউনিয়ন একবার ধর্মঘট হল—সরকারী সাহায্যে এক পাঠান শ্রমিক বাহিনী রিকুট করে লাগিয়ে দেওয়া হল দুর্ঘটন ভাঙতে। ফলে একদিনে বাধে সহরে লাগলো এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কিন্তু গিরনি কামগর ইউনিয়ন হয়ে উঠলো সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ইউনিয়ন। তার নেতাদের অজ্ঞতম ছিলেন মিরাজকর, যিনি এখানে বিশ্বের মেয়র হয়েছিলেন।

যাই হোক,—বলশেভিকবাদের প্রচার অল্পে বিনাশ করার জন্য সরকার ২৪ সালে কাগপরে এক বলশেভিক বড়ব্রহ্ম মামলা খাড়া করলেন। বলশেভিক এক্সেটে বলে আউজনের নামে মামলা হয়েছিল।—তার ১ নম্বর আসামী এম এন রায়—তিনি দেশে ছিলেন না বলে তাঁকে হাজির করা যায় নি। মাদ্রাজের শিলাবাড়লের স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাঁকেও হাজির করা হয়নি—লোকে বলে তিনি নাকে খং দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন। পাঞ্জাবের এক প্রোফেসর—গোলাম হোসেন বা ঐ রকম কি নাম—তিনি নাকি স্বীকারাভি করে বলছিলেন, পার্টির জন্তে প্রেস করা বলে এম এন রায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেয়ে দিয়ে আমি নিজের নামে প্রেস করেছি,—সরকারের তো আমাকে ধস্তাবাদ দেওয়াই উচিত!

শেষ পর্যন্ত—মামলায় বাংলার মোজাফফর আহমদ ও কুতুবুদ্দিন আহমদ বিশ্বের ডাঙ্গে এবং সন্তুষ্ট ও সম্মানী (কোথাকার, তা ভুলে গেছি)—এই চারজনের কারাদণ্ড হয়। বলশেভিকবাদের প্রচার কিছু দিনের জন্যে থমকে যায়।

এদিকে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করে গভর্নমেন্ট তাঁদের ৬৪০০০ টাকা বেতনের বিল দ্বিতীয়বার কাউন্সিলে পাশ করতে চেষ্টা করে, এবং সেবারও পরাজিত হয় এবং স্বরাজ পাটির সংশোধনী প্রস্তাব ১ টাকা বেতন পাশ হয়। সেবার পদচূত মন্ত্রী প্রভাস মিত্রকেও দেশবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সম্মত করিয়েছিলেন। ভোট ভোট স্মৃতি করে সরকার ও স্বরাজ পাটির পক্ষীয় নির্দিষ্ট ভোট বাদে কয়েকটা অনিশ্চিত ভোট স্বপক্ষে আনতে পারলেই মেজরিটা হয়—এইভাবে হিসাব করে, অনিশ্চিত ভোটের মধ্যে কটা ভোট হাত করতে হবে,—এবং তার জন্যে কাকে কাকে হাতাবার কি চেষ্টা করতে হবে, স্থির করা হয়। গণতন্ত্রের এই কসরৎ একটা দেখবার জিনিস—দেখলাম।

শেষ পর্যন্ত একজন এম, এল, সিকে ছদ্মনি একটা বিশেষ জায়গায় আটকে রেখে দেওয়া হল, আমোদ-প্রমোদের সর্ববিধ আয়োজনের মধ্যে আকর্ষণ তুলিয়ে রেখে। তাব জন্যে একদল অল্পরূপ রসিক কর্মী বিশেষ ভাবে নিয়োজিত থাকলো এবং এই ভাবে সরকার পক্ষের একটা ভোট নিশ্চিত করে দেওয়া হল। সরকার পক্ষের আর একটা ভোট নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হল—তিনি ময়মনসিংগের জমিদার জেজেব্র কিশোরী আচার্য চৌধুরী। অন্ততভাবে কারদা করতে না পেরে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে আটকে রেখে দেওয়া হল—তারকেশ্বরের মল্লির আগলার কারদার। তাঁর স্ত্রীবাঈ ইন্টার বড়ীর দরজার ভিতর

থেকে স্বত্ব করে' চারিদিকের রাস্তায় জনতার এমন ঠাসা ভিড় সৃষ্টি করা হল যে, তিনি বাড়ী থেকে বেরোতেই পারেন না—টিক বখন কাউন্সিলে ভোটস্ফুটী লেছে। আমরাও দেখানে ছিলুম। সরকার পরাজিত হয়েছে বলে খবর আসার পর তুমুল স্বয়ং শ্রমের মধ্যে পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। এখনকার গান্ধীরাই হলে অবশ্য লাঠি-শুলী চলতো, এটা এখন সবাই বোঝে, কিন্তু তখন লাঠিগলী এত সম্ভা ছিল না। এ হল ২৪ সালের ২৬ শে আগস্টের কথা।

মাঝে মাঝে এই রকম খোলেই আমাদের সংগ্রামের হৃদয়ের মগ মেটে। আনন্দবাবুর বাড়িতেই রাতে দোতালার ঘরে একটা আড্ডা জমে, বাইরের লোকও আসে—আমরাও গিয়ে বসি। জিতেন লাহিড়ীও প্রায়ই আসেন। হরিদা (চক্রবর্তী) এবং অমর বোসও। আর মাঝে মাঝে ক্যারিকচারিষ্ট অতুল সেন। তিনি এলে একটু হাস্যকৌতুক হয়। অন্ধশ্রম হয় দলের Informal meeting এর মত আলোচনা,—বর্তমান কালক্রম ও ভবিষ্যতের আশার স্বপ্ন নিয়ে। চুপি চুপি কথাও ছুটাতে হত।

বোম্ব-বন্ধুকের মত বিপজ্জনক বাস্তবতা ও গুপ্ত সমিতির আমলে বেওয়াজ ছিল, একজন বিপ্লবীর কাছে একজন তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে "আমাদের লোক" বলে সুপারিশ করলেই সে ঐ তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে অবাধে বিশ্বাস করে। সে যুগে সেটা ছিল এক অপরিহার্য ব্যবস্থা,—এবং তাতে কোন দ্বিভিত্তিও হত না,—কারণ লজ্জাবে কেউ কাউকে সুপারিশ করতে পারতো না সে যুগে।

কিন্তু বখন বোম্ব-বন্ধুকের মতন বিপজ্জনক ব্যাপার কিছুই নেই,—অথচ সে যুগের বেওয়াজটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে,—তখন অত্যন্ত লজ্জা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবেই—এমন কি দাদাও—অনেকে "আমাদের লোক" বলে চালাতেন—নিশ্চয় নতুন "আমাদের লোক" দেখা যেত,—এবং বিশ্বাসও করা হত লজ্জাবেই। ফলে ছুরাচোর বা গুপ্তচরদের নিশ্চয়ই খুব সুবিধে হয়েছিল। বসন্ত গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়ে পরম্পরের সঙ্গে কথাবার্তা করে সকল দাদাই বুঝতেন যে, সরকার আমাদের দলের ভিতরকার কথা, খুঁটিনাটি কথাও, প্রায় সবই জানে। সম্ভবত আনন্দবাবুর বাড়িঘরেরও সকল কথা তারা জানতো।

এইভাবে দিন কাটে। আমার নীচের ঘরে গরম—বাজেই মাঝে মাঝে খোলা ছাদে শুই। প্রকাণ্ড ছাদ,—অনেকে রোজই ছাদে শোয়। এমনভাবে একদিন সারা ছাদ জুড়ে অনেকেই শুয়ে আছি,—চঠাৎ সিঁড়িতে ছপদাপ শব্দে ঘর ভেঙ্গে গেল। চোখ চাইতেই টেবের আলোতে চোখ ধোঁয়ে গেল। ছাদ ভরে গিজগিজ করছে পুলিশ,—আরো আসছে। বুলবুল, আপাততঃ লীলা সাঙ্গ হল। কাকে কাকে নেহব কে জানে—সুরেনলাভো আছেন-ই। নরেশনা এবং মণিদাও (চৌধুরী) আছেন। এরা গেলেই সব গড়বড় হয়ে যাবে।

সবাই লালেন নিজ নিজ ঘরে—আমরাও। সকলেরই পিছু পিছু চললো কয়েকজন করে পুলিশ এবং অফিসার। সমগ্র বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে সার্চ হল। এসেছিল ভোর হওয়ার আগে—বেশা অনেক হল সার্চ শেষ করতে। তারপর কয়েকজনকে নিয়ে গিয়ে

তুললে গাড়ীতে—আমাকেও। সাবদাকে একটু সাহায্য দিয়ে বুলবুল, অবস্থা বুঝে যা ভাল মনে কর, অদৃষ্টোচ্চকরো।

সে হচ্ছে ২৪ সালের ২৫শে অক্টোবরের সকাল। একবার ইসিসিয়াম থা দেখিয়ে কারাগারস্থ টিকঠাক করে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানেই প্রথম দেখলুম আমাদের ওয়ারেট রেগুলেশন থি অফিসারে—অর্থাৎ ষ্টেট প্রিজনার—ভারত সরকারের বন্দী। ঐদিন এক অডিটাল জারী হয়েছিল, এবং সারা বাংলায় বানান্ডারী করে প্রায় দুশো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতা এলাকার অডিটাল প্রিজনারদের নিয়ে গিয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে।

সেন্ট্রাল জেলে ষ্টেট ইয়ার্ড বা সিলিগেশন ইয়ার্ডে আমাদের তুললে। দেখলুম আমরা ১৮ জন জমিছি—মুন্ডাবাবু এসেছেন, অনিলবরণ রায়ও এসেছেন,—তাছাড়া এসেছেন সত্যেন দা (মিত্র—স্বরাজ পাটির সেক্রেটারী) সুরেন দা, নরেশ দা'তো আছেনই, হরিদাও আছেন—অনুলুলা (মুখার্জি), গিরীন্দ্রনাথ (বানার্জী) আছেন—অমরকুমার ঘোষও আছেন—পাবনার রমেন দাসও আছেন,—মল্লিকার আন্ত বানার্জী,—অনুলুলা'র সুরেশ ভরবাজ,—আর দুটা তরুণ—রঞ্জিত বানার্জী এবং গুনেশ ঘোষ (চট্টগ্রামের জুলু সেনের সঙ্গে মিশিষ্ট)—আর ২৩ জনের কথা ঠিক মনে নেই।

কিন্তু মজা হল, আমাদের ওয়ারেটের তারিখ ২৭শে আগষ্ট। অর্থাৎ ২৬শে আগষ্ট বিতায়বার মন্ত্রী'র বেতন ব্যাপারে সরকারের পরাজয়ে যেন ক্ষেপে গিয়ে ২৭শে আগষ্ট ওয়ারেট ইন্স করা হয়েছিল,—কিন্তু তখন গ্রেপ্তার করা হয়নি,—কারণ তাতে স্পষ্ট বোঝা যেত স্বরাজ পাটী আক্রমণের আসল লক্ষ্য। পরে অডিটাল জারী ও গ্রেপ্তারের সঙ্গে ২৫শে অক্টোবর আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লর্ড লিটন মালদহে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলার দুটো প্রধান বিপ্লবী দল সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবী দল গড়ছিল—একটা দল অবিলম্বে কিছু করার পক্ষপাতী, আর একটা দল আরো প্রস্তুতির পক্ষপাতী।

দেশবন্ধু কাউন্সিলে বক্তৃতায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, স্বরাজপাটীই আক্রমণের লক্ষ্য—স্বরাজপাটীর কাছে ভোট পরাজিত হয়ে ক্ষেপে গিয়েই সরকার স্বরাজপাটীর ভাল ভাল কর্মকে (best workers) গ্রেপ্তার করেছে।

তখন উপেনন্দা, অমরদা (চট্টোপাধ্যায়), অনুলুলা (ঘোষ), মনোমোহন ভট্টাচার্য এবং এক তরুণ নৃপেন মুখার্জী—ষ্টেট প্রিজনার—ফিমেল ইয়ার্ডে থাকতেন—সেটা খালি ছিল বলে। আর এক ইয়ার্ডে ফরেনার্স ইনগ্রেস উনটু ইণ্ডিয়া আইনে বন্দী ছিলেন এক আবহুর রসিদ, খেতকার পাঞ্জাবী—কেজপরা স্বরাজপাটী থেকে মুসলমান—দিনরাত কোরাণ আর নমাজ নিয়ে থাকেন—গুলিশের মতে বলশেভিক এজেন্ট—বে-আইনী ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

সম্ভাব্য মিত্র, দীরেন বাগচি, সুবোধ লাহিড়ী তখন দাজিলি জেলে বন্দী হয়েছেন। ষ্টেট ইয়ার্ডের পাশে ছিল বর্ষ ইয়ার্ড (পরে সেখানে দক্ষিণেশ্বর মামলার আসামীর থাকতেন)—সেখানে তখন আছেন আলাউদ্দীন-ফরহা মাহমুদীন সঙ্গে ধণ্ডিত শিবপুর ডাক্তারি মামলার নরেন ঘোষ চৌধুরী, ভূপেন ঘোষ, সাহুকুল চ্যাটার্জি এবং

রাজ্যবাজার বোমার মামলার অন্তর্ভুক্ত হাজার (শশাঙ্ক বাবু) প্রভৃতি। ভূপেন যোগ ছিলেন সর্বপ্রকারের রান্নার ওজ্ঞাদ। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে তাঁর সঙ্গে করা হল—আমাদের মোট food allowance এর টাকা হিসেব করে তিনি বাজারের কর্তৃক করে দেন, এক মালের ভাণ্ডার এবং রান্নার ব্যবস্থা তাঁর হাতেই থাকবে। ডেপুটি জেলার বীরেন বাবু আমাদের দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত—তিনিই এ বন্দোবস্ত করলেন।

তারপর তিনি কার কি কাপড় চোড় বিছানাপত্র লাগবে জেনে নিয়ে বাজারে গেলেন। এই বাজার করার কাজটা যে লোভনীয়, তা কি বলে দিতে হবে? তিনি খুব যত্ন নিয়ে সব ব্যবস্থা করলেন। কয়েকদিনের হাতের রান্নার চেয়ে পুরানো বস্তুর দরদার রান্না,—সকলেই খুশি হলেন।

কিন্তু প্রথম দিনই আমাদের সন্তানরা (মিত্র) দইয়ের পরিমাণ কম হয়েছে বলে রেগে টেবিল চাপড়ে চাংকার করে এক কাণ্ড বাধালেন—ডেপুটি জেলার বাবুকে ডাকিয়ে হিসেব চাইলেন, ১৮ জনের খোরাকী কত? ইত্যাদি। তিনি লজ্জায় জড়সড় হলেন,—আমরাও অনেকই লুকিয়ে লজ্জা ঢাকলুম,—আর বোকারী ভূপেন বাবু কাতর ভাবে কৈফিয়ত দিলেন,—রাত্রে তিনি ভালো কিছু খাওয়াবেন বলে মাস মজুত রেখেছেন,—সকালে তাড়াতাড়ির জেগে সেটা করে উঠতে পারেননি।

বাই হোক,—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ষ্টেটইয়ার্ডেই নিজস্বের তত্ত্বাবধানে কয়েকদিনের দ্বারা রান্না করানোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এ সব কুট কৌশল জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাংগামি ব্যাপারে অভিজ্ঞ ঘাঘা বিপ্লবীদের এলাকা—সুভাষবাবু বা অনিলবরণ বাবু এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ—সুতরাং তাঁরা ‘খ’ হয়ে গেলেন—চুপ করেই সব দেখলেন।

সুভাষবাবুর যে বিপ্লবীদের খাতায় নাম উঠেছে,—নাদারা তাতে সন্দেহ হচ্ছেন। অনিলবরণ লোভনীয় নয়, কারণ তাঁর গাফী ভক্তি বাগ মানবে না, সকলেই বুঝতেন—হয়ত মনোরঞ্জননা ছাড়া। বসন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে আটক থেকে তাঁর মন এমন হাঁপিয়ে উঠেছিল যে, পরে যুক্তি পেয়েই তিনি পড়িচেরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বাই হোক,—এর পর এস ভাতা স্থির করার পালা। আইনানুসারে ভাতা নির্ধারিত হবে according to rank and station in life. সুভাষবাবু I. C. S. সন্তানরা সেন্ট্রাল অ্যাসেমব্লির সদস্য, অনিলবরণ বাংলা কাউন্সিলের সদস্য—এরা বিশেষ, এক বাকি সকলে সাধারণ।

গভর্ণমেন্ট অনিলবাবুকে সাধারণ ভাতার চেয়ে কিছু বেশী দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি এখানে বখন এম; এল, সি হিসেবে আসিনি,—সুতরাং সাধারণ ভাতাই নোব। সন্তানরা এম-এস-এ হিসেবে দৈনিক ১০ টাকা হিসাবে ভাতা দাবী করে দরখাস্ত করলেন—সরকার সেটা নামঞ্জুর

করলেন। তখন রণনীতির পরিবর্তন করে সন্তানরা লিখলেন শুধু এম-এল-এ বলেই নয়,—তাঁর বহুমুখ বোগের লক্ষণ আছে, সুতরাং আহালাদি সম্বন্ধে সাবধানতা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত সরকার ‘মেডিক্যাল প্রাইভেট’ বলে তাঁর ১০ টাকা দৈনিক ভাতাই মঞ্জুর করলেন।

পরে তাঁর আর একটা নতুন দাবী এল, এবং সেটা নিয়ে দাদামহলে প্রথমে বিষয়, ও পরে চাপা হাতকোঁতুকের গুজর চললো। সে হচ্ছে তাঁর স্ত্রী-কঙ্কার জন্ম ভাতার দাবী। সবাই জানতেন, তিনি অবিবাহিত,—এই প্রথম শুনলেন, তাঁর স্ত্রী নতুন বর্তমান। সরকার জবাব দিলেন, তাঁরা অসুস্থকান করে দেগেছেন, তাঁর স্ত্রী-কঙ্কা নেই,—তিনি বিবাহ করেছেন বলেই কোন প্রমাণ নেই। দাদা বললেন, বৌদির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল কাশীতে, দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে—কোনো বিশেষ কারণে তিনি সে বিবাহের কথা গোপন রেখেছিলেন।—ঘটি হোক, পরে বৌদির ভাতাও মঞ্জুর হয়েছিল।

তারপর সুভাষবাবুর কথা। তিনি I. C. S., এবং কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার,—সুতরাং তাঁর standard of living ইউরোপীয়ানদের মতন—এই যুক্তিতে তাঁর আহালাদির ভাতা সরকার স্থির করলেন মাসিক ২০০ টাকা। তিনি স্থির করলেন, ইউরোপীয়ান ষ্ট্যান্ডার্ড তিনি স্বীকার করবেন না, এবং ঐ ভাতা প্রত্যাখ্যান করবেন।

স্বরেননা প্রভৃতি তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, এ ভাতা তাঁকে নিতেই হবে। কারণ এবার জেল থেকে বেরোবার পর তাঁকে যুগান্তর দলের অল-ইন্ডিয়া প্রতিনিধি, পাবলিক ফিল্ডের নেতা হিসাবে কাজ করতে হবে,—সুতরাং তাঁর স্থান যে সবার উপরে, সেটা দেখতে ও ভাবতে লোকের অভ্যাস হওয়া দরকার,—এক উঁচু ষ্ট্যান্ডার্ড ও বেশী ভাতার হিপনোটিক একেটা তাতে সাহায্য করবে।

এতবড় একটা বিপ্লবী দলের নেতা বলে পরিচিত হওয়া, হঠাৎ ডবল প্রোমোশন, এ অবস্থায় লোকের মাথা ঘুরে যাওয়ারই কথা—বিশেষত তখনও সুভাষবাবুর মাথাটা খুব পাকেনি। তিনি ভাতা প্রত্যাখ্যান করার মতলব ছেড়ে দিলেন।

বাই হোক, আমরা ছয়দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার পর বদলীর জর্ডার এল। সুভাষবাবু, অনিলবরণ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন চললেন বহরমপুর জেলে। অহুকুলা, গিরিনাদা, এবং আশু বাবু চললেন যেদিনপুর্বে এবং আমি, রঞ্জিত ব্যানার্জী এক গণেশ যোগ বাকুড়ায়। আবার কোন্ নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্মে অপেক্ষা করছে, কে জানে!

[গত মাসের লেখার অনবধানবশত একটা মন্ত তুল হয়ে গেছে—১৯২৩ সালের শেষে দিল্লী কংগ্রেসের পর যে ১৭ জন বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা থেকে বিপিনদাস নামটা বাদ পড়ে গেছে—বিপিনদাস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।]

[ক্রমশঃ]

An idea, to be suggestive, must come to the individual with the force of a revelation.

—William James

মিষ্টি স্নরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



মুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

কবি কণ্ঠপুর-বিরচিত আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অম্বাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৬। এই ধরণের যিনি লীলা-গ্রাহী, এই ধরণের বন্দ্যুলে ধীর আচরণ, তাঁর এই শৈশবদি পৌগণ্ড দশা অতএব নিত্যলীলা-বন্ধার কল্পলতা-রূপেই প্রতিভাত হয় ভক্তজনের কাছে। যদিও এই দশাগুলি বিবাদি এবং পরম্পর-বিরোধী, যেহেতু এগুলিতে রয়েছে মূর্তানন্দ্য, রয়েছে নিত্য-কিশোর্য, রয়েছে অবিকারিত্ব, .. তথাপি, ধীর, যেজ্ঞার আচ্ছন্ন থাকে পরমেশ্বর্য, এগুলি যে তাঁরই কল্যাণধর্মী পরমেশ্বরের বেগললিত লীলা-প্রকাশ, তা কেমন করে অস্বীকার করা চলে? বিবিধ ভক্তজন আপন আপন বাগনা অম্বাদী ভগবানকে লাভ করতে চান; এবং তাঁদের অম্বগ্রহাধীন বলেই, যিনি সচ্ছিদানন্দ্যন নিত্যকিশোর, তিনিই নিজেকে প্রকাশিত করেন বাৎসল্য-সখ্য-মধুরাদি সর্বভাব-পোষক বসুন্তে। কল-কৃত নয় এই স্ববস্থা। ভবর যেখানে বিজড়িত হয়ে রয়েছে অচিন্ত্য-ভৈবত্বে, সেখানে বাস্যপৌগণ্ডাদির এই সমস্ত লীলা-প্রকাশ হতেই হবে নিত্যক-নিত্য এবং এইভাবেই তিনি একদা বিশ্বয় বাঁড়িয়েছিলেন ব্রজপুর-পুরন্দ্রাদের, যেদিন তিনি আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর মোহন মুরলীর ধ্বনি। বাক্যহারা হয়ে গেলেন পুরন্দ্রারা। কান পেতে শুনলেন সেই ধ্বনি। কী অনবত্ত বেণুবাদন-শীলতা! মুরলীতে বেজে চলছে নধুর অক্ষুট ঘেন গান।

২৭। কৃষ্ণের সমীপে ছুটে এসে তাঁরা বললেন—“ওরে কৃষ্ণ, মায়ের বুকের বোটা টানতে পারত না তোরা ঐ টোট ছুটি, আজ হঠাৎ কেমন করে সেই টোট ছুটো দিয়েই বাজালি.. এমন মুরলী? কদিনের মধ্যে কোন গুচ্চর কাছে নিলি কলবেণুর এমন পাঠ?”

..“ওরে ছেলে, তোরা মুখের আশ্রিত করে মরি, আবার বাজা, আবার বাজারে তোরা বেণু।”

তাঁরাও বলছেন আর ততক্ষণে নন্দকুলাল পৌছে গেছেন জনক-জননীর কাছে। সেখানে গিয়েই তিনি বাজিয়ে দিলেন বেণু। বাজাতে বাজাতে সরস করে তুললেন বাঁশের বাঁশরী।

২৮। সেই দিন থেকে ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে, কমলযোনি স্বাক্ষার সঙ্গে, নভোমণ্ডলে প্রতিদিন উপস্থিত হতে লাগলেন স্বরনগরের নাপ্যেরা। তাঁরা সকলেই দর্শনাদী লীলাবালকের;—তমালবরণ ধীর অঙ্গ, হরিতাল-বরণ ধীর বসন, যিনি বকুলকুলের বেণুমাখা তমাল শাখার তুল্যরূপ, যিনি বনকুঞ্জের শিশুর মত পা-পর্ধ্যন্ত স্নিগ্ধে চলেন বনমাগা, যিনি বাঙ-মানসের অবদান, মুরলীতে দেন মোহন তান।

২৯। এই বকম করে দিন কাটছে। তৎপরে একদিন, দিনমণি তখনো অম্বদিত গগনে, পরম্পরী নন্দকুলাল তাঁর জননীকে জড়িয়ে ধরে বললেন—“মাগো মা, ও আমার জনেশ্বরী মাগো, আমার ভক্তর মন হয়েছে বন-ভোজনের। সত্যি বলছি, এতটুকু

ছটমি করব না মা। ঘরে বসে খাব না আজ, বনে গিয়ে খাব। ও আমার লক্ষ্মী মা আমার, কথা ঠেসি নি মা।”

পুত্রের বাক্যের মূলে রয়েছে নিশ্চয় কোনো দৃষ্টবুদ্ধি-বুদ্ধিতে বিলম্ব হল না ব্রজরাজ-বধুর। সাত তাড়াতাড়ি মাথা নাড়তে নাড়তে যেই বলে উঠেছেন—“না না, না না,” সেই আবার লীলাবালকের কপালখানির উপর নেচে নেচে উঠল ভাঙা ভাঙা চুল, অঙ্গের আড়ার আর চোখের আলোকে দূর হয়ে গেল অন্ধকার। অতীষ্ট শিখির পথ নিত্যন্ত বিঘ্নিত হয়েছে দেখে লীলাবালকের পথ বেছে নিতে হল শপথের। নিরন্তর নিরুপায় অম্বনয় শেষ পর্যন্ত আদায় করে ছাড়ল জননীর অম্বমতি।

৩০। তারপরে আর সঙ্গী জোটাতে কতকণ? সজ্ঞেয়ে শূলা বাজিয়ে উল্লসিত হয়ে গেলেন দাদা শ্রীবলরাম। নিজের নিজের ঘর ছেড়ে দেখতে দেখতে খেলার সাধীরা ছুটে এসে জুটলেন। বসরামের শূলা বাজলে দূরও যে নিকট হয়ে যায়।

ত্রিভুবনের নাথতিসক তখন মায়ের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন—“মা, এমন খাবার করে দে মা, হাতে সবাই ভোল, সকলের মুখে রেঁচে।” তখন এল বন-ভোজনের উপযোগী ভোজ্যদ্রব্য। বাদি খাবার নয় একটুও। এল..চাপ চাপ দই; দধিমহোদধির ঘন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ পঙ্কপণ্ড। ভাঙে ভাঙে এল ললিত নবনীত ..চাঁদের গায়ের ঘেন ডেলা ডেলা মাসে। এল পুঙ্ক পুঙ্ক দুধের সর; স্কীরসমুদ্রের ঘেন রাশি রাশি কেনা। এল শঙ্কনী প্রকৃতি স্বরশব্দভি বহুমূল্য পাণ্ড। এল পাঁপড়, এল বড়া..আহা দেহলে সব চোখ জুড়ায়। এতোতেও শেষ নেই। আসছেই তো আসছে। এল মোদক, দেবতা দেবতা চোখ টাটার এমন আমোদক। পিঠে স্কলোরও কী হৃন্দর চেহারা..এক একট যেন পুনিমার চন্দ্রমণ্ডল। মিলীর কুঁদোস্তলোরও কী বাহার..জমাট শিলার মত দেখতে অখট গলছে না। এল দইভাত, কী তার পবির সুবাদ। এল দুধে-ভজা চিড়ে, ভুবন করে গন্ধ উঠছে কপুঁদে, ঘেন টলটল করছে অম্বুতর মাধুর্য, এল পরমাণু..আবর্তিত জ্যোত্স্নার দিয়ে ঘেন প্রস্তুত। এল আমের আচার, নেবুর আচার..টুপটুপ করছে, রসে গন্ধে।

সদন্ত খাণ্ডগুলি অপরিমিত উপাদেয় ও পেয়..মাস্তৃবাৎসল্যের মত। সত্যিই লেহুগুলিকে তো মন দিয়েও উজ্জ করা যায় না। চর্যগুলিও অহো, নয়নের আরাম, অপূর্য। চূষাগুলি একান্তই অব্য। দুল্লভ পুষ্টিকর সেই খাণ্ড-সমারোহ অবলোকন করে আত্মাণে আটখানা হয়ে উঠলেন বশোদাহুলাল। সহচরদের হাঁক দিয়ে বললেন—গেল গো..মদ-মাংসসর্গ সব ধ্বংস হয়ে গেল গো। এবার ভাই, এগুলো তুলে নাও, চল বনে গিয়ে মোদকগুলোকে ধ্বংস করা যাক।

এমন প্রেয়সভের এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন নন্দকুলাল যে, একমুহূর্তে অভিমানমুক্ত হয়ে গেল সকলের মনোবৃত্তি। খাণ্ড সম্ভার গ্রহণ করবার জন্তে এগিয়ে এলেন সকলে। কিন্তু যিনি সৌন্দর্যে ..অব্দ কল্পপেরও স্বরয়ে অব্দ ঘটিয়ে ছাটলেন..তিনি পুনরায় বললেন—“খাণ্ডগুলি সব আধ্যাত্মিকদের ক্ষমার মত কড়াপাকের। ওগুলো তুলে নিয়ে বাছুরদের পাছ পাছ দৌড়লেও গলে যাবে না কিছু..” বলতে-বলতে লীলাবালক বখোচিত বটন করে দিতে লাগলেন খাণ্ডভার, সখারও নিতে লাগলেন, ধীর যেমন ক্ষমতা। কিছু খাবার অত হলে হবে কি, কম পড়ে গেল; কৃষ্ণের সখাদের সখ্যাণ্ড

তা আর কিছু কম নয়। বগড় দেখে হাসি চাপতে পারলেন না গুণজ্ঞানী। নিরে এলেন আরো খাবার, আরো খাবার।

৩১। প্রত্যেকের নিজের নিজের স্বন্দর স্বন্দর বাক। শিকের স্বাগনো ভাঁড়! ভাঁড়ে ভাঁড়ে ভাগ করে খাবার নামিয়ে গেলেন কৃষ্ণসহচরী। তারপর সেজেগুজে যেই যাত্রা করবেন কলে, অগ্নি ভগবন্ধননী নিজের হাতে আবার একবার ছিমছাম করে গুছিয়ে দিলেন শ্রীভগবানের বেশভূষা এবং বিশেষ করে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বেণু, গলার হুলিয়ে দিলেন বনমালা। ব্রহ্মত কীরধারায় সিক্ত হয়ে গেল তাঁর কক্করের অগ্নিগরিসর। বৃদ্ধাদের সঙ্গে কিছুদূর দল নিলেন বালকদের।

আগে আগে চলছে কৃষ্ণের অসখ্য বাছুর। শাছে পাছে চলছে অসখ্য অন্তরঙ্গদের প্রত্যেকের অগণিত বাছুর। তারপরে ঐক্য। কী বেন কী কারণে, কিসের যেন কৌতূহলে ঘরে রয়ে গেলেন হস্তধারী বলরাম।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেলেন মা। দেখতে লাগলেন তাঁর ছোটটিকে। শ্রীকৃষ্ণ চলছেন আর তাঁর পাছু পাছু চলছেন সখারা। সে এক অভিলোক্যোক্তব সৌন্দর্য্য-দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের বাম হাতে রয়েছে বেণু, ডানহাতে চাক খটি, কটিদেশে বের এবং পাতায়-রচা অভ্যুত্থত একটি শৃঙ্গ; চিকণ চুলের চূড়ায় ঝুপুপে শিশি-লিখিত; কিন্তু কান্ঠর উপকণ্ঠে গুঞ্জাহার; আর তাঁর কান দুটিকে ঢেকে রেখেছে নীলোৎপলের নির্ভল তুটি মাথুরী।

সত্যিই, বড় আশ্চর্য্য ঠেকল মায়ের চোখে যখন তিনি দেখলেন-- ঘর অতো আর অমন ভালো ভালো অলঙ্কার থাকতে কৃষ্ণের ঘটেছে হাতে অবহেলা! আর বসুপালদের অমুকরণে হঠাৎ অত্যন্ত অনুরাগ ঘটেছে তাঁর বড় বেশভূষায়! কিন্তু কৃষ্ণ তখন চুটেছেন ব্রজবালকদের দর্শাগ্র--ঐবজ্রস্বস্তী মালা নাচিয়ে। তাঁর বক্ষের ভিত্তিতে আভা কাটছে শ্রীবংশ-চিহ্নের স্বর্ণ রেখা।

ব্রজবালকদেরও শোভা কিছু কম যায় না। তাঁদেরও প্রত্যেকের বাঁ কানে স্বন্দর গজনের বাক, বাঁকের ডগায় শিকের স্বগছে ভাঁড়ভর্তি খাবার; কোমরে বেণু, বিধাণ, পত্র-স্বপলী আর শৃঙ্গ। তাঁদেরও হাতে--যষ্টি, কানে কুঁচফলের কর্ণপুং, মাথার ময়ূর-পিছেব রচনা, গলার গুঞ্জাহার। প্রত্যেকটিকেই মানিয়েছে ভালো কটি-হটের ধীর বাহারে।

মাতৃদেবীরা যদিও তাঁদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে পরিচয় দিয়েছিলেন কেশব, বলয়, ঘটা করে কোমরে বেঁধে দিয়েছিলেন কিঙ্কিণী আর মণিময় কোমরবন্ধ, গলার পরিচয় দিয়েছিলেন হার, কানে কুণ্ডল, চোখে মঞ্জীর--তবুও এই ব্রজশিশুদেরও কেমন যেন তেমনটি আগ্রহ ছিল না সেই সব ভূষণে, যেমনটি ছিল তাঁদের এই বাছুর-চরানো বসু সাজে।

৩২। খেলতে খেলতে দূরে চলে গেলেন ব্রজবালকেরা, আর কৌতূকের আকুলতার চোখ কুঁচকিয়ে বহুদূর তাঁদের দিকে তাকিয়েই বসে ব্রজাশ্রমমহিরা। তারপরে অতিব্যবধানের বাধায় আত্মী হয়ে ধীরচরণে ফিরে এলেন রাজভবন।

৩৩। বংশ-বাহিনীটিকে আগে নিরে শ্রীভগবান যখন চললেন, তখন পরম-স্ববিরতম হলে হবে কি, সর্বলোকপিতামহ জ্ঞানারও স্বপ্নের ঐক্য হয়ে উঠল অমৃত-কুঁড়ল-বিলোকনের বৃত্তিনিচয়। পরম

আশ্চর্য্যম হলে হবে কি, নীলকণ্ঠ শিবেরও হৃদয় জন্মে উঠল উৎকণ্ঠিত আনন্দে। মেঘ দেখে যেন নেচে উঠল ময়ূর, সূর্য দেখে যেন ঝুপ খুলল কমল। নভোরাশ্যে নিমেষ হারিয়ে তাঁরা হুজুনেই দাঁড়িয়ে উঠলেন চিত্রলিখিতের মত। ইত্যাদি প্রমুখ কৌতুকলম্পট দেবতাদের কথা না তোলাই মঙ্গল।

৩৪। এগিয়ে এগিয়ে চলছেন শ্রীভগবান, আর তাঁর পিছিয়ে-পড়া সখারা এদিকে বাজী ধরছেন--কে আগে ছুঁতে পারবে তাঁকে। আমি আগে আমি আগে বলেই দৌড়লেন সকলে। তারপর চুয়েই--'আমি আগে ছুঁয়েছি, আমি আগে--'বলে বগড়াও করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। পরস্পরকে এই জয়েছাঁ। শেষে সকলে--শ্রীকৃষ্ণকেই বরণ করলেন সাক্ষীরূপে। হেন অবস্থার প্রথমে হেসে ফেললেন শ্রীভগবান। হাসির অমরায় ভেসে গেল মশন-বসন, দিকদিগন্তে যেন ফুটে উঠল যেতকরবী। তারপরে সহচরদের স্বর্ধের উপর দৃষ্টি রেখে তিনি দৃঢ়চরে বললেন--'কে আগে, কে পরে, সে বিচারে তোমাদের এত প্রয়োজন কিসের? এই স্থানেই তো তোমরা রয়েছ, তোমরা তো এতসঙ্গেই আমাকে পেরেছ।'

৩৫। মুনিমানস-হৃদয় দহুদহন যখন এই প্রকারের আলাপন করতে করতে বাছুরদের পাছু পাছু ছুটলেন, তখন কৌতুকীকরণকে অমুহর্তন করে তাঁর সেই চকল তিমিয়ার সদৃশ অগ্রসরণ গোপবালকদের সক্রমের মধ্যেই উজ্জলিত করে তুলল কৌড়ারসের এক অশূর্য আনন্দগন্ধ। একদল বরণ করলেন অপর দলের শিক্ষা; তাঁদের হাত থেকে আবার সেইট নিয়ে নিলেন আর একদল; আবার সে দলের হাত থেকে সেইটি ছিনিয়ে নিলেন আর একদল; নিষেই হো: হো: হাসি। ষাঁদের জিনিষ তাঁদের হাতেই ফিরিয়ে দিলেন সেটি। কেউ কেউ চকিতে বলিয়ে নিলেন খাতি। বদলানোও যেট, ধরাটি পড়াও সেই, ফিরিয়ে দেওয়াটিও সেই; আর তারপরেই হো: হো: হো: হাসির বোল। একখানা বিলাস বটে হাসির, তারপরেই আবার বিলাসভরা আলস্ত!

এ রে, এ দেখ, ও চুরি করেছে ওর পাচনবাড়ি। ছি: ছি: এ দেখ, ও ছিনিয়ে নিয়েছে ওর বেণু। নিয়েছে, চুরি করে নিয়েছে শিঙা, গলা থেকে সরিয়ে ফেলেছে গুঞ্জামালা। হা: হা: হো: হো:, এর কাছ থেকে নিয়েছেন উনি, ওনার কাছ থেকে তিনি, তাঁর কাছ থেকে ঐ উনি; এ যে একেবারে চুরির দোহাধ। কি হতা যে কি মজা, যার যেটি হারাল, তার হাতেই যে ফিরে আসছে সেটি। হো: হো:।

৩৬। এইভাবে খেলতে খেলতে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তাঁদের সামনে পড়ল এক গোচারণ-ভূমি। নবীন ভূগাহুরের পর্য্যাপ্তি দেখে বাছুরদের কী চারপায়ে আনন্দ! তৃপ্তির খাণ্ডা যেহে যখন তারা বিশ্রাম করতে বসল, তখন ব্রজবালকেরা আবার রক্তে উঠলেন যেতে। অতি স্বন্দর দেখে একটি গাছের ডুলা বেছে নিয়ে নিজের নিজের বাক ইত্যাদি সামগ্রী সেখানে তাঁরা রাখলেন। তার পরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বগড় করতে করতে তাঁকে হাসাতে হাসাতে রচনা করতে লেগে গেলেন খেলা থেকে খেলাস্তর।

নিকটেই একটা ময়ূর নাচছিল, আনন্দে ডাক ছেড়ে। তাই না দেখে তারা নাচের চক্রে নাচতে লেগে গেলেন কেউ কেউ। দীর্ঘ লাড় চূপ করে দাঁড়িয়েছিল এক বক; তার অমুহর্তন

গা কুঁচকিয়ে বসে পড়লেন কেউ কেউ। ব্যাঙ লাকছে জলে; অমনি কতকগুলি মালককে ব্যাঙের মত শুড়াক শুড়াক করে লাকিয়ে, বাণিয়ে পড়তেই হল জলে। আকাশ দিয়ে এদিক ওদিক উড়ে যায় পাখীরা; অমনি তাদের ছায়া-খরার খেলার মেতে উঠতেই হল একদলকে।

বাঁদর বসে আছে গাছের ডালে। মুখ ভেঙিরে ভীষণ চেঁচিরে সেগুলোকে ভয় দেখানোর খেলা খেলেন কেউ কেউ। কেউ আবার ঝোলানো লাজ খবে মারেন টান। বাঁদরগুলো তড়ুতড়ু করে চড়ে যায় গাছের ডগায়। কিন্তু এঁরাও কি কেউ কম বান? এঁরাও তড়ুতড়ু করে গাছে চড়েন নিমেষে, বাঁদরের সঙ্গে সমানে মারেন লক্ষ। কেউ পেরে ওঠেন, কেউ নেচে ওঠেন, কেউ আবার হাসেন.. বাঁদরের লক্ষা করে হিলহিলিয়ে।

ওদিকে আবার আর এক খেলায় কেউ হলেন রাজা, কেউ বা হলেন বরী। একজন হলেন কোটাল, অস্ত্রেরা হলেন সামন্ত। অস্ত্রের কাউকে তত্বেই হল চোর। অস্ত্রের চোরটিকে ধরে রাজার কাছে হাজির করে ক্ষুদ্রমুখিতে কাউকে নিবেদন করতেই হল অপরধের বিজ্ঞাপন। রাজা জারী করে দিলেন চোর-শাসনী আজ্ঞা।

আবার এদিকে চঙ্গ হুই বালকে মিলে মেড়ার লড়াই। সামান্যামনি ষাড় বৈকিয়ে একবার জোরে তেড়ে আসছেন হুজনে, একবার হেটমুণ্ডে জোরে পছিয়ে থাকছেন হুজনে। খেলায় এত রগড়ও থাকে। কেউ কেউ ব্যাঙ্গ হলেন। গজ্ঞন ছাড়লেন কটু ও পটু। বিভীষিকা অস্ত্রদের। কেউ এলেন টপিটিপি, পিছন থেকে, দুহাত দিয়ে টিপে ধরলেন অসংবানীর জোড়া চোখ। আর এই সমস্ত খেলার মধ্যে মুন্ডিনী হর্ষ রসময় গ্রাম্য গোপ-বালকেরা মূর্তানন্দ গ্রাম্যবালকরূপী—শ্রীভগবানের সঙ্গে বনভূমি আলোড়িত করে রঞ্জিত হয়ে উঠলেন, যেমন হয় সিংহশাবকেরা মহাসিংহের শ্রেষ্ঠশাবকের সঙ্গে খেলায়, যেমন হয় হাতীর বাজীর অভিনবোত্তর জাগৃত উন্নয়ন হস্তিশাবকের সঙ্গে খেলায়।

৩৭। তারপর ব্রজবালকেরা সকলে মিলে মন্ত্রণা করলেন—

“আচ্ছা দেখা যাক, কে বেশী জোরে দৌড়াতে পারে, কুক না আমরা?” সকলেই দিলেন দোড়। শ্রীকৃষ্ণও দৌড়লেন বটে, কিন্তু একটু বেতে না যেতেই তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন সাখীরা।

৩৮। হারয়ে, প্রকৃতি বা ব্রহ্মারও অগ্রে বিজয়মান ধীর অগ্রযাত্র জাগৃতি, তাঁকে, সেই হেন অকৃতককেও দৌড়ে হারিয়ে গিতে গেলেন ব্রজবালকেরা। আশ্চর্য্য, ছাড়িয়েও গেলেন তাঁকে। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিছু দূর গিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন, সত্যিই একটি বিরাট অত্যাশ্চর্য বস্তু। বস্তুটি আর কিছুই নয়, বস্তু বুদ্ধিমান পাণের মত এক অনুর, নায়.. অযানুর।

এই অযানুর.. বকী (পুন্ডা) ও বকানুরের সহোদর। বক-বকী দুজনেই ইত্যপূর্বে হমালয়ে গিয়েছিলেন, তাই অসীম হয়ে উঠেছিল অযানুরের কোথ এক শোক। হৃদয়ের সমস্ত অগ্রহ ও আবেগ নিয়ে তাই তিনি এতকাল কামনা বরেছিলেন বৈরতুচ্ছ। ক্রমশঃ অজি-শায়র সেই অযানুর আজ দিনাজে কিংবা আবির্ভাবের কক্ষ করে পাঁড়ালের ব্রজবালকের পোচায়-পথ। গৃহীণী হুয়ে রইল

তাঁর চৌচির নীচের পাটি এক উচ্চ মহাকাশ হুয়ে রইল তাঁর উত্তমমস্তকের উপর পাটি। যেন চরাচর গ্রাস করতে চায় একই বিপুল হী। ভীত হয়ে উঠলেন ব্রজাদি দেবগণ। এই অকৃত্য আবিষ্কারে বিষয়-বাচাল হলেন ব্রজবালকেরা—

৩৯। “অরে, এতো এক বিচিত্র গি-গহ্বর দেখা যাচ্ছে ভাই। দেখ দেখ, চোখ মেলে দেখ; মনের কুল, চোখের কুল, সব কুলগুলোকে ছেঁতে ফেল দেখ.. পৃথিবীতে কি নি এমন রয়েছে যিনি এই গহ্বরটার শোভা আর রঙ্গ দেখে না মজেন! .. দেখেছিস ভাই, এটি যেন একটি মহাসর্প, বিরাট আলয়ে মুখ হী করে যেন বসে রয়েছে।”

৪০। সত্যিই তো, সর্পহস্তীর মতই তো দেখাচ্ছে এই গিহ্বরটার শৃঙ্গগুলি। তরও পাচ্ছে, আনন্দও হচ্ছে। সত্যিই যেন সাপের দোলাসি স্তিত আমাদের তরগুলোকে নেমন্তন্ন করে ডাকছে। গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে নিশ্চয় একজোড়া যোজন-লতা কুল কুল করে বাতালে কাঁপছে।

৪১। “মহাসর্পের বিষের কুলের মত এই গুহাটা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে নানান ধাতুর কথা। বৃকলে হে, মহাসর্প তালুতে থাকে অতিভয়, শোক আর বিকার; এই গুহার উপর দিকটাত্তেও দেখছি, ছড়ানো রয়েছে কুল-বিশালার বিশাল। দেখিস ভাই, মহাসর্পের কুণ্ঠিত ধমনীর মত এই লতাগুলো গর্জে দিকে হোদোর না টেনে নিয়ে যায়।”

৪২। বটেই তো, বটেই তো, সাপের মাথার তুপাশে থাকে যেমন দু-হুটো স্কন্দর চোখ, এই গুহাটারও তুপাশে রয়েছে তেমনি দু-হুটো বড় বড় কমলরাগ-মণি। সাপের নিঃশ্বাসের মত এই দরীটাত্তেও বইছে উপবন-ওপড়ানো প্রথর পবন; বিধানেরা ধূমশোভার মত এতেও উঠছে মরকতমণির আভা। গুহার মাথাটাও কি ঠিক কনার মতনই দেখতে?

৪৩। তাহলে ভাই সব, এখন এস; এই গুহার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। গহ্বর দেখে আর কে সরছে বল ডয়ে?

মনঃস্থির করলেন বটে সকলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কেমন যেন তাঁদের সকলের বুদ্ধিবৈরাট কালিয়ে গেলেন সঙ্গেই আর শঙ্কায়। পেষে স্থির করলেন—

“সত্যিই যদি এটা প্রবল প্রতাপ সর্পট হয়.. তাহলে...! তাহলে আর কি? তাহলে ভাই সব, আমাদের অরিন্দম গ্রিঃ সখা এটিকে নির্ধাৎ মেরে ফেলবেন.. বকানুরের মত। আর উষার করবেন আমাদেরও। অস্ত্র কারোর সাধ্য নেই অমন ব্যাণীর সামলানো।”

এই বলে সকলে মিলে তখন তড়ুতড়ু করে সাপ-তাড়ানোই ভঙ্গিতে তালি বাজাতে লাগলেন হাতে। শ্রীভগবানে তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, একান্ত তাঁদের আশ্রিত্য। কই শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁর হাংগ মুখখানির একটি চাক চাউনি দিয়েও তাঁদের নিয়ে করছেন না। ব্যাস, তালির করতাল বাজাতে বাজাতে তখন দেবতনের স্কন্দে ব্রজগোপালেরা প্রবেশ করলেন অযানুরের আমদ-বিবরে।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



**রেক্সোনা
সাবান**

**আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে**

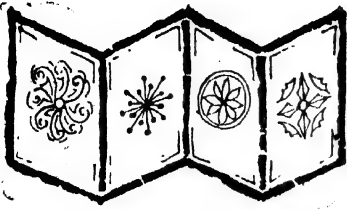
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে স্নান করেন—
আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে।
তার কারণ, রেক্সোনার থাকে ক্যাডিল—সবচেয়ে
করেকট ত্বকের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার
লাগণকে সুন্দর করে তোলে এবং আপনার ত্বকে
অঁহ রাখে। রেক্সোনার সেরেব মত কেণা মাখুন দেখবেন
আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্যে... রেক্সোনা



রেক্সোনা, প্রো, লি, অটোম্যাটিক পকে কিম্বা লিভার, লি, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

RP. 150-X52 BG



পত্র

বিখ্যাত সাংবাদিক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[রাষ্ট্রকুরু সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত "বেঙ্গলী" পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে পদ্মিনীমোহন নিয়োগী বাঙলার অগ্রিমুখে যথেষ্ট খ্যাত অর্জন করেছিলেন। এর সাংবাদিক খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। বাঙলার বহু জ্ঞানী-গুণী ও নেতৃস্থানীয় পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ইনি আসন এবং তাঁদের সঙ্গে এর পত্র বিনিময় হয়। এই অসংখ্য অপ্রকাশিত পত্রের মধ্যে কয়েকখানি মাত্র এখানে প্রকাশ করা হল। ১৯৫৪ সালের ১২ই মার্চ পদ্মিনীমোহন পরলোকগমন করেন। পত্রগুলি শ্রীমতী সাধনা নিয়োগীর সৌজন্মে প্রাপ্ত।—স:]

রাষ্ট্রকুরু সুরেন্দ্রনাথের পত্র

সহাধ্বা অধিনীকুমার দত্তের পত্র

দি 'বেঙ্গলী' [স্থাপিত ১৮৫১]

১২৬, বহুবাজার স্ট্রীট

টেলিফোন নং ১৩৭

কলিকাতা ১৫৮/১১১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

প্রীতি

বরিশাল

৭ই বৈশাখ, ১৩১৪

অসম্পাদিত,

আমি আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি যে নবাবজাদার 'অন্ততঃ' একটি ভোট আমার জন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, সেজ্ঞ আপনার কাছে নিতান্ত আনন্দের সহিত ধন্যবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি। 'অন্ততঃ' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আপনি আপনার চেঁচা এখনও ভাগ্য করেন নাই এবং সম্ভব হইলে উত্তর ভোটই আপনি আদায় করিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোর হইবে এবং আমি আমার বন্ধুদের বন্ধুর সম্বন্ধ সমর্থন চাই।

আশা করি আপনি বেশ কুশলেই আছেন। আপনার

(বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

পুনশ্চ—নবাবজাদা কখন কলিকাতার আসেন, অল্পগ্রহপূর্বক জানাইবেন এবং তাঁহার টিকানটাও দিবেন। (বাঃ) এস, এন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্র

১১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

প্রিয় নিয়োগী বাবু,

১১শে আগষ্ট, ১৯১২

আপনার সমগ্র পত্রের জন্ত অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনাকে অকপটভাবে আশ্বাস দিতে চাই যে, আমার বন্ধুদের সম্পর্কে আপনার সম্বন্ধর সম্যক ও শুভকার আমি খুব মূল্য দিয়া থাকি। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে আমি কখনও কোন কঠো নিতে দিই নাই বলিতেই চলে। কারণ, এই জিনিসটাকে আমি ভয়ের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি। বছর দুই হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা দিইয়া আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। 'মডার্ন বিল্ডিং'-এ তাঁহার তোলা একটি ছবি প্রকাশিত হয়। উহাই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

সাংবাদিকতার সম্বন্ধ কাছটী আপনাকে ছাড়িতে হইয়াছে, সেজ্ঞ হুঃখিত। তবে আমি ভালবাসি আমি যে, এই ভিন্ন আপনায় উপায় ছিল না।

আপনার 'জাতীয় এলকাটি' পাওয়ার প্রত্যাশার মহিলায়। ইতি—

আপনার

(বাঃ) পি. সি. রায়

অধ্যক্ষ হেরবুচের মৈত্রের পত্র

৬৫, হারিসন রোড, কলিকাতা

২২শে ডিসেম্বর, ১৯১৩

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

চলিত মাসের ১লা তারিখে লিখিত আপনার পত্রের উত্তর দিতে গোণ হইল বলিয়া দয়া করিয়া মাফ করিবেন। আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম এবং সেই কারণেই এই বিলম্ব ঘটয়াছে।

বাবু ভুবনমোহন হাওলাদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কথাবার্তায় তাঁর সম্পর্কে আমার বেশ ভাল ধারণা হইয়াছে। কিন্তু হুঃখের বিষয়, আপনি যে পদের জন্ত তাঁহার নাম সুপারিশ করিয়াছেন, সেইটো তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। আমাদের পরিষদ একজন গ্র্যাডুয়েট কিংবা অনুরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চাহেন। এখন যিনি লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্ত সেই ডব্লোকেই চেয়েও অধিক বোগ্যভাগসম্পন্ন একজন লাইব্রেরিয়ান আমাদের দরকার। যদি তুলনার নিশ্চিতরূপে ভাল না হইলেন, তেমন কোন লোককে নিয়োগ করার আসে বৌদ্ধিকতা থাকিবে না।

বাবু শশিভূষণ রায়কে আমার আন্তরিক প্রদ্বা নিবেদন করিবেন। তাঁহাকে এই কথা বলিবেন যে, ভবানীপুরে তিনি বখন অস্থায়ী ছিলেন; সেই সময় তাঁহাকে দেখিতে বাইতে পারি নাই বলিয়া তিনি যেন আমার ক্ষমা করেন। তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করার বিষয় আমি প্রায়ই ভাবিয়াছি, কিন্তু, কাজের বিশেষ চাপে ইহা করিতে সময় পাই নাই। তিনি কেমন আছেন—জানিবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম। স্তব্ধ আছেন জানিতে পারায় আমি খুবই আনন্দিত। ইতি—

আপনাদের

(স্বাঃ) হেবখচন্দ্র মৈত্র

স্রার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র

৬ নং ও ৭ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০

প্রিয় মহাশয়,

১ই সেপ্টেম্বরের পত্রে আপনি যে অমুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, তদনুসারে আমি এই সঙ্গে আপনাকে আমার দুইখানি ফটো এবং স্থানীয় দুইটি পত্রিকার কাটিং পাঠাইতেছি। কাটিংগুলি হইতে আপনার বইয়ের জন্য কিছুটা নোট করিয়া নিতে পারিবেন। এই পত্রিকাগুলির তারিখ হইতে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (তত্ত্বপরি উক্ত সংস্থার ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অন্ততম সদস্য), শিম্পুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন গভর্নর ও ভারতীয় বাহুবরের (কলিকাতা) অন্ততম অছি নিযুক্ত হইয়াছি।

আপনি যে ফটোখানি পছন্দ করেন, তাহাই কাজে লাগাইতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবশ্য ইহার ভিতর ছোট্ট যে ফটোটী, তাহাই পছন্দ করি। দুঃখের বিষয়, আমার কোন হার্ডটোন ব্রক নাই। তবে খুব সম্ভব দুই তিন সপ্তাহের ভিতর আপনাকে আমি একটি দিতে পারিব।

একান্ত অমুখোপাধ্যায়

(স্বাঃ) আর, এন, মুখোপাধ্যায়।

বাবু পদ্মিনীমোহন নিয়োগী

বরাবরে

শাব এডিটর, 'বেঙ্গলী'

দেশনায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্র

১৪, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

২রা জুলাই, ১৯১৭

প্রিয় পদ্মিনী,

তোমার সম্ভবর অভিনন্দন পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কবে পর্যন্ত আমার পক্ষে বওয়ানা হওয়া সম্ভব, আমি নিজেই জানি না। তবে কলিকাতা হইতে ১৫ই আগস্টের পূর্বেই যাত্রা করিব। ইতি—

ভক্তাভাষী

(স্বাঃ) ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ডাঃ স্রার নীলরতন সরকারের পত্র

৬১, হারিসন রোড, কলিকাতা

১৮-১-১৯১৩

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার সাহুগ্রহ পত্রখানি আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার প্রিয় ভায়ের মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে এই আঘাত এতই নিদাক্ষণ ও অপ্রত্যাশিত যে সহ্য করা কঠিন। কিন্তু আমাদের অভিযোগের অবকাশ নাই, সহ্য করাই আমাদের কাজ। আমাদের শোকের মাঝেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই শোকও অন্তভাবে তাঁহার কক্ষণা মাত্র। বঙ্গীয় পরিষদের সমস্ত হিসাবে আমার নিয়োগের ব্যাপারে আমি (১) আমার পেশা ও (২) লর্ড কারমাইকেলের কাছে স্বীকী। এই মর্মান্বায় আমি কতখানি অযোগ্য, সে আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি কাজ করিতে চাই ও শিখিতে চাই। এক্ষণে আমার কাছে এইটি আমার শিক্ষার আর একটি বাণ ছাড়া কিছু নয়। আমি একজন কৃতী ছাত্র হইব কিনা, জানি না। তবে আমি কঠোর শ্রম করিতে চাই। এখন আমার আন্তরিক প্রার্থনা, আমি যেন আমার মাতৃভূমির কোন না কোন কার্যে লাগিতে পারি।

আপনাদের

(স্বাঃ) নীলরতন সরকার

বি, কে, রায়চৌধুরীর পত্র

গৌরীপুর

১২/৭/১৩

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

এইমাত্র আমি আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যে আমার জন্য এতটা ব্যয় নিয়া থাকেন, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ। বাবু হেমেন্দ্রনাথ রায় এক হিসাবে জলপাইগুড়ি এন্ট্রি বোগদান করিলেও আমি সরকারী ভাবে অন্তত তাঁহার চাকুরী অন্বেষণ করিতে পারি না; কিংবা বালিহার এন্ট্রি শরীকিত হিসাবে তাঁহার দাখিল করার পূর্বে এই এন্ট্রি সম্পর্ক ছিন্ন করিতে তাঁহাকে অসম্মতি দানে আমি অক্ষম। স্তব্ধ আমি দুঃখিত যে, ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনার অমুখোপাধ্যায় বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। সে বাহাই হোক, আপনি কুমারের নিকট ও ভূপেনবাবুর নিকট এই সম্পর্কে পত্র লিখিতে পারেন। কুমার খুব শীঘ্র সাবালক প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন। তাঁহার নিজের নির্বাচনের উপরই আমি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিব।

এখন আমি অপেক্ষাকৃত ভাল আছি। ৭ই আগষ্ট কাউন্সিলের পরবর্তী বৈঠকে বোগদান করিতে পারিব। আপনারা ভাল আছেন, এই বিশ্বাস রাখিল। ইতি—

একান্ত আপনাদয়

(স্বাঃ) বি, কে, রায়চৌধুরী

শীঘ্রকান্তি বোম্বের পত্র

দি অমৃতবাজার পত্রিকা লি:
২, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

হাঁ, আপনার বই-এর জন্য ঠিক যে সময় প্রয়োজন হইবে, তখনই ব্রুকটি পাইবেন, পূর্বের নহে। কারণ, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বাহারা এইটি চাহিয়া লিখিতেছেন, তাহাদের জন্য আরও কতক কপি মুদ্রণ করিতে চাহিতেছি। হাঁ, ব্রুকটি ১১৫, আমহার্ট' স্ট্রিট Acme Pressএর বাবু চিত্তোষ বসুর নিকটেই আছে।

হিন্দু স্পি বচায়েল ম্যাগাজিনের একটি সমালোচনা আপনার কাগজে বাহাতে প্রকাশ পায়, অমূল্যপূর্বক দেখিবেন কি? কিছুকাল আগে ঐ কাগজের পঞ্চম বর্ষের সম্পূর্ণ সেটখানি এবং অন্যান্য হয় জাহ্নবীর একটি সংখ্যা আপনাকে পাঠাইয়াছি।

আপনাদের
(বা:) শীঘ্রকান্তি বোম্ব

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর পত্র

স্ট্রট হিল, দার্জিলিং
১৫।১০।১২

প্রিয় পদ্মিনী,

চলিত মাসের ১ই তারিখে লিখিত তোমার পত্রখানি পাইলাম। তুমি জান না যে, আমাদের নৌকাগুলি ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। সবুজ নৌকাটি অর্থাৎ পিনিস (Pinnee) নৌকাটি আমার ভাগে পড়িয়াছে আর বড় ভাওরাটি পড়িয়াছে আমার ভাইদের ভাগে। রামলাভা পুত্রে আমার সবুজ নৌকাটির এখন সেরামতী চলিয়াছে। সুতরাং তোমার কাজে উহা আমি দিতে পারিতেছি না এবং তাহার জন্য দুঃখিত। আমার এক পান্শি (Panshi) নৌকা আছে। তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী সেইটি আমি তোমার কাজে দিতে পারি। যদি ইহাতে তোমার হয়, তাহা হইলে সমস্তোই আমার ম্যানেজারের নিকট একখানি লিপি পাঠাইতে পার। তাহাতে ঠিক কবে তোমার নৌকাটি সরকার, সেইটি উল্লেখ করিও। আমি সমস্তোই সেইভাবে নির্দেশ দিয়া রাখিতেছি।

আমরা এখানে চেয়ে আসিয়াছি এবং আমাদের ভালই কাটিতেছে। আশা করি, তোমরা বেশ সুস্থ আছ। ইতি

ততাকাকী

(বা:) প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
(সন্তোষের)

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

ও

১৬ই মে, ১৯১৪

6, Dwarakanath Tagore's Lane

সবিরম্ম নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনি যে ছেলেটির সন্ধান দিয়াছেন তাহার সবুজ আপাততঃ আমি কোন কথা

দিতে পারিতেছি না, কারণ আমি দুই একটি ছেলে দেখিয়াছি এবং খুব সম্ভবতঃ তাহাদের একজনের সঙ্গে এই বিবাহ হইবে। যদি কোন কারণে এই বিবাহ না হয় তখন আপনার এই পত্রটি সবুজকে বিবেচনা করিয়া দেখিব—আপনি গরীববাবুকে লিখিতে পারেন যে তাহারা আপনার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

আপনি এই বিষয়ে যে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তাহার জন্য আমার আত্মবিক্রমিতভাৱে ও ধন্যবাদ জানিবেন।

ভবদীয়

(বা:) শ্রীসমরেন্দ্র

সাংবাদিক পৃথীশচন্দ্র রায়ের পত্র

৩১, ক্রীক রো, কলিকাতা
১৩ই জানুয়ারী, '১৫

প্রিয় পদ্মিনী,

এই মাসের ১০ই তারিখে লেখা তোমার পত্রখানি গতকাল সন্ধ্যায় আমার হস্তগত হইয়াছে।

তুমি গত শনিবার কিংবা রবিবার কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাও নাই বলিয়া আমি আর আমার সঙ্গে এখানকার তোমার বন্ধুগণ খুবই দুঃখিত। তোমার যে পত্রের এখন উত্তর দিতেছি, তাহাতে তুমি নিজে কেবল আভাস দিয়াছ, তাহার চেয়েও সুবিধাজনক সর্বোত্তম তোমার জন্য একটা কাজ দেখিয়া রাখিয়াছিলাম। উহা ছিল মাননীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের কাউন্সিল সেক্রেটারী কাজ এবং সেইটি নয় মাসের জন্য। আমার কথামত তোমার শিল্পীর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য তিনি পঞ্চাশ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি নিজ ইচ্ছাই তোমার থাকা ও প্রথম শ্রেণীর গাড়ীভাড়া—সকল খরচ বহনের প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন কি, তাঁহার এক ছুঁলে ব্যাটার নির্দ্ধারিত তারিখ পর্যন্ত শনিবার ইচ্ছা গত রবিবারে পিছাইয়া লন। কিন্তু তোমার তারবার্তা পাওয়ার পর তাঁহার পক্ষে তোমার জন্য আর অপেক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই মাসে কাউন্সিলের মাত্র একটি বৈঠক ছিল এবং সেইটি গতকাল হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী বৈঠক আগামী মাসের ২৩শে তারিখের পূর্বে হইবে না। এই অবস্থায়—আমার অন্তর্ভুক্ত দুঃখ হইতেছে যে, তাঁহাকে পুনরায় প্রবেশবাবুকে ডাকিতে হইল। আমার মনে হয়, এই প্রবেশবাবুই রায় সীতানাথের সহিত আবার সিমলায় গিয়াছেন। ইহা একটি বেশ অভিপ্রেত পদ ছিল এবং তুমি যে যথেষ্ট কারণ ছাড়াই এই সুযোগ ছাড়িয়া দিলে, সেজন্য আমি দুঃখিত। বাহা ইউক, বাহা গত হইয়া গিয়াছে, তাহার নিমিত্ত দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আমি এই মাত্র আশা করিব শীঘ্রই আর একটি সুযোগ আসিবে এবং তুমি সেই সুযোগ গ্রহণ এইভাবে ইতস্ততঃ করিবে না।

তোমার শরীর ভালই বাইতেছে—ইহাতে আমি সুখী। আশা করি, জামালদার আরও বেশ কিছুদিন থাকিয়া শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া লইতে সক্ষম হইবে।

রায় সীতানাথের চাকরিটি তোমার উপযুক্ত হইবে, আমি এ মনে করি না। তিনি একটুতেই টিফা বাইবার লোক আর তাঁহার ডাইপো—বিনি তাঁহাদের বোধ সম্প্রদায় অংশীদার, সব ব্যাপারেই

তাহার উটো কাজ। দুইজন মনিব দুই পথে চলিলে, সেখানে চাকরি অভ্যস্ত নয়। কাজটি জোগাড় করা সম্ভব হইলেও আমি তোমাকে সেইটি গ্রহণ করিতে বাওয়ার পরামর্শ দিতাম না। বতদূর মনে হইতেছে তাহার একজন অবসংপ্রাপ্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিবেন। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করিও। ইতি—

ভূভাকাজী

(বা:) পৃথীশচন্দ্র রায়

হেমচন্দ্র নাগের পত্র

Mymensingh

13. 4. 15.

My dear Padmini Babu

আপনার চিঠি কাল পাইয়াছি। আজ ১২ নং বার টাকা মনিঅর্ডার করিয়া আপনার নিকট পাঠাইলাম। বাকী ১০ নং postage stamp এই চিঠির সঙ্গে পাইবেন। আমি আসিবার সময় আমার টেবিলের উপর আপনার Hindusthan Review ও তাহার মধ্যে summaryটা রাখিয়া আসিয়াছিলাম—জাশা করি পাইয়াছেন। নাটুর বাড়ী চকিয়া গিয়াছে কি? আমার চেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্ত যে কষ্ট আপনি স্বীকার করিয়াছেন, তৎক্ষণত আপনারকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ।

Yours

Sd/-Hem Chandra Nag

অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পত্র

৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট

২৩/৪/১২

সকাল ৭ ঘটিকা

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

বহু দিন হইল আপনাকে একখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়াছি, আপনার কলিকাতায় আসার পর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। আমাদের দুই জনকে হযত শীঘ্র কলিকাতা ছাড়িতে হইবে। সেই কারণে একবার বাহাতে আমরা মিলিতে পারি, সেইটি ঠিক রাখুন। একদিন ভোরবেলা কিংবা ১-৩টা ও ১০-৩টার ভিতর কিংবা রাত্রি ৭-৩টার পর এখানে আসিবার সুযোগ করিতে পারিবেন কি? কখন আসিবেন, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইবেন। আপনার সহিত আমার কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা আছে।

আপনাদের

(বা:) সুরেন দাশগুপ্ত

জাশা করি, এখানে আপনি সুখেই আছেন। আমি আগামী মঙ্গলবার কি বুধবার রওনা হইয়া বাইতেছি।

প্রিয় পদ্মিনী,

সিমলা হইতে হঠাৎ তোমার একখানি পত্র আসার আমি সত্যই বিমত হইয়াছি। বিষয়ের হইলেও এমন পত্র পাওয়া প্রীতিপ্রদ ও কাম্য। কলকাতা হইতে বাহির হইবার পরই টাঙ্গাইলে যে কতক দিন কাটায়াছিলাম, সে দিনগুলি আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলির সমতুল্য। আমার দৃষ্টিপাট সেই সকল বিষয়ে কথা আলাপ-স্বাধী রাখা

আছে। সেই সময় বাহাদের আমার পড়াইবার সুযোগ হইয়াছিল, আমার প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারি না। আর তোমার ও আমার ভিতর ইহা ছাড়াও একটি বন্ধন ছিল।

পরিবার ও ছেলোমেয়েসহ আমি এখানে আছি। তুমি আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়া আসিলে খুবই আনন্দিত হইব। এবছর গরীবের পক্ষে বতদূর সম্ভব হয়, সেই পরিমিত আতিথেয়তা তোমাকে প্রদান করা হইবে। দয়া করিয়া অবশ্য আসিও। কোন কারণে আমি নিজেকে চেষ্টা করি বাইতে না পারিলেও আমার বাড়ীতে তোমার লইয়া আসার জন্ত সোকের ব্যবস্থা রাখিব। পত্রান্তরে তোমার বক্তব্য জানিতে চাই। ইতি—

ভূভাকাজী

(বা:) এস, এন, দাশগুপ্ত

সৈয়দ নবাব আলির পত্র

২৭, ওয়েস্টন স্ট্রীট, কলিকাতা।

১লা এপ্রিল, ১৯১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার ৩০শে মার্চের পত্র পাইলাম। 'হেবাল্ড' অফিস হইতে আমি স্তার চার্লস বেইলি'র টাইপ করা ভাষণ পাইয়াছি। সেইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মনে হইতেছে ভাষণটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই।

নাগ মহাশয় তাহার পত্রে আমি যেন তাহার কাগজের গ্রাহক হই, সেজন্য আপনাকে আশ্রয় বিশেষভাবে বলিতে অনুবোধ জানাইয়াছেন। ব্যাপারটি কি রকম, আমি যে একদম গোড়া হইতেই তাহার পত্রিকার গ্রাহক, এই সবাদটা তিনি রাখেন না। এলিকে কাগজখানি পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ধানবাড়ী বাইতেছে।

আপনাদের

(বা:) সৈয়দ নবাব আলি

কিশোরীমোহন রায়ের পত্র

Pabna

সোদরপ্রতিমেষু,

১৮/১২/১১

জাশা করি ভগবৎ কৃপায় আপনি ভাল আছেন। এখানে রবিবারের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি আনন্দ প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, আমরা একপ সুরাজ পাইলে আপাততঃ আর 'সুরাজ' চাহি না। সুরাজ যদি কুরাজ হয়, তাহার শাসক সম্প্রদায় যদি নিঃস্বার্থ ও নিয়মেক না হন, সে আশ্রয়ে যদি জনসাধারণের শান্তিলাভ না হয়, স্বজাতির মধ্যে যদি পরস্পর হিংসা বিষয়ে বিরাজ করে, সাম্প্রদায়িক সন্ধীভা যদি যেমন তেমনি থাকে, তবে সে 'সুরাজ' কাজ কি? আপনার নিকট আমাদের এই নিবেদন, এই কথাটি উল্লেখ করিয়া 'বেঙ্গলীতে' একটু সহজাত্ত্বিত্বচক সম্ভব্য প্রকাশিত হইলে আনুগ্রহীত হইব। সুখের বিষয়, পাবনার সকলেই এই নূতন কথাটিতে সভ্যহুলেই অসাধারণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিরদিনই আমার কার্যের প্রতি আপনাদের দেহদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে,
তাই আপনাকে লিখিলাম। নিবেদনমিতি।

স্নেহাকাজী

ত্রিংশোদীপন রায়।

সৈয়দ হোসেনের পত্র

৭নং দিল্লারবজা সেন

১২ই নভেম্বর ১৯০৮

প্রিয়বরেণ্য,

সকল দিকে কুশল থাকিলে ইহার ভিতর বাইরা আপনার সহিত
লেখা করা আমার কর্তব্য ছিল। এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমার
ডান পাখানি জখম হইয়াছে এবং ইহার কলে গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া
আমি শয্যাশায়ী রহিয়াছি। আমি এখনও বলিতে গেলে নড়াচড়া
করিতে পারি না। তবে দুই এক দিনের মধ্যে খোঁড়াইয়া চলিতে
পাখির বলিয়া আশা রাখি। আমি যে ভাগ্যের কবলে পড়িয়াছি,
তাঁহার বিষয় আপনি জানেন, দেখিতেছি। আপনার অত্যন্ত সহৃদয়
অভিনন্দনপত্রের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু বলিতে
বাধ্য যে, যে সুযোগ আমি পাইতেছি, ইহাতে আমার ক্ষণ আর্দ্র সায়
দেয় না। ইহার চেয়ে আর কি খারাপ হইতে পারে। কাজটি
আমার পক্ষে কতখানি অপ্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা আপনি নিশ্চয়
বুঝিবেন। স্ততরাং আপনার সহানুভূতি আমি পাইব। কিন্তু
অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াই দেওয়া চলে না। এবং এক্ষেত্রেও আমার
পক্ষে যতই অসম্ভব হউক, সর্বোপরি ঘটনার গতিবেগ অরোধ।
তবে আমার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের বিষয় জানাইয়া আপনাকে ভাবাক্রান্ত
করিব না।

শারীরিক সক্ষমতা কিরিয়া আসিলেই আপনার সহিত দেখা
হইবে এবং সেই সময় আরও আলোচনা করিব। ইতি

আপনাদের

(স্বাক্ষর) সৈয়দ হোসেন

পি, এল, গাঙ্গুলীর পত্র

বিন্দু হাউস

সিমলা ডব্লিউ

৬ই অক্টোবর, ১৯০৯

প্রিয় নিয়োগী বাবু,

আপনি আমার এখানে আসিয়া থাকিলে খুবই সুখী হইব।
দুঃখের বিষয়, কাজের চাপে আপনাকে আমার জন্য আমি নিজে
চেষ্টা করিতে পারি না। ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন
না, এই বিশ্বাস রাখি। পত্রবাহক আপনাকে আমার দীন কুটীরে
লইয়া আসিতে সাহায্য করিবে।

আপনার

(স্বাক্ষর) পি, এল, গাঙ্গুলী

কিশোরীমোহন চৌধুরীর পত্র

রাজশাহী

১-৭-১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার সহৃদয় অভিনন্দন বাণীর জন্য ধন্যবাদ। ভগবৎ কৃপায়
এই বৎসর আমি নির্ভরচিত হইয়াছি। সকলের সম্ভোষণাকাজ
যাহাতে করিতে পারি, সেইজন্য তাঁহার নিকটই প্রার্থনা জানাই।
কাজের চাপে যথা সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই, সে কারণে দুঃখিত।
বিলম্ব ঘটিল বলিয়া দয়া করিয়া মাফ করা করিবেন। আবার
আপনাকে ধন্যবাদ।

একান্ত আপনার

(স্বাক্ষর) কিশোরীমোহন চৌধুরী

সত্যানন্দ বন্ধুর পত্র

কলিকাতা

৪ঠা মে, ১৯০৯

প্রিয় পদ্মিনী,

তোমার পত্রগুলির আগে জবাব দিতে পারি নাই বলিয়া মাফ করা
চাহিতেছি।

বন্ধুভাষীর হাতে স্তানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন ও সার্টফিকেট
ফর্মটি দিয়াছি।

আবার টাকা পরিশোধের জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

নিজস্ব দাঞ্জিলিং সংবাদদাতার নিকট 'দি বেঙ্গলী'র দীর্ঘ পত্র
পাওয়া উচিত ছিল। কাগজের 'কলামে' ইহার জন্য আমি বৃথাই
খুঁজিলাম।

আশা করি, খারাপ আবহাওয়ার হাত হইতে তোমরা রেহাই
পাইয়াছে এবং শুভ হিমালয়ের সম্পূর্ণ দৃশ্যই দেখা যাইতেছে।

তোমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে, এই বিশ্বাস রাখিলাম। ইতি

স্নেহাকাজী

(স্বাক্ষর) সত্যানন্দ বন্ধু

আলতাফ আলির পত্র

দাঞ্জিলিং

১৩ই অক্টোবর, ১৯১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

এই মাসের ১১ই তারিখে লিখিত আপনার কার্ডখানি পাইয়া
প্রীত হইলাম। আপনি সপরিবারে বগুড়া আসিতেছেন জানিয়া
আমার আনন্দ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনার নূতন 'হোম'-এ
ঠিকঠাক করিয়া বসিতে বেশী সময় লাগিবে না।

শীঘ্র আপনার উত্তর পাইতে ইচ্ছা করি।

ভবনীর

(স্বাক্ষর) আলতাফ আলি

I don't mind living in a man's world as long
as I can be a woman in it.

—Marilyn Monroe

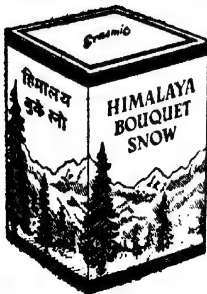


অশ্রু সৌন্দর্যের জন্য...

হিমালয় বোকে

শ্রেষ্ঠ

অসাধন



মৃদু এবং সুগন্ধ হিমালয় বোকে স্নো আপনার

অবধে মৃদু এবং মোলায়েম রাখে। মরমলের মত হিমালয় বোকে টয়লেট

পাউডার আপনার লাগণ্যর স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে

বাড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার



অমন ও আমন



কল্যাণী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অপরাজিতা ঘোষ

একটা বেজে গেল ঢ় করে। নিভ্রাদেবী আজ আমার ওপর বিরূপ। এককালি চাঁদের আলো জানালা দিয়ে আমার বুকের ওপর এসে পড়েছে। বলছে যেন ইসারায়, রেজাই ত বুঝাও, দেখ না আজকে তুমি-পড়া বাতে আমার রূপ কত সুন্দর। তোমার মনের পাতায় লেখা হয়ে থাকবে চিরদিন। গর্ব করবে বলতে পারবে শ্রিয়াকে।

সত্যি এত সুন্দর তুমি। এত বগ্নময়। আগে ত কখনও এত ভালো করে তোমাকে দেখিনি। তাই ত তোমাকে নিয়ে কত কাব্য, কবিতা, গান। বঠ-আলিলন করে শ্রেমিকযুগল সারা রাত ধরে তোমাকে দেখে, আশ আশ মেটে না তাদের। তাই ত তোমাকে দেখে পানিয়া ডেকে ওঠে শিউ কাঁধা বলে।

বাইরে হাওয়া-লাগা পার্কের ঝাউগাছগুলো শব্দ শব্দ করছে। হঠাৎ জেগে-ওঠা ছোট পাখিগুলো কিচির-মিচির করে উঠছে—তাবছে বোধ হয় জোর হয়ে এল।

একটু একটু করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে দশ বছর আগের দিনগুলো। বেলাদি। হ্যাঁ বেলাদির কথা।

খাঁড় ইয়ারের প্রথম দিন। অনাস' ক্লাস করতে সাত নম্বর হয়ে চুকেছি। শেখি, একটি মেয়ে চূপচাপ বসে রয়েছে। জুতোয় লজ্জা হতেই মেয়েটি পেছন ফিরে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখতে লাগল ডাব ডাব করে। কি দেখল ওই জানে।

মনে হল মেয়েটি আমার থেকে বড়, দিমির মত। বেশ ছিমছাম চেহারা। লজ্জা পেলাম খুব, চোখ নামিয়ে নিলাম

ঘটা পড়ল। আর একটি ছেলে এল, অধ্যাপকও এসেন। ক্লাস চলার মধ্যেও দেখি, মেয়েটি আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকান্ছে।

সারাটা দিন কেমন যেন একটা অবস্তি বোধ করলাম। কেবলই মনে হয়েছে,—কেন মেয়েটি আমার দিকে অমন ভাবে তাকান্ছিল। কোনদিন ওকে পথে-বাটে কোথাও দেখেছি বলেও ত মনে হয় না।

পরের দিন অনাস' ক্লাস ছিল প্রথম বটায়। একটু আগে এসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি এল। তাকালাম না, একটা বই খুলে পড়ার ভাণ করলাম।

—এই শোন।

লজ্জাজনিত চোখে তাকালাম মেয়েটির দিকে।

—তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে মনে কিছু ক'রো না কিছ। তোমার থেকে আমি অনেক বড়। চার বছর আগে আই. এ. পাশ করেছি। হেসে হেসে বলে গেল মেয়েটি।

লজ্জাজনিত কণ্ঠে বললাম, আপনি ত আমার দিমির মত।

—হ্যাঁ, আমাকে তুমি দিমি বলেই ডেকে। কি নাম জান তো আমার—বেলা বানাজি।

আবার বলে যেতে লাগল মেয়েটি, কোন ডিভিশনে পাশ করেছ, কোন কলেজ থেকে পাশ করেছ, বাংলার অনাস' নিলে কেন, খুব ভালো লাগে বৃষ্টি বাংলা সাহিত্য পড়তে?

একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলাম।

বেলাদি আমার দিমি ও বন্ধু হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। এমন একদিন এসেছিল, বেলাদি আমাকে দেখতে না পেয়ে থাকতে পারেনি, আমিও পারিনি ওকে না দেখতে পেয়ে। যেদিন ও না আসত, মনটা ভাষণ খাবার হয়ে যেত। আজকের দিনটা মাটি হয়ে গেল, গল্প করা হ'ল না।

একদিন বেলাদিকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—আজ বেলাদি, আমাকে তোমার এত ভালো লাগল কি করে, আমাকেই তুমি ভাইয়ের মর্যাদা দিলে কেন? আমার ত রূপও নেই, গুণও নেই।

একটা সুন্দর উত্তর দিয়েছিল বেশ মনে আছে—'এক নজরে তোমাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। ভাই বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়েছিল। আর কিছু ভনতে চাও?'

তারপর বেলাদির সঙ্গে কত গল্প করেছি, পড়াশুনা নিয়ে কত আলোচনা করেছি, একসঙ্গে বেড়িয়েছি।

সেদিন কি একটা কারণে দেড়টার সময় কলেজ ছুটি হয়ে গেল। বেলাদি আমাকে ওদের বাড়ী বাবার জন্য বিশেষ করে অমুঝোষ করল।

বললাম,—আজ থাক, রক্তদিন বাব।

—না না, ওসব ভনছি না। সেই কবে থেকে ত বলে আসছ একদিন বাব, একদিন বাব। আজ আর ছাড়ছি না। যেতেই হবে তোমাকে।

—না না, আজ থাক। বলে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

বোধ হয় বুঝতে পারল আমার মনের ভাব, তাই অজিয়ার্ন করে বলল,—তাহলে তোমার সঙ্গে আজই আমার সখ্য ছেদ। আর আমাকে বেলাদি বলে ডেকে না।

কি আর করব? বললাম, চল।

একটু চেষ্টা বলল বেলাদি, বশেষ, হুই, ঘোড়াকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় জান?

—কি করে?

—খাক।

চলতে চলতে বেলাদি বলে যেতে লাগল,—তোমাকে আমি নিজের ভাইএর মত ভালবাসি। নিজের একটা ভাইও নেই, বোনও নেই—তাই তোমাকে আমার সব ভালবাসাটুকু উজাড় করে দিয়েছি। আরো বলল,—আমাদের এই ভাই-বোনের সম্পর্ক যেন চিরদিন এমন ভাবে থাকে, ফাটল যেন না ধরে এগে।

বেলাদির বাবা মার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁদের আপনজন হয়ে যেতে বসিদ্দিন লাগল না। প্রাইই যেতাম, দুটো মনখোলা গল্প করে ঘটাক্ষরেক কাটিয়ে আসতাম, সেই সঙ্গে এক-পেট খেয়ে।

দেখতে দেখতে কলেজ-জীবনের দুটো বছর কেটে গেল। পরীক্ষা হয়ে গেল। রেজাল্টও বার হ'ল। আমরা দু'জনেই সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেলাম।

সেদিন বিকেলে কত আনন্দ করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম দুজনে, কিন্তু বাড়ী কিরলাম ভারী মন নিয়ে।

গঙ্গার ধারে বসেছিলাম। নদীর বুকের ওপর জাহাজগুলো গারি গারি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে বেলাদি বলল,—একদিন হয়ত তুমি ঐ একটা জাহাজে করে সাতগাঁওয়ের পায়ে চলে যাবে। তোমাকে 'সি অফ' করতে হবে আমি। কিরে আসবে মস্তবুদ হয়ে, সেদিনও হবে আমি তোমাকে 'ওয়েল কাম' করতে।

বললাম,—না বেলাদি, অতবূহ স্বপ্ন আমার নেই। তবে এম, এ, পড়ব তুমি আর আমি একসঙ্গে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বেলাদি বলল, এক সঙ্গে না ত কি? আমরা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবো, একসঙ্গে বেরিয়ে আসব। যথাস্থ্য হবে করতে হবে বলত?

—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অনার্স বখন শেষেছি, সীট নিশ্চয়ই মিলবে। আমি না পাই, তুমি ত নিশ্চয়ই পাবে।

এই রকম কত ভালো-লাগা টুকরো টুকরো কথাবার্তা হ'ল।

একটু ঠাটা করে বেলাদিকে বললাম,—তোমাকে যে পাবে, তার কত জন্মের পুণ্যের ফলে, একথা মানতেই হবে। এত ভাল, এত ভাল—তোমাকে সে মাধ্যম করে রাখবে।

হঠাৎ যেন বড় গভীর হয়ে গেল বেলাদি। গভীরভাবেই বলল, বিয়ে আমার হবে না।

—কেন?

কোন উত্তর নেই, চোখদুটো ওর চলে গিয়েছে জাহাজগুলোর ওপরে। নিজেরই একটু কেমন জানি লাগল। বেলাদিকে তখনও এরকম গভীর হতে দেখিনি। মনে হ'ল কথাটা বলে অত্যন্ত করে ফেলেছি। কাটিয়ে নেবার জন্য হেসে বললাম, একটা সামান্য ঠাট্টাও বুঝতে পার না বেলাদি? ভাইএর কি দিল্লির সঙ্গে একটু ঠাটা করারও অধিকার নেই?

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হ'ল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। তারপর গভীর কণ্ঠে খেমে খেমে

বলল,—এতদিন কেবল ঠাট্টাই করে এসেছি তোমার সঙ্গে—আজ একটু আমার ভেতরের কথা শোন। ক'উকে কোনদিন বলিনি, আজ তোমাকে বলছি। শুনে হয়ত একটু দুঃখ পেতে পার এই অভাগী বেলাদির জন্য।

কে, দিল্লি মনে আবার দুঃখ আছে নাকি? সব সময়েই তু হাঙ্গ, কত ঠাটা ঠকাকি করে আমার সঙ্গে। বাপের একমাত্র মেয়ে। কোনদিন অভাব কাকে বলে জানে না, তার আবার দুঃখ আছে নাকি? কিন্তু ইহুত থাকতেও পারে। অর্থপূর্ণ দুইতে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

বেলাদি যেন একটু চেষ্টা চেষ্টা বলল,—আমার স্বামী ছিল, আমি বিবাহিতা।

—কি যা তা বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছে তোমার বেলাদি। শুধু শুনে যাও।

বোমার ভয়ে যে যেখানে পায়ে পালাচ্ছে কলকাতা ছেড়ে, বাবাও আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আমার এক ঠাকুমার কাছে।

মাছের খোল দিয়ে ভাত মেখেছি, ঠাকুমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,—গ্যাবে বেলা, তুই মাছ খাস? শাড়ীটারী না হয় পরিস ছেলেন'মুখ বলে, তাই কল মাছ মাংস খাস?

—কেন ঠাকুমা, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস অবলাম।

—তুই না বিবাহ—?

চমকিয়ে উঠলাম কথাটা শুনে। আমি বিবাহ! আমার স্বামী ছিল!

—চমকিয়ে উঠল কেন? কেন, তুই এসব কিছু জানতিস না? কারুর কাছে কখনও শুনিসনি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ঠাকুমার মুখের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠাকুমা বলে যেতে লাগলেন, তোর ওপরে, তোর আরো তিন বোন ছিল। সব কটারই পাঁচ বছর আর পেরোয়ো না। পাঁচ পড়ল কি সবকটা টপাটপ হয়ে গেল। তোর ওপরেবটী বখন মরে গেল তখন তুই তিন বছরের মেরে। তোরের বাড়ীর সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সেই সময়ে তাদের গুহানে এক সাধু এসেছিলেন, তাদের বাড়ীর কাছেই তাঁর ডেরা ছিল। আমি তখন তাদের গুহানে ছিলাম। আমার দিদি মানে তোর বাবার মা কেঁদে পড়লেন সেই সাধুর পায়ে। সেই সাধু অনেককিছু বলতে পারতেন। দিল্লির কথা শুনে সাধু বললেন, তাদের বাড়ীতে একটা অভিশাপ আছে। পাঁচ বছরের বেশী কোন মেয়ে বাঁচবে না তাদের বাসে। এই মেয়েটাকে যদি বাঁচাতে চাস ত পাঁচ বছর বরস হবার আগে এ'ব বিয়ে দিয়ে দে। যে কোন বর হলেই চলবে।

তোর বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন তোর ঠাকুমা আর তোর দাদু। সাধা গা খুঁজলেন তোর দাদু, পাঁজ'একটাও মিলল না। শেষে এক বুড়ো বিয়ে করতে চাইল পনের লোভে। অগত্যা তোর দাদু সেই বুড়োর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। তোর বাপ মা আপত্তি করেছিল কিন্তু তোর দাদু ঠাকুমার কাছে তাদের আপত্তি টিকলো না। আমাদেরও মনটা খচ, খচ, করছিল।

বিয়ে হয়ে গেল তোর দেই বাটের বাড়ীর সঙ্গে। জানিস আমাদের কোলে বসে তোর বিয়ে হয়েছিল; তোকে আমিই সাক্ষ্য দিয়েছিলাম।

বছর ব্রতে না ব্রতে একদিন খবর এল, তোর বামী মরেছে শাপের কামড়ে। তোর হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল জন্মের মত। তবে একটা লাভ হ'ল, তুই বাচিল।

তোর বাবা বলল, মেয়ে বড় হলে আমি আবার ওর বিয়ে দেব। ঠাঁটুকু মেয়ে বিয়ের বিবাহে। গোটা জীবন শুকে আমি বিবাহ থাকতে দেব না। আমরা ত তোর বাবার কথা শুনে কাশে আঙুল দিলাম। হি, হি, কি কেলেকারী কাণ্ড। বাপ হয়ে মেয়ের আবার বিয়ে দেবে, হিন্দুশাস্ত্রে কেউ কখনও দেখেছে, না শুনেছে!

কদিন পরে তোর বাবা তোর মাকে আর তোকে নিয়ে কলকাতা চলে গেল, নিজের চাকরীস্থলে।

পরে শুনেছিলাম, তুই নাকি শাড়ী গয়না প'রে পায়ে ছুতো লাগিয়ে গট গট করে ইস্কুল কলেজে বাস্। তা না হয় হ'ল, ছোট মেয়ে শাড়ী-গয়না পরে, কিন্তু তাই বলে তোর মা বাবা তোকে মাছ মাংস খেতে দেয়? হি, হি, কি খেণা! কালে কালে কত দেখব!

একটু খামল বেলাদি, বোধহয় ধরা গলাটাকে একটু সাক করে নিতে। আবার বলে চলল, পরদিনই আমি সোজা বাবার কাছে চলে এলাম। ঠাকুমার কাছে বা বা শুনেছি সব বললাম মাকে। মা আমাকে শাস্ত করতে চাইলেন। বললেন, হি: ওর জন্ত আবার মন খারাপ করে? ওটাও একটা ছেলে-খোলা। কোন কালে কি ঘটেছে—বত সব অনাস্থ্য! বিয়ে বললেই বিয়ে হয়ে গেল? একটা ছোট শিশু, কি জানে সে বিয়ের? আমি এ বিয়ে মানি না। বেশ জোর গলায় মা বললেন।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম,—না মা, আমিও এ বিয়ে মানি না। কিছু বুঝলাম না, জানলাম না—তিন বছরের ছোট মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেল আমার এক বুড়োর সঙ্গে! এসব সেকালে ছিল, এখন আর নেই!

এর একটা কারণও ছিল, বুঝলে স্বদেশ। তোমার কাছে আমি কিছুই লুপেবো না, আজ উজাড় করে সব বলে বাব। আমি তখন ভালবাসতাম একটা ছেলেকে, নাম সুজিত। একরকম তার আমি বাগদস্তাই ছিলাম। কিন্তু পরে সেই ছেলেটি আমাকে যে চরম প্রতীধান দিল, ইন্তর না হলে কেউ পারে না এইরকম করতে।

আচ্ছা, প্রথম থেকে বলে বাই, তা হলে সব বুঝতে পারবে। একটু খামল বেলাদি বোধ হয় ভেবে নিতে!

আজ আমার ধারণা পালটিয়ে গেল। এতদিন বুঝতে পারিনি, কত দুঃখ এই মেয়েটির ভেতরে লুকিয়ে আছে। কি করে পারতে তুমি হেসে খেলে কাটাস্তে, একদিনও ত তোমাকে গভীর হ'তে দেখিনি।

আবার বেলাদি শুরু করল,—তখন আমার বয়স বছর বারো বোধ হয়, একদিন দেখলাম একটা ছেলে বাবার কাছে এল, একেবারে ভিখারীর মত চোরা। তনুলাম ছেলেটা বাবাদের দেশের। বাপ মা কেউ নেই। দেশ থেকে বাবার কাছে এসেছে একটা চাকরীর আশায়। ছেলেটিকে দেখে বাবার একটু দুঃখ হ'ল। এইটুকু ছেলে চাকরী করবে? কি চাকরীই বা পাবে, বড় জোর একটা পিরনের চাকরী।

বাবা ওকে চাকরী করতে দিলেন না, আমাদের বাড়ীতে থেকে

পড়াশুনা করবার ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটা অন্তত লাক্ক প্রকৃতির, গাঁয়ের ছেলে যেমন হয়—সাধারণতঃ। তবে লেখাপড়ার খুব ভালো।

বাংর জন্তাই ও আজ এতবড় হয়েছে; দিল্লীতে বেশ বড় অফিসর হয়েছে, ভালো কোয়ার্টার পেয়েছে, হুসিন বাদে হয়ত গাড়ীও কিনতে পারে। ভাবি, বাবা যদি না থাকতেন, ও ষোঁধার তলিয়ে যেত। বেশ লাগত ছেলেটাকে তখন, ওর কাছে মাঝে মাঝে পড়া বুঝে নিতে যেতাম। তারপর ত বুঝতেই পারছ, বা হয়ে থাকে। হু'জন হু'জনকে ভালবেসে ফেললাম।

বাবারও পছন্দ হয়েছিল সুজিতকে, ঠিক করেছিলেন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন।

এম-এ পাশ করে সুজিত দিল্লীতে ভাল চাকরী পেল। বাবার সময়ে বলে গেল ছুটিতে আসবে, চিঠি দেবে। তবে অব্যক্ত প্রথম প্রথম কথা রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ও যেদিন চলে গেল, বাড়ীর সবাই আমরা কঁদেছিলাম, সুজিতও বাবার সন্মুখে ক্রমল দিয়ে চোখ মুছেছিল। বাবা মার দুঃখটা খুব বেশী হয়েছিল। হবারই ত কথা, নিজের কোন ছেলে ছিল না, ওকে নিজের ছেলের মত করে এত বড়টা করলেন।

দিনে দিনে সুজিতের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগলাম। চিঠিপত্র একেবারে কমে আসতে লাগল, ছুটিতেও আর আসে না। চিঠি দিলে উত্তর পেতাম না।

তারপর একদিন চরম পরীক্ষা হয়ে গেল আমার, নিজের জীবনের সঙ্গে। অতটা ভাবতে পারি নি। এখন মনে হয় ষর্ষ না মেনে বোধ হয় ভুলই করেছি—চরম ভুল। হিন্দু ধর্মের বা শাখত তাকে যদি মেনে নিতাম, বৈধব্যকে যদি জীবনের সঙ্গী করে নিতাম, হয়ত এতটা আঘাত পেতাম না। সেদিন ঠাকুমার কথাগুলো স্মৃ করত না পেরে পেরে দিনই বিয়ে গিয়েছিলাম কলকাতার, কিন্তু এখানে পালিয়ে গিয়েও বাচতে পারি নি। সুজিত আমাকে না ডাকলেও ত পারভ, রাস্তার মাঝে আমাকে এমনভাবে অপমান করল! সত্যি, তোমরা বড় নেমকহাংরা।

বাছিলাম এক বছর বাড়ী স্ত্রীমবাজারের দিকে। ধর্মতলার ট্রাম ধরবার জন্ত পাড়িয়ে আছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল, বেলা—বুঝে তাকিয়ে দেখি সুজিত, এক গাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে একটা অবাঙ্গালী মেয়ে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, পরে সুজিতের সঙ্গে কথাবার্তার বুঝলাম ঐ মেয়েটি সুজিতের স্ত্রী।

সমস্ত শরীরাট কি রকম করে উঠল, মনে হল' সমস্ত মাটিটা কাঁপছে, একুনি পড়ে বাব। কোন রকমে টলতে টলতে সামনের ট্রামটার উঠে পড়লাম, টালিগঞ্জ বাচ্ছে ট্রামটা। কিরে গেলাম বাড়ীতে। সব শুনে বাবা বললেন,—'জানতাম। আজকের জগতটা এই রকমই, বাকি বত করবে, সে ততই এমনি করে প্রতীপন দেবে।'

আমার মনটা সেই যে সুজিত ভেঙ্গে দিয়ে গেল, আজও জোড়া লাগল না, লাগবেও না বোধ হয় কোনদিনও। আমারই ভুল, চরম ভুল করেছে।

বেলাদির স্বর ভারী হয়ে গিয়েছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রাজার লাইটের আলোয় পাল ছুটো চিক চিক করছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কত মেয়ের জীবনে এই রকম হয়, আমরা ক'জনের খবর রাখি।

রাত হয়ে গিয়েছিল, উঠে পড়লাম। আরো ঝানিকফণ-কয়ত বসতে পারতাম, বেলাদি আরো হয়ত কত কি বলে বেত, কিন্তু কি লাভ? আরো শোনা মানেই বেলাদির মনে আরো ছুঁথের প্রলেপ লাগান। পথে দু'জনে একটিও কথা বললাম না, বলবার মত মনও ছিল না। শুধু বিলারের সময়ে বললাম, আচ্ছা চলি বেলাদি। উত্তর এল, এল ভাই। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তত্ব তত্ব করে ওপরে উঠে গেল বেলাদি।

বাড়ী ফিরলাম তখন ন'টা বেজে গিয়েছে।

সেই আমার শেষ দেখা বেলাদির সঙ্গে, আর আজ দশ বছর পরে দেখা। বেন একটা যুগ পেরিয়ে গিয়েছে। তবে এই দশ বছরের মধ্যে ফুলতে পারিনি বেলাদিকে একটা দিনের জুগু। মনে হয়েছে ছুটে চলে বাই, কিন্তু পারিনি, পারিনি লজ্জায়। লজ্জাই আমার পথ বোধ করে ঈড়িয়েছিল।

এম-এ পড়া আর আমার হ'ল না। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম, কোথায় সব মিলিয়ে গেল। ছিটকিরে গোলাম রুচ সংসারের চাপে। একটা কেরানীর পদে বহাল হলাম।

ফাইল নিয়ে ঢুকেছি সুপারিন্টেন্ডেন্টের চেম্বারে। দেখলাম একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক খুব গল্প করছেন সুপারের সঙ্গে। তাঁদের কথাবার্তা শুনেই মনে পড়ল 'তুই' করে। মি: সেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, আমার বন্ধু, একসঙ্গে আমরা বি-এ পাশ করেছি। এর নাম অবনী বাড়ুজ্জ্য, গেজেটেড অফিসার ছিলেন, অবসর নিয়েছেন।

তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে, খুব বেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকও দেখি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হঠাৎ বললেন, তোমার নাম ষোল না? আমার মেয়ে বেলাদি সঙ্গে তুমি পড়তে না?

আমার অস্থান সত্য হয়ে গেল। অবনীবাবু আপনি? ঠিক চিনতে পেরেছি। বেলাদি এখন কোথায়, বিয়ে টিরে হয়ে গেছে বোধ হয় এতদিনে। তারপর আপনি কেমন আছেন? এক নিঃশ্বাসে বল গেলাম কথ গুলো।

অবনীবাবু বললেন, এতদিন কোথায় ছিল? বেলা তোমাকে সারা কলকাতা খুঁজে বেড়িয়েছে, তোমার কোন পাত্তা নেই। বললে হয়ত বিখাস করবে না, মা আমার কেঁদে ছিল পর্যন্ত তোমার জন্ম। কল্যাণীতে বাড়ী কিনেছি, বেলা ওখানকার ফুলের টিচার হয়েছে। কবে বাচ্ছ বল।

মনের কথা

"এমন স্নেহ গহনা কোথায় গড়ালে?"
"আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌঁছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিক্তান, সত্যতা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই থুঁসি হয়েছি।"

মুখার্জী জুয়েলার্স

দৈনিক জেনারেল পররা নির্যাতা ও রায়-ভবন
বকবাজার যার্কট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



—হ্যাঁ, যাব একদিন। নিশ্চয়ই যাব আপনাদের ওখানে।

—একদিন দুদিন বুঝি না, কেবো যাবে ঠিক করে বল। বেলাকে তোমার কথা বলবো, তায় হারানো ভিনিব খুঁজে পেরেছি। জানো, এখনও বেলো তোমার কথা বলে।

অনেক কথা হ'ল অবনীবাবুর সঙ্গে। যাবার সময়ে, কল্যাণীতে আসবার জন্য বার বার করে বলে গেলেন।

দেখলাম, কত বদলিয়ে গিয়েছেন অবনীবাবু। মনেব দিক থেকে নয়, চেতনার দিক থেকে।

দু'দিন পরে বেলাদির একখানা খামতর্জি চিঠি এল। অনেক কথা লিখেছে, পুনশ্চ: দিয়ে লিখেছে, 'কেবো আসছো'। এরপরে আবার অনেক চিঠি এসেছিল। প্রত্যেক চিঠিরই বড় কথা হ'ল, 'কেবো আসছো'। প্রত্যেকটিই উত্তর দিয়েছি, 'শীগগির যাবছি' বলে। প্রায় একটা বছর কেটে গেল, এখনও গেলাম না। যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছি না। সেই লজ্জাটা আবার যেন আমার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। তাহাড়া কাজের চাপে সময়ও আর হয়ে উঠছিল না।

এবার বেলাদির একখানা ভীষণ কড়া চিঠি এল। খুব অভিমান করে লিখেছে। লিখেছে 'এটাই আমার শেষ চিঠি'।

আর ত বেলাদিকে এড়িয়ে চলা যাবে না। এবার ওর সামনে দাঁড়াতেই হবে। চিঠি দিয়ে আর শাস্ত করা যাবে না ওকে। দশ বছর পরেও আমাকে ভুলতে পারেনি, কত আপন করে চিঠিকলো লিখেছে, তাকে মিথ্যা আশা দিয়ে কি লাভ? লজ্জা কাটিয়েও তার সামনে আমাকে দাঁড়াতেই হবে।

মাস খানেকের ছুটি নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম। পকেটে ডিরেকসন দেওয়া বেলাদির চিঠিটা নিতে ভুলিনি।

খেরাল হ'ল, ছুটুবেট অঙ্কার চারিদিক। তাকিয়ে দেখি চার কখন চলে গিয়েছে আমাকে ছেড়ে। ছোট পাখিগুলো কিচির মিচির করছে ভোরের ইঞ্জিত পেয়ে বোধ হয়—।

হুমে চোখ জুড়ু আসছিল। পাশ ফিরে তুলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

দরজা হাল্কা নোয় শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চারিদিকে যোন খট খট করছে, অনেক বেলো হয়ে গিয়েছে। দরজা খুলেই দেখি বেলাদি দাঁড়িয়ে। যুচকি হেসে বলল, বাও, আর একটু ঘুমাও গে। এখনও সকাল হয় নি। বাব্বা: কি ঘুমোতেই না পার!

মাষ্টার মশায়

আশা দেবী

মাষ্টার মশায়ের বিনায়ী-সভাটা খুব জোয়ারি হয়েছিল—একথা সবাই-ই একবাক্যে স্বীকার করলো। শুধু যাকে উপলক্ষ করে এত আয়োজন, সেই মাষ্টার মশায় নীরবে নিজীবের মত বসে রইলেন যেন শেকড়-ছেড়া গাছ। মাথাটা চেয়ার থেকে ঢলে পড়েছে—নাক থেকে ঝলে পড়েছে নিকেলের ডাঁট ভাঙ্গা চশমাটা—মুন্ডায় বাঁধা না থাকলে হয়তো বাঁচটা ভেঙ্গেই যেত। বন্ধ চোখ হুটোতে জলের ধারা। মাষ্টার মশায় মুছা গেছেন।

গলায় তারে গাঁথা খেতপদ্মের মালা, পরনে মেয়েদের দেওয়া তাঁতের ধান ধুতি। কোলে টকটকে লাল গীতা খানিকটা রক্তের মত জমে আছে—এটি প্রেসিডেন্টের বিনায়ী উপহার। ত্রিশ বছর ধরে ছুলা কাঁচ করছেন,—তাঁরই হাতে গড়া ছুলা। তিনি ছুলের প্রতিষ্ঠাতা—ছাত্রীদের কাছ থেকে এতটুকু দান তিনি নেবেন বৈকি! গুরুদক্ষিণার চেয়েও এর সঙ্গে যে তাদের সমস্ত স্বয়ং মিশে আছে।

কি যেন একটা কল্পন রাগিনী গাইলো একটি মেয়ে। গান খামলে স্তব্ব হলো প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা। ছ'বার ইলেকসনে হারা, বহু ঘাটের জল খাওয়া হরিতোষ সমাদ্দার, গলা কাঁপিয়ে—নানা সুরে তালে—নানা কায়দায় ভাষণ দিলেন। একেত্রে রাখা বলা সরকার, কোন কথাই তিনি বার দিলেন না—দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রমের সুখবচন দাস মশায় আজ আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিচ্ছেন। বিজ্ঞালয় এখন ক্রমাগতির দিকে—উচ্চ থেকে উচ্চতর ধাপে সে এগিয়ে যাচ্ছে—আমরা একে বসুমতী বিজ্ঞালয়ের পর্ধ্যায়ে উন্নীত করতে চাই। কাজেই নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকের আর এখানে স্থান হবে না। কাজেই আমরা বাধ্য হয়েই একে অবসর—বলেই প্রেসিডেন্ট এই বক্তৃতাভাজিত গুরুতর পরিশ্রমের জন্য টেবিলের উপর সবচেয়ে পূর্বসংকিত জলের গ্লাস থেকে টক টক করে খানিকটা জল খেয়ে নিলেন। আর এই কাঁকে ছুল-কমিটার মেথাররা পটাপট হাততালি দিয়ে নিলেন। জলটা খেয়ে ভিজ্জগলাটার একটা খাঁকারি দিয়ে তিনি আবার স্তব্ব করলেন—“অবশ্য চেষ্টা করলে যে রাখা একেবারে যেত না, এমন নয়। কিন্তু কি জানেন”—বলেই তিনি নিজের হাতের হীরের আঙটিটা একবার ঘোরালেন—“ফটিক্ট প্রিন্সিপলের দিক থেকে মেয়েদের বিজ্ঞালয়ে আর পুঙ্খ টিচার রাখা হবে না—আমি এই নীতিরই পক্ষপাতী। অবজ্ঞা জানি, এখানকার চাকরী মেলে ওঁর বিশেষ কষ্ট হবে। বাড়িতে ১০১১ জন খাইয়ে লোক—শাক্তান্তানের কল্যাণে আত্মীয়-স্বজনের অভাব নেই বাড়িতে। রোজগারের লোক উনিই একা—চাকরীটা গেলে সে বাস্তব বন্ধ; তা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষাবিদ—তাঁই নীতির মধ্যদা সর্বদাই রক্ষা করবো—এই আমাদের আদর্শ—”

পটাপট করে হাততালি পড়লো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। শুধু মেয়েরা যেন আচ্ছন্নের মত বসে রইলো—হাততালি দিতে গিয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে মাষ্টার মশায়ের ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে। একদিনেই যেন লোকটি একেবারে বদলে গেছেন; একদিনেই যেন তাঁর ঘরস একঘুগ পার হয়ে গেছে; তিনি যেন একেবারে অপরিচিত হয়ে গেছেন। এক কাছের তিনি ছিলেন একদিন, যেন এক মুহূর্তে অনেক—অনেক দূরেব মাছুব হয়ে গেলেন তিনি। আজ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে কেউ চিনে বের করতে পারবে না।

মাষ্টার মশায়!—উঠুন, একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। একটা মিষ্টিগলার ডাক এলো যেন অনেক দূর থেকে।

জ্যা—। হুমে থেকে জেগে উঠলেন সুখী দাস—আচ্ছন্ন চোখের ভেতর দিয়ে যেন সবটুকু দেখে নিতে চাইলেন, বুঝে নিতে চাইলেন সব ব্যাপারটা। তারপর একবার শূন্য ঘরটার দিকে, আর একবার ছলছলে চোখের উৎসুক দুটিমাথা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে একটু রান হেসে বললেন: ভোরা বা, আমি আসছি।

হেঁড়া হেঁড়া মেঘের কঁাকে ঘেন আলোর ঝিকিমিকি, মটর মশায় দ্রুতপদে এলেন ফুলের মাঠে। সমস্ত ফুলবাড়ীটাকে তিনি একবার চোখভরে দেখে নিলেন। সমস্ত দৃষ্টির অপূর্ণতা যেন দূরে থেল এক যুগান্তে। মনে হলো—“ভাবি সন্ধ্যা তো ফুলটা”—এ যেন এক নতুন আবিষ্কার, অভিনব উপলব্ধি মাঠের মশায়ের। যারা বিলারী সভা উপলক্ষে এসেছিলেন, তাঁরা বহুতা দেবার দুরুহ কর্তব্য সমাধা করে হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে বসেছেন চিরাচরিত নিয়ম মত। তাঁদের কলকণ্ঠের বিস্তারী হাসির আওরাজ ভেসে আসছে চারভালা থেকে। হয়তো এতক্ষণ তারা হাসির কঁাকে কঁাকে ঢা—আর বসগোঁরা খাচ্ছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য, একটু আগেও তো এদের গলা ডরা কাঁদা ছিল—অকুপ অশ্রুধরণে সভাকে করুণ বসে ভরে দিয়ে ছিলেন এরা—এরা কি সবাই পাঁকা অভিনেতা? বুকের ভেতরটা একটা গভীর ব্যথার টুন টুন করে উঠলো মাষ্টার মশায়ের। কেন—কেন এমন হয়? কেন এত নিঃশব্দ হয় এরা? পাণের ছিটে লাগা পাঞ্জাবীর হাতে চোখের জল ফুটতে গিয়ে চমকে উঠলেন মাষ্টার মশার। মিড়িতে খুঁট খুঁট করে গোটাতে পারের শব্দ। না—এরা তাঁকে এখনি ঘরে নিয়ে যাবে! খাওয়াতে। সরল—পরিষ্ক ফুলের মত মুখগুলো এদের—পৃথিবীর কমতা-লোলুপতা এখনও স্পর্শ করেনি মনকে। এখনও কাদে এরা অগ্রয়োজন—মেঘের উৎস বইছে অস্তঃশীলা ফন্ডর মত, এরা তো কিছুটা বোঝে না ওপর তলার কথা, স্তবরাং আর ধাধা চলে না। এদের মুখ দেখলে মটর মশার সব তুলে যান। এখনি—এখনি পালাতে হবে এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্তে—নইলে এরা খাওয়ার জন্তে কঁাদবে, খুব কঁাদবে।

রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে পড়ে মাষ্টার মশার একটা রিক্সায় চড়ে বসলেন। কোলের থেকে পড়ে থাওয়া গীতার উদ্বৃত্ত পাতাগুলো নিচু মাঠের মধ্যে পড়ে পড়ে বনমর্গের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল এলোমেলো হাওয়ায়।

রিক্সার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে প্রায় হুমড়ি খেতে খেতে ঘরে ঢুকলেন।

বাড়ীটা আজ খালি মটরমশায়ের। ভাবি ভালো লাগলো বাড়ীতে ঢুকতে। অন্তত কিছুক্ষণ একা থাকা হবে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদা হবে। সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকারে তুলিয়ে আছে—ঠাঁহে অনাগত ভবিষ্যতের মত। অজ্ঞ গিটার বোনের বিয়ে। সন্ধ্যাই সবাই বেরিয়ে গেছে। তিনি বারণ করে ছিলেন। গরীবের আখর আনন্দ—! গরীবের আবার নেমন্তন্ন খাওয়া! ভাবতে গিয়ে হাসি পেল মাষ্টার মশায়ের। না : থাকগে ওরা। এই উপলক্ষে তবু ওরা একটু খুসি হবে। কিছু সময়ের জন্তেও এই বিদায় শরিয়ত্রের দম বন্ধ করা পরিকল্পনা থেকে মুক্তি পাবে, একদিন অন্তত ওরা প্রাণভরে আনন্দ করবে। আর? মাষ্টার মশায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—অন্তত পেট ভরে ভালো মন্দ খাবে—তারপর তো অনন্ত উপবাস।

ঘরে পূজ পুজ অন্ধকার জমা হয়ে আছে। আলো আর আলোনে না তিনি। এখনও পকেটে উনবাট টাকা বার আনা আছে। টাকা আছে ভিন্নারদেসে এলাউলের পরিত্রিশ টাকা। এন্ড্রিডেট কণ্ঠে টাকা এখনও স্পর্শনি। তবে পাবেন। হুড়ি বন্ধের মধ্যে

এই প্রথম রিক্সা চড়লেন তিনি। মিথ্যে চার আনা পয়সা নষ্ট করলেন, থাকলো আখ সের আলু হতো।

ঘর অন্ধকার হলো সবই তাঁর পরিচিত। কাজেই সন্তর্পণে একটা কাঠের বাজ খুলে একটা মাটির ভাঁড়ে তেলে ভেজানো একদলা আফিং বের করলেন। জীবনের সব কিছুকে আর ভিলে ভিলে না মেঝে একবারেই সব শেষ করে দেবেন তিনি। কত এলোমেলো চিন্তা যেন পাগলের মত মাথায় বাসা বাঁধতে চাইছে—কত কথা আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে,—কত আশার কথা—কত অপূর্ণ সাধের কথা।

খাতা-পেনসিল নিয়ে আজ তাঁকে সব কথাই লিখে যেতে হবে। প্রথমেই ভাবলেন কর্তৃপক্ষকে একটু অনুরোধ করবেন যে, তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে যেন একদিন ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু না—কেন তিনি অনুরোধ করবেন—যারা তাঁকে অজ্ঞায় করে,—জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। পেনসিল দিয়ে যবে যবে ও জায়গাটা কেটে লেখেন তিনি।

আবার নতুন করে শুরু হলো লেখা—“মাত্র দশ পয়সা পকেটে নিয়ে কলকাতায় ফুল খুলেছিলাম আমি। মনের মধ্যে যেন এখনও সেই ছবি ভেসে উঠছে। দশটি মাত্র ছাত্র; মাতুর পেতে রক বসে পড়তাম। মনে পড়ে কার যেন একখানা বই ফেরার গরুতে পথ দিয়ে যেতে যেতে মুখে করে চলে গিয়েছিল। যখন আকাশ কালো করে সন্ধ্যা নামতো, তখন হাটুজল আর একটা কাঁচা রুজা দিয়ে সাদা ভোজন দেবে সেই মাতৃহৃদয়েই ভুয়ে পড়তাম। তখন বয়স ছিল অল্প,—মন ছিল শক্ত—দেহে ছিল শক্তি। আশা? হ্যাঁ, আশাও ছিল—ফুল একদিন বড় হবেই, এ বিশ্বাস ছিল আমার। স্বাস্থ্য ছিল ভালো, লোহা খেয়ে লোহা হজম করতাম। কিন্তু আমার ছাত্ররা? তারা আমাকে ছাড়তো না; রাগে মাঝে তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাওয়াত সন্ধ্যা। তাদের ভালোবাসায় আমার মন ভরে থাকতো। ছিলাম ভালই—খেতামও ভালোমন্দ প্রকৃষ্টি। মনে পড়ে, আমারই হেঁড়া মাতুর বসে পড়ে আমারই ছাত্র তখনক দাস বড় ফুলে গিয়ে জলপানি পেয়েছিল। সেদিন আমি ওকে কোলে নিয়ে নাচতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও লজ্জা পেলে ভাবি—তবে হ্যাঁ, আমারকে পেঁচাবে সন্ধ্যা খাইয়েছিল। এত ভাল সন্ধ্যা আমি আমার জীবনেও খাইনি।

তারপর ঘরভাড়া বাকী পড়লো। বাড়ীওয়ালা তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে। রকও গেল। সম্পত্তির মধ্যে একটা হেঁড়া মাতুর, একটা টিনের ফুলকাটা স্ট্রটেকশ, আর একটা ব্র্যাকবোর্ড। সব খাড়ে করে রাস্তার নেমে পড়লাম। চার দিন না খাওয়া—না দাঁওয়া, একটা পার্কের মধ্যে ব্র্যাকবোর্ড পেতে মাতুর মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছি। স্ট্রটেকশ চুপি গেছে। দ্বিধের মন্ত্রণায় প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

গায়ে ঠাণ্ডা হাত পড়লো কার—যেন মাঁর হাত, বড় ঠাণ্ডা—বড় স্নিগ্ধ।

: কে রে?—চোখ বুজেই ভিজাসা করলাম।

: আমি মণিমা স্ত্রীর। আজ চার দিন থেকে আমার আপনাকে খুঁজছি—চলুন একবার আমার ঘর বাড়ী। মা আপনাকে নিয়ে বেতে বসেছেন। ঠিক মনে পড়ছে স্না—ওদের চাঁদকার করে বলেছিলাম : একটু জল, আগে একটু জল কে বাবা, গলাটা তকিয়ে কাঁট হয়ে গেছে।

ওরা খাঁজলা ভরে ভরে জল এনে দিলে আমায়—

আঃ আটটি ছোট ছোট হাতের কি মিঠে জলই না সেদিন খেয়েছিলাম—হুঁহাত তুলে বললাম, মণিরাম, সতে, নীলে, বেশ—বেঁচে থাক—বেঁচে থাক বাবা।

মণিরামের বাবা থাকবার ঘর দিলেন—পড়াবার বক দিলেন। সতের মার ঘরে ছুবেলা খাবার ব্যবস্থা হলো—নীলে মাটির ভাঁড়ে চা জোপাত—আমি যেন ইন্দ্রজ পেলাম। আন্তে আন্তে স্থূল বাড়ী ভাড়া নিলাম—সকালে মেয়েদের স্থূল হক্কো, দুপুরে ছেলেদের, তাও পাটনার সোপে। আবার দাঙ্গা এলো—সবাই পালাল স্থূল-বাড়ী ছেড়ে; শুধু চোরা বেকি আগলে পড়ে রইলাম আমি—ছাত্র-ছাত্রীরা পালিয়েছে—সামনে অনাহার।

আবার চাকা ঘুরলো। এখন আর ছাত্র ছাত্রী ঘরে না। স্থূল বড় হয়েছে—স্থূলের উন্নতি হচ্ছে—এখন আর আমার অগ্রগা হলো না।

লেখাটা শেষ করে খাতাটা টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে আঁকড়ের বাটটা হাতে তুলে নিলেন। কাল সকালেই সমস্ত পৃথিবী থেকে তাঁর নাম মুছে যাবে। পরিবারের এগারটি লোক ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে—এ মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না।—যা কিছু থাকে তা বিক্রি করে বড় জোর একমাস চসতে পাবে, প্রভিডেন্ট, ফাণ্ডের টাকায় আরো মাস তিনেক।—তার পর।

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন বুকের সমস্ত শিরাগুলো স্থূলের ন্যম্নে মুচড়ে উঠতে চায়—অসহ্য বেমনায় টনটন করে? বাবা তাঁর জন্মে একবারও ভাবলো না, তিনিই বা কেন তাদের জন্মে এত ভাববেন? নাঃ আর ভাববেন না তিনি। উত্তেজিত শিরাগুলো নগ্ন নগ্ন করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে।

একটু জল—একটু জল খেতে হবে। আজই শেষ তাঁর জল খাওয়ার পালা। কুঁজোতে ছুটে গিয়ে হাত দিলেন। সেটা একেবারে খালি, গড়িয়ে পড়লো—ওতে জল নেই এক ফোঁটাও। বাড়ীর সবাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে, কুঁজোর জল ভরতে তুলে গেছে ওরা। আঁকড় তেঁতায় যেন জিতটা টেনে টেনে নিচ্ছে মুখের ভেতর। সমস্ত শরীরে একটা ভীম জ্বালা—যেমন সেইদিন লেগেছিল পার্কেই মধ্যে তবু ওয়ে।

যেন একটা জেল চেপে গেল মাষ্টার মশায়ের। এতটুকু দাবীও তাঁর মেটবার নয়? এক-বুকে তুফা নিয়ে মরতে হবে তাঁকে? একটা ছোট দাবী—এক গ্রাস জল,—এও তিনি মৃত্যুর সময় পাবেন না? না,—জল তাঁর চাই-ই! অসম্ভব আজ এই মুহূর্তেই পোতে হবে।

অঙ্ককারে একপা—এক পা করে এগিয়ে গেলেন মাষ্টার মশায় কলের দিকে। বাঁ-হাতে কলটাকে ধুলে দিয়ে তার নীচে হাতটা ঝঞ্জলি করে পোতে গেলেন।

ঃ শ্রাবঃ— মাষ্টার মশায়ঃ— মিষ্টগলার একটা ডাক এলো।

ঃ কে?

ঃ আমরা। আমাদের বেগুনা চাপড়, কাপড়, বই—সব কেসে, না খেয়ে চলে এসেছে কেস মাষ্টার মশায়? আমরা কি লোখ

করেছি? এই যে খাবার—আমরা নিয়েই এসেছি। একি! কীপছেন যে আপনি? হাতে এটা কি? বাটি? জল রাখেন? দিন, আমরা দিচ্ছি—ওমা, গ্রাস কি যেন। ঝাঁপান, একটু মেজ দি।

ঃ ওরা দিল না মরতে—ওরা আমাদের কিছুতেই দেবে না একটু শাস্তি—ডুকরে কেনে উঠলেন মাষ্টার মশায়।—পাগলের মত নিজের কপালে করাঘাত করতে লাগলেন।

আবার সেই মাহুৎসর্প—তেমনি স্নিগ্ধ—তেমনি ঠাণ্ডা। ওদের হাতে জল খেয়ে আবার তেমনি সুস্থ লাগতে, আবার নিশ্চেতন যেন নতুন করে উপলব্ধি জাগছে, যেমন জেগেছিল সেদিন পার্কে চার দিন না খাবার পর সতের হাতে জল খেয়ে।

সত্যিই তো—কি লোখ ওদের? ওরা তো আমার ত্যাগ করেনি। একটা আশ্চর্য উপলব্ধির তরঙ্গ যেন বয়ে গেল তাঁর শিরায় শিরায়। আর মৃত্যুর মৃত্যু পলারনে নয়—জীবনের মধ্যে বাঁচবার প্রেরণায় মাষ্টার মশায় উঠে রসলেন। মণিরামের ছেলে, সতের ছেলেদের কে পড়াবে? মীরা, লীলারা তাদের বাড়ীর দিকে নিশ্চয়ই তাঁর পাঠশালা বসাবার ব্যবস্থা করে দেবে!—নয় তো—নিজের বাড়ীর বারান্দায়—? ওদের মীরা—আলোটা জ্বালানো—?

ঃ জ্বালানো স্রাব? বিনি বললে।

ঃ এক অঙ্ককার দেখছিনু না; আলো না জ্বালালে কি হয়?

ঃ একি আপনি কি বেরবেন? বিনি বললে।

ঃ দে—তো তোদের নতুন চান্দা—কাপড়, আমি এখন মণিরামের বাড়ী যাচ্ছি। তাদের বাড়ীর তিনটি ছেলে এবার স্থূল সীট পায়নি,—আর তোর ভাই দাবাকে বন্দি, কাল থেকে আমার বাড়ীর বাবান্দায় কোচিং ক্লাশ বসবে।—আর শোন, আমি বেরছি। তোরা খাবারটা ভালো করে ঢেকে ঘরে ঢাচি দিয়ে বাড়ী বা। আমি কেববার পথে তোর বাবার সঙ্গে দেখা করে চাচি নিয়ে বাড়ী ফিরবো।

অঙ্ককারের মধ্যেই মাষ্টার মশায় পথে নেমে পড়লেন। নতুন বাড়ীর।

সুখা-সম্ভবা

পূর্ববী চক্রবর্তী

এক অল্পবয়স্ক কানন মুহূর্তে তোমার আমি প্রথম দেখেছিলাম। দেবতার মেয়ে এক দেবিকার রূপে আমার দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করে তোমার সেই স্নানর উদ্ভব আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, মুগ্ধ করেছিল। আমি নির্ভীক বিষয়ে জন্ম চেয়েছিলাম তোমার পাথে। কখন যে তুমি আমার নয়নের সব আকুলতাকে ধার্য করে দূরে চলে গিয়েছিলে—তা আমি জানিনি, বুঝিনি। শুধু বক্তব্য পবে অবস্থিত হয়ে আমি অকৃতব্রত করেছিলাম—প্রথম দর্শনের সেই প্রথম কণ্ঠে আপন অজ্ঞানিতে মর্ন্তের কলুষ ভীম আমার ধন হয়ে গেছে,—বক্ত হয়েছি বুঝি এক অমরলোকবাসিনীর যমদীর আধিভাব।

দীর্ঘ ভিনমাস পথে ফিরে এসেছি—আবার এসেছি—আমার চিরপরিচিত কলকাতার। প্রবাসের যেমন দাবার দৃষ্টিকে নতুন

করেছে, স্মরণ করছে, আমার অজুত্বির চেতনাকে। স্মৃতি
কণে আমি কিংরেছি। আলোকোজ্জ্বল পথের সেই লেখান জনপ্রান্তের
মাঝে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে
আমি একান্তভাবে যোগ করেছি—প্রতিটি জিনিষের দিকে পরিচিতকে
কোমর আগ্রহে চেয়েছি। কি যেন এত আনন্দের ব্যাকুলতা আমাকে
জবর করেছে। বারে বারে মনে ভেবেছি, এই প্রকল্পে মনোনিবেশ
তো ছিল দেশের প্রাণকেন্দ্র হবার আদর্শ ক্ষেত্র। রাজধানী দিল্লীর
দেখা মাথা হাসি আর মেকি জীবনের অস্বচ্ছন্দ গতি আমাকে অস্থির
করে তুলেছে। তাই তো ছুটি পাওনা হতেই ছুটি এসেছি
আমার আপনস্থানে—এই স্বচ্ছন্দ জীবনের দেশে।

গাড়ী থামল আমার বাড়ীর দরজায়। বাড়ীর গাড়ী নয়—
টাক্সী। না জানিয়েই আমি চলে এসেছি—সকলকে খুঁজতে অবাক
কর দেব। ওই তো বারোয়ান আমাকে দেখতে পেয়েছে।
বিশ্বের আনন্দে সে এগিয়ে এসে আমাকে অভিভাবন
করাল। আমি বিহ্বল হয়ে নেমে এলাম। আর আমার চিন্তা
নষ্ট। মাসপত্র নামিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে, ওরাই আমার
ঘরে সব কিছু তুলে রাখবে। আমি এখন ছুটি বেতে পারি
আমার আশ্রয়নের প্রীতির উচ্ছলতায়। তুলে যেতে পারি আমার
পশুপাখী। আর গাড়ীঘোর মুখোশ দূরে ফেলে সঙ্গীসখীর
মচমচে পরিপূর্ণতায় উপভোগ করে নিতে পারি এই দশটি দিনের
সীমিত মুক্তির প্রতিটি পল অল্পপল।

কাকভোরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নিশ্চিন্ত শরীর আনন্দ
থেকে দোর খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। অপরাহ্নের অবসর
তো আর নেই। সময় যে আজ সোনা হয়ে গেছে। মুক্তির
মুহূর্ত্তলিতে বহুটুকু মধু-মাধুরী আমি মনের অজলিতে সঞ্চয় করে
নব—ভবিষ্যতের কর্মমুখর দিনগুলির গ্রানিতে তাইতো আমাকে
নবতর উদ্দীপনার সজীবিত করবে—শ্রেণী বোণাবো আমার কর্তব্যের
স্বপ্ন পথে। স্মরণের কোন আকৃষ্ণা থেকেও তই আমি আজ
নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইনি। শেষরাতের আবছায়ায় এই
মলবারান্দার অকিড আর মনি প্রাণের সমারোহের মাঝে দাঁড়িয়ে
এই যে বিচিত্র অজুত্বিত—এর তুলনা কোথায়। পশ্চিমের আকাশে
চন্দ্রা মস্তবড় হয়ে উঠেছে—একটু নীলের সায়ের যেন ফুটে ওঠা
কপাল বরণ ফুলটি। ও তো শুধুই অকাশকুসুম নয়। যাবার
বোলায় মুঠি মুঠি আলোর তেণু ছড়িয়ে ও বৃষ্টি পূর্ব্বাচলের সেই
জ্যোৎস্না-সঙ্গী—এর পরম আবির্ভাবের কথাই জানিয়ে যেতে চায়।
বাতের অন্তরে আলোর আবাহন—সে যে শান্ত, স্নানর। নিগন্তের
বৃক দুই মেলে দেখলাম উদার প্রথম আভাষ। এত ভোরে
ঐক্যিক এমন করে আর কখনও শেমিনি। মন আমার ভর
গেল। রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ বাতাস আমাকে ছলিয়ে দিয়ে গেল।
আর আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম প্রকৃতির কোলে পৃথিবীর সেই
শান্ত মধুর রূপটি।

শহর কলকাতার এক মধ্যস্থতা আমি অজুত্ব করছি।
মাসপত্রের দুধারে ছোটবড় অনেক বাড়ী। প্রাসাদের পাশেই হয়তো
বড়ো সারি। আর তারই মাঝে স্নেহে-দুঃখে শোকে-আনন্দে
অনেক মানুষ দিন কাটার। শ্রেণীপুত্র বৈষম্য তাদের
মাঝে আপাত বিভেদের আর দ্বিধাবের প্রতীক তুলেছে—

তবু তাদের বেদনার কান্না আর আনন্দের গান এখানকার আকাশে
বাতাসে এক হয়ে মিশে আছে। দেশের কলরোল-মুখরতাকে
অতিক্রম করে বাস্তবতার দীর্ঘশ্বাস তুলেছি, আবার, মিনিটের
বাড়ীর পাশে স্তম্ভ সন্ধানের ভীনের বেঁচে থাকার মত আর্থিক সঙ্কটের
জগৎ ভর্তাগোব বিশেষ অপরিণীম প্রাণশক্তির সংগ্রাম আর তার
জয়যাত্রা—তাও দেখেছি। ভালবাসার মাধুর্য আর মধ্যস্থতার ক্রুরতা,
বন্ধনার বার্তা আর ভীষনমৃত্যুর সার্থকতা এখানে বড় পাশাপাশি
আর কাছাকাছি আছে। বিস্তে শুধু অহমিকা নয় উদারতাও আছে,
দীনতার মাঝে শুধু দীনতা নয় উচ্চতর মনোবৃত্তির প্রকাশও আছে।
আর সৌন্দর্যের পাশে মালিন্য আছে বলেই তো তাদের আবেদন
এমন সার্বজনীন হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার এই অভিজাত
অঞ্চলে,—সুদৃঢ় আর সুসুহৃৎ বাড়ীর সুস্বস্তি মাধুর্যগুলির শুধু অর্থের
আতিশয়াট নয়, সামাজিক সম্মানের প্রচুরতাও আছে। তারা দেশ
আর সমাজের শীর্ষস্থানে। তবু তাদের অনেকের চরিত্রগত আদর্শে
যে ঘৃণ আছে, তা ব্যক্তির অন্তরের সীমারেখা ছাড়িয়ে ব্যষ্টিকে
দুর্গতির পথে নিয়ে যায়। আর ঐ বস্তীর মাঝে যারা তাদের পাশেই
আছে—তারা তো সমাজের অবলো আর অনাদরের জীবন। তারা
ছলনা করে, কলহ করে, শুধু বেঁচে থাকার আগ্রহে প্রাণান্ত করে,
আবার পরস্পরকে ভালও বাসে। স্নেহে-দুঃখে ওরা একে অন্দের
সাথী হয়ে থাকে। শেষরাত থেকে রজনীর মধ্যমাধ্যম পর্যন্ত রাত্তির
ঐ জলকলটির ধারে ওদের প্রেরমান কাজের মাঝে নিম্নতই প্রকাশ
পায় যে, ওদের জীবনেও একটা শৃঙ্খলার ধারা আছে—আর আরও
আছে সমাজচেতনা। অনন্ত রূপবৈচিত্র্য এই শহর কলকাতার।
তবু তার অন্তরে কোথায় যেন এক মিলনের সুর বাঁধা আছে, যা
শুনতে আর বুঝতে আমাদের তুল হয় না। তাইতো কলকাতাকে
এমন করে ভালবেসেছি।

রাজধানী দিল্লীর শৃঙ্খলাবোধও রাজকীয়। সেখানে রীতিনীতির
শাসন বড় কঠিন। নয়াদিল্লী আর তার আশেপাশের সুপ্রশস্ত
পথের ধারের ঐ যে বাড়ীগুলি, ওরা যেন বাস্তব পৃথিবীর নয়—
রঙে রূপে আর কল্পনায় ওরা ছবি হয়ে উঠেছে। এক এক পাশে
যেন একটু ছবির অনেকগুলি অঙ্করণ। স্থানের ভিন্নতায় শুধু
ভিন্নত্ব হচ্ছে ছবির আদর্শ—আর তাতেই সার্থকভাবে রূপায়িত
হয়েছে অর্থ ও সম্মানের মাণকাঙ্কিত পাওনা জীবন-ব্যবধানের
বিচিত্র রূপ। বড় রাস্তার পাশে গদিশক্তির দোজা পথের মতই
মানীক্যের পাশে সাধারণের ভীড় রাজধানী এড়িয়ে চলতে চায়
আর নিজের দীনতাটুকুও সে সবচেয়ে বিলাসসজ্জার অন্তরালেই রেখে
দেয়। তাই স্বাধীন ভারতের মধ্যকেন্দ্র—মহানগরী দিল্লী—তার
অতীত ইতিহাসের গৌরবান্বিত নিয়ে দেশ আর বিদেশের কৌতূহলী
জনতাকে প্রকিয়িত আকর্ষণ করে। শুধু ঘরের সেই মহাভারতের
ইঙ্গুপ্রস্থের ধ্বংস-শেষের উপরে গড়া, পুরাতন ভারতের বিজয়কীর্তি
পুরাণ বেলায় ভয়ঙ্করের দিকে চেয়ে, একটিটার দর্শনাঙ্গী মন চমকে
ওঠে। ঐ যে মাধুর্যগুলি জরাজীর্ণ প্রাচীরের গুমটিঘরের কাঁকে কাঁকে
অসুস্থ পরিবেশে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধে থকে চলেছে—মনে হয়,
ওরা যেন চিরন্তন বেদনা আর লাধনার মূর্ত্ত প্রতীক—আপাতমধুর
বিলাসনগরীকে তার প্রকৃত রূপের কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে
দিতে চায়। আরও একবার দর্শক-অন্ধর ব্যথিত হয়ে ভাবে,—

সম্বিকল্পিত নগররূপের অন্তরালে যে শ্রেণীবিভেদের রেখা আচ্ছন্ন রয়েছে, জাতীয় চেতনা করে তাকে বিদেশের অস্ত্র অহিত অমৃতরূপের মতই ভোগ্য করতে পারবে—আর ব্যক্তিগত তার সব উচ্চতা আর তৃষ্ণতা নিয়ে এক ভারত-আত্মার বিলীন হয়ে যাবে। রাজধানী দিল্লী তার সব সৌন্দর্য আর গরিমা নিয়ে শেষ হয়েছে—কিন্তু শ্রিয় সে হবে কবে, আরও কত দুঃখ তপস্রার অন্তরে!

আরও একটি নতুন দিনের আলো-উজ্জ্বল জাগরণ আমাকে চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে বাস্তবের উদ্দীপনায় ফিরিয়ে আনল। পথে লোক-চলচল শুরু হয়েছে। গাড়ীগুলো প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। সামনের ঐ গরুগুলোর গলার ঘটা টুং টাং বাজছে। একটু টাটকা হৃৎকের জল কত জন এসে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। মুরগীগুলো ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে আর হুঁকরে হুঁকরে খাচ্ছে কি যেন। প্রভাত-ভ্রমণে চলেছে কত জন। গৃহহীনের দল ফুটপাথের আশ্রয় হেড়ে উঠেছে একে একে। বাড়ীর লোকজনও জেগে উঠেছে। বাগানে মালী গাছে জল দিচ্ছে। ঘাসোয়ান এবার গেট খুলে দিল। আমি নীচে নেমে বেরিয়ে এসলাম পথে। আর সিগারেটের ধোঁয়ায় মায়াজাল বিস্তার করে সংকীর্ণ ছি আমার মনের মধ্যে ঘরে নিতে চাইলাম। ঘোস পাটশে জল দিতে এসেছে রাস্তার। জলে ডিজে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ বার হচ্ছে। ওদিকে ওরা রাস্তা পরিষ্কার করছে। অ্যালসেদিয়ানটাকে বেড়াতে নিয়ে গেল। বাগদার আগে বনি এল আমার কাছে। পা তুঁকে, ল্যাক্স নেড়ে, একটু আদর পেতে আর জানাতে চাইল ও পুরাতন প্রভুকে। তারও পরে বাস চলাচল শুরু হল। আকাশে লালের ছোঁয়া লেগেছে কতক্ষণ। সূর্য্য উঠতে আরও কত দেরী! শহরের ইটকাঠের অন্তরাল থেকে সূর্য্যের উদয়কাল পাঁজি-পুথির হিসাবকে কতকটা ছাড়িয়ে যায় জানি। তবুও তো কাম্য সেই আবির্ভাব। নগরীর বিরস জীবনে সে যে স্নানরের এককণা মধুর আশীর্বাদ।

সূর্য্যের বৃষ্টি সাত রঙ। আমার দৃষ্টির আকাশ আচ্ছন্ন করে আছে শুধু এক রঙ—সে রঙ, অম্লবাগের। শুধু বাতির স্নানমাকেই অবলুণ্ণ করেনি ঐ আলোর লালিমা—আমার জীবন মনকেও বৃষ্টি রাড়িয়ে তুলেছে সব কামনা আর কলঙ্কের কালিমা মুছিয়ে। কোনও এক উজ্জ্বল উল্লসের তির্য্যাসা যেন আমাকে অধীর করেছে। তাই অনন্ত প্রীতির আগ্রহ ব্যাকুলতায় অন্তর আর বাতির প্ররুতির সিকে চেয়ে আছি আমি নির্নিমেবে—কোন অপেক্ষার আসার আশায়।

প্রশান্ত ঘীর পদক্ষেপে রাজপথ বয়ে তোমার সেই আগমন—সে যেন আমার জীবনসরণিতে এক পরম রমণীস্বের প্রথম সঞ্চারণ! 'আলমাসিহ কুন্তলা', তরঙ্গকু কেশকলাপের মাঝে তোমার ঐ অনিন্দ্য স্নানলম্বী নিয়ে তুমি এল আমার দুয়ার প্রান্তে—মগাবিত্যায়নের পথচারিণী এক কস্তাকুমারী—বাঁচাঙ্গে বিপদান্ত আঁলে সামলিয়ে হাতের বই কটকে সধ ত্ব ধরে চলেতে চাইল আপন পাখে একান্ত উপাসিনীর মত। শুধু একটিবার অসম্মান দৃষ্টিত বৃষ্টি নশিত হলাম আমি—আর তখনই উদয়চলের সেই আলোক-দেবতার দ্ব্যতিময় হাসি মুঠে মুঠে সোনার আশীর্বাদ হয়ে বয়ে পড়ল তোমার মুখে, বৃকে বরষায়ে। তোমার দুই আরত মরনের সিন্ধু বিত বসন্তার জাঘর

হলেন ভাষার, আর এক মৃতিমতী আলোক-কস্তার উদ্দেশে আমার মুগ্ধ মনের আরতি তখন ধস্ত হয়ে গেল।

মুহুর্তে বাস্তবকে ভুললাম আমি। মনে হল আমি যেন সেই মতভারতের রাষ্ট্র সংবরণ—চলার পাখে দেখেছি আমার মানসী প্রতিমা স্বর্ধাকস্তা তপতীকে। এক দৃশ্বর তপস্রা শেষে অমহলোকবাসিনী অধরা ধরা দিচ্ছেল পৃথিবীর প্রণয়মালার বন্ধনে—আদিত্যকস্ত হয়েছিল সংবরণ-ভায়া। কিন্তু ঐ যে শ্রীমতী মেয়ে লাভণ্যের অমৃতধারায় স্নাত হয়ে পৃথিবীর সব নিবিড়তাকে ডলে দূব আকাশের আলোক-চেতনার মগ্ন হয়ে গেছে—ওব ঐ দীপ্তোজ্জ্বল রূপের কাছে আমার সব স্পন্দার কামনা যে স্নান হতে চায়। আমি তো পুরাণের সেই শুক্লভী রাজা নই। শুধু উজ্জ্বল আর দুঃখযৌবন—আজকের পৃথিবীর মর্ত্ত পুঙ্খ আমি। শুচিতার প্রতিমূর্ত্তি ঐ দেবপ্রকৃতি মেয়ের শ্রিয়হাতের বরণমালার সুরভিতে সিন্ধু হয়ে যাব—দেহমনের সে অকলঙ্কতার গৌরব কোথায় আমার! দুঃসহ অন্তরাগ্নির চিত্তবিক্ষেপেও কি এই হৃদয় জীবন-ব্যবধানেকে অতিক্রম করা যায়!

আলোক সামান্য কি কখনও অন্তরতমা হয়ে ধরা দেয় পৃথিবীর গেরকোণে! আর সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে জীবন তখন সার্থক হয়ে যায় পরমপ্রাপ্তির আনন্দমধুরতায়!

আরও এক সোনাবরা সকালের আলোকময় স্মৃতি বাহবাগেই উজ্জ্বল আর উজ্জ্বল করে আমার অন্তরকে। যাত্রার প্রস্তুতি চলেছে শতরত্নার পাখে—শান্ত আর সিন্ধু পরিবেশে এক সারাদিনব্যাপী পিকনিকের আয়োজনে। চারখানা গাড়ী বাওয়াই করা হচ্ছে স্কিনিয় আর মালুবে। বহুজন আর আত্মীয় পরিজন—কেউ বা উঠেছে কেউ বা ওঠেনি এখনও। টুন্ডিবেরারের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যারিয়ারে কি উঠল না উঠল তাই দেখছি দাঁড়িয়ে—পাশে থেকে কাজে সাহায্য করছে বৌদি আর ছোটবোন তিথি। হঠাৎই ওদের যুগ্মকঠের মুগ্ধধনিত্রে সচ্যকিত হয়ে ফিরে চাইলাম আমি—“একী এ!” আর তখনই ওদের দৃষ্টিকে অম্লসরণ করে আবারও দেখলাম আমি তোমাকে। কলরোলমুখরতায় বৃষ্টি মুহুর্ত্তেকের জল বাহিত হল তোমার অচকলতা। কৌতুক আর কৌতুহলের নীপ্তিতে নয়ন উন্মাদিত করে বারেকের চক্রে চেয়ে দেখলে এই বিচিত্র কারাবানানের দিকে। শুধু স্নানিকের দৃষ্টিবিনিময়। আর তখনই উদীচীর সেই আলোর আবির্ভাবে গোলালী পশে রঞ্জিত হয়ে উঠল তোমার তমুশ্রী। স্বর্ধাকাস্তমণির মত আলো উছলে-ওঠা তোমার দুই দৃষ্টিপশের আনন্দ-আরতিতে বৃষ্টি প্রীত হলেন আলোর দেবতা, আর সে প্রীতির অম্লভবে তুমি হলে তখন পরম রমণীয়া! মুহুর্ত্তে সব মুখরতা হারিয়ে কোন অলখ আকর্ষণে যেন সবাই ক্ষিপ্র দেখল তোমার মুখে! স্নানকের অম্লভূতিতে আচ্ছন্ন হল তারের অন্তর, আর তোমার অভ্যাসের নীরব প্রকার ডালি সাজাল তার তোমারই উদ্দেশে।

শুভ্রবদনা তোমাকে দেখে ওরা বলেছিল মৃতিমতী বাগদেবী। আমি পরিচায়ের আবরণে আমার মনের এক মধুর সন্ধ্যাবনাকে অন্তরাল করতে চাইলাম ওদের চোখে—“অবাক দেবী বলা। যে অকল্লনীর সিন্ধুদেশনেই সৃষ্টি হল তাকে, এ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে!” আশ্চর্য্য! জালসায় আরি সবার চিত্তাভাষার মাফেই



সৌন্দর্য্য মার্গ



গিনি টাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৩১ ১৬৭/সি ১৬৭/সি/২ ভবনভাড়া ট্রাই কলিকাতা-১২ গ্রাম-গুণিয়াকৈ
প্রাক-বালি গজ-২০০/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১২ ফোন- ৪৬-৪৫৬৬
সোনারদর পুরাতন ষ্টোর ১২৪, ১২৪/২, ভবনভাড়া ট্রাই, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাহ্ম-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৪৪৮-৪

এক সঙ্গতির আভাস খুঁজে পেয়ে। যেহেতু কোনও তত্ত্বগলাষণ নয়, সুখ-আনন্দের রূপেই তো তুমি আমার হৃদয়কে হরণ করেছ। তুমি বুঝি এই পৃথিবীর মেয়ে নয়, দেবীত্বের অচলারতনেই তোমার নিত্যপ্রতিষ্ঠা!

আমার জীবন প্রাথমিক নয় তুমি—তুমি শুধু—একতম। তবু তুমিই আমার অন্তর। সপ্তদশ বসন্তের সন্ধ্যার আমার দেহমনকে হেরে ধরে সাজিয়েছে। আর তাইই অনতিক্রমণীয় আকর্ষণে ওরা ছুটে এসেছে জনে জনে—ঐ মুকুলিত যৌবনার দল। ওরা এসেছে, এসেছে, আর তারও পরে ওরা শুধুই কৈদেছে। ব্যস্তির প্রথের প্রেক্ষাগণে উচ্ছ্বল স্বরূপ লুকিয়ে ওদের নিঃশেষ আশ্বাসন আমি গ্রহণ করেছি। আমার যৌবনের খরতাপখালার ওরা শুকিয়ে গেছে—মান হয়ে বয়ে গেছে মাটির কলকে একের পরে এক। আর আমি শুধু অলঙ্কার অবহেলার হাসিতে এগিয়ে চলেছি আমার জয়যাত্রার পথে—অরুণ একটি জীবনকৃত্তমকে বৃষ্টিচাত কববার নিষ্ঠুর আনন্দ-অধীরতার। রূপ, গুণ, বিজ্ঞা, অর্থ আর সামাজিক প্রভাবের ব্যাপকতা—এসবই তো চিরবালের চরিত্রবানদের পরিচিতির নাথ্যম! বিধাতার অপার দাক্ষিণ্যে এর সব কটিতেই আমি বঞ্চিত হয়েছি। সব সন্দেহের স্পর্শে আর অপবাদের চক্ৰে আমার পথে এসে তাই খমকে সরে গেছে। ডনজুয়ানের ভূমিকা নিয়েও ঘবে-বাইরে আমার নিকলঙ্ক পরিচয় ব্যাহত হবার অবকাশ ঘটেনি কখনও। মারীয়েচের চরমতম অপমান করেছি আমি নির্বিধায়। রূপবিস্তারিত পৃথিবীতে নারীকে ধেনেছি শুধু পুরুষের বিলাসের এক মূল্যের উপকরণ। তবু সেই অসংখ্য বিভ্রান্ত আশা আশার মলিনের কালেও বুঝি সাক্ষী মায়েব প্রীতিমিত্র পবিত্রতার রূপ আমার অবচেতন মানসে এক প্রতিফলিত স্মৃতি বয়েছে। তাই আমার অলঙ্কারকে বায়েবের চমকিত বয়েছে এক কল্যাণি পার্শ্বচাঞ্চীর মধুময় করুণা। আজ এতদিনে বুঝি আমার সেই প্রতীকার অবদান হল। মধুমতী তুমি এসে আমার জীবনে আর মুহূর্তে আমাকে জয় করে গেলে পরমা-প্রকৃতির রূপবিন্যাসতায়!

কলকাতার এসেছি গেছি আরও কয়েক বার। জীবনের একটা নতুন দিককে ধেনেছি আমি। প্রথম ভালবেসেছি এক নারীকে পরম নিবিড়তায়। তাই আলা বাওয়ার ক্ষণে মিলনের আনন্দ আর বিরহের বেদনা অল্পভব করেছি গভীরতর ভাবে। কতদিন উদ্বুদ্ধ হয়ে থেকেছি। তোমাকে দেখার আগ্রহে। কোনও দিন বা দেখেছি তোমার। আর সেই স্মৃতির আলোর আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলির বিপনছায়ায় দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। এর বেশী কিছুই তো আমি কামনা করিনি। তোমাকে অল্পসংগ করবার মত প্রাকৃত প্রবৃত্তি আমার হয়নি। তোমাকে কাছে পেতে চাইনি আমি। তোমার জাগতিক পরিচয় জানবার আগ্রহও জাগেনি আমার মনে। আমার অন্তর মায়েই যে তোমার নিরন্তর অস্তিত্বের উজ্জ্বলতা! আমার জীবন মন শুধু এক নতুন ধারায় বয়ে চলেছে এখন। পাটি, ক্লাব, আর পিকনিকের উচ্ছলতার মাঝে আমার সংঘম দেখে বিস্মিত হয়েছেন সকলে। কত লোকজ্ঞার অভিভাবক আমার নিঃসঙ্গতায় হতশ হয়েছেন। অন্তরঙ্গজন এই আকস্মিক পরিবর্তনের সূত্র অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন কতবার—আর বিবে গেছে বার্থমনোরথ হয়ে। আমি নিজেকে কি সঠিক

বুঝেছি এর কারণ! শুধু ধেনেছি ডিক্যাপ্টাবের রক্তিম পানীয়ের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় এই আন্তর অম্লরাগের সুধার আশ্বাসন!

কতদিন পরে আর দেখিনি তোমায়। হয়তো তোমার কণ্ঠের পাঠ সাজ হয়েছিল এতদিনে। আমার দৃষ্টি থেকে তুমি দূরে সরে গেছে—কিন্তু আরও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছে আমার চেতনাকে। প্রিয় অম্লধারের কটিন ব্রতচর্যার এই তো সরে প্রথম পর্ব। জীবনসমুদ্রের মন্থনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখের অম্লধারাই নয়—বাখা আর বার্তার গরলও যে উঠে আসে—সে কথা আমি ভুলেছিলাম। বিশ্বাস আর প্রীতির প্রতিদানে নারীকে দিয়েছি শুধু বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা। তার সঙ্কল্প আশ্রি আর দীর্ঘস্বাসের অভিশাপকে পৌরুষের অহমিকায় ঢুঙ্ক করেছি। আজ বুঝি তারই প্রায়শ্চিত্তের লয় এল আমার জীবনে। তাই সঙ্গিত চিন্তে ভাবি—ঐ বরষারায় দেহলীপ্রাণে আমার মনের প্রার্থনা কি সার্থক হবে কখনও, আর বিচ্ছেদের হুংখ সাধনার অন্তে দয়িতার হাসির মাধুরীতে মধুর হারে বাবে আমার মিলন-বাসবের শুভলয়!

হিতাশীর্জন বিচলিত হয় আমার নিকলঙ্ক বিবর্তনায়। মনে ভাবে এ বুঝি যৌবনধর্মের এক স্বাভাবিক পরিণতি—একক জীবনের মনোবিকলন যাত্রা। তাই শুরু হয় খোজার পালা—আমার নিঃসঙ্গতা দূর করে মনটাকে স্থখী করে দেবার জ্ঞাত প্রয়োজন হয় এক স্মৃতি সহমস্মিতার। আমি বিবর্ত হই আর এড়িয়ে চলেতে চাই এই অব্যাহিত প্রসঙ্গ। বিব্রণ আর বেদনার হাসিতে সব আলোচনা আর সমালোচনা থেকে দূরে সরে আপনহারা হয়ে বাই আমার মনোহাণি সেই স্মৃতিমিত্রের অভিধ্যানে।

কবে যেন কথাগুলো মেয়েমহলে অবতারণা করেছিলাম আমার একান্ত প্রিয় প্রসঙ্গের। নিঃস্পৃহতাই উৎপন্ন করেছিলাম সেই পূর্বদর্শিতা সর্বসুত্রার কথা—তার বর্তমানের উপর কেউ আলোকপাত করতে পারে কিনা, প্রকাশান্তরে সেটা ধেনে নেওয়াই ছিল আমার প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার কৌতুকের কূহকে ওরা ভাঙে হয়নি। অনতিপরিচিতা এক পথসংসারিণীর প্রতি আমার এই অনাবগত কৌতুহল প্রকাশের আকস্মিকতায় ওরা বিস্মিত হয়েছিল, স্মৃতিস্ম বন্ধের খরতায় জর্জরিত করেছিল আমাকে। আর আমি তখন সলজ্জ সঙ্কেতে কোনও অছিলার দূরে চলে গিয়েছিলাম। শুধু বাবার বেলার সানন্দ আগ্রহে বৌদির মুখে এক মধুর মন্তব্য শুনেছিলাম—এ মিলন সম্ভব হলে সে নাকি বড় মূল্যের আর সুযোগ্য হয়! মেয়ের আশঙ্কার মাঝে আশার মুহূর্ত স্পর্শে উজ্জ্বলিত হয়ে মা সেই অনবলোচিততার সহজে অল্পসংস্ক হয়েছিলেন। কিন্তু অজানার কুহেলীতে সেই অদর্শনাকে যে সকলে হাণিয়ে ফেলেছে—তাই ব্যর্থকাম হয়ে গেল তাঁর করুণার সব অমিতি। আরও একদিন পরিভাষণের মাঝে আমার আদর্শ নারীর বর্ণনাকে প্রভাবিত করেছিল স্বর্ধান্বিতা সেই অতুলনা কল্পনার জীবন-প্রতীতি। সেদিনও পরিহাস আর লজ্জিত হয়ে সরে গিয়েছিলাম আমি। আর অধিক হয়ে ভেবেছিলাম—ভালবাসার, মোহন হোঁচর আমার উত্তর মনের মুকুট কি অবশেষে লজ্জার মত ললিত বৃত্তি ফুল হয়ে ফুটে উঠল এবার!

[অগামী বারে সমাপ্ত।]

তেজস্ক্রিয়তার সম্পদ

মহাবিশ্বের দাক্ষিণ বিপরীতের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ পরমাণু শক্তির প্রথম পরিচয় পেয়েছে। পরমাণুর বিস্ফোরণ-ক্ষমতা এবং জীবনের তার প্রভাব বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রবল উৎকর্ষের কারণ। অনেকে মানুষের এই অস্বাভাবিক শক্তিকে বিজ্ঞানের অভিশাপ রূপে ধারণা করেছেন। কিন্তু এ হলো একদিক মাত্র। নদী বলতে আমরা যেমন শুধু বহুকেই বুঝি না, বাতাস মানে যেমন শুধু ঝড় নয়, পরমাণু শক্তিও তেমনি কেবল ধ্বংসেরই কারণ হয়নি, আমাদের জীবন বিকাশের পক্ষে নান্দিক দিয়ে কল্যাণকরও হয়েছে। যে প্রাণী তার হৃদয়ে অল্পকালে আচ্ছন্ন রাখে, তাই আবার নশ্বরিক আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

পরমাণুর বিকিরণ

বিকিরণ বলতে আমরা এতোমিনি আলো বা তাপ রূপে শক্তির এক স্থান থেকে অপর স্থানে গমন বোঝাতাম। কিন্তু ১৮৯৫ সালের পর থেকে এই ধারণার পরিবর্তন হলো। ঐ বৎসর ফরাসী বিজ্ঞানী বেকারেল লক্ষ্য করেন যে, বিকিরণের পরিধিতে উৎস হতে স্বতন্ত্র রূপে ইউরেনিয়াম ধাতু অভিন্ন এক রশ্মি নির্গত করে। রেডিয়াম, এট্রেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি থেকেও এই রশ্মি প্রকাশ পায়। পরাধ বিশেষের এই বিকিরণকে আমরা তেজস্ক্রিয়তা বলেছি, ইংরেজিতে রেডিও-এক্টিভিটি।

তেজস্ক্রিয়তার স্বরূপ

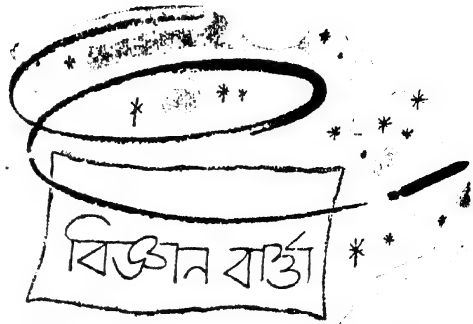
শিঘ্র কুরী, রাদারফোর্ড এবং ভিলার্ডের গবেষণার ফলে ক্রমশ জানা গেলো যে, তেজস্ক্রিয়তা অধৌগিক বিষয় নয় (Composite phenomenon), আলফা, বিটা ও গামা—এই তিনটি রশ্মির উপাদানে গঠিত। আমরা ইচ্ছা করলে বাতির আলো বন্ধ বা প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার সংঘে আশ্রয়ের কথা এই যে, মানবস্বাধা কোন প্রক্রিয়ায় এই বিকিরণকে রোধ করা যায় না।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয়তা স্বাক্রিয়, অপ্ৰতিবোধ্য; তবে কৃত্রিম উপায়েও তা সৃষ্টি করা চলে। আইরিশ কুরী এক জোলিও সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সফল হন। সে হলো ১৯৩৩ সালের কথা। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ইলেকট্রনের আঘাত হেনে এই বৈজ্ঞানিক-দম্পতি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি করেন। আইসোটোপ হলো এক কথায় পরমাণুর ভিন্নরূপ। সোনার আইসোটোপ আসলে সোনা-ই, তবে একটু ওফাৎ এই মাত্র—সোনার ১৯৮ নম্বর পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিটা ও গামা নির্গত হয়ে থাকে। সকল আইসোটোপই তেজস্ক্রিয় নয়, তবে এ পর্যন্ত সৃষ্ট ১,৩০০ আইসোটোপের মধ্যে প্রায় ৪০০টির থেকেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি পাওয়া যায়।

পরমাণুর বিভাজন : শক্তির সূতন উৎস

১৯৩৪ সালে ইটালীতে এনরিকো ফার্মি ইলেকট্রনের পরিবর্তে নিউট্রনের আঘাত হেনে কৃত্রিম আইসোটোপ সৃষ্টির উপায় আবিষ্কার করেন। এর চার বছর পরে জার্মানীতে একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। হান, এবং ষ্ট্রাসমান (Hahn and Strassman) নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভাঙতে সক্ষম হন। (আমাদের জানা উচিত যে, সৌরজগতের অতি দৃঢ়



প্রতিকৃতিরূপে পরমাণু মূলকণা ইলেকট্রন কেন্দ্রবস্ত বা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে। পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ এই পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা, নিউট্রন প্রোটন ইত্যাদি নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস তার স্বল্পতম আয়তন গ্রহণ করে আছে মাত্র, স্ততরং কোন পরমাণু যথাস্থানে আঘাত হেনে তা তুলোপে ভাগ করা নিঃসন্দেহ অতি দৃঢ় প্রক্রিয়া।) লিজে এবং ফ্রিশ (Lise Meitner and Otto Frisch) এই পদ্ধতির নাম দেন 'ফিসন' (Fission), অর্থাৎ পরমাণুর বিভাজন। তাঁরা আরো দেখানেন, ফিসনের ফলে আশ্চর্য শক্তি প্রকাশ পায়। পদার্থের শক্তিতে রূপান্তরের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে (১৯০৫ সালে) আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে, শক্তি (যা বস্তুসাহায্যে কাজ হয়) এবং পদার্থ (যে কোন জায়গা, জুড়ে আছে) একই জিনিসের বিভিন্নরূপ মাত্র, পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তিও পদার্থে রূপান্তরিত হ'তে পারে। কতলা যখন অল্পে তখনো কিছু পরিমাণ পদার্থ তাপশক্তিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু পরমাণু বিভাজনের ক্ষেত্রে এটি পারমাণবিক স্কেলভাৱে অধিক—প্রায় ২৬,০০০ গুণ।

ফিসন প্রক্রিয়ায় জাত ভগ্নাংশগুলি এক একটি নূতন পরমাণু, সাধারণত এরাও তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে। ইউরেনিয়ামের বিভাজনের ফলে সাধারণত তেজস্ক্রিয় ধাতু ক্রিপটন ও রেডিয়াম পাওয়া যায়। একপে পরমাণু বিভাজন তেজস্ক্রিয়ের একটি নূতন উৎস। তাছাড়া, ফিসনের প্রভাবে ছুটি বা ততোধিক নিউট্রন নির্গত হয়ে থাকে। আমরা জানি, নিউট্রনের সাহায্যে পরমাণুর বিভাজন সম্ভব। স্ততরং উপযুক্ত পরিমাণ ইউরেনিয়ামের বর্তমানে একবার ফিসনের ফলে জাত নিউট্রন একাধিক পরমাণু বিলীর্ণ করবে, এটি ছুটি বা তিনটি নিউট্রন আবার চার থেকে নয়টি ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনের কারণ হবে। এরূপে প্রতিটি থেকে ছুটি বা তিনটি, তিনটি থেকে ছুটি বা নয়টি পরমাণু—স্ততরং ফিসন প্রক্রিয়া পরায়বদ্ধ ভাবে অগ্রসর হবে—যেমন এক সারি সিগারেটের খোল কাছাকাছি পাড় কাষে একটিকে ধাক্কা দিলেই সবগুলি খোল একে একে পড়ে যায়। ফিসন-এর ক্ষেত্রে অল্প এ ক্রিয়া অতি দ্রুত অচুপ্তিত হয়ে থাকে—ফল নির্দিষ্ট পরিমাণ (critical mass) ইউরেনিয়াম একত্রিত হওয়া মাত্রই পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটে—অর্থাৎ স্বল্পতম সময়ে অধিকতম শক্তি প্রকাশ পায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন পরায়বদ্ধ প্রতিক্রিয়া (chain reaction)। বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক—কয়লায় নহন-ক্রিয়ার জন্ম আলজেনের সরবরাহ প্রয়োজন, কিন্তু ফিসন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়ামের পরমাণু প্রয়োজনীয় "আলজেন"

অর্থাৎ নিউট্রন নিজেই সৃষ্টি করে নেয়, প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রথমে কয়েকটি নিউট্রন থাকলেই ঘটে।

পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পর কেন্দ্রিক জোড়ি এবং এনরিকো ফার্মি ইউরেনিয়ামের ফিশনে কতকগুলি পর্যায় বহু বলে অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি তখনো প্রমাণ সাপেক্ষ ছিল। অবশেষে ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর ফার্মির নেতৃত্বে ৪১ জন বৈজ্ঞানিক সত্যসত্যই তা সম্ভব করলেন। আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিচিত্র “রিয়েক্টর”-বস্তু (তৎকালীন নাম পরমাণু “পাইল”—চিকাগো পাইল নাম এক, C P 1) স্থাপন করে এই বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠী দেখালেন যে, ফিশন প্রক্রিয়া বাস্তবিকই পর্যায়বদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলে। ইউরেনিয়ামের পরিমাণ অধিক হলে এই প্রক্রিয়া তৎক্ষণাত্ প্রবল বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে, এই বিস্ফোরণ-শক্তিকে আবার সম্ভব করাও চলে। এক্ষেপে পরমাণুর কেন্দ্রস্থল আঘাত করে আধুনিক মানুষ মস্তজ্ঞে ভেদকারী অজুনের স্রোতপদালাভের দ্বারা এক নতুন শক্তির আধারী হলো।

কল্যাণশক্তি পরমাণু

পরমাণুশক্তির নিয়ন্ত্রণ সর্বকালের মানবজাতির একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তৎকালীন মহাযুদ্ধের কারণে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সর্বপ্রকারে গোপন রাখা হয়েছিল। ফলে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের একটি বিখ্যাত সহরে পরমাণুর বিস্ফোরণের আগে পর্যন্ত মানুষের এই আয়ত্তাবান শক্তি সাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিচয় লাভ করেনি। পরমাণুরক আমরা প্রথম ধর্মান্তরিত জেনেছি, কিন্তু মহাযুদ্ধের পর এই নতুন শক্তি প্রধানভাবে শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই নিয়োজিত থাকেনি, বহু ক্ষেত্রে তা মানুষের কল্যাণ সাধনেও তৎপর হয়েছে। পরমাণুশক্তির বলে বহু আশ্চর্য্যাতী অস্ত্র উদ্ভাবন সম্ভব হলো সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তা মানুষের অগ্রগতি সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। পরমাণু আজ শক্তির বিকল্প উৎস, পরমাণু আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, পরমাণু শিল্পকাজে, কৃষিকর্মে—পরমাণু আজ সকল ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণে ব্রতী হয়েছে।

পরমাণুর “অদৃশ্য হাত”

জল বলতে যেমন সিন্ততা, পরমাণুর সাথে তেমন তেজস্ক্রিয়তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা জানি, এই তেজস্ক্রিয়তা দ্বিবিধ রশ্মির উপস্থান। আলফা ও বিটা—বস্তুকণার প্রবাহ মাত্র। আলফা নিউট্রনের এবং বিটা-র হলো ইলেকট্রন। গামা কিন্তু প্রকৃত অর্থে বস্তুনিষ্ঠ রশ্মি, এবং এক্ষেত্রে বা আলোর সঙ্গে তুলনায়। আলো কাচ ডিঙ্কিয়ে যায়, এক্ষেত্রে মোটা মোটা কন্ক্রীটের দেওয়াল পর্যন্ত ভেদ করতে পারে—গামা রশ্মি এর ভেদন ক্ষমতা (Penetrating power) এক্ষেত্রে তুলনায় কয়েক শতগুণ। তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিনটির মধ্যে গামা-বেই সবচেয়ে শক্তিশালী, তারপর বিটা বে, এবং সবচেয়ে কম আলফা রশ্মি।

এইচ, জি, ওয়েলস্-এর অদৃশ্য মানুষের গল্প আমরা শুনেছি। যে মানুষকে চোখে দেখা যায় না, পায়ে হুপ লক্ষ্য করে তাকে কেমন অনুসরণ করা চলে। পরমাণুর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তাও এমনি “অদৃশ্য হাত”। এই “অদৃশ্য হাত” আমাদের কেমন কাজে আসছে, তার কয়েকটি এখন উল্লেখ করছি।

পরমাণু শিল্পকাজে

তৈল অঞ্চল বা শোণনাগার হতে সাইমোজেন, পেট্রোলিয়াম-ইথার, পেট্রল, গ্যামোলিন, কেরোসিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের তেল একই নলপথে পর্যায়ক্রমে পাঠানো হয়ে থাকে। পরিবহন-ব্যয় এতে কম হয় সত্য, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তেল কখন আসবে তা জানতে না পারায় দুই রকম তেল একত্র মিশে যেতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে এর সমাধান আছে। এক জৈবীর তেল যখন পাঠানো শেষ হলো তখন তেজস্ক্রিয় এনট্রমিন বা বেডিয়াম নলপথে কিছু পরিমাণে ঢেলে দেওয়া হয়। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, কোন তেজস্ক্রিয়তা সন্ধানী যন্ত্র (Geiger-Müller Counter)-এর সাহায্যে সহজেই তা ধরা পড়বে। তেজস্ক্রিয়তা তৈলবাহী নলগুলিকে বায়ুমুক্ত রাখার কাজেও সাহায্য করে।

দুটি ধাতুখণ্ডের ঘর্ষণে কণিকের জন্ম যে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে ধাতুর ঘয় হয়ে থাকে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ খুবই কম, অবিচ্ছিন্নের সাহায্যেও সহসা ধরা যায় না, কিন্তু নিয়ত সচল থাকার ফলে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এই ক্ষয়ের পরিমাণ সহজেই প্রকট হয়ে ওঠে। যন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাই মাঝে মাঝে তেল (Lubricating oil) দেওয়ার বিধি আছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তেলের কার্যকারিতা লক্ষ্য করার জন্য পূর্বে পরীক্ষা-মূলক ভাবে যন্ত্রকে চালিয়ে ক্ষয়ের পরিমাণ হিসাব করা হতো। কিন্তু কাজটি সময়সাধ্য এবং ব্যয়সাধ্যও বটে—কারণ এই পদ্ধতিতে দামী দামী যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শুধু পরীক্ষার্থেই নষ্ট হতো। সাধারণ ধাতুকলকের পরিবর্তে যদি যন্ত্রের অংশকে তেজস্ক্রিয় করা হয়, তা হলে নূনতম ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পরিমাণও গাইগার কাউন্টার জানিয়ে দেবে। একটি উদাহরণ দেওয়া ভাল। ক্যালিফোর্নিয়া রিসার্চ কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, এই পদ্ধতি অল্পমানে পরীক্ষিত হাজার হাজার ধরনের চার বছরে যে তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, সাধারণ উপায়ে তার অন্তত পঁচিশগুণ অর্থব্যয় ও ব্যয় গুণ সময় নষ্ট হতো।

শিল্পে তেজস্ক্রিয়তার আরো বিভিন্ন প্রয়োগ আছে। কগজ বা ধাতুর পাত কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে। জানা দরকার, পুরুর সমতা রক্ষিত হচ্ছে কিনা। তেজস্ক্রিয় খ্যাগলিয়াম নিম্নেবেই তা করে দেবে। খ্যাগলিয়াম রিটার্ডার বিকিরক, চলন্ত পাতের নিচে এটি রাখা হয়। পাতটি বত পুঙ্, রশ্মির তীব্রতাও তত হ্রাস পাবে। তেজস্ক্রিয়তা সন্ধানী যন্ত্র সহজেই তা ধরতে পারে।

ধাতুতে ধাতুতে জোড়া লাগানো হলো, কিন্তু ভিতরে গলদ থাকতে পারে। স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈধ দেওয়া হয়েছিল, বলা যায় না জলের চাপে কোথাও যদি ফাটল ধরে। ভয় নেই, তেজস্ক্রিয়তা আছে। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ রশ্মি বিকিরণে ভিতরকার ছবি তুলে দেবে—টীক বেন “ওটোগ্রাফ” (Auto Graph)। পাঁচ সেন্টিমিটার (ছ’ ইঞ্চি)-এর ভিতর হলে তেজস্ক্রিয় ইরিডিয়াম, তার বেশী চাইলে কোবাল্ট (ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত)।

ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnace) এর ভিতরটা বিশেষ ইট (Fire Brick) দিয়ে গঠা থাকে। কয়েক বছর পরে কিন্তু এই ইট ভেঙে যায়। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের সাহায্যে সহজেই আমরা

চুল্লীর দেওয়ালের পৃষ্ঠকে যেনে নিতে পারি। ফলে কখন সারাই করা উচিত তা নিয়ে আর সমস্যা থাকে না।

এমন অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া আছে যাদের পরিণত পণ্যই মাত্র আমাদের জন্যে আছে, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা থেকে কি করে বিভিন্ন স্তরে এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তা আর জানা নেই। যেমন ধরুন, রবারের ভালকানাইজেশন (Vulcanization), কার্বোহাইড্রেটের অক্সিজেন-সংযোগ (oxidation) ইত্যাদি। কার্বো-দুই-অক্সিজেন (Carbon Dioxide) জল ও সূর্য কিরণ হতে কি করে যে উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ও চর্বি গঠন করে (Photo Synthesis) তা-ও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তা যদি কোন দিন জানা যায়, খাত সামগ্রীর ভল্য মাহুকে আর কৃষি ও গৃহপালিত পশু-পূর নির্ভর করতে হতো না। এই কয়টি সামগ্র্য ক্রিয়াকেই খাত সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেতো। যদি তা কোন দিন পাওয়া যায়, একমাত্র তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যেই সম্ভব হবে।

আপাতত পরমাণু-ব "অজ্ঞাত হাত" কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংকেত করেছে। লৌহ-শোধন কার্খা রাষ্ট্র ফারেনস-এ গন্ধকের পরিমাণ ধাতুর গুণাগুণ নির্ধারণ করে। চুল্লীর ভিতর গন্ধকের ক্রিয়া অস্বাভাবিক করা আগে সম্ভব ছিল না, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা তা সহজ করেছে। তেজস্ক্রিয় গন্ধকের গতি অস্বরণ করে ফারেনস-এ তার ক্রিয়া উন্নততর করা এখন আর দূরত নয়।

তেজস্ক্রিয়তার ফলে শংকর ধাতু বা Alloy-এর গঠন-প্রণালী সহজে যা জানা গেলে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। অ্যালয়ের দানার ভিতর পরমাণুগুলি নিম্নতর গতিসম্পন্ন থাকে, বাইরের কোন পরমাণু অ্যালয়ের সম্পর্শে দানার এই "অবর্তে" ডুবে যেতে পারে। কার্বো-দুই-অক্সিজেন গ্যাসের কথাই ধরা যাক। এই গ্যাসের কার্বন পরমাণু ইম্পাতের ভিতর সহজেই প্রবেশ করে। নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রেও তা-ই। ইক্সিনিয়ারিং বিজ্ঞান দিক থেকে অ্যালয়ের এই দ্রব্যগুণ (Proterty) অজ্ঞাত কার্যকারী।

পরমাণু কৃষিক্ষেত্রে

ফটোসিন্থেসিস-এর কথা আমরা বসেছি, যার রহস্য মোচন হলে পৃথিবীতে কৃষিকাজ নিরর্থক হয়ে যাবে। গরুর সেকটিক গ্রন্থি (Lactic Gland) স্বল্পেও বিক্রান্তরী অল্পরূপ চিন্তা করছেন। এই গ্রন্থির জৈবিক ক্রিয়া (Metabolism) জানা গেলে ঘাগ থেকে দুধ তৈরী করা বৃষ্টি আর সমস্যা থাকে না। ভেড়ার গায়ে কি করে লোম জন্মে, দেহে কিভাবে চর্বি সঞ্চার হয়—এ সমস্ত এখনো মস্ত জিজ্ঞাসা। তেজস্ক্রিয় রশ্মি একদিন তার উত্তর দিতে পারে। কৃষিকাজ এখনো নিরর্থক হয়নি, ফলে তেজস্ক্রিয়তা এখন আমাদের এই কালে সাহায্যকারী হয়েছে।

সব কখন কিভাবে দিলে গাছের সর্বাপেক্ষা উপকার হয়, তেজস্ক্রিয়তা তা আমাদের জানিয়ে দেয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে গাছের ভিতর সাবের কাজ অস্বরণ করা এখন আর সমস্যা নয়। নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া কলেজ এইভাবে অস্বরণ করে দেখেছেন, তামাক চাষার পোড়ায় যে স্পার, ফসফেট (Superphosphate) সার দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ নিরর্থক, কারণ বাড়ন্ত অবস্থার তামাক এই সার গ্রহণ করে না। এই একটি মাত্র আবিষ্কারে সেশানকার চৌধুরী বছরে প্রায় ৪,০০ টন সার বাঁচাতে পেরেছিল।

অনেক সময় দেখা যায় সামান্য কোন পদার্থের অভাবে উদ্ভিদ বা জীবদেহ রোগ ধারণ করে। এক সময় রাশিয়ার লাটভিয়ার প্রদেশে গরু ও ভেড়ার পালে মড়ক দেখা দেয়। মছোর জীব-প্রজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জানালেন, সেহে কোবাণ্টের অভাব হেতু রোগ দেখা দিয়েছে। তখন সাধারণ খাতের সাথে পশুদের কোবাণ্টের বটিকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা হলো। ই লাও আলফাফা (Alfalfa) এবং অল্পাংশে যে সকল উদ্ভিজ্জ শীতকালে নষ্ট হয়ে যেতো, জমিতে ফসফাসের অভাবই তার কারণ, তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যেই এই সমস্যা পাওয়া গেছে।

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে শস্তকীট ধ্বংসও সম্ভব। এই রশ্মির সাহায্যে সম্প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, ডি, ডি, টি কীট ইত্যাদি সকল শ্রেণীর পোকার পক্ষে মারাত্মক নয়, ডি, ডি, টির সাথে অজ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বর্তমানে তা আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন, এবং তা করাও হয়েছে।

কিন্তু শস্তক্ষেতে তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বৃশলাণ্ড (Bushland) নামে এক জীববিদ এই উদ্দেশ্যে এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যক্সায় আনে। বৃশলাণ্ড পুঞ্জীভূত পোকাকে বিকিরণে বিদ্ধ করে উপজাত অঞ্চলে ছেড়ে দেন। স্বাভাবিক স্ট্রীপোকো এই সকল "তেজস্ক্রিয়" পোকার সম্পর্শে এসে যে ডিম পাড়ে তা ফুটে আর বাচ্চা বেরায় না। এইভাবে সহজেই কীট ধ্বংস করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রাচারে পরমাণু।

পরমাণু শুধু কৃষিক্ষেত্রেই কাজ করে নি, রাষ্ট্রাচারেও চলে এসেছে। খাত সংরক্ষণ একটি মস্ত সমস্যা। কিন্তু জীবগুণের জ্ঞান তা সম্ভব হচ্ছে না। তেজস্ক্রিয়তা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু জীবগুণ নিমূল করতে শক্তিশালী রশ্মির প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বিকিরণের প্রয়োগে কলা ইত্যাদি কয়েক প্রকার ফল অনেকদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক বাবা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই ব্যবস্থার খাতের স্বাভাবিক স্বাদ ও বর্ণ নষ্ট হয়ে থাকে। মোট কথা, খাত সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয়তা এখনো সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। তবে পেনিসিলিন ইত্যাদি কয়েক প্রকার ঔষধ এই প্রক্রিয়ার জীবগুণের করা হয়, তাপ প্রয়োগে পেনিসিলিন নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগকল্যাণে পরমাণু

চিকিৎসায় একদিন আমরা রেডিয়ামের কথা শুনেছি। রেডিয়াম ক্যানসারে ব্যবহার হয়। এই ক্যানসার কি? আমাদের দেহকোষে যে প্রোটিন ও নানাবিধ নিউক্লিকিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic Acid) ইত্যাদি আছে, তার পরিমাণ এখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন দেহকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে—তারই ফল হলো ক্যানসার।

কিন্তু দেহকোষে অ্যাসিডের পরিমাণ কেন বেড়ে বাবে তা এখনো অজ্ঞাত আছে। তাই ক্যান্সার আজও দুরারোগ্য ব্যাধি। তবে কয়েক প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার এই রোগকে অনেকটা সংহত করে এনেছে। তেজস্ক্রিয় কোবাণ্টের কথাই ধরা যাক। রূপোর ভার ওজ এই মৌলিক পদার্থটিকে আগে বলা হতো "বিশ্বহীন বর্ণ"। কিন্তু ক্যান্সারের চিকিৎসায় আজ কোবাণ্টের যে দান তা রেডিয়ামের সঙ্গেই তুলনীয়—এ বিকিরণের দ্বারা দেহকোষ

নষ্ট হয় বলে আমরা জানি, এই জগৎই ক্যালসিয়ামের আকর্ষণ কোষকে ধ্বংস করার জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার। কিন্তু সমস্তা হলো এই যে, তেজস্ক্রিয়তার ফলে রক্ত দেহকোষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক কোষেরও ক্ষতি হয়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থকে এমন আকারে প্রয়োগ করতে হবে যাতে স্বাভাবিক দেহকোষের তার প্রভাব অত্যন্ত পরিমিত হয়ে থাকে। চিকিৎসার প্রয়োজন বসে "বিস্ফোরকের স্বর্ণকৈ" সংজ্ঞাট বিভিন্ন আকারের রূপ দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে কোবাল্ট লাইলন তত্ত্বও ব্যবহার করা হয়েছে। সম্প্রতি, আমাদের দেশেও তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের ব্যবহার হচ্ছে। ক্যালসিয়াম চিকিৎসায় কিন্তু ক্রমশঃ তেজস্ক্রিয় সেসিয়াম (cesium)-এর ব্যবহার চালু হবে, কারণ এর তেজস্ক্রিয়তা অনেকদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

গলদেশে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Gland) আমাদের জৈবিক ক্রিয়া অনেকাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি যখন অধিক মাত্রায় সক্রিয় হয়, তখন থাইরয়েটিক্স কাসিস (Thyrotoxicosis) রোগ জন্মে, মাইক্সোডেমা (Myxoedema) হলে এই ক্রিয়া হ্রাস পায়। তেজস্ক্রিয় আইওডিনের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থির ব্যাধি সহজেই নিরাময় হয়।

মাথার ভিতরে টিউমার (Tumour) সন্ধানের জন্য এখন এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। শিরায় থানিকটা তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি প্রধানত টিউমারে গিয়ে সঞ্চিত হবে, টিউমারে তেজস্ক্রিয় পদার্থের রূপ স্থানে বেশী ভাগ জমা হয়। তেজস্ক্রিয় সন্ধানী কোন হস্ত যন্ত্রের সাহায্যে তা অনুধাবন করা তখন আর সম্ভব থাকে না।

তেজস্ক্রিয়তার একটি সফল প্রয়োগ হলো রক্ত চিকিৎসায়। রক্তরসে (Plasma) শ্বেত ও লোহিত কণিকা থাকে বলে আমরা জানি। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে পাঁচ হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। এই সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেড়ে যায় (প্রতি

ঘন সেন্টিমিটারে এক লক্ষ বা তারও অধিক) তখন তা 'হলো রক্তের ক্যান্সার বা লুকেমিয়া (Lukaemia)। এই মারাত্মক রোগে এক্ষণের ব্যবহার আছে, তেজস্ক্রিয় ফসফরাসও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

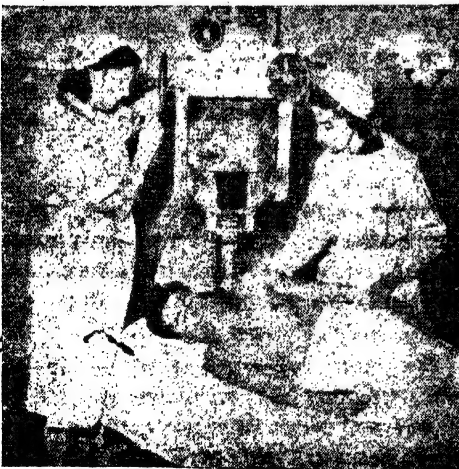
লুকেমিয়ার বিপরীত হলো পলিসাইথেমিয়া ভেরা (Polycythaemia vera)—এই রোগে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের প্রয়োগে এ ক্ষেত্রে এক্ষণের চেয়েও অধিক কাজ দিয়েছে।

রোগ নিরাময়ের কথা আমরা মোটামুটি আলোচনা করলাম—মাত্র কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতার মানুষ আটসোটাগকে যে কত বিচিত্র উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে তা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়। এই কুড়ি বছরে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে পরমাণু যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা স্বরণ করলে আজ নতুন করে মনে হয়—হী, কথটা ঠিক বটে, জোনই শক্তি, তেজস্ক্রিয়তা আমাদের জন্য এতই করেছে! এই প্রসঙ্গে মানুষের দেহ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে তথ্য গৃহীত হয়েছে তা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের দেহ—তার মাংসপেশী, হাড়, নখ, চুল—কিছুই স্থির অপরিবর্তিত নয়, বরং নদীর মতই চঞ্চল; নদীর জল যেমন নিয়ত বয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেহগঠনের মৌলিক উপাদানগুলিরও তেমনি সর্বদা পরিবর্তন হয়, আজ যে প্রোটিন বা ক্যালসিয়াম আমার দেহে আছে, কাল তা না-ও থাকতে পারে। এরিক দিলে লেখতে গেলে মানুষ প্রায় তত্ত্বের নতুন করে জন্মলাভ করছে। ডাঃ স্কোয়েনহাইমার (Schoenheimer) তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেছেন, লবণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে তা শিরার মাধ্যমে বর্ষ গ্রন্থিতে এগে তৎক্ষণৎ ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়—এক সেকেন্ডেরও বেশী সময় অপেক্ষা করেনা। মানুষের দেহ সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য ধারণা পূর্বে আমাদের ছিল না।

পরমাণু "পশুজাত"

পশু থেকে পদ্ম জাগে, এ কথা আমরা শুনেছি। পরমাণু বিকিরণের ক্ষেত্রে তা স্বরণ করা চলে। তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ-কৌশল আজ যে স্তরে উন্নত হয়েছে, তার মূলে ছিল যুদ্ধকামী রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণপোষকতা। কিন্তু কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে পরমাণু বেশী দিন আটকে রাখা যায় নি; "শান্তির চলিত বাণী" আজ দিকে দিকে উচ্চারিত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকরাও জনসাধারণের সাঃ বাগ দিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এমন পদার্থ খোঁজা করেছেন যে, মারপাট তৈরীর কাজে তাঁরা পরমাণু শক্তি নিয়োগ করতে আর সাহায্য করবেন না। কোন কোন রাষ্ট্রশক্তিও এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। নতুন হুচনা দেখা দিয়েছে—অস্ত্র তৈরীর আশঙ্ক্যভী সভাবনা হতে দূরে তেজস্ক্রিয়তা আজ মানুষের বলাপের কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। মানুষ যেন আজ এই বিশ্বাস পোষণ করতে পারে,—হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বা একদিন সূর্য হতেছিল, তা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে; পরমাণু শক্তি এখন আমাদের সভ্যতার লালন করবে। পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার ওষুধের সমস্তা পরমাণু শক্তির বলে দূর হবে, জ্ঞানের প্রসার হবে—পরমাণু শক্তি আমাদের জীবন বিকাশের পক্ষে সর্বদা দিক দিয়ে স্ফূর্ত্যবকর হবে।

—অশোককুমার দত্ত



পরমাণু "জাদুঘর"। রোগ চিকিৎসায় ব্যস্তিক কৌশলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে।



পিয়াম

সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!



পিয়াম সাবান—বিশুদ্ধ রিসারিনবদ্ধ সৌন্দর্য সাবান—আপনার
হৃকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপদ।
হৃগড় পিয়াম সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার নিত্য সঙ্গী হোক।
শিতলের কোমল হৃকের পক্ষেও পিয়াম আদর্শ।
পিয়াম টালকাম, এত স্বথমলের স্বত মোলারেম, এত অপূর্ণ হৃগড়—
আপনাকে সারাদিন সতেজ, হৃন্দর রাখে। হৃদৃশ্য হৃদৃদ হৃদৃহ-সহৃহ-
সোসালী টসে পিয়াম টালকামে কিসুদ।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

আগের অসীমের গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠতেই, ঘরে গিয়ে সোফার
বসলো অনিল, তাক্ক নজর হইলো গাড়ী-বারান্দার দিকে।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো গাড়ী-বারান্দার ভেতর।

মম মম জুরার শব্দ তুলে ভেতরে চলে গেলো অসীম, আর
টলারমান অবস্থার ঘরে ঢুকলো শুকতার।

অনিলকে বসে থাকতে দেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—এখনও
বসে কেন, ডার্লিং? খাওয়া হয়নি? শোবে না? কথা বলতে
বলতে ধপ্প করে ওর পাশে বসে পড় মাথাটা ওর বুকের ওপর এলিয়ে
দিলো সে।

দারুণ ঘুগার সঙ্গে ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে খাটে বসলো অনিল।
তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো—এটা অভিনয় দেখাবার জায়গা নয়। আজ
তোমার কাছে সোজা জবাব শোনবার জঞ্জাই বসে পাছি।

—তাই নাকি? তা বলো। লাল লাল ফুলো ফুলো চোখ
ছুটো ওর চোখের ওপর মেলে ধরলো শুকতার।

সিগারেট ধরালো অনিল। লজ্জাহান্না রমণীর সর্বাসঙ্গে এষ্টটা
স্বপ্নভরা দৃষ্টি বুলিয়ে বললো—রাত বারোটার সময় পশুপুঙ্খের সঙ্গে
বেড়িয়ে, ঘরে এস মাতলালো করতে তোমার একটুও সময় হলো না?
ভয় পরিবারের সঙ্গে যে তোমার একটা সম্বন্ধ আছে, সেটা কি
একেবারেই ভুলে গেছ? বাজারের মেয়েমানুষগুলোকেও যে হার
মানালে দেখছি!

উত্তেজিত ভাবে ঘবঘর ঘোরা ফেরা করতে করতে কলসো
অনিল—বহুদিন সাবধান করেছি তোমাকে কিন্তু আজ ব্য্রলাম
চর অবনতির পাকে ডুবছো। তুমি, তোমাকে সে পাক থেকে
তোলবার সাধ্য বোধ করি হয় ভগবানেরও নেই।

—তবে এটাও স্থির জেনো, আমি মরমাধু্য নই। দিনের পর
দিন তোমার বেলেলাপনার অসহ্য অত্যাচার আজ আমাকে কিন্তু
কুকুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

গীতে গীত ঘলে, ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চরম
উদ্ভ্রজন্যর হাঁপাতে থাকে অনিল।

সোফার অধলোয়া ভাবে এলিয়ে থেকে চোখ বুজে কথাগুলো
তুলছিলো শুকতার।

হাই তুলে চুহাতে চোখ কচলে বললো—আঃ। এমন আমেজটা
একদম দিলেতো মাটি করে? নালিশ আর নালিশ। কি এমন
অপরূপ কিছুই গো? জানতেই তো অসীম আমার অনেক—অনেক
পুরোনো বন্ধু। তার সঙ্গে একটু বেড়ালে বা হু-এক গেলান খেলে বাসের
জ্ঞাত বায় আমি তো তেমন সতী সারিক্রান্তের দলের কেউ নই গো! —
আর, তোমারও তো অনেক মেয়ে বন্ধু আছে; তাদের নিয়ে তুমি যদি
একটু কৃতি করো, তাহলে আমার দিক থেকে একটুও আপত্তি হবেনা,
এ আমি হলপ করে বোলতে পারি বহু তোমারও একটু দুখ
ফলাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার।

—ব্যাঃ! ব্যঃ চমৎকার। বাগে কিন্তু হয়ে টেবিলের ওপর
একটা এচও ব্লি ঘেরে বললো অনিল, বেজ্জাচারিণী! কি দরকার
ছিলো তবে এই লোক দেখানো বিয়ে করার?—একটা ভয় পরিবারের
মুখে কালি মাখিয়ে কি লাভ হল তোমার? কেন অধিকারে আমার
জীবনটা বিধিয়ে তুলেছো তুমি? জবাব দাও।

শুকতারর উঠে বসবার অস্বস্তি আর ছিলো না, সোফার ভয়ে গড়ে
খিল খিল করে হেসে বললো—আহা! আর কাকে বলে।
অভিনেত্রীর স্বামী হতেও সাধ যায়, আমার তাকে সত্যলক্ষী বউ
বানাতেও সখ। যাক সে এই রাত দুপুরে গলা ফাটিয়ে পাড়ার লোক
জড়ো করে আর কি ফল হবে বলা, তার চেয়ে বেশে তখন ঐ শ্রমিকার
মতো জড়ভরত একটু বিয়ে করে নিলে এসো, সব ভাগ্যমা চুক বাবে।
আমি কিন্তু এখন এক পাও নড়াছি না, কাল ভেবে দেখবো তোমার
কথা।

নাক ডাকতে লাগলো শুকতারর।

টোটা কামড়ে মনের জ্ঞানর জ্বলতে জ্বলতে ছুটে বাইরের লনে
বেরিয়ে গেলো অনিল। পরিব্রাজ্ঞ দেখখানি এলিয়ে দিলো নয়ম
বাসের বিচ্ছিন্নার ওপর।

প্রচণ্ড গিফোণ যেন ঘটে গেছে ওর মস্তিষ্কে, তাইই সুতীত
উত্তাপ ওর দেহ মনকে দগ্ধ করতে লাগলো। এমন ব্যাপার ওদের
প্রায় ঘটছে আজকাল! উপায় কি? উপায় কি?

মনের-গভীর অন্ধকার অন্তর গুহাপাথ হাতড়ে বেড়াতে লাগলো
অনিল, কোন ছিন্ন পাথে আছে একটু আলো!

পরদিন শুকতারর ডাকে যখন ঘুম ভাঙলো অনিলের হাঙ্গা
বোদ্ধর তখন ঝিল ঝিল করছে বাসের ওপর।

অব্রাণের শিশির জুড়িয়ে দিয়েছে ওর শহ আলাকে!

বহুদিন পরে আজ তার ভালো লাগলো ওর শুকতারকে!

পরনে ওর চকড়া লালপাড় ধনেখালি সালা সাড়া। সজ্জন
করা ভিজ়ে চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো,—কপালে কুহুমের টিপ।

সাক্ষ্য গৃহলক্ষ্যর প্রতিমূর্তি!

মিষ্ট হেসে অনিলের একখানি হাত চেপে ধরে মুহু টান দিতে
দিতে বললো শুকতার—ওমা, কত ঘুমুবে গো? ন'টায় যে শুটি
আছে! চলো, চলো, চা জল হয়ে গেলো যে!

কাল রাতের সেই লাভময়ী শুকতার সেন তো, এ নয়!—এ যে
মঙ্গলময়ী চিরন্তন নারী। কাল রাতের অত গোলোযোগের বিন্দুমাত্র
চিহ্ন নেই ওর চোখে, মুখে, সঃষত ব্যবহারে।

ওর মুখের দিকে বেন চোখ তুলে চাইতে পারছিলো না অনিল।
গত রাতের নিজের উদ্ধত আচরণগুলোকে দিনের আলোতে কেমন
অসঙ্গত অর্থহীন বলে মনে হল। নিঃশব্দে উঠে বাথরুমে চলে
গেলো সে।

জ্ঞান সরে চায়ের টেবিলে বোণ দিলো অনিল।

—খেরে দেখো তো মাস'র প্যাটিসগুলো! কেমন হয়েছে!
অনেকদিন ঝড় করেছি কি না, হেসে ওর দিকে চেয়ে বললো
শুকতার।

চমৎকার! প্যাটিসে কামড় গিরে বললো অনিল। এই
সন্তানবেলা আবার এত পরিভ্রম করে এগুলো করতে গেল
কেন?

—বাঃ! তোমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে না বুঝি? সময় পাইনা যে হবে কি?

খাওয়া কৈলে, অল্পহাগতের শুকতারার একখানি হাত নিজের বা হাতত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মিনতিভরা গলায় বললো অনিল—আমাকে ক্ষমা করো তারা! কাল রাতে বড় অবিচার করেছি তোমার ওপর। বলো, বলো মাই সুইট হ্যাট বাগ নেই তো আমার ওপর?—বুঝতে পারিনা তারা, কেন যে মনটা দিন দিন আমার এত উগ্র হয়ে উঠেছে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লো অনিল।

নিগূণা অভিনেত্রী বুঝলো তার নতুন অভিনয় কতখানি সাক্ষেসম্পূর্ণ হয়েছে। অনিলের কাঁধে মাথাটি তেলিয়ে দিয়ে আদরে গলে পড়া স্তরে বললো সে—বেশ করেছো বলেছো। মাগো, একটু স্বগভীর'টিও কি করবো না আমরা? তার জন্তে আমার মন খারাপের কি আছে? নাও এবার ত্যাগাতাড়ি তৈরী হবে নাও তো?

গত রাতে খাওয়া হয়নি অনিলের। মনের আলা জুড়িয়েছে; এবারে পেটের আলার তাগিদে পরম তৃপ্তি ভরে খাবারের প্লেট খালি করতে সুরু করলো।

শুভ পেছে এসেছে বসন্ত! পাছে পাছে জেগেছে কচিণীতার শিরশ। আবার কুহুমের ছোপ সেগেছে ডালে ডালে নীল, বেগুনী, বাসন্তী ফুল করিয়ে, উড়িয়ে, বিচিত্র বর্ণের আভ্যন। দিয়ে বেড়ায় মধির চকল, দখিনা বাতাস।

দক্ষপুরাত বসিনী হাজকন্ডার রক্ত ভবনের দ্বারে দ্বারে বাকুল

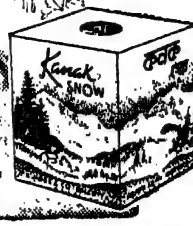
করাখাত করলো সেই উতলা শবন। ওর আতুল আছানে আর ঘরে থাকতে পারে না স্রমিতা। লালকুঠির চুখে-খোওয়া সাদা মার্বেল-পাথরের সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে সে নিচের তলার নামতে থাকে। ধুলোর আন্তরগে ঢেকে গেছে সিঁড়িটা, এক ধারে আছে খেত মধ্যরের ভেনাসের মূর্তি। তার খাঁকে খাঁকে জমেছে পুঙ্খ ধুলো। প্রকাণ্ড আয়না সোনার ফ্রেমে বাঁধানো সিঁড়ির বাঁকের যুখে আটকানো। আয়নার স্বকৃৎকে বেলেজিয়াম কাঁটা, বেন বড় ঝাপসা মনে হল স্রমিতার চোখে।

সারি সারি ফটিকের স্বচ্ছ বাতিদানগুলো আর জলে না। যুক্ত দুইতে বেন ওরা চেয়ে আছে স্রমিতার দিকে। ওদের দিকে একবার নিম্প্রহ ভাবে চেয়ে থাকের পর ঝাপ বেয়ে চললো স্রমিতা ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ একে একে। অন্ধারে বাবার সিঁড়ি এটা। ব্যবহার করে একমাত্র স্রমিতা। সবচেয়ে কাপেট মোড়া সুসজ্জিত কাঠের সিঁড়িটা শুধু অসীম আবে তার সন্দ্বৈদ্য জন্ত। চাকর দাসীদের ওঠা নামার জন্ত আছে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।

কত—কত দিন; প্রায় বছর ধানেক নামেনি সিঁড়ি দিয়ে স্রমিতা। বায়নি বাগানে। বাইরে বেরনো ছেড়েছে এ বাড়িতে এসে অবধি, তবে মাঝে মাঝে বাগানে বেড়াতো, অকিঞ্চিৎকর হাউসে বসতো একা, একা। কখনও বা ওর ভজনশা এসে আপন মনে বলে যেতো লালকুঠির সমুদ্র কাহিনী। কিন্তু তাও বন্ধ করতে হলো, শুকতারার বিজ্ঞপতরা বাক্য-বাদের আলার। আর মাঝে, মাঝে চোখে বা পাড়েছে—অসীম, আর শুকতারার—কি জানি ওরা এখন ওখানেই আছে 'ক না, সিঁড়ির মাঝমাঝি নেমে



আনন্দ ঈশবে
ক. হোডের
প্রসারিত সামগ্রী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-২০

ধমকে ঠাঁড়িয়ে ভাবে স্রমিতা, ওদিকে বাবে কি না। খুলে
নিলো বন্ধ শাপিটা। জালসা দিয়ে হু, হু বলে বেরে গেলো
কমকা বাতাস, খন খন লম্বে ভেঙে পড়লো সিঁড়িতে টাঙানো
একখানি ছবি। প্রতিদিন তার গম গম করে বেড়াতে লাগলো
খুলে প্রাসাদের তেতর। বাশি বাশি কাঁচ ভাঙা ছড়িয়ে রইলো
চুড়ু সিঁড়ির চাতালটার ওপর।

জনহীন পুত্র পুত্রী। হু একজন চাকর বাবুন বা আচ্ছ সব
সাইয়ের জাউট হাউসে আড়াল দিচ্ছে, বেশ গেলে তবে ওরা তেতরের
জান। তাই কেউ এসোনা অন্তখানি শব্দের মজার গুনে।
ছবিখানা মাঝখানে কুলে দেওয়ালের গায়ে টেস দিয়ে ঝাঁড় করিয়ে
চাপলো স্রমিতা। অনেক পুরোনো লণ্ডনের রাজনরায়ের ছবি
ওটা। ছবির গায়ে পুত্র কুলো লাগলো ওর হাতে।

অখিত দৃষ্টি মেলে বাকি ছবিগুলোর বিকে লাইলো স্রমিতা।
কত পরিচায়ক বসবাসকে ছিলো আগে ওগুলো, তার আচ্ছ কি হাল
হয়েছে ওদের? কোনটার কাঁচ নেই কোনটি কাঁচ হয়ে খুলছে।
কুলোর ঢাকা পড়ছে ক্রমের সোনালী রং। মাকড়সার বড় বড়
হেঁড়া জাল ছবিগুলোর গায়ে আলয়ের মত স্থলছে।

নিঃশাস ফেলে আন্তে আন্তে নীচে নেমে এসো সে। সিঁড়ির
শেষ ধাপের ছপাশে ছুটি স্রোজের সৈনিক মূর্তি, ঈষৎ নত মস্তক
ঠাঁড়িয়ে। অটল গাভীরাযের কাঠিও ওদের চোখে মুখে, ঝাঁড়বার
জড়িত। ওরা যেন এই রাজপ্রাসাদের মৌন দর্শক মাত্র। রহস্যময়
নাটকটির শুরু দেখেছে, আচ্ছ ও ঠাঁড়িয়ে আচ্ছ শেষ অঙ্কটি দেখবার
জন্ম। মূর্তি ছুটির গায়ে পরম মেহ ভরে হাত বুলোতে গিয়ে সভরে
হাত সরিয়ে নিলো স্রমিতা। ওদের পাশাপাশি বুকে কি স্পন্দন
জেনেছে? না। তা নয়। ঝট পট শব্দ করে মূর্তিগুলোর
খাঁজের ভেতর থেকে ছুটো বড় আকারের চামটিকে বেড়িয়ে
সাঁই সাঁই শব্দ কুলে ওর মাথার ওপর উড়তে লাগলো। জান
আলোতে ওদের বিস্তারিত ছায়াগুলো বিভীষিকার মত নাচতে
লাগলো দেওয়ালে দেওয়ালে। সভরে পিছু হটে দরজা দিয়ে
ছুটে বাইরে যেখানে এসো স্রমিতা।

আঁচল দিয়ে কপালের বাম মুখে বুক ভরে টেনে নিলো বাইরের
হুস্ত বাতাস। তার পর এদিক চেয়ে নেমে এসো কীকর বিছানো
পথের ওপর। দেওয়ালের ছায়াছন্দ পথ ধরে স্রাঙ পায় এগিয়ে
চললো সে। না কেউ নেই, ভজনদাও নয়।

বকুল কুলের গাছটার তলার শালা পথের দিয়ে বাঁধানো বেদীটার
ওপর গিয়ে কালো স্রমিতা! ঘন গন্ধপূর্ণ ছায়াছকাকরে নিঃশব্দে
ভেসে এসো অনেক ছায়াছবি। ওর অস্থিত্তির মানসিক কেন্দ্রগুলোকে
বীরে বীরে আচ্ছ করে ফেললো ওরা। তিস্ত বর্জমানটা, পালালো
খন থেকে।

হলুদ রঙের কন্যা ভাঙা চাঁদ আন্তে আন্তে উঁকি মাথলো
দেওয়ালের পাতার কাঁক দিয়ে। টুপ টাপ করে বকুল ফুল করতে
লাগলো ওর মাথার গায়ে।

কতকশ কেটে গেছে খেয়াল ছিলোনা ওর। নারী পুরুষের
মিশ্রকণ্ঠের উচ্চহাসির শব্দ চমকে উঠলো স্রমিতা।

গাছের কাঁক দিয়ে নজরে পড়লো, শুকতারার ঘরের বন্ধ দরজা
খুলে বেরিয়ে আসছে অসীম আর শুকতারার।

অসীমের একখানি হাত শুকতারার কোমরে জড়ানো। অপর
হাতের আঙুলের কাঁক হলুদ সিগারেট। বাড়ীর পেছনে গায়েখের
বিকে চলে গেলো ওরা।

মনে পড়লো ছোটমামার কথা। সেই হাসিখুসিতে সরা চকল
ছোটমামার আচ্ছ কতই না পরিবর্তন ঘটেছে। গরলে অমৃত ভ্রম
জুই তারই হয়নি, ছোটমামারও হয়েছিলো। তাই হু'জনে একসঙ্গে
আকর্ষণ বিবপান করে, অসহ্য আলার জলে মরছে। সাধারণ বিব
সকল আলার অবসান ঘটায়। আর এই অসাধারণ বিব অন্তরে
আলির সের আলামরী অনিরীক্ষণ শিখা। সেই ভরাবহ উদ্ভাপে
বন্ধ হলে ওদের হু'জনের আচ্ছ।

একরাশ খোঁয়া উড়িয়ে অসীমের গাড়ী বেরিয়ে গেলো পোট
দিয়ে। ওর পাশে বসে শুকতারার ড্রাইভ করছে।

দেওয়ালের আঁচল থেকে কখন টাটকা এসে ঠাঁড়িয়েছে স্রমিতার
ঠিক সামনের আকাশে। অব্যবহিত জোহনার উচ্ছলধারার ভেসে
গেছে স্রিক সিগন্ত। পাতার, পাতার, কুলে, কুলে, বিলম্বিত
করছে নীলাভ আলো।

উতাল বাতাসের অশান্ত কলবোলে মুখর হয়ে উঠেছে ঝাউ,
দেওয়াল। ওরা যেন মহাপুত্র শত শত বাহু বিস্তার করে কার
উদেশে জানাচ্ছে বাকুল আচ্ছান অধীর প্রতীক্ষার বিপুল আবেগে
কঁপে কঁপে কুলে, কুলে উঠছে। আবার মাঝে মাঝে ওরা স্থির
হয়ে ঠাঁড়িয়ে কলবোলে কান পেতে শুনেছে কার পদধ্বনি।

না সে বুকি আর কোনোদিন আসবে না ফিরে। কোন অদৃশ্য
নিয়তির নিষ্ঠর, কঠোর হাতে গঠিত হয়েছে এক হলুদ্য বিরট
লৌহ প্রাচীর ওদের হু'জনের মাঝখানে। তাকে অতিক্রম করে
আসা কি সম্ভব? উঃ। তবে? তবে কি হবে?

এই ভরাবহ পাশাপাশি করার অন্তর অন্ধকারে কে দেখাবে একটু
আলো? কে তার দুর্বল ভীক হাতখানি ধরে নিয়ে বাবে এখান থেকে?
উঃ মাগো। আর্গুমেন্ট কেঁদে ওঠে স্রমিতা, দামীদা! দামীদা!

—মিতা! মিছু।

ভীষণ চমকে উঠলো স্রমিতা। কার কঠর?

ওর ঠিক সামনে সারা গায়ে চাঁদের আলো দেখে ঠাঁড়িয়ে আচ্ছ
হুদাম।

—স্বপ্ন? হ্যাঁ তাই হবে। এরকম স্বপ্নই তো কত বার
দেখেছে সে। সেই মন ভোলানো চোখ জুড়ানো স্বপ্নই তার সামনে
ভাসছে। বিস্তারিত স্থির দৃষ্টি মেলে স্বপ্ন দেখতে লাগলো স্রমিতা।
ওর স্বপ্নের ছবিখানি বীরে বীরে এগিয়ে এসো কাছে, আরো
কাছে। হু'হাত বাড়িয়ে ধরলো ওর হাত হু'খানি।

—অমন করে চেয়ে কি দেখছে মিতা? চিনতে পারছে না?
আমি যে তোমার দামীদা!

—জ্যাঁ। দাঁ-দাঁ-দাঁ??? তুমি? তুমি সত্যি দামীদা?
তুমি এসেছো দামীদা? সাত বছর পরে, তুমি ফিরে এসেছো
দামীদা?

—হ্যাঁ মিষ্টা এই তো, এই তো তোমার কাছে এসেছি। রাগ
করছে? এতদিন আসিনি বোলে? না মিছু। লণ্ডন
থেকে ফিরে ছুদিন এসেছিলাম, কাঁকা বললেন তোমার পরী

যদি আপনি জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে চান

—পড়ে দেখুন!



আজকাল ভালভাবে বাচবার কত সুযোগ হয়েছে—তবু পুরণা সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব সুযোগ নষ্ট করে।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের খাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অল্পতঃ দু' আউল মেহপদার্থ খাওয়া প্রয়োজন। বনস্পতির তেতর এই মেহপদার্থ আরও সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কার আছে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিদ মেহপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই বায়ুবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিদ থেকে দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাংসের দেশেও দুর্ভাগ্য মেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির

মত উদ্ভিদ থেকেই ব্যবহার করে বেঁচে। কেন বলবো? কারণ লোকে জেনেছে যে এই সব উদ্ভিদ থেকে দুর্ভাগ্য মেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানার বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছন। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউল এ-ভিটামিনের ১০০ আন্তঃ-জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন দৃক ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তারা রান্নার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার শুরু করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিল্লীর বন্ধু

ধায়াণ, তাই আর বিরক্ত করিনি তোমার। তারপর কারাবাসস্থ হুশিটালটার কাছে এত ব্যস্ত ছিলাম, যে আসবার সময় পাইনি মোটে। খিরেটার বোড়ের বাড়ীখানা খানিকটা ভেঙে চূরে হুশিটালের উপযোগী করে তৈরী করা হলো। এবারে অন্তত কাকগুলো আরক্ত হয়েছে। তাই এসেছি তোমাদের বলবার জন্য। তুমি আর কাঁকা একদিন গিয়ে যদি দেখে আসো, আরও কি করলে ভালো হয়, তোমাদের মতামত যে আমার বড় প্রয়োজন মিতু। ওর পাশে বসলো সুদাম। একটু হেসে বললো—তেতরে বাছিয়াম, হঠাৎ তোমার দামীদা' ডাক শুনে কিরে দেখলাম তুমি এখানে বসে আছে। তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে মিতা ?

—না দামীদা'। আজ এখন তোমার দেখতে পাইনি। তবে দেখছি। এর আগে অনেক—অনেকদিন দেখেছি তোমায়। এখনই ডেকেছি তখনই তো এসেছো তুমি। শুধু আজই নয়।

—কি বলছো মিতু। ঠিক বুঝতে পারছি না যে। চলো তেতরে বাই। কাঁকা কোথায় ?

—বাড়ী নেই। যেখানে গেলেন একটু আগে। তেতরে যেতে চাইতো ? না, না দামীদা' অনেক অনেককাল বন্ধী আছি ওখানে কতদিন জানো ? প্রায় চার বছর ভতে চললো কিন্তু আর পারছি না আর যে আমি পারছি না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো দামীদা' ?

—কি বলছো তুমি মিতু ? নিজের বাড়ী কেলে কেন যাবে তুমি ? স্থির হও লক্ষ্মীটী। ওসব ইচ্ছে মন থেকে একবারে মুছে ফেলো। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বললো সুদাম,—সংসারে থাকতে গেলে কত কি হয় মিতু। সব কিছুকে যে মানিয়ে নিয়ে আমাদের চলতে হবে ভাই।

—বাড়ী ? কোনটা আমার বাড়ী দামীদা' ? নিজের বাড়ীতে কেই বন্দী জীবন যাপন করে ? সংসার ? কোথায় আমার সংসার ? কোথার মানিয়ে নেব নিজেকে ? আমার চার পাশে দাঁউ দাঁউ করে ঝলছে শুধু নরকের ভাঙন, আর তার মাঝখানে পেতনীর মতো পাক খেয়ে বেড়া'চ্ছ আমি। পালারার চেষ্টা করছি, কিন্তু পথ যেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না দামীদা'। এই পাঁচ বছর ধরে আমি শুধু ঘরে মরছি।

—মিতা ! মিতু ! বেদমার্গ গলার ডাকলো সুদাম। এত কষ্ট তোমার কিসের জন্যে মিতা ? কিছুই যে জানি না আমি। বোলো, কি করবো তোমার জন্যে কিসে শান্তি পাবে তুমি ?

—দামীদা' ! রান হেসে ওর মুখের দিকে চোখ দুটি তুলে ধরলো সুমিতা।

সুদাম কিরে চাইলো ওর দিকে। এতক্ষণ ভালো করে নজর দিয়ে দেখেনি তার পরম স্নেহের পাত্রীকে।

সরু কালাপাড় সাদা সাদা পরনে ওর। হাতে অল্প কয়েকগাছি সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোনো অঙ্গে নেই আভরণ। একরাশ লক্ষ্যল খোলা পিঠের ওপর। হরন্ত বাতাস, বার বার চোখে মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনা রং এলো চুলগুলোকে। মুখখানি যেন বড় ক্লম্ব বড় রান। অনেক বেগা হয়ে গেছে আলোর চেয়ে মিতা। গালের হাড় দুটো একটু উঁচু লাগছে যেন। চোখ দুটো আরো বড় দেখাচ্ছে মুখের ওপর।

একে ? এতো সেই আগেকার হাত চকলা শান্তি প্রীতিময়ী মিতা নয়। এ যেন হুঃ ভাবাক্রান্ত এক উদাসিনী নারী। আবাল্য সাথীর জন্ত অন্তরটা ওর হাহাকার করে উঠলো। সে ভেবেছিলো মিতা সুখে আছে, তার সুখই ছিলো ওর একমাত্র সম্বল।—কিন্তু সব তুলের ছায়াগুলো আজ মিলিয়ে গেলো খাঁটি সত্যের আলোয়।

—কি দেখছো দামীদা' বড় ধায়াণ লাগছে আমার চেহারা খানা,—তাই না ?

—না মিতা, ঠিক তা নয়। তবে একটু রোগা হয়ে গেছো, আর,—আর—

—আর রামী বসন ভূষণ নেই আর, এই তো ? এখনও কেমন করে বেঁচে আছি, সেটা তো জিজ্ঞেস করলেনা দামীদা'।

এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে কত কষ্ট, তুফান গেলো আমার ওপর দিয়ে—তা যদি জানতে তুমি। জীবনটা আমার একেবারে ছিন্ন, ভিন্ন হয়ে গেছে। দামীদা'। কেন এমন হোল ? কেন তুমি আমাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলে ? যদি তুমি পাশে থাকতে—আর বলতে পারতো না সুমিতা। অবরুদ্ধ কল্লার বেগে কষ্ট রুদ্ধ হয়ে গেলো। ওর বুকের ভেতর উঠেছে কান্নার সাগর। দুটি চোখের কূল ছাপিয়ে দর দর করে অঝোর ধারায় ঝরতে লাগলো এত দিনের সঞ্চিত বেদনাশ্রু। দুহাতে চোখ ঢেকে ফুলে ফুল কাঁদলো সুমিতা।

কি করবে ভেবে পায়না সুদাম। অবরুদ্ধ বেদনার পাখাণ ভারে ওর বুকাটাও কি ভেঙে যাচ্ছেনা ? কিন্তু উপায় কি ? তাকে চোখের জলে ঝরিয়ে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। এতে মিতার আরো ক্ষতি হবে।

কঠোর সংযমের বাঁধ লিখে অবরোধ করলো সুদাম অন্তর আলোড়িত কণ্ড অসহ বেদনার উল্লসিত ধারাকে। নিজের দুটি হাতে মিতার হাতখানি চেপে ধরে নত মস্তকে বসে রইলো নির্বাক হয়ে বুখা সাধনার বাণী উচ্চারণ করে ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো না। প্রাণভরে কাঁদুক ও। হাড্ডা হোক কিছুটা মনের গুরুভার। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিলেনা ওদের। বিবাহভরা ছবিখানি বুঝি চাদেরও ভালো লাগেনি, তাই সে হাড্ডা মেঘের আরণে মুখ ঢেকে ধীরে ধীরে সরে গেছে ওদের সামান থেকে।

নরম নরম আলো লাগা অন্ধকার ওদের বুকে ছড়িয়ে ধরেছে স্নেহময়ী মায়ের মতো। গাছের দীর্ঘ বিশিষ্ট ছায়াগুলো গভীর মমতাভরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওদের সর্বত্র। টুপ টাপ করে বহুল ফুল ঝরে পড়ছে ওদের গায়ে মাথার।

কট পট করে ডানা কেড়ে, সিঁ, সিঁ শব্দ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো এক বাক রাতজাগা পাখী।

চমকে উঠলো সুদাম। কত রাত হলো ? হাতে আজ ঘড়িটা পরে আলা হয়নি, সব কাজেই যেন বড় তুল হচ্ছে আজকাল। শান্তগলার ডাকলো সে—মিতা।

—কি বলবে ? রাত হলো চলে যাবো এইতো ? ফুলো, ফুলো চোখদুটো ওর চোখের ওপর মেলে, ভাঙা গলার বললো সুমিতা পৃথিবীটা কি আশ্চর্য্য লামীদা'।

আজ বা জাক্জাক্য়ান সত্য কাল সে মিথ্যা ছায়া দাড়।

এখন কি সব মেকি? সব খুটো? কোনো কিছুর ওপরেই কি নিশ্চিত নির্ভর করা চলে না মামীমা?

সেই বহুসত্তা আছে, সেই আছি তুমি, আমি শুধু নেই বুঝি সেই আগের বন্ধনটা আমাদের। হারালো ছুরি দিয়ে কে বেন সেটা নিশূল করে ছেটে দিয়েছে। তাই আজ তোমাকে চলে যেতে হবে, আর ঘরে বাথবার অধিকারও আমার হারিয়ে গেছে।

—না। না। ওকথা বোলোনা মিঠা। তা হয় না, কোনোদিন হবে না—গভীর দরদ ভরা গলায় বললো সুলাম—সব মিথ্যার উক্কে আছে আমাদের এক অবিনশ্বর সত্তা—এক শাশ্বত রূপ। সেখানকার সবকিছু কোনোদিন মিথ্যা হয় না, —সে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি কারুর নেই মিঠু। তার স্বরূপ ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না—অন্তরের উপলব্ধি দিয়ে জানতে হয় তাকে। কিসের আলো বেন চক্ চক্ করে ছলে উঠলো সুলামের স্থির দৃষ্টি বিক্ষমিত ছুটি চোখে।

শির শির করে উঠলো স্মৃতির সর্পিঙ্গ। এক অগাধির আনন্দ বিজ্ঞানী গেলে গেলো বেন ওর প্রতিটি শিরায়। সকল অঙ্গে জাগলো পূনক রোমাঞ্চ।

সভা সুধা উন্মিত হস অস্তুর মহাকাশে। মিথ্যা কুহেলিকার জাল ছিন্ন ভিন্ন করে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

মেঘাবরণ সরিয়ে মমতাময়ী চাঁদ বুটো মুঠো আলোর ফুল ছড়িয়ে দিলো ওদের সর্পিঙ্গ।

হ্যা অনেক রাতই হয়েছে। গাভী বারান্দার তলা দিয়ে কীকর বিছানো পথটা গোল হয়ে ঘুরে গেটের দিকে গেছে,—সেই পথ ধরে চলেছে স্মৃতি আর সুলাম।

ঢা, ঢা করে লালকৃষ্ণ ভঙিতে এগারোটা বেজে গেলো।

একটু চমক লাগলো ওদের হৃদনার। চার ঘণ্টা সময় এমন ছুটে পালালো কি করে?

কীকরের ওপর খর খর শব্দ শুনে সেরিকে চেয়ে বললো স্মৃতি—হোটামা আসছে।

—তাট নাকি। ওর সঙ্গে ওতো এসে অবধি দেখা হয়নি। ভ্রতপক্ষে এগিয়ে এগিয়ে অনিলকে প্রণাম করে পারের ধূলা নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো সুলাম।

—বিশ্বয় ভরে ওর দিকে খানিক দেরি থেকে শোলাসে ঢেঁচিয়ে উঠলো অনিল—জাবে এক,—একি, সুলাম যে! কবে কিরলে? বুকের ভেতরের বিবেকের কীটা ছুটো খচ খচ করে উঠলো আবার।

—তা বছর দেড়েক হয়ে গেলো। হেসে বললো সুলাম। ভালো আছেন তো ছোট মামা! মামীমা কই? আজ আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা হলো না, বজ্ঞ রাত হয়ে গেছে, আরেকদিন এসে ও কাছটা সেয়ে দেবো।

—মামীমা? হো, হো, কবে হেসে উঠলো অনিল। তাঁর নাগাল তুমি পাবে কেনেছো?

ভুল করছো ডারলিং। হ্যা শুধু তুমিই নও, ভুল আমরা সকলেই করছি। আমি, ওকতা, আমার মা, জামাইবাবু এমন কি মিঠাও—আমরা সকলেই বেন একটা ভুলের চাকার চড়ে অমর্যত পাক খাচ্ছি। হাঁড়, বাস মন, প্রাণগুলো সব পিষে বাচ্ছে, কিন্তু ওর কবল থেকে ছাড়ান নেই কারবই।

একটু হেসে আবার বললো অনিল—কিন্তু জানো সুলাম! কবিতা বজ্ঞ বেঁচে গেছে। এখন বয় ছ, জামাইবাবু ওর কানে ভালো মন্তরই দিয়েছিলেন। আমরা কেউ আর বেশীদিন বাঁচবো না। যে আশ্রন জগতে এ বাড়ীতে সগাই ছলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

পরম বিশ্বাসে ওর দিকে চেয়েছিলো সুলাম। এই কি সেই সলা শব্দস্থিবাঙ্গ, প্রাণচাক্য ভরপুর ছোটমামা?

এ বেন জীবন সন্তানে পলাতক কোনো হতাশ সৈনিক। কপালে ফুটেছে কয়েকটি গভীর চিন্তাধারা। চোখের কোলে কালি জমেছে। গাল হুটো গর্ত হয়ে গেছে। গভীর রক্তিক আর হতাশা ছড়ানো চোখ মুখে।

আপনারা সকলেই যদি অন্তটা ভেঙে পড়েন ছোটমামা। তবে কে কাকে দেখবে? বাথিত ভাবে বললো সুলাম। সুখ, দুঃখ, মিলিয়েই তো মানুষের পূর্ণ জীবন।

—ও সব কীকা বুলি কোনো কাজ লাগবেনা তে ছাপি, বয়! 'কি যতন! বিবে, বুঝিয়ে সে কিসে কত আশীর্বিবে নংশেনি যাবে।'

হাত নেড়ে, অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলতে বলতে হঠাৎ হুহাতে সুলামকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাল। ভরা গলায় বললো অনিল—কমা করো আমাকে সুলাম। তুমি আর মিঠা আমাকে কমা করো। গোখরো সাপ মিতাকে ছোবল দিতে আসছে, আমি দেখে শুনেও, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি। কেন জানো? নিজের স্বার্থসিঁদ্বর জন্তে। কিন্তু তখন কি বুকেছিলাম? যে বিষধ কালনাগের সঙ্গে মিতালা করলে তার বিষের ছোবলটাও নিতে হবে? তাই মামা ভাগী ছুঁতেই আজ বিষের আলার ছলে মরছি ভাই।

সুলামকে ছেড়ে দিয়ে স্মৃতির একখানি হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বলতে থাকে অনিল—জানিস মিঠু! এককাল পরে

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডক্টরডোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাঞ্জ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

অঙ্গশূল, পিত্তশূল, অঙ্গপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকডাব, ঢেঁকুর ওঠা, বমিডাব, বমি হওয়া, পেট ঝাঁপা, মন্দাগ্রি, বুকডালা, আহারে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক ঐশ দিলে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্য্য সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিহলে সুল্য ফেরত। ৩২ ডোলের প্রতি কোটা ৩ টকা, একটো ৩ কোটা — ৮-১১ আনা। ড্র. ম্য. এ. পাইকরী নর দুখক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস—অফিসিয়াল (দুখক পাকিস্তান) স্রাঙ্ক-১৪২, মহামা গাঙ্গা রোড, কলি-৬

পাঁজ মার কাছে গিয়েছিলাম। কদিন ধরে বড় মার সঙ্গে প্রাণটা কেমন করছিলো যে।

মা কিন্তু প্রথমে আমার সঙ্গে কথা কইলেন না—আমি মায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলাম। তারপর মায়ের সেকি করা। আমাকে বকে টেনে নিয়ে বললেন,—তুই আমার কাছে চলে আর বাবা। ভোদের ছেড়ে আমি যে মরে বেঁচে আছি।

তাই মনে করছি—সব ছেড়ে ছুড়ে মাকে নিয়ে দিনকতক তাঁর জমণে বেড়িয়ে পড়বো।

নত মুখে চুপ করে পাড়িয়েছিলো স্মৃতি। চোখের জলে গাল দুটো ওর ভেসে যাচ্ছে।

সুদামেরও চোখদুটো অকস্মাৎ জলে ভরে উঠলো। পকেট থেকে কামাল বার করে গোধ মুছে—বরা গলায় বললো—বা হয়ে গেছে, তাকে তো আর ফেরানো বাবে না ছোট মামা। অদৃষ্ট বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি!—আমাকে যদি কোনো কাজে দরকার মনে করেন ডাকবেন। জানেন বোধহয়, আমি কাকাবাবুর এলসিন রোডের বাড়ীতে আছি। বাবেন একদিন সময় মত। কাকাবাবুর হুপিটালের কাজ হচ্ছে, দেখে আসবেন। আজ্ঞা আজ তাহলে চল।

—বাবো, বাবো। আবার তোমাদের কাছে কিরে না গেলে, কি যে হবে এর পরে ভাবতেও ভয় করে, জানো সুদাম কেমন ভয় পাই আজকাল। এক হাতের মুঠোয় নিজের মাথার চুলগুলো চেপে ধরে মুই গলায় বললো অনিল। মিতার দিকে একটা মমতাবরা দৃষ্টিপাত করে বিধান ভাবাকান্ত স্বপ্নে বীর পায়ে পেটের দিকে এগিয়ে চললো সুদাম।

বড় অশান্ত চিন্তে তিনটে দিন কাটালো স্মৃতি। একি হোলো? সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের কুহ গভী রচনা করে তার ভেতর এতদিন আত্মগোপন করেছিলো সে। কিন্তু সহসা সে গভীর আগল কে যেন ভেঙে দিলো।

খুলে গেছে তার রুদ্ধ ভবনের সব জানলা দরোজাগুলো। হাত ছানি দিয়ে ডাকছে ওকে বাইরের আকাশ, বাতাস। আর যে ঘরে থাকা যায় না। লজ্জা, সন্দেহ, বিধা, ভয়, কোন বাধনই আর ওকে বেঁধে রাখতে বুঝি পারবে না।

সেদিন ভোর না হতেই বাইরে বেরবার জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো স্মৃতি। সাদা সাড়ী সরিয়ে রাখলো। পড়লো চাপা স্বঃ এর ঢাকাই সাড়ীখানা তার সঙ্গে মানিয়ে লাল সিল্কের ব্লাউজ। কানে গলায় হাফা ধরনের সোনার গহনা পরে, আয়নার সামনে গিয়ে পাঁড়ালো চুলটা ঠিক করে নেবার জন্তে। নিজের ছায়াটি আজ কেমন বেন ভালো লাগলো ওর কাছে। না। খুব ধারাপ এখনো হৃদে-বাহুনি মুখখানা।

আপন মনে হাসলো স্মৃতি। কালো একখানি ওড়নার সর্ব্বত্র থেকে নিয়ে নিচে নেমে এলো স্মৃতি।

তখন অসীম পটভূমিকার ধূসর স্বঃ এর গুণ কিত্তে লালের সখ হৌপ লেগেছে। দিগন্তে ঐ ঐ অঁধার সারয়ে আলোর কমল, একটি একটি করে দল মেলেতে শুরু করেছে। গাছে, গাছে, ঘনপত্রব অন্তরালে জেগেতে ঘমতারা পাখীদের অন্ধত ভরবর।

শিশিরের মনিকুণ্ডো ছড়ানো পাছের পাঁতায় ফুলে। ভোরের বিরিয়িরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ, হুইয়ের গন্ধ। এমন মন প্রাণ জুরোনো প্রভাত সৌন্দর্য অনেকদিন পরে আবার দেখলো স্মৃতি। জালের ঘের দেওয়া সারি সারি সবুজ বা কাঠের শূন্য ঘরগুলোর কাছে গিয়ে একবার থমকে পাঁড়ালো সে।

ময়ূর, নানা জাতের পাখী, আর গিনিপিগ খরগোস থাকতো ঐ ঘরগুলোতে।

হ' সাত বছর আগে ওরাই ছিলো তার নিত্যসঙ্গী ওকে হু থেকে দেখতে পেলে, কাছে ছুটে যেতো ওরা। হাত থেকে খাবার খেতো। গারে মাথার উঠে কত আদর জানাতো ওকে। আজ আর তারা কেউ নেই।

ওদের ঘরগুলো আগছা জঙ্গলে ভরে গেছে। কয়েক মিনিট ওখানে পাঁড়িয়ে থেকে, একটা মূহু নিঃশ্বাস ফেলে, গেটের কাছে এগিয়ে গেলো স্মৃতি।

—গেটে তালাবন্ধ। দরোয়ানটা ওদের ঘরের সামনের রোয়াকে পড়ে নাক ডাকাছিলো, স্মৃতির ডাক শুনে হড়মড় করে উঠে বসে হীক দিলো—কোন ছায়?

—গেট খুলে দাও, বাইরে বাবো। অ. শ করলো স্মৃতি।

—দ্বিমিথি? ব্যস্তভাবে উঠে পাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে গেট খুলে দিলো দরোয়ান। ডাইভারকে ডাকবে কিনা জানতে চাইলো সে।

—না দরকার নেই। বাবুকে বোলো আমি এলসিন রোডের বাড়ীতে গেছি।

ক্রতপায় রাক্ষা দিয়ে এগিয়ে চললো স্মৃতি চলতি ট্যান্ডি দেখতে পেলে ডাকবে ভাবলো।

অত ভোরে ট্যান্ডি মেলা সহজ ব্যাপার নয়। জনশূন্য পথটা ঘুরন্ত অজাগরের মধ্যে পড়েছিলো নিঃশব্দে। হুচারটে ভিত্তিওলা ওর গারে স্বপন জল ছিটিয়ে দিচ্ছিলো।

জোরে পা চালালো স্মৃতি। এমিক, ওরিক চাইলো—ট্যান্ডির আশায়, না কোথাও নেই তার সারা লক্ষটুকুও। অনেকখানি পথ হেটে একটা গাছের তলার এসে দম নেয় স্মৃতি। কপালে বিলু বিলু ধাম জমেছে, জাঁচল দিয়ে মুছে ফেলে—পাঁড়িয়ে এমিক-ওরিক নজর ফেরায়। রাস্তার ওপারে হু তিনজন, ভিত্তিওলা আর বাতুলার পাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে কি বেন দেখছিলো।

হু, চারটে কাক আশে পাশে উড়ে উড়ে ডাকাডাকি করছে। একটু দূরে একটা কুকুর পাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে; মাঝে, মাঝে সতৃষ্ণচোখে চাইছে সেই দিকে।

সল্যোজাত শিশুর কচিগলার কীণ স্বরের কান্না শুনে চমকে উঠলো স্মৃতি। চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের শুধালো।—কি হয়েছে ওখানে?

—কোন বদনাইস মাগী একটা ছেলে ফেলে দিয়েছে মা। এখনো বেঁচে আছে ছেলটো।

—কি সর্ব্বদাশে কথা। দেখি, দেখি—

বলতে ডাটবিনের কাছে এগিয়ে গেলো স্মৃতি। একপালা নোংরা পাশে এখনো সাদা কাপড়ে জড়ানো সজঘোটা পদ্মফুলের স্বয়ং একটি জলে পাক জ্বালা।



যুক্তেশ্বর ও মুক্তেশ্বর মন্দির-তোরণ

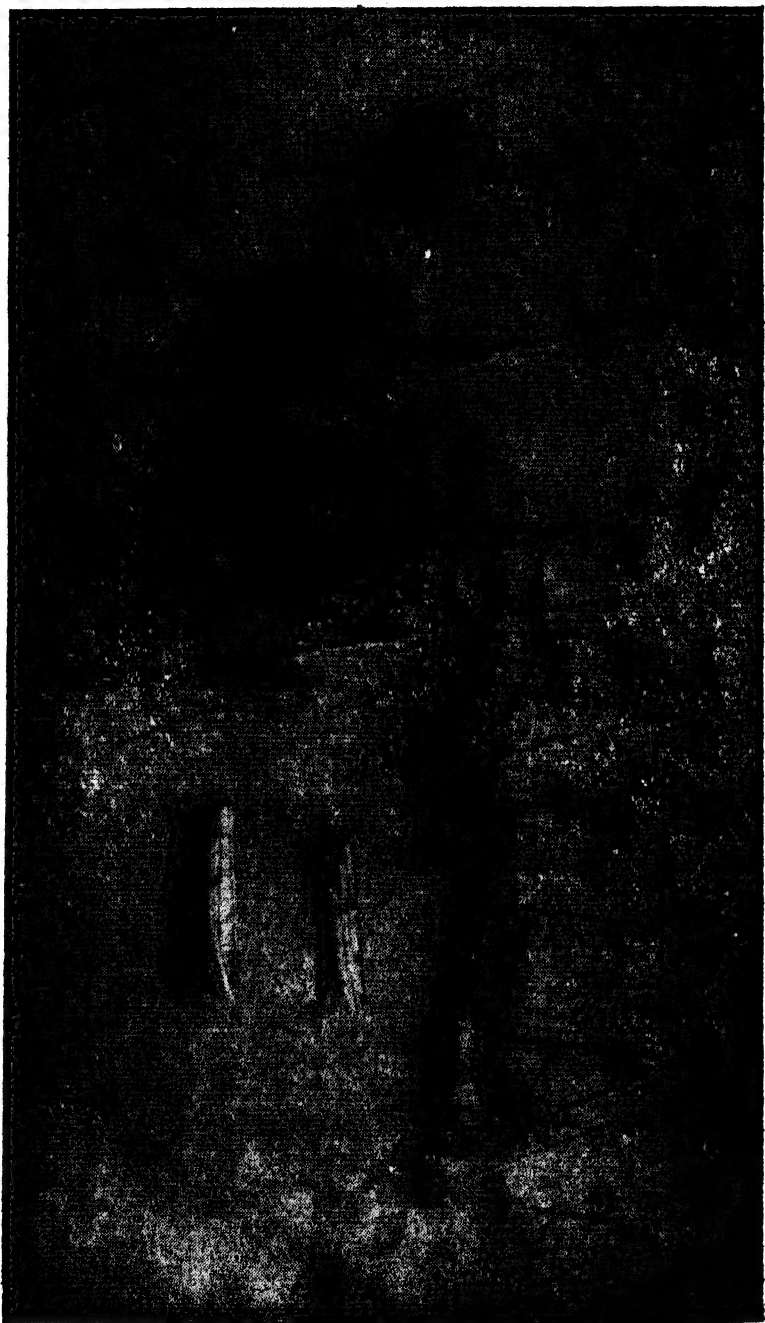
—শ্রীতা বসুমতীক

অপিল-পথ

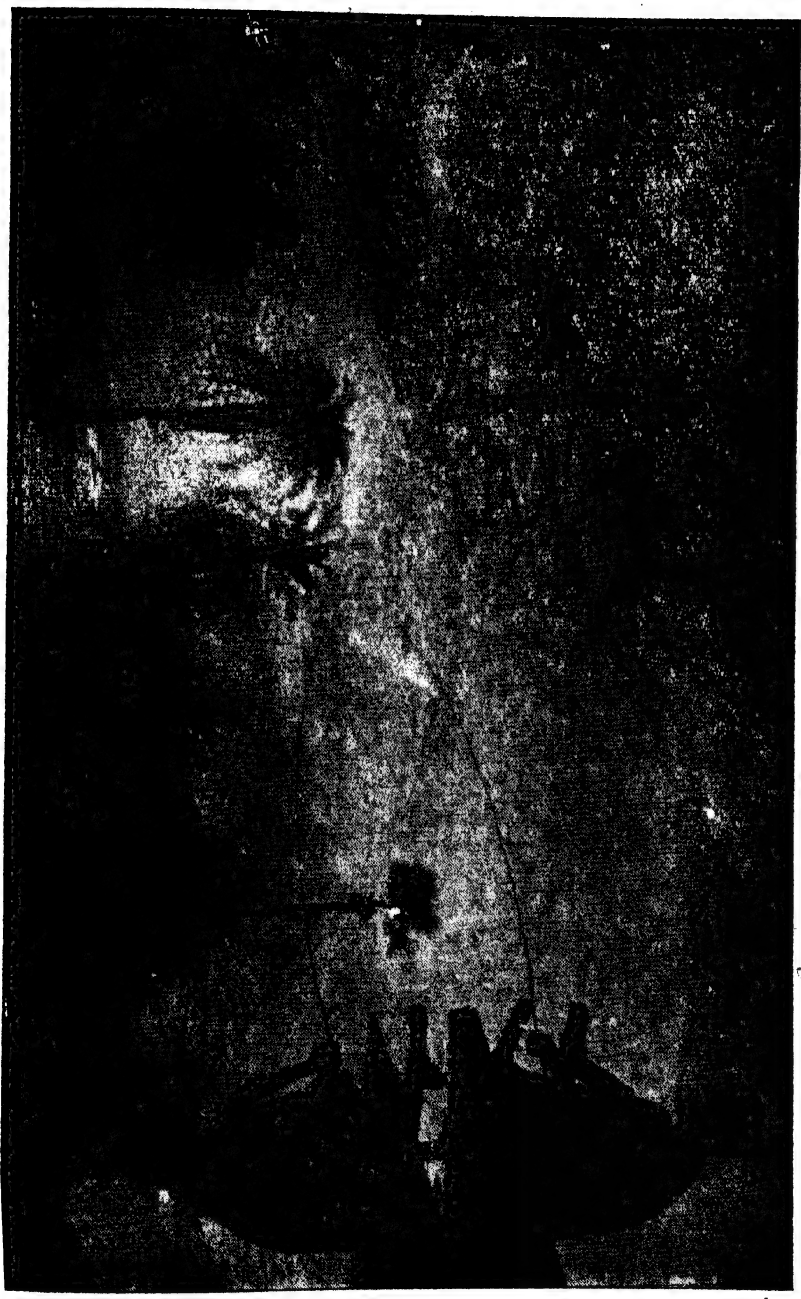
ঐশাখিক (স্থাপনাধার)



পাৰ্শ্বাৰ্ণ



—বৈষ্ণব ভাষিকার



হাসা হাসা

—কবির জন্মদিন—

ସ୍ଥାନୀ

—ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଖ



পদ্মশূল ফুটেছে পাঁকের ভেতর। কিন্তু তার গায়ে তো পাঁক নেই। কি অপকণ, কি শবির ফলটি?

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ দুটো মেলে অবাক হয়ে দেখছিলো আশ্চর্য্য পৃথিবীটাকে এই অব্যাহিত অস্তিত্বিট। মাঝে মাঝে হাচ-পা ছুঁড়ে মাঝুপের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিলো।

গেট হয়ে পরমাশ্চর্য্য ভাব গুণক দেখলো সুমিতা। তারপর হুঁততে ওকে সাবধানে কোলে ভুলে নিলো।

—এ মাথো! বাচ্ছাটা লিবেন আপুনি? অবাক হয়ে শুধলো বুড়ো ঝাড়ুশারটা।

—হ্যাঁ বাবা। নিয়ে ধাবো। আচ্ছা! এমন টাসের টুকরো হেলনাকে কোন পাখীরা ফেলে দিয়েছে গো?

—রাফুণী আছে মা। এই মাছের ভিতরেই ডান্. রাক্স, ডুত, পেরেস্ত, সব আছে, আবার দেওতাও আছে মা।

রাফুণী মান্নীতে কি সন্তান পালে মা? সে জন্ম দিতে পারে, কিন্তু মা হতে পারে না। তুমি, দেবী ভগবতী মা আছো, সন্তানকে ঝাঁচাতে সেই দেওতাই তোমাকে হেথায় পাঠিয়েছে মা। কিন্তু আর দেবী কোরোনা মা, লোক জন্মে যাবে, পুলিশের হাঙ্গামা জোরে, জলদ চলে যাবে।

কোথার নিয়ে যাবে একে? একটু ভাবলো সুমিতা—
‘তারপর বললো—কাছাকাছি ট্যান্সি পাওয়া যাবে?’

—বাক্সো, আর একটু গেলই পাবে। হেঁট হয়ে ওরা প্রশ্নাম করলো সুমিতাকে। ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসলো মিউ। ছোট হাতবাগটি খুলে পাঁচ টাকা ওদের দিয়ে বললো—তোমরা খাবার কিনে খেও। রাত প্রভাত না হতে হতে এমন বখশিশ কখনও ওদের বরাতে মেলেনা। মহানন্দে ওরা টাকাটা নিয়ে বললো—চলো মা তোমাকে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে আসি। একজন আগে ছুটলো ট্যান্সির সন্ধানে। ওর সঙ্গে সঙ্গে চললো বুড়ো ঝাড়ুশার। তুলতুলে নবম মাস শিশুটি বুকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে হেঁট চলেছে সুমিতা।

এক অনাধারিত বিপুল আনন্দময় সত্তা বেম ভড়িয়ে ধরেছে ওকে। বিগলিত করুণায় সিক্ত হয়ে গেছে, ওর সাধা স্বপ্নরা। নারী স্বপ্নের সহজাত কোমল বৃত্তিগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে ই ক্ষুদ্র মানব শিশুর ছোঁয়া সেগে।

ট্যান্সি নিয়ে হলো ভিত্তিওলাটি। সুমিতা উঠে বসলো তার ভেতরে। ওরা সকলে আবার প্রশ্নাম করলো সুমিতাকে। বুড়ো ঝাড়ুশারটি কোমরে জড়ানো কাপড়ের খুঁটি খুলে চোখ মুছলো তারপর একগাল হেসে বললো—ভগবান তোমার ভালো করবে মা। ট্যান্সি চলতে শুরু করলো এলগিন রোডের দিকে। [ক্রমশঃ।

টিয়াপাখি রঙ

রমেশ্রনাথ মল্লিক

বসন্ত বাতাসে ত'লে প্রচুর সবুজপত্র পৌষালীর হলুদে পাতার
তারপর বৈশাখের ধূসো জন্মে যায়;
কোথার স্বন্দর কচি সবুজের রঙ?
সেখান ভাসছে যেন বেদনার খেয়ালী সারঙ!
জীবন-সেতাবে বাজে ব্যথার মূহুরী
যখন জগতে আর জীবনের সীমানায় কঠিন ব্যস্তনা।

স্বয়ং প্রশান্ত তীর খুঁজে ফেরে বদ্বি
তখন তো চাই তার একটি খিরখিরে নদী;
অক্লান্ত সুর আর অজস্র আশায়
সেখানে তো ডেউ আসে দক্ষিণীর সাগর-ধালায়।
খড়-কুটী ভেসে যায় ছ'দিনের স্নান বত কিছু
ভাসয়ে স্রোতের পিছু-পিছু।

মরিচা ধরার প্রাণে তৈলাক্তের যেন স্পর্শ চাই
চিকচিক রূপ দেখা চোখের নেশাই;
দু'কোঁটা বৃষ্টি শো এলো মাটির অঙ্গনে
ঝড় নিয়ে পিছনে-পিছনে—
একটি নতুন পৃথিবীর
তুলছে হরতো সত্যি জন্মের জিগির।

অবাক দৃষ্টি যে তাই মেলে দিই আজ
কমকম বৃষ্টি ধরে আশ-পাশে, ফেলে রাখি কাজ ও অকাজ;
বাড়িগুলো ভিজে গেছে ঝড়ো কাক বত,
মাটি-ভেজা সোনা ভ্রাণ কত
আনন্দ বর্ষার দিনে বুজ্জ
মেঘি বাস আর পাতা টিয়াপাখি রঙ ধরে স্বন্দর সবুজে।



সঙ্গীতশিল্পী শরৎচন্দ্র ত্রিভাঙ্গাইক সনকার

পুর্বেই বলেছি প্রখ্যাত কথাবিল্লী শরৎচন্দ্রকে সঙ্গীতশিল্পী বলে কম সোকেই জানে। এই সম্পর্ক বিস্তৃত আলোচনার দরকার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় তাঁর দেশবিশেষের অপরিচিত বিদ্যুৎ পাঠক পাঠিকার কাছে দেওয়ার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। আমরা এদেশী এবং বিদেশী অনেক কবি সাহিত্যিক নাট্যকার, শিল্পী, সাধক ও মনোশার জীবনে এই গুণটির কথা জেনেছি। তাঁরা অনেকেই গান জানতেন, সঙ্গীত সাধনা করতেন। তাঁদের নাম কবা শক্তল্যমাত্র। জানি না সঙ্গীতের প্রেরণা তাঁদের জীবনের সাধনাকে সফলতার দ্বারায় প্রেরণিত করতে কি না। নাট্য কলা সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের সুকুমার বুদ্ধিগুলির মধ্যে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। এটি সর্বাপেক্ষা বসমত, সৌন্দর্যময় ও আবেদনময়। তাই বা অমুভূতি পুষ্প পথীয়ে উঠলে তবে তা সঙ্গীতে প্রকাশ পায়। সঙ্গীতকে সৈবতাবেব একটি সোপানও বলা চলে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ বা ক্রমশে সঙ্গীত ক্রম সহ্যরতা করে না। ডগবদলাত্তের জন্তে মানুষের যে আকুলতা তা সঙ্গীত অপেক্ষা এমন প্রকাশ লাভ আর কিসের দ্বারা হতে পারে। এইজন্যই বহু মহাপুঙ্ক ত্রিভাঙ্গবানের নাম গান করেছেন, তাঁর গুণকীর্তন করেছেন তাঁকে পাবাব জন্ত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর মত স্তম্ভপ্রিয়তা অর্জন করতে আর কোন সাহিত্যিক ইদানীং শেয়েছেন কিনা সন্দেহ। তিনি একজন পৃথিবীর প্রথম প্রেমীর লেখক হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর জন্তে সারা বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ গর্জ অমৃতব করে। সেই কথাবিল্লী শরৎচন্দ্র সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। বৌবনে তিনি সঙ্গীতচর্চা করেছেন, প্রভুত বশ অর্জনও করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজীবনের কোন পুঁজি ইতিহাস আমরা আজও পেলাম না। কোন অল্প

শক্তির ইঙ্গিতে তাঁর সঙ্গীতজীবন সাহিত্যের দিকে নিবেশিত হোল, তিনি জীবনের মোড় কিয়দে তানপুবা ছেড়ে কলম ধরলেন—শে রহস্ত তাঁর বহুবিচিত্রময় জীবনের মতই আমাদের কাছে রহস্তময় ও চুড়ের ররে গেল।

বতবুর জানা বার প্রবেশিকা পরীক্ষার পর থেকেই শরৎচন্দ্র গান বাজনার যেতে গুটেন বেশী করে। তাঁর প্রিয় সঙ্গীত বাজু কাছে বাঁশী লখতে আরম্ভ করে দেন। ডাগলপুরে সেই কুতুড়ে বাড়ির গঙ্গার ধারের জঙ্গল 'তপোবনে' তাঁর সাধনার আড্ডা ছিল। বন্ধুদের সংগে গানবাজনা তখন রীতিমত চলছে। কিন্তু একটা হারমোনিয়ম নেই। কেনবার টাকাও নেই। অম্মা শরৎচন্দ্র উপার খুঁজলেন। সঙ্গীত পিয়াদা কলম ধরলেন সাহিত্য রচনা। কুন্তলান পুথ্যাবের জন্তে তাঁর মন্দির গম্ভী স্থপী হল। ১৩১০ সালে ভাদ্র মাসে তাঁর মাতুল শ্রবেরেনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে সনপ্রথম ছাপার অক্ষরে এটি প্রকাশিত হয়। গম্ভী প্রোত্তবোগিতায় ১ম স্থান আধিকার করে ২৫ টাকা পুরস্কার লাভ করে ও তাঁর বন্ধুদের প্রয়োজন মেটে। এই হল সঙ্গীতের প্রেরণার শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রথম সকল পদক্ষেপ।

এমান করে শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের সাধনা চলতে থাকে। এর পরই দেখতে পাই মাঝে গান বাজনার বাগা ও বিরতি এবং ভববুরে শরৎচন্দ্রের ছাঁব।

পিতার জন্মদিন শরৎচন্দ্র বেয়িরে পড়লেন বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংগে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন মজঃকরপুরে। সেখানে উঠলেন এক ধর্মশালায়। রাত তখন গভীর। ধর্মশালার সামনের বাড়িতে কে একজন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। নিম্ভুত নিম্বর রাত সেই স্বরের মুচ্ছনার ভেত্রে ভেঙে পড়ছিল। শরৎচন্দ্র আর থাকতে না পেয়ে তাঁর স্বরে তন্ময় হয়ে ছায়ে উঠে গাইতে লাগলেন—

‘জীবনে বহু পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।’

কবিত্বের এই গানটি বোধ হয় তখন তাঁর ছরছাড়া জীবনকে স্পর্শ করেছিল। পরদিন উভয় সুর সাধকের আলাপ হল। বেহালা বাদকটি ছিলেন নিশানাথ—অমৃতকপা দেবীর স্বামী শিখর বাবুর শিসকৃত ডাই। শরৎচন্দ্রের মত নিশানাথও ছিলেন চরছাড়া, জংবুরে, পরোপকারী নিঃস্বার্থ যুবক। এইখানেই বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে অমৃতকপা দেবী ও তাঁর স্বামী শিখরনাথ বঙ্গোপাধ্যায়ের সংগে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় ও মজঃকরপুরে ভাষণ জনপ্রিয় হয়ে গুটেন তিনি। এখানে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র বহু গান প্রচ্ছেরা অমৃতকপা দেবী ও শিখর বাবুকে শুনিয়েছেন। গানের সংগে সংগে কিছু কিছু লিখেছেনও তিনি এই সময়।

এরপর এখানে চাকরী না পাওয়ার ভাগ্যের অধরণে আর পাটো বাড়ালার মতই শরৎচন্দ্র চলে যান বখা হুলুকে। ১১০৫ সালে রত্নর এ্যাকাউন্টিং জেনারেল অফিসে তাঁর চাকরী পাওয়ার লেও আছে তাঁর গান। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গার নিঃসবল শরৎচন্দ্র বখন বাউলবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় এম, কে, মিজ ম’শাই তাঁর গান শোলেন। তখন তাঁর সংগে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুর হয়। তিনি শরৎচন্দ্রের স্কেনুে আসার কারণ জেনে বেছার তাঁকে একটি চাকুরী বোগাড় করে দেন। এরপর শরৎচন্দ্র রেকুে অনেকদিন

ধাকেন এবং সেখানকার সামাজিক জীবনে অকৃতপূর্ণ জনজীবিতা কর্তন করেন। সে ইতিবৃত্ত অনেকই জানেন। তাঁই-নানা, গুণাবলীর মধ্যে তিনি কবি নবীনচন্দ্রের কাছে 'বেঙ্গল-রত্ন' উপাধিটি লাভ করেন। স্থানীয় বেঙ্গলী সোভাল দ্বাবের উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে কবির নবীনচন্দ্র সেনের যে স্বর্ধ্বনা সভা হয় তার উদ্বোধন সঙ্গীতে শরৎচন্দ্র যে গানটি গেয়েছিলেন তার পূর্ণ রূপ হ'ল—

‘ব্রহ্মভূমি অশোভিত বঙ্গ রতন আছি যে

এস কবির এস যে।

সমবেত বঙ্গ দেশবাসী

দর্শন তব অভিসারী

এস কাব্যদিলারী শব্দ যে।

এস বঙ্গ ভ্রমর ভরণ—

এস সুন্দর প্রিয় দর্শন

প্রীতি পুষ্প ডাল লহ যে

এস কবির এস যে।’

বেঙ্গল খাকবার সময় শরৎচন্দ্র বঙ্গ ভ্রমরগায় বঙ্গ স্রাবাগে বঙ্গ গান গেয়েছিলেন। সে সব গানের ও অনুরাগে কোন চিসের পছন্দ বা তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নি। তাঁর প্রয়োজন হয়ত তখন ছিল না কিন্তু এখন তার ভক্ত আপশাস হয়। তবু যেটুকু জানা যায়—তিনি যে সমস্ত গান গাইতেন বা তাঁর প্রিয় ছিল—তার মধ্যে—

‘কোথা কবরার! দুর্গতি হারা কতদিনে তোব করুণা চবে

কবে দেশ মিথি। কোলে তুলে নিবি সকল যাতনা জুড়াবে।’—

‘আমার সাধ না মিটল আশা না পূরিল’—

‘এই করেছ ভাল নিষ্ঠুর তে’—

‘ভালবাসা নহে ত ভালোয়া, ভালো সে যে শুধু আলো’—

‘পথের পথিক করেছ আমার সেই ভালো যে সেই ভালো

আলোয়া ভালোলে প্রাণের ভালো সেই আলো মোর সেই আলো’—

ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

বেঙ্গলে বায়বিক সেবা সমিতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতীগ্রামভ্রমর ভ্রমরগানে তিনি গেয়েছিলেন—

‘ভেমনি করে’ আলার এসে ডাকাও ঠাকুর প্রেমের বাণ

তাতে ভেসে বাবে ভূরে বাবে জীবের দগুণ অভিমান ॥

সেদিন সেমন জীবের লাগি ‘কথারূত’ করলে দান

প্রের শিয়ারী, বিশ্ববাসী, প্রেমের শুভা কবিত পান।—’

শরৎচন্দ্রের গানবাক্যনা সবকিছু সুবিখ্যাতা নিরুপমা সৌী ও তাঁর ভাষা প্রীতিকৃতি তই লিখেছেন—

‘শরৎচন্দ্র রসপ্রাণী রূপেই শেষ জীবনে প্রকটিত। কিন্তু বোঝেন কখনো না, সলীলতা, স্বাী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপেই উজ্জ্বল দেখিরাছি।—শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেগবোয়া— কোন বিরা তাঁতাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না।—আমাদের বঙ্গরপূর বড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়ত এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলো কবর আছে। কত গভীর জমাবস্তার অন্ধকার রাত্রি এই কবরস্থানেই মথো কাটিয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের বাঁকী চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ম-সহ গান চলিতেছে এবং আমরা টুটার জনে

বসিয়া তদ্যব চট্টরা ভুলিতেছি।—কোনও গভীর রাতে সেই মসজিদের শুউক প্রাঙ্গণ চব্ব চট্টতে গানের শব্দ, কখনো ‘হমানিয়া’ নগর তাঁর হইতে বাঁকীর আওতাভ্য তাসিয়া আসিলে মেজমা মেজবোধিকে শুনাটয়া বলিতেন, এ ভাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।—আমাদের মল একদিন বায়ুপথে তাসিয়া আসা গানের এক লাইন আবিষ্কার করিল—

‘আমি ছিলাম আসিনি,

হুদিন দেখিনি

অমনি মুদলি আঁধি।’

ইহার পরে কাশানের বৈঠকখানার তাহার কবির আবেগ গান আমরা ভিতর চট্টতে শুনায়াছি; কিন্তু বাঁকী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাক্যনা নাই। নবকক ভটাচাণ্ডের একটি গান তাহার প্রিয় ছিল—

‘গোকুলের মধু কুবায় গেলে,

আঁগার আজ কুঞ্জন।—’

শরৎচন্দ্র শুধু যে গানই জানতেন তা নয়। তিনি বেশ ভাল তরলচীও ছিলেন। একবার কলকাতায় এক বিবাসীর আসরে পাতিতা ও সঙ্গীত সভার আয়োজন হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের চোঁটার সভা আয়োজিত। তিনি সভার তাকরা ঠেস দিয়ে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথেরও সে সভার আসবার কথা ছিল, কিন্তু সদ্যভাব্যে তিনি আসতে পারলেন না।

সভায় কবিতাপাঠ, রবীন্দ্র সঙ্গীত ইত্যাদির সবকিছু ছিল। কবিতা পাঠ প্রভৃতি হয়ে বাবার পর গান আরম্ভ হল। কিন্তু ভাল

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়াকিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়াকিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জ্ঞতার কলে

তাদের প্রাতিষ্ঠি বঙ্গ নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে হুণ্ড-ভালিকার
অঙ্গ লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শে-কম :- ৮/২, এলগ্যান্ডে ইস্ট, কলিকাতা - ১

ভবলাটীর অভাবে গান তেমন হয়তো না। তখন শরৎচন্দ্র নিজেকে আর হির রাখতে না পেরে একটু আঁকি আর চারের জোগাড় করতে বলে লেগে পড়লেন। তারপর সন্ধ্যা ও গান দুই জমে উঠতে আর দেবী হল না। সন্ধ্যা শেষে সকলে ধরলেন তাঁকে—কোথায় এমন সুন্দর বাজাতে শিখলেন? শ্রিত হাসি বোখটুকু বুঝে এঁকে শরৎচন্দ্র ভাবার দিলেন—আমার সব সঙ্গসই বন্ধাবল্যকে; তবে ভবলাটা শিখেছি সজ্জার এক তরঙ্গটার কাছে। শুধু ভবলাই নয়—সেতারও বাজাতে পারতেন তিনি চমৎকার। ছদ্মনাম পরে একদিন পান্সিডাসে সামন্তাবাড়ের বাড়ীতে সজ্জাবাদকের সোতার তনিবেছিলেন তাদের অহুযোব মেটাসে। এককালে গানটী ছিল শরৎচন্দ্রের জীবিকা; পরে লিখন হল তাঁর সাধনা। সেই লিখনের সিঁড়িলাভ করেও তিনি তাঁর প্রিয় গান ত্যাগ করতে পারেন নি। পরবর্তী জীবনে গান না গাটলেও ভনতেন প্রচুর। এইভাবে একটি বেডিও সেট কিনে রেখেছিলেন সামন্তাবাড়ের বাড়ীতে। এখনও তায় অবস্থার সৌতকে দেখতে পাওয়া যায়। লাকতাবেড়ে তাঁর শেষ জীবনের অবসর আলমটি সজ্জাটি শুরুর আবহাওয়ায় ভরপুর ছিল। জীবনের সামান্য গড়গড়া তাক কত জল অপরাতে বাড়ীর বাবাকায় ইজিচেটেবে বসে সিগার প্রসারিত হার্টের ওপর দিবে মেঘ ঢাকা কপনাবাগণের দিকে নিশ্চলক চোখে চেয়ে থাকতে জীবনরূপকার শরৎচন্দ্রের মনে কত কথা আর গানই না গুঞ্জন ফুলেছে তা কে জানে!

আমার কথা (৫৭)

শ্রীমতী ইলা বসু

সঙ্গীতের পরিবেশে বীহার জন্ম—মাত্র ছয় বৎসর বয়সে যিনি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন—পরবর্তীকালে যিনি বাংলা ভাষার সঙ্গীতে এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছেন—সেই শ্রীমতী ইলা বসু বলেন :

১৯৩৬ সালের ১০ই আগষ্ট হাওড়া পঞ্চাননতলায় জন্মটি। বাবা শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী ডাকনিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আর মা হলেন শ্রীমতী নির্মলা দেবী। রাজসাহী জেলার লাংদেশপুর হল আমাদের স্বগ্রাম। প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। চারি বৎসর পূর্বে হাওড়া জেলা সম্মেলনে প্রথম গান করি—পনের বৎসর বয়সে এলাহাবাদ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিই এক উদ্যম প্রণয় গানে প্রথম চার স্বর্ণপদক ও অনার্স সার্টিফিকেট পাই। তার আগের বছর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আমার প্রথম গুরু ছিলেন শ্রীনীগোপাল মিত্র ও পরে শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। শ্রীহরী গাঙ্গুলীর নিকট আমার ভাই দীপক তবলা পেখে। প্রায় বার বৎসর আগে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিশু বিভাগে যোগদান করি। শেষে আমি উহার সঙ্গীত-শিল্পী হই। হিন্দুস্থানি রেকর্ডে ৬অনুশয়



শ্রীমতী ইলা বসু

ঘটকের পরিচালনায় আমার প্রথম রেকর্ড 'মোর গানেরই ইন্দ্রধনু' হয়। ইহার পর এচ. এম. ভি তে শ্রীচন্দ্র লাহিড়ীর শিষ্কাবানে রেকর্ড হল 'বনে বনে গাছে কোহেলিয়া।' এ পর্যন্ত আমার গাওয়া গানের অনেক রেকর্ড হয়েছে। শারদীয়ার আমার রেকর্ড হবে 'তোমাংই বেসেছি ভালো' ও 'ছোট করে বলতে গেলে গল্প।' ছোট বয়সে যদিও প্রথম প্রথম গান শিখি, পরবর্তী সময়ে ঠুংরা, দানরা ও গজল ভালভাবে আয়ত্ত করি। ছায়াছবিতে আমি নেপথ্য গায়িকা হিসাবে গান গেয়েছি। বর্তমানে 'নৃত্যরই তালে তালে,' 'এ জহর সে জহর নয়,' 'আকাশ পাঁতাল,' 'সুখা ও সাবহান'-এ গানে বেশ গ্রহণ করেছে। হিন্দী ভাষায় অদ্বিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমি গেয়ে থাকি। শ্রীঅশোক বসুর সহিত আমি পরিণয় বৃত্তে আবদ্ধ। আমার 'হরি' হল কুহুর পোষা এবং তজ্জন্ম আমি অনেক টাকা খরচ করে থাকি। বৎসরে কয়েক মাস পাটনার আমার কাকার নিকট অবস্থান করি। আমার মনে হয় যে আধুনিক সঙ্গীতের সহিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্মিশ্রণ হলে শ্রোতাদের মনের গভীরে বেখাপাত করে। গজল গান আমার খুব ভাল লাগে।

To be without some of the things you want is
an indispensable part of happiness.

—Bertrand Russel

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্রাণ্ড গ্লিসারীন্স কেমন করে
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সমস্যা? মায়ের ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার
আঙ্গুল ভেঁড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙ্গুলটা ভুঁয়ে
নিন তারপর আন্তে আন্তে শিশুর মায়ীতে মালিশ করে দিন
এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও সুবাস
শিশুরের প্রিয়। এটা বিস্তৃত এবং গৃহকর্মে, ওষুধ হিসাবে, অসাধনে
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাছে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুশনটী ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান :
হিন্দুস্থান লিটারার লিমিটেড, পোষ্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে জ্ঞাত করুন পিরামীড ব্রাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

B.M.C

ডিষ্ট্রিবিউটারস : আই. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লি: কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস

PYA. 13-X30 BO

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ

(৩)

১৮৩০, ১২ই জানুয়ারি সমাচার দর্পণে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়—

শ্রীরামপুরের মুদ্রাবন্দালয়ে।

ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

পুস্তকের বিবরণ।

ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায়

১ বাঙ্গালা ডিক্সনরি।

অর্থাৎ শ্রীযুত ডাক্তার কেরি সাতের কঠক রচিত বাঙ্গালা ডিক্সনরি তাহাতে বাঙ্গালা শব্দ সমূহের অর্থ ইঙ্গরেজীতে ব্যক্ত আছে তাহা মুদ্রণ তিন বাল্যে প্রকাশিত মূল্য ৭০ টাকা।

২ শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা ডিক্সনরি

২ বাল্যে।

তাহার প্রথম বাল্যে পূর্বোক্ত গ্রন্থের। শব্দ সংক্ষেপে অর্পিত আছে। ২৬০০০ বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ইঙ্গরেজীতে করা গিয়াছে। দ্বিতীয় বাল্যে ২৩২৬৩ ইঙ্গরেজী শব্দের অর্থ বাঙ্গালাতে লিখা গিয়াছে। দুই বাল্যের মূল্য ১০ টাকা। পুস্তকরূপে লটলে ৬টাকা। (অমূল্যচরণ বিভাবরণ কৃত সংগ্রহ হতে)। উপরোক্ত ২নং অভিধানটি কেরী সাতের অধিভানেবটী সাক্ষিপ্ত সংস্করণ। জন রুকার্‌ মাস'ম্যান ১৮২৭ খৃঃ ইহা প্রকাশ করেন। (কেরী সাতের অধিভানের বিস্তৃত বিবরণ 'বাংলা পঞ্জের প্রথম' বৃপ. সা-প-প, ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সাখার দ্রষ্টব্য)।

ডাঃ কেরী সাতের বৃত্তে অভিভানের পরে বাঙালী রচিত সর্বপ্রথম বর্ণনাত্মক বাঙলা অভিধান-কার যল প্রসিদ্ধি আছে হার্ভ পণ্ডিত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য, সংস্কৃত কলেজ, চিন্মু পাঠশালায় অধ্যাপক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিভাবরণীশের। বিভাবরণীশ মহাশয়ের ১৭৮৬ খৃঃ (১) (১৭৭৭ শক ২১শ মাঘ) পালপাড়ার জন্ম ও ১৮৭৪ খৃঃ ২রা মার্চ মৃত্যু। পিতা লক্ষ্মীনাথগণ ভক্তবরণ। বিভাবরণীশ রাজা রামমোহন রায়ের অমুখ্যপ্রবণার কলকাতায় এসে প্রথমে শাস্ত্রচর্চায় প্রবৃত্ত হন আর অধ্যাপনা করেন। ৬ খানি বই লেখেন, তাঁর মধ্যে প্রথমেই তিনি একখানি অভিধান প্রস্তুত করেন। অভিধানখানির নাম—“বঙ্গভাষাভিধান”। ১৮১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল্য ১৭ টাকা। শোনা যায় শুৎকালে এই অভিধান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ ‘জ্যোতিষ সূত্রসার’ের বিক্রয়লব্ধ অর্থে তিনি সিমলা-কেন্দ্রস্থায় উত্তরে এক বাড়ী তিনিয়া ভ্রমণ বসবাস করেন। ১৮২০ সালে অভিধান-খানির ২য় সংস্করণ হয়। ইহা পূর্ণাঙ্গের বর্ধিতাকারে। এই সংস্করণের পূর্বে তিনি সোসাইটিকে বিক্রয় করেন। ইতিহাস-অধ্যয়নকারীরা এই অভিধানের যে কথখানির সন্ধান পোষণেন—সেগুলির কোনটারই আখ্যাপর নেই। কেরী সাতের এই অভিধানখানিকে শুৎকালে জেরি বিবেচনা করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্তে ২০০ কপি কর করেন।

এর পরে নার পাণ্ডা বার যোজনপ্রসাদ ঠাকুরের। ইনি একখানি অভিধান রচনা করেন ১৮১৮ সালে।

এই ১৮১৮ সালেই পিতাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত অমরকোষ খানিকে অকাগাদি ক্রমে সাংঘ্যে বাঙলা ভাষার তার অর্থ প্রকাশ করে ‘শব্দসিদ্ধি’ নামে বাঙালীভাষার ব্যবহারোপযোগী অভিধান বের করেন। বইখানির আখ্যাপত্র এইরূপ—

“ভগবান অমরসিঃ। কৃত। অভিধান অকারাদিক্রমে। ভাষায়। বিবরণ কারয়া শব্দাসমুঃ। নাম। বাখিয়া কলিকাতায় ছাপা। হইল। সন ১২২৫।”

বইখানির ভূমিকার শেষে গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ (১৭৪০ শক) এইভাবে লেখা আছে—

‘গগন গণেশ ভূজ গর্ভর ভূমিতে।

গ্রন্থ সমাপ্তর শাক জানিবা পণ্ডিতে ॥’

সমাচার দর্পণের (২৫ জুলাই ১৮১৮) নতুন বইয়ের এক ইস্তাহার প্রকাশ হয়—

“ইস্তাহার। শ্রীপিতাম্বর শর্মণঃ। এতদেবীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া লিপিতে অশুদ্ধ এ কারণ এ অসিক্ত ভগবান অমরসিঃ কৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী অর্থ ডেক্সনরীর দ্বার ভাষায় বিবরণী লম্বা ওঠা ব কাবের প্রোক্ত করিয়া যেমনী বহুসিদ্ধি নানা অভিভানের অর্থ সিদ্ধা নানার্থ স্বরূপ ৪১২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতা ব করিয়া উত্তম অকারে ছাপাইয়াছে তাহার চাপিত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তম্বা মূল্যে বাহার বাজা হয় তবে মোঃ উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত চুর্ণাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোঃ কলিকাতার শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সোসাইটী অর্থাৎ আশ্রয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিত।” (সং-সে-কথা, ১ম, ৬৬)।

১৮১১ সালে ইংরেজ পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেয়ান উইলসন (Horace Hayman Wilson) এক সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রস্তুত করেন। বইখানির নাম—A Dictionary in Sanskrit and English, translated.. from Original Compilations prepared by learned Natives for the college of Fort William, Calcutta 1819 পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০০। বইখানির দু বকম দাম ছিল—ভাল বিলিতি কাগজে ছাপা—১০৭ আর পাটনাই কাগজে ছাপা—৮০। ডাঃ উইলসন সাহেব ১৭৮৬ খৃঃ ২৩এ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের সোহো ঘোড়ার জমা গ্রহণ করেন। ১৮০৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ডাক্তার হয়ে ভারতে আসেন। ময়াদন-শাস্ত্রে পারদর্শী বলে ট্যাক্সমাসে assay master নিযুক্ত হন কয়েক বছর পরে ১৮১১-১৩ খৃঃ পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অবসর সময় সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮১৩ সালে কালিশাসর মেম্বরের ইংরেজি অধ্যয়ন, তারপর অনেকগুলি কাব্য অধ্যয়ন করেন। এই সময়েই সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের রচনা হয়। তিনি হিন্দুদের খিয়েটার নিরেও গ্রন্থ লেখেন—রামচরিতের অধ্যয়ন করলে তাঁরই অধ্যাক্তার এসরুমুয়ার ঠাকুরের বাড়ীতে এই নাটক অভিনীত হয় (১৮৩১)। ১৮৩৩ সালে অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক, ১৮৩৬এ ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ। ১৮৩০ সালে ৮ই মে মৃত্যু।

গোটে উইলসন সাহেবের অভিধানখানির একদিকে সংস্কৃত ও আর একদিকে ইংরেজি শব্দ। ইংরেজিতে এক এক শব্দের দু'তিন বহুসংখ্যক মানে আর নানা কোষ গ্রন্থ থেকে তার প্রমাণ দেওয়া আছে।

১৮২০ সালে ক্যাপ্টেন ফেল (Captain Fael) সাহেব মেরিনী কোষ ইংরেজিতে তর্জমা করে সংস্কৃত-ইংরেজি এক অভিধান প্রস্তুত করেন। এই বইখানি ইংলণ্ডে বাগা সংস্কৃত শিক্ষা করতে চান তাদের জন্যই বিশেষ ভাবে রচিত হয়েছে।

রেভা: উইলিয়াম মর্টন (Rev. William Morton) সাহেবের বাঙলাভাষায় এক অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইখানির নাম—A Dictionary of the Bengali Language, Calcutta 1828. বইখানি বসিগাষ্টিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে রক্ষিত আছে। এ ছাড়াও তিনি "Biblical and Theological Dictionary, English and Bengali, Calcutta 1845" নামে একখানি অভিধান রচনা করেন। ইহাও উক্ত সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।

ডা: কেরী পুত্র ফিলিপ কেরা (Felix Carey) ও রামকমল সেন (১৭৮০—১৮৪৪) (বিনি তৎকালে ব্যাক অব বেঙ্গলের দেওয়ান ছিলেন) উভয় মিলিয়া দু' খণ্ডে এক অভিধান তৈরী করেন। অভিধানখানির সূত্রপাতের প্রায় দু' বছরের মধ্যেই ফিলিপ কেরী মৃত্যু হন (১৮২৩)। পরে রামকমল সেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক হন। তিনি গ্রিকাগলার ও হটিকালগার সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃমহ। কেরী ও রামকমলসেন উভয়ের মিলিত যে অভিধান তার প্রস্তুতির প্রধান সমাচার দর্পণে (১৮২১, ৩১শে মার্চ) প্রকাশ হয়েছিল—

"ঐযুত ফিলিপ কেরী সাহেব ও ঐরামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাংলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া ঐরামপুত্রের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক দ্বয় অক্ষরে দুই বালাসে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাত পাইবেন তত্তির লোকের দণ্ডের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবক বাহারদণ্ডের সহী করিবার বাগনা থাকে তাহার হিন্দু স্থানীয় প্রেসে ঐযুত শেখের সাহেবের নিকটে কিবা যোকাম লালবাগারে ঐযুত খ্যাকার সাহেবের নিকটে কিবা ঐরামপুত্রের ঐযুত ফিলিপ কেরী সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

বিজ্ঞেতে জনসন সাহেবের ইংরেজি ডিক্সনারীখানি খুব বিখ্যাত। এসেলেও তৎকালে ইংরেজি শিক্ষানবীশদের কাছে অভিধানখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। জন মেন্ডিস (John Mendies) সাহেব এই অভিধানখানিকে ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেন। নাম—Companion to Johnson's Dictionary in English and Bengalese. ইহা ঐরামপুত্রের ছাপাখানার ছাপা হয়। দাম হয় ৮/-। ১৮২৮ সালে এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড প্রকাশ হয়। ছাপাও হয় ঐ ঐরামপুত্রে।

১৮২৫ সালের ২২এ জাযুয়ারির সমাচার দর্পণে দেখা যায়—
"যো: কলুটোলা চন্দ্রিকা মন্ডালারে ঐসেবেওয়ার সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত খামসেনে ডিক্সনারীর ইংরাজী সমেত বাংলা" অভিধানের বিজ্ঞাপন।

১৮ই জুন ১৮২৫এর বিজ্ঞাপনে দেখা যায় "জনসন ডিক্সনারি।—ঐযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তার জানসেন সাহেব

কৃত ইংরাজী ডেক্সিয়ারিয়ার ত্র্যব শব্দের বর্ধাৎ অর্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ঐরামপুত্রের ছাপাখানায় ছাপাইতেছেন। এই পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক ২ নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। এই পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে..." (সংসে কথা, ১ম, ৭৪)। ১৮৩৪ সালে এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড সমাপ্ত হয়। নাম—
"A Dictionary in English and Bengalee, translated from Todd's Edition of Johnson's English Dictionary, 2 Vols. Seerampore Press, 1834."

ঐরামপুত্রের পক্ষদ্বী কেরী সাহেবের সহকর্মী জোন্সরা মার্সম্যান (J. C. Marshman) যে অভিধানখানি সকলক করেন, তার নাম "A Dictionary of the Bengali Language," etc. ইহা দু' খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড ১৮২৭ খৃঃ পত্র সংখ্যা ৫৩১ এবং ২য় খণ্ড ১৮২৮ খৃঃ পত্র সংখ্যা ৪৪০। এই অভিধানটি ঐরামপুত্রে ছাপা হয়।

১৮২৭ সালে তারাবাট চক্রবর্তী এক অভিধান করেন। অভিধানখানির নাম—A Dictionary of Bengali, Calcutta. 1827. "ইংরাজি বাংলা অভিধান।" তারাবাট তৎকালে 'ইন্ডা ক্যালকাটা' রেলের ও পরে বর্ধমান রাজ্যের অধীনে করা করিতেন।

১৮২৯ সালে রামধন সেন—পারস্য ইংরেজি অভিধান "Dictionary in Persian and English, Calcutta, 1829" রচনা করেন।

১৮৩১ সালে শব্দকামমুদ্রাভিধানের এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। তাতে তিন জন পাণ্ডিত ও একজন সংগ্রহকারের স্বাক্ষর থাকে এবং উহা চন্দ্রিকা মন্ডালারে মুদ্রিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়।

১৮৩২ সালে জগন্নাথ মল্লিক সংস্কৃত অমরকোষের প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। বইখানির পৃষ্ঠ সংখ্যা ছিল ৪০০। সমাচার দর্পণের (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩২) সংবাদ—

"ঐযুত বাবু জগন্নাথ মল্লিক সম্প্রতি সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠ পরিমিত হইবে। এই মূল গ্রন্থে বাহাদের আবঙ্গক তাহাদের ইহাতে মহোদগপকার হইবে। এই গ্রন্থ উক্ত বাবু অমুমতিতে ঐযুক্ত রামোদর বিজ্ঞানস্বাক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।"

১৮৩৩ সালে স্যার গ্রোভ চ্যামনি হটন (Sir G. C. Haughton. ১৮৮৮—১৮৪৯) এক বাঙলা-ইংরেজি ও সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করেন। স্যার হটন ১৮০৮ সালে ভারতে এসে বেঙ্গল আমিতে যোগ দেন। বাহালাতে ও কোর্ট উইলিয়াম কলেজে এসেঞ্জীর ভাষা শিক্ষা করেন। স্বাধ্যভঙ্গ হেতু ১৮১৫ সালে বিলাতে ফিরে যান—সেখানে প্রাচীন ভাষার অধ্যাপক হন এবং একখানি বাংলা-অভিধান তৈরী করেন। অভিধানখানির নাম—"A Dictionary, Bengali and Sanskrit Explained in English..to which is

added an index, serving as a reversed dictionary, London 1833." সমাচার দর্পণে (১৮৩৪, ৪ঠা জুন)

প্রকাশ—আমি। তুমি। পরম আপ্যায়িত হইলাম। শ্রীযুক্ত শ্রবণেন্দ্রনাথ সাহেব লণ্ডন নগরে সংস্কৃত ও বাংলা ও ইংরাজিতে নুতন এক ডিক্শনারী মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের শেষে এতদ্রূপ নির্বণী লিখাছেন—যে তাহা উলট করিয়া পড়িলে ইংরেজী ভাষার সংস্কৃত ও বাংলা অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এখানে ৮০ টাকারও অধিক।

১৮৩৭ সালে ডি'রোজারিও (P. S. D'Rozario) "A Dictionary of Principal Languages of Bengal Presidency in Bengali, Hindi, 1837" নামে একখানি অভিধান করেন।

১৮৩৭ সালে আর একখানি অভিধান পাওয়া যায়। নাম—Dictionary of English, Bengali & Manipuri গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

১৮৩৮ সালে ব্রজনাথ তর্কভূষণ রচিত অভিধান। "শ্রীব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তীক্ষ্ণ সর্বলোকের জ্ঞাত আছেন তিনি এতদ্বৈদ্য ভাষার এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন—এই অভিধান এতদ্বৈদ্য সর্বলোকের উপকারক হইবেক কারণ বাংলা ভাষায় এতাবধি অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিজ্ঞাপাণীশ কর্তৃক রচিত যে অভিধান বাহা এক্ষণে ইচ্ছাশ্রমে ব্যবহার্য হইতেছে—সেই অভিধান বাহারা অধিক বাংলা শিক্ষা করেন তীক্ষ্ণদিগের উপকারক নহে এই ভারি অভিধান পূর্ব পূর্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যন্তম হইবে কারণ ইহা অত্যন্তম বিজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে। (সমাচার দর্পণ, ৮ই আগষ্ট ১৮৩৮)।

সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের অভিধান— সমাচার দর্পণের ১৮ই আগষ্ট ১৩৩৮-এর সংবাদে প্রকাশ "পারস্ত ও বঙ্গভাষাতে অভিধান। আদালতের কার্যে পারস্ত ভাষা উঠিয়া বাওয়াতে বঙ্গভাষার অন্তান্ত সমাদর হইয়াছে। বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পারস্ত ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে পঁচিশ শতেরো অধিক পারস্ত শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইখানে ঐ মহোপকারক বহুমূল্য গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যন্ত মূল্য একটা টাকা মাত্রে দ্বিবিকৃত হইয়াছে।"

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সংকলন করেন। নাম—বঙ্গাভিধান। সেই শব্দগুলি অকারাদিক্রমে সাজান হয় এবং তাহা সঙ্গে ইংরেজি ভাষার অর্থও প্রকাশ করেন। যেমন—

| | | |
|-----------|----|------------------|
| কল | s. | a share, a part |
| কলী | s. | a partner |
| অকথা | a. | unutterable |
| অকথ্য কথা | s. | unutterable word |

| | | |
|----------|----|-------------|
| অকর্তব্য | a. | improper |
| অকর্মণ্য | a. | useless |
| অকল্যাণ | s. | misfortune" |

--ইত্যাদি। (সং-সে-কথা, ২য়, ১১৫)।

এই ১৮৩৮ সালে লন্ডনীর রায়েণ জ্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ (১৮২৪-৩১) ছিলেন ও পরে যুক্তক, সদর আমিন, পূর্ণিয়া জেলার আদালতের জজ পণ্ডিত হন, তিনি আইন সংক্রান্ত পারস্ত শব্দের বাঙলা সমেত অভিধান প্রস্তুত করেন। নাম— "ব্যবহার-বিচার শাস্ত্রাভিধান। সম্বৎ ১৮৩৫, আষাঢ়, পূঃ ৩৬।" "ব্যবহার বিচারোপযোগি পারস্ত শব্দের সাধু গৌড়ীয় ভাষায় অমুবাদ।" ইহা কলকাতার পূর্ণচন্দ্রদেব ব্রহ্ম মুদ্রিত হয়।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার বাহা লিখেছেন—তাহা আমি সংবাদপত্রে সেকালের কথায় ১ম খণ্ডের ৪১৬ পৃঃ হতে উদ্ধৃত করছি—

"সম্মানন মিত্র

ভারতবর্ষ রাজধানীর সকল বিচারস্থলে পারস্ত ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষা বাহা বাস্তব শাসন ও রাজস্ব আদায় ও অঙ্গ অঙ্গ তাৎকালিক নিরীহ করিতে সুপ্রিয় কৌশল হইতে যে অবধি আজ্ঞা হইয়াছে এইক্ষণ পর্যন্ত তাহা সুচারু রূপে নির্বাহ হওয়া শব্দের পরিত্রা প্রভৃতি বঙ্গদেশের মধ্যে নানা স্থানে জ্ঞানাবধি শব্দ প্রয়োগ হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল স্থানের ব্যবহার নিষ্পত্তি হইয়া যখন দ্বিতীয়বিভাগার্থে সদরদেওয়ানিতে উপস্থিত হইবে সেসময়ে বিচারকর্তৃদিগের এবং পাঠকলেখকদিগের অনর্থক কাল হরণ ও বৈরক্তি জন্মিতে পারে অতএব এই বিষয়ের যত আবশ্যিক পারস্ত শব্দ আমি আপন প্রাপ্তব্যবহার বিচার সময়ে ক্রমে ২ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অর্থ মিতাকগানি ধন্দলাস্ত হইতে সংকলন করিয়া সাধু-গৌড়ীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিয়া তাহা সুপ্রিয়মকটের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক অনেক শব্দ পুনর্নিবেচিত হইয়া মুদ্রিত হইল আমার বাসনা এই পুস্তক লন্ডন রাজধানীস্থ সকল বিচারকর্তৃ মহাশয়দিগের নিকটে স্বীয়াক্ষর্য্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করিব তাহাতে রাজকর্ম নিরীহ সুচারুরূপে হইতে পারে তাহাতে আমার পরমোপকার হইবে ইতি।

পূনর্নিবন্ধন পারস্ত শব্দের গৌড়াক্ষরে লিখনে কোন স্থানে বর্ণবান্তর হওয়াতে মহাশয়েরা ক্রটি ধরবেন না কারণ স্বাধীনপুস্তক পারস্তাক্ষর বিস্তার করা যায় নাই পরে তাহাতে প্রয়োজনও নাই কেবল সাধু ভাষা গৌড়ীয় দিগদর্শনার্থ ইহা প্রস্তুত করা নতুবা পারস্তাভিধান অনেক আছে কিম্বাধিক বিজ্ঞবরের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জ্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত।

সদরআমীন পূর্ণিয়া।"

[ক্রমশঃ]

Money can't buy health, but I'd settle for a diamond-studded wheelchair.

—Dorothy Parker, authoress



দুশ্রাপ্য জিনিস সংরক্ষণ

পূর্বনো দুশ্রাপ্য জিনিসের দাম সব সময়ই রয়েছে, পাবেও থাকবে। বরং বলা যায়, দিন বতাই যাবে, অতীত যুগের কোন সম্পদের মূল্য বাড়বে বই কমবে না। হুলভ জিনিস সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের দাবী দেখতেই ওঠে।

একটা জিনিস বলতে হয় এই সূত্রে এবং সে গোড়াতেই। এইমাত্র দাম বা মূল্যের কথা বা বলা হলো, সে বস্তুগত বতটাই নয়, তার চেয়ে বেশি কালগত। অর্থাৎ এ অনেকটা বস্তু বা শিল্পের ঐতিহাসিক মূল্য—ওর প্রাচীনত্বের মর্যাদা।

সভ্যতাগবী ও অগ্রসর দেশসমূহে পুরনো দুশ্রাপ্য জিনিসের সমাদর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কত অমূল্যদান ও কত খননকার্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে একজন্তে, বলবার নয়। উত্তম, দৃষ্টি ও প্রযত্ন এই যেখানে নিবিড়ভাবে থাকে, সেখানেই দুশ্রাপ্য জিনিসের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

যা কিছু পুরনো, তাই পরিচায়ক, এ ধারণা অচল প্রমাণিত হয়েছে বহুকাল। অমূল্যদানে অতীতের গর্ভে নিহিত অনেক জিনিসই বর্তমানের চোখে নতুন ঠেকতে পারে। এই যে সহস্রা চোখে লাগা, মনের ওপর আপনি প্রভাব বিস্তার, পুরনো সামগ্রীর মূল্য স্বীকৃত ও নিনীত হয় সর্বত্রই এখানেই।

পুরনো দিনের মুদ্রা, ডাকটিকিট, শিল্পকলা প্রভৃতির মূল্য অনস্বীকার্য। এই ধরনের দুশ্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে পশ্চিমী দেশগুলোর প্রযত্ন ও তৎপরতার অভাব নেই। পূর্বে বাই হোক, এ ক্ষেত্রেপূর্ণ ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলোর মতো ভারতও এখন এগিয়ে আসতে চাইছে বেশ কিছুটা।

প্রাচীন যুগের দুশ্রাপ্য জিনিসের জন্ত সোভিয়েট দেশের দরদ ও মমত্বের ব্যুৎ তুলনা হয় না। একটি মাত্র ঘটনা থেকেই এই উক্তির যথার্থ উপলব্ধি করা যেতে পারে। রুশ বিপ্লব জ্বলন পুরানো চলেছে—সমগ্র বিশ্ব তখন প্রকল্লিত। পাঁচ সংগ্রহ হয়ে যায়, তাই পুরনো হুলভ জিনিস সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে একটি প্রকাণ্ড হল। দিনের মূল্য সংগ্রহ বা শিল্প সত্ত্বার নিয়েই রুশিয়ার বিখ্যাত সেন্টপেটার্সবার্গ (নিউজিয়ার) আজও গর্ব করতে পারছে।

এখনকার যুগে অবশ্য পুরনো জিনিসের দ্বারা বাজার গড়ে উঠছে এটা প্রত্যক্ষ অনেক দেখেই। বিশেষতঃ এই প্রকার বড় বড় বাজার বা বাইনা কেন্দ্র বহু দিন থেকেই চলু রয়েছে। দুশ্রাপ্য আসবাবই দোকান, বাণ্যর কেন্দ্র হয়েই শিল্প সামগ্রীই দোকান, ব্যাপকতার ব্যস্তার

এর মিলবেই। পুরনো শিল্পদ্রব্য নিয়ে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য করে চলেছেন, বিশ্বের এমন কয়েকটি নামকরা কার্ণ বা সন্ধ্যা : ক্রিষ্ট'ল ও সোফেসাই'জ (লগুন), পার্কে-বার্ণেটস (নিউইয়র্ক), গ্যালারী কার্পেটিয়ার (প্যারিস) ইত্যাদি।

একটি কথা মানতেই হবে—সাধারণভাবে পুরনো দুশ্রাপ্য জিনিসের মূল্য ক্রমে বাড়বেই, সহসা কমবে না। বিশেষতঃ বাজারের সাম্প্রতিক বিবরণ—কয়েক বছর আগেও সেখানে প্রাক্কলনদ্বারা (১৮০১) যুগের জহরতের যে দাম ছিল, আজ তা ঠাড়িয়েছে অন্ততঃ তিনগুণ। প্রাচীন চিত্রকলার মূল্যও আজকের দিনে বেড়েছে অতিমাত্রায়। বার্নার্ড বাকটের হাতের একখানি শিল্পের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগেও এর বাজার মূল্য যেখানে ছিল মাত্র ২৫ পাউণ্ড, আজ ২৫০ পাউণ্ডের কমে তা পাবার উপায় নেই।

পূর্বাত্মক বিশ্বের আবিষ্কৃত বিভিন্ন অমূল্য জিনিস তথা সেকালের দুশ্রাপ্য শিল্প-সামগ্রীর দাম বাড়বার পেছনে অবশ্য কয়েকটি কারণই রয়েছে। একটি প্রধান কারণ বা সূত্র—সরবরাহ থেকে চাহিদা বৃদ্ধি। মাহুৎ পুরনো সম্পদের মাধ্যমে পুরনো যুগের সাথে পরিচিত হতে চায় কিন্তু সে সম্পদ চাওয়া মাত্রই হাতে পৌঁছতে পারে না। প্যারিসের বাজারে ছ' বছর আগে মাত্র ৮লক পাউণ্ড মূল্যের দুশ্রাপ্য শিল্প সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। বাটার এদের চাহিদা এতো বেশি হয়ে পড়ে যে, দেখতে দেখতে এই খাতে পাঁচগুণ অর্থাৎ ৪০ লক পাউণ্ড এসে যায়।

মোটের ওপর, আজ এই নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, শতাব্দী আগেকার মুদ্রা, ডাকটিকিট, পুঁথি-পুস্তক (বিশেষ করে পাণ্ডুলিপি), শিল্প, ভাস্কর্য—এসকলের সংগ্রহ ওরফে অপরিহার্য। কখন কার কোঁহুল আকর্ষণ করে কোন্ জিনিসের মূল্য কত পঁড়াবে, কেউ বলতে পারে না। এই সব মহামূল্য সম্পদ জাতীয় সংগ্রহ-শালায় বড় করে রাখবার ব্যবস্থা হল, সবচেয়ে ভালো হয়।

পুরনো হুলভ জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব অনস্বীকার্য। মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালায় রেখে, এক প্রকার-পুস্তিকা দ্বারকত তাঁরাই এসকল সম্পদের যত্নে সাধারণ মাহুৎের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন সহজে। ভাবন্তের জাতীয় সরকার ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ এদিকে উত্তেজী হয়েছেন, এ আশার কথা। সম্রাতি কার্লিনাভে প্রাচীন ভারতের শিল্প-সম্পদের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এমনি ধরনের প্রদর্শনী দেশে-বিদেশে বত বেশি হবে, ততটাই ভালো, একে সন্দেহ নেই।

তাসের ব্যবহার ও আধুনিক যুগ

আজকের দিনে এমন দেশ নিতান্ত বিরল, যেখানে তাসের ব্যবহার নেই। অনেক উৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং অবশ্য উপভোগের একটি চমৎকার মাধ্যম এই তাস। ব্রিজ, ব্রে, হুইষ্ট, পোকার প্রভৃতি অসংখ্য রকমের তাস খেলা এ যুগে চলতি। জুয়ার কেন্দ্র বা আজ্ঞালোভেও তাস ব্যবহৃত হয় অতিমাত্রায়।

তাসের ব্যবহার ঠিক কোন যুগে কি অবস্থায় শুরু হয়েছে, এ নিশ্চয় করে বলা যায় না। ভারতে কিন্তু এর প্রচলন ছিল বহু শতাব্দী আগের। তবে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানগত তাস খেলা ইউরোপের অবদান, বিশেষ করে বৃটেনের। সে দেশ থেকেই সারা দুনিয়ার সম্প্রদায়িত হয়েছে তাসের নতুন নতুন জনপ্রিয় খেলা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, ইউরোপে তাস খেলার পুত্রপাত হয় চতুর্দশ শতকে। তখনকার দিনের তাস আজকের দিনের মতো এত সুন্দর ও মসৃণ ছিল না, এ সহজেই অনুমেয়। আধুনিক যুগে বাজারে কত চিত্তাকর্ষক সুসুন্দরিত তাস দেখতে পাওয়া যায়। এই উন্নতির জন্য বিলেতের টমাস জা লা রিউ কোম্পানী বহুলাংশে দায়ী।

সে ১৮৩২ সালের কথা। তখন অবশিষ্ট ইউরোপে যে তাস ব্যবহৃত হতো, সে হাতে টেনেসিল করে। কাজটি সহস্রাধ্যও ছিল না মোটেই, ব্যয়ও হতো প্রচুর। টমাস জা লা রিউ (তঁারই নামে পরে কোম্পানী হয়) ব্যাপারটি নিয়ে ভাবলেন—আবিষ্কার করলেন তাস ছাপার ছাঁচ বা যন্ত্র। ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্দশ উইলিয়াম এ যুগ যন্ত্র দিয়ে তাস উৎপাদনের ছাড়পত্র তাঁকে অর্পণ করেন। এই অভিনব আবিষ্কারের পর থেকে তাস ছাপা হয়ে চলে হরবম—স্বারাসে তৈরী হয় তাসের এক একটি তাড়া। ক্রমে অনেক মনোরম শিল্পকাজ চলতে থাকে এর ওপর পাঠ্য—সাহেব, বিবি, গোলামকেও নানাভঙ্গিতে বসানো হয়। ভালো ভালো ডিজাইনের তাস বাজারে বতাই আসতে থাকে, তাসের ব্যবহারও বেড়ে যায় সেই অনুপাতেই।

তাস উৎপাদন এ যুগে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সম্পর্কে একটি হিসাব পাওয়া গেছে। ১৮৩২ সালের আগে বছরে তাসের তাড়া তৈরী করা সম্ভব হতো প্রায় দুই লক্ষ। ১৮৫৭ সালে অর্ধাংশ বৃদ্ধি বহুত না হলেই বাস্তবিক ব্যবহারে বছরে উৎপাদন ৮ লক্ষে পৌঁছায়। এর পর শত বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে উৎপাদনের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি হয়েছে, আজ তা পরিহার। এক্ষেত্রে একমাত্র বৃটেনেই তাস তৈরী হয় বছরে ১০ কোটি তাড়া আর ৮ কোটি তাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইউরোপ ও আমেরিকার আজ শতকরা প্রায় ৮০টি গৃহেই তাসের নিয়মিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। জা লা রিউ কোম্পানীর ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনে তাস ব্যবসারীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। সেইসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন উক্ত সম্মেলন। ব্যবসা-প্রতিনিধি। ১৫টি দেশ থেকে ২১টি কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সম্মেলনে বোগ দিয়েছিলেন আর কচিসম্মত অসংখ্য ডিজাইনের খেলার তাস করা হয়েছিল প্রদর্শনীর।

অতীত দিনের এমন কি পাঁচ শত বছর আগেকারও রকমারী

তাস দেখতে পাওয়া যায় এ সময়। হাতীর দাঁত, বক্সের খোলা, মাহের জাঁব, জন্তু-চামড়া প্রভৃতি কত জিনিস দিয়ে তৈরী সে সকল তাস। রাজা প্রথম চার্লসের ব্যবহৃত এক তাড়া দামী তাস আলোচ্য প্রদর্শনীর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল। আর হাতে তৈরী পুরনো ডিজাইন বা নমুনার তাসের ছড়াছড়িও হয়েছিল কুলনার কম নয়।

আধুনিক যুগে খেলার তাস সত্যি একটি প্রকাণ্ড শিল্পে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারগণ এই খাতে করা বা রাজস্বও পেয়ে থাকেন বেশ মোটামুটি। একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকাতেই বছরে তাস কেনা হয় ১ কোটি তাড়া। ভারতেও তাস খেলার প্রসার দিন দিন বেড়েছে ছাড়া কমছে না। শুধু পুরুষরা নয়, অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও এই খেলার যোগদান করছেন, তাও লক্ষ্য করা যায়। সবকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এদেশেও তাসকে কেন্দ্র করে একটি বড় শিল্প গড়ে ওঠতে পারে। দেশীর তাসের মান আশাচর্য উন্নত হলেই অর্থাৎ আধুনিক যুগ-চাহিদা অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ ব্যবহারীনে তাস সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি হয়, তা হলেই পরমির্ভরতা আপন হ্রাস পেয়ে যাবে এবং সেই অবস্থাই কার্য।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-শ্রমিক

নদীমাতৃক বাংলা বরাবরই কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি প্রধান দেশে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা বেশি থাকবে, এ বলাবার অপেক্ষা রাখে না। তবে আধুনিক যুগে সকল দেশেই শিল্পযুগী। এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও শিল্পায়নের ব্যাপক উত্তম চলছে। সে দিক থেকে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যাও এখানে বাড়ছে দিন দিন।

পশ্চিমবঙ্গের ভেতর কলকাতা ও এর আশে পাশে অর্থাৎ বৃহত্তর কলকাতার অসংখ্য কল-কারখানা ও শিল্প-সংস্থা চালু রয়েছে। এই কর্ম-সংস্থানগুলোতে দিনরাত কাজ করে চলেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক—কেউ আঁক-কুশলী (ট্রেনিং প্রান্ত), কেউ বা তা নয়। এদের ভালোমন্দ প্রশ্ন নিয়ে বহু ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন রয়েছে সক্রিয়।

এই সুস্বায়তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় বাঙালী শ্রমিক কতজন নিযুক্ত আছে, সঠিক সংখ্যা হাজির করা কঠিন। কিছুদিন হয় রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক মি: আকাশ সান্তার পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি তথ্যবহুল এই দিক থেকে যে, শ্রমিকদের একটা পরিসংখ্যান এতে পাওয়া যায়। মি: সান্তার বা জানিয়েছেন—১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের সেরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা সংহত শ্রমিক নিযুক্ত থাকে মোট ৮, ৮৭, ৪০৬ জন। এর ভেতর বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৩, ৬৮, ০০০ অর্থাৎ বাঙালী নয়, এমন শ্রমিক ৫ লক্ষের ওপর। মোট শ্রমিকের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ জন কাজ করছে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য সংস্থায়। অপর দিকে রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৭ লক্ষের কাছাকাছি। এই পরিসংখ্যানে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের ধরা হয়নি, অন্ততঃ এটি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলায় বাঙালী শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা কুলনার কম কেন, এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। একটু বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে—এই অবস্থার জন্তু কর্মীর অক্ষমতা ও অযোগ্যতার জন্যে অনাগ্রহ ও অনুদোষগোষ্ঠিতাই বেশিটা দায়ী। আর তাই যদি হয় থাকে, তবে এই সমস্যাভাব ও দুরীভাবের পরিবর্তন না হলে নয়।



তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে খেলনা। ইম্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাথে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিদ্যুৎ, আরও বিদ্যুৎ তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু...

তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্তব্য আর কৰ্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব খেলাই তেদিন কৰ্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্ঠা। মহৎ কাকের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শান্তিময়, ক্রান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র্য আর অভিনব জীবনকে করে তুলবে স্নন্দরতর।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যজীব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টাএগিয়ে চলেছে আগামী পথে—স্নন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা যেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মস্ত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও দেশের সকলকে হিন্দুস্থান লিভার

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১০

১৮৭৭ সালের সে বসন্তে প্রকৃতি বড় মধুর হয়ে উঠলো। যে গঙ্গার সাথি বছর নৌকা চলে, তার জলে চান এল সন্ধ্যা। কিন্তু ভক্তগিণির বেলা শুরু হতে না হতে অসংখ্য আলোকিত বুকুল ভরে এল। সে বুকুলে মধু সকার হলো কি না সে সন্ধ্যার নিভে ব্যস্ত হয়ে এলো মৌমাছি ও ভোমরা। আকাশে বাতাসে এক লব আলোক বিকৃত। কোকিল ও বহু পাখীর কুঞ্জে মধ্যাহ্ন ভঞ্জনিত। এ কাণ্ডরাসে বং খেলা হবে কি না সে খবর না বেখেই হোরিগানের মহলার মেতে উঠলো গ্রামবাসী। বান্ধি গভীর হলেও শোনা যেতে লাগলো ঢোলক বাজিয়ে গান করে চলেছে কোন উৎসাহী কণ্ঠ—খেলু বহু পিচকারী নন্দলালা খেলু বহু পিচকারী।

কিশোর ভায়ের পিচকারীর রঙে নিজের মনের মাছুর কোন প্রায় কিশোরীর আত্মীয় রঙিরে হয়তো দেখে গারুক মনের ঢোঁচে। গাঙ্গুর স্বর ভাই মধুমত কোন করুণ প্রান্তিতে কিসে কিসে বাজে। আরবাগানের মাঝে মাঝে সবুহু ইলয়ার জল নিতে এসে মেয়েরা এই ভক্ত বসন্ত দিনের আলস্য মেনে অল্পভব করে। গতি হয় বীর। চলিতে চরণ ধুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বায়। যেন পথ ও পথের ধূলা বড় প্রিয়, বড় স্নহর। স্রব চরণ আর ছেড়ে যেতে চাইছে না সে ধূলা।

শহর কানপুরের সহস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সে মায়ী ছড়িয়ে পড়ে। সকালের মাছুর চলাচল ও জীবনের সুখের সম্মুখ বোঝা বার না। তবে ঠিক দুপুরে মাছুর বিরতি নেয়। মিঠাইওয়ালার দোকানের সামনে সড়ক চোখ চেয়ে বসে থাকে ছোটো একটা কুকুর। টালা, একতার বোকাগুলো কপালে পিতলের সাজ পরে চুপ করে থাকে। শহর বাজারের ধূলাতে, চান্দার বাজারের তীক্ষ্ণ পক্ষে সর্বাধিকারের একটা রিম্বিম্বি ডাব সকারিত হয়ে থাকে। উত্তম বাহুরের মতো কীপতে কীপতে ধীরে ধীরে।

কোন বৈষয়্য ঢোঁচে পড়ে না ইভানুস ট্রাইট ও তাদের সমগোত্রীর খেতল সম্ভারের। বসন্ত বলতে তাঁরা যা বোঝেন, এ বসন্ত সে বকব নয়। কিন্তু তবুও মক কি? আলস্য একটা মধুর আলস্য, একটা লবু আরানের জোয়ার শবীর মন ভাসিয়ে ডেসে চলবার মতোই অল্পকুল হয়ে হয় পরিবেশ। ক্যান্সনমেন্টের চক্কা স্নহর মাছাগুলির দুইপাশে বড় মা মেহগিনি, শিরীষ, বট, অম্বা, শিপুল ও সেগুনার গাছ। বিকৃত পল্লবিত তাদের শাখাপ্রশাখায় কি স্নহর স্বর তোলে বাতাস। সে পথে প্রত্যহ প্রভাতে অম্বচারণ। বাছাই করা স্নহর ডেজবী ঘোড়া

ও খোঁজী। সহিসর সন্ধ্যা মার্জনার তাদের গা থেকে আলো ঝিকবে পড়ে। আর উৎকৃষ্ট জিনপোষের সাজে তাদের আরো স্নহর দেখায়। অশিকিত সে কুয়লম তুলকি কয়েম চলে। চলতে চলতে কথা হয় ছুই আরোহীর মধ্যে। গলক ও পোলো প্রাউত ভৈরী হলো কিমা—মহলীর ধরবার জন্ত কতেহপুর্ ও নবাবগঞ্জে বাবার আর কত দেখা—ভালো ছুইল এনে দেবে কলেছিলো পারি সাহেব—কই, ছিল না তো? বড় চলে চালা হয়ে গিয়েছে পারি। এই তো। কলকাতা থেকে ভালো জ্যাতি আনানো, ভাই কি পারলো? যদি জ্যাতির কথাই উঠলো, তবে বলা চলে বিটুরে নানাসাহেব যে জ্যাতি বাইয়েছে, তারপর আর কিছু মুখে লাগবে না। ঝাঁটি কংসী জ্যাতি। আর সেই জালেশ? কি চরংকার ভাবে রাখা। নানাসাহেবের চেয়েও তার মতকারী আজিমুদা এ সব জানে ভালো। আর এ সব জিনিস এসেছে ওখানে নানাসাহেবের বা সেই বড়ো পেশোয়ার আমলে।

—কিন্তু নানাসাহেব গেল কেন এখন?

—খব করতে।

কি হাসির কথা। আচ্ছা, কথার কথার মনে হলো, এই যে শোনা গেল ভালভাবে নতুন করে আশ্রয় নেবার মতো সুরকিত একটা ঝাঁটি বানানো হবে? তার কি হলো?

—ইলয়ার ভানেন। তবে তেমন দরকার কি?

সকালের অম্বারোহণ পর্ব শেষ হলে প্যারেড বা কাছারীতে হাজিরা দিতে হয়। তার আগে প্রতিরাশের সবুহু বন্দোবস্ত। প্রশস্ত টেবিল। তাতে অল্প কাচ ও ফটিকের বাসন। ইল্যাকের ছাপসারী এই বাসন কলকাতার বন্দর হয়ে পৌঁছিয়েছে এখানে। ভিম, বেকন, টোগট। স্বর্ণাভ মাখন গলে গলে করে পড়ে। কাঁচের বাটিকে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অকলের উৎকৃষ্ট মধু। মিল্লা ও আঝা উত্তরের আপেল, পীচ নানাপাতি। উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাবের আছুর। ফটিকের আধারে আছুরের গুহ। রাসে টালরল সে কল সজারের কি বিনীত প্রভাটিকা। কুকুরার কৃত্যদের সমস্ত অপেক্ষ।

ভাষ্যর নতলে বা ম্যাপাজিল পড়া। বিপ্লবের আবার তেমনি এলাহী মধ্যাহ্নভোজন। সন্ধ্যার ডিনার, নাচ বা নতুন কোন প্রদর্শন। মহিলাদের সময় আর কার্টোজ কোলসির বা সব বার হারবার মাদের। বড় কুঠুরীতে ছুইজন আরা নয় দেখে যেমন পোলা মাখার। মেমসাহেব ঠাণ্ড হয়ে চুপ করে থাকেন। কয়েক

বেসমের সে আভরণ তাকিরে গুঠে। চামড়ার টান লাগে। দাসীরা তখন উত্তপ্ত জলের বড় বড় পাঞ্জা আনে। সে বন্ধ কুইয়েতে জলের বাষ্প উঠে গা ভিজিয়ে দেয়। নিপুল হাতে দাসীরা বেসম তুলে কেনে। ভারপূর্ণ ল্যাভেণ্ডার গন্ধী উক জলে নেমে অবগাহন।

হাসনের পরিচয়ে এলিয়ে পড়ে বরদহ। সন্ধ্যার স্তাবে বা বাগান পাটিতে বা ক্যান্টোফেরাে অনাস্থীর কোন অক্সিগাং মেজরের সঙ্গে কথা কইবার সময়ও সেই অলস লাস্ত নয়নের কোণে ডেতে ডেতে পড়ে। পুরুবক্ট থেকে সৌন্দর্যের ভবনভি ভ্রমতে ভ্রমতে কোঁচুক ছলে পালকের পাখা দিয়ে বৃহৎ ভাঙনা করতে চান সুন্দরী—কিন্তু কেমন বেন ভলীমাটা আদর করবার মতো হয়ে যায়।

ব্যাঙ বাজে। ব্যাঙে বাজে পরিচিত সুন্দর সুন্দর গানের সুর। কানপুরে বসে ব্যাঙপাটির কাছে কেউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আশা করে না। টুকরোটাকরা চালু গান ভুলেই মনটা খুঁদী হয়ে ওঠে। বড় বড় মোমবাতির আলোতে ছায়া নাচে খেয়ে। বড় বড় দরজা দিয়ে কুশল ভুতারা পানীর নিয়ে চলাকেরা করে। হাসি, আলাপ, কথাবার্তা। বিসেত থেকে অবিরাহিত বোন বা মনদকে ভরসা দিয়ে আনিয়েছেন ঝাং, সেই সব মহিলারা বিবাহযোগ্য ছেলেদের কোণে টেনে নিয়ে আলাপ করেন। ঘরের মাঝে কাপেটে দুই পা ফাঁক করে পাড়িয়ে কোনো কুস্তিপুরুষ নেপাল গা বধা বা শিশুরী বুড়ে বীর কৃতিত্বের পুনরাবুত্তি করেন। কথাবার্তার মধ্যে কখনো বা নেটিভ ব্রহ্মাসঙ্গের কোন আঙ্গল নিরুৎসাহের কথা এসে পড়ে। কি বেশ করয়ে তারা। কি বেন শোনা বাচ্ছিলে?

য়েজিনেটের স্তাব ঘরের চুচা থেকে কানপুরের আকাশে

সিংলাঙ্কিত ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে। সিন্ধের খাবার অরক্ষিত সন্ত্রাজীর মুকুট।

আর -ঐ পতাকার আধাসেই অরক্ষিত বেতাজ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জীবাণ।

সন্ধ্যার সে বসন্তে চন্দ্রমের পিভামহ চন্দ্রনের সাক্ষাখানি চারিপাশে কুমায়ূনের জু-একুতি সহসা অন্দর হয়ে উঠলো। সমস্ত বনভূমি এক জাহ্নবীকে কেটে পড়লো গুহু গুহু কুল ও কলে। কুল ও জাহ্নবী বনজ কদের গন্ধে জুগু মৌমাছিই ডিঙে জরালো না। বুধাল ও চিত্রল হরিশের সঙ্গে সঙ্গে ভালুককে জায়র মতো চলাকেরা করতে দেখা গেল। পোছা পোছা কল হিঁড়ে সোড়ীর মতো মুখে পুর দিয়ে ভালুকশিশু মায়ের জুবার দিকে চেয়ে থাকলো ঝাড় বাঁকিয়ে। অপরূপ ঐশ্বর্যময়ী এই অরব্যভূমি। অজস্র তার প্রোলাভন ইতস্তত হুড়ালো, ছেটালো। কাঠবিড়ালী, বেছি, খরগোশ, সজ্জাক এইসব ছোট ছোট প্রাণীদেরও বাসের মরকত গালিচায় উঠে পাশে খেলা করতে দেখা গেল। সাক্ষাখানা থেকে দেখাইল দূরে যে পার্বতী নদী আছে, তার দিকে একটিন গামাবলুক বসলেও জাল ঝাঁবে জালো চন্দন। সকালের রোয়ে আভগু হয়েছে অরব্যের শিবর। ভালপালার কীকে কীকে রোহ পড়েছে বাসে। তন্তু একটা মিল্ল সোয়তে বহুর বাতাসের গতি। নিঃশব্দ অতি নিঃশব্দ পরিবেশ। শিকারীর শব্দক্ প্রবেশে চন্দ্রনের মনে হলো দূরত্বের অলকানন্দা নদীর গভীর লবণ বেন শোনা বাচ্ছে। বাকাল তাকে আর অজি

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন ...

ধাতের সারাংশ সম্পূর্ণ শরীরের প্রয়োজনে নিয়োগ করলেই অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। ডায়া-পেপসিন ব্যবহার করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন, কারণ ডায়া-পেপসিন খাদ্য হজমের সাহায্য করে।

ডায়াপেপসিন



দুবেলা খাবার সময় নিয়মিত ছোট এক চামচ খাবেন।

ডায়া-পেপসিন কখনো জন্ডাইল দাঁড়ায় না।

ইউনিফর্ম ড্রাগ • কলিকাতা

চোখে সব দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো চন্দন। এবার শিকার জমবে। শিকারের প্রকৃষ্ট সময়। নদীর ধারে গিয়ে সে বন্দুক নামালো। গতকাল দুটি পাখর দিয়ে জলে বাঁধ দিয়ে গিয়েছিল আজ বৃকে নিচু হয়ে পাখর সরিয়ে সরিয়ে দেখে তার জরাজীর্ণ প্রশান্ত মুখখানি হাসিতে ভরে গেল। রূপালী লম্বাটে মাছের বীক সিংহর হয়ে আছে সেখানে। চূপ করে আছে। জাল কেলে দিলো চন্দন। তুলে আনলো কয়টা মাছ। তারপরেও ঘাসের 'পরে নিচু হয়ে জলের দিকে চেয়ে রইলো। ঠ্যা। এবারকার মতো আশ্চর্য স্তব্ধ বোগাবোগের বছর আর কখনো আসেনি। তার মুক্তিতে নেই। প্রকৃতি এমন কয় স্বজ্ঞান স্বফল্য হচনি। এবার সে বুঝা ম্যাকমোহনকে চিঠি লিখবে। লিখে জানাবে যে শিকারের ও মাছ ধরবার এক বর্ষ সন্মোগ উপস্থিত। সাহেব চলে আসুক। অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছে। সাহেবকে বদি আসতে হয় তো তাড়াতাড়ি আসতে হবে ঘরে, বাবে চন্দন। ছুটি মজুর। কিছুদিন ঘরে না থাকলে হবে না।

কিরতে কিরতে সাক্ষাৎখানায় বাংলাঘরের কার্টের ছাদ চোখে পড়লো। ছাদটার পেছনে শাখাপ্রশাখার ফুলসজ্জারে কেটে পড়ছে এ্যাকাশিয়া গাছটা। চন্দন এসে সেবার লাগিয়েছিলো।

দেলে বেতে হবে চন্দনকে। ঐ হতভাগী চন্দনের জন্তে। চন্দনের ছেলে আর বৌ চন্দনকে বন মনান্তে পারে নি। 'আবার সেই বনমাদেশ ছোট্টো পালিয়েছে। জোয়ান রক্ত। সোব-ই বা কেমন করে পের চন্দন। ও বরষে কি কল! খুঁ খুঁ দেখলে মনটা সোলে না? নিজের বৌবনে সে-ও তো কম রসিক ছিল না।

সহসা চোখের সামনে পড়ে তাঁজা বাঘের খাবার ছাপ। একবারে তাঁজা। আবার হাসির রেখার ভেত্রে পড়ে চন্দনের মুখ। এ হলো ঐ তরুণ বাঘটা। বাকে সে বাচ্চাবেলার দেখেছিলো মায়ের সঙ্গে খেলতে ঘাসের 'পরে। যে কিছুদিন ছিলো ঐ কালাভুজির হাটখরের পেছনে পরিত্যক্ত কাঠগেলার জলসে। এবার সে মদক্ষরণ করে জোয়ান হয়ে উঠেছে। সঙ্গিনী খুঁজে গম্ভীর বাক্তে আজকাল সে প্রায়ই ডাকে। ডাকে রাত্রির প্রথম প্রহরে। কতদিন শুনেছে চন্দন। সাহেবকে বলবে এটাকে নয়। ঐ কানী বাঘটাকে মারো: সাহেব। এক চোখ নেই। কিন্তু জলল খেকে মোব বাছুর ধরে বড় আলাতন করছে।

চন্দন চলে, আর নির্ভয়ে তার গায়ের কাছে, দূরে, ঘাসের 'পরে, জালের 'পরে উড়ে বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। কত রঙের, কত জাতের। বনভূমির খুশিরালীর দূত এরা। কত রকম কুন্ডই বে শোনা যায়। চূপের মতো লালচোখ বীকিরে, রঙীন ল্যাজ ঝাপটে তারা কত রকম বে বাহার দিয়ে বেড়ায়।

সালাখানদ পৌঁছিয়ে মাছের বোঝা নামায় চন্দন। মৈনিতাল থেকে জঙ্গলী খবর পেয়ে চলে বাছেন এক মেডিক্যাল অফিসার। তাঁর টেবিলে গরম মাছ ভাজা ও ককি পৌঁছিয়ে দেয়। ভাস্কর্য শৈব মুসাবিলা করতে বসে। তার বদলীতে যে কাজ করবে সে লিখতে জানে। তাকে নিয়ে বসে।

বিকটে পাশায়তনের বাঙ্গোর বসে বুড়ো লম্বী চিঠি পেরে আনমনা হয়ে চেয়ে থাকেন।

চন্দনের চিঠি তাঁকে অনেক পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দেয়। চন্দনের প্রেহা জীতি ভরা রেখাঙ্কিত মুখখানি মনে পড়ে। চন্দন আজও মনে ভাবে হয়তো, যে ম্যাকমোহন সেই একই মানুষ আছেন। কিন্তু ঈশ্বর জানেন ভরতপুর ও বর্ধা, বোইটক, ও পিত্তারীভূত কেন সে অসমসাহসী ম্যাকমোহন অনেক বদলিয়ে গিয়েছেন। যে ম্যাকমোহনকে তাঁর সিপাহী সওয়াররা ভালবেসে বুঝা সাহেব বলতো—যে ম্যাকমোহনের সঙ্গে কানপুরের হুইলার বেঙারাতে বাজি রেখে চাঁদমারী এ্যাকাটিক করতো, সে ম্যাকমোহন আর নেই।

চিঠিপানা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকেন ম্যাকমোহন। তাঁর বাগানে বড় বড় ঘাস হয়েছে। ঘাস ফুলের গুপার ফড়ি উড়ছে। মালীর ছোট ছোটো ছুটেছুটে সেই প্রজাপতি ধরছে। মনে পড়ে যায় অনেক কথা। নিজের বোন এমিলির কথা। আর ভাইটের মুখখানিও মনে পড়ে। অন্তরটা কুন্ডী বকেই কি ছোটোটা মুখ অমন সুন্দর? সুন্দর দেহ সুন্দর মনের আধার তো নয়। কেন এমন হলো? তবে তার দুর্ভাবতার তাঁর জীবনটা মিছে হয়ে গেল কি? তা নয়। আসলে ম্যাকমোহন শান্ত হয়ে গিয়েছেন। স্তেতবে ভেতরে কিমিয়ে এসেছে বক্তকণিকা। ম্যাকমোহন নতুন করে আগ্রহ নিয়ে শুরু করেছেন একখানা বই লিখতে। 'Fifty years in India'—ঐ 'বইখানায় তিনি হিন্দুস্থানকে যেমন জেনেছেন, তেমনি লিখে যাবেন। এদেশের মানুষের পরিচয়—তাদের আচাৰ ব্যবহার, উৎসব, রূপকথা। এখন বেন ম্যাকমোহন বুঝতে পারেন ঐ দেশটাকে কেমন করে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি। ঐ দেশটাকে, এ দেশের মানুষগুলিকে। মনে হচ্ছে বয়সই হলো, সক্ষর কিছু করলেন না। সক্ষর যদি কিছু করে থাকেন—সে হলো এ দেশের মানুষের স্বতঃকৃত ভালবাসা। তাঁর সম্ভব ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বা তারা ঢেলে দিয়েছে। এর জন্তে স্বদেশবাসীর থেকে কিছুটা খুঁ সরে আসতে হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে বেন 'কতি বোধ হয় না। এখানকার বিজ্ঞাপী আকাশ, সবুজ মঠ, অরণ্য, এখানকার সহজ সরল গ্রামীণ মানুষগুলি, এদের সঙ্গে দীর্ঘ পক্ষাশ বছর বাস করেছেন তিনি। আজ সন্তরের প্রান্ত্রে এসে মনে হয়। ঐ দেশের মানুষ, পরোক্ষে তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মনটা বৈষ্ণবপ্রণ, ক্ষমাপ্রবণ হয়েছে। বাইরেটা টিলেগালা হয়েছে। সাধে কি আর সাহেবরা বলে, 'বড় ওরিয়েন্টাল ঢঙের হয়ে বাছ তুমি।'

তাঁর বাংলোর সামনের জমিটুকু নিয়েছে একটি মালী পরিবার। কঠোর পরিশ্রমে আর হুনিপুণ বৈষ্ণে চাব করেছে জমি। বনেছে সজ্জা মোতিয়া, বেলাফুল, চামেলি। জমীম আগ্রহে ঐ দরিদ্র দল্লভি এক একটি গাছের জন্ম থেকে পুষ সক্ষর পৰ্ব্বত বহু নেয়। ম্যাকমোহনেরও মন্দ লাগেনা। লীভের অনেকগুলো বছর ছুটোছুটি করেছেন। লড়াই করেছেন। সে সব কাজকে বহনীর বলেই জানতেন। এ কাজটাকেও এখন তুচ্ছ মনে হয়না। মনে হয় মন্দ কি—বাগান করে আর মৌজরী পারীদের দেখে কেখেই তো কেটে বাবে বাকি সির ক-টা!

চন্দন কি বুঝতে পারবে তাঁকে? শিকার খেলবার মন আর নেই। তবে ঠ্যা, মাছ ধরবার কথাটা মন্দ নয়। আর ঐ সময়কার অরণ্যপ্রকৃতিও তাঁর ভালো লাগবে। কিন্তু এখন তো

তিনি যেতে পারবেন না। সহসা কি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলো কে জানে। বার ভ্রম তাঁর মতো বুড়োজ্ঞানীদেরও ডাক পড়েছে এলাহাবাদে। তিনি অবশ্য শুনেছেন, যে নেটিভ সিপাহীরা গোলমাল করতে পারে। কিন্তু সে সংবাদের কোনো ভিত্তি আছে কি? রেভিনিউ কলেজের ফেরার বলছিলেন বটে সেদিন।

ম্যাকমোহন চিঠি লিখতে শুরু করেন। তাঁর খুবই হুঁতুগা, যে চম্বনের সাহেব আমন্ত্রণ তিনি রাখতে পারছেন না। একদিন তিনি বলেছিলেন বটে, যে 'হাও, আপনা স্বর মে' সি কা দিয়া লালাও'—অর্থাৎ প্রস্তুত হও—আমি আসছি নিমন্ত্রণ রাখতে। তবু দেখা যাচ্ছে সেদিন আজ-ও আসেনি। যা হোক, আবার দেখা যাবে। চম্বনের সাহেব বুড়ো হয়েছেন বটে। তবে এমন বৃদ্ধ হননি, যে চম্বনের নিমন্ত্রণ না রেখেই মরে যাবেন।

বুঢ়া সাহেবের হাতের হিন্দী লেখাটি চমৎকার। যেন ছাপার অক্ষরে লিখছেন। চিঠি শেষ করলেন। বারান্দার এসে আবার পাড়ালেন। তাকালেন অ-কৃপন করে। কি প্রশান্ত উজ্জল নীলিমা আকাশের আকাশে। ধরতির বুক থেকে কি তপ্ত সুবাস উঠছে আকাশের দিকে। সহসা ম্যাকমোহনের মনে হলো—এত সুন্দর... এমন মনোহরিণী বসন্তসীলা আর যেন তিনি দেখেননি। সর্বত্র-ই যেন একটা অদ্ভুত প্রতীক্ষা, আনন্দ ও উত্তেজনা সঞ্চারিত। ঐ মৌন প্রকৃতির মধ্যে-ও।

ইভান্স-এর প্রেমিক চোখে মনে হলো এমন অপূর্ণ বাসন্তী শোভা আর কখনো দেখেনি সে—এই সাতাশতে যেমন দেখছে। রেজিমেন্টের অনতিদূরে চৈত্রামদের-ই ছোট্ট একটি বাগো নিতে ইচ্ছে ছিল ইভান্সের—বাড়াটি নিল। সাজাগ-ও সাগামতো আসবাবে। মেঝের গালিচা, কুর্শী, ডেকচেয়ার, সেজানিতে বাতি, এই সব। তবে হুইলার সাহেবের ঢালা জুজুম। কোন ইংরাজ অফিসার ক্যান্টিনমেন্টের বাইরে রাত কাটা'ত পারবেন না। কানপুরে সিভিলিয়ান, মিশনারীদের সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নয়। প্রয়োজন হলে তাঁরাও আসবেন ক্যান্টিনমেন্টে।

তা হোক, তবু অবসর বিনোদনের সুন্দর পরিবেশ। ইভান্স-এর নেটিভ পল্লীতে চম্পার বাড়ীতে যেতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু চম্পা মেহেরী রঞ্জিত ছোট হাতখানি চাপা দিয়েছে ইভান্স-এর হুখে ইভান্স বলেছে—কেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না?

—কিসে?

—আমার প্রেমে?

—আমার প্রেমের মাহুয যে আরো অনেক আছে। এখন মাহুযটি পেয়ে যদি তারা অনিষ্ট করে?

—কি হবে?

—আমার হৃৎ হব না?

বলে চম্পা খিলখিল করে হেসেছে। হৃৎখের প্রকাশ এমন হালিতে হয় কি না। ইভান্স সে প্রশ্ন তোলেনি। চম্পার হাসিটিও

যেন সুন্দর। ইভান্স মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছে—চম্পা গান কর।

—কোন গান?

—ঐ তোমার প্রাণ চার।

ইভান্সের অনেক আল্পের ব্যবহারে অনেক সময় চম্পার তাকে ছেলেমানুষ বোঝে হয়। ইচ্ছা করে সে গাঁয়ে শোনা রামসীতার বিয়ের গান ধরে:

—জনকপুরসে রামচন্দ্র কী সীতা লে কর, আরে—

রাম ও সীতার মোতির কুণ্ডল, সোনার মালা ও আরত নরনের বর্ণনার কতটুকুই বা বোঝে ইভান্স। দেখে চম্পার সহানুভূতি নয়ন ঐ গ্রীবার মনোহর ভঙ্গিমা। যন কালো চুলগুলি ষড় করে টেনে তুলে বেণী বাঁধা। যন ভুজুর নিচে কালো চোখ। কানে ও মি'থিতে সাধারণ গহনা। কালো বেশমে নানরঙের কাজ করা ঝগড়া। সবুজ চোলি ও সোনালী আঙ্গিরাতেও চম্পার যৌবন শাসন মাননি। ওড়নী নেমেছে তার পরে। ওড়নীর উদ্বেগে কিন্তু আবরণ নয়, অভরণ হয়ে ওঠা। তাই লজ্জায়ের চিকণ রসমলের জালি কাজের ওড়নী গলা ছুঁয়ে পড়ে আছে। তার কাঁকে নিটোল ও কটিন দুই মুগ্ধকোরকের আভাস অতি স্পষ্ট।

ব্রিজহলারীর দেখাদেখি চম্পা-ও আতরজলে গান করে। আজ মুহূ একটা সুগন্ধের জালি অল্প একটা অল্প ওড়নীর মতোই তাকে ঘিরে রয়েছে। গান শেষ করে চম্পা চার ইভান্সের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের রাত্তি আলো তার হুখে চোখে পড়ে আনন্দের বিজয় সৃষ্টি করে। সত্যই আশুন। মরিয়া যৌবনা চম্পা যেন আরো কুলে কুলে ভরে উঠেছে দিন হতে দিনে। বিমুগ্ধ ইভান্স চেয়ে-চেয়ে একটা কথাই বলতে পারে—চম্পা, বড় সুন্দর তুমি।

চম্পার টানা টানা চোখ হাসে। বলে—তোমাদের মেয়েরা আরো কত সুন্দর।

—তোমার মতো নয় চম্পা।

—কিন্তু আমি তোমার উপর রাগ করেছি সাহেব।

—কেন চম্পা?



—সেখ শহর শুধু মাল্লব হাঙ্গর আবার দিকে চেয়ে। আমীকে ভূমি কেমন ভালবাসে? এখানে তো একাধন ও রইলে না। বলেছিলে আমার তোমার একঘর হবে। সেখানে যেন কত কি?

—চম্পা, তা হলে ভূমি সুখী হতে?

—নিশ্চয়।

ইভালের বৃক মাথা হেলিয়ে বলে চম্পা। চম্পার স্মৃতি নিখাসের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বুকখানাও যখন তোলপাড় হয় তখন ইভাল অনেক কথা ভাবতে পারে। তার সত্যি অস্তিত্ব বুঝসা অবশ্য নেটিভ একটা নাচগাল-এর সঙ্গে এতটা আন্তরিকতা পছন্দ করে না। আর ইভালও মনে মনে জানে। যে এই মেয়েটাকে নিয়েই সে কিছু চিরকাল পড় থাকবে না। তবে এখন, এমনি সময় তার মনে হয় মন্দ কি। তার নজীর তো এই কানপুরেই আছে। সে যদি বিয়ে করে এই মেয়েটিকে? প্রাণটার সাহেবদের মতো কিছু সম্পত্তি করে কেলে এই উত্তর প্রদেশে? মন্দ কি? বিশাল বাগানের মধ্যে প্রশস্ত বালো বাড়ী, গোড়োঘোড়া, চাকর, দাসী। সে ও না হয় আলবোলা ফরসিতে তামাক খাবে—নিচু চৌকিতে বসবে—প্রয়োজনে দেশী খানা খাবে। যদি ছেলেমেয়ে হয়? তাও ভারতে পারে ইভাল এখন, তার রক্ত ঐ কৃষ্ণাঙ্গার রক্তে মিশ্রিত হবে। স্ট্রাইট হবে নব নব রক্তকণিকা। বর্ষসঙ্কর শিশুর হল। তাদের শিক্ষারীক্ষা সেদিকে অবশ্য নজর দিতে হবে। আর, নিজেকে ছোট করবার কথাই বা সে কেন ভাবে? এমনও তো হতে পারে যে চম্পাকেই সে গাউন পরিয়ে জাভে তুলবে। চম্পাকে শিখিয়ে পড়িয়ে মাল্লব করবে?

—কি ভাবে?

—কিছু নয় চম্পা।

—আবার কথার তা জবাব দিলে না?

—ও। কি জগর, কোন কাণ নেই, শহরে ও বারাকে হিন্দুস্থানীরা বড় দ্বিষ্ট হলে পড়েছে। মিছেমিছি গুজব উড়ছে বাতাসে। এমন সময় শুধু ক্যান্টনমেন্টের কেন, সকল ইংরেজদেরই থাকবার মতো ব্যবস্থা ক্যান্টনমেন্টেই করলে ভাল হয়।

—কেন?

—এমনিই চম্পা। ভূমি বুঝবে না।

—ত, সকলে তো বাচ্ছে না শহর ছেড়ে?

—ছাঁচ সব সাহেবরা বাবে কেন? তাহলে সঙ্গেই করবে না ব্যারাক আর বাজারের মাল্লব?

চম্পা যেন বুঝতে পারে না এমনই বিশ্বাসে ডাকিয়ে থাকে। ইভালের সহসা মনে হয়, এত বড় কথাটা বলে সে ঠিক করেনি। একটা অসতর্ক কথাই চাকরার জন্ত সে আজ বাজে কথা বলে। বলে—সাহেবরা কি ভর পার যে চলে বাবে?

—সাক্ষ্যে কখনো ভর পার?

চম্পাও সায় দিয়ে বলে। ইভাল বলে—কখনো ভর পার না। তোমার দেশের মাল্লব গান শুনে কীসে, মন্দ খেলে কীসে, শরীয়ে আখাত লাগলে কীসে। আমরা কীদি না।

—নিশ্চয়।

—সেখ, সাহেবদের আন্দর ক্ষমতা না থাকলে কেমন করে তারা এত বড় দেশটাকে চালাচ্ছে?

—নিশ্চয়।

ইভাল বলে—চম্পা, ভূমি নাকি বাছ মগনলালের বাড়ীতে? বড় জলদার?

—ভূমি মানা করছ?

—কত টাকা পাবে?

—হানেক।

ষাড় কাৎ করে চেয়ে থাকে চম্পা। ইভাল বলে—কিসের তোমার এত দরকার চম্পা? এত টাকার?

চম্পা এবার বকিনী মোহিনী। বলে—সাহেব, আমি ঝ কিসে জানব। ফাগুয়ার রঙ তোমার সঙ্গে হোলি খেলব।

—Heathen festival!

—রঙ দিয়ে তোমাকে রাজ্যব। ভূমিও রঙ দেবে আমাকে। দেবে না? এই এখানে রঙ দিতে পার সাহেব?

চম্পা ইভালের হাতটা নিয়ে নিজের বৃকের ওপর ধরে বলে—ছংপিণ্ডের শব্দ শুনেও পাও সেখানে ঝ চায় চম্পা!

—You vixen!

বলে চম্পাকে কাছে টানে ইভাল।

মগনলালের সে জলসা সাক্ষর হয়ে যায়। তবু ভেতরের ঘরে বাতি জলে। মগনলালের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন কাকীর থেকে। চিরকাল তাঁর পরিবার সরকারের মোহরাক্ষিত ছাড়পত্র নিয়ে খাজশত্রু সরবরাহের ব্যবসা করেছেন। আজও তাঁদের সে ব্যবসা আছে, কিন্তু রেজিমেট বা রিসালার বানিয়া কারবারীর চিট তাঁকে সেননি ফৌজী কর্তৃপক্ষ। বড় অপমানিত হয়েছেন তিনি।

তাঁর কুঠিতে এক গালিচা বিছানো ঘরে অনেকে আজ সমাগত। কানপুর ক্ষেতপুত্র ও বিহুরের সম্ভ্রান্ত লোক কয়েকজনকে দেখা যায়। সম্পূর্ণরূপে পাশে বলে শোনে চম্পা। আন্দর সব কথা। চৈৎগার স্বয়ং, এক আরো বীরা আছেন—তাঁদের আর তাঁর মাঝখানে যে দুজর খাদ। সামাজিক বাধা। কি এমন ঘটনা যে সেই বাধায় কোন অস্তিত্বই আজ নেই? চৈৎগার বলেন—বিল্লিতে মোগলশাহী কারের হোক, বা এখানে পেশোয়ারা হিন্দুসাক্ষর কারের কখন—আমাদের তাতে স্রাবধা হবে। এই একই কিংবদন্তীর জেরে সে অনেক ভাল।

—এরা এর মধ্যেই টাকা সরিয়ে নেবার মন্তব্যে আছে খাজাকিখানা থেকে।

—এদিকে হল কি?

—আমরা বাজার থেকে টাকা গুটিয়ে নিচ্ছি। সোনা তুলে নিমি। টট করে বাজার হুড়লে এক সঙ্গে শ' তোলা সোনা মেলা হুঁশিল।

—বলছেন!

—বাচিয়ে দেখুন।

—কিন্তু খাজাকিখানার টাকা?

চম্পা একটু কেসে জানান দেয় নিজের উপস্থিতি। বলে—ঝুড়া ছইলার শালা মনের মাল্লব পেশোয়ারাকে তিনি মোহ জানেন। টাকা জবাব হিম্মতের কারেও করতে পারেন।

কর খোড়া তাঁর জীভ-কুঁচি চম্পার ওপর পড়ে। জবাবের কথা

হয়—যানবাহনের ব্যবস্থা কেমন! নৌকো না কি গলার কার তেমন চলবে না। নৌকো তুলে ফেলা হবে। ডাকগাড়ী, একা, টাক্সা বা পাড়ীও বাতে সহজে পান সহরে ভারতীর বাসিন্দারা, তাও দেখতে হবে। চম্পার মনে হলো আলোচনাটা হচ্ছে এমন ভাবে, যে এই কথাই হচ্ছে, প্রয়োজন যেন সমবেত মানুষদের ব্যক্তিগত অন্তর্বিবে না হয়। আবার নিজেকে তিরস্কার করলো সে। হি! এমন ছোট মন তার?

আরো কিছু করার পর তার সঙ্গেও কথা কইলেন মগনলাল সহস্র কণ্ঠে। তার প্রাপ্য টাকা তার হাতে দিলেন। বললেন—টাকার আমায়ের অনেক দরকার হবে। তখন যেন পাই। ব্রাইটের বিবির সঙ্গে দোস্তি আছে ত?

—হ্যাঁ, জী।

—বলো অত পূহনা যেন না পরে। লুঠ হয়ে যাবে। পারো ত কিছু চেয়ে নিও।

যখন উঠে দাঁড়ালো চম্পা—তার সে উৎসব সজ্জার দিকে চোখ না পড়ে পারলো না সকলের। সকলেরই মনে অভিশঙ্কি আছে, জালা আছে। কিন্তু বেছায় আগুনে পুড়ে মরতে এই বৌবন-মুকুলমঞ্জরী কেন এলো? তাঁরাই বা কেন তাকে ঢেলে দিচ্ছেন মহন নিশ্চিত জেনে? না কি, উদ্বেগ এমনই বৃহৎ যে তাতে এমন প্রখর চম্পাকালি অনারাসে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ভাসিয়ে দেওয়া চলে?

কিরতে কিরতে সম্পূর্ণের সেই কথা মনে হয়। সে না বলে পারেনা—চম্পা, তাকে টেনে এনে যে কি করলাম—

চম্পা ঈষৎ হাসে। হাসি ছাড়া তার মুখে কোনদিন কথা শুনলো না সম্পূর্ণ। কি সুখে, কি দুখে। চম্পার হাসি আজ তাকে লজ্জা দেয়। চম্পা বলে—বুড়া আমি যদি নিজে না ভাসতাম, তুমি কি তোমার এই মগনলালের কি ক্ষমতা যে আমাকে দরিয়ার ভাসাও?

সম্পূর্ণ তারার আলোয় তবু চম্পার মুখে উত্তর খোঁজে। বলে—চম্পা, মাগ করিস। তোর তো চন্দন ছিল। তবু তুই মানলি না কেন? কেন এ পথে এলি?

—বুড়া, সব কথার জবাব হয় না।

জবাব হয় না, জবাব জানে না চম্পা—কি জবাব সে দেবে সম্পূর্ণকে? হ্যাঁ, তার চন্দন আছে। কতখানি আছে, সে কে বুঝবে? চম্পা জানে তার রক্তে রক্তে আছে, তার হৃৎস্পন্দনে আছে। শৈশব থেকে চন্দনের সঙ্গে সে যে এক নিয়তিতে বাঁধা। সে কথা কাকে বোঝাবে?

তবু কেন অনিশ্চিত এই ভাগ্যের দরিয়ার, এই বৃত্তার আব্বাঘন গোপিয়ে পড়তে বার বার সাধ যায়? কেন সর্বনাশ তাকে এমন করে ডাকে? এ কোন প্রেম যে চম্পা স্থির থাকতে পারে না? এ প্রেম কি চন্দনের প্রেমের চেয়ে অনেক শক্তিশালী? না, চন্দন আর এই প্রেম এক হয়ে গেছে? বৃহতে পারে না চম্পা। তবে এই তার বিধিগণি। সে ঘরের নয়, সে পরিবারের নয়, সে স্বপ্ন শান্তির সাধ কামনার নয়। তার ভেত্রে অস্ত নিয়তি। অস্ত পথ। তা যদি না হয় তো সেই বিদ্বত লৈখ্য থেকে কেন প্রতিজ্ঞা তেঁও হতে তেঁওয়ের

মাথার সে উৎকণ্ঠ হয়েছে বার বার? কেন চন্দনকে পাবার মুখে শৈশবের সেই নাড়ীতে নাড়ীতে জড়ানো সঙ্কল্পের চুলকানো বাধা? প্রেম, তাই তার কাছে গরল মিশ্রিত। বিবকল্পার মতো প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সে অভিপ্যাকি চম্পা অবহেলা বহন করেনি? অবহেলা? হায় যদি অবহেলা হবে তো আজ ও কেন হ্রস্ব কীদে? কিরে যেতে চার সেই ঘরে, সেই গ্রামে, সেই নদীপ্রান্তের বটগাছের শীতলহারার—চন্দনের সঙ্গে?

তার ছিলো গৃহপ্রান্তে প্রাণীপ হবার কামনা। তাপ্য তাকে করেছে দাবানল সকারী ক্ষুদ্রিক। এখন তাকে জ্বলতে হবে, আর আলিয়ে চলতে হবে—এই তার অলজ্ঞা পরিণাম।

সম্পূর্ণেরা তাকে সাহায্য-ই করেছে। সস্তরভঃ চম্পার মনের এই কথাগুলিতে কোন শক্তি ছিলো। সম্পূর্ণের মনে হচ্ছিলো এ নীরবতাও সুখের। চলতে চলতে নিশীথের এ প্রশান্তি বড় ভাল লাগলো তার। অক্ষুটে বললে—বড় সুন্দর হয়েছে দিন।

সত্যবানের আকাশ চিত্রে একটা উজ্জ্বল সূর্যেরা জলে উঠে নিতে গেল সম্পূর্ণের কথার জের টেনে।

সেই সময় বিজ্ঞানের সজ্জা অন্তরমহলে চলতে চলতে মগনলালের সহস্রা মনে পড়লো একটা কথা: মনে পড়তেই এ-ও বুঝলেন, যে সারাসক্যা এই ছোট কথাটি মনের তলার ঘূর্ণপাক খাচ্ছিলো। হাত-পা খুঁজে চৌকিতে বসেছিলেন। একটি বালক ভৃত্য পা দাবাচ্ছিলো। শিশুপাই আছে। গোল ও বাতের ব্যাধ্য কই পান মগনলাল। কিন্তু এই খবর বা জরুরী, তার কাছে আর কিছু ভাববার নেই। তিনি বললেন—আমার ভাতিশাকে ডাক!

—এখন?

—হ্যাঁ বেওকুব!

জরুরী এন্তোপা পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলো ভাইপো। মগনলালের ছোট ছোট লাল চোখ হুটী অগহিহু। তিনি বললেন—সে হাজার মণ আটার কথা ডেবেছ?

—কোন আটা?

—সেই গাজিপুয়ের বরদায়ের পাঠানো?

—হ্যাঁ। বন্দোবস্ত করেছে।

—কি করলে?

রেজিস্ট্রারের বানিয়ারাই নিজে। আটা পাবে কোথায়? পদ্ম সরিয়ে ফেলেছে না হাজি সাহেব?

—কি করলে?

—পচা আটা ফেলে বিলাম বিশ বস্তা। বাকি আটা পচার-ভালোয় মিশাল দিয়েছি। একটু কালো হলো, আর গন্ধ—তা চলে যাবে। বাকি তিন-শো মণ সহরে চালান করে দেব কাল-ই।

—ভাল করছে। হাকামা একবার বাধলে কে ঐ আটার কতি সামলাতো? কেউ না।

এমনি করে আটার ব্যবস্থা হয়ে গেল মগনলালের। চাকরটি আবার গোদ-পা টিপবার অধিকার পেল। ঈষৎ পচা, কালো রং, গন্ধ আটা—ওলাম বন্দী মাল—তার ব্যবস্থা হুঁত মগনলাল পথ্য নিশ্চিত হলেন।

বিজ্ঞান।



পত্রলেখক কে ?

ছেলেরা চেয়েছিল বুড়াকে বন্ধুপুরীর গেটের কাছে নামিয়ে রেখে দিয়ে চলে আসবে, কিন্তু কমলেশ তাতে রাজী হয়নি, বুড়াকে নিয়ে গিয়ে দরওয়ানের ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের ওপর শুইয়ে দেয়। বুড়া তখনও অজ্ঞান, কমলেশ বলে আমাদের আর একটু অপেক্ষা করা উচিত। যতক্ষণ না ওর জ্ঞান ফিরে আসে।

তাতে কিন্তু অল্প ছেসেবা আপত্তি করে। প্রশ্নেত্তে বুঝিয়ে বলে, আর দেয়ী করলে ঠিক হবে না যে কমল, চল আমরা হোট্টেলে ফিরে যাই। শঙ্করদা'র নিশ্চয় আমাদের জন্তে লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছে।

প্রশান্ত'র কথা উড়িয়ে দেবার মত নয়। সত্যিই সন্ধ্যা পেরিয়ে যাত্রী নামতে শুরু করেছে। তাছাড়া সকলেরই বখান ফিরে যাবার ইচ্ছে, কমলেশ একলা আর কি করবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুড়াকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে হোট্টেলের দিকে রওনা হয়।

কমলেশের মন থেকে কিন্তু বুড়ার চিন্তা কিছুতেই যায় না। লাইব্রেরী ঘরে সবাই পড়তে বসলেও সে জানালা দিয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐ বিরাট বন্ধুপুরীতে আর কি কেউ বাস করে তার কি জানবে বুড়া ঐ দরওয়ানের ঘরে অজ্ঞান হয়ে

পড়ে আছে? না, না, ও ভাবে ওকে কেলে রেখে আসা মোটেই উচিত হয় নি।

সমালোচক এসে কমলেশের পিঠে হাত রাখে। কি ভাবছিল যে কমল ?

কমল সহজ হবার চেষ্টা করে, কিছু না।

—আমি জানি, বুড়ার জন্তে মন কেমন করছে ?

—আগনি কি করে জানলেন।

—আমি সব শুনেছি। অত ভাববার কি আছে, কাল সকালে গিয়ে একবার দেখে আসিস বৎ।

—আমি কি ভাবছিলাম জান শঙ্করদা, বুড়াকে নিয়ে এসে এখানকার হাসপাতালে মিহিরদাকে দিয়ে চিকিৎসা করালে হয়।

সদাশঙ্কর ব্রাহ্ম হাঙ্গ, ওয়া কি আর এখানে আসবে।

—কেন আসবে না শঙ্করদা ?

—তা জানি না, সদাশঙ্কর যেন ইচ্ছে করেই কমলেশের কথা জবাব দেয় না।

পূর্বদিন ডোর বেলা উঠে কাউকে কিছু না বলে প্যারেক্স থেকে একটা সাইকেল নিয়ে কমলেশ চললো বন্ধুপুরীর দিকে। সবে শুখন ভোর হচ্ছে, রাতের অন্ধকারকে সন্ধ্যার দিনের আলো ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, চারদিকে পানীদের কলরব, বাসা ছেড়ে গাছের ডালের ওপর তারা বসে।

বন্ধুপুরীর গেটের কাছে সাইকেল রেখে কমলেশ তাড়াতাড়ি দারওয়ানের ঘরের কাছে হাজির হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য বুড়া সেখানে নেই। তক্তাপোষের ওপর এখনও তার গলার চালর পড়ে রয়েছে, মাটিতে জুতো জোড়া, এমন কি ঘরের কোণে লাটিটাও। তবে সে বুড়া কোথায় গেল? তবে কি কেউ তাকে ভেতরে নিয়ে গেছে? না নিজেই সে উঠে গেছে? চারদিক ভাল করে দেখে কমলেশ চলল সেই বিরাট প্রাঙ্গণের দিকে। দৈন্তোব মত তার বিরাট চোখা নিয়ে সে চূপচাপ ঝাঁড়িয়ে আছে। বড় দরজার কাছ ঝাঁড়িয়ে 'বুড়া' 'বুড়া' বলে বারবার ডেকেও সে কোন সাড়া পেল না। ঘুরে গিয়ে দেখল খিড়কীর দরজাও বন্ধ। কোথাও একটি জানালা খোলা নেই। জনপ্রাণী এর মধ্যে বাস করে বলে বাইরে থেকে মনে হয় না। বিকল মনোরথ কমলেশ হোট্টেলে ফিরে আসে। কিন্তু বুড়ার কথা নিয়ে কান্নার সঙ্গে আলোচনা করে না। নানান কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।

দিনকয়েক পরের কথা। কলোনীর ছেলেরা রাজ্জা কাটতে যেতে গেছে শহর থেকে কলোনী পর্যন্ত একটা মোজা রাজ্জা তৈরী

দিন আগত ঐ

কলকাতা বৈরাগী

করা হচ্ছে, বাতে সকলেইই বাতায়ানের সুবিধে হয়। ঘর পাশে যেখানে সাত মাইল যেতে হয় এ রাস্তা তিন মাইলে সমান্নে পৌঁছে গেবে, সকলেই পালা করে রাস্তা কাটার কাজ হাত লাগায়।

কমলেশ আর অমিতাভ পাশাপাশি কাজ করছিল, অমিতাভ নিজের মনেই গজ গজ করে, এটা কিন্তু শব্দবদার অজ্ঞার।

কমলেশ মুখ তুলে তাকায়, কেন কি হয়েছে ?

—আমাদের নিয়ে কেন রাস্তা কাটছে ? আমরা তো হোটেলের ছেলে। এ রাস্তা হলে সুবিধে হবে কলোনীর লোকদের, নয় ত গ্রামবাসীর। আমরা খেটে মরব কেন ?

—যে কোন জিনিষ গড়তে হলে সকলকেই কাজ করতে হয়। সেখানে তো তোমার আমার বললে হবে না।

ওসব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। যদি এমন করে ব্যাগার খাটানো হয় এ স্থল আমবা ছেড়ে দেব।

কমলেশ আর কথা বাড়ায় না। চূপ-চাপ নিজের কাজ করে, কিন্তু বোকে অমিতাভ চূপ করে নেই। সে কাজ করতে করতে প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে এই বিষয়েই আলোচন করছে। হাত-পা নেড়ে কত রকম বোঝাচ্ছে।

সেই দিনই রাতে শোবার সময় কমলেশ এই কথাই তোলে, আমার ভয় করছে যে প্রশান্ত অমিতাভ বোধহয় দল পাকবার চেষ্টা করছে, আমরা সবাই মিলে-মিলে কাজ করছিলাম, ওরা না সব গোলমাল করে দেয়।

প্রশান্ত গম্ভীর গলায় বলে, হোটেলের বৈশিষ্ট্য ভাগ ছেলেই কিন্তু দেখছি ওর নিকে, কেউ এই রাস্তা কাটার হাত দিতে চাইছে না। কাজ নাকি ওরা শব্দবদার বলবে।

—ছি, ছি, শব্দবদা' কি ভাববন বলতো ? নিশ্চয় উনি মনে খুব দুঃখ পাবেন।

পরদিন অমিতাভ সত্যিই গোলমাল পাকাল। কাজ করতে বাবার আগে ছেলেরা জড় হয়ে পিড়িরে রইল রাস্তার দু'ধারে। শব্দবদা' এসে কাজ করতে বলতেই তারা সম্মুখে জানিয়ে দিল যে আর তারা রাস্তা কাটেবে না। সর্বাশঙ্কর চূপ করে সব কথা শুনল, মনে ব্যাধ পেলেও তা প্রকাশ না করে বলল, রাস্তাটা তৈরী হলে সবলেই সুবিধে হবে, তাই তোমাদের কাজ করতে বলেছিলাম। কাকর ওপরি আমি জোর করিনি।

অমিতাভ চৈতন্যে বলল, আমরা এখানে পড়াশুনো করতে এসছি, কুলীগিরি শিখতে আসিনি।

সর্বাশঙ্কর রান্না হাঙ্গ, আমরা চাই এখানকার ছাত্ররা বাতে মাহুঘ হয়, এই রাস্তা কাটাটা মাহুঘেরই কাজ। তাই তোমাদের করতে বলেছিলাম। না ইচ্ছে হয় কোর না।

কমলেশ আর প্রশান্ত শব্দবদার কাছে এগিয়ে যায়, স্পষ্ট গলায় বলে, আমরা কিন্তু কাজ করব শব্দবদা'।

সর্বাশঙ্কর তাদের নিকে তাকিয়ে হাঙ্গ। এ আমি জানি। ঠাণ্ডা লেখাপড়া শিখে কিছু হয় না, আমাদের মাহুঘ হতে হবে, মাহুঘের মত মাহুঘ।

অর্ধেক লোক কাজ না করলে বাকি বারা কাজ করে তাদের উপর চাপ পড়ে বৈশি। তবু কমলেশরা ছাড়বার পাক্স নয়। পুরোদমে তারা কাজ করে থাকে। এ লজ্জা রাস্তা বুড়ার বাড়ীর শিখন দিক

দিয়ে বাবার কথা। এ কদিনের অজান্তে চোঁয় রাস্তা বদলপুরী হাড়িরে গেল।

অমিতাভরা শুধু যে কাজ করে না, তাই নয়, অজান্তের বাগড়া দিতেও হাড়ে না। কত সময় তিনিয়ে তিনিয়ে বলে, শব্দবদা' খাসা এক জোড়া বলল এনেছে হে, বুড়ির বালাই নেই, ওদের বা বোঝাচ্ছে ওরা তাই করছে।

জোড়া বলল ওরা কাকের বলছে তা বুঝতে কমলেশ আর প্রশান্তর দেয়ী হয়না, কিন্তু কোনদিন তা নিয়ে কগড়া করে না। হাঙ্গ, বলে, এমনি বলই যেন থাকতে পারি, অজান্তে কাজ করেও আনন্দ পাবো। অজান্তের দেখাশোনি শেয়াল হলে আর রক্ষে নেই, শুধু কেউ ডেকে বেড়াতে হবে।

এ কথাই আর কেউ উত্তর দিতে পারে না।

এরই মধ্যে একদিন কমলেশ মণিকানির বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, দেখে বেগুলা শুকনো মুখে জানলার কাছে পিড়িরে আছে। কমলেশ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে শিখি, ওরকম অজ্ঞমনস্ক হয়ে কি ভাবছ ?

কমলেশের কথাই বেগুলা চমক ভালে, এমনি পিড়িরে আছি, কাজে যাচ্ছিল ? সময় থাকে তো ভেতরে যায় না—

কমলেশ ঘরের ভেতরে ঢোকে, একটু আগে বেগুলা মাহুঘের ওপর বসে কয়েকটা ছবির স্কেচ করছিল। সেগুলো এখনও চারদিকে ছড়ানো আছে। কমলেশ সেই দিকে তাকিয়ে বলে, এতকণ আঁকছিলে বুঝি ?

বেগুলা রাস্তা হলে বলে, আর ছবি আঁকতে ভাল লাগছে না—

—কেন, তোমার আবার কি হোল ?

—মনে হচ্ছে সারা কলোনী জুড়ে কোন একটা গোলমাল হবে। ঠিক বড় গুঁড়বার আগে আকাশ বেমন ধমধম করে এখন সেই অবস্থা।

—তুমি কি করে বুঝলে ?

—মণিকানির কথা থাক, উনি তো আর আমাদের কাজ শেখাতেই পারছেন না। সব সময় কি যেন ভাবছেন। অমিতাভরা যে হোটেলের ছেলেরা নিয়ে দল পাকিয়েছে, সে শুধু নিজেদের বুঝতে নয়, এর পেছনে লোক আছে।

কমলেশ উলগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে, কে ?

—কে তা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে শব্দবদা', মণিকানি সবাই যেন কোন একজনকে সন্দেহ করছেন। আমিও তাই তাই ভাবছি লোকটা কে ?

কমলেশ দৃঢ় গলায় বলে, সে যেই হোক এ আমাদের স্বপ্নরাস্তা। এখানে কোন দলাদলি আমরা আসতে দেব না। কাউকে ভাবতে দেব না।

সেই দিনই হুপুর বেলা রাস্তার কাজ করতে করতে রাস্তা হয়ে কমলেশ পাছের ছাত্রায়, জিরুছিল। শেখন থেকে কে যেন কথা বলে, তোমরা এখানে কি করছ ?

কমলেশ কিংবা তাকায়, দেখে সেই বুড়ো। এতদিন অনেক রকম হাজিরার মধ্যে থেকে বুড়ার কথা এক রকম সে তুলে গিয়েছিল। এখন তাকে সামনে দেখে আবার পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, এখন কি রকম আছেন ?

বুড়ো ভুল হুঁচকার, কেন আমার কি হয়েছিল ?

—বাঃ, আপনি অজ্ঞান হয়ে মাঠে পড়ে গিয়েছিলেন না ?
আমরাই তো তুলে নিয়ে এলাম।

—ও, তোমরা ? তাই আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।
সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরুলাম। তারপর শরীরটা খারাপ লাগছিল।
মাথা ঘুরে গেল। তারপর কি করে যে বাড়ীতে এলাম বুঝতে
পারছিলাম না। তাহলে তোমরাই—

কমলেশ উঠে পাড়িয়ে বলে, বড় জল তেঁট পেয়েছে, জল
খাওনারে ?

—চল আমার বাড়ীর মধ্যে।

কমলেশ জিনিষপত্র নিয়ে বুড়োর পেছনে পেছনে চলল।
বন্ধুপুত্রী বাগানের বেড়া পেরুলে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয় বাড়ী
পৌঁছবার জন্যে, বুড়ো হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস করে। রাত্তা কাটার
উৎসাহ তোমাদের কমে গেছে বুঝি ?

—কই, না।

—ছেলে বেন কম মনে হচ্ছে।

—ও হ্যাঁ, ছোট্টলের ছেলেরা কাজ করছে না।

বুড়ো নিজের মনেই বিড় বিড় করে, আমি আগেই বলেছিলাম,
ব্যাপার খাটলেই হোল। আন্তে আন্তে সব টের পাবেন।

কমলেশ কিছু বুঝতে পারে না, বলে, কার কথা বলছেন ?

বুড়ো, ঠিক আগের মত কর্কশ গলায় বলে, তোমার তাতে কি ?

খিড়কীর দরজার কাছে এসে বুড়ো পাড়িয়ে পড়ে, বলে, তুমি
এইখানে অপেক্ষা কর আমি জল নিয়ে আসছি।

বুড়ো বাড়ীর মধ্যে ঢলে যায়। কমলেশ চুপচাপ পাড়িয়ে
থাকে, চারদিকটা ভাল করে দেখে আমি, কাঁঠালের কি বিরাট
বাগান, সারা ঘাটটার শুকনো পাতা ছড়ানো রয়েছে, কমলেশের
মনে হ'ল, বৃষ্ণ থেকে কে বেন আসছে, পাভার ওপর দিয়ে হাঁটার
মত মত শব্দ শোনা যাচ্ছে। কমলেশ তড়াতিড়া গাছের আড়ালে
সরে যায়। মনে মনে ভাবে, কে আসছে এ বাড়ীতে, বন্ধুপুত্রী
সঙ্গে বাইরের কাঙ্কর যোগাযোগ আছে বলে তো এত দিন শোনেনি
গাছের কাঁক দিয়ে সে তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।
পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসে, কাছে, কাছে, আরো কাছে।
আগন্তুক কে কমলেশ এবার স্পষ্ট দেখতে পার। কমলেশের বিষয়ের
অবধি থাকে না, সে আর কেউ না, অমিতাভ। চোরের মত চার
দিক চেয়ে পকেট থেকে একটা খাম বার করে চিঠির বাজ্ঞে ফেলে
দেয় : তার পর আবার যে রকম এসেছিল তেমনি দ্রুত পারে
পালিয়ে যায়।

সব ব্যাপারটাই কমলেশের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়।
কলোনীর থেকে বুড়োকে চিঠি লিখে কে ? সে কি অমিতাভ ?
তাহলে তো সরাসরি বুড়োর সঙ্গেই কথা বলতে পারতো। ও
নিশ্চয় শিঙন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে পত্রলেখক কে ?
বুড়োও কি তাহলে এই কলোনী ভাঙ্গার মলের একজন ? সব
সন্দেহেরই নিরসন হয় চিঠিটা একবার পড়তে পারলে, গাছের
আড়াল থেকে বেরিয়ে কমলেশ খিড়কীর দরজার দিকে এগিয়ে
যায়। চিঠির বাজ্ঞের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে চার দিক দেখে নিয়ে
বাজ্ঞটা খোলার চেষ্টা করে। চিঠির বাজ্ঞটা পুরোনো হলেও সম্বৃত।

কিছুতেই খোলে না। হয় ত গা-চাবী লাগান আছে। ভাল
করে দেখবার আর সুযোগ পায় না, বুড়ো এসে পড়ে। এক
গেলাস সবং কমলেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে এই নাও খাও।

কমলেশ সবং খেতে খেতে লক্ষ্য করে বুড়ো পকেট থেকে
একটা চাবী বার করে চিঠির বাজ্ঞটা খুলে অমিতাভের দিয়ে বাড়ায়
খামটা বার করে। ওপরের ছাতের লেখাটা দেখে নিয়ে নিজের
মনে হেসে সবং চিঠিটা কতুরার পকেটে রেখে দেয়। কমলেশ এর
হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে বলে, এবার তুমি খাও, আমার একটু
কাজ আছে।

কমলেশ বুঝতে পারে চিঠিটা পড়ার জন্যে বুড়ো খুব ব্যস্ত হয়ে
পড়েছে। কমলেশ চলতে শুরু করলেই বুড়ো বাড়ীর ভেতর ঢুকে
বিক্রীর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সারা রাত্তা কমলেশ ভাবতে
ভাবতে ফেরে, এই পত্রলেখক কে ? বুড়োর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ?

[ক্রমশঃ]

আধুনিক আফ্রিকাতে পাঁচ মাস

যাহ্নসড্রাট পি, সি, সরকার

আফ্রিকা বনজলদের দেশ। অরণ্য সম্পদই আফ্রিকাকে সমৃদ্ধ
করে তুলেছে। সুজলা, সুফলা হয়েও আফ্রিকা শূন্য স্থানলা
হয়ে উঠেনি। এদেশের চাষ আবাদ আমাদের দেশের মতন নয়।
জমলে জলায় গাছে জলা ফলে, কলর আর আনারস গাছে প্রচুর
ফলা, আনারস জমার, আফ্রিকাবাসীরা সেগুলি বিক্রয় করে জীবিকার
সংস্থান করে। কেনিরা রাজ্যে খুব মকাই ভুট্টার চাষ হয়—ভুট্টা
নাকি ভারতীয়দের আমদানী। সেরালীভার 'মহিন্দা' অর্থে ভুট্টা
এক 'মহিন্দা' অর্থে ভারতবাসী। ভারতীয়রা এই ভুট্টার আমদানী
করেছিল কিনা সে বিষয়ে হির মত না থাকলেও এদেশে ইক্ষুর চাষ
ভারতীয়রাই আরম্ভ করেছেন—তার। এদেশে ইক্ষুর চাষ করে
বহু বড় বড় চিনির কল বসিয়েছে। বহু চা-বাগান ও কচি
বাগান আছে তার অধিকাংশেরই মালিক ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাকী
অংশ ইউরোপীয়দের। সমগ্র আফ্রিকাতেই জলজ—কাঁটা গাছে
জন্মি, টাঙ্গানাইকা অঞ্চলে ঐ কাঁটা গাছের চাষ করে এক নতুন শিল্প
গড়ে উঠেছে।

কয়েক বৎসর আগে আমরা যখন অস্ট্রেলিয়াতে থাকা দেখাছিলাম
তখন একজন ইংরেজ সোকানদার আমাদের একটা পাখেল
সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। বাঙালিটার দড়ি ছিঁড়ে পড়ে
যাবে আশঙ্কার আবি তাকে আরও লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে
বলাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে ভটা পাটের দড়ি নয় ভটা
শিল্প দড়ি ভীষণ শক্ত। আমি শিল্প দড়ি চিন্তাম না, তিনি
দেখালেন আমাদের দেশের শূন্য পুতার দড়ির মত আরও মোটা
মোটা জাঁপের খুব ধরণে সাধা শক্ত দড়ি। তিনি বললেন
আফ্রিকাতে এই শিল্পের চাষ হয়—এই শিল্প এখন তোমাদের
ভারতবর্ষ-পাকিস্তানের পাট এবং ম্যানিলার শবের দড়িকে পরাণ্ড
করেছে। এ ভীষণ শক্ত, সুস্থক এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। ঐ দড়ি
সস্তা কিনা জানিনা, তবে পাট বা শবের দড়ির চাইতে বহুগুণ শক্ত
এক সুস্থক একথা অবশ্যই স্বীকার করেছিলাম। তারপর সারা

আফ্রিকা নিউজিল্যান্ডে টুয়েন্টের সময় সর্বত্র এই শিশলের দড়ির ব্যবহার দেখিছি। কলিকাতায় শিশলের দড়ির প্রচলন নেই বললেই চলে—। বিলাত থেকে বখন বড় বড় পাখেল আসে সেগুলি প্রায়ই এই শিশল দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। আমরা আফ্রিকাতে এসে এই শিশলের চাব দেখতে পেলাম। সব চাইতে বেশী শিশলের চাব দেখলাম টাঙ্গানাইকার বনভূমিতে। শিশল গাছ আমরা ভারতবর্ষেও অনেক দেখি—আনারস গাছের মতন গাছ পাতার ডগাটা ভীষণ খুঁচালো এবং শক্ত। অনেকে ফুলের বাগানে সঞ্চ করে বসান, কেউ কেউ টবেও পুতেছেন লক্ষ্য করছি। আফ্রিকাতে এই শিশলের চাব খুব বেশী হয়, জঙ্গলের গাছ অল্পে বৃদ্ধি হয়ে ওঠে, ওর পাতা কেটে ফাট্টারিতে সূতা বের করা হয়। এমন এই শিশল টাঙ্গানাইকা এবং কেনিয়ার বড় কৃষিজাত সামগ্রী হয়েছে—ইউরোপীয়ানরা হু ফাট্টারী গড়ে তুলে শিশলের চাব করেছেন।

কেনিয়া প্রসিদ্ধ তার ভুট্টা (Maize)র জন্ম আর উগাণ্ডা বিখ্যাত তার কলা এবং তুলার জন্ম। উগাণ্ডাতে ঐ কলা আর তুলা ছাড়া অন্য কোনও শস্যের চাব নেই। আফ্রিকার লোকেরা তাই ঐ দেশে শুধু কলা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ওরা কলাকে বলে ‘মেই ফু’ আমার মতে ওটা ‘মইন ফুড’। উগাণ্ডার প্রতিটি আফ্রিকাবাসী ঐ কলা খেয়েই বেঁচে আছে। কাঁচাকলা জলে ভিজিয়ে ওরা ওদের প্রধান খাদ্য ‘ত্বরী’ করে। কেনিয়া ও টাঙ্গানাইকা এই দুই দেশের যে সব ভার্যগার ভুট্টা আমরা সেখানে লোকেরা ভুট্টা খেয়ে জীবন ধারণ করে।

টাঙ্গানাইকার মাসাই অঞ্চলে অনেকটা মকময় আগ্নেয়গিরি সৃষ্ট জলা ভূমি আছে সেখানে একপ্রকার ঘাস আর কাঁটা গাছ ছাড়া কিছুই জন্মায় না—শতাব্দিক মাইলবাগী ঐ মকময় অঞ্চলে কোনপ্রকার খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না—তাই ওখানকার মাসাইর অধিবাসারা শুধুমাত্র গরুর দুধ এবং গরুর টাটকা রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। ওরা জলী জাতি জঙ্গলেই বাস করে, গরু পোষে এবং গরুর দুধ পায়। গরুর দুধ সংগ্রহ করে প্রথমে দেবতার জন্ত উৎসর্গ করে তার পর ওরা নিজেরা পান করে। একপ্রকার তাঁর ঘরুক দিয়ে গরুর গলায় ছিদ্র করে সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত করতে আরম্ভ করে সেই রক্ত সংগ্রহ করে ওরা বাড়ীর সকলে মিলে পান করে। অনেকগুলি গরুকে এইভাবে তাদের Blood Bankএ রক্তদান করতে হয়। ওরা দেশী লাউয়ের খোলা দিয়ে তাদের পানপাত্র (kibuyu) তৈরী করে নেয়—প্রত্যেক মাসাইয়ের হাতে ঐ পানপাত্র কিবুয় দেখা যায়, আর ওদের পুরুষদের হাতে থাকে তাঁর ধ্বজ অথবা বন্ধন। ওরা জঙ্গলে নির্ভয়ে যাতায়াত করে দরকার হলে ঐ বন্ধন দিয়ে সিংহ পর্যন্ত বধ করতে পারে। মাসাইদের ভাষায় খুবই ভাল—শত্রীর কৃপবর্ষ এবং চকচকে। ওরা লাল রং খুব ভালবাসে, রক্ত বস্ত্র পরিধান করলে খুব খুশী হয়। ওদেরকে দেখলেই ভয় করে—মনে হয় দুর্ভবতার প্রতীকৃতি।

আফ্রিকাতে কালো আদমীর মধ্যে অনেক রকম ভাষা প্রচলিত হলেও সবাই সোহালী (swahili) ভাষা জানে এক বৃকতে পারে। সোহালী ভাষার এদের সঙ্গে কথা বললে সহজেই বন্ধুত্ব করা যায়। এরা দুর্ভব হলেও খুবই বন্ধুবৎসল। ভাল ব্যবহার করলে,

বন্ধু মত চললে এদের কাছে খুবই স্থলব, সদর ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু এদের বিকল্পে চললে কোন জ্ঞানী সাক্ষাতে সারা বনভূমিতে এদের বার্তা অনুভূতাবেই ছড়িয়ে পড়ে, এদের চক্ষু-এদের হাত এড়ানো অসম্ভব। গাছে এরা ঢোল বুলিয়ে রাখে সেই ঢোল বালিয়ে ওরা সমস্ত জঙ্গলে ওদের সাত্তিক বার্তা জানিয়ে দেয়। যে জঙ্গলে কোথাও কিছু নাই—যুহুর্ন্ত মধ্যে শত শত বন্ধু এসে জুটেতে পারে, আবার পরক্ষণে তারা সবাই অদৃশ হতে পারে—বেন সবই সত্যিকার বাহুবিজ্ঞা—যুহুর্ন্তে আবির্ভাব বা যুহুর্ন্তে জনগণের অদৃশ হওয়া এটা ওদের জঙ্গলের ম্যাজিক—ওখানে আমার ম্যাজিক অক্ষম।

কেনিয়াতে ‘মাইডাউট’ আন্দোলন চলেছিল—ওটা এদেশের পার্বত্য কিছু জাতিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভ্যুত্থান বলে অভিহিত করা হয়। ‘৪২ সালে ভারতে যেক্ষণ আন্দোলন চলেছিল বা মালয়ের জঙ্গলে সম্ভ্রাসবাসীদের ক্রিয়াকলাপ চলেছিল—এই আন্দোলন ঠিক তেমনই। যেতাজ বহিরাগত জাতিদের আফ্রিকা থেকে উচ্ছেদ করার জন্ত এ বেন আফ্রিকায় জলী (এক জেবী) জাতির সুসংবদ্ধ গরিলা যুদ্ধ—গত ১৯৫২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। গভর্ণমেন্ট এই ‘মাইডাউট’কে বেআইনী ঘোষণা করে কর্তার হস্তে দমন করেছেন এখনও ৮,৪১৪ জন ‘মাইডাউট’কে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি জাঙ্গিয়ার সহরে নিখিল আফ্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিরাট অধিবেশন হয়েছে তাতে সভাপতির ভাষণে বলা হয়েছে যে কেনিয়ার ‘মাইডাউট’ আন্দোলনকে সাইপ্রাস দ্বীপের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো তুলনা করা চলে। সাইপ্রাসে আর্কবিষণ মাকারিওকে একদিন বিদ্রোহী বলা হয়েছিল আজ তিনিই সেখানকার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন—ঠিক সেইভাবে ‘মাইডাউট’ আন্দোলনের নেতা জোমো কেনিয়েটাকে আজ বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে বংসরের পর বংসর কারাবদ্ধ করে রাখলেও, সেই কেনিয়েটাই একদিন মাকারিওর সতাই একজন দেশপ্রেমিক নেতা বলে স্বীকৃত হবেন।

সমগ্র আফ্রিকাতে বর্তমানে বিরাটভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে—চারিদিক সভা, সমিতি, আইন অমান্য, গরিলাযুদ্ধ, সাদা-আইন, আশংকালীন জরুরী ব্যবস্থা—ঠিক বেন ‘৪২ সালের ভারতে বসে আছি। আফ্রিকার কৃষকার লোকেরা স্বাধীনতা লাভের জন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সবাইর মুখে এক বুলি ‘আফ্রিকা ছাড়। আফ্রিকা শুধু আফ্রিকানদের জন্ত’। এতদিন এই আন্দোলন শুধু যেতাজ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেই প্রবেশা ছিল এখন এরা ভাবতীয়নিগকেও এদেশ ছেড়ে বেতে বলছে। সবাই এখন ইঙ্গ-এশিয় লোকদের দোকানপাট ব্যবসা সবকিছুকে অহিসংভাবে ‘বয়কট’ করতে আরম্ভ করেছে। আমরা থাকতে থাকতে এই কয়েক মাসের মধ্যেই এই আন্দোলন বেশ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি—এর ফল কি হবে তা শুধু ভগবানই জানেন।

আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ—এ দেশের পশু চলতে বখন তখন অসংখ্য বুদো জন্ত জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। গভর্ণমেন্ট এসব অরণ্যকে সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করে বনজন্তকে রক্ষা করে চলছেন। দেশের সর্বত্র গভর্ণমেন্টের স্ত্রাসনাল পার্ক বা game reserve গড়ে উঠেছে। শত শত মাইল লম্বা উঁচু তাদের জালের বেটী দিয়ে

বড় বড় জলধানী ঠিকই হয়েছে ওতে বন্দী রয়েছে হাতী, সিংহ, গণ্ডার জলহস্তী, জেব্রা, জিরফ, কুমীর, বইগন, উটপাখী প্রভৃতি আফ্রিকার বিখ্যাত বহু প্রজাতির প্রাণী। এগুলি সংরক্ষিত অঞ্চল এখানে শিকার করা বোঝানো এমনকি জঙ্গলে প্রবেশ করার সময় কোনপ্রকার আগেরাত্র সঙ্গে লওয়াও আইনবিরুদ্ধ। গাড়ীর 'হর্ণ' বাজানো নিষেধ দুই শত টাকা জরিমানা হয়। দিনের আলোতে জঙ্গলে মোটর গাড়ী নিয়ে যাওয়া চলে, রাত্রিতে থাকা নিষেধ কারণ গাড়ীর আলো আলো চলেবে না। গাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ করে—'গাইড' সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হয়। প্রবেশদ্বারে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—আপনার জীবনের জগৎ আপনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করছেন। গাড়ীর দরজা খোলা নিষেধ। হর্ণ বাজানো বা আলো জ্বালানো নিষেধ। গাড়ী থেকে নামবেন না, বন্ধ প্রাণীকে কোন ভাবে ভয় দেখাবেন না, চুপ করে বসে থাকবেন। মাঝে মাঝে বড় বড় সাইনবোর্ড আছে Elephants have the right of way. অর্থাৎ আগে হাতীকে পথ ছেড়ে দিন।

ওখানে পথ চসতে অবশ্য বুনো হাতী নজরে পড়ে, আগে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হাতীকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। যারা নিভিয়ে হাতী দেখতে চান তারা দিনের আলোতে Tree Top Hotel অর্থাৎ (ফিল্মের টাক্সনের বাড়ীর মত) গাছের ডগায় হোটেলের আশ্রয় নিয়ে ভালভাবে দেখতে পারেন। গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে অনেক গ্রুপ গাছের হোটেল এ দেশে আছে। আমরা বেলজিয়াম কঙ্গো, উগান্ডা এবং সুদানের মধ্যখানে এলবাট্রুদে 'মার্শেলন ফলস' দেখতে গিয়ে গভর্ণমেন্টের বেষ্ট হাউস 'পারা সক্রী লক্সে' একত্রি ছিলাম—পরদিন একটা লক্সে চেষ্টে এলবাট্রুদে বেড়াতে গিয়াছিলাম। রাত্রিতে বুনো হাতীর দল এসে আমাদের ঘরের জানালায় শুড় ঘষছিলো নানাভাবে গঞ্জন করছিলো। হ্রদের তলে কুমীর এবং জলহস্তী মোট বোখ হয় দুই তিন হাজার দেখেছি—আমাদের মোটর লকের ওই তিন ফুট দূর গিরে জলহস্তী ও কুমীরের পাল হেঁটে আর সাঁতারিয়ে বেড়াছিল। পথে আমরা হাতীও দেখেছি অন্ততঃ একহাজার। জিনজা সহরে মিশরের বিখ্যাত নীল নদের উৎসস্থ ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও বিপন জলপ্রপাতের Ripon Falls Hotel-এ আমরা অনেকদিন ছিলাম। রাত্রিতে খেলার শেষে হোটেল ফিরতেই দেখি বড় বড় দুইটি জলহস্তী আমাদের হোটেলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমাদের গাড়ীর ভীড় আলোক দেখে ঐ দুইটি বড় পিচ ঢালা রাস্তা অতিক্রম করে আবার হ্রদের তলে নেমে গেল।

পরদিনই দেখি একটু দূরে রাস্তার পাশে আরও চারিটা বড় বড় জলহস্তী দাঁড়িয়ে রয়েছে—এরাও গাড়ীর আলো দেখে জলে নেমে গেল। প্রথম দর্শনে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম কারণ এত কাছে থেকে এর আগে 'হিপো' (জলহস্তী) আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। পরে প্রতিনির্দন হিপো-দর্শন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চলে যখন তখন রাস্তাঘাটে 'হিপো' দেখা যায়। নাইরোবীতে গেলে লোকে যে কোন দিন সিংহ দেখতে পারে—সহর থেকে তিন মাইল দূরে সংরক্ষিত বন-অঞ্চলে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্তত পাঁচ সাতো সিংহের দেখা পাওয়া যায়।

৩রা মেটির গাড়ী আর মাছের দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কলিকাতায় রাস্তার যেমন বাঁড় দেখা যায়—বনপথে তেমনি মাঝে মাঝেই সিংহদের দর্শন পাওয়া যায়। দশ বৎসর আগে নাইরোবী সহরের রাজপথেও মাঝে মাঝে সিংহের দেখা পাওয়া যেত। জেনারেল শোষ্টাকিসের কাছে নাকি প্রতিদিন সহ্যার সিংহের পাল এসে জমা হ'ত। এখন ওরা শুধু সংরক্ষিত বনেই চড়ে বেড়ায়। বাইরে চলে এলেই লোকেরা গুলী করে হত্যা করে ফেলে।

আফ্রিকাতে এখন অনেক বড় বড় জাশানা পার্ক 'সংরক্ষিত বন' গড়ে উঠেছে আর তাদের বেটনী এলাকাও কম নয়। একমাত্র বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকার হিসাব নিলে দেখা যাবে—কেনিয়াতে ৮টি সংরক্ষিত জঙ্গল আছে (১) নাইরোবী রয়েল জাশানা পার্ক এলাকা ৪৪ বর্গ মাইল (২) টগাতো রয়েল জাশানা পার্ক ৮,০৬১ বর্গ মাইল, (৩) মাসারিটি জাশানা পার্ক ১০,০০০ বর্গ মাইল ইহা ছাড়াও গেভা জাশানা পার্ক, আদোলেগা, প্রমুখ অনেক সংরক্ষিত বন আছে। উগান্ডা রাজ্যে চারিটি সংরক্ষিত বন আছে তন্মধ্যে 'মার্শেলন ফলস জাশানা পার্ক' এবং 'কুইন এলিজাবেথ জাশানা পার্ক' খুবই প্রসিদ্ধ। টাঙ্গানাইকার মধ্যে যে কয়টি সংরক্ষিত বনভূমি আছে, তার মধ্যে সেরেনগেটি এলাকাটি সব চাইতে বিখ্যাত। এই তিনটি দেশের মধ্যে কেনিয়া অঞ্চল তার সিংহের জগৎ প্রসিদ্ধ, কাজেই কেনিয়া রাজ্যের প্রতীক চিহ্ন এই সিংহকেই করা হয়েছে, টাঙ্গানাইকা অঞ্চলে জেব্রা এবং জিরাক খুব বেশী দেখা যায়। আমরা নাইরোবী থেকে টাঙ্গানাইকা আসার সময় ৭৩০ মাইল পথে কমপক্ষে তিন-চার হাজার জেব্রা, জিরাক ও উটপাখী মোটরে বসে বসেই দেখেছি।—এই জিরাককে এই দেশের প্রতীক চিহ্ন করা হয়েছে। উগান্ডা রাজ্যে বুনো হাতী এবং জলহস্তী বেশী পাওয়া যায় তাই উগান্ডা রাজ্যের প্রতীক হচ্ছে ঐ জলী হাতী। জিনজা সহরে জলহস্তী খুব বেশী, তাই ঐ সহরের মিউনিসিপালিটি ঐ জলহস্তীকেই তাঁদের প্রতীক চিহ্ন করেছেন। ভারী বিচিত্র এই দেশ! রাস্তাঘাটে পথ চলতে যখন-তখন যে কোনও বহুপ্রাণীর দেখা পাওয়া বিচিত্র নয়।

এদেশে একপ্রকার মাছি আছে (যার নাম Tsetse fly) এগুলি সাধারণ মাছির মতই উড়ে বেড়ায়—কিন্তু ঐ মাছি কামড় দিলে লোকেরা এক নতুন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যার নাম sleeping sickness। বিগত ১৯১১-১৯১৬ সালে (পাঁচ বৎসরে) একমাত্র উগান্ডা রাজ্যেই মোট ২০,০০০ দুই লক্ষ লোক ঐ মাছির কামড়ে sleeping sickness-রোগে মারা গিয়েছে। ইংরেজরা নানাভাবে সতর্ক নিয়ে, ঔষধপত্র দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে—এখন স্বাস্থ্য অবস্থার অনেক উন্নতি করে তুলেছে। আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ-গণ্ডার-বুনোহাতী, অন্তরীক জলীদের বিখ্যাত গুরু-তীর, জলে জলহস্তী, কুমীর—কোপে ঝাড়ে কর্দমহ্রদ চোরাবালি, সামান্য মাছির কামড়ে অদ্ভুত ব্যাধি, জঙ্গলে মহাভয়কর অদ্ভুত গাছপালা। চারিদিকের শব্দ বিপদকে উপেক্ষা করে ভারতীয়রা এবং যেতাল বণিকেরা এদেশে ভাণ্ডার্যবেশন করতে এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন নতুন সহর গড়ে তুলেছে—জনপদের হুড়ি করেছে। ইকুর চাষ করে 'জিনি' কল বসিয়েছে, চা এবং কফির চাষ করে বড় বড় কাঠের বসিয়েছে, চারিদিকে শিশলের চাষ, তুলার চাষ,

ভূতীর চাম, জলজলের ভূলা, কলা, আনারসের পাশেই গড়ে উঠেছে বড় বড় সিমেন্ট ফ্যাক্টরী। বড় বড় বিরাট পিচঢালা 'রাজশাহী', জলবিদ্যাৎ কেন্দ্র, বড় বড় সেতু—আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সর্গপ্রকার সুযোগ সুবিধা।

ভারতীয়রা এদেশের ব্যবসায় প্রবেশ করে এদেশের সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট প্রাধান্য করে নিয়েছে। টাঙ্গানাইকায় রাজধানী ডারেস সালের সহরের বর্তমান পৌরপাল (মেয়র) একজন ভারতীয়। এদেশের লোকেরা যখন জঙ্গলে জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে কলা খেয়ে বুর বেড়িয়েছে—ভারতীয় বণিকরা এক ইউরোপীয় বণিক ও রাজনৈতিকরা ততদিনে এদেশে নিজেদের প্রভু ভালভাবে বসিয়ে নিয়ে দেশের উন্নতির সাথে সাথে নিজেদের জাগোয়ান্তি করে তুলেছেন। কৃষাজ্ঞার আজ ইউরোপীয়দিগকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলছে—ভারতীয়দের নিকট থেকে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা শিক্ষা করেছে—বোধহয় ভারতীয়রা তাদেরকে পেছনে থেকে কিছু কিছু শিক্ষাও দিতে চেষ্টা করেছে—যায় ফল আজ কাদের চক্রান্তে ঐ আন্দোলন আজ ভারতীয়দের বিরুদ্ধেও চালানো হচ্ছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অভ্যস্ত বৈদেশিক কুটনৈতিকদের চালে ভুলে কৃষকরা আফ্রিকাবাসীরা আজ হঠাৎ রক্তাভ ভুলই করতে বসেছে। ভারতও এই বুদ্ধিতেই খণ্ডিত্তির বিকিপ্ত হয়েছে! আফ্রিকা আজ কোনপথে চলেছে—কি জানে?

হৈমবতী উমা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। একবার দেবতা আর অমুরে ভীষণ যুদ্ধ লাগল। দুই দলই পরাক্রমশালী, কে হারে কে জেতে বোঝা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহুদিন যুদ্ধের পর দেবতাদেরই জিত হল। তাদের উদ্ধাসে আর আফালনে স্বর্গ তোলপাড়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন, আমাদের কি রকম শক্তি। আর অদ্বুত ক্ষমতা, তাই না অমরদের পরাভব করতে পারলাম।

দেবতাদের এই অহঙ্কার দেখে স্বষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভাবলেন তাদের এ অহঙ্কার একটু চূর্ণ করা দরকার। একদিন তিনি এক জ্যোতিষ্যর বন্ধরূপে দেবতাদের সামনে ধাঁড়ালেন। দেবতারা আমোদ খান্ধানে মগ্ন হল। এমন সময় হঠাৎ অচেনা এক নীলময়ী মূর্তি দেখে বিম্মিত হলেন, ভয় পেলেন। তিনি কে এই পরিচয় জানবার জন্যে তারা অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবতাদের বৈঠক বসল, তাঁরা অগ্নিদেবকে তাঁদের প্রতিনিধি করে সেই জ্যোতিষ্যয়ের কাছে পাঠালেন।

অগ্নি সেখানে গিয়ে ধাঁড়াতেই সেই জ্যোতিষ্যর বন্ধ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

অগ্নি সগর্বে উত্তর দিলেন। আমি অগ্নি। আমাকে সবাই আতরোহা: (সর্বভা) বলে জানে।

যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন শক্তির অধিকারী?

অগ্নি বললেন, আমার শক্তি এই, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকে বা অদ্বৈত সাক্ষরে পড়ে ভাই আমি স্বেচ্ছা করত পাখি।

—তখন সেই বক্ষ দুই অঙ্গুলীতে একটি শুক তৃণখণ্ড ধরে বললেন, একে দগ্ধ করো।

কিন্তু দাহিকা শক্তিশালী অগ্নির অহঙ্কার চূর্ণ হল, তিনি প্রাণপণ শক্তিতেও সেই তৃণখণ্ড দগ্ধ করতে পারলেন না নত মস্তকে দেবপুত্রিতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা জানালেন।

তখন দেবতারা পবন দেবকে পাঠালেন। পবনদেব স্বীয় শক্তিতে আহ্বান হয়ে তাঁরবেগে বক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন।

বক্ষ তাঁর শক্তির পরিচয় জিজ্ঞেস করলে। তিনি সগর্বে উত্তর দিলেন আমি বায়ু, আমার সামনে বা পড়ে তাই আমি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বক্ষ তৃণ খণ্ড ধরে বললেন, এটা উড়িয়ে নিয়ে যাও।

বায়ু তাঁর শ্রোণ্ড শক্তি দিয়েও সেই তৃণখণ্ডকে মোটেই হেলাতে পারলেন না। উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তো ঘুরে কথা। লজ্জার অধোবদন হয়ে পবনদেব ফিরে এলেন।

দেবপুত্রিতে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। এই মহাপরাক্রমশালী জ্যোতিষ্যর পূর্বব কৈ তা জানবার জন্যে দেবতারা অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁরা পাঠালেন। কিন্তু দেবরাজ সেখানে ধাঁড়াবামাত্র নিমেষের মধ্যে সেই জ্যোতিষ্যর পূর্বব অদৃশ হলেন। দেবরাজ বিমূঢ় হয়ে ধাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন চতুর্দিক আলোকিত করে অতি সুন্দরী রূপলাবণ্যময়ী এক নারী মূর্তির আবির্ভাব হল। তিনি কে? না, বিশ্ববাসিতা সেই হৈমবতী-উমা। তাঁকে দেখে দেবতারা স্তম্ভিত বন্দনা করতে লাগলেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য জ্যোতিষ্যর পূর্ববের পরিচয় জানতে চাইলেন।

তখন হৈমবতী-উমা বললেন, হে দেবগণ। তোমরা যে আশ্চর্য্য সুন্দর অদ্বুত তেজোময় পূর্বব দেখে বিম্মিত, ভীত হয়েছে। তিনি আর কেউ নন, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টী বর্তা সেই পরমপূর্বব। তোমরা অহঙ্কারে স্তম্ভিত হয়ে উঠছিলে ভেবেছিলে তোমাদের নিজ শক্তিতে তোমরা অমরদের জয় করবে, কিন্তু না, তা নয়, জেনো ঐ বিরাট পূর্ববের অঙ্গুলি হলেন ভগবতের সমস্ত কাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তোমরা অমর জয় করতে পেরেছ। তোমাদের নিজদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই, তার প্রমাণ এখনই পেরেছ।

দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ হল। তাঁরা নিজেদের ভ্রম বুঝতে পারলেন, লজ্জিত হয়ে সেই সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন।

কালি থেকে সন্দেহ

বাহুরদাকর এ, সি, সরকার

এবার যে খেলাটার কথা বলছি সেটি খুবই মজাদার।

বাহুরদাকর হাতে আছে একটি কাচের গ্রাস বা ভর্ত্তি আছে কালিতে। হন কালো কালি। টেবিলের উপর এই গ্রাস নামিয়ে রেখে তিনি হাতে তুলে নিলেন এক ফালি সালা কাগজ। সবার সামনে এই সালা কাগজের ফালিটাকে বাহুরদাকর ডোবালেন কালির গ্রাসে আর তার কল কাগজের ফালি একটা প্রান্ত কালিতে কলঙ্কিত হল। এ দেখায়

পরে দর্শকদের আর কোন সন্দেহই রইলো না যে গ্রাসে সত্যি সত্যিই কালি আছে। এর পরে বাহুর আরম্ভ করলেন বাগাড়ম্বর :

বহুগুণ, এখন যে খেলা আপনাদের সামনে হাজির করছি তা দেখলে আপনাদের সবাইই ক্রিদে পাবেন! আর সে ক্রিদে দূর করার ব্যবস্থাও হবে বাবে সঙ্গে সঙ্গে।

টেবিলের উপর থেকে কালির গ্রাস আর একটা কালো কুমাল তুলে নিয়ে ঐ কুমাল দিয়ে তিনি আচ্ছাদিত করে মুড়ে দিলেন গ্রাসটাকে। আর শুরুর করে পড়তে থাকলেন ম্যাজিকের মন্ত্র :

আরম্ভলাদের সঙ্গে আড়ি

তাই মাছি যার ময়রা বাড়ি

হুতোম প্যাটার হুতোম হুতোম ডাক

মিহিদানার মিহি দানা

রাজতোপ যে রাজার ধান

তাই দিয়ে এই গেলান ভরা বাক।

গ্রাসের ঢাকনা খুলতে ভো সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কালি উঠাও। গ্রাস ভর্তি হয়ে গেছে কড়া পাকের সন্দেশে! একটি একটি করে তুলে নিয়ে বাহুর তা পরিবেশন করলেন তাঁর দর্শকদের।

এবারে শোন কেমন ক'রে এই অসম্ভব সম্ভব হল। গ্রাসটাতে কিন্তু আসলে কোনও কালিই ছিল না। গ্রাসটাতে একটু কারসাজি ক'রে নিয়ে ছিলেন বাহুর মশাই। কানার দিকে আর ইকি পরিমাণ আয়গা ছেড়ে দিয়ে ঐ গ্রাসের সারা গায়ে লাগিয়ে ছিলেন ভূষো কালি আর গ্রাসটার ভেতরে রেখেছিলেন সন্দেশ। তোমরা এই খেলা করার সময়ে ব্যবহার ক'রো লক্ষের ভূষো কালি। একটা কেরাসিনের লক্ষ আলিয়ে তার শিখার উপরে ধরে ধরে সহজেই গ্রাসের গায়ে ভূষো

ভূষো কালি



সন্দেশ



কালির পলস্তরা লাগাতে পারবে। গ্রাসের ভেতরে সন্দেশের বদলে কিছুটা লেবনচূষ এমন কি মুড়িও রাখতে পারো তবে কোনও ক্ষেত্রেই গ্রাসের তিন চতুর্থাংশের বেশী অংশ বেন ভর্তি না হয়। কালো কুমাল দিয়ে মুড়ে নেবার সময়ে গ্রাসের গা ডালভাবে মুছে নেবার কৌশলটা কিন্তু অভ্যাস করে নেবে বেশ ভাল ক'রে তা না হলে কিছু সব ভুল হয়ে যাবে। যে কাগজের কাগিটি দিয়ে বাহুর গ্রাসে কালির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তাতেও আছে কৌশল। এর সামনের দিকটা সাপা হলেও পেছনের দিকে নীচের প্রান্তে থাকে কালির দাগ। গ্রাসে ঢুকিয়ে তোলায় সময়ে বাহুর কাগজের কাগিটি

ঘুরিয়ে দেখে আর দর্শকেরা তাই দেখতে পান যে কাগজের ফালিতে কালি লেগেছে।

বাহুবিকার উৎসাহী পাঠক পাঠিকারা আমার সঙ্গে উপযুক্ত জবাবী ডাকমাকুলসহ পত্রালাপ করতে পার A. C. SORCER. Magician, Post Box 16214, Calcutta-29 ঠিকানায়।

অরণীয় ধাঁরা

কবি কর্ণপূর

পুরীর সমুদ্রের ধারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মঠ। প্রতিবারের মত সেবারেও এসেছেন বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী। সকলেই বৈষ্ণব এঁদের মধ্যে আবার কেউ বা মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরংগ। তাঁরা বৎসরান্তে মহাপ্রভু আর জগদ্বাসদেরকে দেখতে আসেন। তাঁর সঙ্গে নাম সংকীর্তন করে কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে যান দেশে।

প্রতিবারের মত এবারেও এসেছেন নদীয়া জেলার কাকদপল্লী হ'তে সেন শিবানন্দ, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শদ। নীলাচল বাজীসেব অনেককেই তিনি নিজের খরচে সঙ্গে নিয়ে আসেন। অতুল ঐশ্বর্যের মলিক হয়েও তিনি ভগবানকে নিজের সমস্ত কিছু দান করে দিয়ে ভিখিরীর মত জীবন বাপন করছেন। গৃহবিগ্রহ কৃষ্ণায়ের নামে সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এবারকার তীর্থযাত্রায় তিনি একলা ন'ন। সঙ্গে তাঁর জী আর সাত বছরের ছেলে পরমানন্দ। শিবানন্দ এসেছেন মহাপ্রভুর কাছ থেকে পরমানন্দের জন্ম আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। যার কালে ছেলের ধর্মে মতি হয় এবং মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু মহাপ্রভুর সামনে এসে সাত বছরের ছেলে পরমানন্দ গৌ ধরল। কিছুতেই কৃষ্ণ নাম ক'বে না। মহাপ্রভু কত চেষ্টা করলেন তবুও পরমানন্দ নোবব। বিরক্ত হয়েই মহাপ্রভু বললেন, জগন্তের সকলকেই আমি কৃষ্ণ নাম নেওয়ারাম আর এই বাগকের কাছে আজ পরাজিত হলাম এ অন্ত্যস্ত আশ্চর্যের কথা।

সকলেই ছেলের এই ভাব দেখে বিব্রত হল। শিবানন্দ আর তাঁর জী ভো মনে মনে চটেই গেলেন। কিন্তু তবু তাঁরা হাল ছাড়লেন না। আরও দিনকয়েক পরে ছেলেকে আবার তাঁরা নিয়ে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে আর আশ্চর্যের বিষয় এবার পরমানন্দ মহাপ্রভুর পায়ে মুখ রেখে বলে উঠলেন একটি সংস্কৃত শ্লোক। যে শ্লোক কোন শাস্ত্র বা পুরাণের নয় বালকেরই স্বরচিত। শ্লোকটিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেছিলেন।

সাত বছরের শিশুর মুখে এমন স্বন্দর অর্থ নিভূল শ্লোক শুনে সকলেই বিম্বিত হলেন, এমন কি মহাপ্রভু পর্যন্ত। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই শিশুর এমন পরিবর্তন দেখে। আর সেই সঙ্গে তখনই তাঁকে 'কবি কর্ণপূর' উপাধি দান করলেন। মহাপ্রভুর প্রসন্ন এই কবি কর্ণপূর উপাধিই উত্তর কালে তাঁকে বৈষ্ণব-সমাজে বিখ্যাত করে তুলেছিল।

শিবানন্দ ছেলের এই পরিবর্তন আশ্চর্য্য হতে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁকে সবাই কবি কর্ণপূর নামে ডাকতে শুরু করলেন।

কবি কর্ণপূর ছিলেন শিবানন্দের ছোট ছেলে। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। অনেকগুলি বই তিনি লিখেছিলেন। সমস্তগুলিই

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক'ই মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। এ নাটকে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর থেকে পুরীতে বসবাসের সময় পর্যন্ত ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করা আছে।

প্রাচীন সাহিত্যের অসংখ্য পুঁথির মত এ নাটকটির রচনা কাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ১৫৭১-৮০ সালে আবার কেহ বলেন ১৫৩২-১৫৪০ সালের মধ্যে নাটকটি লেখা হয়। তবে নানা অঙ্কশঙ্কানের পর ঠিক হয়েছে যে নাটকটি ১৫৪০ সালের আগেকার রচনা।

নাটক রচনার কয়েক বছর পরে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনা করেন কবি। ১৫৪২ সালে এটি রচিত হয়। এ কাব্য রচনায় কবি তাঁর আগেকার কবি মুবারি গুপ্তকে অহসরণ করেছেন।

কবির তৃতীয় গ্রন্থ হচ্ছে 'গৌরগোবিন্দদীপিকা'। এ বইটি নিয়েও বৈষ্ণব সমাজে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে। অনেকে একে কর্ণপুরের রচনা বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু নানা বাকবিতণ্ডার পরে তাঁর সময়ের কবি নয়রহি চক্রবর্তীর কথার পুনরুক্তি করে বলা যায় যে এটিও কর্ণপুর রচনা করেন।

এছাড়া 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পু', 'আরাধনাক', 'অলংকার কোষভ'

এ 'বইগুলিও তিনি লিখেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অঙ্করূপে আনন্দবৃন্দাবনচম্পু লিখিত হয়েছিল। অলংকারকোষভ, কাব্য অলংকারকে কেন্দ্র করে কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা।

কিন্তু গ্রন্থসমূহের বিষয় যে এত পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এত পুঁথি রচনা করেও তাঁর নাম আজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত হয়ে রয়েছে। বৈষ্ণব সমাজেও কবি হিসাবে তিনি তেমন খ্যাতি পাননি। তখনকার দিনে বৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠামী ছিলেন গ্রন্থ অঙ্কমোদনের অধিকর্তা। তাঁরা কবি কর্ণপুরকে ভাল চোখে দেখতেন না। কবির সংগে তাঁদের ধর্ম বিয়ে বেশ কিছুটা পার্থক্য ছিল আর তাছাড়া তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের রচিত পুঁথিই বাংলাদেশে বেশি প্রচার হোক। কলে কর্ণপুরের কোন গ্রন্থকেই তাঁরা অঙ্কমোদন করেননি। কিন্তু না করলেও তাঁর গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট ঋণ অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশে বসে কবি কর্ণপুর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইগুলি রচনা করেছিলেন বাঙালী তা থেকে যথেষ্ট আনন্দ আর জ্ঞান লাভ করেছিল। বৃন্দাবনের গৌসাইরা তাঁকে স্থান না দিলেও তিনি বাঙালীর স্বপ্নে স্থান করে নিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর দেহাশ্রীধর্মপুত্র এই ভক্ত কবির কথা তাই বাঙালী ভক্তের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শীতের দিনে-ও

ল্যামোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে বাতাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ তৈলী ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, মৃদুভিত্ত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, বন্ধন ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তরীণ বাতাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোন্মল করুন।



বোরোলীন

পরিমিত প্রসাধন

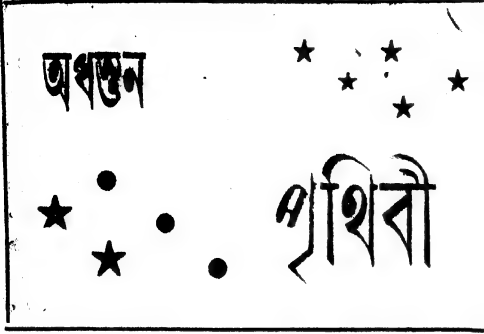
পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং



বোরোলীনে—ল্যামোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও টোটকটির হাত থেকে রক্ষা করে আর রূকতম বস্কের-ও লাভ্য বৃদ্ধি করে।



১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ড: পঞ্চানন ঘোষাল

জোড়াবাসীর রিপোর্ট থেকে গালমন্দ খেয়ে কিরে এসে চিরঞ্জীব বাবু আর একটা মাত্রও নীচের আফিস দেয়ী না করে তড় তড় করে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর উপরের কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলেন। এই দিন তাঁর কোয়ার্টারের ভিতরে ঢোকায় দরজাটি খুলেই ছিল। কোনও দিকে না দেখে তিনি ভিতরে এসে একটি চৌকীর ওপর গুম হয়ে বসে পড়লেন। চিরঞ্জীব বাবুর মনের এই বিশেষ অবস্থাটি তাঁর স্ত্রী সারদামণির নজর এড়ায় নি। প্রায় দুই তিন দিন ধাবৎ তিনি তাঁর স্বামীকে চিন্তিত দেখেছেন। তবে পুলিশের কাজে মাঝে মাঝে এইরূপ হয়েই থাকে। কয়েকদিন মনমরা হয়ে থাকে পুনরায় এরা এদের মনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তখন এঁা বিগত উৎসাহে প্রিয়জনদের সঙ্গে পুনরায় কথাবার্তা শুরু করেন। তাঁদের মন তখন প্রিয়জনদের প্রতি ঘিণভরত স্নেহ ও প্রীতিতে ভরে যায়। এই সব এতোদিনে সারদামণির গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইদিন তাঁর মুখে শুধু চিন্তা নয়, একটা নিরাশ্রয় বিবারণও যেন ফুটে উঠেছে। এই অবস্থায় স্বামীকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা সারদামণির ছিল না। তবু রান্না ঘরের দিকে যেতে-যেতে তিনি স্বামীকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, অমন করে মন খারাপ করে বসে আছো কেন? অফিসের কাজে নতুন কোনও আবার বজাট বজাট হলো না কি? প্রশ্নবাবুকে জোড়াবাসীর আঁজকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করেছিল। কখন পুরী থেকে ফিরবেন তিনি? একটা তো বেজে গেল এলিগে? ছুটি না হও এর মধ্যে একটুখানি খেয়ে নাও। পরে আখর তাঁর সঙ্গে বসে থাকে আখুন।

নীচে মেঝের উপর একটা মাহুর পেতে বসে চিরঞ্জীব বাবুর শিশু পুত্র চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা বাহলা পাঠাপুস্তক পড়ছিল। অল্পদিন এই সময় স্বানাহারের পূর্বে চিরঞ্জীব বাবু পুত্রের পঠন পাঠন সবকিছু একটু খবর নেন। ছেলে কি পড়ছে বা না পড়ছে তা জরুরার বা দেখবার জন্য অন্য কোনও সময় তাঁর হাতে থাকে না। একটু পরেই তাঁকে খেয়ে দেয়ে আবার নীচের অফিসে নেমে যেতে হবে। উপরে ফিরে আসতে কোনও কোলও দিন পড়ার হাতও থাকেই। প্রফুল্ল পুত্র তাঁর কোলে উঠে তাঁর

দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখবার পূর্বেই তাকে সরকারি কাজের জন্য নীচে নেমে যেতে হয়। পুত্রের দিকে একবার সরল্লপন করে চেয়ে দেখে অল্পমন্দ ভাবে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর স্ত্রীকে জানালেন, ট্রেন তো বহুক্ষণ এসে পড়েছে। এখনি প্রণব বাবু এসে পড়লো বলে। এক সঙ্গে খেতে বসবো আখুন। হয়তো এতোক্ষণ স এসেও পড়েছে। তাঁর কোয়ার্টারে একবার খোঁজ নিয়ে দেখছি। তুমি বাও—

মাহুরের মন যখন অত্যধিক খারাপ থাকে, তখন প্রিয়জনদের সম্পর্ক বোধ হয় অধিকন্তর অসহনীয় হয়ে উঠে। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট থেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের মত বিদেয় দিয়ে চিরঞ্জীব বাবু যেন একটু স্থিতির শিখার কপলেন। সৌভাগ্যক্রমে স্বামীর মন খারাপের কারণ সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তাঁর এই অসহনীয় অবস্থাকে আরও অসহনীয় করে তুলবার মত সারদামণির হাতে এইদিন পর্যাপ্ত সময় ছিল না। বহির্ভাগ্যে সবকিছু নিতান্ত অস্তিত্ব প্রিয়তমা স্ত্রীকে তাঁর মন খারাপের কারণ সবকিছু কেনও মনগড়া ঘটনার উল্লেখ করে রেহাই পাবার মত মনের অবস্থার আঁজ যেন আর তাঁর নেই। নানান প্রশ্ন দ্বারা তাঁকে উত্থাপিত করার জন্য তাঁর কাছে জেঁকে না বসে তাঁর প্রিয়তমার চলে বাওয়াটিই যেন তাঁকে একটা শান্তির প্রলেপ এনে দিলো। মন খারাপের কারণ সম্পর্কীয় ঘটনা সমূহের প্রকৃত স্বরূপ সবকিছু যে দাম্পত্যে ওয়াকিবহাল নয় তাঁর কাছে থেকে এই বিষয়ে কোনও সন্ধানের বাণী শুনা বোধ হয় আরও পীড়াদায়ক। তাঁর এইরূপ মানসিক অবস্থার একমাত্র প্রশ্নবাবুর মত লোকের বোধ হয় তাঁকে সন্ধানের বাণী শুনাতে পারে। এইজন্য অন্তরের সঙ্গে চিরঞ্জীব বাবুর মন মাত্র প্রশ্নবাবুকেই এই সময় তারনা করছিল। মাহুর বা মনে প্রশ্নে কামনা করে বহু ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন মত এসেও যা। হঠাৎ কান খাড়া করে চিরঞ্জীব বাবু শুনলো, দরজার কলিত বেলটি ক্রিড় ক্রিড় করে বেজে উঠেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে এসে চিরঞ্জীব বাবু দেখলেন যে ইতিমধ্যে প্রশ্নবাবু ট্রেন থেকে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে ফ্রান করে মধ্যাহ্নের আহ্বারের জন্য তাঁদের কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ বক্ষাৎ এসে গিয়েছেন।

নীচের অফিসের হুলী বাবুদের কাছ হতে এই দিনের রিপোর্ট রুমের ঐ ঘটনা সবকিছু সবিশেষ স্বাবল প্রশ্নবাবু ইতিমধ্যেই শোনে গিয়েছিলেন। সন্নেছে চিরঞ্জীব বাবুর কাঁধে হাত রেখে প্রশ্নবাবু সন্ধানের স্তরে বলে উঠলেন নীচে এসেই সাহেবদের কাঁচিকলাপ সবকিছু কিছুটা শুনলাম। আমি হঠাৎ বাইরে না গেলে বোধহয় এতোটা হতে পারতো না। অন্ততঃ আমাদের বড় বাবুকেও সময় মত আমি রিপোর্ট রুমে হাজির করে দিতে পারতাম। বড় বাবু যে মাঝে মাঝে কান্ডজান হীন হয়ে পড়েন। অথচ তাঁকে বাঁচানোর জন্যই আমাদের এতো হুঁড়োগ। তা না হলে ছোট সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিরোধের আর কি কারণ থাকতে পারে। সব কথা খুলে তাঁকে না বলার জন্যই না তিনি মিছামিছি আপনাকে সন্দেহ করছেন। এর দেখছি মাহুরকে আর মাহুর বলেই মনে করতে চান না। আপনাদের সেই জোড়া বাগানের সিংহীর হুমকীর গল্পটাও শুনেই পেলাম। ইতিমধ্যেই দেখছি ব্যাপারটা সর্বত্রই প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তা এমন কথা যে শুনেই সে গুলেরই নিশে করছে। আমাদের আর কি? ওরা শুনের ওপরওয়ালাদের অনাহ্বাসে ত্রাণ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের নীচেরওয়ালাদের তো তা তাঁরা পারেন না। এখানে

প্রতিটি হৃদয়লতা তাঁদের ওপরওয়ালারা না জানতে পারলেও তা তাঁদের নীচের অফিসারদের কাছে কোনও দিনই 'অজ্ঞাত' থাকে নি। একদিন আমাদের হাতেও তাঁদের মত এইরূপ অসীম ক্ষমতা আসবে। কিন্তু সেদিন যেন একথা আমরা না ভুলে যাই। এখন এঁদের অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত আমাদের বৈধা হবে অপেক্ষা করতে হবে। আশ্রম, ভেতরে আশ্রম। মন খাটাপ করবেন না। ভুলে যাবেন না যে আমরা পুরাতন ও নতুন যুগের সম্মিলনে দাঁড়িয়ে আছি। অল্প বিধায়ে ভিন্নমত হলেও এই একটি বিষয়ে আমি আমাদের বড়বাবুর সঙ্গে একমত।

যে অসম্ভবতার একই ভাবে সকলকে সহ্য করতে হয় তাঁর জন্তে ভুক্তভোগীদের কেউ কারুর কাছে স্থানে ছোট হয়ে যায় না। পরস্পর পরস্পরের উপর প্রযুক্ত কটুবাক্য জানতে পারলে তা তাদের কাছে অপমানকর না হয়ে বরং শাস্তির পথিয়ে পড়ে। তবে তা তাদের গোষ্ঠির বাইরের কেউ না জানতে পারতেই হ'ল। ছোট সাহেব কিংবা বড় সাহেবকে তাঁদের কোন ওপরওয়ালার ঘর থেকে বের হলে এসে তাঁদের অফিসারদের গাল পাড়তে দেখলে তাঁরা বুকে নেন তবে ওপরওয়ালাদের ও ওপরওয়ালার আছে—ওটুকু যা তাদের সাধনা। বাঘ নাজেহাল করে তুলে নেকড়ে। নেওড়ে অম্লরূপ ভাবে খেসিয়ে বেড়ায় শৃগালকে। শৃগাল ইচ্ছা করলে খরগোষকে এই একই ভাবে বিব্রত করতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীই এই নিয়মের বশবর্তী। এদের বিরুদ্ধে ঘরে কাঁড়াতে হলে হস্তীর মত বলশালী হতে হবে। নয় তো গণ্ডারের মত শৃঙ্গের সৃষ্টি করতে হবে। অস্ত্রধার্য তাদের অজ্ঞান করতে হবে আত্মরক্ষার জন্তে হরিণ ও অশ্বজীবের মত পাথের স্তোর। তাই যে ঐরূপ গালিই তিনিও তাঁর উদ্ভ্রান্ত অফিসারের কাছে হতে একটু আগে থেকে এসেছেন। তবে পরমর্থালা ভেদে ভাবার একটু তারতম্য হলেও হতে পারে। উপরন্তু তাঁরা বুকে যে ভুক্তভোগীদের মধ্যে তারা কেউ একা নয়, এই ব্যাপারে তার আরও অম্লরূপ বহু দোষের আছে। এইরূপ অবস্থায় কটুবাক্যগুলি কাঙ্ক্ষিত হার তীব্রতা ও দাঙ্ঘশক্তি হারিয়ে ফেলে। ওগুলো তখন অর্থহীন

কয়েকটি উচ্চনাদ যুক্ত শব্দে মাত্র পরিণত হয়ে পড়ে। এই সব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা তাদের কাছে তখন একটা স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র মনে হয়। অস্বাদিক কটুবাক্যকারী উদ্ভ্রান্ত অফিসার নিজেই তাদের অশ্রান্ত অফিসারদের নিকট একটা উপহাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেন। কিন্তু এইরূপ এক চিত্তপ্রস্তম্ভ সময় ও অনাগ্র সাপেক্ষ। চিরঞ্জীব বাবু নবাবগত বিধার তখনও পর্যাপ্ত মনের এই অবস্থায় পৌঁছতে পারেন নি। তাই বিকৃত চিত্ত নিয়েই চিরঞ্জীব বাবু প্রথম বাবুকে নিয়ে তাঁর ঘরের ভিতরকার চৌকিটার উপর পুনরায় বসে পড়লেন।

চিরঞ্জীব বাবুর মনের ভিতর তখনও পর্যাপ্ত আশ্রম জলছিল। তাঁর যা কিছু প্রতিরোধ শক্তি তা বোধ হয় সম্পূর্ণ রূপেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। থেকে থেকে তাঁর মনের মধ্যে এসে পড়ছিল ছোট সাহেবের কয়েকটি কটুক্তি, জানো আমি জোড়াপাণে একটা সিন্ধী বসে আছি। এখান থেকে হস্তার দেবো আর টুটা খানা কেঁপে উঠবে, খর খর। হঠাৎ আসা উদ্ভ্রজন্যর হারা সম্মতি প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাবের জন্ত দ্বিধা বিভক্ত মনের মধ্যে অস্ত্রধন্য সৃষ্টি হলে মানুষ সময় বিশেষে শিশুরও অধম হয়ে যায়। এই সময় উপহাসের বস্তুও তাদের নিকট বেদনাদায়ক হয়ে উঠে। এই সাধারণ সত্যটি কিন্তু চিরঞ্জীব বাবু এই দিন যেন বুকেও বুকে উঠতে পারছিলেন না। হঠাৎ এই সময় চিরঞ্জীব বাবু শুনতে পেলেন তাঁর শিশু পুত্রটি মেঝের উপর বসে তার পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত একটি সিংহ সম্পর্কিত কাহিনীই আশ্রম মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে যাচ্ছে—পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রচুর সিংহ পাওয়া হাতিত। প্রাচীন সাহিত্যে হিমালয়ের পাদদেশে সিংহের বহুল অবস্থিতির কথা জানা যায়। এক্ষণে ভারতবর্ষে কৃত্রাপি আর সিংহ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে কেবলমাত্র গুজ্জর প্রদেশে তিনটি সিংহ বাস করে। পুত্রের মুখে এই কথা কয়টি কানে যাওয়া মাত্র চিরঞ্জীব বাবু হঠাৎ নেমে এসে পুত্রের কপালের উপরে এসে ফুল পড়া পাতলা সোনালী রংের চুল ঘুটি করে ধরে নেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, মাত্র গুজ্জর দেশে তিনটি সিংহ আছে কিবে? লেখ লেখ। গুজ্জর প্রদেশে তিনটি এবং জোড়াপাণে একটি।

চিরঞ্জীব বাবুর শিশুপুত্র সঞ্জীবচন্দ্র পিতার নিকট হতে

প্রত্যেকের ঘরে রাশিবার মত বই

শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী, এম-এ প্রণীত সেই বিখ্যাত

চিকিৎসা সোপান

পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইল

যে বসিরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিবার অপরূপ সুযোগ। প্রত্যেক রোগের পরিচয়, লক্ষণ, ঔষধ, পথ্য সকলের উপযোগী সরল ভাষায় লেখা আছে। মিহিলায়ের প্রসিদ্ধ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল এই অল্প কয়খানি হোমিওপ্যাথিক ডাঃ পি. বাসুদেব মহাশয় আপাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন। কম্পার্টেট মেট্রিয়ার মেডিকা, দিপার্টারী, পথ্যভাষ্য উভয়ের সম্বন্ধ সবই দেওয়া আছে। এই গ্রন্থখানি বই হয়ে থাকিবেই চলিবে। মূল্য সাড়ে চার টাকা ৪।।. ডাকমামুল এক টাকা।

এইরূপ ধরণের সম্পূর্ণ ও সুন্দর বই বাংলাদেশে আর নাই।

চতুর্থ সংস্করণের বিশেষ—ইহাতে দুইটি কঠিন ও দুঃসাধ্য রোগ 'বল' ও 'কুর্ভের' বহু অভিজ্ঞতালব্ধ হোমিওপ্যাথিক ফলপ্রসূ চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশক : প্রজ্ঞাপ্রী—৮২ ভবানী দত্ত সেন, কলিকাতা-৭

এইরূপ ব্যবহার ইতিপূর্বে কখনও পায়নি। সে শিতাটিকে খুঁসী করবার জন্তই এইদিন টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে তত্ত্ব পাঠ্যপুস্তক হতে একটির পর একটি কাহিনী পড়ে শুনাচ্ছিল। সে হতভম্ব হয়ে ছল ছল চোখে চিরঞ্জীব বাবু দিকে চাইলেই চিরঞ্জীব বাবুও চোখে জল এসে গেল। তাঁর মন তখনই পূত্রকে কোলে তুলে নিতে চাইলেও প্রণব বাবুর সম্মুখে দুর্বলতার পর দুর্বলতা দেখাতে তাঁর কেমন বেন একটা সমীহ হলো। এক্ষণে একটা প্রচণ্ড আঘাতে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর মনের স্বাভাবিক সত্তা ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি শুধু ক্যাল ক্যাল করে প্রণব বাবুর দিকে অশ্রুস্রাবের মত চেয়ে বসে গেলেন। চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর সকল কুঠা হতে মুক্ত করে প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর শিশু পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়ে চিরঞ্জীব বাবুকে ভূঁইয়াদের হস্তে বলে উঠালেন, এ আবার কি রকম হলো? এঁা? দোষ করলো একজন আর শাস্তি হলো আর একজনকে। এই না আপনি সেই দিন বড় গলা করে সুরিচারের ওকালতি করেছিলেন, বাঃ বাঃ! সহনশীলতার অভাব পৃথিবীতে সর্বত্রই। তা আপনার জুয়াড়ীদের মামলার কল কি হলো। নিশ্চয়ই আপনার সেই উপকারী বন্ধুটির কোনও সুরিচার করা যায়নি। জরিমানা দিয়ে সে বেগিরে এসে, বা তাকে কয়েকদিনের মত জেলেই বেত হলো।

চিরঞ্জীব বাবুও শেষের কথাটা কাণে ষাওয়া মাত্র তার মনটা বেন আর একবার জোরে লাড় দিয়ে উঠল। চিরঞ্জীব বাবু তার বুকের মধ্যে কেনার অপর একটি নতুন বস্তার অন্বেষণ করলেন, উপকারী বন্ধু সারদামণির বিচার ভখনও শেষ না হলেও অবিচারের একটা অশঙ্কা তাঁর মনের মধ্যে থেকে থেকে খোঁচা দিয়ে উঠে। কিন্তু আজকের বেদনার কাছে সেই দিনের বেদনা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আজকের এই যুহুতে তিনি কি এক ছেলেমাছবি করে বসালেন, তাঁর মনে হলো সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রীর কথা, অবাধ পুত্রের প্রতি তাঁর এই অকৃত আচরণ জানতে পারলে তো সে আর এক অনর্থ বীণাবে। চিরঞ্জীব বাবু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

সৌভাগ্যক্রমে চিরঞ্জীব বাবুর স্ত্রী সারদামণি কাছাকাছি কোথাও ছিলেন না। রান্নাঘরের পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চিরঞ্জীব বাবু সলজ্জভাবে তাঁর একমাত্র পুত্রের গালটি সম্মুখে একটু নেড়ে দিয়ে প্রণব বাবুকে বললেন, কি আর বলবে প্রণববাবু। আজ রিক্লাইন দোবোই ভেবেছিলাম। কিন্তু ভ্রমের মুখে দিকে তাকিয়ে এই সর্বজন্য আমাকে পরিভ্যাগই করতে হলো। তাই-ই বোধ হয় প্রথমে গর ওপরই আমার রাগ এসে গিয়েছিল। এখান বুঝছি যে অবসর গ্রহণের দিন পর্বন্ত এই পুলিশ বিভাগে থেকে বাগদার জন্তই বোধ হয় আমার প্রতি ঈর্ষ্যের নির্দেশ আছে। নিতান্ত ছাত্র অবস্থায় বিয়ে করেই না আমি এইরূপ বিপদে পড়েছি। আপনি কিন্তু প্রণব বাবু এখনও পর্যন্ত বিয়ে না করে ভালোই করেছেন। আর বা চাকরী আমাদের, থেং। পুলিশের লোকদের বিয়ে করার মধ্যে কোনও যুক্তিই নেই।

কি সব আপনি বাজে তথ্য বলছেন, হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর করলেন। যুক্তির সঙ্গে বিয়ে করার কি সম্পর্ক? তা ছাড়া যুক্তি তো হচ্ছে একটা উকিলা। সে নিজে কিছুই বুঝে না। সে অপত্যকে বুঝার মাত্র। আমার কমবাইও ছাড়াটির রান্না খাওয়া

কাঁকে কাঁকে বহন আপনারদের এখানে এসে সজীবের মার হাতের রান্না খাই, অন্ততঃ তখনকার মত তো মনে হয় যে বিয়ে একটা করে কোলাই ভালো। তা ছাড়া বিয়ের বাপায়ে কোনও যুক্তি দেখিয়ে কেউ কখনও যুক্তি পেয়েছে বলে তো শুনিনি। অন্ততঃ স্বাভাবিক মানুষ সম্পর্কে একথা আদর্শেই প্রোবান্স বলে আমি মনে করি না। বিয়ে না করে বারা সংসার ধর্মের দার এখানে চায় তারা জীত। শুধু তাই নয় তাদের অসামাজিক জীবনও বলা যেতে পারে। অন্ততঃ এই সব ভীত ও দারিদ্র জ্ঞানহীন নিউরিটিক লোকদের পুলিশ বিভাগে স্থান হওয়া উচিত হবে না। মতান্তরে এদের হাউজিং বা আন-প্রোডাক্টিভ বলে অভিহিত করলেও অসঙ্গত হবে না। আমি বিয়ে এখনও করি নি বলে যে তা কখনও করবে না, এমন কথা কিন্তু আপনাকে আমি কোনও দিনই বলি নি।

এমনি হাডা কথা-বাগীর মধ্যে চিরঞ্জীব বাবুর মনও যে কখন হাডা হয়ে গিয়েছে তা তিনি টেরও পান নি। হঠাৎ পিছন হতে চুড়ির একটু ঠুনঠান আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে তাঁরা দেখলেন সারদামণি সাহসে মুখে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সারদামণিকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে উঠে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর শিশুপুত্রের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। কিন্তু ততক্ষণ পুত্র সজীবগতের মুখে পুনরায় হাসি ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য হয়ে চিরঞ্জীব বাবু ও প্রণব বাবু উঠে দাঁড়ালেন। প্রণব বাবুকে সম্মুখে উঠে দাঁড়াতে দেখে সারদামণি বলে উঠলেন, খুব তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না শেষ করে ফেললাম। আবার এখনি বার হতে ডাক এলে তো কাউরিই খাওয়া হবে না। আর সেই সঙ্গে আমাকেও সম্মুখে খাবারের থালা সাজিয়ে রেখে আপনারদের মতই সারাদিন উপবাসী থাকতে হবে। মাসের মধ্যে দিন দশেক তো এই রকম হয়ই। তা আর কি করা বাবে বলুন। আনুন, ভিতরে আনুন। সব তৈরি হয়ে গিয়েছে। সারদামণি দেবীর সন্দেহ আমূলক ছিল না। তাঁর মুখের কথা কয়টি শেষ হবার পূর্বেই দরজার বাইরে থেকে একজন সিপাহী প্রণব বাবুকে উদ্দেশ করে তার স্বভাবসিদ্ধ বাজখাই গলার বলে উঠলো, হজুর। বড় সাহেব থানা ভিসিটমে আগয়া। বড়ি বাবু আকিসমে হাজির নেহি হার। আপ আগয়া শুনকে আপকো বোলতা হার। সিপাহীজীর কথা কয়টি চিরঞ্জীব বাবুর স্ত্রী সারদামণি দেবীরও কানে পৌঁছিয়ে ছিল। সিপাহীর এই হাঁক ডাকে লজ্জিত হয়ে উঠে আপন মনে তিনি বলে উঠলেন, হিঃ হিঃ হিঃ। পাপ মুখে আমার কি পোড়া কথা বার হয়েছিল! সত্য সত্যই কি তাই হলে আপনারদের আজ খাওয়া হবে না।

এই সময়ে বড় সাহেব থানা ভিজিটে এসেছেন শুনে প্রণব বাবু ও চিরঞ্জীব বাবু হুঁজুনিই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে কখনও কখনও এইরূপ ব্যতিক্রম যে পূর্বেও না হয়েছে তাও নয়। চিরঞ্জীব বাবুকে অপেক্ষা করতে বলে প্রণব বাবু ছুটাছুটা পারের দিকে দিতে দিতে উঠলেন, আপনি এখান আর নামবেন না। আপনাকে দেখেই আবার হয়তো তিন জেলে বেগুন হলো উঠবেন। আমি শুকে সামলে এখনিই আবার ফিরে আসছি।

কোনও দিকে আর দৃকপাত না করে নেমে এসে প্রণব বাবু দেখলেন বড় সাহেব মহাজ্ঞ বাবু ইতিমধ্যেই থানার ইন-চার্জ

লক্ষ্যস্বের জন্ত নির্দিষ্ট চোরাগিট লক্ষ্য করে বসে রয়েছেন। সহকারী লক্ষ্যস্ব ধীরাক্ষ বাবু দম্ভবতের জন্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ড বহিষ্ঠলি তাঁর সম্মুখে একে একে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রণব বাবু ঘরে ঢুকে তাঁকে অভিবাদন করা মাত্র বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু তাঁকে সম্মুখের চোরাগিটে বসতে বলে দ্বিত হস্তে বলে উঠলেন, আস্থান। আস্থান, প্রণব বাবু। তাহলে এসে গেছেন আপনি। তা বোমা ভালো আছেন? আর আপনার বাচ্চাটিও ভালো আছে তো! এঁা?

বড় সাহেবের এই অদ্ভুত প্রস্নে প্রণব বাবু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনে হলো বোধ হয় তিনি অল্প খানার কাউকে মনে করে কথা বলছেন। একটু কিছু কিছু করে মাথা চুলকে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, কি বলছেন স্যার, আপনি। আমার বো বা বাচ্চা কো নেই। আমি তো এখানেো বিয়ে থা কিছুই কমি নি। প্রণব বাবুর এই উক্তি শুনে বড় সাহেব মহীন্দ্রবাবুও কম বিস্মিত হন নি। বিষয়ের ঠোঁটটা একটু সামলে নিয়ে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে হাতের মুঠি পাকিয়ে তিনি একবার তড়া করে পাড়িয়ে উঠলেন, স্যার পর সজ্ঞারে চোরাগিরের উপর তাঁর পাছাটা ঠুকে দিয়ে বসে পড়ে তাঁর বজ্রমুষ্টি দিয়ে টেবিলের উপর একটা ঘূঁরি মেয়ে বলে উঠলেন, কি-ই! এতো বড়ো আশ্চর্য্য তার। আমাকে মায় ডেপুটি সাহেবকে পর্য্যন্ত কিনা বোকা বানাবে। উঁ। আমি একটা সিঁহী; উঁ। বাঘ সিঁহীকে পর্য্যন্ত ভয় করে না। পাঁড়াও আমি মজা দেখছি। ডিসহনেট আউগ্লেস। বলে কিনা প্রণবের বোঁএর প্রেস বেনদা হয়েছে। তাকে সে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আর কিনা এদিকে প্রণবের বিয়েই হয় নি। এঁা, দেখে নেবো তাকে আমি এখন।

প্রণব হতভম্ব। অফিসে উপস্থিত সকলেই হতভম্ব। আজ বড় সাহেবের কলমেয় একটি আঁচড়ে তাদের বড় বাবু সাসপেন্ড হয়ে যাবেন। মামলা কঠিন। সাক্ষ্যস্বাবৃত বথেষ্ট। এক প্রণব ও বড় সাহেবের সাক্ষ্যতেই বড় বাবু সাসপেন্ড হয়ে যাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রেসিডিউ স্ক্র হলো প্রণব বাবুকেই হয়তো করা হবে এক নম্বরের সাক্ষ্য। বড় বাবুর উপস্থিতিতে বড় বাবুর সামনে এমন সব কথা তাঁকে বলতে হবে যার জন্য বড় বাবুকে চাকুরী হতে একেবারে বরখাস্ত না করলেও তাকে কোনও এক নিম্নের পদে নাবিয়ে দেওয়া হবে। যে বড় বাবুর অধীনে প্রণব বাবুরা কাজ করছে সেই বড় বাবুকে তাদেরই পাশাপাশি তাদেরই একজনের মত হয়ে কাজ করতে হবে। পুলিশ অফিসার হিসেবে তাঁর যত দোহাই থাক, প্রণব বাবুদের উপর তাঁর সদ্ব্যবহার ছিল আশাতীত। তাঁর আত্মীয় মূলভ ব্যবহারে অফিসার হতে সিঁহী জমাদাররা পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু এখন উপায়? এখন উপায় কি? এখন বড় বাবুকে বাঁচাবার জন্তে যদি সে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয় তাহলে বড় বাবু তো বাঁচবেনই না, উপরন্তু তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নতুন প্রেসিডিউ ড করা হবে। মিথ্যে বলার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ করারও কোনও সম্ভাব্য নেই। বড় বাবুর উপকারার্থে কয়েকটা মিথ্যা কথা বলতে প্রণব বাবু প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জলজ্যাক্স একটা বধু নবজাত শিশুসহ সে এখনই তৈরী করে কি করে? তা ছাড়া হাতের জীর একবার বেরিয়ে গেলে তা কিরিয়ে আনাও অসম্ভব।

সদ্য সাক্ষ্যের মতীন্দ্রবাবুর ক্রুদ্ধ প্রণব বাবুর হাতের দিকে একবার

চোরে দেখবারও অবসর ছিল না। তিনি তাকাতাড়ি কেতাব কাঁটার পাড়া করটার একটা করে দম্ভবত দিয়ে জেনারেল ডাইরীটা টেনে নিলেন। তারপর তাঁর পাতার পাতার বড়বাবু বিরুদ্ধে মন্ত একটা রিপোর্ট লিখে প্রণব বাবুকে বললেন, কাল সকাল আটটার মধ্যে এই রিপোর্টের একটা কপি আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবে। আমি কালই তাঁকে খতম করে দেবো।

প্রণব বাবুকে তাঁর শেষ আদেশ জানিয়ে বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু শান্তভাবেই উঠে পাড়ালেন। এতক্ষণে তাঁর রাগটা একেবারে পড়ে গিয়েছিল। অধিকক্ষণ অহেতুক ক্রোধ ধরে রাখবার তাঁর কোনও কারণ ছিল না। তিনি উঠে পাড়িয়ে বাম হাতে তাঁর চুলটা কপালের উপর থেকে একটু সরিয়ে দিলেন। তারপর রুমাল বার করে মুখটা পুঁছে নিয়ে বুক পকেটের কাউন্টেন পেনটা সোজা করে বসিয়ে নিলেন। আজ বিকালের দিকে কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। তাই নিয়মমত সন্ধ্যার দিকে থানা ভিলিতে না এসে তিনি এইদিন একটু সকাল সকালই এসে গিয়েছেন। তাঁর টি দুটা পাঁত দিয়ে আলতো ভাবে একবার কামড়ে তিনি একটু ভেবে নিলেন। তাঁর পর শিশু দিতে দিতে যেমন প্রফুল্ল মনে এসেছিলেন, তেমনি প্রফুল্ল মনেই এই থানা থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সকালে রাজারা এমন করেই গর্দান নেবার হুকুম দিয়ে অবলীলাক্রমে তাঁদের প্রমোদাগারে প্রবেশ করতেন। একজনেও বিচারকরা তেমনি করেই কাঁদার হুকুম দিয়ে হাসতে হাসতে চায়ের পাটিতে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসেন। অভ্যাস মানুষের প্রকাজ বা অকাজ সকল কাজই সহজ করে তুলে। তা না হলে স্বাভাবিক

for JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

জীবন বাজা পালন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। বাবু দেখে দুভাগ না করতে পারলেও সে তার মনকে তথা বাস্তবকে দুভাগ কেন বহু ভাগে বিভক্ত করে নিতে সক্ষম। তাই মাঝবের চরিত্রের বা মনের একটি দিকই তার সব দিক না। তাই কান্নার মাত্র একটি দিক দেখে তাকে বুঝতে চেষ্টা করলে তাকে ভুলই বুঝা হবে। তাই প্রণব বাবু বড়সাহেবের উপর একটু মাত্রও বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং সশ্রদ্ধ ভাবেই তার প্রত্যাগমনের পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চল ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। এই দিনকার ঘটনার প্রণব বাবু এমনিই অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল যে অন্ধদিনের মত এইদিন তাঁর পিছন পিছন ছুটে তাঁকে তাঁর মোটারে পৌঁছে সেলাম দিয়ে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে পর্যন্ত তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রণব বাবু এই ভুল বা ত্রুটি বড়সাহেবের নজর এড়ায় মি। তিনি ফুটের উপর নেমে গিয়েই একবার থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হয়েছিল প্রণব বাবু বুঝি অন্ধ দিনের মত এই দিনও তার পিছন পিছন আসছেন। তিনি তাঁকে বায়ন করবার জুতাই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পিছন ফিরে প্রণব বাবুকে না দেখে তিনি ট্রাট বেকিয়ে ধীরে ধীরে মোটারের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এতক্ষণ প্রণব বাবুরও সন্দিগ্ধ কিংবা এসেছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে একি তিনি করলেন। কাঁচা খেঁকো গুয়া। ভুল বুঝলেন না তো আবার। কথাটা মনে হবা মাত্র প্রণব বাবু দৌড়ে গাড়ীর কাছে পর্যন্ত এসে মাথা নীচু করে গাড়ীর ভিতরের দিকে চেয়ে বসতে বাচ্ছিলেন, শুভ নাইট, ত্যার। কিন্তু আবার তাঁর

বলা হলো না। সহসা তিনি দেখতে পেলেন বড় সাহেবের শ্রী ও গাড়ীর মধ্যে বসে আছেন। অপ্রতীত ভাবে প্রণব বাবু 'হু' পা পিছিয়ে আসা মাত্র গাড়ীখানা হুস হুস করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে আসতে আসতে প্রণব বাবু ভাবছিলেন, কিংবা বাবা! বড় সাহেব আমাকে দেখেছে তো। না ভ্রমলোক মনে করলে আমি তাঁকে তাচ্ছিল্যই করলাম। প্রণব বাবুর আপত্তা অমূলক ছিল না। নিরন্তর সন্ধান পেয়ে পেয়ে এক সময় মাঝবের মন সন্ধান পাওয়া বা না পাওয়া সম্বন্ধে বোধ হয় অতিশ্রীয়াতা লাভ করে। সামান্যতম অবহেলাও তখন আঘাতের আকারে তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করে অপরাধী-মস্ত ব্যক্তিদের উপর তাঁদের প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে। থানায় ফিরেই প্রণব বাবু দেখলো চিরঞ্জীব বাবু কখন নেবে এসে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। উপরের বারগার উপর একটা কাপড় শুকাত্তিল। সেই কাপড়খানা আড়াল করে তিনি লক্ষ্য করছিলেন, বড় সাহেব কখন চলে যান। বড় সাহেবের গাড়ী ট্রাট দেওয়ামাত্র চিরঞ্জীব বাবু নীচের অফিস ঘরে নেমে এসেছেন। চিরঞ্জীব বাবুকে দেখে প্রণব বাবু অভিযোগের সুরে বলে উঠলেন, আচ্ছা চিরঞ্জীব বাবু। আপনিও তো আজ রিপোর্টে গিয়েছিলেন। বড় বাবু সেখানে আমার সবচেয়ে কি বলেছেন বা কি না বলেছেন তা'তো আমাকে আমার ভাগে জানিয়ে দিতে হয়। ওসব কথা ভুললে তো আজ আর আমি বড়ো সাহেবের সামনেই আসতাম না। আপনি শুধু বললেন যে বড় বাবু রিপোর্টে খুঁউব দেবী করে এসেছিলেন। দেখুন তো কি কাণ্ড হয়ে গেলো। এখন উপায়?

যেখানে একক আশ্বরক্ষা সম্ভব নয়। সেখানে দলগত ভাবে আশ্বরক্ষা করতে হয়। তাই কোনও এক ঘটনা ঘটনামাত্র সে সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া এখনকার একটা রেওয়াজ। এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করে তারা আশ্বরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হয়। এইভাবে বুঝে বুঝে কথা বলে তারা বহু আঙ্গুর বিপদ এড়িয়েও যেতে পেরেছে। এই নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্ত শুধু প্রণব বাবু কেন থানার প্রত্যেক অফিসারেরই চিরঞ্জীব বাবুর উপর বিরক্ত হবার কথা। এইভাবে দলীয় স্বার্থ চিরঞ্জীব বাবু ক্ষুণ্ণ করছেন তা সকলের বিশ্বাসের বাইরে ছিল। তাই প্রণব বাবুর কথায় বিক্ষুব্ধ হয়ে চিরঞ্জীব বাবু উত্তর করলেন, বিশ্বাস করুন প্রণব বাবু। আমি এই ব্যাপার মাত্র এখন জানতে পারলাম। বাইরের অফিসে বসে থাকায় রিপোর্ট রুমের ভিতরের ঘটনা আমি একটুও জানতে পারিনি। তা' ছাড়া বড় বাবু আমাকে এ বিষয়ে কোনও রূপ সন্দেহও করে নেননি।

সারা থানায় লিপাহী জমাদারদের মধ্যেও ইতিমধ্যে এই গুণ্ডগোলার কথা মুখে মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছে। সকলেই তাদের বড় বাবুর বিপদের জন্ত মনে মনে আতঙ্কিতও বটে। এ ওর মুখ 'চ' বা চাঁওরি করে ভাবছে বড় বাবু কখন থানায় ফিরে আসবেন। ১০ক এই সময় কোথা থেকে খবর পেয়ে বড় বাবু হস্তান্তর হয়ে থানায় ফিরে এলেন। খুব সম্ভবতঃ থানায়ই কোনও বিষয়ত অমুচর টান্সি করে তাঁকে খবর দিয়ে এসেছে। খুব সম্ভবতঃ সেই টান্সি কয়েই তিনি স্বরিত্ গতিতে ফিরে এসেছেন। কাছাকাছি কোথা থেকে টেনিফোলেনও তাঁকে খবর দেওয়া অসম্ভব নয়। বড় বাবু গোছা অফিসে এসে তাঁর নিশ্চিষ্ট চেয়ারে বসে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর সমুখের চেয়ারগুলিতে বসতে অজ্ঞোষ করে বললেন, হম।

Amico's
GREEN LINIMENT


আপনি নিশ্চয় দৈনিক ব্যথার স্বপ্না পাচ্ছেন- কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে, কিংবা কোন সন্ধিস্থানে?
তখন বুদী হবেন—
পারীষিক, হুক বা পিঠের পীড়ন,
বাড়ের ইত্যাদি বাবুজীর ব্যথার

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট
(সমুদ্র বাসিন্দা)
বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য: বড় শিশি—২.৭৫ নং গঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং গঃ
"মাগুন" বস্তুর

বাথপাণের জন্য গিটুন—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
১০ নং বঙ্গবন্ধু স্ট্রিট, কলিকাতা-১



দেখ আমাবাই। তা কি করে জানবো। প্রণব আজই কিরে আসবে।
 বাক ঠিক আছে। তুল বখন আমিই করেছি তখন সেই তুলের
 সমুখীন আমাকেই হতে হবে। বড় সাহেবের সঙ্গে আমার
 এবার প্রজ্ঞাপক সংগ্রামে বাঁধলো। তাই এখন হতে তোমাদের
 একটু সাবধানে থাকতে হবে। কোনও কাজ কর্তে যেন তুল জুটি
 না হয়। অবশ্য তুল মাছের হবেই। যে সব তুল সাধারণতঃ তিনি
 অগ্রাহ্য করতেন সেই সব তুল এখন হতে হয়তো বড় করে ধরবেন
 যখন আগে লিখতেন ডাষ্টরীগুলি লিখতে এতা কাটাছুটি করেছো
 কেন? এ ভেদে কেয়ারলেন্স অফিসার। সেখানে এখন হয়তো তিনি
 লিখে বসবেন, ফলসিকিফিকেশন্স অব গভার্নমেন্ট বেকর্ড উইথ
 আলটেরীয়ার মোটিভ। তা বলে বসে পোকা বাছিতে আরম্ভ করলে
 অনেক পোকা বার করে আনা যায়। আমার অফিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
 চেক করলে উনি বা পায়েন, ঠর অফিস চেক করলে আমিও
 তাই শোতে পারি। শিষ্ট সে স্রবোগ আমাদের বখন নেই তখন
 ওসব কথা এখন থাক। বাক, এখন কিছুদিন তোমাদের
 একটু সাবধানে থাকতে হবে। এর কারণ আমাকে বাগে না
 পেলে তোমাদের তিনি ধরবেন শুধু আমার শাসন ব্যবস্থার দোষ
 ধরবার জন্তে। একবার মট মল্লিককে বলে রাজের দিকে বড়সাহেবের
 ওখানে একবার ঘুরে আসবো, আধুন। সহজে মিটে গেলে আর অধুনা
 শক্তি ক্ষয় করবো না। কাল রববার আর পর শুটি। হুদিনতো 'সময়
 পাওয়া যাচ্ছে। তবে তুমি তোমার পূর্বের ষ্টেটমেন্টেই ঠিক করে
 থেকো। সকালে ডাষ্টরী বইতে বা ছাই ভাষ লিখেছে তা কশি করে
 ওঁর অফিসে পাঠিয়ে দিও। আমি এখন তা'হলে চলি—

বড়বাবু খানার বাইরে চলে গেলে প্রণব বাবু আপন মনে বলে
 উঠলো, বাবাঃ! মনের জোর বটে। ভয় ভয় বা ভাবনার কোনও
 বাসাই নেই ভুল্লোকেব মধ্যে। প্রণব বাবু অফুট স্বরে কথা
 কয়টি উচ্চারণ করলো তা চিরঞ্জীব বাবুর কানে গিয়েছিল।
 চিরঞ্জীব বাবুও যথাসম্ভব গলাব স্বর থাকে নামিয়ে বলে উঠলো,
 দেখবেন আধুন প্রণব বাবু। উনি সব ঠিক করে নেবেন।
 শুনেছি মট মল্লিক বড় বাবুর বিশেষ বন্ধু। ডিপুটি সাহেবের সঙ্গে
 তাঁর খাত্তর আছে। নেপথ্যে থেকে কলকাতা টিপে দিলেই হলো।

প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর এই স্বগতোক্তি কানও উত্তর দিলেন
 না। চিরঞ্জীব বাবুর এই কথাগুলো তাঁর মনঃপূত হয়েছিল।
 তাই মনে মনে তিনিও কামনা করলেন, ভগবান। এই কথাই যেন
 সত্য হয়। তার পর একটু ভেবে নিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে তিনি
 চিরঞ্জীব বাবুর দিকে মুখ ফিফিয়ে বলে উঠলেন, আরে। হুটো
 যে বাজে। খোঁতে বেতে হবে না। আমাদের সঙ্গে উনিও কি
 উপোস করবেন। চলো চলো, উপরে যাই। কথা কটটা বলে
 প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে সিঁড়ীর
 দিকে এগিয়ে চললো। তাঁর পিছন পিছন অপ্রতিভ ভাবে
 চললেন চিরঞ্জীব বাবু। সিঁড়ীর উপর উঠতে উঠতে
 তাঁর বাবো বাবো মনে হচ্ছিল। বাবাঃ! একটা ছুয়া
 ধারার জন্ত এতো কাণ্ড। কে জানে ভাগ্যে আরও কি
 আছে।

উত্তরে উপরে এসে দেখলেন চিরঞ্জীব বাবু স্ত্রী থাবারের খালি
 হুটো ও পাশের বাটা কয়টা করে কটা পিতলের গামলা ও
 ঢাকনী দিয়ে ঢেকে রেখে গালে হাত দিয়ে মেয়ের উপর চুপ করে
 বসে আছেন। তাঁকে এই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সলজ্জ
 ভাবে প্রণব বাবু বললেন, মাপ করবেন বোদি। বজ্র কষ্ট দিলার
 আপনাকে। নীচে যে একটা অঘটন ঘটছিল তা চিরঞ্জীব বাবুর
 জ্বর বৃদ্ধিতে বাকি থাকে নি। থাবারের ঢাকনীগুলি এক একটি
 করে উঠাতে উঠতে তিনি উত্তর করলেন, একি বলছেন আপনি
 বলুন তো। এ বকম কষ্ট কি আমার নুতন না কি? এর পর
 চিরঞ্জীব বাবুর দিকে ফিরে তিনি অনুযোগের স্বরে বললেন, তোমার
 কি মাথা খাঁপা হয়েছে না কি? মিছি মিছি ছেলটাকে মেয়ে
 গেছো। কেঁদে কেঁদে গেয়ে নিয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে বোধহয় সে
 ঘুমিয়ে পড়লো। বাও ওঁ'বরে গিয়ে ভকে একটু আর কয়ে তার পর
 মুখ হাত ঘুরে খেতে বসো। তোমার আর প্রণব বাবু জন্ত বাধকমে
 জল সাবান ভোয়ালো ঠিক করে রেখি। মাংসটা আর একবার না হয়
 গরম করে দিলাম। তবে ভাতটাত সব ঠাণ্ডাই খেতে হবে।
 তা' কি আর করা বাবে বলো। তা'ছাড়া এত তো তোমরা
 অভ্যস্ত। বাক—

[কথনঃ]

বাসবো ভালো

সাধনা দেবী

আজিকে আমার নাইকো ভেমন কিছু
 সেই অভ্যস্ত দিনে এসেছি ফেলে সব,
 শুধু হস্তবানি কবর অস্ত্রভব
 আজি তোমার গুপ্তো বাসবো ভালো কিছু।

দেবীর বেশে যখন তুমি মায়ায় ছিলে তেঁকে—
 রহস্য আর রূপের খেঁকে ছিলেম অনেক দূরে
 হৃদয় শুধু থাকত তুলে বেহুতো সব স্বরে ;
 অন্ধকারে সেদিন কুণ্ডল ছিলেম তোমার খেঁকে।

তোমার তব জীবন ভায়ে চলেছি তুলের পিছু
 জোর করেই কি শুভ-দুষ্টির চোখ মেলাতে পারি ?
 হবে সকল দিয়ে ব্যর্থ হয়ে করেছি মাথা নিচু—
 পথের দিশা পেলোম তখন বাসনা অপমারি।

আজিকে আমার রিক্তমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা
 দীনের বেশে শূন্য হাতেও ছটবে না সে পিছু
 বাঁহিরটুকু চার না সে তো খোঁজে মনের কথা
 জ্ঞান আর তোমার তুলে বাসবো ভালো কিছু !
 আজিকে আমার নাইকো ভেমন কিছু।



ভাবানী মুখোপাধ্যায়

বক্তৃতা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব অল্পজ্ঞিত হওয়ার পর মার্কসীয় কমুনিজম সর্ব প্রথম ব্যবহারিক ভাবে পরীক্ষিত হল, কিন্তু বলশেভিকরা ইংলণ্ডের ফ্যাপিটালিস্টদের চাইতে তার ভাবে আক্রান্ত হলেন সোভিয়েটদের হাতে। ব্রিটিশ শ্রমিক নেতারা যা খুসী বলতে শুরু করলেন।

এর কিছু কাল পরে ফেব্রুয়ারি মাসের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, বার্নার্ড শ' সেই সভায় উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন We are Socialists, The Russian side is our side যেহেতু আমরা সমাজবাদী আমাদেরই দল রুশ দল।

এই উক্তি পর সভাগৃহে অশান্তি সৃষ্টি করা বিরাজ করতে লাগল। তারপর স্বয়ং সভার কাজ আবার শুরু হল, তখন আর সোভিয়েট সরকার সম্পর্কে কোনো কটুক্তি বর্ণিত হইল না।

বার্নার্ড শ' স্বয়ং রাশিয়ায় গেলেন তখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে Hearst Press of America বার্নার্ড শ'কে অমুরোধ করেছিল তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাদের মাধ্যমে প্রচারের জন্য। বার্নার্ড শ' এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বার্নার্ড শ' জানুতেন প্রাথমিক অবস্থায় সোভিয়েট সরকারের সহিত কিছু ক্রটি বিচারিত থাকতে পারে কিন্তু সারা পৃথিবীকে তা জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং লেডী গ্র্যাষ্টন প্রভৃতির সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণে যাত্রা করলেন তখন সোভিয়েট সরকারের প্রাথমিক ক্রটি বিচারিত কাল শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা তখন পরিপূর্ণ পরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

লর্ড লোথিয়ান (তখন কিলিংয়ের) এক সন্ধ্যায় বার্নার্ড শ'র বাস ভবনে এসে বললেন—লেডী গ্র্যাষ্টনের কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন, লর্ড গ্র্যাষ্টনও সঙ্গে যাবেন। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।

বার্নার্ড শ' যেন এই চাইছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। রাশিয়া ভ্রমণের পক্ষে সেপ্টেম্বর অক্টোবর হচ্ছে প্রশস্ত।

বার্নার্ড শ' সম্রাজ্য গিয়েছিলেন জুলাই মাসে। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, এমন কি থিয়েটারে ওপেরা সব বন্ধ।

বার্নার্ড শ' স্বয়ং এই ভ্রমণের একটি বিবরণ লিখেছেন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভ্যাঙ্কোভারি ফেব্রুয়ারি মাসের Nash's Pall Mall Magazine নামক অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকায়, এই রচনাটি বার্নার্ড শ'র কোনো গ্রন্থে সংযোজিত হয়নি। এ ছাড়া বার্নার্ড শ' ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত উইনস্টন চার্চিলের বার্নার্ড শ' নামক প্রবন্ধের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি আলোচনার কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেন, সেই রচনাটি Sixteen Self Sketches এর মধ্যে আছে। বার্নার্ড শ'র রাশিয়া পর্যটনের বিবরণ মূলতঃ এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরিবেশন করা যাবে।

শ' বলেছেন, যাওয়া স্থির হওয়ার পর কেউ বলে না খেয়ে যরতে হবে, কেউ বলে গায়ে উকুন ধরবে, কেউ বলে শেষ পর্যন্ত কোতল (liquidated) করবে। স্তব্ধতা এমন একটা নির্বোধের মত কর্ম না করাই শ্রেয়। দলের সমস্ত দ্বীলোককে জাতীয়করণ করা হবে আর তারা যা দেখাবে তাই শুধু দেখতে পাবে।

বার্নার্ড শ' বলেছেন, তাই অকৃতোভয়ে এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়া গেল। যা কেউ করেনা তাই করাটাই ত' বাহাদুরী। সীমান্তে দেখলাম তোরণ শীর্ষে লেখা আছে Communism will do away with all frontiers. সীমান্তের গতি দূর করবে কমুনিজম। নিশ্চয়ই একদিন তাই হবে, তবে উপস্থিত এই তোরণ লিপি স্মরণ করিয়ে দিল পাসপোর্ট বার করতে হবে আর আমি রাশিয়ায় পৌছলাম।

যতটা ভয়ংকর এবং বিভীষিকাময় শোনা গিছিল, আসলে সোভিয়েট ভূমি তেমন ভয়াবহ নয়। রাশিয়ায় অর্থ, পদমর্যাদা প্রভৃতি কোনো সন্ত্রাস উদ্বেক করে না, অর্থ না থাকলেও সমান সমাদর। বার্নার্ড শ' বলেছেন—I was certainly treated as if I were Karl Marx in person and given a grand reception in the Hall of Nobles, which holds 4000 people and was crammed.

রাশিয়ায় এক সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান সভার সঞ্চর্চনার ব্যাডেক, লুনাতারসকী, থালাটোক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বার্নার্ড শ'র রাশিয়ার অনেক বিচিত্র বস্তু চমৎকার লাগল। রেল-স্টেশনের সঙ্গে প্রাকণ্ড হল সন্নিবেশিত করা হয়েছে আর সেই সব হলের প্রাচীরগাত্র ভেনিসের scuola di San Rocco-র মতো শুল্কর দেয়ালচিত্র আঁকা রয়েছে, বার্নার্ড শ' বলেছেন, এইগুলি 'রিলিজিয়স পেইন্টরিং' এবং সেই ধর্মের নাম মার্কসবাদ। তিনি দেখে বলেছেন বিখ্যাত শিল্পী জি. এক, ওয়াটস্ বনন লণ্ডন গ্রাণ্ড ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের লণ্ডন স্টেশনটি বিনা মূল্যে অলংকরণের প্রস্তাব করেছিলেন। প্রাচীরে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কর্তৃপক্ষরা মনে করেছিলেন যে ব্যবসায়িক স্থবিধার চেয়ে এই ছবি দেখার জন্য ভবঘুরেরা ভীড় করবে। শ' মন্তব্য করেছেন, সোভিয়েট সরকারের বিচারবুদ্ধি অনেক উন্নত, তাই তাঁরা শিল্পীকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দান করে এই ছবি আঁকিয়েছেন।


রাশিয়ার শ্রমিক সম্পর্কে বার্নার্ড শ' বলেছেন—রেলের কাজ বারাক্রমে যেন ছুটিবেলার বেঁছাসেবক কথা বলতে কলতে একটি

অড়াআড়ি করো! অড়াআড়ি করো!

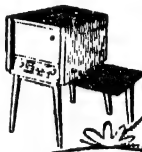
সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

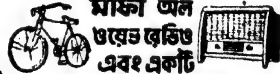
২ টি প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার ভেতর সমস্ত ভারত প্রদান বা নগদ ৪,০০০ টাকা



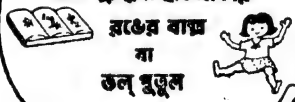
চারটি ২য় পুরস্কার
এইচ.এম. ডি. রেডিওগ্রাম



৬ টি ৩য় পুরস্কার
মাসী অল গয়েজ রেডিও এবং একটি করে ফ্রিজ প্রায়ামডর সাইকেল




২,০০০ অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার
রঙের বাস্তু না তল হুতুল



নিম্নলিখিত আপনার সানলাইট পিচকার খাও থেকে প্রবেশের নিয়ম আনুন। প্রতিটি প্রবেশপত্র একটি কলর দাঁধ আছে। অল্পে আপনার প্রবেশপত্রের ৪০ লাগতে হবে। যে ৪০০ ৪০ কলর ইচ্ছা স্বাক্ষর করতে পারবে।

অড়াআড়ি করো
শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।



মালগাড়ি এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে এমন ছন্দোময় ভঙ্গীতে ট্রেনের কাঁজ করল যে মনে হল যেন বালেনুতা দেখছি, রাশিয়ায় এই একটি বালেনুতা দেখেছি।

বার্ণার্ড শ'র রাশিয়া ভ্রমণের প্রাক্কালে অনেকে তাঁদের ভয় দেখিয়েছিল যে সেখানে খাদ্যের কিছুই ভুটবে না। লেডী গ্র্যাটর তাই প্রচুর টিনে সংরক্ষিত খাদ্যসম্ভার সঙ্গে নিয়েছিলেন, পরে সেগুলি বিলিয়ে দিতে হয়। শ' বলেছেন—রাশিয়ান খাদ্য পুষ্টির দিক থেকে আশ্চর্যজনক। রাশিয়ানরা কালো রুটি (Black bread) আর বাগারপির সুপ খেয়ে বেঁচে আছে জেনে পাশ্চাত্য জগৎ শিউরে ওঠে। তাদের সেই অজ্ঞতা মাঠে মারা যাচ্ছে। আমাদের সাদা রুটির চাইতে কালো রুটি সহস্রগুণ ভালো। ক্যাবেজ সুপের নাম Stichi, তাতে ক্যাবেজ ছাড়া আরো অনেক কিছু বস্তু আছে, এক হিসাবে ক্ষতের খেঁচ প্রতিক্ষম। বীরা আগুনের রস, দুধ বা লেবুর রসে জ্বীন ধারণের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেন, তাঁদের অমুরোধ জানাই রাশিয়া ভ্রমণে এসে ব্ল্যাক ব্রেড আর ক্যাবেজ সুপের স্বাদ গ্রহণ করতে। আরো অনেক পদ আছে, যেমন সব রকম পরিভ্রমের নাম Casha। কোষ্টবন্ধবাসী পশ্চিমের গো-খাদকদের রাশিয়ান কালো রুটি আর ক্যাবেজ সুপ, আর সেই সঙ্গে চাঁজ আর মোটা শশা (রাশিয়ায় এই স্লিনিথটি প্রচুর পাওয়া যায়) যদি নিষিদ্ধ ভাবে প্রভাতী খানা হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে তার মানসিক ও নৈতিক শক্তি লক্ষ্য করে শিউরে উঠবেন। এখন যেমন প্রতিবেশীর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিকে নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের হেতু মনে করে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

বার্ণার্ড শ লিখেছেন যে রাশিয়ায় আজ বাঁচিয়ে থাকা শক্ত, যেমন ব্যারাকবার্ডি বা বুদ্ধ জাহাজের অবস্থা। স্থানীয় বিনি রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক তিনি সপরিবারে মাত্র তিনখানি ঘরে থাকেন। অবশ্য হোটেল মেন্টোপালে বার্নার্ড শ'র ঘর বেশী জায়গা পেয়েছিলেন হাত-পা ছড়িয়ে থাকার রকম। তিনি তাই বলেছেন, আমার মতো দরিদ্র সোশালিষ্ট লেখকের অদৃষ্ট যদি এই জোটে তাহলে হারসট বা ব্লুফেলারের সইকরা চেকের বিনিময়ে কি না পাওয়া যাবে?

একদিন পুলিশ আদালতের বিরাট প্রাসাদে বেড়াতে গেলেন বার্নার্ড শ'। সে বাড়িতে আরো অনেক সরকারী অফিস আছে। অবশেষে তিনি দেখলেন একটি ঘরে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে, একটি উঁচু টেবিলের ধারে জটিল কর্মদক্ষ মহিলা বসে আছেন। প্রশ্ন করে শ' জানলেন তিনিই ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর দুপাশে বসে আছেন একজন পুরুষ ও মহিলা। তাঁরা দুজনে জনসাধারণের পক্ষে ত্রায় বিচার হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখছেন। সেই আদালতের কোথাও পাহারাবন্দ নেই। জানা গেল লোকটি একটি মাত্র শস্যার অধিকারী সেই জমগায় একটা পুরা কাদরা দখল করে রেখেছিল এই অপরাধ। কি শাস্তি হল তা আর বার্নার্ড শ' জানতে পারেননি, তিনি অল্প ঘরে গিয়ে আর একটি বিচার দেখতে গেলেন।

এই ঘরের ম্যাজিস্ট্রেটও একজন মহিলা। তিনি রায়দানের পূর্বে বিজ্ঞান কক্ষে ঢুকছেন। বার্নার্ড শ' শুনেলেন যে এখানকার কেসটা বেশ গুরুতর। একটি মেয়ে গর্ভপাতের অপরাধে আগে শাস্তি পেয়েছিল, সে আবার সেই অপরাধ করেছে। অথচ এই কক্ষেও পাহারাবন্দ নেই, অপরাধী ও দর্শক চেনার উপায় নেই। শ'

বিম্বিত হলেন। রাশিয়ার তখনকার আইনানুসারে দু মাসের গর্ভ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে গর্ভবতী মহিলারা গর্ভপাত ঘটতে পারেন, তার জন্য লাইসেন্সধারী ডাক্তার আছেন। বিচারাবলী মামলার আসামী কোনো নীতিই মানেন নি, নিজের খুশীমত কথ করেছেন, তাই বিচার। ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে দুজন জুরিস্ট ফিরে এসে সুচিন্তিত রায় দিলেন। এক বংশের কারাদণ্ড। বার্নার্ড শ' ভাললেন এইবার বোধহয় ওয়ার্ডার এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে। একটি স্ত্রীলোক দেওরার ধারে এককণ বসেছিলেন তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আকাশের দিকে হাত তুললেন। তাঁর ভাষা বার্নার্ড শ' বুঝলেন না। হয়ত সুবিচার হয়নি এই কথা বলতে চায়। তারপর মেয়েটি দৌড় ভঙ্গীতে বিচারসভা ত্যাগ করে চলে গেল।

সবিস্ময়ে শ' প্রশ্ন করলেন—ওকে কি কারাগার নিয়ে যাবে না?

উত্তর হল—না, ওর কাজে ফিরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ এক বছর তাকে কোনো কারখানার কাজ করতে হবে, এই তার শাস্তি। থিয়েটার বা সিনেমা দেখার অধিকার নেই, রাতে বন্দী করে রাখা হবে।

বার্নার্ড শ' প্রাচীন চিত্র গ্যালারী, বাহুঘর প্রভৃতি দেখে বিম্বিত হয়েছেন। লেলিনগ্রাদ ও মস্কো শহরের এই সব সংগ্রহশালায় বহুলা ভ্রাবাদি প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। ক্রশ বিপ্লবের ফলে যে এতটুকু লুণ্ঠরাজ, গুণ্ডামি হয়নি এই দেখে বার্নার্ড শ' অবাক। তিনি প্রশ্নকাদের বললেন—তোমরা বিপ্লবী বলে বড়ই কসো, আর এইসব অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠরাজ হয় না বিপ্লবের কালে? কোনো রকম গুণ্ডামি বা লুণ্ঠ হয়নি? পশ্চিমে হলে এর কিছুই থাকতো না। তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

গির্জাগুলি পর্বত একেবারে অক্ষত।

বার্নার্ড শ' লিখেছেন যে আমি ভেবেছিলাম লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানীর দল বড়ই কষ্টে আছেন। হয়ত ছ বেলো দু মুঠো অন্ন জোটে না। তাঁরা হয়ত অবহেলিত অবজ্ঞাত। এঁদের প্রতিনিধিরা স্বধন বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁরা কেউ একখণ্ড সাবান বা একজোড়া পুথানো জুতা ভিক্ষা করলেন না। বার্নার্ড শ'র কাছে লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজের চাইতে এঁদের আনন্দময় মনে হল। তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বললেন—আপনারা ত' লোক সম্প্রদায়, বিদগ্ধ সমাজবৃত্ত (intelligentsia?) তাঁরা অশ্রদ্ধা ভরে বললেন—রামো, আমরা ইনটেলিজেক্টসিয়া নই। বার্নার্ড শ' বললেন—তা অবশ্য আমি জানতাম, অবশ্য রাশিয়ান সরকার তা জানেন কিনা জানতাম না। তাহলে আপনারা যদি ইনটেলিজেক্টসিয়া না হন তবে কি আপনারদের নাম এবং পরিচয়?

তাঁরা জবাবে বললেন—আমরা ইনটেলেকচুয়াল প্রলেটারিয়েট। বুদ্ধিজীবী সর্বস্বার্থের দল।

বার্নার্ড শ' বলেছেন—এর নামই কম্যুনিষ্ট রীতি। যদি তাঁদের জঘন্য অপরাধের জন্য মানব সমাজের দরবারে হাজির করা হয় তবে দেখা যাবে তাঁদের সেই অপরাধই হচ্ছে একমাত্র বুদ্ধিব্রাজ্য ব্যবস্থা, নিজের হস্তগত্যাগ দেশে ফিরে এসে আপনি সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন।

বে সংখ্যা Nash's Magazine-এ বার্নার্ড শ'র এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যায় জি. কে. চৌধুরীদেবের—The true Sin of Bolshevism নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য, আমি সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

যে কোনো বিপ্লব প্রকৃত ঘটনার অনেক আগেই প্রাচীন হয়ে যায়। রুশ বিপ্লবের এই বিশেষ অঙ্গবিধা। রুশ বিপ্লব অনেক দেরীতে ঘটেছে। এতদ্বারা এই কথাই বলতে চাই আসল মুহূর্তের অনেক আগে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত। সাম্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীর বস্তু, বিংশ শতাব্দীর নয়। শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্টরা কম্যুনিজমের আবির্ভাবের অনেক আগেই বিগত হয়েছেন। এদিক দিয়ে বিশ্বদ্রকর ভাবে আমেরিকার বিপ্লব সৌভাগ্যবান, সে কালে শ্রেষ্ঠ রিপাবলিকানরা জীবিত ছিলেন, তখনই রিপাবলিকের জন্ম ঘটেছে। প্রকৃত যুগান্তকারী কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু তা তখন অসম্ভব হয়েছে। আমার বাল্যকালে উইলিয়াম মরিস একটি কথায় কম্যুনিষ্ট আদর্শ প্রকাশ করেছেন—Fellowship is heaven and lack of fellowship is hell—যদি উইলিয়াম মরিসের কালে রুশ বিপ্লব ঘটতো তাতলে সারা পৃথিবীতে আনন্দরোল উঠত। আজ বলাশক্তিবাদ সংখ্যাসংঘের ডিক্টেটরশিপ মাত্র। এই কারণেই বার্ণার্ড শ' মন্ডো ভ্রমণে বাওয়ার সময় খুসী হয়েছিলেন। বার্ণার্ড শ'র প্রগতি মানবিক, কিন্তু সে প্রগতি পিছনের দিকে। ইংলণ্ডাবির মতো বার্ণার্ড শ' তাঁর মনোভাগী নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে কিরে গেছেন। তিনি আর আর্মি উভয়েই যখন বালক ছিলাম তখনকার স্বপ্ন সেইকালে সীমাবদ্ধ। বার্ণার্ড শ' আজো বালক থেকে গেছেন। কিন্তু একথা সত্য রাশিয়া ভ্রমণে বুদ্ধ বার্ণার্ড শ' তাঁর পুরাতন স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন, সমাজ সবল ও সহজভাবে সেখানে সক্রিয়—যদি স্বাধীন স্বাধীনতার দুর্দমনীয় কামনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি অবজ্ঞা তা চাই না।

প্রবন্ধটির মূল কথাগুলি মাত্র এইখানে উদ্ধৃত করা হল বার্ণার্ড শ'র বিশিষ্ট বন্ধু ও সমসাময়িক চিন্তানায়কের মত হিসাবেই প্রবন্ধটি হলাবান।

আর একজন এই Nash's Magazine এ ১৯৩৭ এ বার্ণার্ড শ'র জীবনী প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

Multitudes of well-drilled demonstrators were served out their red scarves and flags. The massed bands blared. Loud cheers from sturdy proletarians rent the welkin. এই লোকের নাম উইনস্টন চার্চিল।

একথা বার্ণার্ড শ' হজম করার পাত্র নন। তিনি এর জবাবে লিখেছেন—এ নিছক কল্পনা মাত্র। বাণ্ড নয়, পতাকা নয়, লাল চাদর নয়, পাথের চাঁৎকার ও রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণকালে শুনি। আমি অবজ্ঞা স্বয়ং কার্ল মার্কস শব্দটারে হাজির হলে যে অভ্যর্থনা পেতেন তা পেয়েছি Hall of Nobles এ, সেখানে চার হাজার লোক ধরে। সেই কক্ষে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বক্তৃতাটি সঙ্ক্ষিপ্ত। লুনচারসকি বক্তৃতা করলেন। তিনি এবং লিটভিনফ প্রায় সব সময়ে আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি আবিষ্কার করলাম যে সোভিয়েটবাদের বিশ্বদ্রকর

সাক্ষ্য স্বচক্ষে দেখার সময় তাঁদের হয়ে ওঠেনি। বর্ষাসত্তর ভ্রমণ ও সৌজন্য আমার প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে অনাড়ম্বর ভাবে। এই সফরের চূড়ান্ত হয়েছে স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। যে সাত্রী ফেমলিনের দোরগোড়ায় আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল সেই একমাত্র সৈনিক সারা রাশিয়ার আমার চোখে পড়েছে।

স্তালিনের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র এই সাক্ষাৎকার বার্ণার্ড শ'র অন্যতম জীবনীকার ভলন্তেরারের সঙ্গে ফেডরিক দি গ্রেট বা নেপোলিয়নের সঙ্গে গায়টের সাক্ষাৎকারের তুলনীয় বলেছেন।

তখনকার কালে স্তালিনের সঙ্গে কাহো বড়ো একটা সাক্ষাৎকার ঘটতো না, এমন কি ব্রিটিশ বা মার্কিন রাষ্ট্রদূতদেরও নয়। বার্ণার্ড শ'র দলবলের বেলায় কিন্তু একটু ব্যতিক্রম করলেন স্তালিন। লর্ড গ্র্যাষ্টর প্রভৃতি সকলেই এই সুযোগ পেলেন। এই ব্যবস্থার বেশ একটা গাড়া পড়ে গেল। বার্ণার্ড শ' এই সাক্ষাৎকার করে নিজের কৌতুহল চরিতার্থ করতে চান নি। স্তালিনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। লর্ড গ্র্যাষ্টর সব ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন—স্তালিনের অদম্য বদজ্ঞান ছিল। তিনি রাশিয়ান নয়, বদর্শন জর্জিয়ান। স্তালিনের আকৃষ্ট বেশ পোশাক আর কিন্তু মার্শালের সমিধ্রণ! স্তালিন আমাদের যা বলার আছে সব উজাড় করে দেওয়ার সুযোগ দিলেন। তারপর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন। তার এক বর্ণণে বুঝলাম না। শুধু 'Wrangel' কথাটি বোঝা গেল, বলাশক্তিদের বিরুদ্ধে যে সব জেনারেলকে ইংলণ্ডে লেজিয়ে দিয়েছিল তাঁদের অন্যতম। স্তালিন খুসিতে উপহাসে পড়ছিলেন। তবে দোষাধী ভয়ে এমনই তটস্থ যে তার কম্পমান ওষ্ঠে সে শব্দমাধুরী উপভোগ করা গেল না। লিটভিনফ না থাকলে আমরা এতটুকু অনুবাদ পেতাম না।

লেডী গ্র্যাষ্টর স্তালিনকে বলেছিলেন—সোভিয়েটরা শিশুপালনের কিছু জানে না।

স্তালিন জানতেন, রাশিয়ার সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। এই কথা শুনে তাঁর মুখ গভীর হয়ে গেল, তিনি বহুদিন আগে যেন বলে উঠলেন—ইংলণ্ডে ত শুনেছি আপনারা ছেলেরদের প্রহার করেন।

লেডী গ্র্যাষ্টর দমবায় বা ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়। শিশুপালন শিশুকল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁর নখাঞ্জে। শিশুকল্যাণে তাঁর অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। তিনি স্তালিনকে বললেন—আপনি কোনো সহস্রায় রমণীকে লগুনে পাঠাবেন, আমি তাঁকে সহস্রে শিখিয়ে দেব কিভাবে পাঁচ বছরের শিশুদের পালন করতে হয়।

স্তালিন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি ব্যতলেন এই প্রলয়ঙ্করী রমণী সত্যই হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারেন। একটি খাম নিয়ে তিনি তার ওপর লেডী গ্র্যাষ্টরের ঠিকানা লিখে দিতে জ্বরবোধ করলেন।

এই ঘটনাটি স্তালিনের ভ্রমতার পরিচায়ক মনে করলেন বার্ণার্ড শ' এবং তাঁর দলের সবাই। ভ্রমতার খাতিরেই হয়ত ঠিকানা রাখলেন তারপর কেউ আর কোনো খবরই করলেন না হয়ত।

কিন্তু এই দেশের নাম রাশিয়া। লেডী গ্র্যাষ্টর একজন মহিলা পাঠাতে বলেছিলেন, তিনি লগুনে পা না মিতেই স্তালিন প্রায় বারোজন মহিলাকে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

লেডী গ্র্যাষ্টরের সঙ্গে বিতর্কের পর লর্ড লোথিয়ান আলোচনা শুরু করলেন। তিনি ইংলণ্ডের উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের ছদ্মস্বাক্ষর তুললেন। সেই দলের দক্ষিণপন্থী ভোগ দিয়েছেন সরস্বতীসীলনের সঙ্গে আর বামপন্থীরা ভাসছেন কক্সলে। ব্রিটেনে লেবরপারটির দ্বারাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কমুনিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ব্রিটিশ রাজনীতির বহুবিধ সমস্যার কথা।

বেশ চলছিল, সহসা লর্ড লোথিয়ান বললেন—পোলিটব্যুরোর উচিত লয়েড জর্জকে রাশিয়ার আমন্ত্রণ করে এনে রাশিয়ার উন্নতি দেখানো। এই প্রস্তাবে স্তালিন হাসলেন।

স্তালিন হেসেই বললেন—সেটা ঠিক সম্ভব হবে না, মাত্র দশ বছর আগে রুশ বিদ্রোহে লয়েড জর্জের ভূমিকাটি প্রীতিকর ছিল না, জেনারেল গ্যাংগেল সেইকালে লালকোজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেছেন। তাকে তাই সরকারী ভাবে আমন্ত্রণ জানানো যায় না, তবে তিনি যে কোনো সময় বেসরকারী ভ্রমশকারী হিসাবে এসে সব কিছুই দেখতে পাবেন।

এইবার সর্বপ্রথম বার্বার্ড শ' কথা বললেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—উইনস্টন চার্চিলকে কি আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব।

স্তালিন এইবার বললেন—মিঃ চার্চিলও এইভাবে আসতে পারেন। তাঁকেও সব সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা আবার তাঁর কাছে কুত্তজ।

এই কুত্তজতার কারণটুকু বড় মজার। সে রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন বার্বার্ড শ' হেসকেথ পীরসনের কাছে। চার্চিল লাস ফোজের জুতা, সাজ শোবাঁক আর বন্দুক সরবরাহ করেছেন। চার্চিল যখন সেক্রেটারী অব ওয়ার তখন একশত কোটির ওপর মুদ্রা পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নেন। রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লবী দলের সাহায্যে। বলশেভিকদের বিজয় লাভ করে বুটেনের সেই টাকায় জামা-কাপড়, অস্ত্র ইত্যাদি কিনেছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারের মূল গায়নে লর্ড গ্র্যাষ্টর তখন স্তালিনকে বোঝাতে শুরু করলেন—যদিও ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সোভিয়েট বিরোধী, ইংলণ্ডে সোভিয়েটের প্রতি যথেষ্ট ভীতি আছে। ভবিষ্যতে সম্ভাব্যমূলক বোকাপড়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে।

বার্বার্ড শ' এই সময় স্তালিনকে প্রশ্ন করলেন—আপনি ওলিভার ক্রমওয়েলের নাম শুনেছেন?

স্তালিন লিটভিনকের সঙ্গে আলোচনা করে ক্রমওয়েল বুড়ন্ত জেনে নিলেন। লিটভিনক সবিসয়ে প্রশ্ন করলেন—এই যুদ্ধে সে কথা বলার অধীক তেমন স্পষ্ট হল না।

বার্বার্ড শ' বললেন—উদ্বেগটা বুঝিয়ে বলি, আয়ারল্যান্ডে ওলিভার ক্রমওয়েল সম্পর্কে একটি গাথা প্রচলিত আছে। ক্রমওয়েল তাঁর সেনাপাহানীকে নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন—

Put your trust in God, my boys,
And keep your powder dry.

অর্থটি ভুলদ্রব্যম করলেন স্তালিন। ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে বললেন—রাশিয়ার বারুদ যথেষ্ট শুকনো রাখা হবে।

বার্বার্ড শ' বললেন—স্তালিনের বসজান আপাগোডাই বেশ স্পষ্ট ছিল। তিনি হাসতে পারেন, হাসতে জানেন। এর পর আমরা বিদায় নিলাম, তখন মধ্যরাত্রি। আমরা ভেবেছিলাম বোধহয়

আধবাক্যের কিছু সময় বেশী ছিলাম, আমাদের ঘড়িতে দেখলাম দু' ঘণ্টা পর্যন্ত মিনিট পার হয়ে গেছে।

সোভিয়েট দেশ ভ্রমণ কালে বার্বার্ড শ'র মনোভঙ্গী নিঃসন্দেহে সোভিয়েট সরকারের প্রতি বিশেষ অহুকূল ছিল। তাঁর ধারণা এই বিরাট পরিবর্তনে তাঁর ভূমিকা কম নয়। তিনি বলতেন—I always regard myself as the real author of the Russian Revolution because I said that the best thing the soldiers could do in the 1914-18 war was to shoot their officers and go home; and the Russians were the only soldiers who had the intelligence to take my advice.

তা ছাড়া চেষ্টাবটন যা বলছেন তাও ঠিক, বার্বার্ড শ' মস্তা সকলের তাঁর জীবনের স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন, তাই তাঁর আনন্দ শিশুর মতো।

বাওয়ার সময় সার্লেট শ' লেডী গ্র্যাষ্টরকে বিশেষ অহুকূল জানিয়েছিলেন শ'র প্রতি নজর রাখতে, কারণ বার্বার্ড শ' ছাড়া পাওয়া শিশুর মতো আশপাশের অবস্থা বিমুগ্ধ হয়ে যা থুসী করে ফেলতে পারেন, নিজের শরীরের প্রতি অবহেলা করে ঘুরে বেড়াতেও পাবেন। কথাটি ঠিক, ব্রাসেলসে বার্বার্ড শ' সহসা দলভ্রষ্ট হয়ে অন্ধদিকে চলে যাচ্ছিলেন, লেডী গ্র্যাষ্টর ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে আনেন। বার্বার্ড শ' বলেছেন আমাকে কাল' মার্কসের সমান দিয়েছে রাশিয়া। লেডী গ্র্যাষ্টর বলেছেন—They received him as if he had been God, we were just no bodies, he was the great man—বার্বার্ড শ' অবজ্ঞা সকলের সমান মর্মান্বী প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন।

বার্বার্ড শ' ইংলণ্ডে ফিরে আসার পর তাঁর মস্তা সফরের সবটুকু বাদ দিয়ে যে সংবাদ ইংরাজ ও মার্কিন সাংবাদিকরা প্রচার করল, তা অতি হাস্যকর। লেডী গ্র্যাষ্টর নাকি রাশিয়ায় বার্বার্ড শ'র দাড়ি ধুয়ে দিয়েছেন।

বার্বার্ড শ' স্বয়ং এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন—রাশিয়ার সাংবাদিকের ভীড় এসে খাতনামা ব্যক্তিদের ওপর উৎপাত করে না এ পশ্চিমের ব্যাপি। তিন রাত্রি তিন দিন ট্রেনে কাটানোর পর আমাদের নান্নের প্রয়োজন হয়। লেডী গ্র্যাষ্টরের কাছে প্রয়োজনীয় সাবান ছিল। আমি তাঁকে যখন বললাম, আমার সাট যে ভিন্ন গেল। তিনি বললেন—খুলে ফেলুন। আমি কোমর পর্যন্ত খুলে ফেললাম আমার সাট। আমরা মগ্ন হয়ে কথা বলছি, গা মুছছি, আশপাশে তাকাইনি। সহসা কলরবে সজকিত হয়ে বেশি আশপাশে ভীড় জমে গেছে, সবাই আমাদের দেখছে। তারা রিপোর্টার নর সঙ্গে ক্যামেরাও ছিল না। তবে মেট্রোপোল হোটেলের সমস্ত কর্মচারী এবং মস্তা সফরের বোধ করি বধ্যাসম্ভব লোক ভীড় করে এই দৃশ্য দেখছে। বতদূর জানি এর জ্ঞান অবজ্ঞা কোনো প্রবেশ-মূল্য আমরা নিইনি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করি নিম্নলিখিত কথোপকথনে। বার্বার্ড শ' লিটভিনকে প্রশ্ন করলেন—Now tell me honestly would not you rather not have had a revolution at all? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লিটভিনক উত্তর দিলেন—My whole life was spent in preparing for one. [ক্রমশঃ]



জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ টুফির মূল প্রতিযোগিতার খেলা গত ১৫ই অক্টোবর থেকে আসামের নগাঁও সহরে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বিজয়ী আটটি দল আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দুইটি গুণে লীগের ভিত্তিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে নৈপুণ্য আউট প্রথায়। প্রথম গুণে গত বৎসরের বিজয়ী বাঙ্গলা, অন্ধ্র প্রদেশ (পূর্বে হায়দ্রাবাদ নামে খ্যাত), বিহার প্রদেশ এবং দ্বিতীয় গুণে বোম্বাই, সার্ভিসেস আসাম ও কেরালাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম গুণের খেলার বাঙ্গলা দল অপরাধিত থাকিয়া স্বীয় স্থান অধিকারীর সম্মান অর্জন করে। প্রত্যেক খেলার তাহারা উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন এবং এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত খেলায় তাদের বিরুদ্ধে কোন গোল হয় নাই। শেষ খেলায় বাঙ্গলার কাছে পরাজিত হওয়ায় অন্ধ্র এই গুণে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিহার দুই পয়েন্ট ও উত্তর প্রদেশ কোন পয়েন্ট না পাওয়ায় তাহারা বর্ষাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

দ্বিতীয় গুণে বোম্বাই আসাম ও কেরালা বিরুদ্ধে জয়ী হইলেও গত বৎসরের রানার্স আপ সার্ভিসেস দলের সঙ্গে অসমীয়াসিত ভাবে খেলা শেষ করতে বাধ্য হয়। সার্ভিসেস দল কেরালা বিরুদ্ধে জয়ী হইলেও আসামের সহিত পয়েন্ট বন্টনে বাধ্য হওয়ায় তাহারা মাত্র চারিপয়েন্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই গুণে বোম্বাই ও সার্ভিসেস দল বর্ষাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার তাহারা সেমিফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করে। সেমিফাইনালের খেলার বাঙ্গলা সার্ভিসেস দলের এবং বোম্বাই অন্ধ্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

এই বৎসর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় বিভিন্ন দল বেশ উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যে কোন দল খেলায় বিজয়ী আখ্যা লাভ করবেন, বলা যায় না। তবে বাঙ্গলা দল যে চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব ভক্ষুর রাখার আশ্রয় চেষ্টা করবে, তা বলাই বাহুল্য।

আরতি সাহা'র ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

বাঙ্গলা তথা ভারতের প্রথম মেয়ে-প্রতিনিধি কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। শুধু ভারত নয়, এশিয়ার প্রথম মেয়ে-প্রতিনিধি হিসাবে ইংলিশ

চ্যানেল অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে তিনি যে ভারতের সম্মান বাড়িয়েছেন, তার জগৎ প্রতিটি ভারতবাসী গর্ববোধ করবে। কুমারী আরতি সাহা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হলেও একান্ত সাহা আট মনোবল ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা সকলের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপ হয়ে থাকবে।

আরতি সাহা এখন সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক 'কলার ছাত্রী'। তাঁতারে এই অসামান্য সাফল্য অর্জনের জগৎ প্রত্যেক ভারতবাসীর সঙ্গে আমরারও তাঁকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

সিংহল সফরে ভারতীয় ডলিবেল দলের সাফল্য

ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা ডলিবেল দল সিংহলে টেষ্ট খেলার 'রাবার' লাভ করিবার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। মহিলা দল উপযুক্তি পরি টেষ্ট খেলায় সিংহলকে পরাজিত করে। পুরুষ দল প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে। শেষ টেষ্ট খেলাটি পর্যাপ্ত আলোর অভাবের জগৎ পরিত্যক্ত হয়। পুরুষ ও মহিলা দল সকল স্থানেই খেলায় প্রাণাঞ্চ প্রকাশ করে। তাহারা মোট ৩০টি খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া সকল খেলার অপরাধিত থাকিয়া সফরের নতুন রেকর্ড করেন।

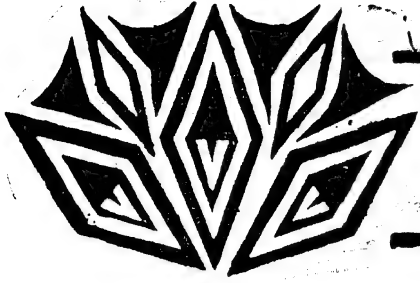
গারকিন্ড সোবাসের বিরুদ্ধে সমন জারী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খ্যাতনামা টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গারকিন্ড সোবাসের বিরুদ্ধে ষ্টাফোর্ডশায়ারের বিচারালয় হইতে কোর্টে উপস্থিত হইবার জগৎ সমন জারী করা হইয়াছে। অভিযোগে তাঁহাকে বেপরোয়া গাড়ী চালাইয়া মৃত্যু ঘটাইবার বিষয় জবাব দিহি করিতে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় উক্ত দুর্ঘটনায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খ্যাতনামা টেষ্ট খেলোয়াড় কোলি স্মিথ মারা বান এবং কয়েকজন খেলোয়াড় গুরুতর রূপে আহত হন।

লক্ষ ডলারের চুক্তি

প্রাক্তন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের মিস এলথিয়া গিবসন ও স্টোরিয়ার ক্যারন স্মারগমও পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত দুইজনে চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নব্বইটি সহর পরিভ্রমণ করে পরস্পরের সঙ্গে টেনিস খেলবেন। বিখ্যাত বাল্লেট বল দল হারগেম ট্রোবটসের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বাল্লেট বল খেলার আগে প্রদর্শনী টেনিস অংশগ্রহণ করবেন। চুক্তি অনুযায়ী গিবসন প্রায় এক লক্ষ ও স্মারগেমস ত্রিশ হাজার ডলার পাবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে জ্যাক ক্রেমারের দলভুক্ত সেরা পুরুষ পেশাদার খেলোয়াড় রিচার্ড গনজালেসও এলথিয়া গিবসনের মত এক অধিক পরিমাণ পারিশ্রমিক পান না।

Of all liars, the smoothest and most convincing is memory.
—Olin Miller



সাহিত্য পরিচয়

রাজভাষা

বাঙলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে, গঠনের ক্ষেত্রে, পুষ্টির ক্ষেত্রে বহুমতী সাহিত্য হিন্দির অস্বাভাবিক অনুকরণ। আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য যে 'মানে উপনীত হতে পেরেছে তার মূলে বহুমতী সাহিত্য হিন্দির কৃত্রিম যে কতখানি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। সুলভ মূল্যে সাহিত্যের প্রচার করে সর্বাধারগত সাহিত্যের অমূল্য আধার বানানোর যে মহৎ সঙ্কল্প বহুমতী সাহিত্য হিন্দির একটা গ্রহণ করেছিলেন আজও তার বিরাম নেই। "রাজভাষা" বহুমতীর প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা পরমভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমহাশয়ের আশীর্বাদমুখ শিষ্য স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য কীর্তি যার মূল্যায়ন সহজসাধ্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ইংরাজী ভাষার প্রসার বা তাৎপর্য আজ জগৎজোড়া, বিশ্ব-সভাতার ঐ ভাষার দানও অসীম, তা ছাড়া ঐ ভাষায় সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ অপরিহার্য ও শ্রেষ্ঠ অংশ রূপ পেয়েছে স্রুতরাং ঐ ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনার ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থটি এক অনন্তসাধারণ সহায়ক—একটি গ্রন্থের মধ্যে সমগ্র ভাষাটিকে সহজ সরল ও বিস্তারিতভাবে সর্বাধারগত বোধগম্য করে তুলে ধরেছেন উপেন্দ্রনাথ। ভাষা শিক্ষার্থীদের দল এই গ্রন্থটি থেকে বহুল উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থটি আয়ত্তে থাকলে ইংরাজী ভাষা সফল সম্পূর্ণরূপে পারদর্শী হওয়ার কোন অসম্ভাব্য বা-বাধা থাকতে পারে না। এ বিবাস আমরা পোষণ করি। ইংরাজী ব্যাকরণ, শব্দাদির উচ্চারণ, শব্দের ব্যবহার, প্রয়োগ-প্রণালী, পত্র রচনার কৌশল, সাংকেতিক চিহ্ন, বানান শিক্ষা, কথোপকথন ইত্যাদি সফল প্রাঞ্জল আলোচনা ইংরাজী ভাষা সফল সকলপ্রকার অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে ঐ ভাষা সফল যথেষ্ট পরিমাণে আলোক বিকীরণ করে। প্রকাশক—বহুমতী সাহিত্য হিন্দি, ১৬৩ বিপিন গান্ধী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

গুভনির্মাল্য

বাঙলা ও বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য কবিদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন একটি বিশেষ নাম। গত শতাব্দীতে বাঙলা কাব্যের নবরূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছিল যে কীর্তিমান সন্তানদের সাধনায় নবীনচন্দ্র তাঁদেরই অজ্ঞতম। বাঙলাদেশের কাব্য জগতে তাঁর বিরাত অবদানের ইতিবৃত্ত ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। নবীনচন্দ্রের লেখনী কেবলমাত্র কাব্য সৃষ্টি করেছে স্বাস্থ্য হৃদয়, তাঁর লেখনী থেকে নাটকও জন্ম নিয়েছে। গুভনির্মাল্য গীতিনাট্যটি তাঁর নাটক। রচনায় দক্ষতার চিহ্ন বহন করে। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বের বিবাহোৎসব উপলক্ষে গীতিনাট্যটি রচিত হয়।

বিবাহোৎসবকে পটভূমিকা করেই গীতিনাট্যটি রূপ পেয়েছে। নবীনচন্দ্রের জীবনী, সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে এতাবৎ অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু সার্থক গীতিনাট্যকার হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি বললেই চলে। বলা বাহুল্য মাত্র যে বাঙলা সাহিত্যের তৎকালীন মানাভূমিতে গুভনির্মাল্যকে বিচার করলে দেখা যাবে যে গুভনির্মাল্য এক অশূন্য সাহিত্য সৃষ্টি। মহাকাব্যের দেহান্তের অর্ধ শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হবার পর সম্পাদনাকারী শ্রীশ্রীপদকুমার সেন এই সর্বসম্মত অথচ প্রায় বিস্মৃত গ্রন্থটি পাঠক সমাজে নতুন করে উপহার দেওয়ার জন্য সকলের দৃষ্টিভঙ্গ্য লাভ করবেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চির প্রগম্য লোকান্তরিত সাহিত্য রখীদের এই জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থগুলিকে বিস্মৃতির অতল অন্ধকার থেকে যত উদ্ধার করা যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এদের প্রসার ও প্রচারের ব্যাপকতার দিকে যতদূর হওয়ার সময় এসেছে। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর ভূমিকা রচনা সম্পাদিত গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক নবীনচন্দ্র গ্রন্থাগার, ৪৪-২, রাইড কলোনী, কলকাতা—২৮। দাম আট আনা মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ

উনবিংশ শতাব্দীর কাছে বাঙালীর স্বপ্ন অপরিশোধনীয়। উনবিংশ শতাব্দী সর্ববিষয়ে যে ভাবে বাঙালীকে ভরিয়ে তুলেছে অজ্ঞাত শতাব্দীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার জাতীয় জীবনে নবজাগরণের এক জোয়ার এসে—তার ফলেই বাঙালীর মননভূমি হতে লাগল উর্বর থেকে উর্বরতর। বিভিন্ন মনীষী, চিন্তানায়ক, দিকপালবৃন্দের স্তব্ধ অববির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। উপরোক্ত পটভূমিকা অবলম্বন করে বাঙলাভাষায় এতাবৎ অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য—খ্যাতনামা কবি ডক্টর হুম্মীলকুমার গুপ্তের গ্রন্থটিও উপরোক্ত পটভূমি অবলম্বন করেই রচিত। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থটি যথেষ্ট পরিমাণে নিজস্বতা, বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তার দাবী রাখে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখকের আলোচনার পরিধি। গ্রন্থটি রচনায় লেখককে প্রভূত পরিপ্রমাণ স্বীকার করতে হয়েছে, বলা বাহুল্য সমগ্র গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি সাহিত্যাহুগী ও ছাত্র সাধারণকে যুগপৎ ভাবে আনন্দ দেবে ও উপকৃত করবে। বাঙালীর নবজাগরণের অন্তর্নিহিত মূলস্রোতের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও লেখক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮০১ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম আন্দোলন সফল স্রুতিমিত্ত ও স্রবিস্তৃত

আলোচনা গ্রন্থটিতে সম্মিলিত হয়েছে। প্রকাশক—এ মুখার্জী
গ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। দাম—
সাত টাকা মাত্র।

রমাণি বীক্ষ্য (সৌরাষ্ট্র পর্ব)

ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে একমিকে
বৈশিষ্ট্য অঙ্গদিকে বৈচিত্র্য। সরস্বতীর উপাসকদের কলাণে
ভারতমৃত্তিকার মহিমা লিপিবদ্ধ হল সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্যের
একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি হল ভ্রমণ কাহিনী। তারপর একাধিক
লেখকের অবদানে এই বিভাগটি পুষ্টলাভ করে চলেছে। ভ্রমণ-
কাহিনীর উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে সুসাহিত্যিক সুবোধকুমার
চক্রবর্তীর নাম অগ্রস্বে নয়। তাঁর রমাণি বীক্ষ্য প্রথম প্রকাশের
সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া জাগিয়েছিল সাহিত্যজগতে। বর্তমানে রমাণি
বীক্ষ্যের সৌরাষ্ট্র পর্বটি প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যে ভ্রমণ-
কাহিনীর যে একটি বিশেষ আসন স্বীকৃত সুবোধকুমার চক্রবর্তী সেই
আসনেরই মর্যাদাবৃক্ষের ক্ষেত্রে সঙ্গীত করা করেন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে।
রচনার প্রসঙ্গগুণে সমগ্র গ্রন্থটি যথেষ্ট বসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি
সারবান, তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত সুসংগঠিত। কয়েকটি
আলোকচিত্রও গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। বর্ণনা যেমনই বলিষ্ঠ তেমনিই
সাবলীল। বর্ণনভঙ্গী এবং রচনাশৈলী পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করবার
যথেষ্ট শক্তি রাখে। গ্রন্থটির ইতিহাস মূল্যও অসীম। প্রসঙ্গক্রমে
নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে লেখক গ্রন্থটিকে সঙ্গীত
সুন্দর করে তুলেছেন। গ্রন্থের আঙ্গিকটিও গম্ভীরগতিক নয়। ভ্রমণ-
কাহিনী হলেও গ্রন্থটি উপভাসগন্ধী। টুকরা টুকরা সংলাপের মধ্যে
বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস বর্ণনায় লেখক
অনন্তসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক এ. মুখার্জী
গ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। দাম ছটাকা
মাত্র।

জাতিস্মরণ কথা

জাতিস্মরণ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। জীবিত
মানুষের মুখে তার গভীরতম ইতিহাস আজও যে পরিমাণ বিষয়
সঞ্চার করে তার ভুলনা মেলা ভার। বিগত জীবনের পরিচয়, কাহিনী,
ঘটনাবলী সব্বন্ধে দুর্বার কোঁতুল এক চিরন্তন প্রশ্নের রূপ নিয়ে
মানব মন অধিকার করে আছে। জাতিস্মরণ নিয়ে আজ পর্যন্ত
বহু আলোচনা হয়ে গেছে, অসংখ্য গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে তবু
মানব মনের এই কোঁতুলের ক্ষুধা মেটে নি, তাতে ভাঁটা পড়ে নি,
তা এখনও অক্ষুণ্ণ। এই জাতিস্মরণ সব্বন্ধেই উপরোক্ত গ্রন্থটি
রচনা করেছেন জীহ্মলীলস্র বসু। গ্রন্থে জাতিস্মরণ সব্বন্ধে স্পষ্ট
বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানধর্মী বাখ্যা এবং সারবান আলোচনাদি উক্ত শাস্ত্রকে
সরল ধারায় ঐ শাস্ত্রের বিভিন্ন দুরূহ জটিল বিষয়গুলি সব্বন্ধে আলোচনা
যথেষ্ট পরিমাণে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে ধীরে আগ্রহশীল
এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা উপরোক্ত বিষয় সব্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন
করতে পারবেন। কয়েকটি জাতিস্মরণের কোঁতুলোদীপক কাহিনী
সহ জাতিস্মরণ বাহ সব্বন্ধে অল্প খুঁটিনাটি বিবরণ ব্যাপকভাবে গ্রন্থে

পরিবেশিত হয়েছে। প্রকাশক—দি ঘাটশীলা কোম্পানী, ৩ ম্যাগো
লেন। দাম—চার টাকা পঁচাত্তর নয় পয়সা মাত্র।

নোনা জল মিঠে মাটি

বাঙলা দেশের বর্তমানকালের প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবীদের মধ্যে
প্রফুল্ল রায় অন্যতম এবং বৃক্ষণীয়ও। ইতিপূর্বে কয়েকটি সুসিদ্ধ
উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি যথেষ্ট সন্মানের অধিকারী হয়েছেন। আলোচ্য
উপন্যাসটি আন্দামানকে কেন্দ্র করে লেখা। আন্দামানকে কেন্দ্র করে
আজ পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় খুব নগণ্য সংখ্যক গ্রন্থই আত্মপ্রকাশ
করেছে, এই উপন্যাসটি তাদেরই মধ্যে একটি বিশেষ আসন দাবী করার
যোগ্যতা বহন করে। আয়তনের দিক দিয়ে গ্রন্থটি বিরাট হলেও
রচনাস্বাক্ষর উৎকর্ষে পাঠকের কোথাও ধৈর্যহীনতা ঘটে না। কেবলমাত্র
লেখনাই প্রফুল্ল রায়ের একমাত্র সম্পদ নয়, বুদ্ধির অল্পভূতি তাঁর
এক বিরাট সম্পদ আর সেই অল্পভূতিরই পরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করে
গেছেন এই গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। উপন্যাসের কয়েকটি অংশবিশেষ
পাঠকচিত্ত গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সমগ্র আন্দামান যেন চোখের
গামনে ভেসে ওঠে। লেখকের রচনাশৈলী মনোহর। সকল দিক দিয়ে
আন্দামানকে লেখক সাহিত্যের পাতায় যে ভাবে প্রকাশ করেছেন
সেই প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে অভিমম্বনীয়। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ
পরিকল্পনাও প্রশংসার্য। গ্রন্থের নামকরণ করেছেন কবি শ্রীশ্রীমেন্দ্র
মিত্র। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় গ্যাণ্ড সন্ধ্যা, ২০৩।১।১
কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট। দাম আট টাকা পঁচাত্তর নয় পয়সা মাত্র।

একান্ত আপন

আজকের দিনের বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পাথে অগ্রসর হতে
বারা সহায়তা করেছেন স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম।
সার্থক কথাসিদ্ধিরূপে যথেষ্ট সন্মানের ইনি অধিকারী। এবং সাহিত্যের
দরবারে একটি মূল্যবান আসন গ্রহণে সর্মথ হয়েছেন। আলোচ্য
উপন্যাসটি সর্বতোভাবে তাঁর সন্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এক অসুখ
পটভূমিকা অবলম্বন করে উপন্যাসটি রচিত। লেখকের ভাষা,
ভাষাণ্য, বক্তব্য সব্বন্ধেই বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। লেখকের তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিভঙ্গি, তীব্র অন্তর্দৃষ্টি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর চিহ্ন উপন্যাসটির পাতায়
পাতায় বহন করছে। চরিত্র-চিত্রণে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময়
আলোচ্যের ভাবার মাধ্যমে প্রকাশের ঘটনাদির দ্বারা বন্ধনে লেখক
যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন,
২ শ্যামচরণ দে স্ট্রিট। দাম তিন টাকা মাত্র।

ফুলবয়ী

বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্পের দরবারে শক্তিশালী কথাসিদ্ধী
সমরেশ বসু যে আজ একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী এ সব্বন্ধে
নতুন করে কিছু বলা অর্থহীন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সমরেশ বসুর
বিশেষত্ব সব্বন্ধে পাঠকমহলও সর্ববিশেষ অবহিত আছেন। ফুলবয়ী
তাঁর ছোটগল্পের একটি সংকলন, এতে মোট ছ'টি গল্প স্থান পেয়েছে।
গল্পগুলি উচ্চাঙ্গের, স্বকীয়তার ভরপুর এবং যথোচিত বৈচিত্র্যপূর্ণ।
চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনা সংস্থাপনে এবং সংলাপ বোঝানায় লেখক তাঁর
স্বভাবস্বল নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার্য,
গল্পগুলির মুগোণযোগ্য আবদান দৃষ্টান্তকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে

গল্পগুলির মধ্যে তাঁর দরদী মনেরই ছায়া দেখা যায়। সুখ-দুঃখ, ষাট-প্রতিষাট, আনন্দ-বেদনাকে ঘিরে যে জীবন—সেই জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন লেখক, দরদী মনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধানী মনেরও পরিচয় দিয়েছেন তিনি। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীও গল্পগুলির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে অসীম দক্ষতা সত্ত্বাবে। শ্রীগণেশ বসু প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ স্তামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—মাড়াই টাকা মাত্র।

অন্যদৃষ্টি

“হাত” আর “হাভনট”দের বিরোধ চিরকালের। ছাভেদের দল দর্পে অন্ধ, চিরকালের জন্তে হাভনটদের তারা পায়ের তলায় চেপে রাখতে চায়, কিন্তু হাভনটদের অন্তরাষ্ট্রাও পীড়নে জর্জরিত হয়ে জেগে ওঠে, মরণ পণ করে, মেরুদণ্ড সোঁা করে পাঁড়ায় শোকেদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাই আজকের দিনের সমাজে এক বাস্তব সত্যের রূপ নিয়েছে, তারই প্রতিচ্ছবির প্রতিকলন হয় সাহিত্যের পাতায়। শক্তিমাম লেখক অনীল ঘোষের “অন্যদৃষ্টি” উপন্যাসটি পাঠ করলে উপরোক্ত মন্তব্যের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। শ্রমিক-মালিক বিরোধ এই প্রস্থের খুঁচা উপজীব্য হলে আরও একটি বিষয়ে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমাদের মত সুস্থ জীবন ব্যতীর পরিবর্তে যারা যুগ্মিত জীবনব্যতী বেছে নিল, তাদের জন্তেও ভাববার একটা দিক আছে। লেখক একটি ছেলেকে কেন্দ্র করে এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বলেছেন যে এই পথ তারা বেছায়ে বেছে নেয় নি, নিয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অস্বীকার করতে না পেরে, তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে সময় ও সুযোগ পেলে তারা অনায়াসে তাদের বিপত্ত জীবনে ফিরে আসতে পারে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত, বক্তব্য স্কোরালো এবং দরদী অমুদ্রুতি সাপেক্ষ। উপন্যাসটির মাধ্যমে আজকের দিনের সমাজের নানাবিধ গল্প, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের এক নয়চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং সেই প্রচেষ্টায় লেখক জয়যুক্ত হয়েছেন, একথা বলতে বাধা নেই। প্রকাশক—জ্ঞানদাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, দম্ভা ছ’ টাকা মাত্র।

শৃঙ্খলিতা

শুধু একজন আইনজ্ঞ বা শিক্ষাব্রতী হিসেবেই ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যসেবী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। দীর্ঘকাল সাহিত্য সেবা করে সাহিত্যের দরবারেও আজ তিনি সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। উপরোল্লিখিত উপন্যাসটির পটভূমিকা ঐতিহাসিক। শিবাজীর স্বর্গ লাভের পর তাঁর আসন স্বখন তাঁর অযোগ্য, ইন্ডিয়পারায়ণ, অপদার্প পুত্র শঙ্কাজীর অধিকারভুক্ত সেই সময়ে একদিকে মোগল ‘মারাঠা’ সংঘর্ষ অন্যদিকে পত্নীগীতদের সর্বগ্রাসী শোষণ—এই দু’য়ের যোগাযোগে গোয়ার অভ্যন্তরীণ সর্ববিধরক অবস্থা কি রূপ নিয়েছিল সেই স্ববৃত্তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ডক্টর চন্দ্র এই উপন্যাসটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোয়ার তৎকালীন সামগ্রিক পরিবেশ, রীতি-নীতি, আইন, সমাজ এবং সর্বোপরি পত্নীগীতদের বিকল্পে গোয়ার হুজি সংগ্রামের বিশদ, চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ লেখক উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন।

কাথারিনা ও অশুর মত প্রেমের দুটি প্রকৃত পূজারিণীর চরিত্র উপন্যাসে যুক্ত হওয়ার উপন্যাসটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শশিত বেলভেলকার তো ‘একটি অপরূপ চরিত্র সৃষ্টি। শুধু মাত্র এই একটি চরিত্র সৃষ্টির জন্তে লেখক পাঠকসমাজের আন্তরিক ধ্যানবাদ দাবী করতে পারেন। আমরা আনন্দের সঙ্গেই এ কথা বলতে পারি যে ইতিহাস-গদ্যী যে কটি সার্থক উপন্যাস বাঙালী সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধি করে এসেছে এতাবৎকাল, শৃঙ্খলিতা তাদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করল। সমগ্র উপন্যাসটি লেখকের কৃতিত্বের, কুশলতার ও ক্ষমতার স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। প্রকাশক রীডার্স কর্পার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

চা—মাটি—মাছুষ

কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ধনী কি নিধন, কি পুরুষ কি মহিলা, চায়ের গতিবিধি সর্বত্রই অব্যবহিত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিবিশেষে প্রায় সকলেই চায়ের অনুগামী। ভারতের যে যে অঞ্চলে চাএর জন্ম হয় সেই উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বিবিধ বৈচিত্র্যে ভরপুর—পাঠক সমাজকে সেই বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীবীরেশ্বর বসু আলোচ্য উপন্যাসটির মাধ্যমে। চা-বাগান এই উপন্যাসের পটভূমিকা। চা-বাগানের নরনারী, তাদের জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার এক স্পষ্ট বাস্তব চিত্র লেখক এখানে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এর নায়ক জীবনের প্রতি পদে পদে তিস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল, আঘাত পেলে ভালবাসার ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার পেলে লালিত্ব। তবু ভালবাসার নেশা তার মন থেকে গেল না। এই স্বয়ম্পর্শী চরিত্রটির মাধ্যমেই জীবনের এক বিরাট সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চা, মাটি আর মাছুষের যে নিবিড় সংযোগ, তার সূত্র অন্বেষণে লেখক চিন্তা তৎপর। উপন্যাসটি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে, কাহিনী স্বয়ম্পর্শী, লেখকের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। সুযোগ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনও সুন্দর হয়েছে। প্রকাশক—কথামালা প্রকাশনী, ১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। দাম—চার টাকা মাত্র।

অচিরা

সার্বজনীন কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি খ্যাতি আজকের নয়, দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যের তিনি সেবা করে আসছেন এবং তাঁর সেবার কাব্য সাহিত্য লাভবানই হয়েছে। বীরের কবিতা ভাবে, ভাবায়, কল্পনায়, ব্যঙ্গনায়, চিত্রণে সকল দিক দিয়েই রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে প্রভাতমোহন সেই কবিদেরই অঙ্গতম। তাঁর পরম্প্রিষ্ট কবিতাকে একত্রে সংকলিত করে “অচিরা” গ্রন্থটির সৃষ্টি হয়েছে। কবিতাগুলি সুপাঠ্য, চিত্তস্পর্শী এবং বৈশিষ্ট্যবান। বলা বাহুল্য “অচিরা”র কবিতাগুলি প্রভাতমোহনের কবি হিসেবে সুনাম অক্ষুর রেখেছে। প্রভাতমোহন জীবন দেবতার একনিষ্ট উপাসক, তাঁর কাব্যে সত্য, ও শিব স্মৃতির মহিমা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর সৌন্দর্যবোধ, শব্দচয়ন এবং প্রকাশকৌশল সাধুবাদের দাবী রাখে। রসজ্ঞ ও সুবোধীদের দরবারে তাঁর কাব্য তার যথাপ্রাপ্য সমাদরই লাভ করুক এই কামনাই করি। প্রকাশক শান্তি লাইব্রেরী, ১-বি, কলেজ রো। দাম চার টাকা মাত্র।

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গা-বিধসত্ত্ব অঞ্চলসমূহের সমস্তাবলী পর্যালোচনার জগ্না রাজ্য সরকার কর্তৃক মন্ত্রিসভা সাব কমিটি গঠন—চোয়ারমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

২রা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের অধিকাংশ দলের পক্ষ হইতে বিধান সভা দপ্তরে রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিকাশ অনাস্থা প্রস্তাবের মোটিও দাখিল।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর) : বর্ধমান, নদীয়া, ভগলী, মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল অভাবনীয় বন্যায় প্রস্রিত হওয়ায় ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ।

৪ঠা আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শরৎকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে খাজা আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশের গুলীবির্ষণ ও লাঠিচালনা প্রসঙ্গে বিরোধী সদস্যদের অনীত মূলত্বীয় প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস ও কমুনিষ্ট সদস্যদের মধ্যে শেষ অবধি খণ্ডযুদ্ধ।

৫ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও হুজিফ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে খাজের দাবীতে এবং সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে কলকাতার নিরাট ছাত্র মিছিল—বিধান সভার অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া ১১৭ জনের গ্রেপ্তার বরণ।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) : ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের দাবী জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর নিকট স্মারকপত্র পেশ।

৭ই আশ্বিন (২৪শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গের খাজসচিব জীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের পদত্যাগের জগ্না বিরোধী পক্ষের দাবী মানিয়া লইতে ডাঃ রায়ের অসম্মতিসূচক ঘোষণা।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) : চীনা ফৌজের ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘনে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

কলিকাতায় ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের অভিমত—ভারত চীন সীমান্ত সম্পর্কিত বিরোধ উত্তর রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা মারফত মীমাংসা সম্ভব।

৯ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) : পাঞ্জাবের নবীন নগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু—তৃতীয় পক্ষবাদিক পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইবে বলিয়া সদস্যদের অভিমত প্রকাশ।

১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) : চীন-ভারত সীমানা বিরোধ সম্পর্কে কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির সংশোধিত প্রস্তাবে ঘোষণা—ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণ সর্বতোভাবে প্রতিক্রিয়া করা হইবে।

১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের অনীত দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব ভোটদ্বিকো অগ্রাহ্য।

আই. এফ. এ. স্কীড ফাইন্যান্স (মোটনবাগান এনাম ইষ্টেবলস) খেলা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত—আই. এফ. এ. টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত।

১২ই আশ্বিন (২৯শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সিকিৎসক অনাস্থা প্রস্তাব রাজ্য বিধান পরিষদে বিনা ডিভিশনে অগ্রাহ্য।

১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গা পরিষদে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে—রাজ্যের বঙ্গা বিধসত্ত্ব ভগলী,

দেশে-বিদেশে

আশ্বিন, ১৩৬৬ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '৫৯)

মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় পাঁচ লক্ষাধিক একর জমি জলবায়—দুই লক্ষ টন ধান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিশেষভাবে ২৪-পরগণা, হাওড়া, ভগলী, মেদিনীপুর জেলায় দুই শিবসংযোগী প্রলয়ঙ্করী ঝড়াবাত্যা—অসংখ্য লোক হতাহত, শত শত ঘরবাড়ী বিধসত্ত্ব।

ম্যাকমাহন লাইনট ভাঙত ও চীনের সীমারেখা—প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর কর্তৃক চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-এর পত্রের জবাব।

১৫ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) : সহকারী রেলওয়েসচিব মিঃ শাহ নওয়াজ খাঁ-এর ঘোষণা—শিয়ালদহ ডিভিশনে সম্ভবতঃ তিন বৎসরের ভিতর বৈজ্ঞানিক ট্রেণ চলাচল কার্যে।

মহাত্মা গান্ধীর একনবতম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে সমগ্র দেশের সঙ্গে বাৎসরিক গান্ধীঘাটে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান।

১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) : নামোদর ভাসী কর্পোরেশনের (ডি. ভি. সি) বঙ্গা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যর্থতার পর্যালোচনা—ডি. ভি. সি ষ্টাফ এসোসিয়েশন সম্পাদকের বিরুদ্ধে।

১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর) : আগে সৈন্যপাসারণ—পরে সীমান্ত বিরোধের আলোচনা—চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর পত্রের উত্তরে জীনেহরুর স্পষ্ট উক্তি।

১৮ই আশ্বিন (৫ই অক্টোবর) : বর্ধমান, নদীয়া, ভগলী, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর—পশ্চিমবঙ্গের এই পাঁচটি জেলায় জলপ্রাণে বিচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যমা অঞ্চলগুলির দুর্গত অনশনক্লান্ত নরনারীদের জগ্না সামরিক বাহিনীর বিমান হইতে খাজ সরবরাহের ব্যবস্থা।

১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সহিত বৈঠকান্তে কেন্দ্রীয় খাজ সচিব জী এস কে, পাতিলের ঘোষণা—খাজ বটন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতে লইয়া ঐক্যই একটি নূতন খাজাঞ্চল গঠন করা হইবে।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) : ভারত চীন সম্পর্কের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে আশা প্রকাশ করিয়া প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর নিকট চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-এর তারবার্তা।

২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) : ম্যাকমোহন লাইন প্রসঙ্গে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর ও জে. নে উইন (ব্রহ্ম প্রধান মন্ত্রী) বৈঠক।

২২শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর) : নদীয়ার সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গী দুর্বৃত্তদ্বয় হানা—ভারতীয় সীমান্ত টহলদার পুলিশের গুলীবির্ষণ।

২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর) : ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ১২ সপ্তাহে এক সতন্ত্র নাগা বিদ্রোহীকে আটক কিংবা আত্মসমর্পণে বাধ্যকরণের সংবাদ।

২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): তিন দিবস বখারীতি শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের পর কলিকাতা ও সহরতলীতে নিকিয়ে নিরঞ্জন উৎসব সম্পন্ন।

২৫শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর): ভিলাই ইম্পাত কারখানার ইম্পাত উৎপাদন শুরু—ভারত সোভিয়েট সহযোগিতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

২৬শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বিজ্ঞপ্তি—রাজ্যের ৭৫টি মহর (মিউনিসিপাল) কলাকায় কলেজের প্রাচুর্য্য হওয়ার আশঙ্কা।

২৭শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর): বৃহত্তর কলিকাতায় জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশন সমস্ত সম্পর্কে পর্যালোচনার জ্ঞা বিশ্বাস্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কলিকাতা উপস্থিতি।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার আচার্য্য মন্থমোহন বসুর (১১) কলিকাতার বাসভবনে জীবনদীপ নিৰ্ধাণ।

২৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বজ্রা সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বজ্রার্ভ সহায়তা সমিতির সভাপতি শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জী ও সম্পাদক শ্রীদ্রিবি চৌধুরী, এম পি'র প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট পত্র।

২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে পূর্ব সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে পাক-ভারত প্রতিনিধিদের বৈঠক আরম্ভ। পশ্চিমবঙ্গের বজ্রা পরিস্থিতি সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানেন্দ্র বাবের সাক্ষাৎকার।

৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর): দিল্লীতে তিন দিবসব্যাপী আলোচনার পর সীমান্ত প্রশংসে পাক-ভারত বৈঠকের প্রথম পর্ব শেষ।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): কেরলের নির্বাচনে হুগিত বাধা হইবে না—রাজ্যপাল ডাঃ রামকৃষ্ণ রাওএর ঘোষণা।

বহির্দেশীয়—

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর): রাষ্ট্রসংঘে (নিউইয়র্ক) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ম: নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঐতিহাসিক ভাষণ ও পূর্বাপ্ত নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পেশ।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর): প্রে: নাসেরের অটুট ক্ষমতা—ইস্রায়েলকে কিছুতেই স্বয়ংক্সে থালে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না।

৫ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর): ইরানের শাহ ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আলোচনা শেষ—আলোচনাস্তে অনাক্রম্য নীতির উপর উভয় পক্ষের যুক্ত ইশতাহার।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর): রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রতিনিধিদের প্রশ্ন আলোচনার প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে ভোটদ্বিকো অগ্রাহ—ভারতের দেশবন্ধু সচিব শ্রীকুমারেন্দ্রের চেষ্টা ব্যর্থ।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর): সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মি: সলোমন বন্দরনায়ক গুলীতে আহত—বৌদ্ধভিক্ষুর বৈশাখী আততায়ী প্রেষ্টার—সমগ্র দেশে জঙ্করী অবস্থা ঘোষণা।

৯ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর): গোটিলবার্গের (আমেরিকা) নিরুত্তর শৈলশিখরের বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আইক-ক্রুশ্চেভ (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রুশ প্রধান মন্ত্রী) তত্ত্বপূর্ণ বৈঠক।

আততায়ীর রিভলবারের গুলীতে আহত মি: বন্দরনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মি: বিজয়ানন্দ বহনায়কের শপথ গ্রহণ।

১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর): গোটিলবার্গে দুই দিবস ব্যাপী বৈঠকের পর পাঁচ শত শব্দ সম্মিলিত আইক-ক্রুশ্চেভ যুক্ত ইশতাহার প্রচার। উভয় নেতার সম্মিলিত ঘোষণা—বল প্রয়োগ দ্বারা নহে, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে অসীমায়িত আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয় মীমাংসা করিতে হইবে। আগামী বৎসর (১৯৬০) বসন্তকালে প্রেসিডেন্ট আইকের সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন।

ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ে জাপানে প্রায় আড়াই সহস্র নরনারী নিহত বা নিখোঁজ—তিন লক্ষাধিক লোক গৃহহারা।

১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর): যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ দিবস ঐতিহাসিক সফর শেষে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মধ্যে প্রত্যাবর্তন।

১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে কলিকাতা কলেজের ছাত্রী কুমারী আরতি সাহার (১৯) ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব অর্জন।

১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর): কম্যুনিষ্ট চীনের দশম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত বিবাত কূটকাণ্ডদ্বায়ে রুশ প্রধানমন্ত্রী ম: ক্রুশ্চেভের যোগদান।

১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের পিকিংস্থ দূতাবাস চীন কর্তৃক অবরোধ।

১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর): কশিরা কর্তৃক সাফল্যের সহিত রকেট দ্বারা চন্দ্র প্রসঙ্গিককারী আন্তঃগ্রহ স্টেশনে উৎক্ষেপ।

১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) রাষ্ট্রসংঘে ভারতের দেশবন্ধু মন্ত্রী শ্রীকুমারেন্দ্রের ঘোষণা—ভারত চীনা আক্রমণ বরাদ্দ করিবে না।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মো: জে: আব্দুল করিম কাসেম বাগদাদের পথে মোটরে আততায়ীর গুলীতে আহত।

২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর): বুটেনে সাধারণ নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী মি: ছারঙ ম্যাকমিলনের বন্ধুশীল দলের নিরুত্থ সংযোগবিরহিতা লাভ।

২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): চন্দ্রলোক অভিযুখে উৎক্ষেপিত কশিয়ার সর্বশেষ মহাজাগতিক রকেট (লুনিক-৩) পৃথিবী হইতে সর্বদোচ উড়ে উপস্থিতি সম্পর্কে মন্ডো বেতারের দাবী।

২৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে তিনবার পরিবর্তিত আলোচনার দাবীতে আয়ারল্যান্ড ও মালদেবের আনীত প্রস্তাব ভোটদ্বিকো গৃহীত—ভারত ভোটদানে বিরত।

২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আব্দুর হায ঘোষণা—১৯৬০ সালের শেষ নাগাদ পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।

৩০শে আশ্বিন (১৭ অক্টোবর): চর্চা ইউ অভিবাসী মহিলা দলের নেত্রী সহ ৮ জন সঙ্গত নিহত হওয়ার বিশ্বের বর্ষ উচ্চতম শূণ বিজয়র চেষ্টা পরিচাল্য।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): পূর্ব সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে দিল্লী বৈঠকান্তে ঢাকার, পাক-ভারত উক্ত পক্ষদ্বয়ে আলোচনা শুরু।

আশনাল-একো সপ্তাহ—১৮ই থেকে ২৪এ অক্টোবর

এই উৎসবের দিনগুলোয়—

সঙ্গীতে ও কৌতুকে আপনার হৃদয় আনন্দমুগ্ধ করে তুলতে সুন্দর একটি

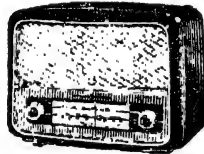
আশনাল-একো

রেডিও

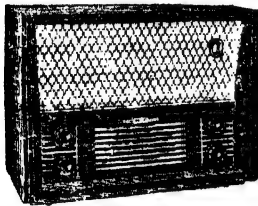
ঘরে রাখুন



মডেল ইউ-৭১৭ঃ ৪ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড
এসি বা ডিসি। বাদামী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা।
ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের।
২৬০০ টাকা।



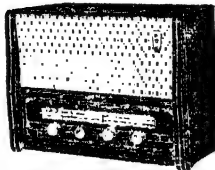
মডেল বি-৭১৭ঃ ৪ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড,
ড্রাই ব্যাটারী। বাদামী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা। ক্রীম,
নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০০ টাকা।



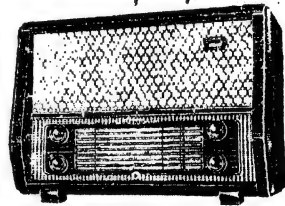
মডেল-৭৩০ঃ ৬ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড,
'ম্যাপ' নি-ব্যাণ্ড টিউনিং। মডেল এ-৭৩০
এসি; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি।
৪০৫০ টাকা।

আশনাল-একো রেডিওই সেরা

—এগুলি 'মনসুনাইজড'—



মডেল বি-৭২২ঃ ৬ ভালভ,
৩ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারী।
৩০৫০ টাকা।



মডেল এ-৭৩১ঃ ৭ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড, এসি।
শব্দগ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত উঁচু দূরের। স্বনিয়ন্ত্রিত
আর, এফ, স্টেজিয়ু। সমস্ত আশনাল-একো
রেডিওর মধ্যে সেরা। ৬২৫০ টাকা।

সবই নেট দাম—টার আলদা
এক বছরের গ্যারান্টি।

GRP

জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্লায়েন্সেস
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ মাদান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। অপেরা
হাউস, বোম্বাই-৪। ফ্রেজার রোড, পাটনা।
২/১০, মাইলি রোড, মাদ্রাজ। ৩৬/৭৯,
সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর।
জোগেশ্বর কলোনি, চাঁদনী চক, দিল্লী।
রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ড: পঞ্চানন ঘোষাল

এর পরদিনই রাতে আমরা খবর পেলাম যে শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়াকে কে বা কাহারো হত্যা করে কুমারটুলীর রাস্তার একটি বোয়াকের উপর ফেলে রেখে গিয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে দেখি, শিউচরণের মৃতদেহ রক্তাশ্রুত অবস্থায় একটি গৃহের বোয়াকে পড়ে রয়েছে। অকুস্থলে বহু লোককেই এই হত্যা সন্দেহে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, কিন্তু তারা কেহই ঐ নৃশংস হত্যা সন্দেহে কোনও খবর আমাদের দিতে পারেনি। মৃত পাগলাবাবুর দেহের দ্বার শিউচরণিয়াদের দেহেও আমি একটি প্রকারের ক্ষত লক্ষ্য করেছিলাম। এই উভয় ব্যক্তিকে একই ভাবে বন্ধ ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তখনও পর্যন্ত আমরা ঐ খুনের কোনও কিনারা করতে সমর্থ হইনি। সম্ভবতঃ অল্পরূপাবে নিহত হবার ভয়ে এখানকার বস্তি অঞ্চলের কেহ খাঁদাশুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়নি। এ মামলাটি ব্যতীত অপর আর একটি মামলারও আসামীরূপে তাকে আমি খোঁজাখুঁজি করেছিলাম। এই মামলাটি ছিল একটি সিঁদেল চুরির মামলা। কুমারটুলীর এক নামকরা জমিদার বাড়ী হতে একটি টোটান্ডার বিভিন্নভারসহ সহস্র সহস্র মুদ্রার জুয়েলারী দ্রব্য চুরি হওয়ায় এই মামলাটি লাতের করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে গঙ্গাবন্ধে নৌকা করে পার হবার সময় হাওড়ার ভরৈন পুলিশ-অফিসার তাকে ঐ নৌকাত্রে গ্রেপ্তারও করেছিল। কিন্তু খাঁদাশুণ্ডা তাকে অতিক্রমে গঙ্গাবন্ধে নিক্ষেপ করে নিজে সাঁতার কেটে ওপারে উঠে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে খাঁদাশুণ্ডা ছিল এইরূপ এক সাংঘাতিক ব্যক্তি। এইবার আমার আর কোনও সন্দেহ হইলো না যে, এই থোকা ও খাঁদা একই ব্যক্তি এবং তারা দুজনে কখনই বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে না।

এরপর আমরা আর দেরী না করে লালবাড়ারের পুলিশ হেডকোয়ার্টারস্ থেকে একজন সশস্ত্র বাহিনী আনিয়াে নিলাম। তারপর দুইখানি লবীতে দুইদিক থেকে অভিযান চালিয়ে অতিক্রমে ঐ বাড়ীটি আমরা ঘেরায়া করে ফেলে উহার মধ্যে আমরা প্রবিশ্ত গতিতে ঢুকে পড়লাম। এই বাড়ীটি ১০ নম্বর কুপামাখ লেনের একটি বস্তির সমুখভাগে অবস্থিত ছিল। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ চুপি চুপি আমাদের জানিয়ে দিল যে ঐ বস্তির কোণের ঘরখানিতে ঐ খাঁদাশুণ্ডা নিজে থাকতো এবং তার পাশের ঘরখানিতে এখনও তার আত্মীয় স্বজনরা বসবাস করছে। এই মামলার হত্যাকাণ্ডী আসামী থোকা বা খাঁদাকে সেখানে পাওয়া গেল না। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হওয়া যে হয়তো ঐ ঘরের মাটির মেঝে পাগলাবাবু কাটা খুণ্ডা পুতে রাখা হয়েছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ শাল ও কোদাল এনে এখানকার মৃতদেহ অপসারিত করতে শুরু করলাম। প্রকৃত সেখানে বহু খোঁজাখুঁজি করেও কাটা-খুণ্ডের সন্ধান

পাওয়া গেল না। কিন্তু তার পরিবর্তে মাটির তলা হতে বার হয়ে আসতে লাগল রাশি রাশি হায়া-মুস্তা ও জহরত অলঙ্কার এবং বাব্ববন্দী হাজার ও একশত টাকার কারেন্সি নোট। এইদিন ঐ স্থান হতে অলঙ্কারে ও নগদ টাকায় প্রায় ৭০ হাজার টাকার অপসৃত সম্পত্তি আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুধু তাই নয় ঐ ঘরের একটি কোণ হতে একটি রক্তবর্ণিত ধুতি, একটি রক্তবর্ণিত অর্জবাস, দুইটি রক্তবর্ণিত পাঞ্জাবী এবং অসংখ্য কয়েকটি কাপড় চোপড় আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম। এইগুলি ঘরের ঐ কোণে একত্রে জড় করে রাখা হয়েছিল। ঐ সকল পরিধেয় বস্তাদি পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পেলাম যে উক্ত প্রাতিটি কোণে কোণে একটি ইংরাজী 'S' অক্ষর স্বস্তির দ্বারা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই বাড়ী অপরাধের ঘরে বাবা বাস করে তারা সকলেই ছিল গৃহস্থবৈশী বেঙ্গা নারী। এরা সাধারণতঃ দিনের বেলা ঝিগিরি করে এবং রাতে তারা করে পেশা। এদের মধ্যে দুই একজন আবার সাধারণ বেঙ্গা নারীর পদাধারে নেমে এসেছিল। আমি এদের সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে থোকাবাবুর পিতা ও খল্লতাত নামে পরিচিত দুই ব্যক্তি সাধারণতঃ থোকাবাবু কর্তৃক ভাড়া করা এই ঘর দুইটিতে বসবাস করে। এরা থোকাবাবুর আসল বা নকল আত্মীয় কিনা তা তারা বলতে পারেনা। তবে তাদের মতে এরা থোকাবাবুর নকল বা পাতানা আত্মীয় মাত্র। প্রথমে এরা খুন সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দিতে চায় নি। থোকাবাবু সন্দেহে তাদের জিজ্ঞাসা করা মাত্র তারা আতঙ্কে কঁপে উঠছিল। আমাদের গীড়াগীড়িতে এদের কেউ কেউ ভয়ে কঁদেও ফেললে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ইনসপেক্টার সুন্দল বায়ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে এই সকল রূপজবানীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় বিবৃতি আদায়ের ব্যাপারে বার্ষ মনোর্থ হতে দেখে তিনি আমাকে বললেন, এরা এখন যা বল তা শুনে যাও মাত্র। প্রথম দিনে এরা কোনও দিনই সত্য কথা বলেনি। আজ হতে তিন চার দিন পর এরা সত্য কথা বলবে। সাধারণতঃ বেঙ্গা নারীদের সত্যভাষণের নিয়মই হচ্ছে এই। সুন্দল বাবু এদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে একটি বুবতী নারী এবং একটি তিসল পরা বৃদ্ধাকে বার করে এনে আমাকে বললেন, এখান এদের পৃথক পৃথক ভাবে অর্থাৎ একের অবর্তমান অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করো। ভুলে যেও না যে বিভিন্ন বয়সের মানুষ বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা কথা বলে। এই জ্ঞাত পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বৃদ্ধকে পাবে যে এদের কে কতটুকু মিথ্যা বলেনি। মিষ্টি কথাই জুলিয়ে দিতে জিজ্ঞাসাবাদের শুরু তুমি এখন এদের ঐ পাশের ঘরে নিয়ে যাও। শুভরূপ আমি মেঝেটা আরও একটু খুঁড়ে দেখি। থোকাবাবুর ঘরের মেঝের তলা থেকে

এতো সোনা-দানা বেরিয়েছিল যে একজন দায়িত্বপূর্ণ অফিসারের
কোমরে উপস্থিতি একান্ত রূপে প্রয়োজন ছিল, তা না হলে
বিশ্বাস্য এবং বিপক্ষীয় ব্যক্তিদের দ্বারা করেকটি দ্রব্য লুণ্ঠ পাট
হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই জগৎ ইনসপেক্টর সুনীল রায়ের
উপদেশ শিরোধার্য করে বেজা নাগী দুইটিকে পৃথক পৃথক ভাবে
তাদের নিজ নিজ ঘরে নিয়ে তাদের বহবার অভয় দিলাম এবং এ
কথাও তাদের বললাম যে তারা যা বলবে তা কাউকেই জানানো
হবে না। এইভাবে বহু সাধ্য সাধনার পর তারা স্বীকার করলো
যে তারা খাঁদা বাবুকে একজন খুঁনে গুণ্ডা বলেই জানে।
তবে খোঁকা নামে কোনও খুঁনে বা গুণ্ডাকে তারা চেনে না।
তা ছাড়া খোঁকা ও খাঁদা এক ব্যক্তি কিনা তাও তাদের জানা
নেই। খাঁদা বাবু প্রায়ই আজকাল তার এই বাড়ীতে আসেন
কিন্তু রাজিবাস তিনি কদাচ এখানে করে থাকেন। এইদিন
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১১৩৬ আনুমানিক ১২-৩০ মিঃ ঘটিকায় আমাদের
কেউ কেউ দরজার গলির মুখে খন্দেবের আশায় দাঁড়িয়েছিলাম,
এমন সময় হঠাৎ খাঁদা বাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকতে ঢুকতে চেঁচিয়ে
উঠলেন এই ভাগ যা সব যে বার ঘরে! যতক্ষণ আমি এখানে
থাকবো ততক্ষণ কেউ কখনো বেরুবি না। খবরদার!
দেখছিস তো এই ছুরি। এই বলে হাতের আস্তিন থেকে একটা
ছুরি বার করে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন।—এর পর
ভয়ে যে বার ঘরে চলে এসে আমরা দরজা বন্ধ করেছিলাম।
প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাউর সাড়া না পেয়ে আমরা মনে করেছিলাম
খাঁদাবাবু চলে গিয়েছে। তাই আমরা কেউ কেউ সাহস করে
বাইরে এসে দেখি খাঁদা বাবুর বাবা চৌবাচ্চা থেকে বাসন্তি করে জল
তুলে কতকগুলো কাপড় চোপড় কাচ্ছে। উঠানের উপর এই সময়
জোহনার তীর আলো এসে পড়েছিল। এই আলোতে আমরা দেখলাম
যে বাসন্তির জল টকটকে লাল। এই সময় খাঁদাবাবু হঠাৎ তার
ঘর হতে বার হয়ে এসে ধমকে উঠলো, ফের বের হয়ে এসেছিস।
যা যা যে বার ঘরে। আমরা খাঁদা বাবুকে সকলে মমের মতই ভয়
করে থাকি। তাই 'বাচ্ছি বাচ্ছি' বলে আমরা আপন আপন ঘরে
এসে ভয়ে অর্গল বন্ধ করে দিয়ে যে বার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম।
এই কয়টি বিষয় ছাড়া এই খোঁকা বা খাঁদাবাবুর কাণ্ডাকরণ সম্বন্ধে
আমরা আর কিছুই বলতে পারবো না। তবে একথা আমরা
সকলেই জানি যে খাঁদাবাবুর ব্যবসায় প্রতিটি পরিচ্ছেদে ইংরাজী
'S' অক্ষরটি তারই ইচ্ছা মত লিখে রাখা হতো। আমরাও মধ্যে
মধ্যে অনুকূল হয়ে ঐ 'S' অক্ষরটি তার কাপড় জামার কোণে কোণে
হস্তির সাহায্যে তুলে দিয়েছি। এই 'S' অক্ষরটি খাঁদাবাবুর নিকট
একটি বিশেষ সখের বস্তু ছিল।

এই সময় আমরা খোঁজাখুঁজি করে খাঁদার পাতানো পিতার
নিকট হতে খোঁপার হিসাব সহ একটি নোটবুকও উদ্ধার করতে
সমর্থ হই। ঐ নোটবুকের লেখা হতে প্রমাণিত হয় যে কতকগুলি
কাপড়-চোপড় ৫ই সেপ্টেম্বর ১১৫৭ তারিখে খোঁপার বাড়ী পাঠিয়ে
দেওয়া হয়েছিল। এই খোঁপাটির নাম ঠিকানাও ঐ নোটবুকে লিখে
রাখা ছিল।

এর পর আমি অজান্তে অফিসারদের খাঁদার পিতার বাটীতে
তদন্তরত দেখে ঐ নোটবুকটি সহ মানিকতলা স্ট্রীটে তাদের ধোঁপা

রা মা স্নান

কৃতিবাস বিরচিত

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত
এবং সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
বাঙলার এই অতিপ্রিয় গ্রন্থখানি মৃদু প্যারিপাটো
একটি যুগপ্রবর্তক। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত।
৮টি বহুবর্ণ ও ১৫টি একবর্ণ চিত্রসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ। [২৯]

জী ন নের

বা রা পা তা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেময়ী সরলা দেবীচৌধুরাণীর
জীবনালেখ্য। গত শতকের শেষার্ধের নবজাগরণ
যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঘরোয়া ছবি অতি
সরস ভঙ্গীতে এই বইয়ে পরিবেশিত হয়েছে।
ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৪৯]

ম হা ন গ রী র

উ পা থ্যা ন

শ্রীকৃষ্ণাঙ্গনা গুপ্তা রচিত অভিনব উপন্যাস।
পটভূমিকা—কৈবর্ত্য বিদ্রোহে বাঙলা দেশের
গণঅভ্যুত্থান; চরিত্র সৃষ্টিতে—চিরায়ত সাহিত্যের
যে কোন চরিত্রের মত রসগাধুরে সমৃদ্ধ। [২১০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

॥ অত্যাশু পুস্তকালয়েও পাইবেন ॥

মাথুরামের ভাটখানায় এসে উপস্থিত হলাম। সৌভাগ্যক্রমে ওদের সেই ধোপাটি সেইখানে উপস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সে তখনও পর্যন্ত খাঁদার ঐ সকল কাপড়-চোপড় কাটাচুটি করতে আরম্ভ করেনি। আমরা ঐ নোটবকের লেখামুযায়ী প্রতিটি বস্ত্র উদ্ধার করে দেখি যে তাদের প্রতিটিতেই এক একটি 'S' অক্ষর স্রুতির সাহায্যে তোলা হয়েছে তো বটেই, অধিকন্তু ঐ সকল বস্ত্র ও সাটের স্থানে স্থানে তখনও পর্যন্ত শুষ্ক রক্তের প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ দুই জন স্থানীয় সাকার সমক্ষে ঐ সকল পরিষেয় পরিচ্ছন্ন সমূহ উহাদের যথাযথ বিবরণ সহ তালিকাভুক্ত করে আপন হেপাজতে গ্রহণ করে নিই। এই সকল কাপড় রক্তের দাগগুলি মনুষ্য বস্ত্র বলে সরকারী রক্তপরীক্ষক অভিমত প্রকাশ করলে উল্লাহ যে আমাদের বিরুদ্ধে এক আকস্মিক প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না। তবে কয়েকটি রক্তমাখা কাপড়-চোপড় ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে অপর কয়েকটি রক্ত মাখা কাপড়-চোপড় ঘরে মজুত রাখার অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি উৎফুল্ল হয়ে খাঁদার পিতার বাড়িতে ফিরে এসে দোথ ইনসপেক্টার রায় বহুলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঐ পল্লী হতে দেবেনবাবু নামে একটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষীকে খুঁজে বার করেছেন। আমি তাকে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সোল্লাসে তাঁর বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিলাম। তাঁর মহানুশ্রাবণ বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খাও নদু'

মার্কী গেঞ্জী
ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিয়েল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪২৯৯৫

১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসে ১২-৩০ মিনিটে ১০ কুপনাবধি লেনে খাঁদাবাবুর বাটর রোয়াকে বসে আমি বাঘু সেবন করছিলাম। এমন সময় আমি খাঁদাকে নগ্ন পদে একটি সাদা বৃত্তি ও একটি নীল রঙের সাট পরা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হতে দেখি। খাঁদা বাবুর পিছন পিছন তার বন্ধু কেউ বাবুকেও আমি আসতে দেখেছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ে যে আমি খাঁদার বৃত্তি ও সাটের উপর রক্তের দাগ দেখে চমকে উঠেছিলাম। আমার ভীত হয়ে উঠার অপর কারণ হচ্ছে এই যে এই সময় খাঁদা একটি উগ্ৰুজ ছুরিকার ব্লেড তার সাটের হাতলের মধ্যে দাঁগিয়ে তার সাদা বাটের হাওলাটি সে তার হাতের বৃত্তির মধ্যে ধরে রেখেছিল।

খাঁদা কোনও দিকে দৃকপাত না করে ভীত গতিতে তার পিতার ঐ বাড়িটির মধ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু কোঠাবাবু খাঁদাকে অনুসরণ না করে আমাকে বোধ হয় আগলারার জঙ্গলই সেখানে পাড়িয়ে রইলো। আমি ভয়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে উপান শক্তি পর্যন্ত আমার রহিত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে খাঁদা বাবু তার বাড়ি হতে বার হয়ে এলো। তাকে দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে সে ভালো করে চান করেছে। এই সময় খাঁদা নীল সাটের পরিবর্তে একটি ক্রীম রঙের সাট পরে ফেরেছিল। এ ছাড়া সে শারা দেহে প্রচুর স্বগন্ধি সেটও মেখে নিয়েছে। আমাদের তখনও পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতে দেখে খাঁদা পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে তা আমাকে দেখিয়ে ইসারায় আমার চুপ করে থাকতে উপদেশ দিল। তারপর সে নির্ভয়ে শির দিতে দিতে কেপ্টার সঙ্গে পুনরায় শোভাবাজার স্ট্রীটের দিকে চলে গেল।

এই সাক্ষী দেবেনবাবুর বিবৃতি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল তাতে আমরা সকলেই একমত হয়েছিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই দেবেনবাবুর সহিত খোকারাবুর পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ করায়ও আমরা প্রয়োজন মনে করলাম। এই সম্পর্কে দেবেনবাবুকে আমরা বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর সমূহ এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রাধিকারযোগ্য।

প্রঃ—আপনার সহিত খাঁদাবাবুর পরিচয় কতদিনের? জ্ঞান কবি আপনি তাদের একজন দলের লোক নন। এইরূপ একটি দৃষ্ট দেখার পরও আপনি খাঁদার খবর দেননি কেন? ঐদিনকার ঐ কৃষ্ণ বস্ত্রের সংবাদটি নিশ্চয়ই আপনার অগোচর ছিল না।

উঃ—আজ্ঞে, সে আমার বাল্যবন্ধু। আমি, খোকা, কেঠো ও হরিপদ এককালে স্থানীয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পড়াশুনা করতাম। তবে নীচের ক্লাশ হতেই আমরা একে একে ঐ স্থল ত্যাগ করে আসি। আমাদের মধ্যে আমি এক হরিপদ এই পাড়াতেই বাস কবি। আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করে থাকি। আমাদের পূর্বতন বন্ধু খোকা ও কেঠোর কথা আর জিজ্ঞেস করে লাভ কি? আজকাল আমরা ওদের লগ্ন বিশেষ রূপে এড়িয়ে চলে থাকি। পাড়ার আর পাঁচজনের মত আমরা ওদের ত্রুণ কারও চলি। এই

কারণেই আমরা কেউই ওদের সবক্কে কোনও সংবাদ ধানায় পৌঁছিয়ে দিতে সাহসী হইনি। ঐ দিনকার খুন্টো যে খাঁদাবাবুরাই করেছিল তা সহজেই আমরা অনুমান করে নিতে পারেছিলাম।—আজ্ঞে, এই সবক্কে কোনও খবর আপনাদের দিলে ঐ নিহত ব্যক্তির ছায় আমরাও একে একে মুগ্ধচাত হয়ে যেতাম। এই জন্তই সব বুকে বা ভেদেও আমরা চুপ করে থাকাই প্রের: মনে করেছিলাম।

একশ্রেণে এই দেবেন, মলিনা এবং অধিকার বিবৃতি তিনটি তাদের প্রেমত বিবিধ সময়গুলির পরিশ্রান্তিতে বিবেচনা করে আমরা নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারলাম যে ঐ দিন সন্ধ্যা আট বা সাড়ে আট ঘটিকায় খোকা ওরফে খাদা তার সাক্ষরদের সাহায্যে পাগলা ওরফে প্রান্তলকে পাকড়াও করে ঐ মেঘর গলিতে নিয়ে এসে সন্ধ্যা নয় ঘটিকা আশ্রাজ সময়ে তাকে ছুরিকাহত করে ফেলে রেখে যায়। এরপর নিকটের কোনও এক নিভৃত বা নিবাসী বাড়ীতে বা ঐরূপ কোনও এক সুরিধা জনক স্থানে কিংবা খোকারই রূপানাথ লেনের বাড়ীতে অলক্ষ্যে এসে তারা একস্থানে তাদের রক্তরঞ্জিত পরিচ্ছন্ন পরিবর্তন করে তারা রপজীবিনী উবারাণীর গৃহে এসে মলিনাভূমকরীর সচিৎ সাক্ষ্য করে। তবে ঐ রাত্রে উবার কক্ষে তারা অধিকক্ষণ সময় অতিবাহিত করেনি। স্বল্পক্ষণ পরে তারা পুনরায় বিবর্তিত হয়ে ঐ মেঘর গলিতে ফিরে এসে পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। এরপর তারা এ মুণ্ডটা নিকটে কোনও এক স্থানে নিক্ষেপ করে খোকা ও কেট্টো আবার খোকার রূপানাথ লেনের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ খোকা পাগলার দেহ হতে তার মুণ্ডকর্তন কার্যে একাই লিপ্ত হয়েছিল। এইজন্য মাত্র তারই পরিচ্ছন্ন এই সময় রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠে। এইজন্য এই সময় একমাত্র তারই পুনরায় পরিচ্ছন্ন পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'য়েছিল। সম্ভবতঃ এই জন্ত কেট্টাবাবু প্রথম অপারেশনের সময় পরিচ্ছন্ন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলেও ওই দ্বিতীয় অপারেশনের সময় তার পোষাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি। বঙ্গবীর বঝা যায় যে খাদাকে ঐ রাত্রে দুইবার তার রক্তরঞ্জিত পরিচ্ছন্ন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল; প্রথমবার বধন সে পাগলাকে বন্ধনের সাহায্যে পৃথক করে তাকে ছুরিকাহত করে এবং দ্বিতীয়বার বধন তাকে তার মুণ্ডকর্তন কার্যে লিপ্ত হতে হয়। মুণ্ডকর্তন রূপ দ্বিতীয় অপারেশনের সময় কেট্টাবাবুর পায়ে রক্ত না লাগায় তাকে এইবার পোষাক পরিবর্তনের জন্ত খোকার বাড়ীর ভিতর ঢুকতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মলিনা ও দেবেন—এই উভয় সাক্ষীর বিবৃতিদ্বয় সময়ের পরিশ্রান্তিতে পারি-পারিক ঘটনার সচিৎ একত্রে গ্রহণ করলে বুঝা যাবে যে খোকা কে ঐ রাত্রে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার পোষাক পরিবর্তন করেছে হয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে খোকার রক্তিতা মলিনাবন্দরী তার দয়িত খোকাবাবুকে নীল রঙের সাট পরে উবার বাড়ীতে কিংবা আসতে দেখেছে এবং দেখেন তাকে নীল সাট ছেড়ে কীম রঙের সাট পরে তার বাড়ী থেকে তাকে বেঙ্গতে দেখেছে।

এই বুন সবক্কে উপরেই এই খিওরাটি আশাতরঙ্গিতে সত্য ব'লে যেন হলেও উদ্ধাতে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ ছিল। সাক্ষী মলিনাবন্দরীর বিবৃতি হতে আমরা 'জেনেছি যে, সে উবার কক্ষ খোকার নীল সাটের উপর লাল রক্তের দাগ দেখেছিল। কিন্তু দুইটি

বিশেষ কারণে ঐ রাত্রে মলিনা খোকার সাটের উপর সত্যি রক্তের দাগ দেখেছিল কিনা তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমতঃ ঐ নীল সাটটি পরে খোকা পাগলাকে ছুরিকাহত করলে তার ঐ সাটের অনেকখানি স্থানে রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠতো। এর কারণ ছুরিকা দেহে প্রবেশ করলে সেখান হতে ফিনকী দিয়ে রক্ত বহির্গত হইওয়া স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য যদি অসাধারণতঃ কলতঃ খোকার পোষাক পরিবর্তনের সময় তার ঐ নতুন নীল সাটের সচিৎ তার রক্তরঞ্জিত পরিত্যক্ত সাটের সংযোগ হয়ে থাকে তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে নীল কাপড়ের উপর মনুষ্যরক্ত পড়লে উচ্চ রক্তিকালে কালো দেখায়। ঐ অবস্থায় মনুষ্য রক্তবিন্দু কখনও লোভিত বর্ণের রূপে প্রতীয় হয়নি। অতুলিকে পানের পিচ কোনও এক নীল বস্ত্রখণ্ডের উপর নিশ্চিন্ত হলে উচ্চ রক্তিকালে টকটকে লালবর্ণের দেখা যাবে। এইজন্য আমাদের মনে হল যে খাদা বধন মলিনার প্রবেশের উত্তরে বলেছিল, যে উচ্চ রক্ত নয় পানের পিচ তখন সে সত্য কথাই বলেছিল। ব'উব সম্ভবতঃ খোকা ওরফে খাদাবাবু প্রথম অপারেশনের পর পোষাক পরিবর্তন করে পান চিবুতে চিবুতে মলিনার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত উবারাণীর ঘরে এসেছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে মলিনার দেখা রক্তের দাগ পানের পিচের দাগ রূপে স্বীকার করে নিলে অবশ্য আমাদের পরিকল্পিত এই খিওরাটি সত্য রূপে প্রতীয় হবে।

ক্রমশঃ।



ফোন ৬৪-৩২৩২

পি.জি.আ.ড.

১২৫ বি বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বিপুল সাদা এল জনতার দল থেকেও, আর কেবলমাত্র সাদা দিয়েই তারা কান্ড থাকেনি—আমাদের প্রতি তাদের সহস্র মনোভাষ্যে পরিচয় দিতেও এতটুকু কাণ্ডা তারা করেনি প্রকাশ। এই সময়ে এদের প্রীতি, সমাদর, আপ্যায়নের মধ্যে দিয়েই আমার জীবনে সবচেয়ে বা বড় লাভ হয়েছিল—যাকে আজও আমি অসীম-সৌভাগ্যের নামান্তর বলেই মনে করি এবং শুধু আজ কেন চিরকালই করে থাক তা হচ্ছে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অনুগণের প্রীতি, সমাদর, আপ্যায়ন আমার ভরিয়ে তুলেছে অনেকখানি, তাদের সমাদর আমাকে স্বীকরেছে আমাকে জুগিয়েছে উদ্দীপনা, আমার সামনে দেখা দিয়েছে আমার শিরসাদানার গৌরবময় স্বীকৃতির রূপ নিয়ে কিছু সরোজিনী নাইডুর সান্নিধ্যভাঙের গুরুত্ব বা তাৎপর্য যে অমূল্য, অসীম, অশেষ—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে আমার সঙ্গে যিহাত কেউ হবেন না। হায়দ্রাবাদে সরোজিনী নাইডু ও তাঁর পরিজনবর্গ যথেষ্ট উৎসাহে এবং সমাদরে এবং অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে তুলেছিলেন আমাদের। এই উপলক্ষ্যে, এই রচনার সুযোগ নিয়ে সজ্ঞা প্রেরণা উৎসর্গ করি ভারত জননীর মনবিনী হুতিতা, ভগবতের কবিকুলের অঙ্গভূম শ্রেষ্ঠ ভারতিকা এবং ভাগবতের প্রথম মহিলা রাজ্যপালিকা (ভারত-কল্পারের মধ্যে) এর পর এই আসন অলঙ্কৃত করার গৌরব অর্জন করেছেন একমাত্র এঁরই কল্পা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। স্বর্গীয়া কবি সরোজিনী নাইডুর অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

স্বর্গীয় স্ত্রীর আকবর হায়দারীও আন্তরিক সমাদরে আমার ভরিয়ে তুলতে খিগা বোধ করেননি। শিল্পের প্রকৃত সমর্থনার লোক ছিলেন স্ত্রীর আকবর হায়দারী। তাঁর শিল্পবাসিক মনের পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর মূল্যবান শিল্প সংগ্রহশালা দেখে, এক কথায় যাকে বলা যায় অপরূপ। স্ত্রীর আকবর যে কত বড় শিল্পবোদ্ধা ছিলেন তা তাঁর সংগ্রহশালাই প্রমাণ করল। আমাদের আবুও বুদ্ধ করেছিল নবাব সালারজাঙ্গের প্রাসাদ। স্ত্রীর আকবরের বাড়ীতে দেখেছি শিল্পের অপরূপ সংগ্রহশালা, নবাব সালারজাঙ্গের বাড়ীতে শিল্পসংগ্রহশালা তো দেখেছিই কিন্তু পরি একটি বাহুবল্যও দেবার সৌভাগ্য হল (টিক

‘বাহুবল্য’ আখ্যাটি এখানে প্রযোজ্য না হলে ‘বিবিধ সংরক্ষণশালা’ কথাটি এ ক্ষেত্রে অন্যায়সে ব্যবহার করা যেতে পারে।) প্রচুর সংখ্যক শিল্পীরাই জুলুভ বস্তুর এবং শুদ্ধ সিদ্ধ চাক্তর স্তম্ভিগুণ সৃষ্টি সমূহের সংরক্ষণ নবাবের সমগ্র প্রাসাদের মধ্যকার বহলক্ষেত্রে বুদ্ধি করেছিল এবং সমাগত অতিথিবৃন্দের কবেছিল চিত্তস্তবণ। আমাদের বহু শ্রীজয়গোপাল পিল্লাইয়ের পরিজনবর্গের আন্তরিকতাও এ প্রসঙ্গে ভোলাবার নয়।

ব্যাক্সা লাবে—মতীশুবে কি স্তম্ভর ভাবে দিনগুলো কেটেছে আমাদের—ব্রততন্ত্র ভ্রমণ এবং প্রাকৃতিক দৃষ্টিবলী অবলোকন এবং তদর্শনে মুগ্ধ হওন...সত্যি, ভ্রমণে যে অপার আনন্দের বজা...বারবার এই কথাটিই মনে পড়ত।

তারপর মাস্তান। মস্তদেশ। বিশাল ভাববতের দক্ষিণপ্রান্ত। পিঠাপুরমের মহাবাজা এবং তাঁর পরিবারবর্গের কাছে পাওয়া গেল প্রভূত আদর আপ্যায়ন। কৃতজ্ঞতার পাশে আনন্দ করলেন শ্রীমতী অম্মু স্বামীনাথনও। মাস্তানের Y. M. C. A. আমার জন্য একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন, আমার মনে আছে সেখানে শ্রীমতী অম্মু বক্তৃতার মধ্যে আমাদের নৃত্যাত্মহীন সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশংসা, উৎসাহ, স্তম্ভাতি এবং প্রশস্তিও ছিল।

মাস্তানজ বাস করার সময় আমার জীবন সবচেয়ে টিপ্পনযোগ্য, সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং সবচেয়ে অস্বাভাবিক যে ঘটনা ঘটল তা হল বালা সরস্বতীর সান্নিধ্যলাভ। শ্রীমতী বালা সরস্বতী—ভারত-নাট্যমের ঐতিহ্যসে বীর নাম চিরকালের জন্তে জড়িয়ে থাকবে। ভারতবর্ষের নৃত্যশিল্পের প্রচুর উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে বীর কলাপে। যে দিনদিন সেখানে আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই দিনদিনের প্রতিটি দিনই তিনি এসে আমাদের উৎসাহ বর্ধন করে গেছেন—আর কেড়ে নিয়ে গেছেন আমাদের সকলের সুগভীর শ্রদ্ধা। আমরা উঠেছিলুম হোটেল কোনেনমারা (Hotel Connemara)। সেই হোটেল এলেন বালা সরস্বতী জামাকে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিটি শিল্পীকে অভিনন্দন জানাতে, বোকা সেল, আমাদের নৃত্যাত্মহীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে আনন্দ দেবার মত নেতাজী অনুপ্রবৃত্ত হয়ে ওঠে নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চোখে আমাদের অনুষ্ঠান অপারাজ্যের রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি—মাথা পেতে গ্রহণ করলুম শিল্পীর সন্তোষ আশীর্বাদ। আনন্দ তখন হৃদয় উপচে পড়ছে। সারির আহবান আমাদের জানিয়ে গেলেন তাঁর বাসভবনে। আমাদের পরিচুপ্তি দেওয়ার জন্তে নিজের নাচ দেখালেন। হ্যা, সেদিন নিজেকে চোঁটলেন বালা সরস্বতী আর সেই নাচের স্মৃতি কোনওদিন মুছবে না আমার মন থেকে, সে মুগ্ধ আমি জীবনে কখনও তুলতে পারব না সেই মুগ্ধ যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনাকে ভুলিয়ে দেখে সমকালীন ঘটনারও অনেক কিছু হয়তো বা কল্পকালের জন্তে সবে যায় মন থেকে, আপন অস্তিত্বও এক এক সময়ে ভাবিয়ে যায়—চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মুগ্ধ। সেই মুগ্ধ, সেই ভাল, সেই ভল্লীমা, সেই কুলশতা, সেই মাধুর্য। চার ঘণ্টা নেচেছিলেন বালা সরস্বতী। জীবতে পারেন? একনাগাড়ে নেচেছিলেন—কোন বিরাম, কোন বিরতি বা কোম ছেদ ছিল না সেই নাচে। তাঁর এই বাহুবলী প্রতিভা ভুলিয়ে জিয়েছিল আমাদের স্থান-কাল-পাত্র। কেড়ে নিয়েছিল মুখের ভাষা-বিশ্বয়ে আর বর্ণনার অসীম এক পৌরুষত্ব প্রদায় আমাদের করে দিয়েছিল



মাধনা বসু

তবাক। তিনি কি শুধুই শিল্পী? না—শুধু শিল্পী তিনি নন—
তিনি নিজেই একজন জীবন্ত বিশ্বয়। জীবন্ত আশঙ্কের তিনি একজন
বিশ্ব প্রতীক।

মধুগুপ্ত অভিজ্ঞতা আর অকুণ্ঠ স্বপ্নবৃত্তি সফল করে কলকাতার
ফরে এলুম। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ হল সমাপ্ত। কলকাতার
স্বপ্নবাসনের তরঙ্গে আবার নিজেকে ভাসিয়ে দিলুম স্বভাবতঃই।
‘মোনাক’র নায়িকারূপে নিউ থিয়েটার্সের ছবির কাজ আবার শুরু
করলুম। মধুর পরিচালনায়। বাঙলা এবং হিন্দী দুটি ভাষায়
তোলা হল ‘মোনাক’। আজকের দিনের প্রখ্যাতনাম প্রযোজক-
পরিচালক শ্রীবিমল রায় ছিলেন এর চিত্রকর। চিত্রকন হিসেবে
তার অসাধারণ নিপুণতা সর্বজনবিদিত। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিতে
অবদান হলেন নটশেখর শ্রীমদেবশচন্দ্র মিত্র, নটস্বয়ী শ্রীঅঙ্গদ
চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীপ্রীত মজুমদার, শ্রীমতী দেববালা
এবং শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি। সুরমোহনার দায়িত্বভার গ্রহণ
করেছিলেন শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। আগেই বলেছি নায়িকার চরিত্রে
রূপ দেওয়ার ভার পড়েছিল আমার উপর। নায়িকা চরিত্রে একটি
নটরীণ চরিত্র, একটি অন্ধ মেয়ের ভূমিকা। ছবির হিন্দী সংস্করণে
নাট্যকর ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন। বোম্বে
টকস থেকে দেবিকার্যপীর সঙ্গে অভিনয় করার পর থেকে ইনি
যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হন। ছবির বাঙলা সংস্করণে
নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বাঙলার তৎকালীন চিত্রসঙ্গীত

অন্ততম প্রধান সুদর্শন অভিনেতা স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রকাশ, ‘বাক্সটকী’
কবিভেণ্ড আমার সঙ্গে নায়কের ভূমিকায় বীর অভিনয় দর্শকসাধারণ
দেখেছেন।

এইবার এখনকার একটি কথা বলি। মাঝে মাঝে যখন
“বিরস দিন, বিরল কাজ” অবস্থার একা বসে থাকি অসুখা চিন্তাকে
সঙ্গী করে তখন এক-এক সময়ে আমার মনে হয়, আমি ভাবতে চেষ্টা
করি ঐ অসুখা চিন্তাবাদির মধ্যে থেকে একটি চিন্তাটি আমার মন
অধিকার করে সব চেয়ে বেশী। খ্যাতি, বশ, যৌবন, ঔজ্জ্বল্য
স্বকীয়তা ইত্যদির করণায় আমি তো অকুণ্ঠ পেরেছি—তার অসীম
অমুগ্ধকে আমি তো পূর্ণ হয়ে উঠছি প্রাপ্তির পথ প্রাচুর্য।
তার কুপারট কল্যাণারার মত মরে পড়ে ধরা করেছে আমাকে।
কিন্তু সে সবকে কোন সচেতনতা জাগে নি আমার মধ্যে। তার
কারণ আমার মতে আমাকে এক “এরিয়েল” এর সঙ্গেই তুলনা করা
চলে। গুট গভীর রক্তচাপের স্বপ্নজগতের চিত্রশাস্ত্রী বাসিন্দার
মত, মন যেন সতত নভোটাসী, ভাবপ্রস্রাৱী, কল্পনাবাহী—অসীমের
সুত্রসন্ধান ব্যাকুল, তৎপর, উন্মুখ এবং স্বভাবতঃই সেই জগতই
জাগতিক পরিবেশ প্রস্তুত করতে পারে নি আমার চেতনাকে,
আমার অমুগ্ধতিকে, আমার সত্যকে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে
এখানে আমি ভাবি কি অজান্তে—তারও উত্তর আছে। ভাবতেই হই
কি অজান্তেই হই, হাই হই না কেন—তা নিয়ে আমার ভাবাই বা
কি আছে? কেন না এখনও পর্যন্ত আমি নিজে তার বিচারবিবরণই না।

[ক্রমশঃ।

অমুবাদ—কল্যাণাক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি

শরৎচন্দ্রের কাহিনী বাঙলার চিত্রঙ্গতকে যে কতখানি
গৌরবান্বিত করেছে তার তুলনা নেই। বাঙলার চিত্রঙ্গতের
ইতিহাস-কাহিনীর ক্ষেত্রে শরৎ-কাহিনীর অবদান অতুলনীয়। বাঙলার
অন্ততম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবীও প্রথম জীবনে
শরৎচন্দ্রের একাধিক কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে অভিনয়ে অংশগ্রহণ
করে এবং পরবর্তীকালে নিজেই একাধিক শরৎ-কাহিনীকে চিত্ররূপ
দিয়ে যথেষ্ট সুনাম ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন এবং শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন
কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য দশকের অকুণ্ঠ সাধুবাসের অধিকারিনী
হয়েছেন। চিত্রঙ্গতের তাঁর সাপ্তাহিক অবদান “ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও
অন্নদাদি” শ্রীকান্তের প্রথম পদের প্রথমধারকে “অবলম্বন” করে এই
ছবিটির রূপ দেওয়া হয়েছে। আমরা মুগ্ধকণ্ঠে স্বীকার করছি যে
এ ধরনের সর্বাঙ্গসম্পন্ন বাঙলা ছবি অনেক দিনের ব্যবধানে কচিৎ
কখনো আশুপ্রকাশ করে। সকল দিক দিয়ে ছবিটি ত্রুটিহীন।
পিসীমার বাড়ীতে বালক শ্রীকান্ত সময় আতিবাহিত করছে, তারপর
ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগ, তার সঙ্গে ডিকীতে নৈশবিহার,
মাছ চুরি, রীতিমত গ্যাডজেটের মধ্যে দিয়ে তাদের যাত্রা,
নতুনশার আরবিবি, অন্নদাদির সঙ্গে যোগাযোগ, শাহজীর পরিচয়
লাভ, শাহজীর মৃত্যু, শ্রীকান্তকে চিঠি লিখে বেধে অন্নদাদির
নিরুদ্দেশযাত্রা, চিঠির মধ্যে দিয়ে ক্লাসিক্যকে অন্নদাদির আশুপরিচয়
দিয়ে—এই ভাবে ছবিটির চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে, সব শেষে শিশুন

থেকে দেখানো হচ্ছে শরৎচন্দ্র সেই অমর কাহিনী লিখে চলেছেন। ছবির পরিচালনা এত উচ্চাঙ্গের হয়েছে বার কলে সাহিত্যগুরু, রচনার রস কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি, কাহিনীর মূল রস ছবিতে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। শ্রীকান্তের এই অধ্যায়টিতে এমন কয়েকটি বর্ণনা বা বিবরণ আছে যাকে ছবিতে ফোটানো নিতান্ত দুঃস্থ, আনন্দের সঙ্গে পরিচালণীয় যে সেই সব বর্ণনা বা বিবরণীর স্ফূর্তিতে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিটিকে এত নিখুঁতভাবে ফোটানো হয়েছে, যাতে মনে হয়েছে যে বইয়ের কাগজের পাতাকেই এত বড় আকারে দেখতে পাচ্ছি, কিশোরদের ব্যাডভেকার বলতে বা বোকার, বাঙলা ছবিতে তো তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে—কিন্তু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের ডিল্লোতে নৈশ অভ্যাস এমন ভাবে দেখানো হয়েছে, যা বীতিমত শিহরণ বইয়ে দেয় দর্শকমহলে। ছবিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন। ছবিতে গান একটিও জোড়েননি অথচ ইচ্ছে করলে বিভিন্ন পরিবেশে পাঁচ-ছটি গান অনায়াসে জুড়তে পারতেন, বাস্তবিক তিন আগাগোড়া তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছেন, বিমলার সঙ্গে শাহজাদীর যে সম্পর্ক, তা মাত্র দুটি সংলাপের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এই বাস্তবিকপূর্ণ ও শ্রান্তি-ভগিনীপতির প্রেমপথ নৃত্য-গীত সহযোগে ফেনিচে-কাঁপিয়ে সুবিভূত হয়ে ছবির একটি বিরাট অংশ জুড়ে বসেনি। আভাসে-ইঙ্গিতে, স্বল্প পরিসরে সমগ্র অধ্যায়টি দর্শকদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়ে উঠেছে, আভাস-ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়েই আগাগোড়া অংশটি স্বয়ংস্বয় করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না দর্শকসাধারণকে। মূল গ্রন্থ আমবা জেনেছি যে, অন্নদা, দিসিকে হত্যা করে শাহজাদী নিরুদ্ধিত হন। ছবিতে সেই জায়গায় একটু পরিবর্তন করা হয়েছে, দিসিকে তপায়িত করা হয়েছে বোনে, একটু ভাবলেই বোকা যাবে যে এই পরিবর্তনের পিছনেও যথেষ্ট কারণ বিজ্ঞান-মেন্ডেলার অধ্যায়টিকে আর একটু বড় করলে খুব অশোভন হতো কি? বড় করা মানে অতিরিক্ত সংলাপ দিয়ে নয়—শরৎচন্দ্রই তাঁর গ্রন্থে মেন্ডেলাকে আরও শানিকটা চিত্রিত করে গেছেন—সুতরাং তাঁরই বর্ণনামুসারে মেন্ডলা চরিত্রটিকে আর একটু বড় করা যেতে পারত—যেমন দুর্দান্ত ঐশ্বর্যের ভরা দুপুরে শ্রীকান্তদের যেতে হোত ছুঁ মাইল রাস্তা হেটে তাঁর তাস খেলার বন্ধুকে ডেকে আনার জন্তে, দারুণ শীতে কবল মুড়ি দিয়ে বসে মেন্ডলা বই পড়তেন, শ্রীকান্তদের ঠায় হাজিরা দিতে হোত বইয়ের পাতা উল্টে দেবার জন্তে।

সবচেয়ে প্রাণ-স্নায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেলেন জামল গুপ্ত। অতিরিক্ত সংলাপ রচনার দারিদ্ৰ্যভার তাঁর উপর স্তম্ভ ছিল। তাঁর সংলাপ রচনা এত নিখুঁত হয়ে উঠেছে যে শরৎচন্দ্রের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে—কিন্তু কোথাও তা বোমানান লাগে নি, কোন অংশে তা নির্যাস মনে হয় নি। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্তে জামল গুপ্ত নিশ্চয়ই বঙ্গবাহার। অভিনয়ক্ষেত্রে কোনও একজন শিল্পীর কথা বলা চলে না। প্রত্যেকটি শিল্পীর অভিনয় স্ব স্ব ভূমিকানুযায়ী অসুপূর্ণ। প্রধান শিল্পীদের অভিনয় তো নিম্নলিখিত চমৎকার পার্শ্ব শিল্পীরাও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকালিপি এইভাবে হয়েছে—অন্নদা—কানন দেবী, শাহজাদী—বিকাশ রায়, পিসীমা—মলিনা দেবী, শিলেশমশায়ী—জুহুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ—পার্শ্বপ্রভিন, শ্রীকান্ত

—সম্মল বোব, রায় সাহেব—বীণেশ্বর সেন, বিমলা—শেখালী দেবী, নতুনশা—অতুল বোব, নবীন (বড়বা)—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সত্যীন্দ্র (মেজলা)—ঈশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীনাথ—অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিশেষতঃ মেন্ডলাদের চরিত্রে বারেকের জন্তে অনেককিন বাদে বোহন মুখোপাধ্যায়কে দেখা গেল। ছবির চিত্রকর ও সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন স্বাক্ষর জি, কে, মেহতা ও পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সোনার হরিণ

অপরূপমূলক রহস্যকাহিনীর স্বাধাধ চলচ্চিত্রায়ণ দর্শকমহলে যে যথেষ্ট সমাদর পাবে, এ সম্বন্ধে অন্তরে নিশ্চয়তা পোষণ করার কোন বাধা নেই। কিন্তু সেই “স্বাধাধ” চিত্রায়ণের জন্তে কুশলী হাজের সম্পূর্ণ প্রয়োজন, অপরূপ হাতের কাঁচ নয়, এই ক’টি কথাই বার বার মনে পড়ছিল “সোনার হরিণ” দেখতে দেখতে। ছবির নামকরণ ও ক্যামেরার কাজ ছাড়া ছবির আর কিছু উল্লেখযোগ্য, আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক বলে প্রতিভাত হয় না। ছবিটিকে অবধা দীর্ঘ করা হয়েছে। সমগ্র ছবিতে পতির নিতান্ত অভাব। ছবির অর্ধাংশ প্রদর্শিত হয়ে গেছে, তখনও মূলগল্পটি কি বা ছবিটি অপরাধমূলক না মনস্তত্ত্বমূলক না সাধারণ প্রেমোপাখ্যান এই প্রশ্নই বিরাট রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে দেখা দেয়। পরিচালক সবচেয়ে হাস্যকর পরিচয় দিয়েছেন ঘরের জানলার পাশে হাতে-পাওয়া চাঁদের মত কুতুব-মীনার দেখিয়ে। মিল্লী দেখানো হচ্ছে, দর্শককে বোঝাতে হবে সে কথা, অতঃপর কুতুব-মীনার দিয়ে বুঝিয়ে দাও—হা-হতোছম্মি, মিল্লী বিনি চোখে দেখেছেন তিনিই জানেন মূল মিল্লী থেকে বহু দূরে কুতুব-মীনার এক কুতুবের আলো-পাশে জনবসতি কোথায়? বহু দূর থেকে কুতুবকে দেখা যায় শূন্যপ্রান্তরে কে যেন ইট-চূণ-সুরকি দিয়ে বাড়লা ভাষায় “চাঁর আনার” পার্ণাতিক চিহ্ন একে রেখে গেছে। একটা হোটলে খুনোখুনি চলছে। হত্যাকাণ্ড। অস্ত্রাশ্রয় বাসিন্দাদের কানে সে গুলির শব্দ পৌঁছয় না—অনেকজন বাদে দেখা যায় সিঁড়ির নীচে চারটি লোক কাঠের পুতুলের মত ঠাঁয়গেয়ে আছে। একটা আকাশক হত্যাকাণ্ডের এই প্রতিক্রিয়া? যে বিমান নষ্ট করা নিয়ে এত কাণ্ড, এত রহস্য, এত খুনোখুনি সেই বিমান কেন নষ্ট করা হল? কি তার উদ্দেশ্য, সেই ব্যাপারে কার-কার যোগাযোগ ছিল, এই বিবরণগুলি তো আগাগোড়া ছবিতে সম্পূর্ণ, এ সম্বন্ধে পরিচালকের নীরবতাই চোখে পড়ল, দর্শকমনে যে এই প্রশ্ন জাগতে পারে বোকা গেল এ সম্বন্ধে পরিচালক মাথা ঘামাবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করেন নি। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন ছবি বিবাস, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নমিতা সিন্হা, অজান্ত চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বিগত দিনের বিখ্যাত চিত্রনায়ক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জবি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপকুমার, অশোক সরকার, জীমান তিলক, পদ্মা দেবী, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবির কাহিনীকার বাসবিহারী লাল এবং সুরকার দেবদ মুখোপাধ্যায়।

বক্তাবর্তনের সাহায্যকরে রঙমহলের প্রবেশ

ধনজয় বৈরাগী! সর্বজন-সমাদৃত নাটক ‘এক হুঁটা আকাশ’ সঙ্গীরবে অভিনীত হয়ে চলেছে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। নাটকটির শতত

অভিনয় রজনী অনেক আগেই অতিক্রান্ত করে গেছে—কিন্তু তার ঊনসবটি উল্লেখ্যপিত হবে আগামী ১৬ই নভেম্বর। আরও অবগত-হয় যে কর্তৃপক্ষ এই দিনের টিকিট বিক্রয়কৃত টিকিটের সমস্ত অর্থ বক্তৃতাগুলির ব্যয়কল্পে দান করবেন। বাংলাদেশ দেশের জনসাধারণ সুবিস্তৃত আছেন যে আজকাল এই জাতীয় বিশেষ অভিনয়সম্মেলন উপলক্ষে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয়, উপরোক্ত কার্যেই রঙ্গমঞ্চের শিল্পীগণও পুরস্কার না নিয়ে এই ব্যবস্থা যে পরিমাণ টাকা নির্ধারিত সেই টাকা বক্তৃতাগুলির সাহায্যে ব্যয়িত হোক, এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অসহায়, ভাগ্যবিড়ম্বিত সর্বহার্য বক্তৃতাগুলির কল্যাণ কামনায় খিচিটোরের স্বত্বাধিকারিগণ এবং শিল্পীর দল এই উদ্দেশ্যকেই যে দরদ, সহানুভূতি ও উদার মনোভাবের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদাই।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

প্রদেয় প্রেমের মিত্রের রচনা “হাত বাড়ালেই বন্ধু” চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে সুকুমার দীপকপুত্রের পরিচালনায়। শুর দিচ্ছেন নটিকেন্দ্রা ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * শক্তিশালী পরিচালকবৃত্ত শঙ্কু মিত্র ও অমিত মিত্রের চিত্রায়িতদের দরবারে আগামী উপহার “ভাববিবাহ”। বিভিন্ন ভূমিকার অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, শঙ্কু মিত্র, নির্মল চট্টোপাধ্যায়,

অমর গঙ্গোপাধ্যায়, হারা দেবী, হুজি মিত্র, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্রী গৌরী, মহিকা দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। * * * একাধারে পরিচালক ও অভিনেতারূপে বিকাশ রায় আবার আত্মপ্রকাশ করবেন “রাজাসাজা” ছবিটির মাধ্যমে। এর সংলাপ রচনার ভার নিয়েছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। রূপায়ণে দেখা যাবে বিকাশ রায় উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, ভাস্কর রায়, চন্দ্রাবতী দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি শিল্পীর দলকে। * * “হুক” ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্ৰদূতগোষ্ঠী। সুরারোপ করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছবিটির মাধ্যমে আপনায় উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংক বসু, তরুণকুমার, গঙ্গালী, রঙ্গুনার, তুলসী চক্রবর্তী, শ্রীমান দীপক এবং শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রূপদক্ষ শিল্পীদের অভিনয় দেখতে পাবেন। * * দীর্ঘকাল পরে পঞ্চজ মল্লিকের সুরসমৃদ্ধ একটি ছবি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। ছবিটির নাম “নিমাই”। শিনাকীভূষণ পরিচালিত এই ছবিটির কাহিনীকার অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে অভিনয় করছেন বলে যে সকল অভিনয়শিল্পীর নাম ঘোষিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্তাল, বিশ্বজিৎ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিনন্দন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান বাবুয়া ও তিলক, মালিনা দেবী, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, রেণুকা রায় এবং শ্রীমতী অমরাধা গুহের নাম সর্বশেষ উল্লেখনীয়।

গৃহপালিতের কথা

সহিবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হিমালয় শিখর তার পরিপূর্ণ বক্ষের উপমা
সুকুমার স্রবকের প্রথম লে মুক্ত-মনোবদা
লক্ষ কেন্দ্রভূত দেখে—মনে মনে গল্পতরুকে সখা
সেই সে সমুদ্রে গিরে তারই ভরে হল পলাতিকা;

পাখির ঠোঁটের মত ব্যঙ্গবিদ্য বালুকার শর
তার পায়ে পায়ে কুরে ঢেকে দিল দিগন্ত প্রান্তর
নয়-লক্ষা বুকে নিয়ে সৈন্যবাহিনীর বিজয়ের হাতে
সে হরত ধরা দেবে সমুদ্রের পৌরব পোড়াতে;

আমি তাই ডাকলাম, নির্ধাষিতা, ধর কত ভাল—
বাইরে যেখানে নিয়ে ত্রিসন্ধ্যার ইন্দ্রধনু আলো
সত্যের সমস্ত স্ত্রি রানি থাকে সতীর্ণ জিতরে
আর সে হুতুই সাধ্য হ্রাসাক্ষী বিপর সাগরে;

অবসর বিপুল লক্ষ্য—সৈন্যবাহিনীর শত্রু হলো দুপ
জেরে দেখি অবিভক্ত তবু সেই পক্ষের লক্ষণ!

সাময়িক প্রসঙ্গ

দিল্লীতে রাজ্যপালবর্গ

“দিল্লীতে রাজ্যপাল সম্মেলনে রাজ্যপালগণ নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনতার উপর গুলীচালনা বাহাতে এড়ান যায় তাহার চেষ্টা করা দরকার। আর যদি গুলী চালাইতেই হয় তবে তাহা যেন একেবারে শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।” জনতার উপর গুলীচালনার ঐতিহ্য এদেশে ব্রিটিশ আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখার জন্য ব্রিটিশরা ঐ অস্ত্র দেশ শাসনের স্বাভাবিক উপায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বদেশী আমলে ঐ ঐতিহ্য অনেক আগেই পরিত্যক্ত হওয়া দাচত ছিল—কিন্তু তাহা হয় নাই। ফলে বহু লোককে নিজেদের গণতান্ত্রিক দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়াও প্রাণ দিতে হইয়াছে এবং শাসকশক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা ও বিভেদের প্রাচীর গাড়িয়া উঠিয়াছে। এবার যদি সমস্তকে শাসকবর্গ নূতন দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চান তো মন্দের ভাল বলিতে হইবে।”

—দৈনিক বনুমতী।

বাঙলার নদ-নদী

“পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গার ফলে নদীর যে সব বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা মেরামতের জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চলতি সরকারী বৎসরের হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন। প্রকাশ যে, একজু ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ আছে। কিন্তু চলতি বৎসরে এত টাকা ব্যয় কার্যায় উঠা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া চলতি বৎসরের বাকী পাঁচ মাসের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বাঁধ ভাঙার জন্য বঙ্গার ফলে এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরে বাহাতে উহার পুনরুদ্ধার না ঘটে তৎক্ষণাৎ আগামী বর্ষাঋতুর পূর্বেই সমস্ত ভাঙা বাঁধ মেরামত করার প্রয়োজন ছিল। কর্তৃপক্ষ আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা কেন যে অসম্ভব মনে করিলেন তাহা আমরা হৃদয়লম্ব করিতে পারিতেছি না। এই কাজে তেমন জটিল কোন কারিগরী ব্যবহার প্রয়োজন নাই। উত্তর জঙ্গ দেশে শ্রমিকেরও কোন অভাব নাই। এক্ষণে অবস্থার এই কাজ দুই-তিন বৎসর বিলম্বিত করিবার কোন হেতুই নাই। বাহা হউক, কিছুমাত্র কাজ না হওয়া অপেক্ষা কিছু ক্ষতি হওয়া মন্দের ভাল এবং সেই হিসাবে চলতি সরকারী বৎসরে একজু যে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে সেজন্য আমরা আনন্দিত। তবে আমরা আশা করিব যে, নদীর ভাঙে আর একটু কমিডেই এই কাজ শুরু হইবে এবং আগামী বর্ষার পূর্বেই বাহাতে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। আরও আশা করিব যে, এই টাকার কোন অংশ দুর্নীতির রূপেই উর্বরা-বাইবে

না। আমাদের নিজের গবর্ণমেন্টকে এ কথা বলিয়া নিজেরাই লজ্জাবোধ করিতেছি। কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

পৃথিবী থেকে চাঁদ

“সোভিয়েট রাশিয়ার চন্দ্র আবর্তনকারী রকেট লুনিক-৩ চাঁদের অপর পিঠের যে ছবি বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে, তা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদের যে পিঠটি পৃথিবী হইতে দেখা যায়, তাহার পিছন পিঠটি ইতিপূর্বে কোনদিনই মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লুনিক-৩ এই প্রথম তা মানুষের দৃষ্টিতে অংকিত করিল। কিন্তু এই দিকের ছবিতে দেখা গেল, শুষ্ক সমুদ্রের গর্ভে বহু বিস্তারিত মৃত মক্ক-অঞ্চল ও ছোট-বড় পাহাড়ের কঁকে কঁকে বিক্ষিপ্ত সিক্ততাইন হ্রদ ছাড়া চাঁদের পিছনে কোন নৃতনও বা বিচ্ছিন্ন নাই। অর্থাৎ চন্দ্রলোক জলবায়ু ও প্রাণশূন্য মৃত মক্ক বলিয়া যে ধারণা বহুদিন হইতে চলিত আছে, তা এতদিনে হাতে-কলমে প্রমাণিত হইল। কিন্তু এই যেখানে অবস্থা, সেখানে চাঁদে বাওয়ার জন্ম মানুষের আর আগ্রহ থাকিবে কি? শুষ্ক খাল, মৃত আগ্নেয়গিরি ও ক্ষুদ্রে পাহাড় সমাকীর্ণ এই মৃত্যুকে সোনা রূপা ইউরেনিয়াম কোন লোভের বস্তু নাই। নগর বন্দর উদ্ভান কারখানা কোন কিছু বানানোর সুযোগ নাই। কোন সুখে মানুষ সেখানে ঘাটাবে? গল্প আছে প্রেসিডেন্ট রুগার বলতেন, আর যেখানেই থাক, চাঁদে সোনা নাই। থাকিলে ইংরেজরা ঠিক সেখানে হাজির হইত। ইংরেজদের আজ আর সেদিন নাই, তবে আমেরিকা চাঁদে বাইবার জন্য এ পথন্ত লাগাড়ে আয়োজন করিয়াছে। জানি না লুনিক ৩এর ফোটোগ্রাফের পর তাহার উজ্জম অঁটু আছে কিনা! তবে রাশিয়া চাঁদে হাজির হওয়ার আগেই ত দেখিতেছি সেখানে তাহার পতাকা প্রোথিত করিয়াছে এবং সমস্ত মক্ক পাহাড় ও প্রান্তরকে রক্ত নামে চিহ্নিত করিয়াছে। এর পর আর দখলী স্বত্ব দাঁড়াইবে কি?”

—যুগান্তর।

রিলিফ কেলেকারী

“বিষয়টি সামান্য নহে। রিলিফে রাজনীতি করার যে-সকল অভিযোগ উঠিতেছে ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সংবাদে ইহাও প্রকাশ, ডাঃ রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গাঙ্গণ কমিটি গঠিত হওয়ায় কংগ্রেসকর্মীদের প্রয়াস বিধাব্যবস্ত হইয়াছে এবং বাদও খাতমাত্রী শ্রীপ্রবুল সেন কংগ্রেসের নামে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেছেন তথাপি কংগ্রেসের প্রতিপত্তিশালী ও বিস্তারিত সমর্থকগণ স্বভাবতই এইবার মুখ্যমন্ত্রীর কমিটির দিকে বেশী করিয়া ঝুঁকিয়াছেন। কংগ্রেসকর্মীদের এই বিধাব্যবস্ত প্রয়াস সত্যই

লক্ষাজনক ব্যাপার! পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকোটি মানুষ এখন বঙ্গুর দুর্গতি ভোগ করিতেছেন ঠিক তখনই রিলিক সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে এই সকল ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে যে, মাছুষকে সত্যকার রিলিক ও সাহায্য করা অপেক্ষা দলগত স্বার্থ এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধিই বড় করিয়া দেখা গিয়াছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়াস সরকারী ও বেসরকারী দলের প্রয়াসের সহিত একত্রিত করিয়া স্তম্ভ রিলিক ব্যবস্থা 'গঠনের যে-প্রস্তাব প্রীত্বোতি বঙ্গু গিয়াছিল, তাহা অন্তিময় তৎপরতার সহিত ডাঃ রায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাহার উপর কংগ্রেসের নিজ দলের ভিতরেই আবার এইরূপ বিধাবিভক্ত প্রচেষ্টা।"

—আখিনতা।

পূজার আসর

"সংবাদপত্রের পোয়া বারো। মা দুর্গার ছবির সাথে বঙ্গাপ্রাণিত অকস্মে ছবির দারুণ প্রতিধ্বনিত। দুর্গতদের ত্বি ও কাহিনী নিন্তা পাঠা ছুড়ে আছে। নাই কেবল সাহায্য বিতরণের ত্বি। নাই কোন কথা—কত কষ্ট স্বীকার করে দুর্গত এলাকার সরকারী কণ্ঠচ্যারী সতবরাহ পৌছে দিচ্ছে। তা কি করে হয়? ভয়াবহ চিত্র ক্ষয়-ক্ষতির বীভৎস রূপ না দিলে কালো বাজার কীপবে কেন? মোক্ষা কথা। গত পূজার আসর এই ভাবেই কাটিলো।"

—বর্তমানবাণী।

উদ্বাস্ত ঋণ বটনে পলদ

"করিমগঞ্জ পুনর্নগতি অফিসে একই উদ্বাস্তর নামে মঞ্জুরীকৃত ৫০০ শত টাকা ঋণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে দুইবার বটন করার পর তৃতীয়বার বটন করা কালে তাহা ধরা পড়ে। করিমগঞ্জের পুলিশ এক বৎসর এই ব্যাপারে তদন্তক্রমে করিমগঞ্জ উদ্বাস্ত পুনর্নগতি অফিসের দুইজন কোরাণী শ্রীমালনী নাথ ও শ্রীযতীন্দ্র দত্ত এবং অপর পাঁচজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১, ৪২০ ও ৪৬৮ ধারামুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশে, ১৯৫৬ ইংরাজীতে শ্রীরাইমোহন নাথের নামে ৫০০ শত টাকার পুনর্বাসন ঋণ মঞ্জুর হয়। শ্রীহরিশ দেবনাথ নামক এক ব্যক্তি করিমগঞ্জ উদ্বাস্ত সাহায্য ও পুনর্নগতি অফিসে কোন কোন কণ্ঠচ্যারীর সহিত যোগাযোগ করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে রাইমোহন নাথ নামে পরিচয় দিয়া আবেদনপত্রের কটো পরিবর্তন ক্রমে উদ্বাস্ত ঋণ গ্রহণ করে। এর পর যখন প্রকৃত রাইমোহন নাথ উপস্থিত হন তখন দরখাস্তের কটো ঠিক করিয়া আবার তাকে একই মরখাস্তের উপর ঋণ দেওয়া হয়। এর পর নকল রাইমোহন নাথের নামে তৃতীয়বার ঋণ বটনের চেষ্টা করা হয়। ফিল্ড ইন্সপেক্টরের শ্রী এ সিদ্ধিকী এই সম্পর্কে তদন্তক্রমে রিপোর্ট দেন যে, এই মরখাস্তের উপর পূর্বে দুইবার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ তদন্তক্রমে দুইজন কোরাণী, নকল রাইমোহন নাথ, তাহার দুইজন জামিনদার ও অপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শ্রীহরিশ দেবনাথ, পলাতক। বলিয়া জানা যায়।"

বুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

শিখার উপর ময়ূর পাখা

"প্রতি বছর রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের বিনা খরচায় মোট দুই হাজার মাইল পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে সদস্যদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত আইনের উপর একটি সশোভনী বিল আনা হইতেছে। রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নের পরিশ্রমিক্তে বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের রাজ্য ও গৃহ নির্মাণ, শিল্প, কৃষি, সেচ প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলির সহিত ভাগভাবে পরচিত করার উদ্দেশ্যে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন ও কমিটি মিটিংয়ে ষোণ দিবার জন্য যে বেতন ও ভাতা সদস্যদের দেওয়া হয়, তাহা ছাড়াও তাহাদের বিনা খরচায় উপরোক্ত ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হইবে। এই বিলটি আইনে পরিণত হইলে উহার ব্যবস্থা অনুসারে সদস্যদের দুই হাজার মাইল ভ্রমণের জন্য বিমান রেল অথবা স্ট্রামারের ভাড়া এবং এই আইনের বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট অঙ্কত ভাতা দেওয়া হইবে।"

—প্রদীপ (বেদিনীপুর)

যৌতুক নিবারণ বিল

"যৌতুক নিবারণ বিলের উদ্দেশ্য যৌতুক গ্রহণ বা দান নিবারণ করা। বিবাহের দুই পক্ষের মধ্যে যে কোন পক্ষ বিবাহের সময়ে যে সকল গহনা, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিবে, সেইগুলির মোট মূল্য যদি দুই হাজার টাকার অধিক না হয় তবে তাহা 'যৌতুক' বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক বা দান গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক বা দান গ্রহণের জন্য পণবদ্ধ হন, তবে তাহাদের ছয় মাস পর্যন্ত কারাগারে বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। যৌতুক দাবী করাকেও অপরাধ গণ্য করা হইয়াছে। কোনও বিবাহে, যে নারীর বিবাহ হইতেছে তাহান ছাড়া আর কোনও ব্যক্তি যদি কোনও যৌতুক গ্রহণ করেন তবে সেই বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে সেই ব্যক্তিকে সেই যৌতুক অরুই সেই নারীর নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে। না করিলে সেই ব্যক্তি দণ্ডিত হইবেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে কোন অপরাধের অনুষ্ঠান হইলে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন জেলাসরকারী দ্বারা তাহার বিচার হইতে পারবে।"

—বারাসাতবার্তা।

সরকারের গাফিলতি

"বিত্তীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিদ্রাশ্রয় গাফিলতির ফলে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। কোন কোন খাতে মোট বরাদ্দের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ব্যয় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ও সহরে যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী বাসস্থানের অভাবে অস্বাস্থ্যকর স্থানে মাথা গুজিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে, কলিকাতায় হাজার হাজার লোক যখন ফুটপাথকেই বাসস্থান করিয়া লইয়াছে, ক্ষমতাবিশিষ্ট ভাড়া গাণিয়া মধ্যবিত্ত নাগরিককে যে সময় যেখানে সেখানে বাসা কারতে হইতেছে, সেই সময় বাসগৃহ নির্মাণ খাতে বাজেটে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ বিত্তীয় পরিকল্পনায় মধ্যে প্যাঁচ বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর কাবার হইয়া গেলেও এই বরাদ্দের নাম মাত্র টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

—বেদিনীপুর

বজার প্রতিকার

“১১৫৬ আর এবছরের সর্বস্বাসী বজা সকল তরুর ‘সীমাসা’ করে, সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের জলাধার আর খালের জল মানুষের সকল আশায় বর্ষা দিয়ে সারা রাজ্যে আজ ধ্বংস-উন্নাদনার বিভিন্ন রূপ প্রকট করেছে। খালের বাঁধগুলোও অনেক বায়গার জল নিকাশী ব্যবহার বাধা দিয়ে হাজার হাজার একর জমির কসল নষ্ট করেছে। তাই প্রশ্ন হল, মানুষকে এভাবে গৃহহারা, সর্বহারা, ছয়ছাড়া করার কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকার করবেন না? আজও কি মান বাঁচানোর জন্য চোখ রাঙিয়ে, ধমক দিয়ে, গুলীর ভয় দেখিয়ে সকলের জন্য ভবিষ্যতের সকল আশা আকাখা কি নির্মূল করবেন? ডি. ডি. সি. কর্তৃপক্ষ এবং কোন কোন বস্ত্রী বলছেন যে এরকম অতিবৃষ্টি প্রায় প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার হয়। জিজ্ঞাস্য করি, এ সকল প্রতিভাবান ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিত বিশারদদের এ ভাষ্য তাঁরা কোথা হতে পেলেন? আমরা জানি পূর্বে কোথায় কত বৃষ্টিপাত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ পাণ্ডুর ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ করে বর্ধমান জেলায় ও ডি. ডি. সি. জলাধার এলাকায়। আর যদি এরূপ তথ্য তাঁদের জানা ছিল তাহলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা হয়নি কেন?”

—নিশান (বর্ধমান)।

সরকারী সাফাই

“দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার যুগপাত এই সমালোচনার ঘনাবে কতকগুলি সাফাই গিয়েছেন। প্রথম, এবারের হত বজা অভিযুক্ত ‘মের’ অর্গতের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে ৫০ বছরে একবার এইরকম বজা হয় এবং এই বিশেষ অবস্থায় বজা নিরোধ ‘বহু-সংস্করণ বর্তমান’ পরিকল্পনার নাই। দ্বিতীয় সাফাই হচ্ছে যে, আবহাওয়া কি রকম থাকবে, কোন অঞ্চলে কবে কতটা বৃষ্টি হবে, এ সম্পর্কে যদি সঠিক ও যথেষ্ট আগে থেকে ধরন না পাওয়া যায়, তবে বাঁধের হ্রদে কতটা জল রাখতে হবে আর কতটা কোন সময়ে ছেড়ে দিতে হবে, তা সিদ্ধান্ত করা যায় না। অর্থাৎ সেবাটা হচ্ছে দাবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। তৃতীয় একটি ‘হাস্যকর’ সাফাই হচ্ছে অতিবৃষ্টির ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে বোগাবোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন হওয়ায় বৃষ্টিপাতের সঠিক ধরন বাঁধ-কর্তৃপক্ষের কাছে না পৌঁছানোর এই বিশিষ্ট ঘটনা।”

—জনসাধারণ।

শোক সন্বাদ

আচার্য্য মন্থমোহন বসু

মুদ্রপ্রণয় শিক্ষাব্রতী, নাট্যকলাবিশেষজ্ঞ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি পদম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মন্থমোহন বসু মহাশয় গত ২১শে আশ্বিন ১১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। ইরানী, বাঙালী ও সংস্কৃত ভাষায় এর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সর্বজনবিদিত। অভিনেতা ও সমালোচকরূপেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতি, অধিকারী

ছিলেন। নটক শিক্ষাক্ষেত্র ও নটশৈলীর নবোদয়ও এর কাছ থেকেই সম্ভব শিক্ষালাভ করে পরবর্তী জীবনে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আসন অধিকার করেন। ‘স্ট্রিপ চ্যাট’ কলেজের বাঙালী ভাষার ইনি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, পরে এমারিটাস প্রফেসরের পৌরবে বিভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একে সম্মানিত স্বর্ণপদক এবং গিরিশ লেকচারারের আসনে বরণ করে সম্মানিত করেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি মানাভাবে জড়িত। ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যবিভাগের প্রথম সভাপতি হন বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করেন মন্থমোহন। ভারতীয় সাহিত্যপত্রসেবী-সম্ভারও ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। এর প্রতিভা বা কর্মক্ষমতা বহুস্থায়ী। শিয়ালদহ কোর্টে প্রথম জুরীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের আসনেও মন্থমোহনকে অধিষ্ঠিত দেখা গেছে। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটরূপে তাঁর বিশেষ এই যে, তদানীন্তন ব্রিটিশ যুগে শাসনবিভাগের প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও মন্থমোহন বাঙালী ভাষার রায় লিখে এক দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। ‘এ’র উত্তর পুত্রই (অমিত্য বসু ও লালমোহন বসু) অভিনেতারূপে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। উভয়েই বর্তমানে পরলোকগত। এই বীরদান শ্রমীবরের জিরোয়ানে বাঙ্গালার সংস্কৃতি ঙ্গিতে একজন প্রধান পুরুষের অভাব ঘটল।

স্মার রূপেন্দ্রকুমার মিত্র

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, লেবার ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইব্যুনালের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ স্মার রূপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় গত ২২ই কান্তিক ১০ বছর বয়সে শের-ই-নাশাস ত্যাগ করেছেন। প্রথম জীবনে হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ী রূপে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইনি অন্তিম বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে অবসর গ্রহণের প্রাতিশ্রুতি কিছুকাল অস্বাভাব্যে প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তুরায়ত্তের মামলার ইনি স্মার আন্তোভোবের সহকারীর অঙ্গগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোলা এবং আইন ফ্যাকালটির জীবনের আসনও এর দ্বারা অলঙ্কৃত। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার একে ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত করেন। স্মার রূপেন্দ্রের স্মৃতিতে একজন তীক্ষ্ণ, ভায়নিষ্ঠ, নিষ্ঠাক আইনব্যবহারী আসন শূন্য হল।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং পূর্ববাঙালার অসহযোগ আন্দোলনের অন্ততম নেতা করিমপুরের বিশিষ্ট ভূস্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী গত ১২ই আশ্বিন ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। করিমপুরে ওকালতি ব্যবসায় গুরু করার অল্পকালের মধ্যেই ইনি দেওয়ানী কোর্টের উত্তর সেক্রেট্রী একজন বশবী আইনজ্ঞরূপে পরিগণিত হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রচুর পদার সত্ত্বেও জাতীয়তার আহ্বানে উৎসাহ হয়ে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

সম্পাদক—প্রোগ্রামেটর হটক

কলিকাতা ১৩৬ শ্রম বিশিষ্টবিশারদ। ‘বঙ্গবতী বোটারী মেলিঙ্গে’ জীভারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক দ্বিতীয় ও প্রকাশিত,



খ্রীষ্টাব্দে জন্মকাল

আধুনিক কাল কোন পণ্ডিতের মতে 'ঐতিহাসিক খ্রীষ্টাব্দের জন্মকাল খৃঃপূঃ ১৫০০ থেকে ১২০০ বৎসর অন্তর্গত হ'য়েছে। এ নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার অপেক্ষা রাখে বলে মনে করি। সমগ্র জগৎ ছাড়া অন্য তথ্যে জ্যোতিষ একটি। জ্যোতিষ জর্মে Astrology নয়। Astronomy জ্যোতির্বিজ্ঞান। বা গাণিতিক জ্যোতিষ। বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে কাল নির্ণয়িত হ'ত। খ্রীঃপূঃ ৩৬০০ বৎসর পূর্বে বেদান্ত জ্যোতিষের আবির্ভাব কাল বলে নিরূপিত হ'য়েছে। তখন থেকেই বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রাদির সমাবেশ ও স্থান, বিবরণ, অক্ষাংশ ও অয়নাংশ ইত্যাদির গণনা সাহায্যে 'ঐতিহাসিক' প্রাচীন যুগের কাল নির্ণয় অনেকটা সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। পরবর্তী যুগে গাণিতিক জ্যোতিষের আরও সমধিক চর্চা ও উন্নতি ঘন হ'য়েছে। এর ফলে আমরা পাই—বৃহৎসংহিতা, সূর্যসিদ্ধান্ত, পদ্যসিদ্ধান্ত, গর্গ্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, আর ভট্ট ইত্যাদি গাণিতিক জ্যোতিষ শাস্ত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞান। পরব্রহ্ম ভগবান খ্রীষ্টাব্দের প্রকালোত্তর আবির্ভাবকাল দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে। (ভাগবতাদি হু উষ্ট্রবা।) 'স চ দ্বাপর যুগশ্চৈব ভাস্কর্যকালমায়ং রোহিণী নক্ষত্রে নিশীথে আবিভূতঃ।' 'নৈশীথে সময়োহষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মক মন্ত্রে স্তোত্রীকৃষ্ণাভিধমবুধক্ষণমভূদাবিঃ পরঃ ব্রহ্ম তৎ ॥'—ইতি খ মানিকা ন জ্যোতির্বিজ্ঞানঃ। বৃহদী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শকারি বিক্রমাদিতে রাজসভার নবমস্তব অঙ্গতম ব্রহ্ম আচার্য বরাহসিদ্ধ বা বরাহমিহির। বরাহসিদ্ধ বা গাণিতিক জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তারপরের আর্য পাই তাঁর রচিত সূর্যসিদ্ধান্ত ও বৃহৎ সংহিতা নামকগ্রন্থ। আধুনিক পঞ্জিকা গণনা প্রথা আচার্যসিদ্ধের এই সূর্যসিদ্ধান্তের নিকট কই বললে অত্যুক্তি হ'বে না। অবশ্য এই সময়ে ইউরোপে এস ও গ্রাম ব্যতীত অন্তর্য গাণিতিক জ্যোতিষের চর্চা ছিল সল মনে হয় না। পরবর্তী কালে ইউরোপে এক আমেরিকান গাণিতিক জ্যোতিষের বহুল চর্চা আরম্ভ হয়। এর ফলে আমরা H. Jacqy, M. Winternitz, W. D. Whitney প্রভৃতি মনোহর গাণিতিক জ্যোতিষ গণনার পরিচয় পাই। মহাভারতের বৃষ্টির রাজসভার কাল নির্ণয় হয়েছে বরাহসিদ্ধের বৃহৎসংহিতায়। আচার্য বরাহগর্গ্যসিদ্ধের একটি বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন বৃষ্টির রাজসভার বরংক্রম কাল খৃঃপূঃ ২৪৪১ বৎসর। তিলক মহারাজ Orion নামক গ্রন্থেও অনুরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। সূর্যসিদ্ধের পুনঃপ্রবর্তী কলিযুগের বরংক্রম কাল অভাবি ৫৬০০ বৎসর পিত হ'য়েছে। অতএব দ্বাপর যুগের শেষভাগ খৃষ্টাব্দের প্রায় ৩৬০০ বৎসর পূর্ব দ্বারা উচিত। অতএব

আচার্যসিদ্ধের মতে খ্রীষ্টাব্দের জন্মকাল নিরূপণে কিছুটা বিভ্রান্তির স্থিতি করে ভুলেছে। বেহু মহাভারতের কালও ত দ্বাপরযুগের শেষভাগে নির্ণীত হ'য়েছে। ঐতিহাসিক খ্রীষ্টাব্দের জন্মকাল ১৫০০ হতে ১২০০ খৃঃপূঃ এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি বা তথ্য নিরূপিত হ'য়েছে বলে মনে পড়ে না। তবে হয়ত কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতের অনুরূপ প্রতিকলন শুধি হতে পারে। অতএব এ মতবাক্যও সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না।

আধুনিক পুরাতত্ত্ব আলোচনা বা উদ্ভাটনের ক্ষেত্রে বা কল্পনা অনুযায়ী 'ঐতিহাসিক' বৈদিকযুগের বা পৌরাণিক যুগের কাল নির্ণয় করা এক দুর্ভাগ্য ব্যাপার বলে মনে হয়। প্রাচীন বৈদিক যুগের কাল নির্ণয়ের জন্য শিলালিপি, ভগ্নমূর্তি, ভাস্কর্য, শিলাস্তম্ভ এমন কি লিপিমালার আশ্রিত গঠন ইত্যাদি এ বিষয়ে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। একমাত্র ভাষা ও বর্ণমালার বা ভাস্কর্যলিপির গঠনের ক্ষেত্রে ধরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সকল কাল নির্ণয় করেছেন সেগুলিতে অনেক বিভ্রান্তির স্থিতি করেছে। অধুনা বেদগ্রন্থ হাওয়া পড়িয়ে উঠা প্রচেষ্টা হ'য়েছে। হাজার হাজার যুগ ধরে স্মৃতিপরাশ্রয় বেদজ্ঞানের বিষয়বস্তু চিত্রিত হ'য়েছে। এইরূপ বেদের আর এক নাম স্মৃতি। বেদের সেই আদিম যুগে অর্থাৎ স্মৃতিপরাশ্রয় কালে বৈদিক লিপি বা ভাষা কি রূপ জ্ঞান হ'য়েছিল। প্রাচীন বৈদিক ভাষা ও পরবর্তীকালের রূপান্তরিত বৈদিক ভাষা ও বর্ণমালার গঠনাক্রমে পঞ্চাশতাব্দীর ফলে আধুনিক পণ্ডিতদের, বিশেষত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাল নির্ণয় যে অজ্ঞান, এইরূপ মানসিক প্রবণতার কিছুটা পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। খ্রীষ্টাব্দের জন্মকাল নির্ণয় স্বাক্ষরে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অবশ্য গাণিতিক জ্যোতিষ নির্ণীত খ্রীষ্টাব্দের জন্মের সমসাময়িক যে দুইটি সময়ের উল্লেখ করা হ'য়েছে তা যে একেবারে অজ্ঞান, এরূপ মতের গোড়ামী পোষণের মনোভাব আমার নৈ। গণিত বিচারে যে সময় সময় কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি উদ্ভব না হয় এমন কিছু কলা চলে না। তবে তা মারাত্মক ব্যবধান ঘটনা করে না। তবে গাণিতিক জ্যোতিষের সাহায্য ব্যতীত উক্ত কাল নির্ণয়ও যে দুর্ভাগ্য ব্যাপার, এ বিষয়ে সন্দেহ নৈ।—হেম সমাজদার।

পত্রিকা-প্রসঙ্গে

জেলেবেলা থেকেই-মাসিক বসন্তমতীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তবে গত দশ বছরের মধ্যে সেই পরিচয় গাঢ় হতে গাঢ়ত্ব করে উঠেছে। বর্তমান দশকে, আপনার সম্পাদনার অনন্তসাধারণ কৃতিত্বে বিষয়-বিহীন হয়ে বাচ্চি। বাঙলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত কেবল মাত্র নাটকই নয় কাগজও পড়িয়ে উঠেছে কিন্তু অধিকাংশই বা চোখে পড়ে লবই, পত্রাঙ্গণিকার দ্বারা কোমরকর্মে এগিয়ে চলেছে; না আছে

তাদের কোন বৈশিষ্ট্য, না কোন নিজস্বতা, না তারা যেনে হচ্ছে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের পৌরস্বয় চিহ্ন। কিন্তু যদিও এ কথা বলা বাতুলই তবু বর্লছি যে, মাসিক বসুমতী তাদের ব্যতিক্রম, শুধু ব্যতিক্রম বলায় তুল হয়, এক উল্লেখ্যতম ব্যতিক্রম। মাসিক বসুমতীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি বলেই কৈয়কটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি বা আপনাকে অমরোথ জানাই। "বর্ণালী" আগে সত্যি ভাল লাগত, বেশ লিখছিলেন সুলেখা লালকণ্ঠ, তবে এখন বেশ লিখছেন এ কথা বলা চলে না। কেন না একটি উপক্ৰাস শেষ করতে তিনি এক দীর্ঘ সময় নিচ্ছেন যার ফলে ঐ উপক্ৰাস এখনও কেউ পড়ছেন বলে মনে হয় না, এখন বর্ণালী ভাবনক একঘেয়ে মনে হচ্ছে এবং পড়ারও আর ঐধি থাকছে না। আচ্ছা, বর্ণালী তিনি কবে শেষ করবেন জানানেন কি? আর একটি অমরোথ—মাসিক বসুমতীতে আন্তঃকাল কোট গল্পের সংখ্যা কিছু কম দেখছি, এ বিষয়ে একটি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে সুখী হয়।—বিনীতা সেনগুপ্তা, লক্ষ্মী, উত্তরপ্রদেশ।

বঙ্গ বর্মণীর মৌনবিক্রম

মাসিক বসুমতী আমি নিয়মিত পড়ি। এই ভাদ্র মাসের মাসিক বসুমতীতে নির্মলচন্দ্র চৌধুরার লিখিত "বঙ্গ বর্মণীর মৌনবিক্রম" (P ৭৫১) পড়িলাম। ঐ প্রবন্ধের প্রথম (paragraph) "অল্প কয়েক দিন—বেটিদের প্রতিমূর্তি অপসারিত হইয়াছে। ইহা লইয়া... প্রকাশিত হইয়াছে—" এই অপসারণের কথা ৭৫০ পৃষ্ঠার ওপরেই আবার উল্লেখ করা আছে। বেটিদের মূর্তি কবে অপসারিত হইয়াছিল কিবা খবরের কাগজে কবে অনেক আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানি না। "অম্মি অন্তত ৩৫ বৎসর বাবং High Court এর main gate এর High Court এর লিক মুখ করিয়া ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিয়া আসিতেছি; High Court এর main gate দিয়া যে High Court এর প্রবেশ করে সে ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিতে পায়। Sensation ও Interest এর জন্য ঐরূপ ভুল সংবাদ দিলে কখন কখন কাজ হয় কিন্তু সর্বদা কাজ হয় না, বরং হাতাশ্পন্ন হইতে হয়—ঐ প্রবেশচন্দ্র কর। ৩৮ এ, রমেশ মিত্র রোড। কলি—২৫।

রাজনৈতিক বন্দিনী

আপনার বাঙ্গালী পরিচিত (চারজন) ভাদ্র সংখ্যা ১৩৬৬ সনের শ্রীমতী কল্পনা বোশীর (পৃষ্ঠা ৭৭৫) বিষয়ে এক জায়গায় জানিয়েছেন যে "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে মেয়ে রাজনৈতিক বন্দিনীদের (—) আন্দামানে প্রেরণ করা হয় নাই।" এ সত্যকে শ্রীমতী কিবা দাসের "বৃক্ষল-তত্ত্ব" (পৃষ্ঠা ৬৮) আপনার দৃষ্টি-আকর্ষণ করি।—ইহা আমাদের আন্দামান বাবার কথা হয়, যাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ে বাঁদের চোঁতার আমাদের (মেয়েদের) আন্দামান বাওয়া বন্ধ করা হয়—তাদের একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন এণ্ডার্স। সি, এক, এণ্ডার্স-এর নাম এ সম্পর্কে উল্লেখ না করলে ব্যবহারটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।—শ্রীসমর ভাট্টা। ২৫১১, চৌধুরীপাড়া সেন। পোঃ সীতাপাহি। হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমি আপনাকে ১০ পাঠাইলাম। এই বৎসর ভাদ্র মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত (৮ মাস) দয়া করিয়া আপনার

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিক শ্রেণীভুক্ত করিবেন। ভট্টনী দত্ত। গৌরকপুর।

১৫ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের ভাদ্র হইতে ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া রাখিত করিবেন। ডাঃ এক ক্রীত। সাওতাল পরগণা।

Being the yearly subscription for Monthly Basumati. Please send the same regularly. Principal, Sibsagar College, Joysagar.

আমাকে পুনরায় ভাদ্র মাস হইতে গ্রাহক করিয়া লইবেন। ৭৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া রাখিত করিবেন।—জ্যোৎস্না সেন। বাক/ভাগলপুর।

বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ৭৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইব। প্রাঞ্জলি লালকণ্ঠ। মীরট।

আমার ছয় মাসের চাঁদা ৭৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া হিসাবে জমা করিয়া লইবেন ও পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইবেন।—আরতি মুখোপাধ্যায়। বৃন্দাবন মহর।

Sending subscription for next twelve months. Rs. 15-0-0 only. R. N. Sikder Jalpaiguri.

১৫ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া রাখিত করিবেন। অমিতা দেবী, পূর্ণিমা।

Sending herewith Rs. 7-50 n.p. towards our subscription for the monthly Basumati commencing from Bhadra to Magh. সেক্রেটারী, কুম্ভার লাব, ছগলী।

Remitting herewith the subscription for Monthly Magazine Basumati for the period from Kartick to Chaitra 1366 B.S. against receipt No. 49764. Please arrange to supply same regularly. Sm. Radharani Mitra, 27B Indra Biswas Road. Cal-37.

Sending herewith halfyearly subscription with effect from Sravan 1366 B. S. Please acknowledge the receipt of the amount. Headmaster, Rajganj M. N. High School. Jalpaiguri.

কিনাডেলকিয়াতে অমলকুমার ঘোষের নামে মাসিক বসুমতী পাঠাইবার জন্য আগামী কার্তিক হইতে চৈত্র বাবৎ ১২৭ পাঠাইলাম। তরুলতা ঘোষ, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১।

আপনার পত্রাধিবাসী রেজেষ্ট্রি খরচ বাবৎ ৬ পাঠাইলাম। সমস্ত মাসিক বসুমতী পাঠাইছেন। বন্দিনী লিখা, মেদিনীপুর।

